রবীন্দ্র রচনাবলী

দশম খণ্ড

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

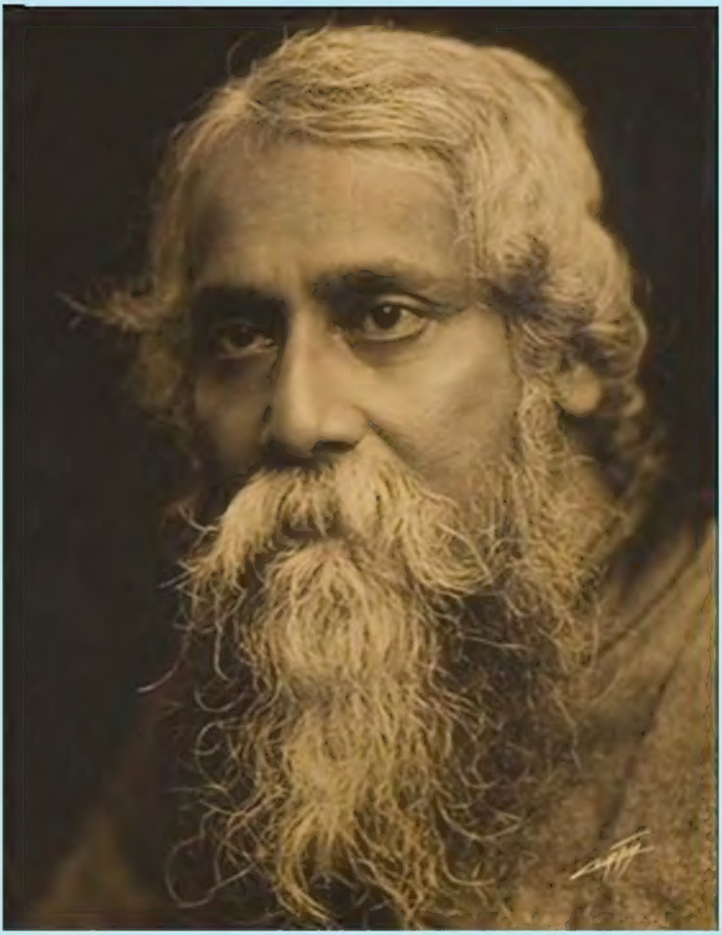

রবীন্দ্র-রচনাবলী

দশম খণ্ড

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

50,378

বিশ্বভারতী
২, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

প্রকাশক—শ্রীপুলিনবিহারী সেন
বিশ্বভারতী, ৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা

প্রথম প্রকাশ—চৈত্র, ১৩৪৮
মূল্য ৪॥০, ৫৸০, ৬৸০ ও ৮॥০

মুদ্রাকর—শ্রীগঙ্গানারায়ণ ভট্টাচার্য
তাপসী প্রেস, ৩০ কর্নওআলিস স্ট্রীট, কলিকাতা

সূচী

চিত্রসূচী ।৶৹

কবিতা ও গান

উৎসর্গ ৩
খেয়া ৯৩

নাটক ও প্রহসন

রাজা ১৯১

উপন্যাস ও গল্প

শেষের কবিতা ২৬৯

প্রবন্ধ

রাজা ও প্রজা ৩৭৭
সমূহ ৪৮৫
পরিশিষ্ট ৫৩৩
গ্রন্থ-পরিচয় ৬৪৩
বর্ণানুক্রমিক সূচী ৬৬৭

চিত্রসূচী

আশ্রমগুরু রবীন্দ্রনাথ ৭

'খেয়া'র পাণ্ডুলিপির এক পৃষ্ঠা ১২৪

কবিতা ও গান

উৎসর্গ

রেভারেণ্ড সি. এফ্‌. এণ্ডরুজ
প্রিয়বন্ধুবরেষু

শান্তিনিকেতন
১লা বৈশাখ
১৩২১

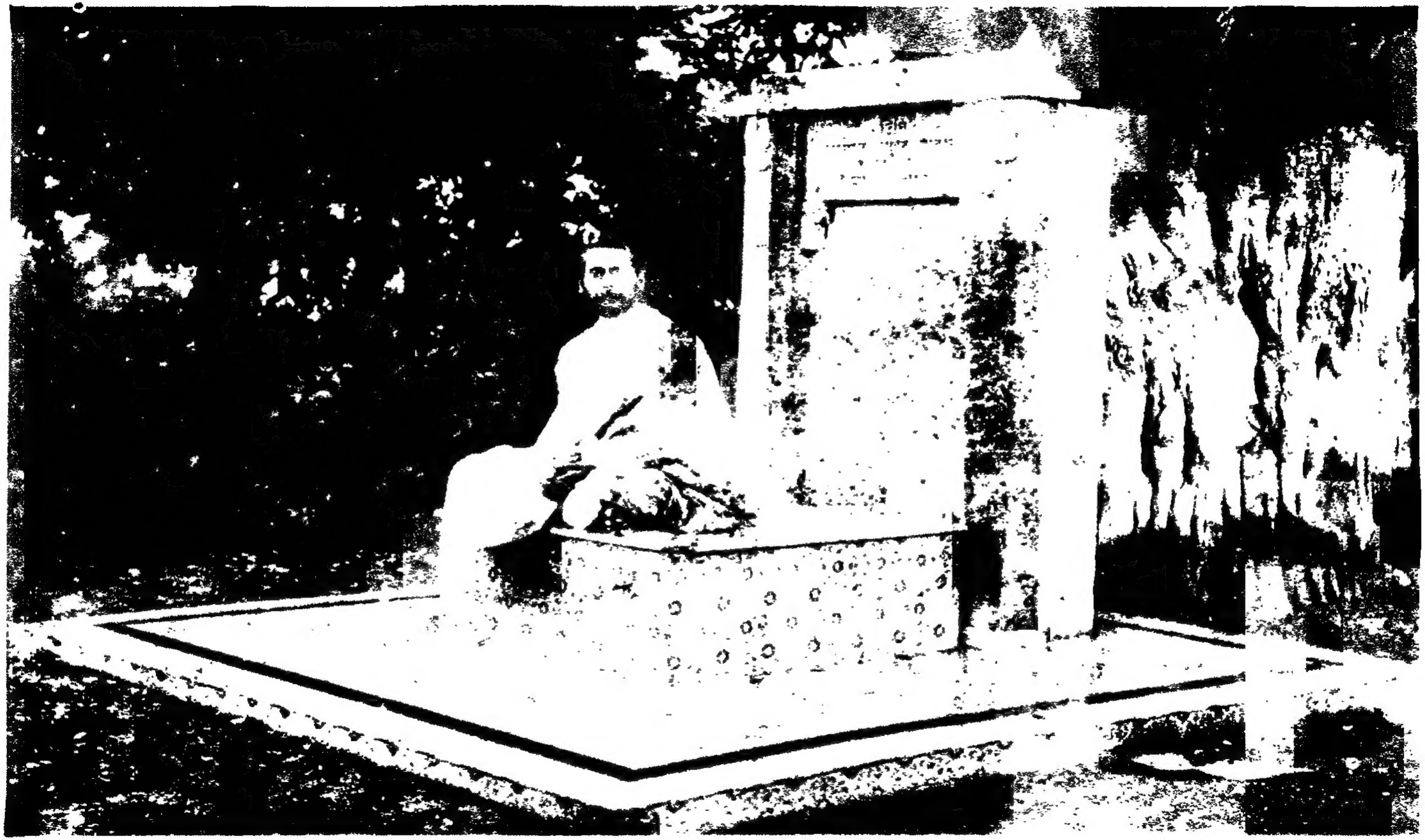

আশ্রমগুরু রবীন্দ্রনাথ

উৎসর্গ

১

ভোরের পাখি ডাকে কোথায়
ভোরের পাখি ডাকে।
ভোর না হতে ভোরের খবর
কেমন করে রাখে।
এখনো যে আঁধার নিশি
জড়িয়ে আছে সকল দিশি
কালিবরন পুচ্ছ-ডোরের
হাজার লক্ষ পাকে।
ঘুমিয়ে-পড়া বনের কোণে
পাখি কোথায় ডাকে।

ওগো তুমি ভোরের পাখি,
ভোরের ছোটো পাখি।
কোন্ অরুণের আভাস পেয়ে
মেল তোমার আঁখি।
কোমল তোমার পাখার 'পরে
সোনার রেখা স্তরে স্তরে,
বাঁধা আছে ডানায় তোমার
উষার রাঙা রাখি
ওগো তুমি ভোরের পাখি।
ভোরের ছোটো পাখি।

রয়েছে বট, শতেক জটা
ঝুলছে মাটি ব্যেপে,
পাতার উপর পাতার ঘটা
উঠছে ফুলে ফেঁপে।
তাহারি কোন্ কোণের শাখে
নিদ্রাহারা ঝিঁঝির ডাকে
বাঁকিয়ে গ্রীবা ঘুমিয়েছিলে
পাখাতে মুখ ঝেঁপে,
যেখানে বট দাঁড়িয়ে একা
জটায় মাটি ব্যেপে।

ওগো ভোরের সরল পাখি
কহ আমায় কহ—
ছায়ায় ঢাকা দ্বিগুণ রাতে
ঘুমিয়ে যখন রহ,
হঠাৎ তোমার কুলায় 'পরে
কেমন ক'রে প্রবেশ করে
আকাশ হতে আঁধার পথে
আলোর বার্তাবহ?
ওগো ভোরের সরল পাখি
কহ আমায় কহ!

কোমল তোমার বুকের তলে
রক্ত নেচে উঠে
উড়বে ব'লে পুলক জাগে
তোমার পক্ষপুটে।
চক্ষু মেলি পুবের পানে
নিদ্রা-ভাঙা নবীন গানে

অকুণ্ঠিত কণ্ঠ তোমার
উৎস-সমান ছুটে।
কোমল তোমার বুকের তলে
রক্ত নেচে উঠে।

এত আঁধারমাঝে তোমার
এতই অসংশয়।
বিশ্বজনে কেহই তোরে
করে না প্রত্যয়।
তুমি ডাক, "দাঁড়াও পথে,
সূর্য আসেন স্বর্ণরথে,
রাত্রি নয়, রাত্রি নয়,
রাত্রি নয় নয়।"
এত আঁধারমাঝে তোমার
এতই অসংশয়!

আনন্দেতে জাগো আজি
আনন্দেতে জাগো।
ভোরের পাখি ডাকে যে ঐ
তন্দ্রা এখন না গো।
প্রথম আলো পড়ুক মাথায়,
নিদ্রা-ভাঙা আঁখির পাতায়,
জ্যোতির্ময়ী উদয়-দেবীর
আশীর্বচন মাগো।
ভোরের পাখি গাহিছে ঐ,
আনন্দেতে জাগো।

২

কেবল তব মুখের পানে
চাহিয়া,
বাহির হনু তিমির রাতে
তরণীখানি বাহিয়া।
অরুণ আজি উঠেছে,
অশোক আজি ফুটেছে,
না যদি উঠে, না যদি ফুটে,
তবুও আমি চলিব ছুটে,
তোমার মুখে চাহিয়া।

নয়নপাতে ডেকেছ মোরে
নীরবে।
হৃদয় মোর নিমেষমাঝে
উঠেছে ভরি গরবে।
শঙ্খ তব বাজিল,
সোনার তরী সাজিল,
না যদি বাজে, না যদি সাজে,
গরব যদি টুটে গো লাজে,
চলিব তবু নীরবে।

কথাটি আমি শুধাব নাকো
তোমারে।
দাঁড়াব নাকো ক্ষণেক তরে
দ্বিধার ভরে দুয়ারে।
বাতাসে পাল ফুলিছে,
পতাকা আজি দুলিছে,
না যদি ফুলে, না যদি দুলে,
তরণী যদি না লাগে কূলে,
শুধাব নাকো তোমারে।

৩

মোর কিছু ধন আছে সংসারে,
বাকি সব ধন স্বপনে,
নিভৃত স্বপনে।
ওগো কোথা মোর আশার অতীত,
ওগো কোথা তুমি পরশ-চকিত,
কোথা গো স্বপনবিহারী।
তুমি এস এস গভীর গোপনে,
এস গো নিবিড় নীরব চরণে,
বসনে প্রদীপ নিবারি,
এস গো গোপনে।
মোর কিছু ধন আছে সংসারে
বাকি সব আছে স্বপনে
নিভৃত স্বপনে।

রাজপথ দিয়ে আসিয়ো না তুমি
পথ ভরিয়াছে আলোকে,
প্রখর আলোকে।
সবার অজানা, হে মোর বিদেশী,
তোমারে না যেন দেখে প্রতিবেশী,
হে মোর স্বপনবিহারী।
তোমারে চিনিব প্রাণের পুলকে,
চিনিব সজল আঁখির পলকে,
চিনিব বিরলে নেহারি
পরম পুলকে।
এস প্রদোষের ছায়াতল দিয়ে,
এসো না পথের আলোকে
প্রখর আলোকে।

৪

তোমারে পাছে সহজে বুঝি
তাই কি এত লীলার ছল,
বাহিরে যবে হাসির ছটা
ভিতরে থাকে আঁখির জল।
বুঝি গো আমি, বুঝি গো তব
ছলনা,
যে-কথা তুমি বলিতে চাও
সে-কথা তুমি বল না।

তোমারে পাছে সহজে ধরি
কিছুরি তব কিনারা নাই,
দশের দলে টানি গো পাছে
বিরূপ তুমি, বিমুখ তাই।
বুঝি গো আমি, বুঝি গো তব
ছলনা,
যে-পথে তুমি চলিতে চাও
সে-পথে তুমি চল না।

সবার চেয়ে অধিক চাহ
তাই কি তুমি ফিরিয়া যাও?
হেলার ভরে খেলার মতো
ভিক্ষাঝুলি ভাসায়ে দাও?
বুঝেছি আমি বুঝেছি তব
ছলনা,
সবার যাহে তৃপ্তি হল
তোমার তাহে হল না!

৫

আপনারে তুমি করিবে গোপন
কী করি ?
হৃদয় তোমার আঁখির পাতায়
থেকে থেকে পড়ে ঠিকরি'।
আজ আসিয়াছ কৌতুক-বেশে,
মানিকের হার পরি এলোকেশে,
নয়নের কোণে আধো হাসি হেসে
এসেছ হৃদয়-পুলিনে।
ভুলি নে তোমার বাঁকা কটাক্ষে,
ভুলি নে চতুর নিঠুর বাক্যে
ভুলি নে।
কর-পল্লবে দিলে যে আঘাত
করিব কি তাহে আঁখিজলপাত ?
এমন অবোধ নহি গো।
হাসো তুমি, আমি হাসিমুখে সব
সহি গো।

আজ এই বেশে এসেছ আমায়
ভুলাতে।
কভু কি আস নি দীপ্ত ললাটে
স্নিগ্ধ পরশ বুলাতে ?
দেখেছি তোমার মুখ কথাহারা
জলে ছলছল ম্লান আঁখিতারা,
দেখেছি তোমার ভয়-ভরে সারা
করুণ পেলব মুরতি।
দেখেছি তোমার বেদনা-বিধুর
পলক-বিহীন নয়নে মধুর
মিনতি।

আজি হাসিমাখা নিপুণ শাসনে
তরাস আমি যে পাব মনে মনে
এমন অবোধ নহি গো।
হাসো তুমি, আমি হাসিমুখে সব
সহি গো।

৬

তোমায় চিনি বলে আমি করেছি গরব
লোকের মাঝে;
মোর আঁকা পটে দেখেছে তোমায়
অনেকে অনেক সাজে।
কত জনে এসে মোরে ডেকে কয়—
"কে গো সে"—শুধায় তব পরিচয়,
"কে গো সে?"
তখন কী কই, নাহি আসে বাণী,
আমি শুধু বলি, "কী জানি কী জানি।"
তুমি শুনে হাস, তারা দুষে মোরে
কী দোষে।

তোমার অনেক কাহিনী গাহিয়াছি আমি
অনেক গানে।
গোপন বারতা লুকায়ে রাখিতে
পারি নি আপন প্রাণে।
কত জন মোরে ডাকিয়া কয়েছে,
"যা গাহিছ তার অর্থ রয়েছে
কিছু কি?"
তখন কী কই, নাহি আসে বাণী,
আমি শুধু বলি, "অর্থ কী জানি।"
তারা হেসে যায়, তুমি হাস বসে
মুচুকি।

তোমায় জানি না চিনি না এ-কথা বলো তো
কেমনে বলি ?
খনে খনে তুমি উঁকি মারি চাও,
খনে খনে যাও ছলি ।
জ্যোৎস্না-নিশীথে, পূর্ণ শশীতে,
দেখেছি তোমার ঘোমটা খসিতে,
আঁখির পলকে পেয়েছি তোমায়
লখিতে ।
বক্ষ সহসা উঠিয়াছে দুলি,
অকারণে আঁখি উঠেছে আকুলি,
বুঝেছি হৃদয়ে ফেলেছ চরণ
চকিতে ।

তোমায় খনে খনে আমি বাঁধিতে চেয়েছি
কথার ডোরে ।
চিরকাল তরে গানের সুরেতে
রাখিতে চেয়েছি ধরে ।
সোনার ছন্দে পাতিয়াছি ফাঁদ,
বাঁশিতে ভরেছি কোমল নিখাদ,
তবু সংশয় জাগে—ধরা তুমি
দিলে কি ?
কাজ নাই, তুমি যা খুশি তা করো
ধরা নাই দাও, মোর মন হরো,
চিনি বা না চিনি প্রাণ উঠে যেন
পুলকি ।

৭

পাগল হইয়া বনে বনে ফিরি
আপন গন্ধে মম
কস্তুরীমৃগসম।
ফাল্গুন-রাতে দক্ষিণ-বায়ে
কোথা দিশা খুঁজে পাই না,
যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই,
যাহা পাই তাহা চাই না।

বক্ষ হইতে বাহির হইয়া
আপন বাসনা মম
ফিরে মরীচিকাসম।
বাহু মেলি তারে বক্ষে লইতে
বক্ষে ফিরিয়া পাই না।
যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই
যাহা পাই তাহা চাই না।

নিজের গানেরে বাঁধিয়া ধরিতে
চাহে যেন বাঁশি মম,
উতলা পাগলসম।
যারে বাঁধি ধরে তার মাঝে আর
রাগিণী খুঁজিয়া পাই না।
যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই
যাহা পাই তাহা চাই না।

৮

আমি চঞ্চল হে,
আমি সুদূরের পিয়াসি।
দিন চলে যায়, আমি আনমনে
তারি আশা চেয়ে থাকি বাতায়নে,
ওগো প্রাণে মনে আমি যে তাহার
পরশ পাবার প্রয়াসী।
আমি সুদূরের পিয়াসি।
ওগো সুদূর, বিপুল সুদূর। তুমি যে
বাজাও ব্যাকুল বাঁশরি।
মোর ডানা নাই, আছি এক ঠাঁই,
সে-কথা যে যাই পাসরি।

আমি উৎসুক হে,
হে সুদূর, আমি প্রবাসী।
তুমি দুর্লভ দুরাশার মতো
কী কথা আমায় শুনাও সতত।
তব ভাষা শুনে তোমারে হৃদয়
জেনেছে তাহার স্বভাষী।
হে সুদূর, আমি প্রবাসী।
ওগো সুদূর, বিপুল সুদূর। তুমি যে
বাজাও ব্যাকুল বাঁশরি।
নাহি জানি পথ, নাহি মোর রথ
সে-কথা যে যাই পাসরি।

আমি উন্মনা হে,
হে সুদূর, আমি উদাসী।
রৌদ্র-মাখানো অলস বেলায়
তরু-মর্মরে, ছায়ার খেলায়

কী মুরতি তব নীলাকাশশায়ী
নয়নে উঠে গো আভাসি।
হে সুদূর, আমি উদাসী।
ওগো সুদূর, বিপুল সুদূর। তুমি যে
বাজাও ব্যাকুল বাঁশরি।
কক্ষে আমার রুদ্ধ দুয়ার
সে-কথা যে যাই পাসরি।

৯

কুঁড়ির ভিতরে কাঁদিছে গন্ধ অন্ধ হয়ে—
কাঁদিছে আপন মনে,—
কুসুমের দলে বন্ধ হয়ে
করুণ কাতর স্বনে
কহিছে সে—হায় হায়,
বেলা যায় বেলা যায় গো
ফাগুনের বেলা যায়।
ভয় নাই তোর, ভয় নাই ওরে, ভয় নাই,
কিছু নাই তোর ভাবনা।
কুসুম ফুটিবে, বাঁধন টুটিবে,
পুরিবে সকল কামনা।
নিঃশেষ হয়ে যাবি যবে তুই
ফাগুন তখনো যাবে না।

কুঁড়ির ভিতরে ফিরিছে গন্ধ কিসের আশে
ফিরিছে আপনমাঝে,
বাহিরিতে চায় আকুল শ্বাসে
কী জানি কিসের কাজে।

কহিছে সে—হায় হায়,
কোথা আমি যাই, কারে চাই গো
না জানিয়া দিন যায়।
ভয় নাই তোর, ভয় নাই ওরে, ভয় নাই,
কিছু নাই তোর ভাবনা।
দখিন-পবন দ্বারে দিয়া কান
জেনেছে রে তোর কামনা।
আপনারে তোর না করিয়া ভোর
দিন তোর চলে যাবে না।

কুঁড়ির ভিতরে আকুল গন্ধ ভাবিছে বসে—
ভাবিছে উদাসপারা,—
জীবন আমার কাহার দোষে
এমন অর্থহারা।
কহিছে সে—হায় হায়।
কেন আমি কাঁদি, কেন আছি গো
অর্থ না বুঝা যায়।
ভয় নাই তোর, ভয় নাই ওরে, ভয় নাই,
কিছু নাই তোর ভাবনা।
যে শুভ প্রভাতে সকলের সাথে
মিলিবি, পুরাবি কামনা,
আপন অর্থ সেদিন বুঝিবি।
জনম ব্যর্থ যাবে না।

১০

আমার মাঝারে যে আছে, কে গো সে,
কোন্ বিরহিণী নারী?
আপন করিতে চাহিনু তাহারে,
কিছুতেই নাহি পারি।

রমণীরে কে বা জানে—
মন তার কোন্‌খানে।
সেবা করিলাম দিবানিশি তার,
গাঁথি দিনু গলে কত ফুলহার,
মনে হল, সুখে প্রসন্ন মুখে
চাহিল সে মোর পানে।
কিছু দিন যায়, একদিন হায়
ফেলিল নয়নবারি—
"তোমাতে আমার কোনো সুখ নাই"
কহে বিরহিণী নারী।

রতনে জড়িত নূপুর তাহারে
পরায়ে দিলাম পায়ে,
রজনী জাগিয়া ব্যজন করিনু
চন্দন-ভিজা বায়ে।
রমণীরে কে বা জানে—
মন তার কোন্‌খানে।
কনক-খচিত পালঙ্ক 'পরে
বসানু তাহারে বহু সমাদরে,
মনে হল হেন হাসিমুখে যেন
চাহিল সে মোর পানে।
কিছু দিন যায়, লুটায়ে ধুলায়
ফেলিল নয়নবারি—
"এ-সবে আমার কোনো সুখ নাই"
কহে বিরহিণী নারী।

বাহিরে আনিনু তাহারে, করিতে
হৃদয়-দিগ্‌বিজয়।
সারথি হইয়া রথখানি তার
চালানু ধরণীময়।

রমণীরে কে বা জানে—
মন তার কোন্‌খানে।
দিকে দিকে লোক সঁপি দিল প্রাণ,
দিকে দিকে তার উঠে চাটুগান,
মনে হল তবে দীপ্ত গরবে
চাহিল সে মোর পানে।
কিছু দিন যায় মুখ সে ফিরায়
ফেলে সে নয়নবারি।
"হৃদয় কুড়ায়ে কোনো সুখ নাই"
কহে বিরহিণী নারী।

আমি কহিলাম, "কারে তুমি চাও
ওগো বিরহিণী নারী।"
সে কহিল, "আমি যারে চাই, তার
নাম না কহিতে পারি।"
রমণীরে কে বা জানে—
মন তার কোন্‌খানে।
সে কহিল, "আমি যারে চাই তারে
পলকে যদি গো পাই দেখিবারে,
পুলকে তখনি লব তারে চিনি,
চাহি তার মুখপানে।"
দিন চলে যায়, সে কেবল হায়
ফেলে নয়নের বারি।
"অজানারে কবে আপন করিব"
কহে বিরহিণী নারী॥

১১

না জানি কারে দেখিয়াছি,
দেখেছি কার মুখ।
প্রভাতে আজ পেয়েছি তার চিঠি।
পেয়েছি তাই সুখে আছি,
পেয়েছি এই সুখ
কারেও আমি দেখাব নাকো সেটি।
লিখন আমি নাহিকো জানি
বুঝি না কী যে রয়েছে বাণী,
যা আছে থাক্ আমার থাক্ তাহা।
পেয়েছি এই সুখে আজি
পবনে উঠে বাঁশরি বাজি,
পেয়েছি সুখে পরান গাহে আহা।

পণ্ডিত সে কোথা আছে,
শুনেছি নাকি তিনি
পড়িয়া দেন লিখন নানামতো।
যাব না আমি তাঁর কাছে,
তাঁহারে নাহি চিনি,
থাকুন লয়ে পুরানো পুঁথি যত।
শুনিয়া কথা পাব না দিশে,
বুঝেন কিনা বুঝিব কিসে।
ধন্দ লয়ে পড়িব মহাগোলে।
তাহার চেয়ে এ লিপিখানি
মাথায় কভু রাখিব আনি
যতনে কভু তুলিব ধরি কোলে।

রজনী যবে আঁধারিয়া
আসিবে চারিধারে,
গগনে যবে উঠিবে গ্রহতারা ;

ধরিব লিপি প্রসারিয়া
বসিয়া গৃহদ্বারে
পুলকে রব হয়ে পলকহারা।
তখন নদী চলিবে বাহি
যা আছে লেখা তাহাই গাহি,
লিপির গান গাবে বনের পাতা।
আকাশ হতে সপ্তঋষি
গাহিবে ভেদি গহন নিশি
গভীর তানে গোপন এই গাথা।

বুঝি না বুঝি ক্ষতি কিবা,
রব অবোধসম।
পেয়েছি যাহা কে লবে তাহা কাড়ি।
রয়েছে যাহা নিশিদিবা
রহিবে তাহা মম,
বুকের ধন যাবে না বুক ছাড়ি।
খুঁজিতে গিয়া বৃথাই খুঁজি,
বুঝিতে গিয়া ভুল যে বুঝি,
ঘুরিতে গিয়া কাছেরে করি দূর।
না বোঝা মোর লিখনখানি
প্রাণের বোঝা ফেলিল টানি,
সকল গানে লাগায়ে দিল সুর।

১২

হায় গগন নহিলে তোমারে ধরিবে কে বা।
ওগো তপন তোমার স্বপন দেখি যে করিতে পারি নে সেবা।
শিশির কহিল কাঁদিয়া,
“তোমারে রাখি যে বাঁধিয়া
হে রবি, এমন নাহিকো আমার বল।
তোমা বিনা তাই ক্ষুদ্র জীবন কেবলি অশ্রুজল।”

“আমি বিপুল কিরণে ভুবন করি যে আলো,
তবু শিশিরটুকুরে ধরা দিতে পারি
বাসিতে পারি যে ভালো।”
শিশিরের বুকে আসিয়া
কহিল তপন হাসিয়া,
“ছোটো হয়ে আমি রহিব তোমারে ভরি,
তোমার ক্ষুদ্র জীবন গড়িব
হাসির মতন করি।”

১৩

আজ মনে হয় সকলেরি মাঝে
তোমারেই ভালোবেসেছি।
জনতা বাহিয়া চিরদিন ধরে
শুধু তুমি আমি এসেছি।
দেখি চারিদিক পানে,
কী যে জেগে ওঠে প্রাণে।
তোমার আমার অসীম মিলন
যেন গো সকল খানে।
কত যুগ এই আকাশে যাপিনু
সে-কথা অনেক ভুলেছি।
তারায় তারায় যে-আলো কাঁপিছে
সে-আলোকে দোঁহে দুলেছি।

তৃণ-রোমাঞ্চ ধরণীর পানে
আশ্বিনে নব আলোকে
চেয়ে দেখি যবে আপনার মনে
প্রাণ ভরি উঠে পুলকে।
মনে হয় যেন জানি
এই অকথিত বাণী,

মূক মেদিনীর মর্মের মাঝে
জাগিছে যে ভাবখানি।
এই প্রাণে-ভরা মাটির ভিতরে
কত যুগ মোরা জেগেছি,
কত শরতের সোনার আলোকে
কত তৃণে দোঁহে কেঁপেছি।

প্রাচীন কালের পড়ি ইতিহাস
সুখের দুখের কাহিনী ;
পরিচিতসম বেজে ওঠে সেই
অতীতের যত রাগিণী।
পুরাতন সেই গীতি
সে যেন আমার স্মৃতি।
কোন্ ভাণ্ডারে সঞ্চয় তার
গোপনে রয়েছে নিতি।
প্রাণে তাহা কত মুদিয়া রয়েছে
কত বা উঠিছে মেলিয়া—
পিতামহদের জীবনে আমরা
দু-জনে এসেছি খেলিয়া।

লক্ষ বরষ আগে যে-প্রভাত
উঠেছিল এই ভুবনে
তাহার অরুণ-কিরণ-কণিকা
গাঁথ নি কি মোর জীবনে ?
সে-প্রভাতে কোন্খানে
জেগেছিনু কেবা জানে।
কী মুরতি মাঝে ফুটালে আমারে
সেদিন লুকায়ে প্রাণে।

হে চির-পুরানো, চিরকাল মোরে
গড়িছ নূতন করিয়া।
চিরদিন তুমি সাথে ছিলে মোর
রবে চিরদিন ধরিয়া।

১৪

সব ঠাঁই মোর ঘর আছে, আমি
সেই ঘর মরি খুঁজিয়া।
দেশে দেশে মোর দেশ আছে, আমি
সেই দেশ লব যুঝিয়া।
পরবাসী আমি যে-দুয়ারে চাই—
তারি মাঝে মোর আছে যেন ঠাঁই,
কোথা দিয়া সেথা প্রবেশিতে পাই
সন্ধান লব বুঝিয়া।
ঘরে ঘরে আছে পরমাত্মীয়,
তারে আমি ফিরি খুঁজিয়া।

রহিয়া রহিয়া নব বসন্তে
ফুল-সুগন্ধ গগনে
কেঁদে ফেরে হিয়া মিলন-বিহীন
মিলনের শুভ লগনে।
আপনার যারা আছে চারিভিতে
পারি নি তাদের আপন করিতে,
তারা নিশিদিসি জাগাইছে চিতে
বিরহ-বেদনা সঘনে।
পাশে আছে যারা তাদেরি হারায়ে
ফিরে প্রাণ সারা গগনে।

তৃণে পুলকিত যে মাটির ধরা
　　লুটায় আমার সামনে—
সে আমায় ডাকে এমন করিয়া
　　কেন যে, কব তা কেমনে।
মনে হয় যেন সে ধূলির তলে
যুগে যুগে আমি ছিনু তৃণে জলে,
সে-দুয়ার খুলি কবে কোন্ ছলে
　　বাহির হয়েছি ভ্রমণে।
সেই মূক মাটি মোর মুখ চেয়ে
　　লুটায় আমার সামনে।

নিশার আকাশ কেমন করিয়া
　　তাকায় আমার পানে সে।
লক্ষযোজন দূরের তারকা
　　মোর নাম যেন জানে সে।
যে-ভাষায় তারা করে কানাকানি
সাধ্য কী আর মনে তাহা আনি;
চিরদিবসের ভুলে-যাওয়া বাণী
　　কোন্ কথা মনে আনে সে।
অনাদি উষার বন্ধু আমার
　　তাকায় আমার পানে সে।

এ সাত-মহলা ভবনে আমার,
　　চির-জনমের ভিটাতে
স্থলে জলে আমি হাজার বাঁধনে
　　বাঁধা যে গিঁঠাতে গিঁঠাতে।
তবু হায় ভুলে যাই বারে বারে
দূরে এসে ঘর চাই বাঁধিবারে,

আপনার বাঁধা ঘরেতে কি পারে
ঘরের বাসনা মিটাতে ?
প্রবাসীর বেশে কেন ফিরি হায়
চির-জনমের ভিটাতে ।

যদি চিনি, যদি জানিবারে পাই,
ধুলারেও মানি আপনা ।
ছোটো-বড়ো হীন সবার মাঝারে
করি চিত্তের স্থাপনা ।
হই যদি মাটি, হই যদি জল,
হই যদি তৃণ, হই ফুলফল,
জীব সাথে যদি ফিরি ধরাতল
কিছুতেই নাহি ভাবনা ।
যেথা যাব সেথা অসীম বাঁধনে
অন্তবিহীন আপনা ।

বিশাল বিশ্বে চারিদিক হতে
প্রতি কণা মোরে টানিছে ।
আমার দুয়ারে নিখিল জগৎ
শত কোটি কর হানিছে ।
ওরে মাটি, তুই আমারে কী চাস ?
মোর তরে জল দু-হাত বাড়াস ?
নিশ্বাসে বুকে পশিয়া বাতাস
চির-আহ্বান আনিছে ।
পর ভাবি যারে তারা বারে বারে
সবাই আমারে টানিছে ।

আছে আছে প্রেম ধুলায় ধুলায়,
আনন্দ আছে নিখিলে ।

মিথ্যায় ঘেরে, ছোটো কণাটিরে
তুচ্ছ করিয়া দেখিলে।
জগতের যত অণু রেণু সব
আপনার মাঝে অচল নীরব
বহিছে একটি চির-গৌরব···
এ-কথা না যদি শিখিলে,
জীবনে মরণে ভয়ে ভয়ে তবে
প্রবাসী ফিরিবে নিখিলে।

ধূলা সাথে আমি ধূলা হয়ে রব
সে গৌরবের চরণে।
ফুলমাঝে আমি হব ফুলদল
তাঁর পূজারতি বরণে।
যেথা যাই আর যেথায় চাহি রে
তিল ঠাঁই নাই তাঁহার বাহিরে,
প্রবাস কোথাও নাহি রে নাহি রে
জনমে জনমে মরণে।
যাহা হই আমি তাই হয়ে রব।
সে গৌরবের চরণে।

ধন্য রে আমি অনন্ত কাল,
ধন্য আমার ধরণী।
ধন্য এ মাটি, ধন্য সুদূর
তারকা হিরণ-বরনী।
যেথা আছি আমি আছি তাঁরি দ্বারে,
নাহি জানি ত্রাণ কেন বল কারে।
আছে তাঁরি পারে তাঁরি পারাবারে
বিপুল ভুবন-তরণী।
যা হয়েছি আমি ধন্য হয়েছি
ধন্য এ মোর ধরণী॥

১৫

আকাশ-সিন্ধু মাঝে এক ঠাঁই
কিসের বাতাস লেগেছে,—
জগৎ ঘূর্ণি জেগেছে।
ঝলকি উঠেছে রবিশশাঙ্ক
ঝলকি ছুটেছে তারা,
অযুত চক্র ঘুরিয়া উঠেছে
অবিরাম মাতোয়ারা।
স্থির আছে শুধু একটি বিন্দু
ঘূর্ণির মাঝখানে—
সেইখান হতে স্বর্ণকমল
উঠেছে শূন্যপানে।
সুন্দরী, ওগো সুন্দরী,
শতদলদলে ভুবনলক্ষ্মী
দাঁড়ায়ে রয়েছ মরি মরি।
জগতের পাকে সকলি ঘুরিছে,
অচল তোমার রূপরাশি।
নানাদিক হতে নানা দিন দেখি,—
পাই দেখিবারে ওই হাসি।

জনমে মরণে আলোকে আঁধারে
চলেছি হরণে পূরণে,
ঘুরিয়া চলেছি ঘুরনে।
কাছে যাই যার দেখিতে দেখিতে
চলে যায় সেই দূরে,
হাতে পাই যারে, পলক ফেলিতে
তারে ছুঁয়ে যাই ঘুরে।
কোথাও থাকিতে না পারি ক্ষণেক,
রাখিতে পারি নে কিছু,

মত্ত হৃদয় ছুটে চলে যায়
ফেনপুঞ্জের পিছু।
হে প্রেম, হে ধ্রুবসুন্দর,
স্থিরতার নীড় তুমি রচিয়াছ
ঘূর্ণার পাকে খরতর।
দ্বীপগুলি তব গীতমুখরিত,
ঝরে নির্ঝর কলভাষে,
অসীমের চির-চরম শান্তি
নিমেষের মাঝে মনে আসে।

১৬

হে বিশ্বদেব, মোর কাছে তুমি
দেখা দিলে আজ কী বেশে।
দেখিনু তোমারে পূর্বগগনে,
দেখিনু তোমারে স্বদেশে।
ললাট তোমার নীল নভতল,
বিমল আলোকে চির-উজ্জ্বল,
নীরব আশিস-সম হিমাচল
তব বরাভয় কর,—
সাগর তোমার পরশি চরণ
পদধূলি সদা করিছে হরণ;
জাহ্নবী তব হার-আভরণ
দুলিছে বক্ষ'পর।
হৃদয় খুলিয়া চাহিনু বাহিরে,
হেরিনু আজিকে নিমেষে—
মিলে গেছ ওগো বিশ্বদেবতা
মোর সনাতন স্বদেশে।

শুনিনু তোমার স্তবের মন্ত্র
  অতীতের তপোবনেতে,—
অমর ঋষির হৃদয় ভেদিয়া
  ধ্বনিতেছে ত্রিভুবনেতে।
প্রভাতে, হে দেব, তরুণ তপনে
দেখা দাও যবে উদয়-গগনে
মুখ আপনার ঢাকি আবরণে
  হিরণ-কিরণে গাঁথা,—
তখন ভারতে শুনি চারিভিতে
মিলি কাননের বিহঙ্গগীতে,
প্রাচীন নীরব কণ্ঠ হইতে
  উঠে গায়ত্রীগাথা।
হৃদয় খুলিয়া দাঁড়ানু বাহিরে
  শুনিনু আজিকে নিমেষে,
অতীত হইতে উঠিছে হে দেব,
  তব গান মোর স্বদেশে।

নয়ন মুদিয়া শুনিনু, জানি না
  কোন্ অনাগত বরষে
তব মঙ্গলশঙ্খ তুলিয়া
  বাজায় ভারত হরষে।
ডুবায়ে ধরার রণহুংকার
ভেদি বণিকের ধনঝংকার
মহাকাশতলে উঠে ওংকার
  কোনো বাধা নাহি মানি।
ভারতের শ্বেত হৃদিশতদলে,
দাঁড়ায়ে ভারতী তব পদতলে,
সংগীত-তানে শূন্যে উথলে
  অপূর্ব মহাবাণী।

নয়ন মুদিয়া ভাবীকালপানে
চাহিনু, শুনিনু নিমেষে
তব মঙ্গলবিজয়শঙ্খ
বাজিছে আমার স্বদেশে।

১৭

ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধে,
গন্ধ সে চাহে ধূপেরে রহিতে জুড়ে।
সুর আপনারে ধরা দিতে চাহে ছন্দে,
ছন্দ ফিরিয়া ছুটে যেতে চায় সুরে।
ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ,
রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝারে ছাড়া।
অসীম সে চাহে সীমার নিবিড় সঙ্গ,
সীমা চায় হতে অসীমের মাঝে হারা।
প্রলয়ে সৃজনে না জানি এ কার যুক্তি,
ভাব হতে রূপে অবিরাম যাওয়া-আসা,
বন্ধ ফিরিছে খুঁজিয়া আপন মুক্তি,
মুক্তি মাগিছে বাঁধনের মাঝে বাসা।

১৮

তোমার বীণায় কত তার আছে
কত না সুরে,
আমি তার সাথে আমার তারটি
দিব গো জুড়ে।
তার পর হতে প্রভাতে সাঁঝে
তব বিচিত্র রাগিণী মাঝে
আমারো হৃদয় রণিয়া রণিয়া
বাজিবে তবে।
তোমার সুরেতে আমার পরান
জড়ায়ে রবে।

তোমার তারায় মোর আশাদীপ
রাখিব জ্বালি।
তোমার কুসুমে আমার বাসনা
দিব গো ঢালি।
তার পর হতে নিশীথে প্রাতে
তব বিচিত্র শোভার সাথে
আমারো হৃদয় জ্বলিবে, ফুটিবে
দুলিবে সুখে।
মোর পরানের ছায়াটি পড়িবে
তোমার মুখে।

১৯

হে রাজন্, তুমি আমারে
বাঁশি বাজাবার দিয়েছ যে ভার
তোমার সিংহ-দুয়ারে—
ভুলি নাই তাহা ভুলি নাই,
মাঝে মাঝে তবু ভুলে যাই,
চেয়ে চেয়ে দেখি কে আসে কে যায়
কোথা হতে যায় কোথা রে।

কেহ নাহি চায় থামিতে।
শিরে লয়ে বোঝা চলে যায় সোজা
না চাহে দখিনে বামেতে।
বকুলের শাখে পাখি গায়,
ফুল ফুটে তব আঙিনায়,
না দেখিতে পায় না শুনিতে চায়,
কোথা যায় কোন্ গ্রামেতে।

বাঁশি লই আমি তুলিয়া।
তারা ক্ষণতরে পথের উপরে
বোঝা ফেলে বসে ভুলিয়া।

আছে যাহা চিরপুরাতন
তারে পায় যেন হারাধন,
বলে, "ফুল এ কী ফুটিয়াছে দেখি।
পাখি গায় প্রাণ খুলিয়া।"

হে রাজন্, তুমি আমারে
রেখো চিরদিন বিরামবিহীন
তোমার সিংহ-দুয়ারে।
যারা কিছু নাহি কহে যায়,
সুখদুখভার বহে যায়,
তারা ক্ষণতরে বিস্ময়ভরে
দাঁড়াবে পথের মাঝারে
তোমার সিংহ-দুয়ারে।

২০

দুয়ারে তোমার ভিড় ক'রে যারা আছে,
ভিক্ষা তাদের চুকাইয়া দাও আগে।
মোর নিবেদন নিভৃতে তোমার কাছে,
সেবক তোমার অধিক কিছু না মাগে।
ভাঙিয়া এসেছি ভিক্ষাপাত্র,
শুধু বীণাখানি রেখেছি মাত্র,
বসি এক ধারে পথের কিনারে
বাজাই সে বীণা দিবসরাত্র।

দেখো কতজন মাগিছে রতনধূলি,
কেহ আসিয়াছে যাচিতে নামের ঘটা,—
ভরি নিতে চাহে কেহ বিদ্যার ঝুলি,
কেহ ফিরে যাবে লয়ে বাক্যের ছটা।

আমি আনিয়াছি এ বীণাযন্ত্র,
তব কাছে লব গানের মন্ত্র,
তুমি নিজ-হাতে বাঁধো এ বীণায়
তোমার একটি স্বর্ণতন্ত্র।

নগরের হাটে করিব না বেচাকেনা,
লোকালয়ে আমি লাগিব না কোনো কাজে,
পাব না কিছুই, রাখিব না কারো দেনা,
অলস জীবন যাপিব গ্রামের মাঝে।
তরুতলে বসি মন্দ-মন্দ
ঝংকার দিব কত কী ছন্দ,
যত গান গাব, তব বাঁধা-তারে
বাজিবে তোমার উদার মন্দ্র।

২১

বাহির হইতে দেখো না এমন করে,
আমায় দেখো না বাহিরে।
আমায় পাবে না আমার দুখে ও সুখে,
আমার বেদনা খুঁজো না আমার বুকে,
আমায় দেখিতে পাবে না আমার মুখে,
কবিরে খুঁজিছ যেথায় সেথা সে নাহি রে।

সাগরে সাগরে কলরবে যাহা বাজে,
মেঘগর্জনে ছুটে ঝঞ্ঝার মাঝে,
নীরব মন্দ্রে নিশীথ-আকাশে রাজে
আঁধার হইতে আঁধারে আসন পাতিয়া,—
আমি সেই এই মানবের লোকালয়ে
বাজিয়া উঠেছি সুখে দুখে লাজে ভয়ে,
গরজি ছুটিয়া ধাই জয়ে পরাজয়ে
বিপুল ছন্দে উদার মন্দ্রে মাতিয়া।

যে গন্ধ কাঁপে ফুলের বুকের কাছে,
ভোরের আলোকে যে গান ঘুমায়ে আছে,
শারদধান্যে যে আভা আভাসে নাচে
কিরণে কিরণে হসিত হিরণে-হরিতে,
সেই গন্ধই গড়েছে আমার কায়া,
সে গান আমাতে রচিছে নূতন মায়া,
সে আভা আমার নয়নে ফেলেছে ছায়া ;—
আমার মাঝারে আমারে কে পারে ধরিতে ?

নব-অরণ্যে মর্মর-তান তুলি
যৌবন-বনে উড়াই কুসুমধূলি,
চিত্ত-গুহায় সুপ্ত রাগিণীগুলি
শিহরিয়া উঠে আমার পরশে জাগিয়া।
নবীন উষার তরুণ অরুণে থাকি'
গগনের কোণে মেলি পুলকিত আঁখি,
নীরব প্রদোষে করুণ-কিরণে ঢাকি'
থাকি মানবের হৃদয়চূড়ায় লাগিয়া।

তোমাদের চোখে আঁখিজল ঝরে যবে
আমি তাহাদের গেঁথে দিই গীতরবে,
লাজুক হৃদয় যে-কথাটি নাহি কবে
সুরের ভিতরে লুকাইয়া কহি তাহারে।
নাহি জানি আমি কী পাখা লইয়া উড়ি,
খেলাই ভুলাই দুলাই ফুটাই কুঁড়ি,
কোথা হতে কোন্ গন্ধ যে করি চুরি
সন্ধান তার বলিতে পারি না কাহারে।

যে আমি স্বপন-মুরতি গোপনচারী,
যে আমি আমারে বুঝিতে বুঝাতে নারি,
আপন গানের কাছেতে আপনি হারি,
সেই আমি কবি, কে পারে আমারে ধরিতে।

মানুষ-আকারে বদ্ধ যে জন ঘরে,
ভূমিতে লুটায় প্রতি নিমেষের ভরে,
যাহারে কাঁপায় স্তুতি-নিন্দার জ্বরে,
কবিরে পাবে না তাহার জীবনচরিতে।

২২

আছি আমি বিন্দুরূপে, হে অন্তরযামী,
আছি আমি বিশ্বকেন্দ্রস্থলে। "আছি আমি"
এ-কথা স্মরিলে মনে মহান্ বিস্ময়
আকুল করিয়া দেয়, স্তব্ধ এ হৃদয়
প্রকাণ্ড রহস্যভারে। "আছি আর আছে,"
অন্তহীন আদি প্রহেলিকা, কার কাছে
শুধাইব অর্থ এর? তত্ত্ববিদ্ তাই
কহিতেছে, "এ নিখিলে আর কিছু নাই,
শুধু এক আছে।" করে তারা একাকার
অস্তিত্ব-রহস্যরাশি করি অস্বীকার।
একমাত্র তুমি জান এ ভব সংসারে।
যে আদি গোপন তত্ত্ব,—আমি কবি তারে
চিরকাল সবিনয়ে স্বীকার করিয়া
অপার বিস্ময়ে চিত্ত রাখিব ভরিয়া।

২৩

শূন্য ছিল মন,
নানা কোলাহলে ঢাকা,
নানা আনাগোনা-আঁকা
দিনের মতন।
নানা জনতায় ফাঁকা,
কর্মে অচেতন
শূন্য ছিল মন।

জানি না কখন এল নূপুর-বিহীন
নিঃশব্দ গোধূলি।
দেখি নাই স্বর্ণ-রেখা,
কী লিখিল শেষ লেখা
দিনান্তের তুলি।
আমি যে ছিলাম একা
তাও ছিনু ভুলি।
আইল গোধূলি।

হেনকালে আকাশের বিস্ময়ের মতো
কোন্ স্বর্গ হতে
চাঁদখানি লয়ে হেসে
শুক্ল-সন্ধ্যা এল ভেসে
আঁধারের স্রোতে।
বুঝি সে আপনি মেশে
আপন আলোতে।
এল কোথা হতে।

অকস্মাৎ বিকশিত পুষ্পের পুলকে
তুলিলাম আঁখি।
আর কেহ কোথা নাই
সে শুধু আমারি ঠাঁই
এসেছে একাকী।
সম্মুখে দাঁড়াল তাই
মোর মুখে রাখি
অনিমেষ আঁখি।

রাজহংস এসেছিল কোন্ যুগান্তরে
শুনেছি পুরাণে।

দময়ন্তী আলবালে
স্বর্ণঘটে জল ঢালে
নিকুঞ্জ-বিতানে,—
কার কথা হেনকালে
কহি গেল কানে
শুনেছি পুরাণে।

জ্যোৎস্নাসন্ধ্যা তারি মতো আকাশ বাহিয়া
এল মোর বুকে।
কোন্ দূর প্রবাসের
লিপিখানি আছে এর
ভাষাহীন মুখে।
সে যে কোন্ উৎসুকের
মিলনকৌতুকে
এল মোর বুকে।

দুইখানি শুভ্র ডানা ঘেরিল আমারে
সর্বাঙ্গে হৃদয়ে।
স্কন্ধে মোর রাখি শির
নিস্পন্দ রহিল স্থির,
কথাটি না কয়ে।
কোন্ পদ্ম-বনানীর
কোমলতা লয়ে
পশিল হৃদয়ে?

আর কিছু বুঝি নাই, শুধু বুঝিলাম
আছি আমি একা।
এই শুধু জানিলাম
জানি নাই তার নাম
লিপি যার লেখা।

এই শুধু বুঝিলাম
না পাইলে দেখা
রব আমি একা।

ব্যর্থ হয়, ব্যর্থ হয় এ দিনরজনী,
এ মোর জীবন।
হায় হায়, চিরদিন
হয়ে আছে অর্থহীন
এ বিশ্বভুবন।
অনন্ত প্রেমের ঋণ
করিছে বহন
ব্যর্থ এ জীবন।

ওগো দূত দূরবাসী, ওগো বাক্যহীন,
হে সৌম্য-সুন্দর।
চাহি তব মুখপানে
ভাবিতেছি মুগ্ধপ্রাণে
কী দিব উত্তর?
অশ্রু আসে দু-নয়নে,
নির্বাক অন্তর,
হে সৌম্য-সুন্দর।

২৪

হে নিস্তব্ধ গিরিরাজ, অভ্রভেদী তোমার সংগীত
তরঙ্গিয়া চলিয়াছে অনুদাত্ত উদাত্ত স্বরিত
প্রভাতের দ্বার হতে সন্ধ্যার পশ্চিম নীড়পানে
দুর্গম দুরূহ পথে কী জানি কী বাণীর সন্ধানে।
দুঃসাধ্য উচ্ছ্বাস তব শেষ প্রান্তে উঠি আপনার
সহসা মুহূর্তে যেন হারায়ে ফেলেছে কণ্ঠ তার,
ভুলিয়া গিয়াছে সব সুর,—সামগীত শব্দহারা
নিয়ত চাহিয়া শূন্যে বরষিছে নির্ঝরিণীধারা।

হে গিরি, যৌবন তব যে দুর্দম অগ্নিতাপবেগে
আপনারে উৎসারিয়া মরিতে চাহিয়াছিল মেঘে—
সে তাপ হারায়ে গেছে, সে প্রচণ্ড গতি অবসান,
নিরুদ্দেশ চেষ্টা তব হয়ে গেছে প্রাচীন পাষাণ।
পেয়েছ আপন সীমা, তাই আজি মৌন শান্ত হিয়া
সীমাবিহীনের মাঝে আপনারে দিয়েছ সঁপিয়া।

২৫

ক্লান্ত করিয়াছ তুমি আপনারে, তাই হেরো আজি
তোমার সর্বাঙ্গ ঘেরি পুলকিছে শ্যাম শস্পরাজি
প্রস্ফুটিত পুষ্পজালে; বনস্পতি শত বরষার
আনন্দবর্ষণকাব্য লিখিতেছে পত্রপুঞ্জে তার
বল্কলে শৈবালে জটে; সুদুর্গম তোমার শিখর
নির্ভয় বিহঙ্গ যত কলোল্লাসে করিছে মুখর;
আসি নরনারীদল তোমার বিপুল বক্ষপটে
নিঃশঙ্ক কুটিরগুলি বাঁধিয়াছে নির্ঝরিণীতটে।
যেদিন উঠিয়াছিলে অগ্নিতেজে স্পর্ধিতে আকাশ,
কম্পমান ভূমণ্ডলে, চন্দ্রসূর্য করিবারে গ্রাস,—
সেদিন, হে গিরি, তব এক সঙ্গী আছিল প্রলয়;
যখনি থেমেছ তুমি বলিয়াছ, "আর নয়, নয়,"
চারিদিক হতে এল তোমা'পরে আনন্দ-নিশ্বাস,
তোমার সমাপ্তি ঘেরি বিস্তারিল বিশ্বের বিশ্বাস।

২৬

আজি হেরিতেছি আমি, হে হিমাদ্রি, গভীর নির্জনে
পাঠকের মতো তুমি বসে আছ অচল আসনে,
সনাতন পুঁথিখানি তুলিয়া লয়েছ অঙ্ক'পরে।
পাষাণের পত্রগুলি খুলিয়া গিয়াছে থরে থরে,
পড়িতেছ একমনে। ভাঙিল গড়িল কত দেশ,
গেল এল কত যুগ—পড়া তব হইল না শেষ।

আলোকের দৃষ্টিপথে এই যে সহস্র খোলা পাতা
ইহাতে কি লেখা আছে ভব-ভবানীর প্রেম-গাথা ?
নিরাসক্ত নিরাকাঙ্ক্ষ ধ্যানাতীত মহাযোগীশ্বর
কেমনে দিলেন ধরা সুকোমল দুর্বল সুন্দর
বাহুর করুণ আকর্ষণে ? কিছু নাহি চাহি যাঁর,
তিনি কেন চাহিলেন—ভালোবাসিলেন নির্বিকার,—
পরিলেন পরিণয়পাশ ? এই যে প্রেমের লীলা
ইহারি কাহিনী বহে, হে শৈল, তোমার যত শিলা।

২৭

তুমি আছ হিমাচল ভারতের অনন্তসঞ্চিত
তপস্যার মতো। স্তব্ধ ভূমানন্দ যেন রোমাঞ্চিত
নিবিড় নিগূঢ়ভাবে পথশূন্য তোমার নির্জনে,
নিষ্কলঙ্ক নীহারের অভ্রভেদী আত্মবিসর্জনে।
তোমার সহস্র শৃঙ্গ বাহু তুলি কহিছে নীরবে
ঋষির আশ্বাসবাণী—"শুন শুন বিশ্বজন সবে
জেনেছি, জেনেছি আমি।" যে ওংকার আনন্দ-আলোতে
উঠেছিল ভারতের বিরাট গভীর বক্ষ হতে
আদিঅন্তবিহীনের অখণ্ড অমৃত লোকপানে,
সে আজি উঠিছে বাজি, গিরি, তব বিপুল পাষাণে।
একদিন এ ভারতে বনে বনে হোমাগ্নি-আহুতি
ভাষাহারা মহাবার্তা প্রকাশিতে করেছে আকুতি,
সেই বহ্নিবাণী আজি অচল প্রস্তরশিখারূপে
শৃঙ্গে শৃঙ্গে কোন্ মন্ত্র উচ্ছ্বাসিছে মেঘধূম্রস্তূপে।

২৮

হে হিমাদ্রি, দেবতাত্মা, শৈলে শৈলে আজিও তোমার
অভেদাঙ্গ হরগৌরী আপনারে যেন বারংবার
শৃঙ্গে শৃঙ্গে বিস্তারিয়া ধরিছেন বিচিত্র মুরতি।
ওই হেরি ধ্যানাসনে নিত্যকাল স্তব্ধ পশুপতি,

দুর্গম দুঃসহ মৌন,—জটাপুঞ্জ তুষারসংঘাত
নিঃশব্দে গ্রহণ করে উদয়াস্ত রবিরশ্মিপাত
পূজাস্বর্ণপদ্মদল। কঠিন প্রস্তরকলেবর
মহান্-দরিদ্র, রিক্ত, আভরণহীন দিগম্বর।
হেরো তাঁরে অঙ্গে অঙ্গে এ কী লীলা করেছে বেষ্টন—
মৌনেরে ঘিরিছে গান, স্তব্ধেরে করেছে আলিঙ্গন
সফেন চঞ্চল নৃত্য, রিক্ত কঠিনেরে ওই চুমে
কোমল শ্যামলশোভা নিত্যনব পল্লবে কুসুমে
ছায়ারৌদ্রে মেঘের খেলায়। গিরিশেরে রয়েছেন ঘিরি
পার্বতী মাধুরীচ্ছবি তব শৈলগৃহে হিমগিরি।

২৯

ভারতসমুদ্র তার বাষ্পোচ্ছ্বাস নিশ্বসে গগনে
আলোক করিয়া পান, উদাস দক্ষিণ-সমীরণে,
অনির্বচনীয় যেন আনন্দের অব্যক্ত আবেগ।
ঊর্ধ্ববাহু হিমাচল, তুমি সেই উদ্বাহিত মেঘ
শিখরে শিখরে তব ছায়াচ্ছন্ন গুহায় গুহায়
রাখিছ নিরুদ্ধ করি,—পুনর্বার উন্মুক্ত ধারায়
নূতন আনন্দ-স্রোতে নব প্রাণে ফিরাইয়া দিতে
অসীম-জিজ্ঞাসারত সেই মহাসমুদ্রের চিতে।
সেইমতো ভারতের হৃদয়সমুদ্র এতকাল
করিয়াছে উচ্চারণ ঊর্ধ্বপানে যে বাণী বিশাল,—
অনন্তের জ্যোতিস্পর্শে অনন্তেরে যা দিয়েছে ফিরে—
রেখেছ সঞ্চয় করি, হে হিমাদ্রি, তুমি স্তব্ধশিরে।
তব মৌন শৃঙ্গমাঝে তাই আমি ফিরি অন্বেষণে
ভারতের পরিচয় শান্ত-শিব-অদ্বৈতের সনে।

৩০

ভারতের কোন্ বৃদ্ধ ঋষির তরুণ মূর্তি তুমি
হে আর্য আচার্য জগদীশ ? কী অদৃশ্য তপোভূমি
বিরচিলে এ পাষাণ-নগরীর শুষ্ক ধূলিতলে ?
কোথা পেলে সেই শান্তি এ উন্মত্ত জনকোলাহলে
যার তলে মগ্ন হয়ে মুহূর্তে বিশ্বের কেন্দ্রমাঝে
দাঁড়াইলে একা তুমি—এক যেথা একাকী বিরাজে
সূর্যচন্দ্র-পুষ্পপত্র-পশুপক্ষী-ধুলায়-প্রস্তরে,—
এক তন্দ্রাহীন প্রাণ নিত্য যেথা নিজ অঙ্ক'পরে
দুলাইছে চরাচর নিঃশব্দ সংগীতে। মোরা যবে
মত্ত ছিনু অতীতের অতিদূর নিষ্ফল গৌরবে,
পরবস্ত্রে, পরবাক্যে, পর-ভঙ্গিমার ব্যঙ্গরূপে
কল্লোল করিতেছিনু স্ফীতকণ্ঠে ক্ষুদ্র অন্ধকূপে—
তুমি ছিলে কোন্ দূরে ? আপনার স্তব্ধ ধ্যানাসন
কোথায় পাতিয়াছিলে ? সংযত গম্ভীর করি মন
ছিলে রত তপস্যায় অরূপরশ্মির অন্বেষণে
লোকলোকান্তের অন্তরালে,—যেথা পূর্ব ঋষিগণে
বহুত্বের সিংহদ্বার উদ্ঘাটিয়া একের সাক্ষাতে
দাঁড়াতেন বাক্যহীন স্তম্ভিত বিস্মিত জোড়হাতে।
হে তপস্বী, ডাকো তুমি সামমন্ত্রে জলদগর্জনে
"উত্তিষ্ঠত নিবোধত।" ডাকো শাস্ত্র-অভিমানী জনে
পাণ্ডিত্যের পণ্ডতর্ক হতে। সুবৃহৎ বিশ্বতলে
ডাকো মূঢ় দাম্ভিকেরে। ডাক দাও তব শিষ্যদলে
একত্রে দাঁড়াক তারা তব হোম-হুতাগ্নি ঘিরিয়া।
আরবার এ ভারত আপনাতে আসুক ফিরিয়া
নিষ্ঠায়, শ্রদ্ধায়, ধ্যানে,—বসুক সে অপ্রমত্ত চিতে
লোভহীন দ্বন্দ্বহীন শুদ্ধ শান্ত গুরুর বেদীতে॥

৩১

আজিকে গহন কালিমা লেগেছে গগনে, ওগো,
দিক্‌-দিগন্ত ঢাকি।—
আজিকে আমরা কাঁদিয়া শুধাই সঘনে ওগো,
আমরা খাঁচার পাখি,—
হৃদয়বন্ধু, শুন গো বন্ধু মোর,
আজি কি আসিল প্রলয় রাত্রি ঘোর?
চিরদিবসের আলোক গেল কি মুছিয়া?
চিরদিবসের আশ্বাস গেল ঘুচিয়া?
দেবতার কৃপা আকাশের তলে
কোথা কিছু নাহি বাকি?—
তোমাপানে চাই, কাঁদিয়া শুধাই
আমরা খাঁচার পাখি।

ফাল্গুন এলে সহসা দখিন পবন হতে
মাঝে মাঝে রহি রহি
আসিত সুবাস সুদূর কুঞ্জভবন হতে
অপূর্ব আশা বহি।
হৃদয়বন্ধু, শুন গো বন্ধু মোর,
মাঝে মাঝে যবে রজনী হইত ভোর,
কী মায়ামন্ত্রে বন্ধনদুখ নাশিয়া
খাঁচার কোণেতে প্রভাত পশিত হাসিয়া
ঘনমসি-আঁকা লোহার শলাকা
সোনার সুধায় মাখি।
নিখিল বিশ্ব পাইতাম প্রাণে
আমরা খাঁচার পাখি।

আজি দেখো ওই পূর্ব-অচলে চাহিয়া, হোথা
কিছুই না যায় দেখা,—

আজি কোনো দিকে তিমিরপ্রান্ত দাহিয়া, হোথা
পড়ে নি সোনার রেখা।
হৃদয়বন্ধু, শুন গো বন্ধু মোর,
আজি শৃঙ্খল বাজে অতি সুকঠোর।
আজি পিঞ্জর ভুলাবারে কিছু নাহি রে,
কার সন্ধান করি অন্তরে-বাহিরে।
মরীচিকা লয়ে জুড়াব নয়ন
আপনারে দিব ফাঁকি
সে আলোটুকুও হারায়েছি আজি
আমরা খাঁচার পাখি।

ওগো আমাদের এই ভয়াতুর বেদনা যেন
তোমারে না দেয় ব্যথা।
পিঞ্জরদ্বারে বসিয়া তুমিও কেঁদো না যেন
লয়ে বৃথা আকুলতা।
হৃদয়বন্ধু, শুন গো বন্ধু মোর,
তোমার চরণে নাহি তো লৌহডোর।
সকল মেঘের ঊর্ধ্বে যাও গো উড়িয়া,
সেথা ঢালো তান বিমল শূন্য জুড়িয়া,—
"নেবে নি, নেবে নি প্রভাতের রবি"
কহ আমাদের ডাকি,
মুদিয়া নয়ান শুনি সেই গান
আমরা খাঁচার পাখি।

৩২

যদি ইচ্ছা কর তবে কটাক্ষে, হে নারী,
কবির বিচিত্র গান নিতে পার কাড়ি
আপন চরণপ্রান্তে ; তুমি মুগ্ধ চিতে
মগ্ন আছ আপনার গৃহের সংগীতে।

স্তবে তব নাহি কান, তাই স্তব করি,
তাই আমি ভক্ত তব, অনিন্দ্যসুন্দরী,
ভুবন তোমারে পূজে, জেনেও জান না ;
ভক্তদাসীসম তুমি কর আরাধনা
খ্যাতিহীন প্রিয়জনে। রাজমহিমারে
যে কর-পরশে তব পার করিবারে
দ্বিগুণ মহিমান্বিত, সে সুন্দর করে
ধূলি ঝাঁট দাও তুমি আপনার ঘরে।
সেই তো মহিমা তব সেই তো গরিমা,
সকল মাধুর্য চেয়ে তারি মধুরিমা।

৩৩

দেখো চেয়ে গিরির শিরে
মেঘ করেছে গগন ঘিরে,
আর ক'রো না দেরি।
ওগো আমার মনোহরণ,
ওগো স্নিগ্ধ ঘনবরন,
দাঁড়াও তোমায় হেরি।
দাঁড়াও গো ঐ আকাশকোলে,
দাঁড়াও আমার হৃদয়-দোলে,
দাঁড়াও গো ঐ শ্যামলতৃণ 'পরে,
আকুল চোখের বারি বেয়ে
দাঁড়াও আমার নয়ন ছেয়ে,
জন্মে জন্মে যুগে যুগান্তরে।
অমনি করে ঘনিয়ে তুমি এসো,
অমনি করে তড়িৎ হাসি হেসো,
অমনি করে উড়িয়ে দিয়ো কেশ।
অমনি করে নিবিড় ধারাজলে
অমনি করে ঘন তিমির তলে
আমার তুমি করো নিরুদ্দেশ।

ওগো তোমার দরশ লাগি,
ওগো তোমার পরশ মাগি,
    গুমরে মোর হিয়া।
রহি রহি পরান ব্যেপে
আগুনরেখা কেঁপে কেঁপে
    যায় যে ঝলকিয়া।
আমার চিত্ত-আকাশ জুড়ে
বলাকা-দল যাচ্ছে উড়ে
    জানি নে কোন্ দূর সমুদ্রপারে।
সজল বায়ু উদাস ছুটে,
কোথায় গিয়ে কেঁদে উঠে
    পথবিহীন গহন অন্ধকারে।
    ওগো তোমার আনো খেয়ার তরী,
    তোমার সাথে যাব অকূল 'পরি,
যাব সকল বাঁধন-বাধা-খোলা।
    ঝড়ের বেলা তোমার স্মিতহাসি
    লাগবে আমার সর্বদেহে আসি,
তরাস-সাথে হরষ দিবে দোলা।

ঐ যেখানে ঈশানকোণে
তড়িৎ হানে ক্ষণে ক্ষণে
    বিজন উপকূলে,
তটের পায়ে মাথা কুটে
তরঙ্গদল ফেনিয়ে উঠে
    গিরির পদমূলে;
ঐ যেখানে মেঘের বেণী
জড়িয়ে আছে বনের শ্রেণী
    মর্মরিছে নারিকেলের শাখা,

কত আষাঢ় মাসে
ভিজে মাটির বাসে
বাদলা হাওয়া বয়ে গেছে তাদের কাঁচা ধানে।
সে-সব ঘনঘটার দিনে সে ছিল এইখানে।

এই দিঘি, ঐ আমের বাগান, ঐ যে শিবালয়,
এই আঙিনা ডাক-নামে তার জানে পরিচয়।
এই পুকুরে তারি
সাঁতার-কাটা বারি;
ঘাটের পথ-রেখা তারি চরণ-লেখাময়।
এই গাঁয়ে সে ছিল কে সেই জানে পরিচয়।

এই যাহারা কলস নিয়ে দাঁড়ায় ঘাটে আসি
এরা সবাই দেখেছিল তারি মুখের হাসি।
কুশল পুছি তারে
দাঁড়াত তার দ্বারে
লাঙল কাঁধে চলছে মাঠে ঐ যে প্রাচীন চাষি।
সে ছিল এই গাঁয়ে আমি যারে ভালোবাসি।

পালের তরী কত যে যায় বহি দখিন বায়ে,
দূরপ্রবাসের পথিক এসে বসে বকুলছায়ে;
পারের যাত্রিদলে
খেয়ার ঘাটে চলে,
কেউ গো চেয়ে দেখে না ঐ ভাঙা ঘাটের বাঁয়ে।
আমি যারে ভালোবাসি সে ছিল এই গাঁয়ে॥

৩৫

ওরে আমার কর্মহারা ওরে আমার সৃষ্টিছাড়া
ওরে আমার মন রে আমার মন।
জানি নে তুই কিসের লাগি কোন্ জগতে আছিস জাগি,
কোন্ সেকালের বিলুপ্ত ভুবন।

কোন্ পুরানো যুগের বাণী অর্থ যাহার নাহি জানি,
তোমার মুখে উঠছে আজি ফুটে।
অনন্ত তোর প্রাচীন স্মৃতি কোন্ ভাষাতে গাঁথছে গীতি
শুনে চক্ষে অশ্রুধারা ছুটে।
আজি সকল আকাশ জুড়ে যাচ্ছে তোমার পাখা উড়ে
তোমার সাথে চলতে আমি নারি।
তুমি যাদের চিনি ব'লে টানছ বুকে নিচ্ছ কোলে
আমি তাদের চিনতে নাহি পারি।

আজকে নবীন চৈত্রমাসে পুরাতনের বাতাস আসে,
খুলে গেছে যুগান্তরের সেতু।
মিথ্যা আজি কাজের কথা, আজ জেগেছে যে-সব ব্যথা
এই জীবনে নাইকো তাহার হেতু।
গভীর চিত্তে গোপন শালা সেথা ঘুমায় যে রাজবালা
জানি নে সে কোন্ জনমের পাওয়া।
দেখে নিলেম ক্ষণেক তারে, যেমনি আজি মনের দ্বারে
যবনিকা উড়িয়ে দিল হাওয়া।
ফুলের গন্ধ চুপে চুপে আজি সোনার কাঠিরূপে
ভাঙাল তার চিরযুগের ঘুম।
দেখছে লয়ে মুকুর করে আঁকা তাহার ললাট 'পরে
কোন্ জনমের চন্দন-কুঙ্কুম।

আজকে হৃদয় যাহা কহে মিথ্যা নহে সত্য নহে,
কেবল তাহা অরূপ অপরূপ।
খুলে গেছে কেমন করে আজি অসম্ভবের ঘরে
মর্চে-পড়া পুরানো কুলুপ।
সেথায় মায়াদ্বীপের মাঝে নিমন্ত্রণের বীণা বাজে,
ফেনিয়ে উঠে নীল সাগরের ঢেউ,
মর্মরিত-তমাল-ছায়ে ভিজে-চিকুর শুকায় বায়ে
তাদের চেনে চেনে না বা কেউ।

শৈলতলে চরায় ধেনু রাখালশিশু বাজায় বেণু,
চূড়ায় তারা সোনার মালা পরে।
সোনার তুলি দিয়া লিখা চৈত্রমাসের মরীচিকা
কাঁদায় হিয়া অপূর্বধন-তরে।

গাছের পাতা যেমন কাঁপে দখিন-বায়ে মধুর তাপে,
তেমনি মম কাঁপছে সারা প্রাণ।
কাঁপছে দেহে কাঁপছে মনে হাওয়ার সাথে আলোর সনে,
মর্মরিয়া উঠছে কলতান।
কোন্ অতিথি এসেছে গো কারেও আমি চিনি নে গো
মোর দ্বারে কে করছে আনাগোনা।
ছায়ায় আজি তরুর মূলে ঘাসের 'পরে নদীর কূলে
ওগো তোরা শোনা আমায় শোনা—
দূর আকাশের ঘুম-পাড়ানি মৌমাছিদের মন-হারানি
জুঁই-ফোটানো ঘাস-দোলানো গান,
জলের গায়ে পুলক-দেওয়া ফুলের গন্ধ কুড়িয়ে-নেওয়া
চোখের পাতে ঘুম-বোলানো তান।

শুনাস নে গো ক্লান্ত বুকের বেদনা যত সুখের দুখের
প্রেমের কথা, আশার নিরাশার।
শুনাও শুধু মৃদুমন্দ অর্থবিহীন কথার ছন্দ
শুধু সুরের আকুল ঝংকার।
ধারাযন্ত্রে সিনান করি যত্নে তুমি এস পরি'
চাঁপাবরন লঘু বসনখানি।
ভালে আঁকো ফুলের রেখা চন্দনেরি পত্রলেখা,
কোলের 'পরে সেতার লহ টানি।
দূর দিগন্তে মাঠের পারে সুনীলছায়া গাছের সারে
নয়ন দুটি মগন করি চাও।
ভিন্নদেশী কবির গাঁথা অজানা কোন্ ভাষার গাথা
গুঞ্জরিয়া গুঞ্জরিয়া গাও।

৩৬

আমার খোলা জানালাতে
শব্দবিহীন চরণপাতে
কে এলে গো, কে গো তুমি এলে।
একলা আমি বসে আছি
অস্তলোকের কাছাকাছি
পশ্চিমেতে দুটি নয়ন মেলে।
অতি সুদূর দীর্ঘপথে
আকুল তব আঁচল হতে
আঁধারতলে গন্ধরেখা রাখি'
জোনাক-জ্বালা বনের শেষে
কখন এলে দুয়ারদেশে
শিথিল কেশে ললাটখানি ঢাকি'।

তোমার সাথে আমার পাশে
কত গ্রামের নিদ্রা আসে,
পান্থবিহীন পথের বিজনতা,
ধূসর আলো কত মাঠের,
বধূশূন্য কত ঘাটের
আঁধার কোণে জলের কলকথা।
শৈলতটের পায়ের 'পরে
তরঙ্গদল ঘুমিয়ে পড়ে
স্বপ্ন তারি আনলে বহন করি,
কত বনের শাখে শাখে
পাখির যে গান সুপ্ত থাকে
এনেছ তাই মৌন নূপুর ভরি।

মোর ভালে ঐ কোমল হস্ত
এনে দেয় গো সূর্য-অস্ত,
এনে দেয় গো কাজের অবসান,

সত্যমিথ্যা ভালোমন্দ
সকল সমাপনের ছন্দ,
সন্ধ্যানদীর নিঃশেষিত তান।
আঁচল তব উড়ে এসে
লাগে আমার বক্ষে কেশে,
দেহ যেন মিলায় শূন্য'পরি,
চক্ষু তব মৃত্যুসম
স্তব্ধ আছে মুখে মম
কালো আলোয় সর্বহৃদয় ভরি।

যেমনি তব দখিন-পাণি
তুলে নিল প্রদীপখানি
রেখে দিল আমার গৃহকোণে।
গৃহ আমার একনিমেষে
ব্যাপ্ত হল তারার দেশে
তিমিরতটে আলোর উপবনে।
আজি আমার ঘরের পাশে
গগনপারের কারা আসে
অঙ্গ তাদের নীলাম্বরে ঢাকি।
আজি আমার দ্বারের কাছে
অনাদি রাত স্তব্ধ আছে
তোমার পানে মেলি তাহার আঁখি।

এই মুহূর্তে আধেক ধরা
লয়ে তাহার আঁধার-ভরা
কত বিরাম, কত গভীর প্রীতি
আমার বাতায়নে এসে
দাঁড়াল আজ দিনের শেষে,
শোনায় তোমায় গুঞ্জরিত গীতি।

চক্ষে তব পলক নাহি,
ধ্রুবতারার দিকে চাহি
তাকিয়ে আছ নিরুদ্দেশের পানে।
নীরব দুটি চরণ ফেলে
আঁধার হতে কে গো এলে
আমার ঘরে আমার গীতে গানে।
কত মাঠের শূন্যপথে,
কত পুরীর প্রান্ত হতে
কত সিন্ধুবালুর তীরে তীরে,
কত শান্ত নদীর পারে,
কত স্তব্ধ গ্রামের ধারে,
কত সুপ্ত গৃহদুয়ার ফিরে
কত বনের বায়ুর 'পরে
এলোচুলের আঘাত ক'রে
আসিলে আজ হঠাৎ অকারণে।
বহু দেশের বহু দূরের
বহু দিনের বহু সুরের
আনিলে গান আমার বাতায়নে।

৩৭

আলোকে আসিয়া এরা লীলা করে যায়
আঁধারেতে চলে যায় বাহিরে।
ভাবে মনে বৃথা এই আসা আর যাওয়া,
অর্থ কিছুই এর নাহি রে।
কেন আসি, কেন হাসি,
কেন আঁখিজলে ভাসি,
কার কথা বলে যাই,
কার গান গাহি রে—
অর্থ কিছুই তার নাহি রে।

ওরে মন আয় তুই সাজ ফেলে আয়,
মিছে কী করিস নাট-বেদীতে ?
বুঝিতে চাহিস যদি বাহিরেতে আয়
খেলা ছেড়ে আয় খেলা দেখিতে।
ওই দেখ্ নাটশালা
পরিয়াছে দীপমালা,
সকল রহস্য তুই
চাস যদি ভেদিতে
নিজে না ফিরিস নাট-বেদীতে।

নেমে এসে দূরে এসে দাঁড়াবি যখন,—
দেখিবি কেবল, নাহি খুঁজিবি,
এই হাসি-রোদনের মহানাটকের
অর্থ তখন কিছু বুঝিবি।
একের সহিত একে
মিলাইয়া নিবি দেখে,
বুঝে নিবি,—বিধাতার
সাথে নাহি যুঝিবি,—
দেখিবি কেবল, নাহি খুঁজিবি।

৩৮

চিরকাল এ কী লীলা গো—
অনন্ত কলরোল।
অশ্রুত কোন্ গানের ছন্দে
অদ্ভুত এই দোল।
দুলিছ গো, দোলা দিতেছ।
পলকে আলোকে তুলিছ, পলকে
আঁধারে টানিয়া নিতেছ।

সম্মুখে যখন আসি,
তখন পুলকে হাসি,
পশ্চাতে যবে ফিরে যায় দোলা
ভয়ে আঁখিজলে ভাসি।
সম্মুখে যেমন পিছেও তেমন
মিছে করি মোরা গোল।
চিরকাল এ কী লীলা গো
অনন্ত কলরোল।

ডান হাত হতে বাম হাতে লও,
বাম হাত হতে ডানে।
নিজধন তুমি নিজেই হরিয়া
কী যে কর কে বা জানে।
কোথা বসে আছ একেলা।
সব রবিশশী কুড়ায়ে লইয়া
তালে তালে কর এ খেলা।
খুলে দাও ক্ষণতরে,
ঢাকা দাও ক্ষণপরে,
মোরা কেঁদে ভাবি আমারি কী ধন
কে লইল বুঝি হ'রে ?
দেওয়া-নেওয়া তব সকলি সমান,
সে-কথাটি কে বা জানে।
ডান হাত হতে বাম হাতে লও
বাম হাত হতে ডানে।

এইমতো চলে চিরকাল গো
শুধু যাওয়া, শুধু আসা।
চির দিনরাত আপনার সাথ
আপনি খেলিছ পাশা।

আছে তো যেমন যা ছিল।
হারায় নি কিছু ফুরায় নি কিছু
যে মরিল যে বা বাঁচিল।
বহি সব সুখদুখ
এ ভুবন হাসিমুখ,
তোমারি খেলার আনন্দে তার
ভরিয়া উঠেছে বুক।
আছে সেই আলো, আছে সেই গান,
আছে সেই ভালোবাসা।
এইমতো চলে চিরকাল গো
শুধু যাওয়া, শুধু আসা।

৩৯

সেদিন কি তুমি এসেছিলে, ওগো
সে কি তুমি, মোর সভাতে ?
হাতে ছিল তব বাঁশি,
অধরে অবাক হাসি,
সেদিন ফাগুন মেতে উঠেছিল
মদবিহ্বল শোভাতে।
সে কি তুমি, ওগো, তুমি এসেছিলে
সেদিন নবীন প্রভাতে—
নবযৌবন-সভাতে ?

সেদিন আমার যত কাজ ছিল
সব কাজ তুমি ভুলালে।
খেলিলে সে কোন্ খেলা,
কোথা কেটে গেল বেলা।
ঢেউ দিয়ে দিয়ে হৃদয়ে আমার
রক্তকমল দুলালে।

পুলকিত মোর পরানে তোমার
বিলোল নয়ন বুলালে,—
সব কাজ মোর ভুলালে।

তার পরে হায় জানি নে কখন
ঘুম এল মোর নয়নে।
উঠিনু যখন জেগে,
ঢেকেছে গগন মেঘে,—
তরুতলে আছি একেলা পড়িয়া
দলিত পত্র-শয়নে।
তোমাতে আমাতে রত ছিনু যবে
কাননে কুসুম-চয়নে
ঘুম এল মোর নয়নে।

সেদিনের সভা ভেঙে গেছে সব
আজি ঝরঝর বাদরে।
পথে লোক নাহি আর,
রুদ্ধ করেছি দ্বার,
একা আছে প্রাণ ভূতলে শয়ান
আজিকার ভরা ভাদরে।
তুমি কি দুয়ারে আঘাত করিলে,
তোমারে লব কি আদরে
আজি ঝরঝর বাদরে?

তুমি যে এসেছ ভস্মমলিন
তাপস-মুরতি ধরিয়া।
স্তিমিত নয়নতারা
ঝলিছে অনলপারা,
সিক্ত তোমার জটাজুট হতে
সলিল পড়িছে ঝরিয়া।

বাহির হইতে ঝড়ের আঁধার
আনিয়াছ সাথে করিয়া
তাপস-মুরতি ধরিয়া।

নমি হে ভীষণ, মৌন, রিক্ত,
এস মোর ভাঙা আলয়ে।
ললাটে তিলকরেখা,
যেন সে বহ্নিলেখা,
হস্তে তোমার লৌহদণ্ড
বাজিছে লৌহবলয়ে।
শূন্য ফিরিয়া যেয়ো না, অতিথি,
সব ধন মোর না লয়ে।
এস এস ভাঙা আলয়ে।

৪০

মন্ত্রে সে যে পূত
রাখির রাঙা সুতো,
বাঁধন দিয়েছিনু হাতে
আজ কি আছে সেটি হাতে?
বিদায়-বেলা এল মেঘের মতো ব্যেপে,
গ্রন্থি বেঁধে দিতে দু-হাত গেল কেঁপে,
সেদিন থেকে থেকে চক্ষুদুটি ছেপে
ভরে যে এল জলধারা।
আজকে বসে আছি পথের এক পাশে,
আমের ঘন বোলে বিভোল মধুমাসে,
তুচ্ছ কথাটুকু কেবল মনে আসে
ভ্রমর যেন পথহারা;—
সেই যে বাম হাতে একটি সরু রাখি
আধেক রাঙা, সোনা আধা
আজো কি আছে সেটি বাঁধা?

পথ যে কতখানি
কিছুই নাহি জানি,
মাঠের গেছে কোন্ শেষে,
চৈত্র ফসলের দেশে।
যখন গেলে চলে তোমার গ্রীবামূলে
দীর্ঘ বেণী তব এলিয়ে ছিল খুলে,
মালাখানি গাঁথা সাঁজের কোন্ ফুলে
লুটিয়ে পড়েছিল পায়ে।
একটুখানি তুমি দাঁড়িয়ে যদি যেতে।
নতুন ফুলে দেখো কানন ওঠে মেতে,
দিতেম ত্বরা করে নবীন মালা গেঁথে
কনকচাঁপা-বনছায়ে।
মাঠের পথে যেতে তোমার মালাখানি
প'ল কি বেণী হতে খসে?
আজকে ভাবি তাই বসে।

নূপুর ছিল ঘরে
গিয়েছ পায়ে পরে,
নিয়েছ হেথা হতে তাই,
অঙ্গে আর কিছু নাই।
আকুল কলতানে শতেক রসনায়
চরণ ঘেরি তব কাঁদিছে করুণায়,
তাহারা হেথাকার বিরহবেদনায়
মুখর করে তব পথ।
জানি না কী এত যে তোমার ছিল ত্বরা,
কিছুতে হল না যে মাথার ভূষা পরা,
দিতেম খুঁজে এনে সিঁথিটি মনোহরা
রহিল মনে মনোরথ।

হেলায় বাঁধা সেই নূপুর দুটি পায়ে
আছে কি পথে গেছে খুলে,
সে-কথা ভাবি তরুমূলে।

অনেক গীত গান
করেছি অবসান
অনেক সকালে ও সাঁজে
অনেক অবসরে কাজে।
তাহারি শেষ গান আধেক লয়ে কানে
দীর্ঘপথ দিয়ে গেছ সুদূর পানে,
আধেক জানা সুরে আধেক ভোলা তানে
গেয়েছ গুনগুন স্বরে।
কেন না গেলে শুনি একটি গান আরো,
সে গান শুধু তব, সে নহে আর কারো,
তুমিও গেলে চলে সময় হল তারো,
ফুটল তব পূজা-তরে।
মাঠের কোন্‌খানে হারাল শেষ সুর
যে গান নিয়ে গেলে শেষে,
ভাবি যে তাই অনিমেষে।

৪১

পথের পথিক করেছ আমায়
সেই ভালো, ওগো সেই ভালো।
আলেয়া জ্বালালে প্রান্তরভালে
সেই আলো মোর সেই আলো।
ঘাটে বাঁধা ছিল খেয়া-তরি,
তাও কি ডুবালে ছল করি?
সাঁতারিয়া পার হব বহি ভার,
সেই ভালো মোর সেই ভালো।

ঝড়ের মুখে যে ফেলেছ আমায়
সেই ভালো, ওগো সেই ভালো।
সব সুখজালে বজ্র জ্বালালে
সেই আলো মোর সেই আলো।
সাথি যে আছিল নিলে কাড়ি,
কী ভয় লাগালে, গেল ছাড়ি।
একাকীর পথে চলিব জগতে
সেই ভালো মোর সেই ভালো।

কোনো মান তুমি রাখ নি আমার
সেই ভালো, ওগো সেই ভালো।
হৃদয়ের তলে যে আগুন জ্বলে
সেই আলো মোর সেই আলো।
পাথেয় যে-কটি ছিল কড়ি
পথে খসি কবে গেছে পড়ি,
শুধু নিজবল আছে সম্বল
সেই ভালো মোর সেই ভালো।

৪২

আলো নাই, দিন শেষ হল, ওরে
পান্থ, বিদেশী পান্থ।
ঘণ্টা বাজিল দূরে,
ওপারের রাজপুরে,
এখনো যে পথে চলেছিস তুই
হায় রে পথশ্রান্ত
পান্থ, বিদেশী পান্থ।

দেখ্ সবে ঘরে ফিরে এল, ওরে
পান্থ, বিদেশী পান্থ।

পূজা সারি দেবালয়ে
প্রসাদী কুসুম লয়ে,
এখন ঘুমের কর্ আয়োজন
হায় রে পথশ্রান্ত
পান্থ, বিদেশী পান্থ।

রজনী আঁধার হয়ে আসে, ওরে
পান্থ, বিদেশী পান্থ।
ওই যে গ্রামের 'পরে
দীপ জ্বলে ঘরে ঘরে,
দীপহীন পথে কী করিবি একা
হায় রে পথশ্রান্ত
পান্থ, বিদেশী পান্থ।

এত বোঝা লয়ে কোথা যাস, ওরে
পান্থ, বিদেশী পান্থ।
নামাবি এমন ঠাঁই
পাড়ায় কোথা কি নাই?
কেহ কি শয়ন রাখে নাই পাতি
হায় রে পথশ্রান্ত
পান্থ, বিদেশী পান্থ।

পথের চিহ্ন দেখা নাহি যায়
পান্থ, বিদেশী পান্থ।
কোন্ প্রান্তরশেষে
কোন্ বহুদূরদেশে,
কোথা তোর রাত হবে যে প্রভাত
হায় রে পথশ্রান্ত
পান্থ, বিদেশী পান্থ॥

৪৩

সাঙ্গ হয়েছে রণ।
অনেক যুঝিয়া অনেক খুঁজিয়া
শেষ হল আয়োজন।
তুমি এস, এস নারী,
আনো তব হেমঝারি।
ধুয়ে-মুছে দাও ধূলির চিহ্ন,
জোড়া দিয়ে দাও ভগ্ন-ছিন্ন,
সুন্দর করো, সার্থক করো
পুঞ্জিত আয়োজন।
এস সুন্দরী নারী
শিরে লয়ে হেমঝারি।

হাটে আর নাহি কেহ।
শেষ করে খেলা ছেড়ে এনু মেলা,
গ্রামে গাড়িলাম গেহ।
তুমি এস, এস নারী,
আনো গো তীর্থবারি।
স্নিগ্ধ-হসিত বদন-ইন্দু
সিঁথায় আঁকিয়া সিঁদুর-বিন্দু,
মঙ্গল করো, সার্থক করো
শূন্য এ মোর গেহ।
এস কল্যাণী নারী
বহিয়া তীর্থবারি।

বেলা কত যায় বেড়ে।
কেহ নাহি চাহে খর-রবি-দাহে
পরবাসী পথিকেরে।
তুমি এস, এস নারী,
আনো তব সুধাবারি।

বাজাও তোমার নিষ্কলঙ্ক
শত-চাঁদে-গড়া শোভন শঙ্খ,
বরণ করিয়া সার্থক করো
পরবাসী পথিকেরে।
আনন্দময়ী নারী,
আনো তব সুধাবারি।

স্রোতে যে ভাসিল ভেলা।
এবারের মতো   দিন হল গত
এল বিদায়ের বেলা।
তুমি এস, এস নারী,
আনো গো অশ্রুবারি।
তোমার সজল কাতর দৃষ্টি
পথে করে দিক করুণাবৃষ্টি,
ব্যাকুল বাহুর পরশে ধন্য
হ'ক বিদায়ের বেলা।
অয়ি বিষাদিনী নারী
আনো গো অশ্রুবারি।

আঁধার নিশীথরাতি।
গৃহ নির্জন   শূন্য শয়ন
জ্বলিছে পূজার বাতি।
তুমি এস, এস নারী,
আনো তর্পণবারি।
অবারিত করি ব্যথিত বক্ষ
খোলো হৃদয়ের গোপন কক্ষ,
এলো-কেশপাশে শুভ্র-বসনে
জ্বালাও পূজার বাতি।
এস তাপসিনী নারী,
আনো তর্পণবারি॥

৪৫

আমাদের এই পল্লিখানি পাহাড় দিয়ে ঘেরা,
দেবদারুর কুঞ্জে ধেনু চরায় রাখালেরা।
কোথা হতে চৈত্রমাসে হাঁসের শ্রেণী উড়ে আসে
অঘ্রানেতে আকাশপথে যায় যে তারা কোথা
আমরা কিছুই জানি নেকো সেই সুদূরের কথা।
আমরা জানি গ্রাম কখানি, চিনি দশটি গিরি,
মা ধরণী রাখেন মোদের কোলের মধ্যে ঘিরি।

সে ছিল ঐ বনের ধারে ভুট্টাখেতের পাশে
যেখানে ঐ ছায়ার তলে জলটি ঝরে আসে।
ঝরনা হতে আনতে বারি জুটত হোথা অনেক নারী,
উঠত কত হাসির ধ্বনি তারি ঘরের দ্বারে,
সকাল-সাঁঝে আনাগোনা তারি পথের ধারে।
মিশত কুলুকুলুধ্বনি তারি দিনের কাজে,
ঐ রাগিণী পথ হারাত তারি ঘুমের মাঝে।

সন্ধ্যাবেলায় সন্ন্যাসী এক বিপুল জটা শিরে
মেঘে-ঢাকা শিখর হতে নেমে এলেন ধীরে।
বিস্ময়েতে আমরা সবে শুধাই, "তুমি কে গো হবে?"
বসল যোগী নিরুত্তরে নির্ঝরিণীর কূলে
নীরবে সেই ঘরের পানে স্থির নয়ন তুলে।
অজানা কোন্ অমঙ্গলে বক্ষ কাঁপে ডরে,
রাত্রি হল, ফিরে এলেম যে যার আপন ঘরে।

পরদিনে প্রভাত হল দেবদারুর বনে,
ঝরনাতলায় আনতে বারি জুটল নারীগণে।
দুয়ার খোলা দেখে আসি, নাই সে খুশি, নাই সে হাসি,
জলশূন্য কলসখানি গড়ায় গৃহতলে,
নিব-নিব প্রদীপটি সেই ঘরের কোণে জ্বলে।

কোথায় সে যে চলে গেল রাত না পোহাতেই
শূন্য ঘরের দ্বারের কাছে সন্ন্যাসীও নেই।

চৈত্রমাসে রৌদ্র বাড়ে বরফ গলে পড়ে,—
ঝরনাতলায় বসে মোরা কাঁদি তাহার তরে।
আজিকে এই তৃষার দিনে কোথায় ফিরে নিঝর বিনে
শুষ্ক কলস ভরে নিতে কোথায় পাবে ধারা।
কে জানে সে নিরুদ্দেশে কোথায় হল হারা।
কোথাও কিছু আছে কি গো---শুধাই যারে তারে,—
আমাদের এই আকাশ-ঢাকা দশপাহাড়ের পারে?

গ্রীষ্মরাতে বাতায়নে বাতাস হু হু করে,
বসে আছি প্রদীপ-নেবা তাহার শূন্য ঘরে।
শুনি বসে দ্বারের কাছে ঝরনা যেন তারেই যাচে
বলে, "ওগো আজকে তোমার নাই কি কোনো তৃষা,
জলে তোমার নাই প্রয়োজন এমন গ্রীষ্মনিশা?"
আমিও কেঁদে কেঁদে বলি, "হে অজ্ঞাতচারী,
তৃষা যদি হারাও তবু ভুলো না এই বারি।"

হেনকালে হঠাৎ যেন লাগল চোখে ধাঁধা,
চারিদিকে চেয়ে দেখি নাই পাহাড়ের বাধা।
ঐ যে আসে, কারে দেখি? আমাদের যে ছিল সে কি?
ওগো তুমি কেমন আছ, আছ মনের সুখে?
খোলা আকাশতলে হেথা ঘর কোথা কোন্ মুখে?
নাইকো পাহাড়, কোনোখানে ঝরনা নাহি ঝরে,
তৃষ্ণা পেলে কোথায় যাবে বারিপানের তরে?

সে কহিল, "যে ঝরনা সেথা মোদের দ্বারে,
নদী হয়ে সে-ই চলেছে হেথা উদার-ধারে।

সে আকাশ সেই পাহাড় ছেড়ে অসীম পানে গেছে বেড়ে
সেই ধরারেই নাইকো হেথা পাষাণ-বাঁধা বেঁধে।”
“সবই আছে, আমরা তো নেই” কইনু তারে কেঁদে।
সে কহিল করুণ হেসে, “আছ হৃদয়মূলে।”
স্বপন ভেঙে চেয়ে দেখি আছি ঝরনাকূলে ॥

৪৫

অত চুপি চুপি কেন কথা কও
ওগো মরণ, হে মোর মরণ।
অতি ধীরে এসে কেন চেয়ে রও,
ওগো এ কি প্রণয়েরি ধরণ ?
যবে সন্ধ্যাবেলায় ফুলদল
পড়ে ক্লান্ত বৃন্তে নমিয়া,
যবে ফিরে আসে গোঠে গাভীদল
সারা দিনমান মাঠে ভ্রমিয়া,
তুমি পাশে আসি বস অচপল
ওগো অতি মৃদুগতি-চরণ।
আমি বুঝি না যে কী যে কথা কও,
ওগো মরণ, হে মোর মরণ।

হায় এমনি করে কি, ওগো চোর,
ওগো মরণ, হে মোর মরণ।
চোখে বিছাইয়া দিবে ঘুমঘোর
করি হৃদিতলে অবতরণ।
তুমি এমনি কি ধীরে দিবে দোল
মোর অবশ বক্ষশোণিতে ?
কানে বাজাবে ঘুমের কলরোল
তব কিঙ্কিণি-রণরণিতে ?

শেষে পসারিয়া তব হিম-কোল
মোরে স্বপনে করিবে হরণ ?
আমি বুঝি না যে কেন আস-যাও
ওগো মরণ, হে মোর মরণ ।

কহ মিলনের এ কি রীতি এই,
ওগো মরণ, হে মোর মরণ ।
তার সমারোহভার কিছু নেই
নেই কোনো মঙ্গলাচরণ ?
তব পিঙ্গলছবি মহাজট
সে কি চূড়া করি বাঁধা হবে না ?
তব বিজয়োদ্ধত ধ্বজপট
সে কি আগে-পিছে কেহ ববে না ?
তব মশাল-আলোকে নদীতট
আঁখি মেলিবে না রাঙাবরন ?
ত্রাসে কেঁপে উঠিবে না ধরাতল
ওগো মরণ, হে মোর মরণ ।

যবে বিবাহে চলিলা বিলোচন
ওগো মরণ, হে মোর মরণ ।
তাঁর কতমতো ছিল আয়োজন,
ছিল কতশত উপকরণ ।
তাঁর লটপট করে বাঘছাল,
তাঁর বৃষ রহি রহি গরজে,
তাঁর বেষ্টন করি জটাজাল
যত ভুজঙ্গদল তরজে ।
তাঁর ববম্ববম্ বাজে গাল
দোলে গলায় কপালাভরণ,
তাঁর বিষাণে ফুকারি উঠে তান
ওগো মরণ, হে মোর মরণ ।

শুনি শ্মশানবাসীর কলকল
ওগো মরণ, হে মোর মরণ।
সুখে গৌরীর আঁখি ছলছল
তাঁর কাঁপিছে নিচোলাবরণ।
তাঁর বাম আঁখি ফুরে থর থর
তাঁর হিয়া দুরুদুরু দুলিছে,
তাঁর পুলকিত তনু জরজর
তাঁর মন আপনারে ভুলিছে।
তাঁর মাতা কাঁদে শিরে হানি কর,
খেপা বরেরে করিতে বরণ,
তাঁর পিতা মনে মানে পরমাদ
ওগো মরণ, হে মোর মরণ।

তুমি চুরি করি কেন এস চোর
ওগো মরণ, হে মোর মরণ।
শুধু নীরবে কখন নিশি ভোর,
শুধু অশ্রু-নিঝর-ঝরন।
তুমি উৎসব করো সারারাত
তব বিজয়-শঙ্খ বাজায়ে।
মোরে কেড়ে লও তুমি ধরি হাত
নব রক্তবসনে সাজায়ে।
তুমি কারে করিয়ো না দৃক্‌পাত
আমি নিজে লব তব শরণ,
যদি গৌরবে মোরে লয়ে যাও
ওগো মরণ, হে মোর মরণ।

যদি কাজে থাকি আমি গৃহমাঝ
ওগো মরণ, হে মোর মরণ।
তুমি ভেঙে দিয়ো মোর সব কাজ
ক'রো সব লাজ অপহরণ।

যদি স্বপনে মিটায়ে সব সাধ
আমি শুয়ে থাকি সুখশয়নে,
যদি হৃদয়ে জড়ায়ে অবসাদ
থাকি আধজাগরূক নয়নে,—
তবে শঙ্খে তোমার তুলো নাদ
করি প্রলয়শ্বাস ভরণ,
আমি ছুটিয়া আসিব ওগো নাথ
ওগো মরণ, হে মোর মরণ।

আমি যাব, যেথা তব তরী রয়
ওগো মরণ, হে মোর মরণ।
যেথা অকূল হইতে বায়ু বয়
করি আঁধারের অনুসরণ।
যদি দেখি ঘনঘোর মেঘোদয়
দূর ঈশানের কোণে আকাশে,
যদি বিদ্যুৎফণী জ্বালাময়
তার উদ্যত ফণা বিকাশে,
আমি ফিরিব না করি মিছা ভয়
আমি করিব নীরবে তরণ
সেই মহাবরষার রাঙা জল
ওগো মরণ, হে মোর মরণ।

৪৬

সে তো সেদিনের কথা, বাক্যহীন যবে
এসেছিনু প্রবাসীর মতো এই ভবে
বিনা কোনো পরিচয়, রিক্ত শূন্য হাতে,
একমাত্র ক্রন্দন সম্বল লয়ে সাথে।
আজ সেথা কী করিয়া মানুষের প্রীতি
কণ্ঠ হতে টানি লয় যত মোর গীতি।

এ ভুবনে মোর চিত্তে অতি অল্প স্থান
নিয়েছ, ভুবননাথ। সমস্ত এ প্রাণ
সংসারে করেছ পূর্ণ। পাদপ্রান্তে তব
প্রত্যহ যে ছন্দে বাঁধা গীত নব নব
দিতেছি অঞ্জলি, তাও তব পূজাশেষে
লবে সবে তোমা সাথে মোরে ভালোবেসে
এই আশাখানি মনে আছে অবিচ্ছেদে।
যে প্রবাসে রাখ সেথা প্রেমে রাখো বেঁধে ॥

নব নব প্রবাসেতে নব নব লোকে
বাঁধিবে এমনি প্রেমে। প্রেমের আলোকে
বিকশিত হব আমি ভুবনে ভুবনে
নব নব পুষ্পদলে; প্রেম-আকর্ষণে
যত গূঢ় মধু মোর অন্তরে বিলসে
উঠিবে অক্ষয় হয়ে নব নব রসে
বাহিরে আসিবে ছুটি,—অন্তহীন প্রাণে
নিখিল জগতে তব প্রেমের আহ্বানে
নব নব জীবনের গন্ধ যাব রেখে,
নব নব বিকাশের বর্ণ যাব এঁকে।
কে চাহে সংকীর্ণ অন্ধ অমরতা-কূপে
এক ধরাতল মাঝে শুধু একরূপে
বাঁচিয়া থাকিতে? নব নব মৃত্যুপথে
তোমারে পূজিতে যাব জগতে জগতে ॥

সংযোজন

১

“হে পথিক, কোন্‌খানে
চলেছ কাহার পানে ?”

“গিয়েছে রজনী   উঠে দিনমণি
চলেছি সাগরস্নানে।
উষার আভাসে   তুষার বাতাসে
পাখির উদার গানে
শয়ন তেয়াগি   উঠিয়াছি জাগি
চলেছি সাগরস্নানে।”

‘শুধাই তোমার কাছে
সে সাগর কোথা আছে ?”

“যেথা এই নদী   বহি নিরবধি
নীল জলে মিশিয়াছে।
সেথা হতে রবি   উঠে নবছবি
লুকায় তাহারি পাছে,
তপ্ত প্রাণের   তীর্থ-স্নানের
সাগর সেথায় আছে।”

“পথিক তোমার দলে
যাত্রী কজন চলে ?”

“গনি তাহা, ভাই,   শেষ নাহি পাই,
চলেছে জলে স্থলে।
তাহাদের বাতি   জ্বলে সারারাতি
তিমির আকাশতলে।
তাহাদের গান   সারা দিনমান
ধ্বনিছে জলে স্থলে।”

“সে সাগর কহ তবে
আর কত দূরে হবে?”

“আর কত দূরে   আর কত দূরে
সেই তো শুধাই সবে।
ধ্বনি তার আসে   দখিন বাতাসে
ঘন ভৈরব রবে।
কভু ভাবি কাছে,   কভু দূরে আছে,
আর কত দূরে হবে?”

“পথিক, গগনে চাহ,
বাড়িছে দিনের দাহ।”

“বাড়ে যদি দুখ   হব না বিমুখ,
নিবাব না উৎসাহ।
ওরে ওরে ভীত   তৃষিত তাপিত
জয়সংগীত গাহ।
মাথার উপরে   খর রবিকরে
বাড়ুক দিনের দাহ।”

“কী করিবে চলে চলে
পথেই সন্ধ্যা হলে?”

“প্রভাতের আশে   স্নিগ্ধ বাতাসে
ঘুমাব পথের কোলে।
উদিবে অরুণ   নবীন করুণ
বিহঙ্গ-কলরোলে।
সাগরের স্নান   হবে সমাধান
নূতন প্রভাত হলে।”

২

কী কথা বলিব বলে
বাহিরে এলেম চলে
দাঁড়ালেম দুয়ারে তোমার,
ঊর্ধ্বমুখে উচ্চরবে
বলিতে গেলেম যবে
কথা নাহি আর।
যে-কথা বলিতে চাহে প্রাণ
সে শুধু হইয়া উঠে গান।
নিজে না বুঝিতে পারি
তোমারে বুঝাতে নারি
চেয়ে থাকি উৎসুক-নয়ান।

তবে কিছু শুনায়ো না
শুনে যাও আনমনা
যাহা বোঝ, যাহা নাই বোঝ।
সন্ধ্যার আঁধার 'পরে
মুখে আর কণ্ঠস্বরে
বাকিটুকু খোঁজো।
কথায় কিছু না যায় বলা
গান সেও উন্মত্ত উতলা।
তুমি যদি মোর সুরে
নিজ কথা দাও পুরে
গীতি মোর হবে না বিফলা।

৩

কত দিবা কত বিভাবরী
কত নদী নদে লক্ষ স্রোতের
মাঝখানে এক পথ ধরি,
কত ঘাটে ঘাটে লাগায়ে,
কত সারিগান জাগায়ে,
কত অঘ্রানে নব নব ধানে
কতবার কত বোঝা ভরি',
কর্ণধার হে কর্ণধার,
বেচে কিনে কত স্বর্ণভার,
কোন্ গ্রামে আজ সাধিতে কী কাজ
বাঁধিয়া ধরিলে তব তরী।

হেথা বিকিকিনি কার হাটে?
কেন এত ত্বরা লইয়া পসরা,
ছুটে চলে এরা কোন্ বাটে?
শুন গো থাকিয়া থাকিয়া
বোঝা লয়ে যায় হাঁকিয়া,
সে করুণ স্বরে মন কী যে করে
কী ভেবে আমার দিন কাটে।
কর্ণধার হে কর্ণধার,
বেচে কিনে লও স্বর্ণভার,
হেথা কারা রয় লহ পরিচয়
কারা আসে যায় এই ঘাটে।

যেথা হতে যাই, যাই কেঁদে।
এমনটি আর পাব কি আবার
সরে না যে মন সেই খেদে।
সে-সব কাঁদন ভুলালে,
কী দোলায় প্রাণ দুলালে?

হোথা যারা তীরে আনমনে ফিরে
আমি তাহাদের মরি দেখে।
কর্ণধার হে কর্ণধার,
বেচে কিনে লও স্বর্ণভার।
এই হাটে নামি দেখে লব আমি
এক বেলা তরী রাখো বেঁধে।

গান ধর তুমি কোন্ সুরে।
মনে পড়ে যায় দূর হতে এনু,
যেতে হবে পুন কোন্ দূরে।
শুনে মনে পড়ে দুজনে
খেলেছি সজনে বিজনে,
সে যে কত দেশ নাহি তার শেষ
সে যে কত কাল এনু ঘুরে।
কর্ণধার হে কর্ণধার,
বেচে কিনে লও স্বর্ণভার।
বাজিয়াছে শাঁখ, পড়িয়াছে ডাক
সে কোন্ অচেনা রাজপুরে।

৭

দিয়েছ প্রশ্রয় মোরে, করুণানিলয়,
হে প্রভু, প্রত্যহ মোরে দিয়েছ প্রশ্রয়।
ফিরেছি আপন-মনে আলসে লালসে
বিলাসে আবেশে ভেসে প্রবৃত্তির বশে
নানা পথে, নানা ব্যর্থ কাজে,—তুমি তবু
তখনো যে সাথে সাথে ছিলে মোর, প্রভু,
আজ তাহা জানি। যে অলস চিন্তা-লতা
প্রচুর পল্লবাকীর্ণ ঘন জটিলতা

হৃদয়ে বেষ্টিয়াছিল, তারি শাখাজালে
তোমার চিন্তার ফুল আপনি ফুটালে,
নিগূঢ় শিকড়ে তার বিন্দু বিন্দু সুধা
গোপনে সিঞ্চন করি'। দিয়ে তৃষ্ণা ক্ষুধা,
দিয়ে দণ্ড পুরস্কার, সুখ দুঃখ ভয়
নিয়ত টানিয়া কাছে দিয়েছ প্রশ্রয়।

৫

রোগীর শিয়রে রাত্রে একা ছিনু জাগি,
বাহিরে দাঁড়ানু এসে ক্ষণেকের লাগি।
শান্ত মৌন নগরীর সুপ্ত হর্ম্যশিরে
হেরিনু জ্বলিছে তারা নিস্তব্ধ তিমিরে।
ভূত ভাবী বর্ত্তমান একটি পলকে
মিলিল বিষাদস্নিগ্ধ আনন্দপুলকে
আমার অন্তরতলে; অনির্বচনীয়
সে-মুহূর্ত্তে জীবনের যত কিছু প্রিয়,
দুর্লভ বেদনা যত, যত গত সুখ,
অনুদ্‌গত অশ্রুবাষ্প, গীত মৌনমূক
আমার হৃদয়পাত্রে হয়ে রাশি রাশি
কী অনলে উজ্জ্বলিল। সৌরভে নিঃশ্বাসি'
অপরূপ ধূপধূম্র উঠিল সুধীরে
তোমার নক্ষত্রদীপ্ত নিঃশব্দ মন্দিরে।

৬

কাল যবে সন্ধ্যাকালে বন্ধুসভাতলে
গাহিতে তোমার গান কহিল সকলে,
সহসা রুধিয়া গেল হৃদয়ের দ্বার,
যেথায় আসন তব গোপন আগার।

স্থানভেদে তব গান মূর্তি নব নব,
সখাসনে হাস্যোচ্ছ্বাস সেও গান তব,
প্রিয়াসনে প্রিয়ালাপ, শিশুসনে খেলা,
জগতে যেথায় যত আনন্দের মেলা,
সর্বত্র তোমার গান বিচিত্র গৌরবে
আপনি ধ্বনিতে থাকে সরবে নীরবে।
আকাশে তারকা ফুটে ফুলবনে ফুল,
খনিতে মানিক থাকে হয় নাকো ভুল,
তেমনি আপনি তুমি যেখানে যে গান
রেখেছ, কবিও যেন রাখে তার মান।

৭

নানা গান গেয়ে ফিরি নানা লোকালয়;
হেরি সে মত্ততা মোর বৃদ্ধ আসি কয়—
তাঁর ভৃত্য হয়ে তোর এ কী চপলতা।
কেন হাস্য-পরিহাস, প্রণয়ের কথা,
কেন ঘরে ঘরে ফিরি তুচ্ছ গীতরসে
ভুলাস এ সংসারের সহস্র অলসে।
দিয়েছি উত্তর তাঁরে—ওগো পক্ককেশ,
আমার বীণায় বাজে তাঁহারি আদেশ।
যে আনন্দে, যে অনন্ত চিত্তবেদনায়
ধ্বনিত মানব-প্রাণ, আমার বীণায়
দিয়েছেন তারি সুর,—সে তাঁহারি দান,
সাধ্য নাই নষ্ট করি সে বিচিত্র গান।
তব আজ্ঞা রক্ষা করি নাই সে-ক্ষমতা,
সাধ্য নাই তাঁর আজ্ঞা করিতে অন্যথা।

৮

বিরহ-বৎসর পরে, মিলনের বীণা
তেমন উন্মাদ-মন্দ্রে কেন বাজিলি না ?
কেন তোর সপ্তস্বর সপ্তস্বর্গপানে
ছুটিয়া গেল না ঊর্ধ্বে উদ্দাম পরানে
বসন্তে মানস-যাত্রী বলাকার মতো ?
কেন তোর সর্ব তন্ত্র সবলে প্রহত
মিলিত ঝংকারভরে কাঁপিয়া কাঁদিয়া
আনন্দের আর্তরবে চিত্ত উন্মাদিয়া
উঠিল না বাজি' ?   হতাশ্বাস মৃদুস্বরে
গুঞ্জরিয়া গুঞ্জরিয়া লাজে শঙ্কাভরে
কেন মৌন হল ?   তবে কি আমারি প্রিয়া
সে পরশ-নিপুণতা গিয়াছে ভুলিয়া ?
তবে কি আমারি বীণা ধূলিচ্ছন্ন-তার,
সেদিনের মতো ক'রে বাজে নাকো আর ?

৯

ওরে পদ্মা, ওরে মোর রাক্ষসী প্রেয়সী
লুব্ধ বাহু বাড়াইয়া উচ্ছ্বসি উল্লসি
আমারে কি পেতে চাস চির আলিঙ্গনে ?
শুধু এক মুহূর্তের উন্মত্ত মিলনে
তোর বক্ষমাঝে চাস করিতে বিলয়
আমার বক্ষের যত সুখ দুঃখ ভয় ?
আমিও তো কতদিন ভাবিয়াছি মনে
বসি' তোর তটোপান্তে প্রশান্ত নির্জনে,
বাহিরে চঞ্চলা তুই প্রমত্ত মুখরা
শাণিত অসির মতো ভীষণ প্রখরা,

অন্তরে নিভৃত স্নিগ্ধ শান্ত সুগম্ভীর,—
দীপহীন রুদ্ধদ্বার অর্ধ রজনীর
বাসরঘরের মতো নিষুপ্ত নির্জন ;—
সেথা কার তরে পাতা সুচির শয়ন ?

১০

অচির বসন্ত হায় এল, গেল চলে,
এবার কিছু কি কবি করেছ সঞ্চয় ?
ভরেছ কি কল্পনার কনক-অঞ্চলে
চঞ্চল-পবন-ক্লিষ্ট শ্যাম কিশলয়,
ক্লান্ত করবীর গুচ্ছ ? তপ্ত রৌদ্র হতে
নিয়েছ কি গলাইয়া যৌবনের সুরা,
ঢেলেছ কি উচ্ছলিত তব ছন্দঃস্রোতে,
রেখেছ কি করি তারে অনন্ত মধুরা।

এ বসন্তে প্রিয়া তব পূর্ণিমা নিশীথে
নবমল্লিকার মালা জড়াইয়া কেশে,
তোমার আকাঙ্ক্ষাদীপ্ত অতৃপ্ত আঁখিতে
যে দৃষ্টি হানিয়াছিল একটি নিমেষে,
সে কি রাখ নাই গেঁথে অক্ষয় সংগীতে ?
সে কি গেছে পুষ্পচ্যুত সৌরভের দেশে ?

১১

হে জনসমুদ্র, আমি ভাবিতেছি মনে
কে তোমারে আন্দোলিছে বিরাট মন্থনে
অনন্ত বরষ ধরি। দেব-দৈত্যদলে
কী রত্ন সন্ধান লাগি তোমার অতলে
অশান্ত আবর্ত নিত্য রেখেছে জাগায়ে
পাপে পুণ্যে সুখে দুঃখে ক্ষুধায় তৃষ্ণায়

ফেনিল কল্লোলভঙ্গে ? ওগো দাও দাও
কী আছে তোমার গর্ভে—এ ক্ষোভ থামাও।
তোমার অন্তরলক্ষ্মী যে শুভপ্রভাতে
উঠিবেন অমৃতের পাত্র বহি হাতে
বিস্মিত ভুবনমাঝে,—লয়ে বরমালা
ত্রিলোকনাথের কণ্ঠে পরাবেন বালা,
সেদিন হইবে ক্ষান্ত এ মহামন্থন,
থেমে যাবে সমুদ্রের রুদ্র এ ক্রন্দন।

১২

হে ভারত, আজি নবীন বর্ষে
শুন এ কবির গান।
তোমার চরণে নবীন হর্ষে
এনেছি পূজার দান।
এনেছি মোদের দেহের শকতি,
এনেছি মোদের মনের ভকতি,
এনেছি মোদের ধর্মের মতি,
এনেছি মোদের প্রাণ।
এনেছি মোদের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য
তোমারে করিতে দান।

কাঞ্চন-থালি নাহি আমাদের,
অন্ন নাহিকো জুটে।
যা আছে মোদের এনেছি সাজায়ে
নবীন পর্ণপুটে।
সমারোহে আজ নাই প্রয়োজন,
দীনের এ পূজা, দীন আয়োজন,

চিরদারিদ্র্য করিব মোচন
    চরণের ধুলা লুটে।
সুর-দুর্লভ তোমার প্রসাদ
    লইব পর্ণপুটে।

রাজা তুমি নহ, হে মহাতাপস,
    তুমিই প্রাণের প্রিয়।
ভিক্ষাভূষণ ফেলিয়া পরিব
    তোমারি উত্তরীয়।
দৈন্যের মাঝে আছে তব ধন,
মৌনের মাঝে রয়েছে গোপন
তোমার মন্ত্র অগ্নিবচন
    তাই আমাদের দিয়ো।
পরের সজ্জা ফেলিয়া পরিব
    তোমার উত্তরীয়।

দাও আমাদের অভয়মন্ত্র,
    অশোকমন্ত্র তব।
দাও আমাদের অমৃতমন্ত্র,
    দাও গো জীবন নব।
যে জীবন ছিল তব তপোবনে,
যে জীবন ছিল তব রাজাসনে,
মুক্ত দীপ্ত সে মহাজীবনে
    চিত্ত ভরিয়া লব।
মৃত্যুতরণ শঙ্কাহরণ
    দাও সে মন্ত্র তব।

১৩

নব বৎসরে করিলাম পণ
লব স্বদেশের দীক্ষা,
তব আশ্রমে, তোমার চরণে,
হে ভারত, লব শিক্ষা।
পরের ভূষণ, পরের বসন,
তেয়াগিব আজ পরের অশন,
যদি হই দীন, না হইব হীন,
ছাড়িব পরের ভিক্ষা।
নব বৎসরে করিলাম পণ
লব স্বদেশের দীক্ষা।

না থাকে প্রাসাদ, আছে তো কুটির
কল্যাণে সুবিচিত্র।
না থাকে নগর আছে তব বন
ফলে ফুলে সুপবিত্র।
তোমা হতে যত দূরে গেছি সরে
তোমারে দেখেছি তত ছোটো করে
কাছে দেখি আজ, হে হৃদয়রাজ
তুমি পুরাতন মিত্র।
হে তাপস, তব পর্ণকুটির
কল্যাণে সুপবিত্র।

পরের বাক্যে তব পর হয়ে
দিয়েছি পেয়েছি লজ্জা।
তোমারে ভুলিতে ফিরায়েছি মুখ,
পরেছি পরের সজ্জা

কিছু নাহি গনি' কিছু নাহি কহি'
জপিছ মন্ত্র অন্তরে রহি,
তব সনাতন ধ্যানের আসন
মোদের অস্থিমজ্জা।
পরের বুলিতে তোমারে ভুলিতে
দিয়েছি পেয়েছি লজ্জা।

সে সকল লাজ তেয়াগিব আজ
লইব তোমার দীক্ষা।
তব পদতলে বসিয়া বিরলে
শিখিব তোমার শিক্ষা।
তোমার ধর্ম, তোমার কর্ম,
তব মন্ত্রের গভীর মর্ম
লইব তুলিয়া সকল ভুলিয়া
ছাড়িয়া পরের ভিক্ষা ;
তব গৌরবে গরব মানিব
লইব তোমার দীক্ষা।

খেয়া

উৎসর্গ

বিজ্ঞানাচার্য শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু
করকমলেষু

বন্ধু, এ যে আমার লজ্জাবতী লতা।
কী পেয়েছে আকাশ হতে,
কী এসেছে বায়ুর স্রোতে,
পাতার ভাঁজে লুকিয়ে আছে
সে যে প্রাণের কথা।
যত্নভরে খুঁজে খুঁজে
তোমায় নিতে হবে বুঝে,
ভেঙে দিতে হবে যে তার
নীরব ব্যাকুলতা।
আমার লজ্জাবতী লতা।

বন্ধু, সন্ধ্যা এল, স্বপনভরা
পবন এরে চুমে।
ডালগুলি সব পাতা নিয়ে
জড়িয়ে এল ঘুমে।
ফুলগুলি সব নীল নয়ানে
চুপি চুপি আকাশপানে
তারার দিকে চেয়ে চেয়ে
কোন্ ধেয়ানে রতা।
আমার লজ্জাবতী লতা।

বন্ধু, আনো তোমার তড়িৎ-পরশ,
হরষ দিয়ে দাও,—
করুণ চক্ষু মেলে ইহার
মর্মপানে চাও।
সারাদিনের গন্ধগীতি
সারাদিনের আলোর স্মৃতি
নিয়ে এ যে হৃদয়ভারে
ধরায় অবনতা ;—
আমার লজ্জাবতী লতা।

বন্ধু, তুমি জান ক্ষুদ্র যাহা
ক্ষুদ্র তাহা নয় ;—
সত্য যেথা কিছু আছে
বিশ্ব সেথা রয়।
এই যে মুদে আছে লাজে
পড়বে তুমি এরি মাঝে
জীবনমৃত্যু রৌদ্রছায়া
ঝটিকার বারতা।
আমার লজ্জাবতী লতা।

১৮ আষাঢ় ১৩১৩
কলিকাতা

খেয়া

শেষ খেয়া

দিনের শেষে ঘুমের দেশে ঘোমটা-পরা ঐ ছায়া
ভুলাল রে ভুলাল মোর প্রাণ।
ওপারেতে সোনার কূলে আঁধারমূলে কোন্ মায়া
গেয়ে গেল কাজ-ভাঙানো গান ।
নামিয়ে মুখ চুকিয়ে সুখ যাবার মুখে যায় যারা
ফেরার পথে ফিরেও নাহি চায়,
তাদের পানে ভাঁটার টানে যাব রে আজ ঘরছাড়া,
সন্ধ্যা আসে দিন যে চলে যায়।
ওরে আয়।
আমায় নিয়ে যাবি কে রে
দিনশেষের শেষ খেয়ায়।

সাঁঝের বেলা ভাঁটার স্রোতে ওপার হতে একটানা
একটি-দুটি যায় যে তরী ভেসে।
কেমন করে চিনব ওরে ওদের মাঝে কোন্‌খানা
আমার ঘাটে ছিল আমার দেশে ।
অস্তাচলে তীরের তলে ঘন গাছের কোল ঘেঁষে
ছায়ায় যেন ছায়ার মতো যায়,
ডাকলে আমি ক্ষণেক থামি হেথায় পাড়ি ধরবে সে
এমন নেয়ে আছে রে কোন্ নায় ?
ওরে আয়
আমায় নিয়ে যাবি কে রে
দিনশেষের শেষ খেয়ায়।

ঘরেই যারা যাবার তারা কখন গেছে ঘরপানে
পারে যারা যাবার গেছে পারে ;
ঘরেও নহে পারেও নহে যে-জন আছে মাঝখানে
সন্ধ্যাবেলা কে ডেকে নেয় তারে।
ফুলের বার নাইক আর ফসল যার ফলল না,
চোখের জল ফেলতে হাসি পায়,
দিনের আলো যার ফুরাল সাঁজের আলো জ্বলল না
সেই বসেছে ঘাটের কিনারায়
ওরে আয়।
আমায় নিয়ে যাবি কে রে
বেলাশেষের শেষ খেয়ায়।

আষাঢ় ১৩১২

ঘাটের পথ

ওরা চলেছে দিঘির ধারে।
ঐ শোনা যায় বেণুবনছায়
কঙ্কণ-ঝংকারে।
আমার চুকেছে দিবসের কাজ,
শেষ হয়ে গেছে জলভরা আজ,
দাঁড়ায়ে রয়েছি দ্বারে।
ওরা চলেছে দিঘির ধারে।

আমি কোন্ ছলে যাব ঘাটে—
শাখা-থরথর পাতা-মরমর
ছায়া-সুশীতল বাটে ?
বেলা বেশি নাই, দিন হল শোধ,
ছায়া বেড়ে যায়, পড়ে আসে রোদ,
এ বেলা কেমনে কাটে ?
আমি কোন্ ছলে যাব ঘাটে ?

ওগো কী আমি কহিব আর ?
ভাবিস নে কেহ ভয় করি আমি
ভরা-কলসের ভার।
যা হ'ক তা হ'ক এই ভালোবাসি,
বহে নিয়ে যাই, ভরে নিয়ে আসি,
কতদিন কতবার।
ওগো আমি কী কহিব আর।

একি শুধু জল নিয়ে আসা ?
এই আনাগোনা কিসের লাগি যে
কী কব, কী আছে ভাষা !
কত-না দিনের আঁধারে আলোতে
বহিয়া এনেছি এই বাঁকা পথে
কত কাঁদা কত হাসা।
একি শুধু জল নিয়ে আসা ?

আমি ডরি নাই ঝড়জল
উড়েছে আকাশে উতলা বাতাসে
উদ্দাম অঞ্চল।
বেণুশাখা 'পরে বারি ঝরঝরে,
এ-কূলে ও-কূলে কালো ছায়া পড়ে,
পথঘাট পিচ্ছল।
আমি ডরি নাই ঝড়জল।

আমি গিয়াছি আঁধার সাঁজে।
শিহরি শিহরি উঠে পল্লব
নির্জন বনমাঝে।
বাতাস থমকে, জোনাকি চমকে,
ঝিল্লীর সাথে ঝমকে ঝমকে
চরণে ভূষণ বাজে।
আমি গিয়াছি আঁধার সাঁজে।

যবে   বুকে ভরি উঠে ব্যথা,—
ঘরের ভিতরে না দেয় থাকিতে
অকারণ আকুলতা,—
আপনার মনে একা পথে চলি,
কাঁখের কলসী বলে ছলছলি
জলভরা কলকথা,
যবে   বুকে ভরি উঠে ব্যথা।

ওগো   দিনে কতবার করে
ঘর-বাহিরের মাঝখানে রহি
ঐ পথ ডাকে মোরে।
কুসুমের বাস ধেয়ে ধেয়ে আসে,
কপোত-কূজন-করুণ আকাশে
উদাসীন মেঘ ঘোরে—
ওগো   দিনে কতবার করে।

আমি   বাহির হইব বলে
যেন সারাদিন কে বসিয়া থাকে
নীল আকাশের কোলে!
তাই কানাকানি পাতায় পাতায়,—
কালো লহরীর মাথায় মাথায়
চঞ্চল আলো দোলে—
আমি   বাহির হইব বলে।

আজ   ভরা হয়ে গেছে বারি।
আঙিনার দ্বারে চাহি পথপানে
ঘর ছেড়ে যেতে নারি।
দিনের আলোক ম্লান হয়ে আসে,
বধূগণ ঘাটে যায় কলহাসে
কক্ষে লইয়া ঝারি।
মোর   ভরা হয়ে গেছে বারি।

ঘাটে

বাউলের সুর

আমার নাই বা হল পারে যাওয়া।
যে হাওয়াতে চলত তরী
অঙ্গেতে সেই লাগাই হাওয়া॥
নেই যদি বা জমল পাড়ি
ঘাট আছে তো বসতে পারি,
আমার আশার তরী ডুবল যদি
দেখব তোদের তরী বাওয়া॥
হাতের কাছে কোলের কাছে
যা আছে সেই অনেক আছে,
আমার সারাদিনের এই কি রে কাজ
ওপার পানে কেঁদে চাওয়া?
কম কিছু মোর থাকে হেথা
পুরিয়ে নেব প্রাণ দিয়ে তা,
আমার সেই খানেতেই কল্পলতা
যেখানে মোর দাবি-দাওয়া॥

২১ ভাদ্র ১৩১২
গিরিডি

শুভক্ষণ

ওগো মা,
রাজার দুলাল যাবে আজি মোর
ঘরের সমুখপথে,
আজি এ প্রভাতে গৃহকাজ লয়ে
রহিব বলো কী মতে?

বলে দে আমায় কী করিব সাজ,
কী ছাঁদে কবরী বেঁধে লব আজ,
পরিব অঙ্গে কেমন ভঙ্গে
কোন্ বরনের বাস ?
মাগো, কী হল তোমার, অবাকনয়নে
মুখপানে কেন চাস ?
আমি দাঁড়াব যেথায় বাতায়নকোণে
সে চাবে না সেথা জানি তাহা মনে
ফেলিতে নিমেষ দেখা হবে শেষ
যাবে সে সুদূর পুরে ;—
শুধু সঙ্গের বাঁশি কোন্ মাঠ হতে
বাজিবে ব্যাকুল সুরে।

তবু রাজার দুলাল যাবে আজি মোর
ঘরের সমুখপথে,
শুধু সে নিমেষ লাগি না করিয়া বেশ
রহিব বলো কী মতে ?

ত্যাগ

ওগো মা,
রাজার দুলাল গেল চলি মোর
ঘরের সমুখপথে,
প্রভাতের আলো ঝলিল তাহার
স্বর্ণশিখর রথে।
ঘোমটা খসায়ে বাতায়নে থেকে
নিমেষের লাগি নিয়েছি মা দেখে,
ছিঁড়ি মণিহার ফেলেছি তাহার
পথের ধুলার 'পরে।

মাগো কী হল তোমার, অবাকনয়নে
চাহিস কিসের তরে।
মোর হার-ছেঁড়া মণি নেয় নি কুড়ায়ে
রথের চাকায় গেছে সে গুঁড়ায়ে,
চাকার চিহ্ন ঘরের সমুখে
পড়ে আছে শুধু আঁকা।
আমি কি দিলেম কারে জানে না সে কেউ
ধুলায় রহিল ঢাকা।

তবু রাজার দুলাল গেল চলি মোর
ঘরের সমুখপথে—
মোর বক্ষের মণি না ফেলিয়া দিয়া
রহিব বলো কী মতে?

১৩ শ্রাবণ ১৩১২
বোলপুর

আগমন

তখন রাত্রি আঁধার হল
সাঙ্গ হল কাজ—
আমরা মনে ভেবেছিলেম
আসবে না কেউ আজ।
মোদের গ্রামে দুয়ার যত
রুদ্ধ হল রাতের মতো,
দু-এক জনে বলেছিল,
"আসবে মহারাজ।"
আমরা হেসে বলেছিলেম
"আসবে না কেউ আজ।"

দ্বারে যেন আঘাত হল
শুনেছিলেম সবে,
আমরা তখন বলেছিলেম,
“বাতাস বুঝি হবে!”
নিবিয়ে প্রদীপ ঘরে ঘরে
শুয়েছিলেম আলসভরে,
দু-এক জনে বলেছিল,
“দূত এল বা তবে!”
আমরা হেসে বলেছিলেম
“বাতাস বুঝি হবে।”

নিশীথ রাতে শোনা গেল
কিসের যেন ধ্বনি।
ঘুমের ঘোরে ভেবেছিলেম
মেঘের গরজনি।
ক্ষণে ক্ষণে চেতন করি
কাঁপল ধরা থরহরি,
দু-এক জনে বলেছিল,
“চাকার ঝনঝনি।”
ঘুমের ঘোরে কহি মোরা,
“মেঘের গরজনি!”

তখনো রাত আঁধার আছে,
বেজে উঠল ভেরী,
কে ফুকারে “জাগো সবাই,
আর ক’রো না দেরি।”
বক্ষ’পরে দু-হাত চেপে
আমরা ভয়ে উঠি কেঁপে,

দু এক জনে কহে কানে,
"রাজার ধ্বজা হেরি।"
আমরা জেগে উঠে বলি
"আর তবে নয় দেরি ।"

কোথায় আলো, কোথায় মাল্য,
কোথায় আয়োজন।
রাজা আমার দেশে এল
কোথায় সিংহাসন।
হায় রে ভাগ্য, হায় রে লজ্জা,
কোথায় সভা, কোথায় সজ্জা।
দু-এক জনে কহে কানে,
"বৃথা এ ক্রন্দন—
রিক্তকরে শূন্য ঘরে
করো অভ্যর্থন।"

ওরে দুয়ার খুলে দে রে,
বাজা শঙ্খ বাজা!
গভীর রাতে এসেছে আজ
আঁধার ঘরের রাজা।
বজ্র ডাকে শূন্যতলে,
বিদ্যুতেরি ঝিলিক ঝলে,
ছিন্নশয়ন টেনে এনে
আঙিনা তোর সাজা
ঝড়ের সাথে হঠাৎ এল
দুঃখরাতের রাজা।

২৮ শ্রাবণ ১৩১২
কলিকাতা

দুঃখমূর্তি

দুখের বেশে এসেছ বলে
তোমারে নাহি ডরিব হে।
যেখানে ব্যথা তোমারে সেথা
নিবিড় ক'রে ধরিব হে।
আঁধারে মুখ ঢাকিলে, স্বামী,
তোমারে তবু চিনিব আমি,
মরণরূপে আসিলে, প্রভু,
চরণ ধরি' মরিব হে—
যেমন করে দাও না দেখা
তোমারে নাহি ডরিব হে।

নয়নে আজি ঝরিছে জল
ঝরুক জল নয়নে হে।
বাজিছে বুকে বাজুক, তব
কঠিন বাহুবাঁধনে হে।
তুমি যে আছ বক্ষে ধরে
বেদনা তাহা জানাক মোরে
চাব না কিছু, কব না কথা,
চাহিয়া রব বদনে হে।
নয়নে আজি ঝরিছে জল
ঝরুক জল নয়নে হে।

মুক্তিপাশ

ওগো নিশীথে কখন এসেছিলে তুমি
কখন যে গেছ বিহানে
তাহা কে জানে।
আমি চরণশবদ পাই নি শুনিতে
ছিলেম কিসের খেয়ানে
তাহা কে জানে।
রুদ্ধ আছিল আমার এ গেহ
কতকাল আসে-যায় নাই কেহ,
তাই মনে মনে ভাবিতেছিলাম
এখনো রয়েছে যামিনী,—
যেমন বন্ধ আছিল সকলি
বুঝি বা রয়েছে তেমনি।
হে মোর গোপনবিহারী,
ঘুমায়ে ছিলেম যখন, তুমি কি
গিয়েছিলে মোরে নেহারি ?

আজ নয়ন মেলিয়া একী হেরিলাম
বাধা নাই কোনো বাধা নাই—
আমি বাঁধা নাই।
ওগো যে-আঁধার ছিল শয়ন ঘেরিয়া
আধা নাই তার আধা নাই,
আমি বাঁধা নাই।
তখনি উঠিয়া গেলেম ছুটিয়া,
দেখিনু কে মোর আগল টুটিয়া
ঘরে ঘরে যত দুয়ার-জানালা
সকলি দিয়েছে খুলিয়া ;—
আকাশ-বাতাস ঘরে আসে মোর
বিজয়পতাকা তুলিয়া !

হে বিজয়ী বীর অজানা,
কখন যে তুমি জয় করে যাও
কে পায় তাহার ঠিকানা !

আমি ঘরে বাঁধা ছিনু, এবার আমারে
আকাশে রাখিলে ধরিয়া
দৃঢ় করিয়া।
সব বাঁধা খুলে দিয়ে মুক্তিবাঁধনে
বাঁধিলে আমারে হরিয়া
দৃঢ় করিয়া।
রুদ্ধদুয়ার ঘরে কতবার
খুঁজেছিল মন পথ পালাবার,
এবার তোমার আশাপথ চাহি
বসে রব খোলা দুয়ারে,—
তোমারে ধরিতে হইবে বলিয়া
ধরিয়া রাখিব আমারে।
হে মোর পরানবঁধু হে
কখন যে তুমি দিয়ে চলে যাও
পরানে পরশমধু হে।

প্রভাতে

এক রজনীর বরষনে শুধু
কেমন করে
আমার ঘরের সরোবর আজি
উঠেছে ভরে।
নয়ন মেলিয়া দেখিলাম ওই
ঘন নীল জল করে থইথই,

কূল কোথা এর, তল মেলে কই
কহ গো মোরে—
এক বরষায় সরোবর দেখো
উঠেছে ভরে।

কাল রজনীতে কে জানিত মনে
এমন হবে
ঝরঝর বারি তিমির নিশীথে
ঝরিল যবে,—
ভরা শ্রাবণের নিশি দু-পহরে
শুনেছিনু শুয়ে দীপহীন ঘরে
কেঁদে যায় বায়ু পথে প্রান্তরে
কাতর রবে
তখন সে রাতে কে জানিত মনে
এমন হবে।

হেরো হেরো মোর অকূল অশ্রু-
সলিলমাঝে
আজি এ অমল কমলকান্তি
কেমনে রাজে।
একটিমাত্র শ্বেত শতদল
আলোক-পুলকে করে ঢলঢল,
কখন ফুটিল বল্ মোরে বল্
এমন সাজে
আমার অতল অশ্রু-সাগর-
সলিলমাঝে!

আজি একা বসে ভাবিতেছি মনে
ইহারে দেখি,
দুখ-যামিনীর বুকচেরা ধন
হেরিনু এ কী।

ইহারি লাগিয়া হৃদ্‌ বিদারণ,
এত ক্রন্দন, এত জাগরণ,
ছুটেছিল ঝড় ইহারি বদন
বক্ষে লেখি।
দুখ-যামিনীর বুকচেরা ধন
হেরিনু এ কী।

১৪ শ্রাবণ ১৩১২

দান

ভেবেছিলাম চেয়ে নেব—
চাই নি সাহস করে—
সন্ধ্যেবেলায় যে মালাটি
গলায় ছিলে পরে—
আমি চাই নি সাহস করে।
ভেবেছিলাম সকাল হলে
যখন পারে যাবে চলে
ছিন্নমালা শয্যাতলে
রইবে বুঝি পড়ে।
তাই আমি কাঙালের মতো
এসেছিলেম ভোরে—
তবু চাই নি সাহস করে।

এ তো মালা নয় গো, এ যে
তোমার তরবারি।
জ্বলে ওঠে আগুন যেন,
বজ্র-হেন ভারি—
এ যে তোমার তরবারি।

তরুণ আলো জানলা বেয়ে
পড়ল তোমার শয়ন ছেয়ে
ভোরের পাখি শুধায় গেয়ে
"কী পেলি তুই নারী ?"
নয় এ মালা, নয় এ থালা,
গন্ধজলের ঝারি,
এ যে ভীষণ তরবারি।

তাই তো আমি ভাবি বসে
এ কী তোমার দান ?
কোথায় এরে লুকিয়ে রাখি
নাই যে হেন স্থান।
ওগো এ কী তোমার দান ?
শক্তিহীনা মরি লাজে,
এ ভূষণ কি আমায় সাজে ?
রাখতে গেলে বুকের মাঝে
ব্যথা যে পায় প্রাণ।
তবু আমি বইব বুকে
এই বেদনার মান—
নিয়ে তোমারি এই দান।

আজকে হতে জগৎমাঝে
ছাড়ব আমি ভয়,
আজ হতে মোর সকল কাজে
তোমার হবে জয়—
আমি ছাড়ব সকল ভয়।
মরণকে মোর দোসর করে
রেখে গেছ আমার ঘরে,
আমি তারে বরণ ক'রে
রাখব পরানময়।

তোমার তরবারি আমার
করবে বাঁধন ক্ষয়।
আমি ছাড়ব সকল ভয়।

তোমার লাগি অঙ্গ ভরি
করব না আর সাজ।
নাই বা তুমি ফিরে এলে
ওগো হৃদয়রাজ।
আমি করব না আর সাজ।
ধুলায় বসে তোমার তরে
কাঁদব না আর একলা ঘরে,
তোমার লাগি ঘরে-পরে
মানব না আর লাজ।
তোমার তরবারি আমায়
সাজিয়ে দিল আজ,
আমি করব না আর সাজ।

২৬ ভাদ্র ১৩১২
গিরিডি

বালিকা বধূ

ওগো বর, ওগো বঁধু,
এই যে নবীনা বুদ্ধিবিহীনা
এ তব বালিকা বধূ।
তোমার উদার প্রাসাদে একেলা
কত খেলা নিয়ে কাটায় যে বেলা,
তুমি কাছে এলে ভাবে তুমি তার
খেলিবার ধন শুধু,
ওগো বর, ওগো বঁধু।

জানে না করিতে সাজ।
কেশবেশ তার হলে একাকার
মনে নাহি মানে লাজ।
দিনে শতবার ভাঙিয়া গড়িয়া,
ধুলা দিয়ে ঘর রচনা করিয়া,
ভাবে মনে মনে সাধিছে আপন
ঘরকরনের কাজ।
জানে না করিতে সাজ।

কহে এরে গুরুজনে,
"ও যে তোর পতি, ও তোর দেবতা"
ভীত হয়ে তাহা শোনে।
কেমন করিয়া পূজিবে তোমায়
কোনোমতে তাহা ভাবিয়া না পায়,
খেলা ফেলি কভু মনে পড়ে তার
"পালিব পরানপণে
যাহা কহে গুরুজনে।"

বাসকশয়ন'পরে
তোমার বাহুতে বাঁধা রহিলেও
অচেতন ঘুমভরে।
সাড়া নাহি দেয় তোমার কথায়
কত শুভখন বৃথা চলি যায়,
যে-হার তাহারে পরালে, সে-হার
কোথায় খসিয়া পড়ে
বাসকশয়ন'পরে।

শুধু দুর্দিনে ঝড়ে
—দশদিক ত্রাসে আঁধারিয়া আসে
ধরাতলে অম্বরে—
তখন নয়নে ঘুম নাই আর,
খেলাধুলা কোথা পড়ে থাকে তার,

তোমারে সবলে রহে আঁকড়িয়া,
হিয়া কাঁপে থরথরে—
দুঃখদিনের ঝড়ে।

মোরা মনে করি ভয়
তোমার চরণে অবোধজনের
অপরাধ পাছে হয়।
তুমি আপনার মনে মনে হাস
এই দেখিতেই বুঝি ভালোবাস,
খেলাঘরদ্বারে দাঁড়াইয়া আড়ে
কী যে পাও পরিচয়।
মোরা মিছে করি ভয়।

তুমি বুঝিয়াছ মনে
একদিন এর খেলা ঘুচে যাবে
ওই তব শ্রীচরণে।
সাজিয়া যতনে তোমারি লাগিয়া
বাতায়নতলে রহিবে জাগিয়া,
শতযুগ করি মানিবে তখন
ক্ষণেক অদর্শনে,
তুমি বুঝিয়াছ মনে।

ওগো বর, ওগো বঁধু,
জান জান তুমি—ধুলায় বসিয়া
এ বালা তোমারি বধূ।
রতন-আসন তুমি এরি তরে
রেখেছ সাজায়ে নির্জন ঘরে,
সোনার পাত্রে ভরিয়া রেখেছ
নন্দনবন-মধু—
ওগো বর, ওগো বঁধু।

১৫ শ্রাবণ ১৩১২

অনাহত

দাঁড়িয়ে আছ আধেকখোলা
বাতায়নের ধারে
নূতন বধূ বুঝি ?
আসবে কখন চুড়িওলা
তোমার গৃহদ্বারে
লয়ে তাহার পুঁজি।
দেখছ চেয়ে গোরুর গাড়ি
উড়িয়ে চলে ধূলি
খর রোদের কালে ;
দূর নদীতে দিচ্ছে পাড়ি
বোঝাই নৌকাগুলি
বাতাস লাগে পালে।

আধেক খোলা বিজনঘরে
ঘোমটা-ছায়ায় ঢাকা
একলা বাতায়নে,
বিশ্ব তোমার আঁখির 'পরে
কেমন পড়ে আঁকা,
তাই ভাবি যে মনে।
ছায়াময় সে ভুবনখানি
স্বপন দিয়ে গড়া
রূপকথাটি ছাঁদা,
কোন্ সে পিতামহীর বাণী
নাইকো আগাগোড়া
দীর্ঘ ছড়া বাঁধা।

আমি ভাবি হঠাৎ যদি
বৈশাখের এক দিন

বাতাস বহে বেগে—
লজ্জা ছেড়ে নাচে নদী
শূন্যে বাঁধনহীন,
পাগল উঠে জেগে,—
যদি তোমার ঢাকা ঘরে
যত আগল আছে
সকলি যায় দূরে—
ওই যে বসন নেমে পড়ে
তোমার আঁখির কাছে
ও যদি যায় উড়ে,—

তীব্র তড়িৎহাসি হেসে
বজ্রভেরীর স্বরে
তোমার ঘরে ঢুকি
জগৎ যদি এক নিমেষে
শক্তিমূর্তি ধ'রে
দাঁড়ায় মুখোমুখি—
কোথায় থাকে আধেকঢাকা
অলস দিনের ছায়া,
বাতায়নের ছবি,
কোথায় থাকে স্বপনমাখা
আপনগড়া মায়া,—
উড়িয়া যায় সবি।

তখন তোমার ঘোমটা-খোলা
কালো চোখের কোণে
কাঁপে কিসের আলো,
ডুবে তোমার আপনা-ভোলা
প্রাণের আন্দোলনে
সকল মন্দভালো।

বক্ষে তোমার আঘাত করে
উত্তাল নর্তনে
রক্ততরঙ্গিণী।
অঙ্গে তোমার কী সুর তুলে
চঞ্চল কম্পনে
কঙ্কণ-কিঙ্কিণী।

আজকে তুমি আপনাকে
আধেক আড়াল ক'রে
দাঁড়িয়ে ঘরের কোণে
দেখতেছ এই জগৎটাকে
কী যে মায়ায় ভরে,
তাহাই ভাবি মনে।
অর্থবিহীন খেলার মতো
তোমার পথের মাঝে
চলছে যাওয়া-আসা,
উঠে ফুটে মিলায় কত
ক্ষুদ্র দিনের কাজে
ক্ষুদ্র কাঁদা-হাসা।

২৬ শ্রাবণ ১৩১২
বোলপুর

বাঁশি

ঐ তোমার ঐ বাঁশিখানি
শুধু ক্ষণেক তরে
দাও গো আমার করে।
শরৎ-প্রভাত গেল ব'য়ে,
দিন যে এল ক্লান্ত হয়ে,

বাঁশি-বাজা সাঙ্গ যদি
কর আলস ভরে
তবে তোমার বাঁশিখানি
শুধু ক্ষণেক তরে
দাও গো আমার করে।

আর কিছু নয় আমি কেবল
করব নিয়ে খেলা
শুধু একটি বেলা।
তুলে নেব কোলের 'পরে,
অধরেতে রাখব ধরে,
তারে নিয়ে যেমন খুশি
যেথা-সেথায় ফেলা--
এমনি করে আপন মনে
করব আমি খেলা
শুধু একটি বেলা।

তার পরে যেই সন্ধ্যে হবে
এনে ফুলের ডালা
গেঁথে তুলব মালা।
সাজাব তায় যূথীর হারে,
গন্ধে ভরে দেব তারে
করব আমি আরতি তার
নিয়ে দীপের থালা।
সন্ধ্যে হলে সাজাব তায়
ভরে ফুলের ডালা
গেঁথে যূথীর মালা।

রাতে উঠবে আধেক শশী
তারার মধ্যখানে,
চাবে তোমার পানে।

তখন আমি কাছে আসি
ফিরিয়ে দেব তোমার বাঁশি,
তুমি তখন বাজাবে সুর
গভীর রাতের তানে
রাতে যখন আধেক শশী
তারার মধ্যখানে
চাবে তোমার পানে।

২৯ শ্রাবণ ১৩১২
কলিকাতা

অনাবশ্যক

কাশের বনে শূন্য নদীর তীরে
আমি তারে জিজ্ঞাসিলাম ডেকে,
"একলা পথে কে তুমি যাও ধীরে
আঁচল আড়ে প্রদীপখানি ঢেকে।
আমার ঘরে হয় নি আলো জ্বালা
দেউটি তব হেথায় রাখো বালা।"
গোধূলিতে দুটি নয়ন কালো
ক্ষণেক তরে আমার মুখে তুলে
সে কহিল, "ভাসিয়ে দেব আলো
দিনের শেষে তাই এসেছি কূলে।"
চেয়ে দেখি দাঁড়িয়ে কাশের বনে
প্রদীপ ভেসে গেল অকারণে।

ভরা সাঁঝে আঁধার হয়ে এলে
আমি ডেকে জিজ্ঞাসিলাম তারে,
"তোমার ঘরে সকল আলো জ্বেলে
এ দীপখানি সঁপিতে যাও কারে?

আমার ঘরে হয় নি আলো জ্বালা
দেউটি তব হেথায় রাখো বালা।”
আমার মুখে দুটি নয়ন কালো
ক্ষণেক তরে রৈল চেয়ে ভুলে
সে কহিল “আমার এ যে আলো
আকাশপ্রদীপ শূন্যে দিব তুলে।”
চেয়ে দেখি শূন্য গগনকোণে
প্রদীপখানি জ্বলে অকারণে।

অমাবস্যা আঁধার দুই পহরে
জিজ্ঞাসিলাম তাহার কাছে গিয়ে
“ওগো তুমি চলেছ কার তরে
প্রদীপখানি বুকের কাছে নিয়ে?
আমার ঘরে হয় নি আলো জ্বালা
দেউটি তব হেথায় রাখো বালা।”
অন্ধকারে দুটি নয়ন কালো
ক্ষণেক মোরে দেখলে চেয়ে তবে,
সে কহিল, “এনেছি এই আলো
দীপালিতে সাজিয়ে দিতে হবে।”
চেয়ে দেখি লক্ষ দীপের সনে
দীপখানি তার জ্বলে অকারণে।

২৫ শ্রাবণ ১৩১২
বোলপুর

অবারিত

ওগো তোরা বল্‌ তো, এরে
ঘর বলি কোন্‌ মতে?
এরে কে বেঁধেছে হাটের মাঝে
আনাগোনার পথে?

আসতে যেতে বাঁধে তরী
আমারি এই ঘাটে,
যে খুশি সেই আসে,—আমার
এই ভাবে দিন কাটে।
ফিরিয়ে দিতে পারি না যে
হায় রে—
কী কাজ নিয়ে আছি,—আমার
বেলা বহে যায় যে, আমার
বেলা বহে যায় রে।

পায়ের শব্দ বাজে তাদের,
রজনীদিন বাজে।
ওগো মিথ্যে তাদের ডেকে বলি
"তোদের চিনি না যে!"
কাউকে চেনে পরশ আমার
কাউকে চেনে ঘ্রাণ,
কাউকে চেনে বুকের রক্ত
কাউকে চেনে প্রাণ।
ফিরিয়ে দিতে পারি না যে
হায় রে—
ডেকে বলি, "আমার ঘরে
যার খুশি সেই আয় রে, তোরা
যার খুশি সেই আয় রে।"

সকালবেলায় শঙ্খ বাজে
পুবের দেবালয়ে,—
ওগো স্নানের পরে আসে তারা
ফুলের সাজি লয়ে।
মুখে তাদের আলো পড়ে
তরুণ আলোখানি।

অরুণ পায়ের ধুলোটুকু
বাতাস লহে টানি।
ফিরিয়ে দিতে পারি না যে
হায় রে—
ডেকে বলি, “আমার বনে
তুলিবি ফুল, আয় রে তোরা,
তুলিবি ফুল আয় রে।”

দুপুরবেলা ঘণ্টা বাজে
রাজার সিংহদ্বারে।
ওগো কী কাজ ফেলে আসে তারা
এই বেড়াটির ধারে।
মলিনবরন মালাখানি
শিথিল কেশে সাজে,
ক্লিষ্টকরুণ রাগে তাদের
ক্লান্ত বাঁশি বাজে।
ফিরিয়ে দিতে পারি না যে
হায় রে—
ডেকে বলি, “এই ছায়াতে
কাটাবি দিন, আয় রে তোরা
কাটাবি দিন আয় রে।”

রাতের বেলা ঝিল্লি ডাকে
গহন বনমাঝে।
ওগো ধীরে ধীরে দুয়ারে মোর
কার সে আঘাত বাজে?
যায় না চেনা মুখখানি তার,
কয় না কোনো কথা,
ঢাকে তারে আকাশভরা
উদাস নীরবতা।

ফিরিয়ে দিতে পারি না যে
হায় রে—
চেয়ে থাকি সে-মুখপানে
রাত্রি বহে যায়, নীরবে
রাত্রি বহে যায় রে।

১৫ পৌষ ১৩১২
শান্তিনিকেতন

গোধূলিলগ্ন

আমার গোধূলি-লগন এল বুঝি কাছে
গোধূলি-লগন রে।
বিবাহের রঙে রাঙা হয়ে আসে
সোনার গগন রে।
শেষ করে দিল পাখি গান গাওয়া,
নদীর উপরে পড়ে এল হাওয়া,
ওপারের তীর ভাঙা মন্দির
আঁধারে মগন রে।
আসিছে মধুর ঝিল্লি-নূপুরে
গোধূলি-লগন রে।

আমার দিন কেটে গেছে কখনো খেলায়,
কখনো কত কী কাজে।
এখন কি শুনি পূরবীর সুরে
কোন্ দূরে বাঁশি বাজে।
বুঝি দেরি নাই, আসে বুঝি আসে,
আলোকের আভা লেগেছে আকাশে,

বেলাশেষে মোরে কে সাজাবে ওরে
নবমিলনের সাজে ?
সারা হল কাজ মিছে কেন আজ
ডাক মোরে আর কাজে ?

এখন নিরিবিলি ঘরে সাজাতে হবে রে
বাসক-শয়ন যে।
ফুলশেজ লাগি রজনীগন্ধা
হয় নি চয়ন যে।
সারা যামিনীর দীপ সযতনে
জ্বালায়ে তুলিতে হবে বাতায়নে,
যূথীদল আনি গুণ্ঠনখানি
করিব বয়ন যে।
সাজাতে হবে রে নিবিড় রাতের
বাসক-শয়ন যে।

প্রাতে এসেছিল যারা কিনিতে বেচিতে
চলে গেছে তারা সব।
রাখালের গান হল অবসান,
না শুনি ধেনুর রব।
এই পথ দিয়ে প্রভাতে দুপুরে
যারা এল আর যারা গেল দূরে
কে তারা জানিত আমার নিভৃত
সন্ধ্যার উৎসব।
কেনাবেচা যারা করে গেল সারা
চলে গেল তারা সব।

আমি জানি যে আমার হয়ে গেছে গনা
গোধূলি-লগন রে।
ধূসর আলোকে মুদিবে নয়ন
অস্ত-গগন রে—

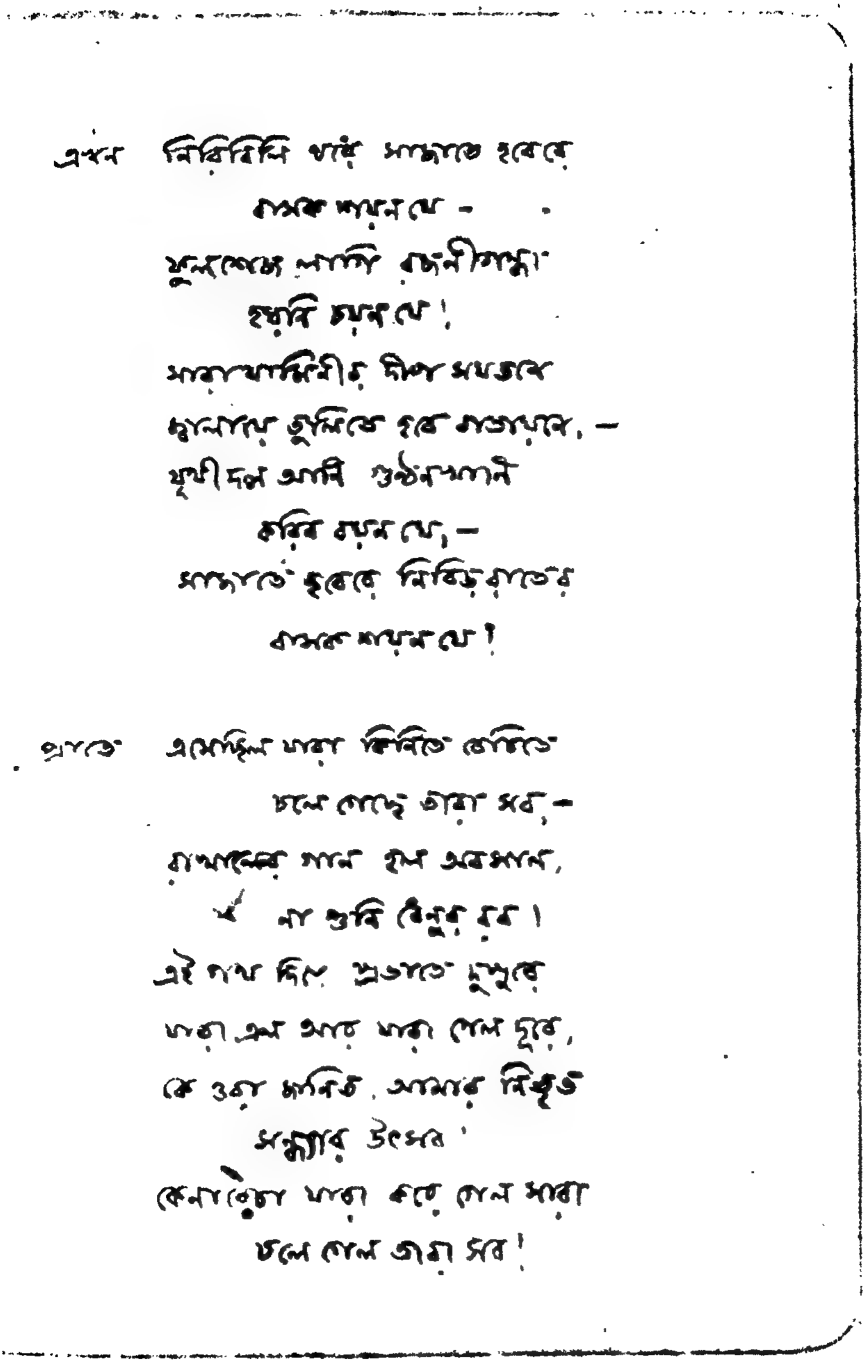

এখন নিরিবিলি থাক্‌ সাজাতে হবে রে
বাসর শয়ন যে —
ফুলশেজে লাগি রজনীগন্ধা
হয়নি চয়ন যে!
সারাযামিনীর দীপ সযতনে
জ্বালায়ে তুলিতে হবে সাবধানে, —
যূথীদল আনি গুণ্ঠনখানি
করিব বয়ন যে, —
সাজাতে হবে রে নিবিড় রাতের
বাসর শয়ন যে!

প্রাতে এসেছিল যারা কিনিতে বেচিতে
চলে গেছে তারা সব, —
রাখালের গান হল অবসান,
না শুনি ধেনুর রব।
এই পথ দিয়ে প্রভাতে দুপুরে
যারা এল আর যারা গেল দূরে,
কে তারা জানিত, আমার নিভৃত
সন্ধ্যার উৎসব!
কেনাবেচা যারা করে গেল সারা
চলে গেল তারা সব!

'খেয়া'র পাণ্ডুলিপির একটি পৃষ্ঠা

তখন এ-ঘরে কে খুলিবে দ্বার,
কে লইবে টানি বাহুটি আমার,
আমায় কে জানে কী মন্ত্রে গানে
করিবে মগন রে—
সব গান সেরে আসিবে যখন
গোধূলি-লগন রে।

লীলা

আমি শরৎশেষের মেঘের মতো
তোমার গগনকোণে
সদাই ফিরি অকারণে।
তুমি আমার চিরদিনের
দিনমণি গো—
আজো তোমার কিরণপাতে
মিশিয়ে দিয়ে আলোর সাথে
দেয় নি মোরে বাষ্প ক'রে
তোমার পরশনি—
তোমা হতে পৃথক হয়ে
বৎসর মাস গনি।

ওগো এমনি তোমার ইচ্ছা যদি,
এমনি খেলা তব
তবে খেলাও নব নব।
লয়ে আমার তুচ্ছ কণিক
ক্ষণিকতা গো—
সাজাও তারে বর্ণে বর্ণে,
ডুবাও তারে তোমার স্বর্ণে,

বায়ুর স্রোতে ভাসিয়ে তারে
খেলাও যথা-তথা,—
শূন্য আমায় নিয়ে রচ
নিত্য বিচিত্রতা।

ওগো আবার যবে ইচ্ছা হবে
সাঙ্গ ক'রো খেলা
ঘোর নিশীথরাত্রিবেলা।
অশ্রুধারে ঝরে যাব
অন্ধকারে গো—
প্রভাতকালে রবে কেবল
নির্মলতা শুভ্রশীতল,
রেখাবিহীন মুক্ত আকাশ
হাসবে চারিধারে,—
মেঘের খেলা মিশিয়ে যাবে
জ্যোতিঃসাগরপারে।

২০ পৌষ ১৩১২
শান্তিনিকেতন, বোলপুর

মেঘ

আদি অন্ত হারিয়ে ফেলে,
সাদা কালো আসন মেলে,
পড়ে আছে আকাশটা খোশখেয়ালি,
আমরা যে সব রাশি রাশি
মেঘের পুঞ্জ ভেসে আসি,
আমরা তারি খেয়াল তারি হেঁয়ালি।
মোদের কিছু ঠিকঠিকানা নাই,
আমরা আসি আমরা চলে যাই।

ঐ যে সকল জ্যোতির মালা,
গ্রহতারা রবির ডালা,
জুড়ে আছে নিত্যকালের পসরা;
ওদের হিসেব পাকা খাতায়
আলোর লেখা কালো পাতায়,
মোদের তরে আছে মাত্র খসড়া;
রংবেরঙের কলম দিয়ে এঁকে
যেমন খুশি মোছে আবার লেখে।

আমরা কভু বিনা কাজে
ডাক দিয়ে যাই মাঝে মাঝে
অকারণে মুচকে হাসি হামেশা।
তাই বলে সব মিথ্যে না কি?
বৃষ্টি সে তো নয়কো ফাঁকি,
বজ্রটা তো নিতান্ত নয় তামাশা।
শুধু আমরা থাকি নে কেউ, ভাই,
হাওয়ায় আসি হাওয়ায় ভেসে যাই।

নিরুদ্যম

তখন আকাশতলে ঢেউ তুলেছে
পাখিরা গান গেয়ে;
তখন পথের দুটি ধারে
ফুল ফুটেছে ভারে ভারে,
মেঘের কোণে রং ধরেছে
দেখি নি কেউ চেয়ে।
মোরা আপন মনে ব্যস্ত হয়ে
চলেছিলেম ধেয়ে।

মোরা সুখের বশে গাই নি তো গান,
করি নি কেউ খেলা ;
চাই নি ভুলে ডাহিন-বাঁয়ে,
হাটের লাগি যাই নি গাঁয়ে,
হাসি নি কেউ, কই নি কথা,
করি নি কেউ হেলা ;
মোরা ততই বেগে চলেছিলেম
যতই বাড়ে বেলা।

শেষে সূর্য যখন মাঝ আকাশে
কপোত ডাকে বনে,
তপ্ত হাওয়ায় ঘুরে ঘুরে
শুকনো পাতা বেড়ায় উড়ে,
বটের তলে রাখালশিশু
ঘুমায় অচেতনে,
আমি জলের ধারে শুলেম এসে
শ্যামল তৃণাসনে।

আমার দলের সবাই আমার পানে
চেয়ে গেল হেসে ;
চলে গেল উচ্চ শিরে
চাইল না কেউ পিছু ফিরে,
মিলিয়ে গেল সুদূর ছায়ায়
পথতরুর শেষে ;
তারা পেরিয়ে গেল কত যে মাঠ,
কতদূরের দেশে !

ওগো ধন্য তোমরা দুখের যাত্রী,
ধন্য তোমরা সবে।
লাজের ঘায়ে উঠিতে চাই,
মনের মাঝে সাড়া না পাই,

মগ্ন হলেম আনন্দময়
অগাধ অগৌরবে,—
পাখির গানে, বাঁশির তানে,
কম্পিত পল্লবে।

আমি মুগ্ধতনু দিলাম মেলে
বসুন্ধরার কোলে।
বাঁশের ছায়া কী কৌতুকে
নাচে আমার চক্ষে মুখে,
আমের মুকুল গন্ধে আমায়
বিধুর ক'রে তোলে
নয়ন মুদে আসে মৌমাছিদের
গুঞ্জন-কল্লোলে।

সেই রৌদ্রে ঘেরা সবুজ আরাম
মিলিয়ে এল প্রাণে।
ভুলে গেলেম কিসের তরে
বাহির হলেম পথের 'পরে,
ঢেলে দিলেম চেতনা মোর
ছায়ায় গন্ধে গানে;
ধীরে ঘুমিয়ে প'লেম অবশ দেহে
কখন কে তা জানে।

শেষে গভীর ঘুমের মধ্য হতে
ফুটল যখন আঁখি,
চেয়ে দেখি, কখন এসে
দাঁড়িয়ে আছ শিয়রদেশে
তোমার হাসি দিয়ে আমার
অচৈতন্য ঢাকি'।
ওগো ভেবেছিলেম আছে আমার
কত না পথ বাকি।

মোরা ভেবেছিলেম পরানপণে
সজাগ রব সবে ;
সন্ধ্যা হবার আগে যদি
পার হতে না পারি নদী,
ভেবেছিলেম তাহা হলেই
সকল ব্যর্থ হবে।
যখন আমি থেমে গেলাম, তুমি
আপনি এলে কবে।

৬ চৈত্র ১৩১২
কলিকাতা

কৃপণ

আমি ভিক্ষা করে ফিরতেছিলেম
গ্রামের পথে পথে,
তুমি তখন চলেছিলে
তোমার স্বর্ণরথে।
অপূর্ব এক স্বপ্নসম
লাগতেছিল চক্ষে মম
কী বিচিত্র শোভা তোমার
কী বিচিত্র সাজ।
আমি মনে ভাবতেছিলেম
এ কোন্ মহারাজ।

আজি শুভক্ষণে রাত পোহাল
ভেবেছিলেম তবে,
আজ আমারে দ্বারে দ্বারে
ফিরতে নাহি হবে।

বাহির হতে নাহি হতে
কাহার দেখা পেলেম পথে,
চলিতে রথ ধনধান্য
ছড়াবে দুইধারে—
মুঠা মুঠা কুড়িয়ে নেব,
নেব ভারে ভারে।

দেখি সহসা রথ থেমে গেল
আমার কাছে এসে,
আমার মুখপানে চেয়ে
নামলে তুমি হেসে।
দেখে মুখের প্রসন্নতা
জুড়িয়ে গেল সকল ব্যথা,
হেনকালে কিসের লাগি
তুমি অকস্মাৎ
“আমায় কিছু দাও গো” বলে
বাড়িয়ে দিলে হাত।

মরি, এ কী কথা রাজাধিরাজ,
“আমায় দাও গো কিছু।”
শুনে ক্ষণকালের তরে
রৈনু মাথা-নিচু।
তোমার কী বা অভাব আছে,
ভিখারি ভিক্ষুকের কাছে?
এ কেবল কৌতুকের বশে
আমায় প্রবঞ্চনা।
ঝুলি হতে দিলেম তুলে
একটি ছোটো কণা।

যবে পাত্রখানি ঘরে এনে
উজাড় করি—এ কী
ভিক্ষামাঝে একটি ছোটো
সোনার কণা দেখি।
দিলেম যা রাজ-ভিখারিরে
স্বর্ণ হয়ে এল ফিরে,
তখন কাঁদি চোখের জলে
দুটি নয়ন ভরে
তোমায় কেন দিই নি আমার
সকল শূন্য করে।

৮ চৈত্র [১৩১২]
কলিকাতা

কুয়ার ধারে

তোমার কাছে চাই নি কিছু,
জানাই নি মোর নাম,
তুমি যখন বিদায় দিলে
নীরব রহিলাম।
একলা ছিলাম কুয়ার ধারে
নিমের ছায়াতলে,
কলস নিয়ে সবাই তখন
পাড়ায় গেছে চলে।
আমায় তারা ডেকে গেল
“আয় গো বেলা যায়।”
কোন্ আলসে রইনু বসে
কিসের ভাবনায়।

পদধ্বনি শুনি নাইকো
কখন তুমি এলে।
কইলে কথা ক্লান্তকণ্ঠে
করুণ চক্ষু মেলে—
“তৃষাকাতর পান্থ আমি”—
শুনে চমকে উঠে
জলের ধারা দিলেম ঢেলে
তোমার করপুটে।
মর্মরিয়া কাঁপে পাতা,
কোকিল কোথা ডাকে
বাবলা ফুলের গন্ধ ওঠে
পল্লীপথের বাঁকে।

যখন তুমি শুধালে নাম
পেলেম বড়ো লাজ,
তোমার মনে থাকার মতো
করেছি কোন্ কাজ ?
তোমায় দিতে পেরেছিলেম
একটু তৃষার জল
এই কথাটি আমার মনে
রহিল সম্বল।
কুয়ার ধারে দুপুরবেলা
তেমনি ডাকে পাখি,
তেমনি কাঁপে নিমের পাতা,
আমি বসেই থাকি।

৯ চৈত্র ১৩১২

জাগরণ

পথ চেয়ে তো কাটল নিশি,
লাগছে মনে ভয়—
সকালবেলা ঘুমিয়ে পড়ি
যদি এমন হয়।
যদি তখন হঠাৎ এসে
দাঁড়ায় আমার দুয়ার-দেশে।
বনচ্ছায়ায় ঘেরা এ ঘর
আছে তো তার জানা,—
ওগো তোরা পথ ছেড়ে দিস
করিস নে কেউ মানা।

যদি বা তার পায়ের শব্দে
ঘুম না ভাঙে মোর
শপথ আমার তোরা কেহ
ভাঙাস নে সে ঘোর।
চাই নে জাগতে পাখির রবে
নতুন আলোর মহোৎসবে,
চাই নে জাগতে হাওয়ায় আকুল
বকুলফুলের বাসে,
তোরা আমায় ঘুমোতে দিস
যদিই বা সে আসে।

ওগো আমার ঘুম যে ভালো
গভীর অচেতনে,
যদি আমায় জাগায় তারি
আপন পরশনে।
ঘুমের আবেশ যেমনি টুটি
দেখব তারি নয়ন দুটি

মুখে আমার তারি হাসি
পড়বে সকৌতুকে—
সে যেন মোর সুখের স্বপন
দাঁড়াবে সম্মুখে।

সে আসবে মোর চোখের 'পরে
সকল আলোর আগে,
তাহারি রূপ মোর প্রভাতের
প্রথম হয়ে জাগে।
প্রথম চমক লাগবে সুখে
চেয়ে তারি করুণ মুখে,
চিত্ত আমার উঠবে কেঁপে
তার চেতনায় ভ'রে—
তোরা আমায় জাগাস নে কেউ,
জাগাবে সেই মোরে।

১০ চৈত্র ১৩১২
কলিকাতা

ফুল ফোটানো

তোরা কেউ পারবি নে গো
পারবি নে ফুল ফোটাতে।
যতই বলিস, যতই করিস,
যতই তারে তুলে ধরিস,
ব্যগ্র হয়ে রজনীদিন
আঘাত করিস বোঁটাতে
তোরা কেউ পারবি নে গো
পারবি নে ফুল ফোটাতে।

দৃষ্টি দিয়ে বারে বারে
ম্লান করতে পারিস তারে,

ছিঁড়তে পারিস দলগুলি তার,
ধুলায় পারিস লোটাতে,
মোদের বিষম গণ্ডগোলে
যদিই বা সে মুখটি খোলে,
ধরবে না রং, পারবে না তার
গন্ধটুকু ছোটাতে।
তোরা কেউ পারবি নে গো
পারবি নে ফুল ফোটাতে।

যে পারে সে আপনি পারে
পারে সে ফুল ফোটাতে।
সে শুধু চায় নয়ন মেলে
দুটি চোখের কিরণ ফেলে,
অমনি যেন পূর্ণপ্রাণের
মন্ত্র লাগে বোঁটাতে!
যে পারে সে আপনি পারে
পারে সে ফুল ফোটাতে।

নিঃশ্বাসে তার নিমেষেতে
ফুল যেন চায় উড়ে যেতে,
পাতার পাখা মেলে দিয়ে
হাওয়ায় থাকে লোটাতে।
রং যে ফুটে ওঠে কত
প্রাণের ব্যাকুলতার মতো,
যেন কারে আনতে ডেকে
গন্ধ থাকে ছোটাতে।
যে পারে সে আপনি পারে,
পারে সে ফুল ফোটাতে।

১১ চৈত্র [১৩১২]
বোলপুর

হার

মোদের হারের দলে বসিয়ে দিলে,
জানি আমরা পারব না।
হারাও যদি হারব খেলায়
তোমার খেলা ছাড়ব না।
কেউ বা ওঠে, কেউ বা পড়ে,
কেউ বা বাঁচে, কেউ বা মরে,
আমরা না হয় মরার পথে
করব প্রয়াণ রসাতলে,
হারের খেলাই খেলব মোরা
বসাও যদি হারের দলে।

আমরা বিনা পণে খেলব না গো
খেলব রাজার ছেলের মতো।
ফেলব খেলায় ধনরতন
যেথায় মোদের আছে যত।
সর্বনাশা তোমার যে ডাক,
যায় যদি যাক সকলি যাক,
শেষ কড়িটি চুকিয়ে দিয়ে
খেলা মোদের করব সারা।
তার পরে কোন বনের কোণে
হারের দলটি হব হারা।

তবু এই হারা তো শেষ হারা নয়,
আবার খেলা আছে পরে।
জিতল যে সে জিতল কি না
কে বলবে তা সত্য করে।
হেরে তোমার করব সাধন,
ক্ষতির ক্ষুরে কাটব বাঁধন,

শেষ দানেতে তোমার কাছে
বিকিয়ে দেব আপনারে।
তার পরে কী করবে তুমি
সে-কথা কেউ ভাবতে পারে?

১২ চৈত্র [১৩১২]
বোলপুর

বন্দী

বন্দী, তোরে কে বেঁধেছে
এত কঠিন করে?

প্রভু আমায় বেঁধেছে যে
বজ্রকঠিন ডোরে।
মনে ছিল সবার চেয়ে
আমিই হব বড়ো,
রাজার কড়ি করেছিলেম
নিজের ঘরে জড়ো।
ঘুম লাগিতে শুয়েছিলেম
প্রভুর শয্যা পেতে,
জেগে দেখি বাঁধা আছি
আপন ভাণ্ডারেতে।

বন্দী ওগো কে গড়েছে
বজ্রবাঁধন খানি?

আপনি আমি গড়েছিলেম
বহু যতন মানি।
ভেবেছিলেম আমার প্রতাপ
করবে জগৎ গ্রাস,

আমি রব একলা স্বাধীন
সবাই হবে দাস।
তাই গড়েছি রজনীদিন
লোহার শিকলখানা—
কত আগুন কত আঘাত
নাইকো তার ঠিকানা।
গড়া যখন শেষ হয়েছে
কঠিন সুকঠোর,
দেখি আমায় বন্দী করে
আমারি এই ডোর।

১ বৈশাখ ১৩১৩
বোলপুর

পথিক

পথিক, ওগো পথিক, যাবে তুমি
এখন এ যে গভীর ঘোর নিশা।
নদীর পারে তমাল-বনভূমি
গহন ঘন অন্ধকারে মিশা।
মোদের ঘরে হয়েছে দীপ জ্বালা,
বাঁশির ধ্বনি হৃদয়ে এসে লাগে,
নবীন আছে এখনো ফুলমালা,
তরুণ আঁখি এখনো দেখো জাগে।
বিদায়-বেলা এখনি কিগো হবে,
পথিক, ওগো পথিক, যাবে তবে?

তোমারে মোরা বাঁধি নি কোনো ডোরে
রুধিয়া মোরা রাখি নি তব পথ,
তোমার ঘোড়া রয়েছে সাজ প'রে
বাহিরে দেখো দাঁড়ায়ে তব রথ।

বিদায়-পথে দিয়েছি বটে বাধা,
কেবল শুধু করুণ কলগীতে।
চেয়েছি বটে রাখিতে হেথা বাঁধা
কেবল শুধু চোখের চাহনিতে।
পথিক ওগো মোদের নাহি বল,
রয়েছে শুধু আকুল আঁখিজল!

নয়নে তব কিসের এই গ্লানি,
রক্তে তব কিসের তরলতা।
আঁধার হতে এসেছে নাহি জানি
তোমার প্রাণে কাহার কী বারতা।
সপ্তঋষি গগনসীমা হতে
কখন কী যে মন্ত্র দিল পড়ি,—
তিমির রাতি শব্দহীন স্রোতে
হৃদয়ে তব আসিল অবতরি।
বচনহারা অচেনা অদ্ভুত
তোমার কাছে পাঠাল কোন্ দূত?

এ মেলা যদি না লাগে তব ভালো,
শান্তি যদি না মানে তব প্রাণ,
সভার তবে নিবায়ে দিব আলো,
বাঁশির তবে থামায়ে দিব তান।
স্তব্ধ মোরা আঁধারে রব বসি,
ঝিল্লিরব উঠিবে জেগে বনে.
কৃষ্ণরাতে প্রাচীন ক্ষীণ শশী
চক্ষে তব চাহিবে বাতায়নে।
পথ-পাগল পথিক রাখো কথা,
নিশীথে তব কেন এ অধীরতা?

৮ বৈশাখ ১৩১৩
বোলপুর

মিলন

আমি কেমন করিয়া জানাব আমার
জুড়াল হৃদয় জুড়াল—আমার
জুড়াল হৃদয় প্রভাতে।
আমি কেমন করিয়া জানাব, আমার
পরান কী নিধি কুড়াল—ডুবিয়া
নিবিড় নীরব শোভাতে।
আজ গিয়েছি সবার মাঝারে, সেথায়
দেখেছি একেলা আলোকে—দেখেছি
আমার হৃদয়-রাজারে।
আমি দু-একটি কথা কয়েছি তা-সনে
সে নীরব সভামাঝারে—দেখেছি
চিরজনমের রাজারে।

ওগো সে কি মোরে শুধু দেখেছিল চেয়ে
অথবা জুড়াল পরশে—তাহার
কমল করের পরশে—
আমি সে-কথা সকলি গিয়েছি যে ভুলে
ভুলেছি পরম হরষে।
আমি জানি না কী হল, শুধু এই জানি
চোখে মোর সুখ মাখাল—কে যেন
সুখ-অঞ্জন মাখাল,—
কার আঁখিভরা হাসি উঠিল প্রকাশি
যেদিকেই আঁখি তাকাল।

আজ মনে হল কারে পেয়েছি—কারে যে
পেয়েছি সে-কথা জানি না।
আজ কী লাগি উঠিছে কাঁপিয়া কাঁপিয়া
সারা আকাশের আঙিনা—কিসে যে
পুরেছে শূন্য জানি না।

এই বাতাস আমারে হৃদয়ে লয়েছে,
আলোক আমার তনুতে—কেমনে
মিলে গেছে মোর তনুতে ;—
তাই এ গগনভরা প্রভাত পশিল
আমার অণুতে অণুতে ।

আজ ত্রিভুবন-জোড়া কাহার বক্ষে
দেহমন মোর ফুরাল,—যেন রে
নিঃশেষে আজি ফুরাল,—
আজ যেখানে যা হেরি সকলেরি মাঝে
জুড়াল জীবন জুড়াল—আমার
আদি ও অন্ত জুড়াল ।

২৩ মাঘ সোমবার ১৩১২
শিলাইদহ । পদ্মা

বিচ্ছেদ

তোমার বীণার সাথে আমি
সুর দিয়ে যে যাব
তারে তারে খুঁজে বেড়াই
সে-সুর কোথায় পাব ।

যেমন সহজ ভোরের জাগা,
স্রোতের আনাগোনা,
যেমন সহজ পাতায় শিশির,
মেঘের মুখে সোনা,
যেমন সহজ জ্যোৎস্নাখানি
নদীর বালু-পাড়ে,
গভীর রাতে বৃষ্টিধারা
আষাঢ়-অন্ধকারে,—

খুঁজে মরি তেমনি সহজ,
তেমনি ভরপুর,
তেমনিতরো অর্থ-ছোটা
আপনি-ফোটা সুর ;
তেমনিতরো নিত্য নবীন,
অফুরন্ত প্রাণ,
বহুকালের পুরানো সেই
সবার জানা গান।

আমার যে এই নূতন গড়া
নূতন-বাঁধা তার
নূতন সুরে করতে সে যায়
সৃষ্টি আপনার।
মেশে না তাই চারিদিকের
সহজ সমীরণে,
মেলে না তাই আকাশ-ডোবা
স্তব্ধ আলোর সনে।
জীবন আমার কাঁদে যে তাই
দণ্ডে পলে পলে,
যত চেষ্টা করি কেবল
চেষ্টা বেড়ে চলে।
ঘটিয়ে তুলি কত কী যে
বুঝি না এক তিল,
তোমার সঙ্গে অনায়াসে
হয় না সুরের মিল।

২৪ মাঘ ১৩১২
শিলাইদহ। পদ্মা

বিকাশ

আজ বুকের বসন ছিঁড়ে ফেলে
দাঁড়িয়েছে এই প্রভাতখানি,
আকাশেতে সোনার আলোয়
ছড়িয়ে গেল তাহার বাণী।
কুঁড়ির মতো ফেটে গিয়ে
ফুলের মতো উঠল কেঁদে,
সুধাকোষের সুগন্ধ তার
পারলে না আর রাখতে বেঁধে।
ওরে মন, খুলে দে মন,
যা আছে তোর খুলে দে।
অন্তরে যা ডুবে আছে
আলোকপানে তুলে দে।
আনন্দে সব বাধা টুটে
সবার সাথে ওঠ রে ফুটে,
চোখের 'পরে আলসভরে
রাখিস নে আর আঁচল টানি।
আজ বুকের বসন ছিঁড়ে ফেলে
দাঁড়িয়েছে এই প্রভাতখানি।

২৪ মাঘ ১৩১২
শিলাইদহ। পদ্মা

সীমা

সেটুকু তোর অনেক আছে
যেটুকু তোর আছে খাটি।
তার চেয়ে লোভ করিস যদি
সকলি তোর হবে মাটি।

একমনে তোর একতারাতে
একটি যে তার সেইটে বাজা,
ফুলবনে তোর একটি কুসুম
তাই নিয়ে তোর ডালি সাজা।
যেখানে তোর বেড়া, সেথায়
আনন্দে তুই থামিস এসে,
যে কড়ি তোর প্রভুর দেওয়া
সেই কড়ি তুই নিস রে হেসে।
লোকের কথা নিস নে কানে,
ফিরিস নে আর হাজার টানে
যেন রে তোর হৃদয় জানে
হৃদয়ে তোর আছেন রাজা,—
একতারাতে একটি যে তার
আপন মনে সেইটি বাজা।

২৫ মাঘ ১৩১২
শিলাইদহ। পদ্মা

ভার

তুমি যত ভার দিয়েছ, সে ভার
করিয়া দিয়েছ সোজা,
আমি যত ভার জমিয়ে তুলেছি
সকলি হয়েছে বোঝা।
এ বোঝা আমার নামাও, বন্ধু,
নামাও।
ভারের বেগেতে চলেছি, আমার
এ যাত্রা তুমি থামাও।

যে তোমার ভার বহে, কভু তার
সে ভারে ঢাকে না আঁখি,
পথে বাহিরিলে জগৎ তারে তো
দেয় না কিছুই ফাঁকি।
অবারিত আলো ধরে আসি তার
হাতে,
বনে পাখি গায় নদীধারা ধায়,
চলে সে সবার সাথে।

তুমি কাজ দিলে কাজেরি সঙ্গে
দাও যে অসীম ছুটি,
তোমার আদেশ আবরণ হয়ে
আকাশ লয় না লুটি।
বাসনায় মোরা বিশ্বজগৎ
ঢাকি,
তোমা পানে চেয়ে যত করি ভোগ
তত আরো থাকে বাকি।

আপনি যে দুখ ডেকে আনি, সে যে
জ্বালায় বজ্রানলে,
অঙ্গার করে রেখে যায়, সেথা
কোনো ফল নাহি ফলে।
তুমি যাহা দাও সে যে দুঃখের
দান,
শ্রাবণধারায় বেদনার রসে
সার্থক করে প্রাণ।

যেখানে যা-কিছু পেয়েছি, কেবলি
সকলি করেছি জমা,—
যে দেখে সে আজ মাগে যে হিসাব,
কেহ নাহি করে ক্ষমা।

এ বোঝা আমার নামাও, বন্ধু,
নামাও।
ভাবের বেগেতে ঠেলিয়া চলেছে
এ যাত্রা মোর থামাও।

২৫ মাঘ [১৩১২]
পদ্মা

টিকা

আজ পুরবে প্রথম নয়ন মেলিতে
হেরিনু অরুণ শিখা,—হেরিনু
কমলবরন শিখা,
তখনি হাসিয়া প্রভাত-তপন
দিলেন আমারে টিকা—আমার
হৃদয়ে জ্যোতির টিকা।
কে যেন আমার নয়ন-নিমেষে
রাখিল পরশমণি,
যেদিকে তাকাই সোনা করে দেয়
দৃষ্টির পরশনি।
অন্তর হতে বাহিরে সকলি
আলোকে হইল মিশা,
নয়ন আমার হৃদয় আমার
কোথাও না পায় দিশা।

আজ যেমনি নয়ন তুলিয়া চাহিনু
কমলবরন শিখা—আমার
অন্তরে দিল টিকা।

ভাবিয়াছি মনে দিব না মুছিতে
এ পরশ রেখা দিব না ঘুচিতে,
সন্ধ্যার পানে নিয়ে যাব বহি
নবপ্রভাতের লিখা
উদয়-রবির টিকা।

২৬ মাঘ [১৩১২]
পদ্মা

বৈশাখে

তপ্ত হাওয়া দিয়েছে আজ
আমলা গাছের কচি পাতায়
কোথা থেকে ক্ষণে ক্ষণে
নিমের ফুলে গন্ধে মাতায়।
কেউ কোথা নেই মাঠের 'পরে,
কেউ কোথা নেই শূন্য ঘরে
আজ দুপুরে আকাশতলে
রিমিঝিমি নূপুর বাজে।
বারে বারে ঘুরে ঘুরে
মৌমাছিদের গুঞ্জ স্বরে
কার চরণের নৃত্য যেন
ফিরে আমার বুকের মাঝে,
রক্তে আমার তালে তালে
রিমিঝিমি নূপুর বাজে।

ঘন মহুল-শাখার মতো
নিশ্বাসিয়া উঠিছে প্রাণ;
গায়ে আমার লেগেছে কার
এলোচুলের সুদূর ঘ্রাণ।

আজি রোদের প্রখর তাপে
বাঁধের জলে আলো কাঁপে,
বাতাস বাজে মর্মরিয়া
সারি-বাঁধা তালের বনে।
আমার মনের মরীচিকা
আকাশপারে পড়ল লিখা,
লক্ষ্যবিহীন দূরের 'পরে
চেয়ে আছি আপন মনে।
অলস ধেনু চরে বেড়ায়
সারি-বাঁধা তালের বনে।

আজিকার এই তপ্ত দিনে
কাটল বেলা এমনি করে।
গ্রামের ধারে ঘাটের পথে
এল গভীর ছায়া পড়ে।
সন্ধ্যা এখন পড়ছে হেলে
শালবনেতে আঁচল মেলে,
আঁধার-ঢালা দিঘির ঘাটে
হয়েছে শেষ-কলস ভরা।
মনের কথা কুড়িয়ে নিয়ে
ভাবি মাঠের মধ্যে গিয়ে—
সারা দিনের অকাজে আজ
কেউ কি মোরে দেয় নি ধরা?
আমার কি মন শূন্য, যখন
হল বধূর কলস-ভরা?

৭ বৈশাখ ১৩১৩

বিদায়

বিদায় দেহ ক্ষম আমায় ভাই।
কাজের পথে আমি তো আর নাই।
এগিয়ে সবে যাও না দলে দলে,
জয়মাল্য লও না তুলি গলে,
আমি এখন বনচ্ছায়াতলে
অলক্ষিতে পিছিয়ে যেতে চাই,
তোমরা মোরে ডাক দিয়ো না ভাই।

অনেক দূরে এলেম সাথে সাথে,
চলেছিলেম সবাই হাতে হাতে।
এইখানেতে দুটি পথের মোড়ে
হিয়া আমার উঠল কেমন করে
জানি নে কোন্ ফুলের গন্ধ ঘোরে
সৃষ্টিছাড়া ব্যাকুল বেদনাতে।
আর তো চলা হয় না সাথে সাথে।

তোমরা আজি ছুটেছ যার পাছে
সে-সব মিছে হয়েছে মোর কাছে।
রত্ন খোঁজা, রাজ্য ভাঙা-গড়া,
মতের লাগি দেশবিদেশে লড়া,
আলবালে জল সেচন করা
উচ্চশাখা স্বর্ণচাঁপার গাছে।
পারি নে আর চলতে সবার পাছে।

আকাশ ছেয়ে মন-ভোলানো হাসি
আমার প্রাণে বাজাল আজ বাঁশি।
লাগল আলস পথে চলার মাঝে,
হঠাৎ বাধা পড়ল সকল কাজে,

একটি কথা পরান জুড়ে বাজে
"ভালোবাসি, হায় রে ভালোবাসি।"
সবার বড়ো হৃদয়-হরা হাসি।

তোমরা তবে বিদায় দেহ মোরে,
অকাজ আমি নিয়েছি সাধ করে।
মেঘের পথের পথিক আমি আজি,
হাওয়ার মুখে চলে যেতেই রাজি,
অকূল-ভাসা তরীর আমি মাঝি
বেড়াই ঘুরে অকারণের ঘোরে।
তোমরা সবে বিদায় দেহ মোরে।

১৭ চৈত্র ১৩১২
বোলপুর

পথের শেষ

পথের নেশা আমায় লেগেছিল,
পথ আমারে দিয়েছিল ডাক।
সূর্য তখন পূব-গগনমূলে,
নৌকা তখন বাঁধা নদীর কূলে,
শিশির তখন শুকায় নিকো ফুলে,
শিবালয়ে উঠল বেজে শাঁখ,
পথের নেশা তখন লেগেছিল,
পথ আমারে দিয়েছিল ডাক।

আঁকাবাঁকা রাঙা মাটির লেখা
ঘরছাড়া ওই নানা দেশের পথ—
প্রভাতকালে অপার পানে চেয়ে
কী মোহগান উঠতেছিল গেয়ে,
উদার সুরে ফেলতেছিল ছেয়ে
বহুদূরের অরণ্য-পর্বত,

নানা দিনের নানা পথিক-চলা
ঘরছাড়া ওই নানা দেশের পথ।

ভাবি নাইকো কেন কিসের লাগি
ছুটে চলে এলেম পথের 'পরে।
নিত্য কেবল এগিয়ে চলার সুখ,
বাহির হওয়ার অনন্ত কৌতুক,
প্রতি পদেই অন্তর উৎসুক
অজানা কোন্ নিরুদ্দেশের তরে,
ভোরের বেলা দুয়ার খুলে দিয়ে
বাহির হয়ে এলেম পথের 'পরে।

বেলা এখন অনেক হয়ে গেছে,
পেরিয়ে চলে এলেম বহুদূর।
ভেবেছিলেম পথের বাঁকে বাঁকে
নব নব ভাগ্য আমায় ডাকে,
হঠাৎ যেন দেখতে পাব কাকে,
শুনতে যেন পাব নূতন সুর।
তার পরে তো অনেক বেলা হল
পেরিয়ে চলে এলেম বহুদূর।

অনেক দেখে ক্লান্ত এখন প্রাণ,
ছেড়েছি সব অকস্মাতের আশা।
এখন কেবল একটি পেলেই বাঁচি,
এসেছি তাই ঘাটের কাছাকাছি,
এখন শুধু আকুল মনে যাচি
তোমার পারে খেয়ার তরী ভাসা।
জেনেছি আজ চলেছি কার লাগি,
ছেড়েছি সব অকস্মাতের আশা।

১৪ চৈত্র [১৩১২]
বোলপুর

নীড় ও আকাশ

নীড়ে বসে গেয়েছিলেম
আলোছায়ার বিচিত্র গান।
সেই গানেতে মিশেছিল
বনভূমির চঞ্চল প্রাণ।
দুপুরবেলার গভীর ক্লান্তি,
রাত্রিবেলার নিবিড় শান্তি,
প্রভাতকালের বিজয়যাত্রা,
মলিন মৌন সন্ধ্যাবেলার,
পাতার কাঁপা, ফুলের ফোটা,
শ্রাবণ রাতে জলের ফোঁটা,
উস্খুস্ শব্দটুকুন
কোটরমাঝে কীটের খেলার,
কত আভাস আসা-যাওয়ার,
ঝরঝরানি হঠাৎ হাওয়ার,
বেণুবনের ব্যাকুল বার্তা
নিশ্বসিত জ্যোৎস্নারাতে,
ঘাসের পাতার মাটির গন্ধ,
কত ঋতুর কত ছন্দ,
সুরে সুরে জড়িয়ে ছিল,
নীড়ে গাওয়া গানের সাথে।

আজ কি আমায় গাইতে হবে
নীল আকাশের নির্জন গান?
নীড়ের বাঁধন ভুলে গিয়ে
ছড়িয়ে দেব মুক্ত পরান?
গন্ধবিহীন বায়ুস্তরে,
শব্দবিহীন শূন্য'পরে,

ছায়াবিহীন জ্যোতির মাঝে,
সঙ্গিবিহীন নির্মমতায়
মিশে যাব অবাধ সুখে,
উড়ে যাব ঊর্ধ্বমুখে,
গেয়ে যাব পূর্ণস্বরে
অর্থবিহীন কলকথায়?
আপন মনের পাই নে দিশা,
ভুলি শঙ্কা, হারাই তৃষা,
যখন করি বাঁধনহারা
এই আনন্দ-অমৃতপান।
তবু নীড়েই ফিরে আসি,
এমনি কাঁদি এমনি হাসি
তবুও এই ভালোবাসি
আলোছায়ার বিচিত্র গান।

১২ চৈত্র [১৩১২]
বোলপুর

সমুদ্রে

সকালবেলায় ঘাটে যেদিন
ভাসিয়ে দিলেম নৌকোখানি
কোথায় আমার যেতে হবে
সে-কথা কি কিছুই জানি?
শুধু শিকল দিলেম খুলে,
শুধু নিশান দিলেম তুলে,
টানি নি দাঁড়, ধরি নি হাল,
ভেসে গেলেম স্রোতের মুখে;
তীরে তরুর ডালে ডালে
ডাকল পাখি প্রভাত কালে,

তীরে তরুর ছায়ায় রাখাল
বাজায় বাঁশি মনের সুখে।

তখন আমি ভাবি নাইকো
সূর্য যাবে অস্তাচলে,
নদীর স্রোতে ভেসে ভেসে
পড়ব এসে সাগর-জলে ;
ঘাটে ঘাটে তীরে তীরে
যে-তরী ধায় ধীরে ধীরে,
বাইতে হবে নিয়ে তারে
নীল পাথারে একলা প্রাণে।
তারাগুলি আকাশ ছেয়ে
মুখে আমার রৈল চেয়ে,
সিন্ধু-শকুন উড়ে গেল
কূলে আপন কুলায় পানে।

দুলুক তরী ঢেউয়ের ’পরে
ওরে আমার জাগ্রত প্রাণ।
গাও রে আজি নিশীথরাতে
অকূল-পাড়ির আনন্দগান।
যাক না মুছে তটের রেখা,
নাই বা কিছু গেল দেখা
অতল বারি দিক না সাড়া
বাঁধনহারা হাওয়ার ডাকে।
দোসর-ছাড়া একার দেশে
একেবারে এক নিমেষে,
লও রে বুকে দু-হাত মেলি
অন্তবিহীন অজানাকে।

৭ বৈশাখ ১৩১৩

দিনশেষ

ভাঙা অতিথশালা।
ফাটা ভিতে অশথ-বটে
মেলেছে ডালপালা।
প্রখর রোদে তপ্ত পথে
কেটেছে দিন কোনোমতে,
মনে ছিল সন্ধ্যাবেলায়
মিলবে হেথা ঠাঁই ;
মাঠের 'পরে আঁধার নামে,
হাটের লোকে ফিরল গ্রামে,
হেথায় এসে চেয়ে দেখি
নাই যে কেহ নাই।

কত কালে কত লোকে
কত দিনের শেষে
ধুয়েছিল পথের ধুলা
এইখানেতে এসে।
বসেছিল জ্যোৎস্নারাতে
স্নিগ্ধ শীতল আঙিনাতে,
কয়েছিল সবাই মিলে
নানাদেশের কথা।
প্রভাত হলে পাখির গানে
জেগেছিল নূতন প্রাণে,
দুলেছিল ফুলের ভারে
পথের তরুলতা।

আমি যেদিন এলেম, সেদিন
দীপ জ্বলে না ঘরে।
বহুদিনের শিখার কালি
আঁকা ভিতের 'পরে।

শুষ্কজলা দিঘির পাড়ে
জোনাক ফিরে ঝোপে ঝাড়ে,
ভাঙা পথে বাঁশের শাখা
ফেলে ভয়ের ছায়া।
আমার দিনের যাত্রাশেষে
কার অতিথি হলেম এসে ?
হায় রে বিজন দীর্ঘ রাত্রি,
হায় রে ক্লান্ত কায়া।

৮ বৈশাখ ১৩১৩

সমাপ্তি

বন্ধ হয়ে এল স্রোতের ধারা,
শৈবালেতে আটক প'ল তরী ;
নৌকা-বাওয়া এবার করো সারা,
নাই রে হাওয়া, পাল নিয়ে কী করি।
এখন তবে চলো নদীর তটে,
গোধূলিতে আকাশ হল রাঙা,
পশ্চিমেতে আঁকা আগুন-পটে
বাবলাবনে ঐ দেখা যায় ডাঙা।
ভেসো না আর, যেয়ো না আর ভেসে,
চলো এখন, যাবে যে দূরদেশে।

এখন তোমায় তারার ক্ষীণালোকে
চলতে হবে মাঠের পথে একা,
গিরিকানন পড়বে কি আর চোখে,
কুটিরগুলি যাবে কি আর দেখা ?
পিছন হতে দখিন-সমীরণে
ফুলের গন্ধ আসবে আঁধার বেয়ে

অসময়ে হঠাৎ ক্ষণে ক্ষণে
আবেশেতে দিবে হৃদয় ছেয়ে।
চলো এবার ক'রো না আর দেরি—
মেঘের আভাস আকাশকোণে হেরি।

হাটের সাথে ঘাটের সাথে আজি
ব্যবসা তোর বন্ধ হয়ে গেল।
এখন ঘরে আয় রে ফিরে মাঝি,
আঙিনাতে আসনখানি মেলো।
ভুলে যা রে দিনের আনাগোনা
জ্বালতে হবে সারারাতের আলো,
শ্রান্ত ওরে, রেখে দে জাল-বোনা,
গুটিয়ে ফেলো সকল মন্দভালো।
ফিরিয়ে আনো ছড়িয়ে-পড়া মন,
সফল হ'ক রে সকল সমাপন।

১০ বৈশাখ ১৩১৩
বোলপুর

কোকিল

আজ বিকালে কোকিল ডাকে,
শুনে মনে লাগে
বাংলাদেশে ছিলেম যেন
তিন-শ বছর আগে।
সে দিনের সে স্নিগ্ধ গভীর
গ্রামপথের মায়া
আমার চোখে ফেলেছে আজ
অশ্রুজলের ছায়া।

পল্লীখানি প্রাণে ভরা,
গোলায় ভরা ধান,
ঘাটে শুনি নারীর কণ্ঠে
হাসির কলতান।
সন্ধ্যাবেলায় ছাদের 'পরে
দখিন হাওয়া বহে,
তারার আলোয় কারা ব'সে
পুরাণ-কথা কহে।

ফুলবাগানের বেড়া হতে
হেনার গন্ধ ভাসে,
কদমশাখার আড়াল থেকে
চাঁদটি উঠে আসে।
বধূ তখন বিনিয়ে খোঁপা
চোখে কাজল আঁকে,
মাঝে মাঝে বকুলবনে
কোকিল কোথা ডাকে।

তিন-শ বছর কোথায় গেল,
তবু বুঝি নাকো
আজো কেন ওরে কোকিল
তেমনি স্বরেই ডাক।
ঘাটের সিঁড়ি ভেঙে গেছে
ফেটেছে সেই ছাদ,
রূপকথা আজ কাহার মুখে
শুনবে সাঁঝের চাঁদ?

শহর থেকে ঘণ্টা বাজে,
সময় নাই রে হায়—
ঘর্ঘরিয়া চলেছি আজ
কিসের ব্যর্থতায়!

আর কি বধূ, গাঁথ মালা,
চোখে কাজল আঁক?
পুরানো সেই দিনের সুরে
কোকিল কেন ডাক?

২৯ বৈশাখ [১৩১৩]
বোলপুর

দিঘি

জুড়াল রে দিনের দাহ, ফুরাল সব কাজ,
কাটল সারা দিন।
সামনে আসে বাকাহারা স্বপ্নভরা রাত
সকল কর্মহীন।
তারি মাঝে দিঘির জলে যাবার বেলাটুকু,
এইটুকু সময়,
সেই গোধূলি এল এখন, সূর্য ডুবুডুবু,
ঘরে কি মন রয়?

কূলে কূলে পূর্ণ নিটোল গভীর ঘন কালো
শীতল জলরাশি,
নিবিড় হয়ে নেমেছে তায় তীরের তরু হতে
সকল ছায়া আসি।
দিনের শেষে শেষ আলোটি পড়েছে ওই পারে
জলের কিনারায়,
পথে চলতে বধূ যেমন নয়ন রাঙা ক'রে
বাপের ঘরে চায়।

শেওলা-পিছল পৈঁঠা বেয়ে নামি জলের তলে
একটি একটি করে,

ডুবে যাবার সুখে আমার ঘটের মতো যেন
অঙ্গ উঠে ভরে।
ভেসে গেলেম আপন মনে ভেসে গেলেম পারে,
ফিরে এলেম ভেসে,
সাঁতার দিয়ে চলে গেলেম, চলে এলেম যেন
সকল-হারা দেশে।

ওগো বোবা, ওগো কালো, স্তব্ধ সুগম্ভীর
গভীর ভয়ংকর,
তুমি নিবিড় নিশীথ রাত্রি বন্দী হয়ে আছ,
মাটির পিঞ্জর।
পাশে তোমার ধুলার ধরা কাজের রঙ্গভূমি,
প্রাণের নিকেতন,
হঠাৎ থেমে তোমার 'পরে নত হয়ে প'ড়ে
দেখিছে দর্পণ।

তীরের কর্ম সেরে আমি গায়ের ধুলো নিয়ে
নামি তোমার মাঝে;
এ কোন্ অশ্রুভরা গীতি ছলছলিয়ে উঠে
কানের কাছে বাজে?
ছায়া-নিচোল দিয়ে ঢাকা মরণভরা তব
বুকের আলিঙ্গন
আমায় নিল কেড়ে নিল সকল বাঁধা হতে
কাড়িল মোর মন।

শিউলিশাখে কোকিল ডাকে করুণ কাকলিতে
ক্লান্ত আশার ডাক।
ম্লান ধূসর আকাশ দিয়ে দূরে কোথায় নীড়ে
উড়ে গেল কাক।

মর্মরিয়া মর্মরিয়া বাতাস গেল মরে
বেণুবনের তলে,
আকাশ যেন ঘনিয়ে এল ঘুমঘোরের মতো
দিঘির কালো জলে।

সন্ধ্যাবেলার প্রথম তারা উঠল গাছের আড়ে,
বাজল দূরে শাঁখ।
রন্ধ্রবিহীন অন্ধকারে পাখার শব্দ মেলে
গেল বকের ঝাঁক।
পথে কেবল জোনাক জ্বলে নাইকো কোনো আলো
এলেম যবে ফিরে।
দিন ফুরাল রাত্রি এল, কাটল মাঝের বেলা
দিঘির কালো নীরে।

২৭ বৈশাখ ১৩১৩
শান্তিনিকেতন

ঝড়

আকাশ ভেঙে বৃষ্টি পড়ে
ঝড় এল রে আজ,
মেঘের ডাকে ডাক মিলিয়ে
বাজ্ রে মৃদঙ বাজ্।
আজকে তোরা কী গাবি গান,
কোন্ রাগিণীর সুরে?
কালো আকাশ নীল ছায়াতে
দিল যে বুক পুরে।

বৃষ্টিধারায় ঝাপসা মাঠে
ডাকছে ধেনুদল,

তালের তলে শিউরে ওঠে
বাঁধের কালো জল।
প'ড়ো বাড়ির ভাঙা ভিতে
ওঠে হাওয়ার হাঁক,
শূন্যখেতের ওপার যেন
এপারকে দেয় ডাক।

আমাকে আজ কে খুঁজেছে
পথের থেকে চেয়ে?
জলের বিন্দু পড়ছে রে তার
অলক বেয়ে বেয়ে।
মল্লারেতে মীড় মিলায়ে
বাজে আমার প্রাণ,
দুয়ার হতে কে ফিরেছে
না গেয়ে তার গান?

আয় গো তোরা ঘরেতে আয়,
ব'স্ গো তোরা কাছে।
আজ যে আমার সমস্ত মন
আসন মেলে আছে।
জলে স্থলে শূন্যে হাওয়ায়
ছুটেছে আজ কী ও?
ঝড়ের 'পরে পরান আমার
উড়ায় উত্তরীয়।

আসবি তোরা কারা কারা
বৃষ্টিধারার স্রোতে
কোন্ সে পাগল পারাবারের
কোন্ পরপার হতে?
আসবি তোরা ভিজে বনের
কান্না নিয়ে সাথে,

আসবি তোরা গন্ধরাজের
গাঁথন নিয়ে হাতে ।

ওরে আজি বহুদূরের
বহুদিনের পানে
পাঁজর টুটে বেদনা মোর
ছুটেছে কোন্‌খানে ?
ফুরিয়ে যাওয়ার ছায়াবনে,
ভুলে যাওয়ার দেশে
সকল গড়া সকল ভাঙা
সকল গানের শেষে ।

কাজল মেঘে ঘনিয়ে ওঠে
সকল ব্যাকুলতা
এলোমেলো হাওয়ায় ওড়ে
এলোমেলো কথা ।
দুলছে দূরে বনের শাখা,
বৃষ্টি পড়ে বেগে,
মেঘের ডাকে কোন্ অশান্ত
উঠিস জেগে জেগে ?

১৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৩
কলিকাতা

প্রতীক্ষা

আমি এখন সময় করেছি—
তোমার এবার সময় কখন হবে ?
সাঁঝের প্রদীপ সাজিয়ে ধরেছি—
শিখা তাহার জ্বালিয়ে দেবে কবে ?

নামিয়ে দিয়ে এসেছি সব বোঝা,
তরী আমার বেঁধে এলেম ঘাটে,—
পথে পথে ছেড়েছি সব খোঁজা,
কেনাবেচা নানান হাটে হাটে।

সন্ধ্যাবেলায় যে মল্লিকা ফুটে
গন্ধ তারি কুঞ্জে উঠে জাগি,
ভরেছি জুঁই পদ্মপাতার পুটে
তোমার করপদ্মদলের লাগি।
রেখেছি আজ শান্ত শীতল ক'রে
অঙ্গন মোর চন্দন-সৌরভে!
সেরেছি কাজ সারাটা দিন ধরে
তোমার এবার সময় কখন হবে।

আজিকে চাঁদ উঠবে প্রথম রাতে
নদীর পারে নারিকেলের বনে,
দেবালয়ের বিজন আঙিনাতে
পড়বে আলো গাছের ছায়া সনে।
দখিন হাওয়া উঠবে হঠাৎ বেগে
আসবে জোয়ার সঙ্গে তারি ছুটে;
বাঁধা তরী ঢেউয়ের দোলা লেগে
ঘাটের 'পরে মরবে মাথা কুটে।

জোয়ার যখন মিশিয়ে যাবে কূলে,
থমথমিয়ে আসবে যখন জল,
বাতাস যখন পড়বে ঢুলে ঢুলে,—
চন্দ্র যখন নামবে অস্তাচল,—

শিথিল তনু তোমার ছোঁওয়া ঘুমে
চরণতলে পড়বে লুটে তবে।
বসে আছি শয়ন পাতি ভূমে
তোমার এবার সময় হবে কবে?

১৭ বৈশাখ [১৩১৩]
কলিকাতা

গান শোনা

আমার এ গান শুনবে তুমি যদি
শোনাই কখন বলো?
ভরা চোখের মতো যখন নদী
করবে ছল ছল,
ঘনিয়ে যখন আসবে মেঘের ভার
বহুকালের পরে,
না যেতে দিন সজল অন্ধকার
নামবে তোমার ঘরে;
যখন তোমার কাজ কিছু নেই হাতে,
তবুও বেলা আছে,
সাথি তোমার আসত যারা রাতে
আসে নি কেউ কাছে;
তখন আমায় মনে পড়ে যদি,
গাইতে যদি বল,—
নবমেঘের ছায়ায় যখন নদী
করবে ছল ছল।

ম্লান আলোয় দখিন বাতায়নে
বসবে তুমি একা—
আমি গাব বসে ঘরের কোণে
যাবে না মুখ দেখা।

ফুরাবে দিন আঁধার ঘন হবে,
বৃষ্টি হবে শুরু,
উঠবে বেজে মৃদুগভীর রবে
মেঘের গুরু গুরু।
ভিজে পাতার গন্ধ আসবে ঘরে,
ভিজে মাটির বাস,
মিলিয়ে যাবে বৃষ্টির ঝর্ঝরে
বনের নিশ্বাস।
বাদল-সাঁঝে আঁধার বাতায়নে
বসবে তুমি একা,
আমি গেয়ে যাব আপন মনে
যাবে না মুখ দেখা।

জলের ধারা ঝরবে দ্বিগুণ বেগে,
বাড়বে অন্ধকার,
নদীর ধারে বনের সঙ্গে মেঘে
ভেদ রবে না আর ;
কাঁসরঘণ্টা দূরে দেউল হতে
জলের শব্দে মিশে
আঁধার পথে ঝ'ড়ো হাওয়ার স্রোতে
ফিরবে দিশে দিশে।
শিরীষ ফুলের গন্ধ থেকে থেকে
আসবে জলের ছাঁটে,
উচ্চরবে পাইক যাবে হেঁকে
গ্রামের শূন্য বাটে।
জলের ধারা ঝরবে বাঁশের বনে,
বাড়বে অন্ধকার,
গানের সাথে বাদলা রাতের সনে
ভেদ রবে না আর।

ও-ঘর হতে যবে প্রদীপ জ্বেলে
আনবে আচম্বিত,
সেতারখানি মাটির 'পরে ফেলে
থামাব মোর গীত।
হঠাৎ যদি মুখ ফিরিয়ে তবে
চাহ আমার পানে
এক নিমিষে হয়তো বুঝে লবে
কী আছে মোর গানে।
নামায়ে মুখ নয়ন করে নিচু
বাহির হয়ে যাব
একলা ঘরে যদি কোনো কিছু
আপন মনে ভাব।
থামায়ে গান আমি চলে গেলে,
যদি আচম্বিত
বাদল-রাতে আঁধারে চোখ মেলে
শোন আমার গীত।

১২ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৩
বোলপুর

জাগরণ

কৃষ্ণপক্ষে আধখানা চাঁদ
উঠল অনেক রাতে,
খানিক কালো খানিক আলো
পড়ল আঙিনাতে।
ওরে আমার নয়ন আমার
নয়ন নিদ্রাহারা,
আকাশ পানে চেয়ে চেয়ে
কত গুনবি তারা?

সাড়া কারো নাই রে সবাই
ঘুমায় অকাতরে।

প্রদীপগুলি নিবে গেল
দুয়ার দেওয়া ঘরে।
তুই কেন আজ বেড়াস ফিরি
আলোয় অন্ধকারে ?
তুই কেন আজ দেখিস চেয়ে
বনপথের পারে ?

শব্দ কোথাও শুনতে কি পাস
মাঠে তেপান্তরে ?
মাটি কোথাও উঠছে কেঁপে
ঘোড়ার পদভরে ?
কোথাও ধুলো উড়ছে কি রে
কোনো আকাশকোণে ?°
আগুনশিখা যায় কি দেখা
দূরের আম্রবনে ?

সন্ধ্যাবেলা তুই কি কারো
লিখন পেয়েছিলি ?
বুকের কাছে লুকিয়ে রেখে
শান্তি হারাইলি ?
নাচে রে তাই রক্ত নাচে
সকল দেহমাঝে,
বাজে রে তাই কী কথা তোর
পাঁজর জুড়ে বাজে।

আজিকে এই খণ্ড চাঁদের
ক্ষীণ আলোকের 'পরে
ব্যাকুল হয়ে অশান্ত প্রাণ
আঘাত করে মরে।

কী লুকিয়ে আছে ওরে,
কী রেখেছে ঢেকে,
কিসের কাঁপন কিসের আভাস
পাই যে থেকে থেকে ?

ওরে কোথাও নাই রে হাওয়া,
স্তব্ধ বাঁশের শাখা ;
বালুতটের পাশে নদী
কালির বর্ণে আঁকা ।
বনের 'পরে চেপে আছে
কাহার অভিশাপ,—
ধরণীতল মূর্ছা গেছে
লয়ে আপন তাপ ।

ওরে হেথায় আনন্দ নেই
পুরানো তোর বাড়ি ।
ভাঙা দুয়ার বাদুড়কে ওই
দিয়েছে পথ ছাড়ি ।
সন্ধ্যা হতে ঘুমিয়ে পড়ে
যে যেথা পায় স্থান ।
জাগে না কেউ বীণা হাতে,
গাহে না কেউ গান ।

হেথা কি তোর দুয়ারে কেউ
পৌঁছোবে আজ রাতে ?
এক হাতে তার ধ্বজা তুলে
আলো আরেক হাতে ।
হঠাৎ কিসের চঞ্চলতা
ছুটে আসবে বেগে,
গ্রামের পথে পাখিরা সব
গেয়ে উঠবে জেগে ।

উঠবে মৃদঙ্গ বেজে বেজে
গর্জি গুরু গুরু
অঙ্গে হঠাৎ দেবে কাঁটা,
বক্ষ দুরু দুরু।
ওরে নিদ্রাবিহীন আঁখি,
ওরে শান্তিহারা,
আঁধার পথে চেয়ে চেয়ে
কার পেয়েছিস সাড়া ?

১৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৩
বোলপুর

হারাধন

বিধি যেদিন ক্ষান্ত দিলেন
সৃষ্টি করার কাজে
সকল তারা উঠল ফুটে
নীল আকাশের মাঝে ;
নবীন সৃষ্টি সামনে রেখে
সুরসভার তলে
ছায়াপথে দেবতা সবাই
বসেন দলে দলে।
গাহেন তাঁরা, "কী আনন্দ।
এ কী পূর্ণ ছবি।
এ কী মন্ত্র, এ কী ছন্দ,
গ্রহ চন্দ্র রবি।"

হেনকালে সভায় কে গো
হঠাৎ বলি উঠে—
"জ্যোতির মালায় একটি তারা
কোথায় গেছে টুটে।"

ছিঁড়ে গেল বীণার তন্ত্রী,
থেমে গেল গান,
হারা তারা কোথায় গেল
পড়িল সন্ধান।
সবাই বলে, "সেই তারাতেই
স্বর্গ হতে আলো--
সেই তারাটাই সবার বড়ো,
সবার চেয়ে ভালো।"

সেদিন হতে জগৎ আছে
সেই তারাটির খোজে,
তৃপ্তি নাহি দিনে, রাত্রে
চক্ষু নাহি বোজে।
সবাই বলে, "সকল চেয়ে
তারেই পাওয়া চাই।"
সবাই বলে, "সে গিয়েছে
ভুবন কানা তাই।"
শুধু গভীর রাত্রিবেলায়
স্তব্ধ তারার দলে—
"মিথ্যা খোজা, সবাই আছে"
নীরব হেসে বলে।

চাঞ্চল্য

নিশ্বাস রুধে দু-চক্ষু মুদে
তাপসের মতো যেন
স্তব্ধ ছিলি যে ওরে বনভূমি
চঞ্চল হলি কেন?

হঠাৎ কেন যে দুলে ওঠে শাখা,
যাবে না ধরায় আর ধরে রাখা,
ঝটপট করে হানে যেন পাখা
খাঁচায় বনের পাখি।
ওরে আমলকী, ওরে কদম্ব,
কে তোদের গেল ডাকি ?

"ঐ যে ঈশানে উড়েছে নিশান,
বেজেছে বিষাণ বেগে—
আমার বরষা কালো বরষা যে
ছুটে আসে কালো মেঘে।"

ওরে নীলজল অতল অটল
ভরা ছিলি কূলে কূলে,
হঠাৎ এমন শিহরি শিহরি
উঠিলি কেন রে দুলে ?
তালতরুছায়া করে টলমল,
কেন কলকল কেন ছলছল,
কী কথা বলিতে হলি চঞ্চল,
ফুটিতে চাহে না বাক,—
কাঁদিয়া হাসিয়া সাড়া দিতে চাস
কার শুনেছিস ডাক ?

"ঐ যে আকাশে পুবের বাতাসে
উতলা উঠেছে জেগে,—
আজি মোর বর মোর কালো ঝড়
ছুটে আসে কালো মেঘে।"

পরান আমার রুধিয়া দুয়ার
আপনার গৃহমাঝে

ছিলি এতদিন বিশ্রামহীন,
কী জানি কত কী কাজে।

আজিকে হঠাৎ কী হল রে তোর,
ভেঙে যেতে চায় বুকের পাঁজর,
অকারণে বহে নয়নের লোর,
কোথা যেতে চাস ছুটে ?
কে রে সে পাগল ভাঙিল আগল
কে দিল দুয়ার টুটে ?

"জানি না তো আমি কোথা হতে নামি,
কী ঝড়ে আঘাত লেগে,
জীবন ভরিয়া মরণ হরিয়া
কে আসিছে কালো মেঘে।"

প্রচ্ছন্ন

কোথা ছায়ার কোণে দাঁড়িয়ে তুমি কিসের প্রতীক্ষায়
কেন আছ সবার পিছে ?
যারা ধুলাপায়ে ধায় গো পথে তোমায় ঠেলে যায়
তারা তোমায় ভাবে মিছে।
আমি তোমার লাগি কুসুম তুলি, বসি তরুর মূলে,
আমি সাজিয়ে রাখি ডালি—
ওগো যে আসে সেই একটি-দুটি নিয়ে যে যায় তুলে
আমার সাজি হয় যে খালি।

ওগো সকাল গেল, বিকাল গেল, সন্ধ্যা হয়ে আসে,
চোখে লাগছে ঘুমঘোর ;
সবাই ঘরের পানে যাবার বেলা আমায় দেখে হাসে
মনে লজ্জা লাগে মোর।

আমি বসে আছি বসনখানি টেনে মুখের 'পরে
যেন ভিখারিনীর মতো
কেহ শুধায় যদি "কী চাও তুমি", থাকি নিরুত্তরে
করি দুটি নয়ন নত।

আজি কোন্ লাজে বা বলব আমি তোমায় শুধু চাহি,—
আমি বলব কেমন করে—
শুধু তোমারি পথ চেয়ে আমি রজনীদিন বাহি,—
তুমি আসবে আমার তরে?
আমার দৈন্যখানি যত্নে রাখি, রাজৈশ্বর্যে তব
তারে দিব বিসর্জন,
ওগো অভাগিনীর এ অভিমান কাহার কাছে কব,
তাহা রৈল সংগোপন।

আমি সুদূরপানে চেয়ে চেয়ে ভাবি আপন মনে
হেথা তৃণে আসন মেলে—
তুমি হঠাৎ কখন আসবে হেথায় বিপুল আয়োজনে
তোমার সকল আলো জ্বেলে।
তোমার রথের 'পরে সোনার ধ্বজা ঝলবে ঝলমল
সাথে বাজবে বাঁশির তান,—
তোমার প্রতাপভরে বসুন্ধরা করবে টলমল
আমার উঠবে নেচে প্রাণ।

তখন পথের লোকে অবাক হয়ে সবাই চেয়ে রবে,
তুমি নেমে আসবে পথে।
হেসে দু-হাত ধরে ধুলা হতে আমায় তুলে লবে—
তুমি লবে তোমার রথে।
আমার ভূষণবিহীন মলিনবেশে ভিখারিনীর সাজে
তোমার দাঁড়াব বামপাশে,
তখন লতার মতো কাঁপব আমি গর্বে সুখে লাজে
সকল বিশ্বের সকাশে।

ওগো সময় বয়ে যাচ্ছে চলে রয়েছি কান পেতে
কোথা কই গো চাকার ধ্বনি।
তোমার এ-পথ দিয়ে কত না লোক গর্বে গেল মেতে
কতই জাগিয়ে রনরনি।
তবে তুমিই কি গো নীরব হয়ে রবে ছায়ার তলে
তুমি রবে সবার শেষে—
হেথায় ভিখারিনীর লজ্জা কি গো ঝরবে নয়নজলে
তারে রাখবে মলিন বেশে ?

অনুমান

পাছে দেখি তুমি আস নি, তাই
আধেক আঁখি মুদিয়ে চাই,
ভয়ে চাই নে ফিরে।
আমি দেখি যেন আপন মনে
পথের শেষে দূরের বনে
আসছ তুমি ধীরে।
যেন চিনতে পারি সেই অশান্ত
তোমার উত্তরীয়ের প্রান্ত
ওড়ে হাওয়ার 'পরে।
আমি একলা বসে মনে গনি
শুনছি তোমার পদধ্বনি
মর্মরে মর্মরে।
ভোরে নয়ন মেলে অরুণরাগে
যখন আমার প্রাণে জাগে
অকারণের হাসি,
যখন নবীন তৃণে লতায় গাছে
কোন্ জোয়ারের স্রোতে নাচে
সবুজ সুধারাশি,—

যখন নব মেঘের সজল ছায়া
যেন রে কার মিলন-মায়া
ঘনায় বিশ্ব জুড়ে,
যখন পুলকে নীল শৈল ঘেরি
বেজে ওঠে কাহার ভেরী,
ধ্বজা কাহার উড়ে,—

তখন মিথ্যা সত্য কেই বা জানে,
সন্দেহ আর কেই বা মানে,
ভুল যদি হয় হ'ক।
ওগো জানি না কি আমার হিয়া
কে ভুলাল পরশ দিয়া,
কে জুড়াল চোখ।
সে কি তখন আমি ছিলেম একা,
কেউ কি মোরে দেয় নি দেখা?
কেউ আসে নাই পিছে?
তখন আড়াল হতে সহাস আঁখি
আমার মুখে চায় নি নাকি?
এ কি এমন মিছে?

বর্ষাপ্রভাত

ওগো এমন সোনার মায়াখানি
কে যে গড়েছে।
মেঘ টুটে আজ প্রভাত-আলো
ফুটে পড়েছে।
বাতাস কাহার সোহাগ মাগে,
গাছে পাতায় চমক লাগে,
হৃদয় আমার বিভাসরাগে
কী গান ধরেছে।

আজ বিশ্বদেবীর দ্বারের কাছে
কোন্ সে ভিখারি
ভোরের বেলা দাঁড়িয়েছিল
দু-হাত বিথারি',—
আঁজল ভরে সোনা দিতে
ছাপিয়ে পড়ে চারি ভিতে,
লুটিয়ে গেল পৃথিবীতে,
এ কী নেহারি।

ওগো পারিজাতের কুঞ্জবনে
স্বর্গপুরীতে
মৌমাছিরা লেগেছিল
মধু চুরিতে।
আজ প্রভাতে একেবারে
ভেঙেছে চাক সুধার ভারে,
সোনার মধু লক্ষধারে
লাগে ঝুরিতে।

আজ সকাল হতেই খবর এল,—
লক্ষ্মী একেলা
অরুণরাগে পাতবে আসন
প্রভাত বেলা।
শুনে দিগ্‌বিদিকে ছুটে
আলোর পদ্ম উঠল ফুটে,
বিশ্বহৃদয়মধুপ জুটে
করেছে মেলা।

ও কি সুরপুরীর পর্দাখানি
নীরবে খুলে
ইন্দ্রাণী আজ দাঁড়িয়ে আছেন
জানালা-মূলে?

কে জানে গো কী উল্লাসে
হেসেছে ধরা মধুর হাসে,
আঁচলখানি নীলাকাশে
পড়েছে দুলে।

ওগো কাহারে আজ জানাই, আমি—
—কী আছে ভাষা—
আকাশপানে চেয়ে আমার
মিটেছে আশা।
হৃদয় আমার গেছে ভেসে
চাই নে-কিছুর স্বর্গ-শেষে,
ঘুচে গেছে এক নিমেষে
সকল পিপাসা।

বর্ষা-সন্ধ্যা

আমায় অমনি খুশি করে রাখো
কিছুই না দিয়ে,—
শুধু তোমার বাহুর ডোরে
বাহু বাঁধিয়ে।
এমনি ধূসর মাঠের পারে,
এমনি সাঁঝের অন্ধকারে,
বাজাও আমার প্রাণের তারে
গভীর ঘা দিয়ে।
আমায় অমনি রাখো বন্দী করে
কিছুই না দিয়ে।

আমি আপনাকে আজ বিছিয়ে দেব
কিছুই না করি',
দু-হাত মেলে দিয়ে, তোমার
চরণ পাকড়ি।

আষাঢ়-রাতের সভায় তব
কোনো কথাই নাহি কব,
বুক দিয়ে সব চেপে লব
নিখিল আঁকড়ি।
আমি রাতের সাথে মিশিয়ে রব
কিছুই না করি'।

আজ বাদল হাওয়ায় কোথা রে জুঁই
গন্ধে মেতেছে ?
লুপ্ত তারার মালা কে আজ
লুকিয়ে গেঁথেছে ?
আজি নীরব অভিসারে
কে চলেছে আকাশপারে,
কে আজি এই অন্ধকারে
শয়ন পেতেছে ?
আজ বাদল হাওয়ায় জুঁই আপনার
গন্ধে মেতেছে।

ওগো আজকে আমি সুখে রব
কিছুই না নিয়ে
আপন হতে আপন মনে
সুধা ছানিয়ে।
বনে হতে বনান্তরে
ঘনধারায় বৃষ্টি ঝরে,
নিদ্রাবিহীন নয়ন 'পরে
স্বপন বানিয়ে।
ওগো আজকে পরান ভরে লব
কিছুই না নিয়ে।

"সব-পেয়েছি"র দেশ

সব-পেয়েছির দেশে কারো
নাই রে কোঠাবাড়ি,
দুয়ার খোলা পড়ে আছে,
কোথায় গেল দ্বারী ?
অশ্বশালায় অশ্ব কোথায়
হস্তিশালায় হাতি,
স্ফটিকদীপে গন্ধতৈলে
জ্বালায় না কেউ বাতি।
রমণীরা মোতির সিঁথি
পরে না কেউ কেশে,
দেউলে নেই সোনার চূড়া
সব-পেয়েছির দেশে।

পথের ধারে ঘাস উঠেছে
গাছের ছায়াতলে,
স্বচ্ছতরল স্রোতের ধারা
পাশ দিয়ে তার চলে।
কুটিরেতে বেড়ার 'পরে
দোলে ঝুমকা লতা ;
সকাল হতে মৌমাছিদের
ব্যস্ত ব্যাকুলতা।
ভোরের বেলা পথিকেরা
কী কাজে যায় হেসে—
সাঁঝে ফেরে বিনা-বেতন
সব-পেয়েছির দেশে।

আঙিনাতে দুপুর বেলা
মৃদুকরুণ গেয়ে

বকুলতলার ছায়ায় বসে
চরকা কাটে মেয়ে।
মাঠে মাঠে ঢেউ দিয়েছে
নতুন কচি ধানে,
কিসের গন্ধ কাহার বাঁশি
হঠাৎ আসে প্রাণে।
নীল আকাশের হৃদয়খানি
সবুজ বনে মেশে,
যে চলে সেই গান গেয়ে যায়
সব-পেয়েছির দেশে।

সদাগরের নৌকা যত
চলে নদীর 'পরে—
হেথায় ঘাটে বাঁধে না কেউ
কেনাবেচার তরে।
সৈন্যদলে উড়িয়ে ধ্বজা
কাঁপিয়ে চলে পথ ;
হেথায় কভু নাহি থামে
মহারাজের রথ।
এক রজনীর তরে হেথা
দূরের পান্থ এসে
দেখতে না পায় কী আছে এই
সব-পেয়েছির দেশে।

নাইকো পথে ঠেলাঠেলি,
নাইকো ঘাটে গোল,
ওরে কবি এইখানে তোর
কুটিরখানি তোল।
ধুয়ে ফেল্‌ রে পথের ধুলো,
নামিয়ে দে রে বোঝা,

বেঁধে নে তোর সেতারখানা
রেখে দে তোর খোঁজা।
পা ছড়িয়ে ব'স্ রে হেথায়
সারাদিনের শেষে,
তারায়-ভরা আকাশতলে
সব-পেয়েছির দেশে।

সার্থক নৈরাশ্য

তখন ছিল যে গভীর রাত্রিবেলা
নিদ্রা ছিল না চোখের কোণে ;
আষাঢ় আঁধারে আকাশে মেঘের মেলা,
কোথাও বাতাস ছিল না বনে।
বিরাম ছিল না তপ্ত শয়ন তলে,
কাঙাল ছিল বসে মোর প্রাণে ;
দু-হাত বাড়ায়ে কী জানি কী কথা বলে,
কাঙাল চায় যে কারে কে জানে।
দিল আঁধারের সকল রন্ধ্র ভরি
তাহার রুদ্ধ ক্ষুধিত ভাষা ;
মনে হল যেন বর্ষার বিভাবরী
আজি হারাল রে সব আশা।

অনাথ জগতে যেন এক স্বপ্ন আছে,
তাও জগৎ খুঁজে না মেলে ;
আঁধারে কখন সে এসে যায় গো পাছে
বুকে রেখেছে আগুন জ্বেলে।
দাও দাও বলে হাঁকিনু সুদূরে চেয়ে
আমি ফুকারি ডাকিনু কারে।
এমন সময়ে অরুণ-তরণী বেয়ে
প্রভাত নামিল গগনপারে।

পেয়েছি পেয়েছি নিবাও নিশার বাতি,
আমি কিছুই চাহি নে আর।
ওগো নিষ্ঠুর শূন্য নীরব রাতি
তোমায় করি গো নমস্কার।
বাঁচালে, বাঁচালে,—বধির আঁধার তব
আমায় পৌছিয়া দিল কূলে।
বঞ্চিত করি যা দিয়েছ কারে কব,
আমায় জগতে দিয়েছ তুলে।

ধন্য প্রভাতরবি,
আমার লহ গো নমস্কার।
ধন্য মধুর বায়ু
তোমায় নমি হে বারম্বার।
ওগো প্রভাতের পাখি
তোমার কল-নির্মল স্বরে
আমার প্রণাম লয়ে
বিছাও দূর গগনের 'পরে।
ধন্য ধরার মাটি
জগতে ধন্য জীবের মেলা।
ধুলায় নমিয়া মাথা
ধন্য আমি এ প্রভাতবেলা।

প্রার্থনা

আমি বিকাব না কিছুতে আর
আপনারে।
আমি দাঁড়াতে চাই সভার তলে
সবার সাথে এক-সারে।

সকালবেলায় আলোর মাঝে
মলিন যেন না হই লাজে,
আলো যেন পশিতে পায়
মনের মধ্যে এক-বারে।
বিকাব না বিকাব না
আপনারে।

আমি বিশ্ব সাথে রব সহজ-
বিশ্বাসে।
আমি আকাশ হতে বাতাস নেব
প্রাণের মধ্যে নিশ্বাসে।
পেয়ে ধরার মাটির স্নেহ
পুণ্য হবে সর্ব দেহ,
গাছের শাখা উঠবে দুলে
আমার মনের উল্লাসে।
বিশ্বে রব সহজ সুখে
বিশ্বাসে।

আমি সবায় দেখে খুশি হব
অন্তরে।
কিছু বেসুর যেন বাজে না আর
আমার বীণাযন্তরে।
যাহাই আছে নয়ন ভরি
সবই যেন গ্রহণ করি,
চিত্তে নামে আকাশ-গলা
আনন্দিত মন্ত্র রে।
সবায় দেখে তৃপ্ত রব
অন্তরে।

খেয়া

তুমি এপার-ওপার কর কে গো
ওগো খেয়ার নেয়ে।
আমি ঘরের দ্বারে বসে বসে
দেখি যে তাই চেয়ে
ওগো খেয়ার নেয়ে।
ভাঙিলে হাট দলে দলে
সবাই যবে ঘাটে চলে,
আমি তখন মনে করি
আমিও যাই ধেয়ে
ওগো খেয়ার নেয়ে।

তুমি সন্ধ্যাবেলা ওপার-পানে
তরণী যাও বেয়ে,
দেখে মন আমার কেমন সুরে
ওঠে যে গান গেয়ে
ওগো খেয়ার নেয়ে।
কালো জলের কলকলে
আঁখি আমার ছলছলে,
ওপার হতে সোনার আভা
পরান ফেলে ছেয়ে,
ওগো খেয়ার নেয়ে।

দেখি তোমার মুখে কথাটি নেই
ওগো খেয়ার নেয়ে।
কী যে তোমার চোখে লেখা আছে
দেখি যে তাই চেয়ে
ওগো খেয়ার নেয়ে।

আমার মুখে ক্ষণতরে
যদি তোমার আঁখি পড়ে
আমি তখন মনে করি
আমিও যাই ধেয়ে,
ওগো খেয়ার নেয়ে।

১৫ শ্রাবণ ১৩১২

নাটক ও প্রহসন

রাজা

রাজা

১

অন্ধকার ঘর

রানী সুদর্শনা ও তাঁহার দাসী সুরঙ্গমা

সুদর্শনা। আলো, আলো কই? এ-ঘরে কি একদিনও আলো জ্বলবে না?

সুরঙ্গমা। রানীমা, তোমার ঘরে ঘরেই তো আলো জ্বলছে—তার থেকে সরে আসবার জন্যে কি একটা ঘরেও অন্ধকার রাখবে না?

সুদর্শনা। কোথাও অন্ধকার কেন থাকবে?

সুরঙ্গমা। তা হলে যে আলোও চিনবে না অন্ধকারও চিনবে না।

সুদর্শনা। তুই যেমন এই অন্ধকার ঘরের দাসী তেমনি তোর অন্ধকারের মতো কথা, অর্থই বোঝা যায় না। বল্ তো এ-ঘরটা আছে কোথায়। কোথা দিয়ে এখানে আসি কোথা দিয়ে বেরোই প্রতিদিনই ধাঁদা লাগে।

সুরঙ্গমা। এ-ঘর মাটির আবরণ ভেদ করে পৃথিবীর বুকের মাঝখানে তৈরি। তোমার জন্যেই রাজা বিশেষ করে করেছেন।

সুদর্শনা। তাঁর ঘরের অভাব কী ছিল যে, এই অন্ধকার ঘরটা বিশেষ করে করেছেন।

সুরঙ্গমা। আলোর ঘরে সকলেরই আনাগোনা—এই অন্ধকারে কেবল একলা তোমার সঙ্গে মিলন।

সুদর্শনা। না, না, আমি আলো চাই—আলোর জন্যে অস্থির হয়ে আছি। তোকে আমি আমার গলার হার দেব যদি এখানে একদিন আলো আনতে পারিস।

সুরঙ্গমা। আমার সাধ্য কী মা। যেখানে তিনি অন্ধকার রাখেন আমি সেখানে আলো জ্বালব!

সুদর্শনা। এত ভক্তি তোর? অথচ শুনেছি তোর বাপকে রাজা শাস্তি দিয়েছেন। সে কি সত্যি?

সুরঙ্গমা। সত্যি। বাবা জুয়ো খেলত। রাজ্যের যত যুবক আমাদের ঘরে জুটত—মদ খেত আর জুয়ো খেলত।

সুদর্শনা। তুই কী করতিস?

সুরঙ্গমা। মা, তবে সব শুনেছ। আমি নষ্ট হবার পথে গিয়েছিলুম। বাবা ইচ্ছে করেই আমাকে সে-পথে দাঁড় করিয়েছিলেন। আমার মা ছিল না।

সুদর্শনা। রাজা যখন তোর বাপকে নির্বাসিত করে দিলেন তখন তোর রাগ হয় নি?

সুরঙ্গমা। খুব রাগ হয়েছিল—ইচ্ছে হয়েছিল কেউ যদি রাজাকে মেরে ফেলে তো বেশ হয়।

সুদর্শনা। রাজা তোর বাপের কাছ থেকে ছাড়িয়ে এনে কোথায় রাখলেন?

সুরঙ্গমা। কোথায় রাখলেন কে জানে। কিন্তু কী কষ্ট গেছে! আমাকে যেন ছুঁচ কোটাত, আগুনে পোড়াত।

সুদর্শনা। কেন, তোর এত কষ্ট কিসের ছিল।

সুরঙ্গমা। আমি যে নষ্ট হবার পথে গিয়েছিলুম—সে-পথ বন্ধ হতেই মনে হল আমার যেন কোনো আশ্রয়ই রইল না। আমি কেবল খাঁচায়-পোরা বুনো জন্তুর মত কেবল গর্জে বেড়াতুম এবং সবাইকে আঁচড়ে কামড়ে ছিঁড়ে ফেলতে ইচ্ছে করত।

সুদর্শনা। রাজাকে তখন তোর কী মনে হত!

সুরঙ্গমা। উঃ কী নিষ্ঠুর! কী নিষ্ঠুর! কী অবিচলিত নিষ্ঠুরতা!

সুদর্শনা সেই রাজার 'পরে তোর এত ভক্তি হল কী করে?

সুরঙ্গমা। কী জানি মা! এত অটল এত কঠোর বলেই এত নির্ভর এত ভরসা। নইলে আমার মতো নষ্ট আশ্রয় পেত কেমন করে?

সুদর্শনা। তোর মন বদল হল কখন?

সুরঙ্গমা। কী জানি কখন হয়ে গেল। সমস্ত দুরন্তপনা হার মেনে একদিন মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। তখন দেখি যত ভয়ানক ততই সুন্দর। বেঁচে গেলুম, বেঁচে গেলুম, জন্মের মতো বেঁচে গেলুম।

সুদর্শনা। আচ্ছা সুরঙ্গমা, মাথা খা, সত্যি করে বল্ আমার রাজাকে দেখতে কেমন? আমি একদিনও তাঁকে চোখে দেখলুম না। অন্ধকারেই আমার কাছে আসেন অন্ধকারেই যান। কতলোককে জিজ্ঞাসা করি কেউ স্পষ্ট করে জবাব দেয় না—সবাই যেন কী একটা লুকিয়ে রাখে।

সুরঙ্গমা। আমি সত্যি বলছি রানী, ভালো করে বলতে পারব না। তিনি কি সুন্দর? না, লোকে যাকে সুন্দর বলে তিনি তা নন।

সুদর্শনা। বলিস কী? সুন্দর নন?

সুরঙ্গমা। না রানীমা। সুন্দর বললে তাঁকে ছোটো করে বলা হবে।

সুদর্শনা। তোর সব কথা ওই একরকম। কিছু বোঝা যায় না।

সুরঙ্গমা। কী করব মা, সব কথা তো বোঝানো যায় না। বাপের বাড়িতে অল্পবয়সে অনেক পুরুষ দেখেছি, তাদের সুন্দর বলতুম। তারা আমার দিনরাত্রিকে আমার সুখদুঃখকে কী নাচন নাচিয়ে বেড়িয়েছিল সে আজও ভুলতে পারি নি। আমার রাজা কি তাদের মতো? সুন্দর! কক্‌খনো না।

সুদর্শনা। সুন্দর নয়?

সুরঙ্গমা। হাঁ, তাই বলব—সুন্দর নয়। সুন্দর নয় বলেই এমন অদ্ভুত এমন আশ্চর্য! যখন বাপের কাছ থেকে কেড়ে আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে গেল তখন সে ভয়ানক দেখলুম। আমার সমস্ত মন এমন বিমুখ হল যে কটাক্ষেও তাঁর দিকে তাকাতে চাইতুম না। তার পরে এখন এমন হয়েছে যে যখন সকালবেলায় তাঁকে প্রণাম করি তখন কেবল তাঁর পায়ের তলার মাটির দিকেই তাকাই—আর মনে হয় এই আমার ঢের—আমার নয়ন সার্থক হয়ে গেছে।

সুদর্শনা। তোর সব কথা বুঝতে পারি নে তবু শুনতে বেশ ভালো লাগে। কিন্তু যাই বলিস তাঁকে দেখবই। আমার কবে বিবাহ হয়েছিল মনেও নেই; তখন আমার জ্ঞান ছিল না। মার কাছে শুনেছি তাঁকে দৈবজ্ঞ বলেছিল তাঁর মেয়ে যাঁকে স্বামিরূপে পাবে পৃথিবীতে তাঁর মতো পুরুষ আর নেই। মাকে কতবার জিজ্ঞাসা করেছি আমার স্বামীকে দেখতে কেমন—তিনি ভালো করে উত্তর দিতেই চান না, বলেন, আমি কি দেখেছি—আমি ঘোমটার ভিতর থেকে ভালো করে দেখতেই পাই নি। যিনি সুপুরুষের শ্রেষ্ঠ তাঁকে দেখব এ লোভ কি ছাড়া যায়!

সুরঙ্গমা। ওই যে মা একটা হাওয়া আসছে।

সুদর্শনা। হাওয়া? কোথায় হাওয়া?

সুরঙ্গমা। ওই যে গন্ধ পাচ্ছ না।

সুদর্শনা। না, কই গন্ধ পাচ্ছি নে তো।

সুরঙ্গমা। বড়ো দরজাটা খুলেছে—তিনি আসছেন, ভিতরে আসছেন।

সুদর্শনা। তুই কেমন করে টের পাস?

সুরঙ্গমা। কী জানি মা। আমার মনে হয় যেন আমার বুকের ভিতরে পায়ের শব্দ পাচ্ছি। আমি তাঁর এই অন্ধকার ঘরের সেবিকা কিনা তাই আমার একটা বোধ জন্মে গেছে—আমার বোঝবার জন্যে কিছুই দেখবার দরকার হয় না।

সুদর্শনা। আমার যদি তোর মতো হয় তাহলে যে বেঁচে যাই।

সুরঙ্গমা। হবে মা হবে। তুমি দেখব দেখব করে যে অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে রয়েছ সেইজন্যে কেবল দেখবার দিকেই তোমার সমস্ত মন পড়ে রয়েছে। সেইটে যখন ছেড়ে দেবে তখন সব আপনি সহজ হয়ে যাবে।

সুদর্শনা। দাসী হয়ে তোর এত সহজ হল কী করে? রানী হয়ে আমার হয় না কেন?

সুরঙ্গমা। আমি যে দাসী সেইজন্যেই এত সহজ হল। আমাকে যেদিন তিনি এই অন্ধকার ঘরের ভার দিয়ে বললেন, সুরঙ্গমা, এই ঘরটা প্রতিদিন তুমি প্রস্তুত করে রেখো, এই তোমার কাজ, তখন আমি তাঁর আজ্ঞা মাথায় করে নিলুম—আমি মনে মনেও বলি নি যারা তোমার আলোর ঘরে আলো জ্বালে তাদের কাজটি আমাকে দাও। তাই যে-কাজটি নিলুম তার শক্তি আপনি জেগে উঠল, কোনো বাধা পেল না। ওই যে তিনি আসছেন—ঘরের বাইরে এসে দাঁড়িয়েছেন। প্রভু!

বাহিরে গান

খোলো খোলো দ্বার   রাখিয়ো না আর
বাহিরে আমায় দাঁড়ায়ে।
দাও সাড়া দাও   এই দিকে চাও
এস দুই বাহু বাড়ায়ে॥
কাজ হয়ে গেছে সারা,
উঠেছে সন্ধ্যাতারা,
আলোকের খেয়া   হয়ে গেল দেয়া
অস্তসাগর পারায়ে॥
এসেছি দুয়ারে   এসেছি, আমারে
বাহিরে রেখো না দাঁড়ায়ে॥
ভরি লয়ে ঝারি   এনেছ কি বারি,
সেজেছ কি শুচি দুকূলে?
বেঁধেছ কি চুল,   তুলেছ কি ফুল
গেঁথেছ কি মালা মুকুলে?
ধেনু এল গোঠে ফিরে,
পাখিরা এসেছে নীড়ে,

পথ ছিল যত জুড়িয়া জগত,
আঁধারে গিয়েছে হারায়ে॥
তোমারি দুয়ারে এসেছি, আমারে
বাহিরে রেখো না দাঁড়ায়ে॥

সুরঙ্গমা। তোমার দুয়োর কে বন্ধ রাখতে পারে রাজা? ও তো বন্ধ নেই কেবল ভেজানো আছে, একটু ছোঁও যদি আপনি খুলে যাবে। সেটুকুও করবে না? নিজে উঠে গিয়ে না খুলে দিলে ঢুকবে না?

গান

এ যে মোর আবরণ
ঘুচাতে কতক্ষণ?
নিশ্বাস-বায়ে উড়ে চলে যায়
তুমি কর যদি মন।
যদি পড়ে থাকি ভূমে
ধুলায় ধরণী চুমে,
তুমি তারি লাগি দ্বারে রবে জাগি
এ কেমন তব পণ?
রথের চাকার রবে
জাগাও জাগাও সবে,
আপনার ঘরে এস বলভরে
এস এস গৌরবে।
ঘুম টুটে যাক চলে,
চিনি যেন প্রভু বলে;
ছুটে এসে দ্বারে করি আপনারে
চরণে সমর্পণ॥

রানী, যাও তবে, দরজাটা খুলে দাও, নইলে আসবেন না।

সুদর্শনা। আমি এ-ঘরের অন্ধকারে কিছুই ভালো করে দেখতে পাই নে—কোথায় দরজা কে জানে। তুই এখানকার সব জানিস—তুই আমার হয়ে খুলে দে।

[সুরঙ্গমার দ্বার উদ্‌ঘাটন, প্রণাম ও প্রস্থান[১]

---

[১] রাজাকে এ নাটকের কোথাও রঙ্গমঞ্চে দেখা যাইবে না।

তুমি আমাকে আলোয় দেখা দিচ্ছ না কেন ?

রাজা। আলোয় তুমি হাজার হাজার জিনিসের সঙ্গে মিশিয়ে আমাকে দেখতে চাও ? এই গভীর অন্ধকারে আমি তোমার একমাত্র হয়ে থাকি না কেন ?

সুদর্শনা। সবাই তোমাকে দেখতে পায়, আমি রানী হয়ে দেখতে পাব না ?

রাজা। কে বললে দেখতে পায় ? মূঢ় যারা তারা মনে করে দেখতে পাচ্ছি।

সুদর্শনা। তা হ'ক, আমাকে দেখা দিতেই হবে।

রাজা। সহ্য করতে পারবে না—কষ্ট হবে।

সুদর্শনা। সহ্য হবে না—তুমি বল কী ! তুমি যে কত সুন্দর কত আশ্চর্য তা এই অন্ধকারেই বুঝতে পারি, আর আলোতে বুঝতে পারব না ? বাইরে যখন তোমার বীণা বাজে তখন আমার এমনি হয় যে, আমার নিজেকে সেই বীণার গান বলে মনে হয়। তোমার ওই সুগন্ধ উত্তরীয়টা যখন আমার গায়ে এসে ঠেকে তখন আমার মনে হয়, আমার সমস্ত অঙ্গটা বাতাসে যেন আনন্দের সঙ্গে মিলে গেল। তোমাকে দেখলে আমি সইতে পারব না এ কী কথা !

রাজা। আমার কোনো রূপ কি তোমার মনে আসে না ?

সুদর্শনা। এক রকম করে আসে বই কি ! নইলে বাঁচব কী করে ?

রাজা। কী রকম দেখেছ ?

সুদর্শনা। সে তো একরকম নয় ! নববর্ষার দিনে জলভরা মেঘে আকাশের শেষ প্রান্তে বনের রেখা যখন নিবিড় হয়ে ওঠে, তখন বসে বসে মনে করি আমার রাজার রূপটি বুঝি এইরকম—এমনি নেমে-আসা, এমনি ঢেকে-দেওয়া, এমনি চোখ-জুড়ানো, এমনি হৃদয়-ভরানো, চোখের পল্লবটি এমনি ছায়ামাখা, মুখের হাসিটি এমনি গভীরতার মধ্যে ডুবে থাকা। আবার শরৎকালে আকাশের পর্দা যখন দূরে উড়ে চলে যায় তখন মনে হয় তুমি স্নান করে তোমার শেফালিবনের পথ দিয়ে চলেছ, তোমার গলায় কুন্দফুলের মালা, তোমার বুকে শ্বেত-চন্দনের ছাপ, তোমার মাথায় হালকা সাদা কাপড়ের উষ্ণীষ, তোমার চোখের দৃষ্টি দিগন্তের পারে—তখন মনে হয়, তুমি আমার পথিক বন্ধু ; তোমার সঙ্গে যদি চলতে পারি তাহলে দিগন্তে দিগন্তে সোনার সিংহদ্বার খুলে যাবে, শুভ্রতার ভিতরমহলে প্রবেশ করব। আর যদি না পারি তবে এই বাতায়নের ধারে বসে কোন্ এক অনেক-দূরের জন্যে দীর্ঘনিশ্বাস উঠতে থাকবে, কেবলই দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি, অজ্ঞাত বনের পথশ্রেণী আর অনাঘ্রাত ফুলের গন্ধের জন্যে বুকের ভিতরটা কেঁদে কেঁদে ঘুরে ঘুরে মরবে। আর বসন্তকালে এই যে সমস্ত বন রঙে রঙিন, এখন আমি তোমাকে দেখতে পাই কানে কুণ্ডল, হাতে অঙ্গদ, গায়ে বসন্তী রঙের

উত্তরীয়, হাতে অশোকের মঞ্জরী, তানে তানে তোমার বীণার সব-কটি সোনার তার উতলা।

রাজা। এত বিচিত্ররূপ দেখছ তবে কেন সব বাদ দিয়ে কেবল একটি বিশেষ মূর্তি দেখতে চাচ্ছ? সেটা যদি তোমার মনের মতো না হয় তবে তো সমস্ত গেল।

সুদর্শনা। মনের মতো হবে নিশ্চয় জানি।

রাজা। মন যদি তার মতো হয় তবেই সে মনের মতো হবে। আগে তাই হ'ক।

সুদর্শনা। সত্য বলছি এই অন্ধকারের মধ্যে যখন তোমাকে দেখতে না পাই অথচ তুমি আছ বলে জানি তখন এক-একবার কেমন একটা ভয়ে আমার বুকের ভিতরটা কেঁপে ওঠে।

রাজা। সে-ভয়ে দোষ কী? প্রেমের মধ্যে ভয় না থাকলে তার রস হালকা হয়ে যায়।

সুদর্শনা। আচ্ছা আমি জিজ্ঞাসা করি এই অন্ধকারের মধ্যে তুমি আমাকে দেখতে পাও?

রাজা। পাই বইকি।

সুদর্শনা। কেমন করে দেখতে পাও? আচ্ছা, কী দেখ?

রাজা। দেখতে পাই যেন অনন্ত আকাশের অন্ধকার আমার আনন্দের টানে ঘুরতে ঘুরতে কত নক্ষত্রের আলো টেনে নিয়ে এসে একটি জায়গায় রূপ ধরে দাঁড়িয়েছে। তার মধ্যে কত যুগের ধ্যান, কত আকাশের আবেগ, কত ঋতুর উপহার!

সুদর্শনা। আমার এত রূপ! তোমার কাছে যখন শুনি বুক ভরে ওঠে; কিন্তু ভালো করে প্রত্যয় হয় না; নিজের মধ্যে তো দেখতে পাই নে।

রাজা। নিজের আয়নায় দেখা যায় না—ছোটো হয়ে যায়। আমার চিত্তের মধ্যে যদি দেখতে পাও তো দেখবে সে কতবড়ো! আমার হৃদয়ে তুমি যে আমার দ্বিতীয়, তুমি সেখানে কি শুধু তুমি!

সুদর্শনা। বলো বলো এমনি করে বলো! আমার কাছে তোমার কথা গানের মতো বোধ হচ্ছে,—যেন অনাদিকালের গান, যেন জন্ম-জন্মান্তর শুনে এসেছি। সে কি তুমিই শুনিয়েছ, আর আমাকেই শুনিয়েছ? না, যাকে শুনিয়েছ সে আমার চেয়ে অনেক বড়ো, অনেক সুন্দর;—তোমার গানে সেই অলোক-সুন্দরীকে দেখতে পাই—সে কি আমার মধ্যে, না তোমার মধ্যে? তুমি আমাকে যেমন করে দেখছ তাই একবার এক নিমেষের জন্য আমাকে দেখিয়ে দাও না! তোমার কাছে অন্ধকার বলে কি কিছুই নেই? সেইজন্যেই তো তোমাকে কেমন আমার ভয় করে। এই যে কঠিন কালো লোহার

মতো অন্ধকার, যা আমার উপর ঘুমের মতো মূর্ছার মতো মৃত্যুর মতো, তোমার দিকে তার কিছুই নেই! তবে এ-জায়গায় তোমার সঙ্গে আমি কেমন করে মিলব? না, না, হবে না মিলন, হবে না। এখানে নয়, এখানে নয়। যেখানে আমি গাছপালা পশুপাখি মাটিপাথর সমস্ত দেখছি সেইখানেই তোমাকে দেখব।

রাজা। আচ্ছা দেখো—কিন্তু তোমাকে নিজে চিনে নিতে হবে; কেউ তোমাকে বলে দেবে না—আর বলে দিলেই বা বিশ্বাস কী।

সুদর্শনা। আমি চিনে নেব, চিনে নেব—লক্ষ লোকের মধ্যে চিনে নেব। ভুল হবে না।

রাজা। আজ বসন্তপূর্ণিমার উৎসবে তুমি তোমার প্রাসাদের শিখরের উপরে দাঁড়িয়ো—চেয়ে দেখো—আমার বাগানে সহস্র লোকের মধ্যে আমাকে দেখবার চেষ্টা ক'রো।

সুদর্শনা। তাদের মধ্যে দেখা দেবে তো?

রাজা। বার বার করে সকল দিক থেকেই দেখা দেব। সুরঙ্গমা!

সুরঙ্গমার প্রবেশ

সুরঙ্গমা। কী প্রভু?

রাজা। আজ বসন্তপূর্ণিমার উৎসব।

সুরঙ্গমা। আমাকে কী কাজ করতে হবে?

রাজা। আজ তোমার সাজের দিন,—কাজের দিন নয়। আজ আমার পুষ্পবনের আনন্দে তোমাকে যোগ দিতে হবে।

সুরঙ্গমা। তাই হবে প্রভু।

রাজা। রানী আজ আমাকে চোখে দেখতে চান।

সুরঙ্গমা। কোথায় দেখবেন?

রাজা। যেখানে পঞ্চমে বাঁশি বাজবে, ফুলের কেশরের ফাগ উড়বে, জ্যোৎস্নায় ছায়ায় গলাগলি হবে সেই আমাদের দক্ষিণের কুঞ্জবনে।

সুরঙ্গমা। সে-লুকোচুরির মধ্যে কি দেখা যাবে? সেখানে যে হাওয়া উতলা, সবই চঞ্চল, চোখে ধাঁধা লাগবে না?

রাজা। রানীর কৌতূহল হয়েছে।

সুরঙ্গমা। কৌতূহলের জিনিস হাজার হাজার আছে—তুমি কি তাদের সঙ্গে মিলে কৌতূহল মেটাবে? তুমি আমার তেমন রাজা নও! রানী, তোমার কৌতূহলকে শেষকালে কেঁদে ফিরে আসতে হবে।

গান

কোথা বাইরে দূরে যায় রে উড়ে হায় রে হায়,
তোমার চপল আঁখি বনের পাখি বনে পালায়।
আজি হৃদয় মাঝে যদি গো বাজে প্রেমের বাঁশি
তবে আপনি সেধে আপনা বেঁধে পরে সে ফাঁসি,
তবে ঘুচে গো ত্বরা ঘুরিয়া মরা হেথা হোথায়—
আহা আজি সে আঁখি বনের পাখি বনে পালায়।
চেয়ে দেখিস নারে হৃদয়-দ্বারে কে আসে যায়।
তোরা শুনিস কানে বারতা আনে দখিন বায়!
আজি ফুলের বাসে সুখের হাসে আকুল গানে
চির- বসন্ত যে তোমারি খোঁজে এসেছে প্রাণে।
তারে বাহিরে খুঁজি ঘুরিয়া বুঝি পাগল প্রায়,
তোমার চপল আঁখি বনের পাখি বনে পালায়।

২

পথ

প্রথম পথিক। ওগো মশায়!

প্রহরী। কেন গো?

দ্বিতীয়। রাস্তা কোথায়? আমরা বিদেশী, আমাদের রাস্তা বলে দাও।

প্রহরী। কিসের রাস্তা?

তৃতীয়। ওই যে শুনেছি আজ কোথায় উৎসব হবে। কোন্ দিক দিয়ে যাওয়া যাবে?

প্রহরী। এখানে সব রাস্তাই রাস্তা। যেদিক দিয়ে যাবে ঠিক পৌছোবে। সামনে চলে যাও। [প্রস্থান

প্রথম। শোনো একবার কথা শোনো। বলে সবই এক রাস্তা। তাই যদি হবে তবে এতগুলোর দরকার ছিল কী?

দ্বিতীয়। তা ভাই রাগ করিস কেন? যে-দেশের যেমন ব্যবস্থা! আমাদের দেশে তো রাস্তা নেই বললেই হয়—বাঁকাচোরা গলি, সে তো গোলকধাঁধা। আমাদের রাজা

বলে খোলা রাস্তা না থাকাই ভালো—রাস্তা পেলেই প্রজারা বেরিয়ে চলে যাবে। এ-দেশে উলটো, যেতেও কেউ ঠেকায় না, আসতেও কেউ মানা করে না—তবু মানুষও তো ঢের দেখছি—এমন খোলা পেলে আমাদের রাজ্য উজাড় হয়ে যেত !

প্রথম। ওহে জনার্দন, তোমার ওই একটা বড়ো দোষ।

জনার্দন। কী দোষ দেখলে ?

প্রথম। নিজের দেশের তুমি বড়ো নিন্দে কর। খোলা রাস্তাটাই বুঝি ভালো হল ? বলো তো ভাই কৌণ্ডিল্য, খোলা রাস্তাটাকে বলে কিনা ভালো।

কৌণ্ডিল্য। ভাই ভবদত্ত, বরাবরই তো দেখে আসছ জনার্দনের ওই একরকম ত্যাড়া বুদ্ধি। কোন্ দিন বিপদে পড়বেন—রাজার কানে যদি যায় তাহলে ম'লে ওঁকে শ্মশানে ফেলবার লোক খুঁজে পাবেন না।

ভবদত্ত। আমাদের তো ভাই এই খোলা রাস্তার দেশে এসে অবধি খেয়ে-শুয়ে সুখ নেই—দিনরাত গা-ঘিনঘিন করছে। কে আসছে কে যাচ্ছে তার কোনো ঠিক-ঠিকানাই নেই—রাম রাম !

কৌণ্ডিল্য। সে-ও তো ওই জনার্দনের পরামর্শ শুনেই এসেছি। আমাদের গুষ্টিতে এমন কখনো হয় নি। আমার বাবাকে তো জান—কতবড়ো মহাত্মালোক ছিল—শাস্ত্রমতে ঠিক উনপঞ্চাশ হাত মেপে গণ্ডি কেটে তার মধ্যেই সমস্ত জীবনটা কাটিয়ে দিলে—একদিনের জন্যে তার বাইরে পা ফেলে নি। মৃত্যুর পর কথা উঠল ওই উনপঞ্চাশ হাতের মধ্যেই তো দাহ করতে হয় ; সে এক বিষম মুশকিল ; শেষকালে শাস্ত্রী বিধান দিলে যে, উনপঞ্চাশে যে দুটো অঙ্ক আছে তার বাইরে যাবার জো নেই, অতএব ওই চার নয় উনপঞ্চাশকে উলটে নিয়ে নয় চার চুরানব্বই করে দাও—তবেই তো তাকে বাড়ির বাইরে পোড়াতে পারি, নইলে ঘরেই দাহ করতে হত। বাবা, এত আঁটাআঁটি ! এ কি যে-সে দেশ পেয়েছ।

ভবদত্ত। বটেই তো, মরতে গেলেও ভাবতে হবে, এ কি কম কথা !

কৌণ্ডিল্য। সেই দেশের মাটিতে শরীর, তবু জনার্দন বলে কিনা, খোলা রাস্তাই ভালো। [প্রস্থান

বালকগণকে লইয়া ঠাকুরদার প্রবেশ

ঠাকুরদা। ওরে দক্ষিনে হাওয়ার সঙ্গে সমান পাল্লা দিতে হবে—হার মানলে চলবে না—আজ সব রাস্তাই গানে ভাসিয়ে দিয়ে চলব।

গান

আজি দখিন দুয়ার খোলা—
　　এস হে, এস হে, এস হে, আমার
　　　　বসন্ত এস।
দিব　হৃদয়-দোলায় দোলা,
　　এস হে, এস হে, এস হে, আমার
　　　　বসন্ত এস।
নব　শ্যামল শোভন রথে
এস　বকুল-বিছানো পথে,
এস　বাজায়ে ব্যাকুল বেণু,
মেখে পিয়াল ফুলের রেণু
　　এস হে, এস হে, এস হে, আমার
　　　　বসন্ত এস।
এস　ঘন পল্লবপুঞ্জে
　　এস হে, এস হে, এস হে।
এস　বনমল্লিকাকুঞ্জে
　　এস হে, এস হে, এস হে।
মৃদু　মধুর মদির হেসে
এস　পাগল হাওয়ার দেশে,
তোমার উতলা উত্তরীয়
তুমি　আকাশে উড়ায়ে দিয়ো,
　　এস হে, এস হে, এস হে, আমার
　　　　বসন্ত এস॥　　　　[প্রস্থান

নাগরিকদল

প্রথম। যা বলিস ভাই, আজকের দিনটাতে আমাদের রাজার দেখা দেওয়া উচিত ছিল। তার রাজ্যে বাস করছি একদিনও তাকে দেখলুম না এ কি কম দুঃখের কথা।

দ্বিতীয়। ওর ভিতরকার কথাটা তোরা কেউ জানিস নে। কাউকে যদি না বলিস তো বলি।

প্রথম। এক পাড়াতেই তো বসত করছি কবে কার কথা কাকে বলেছি। ওই

যে তোমাদের রাহক দাদা কুয়ো খুঁড়তে খুঁড়তে গুপ্তধন পেলে সে কি আমি সাধ করে ফাঁস করেছি ? সব তো জান ।

দ্বিতীয় । জানি বই কি, সেইজন্যেই তো বলছি—কথাটা যদি চেপে রাখতে পার তো বলি—নইলে বিপদ ঘটতে পারে ।

তৃতীয় । তুমিও তো আচ্ছা লোক হে বিরূপাক্ষ । বিপদই যদি ঘটতে পারে তবে ঘটাবার জন্যে অত ব্যস্ত হও কেন ? কে তোমার কথাটা নিয়ে দিনরাত্রি সামলে বেড়ায় ?

বিরূপাক্ষ । কথাটা উঠে পড়ল নাকি সেইজন্যেই—তা বেশ নাই বললেম । আমি বাজে কথা বলবার লোকই নই । রাজা দেখা দেন না সে-কথাটা তোমরাই তুললে—তাই তো আমি বললেম, সাধে দেখা দেন না ।

প্রথম । ওহে বিরূপাক্ষ, বলেই ফেলো না ।

বিরূপাক্ষ । তা তোমাদের কাছে বলতে দোষ নেই—তোমরা হলে বন্ধু মানুষ । (মৃদুস্বরে) রাজাকে দেখতে বড়ো বিকট, সেইজন্যে পণ করেছে কাউকে দেখা দেবে না ।

প্রথম । তাই তো বটে । আমরা বলি, ভালোরে ভালো, সকল দেশেই রাজাকে দেখে দেশসুদ্ধ লোকের আত্মাপুরুষ বাঁশপাতার মতো হী হী করে কাঁপতে থাকে, আর আমাদেরই রাজাকে দেখা যায় না কেন । কিছু না হ'ক একবার যদি চোখ পাকিয়ে বলে, বেটার শির লেও, তাহলেও যে বুঝি রাজা বলে একটা কিছু আছে । বিরূপাক্ষর কথাটা মনে নিচ্ছে হে ।

তৃতীয় । কিচ্ছু মনে নিচ্ছে না—ওর সিকি পয়সাও বিশ্বাস করি নে ।

বিরূপাক্ষ । কী বললে হে, বিশু, তুমি বলতে চাও আমি মিছে কথা বলেছি ?

বিশ্ববসু । তা বলতে চাই নে কিন্তু কথাটা তাই বলে মানতে পারব না—এতে রাগই কর আর যাই কর ।

বিরূপাক্ষ । তুমি মানবে কেন ? তুমি তোমার বাপখুড়োকেই মান না—এত বুদ্ধি তোমার । এ রাজত্বে রাজা যদি গা ঢাকা দিয়ে না বেড়াত তাহলে কি এখানে তোমার ঠাঁই হত ? তুমি তো নাস্তিক বললেই হয় ।

বিশ্ববসু । ওহে আস্তিক, অন্য রাজার দেশ হলে তোমার জিভ কেটে কুকুরকে দিয়ে খাওয়াত, তুমি বল কিনা আমাদের রাজাকে বিকট দেখতে ।

বিরূপাক্ষ । দেখো বিশু, মুখ সামলে কথা কও ।

বিশ্ববসু । মুখ যে কার সামলানো দরকার সে আর বলে কাজ নেই ।

প্রথম । চুপ চুপ এ-সব ভালো হচ্ছে না । আমাকে সুদ্ধ বিপদে ফেলবে দেখছি । আমি এ-সব কথার মধ্যে নেই । [প্রস্থান

ঠাকুরদাকে একদল লোকের টানাটানি করিয়া লইয়া প্রবেশ

প্রথম। ঠাকুরদা, তোমাকে আজ এমন করে সাজালে কে? মালাটি কোন্ নিপুণ হাতের গাঁথা?

ঠাকুরদা। ওরে বোকারা, সব কথাই কি খোলসা করে বলতে হবে নাকি? কিছু ঢাকা থাকবে না?

দ্বিতীয়। দরকার নেই দাদা, তোমার তো সব ফাঁস হয়েই আছে। আমাদের কবিকেশরী তোমার নামে যে গান বেঁধেছে শোন নি বুঝি? সে যে ঘরে ঘরে রটে গেছে।

ঠাকুরদা। একটা ঘরই যথেষ্ট, ঘরে ঘরে শুনে বেড়াবার কি সময় আছে?

তৃতীয়। ওটা তোমার নেহাত ফাঁকা বড়াই। ঠাকরুনদিদি তোমাকে আঁচলে বেঁধে রাখে বটে! পাড়ার যেখানে যাই সেখানেই তুমি, ঘরে থাক কখন?

ঠাকুরদা। ওরে তোদের ঠাকরুনদিদির আঁচল লম্বা আছে। পাড়ার যেখানে যাই সে-আঁচল ছাড়িয়ে যাবার জো নেই। তা কবি কী বলছেন শুনি।

তৃতীয়। তিনি বলছেন,

গান

যেখানে রূপের প্রভা নয়নলোভা,
সেখানে তোমার মতন ভোলা কে। (ঠাকুরদাদা)
যেখানে রসিক-সভা পরম শোভা
সেখানে এমন রসের ঝোলা কে। (ঠাকুরদাদা)

ঠাকুরদা। আরে চুপ চুপ। এমন বসন্তের দিনে তোরা এ কী গান ধরলি রে?

প্রথম। কেন ধরলুম জান না?

গান

যেখানে গলাগলি কোলাকুলি
তোমারি বেচাকেনা সেই হাটে,
পড়ে না পদধূলি পথ ভুলি
যেখানে ঝগড়া করে ঝগড়াটে,
যেখানে ভোলাভুলি খোলাখুলি
সেখানে তোমার মতন খোলা কে—
ঠাকুরদাদা।

ঠাকুরদা। যদি তোরা তোদের সেই কবির কাছে বিধান নিতিস তাহলে শুনতে পেতিস এই ফাল্গুন মাসের দিনে ঠাকুরদা প্রভৃতি পুরোনো জিনিসমাত্রই একেবারে বর্জনীয়। আমার নামে গান বেঁধে আজ রাগরাগিণীর অপব্যয় করিস নে, তোরা সরস্বতীর বীণার তারে মরচে ধরিয়ে দিবি যে।

দ্বিতীয়। ঠাকুরদা, তুমি তো রাস্তাতেই সভা জমালে, উৎসবে যাবে কখন? চলো আমাদের দক্ষিণ বনে।

ঠাকুরদা। ভাই আমার ওই দশা, আমি রাস্তা থেকেই চাখতে চাখতে চলি, তার পরে ভোজটা তো আছেই। আদাবন্তে চ মধ্যে চ।

দ্বিতীয়। দেখো দাদা, আজকের দিনে মনে একটা কথা বড়ো লাগছে।

ঠাকুরদা। কী বল্ দেখি।

দ্বিতীয়। এবার দেশবিদেশের লোক এসেছে, সবাই বলছে, সবই দেখছি ভালো কিন্তু রাজা দেখি নে কেন? কাউকে জবাব দিতে পারি নে। আমাদের দেশে ওইটে একটা বড়ো ফাঁকা রয়ে গেছে।

ঠাকুরদা। ফাঁকা! আমাদের দেশে রাজা এক জায়গায় দেখা দেয় না বলেই তো সমস্ত রাজ্যটা একেবারে রাজায় ঠাসা হয়ে রয়েছে—তাকে বল ফাঁকা! সে যে আমাদের সবাইকেই রাজা করে দিয়েছে! এই যে অন্য রাজাগুলো তারা তো উৎসবটাকে দলে মলে ছারখার করে দিলে—তাদের হাতিঘোড়া-লোকলশকরের তাড়ায় দক্ষিণ-হাওয়ার দাক্ষিণ্য আর রইল না, বসন্তর যেন দম আটকাবার জো হয়েছে। কিন্তু আমাদের রাজা নিজে জায়গা জোড়ে না, সবাইকে জায়গা ছেড়ে দেয়। কবিকেশরীর সেই গানটা তো জানিস।

গান

আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে
নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কী স্বত্বে।
(আমরা সবাই রাজা)
আমরা যা খুশি তাই করি
তবু তাঁর খুশিতেই চরি,
আমরা নই বাঁধা নই দাসের রাজার ত্রাসের দাসত্বে
নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কী স্বত্বে।
(আমরা সবাই রাজা)

রাজা সবারে দেন মান
সে মান আপনি ফিরে পান,
মোদের খাটো করে রাখে নি কেউ কোনো অসত্যে,
নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কী স্বত্বে।
(আমরা সবাই রাজা)

আমরা চলব আপন মতে
শেষে মিলব তাঁরি পথে
মোরা মরব না কেউ বিফলতার বিষম আবর্তে
নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কী স্বত্বে।
(আমরা সবাই রাজা)

তৃতীয়। কিন্তু দাদা, যা বল তাঁকে দেখতে পায় না বলে লোকে অনায়াসে তাঁর নামে যা খুশি বলে সেইটে অসহ্য হয়।

প্রথম। এই দেখো না, আমাকে গাল দিলে শাস্তি আছে কিন্তু রাজাকে গাল দিলে কেউ তার মুখ বন্ধ করবারই নেই।

ঠাকুরদা। ওর মানে আছে ; প্রজার মধ্যে যে রাজাটুকু আছে তারই গায়ে আঘাত লাগে, তার বাইরে যিনি তাঁর গায়ে কিছুই বাজে না। সূর্যের যে তেজ প্রদীপে আছে তাতে ফুঁটুকু সয় না, কিন্তু হাজার লোকে মিলে সূর্যে ফুঁ দিলে সূর্য অম্লান-হয়েই থাকেন।

বিশ্ববসু ও বিরূপাক্ষের প্রবেশ

বিশ্ববসু। এই যে ঠাকুরদা, এই দেখো, এই লোকটা রটিয়ে বেড়াচ্ছে আমাদের রাজাকে কুৎসিত দেখতে, তাই তিনি দেখা দেন না।

ঠাকুরদা। এতে রাগ কর কেন বিশু। ওর রাজা কুৎসিত বই কী, নইলে তার রাজ্যে বিরূপাক্ষের মতো অমন চেহারা থাকে কেন? স্বয়ং ওর বাপ-মাও তো ওকে কার্তিক নাম দেন নি। ও আয়নাতে যেমন আপনার মুখটি দেখে আর রাজার চেহারা তেমনি ধ্যান করে।

বিরূপাক্ষ। ঠাকুরদা, আমি নাম করব না কিন্তু এমন লোকের কাছে খবরটা শুনেছি যাকে বিশ্বাস না করে থাকবার জো নেই।

ঠাকুরদা। নিজের চেয়ে কাকে বেশি বিশ্বাস করবে বলো।

বিরূপাক্ষ। না, আমি তোমাকে প্রমাণ করে দিতে পারি।

প্রথম। লোকটার লজ্জা নেই হে। একে তো যা না বলবার তাই বলে, তার পরে আবার সেটা প্রমাণ করে দিতে চায়!

দ্বিতীয়। ওহে, দাও না ওকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে একেবারে মাটি-প্রমাণ করে দাও না।

ঠাকুরদা। আরে ভাই, রাগ ক'রো না। ওর রাজা কুৎসিত এই বলে বেড়িয়েই ও-বেচারা আজ উৎসব করতে বেরিয়েছিল। যাও ভাই বিরূপাক্ষ, ঢের লোক পাবে যারা তোমার কথা বিশ্বাস করবে, তাদের নিয়ে দল বেঁধে আজ আমোদ করো গে।

[প্রস্থান

বিদেশী দলের পুনঃপ্রবেশ

কৌণ্ডিল্য। সত্যি বলছি ভাই, রাজা আমাদের এমনি অভ্যেস হয়ে গেছে যে, এখানে কোথাও রাজা না দেখে মনে হচ্ছে দাঁড়িয়ে আছি, কিন্তু পায়ের তলায় যেন মাটি নেই!

ভবদত্ত। দেখো ভাই কৌণ্ডিল্য, আসল কথাটা হচ্ছে এদের মূলেই রাজা নেই। সকলে মিলে একটা গুজব রটিয়ে রেখেছে।

কৌণ্ডিল্য। আমারও তো তাই মনে হয়েছে। আমরা তো জানি, দেশের মধ্যে সকলের চেয়ে বেশি করে চোখে পড়ে রাজা—নিজেকে খুব করে না দেখিয়ে সে তো ছাড়ে না।

জনার্দন। কিন্তু এ-রাজ্যে আগাগোড়া যেমন নিয়ম দেখছি রাজা না থাকলে তো এমন হয় না।

ভবদত্ত। এতকাল রাজার দেশে বাস করে এই বুদ্ধি হল তোমার? নিয়মই যদি থাকবে তাহলে রাজা থাকবার আর দরকার কী?

জনার্দন। এই দেখো না আজ এত লোক মিলে আনন্দ করছে, রাজা না থাকলে এরা এমন করে মিলতেই পারত না।

ভবদত্ত। ওহে জনার্দন, আসল কথাটাই যে তুমি এড়িয়ে যাচ্ছ। একটা নিয়ম আছে সেটা তো দেখছি, উৎসব হচ্ছে সেটাও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, সেখানে তো কোনো গোল বাধছে না—কিন্তু রাজা কোথায়, তাকে দেখলে কোথায় সেইটে বলো।

জনার্দন। আমার কথাটা হচ্ছে এই যে, তোমরা তো এমন রাজ্য জান যেখানে রাজা কেবল চোখেই দেখা যায় কিন্তু রাজ্যের মধ্যে তার কোনো পরিচয় নেই, সেখানে কেবল ভূতের কীর্তন—কিন্তু এখানে দেখো—

কৌণ্ডিল্য। আবার ঘুরে ফিরে সেই একই কথা। তুমি ভবদত্তর আসল কথাটার উত্তর দাও না হে—হাঁ, কি, না? রাজাকে দেখেছ, কি দেখ নি?

ভবদত্ত। রেখে দাও ভাই কৌণ্ডিল্য। ওর সঙ্গে মিথ্যে বকাবকি করা। ওর ন্যায়শাস্ত্রটা পর্যন্ত এ-দেশী রকমের হয়ে উঠছে। বিনা-চক্ষে ও যখন দেখতে শুরু করেছে তখন আর ভরসা নেই। বিনা অন্নে কিছুদিন ওকে আহার করতে দিলে আবার বুদ্ধিটা সাধারণ লোকের মতো পরিষ্কার হয়ে আসতে পারে। [প্রস্থান

বাউলের দল

আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে
তাই হেরি তায় সকল খানে।
আছে সে নয়ন-তারায় আলোক-ধারায়, তাই না হারায়,
ওগো তাই দেখি তায় যেথায় সেথায়
তাকাই আমি যেদিক পানে॥
আমি তার মুখের কথা
শুনব বলে গেলাম কোথা,
শোনা হল না, শোনা হল না,
আজ ফিরে এসে নিজের দেশে
এই যে শুনি,
শুনি তাহার বাণী আপন গানে॥
কে তোরা খুঁজিস তারে
কাঙাল-বেশে দ্বারে দ্বারে,
দেখা মেলে না মেলে না,—
ও তোরা আয় রে ধেয়ে দেখ্ রে চেয়ে
আমার বুকে—
ওরে দেখ্ রে আমার দুই নয়ানে॥ [প্রস্থান

একদল পদাতিক

প্রথম পদাতিক। সরে যাও সব সরে যাও। তফাত যাও।

প্রথম পথিক। ইস, তাই তো। মস্তলোক বটে। লম্বা পা ফেলে চলছেন। কেন রে বাপু, সরব কেন? আমরা সব পথের কুকুর না কি?

দ্বিতীয় পদাতিক। আমাদের রাজা আসছেন।

দ্বিতীয় পথিক। রাজা? কোথাকার রাজা?

প্রথম পদাতিক। আমাদের এই দেশের রাজা।

প্রথম পথিক। লোকটা পাগল হল নাকি? আমাদের দেশের রাজা পাইক নিয়ে হাঁকতে হাঁকতে আবার রাস্তায় কবে বেরোয়?

দ্বিতীয় পদাতিক। মহারাজ আজ আর গোপন থাকবেন না, তিনি স্বয়ং আজ উৎসব করবেন।

দ্বিতীয় পথিক। সত্যি না কি ভাই?

দ্বিতীয় পদাতিক। ওই দেখো না নিশেন উড়ছে।

দ্বিতীয় পথিক। তাই তো রে, ওটা নিশেনই তো বটে।

দ্বিতীয় পদাতিক। নিশেনে কিংশুক ফুল আঁকা আছে দেখছ না?

দ্বিতীয় পথিক। ওরে কিংশুক ফুলই তো বটে, মিথ্যে বলে নি—একেবারে লাল টকটক করছে।

প্রথম পদাতিক। তবে! কথাটা যে বড়ো বিশ্বাস হল না!

দ্বিতীয় পথিক। না দাদা, আমি তো অবিশ্বাস করি নি। ওই কুম্ভই গোলমাল করেছিল। আমি একটি কথাও বলি নি।

প্রথম পদাতিক। বেটা বোধ হয় শূন্যকুম্ভ, তাই আওয়াজ বেশি।

দ্বিতীয় পদাতিক। লোকটা কে হে? তোমাদের কে হয়?

দ্বিতীয় পথিক। কেউ না, কেউ না। আমাদের গ্রামের যে মোড়ল ও তার খুড়শ্বশুর—অন্য পাড়ায় বাড়ি।

দ্বিতীয় পদাতিক। হাঁ হাঁ খুড়শ্বশুর গোছের চেহারা বটে, বুদ্ধিটাও নেহাত খুড়শ্বশুরে ধাঁচার।

কুম্ভ। অনেক দুঃখে বুদ্ধিটা এই রকম হয়েছে। এই যে সেদিন কোথা থেকে এক রাজা বেরোল, নামের গোড়ায় তিন-শ পঁয়তাল্লিশটা শ্রী লাগিয়ে ঢাক পিটতে পিটতে শহর ঘুরে বেড়াল—আমি তার পিছনে কি কম ফিরেছি? কত ভোগ দিলেম, কত সেবা করলেম, ভিটেমাটি বিকিয়ে যাবার জো হল। শেষকালে তার রাজাগিরি রইল কোথায়? লোকে যখন তার কাছে তালুক চায়, মুলুক চায় সে তখন পাজিপুঁথি খুলে শুভদিন কিছুতেই খুঁজে পায় না। কিন্তু আমাদের কাছে খাজনা নেবার বেলায় মঘা অশ্লেষা ত্র্যস্পর্শ কিছুই তো বাধত না!

দ্বিতীয় পদাতিক। হাঁ হে কুম্ভ, আমাদের রাজাকে তুমি সেই রকম মেকি রাজা বলতে চাও!

প্রথম পদাতিক। ওহে খুড়শ্বশুর, এবার খুড়শাশুড়ীর কাছে থেকে বিদায় নিয়ে এস গে, আর দেরি নেই।

কুম্ভ। না বাবা, রাগ ক'রো না। আমি কান মলছি, নাকে খত দিচ্ছি—যতদূর সরতে বল ততদূরই সরে দাঁড়াতে রাজি আছি।

দ্বিতীয় পদাতিক। আচ্ছা বেশ, এইখানে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকো। রাজা এলেন বলে—আমরা এগিয়ে গিয়ে রাস্তা ঠিক করে রাখি। [পদাতিকদের প্রস্থান

দ্বিতীয় পথিক। কুম্ভ, তোমার ওই মুখের দোষেই তুমি মরবে।

কুম্ভ। না ভাই মাধব, ও মুখের দোষ নয়, ও কপালের দোষ। যেবারে মিছে রাজা বেরোল একটি কথাও কই নি—অত্যন্ত ভালোমানুষের মতো নিজের সর্বনাশ করেছি—আর এবার হয়তো বা সত্যি রাজা বেরিয়েছে তাই বেফাঁস কথাটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল। ওটা কপাল।

মাধব। আমি এই বুঝি, রাজা সত্যি হ'ক মিথ্যে হ'ক মেনে চলতেই হবে। আমরা কি রাজা চিনি যে বিচার করব! অন্ধকারে ঢেলা মারা—যত বেশি মারবে একটা-না-একটা লেগে যাবে। আমি ভাই একধার থেকে গড় করে যাই—সত্যি হলে লাভ; মিথ্যে হলেই বা লোকসান কী।

কুম্ভ। ঢেলাগুলো নেহাত ঢেলা হলে ভাবনা ছিল না—দামি জিনিস—বাজে খরচ করতে গিয়ে ফতুর হতে হয়।

মাধব। ওই যে আসছেন রাজা। আহা রাজার মতো রাজা বটে! কী চেহারা। যেন ননির পুতুল। কেমন হে কুম্ভ, এখন কী মনে হচ্ছে।

কুম্ভ। দেখাচ্ছে ভালো—কী জানি ভাই হতে পারে।

মাধব। ঠিক যেন রাজাটি গড়ে রেখেছে। ভয় হয় পাছে রোদ্দুর লাগলে গলে যায়।

রাজবেশধারীর প্রবেশ

মাধব। জয় মহারাজের! দর্শনের জন্যে সকাল থেকে দাঁড়িয়ে। দয়া রাখবেন।

কুম্ভ। বড়ো ধাঁদা ঠেকছে, ঠাকুরদাকে ডেকে আনি। [প্রস্থান

আর একদল পথিক

প্রথম পথিক। ওরে রাজা রে রাজা। দেখবি আয়।

দ্বিতীয় পথিক। মনে রেখো রাজা, আমি কুশলীবস্তুর উদয়দত্তর নাতি। আমার নাম বিরাজ দত্ত। রাজা বেরিয়েছে শুনেই ছুটেছি, লোকের কারও কথায় কান দিই নি—আমি সকলের আগে তোমাকে মেনেছি।

তৃতীয় পথিক। শোনো একবার, আমি যে ভোর থেকে এখানে দাঁড়িয়ে—তখনও কাক ডাকে নি—এতক্ষণ ছিলে কোথায়? রাজা, আমি বিক্রমস্থলীর ভদ্রসেন; ভক্তকে স্মরণ রেখো।

রাজবেশী। তোমাদের ভক্তিতে বড়ো প্রীত হলেম।

বিরাজ দত্ত। মহারাজ, আমাদের অভাব বিস্তর—এতদিন দর্শন পাই নি জানাব কাকে?

রাজবেশী। তোমাদের সমস্ত অভাব মিটিয়ে দেব। [প্রস্থান

প্রথম পথিক। ওরে পিছিয়ে থাকলে চলবে না—ভিড়ে মিশে গেলে রাজার চোখে পড়ব না।

দ্বিতীয় পথিক। দেখ্ দেখ্ একবার নরোত্তমের কাণ্ডখানা দেখ্! আমরা এত লোক আছি সবাইকে ঠেলেঠুলে কোথা থেকে এক তালপাতার পাখা নিয়ে রাজাকে বাতাস করতে লেগে গেছে।

মাধব। তাই তো হে লোকটার আস্পর্ধা তো কম নয়।

দ্বিতীয় পথিক। ওকে জোর করে ধরে সরিয়ে দিতে হচ্ছে—ও কি রাজার পাশে দাঁড়াবার যুগ্যি।

মাধব। ওহে রাজা কি আর একটু বুঝবে না? এ যে অতিভক্তি।

প্রথম পথিক। না হে না—রাজারা বোঝে না কিছু—হয়তো ওই তালপাখার হাওয়া খেয়েই ভুলবে। [সকলের প্রস্থান

ঠাকুরদাকে লইয়া কুম্ভের প্রবেশ

কুম্ভ। এখনই এই রাস্তা দিয়েই যে গেল।

ঠাকুরদা। রাস্তা দিয়ে গেলেই রাজা হয় নাকি রে।

কুম্ভ। না দাদা, একেবারে স্পষ্ট চোখে দেখা গেল—একজন না দুজন না, রাস্তার দুধারের লোক তাকে দেখে নিয়েছে।

ঠাকুরদা। সেইজন্যেই তো সন্দেহ। কবে আমার রাজা রাস্তার লোকের চোখ ধাঁদিয়ে বেড়ায়। এমন উৎপাত তো কোনোদিন করে না!

কুম্ভ। তা আজকে যদি মর্জি হয়ে থাকে বলা যায় কী।

ঠাকুরদা। বলা যায় রে বলা যায়—আমার রাজার মর্জি বরাবর ঠিক আছে—ঘড়ি-ঘড়ি বদলায় না।

কুম্ভ। কিন্তু কী বলব দাদা—একেবারে ননির পুতুলটি। ইচ্ছে করে সর্বাঙ্গ দিয়ে তাকে ছায়া করে রাখি!

ঠাকুরদা। তোর এমন বুদ্ধি কবে হল? আমার রাজা ননির পুতুল, আর তুই তাকে ছায়া করে রাখবি!

কুম্ভ। যা বল দাদা, দেখতে বড়ো সুন্দর—আজ তো এত লোক জুটেছে অমনটি কাউকে দেখলুম না।

ঠাকুরদা। আমার রাজা যদি বা দেখা দিত তোদের চোখেই পড়ত না। দশের সঙ্গে তাকে আলাদা বলে চেনাই যায় না—সে সকলের সঙ্গেই মিশে যায় যে।

কুম্ভ। ধ্বজা দেখতে পেলুম যে গো।

ঠাকুরদা। ধ্বজায় কী দেখলি।

কুম্ভ। কিংশুক ফুল আঁকা—একেবারে চোখ ঠিকরে যায়।

ঠাকুরদা। আমার রাজার ধ্বজায় পদ্মফুলের মাঝখানে বজ্র আঁকা।

কুম্ভ। লোকে বলে, এই উৎসবে রাজা বেরিয়েছে।

ঠাকুরদা। বেরিয়েছে বই কি। কিন্তু সঙ্গে পাইক নেই, বাদ্যি নেই, আলো নেই, কিছু না।

কুম্ভ। কেউ বুঝি ধরতেই পারে না।

ঠাকুরদা। হয়তো কেউ কেউ পারে।

কুম্ভ। যে পারে সে বোধ হয় যা চায় তাই পায়।

ঠাকুরদা। সে যে কিছু চায় না। ভিক্ষুকের কর্ম নয় রাজাকে চেনা। ছোটো ভিক্ষুক বড়ো ভিক্ষুককেই রাজা বলে মনে করে বসে। আজ যে লোকটা গা-ভরা গয়না পরে রাস্তার দুই ধারের লোকের দুই চক্ষুর কাছে ভিক্ষে চেয়ে বেড়িয়েছে তোরা লোভীরা তাকেই রাজা বলে ঠাউরে বসে আছিস!—ওই যে আমার পাগলা আসছে। আয় ভাই আয়—আর তো বাজে বকতে পারি নে—একটু মাতামাতি করে নেওয়া যাক।

পাগলের প্রবেশ ও গান

তোরা যে যা বলিস ভাই
আমার সোনার হরিণ চাই।
সেই মনোহরণ চপল চরণ
সোনার হরিণ চাই॥
সে যে চমকে বেড়ায় দৃষ্টি এড়ায়
যায় না তারে বাঁধা,

তার নাগাল পেলে পালায় ঠেলে
লাগায় চোখে ধাঁদা,
তবু ছুটব পিছে মিছে মিছে
পাই বা নাহি পাই
আমি আপন মনে মাঠে বনে
উধাও হয়ে ধাই ॥
তোরা পাবার জিনিস হাটে কিনিস
রাখিস ঘরে ভরে,
যাহা যায় না পাওয়া তারি হাওয়া
লাগল কেন মোরে ?
আমার যা ছিল তা দিলেম কোথা
যা নেই তারি ঝোঁকে,
আমার ফুরোয় পুঁজি, ভাবিস বুঝি
মরি তাহার শোকে !
ওরে আছি সুখে হাস্যমুখে
দুঃখ আমার নাই ।
আমি আপনমনে মাঠে বনে
উধাও হয়ে ধাই ॥

৩

কুঞ্জবনের দ্বারে

ঠাকুরদা ও উৎসববালকগণ

ঠাকুরদা । ওরে দরজার কাছে এসেছি, এবার খুব কষে দরজায় ঘা লাগা ।

গান

আজি কমলমুকুলদল খুলিল !
দুলিল রে দুলিল
মানস-সরসে রস-পুলকে
পলকে পলকে ঢেউ তুলিল ।

গগন মগন হল গন্ধে,
সমীরণ মূর্ছে আনন্দে,
গুন গুন গুঞ্জন ছন্দে
মধুকর ঘিরি ঘিরি বন্দে ;—
নিখিল ভুবন মন ভুলিল—
মন ভুলিল রে
মন ভুলিল !

[প্রস্থান

অবন্তী কোশল কাঞ্চী প্রভৃতি রাজগণ

অবন্তী। এখানকার রাজা কি আমাদেরও দেখা দেবে না ?

কাঞ্চী। এর রাজত্ব করবার প্রণালী কী-রকম ? রাজার বনে উৎসব, সেখানেও সাধারণ লোকের কারও কোনো বাধা নেই ?

কোশল। আমাদের জন্যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জায়গা তৈরি করে রাখা উচিত ছিল।

কাঞ্চী। জোর করে নিজেরা তৈরি করে নেব।

কোশল। এই সব দেখেই সন্দেহ হয় এখানে রাজা নেই একটা ফাঁকি চলে আসছে।

অবন্তী। ওহে তা হতে পারে কিন্তু এখানকার মহিষী সুদর্শনা নিতান্ত ফাঁকি নয়।

কোশল। সেই লোভেই তো এসেছি। যিনি দেখা দেন না তাঁর জন্যে আমার বিশেষ ঔৎসুক্য নেই, কিন্তু যিনি দেখবার যোগ্য তাঁকে না দেখে ফিরে গেলে ঠকতে হবে।

কাঞ্চী। একটা ফন্দি দেখাই যাক না।

অবন্তী। ফন্দি জিনিসটা খুব ভালো, যদি তার মধ্যে নিজে আটকা না পড়া যায়।

কাঞ্চী। এ কী ব্যাপার। নিশেন উড়িয়ে এদিকে কে আসে ? এ কোথাকার রাজা ?

পদাতিকগণের প্রবেশ

কাঞ্চী। তোমাদের রাজা কোথাকার ?

প্রথম পদাতিক। এই দেশের। তিনি আজ উৎসব করতে বেরিয়েছেন।

[প্রস্থান

কোশল। এ কী কথা। এখানকার রাজা বেরিয়েছে !

অবন্তী। তাই তো তাহলে এঁকে দেখেই ফিরতে হবে—অন্য দর্শনীয়টা রইল।

কাঞ্চী। শোন কেন? এখানে রাজা নেই বলেই যে-খুশি নির্ভাবনায় আপনাকে রাজা বলে পরিচয় দেয়। দেখছ না, যেন সেজে এসেছে—অত্যন্ত বেশি সাজ।

অবন্তী। কিন্তু লোকটাকে দেখাচ্ছে ভালো, চোখ ভোলাবার মতো চেহারাটা আছে।

কাঞ্চী। চোখ ভুলতে পারে কিন্তু ভালো করে তাকালেই ভুল থাকে না। আমি তোমাদের সামনেই ওর ফাঁকি ধরে দিচ্ছি।

রাজবেশীর প্রবেশ

রাজবেশী। রাজগণ, স্বাগত। এখানে তোমাদের অভ্যর্থনার কোনো ত্রুটি হয় নি তো?

রাজগণ। (কপট বিনয়ে নমস্কার করিয়া) কিছু না।

কাঞ্চী। যে অভাব ছিল তা মহারাজের দর্শনেই পূর্ণ হয়েছে।

রাজবেশী। আমি সাধারণের দর্শনীয় নই কিন্তু তোমরা আমার অনুগত এই জন্য একবার দেখা দিতে এলুম।

কাঞ্চী। অনুগ্রহের এত আতিশয্য সহ্য করা কঠিন।

রাজবেশী। আমি অধিকক্ষণ থাকব না।

কাঞ্চী। সেটা অনুভবেই বুঝেছি—বেশিক্ষণ স্থায়ী হবার ভাব দেখছি নে।

রাজবেশী। ইতিমধ্যে যদি কোনো প্রার্থনা থাকে—

কাঞ্চী। আছে বই কি। কিন্তু অনুচরদের সামনে জানাতে লজ্জা বোধ করি।

রাজবেশী। (অনুবর্তীদের প্রতি) ক্ষণকালের জন্য তোমরা দূরে যাও। এইবার তোমাদের প্রার্থনা অসংকোচে জানাতে পার।

কাঞ্চী। অসংকোচেই জানাব—তোমারও যেন লেশমাত্র সংকোচ না হয়।

রাজবেশী। না, সে আশঙ্কা ক'রো না।

কাঞ্চী। এস তবে—মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে আমাদের প্রত্যেককে প্রণাম করো।

রাজবেশী। বোধ হচ্ছে আমার ভৃত্যগণ বারুণী মদটা রাজশিবিরে কিছু মুক্ত হস্তেই বিতরণ করেছে।

কাঞ্চী। ভণ্ডরাজ, মদ যাকে বলে সেটা তোমার ভাগেই অতিমাত্রায় পড়েছে, সেই-জন্যেই এখন ধুলোয় লোটাবার অবস্থা হয়েছে।

রাজবেশী। রাজগণ, পরিহাসটা রাজোচিত নয়।

কাঞ্চী। পরিহাসের অধিকার যাদের আছে তারা নিকটেই প্রস্তুত আছে। সেনাপতি।

রাজবেশী। আর প্রয়োজন নেই। স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি আপনারা আমার প্রণম্য। মাথা আপনিই নত হচ্ছে, কোনো তীক্ষ্ণ উপায়ে তাকে ধুলায় টানবার দরকার হবে না। আপনারা যখন আমাকে চিনেছেন তখন আমিও আপনাদের চিনে নিলুম। অতএব এই আমার প্রণাম গ্রহণ করুন। যদি দয়া করে পালাতে দেন তাহলে বিলম্ব করব না।

কাঞ্চী। পালাবে কেন? তোমাকেই আমরা এখানকার রাজা করে দিচ্ছি—পরিহাসটা শেষ করেই যাওয়া যাক। দলবল কিছু আছে?

রাজবেশী। আছে। রাস্তার লোক যে দেখছে আমার পিছনে ছুটে আসছে। আরম্ভে যখন আমার দল বেশি ছিল না তখন সবাই আমাকে সন্দেহ করছিল—লোক যত বেড়ে গেল সন্দেহ ততই দূর হল। এখন ভিড়ের লোক নিজেদের ভিড় দেখেই মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছে, আমাকে কোনো কষ্ট পেতে হচ্ছে না।

কাঞ্চী। বেশ কথা। এখন থেকে আমরা তোমার সাহায্য করব। কিন্তু তোমাকে আমাদেরও একটা কাজ করে দিতে হবে।

রাজবেশী। আপনাদের দত্ত আদেশ এবং মুকুট আমি মাথায় করে রাখব।

কাঞ্চী। আপাতত আর কিছু চাই নে, রানী সুদর্শনাকে দেখতে চাই—সেইটে তোমাকে করে দিতে হবে।

রাজবেশী। যথাসাধ্য চেষ্টার ত্রুটি হবে না।

কাঞ্চী। তোমার সাধ্যের উপর ভরসা নেই, আমাদের বুদ্ধিমতো চলতে হবে। আচ্ছা এখন তুমি কুঞ্জে প্রবেশ করে রাজ-আড়ম্বরে উৎসব করো গে।

[রাজগণ ও রাজবেশীর প্রস্থান

ঠাকুরদা ও কুম্ভের প্রবেশ

কুম্ভ। ঠাকুরদা, তোমার কথা আমি তেমন বুঝি নে কিন্তু তোমাকে বুঝি। তা আমার রাজায় কাজ নেই, তোমার পাছেই রয়ে গেলুম, কিন্তু ঠকলুম না তো?

ঠাকুরদা। আমাকে নিয়েই যদি সম্পূর্ণ চলে তাহলে ঠকলি নে, আমার চেয়ে বেশি যদি কিছু দরকার থাকে তাহলে ঠকলি বই কি।

কুম্ভ। ঠাকুরদা, উৎসব শুরু হয়েছে, এবার ভিতরে চলো।

ঠাকুরদা। না রে, আগে দ্বারের কাজটা সেরে নিই, তার পরে ভিতরে। এখানে

সকল আগন্তুকের সঙ্গে একবার মিলে নিতে হবে। ওই আমার অকিঞ্চনের দল আসছে।

অকিঞ্চনের দল। ঠাকুরদা, তোমাকে খুঁজে আজ আমাদের দেরি হয়ে গেল।

ঠাকুরদা। আজ আমি দ্বারে, আজ আমাকে অন্য জায়গায় খুঁজলে মিলবে কেন?

প্রথম। তুমি যে আমাদের উৎসবের সূত্রধর।

ঠাকুরদা। তাই তো আমি দ্বারে।

দ্বিতীয়। আজ তুমি বুঝি এই কুম্ভ সুধন মুষল তোষল এদের নিয়েই আছ? দেশবিদেশের কত রাজা এল তাদের সঙ্গে পরিচয় করে নেবে না?

ঠাকুরদা। ভাই এরা সব সরল লোক—চুপ করে কেবল এদের পাশে দাঁড়িয়ে থাকলেও এরা ভাবে এদের যেন কত সেবা করলুম, আর যারা মস্তলোক তাদের কাছে মুণ্ডটাও যদি খসিয়ে দেওয়া যায় তারা মনে করে লোকটা বাজে জিনিস দিয়ে ঠকিয়ে গেল।

প্রথম। এখন চলো দাদা!

ঠাকুরদা। না ভাই, আজ আমার এইখানেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চলা। সকলের চলাচলেই আমার মন ছুটছে। তবে আর কি; এইবারে শুরু করা যাক।

সকলের গান

মোদের কিছু নাই রে নাই,
আমরা ঘরে-বাইরে গাই
তাই রে নাই রে নাই রে না।
যতই দিবস যায় রে যায়
গাই রে সুখে হায় রে হায়
তাই রে নাই রে নাই রে না।
যারা সোনার চোরাবালির 'পরে
পাকা ঘরের ভিত্তি গড়ে
তাদের সামনে মোরা গান গেয়ে যাই
তাই রে নাই রে নাই রে না।
যখন থেকে থেকে গাঁঠের পানে
গাঁঠকাটারা দৃষ্টি হানে,
তখন শূন্য ঝুলি দেখায়ে গাই
তাই রে নাই রে নাই রে না।

যখন দ্বারে আসে মরণ বুড়ি,
মুখে তাহার বাজাই তুড়ি,
তখন তান দিয়ে গান জুড়ি রে ভাই
তাই রে নাই রে নাই রে না।

এ যে বসন্তরাজ এসেছে আজ
বাইরে তাহার উজ্জ্বল সাজ,
ওরে অন্তরে তার বৈরাগী গায়
তাই রে নাই রে নাই রে না।

সে যে উৎসবদিন চুকিয়ে দিয়ে
ঝরিয়ে দিয়ে শুকিয়ে দিয়ে
দুই রিক্ত হাতে তাল দিয়ে গায়
তাই রে নাই রে নাই রে না॥ [প্রস্থান

একদল স্ত্রীলোকের প্রবেশ

প্রথমা। ঠাকুরদা।

ঠাকুরদা। কী ভাই।

প্রথমা। আজ বসন্ত-পূর্ণিমার চাঁদের সঙ্গে মালা বদল করব এই পণ করে ঘর থেকে বেরিয়েছি।

ঠাকুরদা। কিন্তু পণ রক্ষা হওয়া কঠিন দেখছি।

দ্বিতীয়া। কেন বলো তো?

ঠাকুরদা। তোমাদের ঠাকরুনদিদি কেবল একখানিমাত্র মালা আমার গলায় পরিয়েছেন।

তৃতীয়া। দেখেছ, দেখেছ, ঠাকুরদার বিনয়টা একবার দেখেছ?

দ্বিতীয়া। হায় রে হায়, আকাশের চাঁদের এতদূর অধঃপতন হল?

ঠাকুরদা। যে ফাঁদ তোমরা পেতেছ, ধরা না দিয়ে বাঁচে কি করে?

প্রথমা। তবে তাই বলো, আমাদের ফাঁদের গুণ।

ঠাকুরদা। চাঁদেরও গুণ আছে, উপযুক্ত ফাঁদ দেখলে সে আপনি ধরা দেয়।

তৃতীয়া। আচ্ছা ঠাকরুনদিদির হিসেবটা কী রকম? আজ উৎসবের দিনে না হয় দুটো বেশি করেই মালা দিতেন।

ঠাকুরদা। যতই দিতেন কুলোত না, সেইজন্যে আজ একটিমাত্র দিয়েছেন। একটির কোনো বালাই নেই।

দ্বিতীয়া। ঠাকুরদা, তুমি দরজা ছেড়ে নড়বে না?

ঠাকুরদা। হাঁ ভাই, সকলকে এগিয়ে দেব, তার পর সব-শেষে আমি।

[স্ত্রীলোকদের প্রস্থান

নাচের দলের প্রবেশ

ঠাকুরদা। আরে, এস এস।

প্রথম। আমাদের নটরাজ তুমি, তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলুম।

ঠাকুরদা। আমি দরজার কাছে খাড়া আছি, জানি এইখান দিয়েই সবাইকে যেতে হবে। তোমাদের দেখলেই পাদুটো ছটফট করে। একবার নাচিয়ে দিয়ে যাও।

নৃত্য ও গীত

মম চিত্তে নিতি নৃত্যে কে যে নাচে
তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ।
তারি সঙ্গে কী মৃদঙ্গে সদা বাজে
তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ॥
হাসিকান্না হীরাপান্না দোলে ভালে,
কাঁপে ছন্দে ভালোমন্দ তালে তালে,
নাচে জন্ম নাচে মৃত্যু পাছে পাছে,
তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ।
কী আনন্দ, কী আনন্দ, কী আনন্দ,
দিবারাত্রি নাচে মুক্তি নাচে বন্ধ,
সে তরঙ্গে ছুটি রঙ্গে পাছে পাছে
তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ॥

ঠাকুরদা। যাও যাও ভাই, তোমরা নেচে বেড়াও গে, নাচিয়ে বেড়াও গে যাও।

[নাচের দলের প্রস্থান

নাগরিকদল

প্রথম। ঠাকুরদা, আমাদের রাজা নেই এ-কথা দু-শবার বলব।

ঠাকুরদা। কেবলমাত্র দু-শবার। এত কঠিন সংযমের দরকার কী—পাঁচ-শবার বলো না।

দ্বিতীয়। ফাঁকি দিয়ে কতদিন তোমরা মানুষকে ভুলিয়ে রাখবে।

ঠাকুরদা। নিজেও ভুলেছি ভাই।

তৃতীয়। আমরা চারিদিকে প্রচার করে বেড়াব আমাদের রাজা নেই।

ঠাকুরদা। কার সঙ্গে ঝগড়া করবে বলো ? তোমাদের রাজা তো কারও কানে ধরে বলছেন না আমি আছি। তিনি তো বলেন তোমরাই আছ, তাঁর সবই তো তোমাদেরই জন্যে।

প্রথম। এই তো আমরা রাস্তা দিয়ে চেঁচিয়ে যাচ্ছি রাজা নেই—যদি রাজা থাকে সে কী করতে পারে করুক না।

ঠাকুরদা। কিচ্ছু করবে না।

দ্বিতীয়। আমার পঁচিশ বছরের ছেলেটা সাত দিনের জ্বরে মারা গেল। দেশে যদি ধর্মের রাজা থাকবে তবে কি এমন অকালমৃত্যু ঘটে।

ঠাকুরদা। ওরে তবু তো এখনো তোর দু ছেলে আছে—আমার যে একে একে পাঁচ ছেলে মারা গেল একটি বাকি রইল না।

তৃতীয়। তবে ?

ঠাকুরদা। তবে কী রে ? ছেলে তো গেলই তাই বলে কি ঝগড়া করে রাজাকেও হারাব ? এমনি বোকা !

প্রথম। ঘরে যাদের অন্ন জোটে না তাদের আবার রাজা কিসের !

ঠাকুরদা। ঠিক বলেছিস ভাই। তা সেই অন্নরাজাকেই খুঁজে বের কর ! ঘরে বসে হাহাকার করলেই তো তিনি দর্শন দেবেন না।

দ্বিতীয়। আমাদের রাজার বিচারটা কী রকম দেখো না। ওই আমাদের ভদ্রসেন, রাজা বলতে সে একেবারে অজ্ঞান হয়ে পড়ে কিন্তু তার ঘরের এমন দশা যে চামচিকেগুলোরও থাকবার কষ্ট হয়।

ঠাকুরদা। আমার দশাটাই দেখ্ না। রাজার দরজায় সমস্ত দিনই তো খাটছি আজ পর্যন্ত দুটো পয়সা পুরস্কার মিলল না।

তৃতীয়। তবে ?

ঠাকুরদা। তবে কী রে ? তাই নিয়েই তো আমার অহংকার। বন্ধুকে কি কেউ কোনো দিন পুরস্কার দেয় ? তা যা ভাই আনন্দ করে বলে বেড়া গে রাজা নেই। আজ আমাদের নানা সুরের উৎসব—সব সুরই ঠিক একতানে মিলবে।

গান

বসন্তে কি শুধু কেবল ফোটা ফুলের মেলা রে ?
দেখিস নে কি শুকনো পাতা ঝরা ফুলের খেলা রে।
যে ঢেউ ওঠে তারি সুরে
বাজে কি গান সাগর জুড়ে ?
যে ঢেউ পড়ে তাহারো সুর জাগছে সারা বেলা রে।
বসন্তে আজ দেখ্‌ রে তোরা ঝরা ফুলের খেলা রে।
আমার প্রভুর পায়ের তলে,
শুধুই কি রে মানিক জ্বলে ?
চরণে তাঁর লুটিয়ে কাঁদে লক্ষ মাটির ঢেলা রে।
আমার গুরুর আসন কাছে
সুবোধ ছেলে ক-জন আছে,
অবোধ জনে কোল দিয়েছেন তাই আমি তাঁর চেলা রে।
উৎসবরাজ দেখেন চেয়ে ঝরা ফুলের খেলা রে।

৪

প্রাসাদ-শিখর

সুদর্শনা ও সখী রোহিণী

সুদর্শনা। ওলো রোহিণী, তুই আমার রাজাকে কি কখনো দেখিস নি ?

রোহিণী। শুনেছি প্রজারা সবাই দেখেছে কিন্তু চিনেছে খুব অল্প লোকে। সেইজন্যে যখনই কাউকে দেখে মনটা চমকে ওঠে তখনই মনে করি, এই বুঝি হবে রাজা। আবার দুদিন পরে ভুল ভাঙে।

সুদর্শনা। ভুল তোরা করতে পারিস কিন্তু আমার ভুল হতে পারে না। আমি হলুম রানী। ওই তো আমার রাজাই বটে।

রোহিণী। তোমাকে তিনি কত মান দিয়েছেন, তিনি কি তোমাকে চেনাতে দেরি করতে পারেন ?

সুদর্শনা। ওই মূর্তি দেখলেই চিত্ত যে আপনি খাঁচার পাখির মতো চঞ্চল হয়ে ওঠে। ওর কথা ভালো করে জিজ্ঞাসা করে এসেছিস তো ?

রোহিণী। এসেছি বই কি। যাকে জিজ্ঞাসা করি সেই তো বলে রাজা।

সুদর্শনা। কোথাকার রাজা?

রোহিণী। আমাদেরই রাজা।

সুদর্শনা। ওই যার মাথায় ফুলের ছাতা ধরে আছে তার কথাই তো বলছিস?

রোহিণী। হাঁ ওই যার পতাকায় কিংশুক আঁকা।

সুদর্শনা। আমি তো দেখবামাত্রই চিনেছি বরঞ্চ তোর মনে সন্দেহ এসেছিল।

রোহিণী। আমাদের যে সাহস অল্প তাই ভয় হয় কী জানি যদি ভুল করি তবে অপরাধ হবে।

সুদর্শনা। আহা যদি সুরঙ্গমা থাকত তা হলে কোনো সংশয় থাকত না।

রোহিণী। সুরঙ্গমাই আমাদের সকলের চেয়ে সেয়ানা হল বুঝি!

সুদর্শনা। তা যা বলিস সে তাঁকে ঠিক চেনে।

রোহিণী। এ-কথা আমি কক্‌খনো মানব না। ও তার ভান। বললেই হল চিনি, কেউ তো পরীক্ষা করে নিতে পারবে না। আমরা যদি ওর মতো নির্লজ্জ হতুম তাহলে অমন কথা আমাদেরও মুখে আটকাত না।

সুদর্শনা। না, না, সে তো বলে না কিছু।

রোহিণী। ভাব দেখায়। সে যে বলার চেয়ে আরও বেশি। কত ছলই যে জানে। ওইজন্যই তো আমাদের কেউ তাকে দেখতে পারে না।

সুদর্শনা। যাই হ'ক সে থাকলে একবার তাকে জিজ্ঞাসা করে দেখতুম।

রোহিণী। সে তো কখনো কোথাও বেরোয় না,—আজ দেখি সে সাজসজ্জা করে উৎসব করতে বেরিয়েছে। তার রঙ্গ দেখে হেসে বাঁচি নে।

সুদর্শনা। আজ যে প্রভুর হুকুম তাই সে সেজেছে।

রোহিণী। তা বেশ মহারানী, আমাদের কথায় কাজ কী? যদি ইচ্ছা করেন তাকেই ডেকে আনি, তার মুখ থেকেই সন্দেহ ভঞ্জন হ'ক। তার ভাগ্য ভালো, রানীর কাছে রাজার পরিচয় সে-ই করিয়ে দেবে।

সুদর্শনা। না, না, পরিচয় কাউকে করাতে হবে না—তবু কথাটা সকলেরই মুখে শুনতে ইচ্ছে করে।

রোহিণী। সকলেই তো বলছে—ওই দেখো না তাঁর জয়ধ্বনি এখান থেকে শোনা যাচ্ছে।

সুদর্শনা। তবে এক কাজ কর্‌। পদ্মপাতায় করে এই ফুলগুলি তাঁর হাতে দিয়ে আয় গে।

রোহিণী। যদি জিজ্ঞাসা করেন কে দিলে ?

সুদর্শনা। তার কোনো উত্তর দিতে হবে না—তিনি ঠিক বুঝতে পারবেন। তাঁর মনে ছিল আমি চিনতেই পারব না—ধরা পড়েছেন সেটা না জানিয়ে ছাড়ছি নে। (ফুল লইয়া রোহিণীর প্রস্থান) আমার মন আজ এমনি চঞ্চল হয়েছে—এমন তো কোনোদিন হয় না। এই পূর্ণিমার আলো মদের ফেনার মতো চারিদিকে উপচিয়ে পড়ছে, আমাকে যেন মাতাল করে তুলেছে। ওগো বসন্ত, যে-সব ভীরু লাজুক ফুল পাতার আড়ালে গভীর রাত্রে ফোটে, যেমন করে তাদের গন্ধ উড়িয়ে নিয়ে চলেছ তেমনি তুমি আমার মনকে হঠাৎ কোথায় উদাস করে দিলে, তাকে মাটিতে পা ফেলতে দিলে না !—ওরে প্রতিহারী।

প্রতিহারী (প্রবেশ করিয়া)। কী মহারানী।

সুদর্শনা। ওই যে আম্রবনের বীথিকার ভিতর দিয়ে উৎসব-বালকেরা আজ গান গেয়ে যাচ্ছে—ডাক ডাক ওদের ডেকে নিয়ে আয়—একটু গান শুনি। (প্রতিহারীর প্রস্থান) ভগবান চন্দ্রমা, আজ আমার এই চঞ্চলতার উপরে তুমি যেন কেবলই কটাক্ষপাত করছ ! তোমার স্মিত কৌতুকে সমস্ত আকাশ যেন ভরে গেছে—কোথাও আমার আর লুকোবার জায়গা নেই—আমি কেমন আপনার দিকে চেয়ে আপনি লজ্জা পাচ্ছি ! ভয় লজ্জা সুখ দুঃখ সব মিলে আমার বুকের মধ্যে আজ নৃত্য করছে। শরীরের রক্ত নাচছে, চারিদিকের জগৎ নাচছে, সমস্ত ঝাপসা ঠেকছে।

বালকগণের প্রবেশ

এস, এস, তোমরা সব মূর্তিমান কিশোর বসন্ত, ধরো তোমাদের গান ধরো। আমার সমস্ত শরীর মন গান গাইছে অথচ আমার কণ্ঠে সুর আসছে না। তোমরা আমার হয়ে গান গেয়ে যাও।

বালকগণের গান

বিরহ মধুর হল আজি
মধুরাতে।
গভীর রাগিণী উঠে বাজি
বেদনাতে।
ভরি দিয়া পূর্ণিমা নিশা
অধীর অদর্শন-তৃষা

কী করুণ মরীচিকা আনে
আঁখিপাতে !
সুদূরের সুগন্ধ ধারা
বায়ুভরে
পরানে আমার পথহারা
ঘুরে মরে !
কার বাণী কোন্ সুরে তালে
মর্মরে পল্লবজালে,
বাজে মম মঞ্জীররাজি
সাথে সাথে ॥

সুদর্শনা। হয়েছে হয়েছে আর না। তোমাদের এই গান শুনে চোখে জল ভরে আসছে। আমার মনে হচ্ছে যা পাবার জিনিস তাকে হাতে পাবার জো নেই—তাকে হাতে পাবার দরকার নেই। এমনি করে খোঁজার মধ্যেই সমস্ত পাওয়া যেন সুধাময় হয়ে আছে। কোন্ মাধুর্যের সন্ন্যাসী তোমাদের এই গান শিখিয়ে দিয়েছে গো—ইচ্ছে করছে চোখে-দেখা কানে-শোনা ঘুচিয়ে দিই— হৃদয়ের ভিতরটাতে যে গহনপথের কুঞ্জবন আছে সেইখানকার ছায়ার মধ্যে উদাস হয়ে চলে যাই। ওগো কুমার তাপসগণ, তোমাদের আমি কী দেব বলো। আমার গলায় এ কেবল রত্নের মালা—এ কঠিন হার তোমাদের কণ্ঠে পীড়া দেবে—তোমরা যে ফুলের মালা পরেছ ওর মতো কিছুই আমার কাছে নেই।

[প্রণাম করিয়া বালকগণের প্রস্থান

রোহিণীর প্রবেশ

সুদর্শনা। ভালো করি নি, ভালো করি নি রোহিণী। তোর কাছে সমস্ত বিবরণ শুনতে আমার লজ্জা করছে। এইমাত্র হঠাৎ বুঝতে পেরেছি, যা সকলের চেয়ে বড়ো পাওয়া তা ছুঁয়ে পাওয়া নয়, তেমনি যা সকলের চেয়ে বড়ো দেওয়া তা হাতে করে দেওয়া নয়। তবু বল্ কী হল বল্!

রোহিণী। আমি তো রাজার হাতে ফুল দিলুম কিন্তু তিনি যে কিছু বুঝলেন এমন তো মনে হল না।

সুদর্শনা। বলিস কী ? তিনি বুঝতে পারলেন না ?

রোহিণী। না, তিনি অবাক হয়ে চেয়ে পুতুলটির মতো বসে রইলেন। কিছু বুঝলেন না এইটে পাছে ধরা পড়ে সেইজন্যে একটি কথা কইলেন না।

সুদর্শনা। ছি ছি ছি আমার যেমন প্রগল্‌ভতা তেমনি শাস্তি হয়েছে। তুই আমার ফুল ফিরিয়ে আনলি নে কেন?

রোহিণী। ফিরিয়ে আনব কী করে? পাশে ছিলেন কাঞ্চীর রাজা, তিনি খুব চতুর—চকিতে সমস্ত বুঝতে পারলেন—মুচকে হেসে বললেন, মহারাজ, মহিষী সুদর্শনা আজ বসন্ত-সখার পূজার পুষ্পে মহারাজের অভ্যর্থনা করছেন। শুনে হঠাৎ তিনি সচেতন হয়ে উঠে বললেন, আমার রাজসম্মান পরিপূর্ণ হল। আমি লজ্জিত হয়ে ফিরে আসছিলুম এমন সময়ে কাঞ্চীর রাজা মহারাজের গলা থেকে স্বহস্তে এই মুক্তার মালাটি খুলে নিয়ে আমাকে বললেন, সখী, তুমি যে সৌভাগ্য বহন করে এনেছ তার কাছে পরাভব স্বীকার করে মহারাজের কণ্ঠের মালা তোমার হাতে আত্মসমর্পণ করছে।

সুদর্শনা। কাঞ্চীর রাজাকে বুঝিয়ে দিতে হল? আজকের পূর্ণিমার উৎসব আমার অপমান একেবারে উদ্‌ঘাটিত করে দিলে। তা হ'ক, যা তুই যা, আমি একটু একলা থাকতে চাই। (রোহিণীর প্রস্থান) আজ এমন করে আমার দর্প চূর্ণ হয়েছে তবু সেই মোহন রূপের কাছ থেকে মন ফেরাতে পারছি নে। অভিমান আর রইল না—পরাভব, সর্বত্রই পরাভব—বিমুখ হয়ে থাকব সে-শক্তিটুকুও নেই। কেবল ইচ্ছে করছে ওই মালাটা রোহিণীর কাছ থেকে চেয়ে নিই। কিন্তু ও কী মনে করবে। রোহিণী।

রোহিণী। (প্রবেশ করিয়া) কী মহারানী।

সুদর্শনা। আজকের ব্যাপারে তুই কি পুরস্কার পাবার যোগ্য?

রোহিণী। তোমার কাছে না হ'ক যিনি দিয়েছেন তাঁর কাছ থেকে পেতে পারি।

সুদর্শনা। না, না, ওকে দেওয়া বলে না ও জোর করে নেওয়া।

রোহিণী। তবু, রাজকণ্ঠের অনাদরের মালাকেও অনাদর করি এমন স্পর্ধা আমার নয়।

সুদর্শনা। এ অবজ্ঞার মালা তোর গলায় দেখতে আমার ভালো লাগছে না। দে ওটা খুলে দে। ওর বদলে আমার হাতের কঙ্কণটা তোকে দিলুম—এই নিয়ে তুই চলে যা। (রোহিণীর প্রস্থান) হার হল, আমার হার হল। এ মালা ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া উচিত ছিল—পারলুম না। এ যে কাঁটার মালার মতো আমার আঙুলে বিঁধছে তবু ত্যাগ করতে পারলুম না। উৎসব-দেবতার হাত থেকে এই কি আমি পেলুম—এই অগৌরবের মালা।

৫

কুঞ্জদ্বার

ঠাকুরদা ও একদল লোক

ঠাকুরদা। কী ভাই, হল তোমাদের ?

প্রথম। খুব হল ঠাকুরদা। এই দেখো না একেবারে লালে লাল করে দিয়েছে। কেউ বাকি নেই।

ঠাকুরদা। বলিস কী। রাজাগুলোকে সুদ্ধ রাঙিয়েছে না কি ?

দ্বিতীয়। ওরে বাস রে। কাছে ঘেঁষে কে। তারা সব বেড়ার মধ্যে খাড়া হয়ে রইল।

ঠাকুরদা। হায় হায় বড়ো ফাঁকিতে পড়েছে। একটুও রং ধরাতে পারলি নে ? জোর করে ঢুকে পড়তে হয়।

তৃতীয়। ও দাদা, তাদের রাঙা, সে আর এক রঙের। তাদের চক্ষু রাঙা, তাদের পাইকগুলোর পাগড়ি রাঙা, তার উপরে খোলা তলোয়ারের যে রকম ভঙ্গি দেখলুম একটু কাছে ঘেঁষলেই একেবারে চরম রাঙা রাঙিয়ে দিত।

ঠাকুরদা। বেশ করেছিস ঘেঁষিস নি। পৃথিবীতে ওদের নির্বাসনদণ্ড—ওদের তফাতে রেখে চলতেই হবে। এখন বাড়ি চলেছিস বুঝি ?

দ্বিতীয়। হাঁ দাদা, রাত তো আড়াই পহর হয়ে গেল। তুমি যে ভিতরে গেলে না ?

ঠাকুরদা। এখনও ডাক পড়ল না—দ্বারেই আছি।

তৃতীয়। তোমার শম্ভু-সুধনরা সব গেল কোথায় ?

ঠাকুরদা। তাদের ঘুম পেয়ে গেল—শুতে গেছে।

প্রথম। তারা কি তোমার সঙ্গে অমন খাড়া জাগতে পারে ? [প্রস্থান

বাউলের দল

যা ছিল কালো ধলো
তোমার রঙে রঙে রাঙা হল।
যেমন রাঙাবরন তোমার চরণ
তার সনে আর ভেদ না র'ল।

রাঙা হল বসন ভূষণ,
রাঙা হল শয়ন স্বপন,
মন হ'ল কেমন দেখ্ রে, যেমন
রাঙা কমল টলমল।

ঠাকুরদা। বেশ ভাই বেশ—খুব খেলা জমেছিল ?

বাউল। খুব খুব। সব লালে লাল। কেবল আকাশের চাঁদটাই ফাঁকি দিয়েছে—সাদাই রয়ে গেল।

ঠাকুরদা। বাইরে থেকে দেখাচ্ছে যেন বড়ো ভালোমানুষ। ওর সাদা চাদরটা খুলে দেখতিস যদি তাহলে ওর বিদ্যে ধরা পড়ত। চুপি চুপি ও যে আজ কত রং ছড়িয়েছে এখানে দাঁড়িয়ে সব দেখেছি। অথচ ও নিজে কি এমনি সাদাই থেকে যাবে ?

গান

আহা, তোমার সঙ্গে প্রাণের খেলা
প্রিয় আমার ওগো প্রিয়।
বড়ো উতলা আজ পরান আমার
খেলাতে হার মানবে কি ও ?
কেবল তুমিই কি গো এমনি ভাবে
রাঙিয়ে মোরে পালিয়ে যাবে ?
তুমি সাধ করে নাথ ধরা দিয়ে
আমারো রং বক্ষে নিয়ো—
এই হৃৎকমলের রাঙা রেণু
রাঙাবে ঐ উত্তরীয়। [প্রস্থান

স্ত্রীলোকদের প্রবেশ

প্রথমা। ওমা, ওমা, যেখানে দেখে গিয়েছিলুম সেইখানেই দাঁড়িয়ে আছে গো।

দ্বিতীয়া। আমাদের বসন্তপূর্ণিমার চাঁদ, এত রাত হল তবু একটুও পশ্চিমের দিকে হেলল না।

প্রথমা। আমাদের অচঞ্চল চাঁদটি কার জন্যে পথ চেয়ে আছে ভাই ?

ঠাকুরদা। যে তাকে পথে বের করবে তারই জন্যে।

তৃতীয়া। ঘর ছেড়ে এবার পথের মানুষ খুঁজবে বুঝি ?

ঠাকুরদা। হাঁ ভাই, সর্বনাশের জন্যে মন-কেমন করছে।

গান

আমার সকল নিয়ে বসে আছি
সর্বনাশের আশায়।
আমি তার লাগি পথ চেয়ে আছি
পথে যে-জন ভাসায়।

দ্বিতীয়া। আমাদের তো পথে ভাসাবার শক্তি নেই, পথ ছেড়ে দিয়ে যাওয়াই ভালো। ধরা যে দেবে না তার কাছে ধরা দিয়ে লাভ কী।

ঠাকুরদা। তার কাছে ধরা দিলে ধরা-দেওয়াও যা, ছাড়া-পাওয়াও তা।

যে জন দেয় না দেখা যায় যে দেখে,
ভালোবাসে আড়াল থেকে,
আমার মন মজেছে সেই গভীরের
গোপন ভালোবাসায়॥ [স্ত্রীলোকদের প্রস্থান

নাচের দলের প্রবেশ

ঠাকুরদা। ও ভাই, রাত তো অর্ধেকের বেশি পার হয়ে এল কিন্তু মনের মাতন এখনও যে থামতে চাইছে না—তোরা তো বাড়ি চলেছিস তোদের শেষ নাচটা নাচিয়ে দিয়ে যা।

গান

আমার ঘুর লেগেছে— তাধিন তাধিন
তোমার পিছন পিছন নেচে নেচে
ঘুর লেগেছে তাধিন তাধিন।
তোমার তালে আমার চরণ চলে
শুনতে না পাই কে কী বলে
তাধিন তাধিন—
তোমার গানে আমার প্রাণে যে কোন্
পাগল ছিল সেই জেগেছে
তাধিন তাধিন।
আমার লাজের বাঁধন সাজের বাঁধন
খসে গেল ভজন সাধন,
তাধিন তাধিন—

বিষম নাচের বেগে দোলা লেগে
ভাবনা যত সব ভেগেছে
তাধিন তাধিন।

[নাচের দলের প্রস্থান

সুরঙ্গমার প্রবেশ

সুরঙ্গমা। এতক্ষণ কী করছিলে ঠাকুরদা ?

ঠাকুরদা। দ্বারের কাজে ছিলুম।

সুরঙ্গমা। সে কাজ তো শেষ হল। একটি মানুষও নেই—সবাই চলে গেছে।

ঠাকুরদা। এবার তবে ভিতরে চলি।

সুরঙ্গমা। কোন্‌খানে বাঁশি বাজছে এবার বাতাসে কান দিলে বোঝা যাবে।

ঠাকুরদা। সবাই যখন নিজের তালপাতার ভেঁপু বাজাচ্ছিল তখন বিষম গোল।

সুরঙ্গমা। উৎসবে ভেঁপুর ব্যবস্থা তিনিই করে রেখেছেন।

ঠাকুরদা। তাঁর বাঁশি কারও বাজনা ছাপিয়ে ওঠে না, তা না হলে লজ্জায় আর সকলের তান বন্ধ হয়ে যেত।

সুরঙ্গমা। দেখো ঠাকুরদা, আজ এই উৎসবের ভিতরে ভিতরে কেবলই আমার মনে হচ্ছে রাজা আমাকে এবার দুঃখ দেবেন।

ঠাকুরদা। দুঃখ দেবেন!

সুরঙ্গমা। হাঁ ঠাকুরদা। এবার আমাকে দূরে পাঠিয়ে দেবেন, অনেক দিন কাছে আছি সে তাঁর সইছে না।

ঠাকুরদা। এবার তবে কাঁটাবনের পার থেকে তোমাকে দিয়ে পারিজাত তুলিয়ে আনাবেন। সেই দুর্গমের খবরটা আমরা যেন পাই ভাই।

সুরঙ্গমা। তোমার নাকি কোনো খবর পেতে বাকি আছে? রাজার কাজে কোন্ পথটাতেই বা তুমি না চলেছ? হঠাৎ নতুন হুকুম এলে আমাদেরই পথ খুঁজে বেড়াতে হয়।

গান

পুষ্প ফুটে কোন্ কুঞ্জবনে
কোন্ নিভৃতে রে কোন্ গহনে।
মাতিল আকুল দক্ষিণ বায়ু
সৌরভ-চঞ্চল সঞ্চরণে
কোন্ নিভৃতে রে কোন্ গহনে॥

কাটিল ক্লান্ত বসন্ত-নিশা
বাহির-অঙ্গন-সঙ্গী সনে।
উৎসবরাজ কোথায় বিরাজে
কে লয়ে যাবে সে ভবনে—
কোন্ নিভৃতে রে কোন্ গহনে॥ [সুরঙ্গমার প্রস্থান

রাজবেশী ও কাঞ্চীরাজের প্রবেশ

কাঞ্চী। তোমাকে যেমন পরামর্শ দিয়েছি ঠিক সেইরকম ক'রো। ভুল না হয়।

রাজবেশী। ভুল হবে না।

কাঞ্চী। করভোদ্যানের মধ্যেই রানীর প্রাসাদ।

রাজবেশী। হাঁ মহারাজ, সে আমি দেখে নিয়েছি।

কাঞ্চী। সেই উদ্যানে আগুন লাগিয়ে দেবে—তার পরে অগ্নিদাহের গোলমালের মধ্যে কার্যসিদ্ধি করতে হবে।

রাজবেশী। কিছু অন্যথা হবে না।

কাঞ্চী। দেখো হে ভণ্ডরাজ, আমার কেবলই মনে হচ্ছে আমরা মিথ্যে ভয়ে ভয়ে চলছি, এ-দেশে রাজা নেই।

রাজবেশী। সেই অরাজকতা দূর করবার জন্যেই তো আমার চেষ্টা। সাধারণ লোকের জন্যে সত্য হ'ক মিথ্যে হ'ক একটা রাজা চাই-ই, নইলে অনিষ্ট ঘটে।

কাঞ্চী। হে সাধু, লোকহিতের জন্যে তোমার এই আশ্চর্য ত্যাগস্বীকার আমাদের সকলেরই পক্ষে একটা দৃষ্টান্ত। ভাবছি যে এই হিতকার্যটা নিজেই করব। (সহসা ঠাকুরদাকে দেখিয়া) কে হে কে তুমি? কোথায় লুকিয়ে ছিলে?

ঠাকুরদা। লুকিয়ে থাকি নি। অত্যন্ত ক্ষুদ্র বলে আপনাদের চোখে পড়ি নি।

রাজবেশী। ইনি এ-দেশের রাজাকে নিজের বন্ধু বলে পরিচয় দেন, নির্বোধেরা বিশ্বাস করে।

ঠাকুরদা। বুদ্ধিমানদের কিছুতেই সন্দেহ ঘোচে না, তাই নির্বোধ নিয়েই আমাদের কারবার।

কাঞ্চী। তুমি আমাদের সব কথা শুনেছ?

ঠাকুরদা। আপনারা আগুন লাগাবার পরামর্শ করছিলেন।

কাঞ্চী। তুমি আমাদের বন্দী, চলো শিবিরে।

ঠাকুরদা। আজ তবে বুঝি এমনি করেই তলব পড়ল?

কাঞ্চী। বিড় বিড় করে বকছ কী ?

ঠাকুরদা। আমি বলছি, দেশের টান কাটিয়ে কিছুতেই নড়তে পারছিলেম না, তাই বুঝি ভিতর-মহলে টেনে নিয়ে যাবার জন্যে মনিবের পেয়াদা এল।

কাঞ্চী। লোকটা পাগল না কি ?

রাজবেশী। ওর কথা ভারি এলোমেলো—বোঝাই যায় না।

কাঞ্চী। কথা যত কম বোঝা যায় অবুঝরা ততই ভক্তি করে। কিন্তু আমাদের কাছে যে ফন্দি খাটবে না। আমরা স্পষ্ট কথার কারবারি।

ঠাকুরদা। যে আজ্ঞে মহারাজ, চুপ করলুম।

৬

করভোদ্যান

রোহিণী। ব্যাপারখানা কী। কিছু তো বুঝতে পারছি নে। (মালীদের প্রতি) তোরা সব তাড়াতাড়ি কোথায় চলেছিস ?

প্রথম মালী। আমরা বাইরে যাচ্ছি।

রোহিণী। বাইরে কোথায় যাচ্ছিস ?

দ্বিতীয় মালী। তা জানি নে, আমাদের রাজা ডেকেছে।

রোহিণী। রাজা তো বাগানেই আছে। কোন্ রাজা ?

প্রথম মালী। বলতে পারি নে।

দ্বিতীয় মালী। চিরদিন যে-রাজার কাজ করছি সেই রাজা।

রোহিণী। তোরা সবাই চলে যাবি ?

প্রথম মালী। হাঁ সবাই যাব, এখনই যেতে হবে। নইলে বিপদে পড়ব। [প্রস্থান

রোহিণী। এরা কী বলে বুঝতে পারি নে—ভয় করছে। যে নদীর পাড়ি ভেঙে পড়বে সেই পাড়ি ছেড়ে যেমন জন্তুরা পালায় এই বাগান ছেড়ে তেমনি সবাই পালিয়ে যাচ্ছে।

কোশলরাজের প্রবেশ

কোশল। রোহিণী, তোমাদের রাজা এবং কাঞ্চীরাজ কোথায় গেল জান ?

রোহিণী। তাঁরা এই বাগানেই আছেন কিন্তু কোথায় কিছুই জানি নে।

কোশল। তাদের মন্ত্রণাটা ঠিক বুঝতে পারছি নে। কাঞ্চীরাজকে বিশ্বাস করে ভালো করি নি। [প্রস্থান

রোহিণী। রাজাদের মধ্যে কী একটা ব্যাপার চলছে! শীঘ্র একটা দুর্দৈব ঘটবে। আমাকে সুদ্ধ জড়াবে না তো?

অবন্তীরাজ (প্রবেশ করিয়া)। রোহিণী, রাজারা সব কোথায় গেল জান?

রোহিণী। তাঁরা কে কোথায় তার ঠিকানা করা শক্ত। এইমাত্র কোশলরাজ এখানে ছিলেন।

অবন্তী। কোশলরাজের জন্যে ভাবনা নেই। তোমাদের রাজা এবং কাঞ্চীরাজ কোথায়?

রোহিণী। অনেকক্ষণ তাঁদের দেখি নি।

অবন্তী। কাঞ্চীরাজ কেবলই আমাদের এড়িয়ে এড়িয়ে বেড়াচ্ছে। নিশ্চয় ফাঁকি দেবে। এর মধ্যে থেকে ভালো করি নি। সখী, এ বাগান থেকে বেরোবার পথটা কোথায় জান?

রোহিণী। আমি তো জানি নে।

অবন্তী। দেখিয়ে দিতে পারে এমন কোনো লোক নেই?

রোহিণী। মালীরা সব বাগান ছেড়ে গেছে।

অবন্তী। কেন গেল?

রোহিণী। তাদের কথা ভালো বুঝতে পারলুম না। তারা বললে রাজা তাদের শীঘ্র বাগান ছেড়ে যেতে বলেছেন।

অবন্তী। রাজা! কোন্ রাজা!

রোহিণী। তারা স্পষ্ট করে বলতে পারলে না।

অবন্তী। এ তো ভালো কথা নয়। যেমন করেই হ'ক এখান থেকে বেরোবার পথ খুঁজে বের করতেই হবে। আর এক মুহূর্ত এখানে নয়। [দ্রুত প্রস্থান

রোহিণী। চিরদিন তো এই বাগানেই আছি কিন্তু আজ মনে হচ্ছে যেন বাঁধা পড়ে গেছি, বেরিয়ে পড়তে না পারলে নিষ্কৃতি নেই। রাজাকে দেখতে পেলে যে বাঁচি। পরশু যখন তাঁকে রানীর ফুল দিলুম তখন তিনি তো একরকম আত্মবিস্মৃত ছিলেন—তার পর থেকে তিনি আমাকে কেবলই পুরস্কার দিচ্ছেন। এই অকারণ পুরস্কারে আমার ভয় আরও বাড়ছে। এত রাতে পাখিরা সব কোথায় উড়ে চলেছে? এরা হঠাৎ এমন ভয় পেল কেন? এখন তো এদের ওড়বার সময় নয়। রানীর পোষা হরিণী ওদিকে দৌড়ল কোথায়? চপলা, চপলা। আমার ডাক শুনলই না। এমন তো কখনোই হয়

না। চারদিকের দিগন্ত মাতালের চোখের মত হঠাৎ লাল হয়ে উঠেছে। যেন চারদিকেই অকালে সূর্যাস্ত হচ্ছে। বিধাতার এ কী উন্মত্ততা আজ। ভয় হচ্ছে। রাজার দেখা কোথায় পাই।

৭

রানীর প্রাসাদদ্বার

রাজবেশী। এ কী কাণ্ড করেছ কাঞ্চীরাজ?

কাঞ্চী। আমি কেবল এই প্রাসাদের কাছটাতেই আগুন ধরাতে চেয়েছিলুম, সে আগুন যে এত শীঘ্র এমন চারদিকে ধরে উঠবে সে তো আমি মনেও করি নি। এ বাগান থেকে বেরোবার পথ কোথায় শীঘ্র বলে দাও।

রাজবেশী। পথ কোথায় আমি তো কিছুই জানি নে। যারা আমাদের এখানে এনেছিল তাদের একজনকেও দেখছি নে।

কাঞ্চী। তুমি তো এ-দেশের লোক—পথ নিশ্চয় জান।

রাজবেশী। অন্তঃপুরের বাগানে কোনোদিনই প্রবেশ করি নি।

কাঞ্চী। সে আমি বুঝি নে, তোমাকে পথ বলতেই হবে, নইলে তোমাকে দু-টুকরো করে কেটে ফেলব।

রাজবেশী। তাতে প্রাণ বেরোবে, পথ বেরোবার কোনো উপায় হবে না।

কাঞ্চী। তবে কেন বলে বেড়াচ্ছিলে তুমিই এখানকার রাজা?

রাজবেশী। আমি রাজা না, রাজা না। (মাটিতে পড়িয়া জোড়করে) কোথায় আমার রাজা, রক্ষা করো। আমি পাপিষ্ঠ, আমাকে রক্ষা করো। আমি বিদ্রোহী, আমাকে দণ্ড দাও, কিন্তু রক্ষা করো।

কাঞ্চী। অমন শূন্যতার কাছে চীৎকার করে লাভ কী। ততক্ষণ পথ বের করবার চেষ্টা করা যাক।

রাজবেশী। আমি এইখানেই পড়ে রইলুম—আমার যা হবার তাই হবে।

কাঞ্চী। সে হবে না। পুড়ে মরি তো একলা মরব না—তোমাকে সঙ্গী নেব।

নেপথ্য হইতে। রক্ষা করো রাজা রক্ষা করো। চারদিকে আগুন।

কাঞ্চী। মূঢ় ওঠ্, আর দেরি না।

সুদর্শনা (প্রবেশ করিয়া)। রাজা, রক্ষা করো। আগুনে ঘিরেছে।

রাজবেশী। কোথায় রাজা? আমি রাজা নই।

সুদর্শনা। তুমি রাজা নও?

রাজবেশী। আমি ভণ্ড, আমি পাষণ্ড। (মুকুট মাটিতে ফেলিয়া) আমার ছলনা ধূলিসাৎ হ'ক। [কাঞ্চীরাজের সহিত প্রস্থান

সুদর্শনা। রাজা নয়? এ রাজা নয়? তবে ভগবান হুতাশন, দগ্ধ করো আমাকে; আমি তোমারই হাতে আত্মসমর্পণ করব—হে পাবন, আমার লজ্জা, আমার বাসনা, পুড়িয়ে ছাই করে ফেলো।

রোহিণী (প্রবেশ করিয়া)। রানী, ওদিকে কোথায় যাও। তোমার অন্তঃপুরের চারদিকে আগুন ধরে গেছে, ওর মধ্যে প্রবেশ ক'রো না।

সুদর্শনা। আমি তারই মধ্যে প্রবেশ করব। এ আমারই মরবারই আগুন।

[প্রাসাদে প্রবেশ

৮

অন্ধকার কক্ষ

রাজা। ভয় নেই তোমার ভয় নেই। আগুন এ-ঘরে এসে পৌঁছোবে না।

সুদর্শনা। ভয় আমার নেই—কিন্তু লজ্জা! লজ্জা যে আগুনের মতো আমার সঙ্গে সঙ্গে এসেছে। আমার মুখ-চোখ আমার সমস্ত হৃদয়টাকে রাঙা করে রেখেছে।

রাজা। এ দাহ মিটতে সময় লাগবে।

সুদর্শনা। কোনোদিন মিটবে না, কোনোদিন মিটবে না।

রাজা। হতাশ হ'য়ো না রানী।

সুদর্শনা। তোমার কাছে মিথ্যা বলব না রাজা—আমি আর-এক জনের মালা গলায় পরেছি।

রাজা। ও মালাও যে আমার, নইলে সে পাবে কোথা থেকে? সে আমার ঘর থেকে চুরি করে এনেছে।

সুদর্শনা। কিন্তু এ যে তারই হাতের দেওয়া। তবু তো ত্যাগ করতে পারলুম না। যখন চারদিকে আগুন আমার কাছে এগিয়ে এল তখন একবার মনে করলুম এই মালাটা আগুনে ফেলে দিই। কিন্তু পারলুম না। আমার পাপিষ্ঠ মন বললে,

ওই হার গলায় নিয়ে পুড়ে মরব। আমি তোমাকে বাইরে দেখব বলে পতঙ্গের মতো এ কোন্ আগুনে ঝাঁপ দিলুম। আমিও মরি নে, আগুনও নেবে না, এ কী জ্বালা।

রাজা। তোমার সাধ তো মিটেছে, আমাকে তো আজ দেখে নিলে।

সুদর্শনা। আমি কি তোমাকে এমন সর্বনাশের মধ্যে দেখতে চেয়েছিলুম? কী দেখলুম জানি নে, কিন্তু বুকের মধ্যে এখনও কাঁপছে।

রাজা। কেমন দেখলে রানী?

সুদর্শনা। ভয়ানক, সে ভয়ানক। সে আমার স্মরণ করতেও ভয় হয়। কালো, কালো, তুমি কালো। আমি কেবল মুহূর্তের জন্যে চেয়েছিলুম। তোমার মুখের উপর আগুনের আভা লেগেছিল—আমার মনে হল ধূমকেতু যে-আকাশে উঠেছে সেই আকাশের মতো তুমি কালো—তখনই চোখ বুজে ফেললুম, আর চাইতে পারলুম না। ঝড়ের মেঘের মতো কালো—কূলশূন্য সমুদ্রের মতো কালো, তারই তুফানের উপরে সন্ধ্যার রক্তিমা।

রাজা। আমি তো তোমাকে পূর্বেই বলেছি যে-লোক আগে থাকতে প্রস্তুত না হয়েছে সে যখন আমাকে হঠাৎ দেখে সইতে পারে না—আমাকে বিপদ বলে মনে করে আমার কাছ থেকে ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাতে চায়। এমন কতবার দেখেছি। সেইজন্যে সেই দুঃখ থেকে বাঁচিয়ে ক্রমে ক্রমে তোমার কাছে পরিচয় দিতে চেয়েছিলুম।

সুদর্শনা। কিন্তু পাপ এসে সমস্ত ভেঙে দিলে—এখন আর যে তোমার সঙ্গে তেমন করে পরিচয় হতে পারবে তা মনে করতেও পারি নে।

রাজা। হবে রানী হবে। যে-কালো দেখে আজ তোমার বুক কেঁপে গেছে সেই কালোতেই একদিন তোমার হৃদয় স্নিগ্ধ হয়ে যাবে। নইলে আমার ভালোবাসা কিসের?

গান

আমি রূপে তোমায় ভোলাব না
ভালোবাসায় ভোলাব।
আমি হাত দিয়ে দ্বার খুলব না গো
গান দিয়ে দ্বার খোলাব।
ভরাব না ভূষণ-ভারে
সাজাব না ফুলের হারে
সোহাগ আমার মালা করে
গলায় তোমার পরাব।

জানবে না কেউ কোন্‌ তুফানে
তরঙ্গদল নাচবে প্রাণে,
চাঁদের মত অলখ টানে
জোয়ারে ঢেউ তোলাব ॥

সুদর্শনা। হবে না, হবে না, শুধু তোমার ভালোবাসায় কী হবে। আমার ভালোবাসা যে মুখ ফিরিয়েছে। রূপের নেশা আমাকে লেগেছে—সে নেশা আমাকে ছাড়বে না, সে যেন আমার দুই চক্ষে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে, আমার স্বপনসুদ্ধ ঝলমল করছে। এই আমি তোমাকে সব কথা বললুম এখন আমাকে শাস্তি দাও।

রাজা। শাস্তি শুরু হয়েছে।

সুদর্শনা। কিন্তু তুমি যদি আমাকে ত্যাগ না কর আমি তোমাকে ত্যাগ করব।

রাজা। যতদূর সাধ্য চেষ্টা করে দেখো।

সুদর্শনা। কিছু চেষ্টা করতে হবে না—তোমাকে আমি সইতে পারছি নে। ভিতরে ভিতরে তোমার উপর রাগ হচ্ছে। কেন তুমি আমাকে—জানি নে আমাকে তুমি কী করেছ। কিন্তু কেন তুমি এমনতরো? কেন আমাকে লোকে বলেছিল তুমি সুন্দর? তুমি যে কালো, কালো, তোমাকে আমার কখনো ভালো লাগবে না। আমি যা ভালোবাসি তা আমি দেখেছি—তা ননির মতো কোমল, শিরীষ ফুলের মতো সুকুমার, তা প্রজাপতির মতো সুন্দর।

রাজা। তা মরীচিকার মতো মিথ্যা এবং বুদ্‌বুদের মতো শূন্য।

সুদর্শনা। তা হ'ক কিন্তু আমি পারছি নে, তোমার কাছে দাঁড়াতে পারছি নে! আমাকে এখান থেকে যেতেই হবে। তোমার সঙ্গে মিলন সে আমার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। সে-মিলন মিথ্যা হবে, আমার মন অন্যদিকে যাবে।

রাজা। একটুও চেষ্টা করবে না?

সুদর্শনা। কাল থেকে চেষ্টা করছি—কিন্তু যতই চেষ্টা করছি ততই মন আরও বিদ্রোহী হয়ে দাঁড়াচ্ছে। আমি অশুচি, আমি অসতী, তোমার কাছে থাকলে এই ঘৃণা কেবলই আমাকে আঘাত করবে। তাই আমার ইচ্ছে করছে দূরে চলে যাই—এত দূরে যাই যেখানে তোমাকে আমার আর মনে আনতে হবে না।

রাজা। আচ্ছা তুমি যতদূরে পার ততদূরেই চলে যাও।

সুদর্শনা। তুমি হাত দিয়ে পথ আটকাও না বলেই তোমার কাছ থেকে পালাতে মনে এত দ্বিধা হয়। তুমি কেশের গুচ্ছ ধরে জোর করে আমাকে টেনে রেখে দাও না

কেন ? তুমি আমাকে মার না কেন ? মারো, মারো, আমাকে মারো। তুমি আমাকে কিছু বলছ না সেইজন্যেই আরও অসহ্য বোধ হচ্ছে।

রাজা। কিছু বলছি নে কে তোমাকে বললে ?

সুদর্শনা। অমন করে নয়, অমন করে নয়, চীৎকার করে বলো, বজ্রগর্জনে বলো— আমার কান থেকে অন্য সকল কথা ডুবিয়ে দিয়ে বলো—আমাকে এত সহজে ছেড়ে দিয়ো না, যেতে দিয়ো না।

রাজা। ছেড়ে দেব কিন্তু যেতে দেব কেন ?

সুদর্শনা। যেতে দেবে না ? আমি যাবই।

রাজা। আচ্ছা যাও।

সুদর্শনা। দেখো তাহলে আমার দোষ নেই। তুমি আমাকে জোর করে ধরে রাখতে পারতে কিন্তু রাখলে না। আমাকে বাঁধলে না—আমি চললুম। তোমার প্রহরীদের হুকুম দাও আমাকে ঠেকাক।

রাজা। কেউ ঠেকাবে না। ঝড়ের মুখে ছিন্ন মেঘ যেমন অবাধে চলে তেমনি তুমি অবাধে চলে যাও।

সুদর্শনা। ক্রমেই বেগ বেড়ে উঠছে—এবার নোঙর ছিঁড়ল। হয়তো ডুবব কিন্তু আর ফিরব না। [দ্রুত প্রস্থান

সুরঙ্গমার প্রবেশ ও গান

ভয়েরে মোর আঘাত করো
ভীষণ, হে ভীষণ !
কঠিন করে চরণ 'পরে
প্রণত করো মন।
বেঁধেছ মোরে নিত্যকাজে
প্রাচীরে ঘেরা ঘরের মাঝে
নিত্য মোরে বেঁধেছে সাজে
সাজের আভরণ।
এস হে, ওহে আকস্মিক
ঘিরিয়া ফেলো সকল দিক
মুক্ত পথে উড়ায়ে নিক
নিমেষে এ জীবন।

তাহার পরে প্রকাশ হ'ক
উদার তব সহাস চোখ
তব অভয় শান্তিময়
স্বরূপ পুরাতন ॥

সুদর্শনা (পুনঃপ্রবেশ করিয়া)। রাজা, রাজা।

সুরঙ্গমা। তিনি চলে গেছেন।

সুদর্শনা। চলে গেছেন? আচ্ছা বেশ, তাহলে তিনি আমাকে একেবারে ছেড়েই দিলেন। আমি ফিরে এলুম কিন্তু তিনি অপেক্ষা করলেন না। আচ্ছা ভালোই হল—তাহলে আমি মুক্ত। সুরঙ্গমা আমাকে ধরে রাখবার জন্যে তিনি কি তোকে বলেছেন?

সুরঙ্গমা। না, তিনি কিছুই বলেন নি।

সুদর্শনা। কেনই বা বলবেন? বলবার তো কথা নয়। তাহলে আমি মুক্ত। আচ্ছা সুরঙ্গমা, একটা কথা রাজাকে জিজ্ঞাসা করব মনে করেছিলুম কিন্তু মুখে বেধে গেল। বল দেখি বন্দীদের তিনি কি প্রাণদণ্ড দিয়েছেন?

সুরঙ্গমা। প্রাণদণ্ড? আমার রাজা তো কোনোদিন বিনাশ করে শাস্তি দেন না।

সুদর্শনা। তাহলে ওদের কী হল?

সুরঙ্গমা। ওদের তিনি ছেড়ে দিয়েছেন। কাঞ্চীরাজ পরাভব স্বীকার করে দেশে ফিরে গেছেন।

সুদর্শনা। শুনে বাঁচলুম।

সুরঙ্গমা। রানীমা তোমার কাছে আমার একটি প্রার্থনা আছে।

সুদর্শনা। প্রার্থনা কি মুখে জানাতে হবে মনে করেছিস? রাজার কাছ থেকে এ-পর্যন্ত আমি যত আভরণ পেয়েছি সব তোকেই দিয়ে যাব—এ অলংকার আমাকে আর শোভা পায় না।

সুরঙ্গমা। মা, আমি যাঁর দাসী তিনি আমাকে নিরাভরণ করেই সাজিয়েছেন। সেই আমার অলংকার। লোকের কাছে গর্ব করতে পারি এমন কিছুই তিনি আমাকে দেন নি।

সুদর্শনা। তবে তুই কী চাস?

সুরঙ্গমা। আমি তোমার সঙ্গে যাব।

সুদর্শনা। কী বলিস তুই? তোর প্রভুকে ছেড়ে দূরে যাবি, এ কী রকম প্রার্থনা?

সুরঙ্গমা। দূরে নয় মা, তুমি যখন বিপদের মুখে চলেছ তিনি কাছেই থাকবেন।

সুদর্শনা। পাগলের মতো বকিস নে। আমি রোহিণীকে সঙ্গে নিতে চেয়েছিলুম সে গেল না। তুই কোন্ সাহসে যেতে চাস?

সুরঙ্গমা। সাহস আমার নেই, শক্তিও আমার নেই। কিন্তু আমি যাব—সাহস আপনি আসবে, শক্তিও হবে।

সুদর্শনা। না, তোকে আমি নিতে পারব না—তোর কাছে থাকলে আমার বড়ো গ্লানি হবে—সে আমি সইতে পারব না।

সুরঙ্গমা। মা, তোমার সমস্ত ভালোমন্দ আমি নিজের গায়ে মেখে নিয়েছি—আমাকে পর করে রাখতে পারবে না—আমি যাবই।

গান

আমি তোমার প্রেমে হব সবার
কলঙ্কভাগী।
আমি সকল দাগে হব দাগি।
তোমার পথের কাঁটা করব চয়ন ;
যেথা তোমার ধুলার শয়ন
সেথা আঁচল পাতব আমার
তোমার রাগে অনুরাগী।
আমি শুচি আসন টেনে টেনে
বেড়াব না বিধান মেনে,
যে পঙ্কে ঐ চরণ পড়ে
তাহারি ছাপ বক্ষে মাগি॥

৯

সুদর্শনার পিতা কান্যকুব্জরাজ ও মন্ত্রী

কান্যকুব্জ। সে আসবার পূর্বেই আমি সমস্ত খবর পেয়েছি।

মন্ত্রী। রাজকন্যা নগরের বাহিরে নদীকূলে দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁকে অভ্যর্থনা করে আনবার জন্যে লোকজন পাঠিয়ে দিই ?

কান্যকুব্জ। হতভাগিনী স্বামীকে ত্যাগ করে আসছে, অভ্যর্থনা করে তার সেই লজ্জা ঘোষণা করে দেবে ? অন্ধকার হ'ক, রাস্তায় যখন লোক থাকবে না তখন সে গোপনে আসবে।

মন্ত্রী। প্রাসাদে তাঁর বাসের ব্যবস্থা করে দিই ?

কান্যকুব্জ। কিছু করতে হবে না। ইচ্ছা করে সে আপনার একেশ্বরী রানীর পদ ত্যাগ করে এসেছে—এখানে রাজগৃহে তাকে দাসীর কাজে নিযুক্ত থাকতে হবে।

মন্ত্রী। মনে বড়ো কষ্ট পাবেন।

কান্যকুব্জ। যদি তাকে কষ্ট থেকে বাঁচাতে চেষ্টা করি তাহলে পিতা নামের যোগ্য নই।

মন্ত্রী। যেমন আদেশ করেন তাই হবে।

কান্যকুব্জ। সে যে আমার কন্যা এ-কথা যেন প্রকাশ না হয়—তাহলে বিষম অনর্থপাত ঘটবে।

মন্ত্রী। অনর্থের আশঙ্কা কেন করেন মহারাজ?

কান্যকুব্জ। নারী যখন আপন প্রতিষ্ঠা থেকে ভ্রষ্ট হয় তখন সংসারে সে ভয়ংকর বিপদ হয়ে দেখা দেয়। তুমি জান না আমার এই কন্যাকে আমি আজ কী রকম ভয় করছি—সে আমার ঘরের মধ্যে শনিকে সঙ্গে করে নিয়ে আসছে।

১০

অন্তঃপুর

সুদর্শনা। যা যা সুরঙ্গমা, তুই যা! আমার মধ্যে একটা রাগের আগুন জ্বলছে—আমি কাউকে সহ্য করতে পারছি নে—তুই অমন শান্ত হয়ে থাকিস ওতে আমার আরও রাগ হয়।

সুরঙ্গমা। কার উপর রাগ করছ মা?

সুদর্শনা। সে আমি জানি নে—কিন্তু আমার ইচ্ছে করছে সমস্ত ছারখার হয়ে যাক! অতবড়ো রানীর পদ একমুহূর্তে বিসর্জন দিয়ে এলুম সে কি এমনি কোণে লুকিয়ে ঘর ঝাঁট দেবার জন্যে? মশাল জ্বলে উঠবে না? ধরণী কেঁপে উঠবে না? আমার পতন কি শিউলি ফুলের খসে পড়া? সে কি নক্ষত্রের পতনের মতো অগ্নিময় হয়ে দিগন্তকে বিদীর্ণ করে দেবে না?

সুরঙ্গমা। দাবানল জ্বলে ওঠবার আগে গুমরে গুমরে ধোঁয়ায়—এখনও সময় যায় নি।

সুদর্শনা। রানীর মহিমা ধূলিসাৎ করে দিয়ে বাইরে চলে এলুম এখানে আর কেউ

নেই যে আমার সঙ্গে মিলবে? একলা—একলা আমি। আমার এতবড়ো ত্যাগ গ্রহণ করে নেবার জন্যে কেউ এক পাও বাড়াবে না?

সুরঙ্গমা। একলা তুমি না—একলা না।

সুদর্শনা। সুরঙ্গমা তোর কাছে সত্যি করে বলছি, আমাকে পাবার জন্যে প্রাসাদে আগুন লাগিয়েছিল এতেও আমি রাগ করতে পারি নি—ভিতরে ভিতরে আনন্দে আমার বুক কেঁপে কেঁপে উঠছিল। এতবড়ো অপরাধ! এতবড়ো সাহস! সেই সাহসেই আমার সাহস জাগিয়ে দিলে, সেই আনন্দেই আমার সমস্ত ফেলে দিয়ে আসতে পারলুম। কিন্তু সে কি কেবল আমার কল্পনা? আজ কোথাও তার চিহ্ন দেখি না কেন?

সুরঙ্গমা। তুমি যার কথা মনে ভাবছ সে তো আগুন লাগায় নি—আগুন লাগিয়েছিল কাঞ্চীরাজ।

সুদর্শনা। ভীরু! ভীরু! অমন মনোমোহন রূপ—তার ভিতরে মানুষ নেই। এমন অপদার্থের জন্যে নিজেকে এতবড়ো বঞ্চনা করেছি? লজ্জা! লজ্জা! কিন্তু সুরঙ্গমা, তোর রাজার কি উচিত ছিল না আমাকে এখনও ফেরাবার জন্যে আসে? (সুরঙ্গমা নিরুত্তর) তুই ভাবছিস ফেরবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছি! কখনো না! রাজা এলেও আমি ফিরতুম না। কিন্তু সে একবার বারণও করলে না। চলে যাবার দ্বার একেবারে খোলা রইল। বাইরের নিরাবরণ রাস্তা রানী বলে আমার জন্যে একটু বেদনা বোধ করলে না? সেও তোর রাজার মতোই কঠিন? দীনতম পথের ভিক্ষুকও তার কাছে যেমন আমিও তেমনি। চুপ করে রইলি যে। বল না তোর রাজার এ কী রকম ব্যবহার।

সুরঙ্গমা। সে তো সবাই জানে—আমার রাজা নিষ্ঠুর, কঠিন, তাকে কি কেউ কোনোদিন টলাতে পারে?

সুদর্শনা। তবে তুই তাকে দিনরাত্রি এমন ডাকিস কেন?

সুরঙ্গমা। সে যেন এইরকম পর্বতের মতোই চিরদিন কঠিন থাকে—আমার কান্নায় আমার ভাবনায় সে যেন টলমল না করে। আমার দুঃখ আমারই থাক সেই কঠিনেরই জয় হ'ক।

সুদর্শনা। সুরঙ্গমা, দেখ্‌ তো ওই মাঠের পারে পূর্বদিগন্তে যেন ধুলো উড়ছে।

সুরঙ্গমা। হাঁ তাই তো দেখছি।

সুদর্শনা। ওই যে, রথের ধ্বজার মতো দেখাচ্ছে না।

সুরঙ্গমা। হাঁ, ধ্বজাই তো বটে।

সুদর্শনা। তবে তো আসছে। তবে তো এল।

সুরঙ্গমা। কে আসছে।

সুদর্শনা। আবার কে? তোর রাজা। থাকতে পারবে কেন। এতদিন চুপ করে আছে এই আশ্চর্য।

সুরঙ্গমা। না, এ আমার রাজা নয়।

সুদর্শনা। না বই কি। তুমি তো সব জান। ভারি কঠিন তোমার রাজা! কিছুতেই টলেন না! দেখি কেমন না টলেন। আমি জানতুম সে ছুটে আসবে। কিন্তু মনে রাখিস সুরঙ্গমা আমি তাকে একদিনের জন্যেও ডাকি নি। আমার কাছে তোমার রাজা কেমন করে হার মানে এবার দেখে নিয়ো। সুরঙ্গমা যা একবার বেরিয়ে গিয়ে দেখে আয় গে। (সুরঙ্গমার প্রস্থান) রাজা এসে আমাকে ডাকলেই বুঝি যাব? কখনো না। আমি যাব না। যাব না।

সুরঙ্গমার প্রবেশ

সুরঙ্গমা। মা, এ আমার রাজা নয়।

সুদর্শনা। নয়? তুই সত্যি বলছিস? এখনও আমাকে নিতে এল না?

সুরঙ্গমা। না, আমার রাজা এমন করে ধুলো উড়িয়ে আসে না। সে কখন আসে কেউ টেরই পায় না।

সুদর্শনা। এ বুঝি তবে—

সুরঙ্গমা। কাঞ্চীরাজের সঙ্গে সেই আসছে।

সুদর্শনা। তার নাম কী জানিস?

সুরঙ্গমা। তার নাম সুবর্ণ।

সুদর্শনা। তবে তো সে আসছে। ভেবেছিলুম আবর্জনার মতো বুঝি বাইরে এসে পড়েছি, কেউ নেবে না—কিন্তু আমার বীর তো আমাকে উদ্ধার করতে আসছে। সুবর্ণকে তুই জানতিস?

সুরঙ্গমা। যখন বাপের বাড়ি ছিলুম তখন সে জুয়োখেলার দলে—

সুদর্শনা। না না, তোর মুখে আমি তার কোনো কথা শুনতে চাই নে। সে আমার বীর, সে আমার পরিত্রাণকর্তা। তার পরিচয় আমি নিজেই পাব। কিন্তু সুরঙ্গমা, তোর রাজা কেমন বল তো। এত হীনতা থেকেও আমাকে উদ্ধার করতে এল না? আমার আর দোষ দিতে পারবি নে। আমি এখানে দিনরাত্রি দাসীগিরি করে তার জন্যে চিরজীবন অপেক্ষা করে থাকতে পারব না। তোর মতো দীনতা করা আমার দ্বারা হবে না! আচ্ছা সত্যি বল, তুই তোর রাজাকে খুব ভালোবাসিস?

সুরঙ্গমার গান

আমি কেবল তোমার দাসী।
কেমন করে আনব মুখে তোমায় ভালোবাসি!
গুণ যদি মোর থাকত তবে
অনেক আদর মিলত ভবে,
বিনামূল্যের কেনা আমি শ্রীচরণপ্রয়াসী॥

১১

শিবির

কাঞ্চী। (কান্যকুব্জের দূতের প্রতি) তোমাদের রাজাকে গিয়ে বলো গে আমরা তাঁর আতিথ্য গ্রহণ করিতে আসি নি। রাজ্যে ফিরে যাবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে আছি, কেবল সুদর্শনাকে এখানকার দাসীশালা থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবার জন্যেই অপেক্ষা।

দূত। মহারাজ স্মরণ রাখবেন রাজকন্যা তাঁর পিতৃগৃহে আছেন।

কাঞ্চী। কন্যা যতদিন কুমারী থাকে ততদিনই পিতৃগৃহে তার আশ্রয়।

দূত। কিন্তু পতিকুলের সঙ্গেও তাঁর সম্বন্ধ আছে।

কাঞ্চী। সে-সম্বন্ধ তিনি ত্যাগ করেই এসেছেন।

দূত। জীবন থাকতে সে-সম্বন্ধ ত্যাগ করা যায় না—মাঝে মাঝে বিচ্ছেদ ঘটে কিন্তু অবসান ঘটতেই পারে না।

কাঞ্চী। সেজন্য কোনো সংকোচ বোধ করতে হবে না, কারণ তাঁর স্বামীই স্বয়ং তাঁকে ফিরিয়ে নিতে এসেছেন। রাজন্।

সুবর্ণ। কী মহারাজ।

কাঞ্চী। তোমার মহিষীকে কি পিতৃগৃহে দাসীত্বে নিযুক্ত রেখে তুমি স্থির থাকবে?

সুবর্ণ। এমন কাপুরুষ আমি না।

দূত। এ যদি আপনাদের পরিহাস-বাক্য না হয় তাহলে রাজভবনে আতিথ্য নিতে দ্বিধা কিসের?

কাঞ্চী। রাজন্।

সুবর্ণ। কী মহারাজ।

কাঞ্চী। তুমি কি তোমার মহিষীকে ভিক্ষা করে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে?

সুবর্ণ। এ-ও কি কখনো হয়?

দূত। তবে কী ইচ্ছা করেন?

কাঞ্চী। সে-ও কি বলতে হবে?

সুবর্ণ। তা তো বটেই। সে তো বুঝতেই পারছেন।

কাঞ্চী। মহারাজ যদি সহজে তাঁর কন্যাকে আমাদের হাতে সমর্পণ না করেন ক্ষত্রিয়ধর্ম-অনুসারে বলপূর্বক নিয়ে যাব এই আমার শেষ কথা।

দূত। মহারাজ, আমাদের রাজাকেও ক্ষত্রিয়ধর্ম পালন করতে হবে। তিনি তো কেবল স্পর্ধাবাক্য শুনেই আপনার হাতে কন্যা দিয়ে যেতে পারেন না।

কাঞ্চী। এইরকম উত্তর শোনবার জন্যেই প্রস্তুত হয়ে এসেছি এই কথা রাজাকে জানাও গে। [দূতের প্রস্থান

সুবর্ণ। কাঞ্চীরাজ, দুঃসাহসিকতা হচ্ছে।

কাঞ্চী। তাই যদি না হবে তবে এমন কাজে প্রবৃত্ত হয়ে সুখ কী।

সুবর্ণ। কান্যকুব্জরাজকে ভয় না করলেও চলে—কিন্তু—

কাঞ্চী। কিন্তুকে ভয় করতে আরম্ভ করলে জগতে নিরাপদ জায়গা খুঁজে পাওয়া যায় না।

সুবর্ণ। সত্য বলি, মহারাজ, ওই কিন্তুটি দেখা দেন না কিন্তু ওঁর কাছ থেকে নিরাপদে পালাবার জায়গা জগতে কোথাও নেই।

কাঞ্চী। নিজের মনে ভয় থাকলেই ওই কিন্তুর জোর বেড়ে ওঠে।

সুবর্ণ। ভেবে দেখুন না, বাগানে কী কাণ্ডটা হল। আপনি আটঘাট বেঁধেই তো কাজ করেছিলেন, তার মধ্যেও কোথা দিয়ে কিন্তু এসে ঢুকে পড়ল। তিনিই তো রাজা, তাকে মানব না ভেবেছিলুম, আর না মেনে থাকবার জো রইল না।

কাঞ্চী। ভয়ে মানুষের বুদ্ধি নষ্ট হয়, তখন মানুষ যা-তা মেনে বসে। সেদিন যা ঘটেছিল সেটা অকস্মাৎ ঘটেছিল।

সুবর্ণ। আপনি যাঁকে অকস্মাৎ বলছেন আমি তাঁকেই কিন্তু বললেম—কোনোমতে তাঁকে বাঁচিয়ে চললেই তবে বাঁচন।

সৈনিকের প্রবেশ

সৈনিক। মহারাজ, কোশলরাজ অবন্তীরাজ ও কলিঙ্গের রাজা সসৈন্যে আসছেন সংবাদ পেলুম। [প্রস্থান

কাঞ্চী। যা ভয় করছিলুম তাই হল। সুদর্শনার পলায়নসংবাদ রটে গিয়েছে— এখন সকলে মিলে কাড়াকাড়ি করে সকলকেই ব্যর্থ হতে হবে।

সুবর্ণ। কাজ নেই মহারাজ! এ-সমস্ত ভালো লক্ষণ নয়। আমি নিশ্চয় বলছি আমাদের রাজাই এই গোপন সংবাদটা রটিয়ে দিয়েছেন।

কাঞ্চী। কেন? তাতে তাঁর লাভ কী?

সুবর্ণ। লোভীরা পরস্পর কাটাকাটি ছেঁড়াছিঁড়ি করে মরবে—মাঝের থেকে যার ধন তিনিই নিয়ে যাবেন।

কাঞ্চী। এখন বেশ বুঝছি কেন তোমাদের রাজা দেখা দেন না। ভয়ে তাঁকে সর্বত্রই দেখা যাবে এই তাঁর কৌশল। কিন্তু এখনও আমি বলছি তোমাদের রাজা আগাগোড়াই ফাঁকি।

সুবর্ণ। কিন্তু মহারাজ আমাকে ছেড়ে দিন।

কাঞ্চী। তোমাকে ছাড়তে পারছি নে—তোমাকে এই কাজে আমার বিশেষ প্রয়োজন।

সৈনিকের প্রবেশ

সৈনিক। বিরাট পাঞ্চাল ও বিদর্ভরাজও এসেছেন। তাঁদের শিবির নদীর ওপারে। [প্রস্থান

কাঞ্চী। আরম্ভে আমাদের সকলকে মিলে কাজ করতে হবে। কান্যকুব্জের সঙ্গে যুদ্ধটা আগে হয়ে যাক তার পরে একটা উপায় করা যাবে।

সুবর্ণ। আমাকে ওই উপায়টার মধ্যে যদি না টানেন তাহলে নিশ্চিন্ত হতে পারি—আমি অতি হীনব্যক্তি—আমার দ্বারা—

কাঞ্চী। দেখো হে ভণ্ড, উপায় জিনিসটাই হচ্ছে হীন। সিঁড়ি বল রাস্তা বল পায়ের তলাতেই থাকে। উপায় যদি উচ্চশ্রেণীর হয় তাকে ব্যবহারে লাগাতে অনেক চিন্তার দরকার করে। তোমার মতো লোককে নিয়ে কাজ চালাবার সুবিধে এই যে কোনোপ্রকার ভণ্ডামি করতে হয় না। কিন্তু আমার মন্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করতে গেলেও চুরিকে লোকহিত নাম না দিলে শুনতে খারাপ লাগে।

সুবর্ণ। কিন্তু দেখেছি মন্ত্রীমশায় কথাটার আসল অর্থ টাই বুঝে নেন।

কাঞ্চী। এই ভাষাতত্ত্বটুকু তার জানা না থাকলে তাকে মন্ত্রী না করে গোয়ালঘরের ভার দিতুম। যাই, রাজাগুলোকে একবার বোড়ের মতো চেলে দিয়ে আসি গে— সকলেরই যদি রাজার চাল হয় তাহলে চতুরঙ্গ খেলা চলে না।

১২

অন্তঃপুর

সুদর্শনা। যুদ্ধ এখনও চলছে?

সুরঙ্গমা। হাঁ, এখনও চলছে।

সুদর্শনা। যুদ্ধে যাবার পূর্বে বাবা এসে বললেন, তুই একজনের হাত থেকে ছেড়ে এসে আজ সাতজনকে টেনে আনলি—ইচ্ছে করছে তোকে সাত টুকরো করে ওদের সাত জনের মধ্যে ভাগ করে দিই। সত্যিই যদি তাই করতেন ভালো হত। সুরঙ্গমা।

সুরঙ্গমা। কী মা।

সুদর্শনা। তোর রাজার যদি রক্ষা করবার শক্তি থাকত তাহলে আজ তিনি কি নিশ্চিন্ত হয়ে থাকতে পারতেন?

সুরঙ্গমা। মা, আমাকে কেন বলছ? আমার রাজার হয়ে উত্তর দেবার শক্তি কি আমার আছে? উত্তর যদি দেন তো নিজেই এমনি করে দেবেন যে কারও বুঝতে কিছু বাকি থাকবে না। যদি না দেন তাহলে সকলকেই নির্বাক হয়ে থাকতে হবে। আমি কিছুই বুঝি নে জানি, সেইজন্যে কোনোদিন তাঁর বিচার করি নে।

সুদর্শনা। যুদ্ধে কে কে যোগ দিয়েছে বল্ তো।

সুরঙ্গমা। সাতজন রাজাই যোগ দিয়েছে।

সুদর্শনা। আর কেউ না?

সুরঙ্গমা। সুবর্ণ যুদ্ধের পূর্বেই গোপনে পালাবার চেষ্টা করছিল—কাঞ্চীরাজ তাকে শিবিরে বন্দী করে রেখেছেন।

সুদর্শনা। আমার মৃত্যুই ভালো ছিল। কিন্তু রাজা, রাজা, আমার পিতাকে রক্ষা করবার জন্যে যদি আসতে তাহলে তোমার যশ বাড়ত বই কমত না। আমার অপরাধে তিনি শাস্তি পান কেন?

সুরঙ্গমা। সংসারে আমরা তো কেউ একলা নই মা,—ভালোমন্দ সকলকেই ভাগ করে নিতে হয়—সেইজন্যেই ভয়, নইলে একলার জন্যে ভয় কিসের?

সুদর্শনা। দেখ্ সুরঙ্গমা, আমি যখন থেকে এখানে এসেছি কতবার হঠাৎ মনে হয়েছে আমার জানলার নিচে থেকে যেন বীণা বাজছে।

সুরঙ্গমা। তা হবে, কেউ হয়তো বাজায়।

সুদর্শনা। সেখানটা ঘন বন, অন্ধকার, মাথা বাড়িয়ে কতবার দেখতে চেষ্টা করি, ভালো করে কিছু দেখতে পাই নে।

সুরঙ্গমা। হয়তো কোনো পথিক ছায়ায় বসে বিশ্রাম করে, আর বাজায়।

সুদর্শনা। তা হবে, কিন্তু আমার মনে পড়ে আমার সেই বাতায়নটি। সন্ধ্যার সময় সেজে এসে আমি সেখানে দাঁড়াতুম আর আমাদের সেই দীপ-নেবানো বাসরঘরের অন্ধকার থেকে গানের পর গান তানের পর তান ফোয়ারার মুখের ধারার মতো উচ্ছ্বসিত হয়ে আমার সামনে এসে যেন নানা লীলায় ঝরে ঝরে পড়ত। সেই গানই তো কোন্ অন্ধকারের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে কোন্ অন্ধকারের দিকে আমাকে ডেকে নিয়ে যেত।

সুরঙ্গমা। আহা মা, সে কী অন্ধকার। সেই অন্ধকারের দাসী আমি।

সুদর্শনা। আমার জন্যে সেখান থেকে তুই কেন এলি?

সুরঙ্গমা। আমার রাজা আবার হাতে ধরে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন এই আদরটুকু পাবার জন্যে।

সুদর্শনা। না না তিনি আসবেন না—তিনি আমাদের একেবারে ছেড়ে দিয়েছেন। কেনই বা না ছাড়বেন? অপরাধ তো কম করি নি।

সুরঙ্গমা। যদি ছেড়ে দিতেই পারেন তাহলে তাঁকে আর দরকার নেই। তাহলে তিনি নেই। তাহলে আমার সেই অন্ধকার একেবারে শূন্য—তার মধ্যে থেকে বীণা বাজে নি—কেউ ডাকে নি—সমস্ত বঞ্চনা।

দ্বারীর প্রবেশ

সুদর্শনা। কে তুমি?

দ্বারী। আমি এই প্রাসাদের দ্বারী।

সুদর্শনা। কী খবর শীঘ্র বলো।

দ্বারী। আমাদের মহারাজ বন্দী হয়েছেন।

সুদর্শনা। বন্দী হয়েছেন? মাগো বসুন্ধরা। [মূর্ছা

১৩

বন্দী কান্যকুব্জরাজ, অন্যান্য রাজগণ ও সুবর্ণ

কাঞ্চী। রাজগণ, রণক্ষেত্রের কাজ শেষ হল?

কলিঙ্গ। কই শেষ হল? বীরত্বের পুরস্কারটি গ্রহণ করবার পূর্বেই আর-একবার তো বীরত্বের পরিচয় দিতে হবে।

কাঞ্চী। মহারাজ, এখানে তো আমরা জয়মাল্য নিতে আসি নি, বরমাল্য নিতে এসেছি।

বিদর্ভ। সেই মালা কি জয়লক্ষ্মীর হাত থেকে নিতে হবে না?

কাঞ্চী। না মহারাজ, পুষ্পধনুর অন্তঃপুরেই সে মালা গাঁথা হচ্ছে। রক্তমাখা হাতে সেটা ছিন্ন করতে গেলে ফুল ধুলায় লুটিয়ে পড়বে।

কলিঙ্গ। কিন্তু মহারাজ, পঞ্চশর আমাদের সাতজনের দাবি মেটাবেন কি করে।

কাঞ্চী। তা যদি বলেন, সাতজনের দাবি তো রণচণ্ডীও মেটাতে পারেন না।

কোশল। কাঞ্চীরাজ, তোমার প্রস্তাবটি কি পরিষ্কার করেই বলো।

কাঞ্চী। আমার প্রস্তাব এই, স্বয়ংবরসভায় রাজকন্যা স্বয়ং যাঁর গলায় মালা দেবেন এই বসন্তের সফলতা তিনিই লাভ করবেন।

বিদর্ভ। এ প্রস্তাব উত্তম, আমার এতে সম্মতি আছে।

সকলে। আমাদেরও আছে।

কান্যকুব্জ। রাজগণ, আমাকে বধ করুন, অথবা দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করছি, আপনারা আসুন—আমাকে জীবিত মৃত্যুর হাতে সমর্পণ করবেন না।

কাঞ্চী। আপনার কন্যা পতিকুল ত্যাগ করে এসেছেন। তার অধিক দুঃখ আমরা আপনাকে দিচ্ছি নে। এখন যে-প্রস্তাব করলেম তাতে তিনি সম্মান লাভ করবেন।

কোশল। শুভলগ্নে কালই স্বয়ংবরের দিনস্থির হ'ক।

কাঞ্চী। সেই ভালো।

বিদর্ভ। আমরা আয়োজনে প্রবৃত্ত হই গে।

কাঞ্চী। কলিঙ্গরাজ, বন্দী এখন আপনার আশ্রয়েই রইলেন।

[কাঞ্চী ব্যতীত অন্য রাজগণের প্রস্থান

কাঞ্চী। ওহে ভণ্ডরাজ।

সুবর্ণ। কী আদেশ।

কাঞ্চী। এখন মহারথীরা সরবেন। এবার শিখণ্ডীকে সামনে নিয়ে অগ্রসর হতে হবে।

সুবর্ণ। মহারাজের কথাটা স্পষ্ট বুঝতে পারছি নে।

কাঞ্চী। সেখানে তোমাকে আমার ছত্রধর হয়ে বসতে হবে।

সুবর্ণ। কিংকর প্রস্তুত আছে কিন্তু তাতে মহারাজের উপকারটা কী হবে।

কাঞ্চী। ওহে সুবর্ণ, দেখতে পাচ্ছি তোমার বুদ্ধিটা কম বলেই অহংকারটাও কম। রানী সুদর্শনা তোমাকে কী চক্ষে দেখেছেন সেটা এখনও তোমার ধারণার মধ্যে প্রবেশ

করে নি দেখছি। যাই হ'ক তিনি তো রাজসভায় ছত্রধরের গলায় মালা দিতে পারবেন না অথচ অধিক দূরে যেতেও মন সরবে না অতএব যেমন করেই হ'ক এ মালা আমারই রাজছত্রের ছায়ায় এসে পড়বে।

সুবর্ণ। মহারাজ, আমার সম্বন্ধে এই যে-সব অমূলক কল্পনা করছেন এ অতি ভয়ানক কল্পনা—দোহাই আপনার, আমাকে এই মিথ্যা বিপত্তিজালের মধ্যে জড়াবেন না—আমাকে মুক্তি দিন।

কাঞ্চী। কাজটি শেষ হয়ে গেলেই তোমাকে মুক্তি দিতে এক মুহূর্তও বিলম্ব করব না। উদ্দেশ্যসিদ্ধি হয়ে গেলেই উপায়টাকে কেউ আর চিরস্মরণীয় করে রাখে না।

১৪

বাতায়ন

সুদর্শনা ও সুরঙ্গমা

সুদর্শনা। তাহলে স্বয়ংবরসভায় আমাকে যেতেই হবে? নইলে পিতার প্রাণরক্ষা হবে না?

সুরঙ্গমা। কাঞ্চীরাজ তো এইরকম বলেছেন।

সুদর্শনা। এই কি রাজার উচিত কথা? তিনি কি নিজের মুখে বলেছেন?

সুরঙ্গমা। না, তাঁর দূত সুবর্ণ এসে জানিয়ে গেছে।

সুদর্শনা। ধিক, ধিক আমাকে।

সুরঙ্গমা। সেই সঙ্গে কতকগুলি শুকনো ফুল দিয়ে আমাকে বললে, তোমার রানীকে ব'লো বসন্ত-উৎসবের এই স্মৃতিচিহ্ন বাইরে যত মলিন হয়ে আসছে অন্তরে ততই নবীন হয়ে বিকশিত হচ্ছে।

সুদর্শনা। চুপ কর, চুপ কর, আমাকে আর দগ্ধ করিস নে।

সুরঙ্গমা। ওই দেখো, সভায় রাজারা সব বসেছেন। ওই যাঁর গায়ে কোনো আভরণ নেই কেবল মুকুটে একটি ফুলের মালা জড়ানো উনিই হচ্ছেন কাঞ্চীর রাজা। সুবর্ণ তাঁর পিছনে ছাতা ধরে দাঁড়িয়ে আছে।

সুদর্শনা। ওই সুবর্ণ! তুই সত্যি বলছিস।

সুরঙ্গমা। হাঁ মা, আমি সত্যি বলছি।

সুদর্শনা। ওকেই আমি সেদিন দেখেছিলুম? না, না। সে আমি আলোতে অন্ধকারে বাতাসে গন্ধেতে মিলে আর একটা কী দেখেছিলুম, ও নয়, ও নয়।

সুরঙ্গমা। সকলে তো বলে ওকে চোখে দেখতে সুন্দর।

সুদর্শনা। ওই সুন্দরেও মন ভোলে! আমার এ পাপ-চোখকে কী দিয়ে ধুলে এর গ্লানি চলে যাবে?

সুরঙ্গমা। সেই কালোর মধ্যে ডুবিয়ে ধুতে হবে। সেই আমার রাজার সকল-রূপ-ডোবানো রূপের মধ্যে। রূপের কালি যা-কিছু চোখে লেগেছে সব যাবে।

সুদর্শনা। কিন্তু সুরঙ্গমা, এমন ভুলেও মানুষ ভোলে কেন?

সুরঙ্গমা। ভুল ভাঙবে বলে ভোলে।

প্রতিহারী (প্রবেশ করিয়া)। স্বয়ংবরসভায় রাজারা অপেক্ষা করে আছেন।

[প্রস্থান

সুদর্শনা। সুরঙ্গমা, আমার অবগুণ্ঠনের চাদরখানা নিয়ে আয় গে। (সুরঙ্গমার প্রস্থান) রাজা, আমার রাজা। তুমি আমাকে ত্যাগ করেছ উচিত বিচারই করেছ। কিন্তু আমার অন্তরের কথা কি তুমি জানবে না? (বুকের বসনের ভিতর হইতে ছুরিকা বাহির করিয়া) দেহে আমার কলুষ লেগেছে—এ-দেহ আজ আমি সবার সমক্ষে ধুলোয় লুটিয়ে যাব—কিন্তু হৃদয়ের মধ্যে আমার দাগ লাগে নি বুক চিরে সেটা কি তোমাকে আজ জানিয়ে যেতে পারব না? তোমার সেই মিলনের অন্ধকার ঘরটি আমার হৃদয়ের ভিতরে আজ শূন্য হয়ে রয়েছে—সেখানকার দরজা কেউ খোলে নি প্রভু। সে কি খুলতে তুমি আর আসবে না? তবে দ্বারের কাছে তোমার বীণা আর বাজবে না? তবে আসুক মৃত্যু আসুক,—সে তোমার মতোই কালো, তোমার মতোই সুন্দর—তোমার মতোই সে মন হরণ করতে জানে—সে তুমিই সে তুমি।

গান

এ অন্ধকার ডুবাও তোমার অতল অন্ধকারে,
ওহে অন্ধকারের স্বামী।
এস নিবিড়, এস গভীর, এস জীবনপারে
আমার চিত্তে এস নামি।
এ দেহমন মিলায়ে যাক হইয়া যাক হারা
ওহে অন্ধকারের স্বামী।

বাসনা মোর, বিকৃতি মোর, আমার ইচ্ছাধারা
ঐ চরণে যাক থামি।
নির্বাসনে বাঁধা আছি দুর্বাসনার ডোরে
ওহে অন্ধকারের স্বামী।
সব বাঁধনে তোমার সাথে বন্দী করো মোরে
ওহে আমি বাঁধনকামী।
আমার প্রিয়, আমার শ্রেয়, আমার হে পরম,
ওহে অন্ধকারের স্বামী—
সকল ঝরে সকল ভরে আসুক সে চরম
ওগো মরুক না এই আমি॥

১৫

স্বয়ংবরসভা

রাজগণ

বিদর্ভ। ওহে কাঞ্চীরাজ, তোমার অঙ্গে যে কোনো আভরণ রাখ নি।

কাঞ্চী। কোনো আশা নেই বলে। আভরণে যে পরাভবকে দ্বিগুণ লজ্জা দেবে।

কলিঙ্গ। যত আভরণ সমস্তই ছত্রধরের অঙ্গে দেখছি।

বিরাট। এর দ্বারা কাঞ্চীরাজ বাহুশোভার হীনতা প্রচার করতে চান। নিজের দেহে ওঁর পৌরুষের অভিমান অন্য কোনো আভরণ রাখতেই দেয় নি।

কোশল। ওঁর কৌশল জানি, সমস্ত আভরণধারীদের মাঝখানে উনি আভরণ বর্জনের দ্বারাই নিজের মহিমা প্রমাণ করতে চান।

পাঞ্চাল। সেটা কি উনি ভালো করছেন? সকলেই জানে রমণীর চোখ পতঙ্গের মতো—আভরণের দীপ্তিতে সকলের আগে ছুটে এসে পড়ে।

কলিঙ্গ। কিন্তু আর কত বিলম্ব হবে?

কাঞ্চী। অধীর হবেন না কলিঙ্গরাজ, বিলম্বেই ফল মধুর হয়ে দেখা দেয়।

কলিঙ্গ। ফল নিশ্চয় পাব জানলে বিলম্ব সইত। ভোগের আশা অনিশ্চিত, তাই দর্শনের আশায় উৎসুক আছি।

কাঞ্চী। আপনার নবীন যৌবন, এ-বয়সে বারংবার আশাকে ত্যাগ করলেও সে প্রগল্‌ভা নারীর মতো ফিরে ফিরে আসে—আমাদের আর সেদিন নেই।

কলিঙ্গ। কিন্তু শুভলগ্ন যে উত্তীর্ণ হয়ে যায়।

কাঞ্চী। ভয় নেই, শুভগ্রহও দুর্লভ দর্শনের জন্যে অপেক্ষা করবে। যদি নির্বোধ না-ও করে তবে প্রিয়দর্শনে অশুভগ্রহেরও দৃষ্টি প্রসন্ন হয়ে উঠবে।

বিদর্ভ। বিরাটরাজ, আপনি যাত্রা করেছিলেন কবে ?

বিরাট। সুসময় দেখেই বেরিয়েছিলুম, দৈবজ্ঞ বলেছিল যাত্রা সফল হবেই।

পাঞ্চাল। আমরা সকলেই তো শুভযোগ দেখে বেরিয়েছি, কিন্তু কৃপণ বিধাতা তো একটি বই ফল রাখেন নি।

কোশল। এই ফলটি ত্যাগ করানোই হয়তো শুভগ্রহের কাজ।

কাঞ্চী। এ কী উদাসীনের মতো কথা বলছ কোশলরাজ ? ফল ত্যাগ করাবার জন্যে এত আয়োজনের কী দরকার ছিল ?

কোশল। ছিল বই কি। কামনা না করে তো ত্যাগ করা যায় না। কাঞ্চীরাজ, আমাদের আসনগুলো যেন কেঁপে উঠল। এ কি ভূমিকম্প না কি ?

কাঞ্চী। ভূমিকম্প ? তা হবে।

বিদর্ভ। কিংবা হয়তো আর কোনো রাজার সৈন্যদল এসে পড়ল।

কলিঙ্গ। তা হতে পারে কিন্তু তাহলে তো দূতের মুখে সংবাদ পাওয়া যেত।

বিদর্ভ। আমার কাছে এটা কিন্তু দুর্লক্ষণ বলে মনে হচ্ছে।

কাঞ্চী। ভয়ের চক্ষে সব লক্ষণই দুর্লক্ষণ।

বিদর্ভ। অদৃষ্টপুরুষকে ভয় করি, সেখানে বীরত্ব খাটে না।

পাঞ্চাল। বিদর্ভরাজ, আজকেকার শুভকার্যে দ্বিধা জন্মিয়ে দিয়ো না।

কাঞ্চী। অদৃষ্ট যখন দৃষ্ট হবেন তখন তাঁর সঙ্গে বোঝাপড়া করা যাবে।

বিদর্ভ। তখন হয়তো সময় থাকবে না। আমার আশঙ্কা হচ্ছে যেন একটা—

কাঞ্চী। ওই যেন-একটার কথা ভুলবেন না—ওটা আমাদেরই সৃষ্টি অথচ আমাদেরই বিনাশ করে।

কলিঙ্গ। বাইরে বাজনা বাজছে নাকি ?

পাঞ্চাল। বাজনা বলেই বোধ হচ্ছে।

কাঞ্চী। তবে আর কি—নিশ্চয়ই রানী সুদর্শনা। বিধাতা এতক্ষণ পরে আমাদের ভাগ্যফল নিয়ে আসছেন—এ তাঁরই পায়ের শব্দ। (জনান্তিকে) সুবর্ণ

অমনতরো সংকুচিত হয়ে আমার আড়ালে আপনাকে লুকিয়ে রেখো না। তোমার হাতে আমার রাজছত্র কাঁপছে যে।

যোদ্ধবেশে ঠাকুরদার প্রবেশ

কলিঙ্গ। ও কী ও? ও কে?

পাঞ্চাল। বিনা আহ্বানে প্রবেশ করে লোকটা কে হে।

বিরাট। স্পর্ধা তো কম নয়। কলিঙ্গরাজ তুমি একে রোধ করো।

কলিঙ্গ। আপনারা বয়োজ্যেষ্ঠ থাকতে আমার অগ্রসর হওয়া অশোভন হবে।

বিদর্ভ। শোনা যাক না কী বলে।

ঠাকুরদা। রাজা এসেছেন।

বিদর্ভ। (সচকিত হইয়া) রাজা?

পাঞ্চাল। কোন্ রাজা?

কলিঙ্গ। কোথাকার রাজা?

ঠাকুরদা। আমার রাজা।

বিরাট। তোমার রাজা?

কলিঙ্গ। কে?

কোশল। কে সে?

ঠাকুরদা। আপনারা সকলেই জানেন তিনি কে। তিনি এসেছেন।

বিদর্ভ। এসেছেন?

কোশল। কী তাঁর অভিপ্রায়?

ঠাকুরদা। তিনি আপনাদের আহ্বান করেছেন।

কাঞ্চী। ইস। আহ্বান! কী-ভাবে আহ্বান করেছেন?

ঠাকুরদা। তাঁর আহ্বান যিনি যে-ভাবে গ্রহণ করতে ইচ্ছা করেন বাধা নেই—সকল প্রকার অভ্যর্থনাই প্রস্তুত আছে।

বিরাট। তুমি কে?

ঠাকুরদা। আমি তাঁর সেনাপতিদের মধ্যে একজন।

কাঞ্চী। সেনাপতি? মিথ্যে কথা। ভয় দেখাতে এসেছ? তুমি মনে করেছ তোমার ছদ্মবেশ আমার কাছে ধরা পড়ে নি? তোমাকে বিলক্ষণ চিনি—তুমি আবার সেনাপতি?

ঠাকুরদা। আপনি আমাকে ঠিক চিনেছেন। আমার মতো অক্ষম কে আছে?

তবু আমাকেই আজ তিনি সেনাপতির বেশ পরিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন—বড়ো বড়ো বীরদের ঘরে বসিয়ে রেখেছেন।

কাঞ্চী। আচ্ছা, উপযুক্ত সমারোহে আমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাব—কিন্তু উপস্থিত একটা কাজ আছে সেটা শেষ হওয়া পর্যন্ত তাঁকে অপেক্ষা করতে হবে।

ঠাকুরদা। যখন তিনি আহ্বান করেন তখন তিনি আর অপেক্ষা করেন না।

কোশল। আমি তাঁর আহ্বান স্বীকার করছি। এখনই যাব।

বিদর্ভ। কাঞ্চীরাজ, অপেক্ষা করার কথাটা ভালো ঠেকছে না। আমি চললুম।

কলিঙ্গ। আপনি প্রবীণ আমরা আপনারই অনুসরণ করব।

পাঞ্চাল। ওহে কাঞ্চীরাজ, পিছনে চেয়ে দেখো তোমার রাজছত্র ধুলায় লুটোচ্ছে; তোমার ছত্রধর কখন পালিয়েছে জানতেও পার নি।

কাঞ্চী। আচ্ছা আমিও যাচ্ছি, রাজদূত—কিন্তু সভায় নয়, রণক্ষেত্রে।

ঠাকুরদা। রণক্ষেত্রেই আমার প্রভুর সঙ্গে আপনার পরিচয় হবে, সে-ও অতি উত্তম প্রশস্ত স্থান।

বিরাট। ওহে, আমরা সকলে হয়তো কাল্পনিক ভয়ে ভঙ্গ দিচ্ছি—শেষকালে দেখছি একা কাঞ্চীরাজেরই জিত হবে।

পাঞ্চাল। তা হতে পারে। ফলটা প্রায় হাতের কাছে এসেছে এখন ভীরুতা করে সেটা ফেলে যাওয়া ভালো হচ্ছে না।

কলিঙ্গ। কাঞ্চীর সঙ্গে যোগ দেওয়াই শ্রেয়। ও যখন এতটা সাহস করছে তখন ও কি কিছু বিবেচনা না করেই করছে?

১৬

সুদর্শনা ও সুরঙ্গমা

সুদর্শনা। যুদ্ধ তো শেষ হয়ে গেল। এখন আমার রাজা আসবেন কখন?

সুরঙ্গমা। তা তো বলতে পারি নে—পথ চেয়ে বসে আছি।

সুদর্শনা। সুরঙ্গমা, বুকের ভিতরটাতে আনন্দে এমন কাঁপছে যে বেদনা বোধ হচ্ছে। লজ্জাতেও মরে যাচ্ছি—মুখ দেখাব কেমন করে?

সুরঙ্গমা। এবার একেবারে হার মেনে তাঁর কাছে যাও তাহলে আর লজ্জা থাকবে না।

সুদর্শনা। স্বীকার তো করতেই হবে চিরদিনের মতো আমার হার হয়ে গেছে—কিন্তু এতদিন গর্ব করে তাঁর কাছে সকলের চেয়ে বেশি আদরের দাবি করে এসেছি কি না, সেটা একেবারে ছেড়ে দিতে পারছি নে। সবাই যে বলত আমার অনেক রূপ, অনেক গুণ, সবাই যে বলত আমার উপরে রাজার অনুগ্রহের অন্ত নেই—সেইজন্যেই তো সকলের সামনে আমার হৃদয় নত হতে এত লজ্জা বোধ করছে।

সুরঙ্গমা। অভিমান না ঘুচলে তো লজ্জাও ঘুচবে না।

সুদর্শনা। তাঁর কাছ থেকে আদর পাবার ইচ্ছা যে কিছুতে মন থেকে ঘুচতে চায় না।

সুরঙ্গমা। সব ঘুচবে রানীমা। কেবল একটি ইচ্ছা থাকবে, নিজেকে নিবেদন করবার ইচ্ছা।

সুদর্শনা। সেই আঁধার ঘরের ইচ্ছা—দেখা নয়, শোনা নয়, চাওয়া নয়, কেবল গভীরের মধ্যে আপনাকে ছেড়ে দেওয়া! সুরঙ্গমা, সেই আশীর্বাদ কর যেন—

সুরঙ্গমা। কী বল তুমি। আমি আশীর্বাদ করব কিসের?

সুদর্শনা। সকলের কাছে নত হয়ে আমি আশীর্বাদ নেব। সবাই বলত এত প্রসাদ রাজা আর কাউকে দেন নি। তাই শুনে হৃদয় এত শক্ত হয়েছে যে আমার রাজাকেও আঘাত করতে পেরেছি। এত শক্ত হয়েছে যে নুইতে লজ্জা করছে। এ লজ্জা কাটাতে হবে—সমস্ত পৃথিবীর কাছে নিচু হবার দিন আমার এসেছে। কিন্তু, কই রাজা এখনও কেন আমাকে নিতে আসছেন না? আরও কিসের জন্যে তিনি অপেক্ষা করছেন?

সুরঙ্গমা। আমি তো বলেছি আমার রাজা নিষ্ঠুর—বড়ো নিষ্ঠুর।

সুদর্শনা। সুরঙ্গমা তুই যা, একবার তাঁর খবর নিয়ে আয় গে।

সুরঙ্গমা। কোথায় তাঁর খবর নেব তা তো কিছুই জানি নে। ঠাকুরদাকে ডাকতে পাঠিয়েছি—তিনি এলে হয়তো তাঁর কাছ থেকে সংবাদ পাওয়া যাবে।

ঠাকুরদার প্রবেশ

সুদর্শনা। শুনেছি তুমি আমার রাজার বন্ধু—আমার প্রণাম গ্রহণ করো, আমাকে আশীর্বাদ করো।

ঠাকুরদা। কর কী কর কী রানী! আমি কারও প্রণাম গ্রহণ করি নে। আমার সঙ্গে সকলের হাসির সম্বন্ধ।

সুদর্শনা। তোমার সেই হাসি দেখিয়ে দাও—আমাকে সুসংবাদ দিয়ে যাও। বলো আমার রাজা কখন আমাকে নিতে আসবেন?

ঠাকুরদা। ওই তো বড়ো শক্ত কথা জিজ্ঞাসা করলে। আমার বন্ধুর ভাবগতিক কিছুই বুঝি নে তার আর বলব কী। যুদ্ধ তো শেষ হয়ে গেল তিনি যে কোথায় তার সন্ধান নেই।

সুদর্শনা। চলে গিয়েছেন?

ঠাকুরদা। সাড়া শব্দ তো কিছুই পাই নে।

সুদর্শনা। চলে গিয়েছেন? তোমার বন্ধু এমনি বন্ধু!

ঠাকুরদা। সেইজন্যে লোকে তাকে নিন্দেও করে সন্দেহও করে। কিন্তু আমার রাজা তাতে খেয়ালও করে না।

সুদর্শনা। চলে গেলেন? ওরে, ওরে, কী কঠিন, কী কঠিন। একেবারে পাথর, একেবারে বজ্র। সমস্ত বুক দিয়ে ঠেলছি—বুক ফেটে গেল—কিন্তু নড়ল না। ঠাকুরদা, এমন বন্ধুকে নিয়ে তোমার চলে কী করে?

ঠাকুরদা। চিনে নিয়েছি যে—সুখে দুঃখে তাকে চিনে নিয়েছি—এখন আর সে কাঁদাতে পারে না।

সুদর্শনা। আমাকেও সে কি চিনতে দেবে না?

ঠাকুরদা। দেবে বই কি—নইলে এত দুঃখ দিচ্ছে কেন? ভালো করে চিনিয়ে তবে ছাড়বে, সে তো সহজ লোক নয়।

সুদর্শনা। আচ্ছা আচ্ছা দেখব তার কতবড়ো নিষ্ঠুরতা। এই জানালার কাছে আমি চুপ করে পড়ে থাকব—এক পা নড়ব না—দেখি সে কেমন না আসে।

ঠাকুরদা। দিদি তোমার বয়স অল্প—জেদ করে অনেক দিন পড়ে থাকতে পার—কিন্তু আমার যে এক মুহূর্ত গেলেও লোকসান বোধ হয়। পাই না-পাই একবার খুঁজতে বেরোব। [প্রস্থান

সুদর্শনা। চাই নে তাকে চাই নে। সুরঙ্গমা, তোর রাজাকে আমি চাই নে। কিসের জন্যে সে যুদ্ধ করতে এল? আমার জন্যে একেবারেই না? কেবল বীরত্ব দেখাবার জন্যে?

সুরঙ্গমা। দেখাবার ইচ্ছে তাঁর যদি থাকত তাহলে এমন করে দেখাতেন কারও আর সন্দেহ থাকত না। দেখালেন আর কই?

সুদর্শনা। যা যা চলে যা—তোর কথা অসহ্য বোধ হচ্ছে। এত নত করলে তবু সাধ মিটল না? বিশ্বসুদ্ধ লোকের সামনে আমাকে এইখানে ফেলে রেখে দিয়ে চলে গেল?

১৭

নাগরিকদল

প্রথম। ওহে এতগুলো রাজা একত্র হয়ে লড়াই বাধিয়ে দিলে, ভাবলুম খুব তামাশা হবে—কিন্তু দেখতে দেখতে কী যে হয়ে গেল ভালো বোঝাই গেল না।

দ্বিতীয়। দেখলে না, ওদের নিজেদের মধ্যেই গোলমাল বেধে গেল—কেউ যে কাউকে বিশ্বাস করে না।

তৃতীয়। পরামর্শ ঠিক রইল না যে। কেউ এগোতে চায় কেউ পিছোতে চায়—কেউ এদিকে যায় কেউ ওদিকে যায়, একে কি আর যুদ্ধ বলে?

প্রথম। ওরা তো লড়াইয়ের দিকে চোখ রাখে নি—ওরা পরস্পরের দিকেই চোখ রেখেছিল।

দ্বিতীয়। কেবলই ভাবছিল লড়াই করে মরব আমি আর তার ফল ভোগ করবে আর কেউ।

তৃতীয়। কিন্তু লড়েছিল কাঞ্চীরাজ সে-কথা বলতেই হবে।

প্রথম। সে যে হেরেও হারতে চায় না।

দ্বিতীয়। শেষকালে অস্ত্রটা একেবারে তার বুকে এসে লাগল।

তৃতীয়। তার আগে সে যে পদে পদেই হারছিল তা যেন টেরও পাচ্ছিল না।

প্রথম। অন্য রাজারা তো তাকে ফেলে কে কোথায় পালাল তার ঠিক নেই।

দ্বিতীয়। কিন্তু শুনেছি কাঞ্চীরাজ মরে নি।

তৃতীয়। না, চিকিৎসায় বেঁচে গেল কিন্তু তার বুকের মধ্যে যে হারের চিহ্নটা আঁকা রইল সে তো আর এজন্মে মুছবে না।

প্রথম। রাজারা কেউ পালিয়ে রক্ষা পায় নি—সবাই ধরা পড়েছে। কিন্তু বিচারটা কী রকম হল?

দ্বিতীয়। আমি শুনেছি সকল রাজারই দণ্ড হয়েছে কেবল কাঞ্চীর রাজাকে বিচারকর্তা নিজের সিংহাসনের দক্ষিণপার্শ্বে বসিয়ে স্বহস্তে তার মাথায় রাজমুকুট পরিয়ে দিয়েছে।

তৃতীয়। এটা কিন্তু একেবারেই বোঝা গেল না।

দ্বিতীয়। বিচারটা যেন কেমন বেখাপ রকম শোনাচ্ছে।

প্রথম। তা তো বটেই। অপরাধ যা-কিছু করেছে সে তো ওই কাঞ্চীর রাজা। এরা তো একবার লোভে একবার ভয়ে কেবল এগোচ্ছিল আর পিছোচ্ছিল।

তৃতীয়। এ কেমন হল। যেন বাঘটা গেল বেঁচে আর তার লেজটা গেল কাটা।

দ্বিতীয়। আমি যদি বিচারক হতুম তাহলে কাঞ্চীকে কি আর আস্ত রাখতুম? ওর আর চিহ্ন দেখাই যেত না।

তৃতীয়। কী জানি ভাই মস্ত মস্ত বিচারকর্তা—ওদের বুদ্ধি একরকমের।

প্রথম। ওদের বুদ্ধি বলে কিছু আছে কি। ওদের সবই মর্জি। কেউ তো বলবার লোক নেই।

দ্বিতীয়। যা বলিস ভাই, আমাদের হাতে শাসনের ভার যদি পড়ত তাহলে এর চেয়ে ঢের ভালো করে চালাতে পারতুম।

তৃতীয়। সে কি একবার করে বলতে?

১৮

পথ

ঠাকুরদা ও কাঞ্চীরাজ

ঠাকুরদা। এ কী কাঞ্চীরাজ তুমি পথে যে।

কাঞ্চী। তোমার রাজা আমায় পথেই বের করেছে।

ঠাকুরদা। ওই তো তার স্বভাব।

কাঞ্চী। তার পরে আর নিজের দেখা নেই।

ঠাকুরদা। সেও তার এক কৌতুক।

কাঞ্চী। কিন্তু আমাকে এমন করে আর কতদিন এড়াবে? যখন কিছুতেই তাকে রাজা বলে মানতেই চাই নি তখন কোথা থেকে কালবৈশাখীর মতো এসে এক মুহূর্তে আমার ধ্বজা পতাকা ভেঙে উড়িয়ে ছারখার করে দিলে, আর আজ তার কাছে হার মানবার জন্যে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছি তার আর দেখাই নেই।

ঠাকুরদা। তা হ'ক সে যত বড়ো রাজাই হ'ক হার-মানার কাছে তাকে হার মানতেই হবে। কিন্তু রাজন্, রাত্রে বেরিয়েছ যে।

কাঞ্চী। ওই লজ্জাটুকু এখনও ছাড়তে পারি নি। কাঞ্চীর রাজা থালায় মুকুট সাজিয়ে তোমার রাজার মন্দির খুঁজে বেড়াচ্ছে এই যদি দিনের আলোয় লোকে দেখে তাহলে যে তারা হাসবে।

ঠাকুরদা। লোকের ওই দশা বটে। যা দেখে চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে যায় তাই দেখেই বাঁদররা হাসে।

কাঞ্চী। কিন্তু ঠাকুরদা, তোমার এ কী কাণ্ড! সেই উৎসবের ছেলেদের এখানেও জুটিয়ে এনেছ? কিন্তু সেখানে যারা তোমার পিছে পিছে ঘুরত তাদের দেখছি নে বড়ো।

ঠাকুরদা। আমার শম্ভু-সুধনের দল? তারা এবার লড়াইয়ে মরেছে।

কাঞ্চী। মরেছে?

ঠাকুরদা। হাঁ, তারা আমাকে বললে, ঠাকুরদা, পণ্ডিতরা যা বলে আমরা কিছুই বুঝতে পারি নে, তুমি যে গান গাও তার সঙ্গেও গলা মেলাতে পারি নে, কিন্তু একটা কাজ আমরা করতে পারি, আমরা মরতে পারি—আমাদের যুদ্ধে নিয়ে যাও, জীবনটা সার্থক করে আসি। তা যেমন কথা তেমন কাজ। সকলের আগে গিয়ে তারা দাঁড়াল, সকলের আগেই তারা প্রাণ দিয়ে বসে আছে।

কাঞ্চী। সিধে রাস্তা ধরে সব বুদ্ধিমানদের চেয়ে এগিয়ে গেল আর কি, এখন এই ছেলের দল নিয়ে কী বাল্যলীলাটা চলছে?

ঠাকুরদা। এবারকার বসন্ত-উৎসবটা নানাক্ষেত্রে নানারকম হয়ে গেল, তাই সকল পালার মধ্যে দিয়ে এদের ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছি। সেদিন বাগানের মধ্যে দিয়ে দিব্যি লাল হয়ে উঠেছিল—রণক্ষেত্রেও মন্দ জমে নি। সে তো চুকল, আজ আবার আমাদের বড়ো রাস্তার বড়োদিন। আজ ঘরের মানুষদের পথে বের করবার জন্যে দক্ষিণ হাওয়ার মতো দলবল নিয়ে বেরিয়েছি। ধর তো রে ভাই; তোদের সেই দরজায় ঘা দেবার গানটা ধর।

গান

আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে।
তব অবগুন্ঠিত কুন্ঠিত জীবনে,
ক'রো না বিড়ম্বিত তারে।
আজি খুলিয়ো হৃদয়-দল খুলিয়ো,
আজি ভুলিয়ো আপন পর ভুলিয়ো,
এই সংগীত-মুখরিত গগনে
তব গন্ধ তরঙ্গিয়া তুলিয়ো।
এই বাহির ভুবনে দিশা হারায়ে
দিয়ো ছড়ায়ে মাধুরী ভারে ভারে।

অতি নিবিড় বেদনা বনমাঝে রে
আজি পল্লবে পল্লবে বাজে রে
দূরে গগনে কাহার পথ চাহিয়া
আজি ব্যাকুল বসুন্ধরা সাজে রে।
মোর পরানে দখিন বায়ু লাগিছে
কারে দ্বারে দ্বারে কর হানি মাগিছে,
এই সৌরভবিহ্বলা রজনী
কার চরণে ধরণীতলে জাগিছে ?
ওগো সুন্দর বল্লভ-কান্ত,
তব গম্ভীর আহ্বান কারে।

১৯

পথ

সুদর্শনা ও সুরঙ্গমা

সুদর্শনা। বেঁচেছি, বেঁচেছি সুরঙ্গমা। হার মেনে তবে বেঁচেছি। ওরে বাস রে। কী কঠিন অভিমান। কিছুতেই গলতে চায় না। আমার রাজা কেন আমার কাছে আসতে যাবে—আমিই তাঁর কাছে যাব এই কথাটা কোনোমতেই মনকে বলাতে পারছিলুম না। সমস্ত রাতটা সেই জানালায় পড়ে ধুলোয় লুটিয়ে কেঁদেছি—দক্ষিনে হাওয়া বুকের বেদনার মত হুহু করে বয়েছে, আর কৃষ্ণচতুর্দশীর অন্ধকারে বউকথাকও চার পহর রাত কেবলই ডেকেছে—সে যেন অন্ধকারের কান্না।

সুরঙ্গমা। আহা কালকের রাতটা মনে হয়েছিল যেন কিছুতেই আর পোহাতে চায় না।

সুদর্শনা। কিন্তু বললে বিশ্বাস করবি নে তারই মধ্যে বার বার আমার মনে হচ্ছিল কোথায় তার বীণা বাজছিল। যে নিষ্ঠুর, তার কঠিন হাতে কি অমন মিনতির সুর বাজে। বাইরের লোক আমার অসম্মানটাই দেখে গেল—কিন্তু গোপন রাত্রের সেই সুরটা কেবল আমার হৃদয় ছাড়া আর তো কেউ শুনল না। সে-বীণা তুই কি শুনেছিলি সুরঙ্গমা ? না, সে আমার স্বপ্ন ?

সুরঙ্গমা। সেই বীণা শুনব বলেই তো তোমার কাছে কাছে আছি। অভিমান-গলানো সুর বাজবে জেনেই কান পেতে পড়ে ছিলুম।

সুদর্শনা। তার পণটাই রইল—পথে বের করলে তবে ছাড়লে। মিলন হলে এই কথাটাই তাকে বলব যে, আমিই এসেছি, তোমার আসার অপেক্ষা করি নি। বলব চোখের জল ফেলতে ফেলতে এসেছি—কঠিন পথ ভাঙতে ভাঙতে এসেছি। এ-গর্ব আমি ছাড়ব না।

সুরঙ্গমা। কিন্তু সে-গর্বও তোমার টিঁকবে না। সে যে তোমারও আগে এসেছিল নইলে তোমাকে বের করে কার সাধ্য।

সুদর্শনা। তা হয়তো এসেছিল—আভাস পেয়েছিলুম কিন্তু বিশ্বাস করতে পারি নি। যতক্ষণ অভিমান করে বসেছিলুম ততক্ষণ মনে হয়েছিল সেও আমাকে ছেড়ে গিয়েছে—অভিমান ভাসিয়ে দিয়ে যখনই রাস্তায় বেরিয়ে পড়লুম তখনই মনে হল সেও বেরিয়ে এসেছে, রাস্তা থেকেই তাকে পাওয়া শুরু করেছি। এখন আমার মনে আর কোনো ভাবনা নেই। তার জন্যে এত যে দুঃখ এই দুঃখই আমাকে তার সঙ্গ দিচ্ছে— এত কষ্টের রাস্তা আমার পায়ের তলায় যেন সুরে সুরে বেজে উঠছে—এ যেন আমার বীণা, আমার দুঃখের বীণা—এরই বেদনার গানে তিনি এই কঠিন পাথরে এই শুকনো ধুলোয় আপনি বেরিয়ে এসেছেন—আমার হাত ধরেছেন—সেই আমার অন্ধকার ঘরের মধ্যে যেমন করে হাত ধরতেন—হঠাৎ চমকে উঠে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠত—এও সেইরকম। কে বললে, তিনি নেই? সুরঙ্গমা তুই কি বুঝতে পারছিস নে তিনি লুকিয়ে এসেছেন?

সুরঙ্গমার গান

অন্ধকারের মাঝে আমায় ধরেছ দুই হাতে।
কখন তুমি এলে, হে নাথ, মৃদু-চরণপাতে?
ভেবেছিলেম জীবনস্বামী,
তোমায় বুঝি হারাই আমি,
আমায় তুমি হারাবে না বুঝেছি আজ রাতে।
যে নিশীথে আপন হাতে নিবিয়ে দিলেম আলো,
তারই মাঝে তুমি তোমার ধ্রুবতারা জ্বালো।
তোমার পথে চলা যখন
ঘুচে গেল, দেখি তখন
আপনি তুমি আমার পথে লুকিয়ে চল সাথে॥

সুদর্শনা। ও কে ও! চেয়ে দেখ্ সুরঙ্গমা, এত রাত্রে এই আঁধার পথে আরও একজন পথিক বেরিয়েছে যে।

সুরঙ্গমা। মা, এ যে কাঞ্চীর রাজা দেখছি।

সুদর্শনা। কাঞ্চীর রাজা?

সুরঙ্গমা। ভয় ক'রো না মা।

সুদর্শনা। ভয়। ভয় কেন করব? ভয়ের দিন আমার আর নেই।

কাঞ্চীরাজ (প্রবেশ করিয়া)। মা, তুমিও চলেছ বুঝি। আমিও এই এক পথেরই পথিক। আমাকে কিছুমাত্র ভয় ক'রো না।

সুদর্শনা। ভালোই হয়েছে কাঞ্চীরাজ—আমরা দুজনে তাঁর কাছে পাশাপাশি চলেছি এ ঠিক হয়েছে। ঘর ছেড়ে বেরোবার মুখেই তোমার সঙ্গে আমার যোগ হয়েছিল—আজ ঘরে ফেরবার পথে সেই যোগই যে এমন শুভযোগ হয়ে উঠবে তা আগে কে মনে করতে পারত।

কাঞ্চী। কিন্তু, মা, তুমি যে হেঁটে চলেছ এ তো তোমাকে শোভা পায় না। যদি অনুমতি কর তাহলে এখনই রথ আনিয়ে দিতে পারি।

সুদর্শনা। না না, অমন কথা ব'লো না—যে-পথ দিয়ে তাঁর কাছ থেকে দূরে এসেছি সেই পথের সমস্ত ধুলোটা পা দিয়ে মাড়িয়ে মাড়িয়ে ফিরব তবেই আমার বেরিয়ে আসা সার্থক হবে। রথে করে নিয়ে গেলে আমাকে ফাঁকি দেওয়া হবে।

সুরঙ্গমা। মহারাজ, তুমিও তো আজ ধুলোয়। এ-পথে তো হাতিঘোড়া রথ কারও দেখি নি।

সুদর্শনা। যখন রানী ছিলুম তখন কেবল সোনারুপোর মধ্যেই পা ফেলেছি—আজ তাঁর ধুলোর মধ্যে চলে আমার সেই ভাগ্যদোষ খণ্ডিয়ে নেব। আজ আমার সেই ধুলোমাটির রাজার সঙ্গে পদে পদে এই ধুলোমাটিতে মিলন হচ্ছে এ সুখের খবর কে জানত।

সুরঙ্গমা। রানীমা, ওই দেখো, পূর্বদিকে চেয়ে দেখো ভোর হয়ে আসছে। আর দেরি নেই মা—তাঁর প্রাসাদের সোনার চূড়ার শিখর দেখা যাচ্ছে।

গান

ভোর হল বিভাবরী, পথ হল অবসান।
শুন ওই লোকে লোকে উঠে আলোকেরি গান।

ধন্য হলি ওরে পান্থ,
রজনী-জাগরক্লান্ত,
ধন্য হল মরি মরি ধুলায় ধূসর প্রাণ।
বনের কোলের কাছে
সমীরণ জাগিয়াছে।
মধুভিক্ষু সারে সারে
আগত কুঞ্জের দ্বারে।
হল তব যাত্রা সারা,
মোছো মোছো অশ্রুধারা,
লজ্জাভয় গেল ঝরি ঘুচিল রে অভিমান॥

ঠাকুরদার প্রবেশ

ঠাকুরদা। ভোর হল, দিদি, ভোর হল।

সুদর্শনা। তোমাদের আশীর্বাদে পৌঁচেছি, ঠাকুরদা, পৌঁচেছি।

ঠাকুরদা। কিন্তু আমাদের রাজার রকম দেখেছ? রথ নেই, বাদ্য নেই, সমারোহ নেই।

সুদর্শনা। বল কী, সমারোহ নেই? ওই যে আকাশ একেবারে রাঙা, ফুলগন্ধের অভ্যর্থনায় বাতাস একেবারে পরিপূর্ণ।

ঠাকুরদা। তা হ'ক, আমাদের রাজা যত নিষ্ঠুর হ'ক আমরা তো তেমন কঠিন হতে পারি নে—আমাদের যে ব্যথা লাগে। এই দীনবেশে তুমি রাজভবনে যাচ্ছ এ কি আমরা সহ্য করতে পারি? একটু দাঁড়াও, আমি ছুটে গিয়ে তোমার রানীর বেশটা নিয়ে আসি।

সুদর্শনা। না না না। সে রানীর বেশ তিনি আমাকে চিরদিনের মতো ছাড়িয়েছেন—সবার সামনে আমাকে দাসীর বেশ পরিয়েছেন—বেঁচেছি বেঁচেছি—আমি আজ তাঁর দাসী—যে-কেউ তাঁর আছে আমি আজ সকলের নিচে।

ঠাকুরদা। শত্রুপক্ষ তোমার এ দশা দেখে পরিহাস করবে সেইটে আমাদের অসহ্য হয়।

সুদর্শনা। শত্রুপক্ষের পরিহাস অক্ষয় হ'ক—তারা আমার গায়ে ধুলো দিক। আজকের দিনের অভিসারে সেই ধুলোই যে আমার অঙ্গরাগ।

ঠাকুরদা। এর উপরে আর কথা নেই। এখন আমাদের বসন্ত-উৎসবের শেষ খেলাটাই চলুক—ফুলের রেণু এখন থাক, দক্ষিনে হাওয়ায় এবার ধুলো উড়িয়ে দিক। সকলে মিলে আজ ধূসর হয়ে প্রভুর কাছে যাব। গিয়ে দেখব তার গায়েও ধুলো মাখা। তাকে বুঝি কেউ ছাড়ে মনে করছ? যে পায় তার গায়ে মুঠো মুঠো ধুলো দেয় যে—সে-ধুলো সে ঝেড়েও ফেলে না।

কাঞ্চী। ঠাকুরদা, তোমাদের এই ধুলোর খেলায় আমাকেও ভুলো না। আমার এই রাজবেশটাকে এমনি মাটি করে নিয়ে যেতে হবে যাতে একে আর চেনা না যায়।

ঠাকুরদা। সে আর দেরি হবে না ভাই। যেখানে নেবে এসেছ এখানে যত তোমার মিথ্যে মান সব ঘুচে গেছে—এখন দেখতে দেখতে রং ফিরে যাবে।—আর এই আমাদের রানীকে দেখো—ও নিজের উপর ভারি রাগ করেছিল—মনে করেছিল গয়না ফেলে দিয়ে নিজের ভুবনমোহন রূপকে লাঞ্ছনা দেবে—কিন্তু সে-রূপ অপমানের আঘাতে আরও ফুটে পড়েছে—সে যেন কোথাও আর কিছু ঢাকা নেই। আমাদের রাজাটির নিজের নাকি রূপের সম্পর্ক নেই তাই তো এই বিচিত্র রূপ সে এত ভালোবাসে, এই রূপই তো তার বক্ষের অলংকার। সেই রূপ আপনার গর্বের আবরণ ঘুচিয়ে দিয়েছে—আজ আমার রাজার ঘরে কী সুরে যে এতক্ষণে বীণা বেজে উঠেছে তাই শোনবার জন্যে প্রাণটা ছটফট করছে।

সুরঙ্গমা। ওই যে সূর্য উঠল।

২০

অন্ধকার ঘর

সুরঙ্গমা। প্রভু, যে-আদর কেড়ে নিয়েছ সে-আদর আর ফিরিয়ে দিয়ো না; আমি তোমার চরণের দাসী, আমাকে সেবার অধিকার দাও।

রাজা। আমাকে সইতে পারবে?

সুদর্শনা। পারব রাজা পারব। আমার প্রমোদবনে আমার রানীর ঘরে তোমাকে দেখতে চেয়েছিলুম বলেই তোমাকে এমন বিরূপ দেখেছিলুম—সেখানে তোমার দাসের অধম দাসকেও তোমার চেয়ে চোখে সুন্দর ঠেকে। তোমাকে তেমন করে দেখবার তৃষ্ণা আমার একেবারে ঘুচে গেছে—তুমি সুন্দর নও প্রভু সুন্দর নও, তুমি অনুপম।

রাজা। তোমারই মধ্যে আমার উপমা আছে।

সুদর্শনা। যদি থাকে তো সেও অনুপম। আমার মধ্যে তোমার প্রেম আছে সেই প্রেমেই তোমার ছায়া পড়ে, সেইখানেই তুমি আপনার রূপ আপনি দেখতে পাও— সে আমার কিছুই নয়, সে তোমার।

রাজা। আজ এই অন্ধকার ঘরের দ্বার একেবারে খুলে দিলুম—এখানকার লীলা শেষ হল! এস, এবার আমার সঙ্গে এস, বাইরে চলে এস—আলোয়।

সুদর্শনা। যাবার আগে আমার অন্ধকারের প্রভুকে আমার নিষ্ঠুরকে আমার ভয়ানককে প্রণাম করে নিই।

উপন্যাস ও গল্প

শেষের কবিতা

শেষের কবিতা

১

অমিত-চরিত

অমিত রায় ব্যারিস্টার। ইংরেজি ছাঁদে রায় পদবী "রয়" ও "রে" রূপান্তর যখন ধারণ করলে তখন তার শ্রী গেল ঘুচে কিন্তু সংখ্যা হল বৃদ্ধি। এই কারণে, নামের অসামান্যতা কামনা করে অমিত এমন একটি বানান বানালে, যাতে ইংরেজ বন্ধু ও বন্ধুনীদের মুখে তার উচ্চারণ দাঁড়িয়ে গেল—অমিট রায়ে।

অমিতর বাপ ছিলেন দিগ্‌বিজয়ী ব্যারিস্টার। যে-পরিমাণ টাকা তিনি জমিয়ে গেছেন সেটা অধস্তন তিন পুরুষকে অধঃপাতে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু পৈতৃক সম্পত্তির সাংঘাতিক সংঘাতেও অমিত বিনা বিপত্তিতে এ-যাত্রা টিঁকে গেল।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বি. এ র কোঠায় পা দেবার পূর্বেই অমিত অক্সফোর্ডে ভরতি হয়; সেখানে পরীক্ষা দিতে দিতে এবং না দিতে দিতে ওর সাত বছর গেল কেটে। বুদ্ধি বেশি থাকাতে পড়াশুনো বেশি করে নি, অথচ বিদ্যেতে কমতি আছে বলে ঠাহর হয় না। ওর বাপ ওর কাছ থেকে অসাধারণ কিছু প্রত্যাশা করেন নি। তাঁর ইচ্ছে ছিল তাঁর একমাত্র ছেলের মনে অক্সফোর্ডের রং এমন পাকা করে ধরে যাতে দেশে এসেও ধোপ সয়।

অমিতকে আমি পছন্দ করি। খাসা ছেলে। আমি নবীন লেখক, সংখ্যায় আমার পাঠক স্বল্প, যোগ্যতায় তাদের সকলের সেরা অমিত। আমার লেখার ঠাট-ঠমকটা ওর চোখে খুব লেগেছে। ওর বিশ্বাস, আমাদের দেশের সাহিত্য-বাজারে যাদের নাম আছে তাদের স্টাইল নেই। জীবসৃষ্টিতে উট জন্তুটা যেমন, এই লেখকদের রচনাও তেমনি, ঘাড়ে-গর্দানে, সামনে-পিছনে পিঠে-পেটে বেখাপ, চালটা ঢিলে নড়বড়ে, বাংলা-সাহিত্যের মতো ন্যাড়া ফ্যাকাশে মরুভূমিতেই তার চলন।—সমালোচকদের কাছে সময় থাকতে বলে রাখা ভালো, মতটা আমার নয়।

অমিত বলে, ফ্যাশানটা হল মুখোশ, স্টাইলটা হল মুখশ্রী। ওর মতে, যারা সাহিত্যের ওমরাও দলের, যারা নিজের মন রেখে চলে, স্টাইল তাদেরই। আর যারা আমলা দলের, দশের মন রাখা যাদের ব্যবসা, ফ্যাশান তাদেরই। বঙ্কিমি স্টাইল

বঙ্কিমের লেখা 'বিষবৃক্ষে,' বঙ্কিম তাতে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছেন,—বঙ্কিমি ফ্যাশান নসিরামের লেখা "মনোমোহনের মোহনবাগানে," নসিরাম তাতে বঙ্কিমকে দিয়েছে মাটি করে। বারোয়ারি তাঁবুর কানাতের নিচে ব্যবসাদার নাচওআলীর দর্শন মেলে, কিন্তু শুভদৃষ্টিকালে বধূর মুখ দেখবার বেলায় বেনারসি ওড়নার ঘোমটা চাই। কানাত হল ফ্যাশানের, আর বেনারসি হল স্টাইলের, বিশেষের মুখ বিশেষ রঙের ছায়ায় দেখবার জন্যে। অমিত বলে, হাটের লোকের পায়ে-চলা রাস্তার বাইরে আমাদের পা সরতে ভরসা পায় না বলেই আমাদের দেশে স্টাইলের এত অনাদর। দক্ষযজ্ঞের গল্পে এই কথাটির পৌরাণিক ব্যাখ্যা মেলে। ইন্দ্রচন্দ্রবরুণ একেবারে স্বর্গের ফ্যাশান-দুরস্ত দেবতা, যাজ্ঞিকমহলে তাঁদের নিমন্ত্রণও জুটত। শিবের ছিল স্টাইল, এত ওরিজিন্যাল যে, মন্ত্রপড়া যজমানেরা তাঁকে হব্যকব্য দেওয়াটা বে-দস্তুর বলে জানত। অক্সফোর্ডের বি এ র মুখে এ-সব কথা শুনতে আমার ভালো লাগে। কেননা, আমার বিশ্বাস, আমার লেখায় স্টাইল আছে—সেইজন্যেই আমার সকল বইয়েরই এক সংস্করণেই কৈবল্যপ্রাপ্তি, তারা "ন পুনরাবর্তন্তে।"

আমার শ্যালক নবকৃষ্ণ অমিতর এ-সব কথা একেবারে সইতে পারত না—বলত, "রেখে দাও তোমার অক্সফোর্ডের পাস।" সে ছিল ইংরেজি সাহিত্যে রোমহর্ষক এম এ; তাকে পড়তে হয়েছে বিস্তর, বুঝতে হয়েছে অল্প। সেদিন সে আমাকে বললে, "অমিত কেবলই ছোটো লেখককে বড়ো করে, বড়ো লেখককে খাটো করবার জন্যেই। অবজ্ঞার ঢাক পিটোবার কাজে তার শখ, তোমাকে সে করেছে তার ঢাকের কাঠি।" দুঃখের বিষয়, এই আলোচনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন আমার স্ত্রী, স্বয়ং ওর সহোদরা। কিন্তু পরম সন্তোষের বিষয় এই যে, আমার শ্যালকের কথা তাঁর একটুও ভালো লাগে নি। দেখলুম, অমিতর সঙ্গেই তাঁর রুচির মিল, অথচ পড়াশুনো বেশি করেন নি। স্ত্রীলোকের আশ্চর্য স্বাভাবিক বুদ্ধি।

অনেক সময় আমার মনেও খটকা লাগে যখন দেখি, কত কত নামজাদা ইংরেজ লেখকদেরকেও নগণ্য করতে অমিতর বুক দমে না। তারা হল, যাদের বলা যেতে পারে, বহুবাজারে চলতি লেখক, বড়োবাজারের ছাপমারা; প্রশংসা করবার জন্যে যাদের লেখা পড়ে দেখবার দরকারই হয় না, চোখ বুজে গুণগান করলেই পাসমার্ক পাওয়া যায়। অমিতর পক্ষেও এদের লেখা পড়ে দেখা অনাবশ্যক, চোখ বুজে নিন্দে করতে ওর বাধে না। আসলে, যারা নামজাদা তারা ওর কাছে বড়ো বেশি সরকারি, বর্ধমানের ওয়েটিংরুমের মতো; আর যাদেরকে ও নিজে আবিষ্কার করেছে তাদের উপর ওর খাসদখল, যেন স্পেশাল ট্রেনের সেলুন কামরা।

অমিতর নেশাই হল স্টাইলে। কেবল সাহিত্য-বাছাই কাজে নয়, বেশে ভূষায় ব্যবহারে। ওর চেহারাতেই একটা বিশেষ ছাঁদ আছে,—পাঁচজনের মধ্যে ও যে-কোনো একজন মাত্র নয়, ও হল একেবারে পঞ্চম। অন্যকে বাদ দিয়ে চোখে পড়ে। দাড়িগোঁফ-কামানো চাঁচা-মাজা চিকন শ্যামবর্ণ পরিপুষ্ট মুখ, স্ফূর্তিভরা ভাবটা, চোখ চঞ্চল, হাসি চঞ্চল, নড়াচড়া চলাফেরা চঞ্চল, কথার জবাব দিতে একটুও দেরি হয় না; মনটা এমন একরকমের চকমকি যে, ঠুন করে একটু ঠুকলেই স্ফুলিঙ্গ ছিটকে পড়ে। দেশী কাপড় প্রায়ই পরে, কেননা ওর দলের লোক সেটা পরে না। ধুতি সাদা থানের, যত্নে কোঁচানো, কেননা ওর বয়সে এ-রকম ধুতি চলতি নয়। পাঞ্জাবি পরে, তার বাঁ কাঁধ থেকে বোতাম ডান-দিকের কোমর অবধি, আস্তিনের সামনের দিকটা কনুই পর্যন্ত দু-ভাগ করা; কোমরে ধুতিটাকে ঘিরে একটা জরি-দেওয়া চওড়া খয়েরি রঙের ফিতে, তারই বাঁ দিকে ঝুলছে বৃন্দাবনী ছিটের এক ছোটো থলি, তার মধ্যে ওর ট্যাঁকঘড়ি; পায়ে সাদা চামড়ার উপর লাল চামড়ার কাজ-করা কটকি জুতো। বাইরে যখন যায়, একটা পাট-করা পাড়ওয়ালা মাদ্রাজি চাদর বাঁ কাঁধ থেকে হাঁটু অবধি ঝুলতে থাকে, বন্ধুমহলে যখন নিমন্ত্রণ থাকে মাথায় চড়ায় এক মুসলমানি লক্ষ্ণৌ টুপি, সাদার উপর সাদা কাজ-করা। একে ঠিক সাজ বলব না, এ হচ্ছে ওর একরকমের উচ্চ হাসি। ওর বিলিতি সাজের মর্ম আমি বুঝি নে, যারা বোঝে তারা বলে—কিছু আলুথালু গোছের বটে, কিন্তু ইংরেজিতে যাকে বলে ডিসটিঙ্গুইশড। নিজেকে অপরূপ করবার শখ ওর নেই, কিন্তু ফ্যাশানকে বিদ্রূপ করবার কৌতুক ওর অপর্যাপ্ত। কোনোমতে বয়স মিলিয়ে যারা কুষ্ঠির প্রমাণে যুবক তাদের দর্শন মেলে পথে ঘাটে; অমিতর দুর্লভ যুবকত্ব নির্জলা যৌবনের জোরেই, একেবারে বেহিসেবি, উড়নচণ্ডী, বান ডেকে ছুটে চলেছে বাইরের দিকে, সমস্ত নিয়ে চলেছে ভাসিয়ে, হাতে কিছুই রাখে না।

এদিকে ওর দুই বোন, যাদের ডাকনাম সিসি এবং লিসি, যেন নতুনবাজারে অত্যন্ত হালের আমদানি,—ফ্যাশানের পসরায় আপাদমস্তক যত্নে মোড়ক-করা পয়লা নম্বরের প্যাকেট বিশেষ। উঁচুখুরওয়ালা জুতো, লেসওয়ালা বুককাটা জ্যাকেটের ফাঁকে প্রবালে অ্যাম্বারে মেশানো মালা, শাড়িটা গায়ে তির্যগ্‌ভঙ্গীতে আঁট করে ল্যাপটানো। এরা খুটখুট করে দ্রুত লয়ে চলে; উচ্চৈঃস্বরে বলে; স্তরে স্তরে তোলে সূক্ষ্মাগ্র হাসি; মুখ ঈষৎ বেঁকিয়ে স্মিতহাস্যে উঁচু কটাক্ষে চায়, জানে কাকে বলে ভাবগর্ভ চাউনি; গোলাপি রেশমের পাখা ক্ষণে ক্ষণে গালের কাছে ফুর ফুর করে সঞ্চালন করে, এবং পুরুষবন্ধুর চৌকির হাতার উপরে বসে সেই পাখার আঘাতে তাদের কৃত্রিম স্পর্ধার প্রতি কৃত্রিম তর্জন প্রকাশ করে থাকে।

আপন দলের মেয়েদের সঙ্গে অমিতর ব্যবহার দেখে তার দলের পুরুষদের মনে ঈর্ষার উদয় হয়। নির্বিশেষ ভাবে মেয়েদের প্রতি অমিতর ঔদাসীন্য নেই, বিশেষ ভাবে কারও প্রতি আসক্তিও দেখা যায় না, অথচ সাধারণভাবে কোনোখানে মধুর রসেরও অভাব ঘটে না। এক কথায় বলতে গেলে মেয়েদের সম্বন্ধে ওর আগ্রহ নেই, উৎসাহ আছে। অমিত পার্টিতেও যায়, তাসও খেলে ইচ্ছে করেই বাজিতে হারে, যে-রমণীর গলা বেসুরো তাকে দ্বিতীয়বার গাইতে পীড়াপীড়ি করে, কাউকে বদ-রঙের কাপড় পরতে দেখলে জিজ্ঞাসা করে কাপড়টা কোন্ দোকানে কিনতে পাওয়া যায়। যে-কোনো আলাপিতার সঙ্গেই কথা ব'লে বিশেষ পক্ষপাতের সুর লাগায়; অথচ সবাই জানে ওর পক্ষপাতটা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ। যে-মানুষ অনেক দেবতার পূজারি, আড়ালে সব দেবতাকেই সে সব দেবতার চেয়ে বড়ো বলে স্তব করে, দেবতাদের বুঝতে বাকি থাকে না, অথচ খুশিও হন। কন্যার মাতাদের আশা কিছুতেই কমে না, কিন্তু কন্যারা বুঝে নিয়েছে, অমিত সোনার রঙের দিগন্তরেখা, ধরা দিয়েই আছে তবু কিছুতেই ধরা দেবে না। মেয়েদের সম্বন্ধে ওর মন তর্কই করে, মীমাংসায় আসে না। সেইজন্যেই গম্যবিহীন আলাপের পথে ওর এত দুঃসাহস। তাই অতি সহজেই সকলের সঙ্গে ও ভাব করতে পারে,—নিকটে দাহ্যবস্তু থাকলেও ওর তরফে আগ্নেয়তা নিরাপদে সুরক্ষিত।

সেদিন পিকনিকে গঙ্গার ধারে যখন ওপারের ঘন কালো পুঞ্জীভূত স্তব্ধতার উপরে চাঁদ উঠল ওর পাশে ছিল লিলি গাঙ্গুলি। তাকে ও মৃদুস্বরে বললে, "গঙ্গার ওপারে ওই নতুন চাঁদ, আর এপারে তুমি আর আমি, এমন সমাবেশটি অনন্তকালের মধ্যে কোনোদিনই আর হবে না।"

প্রথমটা লিলি গাঙ্গুলির মন এক মুহূর্তে ছলছলিয়ে উঠেছিল,—কিন্তু সে জানত এ-কথাটায় যতখানি সত্য সে কেবল ওই বলার কায়দাটুকুর মধ্যেই। তার বেশি দাবি করতে গেলে বুদ্বুদের উপরকার বর্ণচ্ছটাকে দাবি করা হয়। তাই নিজেকে ক্ষণকালের ঘোর-লাগা থেকে ঠেলা দিয়ে লিলি হেসে উঠল, বললে, "অমিট, তুমি যা বললে সেটা এত বেশি সত্য যে, না বললেও চলত। এইমাত্র যে-ব্যাঙটা টপ করে জলে লাফিয়ে পড়ল এটাও তো অনন্তকালের মধ্যে আর কোনোদিন ঘটবে না।"

অমিত হেসে উঠে বললে, "তফাত আছে, লিলি, একেবারে অসীম তফাত। আজকের সন্ধ্যাবেলায় ওই ব্যাঙের লাফানোটা একটা খাপছাড়া ছেঁড়া জিনিস। কিন্তু তোমাতে আমাতে চাঁদেতে, গঙ্গার ধারায়, আকাশের তারায়, একটা সম্পূর্ণ ঐকতানিক সৃষ্টি,—বেটোফেনের চন্দ্রালোক-গীতিকা। আমার মনে হয় যেন বিশ্বকর্মার কারখানায় একটা পাগলা স্বর্গীয় স্যাকরা আছে সে যেমনি একটি নিখুঁত সুগোল সোনার চক্রে

নীলার সঙ্গে হীরে এবং হীরের সঙ্গে পান্না লাগিয়ে এক প্রহরের আঙটি সম্পূর্ণ করলে অমনি দিলে সেটা সমুদ্রের জলে ফেলে, আর তাকে খুঁজে পাবে না কেউ।"

"ভালোই হল, তোমার ভাবনা রইল না, অমিট, বিশ্বকর্মার স্যাকরার বিল তোমাকে শুধতে হবে না।"

"কিন্তু, লিলি, কোটি কোটি যুগের পর যদি দৈবাৎ তোমাতে আমাতে মঙ্গলগ্রহের লাল অরণ্যের ছায়ায় তার কোনো-একটা হাজার-ক্রোশী খালের ধারে মুখোমুখি দেখা হয়, আর যদি শকুন্তলার সেই জেলেটা বোয়াল মাছের পেট চিরে আজকের এই অপরূপ সোনার মুহূর্তটিকে আমাদের সামনে এনে ধরে, চমকে উঠে মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করব, তার পরে কী হবে ভেবে দেখো।"

লিলি অমিতকে পাখার বাড়ি তাড়না করে বললে, "তার পরে সোনার মুহূর্তটি অন্যমনে খসে পড়বে সমুদ্রের জলে। আর তাকে পাওয়া যাবে না। পাগলা স্যাকরার গড়া এমন তোমার কত মুহূর্ত খসে পড়ে গেছে, ভুলে গেছ বলে তার হিসেব নেই।"

এই বলে লিলি তাড়াতাড়ি উঠে তার সখীদের সঙ্গে গিয়ে যোগ দিলে। অনেক ঘটনার মধ্যে এই একটা ঘটনার নমুনা দেওয়া গেল।

অমিতর বোন সিসি-লিসিরা ওকে বলে, "অমি, তুমি বিয়ে কর না কেন?"

অমিত বলে, "বিয়ে ব্যাপারটায় সকলের চেয়ে জরুরি হচ্ছে পাত্রী, তার নিচেই পাত্র।"

সিসি বলে, "অবাক করলে, মেয়ে এত আছে।"

অমিত বলে, "মেয়ে বিয়ে করত সেই পুরাকালে, লক্ষণ মিলিয়ে। আমি চাই পাত্রী, আপন পরিচয়েই যার পরিচয়, জগতে যে অদ্বিতীয়।"

সিসি বলে, "তোমার ঘরে এলেই তুমি হবে প্রথম, সে হবে দ্বিতীয়, তোমার পরিচয়েই হবে তার পরিচয়।"

অমিত বলে, "আমি মনে-মনে যে-মেয়ের ব্যর্থ প্রত্যাশায় ঘটকালি করি সে গরঠিকানা মেয়ে। প্রায়ই সে ঘর পর্যন্ত এসে পৌঁছোয় না। সে আকাশ থেকে পড়ন্ত তারা, হৃদয়ের বায়ুমণ্ডল ছুঁতে-না-ছুঁতেই জ্বলে ওঠে, বাতাসে যায় মিলিয়ে, বাস্তুঘরের মাটি পর্যন্ত আসা ঘটেই ওঠে না।"

সিসি বলে, "অর্থাৎ, সে তোমার বোনেদের মতো একটুও না।"

অমিত বলে, "অর্থাৎ সে ঘরে এসে কেবল ঘরের লোকেরই সংখ্যা বৃদ্ধি করে না।"

লিসি বলে, "আচ্ছা ভাই সিসি, বিমি বোস তো অমির জন্যে পথ চেয়ে তাকিয়ে আছে, ইশারা করলেই ছুটে এসে পড়ে, তাকে ওর পছন্দ নয় কেন? বলে,

তার কালচার নেই। কেন, ভাই, সে তো এম.এ.তে বটানিতে ফার্স্ট। বিদ্যেকেই তো বলে কালচার।"

অমিত বলে, "কমল-হীরের পাথরটাকেই বলে বিদ্যে, আর ওর থেকে যে-আলো ঠিকরে পড়ে তাকেই বলে কালচার। পাথরের ভার আছে, আলোর আছে দীপ্তি।"

লিসি রেগে উঠে বলে, "ইস, বিমি বোসের আদর নেই ওঁর কাছে! উনি নিজেই না কি তার যোগ্য! অমি যদি বিমি বোসকে বিয়ে করতে পাগল হয়েও ওঠে আমি তাকে সাবধান করে দেব সে যেন ওর দিকে ফিরেও না তাকায়।"

অমিত বললে, "পাগল না হলে বিমি বোসকে বিয়ে করতে চাইবই বা কেন? সে-সময়ে আমার বিয়ের কথা না ভেবে উপযুক্ত চিকিৎসার কথা ভেবো।"

আত্মীয়স্বজন অমিতর বিয়ের আশা ছেড়েই দিয়েছে। তারা ঠিক করেছে, বিয়ের দায়িত্ব নেবার যোগ্যতা ওর নেই, তাই ও কেবল অসম্ভবের স্বপ্ন দেখে আর উলটো কথা বলে মানুষকে চমক লাগিয়ে বেড়ায়। ওর মনটা আলেয়ার আলো, মাঠে বাটে ধাঁধা লাগাতেই আছে, ঘরের মধ্যে তাকে ধরে আনবার জো নেই।

ইতিমধ্যে অমিত যেখানে-সেখানে হো হো করে বেড়াচ্ছে,— ফিরপোর দোকানে যাকে-তাকে চা খাওয়াচ্ছে, যখন-তখন মোটরে চড়িয়ে বন্ধুদের অনাবশ্যক ঘুরিয়ে নিয়ে আসছে; এখান-ওখান থেকে যা-তা কিনছে আর একে-ওকে বিলিয়ে দিচ্ছে, ইংরেজি বই সদ্য কিনে এ-বাড়িতে ও-বাড়িতে ফেলে আসছে, আর ফিরিয়ে আনছে না।

ওর বোনেরা ওর যে-অভ্যাসটা নিয়ে ভারি বিরক্ত সে হচ্ছে ওর উলটো কথা বলা। সজ্জনসভায় যা-কিছু সর্বজনের অনুমোদিত ও তার বিপরীত কিছু একটা বলে বসবেই।

একদা কোন্ একজন রাষ্ট্রতাত্ত্বিক ডিমোক্রাসির গুণ বর্ণনা করছিল, ও বলে উঠল "বিষ্ণু যখন সতীর মৃতদেহ খণ্ড খণ্ড করলেন তখন দেশ জুড়ে যেখানে-সেখানে তাঁর এক-শর অধিক পীঠস্থান তৈরি হয়ে গেল। ডিমোক্রাসি আজ যেখানে-সেখানে যত টুকরো অ্যারিস্টক্রেসির পুজো বসিয়েছে,—খুদে খুদে অ্যারিস্টক্র্যাটে পৃথিবী ছেয়ে গেল, কেউ পলিটিক্সে, কেউ সাহিত্যে, কেউ সমাজে। তাদের কারও গাম্ভীর্য নেই, কেননা তাদের নিজের 'পরে বিশ্বাস নেই।"

একদা মেয়েদের 'পরে পুরুষের আধিপত্যের অত্যাচার নিয়ে কোনো সমাজহিতৈষী অবলাবান্ধব নিন্দা করছিল পুরুষদের। অমিত মুখ থেকে সিগারেট নামিয়ে ফস করে বললে, "পুরুষ আধিপত্য ছেড়ে দিলেই মেয়ে আধিপত্য শুরু করবে। দুর্বলের আধিপত্য অতি ভয়ংকর।"

সভাস্থ অবলা ও অবলাবান্ধবেরা চটে উঠে বললে, "মানে কী হল ?"

অমিত বললে, "যে-পক্ষের দখলে শিকল আছে সে শিকল দিয়েই পাখিকে বাঁধে, অর্থাৎ জোর দিয়ে। শিকল নেই যার সে বাঁধে আফিম খাইয়ে, অর্থাৎ মায়া দিয়ে। শিকলওআলা বাঁধে বটে, কিন্তু ভোলায় না, আফিমওআলী বাঁধেও বটে ভোলায়ও। মেয়েদের কৌটো আফিমে ভরা, প্রকৃতি শয়তানী তার জোগান দেয়।"

একদিন ওদের বালিগঞ্জের এক সাহিত্যসভায় রবি ঠাকুরের কবিতা ছিল আলোচনার বিষয়। অমিতর জীবনে এই সে প্রথম সভাপতি হতে রাজি হয়েছিল ; গিয়েছিল মনে-মনে যুদ্ধসাজ পরে। একজন সেকেলে গোছের অতি ভালোমানুষ ছিল বক্তা। রবি ঠাকুরের কবিতা যে কবিতাই এইটে প্রমাণ করাই তার উদ্দেশ্য। দুই-একজন কলেজের অধ্যাপক ছাড়া অধিকাংশ সভ্যই স্বীকার করলে, প্রমাণটা একরকম সন্তোষজনক।

সভাপতি উঠে বললে, "কবিমাত্রের উচিত পাঁচ বছর মেয়াদে কবিত্ব করা ; পঁচিশ থেকে ত্রিশ পর্যন্ত। এ-কথা বলব না যে, পরবর্তীদের কাছ থেকে আরও ভালো কিছু চাই, বলব অন্য কিছু চাই। ফজলি আম ফুরোলে বলব না, 'আনো ফজলিতর আম।' বলব, 'নতুনবাজার থেকে বড়ো দেখে আতা নিয়ে এস তো হে।' ডাব-নারকেলের মেয়াদ অল্প, সে রসের মেয়াদ, ঝুনো নারকেলের মেয়াদ বেশি, সে শাঁসের মেয়াদ। কবিরা হল ক্ষণজীবী, ফিলজফারের বয়সের গাছপাথর নেই।…রবি ঠাকুরের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড়ো নালিশ এই যে, বুড়ো ওঅর্ডস্‌ওঅর্থের নকল করে ভদ্রলোক অতি অন্যায়-রকম বেঁচে আছে। যম বাতি নিবিয়ে দেবার জন্যে থেকে-থেকে ফরাশ পাঠায়, তবু লোকটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েও চৌকির হাতা আঁকড়িয়ে থাকে। ও যদি মানে মানে নিজেই সরে না পড়ে আমাদের কর্তব্য ওর সভা ছেড়ে দল বেঁধে উঠে আসা। পরবর্তী যিনি আসবেন, তিনিও তাল ঠুকেই গর্জাতে গর্জাতে আসবেন যে, তাঁর রাজত্বের অবসান নেই। অমরাবতী বাঁধা থাকবে মর্ত্যে তাঁরই দরজায়। কিছুকাল ভক্তরা দেবে মালাচন্দন, খাওয়াবে পেট ভরিয়ে, সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করবে, তার পরে আসবে তাকে বলি দেবার পুণ্য দিন,—ভক্তিবন্ধন থেকে ভক্তদের পরিত্রাণের শুভলগ্ন। আফ্রিকায় চতুষ্পদ দেবতার পুজোর প্রণালী এইরকমই। দ্বিপদী ত্রিপদী চতুষ্পদী চতুর্দশপদী দেবতাদের পুজোও এই নিয়মে। পূজা জিনিসটাকে একঘেয়ে করে তোলার মতো অপবিত্র অধার্মিকতা আর কিছু হতে পারে না।…ভালো-লাগার এভোল্যুশন আছে। পাঁচ বছর পূর্বেকার ভালো-লাগা পাঁচ বছর পরেও যদি একই জায়গায় খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে তাহলে বুঝতে হবে বেচারা জানতে পারে নি যে, সে মরে গেছে। একটু ঠেলা

মারলেই তার নিজের কাছে প্রমাণ হবে যে, সেন্টিমেণ্টাল আত্মীয়েরা তার অন্ত্যেষ্টিসংকার করতে বিলম্ব করেছিল, বোধ করি উপযুক্ত উত্তরাধিকারীকে চিরকাল ফাঁকি দেবার মতলবে। রবি ঠাকুরের দলের এই অবৈধ ষড়যন্ত্র আমি পাব্লিকের কাছে প্রকাশ করব বলে প্রতিজ্ঞা করেছি।"

আমাদের মণিভূষণ চশমার ঝলক লাগিয়ে প্রশ্ন করলে, "সাহিত্য থেকে লয়াল্‌টি উঠিয়ে দিতে চান।"

"একেবারেই। এখন থেকে কবি-প্রেসিডেন্টের দ্রুত নিঃশেষিত যুগ। রবি ঠাকুর সম্বন্ধে আমার দ্বিতীয় বক্তব্য এই যে, তাঁর রচনারেখা তাঁরই হাতের অক্ষরের মতো— গোল বা তরঙ্গরেখা, গোলাপ বা নারীর মুখ বা চাঁদের ধরনে। ওটা প্রিমিটিভ; প্রকৃতির হাতের অক্ষরের মক্‌শো-করা। নতুন প্রেসিডেন্টের কাছে চাই কড়া লাইনের খাড়া লাইনের রচনা—তীরের মতো, বর্শার ফলার মতো, কাঁটার মতো, ফুলের মতো নয়, বিদ্যুতের রেখার মতো, ন্যুর‍্যালজিয়ার ব্যথার মতো, খোচাওআলা, কোণওআলা, গথিক গির্জের ছাঁদে, মন্দিরের মণ্ডপের ছাঁদে নয়, এমন কি, যদি চটকল, পাটকল অথবা সেক্রেটারিয়েট বিল্‌ডিঙের আদলে হয়, ক্ষতি নেই।… এখন থেকে ফেলে দাও মন ভোলাবার ছলাকলা ছন্দোবন্ধ, মন কেড়ে নিতে হবে, যেমন করে রাবণ সীতাকে কেড়ে নিয়ে গিয়েছিল। মন যদি কাঁদতে কাঁদতে আপত্তি করতে করতে যায় তবুও তাকে যেতেই হবে—অতিবৃদ্ধ জটায়ুটা বারণ করতে আসবে, তাই করতে গিয়েই তার হবে মরণ। তার পরে কিছু দিন যেতেই কিষ্কিন্ধ্যা জেগে উঠবে, কোন্ হনুমান হঠাৎ লাফিয়ে পড়ে লঙ্কায় আগুন লাগিয়ে মনটাকে পূর্বস্থানে ফিরিয়ে নিয়ে আসবার ব্যবস্থা করবে। তখন আবার হবে টেনিসনের সঙ্গে পুনর্মিলন, বায়রনের গলা জড়িয়ে করব অশ্রুবর্ষণ, ডিকেন্‌সকে বলব, মাপ করো, মোহ থেকে আরোগ্য লাভের জন্যে তোমাকে গাল দিয়েছি।… মোগল বাদশাদের কাল থেকে আজ পর্যন্ত দেশের যত মুগ্ধ মিস্ত্রি মিলে যদি যেখানে-সেখানে ভারত জুড়ে কেবলই গম্বুজওআলা পাথরের বুদ্‌বুদ বানিয়ে চলত তাহলে ভদ্রলোক মাত্রই যেদিন বিশ বছর বয়স পেরোত সেইদিনই বানপ্রস্থ নিতে দেরি করত না। তাজমহলকে ভালো-লাগাবার জন্যেই তাজমহলের নেশা ছুটিয়ে দেওয়া দরকার।"

(এইখানে বলে রাখা দরকার, কথার তোড় সামলাতে না পেরে সভার রিপোর্টারের মাথা ঘুরে গিয়েছিল, সে যা রিপোর্ট লিখেছিল সেটা অমিতর বক্তৃতার চেয়েও অবোধ্য হয়ে উঠেছিল। তারই থেকে যে-কটা টুকরো উদ্ধার করতে পারলুম তাই আমরা উপরে সাজিয়ে দিয়েছি।)

তাজমহলের পুনরাবৃত্তির প্রসঙ্গে রবি ঠাকুরের ভক্ত আরক্তমুখে বলে উঠল, "ভালো জিনিস যতো বেশি হয় ততই ভালো।"

অমিত বললে, "ঠিক তার উলটো। বিধাতার রাজ্যে ভালো জিনিস অল্প হয় বলেই তা ভালো, নইলে সে নিজেরই ভিড়ের ঠেলায় হয়ে যেত মাঝারি।··· যে-সব কবি ষাট-সত্তর পর্যন্ত বাঁচতে একটুও লজ্জা করে না, তারা নিজেকে শাস্তি দেয় নিজেকে সস্তা করে দিয়ে। শেষকালটায় অনুকরণের দল চারিদিকে ব্যূহ বেঁধে তাদেরকে মুখ ভ্যাঙচাতে থাকে। তাদের লেখার চরিত্র বিগড়ে যায়, পূর্বের লেখা থেকে চুরি শুরু করে হয়ে পড়ে পূর্বের লেখার রিসীভর্স অফ স্টোল্‌ন্ প্রপার্টি। সে-স্থলে লোকহিতের খাতিরে পাঠকদের কর্তব্য হচ্ছে, কিছুতেই এই সব অতিপ্রবীণ কবিদের বাঁচতে না দেওয়া,--শারীরিক বাঁচার কথা বলছি নে, কাব্যিক বাঁচা। এদের পরমায়ু নিয়ে বেঁচে থাক প্রবীণ অধ্যাপক, প্রবীণ পোলিটিশন, প্রবীণ সমালোচক।"

সেদিনকার বক্তা বলে উঠল, "জানতে পারি কি, কাকে আপনি প্রেসিডেণ্ট করতে চান? তার নাম করুন।"

অমিত ফস করে বললে, "নিবারণ চক্রবর্তী।"

সভার নানা চৌকি থেকে বিস্মিত রব উঠল- "নিবারণ চক্রবর্তী? সে লোকটা কে?"

"আজকের দিনে এই যে প্রশ্নের অঙ্কুর মাত্র, আগামী দিনে এর থেকে উত্তরের বনস্পতি জেগে উঠবে।"

"ইতিমধ্যে আমরা একটা নমুনা চাই।"

"তবে শুনুন।" বলে পকেট থেকে একটা সরু লম্বা ক্যাম্বিসে-বাঁধা খাতা বের করে তার থেকে পড়ে গেল

          আনিলাম
অপরিচিতের নাম
          ধরণীতে,
পরিচিত জনতার সরণীতে।
          আমি আগন্তুক,
আমি জন-গণেশের প্রচণ্ড কৌতুক।
          খোলো দ্বার,
বার্তা আনিয়াছি বিধাতার;

মহাকালেশ্বর
পাঠায়েছে দুর্লক্ষ্য অক্ষর,
বল্ দুঃসাহসী কে কে
মৃত্যু পণ রেখে
দিবি তার দুরূহ উত্তর।

শুনিবে না।
মূঢ়তার সেনা
করে পথরোধ।
ব্যর্থ ক্রোধ
হুংকারিয়া পড়ে বুকে :
তরঙ্গের নিষ্ফলতা
নিত্য যথা
মরে মাথা ঠুকে
শৈলতট 'পরে
আত্মঘাতী দম্ভভরে।

পুষ্পমাল্য নাহি মোর, রিক্ত বক্ষতল,
নাহি বর্ম অঙ্গদ কুণ্ডল।
শূন্য এ ললাটপট্টে লিখা
গূঢ় জয়টিকা।
ছিন্ন কন্থা দরিদ্রের বেশ।
করিব নিঃশেষ
তোমার ভাণ্ডার।
খোলো খোলো দ্বার।
অকস্মাৎ
বাড়ায়েছি হাত,
যা দিবার দাও অচিরাৎ!
বক্ষ তব কেঁপে উঠে, কম্পিত অর্গল,
পৃথ্বী টলমল।

ভয়ে আর্ত উঠিছে চীৎকারি
দিগন্ত বিদারি,
"ফিরে যা এখনি,
রে দুর্দান্ত দুরন্ত ভিখারি,
তোর কণ্ঠধ্বনি,
ঘুরি ঘুরি
নিশীথ নিদ্রার বক্ষে হানে তীব্র ছুরি।"

অস্ত্র আনো।
ঝঞ্ঝনিয়া আমার পঞ্জরে হানো।
মৃত্যুরে মারুক মৃত্যু, অক্ষয় এ প্রাণ
করি যাব দান।
শৃঙ্খল জড়াও তবে,
বাঁধো মোরে, খণ্ড খণ্ড হবে
মুহূর্তে চকিতে,
মুক্তি তব আমারি মুক্তিতে।

শাস্ত্র আনো।
হানো মোরে, হানো।
পণ্ডিতে পণ্ডিতে
ঊর্ধ্বস্বরে চাহিব খণ্ডিতে
দিব্য বাণী।
জানি জানি
তর্কবাণ
হয়ে যাবে খান খান।
মুক্ত হবে জীর্ণ বাক্যে আচ্ছন্ন দু-চোখ,
হেরিবে আলোক।

অগ্নি জ্বালো।
আজিকার যাহা ভালো
কল্য যদি হয় তাহা কালো,

যদি তাহা ভস্ম হয়
বিশ্বময়,
ভস্ম হ'ক।
দূর করো শোক।
মোর অগ্নিপরীক্ষায়
ধন্য হ'ক বিশ্বলোক অপূর্ব দীক্ষায়।

আমার দুর্বোধ বাণী
বিরুদ্ধ বুদ্ধির 'পরে মুষ্টি হানি,
করিবে তাহারে উচ্চকিত,
আতঙ্কিত।
উন্মাদ আমার ছন্দ
দিবে ধন্দ
শান্তিলুব্ধ মুমুক্ষুরে,
ভিক্ষাজীর্ণ বুভুক্ষুরে।
শিরে হস্ত হেনে
একে একে নিবে মেনে
ক্রোধে ক্ষোভে ভয়ে
লোকালয়ে
অপরিচিতের জয়,
অপরিচিতের পরিচয়,—
যে অপরিচিত
বৈশাখের রুদ্র ঝড়ে বসুন্ধরা করে আন্দোলিত,
হানি বজ্র-মুঠি
মেঘের কার্পণ্য টুটি
সংগোপন বর্ষণ-সঞ্চয়
ছিন্ন করে মুক্ত করে সর্বজগন্ময়॥

রবি ঠাকুরের দল সেদিন চুপ করে গেল। শাসিয়ে গেল, লিখে জবাব দেবে। সভাটাকে হতবুদ্ধি করে দিয়ে মোটরে করে অমিত যখন বাড়ি আসছিল, সিসি তাকে

বললে, "একখানা আস্ত নিবারণ চক্রবর্তী তুমি নিশ্চয় আগে থাকতে গড়ে তুলে পকেটে করে নিয়ে এসেছ, কেবলমাত্র ভালোমানুষদের বোকা বানাবার জন্যে।"

অমিত বললে, "অনাগতকে যে-মানুষ এগিয়ে নিয়ে আসে তাকেই বলে অনাগত-বিধাতা। আমি তাই। নিবারণ চক্রবর্তী আজ মর্ত্যে এসে পড়ল, কেউ তাকে আর ঠেকাতে পারবে না।"

সিসি অমিতকে নিয়ে মনে-মনে খুব একটা গর্ব বোধ করে। সে বললে, "আচ্ছা অমিত, তুমি কি সকালবেলা উঠেই সেদিনকার মতো তোমার যত শানিয়ে-বলা কথা বানিয়ে রেখে দাও?"

অমিত বললে, "সম্ভবপরের জন্যে সব সময়েই প্রস্তুত থাকাই সভ্যতা; বর্বরতা পৃথিবীতে সকল বিষয়েই অপ্রস্তুত। এ-কথাটাও আমার নোট বইয়ে লেখা আছে।"

"কিন্তু তোমার নিজের মত বলে কোনো পদার্থই নেই; যখন যেটা বেশ ভালো শোনায় সেইটেই তুমি বলে বস।"

"আমার মনটা আয়না, নিজের বাঁধা মতগুলো দিয়েই চিরদিনের মতো যদি তাকে আগাগোড়া লেপে রেখে দিতুম তাহলে তার উপরে প্রত্যেক চলতি মুহূর্তের প্রতিবিম্ব পড়ত না।"

সিসি বললে, "অমি, প্রতিবিম্ব নিয়েই তোমার জীবন কাটবে।"

২

সংঘাত

অমিত বেছে বেছে শিলঙ পাহাড়ে গেল। তার কারণ, সেখানে ওর দলের লোক কেউ যায় না। আরও একটা কারণ, ওখানে কন্যাদায়ের বন্যা তেমন প্রবল নয়। অমিতর হৃদয়টার 'পরে যে-দেবতা সর্বদা শরসন্ধান করে ফেরেন, তাঁর আনাগোনা ফ্যাশানেবল পাড়ায়। দেশের পাহাড়-পর্বতে যত বিলাসী বসতি আছে তার মধ্যে শিলঙে এদের মহলে তাঁর টার্গেট প্র্যাকটিসের জায়গা সব-চেয়ে সংকীর্ণ। বোনেরা মাথা ঝাঁকানি দিয়ে বললে, "যেতে হয় একলা যাও, আমরা যাচ্ছি নে।"

বাঁ হাতে হাল কায়দার বেঁটে ছাতা, ডান হাতে টেনিস ব্যাট, গায়ে নকল পারসিক শালের ক্লোক পরে বোনরা গেল চলে দার্জিলিঙে। বিমি বোস আগেভাগেই সেখানে গিয়েছে। যখন ভাইকে বাদ দিয়ে বোনদের সমাগম হল তখন সে চারদিক চেয়ে আবিষ্কার করলে দার্জিলিঙে জনতা আছে মানুষ নেই।

অমিত সবাইকে বলে গিয়েছিল, সে শিলঙে যাচ্ছে নির্জনতা ভোগের জন্যে— দুদিন না যেতেই বুঝলে, জনতা না থাকলে নির্জনতার স্বাদ মরে যায়। ক্যামেরা হাতে দৃশ্য দেখে বেড়াবার শখ অমিতর নেই। সে বলে, আমি টুরিস্ট না, মন দিয়ে চেখে খাবার ধাত আমার, চোখ দিয়ে গিলে খাবার ধাত একেবারেই নয়।

কিছুদিন ওর কাটল পাহাড়ের ঢালুতে দেওদার গাছের ছায়ায় বই পড়ে পড়ে। গল্পের বই ছুঁলে না, কেননা, ছুটিতে গল্পের বই পড়া সাধারণের দস্তুর। ও পড়তে লাগল সুনীতি চাটুজ্যের বাংলা ভাষার শব্দতত্ত্ব, লেখকের সঙ্গে মনান্তর ঘটবে এই একান্ত আশা মনে নিয়ে। এখানকার পাহাড় পর্বত অরণ্য ওর শব্দতত্ত্ব এবং আলস্য-জড়তার ফাঁকে ফাঁকে হঠাৎ সুন্দর ঠেকে, কিন্তু সেটা মনের মধ্যে পুরোপুরি ঘনিয়ে ওঠে না; যেন কোনো রাগিণীর একঘেয়ে আলাপের মতো, ধুয়ো নেই, তাল নেই, সম নেই। অর্থাৎ ওর মধ্যে বিস্তর আছে, কিন্তু এক নেই,—তাই এলানো জিনিস ছড়িয়ে পড়ে, জমা হয় না। অমিতর আপন নিখিলের মাঝখানে একের অভাবে ও যে কেবলই চঞ্চলভাবে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ছে, সে-দুঃখ ওর এখানেও যেমন শহরেও তেমনি। কিন্তু শহরে সেই চাঞ্চল্যটাকে সে নানাপ্রকারে ক্ষয় করে ফেলে, এখানে চাঞ্চল্যটাই স্থির হয়ে জমে জমে ওঠে। ঝরনা বাধা পেয়ে যেমন সরোবর হয়ে দাঁড়ায়। তাই ও যখন ভাবছে পালাই, পাহাড় বেয়ে নেমে গিয়ে পায়ে হেঁটে শিলেট শিলচরের ভিতর দিয়ে যেখানে খুশি, এমন সময় আষাঢ় এল পাহাড়ে পাহাড়ে বনে বনে তার সজল ঘনচ্ছায়ার চাদর লুটিয়ে। খবর পাওয়া গেল, চেরাপুঞ্জির গিরিশৃঙ্গ নববর্ষার মেঘদলের পুঞ্জিত আক্রমণ আপন বুক দিয়ে ঠেকিয়েছে; এইবার ঘন বর্ষণে গিরিনির্ঝরিণীগুলোকে খেপিয়ে কূলছাড়া করবে। স্থির করলে, এই সময়টাতে কিছুদিনের জন্যে চেরাপুঞ্জির ডাকবাংলায় এমন মেঘদূত জমিয়ে তুলবে যার অলক্ষ্য অলকার নায়িকা অশরীরী বিদ্যুতের মতো, চিত্ত-আকাশে ক্ষণে ক্ষণে চমক দেয়, নাম লেখে না, ঠিকানা রেখে যায় না।

সেদিন সে পরল হাইলাণ্ডারি মোটা কম্বলের মোজা, পুরু সুকতলাওআলা মজবুত চামড়ার জুতো, খাকি নরফোক কোর্তা, হাঁটু পর্যন্ত হ্রস্ব অধোবাস, মাথায় সোলা-টুপি। অবনী ঠাকুরের আঁকা যক্ষের মতো দেখতে হল না,—মনে হতে পারত রাস্তা তদারক করতে বেরিয়েছে ডিস্ট্রিক্ট এঞ্জিনিয়ার। কিন্তু পকেটে ছিল গোটা পাঁচ-সাত পাতলা এডিশনের নানা ভাষার কাব্যের বই।

আঁকাবাঁকা সরু রাস্তা, ডান দিকে জঙ্গলে-ঢাকা খদ। এ-রাস্তার শেষ লক্ষ্য অমিতর বাসা। সেখানে যাত্রী-সম্ভাবনা নেই, তাই সে আওয়াজ না করে অসতর্কভাবে গাড়ি হাঁকিয়ে চলেছে। ঠিক সেই সময়টা ভাবছিল, আধুনিক কালে দূরবর্তিনী প্রেয়সীর

জন্যে মোটর-দূতটাই প্রশস্ত—তার মধ্যে "ধূমজ্যোতিঃসলিলমরুতাং সন্নিপাতঃ" বেশ ঠিক পরিমাণেই আছে—আর চালকের হাতে একখানি চিঠি দিলে কিছুই অস্পষ্ট থাকে না। ও ঠিক করে নিলে আগামী বৎসরে আষাঢ়ের প্রথম দিনেই মেঘদূতবর্ণিত রাস্তা দিয়েই মোটরে করে যাত্রা করবে, হয়তো বা অদৃষ্ট ওর পথ চেয়ে "দেহলীদত্তপুষ্পা" যে-পথিকবধূকে এতকাল বসিয়ে রেখেছে সেই অবন্তিকা হ'ক বা মালবিকাই হ'ক, বা হিমালয়ের কোনো দেবদারুবনচারিণীই হ'ক ওকে হয়তো কোনো একটা অভাবনীয় উপলক্ষ্যে দেখা দিতেও পারে। এমন সময়ে হঠাৎ একটা বাঁকের মুখে এসেই দেখলে আর-একটা গাড়ি উপরে উঠে আসছে। পাশ-কাটাবার জায়গা নেই। ব্রেক কষতে কষতে গিয়ে পড়ল তার উপরে—পরস্পর আঘাত লাগল, কিন্তু অপঘাত ঘটল না। অন্য গাড়িটা খানিকটা গড়িয়ে পাহাড়ের গায়ে আটকে থেমে গেল।

একটি মেয়ে গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়াল। সদ্য মৃত্যু-আশঙ্কার কালো পটখানা তার পিছনে, তারই উপরে সে যেন ফুটে উঠল একটি বিদ্যুৎরেখায় আঁকা সুস্পষ্ট ছবি—চারিদিকের সমস্ত হতে স্বতন্ত্র। মন্দারপর্বতের নাড়া-খাওয়া ফেনিয়ে-ওঠা সমুদ্র থেকে এইমাত্র উঠে এলেন লক্ষ্মী, সমস্ত আন্দোলনের উপরে—মহাসাগরের বুক তখনো ফুলে ফুলে কেঁপে উঠছে। দুর্লভ অবসরে অমিত তাকে দেখলে। ড্রয়িংরুমে এ-মেয়ে অন্য পাঁচজনের মাঝখানে পরিপূর্ণ আত্মস্বরূপে দেখা দিত না। পৃথিবীতে হয়তো দেখবার যোগ্য লোক পাওয়া যায়, তাকে দেখবার যোগ্য জায়গাটি পাওয়া যায় না।

মেয়েটির পরনে সরু-পাড়-দেওয়া সাদা আলোয়ানের শাড়ি, সেই আলোয়ানেরই জ্যাকেট, পায়ে সাদা চামড়ার দিশি ছাঁদের জুতো। তনু দীর্ঘ দেহটি, বর্ণ চিকন শ্যাম, টানা চোখ ঘন পক্ষ্মচ্ছায়ায় নিবিড় স্নিগ্ধ, প্রশস্ত ললাট অবারিত করে পিছু হটিয়ে চুল আঁট করে বাঁধা, চিবুক ঘিরে সুকুমার মুখের ডৌলটি একটি অনতিপক্ব ফলের মতো রমণীয়। জ্যাকেটের হাত কবজি পর্যন্ত, দু-হাতে দুটি সরু প্লেন বালা। ব্রোচের বন্ধনহীন কাঁধের কাপড় মাথায় উঠেছে, কটকি-কাজ-করা রুপোর কাঁটা দিয়ে খোপার সঙ্গে বদ্ধ।

অমিত গাড়িতে টুপিটা খুলে রেখে তার সামনে চুপ করে এসে দাঁড়াল। যেন একটা পাওনা শাস্তির অপেক্ষায়। তাই দেখে মেয়েটির বুঝি দয়া হল, একটু কৌতুকও বোধ করলে। অমিত মৃদুস্বরে বললে, "অপরাধ করেছি।"

মেয়েটি হেসে বললে, "অপরাধ নয়, ভুল। সেই ভুলের শুরু আমার থেকেই।"

উৎসজলের যে-উচ্ছলতা ফুলে ওঠে, মেয়েটির কণ্ঠস্বর তারই মতো নিটোল। অল্পবয়সের বালকের গলার মতো মসৃণ এবং প্রশস্ত। সেদিন ঘরে ফিরে এসে অমিত

অনেকক্ষণ ভেবেছিল, এর গলার সুরে যে-একটি স্বাদ আছে, স্পর্শ আছে তাকে বর্ণনা করা যায় কী করে। নোটবইখানা খুলে লিখলে, "এ যেন অম্বুরি তামাকের হালকা ধোঁয়া, জলের ভিতর দিয়ে পাক খেয়ে আসছে,—নিকোটিনের ঝাঁজ নেই, আছে গোলাপজলের স্নিগ্ধ গন্ধ।"

মেয়েটি নিজের ত্রুটি ব্যাখ্যা করে বললে, "একজন বন্ধু আসার খবর পেয়ে খুঁজতে বেরিয়েছিলুম। এই রাস্তায় খানিকটা উঠতেই শোফার বলেছিল এ রাস্তা হতে পারে না। তখন শেষ পর্যন্ত না গিয়ে ফেরবার উপায় ছিল না। তাই উপরে চলেছিলেম। এমন সময় উপরওআলার ধাক্কা খেতে হল।"

অমিত বললে, "উপরওআলার উপরেও উপরওআলা আছে—একটা অতি কুশ্রী কুটিল গ্রহ, এ তারই কুকীর্তি।"

অপর পক্ষের ড্রাইভার জানালে, "লোকসান বেশি হয় নি, কিন্তু গাড়ি সেরে নিতে দেরি হবে।"

অমিত বললে, "আমার অপরাধী গাড়িটাকে যদি ক্ষমা করেন, তবে আপনি যেখানে অনুমতি করবেন সেইখানেই পৌঁছিয়ে দিতে পারি।"

"দরকার হবে না, পাহাড়ে হেঁটে চলা আমার অভ্যেস।"

"দরকার আমারই, মাপ করলেন তার প্রমাণ।"

মেয়েটি ঈষৎ দ্বিধায় নীরব রইল। অমিত বললে, "আমার তরফে আরও একটু কথা আছে। গাড়ি হাঁকাই,—বিশেষ একটা মহৎ কর্ম নয়—এ-গাড়ি চালিয়ে পস্টারিটি পর্যন্ত পৌঁছোবার পথ নেই। তবু আরম্ভে এই একটিমাত্র পরিচয়ই পেয়েছেন। অথচ এমনি কপাল, সেটুকুর মধ্যেও গলদ। উপসংহারে এটুকু দেখাতে দিন যে, জগতে অন্তত আপনার শোফারের চেয়ে আমি অযোগ্য নই।"

অপরিচিতের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ে অজানা বিপদের আশঙ্কায় মেয়েরা সংকোচ সরাতে চায় না। কিন্তু বিপদের এক ধাক্কায় উপক্রমণিকার অনেকখানি বিস্তৃত বেড়া একদমে গেল ভেঙে। কোন্ দৈব নির্জন পাহাড়ের পথে হঠাৎ মাঝখানে দাঁড় করিয়ে দুজনের মনে দেখাদেখির গাঁঠ বেঁধে দিলে; সবুর করলে না। আকস্মিকের বিদ্যুৎ-আলোতে এমন করে যা চোখে পড়ল, প্রায় মাঝে মাঝে এ যে রাত্রে জেগে উঠে অন্ধকারের পটে দেখা যাবে। চৈতন্যের মাঝখানটাতে তার গভীর ছাপ পড়ে গেল, নীল আকাশের উপরে সৃষ্টির কোন্ এক প্রচণ্ড ধাক্কায় যেমন সূর্য-নক্ষত্রের আগুন-জ্বলা ছাপ।

মুখে কথা না বলে মেয়েটি গাড়িতে উঠে বসল। তার নির্দেশমতো গাড়ি পৌঁছোল

যথাস্থানে। মেয়েটি গাড়ি থেকে নেমে বললে, "কাল যদি আপনার সময় থাকে একবার এখানে আসবেন, আমাদের কর্তা-মার সঙ্গে আপনার আলাপ করিয়ে দেব।"

অমিতর ইচ্ছে হল বলে, "আমার সময়ের অভাব নেই, এখনই আসতে পারি।" সংকোচে বলতে পারলে না।

বাড়ি ফিরে এসে ওর নোট-বই নিয়ে লিখতে লাগল: "পথ আজ হঠাৎ এ কী পাগলামি করলে। দুজনকে দু-জায়গা থেকে ছিঁড়ে এনে আজ থেকে হয়তো এক রাস্তায় চালান করে দিলে। অ্যাস্ট্রনমার ভুল বলেছে। অজানা আকাশ থেকে চাঁদ এসে পড়েছিল পৃথিবীর কক্ষপথে,—লাগল তাদের মোটরে মোটরে ধাক্কা, সেই মরণের তাড়নার পর থেকে যুগে যুগে দুজনে একসঙ্গেই চলেছে, এর আলো ওর মুখে পড়ে, ওর আলো এর মুখে। চলার বাঁধন আর ছেড়ে না। মনের ভিতরটা বলছে, আমাদের শুরু হল যুগলচলন, আমরা চলার সূত্রে গাঁথব ক্ষণে ক্ষণে কুড়িয়ে-পাওয়া উজ্জ্বল নিমেষ-গুলির মালা। বাঁধা মাইনের বাঁধা খোরাকিতে ভাগ্যের দ্বারে পড়ে থাকবার জো রইল না: আমাদের দেনাপাওনা সবই হবে হঠাৎ।"

বাইরে বৃষ্টি পড়ছে। বারান্দায় ঘন ঘন পায়চারি করতে করতে অমিত মনে মনে বলে উঠল, "কোথায় আছ নিবারণ চক্রবর্তী। এইবার ভর করো আমার 'পরে, বাণী দাও, বাণী দাও!" বেরোল লম্বা সরু খাতাটা, নিবারণ চক্রবর্তী বলে গেল:

পথ বেঁধে দিল বন্ধনহীন গ্রন্থি,
আমরা দুজন চলতি হাওয়ার পন্থী।
রঙিন নিমেষ ধুলার দুলাল
পরানে ছড়ায় আবীর গুলাল,
ওড়না ওড়ায় বর্ষার মেঘে
দিগঙ্গনার নৃত্য,
হঠাৎ-আলোর ঝলকানি লেগে
ঝলমল করে চিত্ত।

নাই আমাদের কনক-চাঁপার কুঞ্জ,
বনবীথিকায় কীর্ণ বকুলপুঞ্জ।
হঠাৎ কখন সন্ধ্যেবেলায়
নামহারা ফুল গন্ধ এলায়,

প্রভাতবেলায় হেলাভরে করে
অরুণ মেঘেরে তুচ্ছ,
উদ্ধত যত শাখার শিখরে
রডোডেনড্রনগুচ্ছ।

নাই আমাদের সঞ্চিত ধনরত্ন,
নাই রে ঘরের লালন-ললিত যত্ন।
পথপাশে পাখি পুচ্ছ নাচায়,
বন্ধন তারে করি না খাঁচায়,
ডানা-মেলে-দেওয়া মুক্তিপ্রিয়ের
কূজনে দুজনে তৃপ্ত।
আমরা চকিত অভাবনীয়ের
ক্বচিৎ কিরণে দীপ্ত।

এইখানে একবার পিছন ফেরা চাই। পশ্চাতের কথাটা সেরে নিতে পারলে গল্পটার সামনে এগোবার বাধা হবে না।

পূর্ব ভূমিকা

বাংলাদেশে ইংরেজি শিক্ষার প্রথম পর্যায়ে চণ্ডীমণ্ডপের হাওয়ার সঙ্গে স্কুলকলেজের হাওয়ার তাপের বৈষম্য ঘটাতে সমাজবিদ্রোহের যে-ঝড় উঠেছিল সেই ঝড়ের চাঞ্চল্যে ধরা দিয়েছিলেন জ্ঞানদাশংকর। তিনি সেকালের লোক, কিন্তু তাঁর তারিখটা হঠাৎ পিছলিয়ে সরে এসেছিল অনেকখানি একালে। তিনি আগাম জন্মেছিলেন। বুদ্ধিতে বাক্যে ব্যবহারে তিনি ছিলেন তাঁর বয়সের লোকদের অসমসাময়িক। সমুদ্রের ঢেউ-বিলাসী পাখির মতো লোকনিন্দার ঝাপট বুক পেতে নিতেই তাঁর আনন্দ ছিল।

এমন সকল পিতামহের নাতিরা যখন এই রকম তারিখের বিপর্যয় সংশোধন করতে চেষ্টা করে তখন তারা এক দৌড়ে পৌঁছোয় পঞ্জিকার একেবারে উলটো দিকের টার্মিনসে। এ-ক্ষেত্রেও তাই ঘটল। জ্ঞানদাশংকরের নাতি বরদাশংকর বাপের মৃত্যুর পর যুগ-হিসাবে বাপ-পিতামহের প্রায় আদিম পূর্বপুরুষ হয়ে উঠলেন। মনসাকেও হাত জোড় করেন, শীতলাকেও মা বলে ঠাণ্ডা করতে চান। মাদুলি ধুয়ে জল খাওয়া শুরু হল; সহস্র দুর্গানাম লিখতে লিখতে দিনের পূর্বাহ্ন যায় কেটে; তাঁর এলেকায় যে-বৈশ্যদল নিজেদের

দ্বিজত্ব প্রমাণ করতে মাথা ঝাঁকা দিয়ে উঠেছিল অন্তরে বাহিরে সকল দিক থেকেই তাদের বিচলিত করা হল, হিন্দুত্বরক্ষার উপায়গুলিকে বিজ্ঞানের স্পর্শদোষ থেকে বাঁচাবার উদ্দেশ্যে ভাটপাড়ার সাহায্যে অসংখ্য প্যাম্ফলেট ছাপিয়ে আধুনিক বুদ্ধির কপালে বিনামূল্যে ঋষিবাক্যবর্ষণ করতে কার্পণ্য করলেন না। অতি অল্পকালের মধ্যেই ক্রিয়াকর্মে, জপে তপে, আসনে আচমনে, ধ্যানে স্নানে, ধূপে ধুনোয়, গোব্রাহ্মণ সেবায় শুদ্ধাচারের অচল দুর্গ নিশ্ছিদ্র করে বানালেন। অবশেষে গোদান, স্বর্ণদান, ভূমিদান, কন্যাদায় পিতৃদায় মাতৃদায় হরণ প্রভৃতির পরিবর্তে অসংখ্য ব্রাহ্মণের অজস্র আশীর্বাদ বহন করে তিনি লোকান্তরে যখন গেলেন তখন তাঁর সাতাশ বছর বয়স।

এঁরই পিতার পরম বন্ধু, তাঁরই সঙ্গে এক কলেজে-পড়া, একই হোটেলে চপ-কাটলেট-খাওয়া, রামলোচন বাঁড়ুজ্যের কন্যা যোগমায়ার সঙ্গে বরদার বিবাহ হয়েছিল। ঠিক সেই সময়ে যোগমায়ার পিতৃকুলের সঙ্গে পতিকুলের ব্যবহারগত বর্ণভেদ ছিল না। এঁর বাপের ঘরে মেয়েরা পড়াশুনো করেন, বাইরে বেরোন, এমন কি, তাঁদের কেউ-কেউ মাসিকপত্রে সচিত্র ভ্রমণবৃত্তান্তও লিখেছেন। সেই বাড়ির মেয়ের শুচি সংস্করণে যাতে অনুস্বার-বিসর্গের ভুল-চুক না থাকে সেই চেষ্টায় লাগলেন তাঁর স্বামী। সনাতন সীমান্ত-রক্ষা নীতির অটল শাসনে যোগমায়ার গতিবিধি বিবিধ পাসপোর্ট প্রণালীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হল। চোখের উপরে তাঁর ঘোমটা নামল, মনের উপরেও। দেবী সরস্বতী যখন কোনো অবকাশে এঁদের অন্তঃপুরে প্রবেশ করতেন তখন পাহারায় তাঁকেও কাপড়ঝাড়া দিয়ে আসতে হত। তাঁর হাতের ইংরেজি বইগুলো বাইরেই হত বাজেয়াপ্ত,—প্রাগ্‌বঙ্কিম বাংলা সাহিত্যের পরবর্তী রচনা ধরা পড়লে চৌকাঠ পার হতে পেত না। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের উৎকৃষ্ট বাঁধাই বাংলা অনুবাদ যোগমায়ার শেলফে অনেক কাল থেকে অপেক্ষা করে আছে। অবসর-বিনোদন উপলক্ষ্যে সেটা তিনি আলোচনা করবেন এমন একটা আগ্রহ এ-বাড়ির কর্তৃপক্ষের মনে অন্তিমকাল পর্যন্তই ছিল। এই পৌরাণিক লোহার সিন্দুকের মধ্যে নিজেকে সেফ ডিপজিটের মতো ভাঁজ করে রাখা যোগমায়ার পক্ষে সহজ ছিল না, তবু বিদ্রোহী মনকে শাসনে রেখেছিলেন। এই মানসিক অবরোধের মধ্যে তাঁর একমাত্র আশ্রয় ছিলেন দীনশরণ বেদান্তরত্ন। এঁদের সভাপণ্ডিত। যোগমায়ার স্বাভাবিক স্বচ্ছ বুদ্ধি তাঁকে অত্যন্ত ভালো লেগেছিল। তিনি স্পষ্টই বলতেন, "মা, এ-সমস্ত ক্রিয়াকর্মের জঞ্জাল তোমার জন্যে নয়। যারা মূঢ়, তারা কেবল যে নিজেদেরকে নিজেরাই ঠকায় তা নয়, পৃথিবী সুদ্ধ সমস্ত কিছুই তাদের ঠকাতে থাকে। তুমি কি মনে কর আমরা এ-সমস্ত বিশ্বাস করি? দেখ নি কি, বিধান দেবার বেলায় আমরা প্রয়োজন বুঝে শাস্ত্রকে ব্যাকরণের প্যাঁচে উলটপালট করতে

দুঃখ বোধ করি না—তার মানে, মনের মধ্যে আমরা বাঁধন মানি নে, বাইরে আমাদের মূঢ় সাজতে হয় মূঢ়দের খাতিরে। তুমি নিজে যখন ভুলতে চাও না, তখন তোমাকে ভোলাবার কাজ আমার দ্বারা হবে না। যখন ইচ্ছা করবে, মা, আমাকে ডেকে পাঠিয়ো, আমি যা সত্য বলে জানি তাই তোমাকে শাস্ত্র থেকে শুনিয়ে যাব।"

এক-একদিন তিনি এসে যোগমায়াকে কখনো গীতা কখনো ব্রহ্মভাষ্য থেকে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে যেতেন। যোগমায়া তাঁকে এমন বুদ্ধিপূর্বক প্রশ্ন করতেন যে, বেদান্তরত্ন-মশায় পুলকিত হয়ে উঠতেন, এঁর কাছে আলোচনায় তাঁর উৎসাহের অন্ত থাকত না। বরদাশংকর তাঁর চারিদিকে ছোটোবড়ো যে-সব গুরু ও গুরুতরদের জুটিয়েছিলেন, তাদের প্রতি বেদান্তরত্নমশায়ের বিপুল অবজ্ঞা ছিল; তিনি যোগমায়াকে বলতেন, "মা, সমস্ত শহরে একমাত্র এই তোমার ঘরে কথা কয়ে আমি সুখ পাই। তুমি আমাকে আত্মধিক্কার থেকে বাঁচিয়েছ।" এমনি করে কিছুকাল নিরবকাশ ব্রত-উপবাসের মধ্যে পঞ্জিকার শিকলি-বাঁধা দিনগুলো কোনোমতে কেটে গেল। জীবনটা আগাগোড়াই হয়ে উঠল আজকালকার খবরের কাগজি কিম্ভূত ভাষায় যাকে বলে "বাধ্যতামূলক।" স্বামীর মৃত্যুর পরেই তাঁর ছেলে যতিশংকর ও মেয়ে সুরমাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। শীতের সময় থাকেন কলকাতায়, গরমের সময়ে কোনো একটা পাহাড়ে। যতিশংকর এখন পড়ছে কলেজে; কিন্তু সুরমাকে পড়াবার মতো কোনো মেয়ে-বিদ্যালয় তাঁর পছন্দ না হওয়াতে বহুসন্ধানে তার শিক্ষার জন্যে লাবণ্যলতাকে পেয়েছেন। তারই সঙ্গে আজ সকালে আচমকা অমিতর দেখা।

৪

লাবণ্য-পুরাবৃত্ত

লাবণ্যের বাপ অবনীশ দত্ত এক পশ্চিমি কালেজের অধ্যক্ষ। মাতৃহীন মেয়েকে এমন করে মানুষ করেছেন যে, বহু পরীক্ষা পাসের ঘষাঘষিতেও তার বিদ্যাবুদ্ধিতে লোকসান ঘটাতে পারে নি। এমন কি, এখনও তার পাঠানুরাগ রয়েছে প্রবল।

বাপের একমাত্র শখ ছিল বিদ্যায়, মেয়েটির মধ্যে তাঁর সেই শখটির সম্পূর্ণ পরিতৃপ্তি হয়েছিল। নিজের লাইব্রেরির চেয়েও তাকে ভালোবাসতেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল জ্ঞানের চর্চায় যার মনটা নিরেট হয়ে ওঠে, সেখানে উড়ো ভাবনার গ্যাস নিচে থেকে ঠেলে ওঠবার মতো সমস্ত ফাটল মরে যায়, সে-মানুষের পক্ষে বিয়ে করবার দরকার হয় না। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস যে, তাঁর মেয়ের মনে স্বামী-সেবা আবাদের যোগ্য যে নরম

জমিটুকু বাকি থাকতে পারত সেটা গণিতে ইতিহাসে সিমেন্ট করে গাঁথা হয়েছে—খুব মজবুত পাকা মন যাকে বলা যেতে পারে—বাইরে থেকে আঁচড় লাগলে দাগ পড়ে না। তিনি এতদূর পর্যন্ত ভেবে রেখেছিলেন যে, লাবণ্যের নাই বা হল বিয়ে, পাণ্ডিত্যের সঙ্গেই চিরদিন নয় গাঁঠবাঁধা হয়ে থাকল।

তাঁর আর একটি স্নেহের পাত্র ছিল। তার নাম শোভনলাল। অল্প বয়সে পড়ার প্রতি এত মনোযোগ আর কারও দেখা যায় না। প্রশস্ত কপালে, চোখের ভাবের স্বচ্ছতায়, ঠোঁটের ভাবের সৌজন্যে, হাসির ভাবের সরলতায়, মুখের ভাবের সৌকুমার্যে তার চেহারাটি দেখবামাত্র মনকে টানে। মানুষটি নেহাত মুখচোরা, তার প্রতি একটু মনোযোগ দিলে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

গরিবের ছেলে, ছাত্রবৃত্তির সোপানে সোপানে দুর্গম পরীক্ষার শিখরে শিখরে উত্তীর্ণ হয়ে চলেছে। ভবিষ্যতে শোভন যে নাম করতে পারবে, আর সেই খ্যাতি গড়ে তোলবার প্রধান কারিগরদের ফর্দে অবনীশের নামটা সকলের উপরে থাকবে এই গর্ব অধ্যাপকের মনে ছিল। শোভন আসত তাঁর বাড়িতে পড়া নিতে, তাঁর লাইব্রেরিতে ছিল তার অবাধ সঞ্চরণ। লাবণ্যকে দেখলে সে সংকোচে নত হয়ে যেত। এই সংকোচের অতিদূরত্ববশত শোভনলালের চেয়ে নিজের মাপটাকে বড়ো করে দেখতে লাবণ্যর বাধা ছিল না। দ্বিধা করে নিজেকে যে-পুরুষ যথেষ্ট জোরের সঙ্গে প্রত্যক্ষ না করায় মেয়েরা তাকে যথেষ্ট স্পষ্ট করে প্রত্যক্ষ করে না।

এমন সময় একদিন শোভনলালের বাপ ননিগোপাল অবনীশের বাড়িতে চড়াও হয়ে তাঁকে খুব একচোট গাল পেড়ে গেল। নালিশ এই যে, অবনীশ নিজের ঘরে অধ্যাপনার ছুতোয় বিবাহের ছেলে-ধরা ফাঁদ পেতেছেন, বৈদ্যর ছেলে শোভনলালের জাত মেরে সমাজ-সংস্কারের শখ মেটাতে চান। এই অভিযোগের প্রমাণ স্বরূপে পেনসিলে-আঁকা লাবণ্যলতার এক ছবি দাখিল করলে। ছবিটা আবিষ্কৃত হয়েছে শোভনলালের টিনের প্যাটরার ভিতর থেকে, গোলাপফুলের পাপড়ি দিয়ে আচ্ছন্ন। ননিগোপালের সন্দেহ ছিল না, এই ছবিটি লাবণ্যেরই প্রণয়ের দান। পাত্র হিসাবে শোভনলালের বাজার দর যে কত বেশি, এবং আর কিছুদিন সবুর করে থাকলে সে-দাম যে কত বেড়ে যাবে ননিগোপালের হিসাবি বুদ্ধিতে সেটা কড়ায়-গণ্ডায় মেলানো ছিল। এমন মূল্যবান জিনিসকে অবনীশ বিনামূল্যে দখল করবার ফন্দি করছেন এটাকে সিঁধ কেটে চুরি ছাড়া আর কী নাম দেওয়া যেতে পারে? টাকা চুরির থেকে এর লেশমাত্র তফাত কোথায়?

এতদিন লাবণ্য জানতেই পারে নি, কোনো প্রচ্ছন্ন বেদীতে শ্রদ্ধাহীন লোকচক্ষুর

অগোচরে তার মূর্তিপূজা প্রচলিত হয়েছে। অবনীশের লাইব্রেরির এক কোণে নানাবিধ প্যাম্ফলেট ম্যাগাজিন প্রভৃতি আবর্জনার মধ্যে লাবণ্যর একটি অযত্নম্লান ফোটোগ্রাফ দৈবাৎ শোভনের হাতে পড়েছিল, সেইটে নিয়ে ওর কোনো আর্টিস্ট বন্ধুকে দিয়ে ছবি করিয়ে ফোটোগ্রাফটি আবার যথাস্থানে ফিরিয়ে রেখেছে। গোলাপফুলগুলিও ওর তরুণ মনের সলজ্জ গোপন ভালোবাসারই মতো সহজে ফুটেছিল একটি বন্ধুর বাগানে, তার মধ্যে কোনো অনধিকার ঔদ্ধত্যের ইতিহাস নেই। অথচ শাস্তি পেতে হল। লাজুক ছেলেটি মাথা হেঁট করে, মুখ লাল করে, গোপনে চোখের জল মুছে এই বাড়ি থেকে বিদায় নিয়ে গেল। দূর থেকে শোভনলাল তার আত্মনিবেদনের একটি শেষ পরিচয় দিলে, সেই বিবরণটা অন্তর্যামী ছাড়া আর কেউ জানত না। বি. এ পরীক্ষায় সে যখন পেয়েছিল প্রথম স্থান, লাবণ্য পেয়েছিল তৃতীয়। সেটাতে লাবণ্যকে বড়ো বেশি আত্মলাঘব-দুঃখ দিয়েছিল। তার দুটো কারণ ছিল, এক হচ্ছে শোভনের বুদ্ধির 'পরে অবনীশের অত্যন্ত শ্রদ্ধা নিয়ে লাবণ্যকে অনেকদিন আঘাত করেছে। এই শ্রদ্ধার সঙ্গে অবনীশের বিশেষ স্নেহ মিশে থাকাতে পীড়াটা আরও হয়েছিল বেশি। শোভনকে পরীক্ষার ফলে ছাড়িয়ে যাবার জন্যে সে চেষ্টা করেছিল খুব প্রাণপণেই। তবুও শোভন যখন তাকে ছাড়িয়ে গেল তখন এই স্পর্ধার জন্যে তাকে ক্ষমা করাই শক্ত হয়ে উঠল। তার মনে কেমন একটা সন্দেহ লেগে রইল যে, বাবা তাকে বিশেষভাবে সাহায্য করাতেই উভয় পরীক্ষিতের মধ্যে ফলবৈষম্য ঘটল, অথচ পরীক্ষার পড়া সম্বন্ধে শোভনলাল কোনো দিন অবনীশের কাছে এগোয় নি। কিছুদিন পর্যন্ত শোভনলালকে দেখলেই লাবণ্য মুখ ফিরিয়ে চলে যেত। এম এ-পরীক্ষাতেও শোভনের প্রতিযোগিতায় লাবণ্যর জেতবার কোনো সম্ভাবনা ছিল না। তবু হল জিত। স্বয়ং অবনীশ আশ্চর্য হয়ে গেলেন। শোভনলাল যদি কবি হত তাহলে হয়তো সে খাতা ভরে কবিতা লিখত—তার বদলে আপন পরীক্ষা পাসের অনেকগুলো মোটা মার্কা সে লাবণ্যর উদ্দেশে উৎসর্গ করে দিলে।

তার পরে এদের ছাত্রদশা গেল কেটে। এমন সময় অবনীশ হঠাৎ প্রচণ্ড পীড়ায় নিজের মধ্যেই প্রমাণ পেলেন যে, জ্ঞানের চর্চায় মনটা ঠাসবোঝাই থাকলেও মনসিজ তার মধ্যেই কোথা থেকে বাধা ঠেলে উঠে পড়েন, একটুও স্থানাভাব হয় না। তখন অবনীশ সাতচল্লিশ,—সেই নিরতিশয় দুর্বল নিরুপায় বয়সে একটি বিধবা তাঁর হৃদয়ে প্রবেশ করলে, একেবারে তাঁর লাইব্রেরির গ্রন্থব্যূহ ভেদ করে, তাঁর পাণ্ডিত্যের প্রাকার ডিঙিয়ে। বিবাহে আর কোনো বাধা ছিল না, একমাত্র বাধা লাবণ্যর প্রতি অবনীশের স্নেহ। ইচ্ছার সঙ্গে বিষম লড়াই বাধল। পড়াশুনো করতে যান খুবই

জোরের সঙ্গে, কিন্তু তার চেয়ে জোর আছে এমন কোনো একটা চমৎকারা চিন্তা পড়াশুনোর কাঁধে চেপে বসে। সমালোচনার জন্যে মডার্নরিভিয়ু থেকে তাঁকে লোভনীয় বই পাঠানো হয় বৌদ্ধধ্বংসাবশেষের পুরাবৃত্ত নিয়ে,—অনুদ্‌ঘাটিত বইয়ের সামনে স্থির হয়ে বসে থাকেন, এক ভাঙা বৌদ্ধস্তূপেরই মতো যার উপরে চেপে আছে বহুশত বৎসরের মৌন। সম্পাদক ব্যস্ত হয়ে ওঠেন, কিন্তু জ্ঞানীর স্তূপাকার জ্ঞান যখন একবার টলে তখন তার দশা এইরকমই হয়ে থাকে। হাতি যখন চোরাবালিতে পা দেয় তখন তার বাঁচবার উপায় কী?

এতদিন পরে অবনীশের মনে একটা পরিতাপ ব্যথা দিতে লাগল। তাঁর মনে হল, তিনি হয়তো পুঁথির পাতা থেকে চোখ তুলে দেখবার অবকাশ না পাওয়াতে দেখেন নি যে, শোভনলালকে তাঁর মেয়ে ভালোবেসেছে, কারণ শোভনের মতো ছেলেকে না ভালোবাসতে পারাটাই অস্বাভাবিক। সাধারণভাবে বাপ-জাতটার 'পরেই রাগ ধরল, নিজের উপরে, ননিগোপালের 'পরে।

এমন সময় শোভনের কাছ থেকে এক চিঠি এল। প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তির জন্যে গুপ্তরাজবংশের ইতিহাস আশ্রয় করে পরীক্ষার প্রবন্ধ লিখবে বলে সে তাঁর লাইব্রেরি থেকে গুটিকতক বই ধার চায়। তখনই তিনি তাকে বিশেষ আদর করে চিঠি লিখলেন, বললেন, "পূর্বের মতোই আমার লাইব্রেরিতে বসেই তুমি কাজ করবে, কিছুমাত্র সংকোচ করবে না।"

শোভনলালের মনটা চঞ্চল হয়ে উঠল। সে ধরে নিলে, এমন উৎসাহপূর্ণ চিঠির পিছনে হয়তো লাবণ্যর সম্মতি প্রচ্ছন্ন আছে। সে লাইব্রেরিতে আসতে আরম্ভ করলে। ঘরের মধ্যে যাওয়া-আসার পথে দৈবাৎ কখনো ক্ষণকালের জন্যে লাবণ্যর সঙ্গে দেখা হয়। তখন শোভন গতিটাকে একটু মন্দ করে আনে। ওর একান্ত ইচ্ছে, লাবণ্য তাকে একটা কোনো কথা বলে, জিজ্ঞাসা করে, কেমন আছ; যে-প্রবন্ধ নিয়ে ও ব্যাপৃত, সে-সম্বন্ধে কিছু কৌতূহল প্রকাশ করে। যদি করত তবে খাতা খুলে এক সময় লাবণ্যর সঙ্গে আলোচনা করতে পারলে ও বেঁচে যেত। ওর কতকগুলি নিজের উদ্‌ভাবিত বিশেষ মত সম্বন্ধে লাবণ্যর মত কী, জানবার জন্যে ওর অত্যন্ত ঔৎসুক্য। কিন্তু এ-পর্যন্ত কোনো কথাই হল না, গায়ে-পড়ে কিছু বলতে পারে এমন সাহসও ওর নেই।

এমন কয়েক দিন যায়। সেদিন রবিবার। শোভনলাল তার খাতাপত্র টেবিলের উপর সাজিয়ে একখানা বই নিয়ে পাতা ওলটাচ্ছে, মাঝে মাঝে নোট নিচ্ছে। তখন দুপুরবেলা, ঘরে কেউ নেই। ছুটির দিনের সুযোগ নিয়ে অবনীশ কোন্ এক বাড়িতে যাচ্ছেন তার নাম করলেন না,—বলে গেলেন, আজ আর চা খেতে আসবেন না।

হঠাৎ একসময় ভেজানো দরজা জোরে খুলে গেল। শোভনলালের বুকটা ধড়াস করে উঠল কেঁপে। লাবণ্য ঘরে ঢুকল। শোভন শশব্যস্ত হয়ে উঠে কী করবে ভেবে পেল না। লাবণ্য অগ্নিমূর্তি ধরে বললে, "আপনি কেন এ-বাড়িতে আসেন ?"

শোভনলাল চমকে উঠল, মুখে কোনো উত্তর এল না।

"আপনি জানেন, এখানে আসা নিয়ে আপনার বাবা কী বলেছেন ? আমার অপমান ঘটাতে আপনার সংকোচ নেই ?"

শোভনলাল চোখ নিচু করে বললে, "আমাকে মাপ করবেন, আমি এখনই যাচ্ছি।"

এমন উত্তর পর্যন্ত দিলে না যে, লাবণ্যর পিতা তাকে স্বয়ং আমন্ত্রণ করে এনেছেন। সে তার খাতাপত্র সমস্ত সংগ্রহ করে নিলে। হাত থর থর করে কাঁপছে ; বোবা একটা ব্যথা বুকের পাঁজরগুলোকে ঠেলা দিয়ে উঠতে চায়, রাস্তা পায় না। মাথা হেঁট করে বাড়ি থেকে সে চলে গেল।

যাকে খুবই ভালোবাসা যেতে পারত, তাকে ভালোবাসবার অবসর যদি কোনো একটা বাধায় ঠেকে ফসকে যায়, তখন সেটা না-ভালোবাসায় দাঁড়ায় না, সেটা দাঁড়ায় একটা অন্ধ বিদ্বেষে, ভালোবাসারই উলটো পিঠে। একদিন শোভনলালকে বরদান করবে বলেই বুঝি লাবণ্য নিজের অগোচরেই অপেক্ষা করে বসে ছিল। শোভনলাল তেমন করে ডাক দিলে না। তার পরে যা-কিছু হল সবই গেল তার বিরুদ্ধে। সকলের চেয়ে বেশি আঘাত দিলে এই শেষকালটায়। লাবণ্য মনের ক্ষোভে বাপের প্রতি নিতান্ত অন্যায় বিচার করলে। তার মনে হল, নিজে নিষ্কৃতি পাবেন ইচ্ছে করেই শোভনলালকে তিনি আবার নিজে থেকে ডেকে এনেছেন, ওদের দুজনের মিলন ঘটাবার কামনায়। তাই এমন দারুণ ক্রোধ হল সেই নিরপরাধের উপরে।

তার পর থেকে লাবণ্য ক্রমাগতই জেদ করে করে অবনীশের বিবাহ ঘটাল। অবনীশ তাঁর সঞ্চিত টাকার প্রায় অর্ধাংশ তাঁর মেয়ের জন্যে স্বতন্ত্র করে রেখেছিলেন। তাঁর বিবাহের পরে লাবণ্য বলে বসল, সে তার পৈতৃক সম্পত্তি কিছুই নেবে না, স্বাধীন উপার্জন করে চালাবে। অবনীশ মর্মাহত হয়ে বললেন, "আমি তো বিয়ে করতে চাই নি, লাবণ্য, তুমিই তো জেদ করে বিয়ে দিইয়েছ। তবে কেন আজ আমাকে তুমি এমন করে ত্যাগ করছ ?"

লাবণ্য বললে, "আমাদের সম্বন্ধ কোনোকালে যাতে ক্ষুণ্ণ না হয়, সেইজন্যেই আমি এই সংকল্প করেছি। তুমি কিছু ভেবো না, বাবা। যে-পথে আমি যথার্থ সুখী হব, সেই পথে তোমার আশীর্বাদ চিরদিন রেখো।"

কাজ তার জুটে গেল। সুরমাকে পড়াবার সম্পূর্ণ ভার তার উপরে। যতিকেও

অনায়াসে পড়াতে পারত, কিন্তু মেয়ে-শিক্ষয়িত্রীর কাছে পড়বার অপমান স্বীকার করতে যতি কিছুতেই রাজি হল না।

প্রতিদিনের বাঁধা কাজে জীবন একরকম চলে যাচ্ছিল। উদ্‌বৃত্ত সময়টা ঠাসা ছিল ইংরেজি সাহিত্যে, প্রাচীন কাল থেকে আরম্ভ করে হালের বার্নার্ড শ'র আমল পর্যন্ত, এবং বিশেষভাবে গ্রীক ও রোমান যুগের ইতিহাসে, গ্রোট, গিবন ও গিলবার্ট মারের রচনায়। কোনো কোনো অবকাশে একটা চঞ্চল হাওয়া এসে মনের ভিতরটা যে একটু এলোমেলো করে যেত না তা বলতে পারি নে, কিন্তু হাওয়ার চেয়ে স্থূল ব্যাঘাত হঠাৎ ঢুকে পড়তে পারে ওর জীবনযাত্রার মধ্যে এমন প্রশস্ত ফাঁক ছিল না। এমন সময় ব্যাঘাত এসে পড়ল মোটরগাড়িতে চড়ে, পথের মাঝখানে, কোনো আওয়াজমাত্র না করে। হঠাৎ গ্রীস-রোমের বিরাট ইতিহাসটা হালকা হয়ে গেল ;—আর-সমস্ত-কিছুকে সরিয়ে দিয়ে অত্যন্ত নিকটের একটা নিবিড় বর্তমান ওকে নাড়া দিয়ে বললে, "জাগো"। লাবণ্য এক মুহূর্তে জেগে উঠে এতদিন পরে আপনাকে বাস্তবরূপে দেখতে পেলে, জ্ঞানের মধ্যে নয়, বেদনার মধ্যে।

৫

আলাপের আরম্ভ

অতীতের ভগ্নাবশেষ থেকে এবার ফিরে আসা যাক বর্তমানের নতুন সৃষ্টির ক্ষেত্রে।

লাবণ্য পড়বার ঘরে অমিতকে বসিয়ে রেখে যোগমায়াকে খবর দিতে গেল। সে-ঘরে অমিত বসল যেন পদ্মের মাঝখানটাতে ভ্রমরের মতো। চারিদিকে চায়, সকল জিনিস থেকেই কিসের ছোঁওয়া লাগে,ওর মনটাকে দেয় উদাস করে। শেলফে, পড়বার টেবিলে ইংরেজি সাহিত্যের বই দেখলে ; সে-বইগুলো যেন বেঁচে উঠেছে। সব লাবণ্যর পড়া বই, তার আঙুলে পাতা-ওলটানো, তার দিনরাত্রির ভাবনা-লাগা, তার উৎসুক দৃষ্টির পথ-চলা, তার অন্যমনস্ক দিনে কোলের উপর পড়ে-থাকা বই। চমকে উঠল যখন টেবিলে দেখতে পেলে ইংরেজ কবি ডন-এর কাব্যসংগ্রহ। অক্‌সফোর্ডে থাকতে ডন এবং তাঁর সময়কার কবিদের গীতিকাব্য ছিল অমিতর প্রধান আলোচ্য, এইখানে এই কাব্যের উপর দৈবাৎ দুজনের মন এক জায়গায় এসে পরস্পরকে স্পর্শ করল।

এতদিনকার নিরুৎসুক দিনরাত্রির দাগ লেগে অমিতর জীবনটা ঝাপসা হয়ে গিয়েছিল,

যেন মাস্টারের হাতে ইস্কুলের প্রতি বছরে পড়ানো একটা ঢিলে মলাটের টেক্সটবুক। আগামী দিনটার জন্য কোনো কৌতূহল ছিল না আর বর্তমান দিনটাকে পুরো মন দিয়ে অভ্যর্থনা করা ওর পক্ষে ছিল অনাবশ্যক। এখন সে এইমাত্র এসে পৌঁছোল একটা নতুন গ্রহে; এখানে বস্তুর ভার কম; পা মাটি ছাড়িয়ে যেন উপর দিয়ে চলে; প্রতিমুহূর্ত ব্যগ্র হয়ে অভাবনীয়ের দিকে এগোতে থাকে; গায়ে হাওয়া লাগে আর সমস্ত শরীরটা যেন বাঁশি হয়ে উঠতে ইচ্ছে করে; আকাশের আলো রক্তের মধ্যে প্রবেশ করে, আর ওর অন্তরে অন্তরে যে-উত্তেজনার সঞ্চার হয় সেটা গাছের সর্বাঙ্গপ্রবাহিত রসের মধ্যে ফুল-ফোটাবার উত্তেজনার মতো। মনের উপর থেকে কতদিনের ধুলো-পড়া পর্দা উঠে গেল, সামান্য জিনিসের থেকে ফুটে উঠছে অসামান্যতা। তাই যোগমায়া যখন ধীরে ধীরে ঘরে এসে প্রবেশ করলেন সেই অতি সহজ ব্যাপারেও আজ অমিতকে বিস্ময় লাগল। সে মনে মনে বললে, "আহা, এ তো আগমন নয়, এ যে আবির্ভাব।"

চল্লিশের কাছাকাছি তাঁর বয়স, কিন্তু বয়সে তাঁকে শিথিল করে নি, কেবল তাঁকে গম্ভীর শুভ্রতা দিয়েছে। গৌরবর্ণ মুখ টস টস করছে। বৈধব্যরীতিতে চুল ছাঁটা; মাতৃভাবে পূর্ণ প্রসন্ন চোখ; হাসিটি স্নিগ্ধ। মোটা থান চাদরে মাথা বেষ্টন ক'রে সমস্ত দেহ সংবৃত। পায়ে জুতো নেই, দুটি পা নির্মল সুন্দর। অমিত তাঁর পায়ে হাত দিয়ে যখন প্রণাম করলে ওর শিরে শিরে যেন দেবীর প্রসাদের ধারা বয়ে গেল।

প্রথম পরিচয়ের পর যোগমায়া বললেন, "তোমার কাকা অমরেশ ছিলেন আমাদের জেলার সব-চেয়ে বড় উকিল। একবার এক সর্বনেশে মকদ্দমায় আমরা ফতুর হতে বসেছিলুম, তিনি আমাদের বাঁচিয়ে দিয়েছেন। আমাকে ডাকতেন বউদিদি বলে।"

অমিত বললে, "আমি তাঁর অযোগ্য ভাইপো। কাকা লোকসান বাঁচিয়েছেন, আমি লোকসান ঘটিয়েছি। আপনি ছিলেন তাঁর লাভের বউদিদি, আমার হবেন লোকসানের মাসিমা।"

যোগমায়া জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার মা আছেন ?"

অমিত বললে, "ছিলেন। মাসি থাকাও খুব উচিত ছিল।"

"মাসির জন্যে খেদ কেন, বাবা ?"

"ভেবে দেখুন না, আজ যদি ভাঙতুম মায়ের গাড়ি, বকুনির অন্ত থাকত না; বলতেন এটা বাঁদরামি। গাড়িটা যদি মাসির হয় তিনি আমার অপটুতা দেখে হাসেন, মনে-মনে বলেন, ছেলেমানুষি।"

যোগমায়া হেসে বললেন, "তাহলে না হয় গাড়িখানা মাসিরই হল।"

অমিত লাফিয়ে উঠে যোগমায়ার পায়ের ধুলো নিয়ে বললে, "এইজন্যেই তো পূর্বজন্মের

কর্মফল মানতে হয়। মায়ের কোলে জন্মেছি, মাসির জন্যে কোনো তপস্যাই করি নি—গাড়ি ভাঙাটাকে সংকর্ম বলা চলে না, অথচ এক নিমেষে দেবতার বরের মতো মাসি জীবনে অবতীর্ণ হলেন,—এর পিছনে কত যুগের সূচনা আছে ভেবে দেখুন।"

যোগমায়া হেসে বললেন, "কর্মফল কার, বাবা? তোমার, না আমার, না যারা মোটর মেরামতের ব্যবসা করে তাদের?"

ঘন চুলের ভিতর দিয়ে পিছন দিকে আঙুল চালিয়ে অমিত বললে, "শক্ত প্রশ্ন। কর্ম একার নয়, সমস্ত বিশ্বের, নক্ষত্র থেকে নক্ষত্রে তারই সম্মিলিত ধারা যুগে যুগে চলে এসে শুক্রবার ঠিক বেলা নটা বেজে আটচল্লিশ মিনিটের সময় লাগালে এক ধাক্কা। তার পরে?"

যোগমায়া লাবণ্যর দিকে আড়চোখে চেয়ে একটু হাসলেন। অমিতর সঙ্গে যথেষ্ট আলাপ হতে না হতেই তিনি ঠিক করে বসে আছেন এদের দুজনের বিয়ে হওয়া চাই। সেইটের প্রতি লক্ষ্য করেই বললেন, "বাবা, তোমরা দুজনে ততক্ষণ আলাপ করো, আমি এখানে তোমার খাওয়ার বন্দোবস্ত করে আসি গে।"

দ্রুততালে আলাপ জমাবার ক্ষমতা অমিতর। সে একেবারে শুরু করে দিলে, "মাসিমা আমাদের আলাপ করবার আদেশ করেছেন। আলাপের আদিতে হল নাম। প্রথমেই সেটা পাকা করে নেওয়া উচিত। আপনি আমার নাম জানেন তো? ইংরেজি ব্যাকরণে যাকে বলে প্রপার নেম।"

লাবণ্য বললে, "আমি তো জানি আপনার নাম অমিতবাবু।"

"ওটা সব ক্ষেত্রে চলে না।"

লাবণ্য হেসে বললে, "ক্ষেত্র অনেক থাকতে পারে, কিন্তু অধিকারীর নাম তো একই হওয়া চাই।"

"আপনি যে-কথাটা বলছেন ওটা একালের নয়। দেশে কালে পাত্রে ভেদ আছে অথচ নামে ভেদ নেই ওটা অবৈজ্ঞানিক। **Relativity of names** প্রচার করে আমি নামজাদা হব স্থির করেছি। তার গোড়াতেই জানাতে চাই আপনার মুখে আমার নাম অমিতবাবু নয়।"

"আপনি সাহেবি কায়দা ভালোবাসেন? মিস্টার রয়।"

"একেবারে সমুদ্রের ওপারের ওটা দূরের নাম। নামের দূরত্ব ঠিক করতে গেলে মেপে দেখতে হয় শব্দটা কানের সদর থেকে মনের অন্দরে পৌঁছোতে কতক্ষণ লাগে।"

"দ্রুতগামী নামটা কী শুনি।"

"বেগ দ্রুত করতে গেলে বস্তু কমাতে হবে। অমিতবাবুর বাবুটা বাদ দিন।"

লাবণ্য বললে, “সহজ নয়, সময় লাগবে।”

“সময়টা সকলের সমান লাগা উচিত নয়। একঘড়ি ব'লে কোনো পদার্থ নেই, ট্যাঁকঘড়ি আছে, ট্যাঁক অনুসারে তার চাল। আইনস্টাইনের এই মত।”

লাবণ্য উঠে দাঁড়িয়ে বললে, “আপনার কিন্তু স্নানের জল ঠাণ্ডা হয়ে আসছে।”

“ঠাণ্ডা জল শিরোধার্য করে নেব, যদি আলাপটাকে আরও একটু সময় দেন।”

“সময় আর নেই, কাজ আছে” বলেই লাবণ্য চলে গেল।

অমিত তখনই স্নান করতে গেল না। স্মিতহাস্যমিশ্রিত প্রত্যেক কথাটি লাবণ্যর ঠোঁটদুটির উপর কী রকম একটি চেহারা ধরে উঠছিল, বসে বসে সেইটি ও মনে করতে লাগল। অমিত অনেক সুন্দরী মেয়ে দেখেছে, তাদের সৌন্দর্য পূর্ণিমারাত্রির মতো উজ্জ্বল অথচ আচ্ছন্ন; লাবণ্যর সৌন্দর্য সকালবেলার মতো, তাতে অস্পষ্টতার মোহ নেই, তার সমস্তটা বুদ্ধিতে পরিব্যাপ্ত। তাকে মেয়ে করে গড়বার সময় বিধাতা তার মধ্যে পুরুষের একটা ভাগ মিশিয়ে দিয়েছেন; তাকে দেখলেই বোঝা যায় তার মধ্যে কেবল বেদনার শক্তি নয় সেই সঙ্গে আছে মননের শক্তি। এইটেতেই অমিতকে এত করে আকর্ষণ করেছে। অমিতর নিজের মধ্যে বুদ্ধি আছে ক্ষমা নেই, বিচার আছে ধৈর্য নেই, ও অনেক জেনেছে শিখেছে কিন্তু শান্তি পায় নি—লাবণ্যর মুখে ও এমন একটি শান্তির রূপ দেখেছিল যে-শান্তি হৃদয়ের তৃপ্তি থেকে নয়, যা ওর বিবেচনাশক্তির গভীরতায় অচঞ্চল।

৬

নূতন পরিচয়

অমিত মিশুক মানুষ। প্রকৃতির সৌন্দর্য নিয়ে তার বেশিক্ষণ চলে না। সর্বদাই নিজে বকা-ঝকা করা অভ্যাস; গাছপালা-পাহাড়পর্বতের সঙ্গে হাসিতামাশা চলে না, তাদের সঙ্গে কোনোরকম উলটো ব্যবহার করতে গেলেই ঘা পেয়ে মরতে হয়, তারাও চলে নিয়মে, অন্যের ব্যবহারেও তারা নিয়ম প্রত্যাশা করে; এক কথায়, তারা অরসিক, সেই জন্যে শহরের বাইরে ওর প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে।

কিন্তু হঠাৎ কী হল, শিলঙ পাহাড়টা চারদিক থেকে অমিতকে নিজের মধ্যে যেন রসিয়ে নিচ্ছে। আজ সে উঠেছে সূর্য ওঠবার আগেই; এটা ওর স্বধর্মবিরুদ্ধ। জানলা দিয়ে দেখলে, দেবদারু গাছের ঝালরগুলো কাঁপছে, আর তার পিছনে পাতলা মেঘের উপর পাহাড়ের ওপার থেকে সূর্য তার তুলির লম্বা লম্বা সোনালি টান লাগিয়েছে—

আগুনে-জ্বলা যে-সব রঙের আভা ফুটে উঠছে তার সম্বন্ধে চুপ করে থাকা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই।

তাড়াতাড়ি এক পেয়ালা চা খেয়ে অমিত বেরিয়ে পড়ল। রাস্তা তখন নির্জন। একটা শ্যাওলাধরা অতি প্রাচীন পাইন গাছের তলায় স্তরে স্তরে ঝরা-পাতার সুগন্ধ-ঘন আস্তরণের উপর পা ছড়িয়ে বসল। সিগেরেট জ্বালিয়ে দুই আঙুলে অনেকক্ষণ চেপে রেখে দিলে, টান দিতে গেল ভুলে।

যোগমায়ার বাড়ির পথে এই বন। ভোজে বসবার পূর্বে রান্নাঘরটা থেকে যেমন আগাম গন্ধ পাওয়া যায়, এই জায়গা থেকে যোগমায়ার বাড়ির সৌরভটা অমিত সেই রকম ভোগ করে। সময়টা ঘড়ির ভদ্রদাগটাতে এসে পৌঁছোলেই সেখানে গিয়ে এক পেয়ালা চা দাবি করবে। প্রথমে সেখানে ওর যাবার সময় নির্দিষ্ট ছিল সন্ধ্যেবেলায়। অমিত সাহিত্যরসিক এই খ্যাতিটার সুযোগে আলাপ-আলোচনার জন্যে ও পেয়েছিল বাঁধা নিমন্ত্রণ। প্রথম দুই-চারি দিন যোগমায়া এই আলোচনায় উৎসাহ প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু যোগমায়ার কাছে ধরা পড়ল যে, তাতে করেই এ-পক্ষের উৎসাহটাকে কিছু যেন কুণ্ঠিত করলে। বোঝা শক্ত নয় যে, তার কারণ দ্বিবচনের জায়গায় বহুবচন প্রয়োগ। তার পর থেকে যোগমায়ার অনুপস্থিত থাকবার উপলক্ষ্য ঘন ঘন ঘটত। একটু বিশ্লেষণ করতেই বোঝা গেল, সেগুলি অনিবার্য নয়, দৈবকৃত নয়, তাঁর ইচ্ছাকৃত। প্রমাণ হল, কর্তামা এই দুটি আলোচনাপরায়ণের যে-অনুরাগ লক্ষ্য করেছেন, সেটা সাহিত্যানুরাগের চেয়ে বিশেষ একটু গাঢ়তর। অমিত বুঝে নিলে যে, মাসির বয়স হয়েছে বটে, কিন্তু দৃষ্টি তীক্ষ্ণ, অথচ মনটি আছে কোমল। এতে করেই আলোচনা উৎসাহ তার আরও প্রবল হল। নির্দিষ্ট কালটাকে প্রশস্ততর করবার অভিপ্রায়ে যতিশংকরের সঙ্গে আপসে ব্যবস্থা করলে, তাকে সকালে এক ঘণ্টা এবং বিকেলে দু ঘণ্টা ইংরেজি সাহিত্য পড়ায় সাহায্য করবে। শুরু করলে সাহায্য,—এত বাহুল্যপরিমাণে যে, প্রায়ই সকাল গড়াত দুপুরে, সাহায্য গড়াত বাজে কথায়, অবশেষে যোগমায়ার এবং ভদ্রতার অনুরোধে মধ্যাহ্নভোজনটা অবশ্যকর্তব্য হয়ে পড়ত। এমনি করে দেখা গেল অবশ্যকর্তব্যতার পরিধি প্রহরে প্রহরে বেড়েই চলে।

যতিশংকরের অধ্যাপনায় ওর যোগ দেবার কথা সকাল আটটায়। ওর প্রকৃতিস্থ অবস্থায় সেটা ছিল অসময়। ও বলত, যে-জীবের গর্ভবাসের মেয়াদ দশ মাস তার ঘুমের মেয়াদ পশুপক্ষীদের মাপে সংগত হয় না। এতদিন অমিতর রাত্রিবেলাটা তার সকালবেলাকার অনেকগুলো ঘণ্টাকে পিলপেগাড়ি করে নিয়েছিল। ও বলত, এই চোরাই সময়টা অবৈধ বলেই ঘুমের পক্ষে সব-চেয়ে অনুকূল।

কিন্তু আজকাল ওর ঘুমটা আর অবিমিশ্র নয়। সকাল-সকাল জাগবার একটা আগ্রহ তার অন্তর্নিহিত। প্রয়োজনের আগেই ঘুম ভাঙে—তার পরে পাশ ফিরে শুতে সাহস হয় না, পাছে বেলা হয়ে যায়। মাঝে মাঝে ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে দিয়েছে; কিন্তু সময়-চুরির অপরাধ ধরা পড়বার ভয়ে সেটা বারবার করা সম্ভব হত না। আজ একবার ঘড়ির দিকে চাইলে, দেখলে বেলা এখনও সাতটার এপারেই। মনে হল ঘড়ি নিশ্চয় বন্ধ। কানের কাছে নিয়ে শুনলে টিকটিক শব্দ।

এমন সময় চমকে উঠে দেখে, ডান হাতে ছাতা দোলাতে দোলাতে উপরের রাস্তা দিয়ে আসছে লাবণ্য। সাদা শাড়ি, পিঠে কালো রঙের তিনকোণা শাল, তাতে কালো ঝালর। অমিতর বুঝতে বাকি নেই যে, লাবণ্যর অর্ধেক দৃষ্টিতে সে গোচর হয়েছে, কিন্তু পূর্ণদৃষ্টিতে সেটাকে মোকাবিলায় কবুল করতে লাবণ্য নারাজ। বাঁকের মুখ পর্যন্ত লাবণ্য যেই গেছে, অমিত আর থাকতে পারলে না, দৌড়োতে দৌড়োতে তার পাশে উপস্থিত।

বললে, "জানতেন এড়াতে পারবেন না, তবু দৌড় করিয়ে নিলেন। জানেন না কি, দূরে চলে গেলে কতটা অসুবিধা হয়?"

"কিসের অসুবিধা?"

অমিত বললে, "যে-হতভাগা পিছনে পড়ে থাকে তার প্রাণটা উর্ধ্বস্বরে ডাকতে চায়। কিন্তু ডাকি কী বলে? দেবদেবীদের নিয়ে সুবিধে এই যে, নাম ধরে ডাকলেই তাঁরা খুশি। দুর্গা দুর্গা বলে গর্জন করতে থাকলেও ভগবতী দশভুজা অসন্তুষ্ট হন না। আপনাদের নিয়ে যে মুশকিল।"

"না ডাকলেই চুকে যায়।"

"বিনা সম্বোধনেই চালাই যখন কাছে থাকেন। তাই তো বলি, দূরে যাবেন না। ডাকতে চাই অথচ ডাকতে পারি নে, এর চেয়ে দুঃখ আর নেই।"

"কেন, বিলিতি কায়দা তো আপনার অভ্যাস আছে।"

"মিস ডাট? সেটা চায়ের টেবিলে। দেখুন না, আজ এই আকাশের সঙ্গে পৃথিবী যখন সকালের আলোয় মিলল, সেই মিলনের লগ্নটি সার্থক করবার জন্যে উভয়ে মিলে একটি রূপ সৃষ্টি করলে, তারই মধ্যে রয়ে গেল স্বর্গমর্ত্যের ডাকনাম। মনে হচ্ছে না কি, একটা নাম ধরে ডাকা উপর থেকে নিচে আসছে, নিচে থেকে উপরে উঠে চলেছে? মানুষের জীবনেও কি ওই রকমের নাম সৃষ্টি করবার সময় উপস্থিত হয় না? কল্পনা করুন না, যেন এখনই প্রাণ খুলে গলা ছেড়ে আপনাকে ডাক দিয়েছি, নামের ডাক বনে বনে ধ্বনিত হল, আকাশের ওই রঙিন মেঘের কাছ পর্যন্ত পৌঁছোল, সামনের ওই

পাহাড়টা তাই শুনে মাথায় মেঘ-মুড়ি দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল, মনে ভাবতেও কি পারেন সেই ডাকটা মিস ডাট ?"

লাবণ্য কথাটাকে এড়িয়ে বললে, "নামকরণে সময় লাগে, আপাতত বেড়িয়ে আসি গে।"

অমিত তার সঙ্গ নিয়ে বললে, "চলতে শিখতেই মানুষের দেরি হয়, আমার হল উলটো, এতদিন পরে এখানে এসে তবে বসতে শিখেছি। ইংরেজিতে বলে, গড়ানে পাথরের কপালে শ্যাওলা জোটে না—সেই ভেবেই অন্ধকার থাকতে কখন থেকে পথের ধারে বসে আছি। তাই তো ভোরের আলো দেখলুম।"

লাবণ্য কথাটাকে তাড়াতাড়ি চাপা দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "ওই সবুজ ডানাওআলা পাখিটার নাম জানেন ?"

অমিত বললে, "জীবজগতে পাখি আছে সেটা এতদিন সাধারণভাবেই জানতুম, বিশেষভাবে জানবার সময় পাই নি। এখানে এসে, আশ্চর্য এই যে, স্পষ্ট জানতে পেরেছি, পাখি আছে, এমন কি, তারা গানও গায়।"

লাবণ্য হেসে উঠে বললে, "আশ্চর্য।"

অমিত বললে, "হাসছেন ! আমার গভীর কথাতেও গাম্ভীর্য রাখতে পারি নে। ওটা মুদ্রাদোষ। আমার জন্মলগ্নে আছে চাঁদ, ওই গ্রহটি কৃষ্ণচতুর্দশীর সর্বনাশা রাত্রেও একটুখানি মুচকে না হেসে মরতেও জানে না।"

লাবণ্য বললে, "আমাকে দোষ দেবেন না। বোধ হয় পাখিও যদি আপনার কথা শুনত, হেসে উঠত।"

অমিত বললে, "দেখুন, আমার কথা লোকে হঠাৎ বুঝতে পারে না বলেই হাসে, বুঝতে পারলে চুপ করে বসে ভাবত। আজ পাখিকে নতুন করে জানছি এ-কথায় লোকে হাসছে। কিন্তু এর ভিতরের কথাটা হচ্ছে এই যে, আজ সমস্তই নতুন করে জানছি, নিজেকেও। এর উপরে তো হাসি চলে না। ওই দেখুন না, কথাটা একই, অথচ এইবার আপনি একেবারেই চুপ।"

লাবণ্য হেসে বললে, "আপনি তো বেশিদিনের মানুষ না, খুবই নতুন, আরও নতুনের ঝোঁক আপনার মধ্যে আসে কোথা থেকে ?"

"এর জবাবে খুব একটা গম্ভীর কথাই বলতে হল যা চায়ের টেবিলে বলা চলে না। আমার মধ্যে নতুন যেটা এসেছে সেটাই অনাদিকালের পুরোনো,—ভোরবেলাকার আলোর মতোই সে পুরোনো, নতুন-ফোটা ভুঁইচাঁপা ফুলেরই মতো, চিরকালের জিনিস, নতুন করে আবিষ্কার।"

কিছু না বলে লাবণ্য হাসলে।

অমিত বললে, "আপনার এবারকার এই হাসিটি পাহারাওআলার চোর-ধরা গোল লণ্ঠনের হাসি। বুঝেছি আপনি যে-কবির ভক্ত তার বই থেকে আমার মুখের এ-কথাটা আগেই পড়ে নিয়েছেন। দোহাই আপনার আমাকে দাগি চোর ঠাওরাবেন না,—এক-এক সময়ে এমন অবস্থা আসে, মনের ভিতরটা শংকরাচার্য হয়ে ওঠে, বলতে থাকে আমিই লিখেছি, কি আর কেউ লিখেছে এই ভেদজ্ঞানটা মায়া। এই দেখুন না, আজ সকালে বসে হঠাৎ খেয়াল গেল আমার জানা সাহিত্যের ভিতর থেকে এমন একটা লাইন বের করি, যেটা মনে হবে এইমাত্র স্বয়ং আমি লিখলুম, আর কোনো কবির লেখবার সাধ্যই ছিল না।"

লাবণ্য থাকতে পারলে না, প্রশ্ন করলে, "বের করতে পেরেছেন?"

"হাঁ, পেরেছি।"

লাবণ্যর কৌতূহল আর বাধা মানল না, জিজ্ঞাসা করে ফেললে, "লাইনটা কী বলুন না।"

"For God's sake, hold your tongue
and let me love!"

লাবণ্যর বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠল।

অনেকক্ষণ পরে অমিত জিজ্ঞাসা করলে, "আপনি নিশ্চয় জানেন লাইনটা কার।"

লাবণ্য একটু মাথা বেঁকিয়ে ইশারায় জানিয়ে দিলে, "হাঁ।"

অমিত বললে, "সেদিন আপনার টেবিলে ইংরেজ কবি ডন-এর বই আবিষ্কার করলুম, নইলে এ-লাইন আমার মাথায় আসত না।"

"আবিষ্কার করলেন?"

"আবিষ্কার নয় তো কী? বইয়ের দোকানে বই চোখে পড়ে, আপনার টেবিলে বই প্রকাশ পায়। পাব্লিক লাইব্রেরির টেবিল দেখেছি, সেটা তো বইগুলিকে বহন করে, আপনার টেবিল দেখলুম, সে যে বইগুলিকে বাসা দিয়েছে। সেদিন ডন-এর কবিতাকে প্রাণ দিয়ে দেখতে পেয়েছি। মনে হল, অন্য কবির দরজায় ঠেলাঠেলি ভিড়; বড়োলোকের শ্রাদ্ধে কাঙালি-বিদায়ের মতো। ডন-এর কাব্যমহল নির্জন, ওখানে দুটি মানুষ পাশাপাশি বসবার জায়গাটুকু আছে। তাই অমন স্পষ্ট করে শুনতে পেলুম আমার সকালবেলাকার মনের কথাটি—

দোহাই তোদের, একটুকু চুপ কর্‌।
ভালোবাসিবারে দে আমারে অবসর।"

লাবণ্য বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "আপনি বাংলা কবিতা লেখেন না কি ?"

"ভয় হচ্ছে আজ থেকে লিখতে শুরু করব বা। নতুন অমিত রায় কী যে কাণ্ড করে বসবে পুরোনো অমিত রায়ের তা কিছু জানা নেই। হয়তো বা সে এখনই লড়াই করতে বেরোবে।"

"লড়াই ? কার সঙ্গে ?

"সেইটে ঠিক করতে পারছি নে। কেবলই মনে হচ্ছে খুব মস্ত কিছু একটার জন্যে এক্‌খুনি চোখ বুজে প্রাণ দিয়ে ফেলা উচিত, তার পরে অনুতাপ করতে হয় রয়ে বসে করা যাবে।"

লাবণ্য হেসে বললে, "প্রাণ যদি দিতেই হয় তো সাবধানে দেবেন।"

"সে-কথা আমাকে বলা অনাবশ্যক। কম্যুন্যাল রায়টের মধ্যে আমি যেতে নারাজ। মুসলমান বাঁচিয়ে ইংরেজ বাঁচিয়ে চলব। যদি দেখি বুড়োসুড়ো গোছের মানুষ, অহিংস্র মেজাজের ধার্মিক চেহারা, শিঙে বাজিয়ে মোটর হাঁকিয়ে চলেছে—তার সামনে দাঁড়িয়ে পথ আটকিয়ে বলব, যুদ্ধং দেহি। ওই যে-লোক অজীর্ণ রোগ সারবার জন্যে হাসপাতালে না গিয়ে এমন পাহাড়ে আসে, খিদে বাড়াবার জন্যে নির্লজ্জ হয়ে হাওয়া খেতে বেরোয়।"

লাবণ্য হেসে বললে, "লোকটা তবু যদি অমান্য করে চলে যায়।"

"তখন আমি পিছন থেকে দু-হাত আকাশে তুলে বলব—এবারকার মতো ক্ষমা করলুম, তুমি আমার ভ্রাতা, আমরা এক ভারতমাতার সন্তান।—বুঝতে পারছেন, মন যখন খুব বড়ো হয়ে ওঠে তখন মানুষ যুদ্ধও করে, ক্ষমাও করে।"

লাবণ্য হেসে বললে, "আপনি যখন যুদ্ধের প্রস্তাব করেছিলেন মনে ভয় হয়েছিল, কিন্তু ক্ষমার কথা যে-রকম বোঝালেন তাতে আশ্বস্ত হলুম যে, ভাবনা নেই।"

অমিত বললে, "আমার একটা অনুরোধ রাখবেন ?"

"কী, বলুন।"

"আজ খিদে বাড়াবার জন্যে আর বেশি বেড়াবেন না।"

"আচ্ছা বেশ, তার পরে ?"

"ওই নিচে গাছতলায় যেখানে নানা রঙের ছ্যাতলাপড়া পাথরটার নিচে দিয়ে একটুখানি জল ঝিরঝির করে বয়ে যাচ্ছে ওইখানে বসবেন আসুন।"

লাবণ্য হাতে-বাঁধা ঘড়িটার দিকে চেয়ে বললে, "কিন্তু সময় যে অল্প।"

"জীবনে সেইটেই তো শোচনীয় সমস্যা, লাবণ্য দেবী, সময় অল্প। মরুপথে সঙ্গে আছে আধ মশক মাত্র জল, যাতে সেটা উছলে উছলে শুকনো ধুলোয় মারা না যায় সেটা

নিতান্তই করা চাই। সময় যাদের বিস্তর তাদেরই পাঙ্কচুয়াল হওয়া শোভা পায়, দেবতার হাতে সময় অসীম, তাই ঠিক সময়টিতে সূর্য ওঠে ঠিক সময়ে অস্ত যায়। আমাদের মেয়াদ অল্প, পাঙ্কচুয়াল হতে গিয়ে সময় নষ্ট করা আমাদের পক্ষে অমিতব্যয়িতা। অমরাবতীর কেউ যদি প্রশ্ন করে, 'ভবে এসে করলে কী', তখন কোন্ লজ্জায় বলব, 'ঘড়ির কাঁটার দিকে চোখ রেখে কাজ করতে করতে জীবনের যা-কিছু সকল সময়ের অতীত তার দিকে চোখ তোলবার সময় পাই নি।' তাই তো বলতে বাধ্য হলুম, চলুন ওই জায়গাটাতে।"

ওর যেটাতে আপত্তি নেই সেটাতে আর কারও যে আপত্তি থাকতে পারে অমিত সেই আশঙ্কাটাকে একেবারে উড়িয়ে দিয়ে কথাবার্তা কয়। সেইজন্যে তার প্রস্তাবে আপত্তি করা শক্ত। লাবণ্য বললে, "চলুন।"

ঘনবনের ছায়া। সরু পথ নেমেছে নিচে একটা খাসিয়া গ্রামের দিকে। অর্ধপথে আর-এক পাশ দিয়ে ক্ষীণ ঝরনার ধারা একজায়গায় লোকালয়ের পথটাকে অস্বীকার করে তার উপর দিয়ে নিজের অধিকারচিহ্নস্বরূপ নুড়ি বিছিয়ে স্বতন্ত্র পথ চালিয়ে গেছে। সেইখানে পাথরের উপরে দুজনে বসল। ঠিক সেই জায়গায় খাদটা গভীর হয়ে খানিকটা জল জমে আছে, যেন সবুজ পর্দার ছায়ায় একটি পর্দানশীন মেয়ে, বাইরে পা বাড়াতে তার ভয়। এখানকার নির্জনতার আবরণটাই লাবণ্যকে নিরাবরণের মতো লজ্জা দিতে লাগল। সামান্য যা-তা একটা কিছু বলে এইটেকে ঢাকা দিতে ইচ্ছে করছে, কিছুতেই কোনো কথা মনে আসছে না,—স্বপ্নে যে-রকম কণ্ঠরোধ হয় সেই দশা।

অমিত বুঝতে পারলে, একটা-কিছু বলাই চাই। বললে, "দেখুন আর্যা, আমাদের দেশে দুটো ভাষা, একটা সাধু আর একটা চলতি। কিন্তু এ-ছাড়া আরও একটা ভাষা থাকা উচিত ছিল, সমাজের ভাষা নয়, ব্যবসায়ের ভাষা নয়, আড়ালের ভাষা, এই রকম জায়গার জন্যে। পাখির গানের মতো, কবির কাব্যের মতো,—সেই ভাষা অনায়াসেই কণ্ঠ দিয়ে বেরোনো উচিত ছিল, যেমন করে কান্না বেরোয়। সেজন্যে মানুষকে বইয়ের দোকানে ছুটতে হয় সেটা বড়ো লজ্জা। প্রত্যেকবার হাসির জন্যে যদি ডেণ্টিস্টের দোকানে দৌড়াদৌড়ি করতে হত তা হলে কী হত ভেবে দেখুন। সত্যি বলুন, লাবণ্য দেবী, এখনই আপনার সুর করে কথা বলতে ইচ্ছে করছে না?"

লাবণ্য মাথা হেঁট করে চুপ করে বসে রইল।

অমিত বললে, "চায়ের টেবিলের ভাষায় কোন্‌টা ভদ্র, কোন্‌টা অভদ্র, তার হিসেব মিটতে চায় না। কিন্তু এ জায়গায় ভদ্রও নেই, অভদ্রও নেই। তাহলে কী উপায় বলুন। মনটাকে সহজ করবার জন্যে একটা কবিতা না আওড়ালে তো চলছে না।

গদ্যে অনেক সময় নেয়, অত সময় তো হাতে নেই। যদি অনুমতি করেন তো আরম্ভ করি।"

দিতে হল অনুমতি, নইলে লজ্জা করতে গেলেই লজ্জা।

অমিত ভূমিকায় বললে, "রবি ঠাকুরের কবিতা বোধ হয় আপনার ভালো লাগে।"

"হাঁ, লাগে।"

"আমার লাগে না। অতএব আমাকে মাপ করবেন। আমার একজন বিশেষ কবি আছে, তার লেখা এত ভালো যে, খুব অল্প লোকেই পড়ে। এমন কি, তাকে কেউ গাল দেবার উপযুক্ত সম্মানও দেয় না। ইচ্ছে করছি আমি তার থেকে আবৃত্তি করি।"

"আপনি এত ভয় করছেন কেন?"

"এ-সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা শোকাবহ। কবিবরকে নিন্দে করলে আপনারা জাতে ঠেলেন, তাকে নিঃশব্দে পাশ কাটিয়ে বাদ দিয়ে চললে তাতে করেও কঠোর ভাষার সৃষ্টি হয়। যা আমার ভালো লাগে তাই আর-একজনের ভালো লাগে না, এই নিয়েই পৃথিবীতে যত রক্তপাত।"

"আমার কাছ থেকে রক্তপাতের ভয় করবেন না। আপন রুচির জন্যে আমি পরের রুচির সমর্থন ভিক্ষে করি নে।"

"এটা বেশ বলেছেন, তাহলে নির্ভয়ে শুরু করা যাক।—

রে অচেনা, মোর মুষ্টি ছাড়াবি কী করে,
যতক্ষণ চিনি নাই তোরে?

বিষয়টা দেখছেন? না-চেনার বন্ধন। সব-চেয়ে কড়া বন্ধন। না-চেনা জগতে বন্দী হয়েছি, চিনে নিয়ে তবে খালাস পাব, একেই বলে মুক্তিতত্ত্ব।

কোন্ অন্ধক্ষণে
বিজড়িত তন্দ্রা-জাগরণে
রাত্রি যবে সবে হয় ভোর,
মুখ দেখিলাম তোর।
চক্ষু 'পরে চক্ষু রাখি' শুধালেম, "কোথা সংগোপনে
আছ আত্মবিস্মৃতির কোণে?"

নিজেকেই ভুলে-থাকার মতো কোনো এমন ঝাপসা কোণ আর নেই। সংসারে কত যে দেখবার ধন দেখা হল না, তারা আত্মবিস্মৃতির কোণে মিলিয়ে আছে। তাই বলে তো হাল ছেড়ে দিলে চলে না।

তোর সাথে চেনা
সহজে হবে না,
কানে কানে মৃদুকণ্ঠে নয়।
করে নেব জয়
সংশয়কুণ্ঠিত তোর বাণী;
দৃপ্ত বলে লব টানি'
শঙ্কা হতে, লজ্জা হতে, দ্বিধা দ্বন্দ্ব হতে
নির্দয় আলোতে।

একেবারে নাছোড়বান্দা। কতবড়ো জোর। দেখেছেন রচনার পৌরুষ।

জাগিয়া উঠিবি অশ্রুধারে,
মুহূর্তে চিনিবি আপনারে;
ছিন্ন হবে ডোর,
তোরে মুক্তি দিয়ে তবে মুক্তি হবে মোর।

ঠিক এই তানটি আপনার নামজাদা লেখকের মধ্যে পাবেন না, সুযমণ্ডলে এ যেন আগুনের ঝড়। এ শুধু লিরিক নয়, এ নিষ্ঠুর জীবনতত্ত্ব।"—লাবণ্যর মুখের দিকে এক-দৃষ্টিতে চেয়ে বললে,—

"হে অচেনা,
দিন যায়, সন্ধ্যা হয়, সময় রবে না,
তীব্র আকস্মিক
বাধা বন্ধ ছিন্ন করি দিক,
তোমারে চেনার অগ্নি দীপ্ত শিখা উঠুক উজ্জ্বলি
দিব তাহে জীবন অঞ্জলি।"

আবৃত্তি শেষ হতে না হতেই অমিত লাবণ্যর হাত চেপে ধরলে। লাবণ্য হাত ছাড়িয়ে নিলে না। অমিতর মুখের দিকে চাইলে, কিছু বললে না।

এর পরে কোনো কথা বলবার কোনো দরকার হল না। লাবণ্য ঘড়ির দিকে চাইতেও ভুলে গেল।

৭

ঘটকালি

অমিত যোগমায়ার কাছে এসে বললে, "মাসিমা, ঘটকালি করতে এলেম। বিদায়ের বেলা কৃপণতা করবেন না।"

"পছন্দ হলে তবে তো। আগে নাম-ধাম-বিবরণটা বলো।"

অমিত বললে, "নাম নিয়ে পাত্রটির দাম নয়।"

"তাহলে ঘটক-বিদায়ের হিসাব থেকে কিছু বাদ পড়বে দেখছি।"

"অন্যায় কথা বললেন। নাম যার বড়ো তার সংসারটা ঘরে অল্প, বাইরেই বেশি। ঘরের মন-রক্ষার চেয়ে বাইরে মান-রক্ষাতেই তার যত সময় যায়। মানুষটার অতি অল্প অংশই পড়ে স্ত্রীর ভাগে, পুরো বিবাহের পক্ষে সেটুকু যথেষ্ট নয়। নামজাদা মানুষের বিবাহ স্বল্পবিবাহ, বহুবিবাহের মতোই গর্হিত।"

"আচ্ছা, নামটা না হয় খাটো হল, রূপটা?"

"বলতে ইচ্ছে করি নে, পাছে অত্যুক্তি করে বসি।"

"অত্যুক্তির জোরেই বুঝি বাজারে চালাতে হবে?"

"পাত্র বাছাইয়ের বেলায় দুটি জিনিস লক্ষ্য করা চাই,—নামের দ্বারা বর যেন ঘরকে ছাড়িয়ে না যায়, আর রূপের দ্বারা কনেকে।"

"আচ্ছা নামরূপ থাক, বাকিটা?"

"বাকি যেটা রইল সব-জড়িয়ে সেটাকে বলে পদার্থ। তা লোকটা অপদার্থ নয়।"

"বুদ্ধি?"

"লোকে যাতে ওকে বুদ্ধিমান বলে হঠাৎ ভ্রম করে সেটুকু বুদ্ধি ওর আছে।"

"বিদ্যে?"

"স্বয়ং নিউটনের মতো। ও জানে যে জ্ঞানসমুদ্রের কূলে সে নুড়ি কুড়িয়েছে মাত্র। তাঁর মতো সাহস করে বলতে পারে না, পাছে লোকে ফস করে বিশ্বাস করে বসে।"

"পাত্রের যোগ্যতার ফর্দটা তো দেখছি কিছু খাটো গোছের।"

"অন্নপূর্ণার পূর্ণতা প্রকাশ করতে হবে বলেই শিব নিজেকে ভিখারি কবুল করেন, একটুও লজ্জা নেই।"

"তাহলে পরিচয়টা আরও একটু স্পষ্ট করো।"

"জানা ঘর। পাত্রটির নাম অমিতকুমার রায়। হাসছেন কেন, মাসিমা? ভাবছেন কথাটা ঠাট্টা।"

"সে-ভয় মনে আছে, বাবা, পাছে শেষ পর্যন্ত ঠাট্টাই হয়ে ওঠে।"

"এ সন্দেহটা পাত্রের 'পরে দোষারোপ।"

"বাবা, সংসারটাকে হেসে হালকা করে রাখা কম ক্ষমতা নয়।"

"মাসি, দেবতাদের সেই ক্ষমতা আছে, তাই দেবতারা বিবাহের অযোগ্য, দময়ন্তী সে-কথা বুঝেছিলেন।"

"আমার লাবণ্যকে সত্যি কি তোমার পছন্দ হয়েছে?"

"কী রকম পরীক্ষা চান, বলুন।"

"একমাত্র পরীক্ষা হচ্ছে, লাবণ্য যে তোমার হাতেই আছে, এইটি তোমার নিশ্চিত জানা।"

"কথাটাকে আর-একটু ব্যাখ্যা করুন।"

"যে-রত্নকে সস্তায় পাওয়া গেল, তারও আসল মূল্য যে বোঝে সে-ই জানব জহুরি।"

"মাসিমা, কথাটাকে বড়ো বেশি সূক্ষ্ম করে তুলছেন। মনে হচ্ছে যেন একটা ছোটো গল্পের সাইকোলজিতে শান লাগিয়েছেন। কিন্তু কথাটা আসলে যথেষ্ট মোটা।— জাগতিক নিয়মে এক ভদ্রলোক, এক ভদ্ররমণীকে বিয়ে করবার জন্যে খেপেছে। দোষেগুণে ছেলেটি চলনসই, মেয়েটির কথা বলা বাহুল্য। এমন অবস্থায় সাধারণ মাসিমার দল স্বভাবের নিয়মেই খুশি হয়ে তখনই ঢেঁকিতে আনন্দনাড়ু কুটতে শুরু করেন।"

"ভয় নেই, বাবা, ঢেঁকিতে পা পড়েছে। ধরেই নাও, লাবণ্যকে তুমি পেয়েইছ। তার পরেও হাতে পেয়েও যদি তোমার পাবার ইচ্ছে প্রবল থেকেই যায় তবেই বুঝব লাবণ্যর মতো মেয়েকে বিয়ে করবার তুমি যোগ্য।"

"আমি যে এ-হেন আধুনিক আমাকে সুদ্ধ তাক লাগিয়ে দিলেন।"

"আধুনিকের লক্ষণটা কী দেখলে?

"দেখছি বিংশ শতাব্দীর মাসিমারা বিয়ে দিতেও ভয় পান।"

"তার কারণ আগেকার শতাব্দীর মাসিমারা যাদের বিয়ে দিতেন তারা ছিল খেলার পুতুল। এখন যারা বিয়ের উমেদার মাসিমাদের খেলার শখ মেটাবার দিকে তাদের মন নেই।"

"ভয় নেই আপনার। পেয়ে পাওয়া ফুরোয় না, বরঞ্চ চাওয়া বেড়েই ওঠে, লাবণ্যকে বিয়ে করে এই তত্ত্ব প্রমাণ করবে বলেই অমিত রায় মর্ত্যে অবতীর্ণ। নইলে, আমার মোটরগাড়িটা অচেতন পদার্থ হয়েও অস্থানে অসময়ে এমন অদ্ভুত অঘটন ঘটিয়ে বসবে কেন?"

"বাবা, বিবাহযোগ্য বয়সের সুর এখনও তোমার কথাবার্তায় লাগছে না, শেষে সমস্তটা বাল্যবিবাহ হয়ে না দাঁড়ায়।"

"মাসিমা, আমার মনের স্বকীয় একটা স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি আছে, তারই গুণে আমার হৃদয়ের ভারী কথাগুলোও মুখে খুব হালকা হয়ে ভেসে ওঠে, তাই বলে তার ওজন কমে না।"

যোগমায়া গেলেন ভোজের ব্যবস্থা করতে। অমিত এ-ঘরে ও-ঘরে ঘুরে বেড়ালে, দর্শনীয় কাউকে দেখতে পেলে না। দেখা হল যতিশংকরের সঙ্গে। মনে পড়ল আজ তাকে অ্যান্টনি ক্লিয়োপাট্রা পড়াবার কথা। অমিতর মুখের ভাব দেখেই যতি বুঝেছিল জীবের প্রতি দয়া করেই আজ তার ছুটি নেওয়া আশু কর্তব্য। সে বললে, "অমিতদা, কিছু যদি মনে না কর, আজ আমি ছুটি চাই, আপার শিলঙে বেড়াতে যাব।"

অমিত পুলকিত হয়ে বললে, "পড়ার সময় যারা ছুটি নিতে জানে না, তারা পড়ে, পড়া হজম করে না। তুমি ছুটি চাইলে আমি কিছু মনে করব এমন অসম্ভব ভয় করছ কেন?"

"কাল রবিবার ছুটি তো আছেই, পাছে তুমি তাই ভাব—"

"ইস্কুলমাস্টারি বুদ্ধি আমার নয় ভাই, বরাদ্দ ছুটিকে ছুটি বলিই নে। যে-ছুটি নিয়মিত, তাকে ভোগ করা, আর বাঁধা পশুকে শিকার করা একই কথা। ওতে ছুটির রস ফিকে হয়ে যায়।"

হঠাৎ যে-উৎসাহে অমিতকুমার ছুটিতত্ত্ব ব্যাখ্যায় মেতে উঠল তার মূল কারণটা অনুমান করে যতির খুব মজা লাগল। সে বললে, "কয়দিন থেকে ছুটিতত্ত্ব সম্বন্ধে তোমার মাথায় নতুন নতুন ভাব উঠছে। সেদিনও আমাকে উপদেশ দিয়েছিলে। এমন আর কিছুদিন চললেই ছুটি নিতে আমার হাত পেকে যাবে।"

"সেদিন কী উপদেশ দিয়েছিলুম?"

"বলেছিলে, 'অকর্তব্যবুদ্ধি মানুষের একটা মহদ্‌গুণ। তার ডাক পড়লেই একটুও বিলম্ব করা উচিত হয় না।' বলেই বই বন্ধ করে তখনই বাইরে দিলে ছুট। বাইরে হয়তো একটা অকর্তব্যের কোথাও আবির্ভাব হয়েছিল, লক্ষ্য করি নি।"

যতির বয়স বিশের কোঠায়। অমিতর মনে যে-চাঞ্চল্য উঠেছে ওর নিজের মনেও তার আন্দোলনটা এসে লাগছে। ও লাবণ্যকে এতদিন শিক্ষকজাতীয় বলেই ঠাউরেছিল, আজ অমিতর অভিজ্ঞতা থেকেই বুঝতে পেরেছে, সে নারীজাতীয়।

অমিত হেসে বললে, "কাজ উপস্থিত হলেই প্রস্তুত হওয়া চাই, এই উপদেশের বাজারদর বেশি, আকবরি মোহরের মতো,—কিন্তু ওর উলটো পিঠে খোদাই থাকা উচিত, অকাজ উপস্থিত হলেই সেটাকে বীরের মতো মেনে নেওয়া চাই।"

"তোমার বীরত্বের পরিচয় আজকাল প্রায়ই পাওয়া যাচ্ছে।"

যতির পিঠ চাপড়িয়ে অমিত বললে, "জরুরি কাজটাকে এক কোপে বলি দেবার পবিত্র অষ্টমী তিথি তোমার জীবনপঞ্জিকায় একদিন যখন আসবে দেবীপূজায় বিলম্ব ক'রো না, ভাই, তার পরে বিজয়াদশমী আসতে দেরি হয় না।"

যতি গেল চলে, অকর্তব্যবুদ্ধিও সজাগ, যাকে আশ্রয় করে অকাজ দেখা দেয় তারও দেখা নেই। অমিত ঘর ছেড়ে গেল বাইরে।

ফুলে আচ্ছন্ন গোলাপের লতা, একধারে সূর্যমুখীর ভিড়, আর-একধারে চৌকো কাঠের টবে চন্দ্রমল্লিকা। ঢালুঘাসের খেতের উপরপ্রান্তে এক মস্ত য়ুক্যালিপ্‌টস গাছ। তারই গুঁড়িতে হেলান দিয়ে সামনে পা ছড়িয়ে বসে আছে লাবণ্য। ছাই রঙের আলোয়ান গায়ে, পায়ের উপর পড়েছে সকালবেলাকার রোদ্দুর। কোলে রুমালের উপর কিছু রুটির টুকরো, কিছু ভাঙা আখরোট। আজ সকালটা জীবসেবায় কাটাবে ঠাউরেছিল, তাও গেছে ভুলে। অমিত কাছে এসে দাঁড়াল, লাবণ্য মাথা তুলে তার মুখের দিকে চেয়ে চুপ করে রইল, মৃদু হাসিতে মুখ গেল ছেয়ে। অমিত সামনা-সামনি বসে বললে, "সুখবর আছে। মাসিমার মত পেয়েছি।"

লাবণ্য তার কোনো উত্তর না করে অদূরে একটা নিষ্ফলা পিচগাছের দিকে একটা ভাঙা আখরোট ফেলে দিলে। দেখতে দেখতে তার গুঁড়ি বেয়ে একটা কাঠবিড়ালি নেমে এল। এই জীবটি লাবণ্যর মুষ্টিভিখারিদলের একজন।

অমিত বললে, "যদি আপত্তি না কর তোমার নামটা একটু ছেঁটে দেব।"

"তা দাও।"

"তোমাকে ডাকব বন্য বলে।"

"বন্য!"

"না না, এ-নামটাতে হয়তো বা তোমার বদনাম হল। এ-রকম নাম আমাকেই সাজে। তোমাকে ডাকব, বন্যা। কী বল?"

"তাই ডেকো, কিন্তু তোমার মাসিমার কাছে নয়।"

"কিছুতেই নয়। এ-সব নাম বীজমন্ত্রের মতো, কারও কাছে ফাঁস করতে নেই। এ রইল আমার মুখে আর তোমার কানে।"

"আচ্ছা বেশ।"

"আমারও ওইরকমের একটা বেসরকারি নাম চাই তো। ভাবছি ব্রহ্মপুত্র কেমন হয়? বন্যা হঠাৎ এল তারই কূল ভাসিয়ে দিয়ে।"

"নামটা সর্বদা ডাকবার পক্ষে ওজনে ভারি।"

"ঠিক বলেছ। কুলি ডাকতে হবে ডাকবার জন্যে। তুমিই তাহলে নামটা দাও। সেটা হবে তোমারই সৃষ্টি।"

"আচ্ছা, আমিও দেব তোমার নাম ছেঁটে। তোমাকে বলব মিতা।"

"চমৎকার! পদাবলীতে ওরই একটি দোসর আছে, বঁধু। বন্যা, মনে ভাবছি, ওই নামে না হয় আমাকে সবার সামনেই ডাকলে, তাতে দোষ কী?"

"ভয় হয় এক কানের ধন পাঁচ কানে পাছে সস্তা হয়ে যায়।"

"সে-কথা মিছে নয়। দুইয়ের কানে যেটা এক, পাঁচের কানে সেটা ভগ্নাংশ। বন্যা।"

"কী মিতা?"

"তোমার নামে যদি কবিতা লিখি তো কোন্ মিলটা লাগাব জান?—অনন্যা।"

"তাতে কী বোঝাবে?"

"বোঝাবে তুমি যা তুমি তাই-ই, তুমি আর কিছুই নও।"

"সেটা বিশেষ আশ্চর্যের কথা নয়।"

"বল কী, খুবই আশ্চর্যের কথা। দৈবাৎ এক-একজন মানুষকে দেখতে পাওয়া যায় যাকে দেখেই চমকে বলে উঠি এ-মানুষটি একেবারে নিজের মতো। পাঁচজনের মতো নয়। সেই কথাটি আমি কবিতায় বলব—

হে মোর বন্যা, তুমি অনন্যা,
আপন স্বরূপে আপনি ধন্যা।"

"তুমি কবিতা লিখবে না কি?"

"নিশ্চয়ই লিখব। কার সাধ্য রোধে তার গতি।"

"এমন মরিয়া হয়ে উঠলে কেন?"

"কারণ বলি। কাল রাত্তির আড়াইটা পর্যন্ত, ঘুম না হলে যেমন এ-পাশ ও-পাশ করতে হয়, তেমনি করেই কেবলই অক্সফোর্ড বুক অফ ভার্সেস-এর এ-পাত ও-পাত উলটেছি। ভালোবাসার কবিতা খুঁজেই পেলুম না, আগে সেগুলো পায়ে পায়ে ঠেকত। স্পষ্টই বুঝতে পারছি আমি লিখব বলেই সমস্ত পৃথিবী আজ অপেক্ষা করে আছে।"

এই বলেই লাবণ্যর বাঁ হাত নিজের দুই হাতের মধ্যে চেপে ধরে বললে, "হাত

জোড়া পড়ল, কলম ধরব কী দিয়ে। সব-চেয়ে ভালো মিল হাতে-হাতে মিল। এই যে তোমার আঙুলগুলি আমার আঙুলে আঙুলে কথা কইছে কোনো কবিই এমন সহজ করে কিছু লিখতে পারলে না।"

"কিছুই তোমার সহজে পছন্দ হয় না, সেইজন্যে তোমাকে এত ভয় করি, মিতা।"

"কিন্তু আমার কথাটা বুঝে দেখো। রামচন্দ্র সীতার সত্য যাচাই করতে চেয়েছিলেন বাইরের আগুনে; তাতেই সীতাকে হারালেন। কবিতার সত্য যাচাই হয় অগ্নিপরীক্ষায়, সে আগুন অন্তরের। যার মনে নেই সেই আগুন, সে যাচাই করবে কী দিয়ে? তাকে পাচজনের মুখের কথা মেনে নিতে হয়, অনেক সময়ই সেটা দুর্মুখের কথা। আমার মনে আজ আগুন জ্বলেছে, সেই আগুনের ভিতর দিয়ে আমার পুরোনো সব পড়া আবার পড়ে নিচ্ছি, কত অল্পই টিকল। সব হু হু শব্দে ছাই হয়ে যাচ্ছে। কবিদের হট্টগোলের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আজ আমাকে বলতে হল, তোমরা অত চেঁচিয়ে কথা ক'য়ো না, ঠিক কথাটি আস্তে বলো—

For God's sake, hold your tongue
and let me love"

অনেকক্ষণ দু-জনে চুপ করে বসে রইল। তার পরে এক সময়ে লাবণ্যর হাতখানি তুলে ধরে অমিত নিজের মুখের উপর বুলিয়ে নিলে। বললে, "ভেবে দেখো বন্যা, আজ এই সকালে ঠিক এই মুহূর্তে সমস্ত পৃথিবীতে কত অসংখ্য লোকই চাচ্ছে, আর কত অল্প লোকই পেলে। আমি সেই অতি অল্প লোকের মধ্যে একজন। সমস্ত পৃথিবীতে একমাত্র তুমিই সেই সৌভাগ্যবান লোককে দেখতে পেলে শিলঙ পাহাড়ের কোণে এই য়ুক্যালিপটস গাছের তলায়। পৃথিবীতে পরমাশ্চর্য ব্যাপারগুলিই পরম নম্র, চোখে পড়তে চায় না। অথচ তোমাদের ওই তারিণী তলাপাত্র কলকাতার গোলদিঘি থেকে আরম্ভ করে নোয়াখালি চাটগাঁ পর্যন্ত চীৎকার-শব্দে শূন্যের দিকে ঘুষি উঁচিয়ে বাঁকা পলিটিক্সের ফাঁকা আওয়াজ ছড়িয়ে এল, সেই দুর্দান্ত বাজে খবরটা বাংলা দেশের সর্বপ্রধান খবর হয়ে উঠল। কে জানে হয়তো এইটেই ভালো।"

"কোন্‌টা ভালো?"

"ভালো এই যে, সংসারের আসল জিনিসগুলো হাটেবাটেই চলাফেরা করে বেড়ায়, অথচ বাজে লোকের চোখের ঠোকর পেয়ে পেয়ে মরে না। তার গভীর জানাজানি বিশ্বজগতের অন্তরের নাড়ীতে নাড়ীতে।—আচ্ছা, বন্যা, আমি তো বকেই চলেছি, তুমি চুপ করে বসে কী ভাবছ বলো তো।"

লাবণ্য চোখ নিচু করে বসে রইল, জবাব করলে না।

অমিত বললে, "তোমার এই চুপ করে থাকা যেন মাইনে না দিয়ে আমার সব কথাকে বরখাস্ত করে দেওয়ার মতো।"

লাবণ্য চোখ নিচু করেই বললে, "তোমার কথা শুনে আমার ভয় হয়, মিতা।"

"ভয় কিসের?"

"তুমি আমার কাছে কী যে চাও আর আমি তোমাকে কতটুকুই বা দিতে পারি ভেবে পাই নে।"

"কিছু না ভেবেই তুমি দিতে পার এইটেতেই তো তোমার দানের দাম।"

"তুমি যখন বললে কর্তামা সম্মতি দিয়েছেন আমার মনটা কেমন করে উঠল। মনে হল এইবার আমার ধরা পড়বার দিন আসছে।"

"ধরাই তো পড়তে হবে।"

"মিতা, তোমার রুচি তোমার বুদ্ধি আমার অনেক উপরে। তোমার সঙ্গে একত্রে পথ চলতে গিয়ে একদিন তোমার থেকে বহুদূরে পিছিয়ে পড়ব,তখন আর তুমি আমাকে ফিরে ডাকবে না। সেদিন আমি তোমাকে একটুও দোষ দেব না,—না না, কিছু ব'লো না, আমার কথাটা আগে শোনো। মিনতি করে বলছি, আমাকে বিয়ে করতে চেয়ো না। বিয়ে করে তখন গ্রন্থি খুলতে গেলে তাতে আরও জট পড়ে যাবে। তোমার কাছ থেকে আমি যা পেয়েছি সে আমার পক্ষে যথেষ্ট, জীবনের শেষ পর্যন্ত চলবে। তুমি কিন্তু নিজেকে ভুলিয়ো না।"

"বন্যা, তুমি আজকের দিনের ঔদার্যের মধ্যে কালকের দিনের কার্পণ্যের আশঙ্কা কেন তুলছ?"

"মিতা, তুমিই আমাকে সত্য বলবার জোর দিয়েছ। আজ তোমাকে যা বলছি তুমি নিজেও তা ভিতরে ভিতরে জান। মানতে চাও না, পাছে যে-রস এখন ভোগ করছ তাতে একটুও খটকা বাধে। তুমি তো সংসার ফাঁদবার মানুষ নও, তুমি রুচির তৃষ্ণা মেটাবার জন্যে ফের; সাহিত্যে সাহিত্যে তাই তোমার বিহার, আমার কাছেও সেইজন্যেই তুমি এসেছ। বলব ঠিক কথাটা? বিয়েটাকে তুমি মনে-মনে জান, যাকে তুমি সর্বদাই বল, ভালগার। ওটা বড়ো রেসপেক্টেবল; ওটা শাস্ত্রের-দোহাই-পাড়া, সেই সব বিষয়ী লোকের পোষা জিনিস যারা সম্পত্তির সঙ্গে সহধর্মিণীকে মিলিয়ে নিয়ে খুব মোটা তাকিয়া ঠেসান দিয়ে বসে।"

"বন্যা, তুমি আশ্চর্য নরম সুরে আশ্চর্য কঠিন কথা বলতে পার।"

"মিতা, ভালোবাসার জোরে চিরদিন যেন কঠিন থাকতেই পারি, তোমাকে ভোলাতে গিয়ে একটুও ফাঁকি যেন না দিই। তুমি যা আছ ঠিক তাই থাকো, তোমার রুচিতে

আমাকে যতটুকু ভালো লাগে ততটুকুই লাগুক, কিন্তু একটুও তুমি দায়িত্ব নিয়ো না,— তাতেই আমি খুশি থাকব।"

"বন্যা, এবার তবে আমার কথাটা বলতে দাও। কী আশ্চর্য করেই তুমি আমার চরিত্রের ব্যাখ্যা করেছ। তা নিয়ে কথা-কাটাকাটি করব না। কিন্তু একটা জায়গায় তোমার ভুল আছে। মানুষের চরিত্র জিনিসটাও চলে। ঘর-পোষা অবস্থায় তার একরকম শিকলি-বাঁধা স্থাবর পরিচয়। তার পরে একদিন ভাগ্যের হঠাৎ এক ঘায়ে তার শিকলি কাটে, সে ছুট দেয় অরণ্যে, তখন তার আর-এক মূর্তি।"

"আজ তুমি তার কোন্‌টা?"

"যেটা আমার বরাবরের সঙ্গে মেলে না, সেইটে। এর আগে অনেক মেয়ের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল, সমাজের কাটা খাল বেয়ে বাঁধা ঘাটে, রুচির ঢাকা-লণ্ঠন জ্বালিয়ে। তাতে দেখাশোনা হয়, চেনাশোনা হয় না। তুমি নিজেই বলো, বন্যা, তোমার সঙ্গেও কি আমার সেই আলাপ?"

লাবণ্য চুপ করে রইল।

অমিত বললে, "বাইরে বাইরে দুই নক্ষত্র পরস্পরকে সেলাম করতে করতে প্রদক্ষিণ করে চলে, কায়দাটা বেশ শোভন, নিরাপদ, সেটাতে যেন তাদের রুচির টান, মর্মের মিল নয়। হঠাৎ যদি মরণের ধাক্কা লাগে, নিবে যায় দুই তারার লণ্ঠন, দোঁহে এক হয়ে ওঠবার আগুন ওঠে জ্বলে। সেই আগুন জ্বলেছে, অমিত রায় বদলে গেল। মানুষের ইতিহাসটাই এইরকম। তাকে দেখে মনে হয় ধারাবাহিক, কিন্তু আসলে সে আকস্মিকের মালা গাঁথা। সৃষ্টির গতি চলে সেই আকস্মিকের ধাক্কায় ধাক্কায়, দমকে দমকে, যুগের পর যুগ এগিয়ে যায় ঝাঁপতালের লয়ে। তুমি আমার তাল বদলিয়ে দিয়েছ, বন্যা, সেই তালেই তো তোমার সুরে আমার সুরে গাঁথা পড়ল।"

লাবণ্যর চোখের পাতা ভিজে এল। তবু এ-কথা মনে না-করে থাকতে পারলে না যে, অমিতর মনের গড়নটা সাহিত্যিক, প্রত্যেক অভিজ্ঞতায় ওর মুখে কথার উচ্ছ্বাস তোলে। সেইটে ওর জীবনের ফসল, তাতেই ও পায় আনন্দ। আমাকে ওর প্রয়োজন সেইজন্যেই। যে-সব কথা ওর মনে বরফ হয়ে জমে আছে, ও নিজে যার ভার বোধ করে, কিন্তু আওয়াজ পায় না, আমার উত্তাপ লাগিয়ে তাকে গলিয়ে ঝরিয়ে দিতে হবে।

দুজনে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থেকে লাবণ্য হঠাৎ এক সময়ে প্রশ্ন করলে, "আচ্ছা, মিতা, তুমি কি মনে কর না, যেদিন তাজমহল তৈরি শেষ হল, সেদিন মমতাজের মৃত্যুর জন্যে শাজাহান খুশি হয়েছিলেন? তাঁর স্বপ্নকে অমর করবার জন্যে এই মৃত্যুর দরকার

ছিল। এই মৃত্যুই মমতাজের সব-চেয়ে বড়ো প্রেমের দান। তাজমহলে শাজাহানের শোক প্রকাশ পায় নি, তাঁর আনন্দ রূপ ধরেছে।"

অমিত বললে, "তোমার কথায় তুমি ক্ষণে ক্ষণে আমাকে চমক লাগিয়ে দিচ্ছ। তুমি নিশ্চয়ই কবি।"

"আমি চাই নে কবি হতে।"

"কেন চাও না?"

"জীবনের উত্তাপে কেবল কথার প্রদীপ জ্বালাতে আমার মন যায় না। জগতে যারা উৎসবসভা সাজাবার হুকুম পেয়েছে কথা তাদের পক্ষেই ভালো। আমার জীবনের তাপ জীবনের কাজের জন্যেই।"

"বন্যা, তুমি কথাকে অস্বীকার করছ? জান না, তোমার কথা আমাকে কেমন করে জাগিয়ে দেয়। তুমি কী করে জানবে তুমি কী বল, আর সে-বলার কী অর্থ। আবার দেখছি নিবারণ চক্রবর্তীকে ডাকতে হল। ওর নাম শুনে শুনে তুমি বিরক্ত হয়ে গেছ। কিন্তু কী করব বল, ওই লোকটা আমার মনের কথার ভাণ্ডারী। নিবারণ এখনও নিজের কাছে নিজে পুরোনো হয়ে যায় নি,—ও প্রত্যেক বারেই যে-কবিতা লেখে সে ওর প্রথম কবিতা। সেদিন ওর খাতা ঘাঁটতে ঘাঁটতে অল্পদিন আগেকার একটা লেখা পাওয়া গেল। ঝরনার উপরে কবিতা,—কী করে খবর পেয়েছে শিলঙ পাহাড়ে এসে আমার ঝরনা আমি খুঁজে পেয়েছি। ও লিখছে—

ঝরনা, তোমার স্ফটিক জলের
স্বচ্ছ ধারা,
তাহারি মাঝারে দেখে আপনারে
সূর্যতারা।

আমি নিজে যদি লিখতুম, এর চেয়ে স্পষ্টতর করে তোমার বর্ণনা করতে পারতুম না। তোমার মনের মধ্যে এমন একটি স্বচ্ছতা আছে যে, আকাশের সমস্ত আলো সহজেই প্রতিবিম্বিত হয়। তোমার সব-কিছুর মধ্যে ছড়িয়ে-পড়া সেই আলো আমি দেখতে পাই। তোমার মুখে, তোমার হাসিতে, তোমার কথায়, তোমার স্থির হয়ে বসে থাকায়, তোমার রাস্তা দিয়ে চলায়।

আজি মাঝে মাঝে আমার ছায়ারে
দুলায়ে খেলায়ো তারি এক ধারে,
সে-ছায়ারি সাথে হাসিয়া মিলায়ো
কলধ্বনি;

দিয়ো তারে বাণী যে-বাণী তোমার
চিরন্তনী।

তুমি ঝরনা, জীবনস্রোতে তুমি যে কেবল চলছ তা নয়, তোমার চলার সঙ্গে সঙ্গেই তোমার বলা। সংসারের যে-সব কঠিন অচল পাথরগুলোর উপর দিয়ে চল তারাও তোমার সংঘাতে সুরে বেজে ওঠে।

আমার ছায়াতে তোমার হাসিতে
মিলিত ছবি,
তাই নিয়ে আজি পরানে আমার
মেতেছে কবি।
পদে পদে তব আলোর ঝলকে
ভাষা আনে প্রাণে পলকে পলকে,
মোর বাণীরূপ দেখিলাম আজি
নির্ঝরিণী,
তোমার প্রবাহে মনেরে জাগায়,
নিজেরে চিনি।"

লাবণ্য একটু ম্লান হাসি হেসে বললে, যতই আমার আলো থাক আর ধ্বনি থাক, তোমার ছায়া তবু ছায়াই, সে-ছায়াকে আমি ধরে রাখতে পারব না।"

অমিত বললে, "কিন্তু একদিন হয়তো দেখবে আর কিছু যদি না থাকে আমার বাণীরূপ রয়েছে।"

লাবণ্য হেসে বললে, "কোথায়? নিবারণ চক্রবর্তীর খাতায়?"

"আশ্চর্য কিছুই নেই। আমার মনের নিচের স্তরে যে-ধারা বয়, নিবারণের ফোয়ারায় কেমন করে সেটা বেরিয়ে আসে।"

"তা হলে কোনো একদিন হয়তো কেবল নিবারণ চক্রবর্তীর ফোয়ারার মধ্যেই তোমার মনটিকে পাব, আর কোথাও নয়।"

এমন সময় বাসা থেকে লোক এল ডাকতে,— খাবার তৈরি।

অমিত চলতে চলতে ভাবতে লাগল যে, লাবণ্য বুদ্ধির আলোতে সমস্তই স্পষ্ট করে জানতে চায়। মানুষ স্বভাবত যেখানে আপনাকে ভোলাতে ইচ্ছা করে ও সেখানেও নিজেকে ভোলাতে পারে না। লাবণ্য যে-কথাটা বললে, সেটার তো প্রতিবাদ করতে পারছি নে। অন্তরাত্মার গভীর উপলব্ধি বাইরে প্রকাশ করতেই হয়, কেউ বা করে জীবনে, কেউ বা করে রচনায়,— জীবনকে ছুঁতে ছুঁতে, অথচ তার থেকে সরতে সরতে,

নদী যেমন কেবলই তীর থেকে সরতে সরতে চলে, তেমনি। আমি কি কেবলই রচনার স্রোত নিয়েই জীবন থেকে সরে সরে যাব ? এইখানেই কি মেয়েপুরুষের ভেদ ? পুরুষ তার সমস্ত শক্তিকে সার্থক করে সৃষ্টি করতে, সেই সৃষ্টি আপনাকে এগিয়ে দেবার জন্যেই আপনাকে পদে পদে ভোলে। মেয়ে তার সমস্ত শক্তিকে খাটায় রক্ষা করতে, পুরোনোকে রক্ষা করবার জন্যেই নতুন সৃষ্টিকে সে বাধা দেয়। রক্ষার প্রতি সৃষ্টি নিষ্ঠুর, সৃষ্টির প্রতি রক্ষা বিঘ্ন। এমন কেন হল ? এক জায়গায় এরা পরস্পরকে আঘাত করবেই। যেখানে খুব করে মিল, সেইখানেই মস্ত বিরুদ্ধতা। তাই ভাবছি আমাদের সকলের চেয়ে বড়ো যে-পাওনা, সে মিলন নয়, সে মুক্তি। এ-কথাটা ভাবতে অমিতকে পীড়া দিলে, কিন্তু ওর মন এটাকে অস্বীকার করতে পারলে না।

৮

লাবণ্য-তর্ক

যোগমায়া বললেন, "মা লাবণ্য, তুমি ঠিক বুঝেছ ?"

"ঠিক বুঝেছি, মা।"

"অমিত ভারি চঞ্চল, সে-কথা মানি। সেইজন্যেই ওকে এত স্নেহ করি। দেখো না, ও কেমনতরো এলোমেলো। হাত থেকে সবই যেন পড়ে পড়ে যায়।"

লাবণ্য একটু হেসে বললে, "ওঁকে সবই যদি ধরে রাখতেই হত, হাত থেকে সবই যদি খসে খসে না পড়ত তাহলেই ওঁর ঘটত বিপদ। ওঁর নিয়ম হচ্ছে, হয় উনি পেয়েও পাবেন না, নয় উনি পেয়েই হারাবেন। যেটা পাবেন সেটা যে আবার রাখতে হবে এটা ওঁর ধাতের সঙ্গে মেলে না।"

"সত্যি করে বলি, বাছা, ওর ছেলেমানুষি আমার ভারি ভালো লাগে।"

"সেটা হল মায়ের ধর্ম। ছেলেমানুষিতে দায় যত-কিছু সব মায়ের। আর ছেলের যত-কিছু সব খেলা। কিন্তু আমাকে কেন বলছ, দায় নিতে যে পারে না তার উপরে দায় চাপাতে ?"

"দেখছ না, লাবণ্য, ওর অমন দুরন্ত মন, আজকাল অনেকখানি যেন ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। দেখে আমার বড়ো মায়া করে। যাই বল, ও তোমাকে ভালোবাসে।"

"তা বাসেন।"

"তবে আর ভাবনা কিসের ?"

"কর্তামা, ওঁর যেটা স্বভাব তার উপর আমি একটুও অত্যাচার করতে চাই নে।"

"আমি তো এই জানি, লাবণ্য, ভালোবাসা খানিকটা অত্যাচার চায়, অত্যাচার করেও।"

"কর্তামা, সে-অত্যাচারের ক্ষেত্র আছে; কিন্তু স্বভাবের উপর পীড়ন সয় না। সাহিত্যে ভালোবাসার বই যতই পড়লেম ততই এই কথাটা বার বার আমার মনে হয়েছে ভালোবাসার ট্র্যাজেডি ঘটে সেইখানেই যেখানে পরস্পরকে স্বতন্ত্র জেনে মানুষ সন্তুষ্ট থাকতে পারে নি, নিজের ইচ্ছেকে অন্যের ইচ্ছে করবার জন্যে যেখানে জুলুম, যেখানে মনে করি আপন মনের মতো করে বদলিয়ে অন্যকে সৃষ্টি করব।"

"তা, মা, দুজনকে নিয়ে সংসার পাততে গেলে পরস্পর পরস্পরকে খানিকটা সৃষ্টি না করে নিলে চলেই না। ভালোবাসা যেখানে আছে সেখানে সেই সৃষ্টি সহজ,—যেখানে নেই সেখানে হাতুড়ি পিটোতে গিয়ে, তুমি যাকে ট্র্যাজেডি বল, তাই ঘটে।"

"সংসার পাতবার জন্যেই যে-মানুষ তৈরি, তার কথা ছেড়ে দাও। সে তো মাটির মানুষ, সংসারের প্রতিদিনের চাপেই তার গড়নপিটোন আপনিই ঘটতে থাকে। কিন্তু যে-মানুষ মাটির মানুষ একেবারেই নয়, সে আপনার স্বাতন্ত্র্য কিছুতেই ছাড়তে পারে না। যে-মেয়ে তা না বোঝে সে যতই দাবি করে ততই হয় বঞ্চিত, যে-পুরুষ তা না বোঝে সে যতই টানাহেঁচড়া করে ততই আসল মানুষটাকে হারায়। আমার বিশ্বাস, অধিকাংশ স্থলেই আমরা যাকে পাওয়া বলি সে, আর কিছু নয়, হাতকড়া হাতকে যে-রকম পায় সেই আর কি।"

"তুমি কী করতে চাও, লাবণ্য?"

"বিয়ে করে দুঃখ দিতে চাই নে। বিয়ে সকলের জন্যে নয়। জান, কর্তামা খুঁতখুঁতে মন যাদের, তারা মানুষকে খানিক-খানিক বাদ দিয়ে দিয়ে বেছে বেছে নেয়। কিন্তু বিয়ের ফাঁদে জড়িয়ে পড়ে স্ত্রীপুরুষ যে বড়ো বেশি কাছাকাছি এসে পড়ে—মাঝে ফাঁক থাকে না, তখন একেবারে গোটা মানুষকে নিয়েই কারবার করতে হয়, নিতান্ত নিকটে থেকে। কোনো একটা অংশ ঢাকা রাখবার জো থাকে না।"

"লাবণ্য, তুমি নিজেকে জান না। তোমাকে নিতে গেলে কিছুই বাদ দিয়ে নেবার দরকার হবে না।"

"কিন্তু উনি তো আমাকে চান না। যে-আমি সাধারণ মানুষ, ঘরের মেয়ে, তাকে উনি দেখতে পেয়েছেন বলে মনেই করি নে। আমি যেই ওঁর মনকে স্পর্শ করেছি অমনি ওঁর মন অবিরাম ও অজস্র কথা কয়ে উঠেছে। সেই কথা দিয়ে উনি কেবলই আমাকে গড়ে তুলেছেন। ওঁর মন যদি ক্লান্ত হয়, কথা যদি ফুরোয়, তবে সেই নিঃশব্দের ভিতরে

ধরা পড়বে এই নিতান্ত সাধারণ মেয়ে, যে-মেয়ে ওঁর নিজের সৃষ্টি নয়। বিয়ে করলে মানুষকে মেনে নিতে হয়, তখন আর গড়ে নেবার ফাঁক পাওয়া যায় না।"

"তোমার মনে হয়, অমিত তোমার মতো মেয়েকেও সম্পূর্ণ মেনে নিতে পারবে না?"

"স্বভাব যদি বদলায় তবে পারবেন। কিন্তু বদলাবেই বা কেন? আমি তো তা চাই না।"

"তুমি কী চাও?"

"যতদিন পারি, না হয় ওঁর কথার সঙ্গে, ওঁর মনের খেলার সঙ্গে মিশিয়ে স্বপ্ন হয়েই থাকব। আর স্বপ্নই বা তাকে বলব কেন? সে আমার একটা বিশেষ জন্ম, একটা বিশেষ রূপ, একটা বিশেষ জগতে সে সত্য হয়ে দেখা দিয়েছে। না হয় সে, গুটি থেকে বের-হয়ে-আসা দু-চারদিনের একটা রঙিন প্রজাপতিই হল, তাতে দোষ কী—জগতে প্রজাপতি আর-কিছুর চেয়ে যে কম সত্য তা তো নয়—না হয় সে সূর্যোদয়ের আলোতে দেখা দিলে, আর সূর্যাস্তের আলোতে মরেই গেল তাতেই বা কী? কেবল এইটুকুই দেখা চাই যে, সেটুকু সময় যেন ব্যর্থ হয়ে না যায়।"

"সে যেন বুঝলুম, তুমি অমিতর কাছে না হয় ক্ষণকালের মায়ারূপেই থাকবে। আর নিজে? তুমিও কি বিয়ে করতে চাও না? তোমার কাছে অমিতও কি মায়া?"

লাবণ্য চুপ করে বসে রইল, কোনো জবাব করলে না।

যোগমায়া বললেন, "তুমি যখন তর্ক কর তখন বুঝতে পারি তুমি অনেক বই-পড়া মেয়ে, তোমার মতো করে ভাবতেও পারি নে, কথা কইতেও পারি নে; শুধু তাই নয়, হয়তো কাজের বেলাতেও এত শক্ত হতে পারি নে। কিন্তু তর্কের ফাঁকের মধ্যে দিয়েও যে তোমাকে দেখেছি, মা। সেদিন রাত তখন বারোটা হবে—দেখলুম তোমার ঘরে আলো জ্বলছে, ঘরে গিয়ে দেখি, তোমার টেবিলের উপর শুয়ে পড়ে দুই হাতের মধ্যে মুখ রেখে তুমি কাঁদছ। এ তো ফিলজফি-পড়া মেয়ে নয়। একবার ভাবলুম, সান্ত্বনা দিয়ে আসি, তার পরে ভাবলুম, সব মেয়েকেই কাঁদবার দিনে কেঁদে নিতে হবে, চাপা দিতে যাওয়া কিছু নয়। এ-কথা খুবই জানি, তুমি সৃষ্টি করতে চাও না, ভালোবাসতে চাও। মনপ্রাণ দিয়ে সেবা না করতে পারলে তুমি বাঁচবে কী করে? তাই তো বলি ওকে কাছে না পেলে তোমার চলবে না। বিয়ে করব না বলে হঠাৎ পণ করে ব'সো না। একবার তোমার মনে একটা জেদ চাপলে আর তোমাকে সোজা করা যায় না, তাই ভয় করি।"

লাবণ্য কিছু বললে না, নতমুখে কোলের উপর শাড়ির আঁচলটা চেপে চেপে

অনাবশ্যক ভাঁজ করতে লাগল। যোগমায়া বললেন, "তোমাকে দেখে আমার অনেকবার মনে হয়েছে, অনেক পড়ে, অনেক ভেবে তোমাদের মন বেশি সূক্ষ্ম হয়ে গেছে; তোমরা ভিতরে ভিতরে যে-সব ভাব গড়ে তুলছ আমাদের সংসারটা তার উপযুক্ত নয়। আমাদের সময়ে মনের যে-সব আলো অদৃশ্য ছিল, তোমরা আজ যেন সেগুলোকেও ছাড়ান দিতে চাও না। তারা দেহের মোটা আবরণটাকে ভেদ করে দেহটাকে যেন অগোচর করে দিচ্ছে। আমাদের আমলে মনের মোটা মোটা ভাবগুলো নিয়ে সংসারে সুখদুঃখ যথেষ্ট ছিল—সমস্যা কিছু কম ছিল না। আজ তোমরা এতই বাড়িয়ে তুলছ, কিছুই আর সহজ রাখলে না।"

লাবণ্য একটুখানি হাসলে। এই সেদিন অমিত অদৃশ্য আলোর কথা যোগমায়াকে বোঝাচ্ছিল, তার থেকে এই যুক্তি তাঁর মাথায় এসেছে—এও তো সূক্ষ্ম; যোগমায়ার মাঠাকরুন এ-কথা এমন করে বুঝতেন না। বললে, "কর্তামা, কালের গতিকে মানুষের মন যতই স্পষ্ট করে সব কথা বুঝতে পারবে ততই শক্ত করে তার ধাক্কা সইতেও পারবে। অন্ধকারের ভয়, অন্ধকারের দুঃখ অসহ্য, কেননা সেটা অস্পষ্ট।"

যোগমায়া বললেন, "আজ আমার বোধ হচ্ছে কোনোকালে তোমাদের দুজনের দেখা না হলেই ভালো হত।"

"না না, তা ব'লো না। যা হয়েছে এ ছাড়া আর কিছু যে হতে পারত এ আমি মনেও করতে পারি নে। এক সময়ে আমার দৃঢ়বিশ্বাস ছিল যে, আমি নিতান্তই শুকনো,—কেবল বই পড়ব আর পাস করব এমনি করেই আমার জীবন কাটবে। আজ হঠাৎ দেখলুম আমিও ভালোবাসতে পারি। আমার জীবনে এমন অসম্ভব যে সম্ভব হল এই আমার ঢের হয়েছে। মনে হয় এতদিন ছায়া ছিলুম, এখন সত্য হয়েছি। এর চেয়ে আর কী চাই। আমাকে বিয়ে করতে ব'লো না, কর্তামা।"

বলে চৌকি থেকে মেঝেতে নেমে যোগমায়ার কোলে মাথা রেখে কাঁদতে লাগল।

১০

বাসা-বদল

গোড়ায় সবাই ঠিক করে রেখেছিল অমিত দিন পনেরোর মধ্যে কলকাতায় ফিরবে। নরেন মিত্তির খুব মোটা বাজি রেখেছিল যে, সাত দিন পেরোবে না। এক মাস যায়, দু-মাস যায়, ফেরবার নামও নেই। শিলঙের বাসার মেয়াদ ফুরিয়েছে,—রংপুরের কোন্ জমিদার এসে সেটা দখল করে বসল। অনেক খোঁজ করে যোগমায়াদের কাছাকাছি একটা বাসা পাওয়া গেছে। এক সময়ে ছিল গোয়ালার কি মালীর ঘর,—

তার পরে একজন কেরানির হাতে পড়ে তাতে গরিবি ভদ্রতার অল্প একটু আঁচ লেগেছিল। সে কেরানিও গেছে মরে, তারই বিধবা এটা ভাড়া দেয়। জানলা-দরজা প্রভৃতির কার্পণ্যে ঘরের মধ্যে তেজ মরুৎ ব্যোম এই তিন ভূতেরই অধিকার সংকীর্ণ, কেবল বৃষ্টির দিনে অপ্ অবতীর্ণ হয় আশাতীত প্রাচুর্যের সঙ্গে, অখ্যাত ছিদ্রপথ দিয়ে।

ঘরের অবস্থা দেখে যোগমায়া একদিন চমকে উঠলেন। বললেন, "বাবা, নিজেকে নিয়ে এ কী পরীক্ষা চলেছে?"

অমিত উত্তর করলে, "উমার ছিল নিরাহারের তপস্যা, শেষকালে পাতা পর্যন্ত খাওয়া ছেড়েছিলেন। আমার হল নিরাসবাবের তপস্যা,—খাট পালঙ টেবিল কেদারা ছাড়তে ছাড়তে প্রায় এসে ঠেকেছে শূন্য দেয়ালে। সেটা ঘটেছিল হিমালয় পর্বতে, এটা ঘটল শিলঙ পাহাড়ে। সেটাতে কন্যা চেয়েছিলেন বর, এটাতে বর চাচ্ছেন কন্যা। সেখানে নারদ ছিলেন ঘটক, এখানে স্বয়ং আছেন মাসিমা,—এখন শেষ পর্যন্ত যদি কোনো কারণে কালিদাস এসে না পৌঁছোতে পারেন অগত্যা আমাকেই তাঁর কাজটাও যথাসম্ভব সারতে হবে।"

অমিত হাসতে হাসতে কথাগুলো বলে কিন্তু যোগমায়াকে ব্যথা দেয়। তিনি প্রায় বলতে গিয়েছিলেন, আমাদের বাড়িতেই এসে থাকো,—থেমে গেলেন। ভাবলেন, বিধাতা একটা কাণ্ড ঘটিয়ে তুলছেন তার মধ্যে আমাদের হাত পড়লে অসাধ্য জট পাকিয়ে উঠতে পারে। নিজের বাসা থেকে অল্প কিছু জিনিসপত্র পাঠিয়ে দিলেন, আর সেই সঙ্গে এই লক্ষ্মীছাড়াটার 'পরে তাঁর করুণা দ্বিগুণ বেড়ে গেল। লাবণ্যকে বারবার বললেন, "মা লাবণ্য, মনটাকে পাষাণ ক'রো না।"

একদিন বিষম এক বর্ষণের অন্তে অমিত কেমন আছে খবর নিতে গিয়ে যোগমায়া দেখলেন, নড়বড়ে একটা চারপেয়ে টেবিলের নিচে কম্বল পেতে অমিত একলা বসে একখানা ইংরেজি বই পড়ছে। ঘরের মধ্যে যেখানে-সেখানে বৃষ্টিবিন্দুর অসংগত আবির্ভাব দেখে টেবিল দিয়ে একটা গুহা বানিয়ে তার নিচে অমিত পা ছড়িয়ে বসে গেল। প্রথমে নিজে নিজেই হেসে নিলে এক চোট, তার পরে চলল কাব্যালোচনা। মনটা ছুটেছিল যোগমায়ার বাড়ির দিকে। কিন্তু শরীরটা দিলে বাধা। কারণ, যেখানে কোনো প্রয়োজন হয় না সেই কলকাতায় অমিত কিনেছিল এক অনেক দামের বর্ষাতি, যেখানে সর্বদাই প্রয়োজন সেখানে আসবার সময় সেটা আনবার কথা মনে হয় নি। একটা ছাতা সঙ্গে ছিল, সেটা খুব সম্ভব কোনো একদিন সংকল্পিত গম্যস্থানেই ফেলে এসেছে, আর তা যদি না হয় তবে সেই বুড়ো দেওদারের তলে সেটা আছে পড়ে। যোগমায়া ঘরে ঢুকে বললেন, "এ কী কাণ্ড অমিত?"

অমিত তাড়াতাড়ি টেবিলের নিচে থেকে বেরিয়ে এসে বললে, "আমার ঘরটা আজ অসম্বদ্ধ প্রলাপে মেতেছে, দশা আমার চেয়ে ভালো নয়।"

"অসম্বদ্ধ প্রলাপ ?"

"অর্থাৎ বাড়ির চালটা প্রায় ভারতবর্ষ বললেই হয়। অংশগুলোর মধ্যে সম্বন্ধটা আলগা। এইজন্যে উপর থেকে উৎপাত ঘটলেই চারিদিকে এলোমেলো অশ্রুবর্ষণ হতে থাকে, আর বাইরের দিক থেকে যদি ঝড়ের দাপট লাগে, তবে সোঁ সোঁ ক'রে উঠতে থাকে দীর্ঘশ্বাস। আমি তো প্রটেস্ট স্বরূপে মাথার উপরে এক মঞ্চ খাড়া করেছি,— ঘরের মিসগভর্মেন্টের মাঝখানেই নিরুপদ্রব হোমরুলের দৃষ্টান্ত। পলিটিকসের একটা মূলনীতি এখানে প্রত্যক্ষ।"

"মূলনীতিটা কী শুনি।"

"সেটা হচ্ছে এই যে, যে-ঘরওআলা ঘরে বাস করে না সে যতবড়ো ক্ষমতাশালীই হ'ক তার শাসনের চেয়ে যে-দরিদ্র বাসাড়ে ঘরে থাকে তার যেমন-তেমন ব্যবস্থাও ভালো।"

আজ লাবণ্যর 'পরে যোগমায়ার খুব রাগ হল। অমিতকে তিনি যতই গভীর ক'রে স্নেহ করছেন ততই মনে-মনে তার মূর্তিটা খুব উঁচু করেই গড়ে তুলছেন। "এত বিদ্যে, এত বুদ্ধি, এত পাস, অথচ এমন সাদা মন। গুছিয়ে কথা বলবার কী অসামান্য শক্তি। আর যদি চেহারার কথা বল আমার চোখে তো লাবণ্যর চেয়ে ওকে অনেক বেশি সুন্দর ঠেকে। লাবণ্যর কপাল ভালো, অমিত কোন্ গ্রহের চক্রান্তে ওকে এমন মুগ্ধ চোখে দেখেছে। সেই সোনার চাঁদ ছেলেকে লাবণ্য এত করে দুঃখ দিচ্ছে। খামকা বলে বসলেন কিনা, বিয়ে করবেন না। যেন কোন্ রাজরাজেশ্বরী। ধনুক-ভাঙা পণ। এত অহংকার সইবে কেন ? পোড়ারমুখীকে যে কেঁদে কেঁদে মরতে হবে।"

একবার যোগমায়া ভাবলেন অমিতকে গাড়িতে করে তুলে নিয়ে যাবেন তাঁদের বাড়িতে। তার পরে কী ভেবে বললেন, "একটু বসো, বাবা, আমি এখনই আসছি।"

বাড়ি গিয়েই চোখে পড়ল লাবণ্য তার ঘরের সোফায় হেলান দিয়ে পায়ের উপর শাল মেলে গোর্কির "মা" বলে গল্পের বই পড়ছে। ওর এই আরামটা দেখে ওঁর মনে-মনে রাগ আরও বেড়ে উঠল।

বললেন, "চলো, একটু বেড়িয়ে আসবে।"

সে বললে, "কর্তামা, আজ বেরোতে ইচ্ছে করছে না।"

যোগমায়া ঠিক বুঝলেন না যে, লাবণ্য নিজের কাছ থেকে ছুটে গিয়ে এই গল্পের

মধ্যে আশ্রয় নিয়েছে। সমস্ত দুপুরবেলা, খাওয়ার পর থেকেই, তার মনের মধ্যে একটা অস্থির অপেক্ষা ছিল কখন আসবে অমিত। কেবলই মন বলেছে এল বুঝি। বাইরে দমকা হাওয়ার দৌরাত্ম্যে পাইন গাছগুলো থেকে থেকে ছটফট করে, আর দুর্দান্ত বৃষ্টিতে সদ্যোজাত ঝরনাগুলো এমনি ব্যতিব্যস্ত, যেন তাদের মেয়াদের সময়টার সঙ্গে ঊর্ধ্বশ্বাসে তাদের পাল্লা চলেছে। লাবণ্যর মধ্যে একটা ইচ্ছে আজ অশান্ত হয়ে উঠল,—যাক সব বাধা ভেঙে, সব দ্বিধা উড়ে, অমিতর দুই হাত আজ চেপে ধরে বলে উঠি—জন্মে-জন্মান্তরে আমি তোমার। আজ বলা সহজ। আজ সমস্ত আকাশ যে মরিয়া হয়ে উঠল, হূহু করে কী যে হেঁকে উঠছে তার ঠিক নেই, তারই ভাষায় আজ বন-বনান্তর ভাষা পেয়েছে, বৃষ্টিধারায় আবিষ্ট গিরিশৃঙ্গগুলো আকাশে কান পেতে দাঁড়িয়ে রইল। অমনি করেই কেউ শুনতে আসুক লাবণ্যর কথা, অমনি মস্ত করে, স্তব্ধ হয়ে, অমনি উদার মনোযোগে। কিন্তু প্রহরের পর প্রহর যায়, কেউ আসে না। ঠিক মনের কথাটি বলার লগ্ন যে উত্তীর্ণ হয়ে গেল। এর পরে যখন কেউ আসবে তখন কথা জুটবে না, তখন সংশয় আসবে মনে, তখন তাণ্ডবনৃত্যোন্মত্ত দেবতার মাভৈঃ রব আকাশে মিলিয়ে যাবে। বৎসরের পর বৎসর নীরবে চলে যায়, তার মধ্যে বাণী একদিন বিশেষ প্রহরে হঠাৎ মানুষের দ্বারে এসে আঘাত করে। সেই সময়ে দ্বার খোলবার চাবিটি যদি না পাওয়া গেল, তবে কোনোদিনই ঠিক কথাটি অকুণ্ঠিত স্বরে বলবার দৈবশক্তি আর জোটে না। যেদিন সেই বাণী আসে সেদিন সমস্ত পৃথিবীকে ডেকে খবর দিতে ইচ্ছে করে—শোনো তোমরা, আমি ভালোবাসি। আমি ভালোবাসি, এই কথাটি অপরিচিত-সিন্ধুপারগামী পাখির মতো কত দিন থেকে, কত দূর থেকে আসছে, সেই কথাটির জন্যেই আমার প্রাণে আমার ইষ্টদেবতা এত দিন অপেক্ষা করছিলেন। স্পর্শ করল আজ সেই কথাটি,—আমার সমস্ত জীবন, আমার সমস্ত জগৎ সত্য হয়ে উঠল। বালিশের মধ্যে মুখ লুকিয়ে লাবণ্য আজ কাকে এমন করে বলতে লাগল, সত্য, সত্য, এত সত্য আর কিছু নেই।

সময় চলে গেল, অতিথি এল না। অপেক্ষার গুরুভারে বুকের ভিতরটা টন টন করতে লাগল, বারান্দায় বেরিয়ে গিয়ে লাবণ্য খানিকটা ভিজে এল জলের ঝাপটা লাগিয়ে। তার পরে একটা গভীর অবসাদে তার মনটাকে ঢেকে ফেললে, নিবিড় একটা নৈরাশ্যে; মনে হল ওর জীবনে যা জ্বলবার তা একবার মাত্র দপ করে জ্বলে তার পরে গেল নিবে, সামনে কিছুই নেই। অমিতকে নিজের ভিতরকার সত্যের দোহাই দিয়ে সম্পূর্ণ করে স্বীকার করে নিতে ওর সাহস চলে গেল। এই কিছু আগেই ওর প্রবল যে একটা ভরসা জেগেছিল সেটা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। অনেকক্ষণ

চুপ করে পড়ে থেকে অবশেষে টেবিল থেকে বইটা টেনে নিলে। কিছু সময় গেল মন দিতে, তার পরে গল্পের ধারার মধ্যে প্রবেশ করে কখন নিজেকে ভুলে গেল তা জানতে পারে নি।

এমন সময় যোগমায়া ডাকলেন বেড়াতে যেতে, ওর উৎসাহ হল না।

যোগমায়া একটা চৌকি টেনে লাবণ্যর সামনে বসলেন, দীপ্ত চোখ তার মুখে রেখে বললেন, "সত্যি করে বলো দেখি লাবণ্য, তুমি কি অমিতকে ভালোবাস ?"

লাবণ্য তাড়াতাড়ি উঠে বসে বললে, "এমন কথা কেন জিজ্ঞাসা করছ, কর্তামা ?"

"যদি না ভালোবাস ওকে স্পষ্ট করেই বল না কেন ? নিষ্ঠুর তুমি, ওকে যদি না চাও তবে ওকে ধরে রেখো না।"

লাবণ্যর বুকের ভিতরটা ফুলে ফুলে উঠল, মুখ দিয়ে কথা বেরোল না।

"এইমাত্র যে-দশা ওর দেখে এলুম বুক ফেটে যায়। এমন ভিক্ষুকের মতো কার জন্যে এখানে ও পড়ে আছে ? ওর মতো ছেলে যাকে চায় সে যে কতবড়ো ভাগ্যবতী তা কি একটুও বুঝতে পার না ?"

চেষ্টা করে রুদ্ধ কণ্ঠের বাধা কাটিয়ে লাবণ্য বলে উঠল, "আমার ভালোবাসার কথা জিজ্ঞাসা করছ, কর্তামা ? আমি তো ভেবে পাই নে আমার চেয়ে ভালোবাসতে পারে পৃথিবীতে এমন কেউ আছে। ভালোবাসায় আমি যে মরতে পারি। এতদিন যা ছিলুম সব যে আমার লুপ্ত হয়ে গেছে। এখন থেকে আমার আর-এক আরম্ভ, এ আরম্ভের শেষ নেই। আমার মধ্যে এ যে কত আশ্চর্য সে আমি কাউকে কেমন করে জানাব ? আর কেউ কি এমন করে জেনেছে ?"

যোগমায়া অবাক হয়ে গেলেন। চিরদিন দেখে এসেছেন লাবণ্যর মধ্যে গভীর শান্তি, এতবড়ো দুঃসহ আবেগ কোথায় এতদিন লুকিয়ে ছিল ? তাকে আস্তে আস্তে বললেন, "মা লাবণ্য, নিজেকে চাপা দিয়ে রেখো না। অমিত অন্ধকারে তোমাকে খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছে,—সম্পূর্ণ করে তার কাছে তুমি আপনাকে জানাও,—একটুও ভয় ক'রো না। যে-আলো তোমার মধ্যে জ্বলেছে সে-আলো যদি তার কাছেও প্রকাশ পেত তাহলে তার কোনো অভাব থাকত না। চলো, মা, এখনই চলো আমার সঙ্গে।"

দুজনে গেলেন অমিতর বাসায়।

১০

দ্বিতীয় সাধনা

তখন অমিত ভিজে চৌকির উপরে এক তাড়া খবরের কাগজ চাপিয়ে তার উপর বসেছে। টেবিলে এক দিস্তে ফুলস্ক্যাপ কাগজ নিয়ে তার চলছে লেখা। সেই সময়েই সে তার বিখ্যাত আত্মজীবনী শুরু করেছিল। কারণ জিজ্ঞাসা করলে বলে, সেই সময়েই তার জীবনটা অকস্মাৎ তার নিজের কাছে দেখা দিয়েছিল নানা রঙে, বাদলের পরদিনকার সকালবেলায় শিলঙ পাহাড়ের মতো—সেদিন নিজের অস্তিত্বের একটা মূল্য সে পেয়েছিল, সে-কথাটা প্রকাশ না করে সে থাকবে কী করে। অমিত বলে, মানুষের মৃত্যুর পরে তার জীবনী লেখা হয়, তার কারণ, একদিকে সংসারে সে মরে আর-একদিকে মানুষের মনে সে নিবিড় করে বেঁচে ওঠে। অমিতর ভাবখানা এই যে, শিলঙে সে যখন ছিল তখন একদিকে সে মরেছিল, তার অতীতটা গিয়েছিল মরীচিকার মতো মিলিয়ে, তেমনি আর-একদিকে সে উঠেছিল তীব্র করে বেঁচে; পিছনের অন্ধকারের উপরে উজ্জ্বল আলোর ছবি প্রকাশ পেয়েছে। এই প্রকাশের খবরটা রেখে যাওয়া চাই। কেননা পৃথিবীতে খুব অল্প লোকের ভাগ্যে এটা ঘটতে পারে, তারা জন্ম থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত একটা প্রদোষচ্ছায়ার মধ্যেই কাটিয়ে যায়, যে-বাদুড় গুহার মধ্যে বাসা করেছে তারই মতো।

তখন অল্প অল্প বৃষ্টি পড়ছে, ঝ'ড়ো হাওয়াটা গেছে থেমে, মেঘ এসেছে পাতলা হয়ে।

অমিত চৌকি ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "এ কী অন্যায় মাসিমা।"

"কেন, বাবা, কী করেছি ?"

"আমি যে একেবারে অপ্রস্তুত। শ্রীমতী লাবণ্য কী ভাববেন ?"

"শ্রীমতী লাবণ্যকে একটু ভাবতে দেওয়াই তো দরকার। যা জানবার সবটাই যে জানা ভালো। এতে শ্রীযুক্ত অমিতের এত আশঙ্কা কেন ?"

"শ্রীযুক্তের যা ঐশ্বর্য সেইটেই শ্রীমতীর কাছে জানাবার। আর শ্রীহীনের যা দৈন্য সেইটে জানাবার জন্যেই আছ তুমি, আমার মাসিমা।"

"এমন ভেদবুদ্ধি কেন, বাছা ?"

"নিজের গরজেই। ঐশ্বর্য দিয়েই ঐশ্বর্য দাবি করতে হয়, আর অভাব দিয়ে চাই আশীর্বাদ। মানবসভ্যতায় লাবণ্য দেবীরা জাগিয়েছেন ঐশ্বর্য, আর মাসিমারা এনেছেন আশীর্বাদ।"

"দেবীকে আর মাসিমাকে একাধারেই পাওয়া যেতে পারে, অমিত ; অভাব ঢাকবার দরকার হয় না।"

"এর জবাব কবির ভাষায় দিতে হয়। গদ্যে যা বলি সেটা স্পষ্ট বোঝাবার জন্যে ছন্দের ভাষ্য দরকার হয়ে পড়ে। ম্যাথ্যু আর্নল্ড কাব্যকে বলেছেন ক্রিটিসিজম্ অফ্ লাইফ, আমি কথাটাকে সংশোধন করে বলতে চাই লাইফ্স কমেণ্টারি ইন ভার্স। অতিথিবিশেষকে আগে থাকতে জানিয়ে রাখি যেটা পড়তে যাচ্ছি সে-লেখাটা কোনো কবিসম্রাটের নয়—

পূর্ণপ্রাণে চাবার যাহা
রিক্ত হাতে চাস নে তারে,
সিক্ত চোখে যাস নে দ্বারে।

ভেবে দেখবেন, ভালোবাসাই হচ্ছে পূর্ণতা, তার যা আকাঙ্ক্ষা সে তো দরিদ্রের কাঙালপনা নয়। দেবতা যখন তাঁর ভক্তকে ভালোবাসেন তখনই আসেন ভক্তের দ্বারে ভিক্ষা চাইতে।

রত্নমালা আনবি যবে
মালা-বদল তখন হবে,
পাতবি কি তোর দেবীর আসন
শূন্য ধুলায় পথের ধারে ?

সেইজন্যেই তো সম্প্রতি দেবীকে একটু হিসেব করে ঘরে ঢুকতে বলেছিলুম। পাতবার কিছুই নেই তো পাতব কী। এই ভিজে খবরের কাগজগুলো ? আজকাল সম্পাদকী কালির দাগকে সব-চেয়ে ভয় করি। কবি বলছেন, ডাকবার মানুষকে ডাকি, যখন জীবনের পেয়ালা উছলে পড়ে, তাকে তৃষ্ণার শরিক হতে ডাকি নে।

পুষ্প-উদার চৈত্রবনে
বক্ষে ধরিস নিত্য-ধনে,
লক্ষ শিখায় জ্বলবে যখন
দীপ্ত প্রদীপ অন্ধকারে।

মাসিদের কোলে জীবনের আরম্ভেই মানুষের প্রথম তপস্যা দারিদ্র্যের, নগ্ন সন্ন্যাসীর স্নেহসাধনা। এই কুটিরে তারই কঠোর আয়োজন। আমি তো ঠিক করে রেখেছি এই কুটিরের নাম দেব মাসতুতো বাংলো।"

"বাবা, জীবনের দ্বিতীয় তপস্যা ঐশ্বর্যের, দেবীকে বাঁ পাশে নিয়ে প্রেমসাধনা।

এ-কুটিরেও তোমার সে-সাধনা ভিজে কাগজে চাপা পড়বে না। বর পাই নি বলে নিজেকে ভোলাচ্ছ? মনে-মনে নিশ্চয় জান পেয়েছ।"

এই বলে লাবণ্যকে অমিতর পাশে দাঁড় করিয়ে তার ডান হাত অমিতর ডান হাতের উপর রাখলেন। লাবণ্যর গলা থেকে সোনার হারগাছি খুলে তাই দিয়ে দুজনের হাত বেঁধে বললেন, "তোমাদের মিলন অক্ষয় হ'ক।"

অমিত লাবণ্য দুজনে মিলে যোগমায়ার পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করলে। তিনি বললেন, "তোমরা একটু বসো, আমি বাগান থেকে কিছু ফুল নিয়ে আসি গে।"

বলে গাড়ি করে ফুল আনতে গেলেন। অনেকক্ষণ দুইজনে পাটিয়াটার উপরে পাশাপাশি চুপ করে বসে রইল। একসময়ে অমিতর মুখের দিকে মুখ তুলে লাবণ্য মৃদুস্বরে বললে, "আজ তুমি সমস্ত দিন গেলে না কেন?"

অমিত উত্তর দিলে, "কারণটা এত বেশি তুচ্ছ যে আজকের দিনে সে-কথাটা মুখে আনতে সাহসের দরকার। ইতিহাসে কোনোখানে লেখে না যে, হাতের কাছে বর্ষাতি ছিল না বলে বাদলার দিনে প্রেমিক তার প্রিয়ার কাছে যাওয়া মুলতবি রেখেছে। বরঞ্চ লেখা আছে সাঁতার দিয়ে অগাধ-জল পার হওয়ার কথা। কিন্তু সেটা অন্তরের ইতিহাস, সেখানকার সমুদ্রে আমিও কি সাঁতার কাটছি নে ভাবছ? সে-অকূল কোনোকালে কি পার হব?

For we are bound where mariner has not yet dared to go,
And we will risk the ship, ourselves and all.

আমরা যাব যেখানে কোনো
যায় নি নেয়ে সাহস করি,
ডুবি যদি তো ডুবি না কেন,
ডুবুক সবি, ডুবুক তরী।

বন্যা, আমার জন্যে আজ তুমি অপেক্ষা করে ছিলে?"

"হাঁ, মিতা, বৃষ্টির শব্দে সমস্ত দিন যেন তোমার পায়ের শব্দ শুনেছি। মনে হয়েছে কত অসম্ভব দূর থেকে যে আসছ তার ঠিক নেই। শেষকালে তো এসে পৌঁছোলে আমার জীবনে।"

"বন্যা, আমার জীবনের মাঝখানটিতে ছিল এতকাল তোমাকে না-জানার একটা প্রকাণ্ড কালো গর্ত। ওইখানটা ছিল সব-চেয়ে কুশ্রী। আজ সেটা কানা ছাপিয়ে ভরে উঠল—তারই উপরে আলো ঝলমল করে, সমস্ত আকাশের ছায়া পড়ে, আজ

সেইখানটাই হয়েছে সব-চেয়ে সুন্দর। এই যে আমি ক্রমাগতই কথা কয়ে যাচ্ছি এ হচ্ছে ওই পরিপূর্ণ প্রাণসরোবরের তরঙ্গধ্বনি, একে থামায় কে।"

"মিতা, তুমি আজ সমস্ত দিন কী করছিলে?"

"মনের মাঝখানটাতে তুমি ছিলে, একেবারে নিস্তব্ধ। তোমাকে কিছু বলতে চাচ্ছিলুম,—কোথায় সেই কথা। আকাশ থেকে বৃষ্টি পড়ছে আর আমি কেবলই বলেছি, কথা দাও, কথা দাও!

O what is this?
Mysterious and uncapturable bliss
That I have known, yet seems to be
Simple as breath and easy as a smile,
And older than the earth.

এ কী রহস্য, এ কী আনন্দরাশি!
জেনেছি তাহারে, পাই নি তবুও পেয়ে।
তবু সে সহজে প্রাণে উঠে নিঃশ্বাসি',
তবু সে সরল যেন রে সরল হাসি,
পুরানো সে যেন এই ধরণীর চেয়ে।

বসে বসে ওই করি। পরের কথাকে নিজের কথা করে তুলি। সুর দিতে পারতুম যদি তবে সুর লাগিয়ে বিদ্যাপতির বর্ষার গানটাকে সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করতুম—

বিদ্যাপতি কহে, কৈসে গোঙায়বি
হরি বিনে দিন রাতিয়া।

যাকে না হলে চলে না, তাকে না পেয়ে কী করে দিনের পর দিন কাটবে, ঠিক এই কথাটার সুর পাই কোথায়। উপরে চেয়ে কখনো বলি, কথা দাও, কখনো বলি সুর দাও। কথা নিয়ে সুর নিয়ে দেবতা নেমেও আসেন, কিন্তু পথের মধ্যে মানুষ-ভুল করেন, খামকা আর-কাউকে দিয়ে বসেন,—হয়তো বা তোমাদের ওই রবি ঠাকুরকে।"

লাবণ্য হেসে বললে, "রবি ঠাকুরকে যারা ভালোবাসে তারাও তোমার মতো এত বার বার করে তাঁকে স্মরণ করে না।"

"বন্যা, আজ আমি বড়ো বেশি বকছি, না? আমার মধ্যে বকুনির মনসুন নেমেছে। ওয়েদার রিপোর্ট যদি রাখ তো দেখবে এক-একদিনে কত ইঞ্চি পাগলামি তার ঠিকানা নেই। কলকাতায় যদি থাকতুম তোমাকে নিয়ে টায়ার কাটাতে কাটাতে মোটরে

করে একেবারে মোরাদাবাদে দিতুম দৌড়। যদি জিজ্ঞাসা করতে মোরাদাবাদে কেন, তার কোনোই কারণ দেখাতে পারতুম না। বান যখন আসে তখন সে বকে, ছোটে, সময়টাকে হাসতে হাসতে ফেনার মতো ভাসিয়ে নিয়ে যায়।"

এমন সময় ডালিতে ভরে যোগমায়া সূর্যমুখী ফুল আনলেন। বললেন, "মা লাবণ্য, এই ফুল দিয়ে আজ তুমি ওকে প্রণাম করো।"

এটা আর কিছু নয়, একটা অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে প্রাণের ভিতরকার জিনিসকে বাইরে শরীর দেবার মেয়েলি চেষ্টা। দেহকে বানিয়ে তোলবার আকাঙ্ক্ষা ওদের রক্তে মাংসে।

আজ কোনো এক সময়ে অমিত লাবণ্যকে কানে কানে বললে, "বন্যা, একটি আংটি তোমাকে পরাতে চাই।"

লাবণ্য বললে, "কী দরকার, মিতা।"

"তুমি যে আমাকে তোমার এই হাতখানি দিয়েছ সে কতখানি দেওয়া তা ভেবে শেষ করতে পারি নে। কবিরা প্রিয়ার মুখ নিয়েই যত কথা কয়েছে। কিন্তু হাতের মধ্যে প্রাণের কত ইশারা; ভালোবাসার যতকিছু আদর, যতকিছু সেবা, হৃদয়ের যত দরদ যত অনির্বচনীয় ভাষা, সব যে ওই হাতে। আংটি তোমার আঙুলটিকে জড়িয়ে থাকবে আমার মুখের ছোটো একটি কথার মতো; সে-কথাটি শুধু এই, 'পেয়েছি'। আমার এই কথাটি সোনার ভাষায় মানিকের ভাষায় তোমার হাতে থেকে যাক না।"

লাবণ্য বললে, "আচ্ছা, তাই থাক।"

"কলকাতা থেকে আনতে দেব, বলো কোন্ পাথর তুমি ভালোবাস।"

"আমি কোনো পাথর চাই নে, একটিমাত্র মুক্তো থাকলেই হবে।"

"আচ্ছা, সেই ভালো। আমিও মুক্তো ভালোবাসি।"

১১

মিলন-তত্ত্ব

ঠিক হয়ে গেল আগামী অঘ্রান মাসে এদের বিয়ে। যোগমায়া কলকাতায় গিয়ে সমস্ত আয়োজন করবেন।

লাবণ্য অমিতকে বললে, "তোমার কলকাতায় ফেরবার দিন অনেককাল হল পেরিয়ে গেছে। অনিশ্চিতের মধ্যে বাঁধা পড়ে তোমার দিন কেটে যাচ্ছিল। এখন ছুটি। নিঃসংশয়ে চলে যাও। বিয়ের আগে আমাদের আর দেখা হবে না।"

"এমন কড়া শাসন কেন ?"

"সেদিন যে সহজ আনন্দের কথা বলেছিলে তাকে সহজ রাখবার জন্যে।"

"এটা একেবারে গভীর জ্ঞানের কথা। সেদিন তোমাকে কবি বলে সন্দেহ করেছিলুম, আজ সন্দেহ করছি ফিলজফার বলে। চমৎকার বলেছ। সহজকে সহজ রাখতে হলে শক্ত হতে হয়। ছন্দকে সহজ করতে চাও তো যতিকে ঠিক জায়গায় কষে আঁটতে হবে। লোভ বেশি, তাই জীবনের কাব্যে কোথাও যতি দিতে মন সরে না, ছন্দ ভেঙে গিয়ে জীবনটা হয় গীতহীন বন্ধন। আচ্ছা, কালই চলে যাব, একেবারে হঠাৎ এই ভরা-দিনগুলোর মাঝখানে। মনে হবে যেন মেঘনাদবধ কাব্যের সেই চমকে থেমে-যাওয়া লাইনটা—

চলি যবে গেলা যমপুরে
অকালে !

শিলঙ থেকে আমিই না হয় চল্লুম কিন্তু পাঁজি থেকে অঘ্রান মাস তো ফস করে পালাবে না। কলকাতায় গিয়ে কী করব জান ?"

"কী করবে ?"

"মাসিমা যতক্ষণ করবেন বিয়ের দিনের ব্যবস্থা, ততক্ষণ আমাকে করতে হবে তার পরের দিনগুলোর আয়োজন। লোকে ভুলে যায় দাম্পত্যটা একটা আর্ট, প্রতিদিন ওকে নূতন করে সৃষ্টি করা চাই। মনে আছে, বন্যা, রঘুবংশে অজ মহারাজা ইন্দুমতীর কী বর্ণনা করেছিলেন ?"

লাবণ্য বললে, "প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ।"

অমিত বললে, "সেই ললিত কলাবিধিটা দাম্পত্যেরই। অধিকাংশ বর্বর বিয়েটাকেই মনে করে মিলন, সেইজন্যে তার পর থেকে মিলনটাকে এত অবহেলা।"

"মিলনের আর্ট তোমার মনে কী রকম আছে বুঝিয়ে দাও। যদি আমাকে শিষ্যা করতে চাও আজই তার প্রথম পাঠ শুরু হ'ক।"

"আচ্ছা, তবে শোনো। ইচ্ছাকৃত বাধা দিয়েই কবি ছন্দের সৃষ্টি করে। মিলনকেও সুন্দর করতে হয় ইচ্ছাকৃত বাধায়। চাইলেই পাওয়া যায় দামি জিনিসকে এত সস্তা করা নিজেকেই ঠকানো। কেননা শক্ত করে দাম দেওয়ার আনন্দটা বড়ো কম নয়।"

"দামের হিসাবটা শুনি।"

"রসো, তার আগে আমার মনে যে-ছবিটা আছে বলি। গঙ্গার ধার, বাগানটা ডায়মণ্ড হারবারের ওই দিকটাতে। ছোটো একটি স্টীম লঞ্চ করে ঘণ্টা-দুয়েকের মধ্যে কলকাতায় যাতায়াত করা যায়।"

"আবার কলকাতায় কী দরকার পড়ল ?"

"এখন কোনো দরকার নেই সে-কথা জান। যাই বটে বার-লাইব্রেরিতে,—ব্যবসা করি নে, দাবা খেলি। অ্যাটর্নিরা বুঝে নিয়েছে কাজে গরজ নেই তাই মন নেই। কোনো আপসের মকদ্দমা হলে তার ব্রীফ আমাকে দেয়, তার বেশি আর কিছুই দেয় না। কিন্তু বিয়ের পরেই দেখিয়ে দেব কাজ কাকে বলে,—জীবিকার দরকারে নয়, জীবনের দরকারে। আমের মাঝখানটাতে থাকে আঁঠি, সেটা মিষ্টিও নয়, নরমও নয়, খাদ্যও নয়—কিন্তু ওই শক্তটাই সমস্ত আমের আশ্রয়, ওইটেতেই সে আকার পায়। কলকাতার পাথুরে আঁঠিটাকে কিসের জন্য দরকার বুঝেছ তো ? মধুরের মাঝখানে একটা কঠিনকে রাখবার জন্যে।"

"বুঝেছি। তাহলে দরকার তো আমারও আছে। আমাকেও কলকাতায় যেতে হবে—দশটা-পাঁচটা।"

"দোষ কী ? কিন্তু পাড়া-বেড়াতে নয়, কাজ করতে।"

"কিসের কাজ বলো। বিনা মাইনের ?"

"না না, বিনা মাইনের কাজ কাজও নয় ছুটিও নয়, বারো আনা ফাঁকি। ইচ্ছে করলেই তুমি মেয়ে-কলেজে প্রোফেসারি নিতে পারবে।"

"আচ্ছা, ইচ্ছে করব। তার পর ?"

"স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, গঙ্গার ধার ; পাড়ির নিচে তলা থেকে উঠেছে ঝুরি-নামা অতি পুরোনো বটগাছ। ধনপতি যখন গঙ্গা বেয়ে সিংহলে যাচ্ছিল তখন হয়তো এই বটগাছে নৌকো বেঁধে গাছতলায় রান্না চড়িয়েছিল। ওরই দক্ষিণ ধারে ছ্যাতলা-পড়া বাঁধানো ঘাট, অনেকখানি ফাটল-ধরা, কিছু কিছু ধসে-যাওয়া। সেই ঘাটে সবুজে সাদায় রঙ-করা আমাদের ছিপছিপে নৌকোখানি। তারই নীল নিশানে সাদা অক্ষরে নাম লেখা। কী নাম বলে দাও তুমি।"

"বলব ? মিতালি।"

"ঠিক নামটি হয়েছে, মিতালি। আমি ভেবেছিলুম, সাগরী, মনে একটু গর্বও হয়েছিল। কিন্তু তোমার কাছে হার মানতে হল।···বাগানের মাঝখান দিয়ে সরু একটি খাড়ি চলে গেছে, গঙ্গার হৃৎস্পন্দন বয়ে। তার ওপারে তোমার বাড়ি এপারে আমার।"

"রোজই কি সাঁতার দিয়ে পার হবে, আর জানলায় আমার আলো জ্বালিয়ে রাখব ?"

"দেব সাঁতার মনে-মনে, একটা কাঠের সাঁকোর উপর দিয়ে। তোমার বাড়িটির নাম মানসী, আমার বাড়ির একটা নাম তোমাকে দিতে হবে।"

"দীপক।"

"ঠিক নামটি হয়েছে। নামের উপযুক্ত একটি দীপ আমার বাড়ির চুড়োয় বসিয়ে দেব, মিলনের সন্ধ্যেবেলায় তাতে জ্বলবে লাল আলো, আর বিচ্ছেদের রাতে নীল। কলকাতা থেকে ফিরে এসে রোজ তোমার কাছ থেকে একটি চিঠি আশা করব। এমন হওয়া চাই সে-চিঠি পেতেও পারি, না-পেতেও পারি। সন্ধ্যে আটটার মধ্যে যদি না পাই তবে হতবিধিকে অভিসম্পাত দিয়ে বার্ট্রাণ্ড রাসেলের লজিক পড়বার চেষ্টা করব। আমাদের নিয়ম হচ্ছে অনাহূত তোমার বাড়িতে কোনোমতেই যেতে পারব না।"

"আর তোমার বাড়িতে আমি?"

"ঠিক এক নিয়ম হলেই ভালো হয়, কিন্তু মাঝে মাঝে নিয়মের ব্যতিক্রম হলে সেটা অসহ্য হবে না।"

"নিয়মের ব্যতিক্রমটাই যদি নিয়ম না হয়ে ওঠে তাহলে তোমার বাড়িটার দশা কী হবে ভেবে দেখে বরঞ্চ আমি বুরকা পরে যাব।"

"তা হ'ক, কিন্তু আমার নিমন্ত্রণ-চিঠি চাই। সে-চিঠিতে আর কিছু থাকবার দরকার নেই, কেবল কোনো-একটা কবিতা থেকে দুটি-চারটি লাইন মাত্র।"

"আর আমার নিমন্ত্রণ বুঝি বন্ধ? আমি একঘরে?"

"তোমার নিমন্ত্রণ মাসে একদিন, পূর্ণিমার রাতে; চোদ্দটা তিথির খণ্ডতা যেদিন চরম পূর্ণ হয়ে উঠবে।"

"এইবার তোমার প্রিয়শিষ্যাকে একটি চিঠির নমুনা দাও।"

"আচ্ছা, বেশ।" পকেট থেকে একটা নোটবই বের করে তার পাতা ছিঁড়ে লিখলে—

"**Blow gently over my garden**
Wind of the southern sea
In the hour my love cometh
And calleth me.

চুমিয়া যেয়ো তুমি
আমার বনভূমি
দখিন সাগরের সমীরণ,
যে-শুভখনে মম
আসিবে প্রিয়তম,
ডাকিবে নাম ধ'রে অকারণ।"

লাবণ্য কাগজখানা ফিরিয়ে দিলে না।

অমিত বললে, “এবারে তোমার চিঠির নমুনা দাও, দেখি তোমার শিক্ষা কতদূর এগোল।”

লাবণ্য একটা টুকরো কাগজে লিখতে যাচ্ছিল। অমিত বললে, “না, আমার এই নোটবইয়ে লেখো।”

লাবণ্য লিখে দিলে—

“মিতা, ত্বমসি মম জীবনং, ত্বমসি মম ভূষণং,
ত্বমসি মম ভবজলধিরত্নম্।”

অমিত বইটা পকেটে পুরে বললে, আশ্চর্য এই, আমি লিখেছি মেয়ের মুখের কথা, তুমি লিখেছ পুরুষের। কিছুই অসংগত হয় নি। শিমূলকাঠই হ'ক আর বকুলকাঠই হ'ক, যখন জ্বলে তখন আগুনের চেহারাটা একই।”

লাবণ্য বললে, “নিমন্ত্রণ তো করা গেল, তার পরে?”

অমিত বললে, “সন্ধ্যাতারা উঠেছে, জোয়ার এসেছে গঙ্গায়, হাওয়া উঠল ঝিরঝির করে ঝাউগাছগুলোর সার বেয়ে, বুড়ো বটগাছটার শিকড়ে শিকড়ে উঠল স্রোতের ছলছলানি। তোমার বাড়ির পিছনে পদ্মদিঘি, সেইখানে খিড়কির নির্জন ঘাটে গা ধুয়ে চুল বেঁধেছ। তোমার এক-একদিন এক-এক রঙের কাপড়, ভাবতে ভাবতে যাব আজকে সন্ধ্যেবেলায় রঙটা কী। মিলনের জায়গারও ঠিক নেই, কোনোদিন শান-বাঁধানো চাঁপাতলায়, কোনোদিন বাড়ির ছাতে, কোনোদিন গঙ্গার ধারের চাতালে। আমি গঙ্গায় স্নান সেরে সাদা মলমলের ধুতি আর চাদর পরব, পায়ে থাকবে হাতির দাঁতে কাজ-করা খড়ম। গিয়ে দেখব, গালচে বিছিয়ে বসেছ, সামনে রুপোর রেকাবিতে মোটা গোড়ে মালা, চন্দনের বাটিতে চন্দন, এক কোণে জ্বলছে ধূপ। পুজোর সময় অন্তত দু-মাসের জন্যে দুজনে বেড়াতে বেরোব। কিন্তু দু-জনে দু-জায়গায়। তুমি যদি যাও পর্বতে আমি যাব সমুদ্রে।—এই তো আমার দাম্পত্য বৈরাজ্যের নিয়মাবলি তোমার কাছে দাখিল করা গেল। এখন তোমার কী মত?”

“মেনে নিতে রাজি আছি।”

“মেনে নেওয়া আর মনে নেওয়া, এই দুইয়ে যে তফাত আছে, বন্যা।”

“তোমার যাতে প্রয়োজন আমার তাতে প্রয়োজন না-ও যদি থাকে তবু আপত্তি করব না।”

“প্রয়োজন নেই তোমার?”

“না, নেই। তুমি আমার যতই কাছে থাক তবু আমার থেকে তুমি অনেক দূরে।

কোনো নিয়ম দিয়ে সেই দূরত্বটুকু বজায় রাখা আমার পক্ষে বাহুল্য। কিন্তু আমি জানি আমার মধ্যে এমন কিছুই নেই যা তোমার কাছের দৃষ্টিকে বিনা লজ্জায় সইতে পারবে, সেইজন্যে দাম্পত্যে দুই পারে দুই মহল করে দেওয়া আমার পক্ষে নিরাপদ।"

অমিত চৌকি থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "তোমার কাছে আমি হার মানতে পারব না, বন্যা, যাক গে আমার বাগানটা। কলকাতার বাইরে এক পা নড়ব না। নিরঞ্জনদের আফিসে উপরের তলায় পঁচাত্তর টাকা দিয়ে একটা ঘর ভাড়া নেব। সেইখানে থাকবে তুমি, আর থাকব আমি। চিদাকাশে কাছে-দূরে ভেদ নেই। সাড়ে তিন হাত চওড়া বিছানায় বাঁ পাশে তোমার মহল মানসী, ডান পাশে আমার মহল দীপক। ঘরের পুব দেওয়ালে একখানা আয়নাওআলা দেরাজ, তাতেই তোমারও মুখ দেখা আর আমারও। পশ্চিম দিকে থাকবে বইয়ের আলমারি, পিঠ দিয়ে সেটা রোদ্দুর ঠেকাবে আর সামনের দিকে সেটাতে থাকবে দুটি পাঠকের একটিমাত্র সার্ক্যুলেটিং লাইব্রেরি। ঘরের উত্তর দিকটাতে একখানি সোফা, তারই বাঁ পাশে একটু জায়গা খালি রেখে আমি বসব এক প্রান্তে, তোমার কাপড়ের আল্‌নার আড়ালে তুমি দাঁড়াবে, দুহাত তফাতে নিমন্ত্রণের চিঠিখানা উপরের দিকে তুলে ধরব কম্পিতহস্তে, তাতে লেখা থাকবে—

ছাদের উপরে বহিয়ো নীরবে
ওগো দক্ষিণ হাওয়া,
প্রেয়সীর সাথে যে-নিমেষে হবে
চারি চক্ষুতে চাওয়া।

এটা কি খারাপ শোনাচ্ছে বন্যা?"

"কিচ্ছু না, মিতা। কিন্তু এটা সংগ্রহ হল কোথা থেকে?"

"আমার বন্ধু নীলমাধবের খাতা থেকে। তার ভাবী বধূ তখন অনিশ্চিত ছিল। তাকে উদ্দেশ করে ওই ইংরেজি কবিতাটাকে কলকাতাই ছাঁচে ঢালাই করেছিল, আমিও সঙ্গে যোগ দিয়েছিলুম। ইকনমিকসে এম এ. পাশ করে পনেরো হাজার টাকা নগদ পণ আর আশি ভরি গয়না সমেত নববধূকে লোকটা ঘরে আনলে, চার চক্ষে চাওয়াও হল, দক্ষিনে বাতাসও বয়, কিন্তু ওই কবিতাটাকে আর ব্যবহার করতে পারলে না। এখন তার অপর শরিককে কাব্যটির সর্বস্বত্ব সমর্পণ করতে বাধবে না।"

"তোমারও ছাতে দক্ষিনে বাতাস বইবে, কিন্তু তোমার নববধূ কি চিরদিনই নববধূ থাকবে?"

টেবিলে প্রবল চাপড় দিতে দিতে উচ্চৈঃস্বরে অমিত বললে, "থাকবে, থাকবে, থাকবে।"

যোগমায়া পাশের ঘর থেকে তাড়াতাড়ি এসে জিজ্ঞাসা করলেন, "কী থাকবে, অমিত? আমার টেবিলটা বোধ হচ্ছে থাকবে না।"

"জগতে যা-কিছু টেকসই সবই থাকবে। সংসারে নববধূ দুর্লভ, কিন্তু লাখের মধ্যে একটি যদি দৈবাৎ পাওয়া যায় সে চিরদিনই থাকবে নববধূ।"

"একটা দৃষ্টান্ত দেখাও দেখি।"

"একদিন সময় আসবে, দেখাব।"

"বোধ হচ্ছে তার কিছু দেরি আছে, ততক্ষণ খেতে চলো।"

১২

শেষ সন্ধ্যা

আহার শেষ হলে অমিত বললে, "কাল কলকাতায় যাচ্ছি মাসিমা। আমার আত্মীয়স্বজন সবাই সন্দেহ করছে আমি খাসিয়া হয়ে গেছি।"

"আত্মীয়স্বজনরা কি জানে কথায় কথায় তোমার এত বদল সম্ভব?"

"খুব জানে, নইলে আত্মীয়স্বজন কিসের? তাই বলে কথায় কথায় নয়, আর খাসিয়া হওয়া নয়। যে-বদল আজ আমার হল এ কি জাত-বদল, এ যে যুগ-বদল তার মাঝখানে একটা কল্পান্ত। প্রজাপতি জেগে উঠেছেন আমার মধ্যে এক নূতন সৃষ্টিতে। মাসিমা, অনুমতি দাও, লাবণ্যকে নিয়ে আজ একবার বেড়িয়ে আসি। যাবার আগে শিলঙ পাহাড়কে আমাদের যুগল প্রণাম জানিয়ে যেতে চাই।"

যোগমায়া সম্মতি দিলেন। কিছুদূরে যেতে যেতে দুজনের হাত মিলে গেল, ওরা কাছে কাছে এল ঘেঁষে। নির্জন পথের ধারে নিচের দিকে চলেছে ঘন বন। সেই বনের একটা জায়গায় পড়েছে ফাঁক, আকাশ সেখানে পাহাড়ের নজরবন্দি থেকে একটুখানি ছুটি পেয়েছে; তার অঞ্জলি ভরিয়ে নিয়েছে অস্তসূর্যের শেষ আভায়। সেইখানে পশ্চিমের দিকে মুখ করে দুজনে দাঁড়াল। অমিত লাবণ্যর মাথা বুকে টেনে নিয়ে তার মুখটি উপরে তুলে ধরলে। লাবণ্যর চোখ অর্ধেক বোজা, কোণ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। আকাশে সোনার রঙের উপর চুনি-গলানো পান্না-গলানো আলোর আভাসগুলি মিলিয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে; মাঝে মাঝে পাতলা মেঘের ফাঁকে ফাঁকে সুগভীর নির্মল নীল, মনে হয় তার ভিতর দিয়ে, যেখানে দেহ নেই শুধু আনন্দ আছে সেই অমর্ত্যজগতের অব্যক্তধ্বনি আসছে। ধীরে ধীরে অন্ধকার হল ঘন। সেই খোলা আকাশটুকু, রাত্রিবেলায় ফুলের মতো, নানা রঙের পাপড়িগুলি বন্ধ করে দিলে।

অমিতর বুকের কাছ থেকে লাবণ্য মৃদুস্বরে বললে, "চলো এবার।" কেমন তার মনে হল এইখানে শেষ করা ভালো।

অমিত সেটা বুঝলে, কিছু বললে না। লাবণ্যর মুখ বুকের উপর একবার চেপে ধরে ফেরবার পথে খুব ধীরে ধীরে চলল।

বললে, "কাল সকালেই আমাকে ছাড়তে হবে, তার আগে আর দেখা করতে আসব না।"

"কেন আসবে না?"

"আজ ঠিক জায়গায় আমাদের শিলঙ পাহাড়ের অধ্যায়টি এসে থামল—ইতি প্রথমঃ সর্গঃ, আমাদের সয়ে বয়ে স্বর্গ।"

লাবণ্য কিছু বললে না, অমিতর হাত ধরে চলল। বুকের ভিতর আনন্দ, আর তারই সঙ্গে সঙ্গে একটা কান্না স্তব্ধ হয়ে আছে। মনে হল জীবনে কোনোদিন এমন নিবিড় করে অভাবনীয়কে এত কাছে পাওয়া যাবে না। পরমক্ষণে শুভদৃষ্টি হল, এর পরে আর কি বাসরঘর আছে? রইল কেবল মিলন আর বিদায় একত্র মিশিয়ে একটি শেষ প্রণাম। ভারি ইচ্ছে করতে লাগল অমিতকে এখনই সেই প্রণামটি করে, বলে, তুমি আমাকে ধন্য করেছ। কিন্তু সে আর হল না।

বাসার কাছাকাছি আসতেই অমিত বললে, "বন্যা, আজ তোমার শেষ কথাটি একটি কবিতায় বলো, তাহলে সেটা মনে করে নিয়ে যাওয়া সহজ হবে। তোমার নিজের যা মনে আছে এমন একটা কিছু আমাকে শুনিয়ে দাও।"

লাবণ্য একটুখানি ভেবে আবৃত্তি করলে—

"তোমারে দিই নি সুখ, মুক্তির নৈবেদ্য গেনু রাখি'
রজনীর শুভ্র অবসানে। কিছু আর নাই বাকি,
নাইকো প্রার্থনা, নাই প্রতি মুহূর্তের দৈন্যরাশি,
নাই অভিমান, নাই দীন কান্না, নাই গর্ব হাসি,
নাই পিছু ফিরে দেখা। শুধু সে মুক্তির ডালিখানি,
ভরিয়া দিলাম আজি আমার মহৎ মৃত্যু আনি।"

"বন্যা, বড়ো অন্যায় করলে। আজকের দিনে তোমার মুখে বলবার কথা এ নয়, কিছুতেই নয়। কেন এটা তোমার মনে এল? তোমার এ কবিতা এখনই ফিরিয়ে নাও।"

"ভয় কিসের মিতা? এই আগুনে-পোড়া প্রেম, এ সুখের দাবি করে না, এ নিজে মুক্ত বলেই মুক্তি দেয়, এর পিছনে ক্লান্তি আসে না, ম্লানতা আসে না—এর চেয়ে আর কিছু কি দেবার আছে?"

"কিন্তু আমি জানতে চাই এ কবিতা তুমি পেলে কোথায় ?"

"রবি ঠাকুরের ।"

"তার তো কোনো বইয়ে এটা দেখি নি ।"

"বইয়ে বেরোয় নি ।"

"তবে পেলে কী করে ?"

"একটি ছেলে ছিল, সে আমার বাবাকে গুরু বলে ভক্তি করত, বাবা দিয়েছিলেন তাকে তার জ্ঞানের খাদ্য, এদিকে তার হৃদয়টিও ছিল তাপস ! সময় পেলেই সে যেত রবি ঠাকুরের কাছে, তাঁর খাতা থেকে মুষ্টিভিক্ষা করে আনত ।"

"আর নিয়ে এসে তোমার পায়ে দিত ।"

"সে-সাহস তার ছিল না । কোথাও রেখে দিত, যদি আমার দৃষ্টিতে পড়ে, যদি আমি তুলে নিই ।"

"তাকে দয়া করেছ ?"

"করবার অবকাশ হল না, মনে-মনে প্রার্থনা করি ঈশ্বর যেন তাকে দয়া করেন ।"

"যে-কবিতাটি আজ তুমি পড়লে, বেশ বুঝতে পারছি এটা সেই হতভাগারই মনের কথা ।"

"হাঁ, তারই কথা বই কি ।"

"তবে তোমার কেন আজ ওটা মনে পড়ল ?"

"কেমন করে বলব ? ওই কবিতাটির সঙ্গে আর-এক টুকরো কবিতা ছিল সেটাও আজ আমার কেন মনে পড়ছে ঠিক বলতে পারি নে—

সুন্দর, তুমি চক্ষু ভরিয়া
এনেছ অশ্রু-জল ।
এনেছ তোমার বক্ষে ধরিয়া
দুঃসহ হোমানল ।
দুঃখ যে তার উজ্জ্বল হয়ে উঠে,
মুগ্ধ প্রাণের আবেশ বন্ধ টুটে,
এ তাপে শ্বসিয়া উঠে বিকশিয়া
বিচ্ছেদ-শতদল ।"

অমিত লাবণ্যর হাত চেপে ধরে বললে, "বন্যা, সে-ছেলেটা আজ আমাদের মাঝখানে কেন এসে পড়ল ? ঈর্ষা করতে আমি ঘৃণা করি, এ আমার ঈর্ষা নয়—কিন্তু কেমন

একটা ভয় আসছে মনে। বলো, তার দেওয়া ওই কবিতাগুলো আজই কেন তোমার এমন করে মনে পড়ে গেল।"

"একদিন সে যখন আমাদের বাড়ি থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল তার পরে যেখানে বসে সে লিখত সেই ডেস্কে এই কবিতা দুটি পেয়েছি। এর সঙ্গে রবি ঠাকুরের আরও অনেক অপ্রকাশিত কবিতা, প্রায় এক খাতা ভরা। আজ তোমার কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি, হয়তো সেইজন্যেই বিদায়ের কবিতা মনে এল।"

"সে-বিদায় আর এ-বিদায় কি একই ?"

"কেমন করে বলব ? কিন্তু এ-তর্কের তো কোনো দরকার নেই। যে-কবিতা আমার ভালো লেগেছে তাই তোমাকে শুনিয়েছি, হয়তো এ ছাড়া আর কোনো কারণ এর মধ্যে নেই।"

"বন্যা, রবি ঠাকুরের লেখা যতক্ষণ না লোকে একেবারে ভুলে যাবে ততক্ষণ ওর ভালো লেখা সত্য করে ফুটে উঠবে না। সেইজন্যে ওর কবিতা আমি ব্যবহারই করি নে। দলের লোকের ভালো লাগাটা কুয়াশার মতো, যা আকাশের উপর ভিজে হাত লাগিয়ে তার আলোটাকে ময়লা করে ফেলে।"

"দেখো মিতা, মেয়েদের ভালো-লাগা তার আদরের জিনিসকে আপন অন্দরমহলে একলা নিজেরই করে রাখে, ভিড়ের লোকের কোনো খবরই রাখে না। সে যত দাম দিতে পারে সব দিয়ে ফেলে, অন্য পাঁচজনের সঙ্গে মিলিয়ে বাজার যাচাই করতে তার মন নেই।"

"তাহলে আমারও আশা আছে, বন্যা। আমার বাজারদরের ছোট্টো একটা ছাপ লুকিয়ে ফেলে তোমার আপন দরের মস্ত একটা মার্কা নিয়ে বুক ফুলিয়ে বেড়াব।"

"আমাদের বাড়ি কাছে এসে পড়ল, মিতা। এবার তোমার মুখে তোমার পথ-শেষের কবিতাটা শুনে নিই।"

"রাগ ক'রো না, বন্যা, আমি কিন্তু রবি ঠাকুরের কবিতা আওড়াতে পারব না।"

"রাগ করব কেন ?"

"আমি একটি লেখককে আবিষ্কার করেছি, তার স্টাইল—"

"তার কথা তোমার কাছে বরাবরই শুনতে পাই। কলকাতায় লিখে দিয়েছি তার বই পাঠিয়ে দেবার জন্যে।"

"সর্বনাশ ! তার বই ! সে-লোকটার অন্য অনেক দোষ আছে, কিন্তু কখনো বই ছাপতে দেয় না। তার পরিচয় আমার কাছ থেকেই তোমাকে ক্রমে ক্রমে পেতে হবে। নইলে হয়তো—"

"ভয় ক'রো না, মিতা, তুমি তাকে যে-ভাবে বোঝ আমিও তাকে সেই ভাবেই বুঝে নেব এমন ভরসা আমার আছে। আমারই জিত থাকবে।"

"কেন ?"

"আমার ভালো লাগায় যা পাই সেও আমার, আর তোমার ভালো লাগায় যা পাব সেও আমার হবে। আমার নেবার অঞ্জলি হবে দুজনের মনকে মিলিয়ে। কলকাতায় তোমার ছোটো ঘরের বইয়ের আলমারিতে এক শেলফেই দুই কবির কবিতা ধরাতে পারব। এখন তোমার কবিতাটি বলো।"

"আর বলতে ইচ্ছে করছে না। মাঝখানে বড্‌ডো কতকগুলো তর্কবিতর্ক হয়ে হাওয়াটা খারাপ হয়ে গেল।"

"কিচ্ছু খারাপ হয় নি। হাওয়া ঠিক আছে।"

অমিত তার কপালের চুলগুলো কপালের থেকে উপরের দিকে তুলে দিয়ে খুব দরদের সুর লাগিয়ে পড়ে গেল—

"সুন্দরী তুমি শুকতারা
সুদূর শৈলশিখরান্তে,
শর্বরী যবে হবে সারা
দর্শন দিয়ো দিক্‌ভ্রান্তে।

বুঝেছ বন্যা, চাঁদ ডাক দিয়েছে শুকতারাকে, সে আপনার রাত পোহাবার সঙ্গিনীকে চায়। নিজের রাতটার 'পরে ওর বিতৃষ্ণা হয়ে গেছে।

ধরা যেথা অম্বরে মেশে
আমি আধো-জাগ্রত চন্দ্র,
আঁধারের বক্ষের 'পরে
আধেক আলোক-রেখা রন্ধ্র।

ওর এই আধখানা জাগা, ওই অল্প একটুখানি আলো, আঁধারটাকে সামান্য খানিকটা আঁচড়ে দিয়েছে। এই হল ওর খেদ। এই স্বল্পতার জালে ওকে জড়িয়ে ফেলেছে, সেইটে ছিঁড়ে ফেলবার জন্যে ও যেন সমস্ত রাত্রি ঘুমোতে ঘুমোতে গুমরে উঠছে। কী আইডিয়া। গ্র্যাণ্ড।

আমার আসন রাখে পেতে
নিদ্রাগহন মহাশূন্য।
তন্ত্রী বাজাই স্বপনেতে,
তন্দ্রা ঈষৎ করি ক্ষুণ্ণ।

কিন্তু এমন হালকা করে বাঁচার বোঝাটা যে বড্ডো বেশি ; যে-নদীর জল মরেছে তার মন্থর স্রোতের ক্লান্তিতে জঞ্জাল জমে, যে স্বর সে নিজেকে বইতে গিয়ে ক্লিষ্ট হয়। তাই ও বলছে—

মন্দচরণে চলি পারে,
যাত্রা হয়েছে মোর সাঙ্গ।
সুর থেমে আসে বারে বারে
ক্লান্তিতে আমি অবশাঙ্গ।

কিন্তু এই ক্লান্তিতেই কি ওর শেষ ? ওর ঢিলে তারের বীণাকে নতুন করে বাঁধবার আশা ও পেয়েছে, দিগন্তের ওপারে কার পায়ের শব্দ ও যেন শুনল—

সুন্দরী ওগো শুকতারা,
রাত্রি না যেতে এস তূর্ণ।
স্বপ্নে যে-বাণী হল হারা
জাগরণে করো তারে পূর্ণ।

উদ্ধারের আশা আছে, কানে আসছে জাগ্রত বিশ্বের বিপুল কলরব, সেই মহাপথের দূতী তার প্রদীপ হাতে করে এল বলে—

নিশীথের তল হতে তুলি
লহ তারে প্রভাতের জন্য।
আঁধারে নিজেরে ছিল ভুলি,
আলোকে তাহারে করো ধন্য।
যেখানে সুপ্তি হল লীনা,
যেথা বিশ্বের মহামন্ত্র,
অর্পিনু সেথা মোর বীণা
আমি আধো-জাগ্রত চন্দ্র।

এই হতভাগা চাঁদটা তো আমি। কাল সকালবেলা চলে যাব। কিন্তু চলে যাওয়াকে তো শূন্য রাখতে চাই নে। তার উপরে আবির্ভাব হবে সুন্দরী শুকতারার, জাগরণের গান নিয়ে। অন্ধকার জীবনের স্বপ্নে এতদিন যা অস্পষ্ট ছিল, সুন্দরী শুকতারা তাকে প্রভাতের মধ্যে সম্পূর্ণ করে দেবে। এর মধ্যে একটা আশার জোর আছে, ভাবী প্রত্যুষের একটা উজ্জ্বল গৌরব আছে, তোমার ওই রবি ঠাকুরের কবিতার মতো মিইয়ে-পড়া হাল-ছাড়া বিলাপ নয়।"

"রাগ কর কেন, মিতা? রবি ঠাকুর যা পারে তার বেশি সে পারে না এ-কথা বারবার বলে লাভ কী?"

"তোমরা সবাই মিলে তাকে নিয়ে বড়ো বেশি—"

"ও-কথা ব'লো না, মিতা। আমার ভালো-লাগা আমারই, তাতে যদি আর-কারও সঙ্গে আমার মিল হয় বা তোমার সঙ্গে মিল না হয় সেটাতে কি আমার দোষ? না-হয় কথা রইল; তোমার সেই পঁচাত্তর টাকার বাসায় একদিন আমার যদি জায়গা হয় তাহলে তোমার কবির লেখা আমাকে শুনিয়ো, আমার কবির লেখা তোমাকে শোনাব না।"

"কথাটা অন্যায় হল যে। পরস্পর পরস্পরের জুলুম ঘাড় পেতে বহন করবে এইজন্যেই তো বিবাহ।"

"রুচির জুলুম তোমার কিছুতেই সইবে না। রুচির ভোজে তোমরা নিমন্ত্রিত ছাড়া কাউকে ঘরে ঢুকতে দাও না, আমি অতিথিকেও আদর করে বসাই।"

"ভালো করলুম না তর্ক তুলে। আমাদের এখানকার এই শেষ সন্ধ্যেবেলার সুর বিগড়ে গেল।"

"একটুও না। যা-কিছু বলবার আছে সব স্পষ্ট করে বলেও যে-সুরটা খাটি থাকে সেই আমাদের সুর। তার মধ্যে ক্ষমার অন্ত নেই।"

"আজ আমার মুখের বিস্বাদ ঘোচাতেই হবে। কিন্তু বাংলা কাব্যে হবে না। ইংরেজি কাব্যে আমার বিচারবুদ্ধি অনেকটা ঠাণ্ডা থাকে। প্রথম দেশে ফিরে এসে আমিও কিছুদিন প্রোফেসারি করেছিলুম।"

লাবণ্য হেসে বললে, "আমাদের বিচারবুদ্ধি ইংরেজ বাড়ির বুলডগের মতো—ধুতির কোঁচাটা দুলছে দেখলেই ঘেউ ঘেউ করে ওঠে। ধুতির মহলে কোন্‌টা ভদ্র ও তার হিসেব পায় না। বরঞ্চ খানসামার তকমা দেখলে লেজ নাড়ে।"

"তা মানতেই হবে। পক্ষপাত-জিনিসটা স্বাভাবিক জিনিস নয়। অধিকাংশ স্থলেই ওটা ফরমাশে তৈরি। ইংরেজি সাহিত্যে পক্ষপাত কানমলা খেয়ে খেয়ে ছেলেবেলা থেকে অভ্যেস হয়ে গেছে। সেই অভ্যেসের জোরেই এক পক্ষকে মন্দ বলতে যেমন সাহস হয় না অন্য পক্ষকে ভালো বলতেও তেমনি সাহসের অভাব ঘটে। থাক গে, আজ নিবারণ চক্রবর্তীও না, আজ একেবারে নিছক ইংরেজি কবিতা—বিনা তর্জমায়।"

"না না মিতা, তোমার ইংরেজি থাক, সেটা বাড়ি গিয়ে টেবিলে বসে হবে। আজ আমাদের এই সন্ধ্যেবেলাকার শেষ কবিতাটি নিবারণ চক্রবর্তীর হওয়াই চাই। আর-কারও নয়।"

অমিত উৎফুল্ল হয়ে বললে, "জয় নিবারণ চক্রবর্তীর। এতদিনে সে হল অমর। বন্যা, তাকে আমি তোমার সভাকবি করে দেব। তুমি ছাড়া আর-কারও দ্বারে সে প্রসাদ নেবে না।"

"তাতে কি সে বরাবর সন্তুষ্ট থাকবে?"

"না থাকে তো তাকে কান মলে বিদায় করে দেব।"

"আচ্ছা কানমলার কথা পরে স্থির করব, এখন শুনিয়ে দাও।"

অমিত আবৃত্তি করতে লাগল—

কত ধৈর্য ধরি
ছিলে কাছে দিবসশর্বরী।
তব পদ-অঙ্কনগুলিরে
কতবার দিয়ে গেছ মোর ভাগ্য-পথের ধূলিরে।
আজ যবে
দূরে যেতে হবে—
তোমারে করিয়া যাব দান
তব জয়গান।
কতবার ব্যর্থ আয়োজনে
এ জীবনে
হোমাগ্নি উঠে নি জ্বলি,
শূন্যে গেছে চলি
হতাশ্বাস ধূমের কুণ্ডলী।
কতবার ক্ষণিকের শিখা
আঁকিয়াছে ক্ষীণ টিকা
নিশ্চেতন নিশীথের ভালে।
লুপ্ত হয়ে গেছে তাহা চিহ্নহীন কালে।

এবার তোমার আগমন
হোম-হুতাশন
জ্বেলেছে গৌরবে।
যজ্ঞ মোর ধন্য হবে।

আমার আহুতি দিনশেষে
করিলাম সমর্পণ তোমার উদ্দেশে।
লহ এ প্রণাম
জীবনের পূর্ণ পরিণাম।
এ প্রণতি'পরে
স্পর্শ রাখো স্নেহ-ভরে,
তোমার ঐশ্বর্যমাঝে
সিংহাসন যেথায় বিরাজে,
করিয়ো আহ্বান,
সেথা এ প্রণতি মোর পায় যেন স্থান।

১৩

আশঙ্কা

সকালবেলায় কাজে মন দেওয়া আজ লাবণ্যর পক্ষে কঠিন। সে বেড়াতেও যায় নি। অমিত বলেছিল শিলঙ থেকে যাবার আগে আজ সকালবেলায় সে ওদের সঙ্গে দেখা করতে চায় না। সেই পণটাকে রক্ষা করবার ভার দুজনেরই উপর। কেননা, যে-রাস্তায় ও বেড়াতে যায় সেই রাস্তা দিয়েই অমিতকে যেতে হবে। মনে তাই লোভ ছিল যথেষ্ট। সেটাকে কষে দমন করতে হল। যোগমায়া খুব সকালেই স্নান সেরে তাঁর আহ্নিকের জন্যে কিছু ফুল তোলেন। তিনি বেরোবার আগেই লাবণ্য সে-জায়গাটা থেকে চলে এল য়ুক্যালিপটাস-তলায়। হাতে দুই-একটা বই ছিল, বোধ হয় নিজেকে এবং অন্যদেরকে ভোলাবার জন্যে। তার পাতা খোলা, কিন্তু বেলা যায়, পাতা ওলটানো হয় না। মনের মধ্যে কেবলই বলছে, জীবনের মহোৎসবের দিন কাল শেষ হয়ে গেল। আজ সকালে এক-একবার মেঘরৌদ্রের মধ্যে দিয়ে ভাঙনের দূত আকাশ ঝেঁটিয়ে বেড়াচ্ছে। মনে দৃঢ়বিশ্বাস যে, অমিত চিরপলাতক, একবার সে সরে গেলে আর তার ঠিকানা পাওয়া যায় না। রাস্তায় চলতে চলতে কখন সে গল্প শুরু করে, তার পর রাত্রি আসে, পরদিন সকালে দেখা যায় গল্পের গাঁথন ছিন্ন, পথিক গেছে চলে। লাবণ্য তাই ভাবছিল ওর গল্পটা এখন থেকে চিরদিনের মতো রইল বাকি। আজ সেই অসমাপ্তির ম্লানতা সকালের আলোয়, অকাল-অবসানের অবসাদ আর্দ্র হাওয়ার মধ্যে।

এমন সময়, বেলা তখন নটা, অমিত দুমদাম শব্দে ঘরে ঢুকেই মাসিমা মাসিমা করে ডাক দিলে। যোগমায়া প্রাতঃসন্ধ্যা সেরে ভাঁড়ারের কাজে প্রবৃত্ত। আজ তাঁরও মনটা পীড়িত। অমিত তার কথায় হাসিতে চাঞ্চল্যে এতদিন তাঁর স্নেহাসক্ত মনকে তাঁর ঘরকে ভরে রেখেছিল। সে চলে গেছে এই ব্যথার বোঝা নিয়ে তাঁর সকালবেলাটা যেন বৃষ্টিবিন্দুর ভারে সদ্যঃপাতী ফুলের মতো নুয়ে পড়ছে। তাঁর বিচ্ছেদকাতর ঘরকন্নার কাজে আজ তিনি লাবণ্যকে ডাকেন নি, বুঝেছিলেন আজ তার দরকার ছিল একলা থাকার, লোকের চোখের আড়ালে।

লাবণ্য তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল, কোলের থেকে বই গেল পড়ে, জানতেও পারলে না। এদিকে যোগমায়া ভাঁড়ারঘর থেকে দ্রুতপদে বেরিয়ে এসে বললেন, "কী বাবা অমিত, ভূমিকম্প নাকি?"

"ভূমিকম্পই তো। জিনিসপত্র রওনা করে দিয়েছি; গাড়ি ঠিক; ডাকঘরে গেলুম দেখতে চিঠিপত্র কিছু আছে কিনা। সেখানে এক টেলিগ্রাম।"

অমিতর মুখের ভাব দেখে যোগমায়া উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "খবর সব ভালো তো?"

লাবণ্যও ঘরে এসে জুটল। অমিত ব্যাকুল মুখে বললে, "আজই সন্ধ্যেবেলায় আসছে সিসি, আমার বোন, তার বন্ধু কেটি মিত্তির, আর তার দাদা নরেন।"

"তা ভাবনা কিসের, বাছা? শুনেছি ঘোড়দৌড়ের মাঠের কাছে একটা বাড়ি খালি আছে। যদি নিতান্ত না পাওয়া যায় আমার এখানে কি একরকম করে জায়গা হবে না?"

"সেজন্যে ভাবনা নেই, মাসি। তারা নিজেরাই টেলিগ্রাফ করে হোটেলে জায়গা ঠিক করেছে।"

"আর যাই হ'ক বাবা, তোমার বোনেরা এসে যে দেখবে তুমি ওই লক্ষ্মীছাড়া বাড়িটাতে আছ সে কিছুতেই হবে না। তারা আপন লোকের খ্যাপামির জন্যে দায়িক করবে আমাদেরই।"

"না মাসি, আমার প্যারাডাইস লস্ট। ওই নগ্ন আসবাবের স্বর্গ থেকে আমার বিদায়। সেই দড়ির খাটিয়ার নীড় থেকে আমার সুখস্বপ্নগুলো উড়ে পালাবে। আমাকেও জায়গা নিতে হবে সেই অতিপরিচ্ছন্ন হোটেলের এক অতিসভ্য কামরায়।"

কথাটা বিশেষ কিছু নয়, তবু লাবণ্যর মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। এতদিন একটা কথা ওর মনেও আসে নি যে, অমিতর যে-সমাজ সে ওদের সমাজ থেকে সহস্র যোজন দূরে। এক মুহূর্তেই সেটা বুঝতে পারলে। অমিত যে আজ কলকাতায় চলে যাচ্ছিল তার

মধ্যে বিচ্ছেদের কঠোর মূর্তি ছিল না। কিন্তু এই যে আজ ও হোটেলে যেতে বাধ্য হল এইটেতেই লাবণ্য বুঝলে যে-বাসা এতদিন ওরা দুজনে নানা অদৃশ্য উপকরণে গড়ে তুলছিল সেটা কোনোদিন বুঝি আর দৃঢ় হবে না।

লাবণ্যর দিকে একটু চেয়ে অমিত যোগমায়াকে বললে, "আমি হোটেলেই যাই, আর জাহান্নমেই যাই কিন্তু এইখানেই রইল আমার আসল বাসা।"

অমিত বুঝেছে শহর থেকে আসছে একটা অশুভ দৃষ্টি। মনে-মনে নানা প্ল্যান করছে যাতে সিসির দল এখানে না আসতে পারে। কিন্তু ইদানীং ওর চিঠিপত্র আসছিল যোগমায়ার বাড়ির ঠিকানায়, তখন ভাবে নি কোনো সময়ে তাতে বিপদ ঘটতে পারে। অমিতর মনের ভাবগুলো চাপা থাকতে চায় না, এমন কি, প্রকাশ পায় কিছু আতিশয্যের সঙ্গে। ওর বোনের আসা-সম্বন্ধে অমিতর এত বেশি উদ্বেগ যোগমায়ার কাছে অসংগত ঠেকেছিল; লাবণ্যও ভাবলে অমিত ওকে নিয়ে বোনেদের কাছে লজ্জিত। ব্যাপারটা লাবণ্যর কাছে বিস্বাদ ও অসম্মানজনক হয়ে দাঁড়াল।

অমিত লাবণ্যকে জিজ্ঞাসা করলে, "তোমার কি সময় আছে? বেড়াতে যাবে?"

লাবণ্য একটু যেন কঠিন করে বললে, "না, সময় নেই।"

যোগমায়া ব্যস্ত হয়ে বললেন, "যাও না মা, বেড়িয়ে এস গে।"

লাবণ্য বললে, "কর্তামা, কিছুকাল থেকে সুরমাকে পড়ানোয় বড়ো অবহেলা হয়েছে। খুবই অন্যায় করেছি। কাল রাত্রেই ঠিক করেছিলুম আজ থেকে কিছুতেই আর ঢিলেমি করা হবে না।" বলে লাবণ্য ঠোঁট চেপে মুখ শক্ত করে রইল।

লাবণ্যর এই জেদের মেজাজটা যোগমায়ার পরিচিত। পীড়াপীড়ি করতে সাহস করলেন না।

অমিতও নীরস কণ্ঠে বললে, "আমিও চললুম কর্তব্য করতে, ওদের জন্যে সব ঠিক করে রাখা চাই।"

এই বলে চলে যাবার আগে বারান্দায় একবার স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াল। বললে, "বন্যা, ওই চেয়ে দেখো। গাছের আড়াল থেকে আমার বাড়ির চালটা অল্প একটু দেখা যাচ্ছে। একটা কথা তোমাদের বলা হয় নি, ওই বাড়িটা কিনে নিয়েছি। বাড়ির মালেক অবাক, নিশ্চয় ভেবেছে ওখানে সোনার গোপন খনি আবিষ্কার করে থাকব। দাম বেশ একটু চড়িয়ে নিয়েছে। ওখানে সোনার খনির সন্ধান তো পেয়েইছিলুম, সে সন্ধান একমাত্র আমিই জানি। আমার জীর্ণ কুটিরের ঐশ্বর্য সবার চোখ থেকে লুকোনো থাকবে।"

লাবণ্যর মুখে গভীর একটা বিষাদের ছায়া পড়ল। বললে, "আর-কারও কথা অত

করে তুমি ভাব কেন? না হয় আর সবাই জানতে পারলে। ঠিকমতো জানতে পারাই তো চাই, তা হলে কেউ অমর্যাদা করতে সাহস করে না।"

এ-কথার কোনো উত্তর না দিয়ে অমিত বললে, "বন্যা, ঠিক করে রেখেছি, বিয়ের পরে ওই বাড়িতেই আমরা কিছুদিন এসে থাকব। আমার সেই গঙ্গার ধারের বাগান, সেই ঘাট, সেই বটগাছ সব মিলিয়ে গেছে ওই বাড়িটার মধ্যে। তোমার দেওয়া মিতালি নাম ওকেই সাজে।"

"ও-বাড়ি থেকে আজ তুমি বেরিয়ে এসেছ, মিতা। আবার একদিন যদি ঢুকতে চাও দেখবে ওখানে তোমাকে কুলোবে না। পৃথিবীতে আজকের দিনের বাসায় কালকের দিনের জায়গা হয় না। সেদিন তুমি বলেছিলে, জীবনে মানুষের প্রথম সাধনা দারিদ্র্যের, দ্বিতীয় সাধনা ঐশ্বর্যের। তার পরে শেষ সাধনার কথা বল নি, সেটা হচ্ছে ত্যাগের।"

"বন্যা, ওটা তোমাদের রবি ঠাকুরের কথা। সে লিখেছে, শাজাহান আজ তার তাজমহলকেও ছাড়িয়ে গেল। একটা কথা তোমার কবির মাথায় আসে নি যে, আমরা তৈরি করি, তৈরি জিনিসকে ছাড়িয়ে যাবার জন্যেই। বিশ্বসৃষ্টিতে ওইটেকেই বলে এভোল্যুশন। একটা অনাসৃষ্টি ভূত ঘাড়ে চেপে থাকে, বলে, সৃষ্টি করো, সৃষ্টি করলেই ভূত নামে, তখন সৃষ্টিটাকেও আর দরকার থাকে না। কিন্তু তাই বলে ওই ছেড়ে-যাওয়াটাই চরম কথা নয়। জগতে শাজাহান-মমতাজের অক্ষয় ধারা বয়ে চলেছেই, ওরা কি একজন মাত্র? সেইজন্যেই তো তাজমহল কোনোদিন শূন্য হতেই পারল না। নিবারণ চক্রবর্তী বাসরঘরের উপর একটা কবিতা লিখেছে,—সেটা তোমাদের কবিবরের তাজমহলের সংক্ষিপ্ত উত্তর, পোস্টকার্ডে লেখা—

তোমারে ছাড়িয়া যেতে হবে
রাত্রি যবে
উঠিবে উন্মনা হয়ে প্রভাতের রথচক্ররবে।
হায় রে বাসরঘর,
বিরাট বাহির সে যে বিচ্ছেদের দস্যু ভয়ংকর।
তবু সে যতই ভাঙে-চোরে,
মালাবদলের হার যত দেয় ছিন্ন ছিন্ন করে,
তুমি আছ ক্ষয়হীন
অনুদিন;
তোমার উৎসব
বিচ্ছিন্ন না হয় কভু, না হয় নীরব।

কে বলে তোমারে ছেড়ে গিয়েছে যুগল
শূন্য করি তব শয্যাতল ?
যায় নাই, যায় নাই,
নব নব যাত্রী মাঝে ফিরে ফিরে আসিছে তারাই
তোমার আহ্বানে
উদার তোমার দ্বার পানে।
হে বাসরঘর,
বিশ্বে প্রেম মৃত্যুহীন, তুমিও অমর।

রবি ঠাকুর কেবল চলে যাবার কথাই বলে, রয়ে যাবার গান গাইতে জানে না। বন্যা, কবি কি বলে যে, আমরাও দুজন যেদিন ওই দরজায় ঘা দেব, দরজা খুলবে না ?"

"মিনতি রাখো, মিতা, আজ সকালে কবির লড়াই তুলো না। তুমি কি ভাবছ প্রথম দিন থেকেই আমি জানতে পারি নি যে, তুমিই নিবারণ চক্রবর্তী ? কিন্তু তোমার ওই কবিতার মধ্যে এখনই আমাদের ভালোবাসার সমাধি তৈরি করতে শুরু ক'রো না, অন্তত তার মরার জন্যে অপেক্ষা ক'রো।"

অমিত আজ নানা বাজে কথা বলে ভিতরের কোন্ একটা উদ্বেগকে চাপা দিতে চায়, লাবণ্য তা বুঝেছিল।

অমিতও বুঝতে পেরেছে কাব্যের দ্বন্দ্ব কাল সন্ধ্যেবেলায় বেখাপ হয় নি, আজ সকালবেলায় তার সুর কেটে যাচ্ছে। কিন্তু সেইটে যে লাবণ্যর কাছে সুস্পষ্ট সেও ওর ভালো লাগল না। একটু নীরসভাবে বললে, "তা হলে যাই, বিশ্বজগতে আমারও কাজ আছে, আপাতত সে হচ্ছে হোটেল পরিদর্শন। ওদিকে লক্ষ্মীছাড়া নিবারণ চক্রবর্তীর ছুটির মেয়াদ এবার ফুরোল বুঝি।"

তখন লাবণ্য অমিতর হাত ধরে বললে, "দেখো, মিতা, আমাকে চিরদিন যেন ক্ষমা করতে পার। যদি একদিন চলে যাবার সময় আসে, তবে, তোমার পায়ে পড়ি, যেন রাগ করে চলে যেয়ো না।" এই বলে চোখের জল ঢাকবার জন্যে দ্রুত অন্য ঘরে গেল।

অমিত কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তার পরে আস্তে আস্তে যেন অন্যমনে গেল যুক্যালিপটাস-তলায়। দেখলে সেখানে আখরোটের গোটাকতক ভাঙা খোলা ছড়ানো। দেখেই ওর মনটার ভিতর কেমন একটা ব্যথা চেপে ধরলে। জীবনের ধারা চলতে চলতে তার যে-সব চিহ্ন বিছিয়ে যায় সেগুলোর তুচ্ছতাই সব-চেয়ে সকরুণ। তার পরে দেখলে ঘাসের উপর একটা বই, সেটা রবি ঠাকুরের 'বলাকা'। তার

নিচের পাতাটা ভিজে গেছে। একবার ভাবলে ফিরিয়ে দিয়ে আসি গে, কিন্তু ফিরিয়ে দিলে না, সেটা নিল পকেটে। হোটেলে যাব-যাব করলে, তাও গেল না; বসে পড়ল গাছতলাটাতে। রাত্রের ভিজে মেঘে আকাশটাকে খুব করে মেজে দিয়েছে। ধুলো-ধোওয়া বাতাসে অত্যন্ত স্পষ্ট করে প্রকাশ পাচ্ছে চারদিকের ছবিটা; পাহাড়ের আর গাছপালার সীমান্তগুলি যেন ঘন নীল আকাশে খুদে-দেওয়া, জগৎটা যেন কাছে এগিয়ে একেবারে মনের উপরে এসে ঠেকল। আস্তে আস্তে বেলা চলে যাচ্ছে, তার ভিতরটাতে ভৈরবীর সুর।

এখনই খুব কষে কাজে লাগবে বলে লাবণ্যর পণ ছিল, তবু যখন দূর থেকে দেখলে অমিত গাছতলায় বসে, আর থাকতে পারলে না, বুকের ভিতরটা হাঁপিয়ে উঠল, চোখ এল জলে ছলছলিয়ে। কাছে এসে বললে, "মিতা, তুমি কী ভাবছ?"

"এতদিন যা ভাবছিলুম একেবারে তার উলটো।"

"মাঝে মাঝে মনটাকে উলটিয়ে না দেখলে তুমি ভালো থাক না। তা তোমার উলটো ভাবনাটা কী রকম শুনি।"

"তোমাকে মনের মধ্যে নিয়ে এতদিন কেবল ঘর বানাচ্ছিলুম,—কখনো গঙ্গার ধারে, কখনো পাহাড়ের উপরে। আজ মনের মধ্যে জাগছে সকালবেলাকার আলোয় উদাস-করা একটা পথের ছবি,—অরণ্যের ছায়ায় ছায়ায় ওই পাহাড়গুলোর উপর দিয়ে। হাতে আছে লোহার ফলাওআলা লম্বা লাঠি, পিঠে আছে চামড়ার স্ট্র্যাপ দিয়ে বাঁধা একটা চৌকো থলি। তুমি চলবে সঙ্গে। তোমার নাম সার্থক হ'ক, বন্যা, তুমি আমাকে বদ্ধঘর থেকে বের করে পথে ভাসিয়ে নিয়ে চললে বুঝি। ঘরের মধ্যে নানান লোক, পথ কেবল দুজনের।"

"ডায়মণ্ড হারবারের বাগানটা তো গেছেই, তার পরে সেই পঁচাত্তর টাকার ঘর-বেচারাও গেল। তা যাক গে। কিন্তু চলবার পথে বিচ্ছেদের ব্যবস্থাটা কী রকম করবে? দিনান্তে তুমি এক পান্থশালায় ঢুকবে, আর আমি আর-একটাতে?"

"তার দরকার হয় না, বন্যা। চলাতেই নতুন রাখে, পায়ে পায়ে নতুন, পুরোনো হবার সময় পাওয়া যায় না। বসে-থাকাটাই বুড়োমি।"

"হঠাৎ এ খেয়ালটা তোমার কেন মনে হল, মিতা?"

"তবে বলি। হঠাৎ শোভনলালের কাছ থেকে একখানা চিঠি পেয়েছি। তার নাম শুনেছ বোধ হয়, রায়চাঁদ-প্রেমচাঁদওআলা। ভারত-ইতিহাসের সাবেক পথগুলো সন্ধান করবে বলে কিছুকাল থেকে সে বেরিয়ে পড়েছে। সে অতীতের লুপ্ত পথ উদ্ধার করতে চায়, আমার ইচ্ছে ভবিষ্যতের পথ সৃষ্টি করা।"

লাবণ্যর বুকের ভিতরে হঠাৎ খুব একটা ধাক্কা দিলে। কথাটাকে বাধা দিয়ে অমিতকে বললে, "শোভনলালের সঙ্গে একই বৎসর আমি এম. এ. দিয়েছি। তার সব খবরটা শুনতে ইচ্ছে করে।"

"এক সময়ে সে খেপেছিল আফগানিস্থানের প্রাচীন শহর কাপিশের ভিতর দিয়ে একদিন যে পুরোনো রাস্তা চলেছিল, সেইটেকে আয়ত্ত করবে। ওই রাস্তা দিয়েই ভারতবর্ষে হিউয়েন সাঙের তীর্থযাত্রা, ওই রাস্তা দিয়েই তারও পূর্বে আলেকজাণ্ডারের রণযাত্রা। খুব কষে পুশতু পড়লে, পাঠানি কায়দাকানুন অভ্যেস করলে। সুন্দর চেহারা, ঢিলে কাপড়ে ঠিক পাঠানের মতো দেখতে হয় না, দেখায় যেন পারসিকের মতো। আমাকে এসে ধরলে সেখানে ফরাসি পণ্ডিতরা এই কাজে লেগেছেন তাঁদের কাছে পরিচয়-পত্র দিতে, ফ্রান্সে থাকতে তাঁদের কারও কারও কাছে আমি পড়েছি। দিলেম পত্র, কিন্তু ভারত-সরকারের ছাড়চিঠি জুটল না। তার পর থেকে দুর্গম হিমালয়ের মধ্যে কেবলই পথ খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছে, কখনো কাশ্মীরে কখনো কুমায়ুনে। এবার ইচ্ছে হয়েছে হিমালয়ের পূর্ব-প্রান্তটাতেও সন্ধান করবে। বৌদ্ধধর্ম প্রচারের রাস্তা এদিক দিয়ে কোথায় কোথায় গেছে সেইটে দেখতে চায়। ওই পথ-খ্যাপাটার কথা মনে করে আমারও মন উদাস হয়ে যায়। পুঁথির মধ্যে আমরা কেবল কথার রাস্তা খুঁজে খুঁজে চোখ খোওয়াই, ওই পাগল বেরিয়েছে পথের পুঁথি পড়তে, মানব-বিধাতার নিজের হাতে লেখা। আমার কী মনে হয় জান?"

"কী, বলো।"

"প্রথম যৌবনে একদিন শোভনলাল কোন্ কাঁকনপরা হাতের ধাক্কা খেয়েছিল, তাই ঘরের থেকে পথের মধ্যে ছিটকিয়ে পড়েছে। ওর সমস্ত কাহিনীটা স্পষ্ট জানি নে, কিন্তু একদিন ওতে-আমাতে একলা ছিলুম, নানা কথায় হল প্রায় রাত দুপুর, জানলার বাইরে হঠাৎ চাঁদ দেখা দিল, একটা ফুলন্ত জারুলগাছের আড়ালে, ঠিক সেই সময়টাতে কোনো-একজনের কথা বলতে গেল, নাম করলে না, বিবরণ কিছুই বললে না, অল্প একটু আভাস দিতেই গলা ভার হয়ে এল, তাড়াতাড়ি বেরিয়ে চলে গেল। বুঝতে পারলুম ওর জীবনের মধ্যে কোন্খানে অত্যন্ত একটা নিষ্ঠুর কথা বিঁধে আছে। সেই কথাটাকেই বুঝি পথ চলতে চলতে ও পায়ে-পায়ে খইয়ে দিতে চায়।"

লাবণ্যর হঠাৎ উদ্ভিদতত্ত্বের ঝোঁক এল, নুয়ে পড়ে দেখতে লাগল, ঘাসের মধ্যে সাদায়-হলদেয় মেলানো একটা বুনো ফুল। একান্ত মনোযোগে তার পাপড়িগুলো গুনে দেখার জরুরি দরকার পড়ল।

অমিত বললে, "জান বন্যা, আমাকে তুমি আজ পথের দিকে ঠেলে দিয়েছ।"

"কেমন করে ?"

"আমি ঘর বানিয়েছিলুম। আজ সকালে তোমার কথায় মনে হল তুমি তার মধ্যে পা দিতে কুণ্ঠিত। আজ দু-মাস ধরে মনে-মনে ঘর সাজালুম। তোমাকে ডেকে বললুম, এস বধূ, ঘরে এস। তুমি আজ বধূসজ্জা খসিয়ে ফেললে, বললে, এখানে জায়গা হবে না, বন্ধু, চিরদিন ধরে আমাদের সপ্তপদীগমন হবে।"

বনফুলের বটানি আর চলল না। লাবণ্য হঠাৎ উঠে পড়ে ক্লিষ্টস্বরে বললে, "মিতা, আর নয়, সময় নেই।"

১৪

ধূমকেতু

এতদিন পরে অমিত একটা কথা আবিষ্কার করেছে যে, লাবণ্যর সঙ্গে তার সম্বন্ধটা শিলঙসুদ্ধ বাঙালি জানে। গভর্মেণ্ট আপিসের কেরানিদের প্রধান আলোচ্য বিষয় তাদের জীবিকাভাগ্যগগনে কোন্ গ্রহ রাজা হৈল কে বা মন্ত্রিবর। এমন সময় তাদের চোখে পড়ল মানবজীবনের জ্যোতির্মণ্ডলে এক যুগ্মতারার আবর্তন, একেবারে ফার্স্ট ম্যাগ্নিচ্যুডের আলো। পর্যবেক্ষকদের প্রকৃতি অনুসারে এই দুটি নবদীপ্যমান জ্যোতিষ্কের আগ্নেয়নাট্যের নানাপ্রকার ব্যাখ্যা চলছে।

পাহাড়ে হাওয়া খেতে এসে এই ব্যাখ্যার মধ্যে পড়েছিল কুমার মুখুজ্জো—অ্যাটর্নি। সংক্ষেপে কেউ তাকে বলে কুমার মুখো, কেউ বলে মার মুখো। সিসিদের মিত্রগোষ্ঠীর অন্তশ্চর নয় সে, কিন্তু জ্ঞাতি, অর্থাৎ জানাশোনার দলে। অমিত তাকে ধূমকেতু মুখো নাম দিয়েছিল। তার একটা কারণ, সে এদের দলের বাইরে, তবু সে মাঝে মাঝে এদের কক্ষপথে পুচ্ছ বুলিয়ে যায়। সকলেই আন্দাজ করে, যে-গ্রহটি তাকে বিশেষ করে টান মারছে তার নাম লিসি। এই নিয়ে সকলেই কৌতুক অনুভব করে, কিন্তু লিসি স্বয়ং এতে ক্রুদ্ধ ও লজ্জিত। তাই লিসি প্রায়ই প্রবল বেগে এর পুচ্ছমর্দন করে চলে যায়, কিন্তু দেখতে পাই তাতে ধূমকেতুর ল্যাজার বা মুড়োর কোনোই লোকসান হয় না।

অমিত শিলঙের রাস্তায় ঘাটে মাঝে মাঝে কুমার মুখোকে দূর থেকে দেখেছে। তাকে না দেখতে পাওয়া শক্ত। বিলেতে আজও যায় নি বলে তার বিলিতি কায়দা খুব উৎকটভাবে প্রকাশমান। তার মুখে নিরবচ্ছিন্ন একটা দীর্ঘ মোটা চুরুট থাকে

এইটেই তার ধূমকেতু মুখো নামের প্রধান কারণ। অমিত তাকে দূর থেকেই এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেছে এবং নিজেকে ভুলিয়েছে যে, ধূমকেতু বুঝি সেটা বুঝতে পারে নি। কিন্তু দেখেও দেখতে না পাওয়াটা একটা বড়ো বিদ্যের অন্তর্গত। চুরিবিদ্যের মতোই, তার সার্থকতার প্রমাণ হয় যদি না পড়ে ধরা। তাতে প্রত্যক্ষ দৃশ্যটাকে সম্পূর্ণ পার করে দেখবার পারদর্শিতা চাই।

কুমার মুখো শিলঙের বাঙালিসমাজ থেকে এমন অনেক কথা সংগ্রহ করেছে যাকে মোটা অক্ষরে শিরোনামা দেওয়া যেতে পারে "অমিত রায়ের অমিতাচার।" মুখে সব-চেয়ে নিন্দে করেছে যারা, মনে সব-চেয়ে রসভোগ করেছে তারাই। যকৃতের বিকৃতি-শোধনের জন্যে কুমার কিছুদিন এখানে থাকবে বলেই স্থির ছিল, কিন্তু জনশ্রুতি বিস্তারের উগ্র উৎসাহে তাকে পাঁচদিনের মধ্যে কলকাতায় ফেরালে। সেখানে গিয়ে অমিত সম্বন্ধে তার চুরুটধূমাকৃত অত্যুক্তি উদ্‌গারে সিসি-লিসিমহলে কৌতুকে কৌতূহলে জড়িত বিভীষিকা উৎপাদন করলে।

অভিজ্ঞ পাঠকমাত্রই এতক্ষণে অনুমান করে থাকবেন যে, সিসি-দেবতার বাহন হচ্ছে কেটি মিত্তিরের দাদা নরেন। তার অনেক দিনের একনিষ্ঠ বাহন-দশা এবার বৈবাহনের দশম দশায় উত্তীর্ণ হবে এমন কথা উঠেছে। সিসি মনে-মনে রাজি। কিন্তু যেন রাজি নয় ভাব দেখিয়ে একটা প্রদোষান্ধকার ঘনিয়ে রেখেছে। অমিতর সম্মতি-সহায়ে নরেন এই সংশয়টুকু পার হতে পারবে বলে ঠিক করেছিল, কিন্তু অমিত হাম্বাগটা না ফেরে কলকাতায়, না দেয় চিঠির জবাব। ইংরেজি যতগুলো গর্হিত শব্দভেদী বাক্য তার জানা ছিল সবগুলিই প্রকাশ্যে ও স্বগত উক্তিতে নিরুদ্দেশ অমিতর প্রতি নিক্ষেপ করেছে। এমন কি, তারযোগে অত্যন্ত বেতার বাক্য শিলঙে পাঠাতে ছাড়ে নি,—কিন্তু উদাসীন নক্ষত্রকে লক্ষ্য করে উদ্ধত হাউয়ের মতো কোথাও তার দাহরেখা রইল না। অবশেষে সর্বসম্মতিক্রমে স্থির হল অবস্থাটার সরেজমিন তদন্ত হওয়া দরকার। সর্বনাশের স্রোতে অমিতর ঝুঁটির ডগাটাও যদি কোথাও একটু দেখা যায় টেনে ডাঙায় তোলা আশু দরকার। এ-সম্বন্ধে তার আপন বোন সিসির চেয়ে পরের বোন কেটির উৎসাহ অনেক বেশি। ভারতের ধন বিদেশে লুপ্ত হচ্ছে বলে আমাদের পলিটিক্সের যে আক্ষেপ কেটি মিটারের ভাবখানা সেই জাতের।

নরেন মিটার দীর্ঘকাল য়ুরোপে ছিল। জমিদারের ছেলে, আয়ের জন্য ভাবনা নেই, ব্যয়ের জন্যেও; বিদ্যার্জনের ভাবনাও সেই পরিমাণে লঘু। বিদেশে ব্যয়ের প্রতিই অধিক মনোযোগ করেছিল, অর্থ এবং সময় দুই দিক থেকেই। নিজেকে আর্টিস্ট বলে পরিচয় দিতে পারলে একই কালে দায়মুক্ত স্বাধীনতা ও অহৈতুক আত্মসম্মান লাভ করা

যায়। এই জন্যে আর্ট-সরস্বতীর অনুসরণে য়ুরোপের অনেক বড়ো বড়ো শহরের বোহিমীয় পাড়ায় সে বাস করেছে। কিছুদিন চেষ্টার পর স্পষ্টবক্তা হিতৈষীদের কঠোর অনুরোধে ছবি আঁকা ছেড়ে দিতে হল, এখন সে ছবির সমজদারিতে পরিপক্ব বলেই নিজের প্রমাণনিরপেক্ষ পরিচয় দেয়। চিত্রকলা সে ফলাতে পারে না কিন্তু দুই হাতে সেটাকে চটকাতে পারে। ফরাসি ছাঁচে সে তার গোঁফের দুই প্রত্যন্তদেশকে সযত্নে কণ্টকিত করেছে, এদিকে মাথায় ঝাঁকড়া চুলের প্রতি তার সযত্ন অবহেলা। চেহারাখানা তার ভালোই, কিন্তু আরও ভালো করবার মহার্ঘ্য সাধনায় তার আয়নার টেবিল প্যারিসীয় বিলাসবৈচিত্র্যে ভারাক্রান্ত। তার মুখ-ধোবার টেবিলের উপকরণ দশাননের পক্ষেও বাহুল্য হত। দামি হাভানা দু-চার টান টেনেই অনায়াসেই সেটাকে অবজ্ঞা করা, এবং মাসে মাসে গাত্রবস্ত্র পার্সেল পোস্টে ফরাসি ধোবার বাড়িতে ধুইয়ে আনানো— এ-সব দেখে ওর আভিজাত্য সম্বন্ধে দ্বিরুক্তি করতে সাহস হয় না। য়ুরোপের শ্রেষ্ঠ দরজিশালার রেজেস্ট্রি বহিতে ওর গায়ের মাপ ও নম্বর লেখা, এমন সব কোঠায়, যেখানে খুঁজলে পাতিয়ালা-কর্পূরতলার নাম পাওয়া যেতে পারে। ওর স্ল্যাঙ-বিকীর্ণ ইংরেজি ভাষার উচ্চারণটা বিজড়িত বিলম্বিত, আমীলিত চক্ষুর অলস কটাক্ষ সহযোগে অনতিব্যক্ত; যারা অভিজ্ঞ তাদের কাছে শোনা যায় ইংলণ্ডের অনেক নীলরক্তবান্ আমীরদের কণ্ঠস্বরে এই রকম গদ্‌গদ জড়িমা। এর উপরে ঘোড়দৌড়ীয় অপভাষা এবং বিলিতি শপথের দুর্বাক্যসম্পদে সে তার দলের লোকের আদর্শ পুরুষ।

কেটি মিটারের আসল নাম কেতকী। চালচলন ওর দাদারই কায়দাকারখানার বকযন্ত্রপরম্পরায় শোধিত তৃতীয় ক্রমের চোলাই-করা,—বিলিতি কৌলীন্যের ঝাঁঝালো এসেন্স। সাধারণ বাঙালি মেয়ের দীর্ঘকেশগৌরবের গর্বের প্রতি গর্বসহকারেই কেটি দিয়েছে কাঁচি চালিয়ে, খোঁপাটা ব্যাঙাচির লেজের মতো বিলুপ্ত হয়ে অনুকরণের উল্লম্ফশীল পরিণত অবস্থা প্রতিপন্ন করছে। মুখের স্বাভাবিক গৌরিমা বর্ণপ্রলেপের দ্বারা এনামেল-করা। জীবনের আদ্যলীলায় কেটির কালো চোখের ভাবটি ছিল স্নিগ্ধ, এখন মনে হয় সে যেন যাকে-তাকে দেখতেই পায় না। যদি বা দেখে তো লক্ষ্যই করে না, যদি বা লক্ষ্য করে তাতে যেন আধখোলা একটা ছুরির ঝলক থাকে। প্রথম-বয়সে ঠোঁটদুটিতে সরল মাধুর্য ছিল, এখন বার-বার বেঁকে বেঁকে তার মধ্যে বাঁকা অঙ্কুশের মতো ভাব স্থায়ী হয়ে গেছে। মেয়েদের বেশের বর্ণনায় আমি আনাড়ি। তার পরিভাষা জানি নে। মোটের উপর চোখে পড়ে, উপরে একটা পাতলা সাপের খোলসের মতো ফুরফুরে আবরণ, অন্দরের কাপড় থেকে অন্য একটা রঙের আভাস আসছে। বুকের অনেকখানিই অনাবৃত; আর অনাবৃত বাহুদুটিকে কখনো কখনো টেবিলে, কখনো

চৌকির হাতায়, কখনো পরস্পরকে জড়িত করে ধ্যানের ভঙ্গিতে আলগোছে রাখবার সাধনা সুসম্পূর্ণ। আর যখন সুমার্জিতনখররমণীয় দুই আঙুলে চেপে সিগারেট খায় সেটা যতটা অলংকরণের অঙ্গরূপে ততটা ধূমপানের উদ্দেশ্যে নয়। সব-চেয়ে যেটা মনে দুশ্চিন্তা উদ্রেক করে সেটা ওর সমুচ্চ খুরওআলা জুতোজোড়ার কুটিল ভঙ্গিমায়; যেন ছাগলজাতীয় জীবের আদর্শ বিস্মৃত হয়ে মানুষের পায়ের গড়ন দেবার বেলায় সৃষ্টিকর্তা ভুল করেছিলেন, যেন মুচির দণ্ড পদোন্নতির কিম্ভূত বক্রতায় ধরণীকে পীড়ন করে চলার দ্বারা এভোল্যুশনের ত্রুটি সংশোধন করা হয়।

সিসি এখনও আছে মাঝামাঝি জায়গায়। শেষের ডিগ্রি এখনও পায় নি, কিন্তু ডবল প্রোমোশন পেয়ে চলেছে। উচ্চ হাসিতে, অজস্র খুশিতে, অনর্গল আলাপে ওর মধ্যে সর্বদা একটা চলনবলন টগবগ করছে, উপাসকমণ্ডলীর কাছে সেটার খুব আদর। রাধিকার বয়ঃসন্ধির বর্ণনায় দেখতে পাওয়া যায় কোথাও তার ভাবখানা পাকা, কোথাও কাঁচা, এরও তাই। খুরওআলা জুতোয় যুগান্তরের জয়তোরণ, কিন্তু অনবচ্ছিন্ন খোঁপাটাতে রয়ে গেছে অতীত যুগ; পায়ের দিকে শাড়ির বহর ইঞ্চি দুই-তিন খাটো, কিন্তু উত্তরচ্ছদে অসংবৃতির সীমানা এখনও আলজ্জতার অভিমুখে; অকারণ দস্তানা পরা অভ্যস্ত, অথচ এখনও এক হাতের পরিবর্তে দুই হাতেই বালা; সিগারেট টানতে আর মাথা ঘোরে না, কিন্তু পান খাবার আসক্তি এখনও প্রবল; বিস্কুটের টিনে ঢেকে আচার-আমসত্ত্ব পাঠিয়ে দিলে সে আপত্তি করে না, ক্রিস্টমাসের প্লাম্‌ পুডিং এবং পৌষপার্বণের পিঠে এই দুইয়ের মধ্যে শেষটার প্রতিই তার লোলুপতা কিছু বেশি। ফিরিঙ্গি নাচওআলীর কাছে সে নাচ শিখেছে, কিন্তু নাচের সভায় জুড়ি মিলিয়ে ঘূর্ণিনাচ নাচতে সামান্য একটু সংকোচ বোধ করে।

অমিত সম্বন্ধে জনরব শুনে এরা বিশেষ উদ্বিগ্ন হয়ে চলে এসেছে। বিশেষত এদের পরিভাষাগত শ্রেণীবিভাগে লাবণ্য গবর্নেস। ওদের শ্রেণীর পুরুষের জাত মারবার জন্যেই তার "স্পেশাল ক্রিয়েশন"। মনে সন্দেহ নেই, টাকার লোভে মানের লোভেই সে অমিতকে কষে আঁকড়ে ধরেছে, ছাড়াতে গেলে সেই কাজটাতে মেয়েদেরই সম্মার্জনপটু হস্তক্ষেপ করতে হবে। চতুর্মুখ তাঁর চারজোড়া চক্ষে মেয়েদের দিকে কটাক্ষপাত ও পক্ষপাত একসঙ্গেই করে থাকবেন, সেইজন্যে মেয়েদের সম্বন্ধে বিচারবুদ্ধিতে পুরুষদের গড়েছেন নিরেট নির্বোধ করে। তাই, স্বজাতিমোহমুক্ত আত্মীয়-মেয়েদের সাহায্য না পেলে অনাত্মীয়-মেয়েদের মোহজাল থেকে পুরুষদের উদ্ধার পাওয়া এত দুঃসাধ্য।

আপাতত এই উদ্ধারের প্রণালীটা কী রকম হওয়া চাই তাই নিয়ে দুই নারী নিজেদের মধ্যে একটা পরামর্শ ঠিক করেছে। এটা নিশ্চিত, গোড়ায় অমিতকে কিছুই

জানতে দেওয়া হবে না। তার আগেই শত্রুপক্ষকে আর রণক্ষেত্রটাকে দেখে আসা চাই। তার পর দেখা যাবে মায়াবিনীর কত শক্তি।

প্রথমে এসেই চোখে পড়ল অমিতর উপর ঘন এক পোঁচ গ্রাম্য রং। এর আগেও ওর দলের সঙ্গে অমিতর ভাবের মিল ছিল না। তবু সে তখন ছিল প্রখর নাগরিক, চাঁচা মাজা ঝকঝকে। এখন কেবল যে খোলা হাওয়ায় রংটা কিছু ময়লা হয়েছে তা নয়, সবসুদ্ধ ওর উপর যেন গাছপালার আমেজ দিয়েছে। ও যেন কাঁচা হয়ে গেছে এবং ওদের মতে কিছু যেন বোকা। ব্যবহারটা প্রায় যেন সাধারণ মানুষের মতো। আগে জীবনের সমস্ত বিষয়কে হাসির অস্ত্র নিয়ে তাড়া করে বেড়াত, এখন ওর সে শখ নেই বললেই হয়; এইটেকেই ওরা মনে করেছে নিদেন কালের লক্ষণ।

সিসি একদিন ওকে স্পষ্টই বললে, "দূর থেকে আমরা মনে করছিলুম তুমি বুঝি খাসিয়া হবার দিকে নামছ। এখন দেখছি তুমি হয়ে উঠেছ, যাকে বলে গ্রীন, এখানকার পাইনগাছের মতো, হয়তো আগেকার চেয়ে স্বাস্থ্যকর, কিন্তু আগেকার মতো ইন্টারেস্টিং নয়।"

অমিত ওঅর্ডসওঅর্থের কবিতা থেকে নজির পেড়ে বললে, প্রকৃতির সংসর্গে থাকতে থাকতে নির্বাক নিশ্চেতন পদার্থের ছাপ লেগে যায় দেহে মনে প্রাণে, যাকে কবি বলেছেন "**mute insensate things.**"

শুনে সিসি ভাবলে, নির্বাক নিশ্চেতন পদার্থকে নিয়ে আমাদের কোনো নালিশ নেই, যারা অত্যন্ত বেশি সচেতন আর যারা কথা কইবার মধুর প্রগল্‌ভতায় সুপটু, তাদের নিয়েই আমাদের ভাবনা।

ওরা আশা করেছিল লাবণ্য সম্বন্ধে অমিত নিজেই কথা তুলবে। একদিন দুদিন তিনদিন যায় সে একেবারে চুপ। কেবল একটা কথা আন্দাজে বোঝা গেল, অমিতর সাধের তরণী সম্প্রতি কিছু বেশিরকম ঢেউ খাচ্ছে। ওরা বিছানা থেকে উঠে তৈরি হবার আগেই অমিত কোথা থেকে ঘুরে আসে, তার পরে মুখ দেখে মনে হয় ঝ'ড়ো হাওয়ায় যে-কলাগাছের পাতাগুলো ফালি ফালি হয়ে ঝুলছে তারই মতো শতদীর্ণ ভাবখানা। আরও ভাবনার কথাটা এই যে, রবি ঠাকুরের বই কেউ কেউ ওর বিছানায় দেখেছে। ভিতরের পাতায় লাবণ্যর নাম থেকে গোড়ার অক্ষরটা লাল কালি দিয়ে কাটা। বোধ হয় নামের পরশপাথরেই জিনিসটার দাম বাড়িয়েছে।

অমিত ক্ষণে ক্ষণে বেরিয়ে যায়। বলে, খিদে সংগ্রহ করতে চলেছি। খিদের জোগানটা কোথায়, আর খিদেটা খুবই যে প্রবল তা অন্যদের অগোচর ছিল না। কিন্তু তারা এমনি অবুঝের মতো ভাব করত যেন হাওয়ায় ক্ষুধাকরতা ছাড়া শিলঙে আর

কিছু আছে এ-কথা কেউ ভাবতে পারে না। সিসি মনে-মনে হাসে, কেটি মনে-মনে জ্বলে। নিজের সমস্তটাই অমিতর কাছে এত একান্ত যে, বাইরের কোনো চাঞ্চল্য লক্ষ্য করার শক্তিই তার নেই। তাই সে নিঃসংকোচে সখীযুগলের কাছে বলে, "চলেছি এক জলপ্রপাতের সন্ধানে।" কিন্তু প্রপাতটা কোন্ শ্রেণীর, আর তার গতিটা কোন্ অভিমুখী, তা নিয়ে অন্যদের মনে যে কিছু ধোঁকা আছে তা সে বুঝতেই পারে না। আজ বলে গেল, এক জায়গায় কমলালেবুর মধুর সওদা করতে চলেছে। মেয়ে দুটি নিতান্ত নিরীহভাবে সরল ভাষায় বললে, এই অপূর্ব মধু সম্বন্ধে তাদের দুর্দমনীয় কৌতূহল, তারাও সঙ্গে যেতে চায়। অমিত বললে, পথ দুর্গম, যানবাহনের আয়ত্তাতীত। বলেই আলোচনাটাকে প্রথম অংশে ছেদন করেই দৌড় দিলে। এই মধুকরের ডানার চাঞ্চল্য দেখে দুই বন্ধু স্থির করলে আর দেরি নয়, আজই কমলালেবুর বাগানে অভিযান করা চাই। এদিকে নরেন গেছে ঘোড়দৌড়ের মাঠে, সিসিকে নিয়ে যাবার জন্যে খুব আগ্রহ ছিল। সিসি গেল না। এই নিবৃত্তিতে তার কতখানি শমদমের দরকার হয়েছিল তা দরদি ছাড়া অন্যে কে বুঝবে।

১৫

ব্যাঘাত

দুই সখী যোগমায়ার বাগানে বাইরের দরজা পার হয়ে চাকরদের কাউকে দেখতে পেলে না। গাড়িবারান্দায় এসে চোখে পড়ল বাড়ির রোয়াকে একটি ছোটো টেবিল পেতে একজন শিক্ষয়িত্রী ও ছাত্রীতে মিলে পড়া চলছে। বুঝতে বাকি রইল না; এরই মধ্যে বড়োটি লাবণ্য।

কেটি টকটক করে উপরে উঠে ইংরেজিতে বললে, "দুঃখিত।"

লাবণ্য চৌকি ছেড়ে উঠে বললে, "কাকে চান আপনারা ?"

কেটি এক মুহূর্তে লাবণ্যর আপাদমস্তকে দৃষ্টিটাকে প্রখর ঝাঁটার মতো দ্রুত বুলিয়ে নিয়ে বললে, "মিস্টার অমিট্রায়ে এখানে এসেছেন কি না খবর নিতে এলুম।"

লাবণ্য হঠাৎ বুঝতেই পারলে না, অমিট্রায়ে কোন্ জাতের জীব। বললে, "তাঁকে তো আমরা চিনি নে।"

অমনি দুই সখীতে একটা বিদ্যুচ্চকিত চোখ-ঠারাঠারি হয়ে গেল, মুখে পড়ল

একটা আড়হাসির রেখা। কেটি দাঁড়িয়ে উঠে মাথা নাড়া দিয়ে বললে, "আমরা তো জানি, এ বাড়িতে তাঁর যাওয়া-আসা আছে **oftener than is good for him**।"

ভাব দেখে লাবণ্য চমকে উঠল, বুঝলে এরা কে আর ও কী ভুলটাই করেছে। অপ্রস্তুত হয়ে বললে, "কর্তামাকে ডেকে দিই, তাঁর কাছে খবর পাবেন।"

লাবণ্য চলে গেলেই সুরমাকে কেটি সংক্ষেপে জিজ্ঞাসা করলে, "তোমার টীচার?"

"হাঁ।"

"নাম বুঝি লাবণ্য?"

"হাঁ।"

"গট ম্যাচেস?"

হঠাৎ দেশালাইয়ের প্রয়োজন আন্দাজ করতে না পেরে সুরমা কথাটার মানেই বুঝল না। মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

কেটি বললে, "দেশালাই।"

সুরমা দেশালাইয়ের বাক্স নিয়ে এল। কেটি সিগারেট ধরিয়ে টানতে টানতে সুরমাকে জিজ্ঞাসা করলে, "ইংরেজি পড়?"

সুরমা স্বীকৃতিসূচক মাথা নেড়েই ঘরের দিকে দ্রুত চলে গেল। কেটি বললে, "গবর্নেসের কাছে মেয়েটা আর যাই শিখুক ম্যানার্স শেখে নি।"

তার পরে দুই সখীতে টিপ্পনী চলল। "ফেমাস লাবণ্য! ডিলীশস! শিলঙ পাহাড়টাকে ভলক্যানো বানিয়ে তুলেছে, ভূমিকম্পে অমিটের হৃদয়-ডাঙায় ফাটল ধরিয়ে দিলে, এধার থেকে ওধার। সিলি! মেন আর ফানি।"

সিসি উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠল। এই হাসিতে ঔদার্য ছিল। কেননা, পুরুষমানুষ নির্বোধ বলে সিসির পক্ষে আক্ষেপের কারণ ঘটে নি। সে তো পাথুরে জমিতেও ভূমিকম্প ঘটিয়েছে, দিয়েছে একেবারে চৌচির করে। কিন্তু এ কী সৃষ্টিছাড়া ব্যাপার। একদিকে কেটির মতো মেয়ে, আর অন্যদিকে ওই অদ্ভুত ধরনে কাপড়-পরা গবর্নেস। মুখে মাখন দিলে গলে না, যেন একতাল ভিজে ন্যাকড়া, কাছে বসলে মনটাতে বাদলার বিস্কুটের মতো ছাতা পড়ে যায়। কী করে অমিট ওকে এক মোমেন্টও সহ্য করে?

"সিসি, তোমার দাদার মনটা চিরদিন উপরে পা করে হাঁটে। কোন্ এক সৃষ্টিছাড়া উলটো বুদ্ধিতে এই মেয়েটাকে হঠাৎ মনে হয়েছে এঞ্জেল।"

এই বলে টেবিলে অ্যালজেব্রার বইয়ের গায়ে সিগারেটটা ঠেকিয়ে রেখে কেটি ওর রুপোর শিকলওআলা প্রসাধনের থলি বের করে মুখে একটুখানি পাউডার লাগালে, অঞ্জনের পেনসিল দিয়ে ভুরুর রেখাটা একটু ফুটিয়ে তুললে। দাদার কাণ্ডজ্ঞানহীনতায়

সিসির যথেষ্ট রাগ হয় না, এমন কি, ভিতরে ভিতরে একটু যেন স্নেহই হয়। সমস্ত রাগটা পড়ে পুরুষদের মুগ্ধনয়নবিহারিণী যেকি এক্সেলদের 'পরে। দাদার সম্বন্ধে সিসির এই সকৌতুক ঔদাসীন্যে কেটির ধৈর্যভঙ্গ হয়। খুব করে ঝাঁকানি দিয়ে নিতে ইচ্ছে করে।

এমন সময়ে সাদা গরদের শাড়ি পরে যোগমায়া বেরিয়ে এলেন। লাবণ্য এল না। কেটির সঙ্গে এসেছিল ঝাঁকড়া চুলে দুই চোখ আচ্ছন্নপ্রায় ক্ষুদ্রকায়া ট্যাবি নামধারী কুকুর। সে একবার ঘ্রাণের দ্বারা লাবণ্য ও সুরমার পরিচয় গ্রহণ করেছে। যোগমায়াকে দেখে হঠাৎ কুকুরটার মনে কিছু উৎসাহ জন্মাল। তাড়াতাড়ি গিয়ে সামনের দুটো পা দিয়ে যোগমায়ার নির্মল শাড়ির উপর পঙ্কিল স্বাক্ষর অঙ্কিত করে দিয়ে কৃত্রিম প্রীতি জ্ঞাপন করলে। সিসি ঘাড় ধরে টেনে আনলে কেটির কাছে, কেটি তার নাকের উপর তর্জনী তাড়ন করে বললে, "নটি ডগ।"

কেটি চৌকি থেকে উঠলই না। সিগারেট টানতে টানতে অত্যন্ত নির্লিপ্ত আড়ভাবে একটু ঘাড় বাঁকিয়ে যোগমায়াকে নিরীক্ষণ করতে লাগল। যোগমায়ার 'পরে তার আক্রোশ বোধ করি লাবণ্যর চেয়েও বেশি। ওর ধারণা, লাবণ্যর ইতিহাসে একটা খুঁত আছে। যোগমায়াই মাসি সেজে অমিতর হাতে তাকে গছিয়ে দেবার কৌশল করছে। পুরুষমানুষকে ঠকাতে অধিক বুদ্ধির দরকার করে না, বিধাতার স্বহস্তে তৈরি ঠুলি তাদের দুই চোখে পরানো।

সিসি সামনে এসে যোগমায়াকে নমস্কারের একটু আভাস দিয়ে বললে, "আমি সিসি, অমির বোন।"

যোগমায়া একটু হেসে বললেন, "অমি আমাকে মাসি বলে, সেই সম্পর্কে আমি তোমারও মাসি হই, মা।"

কেটির রকম দেখে যোগমায়া তাকে লক্ষ্যই করলেন না। সিসিকে বললেন, "এস, মা, ঘরে বসবে এস।"

সিসি বললে, "সময় নেই, কেবল খবর নিতে এসেছি, অমি এসেছে কি না।"

যোগমায়া বললেন, "এখনও আসে নি।"

"কখন আসবেন জানেন?"

"ঠিক বলতে পারি নে, আচ্ছা আমি জিজ্ঞাসা করে আসি গে।

কেটি তার স্বস্থানে বসেই তীব্রস্বরে বলে উঠল, "যে-মাস্টারনী এখানে বসে পড়াচ্ছিল সে তো ভান করলে অমিটকে সে কোনোকালেই জানেই না।"

যোগমায়ার ধাঁধা লেগে গেল। বুঝলেন কোথাও একটা গোল আছে। এ-ও

বুঝলেন এদের কাছে মান রাখা শক্ত হবে। এক মুহূর্তে মাসিত্ব পরিহার করে বললেন, "শুনেছি অমিতবাবু আপনাদের হোটেলেই থাকেন, তাঁর খবর আপনাদেরই জানা আছে।"

কেটি বেশ একটু স্পষ্ট করেই হাসলে। তাকে ভাষায় বললে বোঝায়, "লুকোতে পার, ফাঁকি দিতে পারবে না।"

আসল কথা, গোড়াতেই লাবণ্যকে দেখে এবং অমিকে সে চেনে না শুনে কেটি মনে-মনে আগুন হয়ে আছে। কিন্তু সিসির মনে আশঙ্কা আছে মাত্র, জ্বালা নেই; যোগমায়ার সুন্দর মুখের গাম্ভীর্য তার মনকে টেনেছিল। তাই, যখন দেখলে কেটি তাঁকে স্পষ্ট অবজ্ঞা দেখিয়ে চৌকি ছাড়লে না, তার মনে কেমন সংকোচ লাগল। অথচ কোনো বিষয়ে কেটির বিরুদ্ধে যেতে সাহস হয় না, কেননা, কেটি সিডিশন দমন করতে ক্ষিপ্রহস্ত,—একটু সে বিরোধ সয় না। কর্কশ ব্যবহারে তার কোনো সংকোচ নেই। অধিকাংশ মানুষই ভীরু, অকুণ্ঠিত দুর্ব্যবহারের কাছে তারা হার মানে। নিজের অজস্র কঠোরতায় কেটির একটা গর্ব আছে; যাকে সে মিষ্টিমুখো ভালোমানুষি বলে, বন্ধুদের মধ্যে তার কোনো লক্ষণ দেখলে তাকে সে অস্থির করে তোলে। রূঢ়তাকে সে অকপটতা বলে বড়াই করে, এই রূঢ়তার আঘাতে যারা সংকুচিত তারা কোনোমতে কেটিকে প্রসন্ন রাখতে পারলে আরাম পায়। সিসি সেই দলের,—সে কেটিকে মনে-মনে যতই ভয় করে ততই তার নকল করে, দেখাতে যায় সে দুর্বল নয়। সব সময়ে পেরে ওঠে না। কেটি আজ বুঝেছিল যে, তার ব্যবহারের বিরুদ্ধে সিসির মনের কোণে একটা মুখচোরা আপত্তি লুকিয়ে ছিল। তাই সে ঠিক করেছিল, যোগমায়ার সামনে সিসির এই সংকোচ কড়া ক'রে ভাঙতে হবে। চৌকি থেকে উঠল, একটা সিগারেট নিয়ে সিসির মুখে বসিয়ে দিলে, নিজের ধরানো সিগারেট মুখে করেই সিসির সিগারেট ধরাবার জন্যে মুখ এগিয়ে নিয়ে এল। প্রত্যাখ্যান করতে সিসি সাহস করলে না। কানের ডগাটা একটুখানি লাল হয়ে উঠল। তবু জোর করে এমনি একটা ভাব দেখালে, যেন তাদের হাল পাশ্চাত্যিকতায় যাদের ভ্রূ এতটুকু কুঞ্চিত হবে তাদের মুখের উপর ও তুড়ি মারতে প্রস্তুত—**that much for it!**

ঠিক সেই সময়টাতে অমিত এসে উপস্থিত। মেয়েরা তো অবাক। হোটেল থেকে যখন সে বেরিয়ে এল মাথায় ছিল ফেল্ট হ্যাট, গায়ে ছিল বিলিতি কোর্তা। এখানে দেখা যাচ্ছে পরনে তার ধুতি আর শাল। এই বেশান্তরের আড্ডা ছিল তার সেই কুটিরে। সেইখানে আছে একটি বইয়ের শেল্ফ, একটি কাপড়ের তোরঙ্গ, আর যোগমায়ার দেওয়া একটি আরামকেদারা। হোটেল থেকে মধ্যাহ্নভোজন সেরে

এইখানে সে আশ্রয় নেয়। আজকাল লাবণ্যর শাসন কড়া, সুরমাকে পড়ানোর সময়ের মাঝখানটাতে জলপ্রপাত বা কমলালেবুর সন্ধানে কাউকে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না। সেইজন্যে, বিকেলে সাড়ে চারটে বেলায় চা-পানসভার পূর্বে এ-বাড়িতে দৈহিক মানসিক কোনোপ্রকার তৃষ্ণানিবারণের সৌজন্যসম্মত সুযোগ অমিতর ছিল না। এই সময়টা কোনোমতে কাটিয়ে কাপড় ছেড়ে যথানির্দিষ্ট সময়ে এখানে সে আসত।

আজ হোটেল থেকে বেরোবার আগেই কলকাতা থেকে এসেছে তার আংটি। কেমন করে সে সেই আংটি লাবণ্যকে পরাবে তার সমস্ত অনুষ্ঠানটা সে বসে বসে কল্পনা করেছে। আজ হল ওর একটা বিশেষ দিন। এ-দিনকে দেউড়িতে বসিয়ে রাখা চলবে না। আজ সব কাজ বন্ধ করা চাই। মনে-মনে ঠিক করে রেখেছে লাবণ্য যেখানে পড়াচ্ছে সেইখানে গিয়ে বলবে—একদিন হাতিতে চড়ে বাদশা এসেছিল, কিন্তু তোরণ ছোটো, পাছে মাথা হেঁট করতে হয় তাই সে ফিরে গেছে, নতুন-তৈরি প্রাসাদে প্রবেশ করে নি। আজ এসেছে আমাদের একটি মহাদিন, কিন্তু তোমার অবকাশের তোরণটা তুমি খাটো করে রেখেছ,—সেটাকে ভাঙো, রাজা মাথা তুলেই তোমার ঘরে প্রবেশ করুন।

অমিত এ-কথাও মনে করে এসেছিল যে, ওকে বলবে, ঠিক সময়টাতে আসাকেই বলে পাঙ্কচুয়ালিটি ;—কিন্তু ঘড়ির সময় ঠিক সময় নয়, ঘড়ি সময়ের নম্বর জানে, তার মূল্য জানবে কী করে ?

অমিত বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখলে, মেঘে আকাশটা ম্লান, আলোর চেহারাটা বেলা পাঁচটা-ছটার মতো। অমিত ঘড়ি দেখলে না, পাছে ঘড়িটা তার অভদ্র ইশারায় আকাশের প্রতিবাদ করে। যেমন বহুদিনের জ্বরো রোগীর মা ছেলের গা একটু ঠাণ্ডা দেখে আর থার্মমিটর মিলিয়ে দেখতে সাহস করে না। আজ অমিত এসেছিল নির্দিষ্ট সময়ের যথেষ্ট আগে। কারণ, দুরাশা নির্লজ্জ।

বারান্দার যে-কোণটায় বসে লাবণ্য তার ছাত্রীকে পড়ায়, রাস্তা দিয়ে আসতে সেটা চোখে পড়ে। আজ দেখলে সে-জায়গাটা খালি। মন আনন্দে লাফিয়ে উঠল। এতক্ষণ পরে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলে। এখনও তিনটে বেজে বিশ মিনিট। সেদিন ও লাবণ্যকে বলেছিল নিয়মপালনটা মানুষের, অনিয়মটা দেবতার ; মর্ত্যে আমরা নিয়মের সাধনা করি স্বর্গে অনিয়ম-অমৃতে অধিকার পাব বলেই। সেই স্বর্গ মাঝে মাঝে মর্ত্যেই দেখা দেয় তখন নিয়ম ভেঙে তাকে সেলাম করে নিতে হয়। আশা হল, লাবণ্য নিয়ম-ভাঙার গৌরব বুঝেছে বা ; লাবণ্যর মনের

মধ্যে হঠাৎ আজ বুঝি কেমন করে বিশেষ দিনের স্পর্শ লেগেছে, সাধারণ দিনের বেড়া গেছে ভেঙে।

নিকটে এসে দেখে যোগমায়া তাঁর ঘরের বাইরে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে, আর সিসি তার মুখের সিগারেট কেটির মুখের সিগারেট থেকে জ্বালিয়ে নিচ্ছে। অসম্মান যে ইচ্ছাকৃত তা বুঝতে বাকি রইল না। ট্যাবি কুকুরটা তার প্রথম-মৈত্রীর উচ্ছ্বাসে বাধা পেয়ে কেটির পায়ের কাছে শুয়ে একটু নিদ্রার চেষ্টা করছিল। অমিতর আগমনে তাকে সংবর্ধনা করবার জন্যে আবার অসংযত হয়ে উঠল। সিসি আবার তাকে শাসনের দ্বারা বুঝিয়ে দিলে যে, এই সদ্‌ভাবপ্রকাশের প্রণালীটা এখানে সমাদৃত হবে না।

দুই সখীর প্রতি দৃক্‌পাত মাত্র না করে "মাসি" বলে দূর থেকে ডেকেই অমিত যোগমায়ার পায়ের কাছে পড়ে তাঁর পায়ের ধুলো নিলে। এ-সময়ে এমন করে প্রণাম করা তার প্রথার মধ্যে ছিল না। জিজ্ঞাসা করলে, "মাসিমা, লাবণ্য কোথায় ?"

"কী জানি, বাছা, ঘরের মধ্যে কোথায় আছে।"

"এখনও তো তার পড়াবার সময় শেষ হয় নি।"

"বোধ হয় এঁরা আসাতে ছুটি নিয়ে ঘরে গেছে।"

"চলো, একবার দেখে আসি সে কী করছে।" যোগমায়াকে নিয়ে অমিত ঘরে গেল। সম্মুখে যে আর-কোনো সজীব পদার্থ আছে সেটা সে সম্পূর্ণই অস্বীকার করলে।

সিসি একটু চেঁচিয়ে বলে উঠল, "অপমান। চলো, কেটি, ঘরে যাই।"

কেটিও কম জ্বলে নি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত না দেখে সে যেতে চায় না।

সিসি বললে, "কোনো ফল হবে না।"

কেটির বড়ো বড়ো চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠল, বললে, "হতেই হবে ফল।"

আরও খানিকটা সময় গেল। সিসি আবার বললে, "চলো ভাই, আর একটুও থাকতে ইচ্ছে করছে না।"

কেটি বারাণ্ডায় ধন্না দিয়ে বসে রইল। বললে, "এইখান দিয়ে তাকে বেরোতেই তো হবে।"

অবশেষে বেরিয়ে এল অমিত, সঙ্গে নিয়ে এল লাবণ্যকে। লাবণ্যর মুখে একটি নির্লিপ্ত শান্তি। তাতে একটুও রাগ নেই, স্পর্ধা নেই, অভিমান নেই। যোগমায়া পিছনের ঘরেই ছিলেন, তাঁর বেরোবার ইচ্ছা ছিল না। অমিত তাঁকে ধরে নিয়ে এল।

একমুহূর্তের মধ্যেই কেটির চোখে পড়ল লাবণ্যর হাতে আংটি। মাথায় রক্ত চন করে উঠল, লাল হয়ে উঠল দুই চোখ, পৃথিবীটাকে লাথি মারতে ইচ্ছে করল।

অমিত বললে, "মাসি, এই আমার বোন শমিতা, বাবা বোধ হয় আমার নামের সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে নাম রেখেছিলেন, কিন্তু রয়ে গেল অমিত্রাক্ষর। ইনি কেতকী, আমার বোনের বন্ধু।"

ইতিমধ্যে আর-এক উপদ্রব। সুরমার এক পোষা বিড়াল ঘর থেকে বেরিয়ে আসাতেই ট্যাবির কুকুরীয় নীতিতে সে এই স্পর্ধাটাকে যুদ্ধঘোষণার বৈধ কারণ বলেই গণ্য করলে। একবার অগ্রসর হয়ে তাকে ভর্ৎসনা করে, আবার বিড়ালের উদ্যত নখর ও ফোঁসফোঁসানিতে যুদ্ধের আশুফল সম্বন্ধে সংশয়াপন্ন হয়ে ফিরে আসে। এমন অবস্থায় কিঞ্চিৎ দূর হতেই অহিংস্র গর্জননীতিই নিরাপদ বীরত্ব প্রকাশের উপায় মনে করে অপরিমিত চীৎকার শুরু করে দিলে। বিড়ালটা তার কোনো প্রতিবাদ না করে পিঠ ফুলিয়ে চলে গেল। এইবার কেটি সহ্য করতে পারলে না। প্রবল আক্রোশে কুকুরটাকে কান-মলা দিতে লাগল। এই কান-মলার অনেকটা অংশই নিজের ভাগ্যের উদ্দেশে। কুকুরটা কেঁই কেঁই স্বরে অসদ্ব্যবহার সম্বন্ধে তীব্র অভিমত জানালে। ভাগ্য নিঃশব্দে হাসল।

এই গোলমালটা একটু থামলে পর অমিত সিসিকে লক্ষ্য করে বললে, "সিসি, এঁরই নাম লাবণ্য। আমার কাছ থেকে এঁর নাম কখনো শোন নি, কিন্তু বোধ হচ্ছে, আর-দশজনের কাছ থেকে শুনেছ। এঁর সঙ্গে আমার বিবাহ স্থির হয়ে গেছে, কলকাতায় অঘ্রান মাসে।"

কেটি মুখে হাসি টেনে আনতে দেরি করলে না। বললে, "আই কনগ্র্যাচুলেট। কমলালেবুর মধু পেতে বিশেষ বাধা হয় নি বলেই ঠেকছে, রাস্তা কঠিন নয়, মধু লাফ দিয়ে আপনিই এগিয়ে এসেছে মুখের কাছে।"

সিসি তার স্বাভাবিক অভ্যাসমতো হী হী করে হেসে উঠল।

লাবণ্য বুঝলে কথাটার খোচা আছে, কিন্তু মানেটা সম্পূর্ণ বুঝলে না।

অমিত তাকে বললে, "আজ বেরোবার সময় এরা আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, কোথায় যাচ্ছ? আমি বলেছিলুম বন্য মধুর সন্ধানে। তাই এরা হাসছে। ওটা আমারই দোষ;—আমার কোন্ কথাটা যে হাসির নয় লোকে সেটা ঠাওরাতে পারে না।"

কেটি শান্তস্বরেই বললে, "কমলালেবুর মধু নিয়ে তোমার তো জিত হল, এবার আমারও যাতে হার না হয়, সেটা করো।"

"কী করতে হবে, বলো।"

"নরেনের সঙ্গে আমার একটা বাজি আছে। সে বলেছিল, জেণ্টেলম্যানরা যেখানে যায় কেউ সেখানে তোমাকে নিয়ে যেতে পারে না, কিছুতেই তুমি রেস দেখতে যাবে না। আমি আমার এই হীরের আংটি বাজি রেখে বলেছিলুম, তোমাকে রেসে নিয়ে যাবই। এ-দেশে যত ঝরনা, যত মধুর দোকান আছে সব সন্ধান করে শেষকালে এখানে এসে তোমার দেখা পেলুম। বলো না, ভাই সিসি, কত ফিরতে হয়েছে বুনো হাঁস শিকারের চেষ্টায়, ইংরেজিতে যাকে বলে **wild goose**।"

সিসি কোনো কথা না বলে হাসতে লাগল। কেটি বললে, "মনে পড়ছে সেই গল্পটা—একদিন তোমার কাছেই শুনেছি অমিট। কোন পার্শিয়ান ফিলজফার তার পাগড়ি-চোরের সন্ধান না পেয়ে শেষে গোরস্থানে এসে বসেছিল। বলেছিল, পালাবে কোথায়? মিস লাবণ্য যখন বলেছিলেন ওকে চেনেন না আমাকে ধোঁকা লাগিয়ে দিয়েছিল, কিন্তু আমার মন বললে, ঘুরে ফিরে ওকে ওর এই গোরস্থানে আসতেই হবে।"

সিসি উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠল।

কেটি লাবণ্যকে বললে, "অমিট আপনার নাম মুখে আনলে না, মধুর ভাষাতে ঘুরিয়ে বললে, কমলালেবুর মধু; আপনার বুদ্ধি খুবই বেশি সরল, ঘুরিয়ে বলবার কৌশল মুখে জোগায় না, ফস করে বলে ফেললেন, অমিটকে জানেনই না। তবু সান ডে স্কুলের বিধানমতো ফল ফলল না, দণ্ডদাতা আপনাদের কোনো দণ্ডই দিলেন না, শক্ত পথের মধুও একজন এক চুমুকেই খেয়ে নিলেন, আর অজানাকেও একজন এক দৃষ্টিতেই জানলেন, এখন কেবল আমার ভাগ্যেই হার হবে? দেখো তো, সিসি, কী অন্যায়।"

সিসির আবার সেই উচ্চ হাসি। ট্যাবি কুকুরটাও এই উচ্ছ্বাসে যোগ দেওয়া তার সামাজিক কর্তব্য মনে করে বিচলিত হবার লক্ষণ দেখালে। তৃতীয়বার তাকে দমন করা হল।

কেটি বললে, "অমিট তুমি জান, এই হীরের আংটি যদি হারি, জগতে আমার সান্ত্বনা থাকবে না। এ আংটি একদিন তুমিই দিয়েছিলে। একমুহূর্ত হাত থেকে খুলি নি, এ আমার দেহের সঙ্গে এক হয়ে গেছে। শেষকালে আজ এই শিলঙ পাহাড়ে কি একে বাজিতে খোয়াতে হবে?"

সিসি বললে, "বাজি রাখতে গেলে কেন, ভাই?"

"মনে-মনে নিজের উপর অহংকার ছিল, আর মানুষের উপর ছিল বিশ্বাস।

অহংকার ভাঙল,—এবারকার মতো আমার রেস ফুরোল, আমারই হার। মনে হচ্ছে অমিটকে আর রাজি করতে পারব না। তা এমন অদ্ভুত করেই যদি হারাবে সেদিন এত আদরে আংটি দিয়েছিলে কেন? সে-দেওয়ার মধ্যে কি কোনো বাঁধন ছিল না? এই দেওয়ার মধ্যে কি কথা ছিল না যে, আমার অপমান কোনোদিন তুমি ঘটতে দেবে না?"

বলতে বলতে কেটির গলা ভার হয়ে এল, অনেক কষ্টে চোখের জল সামলে নিলে।

আজ সাত বৎসর হয়ে গেল, কেটির বয়স তখন আঠারো। সেদিন এই আংটি অমিত নিজের আঙুল থেকে খুলে ওকে পরিয়ে দিয়েছিল। তখন ওরা দুজনেই ছিল ইংলণ্ডে। অক্সফোর্ডে একজন পাঞ্জাবি যুবক ছিল কেটির প্রণয়মুগ্ধ। সেদিন আপসে অমিত সেই পাঞ্জাবির সঙ্গে নদীতে বাচ খেলেছিল। অমিতরই হল জিত। জুন মাসের জ্যোৎস্নায় সমস্ত আকাশ যেন কথা বলে উঠেছিল, মাঠে মাঠে ফুলের প্রচুর বৈচিত্র্যে ধরণী তার ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছে। সেইক্ষণে অমিত কেটির হাতে আংটি পরিয়ে দিলে, তার মধ্যে অনেক কথাই উহ্য ছিল কিন্তু কোনো কথাই গোপন ছিল না। সেদিন কেটির মুখে প্রসাধনের প্রলেপ লাগে নি, তার হাসিটি সহজ ছিল, ভাবের আবেগে তার মুখ রক্তিম হতে বাধা পেত না। আংটি হাতে পরা হলে অমিত তার কানে কানে বলেছিল—

Tender is the night
And haply the queen moon is on her throne.

কেটি তখন বেশি কথা বলতে শেখে নি। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে কেবল যেন মনে-মনে বলেছিল, "মন আমী," ফরাসি ভাষায় যার মানে হচ্ছে, বঁধু।

আজ অমিতর মুখেও জবাব বেধে গেল। ভেবে পেলে না, কী বলবে।

কেটি বললে, "বাজিতে যদিই হারলুম তবে আমার এই চিরদিনের হারের চিহ্ন তোমার কাছেই থাক, অমিট। আমার হাতে রেখে একে আমি মিথ্যে কথা বলতে দেব না।"

বলে আংটি খুলে টেবিলটার উপর রেখেই দ্রুতবেগে চলে গেল। এনামেল-করা মুখের উপর দিয়ে দরদর করে চোখের জল গড়িয়ে পড়তে লাগল।

১৬

মুক্তি

একটি ছোটো চিঠি এল লাবণ্যর হাতে, শোভনলালের লেখা :

> শিলঙে কাল রাত্রে এসেছি। যদি দেখা করতে অনুমতি দাও তবে দেখতে যাব। না যদি দাও কালই ফিরব। তোমার কাছে শাস্তি পেয়েছি, কিন্তু কবে কী অপরাধ করেছি আজ পর্যন্ত স্পষ্ট করে বুঝতে পারি নি। আজ এসেছি তোমার কাছে সেই কথাটি শোনবার জন্যে, নইলে মনে শান্তি পাই নে। ভয় ক'রো না। আমার আর কোনো প্রার্থনা নেই।

লাবণ্যর চোখ জলে ভরে এল। মুছে ফেললে। চুপ করে বসে ফিরে তাকিয়ে রইল নিজের অতীতের দিকে। যে-অঙ্কুরটা বড়ো হয়ে উঠতে পারত অথচ যেটাকে চেপে দিয়েছে, বাড়তে দেয় নি, তার সেই কচিবেলাকার করুণ ভীরুতা ওর মনে এল। এতদিনে সে ওর সমস্ত জীবনকে অধিকার করে তাকে সফল করতে পারত। কিন্তু সেদিন ওর ছিল জ্ঞানের গর্ব, বিদ্যার একনিষ্ঠ সাধনা, উদ্ধত স্বাতন্ত্র্যবোধ। সেদিন আপন বাপের মুগ্ধতা দেখে ভালোবাসাকে দুর্বলতা বলে মনে-মনে ধিক্‌কার দিয়েছে। ভালোবাসা আজ তার শোধ নিলে, অভিমান হল ধূলিসাৎ। সেদিন যা সহজে হতে পারত নিঃশ্বাসের মতো, সরল হাসির মতো, আজ তা কঠিন হয়ে উঠল ;—সেদিনকার জীবনের সেই অতিথিকে দু-হাত বাড়িয়ে গ্রহণ করতে আজ বাধা পড়ে, তাকে ত্যাগ করতেও বুক ফেটে যায়। মনে পড়ল অপমানিত শোভনলালের সেই কুণ্ঠিত ব্যথিত মূর্তি। তার পরে কতদিন গেছে, যুবকের সেই প্রত্যাখ্যাত ভালোবাসা এতদিন কোন্ অমৃতে বেঁচে রইল ? আপনারই আন্তরিক মাহাত্ম্যে।

লাবণ্য চিঠিতে লিখলে,

> তুমি আমার সকলের বড়ো বন্ধু। এ বন্ধুত্বের পুরো দাম দিতে পারি এমন ধন আজ আমার হাতে নেই। তুমি কোনোদিন দাম চাও নি ; আজও তোমার যা দেবার জিনিস তাই দিতে এসেছ কিছুই দাবি না করে। চাই নে বলে ফিরিয়ে দিতে পারি এমন শক্তি নেই আমার, এমন অহংকারও নেই।

চিঠিটা লিখে পাঠিয়ে দিয়েছে এমন সময় অমিত এসে বললে, "বন্যা, চলো আজ দুজনে একবার বেড়িয়ে আসি গে।"

অমিত ভয়ে-ভয়েই বলেছিল, ভেবেছিল লাবণ্য আজ হয়তো যেতে রাজি হবে না।

লাবণ্য সহজেই বললে, "চলো।"

দুজনে বেরোল। অমিত কিছু দ্বিধার সঙ্গেই লাবণ্যর হাতটিকে হাতের মধ্যে নেবার চেষ্টা করলে। লাবণ্য একটুও বাধা না দিয়ে হাত ধরতে দিলে। অমিত হাতটি একটু জোরে চেপে ধরলে তাতেই মনের কথা যেটুকু ব্যক্ত হয় তার বেশি কিছু মুখে এল না। চলতে চলতে সেদিনকার সেই জায়গাতে এল যেখানে বনের মধ্যে হঠাৎ একটুখানি ফাঁক। একটি তরুশূন্য পাহাড়ের শিখরের উপর সূর্য আপনার শেষ স্পর্শ ঠেকিয়ে নেমে গেল। অতিসুকুমার সবুজের আভা আস্তে আস্তে সুকোমল নীলে গেল মিলিয়ে। দুজনে থেমে সেইদিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে রইল।

লাবণ্য আস্তে আস্তে বললে, "একদিন একজনকে যে-আংটি পরিয়েছিলে আমাকে দিয়ে আজ সে-আংটি খোলালে কেন?"

অমিত ব্যথিত হয়ে বললে, "তোমাকে সব কথা বোঝাব কেমন করে, বন্যা। সেদিন যাকে আংটি পরিয়েছিলুম, আর যে আজ সেটা খুলে দিলে তারা দুজনে কি একই মানুষ?"

লাবণ্য বললে, "তাদের মধ্যে একজন সৃষ্টিকর্তার আদরে তৈরি, আর একজন তোমার অনাদরে গড়া।"

অমিত বললে, "কথাটা সম্পূর্ণ ঠিক নয়। যে-আঘাতে আজকের কেটি তৈরি তার দায়িত্ব কেবল আমার একলার নয়।"

"কিন্তু, মিতা, নিজেকে যে একদিন সম্পূর্ণ তোমার হাতে উৎসর্গ করেছিল, তাকে তুমি আপনার করে রাখলে না কেন? যে-কারণেই হ'ক আগে তোমার মুঠো আলগা হয়েছে তার পরে দশের মুঠোয় চাপ পড়েছে ওর উপরে, ওর মূর্তি গেছে বদলে। তোমার মন একদিন হারিয়েছে বলেই দশের মনের মতো করে নিজেকে সাজাতে বসল। আজ তো দেখি ও বিলিতি দোকানের পুতুলের মতো; সেটা সম্ভব হত না, যদি ওর হৃদয় বেঁচে থাকত। থাক গে ও-সব কথা। তোমার কাছে আমার একটা প্রার্থনা আছে। রাখতে হবে।"

"বলো, নিশ্চয় রাখব।"

"অন্তত হপ্তাখানেকের জন্যে তোমার দলকে নিয়ে তুমি চেরাপুঞ্জিতে বেড়িয়ে এস। ওকে আনন্দ দিতে নাও যদি পার ওকে আমোদ দিতে পারবে।"

অমিত একটুখানি চুপ করে থেকে বললে, "আচ্ছা।"

তার পরে লাবণ্য অমিতর বুকে মাথা রেখে বললে, "একটা কথা তোমাকে বলি, মিতা, আর কোনোদিন বলব না। তোমার সঙ্গে আমার যে-অন্তরের সম্বন্ধ তা নিয়ে

তোমার লেশমাত্র দায় নেই। আমি রাগ করে বলছি নে, আমার সমস্ত ভালোবাসা দিয়েই বলছি, আমাকে তুমি আংটি দিয়ো না, কোনো চিহ্ন রাখবার কিছু দরকার নেই। আমার প্রেম থাক নিরঞ্জন, বাইরের রেখা বাইরের ছায়া তাতে পড়বে না।"

এই বলে নিজের আঙুলের থেকে আংটি খুলে অমিতর আঙুলে আস্তে আস্তে পরিয়ে দিলে। অমিত তাতে কোনো বাধা দিলে না।

সায়াহ্নের এই পৃথিবী যেমন অস্তরশ্মি-উদ্‌ভাসিত আকাশের দিকে নিঃশব্দে আপন মুখ তুলে ধরেছে, তেমনি নীরবে, তেমনি শান্ত দীপ্তিতে লাবণ্য আপন মুখ তুলে ধরলে অমিতর নত মুখের দিকে।

সাত দিন যেতেই অমিত ফিরে যোগমায়ার সেই বাসায় গেল। ঘর বন্ধ, সবাই চলে গেছে। কোথায় গেছে তার কোনো ঠিকানা রেখে যায় নি।

সেই য়ুক্যালিপটাস গাছের তলায় অমিত এসে দাঁড়াল, খানিকক্ষণ ধরে শূন্যমনে সেইখানে ঘুরে বেড়ালে। পরিচিত মালী এসে সেলাম করে জিজ্ঞাসা করলে, "ঘর খুলে দেব কি ? ভিতরে বসবেন ?" অমিত একটু দ্বিধা করে বললে, "হাঁ।"

ভিতরে গিয়ে লাবণ্যর বসবার ঘরে গেল। চৌকি টেবিল শেল্‌ফ আছে, সেই বইগুলি নেই। মেজের উপর দুই-একটা ছেঁড়া শূন্য লেফাফা, তার উপরে অজানা হাতের অক্ষরে লাবণ্যর নাম ও ঠিকানা লেখা ; দু-চারটে ব্যবহার-করা পরিত্যক্ত নিব, এবং ক্ষয়প্রাপ্ত একটি অতি ছোটো পেনসিল টেবিলের উপরে। পেনসিলটি পকেটে নিলে। এর পাশেই শোবার ঘর। লোহার খাটে কেবল একটা গদি, আর আয়নার টেবিলে একটা শূন্য তেলের শিশি। দুই হাতে মাথা রেখে অমিত সেই গদির উপর শুয়ে পড়ল, লোহার খাটটা শব্দ করে উঠল। সেই ঘরটার মধ্যে বোবা একটা শূন্যতা। তাকে প্রশ্ন করলে কোনো কথাই বলতে পারে না। সে একটা মূর্ছা, যে-মূর্ছা কোনোদিনই আর ভাঙবে না।

তার পরে শরীরমনের উপর একটা নিরুদ্যমের বোঝা বহন করে অমিত গেল নিজের কুটিরে। যা যেমন রেখে গিয়েছিল তেমনিই সব আছে। এমন কি, যোগমায়া তাঁর কেদারাটিও ফিরিয়ে নিয়ে যান নি। বুঝলে, তিনি স্নেহ করেই এই চৌকিটি তাকে দিয়ে গেছেন, মনে হল যেন শুনতে পেলে, শান্ত মধুর স্বরে তাঁর সেই আহ্বান, বাছা। সেই চৌকির সামনে মাথা লুটিয়ে অমিত প্রণাম করলে।

সমস্ত শিলঙ পাহাড়ের শ্রী আজ চলে গেছে। অমিত কোথাও আর সান্ত্বনা পেল না।

১৭

শেষের কবিতা

কলকাতায় কলেজে পড়ে যতিশংকর। থাকে কলুটোলা প্রেসিডেন্সি কলেজের মেসে। অমিত তাকে প্রায় বাড়িতে নিয়ে আসে, খাওয়ায়, তার সঙ্গে নানা বই পড়ে, নানা অদ্ভুত কথায় তার মনটাকে চমকিয়ে দেয়, মোটরে করে তাকে বেড়িয়ে নিয়ে আসে।

তার পর কিছুকাল যতিশংকর অমিতর কোনো নিশ্চিত খবর পায় না। কখনো শোনে সে নৈনিতালে, কখনো উটকামণ্ডে। একদিন শুনলে অমিতর এক বন্ধু ঠাট্টা করে বলছে, সে আজকাল কেটি মিত্তিরের বাইরেকার রংটা ঘোচাতে উঠে পড়ে লেগেছে। কাজ পেয়েছে মনের মতো, বর্ণান্তর করা। এতদিন অমিত মূর্তি গড়বার শখ মেটাত কথা দিয়ে, আজ পেয়েছে সজীব মানুষ। সে-মানুষটিও একে একে আপন উপরকার রঙিন পাপড়িগুলো খসাতে রাজি, চরমে ফল ধরবে আশা ক'রে। অমিতর বোন লিসি নাকি বলছে যে, কেটিকে একেবারে চেনাই যায় না, অর্থাৎ তাকে নাকি বড্‌ডো বেশি স্বাভাবিক দেখাচ্ছে। বন্ধুদের সে বলে দিয়েছে তাকে কেতকী বলে ডাকতে; এটা তার পক্ষে নির্লজ্জতা, যে-মেয়ে একদা ফিনফিনে শান্তিপুরে শাড়ি পরত সেই লজ্জাবতীর পক্ষে জামাশেমিজ পরারই মতো। অমিত তাকে নাকি নিভৃতে ডাকে "কেয়া" বলে। এ-কথাও লোকে কানাকানি করছে যে, নৈনিতালের সরোবরে নৌকো ভাসিয়ে কেটি তার হাল ধরেছে আর অমিত তাকে পড়ে শোনাচ্ছে রবি ঠাকুরের "নিরুদ্দেশ যাত্রা।" কিন্তু লোকে কী না বলে। যতিশংকর বুঝে নিলে অমিতর মনটা পাল তুলে চলে গেছে ছুটিতত্ত্বের মাঝদরিয়ায়।

অবশেষে অমিত ফিরে এল। শহরে রাষ্ট্র কেতকীর সঙ্গে তার বিয়ে। অথচ অমিতর নিজ মুখে একদিনও যতী এ প্রসঙ্গ শোনে নি। অমিতর ব্যবহারেরও অনেকখানি বদল ঘটেছে। পূর্বের মতোই যতীকে অমিত ইংরেজি বই কিনে উপহার দেয়, কিন্তু তাকে নিয়ে সন্ধ্যেবেলায় সে-সব বইয়ের আলোচনা করে না, যতী বুঝতে পারে আলোচনার ধারাটা এখন বইছে এক নতুন খাদে। আজকাল মোটরে বেড়াতে সে যতীকে ডাক পাড়ে না। যতীর বয়সে এ-কথা বোঝা কঠিন নয় যে, অমিতর "নিরুদ্দেশ যাত্রা"র পার্টিতে তৃতীয় ব্যক্তির জায়গা হওয়া অসম্ভব।

যতী আর থাকতে পারলে না। অমিতকে নিজেই গায়ে পড়ে জিজ্ঞাসা করলে, "অমিতদা, শুনলুম, মিস কেতকী মিত্রের সঙ্গে তোমার বিয়ে?"

অমিত একটুখানি চুপ করে থেকে বললে, "লাবণ্য কি এ খবর জেনেছে ?"

"না, আমি তাকে লিখি নি। তোমার মুখে পাকা খবর পাই নি বলে চুপ করে আছি।"

"খবরটা সত্যি, কিন্তু লাবণ্য হয়তো বা ভুল বুঝবে।"

যতী হেসে বললে, "এর মধ্যে ভুল বোঝবার জায়গা কোথায় ? বিয়ে কর যদি তো বিয়েই করবে, সোজা কথা।"

"দেখো, যতী, মানুষের কোনো কথাটাই সোজা নয়। আমরা ডিকশনারিতে যে-কথার এক মানে বেঁধে দিই মানবজীবনের মধ্যে মানেটা সাতখানা হয়ে যায় সমুদ্রের কাছে এসে গঙ্গার মতো।"

যতী বললে, "অর্থাৎ তুমি বলছ বিবাহ মানে বিবাহ নয়।"

"আমি বলছি, বিবাহের হাজারখানা মানে—মানুষের সঙ্গে মিশে তার মানে হয়, মানুষকে বাদ দিয়ে তার মানে বের করতে গেলেই ধাঁধা লাগে।"

"তোমার বিশেষ মানেটাই বলো না।"

"সংজ্ঞা দিয়ে বলা যায় না, জীবন দিয়ে বলতে হয়। যদি বলি ওর মূল মানেটা ভালোবাসা, তাহলেও আর-একটা কথায় গিয়ে পড়ব, ভালোবাসা কথাটা বিবাহ কথার চেয়ে আরও বেশি জ্যান্ত।"

"তাহলে অমিতদা, কথা বন্ধ করতে হয় যে। কথা কাঁধে নিয়ে মানের পিছন পিছন ছুটব আর মানেটা বাঁয়ে তাড়া করলে ডাইনে, আর ডাইনে তাড়া করলে বাঁয়ে মারবে দৌড় এমন হলে তো কাজ চলে না।"

"ভায়া, মন্দ বল নি। আমার সঙ্গে থেকে তোমার মুখ ফুটেছে। সংসারে কোনোমতে কাজ চালাতেই হবে, তাই কথার নেহাত দরকার যে-সব সত্যকে কথার মধ্যে কুলোয় না ব্যবহারের হাটে তাদেরই ছাঁটি, কথাটাকেই জাহির করি; উপায় কী ? তাতে বোঝাপড়াটা ঠিক না হ'ক চোখ বুজে কাজ চালিয়ে নেওয়া যায়।"

"তবে কি আজকের কথাটাকে একেবারেই খতম করতে হবে ?"

"এই আলোচনাটা যদি নিতান্তই জ্ঞানের গরজে হয়, প্রাণের গরজে না হয় তাহলে খতম করতে দোষ নেই।"

"ধরে নাও না প্রাণের গরজেই।"

"শাবাশ, তবে শোনো।"

এইখানে একটু পাদটীকা লাগালে দোষ নেই। অমিতর ছোটো বোন লিসির স্বহস্তে ঢালা চা যতী আজকাল মাঝে মাঝে প্রায়ই পান করে আসছে। অনুমান করা যেতে

পারে যে, সেই কারণেই ওর মনে কিছুমাত্র ক্ষোভ নেই যে, অমিত ওর সঙ্গে অপরাহ্ণে সাহিত্যালোচনা এবং সায়াহ্নে মোটরে করে বেড়ানো বন্ধ করেছে। অমিতকে ও সর্বান্তঃকরণে ক্ষমা করেছে।

অমিত বললে, "অক্সিজেন একভাবে বয় হাওয়ায় অদৃশ্য থেকে, সে না হলে প্রাণ বাঁচে না। আবার অক্সিজেন আর-একভাবে কয়লার সঙ্গে যোগে জ্বলতে থাকে, সেই আগুন জীবনের নানা কাজে দরকার,—দুটোর কোনোটাকেই বাদ দেওয়া চলে না। এখন বুঝতে পেরেছ ?"

"সম্পূর্ণ না, তবে কিনা বোঝবার ইচ্ছে আছে।"

"যে-ভালোবাসা ব্যাপ্তভাবে আকাশে মুক্ত থাকে অন্তরের মধ্যে সে দেয় সঙ্গ ; যে-ভালোবাসা বিশেষভাবে প্রতিদিনের সব-কিছুতে যুক্ত হয়ে থাকে সংসারে সে দেয় আসঙ্গ। দুটোই আমি চাই।"

"তোমার কথা ঠিক বুঝছি, কি না, সেইটেই বুঝতে পারি নে। আর একটু স্পষ্ট করে বলো, অমিতদা।"

অমিত বললে, "একদিন আমার সমস্ত ডানা মেলে পেয়েছিলুম আমার ওড়ার আকাশ,—আজ আমি পেয়েছি আমার ছোট্টো বাসা, ডানা গুটিয়ে বসেছি। কিন্তু আমার আকাশও রইল।"

"কিন্তু বিবাহে তোমার ওই সঙ্গ-আসঙ্গ কি একত্রেই মিলতে পারে না ?"

"জীবনে অনেক সুযোগ ঘটতে পারে কিন্তু ঘটে না। যে-মানুষ অর্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যা একসঙ্গেই মিলিয়ে পায় তার ভাগ্য ভালো,—যে তা না পায় দৈবক্রমে তার যদি ডান দিক থেকে মেলে রাজত্ব আর বাঁ দিক থেকে মেলে রাজকন্যা, সে-ও বড়ো কম সৌভাগ্য নয়।"

"কিন্তু—"

"কিন্তু তুমি যাকে মনে কর রোম্যান্স সেইটেতে কমতি পড়ে ! একটুও না। গল্পের বই থেকেই রোম্যান্সের বাঁধা বরাদ্দ ছাঁচে ঢালাই করে জোগাতে হবে না কি ? কিছুতেই না। আমার রোম্যান্স আমিই সৃষ্টি করব। আমার স্বর্গেও রয়ে গেল রোম্যান্স, আমার মর্ত্যেও ঘটাব রোম্যান্স। যারা ওর একটাকে বাঁচাতে গিয়ে আর-একটাকে দেউলে করে দেয় তাদেরই তুমি বল রোমান্টিক ! তারা হয় মাছের মতো জলে সাঁতার দেয়, নয় বেড়ালের মতো ডাঙায় বেড়ায়, নয় বাদুড়ের মতো আকাশে ফেরে। আমি রোম্যান্সের পরমহংস। ভালোবাসার সত্যকে আমি একই শক্তিতে জলে স্থলে উপলব্ধি করব, আবার আকাশেও। নদীর চরে রইল আমার পাকা দখল, আবার

মানসের দিকে যখন যাত্রা করব সেটা হবে আকাশের ফাঁকা রাস্তায়। জয় হ'ক আমার লাবণ্যর, জয় হ'ক আমার কেতকীর, আর সব দিক থেকেই ধন্য হ'ক অমিত রায়।"

যতী স্তব্ধ হয়ে বসে রইল, বোধ করি কথাটা তার ঠিক লাগল না। অমিত তার মুখ দেখে ঈষৎ হেসে বললে, "দেখো ভাই, সব কথা সকলের নয়। আমি যা বলছি, হয়তো সেটা আমারই কথা। সেটাকে তোমার কথা বলে বুঝতে গেলেই ভুল বুঝবে। আমাকে গাল দিয়ে বসবে। একের কথার উপর আরের মানে চাপিয়েই পৃথিবীতে মারামারি খুনোখুনি হয়। এবার আমার নিজের কথাটা স্পষ্ট করেই না হয় তোমাকে বলি। রূপক দিয়েই বলতে হবে নইলে এ-সব কথার রূপ চলে যায়—কথাগুলো লজ্জিত হয়ে ওঠে। কেতকীর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ ভালোবাসারই, কিন্তু সে যেন ঘড়ায় তোলা জল, প্রতিদিন তুলবে, প্রতিদিন ব্যবহার করবে। আর লাবণ্যর সঙ্গে আমার যে-ভালোবাসা, সে রইল দিঘি, সে ঘরে আনবার নয়, আমার মন তাতে সাঁতার দেবে।"

যতী একটু কুণ্ঠিত হয়ে বললে, "কিন্তু অমিতদা, দুটোর মধ্যে একটাকেই কি বেছে নিতে হয় না?"

"যার হয় তারই হয়, আমার হয় না।"

"কিন্তু শ্রীমতী কেতকী যদি—"

"তিনি সব জানেন। সম্পূর্ণ বোঝেন কি না বলতে পারি নে। কিন্তু সমস্ত জীবন দিয়ে এইটেই তাঁকে বোঝাব যে, তাঁকে কোথাও ফাঁকি দিচ্ছি নে। এও তাঁকে বুঝতে হবে যে, লাবণ্যর কাছে তিনি ঋণী।"

"তা হ'ক, শ্রীমতী লাবণ্যকে তো তোমার বিয়ের খবর জানাতে হবে।"

"নিশ্চয় জানাব। কিন্তু তার আগে একটি চিঠি দিতে চাই, সেটি তুমি পৌঁছিয়ে দেবে?"

"দেব।"

অমিতর এই চিঠি :

> সেদিন সন্ধ্যেবেলায় রাস্তার শেষে এসে যখন দাঁড়ালুম, কবিতা দিয়ে যাত্রা শেষ করেছি। আজও এসে থামলুম একটা রাস্তার শেষে। এই শেষমুহূর্তটির উপর একটি কবিতা রেখে যেতে চাই। আর কোনো কথার ভার সইবে না। হতভাগা নিবারণ চক্রবর্তীটা যেদিন ধরা পড়েছে সেইদিন মরেছে—অতি শৌখিন জলচর মাছের মতো। তাই উপায় না দেখে তোমারই কবির উপর ভার দিলুম আমার শেষ-কথাটা তোমাকে জানাবার জন্যে :

তব অন্তর্ধানপটে হেরি তব রূপ চিরন্তন,
অন্তরে অলক্ষ্যালোকে তোমার অন্তিম আগমন।
লভিয়াছি চিরস্পর্শমণি ;
আমার শূন্যতা তুমি পূর্ণ করি গিয়েছ আপনি।

জীবন আঁধার হল, সেইক্ষণে পাইনু সন্ধান
সন্ধ্যার দেউল দীপ চিত্তের মন্দিরে তব দান।
বিচ্ছেদের হোমবহ্নি হতে
পূজামূর্তি ধরি প্রেম দেখা দিল দুঃখের আলোতে।

মিতা

তার পরেও আরও কিছুকাল গেল। সেদিন কেতকী গেছে তার বোনের মেয়ের অন্নপ্রাশনে। অমিত গেল না। আরামকেদারায় বসে সামনের চৌকিতে পা-দুটো তুলে দিয়ে বিলিয়ম জেমসের পত্রাবলী পড়ছে। এমন সময় যতিশংকর লাবণ্যর লেখা এক চিঠি তার হাতে দিলে। চিঠির এক পাতে শোভনলালের সঙ্গে লাবণ্যর বিবাহের খবর। বিবাহ হবে ছ-মাস পরে, জ্যৈষ্ঠমাসে, রামগড় পর্বতের শিখরে। অপর পাতে :

কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও
তারি রথ নিত্যই উধাও
জাগাইছে অন্তরীক্ষে হৃদয়-স্পন্দন,
চক্রে পিষ্ট আঁধারের বক্ষ-ফাটা তারার ক্রন্দন।
ওগো বন্ধু,
সেই ধাবমান কাল
জড়ায়ে ধরিল মোরে ফেলি' তার জাল,—
তুলে নিল দ্রুতরথে
দুঃসাহসী ভ্রমণের পথে
তোমা হতে বহু দূরে।
মনে হয় অজস্র মৃত্যুরে
পার হয়ে আসিলাম
আজি নবপ্রভাতের শিখরচূড়ায়,
রথের চঞ্চল বেগ হাওয়ায় উড়ায়
আমার পুরানো নাম।

ফিরিবার পথ নাহি ;
দূর হতে যদি দেখ চাহি
পারিবে না চিনিতে আমায়।
হে বন্ধু, বিদায়।

কোনোদিন কর্মহীন পূর্ণ অবকাশে,
বসন্ত-বাতাসে
অতীতের তীর হতে যে-রাত্রে বহিবে দীর্ঘশ্বাস,
ঝরা বকুলের কান্না ব্যথিবে আকাশ,
সেইক্ষণে খুঁজে দেখো, কিছু মোর পিছে রহিল সে
তোমার প্রাণের প্রান্তে ; বিস্মৃতপ্রদোষে
হয়তো দিবে সে জ্যোতি,
হয়তো ধরিবে কভু নামহারা স্বপ্নের মুরতি।
তবু সে তো স্বপ্ন নয়,
সব-চেয়ে সত্য মোর, সেই মৃত্যুঞ্জয়,
সে আমার প্রেম।
তারে আমি রাখিয়া এলেম
অপরিবর্তন অর্ঘ্য তোমার উদ্দেশে।
পরিবর্তনের স্রোতে আমি যাই ভেসে
কালের যাত্রায়।
হে বন্ধু, বিদায়।

তোমার হয় নি কোনো ক্ষতি।
মর্ত্যের মৃত্তিকা মোর, তাই দিয়ে অমৃত-মুরতি
যদি সৃষ্টি করে থাক, তাহারি আরতি
হ'ক তব সন্ধ্যাবেলা,
পূজার সে খেলা
ব্যাঘাত পাবে না মোর প্রত্যহের ম্লানস্পর্শ লেগে ;
তৃষার্ত আবেগ-বেগে
ভ্রষ্ট নাহি হবে তার কোনো ফুল নৈবেদ্যের থালে।

তোমার মানস-ভোজে সযত্নে সাজালে
যে ভাব-রসের পাত্র বাণীর তৃষায়,
তার সাথে দিব না মিশায়ে
যা মোর ধূলির ধন, যা মোর চক্ষের জলে ভিজে।
আজো তুমি নিজে
হয়তো বা করিবে রচন
মোর স্মৃতিটুকু দিয়ে স্বপ্নাবিষ্ট তোমার বচন।
ভার তার না রহিবে, না রহিবে দায়।
হে বন্ধু, বিদায়।

মোর লাগি করিয়ো না শোক,
আমার রয়েছে কর্ম, আমার রয়েছে বিশ্বলোক।
মোর পাত্র রিক্ত হয় নাই,
শূন্যেরে করিব পূর্ণ, এই ব্রত বহিব সদাই।
উৎকণ্ঠ আমার লাগি কেহ যদি প্রতীক্ষিয়া থাকে
সে-ই ধন্য করিবে আমাকে।
শুক্লপক্ষ হতে আনি'
রজনীগন্ধার বৃন্তখানি
যে পারে সাজাতে
অর্ঘ্যথালা কৃষ্ণপক্ষ রাতে,
যে আমারে দেখিবারে পায়
অসীম ক্ষমায়
ভালোমন্দ মিলায়ে সকলি,
এবার পূজায় তারি আপনারে দিতে চাই বলি।
তোমারে যা দিয়েছিনু, তার
পেয়েছ নিঃশেষ অধিকার।
হেথা মোর তিলে তিলে দান,
করুণ মুহূর্তগুলি গণ্ডূষ ভরিয়া করে পান
হৃদয়-অঞ্জলি হতে মম।

ওগো তুমি নিরুপম,
হে ঐশ্বর্যবান,
তোমারে যা দিয়েছিনু সে তোমারি দান ;
গ্রহণ করেছ যত ঋণী তত করেছ আমায়
হে বন্ধু, বিদায়।

বন্যা

---

২৫ জুন, ১৯২৮
ব্যালাব্রুয়ি, বাঙ্গালোর

প্রবন্ধ

রাজা প্রজা

রাজা প্রজা

ইংরেজ ও ভারতবাসী

> There is nothing like love and admiration for bringing people to a likeness with what they love and admire; but the Englishman seems never to dream of employing these influences upon a race he wants to fuse with himself. He employs simply material interests for his work of fusion; and, beyond these nothing except scorn and rebuke. Accordingly there is no vital union between him and the races he has annexed; and while France can freely boast of her magnificent unity, a unity of spirit no less than of name between all the people who compose her, in our country the Englishman proper is in union of spirit with no one except other Englishmen proper like himself:
>
> **Matthew Arnold**

আমাদের প্রাচীন পুরাণে ইতিহাসে পাঠ করা যায় যে, চরিত্রে বা আচরণে একটা ছিদ্র না পাইলে অলক্ষ্মী প্রবেশ করিতে পথ পায় না। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে প্রত্যেক জাতিরই প্রায় একটা কোনো ছিদ্র থাকে। আরও দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, যেখানে মানুষের দুর্বলতা সেইখানে তাহার স্নেহও বেশি। ইংরেজও আপনার চরিত্রের মধ্যে ঔদ্ধত্যকে যেন কিছু বিশেষ গৌরবের সহিত পালন করে। তাহার দ্বৈপায়ন সংকীর্ণতার মধ্যে সে যে অটল এবং ভ্রমণ অথবা রাজত্ব উপলক্ষে সে যাহাদের সংস্রবে আসে তাহাদের সহিত মেলামেশা করিবার যে কিছুমাত্র প্রয়াস পায় না, সাধারণ "জন"-পুংগব এই গুণটিকে মনে মনে কিছু যেন শ্লাঘার বিষয় বলিয়া জ্ঞান করে। তাহার ভাবখানা এই যে, ঢেঁকি যেমন স্বর্গেও ঢেঁকি, তেমনি ইংরেজ সর্বত্রই খাড়া ইংরেজ, কিছুতেই তাহার আর অন্যথা হইবার জো নাই।

এই যে মনোহারিত্বের অভাব, এই যে অনুচর-আশ্রিতবর্গের অন্তরঙ্গ হইয়া তাহাদের মন বুঝিবার প্রতি সম্পূর্ণ উপেক্ষা, এই যে সমস্ত পৃথিবীকে নিজের সংস্কার অনুসারেই বিচার করা, ইংরেজের চরিত্রের এই ছিদ্রটি অলক্ষ্মীর একটা প্রবেশপথ।

কোথায় কোন্ শত্রু আসিবার সম্ভাবনা আছে ইংরেজ সে ছিদ্র যত্নপূর্বক রোধ করে, যেখানে যত পথঘাট আছে সর্বত্রই পাহারা বসাইয়া রাখে এবং আশঙ্কার অঙ্কুরটি পর্যন্ত পদতলে দলন করিয়া ফেলে, কেবল নিজের স্বভাবের মধ্যে যে একটি নৈতিক বিঘ্ন আছে সেইটাকে প্রতিদিন প্রশ্রয় দিয়া দুর্দম করিয়া তুলিতেছে—কখনো কখনো অল্পস্বল্প আক্ষেপ করিয়াও থাকে—কিন্তু মমতাবশত কিছুতেই তাহার গায়ে হাত তুলিতে পারে না।

ঠিক যেন এক জন লোক বুট পায়ে দিয়া আপনার শস্যক্ষেত্রময় হুই হুই করিয়া বেড়াইতেছে পাছে পাখিতে শস্যের একটি কণামাত্র খাইয়া যায়। পাখি পলাইতেছে বটে কিন্তু কঠিন বুটের তলায় অনেকটা ছারখার হইয়া যাইতেছে তাহার কোনো খেয়াল নাই।

আমাদের কোনো শত্রুর উপদ্রব নাই, বিপদের আশঙ্কা নাই, কেবল বুকের উপরে অকস্মাৎ সেই বুটটা আসিয়া পড়ে। তাহাতে আমরা বেদনা পাই এবং সেই বুটওআলার যে কোনো লোকসান হয় না তাহা নহে। কিন্তু ইংরেজ সর্বত্রই ইংরেজ, কোথাও সে আপনার বুটজোড়াটা খুলিয়া আসিতে রাজি নহে।

আয়র্লণ্ডের সহিত ইংরেজের যে-সমস্ত খিটিমিটি বাধিয়াছে সে-সকল কথা আমাদের পাড়িবার আবশ্যক নাই; অধীন ভারতবর্ষেও দেখা যাইতেছে ইংরেজের সহিত ইংরেজিশিক্ষিতদের ক্রমশই একটি অ-বনিবনাও হইয়া আসিতেছে। তিলমাত্র অবসর পাইলে কেহ কাহাকেও ছাড়িতে চায় না। ইঁটটির পরিবর্তে পাটকেলটি চলিতেছেই।

আমরা যে, সকল জায়গায় সুবিচারপূর্বক পাটকেল নিক্ষেপ করি তাহা নহে, অধিকাংশ স্থলে অন্ধকারেই ঢেলা মারি। আমাদের কাগজে পত্রে অনেক সময় আমরা অন্যায় খিটিমিটি করিয়া থাকি এবং অমূলক কোন্দল উত্থাপন করি, সে-কথা অস্বীকার করা যায় না।

কিন্তু সেগুলিকে স্বতন্ত্রভাবে বিচার করিবার আবশ্যক নাই। তাহার কোনোটা সত্য কোনোটা মিথ্যা, কোনোটা ন্যায় কোনোটা অন্যায় হইতে পারে; আসল বিচার্য বিষয় এই যে, আজকাল এইরূপ পাটকেল ছুঁড়িবার প্রবৃত্তিটা এত প্রবল হইয়া উঠিতেছে কেন? শাসনকর্তা খবরের কাগজের কোনো একটা প্রবন্ধবিশেষকে মিথ্যা সাব্যস্ত করিয়া সম্পাদককে এবং হতভাগ্য মুদ্রাকরকে পর্যন্ত জেলে দিতে পারে কিন্তু প্রতিদিনই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পথে এই যে-সমস্ত ছোটো ছোটো কাঁটাগাছগুলি গজাইয়া উঠিতেছে তাহার বিশেষ কী প্রতিকার করা হইল?

এই কাঁটাগাছগুলির মূল যখন মনের মধ্যে তখন ইহাকে উৎপাটন করিতে হইলে সেই মনের মধ্যে প্রবেশ করিতে হইবে। কিন্তু পাকা রাস্তা ও কাঁচা রাস্তা যোগে ইংরেজরাজের আর সর্বত্রই গতিবিধি আছে কেবল দুর্ভাগ্যক্রমে সেই মনের মধ্যেই নাই। হয়তো সে-জায়গাটাতে প্রবেশ করিতে হইলে ঈষৎ একটুখানি মাথা হেলাইয়া ঢুকিতে হয়, কিন্তু ইংরেজের মেরুদণ্ড কোনোখানেই বাঁকিতে চায় না।

অগত্যা ইংরেজ আপনাকে এইরূপ বুঝাইতে চেষ্টা করে যে, এই যে খবরের কাগজে কটুকথা বলিতেছে, সভা হইতেছে, রাজ্যতন্ত্রের অপ্রিয় সমালোচনা চলিতেছে ইহার সহিত "পীপলের" কোনো যোগ নাই;—এ কেবল কতকগুলি শিক্ষিত পুতুলনাচওআলার বুজরুগিমাত্র। বলে যে, ভিতরে সমস্তই আছে ভালো; বাহিরে যে একটু-আধটু বিকৃতির চিহ্ন দেখা যাইতেছে সে চতুর লোকে রং করিয়া দিয়াছে। তবে তো আর ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিবার আবশ্যক নাই; কেবল যে-চতুর লোকটাকে সন্দেহ করা যায় তাহাকে শাসন করিয়া দিলেই চুকিয়া যায়।

ওইটেই ইংরেজের দোষ। সে কিছুতেই ঘরে আসিতে চায় না। কিন্তু দূর হইতে, বাহির হইতে, কোনোক্রমে স্পর্শসংস্রব বাঁচাইয়া মানুষের সহিত কারবার করা যায় না;—যে-পরিমাণে দূরে থাকা যায় সেই পরিমাণেই নিষ্ফলতা প্রাপ্ত হইতে হয়। মানুষ তো জড়যন্ত্র নহে যে, তাহাকে বাহির হইতে চিনিয়া লওয়া যাইবে; এমন কি পতিত ভারতবর্ষেরও একটা হৃদয় আছে এবং সে-হৃদয়টা সে তাহার জামার আস্তিনে ঝুলাইয়া রাখে নাই।

জড়পদার্থকেও বিজ্ঞানের সাহায্যে নিগূঢ়রূপে চিনিয়া লইতে হয় তবেই জড়প্রকৃতির উপর সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব বিস্তার করিতে পারা যায়। মনুষ্যলোকে যাহারা স্থায়ী প্রভাব রক্ষা করিতে চাহে তাহাদের অন্যান্য অনেক গুণের মধ্যে অন্তরঙ্গরূপে মানুষ চিনিবার বিশেষ গুণটি থাকা আবশ্যক। মানুষের অত্যন্ত কাছে যাইবার যে ক্ষমতা সে একটা দুর্লভ ক্ষমতা।

ইংরেজের বিস্তর ক্ষমতা আছে কিন্তু সেইটি নাই। সে বরঞ্চ উপকার করিতে অসম্মত নহে কিন্তু কিছুতেই কাছে আসিতে চাহে না। কোনোমতে উপকারটা সারিয়া ফেলিয়া অমনি তাড়াতাড়ি সরিতে পারিলে বাঁচে। তাহার পরে সে ক্লবে গিয়া পেগ খাইয়া বিলিয়ার্ড খেলিয়া অনুগৃহীতদের প্রতি অবজ্ঞাসূচক বিশেষণ প্রয়োগপূর্বক তাহাদের বিজাতীয় অস্তিত্ব শরীরমনের নিকট হইতে যথাসাধ্য দূরীকৃত করিয়া রাখে।

ইহারা দয়া করে না উপকার করে, স্নেহ করে না রক্ষা করে, শ্রদ্ধা করে না অথচ ন্যায়াচরণের চেষ্টা করে; ভূমিতে জল সেচন করে না, অথচ রাশি রাশি বীজ বপন করিতে কার্পণ্য নাই।

কিন্তু তাহার পর যখন যথেষ্ট কৃতজ্ঞতার শস্য উৎপন্ন হয় না তখন কি কেবলই মাটির দোষ দিবে ? এ নিয়ম কি বিশ্বব্যাপী নহে যে, হৃদয়ের সহিত কাজ না করিলে হৃদয়ে তাহার ফল ফলে না ?

আমাদের দেশের শিক্ষিতসম্প্রদায়ের অনেকেই ইংরেজকৃত উপকার যে উপকার নহে ইহাই প্রাণপণে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিতেছে। হৃদয়শূন্য উপকার গ্রহণ করিয়া তাহারা মনের মধ্যে কিছুতেই আত্মপ্রসাদ অনুভব করিতে পারিতেছে না। কোনোক্রমে তাহারা কৃতজ্ঞতার দায় হইতে আপনাকে যেন মুক্ত করিতে চাহে। সেইজন্য আজকাল আমাদের কাগজে পত্রে কথায় বার্তায় ইংরেজ সম্বন্ধে নানাপ্রকার কুতর্ক দেখা যায়।

এক কথায়, ইংরেজ নিজেকে আমাদের পক্ষে আবশ্যক করিয়া তুলিয়াছে কিন্তু প্রিয় করিয়া তোলা আবশ্যক বোধ করে নাই ; পথ্য দেয়, কিন্তু তাহার মধ্যে স্বাদ সঞ্চার করিয়া দেয় না, অবশেষে যখন বমনোদ্রেক হয় তখন চোখ রাঙাইয়া হুহুংকার দিয়া উঠে।

আজকালকার অধিকাংশ আন্দোলন গূঢ় মনঃক্ষোভ হইতে উৎপন্ন। এখন প্রত্যেক কথাটাই দুই পক্ষের হারজিতের কথা হইয়া দাঁড়ায়। হয়তো যেখানে পাচটা নরম কথা বলিলে উপকার হয় সেখানে আমরা তীব্রভাষায় অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছড়াইতে থাকি, এবং যেখানে একটা অনুরোধ পালন করিলে বিশেষ ক্ষতি নাই সেখানেও অপর পক্ষ বিমুখ হইয়া থাকে।

কিন্তু বৃহৎ অনুষ্ঠানমাত্রেই আপস ব্যতীত কাজ চলে না। পঞ্চবিংশতি কোটি প্রজাকে সুশৃঙ্খলায় শাসন করা সহজ ব্যাপার নহে। এতবড়ো বৃহৎ রাজশক্তির সহিত যখন কারবার করিতে হয় তখন সংযম, অভিজ্ঞতা এবং বিবেচনার আবশ্যক। এইটে জানা চাই গবর্মেণ্ট ইচ্ছা করিলেই একটা কিছু করিতে পারে না ; সে আপনার বৃহত্ত্বে অভিভূত, জটিলতায় আবদ্ধ। তাহাকে একটুখানি নড়িতে হইলেই অনেক দূর হইতে অনেকগুলা কল চালনা করিতে হয়।

আমাদের এখানে আবার অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান এবং ভারতবর্ষীয় এই দুই অত্যন্ত বিসদৃশ সম্প্রদায় লইয়া কারবার। উভয়ের স্বার্থ অনেক স্থলেই বিরোধী। রাজ্যতন্ত্রের যে চালক সে এই দুই বিপরীত শক্তির কোনোটাকেই উপেক্ষা করিতে পারে না—যে করিতে চায় সে নিষ্ফল হয়। আমরা যখন আমাদের মনের মতো কোনো একটা প্রস্তাব করি তখন মনে করি, গবর্মেণ্টের পক্ষে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানের বাধাটা যেন বাধাই নহে। অথচ প্রকৃতপক্ষে শক্তি তাহারই বেশি। প্রবল শক্তিকে অবহেলা করিলে কিরূপ সংকটে পড়িতে হয় ইলবার্ট বিলের বিপ্লবে তাহার পরিচয় পাওয়া গেছে। সৎপথে এবং ন্যায়পথেও রেলগাড়ি চালাইতে হইলে আগে যথোচিত উপায়ে মাটি সমতল

করিয়া লাইন পাতিতে হইবে। ধৈর্য ধরিয়া সেই সময়টুকু যদি অপেক্ষা করা যায় এবং সেই কাজটা যদি সম্পন্ন হইতে দেওয়া যায় তার পরে দ্রুতবেগে চলিবার খুব সুবিধা হয়।

ইংলণ্ডে রাজাপ্রজার মধ্যে বৈষম্য নাই; এবং সেখানে রাজ্যতন্ত্রের কল বহুকাল হইতে চলিয়া সহজ হইয়া আসিয়াছে। তবু সেখানে একটা হিতজনক পরিবর্তন সাধন করিতেও কত কৌশল কত অধ্যবসায় প্রয়োগ এবং কত সম্প্রদায়কে কত ভাবে চালনা করিতে হয়। অথচ সেখানে বিপরীত স্বার্থের এমন তুমুল সংঘর্ষ নাই; সেখানে একবার যুক্তি দ্বারা প্রস্তাববিশেষের উপকারিতা সকলের কাছে প্রমাণ করিবামাত্র সাধারণ অথবা অধিকাংশের স্বার্থ এক হইয়া তাহা গ্রহণ করে। আর আমাদের দেশে যখন দুই শক্তি লইয়া কথা এবং আমরাই যখন সর্বাংশে দুর্বল তখন কেবল ভাষার বেগে গবর্মেণ্টকে বিচলিত করিবার আশা করা যায় না। নানা দূরগামী উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক।

রাজকীয় ব্যাপারে সর্বত্রই ডিপ্লম্যাসি আছে এবং ভারতবর্ষে আমাদের পক্ষে তাহার সর্বাপেক্ষা আবশ্যক। আমি ইচ্ছা করিতেছি এবং আমার ইচ্ছা অন্যায় নহে বলিয়াই পৃথিবীতে কাজ সহজ হয় না। যখন চুরি করিতে যাইতেছি না শ্বশুরবাড়ি যাইতেছি তখন পথের মধ্যে যদি একটা পুষ্করিণী পড়ে তবে তাহার উপর দিয়াই হাঁটিয়া চলিয়া যাইব এমন পণ করিয়া বসিলে, চাই কি, শ্বশুরবাড়ি না পৌঁছিতেও পারি। সেস্থলে পুকুরটা ঘুরিয়া যাওয়াই ভালো। আমাদের রাজনৈতিক শ্বশুরবাড়ি, যেখানে ক্ষীরটা সরটা মাছের মুড়াটা আমাদের জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে সেখানে যাইতে হইলেও নানা বাধা নানা উপায়ে অতিক্রম করিয়া যাইতে হইবে। যেখানে লঙ্ঘন করিলে চলে সেখানে লঙ্ঘন করিতে হইবে, যেখানে সে সুবিধা নাই সেখানে রাগারাগি করিতে না বসিয়া ঘুরিয়া যাওয়া ভালো।

ডিপ্লম্যাসি অর্থে যে কপটাচরণ বুঝিতে হইবে এমন কথা নাই। তাহার প্রকৃত মর্ম এই, নিজের ব্যক্তিগত হৃদয়বৃত্তি দ্বারা অকস্মাৎ বিচলিত না হইয়া কাজের নিয়ম ও সময়ের সুযোগ বুঝিয়া কাজ করা।

কিন্তু আমরা সেদিক দিয়া যাই না। আমরা কাজ পাই বা না পাই কথা একটাও বাদ দিতে পারি না। তাহাতে কেবল যে আমাদের অনভিজ্ঞতা ও অবিবেচনা প্রকাশ পায় তাহা নহে; তাহাতে প্রকাশ পায় যে, কাজ আদায়ের ইচ্ছার অপেক্ষা দুয়ো দিবার, বাহবা লইবার, এবং মনের ঝাল ঝাড়িবার ইচ্ছা আমাদের বেশি। তাহার একটা সুযোগ পাইলে আমরা এত খুশি হই যে, তাহাতে আসল কাজের কত ক্ষতি হইল

তাহা আমরা ভুলিয়া যাই। এবং কটু ভর্ৎসনার পর সংগত প্রার্থনা পূরণ করিতেও গবর্মেন্টের মনে দ্বিধা উপস্থিত হয়, পাছে প্রজার স্পর্ধা বাড়িয়া উঠে।

ইহার প্রধান কারণ, মনের ভিতরে এমন একটা অসদ্‌ভাব জন্মিয়া গিয়াছে এবং প্রতিদিন তীব্রতর হইয়া উঠিতেছে যে, উভয় পক্ষেরই কর্তব্যপালন ক্রমশই কিছু কিছু করিয়া দুরূহ হইতেছে। রাজাপ্রজার এই অহরহ কলহ দেখিতেও কিছুমাত্র ভালো হইতেছে না। গবর্মেন্টও বাহ্যত যেমনই হউক, মনে মনে যে এ-সম্বন্ধে উদাসীন তাহা বিশ্বাস হয় না। কিন্তু উপায় কী? ব্রিটিশ চরিত্র, হাজার হউক, মনুষ্যচরিত্র তো বটে।

ভাবিয়া দেখিলে এ সমস্যার মীমাংসা সহজ নহে।

সব-প্রথম সংকট বর্ণ লইয়া। শরীরের বর্ণটা যেমন ধুইয়া-মুছিয়া কিছুতেই দূর করা যায় না তেমনি বর্ণসম্বন্ধীয় যে সংস্কার সেটা মন হইতে তাড়ানো বড়ো কঠিন। শ্বেতকায় আর্যগণ কালো রংটাকে বহু সহস্র বৎসর ধরিয়া ঘৃণাচক্ষে দেখিয়া আসিতেছেন। এই অবসরে বেদের ইংরেজি তর্জমা এবং এনসাইক্লোপীডিয়া হইতে এ-সম্বন্ধে অধ্যায়, সূত্র এবং পৃষ্ঠাঙ্ক সমেত উৎকট প্রমাণ আহরণ করিয়া পাঠকদের প্রতি দৌরাত্ম্য করিতে চাহি না—কথাটা সকলেই বুঝিবেন। শ্বেতকৃষ্ণে যেন দিনরাত্রির ভেদ। শ্বেতজাতি দিনের ন্যায় সদাজাগ্রত, কর্মশীল, অনুসন্ধানতৎপর, আর কৃষ্ণজাতি রাত্রির ন্যায় নিশ্চেষ্ট, কর্মহীন, স্বপ্নকুহকে আবিষ্ট। এই শ্যামা-প্রকৃতিতে হয়তো রাত্রির মতো একটা গভীরতা, মাধুর্য, স্নিগ্ধ করুণা এবং সুনিবিড় আত্মীয়তার ভাব আছে, দুর্ভাগ্যক্রমে ব্যস্ত চঞ্চল শ্বেতাঙ্গের তাহা আবিষ্কার করিবার অবসর নাই এবং তাহার কাছে ইহার যথেষ্ট মূল্যও নাই। তাহাদিগকে এ-কথা বলিয়াও কোনো ফল নাই যে, কালো গরুতেও সাদা দুধ দিয়া থাকে এবং ভিন্ন বর্ণের মধ্যে হৃদয়ের একটা গভীর ঐক্য আছে। কিন্তু কাজ নাই এ-সকল ওরিয়েন্টাল উপমা-তুলনায়—কথাটা এই যে, কালো রং দেখিবামাত্র শ্বেতজাতির মন কিছু বিমুখ না হইয়া থাকিতে পারে না।

তার পরে বসনভূষণ-অভ্যাস-আচারে প্রত্যেক বিষয়েই এমন সকল বৈসাদৃশ্য আছে যাহা হৃদয়কে কেবলই প্রতিহত করিতে থাকে।

শরীর অর্ধাবৃত রাখিয়াও যে মনের অনেক সদ্‌গুণ পোষণ করা যাইতে পারে, মনের গুণগুলা যে ছায়াপ্রিয় শৌখিনজাতীয় উদ্ভিজ্জের মতো নহে, তাহাকে যে জিন-বনাতের দ্বারা না মুড়িলেও অন্য উপায়ে রক্ষা করা যায় সে-সমস্ত তর্ক করা মিথ্যা। ইহা তর্কের কথা নহে সংস্কারের কথা।

এক, নিকট-সংস্রবে এই সংস্কারের বল কতকটা অভিভূত হইতে পারে। কিন্তু

ওই সংস্কারই আবার নিকটে আসিতে দেয় না। যখন স্টীমার ছিল না এবং আফ্রিকা বেষ্টন করিয়া পালের জাহাজ সুদীর্ঘকালে ভারতবর্ষ হইতে বিলাতে গিয়া পৌঁছিত তখন ইংরেজ দেশী লোকের সঙ্গে কিছু যেন বেশি ঘনিষ্ঠতা করিত। কিন্তু আজকাল সাহেব তিনটি মাসের ছুটি পাইলেই তৎক্ষণাৎ ইংলণ্ডে পলাইয়া গিয়া ভারতবর্ষের সমস্ত ধুলা ধৌত করিয়া আসেন এবং ভারতবর্ষেও তাঁহাদের আত্মীয়সমাজ ব্যাপক হইয়া পড়িতেছে, এই জন্য যে-দেশ তাঁহারা জয় করিয়াছেন সে-দেশে থাকিয়াও যথাসম্ভব না থাকা এবং যে-জাতিকে শাসন করিতেছেন সে-জাতিকে ভালো না বাসিয়াও কাজ করা সুসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। সহস্র ক্রোশ দূর হইতে সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া আসিয়া একটি সম্পূর্ণ বিদেশী রাজ্য নিতান্ত আপিসের কাজের ন্যায় দিনের বেলায় শাসন করিয়া সন্ধ্যাবেলায় পুনশ্চ সমুদ্রে খেয়া দিয়া বাড়ি গিয়া তপ্ত ভাত খাওয়া, ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্ত আর কোথায় আছে।

এক তো, আমরা সহজেই বিদেশী—এবং আমাদের রূপ রস গন্ধ শব্দ ও স্পর্শ ইংরেজের স্বভাবতই অরুচিকর, তাহার উপরে আরও একটা উপসর্গ আছে। অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানসমাজ এ-দেশে যতই প্রাচীন হইতেছে ততই তাহার কতকগুলি লোকব্যবহার ও জনশ্রুতি ক্রমশ বদ্ধমূল হইয়া যাইতেছে। যদিও বা কোনো ইংরেজ স্বাভাবিক উদারতা ও সহৃদয়তাগুণে বাহ্য বাধাসকল দূর করিয়া আমাদের অন্তরে প্রবেশ করিবার পথ পাইতেন এবং আমাদিগকে অন্তরে আহ্বান করিবার জন্য দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া দিতেন, তিনি এখানে আসিবামাত্র ইংরেজসমাজের জালের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া পড়েন। তখন তাঁহার নিজের স্বাভাবিক সংস্কার এবং স্বজাতিসমাজের পুঞ্জীভূত সংস্কার একত্র হইয়া একটা অলঙ্ঘ্য বাধার স্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। পুরাতন বিদেশী নূতন বিদেশীকে আমাদের কাছে আসিতে না দিয়া তাঁহাদের দুর্গম সমাজদুর্গের মধ্যে কঠিন পাষাণময় স্বাতন্ত্র্যের দ্বারা বেষ্টন করিয়া রাখেন।

স্ত্রীলোক সমাজের শক্তিস্বরূপ। রমণী চেষ্টা করিলে বিরোধী পক্ষের মিলন সাধন করিয়া দিতে পারেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহারাই সর্বাপেক্ষা অধিকমাত্রায় সংস্কারের বশ। আমরা সেই অ্যাংলো-ইণ্ডীয় রমণীগণের স্নায়ুবিকার ও শিরঃপীড়াজনক। সেজন্য তাঁহাদের কী দোষ দিব, সে আমাদের অদৃষ্টদোষ। বিধাতা আমাদিগকে সর্বাংশেই তাঁহাদের রুচিকর করিয়া গড়েন নাই।

তাহার পরে, আমাদের মধ্যে ইংরেজেরা যে-ভাবে আমাদের সম্বন্ধে বলাকহা করে, চিন্তামাত্র না করিয়া আমাদের প্রতি যে-সমস্ত বিশেষণ প্রয়োগ করে, এবং আমাদিগকে সম্পূর্ণরূপে না জানিয়াও আমাদের যে-সমস্ত কুৎসাবাদ করিয়া থাকে, প্রত্যেক সামান্য

কথাটিতে আমাদের প্রতি তাহাদের যে বদ্ধমূল অপ্রেম প্রকাশ হইয়া থাকে তাহা নবাগত ইংরেজ অল্পে অল্পে সমস্ত অন্তঃকরণ দিয়া শোষণ না করিয়া থাকিতে পারে না।

এ-কথা আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে যে, বিধিবিড়ম্বনায় আমরা ইংরেজের অপেক্ষা অনেক দুর্বল এবং ইংরেজকৃত অসম্মানের কোনো প্রতিকার করিতে পারি না। যে নিজের সম্মান উদ্ধার করিতে পারে না এ পৃথিবীতে সে সম্মান পায় না। যখন একজন তাজা বিলাতি ইংরেজ আসিয়া দেখে যে, আমরা অপমান নিশ্চেষ্টভাবে বহন করি তখন আমাদের 'পরে আর তাহার শ্রদ্ধা থাকিতে পারে না।

তখন তাহাদিগকে কে বুঝাইবে যে, অপমান সম্বন্ধে আমরা উদাসীন নহি কিন্তু আমরা দরিদ্র এবং আমরা কেহই স্বপ্রধান নহি, প্রত্যেক ব্যক্তিই এক-একটি বৃহৎ পরিবারের প্রতিনিধি। তাহার উপরে কেবল তাহার একলার নহে, তাহার পিতামাতা-ভ্রাতা-স্ত্রীপুত্রপরিবারের জীবনধারণ নির্ভর করিতেছে। তাহাকে অনেক আত্মসংযম আত্মত্যাগ করিয়া চলিতে হয়। ইহা তাহার চিরদিনের শিক্ষা ও অভ্যাস। সে যে ক্ষুদ্র আত্মরক্ষণেচ্ছার নিকট আত্মসম্মান বলি দেয় তাহা নহে, বৃহৎ পরিবারের নিকট, কর্তব্যজ্ঞানের নিকট দিয়া থাকে। কে না জানে দরিদ্র বাঙালি কর্মচারিগণ কতদিন সুগভীর নির্বেদ এবং সুতীব্র ধিক্কারের সহিত আপিস হইতে চলিয়া আসে, তাহাদের অপমানিত জীবন কী অসহ্য দুর্ভর বলিয়া বোধ হয়—সে তীব্রতা এত আত্যন্তিক যে, সে-অবস্থায় অক্ষমতম ব্যক্তিও সাংঘাতিক হইয়া উঠে কিন্তু তথাপি তাহার পরদিন যথাসময়ে ধুতির উপর চাপকানটি পরিয়া সেই আপিসের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করে এবং সেই মসীলিপ্ত ডেস্কে চামড়ায় বাঁধানো বৃহৎ খাতাটি খুলিয়া সেই পিঙ্গলবর্ণ বড়োসাহেবের রূঢ় লাঞ্ছনা নীরবে সহ্য করিতে থাকে। হঠাৎ আত্মবিস্মৃত হইয়া সে কি একমুহূর্তে আপনার বৃহৎ সংসারটিকে ডুবাইতে পারে? আমরা কি ইংরেজের মতো স্বতন্ত্র, সংসার-ভারবিহীন? আমরা প্রাণ দিতে উদ্যত হইলে অনেকগুলি নিরুপায় নারী অনেকগুলি অসহায় শিশু ব্যাকুল বাহু উত্তোলন করিয়া আমাদের কল্পনাচক্ষে উদিত হয় ইহা আমাদের বহুযুগের অভ্যাস।

কিন্তু সে-কথা ইংরেজের বুঝিবার নহে। ভাষায় একটিমাত্র কথা আছে, ভীরুতা। নিজের জন্য ভীরুতা ও পরের জন্য ভীরুতার প্রভেদ নির্ণয় করিয়া কোনো কথার সৃষ্টি হয় নাই। সুতরাং ভীরু শব্দটা মনে উদয় হইবামাত্র তৎসংবলিত দৃঢ়বদ্ধমূল অবজ্ঞাও মনে উদয় হইবে। আমরা বৃহৎ পরিবার ও বৃহৎ অপমান একত্রে মাথায় বহন করিতেছি।

তাহার পরে ভারতবর্ষের অধিকাংশ ইংরেজি খবরের কাগজ আমাদের প্রতিকূলপক্ষ অবলম্বন করিয়া আছে। চা রুটি এবং আণ্ডার সহিত আমাদের নিন্দাবাদ ভারতবর্ষীয় ইংরেজের ছোটাহাজরি। অঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে। ইংরেজি সাহিত্যে ও গল্পে, ভ্রমণ-বৃত্তান্তে, ইতিহাসে, ভূগোলে, রাজনৈতিক প্রবন্ধে এবং বিদ্রূপাত্মক কবিতায় ভারতবর্ষীয়ের বিশেষত শিক্ষিত "বাবু"দের প্রতি ইংরেজের অরুচি উত্তরোত্তর বর্ধিত করিয়া তুলিতেছে।

ভারতবর্ষীয়েরা আপন গরিবখানায় পড়িয়া পড়িয়া তাহার প্রতিশোধ লইতে চেষ্টা করে। কিন্তু আমরা কী প্রতিশোধ লইতে পারি। আমরা ইংরেজের কতটুকু ক্ষতি করিতে সক্ষম ? আমরা রাগিতে পারি, ঘরে বসিয়া গাল পাড়িতে পারি, কিন্তু ইংরেজ যদি কেবলমাত্র দুইটি অঙ্গুলি দ্বারা আমাদের কোমল কর্ণমূলে কিঞ্চিৎ কঠিন মর্দন প্রয়োগ করে তবে সেটা আমাদিগকে সহ্য করিতে হয়। এইরূপ মর্দন করিবার ছোটো বড়ো কতপ্রকার অবসর যে তাহাদের আছে তাহা সদর-মফস্বলের লোকের অবিদিত নাই। ইংরেজ আমাদের প্রতি মনে মনে যতই বিমুখ বীতশ্রদ্ধ হইতে থাকিবে ততই আমাদের প্রকৃত স্বভাব বোঝা, আমাদের সুবিচার করা, আমাদের উপকার করা তাহাদের পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া দাঁড়াইবে। ভারতবর্ষীয়ের অবিশ্রাম নিন্দা ও তাহার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া ইংরেজি কাগজ ভারতশাসনকার্য দুরূহ করিয়া তুলিতেছে। আর আমরা ইংরেজের নিন্দা করিয়া কেবল আমাদের নিরুপায় অসন্তোষ লালন করিতেছি মাত্র।

এ-পর্যন্ত ভারত-অধিকারকার্যে যে অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে তাহাতে ইহা নিশ্চয় জানা গিয়াছে যে, ভারতবর্ষীয়ের নিকট হইতে ইংরেজের আশঙ্কার কোনো কারণ নাই। দেড়শত বৎসর পূর্বেই যখন কারণ ছিল না বলিলেই হয় তখন এখনকার তো আর কথাই নাই। রাজ্যের মধ্যে যাহারা উপদ্রব করিতে পারিত তাহাদের নখদন্ত গিয়াছে এবং অনভ্যাসে তাহারা এতই নির্জীব হইয়া পড়িয়াছে যে, ভারতরক্ষাকার্যের জন্যই সৈন্য পাওয়া ক্রমশ দুর্ঘট হইতেছে। তথাপি ইংরেজ "সিডিশন" দমনের জন্য সর্বদা উদ্যত। তাহার কারণ, প্রবীণ রাজনীতিজ্ঞগণ কোনো অবস্থাতেই সতর্কতাকে শিথিল হইতে দেন না। সাবধানের বিনাশ নাই।

তত্রাচ উহা অতিসাবধানতামাত্র। কিন্তু অপর পক্ষে ইংরেজ যদি ক্রমশই ভারতদ্রোহী হইয়া উঠিতে থাকে তাহা হইলেই রাজকার্যের বাস্তবিক বিঘ্ন ঘটা সম্ভব। বরং উদাসীনভাবেও কর্তব্যপালন করা যায় কিন্তু আন্তরিক বিদ্বেষ লইয়া কর্তব্যপালন করা মনুষ্য-ক্ষমতার অতীত।

তথাপি, অমানুষিক ক্ষমতাবলে সমস্ত কর্তব্য যথাযথ পালন করিলেও সেই অন্তরস্থিত বিদ্বেষ প্রজাকে পীড়ন করিতে থাকে। কারণ, যেমন জলের ধর্ম আপনার সমতল সন্ধান করা তেমনি মানবহৃদয়ের ধর্ম আপনার সম-ঐক্য অন্বেষণ করা। এমন কি, প্রেমের সূত্রে ঈশ্বরের সহিত সে আপনার ঐক্য স্থাপন করে। যেখানে সে আপনার ঐক্যের পথ খুঁজিয়া না পায় সেখানে অন্য যতপ্রকার সুবিধা থাক সে অতিশয় ক্লিষ্ট হইতে থাকে। মুসলমান রাজা অত্যাচারী ছিল কিন্তু তাহাদের সহিত আমাদের অনেক বিষয়ে সমকক্ষতার সাম্য ছিল। আমাদের দর্শন কাব্য আমাদের কলাবিদ্যা আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিতে রাজায় প্রজায় আদানপ্রদান ছিল। সুতরাং মুসলমান আমাদিগকে পীড়ন করিতে পারিত কিন্তু অসম্মান করা তাহার সাধ্য ছিল না। মনে মনে আমাদের আত্মসম্মানের কোনো লাঘব ছিল না, কারণ বাহুবলের দ্বারা শ্রেষ্ঠতা কিছুতেই অভিভূত হইতে পারে না।

কিন্তু আমরা ইংরেজের রেলগাড়ি কলকারখানা রাজ্যশৃঙ্খলা দেখি আর হাঁ করিয়া ভাবি ইহারা ময়দানবের বংশ—ইহারা এক জাতই স্বতন্ত্র, ইহাদের অসাধ্য কিছুই নহে—এই বলিয়া নিশ্চিন্তমনে রেলগাড়িতে চড়ি, কলের মাল সস্তায় কিনি এবং মনে করি ইংরেজের মুল্লুকে আমাদের আর কিছু ভয় করিবার চিন্তা করিবার চেষ্টা করিবার নাই—কেবল, পূর্বে ডাকাতে যাহা লইত এখন তাহা পুলিস এবং উকিলে মিলিয়া অংশ করিয়া লয়।

এইরূপে মনের এক ভাগ যেরূপ নিশ্চিন্ত নিশ্চেষ্ট হয়, অপর ভাগে এমন কি, মনের গভীরতর মূলে ভার বোধ হইতে থাকে। খাদ্যরস এবং পাকরস মিশিয়া তবে আহার পরিপাক হয়, ইংরেজের সভ্যতা আমাদের পক্ষে খাদ্যমাত্র কিন্তু তাহাতে রসের একান্ত অভাব হওয়াতে আমাদের মন তদুপযুক্ত পাকরস নিজের মধ্য হইতে জোগাইতে পারিতেছে না। লইতেছি মাত্র কিন্তু পাইতেছি না। ইংরেজের সকল কার্যের ফলভোগ করিতেছি কিন্তু আমার করিতে পারিতেছি না, এবং করিবার আশাও নিরস্ত হইতেছে।

রাজ্য জয় করিয়া গৌরব এবং লাভ আছে, রাজ্য সুশাসন করিয়া ধর্ম এবং অর্থ আছে, আর রাজাপ্রজার হৃদয়ের মিলন স্থাপন করিয়া কি কোনো মাহাত্ম্য এবং কোনো সুবিধা নাই? বর্তমান কালের ভারত-রাজনীতির সেই কি সর্বাপেক্ষা চিন্তা এবং আলোচনার বিষয় নহে?

কেমন করিয়া হইবে তাহাই প্রশ্ন। একে একে তো দেখানো গিয়াছে যে, রাজাপ্রজার মধ্যে দুর্ভেদ্য দুরূহ স্বাভাবিক বাধাসকল বর্তমান। কোনো কোনো

সহৃদয় ইংরেজও সেজন্য অনেক সময় চিন্তা ও দুঃখ অনুভব করেন। তবু যাহা অসম্ভব যাহা অসাধ্য তাহা লইয়া বিলাপ করিয়া ফল কী?

কিন্তু বৃহৎ কার্য মহৎ অনুষ্ঠান কবে সহজ সুসাধ্য হইয়াছে? এই ভারতজয়-ভারতশাসনকার্যে ইংরেজের যে-সকল গুণের আবশ্যক হইয়াছে সেগুলি কি সুলভ গুণ? সে সাহস, সে অদম্য অধ্যবসায়, সে ত্যাগস্বীকার কি স্বল্প সাধনার ধন? আর পঞ্চবিংশতি কোটি বিদেশীয় প্রজার হৃদয় জয় করিবার জন্য যে দুর্লভ সহৃদয়তাগুণের আবশ্যক তাহা কি সাধনার যোগ্য নহে?

ইংরেজ কবিগণ গ্রীস ইটালি হাঙ্গেরি পোলাণ্ডের দুঃখে অশ্রুমোচন করিয়াছেন, আমরা ততটা অশ্রুপাতের অধিকারী নহি, কিন্তু এ-পর্যন্ত মহাত্মা এডবিন আর্নল্ড ব্যতীত আর কোনো ইংরেজ কবি কোনো প্রসঙ্গ উপলক্ষে ভারতবর্ষের প্রতি প্রীতি ব্যক্ত করেন নাই। বরঞ্চ শুনিয়াছি নিঃসম্পর্ক ফ্রান্সের কোনো কোনো বড়ো কবি ভারতবর্ষীয় প্রসঙ্গ অবলম্বন করিয়া কাব্য রচনা করিয়াছেন। ইহাতে ইংরেজের যতটা অনাত্মীয়তা প্রকাশ পাইয়াছে এমন আর কিছুতেই নহে।

ভারতবর্ষ ও ভারতবর্ষীয়দের লইয়া আজকাল ইংরেজি নভেল অনেকগুলি বাহির হইতেছে। শুনিতে পাই আধুনিক অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান লেখকসম্প্রদায়ের মধ্যে রাডইয়ার্ড কিপ্লিং প্রতিভায় অগ্রগণ্য। তাঁহার ভারতবর্ষীয় গল্প লইয়া ইংরেজ পাঠকেরা অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়াছেন। উক্ত গল্পগুলি পড়িয়া তাঁহার একজন অনুরক্ত ভক্ত ইংরেজ কবির মনে কিরূপ ধারণা হইয়াছে তাহা পড়িয়াছি। সমালোচনা উপলক্ষে এডমণ্ড গস বলিতেছেন:

> "এই সকল গল্প পড়িতে পড়িতে ভারতবর্ষীয় সেনানিবাসগুলিকে জনহীন বালুকাসমুদ্রের মধ্যবর্তী এক-একটি দ্বীপের মতো বোধ হয়। চারিদিকেই ভারতবর্ষের অপরিসীম মরুময়তা,—অখ্যাত, একঘেয়ে, প্রকাণ্ড—সেখানে কেবল কালা আদমি, পারিয়া কুকুর, পাঠান এবং সবুজবর্ণ টিয়াপাখি, চিল এবং কুম্ভীর, এবং লম্বা ঘাসের নির্জন ক্ষেত্র। এই মরুসমুদ্রের মধ্যবর্তী দ্বীপে কতকগুলি যুবাপুরুষ বিধবা মহারানীর কার্য করিতে এবং তাঁহার অধীনস্থ পূর্বদেশীয় ধনসম্পদপূর্ণ বর্বর সাম্রাজ্য রক্ষা করিতে সুদূর ইংলণ্ড হইতে প্রেরিত হইয়াছে।"

ইংরেজের তুলিতে ভারতবর্ষের এই শুষ্ক শোভাহীন চিত্র অঙ্কিত দেখিয়া মন নৈরাশ্যে বিষাদে পরিপূর্ণ হইয়া যায়। আমাদের ভারতবর্ষ তো এমন নয়। কিন্তু ইংরেজের ভারতবর্ষ কি এত তফাত।

পরন্তু ভারতবর্ষের সহিত স্বার্থসম্পর্কীয় সম্বন্ধ লইয়া প্রবন্ধ আজকাল প্রায়ই দেখা যায়। ইংলণ্ডের জনসংখ্যা প্রতিবৎসর বৃদ্ধি হইয়া ক্রমশ কী পরিমাণে খাদ্যাভাব হইতেছে এবং ভারতবর্ষ তাহা কী পরিমাণে পূরণ করিতেছে এবং বিলাতি মালের আমদানি করিয়া বিলাতের বহুসংখ্যক শ্রমজীবীর হাতে কাজ দিয়া তাহাদের কিরূপে জীবনোপায় করিয়া দিতেছে তাহার তালিকা বাহির হইতেছে।

ইংলণ্ড উত্তরোত্তর ভারতবর্ষকে তাঁহাদেরই রাজগোষ্ঠের চিরপালিত গোরুটির মতো দেখিতেছেন। গোয়াল পরিষ্কার রাখিতে এবং খোলবিচালি জোগাইতে কোনো আলস্য নাই, এই অস্থাবর সম্পত্তিটি যাহাতে রক্ষা হয় সে-পক্ষে তাঁহাদের যত্ন আছে, যদি কখনো দৌরাত্ম্য করে সেজন্য শিং দুটা ঘষিয়া দিতে ঔদাসীন্য নাই এবং দুই বেলা দুগ্ধ দোহন করিয়া লইবার সময় কৃশকায় বৎসগুলাকে একেবারে বঞ্চিত করে না। কিন্তু তবু স্বার্থের সম্পর্কটাকেই উত্তরোত্তর জাজ্বল্যমান করিয়া তোলা হইতেছে। এই সকল প্রবন্ধে প্রায় একই সময় ভারতবর্ষের সহিত ইংরেজি উপনিবেশগুলিরও প্রসঙ্গ অবতারণা করা থাকে। কিন্তু সুরের কত প্রভেদ। তাহাদের প্রতি কত প্রেম, কত সৌভ্রাত্র। কত বারংবার করিয়া বলা হয় যে, যদিও মাতৃভূমি হইতে তাহারা বিচ্ছিন্ন হইয়া গেছে তথাপি এখনও মাতার প্রতি তাহাদের অচলা ভক্তি আছে, তাহারা নাড়ির টান ভুলিতে পারে নাই—অর্থাৎ সে-স্থলে স্বার্থের সঙ্গে প্রেমের কথারও উল্লেখ করা আবশ্যক হয়। আর হতভাগা ভারতবর্ষেরও কোথাও একটা হৃদয় আছে এবং সেই হৃদয়ের সঙ্গে কোথাও একটু যোগ থাকা আবশ্যক সে-কথার কোনো আভাসমাত্র থাকে না। ভারতবর্ষ কেবল হিসাবের খাতায় শ্রেণীবদ্ধ অঙ্কপাতের দ্বারায় নির্দিষ্ট। ইংলণ্ডের প্র্যাকটিক্যাল লোকের কাছে ভারতবর্ষের কেবল মন-দরে সের-দরে, টাকার দরে সিকার দরে গৌরব। সংবাদপত্র এবং মাসিক-পত্রের লেখকগণ ইংলণ্ডকে কি কেবল এই শুষ্ক পাঠই অভ্যাস করাইবেন? ভারতবর্ষের সহিত যদি কেবল তাহার স্বার্থের সম্পর্কই দৃঢ় হয় তবে যে ক্ষামাঙ্গিনী গাভীটি আজ দুধ দিতেছে কালে গোপকুলের অযথা বংশবৃদ্ধি ও ক্ষুধাবৃদ্ধি হইলে তাহার লেজটুকু এবং ক্ষুরটুকু পর্যন্ত তিরোহিত হইবার সম্ভাবনা। এই স্বার্থের চক্ষে দেখা হয় বলিয়াই তো ল্যাঙ্কাশিয়র নিরুপায় ভারতবর্ষের তাঁতের উপর মাশুল বসাইয়াছে আর নিজের মাল বিনা মাশুলে চালান করিতেছে।

আমাদের দেশটাও যে তেমনি। যেমন রৌদ্র তেমনি ধুলা। কেবলই পাখার বাতাস এবং বরফজল না খাইলে সাহেব বাঁচে না। আবার দুর্ভাগ্যক্রমে পাখার কুলিটিও রুগ্ন প্লীহা লইয়া ঘুমাইয়া পড়ে এবং বরফ সর্বত্র সুলভ নহে। ভারতবর্ষ

ইংরেজের পক্ষে রোগশোক স্বজনবিচ্ছেদ এবং নির্বাসনের দেশ, সুতরাং খুব মোটা মাহিনায় সেটা পোষাইয়া লইতে হয়। আবার পোড়া এক্সচেঞ্জ তাহাতেও বাদ সাধিতে চাহে। স্বার্থসিদ্ধি ছাড়া ভারতবর্ষ ইংরেজকে কী দিতে পারে।

হায় হতভাগিনী ইণ্ডিয়া, তোমাকে তোমার স্বামীর পছন্দ হইল না; তুমি তাহাকে প্রেমের বন্ধনে বাঁধিতে পারিলে না। এখন দেখো, যাহাতে তাহার সেবার ত্রুটি না হয়। তাহাকে অশ্রান্ত যত্নে বাতাস করো; খসখসের পর্দা টাঙাইয়া জল সেচন করো, যাহাতে দুই দণ্ড তোমার ঘরে সে সুস্থির হইয়া বসিতে পারে। খোলো, তোমার সিন্দুকটা খোলো, তোমার গহনাগুলো বিক্রয় করো, উদর পূর্ণ করিয়া আহার এবং পকেট পূর্ণ করিয়া দক্ষিণা দাও। তবু সে মিষ্ট কথা বলিবে না, তবু মুখ ভার করিয়া থাকিবে, তবু তোমার বাপের বাড়ির নিন্দা করিবে। আজকাল তুমি লজ্জার মাথা খাইয়া মান-অভিমান করিতে আরম্ভ করিয়াছ, ঝংকার সহকারে দু-কথা পাঁচ কথা শুনাইয়া দিতেছ; কাজ নাই বকাবকি করিয়া; যাহাতে তোমার বিদেশী স্বামী সন্তোষে থাকে আরামে থাকে একমনে তাহাই সাধন করো। তোমার হাতের লোহা অক্ষয় হউক।

ইংরেজ রাজকবি টেনিসন মৃত্যুর পূর্বে তাঁহার সর্বশেষ গ্রন্থে সৌভাগ্যক্রমে ভারতবর্ষকে কিঞ্চিৎ স্মরণ করিয়াছেন।

কবিবর উক্ত গ্রন্থে আকবরের স্বপ্ন নামক একটি কবিতা প্রকাশ করিয়াছেন। আকবর তাঁহার প্রিয়সুহৃৎ আবুল ফজলের নিকট রাত্রের স্বপ্নবর্ণন উপলক্ষে তাঁহার ধর্মের আদর্শ ও জীবনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিতেছেন। তিনি ভারতবর্ষের ভিন্ন ধর্মের মধ্যে যে ঐক্য এবং ভিন্ন জাতির মধ্যে যে প্রেম ও শান্তি স্থাপনার চেষ্টা করিয়াছেন, স্বপ্নে দেখিয়াছেন তাঁহার পরবর্তিগণ সে চেষ্টা বিপর্যস্ত করিয়া দিয়াছে এবং অবশেষে সূর্যাস্তের দিক হইতে একদল বিদেশী আসিয়া তাঁহার সেই ভূমিসাৎ মন্দিরকে, একটি একটি প্রস্তর গাঁথিয়া পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়া তুলিয়াছে এবং সেই মন্দিরে সত্য এবং শান্তি, প্রেম এবং ন্যায়পরতা পুনরায় আপন সিংহাসন স্থাপন করিয়াছে।

কবির এই স্বপ্ন সফল হউক প্রার্থনা করি। আজ পর্যন্ত এই মন্দিরের প্রস্তরগুলি গ্রথিত হইয়াছে; বল, পরিশ্রম ও নৈপুণ্যের দ্বারা যাহা হইতে পারে তাহার কোনো ত্রুটি হয় নাই কিন্তু এখনও এ মন্দিরে সকল দেবতার অধিদেবতা প্রেমের প্রতিষ্ঠা হয় নাই।

প্রেম পদার্থটি ভাবাত্মক, অভাবাত্মক নহে। আকবর সকল ধর্মের বিরোধভঞ্জন করিয়া যে একটি প্রেমের ঐক্য স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহা ভাবাত্মক। তিনি নিজের হৃদয়মধ্যে একটি ঐক্যের আদর্শ লাভ করিয়াছিলেন, তিনি উদার হৃদয় লইয়া

শ্রদ্ধার সহিত সকল ধর্মের অন্তরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তিনি একাগ্রতার সহিত নিষ্ঠার সহিত হিন্দু মুসলমান খ্রীস্টান পারসি ধর্মজ্ঞদিগের ধর্মালোচনা শ্রবণ করিতেন ও তিনি হিন্দু রমণীকে অন্তঃপুরে, হিন্দু অমাত্যদিগকে মন্ত্রী-সভায়, হিন্দু বীরগণকে সেনানায়কতায় প্রধান আসন দিয়াছিলেন। তিনি কেবল রাজনীতির দ্বারায় নহে প্রেমের দ্বারা সমস্ত ভারতবর্ষকে, রাজা ও প্রজাকে এক করিতে চাহিয়াছিলেন। সূর্যাস্তভূমি হইতে বিদেশী আসিয়া আমাদের ধর্মে কোনো হস্তক্ষেপ করে না,—কিন্তু সেই নির্লিপ্ততা প্রেম, না রাজনীতি? উভয়ের মধ্যে আকাশপাতাল প্রভেদ।

কিন্তু এক জন মহদাশয় ক্ষণজন্মা পুরুষ যে অত্যুচ্চ আদর্শ লাভ করিয়াছিলেন একটি সমগ্র জাতির নিকট তাহা প্রত্যাশা করা যায় না। সেইজন্য কবির স্বপ্ন কবে সত্য হইবে বলা কঠিন। বলা আরও কঠিন এইজন্য, যে, দেখিতে পাইতেছি, রাজা-প্রজার মধ্যে যে চলাচলের পথ ছিল উভয় পক্ষে কাঁটাগাছের ঘের দিয়া প্রতিদিন সে-পথ মারিয়া লইতেছেন। নব নব বিদ্বেষ মিলনক্ষেত্রকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে।

রাজ্যের মধ্যে এই প্রেমের অভাব আমরা আজকাল এত অধিক করিয়া অনুভব করি যে, লোকের মনে ভিতরে ভিতরে একটা আশঙ্কা এবং অশান্তি আন্দোলিত হইতেছে। তাহার একটা দৃষ্টান্ত দেখা যায় যে, আজকাল হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ উত্তরোত্তর যে নিদারুণতর হইয়া উঠিতেছে আমরা আপনাদের মধ্যে তাহা লইয়া কিরূপ বলাকহা করি? আমরা কি গোপনে বলি না যে, এই উৎপাতের প্রধান কারণ, ইংরেজেরা এই বিরোধ নিবারণের জন্য যথার্থ চেষ্টা করে না। তাহাদের রাজনীতির মধ্যে প্রেমনীতির স্থান নাই। ভারতবর্ষের দুই প্রধান সম্প্রদায়ের মধ্যে তাহারা প্রেমের অপেক্ষা ঈর্ষা বেশি করিয়া বপন করিয়াছে। ইচ্ছাপূর্বক করিয়াছে এমন নাও হইতে পারে—কিন্তু আকবর যে একটি প্রেমের আদর্শে খণ্ড ভারতবর্ষকে এক করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন ইংরেজের পলিসির মধ্যে সেই আদর্শটি নাই বলিয়াই এই দুই জাতির স্বাভাবিক বিরোধ হ্রাস না হইয়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইবার উপক্রম দেখা যাইতেছে। কেবল আইনের দ্বারা শাসনের দ্বারা এক করা যায় না—অন্তরে প্রবেশ করিতে হয়, বেদনা বুঝিতে হয়, যথার্থ ভালোবাসিতে হয়—আপনি কাছে আসিয়া হাতে হাতে ধরিয়া মিলন করাইয়া দিতে হয়। কেবল পুলিস মোতাইন করিয়া এবং হাতকড়ি দিয়া শান্তি স্থাপন করায় দুর্ধর্ষ বলের পরিচয় পাওয়া যায় কিন্তু সেটা ঠিক আকবরের স্বপ্নের মধ্যে ছিল না এবং সূর্যাস্তভূমির কবিগণ অলীক অহংকার না করিয়া যদি বিনীত প্রেমের সহিত সুগভীর আক্ষেপের সহিত স্বজাতিকে লাঞ্ছনা করিয়া প্রেমের সেই উচ্চ আদর্শ শিক্ষা দেন তবে তাঁহাদের স্বজাতিরও উন্নতি হয় এবং এই আশ্রিত-

বর্গেরও উপকার হয়। ইংরেজের আত্মাভিমান সভ্যতাগর্ব জাত্যহংকার কি যথেষ্ট নাই, কবি কি কেবল সেই অগ্নিতেই আহুতি দিবেন? এখনও কি নম্রতাশিক্ষা ও প্রেমচর্চার সময় হয় নাই? সৌভাগ্যের উন্নততম শিখরে অধিরোহণ করিয়া এখনও কি ইংরেজ কবি কেবল আত্মঘোষণা করিবেন।

কিন্তু আমাদের মতো অবস্থাপন্ন লোকের মুখে এ-সকল কথা কেমন শোভন হয় না, সেইজন্য বলিতেও লজ্জা বোধ হয়। দায়ে পড়িয়া প্রেম ভিক্ষা করার মতো দীনতা আর কিছু নাই। এবং এ-সম্বন্ধে দুই-এক কথা আমাদিগকে মাঝে মাঝে শুনিতেও হয়।

মনে পড়িতেছে কিছুদিন হইল ভক্তিভাজন প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের এক পত্রের উত্তরে লণ্ডনের স্পেক্টেটর পত্র বলিয়াছিলেন, নব্য বাঙালিদের অনেকগুলা ভালো লক্ষণ আছে কিন্তু একটা দোষ দেখিতেছি সিমপ্যাথি-লালসাটা তাহাদের বড়ো বেশি হইয়াছে।

এ দোষ স্বীকার করিতে হয় এবং এতক্ষণ আমি যে-ভাবে কথাগুলা বলিয়া আসিতেছি তাহাতে এ দোষ হাতে হাতে প্রমাণ হয়। ইংরেজের কাছ হইতে আদর পাইবার ইচ্ছাটা আমাদের কিছু অস্বাভাবিক পরিমাণে বাড়িয়া উঠিয়াছে। তাহার কারণ, আমরা স্পেক্টেটরের ন্যায় স্বাভাবিক অবস্থায় নাই। আমরা যখন "তৃষার্ত হইয়া চাহি এক ঘটি জল" আমাদের রাজা তখন "তাড়াতাড়ি এনে দেয় আধখানা বেল।" আধখানা বেল সময়বিশেষে অত্যন্ত উপাদেয় হইতে পারে কিন্তু তাহাতে ক্ষুধাতৃষ্ণা দুই একসঙ্গে দূর হয় না। ইংরেজের সুনিয়মিত সুবিচারিত গবর্মেণ্ট অত্যন্ত উত্তম এবং উপাদেয় কিন্তু তাহাতে প্রজার হৃদয়ের তৃষ্ণা মোচন না হইতেও পারে, এমন কি, গুরুপাক প্রচুর ভোজনের ন্যায় তদ্দ্বারা তৃষ্ণা অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিতেও আটক নাই। স্পেক্টেটর দেশদেশান্তরের সকলপ্রকার ভোজ্য এবং সকলপ্রকার পানীয় অপর্যাপ্ত পরিমাণে আহরণ করিয়া পরিপূর্ণ ডিনারের মাঝখানে বসিয়া কিছুতেই ভাবিয়া পান না তাঁহাদের বাতায়নের বহিঃস্থিত পথপ্রান্তবর্তী ওই বিদেশী বাঙালিটির এমন বুভুক্ষু কাঙালের মতো ভাবখানা কেন?

কিন্তু স্পেক্টেটর শুনিয়া হয়তো সুখী হইবেন, অতিদুষ্প্রাপ্য তাঁহাদের সেই সিমপ্যাথির আঙুর ক্রমে আমাদের নিকটও টক হইয়া আসিয়াছে। আমরা অনেকক্ষণ ঊর্ধ্বে লোলুপ দৃষ্টিপাত করিয়া অবশেষে ধীরে ধীরে ঘরে ফিরিবার উপক্রম করিতেছি। আমাদের এই চির-উপবাসী ক্ষুধিত স্বভাবের মধ্যেও যেটুকু মনুষ্যত্ব অবশিষ্ট ছিল তাহা ক্রমে বিদ্রোহী হইয়া উঠিতেছে।

আমরা বলিতে আরম্ভ করিয়াছি—তোমরা এতই কি শ্রেষ্ঠ। তোমরা না হয় কল

চালাইতে এবং কামান পাতিতে শিখিয়াছ কিন্তু মানবের প্রকৃত সভ্যতা আধ্যাত্মিক সভ্যতা, সেই সভ্যতায় আমরা তোমাদের অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠতর। অধ্যাত্মবিদ্যার ক খ হইতে আমরা তোমাদিগকে শিখাইতে পারি। তোমরা যে আমাদিগকে অর্ধসভ্য বলিয়া অবজ্ঞা কর সে তোমাদের অন্ধ মূঢ়তাবশত, হিন্দুজাতির শ্রেষ্ঠতা ধারণা করিবার শক্তিও তোমাদের নাই। আমরা পুনরায় চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধ্যানে বসিব। আজ হইতে তোমাদের য়ুরোপের সুখাসক্ত চপল সভ্যতার বাল্যলীলা হইতে সমস্ত দৃষ্টি ফিরাইয়া আনিয়া তাহাকে কেবলমাত্র নাসাগ্রভাগে নিবিষ্ট করিয়া রাখিলাম। তোমরা কাছারি করো, আপিস করো, দোকান করো, নাচো, খেলো, মারো, ধরো, হুটোপাটি করো এবং সিমলার শৈলশিখরে বিলাসের স্বর্গপুরী নির্মাণ করিয়া সভ্যতামদে প্রমত্ত হইয়া থাকো।

দরিদ্র বঞ্চিত মানব আপনাকে এইরূপে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করে। যে শ্রেষ্ঠতার সহিত প্রেম নাই সে শ্রেষ্ঠতা সে কিছুতেই বহন করিতে সম্মত হয় না। কারণ, তাহার অন্তরে একটি সহজ জ্ঞান আছে তদ্দ্বারা সে জানে যে, এইরূপ শুষ্ক শ্রেষ্ঠতা বাধ্য হইয়া বহন করিতে হইলে ক্রমশ ভারবাহী মূঢ় পশুর সমতুল্য হইয়া যাইতে হইবে।

কিন্তু কে বলিতে পারে এই মানসিক বিদ্রোহই বিধাতার অভিপ্রেত নহে। তিনি ক্ষুদ্র পৃথিবীকে যেরূপ প্রচণ্ড সূর্যের প্রবল আকর্ষণ হইতে রক্ষা করিতেছেন, তাহার অন্তরে একটি প্রতিকূল শক্তি নিহিত করিয়া দিয়াছেন, সেই শক্তির বলে সে সূর্যের আলোক-উত্তাপ ভোগ করিয়াও আপনার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতেছে এবং সূর্যের ন্যায় প্রতাপশালী হইবার চেষ্টা না করিয়া আপনার অন্তর্নিহিত স্নেহশক্তি দ্বারা শ্যামলা শস্যশালিনী কোমলা মাতৃরূপিণী হইয়া উঠিয়াছে, বিধাতা বোধ করি সেইরূপ আমাদিগকেও ইংরেজের বৃহৎ আকর্ষণের কবল হইতে রক্ষা করিবার উদ্‌যোগ করিয়াছেন। বোধ করি তাঁহার অভিপ্রায় এই যে, আমরা ইংরেজি সভ্যতার জ্ঞানালোকে নিজের স্বাতন্ত্র্যকেই সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিব।

তাহার লক্ষণও দেখা যায়। ইংরেজের সহিত সংঘর্ষ আমাদের অন্তরে যে একটি উত্তাপ সঞ্চার করিয়া দিয়াছে তদ্দ্বারা আমাদের মুমূর্ষু জীবনীশক্তি পুনরায় সচেতন হইয়া উঠিতেছে। আমাদের অন্তরের মধ্যে আমাদের যে-সমস্ত বিশেষ ক্ষমতা অন্ধ ও জড়বৎ হইয়া অবস্থান করিতেছিল তাহারা নূতন আলোকে পুনরায় আপনাকে চিনিতে পারিতেছে। স্বাধীন যুক্তিতর্কবিচারে আমাদের মানসভূমি আমাদের নিকট নবাবিষ্কৃত হইতেছে। দীর্ঘ প্রলয়রাত্রির অবসানে অরুণোদয়ে যেন আমরা আমাদেরই দেশ আবিষ্কার করিতে বাহির হইয়াছি। স্মৃতিশ্রুতি-কাব্যপুরাণ-ইতিহাসদর্শনের প্রাচীন

গহন অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছি—পুরাতন গুপ্তধনকে নূতন করিয়া লাভ করিবার ইচ্ছা। আমাদের মনে যে একটা ধিক্‌কারের প্রতিঘাত উপস্থিত হইয়াছে তাহাতেই আমাদিগকে আমাদের নিজের দিকে পুনরায় সবলে নিক্ষেপ করিয়াছে। প্রথম আক্ষেপে আমরা কিছু অন্ধভাবে আমাদের মাটি ধরিয়া পড়িয়াছি—আশা করা যায়, একদিন স্থিরভাবে অক্ষুব্ধচিত্তে ভালোমন্দ বিচারের সময় আসিবে এবং এই প্রতিঘাত হইতে যথার্থ গভীর শিক্ষা এবং স্থায়ী উন্নতি লাভ করিতে পারিব।

একপ্রকারের কালি আছে যাহা কাগজের গায়ে কালক্রমে অদৃশ্য হইয়া যায় অবশেষে অগ্নির কাছে কাগজ ধরিলে পুনর্বার রেখায় রেখায় ফুটিয়া উঠে। পৃথিবীর অধিকাংশ সভ্যতা সেই কালিতে লেখা; কালক্রমে লুপ্ত হইয়া যায় আবার শুভ দৈবক্রমে নবসভ্যতার সংশ্রবে নবজীবনের উত্তাপে তাহা পুনরায় ফুটিয়া উঠা অসম্ভব বোধ হয় না। আমরা তো সেইরূপ আশা করিয়া আছি। এবং সেই বিপুল আশায় উৎসাহিত হইয়া আমাদের সমুদয় প্রাচীন পুঁথিপত্রগুলি সেই উত্তাপের কাছে আনিয়া ধরিতেছি,—যদি পূর্ব অক্ষর ফুটিয়া উঠে তবেই পৃথিবীতে আমাদের গৌরব রক্ষিত হইতে পারে—নচেৎ বৃদ্ধ ভারতের জরাজীর্ণ দেহ সভ্যতার জ্বলন্ত চিতায় সমর্পণ করিয়া লোকান্তর ও রূপান্তর প্রাপ্তি হওয়াই সদ্‌গতি।

আমাদের মধ্যে সাধারণের সম্মানভাজন এক সম্প্রদায়ের লোক আছেন তাঁহারা বর্তমান সমস্যার সহজ একটা মীমাংসা করিতে চান। তাঁহাদের ভাবখানা এই :

ইংরেজের সহিত আমাদের অনেকগুলি বাহ্য অমিল আছে। সেই বাহ্য অমিলই সর্বপ্রথম চক্ষে আঘাত করে এবং তাহা হইতেই বিজাতীয় বিদ্বেষের সূত্রপাত হইয়া থাকে। অতএব বাহ্য অনৈক্যটা যথাসম্ভব দূর করা আবশ্যক। যে-সমস্ত আচার-ব্যবহার এবং দৃশ্য চিরাভ্যাসক্রমে ইংরেজের সহজে শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে সেইগুলি দেশে প্রবর্তন করা দেশের পক্ষে হিতজনক। বসনভূষণ ভাবভঙ্গি, এমন কি, ভাষাটা পর্যন্ত ইংরেজি হইয়া গেলে দুই জাতির মধ্যে মিলনসাধনের একটি প্রধান অন্তরায় চলিয়া যায় এবং আমাদের আত্মসম্মান রক্ষার একটি সহজ উপায় অবলম্বন করা হয়।

আমার বিবেচনায় এ-কথা সম্পূর্ণ শ্রদ্ধেয় নহে। বাহ্য অনৈক্য লোপ করিয়া দেওয়ার একটি মহৎ বিপদ এই যে, অনভিজ্ঞ দর্শকের মনে একটি মিথ্যা আশার সঞ্চার করিয়া দেওয়া হয় এবং সেই আশাটি রক্ষা করিবার জন্য অলক্ষিতভাবে মিথ্যার শরণাপন্ন হইতে হয়। ইংরেজদিগকে জানাইয়া দেওয়া হয় আমরা তোমাদেরই মতো, এবং যেখানে অন্যতর কিছু বাহির হইয়া পড়ে সেখানে তাড়াতাড়ি যেন তেন প্রকারে চাপাচুপি দিয়া ফেলিতে ইচ্ছা করে। আডাম এবং ঈভ জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাইবার পূর্বে যে সহজ বেশে

ভ্রমণ করিতেন তাহা অতি শোভন ও পবিত্র কিন্তু জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাইবার পরে যে-পর্যন্ত না পৃথিবীতে দরজির দোকান বসিয়াছিল সে-পর্যন্ত তাঁহাদের বেশভূষা অশ্লীলতা-নিবারিণী সভায় নিন্দার্হ হইয়াছিল সন্দেহ নাই। আমাদেরও নব-আবরণে লজ্জানিবারণ না করিয়া লজ্জাবৃদ্ধি করিবারই সম্ভব। কারণ, সমস্ত দেশটাকে ঢাকিবার মতো দরজির এস্টাব্লিশমেণ্ট এখনও খোলা হয় নাই। ঢাকিতে গিয়া ঢাকা পড়িবে না এবং তাহার মতো বিড়ম্বনা আর কিছুই নাই। যাঁহারা লোভে পড়িয়া সভ্যতাবৃক্ষের এই ফলটি খাইয়া বসিয়াছেন তাঁহাদিগকে বড়োই ব্যতিব্যস্ত হইয়া থাকিতে হয়। পাছে ইংরেজ দেখিতে পায় আমরা হাতে করিয়া খাই, পাছে ইংরেজ জানিতে পায় আমরা আসনে চৌকা হইয়া বসি, এজন্য কেবলই তাঁহাদিগকে পর্দা টানিয়া বেড়াইতে হয়। এটিকেট-শাস্ত্রে একটু ত্রুটি হওয়া, ইংরেজি ভাষায় স্বল্প স্খলন হওয়া তাঁহারা পাতকরূপে গণ্য করেন এবং স্বসম্প্রদায়ের পরস্পরের মধ্যে সাহেবি আদর্শের ন্যূনতা দেখিলে লজ্জা ও অবজ্ঞা অনুভব করিয়া থাকেন। ভাবিয়া দেখিলে অনাবরণ অপেক্ষা এই অসম্পূর্ণ আবরণে, এই আবরণের নিষ্ফল চেষ্টাতেই প্রকৃত অশ্লীলতা—ইহাতেই যথার্থ আত্মাবমাননা।

কতকটা পরিমাণে ইংরেজি ছদ্মবেশ ধারণ করিলে বৈসাদৃশ্যটা আরও বেশি জাজ্বল্যমান হইয়া উঠে। তাহার ফলটা বেশ সুশোভন হয় না। সুতরাং রুচিতে দ্বিগুণ আঘাত দেয়। ইংরেজের মনটা অভ্যাসকুহকে নিকটে আকৃষ্ট হওয়াতেই আপনাকে অন্যায় প্রতারিত জ্ঞান করিয়া দ্বিগুণ বেগে প্রতিহত হয়।

নব্য জাপান য়ুরোপীয় সভ্যতায় রীতিমতো দীক্ষিত হইয়াছে। তাহার শিক্ষা কেবল বাহ্যশিক্ষা নহে। কলকারখানা শাসনপ্রণালী বিদ্যাবিস্তার সমস্ত সে নিজের হাতে চালাইতেছে। তাহার পটুতা দেখিয়া য়ুরোপ বিস্মিত হয় এবং কোথাও কোনো ত্রুটি খুঁজিয়া পায় না কিন্তু তথাপি য়ুরোপ আপনার বিদ্যালয়ের এই সর্দার প'ড়োটিকে বিলাতি বেশভূষা-আচারব্যবহারের অনুকরণ করিতে দেখিলেই বিমুখ না হইয়া থাকিতে পারে না। জাপান নিজের এই অদ্ভুত কুরুচি, এই হাস্যজনক অসংগতি সম্বন্ধে নিজে একেবারেই অন্ধ। কিন্তু য়ুরোপ এই ছদ্মবেশী এশিয়াবাসীকে দেখিয়া বিপুল শ্রদ্ধাসত্ত্বেও না হাসিয়া থাকিতে পারে না।

আর আমরা কি য়ুরোপের সহিত অন্য সমস্ত বিষয়েই এতটা দূর একাত্ম হইয়া গিয়াছি যে, বাহ্য অনৈক্য বিলোপ করিয়া দিলে অসংগতি নামক গুরুতর রুচিদোষ ঘটিবে না?

এই তো গেল একটা কথা। দ্বিতীয় কথা এই যে, এই উপায়ে লাভ চুলায় যাক,

মূলধনেরই ক্ষতি হয়। ইংরেজের সহিত অনৈক্য তো আছেই আবার স্বদেশীয়ের সহিত অনৈক্যের সূচনা হয়। আমি যদি আজ ইংরেজের মতো হইয়া ইংরেজের নিকট মান কাড়িতে যাই তবে আমার যে-ভ্রাতারা ইংরেজের মতো সাজে নাই তাহাদিগকে আত্মীয় বলিয়া পরিচয় দিতে স্বভাবতই কিছু সংকোচ বোধ হয়ই। তাহাদের জন্য লজ্জা অনুভব না করিয়া থাকিবার জো নাই। আমি যে নিজগুণে ওই সকল মানুষের সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বতন্ত্রজাতিভুক্ত হইয়াছি এইরূপ পরিচয় দিতে প্রবৃত্তি হয়।

ইহার অর্থ ই এই—জাতীয় সম্মান বিক্রয় করিয়া আত্মসম্মান ক্রয় করা। ইংরেজের কাছে একরকম করিয়া বলা যে, সাহেব, ওই বর্বরদের প্রতি যেমন ব্যবহারই কর আমি যখন কতকটা তোমাদের মতো চেহারা করিয়া আসিয়াছি তখন মনে বড়ো আশা আছে যে, আমাকে তুমি দূর করিয়া দিবে না।

মনে করা যাক যে, এইরূপ কাঙালবৃত্তি করিয়া কিছু প্রসাদ পাওয়া যায় কিন্তু ইহাতেই কি আপনার কিংবা স্বজাতির সম্মান রক্ষা করা হয়?

কর্ণ যখন অশ্বত্থামাকে বলেন যে, তুমি ব্রাহ্মণ, তোমার সহিত কী যুদ্ধ করিব, তখন অশ্বত্থামা বলিয়াছিলেন, আমি ব্রাহ্মণ সেইজন্যই তুমি আমার সহিত যুদ্ধ করিতে পারিবে না? আচ্ছা, তবে আমার এই পইতা ছিঁড়িয়া ফেলিলাম।

সাহেব যদি শেকহ্যাণ্ডপূর্বক বলে এবং এস্কোয়ার যোজনাপূর্বক লেখে যে, আচ্ছা তুমি যখন তোমার জাতীয়ত্ব যথাসম্ভব ঢাকিয়া আসিয়াছ তখন এবারকার মতো তোমাকে আমাদের ক্লাবের সভ্য করা গেল, আমাদের হোটেলে স্থান দেওয়া গেল, এমন কি, তুমি দেখা করিলে এক-আধবার তোমার "কল রিটার্ন" করা যাইতেও পারে—তবে কি তৎক্ষণাৎ আপনাকে পরমসম্মানিত জ্ঞান করিয়া পুলকিত হইয়া উঠিব, না, বলিব—ইহারই জন্য আমার সম্মান! তবে এ ছদ্মবেশ আমি ছিঁড়িয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলাম। যতক্ষণে না আমার সমস্ত স্বজাতিকে আমি যথার্থ সম্মানযোগ্য করিতে পারিব ততক্ষণ আমি রং মাখিয়া এক্সেপশন সাজিয়া তোমাদের দ্বারে পদার্পণ করিব না।

আমি তো বলি সেই আমাদের একমাত্র ব্রত; সম্মান বঞ্চনা করিয়া লইব না, সম্মান আকর্ষণ করিব। নিজের মধ্যে সম্মান অনুভব করিব। সেদিন যখন আসিবে তখন পৃথিবীর যে-সভায় ইচ্ছা প্রবেশ করিব—ছদ্মবেশ, ছদ্মনাম, ছদ্মব্যবহার এবং যাচিয়া মান কাঁদিয়া সোহাগের কোনো প্রয়োজন থাকিবে না।

উপায়টা সহজ নহে। কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি সহজ উপায়ে কোন্ দুঃসাধ্য কাজ হইয়াছে। বড়ো কঠিন কাজ সেইজন্য অন্য সমস্ত ফেলিয়া তাহারই প্রতি বিশেষ মনোযোগ করিতে হইবে।

কার্যে প্রবৃত্ত হইবার আরম্ভে এই পণ করিয়া বসিতে হইবে যে, যতদিন না সুযোগ্য হইব ততদিন অজ্ঞাতবাস অবলম্বন করিয়া থাকিব।

নির্মাণ হইবার অবস্থায় গোপনের আবশ্যক। বীজ মৃত্তিকার নিম্নে নিহিত থাকে, ভ্রূণ গর্ভের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে রক্ষিত হয়। শিক্ষাবস্থায় বালককে সংসারে অধিক পরিমাণে মিশিতে দিলে সে প্রবীণ সমাজের মধ্যে গণ্য হইবার দুরাশায় প্রবীণদিগের অযথা অনুকরণ করিয়া অকালপক হইয়া যায়। সে মনে করে সে একজন গণ্যমান্য লোক হইয়া গিয়াছে। তাহার আর রীতিমতো শিক্ষার প্রয়োজন নাই—বিনয় তাহার পক্ষে বাহুল্য।

পাণ্ডবেরা পূর্বগৌরব গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে অজ্ঞাতবাসে থাকিয়া বল সঞ্চয় করিয়াছেন। সংসারে উদ্‌যোগপর্বের পূর্বে অজ্ঞাতবাসের পর্ব।

আমাদেরও এখন আত্মনির্মাণ-জাতিনির্মাণের অবস্থা, এখন আমাদের অজ্ঞাতবাসের সময়।

কিন্তু এমনি আমাদের দুর্ভাগ্য আমরা বড়োই বেশি প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছি। আমরা নিতান্ত অপরিপক অবস্থাতেই অধীরভাবে ডিম্ব ভাঙিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছি, এখন প্রতিকূল সংসারের মধ্যে এই দুর্বল অপরিণত শরীরের পুষ্টিসাধন বড়ো কঠিন হইয়া পড়িয়াছে।

আমরা আজ পৃথিবীর রণভূমিতে কী অস্ত্র লইয়া আসিয়া দাঁড়াইলাম? কেবল বক্তৃতা এবং আবেদন? কী বর্ম পরিয়া আত্মরক্ষা করিতে চাহিতেছি? কেবল ছদ্মবেশ? এমন করিয়া কতদিনই বা কাজ চলে এবং কতটুকুই বা ফল হয়?

একবার নিজেদের মধ্যে অকপটচিত্তে সরলভাবে স্বীকার করিতে দোষ কী যে, এখনও আমাদের চরিত্রবল জন্মে নাই? আমরা দলাদলি ঈর্ষা ক্ষুদ্রতায় জীর্ণ। আমরা একত্র হইতে পারি না, পরস্পরকে বিশ্বাস করি না, আপনাদের মধ্যে কাহারও নেতৃত্ব স্বীকার করিতে চাহি না। আমাদের বৃহৎ অনুষ্ঠানগুলি বৃহৎ বুদ্‌বুদের মতো ফাটিয়া যায়; আরম্ভে ব্যাপারটা খুব তেজের সহিত উদ্‌ভিন্ন হইয়া উঠে দুইদিন পরেই সেটা প্রথমে বিচ্ছিন্ন, পরে বিকৃত, পরে নির্জীব হইয়া যায়। যতক্ষণ না যথার্থ ত্যাগস্বীকারের সময় আসে ততক্ষণ আমরা ক্রীড়াসক্ত বালকের মতো একটা উদ্‌যোগ লইয়া উন্মত্ত হইয়া থাকি, তার পরে কিঞ্চিৎ ত্যাগের সময় উপস্থিত হইলেই আমরা নানান ছুতায় স্ব স্ব গৃহে সরিয়া পড়ি। আত্মাভিমান কোনো কারণে তিলমাত্র ক্ষুণ্ন হইলে উদ্দেশ্যের মহত্ত্বসম্বন্ধে আমাদের আর কোনো জ্ঞান থাকে না। যেমন করিয়া হউক কাজ আরম্ভ হইতে না হইতেই তপ্ত তপ্ত নামটা চাই। বিজ্ঞাপন, রিপোর্ট, ধুমধাম এবং খ্যাতিটা যথেষ্টপরিমাণে

হইলেই আমাদের এমনি পরিপূর্ণ পরিতৃপ্তি বোধ হয় যে, তাহার পরেই প্রকৃতিটা নিরুদ্যম হইয়া আসে; ধৈর্যসাধ্য শ্রমসাধ্য নিষ্ঠাসাধ্য কাজে হাত দিতে আর তেমন গা লাগে না।

এই দুর্বল অপরিণত শতজীর্ণ চরিত্রটা লইয়া আমরা কী সাহসে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি তাহাই বিস্ময় এবং ভাবনার বিষয়।

এরূপ অবস্থায় অসম্পূর্ণতা সংশোধন না করিয়া অসম্পূর্ণতা গোপন করিতেই ইচ্ছা যায়। একটা কোনো আত্মদোষের সমালোচনা করিতে গেলেই সকলে মিলিয়া মুখ চাপিয়া ধরে, বলে, আরে চুপ চুপ, ইংরেজেরা শুনিতে পাইবে—তাহারা কী মনে করিবে?

আবার আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে ইংরেজও অনেকগুলি বিষয়ে কিছু স্থূলদৃষ্টি। ভারতবর্ষীয়ের মধ্যে যে বিশেষ গুণগুলি আছে এবং যেগুলি বিশেষ সমাদরের যোগ্য তাহা তাহারা তলাইয়া গ্রহণ করিতে পারে না; অবজ্ঞাভরেই হউক বা যে-কারণেই হউক তাহারা বিদেশী আবরণ ভেদ করিতে পারে না বা চাহে না। তাহার একটা দৃষ্টান্ত দেখো—বিদেশে থাকিয়া জর্মান যেমন একাগ্রতার সহিত আমাদের সংস্কৃত শাস্ত্রের অনুশীলন করিয়াছে স্বক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিয়া ইংরেজ তেমন করে নাই। ইংরেজ ভারতবর্ষে জীবনযাপন করে এবং দেশটাকে সম্পূর্ণই দখল করিয়াছে কিন্তু দেশী ভাষাটা দখল করিতে পারে নাই।

অতএব ইংরেজ ভারতবর্ষীয়কে ঠিক ভারতবর্ষীয়ভাবে বুঝিতে এবং শ্রদ্ধা করিতে অক্ষম। এইজন্য আমরা অগত্যা ইংরেজকে ইংরেজি ভাবেই মুগ্ধ করিতে চেষ্টা করিতেছি। মনে যাহা জানি মুখে তাহা বলি না, কাজে যাহা করি কাগজে তাহা বাড়াইয়া লিখি। জানি যে, ইংরেজ পীপল নামক একটা পদার্থকে জুজুর মতো দেখে, আমরাও সেইজন্য কোনোমতে পাঁচজনকে জড়ো করিয়া পীপল সাজিয়া গলা গম্ভীর করিয়া ইংরেজকে ভয় দেখাই। পরস্পরকে বলি, কী করিব ভাই, এমন না করিলে উহারা যদি কোনো কথায় কর্ণপাত না করে তবে কী করা যায়। উহারা কেবল নিজের দস্তুরটাই বোঝে।

এইরূপে ইংরেজের স্বভাবগুণেই আমাদিগকে ইংরেজের মতো ভান করিয়া আড়ম্বর করিয়া তাহাদের নিকট সম্মান এবং কাজ আদায় করিতে হয়। কিন্তু তবু আমি বলি, সর্বাপেক্ষা ভালো কথা এই যে, আমরা সাজিতে পারিব না। না সাজিলে কর্তারা যদি আমাদিগকে একটুখানি অধিকার বা আধটুকরা অনুগ্রহ না দেন তো নাই দিলেন।

কর্তৃপক্ষের প্রতি অভিমান করিয়া যে এ-কথা বলা হইতেছে তাহা নহে। মনে বড়ো ভয় আছে। আমরা মৃৎপাত্র, কাংস্যপাত্রের সহিত বিবাদ চুলায় যাউক আত্মীয়তাপূর্বক শেকহ্যাণ্ড করিতে গেলেও আশঙ্কার সম্ভাবনা জন্মে।

কারণ, এত অনৈক্যের সংঘাতে আত্মরক্ষা করা বড়ো কঠিন। আমরা দুর্বল বলিয়াই ভয় হয় যে, সাহেবের কাছে যদি একবার ঘেঁষি, সাহেব যদি অনুগ্রহ করিয়া আমার প্রতি কিছু সুপ্রসন্ন হাস্য বর্ষণ করে তাহার প্রলোভন আমার কাছে বড়ো বেশি—এত বেশি যে, সে-অনুগ্রহের তুলনায় আমাদের যথার্থ হিত আমরা ভুলিয়া যাইতে পারি। সাহেব যদি হাসিয়া বলিয়া বসে, বাঃ বাবু, তুমি তো ইংরেজি মন্দ বল না; তাহার পর হইতে বাংলার চর্চা করা আমার পক্ষে বড়োই কঠিন হইয়া উঠে। যে বহিরংশে ইংরেজের অনুগ্রহদৃষ্টি পড়ে সেই অংশেরই চাকচিক্য সাধনে প্রবৃত্তি হয়; যেদিকটা য়ুরোপের চক্ষুগোচর হইবার সম্ভাবনা নাই সেদিকটা অন্ধকারে অনাদরে আবর্জনায় আচ্ছন্ন হইয়া থাকে। সেদিকের কোনোরূপ সংশোধনে হাত দিতে আলস্য বোধ হয়।

মানুষকে দোষ দিতে পারি না; অকিঞ্চন অপমানিতের পক্ষে এ প্রলোভন বড়ো স্বাভাবিক। সৌভাগ্যবানের প্রসন্নতায় তাহাকে বিচলিত না করিয়া থাকিতে পারে না।

আজ আমি বলিতেছি, ভারতবর্ষের দীনতম মলিনতম কৃষককেও আমি ভাই বলিয়া আলিঙ্গন করিব আর ওই যে রাঙা সাহেব টমটম হাঁকাইয়া আমার সর্বাঙ্গে কাদা ছিটাইয়া চলিয়া যাইতেছে উহার সহিত আমার কানাকড়ির সম্পর্ক নাই।

ঠিক এমন সময়টিতে যদি উক্ত রাঙা সাহেব হঠাৎ টমটম থামাইয়া আমারই দরিদ্র কুটিরে পদার্পণ করিয়া বলে, “বাবু তোমার কাছে দেশালাই আছে?” তখন ইচ্ছা করে দেশের পঞ্চবিংশতি কোটি লোক সারি সারি কাতার দিয়া দাঁড়াইয়া দেখিয়া যায় যে, সাহেব আজ আমারই বাড়িতে দেশালাই চাহিতে আসিয়াছে। এবং দৈবাৎ ঠিক সেই সময়টিতে যদি আমার দীনতম মলিনতম কৃষক ভাইটি মাঠাকরুনকে প্রণাম করিবার জন্য আমার দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হয় তখন সেই কুৎসিত দৃশ্যটিকে ধরণীতলে বিলুপ্ত করিয়া দিতে ইচ্ছা করে; পাছে সেই বর্বরের সহিত আমার কোনো যোগ কোনো সংস্রব কোনো সুদূর ঐক্য বড়ো সাহেবের কল্পনাপথে উদিত হয়।

অতএব, যখন মনে মনে বলি সাহেবের কাছে আর ঘেঁষিব না তখন অহংকারের সহিত বলি না, বড়ো বিনয়ের সহিত বড়ো আশঙ্কার সহিত বলি। জানি যে, সেই সৌভাগ্যগর্বেই আমার সর্বাপেক্ষা সর্বনাশ হইবে—আমি আর নিভৃতে বসিয়া আপনার কর্তব্যপালন করিতে পারিব না, মনটা সর্বদাই উড়ু উড়ু করিতে থাকিবে এবং

আপনাদের দরিদ্র স্বজনের খ্যাতিহীন গৃহটাকে বড়োই বেশি শূন্য বলিয়া বোধ হইবে। যাহাদের জন্য জীবন উৎসর্গ করা আমার কর্তব্য তাহাদের সহিত নিকট-আত্মীয়ের মতো ব্যবহার করিতে আমার লজ্জা বোধ হইবে।

ইংরেজ তাহাদের আমোদপ্রমোদ আহারবিহার আসঙ্গপ্রসঙ্গ বন্ধুত্বপ্রণয় হইতে আমাদিগকে সর্বতোভাবে বহিষ্কৃত করিয়া দ্বার রুদ্ধ রাখিতে চাহে তবু আমরা নত হইয়া প্রণত হইয়া ছল করিয়া কল করিয়া একটুখানি প্রবেশাধিকার পাইলে, রাজসমাজের একটু ঘ্রাণমাত্র পাইলে, এত কৃতার্থ হই যে, আপনার দেশের লোকের আত্মীয়তা সে-গৌরবের নিকট তুচ্ছ বোধ হয়, এমন স্থলে, এমন দুর্বল মানসিক অবস্থায় সেই সর্বনাশী অনুগ্রহমদ্যকে অপেয়মস্পর্শং বলিয়া সর্বথা পরিহার করাই কর্তব্য।

আরও একটা কারণ আছে। ইংরেজের অনুগ্রহকে কেবল গৌরব মনে করিয়া কেবল নিঃস্বার্থভাবে ভোগ করাও আমাদের পক্ষে কঠিন। কারণ আমরা দরিদ্র, এবং জঠরানল কেবল সম্মানবর্ষণে শান্ত হয় না। আমরা অনুগ্রহটিকে সুবিধায় ভাঙাইয়া লইতে চাহি। কেবল অনুগ্রহ নহে সেই সঙ্গে কিছু অন্নেরও প্রত্যাশা রাখি। কেবল শেকহ্যাণ্ড নহে চাকরিটা বেতনবৃদ্ধিটাও আবশ্যক। প্রথম দুই দিন যদি সাহেবের কাছে বন্ধুর মতো আনাগোনা করি তো তৃতীয় দিনে ভিক্ষুকের মতো হাত পাতিতে লজ্জা বোধ করি না। সুতরাং সম্বন্ধটা বড়োই হীন হইয়া পড়ে। এদিকে অভিমান করি যে, ইংরেজ আমাদিগকে সমকক্ষ ভাবের সম্মান দেয় না ওদিকে তাহাদের দ্বারস্থ হইয়া ভিক্ষা করিতেও ছাড়ি না।

ইংরেজ আমাদের দেশী সাক্ষাৎকারীকে উমেদার, অনুগ্রহপ্রার্থী অথবা টাইটেল-প্রত্যাশী না মনে করিয়া থাকিতে পারে না। কারণ, ইংরেজের সঙ্গে তো আমাদের দেখাশুনার কোনো সম্বন্ধই নাই। তাহাদের ঘরের দ্বার রুদ্ধ, আমাদের কপাটে তালা। তবে আজ হঠাৎ ওই যে লোকটা পাগড়ি-চাপকান পরিয়া শঙ্কিতগমনে আসিতেছে, অপ্রস্তুত অভদ্রের মতো অনভ্যস্ত অশোভন ভাবে সেলাম করিতেছে, কোথায় বসিবে ভাবিয়া পাইতেছে না এবং থতমত খাইয়া কথা কহিতেছে উহার সহসা এত বিরহবেদনা কোথা হইতে উৎপন্ন হইল যে, দ্বারীকে কিঞ্চিৎ পারিতোষিক দিয়াও সাহেবের মুখচন্দ্রমা দেখিতে আসিয়াছে?

যাহার অবস্থা হীন সে যেন বিনা আমন্ত্রণে বিনা আদরে সৌভাগ্যশালীর সহিত ঘনিষ্ঠতা করিতে না যায়—তাহাতে কোনো পক্ষেরই মঙ্গল হয় না। ইংরেজ এ-দেশে আসিয়া ক্রমশই নূতন মূর্তি ধারণ করিতে থাকে তাহার অনেকটা কি আমাদেরই

হীনতাবশত নহে ? সেইজন্যও বলি, অবস্থা যখন এতই মন্দ তখন আমাদের সংস্রব সংঘর্ষ হইতে ইংরেজকে রক্ষা করিলে উঁহাদেরও চরিত্রের এমন দ্রুত বিকৃতি হইবে না। সে উভয় পক্ষেরই লাভ।

অতএব সকল দিক পর্যালোচনা করিয়া রাজাপ্রজার বিদ্বেষভাব শমিত রাখিবার প্রকৃষ্ট উপায় এই দেখা যাইতেছে ইংরেজ হইতে দূরে থাকিয়া আমাদের নিকটকর্তব্যসকল পালনে একান্তমনে নিযুক্ত হওয়া। কেবলমাত্র ভিক্ষা করিয়া কখনোই আমাদের মনের যথার্থ সন্তোষ হইবে না। আজ আমরা মনে করিতেছি ইংরেজের নিকট হইতে কতকগুলি অধিকার পাইলেই আমাদের সকল দুঃখ দূর হইবে। ভিক্ষাস্বরূপে সমস্ত অধিকারগুলি যখন পাইব তখনও দেখিব অন্তর হইতে লাঞ্ছনা কিছুতেই দূর হইতেছে না—বরং যতদিন না পাইয়াছি ততদিন যে-সান্ত্বনাটুকু ছিল সে সান্ত্বনাও আর থাকিবে না। আমাদের অন্তরের শূন্যতা না পুরাইতে পারিলে কিছুতেই আমাদের শান্তি নাই। আমাদের স্বভাবকে সমস্ত ক্ষুদ্রতার বন্ধন হইতে মুক্ত করিতে পারিলে তবেই আমাদের যথার্থ দৈন্য দূর হইবে এবং তখন আমরা তেজের সহিত সম্মানের সহিত রাজসাক্ষাতে যাতায়াত করিতে পারিব।

আমি এমন বাতুল নহি যে, আশা করিব সমস্ত ভারতবর্ষ পদচিন্তা প্রভাবচিন্তা ইংরেজের প্রসাদচিন্তা ত্যাগ করিয়া, বাহ্য আস্ফালন বাহ্য যশ-খ্যাতি পরিহার করিয়া ইংরেজ-আকর্ষণের প্রবল মোহ হইতে আপনাকে রক্ষা করিয়া, নির্বিঘ্নমনে অবিচলিতচিত্তে চরিত্রবল সঞ্চয় করিবে, জ্ঞানবিজ্ঞান অর্জন করিবে, স্বাধীন বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইবে, পৃথিবী ভ্রমণ করিয়া লোকব্যবহার শিক্ষা করিবে, পরিবার ও সমাজের মধ্যে সত্যাচরণ সত্যানুষ্ঠান প্রচার করিবে, মানুষ যেমন আপন মস্তক সহজে বহন করে তেমনি অনায়াসে স্বভাবতই আপনার সম্মান ঊর্ধ্বে বহন করিয়া রাখিবে, লালায়িত লোলজিহ্বায় পরের কাছে মান যাচ্ঞা করিতে যাইবে না এবং ধর্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ এই কথাটির সুগভীর তাৎপর্য সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ংগম করিবে। এ-কথা সুবিদিত যে, সুবিধার ঢাল যে-দিকে, মানুষ অলক্ষিতে ধীরে ধীরে সেই দিকে গড়াইয়া যায় ; যদি হ্যাটকোট পরিয়া ইংরেজি ভাষা অবলম্বন করিয়া, ইংরেজের দ্বারস্থ হইয়া, ইংরেজিতে নিজেকে বড়ো বড়ো অক্ষরে তর্জমা করিয়া কোনো সুবিধা থাকে তবে অল্পে অল্পে লোকে হ্যাটকোট ধরিবে, সন্তানদিগকে বহুচেষ্টায় বাংলা ভুলিতে দিবে এবং নিজের পিতা-ভ্রাতার অপেক্ষা সাহেবের দ্বারবানমহলে বেশি আত্মীয়তা স্থাপন করিবে। এ প্রবাহ রোধ করা দুঃসাধ্য।

দুঃসাধ্য, তবু মনের আক্ষেপ স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করিয়া বলা আবশ্যক। যদি অরণ্যে রোদনও হয় তবু বলিতে হইবে যে, ইংরেজি ফলাইয়া কোনো ফল নাই, স্বভাষার শিক্ষার

মূলভিত্তি স্থাপন করিয়াই দেশের স্থায়ী উন্নতি; ইংরেজের কাছে আদর কুড়াইয়া কোনো ফল নাই, আপনাদের মনুষ্যত্বকে সচেতন করিয়া তোলাতেই যথার্থ গৌরব; অন্যের নিকট হইতে ফাঁকি দিয়া আদায় করিয়া কিছু পাওয়া যায় না, প্রাণপণ নিষ্ঠার সহিত ত্যাগস্বীকারেই প্রকৃত কার্যসিদ্ধি।

শিখদিগের শেষগুরু গুরুগোবিন্দ যেমন বহুকাল জনহীন দুর্গম স্থানে বাস করিয়া নানা জাতির নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া সুদীর্ঘ অবসর লইয়া আত্মোন্নতিসাধনপূর্বক তাহার পর নির্জন হইতে বাহির হইয়া আসিয়া আপনার গুরুপদ গ্রহণ করিয়াছিলেন তেমনি আমাদের যিনি গুরু হইবেন তাঁহাকেও খ্যাতিহীন নিভৃত আশ্রমে অজ্ঞাতবাস যাপন করিতে হইবে, পরম ধৈর্যের সহিত গভীর চিন্তায় নানা দেশের জ্ঞানবিজ্ঞানে আপনাকে গড়িয়া তুলিতে হইবে, সমস্ত দেশ অনিবার্যবেগে অন্ধভাবে যে-আকর্ষণে ধাবিত হইয়া চলিয়াছে সেই আকর্ষণ হইতে বহুযত্নে আপনাকে দূরে রক্ষা করিয়া পরিষ্কার সুস্পষ্টরূপে হিতাহিতজ্ঞানকে অর্জন ও মার্জন করিতে হইবে—তাহার পরে তিনি বাহির হইয়া আসিয়া যখন আমাদের চিরপরিচিত ভাষায় আমাদিগকে আহ্বান করিবেন আদেশ করিবেন, তখন আর কিছু না হউক সহসা চৈতন্য হইবে এতদিন আমাদের একটা ভ্রম হইয়াছিল, আমরা একটা স্বপ্নের বশবর্তী হইয়া চোখ বুজিয়া সংকটের পথে চলিতেছিলাম, সেইটাই পতনের উপত্যকা।

আমাদের সেই গুরুদেব আজিকার দিনের এই উদ্‌ভ্রান্ত কোলাহলের মধ্যে নাই; তিনি মান চাহিতেছেন না, পদ চাহিতেছেন না, ইংরেজি কাগজের রিপোর্ট চাহিতেছেন না, তিনি সমস্ত মত্ততা হইতে মূঢ় জনস্রোতের আবর্ত হইতে আপনাকে সযত্নে রক্ষা করিতেছেন; কোনো একটি বিশেষ আইন সংশোধন করিয়া বা বিশেষ সভায় স্থান পাইয়া আমাদের কোনো যথার্থ দুর্গতি দূর হইবে আশা করিতেছেন না। তিনি নিভৃতে শিক্ষা করিতেছেন এবং একান্তে চিন্তা করিতেছেন; আপনার জীবনকে মহোচ্চ আদর্শে অটল উন্নত করিয়া তুলিয়া চারিদিকের জনমণ্ডলীকে অলক্ষ্যে আকর্ষণ করিতেছেন। তিনি চতুর্দিককে যেন উদার বিশ্বগ্রাহী হৃদয় দিয়া নীরবে শোষণ করিয়া লইতেছেন; এবং বঙ্গলক্ষ্মী তাঁহার প্রতি স্নেহদৃষ্টিপাত করিয়া দেবতার নিকট একান্তমনে প্রার্থনা করিতেছেন যেন এখনকার দিনের মিথ্যা তর্ক ও বাঁধি কথায় তাঁহাকে কখনো লক্ষ্যভ্রষ্ট না করে এবং দেশের লোকের বিশ্বাসহীন নিষ্ঠাহীনতায়, উদ্দেশ্যসাধন অসাধ্য বলিয়া তাঁহাকে নিরুৎসাহ করিয়া না দেয়। অসাধ্য বটে, কিন্তু এ-দেশের যিনি উন্নতি করিবেন অসাধ্যসাধনই তাঁহার ব্রত।

১৩০০

রাজনীতির দ্বিধা

সাধারণত ন্যায়পরতা দয়া প্রভৃতি অনেক বড়ো বড়ো গুণ আপন সমকক্ষ লোকদের মধ্যে যতটা স্ফূর্তি পায় অসমকক্ষ লোকদের মধ্যে ততটা স্ফূর্তি পায় না। এমন অনেক দেখা যায় যাঁহারা আপনার সমশ্রেণীর লোকের মধ্যে গৃহপালিত মৃগশিশুর মতো মৃদুস্বভাব তাঁহারাই নিম্নশ্রেণীয়দের নিকট ডাঙার বাঘ, জলের কুম্ভীর এবং আকাশের শ্যেনপক্ষিবিশেষ।

য়ুরোপীয় জাতি য়ুরোপে যত সভ্য, যত সদয়, যত ন্যায়পর, বাহিরে ততটা নহে এ-পর্যন্ত ইহার অনেক প্রমাণ পাওয়া গেছে। যাহারা খ্রীস্টানদের নিকট খ্রীস্টান অর্থাৎ গালে চড় খাইলে সময়বিশেষে অন্য গালটিও ফিরাইয়া দিতে বাধ্য হয় তাহারাই স্থানান্তরে গায়ে পড়িয়া অখ্রীস্টানের এক গালে চড় মারিয়া তাহাকে অন্য গাল ফিরাইতে বলে এবং অখ্রীস্টান যদি দুর্বুদ্ধিবশত উক্ত অনুরোধ পালনে ইতস্তত করে তবে তৎক্ষণাৎ তাহাকে কান ধরিয়া ঘরের বাহির করিয়া দিয়া তাহার ঘরের মধ্যে নিজের চৌকি টেবিল ও ক্যাম্পখাট আনিয়া হাজির করে, তাহার শস্যক্ষেত্র হইতে শস্য কাটিয়া লয়, তাহার স্বর্ণখনি হইতে স্বর্ণ উত্তোলন করে, তাহার গাভীগুলা হইতে দুগ্ধ দোহন করে এবং তাহার বাছুরগুলা কাটিয়া বাবুর্চিখানায় বোঝাই করিতে থাকে।

সভ্য খ্রীস্টান আমেরিকায় কিরূপ প্রলয়ব্যাপার এবং অস্ট্রেলিয়ায় কিরূপ নিদারুণ লোকসংহার উপস্থিত করিয়াছিল সেই অপেক্ষাকৃত পুরাতন কথা পাড়িবার আবশ্যক দেখি না। দক্ষিণ-আফ্রিকায় ম্যাটাবিলি যুদ্ধের বৃত্তান্ত ভালো করিয়া পর্যালোচনা করিয়া দেখিলেই, অখ্রীস্টানের গালে খ্রীস্টানি চড় কাহাকে বলে কতকটা বুঝিতে পারা যায়।

সমস্ত সংবাদ পুরাপুরি পাওয়া যায় না, এবং যাহা পাওয়া যায় তাহার যে সমস্তই সত্য তাহাতেও সন্দেহ আছে, কারণ, যুদ্ধসংবাদের টেলিগ্রাম রচনার ভার উক্ত খ্রীস্টানের হাতে। ট্রুথ নামক বিখ্যাত ইংরেজি সাপ্তাহিক পত্রে এই যুদ্ধ সম্বন্ধে যে কয়েকটি পত্র ও প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে তাহা পাঠকদিগকে পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

পাঠ করিয়া যে কেহ বিশেষ আশ্বস্ত হইবেন বা আনন্দ লাভ করিবেন এরূপ আশা দিতে পারি না, তবে এইটুকু বুঝিতে পারিবেন সভ্য জাতি যাহাকে আপনার অপেক্ষা অল্প সভ্য জ্ঞান করে তাহার নিকট আপন সভ্যতাকে এবং সেই সঙ্গে সেই অসভ্যটাকে বলিদান দিতে কুণ্ঠিত বোধ করে না। উনিশ শত বৎসরের চিরসঞ্চিত সভ্যনীতি,

য়ুরোপীয় আলোকিত নাট্যমঞ্চের বাহিরে অন্ধকার নেপথ্যদেশে ক্ষণপরিহিত ছদ্মবেশের মতো খসিয়া পড়ে এবং সেখানে যে আদিম উলঙ্গ মানুষ বাহির হইয়া পড়ে উলঙ্গ ম্যাটাবিলি তাহার অপেক্ষা নিকৃষ্টতর নহে।

কিছু সসংকোচে বলিলাম নিকৃষ্টতর নহে, নির্ভয়ে সত্য বলিতে গেলে অনেকাংশে শ্রেষ্ঠতর। বর্বর লবেঙ্গুলা ইংরেজদের প্রতি ব্যবহারে যে উদারতা এবং উন্নত বীরহৃদয়ের পরিচয় দিয়াছে ইংরেজদের ক্রূর ব্যবহার তাহার নিকট লজ্জায় ম্লান হইয়া রহিয়াছে ইংরেজের পত্রেই তাহা প্রকাশ পাইয়াছে।

কোনো ইংরেজ যে সে-কথা স্বীকার করে ইহাই অনেকে ইংরেজের গৌরব বলিয়া মনে করিবেন এবং আমিও তাহা করি। কিন্তু আজকাল ইংরেজের মধ্যে অনেকে সেটাকে গৌরব বলিয়া জ্ঞান করে না।

তাহারা মনে করে ধর্মনীতি আজকাল বড়ো বেশি সূক্ষ্ম হইয়া আসিতেছে। পদে পদে এত খুঁতখুঁত করিলে কাজ চলে না। ইংরেজের যখন গৌরবের মধ্যাহ্নকাল ছিল তখন নীতির সূক্ষ্ম গণ্ডিগুলা এক লম্ফে সে উল্লঙ্ঘন করিতে পারিত। যখন আবশ্যক তখন অন্যায় করিতে হইবে। নর্মান দস্যু যখন সমুদ্রে সমুদ্রে দস্যুবৃত্তি করিয়া বেড়াইত তখন তাহারা সুস্থ সবল ছিল, এখন তাহার যে ইংরেজ বংশধর ভিন্নজাতির প্রতি জবরদস্তি করিতে কুণ্ঠিত হয় সে দুর্বল রুগ্নপ্রকৃতি। কিসের ম্যাটাবিলি, কেই বা লবেঙ্গুলা, আমি ইংরেজ, আমি তোমার সোনার খনি, তোমার গোরুর পাল লুঠিতে ইচ্ছা করি ইহার জন্য এত ছুতা এত ছল কেন, মিথ্যা সংবাদই বা কেন বানাই, আর দুটো-একটা দুরন্তপনা ধরা পড়িলেই বা এত উচ্চৈঃস্বরে কাগজে পরিতাপ করিতে বসি কেন।

কিন্তু বালককালে যাহা শোভা পায় বয়সকালে তাহা শোভা পায় না। একটা দুরন্ত লুব্ধ বালক নিজের অপেক্ষা ছোটো এবং দুর্বলতর বালকের হাতে মোওয়া দেখিলে কাড়িয়া ছিঁড়িয়া লুটপাট করিয়া লইয়া এক মুহূর্তে মুখের মধ্যে পুরিয়া বসে, হৃতমোদক অসহায় শিশুর ক্রন্দন দেখিয়াও কিছুমাত্র অনুতপ্ত হয় না। এমন কি, হয়তো ঠাস করিয়া তাহার গালে একটা চড় বসাইয়া সবলে তাহার ক্রন্দন থামাইয়া দিতে চেষ্টা করে এবং অন্যান্য বালকেরাও মনে মনে তাহার বাহুবল ও দৃঢ় সংকল্পের প্রশংসা করিতে থাকে।

বয়সকালেও সেই বলবানের যদি অসংযত লোভ থাকে তবে সে আর চড় মারিয়া মোওয়া লয় না, ছল করিয়া লয় এবং যদি ধরা পড়ে তো কিছু অপ্রতিভ হয়। তখন সে আর পরিচিত প্রতিবেশীদের ঘরে হাত বাড়াইতে সাহস করে না; দূরে কোনো দরিদ্রপল্লীর অসভ্য মাতার উলঙ্গ শীর্ণ সন্তানের হস্তে যখন তাহার এক সন্ধ্যার

একমাত্র উপজীব্য খাদ্যখণ্ডটুকু দেখে চারিদিকে চাহিয়া গোপনে ছোঁ মারিয়া লয় এবং যখন তাহার ক্রন্দনে গগনতল বিদীর্ণ হইতে থাকে তখন সমাগত স্বজাতীয় পান্থদের প্রতি চোখ টিপিয়া বলে, এই অসভ্য কালো ছোকরাটাকে আচ্ছা শাসন করিয়া দিয়াছি। কিন্তু স্বীকার করে না যে, ক্ষুধা পাইয়াছিল তাই কাড়িয়া খাইয়াছি।

পুরাকালের দস্যুবৃত্তির সহিত এই অধুনাতন কালের চৌর্যবৃত্তির অনেক প্রভেদ আছে। এখনকার অপহরণব্যাপারের মধ্যে পূর্বকালের সেই নির্লজ্জ অসংকোচ বলদর্প থাকিতেই পারে না। এখন নিজের কাজের সম্বন্ধে নিজের চেতনা জন্মিয়াছে সুতরাং এখন প্রত্যেক কাজের জন্য বিচারের দায়িক হইতে হয়। তাহাতে কাজও পূর্বের মতো তেমন সহজে সম্পন্ন হয় না এবং গালিও খাইতে হয়। পুরাতন দস্যু যদি দুর্ভাগ্যক্রমে ঊনবিংশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করে তবে তাহার আবির্ভাব নিতান্ত অসাময়িক হইয়া পড়ে।

সমাজে এরূপ অসাময়িক আবির্ভাব সর্বদা ঘটিয়া থাকে। দস্যু বিস্তর জন্মে কিন্তু সহসা তাহাদিগকে চেনা যায় না—অকালে অস্থানে পড়িয়া তাহারা অনেক সময় আপনাদিগকেও চেনে না। এদিকে তাহারা গাড়ি চড়িয়া বেড়ায়, সংবাদপত্র পড়ে, হুইস্ট খেলে, স্ত্রীসমাজে মধুরালাপ করে, কেহ সন্দেহমাত্র করে না যে, এই সাদা কামিজ কালো কোর্তার মধ্যে রবিন হুডের নব অবতার ফিরিয়া বেড়াইতেছে।

য়ুরোপের বাহিরে গিয়া ইহারা সহসা পূর্ণশক্তিতে প্রকাশিত হইয়া পড়ে। ধর্মনীতির আবরণমুক্ত সেই উৎকট রুদ্রমূর্তির কথা পূর্বেই বলিয়াছি। কিন্তু য়ুরোপের সমাজমধ্যেই যে-সমস্ত ভস্মাচ্ছাদিত অঙ্গার আছে তাহাদেরও উত্তাপ বড়ো অল্প নহে।

ইহারাই আজকাল বলিতেছে, বলনীতির সহিত প্রেমনীতিকে যোগ করিলে নীতির নীতিত্ব বাড়িতে পারে কিন্তু বলের বলত্ব কমিয়া যায়। প্রেম দয়া এ-সব কথা শুনিতে বেশ—কিন্তু যেখানে আমরা রক্তপাত করিয়া আপন প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি সেখানে যে নীতিদুর্বল নব শতাব্দীর সুকুমারহৃদয় শিশু সেন্টিমেন্টের অশ্রুপাত করিতে আসে তাহাকে আমরা অন্তরের সহিত ঘৃণা করি। এখানে সংগীত সাহিত্য শিল্পকলা এবং শিষ্টাচার, সেখানে উলঙ্গ তরবারি এবং অসংকোচ একাধিপত্য।

এইজন্য আমাদের কর্তৃজাতীয়দের মধ্য হইতে আজকাল দুই সুরের গলা শুনা যায়। একদল প্রবলতার পক্ষপাতী, আর একদল প্রেম এবং শান্তি এবং সুবিচার জগতে বিস্তার করিতে চাহে।

জাতির হৃদয় এইরূপে বিভক্ত হইয়া গেলে বলের খর্বতা হয়—আপনি আপনাকে বাধা দিতে থাকে। আজকাল ভারতবর্ষীয় ইংরেজসম্প্রদায় ইহাই লইয়া সুতীব্র আক্ষেপ

করে। তাহারা বলে, আমরা কিছু জোরের সহিত যে-কাজটা করিতে চাই ইংলণ্ডীয় ভ্রাতারা তাহাতে বাধা দিয়া বসে। সকল কথাতেই নৈতিক কৈফিয়ত দিতে হয়। যখন দস্যু ড্রেক সমুদ্রদিগ্‌বিজয় করিয়া বেড়াইত, যখন ক্লাইব ভারতভূমিতে বৃটিশ ধ্বজা খাড়া করিয়া দাঁড়াইল তখন নীতির কৈফিয়ত দিতে হইলে ঘরের বাহিরে ইংরেজের ছেলের এক ছটাক জমি মিলিত না।

কিন্তু এমন করিয়া যতই বিলাপ কর কিছুতেই আর সেই অখণ্ড দোর্দণ্ড বলের বয়সে ফিরিয়া যাইতে পারিবে না। এখন কোনো জুলুমের কাজ করিতে বসিলেই সমস্ত দেশ ব্যাপিয়া একটা দ্বিধা উপস্থিত হইবে। এখন যদি কোনো নিপীড়িত ব্যক্তি ন্যায়বিচার প্রার্থনা করে তবে স্বার্থহানির সম্ভাবনা থাকিলেও, নিদেন, গুটিকতক লোকও তাহার সদ্‌বিচার করিতে উদ্যত হইবে। এখন একজন ব্যক্তিও যদি ন্যায়ের দোহাই দিয়া উঠিয়া দাঁড়ায় তবে প্রবল স্বার্থপরতা হয় লজ্জায় কিঞ্চিৎ সংকুচিত হইয়া পড়ে, নয়, ন্যায়েরই ছদ্মবেশ ধারণ করিতে চেষ্টা করে। অন্যায় অনীতি যখন বলের সহিত আপনাকে অসংকোচে প্রকাশ করিত তখন বল ব্যতীত তাহার আর কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না, কিন্তু যখনই সে আপনাকে আপনি গোপন করিতে চেষ্টা করে এবং বলের সহিত আপন কুটুম্বিতা অস্বীকার করিয়া ন্যায়কে আপন পক্ষে টানিয়া বলী হইতে চায় তখনই সে আপনি আপনার শত্রুতা সাধন করে। এইজন্য বিদেশে ইংরেজ আজকাল কিঞ্চিৎ দুর্বল এবং সেজন্য সে সর্বদা অধৈর্য প্রকাশ করে।

আমরাও সেইজন্য ইংরেজের দোষ পাইলে তাহাকে দোষী করিতে সাহসী হই। সেজন্য ইংরেজ প্রভুরা কিছু রাগ করে। তাহারা বলে, নবাব যখন যথেচ্ছাচারী ছিল, বর্গি যখন লুটপাট করিত, ঠগি যখন গলায় ফাঁসি লাগাইত তখন তোমাদের কনগ্রেসের সভাপতি এবং সংবাদপত্রের সম্পাদক ছিল কোথায়। কোথাও ছিল না এবং থাকিলেও কোনো ফল হইত না। তখন গোপন বিদ্রোহী ছিল, মারহাট্টা এবং রাজপুত ছিল, তখন বলের বিরুদ্ধে বল ছাড়া গতি ছিল না। তখন চোরার নিকট ধর্মের কাহিনী উত্থাপন করিবার কথা কাহারও মনেও উদয় হইত না।

আজ যে কনগ্রেস এবং সংবাদপত্রের অভ্যুদয় হইয়াছে তাহার কারণই এই যে, ইংরেজের মধ্যে অখণ্ড বলের প্রাদুর্ভাব নাই। এখন চোরকে ধর্মের কাহিনী বলিলে যদি বা সে না মানে তবু তার একটা ধর্মসংগত জবাব দিতে চেষ্টা করে এবং ভালো জবাবটি দিতে না পারিলে তেমন বলের সহিত কাজ করিতে পারে না। অতএব যে-সকল ইংরেজ ভারতবর্ষীয় সভাসমিতি ও সংবাদপত্রের বাহুল্যবিস্তারে আক্ষেপ প্রকাশ করে, তাহারা যথার্থপক্ষে স্বদেশীয়দের জাতীয় প্রকৃতিতে ধর্মবুদ্ধির অস্তিত্ব লইয়া দুঃখ

করে। তাহারা যে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছে, তাহারা যে নিজের ত্রুটির জন্য নিজে লজ্জিত হইতে শিখিয়াছে ইহাই তাহাদের নিকট শোচনীয় বলিয়া বোধ হয়

এক হিসাবে ইহার মধ্যে কতকটা শোচনীয়তা আছে। এদিকে ক্ষুধার জ্বালাও নিবারণ হয় নাই ওদিকে পরের অন্নও কাড়িতে পারিব না এ এক বিষম সংকট। জাতির পক্ষে নিজের জীবনরক্ষা এবং ধর্মরক্ষা উভয়ই পরমাবশ্যক। পরের প্রতি অন্যায়াচরণ করিলে যে পরের ক্ষতি হয় তাহা নহে নিজেদের ধর্মের আদর্শ ক্রমশ ভিত্তিহীন হইয়া পড়ে। দাসদের প্রতি যাহারা অত্যাচার করে তাহারা নিজের চরিত্র ধ্বংস করে। ধর্মকে সর্বপ্রযত্নে বলবান না রাখিলে আপনাদের মধ্যে জাতীয় বন্ধন ক্রমশ শিথিল হইয়া পড়িতে থাকে। অপর পক্ষে, পেট ভরিয়া খাইতেও হইবে। ক্রমে বংশবৃদ্ধি ও স্থানাভাব হইতেছে এবং সভ্যতার উন্নতিসহকারে জীবনের আবশ্যক উপকরণ অতিরিক্ত বাড়িয়া চলিয়াছে।

অতএব পঁচিশ কোটি ভারতবাসীর অদৃষ্টে যাহাই থাক মোটাবেতনের ইংরেজ কর্মচারীকে এক্সচেঞ্জের ক্ষতিপূরণস্বরূপ রাশি রাশি টাকা ধরিয়া দিতে হইবে। সেইজন্য রাজকোষে যদি টাকার অনটন পড়ে তবে পণ্যদ্রব্যে মাশুল বসানো আবশ্যক হইবে। কিন্তু তাহাতে যদি ল্যাঙ্কাশিয়রের কিঞ্চিৎ অসুবিধা হয় তবে তুলার উপর মাশুল বসানো যাইতে পারে। তৎপরিবর্তে বরঞ্চ পবলিক ওআর্কস কিছু খাটো করিয়া এবং দুর্ভিক্ষ-ফণ্ড বাজেয়াপ্ত করিয়া কাজ চালাইয়া লইতে হইবে।

একদিকে ইংরেজ কর্মচারীদিগেরও কষ্ট চক্ষে দেখা যায় না, অপরদিকে ল্যাঙ্কাশিয়রের ক্ষতিও প্রাণে সহ্য হয় না। এদিকে আবার পঞ্চবিংশতিকোটি হতভাগ্যের জন্য যে কিছুমাত্র দুঃখ হয় না তাহাও নহে। ধর্মনীতি এমন সংকটেও ফেলে !

অমনি খবরের কাগজে ঢাক বাজিয়া যায়, আহতনীড় পক্ষিসমাজের ন্যায় সভাস্থলে কর্ণবধির কলকলধ্বনি উত্থিত হয়, ইংরেজ ভারি চটিয়া উঠে।

যখন কাজটা ন্যায়সংগত হইতেছে না বলিয়া মন বলিতেছে অথচ না করিয়াও এড়াইবার জো নাই সেই সময়ে ধর্মের দোহাই পাড়িতে থাকিলে বিষম রাগ হয়। তখন রিক্তহস্তে কোনো যুক্তি-অস্ত্র না থাকাতে একেবারে ঘুষি মারিতে ইচ্ছা করে। কেবল মানুষটা নহে ধর্মশাস্ত্রটার উপরেও দিক ধরিয়া যায়।

ভারত-মন্ত্রিসভার সভাপতি এবং অনেক মাতব্বর সভ্য ভাবগতিকে বলিয়াছেন যে, কেবল ভারতবর্ষের নহে সমস্ত ইংরেজ-রাজ্যের মুখ চাহিয়া যখন আইন করিতে হইবে তখন কেবল স্থানীয় ন্যায়-অন্যায় বিচার করিলে চলিবে না এবং করিলে তাহা টিঁকিবেও না। ল্যাঙ্কাশিয়র স্বপ্ন নহে। ভারতবর্ষের দুঃখ যেমন সত্য ল্যাঙ্কাশিয়রের লাভও তেমনি

সভা, বরঞ্চ শেষোক্তটার বল কিছু বেশি। আমি যেন ভারত-মন্ত্রিসভায় ল্যাঙ্কাশিয়রকে ছাড়িয়া দিয়াই একটা আইন পাস করিয়া দিলাম, কিন্তু ল্যাঙ্কাশিয়র আমাকে ছাড়িবে কেন? কমলি নেহি ছোড়তা—বিশেষত কমলির গায়ে খুব জোর আছে।

চতুর্দিকের অবস্থাকে উপেক্ষা করিয়া তাড়াতাড়ি একটা আইন পাস করিয়া শেষকালে আবার দায়ে পড়িয়া তাহা হইতে পশ্চাদ্‌বর্তী হইলেও মান থাকে না, এদিকে আবার কৈফিয়তও তেমন সুবিধামতো নাই। নবাবের মতো বলিতে পারি না যে, আমার যে-অভাব হইবে আমার যেমন ইচ্ছা তাহা পূরণ করিব, ওদিকে ন্যায়বুদ্ধিতে যাহা বলে তাহা সম্পন্ন করিবার অলঙ্ঘ্য বিঘ্ন—অথচ এই সংকটের অবস্থাটাও সাধারণের কাছে প্রকাশ করিতে লজ্জা বোধ হয়, ইহা বাস্তবিকই শোচনীয় বটে।

এইরূপ সময়টায় আমরা দেশী সভা এবং দেশী কাগজপত্রে যখন গোলমাল করিতে আরম্ভ করিয়া দিই তখন সাহেবেরা মাঝে মাঝে আমাদিগকে শাসায় এবং গবর্মেন্ট যদি বা আমাদের গায়ে হাত তুলিতে সংকোচ বোধ করে, ছোটো ছোটো কর্তারা কোনো সুযোগে একবার আমাদিগকে হাতে পাইলে ছাড়িতে চায় না এবং ভারতবর্ষীয় ইংরেজের বড়ো বড়ো খবরের কাগজগুলো শৃঙ্খলবদ্ধ কুকুরের মতো দাঁত বাহির করিয়া আমাদের প্রতি অবিশ্রাম তারস্বর প্রয়োগ করিতে থাকে। ভালো, যেন আমরাই চুপ করিলাম কিন্তু তোমাদের আপনাদিগকে থামাও দেখি। তোমাদের মধ্যে যাঁহারা স্বার্থকে উপেক্ষা করিয়া ধর্মের পতাকা ধরিয়া দণ্ডায়মান হন, তাঁহাদিগকে নির্বাসিত করো, তোমাদের জাতীয় প্রকৃতিতে যে ন্যায়পরতার আদর্শ আছে তাহাকে পরিহাস করিয়া ম্লান করিয়া দাও।

কিন্তু সে কিছুতেই হইবে না। তোমাদের রাজনীতির মধ্যে ধর্মবুদ্ধি একটা সত্য পদার্থ। কখনো বা তাহার জয় হয় কখনো বা তাহার পরাজয় হয় কিন্তু তাহাকে বাদ দিয়া চলিতে পারে না। আয়র্লণ্ড যখন ব্রিটেনিয়ার নিকট কোনো অধিকার প্রার্থনা করে তখন সে যেমন একদিকে খুনের ছুরিতে শান দিতে থাকে তেমনি অন্যদিকে ইংলণ্ডের ধর্মবুদ্ধিকে আপন দলে লইতে চেষ্টা করে। ভারতবর্ষ যখন বিদেশী স্বামীর দ্বারে আপন দুঃখ নিবেদন করিতে সাহসী হয় তখন সেও ইংরেজের ধর্মবুদ্ধিকে আপন সহায় করিবার জন্য ব্যগ্র হয়। মাঝে হইতে ইংরেজের রাজকার্যে ল্যাঠা বিস্তর বাড়িয়া যায়।

কিন্তু যতদিন ইংরেজপ্রকৃতির কোথাও এই সচেতন ধর্মবুদ্ধির প্রভাব থাকিবে, যতদিন তাহার নিজের মধ্যেই তাহার নিজের সুকৃতি-দুষ্কৃতির একটি বিচারক বর্তমান থাকিবে ততদিন আমাদের সভাসমিতি বাড়িয়া চলিবে, আমাদের সংবাদপত্র ব্যাপ্ত

হইতে থাকিবে। ইহাতে আমাদের বলবান ইংরেজগণ বিফল গাত্রদাহে যতই অধীর হইয়া উঠিবে আমাদের উৎসাহ এবং উদ্যমের আবশ্যকতা ততই আরও বাড়াইয়া তুলিবে মাত্র।

১৩০০

অপমানের প্রতিকার

একদা কোনো উচ্চপদস্থ বাঙালি গবর্মেন্ট-কর্মচারীর বাড়িতে কোনো কলেজের ইংরেজ অধ্যক্ষ নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। তখন জুরি-দমন বিল লইয়া দেশে একটা আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল।

আহারান্তে নিমন্ত্রিত মহিলাগণ পার্শ্ববর্তী গৃহে উঠিয়া গেলে প্রসঙ্গক্রমে জুরিপ্রথার কথা উঠিল। ইংরেজ প্রোফেসর কহিলেন, যে-দেশের লোক অর্ধসভ্য, অর্ধশিক্ষিত, যাহাদের ধর্মনীতির আদর্শ উন্নত নহে, জুরির অধিকার তাহাদের হস্তে কুফল প্রসব করে।

শুনিয়া এই কথা মনে করিলাম, ইংরেজ এত অধিক সভ্য হইয়াছে যে, আমাদের সহিত সভ্যতা রক্ষা সে বাহুল্য জ্ঞান করে। আমাদের নৈতিক আদর্শ কত মাত্রা উঠিয়াছে অথবা নামিয়াছে জানি না, কিন্তু ইহা জানি, যাহার আতিথ্য ভোগ করিতেছি তাঁহার স্বজাতিকে পরুষবাক্যে অবমাননা করা আমাদের শিষ্টনীতির আদর্শের অনেক বাহিরে।

অধ্যাপক মহাশয় আর-একটি কথা বলিয়াছিলেন, যে-কথা কেবলমাত্র অমিষ্ট ও অশিষ্ট নহে পরন্তু ইংরেজের মুখে অত্যন্ত অসংগত শুনিতে হইয়াছিল। তিনি বলিয়াছিলেন, জীবনের পবিত্রতা, অর্থাৎ জীবনের প্রতি হস্তক্ষেপ করার পরমদূষণীয়তা সম্বন্ধে ভারতবাসীর ধারণা ইংরেজের তুলনায় অত্যন্ত স্বল্পপরিমিত। সেইজন্য হত্যাকারীর প্রতি ভারতবর্ষীয় জুরির মনে যথোচিত বিদ্বেষের উদ্রেক হয় না।

যাহারা মাংসাশী জাতি এবং যাহারা বিরাট হত্যাকাণ্ডের দ্বারা পৃথিবীর দুই নবাবিষ্কৃত মহাদেশের মধ্যে আপনাদের বাসযোগ্য স্থান পরিষ্কার করিয়া লইয়াছে, এবং সম্প্রতি তরবারির দ্বারা তৃতীয় মহাদেশের প্রচ্ছন্ন বক্ষোদেশ অল্পে অল্পে বিদীর্ণ করিয়া তাহার শস্য-অংশটুকু সুখে ভক্ষণ করিবার উপক্রম করিতেছে তাহারা যদি নিমন্ত্রণ-সভায় আরামে ও স্পর্ধাভরে নৈতিক আদর্শের উচ্চ দণ্ডে চড়িয়া বসিয়া জীবনের

পবিত্রতা ও প্রাণহিংসার অকর্তব্যতা সম্বন্ধে অহিংসক ভারতবর্ষকে উপদেশ দিতে থাকে তবে অহিংসা পরমোধর্মঃ এই শাস্ত্রবাক্য স্মরণ করিয়াই সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিতে হয়।

এই ঘটনা আজ বছর দুয়েকের কথা হইবে। সকলেই জানেন তাহার পরে এই দুই বৎসরের মধ্যে ইংরেজ কর্তৃক অনেকগুলি ভারতবাসীর অপমৃত্যু ঘটিয়াছে এবং ইংরেজের আদালতে সেই সকল হত্যাকাণ্ডে এক জন ইংরেজেরও দোষ সপ্রমাণ হয় নাই। সংবাদপত্রে উপর্যুপরি এই সকল সংবাদ পাঠ করা যায় এবং ভারতবর্ষীয়ের প্রতি সেই মুণ্ডিতগুম্ফশ্মশ্রু খড়্গনাসা ইংরেজ অধ্যাপকের তীব্র ঘৃণাবাক্য এবং জীবনহনন সম্বন্ধে তাঁহাদের নৈতিক আদর্শের শ্রেষ্ঠত্বাভিমান মনে পড়ে। মনে পড়িয়া তিলমাত্র সান্ত্বনা লাভ হয় না।

ভারতবর্ষীয়ের প্রাণ এবং ইংরেজের প্রাণ ফাঁসিকাষ্ঠের অটল তুলাদণ্ডে এক ওজনে তুলিত হইয়া থাকে ইহা বোধ হয় ইংরেজ মনে মনে রাজনৈতিক কুদৃষ্টান্তস্বরূপে গণ্য করে।

ইংরেজ এমন কথা মনে করিতে পারে, আমরা গুটিকতক প্রবাসী পঁচিশ কোটি বিদেশীকে শাসন করিতেছি। কিসের জোরে? কেবলমাত্র অস্ত্রের জোরে নহে, নামের জোরেও বটে। সেইজন্য সর্বদাই বিদেশীর মনে ধারণা জন্মাইয়া রাখা আবশ্যক আমরা তোমাদের অপেক্ষা পঁচিশ কোটি গুণে শ্রেষ্ঠ। আমরা সমান ক্ষেত্রে আছি এরূপ ধারণার লেশমাত্র জন্মিতে দিলে আমাদের বলক্ষয় হয়। পরস্পরের মধ্যে একটা সুদূর ব্যবধান, অধীন জাতির মনে একটা অনির্দিষ্ট সম্ভ্রম এবং অকারণ ভয় শতসহস্র সৈন্যের কাজ করে। ভারতবর্ষীয় যে, কোনোদিন বিচারে নিজের প্রাণের পরিবর্তে ইংরেজকে প্রাণত্যাগ করিতে দেখে নাই, ইহাতে তাহার মনে সেই সম্ভ্রম দৃঢ় হয়—মনে ধারণা হয় আমার প্রাণে ইংরেজের প্রাণে অনেক তফাত, অসহ্য অপমান অথবা নিতান্ত আত্মরক্ষার স্থলেও ইংরেজের গায়ে হাত তুলিতে তাহার দ্বিধা হয়।

এই পলিসির কথা স্পষ্টত অথবা অস্পষ্টত ইংরেজের মনে আছে কিনা জোর করিয়া বলা কঠিন—কিন্তু এ-কথা অনেকটা নিশ্চয় অনুমান করা যাইতে পারে যে, স্বজাতীয় প্রাণের পবিত্রতা তাঁহারা মনে মনে অত্যন্ত অধিক করিয়া উপলব্ধি করেন। একজন ইংরেজ ভারতবর্ষীয়কে হত্যা করিলে নিঃসন্দেহ তাঁহারা দুঃখিত হন—সেটাকে একটা "গ্রেট মিস্টেক", এমন কি, একটা "গ্রেট শেম" মনে করাও তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব—কিন্তু তাই বলিয়া তাহার শাস্তিস্বরূপে য়ুরোপীয়ের প্রাণ হরণ করা তাঁহারা সমুচিত মনে করিতে পারেন না। তদপেক্ষা লঘু শাস্তি যদি আইনে নির্দিষ্ট থাকিত তবে ভারতবর্ষীয়

হত্যাপরাধে ইংরেজের শাস্তি পাইবার সম্ভাবনা অনেক অধিক হইত। যে-জাতিকে নিজেদের অপেক্ষা অনেক নিকৃষ্টতর বলিয়া বিবেচনা করা যায়, সে-জাতি সম্বন্ধে আইনের ধারায় অপক্ষপাতের বিধান থাকিলেও বিচারকের অন্তঃকরণে অপক্ষপাত রক্ষিত হওয়া কঠিন হইয়া উঠে। সে-স্থলে প্রমাণের সামান্য ত্রুটি, সাক্ষ্যের সামান্য স্খলন এবং আইনের ভাষাগত তিলমাত্র ছিদ্রও স্বভাবতই এত বৃহৎ হইয়া উঠে যে, ইংরেজ অপরাধী অনায়াসে তাহার মধ্যে দিয়া গলিয়া বাহির হইয়া যাইতে পারে।

আমাদের দেশের লোকের পর্যবেক্ষণশক্তি এবং ঘটনাস্মৃতি তেমন পরিষ্কার এবং প্রবল নহে; আমাদের স্বভাবের মধ্যে মানসিক শৈথিল্য এবং কল্পনার উচ্ছৃঙ্খলতা আছে এ-দোষ স্বীকার করিতেই হয়। একটা ঘটনার মধ্যে উপস্থিত থাকিয়াও তাহার সমস্ত আনুপূর্বিক পরম্পরা আমাদের মনে মুদ্রিত হইয়া যায় না—এইজন্য আমাদের বর্ণনার মধ্যে অসংগতি ও দ্বিধা থাকে—এবং ভয় অথবা তর্কের মুখে পরিচিত সত্য ঘটনারও সূত্র হারাইয়া ফেলি। এইজন্য আমাদের দেশীয় সাক্ষ্যের সত্যমিথ্যা সূক্ষ্মরূপে নির্ধারণ করা বিদেশীয় বিচারকের পক্ষে সর্বদাই কঠিন। তাহার উপরে অভিযুক্ত যখন স্বদেশী তখন কঠিনতা শতসহস্রগুণে বাড়িয়া উঠে। আরও বিশেষত যখন স্বভাবতই ইংরেজের নিকটে স্বল্পাবৃত স্বল্পাহারা স্বল্পমান স্বল্পবল ভারতবাসীর "প্রাণের পবিত্রতা" স্বদেশীয়ের তুলনায় ক্ষুদ্রতমভগ্নাংশপরিমিত, তখন ভারতবর্ষের পক্ষে যথোপযুক্ত প্রমাণ সংগ্রহ করা একপ্রকার অসম্ভব হইয়া পড়ে। অতএব একে আমাদের সাক্ষ্য দুর্বল, তাহাতে প্লীহা প্রভৃতি আমাদের শারীরযন্ত্রগুলিরও বিস্তর ত্রুটি আবিষ্কৃত হইয়া থাকে, সুতরাং আমরা সহজে মারাও পড়ি এবং তাহার বিচার পাওয়াও আমাদের দ্বারা দুঃসাধ্য হয়।

লজ্জা এবং দুঃখ সহকারে এ-সমস্ত দুর্বলতা আমাদিগকে স্বীকার করিতে হয় কিন্তু সেই সঙ্গে এ সত্যটুকুও প্রকাশ করিয়া বলা উচিত যে, উপর্যুপরি এই সকল ঘটনায় দেশের লোকের চিত্ত নিরতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিতেছে। সাধারণ লোকে আইনের এবং প্রমাণের সূক্ষ্মবিচার করিতে পারে না। ভারতবর্ষীয়কে হত্যা করিয়া কোনো ইংরেজেরই প্রাণদণ্ড হয় না এই তথ্যটি বারংবার এবং অল্পকালের মধ্যে ঘন ঘন লক্ষ্য করিয়া তাহাদের মনে ইংরেজের অপক্ষপাত ন্যায়পরতা সম্বন্ধে সুতীব্র সন্দেহের উদয় হয়।

সাধারণ লোকের মূঢ়তার কেন দোষ দিই, গবর্মেণ্ট অনুরূপ স্থলে কী করেন? যদি তাঁহারা দেখেন কোনো ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট অধিকাংশসংখ্যক আসামিকে খালাস দিতেছেন, তখন তাঁহারা এমন বিবেচনা করেন না যে, সম্ভবত উক্ত ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট

অন্য ম্যাজিস্ট্রেট অপেক্ষা অধিকতর ন্যায়পর, এবং তিনি সাক্ষ্যের সত্যমিথ্যা সম্পূর্ণ নিঃসংশয় সূক্ষ্মরূপে নির্ণয় না করিয়া আসামিকে দণ্ড দিতে কুণ্ঠিত, অতএব এই সচেতন ধর্মবুদ্ধি এবং সতর্ক ন্যায়পরতার জন্য সত্বর তাঁহার পদবৃদ্ধি করিয়া দেওয়া কর্তব্য ; অথবা যদি দেখিতে পান যে, কোনো পুলিস-কর্মচারীর এলাকায় অপরাধের সংখ্যার তুলনায় অল্পসংখ্যক অপরাধী ধরা পড়িতেছে অথবা চালান আসামি বহুলসংখ্যায় খালাস পাইতেছে তখন তাঁহারা এমন তর্ক করেন না যে, সম্ভবত এই পুলিস-কর্মচারী অন্য পুলিস-কর্মচারী অপেক্ষা সৎপ্রকৃতির—ইনি সাধু লোককে চোর বলিয়া চালান দেন না এবং মিথ্যাসাক্ষ্য স্বহস্তে সৃজন করিয়া অভিযোগের ছিদ্রসকল সংশোধন করিয়া লন না, অতএব পুরস্কার স্বরূপে অচিরাৎ ইঁহার গ্রেড বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া কর্তব্য। আমরা যে দুই আনুমানিক দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিলাম উভয়তই সম্ভবপরতা ন্যায় ও ধর্মের দিকেই অধিক। কিন্তু কাহারও অবিদিত নাই গবর্মেন্টের হস্তে উক্তবিধ হতভাগ্য সাধুদিগের সম্মান এবং উন্নতি লাভ হয় না।

জনসাধারণও গবর্মেন্টের অপেক্ষা অধিক সূক্ষ্মবুদ্ধি নহে, সেও খুব মোটামুটি রকমের বিচার করে। সে বলে আমি অত আইনকানুন সাক্ষীসাবুদ বুঝি না, কিন্তু ভারতবর্ষীয়কে হত্যা করিয়া একটা ইংরেজও উপযুক্ত দণ্ডার্হ হয় না এ কেমন কথা।

বারংবার আঘাতে প্রজাসাধারণের হৃদয়ে যদি একটা সাংঘাতিক ক্ষত উৎপন্ন হইতে থাকে তবে তাহা গোপনে আচ্ছন্ন করিয়া রাখা রাজভক্তি নহে। তাই 'ব্যাবু'-অভিহিত অস্মৎপক্ষীয়েরা এ-সকল কথা প্রকাশ করিয়া বলাই কর্তব্য জ্ঞান করে। আমরা ভারতরাজ্য-পরিচালক বাষ্পযন্ত্রের "বয়লার"স্থিত তাপমান মাত্র, আমাদের নিজের কোনো শক্তি নাই, ছোটো বড়ো বিচিত্র লৌহচক্রচালনার কোনো ক্ষমতাই রাখি না, কেবল বৈজ্ঞানিক নিগূঢ় নিয়মানুসারে সময়ে সময়ে আমাদের চঞ্চল পারদবিন্দু হঠাৎ উপরের দিকে চড়িয়া যায়, কিন্তু এঞ্জিনিয়ার সাহেবের তাহাতে রাগ করা কর্তব্য নহে। তিনি একটি ঘুষি মারিলেই এই ক্ষুদ্র ক্ষণভঙ্গুর পদার্থটি ভাঙিয়া তাহার সমস্ত পারদটুকু নাস্তিনভূত হইয়া যাইতে পারে—কিন্তু বয়লারগত উত্তাপের পরিমাণ নির্ণয় করা যন্ত্রচালনকার্যের একটা প্রধান অঙ্গ। ইংরেজ অনেক সময় বিপরীত উগ্রমূর্তি ধারণ করিয়া বলে—প্রজাসাধারণের নাম করিয়া আত্মপরিচয় দিতেছ, তোমরা কে। তোমরা তো আমাদেরই স্কুলের গুটিকয়েক বাক্যবিশারদ ইংরেজিনবিশ।

প্রভু, আমরা কেহই নহি। কিন্তু তোমাদের বিদ্রূপ বিরক্তি এবং ক্রোধদহনের দ্বারা অনুমান করিতেছি তোমরা আমাদিগকে নিতান্তই সামান্য বলিয়া জ্ঞান কর না। এবং সামান্য জ্ঞান করা কর্তব্যও নহে। সংখ্যায় সামান্য হইলেও এই বিচ্ছিন্নসমাজ

ভারতবর্ষে কেবল শিক্ষিতসম্প্রদায়ের মধ্যেই শিক্ষা এবং হৃদয়ের ঐক্য আছে—এবং এই শিক্ষিতসম্প্রদায়ই ভারতবর্ষীয় হৃদয়বেদনা স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ এবং নানা উপায়ে সঞ্চারিত করিয়া দিতে পারে। এই শিক্ষিতসাধারণের অন্তরে কখন কীরূপ আঘাত-অভিঘাত লাগিতেছে তাহা মনোযোগসহকারে আলোচনা করা গবর্মেণ্টের রাজনীতির একটা প্রধান অঙ্গ হওয়া উচিত। লক্ষণে যতদূর প্রকাশ পায় গবর্মেণ্টেরও তাহাতে সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য নাই।

আমরা আলোচিত ব্যাপারে দুই কারণে আঘাত পাই। প্রথমত, একটা অত্যাচারের কথা শুনিলেই তাহার উপযুক্ত দণ্ডবিধানের প্রত্যাশা করিয়া হৃদয় ব্যগ্র হইয়া থাকে। যেজন্যই হউক দোষী অব্যাহতি পাইলে অন্তর ক্ষুব্ধ হয়। দ্বিতীয়ত, এই সকল ঘটনায় আমরা আমাদের জাতীয় অসম্মান তীব্ররূপে অনুভব করিয়া একান্ত মর্মাহত হই।

দোষী অব্যাহতি পাওয়া দোষের বটে কিন্তু আদালতের বিচারের নিকট অদৃষ্টবাদী ভারতবর্ষ অসম্ভব কিছু প্রত্যাশা করে না। আইন এতই জটিল, সাক্ষ্য এতই পিচ্ছল, এবং দেশীয় চরিত্রজ্ঞান মমত্বহীন অবজ্ঞাকারী বিদেশীয়ের পক্ষে এতই দুর্লভ যে, অনিশ্চিতফল মকদ্দমা অনেকটা জুয়াখেলার মতো বোধ হয়। এইজন্যই জুয়াখেলার যেমন একটা মোহকারী উত্তেজনা আছে আমাদের দেশের অনেক লোকের কাছে মকদ্দমার সেইরূপ একটা মাদকতা দেখা যায়। অতএব মকদ্দমার ফলের অনিশ্চয়তা সম্বন্ধে যখন সাধারণের একটা ধারণা আছে এবং যখন সে অনিশ্চয়তা জন্য আমাদের স্বভাবদোষও অনেকটা দায়ী তখন মধ্যে মধ্যে নির্দোষীর পীড়ন ও দোষীর নিষ্কৃতি শোচনীয় অথচ অবশ্যম্ভাবী বলিয়া দেখিতে হয়।

কিন্তু বারংবার য়ুরোপীয় অপরাধীর অব্যাহতি এবং তৎসম্বন্ধে কর্তৃপক্ষীয়ের ঔদাসীন্যে ভারতবর্ষীয়ের প্রতি ইংরেজের আন্তরিক অবজ্ঞার পরিচয় দেয়। সেই অপমানের ধিক্কার শেলের ন্যায় স্থায়ীভাবে হৃদয়ে বিঁধিয়া থাকে।

যদি ঠিক বিপরীত ঘটনা ঘটিত, যদি স্বল্পকালের মধ্যে অনেকগুলি য়ুরোপীয় দেশীয় কর্তৃক হত হইত এবং প্রত্যেক অভিযুক্তই বিচারে মুক্তি পাইত, তবে এরূপ দুর্ঘটনার সমস্ত সম্ভাবনা লোপ করিবার সহস্রবিধ উপায় উদ্‌ভাবিত হইত। কিন্তু প্রাচ্য ভারতবাসী যখন নিরর্থক গুলি খাইয়া লাথি খাইয়া মরে তখন পাশ্চাত্য কর্তৃপুরুষদের কোনোপ্রকার দুর্ভাবনার লক্ষণ দেখা যায় না। কী করিলে এ-সমস্ত উপদ্রব নিবারণ হইতে পারে সে-সম্বন্ধে কোনোরূপ প্রশ্ন উত্থাপন হইতেও শুনা যায় না।

কিন্তু আমাদিগের প্রতি কর্তৃজাতীয়ের এই যে অবজ্ঞা, সেজন্য প্রধানত আমরাই

ধিক্‌কারের যোগ্য। কারণ, এ-কথা কিছুতেই আমাদের বিস্মৃত হওয়া উচিত নয় যে, আইনের সাহায্যে সম্মান পাওয়া যায় না—সম্মান নিজের হস্তে। আমরা সানুনাসিক স্বরে যেভাবে ক্রমাগত নালিশ করিতে আরম্ভ করিয়াছি তাহাতে আমাদের আত্মমর্যাদার নিরতিশয় লাঘব হইতেছে।

উদাহরণস্থলে আমরা খুলনার ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক মুহুরি মারার ঘটনা উল্লেখ করিতে পারি। কিন্তু প্রথমেই বলিয়া রাখা আবশ্যক ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট বেল সাহেব অত্যন্ত দয়ালু উন্নতচেতা সহৃদয় ব্যক্তি এবং ভারতবর্ষীয়ের প্রতি তাঁহার ঔদাসীন্য অথবা অবজ্ঞা নাই। আমাদের বিশ্বাস, তিনি যে মুহুরিকে মারিয়াছিলেন তাহাতে কেবল দুর্ধর্ষ ইংরেজপ্রকৃতির হঠকারিতা প্রকাশ পাইয়াছে, বাঙালিঘৃণা প্রকাশ পায় নাই। জঠরানল যখন প্রজ্বলিত তখন ক্রোধানল সামান্য কারণেই উদ্দীপ্ত হইয়া থাকে, তা বাঙালিরও হয় ইংরেজেরও হয়; অতএব এ ঘটনার প্রসঙ্গে বিজাতিবিদ্বেষের কথা উত্থাপন করা উচিত হয় না।

কিন্তু ফরিয়াদির পক্ষের বাঙালি ব্যারিস্টার মহাশয় এই মকদ্দমার প্রসঙ্গে বারংবার বলিয়াছেন মুহুরি-মারা কাজটা ইংরেজের অযোগ্য হইয়াছে, কারণ, বেল সাহেবের জানা ছিল অথবা জানা উচিত ছিল যে, মুহুরি তাঁহাকে ফিরিয়া মারিতে পারে না।

এ-কথা যদি সত্য হয় তবে যথার্থ লজ্জার বিষয় মুহুরির এবং মুহুরির স্বজাতিবর্গের। কারণ, হঠাৎ রাগিয়া প্রহার করিয়া বসা পুরুষের দুর্বলতা, কিন্তু মার খাইয়া বিনা প্রতিকারে ক্রন্দন করা কাপুরুষের দুর্বলতা। এ-কথা বলিতে পারি মুহুরি যদি ফিরিয়া মারিত তবে বেল সাহেব যথার্থ ইংরেজের ন্যায় তাঁহাকে মনে মনে শ্রদ্ধা করিতেন।

যথেষ্ট অপমানিত হইলেও একজন মুহুরি কোনো ইংরেজকে ফিরিয়া মারিতে পারে না এই কথাটি ধ্রুব সত্যরূপে অম্লানমুখে স্বীকার করা এবং ইহারই উপরে ইংরেজকে বেশি করিয়া দোষাই করা আমাদের বিবেচনায় নিতান্ত অনাবশ্যক এবং লজ্জাজনক আচরণ।

মার খাওয়ার দরুন আইনমতে মুহুরির যে-কোনো প্রতিকার প্রাপ্য, তাহা হইতে সে তিলমাত্র বঞ্চিত না হয় তৎপ্রতি আমাদের দৃষ্টি রাখা উচিত হইতে পারে কিন্তু তাহার আঘাত এবং অপমান-বেদনার উপর সমস্ত দেশের লোক মিলিয়া অজস্র-পরিমাণে আহা উহু করার, এবং কেবলমাত্র বিদেশীকে গালিমন্দ দিবার কোনো কারণ দেখি না। বেল সাহেবের ব্যবহার প্রশংসনীয় নহে, কিন্তু মুহুরি ও তাহার নিকটবর্তী সমস্ত লোকের আচরণ হেয়, এবং খুলনার বাঙালি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের আচরণে হীনতা ও অন্যায় মিশ্রিত হইয়া সর্বাপেক্ষা বীভৎস হইয়া উঠিয়াছে।

অল্পকাল হইল ইহার অনুরূপ ঘটনা পাবনায় ঘটিয়াছিল। সেখানে মুনিসিপালিটির খেয়াঘাটের কোনো ব্রাহ্মণ কর্মচারী পুলিস সাহেবের পাখা-টানা বেহারার নিকট উচিত মাসুল আদায় করাতে পুলিস সাহেব তাহাকে নিজের ঘরে লইয়া লাঞ্ছনার একশেষ করিয়াছিলেন; বাঙালি ম্যাজিস্ট্রেট সেই অপরাধী ইংরেজের কোনোরূপ দণ্ডবিধান না করিয়া কেবলমাত্র সতর্ক করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। অথচ যখন পাখা-টানা বেহারা উক্ত ব্রাহ্মণের নামে উপদ্রবের নালিশ আনে তখন তিনি ব্রাহ্মণকে জরিমানা না করিয়া ছাড়েন নাই।

যে কারণবশত বাঙালি ম্যাজিস্ট্রেট প্রবল ইংরেজ অপরাধীকে সতর্ক এবং অক্ষম বাঙালি অভিযুক্তকে জরিমানা করিয়া থাকেন, সেই কারণটি আমাদের জাতির মর্মে মর্মে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছে। আমাদের স্বজাতিকে যে সম্মান আমরা নিজে দিতে জানি না, আমরা আশা করি এবং আবদার করি সেই সম্মান ইংরেজ আমাদিগকে যাচিয়া সাধিয়া দিবে।

এক বাঙালি যখন নীরবে মার পায় এবং অন্য বাঙালি যখন তাহা কৌতূহলভরে দেখে, এবং স্বহস্তে অপমানের প্রতিকার সাধন বাঙালির নিকট প্রত্যাশাই করা যায় না এ-কথা যখন বাঙালি বিনা লজ্জায় ইঙ্গিতেও স্বীকার করে তখন ইহা বুঝিতে হইবে যে, ইংরেজের দ্বারা হত ও আহত হইবার মূল প্রধান কারণ আমাদের নিজের স্বভাবের মধ্যে—গবর্মেণ্ট কোনো আইনের দ্বারা বিচারের দ্বারা তাহা দূর করিতে পারিবেন না।

আমরা অনেক সময় ইংরেজ কর্তৃক অপমানবৃত্তান্ত শুনিলে আক্ষেপ করিয়া বলিয়া থাকি, কোনো ইংরেজের প্রতি ইংরেজ এমন ব্যবহার করিত না। করিত না বটে, কিন্তু ইংরেজের উপর রাগ করিতে বসার অপেক্ষা নিজের প্রতি রাগ করিতে বসিলে অধিক ফল পাওয়া যায়। যে যে কারণবশত একজন ইংরেজ সহজে আর-একজন ইংরেজের গায়ে হাত তুলিতে সাহস করে না সেই কারণগুলি থাকিলে আমরাও অনুরূপ আচরণ প্রাপ্ত হইতে পারিতাম, সানুনাসিক স্বরে এত অধিক কান্নাকাটি করিতে হইত না।

বাঙালির প্রতি বাঙালি কিরূপ ব্যবহার করে সেইটে গোড়ায় দেখা উচিত। কারণ তাহারই উপর আমাদের সমস্ত শিক্ষা নির্ভর করে। আমরা কি আমাদের ভৃত্যদিগকে প্রহার করি না, আমাদের অধীনস্থ ব্যক্তিদের প্রতি ঔদ্ধত্য এবং নিম্নশ্রেণীস্থদিগের প্রতি সর্বদা অসম্মান প্রকাশ করি না? আমাদের সমাজ স্তরে স্তরে উচ্চে নীচে বিভক্ত, যে-ব্যক্তি কিছুমাত্র উচ্চে আছে সে নিম্নতর ব্যক্তির নিকট হইতে অপরিমিত অধীনতা

প্রত্যাশা করে। নিম্নবর্তী কেহ তিলমাত্র স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ করিলে উপরের লোকের গায়ে তাহা অসহ্য বোধ হয়। ভদ্রলোকের নিকট “চাষা বেটা” প্রায় মনুষ্যের মধ্যেই নহে;—ক্ষমতাপন্নের নিকট অক্ষম লোক যদি সম্পূর্ণ অবনত হইয়া না থাকে তবে তাহাকে ভাঙিয়া দিবার চেষ্টা করা হয়। যেমন দেখা যায় চৌকিদারের উপর কনস্টেবল, কনস্টেবলের উপর দারোগা, কেবল যে গবর্মেন্টের কাজ আদায় করে তাহা নহে, কেবল যে উচ্চতর পদের উচিত সম্মানটুকু গ্রহণ করিয়া সন্তুষ্ট হয় তাহা নহে, তদতিরিক্ত দাসত্ব দাবি করিয়া থাকে—চৌকিদারের নিকট কনস্টেবল যথেচ্ছাচারী রাজা, এবং কনস্টেবলের নিকট দারোগাও তদ্রূপ, তেমনি আমাদের সমাজে সর্বত্র অধস্তনের নিকট উচ্চতনের দাবির একেবারে সীমা নাই। স্তরে স্তরে প্রভুত্বের ভার পড়িয়া দাসত্ব এবং ভয় আমাদের মজ্জার মধ্যে সঞ্চারিত হইতে থাকে। আমাদের আজন্মকালের প্রতিনিয়ত অভ্যাস ও দৃষ্টান্তে আমাদিগকে অন্ধ বাধ্যতার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত করিয়া রাখে, তাহাতে আমরা অধীনস্থ লোকের প্রতি অত্যাচারী, সমকক্ষ লোকের প্রতি ঈর্ষান্বিত এবং উপরিস্থ লোকের নিকট ক্রীতদাস হইতে শিক্ষা করি। সেই আমাদের প্রতিমুহূর্তের শিক্ষার মধ্যে আমাদের সমস্ত ব্যক্তিগত এবং জাতীয় অসম্মানের মূল নিহিত রহিয়াছে। গুরুকে ভক্তি করিয়া ও প্রভুকে সেবা করিয়া ও মান্য লোককে যথোচিত সম্মান দিয়াও মনুষ্যমাত্রের যে একটি মনুষ্যোচিত আত্মমর্যাদা থাকা আবশ্যক তাহা রক্ষা করা যায়। আমাদের গুরু, আমাদের প্রভু, আমাদের রাজা, আমাদের মান্য ব্যক্তিগণ যদি সেই আত্মমর্যাদাটুকুও অপহরণ করিয়া লন তবে একেবারে মনুষ্যত্বের প্রতি হস্তক্ষেপ করা হয়। সেই সকল কারণে আমরা যথার্থই মনুষ্যত্বহীন হইয়া পড়িয়াছি এবং সেই কারণেই ইংরেজ ইংরেজের প্রতি যেমন ব্যবহার করে আমাদের প্রতি সেরূপ ব্যবহার করে না।

গৃহের এবং সমাজের শিক্ষায় যখন আমরা সেই মনুষ্যত্ব উপার্জন করিতে পারিব তখন ইংরেজ আমাদিগকে শ্রদ্ধা করিতে বাধ্য হইবে এবং অপমান করিতে সাহস করিবে না। ইংরেজ গবর্মেন্টের নিকট আমরা অনেক প্রত্যাশা করিতে পারি কিন্তু স্বাভাবিক নিয়ম বিপর্যস্ত করা তাঁহাদেরও সাধ্যায়ত্ত নহে। হীনত্বের প্রতি আঘাত ও অবমাননা সংসারের স্বাভাবিক নিয়ম।

১৩০১

সুবিচারের অধিকার

সংবাদপত্রপাঠকগণ অবগত আছেন অল্পকাল হইল সেতারা জিলায় বাই নামক নগরে তেরো জন সম্ভ্রান্ত হিন্দু জেলে গিয়াছেন। তাঁহারা অপরাধ করিয়া থাকিবেন, এবং আইনমতেও হয়তো তাঁহারা দণ্ডনীয়—কিন্তু ঘটনাটি সমস্ত হিন্দুর হৃদয়ে আঘাত করিয়াছে এবং আঘাতের ন্যায্য কারণও আছে।

উক্ত নগরে হিন্দুসংখ্যা মুসলমান অপেক্ষা অনেক অধিক এবং পরস্পরের মধ্যে কোনো কালে কোনো বিরোধের লক্ষণ দেখা যায় নাই। একটি মুসলমান সাক্ষীও প্রকাশ করিয়াছে যে, সে-স্থানে হিন্দুর সহিত মুসলমানের কোনো বিবাদ নাই—বিবাদ হিন্দুর সহিত গবর্মেণ্টের।

অকস্মাৎ ম্যাজিস্ট্রেট অশান্তি আশঙ্কা করিয়া কোনো এক পূজা উপলক্ষ্যে হিন্দুদিগকে বাদ্য বন্ধ করিতে আদেশ করেন। হিন্দুগণ ফাঁপরে পড়িয়া রাজাজ্ঞা ও দেবসম্মান উভয়রক্ষা করিতে গিয়া কোনোটাই রক্ষা করিতে পারিলেন না। তাঁহারা চিরনিয়মানুমোদিত বাদ্যাড়ম্বর বন্ধ করিয়া একটিমাত্র সামান্য বাদ্যযোগে কোনোমতে উৎসব পালন করিলেন। ইহাতে দেবতা সন্তুষ্ট হইলেন কিনা জানি না, মুসলমানগণ অসন্তুষ্ট হইলেন না, কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট রুদ্রমূর্তি ধারণ করিলেন। নগরের তেরো জন ভদ্র হিন্দুকে জেলে চালান করিয়া দিলেন।

হাকিম খুব জবরদস্ত, আইন খুব কঠিন, শাসন খুব কড়াক্কড়, কিন্তু এমন করিয়া স্থায়ী শান্তি স্থাপিত হয় কিনা সন্দেহ। এমন করিয়া যেখানে বিরোধ নাই সেখানে বিরোধ বাধিয়া উঠে, যেখানে বিদ্বেষের বীজমাত্র আছে সেখানে তাহা অঙ্কুরিত ও পল্লবিত হইয়া উঠিতে থাকে। প্রবল প্রতাপে শান্তি স্থাপন করিতে গিয়া মহাসমারোহে অশান্তিকে জাগ্রত করিয়া তোলা হয়।

সকলেই জানেন অনেক অসভ্যদের মধ্যে আর-কোনোপ্রকার চিকিৎসা নাই কেবল ভূতঝাড়ানো আছে। তাহারা গর্জন করিয়া নৃত্য করিয়া রোগীকে মারিয়া ধরিয়া প্রলয়কাণ্ড বাধাইয়া দেয়। ইংরেজ হিন্দুমুসলমান-বিরোধব্যাধির যদি সেইরূপ আদিম প্রণালীমতে চিকিৎসা শুরু করেন তাহাতে রোগীর মৃত্যু হইতে পারে কিন্তু ব্যাধির উপশম না হইবার সম্ভাবনা। এবং ওঝা ভূত ঝাড়িতে গিয়া যে-ভূত নামাইয়া আনেন তাহাকে শান্ত করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে।

অনেক হিন্দুর বিশ্বাস, বিরোধ মিটাইয়া দেওয়া গবর্মেণ্টের আন্তরিক অভিপ্রায়

নহে। পাছে কনগ্রেস প্রভৃতির চেষ্টায় হিন্দুমুসলমানগণ ক্রমশ ঐক্যপথে অগ্রসর হয় এইজন্য তাঁহারা উভয় সম্প্রদায়ের ধর্মবিদ্বেষ জাগাইয়া রাখিতে চান, এবং মুসলমানের দ্বারা হিন্দুর দর্প চূর্ণ করিয়া মুসলমানকে সন্তুষ্ট ও হিন্দুকে অভিভূত করিতে ইচ্ছা করেন।

অথচ লর্ড ল্যান্সডাউন হইতে আরম্ভ করিয়া লর্ড হ্যারিস পর্যন্ত সকলেই বলিতেছেন এমন কথা যে মুখে আনে সে পাষণ্ড মিথ্যাবাদী। ইংরেজ-গবর্মেন্ট হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের প্রতি যে অধিক পক্ষপাত প্রকাশ করিতেছেন এ অপবাদকেও তাঁহারা সম্পূর্ণ অমূলক বলিয়া তিরস্কার করিয়াছেন।

আমরাও তাঁহাদের কথা অবিশ্বাস করি না। কনগ্রেসের প্রতি গবর্মেন্টের সুগভীর প্রীতি না থাকিতে পারে এবং মুসলমানগণ হিন্দুদের সহিত যোগ দিয়া কনগ্রেসকে বলশালী না করুক এমন ইচ্ছাও তাঁহাদের থাকা সম্পূর্ণ সম্ভব, তথাপি রাজ্যের দুই প্রধান সম্প্রদায়ের অনৈক্যকে বিরোধে পরিণত করিয়া তোলা কোনো পরিণামদর্শী বিবেচক গবর্মেন্টের অভিপ্রেত হইতে পারে না। অনৈক্য থাকে সে ভালো, কিন্তু তাহা গবর্মেন্টের সুশাসনে শান্তমূর্তি ধারণ করিয়া থাকিবে। গবর্মেন্টের বারুদখানায় বারুদ যেমন শীতল হইয়া আছে অথচ তাহার দাহিকাশক্তি নিবিয়া যায় নাই—হিন্দুমুসলমানের আভ্যন্তরিক অসদ্ভাব গবর্মেন্টের রাজনৈতিক শস্ত্রশালায় সেইরূপ সুশীতলভাবে রক্ষিত হইবে এমন অভিপ্রায় গবর্মেন্টের মনে থাকা অসম্ভব নহে।

এই কারণে, গবর্মেন্ট হিন্দুমুসলমানের গলাগলি-দৃশ্য দেখিবার জন্যও ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতেছেন না, অথচ লাঠালাঠি-দৃশ্যটাও তাঁহাদের সুশাসনের হানিজনক বলিয়া বিরক্ত হইয়া উঠিতেছেন।

সর্বদাই দেখিতে পাই দুই পক্ষে যখন বিরোধ ঘটে এবং শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা উপস্থিত হয় তখন ম্যাজিস্ট্রেট সূক্ষ্মবিচারের দিকে না গিয়া উভয় পক্ষকেই সমানভাবে দমন করিয়া রাখিতে চেষ্টা করেন। কারণ, সাধারণ নিয়ম এই যে, এক হাতে তালি বাজে না। কিন্তু হিন্দুমুসলমানবিরোধে সাধারণের বিশ্বাস দৃঢ়বদ্ধমূল হইয়াছে যে, দমনটা অধিকাংশ হিন্দুর উপর দিয়াই চলিতেছে এবং প্রশ্রয়টা অধিকাংশ মুসলমানেরাই লাভ করিতেছেন। এরূপ বিশ্বাস জন্মিয়া যাওয়াতে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ঈর্ষানল আরও অধিক করিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছে। এবং যেখানে কোনোকালে বিরোধ ঘটে নাই সেখানেও কর্তৃপক্ষ আগেভাগে অমূলক আশঙ্কার অবতারণা করিয়া একপক্ষের চিরাগত অধিকার কাড়িয়া লওয়াতে অন্যপক্ষের সাহস ও স্পর্ধা বাড়িতেছে এবং চিরবিরোধের বীজ বপন করা হইতেছে।

হিন্দুদের প্রতি গবর্মেণ্টের বিশেষ একটা বিরাগ না থাকাই সম্ভব কিন্তু একমাত্র গবর্মেণ্টের পলিসির দ্বারাই গবর্মেণ্ট চলে না—প্রাকৃতিক নিয়ম একটা আছে। স্বর্গরাজ্যে পবনদেবের কোনোপ্রকার অসাধু অভিপ্রায় থাকিতে পারে না তথাচ উত্তাপের নিয়মের বশবর্তী হইয়া তাঁহার মর্ত্যরাজ্যের অনুচর উনপঞ্চাশ বায়ু অনেক সময় অকস্মাৎ ঝড় বাধাইয়া বসে। আমরা গবর্মেণ্টের স্বর্গলোকের খবর ঠিক করিয়া বলিতে পারি না, সে-সকল খবর লর্ড ল্যান্সডাউন এবং লর্ড হ্যারিস জানেন কিন্তু আমরা আমাদের চতুর্দিকের হাওয়ার মধ্যে একটা গোলযোগ অনুভব করিতেছি। স্বর্গধাম হইতে মাভৈঃ মাভৈঃ শব্দ আসিতেছে কিন্তু আমাদের নিকটবর্তী দেবচরগণের মধ্যে ভারি একটা উষ্মার লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে। মুসলমানেরাও জানিতেছেন তাঁহাদের জন্য বিষ্ণুদূত অপেক্ষা করিয়া আছে, আমরাও হাড়ের মধ্যে কম্পসহকারে অনুভব করিতেছি আমাদের জন্য যমদূত দ্বারের নিকটে গদাহস্তে বসিয়া আছে এবং উপরন্তু সেই যমদূতগুলার খোরাকি আমাদের নিজের গাঁঠ হইতে দিতে হইবে।

হাওয়ার গতিক আমরা যেরূপ অনুভব করিতেছি তাহা যে নিতান্ত অমূলক এ-কথা বিশ্বাস হয় না। অল্পকাল হইল স্টেটসম্যান পত্রে গবর্মেণ্টের উচ্চ-উপাধিধারী কোনো শ্রদ্ধেয় ইংরেজ সিভিলিয়ান প্রকাশ করিয়াছেন যে, আজকাল সাধারণ ভারতবর্ষীয় ইংরেজের মনে একটা হিন্দুবিদ্বেষের ভাব ব্যাপ্ত হইয়াছে এবং মুসলমানজাতির প্রতিও একটি আকস্মিক বাৎসল্যরসের উদ্রেক দেখা যাইতেছে। মুসলমান ভ্রাতাদের প্রতি ইংরেজের স্তনে যদি ক্ষীরসঞ্চার হইয়া থাকে তবে তাহা আনন্দের বিষয় কিন্তু আমাদের প্রতি যদি কেবলই পিত্তসঞ্চার হইতে থাকে তবে সে আনন্দ অকপটভাবে রক্ষা করা কঠিন হইয়া উঠে।

কেবল রাগদ্বেষের দ্বারা পক্ষপাত এবং অবিচার ঘটিতে পারে তাহা নহে, ভয়েতে করিয়াও ন্যায়পরতার নিক্তির কাঁটা অনেকটা পরিমাণে কম্পিত বিচলিত হইয়া উঠে। আমাদের এমন সন্দেহ হয় যে, ইংরেজ মুসলমানকে মনে মনে কিছু ভয় করিয়া থাকেন। এইজন্য রাজদণ্ডটা মুসলমানের গা ঘেঁষিয়া ঠিক হিন্দুর মাথার উপরে কিছু জোরের সহিত পড়িতেছে।

ইহাকে নাম দেওয়া যাইতে পারে “ঝিকে মারিয়া বউকে শেখানো” রাজনীতি। ঝিকে কিছু অন্যায় করিয়া মারিলেও সে সহ্য করে, কিন্তু বউ পরের ঘরের মেয়ে, উচিত শাসন উপলক্ষ্যে গায়ে হাত তুলিতে গেলেও বরদাস্ত না করিতেও পারে। অথচ বিচারকার্যটা একেবারে বন্ধ করাও যায় না। যেখানে বাধা স্বল্পতম সেখানে শক্তিপ্রয়োগ করিলে শীঘ্র ফল পাওয়া যায় এ-কথা বিজ্ঞানসম্মত। অতএব হিন্দু-

মুসলমানের স্কন্ধে শান্তপ্রকৃতি, ঐক্যবন্ধনহীন, আইন ও বেআইনসহিষ্ণু হিন্দুকে দমন করিয়া দিলে মীমাংসাটা সহজে হয়। আমরা বলি না যে, গবর্মেন্টের এইরূপ পলিসি, কিন্তু কার্যবিধি স্বভাবত, এমন কি অজ্ঞানত, এই পথ অবলম্বন করিতে পারে। যেমন, নদীস্রোত কঠিন মৃত্তিকাকে পাশ কাটাইয়া স্বতই কোমল মৃত্তিকাকে খনন করিয়া চলিয়া যায়।

অতএব, হাজার গবর্মেন্টের দোহাই পাড়িতে থাকিলেও গবর্মেন্ট যে ইহার প্রতিকার করিতে পারেন এ-কথা আমরা বিশ্বাস করি না। আমরা কনগ্রেসে যোগ দিয়াছি, বিলাতে আন্দোলন করিতেছি, অমৃতবাজারে প্রবন্ধ লিখিতেছি, ভারতবর্ষের উচ্চ হইতে নিম্নতন ইংরেজ কর্মচারীদের কার্য স্বাধীনভাবে সমালোচনা করিতেছি, অনেক সময় তাঁহাদিগকে অপদস্থ করিতে কৃতকার্য হইতেছি এবং ইংলণ্ডবাসী অপক্ষপাতী ইংরেজের সহায়তা লইয়া ভারতীয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অনেক রাজবিধি সংশোধন করিতেও সক্ষম হইয়াছি—এই সকল ব্যবহারে ইংরেজ এতদূর পর্যন্ত জালাতন হইয়া উঠিয়াছে যে, ভারত-রাজতন্ত্রের বড়ো বড়ো ভূধর-শিখর হইতেও রাজনীতি সম্মত মৌন ভেদ করিয়া মাঝে মাঝে আগ্নেয়স্রাব উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে। অপর পক্ষে, মুসলমানগণ রাজভক্তিভরে অবনতপ্রায় হইয়া কনগ্রেসের উদ্দেশ্যপথে বাধাস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। এই সকল কারণে ইংরেজের মনে একটা বিকার উপস্থিত হইয়াছে—গবর্মেন্টের ইহাতে কোনো হাত নাই।

কেবল ইহাই নহে। কনগ্রেস অপেক্ষা গোরক্ষণী সভাটাতে ইংরেজের মনে অধিক আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিল। তাঁহারা জানেন ইতিহাসের প্রারম্ভকাল হইতে যে-হিন্দুজাতি আত্মরক্ষার জন্য কখনো একত্র হইতে পারে নাই, চাই কি গোরক্ষার জন্য সে-জাতি একত্র হইতেও পারে। অতএব, সেই সূত্রে যখন হিন্দুমুসলমানের বিরোধ আরম্ভ হইল তখন স্বভাবতই মুসলমানের প্রতিই ইংরেজের দরদ বাড়িয়া গিয়াছিল। তখন উপস্থিত ক্ষেত্রে কোন্ পক্ষ অধিক অপরাধী, অথবা উভয় পক্ষ ন্যূনাধিক অপরাধী কি না তাহা অবিচলিতচিত্তে অপক্ষপাতসহকারে বিচার করিবার ক্ষমতা অতি অল্প ইংরেজের ছিল। তখন তাঁহারা ভীতচিত্তে একটা রাজনৈতিক সংকট কিরূপে নিবারণ হইতে পারে সেইদিকেই অধিক মনোযোগ দিয়াছিলেন। তৃতীয় খণ্ড সাধনায় "ইংরেজের আতঙ্ক" নামক প্রবন্ধে আমরা সাঁওতাল-দমনের উদাহরণ দিয়া দেখাইয়াছি, ভয় পাইলে সুবিচার করিবার ধৈর্য থাকে না এবং যাহারা জ্ঞানত অথবা অজ্ঞানত ভীতির কারণ, তাহাদের প্রতি একটা নিষ্ঠুর হিংস্র ভাবের উদয় হয়। এই কারণে, গবর্মেন্ট নামক যন্ত্রটি যেমনই নিরপেক্ষ থাক গবর্মেন্টের

ছোটোবড়ো মন্ত্রীগুলি যে আদ্যোপান্ত বিচলিত হইয়া উঠিয়াছিলেন তাহা তাঁহারা বারংবার অস্বীকার করিলেও লক্ষণে স্পষ্টই প্রকাশ পাইয়াছিল এখনও প্রকাশ পাইতেছে। এবং সাধারণ ভারতবর্ষীয় ইংরেজের মনে বিবিধ স্বাভাবিক কারণে একবার এইরূপ বিকার উপস্থিত হইলে তাহার যে ফল সে ফলিতে থাকিবেই ;— ক্যান্যুট যেমন সমুদ্রতরঙ্গকে নিয়মিত করিতে পারেন নাই গবর্মেণ্টও সেইরূপ স্বাভাবিক নিয়মকে বাধা দিতে পারিবেন না।

প্রশ্ন উঠিতে পারে, তবে কেনই বা বৃথা আন্দোলন করা এবং আমারই বা এ প্রবন্ধ লিখিতে বসিবার প্রয়োজন কী ছিল ?

গবর্মেন্টের নিকট সকরুণ অথবা সাভিমান স্বরে আবেদন বা অভিযোগ করিবার জন্য প্রবন্ধ লিখার কোনো আবশ্যক নাই সে-কথা আমি সহস্রবার স্বীকার করি। আমাদের এই প্রবন্ধ কেবল আমাদের স্বজাতীয়ের জন্য। আমরা নিজেরা ব্যতীত আমাদের নিজেদের প্রতি অন্যায় ও অবিচারের প্রতিকার কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে।

ক্যান্যুট সমুদ্রতরঙ্গকে যেখানে থামিতে বলিয়াছিলেন, সমুদ্রতরঙ্গ সেখানে থামে নাই—সে জড়শক্তির নিয়মানুবর্তী হইয়া যথোপযুক্ত স্থানে গিয়া আঘাত করিয়াছিল। ক্যান্যুট মুখের কথায় বা মন্ত্রোচ্চারণে তাহাকে ফিরাইতে পারিতেন না বটে কিন্তু বাঁধ বাঁধিয়া তাহাকে প্রতিহত করিতে পারিতেন।

স্বাভাবিক নিয়মানুগত আঘাতপরম্পরাকে যদি অর্ধপথে বাধা দিতে হয় তবে আমাদিগকেও বাঁধ বাঁধিতে হইবে। সকলকে এক হইতে হইবে। সকলকে সমহৃদয় হইয়া সমবেদনা অনুভব করিতে হইবে।

দল বাঁধিয়া যে বিপ্লব করিতে হইবে তাহা নহে—আমাদের সে শক্তিও নাই। কিন্তু দল বাঁধিলে যে একটা বৃহত্ত্ব এবং বল লাভ করা যায় তাহাকে লোকে শ্রদ্ধা না করিয়া থাকিতে পারে না। শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে না পারিলে সুবিচার আকর্ষণ করা বড়ো কঠিন।

কিন্তু বালির বাঁধ বাঁধিবে কী করিয়া ? যাহারা বারংবার নিহত পরাহত হইয়াছে অথচ কোনোকালে সংহত হইতে শিখে নাই, যাহাদের সমাজের মধ্যে অনৈক্যের সহস্র বিষবীজ নিহিত রহিয়াছে তাহাদিগকে কিসে বাঁধিতে পারিবে ? ইংরেজ যে আমাদের মর্মবেদনা অনুভব করিতে পারে না এবং ইংরেজ ঔষধের দ্বারা চিকিৎসার চেষ্টা না করিয়া কঠিন আঘাতের দ্বারা আমাদের হৃদয়ব্যথা চতুর্গুণ বর্ধিত করিবার উদ্যোগ করিতেছে এই বিশ্বাসে উত্তর হইতে দক্ষিণে এবং পূর্ব হইতে পশ্চিমে সমস্ত হিন্দুজাতির হৃদয় অলক্ষিতভাবে প্রতিদিন পরস্পর নিকটে আকৃষ্ট হইয়া আসিতেছে।

কিন্তু ইহাই যথেষ্ট নহে। আমাদের স্বজাতি এখনও আমাদের স্বজাতীয়ের পক্ষে ধ্রুব আশ্রয়ভূমি হইয়া উঠিতে পারেন নাই। এই জন্য বাহিরের ঝটিকা অপেক্ষা আমাদের গৃহভিত্তির বালুকাময় প্রতিষ্ঠাস্থানকে অধিক আশঙ্কা করি। খরবেগ নদীর মধ্যস্রোত অপেক্ষা তাহার শিথিলবন্ধন ভঙ্গপ্রবণ তটভূমিকে পরিহার করিয়া চলিতে হয়।

আমরা জানি, বহুকাল পরাধীনতায় পিষ্ট হইয়া আমাদের জাতীয় মনুষ্যত্ব ও সাহস চূর্ণ হইয়া গেছে, আমরা জানি যে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে যদি দণ্ডায়মান হইতে হয় তবে সর্বাপেক্ষা ভয় আমাদের স্বজাতিকে—যাহার হিতের জন্য প্রাণপণ করা যাইবে সেই আমাদের প্রধান বিপদের কারণ, আমরা যাহার সহায়তা করিতে যাইব তাহার নিকট হইতে সহায়তা পাইব না, কাপুরুষগণ সত্য অস্বীকার করিবে, নিপীড়িতগণ আপন পীড়া গোপন করিয়া যাইবে, আইন আপন বজ্রমুষ্টি প্রসারিত করিবে এবং জেলখানা আপন লৌহবদন ব্যাদান করিয়া আমাদিগকে গ্রাস করিতে আসিবে কিন্তু তথাপি অকৃত্রিম মহত্ত্ব এবং স্বাভাবিক ন্যায়প্রিয়তাবশত আমাদের মধ্যে দুই-চারিজন লোকও যখন শেষ পর্যন্ত অটল থাকিতে পারিবে তখন আমাদের জাতীয় বন্ধনের সূত্রপাত হইতে থাকিবে এবং তখন আমরা ন্যায়বিচার পাইবার অধিকার প্রাপ্ত হইব।

জানি না হিন্দু ও মুসলমানের বিরোধ অথবা ভারতবর্ষীয় ও ইংরেজের সংঘর্ষস্থলে আমরা যাহা অনুমান ও অনুভব করিয়া থাকি তাহা সত্য কি না, আমরা যে অবিচারের আশঙ্কা করিয়া থাকি, তাহা সমূলক কি না, কিন্তু ইহা নিশ্চয় জানি যে, কেবলমাত্র বিচারকের অনুগ্রহ ও কর্তব্যবুদ্ধির উপর বিচারভার রাখিয়া দিলে সুবিচারের অধিকারী হওয়া যায় না। রাজতন্ত্র যতই উন্নত হউক প্রজার অবস্থা নিতান্ত অবনত হইলে সে কখনোই আপনাকে উচ্চে ধারণ করিয়া রাখিতে পারে না, কারণ মানুষের দ্বারাই রাজ্য চলিয়া থাকে, যন্ত্রের দ্বারাও নহে, দেবতার দ্বারাও নহে। তাহাদের নিকট যখন আমরা আপনাদিগকে মনুষ্য বলিয়া প্রমাণ দিব তখন তাহারা সকল সময়েই আমাদের সহিত মনুষ্যোচিত ব্যবহার করিবে। যখন ভারতবর্ষে অন্তত কতকগুলি লোকও উঠিবেন যাঁহারা আমাদের মধ্যে অটল সত্যপ্রিয়তা ও নির্ভীক ন্যায়পরতার উন্নত আদর্শ স্থাপন করিবেন, যখন ইংরেজ অন্তরের সহিত অনুভব করিবে যে, ভারতবর্ষ ন্যায়বিচার নিশ্চেষ্টভাবে গ্রহণ করে না, সচেষ্টভাবে প্রার্থনা করে, অন্যায় নিবারণের জন্য প্রাণপণ করিতে প্রস্তুত হয় তখন তাহারা কখনো ভ্রমেও আমাদিগকে অবহেলা করিবে না এবং আমাদের প্রতি ন্যায়বিচারে শৈথিল্য করিতে তাহাদের স্বভাবতই প্রবৃত্তি হইবে না।

১৩০১

কণ্ঠরোধ

সিডিশন বিল পাস হইবার পূর্ব দিনে টাউনহলে পঠিত

অদ্য আমি যে-ভাষায় প্রবন্ধ পাঠ করিতে উদ্যত হইয়াছি তাহা যদিও বাঙালির ভাষা, দুর্বলের ভাষা, বিজিত জাতির ভাষা তথাপি সে-ভাষাকে আমাদের কর্তৃপক্ষেরা ভয় করিয়া থাকেন। তাহার একটি কারণ, এ-ভাষা তাঁহারা জানেন না। এবং যেখানেই অজ্ঞানের অন্ধকার সেইখানেই অন্ধ আশঙ্কার প্রেতভূমি।

কারণ যাহাই হউক না কেন যে-ভাষা আমাদের শাসনকর্তারা জানেন না, এবং যে-ভাষাকে তাঁহারা মনে মনে ভয় করেন সে-ভাষায় তাঁহাদিগকে সম্ভাষণ করিতে আমি ততোধিক ভয় করি। কেননা আমরা কোন্ ভাব হইতে কী কথা বলিতেছি, আমাদের কথাগুলি সুদুঃসহ বেদনা হইতে উচ্ছ্বসিত, না দুর্বিষহ স্পর্ধা হইতে উদ্‌গিরিত তাহার বিচারের ভার তাঁহাদেরই হস্তে, এবং তাহার বিচারের ফল নিতান্ত সামান্য নহে।

আমি বিদ্রোহী নহি, বীর নহি, বোধ করি নির্বোধও নহি। উদ্যত রাজদণ্ডপাতের দ্বারা দলিত হইয়া অকস্মাৎ অপঘাতমৃত্যুর ইচ্ছাও আমার নাই ; কিন্তু আমাদের রাজকীয় দণ্ডধারী পুরুষটি ভাষার ঠিক কোন্ সীমানায় ঘাটি বাঁধিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছেন তাহা আমি স্পষ্টরূপে জানি না,—এবং আমি ঠিক কোন্‌খানে পদার্পণ করিলে শাসনকর্তার লগুড় আসিয়া আমাকে ভূমিশায়ী করিবে তাহা কর্তার নিকটও অস্পষ্ট,—কারণ, কর্তার নিকট আমার ভাষা অস্পষ্ট, আমিও নিরতিশয় অস্পষ্ট, সুতরাং স্বভাবতই তাঁহার শাসনদণ্ড আনুমানিক আশঙ্কাবেগে অন্ধভাবে পরিচালিত হইয়া দণ্ডবিধির ন্যায়সীমা উল্লঙ্ঘনপূর্বক আকস্মিক উল্কাপাতের ন্যায় অযথাস্থানে দুর্বলজীবের অন্তরিন্দ্রিয়কে অসময়ে সচকিত করিয়া তুলিতে পারে। এমনস্থলে সর্বতোভাবে মূক হইয়া থাকাই সুবুদ্ধির কাজ, এবং আমাদের এই দুর্ভাগ্য দেশে অনেকেই কর্তব্যক্ষেত্র হইতে যথেষ্ট দূরে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া সেই নিরাপদ সদ্‌বুদ্ধি অবলম্বন করিবেন তাহারও দুই-একটা লক্ষণ এখন হইতে দেখা যাইতেছে,—আমাদের দেশের বিক্রমশালী বাগ্মী যাঁহারা বিলাতি সিংহনাদে শ্বেতদ্বৈপায়নগণের চিত্তেও সহসা বিভ্রম উৎপাদন করিতে পারেন তাঁহাদের অনেকে বিবর আশ্রয় করিয়া বাগ্‌রোধ অভ্যাস করিতে বসিবেন দেশের এমন একটা দুঃসময় আসন্ন ;—সে-সময়ে দুর্ভাগ্য দেশের নির্বাক বেদনা নিবেদন করিতে রাজদ্বারে অগ্রসর হইবে এমন দুঃসাহসিক দেশবন্ধু দুর্লভ হইয়া পড়িবে। যদিচ শাস্ত্রে আছে

"রাজদ্বারে শ্মশানে চ যস্তিষ্ঠতি স বান্ধবঃ" তথাপি শ্মশান যখন রাজদ্বারের এত অত্যন্ত নিকটবর্তী হইয়াছে তখন ভীত বন্ধুদিগকে কথঞ্চিৎ মার্জনা করিতে হইবে।

অবশ্য, রাজা বিমুখ হইলে আমরা ভয় পাইব না আমাদের এমন স্বভাবই নহে কিন্তু রাজা যে কেন আমাদের প্রতি এতটা ভয় প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন সেই প্রশ্নই আমাদিগকে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিয়াছে।

যদিচ ইংরেজ আমাদের একেশ্বর রাজা, এবং তাঁহাদের শক্তিও অপরিমেয়, তথাপি এ-দেশে তাঁহারা ভয়ে ভয়ে বাস করেন ক্ষণে ক্ষণে তাহার পরিচয় পাইয়া আমরা বিস্ময় বোধ করি। অতিদূরে রুশিয়ার পদধ্বনি অনুমানমাত্র করিলে তাঁহারা যে কিরূপ চকিত হইয়া উঠেন তাহা আমরা বেদনার সহিত অনুভব করিয়াছি। কারণ প্রত্যেকবার তাঁহাদের সেই হৃৎকম্পের চমকে আমাদের ভারতলক্ষ্মীর শূন্যপ্রায় ভাণ্ডারে ভূমিকম্প উপস্থিত হয়, আমাদের দৈন্যপীড়িত কঙ্কালসার দেশের ক্ষুধার অন্নপিণ্ডগুলি মুহূর্তের মধ্যে কামানের কঠিন লৌহপিণ্ডে পরিণত হইয়া যায়;—সেটা আমাদের পক্ষে লঘুপাক খাদ্য নহে।

বাহিরে প্রবল শত্রুসম্বন্ধে এইরূপ সচকিত সতর্কতার সমূলক কারণ থাকিতেও পারে, তাহার নিগূঢ় সংবাদ এবং জটিল তত্ত্ব আমাদের জানা নাই।

কিন্তু আমরা আমাদিগকে জানি। আমরা যে কোনো অংশেই ভয়ংকর নহি সে-বিশ্বাস আমাদের বদ্ধমূল। এবং যতক্ষণ সে-বিশ্বাস আমাদের নিজের মনে নিঃসংশয়ভাবে দৃঢ় থাকে ততক্ষণ আমাদের ভয়ংকারিতাও সর্বতোভাবে দূরীকৃত।

কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে উপর্যুপরি কতকগুলি অভাবনীয় ঘটনায় আমরা হঠাৎ আবিষ্কার করিয়াছি যে, বিনা চেষ্টায় বিনা কারণে আমরা ভয় উৎপাদন করিতেছি। আমরা ভয়ংকর! আশ্চর্য! ইহা আমরা পূর্বে কেহ সন্দেহই করি নাই।

ইতিমধ্যে একদিন দেখিলাম গবর্মেন্ট অত্যন্ত সচকিত ভাবে তাঁহার পুরাতন দণ্ডশালা হইতে কতকগুলি অব্যবহৃত কঠিন নিয়মের প্রবল লৌহশৃঙ্খল টানিয়া বাহির করিয়া তাহার মরিচা সাফ করিতে বসিয়াছেন। প্রত্যহ প্রচলিত আইনের মোটা কাছিতেও আমাদিগকে আর বাঁধিয়া রাখিতে পারে না—আমরা অত্যন্ত ভয়ংকর!

একদিন শুনিলাম অপরাধিবিশেষকে সন্ধানপূর্বক গ্রেফতার করিতে অক্ষম হইয়া রোষরক্ত গবর্মেন্ট সাক্ষীসাবুদ-বিচারবিবেচনার বিলম্বমাত্র না করিয়া একেবারে সমস্ত পুনা শহরের বক্ষের উপর রাজদণ্ডের জগদ্দল পাথর চাপাইয়া দিলেন। আমরা ভাবিলাম, পুনা বড়ো ভয়ংকর শহর। ভিতরে ভিতরে না জানি কী ভয়ানক কাণ্ডই করিয়াছে!

আজ পর্যন্ত সে ভয়ানক কাণ্ডের কোনো অস্থিসন্ধি পাওয়া গেল না।

কাণ্ডটা সত্য অথবা স্বপ্ন ইহাই ভাবিয়া অবাক হইয়া বসিয়া আছি এমন সময় তারের খবর আসিল, রাজপ্রাসাদের গুপ্তচূড়া হইতে কোন্ এক অজ্ঞাত অপরিচিত বীভৎস আইন বিদ্যুতের মতো পড়িয়া নাটুভ্রাতৃযুগলকে ছোঁ মারিয়া কোথায় অন্তর্ধান করিয়াছে। দেখিতে দেখিতে আকস্মিক গুরুবর্ষার মতো সমস্ত বম্বাই প্রদেশের মাথার উপরে কালো মেঘ নিবিড় হইয়া উঠিল এবং জবরদস্ত শাসনের ঘন ঘন বজ্রপাত ও শিলাবৃষ্টির আয়োজন-আড়ম্বরে আমরা ভাবিলাম, ভিতরে কী ঘটিয়াছে জানি না, কিন্তু বেশ দেখিতেছি, ব্যাপারটি সহজ নহে। মাহারাট্টারা বড়ো ভয়ংকর জাত!

একদিকে পুরাতন আইন-শৃঙ্খলের মরিচা সাফ হইল আবার অন্যদিকে রাজকারখানায় নূতন লৌহশৃঙ্খল নির্মাণের ভীষণ হাতুড়ি-ধ্বনিতে সমস্ত ভারতবর্ষ কম্পান্বিত হইয়া উঠিয়াছে। একটা ভয়ানক ধুম পড়িয়া গেছে। আমরা এতই ভয়ংকর!

আমরা এতকাল বিপুলা পৃথিবীকে অচলা বলিয়া বিশ্বাস করিতাম এবং এই প্রবলা বসুন্ধরার প্রতি আমরা যতই নির্ভর ও যতই উপদ্রব করিয়াছি তিনি তাহা অকুণ্ঠিত প্রকাণ্ড শক্তিতে অনায়াসে বহন করিয়াছেন। একদিন নববর্ষার দুর্যোগে মেঘাবৃত অপরাহ্নে অকস্মাৎ আমাদের সেই চিরনির্ভরভূমি জানি না কোন্ নিগূঢ় আশঙ্কায় কম্পান্বিত হইতে লাগিলেন। আমরা দেখিলাম তাঁহার সেই মুহূর্তকালের চাঞ্চল্যে আমাদের বহুকালের প্রিয় পুরাতন বাসস্থানগুলি ধূলিসাৎ হইল।

গবর্মেণ্টের অচলা নীতিও যদি অকস্মাৎ সামান্য অথবা অনির্দেশ্য আতঙ্কে বিচলিত ও বিদীর্ণ হইয়া আমাদিগকে গ্রাস করিতে উদ্যত হয় তাহা হইলে তাহার শক্তি ও নীতির দৃঢ়তা সম্বন্ধে আমাদের চিরবিশ্বাস হঠাৎ প্রচণ্ড আঘাত প্রাপ্ত হয়। সেই আঘাতে প্রজার মনে ভয়সঞ্চার হওয়া সম্ভবপর কিন্তু সেই সঙ্গে নিজের প্রতিও তাহার অকস্মাৎ অত্যধিক মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়া স্বাভাবিক। হঠাৎ এ প্রশ্নটা আপনিই মনে উদয় হয় আমি না জানি কী!

সুতরাং ইহার মধ্যে আমাদের একটুখানি সান্ত্বনা আছে। কারণ, সম্পূর্ণ নিস্তেজ নিঃসত্ত্ব জাতির প্রতি বলপ্রয়োগ করা যেমন অনাবশ্যক, তেমনি তাহাকে শ্রদ্ধা করাও অসম্ভব। আমাদিগকে দমন করিবার জন্য অতিরিক্ত আয়োজন দেখিলে ন্যায়-অন্যায় বিচার-অবিচারের তর্ক দূরে রাখিয়া এ-কথা আমাদের স্বভাবতই মনে হয় যে, হয়তো আমাদের মধ্যে একটা শক্তির সম্ভাবনা আছে যাহা কেবল

মূঢ়তাবশত আমরা সকল সময়ে উপলব্ধি করিতে পারি না। গবর্মেণ্ট যখন চারি তরফ হইতেই কামান পাতিতেছেন তখন ইহা নিশ্চয় যে আমরা মশা নহি,—অন্তত মরা মশা নহি।

আমাদের স্বজাতির অন্তরে একটা প্রাণ একটা শক্তির সঞ্চার-সম্ভাবনা আমাদের পক্ষে পরমানন্দের বিষয় এ-কথা অস্বীকার করা এমন সুস্পষ্ট কপটতা যে, তাহা পলিসিস্বরূপে অনাবশ্যক এবং প্রবঞ্চনাস্বরূপে নিষ্ফল। অতএব গবর্মেণ্টের তরফ হইতে আমাদের কোনোখানে সেই শক্তির স্বীকার দেখিতে পাইলে নিরাশচিত্তে কিঞ্চিৎ গর্বের সঞ্চার না হইয়া থাকিতে পারে না।

কিন্তু, হায়, এ গর্ব আমাদের পক্ষে সাংঘাতিক,—শুক্তির মুক্তার ন্যায় ইহা আমাদের পক্ষে ব্যাধি,—উপযুক্ত ধীবররাজ আমাদের জঠরের মধ্যে কঠোর ছুরিকা চালাইয়া এই গর্বটুকু নিঃশেষে বাহির করিয়া লইয়া নিজেদের রাজমুকুটের উপরে স্থাপন করিবেন। ইংরেজ নিজের আদর্শে পরিমাপ করিয়া আমাদিগকে যে অযথা সম্মান দিতেছেন সে-সম্মান হয়তো আমাদের পক্ষে একই কালে পরিহাস এবং মৃত্যু। আমাদের যে-বল সন্দেহ করিয়া গবর্মেণ্ট আমাদের প্রতি বলপ্রয়োগ করিতেছেন সে-বল যদি আমাদের না থাকে তবে গবর্মেণ্টের গুরুদণ্ডে আমরা নষ্ট হইয়া যাইব,—সে-বল যদি যথার্থ থাকে তবে দণ্ডের তাড়নায় তাহা উত্তরোত্তর দৃঢ় এবং গোপনে প্রবল হইবে।

আমরা তো আমাদিগকে জানি, কিন্তু ইংরেজ আমাদিগকে জানেন না। না জানিবার ১০১ কারণ আছে—তাহা বিস্তারিত পর্যালোচনা করিবার প্রয়োজন নাই। মূল কথাটা এই, তাঁহারা আমাদিগকে জানেন না। আমরা পূর্বদেশী, তাঁহারা পশ্চিমদেশী। আমাদের মধ্যে যে কী হইতে কী হয়, কোথায় আঘাত লাগিলে কোন্‌খানে ধোঁয়াইয়া উঠে তাহা তাঁহারা ঠিক করিয়া বুঝিতে পারেন না। সেইজন্যই তাঁহাদের ভয়। আমাদের মধ্যে ভয়ংকরত্বের আর কোনো লক্ষণ নাই কেবল একটি আছে, আমরা অজ্ঞাত। আমরা স্তন্যপায়ী উদ্ভিজ্জাশী জীব, আমরা শান্ত সহিষ্ণু উদাসীন কিন্তু তবু আমাদিগকে বিশ্বাস করিতে নাই, কারণ আমরা প্রাচ্য আমরা দুর্জ্ঞেয়।

সত্য যদি তাহাই হইবে, তবে হে রাজন্‌, আমাদিগকে আরও কেন অজ্ঞেয় করিয়া তুলিতেছ? যদি রজ্জুতে সর্পভ্রম ঘটিয়া থাকে তবে তাড়াতাড়ি ঘরের প্রদীপ নিবাইয়া দিয়া ভয়কে আরও পরিব্যাপ্ত করিয়া তুলিতেছ কেন? যে একমাত্র উপায়ে আমরা আত্মপ্রকাশ করিতে পারি, তোমাদের নিকট আপনাকে পরিচিত করিতে পারি তাহা রোধ করিয়া ফল কী?

সিপাহিবিদ্রোহের পূর্বে হাতে হাতে যে-রুটি বিলি হইয়াছিল তাহাতে একটি অক্ষরও লেখা ছিল না—সেই নির্বাক নিরক্ষর সংবাদপত্রই কি যথার্থ ভয়ংকর নহে? সর্পের গতি গোপন এবং দংশন নিঃশব্দ, সেইজন্যই কি তাহা নিদারুণ নহে? সংবাদপত্র যতই অধিক এবং যতই অবাধ হইবে স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে দেশ ততই আত্মগোপন করিতে পারিবে না। যদি কখনো কোনো ঘনান্ধকার অমাবস্যারাত্রে আমাদের অবলা ভারতভূমি দুরাশার দুঃসাহসে উন্মাদিনী হইয়া বিপ্লবাভিসারে যাত্রা করে, তবে সিংহদ্বারের কুকুর না ডাকিতেও পারে, রাজার প্রহরী না জাগিতেও পারে, পুররক্ষক কোতোয়াল তাহাকে না চিনিতেও পারে, কিন্তু তাহার নিজেরই সর্বাঙ্গের কঙ্কণকিঙ্কিণীনূপুরকেয়ূর, তাহার বিচিত্র ভাষার বিচিত্র সংবাদপত্রগুলি কিছু-না-কিছু বাজিয়া উঠিবেই, নিষেধ মানিবে না। প্রহরী যদি নিজহস্তে সেই মুখর ভূষণগুলির ধ্বনি রোধ করিয়া দেন তবে তাঁহার নিদ্রার সুযোগ হইতে পারে কিন্তু পাহারার কী সুবিধা হইবে জানি না।

কিন্তু পাহারা দিবার ভার যে জাগ্রত লোকটির হাতে, পাহারা দিবার প্রণালীও তিনি স্থির করিবেন; সে-সম্বন্ধে বিজ্ঞভাবে পরামর্শ দেওয়া আমার পক্ষে নিরতিশয় ধৃষ্টতা এবং সম্ভবত তাহা নিরাপদও নহে। অতএব মাতৃভাষায় আমার এই দুর্বল উদ্যমের মধ্যে সে দুশ্চেষ্টা নাই। তবে আমার এই ক্ষীণ, ক্ষুদ্র, ব্যর্থ অথচ বিপৎসংকুল বাচালতা কেন? সে কেবল, প্রবলের ভয় দুর্বলের পক্ষে কী ভয়ংকর তাহাই স্মরণ করিয়া।

ইহার একটি ক্ষুদ্র দৃষ্টান্ত এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। কিছুদিন হইল একদল ইতরশ্রেণীর অবিবেচক মুসলমান কলিকাতার রাজপথে লোষ্ট্রখণ্ডহস্তে উপদ্রবের চেষ্টা করিয়াছিল। তাহার মধ্যে বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, উপদ্রবের লক্ষ্যটা বিশেষরূপে ইংরেজেরই প্রতি। তাহাদের শাস্তিও যথেষ্ট হইয়াছিল। প্রবাদ আছে, ইঁটটি মারিলেই পাটকেলটি খাইতে হয়, কিন্তু মূঢ়গণ ইঁটটি মারিয়া পাটকেলের অপেক্ষা অনেক শক্ত শক্ত জিনিস খাইয়াছিল। অপরাধ করিল দণ্ড পাইল কিন্তু ব্যাপারটা কী আজ পর্যন্ত স্পষ্ট বুঝা গেল না। এই নিম্নশ্রেণীর মুসলমানগণ সংবাদপত্র পড়েও না, সংবাদপত্রে লেখেও না;—একটা ছোটো বড়ো কাণ্ড হইয়া গেল অথচ এই মূক নির্বাক প্রজাসম্প্রদায়ের মনের কথা কিছুই বোঝা গেল না। ব্যাপারটি রহস্যাবৃত রহিল বলিয়াই সাধারণের নিকট তাহার একটা অযথা এবং কৃত্রিম গৌরব জন্মিল। কৌতূহলী কল্পনা হ্যারিসন রোডের প্রান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া তুরস্কের অর্ধচন্দ্রশিখরী রাজপ্রাসাদ পর্যন্ত সম্ভব ও অসম্ভব অনুমানকে শাখাপল্লবান্বিত করিয়া চলিল। ব্যাপারটি রহস্যাবৃত রহিল বলিয়াই আতঙ্কচকিত ইংরেজি কাগজ কেহ বলিল, ইহা কনগ্রেসের সহিত যোগবদ্ধ রাষ্ট্রবিপ্লবের সূচনা, কেহ বলিল, মুসলমানদের বসতিগুলা একেবারে উড়াইয়া পুড়াইয়া

দেওয়া যাক, কেহ বলিল, এমন নিদারুণ বিপৎপাতের সময় তুহিনাবৃত শৈলশিখরের উপর বড়োলাটসাহেবের এতটা সুশীতল হইয়া বসিয়া থাকা উচিত হয় না।

রহস্যই অনিশ্চিত ভয়ের প্রধান আশ্রয়স্থান—এবং প্রবল ব্যক্তির অনিশ্চিত ভয় দুর্বল ব্যক্তির নিশ্চিত মৃত্যু। রুদ্ধবাক সংবাদপত্রের মাঝখানে রহস্যান্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া থাকা আমাদের পক্ষে বড়োই ভয়ংকর অবস্থা। তাহাতে করিয়া আমাদের সমস্ত ক্রিয়াকলাপ রাজপুরুষদের চক্ষে সংশয়ান্ধকারে অত্যন্ত কৃষ্ণবর্ণ দেখাইবে। দুরপনেয় অবিশ্বাসে রাজদণ্ড উত্তরোত্তর খরধার হইয়া উঠিবে এবং প্রজার হৃদয় বিষাদে ভারাক্রান্ত ও নির্বাক নৈরাশ্যে বিষতিক্ত হইতে থাকিবে। আমরা ইংরেজের একান্ত অধীন প্রজা, কিন্তু প্রকৃতির নিয়ম তাঁহার দাসত্ব করে না। আঘাত করিলে আমরা বেদনা পাইব; ইংরেজ হাজার চক্ষু রক্তবর্ণ করিলেও এ নিয়মটাকে দেশান্তরিত করিতে পারিবেন না। তাঁহারা রাগ করিয়া আঘাতের মাত্রা বাড়াইতে পারেন, কিন্তু বেদনার মাত্রাও সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়া উঠিবে। কারণ, সে বিধির নিয়ম; পিনাল কোডে তাহার কোনো নিষেধ নাই। অন্তর্দাহ বাক্যে প্রকাশ না হইলে অন্তরে সঞ্চিত হইতে থাকে। সেইরূপ অস্বাস্থ্যকর অস্বাভাবিক অবস্থায় রাজাপ্রজার সম্বন্ধ যে কিরূপ বিকৃত হইবে তাহা কল্পনা করিয়া আমরা ভীত হইতেছি।

কিন্তু এই অনির্দিষ্ট সংশয়ের অবস্থা সর্বাপেক্ষা প্রধান অমঙ্গল নহে। আমাদের পক্ষে ইহা অপেক্ষা গুরুতর অশুভ আছে।

মানবচরিত্রের উপরে পরাধীনতার অবনতিকর ফল আছেই তাহা আমরা ইংরেজের নিকট হইতেই শিখিয়াছি। অসত্যাচরণ কপটতা অধীন জাতির আত্মরক্ষার অস্ত্রস্বরূপ হইয়া তাহার আত্মসম্মানকে তাহার মনুষ্যত্বকে নিশ্চিতরূপে নষ্ট করিয়া ফেলে। স্বাধীনতাপূজক ইংরেজ আপন প্রজাদিগের অধীনদশা হইতে সেই হীনতার কলঙ্ক যথাসম্ভব অপনয়ন করিয়া আমাদিগকে মনুষ্যত্বের শিক্ষা দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। আমরা বিজিত তাঁহারা বিজেতা, আমরা দুর্বল তাঁহারা সবল ইহা তাঁহারা পদে পদে স্মরণ করাইয়া রাখেন নাই। এতদূর পর্যন্তও ভুলিতে দিয়াছিলেন যে, আমরা মনে করিয়াছিলাম ভাবপ্রকাশের স্বাধীনতা আমাদের মনুষ্যত্বের স্বাভাবিক অধিকার।

আজ সহসা জাগ্রত হইয়া দেখিতেছি দুর্বলের কোনো অধিকারই নাই। আমরা যাহা মনুষ্যমাত্রেরই প্রাপ্য মনে করিয়াছিলাম তাহা দুর্বলের প্রতি প্রবলের স্বেচ্ছাধীন অনুগ্রহ মাত্র। আমি আজ যে এই সভাস্থলে দাঁড়াইয়া একটিমাত্র শব্দোচ্চারণ করিতেছি তাহাতে আমার মনুষ্যোচিত গর্বানুভব করিবার কোনো কারণ নাই,—দোষ

করিবার ও বিচার হইবার পূর্বেই যে আমি কারাগারের মধ্যে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত দেখিতেছি না তাহাতেও আমার কোনো গৌরব নাই।

ইহা এক হিসাবে সত্য। কিন্তু এই সত্য সর্বদা অনুভব করা রাজা প্রজা কাহারও পক্ষে হিতকর নহে। মনুষ্য, অবস্থার পার্থক্যের মাঝখানে হৃদয়ের সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া অসমানতার মধ্যেও নিজের মনুষ্যত্ব রক্ষার চেষ্টা করে।

শাসিত ও শাসনকর্তার মধ্যবর্তী শাসনশৃঙ্খলটাকে সর্বদা ঝংকার না দিয়া সেটাকে আত্মীয়সম্বন্ধ-বন্ধনরূপে ঢাকিয়া রাখিলে অধীন জাতির ভার লাঘব হয়।

মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা এই প্রকারের একটা আচ্ছাদনপট। ইহাতে আমাদের অবস্থার হীনতা গোপন করিয়া রাখিয়াছিল। আমরা জেতৃজাতির সহস্র ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত হইয়াও এই স্বাধীনতাসূত্রে অন্তরঙ্গভাবে তাঁহাদের নিকটবর্তী ছিলাম। আমরা দুর্বলজাতির হীন ভয় ও কপটতা ভুলিয়া মুক্তহৃদয়ে উন্নতমস্তকে সত্য কথা স্পষ্ট কথা বলিতে শিখিতেছিলাম।

যদিচ উচ্চতর রাজকার্যে আমাদের স্বাধীনতা ছিল না, তথাপি নির্ভীকভাবে পরামর্শ দিয়া স্পষ্টবাক্যে সমালোচনা করিয়া আপনাদিগকে এই বিপুল ভারতরাজ্যশাসনকার্যের অঙ্গ বলিয়া জ্ঞান করিতাম। তাহার অন্য ফলাফল বিবেচনা করিবার সময় নাই, কিন্তু তাহাতে আমাদের আত্মসম্মান বাড়িয়া উঠিয়াছিল। আমরা জানিতাম আমাদের স্বদেশ-শাসনের বিপুল ব্যাপারে আমরা অকর্মণ্য নিশ্চেষ্ট নহি—ইহার মধ্যে আমাদেরও কর্তব্য আমাদেরও দায়িত্ব আছে। এই শাসনকার্যের উপর যখন প্রধানত আমাদের সুখদুঃখ আমাদের শুভ-অশুভ নির্ভর করিতেছে, তখন তাহার সহিত আমাদের কোনো মন্তব্য কোনো বক্তব্য কোনো কর্তব্যবন্ধনের যোগ না থাকিলে আমাদের দীনতা আমাদের হীনতার আর অবধি থাকে না। বিশেষত আমরা ইংরেজি বিদ্যালয়ে শিক্ষা পাইয়াছি, ইংরেজি সাহিত্য হইতে ইংরেজ কর্মবীরগণের দৃষ্টান্ত আমাদের অন্তঃকরণের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সর্বপ্রকার ব্যাপারেই নিজের শুভসাধনে আমাদের নিজের স্বাধীন অধিকার থাকার যে পরম গৌরব তাহা আমরা অনুভব করিয়াছি। আজ যদি অকস্মাৎ আমরা সেই ভাবপ্রকাশের স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত হই,—রাজকার্যচালনার সহিত আমাদের সমালোচনার ক্ষুদ্র সম্বন্ধটুকুও এক আঘাতে বিচ্ছিন্ন হয়, এবং হয় আমরা নিশ্চেষ্ট উদাসীনতার মধ্যে নিমগ্ন হইয়া থাকি, নয় কপটতা ও মিথ্যা বাক্যের দ্বারা প্রবলতার রাজপদতলে আপন মনুষ্যত্বকে সম্পূর্ণ বলিদান করি, তবে পরাধীনতার সমস্ত হীনতার সঙ্গে উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত আকাঙ্ক্ষার বাক্যহীন ব্যর্থবেদনা মিশ্রিত হইয়া আমাদের দুর্দশা পরাকাষ্ঠাপ্রাপ্ত হইবে; যে-সম্বন্ধের

মধ্যে আদানপ্রদানের একটি সংকীর্ণ পথ খোলা ছিল ভয় আসিয়া সে পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইবে ;—রাজার প্রতি প্রজার সে-ভয় গৌরবের নহে এবং প্রজার প্রতি রাজার সে-ভয় ততোধিক শোচনীয়।

এই মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতাবরণ উত্তোলন করিয়া লইলে আমাদের পরাধীনতার সমস্ত কঠিন কঙ্কাল একমুহূর্তে বাহির হইয়া পড়িবে। আজকালকার কোনো কোনো জবরদস্ত ইংরেজ লেখক বলেন, যাহা সত্য তাহা অনাবৃত হইয়া থাকাই ভালো। কিন্তু, আমরা জিজ্ঞাসা করি ইংরেজশাসনে এই কঠিন শুষ্ক পরাধীনতার কঙ্কালই কি একমাত্র সত্য, ইহার উপরে জীবনের লাবণ্যের যে আবরণ, স্বাধীন গতিভঙ্গির যে বিচিত্র লীলা মনোহর শ্রী অর্পণ করিয়াছিল তাহাই কি মিথ্যা, তাহাই কি মায়া ? দুইশত বৎসর পরিচয়ের পরে আমাদের মানবসম্বন্ধের এই কি অবশেষ ?

১৩০৫

ইম্পীরিয়লিজ্‌ম

বিলাতে ইম্পীরিয়লিজ্‌মের একটা নেশা ধরিয়াছে। অধীন দেশ ও উপনিবেশ প্রভৃতি জড়াইয়া ইংরেজসাম্রাজ্যকে একটা বৃহৎ উপসর্গ করিয়া তুলিবার ধ্যানে সে-দেশে অনেকে নিযুক্ত আছেন। বিশ্বামিত্র একটা নূতন জগৎ সৃষ্টি করিবার উদ্‌যোগ করিয়াছিলেন, বাইবেল-কথিত কোনো রাজা স্বর্গের প্রতি স্পর্ধা করিয়া এক স্তম্ভ তুলিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, স্বয়ং দশাননের সম্বন্ধেও এরূপ একটা জনশ্রুতি প্রচলিত আছে।

দেখা যাইতেছে এইরূপ বড়ো বড়ো মতলব পৃথিবীতে অনেক সময়ে অনেক লোকে মনে মনে আঁটিয়াছে। এ-সকল মতলব টেকে না—কিন্তু নষ্ট হইবার পূর্বে পৃথিবীতে কিছু অমঙ্গল না সাধিয়া যায় না।

তাঁহাদের দেশের এই খেয়ালের ঢেউ লর্ড কার্জনের মনের মধ্যেও যে তোলপাড় করিতেছে সেদিনকার এক অলক্ষণে বক্তৃতায় তিনি তাহার আভাস দিয়াছেন। দেখিয়াছি আমাদের দেশের কোনো কোনো খবরের কাগজ কখনো কখনো এই বিষয়টাতে একটু উৎসাহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, বেশ কথা, ভারতবর্ষকে ব্রিটিশ "এম্পায়ারে" একাত্ম হইবার অধিকার দাও না।

কথার ছল ধরিয়া তো কোনো অধিকার পাওয়া যায় না—এমন কি, লেখাপড়া পাকা কাগজে হইলেও দুর্বল লোকের পক্ষে নিজের স্বত্ব উদ্ধার করা শক্ত। এই কারণে যখন দেখিতে পাই যাহারা আমাদের উপরওআলা তাঁহারা ইম্পীরিয়লবায়ুগ্রস্ত, তখন মনের মধ্যে স্বস্তি বোধ করি না।

পাঠকেরা বলিতে পারেন, তোমার অত ভয় করিবার প্রয়োজন কী, যাহার হাতে ক্ষমতা আছে সে-ব্যক্তি ইম্পীরিয়লিজ্‌মের বুলি আওড়াক বা নাই আওড়াক তোমার মন্দ করিতে ইচ্ছা করিলে সে তো অনায়াসে করিতে পারে।

অনায়াসে করিতে পারে না। কেননা হাজার হইলেও দয়াধর্ম একেবারে ছাড়া কঠিন। লজ্জাও একটা আছে। কিন্তু একটা বড়ো-গোছের বুলি যদি কাহাকেও পাইয়া বসে, তবে তাহার পক্ষে নিষ্ঠুরতা ও অন্যায় সহজ হইয়া উঠে।

অনেক লোকে জন্তুকে শুধু শুধু কষ্ট দিতে পীড়া বোধ করে। কিন্তু কষ্ট দেওয়ার একটা নাম যদি দেওয়া যায় "শিকার" তবে সে-ব্যক্তি আনন্দের সহিত হত-আহত নিরীহ পাখির তালিকা বৃদ্ধি করিয়া গৌরব বোধ করে। নিশ্চয়ই, বিনা-উপলক্ষ্যে যে-ব্যক্তি পাখির ডানা ভাঙিয়া দেয়, সে-ব্যক্তি শিকারির চেয়ে নিষ্ঠুর, কিন্তু পাখির তাহাতে বিশেষ সান্ত্বনা নাই। বরঞ্চ অসহায় পক্ষিকুলের পক্ষে স্বভাবনিষ্ঠুরের চেয়ে শিকারির দল অনেক বেশি নিদারুণ।

যাঁহারা ইম্পীরিয়লিজ্‌মের খেয়ালে আছেন, তাঁহারা দুর্বলের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ও অধিকার সম্বন্ধে অকাতরে নির্মম হইতে পারেন এ-বিষয়ে সন্দেহ নাই, পৃথিবীর নানাদিকেই তাহার দৃষ্টান্ত দেখা যাইতেছে।

রাশিয়া, ফিনল্যাণ্ড-পোল্যাণ্ডকে নিজের বিপুল কলেবরের সহিত একেবারে বেমালুম মিশাইয়া লইবার জন্য যে কী পর্যন্ত চাপ দিতেছে, তাহা সকলেই জানেন। এতদূর পর্যন্ত কখনোই সম্ভব হইত না যদি না রাশিয়া মনে করিত, তাহার অধীন দেশের স্বাভাবিক বৈষম্যগুলি জবরদস্তির সহিত দূর করিয়া দেওয়াই ইম্পীরিয়লিজম নামক একটা সর্বাঙ্গীণ বৃহৎ স্বার্থের পক্ষে প্রয়োজনীয়। এই স্বার্থকে রাশিয়া পোল্যাণ্ড-ফিনল্যাণ্ডেরও স্বার্থ বলিয়া গণ্য করে।

লর্ড কার্জনও সেই ভাবেই বলিতেছেন, জাতীয়তার কথা ভুলিয়া এম্পায়ারের স্বার্থকে তোমাদের নিজের স্বার্থ করিয়া তোলো।

কোনো শক্তিমানের কানে এ-কথা বলিলে তাহার ভয় পাইবার কারণ নাই; কেননা, শুধু কথায় সে ভুলিবে না। বস্তুতই তাহার স্বার্থ কড়ায় গণ্ডায় সপ্রমাণ হওয়া চাই। অর্থাৎ সে-স্থলে তাহাকে দলে টানিতে গেলে নিজের স্বার্থও যথেষ্টপরিমাণে

বিসর্জন না দিলে তাহার মন পাওয়া যাইবে না। অতএব, সেখানে অনেক মধু ঢালিতে হয়, অনেক তেল খরচ না করিয়া চলে না।

ইংলণ্ডের উপনিবেশগুলি তাহার দৃষ্টান্ত। ইংরেজ ক্রমাগতই তাহাদের কানে মন্ত্র আওড়াইতেছে, "যদেতৎ হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব," কিন্তু তাহারা শুধু মন্ত্রে ভুলিবার নয়—পণের টাকা গনিয়া দেখিতেছে।

হতভাগ্য আমাদের বেলায় মন্ত্রেরও কোনো প্রয়োজন নাই, পণের কড়ি তো দূরে থাক!

আমাদের বেলায় বিচার্য এই যে, বিদেশীয়ের সহিত ভেদবুদ্ধি জাতীয়তার পক্ষে আবশ্যক কিন্তু ইম্পীরিয়লিজ্‌মের পক্ষে প্রতিকূল; অতএব সেই ভেদবুদ্ধির যে-সকল কারণ আছে, সেগুলাকে উৎপাটন করা কর্তব্য।

কিন্তু সেটা করিতে গেলে দেশের ভিন্ন ভিন্ন অংশের মধ্যে যে একটা ঐক্য জমিয়া উঠিতেছে, সেটাকে কোনোমতে জমিতে না দেওয়াই শ্রেয়। সে যদি খণ্ড খণ্ড চূর্ণ চূর্ণ অবস্থাতেই থাকে, তবে তাহাকে আত্মসাৎ করা সহজ।

ভারতবর্ষের মতো এতবড়ো দেশকে এক করিয়া তোলার মধ্যে একটা গৌরব আছে। ইহাকে চেষ্টা করিয়া বিচ্ছিন্ন রাখা ইংরেজের মতো অভিমানী জাতির পক্ষে লজ্জার কথা।

কিন্তু ইম্পীরিয়লিজ্‌ম-মন্ত্রে এই লজ্জা দূর হয়। ব্রিটিশ এম্পায়ারের মধ্যে এক হইয়া যাওয়াই ভারতবর্ষের পক্ষে যখন পরমার্থলাভ, তখন সেই মহদুদ্দেশে ইহাকে জাঁতায় পিষিয়া বিশ্লিষ্ট করাই "হিয়ুম্যানিটি"।

ভারতবর্ষের কোনো স্থানে তাহার স্বাধীন শক্তিকে সঞ্চিত হইতে না দেওয়া ইংরেজ-সভানীতি অনুসারে নিশ্চয়ই লজ্জাকর; কিন্তু যদি মন্ত্র বলা যায় "ইম্পীরিয়লিজ্‌ম"—তবে যাহা মনুষ্যত্বের পক্ষে একান্ত লজ্জা তাহা রাষ্ট্রনীতিকতার পক্ষে চূড়ান্ত গৌরব হইয়া উঠিতে পারে।

নিজেদের নিশ্চিন্ত একাধিপত্যের জন্য একটি বৃহৎ দেশের অসংখ্য লোককে নিরস্ত্র করিয়া তাহাদিগকে চিরকালের জন্য পৃথিবীর জনসমাজে সম্পূর্ণ নিঃস্বত্ব নিরুপায় করিয়া তোলা যে কতবড়ো অধর্ম, কী প্রকাণ্ড নিষ্ঠুরতা, তাহা ব্যাখ্যা করিবার প্রয়োজন নাই; কিন্তু এই অধর্মের গ্লানি হইতে আপনার মনকে বাঁচাইতে হইলে একটা বড়ো বুলির ছায়া লইতে হয়।

সেসিল রোড্‌স একজন ইম্পীরিয়লবায়ুগ্রস্ত লোক ছিলেন; সেইজন্য দক্ষিণ-আফ্রিকা হইতে বোয়ারদের স্বাতন্ত্র্য লোপ করিবার জন্য তাঁহাদের দলের লোকের কিরূপ আগ্রহ ছিল, তাহা সকলেই জানেন।

ব্যক্তিগত ব্যবহারে যে-সকল কাজকে চৌর্য, মিথ্যাচার বলে, যাহাকে জাল, খুন, ডাকাতি নাম দেয়, একটা ইজ্‌ম্‌-প্রত্যয়যুক্ত শব্দে তাহাকে শোধন করিয়া কতদূর গৌরবের বিষয় করিয়া তোলে, বিলাতি ইতিহাসের মান্যব্যক্তিদের চরিত্র হইতে তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়।

এইজন্য আমাদের কর্তাদের মুখ হইতে ইম্পীরিয়লিজমের আভাস পাইলে আমরা সুস্থির হইতে পারি না। এতবড়ো রথের চাকার তলে যদি আমাদের মর্মস্থান পিষ্ট হয়, তবে ধর্মের দোহাই দিলে কাহারও কর্ণগোচর হইবে না। কারণ, পাছে কাজ ভণ্ডুল করিয়া দেয়, এই ভয়ে মানুষ তাহার বৃহৎ ব্যাপারগুলিতে ধর্মকে আমল দিতে চাহে না।

প্রাচীন গ্রীসে প্রবল এথীনিয়ানগণ যখন দুর্বল মেলিয়ানদের দ্বীপটি অন্যায় নিষ্ঠুরতার সহিত গ্রহণ করিবার উপক্রম করিয়াছিল, তখন উভয় পক্ষে কিরূপ বাদানুবাদ হইয়াছিল, গ্রীক ইতিহাসবেত্তা থুকিদিদীস তাহার একটা নমুনা দিয়াছিলেন। নিম্নে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—ইহা হইতে পাঠকেরা বুঝিতে পারিবেন, ইম্পীরিয়লিজ্‌ম্‌-তত্ত্ব য়ুরোপে কত প্রাচীন—এবং যে-পলিটিকসের ভিত্তির উপরে য়ুরোপীয় সভ্যতা গঠিত, তাহার মধ্যে কিরূপ নিদারুণ ক্রূরতা প্রচ্ছন্ন আছে।

> *Athenians.* But you and we should say what we really think, and aim only at what is possible, for we both alike know that into the discussion of human affairs the question of justice only enters where the pressure of necessity is equal, and that the powerful exact what they can, and the weak grant what they must. ... And we will now endeavour to show that we have come in the interests of our empire, and that in what we are about to say we are only seeking the preservation of your city. For we want to make you ours with the least trouble to ourselves and it is for the interest of us both that you should not be destroyed.
>
> *Mel.* It may be your interest to be our masters, but how can it be ours to be your slaves?
>
> *Ath.* To you the gain will be that by submission you will avert the worst; and we shall be all the richer for your preservation.

১৩১২

রাজভক্তি

রাজপুত্র আসিলেন। রাজ্যের যত পাত্রের পুত্র তাঁহাকে গণ্ডি দিয়া ঘিরিয়া বসিল—তাহার মধ্যে একটু ফাঁক পায় এমন সাধ্য কাহারও রহিল না। এই ফাঁক যতদূর সম্ভব সংকীর্ণ করিবার জন্য কোটালের পুত্র পাহারা দিতে লাগিল—সেজন্য সে শিরোপা পাইল। তাহার পর? তাহার পর বিস্তর বাজি পুড়াইয়া রাজপুত্র জাহাজে চড়িয়া চলিয়া গেলেন—এবং আমার কথাটি ফুরাল, নটেশাকটি মুড়াল।

ব্যাপারখানা কী? একটি কাহিনীমাত্র। রাজা ও রাজপুত্রের এই বহুদুর্লভ মিলন যত সুদূর, যত স্বল্প, যত নিরর্থক হওয়া সম্ভব তাহা হইল। সমস্ত দেশ পর্যটন করিয়া দেশকে যত কম জানা, দেশের সঙ্গে যত কম যোগস্থাপন হইতে পারে, তাহা বহু ব্যয়ে বহু নৈপুণ্য ও সমারোহসহকারে সমাধা হইল।

অবশ্যই রাজপুরুষেরা ইহার মধ্যে কিছু একটা পলিসি, কিছু একটা প্রয়োজন বুঝিয়াছিলেন—নহিলে এত বাজে খরচ করিবেন কেন? রূপকথার রাজপুত্র কোনো সুপ্ত রাজকন্যাকে জাগাইবার জন্য সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হইয়াছিলেন; আমাদের রাজপুত্রও বোধ করি সুপ্ত রাজভক্তিকে জাগাইবার জন্যই যাত্রা করিয়া থাকিবেন, কিন্তু সোনার কাঠি কি মিলিয়াছিল?

নানা ঘটনায় স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, আমাদের রাজপুরুষেরা সোনার কাঠির চেয়ে লোহার কাঠির উপরেই বেশি আস্থা রাখিয়া থাকেন। তাঁহাদের প্রতাপের আড়ম্বরটাকেই তাঁহারা বজ্রগর্ভ বিদ্যুতের মতো ক্ষণে ক্ষণে আমাদের চোখের উপর দিয়া ঝলকিয়া লইয়া যান। তাহাতে আমাদের চোখ ধাঁধিয়া যায়, হৃৎকম্পও হইতে পারে কিন্তু রাজাপ্রজার মধ্যে অন্তরের বন্ধন দৃঢ় হয় না—পার্থক্য আরও বাড়িয়া যায়।

ভারতবর্ষের অদৃষ্টে এইরূপ অবস্থা অবশ্যম্ভাবী। কারণ, এখানকার রাজাসনে যাঁহারা বসেন, তাঁহাদের মেয়াদ বেশিদিনকার নহে, অথচ এখানে রাজক্ষমতা যেরূপ অত্যুৎকট, স্বয়ং ভারতসম্রাটেরও সেরূপ নহে। বস্তুত ইংলণ্ডে রাজত্ব করিবার সুযোগ কাহারও নাই; কারণ, সেখানে প্রজাগণ স্বাধীন। ভারতবর্ষ যে অধীন রাজ্য, তাহা ইংরেজ এখানে পদার্পণ করিবামাত্র বুঝিতে পারে। সুতরাং এ-দেশে কর্তৃত্বের দম্ভ ক্ষমতার মত্ততা সহসা সংবরণ করা ক্ষুদ্রপ্রকৃতির পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়ে।

বনিয়াদি রাজাকে রাজকীয় নেশায় টলাইতে পারে না। হঠাৎ-রাজার পক্ষে এই

নেশা একেবারে বিষ। ভারতবর্ষে যাঁহারা কর্তৃত্ব করিতে আসেন, তাঁহারা অধিকাংশই এই মদিরায় অভ্যস্ত নহেন। তাঁহাদের স্বদেশ হইতে এ-দেশের পরিবর্তন অত্যন্ত বেশি। যাঁহারা কোনোকালেই বিশেষ কেহ নহেন, এখানে তাঁহারা একমুহূর্তেই হর্তাকর্তা। এমন অবস্থায় নেশার ঝোঁকে এই নূতনলব্ধ প্রতাপটাকেই তাঁহারা সকলের চেয়ে প্রিয় এবং শ্রেয় জ্ঞান করেন।

প্রেমের পথ নম্রতার পথ। সামান্য লোকেরও হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিতে হইলে নিজের মাথাটাকে তাহার দ্বারের মাপে নত করিতে হয়। নিজের প্রতাপ ও প্রেস্টিজ সম্বন্ধে যে-ব্যক্তি হঠাৎ-নবাবের মতো সর্বদাই আপাদমস্তক সচেতন, সে-ব্যক্তির পক্ষে এই নম্রতা দুঃসাধ্য। ইংরেজের রাজত্ব যদি ক্রমাগতই আনাগোনার রাজত্ব না হইত, যদি এ-দেশে তাহারা স্থায়ী হইয়া কর্তৃত্বের উগ্রতাটা কতকটা পরিমাণে সহ্য করিতে পারিত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহারা আমাদের সঙ্গে হৃদয়ের যোগস্থাপনের চেষ্টা করিতে বাধ্য হইত। কিন্তু বর্তমান ব্যবস্থায় ইংলণ্ডের অখ্যাত প্রান্ত হইতে কয়েক দিনের জন্য এ-দেশে আসিয়া ইহারা কোনোমতেই ভুলিতে পারে না যে, আমরা কর্তা—এবং সেই ক্ষুদ্র দম্ভটাকেই সর্বদা প্রকাশমান রাখিবার জন্য তাহারা আমাদিগকে সকল বিষয়েই অহরহ দূরে ঠেকাইয়া রাখে এবং কেবলমাত্র প্রবলতার দ্বারা আমাদিগকে অভিভূত করিয়া রাখিতে চেষ্টা করে। আমাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা যে তাহাদের রাজনীতিকে স্পর্শ করিতে পারে, এ-কথা তাহারা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হয়। এমন কি, তাহাদের কোনো বিধানে আমরা যে বেদনা অনুভব ও বেদনা প্রকাশ করিব, তাহাও তাহারা স্পর্ধা বলিয়া জ্ঞান করে।

কিন্তু স্বামী যতই কঠোর হউক না কেন সে স্ত্রীর কাছে যে কেবল বাধ্যতা চাহে তাহা নহে, স্ত্রীর হৃদয়ের প্রতিও তাহার ভিতরে ভিতরে আকাঙ্ক্ষা থাকে। অথচ হৃদয় অধিকার করিবার ঠিক পথটি সে গ্রহণ করিতে পারে না, তাহার দুর্দম্য ঔদ্ধত্যে বাধা দেয়। যদি তাহার সন্দেহ জন্মে যে, স্ত্রী তাহার আধিপত্য সহ্য করে কিন্তু তাহাকে ভালোবাসে না, তবে সে তাহার কঠোরতার মাত্রা বাড়াইতেই থাকে। প্রীতি জন্মাইবার ইহা যে প্রকৃষ্ট উপায় নহে, সে-কথা বলাই বাহুল্য।

সেইরূপ ভারতবর্ষের ইংরেজ-রাজারা আমাদের কাছ হইতে রাজভক্তির দাবিটুকুও ছাড়িতে পারে না। কিন্তু ভক্তির সম্বন্ধ হৃদয়ের সম্বন্ধ—সে-সম্বন্ধে দান-প্রতিদান আছে—তাহা কলের সম্বন্ধ নহে। সে-সম্বন্ধ স্থাপন করিতে গেলেই কাছে আসিতে হয়, তাহা শুদ্ধমাত্র জবরদস্তির কর্ম নহে। কিন্তু কাছেও ঘেঁষিব না, হৃদয়ও দিব না—

অথচ রাজভক্তিও চাই। শেষকালে সেই ভক্তিসম্বন্ধে যখন সন্দেহ জন্মে, তখন গুরখা লাগাইয়া, বেত চালাইয়া, জেলে দিয়া ভক্তি আদায় করিতে ইচ্ছা হয়।

ইংরেজ, শাসনের কল চালাইতে চালাইতে হঠাৎ এক-একবার রাজভক্তির জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠেন, কার্জনের আমলে তাহার একটা নমুনা পাওয়া গিয়াছিল।

স্বাভাবিক আভিজাত্যের অভাবে লর্ড কার্জন কর্তৃত্বের নেশায় উন্মত্ত হইয়াছিলেন, তাহা স্পষ্ট অনুভব করা গিয়াছিল। এ গদি ছাড়িতে তাঁহার কিছুতেই মন সরিতেছিল না। এই রাজকীয় আড়ম্বর হইতে অবসৃত হইয়া তাঁহার অন্তরাত্মা "খোঁয়ারি"গ্রস্ত মাতালের মতো আজ যে-অবস্থায় আছে, তাহা যদি আমরা যথার্থভাবে অনুভব করিতাম, তবে বাঙালিও বোধ হয় আজ তাঁহাকে দয়া করিতে পারিত। এরূপ আধিপত্য লোলুপতা বোধ করি ভারতবর্ষের আর-কোনো শাসনকর্তা এমন করিয়া প্রকাশ করেন নাই। এই লাটসাহেবটি ভারতবর্ষের পূর্বতন বাদশাহের ন্যায় দরবার করিবেন স্থির করিলেন—এবং স্পর্ধাপূর্বক দিল্লিতে সেই দরবারের স্থান করিলেন।

কিন্তু প্রাচ্যরাজামাত্রেই বুঝিতেন দরবার স্পর্ধাপ্রকাশের জন্য নহে; দরবার রাজার সহিত প্রজাদের আনন্দসম্মিলনের উৎসব। সেদিন কেবল রাজোচিত ঐশ্বর্যের দ্বারা প্রজাদিগকে স্তম্ভিত করা নয়, সেদিন রাজোচিত ঔদার্যের দ্বারা তাহাদিগকে নিকটে আহ্বান করিবার দিন। সেদিন ক্ষমা করিবার, দান করিবার, রাজশাসনকে সুন্দর করিয়া সাজাইবার শুভ অবসর।

কিন্তু পশ্চিমের হঠাৎ-নবাব দিল্লির প্রাচ্য ইতিহাসকে সম্মুখে রাখিয়া এবং বদান্যতাকে সওদাগরি কার্পণ্যদ্বারা খর্ব করিয়া কেবল প্রতাপকেই উগ্রতর করিয়া প্রকাশ করিলেন। ইহাতে বস্তুত ইংরেজের রাজশ্রী আমাদের কাছে গৌরব লাভ করে নাই। ইহাতে দরবারের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়া গেছে। এই দরবারে দুঃসহ দর্পে প্রাচ্যহৃদয় পীড়িত হইয়াছে, লেশমাত্র আকৃষ্ট হয় নাই। সেই প্রচুর অপব্যয় যদি কিছুমাত্র ফল রাখিয়া থাকে, তবে তাহা অপমানের স্মৃতিতে। লোহার কাঠির দ্বারা সোনার কাঠির কাজ সারিবার চেষ্টা যে নিষ্ফল তাহা নহে—তাহাতে উলটা ফল হইয়া থাকে।

এবারে রাজপুত্রকে ভারতবর্ষে আনা হইল। রাজনীতির তরফ হইতে পরামর্শ উত্তম হইয়াছে। কারণ, সাধারণত রাজবংশীয়ের প্রতি ভারতবর্ষীয় হৃদয়ের অভিমুখিতা বহুকালের প্রকৃতিগত। সেইজন্য দিল্লির দরবারে ড্যুক অফ কনট থাকিতে কার্জনের দরবারতক্ত গ্রহণ ভারতবর্ষীয়মাত্রকেই বাজিয়াছিল; এরূপ স্থলে ড্যুকের উপস্থিত থাকাই উচিত ছিল না। বস্তুত প্রজাগণের ধারণা হইয়াছিল যে কার্জন নিজের দম্ভ-প্রচার করিবার জন্যই ইচ্ছাপূর্বক দরবারে ড্যুক অফ কনটের উপস্থিতি ঘটাইয়াছিলেন।

আমরা বিলাতি কায়দা বুঝি না, বিশেষত দরবার ব্যাপারটাই যখন বিশেষভাবে প্রাচ্য, তখন এ উপলক্ষ্যে রাজবংশের প্রকাশ্য অবমাননা অন্তত পলিসিসংগত হয় নাই।

যাই হ'ক ভারতবর্ষের রাজভক্তিকে নাড়া দিবার জন্য একবার রাজপুত্রকে সমস্ত দেশের উপর দিয়া বুলাইয়া লওয়া উচিত ; বোধ করি এইরূপ পরামর্শ হইয়া থাকিবে। কিন্তু ভারতবর্ষের ইংরেজ হৃদয়ের কারবার কোনোদিন করে নাই। তাহারা এ-দেশকে হৃদয় দেয়ও নাই এ-দেশের হৃদয় চায়ও নাই, দেশের হৃদয়টা কোথায় আছে তাহার খবরও রাখে না। ইহারা রাজপুত্রের ভারতবর্ষে আগমনব্যাপারটাকে যত স্বল্পফলপ্রদ করা সম্ভব তাহা করিল। আজ রাজপুত্র ভারতবর্ষের মাটি ছাড়িয়া জাহাজে উঠিতেছেন আর আমাদের মনে হইতেছে যেন একটা স্বপ্ন ভাঙিয়া গেল, যেন একটা রূপকথা শেষ হইল। কিছুই হইল না—মনে রাখিবার কিছু রহিল না, যাহা যেমন ছিল তাহা তেমনি রহিয়া গেল।

ভারতবর্ষের রাজভক্তি প্রকৃতিগত এ-কথা সত্য। হিন্দু-ভারতবর্ষের রাজভক্তির একটু বিশেষত্ব আছে। হিন্দুরা রাজাকে দেবতুল্য ও রাজভক্তিকে ধর্মস্বরূপে গণ্য করিয়া থাকেন। পাশ্চাত্যগণ এ-কথার যথার্থ মর্ম গ্রহণ করিতে পারেন না। তাঁহারা মনে করেন ক্ষমতার কাছে এইরূপ অবনত হওয়া আমাদের স্বাভাবিক দীন চরিত্রের পরিচয়।

সংসারের অধিকাংশ সম্বন্ধকেই হিন্দু দৈবসম্বন্ধ না মনে করিয়া থাকিতে পারে না। হিন্দুর কাছে প্রায় কিছুই আকস্মিক সম্বন্ধ নহে। কারণ, হিন্দু জানে, আমাদের কাছে প্রকাশ যতই বিচিত্র ও বিভিন্ন হউক না, মূলশক্তি একই। ভারতবর্ষে ইহা কেবলমাত্র একটা দার্শনিক তত্ত্ব নহে, ইহা ধর্ম,—ইহা পুঁথিতে লিখিবার কালেজে পড়াইবার নহে—ইহা জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ে উপলব্ধি ও জীবনের প্রাত্যহিক ব্যবহারে প্রতিফলিত করিবার। আমরা পিতামাতাকে দেবতা বলি, স্বামীকে দেবতা বলি, সতী স্ত্রীকে লক্ষ্মী বলি। গুরুজনকে পূজা করিয়া আমরা ধর্মকে তৃপ্ত করি। ইহার কারণ, যে-কোনো সম্বন্ধের মধ্য হইতে আমরা মঙ্গললাভ করি, সেই সম্বন্ধের মধ্যেই আমরা আদি মঙ্গলশক্তিকে স্বীকার করিতে চাই। সেই সকল উপলক্ষ্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া মঙ্গলময়কে সুদূর স্বর্গে স্থাপনপূর্বক পূজা করা ভারতবর্ষের ধর্ম নহে। পিতামাতাকে যখন আমরা দেবতা বলি, তখন এ মিথ্যাকে আমরা মনে স্থান দিই না যে, তাঁহারা বিশ্বভুবনের ঈশ্বর বা তাঁহাদের অলৌকিক শক্তি আছে। তাঁহাদের দৈন্য দুর্বলতা তাঁহাদের মনুষ্যত্ব সমস্তই আমরা নিশ্চিত জানি, কিন্তু ইহাও সেইরূপ নিশ্চিত জানি যে, ইঁহারা পিতামাতারূপে আমাদের যে কল্যাণ সাধন করিতেছেন,

সেই পিতৃমাতৃস্বরূপ জগতের পিতামাতারই প্রকাশ। ইন্দ্র-চন্দ্র-অগ্নি-বায়ুকে যে বেদে দেবতা বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে তাহারও এই কারণ; শক্তিপ্রকাশের মধ্যে ভারতবর্ষ শক্তিমান্ পুরুষের সত্তা অনুভব না করিয়া কোনোদিন তৃপ্ত হয় নাই। এইজন্য বিশ্বভুবনে নানা উপলক্ষ্যে নানা আকারেই ভক্তিবিনম্র ভারতবর্ষের পূজা সমাহৃত হইয়াছে। জগৎ আমাদের নিকট সর্বদাই দেবশক্তিতে সজীব।

এ-কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা যে, আমরা দীনতাবশতই প্রবলতার পূজা করিয়া থাকি। সকলেই জানে গাভীকেও ভারতবর্ষ পূজ্য করিয়াছে। গাভী যে পশু তাহা সে জানে না, ইহা নহে। মানুষ প্রবল এবং গাভীই দুর্বল। কিন্তু ভারতবর্ষীয় সমাজ গাভীর নিকট হইতে নানাপ্রকার মঙ্গল লাভ করে। সেই মঙ্গল মানুষ যে নিজের গায়ের জোরে পশুর কাছ হইতে আদায় করিয়া লইতেছে, এই ঔদ্ধত্য ভারতবর্ষের নহে। সমস্ত মঙ্গলের মূলে সে দৈব অনুগ্রহকে প্রণাম করিয়া সকলের সঙ্গে আত্মীয়-সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারিলে তবে বাঁচে। কারিকর তাহার যন্ত্রকে প্রণাম করে, যোদ্ধা তাহার তরবারিকে প্রণাম করে, গুণী তাহার বীণাকে প্রণাম করে;—ইহারা যে যন্ত্রকে যন্ত্র বলিয়া জানে না তাহা নহে; কিন্তু ইহাও জানে যন্ত্র একটা উপলক্ষ্যমাত্র—যন্ত্রের মধ্য হইতে সে যে আনন্দ বা উপকার লাভ করিতেছে, তাহা কাঠ বা লোহার দান নহে, কারণ, আত্মাকে আত্মীয় ছাড়া কোনো সামগ্রীমাত্রে স্পর্শ করিতে পারে না। এইজন্য তাহাদের কৃতজ্ঞতা, তাহাদের পূজা যিনি বিশ্বযন্ত্রের যন্ত্রী তাঁহার নিকট এই যন্ত্রযোগেই সমর্পিত হয়।

এই ভারতবর্ষ রাজশাসন-ব্যাপারকে যদি পুরুষরূপে নহে, কেবল যন্ত্ররূপে অনুভব করিতে থাকে, তবে তাহার পক্ষে এমন পীড়াকর আর-কিছুই হইতে পারে না। জড়ের মধ্যেও আত্মার সম্পর্ক অনুভব করিয়া তবে যাহার তৃপ্তি হয়, রাষ্ট্রতন্ত্রের মতো এতবড়ো মানব-ব্যাপারের মধ্যে সে হৃদয়ের প্রত্যক্ষ আবির্ভাবকে মূর্তিমান্ না দেখিয়া বাঁচে কিরূপে? আত্মার সঙ্গে আত্মীয়ের সম্বন্ধ যেখানে আছে সেখানেই নত হওয়া যায়—যেখানে তাহা নাই সেখানে নত হইতে অহরহ বাধ্য হইলে অপমান ও পীড়া বোধ হয়; অতএব রাষ্ট্রব্যাপারের মধ্যস্থলে আমরা দেবতার শক্তিকে মঙ্গলের প্রত্যক্ষস্বরূপকে রাজরূপে দেখিতে পাইলে শাসনের বিপুল ভার সহজে বহন করিতে পারি। নহিলে হৃদয় প্রতিক্ষণেই ভাঙিয়া যাইতে থাকে। আমরা পূজা করিতে চাই—রাজতন্ত্রের মধ্যে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার সহিত আমাদের প্রাণের যোগ অনুভব করিতে চাই—আমরা বলকে কেবলমাত্র বলরূপে সহ্য করিতে পারি না।

অতএব ভারতবর্ষের রাজভক্তি প্রকৃতিগত এ-কথা সত্য। কিন্তু সেই জন্য

রাজা তাহার পক্ষে শুদ্ধমাত্র তামাশার রাজা নহে। রাজাকে সে একটা অনাবশ্যক আড়ম্বরের অঙ্গরূপে দেখিতে ভালোবাসে না। সে রাজাকে যথার্থ সত্যরূপে অনুভব করিতেই ইচ্ছা করে। সে রাজাকে বহুকাল ধরিয়া পাইতেছে না বলিয়া উত্তরোত্তর পীড়িত হইয়া উঠিতেছে। ক্ষণস্থায়ী বহুরাজার দুঃসহভারে এই বৃহৎ দেশ কিরূপে মর্মে মর্মে ব্যথিত হইয়া উঠিয়াছে, প্রতিদিন কিরূপ নিরুপায়ভাবে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতেছে, তাহা অন্তর্যামী ছাড়া কেহ দেখিবার নাই। যাহারা পথিকমাত্র, ছুটির দিকেই যাহাদের মন পড়িয়া আছে, যাহারা পেটের দায়ে নির্বাসনে দিন যাপন করিতেছে, যাহারা বেতন লইয়া এই শাসন-কারখানার কল চালাইয়া যাইতেছে, যাহাদের সহিত আমাদের সামাজিক কোনো সম্বন্ধ নাই—অহরহ পরিবর্তমান এমন উপেক্ষাপরায়ণ জনসম্প্রদায়ের হৃদয়-সম্পর্কশূন্য আপিসিশাসন নিরন্তর বহন করা যে কী দুর্বিবহ তাহা ভারতবর্ষই জানে। রাজভক্তিতে দীক্ষিত ভারতবর্ষের অন্তঃকরণ কাতরভাবে প্রার্থনা করিতেছে যে, হে ভারতের প্রতি বিমুখ ভগবান, আমি এই সকল ক্ষুদ্র রাজা ক্ষণিক রাজা অনেক রাজা আর সহিতে পারি না, আমাকে এক রাজা দাও। এমন রাজা দাও যিনি বলিতে পারিবেন, ভারতবর্ষ আমারই রাজ্য ; বণিকের নয়, খনিকের নয়, চা-করের নয়, ল্যাঙ্কাশিয়রের নয় ;—ভারতবর্ষ যাহাকে অন্তরের সহিত বলিতে পারিবে, আমারই রাজা ; হ্যালিডে রাজা নয়, ফুলর রাজা নয়, পায়োনিয়র-সম্পাদক রাজা নয়। রাজপুত্র আসুন, ভারতের রাজতক্তে বসুন, তাহা হইলে স্বভাবতই তাঁহার নিকট ভারতবর্ষই মুখ্য এবং ইংলণ্ড গৌণ হইয়া উঠিবে। তাহাতেই ভারতের মঙ্গল এবং ইংলণ্ডের স্থায়ী লাভ। কারণ, মানুষকে কল দিয়া শাসন করিব, তাহার সহিত হৃদয়ের সম্পর্ক সমাজের সম্পর্ক রাখিব না এ স্পর্ধা ধর্মরাজ কখনোই চিরদিন সহ্য করিতে পারেন না—ইহা স্বাভাবিক নহে, ইহা বিশ্ববিধানকে পীড়িত করিতে থাকে। সেইজন্য সুশাসনই বল, শান্তিই বল, কিছুর দ্বারাই এই দারুণ হৃদয়-দুর্ভিক্ষ পূরণ হইতে পারে না। এ-কথা শুনিয়া আইন ক্রুদ্ধ হইতে পারে, পুলিস-সর্প ফণা তুলিতে পারে ; কিন্তু যে ক্ষুধিত সত্য ত্রিশ কোটি প্রজার মর্মের মধ্যে হাহাকার করিতেছে, তাহাকে বলের দ্বারা উচ্ছেদ করিতে পারে এমন শাসনের উপায় কোনো মানবের হাতে নাই, কোনো দানবের হাতে নাই।

ভারতবর্ষীয় প্রজার এই যে হৃদয় প্রত্যহ ক্লিষ্ট হইতেছে, ইহাকেই কতকটা সান্ত্বনা দিবার জন্য রাজপুত্রকে আনা হইয়াছিল—আমাদিগকে দেখানো হইয়াছিল যে, আমাদেরও রাজা আছে। কিন্তু মরীচিকার দ্বারা সত্যকার তৃষ্ণা দূর হয় না।

বস্তুত আমরা রাজশক্তিকে নহে—রাজহৃদয়কে প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে ও প্রত্যক্ষ

রাজাকে আমাদের হৃদয় অর্পণ করিতে চাই। ধনপ্রাণ সুরক্ষিত হওয়াই যে প্রজার চরম চরিতার্থতা, প্রভুগণ, এ-কথা মনেও করিয়ো না। তোমরা আমাদিগকে নিতান্ত অবজ্ঞা কর বলিয়াই তোমরা বলিয়া থাক, ইহারা শান্তিতে আছে তবু ইহারা আর কী চায়। ইহা জানিয়ো, হৃদয়ের দ্বারা মানুষের হৃদয়কে বশ করিলে সে ধনপ্রাণ স্বেচ্ছাপূর্বক ত্যাগ করিতে পারে, ভারতের ইতিহাসে তাহার প্রমাণ আছে। শান্তি নহে, মানুষ তৃপ্তি চাহে এবং দৈব আমাদের প্রতি যতই বিরূপ হউন, আমরা মানুষ। আমাদেরও ক্ষুধা দূর করিতে হইলে সত্যকার অন্নেরই প্রয়োজন হয়—আমাদের হৃদয় বশ করা ফুলর, প্যুনিটিভ পুলিস এবং জোর-জুলুমের কর্ম নহে।

দেবই হউন আর মানবই হউন, লাটই হউন আর জ্যাকই হউন, যেখানে কেবল প্রতাপের প্রকাশ, বলের বাহুল্য, সেখানে ভীত হওয়া নত হওয়ার মতো আত্মাবমাননা, অন্তর্যামী ঈশ্বরের অবমাননা, আর নাই। হে ভারতবর্ষ, সেখানে তুমি তোমার চিরদিনের উদার অভয় ব্রহ্মজ্ঞানের সাহায্যে এই সমস্ত লাঞ্ছনার ঊর্ধ্বে তোমার মস্তককে অবিচলিত রাখো—এই সমস্ত বড়ো বড়ো নামধারী মিথ্যাকে তোমার সর্বান্তঃকরণের দ্বারা অস্বীকার করো, ইহারা যেন বিভীষিকার মুখোশ পরিয়া তোমার অন্তরাত্মাকে লেশমাত্র সংকুচিত করিতে না পারে। তোমার আত্মার দিব্যতা উজ্জ্বলতা পরমশক্তিমত্তার কাছে এই সমস্ত তর্জন গর্জন, এই সমস্ত উচ্চপদের অভিমান, এই সমস্ত শাসন-শোষণের আয়োজন-আড়ম্বর, তুচ্ছ ছেলেখেলামাত্র—ইহারা যদি বা তোমাকে পীড়া দেয় তোমাকে যেন ক্ষুদ্র করিতে না পারে। যেখানে প্রেমের সম্বন্ধ সেইখানেই নত হওয়ায় গৌরব—যেখানে সে-সম্বন্ধ নাই সেখানে যাহাই ঘটুক, অন্তঃকরণকে মুক্ত রাখিয়ো, ঋজু রাখিয়ো, দীনতা স্বীকার করিয়ো না, ভিক্ষাবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়ো, নিজের প্রতি অক্ষুণ্ণ আস্থা রাখিয়ো। কারণ, নিশ্চয়ই জগতে তোমার একান্ত প্রয়োজন আছে—সেইজন্য বহুদুঃখেও তুমি বিনাশপ্রাপ্ত হও নাই। অন্যের বাহ্য অনুকরণের চেষ্টা করিয়া তুমি যে এতকাল পরে একটা ঐতিহাসিক প্রহসন রচনা করিবার জন্য এতদিন বাঁচিয়া আছ, তাহা কখনোই নহে। তুমি যাহা হইবে যাহা করিবে অন্য দেশের ইতিহাসে তাহার নমুনা নাই—তোমার যথাস্থানে তুমি বিশ্বভুবনের সকলের চেয়ে মহৎ। হে আমার স্বদেশ, মহাপর্বতমালার পাদমূলে মহাসমুদ্রপরিবেষ্টিত তোমার আসন বিস্তীর্ণ রহিয়াছে—এই আসনের সম্মুখে হিন্দু মুসলমান খ্রীস্টান বৌদ্ধ বিধাতার আহ্বানে আকৃষ্ট হইয়া বহুদিন হইতে প্রতীক্ষা করিতেছে, তোমার এই আসন তুমি যখন পুনর্বার একদিন গ্রহণ করিবে, তখন আমি নিশ্চয় জানি, তোমার মন্ত্রে কি জ্ঞানের, কি কর্মের, কি ধর্মের অনেক বিরোধ মীমাংসা হইয়া যাইবে এবং তোমার চরণপ্রান্তে

আধুনিক নিষ্ঠুর পোলিটিক্যাল কালভুজঙ্গের বিদ্বেষী বিষাক্ত দর্প পরিশান্ত হইবে। তুমি চঞ্চল হইয়ো না, লুব্ধ হইয়ো না, ভীত হইয়ো না, তুমি

আত্মানং বিদ্ধি
আপনাকে জানো। এবং
উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত
ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।
উঠ, জাগো, যাহা শ্রেষ্ঠ তাহাই পাইয়া প্রবুদ্ধ হও,
যাহা যথার্থ পথ তাহা ক্ষুরধারশাণিত দুর্গম দুরত্যয়, কবিরা এইরূপ বলিয়া থাকেন।

১৩১২

বহুরাজকতা

সাবেক কালের সঙ্গে এখনকার কালের তুলনা করিতে আমরা ছাড়ি না। সাবেক কাল যখন হাজির নাই, তখন একতরফা বিচারে যাহা হইতে পারে তাহাই ঘটিয়া থাকে অর্থাৎ বিচারকের মেজাজ অনুসারে কখনো বা সেকালের ভাগ্যে যশ জোটে, কখনো বা একালের জিত হয়। কিন্তু এমন বিচারের উপরে ভরসা রাখা যায় না।

আমাদের পক্ষে মোগলের আমল সুখের ছিল কি ইংরেজের আমল সুখের, গোটাকতক মোটা মোটা সাক্ষীর কথা শুনিয়াই তাহার শেষ নিষ্পত্তি হইতে পারে না। নানা সূক্ষ্ম জিনিসের উপর মানুষের সুখদুঃখ নির্ভর করে—সে-সমস্ত তন্ন তন্ন করিয়া দেখা সম্ভবপর নয়। বিশেষত যেকালটা গেছে সে আপনার অনেক সাক্ষীসাবুদ সঙ্গে লইয়া গেছে।

কিন্তু সেকাল-একালের একটা মস্ত প্রভেদ ছোটোবড়ো আর-সমস্ত প্রভেদের উপরে মাথা তুলিয়া আছে। এই প্রভেদটা যেমন সকলের চেয়ে বড়ো, তেমনি নিশ্চয়ই এই প্রভেদের ফলাফলও আমাদের দেশের পক্ষে সকলের চেয়ে গুরুতর। আমাদের এই ছোটো প্রবন্ধে আমরা সেই প্রভেদটির কথাই সংক্ষেপে পাড়িয়া দেখিতে চাই।

ইতিপূর্বে ভারতবর্ষের সিংহাসনে একজন বাদশাহ ছিল, তাহার পরে একটি কোম্পানি বসিয়াছিল, এখন একটি জাতি বসিয়াছে। আগে ছিল এক, এখন হইয়াছে

অনেক। এ-কথাটা এতই সোজা যে ইহা প্রমাণ করিবার জন্য কোনো সূক্ষ্ম তর্কের প্রয়োজন হয় না।

বাদশা যখন ছিলেন, তখন তিনি জানিতেন সমস্ত ভারতবর্ষ তাঁরই, এখন ইংরেজজাত জানে ভারতবর্ষ তাহাদের সকলেরই। একটা রাজপরিবারমাত্র নহে, সমস্ত ইংরেজজাতটা এই ভারতবর্ষকে লইয়া সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছে।

খুব সম্ভব বাদশাহের অত্যাচার যথেষ্ট ছিল—এখন অত্যাচার নাই কিন্তু বোঝা আছে। হাতির পিঠে মাহুত বসিয়া তাহাকে মাঝে মাঝে অঙ্কুশ দিয়া মারে, হাতির পক্ষে তাহা সুখকর নহে। কিন্তু মাহুতের বদলে যদি আর-একটা গোটা হাতিকে সর্বদা বহন করিতে হইত তবে বাহকটি অঙ্কুশের অভাবকেই আপনার একমাত্র সৌভাগ্য বলিয়া জ্ঞান করিত না।

একটিমাত্র দেবতার পূজার থালায় যদি ফুল সাজাইয়া দেওয়া যায়, তবে তাহা দেখিতে স্তূপাকার হইতে পারে এবং যে-ব্যক্তি ফুল আহরণ করিয়াছে তাহার পরিশ্রমটাও হয়তো অত্যন্ত প্রত্যক্ষরূপে দেখা যায়। কিন্তু তেত্রিশ কোটি দেবতাকে একটা করিয়া পাপড়িও যদি দেওয়া যায়, তবে তাহা চোখে দেখিতে যতই সামান্য হউক না কেন, তলে তলে ব্যাপারখানা বড়ো কম হয় না। তবে কিনা, এই একটা একটা করিয়া পাপড়ির হিসাব এক জায়গায় সংগ্রহ করা কঠিন বলিয়া নিজের অদৃষ্টকে ছাড়া আর কাহাকেও দায়ী করার কথা মনেও উদয় হয় না।

কিন্তু এখানে কাহাকেও বিশেষরূপে দায়ী করিবার কথা হইতেছে না। মোগলের চেয়ে ইংরেজ ভালো কি মন্দ তাহার বিচার করিয়া বিশেষ কোনো লাভ নাই। তবে কিনা অবস্থাটা জানা চাই, তাহা হইলে অনেক বৃথা আশা ও বিফল চেষ্টার হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়, সেও একটা লাভ।

মনে করো,—এই যে আমরা আক্ষেপ করিয়া মরিতেছি দেশের বড়ো বড়ো চাকরি প্রায় ইংরেজের ভাগ্যে পড়িতেছে ইহার প্রতিকারটা কোন্‌খানে? আমরা মনে করিতেছি বিলাতে গিয়া যদি দ্বারে দ্বারে দুঃখ নিবেদন করিয়া ফিরি, তবে একটা সদ্‌গতি হইতে পারে।

কিন্তু এ-কথা মনে রাখিতে হইবে যাহার বিরুদ্ধে নালিশ, আমরা তাহার কাছেই নালিশ করিতে যাইতেছি।

বাদশাহের আমলে আমরা উজির হইয়াছি, সেনাপতি হইয়াছি, দেশ শাসন করিবার ভার পাইয়াছি, এখন যে তাহা আমাদের আশার অতীত হইয়াছে ইহার কারণ কী? অন্য গূঢ় বা প্রকাণ্ড কারণ ছাড়িয়া দাও, একটা মোটা কারণ আছে সে তো স্পষ্টই

দেখিতেছি। ইংলণ্ড সমস্ত ইংরেজকে অন্ন দিতে পারে না—ভারতবর্ষে তাহাদের জন্য অন্নসত্র খোলা থাকা আবশ্যক। একটি জাতির অন্নের ভার অনেকটা পরিমাণে আমাদের স্কন্ধে পড়িয়াছে; সেই অন্ন নানারকম আকারে নানারকম পাত্রে জোগাইতে হইতেছে।

যদি সপ্তম এডোআর্ড যথার্থই আমাদের দিল্লির সিংহাসনে রাজা হইয়া বসিতেন, তবে তাঁহাকে গিয়া বলিতে পারিতাম যে, হুজুর, অন্নের যদি বড়ো বড়ো গ্রাস সমস্তই বিদেশী লোকের পাতে পড়ে, তবে তোমার রাজ্য টেঁকে কী করিয়া।

তখন সম্রাটও বলিতেন, তাইতো আমার সাম্রাজ্য হইতে আমার ভোগের জন্য যাহা গ্রহণ করি তাহা শোভা পায়, কিন্তু তাই বলিয়া বারো ভূতে মিলিয়া পাত পাড়িয়া বসিলে চলিবে কেন?

তখন আমার রাজ্য বলিয়া তাঁহার দরদ বোধ হইত এবং অন্যের লুব্ধহস্ত ঠেকাইয়া রাখিতেন। কিন্তু আজ প্রত্যেক ইংরেজই ভারতবর্ষকে 'আমার রাজ্য' বলিয়া জানে। এ-রাজ্যে তাহাদের ভোগের খর্বতা ঘটিতে গেলেই তাহারা সকলে মিলিয়া এমনি কলরব তুলিবে যে, তাহাদের স্বদেশীয় কোনো আইনকর্তা এ-সম্বন্ধে কোনো বদল করিতে পারিবেই না।

এই আমাদের প্রকাণ্ড বহুসহস্রমুখবিশিষ্ট রাজার মুখের গ্রাসে ভাগ বসাইবার জন্য তাহারই কাছে দরবারে যাওয়া নিষ্ফল, এ-কথা একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যায়।

মোটকথা,—একটা আস্ত জাত নিজের দেশে বাস করিয়া অন্য দেশকে শাসন করিতেছে ইতিপূর্বে এমন ঘটনা ইতিহাসে ঘটে নাই। অত্যন্ত ভালো রাজা হইলেও এ-রকম অবস্থায় রাজার বোঝা বহন করা দেশের পক্ষে বড়ো কঠিন। মুখ্যত অন্য দেশের এবং গৌণত আপনার স্বার্থ যে-দেশকে একসঙ্গে সামলাইতে হয়, তাহার অবস্থা বড়োই শোচনীয়। যে-দেশের ভারকেন্দ্র নিজের এতটা বাহিরে পড়িয়াছে সে মাথা তুলিবে কী করিয়া? না হয় চুরি ডাকাতি বন্ধ হইল, না হয় আদালতে অত্যন্ত সূক্ষ্ম সুবিচারই ঘটিয়া থাকে, কিন্তু বোঝা নামাইব কোথায়?

অতএব কনগ্রেসের যদি কোনো সংগত প্রার্থনা থাকে তবে তাহা এই যে, সম্রাট এডোআর্ডের পুত্রই হউন, স্বয়ং লর্ড কার্জন বা কিচেনারই হউন, অথবা ইংলিশম্যান-পায়োনিয়রের সম্পাদকই হউন, ভালো মন্দ বা মাঝারি যে-কোনো একজন ইংরেজ বাছিয়া পার্লামেন্ট আমাদের রাজা করিয়া দিল্লির সিংহাসনে বসাইয়া দিন। একটা দেশ যতই রসালো হউক না, একজন রাজাকেই পালিতে পারে, দেশশুদ্ধ রাজাকে পারে না।

১৩১২

পথ ও পাথেয়

জেলে প্রতিদিন জাল ফেলে তাহার জালে মাছ ওঠে। একদিন জাল ফেলিতেই হঠাৎ একটা ঘড়া উঠিল, এবং ঘড়ার মুখ যেমন খুলিল অমনি তাহার ভিতর হইতে পুঞ্জ পুঞ্জ ধোঁয়ার আকার ধরিয়া একটা দৈত্য বাহির হইয়া পড়িল, আরব্য উপন্যাসে এমনি একটা গল্প আছে।

আমাদের খবরের কাগজ প্রতিদিন খবর টানিয়া আনে; কিন্তু তাহার জালে যে সেদিন এমন একটা ঘড়া ঠেকিবে, এবং ঘড়ার মধ্য হইতে এতবড়ো একটা ত্রাসজনক ব্যাপার বাহির হইয়া পড়িবে তাহা আমরা কোনোদিন প্রত্যাশাও করিতে পারি নাই।

নিতান্তই ঘরের দ্বারের কাছ হইতে এমন একটা রহস্য হঠাৎ চক্ষের নিমেষে উদ্‌ঘাটিত হইয়া পড়িলে সমস্ত দেশের লোকের মনে যে আন্দোলন উপস্থিত হয় সেই সুদূরব্যাপী চাঞ্চল্যের সময় কথায় এবং আচরণের সত্যতা রক্ষা করা কঠিন হইয়া উঠে। জলে যখন ঢেউ উঠিতে থাকে তখন ছায়াটা আপনি বিকৃত হইয়া যায়, সেজন্য কাহাকেও দোষ দিতে পারি না। অত্যন্ত ভয় এবং ভাবনার সময় আমাদের চিন্তা ও বাক্যের মধ্যে সহজেই বিকলতা ঘটে অথচ ঠিক এইরূপ সময়েই অবিচলিত এবং নির্বিকার সত্যের প্রয়োজন সকলের চেয়ে বেশি। প্রতিদিন অসত্য ও অর্ধসত্য আমাদের তত গুরুতর অনিষ্ট করে না কিন্তু সংকটের দিনে তাহার মতো শত্রু আর কেহ নাই।

অতএব ঈশ্বর করুন, আজ যেন আমরা ভয়ে, ক্রোধে, আকস্মিক বিপদে,দুর্বল চিত্তের অতিমাত্র আক্ষেপে আত্মবিস্মৃত হইয়া নিজেকে বা অন্যকে ভুলাইবার জন্য কেবল কতকগুলা ব্যর্থ বাক্যের ধুলা উড়াইয়া আমাদের চারিদিকের আবিল আকাশকে আরও অস্বচ্ছ করিয়া না তুলি। তীব্র বাক্যের দ্বারা চাঞ্চল্যকে বাড়াইয়া তোলা হয়, ভয়ের দ্বারা সত্যকে কোনোপ্রকারে চাপা দিবার প্রবৃত্তি জন্মে—অতএব অদ্যকার দিনে হৃদয়াবেগপ্রকাশের উত্তেজনা সংবরণ করিয়া যথাসম্ভব শান্তভাবে যদি বর্তমান ঘটনাকে বিচার না করি, সত্যকে আবিষ্কার ও প্রচার না করি তবে আমাদের আলোচনা কেবল যে ব্যর্থ হইবে তাহা নহে, তাহাতে অনিষ্ট ঘটিবে।

আমাদের হীনাবস্থা বলিয়াই উপস্থিত বিভ্রাটের সময় কিছু অতিরিক্ত ব্যগ্রতার সহিত তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে ইচ্ছা করে, "আমি ইহার মধ্যে

নাই ; এ কেবল অমুক দলের কীর্তি ; এ কেবল অমুক লোকের অন্যায় ; আমি পূর্ব হইতেই বলিয়া আসিতেছি এ-সব ভালো হইতেছে না, আমি তো জানিতাম এমনি একটা ব্যাপার ঘটিবে ।”

কোনো আতঙ্কজনক দুর্ঘটনার পর এই প্রকার অশোভন উৎকণ্ঠার সহিত পরের প্রতি অভিযোগ বা নিজের সুবুদ্ধি লইয়া অভিমান আমার কাছে দুর্বলতার পরিচয় সুতরাং লজ্জার বিষয় বলিয়া মনে হয় । বিশেষত আমরা প্রবলের শাসনাধীনে আছি এইজন্য রাজপুরুষদের বিরাগের দিনে অন্যকে গালি দিয়া নিজেকে ভালোমানুষের দলে দাঁড় করাইতে গেলে তাহার মধ্যে কেমন একটা হীনতা আসিয়া পড়েই—অতএব দুর্বল পক্ষের এইরূপ ব্যাপারে অতিরিক্ত উৎসাহ প্রকাশ করিতে না যাওয়াই ভালো ।

তাহার পরে, যাহারা অপরাধ করিয়াছে, ধরা পড়িয়াছে, নির্মম রাজদণ্ড যাহাদের 'পরে উদ্যত হইয়া উঠিয়াছে, আর-কিছু বিচার না করিয়া কেবলমাত্র বিপদ ঘটাইয়াছে বলিয়াই তাহাদের প্রতি তীব্রতা প্রকাশ করাও কাপুরুষতা । তাহাদের বিচারের ভার এমন হাতে আছে যে, অনুগ্রহ বা মমত্ব সেই হাতকে লেশমাত্র দণ্ডলাঘবতার দিকে বিচলিত করিবে না । অতএব ইহার উপরেও আমরা যেটুকু অগ্রসর হইয়া যোগ করিতে যাইব তাহাতে ভীরু স্বভাবের নির্দয়তা প্রকাশ পাইবে । ব্যাপারটাকে আমরা যেমনই দোষাবহ বলিয়া মনে করি না কেন, সে-সম্বন্ধে মতপ্রকাশের আগ্রহে আমরা আত্মসম্ভ্রমের মর্যাদা লঙ্ঘন করিব কেন ? সমস্ত দেশের মাথার উপরকার আকাশে যখন একটা রুদ্ররোষ রক্তবর্ণ হইয়া স্তব্ধ হইয়া রহিয়াছে তখন সেই বজ্রধরের সম্মুখে আমাদের দায়িত্ববিহীন চাপল্য কেবল যে অনাবশ্যক তাহা নহে তাহা কেমন এক-প্রকার অসংগত ।

যিনি নিজেকে যতই দূরদর্শী বলিয়া মনে করুন না এ-কথা আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে যে, ঘটনা যে এতদূর আসিয়া পৌঁছিতে পারে তাহা দেশের অধিকাংশ লোক কল্পনা করে নাই । বুদ্ধি আমাদের সকলেরই ন্যূনাধিক পরিমাণে আছে কিন্তু চোর পালাইলে সেই বুদ্ধির যতটা বিকাশ হয় পূর্বে ততটা প্রত্যাশা করা যায় না ।

অবশ্য, ঘটনা যখন ঘটিয়াছে তখন এ-কথা বলা সহজ যে, ঘটনার সম্ভাবনা ছিল বলিয়াই ঘটিয়াছে । এবং অমনি এই সুযোগে আমাদের মধ্যে যাঁহারা স্বভাবত কিছু অধিক উত্তেজনাশীল তাঁহাদিগকেও ভর্ৎসনা করিয়া বলা সহজ যে, তোমরা যদি এতটা দূর বাড়াবাড়ি না করিতে তবে ভালো হইত ।

আমরা হিন্দু, বিশেষত বাঙালি, বাক্যে যতই উত্তেজনা প্রকাশ করি কোনো দুঃসাহসিক কাজে কদাচ প্রবৃত্ত হইতে পারি না এই লজ্জার কথা দেশে বিদেশে রাষ্ট্র হইতে বাকি নাই। ইহা লইয়া বাবুসম্প্রদায় বিশেষভাবে ইংরেজের কাছে অহরহ দুঃসহ ভাষায় খোটা খাইয়া আসিয়াছে। সর্বপ্রকার উত্তেজনাবাক্য অন্তত বাংলাদেশে যে সম্পূর্ণ নিরাপদ এ সম্বন্ধে আমাদের শত্রুমিত্র কাহারও কোনো সন্দেহমাত্র ছিল না। তাই এ-পর্যন্ত কথায় বার্তায় ভাবে ভঙ্গিতে আমরা যতই বাড়াবাড়ি প্রকাশ করিয়াছি তাহা দেখিয়া কখনো বা পর কখনো বা আত্মীয় বিরক্ত হইয়াছে, রাগ করিয়াছে, আমাদের অসংযমকে প্রহসন বলিয়া উপহাস করিতেও ক্ষান্ত হয় নাই। বস্তুত বাংলা কাগজে অথবা কোনো বাঙালি বক্তার মুখে যখন অপরিমিত স্পর্ধাবাক্য বাহির হইত তখন এই বলিয়াই বিশেষভাবে স্বজাতির জন্য লজ্জা অনুভব করিয়াছি যে, যাহারা দুঃসাহসিক কাজ করিবার জন্য বিখ্যাত নহে তাহাদের বাক্যের তেজ দীনতাকে আরও উজ্জ্বল করিয়া প্রকাশ করে মাত্র। বস্তুত বহুদিন হইতে বাঙালিজাতি ভীরু অপবাদের দুঃসহ ভার বহন করিয়া নতশির হইয়াছে বলিয়াই বর্তমান ঘটনাসম্বন্ধে ন্যায় অন্যায় ইষ্ট অনিষ্ট বিচার অতিক্রম করিয়াও অপমানমোচনের উপলক্ষ্যে বাঙালির মনে একটা আনন্দ না জন্মিয়া থাকিতে পারে নাই।

অতএব এ-কথাটা সত্য যে, বাংলাদেশের মনের জ্বালা দেখিতে দেখিতে ক্রমশই যে-প্রকার অগ্নিমূর্তি ধরিয়া প্রকাশ পাইয়া উঠিয়াছে ইহাকে আমাদের দেশের বা অন্য দেশের কোনো জ্ঞানী পুরুষ অবশ্যম্ভাবী বলিয়া কোনোদিন অনুমান করেন নাই। অতএব আজ আমাদের এই অকস্মাৎ-বুদ্ধিবিকাশের দিনে, যাহাকে আমার ভালো লাগে না তাহাকে ধরিয়া অসাবধানতার জন্য দায়ী করিতে বসা সুবিচারসংগত নহে। আমিও এই গোলমালের দিনে কোনো পক্ষের বিরুদ্ধে নালিশ উত্থাপন করিতে চাই না। কিন্তু কেমন করিয়া কী ঘটিল এবং তাহার ফলাফলটা কী, সেটা নিরপেক্ষভাবে বিচার করিয়া আমাদের পথ ঠিক করিয়া লইতেই হইবে; সেই চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়া যদি একজনের বা অনেকের সঙ্গে আমার মতের অনৈক্য প্রকাশ হয়, তবে দয়া করিয়া এ-কথা নিশ্চয় মনে রাখিবেন যে, আমার বুদ্ধির ক্ষীণতা থাকিতে পারে, আমার দৃষ্টিশক্তির দুর্বলতা থাকা সম্ভব, কিন্তু স্বদেশের হিতের প্রতি ঔদাসীন্য বা হিতৈষীদের প্রতি কিছুমাত্র বিরুদ্ধ ভাববশত যে আমি বিচারে ভুল করিতেছি ইহা কদাচ সত্য নহে। অতএব আমার কথাগুলি যদি বা গ্রাহ্য না-ও করেন আমার অভিপ্রায়ের প্রতি ধৈর্য ও শ্রদ্ধা রক্ষা করিবেন।

বাংলাদেশে কিছুকাল হইতে যাহা ঘটিয়া উঠিতেছে তাহার সংঘটনে আমাদের কোন

বাঙালির কতটা অংশ আছে তাহার সূক্ষ্ম বিচার না করিয়া এ-কথা নিশ্চয় বলা যায় যে, কায় বা মন বা বাক্যে ইহাকে আমরা প্রত্যেকেই কোনো-না-কোনো প্রকারে খাদ্য জোগাইয়াছি। অতএব যে-চিত্তদাহ কেবল পরিমিত স্থান লইয়া বদ্ধ থাকে নাই, প্রকৃতিভেদে যাহার উত্তেজনা আমরা প্রত্যেকে নানাপ্রকারে অনুভব ও প্রকাশ করিয়াছি, তাহারই একটা কেন্দ্রক্ষিপ্ত পরিণাম যদি এইপ্রকার গুপ্ত বিপ্লবের অদ্ভুত আয়োজন হয় তবে ইহার দায় এবং দুঃখ বাঙালিমাত্রকেই স্বীকার করিতে হইবে। জ্বর যখন সমস্ত শরীরকে অধিকার করিয়াই হইয়াছিল তখন হাতের তেলো কপালের চেয়ে ঠাণ্ডা ছিল বলিয়াই মৃত্যুকালে নিজেকে সাধু ও কপালটাকেই যত নষ্টের গোড়া বলিয়া নিষ্কৃতি পাইবে না। আমরা কী করিব কী করিতে চাই সে-কথা স্পষ্ট করিয়া ভাবি নাই; এই জানি, আমাদের মনে আগুন জ্বলিয়াছিল; সেই আগুন স্বভাবধর্মবশত ছড়াইয়া পড়িতেই ভিজা কাঠ ধোঁয়াইতে থাকিল, শুকনা কাঠ জ্বলিতে লাগিল এবং ঘরের কোণে কোন্‌খানে কেরোসিন ছিল সে আপনাকে ধারণ করিতে না পারিয়া টিনের শাসন বিদীর্ণ করিয়া একটা বিভীষিকা করিয়া তুলিল।

তা যাই হ'ক, কার্যকারণের পরস্পরের যোগে পরস্পরের ব্যাপ্তি যেমন করিয়াই ঘটুক না কেন, তাই বলিয়া অগ্নি যখন অগ্নিকাণ্ড করিয়া তুলে তখন সব তর্ক ছাড়িয়া তাহাকে নিবৃত্ত করিতে হইবে এ-সম্বন্ধে মতভেদ হইলে চলিবে না।

বিশেষত কারণটা দেশ হইতে দূর হয় নাই; লোকের চিত্ত উত্তেজিত হইয়া আছে। উত্তেজনা এতই তীব্র যে, যে-সকল সাংঘাতিক ব্যাপার আমাদের দেশে অসম্ভব বলিয়া মনে করা যাইত তাহাও সম্ভবপর হইয়াছে। বিরোধবুদ্ধি এতই গভীর এবং সুদূরবিস্তৃতভাবে ব্যাপ্ত যে, কর্তৃপক্ষ ইহাকে বলপূর্বক কেবল স্থানে স্থানে উৎপাটিত করিতে চেষ্টা করিয়া কখনোই নিঃশেষ করিতে পারিবেন না, বরঞ্চ ইহাকে আরও প্রবল ও প্রকাণ্ড করিয়া তুলিবেন।

বর্তমান সংকটে রাজপুরুষদের কী করা কর্তব্য তাহা আলোচনা করিতে গেলে তাঁহারা শ্রদ্ধা করিয়া শুনিবেন বলিয়া ভরসা হয় না। আমরা তাঁহাদের দণ্ডশালার দ্বারে বসিয়া তাঁহাদিগকে পোলিটিকাল প্রাজ্ঞতা শিক্ষা দিবার দুরাশা রাখি না। আমাদের বলিবার কথাও অতি পুরাতন এবং শুনিলে মনে হইবে ভয়ে বলিতেছি। তবু সত্য পুরাতন হইলেও সত্য এবং তাহাকে ভুল বুঝিলেও তাহা সত্য। কথাটি এই—শক্তস্য ভূষণং ক্ষমা—কথা আরও একটু আছে, ক্ষমা শুধু শক্তের ভূষণ নহে সময়বিশেষে শক্তের ব্রহ্মাস্ত্রও ক্ষমা। কিন্তু আমরা যখন শক্তের দলে নহি তখন এই সাত্ত্বিক উপদেশটি লইয়া অধিক আলোচনা আমাদের পক্ষে শোভা পায় না।

ব্যাপারটা দুই পক্ষকে লইয়া—অথচ দুই পক্ষের মধ্যে আপসে বোঝাপড়ার সম্বন্ধ অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে; একদিকে প্রজার বেদনাকে উপেক্ষা করিয়া বল একান্ত প্রবল মূর্তি ধরিতেছে, অন্যদিকে দুর্বলের নিরাশ মনোরথ সফলতার কোনো পথ না পাইয়া প্রতিদিন মরিয়া হইয়া উঠিতেছে;—এ অবস্থায় সমস্যাটি ছোটো নহে। কারণ, আমরা এই দুই পক্ষের ব্যাপারে কেবল এক পক্ষকে লইয়া যেটুকু চেষ্টা করিতে পারি তাহাই আমাদের একমাত্র সম্বল। ঝড়ের দিনে হালের মাঝি নিজের খেয়ালে চলিতেছে; আমরা দাঁড় দিয়া যেটুকু রক্ষা করিতে পারি অগত্যা তাহাই করিতে হইবে;—মাঝি সহায় যদি হয় তবে ভালোই, যদি না-ও হয় তবু দুঃসাধ্য সাধনে প্রবৃত্ত হইতে হইবে; কারণ, যখন ডুবিতে বসিব তখন অন্যকে গালি পাড়িয়া কোনো সান্ত্বনা পাইব না।

এইরূপ দুঃসময়ে সত্যকে চাপাচুপি দিতে যাওয়া প্রলয়ক্ষেত্রে বসিয়া ছেলেখেলা করা মাত্র। আমরা গবর্মেন্টকে বলিবার চেষ্টা করিতেছি এ-সমস্ত কিছুই নয়, এ কেবল দুই-পাঁচ জন ছেলেমানুষের চিত্তবিকারের পরিচয়। আমি তো এ-প্রকার শূন্যগর্ভ সান্ত্বনাবাক্যের কোনোই সার্থকতা দেখি না। প্রথমত এরূপ ফুৎকারবায়ুমাত্রে আমরা গবর্মেন্টের পলিসির পালকে এক ইঞ্চিও ফিরাইতে পারিব না। দ্বিতীয়ত দেশের বর্তমান অবস্থায় কোথায় কী হইতেছে তাহা নিশ্চয় জানি বলিলে যে মিথ্যা বলা হয় তাহার সম্পূর্ণ প্রমাণ হইয়া গেছে। অতএব বিপদের সম্ভাবনা স্বীকার করিয়াই আমাদিগকে কাজ করিতে হইবে। দায়িত্ববোধবিহীন লঘু বাক্যের দ্বারা কোনো সত্যকার সংকটকে ঠেকানো যায় না—এখন কেবল সত্যের প্রয়োজন।

এখন আমাদের দেশের লোককে অকপট হিতৈষণা হইতে এই কথা স্পষ্ট করিয়া বলিতে হইবে গবর্মেন্টের শাসননীতি যে-পন্থাই অবলম্বন করুক এবং ভারতবর্ষীয় ইংরেজের ব্যক্তিগত ব্যবহার আমাদের চিত্তকে যেমনই মথিত করিতে থাক আমাদের পক্ষে আত্মবিস্মৃত হইয়া আত্মহত্যা করা তাহার প্রতিকার নহে।

যে কাল পড়িয়াছে এখন ধর্মের দোহাই দেওয়া মিথ্যা। কারণ, রাষ্ট্রনীতিতে ধর্মনীতির স্থান আছে এ-কথা যে-ব্যক্তি সম্পূর্ণ বিশ্বাসে প্রকাশ করে লোকে তাহাকে হয় কাণ্ডজ্ঞানহীন নয় নীতিবায়ুগ্রস্ত বলিয়া অবজ্ঞা করে। প্রয়োজনের সময় প্রবল পক্ষ ধর্মকে মান্য করা কার্যহন্তারক দীনতা বলিয়া মনে করে, পশ্চিম-মহাদেশের ইতিহাসে তাহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আছে; তৎসত্ত্বেও প্রয়োজনসাধনের উপলক্ষে যদি দুর্বলকে ধর্ম মানিতে উপদেশ দিই তবে উত্তেজনার অবস্থায় তাহারা উত্তর দেয়, এ তো ধর্ম মানা নয় এ ভয়কে মানা।

অল্পদিন হইল যে বোয়ার-যুদ্ধ হইয়াছিল তাহাতে জয়লক্ষ্মী যে ধর্মবুদ্ধির পিছন পিছন চলেন নাই সে-কথা কোনো কোনো ধর্মভীরু ইংরেজের মুখ হইতেই শুনা গিয়াছে। যুদ্ধের সময় শত্রুপক্ষের মনে ভয় উদ্রেক করিয়া দিবার জন্য তাহাদের গ্রামপল্লী উৎসাদিত করিয়া, ঘরদুয়ার জ্বালাইয়া, খাদ্যদ্রব্য লুটপাট করিয়া নির্বিচারে বহুতর নিরপরাধ নরনারীকে নিরাশ্রয় করিয়া দেওয়া যুদ্ধব্যাপারের একটা অঙ্গ বলিয়া গণ্য হইয়াছে। "মার্শাল ল" শব্দের অর্থই প্রয়োজনকালে ন্যায়বিচারের বুদ্ধিকে একটা পরম বিঘ্ন বলিয়া নির্বাসিত করিয়া দিবার বিধি এবং তদুপলক্ষে প্রতিহিংসাপরায়ণ মানবপ্রকৃতির বাধামুক্ত পাশবিকতাকেই প্রয়োজনসাধনের সর্বপ্রধান সহায় বলিয়া ঘোষণা করা। প্যুনিটিভ পুলিসের দ্বারা সমস্ত নিরুপায় গ্রামের লোককে বলপূর্বক ভারাক্রান্ত করিবার নির্বিবেক বর্বরতাও এইজাতীয়। এই সকল বিধির দ্বারা প্রচার করা হয় যে, রাষ্ট্রকার্যে বিশুদ্ধ ন্যায়ধর্ম প্রয়োজনসাধনের পক্ষে পর্যাপ্ত নহে।

য়ুরোপের এই অবিশ্বাসী রাষ্ট্রনীতি আজ পৃথিবীর সর্বত্রই ধর্মবুদ্ধিকে বিষাক্ত করিয়া তুলিতেছে। এমন অবস্থায় যখন বিশেষ ঘটনায় বিশেষ কারণে কোনো অধীন জাতি সহসা নিজেদের অধীনতার ঐকান্তিক মূর্তি দেখিয়া সর্বান্তঃকরণে পীড়িত হইয়া উঠে, অথচ নিজেদের সর্বপ্রকার নিরুপায়তার অপমানে উত্তপ্ত হইতে থাকে, তখন তাহাদের মধ্যে একদল অধীর অসহিষ্ণু ব্যক্তি যখন গোপন পন্থা অবলম্বন করিয়া কেবল ধর্ম-বুদ্ধিকে নহে কর্মবুদ্ধিকেও বিসর্জন দেয় তখন দেশের আন্দোলনকারী বক্তাদিগকেই এইজন্য দায়ী করা বলদর্পে-অন্ধ গায়ের জোরের মূঢ়তা মাত্র।

অতএব দেশের যে-সকল লোক গুপ্তপন্থাকেই রাষ্ট্রহিতসাধনের একমাত্র পন্থা বলিয়া স্থির করিয়াছে তাহাদিগকে গালি দিয়াও কোনো ফল হইবে না এবং তাহাদিগকে ধর্মোপদেশ দিতে গেলেও তাহারা হাসিয়া উড়াইয়া দিবে। আমরা যে-যুগে বর্তমান, এ-যুগে ধর্ম যখন রাষ্ট্রীয় স্বার্থের নিকট প্রকাশ্য ভাবে কুণ্ঠিত, তখন এরূপ ধর্মভ্রংশতার যে-দুঃখ তাহা সমস্ত মানুষকেই নানা আকারে বহন করিতেই হইবে; রাজা ও প্রজা, প্রবল ও দুর্বল, ধনী ও শ্রমী কেহ তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাইবে না। রাজাও প্রয়োজনের জন্য প্রজাকে দুর্নীতির দ্বারা আঘাত করিবে এবং প্রজাও প্রয়োজনের জন্য রাজাকেও দুর্নীতির দ্বারাই আঘাত করিতে চেষ্টা করিবে এবং যে-সকল তৃতীয় পক্ষের লোক এই সমস্ত ব্যাপারে প্রত্যক্ষভাবে লিপ্ত নহে তাহাদিগকেও এই অধর্মসংঘর্ষের অগ্নিদাহ সহ্য করিতে হইবে। বস্তুত সংকটে পড়িয়া মানুষ যেদিন সুস্পষ্ট বুঝিতে পারে যে, অধর্মকে বেতন দিতে গেলে সে যে কেবল এক পক্ষেরই বাঁধা গোলামি করে তাহা নহে, সে দুই পক্ষেরই নিমক খাইয়া

যখন সকল পক্ষেই সমান ভয়ংকর হইয়া উঠে তখন তাহার সহায়তাকে অবিশ্বাস করিয়া তাহাকে একযোগে নির্বাসিত করিয়া দিবার জন্য বিপন্ন সমাজে পরস্পরের মধ্যে রফা চলিতে থাকে। এমনি করিয়াই ধর্মরাজ নিদারুণ সংঘাতের মধ্য হইতেই ধর্মকে জয়ী করিয়া উদ্ধার করিয়া লইতেছেন। যতদিন তাহা সম্পূর্ণ না হয় ততদিন সন্দেহের সঙ্গে সন্দেহের, বিদ্বেষের সঙ্গে বিদ্বেষের এবং কপটনীতির সহিত কপটনীতির সংগ্রামে সমস্ত মানবসমাজ উত্তপ্ত হইতে থাকিবে।

অতএব বর্তমান অবস্থায় যদি উত্তেজিত দেশের লোককে কোনো কথা বলিতে হয় তবে তাহা প্রয়োজনের দিক হইতেই বলিতে হইবে। তাহাদিগকে এই কথা ভালো করিয়া বুঝাইতে হইবে যে, প্রয়োজন অত্যন্ত গুরুতর হইলেও প্রশস্ত পথ দিয়াই তাহা মিটাইতে হয়—কোনো সংকীর্ণ রাস্তা ধরিয়া কাজ সংক্ষেপে করিতে গেলে একদিন দিক হারাইয়া শেষে পথও পাইব না কাজও নষ্ট হইবে। আমার মনের তাগিদ অত্যন্ত বেশি বলিয়া জগতে কোনোদিন রাস্তাও নিজেকে ছাঁটিয়া দেয় না, সময়ও নিজেকে খাটো করে না।

দেশের হিতানুষ্ঠান-জিনিসটা যে কতই বড়ো এবং কতদিকেই যে তাহার অগণ্য শাখাপ্রশাখা প্রসারিত সে-কথা আমরা যেন কোনো সাময়িক আক্ষেপে ভুলিয়া না যাই। ভারতবর্ষের মতো নানা বৈচিত্র্য ও বিরোধগ্রস্ত দেশে তাহার সমস্যা নিতান্তই দুরূহ। ঈশ্বর আমাদের উপর এমন একটি সুমহৎ কর্মের ভার দিয়াছেন, আমরা মানবসমাজের এতবড়ো একটা প্রকাণ্ড জটিল জালের শতসহস্র গ্রন্থিচ্ছেদনের আদেশ লইয়া আসিয়াছি যে, তাহার মাহাত্ম্য যেন একমুহূর্তও বিস্মৃত হইয়া আমরা কোনো-প্রকার চাপল্য প্রকাশ না করি। আদিকাল হইতে জগতে যতগুলি বড়ো বড়ো শক্তির প্রবাহ জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে তাহাদের সকলগুলিরই কোনো-না-কোনো বৃহৎ ধারা এই ভারতবর্ষে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। ঐতিহাসিক স্মৃতির অতীতকালে কোন্ নিগূঢ় প্রয়োজনের দুর্নিবার তাড়নায় যেদিন আর্যজাতি গিরিগুহামুক্ত স্রোতস্বিনীর মতো অকস্মাৎ সচল হইয়া বিশ্বপথে বাহির হইয়া পড়িলেন এবং তাঁহাদেরই এক শাখা বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ভারতবর্ষের অরণ্যচ্ছায়ায় যজ্ঞের অগ্নি প্রজ্বলিত করিলেন সেইদিন ভারতবর্ষের আর্যঅনার্যসম্মিলনক্ষেত্রে যে বিপুল ইতিহাসের উপক্রমণিকা গান আরম্ভ হইয়াছিল আজ কি তাহা সমাপ্ত হইবার পূর্বেই ক্ষান্ত হইয়া গিয়াছে? বিধাতা কি তাহা শিশুর ধূলাঘর নির্মাণের মতোই আজ হঠাৎ অনাদরে ভাঙিয়া ফেলিয়াছেন? তাহার পরে এই ভারতবর্ষ হইতে বৌদ্ধধর্মের মিলনমন্ত্র করুণাজলভার-গম্ভীর মেঘমন্দ্রের মতো ধ্বনিত হইয়া এশিয়ার পূর্বসাগরতীরবাসী সমস্ত মঙ্গোলীয়

জাতিদিগকে জাগ্রত করিয়া দিল এবং ব্রহ্মদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া অতিদূর জাপান পর্যন্ত ভিন্নভাষী অনাত্মীয়দিগকে ধর্মসম্বন্ধে ভারতবর্ষের সঙ্গে একাত্মা করিয়া দিয়াছে, ভারতক্ষেত্রে সেই মহৎ শক্তির অভ্যুদয় কি কেবল ভারতের ভাগ্যেই পরিণামহীন পণ্ডতাতেই পর্যবসিত হইয়াছে? তাহার পরে এশিয়ার পশ্চিমতম প্রান্তে দৈববলের প্রেরণায় মানবের আর-এক মহাশক্তি সুপ্তি হইতে জাগ্রত হইয়া ঐক্যমন্ত্র বহন করিয়া দারুণবেগে পৃথিবী প্লাবিত করিতে বাহির হইল; সেই শক্তিস্রোতকে বিধাতা যে কেবল ভারতবর্ষে আহ্বান করিয়াছেন তাহা নহে, এইখানেই তিনি তাহাকে চিরদিনের জন্য আশ্রয় দিয়াছেন। আমাদের ইতিহাসে এই ব্যাপার কি কোনো একটা আকস্মিক উৎপাত মাত্র? ইহার মধ্যে নিত্যসত্যের কোনো চিরপরিচয় নাই? তাহার পরে য়ুরোপের মহাক্ষেত্রে মানবশক্তি প্রাণের প্রাবল্যে, বিজ্ঞানের কৌতূহলে, পণ্যসংগ্রহের আকাঙ্ক্ষায় যখন বিশ্বাভিমুখী হইয়া বাহির হইল তখন তাহারও একটি বৃহৎ প্রবল ধারা এই ভারতবর্ষে আসিয়াই বিধাতার আহ্বান বহন করিয়া আমাদিগকে আঘাতের দ্বারা জাগ্রত করিয়া তুলিতেছে। এই ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের প্লাবন অপসারিত হইয়া গেলে পর যখন খণ্ড খণ্ড দেশের খণ্ড খণ্ড ধর্মসম্প্রদায় বিরোধবিচ্ছিন্নতায় চতুর্দিককে কণ্টকিত করিয়া তুলিয়াছিল তখন শংকরাচার্য সেই সমস্ত খণ্ডতা ও ক্ষুদ্রতাকে একমাত্র অখণ্ড বৃহত্ত্বের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ করিবার চেষ্টায় ভারতবর্ষের প্রতিভারই পরিচয় দিয়াছিলেন। অবশেষে দার্শনিক জ্ঞানপ্রধান সাধনা যখন ভারতবর্ষে জ্ঞানী-অজ্ঞানী অধিকারী-অনধিকারীকে বিচ্ছিন্ন করিতে লাগিল, তখন চৈতন্য, নানক, দাদু, কবীর ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে জাতির অনৈক্য শাস্ত্রের অনৈক্যকে ভক্তির পরম ঐক্যে এক করিবার অমৃত বর্ষণ করিয়াছিলেন। কেবলমাত্র ভারতবর্ষের প্রাদেশিক ধর্মগুলির বিচ্ছেদক্ষত প্রেমের দ্বারা মিলাইয়া দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তাহা নহে—তাঁহারাই ভারতবর্ষে হিন্দু ও মুসলমান প্রকৃতির মাঝখানে ধর্মসেতু নির্মাণ করিতেছিলেন। ভারতবর্ষ এখনই যে নিশ্চেষ্ট হইয়া আছে তাহা নহে—রামমোহন রায়, স্বামী দয়ানন্দ, কেশবচন্দ্র, রামকৃষ্ণ পরমহংস, বিবেকানন্দ, শিবনারায়ণ স্বামী ইঁহারাও অনৈক্যের মধ্যে একক‍ে, ক্ষুদ্রতার মধ্যে ভূমাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য জীবনের সাধনাকে ভারতবর্ষের হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন। অতীতকাল হইতে আজ পর্যন্ত ভারতবর্ষের এই এক-একটি অধ্যায় ইতিহাসের বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত প্রলাপমাত্র নহে,—ইহারা পরস্পর গ্রথিত, ইহারা কেহই একেবারে স্বপ্নের মতো অন্তর্ধান করে নাই,—ইহারা সকলেই রহিয়াছে; ইহারা সন্ধিতেই হউক সংগ্রামেই হউক ঘাতপ্রতিঘাতে বিধাতার অভিপ্রায়কে অপূর্ব বিচিত্ররূপে সংরচিত করিয়া

তুলিতেছে। পৃথিবীর মধ্যে আর-কোনো দেশেই এতবড়ো বৃহৎ রচনার আয়োজন হয় নাই,—এত জাতি এত ধর্ম এত শক্তি কোনো তীর্থস্থলেই একত্র হয় নাই,—একান্ত বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্যকে প্রকাণ্ড সমন্বয়ে বাঁধিয়া তুলিয়া বিরোধের মধ্যেই মিলনের আদর্শকে পৃথিবীর মধ্যে জয়ী করিবার এমন সুস্পষ্ট আদেশ জগতের আর-কোথাও ধ্বনিত হয় নাই। আর সর্বত্র মানুষ রাজ্য বিস্তার করুক, পণ্য বিস্তার করুক, প্রতাপ বিস্তার করুক—ভারতবর্ষের মানুষ দুঃসহ তপস্যা দ্বারা এককে ব্রহ্মকে, জ্ঞানে প্রেমে ও কর্মে সমস্ত অনৈক্য ও সমস্ত বিরোধের মধ্যে স্বীকার করিয়া মানুষের কর্মশালার কঠোর সংকীর্ণতার মধ্যে মুক্তির উদার নির্মল জ্যোতিকে বিকীর্ণ করিয়া দিক—ভারত-ইতিহাসের আরম্ভ হইতেই আমাদের প্রতি এই অনুশাসন প্রচারিত হইয়াছে। শ্বেত ও কৃষ্ণ, মুসলমান ও খ্রীস্টান, পূর্ব ও পশ্চিম কেহ আমাদের বিরুদ্ধ নহে,—ভারতের পুণ্যক্ষেত্রেই সকল বিরোধ এক হইবার জন্য শত শত শতাব্দী ধরিয়া অতিকঠোর সাধনা করিবে বলিয়াই অতি সুদূরকালে এখানকার তপোবনে একের তত্ত্ব উপনিষদ এমন আশ্চর্য সরল জ্ঞানের সহিত প্রচার করিয়াছিলেন যে, ইতিহাস তাহাকে নানাদিক দিয়া ব্যাখ্যা করিতে করিতে আজও অন্ত পায় নাই।

তাই আমি অনুরোধ করিতেছিলাম অন্যান্য দেশে মনুষ্যত্বের আংশিক বিকাশের দৃষ্টান্তে ভারতবর্ষের ইতিহাসকে সংকীর্ণ করিয়া দেখিবেন না—ইহার মধ্যে যে বহুতর আপাতবিরোধ লক্ষিত হইতেছে তাহা দেখিয়া হতাশ হইয়া কোনো ক্ষুদ্র চেষ্টায় নিজেকে অন্ধভাবে নিযুক্ত করিবেন না—করিলেও কোনোমতেই কৃতকার্য হইবেন না এ-কথা নিশ্চয় জানিবেন। বিধাতার ইচ্ছার সহিত নিজের ইচ্ছাকে সম্মিলিত করাই সফলতার একমাত্র উপায়—তাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতে গেলেই ক্ষণিক কার্যসিদ্ধি আমাদিগকে ভুলাইয়া লইয়া ভয়ংকর ব্যর্থতার মধ্যে ডুবাইয়া মারিবে।

যে-ভারতবর্ষ মানবের সমস্ত মহৎশক্তিপুঞ্জ দ্বারা ধীরে ধীরে এইরূপে বিরাটমূর্তি ধারণ করিয়া উঠিতেছে, সমস্ত আঘাত-অপমান সমস্ত বেদনা যাহাকে এই পরম-প্রকাশের অভিমুখে অগ্রসর করিতেছে, সেই মহাভারতবর্ষের সেবা আমাদের মধ্যে সজ্ঞানে সচেতনভাবে কে করিবেন, কে একান্ত অবিচলিত ভক্তির সহিত সমস্ত ক্ষোভ-অধৈর্য-অহংকারকে এই মহাসাধনায় বিলীন করিয়া দিয়া ভারতবিধাতার পদতলে নিজের নির্মল জীবনকে পূজার অর্ঘ্যের ন্যায় নিবেদন করিয়া দিবেন? ভারতের মহাজাতীয় উদ্‌বোধনের সেই আমাদের পুরোহিতবৃন্দ কোথায়? তাঁহারা যেখানেই থাকুন এ-কথা আপনারা ধ্রুব সত্য বলিয়া জানিবেন, তাঁহারা চঞ্চল নহেন, তাঁহারা উন্মত্ত নহেন, তাঁহারা কর্মনির্দেশশূন্য স্পর্ধাবাক্যের দ্বারা দেশের

লোকের হৃদয়াবেগকে উত্তরোত্তর সংক্রামক বায়ুরোগে পরিণত করিতেছেন না— নিশ্চয় জানিবেন, তাঁহাদের মধ্যে বুদ্ধি, হৃদয় এবং কর্মনিষ্ঠার অতি অসামান্য সমাবেশ ঘটিয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে জ্ঞানের সুগভীর শান্তি ও ধৈর্য এবং ইচ্ছাশক্তির অপরাজিত বেগ ও অধ্যবসায় এই উভয়ের সুমহৎ সামঞ্জস্য আছে।

কিন্তু যখন দেখা যায় কোনো একটা বিশেষঘটনামূলক উত্তেজনার তাড়নায়, একটা সাময়িক বিরোধের ক্ষুব্ধতায় দেশের অনেক লোক সহসা দেশের হিত করিতে হইবে বলিয়া একমুহূর্তে ঊর্ধ্বশ্বাসে ধাবিত হয়, নিশ্চয় বুঝিতে হইবে হৃদয়াবেগকেই একমাত্র সম্বল করিয়া তাহারা দুর্গম পথে বাহির হইয়া পড়িয়াছে। তাহারা দেশের সুদূর ও সুবিস্তীর্ণ মঙ্গলকে শান্তভাবে সত্যভাবে বিচার করিতে অবস্থাগতিকেই অক্ষম। তাহারা তাহাদের উপস্থিত বেদনাকেই এত তীব্রভাবে অনুভব করে এবং তাহারই প্রতিকারচেষ্টাকে এত উগ্রভাবে মনে রাখে যে, আত্মসংবরণে অক্ষম হইয়া দেশের সমগ্র হিতকে আঘাত করা তাহাদের পক্ষে অসম্ভব হয় না।

ইতিবৃত্তের শিক্ষাকে ঠিকমতো বিচার করিয়া লওয়া বড়ো কঠিন। সকল দেশের ইতিহাসেই কোনো বৃহৎ ঘটনা যখন মূর্তিগ্রহণ করিয়া দেখা দেয় তখন তাহার অব্যবহিত পূর্বেই আমরা একটা প্রবল আঘাত ও আন্দোলন দেখিতে পাই। রাষ্ট্রে বা সমাজে অসামঞ্জস্যের বোঝা অনেকদিন হইতে নিঃশব্দে পুঞ্জীভূত হইতে হইতে একদিন একটা আঘাতে হঠাৎ তাহা বিপ্লবে ভাঙিয়া পড়ে। সেই সময় দেশের মধ্যে যদি অনুকূল উপকরণ প্রস্তুত থাকে, পূর্ব হইতেই যদি তাহার ভাণ্ডারে নিগূঢ়ভাবে জ্ঞান ও শক্তির সম্বল সঞ্চিত থাকে তবেই সেই বিপ্লবের দারুণ আঘাতকে কাটাইয়া সে-দেশ আপনার নূতন জীবনকে নবীন সামঞ্জস্য দান করিয়া গড়িয়া তোলে। দেশের সেই আভ্যন্তরিক প্রাণসম্বল যাহা অন্তঃপুরের ভাণ্ডারে প্রচ্ছন্নভাবে উপচিত হয় তাহা আমরা দেখিতে পাই না বলিয়া আমরা মনে করি, বুঝি বিপ্লবের দ্বারাতেই দেশ সার্থকতা লাভ করিল; বিপ্লবই যেন মঙ্গলের মূলকারণ এবং মুখ্য উপায়।

ইতিহাসকে এইরূপে বাহ্যভাবে দেখিয়া এ-কথা ভুলিলে চলিবে না যে, যে-দেশের মর্মস্থানে সৃষ্টি করিবার শক্তি ক্ষীণ হইয়াছে প্রলয়ের আঘাতকে সে কখনোই কাটাইয়া উঠিতে পারে না। গড়িয়া তুলিবার বাঁধিয়া তুলিবার একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি যাহাদের মধ্যে সজীবভাবে বিদ্যমান, ভাঙনের আঘাত তাহাদের সেই জীবনধর্মকেই তাহাদের সৃজনীশক্তিকেই সচেষ্ট সচেতন করিয়া তোলে। এইরূপে সৃষ্টিকেই নূতন বলে উত্তেজিত করে বলিয়াই প্রলয়ের গৌরব। নতুবা শুদ্ধমাত্র ভাঙন, নির্বিচার বিপ্লব, কোনোমতেই কল্যাণকর হইতে পারে না।

পালে খুব দমকা হাওয়া লাগিতেই যে-জাহাজ জড়ত্ব দূর করিয়া হুহু করিয়া চলিয়া গেল নিশ্চয় বুঝিতে হইবে আর-কিছু না হউক সে-জাহাজের খোলের তক্তাগুলার মধ্যে ফাঁক ছিল না; যদি বা পূর্বে ছিল এমন হয় তবে নিশ্চয়ই কোনো এক সময়ে জাহাজের মিস্ত্রি খোলের অন্ধকারে অলক্ষ্যে বসিয়া সেগুলা সারিয়া দিয়াছিল। কিন্তু যে জীর্ণ জাহাজকে একটু নাড়া দিলেই তাহার একটা আলগা তক্তার উপরে আর একটা আলগা তক্তা ঠক্‌ঠক্ করিয়া আঘাত করিতে থাকে ওই দমকা হাওয়া কি তাহার পালের পক্ষে সর্বনেশে জিনিস নয়? আমাদের দেশেও একটুমাত্র নাড়া খাইলেই হিন্দুতে মুসলমানে, উচ্চবর্ণে নিম্নবর্ণে সংঘাত বাধিয়া যায় না কি? ভিতরে যখন এমন সব ফাঁক তখন ঝড় কাটাইয়া ঢেউ বাঁচাইয়া স্বরাজের বন্দরে পৌঁছিবার জন্য কি কেবল উত্তেজনাকে উন্মাদনায় পরিণত করাই পরিত্রাণের প্রশস্ত উপায়?

বাহির হইতে দেশ যখন অপমান লাভ করে, যখন আমাদের অধিকারকে বিস্তীর্ণ করিবার ইচ্ছা করিলেই কর্তৃপক্ষদের নিকট হইতে অযোগ্যতার অপবাদ প্রাপ্ত হইতে থাকি তখন আমাদের দেশের কোনো দুর্বলতা কোনো ত্রুটি স্বীকার করা আমাদের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হইয়া উঠে। তখন যে আমরা কেবল পরের কাছে মুখরক্ষা করিবার জন্যই গরিমা প্রকাশ করি তাহা নহে, আহত অভিমানে নিজের অবস্থা সম্বন্ধে আমাদের বুদ্ধিও অন্ধ হইয়া যায়; আমরা যে অবজ্ঞার যোগ্য নহি তাহা চক্ষের পলকেই প্রমাণ করিয়া দিবার জন্য আমরা একান্ত ব্যগ্র হইয়া উঠি আমরা সবই পারি, আমাদের সমস্তই প্রস্তুত, শুদ্ধমাত্র বাহিরের বাধাতেই আমাদিগকে অক্ষম করিয়া রাখিয়াছে এই কথাই কেবল অস্বাভাবিক উচ্চকণ্ঠে বলিবার চেষ্টা হয় তাহা নহে এইরূপ বিশ্বাসে কাজে প্রবৃত্ত হইবার জন্য আমাদের লাঞ্ছিত হৃদয় উদ্দাম হইয়া উঠে। এই প্রকারে অত্যন্ত চিত্তক্ষোভের সময়েই ইতিহাসকে আমরা ভুল করিয়া পড়ি। মনে স্থির করি, যে-সকল অধীন দেশ স্বাধীন হইয়াছে তাহারা বিপ্লব করিয়াছে বলিয়াই স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে; এই স্বাধীনতাকে হাতে পাওয়া এবং হাতে রাখার জন্য আর কোনো গুণ থাকা আবশ্যক কি না তাহা আমরা স্পষ্ট করিয়া ভাবিতেই চাহি না, অথবা তাড়াতাড়ি করিয়া মনে করি সে-সমস্ত গুণ আমাদের আছে কিংবা উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইলে সেগুলি আপনিই কোনোরকম করিয়া জোগাইয়া যাইবে।

এইরূপে মানুষের চিত্ত যখন অপমানে আহত হইয়া নিজের গৌরব সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতেছে, সমস্ত কঠিন বাধাকে উন্মত্তের মতো একেবারে অস্বীকার করিয়া অসাধ্য চেষ্টায় আত্মহত্যা করিবার উদ্‌যোগ করিতেছে তখন তাহার মতো

মর্মান্তিক করুণাবহ ব্যাপার জগতে আর কী আছে। এই প্রকার দুশ্চেষ্টা অনিবার্য ব্যর্থতার মধ্যে লইয়া যাইবেই, তথাপি ইহাকে আমরা পরিহাস করিতে পারিব না। ইহার মধ্যে মানবপ্রকৃতির যে পরমদুঃখকর অধ্যবসায় আছে তাহা পৃথিবীর সর্বত্রই সর্বকালেই নানা উপলক্ষ্যে নানা অসম্ভব প্রত্যাশায় অসাধ্যসাধনে বারংবার দগ্ধপক্ষ পতঙ্গের ন্যায় নিশ্চিত পরাভবের বহ্নিশিখায় অন্ধভাবে ঝাঁপ দিয়া পড়িতেছে।

যাই হ'ক, যেমন করিয়াই হ'ক, শক্তির অভিমান আঘাত পাইয়া জাগিয়া উঠিলে সেটা জাতির পক্ষে যে অনিষ্টকর, তাহা বলা যায় না। তবে কিনা বিরোধের ক্রুদ্ধ আবেগের দ্বারা আমাদের এই উদ্যম হঠাৎ আবির্ভূত হইয়াছে বলিয়াই আমাদের মধ্যে কেহ কেহ দেশের শক্তিকে বিরোধের মূর্তিতেই প্রকাশ করিবার দুর্বুদ্ধি অন্তরে পোষণ করিতেছেন। কিন্তু যাহারা সহজ অবস্থায় কোনোদিন স্বাভাবিক অনুরাগের দ্বারা দেশের হিতানুষ্ঠানে ক্রমান্বয়ে অভ্যস্ত হয় নাই, যাহারা উচ্চসংকল্পকে বহুদিনের ধৈর্যে নানা উপকরণে নানা বাধাবিঘ্নের ভিতর দিয়া গড়িয়া তুলিবার কাজে নিজের প্রকৃতিকে প্রস্তুত করে নাই, অনেকদিন ধরিয়া রাষ্ট্রচালনার বৃহৎ কার্যক্ষেত্র হইতে দুর্ভাগ্যক্রমে বঞ্চিত হইয়া যাহারা ক্ষুদ্র স্বার্থের অনুসরণে সংকীর্ণভাবে জীবনের কাজ করিয়া আসিয়াছে তাহারা হঠাৎ বিষম রাগ করিয়া এক নিমেষে দেশের একটা মস্ত হিত করিয়া ফেলিবে ইহা কোনোমতেই সম্ভবপর হইতে পারে না। ঠাণ্ডার দিনে নৌকার কাছেও ঘেঁষিলাম না, তুফানের দিনে তাড়াতাড়ি হাল ধরিয়া অসামান্য মাঝি বলিয়া দেশে বিদেশে বাহবা লইব এইরূপ আশ্চর্য ব্যাপার স্বপ্নে ঘটাই সম্ভব। অতএব আমাদিগকেও কাজ একেবারে সেই গোড়ার দিক হইতেই শুরু করিতে হইবে। তাহাতে বিলম্ব হইতে পারে—বিপরীত উপায়ে আরও অনেক বেশি বিলম্ব হইবে।

মানুষ বিস্তীর্ণ মঙ্গলকে সৃষ্টি করে তপস্যাদ্বারা। ক্রোধে বা কামে সেই তপস্যা ভঙ্গ করে, এবং তপস্যার ফলকে একমুহূর্তে নষ্ট করিয়া দেয়। নিশ্চয়ই আমাদের দেশেও কল্যাণময় চেষ্টা নিভৃতে তপস্যা করিতেছে; দ্রুত ফললাভের লোভ তাহার নাই, সাময়িক আশাভঙ্গের ক্রোধকে সে সংযত করিয়াছে; এমন সময় আজ অকস্মাৎ ধৈর্যহীন উন্মত্ততা যজ্ঞক্ষেত্রে রক্তবৃষ্টি করিয়া তাহার বহুদুঃখসঞ্চিত তপস্যার ফলকে কলুষিত করিয়া নষ্ট করিবার উপক্রম করিতেছে।

ক্রোধের আবেগ তপস্যাকে বিশ্বাসই করে না; তাহাকে নিশ্চেষ্টতা বলিয়া মনে করে, তাহাকে নিজের আশু উদ্দেশ্যসিদ্ধির প্রধান অন্তরায় বলিয়া ঘৃণা করে; উৎপাতের দ্বারা সেই তপঃসাধনাকে চঞ্চল সুতরাং নিষ্ফল করিবার জন্য উঠিয়া-পড়িয়া প্রবৃত্ত হয়। ফলকে পাকিতে দেওয়াকেই সে ঔদাসীন্য বলিয়া জ্ঞান করে, টান দিয়া

ফলকে ছিঁড়িয়া লওয়াকেই সে একমাত্র পৌরুষ বলিয়া জানে; সে মনে করে যে-মালী প্রতিদিন গাছের তলায় জল সেচন করিতেছে গাছের ডালে উঠিবার সাহস নাই বলিয়াই তাহার এই দীনতা। এ-অবস্থায় মালীর উপর তাহার রাগ হয়, জল দেওয়াকে সে ছোটো কাজ মনে করে। উত্তেজিত অবস্থায় মানুষ উত্তেজনাকেই জগতের মধ্যে সকলের চেয়ে বড়ো সত্য বলিয়া জানে, যেখানে তাহার অভাব দেখে সেখানে সে কোনো সার্থকতাই দেখিতে পায় না।

কিন্তু স্ফুলিঙ্গের সঙ্গে শিখার যে-প্রভেদ উত্তেজনার সঙ্গে শক্তির সেই প্রভেদ। চকমকি ঠুকিয়া যে-স্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে থাকে তাহাতে ঘরের অন্ধকার দূর হয় না। তাহার আয়োজন স্বল্প তেমনি তাহার প্রয়োজনও সামান্য। প্রদীপের আয়োজন অনেক, তাহার আধার গড়িতে হয়, সলিতা পাকাইতে হয়, তাহার তেল জোগাইতে হয়। যখন যথাযথ মূল্য দিয়া সমস্ত কেনা হইয়াছে এবং পরিশ্রম করিয়া সমস্ত প্রস্তুত হইয়াছে, তখনই প্রয়োজন হইলে স্ফুলিঙ্গ প্রদীপের মুখে আপনাকে স্থায়ী শিখায় পরিণত করিয়া ঘরকে আলোকিত করিয়া তুলিতে পারে। যখন উপযুক্ত চেষ্টার দ্বারা সেই প্রদীপরচনার আয়োজন করিবার উদ্যম জাগিতেছে না, যখন শুদ্ধমাত্র ঘন ঘন চকমকি ঠোকার চাঞ্চল্যমাত্রেই সকলে আনন্দে অভিভূত হইয়া উঠিতেছি তখন সত্যের অনুরোধে স্বীকার করিতেই হইবে, এমন করিয়া কখনোই ঘরে আলো জ্বলিবে না কিন্তু ঘরে আগুন লাগা অসম্ভব নহে।

কিন্তু শক্তিকে সুলভ করিয়া তুলিবার চেষ্টায় মানুষ উত্তেজনার আশ্রয় অবলম্বন করে। এ-কথা ভুলিয়া যায় যে, এই অস্বাভাবিক সুলভতা একদিকে মূল্য কমাইয়া আর-একদিক দিয়া এমন করিয়া কষিয়া মূল্য আদায় করিয়া লয় যে, গোড়াতেই তাহার দুর্মূল্যতা স্বীকার করিয়া লইলে তাহাকে অপেক্ষাকৃত সস্তায় পাওয়া যাইতে পারে।

আমাদের দেশেও যখন দেশের হিতসাধনবুদ্ধি নামক দুর্লভ মহামূল্য পদার্থ একটি আকস্মিক উত্তেজনায় আবালবৃদ্ধবনিতার মধ্যে অভাবনীয় প্রচুররূপে দেখা দিল তখন আমাদের মতো দরিদ্র জাতিকে পরমানন্দে উৎফুল্ল করিয়া তুলিল। তখন এ-কথা আমাদের মনে করিতেও প্রবৃত্তি হয় নাই যে, ভালো জিনিসের এত সুলভতা স্বাভাবিক নহে। এই ব্যাপক পদার্থকে কাজের শাসনের মধ্যে বাঁধিয়া সংযত সংহত করিতে না পারিলে ইহার প্রকৃত সার্থকতাই থাকে না। রাস্তাঘাটের লোক যুদ্ধ করিব বলিয়া মাতিয়া উঠিলেই তাহাদিগকে সৈন্য জ্ঞান করিয়া যদি সুলভে কাজ সারিবার আশ্বাসে উল্লাস করিতে থাকি তবে সত্যকার লড়াইয়ের বেলায় সমস্ত ধনপ্রাণ দিয়াও এই হঠাৎ-সস্তার সাংঘাতিক দায় হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না।

আসল কথা, মাতাল যেমন নিজের এবং মণ্ডলীর মধ্যে নেশাকে কেবলই বাড়াইয়া চলিতেই চায় তেমনি উত্তেজনার মাদকতা আমরা সম্প্রতি যখন অনুভব করিলাম তখন কেবলই সেটাকে বাড়াইয়া তুলিবার জন্য আমাদের প্রবৃত্তি অসংযত হইয়া উঠিল। অথচ এটা যে একটা নেশার তাড়না সে-কথা স্বীকার না করিয়া আমরা বলিতে লাগিলাম, গোড়ায় ভাবের উত্তেজনারই দরকার বেশি ; সেটা রীতিমতো পাকিয়া উঠিলে আপনিই তাহা কাজের দিকে ধাবিত হয়—অতএব দিনরাত যাহারা কাজ কাজ করিয়া বিরক্ত করিতেছে তাহারা ছোটো নজরের লোক, তাহারা ভাবুক নহে—আমরা কেবলই ভাবে দেশ মাতাইব। সমস্ত দেশ জুড়িয়া আমরা ভাবের ভৈরবীচক্র বসাইয়া দিলাম ; মন্ত্র এই হইল—

পীত্বা পীত্বা পুনঃ পীত্বা পুনঃ পততি ভূতলে
উত্থায় চ পুনঃ পীত্বা পুনর্জন্মো ন বিদ্যতে।

চেষ্টা নহে, কর্ম নহে, কিছুই গড়িয়া তোলা নহে, কেবল ভাবোচ্ছ্বাসই সাধনা, মত্ততাই মুক্তি।

অনেককেই আহ্বান করিলাম, অনেককেই সমবেত করিলাম, জনতার বিস্তার দেখিয়া আনন্দিত হইলাম কিন্তু এমন করিয়া কোনো কাজের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিলাম না যাহাতে উদ্‌বোধিত শক্তিকে সকলে সার্থক করিতে পারে। কেবল উৎসাহই দিতে লাগিলাম কাজ দিলাম না। মানুষের মনের পক্ষে এমন অস্বাস্থ্যকর ব্যাপার আর কিছুই নাই। মনে করিলাম উৎসাহে মানুষকে নির্ভীক করে এবং নির্ভীক হইলে মানুষ কর্মের বাধাবিপত্তিকে লঙ্ঘন করিতে কুণ্ঠিত হয় না। কিন্তু এইরূপ লঙ্ঘন করিবার উত্তেজনাই তো কর্মসাধনের সর্বপ্রধান অঙ্গ নহে—স্থিরবুদ্ধি লইয়া বিচারের শক্তি, সংযত হইয়া গড়িয়া তুলিবার শক্তি যে তাহার চেয়ে বড়ো। এইজন্যই মাতাল হইয়া মানুষ খুন করিতে পারে কিন্তু মাতাল হইয়া কেহ যুদ্ধ করিতে পারে না। যুদ্ধের মধ্যে কিছু পরিমাণ মত্ততা নাই তাহা নহে কিন্তু অপ্রমত্ততাই প্রভু হইয়া তাহাকে চালিত করে। সেই স্থিরবুদ্ধি দূরদর্শী কর্মোৎসাহী প্রভুকেই বর্তমান উত্তেজনার দিনে দেশ খুঁজিয়াছে, আহ্বান করিয়াছে, ভাগ্যহীন দেশের দৈন্যবশত তাঁহার তো সাড়া পাওয়া যায় না। আমরা যাহারা ছুটিয়া আসি কেবল মদের পাত্রে মদই ঢালি। এঞ্জিনে স্টীমের দমই বাড়াইতে থাকি। যখন প্রশ্ন ওঠে, পথ সমান করিয়া রেল বসাইবার আয়োজন কে করিবে তখন আমরা উত্তর করি, এ-সমস্ত নিতান্ত খুচরা কাজের হিসাব লইয়া মাথা বকাইবার প্রয়োজন নাই—সময়কালে

আপনিই সমস্ত হইয়া যাইবে, মজুরদের কাজ মজুররাই করিবে কিন্তু আমরা যখন চালক তখন আমরা কেবল এঞ্জিনে দমই চড়াইতে থাকিব।

এ-পর্যন্ত যাঁহারা সহিষ্ণুতা রক্ষা করিতে পারিয়াছেন তাঁহারা হয়তো আমাকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবেন, তবে কি বাংলাদেশের সর্বসাধারণের মধ্যে যে-উত্তেজনার উদ্রেক হইয়াছে তাহা হইতে কোনো শুভফল প্রত্যাশা করিবার নাই ?

নাই এমন কথা আমি কখনোই মনে করি না। অসাড় শক্তিকে সচেষ্ট সচেতন করিয়া তুলিবার জন্য এই উত্তেজনার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু সচেতন করিয়া তুলিয়া তাহার পরে কী করিতে হইবে ? কাজ করাইতে হইবে, না মাতাল করিতেই হইবে ? যে-পরিমাণ মদে ক্ষীণপ্রাণকে কাজের উপযোগী করিয়া তোলে তাহার চেয়ে বেশি মদে পুনশ্চ তাহার কাজের উপযোগিতা নষ্ট করিয়া দেয়; যে-সকল সত্যকর্মে ধৈর্য এবং অধ্যবসায়ের প্রয়োজন সে-কাজে মাতালের শক্তি এবং অভিরুচি বিমুখ হইয়া উঠে। ক্রমে উত্তেজনাই তাহার লক্ষ্য হয় এবং সে দায়ে পড়িয়া কাজের নামে এমন সকল অকাজের সৃষ্টি করিতে থাকে যাহা তাহার মত্ততারই আনুকূল্য করিতে পারে। এই সকল উৎপাত-ব্যাপারকে বস্তুত তাহারা মাদকস্বরূপেই ব্যবহার করে অথচ তাহাকে স্বদেশহিত নাম দিয়া উত্তেজনাকে উচ্চসুরেই বাঁধিয়া রাখে। হৃদয়াবেগ-জিনিসটা উপযুক্ত কাজের দ্বারা বহির্মুখ না হইয়া যখন কেবলই অন্তরে সঞ্চিত ও বর্ধিত হইতে থাকে তখন তাহা বিষের মতো কাজ করে—তাহার অপ্রয়োজনীয় উদ্যম আমাদের স্নায়ুমণ্ডলকে বিকৃত করিয়া কর্মসভাকে নৃত্যসভা করিয়া তোলে।

ঘুম হইতে জাগিয়া নিজের সচল শক্তিকে সত্য বলিয়া জানিবার জন্য প্রথম যে একটা উত্তেজনার আঘাত আবশ্যক তাহাতে আমাদের প্রয়োজন ছিল। মনে নিশ্চয় স্থির করিয়াছিলাম, ইংরেজ জন্মান্তরের সুকৃতি এবং জন্মকালের শুভগ্রহস্বরূপ আমাদের কর্মহীন জোড়করপুটে আমাদের সমস্ত মঙ্গল আপনি তুলিয়া দিবে। বিধাতানির্দিষ্ট আমাদের সেই বিনাচেষ্টার সৌভাগ্যকে কখনো বা বন্দনা করিতাম কখনো বা তাহার সঙ্গে কলহ করিয়া কাল কাটাইতাম। এই করিতে করিতে মধ্যাহ্নকালে যখন সমস্ত জগৎ আপিস করিতেছে তখন আমাদের সুখনিদ্রা প্রগাঢ় হইতেছিল।

এমন সময় কোথা হইতে একটা আঘাত লাগিল, ঘুমের ঘোরও কাটিল, আগেকার মতো পুনশ্চ সুখস্বপ্ন দেখিবার জন্য নয়ন মুদিবার ইচ্ছাও রহিল না, কিন্তু আশ্চর্য এই, আমাদের সেই স্বপ্নের সঙ্গে জাগরণের একটা বিষয়ে মিল রহিয়াই গেল।

তখন আমরা নিশ্চিন্ত হইয়া ছিলাম যে, চেষ্টা না করিয়াই আমরা চেষ্টার ফল পাইতে থাকিব, এখনও ভাবিতেছি ফল পাইবার জন্য প্রচলিত পথে চেষ্টাকে

খাটাইবার প্রয়োজন আমরা যেন যথেষ্ট সংক্ষিপ্ত করিয়া লইতে পারি। স্বপ্নাবস্থাতেও অসম্ভবকে আঁকড়িয়া পড়িয়া ছিলাম, জাগ্রত অবস্থাতেও সেই অসম্ভবকে ছাড়িতে পারিলাম না। শক্তির উত্তেজনা আমাদের মধ্যে অত্যন্ত বেশি হওয়াতে অত্যাবশ্যক বিলম্বকে অনাবশ্যক বোধ হইতে লাগিল। বাহিরে সেই চিরপুরাতন দৈন্য রহিয়া গিয়াছে, অথচ অন্তরে নবজাগ্রত শক্তির অভিমান মাথা তুলিয়াছে, উভয়ের সামঞ্জস্য করিব কী করিয়া? ধীরে ধীরে? ক্রমে ক্রমে? মাঝখানের প্রকাণ্ড গহ্বরটাকে পাথরের সেতু দিয়া বাঁধিয়া? কিন্তু অভিমান দেরি সহিতে পারে না, মত্ততা বলে আমার সিঁড়ির দরকার নাই আমি উড়িব। সময় লইয়া সুসাধ্যসাধন তো সকলেই পারে, অসাধ্যসাধনে আমরা এখনই জগৎকে চমক লাগাইয়া দিব এই কল্পনা আমাদের উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে। তাহার কারণ, প্রেম যখন জাগে তখন সে গোড়া হইতে সকল কাজই করিতে চায়, সে ছোটো হইতে বড়ো কিছুকেই অবজ্ঞা করে না, কোনো কর্তব্য পাছে অসমাপ্ত থাকে এই আশঙ্কা তাহার ঘুচে না। প্রেম নিজেকে সার্থক করিতেই চায় সে নিজেকে প্রমাণ করিবার জন্য ব্যস্ত নহে। কিন্তু অপমানের তাড়নায় কেবল আত্মাভিমানমাত্র যখন জাগিয়া উঠে তখন সে বুক ফুলাইয়া বলে, আমি হাঁটিয়া চলিব না আমি ডিঙাইয়া চলিব। অর্থাৎ পৃথিবীর অন্য সকলের পক্ষেই যাহা খাটে তার পক্ষে তাহার কোনো প্রয়োজন নাই, ধৈর্যের প্রয়োজন নাই, অধ্যবসায়ের প্রয়োজন নাই, সুদূর উদ্দেশ্যকে লক্ষ্য করিয়া সুদীর্ঘ উপায় অবলম্বন করা অনাবশ্যক। ফলে দেখিতেছি পরের শক্তির প্রতি গতকল্য যেমন অন্ধভাবে প্রত্যাশা করিয়া বসিয়া ছিলাম, নিজের শক্তির কাছে আজ তেমনি অন্ধ প্রত্যাশা লইয়া আস্ফালন করিতেছি। তখনও যথাবিহিত কর্মকে ফাঁকি দিবার চেষ্টা ছিল এখনও সেই চেষ্টাই বর্তমান। কথামালার কৃষকের নিশ্চেষ্ট ছেলেরা যতদিন বাপ বাঁচিয়া ছিল খেতের ধারেও যায় নাই, বাপ চাষ করিত তাহারা দিব্য খাইত—বাপ যখন মরিল তখন খেতে নামিতে বাধ্য হইল কিন্তু চাষ করিবার জন্য নহে—তাহারা স্থির করিল মাটি খুঁড়িয়া একেবারেই দৈবধন পাইবে। বস্তুত চাষের ফসলই যে প্রকৃত দৈবধন এ-কথা শিখিতে তাহাদিগকে অনেক বৃথা সময় নষ্ট করিতে হইয়াছিল। আমরাও যদি এ-কথা সহজে না শিখি যে, দৈবধন কোনো অদ্ভুত উপায়ে গোপনে পাওয়া যায় না, পৃথিবীসুদ্ধ লোক সে-ধন যেমন করিয়া লাভ করিতেছে ও ভোগ করিতেছে আমাদিগকেও ঠিক তেমনি করিয়াই করিতে হইবে, তবে আঘাত এবং দুঃখ কেবল বাড়িয়াই চলিতে থাকিবে এবং বিপথে যতই অগ্রসর হইব ফিরিবার পথও ততই দীর্ঘ ও দুর্গম হইয়া উঠিবে।

অধৈর্য বা অজ্ঞানবশত স্বাভাবিক পন্থাকে অবিশ্বাস করিয়া অসামান্য কিছু একটাকে

ঘটাইয়া তুলিবার ইচ্ছা অত্যন্ত বেশি প্রবল হইয়া উঠিলে মানুষের ধর্মবুদ্ধি নষ্ট হয় ;—তখন সকল উপকরণকেই উপকরণ, সকল উপায়কেই উপায় বলিয়া মনে হয়—তখন ছোটো ছোটো বালকদিগকেও এই উন্মত্ত ইচ্ছার নিকট নির্মমভাবে বলি দিতে মনে কোনো দ্বিধা উপস্থিত হয় না। আমরা মহাভারতের সোমক রাজার ন্যায় অসামান্য উপায়ে সিদ্ধিলাভের প্রলোভনে আমাদের অতিসুকুমার ছোটো ছেলেটিকেই যজ্ঞের অগ্নিতে সমর্পণ করিয়া বসিয়াছি—এই নির্বিচার নিষ্ঠুরতার পাপ চিত্রগুপ্তের দৃষ্টি এড়ায় নাই—তাহার প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইয়াছে, বালকদের জন্য বেদনায় সমস্ত দেশের হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে—দুঃখ আরও কত সহ্য করিতে হইবে জানি না।

দুঃখ সহ্য করা তত কঠিন নহে কিন্তু দুর্মতিকে সংবরণ করা অত্যন্ত দুরূহ। অন্যায়কে অত্যাচারকে একবার যদি কর্মসাধনের সহায় বলিয়া গণ্য করি তবে অন্তঃকরণকে বিকৃতি হইতে রক্ষা করিবার সমস্ত স্বাভাবিক শক্তি চলিয়া যায় ;—ন্যায়ধর্মের ধ্রুব কেন্দ্রকে একবার ছাড়িলেই বুদ্ধির নষ্টতা ঘটে, কর্মের স্থিরতা থাকে না—তখন বিশ্বব্যাপী ধর্মব্যবস্থার সঙ্গে আবার আমাদের ভ্রষ্ট জীবনের সামঞ্জস্য ঘটাইবার জন্য প্রচণ্ড সংঘাত অনিবার্য হইয়া উঠে।

সেই প্রক্রিয়া কিছুদিন হইতে আমাদের দেশে চলিতেছে এ-কথা নম্রহৃদয়ে দুঃখের সহিত আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে। এই আলোচনা আমাদের পক্ষে একান্ত অপ্রিয়, তাই বলিয়া নীরবে ইহাকে গোপন করিয়া অথবা অত্যুক্তিদ্বারা ইহাকে ঢাকা দিয়া অনিষ্টকে সাংঘাতিক হইয়া উঠিতে দেওয়া আমাদের কাহারও পক্ষে কর্তব্য নহে।

আমরা সাধ্যমতো বিলাতি পণ্যদ্রব্য ব্যবহার না করিয়া দেশীয় শিল্পের রক্ষা ও উন্নতি সাধনে প্রাণপণে চেষ্টা করিব ইহার বিরুদ্ধে আমি কিছু বলিব এমন আশঙ্কা করিবেন না। বহুদিন পূর্বে আমি যখন লিখিয়াছিলাম,

নিজহস্তে শাক অন্ন তুলে দাও পাতে,
তাই যেন রুচে,—
মোটা বস্ত্র বুনে দাও যদি নিজ হাতে,
তাহে লজ্জা ঘুচে ;—

তখন লর্ড কার্জনের উপর আমাদের রাগ করিবার কোনো কারণই ঘটে নাই এবং বহুকাল পূর্বে যখন স্বদেশী ভাণ্ডার স্থাপন করিয়া দেশী পণ্য প্রচলিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম তখন সময়ের প্রতিকূলতার বিরুদ্ধেই আমাদিগকে দাঁড়াইতে হইয়াছিল।

তথাপি দেশে বিদেশী পণ্যের পরিবর্তে স্বদেশী পণ্য প্রচার যতবড়ো কাজই হউক

লেশমাত্র অন্যায়ের দ্বারা তাহার সমর্থন করিতে হইবে এ-কথা আমি কোনোমতেই স্বীকার করিতে পারি না। বিলম্ব ভালো, প্রতিকূলতা ভালো, তাহাতে ভিত্তিকে পাকা, কর্মকে পরিণত করিয়া তুলে; কিন্তু এমন কোনো ইন্দ্রজাল ভালো নহে যাহা একরাত্রে কোঠা বানাইয়া দেয় এবং আশ্বাস দিয়া বলে আমাকে উচিত মূল্য নগদ তহবিল হইতে দিবার কোনো প্রয়োজন নাই। কিন্তু হায়, মনে না কি ভয় আছে যে একমুহূর্তের মধ্যে ম্যাঞ্চেস্টরের কল যদি বন্ধ করিয়া দিতে না পারি তবে দীর্ঘকাল ধরিয়া এই দুঃসাধ্য উদ্দেশ্য, অটল নিষ্ঠার সহিত বহন করিবার শক্তি আমাদের নাই; সেইজন্য এবং কোনোমতে হাতে হাতে পার্টিশনের প্রতিশোধ লইবার তাড়নায় আমরা পথ-বিপথ বিচার করিতেই চাই নাই। এইরূপে চারিদিক হইতে সাময়িক তাগিদের বধিরকর কলকলায় বিভ্রান্ত হইয়া নিজের প্রতি বিশ্বাসহীন দুর্বলতা, স্বভাবকে অশ্রদ্ধা করিয়া, শুভবুদ্ধিকে অমান্য করিয়া অতিসত্বর লাভ চুকাইয়া লইতে চায় এবং পরে অতিদীর্ঘকাল ধরিয়া ক্ষতির নিকাশ করিতে থাকে; মঙ্গলকে পীড়িত করিয়া মঙ্গল পাইব, স্বাধীনতার মূলে আঘাত করিয়া স্বাধীনতা লাভ করিব ইহা কখনো হইতেই পারে না—এ-কথা মনে আনিতেও তাহার ইচ্ছা হয় না।

আমরা অনেকে সম্পূর্ণ জানি না এবং অনেকে স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক যে, বয়কট-ব্যাপারটা অনেক স্থলে দেশের লোকের প্রতি দেশের লোকের অত্যাচারের দ্বারা সাধিত হইয়াছে। আমি যেটাকে ভালো বুঝি দৃষ্টান্ত এবং উপদেশের দ্বারা অন্য সকলকে তাহা বুঝাইবার বিলম্ব যদি না সহে, পরের ন্যায্য অধিকারে বলপূর্বক হস্তক্ষেপ করাকে অন্যায় মনে করিবার অভ্যাস যদি দেশ হইতে চলিয়া যাইতে থাকে তবে অসংযমকে কোনো সীমার মধ্যে আর ঠেকাইয়া রাখা অসম্ভব হইয়া পড়ে। কর্তব্যের নামে যখন অকর্তব্য প্রবল হয় তখন দেখিতে দেখিতে সমস্ত দেশ অপ্রকৃতিস্থ হইয়া উঠে। সেইজন্যই স্বাধীনতালাভের দোহাই দিয়া আমরা যথার্থ স্বাধীনতাধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছি;—দেশে মতের অনৈক্য ও ইচ্ছার বিরোধকে দণ্ড উত্তোলন করিয়া বলপূর্বক একাকার করিয়া দিতে হইবে এইরূপ দুর্মতির প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। আমি যাহা করিব সকলকেই তাহা করিতেই হইবে, আমি যাহা বলিব সকলকেই তাহা বলিতেই হইবে এইরূপ বলপ্রয়োগে দেশের সমস্ত মত, ইচ্ছা ও আচরণ-বৈচিত্র্যের অপঘাতমৃত্যুর দ্বারা পঞ্চত্বলাভকেই আমরা জাতীয় ঐক্য বলিয়া স্থির করিয়া বসিয়াছি। মতান্তরকে আমরা সমাজে পীড়ন করিতেছি, কাগজে অতিকুৎসিত ভাবে গালি দিতেছি, এমন কি, শারীরিক আঘাতের দ্বারাও বিরুদ্ধ মতকে শাসন করিব বলিয়া ভয় দেখাইতেছি। আপনারা নিশ্চয় জানেন এবং আমি ততোধিক

নিশ্চয়তররূপে জানি, এরূপ বেনামি শাসনপত্র সময়বিশেষে আমাদের দেশের অনেক লোকেই পাইয়া থাকেন এবং দেশের প্রবীণ ব্যক্তিরাও অপমান হইতে রক্ষা পাইতেছেন না। জগতে অনেক মহাপুরুষ বিরুদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে মতপ্রচারের জন্য নিজের প্রাণও বিসর্জন করিয়াছেন, আমরাও মত প্রচার করিতে চাই কিন্তু আর-সকলের দৃষ্টান্ত পরিহার করিয়া একমাত্র কালাপাহাড়কেই গুরু বলিয়া বরণ করিয়াছি।

পূর্বেই বলিয়াছি যাহার ভিতরে গড়নের শক্তি নাই ভাঙন তাহার পক্ষে মৃত্যু। জিজ্ঞাসা করি আমাদের দেশে সেই গঠনতত্ত্বটি কোথায় প্রকাশ পাইতেছে? কোন্ সৃজন শক্তি আমাদের মধ্যে ভিতর হইতে কাজ করিয়া আমাদিগকে বাঁধিয়া এক করিয়া তুলিতেছে? ভেদের লক্ষণই তো চারিদিকে। নিজের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাই যখন প্রবল তখন কোনোমতেই আমরা নিজের কর্তৃত্বকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারি না। তাহা যখন পারি না তখন অন্যে আমাদের উপর কর্তৃত্ব করিবেই—কিছুতেই ঠেকাইতে পারিব না। অনেকে ভাবেন এ-দেশের পরাধীনতা মাথাধরার মতো ভিতরের ব্যাধি নহে, তাহা মাথার বোঝার মতো ইংরেজগবর্মেন্টরূপে বাহিরে আমাদের উপরে চাপিয়া আছে—ওইটেকেই যে-কোনোপ্রকারে হ্যাঁচকা টান মারিয়া ফেলিলেই পরমুহূর্তে আমরা হালকা হইব। এত সহজ নহে। ইংরেজগবর্মেন্ট আমাদের পরাধীনতা নয়, তাহা আমাদের গভীরতর পরাধীনতার প্রমাণমাত্র।

কিন্তু গভীরতর কারণগুলির কথাকে আমল দিবার মতো অবকাশ ও মনের ভাব আজকাল আমাদের নাই। ভারতবর্ষে এত জাতিবিভাগসত্ত্বেও কেমন করিয়া এক মহাজাতি হইয়া স্বরাজ প্রতিষ্ঠা করিব এই প্রশ্ন যখন উঠে তখন আমাদের মধ্যে যাঁহারা বিশেষ ত্বরান্বিত তাঁহারা এই বলিয়া কথাটা সংক্ষেপে উড়াইয়া দেন যে, সুইজরল্যাণ্ডেও তো একাধিক জাতির সমাবেশ হইয়াছে কিন্তু সেখানে কি তাহাতে স্বরাজের বাধা ঘটিয়াছে?

এমনতরো নজির দেখাইয়া আমরা নিজেদের ভুলাইতে পারি কিন্তু বিধাতার চোখে ধুলা দিতে পারিব না; বস্তুত জাতির বৈচিত্র্য থাকিলেও স্বরাজ চলিতে পারে কিনা সেটা আসল তর্ক নহে। বৈচিত্র্য তো নানাপ্রকারে থাকে—যে-পরিবারে দশজন মানুষ আছে সেখানে তো দশটা বৈচিত্র্য। কিন্তু আসল কথা সেই বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের তত্ত্ব কাজ করিতেছে কিনা। সুইজরল্যাণ্ড যদি নানাজাতিকে লইয়াই এক হইয়া থাকে তবে ইহাই বুঝিতে হইবে সেখানে নানাত্বকে অতিক্রম করিয়াও একত্ব কর্তা হইয়া উঠিতে পারিয়াছে। সেখানকার সমাজে এমন একটি ঐক্যধর্ম আছে। আমাদের দেশে বৈচিত্র্যই আছে কিন্তু ঐক্যধর্মের অভাবে বিশ্লিষ্টতাই ভাষা,

জাতি, ধর্ম, সমাজ ও লোকাচারে নানাবিধ আকার ধারণ করিয়া এই বৃহৎ দেশকে ছোটো বড়ো বহুতর ভাগে বিভাগে শতধাবিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে।

অতএব নজির পাড়িয়া তো নিশ্চিন্ত হইবার কিছু দেখি না। চক্ষু বুজিয়া এ-কথা বলিলে ধর্ম শুনিবে না যে, আমাদের আর-সমস্তই ঠিক হইয়া গিয়াছে এখন কেবল ইংরেজকে কোনোমতে বাদ দিতে পারিলেই বাঙালিতে পাঞ্জাবিতে মারাঠিতে মাদ্রাজিতে হিন্দুতে মুসলমানে মিলিয়া একমনে একপ্রাণে একস্বার্থে স্বাধীন হইয়া উঠিব।

বস্তুত আজ ভারতবর্ষে যেটুকু ঐক্য দেখিয়া আমরা সিদ্ধিলাভকে আসন্ন জ্ঞান করিতেছি তাহা যান্ত্রিক তাহা জৈবিক নহে। ভারতবর্ষের ভিন্ন জাতির মধ্যে সেই ঐক্য জীবনধর্মবশত ঘটে নাই—পরজাতির এক শাসনই আমাদিগকে বাহিরের বন্ধনে একত্র জোড়া দিয়া রাখিয়াছে।

সজীব পদার্থ অনেক সময় যান্ত্রিকভাবে একত্র থাকিতে থাকিতে জৈবিকভাবে মিলিয়া যায়। এমনি করিয়া ভিন্ন শ্রেণীর ডালে ডালে জুড়িয়া বাঁধিয়া কলম লাগাইতে হয়। কিন্তু যতদিন না কালক্রমে সেই সজীব জোড়টি লাগিয়া যায় ততদিন তো বাহিরের শক্ত বাঁধনটা খুলিলে চলে না। অবশ্য, দড়ার বাঁধনটা নাকি গাছের অঙ্গ নহে এইজন্য যেমনভাবেই থাক, যত উপকারই করুক, সে তো গাছকে পীড়া দিবেই কিন্তু বিভিন্নতাকে যখন ঐক্য দিয়া কলেবরবদ্ধ করিতে হইবে তখনই ওই দড়াটাকে স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। যতটুকু প্রয়োজন তাহার চেয়ে সে বেশি বাঁধিয়াছে এ-কথা সত্য হইতে পারে কিন্তু তাহার একমাত্র প্রতিকার—নিজের আভ্যন্তরিক সমস্ত শক্তি দিয়া ওই জোড়ের মুখে রসে রস মিলাইয়া, প্রাণে প্রাণ যোগ করিয়া জোড়টিকে একান্ত চেষ্টায় সম্পূর্ণ করিয়া ফেলা। এ-কথা নিশ্চয় বলা যায় জোড় বাঁধিয়া গেলেই যিনি আমাদের মালী আছেন তিনি আমাদের দড়িদড়া সব কাটিয়া দিবেন। ইংরেজশাসন নামক বাহিরের বন্ধনটাকে স্বীকার করিয়া অথচ তাহার 'পরে জড়ভাবে নির্ভর না করিয়া সেবার দ্বারা, প্রীতির দ্বারা, সমস্ত কৃত্রিম ব্যবধান নিরস্ত করার দ্বারা বিচ্ছিন্ন ভারতবর্ষকে নাড়ির বন্ধনে এক করিয়া লইতে হইবে। একত্রসংঘটনমূলক সহস্রবিধ সৃজনের কাজে ভৌগোলিক ভূখণ্ডকে স্বদেশ রূপে স্বহস্তে গড়িতে ও বিযুক্ত জনসমূহকে স্বজাতিরূপে স্বচেষ্টায় রচনা করিয়া লইতে হইবে।

শুনিয়াছি এমন কথাও কেহ কেহ বলেন যে, ইংরেজের প্রতি দেশের সর্বসাধারণের বিদ্বেষই আমাদিগকে ঐক্যদান করিবে। প্রাচ্য পরজাতীয়ের প্রতি স্বাভাবিক নির্মমতায় ইংরেজ ঔদাসীন্যে ও ঔদ্ধত্যে ভারতবর্ষের ছোটো বড়ো সকলকেই ব্যথিত করিয়া তুলিতেছে। যত দিন যাইতেছে এই বেদনার তপ্ত শেল গভীর ও গভীরতররূপে

আমাদের প্রকৃতির মধ্যে অনুবিদ্ধ হইয়া চলিয়াছে। এই নিত্যবিস্তারপ্রাপ্ত বেদনার ঐক্যেই ভারতের নানা জাতি মিলিবার উপক্রম করিতেছে। অতএব এই বিদ্বেষকেই আমাদের প্রধান আশ্রয়রূপে অবলম্বন করিতে হইবে।

এ-কথা যদি সত্যই হয় তবে বিদ্বেষের কারণটি যখন চলিয়া যাইবে, ইংরেজ যখনই এ-দেশ ত্যাগ করিবে, তখন কৃত্রিম ঐক্যসূত্রটি তো এক মুহূর্তে ছিন্ন হইয়া যাইবে। তখন দ্বিতীয় বিদ্বেষের বিষয় আমরা কোথায় খুঁজিয়া পাইব? তখন আর দূরে খুঁজিতে হইবে না, বাহিরে যাইতে হইবে না, রক্তপিপাসু বিদ্বেষবুদ্ধির দ্বারা আমরা পরস্পরকে ক্ষতবিক্ষত করিতে থাকিব।

“ততদিনে যেমন করিয়াই হউক একটা-কিছু সুযোগ ঘটিয়া যাইবেই, আপাতত এই-ভাবেই চলুক” এমন কথা যিনি বলেন তিনি এ-কথা ভুলিয়া যান যে, দেশ তাঁহার একলার সম্পত্তি নহে; ব্যক্তিগত রাগদ্বেষ ও ইচ্ছা-অনিচ্ছা লইয়া তিনি চলিয়া গেলেও এ-দেশ রহিয়া যাইবে। ট্রাস্টি যেমন সর্বাপেক্ষা প্রশস্ত উপায় ব্যতীত ন্যস্ত ধনকে নিজের ইচ্ছামতো যেমন-তেমন করিয়া খাটাইতে পারেন না তেমনি দেশ যখন বহুলোকের এবং বহুকালের, তাহার মঙ্গলকে কোনো সাময়িক ক্ষোভের বেগে অদূরদর্শী আপাতবুদ্ধির সংশয়াপন্ন ব্যবস্থার হাতে চক্ষু বুজিয়া সমর্পণ করিবার অধিকার আমাদের কাহারও নাই। স্বদেশের ভবিষ্যৎ যাহাতে দায়গ্রস্ত হইয়া উঠিতেও পারে এমনতরো নিতান্ত ঢিলা বিবেচনার কাজ বর্তমানের প্ররোচনায় করিয়া ফেলা কোনো লোকের পক্ষে কখনোই কর্তব্য হইতে পারে না। কর্মের ফল যে আমার একলার নহে, দুঃখ যে অনেকের।

তাই বারংবার বলিয়াছি এবং বারংবার বলিব—শত্রুতাবুদ্ধিকে অহোরাত্র কেবলই বাহিরের দিকে উদ্যত করিয়া রাখিবার জন্য উত্তেজনার অগ্নিতে নিজের সমস্ত সঞ্চিত সম্বলকে আহুতি দিবার চেষ্টা না করিয়া ওই 'পরের দিক হইতে ভ্রূকুটিকুটিল মুখটাকে ফিরাও, আষাঢ়ের দিনে আকাশের মেঘ যেমন করিয়া প্রচুর ধারাবর্ষণে তাপশুষ্ক তৃষ্ণাতুর মাটির উপরে নামিয়া আসে তেমনি করিয়া দেশের সকল জাতির সকল লোকের মাঝখানে নামিয়া এস, নানাদিগভিমুখী মঙ্গলচেষ্টার বৃহৎ জালে স্বদেশকে সর্বপ্রকারে বাঁধিয়া ফেলো: কর্মক্ষেত্রকে সর্বত্র বিস্তৃত করো—এমন উদার করিয়া এতদূর বিস্তৃত করো যে, দেশের উচ্চ ও নীচ, হিন্দু মুসলমান ও খ্রীস্টান সকলেই যেখানে সমবেত হইয়া হৃদয়ের সহিত হৃদয়, চেষ্টার সহিত চেষ্টা সম্মিলিত করিতে পারে। আমাদের প্রতি রাজার সন্দেহ ও প্রতিকূলতা আমাদিগকে ক্ষণে ক্ষণে প্রতিহত করিবার চেষ্টা করিবে কিন্তু কখনোই আমাদিগকে নিরস্ত করিতে পারিবে না,—আমরা জয়ী হইবই,—বাধার উপরে উন্মাদের মতো নিজের মাথা ঠুকিয়া নহে, অটল অধ্যবসায়ে তাহাকে শনৈঃ শনৈঃ

অতিক্রম করিয়া কেবল যে জয়ী হইব তাহা নহে, কার্যসিদ্ধির সত্যসাধনাকে দেশের মধ্যে চিরদিনের মতো সঞ্চিত করিয়া তুলিব—আমাদের উত্তরপুরুষদের জন্য শক্তি চালনার সমস্ত পথ একটি একটি করিয়া উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিব।

আজ ওই যে বন্দিশালায় লৌহশৃঙ্খলের কঠোর ঝংকার শুনা যাইতেছে, দণ্ডধারী পুরুষদের পদশব্দে কম্পমান রাজপথ মুখরিত হইয়া উঠিতেছে ইহাকেই অত্যন্ত বড়ো করিয়া জানিয়ো না। যদি কান পাতিয়া শোন তবে কালের মহাসংগীতের মধ্যে ইহা কোথায় বিলুপ্ত হইয়া যায়। কত যুগ হইতে বিপ্লবের আবর্ত, কত উৎপীড়নের মন্থন, এ-দেশের সিংহদ্বারে কত বড়ো বড়ো রাজপ্রতাপের প্রবেশ ও প্রস্থানের মধ্য দিয়া ভারতবর্ষের পরিপূর্ণতা অভিব্যক্ত হইয়া উঠিতেছে, অদ্যকার ক্ষুদ্র দিন তাহার যে ক্ষুদ্র ইতিহাসটুকু ইহার সহিত মিলিত করিতেছে আর কিছুকাল পরে সমগ্রের মধ্যে তাহা কি কোথাও দৃষ্টিগোচর হইবে। ভয় করিব না, ক্ষুব্ধ হইব না, ভারতবর্ষের যে পরম মহিমা সমস্ত কঠোর দুঃখসংঘাতের মধ্যে বিশ্বকবির সৃজনানন্দকে বহন করিয়া ব্যক্ত হইয়া উঠিতেছে—ভক্ত সাধকের প্রশান্ত ধ্যাননেত্রে তাহার অখণ্ড মূর্তি উপলব্ধি করিব। চারিদিকের কোলাহল ও চিত্তবিক্ষেপের মধ্যে সাধনাকে মহৎলক্ষ্যের দিকে অবিচলিত রাখিব। নিশ্চয় জানিব এই ভারতবর্ষে যুগযুগান্তরীয় মানবচিত্তের সমস্ত আকাঙ্ক্ষাবেগ মিলিত হইয়াছে—এইখানেই জ্ঞানের সহিত জ্ঞানের মন্থন হইবে, জাতির সহিত জাতির মিলন ঘটিবে। বৈচিত্র্য এখানে অত্যন্ত জটিল, বিচ্ছেদ এখানে অত্যন্ত প্রবল, বিপরীতের সমাবেশ এখানে অত্যন্ত বিরোধসংকুল—এত বহুত্ব এত বেদনা এত সংঘাত কোনো দেশই এত দীর্ঘকাল বহন করিয়া বাঁচিতে পারিত না—কিন্তু একটি অতিবৃহৎ অতিমহৎ সমন্বয়ের পরম অভিপ্রায়ই এই সমস্ত একান্ত বিরুদ্ধতাকে ধারণ করিয়া আছে, পরস্পরের আঘাতে কাহাকেও উৎসাদিত হইতে দেয় নাই। এই যে সমস্ত নানা বিচিত্র উপকরণ কালকালান্তর ও দেশদেশান্তর হইতে এখানে আহরিত হইয়াছে আমাদের ক্ষুদ্র শক্তিদ্বারা তাহাকে আঘাত করিতে গেলে আমরা নিজেই আহত হইব, তাহার কিছুই করিতে পারিব না। জানি, বাহির হইতে অন্যায় এবং অপমান আমাদের এমন প্রবৃত্তিকে উত্তেজিত করিতেছে, যাহা আঘাত করিতেই জানে, যাহা ধৈর্য মানে না, যাহা বিনাশ স্বীকার করিয়াও নিজের চরিতার্থতাকেই সার্থকতা বলিয়া জ্ঞান করে। কিন্তু সেই আত্মাভিমানের প্রমত্ততাকে নিবৃত্ত করিবার জন্য আমাদের অন্তঃকরণের মধ্যে সুগম্ভীর আত্মগৌরব সঞ্চার করিবার অন্তরতর শক্তি কি ভারতবর্ষ আমাদিগকে দান করিবেন না? যাহারা নিকটে আসিয়া আমাদের পরিচয় গ্রহণ করিতে ঘৃণা করে, যাহারা দূর হইতে আমাদের প্রতি বিদ্বেষ উদ্‌গার করে সেই সকল ক্ষণকালীন বায়ুদ্বারা স্ফীত সংবাদপত্রের

মর্মরধ্বনি, সেই বিলাতের টাইমস অথবা এ-দেশের টাইমস অফ ইণ্ডিয়ার বিদ্বেষতীক্ষ্ণ বাণীই কি অঙ্কুশাঘাতের মতো আমাদিগকে বিরোধের পথে অন্ধবেগে চালনা করিবে? আর ইহা অপেক্ষা সত্যতর নিত্যতর বাণী আমাদের পিতামহদের পবিত্র মুখ দিয়া কি এ-দেশে উচ্চারিত হয় নাই—যে-বাণী দূরকে নিকট করিতে বলে, পরকে আত্মীয় করিতে আহ্বান করে? সেই সকল শান্তিগম্ভীর সনাতন কল্যাণবাক্যই আজ পরাস্ত হইবে? ভারতবর্ষে আমরা মিলিব এবং মিলাইব, আমরা সেই দুঃসাধ্য সাধনা করিব, যাহাতে শত্রুমিত্রভেদ লুপ্ত হইয়া যায়; যাহা সকলের চেয়ে উচ্চ সত্য, যাহা পবিত্রতার তেজে ক্ষমার বীর্যে প্রেমের অপরাজিত শক্তিতে পূর্ণ, আমরা তাহাকে কখনোই অসাধ্য বলিয়া জানিব না, তাহাকে নিশ্চিত মঙ্গল জানিয়া শিরোধার্য করিয়া লইব। দুঃখবেদনার একান্ত পীড়নের মধ্য দিয়াই যাত্রা করিয়া আজ উদার আনন্দে মন হইতে সমস্ত বিদ্রোহ ভাব দূর করিয়া দিব, জানিয়া এবং না জানিয়া বিশ্বের মানব এই ভারতক্ষেত্রে মনুষ্যত্বের যে পরমাশ্চর্য মন্দির নানা ধর্ম, নানা শাস্ত্র, নানা জাতির সম্মিলনে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছে সেই সাধনাতেই যোগদান করিব, নিজের অন্তরের সমস্ত শক্তিকে একমাত্র সৃষ্টিশক্তিতে পরিণত করিয়া এই রচনাকার্যে তাহাকে প্রবৃত্ত করিব। তাহা যদি করিতে পারি, যদি জ্ঞানে প্রেমে ও কর্মে ভারতবর্ষের এই অভিপ্রায়ের মধ্যে সমস্ত প্রাণ দিয়া নিযুক্ত হইতে পারি তবেই মোহমুক্ত পবিত্র দৃষ্টিতে স্বদেশের ইতিহাসের মধ্যে সেই এক সত্য সেই নিত্য সত্যকে দেখিতে পাইব, ঋষিরা যাঁহাকে বলিয়াছেন

স সেতুর্বিধৃতিরেষাং লোকানাম্—

তিনিই সমস্ত লোকের বিধৃতি, তিনিই সমস্ত বিচ্ছেদের সেতু এবং তাঁহাকেই বলা হইয়াছে

তস্য হবা এতস্য ব্রহ্মণোনাম সত্যম্—

সেই যে ব্রহ্ম, নিখিলের সমস্ত প্রভেদের মধ্যে ঐক্যরক্ষার যিনি সেতু ইহারই নাম সত্য।

১৩১৫

সমস্যা

আমি "পথ ও পাথেয়" নামক প্রবন্ধে আমাদের কর্তব্য এবং তাহার সাধন-প্রণালী সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলাম। উক্ত প্রবন্ধটিকে সকলে যে অনুকূলভাবে গ্রহণ করিবেন এমন আমি আশা করি নাই।

কোন্‌টা শ্রেয় এবং তাহা লাভের শ্রেষ্ঠ উপায়টি কী তাহা লইয়া তো কোনো দেশেই আজও তর্কের অবসান হয় নাই। মানুষের ইতিহাসে এই তর্ক কত রক্তপাতে পরিণত হইয়াছে এবং একদিক হইতে তাহা বিলুপ্ত হইয়া আর-একদিক দিয়া বার বার অঙ্কুরিত হইয়া উঠিয়াছে।

আমাদের দেশে দেশহিত সম্বন্ধে মতভেদ এতকাল কেবল মুখে মুখে এবং কাগজে কাগজে, কেবল ছাপাখানায় এবং সভাক্ষেত্রে কথার লড়াইরূপেই সঞ্চরণ করিয়াছে। তাহা কেবল ধোঁয়ার মতো ছড়াইয়াছে, আগুনের মতো জ্বলে নাই।

কিন্তু আজ নাকি সকলেই পরস্পরের মতামতকে দেশের হিতাহিতের সঙ্গে আসন্নভাবে জড়িত মনে করিতেছেন, তাহাকে কাব্যালংকারের ঝংকারমাত্র বলিয়া গণ্য করিতেছেন না, সেইজন্য যাঁহাদের সহিত আমার মতের অনৈক্য ঘটিয়াছে তাঁহাদের প্রতিবাদবাক্যে যদি কখনো পরুষতা প্রকাশ পায় তাহাকে আমি অসংগত বলিয়া ক্ষোভ করিতে পারি না। এ-সময়ে কোনো কথা বলিয়া কেহ অল্পের উপর দিয়া নিষ্কৃতি পাইয়া যান না ইহা সময়ের একটা শুভ লক্ষণ সন্দেহ নাই।

তবু তর্কের উত্তেজনা যতই প্রবল হ'ক যাঁহাদের সঙ্গে আমাদের কোনো কোনো জায়গায় মতের অনৈক্য ঘটিতেছে দেশের হিতসাধনে তাঁহাদের আন্তরিক নিষ্ঠা আছে এই শ্রদ্ধা যখন নষ্ট হইবার কোনো কারণ দেখি না, তখন আমরা পরস্পর কী কথা বলিতেছি কী ইচ্ছা করিতেছি তাহা সুস্পষ্ট করিয়া বুঝিয়া লওয়া আবশ্যক। গোড়াতেই রাগ করিয়া বসিলে অথবা বিরুদ্ধপক্ষের বুদ্ধির প্রতি সন্দেহ করিলে নিজের বুদ্ধিকে হয় তো প্রতারিত করা হইবে। বুদ্ধির তারতম্যেই যে মতের অনৈক্য ঘটে এ-কথা সকল সময়ে খাটে না। অধিকাংশ স্থলে প্রকৃতিভেদেই মতভেদ ঘটে। অতএব মতের ভিন্নতার প্রতি সম্মান রক্ষা করিলে যে নিজের বুদ্ধিবৃত্তির প্রতি অসম্মান করা হয় তাহা কদাচই সত্য নহে।

এইটুকুমাত্র ভূমিকা করিয়া "পথ ও পাথেয়" প্রবন্ধে যে আলোচনা উত্থাপিত করিয়াছিলাম তাহারই অনুবৃত্তি করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

সংসারে বাস্তবের সঙ্গে আমাদিগকে কখনো আপস করিয়া কখনো বা লড়াই

করিয়া চলিতে হয়। অজ্ঞতা বা চাতুরীর জোরে বাস্তবকে লঙ্ঘন করিয়া আমরা অতি ছোটো কাজটুকুও করিতে পারি না।

অতএব দেশহিতের সংকল্প সম্বন্ধে যখন আমরা তর্ক করি তখন সেই তর্কের একটি প্রধান কথা এই যে, সংকল্পটি যতই বড় হ'ক এবং যতই ভাল হ'ক বাস্তবের সঙ্গে তাহার সামঞ্জস্য আছে কিনা। কোন্ ব্যক্তির চেক-বহির পাতায় কতগুলা অঙ্ক পড়িয়াছে তাহা লইয়াই তাড়াতাড়ি উৎসাহ করিবার কারণ নাই, কোন্ ব্যক্তির চেক ব্যাঙ্কে চলে তাহাই দেখিবার বিষয়।

সংকটের সময় যখন কাহাকেও পরামর্শ দিতে হইবে তখন এমন পরামর্শ দিলে চলে না যাহা অত্যন্ত সাধারণ। কেহ যখন রিক্তপাত্র লইয়া মাথায় হাত দিয়া ভাবিতে থাকে কেমন করিয়া তাহার পেট ভরিবে তখন তাহাকে এই কথাটি বলিলে তাহার প্রতি হিতৈষিতা প্রকাশ করা হয় না যে, ভালো করিয়া অন্নপান করিলেই ক্ষুধানিবৃত্তি হইয়া থাকে। এই উপদেশের জন্যই সে এতক্ষণ কপালে হাত দিয়া অপেক্ষা করিয়া বসিয়া ছিল না। সত্যকার চিন্তার বিষয় যেটা, সেটাকে লঙ্ঘন করিয়া যতবড়ো কথাই বলি না কেন তাহা একেবারেই বাজে কথা।

ভারতবর্ষের সম্বন্ধেও প্রধান প্রয়োজনটা কী সে-কথা আলোচনা উপলক্ষে আমরা যদি তাহার বর্তমান বাস্তব অভাব ও বাস্তব অবস্থাকে একেবারেই চাপা দিয়া একটা খুব মস্ত নৈতিকথা বলিয়া বসি তবে শূন্য তহবিলের চেকের মতো সে-কথার কোনো মূল্য নাই; তাহা উপস্থিতমতো ঋণের দাবি শান্ত করিবার একটা কৌশলমাত্র হইতে পারে কিন্তু পরিণামে তাহা দেনদার বা পাওনাদার কাহারও পক্ষে কিছুমাত্র কল্যাণকর হইতে পারে না।

“পথ ও পাথেয়” প্রবন্ধে আমি যদি সেইরূপ ফাঁকি চালাইবার চেষ্টা করিয়া থাকি তবে বিচার-আদালতের ক্ষমা প্রত্যাশা করিতে পারিব না। আমি যদি বাস্তবকে গোপন বা অস্বীকার করিয়া কেবল একটা ভাবের ভুয়া দলিল গড়িয়া থাকি তবে সেটাকে সর্বসমক্ষে খণ্ডবিখণ্ড করাই কর্তব্য। কারণ, ভাব যখন বাস্তবের সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া দেখা দেয় তখন গাঁজা বা মদের মতো তাহা মানুষকে অকর্মণ্য এবং উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তোলে।

কিন্তু বিশেষ অবস্থায় কোন্‌টা যে প্রকৃত বাস্তব তাহা নির্ণয় করা সোজা নহে। সেইজন্যই অনেক সময় মানুষ মনে করে যেটাকে চোখে দেখা যায় সেটাই সকলের চেয়ে বড়ো বাস্তব; যেটা মানবপ্রকৃতির নিচের তলায় পড়িয়া থাকে সেটাই আসল সত্য। কোনো ইংরেজ সাহিত্যসমালোচক রামায়ণের অপেক্ষা ইলিয়ডের শ্রেষ্ঠতা

প্রমাণ করিবার কালে বলিয়াছেন, ইলিয়ড কাব্য অধিকতর হিউম্যান, অর্থাৎ মানব-চরিত্রের বাস্তবকে বেশি করিয়া স্বীকার করিয়াছে ;—কারণ উক্ত কাব্যে একিলিস নিহত শত্রুর মৃতদেহকে রথে বাঁধিয়া ট্রয়ের পথের ধুলায় লুটাইয়া বেড়াইয়াছেন আর, রামায়ণে রাম পরাজিত শত্রুকে ক্ষমা করিয়াছেন। ক্ষমা অপেক্ষা প্রতিহিংসা মানবচরিত্রের পক্ষে অধিকতর বাস্তব এ-কথার অর্থ যদি এই হয় যে, তাহা পরিমাণে বেশি তবে তাহা স্বীকার করা যাইতে পারে। কিন্তু স্থূল পরিমাণই বাস্তবতা পরিমাপের একমাত্র বাটখারা এ-কথা মানুষ কোনোদিনই স্বীকার করিতে পারে না ; এইজন্যই মানুষ ঘরভরা অন্ধকারের চেয়ে ঘরের কোণের একটি ক্ষুদ্র শিখাকেই বেশি মান্য করিয়া থাকে।

যাহাই হউক, এ-কথা সত্য যে, মানব-ইতিহাসের বহুতর উপকরণের মধ্যে কোন্‌টা প্রধান কোন্‌টা অপ্রধান, কোন্‌টা বর্তমানের পক্ষে একান্ত বাস্তব এবং কোন্‌টা নহে, তাহা একবার কেবল চোখে দেখিয়াই মীমাংসা করা যায় না। অবশ্য এ-কথা স্বীকার করিতে পারি, উত্তেজনার সময় উত্তেজনাটাকেই সকলের চেয়ে বড়ো সত্য বলিয়া মনে হয়। রাগের সময় এমন কোনো কথাকেই বাস্তবমূলক বলিয়া মনে হয় না যাহা রাগকে নিবৃত্ত করিবার জন্য দণ্ডায়মান হয়। এরূপ সময় মানুষ সহজেই বলিয়া উঠে, “রেখে দাও তোমার ধর্মকথা।” বলে যে, তাহার কারণ এ নয় যে, ধর্মকথাটাই বাস্তব প্রয়োজনের পক্ষে অযোগ্য এবং রুষ্ট বুদ্ধিই তদপেক্ষা উপযোগী। কিন্তু তাহার কারণ এই যে, বাস্তব উপযোগিতার প্রতি আমি দৃক্‌পাত করিতে চাই না, বাস্তব প্রবৃত্তি-চরিতার্থতাকেই আমি মান্য করিতে চাই।

কিন্তু প্রবৃত্তি-চরিতার্থতাতে বাস্তবের হিসাব অল্পই করিতে হয়, উপযোগিতায় তাহার চেয়ে অনেক বেশি করা আবশ্যক। ম্যুটিনির পর যে-ইংরেজরা ভারতবর্ষকে নির্দয়ভাবে দলন করিতে পরামর্শ দিয়াছিল তাহারা মানবচরিত্রের বাস্তবের হিসাবটাকে অত্যন্ত সংকীর্ণ করিয়াই প্রস্তুত করিয়াছিল ; রাগের সময় এই প্রকার সংকীর্ণ হিসাব করাই যে স্বাভাবিক অর্থাৎ মাথাগনতিতে অধিকাংশ লোকই করিয়া থাকে তাহা ঠিক, কিন্তু লর্ড ক্যানিং ক্ষমার দিক দিয়া যে বাস্তবের হিসাব করিয়াছিলেন তাহা প্রতিহিংসার হিসাব অপেক্ষা বাস্তবকে অনেক বৃহৎপরিমাণে অনেক গভীর এবং দূরবিস্তৃতভাবেই গণনা করিয়াছিল।

কিন্তু যাহারা ক্রুদ্ধ তাহারা ক্যানিঙের ক্ষমানীতিকে সেন্টিমেন্টালিজ্‌ম্‌ অর্থাৎ বাস্তববর্জিত ভাববাতিকতা বলিতে নিশ্চয়ই কুণ্ঠিত হয় নাই। চিরদিনই এইরূপ হইয়া আসিয়াছে। যে-পক্ষ অক্ষৌহিণী সেনাকেই গণনাগৌরবে বড়ো সত্য বলিয়া

মনে করে তাহারা নারায়ণকেই অবজ্ঞাপূর্বক নিজের পক্ষে না লইয়া নিশ্চিন্ত থাকে। কিন্তু জয়লাভকেই যদি বাস্তবতার শেষ প্রমাণ বলিয়া জানি তবে নারায়ণ যতই একলা হ'ন এবং যতই ক্ষুদ্রমূর্তি ধরিয়া আসুন তিনিই জিতাইয়া দিবেন।

আমার এত কথা বলিবার তাৎপর্য এই যে, যথার্থ বাস্তব যে কোন্ পক্ষে আছে তাহা সাময়িক উত্তেজনার প্রাবল্য বা লোকগণনার প্রাচুর্য হইতে স্থির করা যায় না। কোনো একটা কথা শাস্ত্রসাশ্রিত বলিয়াই যে তাহা বাস্তবিকতায় খর্ব, এবং যাহা মানুষকে এত বেগে তাড়না করে যে, পথ দেখিবার কোনো অবসর দেয় না তাহাই যে বাস্তবকে অধিক মান্য করিয়া থাকে এ-কথা আমরা স্বীকার করিব না।

"পথ ও পাথেয়" প্রবন্ধে আমি দুইটি কথার আলোচনা করিয়াছি। প্রথমত ভারতবর্ষের পক্ষে দেশহিতব্যাপারটা কী? অর্থাৎ তাহা দেশী কাপড় পরা বা ইংরেজ তাড়ানো বা আর-কিছু? দ্বিতীয়ত সেই হিতসাধন করিতে হইবে কেমন করিয়া।

ভারতবর্ষের পক্ষে চরম হিত যে কী তাহা বুঝিবার বাধা যে কেবল আমরা নিজেরা উপস্থিত করিতেছি তাহা নহে বস্তুত তাহার সর্বপ্রধান বাধা আমাদের প্রতি ইংরেজের ব্যবহার। ইংরেজ কোনোমতেই আমাদের প্রকৃতিকে মানবপ্রকৃতি বলিয়া গণ্য করিতেই চায় না। তাহারা মনে করে তাহারা যখন রাজা তখন জবাবদিহি কেবলমাত্র আমাদেরই, তাহাদের একেবারেই নাই। বাংলাদেশের একজন ভূতপূর্ব হর্তাকর্তা ভারতবর্ষের চাঞ্চল্য সম্বন্ধে যতকিছু উষ্মা প্রকাশ করিয়াছেন সমস্তই ভারতবাসীর প্রতি। তাঁহার মত এই যে কাগজগুলাকে উচ্ছেদ করো, সুরেন্দ্রবাড়ুজ্যে-বিপিনপালকে দমন করিয়া দাও। দেশকে ঠাণ্ডা করিবার এই একমাত্র উপায় যাহারা অনায়াসে কল্পনা ও নিঃসংকোচে প্রচার করিতে পারে তাহাদের মতো ব্যক্তি যে আমাদের শাসনকর্তার পদে প্রতিষ্ঠিত ছিল ইহাই কি দেশের রক্ত গরম করিয়া তুলিবার পক্ষে অন্তত একটা প্রধান কারণ নহে? ইংরেজের গায়ে জোর আছে বলিয়াই মানবপ্রকৃতিকে মানিয়া চলা কি তাহার পক্ষে একেবারেই অনাবশ্যক? ভারতবর্ষের চাঞ্চল্য নিবারণের পক্ষে ভারতের পেনশনভোগী এলিয়টের কি তাঁহার জাতভাইকে একটি কথাও বলিবার নাই? যাহাদের হাতে ক্ষমতা অজস্র তাহাদিগকেই আত্মসংবরণ করিতে হইবে না, আর যাহারা স্বভাবতই অক্ষম শমদমনিয়মসংযমের সমস্ত ব্যবস্থা কেবল তাহাদেরই জন্য! তিনি লিখিয়াছেন, ভারতবর্ষে ইংরেজের গায়ে যাহারা হাত তোলে তাহারা যাহাতে কোনোমতেই নিষ্কৃতি না পায় সেজন্য সতর্ক হইতে হইবে। আর যে-সকল ইংরেজ ভারতবর্ষীয়কে হত্যা করিয়া কেবলই দণ্ড হইতে অব্যাহতি পাইয়া ব্রিটিশ বিচার সম্বন্ধে চিরস্থায়ী কলঙ্কের রেখা আগুন দিয়া ভারতবর্ষের চিত্তে দাগিয়া

দাগিয়া দিতেছে তাহাদের সম্বন্ধেই সতর্ক হইবার কোনো প্রয়োজন নাই? বলদর্পে অন্ধ ধর্মবুদ্ধিহীন এইরূপ স্পর্ধাই কি ভারতবর্ষে ইংরেজশাসনকে এবং ইংরেজের প্রজাকে উভয়কেই ভ্রষ্ট করিতেছে না? অক্ষম যখন অস্থিমজ্জায় জ্বলিয়া জ্বলিয়া মরে, যখন হাতে হাতে অপমানের প্রতিশোধ লওয়ার কাছে মানবধর্মের আর-কোনো উচ্চতর দাবি তাহার কাছে কোনোমতেই রুচিতে চাহে না তখন কেবল ইংরেজের রক্তচক্ষু পিনাল কোডই ভারতবর্ষে শান্তিবর্ষণ করিতে পারে এত শক্তি ভগবান ইংরেজের হাড়ে দেন নাই। ইংরেজ জেলে দিতে পারে, ফাঁসি দিতে পারে কিন্তু স্বহস্তে অগ্নিকাণ্ড করিয়া তুলিয়া তার পরে পদাঘাতের দ্বারা তাহা নিবাইয়া দিতে পারে না—যেখানে জলের দরকার সেখানে রাজা হইলেও তাহাকে জল ঢালিতে হইবে। তাহা যদি না করে, নিজের রাজদণ্ডকে যদি বিশ্ববিধানের চেয়ে বড়ো বলিয়া জ্ঞান করে, তবে সেই ভয়ংকর অন্ধতাবশতই দেশে পাপের বোঝা স্তূপীকৃত হইয়া একদিন সেই ঘোরতর অসামঞ্জস্য একটা নিদারুণ বিপ্লবে পরিণত না হইয়া থাকিতেই পারে না। প্রতিদিন দেশের অন্তরে অন্তরে যে-চিত্তবেদনা সঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে তাহাকে কৃত্রিম বলিয়া আত্মপ্রসাদস্ফীত ইংরেজ উড়াইয়া দিতে পার—মর্লি তাহাকে না মানাই রাষ্ট্রনীতিক সুবুদ্ধিতা বলিয়া মনে করিতে পার এবং ঐলিয়ট তাহাকে পরাধীন জাতির স্পর্ধামাত্র মনে করিয়া বৃদ্ধবয়সেও দন্তের উপর দন্তঘর্ষণের অসংগত চেষ্টা করিতে পার কিন্তু তাই বলিয়া অক্ষমেরও এই বেদনার হিসাব কি কেহই রাখিতেছে না মনে কর? বলিষ্ঠ যখন মনে করে যে, নিজের অন্যায় করিবার অবাধ অধিকারকে সে সংযত করিবে না, কিন্তু ঈশ্বরের বিধানে সেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে যে অনিবার্য প্রতিকারচেষ্টা মানবহৃদয়ে ক্রমশই ধোঁয়াইয়া ধোঁয়াইয়া জ্বলিয়া উঠিতে থাকে তাহাকেই একমাত্র অপরাধী করিয়া দলিত করিয়া দিয়া সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকিবে তখনই বলের দ্বারাই প্রবল আপনার বলের মূলে আঘাত করে;—কারণ তখন সে অশক্তকে আঘাত করে না—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মূলে যে-শক্তি আছে সেই বজ্রশক্তির বিরুদ্ধে নিজের বদ্ধমুষ্টি চালনা করে। যদি এমন কথা তোমরা বল ভারতবর্ষে আজ যে ক্ষোভ নিরস্ত্রকেও নিদারুণ করিয়া তুলিতেছে, যাহা অক্ষমের ধৈর্যকেও অভিভূত করিয়া তাহাকে নিশ্চিত আত্মঘাতের অভিমুখে তাড়না করিতেছে তাহাতে তোমাদের কোনো হাত নাই—তোমরা ন্যায়কে কোথাও পীড়িত করিতেছ না, তোমরা স্বভাবসিদ্ধ অবজ্ঞা ও ঔদ্ধত্যের দ্বারা প্রতিদিন তোমাদের উপকারকে উপকৃতের নিকট নিতান্তই অরুচিকর করিয়া তুলিতেছ না, যদি কেবল আমাদেরই দিকে তাকাইয়া এই কথাই বল যে, অকৃতার্থের অসন্তোষ ভারতের পক্ষে অকারণ অপরাধ এবং অপমানের দুঃখদাহ ভারতের পক্ষে নিরবচ্ছিন্ন অকৃতজ্ঞতা, তবে

সেই মিথ্যাবাক্যকে রাজতক্তে বসিয়া বলিলেও তাহা ব্যর্থ হইবে এবং তোমাদের টাইম্‌সের পত্রলেখক, ডেলি মেলের সংবাদরচয়িতা এবং পায়োনিয়র-ইংলিশম্যানের সম্পাদকে মিলিয়া তাহাকে ব্রিটিশ পশুরাজের ভীমগর্জনে পরিণত করিলেও সেই অসত্যের দ্বারা তোমরা কোনো শুভফল পাইবে না। তোমার গায়ে জোর আছে বটে তবু সত্যের বিরুদ্ধেও তুমি চক্ষু রক্তবর্ণ করিবে এত জোর নাই। নূতন আইনের দ্বারা নূতন লোহার শিকল গড়িয়া তুমি বিধাতার হাত বাঁধিতে পারিবে না।

অতএব মানবপ্রকৃতির সংঘাতে বিশ্বের নিয়মে যে-আবর্ত পাক খাইয়া উঠিতেছে তাহার ভীষণত্ব স্মরণ করিয়া আমার প্রবন্ধটুকুর দ্বারা তাহাকে নিরস্ত করিতে পারিব এমন দুরাশা আমার নাই। দুর্বুদ্ধি যখন জাগ্রত হইয়া উঠে তখন এ-কথা মনে রাখিতে হইবে সেই দুর্বুদ্ধির মূলে বহুদিনের বহুতর কারণ সঞ্চিত হইয়া উঠিতেছিল; এ-কথা মনে রাখিতে হইবে, যেখানে এক পক্ষকে সর্বপ্রকারে অক্ষম ও অনুপায় করা হইয়াছে সেখানে ক্রমশই অপর পক্ষের বুদ্ধিভ্রংশ ও ধর্মহানি ঘটা একেবারেই অনিবার্য—যাহাকে নিয়তই অশ্রদ্ধা অসম্মান করি তাহার সহিত ব্যবহার করিয়া মানুষ কদাচই আত্মসম্মানকে উজ্জ্বল রাখিতে পারে না—দুর্বলের সংস্রবে সবল হিংস্র হইয়া উঠে এবং অধীনের সংস্রবে স্বাধীন অসংযত হইতে থাকে;—স্বভাবের এই নিয়মকে কে ঠেকাইতে পারে? অবশেষে জমিয়া উঠিতে উঠিতে ইহার কি কোথাও কোনোই পরিণাম নাই? বাধাহীন কর্তৃত্বে চরিত্রের অসংযম যখন বুদ্ধির অন্ধতাকে আনয়ন করে তখন কি কেবল তাহা দরিদ্রেরই ক্ষতি এবং দুর্বলেরই দুঃখের কারণ হয়?

এইরূপে বাহিরের আঘাতে বহুদিন হইতে দেশের মধ্যে একটা উত্তেজনা ক্রমশই উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিতেছে এই অত্যন্ত প্রত্যক্ষ সত্যটুকুকে কেহই অস্বীকার করিতে পারিবে না। এবং ইংরেজ সমস্ত শাসন ও সতর্কতা কেবল একটা দিকে কেবল দুর্বলের দিকে চাপান দিয়া যে একটা অসমতার সৃষ্টি করিতেছে তাহাতে ভারতবাসীর সমস্ত বুদ্ধিকে সমস্ত কল্পনাকে সমস্ত বেদনাবোধকে অহরহ অতিরিক্ত পরিমাণে এই বাহিরের দিকেই, এই একটা নৈমিত্তিক উৎপাতের দিকেই উদ্রিক্ত করিয়া রাখিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

অতএব এমন অবস্থায় দেশের কোন্ কথাটা সকলের চেয়ে বড়ো কথা তাহা যদি একেবারেই ভুলিয়া যাই তবে তাহাতে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই। কিন্তু যাহা প্রাকৃতিক তাহা দুর্নিবার হইলেও তাহা সকল সময়ে শ্রেয়স্কর হয় না। হৃদয়াবেগের তীব্রতাকেই পৃথিবীর সকল বাস্তবের চেয়ে বড়ো বাস্তব বলিয়া মনে করিয়া আমরা যে অনেক সময়েই ভয়ংকর ভ্রমে পড়িয়া থাকি, সংসারে এবং নিজের ব্যক্তিগত জীবনে

পদে পদে তাহার পরিচয় পাইয়া আসিয়াছি। জাতির ইতিহাসেও যে এ-কথা আরও অনেক বেশি খাটে তাহা স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখা কর্তব্য।

“আচ্ছা, ভালো কথা, তুমি কোন্‌টাকে দেশের সকলের চেয়ে গুরুতর প্রয়োজন বলিয়া মনে কর” এই প্রশ্নটাই অনেকে বিশেষ বিরক্তির সহিত আমাকে জিজ্ঞাসা করিবেন ইহা আমি অনুভব করিতেছি। এই বিরক্তিকে স্বীকার করিয়া লইয়াও আমাকে উত্তর দিতে প্রস্তুত হইতে হইবে।

ভারতবর্ষের সম্মুখে বিধাতা যে-সমস্যাটি স্থাপিত করিয়াছেন তাহা অত্যন্ত দুরূহ হইতে পারে কিন্তু সমস্যাটি যে কী তাহা খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন নহে। তাহা নিতান্তই আমাদের সম্মুখে পড়িয়া আছে; অন্য দূরদেশের ইতিহাসের নজিরের মধ্যে তাহাকে খুঁজিয়া বেড়াইলে তাহার সন্ধান পাওয়া যাইবে না।

ভারতবর্ষের পর্বতপ্রান্ত হইতে সমুদ্রসীমা পর্যন্ত যে-জিনিসটি সকলের চেয়ে সুস্পষ্ট হইয়া চোখে পড়িতেছে সেটি কী? সেটি এই যে, এত ভিন্ন জাতি, ভিন্ন ভাষা, ভিন্ন আচার জগতে আর কোনো একটিমাত্র দেশে নাই।

পশ্চিমদেশের যে-সকল ইতিহাস ইস্কুলে পড়িয়াছি তাহার কোথাও আমরা এরূপ সমস্যার পরিচয় পাই নাই। য়ুরোপে যে-সকল প্রভেদের মধ্যে সংঘাত বাধিয়াছিল সে প্রভেদগুলি একান্ত ছিল না;—তাহাদের মধ্যে মিলনের এমন একটি সহজ তত্ত্ব ছিল যে, যখন তাহারা মিলিয়া গেল তখন তাহাদের মিলনের মুখে জোড়ের চিহ্নটুকু পর্যন্ত খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন হইল। প্রাচীন য়ুরোপে গ্রীক রোমক গথ প্রভৃতি জাতির মধ্যে বাহিরে শিক্ষাদীক্ষার পার্থক্য যতই থাক তাহারা প্রকৃতই একজাতি ছিল। তাহারা পরস্পরের ভাষা, বিদ্যা, রক্ত মিলাইয়া এক হইয়া উঠিবার জন্য স্বতই প্রবণ ছিল। বিরোধের উত্তাপে তাহারা গলিয়া যখনই মিলিয়া গেছে তখনই বুঝা গিয়াছে তাহারা এক ধাতুতেই গঠিত। ইংলণ্ডে একদিন স্যাকসন নর্মান ও কেল্টিক জাতির একত্র সংঘাত ঘটিয়াছিল কিন্তু ইহাদের মধ্যে এমন একটি স্বাভাবিক ঐক্যতত্ত্ব ছিল যে জেতা জাতি জেতারূপে স্বতন্ত্র হইয়া থাকিতে পারিল না; বিরোধ করিতে করিতেই কখন যে এক হইয়া গেল তাহা জানাও গেল না।

অতএব য়ুরোপীয় সভ্যতায় মানুষের সঙ্গে মানুষকে যে ঐক্যে সংগত করিয়াছে তাহা সহজ ঐক্য। য়ুরোপ এখনও এই সহজ ঐক্যকেই মানে—নিজের সমাজের মধ্যে কোনো গুরুতর প্রভেদকে স্থান দিতেই চায় না, হয় তাহাকে মারিয়া ফেলে নয় তাড়াইয়া দেয়। য়ুরোপের যে-কোনো জাতি হ'ক না কেন সকলেরই কাছে ইংরেজের উপনিবেশ প্রবেশদ্বার উদ্‌ঘাটিত রাখিয়াছে আর এশিয়াবাসীমাত্রই

যাহাতে কাছে ঘেঁষিতে না পারে সেজন্য তাহাদের সতর্কতা সাপের মতো ফোঁস করিয়া ফণা মেলিয়া উঠিতেছে।

য়ুরোপের সঙ্গে ভারতবর্ষের এইখানেই গোড়া হইতেই অনৈক্য দেখা যাইতেছে। ভারতবর্ষের ইতিহাস যখনই শুরু হইল সেই মুহূর্তেই বর্ণের সঙ্গে বর্ণের, আর্যের সঙ্গে অনার্যের বিরোধ ঘটিল। তখন হইতে এই বিরোধের দুঃসাধ্য সমন্বয়ের চেষ্টায় ভারতবর্ষের চিত্ত ব্যাপৃত রহিয়াছে। আর্যসমাজে যিনি অবতার বলিয়া গণ্য সেই রামচন্দ্র দাক্ষিণাত্যে আর্য উপনিবেশকে অগ্রসর করিয়া দিবার উপলক্ষ্যে যেদিন গুহক চণ্ডালরাজের সহিত মৈত্রী স্থাপন করিয়াছিলেন, যেদিন কিষ্কিন্ধ্যার অনার্যগণকে উচ্ছিন্ন না করিয়া সহায়তায় দীক্ষিত করিয়াছিলেন, এবং লঙ্কার পরাস্ত রাক্ষসরাজ্যকে নির্মূল করিবার চেষ্টা না করিয়া বিভীষণের সহিত বন্ধুতার যোগে শত্রুপক্ষের শত্রুতা নিরস্ত করিয়াছিলেন, সেইদিন ভারতবর্ষের অভিপ্রায় এই মহাপুরুষকে অবলম্বন করিয়া নিজেকে ব্যক্ত করিয়াছিল। তাহার পর হইতে আজ পর্যন্ত এ-দেশে মানুষের যে-সমাবেশ ঘটিয়াছে তাহার মধ্যে বৈচিত্র্যের আর অন্ত রহিল না। যে-উপকরণগুলি কোনোমতেই মিলিতে চায় না, তাহাদিগকে একত্রে থাকিতে হইল। এমন ভাবে কেবল বোঝা তৈরি হয় কিন্তু কিছুতেই দেহ বাঁধিয়া উঠিতে চায় না। তাই এই বোঝা ঘাড়ে করিয়াই ভারতবর্ষকে শত শত বৎসর ধরিয়া কেবলই চেষ্টা করিতে হইয়াছে, যাহারা বিচ্ছিন্ন কী উপায়ে সমাজের মধ্যে তাহারা সহযোগীরূপে থাকিতে পারে; যাহারা বিরুদ্ধ কী উপায়ে তাহাদের মধ্যে সামঞ্জস্যরক্ষা করা সম্ভব হয়; যাহাদের ভিতরকার প্রভেদ মানবপ্রকৃতি কোনোমতেই অস্বীকার করিতে পারে না কিরূপ ব্যবস্থা করিলে সেই প্রভেদ যথাসম্ভব পরস্পরকে পীড়িত না করে;—অর্থাৎ কী করিলে স্বাভাবিক ভেদকে স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াও সামাজিক ঐক্যকে যথাসম্ভব মান্য করা যাইতে পারে।

নানা বিভিন্ন লোক যেখানে একত্রে আছে সেখানকার প্রতিমুহূর্তের সমস্যাই এই যে, এই পার্থক্যের পীড়া এই বিভেদের দুর্বলতাকে কেমন করিয়া দূর করা যাইতে পারে। একত্রে থাকিতেই হইবে অথচ কোনোমতেই এক হইতে পারিব না মানুষের পক্ষে এতবড়ো অমঙ্গল আর কিছুই হইতে পারে না। এমন অবস্থায় প্রথম চেষ্টা হয় প্রভেদকে সুনির্দিষ্ট গণ্ডিদ্বারা স্বতন্ত্র করিয়া দেওয়া;—পরস্পর পরস্পরকে আঘাত না করে সেইটি সামলাইয়া যাওয়া; পরস্পরের চিহ্নিত অধিকারের সীমা কেহ কোনোদিক হইতে লঙ্ঘন না করে সেইরূপ ব্যবস্থা করা।

কিন্তু এই নিষেধের গণ্ডিগুলি যাহা প্রথম অবস্থায় বহুবিচিত্রকে একত্রে অবস্থানে সহায়তা করে তাহাই কালক্রমে নানাকে এক হইয়া উঠিতে বাধা দিতে থাকে। তাহা

আঘাতকেও বাঁচায় তেমনি মিলনকেও ঠেকায়। অশান্তিকে দূরে খেদাইয়া রাখাই যে শান্তিকে প্রতিষ্ঠা করা তাহা নহে। বস্তুত তাহাতে অশান্তিকে চিরদিনই কোনো একটা জায়গায় জিয়াইয়া রাখা হয়; বিরোধকে কোনোমতে দূরে রাখিলেও তবু তাহাকে রাখা হয়—ছাড়া পাইলেই তাহার প্রলয়মূর্তি হঠাৎ আসিয়া দেখা দেয়।

শুধু তাই নয়। ব্যবস্থাবদ্ধভাবে একত্রে অবস্থানমাত্র মিলনের নেতিবাচক অবস্থা, ইতিবাচক নহে। তাহাতে মানুষ আরাম পাইতে পারে কিন্তু শক্তি পাইতে পারে না। শৃঙ্খলার দ্বারা কাজ চলে মাত্র, ঐক্যের দ্বারা প্রাণ জাগে।

ভারতবর্ষও এতকাল তাহার বহুতর অনৈক্য ও বিরুদ্ধতাকে একটি ব্যবস্থার মধ্যে টানিয়া প্রত্যেককে এক-একটি প্রকোষ্ঠে বদ্ধ করিবার চেষ্টাতেই নিযুক্ত ছিল। অন্য কোনো দেশেই এমন সত্যকার প্রভেদ একত্রে আসিয়া দাঁড়ায় নাই, সুতরাং অন্য কোনো দেশেরই এমন দুঃসাধ্য সাধনে প্রবৃত্ত হইবার কোনো প্রয়োজনই হয় নাই।

নানা বিশৃঙ্খল বিচ্ছিন্ন সত্য যখন স্তূপাকার হইয়া জ্ঞানের পথরোধ করিবার উপক্রম করে তখন বিজ্ঞানের প্রথম কাজ হয় তাহাদিগকে গুণকর্ম অনুসারে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া ফেলা। কিন্তু কি বিজ্ঞানে কি সমাজে শ্রেণীবদ্ধ করা আরম্ভের কাজ, কলেবরবদ্ধ করাই চূড়ান্ত ব্যাপার। ইটকাঠ চুনসুরকি পাছে বিমিশ্রিত হইয়া পরস্পরকে নষ্ট করে এইজন্য তাহাদিগকে ভাগ ভাগ করিয়া সাজাইয়া রাখাই যে ইমারত নির্মাণ করা তাহা নহে।

আমাদের দেশেও শ্রেণীবিভাগ হইয়া আছে কিন্তু রচনাকার্য হয় আরম্ভ হয় নাই, নয় অধিকদূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। একই বেদনার অনুভূতির দ্বারা আদ্যোপান্ত আবিষ্ট, প্রাণময় রসরক্তময় স্নায়ুপেশীমাংসের দ্বারা অস্থিরাশি যেমন করিয়া ঢাকা পড়ে তেমনি করিয়াই বিধিনিষেধের শুষ্ক কঠিন ব্যবস্থাকে একেবারে আচ্ছন্ন এবং অন্তরাল করিয়া দিয়া যখন একই সরস অনুভূতির নাড়িজাল সমগ্রের মধ্যে প্রাণের চৈতন্যকে ব্যাপ্ত করিয়া দিবে তখনই জানিব মহাজাতি দেহধারণ করিয়াছে।

আমরা যে-সকল দেশের ইতিহাস পড়িয়াছি তাহারা বিশেষ বিশেষ পথ দিয়া নিজের সিদ্ধির সাধনা করিয়াছে। যে বিশেষ অমঙ্গল তাহাদের পরিপূর্ণ বিকাশের অন্তরায়, তাহারই সঙ্গে তাহাদিগকে লড়িতে হইয়াছে। একদিন আমেরিকার একটি সমস্যা এই ছিল যে, ঔপনিবেশিকদল এক জায়গায়, আর তাহাদের চালকশক্তি সমুদ্রপারে,—ঠিক যেন মাথার সঙ্গে ধড়ের বিচ্ছেদ—এরূপ অসামঞ্জস্য কোনো জাতির পক্ষে বহন করা অসম্ভব। ভূমিষ্ঠ শিশু যেমন মাতৃগর্ভের সঙ্গে কোনো বন্ধনে বাঁধা থাকিতে পারে না—নাড়ি ছেদন করিয়া দিতে হয়—তেমনি আমেরিকার সম্মুখে যেদিন এই নাড়ি ছেদনের

প্রয়োজন উপস্থিত হইল সেদিন সে ছুরি লইয়া তাহা কাটিল। একদিন ফ্রান্সের সম্মুখে একটি সমস্যা এই ছিল যে, সেখানে শাসয়িতার দল ও শাসিতের দল যদিচ একই জাতিভুক্ত তথাপি তাহাদের পরস্পরের জীবনযাত্রা ও স্বার্থ এতই সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল যে সেই অসামঞ্জস্যের পীড়ন মানুষের পক্ষে দুর্বহ হইয়াছিল। এই কারণে এই আত্মবিচ্ছেদকে দূর করিবার জন্য ফ্রান্সকে রক্তপাত করিতে হইয়াছিল।

বস্তুত দেখিতে গেলে, সেই আমেরিকা ও ফ্রান্সের সমস্যার সঙ্গে ভারতবর্ষের মিল আছে। ভারতবর্ষেও শাসয়িতা ও শাসিত পরস্পর অসংলগ্ন। তাহাদের পরস্পর সম-অবস্থা ও সমবেদনার কোনো যোগই নাই। এমন স্থলে শাসনপ্রণালীর মধ্যে সুব্যবস্থার অভাব না ঘটিতে পারে;—কিন্তু কেবলমাত্র ব্যবস্থার অপেক্ষা মানুষের প্রয়োজন অনেক বেশি। যে-আনন্দে মানুষ বাঁচে এবং মানুষ বিকাশ লাভ করে, তাহা কেবল আইন-আদালত সুপ্রতিষ্ঠিত ও ধনপ্রাণ সুরক্ষিত হওয়া নহে। ফল কথা, মানুষ আধ্যাত্মিক জীব—তাহার শরীর আছে, মন আছে, হৃদয় আছে—তাহাকে তৃপ্ত করিতে গেলে তাহার সমস্তকেই তৃপ্ত করিতে হয়—যে-কোনো পদার্থে সজীব সর্বাঙ্গীণতার অভাব আছে তাহাতে সে পীড়িত হইবেই;—তাহাকে কোন্ জিনিস দেওয়া গেল সেই হিসাবটাই তাহার পক্ষে একমাত্র হিসাব নহে, তাহাকে কেমন করিয়া দেওয়া হইল সেই হিসাবটা আরও বড়ো হিসাব। উপকার তাহার পক্ষে বোঝা হইয়া উঠে যদি সেই উপকারের সঙ্গে সঙ্গে আত্মশক্তির উপলব্ধি না থাকে। সে অত্যন্ত কঠিন শাসনও নীরবে সহ্য করিতে পারে, এমন কি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাহাকে বরণ করিতে পারে যদি তাহার সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনতার আনন্দ থাকে। তাই বলিতেছিলাম, একমাত্র সুব্যবস্থা মানুষকে পূর্ণ করিয়া রাখিতে পারে না।

অথচ যেখানে শাসয়িতা ও শাসিত পরস্পর দূরবর্তী হইয়া থাকে, উভয়ের মাঝখানে প্রয়োজনের অপেক্ষা উচ্চতর আত্মীয়তর কোনো সম্পর্ক স্থাপিত হইতে বাধা পায়, সেখানে রাষ্ট্রব্যাপার যদি অত্যন্ত ভালোও হয় তবে তাহা বিশুদ্ধ আপিস-আদালত এবং নিতান্তই আইনকানুন ছাড়া আর কিছু হইতেই পারে না। কিন্তু তৎসত্ত্বেও মানুষ কেন যে কেবলই কৃশ হইতে থাকে, তাহার অন্তর বাহির কেন যে আনন্দহীন হইয়া উঠে তাহা কর্তা কিছুতেই বুঝিতে চান না, কেবলই রাগ করেন—এমন কি, ভোক্তাও ভালো করিয়া নিজেই বুঝিতে পারে না। অতএব শাসয়িতা ও শাসিত পরস্পর বিচ্ছিন্ন থাকাতে যে জীবনহীন শুষ্ক শাসনপ্রণালী ঘটা একেবারেই অনিবার্য, ভারতের ভাগ্যে তাহা ঘটিয়াছে সে-কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না।

তাহার পরে অষ্টাদশ শতাব্দীর ফ্রান্সের সঙ্গে বর্তমান ভারতের একটা মিল

আছে সে-কথাও মানিতে হইবে। আমাদের শাসনকর্তাদের জীবনযাত্রা আমাদের চেয়ে অনেক বেশি ব্যয়সাধ্য। তাঁহাদের খাওয়াপরা বিলাসবিহার, তাঁহাদের সমুদ্রের এপার ওপার দুই পারের রসদ জোগানো, তাঁহাদের এখানকার কর্মাবসানে বিলাতি অবকাশের আরামের আয়োজন এ-সমস্ত আমাদিগকে করিতে হইতেছে। দেখিতে দেখিতে তাঁহাদের বিলাসের মাত্রা কেবলই অত্যন্ত বাড়িয়া চলিয়াছে তাহা সকলেই অবগত আছেন। এই সমস্ত বিলাসের খরচা জোগাইবার ভার এমন ভারতবর্ষের, যাহার দুইবেলার অন্ন পুরা পরিমাণে জোটে না। এমন অবস্থায় যাহারা বিলাসী প্রবলপক্ষ, তাহাদের অন্তঃকরণ নির্মম হইয়া উঠিতে বাধ্য। যদি তাহাদিগকে কেহ বলে ওই দেখো এই হতভাগাগুলা খাইতে পায় না, তাহারা প্রমাণ করিতে ব্যস্ত হয় যে ইহাদের পক্ষে এইরূপ খাওয়াই স্বাভাবিক এবং ইহাই যথেষ্ট। যে-সব কেরানি পনেরো-কুড়ি টাকায় ভূতের খাটুনি খাটিয়া মরিতেছে মোটা মাহিনার বড়ো সাহেব ইলেকট্রিক পাখার নিচে বসিয়া একবার চিন্তা করিতেও চেষ্টা করে না যে, কেমন করিয়া পরিবারের ভার লইয়া ইহাদের দিন চলিতেছে। তাহারা মনকে শান্ত সুস্থির রাখিতে চায় নতুবা তাহাদের পরিপাকের ব্যাঘাত এবং যকৃতের বিকৃতি ঘটে। এ-কথা যখন নিশ্চিত যে অল্পে তাহাদের চলে না, এবং ভারতবর্ষের উপরেই তাহাদের নির্ভর তখন তাহাদের তুলনায় তাহাদের চারিদিকের লোকে কী খায় পরে কেমন করিয়া দিন কাটায় তাহা নিঃস্বার্থভাবে তাহারা বিচার কখনোই করিতে পারে না। বিশেষত এক-আধজন লোক তো নয়—কেবল তো একটি রাজা নয় একজন সম্রাট নয়—একেবারে একটি সমগ্র জাতির বাবুয়ানার সম্বল এই ভারতবর্ষকে জোগাইতে হইবে। যাহারা বহুদূরে থাকিয়া রাজার হালে বাঁচিয়া থাকিতে চায় তাহাদের জন্য আত্মীয়তা-সম্পর্কশূন্য অপরজাতিকে অন্নবস্ত্র সমস্ত সংকীর্ণ করিয়া আনিতে হইতেছে এই যে নিষ্ঠুর অসামঞ্জস্য ইহা যে প্রতিদিন বাড়িয়াই চলিল তাহা কেবল তাঁহারাই অস্বীকার করিতেছেন যাঁহাদের পক্ষে আরাম অত্যন্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে।

অতএব, একপক্ষে বড়ো বড়ো বেতন, মোটা পেনশন এবং লম্বা চাল, অন্যপক্ষে নিতান্ত ক্লেশে আধপেটা আহারে সংসারযাত্রা নির্বাহ।—অবস্থার এই অসংগতি একেবারে গায়ে গায়ে সংলগ্ন। শুধু অন্নবস্ত্রের হীনতা নহে, আমাদের তরফে সম্মানে লাঘব এত অত্যন্ত অধিক, পরস্পরের মূল্যের তারতম্য এত অতিমাত্র, যে, আইনের পক্ষেও পক্ষপাত বাঁচাইয়া চলা অসাধ্য; এমন স্থলে যত দিন যাইতেছে ভারতবর্ষের বক্ষের উপর বিদেশীয় ভার ততই গুরুতর হইতেছে, উভয়পক্ষের মধ্যেকার অসাম্য নিরতিশয় অপরিমিত হইয়া উঠিতেছে ইহা আজ আর কাহারও বুঝিতে বাকি নাই।

ইহাতে একদিকে বেদনা যতই দুঃসহ হইতেছে আর-একদিকে অসাড়তা ও অবজ্ঞা ততই গভীরতা লাভ করিতেছে। এইরূপ অবস্থাই যদি টিকিয়া যায় তবে ইহাতে একদিন না একদিন ঝড় আনিয়া উপস্থিত করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

এইরূপ কতকটা ঐক্য থাকা সত্ত্বেও তথাপি আমাদিগকে বলিতে হইবে বিপ্লবের পূর্বে আমেরিকা ও ফ্রান্সের সম্মুখে যে একমাত্র সমস্যা বর্তমান ছিল—অর্থাৎ যে-সমস্যাটির মীমাংসার উপরেই তাহাদের মুক্তি সম্পূর্ণ নির্ভর করিত আমাদের সম্মুখে সেই সমস্যাটি নাই। অর্থাৎ আমরা যদি দরখাস্তের জোরে বা গায়ের জোরে ইংরেজকে ভারতবর্ষ হইতে বিদায় লইতে রাজি করিতে পারি তাহা হইলেও আমাদের সমস্যার কোনো মীমাংসাই হয় না;—তাহা হইলে হয় ইংরেজ আবার ফিরিয়া আসিবে, নয়, এমন কেহ আসিবে যাহার মুখের গ্রাস এবং পেটের পরিধি ইংরেজের চেয়ে হয়তো ছোটো না হইতে পারে।

এ-কথা বলাই বাহুল্য, যে-দেশে একটি মহাজাতি বাঁধিয়া ওঠে নাই সে-দেশে স্বাধীনতা হইতেই পারে না। কারণ স্বাধীনতার "স্ব" জিনিসটা কোথায়? স্বাধীনতা কাহার স্বাধীনতা? ভারতবর্ষে বাঙালি যদি স্বাধীন হয় তবে দাক্ষিণাত্যের নায়র জাতি নিজেকে স্বাধীন বলিয়া গণ্য করিবে না এবং পশ্চিমের জাঠ যদি স্বাধীনতা লাভ করে তবে পূর্বপ্রান্তের আসামি তাহার সঙ্গে একই ফল পাইল বলিয়া গৌরব করিবে না। এক বাংলাদেশেই হিন্দুর সঙ্গে মুসলমান যে নিজের ভাগ্য মিলাইবার জন্য প্রস্তুত এমন কোনো লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। তবে স্বাধীন হইবে কে? হাতের সঙ্গে পা, পায়ের সঙ্গে মাথা যখন একেবারে পৃথক হইয়া হিসাব মিলাইতে থাকে তখন লাভ বলিয়া জিনিসটা কাহার?

এমন তর্কও শুনা যায় যে, যতদিন আমরা পরের কড়া শাসনের অধীন হইয়া থাকিব ততদিন আমরা জাত বাঁধিয়া তুলিতেই পারিব না পদে পদে বাধা পাইব এবং একত্র মিলিয়া যে-সকল বড়ো বড়ো কাজ করিতে করিতে পরস্পরে মিল হইয়া যায় সেই সকল কাজের অবসরই পাইব না। এ-কথা যদি সত্য হয় তবে এ সমস্যার কোনো মীমাংসাই নাই। কারণ, বিচ্ছিন্ন কোনোদিনই মিলিতের সঙ্গে বিরোধ করিয়া জয়লাভ করিতে পারে না; বিচ্ছিন্নের মধ্যে সামর্থ্যের ছিন্নতা, উদ্দেশ্যের ছিন্নতা, অধ্যবসায়ের ছিন্নতা। বিচ্ছিন্ন জিনিস জড়ের মতো পড়িয়া থাকিলে তবু টিকিয়া থাকে কিন্তু কোনো উপায়ে কোনো বায়ুবেগে তাহাকে চালনা করিতে গেলেই সে ছড়াইয়া পড়ে, সে ভাঙিয়া যায়, তাহার এক অংশ অপর অংশকে আঘাত করিতে থাকে; তাহার অভ্যন্তরের সমস্ত দুর্বলতা নানা মূর্তিতে জাগিয়া উঠিয়া তাহাকে বিনাশ

করিতে উদ্যত হয়। নিজেরা এক না হইতে পারিলে আমরা এমন কোনো এককে স্থানচ্যুত করিতে পারিব না যাহা কৃত্রিমভাবেও সেই ঐক্যের স্থান পূরণ করিয়া আছে।

শুধু পারিব না তাহা নহে, কোনো নিতান্ত আকস্মিক কারণে পারিলেও যে একটিমাত্র বাহ্যবন্ধনে আমরা বিধৃত হইয়া আছি তাহাও ছিন্ন হইয়া পড়িবে। তখন আমাদের নিজের মধ্যে বিরোধ বাধিলে, আমরা কোনো এক প্রকার করিয়া, কিছুকাল মারামারি-কাটাকাটির পর তাহার একটা-কিছু মীমাংসা করিয়া লইব ইহাও সম্ভব হইবে না। আমাদিগকে সেই সময়টুকুও কেহ দিবে না। কারণ, আমরাই যেন আমাদের সুযোগের সুবিধাটুকু লইবার জন্য প্রস্তুত না থাকিতে পারি, কিন্তু জগতে যে-সকল প্রবল জাতি সময়ে অসময়ে সর্বদাই প্রস্তুত হইয়া আছে তাহারা আমাদের ঘরাও যুদ্ধকাণ্ড, অভিনয়ের দর্শকদের মতো, দূরে বসিয়া দেখিবে না। ভারতবর্ষ এমন স্থান নহে, লুব্ধের চক্ষু যাহার উপর হইতে কোনোদিনই অপসারিত হইবে।

অতএব যে-দেশে বহু বিচ্ছিন্ন জাতিকে লইয়া এক মহাজাতি তৈরি হইয়া উঠে নাই সে-দেশে ইংরেজের কর্তৃত্ব থাকিবে কি না থাকিবে সেটা আলোচনার বিষয় নহে; সেই মহাজাতিকে গড়িয়া তোলাই সেখানে এমন একটি উদ্দেশ্য অন্য সমস্ত উদ্দেশ্যই যাহার কাছে মাথা অবনত করিবে—এমন কি, ইংরেজ রাজত্ব যদি এই উদ্দেশ্যসাধনের সহায়তা করে তবে ইংরেজ-রাজত্বকেও আমাদের ভারতবর্ষেরই সামগ্রী করিয়া স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। তাহা অন্তরের সহিত প্রীতির সহিত স্বীকার করিবার অনেক বাধা আছে। সেই বাধাগুলিকে দূর করিয়া ইংরেজ-রাজত্ব কী করিলে আমাদের আত্মসম্মানকে পীড়িত না করে, কী করিলে তাহার সহিত আমাদের গৌরবকর আত্মীয়-সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে পারে এই অতিকঠিন প্রশ্নের মীমাংসাভারও আমাদিগকে লইতে হইবে। রাগ করিয়া যদি বলি, "না আমরা চাই না" তবু আমাদিগকে চাহিতেই হইবে কারণ যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা এক হইয়া মহাজাতি বাঁধিয়া উঠিতে না পারি ততক্ষণ পর্যন্ত ইংরেজ-রাজত্বের যে-প্রয়োজন তাহা কখনোই সম্পূর্ণ হইবে না।

আমাদের দেশের সকলের চেয়ে বড়ো সমস্যা যে কী, অল্পদিন হইল বিধাতা তাহার প্রতি আমাদের সমস্ত চেতনাকে আকর্ষণ করিয়াছিলেন। আমরা সেদিন মনে করিয়াছিলাম, পার্টিশন-ব্যাপারে আমরা যে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছি ইহাই ইংরেজকে দেখাইব, আমরা বিলাতি নিমকের সম্বন্ধ কাটিব এবং দেশের বিলাতি বস্ত্রহরণ না করিয়া জলগ্রহণ করিব না। পরের সঙ্গে যুদ্ধঘোষণা যেমনি করিয়াছি অমনি ঘরের মধ্যে এমন একটা গোল বাধিল যে, এমনতরো আর কখনো দেখা যায় নাই। হিন্দুতে মুসলমানে বিরোধ হঠাৎ অত্যন্ত মর্মান্তিকরূপে বীভৎস হইয়া উঠিল।

এই ব্যাপার আমাদের পক্ষে যতই একান্ত কষ্টকর হউক কিন্তু আমাদের এই শিক্ষার প্রয়োজন ছিল। এ-কথা আমাদের সম্পূর্ণ নিশ্চিতরূপেই জানা আবশ্যক ছিল, আমাদের দেশে হিন্দু ও মুসলমান যে পৃথক এই বাস্তবটিকে বিস্মৃত হইয়া আমরা যে-কাজ করিতেই যাই না কেন এই বাস্তবটি আমাদিগকে কখনোই বিস্মৃত হইবে না। এ-কথা বলিয়া নিজেকে ভুলাইলে চলিবে না যে, হিন্দুমুসলমানের সম্বন্ধের মধ্যে কোনো পাপই ছিল না, ইংরেজই মুসলমানকে আমাদের বিরুদ্ধ করিয়াছে।

ইংরেজ যদি মুসলমানকে আমাদের বিরুদ্ধে সত্যই দাঁড় করাইয়া থাকে তবে ইংরেজ আমাদের একটি পরম উপকার করিয়াছে—দেশের যে একটি প্রকাণ্ড বাস্তব সত্যকে আমরা মূঢ়ের মতো না বিচার করিয়াই দেশের বড়ো বড়ো কাজের আয়োজনের হিসাব করিতেছিলাম, একেবারে আরম্ভেই তাহার প্রতি ইংরেজ আমাদের দৃষ্টি ফিরাইয়াছে। ইহা হইতে কোনো শিক্ষাই না লইয়া আমরা যদি ইংরেজের উপরেই সমস্ত রাগের মাত্রা চড়াইতে থাকি তবে আমাদের মূঢ়তা দূর করিবার জন্য পুনর্বার আমাদিগকে আঘাত সহিতে হইবে;—যাহা প্রকৃত যেমন করিয়াই হউক তাহাকে আমাদের বুঝিতেই হইবে;—কোনোমতেই তাহাকে এড়াইয়া চলিবার কোনো পন্থাই নাই।

এই সঙ্গে একটা কথা বিশেষ করিয়া মনে রাখিতে হইবে যে, হিন্দু ও মুসলমান, অথবা হিন্দুদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ বা উচ্চ ও নীচ বর্ণের মধ্যে মিলন না হইলে আমাদের কাজের ব্যাঘাত হইতেছে অতএব কোনোমতে মিলনসাধন করিয়া আমরা বল লাভ করিব এই কথাটাই সকলের চেয়ে বড়ো কথা নয়, সুতরাং ইহাই সকলের চেয়ে সত্য কথা নহে।

আমি পূর্বেই বলিয়াছি, কেবলমাত্র প্রয়োজনসাধনের সুযোগ, কেবলমাত্র সুব্যবস্থার চেয়ে অনেক বেশি নহিলে মানুষের প্রাণ বাঁচে না। যিশু বলিয়া গিয়াছেন মানুষ কেবলমাত্র রুটির দ্বারা জীবনধারণ করে না; তাহার কারণ, মানুষের কেবল শারীর জীবন নহে। সেই বৃহৎ জীবনের খাদ্যাভাব ঘটিতেছে বলিয়া ইংরেজ-রাজত্ব সকলপ্রকার সুশাসনসত্ত্বেও আমাদের আনন্দ শোষণ করিয়া লইতেছে।

কিন্তু এই যে খাদ্যাভাব এ যদি কেবল বাহির হইতেই ইংরেজ-শাসন হইতেই ঘটিত তাহা হইলে কোনোপ্রকারে বাহিরের সংশোধন করিতে পারিলেই আমাদের কায সমাধা হইয়া যাইত। আমাদের নিজের অন্তঃপুরের ব্যবস্থাতেও দীর্ঘকাল হইতেই এই উপবাসের ব্যাপার চলিয়া আসিতেছে। আমরা হিন্দু ও মুসলমান, আমরা ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশীয় হিন্দুজাতি এক জায়গায় বাস করিতেছি বটে কিন্তু মানুষ মানুষকে রুটির চেয়ে যে উচ্চতর খাদ্য জোগাইয়া প্রাণে শক্তিতে আনন্দে পরিপুষ্ট করিয়া তোলে

আমরা পরস্পরকে সেই খাদ্য হইতেই বঞ্চিত করিয়া আসিয়াছি। আমাদের সমস্ত হৃদয়বৃত্তি সমস্ত হিতচেষ্টা, পরিবার ও বংশের মধ্যে, এবং এক-একটি সংকীর্ণ সমাজের মধ্যে এতই অতিশয় পরিমাণে নিবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে যে, সাধারণ মানুষের সঙ্গে সাধারণ আত্মীয়তার যে বৃহৎ সম্বন্ধ তাহাকে স্বীকার করিবার সম্বল আমরা কিছুই উদ্‌বৃত্ত রাখি নাই। সেই কারণে আমরা দ্বীপপুঞ্জের মতোই খণ্ড খণ্ড হইয়া আছি, মহাদেশের মতো ব্যাপ্ত বিস্তৃত ও এক হইয়া উঠিতে পারি নাই।

প্রত্যেক ক্ষুদ্র মানুষটি বৃহৎ মানুষের সঙ্গে নিজের ঐক্য নানা মঙ্গলের দ্বারা নানা আকারে উপলব্ধি করিতে থাকিবে। এই উপলব্ধি তাহার কোনো বিশেষ কার্যসিদ্ধির উপায় বলিয়াই গৌরবের নহে, ইহা তাহার প্রাণ, ইহাই তাহার মনুষ্যত্ব অর্থাৎ তাহার ধর্ম। এই ধর্ম হইতে সে যে-পরিমাণেই বঞ্চিত হয় সেই পরিমাণেই সে শুষ্ক হয়। আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে বহুদিন হইতেই ভারতবর্ষে আমরা এই শুষ্কতাকে প্রশ্রয় দিয়া আসিয়াছি। আমাদের জ্ঞান, কর্ম, আচারব্যবহারের, আমাদের সর্বপ্রকার আদান-প্রদানের বড়ো বড়ো রাজপথ এক-একটা ছোটো ছোটো গণ্ডীর সম্মুখে আসিয়া খণ্ডিত হইয়া গিয়াছে, আমাদের হৃদয় ও চেষ্টা প্রধানত আমাদের নিজের ঘর নিজের গ্রামের মধ্যেই ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে, তাহা বিশ্বমানবের অভিমুখে নিজেকে উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিবার অবসর পায় নাই। এই কারণে আমরা পারিবারিক আরাম পাইয়াছি, ক্ষুদ্র সমাজের সহায়তা পাইয়াছি কিন্তু বৃহৎ মানুষের শক্তি ও সম্পূর্ণতা হইতে আমরা অনেকদিন হইতে বঞ্চিত হইয়া দীনহীনের মতো বাস করিতেছি।

সেই প্রকাণ্ড অভাব পূরণ করিবার উপায় আমরা নিজের মধ্যে হইতেই যদি বাঁধিয়া তুলিতে না পারি তবে বাহির হইতে তাহা পাইব কেমন করিয়া? ইংরেজ চলিয়া গেলেই আমাদের এই ছিদ্র পূরণ হইবে আমরা এ কল্পনা কেন করিতেছি? আমরা যে পরস্পরকে শ্রদ্ধা করি নাই, সহায়তা করি নাই, আমরা যে পরস্পরকে চিনিবার মাত্রও চেষ্টা করি নাই, আমরা যে এতকাল "ঘর হইতে আঙিনা বিদেশ" করিয়া বসিয়া আছি;—পরস্পর সম্বন্ধে আমাদের সেই ঔদাসীন্য, অবজ্ঞা, সেই বিরোধ আমাদিগকে যে একান্তই ঘুচাইতে হইবে সে কি কেবলমাত্র বিলাতি কাপড় ত্যাগ করিবার সুবিধা হইবে বলিয়া, সে কি কেবলমাত্র ইংরেজ কর্তৃপক্ষের নিকট নিজের শক্তি প্রচার করিবার উদ্দেশে? এ নহিলে আমাদের ধর্ম পীড়িত হইতেছে, আমাদের মনুষ্যত্ব সংকুচিত হইতেছে; এ নহিলে আমাদের বুদ্ধি সংকীর্ণ হইবে, আমাদের জ্ঞানের বিকাশ হইবে না—আমাদের দুর্বল চিত্ত শত শত অন্ধসংস্কারের দ্বারা জড়িত হইয়া থাকিবে—আমরা আমাদের অন্তর-বাহিরের সমস্ত অধীনতার বন্ধন ছেদন করিয়া

নির্ভয়ে নিঃসংকোচে বিশ্বসমাজের মধ্যে মাথা তুলিতে পারিব না। সেই নির্ভীক নির্বাধ বিপুল মনুষ্যত্বের অধিকারী হইবার জন্যই আমাদিগকে পরস্পরের সঙ্গে পরস্পরকে ধর্মের বন্ধনে বাঁধিতে হইবে। ইহা ছাড়া মানুষ কোনোমতেই বড়ো হইতে পারে না, কোনোমতেই সত্য হইতে পারে না। ভারতবর্ষে যে-কেহ আছে যে-কেহ আসিয়াছে, সকলকে লইয়াই আমরা সম্পূর্ণ হইব—ভারতবর্ষে বিশ্বমানবের একটি প্রকাণ্ড সমস্যার মীমাংসা হইবে। সে-সমস্যা এই যে, পৃথিবীতে মানুষ বর্ণে, ভাষায় স্বভাবে আচরণে ধর্মে বিচিত্র—নরদেবতা এই বিচিত্রকে লইয়াই বিরাট—সেই বিচিত্রকে আমরা এই ভারতবর্ষের মন্দিরে একাঙ্গ করিয়া দেখিব। পার্থক্যকে নির্বাসিত বা বিলুপ্ত করিয়া নহে কিন্তু সর্বত্র ব্রহ্মের উদার উপলব্ধি দ্বারা; মানবের প্রতি সর্বসহিষ্ণু পরমপ্রেমের দ্বারা; উচ্চনীচ আত্মীয়পর সকলের সেবাতেই ভগবানের সেবা স্বীকার করিয়া। আর কিছু নহে শুভচেষ্টার দ্বারা দেশকে জয় করিয়া লও—যাহারা তোমাকে সন্দেহ করে তাহাদের সন্দেহকে জয় করো, যাহারা তোমার প্রতি বিদ্বেষ করে তাহাদের বিদ্বেষকে পরাস্ত করো। রুদ্ধ দ্বারে আঘাত করো, বারংবার আঘাত করো—কোনো নৈরাশ্যে কোনো আত্মাভিমানের ক্ষুণ্ণতায় ফিরিয়া যাইয়ো না; মানুষের হৃদয় মানুষের হৃদয়কে চিরদিন কখনোই প্রত্যাখ্যান করিতে পারে না।

ভারতবর্ষের আহ্বান আমাদের অন্তঃকরণকে স্পর্শ করিয়াছে। সেই আহ্বান যে সংবাদপত্রের ক্রুদ্ধ গর্জনের মধ্যেই ধ্বনিত হইয়াছে বা হিংস্র উত্তেজনার মুখরতার মধ্যেই তাহার যথার্থ প্রকাশ এ-কথা আমরা স্বীকার করিব না কিন্তু সেই আহ্বান যে আমাদের অন্তরাত্মাকে উদ্‌বোধিত করিতেছে তাহা তখনই বুঝিতে পারি যখন দেখি আমরা জাতি-বর্ণ-নির্বিচারে দুর্ভিক্ষকাতরের দ্বারে অন্নপাত্র বহন করিয়া লইয়া চলিয়াছি, যখন দেখি ভদ্রাভদ্র বিচার না করিয়া প্রবাসে সমাগত যাত্রীদের সহায়তার জন্য আমরা বদ্ধপরিকর হইয়াছি, যখন দেখি রাজপুরুষদের নির্মম সন্দেহ ও প্রতিকূলতার মুখেও অত্যাচার-প্রতিরোধের প্রয়োজনকালে আমাদের যুবকদিগকে কোনো বিপদের সম্ভাবনা বাধা দিতেছে না। সেবায় আমাদের সংকোচ নাই, কর্তব্যে আমাদের ভয় ঘুচিয়া গিয়াছে, পরের সহায়তায় আমরা উচ্চনীচের বিচার বিস্মৃত হইয়াছি, এই যে সুলক্ষণ দেখা দিয়াছে ইহা হইতে বুঝিয়াছি, এবার আমাদের উপরে যে-আহ্বান আসিয়াছে তাহাতে সমস্ত সংকীর্ণতার অন্তরাল হইতে আমাদিগকে বাহিরে আনিবে—ভারতবর্ষে এবার মানুষের দিকে মানুষের টান পড়িয়াছে। এবারে, যেখানে যাহার কোনো অভাব তাহা পূরণ করিবার জন্য আমাদিগকে যাইতে হইবে;—অন্ন স্বাস্থ্য ও শিক্ষা বিতরণের জন্য আমাদিগকে নিভৃত পল্লীর প্রান্তে নিজের জীবন উৎসর্গ করিতে হইবে; আমাদিগকে

আর কেহই নিজের স্বার্থ ও স্বচ্ছন্দতার মধ্যে ধরিয়া রাখিতে পারিবে না। বহুদিনের শুষ্কতা ও অনাবৃষ্টির পর বর্ষা যখন আসে তখন সে ঝড় লইয়াই আসে—কিন্তু নববর্ষার সেই আরম্ভকালীন ঝড়টাই এই নূতন আবির্ভাবের সকলের চেয়ে বড়ো অঙ্গ নহে, তাহা স্থায়ীও হয় না। বিদ্যুতের চাঞ্চল্য বজ্রের গর্জন এবং বায়ুর উন্মত্ততা আপনি শান্ত হইয়া আসিবে,—তখন মেঘে মেঘে জোড়া লাগিয়া আকাশের পূর্বপশ্চিম স্নিগ্ধতায় আবৃত হইয়া যাইবে—চারিদিকে ধারাবর্ষণ হইয়া তৃষিতের পাত্রে জল ভরিয়া উঠিবে এবং ক্ষুধিতের ক্ষেত্রে অন্নের আশা অঙ্কুরিত হইয়া দুই চক্ষু জুড়াইয়া দিবে। মঙ্গলে পরিপূর্ণ সেই বিচিত্র সফলতার দিন বহুকাল প্রতীক্ষার পরে আজ ভারতবর্ষে দেখা দিয়াছে এই কথা নিশ্চয় জানিয়া আমরা যেন আনন্দে প্রস্তুত হই। কিসের জন্য ? ঘর ছাড়িয়া মাঠের মধ্যে নামিবার জন্য, মাটি চষিবার জন্য, বীজ বুনিবার জন্য, তাহার পরে সোনার ফসলে যখন লক্ষ্মীর আবির্ভাব হইবে তখন সেই লক্ষ্মীকে ঘরে আনিয়া নিত্যোৎসবের প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য।

১৩১৫

সমূহ

সমূহ

দেশনায়ক

সৈন্যদল যখন রণক্ষেত্রে যাত্রা করে, তখন যদি পাশের গলি হইতে তাহাদিগকে কেহ গালি দেয় বা গায়ে ঢিল ছুঁড়িয়া মারে তবে তখনই ছত্রভঙ্গ হইয়া অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য তাহারা পাশের গলিতে ছুটিয়া যায় না। এ অপমান তাহাদিগকে স্পর্শও করিতে পারে না—কারণ, তাহাদের সম্মুখে বৃহৎ সংগ্রাম, তাহাদের সম্মুখে মহৎ মৃত্যু। তেমনি যদি আমরা যথার্থভাবে আমাদের এই বৃহৎ দেশের কাজ করিবার দিকে যাত্রা করি, তবে তাহারই মাহাত্ম্যে ছোটোবড়ো বহুতর বিক্ষোভ আমাদিগকে স্পর্শই করিতে পারে না—তবে ক্ষণে ক্ষণে এক-একটা রাগারাগির ছুতা লইয়া ছুটাছুটি করিয়া বৃথা যাত্রাভঙ্গ করিতে প্রবৃত্তি হয় না।

আমাদের দেশে সম্প্রতি যে-সকল আন্দোলন-আলোচনার ঢেউ উঠিয়াছে, তাহার মধ্যে অনেকটা আছে যাহা কলহমাত্র। নিঃসন্দেহই দেশবৎসল লোকেরা এই কলহের জন্য অন্তরে-অন্তরে লজ্জা অনুভব করিতেছেন। কারণ, কলহ অক্ষমের উত্তেজনাপ্রকাশ, তাহা অকর্মণ্যের একপ্রকার আত্মবিনোদন।

একবার দেশের চারিদিকে চাহিয়া দেখিবেন, এত দুঃখ এমন নিঃশব্দে বহন করিয়া চলিয়াছে, এরূপ করুণ দৃশ্য জগতের আর কোথাও নাই। নৈরাশ্য ও নিরানন্দ, অনশন ও মহামারী এই প্রাচীন ভারতবর্ষের মন্দিরভিত্তির প্রত্যেক গ্রন্থি বিদীর্ণ করিয়া শিকড় বিস্তার করিয়াছে। দুঃখের মতো এমন কঠোর সত্য, এমন নিদারুণ পরীক্ষা আর কী আছে? তাহার সঙ্গে খেলা চলে না—তাহাকে ফাঁকি দিবার জো কী, তাহার মধ্যে কৃত্রিম কাল্পনিকতার অবকাশমাত্র নাই—সে শত্রুমিত্র সকলকেই শক্ত করিয়া বাজাইয়া লয়। এই দেশব্যাপী ভীষণ দুঃখের সম্বন্ধে আমরা কিরূপ ব্যবহার করিলাম, তাহাতেই আমাদের মনুষ্যত্বের যথার্থ পরিচয়। এই দুঃখের কৃষ্ণকঠিন নিকষপাথরের উপরে আমাদের দেশানুরাগ যদি উজ্জ্বল রেখাপাত করিয়া না থাকে, তবে আপনারা নিশ্চয় জানিবেন, তাহা খাটি সোনা নহে। যাহা খাটি নহে, তাহার মূল্য আপনারা কাহার কাছে প্রত্যাশা করেন? ইংরেজজাত যে এ-সম্বন্ধে জহরি, তাহাকে ফাঁকি দিবেন কী

করিয়া? আমাদের দেশহিতৈষণার উদ্‌যোগ তাহাদের কাছে শ্রদ্ধালাভ করিবে কী উপায়ে? আমরা নিজে দান করিলে তবেই দাবি করিতে পারি। কিন্তু সত্য করিয়া বলুন, কে আমরা কী করিয়াছি? দেশের দারুণ দুর্যোগের দিনে আমাদের মধ্যে যাহাদের সুখের সম্বল আছে, তাহারা সুখেই আছি; যাহাদের অবকাশ আছে, তাহাদের আরামের লেশমাত্র ব্যাঘাত হয় নাই; ত্যাগ যেটুকু করিয়াছি, তাহা উল্লেখযোগ্যই নহে; কষ্ট যেটুকু সহিয়াছি, আর্তনাদ তাহা অপেক্ষা অনেক বেশিমাত্রায় করা হইয়াছে।

ইহার কারণ কী? ইহার কারণ এই যে, এতকাল পরের দ্বারে আমরা মাথা কুটিয়া মরিবার চর্চা করিয়া আসিয়াছি, স্বদেশসেবার চর্চা করি নাই। দেশের দুঃখ দূর, হয় বিধাতা নয় গবর্মেন্ট করিবেন, এই ধারণাকেই আমরা সব-উপায়ে প্রশ্রয় দিয়াছি। আমরা যে দলবদ্ধ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া নিজে এই কাজে ব্রতী হইতে পারি, এ-কথা আমরা অকপটভাবে নিজের কাছেও স্বীকার করি নাই। ইহাতে দেশের লোকের সঙ্গে আমাদের হৃদয়ের সম্বন্ধ থাকে না, দেশের দুঃখের সঙ্গে আমাদের চেষ্টার যোগ থাকে না, দেশানুরাগ বাস্তবতার ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত হয় না— সেইজন্যই চাঁদার খাতা মিথ্যা ঘুরিয়া মরে এবং কাজের দিনে কাহারও সাড়া পাওয়া যায় না।

আজ ঠিক কুড়িবৎসর হইল, প্রেসিডেন্সি-কলেজের তদানীন্তন অধ্যাপক ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার রায় মহাশয়ের বাড়িতে ছাত্রসম্মিলন উপলক্ষ্যে যে-গান রচিত হইয়াছিল, তাহার এক অংশ উদ্ধৃত করি—

মিছে কথার বাঁধুনি কাঁদুনির পালা,
চোখে নাই কারো নীর,
আবেদন আর নিবেদনের থালা
ব'হে ব'হে নতশির।
কাঁদিয়ে সোহাগ ছিছি এ কী লাজ,
জগতের মাঝে ভিখারির সাজ,
আপনি করি নে আপনার কাজ,
পরের 'পরে অভিমান।

ওগো আপনি নামাও কলঙ্কপসরা,
যেয়ো না পরের দ্বার।

পরের পায়ে ধ'রে মানভিক্ষা করা
সকল ভিক্ষার ছার।
দাও দাও ব'লে পরের পিছু-পিছু
কাঁদিয়া বেড়ালে মেলে না তো কিছু
যদি মান চাও যদি প্রাণ চাও
প্রাণে আগে করো দান।

সেদিন হইতে কুড়িবৎসরের পরবর্তী ছাত্রগণ আজ নিঃসন্দেহে বলিবেন যে, এখন আমরা আবেদনের থালা নামাইয়া তো হাত খোলসা করিয়াছি, আজ তো আমরা নিজের কাজ নিজে করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছি। যদি সত্যই হইয়া থাকি তো ভালোই, কিন্তু পরের 'পরে অভিমানটুকু কেন রাখিয়াছি—যেখানে অভিমান আছে, সেইখানেই যে প্রচ্ছন্নভাবে দাবি রহিয়া গেছে। আমরা পুরুষের মতো বলিষ্ঠভাবে স্বীকার করিয়া না লই কেন যে, আমরা বাধা পাইবই, আমাদিগকে প্রতিকূলতা অতিক্রম করিতে হইবেই; কথায়-কথায় আমাদের দুই চক্ষু এমন ছলছল করিয়া আসে কেন। আমরা কেন মনে করি, শত্রুমিত্র সকলে মিলিয়া আমাদের পথ সুগম করিয়া দিবে। উন্নতির পথ যে সুদুস্তর, এ-কথা জগতের ইতিহাসে সর্বত্র প্রসিদ্ধ—

ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া
দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।

কেবল কি আমরাই—এই দুর্গম্তার পথ যদি অপরে সহজ করিয়া সমান করিয়া না দেয় —তবে নালিশ করিয়া দিন কাটাইব, এবং মুখ অন্ধকার করিয়া বলিব, তবে আমরা নিজের তাঁতের কাপড় নিজে পরিব, নিজের বিদ্যালয়ে নিজে অধ্যয়ন করিব। এ-সমস্ত কি অভিমানের কথা!

আমি জিজ্ঞাসা করি, সর্বনাশের সম্মুখে দাঁড়াইয়া কাহারও কি অভিমান মনে আসে —মৃত্যুশয্যার শিয়রে বসিয়া কাহারও কি কলহ করিবার প্রবৃত্তি হইতে পারে। আমরা কি দেখিতেছি না, আমরা মরিতে শুরু করিয়াছি। আমি রূপকের ভাষায় কথা কহিতেছি না,—আমরা সত্যই মরিতেছি। যাহাকে বলে বিনাশ, যাহাকে বলে বিলোপ, তাহা নানা বেশ ধারণ করিয়া এই পুরাতন জাতির আবাসস্থলে আসিয়া দেখা দিয়াছে। ম্যালেরিয়ায় শতসহস্র লোক মরিতেছে এবং যাহারা মরিতেছে না তাহারা জীবন্মৃত হইয়া পৃথিবীর ভারবৃদ্ধি করিতেছে। এই ম্যালেরিয়া পূর্ব হইতে পশ্চিমে, প্রদেশ হইতে প্রদেশান্তরে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে। প্লেগ একরাত্রির অতিথির মতো আসিল, তার পরে বৎসরের পর বৎসর যায়, আজও তাহার নররক্তপিপাসার

নিবৃত্তি হইল না। যে-বাঘ একবার মনুষ্যমাংসের স্বাদ পাইয়াছে, সে যেমন কোনোমতে সে-প্রলোভন ছাড়িতে পারে না, দুর্ভিক্ষ তেমনি করিয়া বারংবার ফিরিয়া ফিরিয়া আমাদের লোকালয়কে জনশূন্য করিয়া দিতেছে। ইহাকে কি আমরা দৈবদুর্ঘটনা বলিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকিব? সমস্ত দেশের উপরে মৃত্যুর এই যে অবিচ্ছিন্ন জালনিক্ষেপ দেখিতেছি, ইহাকে কি আমরা আকস্মিক বলিতে পারি?

ইহা আকস্মিক নহে। ইহা বদ্ধমূল ব্যাধির আকার ধারণ করিতেছে। এমনি করিয়া অনেক জাতি মারা পড়িয়াছে—আমরাও যে দেশব্যাপী মৃত্যুর আক্রমণ হইতে বিনা-চেষ্টায় নিষ্কৃতি পাইব, এমন তো কোনো কারণ দেখি না। আমরা চক্ষের সমক্ষে দেখিতেছি যে, যে-সব জাতি সুস্থ-সবল, তাহারাও প্রাণরক্ষার জন্য প্রতিক্ষণে লড়াই করিতেছে—আর আমরা আমাদের জীর্ণতার উপরে মৃত্যুর পুনঃপুন নখরাঘাতসত্ত্বেও বিনাপ্রয়াসে বাঁচিয়া থাকিব?

এ-কথা আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে, ম্যালেরিয়া-প্লেগ-দুর্ভিক্ষ কেবল উপলক্ষ্যমাত্র, তাহারা বাহ্যলক্ষণমাত্র—মূল ব্যাধি দেশের মজ্জার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। আমরা এতদিন একভাবে চলিয়া আসিতেছিলাম—আমাদের হাটে বাটে গ্রামে পল্লীতে আমরা একভাবে বাঁচিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলাম, আমাদের সে-ব্যবস্থা বহুকালের পুরাতন। তাহার পরে আজ বাহিরের সংঘাতে আমাদের অবস্থান্তর ঘটিয়াছে। এই নূতন অবস্থার সহিত এখনও আমরা সম্পূর্ণ আপস করিয়া লইতে পারি নাই—এক জায়গায় মিলাইয়া লইতে গিয়া আর-এক জায়গায় অঘটন ঘটিতেছে। যদি এই নূতনের সহিত আমরা কোনোদিন সামঞ্জস্য করিয়া লইতে না পারি, তবে আমাদিগকে মরিতেই হইবে। পৃথিবীতে যে-সকল জাতি মরিয়াছে, তাহারা এমনি করিয়াই মরিয়াছে।

ম্যালেরিয়ার কারণ দেশে নূতন হইয়াছে, এমন নহে। চিরদিনই আমাদের দেশ জলা-দেশ—বনজঙ্গল এখনকার চেয়ে বরং পূর্বে বেশিই ছিল, এবং কোনোদিন এখানে মশার অভাব ছিল না। কিন্তু দেশ তখন সচ্ছল ছিল। যুদ্ধ করিতে গেলে রসদের দরকার হয়—সর্বপ্রকার গুপ্ত মারীশত্রুর সহিত লড়াইয়ে সেদিন আমাদের রসদের অভাব ছিল না। আমাদের পল্লীর অন্নপূর্ণা সেদিন নিজের সন্তানদিগকে অর্ধভুক্ত রাখিয়া টাকার লোভে পরের ছেলেকে স্তন্য দিতে যাইতেন না। শুধু তাই নয়, তখনকার সমাজব্যবস্থায় পল্লীর জলাশয় খনন ও সংস্কারের জন্য কাহারও অপেক্ষা করিতে হইত না—পল্লীর ধর্মবুদ্ধি পল্লীর অভাবমোচনে নিয়ত জাগ্রত ছিল। আজ বাংলার গ্রামে গ্রামে কেবল যে জলকষ্ট হইয়াছে, তাহা নহে, প্রাচীন জলাশয়গুলি দূষিত

হইয়াছে। এইরূপে শরীর যখন অন্নাভাবে হীনবল এবং পানীয় জল যখন শোধনাভাবে রোগের নিকেতন, তখন বাঁচিবার উপায় কী? এইরূপে প্লেগও সহজেই আমাদের দেশ অধিকার করিয়াছে—কোথাও সে বাধা পাইতেছে না, কারণ পুষ্টি-অভাবে আমাদের শরীর অরক্ষিত।

পুষ্টির অভাব ঘটিবার প্রধান কারণ, নানা নূতন নূতন প্রণালীযোগে অন্ন বাহিরের দিকে প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে—আমরা যাহা খাইয়া এতদিন মানুষ হইয়াছিলাম, তাহা যথেষ্টপরিমাণে পাইতেছি না। আজ পাড়াগাঁয়ে যান, সেখানে দুধ দুর্লভ, ঘি দুর্মূল্য, তেল কলিকাতা হইতে আসে, তাহাকে পূর্ব-অভ্যাসবশত সরিষার তেল বলিয়া নিজেকে সান্ত্বনা দিই—তা ছাড়া, যেখানে জলকষ্ট সেখানে মাছের প্রাচুর্য নাই, সে-কথা বলা বাহুল্য। সস্তার মধ্যে সিংকোনা সস্তা হইয়াছে। এইরূপে একদিনে নহে, দিনে দিনে সমস্ত দেশের জীবনীশক্তির মূলসঞ্চয় ক্রমে ক্রমে ক্ষয় হইয়া যাইতেছে। যেমন মহাজনের কাছে যখন প্রথম দেনা করিতে আরম্ভ করা যায়, তখনও শোধ করিবার সম্বল ও সম্ভাবনা থাকে; কিন্তু সম্পত্তি যখন ক্ষীণ হইতে থাকে, তখন যে-মহাজন একদা কেবল নৈমিত্তিক ছিল, সে নিত্য হইয়া উঠে—আমাদের দেশেও ম্যালেরিয়া প্লেগ ওলাউঠা দুর্ভিক্ষ একদিন আকস্মিক ছিল, কিন্তু এখন ক্রমে আর কোনোকালে তাহাদের দেনা শোধ করিবার উপায় দেখা যায় না, আমাদের মূলধন ক্ষয় হইয়া আসিয়াছে, এখন তাহারা আর কেবল ক্ষণে ক্ষণে তাগিদ করিতে আসে না, তাহারা আমাদের জমিজমাতে আমাদের ঘরবাড়িতে নিত্য হইয়া বসিয়াছে। বিনাশ যে এমনি করিয়াই ঘটে, বৎসরে বৎসরে তাহার কি হিসাব পাওয়া যাইতেছে না?

এমন অবস্থায় রাজার মন্ত্রণাসভায় দুটো প্রশ্ন উত্থাপন করিতে ইচ্ছা কর যদি তো করো, তাহাতে আমি আপত্তি করিব না। কিন্তু সেইখানেই কি শেষ? আমাদের গরজ কি তাহার চেয়ে অনেক বেশি নহে? ঘরে আগুন লাগিলে কি পুলিসের থানাতে খবর পাঠাইয়া নিশ্চিন্ত থাকিবে? ইতিমধ্যে চোখের সামনে যখন স্ত্রীপুত্র পুড়িয়া মরিবে, তখন দারোগার শৈথিল্যসম্বন্ধে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে নালিশ করিবার জন্য বিরাট সভা আহ্বান করিয়া কি বিশেষ সান্ত্বনালাভ করা যায়? আমাদের গরজ যে অত্যন্ত বেশি। আমরা যে মরিতেছি। আমাদের অভিমান করিবার, কলহ করিবার, অপেক্ষা করিবার আর অবসর নাই। যাহা পারি, তাহাই করিবার জন্য এখনই আমাদিগকে কোমর বাঁধিতে হইবে। চেষ্টা করিলেই যে সকল সময়েই সিদ্ধিলাভ হয়, তাহা না হইতেও পারে, কিন্তু কাপুরুষের নিষ্ফলতা যেন না ঘটিতে দিই—চেষ্টা না করিয়া যে-ব্যর্থতা, তাহা পাপ, তাহা কলঙ্ক।

আমি বলিতেছি, আমাদের দেশে যে-দুর্গতি ঘটিয়াছে, তাহার কারণ আমাদের প্রত্যেকের অন্তরে, এবং তাহার প্রতিকার আমাদের নিজের ছাড়া আর কাহারও দ্বারা কোনোদিন সাধ্য হইতে পারে না। আমরা পরের পাপের ফলভোগ করিতেছি, ইহা কখনোই সত্য নহে এবং নিজের পাপের প্রায়শ্চিত্ত সুকৌশলে পরকে দিয়া করাইয়া লইব, ইহাও কোনোমতে আশা করিতে পারি না।

সৌভাগ্যক্রমে আজ দেশের নানাস্থান হইতে এই প্রশ্ন উঠিতেছে—"কী করিব, কেমন করিয়া করিব?" আজ আমরা কর্ম করিবার ইচ্ছা অনুভব করিতেছি, চেষ্টায়ও প্রবৃত্ত হইতেছি—এই ইচ্ছা যাহাতে নিরাশ্রয় না হয়, এই চেষ্টা যাহাতে বিক্ষিপ্ত হইয়া না পড়ে, প্রত্যেকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তি যাহাতে বিচ্ছিন্ন-কণা-আকারে বিলীন হইয়া না যায়, আজ আমাদিগকে সেইদিকে সম্পূর্ণ মনোযোগ দিতে হইবে। রেলগাড়ির ইস্টীম উচ্চস্বরে বাঁশি বাজাইবার জন্য হয় নাই, তাহা গাড়ি চালাইবার জন্যই হইয়াছে। বাঁশি বাজাইয়া তাহা সমস্তটা ফুঁকিয়া দিলে ঘোষণার কাজটা জমে বটে, কিন্তু অগ্রসর হইবার কাজটা বন্ধ হইয়া যায়। আজ দেশের মধ্যে যে-উদ্যম উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে, তাহাকে একটা বেষ্টনের মধ্যে না আনিতে পারিলে তাহা নিজের মধ্যে কেবল বিরোধ করিতে থাকিবে, নূতন নূতন দলের সৃষ্টি করিবে এবং নানা সাময়িক উদ্বেগের আকর্ষণে তুচ্ছ কাজকে বড়ো করিয়া তুলিয়া নিজের অপব্যয় সাধন করিবে।

দেশের সমস্ত উদ্যমকে বিক্ষেপের ব্যর্থতা হইতে একের দিকে ফিরাইয়া আনিবার একমাত্র উপায় আছে—কোনো একজনকে আমাদের অধিনায়ক বলিয়া স্বীকার করা। দশে মিলিয়া যেমন করিয়া বাদবিবাদ করা যায়, দশে মিলিয়া ঠিক তেমন করিয়া কাজ করা চলে না। ঝগড়া করিতে গেলে হট্টগোল করা সাজে, কিন্তু যুদ্ধ করিতে গেলে সেনাপতি চাই। কথা চালাইতে গেলে নানা লোকে মিলিয়া স্ব স্ব কণ্ঠস্বরকে উচ্চ হইতে উচ্চতর সপ্তকে উৎক্ষিপ্ত করিবার চেষ্টা করা যায়, কিন্তু জাহাজ চালাইতে গেলে একজন কাপ্তেনের প্রয়োজন।

আজ অনুনয়সহকারে আমার দেশবাসিগণকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছি, আপনারা ক্রোধের দ্বারা আত্মবিস্মৃত হইবেন না—কেবল বিরোধ করিয়া ক্ষোভ মিটাইবার চেষ্টা করিবেন না। ভিক্ষা করিতে গেলেও যেমন পরের মুখাপেক্ষা করিতে হয়, বিরোধ করিতে গেলেও সেইরূপ পরের দিকে সমস্ত মন বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। জয়ের পন্থা ইহা নহে। এ-সমস্ত সবলে উপেক্ষা করিয়া মঙ্গলসাধনের মহৎ গৌরব লইয়া আমরা জয়ী হইব।

আপনারা ভাবিয়া দেখুন, বাংলার পার্টিশনটা আজ খুব একটা বড়ো ব্যাপার নহে।

আমরা তাহাকে ছোটো করিয়া ফেলিয়াছি। কেমন করিয়া ছোটো করিয়াছি? এই পার্টিশনের আঘাত-উপলক্ষ্যে আমরা সমস্ত বাঙালি মিলিয়া পরম বেদনার সহিত স্বদেশের দিকে যেমনি ফিরিয়া চাহিলাম, অমনি এই পার্টিশনের কৃত্রিম রেখা ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্র হইয়া গেল আমরা যে আজ সমস্ত মোহ কাটাইয়া স্বহস্তে স্বদেশের সেবা করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইয়াছি, ইহার কাছে পার্টিশনের আঁচড়টা কতই তুচ্ছ হইয়া গেছে। কিন্তু আমরা যদি কেবল পিটিশন ও প্রোটেস্ট, বয়কট ও বাচালতা লইয়াই থাকিতাম, তবে এই পার্টিশনই বৃহৎ হইয়া উঠিত,—আমরা ক্ষুদ্র হইতাম, পরাভূত হইতাম। কার্লাইলের শিক্ষা-সর্ক্যুলর আজ কোথায় মিলাইয়া গেছে। আমরা তাহাকে নগণ্য করিয়া দিয়াছি। গালাগালি করিয়া নয়, হাতাহাতি করিয়াও নয়। গালাগালি-হাতাহাতি করিতে থাকিলে তো তাহাকে বড়ো করাই হইত। আজ আমরা নিজেদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিতে উদ্যত হইয়াছি—ইহাতে আমাদের অপমানের দাহ আমাদের আঘাতের ক্ষতযন্ত্রণা একেবারে জুড়াইয়া গেছে। আমরা সকল ক্ষতি সকল লাঞ্ছনার উপরে উঠিয়া গেছি। কিন্তু ওই লইয়া যদি আজ পর্যন্ত কেবলই বিরাট সভার বিরাট ব্যর্থতায় দেশের এক প্রান্ত হইতে আর-এক প্রান্ত পর্যন্ত ছুটিয়া বেড়াইতাম, আমাদের সানুনাসিক নালিশকে সমুদ্রের এপার হইতে সমুদ্রের ওপার পর্যন্ত তরঙ্গিত করিয়া তুলিতাম, তবে ছোটোকে ক্রমাগতই বড়ো করিয়া তুলিয়া নিজেরা তাহার কাছে নিতান্ত ছোটো হইয়া যাইতাম। সম্প্রতি বরিশালের রাস্তায় আমাদের গোটাকতক মাথাও ভাঙিয়াছে এবং আমাদিগকে কিঞ্চিৎ দণ্ডও দিতে হইয়াছে কিন্তু এই ব্যাপারটার উপরে বুক দিয়া পড়িয়া বেত্রাহত বালকের ন্যায় আর্তনাদ করিতে থাকিলে আমাদের গৌরব নষ্ট হইবে। ইহার অনেক উপরে না উঠিতে পারিলে অশ্রুসেচনে কেবল লজ্জাই বাড়িয়া উঠিতে থাকিবে। উপরে উঠিবার একটা উপায়—আমরা যাঁহাকে নায়কপদে বরণ করিব তাঁহাকে রাজ-অট্টালিকার তোরণদ্বার হইতে ফিরাইয়া আনিয়া আমাদের কুটির-প্রাঙ্গণের পুণ্যবেদিকায় স্বদেশের ব্রতপতিরূপে অভিষিক্ত করা। ক্ষুদ্রের সঙ্গে হাতাহাতি করিয়া দিন-যাপনকেই জয়লাভের উপায় বলে না—তাহার চেয়ে উপরে ওঠাই জয়। আমরা আজ আমাদের স্বদেশের কোনো মনস্বীর কর্তৃত্ব যদি আনন্দের সহিত গৌরবের সহিত স্বীকার করিতে পারি, তবে এমার্সন কবে আমাদের কার সহিত কী ব্যবহার করিয়াছে, কেম্পের আচরণ বেআইনি হইয়াছে কি না, তাহা তুচ্ছ হইতে তুচ্ছতর হইয়া সাময়িক ইতিহাসের কলঙ্ক হইতে একেবারে মুছিয়া যাইবে। বস্তুত এই ঘটনাকে অকিঞ্চিৎকর করিয়া না ফেলিলে আমাদের অপমান দূর হইবে না।

স্বদেশের হিতসাধনের অধিকার কেহ আমাদের নিকট হইতে কাড়িয়া লয় নাই—তাহা ঈশ্বরদত্ত—স্বায়ত্তশাসন চিরদিনই আমাদের স্বায়ত্ত। ইংরেজ রাজা সৈন্য লইয়া পাহারা দিন, কৃষ্ণ বা রক্ত গাউন পরিয়া বিচার করুন, কখনো বা অনুকূল কখনো বা প্রতিকূল হউন, কিন্তু নিজের দেশের কল্যাণ নিজে করিবার যে স্বাভাবিক কর্তৃত্ব-অধিকার, তাহা বিলুপ্ত করিবার শক্তি কাহারও নাই। সে-অধিকার নষ্ট আমরা নিজেরাই করি। সে-অধিকার গ্রহণ যদি না করি, তবেই তাহা হারাই। নিজের সেই স্বাভাবিক অধিকার হারাইয়া যদি কর্তব্যশৈথিল্যের জন্য অপরের প্রতি দোষারোপ করি, তবে তাহা লজ্জার উপরে লজ্জা। মঙ্গল করিবার স্বাভাবিক সম্বন্ধ যাহাদের নাই, যাহারা দয়া করিতে পারে মাত্র, তাহাদের নিকটই সমস্ত মঙ্গল সমস্ত-স্বার্থসংকোচ প্রত্যাশা করিব, আর নিজেরা ত্যাগ করিব না, কাজ করিব না, এরূপ দীনতার ধিক্কার অনুভব করা কি এতই কঠিন।

তাই আমি বলিতেছি, স্বদেশের মঙ্গলসাধনের কর্তৃত্বসিংহাসন আমাদের সম্মুখে শূন্য পড়িয়া আমাদিগকে প্রতিমুহূর্তে লজ্জা দিতেছে। হে স্বদেশসেবকগণ, এই পবিত্র সিংহাসনকে ব্যর্থ করিয়ো না, ইহাকে পূর্ণ করো। রাজার শাসন অস্বীকার করিবার কোনো প্রয়োজন নাই—তাহা কখনো শুভ কখনো অশুভ, কখনো সুখের কখনো অসুখের আকারে আমাদের উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া যাইবে, কিন্তু আমাদের নিজের প্রতি নিজের যে-শাসন, তাহাই গভীর, তাহাই সত্য, তাহাই চিরস্থায়ী। সেই শাসনেই জাতি যথার্থ ভাঙে-গড়ে, বাহিরের শাসনে নহে। সেই শাসন অদ্য আমরা শান্তসমাহিত পবিত্রচিত্তে গ্রহণ করিব।

যদি তাহা গ্রহণ করি, তবে প্রত্যেকে স্বস্বপ্রধান হইয়া অসংযত হইয়া উঠিলে চলিবে না। একজনকে মানিয়া আমরা যথার্থভাবে আপনাকে মানিব। একজনের মধ্যে আমাদের সকলকে স্বীকার করিব। একজনের দক্ষিণ-হস্তকে আমাদের সকলের শক্তিতে বলিষ্ঠ করিয়া তুলিব। আমাদের সকলের চিন্তা তাঁহার মন্ত্রণাগারে মিলিত হইবে এবং তাঁহার আদেশ আমাদের সকলের আদেশরূপে বাংলাদেশের ঘরে ঘরে ধ্বনিত হইয়া উঠিবে।

যাহারা পিটিশন বা প্রোটেস্ট, প্রণয় বা কলহ করিবার জন্য রাজবাড়ির বাঁধা-রাস্তাটাতেই ঘনঘন দৌড়াদৌড়ি করাকেই দেশের প্রধান কাজ বলিয়া গণ্য করেন, আমি সে-দলের লোক নই, সে-কথা পুনশ্চ বলা বাহুল্য। আজ পর্যন্ত যাঁহারা দেশহিতব্রতীদের নায়কতা করিয়া আসিতেছেন তাঁহারা রাজপথের শুষ্কবালুকায় অশ্রু ও ঘর্ম সেচন করিয়া তাহাকে উর্বরা করিবার চেষ্টা করিয়া আসিয়াছেন, তাহাও জানি।

ইহাও দেখিয়াছি, মৎস্যবিরল জলে যাহারা ছিপ ফেলিয়া প্রত্যহ বসিয়া থাকে, অবশেষে তাহাদের, মাছ পাওয়া নয়, ওই আশা করিয়া থাকাই একটা নেশা হইয়া যায়, ইহাকে নিঃস্বার্থ নিষ্ফলতার নেশা বলা যাইতে পারে, মানবস্বভাবে ইহারও একটা স্থান আছে। কিন্তু এজন্য নায়কদিগকে দোষ দিতে পারি না, ইহা আমাদের ভাগ্যেরই দোষ। দেশের আকাঙ্ক্ষা যদি মরীচিকার দিকে না ছুটিয়া জলাশয়ের দিকেই ছুটিত, তবে তাঁহারা নিশ্চয় তাহাকে সেইদিকে বহন করিয়া লইয়া যাইতেন, তাহার বিরুদ্ধপথে চলিতে পারিতেন না।

তবে নায়ক হইবার সার্থকতা কী, এ প্রশ্ন উঠিতে পারে। নায়কের কর্তব্য চালনা করা,—ভ্রমের পথেই হউক, আর ভ্রমসংশোধনের পথেই হউক। অভ্রান্ত তত্ত্বদর্শীর জন্য দেশকে অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিতে বলা কোনো কাজের কথা নহে। দেশকে চলিতে হইবে; কারণ, চলা স্বাস্থ্যকর, বলকর। এতদিন আমরা যে পোলিটিকাল অ্যাজিটেশনের পথে চলিয়াছি, তাহাতে অন্য ফললাভ যতই সামান্য হউক, নিশ্চয়ই বললাভ করিয়াছি,—নিশ্চয়ই ইহাতে আমাদের চিত্ত সজাগ হইয়াছে, আমাদের জড়ত্ব-মোচন হইয়াছে। কখনোই উপদেশের দ্বারা ভ্রমের মূল উৎপাটিত হয় না, তাহা বারংবার অঙ্কুরিত হইয়া উঠিতে থাকে। ভোগের দ্বারাই কর্মক্ষয় হয়, তেমনি ভ্রম করিতে দিলেই যথার্থভাবে ভ্রমের সংশোধন হইতে পারে, নহিলে তাহার জড় মরিতে পারে না। ভুল করাকে আমি ভয় করি না, ভুলের আশঙ্কায় নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকাকেই আমি ভয় করি। দেশের বিধাতা দেশকে বারংবার অপথে ফেলিয়াই তাহাকে পথ চিনাইয়া দেন—গুরুমহাশয় পাঠশালায় বসিয়া তাহাকে পথ চিনাইতে পারেন না। রাজপথে ছুটাছুটি করিয়া যতটা ফল পাওয়া যায় সেই সময়টা নিজের মাঠ চষিয়া অনেক বেশি লাভের সম্ভাবনা, এই কথাটা সম্পূর্ণ বুঝিবার জন্য বহুদিনের বিফলতা গুরুর মতো কাজ করে। সেই গুরুর শিক্ষা যখন হৃদয়ংগম হইবে, তখন যাহারা পথে ছুটিয়াছিল, তাহারাই মাঠে চলিবে—আর যাহারা ঘরে পড়িয়া থাকে, তাহারা বাটেরও নয়, মাঠেরও নয়, তাহারা অবিচলিত প্রাজ্ঞতার ভড়ং করিলেও, সকল আশার সকল সদ্‌গতির বাহিরে।

অতএব দেশকে চলিতে হইবে। চলিলেই তাহার সকল শক্তি আপনি জাগিবে, আপনি খেলিবে। কিন্তু রীতিমত চলিতে গেলে চালক চাই। পথের সমস্ত বিঘ্ন অতিক্রম করিবার জন্য বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিদিগকে দল বাঁধিতে হইবে, স্বতন্ত্র পাথেয়গুলিকে একত্র করিতে হইবে, একজনের বাধ্যতা স্বীকার করিয়া দৃঢ় নিয়মের অধীনে নিজেদের মতবিভিন্নতাকে যথাসম্ভব সংযত করিতে হইবে,—নতুবা আমাদের সার্থকতা-অন্বেষণের

এই মহাযাত্রা দীর্ঘকাল কেবল ছুটাছুটি-দৌড়াদৌড়ি, ডাকাডাকি-হাঁকাহাঁকিতেই নষ্ট হইতে থাকিবে।

১৩১৩

সভাপতির অভিভাষণ

পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনী

অদ্যকার এই মহাসভায় সভাপতির আসনে আহ্বান করিয়া আপনারা আমাকে যে-সম্মান দান করিয়াছেন, আমি তাহার অযোগ্য এ-কথার উল্লেখমাত্রও বাহুল্য। বস্তুত এরূপ সম্মান গ্রহণ করা সহজ, বহন করাই কঠিন। অযোগ্য লোককে উচ্চপদে বসানো তাহাকে অপদস্থ করিবারই উপায়।

অন্য সময় হইলে এতবড়ো দুঃসাধ্য দায়িত্ব হইতে নিষ্কৃতি লাভের চেষ্টা করিতাম। কিন্তু বর্তমানে আমাদের আত্মবিচ্ছেদের সংকটকালে যখন ডাঙায় বাঘ ও জলে কুমির, যখন রাজপুরুষ কালপুরুষের মূর্তি ধরিয়াছেন এবং আত্মীয়সমাজেও পরস্পরের প্রতি কেহ ধৈর্য অবলম্বন করিতে পারিতেছেন না—যখন নিশ্চয় জানি অদ্যকার দিনে সভাপতির আসন সুখের আসন নহে এবং হয়তো ইহা সম্মানের আসনও না হইতে পারে—অপমানের আশঙ্কা চতুর্দিকেই পুঞ্জীভূত—তখন আপনাদের এই আমন্ত্রণ বিনয়ের উপলক্ষ্য করিয়া আজ আর কাপুরুষের মতো ফিরিয়া যাইতে পারিলাম না এবং বিশ্বজগতের সমস্ত বৈচিত্র্য ও বিরোধের মাঝখানে "য একঃ" যিনি এক, "অবর্ণঃ" মানবসমাজের বিবিধ জাতির মাঝখানে জাতিহীন যিনি বিরাজমান, যিনি "বহুধা শক্তিযোগাৎ বর্ণান্ অনেকান্ নিহিতার্থো দধাতি" বহুধা শক্তির দ্বারা নানা জাতির নানা প্রয়োজন বিচিত্ররূপে সম্পাদন করিতেছেন, "বিচৈতিচান্তে বিশ্বমাদৌ" বিশ্বের সমস্ত আরম্ভেও যিনি, সমস্ত পরিণামেও যিনি, "স দেবঃ, স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু" সেই দেবতা, তিনি আমাদের এই মহাসভায় শুভবুদ্ধিস্বরূপ বিদ্যমান থাকিয়া আমাদের হৃদয় হইতে সমস্ত ক্ষুদ্রতা অপসারিত করিয়া দিন, আমাদের চিত্তকে পরিপূর্ণ প্রেমে সম্মিলিত এবং আমাদের চেষ্টাকে সুমহৎ লক্ষ্যে নিবিষ্ট করুন, একান্তমনে এই প্রার্থনা করিয়া, অযোগ্যতার বাধা সত্ত্বেও এই মহাসভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিতেছি।

বিশেষত জানি এমন সময় আসে যখন অযোগ্যতাই বিশেষ যোগ্যতার স্বরূপ হইয়া উঠে।

এতদিন আমি দেশের রাষ্ট্রসভায় স্থান পাইবার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করি নাই। ইহাতে আমার ক্ষমতার অভাব এবং স্বভাবেরও ত্রুটি প্রকাশ পাইয়াছে।

সেই ত্রুটিবশতই আমি সকল দলের বাহিরে পড়িয়া থাকাতে আমাকেই সকলের চেয়ে নিরীহ জ্ঞান করিয়া সভাপতির উচ্চ আসনটিকে নিরাপদ করিবার জন্যই আমাকে আপনারা এইখানে বসাইয়া দিয়াছেন। আপনাদের সেই ইচ্ছা যদি সফল হয় তবেই আমি ধন্য হইব। কিন্তু রামচন্দ্র সত্যপালনের জন্য নির্বাসনে গেলে পর, ভরত যে-ভাবে রাজ্যরক্ষার ভার লইয়াছিলেন আমিও তেমনি আমার নমস্য জ্যেষ্ঠগণের খড়মজোড়াকেই মনের সম্মুখে রাখিয়া নিজেকে উপলক্ষ্যস্বরূপ এখানে স্থাপিত করিলাম।

রাষ্ট্রসভার কোনো দলের সহিত আমার যোগ ঘনিষ্ঠ নহে বলিয়াই সম্প্রতি কনগ্রেসে যে আত্মবিপ্লব ঘটিয়াছে তাহাকে আমি দূর হইতে দেখিবার সুযোগ পাইয়াছি। যাঁহারা ইহার ভিতরে ছিলেন তাঁহারা স্বভাবতই এই ব্যাপারটাকে এতই উৎকট করিয়া দেখিয়াছেন ও ইহা হইতে এতই গুরুতর অহিতের আশঙ্কা করিতেছেন যে, এখনও তাঁহাদের মনের ক্ষোভ দূর হইতে পারিতেছে না।

কিন্তু ঘটনায় যাহা নিঃশেষ হইয়াছে বেদনায় তাহাকে বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টা করা বলিষ্ঠ প্রকৃতির লক্ষণ নহে। কবি বলিয়াছেন, যথার্থ প্রেমের স্রোত অব্যাহতভাবে চলে না। যথার্থ জীবনের স্রোতও সেইরূপ, যথার্থ কর্মের স্রোতেরও সেই দশা। দেশের নাড়ির মধ্যে প্রাণের বেগ চঞ্চল হইয়া উঠাতেই কর্মে যদি মাঝে মাঝে এরূপ ব্যাঘাত ঘটিয়া পড়ে তবে ইহাতে হতাশ না হইয়া এই কথাই মনে রাখিতে হইবে যে, যে-জীবনধর্মের অতিচাঞ্চল্যে কনগ্রেসকে একবার আঘাত করিয়াছে সেই জীবনধর্মই এই আঘাতকে অনায়াসে অতিক্রম করিয়া কনগ্রেসের মধ্যে নূতন স্বাস্থ্যের সঞ্চার করিবে। মৃত পদার্থই আপনার কোনো ক্ষতিকে ভুলিতে পারে না। শুষ্ক কাষ্ঠ যেমন ভাঙে তেমনি ভাঙাই থাকে কিন্তু সজীব গাছ নূতন পাতায় নূতন শাখায় সর্বদাই আপনার ক্ষতি পূরণ করিয়া বাড়িয়া উঠিতে থাকে।

অতএব সুস্থ দেহ যেমন নিজের ক্ষতকে শীঘ্রই শোধন করিতে পারে তেমনি আমরা অতিসত্বর কনগ্রেসের আঘাতক্ষতকে আরোগ্যে লইয়া যাইব এবং সেই সঙ্গে এই ঘটনার শিক্ষাটুকুও নম্রভাবে গ্রহণ করিব।

সে-শিক্ষাটুকু এই যে, যখন কোনো প্রবল আঘাতে মানুষের মন হইতে ঔদাসীন্য ঘুচিয়া যায় এবং সে উত্তেজিত অবস্থায় জাগিয়া উঠে তখন তাহাকে লইয়া যে-কাজ করিতে হইবে সে-কাজে মতের বৈচিত্র্য এবং মতের বিরোধ সহিষ্ণুভাবে স্বীকার করিতেই

হইবে। যখন দেশের চিত্ত নির্জীব ও উদাসীন থাকে তখনকার কাজের প্রণালী যেরূপ, বিপরীত অবস্থায় সেরূপ হইতেই পারে না।

এই সময়ে, যাহা অপ্রিয় তাহাকে বলপূর্বক বিধ্বস্ত এবং যাহা বিরুদ্ধ তাহাকে আঘাতের দ্বারা নিরস্ত করিবার চেষ্টা করা কোনোমতেই চলে না। এমন কি, এইরূপ সময়ে হার মানিয়াও জয়লাভ করিতে হইবে, জিতিবই পণ করিয়া বসিলে সে-জিতের দ্বারা যাহাকে পাইতে ইচ্ছা করি তাহাকেই খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিব।

সমস্ত বৈচিত্র্য ও বিরোধকে একটা বৃহৎ ব্যবস্থার মধ্যে বাঁধিয়া তোলাই আমাদের পক্ষে সকলের চেয়ে বড়ো শিক্ষা। এই শিক্ষা যদি আমাদের অসম্পূর্ণ থাকে তবে স্বায়ত্তশাসন আমাদের পক্ষে অসম্ভব হইবে। যথার্থ স্বায়ত্তশাসনের অধীনে মতবৈচিত্র্য দলিত হয় না, সকল মতই আপনার যথাযোগ্য স্থান অধিকার করিয়া লয় এবং বিরোধের বেগেই পরস্পরের শক্তিকে পরিপূর্ণরূপে সচেতন করিয়া রাখে।

য়ুরোপের রাষ্ট্রকার্যে সর্বত্রই বহুতর বিরোধী দলের একত্র সমাবেশ দেখা যায়। প্রত্যেক দলই প্রধান্যলাভের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে। লেবার পার্টি, সোস্যালিস্ট প্রভৃতি এমন সকল দলও রাষ্ট্রসভায় স্থান পাইয়াছে যাহারা বর্তমান সমাজব্যবস্থাকে নানাদিকে বিপর্যস্ত করিয়া দিতে চায়।

এত অনৈক্য কিসের বলে এক হইয়া আছে এবং এত বিরোধ মিলনকে চূর্ণ করিয়া ফেলিতেছে না কেন? ইহার কারণ আর কিছুই নহে, এই সকল জাতির চরিত্রে এমন একটি শিক্ষা সুদৃঢ় হইয়াছে যাহাতে সকল পক্ষই নিয়মের শাসনকে মান্য করিয়া চলিতে পারে। নিয়মকে লঙ্ঘন করিয়া তাহারা প্রার্থিত ফলকে ছিন্ন করিয়া লইতে চায় না, নিয়মকে পালন করিয়াই জয়লাভ করিবার জন্য ধৈর্য অবলম্বন করিতে জানে। এই সংযম তাহাদের বলেরই পরিচয়। এই কারণেই এত বিচিত্র ও বিরুদ্ধ মতিগতির লোককে একত্রে লইয়া, শুধু তর্ক ও আলোচনা নহে, বড়ো বড়ো রাজ্য রাজ্য ও সাম্রাজ্য চালনার কার্য সম্ভবপর হইয়াছে।

আমাদের কনগ্রেসের পশ্চাতে রাজ্য-সাম্রাজ্যের কোনো দায়িত্বই নাই—কেবলমাত্র একত্র হইয়া দেশের শিক্ষিতসম্প্রদায় দেশের ইচ্ছাকে প্রকাশ করিবার জন্যই এই সভাকে বহন করিতেছেন। এই উপায়ে দেশের ইচ্ছা ক্রমশ পরিস্ফুট আকার ধারণ করিয়া বল লাভ করিবে এবং সেই ইচ্ছাশক্তি ক্রমে কর্মশক্তিতে পরিণত হইয়া দেশের আত্মোপলব্ধিকে সত্য করিয়া তুলিবে, এই আমাদের লক্ষ্য। সমস্ত দেশের শিক্ষিতসম্প্রদায়ের সম্মিলিত চেষ্টা যে-মহাসভায় আমাদের ইচ্ছাশক্তির বোধন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে তাহার মধ্যে এমন ঔদার্য যদি না থাকে যাহাতে শিক্ষিতসম্প্রদায়ের সকল শ্রেণী ও সকল

মতের লোকই সেখানে স্থান পাইতে পারেন তবে তাহাতে আমাদের ক্ষমতার অসম্পূর্ণতা প্রকাশ পায়।

এই মিলনকে সম্ভবপর করিবার জন্য মতের বিরোধকে বিলুপ্ত করিতে হইবে এরূপ ইচ্ছা করিলেও তাহা সফল হইবে না এবং সফল হইলেও তাহাতে কল্যাণ নাই। বিশ্বসৃষ্টি ব্যাপারে আকর্ষণ ও বিকর্ষণ, কেন্দ্রানুগ ও কেন্দ্রাতিগ শক্তি পরস্পর প্রতিঘাতী অথচ এক নিয়মের শাসনাধীন বলিয়াই বিচিত্র সৃষ্টি বিকশিত হইয়া উঠিতে পারিয়াছে। রাষ্ট্রসভাতেও, নিয়মের দ্বারা সংযত হইয়াও প্রত্যেক মতকেই প্রাধান্যলাভের চেষ্টা করিতে না দিলে এরূপ সভার স্বাস্থ্য নষ্ট, শিক্ষা অসম্পূর্ণ ও ভবিষ্যৎ পরিণতি সংকীর্ণ হইতে থাকিবে। অতএব মতবিরোধ যখন কেবলমাত্র অবশ্যম্ভাবী নহে, তাহা মঙ্গলকর, তখন মিলিতে গেলে নিয়মের শাসন অমোঘ হওয়া চাই। নতুবা বরযাত্রী ও কন্যাপক্ষে উচ্ছৃঙ্খলভাবে বিবাদ করিয়া শেষকালে বিবাহটাই পণ্ড হইতে থাকে। যেমন বাষ্পসংঘাতকে লোহার বয়লারের মধ্যে বাঁধিতে পারিলে তবেই কল চলিতে পারে তেমনি আমাদের মতসংঘাতের আশঙ্কা যতই প্রবল হইবে আমাদের নিয়ম-বয়লারও ততই বজ্রের ন্যায় কঠিন হইলে তবেই কর্ম অগ্রসর হইবে নতুবা অনর্থপাত ঘটিতে বিলম্ব হইবে না।

আমরা এ-পর্যন্ত কনগ্রেসের ও কনফারেন্সের জন্য প্রতিনিধিনির্বাচনের যথারীতি নিয়ম স্থির করি নাই। যতদিন পর্যন্ত, দেশের লোক উদাসীন থাকাতে, রাষ্ট্রীয় কর্তব্য সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে কোনো মতের দ্বৈধ ছিল না ততদিন এরূপ নিয়মের শৈথিল্যে কোনো ক্ষতি হয় নাই। কিন্তু যখন দেশের মনটা জাগিয়া উঠিয়াছে তখন দেশের কর্মে সেই মনটা পাইতে হইবে, তখন প্রতিনিধিনির্বাচনকালে সত্যভাবে দেশের সম্মতি লইতে হইবে। এইরূপ শুধু নির্বাচনের নহে, কনগ্রেসের ও কনফারেন্সের কার্যপ্রণালীরও বিধি সুনির্দিষ্ট হওয়ার সময় আসিয়াছে।

এমন না করিয়া কেবল বিবাদ বাঁচাইয়া চলিবার জন্য দেশের এক-এক দল যদি এক-একটি সাম্প্রদায়িক কনগ্রেসের সৃষ্টি করেন তবে কনগ্রেসের কোনো অর্থই থাকিবে না। কনগ্রেস সমগ্র দেশের অখণ্ড সভা—বিঘ্ন ঘটিবামাত্রই সেই সমগ্রতাকেই যদি বিসর্জন দিতে উদ্যত হই তবে কেবলমাত্র সভার সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া আমাদের এমনিই কী লাভ হইবে।

এ-পর্যন্ত আমরা কোনো কাজ বা ব্যবসায়, এমন কি আমোদের জন্য দল বাঁধিয়া যখনই অনৈক্য ঘটিয়াছে তখনই ভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া গিয়াছি। বিরোধ ঘটিবামাত্র আমরা মূল জিনিসটাকে, হয় নষ্ট নয় পরিত্যাগ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। বৈচিত্র্যকে

ঐক্যের মধ্যে বাঁধিয়া তাহাকে নানা-অঙ্গবিশিষ্ট কলেবরে পরিণত করিবার জীবনীশক্তি আমরা দেখাইতে পারিতেছি না। আমাদের সমস্ত দুর্গতির কারণই তাই। কনগ্রেসের মধ্যেও যদি সেই রোগটা ফুটিয়া পড়ে, সেখানেও যদি উপরিতলে বিরোধের আঘাত-মাত্রেই ঐক্যের মূল ভিত্তিটা পর্যন্ত বিদীর্ণ হইতে থাকে তবে আমরা কোনো পক্ষই দাঁড়াইব কিসের উপরে? যে-সরষের দ্বারা ভূত ঝাড়াইব সেই সরষেকেই ভূতে পাইয়া বসিলে কী উপায়।

বঙ্গবিভাগকে রহিত করিবার জন্য আমরা যেরূপ প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছি এই আসন্ন আত্মবিভাগকে নিরস্ত করিবার জন্য আমাদিগকে তাহা অপেক্ষাও আরও বেশি চেষ্টা করিতে হইবে। পরের নিকটে যে দুর্বল, আত্মীয়ের নিকট সে প্রচণ্ড হইয়া যেন নিজেকে প্রবল বলিয়া সান্ত্বনা না পায় পরে যে-বিচ্ছেদ সাধন করে তাহাতে অনিষ্টমাত্র ঘটে, নিজে যে-বিচ্ছেদ ঘটাই তাহাতে পাপ হয়, এই পাপের অনিষ্ট অন্তরের গভীরতম স্থানে নিদারুণ প্রায়শ্চিত্তের অপেক্ষায় সঞ্চিত হইতে থাকে।

আমাদের যে-সময় উপস্থিত হইয়াছে এখন আত্মবিস্মৃত হইলে কোনোমতেই চলিবে না, কারণ এখন আমরা মুক্তির তপস্যা করিতেছি; ইন্দ্রদেব আমাদের পরীক্ষার জন্য এই যে তপোভঙ্গের উপলক্ষ্যকে পাঠাইয়াছেন ইহার কাছে হার মানিলে আমাদের সমস্ত সাধনা নষ্ট হইয়া যাইবে। অতএব ভ্রাতৃগণ, যে-ক্রোধে ভাইয়ের বিরুদ্ধে ভাই হাত তুলিতে চায় সে-ক্রোধ দমন করিতেই হইবে— আত্মীয়কৃত সমস্ত বিরোধকে বারংবার ক্ষমা করিতে হইবে—পরস্পরের অবিবেচনার দ্বারা যে-সংঘাত ঘটিয়াছে তাহার সংশোধন করিতে ও তাহাকে ভুলিতে কিছুমাত্র বিলম্ব করিলে চলিবে না। আগুন যখন আমাদের নিজের ঘরেই লাগিয়াছে তখন দুই পক্ষ দুই দিক হইতে এই অগ্নিকে উক্তবাক্যের বায়ু-বীজন করিয়া ইহাকে প্রতিকারের অতীত করিয়া তুলিলে তাহার চেয়ে মূঢ়তা আমাদের পক্ষে আর-কিছুই হইতে পারিবে না। পরের কৃত বিভাগ লইয়া দেশে যে-উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছে শেষে আত্মকৃত বিভাগই যদি তাহার পরিণাম হয়, ভারতের শনিগ্রহ যদি এবার লর্ড কার্জনমূর্তি পরিহার করিয়া আত্মীয়মূর্তি ধরিয়াই দেখা দেয়, তবে বাহিরের তাড়নায় অস্থির হইয়া ঘরের মধ্যেও আশ্রয় লইবার স্থান পাইব না।

এদিকে একটা প্রকাণ্ড বিচ্ছেদের খড়্গ দেশের মাথার উপর ঝুলিতেছে। কত শত বৎসর হইয়া গেল আমরা হিন্দু ও মুসলমান একই দেশমাতার দুই জানুর উপরে বসিয়া একই স্নেহ উপভোগ করিয়াছি, তথাপি আজও আমাদের মিলনে বিঘ্ন ঘটিতেছে।

এই দুর্বলতার কারণ যতদিন আছে ততদিন আমাদের দেশের কোনো মহৎ আশাকে

সম্পূর্ণ সফল করা সম্ভবপর হইবে না ; আমাদের সমস্ত রাষ্ট্রীয় কর্তব্যপালনই পদে পদে দুরূহ হইতে থাকিবে।

বাহির হইতে এই হিন্দুমুসলমানের প্রভেদকে যদি বিরোধে পরিণত করিবার চেষ্টা করা হয় তবে তাহাতে আমরা ভীত হইব না—আমাদের নিজের ভিতরে যে-ভেদবুদ্ধির পাপ আছে তাহাকে নিরস্ত করিতে পারিলেই আমরা পরের কৃত উত্তেজনাকে অতিক্রম করিতে নিশ্চয়ই পারিব। এই উত্তেজনা কালক্রমে আপনিই মরিতে বাধ্য। কারণ, এই আগুনে নিরত কয়লা জোগাইবার সাধ্য গবর্মেন্টের নাই। এ আগুনকে প্রশ্রয় দিতে গেলে শীঘ্রই ইহা এমন সীমায় গিয়া পৌঁছিবে যখন দমকলের জন্য ডাক পাড়িতেই হইবে। প্রজার ঘরে আগুন ধরিলে কোনোদিন কোনোদিক হইতে তাহা রাজবাড়িরও অত্যন্ত কাছে গিয়া পৌঁছিবে। যদি এ-কথা সত্য হয় যে, হিন্দুদিগকে অসংগত প্রশ্রয় দিবার চেষ্টা হইতেছে, অন্তত ভাবগতিক দেখিয়া মুসলমানদের মনে যদি সেইরূপ ধারণা দৃঢ় হইতে থাকে, তবে এই শনি, এই কলি, এই ভেদনীতি রাজাকেও ক্ষমা করিবে না। কারণ, প্রশ্রয়ের দ্বারা আশাকে বাড়াইয়া তুলিলে তাহাকে পূরণ করা কঠিন হয়। যে ক্ষুধা স্বাভাবিক তাহাকে একদিন মেটানো যায়, যোগ্যতার স্বাভাবিক দাবিরও সীমা আছে, কিন্তু প্রশ্রয়ের দাবির তো অন্ত নাই। তাহা ফুটা কলসীতে জল ভরার মতো। আমাদের পুরাণে কলকভঞ্জনের যে-ইতিহাস আছে তাহারই দৃষ্টান্তে গবর্মেন্ট, প্রেয়সীর প্রতি প্রেমবশতই হউক অথবা তাহার বিপরীত পক্ষের প্রতি রাগ করিয়াই হউক, অযোগ্যতার ছিদ্রঘট ভরিয়া তুলিতে পারিবেন না। অসন্তোষকে চিরবুভুক্ষু করিয়া রাখিবার উপায় প্রশ্রয়। এ সমস্ত শাঁখের করাতের নীতি, ইহাতে শুধু একা প্রজা কাটে না, ইহা ফিরিবার পথে রাজাকেও আঘাত দেয়।

এই ব্যাপারের মধ্যে যেটুকু ভালো তাহাও আমাদিগকে বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। আমরা গোড়া হইতে ইংরেজের ইস্কুলে বেশি মনোযোগের সঙ্গে পড়া মুখস্থ করিয়াছি বলিয়া গবর্মেন্টের চাকরি ও সম্মানের ভাগ মুসলমান ভ্রাতাদের চেয়ে আমাদের অংশে বেশি পড়িয়াছে সন্দেহ নাই। এইরূপে আমাদের মধ্যে একটা পার্থক্য ঘটিয়াছে। এইটুকু কোনোমতে না মিটিয়া গেলে আমাদের ঠিক মনের মিলন হইবে না, আমাদের মাঝখানে একটা অসূয়ার অন্তরাল থাকিয়া যাইবে। মুসলমানেরা যদি যথেষ্টপরিমাণে পদমান লাভ করিতে থাকেন তবে অবস্থার অসাম্যবশত জ্ঞাতিদের মধ্যে যে মনোমালিন্য ঘটে তাহা ঘুচিয়া গিয়া আমাদের মধ্যে সমকক্ষতা স্থাপিত হইবে। যে রাজপ্রসাদ এতদিন আমরা ভোগ করিয়া আসিয়াছি আজ প্রচুরপরিমাণে তাহা মুসলমানদের ভাগে পড়ুক ইহা আমরা যেন সম্পূর্ণ প্রসন্নমনে প্রার্থনা করি। কিন্তু এই প্রসাদের যেখানে

সীমা সেখানে পৌঁছিয়া তাঁহারা যেদিন দেখিবেন বাহিরের ক্ষুদ্র দানে অন্তরের গভীর দৈন্য কিছুতেই ভরিয়া উঠে না, যখন বুঝিবেন শক্তিলাভ ব্যতীত লাভ নাই এবং ঐক্য ব্যতীত সে-লাভ অসম্ভব, যখন জানিবেন, যে-একদেশে আমরা জন্মিয়াছি সেই দেশের ঐক্যকে খণ্ডিত করিতে থাকিলে ধর্মহানি হয় এবং ধর্মহানি হইলে কখনোই স্বার্থরক্ষা হইতে পারে না তখনই আমরা উভয় ভ্রাতায় একই সমচেষ্টার মিলনক্ষেত্রে আসিয়া হাত ধরিয়া দাঁড়াইব।

যাই হউক, হিন্দু ও মুসলমান, ভারতবর্ষের এই দুই প্রধান ভাগকে এক রাষ্ট্রসম্মিলনের মধ্যে বাঁধিবার জন্য যে ত্যাগ, যে সহিষ্ণুতা, যে সতর্কতা ও আত্মদমন আবশ্যক তাহা আমাদিগকে অবলম্বন করিতে হইবে। এই প্রকাণ্ড কর্মক্ষণই যখন আমাদের পক্ষে যথেষ্ট তখন দোহাই সুবুদ্ধির, দোহাই ধর্মের, প্রাণধর্মের নিয়মে দেশে যে নূতন নূতন দল উঠিবে তাহারা প্রত্যেকেই এক-একটি বিরোধরূপে উঠিয়া যেন দেশকে বহুভাগে বিদীর্ণ করিতে না থাকে; তাহারা যেন একই তরুকাণ্ডের উপর নব নব সতেজ শাখার মতো উঠিয়া দেশের রাষ্ট্রীয় চিত্তকে পরিণতিদান করিতে থাকে।

পুরাতন দলের ভিতর দিয়া যখন একটা নূতন দলের উদ্ভব হয় তখন তাহাকে প্রথমটা অনাহূত বলিয়া ভ্রম হয়। কার্যকারণপরম্পরার মধ্যে তাহার যে একটা অনিবার্য স্থান আছে অপরিচয়ের বিরক্তিতে তাহা আমরা হঠাৎ বুঝিতে পারি না। এই কারণে নিজের স্বত্বপ্রমাণের চেষ্টায় নূতন দলের প্রথম অবস্থায় স্বাভাবিকতার শান্তি থাকে না, সেই অবস্থায় আত্মীয় হইলেও তাহাকে বিরুদ্ধ মনে হয়।

কিন্তু এ-একথা নিশ্চিত সত্য যে, দেশে নূতন দল, বীজ বিদীর্ণ করিয়া অঙ্কুরের মতো, বাধা ভেদ করিয়া স্বভাবের নিয়মেই দেখা দেয়। পুরাতনের সঙ্গেই এবং চতুর্দিকের সঙ্গে তাহার অন্তরের সম্বন্ধ আছে।

এই তো আমাদের নূতন দল; এ তো আমাদের আপনার লোক। ইহাদিগকে লইয়া কখনো ঝগড়াও করিব আবার পরক্ষণেই সুখে দুঃখে, ক্রিয়াকর্মে ইহাদিগকেই কাছে টানিয়া একসঙ্গে কাঁধ মিলাইয়া কাজের ক্ষেত্রে পাশাপাশি দাঁড়াইতে হইবে। কিন্তু ভ্রাতৃগণ, একস্ট্রিমিস্ট, বা চরমপন্থী, বা বাড়াবাড়ির দল বলিয়া দেশে একটি দল উঠিয়াছে, এইরূপ যে একটা রটনা শুনা যায়, সে-দলটা কোথায়? জিজ্ঞাসা করি, এ-দেশে সকলের চেয়ে বড়ো এবং মূল একস্ট্রিমিস্ট কে? চরমপন্থিত্বের ধর্মই এই যে, একদিক চরমে উঠিলে অন্যদিক সেই টানেই আপনি চরমে চড়িয়া যায়। বঙ্গবিভাগের জন্য সমস্ত বাংলাদেশ যেমন বেদনা অনুভব করিয়াছে এবং যেমন দারুণ দুঃখভোগের দ্বারা তাহা প্রকাশ করিয়াছে ভারতবর্ষে এমন বোধ হয় আর কখনো হয়

নাই। কিন্তু প্রজাদের সেই সত্য বেদনায় রাজপুরুষ যে কেবল উদাসীন তাহা নহে, তিনি ক্রুদ্ধ, খড়্গহস্ত। তাহার পরে ভারতশাসনের বর্তমান ভাগ্যবিধাতা, যাঁহার অভ্যুদয়ের সংবাদমাত্রেই ভারতবর্ষের চিত্তচকোর তাহার সমস্ত তৃষিতচঞ্চু ব্যাদান করিয়া একেবারে আকাশে উড়িয়াছিল, তিনি তাঁহার সুদূর স্বর্গলোক হইতে সংবাদ পাঠাইলেন—যাহা হইয়া গিয়াছে তাহা একেবারেই চূড়ান্ত, তাহার আর অন্যথা হইতে পারে না।

এতই বধিরভাবে সমস্ত বাংলাদেশের চিত্তবেদনাকে একেবারে চূড়ান্ত করিয়া দেওয়া ইহাই কি রাজ্যশাসনের চরমপন্থা নহে? ইহার কি একটা প্রতিঘাত নাই? এবং সে প্রতিঘাত কি নিতান্ত নির্জীবভাবে হইতে পারে?

এই স্বাভাবিক প্রতিঘাত শান্ত করিবার জন্য কর্তৃপক্ষ তো কোনো শান্তনীতি অবলম্বন করিলেন না—তিনি চরমের দিকেই চড়িতে লাগিলেন। আঘাত করিয়া যে-ঢেউ তুলিয়াছিলেন সেই ঢেউকে নিরস্ত করিবার জন্য ঊর্ধ্বশ্বাসে কেবলই দণ্ডের উপর দণ্ড চালনা করিতে লাগিলেন। তাহাতে তাঁহারা যে বলিষ্ঠ এ প্রমাণ হইতে পারে কিন্তু স্বভাব তো এই প্রবল রাজাদের প্রজা নহে। আমরা দুর্বল হই আর অক্ষম হই বিধাতা আমাদের যে একটা হৃৎপিণ্ড গড়িয়াছিলেন সেটা তো নিতান্তই একটা মৃৎপিণ্ড নহে, আমরাও সহসা আঘাত পাইলে চকিত হইয়া উঠি; সেটা একটা স্বাভাবিক প্রতিবৃত্তিক্রিয়া,—যাহাকে ইংরেজিতে বলে রিফ্লেক্স অ্যাকশন। এটাকে রাজসভায় যদি অবিনয় বলিয়া জ্ঞান করেন তবে আঘাতটা সম্বন্ধেও বিবেচনা করিতে হয়। যাহার শক্তি আছে সে অনায়াসেই দুইয়ের পশ্চাতে আরও একটা দুই যোগ করিতে পারে কিন্তু তাহার পরে কলের ঘরে চা দেখিলেই উন্মত্ত হইয়া উঠা বিধাতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ।

স্বভাবের নিয়ম যখন কাজ করে তখন কিছু অসুবিধা ঘটিলেও, সেটাকে দেখিয়া বিমর্ষ হইতে পারি না। বিদ্যুতের বেগ লাগাইলে যদি দেখি দুর্বল মায়ুতেও প্রবলভাবে সাড়া পাওয়া যাইতেছে তবে বড়ো কষ্টের মধ্যে সেটা আশার কথা।

অতএব এদিকে যখন লর্ড কার্জন, মর্লি, ইবেট্‌সন; গুর্খা, প্যুনিটিভ পুলিস ও পুলিসরাজকতা; নির্বাসন, জেল ও বেত্রদণ্ড; দলন, দমন ও আইনের আত্মবিস্মৃতি; তখন অপর পক্ষে প্রজাদের মধ্যেও যে ক্রমশই উত্তেজনাবৃদ্ধি হইতেছে, যে-উত্তাপটুকু অল্পকাল পূর্বে কেবলমাত্র তাহাদের রসনার প্রান্তভাগে দেখা দিয়াছিল তাহা যে ক্রমশই ব্যাপ্ত ও গভীর হইয়া তাহাদের অস্থিমজ্জার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতেছে; তাহারা যে বিভীষিকার সম্মুখে অভিভূত না হইয়া অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতেছে ইহাতে আমাদের যথেষ্ট

অসুবিধা ও আশঙ্কা আছে তাহা মানিতেই হইবে, কিন্তু সেই সঙ্গে এইটুকু আশার কথা না মনে করিয়া থাকিতে পারি না যে, বহুকালের অবসাদের পরেও স্বভাব বলিয়া একটা পদার্থ এখনও আমাদের মধ্যে রহিয়া গেছে; প্রবলভাবে কষ্ট পাইবার ক্ষমতা এখনও আমাদের যায় নাই—এবং জীবনধর্মে যে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ার নিয়ম বর্তমান এখনও আমাদের মধ্যে তাহা কাজ করিতেছে।

চরমনীতি বলিতেই বুঝায় হালছাড়া নীতি, সুতরাং ইহার গতিটা যে কখন কাহাকে কোথায় লইয়া গিয়া উত্তীর্ণ করিয়া দিবে তাহা পূর্ব হইতে কেহ নিশ্চিতরূপে বলিতে পারে না। ইহার বেগকে সর্বত্র নিয়মিত করিয়া চলা এই পন্থার পথিকদের পক্ষে একেবারেই অসাধ্য। তাহাকে প্রবর্তন করা সহজ, সংবরণ করাই কঠিন।

এই কারণেই আমাদের কর্তৃপক্ষ যখন চরমনীতিতে দম লাগাইলেন তখন তাঁহারা যে এতদূর পর্যন্ত পৌঁছিবেন তাহা মনেও করেন নাই। আজ ভারতশাসনকার্যে পুলিসের সামান্য পাহারাওআলা হইতে ন্যায়দণ্ডধারী বিচারক পর্যন্ত সকলেরই মধ্যে স্থানে স্থানে যে অসংযম ফুটিয়া বাহির হইতেছে, নিশ্চয়ই তাহা ভারতশাসনের কর্ণধারগণের অভিপ্রেত নহে। কিন্তু গবর্মেন্ট তো একটা অলৌকিক ব্যাপার নহে, শাসনকার্য যাহাদিগকে দিয়া চলে তাহারা তো রক্তমাংসের মানুষ, এবং ক্ষমতা-মত্ততাও সেই মানুষগুলির প্রকৃতিতে অল্পাধিক পরিমাণে প্রবেশ করিয়াছে। যে-সময়ে প্রবীণ সারথির প্রবল রাশ ইহাদের সকলকে শক্ত করিয়া টানিয়া রাখে তখনও যদিচ ইহাদের উচ্চগ্রীবা যথেষ্ট বক্র হইয়া থাকে তথাপি সেটা রাজবাহনের পক্ষে অশোভন হয় না; কিন্তু তখন ইহারা মোটের উপরে সকলেই এক সমান চালে পা ফেলে; তখন পদাতিকের দল একটু যদি পাশ কাটাইয়া চলিতে পারে তবে তাহাদের আর অপঘাতের আশঙ্কা থাকে না। কিন্তু চরমনীতি যখনই রাশ ছাড়িয়া দেয় তখনই এই বিরাট শাসনতন্ত্রের মধ্যে অবারিত জীবপ্রকৃতি দেখিতে দেখিতে বিচিত্র হইয়া উঠে। তখন কোন্ পাহারাওআলার যষ্টি যে কোন্ ভালোমানুষের কপাল ভাঙিবে এবং কোন্ বিচারকের হাতে আইন যে কিরূপ ভয়ংকর বক্রগতি অবলম্বন করিবে তাহা কিছুই বুঝিবার উপায় থাকে না। তখন প্রজাদের মধ্যে যে বিশেষ অংশ প্রশ্রয় পায় তাহারাও বুঝিতে পারে না তাহাদের প্রশ্রয়ের সীমা কোথায়। চতুর্দিকে শাসননীতির এইরূপ অদ্ভুত দুর্বলতা প্রকাশ হইতে থাকিলে গবর্মেন্ট নিজের চালে নিজেই কিছু কিছু লজ্জাবোধ করিতে থাকেন;—তখন লজ্জানিবারণের কমিশন রিপোর্টের তালি দিয়া শাসনের ছিন্নতা ঢাকিতে চায়, যাহারা আর্ত তাহাদিগকে মিথ্যুক বলিয়া অপমানিত করে এবং যাহারা উচ্ছৃঙ্খল তাহাদিগকেই উৎপীড়িত বলিয়া মার্জনা করে। কিন্তু এমন করিয়া লজ্জা কি ঢাকা পড়ে? অথচ

এই সমস্ত উদ্দাম উৎপাত সংবরণ করাকেও ত্রুটিস্বীকার বলিয়া মনে হয় এবং দুর্বলতাকে প্রবলভাবে সমর্থন করাকেই রাজপুরুষ শক্তির পরিচয় বলিয়া ভ্রম করেন।

অন্যপক্ষে আমাদের মধ্যেও চরমনীতিকে সর্বদা ঠিকমতো সংবরণ করিয়া চলা দুঃসাধ্য। আমাদের মধ্যেও নিজের দলের দুর্বারতা দলপতিকেও টলাইতে থাকে। এরূপ অবস্থায় কাহার আচরণের জন্য যে কাহাকে দায়ী করা যাইবে এবং কোন্ মতটা যে কতটা পরিমাণে কাহার, তাহা নিশ্চয় করিয়া নির্ণয় করে এমন কে আছে।

এইখানে একটি কথা মনে রাখিতে হইবে। একস্ট্রিমিস্ট নাম দিয়া আমাদের মাঝখানে যে একটা সীমানার চিহ্ন টানিয়া দেওয়া হইয়াছে সেটা আমাদের নিজের দত্ত নহে। সেটা ইংরেজের কালো কালির দাগ। সুতরাং এই জরিপের চিহ্নটা কখন কতদূর পর্যন্ত ব্যাপ্ত হইবে বলা যায় না। দলের গঠন অনুসারে নহে, সময়ের গতি ও কর্তৃজাতির মর্জি অনুসারে এই রেখার পরিবর্তন হইতে থাকিবে।

অতএব ইংরেজ তাহার নিজের প্রতি আমাদের মনের ভাব বিচার করিয়া যাহাকে একস্ট্রিমিস্ট দল বলিয়া নির্দেশ করিবার চেষ্টা করিতেছে সেটা কি একটা দল, না দলের চেয়ে বেশি—তাহা দেশের একটা লক্ষণ? কোনো একটা দলকে চাপিয়া মারিলে এই লক্ষণ আর-কোনো আকারে দেখা দিবে অথবা ইহা বাহির হইতে ভিতরে প্রবেশ করিবে।

কোনো স্বাভাবিক প্রকাশকে যখন আমরা পছন্দ না করি তখন আমরা বলিতে চেষ্টা করি যে, ইহা কেবল সম্প্রদায়বিশেষের চক্রান্ত মাত্র। অষ্টাদশ শতাব্দীতে য়ুরোপে একটা ধুয়া উঠিয়াছিল যে, ধর্মজিনিসটা কেবল স্বার্থপর ধর্মযাজকদের কৃত্রিম সৃষ্টি; পাদ্রিদিগকে উচ্ছিন্ন করিলেই ধর্মের আপদটাকেই একেবারে দূর করিয়া দেওয়া যায়। হিন্দুধর্মের প্রতি যাহারা অসহিষ্ণু তাহারা অনেকে বলিয়া থাকে এটা যেন ব্রাহ্মণের দল পরামর্শ করিয়া নিজেদের জীবিকার উপায় স্বরূপে তৈরি করিয়া তুলিয়াছে—অতএব ভারতবর্ষের বাহিরে কোনো গতিকে ব্রাহ্মণের ডিপোর্টেশন ঘটাইতে পারিলেই হিন্দুধর্মের উপদ্রব সম্বন্ধে একপ্রকার নিশ্চিন্ত থাকা যাইবে। আমাদের রাজারাও সেইরূপ মনে করিতেছেন একস্ট্রিমিজম বলিয়া একটা উৎক্ষেপক পদার্থ ভূতের দল তাহাদের ল্যাবরেটরিতে কৃত্রিম উপায়ে তৈরি করিয়া তুলিতেছে অতএব কয়েকটা দলপতি ধরিয়া পুলিস ম্যাজিস্ট্রেটের হাতে সমর্পণ করিয়া দিলেই উৎপাত শান্তি হইতে পারিবে।

কিন্তু আসল কথাটা ভিতরের কথা। সেটা চোখে দেখার জিনিস নহে, সেটা তলাইয়া বুঝিতে হইবে।

যে-সত্য অব্যক্ত ছিল সেটা হঠাৎ প্রথম ব্যক্ত হইবার সময় নিতান্ত মৃদুমন্দ মধুরভাবে হয় না। তাহা একটা ঝড়ের মতো আসিয়া পড়ে, কারণ অসামঞ্জস্যের সংঘাতই তাহাকে জাগাইয়া তোলে।

আমাদের দেশে কিছুকাল হইতেই ইতিহাসের শিক্ষায়, যাতায়াত ও আদানপ্রদানের সুযোগে, এক রাজশাসনের ঐক্যে, সাহিত্যের অভ্যুদয়ে এবং কনগ্রেসের চেষ্টায় আমরা ভিতরে ভিতরে বুঝিতেছিলাম যে, আমাদের দেশটা এক, আমরা একই জাতি, সুখে দুঃখে আমাদের এক দশা, এবং পরস্পরকে পরমাত্মীয় বলিয়া না জানিলে ও অত্যন্ত কাছে না টানিলে আমাদের কিছুতে মঙ্গল নাই।

বুঝিতেছিলাম বটে কিন্তু এই অখণ্ড ঐক্যের মূর্তিটি প্রত্যক্ষ সত্যের মতো দেখিতে পাইতেছিলাম না—তাহা যেন কেবলই আমাদের চিন্তার বিষয় হইয়াই ছিল। সেইজন্য সমস্ত দেশকে এক বলিয়া নিশ্চয় জানিলে, মানুষ দেশের জন্য যতটা দিতে পারে, যতটা সহিতে পারে, যতটা করিতে পারে আমরা তাহার কিছুই পারি নাই।

এই ভাবেই আরও অনেকদিন চলিত। এমন সময় লর্ড কার্জন যবনিকার উপর এমন একটা প্রবল টান মারিলেন যে, যাহা নেপথ্যে ছিল তাহার আর কোনো আচ্ছাদন রহিল না।

বাংলাকে যেমনি দুইখানা করিবার হুকুম হইল অমনি পূর্ব হইতে পশ্চিমে একটিমাত্র ধ্বনি জাগিয়া উঠিল—আমরা যে বাঙালি, আমরা যে এক! বাঙালি কখন যে বাঙালির এতই কাছে আসিয়া পড়িয়াছে, রক্তের নাড়ি কখন বাংলার সকল অঙ্গকেই এমন করিয়া এক চেতনার বন্ধনে বাঁধিয়া তুলিয়াছে তাহা তো পূর্বে আমরা এমন স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে পারি নাই।

আমাদের এই আত্মীয়তার সজীব শরীরে বিভাগের বেদনা যখন এত অসহ্য হইয়া বাজিল তখন ভাবিয়াছিলাম সকলে মিলিয়া রাজার দ্বারে নালিশ জানাইলেই দয়া পাওয়া যাইবে। কেবলমাত্র নালিশের দ্বারা দয়া আকর্ষণ ছাড়া আর যে আমাদের কোনো গতিই আছে তাহাও আমরা জানিতাম না।

কিন্তু নিরুপায়ের ভরসাস্থল এই পরের অনুগ্রহ যখন চূড়ান্তভাবেই বিমুখ হইল তখন যে-ব্যক্তি নিজেকে পঙ্গু জানিয়া বহুকাল অচল হইয়া ছিল ঘরে আগুন লাগিতেই নিতান্ত অগত্যা দেখিতে পাইল তাহারও চলৎশক্তি আছে। আমরাও একদিন অন্তঃকরণের অত্যন্ত একটা তাড়নায় দেখিতে পাইলাম, এই কথাটা আমাদের জোর করিয়া বলিবার শক্তি আছে যে, আমরা বিলাতি পণ্যদ্রব্য ব্যবহার করিব না।

আমাদের এই আবিষ্কারটি অন্যান্য সমস্ত সত্য আবিষ্কারেরই ন্যায় প্রথমে একটা

সংকীর্ণ উপলক্ষ্যকে অবলম্বন করিয়া আমাদের কাছে উপস্থিত হইয়াছিল। অবশেষে দেখিতে দেখিতে আমরা বুঝিতে পারিলাম উপলক্ষ্যটুকুর অপেক্ষা ইহা অনেক বৃহৎ। এ যে শক্তি। এ যে সম্পদ। ইহা অন্যকে জব্দ করিবার নহে ইহা নিজেকে শক্ত করিবার। ইহার আর কোনো প্রয়োজন থাক বা না থাক ইহাকে বক্ষের মধ্যে সত্য বলিয়া অনুভব করাই সকলের চেয়ে বড়ো প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছে।

শক্তির এই অকস্মাৎ অনুভূতিতে আমরা যে একটা মস্ত ভরসার আনন্দ পাইয়াছি সেই আনন্দটুকু না থাকিলে এই বিদেশী-বর্জনব্যাপারে আমরা এত অবিরাম দুঃখ কখনোই সহিতে পারিতাম না। কেবলমাত্র ক্রোধের এত সহিষ্ণুতা নাই। বিশেষত প্রবলের বিরুদ্ধে দুর্বলের ক্রোধ কখনোই এত জোরের সঙ্গে দাঁড়াইতে পারে না।

এদিকে দুঃখ যতই পাইতেছি সত্যের পরিচয়ও ততই নিবিড়তর সত্য হইয়া উঠিতেছে। যতই দুঃখ পাইতেছি আমাদের শক্তি গভীরতায় ও ব্যাপ্তিতে ততই বাড়িয়া চলিয়াছে। আমাদের এই বড় দুঃখের ধন ক্রমেই আমাদের হৃদয়ের চিরন্তন সামগ্রী হইয়া উঠিতেছে। অগ্নিতে দেশের চিত্তকে বার বার গলাইয়া এই যে ছাপ দেওয়া হইতেছে ইহা তো কোনোদিন আর মুছিবে না। এই রাজমোহরের ছাপ আমাদের দুঃখ সহার দলিল হইয়া থাকিবে ;—দুঃখের জোরে ইহা প্রস্তুত হইয়াছে এবং ইহার জোরেই দুঃখ সহিতে পারিব।

এইরূপে সত্য জিনিস পাইলে তাহার আনন্দ যে কত জোরে কাজ করে এবার তাহা স্পষ্ট দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া গিয়াছি। কতদিন হইতে জ্ঞানী লোকেরা উপদেশ দিয়া আসিয়াছেন যে, হাতের কাজ করিতে ঘৃণা করিয়া, চাকরি করাকেই জীবনের সার বলিয়া জানিলে কখনোই আমরা মানুষ হইতে পারিব না। যে শুনিয়াছে সেই বলিয়াছে, হাঁ, কথাটা সত্য বটে। অমনি সেই সঙ্গেই চাকরির দরখাস্ত লিখিতে হাত পাকাইতে বসিয়াছে। এতবড়ো চাকরিপিপাসু বাংলাদেশেও এমন একটা দিন আসিল যেদিন কিছু না বলিতেই ধনীর ছেলে নিজের হাতে তাঁত চালাইবার জন্য তাঁতির কাছে শিষ্যবৃত্তি অবলম্বন করিল, ভদ্রঘরের ছেলে নিজের মাথায় কাপড়ের মোট তুলিয়া দ্বারে দ্বারে বিক্রয় করিতে লাগিল এবং ব্রাহ্মণের ছেলে নিজের হাতে লাঙল বহা গৌরবের কাজ বলিয়া স্পর্ধা প্রকাশ করিল। আমাদের সমাজে ইহা যে সম্ভবপর হইতে পারে আমরা স্বপ্নেও মনে করি নাই। তর্কের দ্বারা তর্ক মেটে না ; উপদেশের দ্বারা সংস্কার ঘোচে না ; সত্য যখন ঘরের একটি কোণে একটু শিখার মতো দেখা দেন তখনই ঘরভরা অন্ধকার আপনি কাটিয়া যায়।

পূর্বে দেশের বড়ো প্রয়োজনের সময়েও দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা চাহিয়া অর্থের অপেক্ষা

ব্যর্থতাই বেশি করিয়া পাইতাম কিন্তু সম্প্রতি একদিন যেমনি একটা ডাক পড়িল অমনি দেশের লোক কোনো অত্যাবশ্যক প্রয়োজনের কথা চিন্তা না করিয়া কেবলমাত্র নির্বিচারে ত্যাগ করিবার জন্যই নিজে ছুটিয়া গিয়া দান করিয়া নিজেকে কৃতার্থ জ্ঞান করিয়াছে।

তাহার পরে জাতীয় বিদ্যালয় যে কোনোদিন দেশের মধ্যে স্থাপন করিতে পারিব, সে কেবল দুটি-একটি অত্যুৎসাহিকের ধ্যানের মধ্যেই ছিল। কিন্তু দেশে শক্তির অনুভূতি একটুও সত্য হইবামাত্রই সেই দুর্লভ ধ্যানের সামগ্রী দেখিতে দেখিতে আকার পরিগ্রহ করিয়া দেশকে বরদান করিবার জন্য উদ্যত দক্ষিণ হস্তে আজ আমাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন।

একত্রে মিলিয়া বড়ো কারখানা স্থাপন করিব বাঙালির এমন না ছিল শিক্ষা, না ছিল অভিজ্ঞতা, না ছিল অভিরুচি,—তাহা সত্ত্বেও বাঙালি একটা বড়ো মিল খুলিয়াছে, তাহা ভালো করিয়াই চালাইতেছে এবং আরও এইরূপ অনেকগুলি ছোটোবড়ো উদ্‌যোগে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

দেশের ইচ্ছা একটিমাত্র উপলক্ষ্যে যেই আপনাকে সফল করিয়াছে, যেই আপনার শক্তিকে দুঃখ ও ক্ষতির উপরেও জয়ী করিয়া দেখাইয়াছে অমনি তাহা নানা ধারায় জাতীয় জীবনযাত্রার সমস্ত বিচিত্র ব্যাপারেই যে নিজেকে উপলব্ধি করিবার জন্য সহজে ধাবিত হইবে ইহা অনিবার্য।

কিন্তু যেমন একদিকে সহসা দেশের এই শক্তির উপলব্ধি আমাদের কাছে সত্য হইল তেমনি সেই কারণেই আমরা নিজেদের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড অভাব অনুভব করিলাম। দেখিলাম এতবড়ো শক্তিকে বাঁধিয়া তুলিবার কোনো ব্যবস্থা আমাদের মধ্যে নাই। স্টীম নানাদিকে নষ্ট হইয়া যাইতেছে, তাহাকে এইবেলা আবদ্ধ করিয়া যথার্থপথে খাটাইবার উপায় করিতে পারিলে তাহা আমাদের চিরকালের সম্বল হইয়া উঠিত—এই ব্যাকুলতায় আমরা কষ্ট পাইতেছি।

ভিতরে একটা গভীর অভাব বা পীড়া থাকিলে যখন তাহাকে ভালো করিয়া ধরিতে বা তাহার ভালোরূপ প্রতিকার করিতে না পারি তখন তাহা নানা অকারণ বিরক্তির আকার ধারণ করিতে থাকে। শিশু অনেক সময় বিনা হেতুতেই রাগ করিয়া তাহার মাকে মারে; তখন বুঝিতে হইবে সে-রাগ বাহ্যত তাহার মাতার প্রতি কিন্তু বস্তুত তাহা শিশুর একটা কোনো অনির্দিষ্ট অস্বাস্থ্য। সুস্থ শিশু যখন আনন্দে থাকে তখন বিরক্তির কারণ ঘটিলেও সেটাকে সে অনায়াসে ভুলিয়া যায়। সেইরূপ দেশের আন্তরিক যে-আক্ষেপ আমাদিগকে আত্মকলহে লইয়া যাইতেছে তাহা আর কিছুই নহে তাহা ব্যবস্থাবন্ধনের অভাবজনিত ব্যর্থ উদ্যমের অসন্তোষ। শক্তিকে অনুভব করিতেছি

অথচ তাহাকে সম্পূর্ণ খাটাইতে পারিতেছি না বলিয়াই সেই অস্বাস্থ্যে ও আত্মগ্লানিতে আমরা আত্মীয়দিগকেও সহ্য করিতে পারিতেছি না।

যখন একদিনের চেষ্টাতেই আমরা দেখিয়াছি যে, জাতীয় ভাণ্ডারে টাকা আসিয়া পড়া এই বহুপরিবারভারগ্রস্ত দরিদ্র দেশেও দুঃসাধ্য নহে তখন এই আক্ষেপ কেমন করিয়া ভুলিব যে, কেবলমাত্র ব্যবস্থা করিতে না পারাতেই এই একদিনের উদ্‌যোগকে আমরা চিরদিনের ব্যাপার করিয়া তুলিতে পারিলাম না। এমন কি, যে-টাকা আমাদের হাতে আসিয়া জমিয়াছে তাহা লইয়া কী যে করিব তাহাই আজ পর্যন্ত ঠিক করা আমাদের পক্ষে অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং এই জমা টাকা মাতৃস্তনের নিরুদ্ধ দুগ্ধের মতো আমাদের পক্ষে একটা বিষম বেদনার বিষয় হইয়া রহিল। দেশের লোক যখন ব্যাকুল হইয়া বলিতেছে, আমরা দিতে চাই আমরা কাজ করিতে চাই, কোথায় দিব কী করিব তাহার একটা কিনারা হইয়া উঠিলে বাঁচিয়া যাই; তখনও যদি দেশের এই উন্মত্ত ইচ্ছাকে সার্থক করিবার জন্য কোনো একটা যজ্ঞক্ষেত্র নির্মিত না হয়, তখনও যদি সমস্ত কাজ বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্তভাবেই হইতে থাকে তবে এমন অবস্থায় এমন খেদে মানুষ আর কিছু না পারিলে ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়া করিয়া আপনার কর্মভ্রষ্ট উদ্যম ক্ষয় করে।

তখন ঝগড়ার উপলক্ষ্যও তেমনি অসংগত হয়। আমাদের মধ্যে কেহ বা বলি আমি ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যভুক্ত স্বায়ত্তশাসন চাহি, কেহ বা বলি আমি সাম্রাজ্যনিরপেক্ষ স্বাতন্ত্র্যই চাহি। অথচ এ-সমস্ত কেবল মুখের কথা এবং এতই দূরের কথা যে, ইহার সঙ্গে আমাদের উপস্থিত দায়িত্বের কোনো যোগ নাই।

দেবতা যখন কলোনিয়াল সেল্‌ফ-গবর্মেন্ট এবং অটনমি এই দুই বর দুই হাতে লইয়া আমাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইবেন এবং যখন তাঁহার মুহূর্তমাত্র বিলম্ব সহিবে না তখন কোন্ বরটা তুলিয়া লইতে হইবে হাতে হাতে তাহার নিষ্পত্তি করিতে পরস্পর হাতাহাতি করাই যদি অত্যাবশ্যক হইয়া উঠে তবে অগত্যা তাহা করিতে হইবে। কিন্তু যখন মাঠে চাষ দেওয়াও হয় নাই তখন কি ফসলভাগের মামলা তুলিবার বিশেষ প্রয়োজন আছে?

ব্যক্তিই বল, জাতিই বল, মুক্তিই সকলের চরম সিদ্ধি। কিন্তু শাস্ত্রে বলে, নিজের মধ্যেই মুক্তির নিগূঢ় বাধা আছে, সেইগুলা আগে কর্মের দ্বারা ক্ষয় না করিলে কোনো-মতেই মুক্তি নাই। আমাদের জাতীয় মুক্তিরও প্রধান বিঘ্নসকল আমাদের অভ্যন্তরেই নানা আকারে বিদ্যমান,—কর্মের দ্বারা সেগুলার যদি ধ্বংস না হয় তবে তর্কের দ্বারা হইবে না এবং বিবাদের দ্বারা তাহা বাড়িতেই থাকিবে। অতএব, ক্তি কয় প্রকারের

আছে, সাযুজ্য-মুক্তিই ভালো না স্বাতন্ত্র্য-মুক্তিই শ্রেয়, শান্তিরক্ষা করিয়া তাহার আলোচনা অনায়াসেই চলিতে পারে, কিন্তু সাযুজ্যই বল, আর স্বাতন্ত্র্যই বল, গোড়াকার কথা একই অর্থাৎ তাহা কর্ম। সেখানে উভয় দলকে একই পথ দিয়া যাত্রা করিতে হইবে। যে-সকল প্রকৃতিগত কারণে আমরা দরিদ্র ও দুর্বল, আমরা বিভক্ত বিরুদ্ধ ও পরতন্ত্র, সেই কারণ ঘোচাইবার জন্য আমরা যদি সত্যসত্যই মন দিই তবে আমাদের সকল মতের লোককে একত্রে মিলিতেই হইবে।

এই কর্মক্ষেত্রেই যখন আমাদের সকলের একত্রে মিলন নিতান্তই চাই তখন সেই মিলনের জন্য একটি বিশেষ গুণের প্রয়োজন—তাহা অমত্ততা। আমরা যদি যথার্থ বলিষ্ঠমনা ব্যক্তির ন্যায় কথায় ও ব্যবহারে, চিন্তায় ও প্রকাশে পরিমাণরক্ষা করিয়া না চলিতে পারি তবে মিলনই আমাদের পক্ষে বিরোধের হেতু হইবে—এবং কর্মের চেষ্টায় লাভ না হইয়া বারংবার ক্ষতি ঘটাইতে থাকিবে।

এই বিষয়ে আজকালকার ভারতীয় রাজপুরুষদের সমান চালে চলিবার চেষ্টা করিলে আমাদের অনিষ্টই হইবে। বর্তমান ভারতশাসনব্যাপারে একটা উৎকট হিস্টীরিয়ার আক্ষেপ হঠাৎ থাকিয়া থাকিয়া কখনো পাঞ্জাবে, কখনো মাদ্রাজে, কখনো বাংলায় যেরূপ অসংযমের সহিত প্রকাশ পাইয়া উঠিতেছে সেটা কি আমাদের পক্ষে একটা দৃষ্টান্ত?

যাহার হাতে বিরাট শক্তি আছে, সে যদি অসহিষ্ণু হইয়া চাঞ্চল্য প্রকাশ করাকেই পৌরুষের পরিচয় বলিয়া কল্পনা করে এবং নিজের রচনাকে নিজে বিপর্যস্ত করিয়া সান্ত্বনা পায় তবে তাহার সেই চিত্তবিকার আমাদের মতো দুর্বলতর পক্ষকে যেন অনুকরণে উত্তেজিত না করে। বস্তুত প্রবলই হউক আর দুর্বলই হউক যে-ব্যক্তি বাক্যে ও আচরণে অন্তরের ভাবাবেগকে যথেষ্ট পরিমাণে সংযত করিতে না পারিয়াছে সেই ব্যক্তি সকল কর্মের অন্তরায় এ-কথাটা ক্ষোভবশত আমরা যখনই ভুলি ইহার সত্যতাও তখনই সবেগে সপ্রমাণ হইয়া উঠে।

সম্প্রতি দেশের কর্ম বলিতে কী বুঝায় এবং তাহার যথার্থ গতিটা কোন্ দিকে সে-সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে যে সত্যকার কোনো মতভেদ আছে এ-কথা আমি মনে করিতেই পারি না।

কর্মের উদ্দেশ্য কেবলমাত্র উপস্থিত একটা কোনো ফললাভ নহে। শক্তিকে খাটাইবার জন্যও কর্মের প্রয়োজন। কর্মের উপযুক্ত সুযোগ পাইলেই এই শক্তি নানা আশ্চর্য ও অভাবনীয় রূপে অভিব্যক্ত হইতে থাকে। এমন যদি উপায় থাকিত যাহাতে ফলটা পাওয়া যায় অথচ শক্তিটার কোনো প্রয়োজনই হয় না তবে তাহাকে আমরা সৌভাগ্য বলিয়া গণ্য করিতে পারিতাম না।

তেমন উপায় পৃথিবীতে নাইও। আমরা কোনো শ্রেয় পদার্থকেই পরের কৃপার দ্বারা পাই না, নিজের শক্তির দ্বারাই লই। ইহার অন্যথা হইতেই পারে না। কারণ, বিধাতা বরঞ্চ আমাদিগকে হনন করিতে পারেন কিন্তু মনুষ্যত্বকে অপমানিত হইবার পথে কোনো প্রশ্রয় দেন না।

সেইজন্যই দেখিতে পাই গবর্মেন্টের দানের সঙ্গে যেখানেই আমাদের শক্তির কোনো সহযোগিতা নাই সেখানে সেই দানই বক্র হইয়া উঠিয়া আমাদের কত না বিপদ ঘটাইতে পারে। প্রশ্রয়প্রাপ্ত পুলিস যখন দস্যুবৃত্তি করে তখন প্রতিকার অসম্ভব হইয়া উঠে; গবর্মেন্টের প্রসাদভোগী পঞ্চায়েত যখন গুপ্তচরের কাজ আরম্ভ করে তখন গ্রামের পক্ষে তাহা যে কতবড়ো উপদ্রবের কারণ হইতে পারে তাহা কিছুই বলা যায় না; গবর্মেন্টের চাকরি যখন শ্রেণীবিশেষকেই অনুগ্রহভাজন করিয়া তোলে তখন ঘরের লোকের মধ্যেই বিদ্বেষ জ্বলিয়া উঠে এবং রাজমন্ত্রিসভায় যখন সম্প্রদায়বিশেষের জন্যই আসন প্রশস্ত হইতে থাকে তখন বলিতে হয় আমার উপকারে কাজ নাই তোমার অনুগ্রহ ফিরাইয়া লও। আমাদের নিজের মধ্যে সতেজ শক্তি থাকিলে এই সমস্ত বিকৃতি কিছুতেই ঘটিতে পারিত না—আমরা দান গ্রহণ করিবার ও তাহাকে রক্ষা করিবার অধিকারী হইতাম—দান আমাদের পক্ষে কোনো অবস্থাতেই বলিদান হইয়া উঠিত না।

অতএব আমি যাহা বলিতেছি তাহাতে এ বোঝায় না যে, আমাদের কর্মের কোনো উপকরণ আমরা গবর্মেন্টের নিকট হইতে লইব না, কিন্তু ইহাই বুঝায় যে, নিজের সম্পূর্ণ সাধ্যমত যদি কর্মে প্রবৃত্ত হই তবেই তাহার উপকরণ আমরা সকল স্থান হইতেই অসংকোচে সংগ্রহ করিবার অধিকারী হইব। নতুবা আমাদের সেই গল্পের দশা ঘটিবে। আমরা মা কালীর কাছে মহিষ মানত করিবার বেলা চিন্তা করিব না বটে কিন্তু পরে তিনি যখন অনেক ক্ষমা করিয়াও একটিমাত্র পতঙ্গ দাবি করিবেন তখন বলিব, মা, ওটা তুমি নিজে ক্ষেত্রে গিয়া ধরিয়া লও গে। আমরাও কথার বেলায় বড়ো বড়ো করিয়াই বলিব কিন্তু অবশেষে দেশের একটি সামান্য হিতসাধনের বেলাতেও অন্যের উপরে বরাত দিয়া দায় সারিবার ইচ্ছা করিব।

কাজে প্রবৃত্ত হইতে গেলে, রাগ করিয়া, গর্ব করিয়া, বা অন্য কারণে, যে-জিনিসটা নিশ্চিত আছে তাহাকে নাই বলিয়া হিসাব হইতে বাদ দিয়া বসিলে চলিবে না। ভারতে ইংরেজ-গবর্মেন্ট যেন একেবারেই নাই এমনভাবে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকা শয়নাগারেই চলে কিন্তু কর্মক্ষেত্রে সেরূপভাবে চলিলেই নিশ্চয় ঠকিতে হইবে।

অবশ্য এ-কথাও সত্য, ইংরেজও, যতদূর সম্ভব, এমনভাবে চলিতেছে যেন আমরা কোথাও নাই। আমাদের ত্রিশ কোটি লোকের মাঝখানে থাকিয়াও তাহারা বহুদূরে।

সেইজন্যই আমাদের সম্বন্ধে তাহাদের পরিমাণবোধ একেবারেই চলিয়া গেছে। সেইজন্যই পনেরো বৎসরের একটি ইস্কুলের ছেলেরও একটু তেজ দেখিলে তাহারা জেলের মধ্যে তাহাকে বেত মারিতে পারে; মানুষ সামান্য একটু নড়িলে-চড়িলেই প্যুনিটিভ পুলিসের চাপে তাহাকে সম্পূর্ণ নিশ্চল করিয়া ফেলিতে মনে তাহাদের ধিক্কার বোধ হয় না; এবং দুর্ভিক্ষে মরিবার মুখে লোকে যখন বিলাপ করিতে থাকে সেটাকে অত্যুক্তি বলিয়া অগ্রাহ্য করা তাহাদের পক্ষে সম্ভব হয়; সেইজন্যই বাংলার বিভাগব্যাপারে সমস্ত বাঙালিকেই বাদ দিয়া মর্লে সেটাকে "সেট্‌ল্‌ড ফ্যাক্ট" বলিয়া গণ্য করিতে পারিয়াছেন। এইরূপে আচারে বিচারে এবং রাষ্ট্রবিধানে যখন দেখিতে পাই ইংরেজের খাতার হিসাবের অঙ্কে আমরা কতবড়ো একটা শূন্য তখন ইহার পালটাই দিবার জন্য আমরাও উহাদিগকে যতদূর পারি অস্বীকার করিবার ভঙ্গি করিতে ইচ্ছা করি।

কিন্তু খাতায় আমাদিগকে একেবারে শূন্যের ঘরে বসাইয়া গেলেও আমরা তো সত্যই একেবারে শূন্য নহি। ইংরেজের শুমারনবিস ভুল হিসাবে যে অঙ্কটা ক্রমাগতই হরণ করিয়া চলিতেছে তাহাতে তাহার সমস্ত খাতা দূষিত হইয়া উঠিতেছে। গায়ের জোরে হাঁ-কে না করিলে গণিতশাস্ত্র ক্ষমা করিবার লোক নয়।

একপক্ষে এই ভুল করিতেছে বলিয়া রাগ করিয়া আমারও কি সেই ভুলটাই করিব? পরের উপর বিরক্ত হইয়া নিজের উপরেই তাহার প্রতিশোধ তুলিব? ইহা তো কাজের প্রণালী নহে।

বিরোধমাত্রই একটা শক্তির ব্যয়—অনাবশ্যক বিরোধ অপব্যয়। দেশের হিতব্রতে যাঁহারা কর্মযোগী, অত্যাবশ্যক কণ্টকক্ষত তাঁহাদিগকে পদে পদে সহ্য করিতেই হইবে; কিন্তু শক্তির ঔদ্ধত্যপ্রকাশ করিবার জন্য স্বদেশের যাত্রাপথে নিজের চেষ্টায় কাঁটার চাষ করা কি দেশহিতৈষিতা!

আমরা এই যে বিদেশী-বর্জনব্রত গ্রহণ করিয়াছি ইহারই দুঃখ তো আমাদের পক্ষে সামান্য নহে। স্বয়ং য়ুরোপেই ধনী আপন ধনবৃদ্ধির পথ অব্যাহত রাখিবার জন্য শ্রমীকে কিরূপ নাগপাশে বেষ্টন করিয়া ফেলিতেছে এবং তাহা লইয়া সেখানে কতই কঠিন আঘাতপ্রতিঘাত চলিতেছে। আমাদের দেশে সেই ধনী শুধু ধনী নন জেলের দারোগা, লিভারপুলের নিমক খাইয়া থাকে।

অতএব এ-দেশের যে-ধন লইয়া পৃথিবীতে তাঁহারা ঐশ্বর্যের চূড়ায় উঠিয়াছেন সেই ধনের রাস্তায় আমরা একটা সামান্য বাধা দিলেও তাঁহারা তো আমাদিগকে সহজে ছাড়িবেন না। এমন অবস্থায় যে-সংঘাত আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে তাহা খেলা নহে,—তাহাতে আরাম-বিশ্রামের অবকাশ নাই, তাহাতে আমাদের সমস্ত শক্তি ও সহিষ্ণুতার

প্রয়োজন আছে। ইহার উপরেও যাঁহারা অনাহত ঔদ্ধত্য ও অনাবশ্যক উষ্ণবাক্য প্রয়োগ করিয়া আমাদের কর্মের দুরূহতাকে কেবলই বাড়াইয়া তুলিয়াছেন তাঁহারা কি দেশের কাছে অপরাধী নহেন? কাজের কঠোরতাকে সম্পূর্ণ গ্রহণ করিব, কিছুতেই পরাভব স্বীকার করিব না—দেশের শিল্পবাণিজ্যকে স্বাধীন করিয়া নিজের শক্তি অনুভব করিব, দেশের বিদ্যাশিক্ষাকে স্বায়ত্ত করিব, সমাজকে দেশের কর্তব্যসাধনের উপযোগী বলিষ্ঠ করিয়া তুলিব ;—ইহা করিতে গেলে ঘরে পরে দুঃখ ও বাধার অবধি থাকিবে না, সেজন্য অপরাজিতচিত্তে প্রস্তুত হইব কিন্তু বিরোধকে বিলাসের সামগ্রী করিয়া তুলিব না। দেশের কাজ নেশার কাজ নহে, তাহা সংযমীর দ্বারা যোগীর দ্বারাই সাধ্য।

মনে করিবেন না, ভয় বা সংকোচ বশত আমি এ-কথা বলিতেছি। দুঃখকে আমি জানি, দুঃখকে আমি মানি, দুঃখ দেবতারই প্রকাশ; সেইজন্যই ইহার সম্বন্ধে কোনো চাপল্য শোভা পায় না। দুঃখ দুর্বলকেই হয় স্পর্ধায় নয় অভিভূতিতে লইয়া যায়। প্রচণ্ডতাকেই যদি প্রবলতা বলিয়া জানি, কলহকেই যদি পৌরুষ বলিয়া গণ্য করি, এবং নিজেকে সর্বত্র ও সর্বদাই অতিমাত্র প্রকাশ করাকেই যদি আত্মোপলব্ধির স্বরূপ বলিয়া স্থির করি তবে দুঃখের নিকট হইতে আমরা কোনো মহৎ শিক্ষা প্রত্যাশা করিতে পারিব না।

দেশে আমাদের যে বৃহৎ কর্মস্থানকে প্রস্তুত করিয়া তুলিতে হইবে কেমন করিয়া তাহা আরম্ভ করিব? উচ্চ চূড়াকে আকাশে তুলিতে গেলে তাহার ভিত্তিকে প্রশস্ত করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়। আমাদের কর্মশক্তির চূড়াকে ভারতবর্ষের কেন্দ্রস্থলে যদি অভ্রভেদী করিতে চাই তবে প্রত্যেক জেলা হইতে তাহার ভিত গাঁথার কাজ আরম্ভ করিতে হইবে। প্রভিন্সাল কনফারেন্সের ইহাই সার্থকতা।

প্রত্যেক প্রদেশে একটি করিয়া প্রাদেশিক প্রতিনিধিসভা স্থাপিত হইবে। এই সভা যথাসম্ভব গ্রামে গ্রামে আপনার শাখা বিস্তার করিয়া সমস্ত জেলাকে আচ্ছন্ন করিবে—প্রথমে সমস্ত প্রদেশের সর্বাংশের সকলপ্রকার তথ্য সম্পূর্ণরূপে সংগ্রহ করিবে—কারণ কর্মের ভূমিকাই জ্ঞান। যেখানে কাজ করিতে হইবে সর্বাগ্রে তাহার সমস্ত অবস্থা জানা চাই।

দেশের সমস্ত গ্রামকে নিজের সর্বপ্রকার প্রয়োজনসাধনক্ষম করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে। কতকগুলি পল্লী লইয়া এক-একটি মণ্ডলী স্থাপিত হইবে। সেই মণ্ডলীর প্রধানগণ যদি গ্রামের সমস্ত কর্মের এবং অভাবমোচনের ব্যবস্থা করিয়া মণ্ডলীকে নিজের মধ্যে পর্যাপ্ত করিয়া তুলিতে পারে তবেই স্বায়ত্তশাসনের চর্চা দেশের সর্বত্র সত্য

হইয়া উঠিবে। নিজের পাঠশালা, শিল্পশিক্ষালয়, ধর্মগোলা, সমবেত পণ্যভাণ্ডার ও ব্যাঙ্ক স্থাপনের জন্য ইহাদিগকে শিক্ষা, সাহায্য ও উৎসাহ দান করিতে হইবে। প্রত্যেক মণ্ডলীর একটি করিয়া সাধারণ মণ্ডপ থাকিবে সেখানে কর্মে ও আমোদে সকলে একত্র হইবার স্থান পাইবে এবং সেইখানে ভারপ্রাপ্ত প্রধানেরা মিলিয়া সালিসের দ্বারা গ্রামের বিবাদ ও মামলা মিটাইয়া দিবে।

জোতদার ও চাষা রায়ত যতদিন প্রত্যেকে স্বতন্ত্র থাকিয়া চাষবাস করিবে ততদিন তাহাদের অসচ্ছল অবস্থা কিছুতেই ঘুচিবে না। পৃথিবীতে চারিদিকে সকলেই জোট বাঁধিয়া প্রবল হইয়া উঠিতেছে; এমন অবস্থায় যাহারাই বিচ্ছিন্ন এককভাবে থাকিবে তাহাদিগকে চিরদিনই অন্যের গোলামি ও মজুরি করিয়া মরিতেই হইবে।

অদ্যকার দিনে যাহার যতটুকু ক্ষমতা আছে সমস্ত একত্র মিলাইয়া বাঁধ বাঁধিবার সময় আসিয়াছে। এ না হইলে ঢালু পথ দিয়া আমাদের ছোটো ছোটো সামর্থ্য ও সম্বলের ধারা বাহির হইয়া গিয়া অন্যের জলাশয় পূর্ণ করিবে। অন্ন থাকিতেও আমরা অন্ন পাইব না এবং আমরা কী কারণে কেমন করিয়া যে মরিতেছি তাহা জানিতেও পারিব না। আজ যাহাদিগকে বাঁচাইতে চাই তাহাদিগকে মিলাইতে হইবে।

য়ুরোপে আমেরিকায় কৃষির নানাপ্রকার মিতশ্রমিক যন্ত্র বাহির হইয়াছে—নিতান্ত দারিদ্র্যবশত সে-সমস্ত আমাদের কোনো কাজেই লাগিতেছে না—অল্প জমি ও অল্প শক্তি লইয়া সে-সমস্ত যন্ত্রের ব্যবহার সম্ভব নহে। যদি এক-একটি মণ্ডলী অথবা এক-একটি গ্রামের সকলে সমবেত হইয়া নিজেদের সমস্ত জমি একত্র মিলাইয়া দিয়া কৃষিকার্যে প্রবৃত্ত হয় তবে আধুনিক যন্ত্রাদির সাহায্যে অনেক খরচ বাঁচিয়া ও কাজের সুবিধা হইয়া তাহারা লাভবান হইতে পারে। যদি গ্রামের উৎপন্ন সমস্ত ইক্ষু তাহারা এক কলে মাড়াই করিয়া লয় তবে দামি কল কিনিয়া লইলে তাহাদের লাভ বই লোকসান হয় না—পাটের খেত সমস্ত এক করিয়া লইলে প্রেসের সাহায্যে তাহারা নিজেরাই পাট বাঁধাই করিয়া লইতে পারে—গোয়ালারা একত্র হইয়া জোট করিলে গোপালন ও মাখন ঘৃত প্রভৃতি প্রস্তুত করা সস্তায় ও ভালোমতে সম্পন্ন হয়। তাঁতিরা জোট বাঁধিয়া নিজের পল্লীতে যদি কল আনে এবং প্রত্যেকে তাহাতে আপনার খাটুনি দেয় তবে কাপড় বেশি পরিমাণে উৎপন্ন হওয়াতে তাহাদের প্রত্যেকেরই সুবিধা ঘটে।

শহরে ধনী মহাজনের কারখানায় মজুরি করিতে গেলে শ্রমীদিগের মনুষ্যত্ব কিরূপ নষ্ট হয় সকলেই জানেন। বিশেষত আমাদের যে-দেশের সমাজ গৃহের উপরে প্রতিষ্ঠিত, যেখানে গৃহনীতি বিচলিত হইলে ধর্মের প্রধান অবলম্বন জীর্ণ হইয়া পড়ে ও সমাজের

মর্মস্থানে বিষসঞ্চার হইতে থাকে সে-দেশে বড়ো বড়ো কারখানা যদি শহরের মধ্যে আবর্ত রচনা করিয়া চারিদিকের গ্রামপল্লী হইতে দরিদ্র গৃহস্থদিগকে আকর্ষণ করিয়া আনে তবে স্বাভাবিক অবস্থা হইতে বিচ্যুত, বাসস্থান হইতে বিশ্লিষ্ট স্ত্রীপুরুষগণ নিরানন্দকর কলের কাজে ক্রমশই কিরূপ দুর্গতির মধ্যে নিমজ্জিত হইতে পারে তাহা অনুমান করা কঠিন নহে। কলের দ্বারা কেবল জিনিসপত্রের উপচয় করিতে গিয়া মানুষের অপচয় করিয়া বসিলে সমাজের অধিকদিন তাহা সহিবে না। অতএব পল্লীবাসীরাই একত্রে মিলিলে যে-সকল যন্ত্রের ব্যবহার সম্ভবপর হয় তাহারই সাহায্যে স্বস্থানেই কর্মের উন্নতি করিতে পারিলে সকলদিক রক্ষা হইতে পারে। শুধু তাই নয় দেশের জনসাধারণকে ঐক্যনীতিতে দীক্ষিত করিবার এই একটি উপায়। প্রাদেশিক সভা উপদেশ ও দৃষ্টান্ত দ্বারা একটি মণ্ডলীকেও যদি এইরূপে গড়িয়া তুলিতে পারেন তবে এই দৃষ্টান্তের সফলতা দেখিতে দেখিতে চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে।

এমনি করিয়া ভারতবর্ষের প্রদেশগুলি আত্মনির্ভরশীল ও ব্যূহবদ্ধ হইয়া উঠিলে ভারতবর্ষের দেশগুলির মধ্যে তাহার কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা সার্থক হইয়া উঠিবে এবং সেই দৈশিক কেন্দ্রগুলি একটি মাহাদেশিক কেন্দ্রচূড়ায় পরিণত হইবে। তখনই সেই কেন্দ্রটি ভারতবর্ষের সত্যকার কেন্দ্র হইবে। নতুবা পরিধি যাহার প্রস্তুতই হয় নাই সেই কেন্দ্রের প্রামাণিকতা কোথায়? এবং যাহার মধ্যে দেশের কর্মের কোনো উদ্‌যোগ নাই কেবলমাত্র দুর্বল জাতির দাবি এবং দায়িত্বহীন পরামর্শ সে-সভা দেশের রাজকর্মসভার সহযোগী হইবার আশা করিবে কোন্ সত্যের এবং কোন্ শক্তির বলে?

কল আসিয়া যেমন তাঁতকে মারিয়াছে তেমনি ব্রিটিশশাসনও সর্বগ্রহ ও সর্বব্যাপী হইয়া আমাদের গ্রাম্যসমাজের সহজ ব্যবস্থাকে নষ্ট করিয়া দিয়াছে। কালক্রমে প্রয়োজনের বিস্তারবশত ছোটো ব্যবস্থা যখন বড়ো ব্যবস্থায় পরিণত হয় তখন তাহাতে ভালো বই মন্দ হয় না—কিন্তু তাহা স্বাভাবিক পরিণতি হওয়া চাই। আমাদের যে গ্রাম্যব্যবস্থা ছিল, ছোটো হইলেও তাহা আমাদেরই ছিল, ব্রিটিশ ব্যবস্থা যতবড়োই হউক তাহা আমাদের নহে। সুতরাং তাহাতে যে কেবল আমাদের শক্তির জড়তা ঘটিয়াছে তাহা নহে তাহা আমাদের সমস্ত প্রয়োজন ঠিকমতো করিয়া পূরণ করিতে পারিতেছে না। নিজের চক্ষুকে অন্ধ করিয়া পরের চক্ষু দিয়া কাজ চালানো কখনোই ঠিকমতো হইতে পারে না।

এখন তাই দেখা যাইতেছে গ্রামের মধ্যে চেষ্টার কোনো লক্ষণ নাই। জলাশয় পূর্বে ছিল আজ তাহা বুজিয়া আসিতেছে, কেননা দেশের স্বাভাবিক কাজ বন্ধ। যে গোচারণের মাঠ ছিল তাহা রক্ষণের কোনো উপায় নাই; যে দেবালয় ছিল তাহা

সংস্কারের কোনো শক্তি নাই; যে-সকল পণ্ডিত সমাজের বন্ধন ছিলেন তাঁহাদের গণ্ডমূর্খ ছেলেরা আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্যের ব্যবসায় ধরিয়াছে; যে-সকল ধনিগৃহে ক্রিয়াকর্মে যাত্রায় গানে সাহিত্যরস ও ধর্মের চর্চা হইত তাঁহারা সকলেই শহরে আকৃষ্ট হইয়াছেন; যাঁহারা দুর্বলের সহায়, শরণাগতের আশ্রয় ও দুষ্কৃতকারীর দণ্ডদাতা ছিলেন তাঁহাদের স্থান পুলিসের দারোগা আজ কিরূপভাবে পূরণ করিতেছে তাহা কাহারও অগোচর নাই; লোকহিতের কোনো উচ্চ আদর্শ, পরার্থে আত্মত্যাগের কোনো উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত গ্রামের মাঝখানে আর নাই; কোনো বিধিনিষেধের শক্তি ভিতর হইতে কাজ করিতেছে না, আইনে যে কৃত্রিম বাঁধ দিতে পারে তাহাই আছে মাত্র; পরস্পরের বিরুদ্ধে মিথ্যা মকদ্দমায় গ্রাম উন্মাদের মতো নিজের নখে নিজেকে ছিন্ন করিতেছে, আহাকে প্রকৃতিস্থ করিবার কেহ নাই; জঙ্গল বাড়িয়া উঠিতেছে, ম্যালেরিয়া নিদারুণ হইতেছে, দুর্ভিক্ষ ফিরিয়া ফিরিয়া আসিতেছে; আকাল পড়িলে পরবর্তী ফসল পর্যন্ত ক্ষুধা মিটাইয়া বাঁচিবে এমন সঞ্চয় নাই; ডাকাত অথবা পুলিস চুরি অথবা চুরি-তদন্ত জন্য ঘরে ঢুকিলে ক্ষতি ও অপমান হইতে আপনার গৃহকে বাঁচাইবে এমন পরস্পর-ঐক্যমূলক সাহস নাই; তাহার পর যা খাইয়া শরীর বল পায় ও ব্যাধিকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারে তাহার কী অবস্থা। ঘি দূষিত, দুধ দুর্মূল্য, মৎস্য দুর্লভ, তৈল বিষাক্ত; যে-কয়টা স্বদেশী ব্যাধি ছিল তাহারা আমাদের যকৃৎ-প্লীহার উপর সিংহাসন পাতিয়া বসিয়াছে; তাহার উপর বিদেশী ব্যাধিগুলা অতিথির মতো আসে এবং কুটুম্বের মতো রহিয়া যায়;—ডিপথিরিয়া, রাজযক্ষ্মা, টাইফয়েড সকলেই এই রক্তহীনদের প্রতি এক্সপ্লয়টেশন-নীতি অবলম্বন করিয়াছে। অন্ন নাই, স্বাস্থ্য নাই, আনন্দ নাই, ভরসা নাই, পরস্পরের সহযোগিতা নাই, আঘাত উপস্থিত হইলে মাথা পাতিয়া লই, মৃত্যু উপস্থিত হইলে নিশ্চেষ্ট হইয়া মরি, অবিচার উপস্থিত হইলে নিজের অদৃষ্টকেই দোষী করি এবং আত্মীয়ের বিপদ উপস্থিত হইলে দৈবের উপর তাহার ভার সমর্পণ করিয়া বসিয়া থাকি। ইহার কারণ কী। ইহার কারণ এই, সমস্ত দেশ যে-শিকড় দিয়া রস আকর্ষণ করিবে সেই শিকড়ে পোকা ধরিয়াছে, যে-মাটি হইতে বাঁচিবার খাদ্য পাইবে সেই মাটি পাথরের মতো কঠিন হইয়া গিয়াছে—যে গ্রামসমাজ জাতির জন্মভূমি ও আশ্রয়স্থান তাহার সমস্ত ব্যবস্থাবন্ধন বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে; এখন সে ছিন্নমূল বৃক্ষের মতো নবীনকালের নির্দয় বন্যার মুখে ভাসিয়া যাইতেছে।

দেশের মধ্যে পরিবর্তন বাহির হইতে আসিলে পুরাতন আশ্রয়টা যখন অব্যবহারে ভাঙিয়া পড়ে, এবং নূতন কালের উপযোগী কোনো নূতন ব্যবস্থাও গড়িয়া উঠে না তখন সেইরূপ যুগান্তকালে বহুতর পুরাতন জাতি পৃথিবী হইতে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

আমরাও কি দিনে দিনে উদাস দৃষ্টির সম্মুখে স্বজাতিকে লুপ্ত হইতে দেখিব ? ম্যালেরিয়া, মারী, দুর্ভিক্ষ—এগুলি কি আকস্মিক ? এগুলি কি আমাদের সান্নিপাতিকের মজ্জাগত দুর্লক্ষণ নহে ? সকলের চেয়ে ভয়ংকর দুর্লক্ষণ সমগ্র দেশের হৃদয়নিহিত হতাশ নিশ্চেষ্টতা। কিছুরই যে প্রতিকার আমাদের নিজের হাতে আছে, কোনো ব্যবস্থাই যে আমরা নিজে করিতে পারি সেই বিশ্বাস যখন চলিয়া যায়, যখন কোনো জাতি কেবল করুণভাবে ললাটে করস্পর্শ করে ও দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া আকাশের দিকে তাকায় তখন কোনো সামান্য আক্রমণও সে আর সহিতে পারে না, প্রত্যেক ক্ষুদ্র ক্ষত দেখিতে দেখিতে তাহার পক্ষে বিষক্ষত হইয়া উঠে। তখন সে মরিলাম মনে করিয়াই মরিতে থাকে।

কিন্তু কালরাত্রি বুঝি পোহাইল,—রোগীর বাতায়নপথে প্রভাতের আলোক আশা বহন করিয়া আসিয়াছে ; আজ আমরা দেশের শিক্ষিত ভদ্রমণ্ডলী—যাহারা একদিন সুখে দুঃখে সমস্ত জনসাধারণের সঙ্গী ও সহায় ছিলাম এবং আজ যাহারা ভদ্রতা ও শিক্ষার বিলাস বশতই চিন্তায় ভাষায় ভাবে আচারে কর্মে সর্ববিষয়েই সাধারণ হইতে কেবলই দূরে চলিয়া যাইতেছি, আমাদিগকে আর-একবার উচ্চনীচ সকলের সঙ্গে মঙ্গল-সম্বন্ধে একত্র মিলিত হইয়া সামাজিক অসামঞ্জস্যের ভয়ংকর বিপদ হইতে দেশের ভবিষ্যৎকে রক্ষা করিতে হইবে। আমাদের শক্তিকে দেশের কল্যাণকর ও দেশের শক্তিকে আমাদের কর্মের সহযোগী করিয়া তুলিবার সময় প্রত্যহ বহিয়া যাইতেছে। যাহারা স্বভাবতই এক অঙ্গ তাহাদের মাঝখানে বাধা পড়িয়া যদি এক রক্ত এক প্রাণ অবাধে সঞ্চারিত হইতে না পারে তবে যে একটা সাংঘাতিক ব্যাধি জন্মে সেই ব্যাধিতেই আজ আমরা মরিতে বসিয়াছি। পৃথিবীতে সকলেই আজ ঐক্যবদ্ধ হইতেছে, আমরাই কেবল সকলদিকে বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়িতেছি আমরা টিকিতে পারিব কেমন করিয়া ?

আমাদের চেতনা জাতীয় অঙ্গের সর্বত্রই যে প্রসারিত হইতেছে না—আমাদের বেদনাবোধ যে অতিশয় পরিমাণে কেবল শহরে, কেবল বিশিষ্ট সমাজেই বদ্ধ তাহার একটা প্রমাণ দেখুন। স্বদেশী-উদ্‌যোগটা তো শহরের শিক্ষিতমণ্ডলীই প্রবর্ত্তন করিয়াছেন কিন্তু মোটের উপরে তাঁহারা বেশ নিরাপদেই আছেন। যাহারা বিপদে পড়িয়াছে তাহারা কাহারা ?

জগদ্দল পাথর বুকের উপরে চাপাইয়া দেওয়া যে একটা দণ্ডবিধি তাহা রূপকথায় শুনিয়াছিলাম। বর্তমান রাজশাসনে রূপকথার সেই জগদ্দল পাথরটা প্যুনিটিভ পুলিসের বাস্তব মূর্তি ধরিয়া আসিয়াছে।

কিন্তু এই পাথরটা অসহায় গ্রামের উপরে চাপিয়াছে বলিয়াই ইহার চাপ আমাদের

সকলের বুকে পড়িতেছে না কেন? বাংলাদেশের এই বক্ষের ভারকে আমরা সকলে মিলিয়া ভাগ করিয়া লইয়া বেদনাকে সমান করিয়া তুলিব না কেন? স্বদেশী-প্রচার যদি অপরাধ হয় তবে প্যুনিটিভ পুলিসের ব্যয়ভার আমরা সকল অপরাধীই বাঁটিয়া লইব। এই বেদনা যদি সকল বাঙালির সামগ্রী হইয়া উঠে তবে ইহা আর বেদনাই থাকিবে না, আনন্দই হইয়া উঠিবে।

এই উপলক্ষে দেশের জমিদারের প্রতি আমার নিবেদন এই যে, বাঙলার পল্লীর মধ্যে প্রাণসঞ্চারের জন্য তাঁহারা উদ্‌যোগী না হইলে এ-কাজ কখনোই সুসম্পন্ন হইবে না। পল্লী সচেতন হইয়া নিজের শক্তি নিজে অনুভব করিতে থাকিলে জমিদারের কর্তৃত্ব ও স্বার্থ খর্ব হইবে বলিয়া আপাতত আশঙ্কা হইতে পারে—কিন্তু এক পক্ষকে দুর্বল করিয়া নিজের স্বেচ্ছাচারের শক্তিকে কেবলই বাধাহীন করিতে থাকা আর ডাইনামাইট বুকের পকেটে লইয়া বেড়ানো একই কথা—একদিন প্রলয়ের অস্ত্র বিমুখ হইয়া অস্ত্রীকেই বধ করে। রায়তদিগকে এমনভাবে সবল ও শিক্ষিত করিয়া রাখা উচিত যে, ইচ্ছা করিলেও তাহাদের প্রতি অন্যায় করিবার প্রলোভনমাত্র জমিদারের মনে না উঠিতে পারে। জমিদার কি বণিকের মতো কেবল দীনভাবে আদায় করিবার পথগুলিই সর্বপ্রকারে মুক্ত রাখিবেন? কিন্তু সেইসঙ্গে মহৎভাবে স্বার্থত্যাগ করিবার সম্বন্ধ যদি একান্ত যত্নে না রক্ষা করেন, উচিত ক্ষতি উদারভাবে স্বীকার করিবার শক্তি যদি তাঁহার না থাকে তবে তাঁহার আত্মসম্মান কেমন করিয়া থাকিবে? রাজহাটে উপাধি কিনিবার বেলায় তিনি তো লোকসানকে লোকসান জ্ঞান করেন না? কিন্তু যথার্থ রাজা হইবার একমাত্র স্বাভাবিক অধিকার আছে তাঁহার রায়তদের কাছে। তিনি যে বহুতর লোকের প্রভু, বন্ধু ও রক্ষক, বহুলোকের মঙ্গলবিধানকর্তা, পৃথিবীতে এতবড়ো উচ্চপদলাভ করিয়া এ-পদের দায়িত্ব রক্ষা করিবেন না?

এ-কথা যেন না মনে করি যে, দূরে বসিয়া টাকা ঢালিতে পারিলেই রায়তের হিত করা যায়। এ-সম্বন্ধে একটি শিক্ষা কোনোদিন ভুলিব না। একসময়ে আমি মফস্বলে কোনো জমিদারি তত্ত্বাবধানকালে সংবাদ পাইলাম, পুলিসের কোনো উচ্চ কর্মচারী কেবল যে একদল জেলের গুরুতর ক্ষতি করিয়াছে তাহা নহে, তদন্তের উপলক্ষ্য করিয়া তাহাদের গ্রামে গৃহস্থদের মধ্যে বিষম অশান্তি উপস্থিত করিয়াছে। আমি উৎপীড়িত জেলেদের ডাকিয়া বলিলাম, তোরা উৎপাতকারীর নামে দেওয়ানি ও ফৌজদারি যেমন ইচ্ছা নালিশ কর আমি কলিকাতা হইতে বড়ো কৌঁসুলি আনাইয়া মকদ্দমা চালাইব। তাহারা হাত জোড় করিয়া কহিল, কর্তা, মামলায় জিতিয়া লাভ কী? পুলিসের বিরুদ্ধে দাঁড়াইলে আমরা ভিটায় টিকিতেই পারিব না।

আমি ভাবিয়া দেখিলাম দুর্বল লোক জিতিয়াও হারে ; চমৎকার অস্ত্রচিকিৎসা হয় কিন্তু ক্ষীণরোগী চিকিৎসার দায়েই মারা পড়ে। তাহার পর হইতে এই কথা আমাকে বারংবার ভাবিতে হইয়াছে আর-কোনো দান দানই নহে, শক্তিদানই একমাত্র দান।

একটা গল্প আছে, ছাগশিশু একবার ব্রহ্মার কাছে গিয়া কাঁদিয়া বলিয়াছিল, "ভগবান, তোমার পৃথিবীতে আমাকে সকলেই খাইতে চায় কেন?" তাহাতে ব্রহ্মা উত্তর করিয়াছিলেন "বাপু, অন্যকে দোষ দিব কী, তোমার চেহারা দেখিলে আমারই খাইতে ইচ্ছা করে।"

পৃথিবীতে অক্ষম বিচার পাইবে, রক্ষা পাইবে এমন ব্যবস্থা দেবতাই করিতে পারেন না। ভারতমন্ত্রসভা হইতে আরম্ভ করিয়া পার্লামেন্ট পর্যন্ত মাথা খুঁড়িয়া মরিলেও ইহার যথার্থ প্রতিবিধান হইতে পারে না। সাধু ইচ্ছা এখানে অশক্ত। দুর্বলতার সংস্রবে আইন আপনি দুর্বল হইয়া পড়ে, পুলিস আপনি বিভীষিকা হইয়া উঠে। এবং যাঁহাকে রক্ষাকর্তা বলিয়া দোহাই পাড়ি স্বয়ং তিনিই পুলিসের ধর্মবাপ হইয়া দাঁড়ান।

এদিকে প্রজার দুর্বলতা সংশোধন আমাদের কর্তৃপক্ষদের বর্তমান রাজনীতির বিরুদ্ধ। যিনি পুলিস-কমিশনে বসিয়া একদিন ধর্মবুদ্ধির জোরে পুলিসকে অত্যাচারী বলিয়া কটুবাক্য বলেন তিনিই লাটের গদিতে বসিয়া কর্মবুদ্ধির ঝোঁকে সেই পুলিসের বিষদাঁতে সামান্য আঘাতটুকু লাগিলেই অসহ্য বেদনায় অশ্রুবর্ষণ করিতে থাকেন। তাহার কারণ আর-কিছুই নহে, কচি পাঁঠাটিকে অন্যের হাত হইতে রক্ষাযোগ্য করিতে গেলে পাছে সে তাঁহার নিজের চতুর্মুখের পক্ষেও কিছুমাত্র শক্ত হইয়া উঠে এ আশঙ্কা তিনি ছাড়িতে পারেন না। দেবা দুর্বলঘাতকাঃ।

তাই দেশের জমিদারদিগকে বলিতেছি, হতভাগ্য রায়তদিগকে পরের হাত এবং নিজের হাত হইতে রক্ষা করিবার উপযুক্ত শিক্ষিত, সুস্থ ও শক্তিশালী করিয়া না তুলিলে কোনো ভালো আইন বা অনুকূল রাজশক্তির দ্বারা ইহারা কদাচ রক্ষা পাইতে পারিবে না। ইহাদিগকে দেখিবামাত্র সকলেরই জিহ্বা লালায়িত হইবে। এমনি করিয়া দেশের অধিকাংশ লোককেই যদি জমিদার, মহাজন, পুলিস, কানুনগো, আদালতের আমলা, যে ইচ্ছা সে অনায়াসেই মারিয়া যায় ও মারিতে পারে তবে দেশের লোককে মানুষ হইতে না শিখাইয়াই রাজা হইতে শিখাইব কী করিয়া?

অবশেষে বর্তমানকালে আমাদের দেশের যে-সকল দৃঢ়নিষ্ঠ যুবক সমস্ত সংকট উপেক্ষা করিয়াও স্বদেশহিতের জন্য স্বেচ্ছাব্রত ধারণ করিতেছেন অদ্য এই সভাস্থলে তাঁহারা সমস্ত বঙ্গদেশের আশীর্বাদ গ্রহণ করুন। রক্তবর্ণ প্রত্যূষে তোমরাই সর্বাগ্রে জাগিয়া উঠিয়া অনেক দ্বন্দ্বসংঘাত এবং অনেক দুঃখ সহ্য করিলে। তোমাদের সেই

পৌরুষের উদ্‌বোধন কেবলমাত্র বজ্রঝংকারে ঘোষিত হইয়া উঠে নাই, আজ করুণাবর্ষণে তৃষ্ণাতুর দেশে প্রেমের বাদল আনিয়া দিয়াছে। সকলে যাহাদিগকে অবজ্ঞা করিয়াছে, অপমানে যাহারা অভ্যস্ত, যাহাদের সুবিধার জন্য কেহ কোনোদিন এতটুকু স্থান ছাড়িয়া দেয় নাই, গৃহের বাহিরে যাহারা কাহারও কাছে কোনো সহায়তা প্রত্যাশা করিতেও জানে না তোমাদের কল্যাণে আজ তাহারা দেশের ছেলেদিগকে ভাই বলিতে শিখিল। তোমাদের শক্তি আজ যখন প্রীতিতে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে তখন পাষাণ গলিয়া যাইবে, মরুভূমি উর্বরা হইয়া উঠিবে, তখন ভগবান আর আমাদের প্রতি অপ্রসন্ন থাকিবেন না। তোমরা ভগীরথের ন্যায় তপস্যা করিয়া রুদ্রদেবের জটা হইতে এবার প্রেমের গঙ্গা আনিয়াছ; ইহার প্রবল পুণ্যস্রোতকে ইন্দ্রের ঐরাবতও বাধা দিতে পারিবে না, এবং ইহার স্পর্শমাত্রেই পূর্বপুরুষের ভস্মরাশি সঞ্জীবিত হইয়া উঠিবে। হে তরুণতেজে উদ্দীপ্ত, ভারতবিধাতার প্রেমের দূতগুলি, আমি আজ তোমাদের জয়ধ্বনি উচ্চারণ করিয়া এই নিবেদন করিতেছি যে, দেশে অর্ধোদয় যোগ কেবল একদিনের নহে। স্বদেশের অসহায় অনাথগণ যে বঞ্চিত, পীড়িত ও ভীত হইতেছে সে কেবল কোনো বিশেষ স্থানে বা বিশেষ উপলক্ষে নহে, এবং তাহাদিগকে যে কেবল তোমাদের নিজের শক্তিতেই রক্ষা করিয়া কুলাইয়া উঠিতে পারিবে সে-দুরাশা করিয়ো না।

তোমরা যে পার এবং যেখানে পার এক-একটি গ্রামের ভার গ্রহণ করিয়া সেখানে গিয়া আশ্রয় লও। গ্রামগুলিকে ব্যবস্থাবদ্ধ করো। শিক্ষা দাও, কৃষিশিল্প ও গ্রামের ব্যবহারসামগ্রীসম্বন্ধে নূতন চেষ্টা প্রবর্তিত করো; গ্রামবাসীদের বাসস্থান যাহাতে পরিচ্ছন্ন, স্বাস্থ্যকর ও সুন্দর হয় তাহাদের মধ্যে সেই উৎসাহ সঞ্চার করো, এবং যাহাতে তাহারা নিজেরা সমবেত হইয়া গ্রামের সমস্ত কর্তব্য সম্পন্ন করে সেইরূপ বিধি উদ্‌ভাবিত করো। এ-কর্মে খ্যাতির আশা করিয়ো না এমন কি, গ্রামবাসীদের নিকট হইতে কৃতজ্ঞতার পরিবর্তে বাধা ও অবিশ্বাস স্বীকার করিতে হইবে। ইহাতে কোনো উত্তেজনা নাই, কোনো বিরোধ নাই, কোনো ঘোষণা নাই, কেবল ধৈর্য এবং প্রেম, নিভৃতে তপস্যা—মনের মধ্যে কেবল এই একটিমাত্র পণ যে, দেশের মধ্যে সকলের চেয়ে যাহারা দুঃখী তাহাদের দুঃখের ভাগ লইয়া সেই দুঃখের মূলগত প্রতিকার সাধন করিতে সমস্ত জীবন সমর্পণ করিব।

বাংলাদেশের প্রভিনশ্যাল কনফারেন্স যদি বাংলার জেলায় জেলায় এইরূপ প্রাদেশিক সভা স্থাপন করিয়া তাহাকে পোষণ করিয়া তুলিবার ভার গ্রহণ করেন, এবং এই প্রাদেশিক সভাগুলি গ্রামে পল্লীতে আপন ফলবান ও ছায়াপ্রদ শাখাপ্রশাখা বিস্তার করিয়া দেন তবেই স্বদেশের প্রতি আমাদের সত্য অধিকার জন্মিবে এবং স্বদেশের সর্বাঙ্গ

হইতে নানাধমনীযোগে জীবনসঞ্চারের বলে কনগ্রেস দেশের স্পন্দমান হৃৎপিণ্ডস্বরূপ মর্মপদার্থ হইয়া ভারতবর্ষের বক্ষের মধ্যে বাস করিবে।

সভাপতির অভিভাষণে সভার কার্যতালিকা অবলম্বন করিয়া আমি কোনো আলোচনা করি নাই। দেশের সমস্ত কার্যই যে-লক্ষ্য ধরিয়া চলিবে আমি তাহার মূলতত্ত্ব কয়টি নির্দেশ করিয়াছি মাত্র। সে-কয়টি এই—

প্রথম, বর্তমানকালের প্রকৃতির সহিত আমাদের দেশের অবস্থার সামঞ্জস্য করিতে না পারিলে আমাদিগকে বিলুপ্ত হইতে হইবে। বর্তমানের সেই প্রকৃতিটি—জোট বাঁধা, ব্যূহবদ্ধতা, অর্গ্যানিজেশন। সমস্ত মহৎগুণ থাকিলেও ব্যূহের নিকট কেবলমাত্র সমূহ আজ কিছুতেই টিকিতে পারিবে না। অতএব গ্রামে গ্রামে আমাদের মধ্যে যে বিশ্লিষ্টতা, যে মৃত্যুলক্ষণ দেখা দিয়াছে গ্রামগুলিকে সত্বর ব্যবস্থাবদ্ধ করিয়া তাহা ঠেকাইতে হইবে।

দ্বিতীয়, আমাদের চেতনা জাতীয়-কলেবরের সর্বত্র গিয়া পৌঁছিতেছে না। সেইজন্য স্বভাবতই আমাদের সমস্ত চেষ্টা এক জায়গায় পুষ্ট ও অন্য জায়গায় ক্ষীণ হইতেছে। জনসমাজের সহিত শিক্ষিতসমাজের নানাপ্রকারেই বিচ্ছেদ ঘটাতে জাতির ঐক্যবোধ সত্য হইয়া উঠিতেছে না।

তৃতীয়, এই ঐক্যবোধ কোনোমতেই কেবল উপদেশ বা আলোচনার দ্বারা সত্য হইতেই পারে না। শিক্ষিতসমাজ গণসমাজের মধ্যে তাঁহাদের কর্মচেষ্টাকে প্রসারিত করিলে তবেই আমাদের প্রাণের যোগ আপনিই সর্বত্র অবাধ সঞ্চারিত হইতে পারিবে।

সর্বসাধারণকে একত্র আকর্ষণ করিয়া একটি বৃহৎ কর্মব্যবস্থাকে গড়িয়া তুলিতে হইলে শিক্ষিতসমাজে নিজের মধ্যে বিরোধ করিয়া তাহা কখনো সম্ভবপর হইবে না। মতভেদ আমাদের আছেই, থাকিবেই এবং থাকাই শ্রেয় কিন্তু দূরের কথাকে দূরে রাখিয়া এবং তর্কের বিষয়কে তর্কসভায় রাখিয়া সমস্ত দেশকে বিনাশ ও বিচ্ছেদের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য সকল মতের লোককেই আজ এখনই একই কর্মের দুর্গম পথে একত্র যাত্রা করিতে হইবে, এ-সম্বন্ধে মতভেদ থাকিতেই পারে না। যদি থাকে, তবে বুঝিতে হইবে দেশের যে সাংঘাতিক দশা ঘটিয়াছে তাহা আমরা চোখ মেলিয়া দেখিতেছি না অথবা ওই সাংঘাতিক দশার যেটি সর্বাপেক্ষা দুর্লক্ষণ—নৈরাশ্যের ঔদাসীন্য—তাহা আমাদিগকেও দুরারোগ্যরূপে অধিকার করিয়া বসিয়াছে।

ভ্রাতৃগণ, জগতের যে-সমস্ত বৃহৎ কর্মক্ষেত্রে মানবজাতি আপন মহত্তম স্বরূপকে পরম দুঃখ ও ত্যাগের মধ্যে প্রকাশ করিয়া তুলিয়াছে, সেই উদার উন্মুক্ত ভূমিতেই আজ আমাদের চিত্তকে স্থাপিত করিব ;—যে-সমস্ত মহাপুরুষ দীর্ঘকালের কঠোরতম সাধনায়

যারা স্বজাতিকে সিদ্ধির পথে উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছেন, তাঁহাদিগকেই আজ আমাদের মনশ্চক্ষুর সম্মুখে রাখিয়া প্রণাম করিব, তাহা হইলেই অদ্য যে-মহাসভায় সমগ্র বাংলা-দেশের আকাঙ্ক্ষা আপন সফলতার জন্য দেশের লোকের মুখের দিকে চাহিয়াছে তাহার কর্ম যথার্থভাবে সম্পন্ন হইতে পারিবে। নতুবা সামান্য কথাটুকুর কলহে আত্মবিস্মৃত হইতে কতক্ষণ? নহিলে ব্যক্তিগত বিদ্বেষ হয়তো উদ্দেশ্যের পথে কাঁটা দিয়া উঠিবে এবং দলের অভিমানকেই কোনোমতে জয়ী করাকে স্বদেশের জয় বলিয়া ভুল করিয়া বসিব।

আমরা এক-এক কালের লোক কালের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে কোথায় নিষ্ক্রান্ত হইয়া চলিয়া যাইব—কোথায় থাকিবে আমাদের যত ক্ষুদ্রতা মান-অভিমান তর্কবিতর্ক বিরোধ—কিন্তু বিধাতার নিগূঢ় চালনায় আমাদের জীবনের কর্ম নিশ্চয়ই ধীরে ধীরে স্তরে-স্তরে আকৃতি দান করিয়া আমাদের দেশকে উপরের দিকে গড়িয়া তুলিবে। অন্ধকার দীনতার শ্রীহীনতার মধ্য দিয়া সেই মেঘবিমুক্ত সমুজ্জ্বল ভবিষ্যতের অভ্যুদয়কে এইখানেই আমাদের সম্মুখে প্রত্যক্ষ করো যেদিন আমাদের পৌত্রগণ সগৌরবে বলিতে পারিবে, এ-সমস্তই আমাদের, এ-সমস্তই আমরা গড়িয়াছি। আমাদের মাঠকে আমরা উর্বর করিয়াছি, জলাশয়কে নির্মল করিয়াছি, বায়ুকে নিরাময় করিয়াছি, বিদ্যাকে বিস্তৃত করিয়াছি ও চিত্তকে নির্ভীক করিয়াছি। বলিতে পারিবে আমাদের এই পরম সুন্দর দেশ—এই সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা মাতৃভূমি, এই জ্ঞানে ধর্মে কর্মে প্রতিষ্ঠিত বীর্যে বিধৃত জাতীয় সমাজ এ আমাদেরই কীর্তি—যেদিকে চাহিয়া দেখি সমস্তই আমাদের চিন্তা, চেষ্টা ও প্রাণের দ্বারা পরিপূর্ণ, আনন্দগানে মুখরিত এবং নূতন নূতন আশাপথের যাত্রীদের অক্লান্ত পদভারে কম্পমান।

১৩১৪

সদুপায়

বরিশালের কোনো এক স্থান হইতে বিশ্বস্তসূত্রে খবর পাইলাম যে, যদিও আজকাল করকচ লবণ বিলাতি লবণের চেয়ে সস্তা হইয়াছে তবু আমাদের সংবাদদাতার পরিচিত মুসলমানগণ অধিক দাম দিয়াও বিলাতি লবণ খাইতেছে। তিনি বলেন যে, সেখানকার মুসলমানগণ আজকাল সুবিধা বিচার করিয়া বিলাতি কাপড় বা লবণ ব্যবহার করে না। তাহারা নিতান্তই জেদ করিয়া করে।

অনেক স্থলে নমশূদ্রদের মধ্যেও এইরূপ ঘটনার সংবাদ পাওয়া যাইতেছে।

আমরা পার্টিশন-ব্যাপারে বিরক্ত হইয়া একদিন দেশকে বিলাতি কাপড় ছাড়াইব ইহাই পণ করিয়াছিলাম, ইহা অপেক্ষা বড়ো কথা এবং দূরের কথা আমরা ভাবি নাই।

যদি জিজ্ঞাসা কর ইহা অপেক্ষা বড়ো কথাটা কী তবে আমি এই উত্তর দিব যে, বাংলাদেশকে দুইভাগ করার দ্বারা যে আশঙ্কার কারণ ঘটিয়াছে সেই কারণটাকেই দূর করিবার প্রাণপণ চেষ্টা করা—রাগ প্রকাশ করা তাহার কাছে গৌণ।

পার্টিশনে আমাদের প্রধান আশঙ্কার কারণ কী? সে-কথা আমরা নিজেরা অনেকবার আলোচনা করিয়াছি; এমন কি, আমাদের মনে এই ধারণা আছে যে, সেইদিকে লক্ষ্য রাখিয়াই কর্তৃপক্ষ বাংলাকে পূর্ব ও অপূর্ব এই দুইভাগে বিভক্ত করিয়া বঙ্গকে ব্যঙ্গ অর্থাৎ বিকলাঙ্গ করিয়াছেন।

বাংলাদেশের পূর্বভাগে মুসলমানের সংখ্যাই অধিক। ধর্মগত ও সমাজগত কারণে মুসলমানের মধ্যে হিন্দুর চেয়ে ঐক্য বেশি—সুতরাং শক্তির প্রধান উপকরণ তাহাদের মধ্যে নিহিত হইয়া আছে। এই মুসলমান-অংশ, ভাষা সাহিত্য শিক্ষা প্রভৃতির একত্ববশত হিন্দুদের সঙ্গে অনেকগুলি বন্ধনে বদ্ধ আছে। যদি বাংলাকে হিন্দুপ্রধান ও মুসলমান-প্রধান এই দুই অংশে একবার ভাগ করা যায়, তবে ক্রমে ক্রমে হিন্দুমুসলমানের সকল বন্ধনই শিথিল করিয়া দেওয়া সহজ হয়।

ম্যাপে দাগ টানিয়া হিন্দুর সঙ্গে হিন্দুকে পৃথক করিয়া দেওয়া কঠিন। কারণ বাঙালি হিন্দুর মধ্যে সামাজিক ঐক্য আছে। কিন্তু মুসলমান ও হিন্দুর মাঝখানে একটা ভেদ রহিয়া গেছে। সেই ভেদটা যে কতখানি তাহা উভয়ে পরস্পর কাছাকাছি আছে বলিয়াই প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করা যায় নাই;—দুই পক্ষে একরকম করিয়া মিলিয়া ছিলাম।

কিন্তু যে-ভেদটা আছে রাজা যদি চেষ্টা করিয়া সেই ভেদটাকে বড়ো করিতে চান, এবং দুইপক্ষকে যথাসম্ভব স্বতন্ত্র করিয়া তোলেন তবে কালক্রমে হিন্দুমুসলমানের দূরত্ব এবং পরস্পরের মধ্যে ঈর্ষাবিদ্বেষের তীব্রতা বাড়িয়া চলিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

আসল কথা, আমাদের দুর্ভাগ্য দেশে ভেদ জন্মাইয়া দেওয়া কিছুই শক্ত নহে, মিলন ঘটাইয়া তোলাই কঠিন। বেহারিগণ বাঙালির প্রতিবেশী এবং বাঙালি অনেক দিন হইতেই বেহারিগণের সঙ্গে কারবার করিতেছে কিন্তু বাঙালির সঙ্গে বেহারির সৌহৃদ্য নাই সে-কথা বেহারবাসী বাঙালিমাত্রেই জানেন। শিক্ষিত উড়িয়াগণ বাঙালি হইতে নিজেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বলিয়া দাঁড় করাইতে উৎসুক এবং আসামিদেরও সেইরূপ অবস্থা। অতএব উড়িষ্যা আসাম বেহার ও বাংলা জড়াইয়া আমরা যে-দেশকে বহুদিন হইতে বাংলাদেশ বলিয়া জানিয়া আসিয়াছি তাহার সমস্ত অধিবাসী আপনাদিগকে

বাঙালি বলিয়া কখনো স্বীকার করে নাই এবং বাঙালিও বেহারি উড়িয়া এবং আসামিকে আপন করিয়া লইতে কখনো চেষ্টামাত্র করে নাই বরঞ্চ তাহাদিগকে নিজেদের অপেক্ষা হীন মনে করিয়া অবজ্ঞাদ্বারা পীড়িত করিয়াছে।

অতএব বাংলাদেশের যে-অংশের লোকেরা আপনাদিগকে বাঙালি বলিয়া জানে সে-অংশটি খুব বড়ো নহে এবং তাহার মধ্যেও যে ভূভাগ ফলে শস্যে উর্বর, ধনে ধান্যে পূর্ণ, যেখানকার অধিবাসীর শরীরে বল আছে; মনে তেজ আছে, ম্যালেরিয়া এবং দুর্ভিক্ষ যাহাদের প্রাণের সার শুষিয়া লয় নাই সেই অংশটিই মুসলমানপ্রধান—সেখানে মুসলমান-সংখ্যা বৎসরে বৎসরে বাড়িয়া চলিয়াছে, হিন্দু বিরল হইয়া পড়িতেছে।

এমন অবস্থায় এই বাঙালির বাংলাটুকুকেও এমন করিয়া যদি ভাগ করা যায় যাহাতে মুসলমান-বাংলা ও হিন্দু-বাংলাকে মোটামুটি স্বতন্ত্র করিয়া ফেলা যায় তাহা হইলে বাংলাদেশের মতো এমন খণ্ডিত দেশ ভারতবর্ষে আর-একটিও থাকিবে না।

এমন স্থলে বঙ্গবিভাগের জন্য আমরা ইংরেজরাজের প্রতি যতই রাগ করি না কেন এবং সেই ক্ষোভ প্রকাশ করিবার জন্য বিলাতি বর্জন আমাদের পক্ষে যতই একান্ত আবশ্যক হউক না, তাহার চেয়ে বড়ো আবশ্যক আমাদের পক্ষে কী ছিল? না, রাজকৃত বিভাগের দ্বারা আমাদের মধ্যে যাহাতে বিভাগ না ঘটে নিজের চেষ্টায় তাহারই সর্বপ্রকার ব্যবস্থা করা।

সেদিকে দৃষ্টি না করিয়া আমরা বয়কট-ব্যাপারটাকেই এত একমাত্র কর্তব্য বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলাম, যে-কোনোপ্রকারেই হ'ক বয়কটকে জয়ী করিয়া তোলাতেই আমাদের সমস্ত জেদ এত বেশিমাত্রায় চড়িয়া গিয়াছিল যে, বঙ্গবিভাগের যে-পরিণাম আশঙ্কা করিয়া পার্টিশনকে আমরা বিভীষিকা বলিয়া জানিয়াছিলাম সেই পরিণামকেই অগ্রসর হইতে আমরা সহায়তা করিলাম।

আমরা ধৈর্য হারাইয়া সাধারণের ইচ্ছা-অনিচ্ছা সুবিধা-অসুবিধা বিচারমাত্র না করিয়া বিলাতি লবণ ও কাপড়ের বহিষ্কারসাধনের কাছে আর-কোনো ভালোমন্দকে গণ্য করিতে ইচ্ছাই করিলাম না। ক্রমশ লোকের সম্মতিকে জয় করিয়া লইবার বিলম্ব আমরা সহিতে পারিলাম না, ইংরেজকে হাতে হাতে তাহার কর্মফল দেখাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম।

এই উপলক্ষে আমরা দেশের নিম্নশ্রেণীর প্রজাগণের ইচ্ছা ও সুবিধাকে দলন করিবার আয়োজন করিয়াছিলাম সে-কথা স্বীকার করিতে আমাদের ভালো লাগে না কিন্তু কথাটাকে মিথ্যা বলিতে পারি না।

তাহার ফল এই হইয়াছে, বাসনার অত্যুগ্রতা দ্বারা আমরা নিজের চেষ্টাতেই দেশের

এক দলকে আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড় করাইয়াছি। তাহাদিগকে আমাদের মনের মতো কাপড় পরাইতে কতদূর পারিলাম তাহা জানি না কিন্তু তাহাদের মন খোয়াইলাম। ইংরেজের শত্রুতাসাধনে কতটুকু কৃতকার্য হইয়াছি বলিতে পারি না, দেশের মধ্যে শত্রুতাকে জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছি তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। আমরা যে সকল স্থানেই মুসলমান ও নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের অসুবিধা ঘটাইয়া বিরোধ জাগাইয়া তুলিয়াছি এ-কথা সত্য নহে। এমন কি, যাহারা বয়কটের কল্যাণে বিশেষ লাভবান হইয়াছে তাহারাও যে আমাদের বিরুদ্ধ হইয়াছে এমন প্রমাণও আছে। ইহার কারণ, আমরা ইহাদিগকে কাজে প্রবৃত্ত করিবার চেষ্টার পূর্বে এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের মন পাই নাই, মন পাইবার প্রকৃত পন্থা অবলম্বন করি নাই, আমাদের প্রতি ইহাদের অবিশ্বাস ও দূরত্ব দূর করি নাই। আমরা ইহাদিগকে নিজের মতে চালাইবার এবং কাজে লাগাইবারই চেষ্টা করিয়াছি কিন্তু ইহাদিগকে কাছে টানি নাই। সেইজন্য সহসা একদিন ইহাদের সুপ্তপ্রায় ঘরের কাছে আসিয়া ইহাদিগকে নাড়া দিতে গিয়া ইহাদের সন্দেহকে বিরোধকেই জাগাইয়া তুলিয়াছি। ইহাদিগকে আত্মীয় করিয়া না তুলিয়াই ইহাদের নিকট হইতে আত্মীয়তা দাবি করিয়াছি। এবং যে-উৎপাত আপন লোক কোনোমতে সহ্য করিতে পারে সেই উৎপাতের দ্বারা ইহাদিগকে পূর্বের চেয়ে দ্বিগুণ দূরে ফেলিয়াছি।

এবারে এতকাল পরে আমাদের বক্তারা ইংরেজি সভার উচ্চমঞ্চ ছাড়িয়া দেশের সাধারণ লোকের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। দেশের লোকের মনে একটা প্রশ্ন উদয় হইল—এ কী ব্যাপার; হঠাৎ আমাদের জন্য বাবুদের এত মাথাব্যথা হইল কেন?

বস্তুতই তাহাদের জন্য আমাদের মাথাব্যথা পূর্বেও অত্যন্ত বেশি ছিল না, এখনও একমুহূর্তে অত্যন্ত বেশি হইয়া উঠে নাই। আমরা এই কথা মনে লইয়া তাহাদের কাছে যাই নাই যে, দেশী কাপড় পরিলে তোমাদের মঙ্গল হইবে এইজন্যই আমাদের দিনে আহার নাই এবং রাত্রে নিদ্রার অবকাশ ঘটিতেছে না। আমরা এই বলিয়াই গিয়াছিলাম যে, ইংরেজকে জব্দ করিতে চাই কিন্তু তোমরা আমাদের সঙ্গে যোগ না দিলে বয়কট সম্পূর্ণ হইবে না অতএব ক্ষতি স্বীকার করিয়াও তোমাদিগকে দেশী কাপড় পরিতে হইবে।

কখনো যাহাদের মঙ্গলচিন্তা ও মঙ্গলচেষ্টা করি নাই, যাহাদিগকে আপন লোক বলিয়া কখনো কাছে টানি নাই, যাহাদিগকে বরাবর অশ্রদ্ধাই করিয়াছি, ক্ষতিস্বীকার করাইবার বেলা তাহাদিগকে ভাই বলিয়া ডাক পাড়িলে মনের সঙ্গে তাহাদের সাড়া পাওয়া সম্ভবপর হয় না।

সাড়া যখন না পাই তখন রাগ হয়। মনে এই হয় যে, কোনোদিন যাহাদিগকে গ্রাহ্যমাত্র করি নাই আজ তাহাদিগকে এত আদর করিয়াও বশ করিতে পারিলাম না! উলটা ইহাদের গুমর বাড়িয়া যাইতেছে।

যাহারা উপরে থাকে, যাহারা নিজেদিগকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানে, নিচের লোকদের সম্বন্ধে তাহাদের এইরূপ অধৈর্য ঘটে। অশ্রদ্ধাবশতই মানবপ্রকৃতির সঙ্গে তাহাদের অপরিচয় জন্মে। ইংরেজও ঠিক এই কারণবশতই আমাদের দ্বারা তাহার কোনো অভিপ্রায়সাধনের ব্যাঘাত ঘটিলেই কার্যকারণ বিচার না করিয়া একেবারে রাগিয়া উঠে;—আমরা যখন নিচে আছি তখন উপরওআলার ইচ্ছা আমাদের ইচ্ছা দ্বারা অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণে বাধা পাইলেও সেটাকে অবিমিশ্র স্পর্ধা বলিয়া মনে হয়।

ময়মনসিং প্রভৃতি স্থানে আমাদের বক্তারা যখন মুসলমান কৃষি-সম্প্রদায়ের চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারেন নাই তখন তাঁহারা অত্যন্ত রাগ করিয়াছিলেন। এ-কথা তাঁহারা মনেও চিন্তা করেন নাই যে, আমরা যে মুসলমানদের অথবা আমাদের দেশের জনসাধারণের যথার্থ হিতৈষী তাহার কোনো প্রমাণ কোনোদিন দিই নাই, অতএব তাহারা আমাদের হিতৈষিতায় সন্দেহ বোধ করিলে তাহাদিগকে দোষী করা যায় না। ভাইয়ের জন্য ভাই ক্ষতিস্বীকার করিয়া থাকে বটে কিন্তু ভাই বলিয়া একজন খামকা আসিয়া দাঁড়াইলেই যে অমনি তখনই কেহ তাহাকে ঘরের অংশ ছাড়িয়া দেয় এমনতরো ঘটে না। আমরা যে দেশের সাধারণ লোকের ভাই তাহা দেশের সাধারণ লোকে জানে না এবং আমাদের মনের মধ্যেও যে তাহাদের প্রতি ভ্রাতৃভাব অত্যন্ত জাগরূক আমাদের ব্যবহারে এখনও তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় নাই।

পূর্বেই বলিয়াছি সত্য কথাটা এই যে, ইংরেজের উপরে রাগ করিয়াই আমরা দেশের লোকের কাছে ছুটিয়াছিলাম, দেশের লোকের প্রতি ভালোবাসাবশতই যে গিয়াছিলাম তাহা নহে। এমন অবস্থায় "ভাই" শব্দটা আমাদের কণ্ঠে ঠিক বিশুদ্ধ কোমল সুরে বাজে না—যে কড়ি সুরটা আর-সমস্ত স্বরগ্রাম ছাপাইয়া কানে আসিয়া বাজে সেটা অন্যের প্রতি বিদ্বেষ।

আমরা দেশের শিক্ষিত লোকেরা জন্মভূমিকে লক্ষ্য করিয়া "মা" শব্দটাকে ধ্বনিত করিয়া তুলিয়াছি। এই শব্দের দ্বারা আমাদের হৃদয়াবেগ এতই জাগিয়া উঠে যে, আমরা মনে করিতে পারি না দেশের মধ্যে মাকে আমরা সত্য করিয়া তুলি নাই। আমরা মনে করি কেবল গানের দ্বারা কেবল ভাবোন্মাদের দ্বারা মা সমস্ত দেশের মধ্যে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছেন। এইজন্য দেশের সাধারণ গণ-সমাজ যদি স্বদেশের মধ্যে মাকে অনুভব না করে তবে আমরা অধৈর্য হইয়া মনে করি সেটা হয় তাহাদের ইচ্ছাকৃত

অজ্ঞতার ভান, নয় আমাদের শত্রুপক্ষ তাহাদিগকে মাতৃবিদ্রোহে উত্তেজিত করিয়াছে। কিন্তু আমরাই যে মাকে দেশের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করি নাই এই অপরাধটা আমরা কোনোমতেই নিজের স্কন্ধে লইতে রাজি নহি। ছাত্রকে মাস্টার পড়া বুঝাইয়া দেয় নাই, বুঝাইবার ক্ষমতাও তাহার নাই, অথচ ছাত্র যখন পড়া বলিতে পারে না তখন রাগিয়া তাহাকে মারিতে যাওয়া যেমন এও তেমনি। আমরাই দেশের সাধারণ লোককে দূরে রাখিয়াছি, অথচ প্রয়োজনের সময় তাহারা দূরে থাকে বলিয়া আমরাই রাগ করি।

অবশেষে যাহারা আমাদের সঙ্গে স্বাভাবিক কারণেই যোগ দিতে পারে নাই, যাহারা বরাবর যে-পথে চলিয়া আসিতেছিল সেই চিরাভ্যস্ত পথ হইতে হঠাৎ ইংরেজি-পড়া বাবুদের কথায় সরিতে ইচ্ছা করিল না, আমরা যথাসাধ্য তাহাদের প্রতি বলপ্রয়োগ করিয়াছি, তাহাদিগকে পরাস্ত করিবার জন্য আমাদের জেদ বাড়িয়া গিয়াছে। আমরা নিজেকে এই বলিয়া বুঝাইয়াছি, যাহারা আত্মহিত বুঝে না বলপূর্বক তাহাদিগকে আত্মহিতে প্রবৃত্ত করাইব।

আমাদের দুর্ভাগ্যই এই, আমরা স্বাধীনতা চাই কিন্তু স্বাধীনতাকে আমরা অন্তরের সহিত বিশ্বাস করি না। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির প্রতি শ্রদ্ধা রাখিবার মতো ধৈর্য আমাদের নাই ;—আমরা ভয় দেখাইয়া তাহার বুদ্ধিকে দ্রুতবেগে পদানত করিবার জন্য চেষ্টা করি। পিতৃপুরুষকে নরকস্থ করিবার ভয়, ধোবানাপিত বন্ধ করিবার শাসন, ঘরে অগ্নিপ্রয়োগ বা পথের মধ্যে ধরিয়া ঠেঙাইয়া দিবার বিভীষিকা, এ সমস্তই দাসবৃত্তিকে অন্তরের মধ্যে চিরস্থায়ী করিয়া দিবার উপায় ;—কাজ ফাঁকি দিবার জন্য পথ বাঁচাইবার জন্য আমরা যখনই এই সকল উপায় অবলম্বন করি তখনই প্রমাণ হয়, বুদ্ধির ও আচরণের স্বাধীনতা যে মানুষের পক্ষে কী অমূল্য ধন তাহা আমরা জানি না। আমরা মনে করি আমার মতে সকলকে চালানোই সকলের পক্ষে চরম শ্রেয়, অতএব সকলে যদি সত্যকে বুঝিয়া সে-পথে চলে তবে ভালোই, যদি না চলে তবে ভুল বুঝাইয়াও চালাইতে হইবে অথবা চালনার সকলের চেয়ে সহজ উপায় আছে জবরদস্তি।

বয়কটের জেদে পড়িয়া আমরা এই সকল সংক্ষিপ্ত উপায় অবলম্বন করিয়া হিতবুদ্ধির মূলে আঘাত করিয়াছি তাহাতে সন্দেহ নাই। অল্পদিন হইল মফস্বল হইতে পত্র পাইয়াছি সেখানকার কোনো একটি বড়ো বাজারের লোকে নোটিস পাইয়াছে যে, যদি তাহারা বিলাতি জিনিস পরিত্যাগ করিয়া দেশী জিনিসের আমদানি না করে তবে নির্দিষ্ট কালের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইলেই বাজারে আগুন লাগিবে। সেই সঙ্গে স্থানীয় ও নিকটবর্তী জমিদারের আমলাদিগকে প্রাণহানির ভয় দেখানো হইয়াছে।

এইরূপভাবে নোটিস দিয়া কোথাও কোথাও আগুন লাগানো হইয়াছে। ইতিপূর্বে জোর করিয়া মাল আমদানি বন্ধ করিবার চেষ্টা হইয়াছে এবং খরিদদারদিগকে বলপূর্বক বিলাতি জিনিস খরিদ করিতে নিরস্ত করা হইয়াছে। ক্রমে এখন সেই উৎসাহ ঘরে আগুন লাগানো এবং মানুষ মারাতে গিয়া পৌঁছিয়াছে।

দুঃখের বিষয় এই যে, এইরূপ উৎপাতকে আমাদের দেশের অনেক ভদ্রলোক আজও অন্যায় বলিয়া মনে করিতেছেন না—তাঁহারা স্থির করিয়াছেন, দেশের হিতসাধনের উপলক্ষে এরূপ উপদ্রব করা যাইতে পারে।

ইঁহাদের নিকট ন্যায়ধর্মের দোহাই পাড়া মিথ্যা;—ইঁহারা বলেন, মাতৃভূমির মঙ্গলের জন্য যাহা করা যাইবে তাহা অধর্ম হইতে পারে না। কিন্তু অধর্মের দ্বারা যে মাতৃভূমির মঙ্গল কখনোই হইবে না সে-কথা বিমুখ বুদ্ধির কাছেও বারবার বলিতে হইবে।

জিজ্ঞাসা করি, বাজারে আগুন লাগাইয়া অথবা অনিচ্ছুক লোকের মাথা ভাঙিয়া যদি আমরা বিলাতি কাপড় ছাড়াইয়া একদল লোককে দেশী কাপড় ধরাই তবে বাহিরে মাত্র দেশী কাপড় পরাইয়া ইহাদের সমস্ত অন্তঃকরণকে কি স্বদেশীর বিরুদ্ধে চিরদিনের জন্য বিদ্রোহী করিয়া তুলি না? দেশের যে-সম্প্রদায়ের লোক স্বদেশী প্রচারের ব্রত লইয়াছেন তাঁহাদের প্রতি এই সকল লোকের বিদ্বেষকে কি চিরস্থায়ী করা হয় না?

এইরূপ ঘটনাই কি ঘটিতেছে না? "যাহারা কখনো বিপদে আপদে সুখে দুঃখে আমাদিগকে স্নেহ করে নাই, আমাদিগকে যাহারা সামাজিক ব্যবহারে পশুর অপেক্ষা অধিক ঘৃণা করে তাহারা আজ কাপড় পরানো বা অন্য যে-কোনো উপলক্ষে আমাদের প্রতি জবরদস্তি প্রকাশ করিবে, ইহা আমরা সহ্য করিব না" দেশের নিম্নশ্রেণীর মুসলমান এবং নমশূদ্রের মধ্যে এইরূপ অসহিষ্ণুতা জাগিয়া উঠিয়াছে। ইহারা জোর করিয়া, এমন কি, ক্ষতিস্বীকার করিয়াও বিলাতি সামগ্রী ব্যবহার করিতেছে।

তাই বলিতেছি, বিলাতি দ্রব্য ব্যবহারই দেশের চরম অহিত নহে, গৃহবিচ্ছেদের মতো এতবড়ো অহিত আর কিছুই নাই। দেশের এক পক্ষ প্রবল হইয়া কেবলমাত্র জোরের দ্বারা অপর ক্ষীণ পক্ষকে নিজের মতশৃঙ্খলে দাসের মতো আবদ্ধ করিবে ইহার মতো ইষ্টহানিও আর কিছু হইতে পারে না। এমন করিয়া, বন্দে মাতরম্ মন্ত্র উচ্চারণ করিলেও মাতার বন্দনা করা হইবে না—এবং দেশের লোককে মুখে ভাই বলিয়া কাজে ভ্রাতৃদ্রোহিতা করা হইবে। সবলে গলা টিপিয়া ধরিয়া মিলনকে মিলন বলে না,—ভয় দেখাইয়া, এমন কি, কাগজে কুৎসিত গালি দিয়া মতের অনৈক্য নিরস্ত করাকেও জাতীয় ঐক্য সাধন বলে না।

এ-সকল প্রণালী দাসত্বেরই প্রণালী। যাহারা এইরূপ উপদ্রবকে দেশহিতের উপায় বলিয়া প্রচার করে তাহারা স্বজাতির লজ্জাকর হীনতারই পরিচয় দেয় এবং এইপ্রকার উৎপাত করিয়া যাহাদিগকে দলন দমন করিয়া দেওয়া যায় তাহাদিগকেও হীনতাতেই দীক্ষা দেওয়া হয়।

সেদিন কাগজে দেখিতেছিলাম, মর্লিকে যখন বলা হইয়াছিল যে প্রাচ্যগণ কোনো-প্রকার আপসে অধিকারপ্রাপ্তির মূল্য বোঝে না, তাহারা জোরকেই মানে—তখন তিনি বলিয়াছিলেন, তাহা হইতে পারে কিন্তু আমরা তো প্রাচ্য নই আমরা পাশ্চাত্য।

কথাটা শুনিয়া মনের মধ্যে আক্ষেপ বোধ হইয়াছিল। আক্ষেপের কারণ এই যে, আমাদের ব্যবহারে আমরা প্রাচ্যদের বিরুদ্ধে এই গুরুতর অপবাদের সমর্থন করিয়া থাকি। অন্যকে জোরের দ্বারা অভিভূত করিয়া চালনা করিব এই অতি হীনবুদ্ধিকে আমরা কিছুতে ছাড়িতে চাহি না। যেখানে আমরা মুখে স্বাধীনতা চাই সেখানেও আমরা নিজের কর্তৃত্ব অন্যের প্রতি অবৈধ বলের সহিত খাটাইবার প্রবৃত্তিকে খর্ব করিতে পারি না। উহার প্রতি জোর না খাটাইলে উহার মঙ্গল হইবে না অতএব যেমন করিয়া পারি আমাকে উহার উপরে কর্তা হইতে হইবে। হিতানুষ্ঠানের উপায়ের দ্বারাও আমরা মানুষের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করি এবং এই প্রকার অশ্রদ্ধার ঔদ্ধত্য দ্বারা আমরা নিজের এবং অন্য পক্ষের মনুষ্যত্বকে নষ্ট করিতে থাকি।

যদি মানুষের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা থাকে তবে লোকের ঘরে আগুন লাগানো এবং মারধর করিয়া গুণ্ডামি করিতে আমাদের কদাচই প্রবৃত্তি হইবে না; তবে আমরা পরম ধৈর্যের সহিত মানুষের বুদ্ধিকে হৃদয়কে মানুষের ইচ্ছাকে মঙ্গলের দিকে ধর্মের দিকে আকর্ষণ করিতে প্রাণপাত করিতে পারিব। তখন আমরা মানুষকেই চাহিব, মানুষ কী কাপড় পরিবে বা কী নুন খাইবে তাহাই সকলের চেয়ে বড়ো করিয়া চাহিব না। মানুষকে চাহিলে মানুষের সেবা করিতে হয়, পরস্পরের ব্যবধান দূর করিতে হয়—নিজেকে নম্র করিতে হয়। মানুষকে যদি চাই তবে যথার্থভাবে মানুষের সাধনা করিতে হইবে; তাহাকে কোনোমতে আমার মতে ভিড়াইবার আমার দলে টানিবার জন্য টানাটানি-মারামারি না করিয়া আমাকে তাহার কাছে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে। সে যখন বুঝিবে আমি তাহাকে আমার অনুবর্তী অধীন করিবার জন্য বলপূর্বক চেষ্টা করিতেছি না, আমি নিজেকে তাহারই মঙ্গলসাধনের জন্য উৎসর্গ করিয়াছি তখনই সে বুঝিবে, আমি মানুষের সঙ্গে মনুষ্যোচিত ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইয়াছি—তখনই সে বুঝিবে, বন্দে মাতরম্ মন্ত্রের দ্বারা আমরা সেই মাকে বন্দনা করিতেছি দেশের ছোটোবড়ো

সকলেই যাঁহার সন্তান। তখন মুসলমানই কি আর নমশূদ্রই কি, বেহারি উড়িয়া অথবা অন্য যে-কোনো ইংরেজিশিক্ষায় পশ্চাদ্‌বর্তী জাতিই কি, নিজের শ্রেষ্ঠতার অভিমান লইয়া কাহাকেও ব্যবহারে বা বাক্যে বা চিন্তায় অপমানিত করিব না। তখনই সকল মানুষের সেবা ও সম্মানের দ্বারা, যিনি সকল প্রজার প্রজাপতি, তাঁহার প্রসন্নতা এই ভাগ্যহীন দেশের প্রতি আকর্ষণ করিতে পারিব। নতুবা, আমার রাগ হইয়াছে বলিয়াই দেশের সকল লোককে আমি রাগাইয়া তুলিব, অথবা আমি ইচ্ছা করিতেছি বলিয়া দেশের সকল লোকের ইচ্ছাকে আমার অনুগত করিব ইহা কোনো বাগ্মিতার দ্বারা কদাচ ঘটিবে না। ক্ষণকালের জন্য একটা উৎসাহের উত্তাপ জাগাইয়া তুলিতে পারি কিন্তু তাহা সত্যকার ইন্ধনের অভাবে কখনোই স্থায়ী হইতে পারিবে না। সেই সত্যপদার্থ মানুষ—সেই সত্যপদার্থ মানুষের হৃদয় বুদ্ধি, মানুষের মনুষ্যত্ব, স্বদেশী মিলের কাপড় অথবা করকচ লবণ নহে। সেই মানুষকে প্রত্যহ অপমানিত করিয়া মিলের কাপড়ের পূজা করিতে থাকিলে আমরা দেবতার বর পাইব না। বরঞ্চ উলটা ফলই পাইতে থাকিব।

একটি কথা আমরা কখনো ভুলিলে চলিবে না যে, অন্যায়ের দ্বারা, অবৈধ উপায়ের দ্বারা কার্যোদ্ধারের নীতি অবলম্বন করিলে কাজ আমরা অল্পই পাই অথচ তাহাতে করিয়া সমস্ত দেশের বিচারবুদ্ধি বিকৃত হইয়া যায়। তখন কে কাহাকে কিসের দোহাই দিয়া কোন্‌ সীমার মধ্যে সংযত করিবে? দেশহিতের নাম করিয়া যদি মিথ্যাকেও পবিত্র করিয়া লই এবং অন্যায়কেও ন্যায়ের আসনে বসাই তবে কাহাকে কোন্‌খানে ঠেকাইব? শিশুও যদি দেশের হিতাহিত সম্বন্ধে বিচারক হইয়া উঠে এবং উন্মত্তও যদি দেশের উন্নতিসাধনের ভারগ্রহণ করে তবে সেই উচ্ছৃঙ্খলতা সংক্রামক হইতে থাকিবে, মহামারীর ব্যাপ্তির মতো তাহাকে রোধ করা কঠিন হইবে। তখন দেশহিতৈষীর ভয়ংকর হস্ত হইতে দেশকে রক্ষা করাই আমাদের পক্ষে সকলের চেয়ে দুঃখকর সমস্যা হইয়া পড়িবে। দুর্বুদ্ধি স্বভাবতই কোনো বন্ধন স্বীকার করে না; বৃহৎভাবে সকলের সহিত যুক্ত হইয়া বৃহৎ কাজ করিতে সে সহজেই অক্ষম। দুঃস্বপ্ন যেমন দেখিতে দেখিতে অসংগত অসংলগ্নভাবে এক বিভীষিকা হইতে আর-এক বিভীষিকায় লাফ দিয়া চলিতে থাকে তেমনি মঙ্গলবুদ্ধির অরাজকতার দিনে নিতান্তই সামান্য কারণে চন্দননগরের মেয়রকে হত্যা করিবার আয়োজন হয়, কোথাও কিছু নাই হঠাৎ কুষ্টিয়ায় নিতান্ত নিরপরাধ পাদ্রির পৃষ্ঠে গুলি বর্ষিত হয়, কেন যে ট্রামগাড়ির প্রতি সাংঘাতিক আক্রমণের উদ্‌যোগ হয় তাহা কিছুই বুঝিতে পারা যায় না; বিভীষিকা অত্যন্ত তুচ্ছ উপলক্ষ্য অবলম্বন করিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতে থাকে, এবং কাণ্ডজ্ঞানহীন মত্ততা মাতৃভূমির

হৃৎপিণ্ডকেই বিদীর্ণ করিয়া দেয়।[1] এইরূপ ধর্মহীন ব্যাপারে প্রণালীর ঐক্য থাকে না, প্রয়োজনের গুরুলঘুতা বিচার চলিয়া যায়, উদ্দেশ্য ও উপায়ের মধ্যে সুসংগতি স্থান পায় না, একটা উদ্‌ভ্রান্ত দুঃসাহসিকতাই লোকের কল্পনাকে উত্তেজিত করিয়া তুলে। অতএব বারবার দেশকে স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে যে, অধ্যবসায়ই শক্তি এবং অধৈর্যই দুর্বলতা ; প্রশস্ত ধর্মের পথে চলাই নিজের শক্তির প্রতি সম্মান এবং উৎপাতের সংকীর্ণ পথ সন্ধান করাই কাপুরুষতা, তাহাই মানবের প্রকৃত শক্তির প্রতি অশ্রদ্ধা, মানবের মনুষ্যধর্মের প্রতি অবিশ্বাস। অসংযম নিজেকে প্রবল বলিয়া অহংকার করে ; কিন্তু তাহার প্রবলতা কিসে ? সে কেবল আমাদের যথার্থ অন্তরতর বলের সম্বলকে অপহরণ করিবার বেলায়। এই বিকৃতিকে যে-কোনো উদ্দেশ্যসাধনের জন্যই একবার প্রশ্রয় দিলে শয়তানের কাছে মাথা বিকাইয়া রাখা হয়। প্রেমের কাজে সৃজনের কাজে পালনের কাজেই যথার্থভাবে আমাদের সমস্ত শক্তির বিকাশ ঘটে ; কোনো একটা দিকে আমরা মঙ্গলের পথ নিজের শক্তিতে একটুমাত্র কাটিয়া দিলেই তাহা অভাবনীয়রূপে শাখায় প্রশাখায় ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে ;—একটা কিছুকে গড়িয়া তুলিলে কতকটা কৃতকার্য হইবামাত্র সেই আনন্দে আমাদের শক্তি অচিন্তনীয়রূপে নবনব সৃষ্টিদ্বারা নিজেকে চরিতার্থ করিতে থাকে। এই মিলনের পথ সৃজনের পথই ধর্মের পথ। কিন্তু ধর্মের পথ দুর্গম—দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি। এই পথেই আমাদের সমস্ত পৌরুষের প্রয়োজন, ইহার পাথেয় সংগ্রহ করিতেই আমাদের সর্বস্ব ত্যাগ করিতে হইবে ; ইহার পারিতোষিক অহংকারতৃপ্তিতে নহে, অহংকারবিসর্জনে ; ইহার সফলতা অন্যকে পরাস্ত করিয়া নহে, নিজেকে পরিপূর্ণ করিয়া।

১৩১৫

---

[1] কাঁকিনাড়ার কারখানার ইংরেজ কর্মচারীদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া রেলগাড়িতে বোমা ছুঁড়িবার পূর্বে এই প্রবন্ধ লিখিত হয়। কোনো ছিদ্রে পাপ একবার অন্তরে প্রবেশ করিতে পারিলে ক্রমশই মানুষকে তাহা কিরূপে বিকৃতিতে লইয়া যায় এই লজ্জাকর শোচনীয় ঘটনাই তাহার প্রমাণ।

পরিশিষ্ট

সার লেপেল গ্রিফিন

কুকুর-সম্প্রদায়ের মধ্যে খেঁকি কুকুর বলিয়া একটা বিশেষ জাত আছে, তাহাদের খেঁই খেঁই আওয়াজের মধ্যে কোনোপ্রকার গাম্ভীর্য অথবা গৌরব নাই কিন্তু সিংহের জাতে খেঁকি সিংহ কখনো শুনা যায় নাই। সার লেপেল গ্রিফিন জুন মাসের ফর্টনাইটলি রিভিয়ু পত্রে বাঙালিদের বিরুদ্ধে যে একটা প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহার মধ্যে ভারি একটা খেঁই খেঁই আওয়াজ দিতেছে, ইহাতে লেখকের জাতি নিরূপণ করা কিছু কঠিন হইয়া পড়িয়াছে।

কিন্তু লেখকের অভিপ্রায় যেমনই হউক বাঙালিদের তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। কারণ, উক্ত আওয়াজে আর কোনো ফল না হউক আমাদিগকে সজাগ করিয়া রাখে। যে-সময় একটুখানি নিদ্রাকর্ষণ হইয়া আসে ঠিক সেই সময়ে যদি এই রকম একটা করিয়া বিদেশী হঠাৎ আমাদের প্রতি খেঁকাইয়া আসে তাহাতে চট করিয়া আমাদের তন্দ্রা ভাঙিয়া যাইতে পারে।

একটু যেন ঢুলুনি আসিয়াছিল—কনগ্রেসের মাথাটা তাহার স্কন্ধের উপর একটু যেন টলটল করিতেছিল, নানাকারণে তাহার স্নায়ু এবং পেশী যেন শিথিল হইতেছিল এমন সময়ে কেবল বন্ধুর উৎসাহ পাওয়ার অপেক্ষা শত্রুপক্ষের নিকট হইতে দুই-একটা ধাক্কা খাইলে বেশি কাজ দেখে। এজন্য গ্রিফিন সাহেব ধন্য।

তিনি আরও ধন্য যে, তিনি কোনো যুক্তি না দিয়া গালি দিয়াছেন। আমরা একটা জাতি নূতন শিক্ষা পাইয়া একটা নূতন উচ্চ আশার আকর্ষণে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিতেছি, অবশ্যই আমাদের নানাপ্রকার ত্রুটি, অক্ষমতা এবং অপরিপক্বতা পদে পদে প্রকাশ পাইবার কথা এবং রাজনীতিবিশারদ ইংরেজের চক্ষে সেগুলি ধরা পড়িবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। কিন্তু সেই দুর্বল ভাগে আমাদিগকে আক্রমণ না করিয়া গ্রিফিন যখন কেবল গালিমন্দ দিয়াছেন তখন আমরা বেশ নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকিতে পারি।

গালি-জিনিসটাও যে নিতান্ত সামান্য তাহা নহে, কিন্তু গালিবিশেষ আছে। গ্রিফিন আমাদিগকে বলিয়াছেন, তোমাদিগকে রাজনৈতিক অধিকার দেওয়াও যা আর বানরকে দেওয়াও তা। একজন স্কুলের ছাত্রও চেষ্টা করিলে ইহা অপেক্ষা সুনিপুণ গালি দিতে পারে। গ্রিফিন যে-জন্তুটার উল্লেখ করিয়াছেন সে-বেচারার কিচিমিচিপূর্বক মুখবিকার করা ছাড়া আক্রোশ প্রকাশের অন্য উপায় নাই—কিন্তু ভদ্রলোকের হাতে এত প্রকার ভদ্রোচিত অস্ত্র আছে যে, অশিষ্ট মুখভঙ্গিমা তাহার পক্ষে নিতান্তই

অনাবশ্যক। গ্রিফিন যখন সেই অশিষ্টতা অবলম্বন করিয়াছেন তখন আমরা তাহা হইতে কেবল কৌতুক লাভ করিবার চেষ্টা করিয়া তাহার অনুকরণে ক্ষান্ত হইব।

গালমন্দ বাদ দিয়া সমস্ত প্রবন্ধে গ্রিফিন সাহেবের একমাত্র কথা এই যে, বাঙালি দুর্বল অতএব রাজ্যতন্ত্রে বাঙালির কোনো স্থান থাকিতে পারে না। কিন্তু ইতিমধ্যে অনেক বাঙালি জিলা শাসনের ভার পাইয়াছে এবং অনেক বাঙালি মন্ত্রী-আসনও অধিকার করিয়াছে, যদি তাহাদের কোনো অযোগ্যতা আবিষ্কৃত হইয়া থাকে তবে প্রবন্ধে তাহার প্রমাণ দিলে তাঁহার যুক্তি পাকা হইত। ঘরে বসিয়া অনেক মূলতত্ত্ব গড়া যায়, কিন্তু সত্যের সঙ্গে যখন তাহার অনৈক্য হয় তখন স্বরচিত হইলেও তাহাকে বিসর্জন দেওয়া কর্তব্য। আমি একটা তত্ত্ব বাঁধিয়াছিলাম যে, ইংরেজ পুরুষের লেখায় যদি বা কোনো কারণে উদারতার অভাব লক্ষিত হয় তথাপি তাহার মধ্যে একটা সংযত আত্মমর্যাদা থাকে; কারণ যে-লোক সৌভাগ্যবান এবং ক্ষমতাবান তাহার লেখার মধ্যে একটি বিনয় এবং সেই বিনয়ের মধ্যেই একটি প্রবল পৌরুষ থাকে—আমাদের মতো যাহারা দুর্ভাগ্য, যাহাদের মুখ ছাড়া আর কিছু নাই সময়ে সময়ে অক্ষম আক্রোশে তাহারা অমিতভাষী হইয়া আপনার নিরুপায় দৌর্বল্যেরই পরিচয় দেয়। কিন্তু গ্রিফিনের লেখা ইংরেজি বড়ো কাগজে বাহির হইয়া থাকে এবং সেই সঙ্গে আমার প্রিয়তত্ত্বটিকে বিসর্জন দিতে হয়।

গ্রিফিন বাঙালিকে রাজনৈতিক অধিকার হইতে বঞ্চিত করিবার পূর্বে নিজেদের পার্লামেন্টে একটা নূতন নিয়ম প্রচার করিবার চেষ্টা করিবেন। এবার হইতে বক্তৃতামঞ্চে বাগ্‌যুদ্ধে পার্লামেন্টের মেম্বর নির্বাচিত না হইয়া মল্লভূমে দ্বন্দ্বযুদ্ধে সভ্য স্থির হইবে। তাহা হইলে ইংরেজ মন্ত্রী-সভায় কেবল বীরমণ্ডলীই অধিকার লাভ করিবে এবং যাহারা শুদ্ধমাত্র কলম চালাইতে জানে তাহারা ফর্টনাইটলি রিভিয়ুতে অত্যন্ত ঝগড়াটে সুরে প্রবন্ধ লিখিবে।

১২৯৯

ইংরেজের আতঙ্ক

১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দে হিন্দু মহাজনদের দ্বারা একান্ত উৎপীড়িত হইয়া গবর্মেণ্টের নিকট নালিশ করিবার জন্য সাঁওতালগণ তাহাদের অরণ্য-আবাস ছাড়িয়া কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিল। তখন ইংরেজ সাঁওতালকে ভালো করিয়া চিনিত না;—তাহারা কী চায়, কেন বাহির হইয়াছে কিছুই বুঝিতে পারিল না। এদিকে পথের মধ্যে পুলিস তাহাদের সহিত লাগিল—আহারও ফুরাইয়া গেল—পেটের জ্বালায় লুটপাট আরম্ভ হইল। অবশেষে গবর্মেণ্টের ফৌজ আসিয়া তাহাদিগকে দলকে-দল গুলি করিয়া ভূমিসাৎ করিতে লাগিল।

এই ঘটনার উপলক্ষে হাণ্টার সাহেব বলেন, ভারতবর্ষে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায়ের সংখ্যা অল্প এবং তাহারা বহুসংখ্যক ভিন্নজাতীয় অধিবাসীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। এরূপ অবস্থায় সামান্য সূত্রপাতেই বিপদের আশঙ্কাটা অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠে। তখন পরিণামের প্রতি লক্ষ্য করিয়া ধীরভাবে বিবেচনা করিবার সময় থাকে না—অতিসত্বর সবলে একটা চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিয়া ফেলিবার প্রবৃত্তি জন্মে। যখন অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানগণ এইরূপ কোনো কারণে অকস্মাৎ সন্ত্রস্ত হইয়া উঠে তখনই গবর্মেণ্টের মাথা ঠাণ্ডা রাখা বিশেষরূপে আবশ্যক হয়। হাণ্টার বলেন, এরূপ উত্তেজনার সময় ভারত-গবর্মেণ্টকে প্রায়ই ঠাণ্ডা থাকিতে দেখা গিয়াছে।

উপরি-উক্ত সাঁওতাল-উপদ্রবে কাটাকুটির কার্যটা বেশ রীতিমতো সমাধা করিয়া এবং বীরভূমের রাঙা মাটি সাঁওতালের রক্তে লোহিততর করিয়া দিয়া তাহার পরে ইংরেজরাজ হতভাগা বন্যদিগের দুঃখনিবেদনে কর্ণপাত করিলেন। যখন বন্দুকের আওয়াজটা বন্ধ করিয়া তাহাদের সকল কথা ভালো করিয়া শুনিলেন তখন বুঝিলেন তাহাদের প্রার্থনা অন্যায় নহে। তখন তাহাদের আবশ্যকমতো আইনের সংশোধন, পুলিসের পরিবর্তন এবং যথোপযুক্ত বিচারাশালার প্রতিষ্ঠা করা হইল।

কিন্তু অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায়ের উষ্মা তখনও নিবারণ হইল না। বিদ্রোহীদের প্রতি নিরতিশয় নির্দয় শাস্তিবিধান না করিয়া তাহারা ক্ষান্ত হইতে চাহে না। তাহারা বলিল, বিদ্রোহীরা যাহা চাহিয়াছিল সকলই যদি পাইল তবে তো তাহাদের বিদ্রোহের সার্থকতাসাধন করিয়া একপ্রকার পোষকতা করাই হইল। ক্যালকাটা রিভিয়ুপত্রের কোনো ইংরেজ লেখক এই শান্তিপ্রিয় নিরীহ সাঁওতালদিগকে বনের ব্যাঘ্র, রক্তপিপাসু বর্বর প্রভৃতি বিশেষণে অভিহিত করিয়া এক প্রবন্ধ লিখিলেন, তাহাতে, কেবল

দোষীদিগকে নহে, বিদ্রোহী জেলার অধিবাসিবর্গকে একেবারে সর্বসমেত সমুদ্রপারে দ্বীপান্তরিত করিয়া দিবার জন্য গবর্মেন্টকে অনুরোধ করিলেন।

মনে একবার ভয় ঢুকিলে বিচারও থাকে না, দয়াও থাকে না। আমাদের সংস্কৃত-শাস্ত্রে আছে—শক্তস্য ভূষণং ক্ষমা। কেবল ভূষণ কেন, তাহা স্বাভাবিক বলিলেও নিতান্ত অত্যুক্তি হয় না। যেখানে মনে মনে আত্মশক্তির অভাব আশঙ্কা হয়, সেখানে মানুষ, হয় অগত্যা ক্ষমা করে, নয় লেশমাত্র ক্ষমা করে না, নিষ্ঠুরভাবে অন্যকে ভয় দেখাইতে চেষ্টা করে। অনেক সময় হিংস্র পশু যে অগ্রসর হইয়া আক্রমণ করে, সকলেই জানেন ভয়ই তাহার মূল কারণ, হিংস্রতা নহে।

ইংরেজ যখন কোনো কারণে আমাদিগকে ভয় করে তখনই সেটা আমাদের পক্ষে বড়ো ভয়ের বিষয় হইয়া দাঁড়ায়—তখনই ভয়ের কম্পনে দয়ামায়া সুবিচার আপাদমস্তক টলমল করিতে থাকে।

ইংরেজ হঠাৎ কনগ্রেসের মূর্তি দেখিয়া প্রথমটা আচমকা ডরাইয়া উঠিয়াছিল। তাহার কারণ, মানুষ চিরসংস্কারবশত স্বদেশী জুজুকে যতটা ভয় করে, বিদেশী বিভীষিকাকে ততটা নহে। এইজন্য ভারতবর্ষের সুখশয়নাগারে হঠাৎ সেই পোলিটিকাল জুজুর আবির্ভাব দেখিয়া ইংরেজের সুস্থ প্লীহাও চমকিয়া উঠিয়াছিল।

কিন্তু কনগ্রেসটার উপরে প্রত্যক্ষভাবে কোনোরূপে আঘাত করা হয় নাই। তাহার কারণ, ঢাকের উপরে ঘা মারিলে ঢাক আরও বেশি করিয়া বাজিয়া উঠে। কনগ্রেসের আর-কোনো ক্ষমতা থাক্ বা না থাক্ গলার জোর আছে, তাহার শব্দ সমুদ্রপার পর্যন্ত গিয়া পৌঁছে।

সুতরাং এই নবনির্মিত জাতীয় জয়ঢাকটার উপরে কাঠি না মারিয়া তাহাকে তলে তলে ছিদ্র করিবার আয়োজন করা হইল। মুসলমানেরা প্রথমে কনগ্রেসে যোগ দিবার উপক্রম করিয়া সহসা যে বিমুখ হইয়া দাঁড়াইল তাহার কারণ বোঝা নিতান্ত কঠিন নহে—এবং পাঠকদের নিকট সে-কারণ স্পষ্ট করিয়া নির্দেশ করা অনাবশ্যক বোধ করি।

কিন্তু এতদিনে ইংরেজ এ-কথা কতকটা বুঝিয়া থাকিবে যে, হিন্দুর হস্তে পলিটিক্স তেমন মারাত্মক নহে। আবহমান কালের ইতিহাস অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেও ভারতবর্ষে পোলিটিকাল ঐক্যের কোনো লক্ষণ কোনোকালে দৃষ্টিগোচর হয় না। ঐক্য কাহাকে বলে মুসলমান তাহা জানে এবং পলিটিক্সও তাহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ নহে; মুসলমান যদি দূরে থাকে তবে কনগ্রেস হইতে আশু আশঙ্কার কোনো কারণ নাই।

হিন্দুজাতির প্রতি পলিটিক্সের প্রভাব যে তেমন প্রবল নহে কনগ্রেসই তাহার

প্রমাণস্থল হইবার উপক্রম করিতেছে। যতই দিন যাইতেছে ততই কনগ্রেস অর্থাভাবে দরিদ্র এবং উৎসাহাভাবে দুর্বলের মতো প্রতিভাত হইতেছে। ইংরেজও সম্প্রতি কিছু যেন নিশ্চিন্ত বোধ করিতেছে।

কিন্তু ইতিমধ্যে ইংরেজের ভারতশাসনক্ষেত্রে আর-একটা নূতন ভয় আসিয়া দেখা দিয়াছে। সেটা আর কিছু নয়, গোরক্ষণী সভা। যাহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য এই সভাটা স্থাপন করা হইয়াছে তাহারা যতটা নিরীহ, সভাটাকে ততটা নিরীহ বলিয়া ইংরেজের ধারণা হইল না।

কারণ, ইংরেজ ইহা বুঝিয়াছে যে, স্বদেশ ও স্বজাতি রক্ষার জন্য যে-হিন্দু এক হইতে পারে না, গোষ্ঠ এবং গোজাতি রক্ষার জন্য চাই কি তাহারা এক হইতেও পারে। স্বাধীনতা, স্বদেশ, আত্মসম্মান, মনুষ্যত্ব প্রভৃতি অনেক শ্রেষ্ঠতর পদার্থের অপেক্ষা গোরুকে রক্ষা করা যে আমাদের পরমতর কর্তব্য এ-কথা হিন্দু ভূপতি হইতে কৃষক পর্যন্ত সকলেই সহজে বুঝিবে। গোহত্যা-নিবারণ সম্বন্ধে নেপালের গুর্খা হইতে পঞ্জাবের শিখ পর্যন্ত একমত।

এই কারণে গোরক্ষণী সভাটা ইংরেজের পক্ষে কিছু বিশেষ আতঙ্কজনক হইতে পারে। ফলেও তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।

প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে, কিন্তু প্রমাণ দেওয়া কিছু কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। সম্প্রতি ভ্রমণোপলক্ষে পশ্চিম ভারতে গিয়া দেখিয়াছি, গোরক্ষার জন্য লোকে আর ততটা ব্যস্ত নহে—এখন গোরক্ষকগণ রক্ষা পাইলে হয়। কিন্তু ভিতরে ভিতরে সকলে ত্রাহি ত্রাহি করিতেছে বটে, তবু মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতেছে না। যে-সকল কথা ঘরে ঘরে আলোচিত হইতেছে সে-সকল কথা যদি প্রকাশ হইত তবে কী হইত? যে প্রকাশ করিত তাহাকে সম্ভবত নির্দিষ্ট রাজ-অট্টালিকায় রাজপ্রহরিগণ কর্তৃক বেষ্টিত হইয়া বাস করিতে হইত। গোরুও সময়ে সময়ে সকরুণ হাম্বারব করে, বাঙালিও সময় সময় দেশী-বিদেশী ভাষায় আর্তনাদ করিয়া থাকে, কিন্তু পশ্চিম-ভারত একেবারে মূক।

তবে বাহির হইতে একটা উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। গাজিপুরের জজ কক্স সাহেব ন্যায়পরায়ণ বলিয়া সাধারণের নিকট সুবিদিত। গোহত্যাসম্বন্ধীয় মকদ্দমার আপীল হাইকোর্ট তাঁহার নিকট হইতে তুলিয়া লইয়াছে।

কক্স সাহেব হিন্দু নহেন; গোজাতির এবং গোবৎসলজাতির প্রতি তাঁহার বিশেষ পক্ষপাত থাকিবার কোনো কারণ দেখা যায় না। গোসম্প্রদায়ের প্রতি যদি তাঁহার কোনো পক্ষপাত থাকে সেও কেবল খাদকভাবে।

দ্বিতীয়ত, এই গোহত্যাসম্বন্ধীয় দাঙ্গাহাঙ্গামার প্রতি গবর্মেন্টের তীব্র দৃষ্টি রহিয়াছে,

এবং অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানগণও বিশেষ ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছেন—এমন কি, বিলাতের স্পেক্টেটর পত্রও এইরূপ উপদ্রবগুলিকে সতেজে দমন, সবলে দলন করিয়া ফেলিতে পরামর্শ দিয়াছেন। এরূপ স্থলে অন্যান্ত সাধারণ মকদ্দমার অপেক্ষা এরূপ মকদ্দমা ইংরেজ বিচারক বিশেষ সতর্কভাবেই বিচার করিয়া থাকেন।

এমন অবস্থাতেও যদি গবর্মেণ্ট জজ সাহেবের বিচারে সন্তুষ্ট না হন, তবে তো তাঁহার হাতে সামান্ত শসা-চুরির মকদ্দমাও রাখা উচিত হয় না।

এই সকল লক্ষণ দেখিয়াই মনে হইতেছে গবর্মেণ্ট কিছু বেশি ভীত হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহারা ভয় পাইলেই আমাদের সর্বনাশ।

কিন্তু ভয় করিতে আরম্ভ করিলে কোথাও নিশ্চিন্ত হইবার জো নাই। ভারতবর্ষকে শিক্ষা দিয়াও ভয় হয়, আবার মূর্খ করিয়া রাখিলেও ভয় আছে।

ইংরেজি শিখিয়া আমরা আত্মদুঃখ নিবেদন করিতে শিখি এবং সাধারণ অভাবমোচনের উপলক্ষে সাধারণের মধ্যে ঐক্যবন্ধনের সূত্রপাত হয়। আবার যেখানে ইংরেজি শিক্ষা নাই সেখানে যে কোন্ অন্ধসংস্কারের কৃষ্ণবর্ণ বারুদে কোন্খান হইতে কণামাত্র অগ্নিস্ফুলিঙ্গ লাগিয়া অকস্মাৎ একটা প্রলয় দিগ্‌দাহ উপস্থিত করে তাহা বলা যায় না।

কিন্তু গবর্মেণ্টের ভয়টা দেখিতে ভালো নহে। কড়া শাসন, অর্থাৎ যখন বিচারপ্রণালীর মধ্যে ন্তায় অপেক্ষা বলের প্রয়োগ বেশি দেখা যায় এবং যখন চতুর্দিক হইতে খোঁচাখুঁচি লাগাইয়া তাড়াতাড়ি দেশের লোককে ভয় পাওয়াইয়া দিবার চেষ্টা দেখিতে পাই তখনই বুঝিতে পারি গবর্মেণ্টের হৃৎস্পন্দন কিছু অযথা বাড়িয়া উঠিয়াছে। সেরূপ উগ্রতায় গবর্মেণ্টের বলিষ্ঠতা প্রকাশ পায় না, কেবল ভয় প্রকাশ হয় মাত্র।

মণিপুরেই গবর্মেণ্টের নিজবুদ্ধিদোষে বিভ্রাট ঘটুক আর ভারতের অন্তত্রই হিন্দু-মুসলমানের অন্ধ আক্রোশবশত ভ্রাতৃবিরোধের সূত্রপাত হউক, গবর্মেণ্টের সর্বদা মনে রাখা উচিত, শক্তস্ত ভূষণং ক্ষমা এবং অবিচলিত অপক্ষপাত এবং প্রশান্ত ন্তায়পরতা।

কিন্তু গবর্মেণ্ট বলিতে যে কাহাকে বুঝায় আমরা কিছুই বুঝিতে পারি না। এই হিন্দু-মুসলমান-বিপ্লবে বড়োকর্তা ল্যান্সডাউন, মেজোকর্তা ক্রসথোয়েট, এবং জেলার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছোটোকর্তাগুলি সকলেই এক পলিসি অবলম্বন করিয়া একভাবে কাজ করিতেছেন কিনা জানি না। সার ওয়েডারবর্ন লিখিয়াছেন, এই সমস্ত উপদ্রবে গবর্মেণ্টের কিছু হাত আছে—ল্যান্সডাউন বলেন, এমন কথা যে বলে সে অত্যন্ত দুষ্ট। আমরা ইহার একটা সামঞ্জস্ত করিয়া লই।

আমরা বলি, গবর্মেণ্টের পলিসি যেমনই থাক্, ইংরেজ কর্মচারিগণ গবর্মেণ্টের যন্ত্র

নহে; তাহারা মানুষ। আপন অধিকারের মধ্যে তাহাদের বিরাগ-অনুরাগ মতামত খাটাইবার যথেষ্ট অবসর আছে। কনগ্রেস এবং শিক্ষিত বাবুদের আচরণে তাহাদের যদি এমন ধারণা হয় যে, হিন্দু-মুসলমানদিগকে পৃথক করিয়া রাখা আবশ্যক, তবে তাহারা ছোটোবড়ো এত উপায় অবলম্বন করিয়া বিদ্বেষবীজ বপন করিতে পারে যে, গবর্মেন্টের পরম উদার সদভিসন্ধি তাহার নিকট হার মানে।

গবর্মেন্টের আইন কাহাকেও ঘৃণা করে না, ভয় করে না, পক্ষপাত করে না, কিন্তু ইংরেজ করে। পায়োনিয়র ইংলিশম্যান প্রভৃতি ইংরেজি কাগজগুলা যখন কনগ্রেসের প্রতি চক্ষু রক্তবর্ণ করে এবং বাবুদের প্রতি সরোষ অবজ্ঞাবর্ষণের চেষ্টা করে, তখন ইংরেজ জজ-ম্যাজিস্ট্রেটগণ যে অবিচলিতচিত্তে থাকে তাহা নহে। এই সমস্ত বিদ্বেষভাব সর্বসাধারণ ইংরেজের মধ্যে প্রতিদিন ব্যাপ্ত ও বদ্ধমূল হইয়া যাইতেছে এবং যাহার হাতে কোনো ক্ষমতা আছে সে যে নানা উপায়ে কার্যত সেই ভাবকে প্রকাশ করে এবং একটা গোপন পলিসি অবলম্বন করিয়া কনগ্রেস প্রভৃতিকে ব্যর্থ করিবার চেষ্টা করে তাহাতে সন্দেহ নাই।

হিন্দু-মুসলমানে যে বিরোধ সম্প্রতি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে ইহা গবর্মেন্টের পলিসি-সম্মত না হইতে পারে কিন্তু গবর্মেন্টের অন্তর্গত বিস্তর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইংরেজ বিস্তর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুৎকারে যে এই অগ্নিকাণ্ডের সূচনা করিয়া দিয়াছে আমাদের দেশের লোকের এইরূপ বিশ্বাস। তুলার বস্তার মধ্যে আগুন ফেলিয়া যখন সমস্তটা ধরিয়া উঠিবার উপক্রম হইল তখন প্রবল পদাঘাতের দ্বারা সেটা নির্বাণ করা হইতেছে; তুলা বেচারি একে তো পুড়িল, তাহার পরে লাথিটাও অপর্যাপ্ত পরিমাণে খাইতে হইল।

কেবল, ইংরেজের মনে অকস্মাৎ একটা আতঙ্ক উপস্থিত হইয়া এই সমস্ত ব্যাপারগুলি ঘটিতেছে।

১৩০০

রাজা ও প্রজা

সিভিলিয়ান রাভীচি সাহেব আইনলঙ্ঘনপূর্বক উড়িষ্যার কোনো এক জমিদারকে অপমান ও পীড়ন করাতে তৎকালীন লেফটেনাণ্ট গবর্নর ম্যাকডোনেল সাহেব অন্যায়কারীকে এক বৎসরের জন্য নিগৃহীত করিয়াছিলেন।

ভাবিয়া দেখিলে ব্রিটিশ শাসনাধীনে এরূপ ঘটনা আশাতীত বিস্ময়জনক বলিয়া মনে হওয়া উচিত ছিল না—কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, সাধারণের নিকট এই ন্যায়বিচারটি আশাতীত বিস্ময়জনক বলিয়াই প্রতিভাত হইয়াছিল। এই কারণে মূঢ়মতি সাধারণ কিছু সবিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিল।

অনতিকাল পরেই ম্যাকডোনেল সাহেব যখন যথাসময়ে এলিয়ট সাহেবকে তাঁহার গদি ছাড়িয়া দিলেন তখন এলিয়ট আসিয়া ম্যাকডোনেলের বিচার লঙ্ঘনপূর্বক রাভীচিকে নিগ্রহ হইতে মুক্ত করিয়া উচ্চতর পদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। এখন আবার মূঢ়মতি সাধারণ সবিশেষ শোক প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

কর্তার ইচ্ছা কর্ম। কর্তাই জানেন এমন প্রথাবিরুদ্ধ কাজ কেন করিলেন, আমরা কেবল অন্ধকারে অনুমান করিয়া মরিতেছি মাত্র। এমন হইতে পারে যে, সিভিলিয়ানের প্রেস্টিজ সিভিলিয়ান রক্ষা করিলেন। কিন্তু সেটা ঠিক হইল না। কারণ, এই ঘটনায় সাধারণের নিকট ম্যাকডোনেলের, এমন কি, গবর্মেণ্টের প্রেস্টিজ, নষ্ট হইল।

অনুমান করিতে গিয়া নানা লোক নানা কথা বলিতেছে—তাহার সব কথাই মিথ্যা হইতে পারে। মোটের উপর এইটুকু বলা যায় যে, গবর্মেণ্টের পলিসি গবর্মেণ্টই জানেন, আমরা সেই পলিসির দ্বারা পরিচালিত অন্ধ পুত্তলিকামাত্র।

সেই কারণে আমার বক্তব্য এই যে, আমাদের কর্তৃস্থানীয় কোনো ব্যক্তির ন্যায়ান্যায়-বিচারে আমরা যে অকস্মাৎ অতিমাত্র হর্ষশোক প্রকাশ করিয়া থাকি সে আমাদের মোহবশত। যেখানে কর্তার ইচ্ছা কর্ম, যেখানে ব্যক্তিবিশেষের স্বভাব এবং মর্জির উপরে আমাদের শুভাশুভ অনেকটা নির্ভর করিতেছে সেখানে ভালো এবং মন্দ, ন্যায় এবং অন্যায় উভয়ই আকস্মিক ক্ষণিক ঘটনামাত্র। ম্যাকডোনেল সাহেব যাহা করিলেন সেও তাঁহার নিজগুণে, এলিয়ট সাহেব যাহা করিলেন সেও তাঁহার নিজগুণে, আমরা নিতান্তই উপলক্ষ্য।

তথাপি আঘাতে ব্যথিত এবং আদরে সুখী না হইয়া আমরা থাকিতে পারি না।

কিন্তু কিরূপ হইলে আমাদের যথার্থ সুখের এবং জাতীয় গৌরবের কারণ হয় তাহা আমাদের সর্বদা স্মরণ রাখা কর্তব্য।

সে আর কিছুই নহে,—যখন আমাদের সাধারণের মধ্যে ন্যায়ান্যায়বোধ এমন সুতীব্র এবং সচেতন হইয়া উঠিবে যে, অপমানে অন্যায়ে আমরা সকলে মিলিয়া যথার্থ বেদনা বোধ করিতে থাকিব এবং সেই ন্যায়ান্যায়বোধের খাতির রক্ষা করা গবর্মেন্টের একটা পলিসির মধ্যে দাঁড়াইয়া যাইবে তখন আমরা যথার্থ আনন্দ করিতে পারিব।

সাধারণত, ধর্মবুদ্ধি কর্মবুদ্ধি লোকনিন্দা সব-কটায় মিলিয়া আমাদিগকে কর্তব্যপথে চালনা করে। আমাদের গবর্মেন্টের কর্তব্যনীতি অনেকটা পরিমাণে কেবলমাত্র ধর্মবুদ্ধি ও কর্মবুদ্ধির উপরেই নির্ভর করিতেছে, প্রজাদিগের ন্যায়ান্যায়বোধের সহিত তাহার যোগ অতিশয় অল্প।

সকলেই জানেন ধর্মবুদ্ধির সহিত কর্মবুদ্ধির বিরোধ বাধিলে অনেক সময় শেষোক্ত শক্তিটিরই জয় হইয়া থাকে, সেই দ্বন্দ্বের সময় বাহিরের লোকের ন্যায়ান্যায়বোধ ধর্মের সহায় হইয়া তাহাকে সবল করিয়া তোলে। যখন দেখিব প্রজার নিন্দা নামক শক্তি গবর্মেন্টের রাজকার্যের মধ্যে আপনার যথাযোগ্য স্থান অধিকার করিতে পারিয়াছে তখন আমরা আনন্দ প্রকাশ করিব।

এই প্রজানিন্দা না থাকাতে ভারতবর্ষীয় ইংরেজের কর্তব্যবুদ্ধি ক্রমে অলক্ষিতভাবে এত শিথিল ও বিকৃত হইয়া আসে যে, ইংলণ্ডবাসী ইংরেজের নৈতিক আদর্শ হইতে তাহাদের আদর্শের বিজাতীয় প্রভেদ হইতে থাকে। সেই কারণে দেখিতে পাই, ভারতবর্ষীয় ইংরেজ একদিকে আমাদিগকে ঘৃণা করে অপরদিকে স্বদেশীয় ইংরেজের মতামতের প্রতিও অত্যন্ত অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করে, যেন উভয়েই তাহার অনাত্মীয়।

ইহার অনেকগুলি কারণ থাকিতে পারে, তাহার মধ্যে একটি কারণ এই যে, ইংলণ্ডে যে-সমাজনিন্দা ইংরেজকে সর্বদাই বিশেষ কর্তব্যপথ নির্দেশ করিয়া দিতেছে ভারতবর্ষে তাহা অত্যন্ত দূরবর্তী হওয়াতে ভারতবর্ষীয় ইংরেজ তাহার প্রভাব বিস্মৃত হইয়া যায়। ইহার উপরে আবার আমাদের সহিত ইংরেজের অনেকটা স্বার্থের সম্পর্ক, এবং আমাদের প্রতি তাহাদের স্বজাতীয়ত্বের মমতাবন্ধন নাই, সুতরাং এখানে কর্তব্যবুদ্ধির বিশুদ্ধতা রক্ষা করা ইংরেজের পক্ষে নানাকারণে কঠিন হইয়া পড়ে। সেইজন্য স্বার্থের সহিত, ক্ষমতাগর্বের সহিত পরাধীন দুর্বল জাতির নৈতিক আদর্শের সহিত, পরজাতি-শাসনতন্ত্রের বিবিধ কুটিলতার সহিত সংমিশ্রিত হইয়া ভারতবর্ষীয়

ইংরেজের একটা বিশেষ স্বতন্ত্র নূতন কর্তব্যনীতি গঠিত হইতে থাকে, তাহাকে অনেক সময় ইংলণ্ডের ইংরেজ ভালো করিয়া চেনে না।

কোনো কোনো প্রতিভাসম্পন্ন ভারতবর্ষীয় ইংরেজ এই নূতন পদার্থটিকে ইংলণ্ডে ভালোরূপে পরিচিত করাইবার ভার লইয়াছেন। তাঁহারা প্রতিভাবলে দেখাইতেছেন, এই নূতন পদার্থের নূতনত্বের একটি বিশেষ আকর্ষণ আছে।

দৃষ্টান্তস্বরূপে রাডইয়ার্ড কিপলিঙের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। তাঁহার অসামান্য ক্ষমতা। সেই ক্ষমতাবলে তিনি ইংরেজের কল্পনাচক্ষে প্রাচ্যদেশকে একটি বৃহৎ পশুশালার মতো দাঁড় করাইয়াছেন। তিনি ইংলণ্ডের ইংরেজকে বুঝাইতেছেন, ভারতবর্ষীয় গবর্মেণ্ট একটি সার্কস কম্পানি। তাঁহারা নানাজাতীয় বিচিত্র অপরূপ জন্তুকে সভ্যজগৎসমক্ষে সুনিপুণভাবে নৃত্য করাইতেছেন। একবার সতর্ক অনিমেষ দৃষ্টি ফিরাইয়া লইলেই সব-কটা ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়িবে। সুতীক্ষ্ণ কৌতূহলের সহিত এই জন্তুদিগের প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করিতে হইবে, যথাপরিমাণে চাবুকের ভয় এবং অস্থিখণ্ডের প্রলোভন রাখিতে হইবে এবং কিয়ৎপরিমাণে পশুবাৎসল্যেরও আবশ্যক আছে। কিন্তু ইহার মধ্যে নীতি প্রীতি সভ্যতা আনিতে গেলে সার্কস রক্ষা করা দুষ্কর হইবে এবং অধিকারীমহাশয়ের পক্ষেও বিপদের সম্ভাবনা।

কেবলমাত্র প্রাণশক্তির বলে প্রবল মনুষ্যজন্তুদিগকে শাসনে সংযত রাখিয়া কেবলমাত্র অঙ্গুলির নির্দেশে তাহাদিগকে নিরীহ নৃত্যে প্রবৃত্ত করার ছবিটি ইংরেজের কাছে কৌতুকজনক মনোরম বলিয়া প্রতিভাত হইবার কথা। ইহাতে ইংরেজের মনে নূতনত্বের কৌতূহল এবং স্বজাতিগর্বের সঞ্চার করে এবং আসন্ন বিপদকে শাসনে রাখিবার যে-একটি সুতীব্র আনন্দ আছে তাহাও ইংরেজপ্রকৃতির নিকট পরম উপাদেয়রূপে প্রতীয়মান হয়।

এদিকে ইংলণ্ডে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানের দলও দিনে দিনে বাড়িয়া উঠিতেছে। অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানের সাহিত্যও বিস্তারলাভ করিতেছে। ইংলণ্ডের ভূমিতে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানের মত ক্রমশ বদ্ধমূল হইয়া শাখাপল্লবিত হইতেছে। এই স্থলে ন্যায়ানুরোধে এ-কথাও বলিয়া রাখা উচিত, অনেক অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ভারতকার্য হইতে অবসর লইয়া স্বদেশে ফিরিয়া নিঃসহায় ভারতবাসীদের প্রতি পরম হিতৈষিতাচরণ করিতেছেন।

এই সকল কারণে স্বদেশস্থ ইংরেজের মধ্যেও একদল সন্দেহ করিতেছেন যে, তাঁহারা নিজেদের সম্বন্ধে যে-সকল কর্তব্য পালন করিয়া চলেন তাহার অধিকাংশই প্রাচ্যদেশীয়

ভিন্নজাতীয় জীবসকলের প্রতি প্রয়োগ করিতে গেলে কুইক্সোটোচিত বাতুলতার পরিচয় দেওয়া হয় কিনা, তাহাতে দ্বীপবাসী সভ্যজাতির বোধশক্তির সংকীর্ণতা এবং অনভিজ্ঞতা প্রকাশ পায় কিনা এবং সম্ভবত তাহাতে ভিন্নজাতীয় জীবের অনিষ্ট হয় কিনা। হার্বার্ট স্পেন্সর প্রভৃতি ইংরেজ দার্শনিকের মত এই যে, সভ্যতার তারতম্য অনুসারে নৈতিক আদর্শের তারতম্য কেবল যে অবশ্যম্ভাবী তাহা নহে, অভিব্যক্তির নিয়মে তাহা আবশ্যক।

এই সকল মতের সত্যাসত্য অন্য সময় বিচার হইবে আপাতত এইটুকু বলিতে পারি ইহার ফল আমাদের পক্ষে বড়ো পীড়াজনক। বেহার প্রদেশে গাছে ছাপ হইতে বিদ্রোহের আশঙ্কা করিয়া অনেক ইংরেজি কাগজে এমন কথা বলা হইয়াছে যে, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য জাতির মধ্যে কোনোকালেই যথার্থ প্রেমের সম্মিলন সম্ভব নহে। উহাদিগকে কেবলমাত্র গায়ের জোরে ভয় দেখাইয়া বশে রাখিতে হইবে। এ-সকল কথা পূর্বাপেক্ষা আজকাল যেন অধিকতর মুক্তকণ্ঠে বলা হইতেছে।

আমাদের বক্তব্য এই, যদি বা স্বীকার করা যায় যে স্বাধীনতাপ্রিয় য়ুরোপের কর্তব্যনীতি চিরপরাধীন প্রাচ্যদেশে সর্বথা উপযোগী নহে তথাপি যখন আমাদের রাজা য়ুরোপীয় তখন প্রাচ্যদেশের স্বাভাবিক গতিকে অব্যাহত রাখিবার চেষ্টা করা তাঁহাদের পক্ষে দুরাশামাত্র। আমাদের দেশ যদি স্বাধীন হইত তবে এই প্রাচ্যদেশে স্বাভাবিক নিয়মে যে-রাজ্যতন্ত্র উদ্‌ভাবিত হইয়া উঠিত তাহা বর্তমান ইংরেজ-রাজ্যতন্ত্র হইতে নিশ্চয়ই অনেক বিষয়ে ভিন্ন প্রকারের হইত। হয়তো একদিক হইতে দেখিতে গেলে রাজার যথেচ্ছ প্রতাপ এখনকার অপেক্ষা অধিক মনে হইত, তেমনি আবার অন্যদিকে রাজার প্রতাপ খর্ব করিয়া প্রজাদের ইচ্ছাচালনার পথ ভিন্ন আকারে নানা উপায়ে প্রকাশ পাইত। স্বাভাবিক সামঞ্জস্য কেবল স্বাভাবিক নিয়মেই সর্বাঙ্গসম্পূর্ণরূপে অভিব্যক্ত হইয়া উঠে। ইংরেজ হাজার ইচ্ছা করিলেও কেবল পলিসির দ্বারা তাহা ঘটাইতে পারে না।

অতএব ইংরেজ আমাদের সহিত কেবল ইংরেজের মতোই ব্যবহার করিতে পারেন; যদি ইচ্ছাপূর্বক তাহা বিকৃত করেন তবে সে কেবল দুর্ব্যবহার হইবে কোনোকালেই ভারতবর্ষীয় ব্যবহারে পরিণত হইতে পারিবে না। তাঁহাদের নিজের আদর্শ তাঁহারা ভাঙিতে পারেন কিন্তু তাহার স্থলে গড়িবেন কী এবং গড়িবেন কী করিয়া? মাঝে হইতে চিরাভ্যস্ত স্বদেশীয় আদর্শচ্যুত ইংরেজ আমাদের পক্ষে বড়ো একটি ভয়ংকর প্রাণী হইয়া দাঁড়াইবার সম্ভাবনা। রাডইয়ার্ড কিপলিং প্রভৃতি লেখকের লেখার মধ্যে যে একটি বলদর্পমিশ্রিত নিষ্ঠুরতার আভাস অনুভব করা যায় তাহা হইতে মনে হয় মানব মধ্যে মধ্যে

সভ্যতার শততন্তুনির্মিত সূক্ষ্ম সুদৃঢ় জাল ছিন্ন করিয়া ফেলিয়া আদিম আরণ্য প্রকৃতির বর্বরতার মধ্যে ঝাঁপ দিয়া পড়িতে ইচ্ছা করে। অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানগণ ভারতবর্ষে আসিয়া যে এক সুতীব্র ক্ষমতা-মদিরার আস্বাদন পায় তাহাতে এই প্রচণ্ড মত্ততার সৃষ্টি করিতে পারে। এই প্রেমহীন কঠিন ক্ষমতাদম্ভ প্রতিভাসম্পন্ন পুরুষের লেখনীতে অকৃত্রিম অসংকোচ পৌরুষ-আকারে একপ্রকার ভীষণ রমণীয়তা ধারণ করে তাহা ইংরেজের পক্ষে সাহিত্য কিন্তু আমাদের পক্ষে মৃত্যুর নিদান।

দ্বিতীয় কথা এই, আজকালকার উপন্যাসে লেখকেরা প্রাচ্য প্রকৃতিকে পাশ্চাত্য-দেশের নিকট যতটা রহস্যময় বলিয়া বর্ণনা করেন তাহার অনেকটা কাল্পনিক। আমাদের পরস্পরের মধ্যে সহস্র যোগ আছে। অন্তরের সাদৃশ্য অনেক সময় বাহ্য বৈসদৃশ্যে আচ্ছন্ন হইয়া থাকে মাত্র। আধুনিক লেখকগণ সেই বাহ্য বৈসদৃশ্যগুলির নূতনত্বকে পাঠকদের মনোরঞ্জনার্থে রঞ্জিত অতিরঞ্জিত করিয়া তুলিতে থাকেন এবং সুগভীর সাদৃশ্যগুলি উদ্ধার করিবার চেষ্টাও পান না ক্ষমতাও রাখেন না।

আমার এত কথা বলিবার তাৎপর্য এই যে, কেবল ভারতবর্ষে নহে ইংলণ্ডেও ক্রমে ক্রমে এই ধারণা বিস্তৃত হইতেছে যে, য়ুরোপের নীতি কেবল য়ুরোপের জন্য। ভারতবর্ষীয়েরা এতই স্বতন্ত্র জাতি যে, সভ্যনীতি তাহাদের পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী নহে।

এরূপ অবস্থায় আমাদের ন্যায়ান্যায়বোধ প্রবল হইয়া উঠিলে ইংরেজের রাজনীতি বিপথগামী হইতে পারিবে না। ইংরেজ যখন জানিবে সমস্ত ভারতবর্ষ তাহার কাজের বিচার করিতেছে তখন ভারতবর্ষকে সে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া কাজ করিতে পারিবে না।

সম্প্রতি তাহার লক্ষণ কিছু কিছু দেখা যাইতেছে। ইংরেজের কোনো অন্যায় দেখিলে ভারতবর্ষ আপন দুর্বলকণ্ঠে সভ্যতা ও নীতির দোহাই পাড়িতে থাকে। সেজন্য ইংরেজ রাগ করে বটে কিন্তু তাহাকে কিঞ্চিৎ সতর্ক থাকিতেও হয়।

তথাপি এখনও সম্পূর্ণ ফল ফলে নাই। আমাদের সম্বন্ধে সকল সময়ে সকল অবস্থায় নীতি মানিয়া চলাকে ইংরেজ দুর্বলতা স্বীকার বলিয়া দেখে। আমাদের প্রতি অপরাধ করিয়া তাঁহাদের কেহ ন্যায়বিচারে দণ্ডনীয় হয় ইহা তাঁহারা লজ্জাজনক ও ক্ষতিজনক বলিয়া জ্ঞান করেন। তাঁহারা মনে করেন ভারতবর্ষীয়ের নিকট ইহাতে ইংরেজের জোর কমিয়া যায়।

রাজপুরুষদিগের মনের ভাব ঠিক করিয়া নির্ণয় করা আমাদের পক্ষে অসাধ্য, কিন্তু বোধ করি রাভীচি সাহেবের অসময়ে পদোন্নতি উপরি-উক্ত পলিসিবশত। বিশেষত যখন দেখা যায় এমন ঘটনা বারংবার ঘটিয়াছে, তখন সন্দেহ আরও দৃঢ় হয়। গবর্মেণ্ট যেন নীরবে বলিতেছেন যে, তোমাদিগের কাহাকেও অন্যায় উৎপীড়ন ও অপমান করিয়া

কোনো কর্তৃপুরুষের লাঞ্ছনা হইতে পারে ইহা মনে করাই তোমাদের পক্ষে স্পর্ধা, সেই স্পর্ধায় পদাঘাত করিবার জন্য যদি বা প্রথা উল্লঙ্ঘন যদি বা রাজশাসনের অনাদর করিতে হয় তবে তাহাও শ্রেয়। ইংরেজ ন্যায়পরতার অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, ধর্মবিচারেরও অতীত।

সত্যের অনুরোধে স্বীকার করিতে হইবে যে, সম্প্রতি দুই-একটি ঘটনায় দেখা গিয়াছে, গবর্মেন্ট কেবল ইংরেজ নহে নিজের কর্মচারীমাত্রকেই ন্যায়বিচারের কিঞ্চিৎ ঊর্ধ্বে তুলিয়া রাখিতে চাহেন। বালাধন হত্যাকাণ্ডের মকদ্দমায় ইংরেজ জজ হইতে বাঙালি পুলিস কর্মচারী পর্যন্ত যে কেহ লিপ্ত ছিল, হাইকোর্টের বিচারে যাহারা প্রত্যেকে প্রকাশ্যে নিন্দিত হইয়াছে তাহারা সকলেই বাংলা গবর্মেন্ট কর্তৃক পুরস্কৃত এবং উৎসাহিত হইয়াছে।

আমরা বাহিরের লোক, রাজনীতির ভিতরকার কথা কিছুই জানি না। হয়তো ইহার মধ্যে কোনো গোপন কারণ থাকিতে পারে। হয়তো কর্তার এমন ধারণা হইতে পারে যে, বালাধনের মকদ্দমায় স্থানীয় জজের বিচার অন্যায় হয় নাই; যেমন করিয়া হউক গোটা পাঁচ-সাত লোকের ফাঁসি যাওয়া উচিত ছিল। তাঁহাদের এমন সংস্কার হইতে পারে যে, আদালতে টিকিবার যোগ্য প্রমাণ না থাকিলেও ঘটনাটা প্রকৃতপক্ষে সত্য এবং সে-সত্য স্থানীয় বিচারকই কেবল নির্ণয় করিতে পারে, হাইকোর্টের জজের পক্ষে অসাধ্য।

আমাদের বক্তব্য এই যে, দেশের সর্বোচ্চ বিচারালয়ে প্রকাশ্যে যাহাদের ব্যবহার নিন্দিত হইয়াছে, সাধারণের নিকটে যাহারা অন্যায়কারী বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে, শাস্তি দেওয়া দূরে থাক তাহাদিগকে প্রকাশ্যে পুরস্কৃত করিলে জনসাধারণের ন্যায়ান্যায়-জ্ঞানের প্রতি একান্ত অবজ্ঞা প্রকাশ করা হয়। সকলকে বলা হয়, তোমাদের কাছে কর্তব্য-অকর্তব্য সম্বন্ধে কোনোরূপ কৈফিয়ত দিবার কোনো আবশ্যক দেখি না—তোমরা ভালোই বল মন্দই বল তাহাতে গবর্মেন্টের কোনো মাথাব্যথা নাই। আমাদের ভারি স্ট্রং গবর্মেন্ট।

যে গবর্নর প্রজার মর্মবেদনার উপর প্রজার ন্যায়ান্যায়বোধের উপর জুতার গোড়ালি ফেলিয়া ফেলিয়া চলেন এবং সেই মচমচ শব্দে দুর্বল কণ্ঠের আর্তস্বর নিমগ্ন করিয়া দেন তিনি অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ায় স্ট্রং গবর্নর।

কিন্তু তাহাতে তাঁহাদের বলপ্রকাশ পায়, না, আমাদের যৎপরোনাস্তি দুর্বলতার সূচনা করে তাহা কাহাকেও বলিয়া দেওয়া আবশ্যক করে না। গবর্মেন্টের এরূপ উদ্ধত অবজ্ঞায় ইহাই প্রকাশ পায় যে, তাঁহাদের মতে ভারতবর্ষীয় জনসাধারণের ন্যায়ান্যায়বোধ

এমন প্রবল নহে যে, তাহার নিকট সংকোচ অনুভব করা যায়। বরঞ্চ এই চিরনিপীড়িত জাতির নিকট নিঃসংকোচ স্বেচ্ছাচারই যথার্থ বলের ন্যায় প্রতিভাত হয়।

আমরা যদি রাজপুরুষগণকে এমন কথা বুঝাইতে পারি যে, ন্যায়পথ লঙ্ঘন করিলে সেটাকে আমরা বাহাদুরি জ্ঞান করি না, অন্যায় যতই বলিষ্ঠ দেখিতে হউক আমাদের প্রাচ্য স্বভাবেও তাহা ঘৃণ্য এবং নিন্দনীয় বলিয়া অনুভূত হয়, এবং সুদৃঢ় নিরপেক্ষভাবে সর্বত্র সর্বলোকের প্রতি যথোচিত ন্যায়দণ্ড বিধান করিবার সাহস না থাকা আমাদের নিকট দুর্বলতা বলিয়াই প্রতিভাত হইয়া থাকে তবে আমাদের সেই কর্তব্যজ্ঞানের আদর্শকে ইংরেজ সম্মান না করিয়া থাকিতে পারিবেন না, কারণ সে-আদর্শের সহিত তাঁহাদের নিজেদের আদর্শের ঐক্য দেখিতে পাইবেন।

যখন আমরা বহুকালব্যাপী পরাধীনতার বিষময় শিক্ষা ভুলিতে পারিব, যখন প্রবলের অন্যায়াচরণকে বিধির বিধানের স্বরূপ নীরবে অবশ্যসহ্য বলিয়া স্থির করিব না, যখন অন্যায়ের প্রতিবিধানচেষ্টা নিষ্ফল হইলেও তাহাকে কর্তব্য বলিয়া জানিব এবং সেজন্য ত্যাগ স্বীকার ও কষ্ট সহ্য করিতে পরাঙ্মুখ হইব না, তখন আমাদের যথার্থ আনন্দের দিন উপস্থিত হইবে। তখন ব্রিটিশ গবর্মেন্টের ন্যায়পরতা কদাচ স্বার্থ পলিসি এবং ব্যক্তিবিশেষের খেয়ালের দ্বারা বিচলিত হইবে না, অটল পর্বতের ন্যায় প্রজা-হৃদয়ের দৃঢ়ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত হইবে। তখন ইংরেজের সদ্ব্যবহার শুভদৈবক্রমে ক্ষণিক অনুগ্রহের ন্যায় আমাদের নত মস্তকের উপর নিক্ষিপ্ত হইবে না, সম্মানের ন্যায় আমাদের নিকট আহরিত হইবে,—আজ যাহা ভিক্ষাস্বরূপে প্রাপ্ত হইতেছি তখন তাহা অধিকারের ন্যায় গ্রহণ করিব।

প্রশ্ন উঠিতে পারে, উপদেশ সহজ, কিন্তু উপায়টা কী? তাহার উত্তরে বলিতে হয়, কোনো যথার্থ মঙ্গল কলকৌশলের দ্বারা পাওয়া যায় না, তাহার যা মূল্য তাহা সমস্তটাই দিতে হইবে। প্রত্যেককে প্রাণপণ করিতে হইবে, ঘরে ঘরে ভ্রাতা এবং সন্তানদিগকে শিক্ষা দিতে হইবে, পরিবার এবং সমাজের মধ্যে ন্যায়াচরণের অটল আদর্শ স্থাপন করিতে হইবে, নিজের ব্যবহারের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে। সমস্ত ভালো কথার ন্যায় এ-কথাটিও শুনিতে সহজ, করিতে কঠিন এবং অত্যন্ত পুরাতন। কিন্তু এই পুরাতন সুদীর্ঘ প্রকাশ্য পথ ছাড়া স্থায়ী কল্যাণের আর কোনো নূতন সংক্ষিপ্ত গূঢ় পথ আবিষ্কৃত হয় নাই।

১৩০১

প্রসঙ্গ-কথা

১

কলিকাতায় প্লেগ-রেগুলেশন যে উগ্রমূর্তিধারণ করিয়া উঠে নাই, সেজন্য আমাদের নব বঙ্গাধিপের প্রতি বঙ্গদেশের কৃতজ্ঞতা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে।

যমদূতের উৎপীড়নের সহিত রাজদূতের বিভীষিকার যোগ হইলে প্রজাগণ একেবারে হতাশ হইয়া পড়িত। কিন্তু সেইটে নিবারণ হইয়াছে বলিয়াই যে একমাত্র আনন্দ তাহা নহে ; ইহা অপেক্ষা গুরুতর সুখের কথা আছে।

ইতিপূর্বে আমরা লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি, প্রজারা যখন কোনো একটা বিষয়ে একটু বেশি জিদ করিয়া বসে তখন গবর্মেণ্ট তাহাদের অনুরোধ পালন করিতে বিশেষ কুণ্ঠিত হইয়া থাকেন, পাছে প্রজা প্রশ্রয় পায়।

সেইজন্য আমাদের শিক্ষিত লোকেরা যে-সমস্ত কোলাহলকে পোলিটিকাল অ্যাজিটেশন নাম দিয়া থাকেন তাহাকে উদ্দেশ্যসিদ্ধির পক্ষে আমরা সদুপায় বলিয়া মনে করি না। কারণ, গবর্মেণ্ট এবং ভারতবর্ষীয় ইংরেজগণ যখন এই সকল অ্যাজিটেশনওআলাকে আপনাদের বিরুদ্ধদল বলিয়া গণ্য করিয়া লইয়াছেন, তখন তাঁহাদের সংগত প্রস্তাবেও কর্ণপাত করিতে কর্তৃপক্ষের দ্বিধা হয়, মনে হয়, এ-কথা পাছে সাধারণে মনে করে যে, আমরা দায়ে পড়িয়া হার মানিয়া ইচ্ছার বিরুদ্ধে কয়েকজন উদ্ধত লোকের বাক্‌শক্তিদ্বারা চালিত হইলাম, পাছে কেহ ভুলিয়া যায় যে, ভারতবর্ষে আমাদের ইচ্ছাই শেষ ইচ্ছা।

অ্যাজিটেশনকারিগণও ভিতরে ভিতরে তাহার আভাস পাইয়াছেন তাঁহাদের ব্যবহারে এরূপ অনুমান করা যায়। কারণ, এবারে যে নিদারুণ আইনের দ্বারা নাটু-হরণ ব্যাপার ঘটিল সে-সম্বন্ধে আমাদের দেশের বাগ্মী-সভাসমূহ অভূতপূর্ব বিজ্ঞতাসহকারে সুদীর্ঘকাল নিস্তব্ধ ছিলেন। আমরা গোল করিতে বসিলেই পাছে গবর্মেণ্টের মন আরও বিগড়িয়া যায় হয়তো এ-আশঙ্কা তাঁহাদের ছিল।

যাহাই হউক বর্তমান ব্যাপারে আমাদের বিশেষ আনন্দের বিষয় এই যে, গবর্মেণ্ট প্রজাদের মন রক্ষা করিতে লজ্জা বা সংকোচ বোধ করেন নাই। গবর্মেণ্ট এবং এ-দেশী ইংরেজসম্প্রদায় বলিতেছেন যে, প্রজারা যখন পুব-দেশী, এবং পরিবারমণ্ডলীর প্রতি হস্তক্ষেপ করার বিরুদ্ধে উহাদের যখন এতই দৃঢ়সংস্কার তখন সেটা বিবেচনা করিয়া এবং যথাসম্ভব বাঁচাইয়া কাজ করাই রাজার কর্তব্য।

আমাদের বিস্ময় এবং কৃতজ্ঞতার কারণ এই যে, প্লেগদমন একমাত্র ভারতবর্ষের হিতের জন্য নহে। তাহাতে ইংরেজের ভয় আছে, বাণিজ্যের ক্ষতি আছে। এরূপ স্থলে প্রজাদের পুব-দেশী সংস্কার বিবেচ্য বিষয়ের মধ্যে গণ্য হওয়ায় প্রাচীলক্ষ্মীর সকরুণ নেত্রযুগল আনন্দাশ্রুজলে অভিষিক্ত হইয়া উঠিয়াছে।

এমন অকস্মাৎ সৌভাগ্য আমরা আশাও করি নাই। কারণ, যে দুর্ভিক্ষ-ভূকম্প-মহামারীর প্রলয়পীড়নে অন্য কোনো দেশ আসন্ন মৃত্যুর ভীষণ নৈরাশ্যে উদ্দাম হইয়া উঠিত, ভারতবর্ষ তাহা অবিচলিত ধৈর্যসহকারে সহ্য করিয়াও কর্তৃপক্ষের করুণা আকর্ষণ করিতে পারে নাই। দেশের এই পরম দুঃসময়ে গবর্মেন্ট উপর্যুপরি তাঁহার কঠোরতম বিধি ও শাসনের দ্বারা ভারতবর্ষীয় সহিষ্ণুতার অগ্নিপরীক্ষা সৃজন করিয়া তুলিয়াছিলেন।

এইরূপ দুর্যোগই বিদেশী রাজার পক্ষে প্রজাদের হৃদয়জয়ের দুর্লভ অবকাশ। এই সময়েই রাজা প্রমাণ করিতে পারেন যে, আমরা পর হইয়াও পর নহি। এই সময়েই তাঁহাদের পক্ষে ক্ষমা ধৈর্য ও সমবেদনা ফৌজ কেল্লা ও গুলিগোলার অপেক্ষা রাজশক্তির যথার্থ পরিচয়স্থল।

পরন্তু এই সময়ে পতিতের উপর পদপ্রহার, ব্যথিতের উপর জবরদস্তি ভয়ের নিষ্ঠুরতামাত্র। ইহাতে রাজার রাজশক্তি নহে বিদেশীর দুর্বলতা প্রকাশ পায়। এবার প্যুনিটিভ পুলিস, নাটু-নিগ্রহ, সিডিশন বিলের দ্বারা গবর্মেন্ট উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন যে, আমরা স্বল্পসংখ্যক বিদেশী, আমরা ক্ষমা করিতে সাহস করি না।

মারীগ্রস্ত পুনা যখন গোরাসৈন্যের আতঙ্কে মুহুর্মুহু কাতরোক্তি প্রকাশ করিতে লাগিল তখন কর্তৃপক্ষ সেই আর্তনাদকে প্রজার স্পর্ধা বলিয়া গণ্য করিলেন। তখন তাঁহারা প্রবলজনোচিত ঔদার্য অবলম্বন করিলেন না, সকরুণচিত্তে এটুকু বিবেচনা করিলেন না যে, দুর্ভাগাগণের অন্তিমশয্যা হইতে অন্তত একটা অসংগত বিভীষিকা দূর করিলেও বিশেষ ক্ষতি নাই। স্বীকার করিলাম গোরাসৈন্যগণ শিষ্ট শান্ত সংযত, এবং দেশীয় লোকদের প্রতি স্নেহশীল। কিন্তু দেশের মূঢ় লোকের যদি এমন একটা সুদৃঢ় অন্ধ সংস্কার জন্মিয়াই থাকে যে, গোরাসৈন্য দুর্দান্ত উচ্ছৃঙ্খল এবং শ্রদ্ধা অভাবে দেশীয় লোকের প্রতি অবিবেকী তবে সেই চরম সংকটের সময় বিপন্ন ব্যক্তিদের একটা অনুনয় রক্ষা করিলে দুর্বলতা নহে মহত্ত্ব প্রকাশ পাইত।

দেখিলাম গবর্মেন্টের উত্তরোত্তর রাগ ও জেদ বাড়িয়া যাইতে লাগিল। যেখানে যত বেদনা শাসনকর্তা সেখানে তত আঘাত করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। ভারতবর্ষের আদ্যন্তমধ্যে অশান্তির আক্ষেপ কোথাও প্রকাশ্যে ফুটিবার উপক্রম করিল কোথাও

গোপনে গুমরিয়া উঠিল। এ-দেশের সর্বসাধারণের মধ্যে এরূপ ক্ষুব্ধ অবস্থা আর কখনো দেখা যায় নাই।

ইতিমধ্যে কলিকাতায় প্লেগ দেখা দিল। ভাবিলাম শংকরের অপেক্ষা তাঁহার ভূতপ্রেতগুলার ভয় বেশি—এবং ভারতগবর্মেন্টের যেরূপ মেজাজ তাহাতে প্লেগ অপেক্ষা প্লেগ-রেগুলেশন বেশি রুদ্রমূর্তি ধারণ করিয়া উঠিবে। সতর্ক থাকিলে প্লেগের হস্ত অনেকে এড়াইবে কিন্তু রেগুলেশনের হস্তে কাহারও রক্ষা নাই।

এমন সময় বুডবর্ন সাহেব মাভৈঃধ্বনি ঘোষণা করিলেন। বুঝিলাম বাংলাদেশে রাজার অভ্যুদয় হইয়াছে, এখানে রেগুলেশন নামক এঞ্জিনের শাসন নহে, রাজার রাজ্য। ইহাতেই রাজভক্তি জাগিয়া উঠে। রাজার ইচ্ছা আমার ইচ্ছার সহিত একভাবে মিলিতে পারে ইহা জানিতে পারিলে রাজাকেও মনুষ্য বলিয়া প্রীতি করি এবং আপনার প্রতিও মনুষ্য বলিয়া শ্রদ্ধা জন্মে।

এ-কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে, আজকাল কিপলিং প্রভৃতি বিখ্যাত লেখকগণের উপন্যাসে ভারতবর্ষ ও তাহার অধিবাসিবর্গ যেরূপ বর্ণে চিত্রিত হইতেছে এবং ভারতবর্ষীয় ইংরেজদের মধ্যে এদেশীয়দের বিরুদ্ধে ক্রমশই যে একটা সাম্প্রদায়িক সংস্কার বদ্ধমূল হইয়া যাইতেছে এবং যাহার অবশ্যম্ভাবী প্রতিঘাতস্বরূপে উত্তরোত্তর ভারতবাসীর মনে ইংরেজ ও সর্বপ্রকার ইংরেজি প্রভাবের প্রতিকূলে যে একটা পরাঙ্মুখভাব বৃদ্ধি পাইতেছে অল্পে অল্পে তাহার প্রতিকার সাধন করিতে পারেন পশ্চিমের ম্যাকডোনেল এবং আশা করি আমাদের বুডবর্ন সাহেবের ন্যায় ক্ষমা-ধৈর্যপরায়ণ সহৃদয় শাসনকর্তৃগণ। কঠিন আইন ও জবরদস্তিতে সম্পূর্ণ উলটা ফল ফলিবে। ইহা আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি।

এখন এমন একটা অবস্থা দাঁড়াইয়াছে যে, ইংরেজ এবং দেশী উভয়েই পরস্পর পরস্পরকে ভুল বুঝিবার, অন্যায় বিচার করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে।

কিন্তু ক্ষমতা যাহার হস্তে, বিচারের শেষ ফল সেই দিতে পারে। আমাদের মন বিগড়াইয়া গেলে আমরা কাগজে দু-চার কথা বলিতে পারি, কিন্তু কর্তৃপক্ষের মন বিগড়াইয়া গেলে তাঁহারা আমাদের কাগজের গলা চাপিয়া ধরিতে পারেন। আমরা ক্ষুব্ধ হইলে তাহা রাজবিদ্রোহ কিন্তু রাজারা রুখিয়া থাকিলে তাহা কি প্রজাবিদ্রোহ নহে? উভয়েরই ফল কি রাজ্যের পক্ষে সমান অমঙ্গলজনক নহে?

কিন্তু দুইদিক বিচার করা কাজটা কঠিন, বিশেষত দুইদিকের মধ্যে একদিক যখন নিজের দিক। তথাপি নীতিতত্ত্ববিৎমাত্রেই বলিয়া থাকেন পরের অপেক্ষা নিজেকে কঠিন বিচারাধীনে আনিলে নিজের পক্ষেই মঙ্গল। ঈসপের কথামালায় আছে কানা

হরিণ পরপারের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া ঘাস খাইত—তাহার নিজপারের দিক হইতেই ব্যাধের শর তাহাকে বিদ্ধ করিয়াছিল। নিজের দিকে সকলে কানা এই জন্য সর্বাপেক্ষা গুরুতর অকল্যাণ সেইদিকেই প্রবল হইয়া উঠে।

আমাদেরও সেই দশা, ইংরেজেরও তাই। যাহা সর্বাগ্রে আমাদের নিজের কর্তব্য তাহার প্রতি আমরা উদাসীন এবং গবর্মেণ্টের কর্তব্যের প্রতি আমাদের শত চক্ষু এবং সহস্র জিহ্বা। ইংরেজেরও প্রজার সামান্যমাত্র চাঞ্চল্যের প্রতি রুদ্ররূপ, কিন্তু নিজে যে প্রতিদিন ঔদ্ধত্য ও অবমাননার দ্বারা প্রজাসাধারণকে নানা আকারে ক্ষুব্ধ করিয়া তুলিতেছেন তাহার বিষময়তার প্রতি কর্তৃপক্ষের শৈথিল্য থাকাতে তাহা প্রশ্রয় পাইয়া বিরাটমূর্তি ধারণ করিতেছে।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমরা একটা উদাহরণ দিতেছি। অনিচ্ছার কারণ এই, বারংবার নিজেদের এই সকল হীনতার দৃষ্টান্ত আলোচনা করিতে সংকোচ বোধ হয়। মাঝে মাঝে প্রায়ই শুনা যায় গোরা সৈন্য শিকার উপলক্ষ্যে এ-দেশী গ্রামবাসীর হত্যার কারণ হইয়া পড়ে। মান্দ্রাজে ঘণ্টাকুলের হত্যাব্যাপারে দেশীয় দ্বাররক্ষীর মহত্ত্ববিবরণ এমন জড়িত রহিয়াছে যে, তাহা বিস্মৃত হওয়া ভারতবাসীর পক্ষে সুকঠিন।

দেশীয় লোককে হত্যা করিয়া এ-পর্যন্ত বাংলাদেশে কেবল বহুকাল পূর্বে একজন ইংরেজের ফাঁসি হইয়াছিল। অভিযুক্তগণ খালাস পাইয়াছে, অবশ্য, সেটা প্রমাণ এবং ইংরেজ জজ ও জুরির বিচার ও বিশ্বাসের কথা। কিন্তু এরূপ দুর্ঘটনা বারংবার না ঘটিতে পারে গবর্মেণ্ট তজ্জন্য কোনো বিশেষ বিধান করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। অথচ ইহাতে করিয়া কোনো পোলিটিকাল কুফল সঞ্চিত হইতেছে না এমন কে বলিতে পারে?

সম্প্রতি ব্যারাকপুরে একজন সম্ভ্রান্ত বাঙালি ভদ্রলোক তিনজন গোরা সৈন্যের দ্বারা যেরূপ নিষ্ঠুরভাবে হত হইয়াছেন তাহা পাঠকগণ জানেন। অবশ্য ইহার বিচার হইবে, এবং দোষিগণ দণ্ড পাইবে এমনও আশা করা যাক। কিন্তু ইতিমধ্যে ইংরেজচালিত কোনো খবরের কাগজে এই নিদারুণ ঘটনা উপলক্ষ্যে কিছুমাত্র বিরক্তি খেদ অথবা রোষ প্রকাশ হইয়াছে? প্রমাণের ত্রুটি অবলম্বন করিয়া আদালতের হস্ত হইতে দোষী নিষ্কৃতি পাইতে পারে কিন্তু ইংরেজসাধারণের সূক্ষ্ম ন্যায়ানুরাগ যদি এই পাপকার্যকে লেশমাত্র লাঞ্ছিত না করে তবে তাহা হইতে কী প্রমাণ হয়?

অথচ, হাওড়ায় কোনো একটি য়ুরোপীয় হত্যা লইয়া সেই সকল ইংরেজি কাগজের ইংরেজ পত্রপ্রেরকগণ কিরূপ উত্তেজনা ও আক্রোশ প্রকাশ করিতেছেন?

হাওড়ার এই হত্যাকাণ্ড অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও শোচনীয় সন্দেহ নাই এবং তাহার বিচার

কঠিন ও দণ্ড সুকঠোর হইবে না এমন আশঙ্কাও কেহ মনে স্থান দিতে পারে না। কিন্তু উভয় হত্যার মধ্যে অনেক প্রভেদ আছে। জনসাধারণ যখন অমূলক অথবা সমূলক আশঙ্কায় ত্রস্ত হইয়া উঠে তখন তাহারা যেরূপ ভীষণমূর্তি ধারণ করে তাহা অন্য দেশের তুলনায় এ-দেশে কিছুই নহে। সেইরূপ উত্তেজিত অবস্থায় যে দুই-একটা অন্যায় হত্যা সংঘটিত হইবে তাহাতে বিচিত্র কী আছে? কিন্তু ব্যারাকপুরে বিনা-কারণে যে হত্যা ঘটিয়াছে তাহার মূলে বহুকালের স্পর্ধা ও প্রশ্রয় আছে,—প্লেগঘটিত উত্তেজনা কচিৎ-সম্ভাব্য কিন্তু শেষোক্ত কারণজনিত দুর্ঘটনা ধারাবাহিক। তাহার বিষবীজ সংক্রামক এবং স্থায়ী।

একটি গোরা পুনা-রাজপথে বায়ু-বন্দুক ছুঁড়িয়া আমোদ করিতেছিল তাহার বিবরণ কাগজে প্রকাশিত হইয়াছে। তিনজনের গায়ে গুলি লাগে। আঘাত অতি সামান্য, এবং সে-হিসাবে অপরাধ গুরুতর নহে। কিন্তু এই খেলার মধ্যে যে একটা নিষ্ঠুর অবজ্ঞা অবহেলা আছে তাহা ভারতবাসীর পক্ষে বিপজ্জনক এবং কর্তৃপুরুষের পক্ষেও চিন্তার কারণ হওয়া উচিত ছিল। অপরাধী স্বীকার করিয়াছে যে, "He fired at a coffee shop sweeper for a lark" অর্থাৎ সে কেবলমাত্র মজা করিয়া একজন কফি-দোকানের ঝাড়ুদারকে গুলি করিয়াছিল। এই গুলি ঝাড়ুদারের গাত্রে অধিকদূর প্রবেশ করে নাই কিন্তু এইরূপ মজা ভারতবর্ষের মর্মের মধ্যে গভীররূপে নিহিত হইয়া থাকে।

এ-কথা অস্বীকার করিতে পারি না যে, যে-জাতি অতিমাত্রায় নিরীহ তাহাকে পদে পদে আঘাত ও অপমান হইতে রক্ষা করিতে কোনো গবর্মেণ্টই কৃতকার্য হইতে পারে না। এই সকল ক্ষুদ্র বিপদ হইতে নিজের পৌরুষই নিজেকে উদ্ধার করে। ইহার জন্য কাহারও কাছে কাঁদিয়া গিয়া পড়ার মতো লজ্জা আর নাই।

সেইজন্য ছোটোখাটো উপদ্রব এবং অপমানের কথায় নিজেদেরই প্রতি ধিক্‌কার জন্মে। সেতারার স্কুলমাস্টারের কুণ্ঠিত সেলাম সাহেবের পক্ষে যথোপযুক্ত না হওয়ায় যে একটা লাঞ্ছনা ও নালিশের সৃষ্টি করিয়াছে তাহা আমরা লজ্জাজনক জ্ঞান করি। প্রত্যক্ষ অপমান যে-দেশে সুমন্দ গতিতে সুদূর নালিশে গিয়া গড়ায় সে-দেশের অপমানেরও শেষ নাই।

কিন্তু যাহারা সুদীর্ঘকাল শান্তভাবে সহ্য করে, তাহারাই যে অকস্মাৎ একদিন তাহাদের চিরসঞ্চিত নীরব নালিশ অন্তর্জ্বালার সহিত উদ্‌গীর্ণ করিতে পারে এ-কথা সকলেই ভুলিয়া যায়—এমন কি, তাহারা নিজেরাও পূর্বে হইতে বলিতে পারে না। এইজন্য যখন তাহারা হঠাৎ সামান্য উপলক্ষ্যে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে তখন তাহাদের নিরর্থক

আচরণ অত্যন্ত অসংগত বলিয়া বোধ হয়। লোকে ভুলিয়া যায় বহুকালের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বেদনা, অবিচার, অবিশ্বাস, অপমান হঠাৎ একটা তুচ্ছ মন্ত্রবলে বিরাট আকার ধারণ করিয়া উঠে। মনে হয় সে যেন একটা আকস্মিক অতিপ্রাকৃত দৈবসৃষ্টি, কেহ যেন পূর্বে হইতে তাহার জন্য অপেক্ষা করিতে পারে না। কিন্তু তাহা আকস্মিক নহে, অতি দীর্ঘকাল ধরিয়া অতিশয় মন্দগতিতেই প্রাকৃত নিয়মের রাজপথ দিয়া সে চলিয়া আসে, তাহার মৌন দীনভাব দেখিয়া কেহ তাহাকে লক্ষ্য করে না।

পূর্বদেশীয়দের এই নীরব সহিষ্ণুতা যাহাতে পশ্চিমদেশীয়দিগকে অলক্ষ্যে অসতর্কতা ও ঔদ্ধত্যে লইয়া যায়, ইহাই প্রাচ্য প্রজা ও পাশ্চাত্য রাজা উভয়েরই পক্ষে বিপদের মূল। ইহা হইতেই গোরা সৈন্যদের মজার খেলা ও কালা আদমিদের অকস্মাৎ উন্মত্ততার সৃষ্টি হয়।

যাহা হউক, এইরূপ সংঘটন এবং সংঘর্ষে প্রজাদের আন্তরিক সন্তাপ যে কিরূপ বাড়িয়া উঠিতেছে তাহা পরিমাণ করিবার উপায় নাই। যে-সকল ইংরেজ কথায় কথায় ঘুষা লাথি চড় এবং শুয়র নিগর সম্ভাষণ প্রয়োগ করিতে সর্বদা প্রস্তুত তাঁহারা প্রত্যহই ভারতবর্ষে কী প্রকার বিপৎপাতের ভিত্তি রচনা করিতেছেন তাহা তাঁহারা জানেন না, এবং যে ইংরেজসমাজ এইরূপ রূঢ়তা ও অবজ্ঞাপরতার বিরুদ্ধে কোনো প্রকার নৈতিক বাধা প্রদান করেন না তাঁহারা যে-শাখায় বসিয়া আছেন সেই শাখা ছেদনে প্রবৃত্ত।

আমাদের প্রতি সাধারণ ইংরেজের এইপ্রকার ভাবই প্রজাবিদ্রোহের ভাব। তাঁহারা আচারে ব্যবহারে ভাষায় ভঙ্গিতে সর্বদাই আমাদের মর্মস্থানকে ক্ষুব্ধ করিতেছেন। এমন কি, তাঁহাদের মধ্যে এমন মূঢ়চেতারও অভাব নাই যাঁহারা অসহ্য অবজ্ঞায় আঘাতে প্রজা-হৃদয়ে অপমানক্ষত সর্বদা জাগাইয়া রাখাই রাজনৈতিক হিসাবে কর্তব্য জ্ঞান করেন। তাঁহারা পথে চলিতে চাবুক তুলিয়া সেলাম শিখাইতে শিখাইতে অগ্রসর হন।

ইহাকেই বলে প্রজাবিদ্রোহ। এবং নিয়ত এই বিদ্রোহেই প্রজার হইয়া প্রজাপতির কালাগ্নি উত্তরোত্তর প্রজ্বলিত হইতে থাকে। ইংরেজ কি সেই চিরজাগ্রত প্রজাপালকের বিশ্বনিয়মের প্রতিও প্রভুত্বমদোদ্ধত ভ্রূকুটি নিক্ষেপ করিবেন? প্রজাদের সংবাদপত্র, সভাসমিতি, এবং বাগ্মিবর্গ আছে, রুদ্রমূর্তি রাজা মুহূর্তের মধ্যে তাহাদের বাগ্‌রোধ করিয়া দিতে পারেন কিন্তু প্রজাপতির সভা নিঃশব্দ নীরব এবং তাঁহার বিচার সুচির কিন্তু সুনিশ্চিত।

১৩০৫

২

পরজাতীয়ের প্রতি বিদ্বেষ যে স্বাভাবিক এবং কিয়ৎপরিমাণে তাহার সার্থকতা আছে এ-সম্বন্ধে সম্প্রতি ইংরেজি স্পেক্টেটর পত্রে একটি প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে।

একটা জাতি বাঁধিয়া তুলিতে অনেক সময় যায়। আজ যাহারা ইংরেজজাতি বলিয়া খ্যাত তাহারা জুলিয়স সীজারের আক্রমণকাল হইতে এডওঅর্ড দি কনফেসরের রাজত্বকাল পর্যন্ত হাজার বৎসর ধরিয়া পরিপাক পাইয়া তবে প্রস্তুত হইয়াছে।

এই সময়ের মধ্যে কেণ্ট রোমান অ্যাঙ্গল জুট ডেন স্যাকসন নর্মান প্রভৃতি বিচিত্র ভিন্ন জাতি এক ঐতিহাসিক চুল্লির উপরে চড়ানো ছিল। তাহাদের মধ্যে প্রভেদ ও বিরোধ ঘুচিয়া যখন তাহারা ঘনভাবে এক হইয়া উঠিল তখন তাহারা ব্রিটিশ জাতিরূপে গণ্য হইল।

এত দীর্ঘকালনির্মিত জাতীয়তা পরের সংঘাত হইতে আপনাকে সর্বতোভাবে রক্ষা করিবার জন্য স্বভাবতই উদ্যত হইয়া থাকে। ধর্মনীতি সমাজনীতি অর্থনীতি সম্বন্ধে তাহার সংস্কারসকল এমন একান্ত বিশেষত্ব ও দৃঢ়তা লাভ করে যে, তাহার মধ্যে বহির্জাতির প্রবেশপথ থাকে না।

ভারতবর্ষের হিন্দুগণ বিশেষ একটি জাতি বলিয়া গণ্য হইতে পারে কিনা তাহা লইয়া কেহ কেহ তর্ক উত্থাপন করেন। সে তর্ক অসংগত নহে।

জগতে হিন্দুজাতি এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত। ইহাকে বিশেষ জাতিরূপে গণ্য করা যায় এবং যায়ও না। জাতীয়ত্বের সংকীর্ণতা ইহার মধ্যে আছে অথচ জাতীয়ত্বের বল ইহার মধ্যে নাই। ইহা এক অথচ অনেক, ইহা বিপুল অথচ দুর্বল। ইহার বন্ধন যেমন কঠিন তেমনি শিথিল, ইহার সীমা যেমন দৃঢ় তেমনি অনির্দিষ্ট।

য়ুরোপে জাতিগত উপাদানে রাজনৈতিক ঐক্যই সর্বপ্রধান। হিন্দুদের মধ্যে সেটা কোনোকালেই ছিল না বলিয়া যে হিন্দুরা জাতিবদ্ধ নহে সে-কথা ঠিক নহে।

বৈদিক সময় হইতে পৌরাণিক যুগ পর্যন্ত সুদীর্ঘকাল ধরিয়া শাস্ত্র এবং সংস্কার, আচার এবং অনুশাসন হিন্দুদিগের জন্য এক বিরাট বিস্তৃত আবাসভবন নির্মাণ করিয়াছে। তাহার সকল কক্ষগুলি সমান নহে ;-- মাঝে মাঝে দেয়াল উঠিয়া তাহার ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের মধ্যে যাতায়াতের পথ রুদ্ধ হইয়াছে কিন্তু তথাপি এই বিপুলতার মধ্যে একটা বৃহৎ ঐক্য আছে।

এই অট্টালিকার মধ্যে যাহারা আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে তাহারা আদৌ একবংশীয় নহে। দক্ষিণের দ্রাবিড়ী হইতে হিমালয়ের নেপালি পর্যন্ত নানা বিচিত্র জাতি বহুকালে ক্রমে ক্রমে ইহার মধ্যে সম্মিলিত হইয়াছে।

বরঞ্চ যে-সকল জাতি মিশ্রিত হইয়া ইংরেজ মহাজাতি রচিত হইয়াছে তাহারা মূলত ভিন্নগোত্রীয় নহে। কিন্তু হিন্দুদের মধ্যে বিসদৃশ জাতিপরম্পরা যেমন একত্র মিশ্রিত হইয়াছে জগতে এমন আর কুত্রাপি ঘটে নাই।

স্পেক্টেটর যে স্বাভাবিক পরজাতিবিদ্বেষের কথা বলিয়াছেন আদিম আর্যদের মধ্যে তাহা প্রচুর পরিমাণেই ছিল। আদানপ্রদান আচারবিচার, এমন কি, জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চায় তাঁহারা আপনাদিগকে অনার্যদের সংস্রব হইতে দূরে রক্ষা করিবার জন্য একান্ত চেষ্টা করিয়াছিলেন।

এ এক বহুদিনব্যাপী প্রকাণ্ড যুদ্ধ। রামায়ণ-মহাভারতের সুবিশাল ছন্দঃস্রোতের মধ্যে এই প্রাণপণ যুদ্ধের প্রলয়কল্লোল এখনও ধ্বনিত হইতেছে।

কিন্তু চারিদিকের সহিত চিরকাল লড়াই করা চলে না। ক্রমে বিরোধচেষ্টা শিথিল হইয়া আসে এবং অল্পে অল্পে সন্ধি স্থাপিত হয়। এবং এইরূপে ধীরে ধীরে আর্য-অনার্যের মাঝখানের ব্যবধান ক্ষীয়মাণ হইয়া আসিল এবং ক্রমে অনার্যদের সংস্কার তাহাদের পূজাবিধি তাহাদের দেবতা অভিমানী আর্যাবর্তের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাকে আবর্তিত করিয়া তুলিল।

সেইজন্যই আজ হিন্দুজাতি জ্ঞানে অজ্ঞানে আচারে অনাচারে বিবেকে এবং অন্ধ কুসংস্কারে এমন একটা অদ্ভুত মিশ্রণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

যদিচ সকল বিষয়েই আর্য-অনার্যের মধ্যবর্তী সীমা বিলুপ্তপ্রায় হইয়া আসিয়াছে, এমন কি, আমাদের বর্ণ, আকার, আয়তনে রক্তমিশ্রণেরও সাক্ষ্য দিতেছে তথাপি স্বাতন্ত্র্যরক্ষাজন্য বহুকালব্যাপী সেই যুদ্ধচেষ্টা আজিও হিন্দুসমাজের আভ্যন্তমধ্যে সজাগ হইয়া আছে।

তবে, পূর্বেকার সেই আর্য-অনার্যের সংগ্রাম অন্ত হিংস্র উগ্রতা পরিত্যাগ করিয়াছে বটে কিন্তু তাহা পরিব্যাপ্ত হইয়া সমাজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে বিচ্ছেদ আনয়ন করিয়াছে।

তাহার এক কারণ আমাদের পরস্পরের মধ্যে বৈসাদৃশ্য এত অধিক যে, প্রকৃতির অনিবার্য নিয়মে যখন আমরা মিলিতেছিলাম তখনও শেষ পর্যন্ত আমাদের স্বাতন্ত্র্যচেষ্টার বিরাম ছিল না। আকর্ষণ এবং বিপ্রকর্ষণ কেহই সম্পূর্ণ হার মানিতে চাহে নাই।

এই কারণে যদিচ আমরা বহুসংখ্যক আর্য অনার্য এবং সংকর জাতি হিন্দুত্ব নামক এক অপরূপ ঐক্যলাভ করিয়াছি, তথাপি আমরা বল পাই নাই। আমরা যেমন এক তেমনি বিচ্ছিন্ন।

এই দুর্বলতার প্রধান কারণ আমরা অভিভূতভাবে এক, আমরা সচেষ্টভাবে এক নহি। যাহারা আমাদের সহিত সংলগ্ন হইয়াছে, যাহাদিগকে আমরা কিছুতেই খেদাইয়া

রাখিতে পারি নাই, আমাদের বেড়া-দেওয়া উদ্যানের মধ্যে যে-সকল আগাছা আপনি আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে তাহারা ক্রমে অনবধান অথবা অভ্যাসের জড়ত্ববশত আমাদের সহিত এক হইয়া গেছে।

দুর্ভাগ্যক্রমে তাহারা, কি শারীরসংস্থানে, কি বুদ্ধিবৃত্তিতে আর্যদের সশ্রেণীয় বা সমকক্ষ নহে। তাহারা সর্ববিষয়েই নিকৃষ্ট। এই কারণে তাহারা আর্যসভ্যতায় বিকার উৎপাদন না করিয়া থাকিতে পারে না। তাহারা যেমন আর্যরক্তের বিশুদ্ধতা নষ্ট করিয়াছে তেমনি আর্যধর্ম-আর্যসমাজকেও বিকৃত করিয়া দিয়াছে।

এই বহুদেবদেবী, বিচিত্র পুরাণ এবং অন্ধলোকাচারসংকুল আধুনিক বৃহৎ বিকারের নাম হিন্দুত্ব।

কিন্তু আমাদের এই বিকারের জন্য তত ক্ষোভ নাই বিচ্ছেদের জন্য যত। এক্ষণে ধর্মে আচারে বিশ্বাসে ও শিক্ষায় ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের মধ্যে ভেদ ক্ষীণপ্রায় হইয়া আসিয়াছে, বহুকালের সংঘর্ষে পরস্পরের মধ্যে অনেক অদলবদল হইয়া আর্য অনার্যতর এবং অনার্য আর্যতরভাবে এক হইয়া আসিয়াছে।—যাহা হইবার তাহা হইয়া গেছে। কিন্তু তবু বিচ্ছেদ ভাঙে না।

অর্থাৎ ঐক্যের যা ক্ষতি তাহাও ঘটিয়াছে এবং অনৈক্যের যা দোষ তাহাও বর্তমান।

এক্ষণে এই দুটাই সংশোধন করা আমাদের কাজ। নতুবা আমাদের উন্নতির ভিত্তি দৃঢ় হইবে না। নতুবা আমাদের শিক্ষা মিথ্যা, আমাদের আন্দোলন নিষ্ফল, আমাদের কনগ্রেস কনফারেন্স প্রভৃতি সমস্তই ক্ষণকালের ক্ষীণ উদ্যম।

এক্ষণে যিনি জড়ীভূত হিন্দুজাতির মধ্যে আচারে ব্যবহারে সমাজে ধর্মে আর্যভাবের একটি বিশুদ্ধ আদর্শ স্থাপন এবং কৃত্রিম ক্ষুদ্র নিরর্থক বিচ্ছেদগুলি দূর করিয়া সমগ্র লোকস্তূপের মধ্যে একটি সজীব ঐক্য সঞ্চার করিয়া দিবেন তিনিই ভারতবর্ষের বর্তমান কালের মহাপুরুষ।

পূর্বেই বলিয়াছি রাষ্ট্রতন্ত্রীয় একতা আমাদের ছিল না। শত্রুকে আক্রমণ, শত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা, এবং এক শাসনতন্ত্রের অধীনে পরস্পরের স্বার্থ ও শুভাশুভের একত্ব অনুভব আমরা কখনো দীর্ঘকাল করি নাই। আমরা চিরদিন খণ্ড খণ্ড দেশে খণ্ড খণ্ড সমাজে সংকীর্ণ প্রাদেশিকতা দ্বারা বিভক্ত। আমাদের স্থানীয় আচার স্থানীয় বিধি স্থানীয় দেবদেবীগণ বাহিরের আক্রমণ ও সংশোধন হইতে নিরাপদভাবে সুরক্ষিত হইয়া একদিকে ক্ষুদ্র অসংগত, অন্যদিকে প্রবল পরাক্রমশালী হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের ভিতরকার অনার্যতা, অদ্ভুত লোকাচার ও অন্ধসংস্কারে শাখাপল্লবিত হইয়া, আমাদিগকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জঙ্গলে পরিবৃত করিয়া রাখিয়াছে, সর্বসাধারণ মানবজাতির

রাজপথকে আমাদের নিকট হইতে অবরুদ্ধ করিয়াছে। আমরা প্রাদেশিক, আমরা পল্লীবাসী ; বৃহৎ দেশ ও বৃহৎ সমাজের উপযোগী মতের উদারতা, প্রথার যুক্তিসংগতি এবং সাধারণ স্বার্থরক্ষার উদ্‌যোগপরতা আমাদের মধ্যে নাই। এক কথায়, বৃহৎক্ষেত্রে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিবার যে সফলতা তাহা আমরা লাভ করিতে পারি নাই।

এক্ষণে ইংরেজ-রাজত্বে আমরা পরস্পর নিকটবর্তী হইয়াছি। এক্ষণে আমাদের প্রাদেশিক বিচ্ছেদগুলি ভাঙিয়া ফেলিবার সময় হইয়াছে। বহুদিনের বিরোধ-দ্বন্দ্বের মধ্যে যে একটি প্রাচীন ঐক্যগ্রন্থি আমাদের নাড়ীতে নাড়ীতে বাঁধিয়া গিয়াছে সেইটেকেই প্রবল করিয়া আমাদের স্থানীয় এবং সাময়িক অনৈক্যগুলিকে ক্ষুদ্র কোণজাত ধুলার মতো ঝাড়িয়া ফেলিতে হইবে।

বর্তমান কালে হিঁদুয়ানির পুনরুত্থানের যে একটা হাওয়া উঠিয়াছে তাহাতে সর্বপ্রথমে ওই অনৈক্যের ধুলা সেই প্রাদেশিক ও ক্ষণিক তুচ্ছতাগুলিই উড়িয়া আসিয়া আমাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। কারণ সেইটেই সর্বাপেক্ষা লঘু, এবং সেইটেই অল্প ফুৎকারে আকাশ পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতে পারে।

কিন্তু এ ধুলা কাটিয়া যাইবে, আমাদের নিশ্বাসবায়ু বিশুদ্ধ হইবে, আমাদের চারিদিকের দৃশ্য উদ্‌ঘাটিত হইবে সন্দেহমাত্র নাই। আমাদের দেশের যাহা স্থায়ী, যাহা সারবান্‌, যাহা গভীর, যাহা আমাদের সকলের ঐক্যবন্ধনের উপায় তাহাই ক্রমে প্রকাশিত হইয়া পড়িবে।

যখন কোনো প্রবল সংঘর্ষে কোনো নূতন শিক্ষায় একটা জাতি জাগ্রত হইয়া উঠে তখন সে নিজেরই মধ্যে শক্তি সন্ধান করে। সে জানে যে ধার করিয়া চলে না। যদি পৈতৃক ভাণ্ডারে মূলধন থাকে তবেই বৃহৎ বাণিজ্য এবং লক্ষ্মীলাভ নতুবা চিরদিন উঞ্ছবৃত্তি।

আমাদের সংস্কার ও শিক্ষা এত দীর্ঘকালের, তাহা আমাদিগকে এমন জটিল, বিচিত্র ও সুদৃঢ়ভাবে জড়িত করিয়া রাখিয়াছে যে, বৃহৎ জাতিকে চিরকালের মতো তাহার বাহিরে লইয়া যাওয়া কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। সেই চিরোদ্‌ভিন্ন ভারতবর্ষীয় প্রকৃতির মধ্য হইতেই আমাদের অভ্যুত্থানের উপাদান সংগ্রহ করিতে হইবে। আমরা ধূমকেতুর মতো দুই-চারিজন মাত্র গর্ববিস্ফারিতপুচ্ছে লঘুবেগে সাহেবিয়ানার দিকে ছিটকিয়া যাইতে পারি, কিন্তু সমস্ত দেশের পক্ষে তেমন লঘুত্ব সম্ভবপর নহে।

অতএব একদিকে আমাদের দেশীয়তা, অপরদিকে আমাদের বন্ধনমুক্তি উভয়ই আমাদের পরিত্রাণের পক্ষে অত্যাবশ্যক। সাহেবি অনুকরণ আমাদের পক্ষে নিষ্ফল এবং হিঁদুয়ানির গোঁড়ামি আমাদের পক্ষে মৃত্যু।

মহাত্মা দয়ানন্দ স্বামীর প্রতিষ্ঠিত আর্যসমাজ ক্ষুদ্র হিঁদুয়ানিকে আর্য উদারতার দিকে

প্রসারিত করিবার যে প্রয়াস পাইতেছেন এবং উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে তাহা যেরূপ পরিব্যাপ্ত হইতেছে তাহাতে আমরা মহৎ আশার কারণ দেখিতেছি।

উক্ত সমাজের, অন্তত সমাজস্থাপয়িতা দয়ানন্দ স্বামীর প্রচারিত মতের প্রধান গুণ এই যে, তাহা দেশীয়তাকেও লঙ্ঘন করে নাই অথচ মনুষ্যত্বকেও খর্ব করে নাই। তাহা ভাবে ভারতবর্ষীয় অথচ মতে সার্বভৌমিক। তাহা হৃদয়ের বন্ধনে আপনাকে প্রাচীন স্বজাতির সহিত বাঁধিয়াছে অথচ উন্মুক্ত যুক্তি এবং সত্যের দ্বারা সর্বকালের সহিত সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছে।

এই সমাজের সমস্ত লক্ষণগুলি পর্যালোচনা করিয়া আমরা আশা করিতেছি যে, ইহা ভারতে আর-একটি অভিনব সম্প্রদায়রূপে নূতন বিচ্ছেদ আনয়ন না করিয়া সমস্ত সম্প্রদায়কে ক্রমশ এক করিতে পারিবে।

বারান্তরে আর্যসমাজ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

ভিন্ন জাতির সহিত সংস্রব ইংরেজের যেমন ঘটিয়াছে এমন আর কোনো য়ুরোপীয় জাতির ঘটে নাই। কিন্তু ইংরেজের পরজাতিবিদ্বেষ সমান সুতীব্র রহিয়াছে। ইহা তাহাদের জাতীয়তার অত্যুগ্র বিকাশের পরিচয়স্থল।

বিদেশ হইতে আগত বিজাতি, ইংলণ্ডে অথবা ইংরেজ-উপনিবেশে বাসগ্রহণে উদ্যত হইলে ইংরেজের মনে যে বিরোধভাবের উদ্রেক করে স্পেক্টেটর সেই সম্বন্ধে আলোচনা উত্থাপিত করিয়াছেন।

কিন্তু পরদেশে গিয়া তদ্দেশীয়দের প্রতি ইংরেজের উদ্ধত বিমুখ ভাবও সুবিখ্যাত। এমন কি, য়ুরোপের মহাদেশবাসীগণ সম্বন্ধেও ইহার অন্যথা হয় না।

আহারবিহারে আচারে ও ভাবে দ্বীপবাসী ইংরেজের সহিত মহাদেশবাসী য়ুরোপীয়ের স্বল্পই প্রভেদ কিন্তু সেই প্রভেদগুলিও সাধারণ ইংরেজের মনে অবজ্ঞা এবং প্রতিকূল ভাব আনয়ন করে। তাহাদের জাতিসংস্কার এত দৃঢ় এবং সুকঠিন।

ইহার উপরে যখন পরজাতির সহিত স্বার্থের সংঘর্ষ জন্মিবার লেশমাত্র সম্ভাবনা ঘটে তখন ইংরেজের অসহিষ্ণুতা যে অত্যন্ত বর্ধিত হইবে ইহা স্বাভাবিক।

ইংলণ্ডপ্রবাসী জর্মান, ইতালীয় ও পোলীয় ইহুদিগণের প্রতি ইংরেজ অধিবাসীদের মনে যে শত্রুতার উদ্রেক করে তাহা যে কেবলমাত্র সুমহৎ জাতীয়ভাবের প্ররোচনায় তাহা বলিতে পারি না—উহার মধ্যে স্বার্থহানির আশঙ্কাই প্রবলতর।

একে বিজাতীয় তাহার উপরে স্বার্থের সংঘর্ষ—এইরূপ স্থলে খ্রীস্টীয় ধর্মনীতি এবং ন্যায়-অন্যায়ের উচ্চতর আদর্শ টেঁকাই কঠিন হয়। ইহাতে যে অন্ধতা আনয়ন করে, ঊনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতারশ্মি তাহা ভেদ করিয়া উঠিতে পারে না।

অল্পদিন হইল ভূতপূর্ব ভারত-স্টেট-সেক্রেটারি সার হেনরি ফাউলার পার্লামেন্টে বলিয়াছিলেন "ওআরেন হেস্টিংস এবং লর্ড ক্লাইভের কার্যবিধি যদি পার্লামেন্টের বিচারাধীন হইত তবে সম্ভবত ভারতসাম্রাজ্য আমরা পাইতাম না।" তাঁহার এই বাক্যে পার্লামেন্টে খুব একটা উৎসাহসূচক করতালি পড়িয়াছিল।

এ-কথাটার কি এই অর্থ যে, যেখানে স্বার্থ স্বজাতির এবং দুঃখ পরজাতির সেখানে অত বিচার-আচার করিলে চলে না? পার্লামেন্টের মতো প্রকাণ্ড বৃহৎ সভায় এ-কথার উচ্ছ্বসিত অনুমোদন কি ধর্মনীতির মূলসূত্রের প্রতি সুস্পষ্ট অবজ্ঞা প্রদর্শন নহে।

ধর্মনীতির প্রতি এই অবজ্ঞা পরজাতির প্রতি সুগভীর অবজ্ঞা হইতেই প্রসূত। ক্লাইভ ও হেস্টিংস যাহাদের প্রতি প্রতারণা মিথ্যাচার ও নিদারুণ উপদ্রব করিয়াছিলেন তাহারা অনাত্মীয়, তাহারা কেহই নহে, এ-কথা পার্লামেন্টের সদস্যবর্গের মনের মধ্যে অন্তত অস্পষ্টভাবেও ছিল।

সাধারণত ধর্মনীতিবোধ তাঁহাদের যে অল্প তাহা বলিতে সাহস হয় না। কারণ বল্‌গেরীয় ও আর্মানিদের প্রতি তুরস্কের অত্যাচার, ক্যুবানদের প্রতি স্পেনের কঠোরতা সম্বন্ধে পার্লামেন্টের সভ্যগণ প্রবলপক্ষের প্রতি উৎসাহ-করতালি বর্ষণ করে না। কিন্তু ভারতবর্ষীয়ের প্রতি হেস্টিংসের ব্যবহার সম্বন্ধে তাঁহাদের নীতিবোধ যে এমন সহসা সবেগে বিপর্যস্ত হইয়া যায় তাহার কারণ স্বার্থজনিত অন্ধতা এবং পরজাতি, বিশেষত প্রাচ্য পরজাতির প্রতি তাঁহাদের স্বাভাবিক সুগভীর অবজ্ঞাপরতা।

যে-অবজ্ঞা ফাউলার সাহেবকে প্রকাণ্ড স্পর্ধার সহিত নির্লজ্জ নীতিবিরুদ্ধ বাক্য বলাইয়াছে, সেই স্পর্ধা এবং সেই অবজ্ঞাই ভারতবর্ষীয় পাপাকুলিদের সম্বন্ধে কালস্বরূপ, সেই অবজ্ঞাই সমস্তিপুরে দরিদ্রের বিবাহ-উৎসবে হত্যাকাণ্ডের হাহাকার তুলিয়াছিল, সেই অবজ্ঞাই গোরাবিভীষিকাগ্রস্ত মারীপীড়িত দুর্ভাগাগণের অন্তিম অনুনয় হইতেও কর্তৃপুরুষদিগকে বধির করিয়া রাখিয়াছিল।

ইংরেজের নীতিবোধ এইরূপে দ্বিখণ্ডিত হইয়া গিয়াছে। সেইজন্য স্বজাতি-বিজাতির মধ্যে অভিযোগ উপস্থিত হইলে বিচার করা তাঁহাদের পক্ষে সুকঠিন। কারণ, ইহা অসম্ভব নহে যে, যে ইংরেজ কস্‌ করিয়া ঘুষা লাথি অথবা গুলি চালাইয়া ভারতবর্ষীয় জনসংখ্যা হ্রাস করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই স্বজাতিসমাজে সে শুভ্র মেষশাবক বিশেষ,—অতএব একজন দেশী হত্যাকারীকে ইংরেজের যেরূপ খুনি বলিয়া মনে হয় তাহাকে সেরূপ খুনি বলিয়া মনেই হয় না,—সুতরাং এমন লোকটাকে ফাঁসি দেওয়া একটা আইনসংগত হত্যাকাণ্ড বলিয়া জ্ঞান হইতে পারে।

আমাদের প্রতি চাঁদের কলঙ্কের দিকটা ফেরানো আছে, কিন্তু তাহার বিপরীত

পৃষ্ঠটা হয়তো সম্পূর্ণ নিষ্কলঙ্কভাবে নিজের নিকট দেদীপ্যমান—অতএব ঠিক কলঙ্কের বিচার করিতে হইলে একবারে আমাদের তরফে আসিয়া দাঁড়াইতে হয়, কিন্তু তাহার মতো দুঃসাধ্য কাজ আর নাই।

ওআরেন হেস্টিংস লর্ড ক্লাইভ পরজাতির সম্বন্ধে যেমনই হ'ন স্বজাতির সম্বন্ধে তাঁহারা মহৎ। ইংরেজ কবি হুড জিরাফ জন্তুকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন

> **"So very lofty in thy front—but then**
> **So dwindling at the tail !"**

অর্থাৎ সম্মুখের দিকে তুমি এত সমুচ্চ কিন্তু তবু লাঙ্গুলের দিকে এতই খর্ব। ইংরেজ-জিরাফের লাঙ্গুলের দিকটা পরজাতির দিকে পড়িয়াছে বলিয়া যে, তাহার স্বজাতি তাহাকে সেইদিকেই পরিমাপ করিবে ইহা কখনো সম্ভবপর হইতে পারে না।

কিন্তু পররাজ্য অধিকার করিয়া স্বজাতি ও বিজাতিকে এক ন্যায়দণ্ডে তুলিত করিবার কঠিন অধিকার ইংরেজ স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং স্বার্থের অনুরোধে সেই ন্যায় হইতে ভ্রষ্ট হইলে তাহাতে উৎসাহ-করতালি বর্ষণের কোনো কারণ দেখি না। তাহা স্বাভাবিক হইতে পারে কিন্তু তাহাতে স্পর্ধা প্রকাশের বিষয় লেশমাত্র নাই।

ইংরেজের এই পরবিদ্বেষ, বিশেষত প্রাচ্যবিদ্বেষ, নেটাল অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি উপনিবেশে কিরূপ নখদন্ত বিকাশ করিয়া উঠিয়াছে তাহা কাহারও অগোচর নাই। অথচ ইহাও দেখা যাইতেছে, ইংরেজ ভারতবর্ষীয় সৈন্যকে আফ্রিকার দুর্গম অরণ্যের মধ্যে রক্তপাত করাইতে কুণ্ঠিত নহেন। তখন, এক রাজ্ঞীর প্রজা এক সাম্রাজ্যের অধিবাসী এমন সকল সৌভ্রাত্র্যমধুমাখা কথা শুনা যায়। ইংরেজ মহারানীর অধিকার-বিস্তারে প্রাণপাত করিতে ভারতবাসীর কোনো বাধা নাই কিন্তু সেই অধিকারে স্থানলাভ করা তাহার পক্ষে নির্বাধ নহে। এই প্রকার ব্যবস্থার মধ্যে যে একটা ক্ষুদ্রতা হীনতা আছে তাহা ইংলণ্ড উপলব্ধি করেন না—তাঁহার সম্মুখভাগের মহত্ত্ব লাঙ্গুলবিভাগের খর্বতার কোনো খবরই রাখে না। অথচ ওই খর্ব দিকটার লাঙ্গুল, আস্ফালন-ব্যাপারে ন্যূন নহে। দমন-শাসন-তাড়ন-তর্জনে সর্বদাই সে চঞ্চলিত। তাহার চক্ষু নাই বলিয়া চক্ষুলজ্জাও নাই।

চক্ষুলজ্জা যে নাই ভারতবর্ষীয় ইংরেজি খবরের কাগজে সর্বদাই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। সমস্তিপুর ব্যারাকপুরের হত্যাব্যাপার ইংরেজি কাগজে কোনোপ্রকার আখ্যা পাইল না, কিন্তু শালিমারের দুর্ঘটনা "শালিমার ট্র্যাজেডি" নামে সমুচ্চস্বরে বারংবার ঘোষিত হইতে লাগিল। তাহাতেও খেদ নাই কিন্তু দুর্বিনীত নেটিভের হস্তে প্রবাসী ইংরেজের প্রাণমান উত্তরোত্তর বিপদ্‌গ্রস্ত হইতেছে বলিয়া যে-সমস্ত প্রেরিতপত্র বাহির

হইতেছিল তাহা পাঠ করিয়া যদি আমাদের শঙ্কার উদয় না হইত তবে বড়ো দুঃখেও হাসিতে পারিতাম। আমরা হাসিতে সাহস করিলাম না, কিন্তু অদৃষ্ট একটা ভীষণ কৌতুকের সৃষ্টি করিল। দেখিতে দেখিতে ইংরেজকর্তৃক কতকগুলি দেশীয় লোকের বীভৎস হত্যা পরে পরে সংঘটিত হইল—ইংরেজ সম্পাদকগণ একবারেই মৌন অবলম্বন করিলেন। ইংরেজ সম্পাদকগণকে যিনি কাল্পনিক নেটিভভীতিদ্বারা মুখর করিয়া তোলেন তিনিও আমাদের দুরদৃষ্ট, এবং যিনি সাংঘাতিক প্রতিবাদের দ্বারা তাহাদিগকে নিরুত্তর করিয়া দেন তিনিও আমাদের দুরদৃষ্ট।

১৩০৫

৩

আমাদের ভূতপূর্ব শাসনকর্তা ম্যাকেঞ্জি সাহেব তাঁহাদের স্বদেশের শীতল বায়ুতে ফিরিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ভারতবর্ষের গরম এখনও তাঁহাকে ছাড়ে নাই। ইতিমধ্যে এক ভোজ উপলক্ষ্যে বক্তৃতা করিয়াছেন তাহাতে কলিকাতা ম্যুনিসিপ্যালিটির বাঙালি কমিশনারদের প্রতি অত্যন্ত অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে গণ্য ব্যক্তির মধ্যে আমল দেন নাই।

তাঁহার সেই বক্তৃতার রিপোর্টে দৈবাৎ রিপোর্টার একটা ভুল করিয়াছিল। তিনি বলিয়াছিলেন "কলিকাতা ম্যুনিসিপ্যালিটিতে ইংরেজমণ্ডলীর প্রতিনিধিগণ স্থান পান নাই"—রিপোর্টার "প্রতিনিধি ইংরেজ" না লিখিয়া "ভদ্র ইংরেজ" লিখিয়াছিল।

কলিকাতা ম্যুনিসিপ্যালিটিতে ভদ্র ইংরেজ নাই এ-কথা শুনিলে কলিকাতার ইংরেজ-হৃদয়ে পাছে আঘাত লাগে সেইজন্য তাড়াতাড়ি সমুদ্রপার হইতে তিনি তাহা সংশোধন করিয়া পাঠাইয়াছেন। বাঙালি কমিশনারদের যে গালি দিয়াছেন সেজন্য অনুতাপ প্রকাশ করেন নাই।

অবশ্য, বাঙালি কমিশনারগণ দেশের আমির-ওমরাও দলের না হইতে পারেন, কিন্তু সিভিল সার্ভিস ও মিলিটারি বিভাগে যে রাজপুরুষেরা ভারতশাসন করিতেছেন তাঁহারাই যে সকলে লাটের পুত্র বা রাজবংশীয় তাহাও নয়। তাঁহারা যে একদা স্বদেশী সমাজের উন্নত উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কমণ্ডলী হইতে খসিয়া ভারতবর্ষে আসিয়া পড়িয়াছেন তথ্যতালিকা লইলে এমনটা প্রকাশ হইবে না।

কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহারা অবজ্ঞেয় নহেন; তাঁহারা শিক্ষিত তাঁহারা যোগ্য লোক;

এবং তাঁহারা যদিও ইংলণ্ড হইতে আসিবার সময় শুদ্ধমাত্র স্বনামটুকু লইয়া আসেন তথাপি যাইবার সময় অনেকে তাহার সহিত উপাধি জুড়িয়া যাইতে পারেন।

কোনো ইংরেজ ভদ্রলোক লিখিতেছেন :

Sir James Westland is a Scotsman, and I have in my possession an old directory for the year 1818, which gives the names of the principal residents in the rural districts of Scotland. The name of Westland, however, is conspicuous by its absence.

এ-কথা সত্য হইলেও ইহাতে আমরা কোনো দোষ দেখি না।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এবং দুঃখের বিষয় এই যে, তাঁহারাই ভারতবর্ষীয় কনগ্রেস প্রভৃতি সভামণ্ডলীর মধ্যে পৈতৃক ধনে ধনী এবং বৃহৎ উপাধিতে ভূষিত লোকের সন্ধান করেন এবং না পাইলে উপেক্ষা প্রকাশের চেষ্টা করিয়া থাকেন।

কনগ্রেসেই কি, আর ম্যুনিসিপ্যাল পৌরসভাতেই কি, সুযোগ্য বাঙালি ভদ্রলোকের অভাব নাই। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীনাথ মিত্র, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, নলিনবিহারী সরকার, মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় ইহারা কোনোকালে লেফটেনান্ট গবর্নর হইতে পারিবেন না সন্দেহ নাই, কিন্তু না পারিবার কারণ এই যে, ইংরেজ-আমলে ভারত-শাসনের উচ্চতর অধিকারসকল হইতে আমরা বঞ্চিত।

আমাদিগকে যেটুকু অধিকার দেওয়া হইয়াছে তাহা যদি সহ্য না হয়, যদি সেটা ফিরাইয়া লইবার মতলব থাকে তবে লও—কিন্তু গালিমন্দ কেন?

ঈসপের কথামালায় নেকড়ে বাঘ যখন মেষশাবকটিকে ভক্ষণ করিতে ইচ্ছা করে তখন বলে, তুমি আমার ঝরনার জল নষ্ট করিয়াছ,—মেষ বলে, প্রভু, তুমি উপরের জল খাও আমি নিচের জল খাইতেছি তোমার জল আমি নষ্ট করিলাম কেমন করিয়া? বাঘ বলে, তুই না করিস তোর বাপ করিয়াছিল। তাহার পর এক চপেটাঘাত।

আমরা মেষশাবকেরও অধম। প্রভেদ এই যে, বাঘের পক্ষে যেটা ছুতা ছিল ম্যাকেঞ্জি সাহেবের পক্ষে সেইটেই আসল কথা। এতদিন সেটা চাপিয়া গিয়াছিলেন; খানার পরে পরিতৃপ্তমনে বন্ধুসভায় সেটা ব্যক্ত করিয়াছেন। ঐশ্বর্য-ঝরনায় ম্যাকেঞ্জি সাহেবদের অনেক নিচের জলে আমরা তৃষ্ণা নিবারণ করিয়া থাকি। কিন্তু সেও অসহ্য। ম্যাকেঞ্জি সাহেব তাঁহার ভোজাবসানের বক্তৃতায় বলিয়াছেন, কলিকাতার কর্তৃত্বভার অসাবধানে আমাদের হাত হইতে অনেকটা খসিয়া পড়িয়াছে। হায়! এটুকুর প্রতিও লোভ! যাহা স্বহস্তে দান করিয়াছ তাহার প্রতিও লোলুপ দৃষ্টি! বিস্তর নিচে আছি, এবং অত্যন্ত অল্প জল পাই, আমাদের দেশী স্পর্শে তোমাদের উচ্চশিখরের জল তো আমরা ঘোলা করি নাই।

নেকড়ে বাঘ মনে মনে বলেন, উচ্চ হ'ক নীচ হ'ক প্রভুত্বের স্বাদমাত্রই তোমাদিগকে দিতে চাহি না। তাহার পর মুখে বলেন, তোমরা অযোগ্য, ইণ্ডিয়া-ক্লাবে বৈঠক কর, তোমরা স্বদেশের প্রতিনিধি নও।

বেসরকারি ইংরেজ-সম্প্রদায়ের সঙ্গে আমাদের বাগ্‌যুদ্ধ চলে। আমরা অনেক সময় রাগের মুখে পরস্পরের প্রতি করুণবাক্য প্রয়োগ করি না। কিন্তু যাঁহারা ভারতশাসন-কার্যে রাজস্থানীয় এতদিন তাঁহারা প্রজাসাধারণকে প্রকাশ্যে রূঢ়ভাষায় অপমান করেন নাই।

আমাদের প্রতি তাঁহাদের যে অত্যন্ত শ্রদ্ধা আছে তাহা না হইতে পারে, প্রচুর স্নেহ আছে এমন অভিমানও হয়তো না করিতে পারি কিন্তু তাঁহারা বাক্‌সংযম করিয়া গেছেন। তাহার একটা কারণ, তাঁহারা যে উচ্চপদের উন্নতশিখরে থাকেন সেখান হইতে একটি ছোটো কথা বর্ষণ করিলেও নিচের লোকের মাথার পক্ষে তাহা গুরুতর হইয়া উঠে; এরূপ অসমকক্ষ আক্রমণ বীরোচিত নহে। ইংরেজি ভাষায় যাহাকে cowardliness অর্থাৎ কাপুরুষতা বলে ইহাও তাহাই। আর-একটা কারণ এই যে, কথার কলহ তাঁহার পক্ষে অনাবশ্যক এবং অযোগ্য। কারণ, তাঁহার হাতে ক্ষমতা আছে। শক্তস্য ভূষণং ক্ষমা। সে-ক্ষমা কাজের ক্ষমা না হইলেও অন্তত বাক্যের ক্ষমা হওয়া উচিত।

রাজনীতির হিসাবেও বাক্‌সংযমের সার্থকতা আছে। রাজকার্য সকল সময়ে প্রজার অনুকূলে যায় না। অতএব মাঝে মাঝে যখন কঠিন আইন বা অপ্রিয় করবৃদ্ধি প্রজার উপরে জারি করিতে হইবে তখন দুর্বাক্য দ্বারা সেটাকে আরও তিক্ত করিয়া তুলিলে রাজাপ্রজার মধ্যে একটা সংঘর্ষ অনাহূত বাড়াইয়া তোলা হয়।

স্বাধীন ইংলণ্ডে পার্লামেন্টে ভিন্ন ভিন্ন দলের মধ্যে বিবাদ-বচসা হইয়া থাকে; কেহ কাহাকেও ছাড়িয়া কথা কহে না। কিন্তু সেখানে জনসাধারণে যাহা চায় রাজশক্তি তাহার বিরুদ্ধে যায় না। এইজন্য দেশ যে কী চায় তাহা নানা দলের আন্দোলনে সম্পূর্ণ আলোচিত হইয়া স্পষ্ট আকার ধারণ করে। এ-দেশে, আমরা যাহা প্রার্থনীয় জ্ঞান করি না তাহাও রাজা আমাদিগকে গিলিতে বাধ্য করেন—আমাদের মতামত-ইচ্ছানিচ্ছার দ্বারা রাজশাসন নিয়মিত হয় না। এখানে সম্পূর্ণই কর্তার ইচ্ছা কর্ম;—সে-স্থলে গায়ে পড়িয়া প্রজাসাধারণ বা সম্প্রদায়বিশেষকে রূঢ় কথায় ক্ষুব্ধ করিয়া তোলা না সুশোভন, না রাজনীতিসংগত।

তিক্ত বড়িকে মিষ্ট আকারে গেলানো রাজনীতির নৈপুণ্য। রাজশাসনের পথকে যত সংঘাত-সংঘর্ষহীন করিয়া তোলা যায় ততই রাজ্যের পক্ষে এবং শাসনকর্তাদের পক্ষে

মঙ্গল। অবশ্য, রাজ্যশাসন সম্পূর্ণ যন্ত্রসাধ্য নহে, তাহার মধ্যে রাগদ্বেষ ও পক্ষপাত আপনি আসিয়া পড়ে কিন্তু তাহা কিছুমাত্র প্রকাশ হইলে শাসনকার্যের গৌরব নষ্ট হয়।

আজকাল ইংরেজশাসনে এই নীতির ব্যতিক্রম দেখিতেছি। ম্যাকেঞ্জি সাহেব যখন বাংলায় রাজপদে ছিলেন, যখন একেবারে অনেকগুলা অপ্রিয় বিধির প্রস্তাব উপলক্ষে সমস্ত দেশ স্বভাবতই ক্ষুব্ধ হইয়া আছে, সেই সংকটের সময়, দেশের সেই দুর্ভাগ্যের সময়, সেই কঠোর বিলগুলি পাস করিবার সময় ম্যাকেঞ্জি সাহেব বঙ্গভূমির ক্ষতবেদনার উপরে অকারণে তাঁহার বাক্যহলাহলজ্বালা যোগ করিয়া দিলেন।

বিল তো পাস হইবেই। বিল-স্রষ্টাদের ইচ্ছার কোনো বাধা নাই। কিন্তু যত নির্বিরোধে হয় ততই ভালো। যদি প্রজার ক্ষতস্থানে ছুরি চালাইতেই হয় সেটা যাহাতে যথাসম্ভব অল্প বেদনায় সমাধা হয় সেই চেষ্টাই উচিত; যাঁহার কিছুমাত্র দায়িত্ববোধ আছে তিনি সে-জায়গাটা অনাবশ্যক আঘাতে ব্যথিত রক্তবর্ণ করিয়া তোলেন না।

কিন্তু উচ্চপদের যে স্বাভাবিক শান্তি সংযম ও ক্ষমা তাহা ম্যাকেঞ্জি সাহেব দেখান নাই। তিনি নিজে রুগ্ন ছিলেন এবং রাজকার্যকেও রোগাতুর করিয়া তুলিয়াছিলেন। অদ্য শাসনকার্য হইতে অবসর লইয়া ভারতভাণ্ডার হইতে বৃত্তিভোগ করিতে করিতেও তাঁহার ভূতপূর্ব প্রজাগণের প্রতি বিষোদ্গার করিতেছেন।

ইহাতে অমিশ্র কুফল ছাড়া আর কিছু দেখি না। ম্যুনিসিপাল বিল পাস করা যদি কর্তৃপক্ষের অভিপ্রেত হয় তবে ভূতপূর্ব বঙ্গাধিপ এ-সম্বন্ধে যতই চুপ করিয়া থাকেন ততই ভালো। তিনি বিলাতে বসিয়া খানার পরে অসংযত বক্তৃতা করিয়া উপদ্রব বাড়াইয়া তুলিতেছেন তিনি কথায় বার্তায় ভাবে ভঙ্গিতে বাঙালিবিদ্বেষ ও স্বজাতিপক্ষপাত দেখাইয়া কেবল যে আত্মমর্যাদা লাঘব করিতেছেন তাহ নহে শাসনকার্যকেও কণ্টকাকীর্ণ করিয়া তুলিতেছেন।

গবর্মেন্টের উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের আত্মবিস্মৃতি ও ধৈর্যচ্যুতি আমরা বর্তমানকালের একটা কুলক্ষণ বলিয়া গণ্য করি। ইংরেজ ও দেশীয়দের মধ্যে উত্তরোত্তর যে বিচ্ছেদ ও বিরোধ বাড়িয়া উঠিতেছে তাহা যদি রাজপুরুষদিগকেও স্পর্শ করে, তাঁহারাও যদি এ অবস্থার প্রতিকারচেষ্টা না করিয়া একটা দলভুক্ত হইয়া পড়েন তবে আমাদের পক্ষে সেটা সংকটের অবস্থা।

সেই রকমের যেন লক্ষণ দেখা যাইতেছে। অবশ্য, স্বজাতিপ্রেম সকল সময়েই স্বাভাবিক, কিন্তু আজকাল যেন ভারতবর্ষের সরকারি ও বেসরকারি ইংরেজ ক্রমশই ঘনিষ্ঠভাবে মিলিত হইতেছে। ভারতবর্ষীয় ইংরেজি খবরের কাগজের নাড়ীতেও যখন বেগ প্রকাশ পায় তখন গবর্মেন্টেরও চক্ষু লাল এবং গাত্র উত্তপ্ত দেখিতে পাই।

ইংরেজি খবরের কাগজে বাঙালিদের প্রতি যে সুতীব্র অসহিষ্ণুতা দেখা যায় গবর্মেণ্টের আচরণেও নানা আকারে তাহা প্রকাশ হইয়া পড়ে।

অন্তত ম্যাকেঞ্জি সাহেব সে-ভাবটি চাপিয়া রাখেন নাই। তিনি যদিচ বঙ্গদেশের শাসনকর্তা ছিলেন, ইংরেজি খবরের কাগজের সম্পাদক ছিলেন না তথাপি ইংরেজ প্লাণ্টার প্রভৃতিকেও সুমিষ্ট স্নেহে অভিষিক্ত করিয়া গিয়াছেন, অথচ যে নিরন্ন জাতি আজ পর্যন্ত তাঁহার মুখের অন্নজল জোগাইতেছে তাহাদের ভদ্রমণ্ডলী সম্বন্ধে তাঁহার মুখে একটি মিষ্টবাক্য জুটিল না।

যাহা হউক, আমরা এমন দুরাশা করি না যে ম্যাকেঞ্জি সাহেব বিলাতে বসিয়া

রচিবেন মধুচক্র গৌড়জন যাহে
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি—

কিন্তু আমরা প্রার্থনা করি নির্বাপিত আগ্নেয়গিরির ন্যায় এক্ষণে তিনি বিশ্রাম লাভ করুন; এখনও অন্তর্জ্বালার উত্তেজনায় তাঁহাকে যেন বাঙালিবিদ্বেষ উদ্‌গীর্ণ করিতে না হয়।

১৩০৫

৪

শ্রীযুক্ত বাবু পৃথ্বীশচন্দ্র রায় বিরচিত "দি পভার্টি প্রব্লেমস ইন ইণ্ডিয়া" নামক সর্বসমাদরযোগ্য সারবান গ্রন্থে লর্ড ক্যারারের একটি উক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে এইখানে তাহার পুনরুদ্ধার করি :

> The persons who carry on our trade on the outskirts of civilization are not distinguished by a special appreciation of the rights of others. ··· When a difficulty arises between ourselves and one of the weaker nations, these are the persons whose voice is most loudly raised for acts of violence, of aggression, or of revenge. ··· Our dealings in the Far East, and elsewhere have not always been such as would do credit to an honest merchant.

অর্থাৎ যে-সকল ব্যক্তি সভ্যতার বহিরঞ্চলে আমাদের বাণিজ্য বিস্তার করিয়া থাকে তাহারা অন্যের ন্যায্য স্বত্বের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবত্তার জন্য বিখ্যাত নহে। যখনই আমাদের সহিত কোনো দুর্বলতর জাতির একটা সংকট বাধিয়া উঠে তখন ইহাদেরই কণ্ঠস্বর,

পীড়ন, আক্রমণ ও প্রতিহিংসাসাধনের জন্ত সর্বোচ্চে ধ্বনিত হইয়া উঠে। দূরপ্রাচ্যদেশে এবং অন্যত্র অনেক সময় আমাদের আচরণ যেরূপ প্রকাশ পাইয়াছে তাহা সাধুপ্রকৃতি বণিকের যোগ্য নহে।

রাজকর্মচারিগণ ব্যতীত অধিকাংশ ভারতবর্ষীয় ইংরেজই বাণিজ্যজীবী। তুচ্ছতম উৎপাত উপলক্ষ্যেই তাঁহারা গুরুতর আশঙ্কায় ত্রস্ত হইয়া উঠিবেন ইহা স্বাভাবিক। কারণ, ভারতশাসনকার্যকে নিজেদের স্বার্থসাধন হিসাব ছাড়া আর-কোনো হিসাবে দেখিতে তাঁহারা বাধ্য নহেন। তাঁহাদের মুখ হইতে এমন কথা প্রায়ই শুনা যায় যে, এ-ভারতবর্ষটা টুপিওআলারই ভারতবর্ষ। পাগড়িওআলা ও খালিমাথাগুলো কেবলমাত্র তাঁহাদের চাবাগানের কুলি, নীলক্ষেত্রের চাষি, পাটজোগানের পাইকড়, এবং লাংকাশিয়রের খরিদ্দার।

রাজনীতির মঞ্চ সুপ্রশস্ত; তাহা দেশে এবং কালে, ধর্মে এবং অর্থে সুদূরব্যাপী, তাহার উপরে যাঁহারা অধিষ্ঠিত হইয়া দূরবিস্তীর্ণ দৃষ্টির দ্বারা রাষ্ট্রীয় ব্যাপার পর্যালোচনা করেন, তাঁহাদের পক্ষে প্রভূতপরিমাণ ধৈর্য ও বিচক্ষণতা আবশ্যক, তাঁহারা তুচ্ছ ও বৃহৎ ব্যাপারের আপেক্ষিকতা, ক্ষুদ্র স্বার্থ ও মহৎ সার্থকতার প্রভেদ বুঝিতে সক্ষম। কিন্তু ইংরেজবণিকগণ ভারতবর্ষকে যেখান হইতে নিরীক্ষণ করেন সে-জায়গাটা যতই উচ্চ হউক তাহার ভিত্তি সংকীর্ণ, তাহা ব্যক্তিগত বা সম্প্রদায়গত লাভক্ষতির উপর দাঁড়াইয়া; একটু নাড়া খাইলেই তাহা দুলিয়া উঠে। গতবর্ষে ভূমিকম্পে কারখানা-ঘরের চিমনিগুলা হাতির শুঁড়ের মতো যেমন করিয়া দুলিয়াছিল, বড়োলাটসাহেবের প্রাসাদ এমন দোলে নাই।

ভারতবর্ষে সরকারি ও বেসরকারি ইংরেজের মতের এবং ভাবের প্রভেদ অনেকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। ১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দে মহাজনকর্তৃক অত্যন্ত উৎপীড়িত হইয়া দলবদ্ধ সাঁওতালগণ গবর্মেন্টের নিকট দুঃখ নিবেদন করিতে আসিয়া যে-দুর্যোগ ঘটাইয়াছিল তদুপলক্ষ্যে মনস্বী সার উইলিয়ম হাণ্টার সাহেব লিখিতেছেন:

The Anglo-Indian community is naturally liable to apprehensions and hasty conclusions incident to a small body of settlers surrounded by an alien and a greatly more numerous race. ··· With the government rests the heavy responsibility of counteracting the natural tendency to panic on the part of the public.

হতভাগ্য সাঁওতালদের দুঃখ কেহ দেখিল না, তাহাদের নালিশ কেহ বুঝিল না,—যখন নিতান্ত অসহ্য হইয়া তাহারা দাবানলপীড়িত মৃগযূথের ন্যায় তাহাদের অরণ্যবাস-

ভূমি ছাড়িয়া বাহির হইয়া পড়িল, তখন রাজসৈন্যগণ তাহাদিগকে গুলিবর্ষণে দলে দলে ধূলিসাৎ করিয়া দিতে লাগিল।[১] অবশেষে এই হত্যাকাণ্ড যখন প্রচুর সাঁওতাল-রক্তে পরিতৃপ্ত হইয়া শান্তিলাভ করিল তখন অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানগণ কিরূপ ধুয়া তুলিলেন?

হাণ্টার সাহেব এ-সম্বন্ধে ক্যালকাটা রিভিয়ু নামক বিখ্যাত পত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধবিশেষের উল্লেখ করিয়া তাঁহার "গ্রাম্যবঙ্গবৃত্তান্ত" গ্রন্থে লিখিয়াছেন :

In short, no one knew anything about the wrongs or the peaceful industry of the Santals. They were simply "adult tigers" or "bloodthirsty savages"; and the reviewer, dismissing the ordinary plan of punishing only the actual rebels as insufficient, adopts a proposal to deport across the seas, not one or two ringleaders, but the entire population of the inflicted districts.

এইরূপ অসংগত এবং অসংযত ভাষা ইংরেজচালিত পত্রে মধ্যে মধ্যে শুনা গিয়াছে এবং নিশ্চয়ই কালে কালে আরও শুনা যাইবে। তাহার কারণ হাণ্টার সাহেব পূর্বেই নির্ণয় করিয়া বলিয়াছেন যে, তাহা আতঙ্ক; এবং ইহাও বলিয়াছেন যে, সাধারণ মনের সেই উদ্দাম আতঙ্কের প্রতিকূলে দৃঢ়ভাবে ধৈর্যরক্ষা করা গবর্মেণ্টের গুরুতর কর্তব্যের অঙ্গ।

আতঙ্ক যে কিরূপ দৃঢ়বদ্ধমূল এবং কতদূর অন্ধ মূঢ়তার দ্বারা বেষ্টিত তাহা সম্প্রতি প্রকাশিত কোনো ইংরেজ পত্রের একটি প্যারাগ্রাফে স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিছুকাল পূর্বে আমাদের গবর্মেণ্ট যখন ভারতবর্ষের উপর বাদশাদিত্যের মূর্তিধারণ করিয়া উঠিয়াছিলেন তখন কলিকাতার বস্‌তিবাসী ইতর-সাধারণের মধ্যেও একটা প্রকাণ্ড ইংরেজবিদ্বেষ প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছিল। সম্প্রতি ঠিক তাহার উলটা ভাব দেখিয়া ইংরেজ সংবাদপত্রের সম্পাদকদের সম্পূর্ণ আশ্বস্ত হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু জুজুর ভয় যুক্তির দ্বারা যায় না। সম্প্রতি একজন ইংরেজ আগন্তুককে দেখিয়া কোনো বস্‌তির অধিবাসিগণ ছোটোলাট ভ্রমে তাঁহাকে প্রচুর ভক্তি প্রদর্শন করিয়াছিল এই প্রসঙ্গ উপলক্ষ্যে উক্ত পত্র লিখিয়াছেন যে, ইহা হইতে স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে দেশের সাধারণের মনে ইংরেজ-রাজভক্তি প্রবল—কিন্তু—উহার মধ্যে জুজু আকারে একটা কিন্তু রহিয়া গেছে—কিন্তু বোধ করি কুমন্ত্রীদের উত্তেজনায় মাঝে মাঝে তাহারা বিগড়িয়া যায়।

সাহেবের হৃদয়াকাশ সম্পূর্ণ পরিষ্কার হইল না। একটা কালো রঙের খটকা

---

[১] তুলনীয়, "ইংরেজের আতঙ্ক", পৃ. ৫৩৭

রাখিয়া দিলেন। একটা কুমন্ত্রী কোনো একটা জায়গায় নিশ্চয়ই আছে। এ-প্রশ্ন একবার মনে উদয় হইল না যে, এক্ষণে তিনি কোথায় আছেন? হঠাৎ কেনই বা তিনি জাগিয়া উঠেন আবার হঠাৎ ছুটিই বা লন কেন?

জুজুর-থিয়োরি ছাড়িয়া দিলেও এই রহস্যের যে একটা অত্যন্ত সরল মীমাংসা আছে সেটা কেন সাহেবের মাথায় প্রবেশ করিল না। কেন তিনি ভাবিলেন না, বর্তমান বঙ্গাধিপকে দেশের লোক যথার্থ রক্ষক বলিয়া অনুভব করিয়াছে, তাঁহারই সহৃদয়তা দেশের হৃদয়কে ইংরেজের দিকে আকর্ষণ করিতেছে।

কিন্তু বোধ করি যাহাদের অতিশয় বুদ্ধি সরল মীমাংসাই তাহাদের পক্ষে সর্বাপেক্ষা দুর্গম। একটা কোথাও কিছু গোল আছে এটা বোধ করি বুদ্ধিমানের কথা। কারণ, গোল যদি দৈবাৎ বাহির হইয়া পড়ে তবে বুদ্ধিমান তাঁহার বুদ্ধির জয়ঢাক বাজাইতে পারিবেন, যদি বাহির নাই হয় সেটা যে কোনো একটা জায়গায় নাই তাহার অপ্রমাণ করিবে কে!

আরও একটা কথা আছে। নিজেদের যে লেশমাত্র দোষ নাই এ-কথা মনে করিতে আরাম আছে—এবং ইংরেজ আরাম ভালোবাসে। দেশের জনসাধারণ কেনই বা ইংরেজের প্রতি কোনো অবস্থায় কিছুমাত্র বিদ্বেষভাব বহন করিবে তাহা ইংরেজ কিছুতেই বুঝিতে পারেন না; কারণ তাঁহারা অতিশয় প্রিয়চারী, তাঁহাদের স্বভাষায় যাহাকে বলে অ্যামিয়েবল;—অতএব, তাঁহাদের প্রতি বিরুদ্ধভাব তাঁহাদের দোষে জন্মিতেই পারে না। তবে কেন এমনতরো ঘটে? নিশ্চয়ই কোনো একটা কুমন্ত্রী আছে। বাস। ইংরেজের বুদ্ধিতে সমস্তই পরিষ্কার হইয়া গেল।

এই মূঢ় অন্ধতা যদি কেবলমাত্র ইংরেজ সম্পাদকদের মধ্যে বদ্ধ থাকিত তাহা হইলেও আমরা অনেকটা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতাম। কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি আজকাল ইংরেজ সম্পাদকের আসন হইতে ভারতরাজতক্ত পর্যন্ত একটা সমভূমিতার লক্ষণ দেখা যাইতেছে।

বোম্বায়ের দুর্ঘটনাবলীতে দেখা গিয়াছে বোম্বাই-কর্তৃপক্ষদিগের মেজাজ টাইমস অফ ইণ্ডিয়ার মেজাজ হইতে বড়ো তফাত নয়। তেমনি উদ্ধত অবিবেচনা, অবজ্ঞাপূর্ণ কঠোরতা, দেশীয় লোকের গভীরতম বেদনা এবং করুণতম আবেদনের প্রতি নিরতিশয় উপেক্ষা।

তা ছাড়া, দেশীয় লোকদের ব্যবহারে যদি কোনোপ্রকার অসন্তোষের লক্ষণ দেখা যায়, সেজন্য তাহারাই একমাত্র দোষী; গবর্মেণ্টও এই প্রকারের একটা আরামদায়ক মূঢ় সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়াছেন। ইংরেজ, সে সামান্য সৈন্যই হউক বা জিলার কর্তাই

হউন,—কখনোই দোষী হইতে পারে না, তাহাদের আচরণে পীড়া অনুভব করাই পীড়িতের পক্ষে বেয়াদবি ; তাহাদের দুর্ব্যবহারের সকল কথাই মিথ্যা ; অতএব নিশ্চয়ই ইহার মধ্যে কুমন্ত্রী আছে।

অতএব ধরো নাটু-ভাইদুটোকে। দাও তিলককে জেলে। দেশী সম্পাদকগুলাকে এক-একটা তৃণের মতো উৎপাটন করিয়া আনো। কুমন্ত্রী থাকিতেই হইবে, কারণ, ইংরেজ অতিশয় প্রিয়চারী, ভারি অ্যামিয়েবল।

এ-সমস্ত, ফলাফলবিচারী ধৈর্যশীল গবর্মেণ্টের মতো ব্যবহার নহে ; এ ঠিক দৈনিক ইংরেজি কাগজের দ্রুতলিখিত গরম গরম ঝাঁঝালো প্রবন্ধকে ইতিহাসে প্রতিফলিত করা। মনে হয় যেন দায়িত্ববিহীন বেসরকারি ইংরেজ-সমাজের উদ্বেলিত অসহিষ্ণুতা গবর্মেণ্টকেও অত্যন্ত অদ্ভুত এবং অশোভনরূপে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে।

গবর্মেণ্টের এই সমস্ত আধুনিক লক্ষণ দেখিয়া আমাদের মনে আশঙ্কা হয়। লর্ড ক্যানিং প্রভৃতি মনস্বী রাজনীতিজ্ঞগণের গবর্মেণ্ট সমুদ্রতীরে শৈলতটের মতো উদার, অটল এবং ক্ষমাশীল ছিল ; তাঁহাদের সময়ে ঝড় কম যায় নাই, এবং তরঙ্গিত ইংরেজ-সমাজ দেশটাকে হাঁ করিয়া গিলিবার জন্য উদ্যত হইয়াছিল ; তখন উন্নত কঠিন গবর্মেণ্ট তাহাদিগকে ঠেকাইয়াছিল।

মনে হইতেছে যেন কালক্রমে সেই উন্নত তীর অল্পে অল্পে খইয়া আসিতেছে, জলের সহিত সমতল হইতেছে ; ঝড়ঝাপটের দিনে তুফানকে অটলভাবে ঠেকাইয়া রাখিবার ক্ষমতা তাহার চলিয়া যাইতেছে। অথচ ফুৎকারমাত্রেই তুফান উঠিয়া পড়ে এবং কেন যে এই সমুদ্র সর্বদাই ফেনিল বিচলিত হইয়া উঠিতেছেন তাহার রহস্য জলবায়ুতত্ত্বের রহস্যের মতোই দুর্বোধ।

আসল কথা, ভারতবর্ষীয় ইংরেজসম্প্রদায়ের মধ্যে সামাজিকতার ঘনিষ্ঠতা উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিয়াছে। সিমলা দার্জিলিং নৈনিতাল নীলগিরি জাঁকিয়া উঠিতেছে। ভারতবর্ষে পূর্বাপেক্ষা ইংরেজনারীদের প্রাদুর্ভাব বেশি হওয়াতে তাহার দুইটি ফল দেখা যায়। প্রথমত দেশীয়দের সহিত ব্যবধান দৃঢ়তর, দ্বিতীয়ত নিজেদের মধ্যে বন্ধন ঘনিষ্ঠতর হইয়াছে। কাজকর্ম কোনোমতে সারিয়া ফেলিয়া আপনাদের সেই মণ্ডলীর মধ্যে ঢুকিয়া পড়িবার প্রলোভন স্বাভাবিক। সেই মণ্ডলীর সহিত অবশিষ্ট ভারতবর্ষের প্রভেদ ইংরেজের কাছে অত্যন্ত অধিক এবং অরুচিকর।

এই কারণে ভারতবর্ষের সহিত ইংরেজের সম্পর্ক উত্তরোত্তর তেলে-জলের মতো হইতেছে। এবং নিজেরাই আপনাদের সুখসান্ত্বনা আরামের একমাত্র উপায় হওয়াতে পরস্পরের নিকট পরস্পরের গৌরব অতিশয় বাড়িয়া উঠিতেছে।

এরূপ কুটুম্বিতা যখন স্বাভাবিক তখন ইহার বিরুদ্ধে কোনো কথা বলিবার জো নাই। আমরা কেবল, সরকারি ও বেসরকারি ইংরেজ কেমন করিয়া একাকার হইয়া আসিতেছে তাহার কারণ নির্ণয় করিতেছি মাত্র।

এখন, যে-কোনো বিধান বা রাজনীতি ভারতবর্ষীয় ইংরেজ-সাধারণের অপ্রিয় তাহাতে হাত দিতে গেলেই সামাজিক চক্ষুলজ্জাটা অত্যন্ত অধিক হইয়া উঠে। টেনিস-কোর্ট, নৃত্যশালা, শিকার-পার্টি, রঙ্গমঞ্চ, সংগীতসভায় স্বসম্প্রদায়ের মতামতকে সর্বদা ঠেলিয়া চলা অসামান্য বলশালী লোকের কর্ম। তর্কদ্বন্দ্বে বা কর্মক্ষেত্রে মতবিরোধ অনেক সময় স্বমতরক্ষার উত্তেজনাস্বরূপ হয়,—কিন্তু খেলায় আমোদে আহারে বিহারে নারীকণ্ঠে বা স্ত্রীকটাক্ষে অমুক্ত এবং অর্ধোক্ত মতামতগুলি অত্যন্ত দুর্ধর্ষ।

তা ছাড়া যে শাসনকর্তা রাজোচিত ঔদার্যের সহিত আমাদের কথায় কর্ণপাত করিতে নারাজ না হন, ইংরেজ-মহলে তাঁহার প্রতি একটা অত্যন্ত কঠিন অপবাদ প্রচার হয়। বলে যে, তিনি ভারতবর্ষীয় আন্দোলনকারীদের দ্বারা চালিত হইতেছেন। ইংরেজের পক্ষে এমন দুর্বলতা আর কী হইতে পারে।

কিন্তু অপবাদকারীরা এ-কথা ভুলিয়া যায় যে, দুর্বলের কথায় কান দেওয়া দুর্বলতার ঠিক বিপরীত। তাহাই সবলের লক্ষণ। আজকাল শাসনকর্তাদের পক্ষে শক্ত হইয়াছে ইংরেজ-সমাজের দ্বারা চালিত না হওয়া ; তাহাই তাঁহাদের পক্ষে দুর্বলতা। পাছে এমন কথা উঠে যে, কনগ্রেসের দলবদ্ধ কাতরতায় ভুলিল, সেই মনে করিয়া কোনো উদারনীতি প্রবর্তনে দ্বিধা বোধ করা ইহাই দুর্বলতা ; ইংরেজ পত্রসম্পাদকের সহিত রাজসিংহাসন ভাগাভাগি করিয়া লওয়া, ইহাই দুর্বলতা। এখনকার ভারত-শাসনব্যাপার ভারতবর্ষীয় ইংরেজের সামাজিকতাজালে আপাদমস্তক জড়িত এবং সেইজন্যই দুর্বল। সেইজন্য প্রেমনীতি-ক্ষমানীতির উপরে ভারতসাম্রাজ্যকে স্থায়ীরূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা যে কেবল রহিত হইতেছে তাহা নহে তাহা প্রকাশ্যভাবে উপেক্ষিত অবজ্ঞাত উপহসিত হইতেছে। সর্বপ্রকার বিচারবিবেকবিধান লঙ্ঘন করিয়া আকস্মিক জবরদস্তি দ্বারা দুঃখিত প্রজাদিগকে স্তম্ভিত করিয়া দেওয়াই প্রবলের ধর্ম এবং ক্ষমা, ধৈর্য, অবিচলিত অপক্ষপাত, অথবা দুর্বলের প্রতি প্রজার প্রতি নিরুপায়ের প্রতি পক্ষপাত দুর্বলের লক্ষণ বলিয়া প্রতিদিন কীর্তিত হইতেছে।

১৩০৫

৫

বরিশাল হইতে দেশবন্ধু শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয় কনগ্রেস সম্বন্ধে একটি আলোচনাপত্র আমাদের নিকট পাঠাইয়াছেন। আমাদের যাহা বক্তব্য তাহা সংক্ষেপে বলিতে চেষ্টা করিব।

আমরা জানি ইংলণ্ডে রাজনৈতিক আন্দোলনের জন্য অনেক সভা আছে। এবং সময়ে সময়ে "কর্ন ল" প্রভৃতি বিশেষ বিধি লইয়া ইংলণ্ডের অনেক উদ্যমশীল মহাত্মা অশ্রান্ত অধ্যবসায়ের সহিত স্বদেশকে স্বমতে দীক্ষিত করিয়াছেন।

তাঁহাদের উৎসাহ ও অধ্যবসায় বারংবার বাধা সত্ত্বেও নিরস্ত হয় না, এবং আমাদেরই বা অল্প বিঘ্নে কেন হয়? অবশ্য, উদ্যমশীলতায় তাঁহারা আমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, সে একটা কারণ; কিন্তু যথার্থ কারণ, তাঁহারা আশালতার বীজ নিজের জমিতে বপন করিতেছেন, আকাশকুসুমপ্রত্যাশী হতভাগ্য আমাদের মতো বাতাসে উড়াইয়া দিতেছেন না।

গবর্মেন্টের সহিত তাঁহাদের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। তাঁহাদের হৃৎপিণ্ড হইতেই রক্ত সঞ্চালিত হইয়া গবর্মেন্টের হাত-পাকে কার্যক্ষম করিয়া তুলে। তাঁহাদের পক্ষে দেশকে বিশেষ মতে দীক্ষিত করা এবং সেই মতের দ্বারা গবর্মেন্টকে চালিত করা একই কথা।

কিন্তু আমাদের কনগ্রেস গবর্মেন্টের দ্বারের বাহিরে। তাহার কেবল ভিক্ষার অধিকার আছে। সেই ভিক্ষার মধ্যে এমন আশার মহত্ত্ব বা কর্মের গৌরব কিছুই নাই যাহাতে দেশকে দীর্ঘকাল উৎসাহিত করিয়া রাখিতে পারে।

আমরা নিশ্চয় জানি অনুগ্রহস্বরূপ আজ যাহা লাভ করিব, কাল তাহা হারাইবার কোনো বাধা নাই। দয়া করিয়া আজ যদি আমাদিগকে কেহ স্বায়ত্তশাসন দিলেন ভাবিলাম এক পরমার্থ লাভ হইল, আবার কর্তাদের মধ্যে কাল যদি সেটাকে কেহ পঙ্গু করিয়া দেন তবে আমরা কেবল বক্ষে করাঘাত করিয়া হাহাকার করিয়া মরিব।

আমাদের অদৃষ্টে ভারতের রাজশক্তি অনেকটা পদ্মানদীর মতো। আজ পাঁচ বৎসরে আমাদের কপালে যেখানে পলি পড়িল পরের পাঁচ বৎসরে সেখানে বালি পড়িতে এবং তাহার পরের পাঁচ বৎসরে ভাঙন ধরিতে কোনো বাধা নাই। এই চরের উপর যদি আমরা কনগ্রেসের ভিত্তি স্থাপন করিয়া তাহার স্থায়িত্ব প্রত্যাশা করি তবে আমরা মূঢ়। কনগ্রেস যদি নিজ শক্তিতে দেশের স্থায়ী উন্নতি সাধন করিতে পারে, তবেই সে দেশের হৃদয়ের মধ্যে স্থায়ী প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে, কিন্তু যদি বিচিত্র মেজাজের প্রভুপরম্পরার

নিকট কনস্টিট্যুশনাল লাঙুল আন্দোলনকেই সে আপন কর্তব্য জ্ঞান করে, তবে অদ্য রুটির টুকরা এবং কল্য লাঠির গুঁতা খাইয়া পথের প্রান্তে পঞ্চত্বলাভই তাহার অদৃষ্টে আছে।

এইরূপ ভিক্ষাবৃত্তির মধ্যে অনেক নীচত্ব আপনি আসিয়া পড়ে। স্বাধীনক্ষমতাদৃপ্ত প্রভুর মন জোগাইতে গেলেই কপট নম্রতা, মিথ্যা আস্ফালন, সত্য গোপন এবং আত্মপ্রবঞ্চনা, দুর্বলপক্ষ স্বতই, অনেক সময় নিজের অজ্ঞাতসারেও, অবলম্বন করিয়া বসে। ইহাতে ক্রমশ যে হীনতা আসে ভিক্ষালব্ধ অধিকারখণ্ডে তাহা পূরণ করিতে পারে না।

এইজন্য আমরা অনেক সময়ে ভাবিয়াছি গবর্মেণ্ট অবজ্ঞাসহকারে কনগ্রেসের আবেদনে কর্ণপাত না করিয়া আমাদিগকে শাপে বর দিতেছেন। আমাদিগকে যথার্থ পথে প্রেরণ করিতেছেন। সে-পথ আত্মশক্তির পথ। ভিক্ষা যদি পূরণ করিতেন তবে আমাদিগকে কঠিন কর্তব্যপথ হইতে ভ্রষ্ট করিয়া সহজ দেশহিতৈষিতার সুকোমল হীনতাপঙ্কের মধ্যে, ভিত্তিহীন আত্মশ্লাঘা, অমূলক কৃত্রিম উন্নতি, এবং অনধিকারলব্ধ আরামনিদ্রার রসাতলে লইয়া ফেলিতেন।

এ-কথা আমরা অন্তরের মধ্যে বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছি। আমরা আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, এতদিন কী করিলাম, ইহাতে ফল কী হইতেছে; এতকাল যাহা বর্ষে বর্ষে প্রার্থনা করিয়া আসিতেছি সবই যদি ইংরেজ-রাজ আমাদের জীর্ণ আঁচল পূর্ণ করিয়া দান করেন তবু কি আমরা যথার্থ বড়ো হইব, অন্তরের মধ্যে সার্থকতা অনুভব করিব? এই সমস্ত প্রশ্ন এবং এই সকল সংশয় বর্ষে বর্ষে আমাদের উৎসাহ নির্বাণ করিয়া আনিতেছে।

কনগ্রেসের প্রত্যেক অধিবেশনেই আমাদিগকে দেশের হিতানুষ্ঠানে খানিকটা দূর করিয়া অগ্রসর হওয়া চাই। চাকা যে কেবলমাত্র ভেল ও ঠেলার দ্বারা চলে তাহা নহে নিজের গতিবেগও তাহাকে চালনা করে। সেইরূপ, কার্যচক্র লোকের আকর্ষণে যেমন চলে নিজের কর্মগতিতেও তেমনি বেগ প্রাপ্ত হয়,—কাজের দ্বারা কাজ অগ্রসর হয়।

কিন্তু কাজের ভার যখন পরের উপর, কেবল প্রার্থনার অধিকার আমাদের—এবং সেই পরও যখন প্রতিকূল, তখন, কিছু যে কাজ হইতেছে তাহা অনুভব করিব কেমন করিয়া। এই লক্ষ্মীছাড়া ভিক্ষাকার্যে আমাদের উৎসাহ কিসে সজীব রাখিবে।

সমালোচ্য পত্রখানির এক জায়গায় আভাস আছে যে নূতনত্বের হ্রাস হওয়াতে আমাদের উৎসাহ ক্রমে ম্লান হইয়া আসিতেছে। কিন্তু যেমন বিজ্ঞানের নব নব

আবিষ্কারের সঙ্গে জগতের রহস্য অধিকতর প্রসারিত হইয়া যায় তেমনি কাজ যত সম্পন্ন হয় উদ্যমের নূতনত্ব ততই বাড়িতে থাকে। কিন্তু যেখানে কাজ নাই কেবলই আয়োজন সেখানে উৎসাহের নবীনতা কৃত্রিম উপায়ে রক্ষা করা অসাধ্য। ভিক্ষাচর্যা যতই নৈপুণ্যসহকারে নব নব কৌশলে নিষ্পন্ন হউক তাহাকে কাজ বলিয়া গণ্য করিতে পারি না।

প্রতি বৎসর সমস্ত ভারতবর্ষ একত্র হইয়া অন্তত একটা কিছু কাজ আমরা নিজেরা যদি করিতে পারি, তবে সেই কৃতকার্যতার উৎসাহে পরবৎসরের কনগ্রেস আপনি সজীব হইয়া উঠিবে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ একটা কাজের উল্লেখ করিতে পারি। বোম্বাইয়ের পার্সি মহাত্মা শ্রীযুক্ত টাটা ভারতবর্ষে যে বিজ্ঞানপরীক্ষাশালার জন্য প্রচুর অর্থ দান করিয়াছেন তাহার সহিত সমস্ত ভারতের যোগসাধন করা কেবল কনগ্রেসের ন্যায় কোনো বিশ্বভারত-সম্মিলনীসভার দ্বারাই সাধ্য।

উক্ত পরীক্ষাশালা কেবলমাত্র শ্রীযুক্ত টাটার অর্থসাহায্য দ্বারা সম্পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না। ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের প্রতিনিধিগণ তাঁহাদের স্ব স্ব প্রদেশ হইতে চাঁদা সংগ্রহ করিয়া যদি টাটাসাহেবের এই প্রস্তাবটিকে প্রতিষ্ঠা দান করিতে পারেন তবে কনগ্রেসের জন্ম সার্থক হয়।

এইরূপ শিল্প বাণিজ্য বিদ্যাশিক্ষা প্রভৃতি সর্ববিষয়েই আমাদের সুগভীর দৈন্য আমাদের দেশের লোকের মুখ তাকাইয়া আছে। সমস্ত ভারতবর্ষ একত্র হইয়া তিনটে দিনের একটা দিনও সে-কথার কোনো উল্লেখ হয় না,—এমন মহৎ সুযোগ কেবল প্রতিকূল রাজশক্তির রুদ্ধ লৌহদ্বারের উপর মাথা কুটিয়াই কাটিয়া যায়, ইহাতে আমাদের আশা ও উৎসাহের কারণ কী আছে জানি না।

ফ্রান্স জর্মানি ইটালি প্রভৃতি য়ুরোপীয় দেশসকল স্বরাজ্যের বাণিজ্য-উন্নতি সাধনের জন্য যে-সকল শিল্পবিদ্যালয় বাণিজ্যবিদ্যালয় প্রভৃতি স্থাপন করিতেছেন তাহা যদি সে-সকল দেশের পক্ষেও অত্যাবশ্যক হয় তবে আমাদের দেশে তাহার যে কিরূপ প্রয়োজন, বলিয়া শেষ করা যায় না। আমাদের এ অভাব কে পূরণ করিবে ? রাজা যদি নাই করে তবে কি আমরা বসিয়া থাকিব এবং আবেদন করিব ?

আমাদের রাজা বিদেশী; তাঁহারা যে রাজকর সংগ্রহ করেন তাহা মাহিনাপত্র, পেনশন, কম্পেনসেশন, যুদ্ধবিগ্রহ, শৈলবিহার প্রভৃতিতে অনেকটা শুষিয়া যায়। সে-সমস্ত বিস্তর বাজেখরচ খাটো করিয়া দেশের ধন দেশের স্থায়ী হিতসাধনে ব্যয় করিবার জন্য কনগ্রেস বহুবৎসর চীৎকার করিলেও রাজার কিরূপ মর্জি হইবে তাহা কেহই বলিতে

পারে না। সেই অনিশ্চিত আশ্বাসে সুদীর্ঘ কাল বক্তৃতাদি না করিয়া আমরা যদি সমস্ত ভারতের সমবেত চেষ্টায় একটা উপযুক্ত শিল্পবিদ্যালয় স্থাপন করিতে পারি তবে তাহাতেই কনগ্রেসের গৌরব বাড়িবে। বিদেশী রাজা নানাকারণে অনেক কাজ করিতে পারে না, স্বদেশী কনগ্রেস সেই কাজগুলি সম্পন্ন করুক। আমাদের রাজা যাহা পারে না বা করে না, কনগ্রেস তাহাই নিজের সাধ্যমত করিবে ইহাই তাহার ব্রত হউক। বিদেশী তো আমাদের অনেক করিয়াছে এখন স্বদেশী কী করিতে পারে তাহাই দেখাইবার সময় আসিয়াছে,—বৎসর বৎসর এখন আর সেই অভ্যস্ত পুরাতন ভিক্ষার বুলি হতাশ্বাস-কণ্ঠে পরের ভাষায় পরের দ্বারে ঘোষণা করিয়া লেশমাত্র সুখ হয় না।

যেমন আত্মীয়ের মৃত্যুদর্শনে আমাদের মনে একটা সুগভীর বৈরাগ্যের উদয় হয় এবং সেই বৈরাগ্য আমাদিগকে ক্ষণকালের জন্যও মোহবন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া দেয়—সম্প্রতি আমাদের মনে সেইরূপ একটা রাজনৈতিক বৈরাগ্য উপস্থিত হইয়াছিল। মহামারী দুর্ভিক্ষ প্রভৃতিতে আমরা যখন অত্যন্ত উৎপীড়িত হইয়াছিলাম সেই সময় হঠাৎ আমাদের গবর্মেণ্টের যেরূপ চেহারা বাহির হইয়াছিল তাহাতে বুঝিয়াছিলাম আমরা তাঁহাদের আপনার নহি। এবং তৎপূর্বে আমাদের একটা ধারণা ছিল যে, রাজ্যের বিধিব্যবস্থা সমস্তই পাকা, কিন্তু হঠাৎ যখন দেখিলাম তাহাও দ্বিধাবিদীর্ণ হইল, এবং তাহার মধ্যে দুই নাটু-ভ্রাতা কোথায় তলাইয়া গেলেন, তখন রাজবিধানের প্রতি আমাদের যে একটা অটল শ্রদ্ধা ও নির্ভর এতদিন লালিত হইয়া উঠিতেছিল তাহার অপঘাতমৃত্যু হইল। সেই সময়ে ভারতবর্ষের আদ্যোপান্তে শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রের মনে একটা সুগভীর রাজনৈতিক বৈরাগ্য জন্মিয়াছিল, মোহ ছুটিয়াছিল, বুঝিয়াছিলাম নিজের চেষ্টায় যতটুকু হয় তাহারই উপর যথার্থ স্থায়ী নির্ভর।

এই বৈরাগ্য এই চৈতন্য পরম হিতকর। ইহাতে আমাদের যথার্থ অবস্থা আমরা বুঝিতে পারি এবং আমাদের সমস্ত বিক্ষিপ্ত চেষ্টা নিজের দিকে ফিরিয়া আসে। ভিক্ষাবৃত্তির অনিশ্চিত আশ্বাসের প্রতি একান্ত ধিক্‌কার জন্মে। কিন্তু সেদিনের কঠিন শিক্ষা আমরা এই অল্পকালের মধ্যেই যেন ভুলিতে বসিয়াছি। কিন্তু সে-শিক্ষা ভুলিবার নয়; অন্তত দেশের দুই-চার জনের মনেও তাহা মুদ্রিত থাকিবে; এবং সেই শিক্ষা কনগ্রেস ও কনফারেন্সকে ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে এই ধিক্কৃত ভিক্ষাবৃত্তির অনন্ত লাঞ্ছনার পথ হইতে স্বচেষ্টায় স্বকার্যসাধনের দিকে নিঃসন্দেহ ফিরাইয়া আনিবে। তাহা যদি না আনিতে পারে তবে একদা এই কনগ্রেসকে লজ্জা, নৈরাশ্য ও অপমৃত্যুর হাত হইতে কেহ রক্ষা করিতে পারিবে না।

১৩০৫

মুখুজ্যে বনাম বাঁড়ুজ্যে

রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয় সম্প্রতি এক সম্প্রদায় জমিদারের মুখপাত্র হইয়া কনগ্রেসপক্ষীয়ের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশপূর্বক আক্ষেপ করিয়াছেন যে, দেশের যাহারা "ন্যাচারাল লীডার" বা স্বাভাবিক অধিনেতা বা প্রকৃত মোড়ল, নানা অস্বাভাবিক কারণে ক্ষমতা তাহাদের হস্ত হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িতেছে।

রাজত্ব কাহার হইবে ইহা লইয়া অনেক দেশে অনেক লড়াই হইয়া গিয়াছে। কুরুপাণ্ডবের মধ্যেও একটা খুব বড়ো রকম তর্ক হইয়াছিল যে, রাজ্যে কাহার স্বাভাবিক অধিকার। উভয় পক্ষ হইতে যে-সকল সূক্ষ্ম এবং স্থূল, তীক্ষ্ণ এবং গুরুতর মারাত্মক যুক্তি প্রয়োগ হইয়াছিল মহাভারতে তাহার বিস্তারিত বর্ণনা আছে।

দাদা ধৃতরাষ্ট্র বড়ো বটে কিন্তু তিনি অন্ধ, সেইজন্য কনিষ্ঠবংশে রাজ্যের ভার পড়িয়াছিল। আমাদের জমিদার-কৌরবপক্ষীয়ের যদি স্বাভাবিক অন্ধতা না থাকিত তবে কনিষ্ঠ কনগ্রেস-পাণ্ডবগণের নেতৃত্ব-সিংহাসনে দাবি থাকিত না।

যাহা হউক, গৃহবিবাদে মঙ্গল নাই। কতকটা সুখের বিষয় এই যে, এ-বিবাদ একটা মৌখিক অভিনয়মাত্র। মুখুজ্যেমহাশয় মনে মনে বেশ জানেন যে, বাঁড়ুজ্যে-মহাশয় কম লোক নহেন কিন্তু সরকারের কাছে সে-কথা বলিয়া সুবিধা নাই। তাঁহাদের বলিতে হয়, হুজুরেরা যে কনগ্রেসকে দুচক্ষে দেখিতে পারেন না আমাদেরও ঠিক সেই দশা।

ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ, গান্ধারী সেই আক্ষেপে নিজের চোখে কাপড় বাঁধিতেন, কারণ তিনি সাধ্বী ছিলেন। গবর্মেন্ট যদি কাহারও প্রতি অন্ধ হন, তবে মুখুজ্যে মহাশয়ের কর্তব্য চোখে কাপড় বাঁধা, কারণ তাঁহারা খয়ের খাঁ।

কেবল রাজভক্তি নহে, ইহার মধ্যে একটু পাকা চালও আছে। উপরওআলা রাজপুরুষেরা আজকাল যখন স্পষ্টত নূতন জনসভাসকলের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করিয়াছেন তখন এ-কথা বলিবার সুযোগ হইয়াছে যে, সরকার যদি মুখুজ্যেমহাশয়দিগকে যথেষ্ট পরিমাণে বাড়াইয়া দেন তাহা হইলে বাঁড়ুজ্যেমহাশয়রা আর এত বাড়াবাড়ি করিতে পারেন না। আমরা স্বভাবতই বড়োলোক, তোমরাও আমাদিগকে বড়ো করিয়া রাখো, কনগ্রেস আপনি ছোটো হইয়া যাইবে। আমরা স্ফীত আছি বটে কিন্তু আরও স্ফীত হইতে পারি তোমরা আর-একটু ফুঁ দাও যদি। তাহা হইলে ওই চাকরিবঞ্চিত নৈরাশ্যপীড়িত কৃশ কনগ্রেসটাকে আরও অনেকটা ক্ষীণ দেখিতে হয়।

কনগ্রেসকে নির্বাসনে দিয়া নিজেরা পরিপুষ্ট হইবার জন্য জমিদার-সমাজ এ একটা দ্যূতক্রীড়ার সূচনা করিয়াছেন। তাঁহারা সময় বুঝিয়া যে অক্ষ ফেলিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ অকপট নহে ইহাই বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য। এইবার পৌরাণিক তুলনাটাকে খতম করিয়া দিয়া প্রকৃত বিষয়ের অবতারণা করি।

প্রশ্ন এই যে আমাদের দেশের জনসাধারণের স্বাভাবিক অধিনেতা কে? উত্তর দেওয়া কঠিন। কারণ, "লীডার" ইংরেজি শব্দ যদিচ আমাদের অভ্যস্ত এবং তাহার বাংলা অনুবাদও সুকঠিন নহে, এবং সৈন্যগণের নেতা, ধর্মসম্প্রদায়ের নেতা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন রূপে নেতৃত্বের ভাব আমাদের নিকট পরিচিত বলিয়া জনসাধারণের নেতা শব্দটা আমাদের কানে খট করিয়া বাজে না কিন্তু জিনিসটা এখানকার নহে। এই নেতৃত্বের কোনো ঐতিহাসিক নজির নাই সুতরাং কাহার পক্ষে ইহা স্বাভাবিক, অর্থাৎ চিরপ্রথাসংগত, তাহা হঠাৎ বলা যায় না।

প্রথম কথা এই যে, জনসাধারণ বলিয়া একটা পদার্থ এ-দেশে ছিল না। গ্রাম ছিল, পল্লী ছিল, পরিবার ছিল, পঞ্চায়ত ছিল, মোড়ল ছিল, কর্তা ছিল, কিন্তু জনসাধারণ ছিল না এবং তাহার অধিনেতা আরও দুর্লভ ছিল।

এক্ষণে, ইংরেজের দৃষ্টান্ত, শিক্ষা এবং একেশ্বর রাজত্বের বিপুল পক্ষপুটের তা লাগিয়া জনসাধারণ যদি ফুটিয়া উঠিবার উপক্রম করে, সে আপনার মাথা আপনি লইয়া আসিবে, গবর্মেণ্ট জোর করিয়া মুখুজ্যেমশায়দিগকে তাহার সহিত যোজনা করিয়া দিলে আর-কিছু না হউক তাহা তাঁহাদের কথিতমতো ন্যাচারাল অর্থাৎ স্বাভাবিক হইবে না।

এমন কি জনসাধারণ নামক বিরাট বিহঙ্গমের মুণ্ডটাই সব-প্রথমে চঞ্চুদ্বারা ঠুকিয়া ঠুকিয়া ডিম্ব বিদারণ করিয়া আলোকপথে দেখা দেয়, পুচ্ছ-অংশ পরে বাহির হইয়া পড়ে। আমরা এখন সেই অবস্থায় আছি। জনসাধারণের মুণ্ড যাঁহারা তাঁহারাই সম্প্রতি বহুকলরবসহকারে প্রকাশমান, তাঁহাদেরই চঞ্চুযুগল মুক্তিপথের কঠিন আবরণ অপসারণে প্রবৃত্ত, অবশিষ্ট অংশ এখনও বাধাধারা গুপ্ত। মুখুজ্যেমহাশয়েরা যে সেই পুচ্ছের মধ্যে প্রচ্ছন্ন আছেন তাহা না হইতে পারে। তাঁহারা জনসাধারণ নহেন, তাঁহারা বিশিষ্টসাধারণ, মাটিতে তাঁহাদের বাসা নহে, উচ্চ শাখায় তাঁহাদের নীড়—কিন্তু তাঁহারা যতই মহৎ হউন না কেন জনসাধারণের মুখপাত্র নহেন।

অবশ্য এ-কথা স্বীকার করিতেই হয় যাঁহার হস্তে ক্ষমতা অধিক অনেক লোক তাঁহার অনুবর্তী হইয়া থাকে। কিন্তু আমাদের শাস্ত্রে এবং দেশাচারে ক্ষমতা এমনি খণ্ড খণ্ড বিভাগ করিয়া দিয়াছে যে, যতবড়োই লোক হউন তাঁহার ক্ষমতা পদে পদে সীমাবদ্ধ। আমাদের দেশে জমিদার জমিদারমাত্র, তিনি জুলুম করিয়া

খাজনা আদায় করিতে পারেন কিন্তু সমাজে তাঁহার অধিক অধিকার নাই। তাঁহারই একজন দীন প্রজা সমাজে হয়তো তাঁহা অপেক্ষা প্রতাপশালী। এইজন্য জাতি ও সমাজ লইয়া রাজা-মহারাজাকেও হিমসিম খাইতে হয়।

ইংলণ্ডে ইহা সম্ভবপর নহে। একজন ইংরেজ বড়ো জমিদার তাঁহার কোনো দীন প্রজা অপেক্ষা সমাজে খাটো হইতে পারেন না। তাঁহার ধনসম্পদ ও ক্ষমতা, সমাজে তাঁহাকে উচ্চাসন দেয়। তাঁহার অধীনস্থ কোনো ফার্মার (বাংলার জোতদারের সমতুল্য ব্যক্তি) সোসাইটিতে তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারে না। অতএব সে-স্থলে একজন ইংরেজ বড়ো জমিদার প্রজাদের নিকট হইতে সর্বতোভাবে মর্যাদালাভ করিতে পারেন।

কেবল তাহাই নহে। ইংলণ্ডে উপাধিধারী প্রাচীন জমিদারবংশ আছে। শুনা যায় এই সকল প্রাচীন উপাধিধারীর প্রতি মুগ্ধভাব ইংরেজ জনসাধারণের মধ্যে অত্যন্ত প্রবল। তাহার কারণ, এই সকল লর্ড প্রভৃতি উপাধির সহিত অধিনায়কতার ভাব দেশের লোকের মনে বদ্ধমূল। পূর্ব-ইতিহাসে যুদ্ধবিগ্রহ শান্তিস্থাপন এবং সর্বপ্রকার সাধারণকার্যের নেতৃত্বে ইঁহারাই এককালে প্রধান ছিলেন। এখন যদিচ ইঁহাদের কার্যকারিতা হ্রাস হইয়া ইঁহারা অনেকটা অলংকারের কাজ করিতেছেন তথাপি কাল-পরম্পরাগত সেই সম্মানপ্রবাহ তাঁহাদিগকে সমাজের অগ্রভাগে বহন করিয়া রাখিয়াছে।

আমাদের দেশে তাহার অনুরূপ আদর্শ ব্রাহ্মণমণ্ডলী। কিন্তু ভ্রান্ত উপমা খাটাইয়া আমাদের জমিদারবর্গ আপনাদিগকে ইংলণ্ডের সেই লর্ডশ্রেণীর সহিত তুলনীয় জ্ঞান করেন, এবং তাঁহাদের ভাবভঙ্গি অনুকরণেরও চেষ্টা করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, আমরা অ্যারিস্টক্র্যাটস।

অ্যারিস্টক্র্যাট শব্দের বাংলাই পাওয়া যায় না। প্রাচীন "অভিজাত" শব্দ বাংলাদেশে অপরিচিত। "কুলীন" শব্দ সর্বজনবিদিত। কিন্তু কৌলীন্য বিলাতিভাবের অ্যারিস্টক্র্যাসি নহে।

আমাদের দেশে ধনের সম্মান য়ুরোপের ন্যায় তেমন অধিক নহে। এমন কি, যে-সকল জাতির মধ্যে ধনী মহাজন বিস্তর আছে তাহারা সমাজে উচ্চস্থান লাভ করিতে পারে নাই।

আমাদের দেশে রাজা-রায়বাহাদুরদের দেখিয়াও লোকে অত্যন্ত অভিভূত হইয়া পড়ে না। তাহার একটা কারণ এই যে, এই সকল পদবীধারী উপাধিধারিগণ সমাজে এক ইঞ্চি উপরে উঠিতে পারেন না। বিবাহ প্রভৃতি ব্যাপারে যাহাদের সহিত তাঁহাদের আদানপ্রদান চলে তাহাদের কেহ হয়তো যাত্রার দলে বেহালা বাজায়,

এমন কি, কেহ হয়তো কনগ্রেসের উপাধিহীন প্রতিনিধি। ইংলণ্ডীয় সমাজে যাহারা উপরকার দশজনা বলিয়া বিখ্যাত নিচেকার দশলক্ষের সহিত তাঁহাদের ব্যবধান দুর্গম—এই জন্য সেই দশলক্ষের ভক্তি সেই রহস্যাবৃত দশজনার দিকে ধাবিত হইতে থাকে। আমাদের দেশে গবর্মেণ্টের খেতাব দশলক্ষের সন্নিধান হইতে সেই দশজনাকে কাঁটাগাছের মতো বেড়িয়া রাখিতে পারে নাই। বৈবাহিক মহাশয়েরা আভিজাত্যের বূ্যহ চারিদিক হইতেই ভেদ করিয়া দেন।

আবার রাজা-রায়বাহাদুরবংশের শাখাপ্রশাখা আত্মীয়কুটুম্ব ভাগিনেয়-ভ্রাতুষ্পুত্র খুড়তুত-মাসতুত ভাইরা মিলিয়া উক্ত বংশকে বংশমর্যাদার বহুদূর বাহিরে ব্যাপ্ত বিক্ষিপ্ত করিয়া দেয়। বটের উচ্চশাখা যেমন তাহার নিম্নগামী অসংখ্য ঝোরাকে ঝাড়িয়া ফেলিতে পারে না, যতই অদ্ভুত এবং যতই গুরুতর হউক তাহাদিগকে রাত্রিদিন ঘনিষ্ঠভাবে বহন করিতে থাকে তেমনি আমাদের দেশে নিম্নগামী দূরতম এবং হীনতম কুটুম্বস্বজনকেও ত্যাগ করিবার জো নাই ;—যদি বা তাহাদিগকে অন্ন হইতে বঞ্চিত করা যায় তথাপি সর্বপ্রকার ক্রিয়াকর্মে লৌকিকাচারে তাহাদের স্পর্শক্রামকতা হইতে আপন আভিজাত্যকে বাঁচাইয়া চলিবার কোনো উপায় নাই। এইরূপে উচ্চ পদবী বাহিরকে ভিতর হইতে এবং ভিতরকে বাহির হইতে ঠেকাইয়া রাখিতে পারে না। সাধারণ এবং অসাধারণের মাঝখানে মায়াগণ্ডি কিছুতেই টিকে না।

আমাদের দেশে কঠিন জাতিভেদ যেমন একদিকে ভিন্ন বর্ণের মধ্যে অলঙ্ঘ্য সামাজিক ব্যবধান স্থাপন করিয়াছে তেমনি অন্যদিকে ধনী দরিদ্র, উচ্চ নীচ, রাজটিকা-লাঞ্ছিত ও খেতাববঞ্চিতদিগকে সমান করিয়া রাখিয়াছে।

প্রাচীন বংশের একটা মোহ আছে বটে। কিন্তু বর্তমান ধনী জমিদারদের মধ্যে নাটোর প্রভৃতি দুই-এক ঘর ছাড়া প্রাচীন বংশ নাই বলিলেই হয়। আমাদের দেশে যেরূপ সম্পত্তিবিভাগ তাহাতে ধনগৌরবকে প্রাচীন করিয়া তোলা একপ্রকার অসাধ্য ; দায়ভাগের শতঘ্নীপ্রহারে সে দেখিতে দেখিতে শতধা বিভক্ত হইয়া অকালে পঞ্চত্ব এমন কি, পঞ্চাধিকত্ব প্রাপ্ত হয়।

এই তো গেল গৌরবের কথা। কিন্তু আমাদের দেশে ধনের গৌরব অদ্যাপি যথেষ্ট জাগে নাই বটে তবু তাহার প্রয়োজন যথেষ্ট আছে এ-কথা অস্বীকার করা যায় না। অতএব যাঁহাদের হাতে ধন আছে তাঁহারা প্রয়োজনসাধন করিয়া সাধারণের আনুগত্য আকর্ষণ করিতে পারেন। তাঁহাদের পক্ষে নেতা হইবার সেই একটা সোনার রাস্তা আছে।

কিন্তু আমাদের অভিজাতগণ যাহাকে রাজপথ জ্ঞান করেন তাহা রাজা হইবার পথ ;—অন্য পথের শেষে দেশের কল্যাণ ও সাধারণের হৃদয় থাকিতে পারে কিন্তু

খেতাবের খনি নাই, এইজন্য সে-পথে বড়োলোকের জুড়িগাড়ি প্রায় দেখা যায় না। একটা দৃষ্টান্ত দিলেই তাহা সকলের প্রতীত হইবে। সার আলফ্রেড ক্রফ্‌ট হয়তো ভালো লোক এবং বড়োলোক, কিন্তু বিদ্যাসাগর তাঁহা অপেক্ষা অনেক বেশি ভালো লোক এবং বড়োলোক, এবং সকলের বেশি, তিনি আমাদের স্বদেশী লোক। কিন্তু ক্রফ্‌ট সাহেব ভারত ছাড়িয়া স্বদেশে গিয়াছেন সেই শোকে বিহ্বল হইয়া তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন নির্মাণে ধনিগণ উৎসুক হইয়া উঠিয়াছেন, আর, বিদ্যাসাগর ইহসংসার ত্যাগ করিয়া গেলেন দেশের ধনশালীরা কোনোপ্রকার চেষ্টা করিলেন না! ইঁহারা দেশের ন্যাচারাল লীডর! আমাদের স্বাভাবিক চালক! ইঁহারা কোন্‌দিকে আমাদিগকে চালনা করিবেন? আমাদের দেশের মহোচ্চ মহদাশয়দিগের দিকে নহে, ইংরেজ মেজোসাহেব সেজোসাহেব ছোটোসাহেবের দিকে; আমাদের দীনহীন দেশের সহস্র অভাব মোচনের দিকে নহে, সাহেবের নিকুঞ্জবনে গড়ের বাদ্যের শ্রীবৃদ্ধিসাধনের দিকে? সাহেব রাজকর্মচারীরা বিলাতে চলিয়া গেলে দেশীয় ধনিগণ তাঁহাদের প্রতিমা স্থাপন করিবেন ইহাতে আমরা আপত্তি করি না, কিন্তু দেশীয় পূজ্যগণের জন্যও যদি সেই পরিমাণে কিছু ত্যাগস্বীকার করেন তবে দেশের নায়কত্বে তাঁহাদের কথঞ্চিৎ দাবি থাকে।

সেকালের ধনী জমিদারগণ নবাব-সরকারে প্রতিপত্তি ও পদবী লাভের জন্য কিরূপ চেষ্টা করিতেন ও কোনো চেষ্টা করিতেন কিনা তাহা আমরা ভালোরূপ জানি না। তখন নবাব-দরবারের প্রসন্নতা হইতে কেবল শূন্যগর্ভ খেতাব ফলিত না, তখন সম্মানের মধ্যে সৌভাগ্য এবং রাজপদের মধ্যে সম্পদ পূর্ণ থাকিত, অতএব তাহা লাভের জন্য অনেকেই চেষ্টা করিতেন সন্দেহ নাই। কিন্তু তখনকার যাহা সাধারণ হিতকার্য,—অর্থাৎ দিঘি খনন, মন্দির স্থাপন, বাঁধ নির্মাণ, এই সকলকেই তাঁহারা যথার্থ কীর্তি বলিয়া জ্ঞান করিতেন, খেতাবলাভকে নহে। দশের নিকট ধন্য হইবার আকাঙ্ক্ষা তাঁহাদের প্রবল ছিল। তখন এই সকল হিতকার্য রাজসম্মানের মূল্যস্বরূপ ছিল না,—ইহাতে সাধারণের সম্মান আকর্ষণ করিত। সেই সাধারণের সম্মানের প্রতি তাঁহাদের উপেক্ষা ছিল না। রানী ভবানী, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ইঁহারা তৎকালীন নবাবদত্ত বিশেষ অনুগ্রহের দ্বারা উজ্জ্বল নহেন, ইঁহারা বিচিত্র কীর্তিদ্বারা লোকসাধারণের হৃদয়ের মধ্যে আপন অক্ষয় মূর্তি স্থাপন করিয়াছেন। তখন জনগণের নিকট হইতে হিতকারী দেশপতিগণ যে খেতাব লাভ করিতেন, তাহা আধুনিক দেশী বিলাতি সর্বপ্রকার খেতাবের অপেক্ষা অনেক উচ্চ; তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল:

আর্তানাম্‌ ইহ জন্তূনাম্‌ আর্তিচ্ছেদং করোতি যঃ
শঙ্খচক্রগদাহীনো দ্বিভুজঃ পরমেশ্বরঃ।

কীর্তিস্থাপনের দ্বারা লোকহিতসাধন অথবা সাধারণের নিকট খ্যাতিলাভ এখনকার ধনিগণের নিকট তেমন স্পৃহনীয় নহে।

আরব্য উপন্যাসে সিন্ধবাদের কাহিনীতে পড়া যায় যে, চুম্বকশৈলের আকর্ষণে দূর হইতে জাহাজের সমস্ত লোহার পেরেক ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিত, তেমনি আমাদের যে-সকল ধনী জমিদার আপন আপন ভূখণ্ডের মধ্যে দৃঢ়ভাবে নিহিত ছিলেন, দানধ্যান ক্রিয়াকলাপ এবং লোকহিতকর বিচিত্র স্থায়ী কীর্তিদ্বারা এই জীর্ণ দেশটাকে একপ্রকার জুড়িয়া রাখিয়া বহুলোকবহনকার্য সম্পন্ন করিতেছিলেন, প্রবল ইংরেজ রাজার সমুচ্চ চুম্বকশৈল অলক্ষ্যে অনায়াসে তাঁহাদিগকে দেশের লোকের নিকট হইতে ছিঁড়িয়া যেন একমাত্র নিজের দিকে আকর্ষণ করিয়া আনিতেছে। সমস্ত পূজা-অর্চনা দান-দক্ষিণা সাহেবের অভিমুখে, সমস্ত খ্যাতিপ্রতিপত্তি সম্মান-সমাদর সাহেবের হস্ত হইতে। সেকালে রাজার আকর্ষণ এবং স্বদেশী সাধারণের আকর্ষণ অন্তত সমান ছিল—নবাব-বাদশারা আমাদের ধনী জমিদারগণকে দেশের কাছ হইতে এমন করিয়া টানিয়া গ্রাস করিতে পারে নাই; কর্তব্য-অকর্তব্যের আদর্শ, স্তুতিনিন্দার চরম দণ্ড-পুরস্কার বিধান দেশের লোকের হাতে ছিল।

অতএব দেখা যাইতেছে, সেকালে বিশিষ্ট ব্যক্তিরা সর্বসাধারণের সহিত যে হিতানুষ্ঠানসূত্রে বদ্ধ ছিলেন একালে তাহাও নাই, আবার নিজেদের মধ্যে একটা অভিজাতমণ্ডলীবন্ধন করিয়া সম্প্রদায়গত মহত্ত্বকে অক্ষুণ্ণভাবে রক্ষণ ও পোষণ, তাহারও সম্ভাবনা নাই। ইঁহারা নিজগৌরবেও উচ্চ নহেন, সর্বসাধারণের সহিত ঐক্য দ্বারাও বৃহৎ বলিষ্ঠ নহেন। ইঁহারা বিলাতের লর্ডদের ন্যায় স্বতন্ত্র নহেন, বিলাতের জননায়কদের ন্যায়ও প্রবল নহেন। ইঁহারা বনস্পতির ন্যায় বিচ্ছিন্ন বৃহৎ নহেন, ওষধির মত ব্যাপ্ত বিস্তৃতও নহেন; ইঁহারা কুষ্মাণ্ডলতার ন্যায় একমাত্র গবর্মেন্টের আশ্রয়যষ্টি বাহিয়া উন্নতির পথে চড়িতে চাহেন,—ভুলিয়া যান যে সেই সংকীর্ণ রাজদণ্ডবাহী উচ্চতা অপেক্ষা গুল্মসমাজের খর্বতা শ্রেয় এবং তৃণসমাজের নম্রতা শোভন।

পুরাকালের বড়ো জমিদারগণ রাস্তাঘাট করিয়া সাধারণের অভাব মোচন, যাত্রাগান প্রভৃতি উৎসবের দ্বারা সাধারণের আমোদ বিধান এবং গুণী, পণ্ডিত ও কবিদের প্রতিপালন দ্বারা দেশের শিল্পসাহিত্যের রক্ষণ ও পালন করিতেন। তাঁহারাই আমাদের দেশে দানশীলতার ও সমাজহিতৈষার উচ্চ আদর্শ জাগ্রত করিয়া রাখিয়াছিলেন। শুভানুষ্ঠান উপলক্ষ্যে ত্যাগস্বীকারে পরাঙ্মুখতা যে লজ্জাকর তাহা তাঁহারাই দেশের হৃদয়ে বদ্ধমূল করিয়াছিলেন।

বর্তমান জমিদারগণ যদি সেকালের দৃষ্টান্ত অনুসারে, কেবল রাজার মুখ না চাহিয়া,

খেতাবের লক্ষ্য ছাড়িয়া, জনহিতসাধন ও দেশের শিল্পসাহিত্যের রক্ষণপালনে সহায়তা করেন তবেই তাঁহাদের ক্ষমতার সার্থকতা হয় এবং গৌরব বাড়িয়া উঠে।

যখন আমাদের রাজা বিদেশী, এবং তাঁহাদের রুচি, ভাষা ও সাহিত্য স্বতন্ত্র তখন দেশী ভাষা ও সাহিত্যের অবহেলা অবশ্যম্ভাবী। যাঁহারা জীবিকাসংগ্রামে প্রবৃত্ত, বাংলা ভাষার দিকে তাকাইবার সময় তাঁহাদের নাই। সর্বত্রই দেশের ধনিগণ স্বদেশীয় তরুণ সাহিত্যের পালনকর্তা। আমাদের বিদেশী-শাসিত দেশে সাহিত্যের পক্ষে ধনীদের সহায়তা বিশেষ আবশ্যক।

কিন্তু মুখ্য জমিদারগণ, জমিদার সভার প্রধান প্রতিনিধিবর্গ, ইংরেজি শেখেন, ইংরেজি লেখেন, ইংরেজি বলেন। পিতাকেও চিঠি লিখিতে ইংরেজি ভাষা ব্যবহার করেন। তাঁহারা বলেন ইংলণ্ডের অভিজাতবর্গের মতো আমরা রক্ষণশীল, কিন্তু মাতৃভাষাকেও তাঁহারা রক্ষা করেন না। দেশের জনসাধারণের ন্যায় দেশের ভাষাও তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ নহে।

তাহার কারণ পূর্বেই বলিয়াছি,—এমন কিছুতে তাঁহাদের উৎসাহ নাই রাজার নিকট যাহার কোনোপ্রকার আদর না থাকে,—যাহা কেবলমাত্র দেশের।

দেশীয় রুচি এবং শিল্প এখনও কিয়ৎপরিমাণে তাঁহাদের আদর পায় কিন্তু তাহাও ক্রমশ হ্রাস হইয়া আসিতেছে। বিলাতি রুচির সঙ্গে সঙ্গে বিলাতি পণ্য তাঁহাদের গৃহ হইতে দেশের শিল্পকে অবমাননা সহকারে নির্বাসিত করিয়া দিতেছে।

সংক্ষেপত, এ-দেশে পূর্বকালে জমিদার-সম্প্রদায়ের যে গৌরব ছিল তাহা খেতাব অবলম্বনে ছিল না,—তাহা দান, অর্চনা, কীর্তিস্থাপন, আর্তগণের আর্তিচ্ছেদ, দেশের শিল্পসাহিত্যের পালন-পোষণের উপর নির্ভর করিত। সেই মহৎ গৌরব এখনকার জমিদাররা প্রতিদিন হারাইতেছেন। দেশ যখন চাহিতেছে রুটি তাঁহারা দিতেছেন প্রস্তর,—বঙ্গভূমি তাহার জলকষ্ট, তাহার অন্নকষ্ট, তাহার শিল্পনাশ, তাহার বিদ্যাদৈন্য, তাহার রোগতাপ লইয়া তাঁহাদের মুখের দিকে চাহিয়া আছে, আর তাঁহারা স্বদেশ-প্রত্যাগত সাহেব-রাজকর্মচারীদের পাষাণ-প্রতিমূর্তি গড়িয়া দিতেছেন।

সাহেবের জন্য তাঁহারা অনেক করেন কিন্তু সাহেবেরা চেষ্টা করিলেও তাঁহাদিগকে দেশীয় সাধারণের স্বাভাবিক অধিনেতা করিতে পারিবেন না। কারণ ইংরেজ রাজা অস্বাভাবিককে স্বাভাবিক করিয়া তুলিতে পারেন না। যদি তাঁহারা আপন পুরাতন উচ্চস্থান অধিকার করিতে চাহেন তবে গবর্মেন্ট-প্রাসাদের গম্বুজটার দিকে অহরহ ঊর্ধ্বমুখে না তাকাইয়া নিম্নে একবার দেশের দিকে সাধারণের দিকে মুখ ফিরাইতে হইবে।

১৩০৫

অপরপক্ষের কথা

ভাদ্রমাসের ভারতীতে "মুখুজ্যে বনাম বাঁড়ুজ্যে" প্রবন্ধের লেখক বাঁড়ুজ্যেমশায়দের হইয়া যে ওকালতি করিয়াছেন, তাহা পক্ষপাতবিহীন নহে। ইংরেজ-প্রসাদবুভুক্ষু উপাধিভিক্ষুকদের পক্ষে আমি কোনো কথা বলিতে চাহি না, কিন্তু লেখক অন্যপক্ষীয়দের প্রতি যে-সমস্ত গুণের আরোপ করিয়াছেন তাহার কোনো প্রমাণ দেন নাই।

এ-কথা সত্য হইতে পারে এখনকার জমিদারবর্গ রাজপুরুষদের অত্যন্ত "ন্যাওটো" হইয়া পড়িয়াছেন, দেশের লোকের দিকে তাঁহারা তাকান না। স্বদেশীয়ের নিকট হইতে খ্যাতিলাভের জন্য এবং স্বদেশের প্রতি স্বাভাবিক বদান্যতাবশত পুরাকালের জমিদারগণ যে-সকল কীর্তিকলাপ স্থাপন করিতেন, এখনকার জমিদারগণ তাহাতে উৎসাহ বোধ করেন না।

কেন করেন না? পূর্বোক্ত প্রবন্ধে তাহার কতকটা হেতু দেওয়া হইয়াছে। ইংরেজের প্রভাব আমাদের দেশে এত অধিক প্রবল হইয়াছে যে, তাহা সকল প্রভাবকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। দেশের লোককে আমরা গণ্য জ্ঞান করি না। দেশের লোকের কাছে প্রশংসা পাওয়ার কোনো স্বাদ নাই।

মুসলমানদের আমলে আমরা স্বদেশকে তুচ্ছ বোধ করিতাম না। কারণ, বিজেতারা আমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইলেও আমাদেরও নানা বিষয়ে শ্রেষ্ঠতা ছিল। অন্তত আমাদের উভয়ের মধ্যে গুরুতর পার্থক্য ছিল না।

কিন্তু ইংরেজরাজার সঙ্গে আমাদের প্রভেদ সর্ববিষয়ে এত অত্যধিক, তাহাদের বুদ্ধিবল যন্ত্রতন্ত্র বিলাসবিভূতি সর্বদাই আমাদের পক্ষে এত দুরায়ত্ত বলিয়া বোধ হয় যে, অলক্ষিতভাবে আপনাদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা হ্রাস হইয়া আসিয়াছে।

যে অনিবার্য শ্রদ্ধার অভাবে ইংরেজ অনেক সময় আমাদের প্রতি সদ্‌বিচার করিতে পারে না, সেই শ্রদ্ধার অভাবে স্বদেশের লোকও আমাদের প্রতি বিমুখ হইয়াছে।

সেইজন্য আমাদের দেশের অনেক শিক্ষিত লোক এবং বিলাতফেরতরা সাধারণ লোকদের হইতে আপনাদিগকে যেন স্বতন্ত্রশ্রেণীভুক্ত করিয়া রাখিতে ভালোবাসেন। বাহ্য বেশভূষা-আচারব্যবহারেও তাঁহারা আপনাদের পার্থক্য কিছু যেন অস্বাভাবিক আড়ম্বরের সহিত জাহির করিয়া রাখিতে চান।

কতকটা পার্থক্য যে আপনিই হইয়া পড়ে সে-কথা অস্বীকার করিবার জো নাই। ইংরেজি-শিক্ষিত এবং ইংরেজিতে অশিক্ষিত লোকদের মধ্যে যে কেবল শিক্ষার তারতম্য

তাহা নহে শিক্ষার শ্রেণীভেদ বর্তমান। পরস্পরের বিশ্বাস, সংস্কার, রুচি এবং চিন্তা করিবার প্রণালী ভিন্নরকমের হইয়া যায়। এবং ইংরেজি-শিক্ষিত ব্যক্তি আপনাদিগকেই শিক্ষিত ও শ্রেষ্ঠ এবং অপরসাধারণকে অশিক্ষিত এবং পশ্চাদ্‌বর্তী না মনে করিয়া থাকিতে পারে না।

জ্ঞানস্পৃহা ও রসবোধ, বুদ্ধি এবং কল্পনা, সাহস ও বাহুবল, অধ্যবসায় ও আত্মসম্মানে য়ুরোপীয় জাতির যে এক মহোচ্চ আদর্শ ইংরেজি শিক্ষা আমাদের মনে জাজ্বল্যমান করিয়া তুলিতেছে তাহার যদি কোনো আকর্ষণ না থাকিবে তবে আমাদের শিক্ষাকে ধিক্‌!

সেই আকর্ষণ আমাদিগকে অনেক সময় ছদ্মবেশ এবং আত্মপ্রতারণায় লইয়া যায়। কেবল ইংরেজি শিখিয়াই আমরা যেন ইংরেজের মহত্ত্বকে কতকটা আপনার বলিয়া মনে করি। এবং যাহারা ইংরেজি শেখে নাই তাহাদিগকে কতকটা বাহিরের লোকের মতো করিয়া দেখি। ইংরেজের মহত্ত্ব যে ঐতিহাসিক, তাহা যে বংশপরম্পরাগত, কর্মগত, চরিত্রগত,—ইংরেজের ভাষা, সাহিত্য, বিজ্ঞান যে সেই ইতিহাস সেই চরিত্র হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, তাহা যে শুদ্ধমাত্র স্কুলে অধ্যয়ন এবং পরীক্ষা পাস হইতে নহে ইহা আমরা চোখ বুজিয়া ভুলিতে ইচ্ছা করি। এবং ইংরেজের স্কুলে পড়িয়াছি বলিয়াই আমরা নিজেকে ইংরেজশ্রেণীয় জ্ঞান করি।

এইরূপ ইংরেজের টানে দেশ হইতে পৃথক হইয়া যাইবার যে ভাব আমাদের মধ্যে দেখা যাইতেছে তাহা কোনো এক পক্ষের মধ্যে বদ্ধ নহে; তাহা নানা আকারে নানা দিক হইতে প্রকাশ পায়। মুখুজ্যেমশায় এবং বাঁড়ুজ্যেমশায় কেহই তাহা হইতে পরিত্রাণ পান নাই।

আজকাল জমিদারবর্গ ইংরেজের মুখ না তাকাইয়া উপাধির দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া দেশহিতকর কোনো কাজে প্রবৃত্ত হইতে চান না—দেশের লোকের স্তুতিনিন্দা তাঁহাদের কাছে এতই ক্ষুদ্র হইয়া গেছে।

তেমনি আমাদের দেশে যাঁহারা জননায়ক বলিয়া সর্বদা সভামঞ্চের উপরে আরোহণ করেন তাঁহাদেরও ভাবগতিক দেখিয়া আমাদের মনে আশ্বাস হয় না। বরঞ্চ আমাদের জমিদারদিগকে দেখিতে শুনিতে ঠিক আমাদের দেশের লোকের মতো, কিন্তু আমাদের জননায়কদের অনেকেই যে-দেশের মুরুব্বি বলিয়া আপনাদিগকে প্রচার করেন সে-দেশকে আচারে ব্যবহারে জীবনযাত্রায় অহরহ অপমানিত করেন। ইংরেজরাহুকর্তৃক জমিদারদের যদি অর্ধগ্রাস হইয়া থাকে ইঁহাদের একেবারে পূর্ণগ্রাস।

জমিদারগণ দেশের জন্য যাহা করেন তাহা গবর্মেন্টের মুখ তাকাইয়া, ইঁহারা যাহা করেন তাহাও ইংরেজের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া। তাহার ভাষা ইংরেজি, তাহার প্রণালী

ইংরেজি, তাহার প্রচার ইংরেজিতে। ইংরেজ-দৃষ্টির প্রবল আকর্ষণ হইতে ইহারা আপনাদিগকে প্রাণ ধরিয়া বিচ্ছিন্ন করিতে পারেন না।

এই স্থলে আমাদের কোনো বন্ধুর লেখা হইতে নিম্নলিখিত সংবাদটি আমরা উদ্ধৃত করি।

> "স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের স্বদেশপ্রীতির বিষয় অনেকেই অবগত আছেন। দুই-তিন বার কনগ্রেস হইবার পর একজন ভদ্রলোক তাঁহাকে কনগ্রেস সম্বন্ধে অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলেন, 'ভারতবর্ষ একটা মহাদেশ; এই মহাদেশের অন্তর্গত প্রত্যেক বিভাগের নেতাগণের যত্নে যদি সমস্ত দেশ মিলিত হইতে পারে তাহা হইলে এক মহাজাতির অভ্যুত্থান কল্পনা করিতে পারি বটে, কিন্তু বর্তমান কনগ্রেসওআলাদিগের দ্বারা যে তাহা সংসাধিত হইবে না তাহা নিশ্চয় বলা যায়। ইহাদের উদ্যম-আলোচনা-আন্দোলনের ফলে চাই কি আমাদের অনেক অভাব-অবিচার দূর হইতে পারে কিন্তু রাজার নিকট সুবিচারপ্রাপ্তি কিংবা দুই-এক স্থলে রাজার সহিত সমান অধিকার প্রাপ্তিই যদি কনগ্রেসের লক্ষ্য হয় তাহা হইলে কনগ্রেসের উদ্দেশ্য যে অতি ক্ষুদ্র সংকীর্ণ ও অদূরদর্শী তাহা বলিতে বাধ্য হইব। কনগ্রেসওআলারা যদি সুসজ্জিত পট্টাবাসের পরিবর্তে হোগলার চালা, চেয়ারের পরিবর্তে কেবলমাত্র মাদুর, পেন্ট্‌লুনের পরিবর্তে ধুতি, এবং ইংরেজির পরিবর্তে ভারতবর্ষীয় ভাষার ব্যবহার করিতে সংকুচিত হয়েন তাহা হইলে বর্তমান কনগ্রেস দ্বারা দেশের কোনো স্থায়ী উপকার সম্ভবপর নহে।'"

মুখে মুখে কথা বিকৃত হয় এবং ভূদেববাবু ঠিক কী-কথাটা বলিয়াছিলেন তাহা জানি না। আমাদের মনে উদ্দেশ্য যাহাই থাক্, তাহা যতই সংকীর্ণ হউক কিন্তু অনুষ্ঠান যদি বৃহৎ হয় তবে উদ্দেশ্যও আপনি বাড়িয়া চলে। সূচির মুখে সুতা পরাইতেও যদি বাতি জ্বালি তবে সেই বাতিতে সমস্ত ঘর আলোকিত হইয়া উঠে। তেমনি যে-উদ্দেশ্যেই কনগ্রেস হউক তাহা স্বভাবতই আপন উদ্দেশ্যকে বহুদূরে ছাড়াইয়া গিয়া দেশের বৃহৎ মঙ্গলের অবতারণা করিবে ইহা আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস। কিন্তু জনসভা ও জনসভাপতিদের মধ্যে ভূদেববাবু যে-সকল দুর্লক্ষণ লক্ষ্য করিয়াছেন তাহাও আমাদের ভাবিবার কথা। আমরা মাছ ধরিতে চাই কিন্তু জলের সহিত সংস্রব রাখিতে চাই না,—আমরা দেশের হিত করিব কিন্তু দেশকে আমরা স্পর্শ করিব না!

দেশকে কেমন করিয়া স্পর্শ করিতে হয়? দেশের ভাষা বলিয়া, দেশের বস্ত্র পরিয়া। ইংরেজের প্রবল আদর্শ যদি মাতার ভাষা এবং ভ্রাতার বস্ত্র হইতে আমাদিগকে

দূরে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া যায় তবে জননায়কের পদ গ্রহণ করিতে যাওয়া নিতান্তই অসংগত।

কিন্তু, ভিন্নভাষী ভারতকে এক করিবার জন্য কনগ্রেসের ভাষা ইংরেজি হওয়া উচিত এমন তর্ক যাঁহারা এ-স্থলে উত্থাপন করিবেন তাঁহারা আমার কথা সম্পূর্ণ বুঝিতে পারেন নাই। যেখানে ইংরেজি বলা দরকার সেখানে অবশ্য ইংরেজি বলিবে,—কিন্তু তোমার ভাষাটা কী? তোমার লেখাপড়া ধ্যানধারণা মন্ত্রতন্ত্র সমস্তই ইংরেজিতে কি না? জনসভার বাহিরে দেশের সহিত তুমি কিরূপ সংস্রব রাখিয়া চল? ইংরেজি ভাষায় যেটুকু কর্তব্য তাহা যেন সাধন করিলে কিন্তু দেশী ভাষায় যে-কর্তব্যপুঞ্জ পড়িয়া আছে, যাহা কাগজে রিপোর্টের জন্য নহে, যাহা সমুদ্রপারে উদ্বেলিত হইবার জন্য নহে, যাহার ফলাফল যাহার ধ্বনিপ্রতিধ্বনি শুদ্ধমাত্র আমাদের দেশী মণ্ডলীর মধ্যে বদ্ধ তাহাতে হাত দিতে তোমার মন উঠে? গবর্মেন্টের সম্মান যাঁহাদের কর্তব্যবুদ্ধির আশ্রয়দণ্ড তাঁহাদিগকে তোমরা নিন্দা কর, কিন্তু ইংরেজ-করতালির এলাকার বাহিরে যাঁহাদের কর্তব্যবুদ্ধি পদনিক্ষেপ করে না তাঁহারাই কি প্রচুর সম্মানের অধিকারী!

কনগ্রেস যেমন সমস্ত ভারতবর্ষের মিলনসভা, কনফারেন্স তেমনি সমস্ত বাংলার। সেই সমগ্র বাংলার মিলনক্ষেত্রে বাঙালির কী অভাব বাঙালির কী কর্তব্য সেও যদি আমরা ইংরেজি ভাষায় বলিবার প্রলোভন সংবরণ করিতে না পারি তবে তাহা হইতে কী প্রমাণ হয়? এই প্রমাণ হয় যে, দেশকে যাঁহারা চালনা করিতে চাহেন তাঁহারা, হয় দেশী ভাষা জানেন না, নয় কর্তব্যের ক্ষতি করিয়াও ইংরেজি ভাষা ব্যবহার না করিলে তাঁহাদের অভিমান চরিতার্থ হয় না।

অতএব ভালো করিয়া দেখিলে দেখা যায় জমিদারের চরিত্রে যে-ঘুণ ঢুকিয়াছে আমাদের জননায়কদের চরিত্রেও সেই ঘুণ। ইংরেজের কৈশিকাকর্ষণ আমাদের দুই পক্ষেরই মস্তকের উপরে। ইংরেজকে বাদ দিলে আমাদের কর্তব্যে স্বাদ থাকে না, সম্মানে গৌরব থাকে না, বেশভূষায় মর্যাদা থাকে না; আমাদের দেশের লোকের খ্যাতি অপেক্ষা গবর্মেন্টের খেতাব, আমাদের দেশের লোকের আশীর্বাদ অপেক্ষা বিলাতি কাগজের রিপোর্ট আমাদের কাছে শ্রেয়।

ইংরেজের সহিত সমান অধিকার ভিক্ষা করিয়া লইবার জন্য ইংরেজি ভাষা আবশ্যক হইতে পারে কিন্তু স্বদেশকে উচ্চতর অধিকারের উপযোগী করিয়া তুলিবার জন্য দেশীয় ভাষা, দেশীয় সাহিত্য, দেশীয় সমাজের মধ্যে থাকিয়া সমাজের উন্নতিসাধন একমাত্র উপায়। যাঁহারা স্বদেশ অপেক্ষা আপনাকে অনেক ঊর্ধ্বে অধিষ্ঠিত বলিয়া জানেন,

যাঁহারা স্বদেশের সহিত এক পংক্তিতে বসিতে লজ্জাবোধ করেন তাঁহারাও স্বদেশকে অনুগ্রহ করিয়া থাকেন স্বীকার করি ; কিন্তু সেটুকু না করিয়া যদি তাঁহারা নিজের দেশকে নিজের উপযুক্ত জ্ঞান করেন এবং নিজেকে স্বদেশের উপযুক্ত করিয়া তুলিতে চেষ্টা করেন, তবে তাহাতে তাঁহাদেরও আত্মসম্মান থাকে এবং দেশকেও সম্মান করা হয়।

১৩০৫

আলট্রা-কনসার্ভেটিভ

মুখ গোপন করিয়া কেবল পুচ্ছটুকু বাহির করিলে পরিচয়ের সুবিধা হয় না। যে বাঙালি পায়োনিয়রে পত্র লিখিয়া কেবল "আলট্রা-কনসার্ভেটিভ" বলিয়া স্বাক্ষর করিয়াছেন কেমন করিয়া জানিব তিনি কে ?

জানিতে কৌতূহল হইতে পারে কারণ তিনি যে-সে লোক নহেন সবিনয়ে এমনতরো আভাস দিয়াছেন। তিনি না উকিল, না মোক্তার, না স্কুলমাস্টার।[১] অহো, তিনি এত মস্ত লোক! তাঁহাকে নিজের চেষ্টায় বড়ো হইতে হয় নাই ; নিজের চেষ্টায় উন্নতিলাভ করা তাঁহার পক্ষে অনাবশ্যক, এবং হয়তো অসম্ভব ; যে ইংরেজি চিঠিখানা কাগজে ছাপা হইয়াছে সেও হয়তো বা তাঁহার নিজের রচনা নহে, হয়তো তাঁহার সেক্রেটারি লিখিয়া দিয়াছে। সেইজন্য গবর্মেণ্ট-কালেজের ভূতপূর্ব ছাত্রদের প্রতি তাঁহার এত অবজ্ঞা এবং বর্তমান সুলভ শিক্ষাপ্রণালীর প্রতি তাঁহার এত বিদ্বেষ।

উকিল, স্কুলমাস্টার, এবং গবর্মেণ্ট কালেজের ভূতপূর্ব ছাত্রগণ শিক্ষিত সন্দেহ নাই, শিক্ষাই তাঁহাদের-প্রধান সম্মান এ-কথাও কবুল করিতে হয় ; অতএব আলট্রা

---

[১] "Have vakils, attorneys, pleaders, mukhtars, and schoolmasters a greater stake in the country than the zamindars ?"

[২] "The self-elected delegates who make up that body (Congress) are lawyers, to whom notoriety means more fees, disappointed office-seekers, and ex-students from Government colleges, whose vanity is gratified by the honour—whatever may be its value—of being a Congress delegate. Their number is, I fear, likely to increase under the present system of practically free education."

বলিতেছেন, ধিক তাঁহাদিগকে। অতএব আলট্রা-কনসার্ভেটিভগণই দেশের স্বাভাবিক অধিনেতা,—কারণ, শিক্ষা বল, বুদ্ধি বল, অভিজ্ঞতা বল, আত্মনির্ভরই বল, কিছুতেই তাঁহাদের লেশমাত্র প্রয়োজন নাই—দেশেতে তাঁহাদের "স্টেক" গাড়া আছে।

তবে আমাদের এই আলট্রার এত সংকোচ কিসের? যদি ইনি উকিল না হন, যদি ইনি স্কুলমাস্টার অথবা স্কুলমাস্টারের দ্বারা উপকারপ্রাপ্ত কেহও না হন তবে কোন্ লজ্জার অনুরোধে আপনার এতবড়ো নিষ্কলঙ্ক নামটা গোপন করিলেন? যদি তিনি জাত-সিংহই হন তবে শিকারের পূর্বে একবার গর্জনসহকারে নিজের নামটা ঘোষণা করিয়া দিলেন না কেন—দেশের শিক্ষিতসম্প্রদায় কালেজের কক্ষ হইতে আদালতের প্রাঙ্গণে, ম্যুনিসিপাল সভা হইতে কনগ্রেসের পাণ্ডালে পর্যন্ত কম্পান্বিত হইতে থাকিত।

যদি অবাধে নামটা প্রকাশ করিতে পারিতেন তবে দেশের সমস্ত গণিতশাস্ত্রবিৎ উকিল, স্কুলমাস্টার ও গবর্মেন্ট-কালেজের ভূতপূর্ব ছাত্রগণ খড়ি পাতিয়া আঁক পাড়িয়া একবার গণনা করিতে বসিত তাঁহার "নোবিলিটি" কতদিনকার, একবার মাপিয়া দেখিত হতভাগ্য দেশের বক্ষঃস্থলে তাঁহার "স্টেক" কতদূর পর্যন্ত প্রবেশ করিয়াছে।

হায় বঙ্গদেশ, তোমার উচ্চতাবিহীন সমতল ভূমিতে "নোবিলিটি", প্রাচীন আভিজাত্য টিকিতে পারে না। তোমার নানাস্রোতঃসংকুল পলিমাটিতে আজ যেখানে স্থল কাল সেখানে জল, আজ যেখানে গ্রাম কাল সেখানে নদী, আজ যিনি উকিল কাল তিনি জমিদার, বাপ যাহার জমিদার পুত্র তাহার স্কুলমাস্টারমাত্র, অদ্য যে "প্রেজেন্ট সিস্টেম অফ প্র্যাকটিক্যালি ফ্রী এডুকেশন"কে অবজ্ঞা করে তাহারই পৌত্র বি. এ পাস পূর্বক বিবাহের হাটে উচ্চ দরে বিকাইয়া যায়।

বৌদ্ধ সাধু মশাটিকে মারিতেও কুণ্ঠিত হন পাছে সেই মশা তাঁহার কোনো পূজনীয় পূর্বপুরুষের নূতন সংস্করণ হয়, পাছে হয়তো সেই বংশে অদূরভবিষ্যতে তিনিও জন্মলাভ করেন। আমাদের দেশেও যাঁহারা প্রভাতে জাগিয়া অকস্মাৎ আপনাদিগকে অ্যারিস্ট-ক্র্যাট বলিয়া জ্ঞান করেন তাঁহারা উকিল-মোক্তার-ইস্কুলমাস্টারের প্রতি চপেটাঘাত উদ্যত করিবার পূর্বে যদি একবার চিন্তা করিয়া দেখেন যে, হয়তো তাঁহাদের অনতিদূরবর্তী পূজনীয় পূর্বপুরুষ উকিল, মোক্তার অথবা তদনুরূপ কেহ ছিলেন অথবা অনতিদূরবর্তী ভবিষ্যতে তাঁহাদেরই "আত্মা বৈ" উকিল-মোক্তার হইয়া জন্মগ্রহণ করিবে তাহা হইলে তাঁহারা এই সকল শিক্ষিত ও সুযোগ্য সম্প্রদায়ের প্রতি যথোচিত অত্রোচিত বিনয়ের সহিত ব্যবহার করিতে পারেন।

কিন্তু আমাদের আলট্রা-কনসার্ভেটিভ মহাশয়েরা অত্যন্ত সুখী। তাঁহাদের গায়ে

কথা সহে না। সম্প্রতি আমাদের শিক্ষিতমণ্ডলী তাঁহাদের সম্প্রদায়কে নিন্দা করিয়াছিল। অন্যায় করিয়াছিল কি ন্যায় করিয়াছিল তাহা তর্কের বিষয়। কিন্তু আমাদের আলট্রা-কনসার্ভেটিভ মহাশয় যুদ্ধক্ষেত্র হইতে সরিয়া দুই চক্ষু মুছিতে মুছিতে সাহেবের নিকট সোহাগ লইতে গিয়াছেন। দুই বাহু মেলিয়া পায়োনিয়রের কোলের উপরে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া বলিতেছেন, "দেশের আর-সকলে উকিল অ্যাটর্নি ইস্কুলমাস্টার এবং কালেজের ছাত্র, তাহারা শিক্ষিত, দেশের উপরে তাহাদের কোনো অধিকার নাই—বিশাল ভারতবর্ষে কেবলমাত্র আমাদেরই কয়েকজনের খোঁটা গাড়া আছে, "We the ultra-conservatives" আমরা জমিদার, আমরা নোবিলিটি; কিন্তু সাহেব উহারা কেন আমাদিগকে খারাপ কথা বলে।" আহা কী আদর! পায়োনিয়রের কোল হইতে ইংলিশম্যানের কোলে কত সান্ত্বনা! একদিকে সোনার-গোট-পরা হৃষ্টপুষ্ট তৈলচিক্কণ আলট্রা-কনসারভেটিভ প্রৌঢ় শিশুটি, অন্যদিকে কালো-কোর্তা-পরা শুভ্রহাস্যকুটিলমুখ রক্তবর্ণ ইংরেজ সম্পাদক,—অশ্রুপরিষিক্ত বাৎসল্যের কী অপরূপ দৃশ্য। কি সুপবিত্র স্নেহসম্মিলন।

আমাদের আলট্রা-কনসার্ভেটিভ কলিকাতা মুনিসিপ্যালিটিতে তাঁহাদের স্বদেশীয়ের কর্তৃত্ব দেখিয়া পায়োনিয়রের বক্ষদেশে মুখ গোপন করিয়া কাতরতা প্রকাশ করিয়াছেন। বলিয়াছেন, "সাহেব এও কি হয়! তোমরা কি কেহ নও! কলিকাতা মুনিসিপ্যালিটি কেবল দিশি লোকের আড্ডা হইয়া উঠিল। আমরা যে-সম্প্রদায়ের লোক আমরা কি ইহা সহ্য করিতে পারি?" [১] তাঁহাকে এ-কথা কেহ জিজ্ঞাসা করে নাই, তোমরা যে দশশালা বন্দোবস্তে দেশের কর্তা হইয়া উঠিয়াছ তাহাই বা চিরদিন থাকে কেন? ইংরেজ যে রক্তপাত দ্বারা দেশ জয় করিয়াছে এবং দেশ রক্ষা করিতেছে তাহা কি কেবল তোমাদের মতো অলস বিলাসীদের মুখে নিরাপদে অন্ন তুলিয়া দিবার জন্য? ইংরেজ সিভিলিয়ানদিগকে পেনশন না দিয়া কেন এক-এক টুকরা জমিদারি দেওয়া হয় না? জীবনের অধিকাংশ কাল যাহারা ভারতবর্ষে রাজত্ব করিয়া গেলেন তাঁহারা কি বৃদ্ধবয়সে ইংলণ্ডের কোনো এক অখ্যাত বাসাবাড়িতে মরিতে যাইবেন? তাঁহারই মুখ হইতে ভাষা লইয়া এ-কথা কি কেহ বলিতে পারে না যে, I do not think that any one will venture to seriously deny that the Permanent Settlement has proved a failure in this country? আমাদের আলট্রা-কনসার্ভেটিভ যেরূপভাবে দেশের মধ্যে খোঁটা গাড়িয়া তাঁহাদের জমিদারি শাসন করেন একজন ইংরেজ প্রভু কি তাহা অপেক্ষা ভালো শাসন করিতে পারে না? তাহার দ্বারা কি স্থানীয় স্বাস্থ্য, শস্য, শিক্ষা ও শিল্প বর্তমান বন্দোবস্তের চেয়ে অনেক বেশি উন্নতি লাভ করিতে পারে না?

[১] "Under the present system the municipality exists for the Native Commissioners, their friends and canvassers."

এ-প্রশ্নের উত্তরে আমাদের আলট্রা-কনসার্ভেটিভ পায়োনিয়রের বক্ষস্থলে হেলিয়া দুলিয়া বাঁকিয়া চুরিয়া বলিবেন, পারে, অবশ্য পারে, তোমরা সাহেব, তোমাদের সঙ্গে আমাদের তুলনা কিসের ? কিন্তু যে-অধিকার দিয়াছ সে কি ফিরাইয়া লইবে ?

হায় আলট্রা-কনসার্ভেটিভ, তুমি মস্তলোক এবং আমাদের উকিল-ইস্কুলমাস্টারগণ তোমার সহিত তুলনীয় নহেন কিন্তু আমাদের সকলেরই অধিকার অতি সামান্য, এবং ইংরেজের কথার উপরেই তাহার একমাত্র নির্ভর। তোমারও কোনো জোর নাই, উকিল মোক্তারদেরও কোনো জোর নাই। যদি একটা অধিকার, একটা উন্নত আশ্বাসের কারণ আমাদিগকে দান করিয়া আবার তাহা ইংরেজ কাড়িয়া লন তবে তোমরা "নোবিলিটি" বর্গই বা কী করিবে আর যাহারা স্ববুদ্ধিজীবী তাঁহারাই বা কী করিবেন ?

হে আলট্রা-কনসার্ভেটিভ, কংগ্রেসের শূন্য বাগ্মিতার প্রতি তুমি অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়াছ এবং একটা পাকা কথা বলিয়াছ যে, কঠিন কার্যের দ্বারাই দেশের উন্নতি। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, আগামী শাসনকর্তা কার্জন সাহেব আসিয়া যদি তোমাদের দশশালা বন্দোবস্তটি কাড়িয়া অন্য দশজনের মধ্যে বাঁটোয়ারা করিয়া দেন তবে তোমরাই বা কী কঠিন কার্যটায় প্রবৃত্ত হও ? তোমরা কি তোমাদের লাঠিয়ালগুলিকে দাঁড় করাইয়া লড়াই কর, না, কনগ্রেসেরই মত বাগ্মিতা অবলম্বন কর ?

কনগ্রেস ইংরেজ কর্তৃপক্ষের নিকট যাহা চায় তাহা কেবলমাত্র বাগ্মিতার দ্বারা চায়, কঠিন কার্যের দ্বারা চায় না,—আমাদের আলট্রা-কনসার্ভেটিভ মহাশয়েরা কি তাহার বিপরীত কোনো দৃষ্টান্ত দেখাইতে ইচ্ছুক আছেন ?

আমাদের আলট্রা-কনসার্ভেটিভ যদিচ মহোচ্চ জমিদার-সম্প্রদায়ভুক্ত তথাপি তাঁহার সংসারজ্ঞান যে একেবারেই নাই তাহা বলিতে পারি না। তাঁহার একটা কথায় অত্যন্ত চতুরতা প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন, কনগ্রেস যে প্রচুর রাজভক্তি প্রকাশ করে, গোড়াতেই মহারানীর জয়কীর্তন করিয়া কার্য আরম্ভ করে ইহার অপেক্ষা চালাকি তাহার পক্ষে আর-কিছুই হইতে পারে না।

বাস্তবিক চোরের কাছে চোর ধরা পড়ে। আমাদের দেশে একটা প্রবাদ আছে, "অতিভক্তি চোরের লক্ষণ।" সেই অতিভক্তি কনগ্রেসই প্রকাশ করুন আর আমাদের আলট্রা-কনসার্ভেটিভ-সম্প্রদায়েরাই করুন ইহার প্রধান উদ্দেশ্য চুরি। যাঁহারা ডফারিন-ফণ্ডে টাকা দেন, ভূতপূর্ব সাহেব-কর্মচারীদের অভূতপূর্ব পাষাণপ্রতিমা প্রতিষ্ঠা দ্বারা দেশকে ভারাতুর করিয়া তোলেন, পায়োনিয়রকে গোপনে জিজ্ঞাসা করো দেখি তাঁহাদের অতিভক্তির মূল্য কি সাহেবেরা বোঝে না ? ইহার মধ্যে ফাঁকি দিয়া কিছু কি আদায়ের চেষ্টা নাই ? আলট্রাগণ না হয় নিজের জন্য উপাধি সন্ধান করেন, কনগ্রেস না হয় দেশের

জন্য একটা কিছু সুযোগের চেষ্টায় থাকেন, পরন্তু ভক্তি-জিনিসটাকে ব্যবহারে লাগানো হইয়া থাকে। এ ভক্তিকে ঠিক বলা যায় না

The desire of the moth for the star,
Of the night for the morrow,
The devotion to something afar
From the sphere of our sorrow!

তবু অতিভক্তিতে তোমাদের কাছে কনগ্রেসকে হার মানিতে হইবে। একবার ভাবিয়া দেখো তুমি যে রাজভক্তির প্রচুর তৈল লেপনে পায়োনিয়র পত্রটাকে সিক্ত করিয়া তুলিয়াছ তাহার মধ্যে কত অভিসন্ধিই আছে। ওই যে মুগ্ধচক্ষু সাহেবের মুখের উপর স্থাপন করিয়া অশ্রুগদ্‌গদ কণ্ঠে বলিতেছ, সাহেব তোমারই জন্য দেশের লোকের কাছে গাল খাইলাম—(অতএব কিছু আশা রাখি!) ঘর কৈছু বাহির বাহির কৈছু ঘর, পর কৈছু আপন আপন কৈছু পর। (অতএব কিঞ্চিৎ সুবিধা চাই।) নাথ, তুমি বল কনগ্রেস মন্দ আমিও বলি তাই; (অতএব দেশের লোকের মাথার উপরে আমাকে চড়াইয়া দাও।) বঁধু, তুমি ম্যুনিসিপালিটি হইতে দিশি জঞ্জাল বিদায় করিয়া বিলাতির আমদানি করিতে চাও সেই হচ্ছে "জেনারেল সেন্টিমেণ্ট অফ দি ক্লাস টু হ্বিচ আই হ্যাভ দি অনার টু বিলঙ্গ" (অতএব তোমার পাদপীঠপার্শে আমাদিগকে স্থান দিয়ো!) ভারতবর্ষের মন্ত্রসভাই বল আর পৌরসভাই বল সমস্ত আগাগোড়া নূতন নিয়মে পরিবর্তন করা আবশ্যক (অর্থাৎ সকল সভাতেই তুমি বসো সিংহাসন জুড়িয়া, আর আমি বসি তোমার কোলে।) ইতি তোমার আদরের অতিভক্ত আলট্রা-কনসার্ভেটিভ।

এমন শুভদিন কখনোই আসিবে না কিন্তু যদি দৈবাৎ আসে, যদি কোনো কারণে সাহেবের প্রসাদ হইতে বঞ্চিত হইয়া কনগ্রেসের নিকট হইতেই সম্মান, সৌভাগ্য ও সহায়তার প্রত্যাশা জন্মে তবে অতিভক্তির প্রবল স্রোত কি কনগ্রেসের দিকেই ফিরিয়া আসে না? তখনও কি রাজা-রায়বাহাদুরগণ সাহেবের ডালি জোগান এবং পায়োনিয়রে পত্র লেখেন?

সাংসারিক ভক্তির এই নিয়ম। তাহা নিঃস্বার্থ নহে। যেখানে পাওনার সম্পর্ক নাই সেখানে আলট্রা-কনসার্ভেটিভেরও যদ্রূপ মনের ভাব গবর্মেন্ট-কালেজের ভূতপূর্ব ছাত্রেরও তদ্রূপ। মনুষ্যচরিত্রের মধ্যে বৈষম্য এতই যৎসামান্য।

উভয় পক্ষের মধ্যে কেবল একটা গুরুতর প্রভেদ আছে। ভূতপূর্ব ছাত্র দেশের হিতোদ্দেশে "হার্ড ওআর্কে" যদি বা অপটু হন অন্তত তাঁহার "এম্পটি এলোকোয়েন্স"ও আছে কিন্তু আমাদের আলট্রা-কনসার্ভেটিভটি যে-সম্প্রদায়ের মুখোজ্জ্বল করেন তাঁহারা

বাগ্মিতার জন্যও বিখ্যাত নহেন "কঠিন কর্ম"ও তাঁহাদের কর্ম নহে। তাঁহারা শিক্ষাকেও অবহেলা করেন এবং সামর্থ্য হইতেও বঞ্চিত। তাঁহাদের ধন আছে; দেশের হিতোদ্দেশে সে-ধন যদি ব্যয় করিতে পারিতেন তবে বাক্যবীর ও কর্মবীর সকলের উপরে উঠিতে পারিতেন,—কারণ, কবি বলিয়াছেন,

শতেষু জায়তে বক্তা, সহস্রেষু চ পণ্ডিতঃ,
শূরো দশসহস্রেষু, দাতা ভবতি বা ন বা।

কিন্তু সম্প্রতি দানে যিনি আমাদের দেশে আদর্শ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন, তিনি অধ্যাপক ছিলেন, দেশে তাঁহার কোনো স্টেক ছিল না এবং তাঁহারই উদার বদান্যতায় "প্রেজেন্ট সিস্টেম অফ প্র্যাকটিক্যালি ফ্রী এডুকেশন" এই দীনহীন দেশে বদ্ধমূল হইতে পারিয়াছে।

১৩০৫

বিরোধমূলক আদর্শ

ওগূস্ৎ ব্রেয়াল কনটেম্পোরারি রিভিয়ু পত্রে আক্ষেপ করিয়াছেন যে, ফরাসি ইংরেজকে জানে না, ইংরেজ ফরাসিকে বোঝে না।

ফরাসিকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, ইংরেজের প্রতি তোমার এত বিদ্বেষ কেন—উত্তর পাওয়া যাইবে, ইংরেজ মানুষটাকে আমার খারাপ লাগে না, কিন্তু ইংরেজ জাতটার উপর আমার ঘৃণা।

য়ুরোপের বিদ্যালয়ে যে-ইতিহাস শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহাতে অন্য দেশের প্রতি বিরোধ প্রকাশ করিয়া নিজেদের দেশের গৌরব ঘোষণা করা হয়। প্যাট্রিয়টিক ভাবের প্রতি লক্ষ্য করিয়া ছেলেদিগকে, অন্য দেশের সহিত স্বদেশের সাবেক কালের ঝগড়ার কথা স্মরণ করাইয়া, ভবিষ্যৎ পর্যন্ত সেই বিরোধ টানিয়া রাখা হয়। কর্সিকা-দেশের মাতৃগণ, অন্য পরিবারের সহিত স্বপরিবারের কুলক্রমাগত যে বিদ্বেষ চলিয়া আসিতেছে এবং তাহাদের প্রতি যে প্রতিহিংসা করিবার আছে, শিশুকাল হইতে সন্তানের কানে তাহা জপ করিতে থাকে,—য়ুরোপীয় বিদ্যালয়ে ইতিহাস পড়ানোও ঠিক সেইরূপ।

আজকাল ইংলণ্ডে খুব একটা লড়াইয়ের নেশা চাপিয়াছে। সৈনিকদলে ভিড়িবার জন্য ডাক পড়িয়াছে। এই ডাক অন্য সকল বাণীকে আচ্ছন্ন করিয়া ধ্বনিত হইতেছে

ফ্রান্সও যে এ-বিষয়ে নিরপরাধ, তাহা নহে। এখন দুই পক্ষের পালোয়ান সাহিত্যে পরস্পরকে শাসাইতেছে। ব্রিটিশ চ্যানেলের দুই পারে একদল খবরের কাগজ সৈনিকতার রাস্তা দিয়া বর্বরতায় পৌঁছিবার জন্ম ঝুঁকিয়া দাঁড়াইয়াছে। লেখক আক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন—ব্যক্তিগত ধর্মনীতি হইতে ন্যাশনাল ধর্মনীতির আদর্শের যে পার্থক্য ঘটিয়াছে, শেষে তাহার কি এইরূপ সমন্বয় হইবে? য়ুরোপ কি ইচ্ছা করিয়া বিধিমতে বর্বরতায় ফিরিয়া যাইবে?

আজকাল দুই পয়সা দিলেই খবরের কাগজে পড়িতে পাওয়া যায় যে, ধাতুগত বিরোধের ভাব, অনিবার্য পার্থক্য এবং জাতিগত বিদ্বেষে পরস্পরের বংশানুক্রমিক শত্রুজাতির সহিত, আজ হউক বা কাল হউক, একটা সংঘর্ষ হইবেই। তাহাদের মতে মানুষের প্রবলতম প্রবৃত্তি এবং ন্যায়ধর্মের উচ্চতম নীতিসকল দুই জাতিকে দুই বিপরীত দিকে ঠেলিয়া লইয়া গেছে। তাহারা বলে, নেশনদের মধ্যে শান্তিস্থাপনের আশা বাতুলের খেয়ালমাত্র। ইত্যাদি।

এই সকল বিরোধ-বিদ্বেষের বাক্য লক্ষ লক্ষ খণ্ড ছাপা হইয়া দেশে বিদেশে বিতরিত হইতেছে। এই প্রাত্যহিক বিষের মাত্রা নিয়মমতো পান করিয়া দেশের ক্ষতি হইতেছে সন্দেহ নাই।

প্যাট্রিয়টিজম, ধর্মনীতি, বিজ্ঞান প্রভৃতি কতকগুলি বাঁধিবোল আছে, যাহা লোকে মুখে উচ্চারণ করে, এবং সে-সম্বন্ধে আর চিন্তা করিবার প্রয়োজন বোধ করে না। সে-বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করিতে গেলেই হাতাহাতি বাধিয়া যায়। বাঁধিবোল মুখে মুখে চলিয়া যায়—লোকে নিঃসংশয়ে জীবনযাপন করে। প্যাট্রিয়টিক খুনাখুনি অথবা যোদ্ধৃধর্ম, এইরূপের একটা বাঁধিবোল।

য়ুরোপীয় লেখক যে-কথা বলিতেছেন, তাহার উপরে আমরা আর কী বলিব? তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে বোঝাপড়া নাই বলিয়া লেখক অনেক দুঃখ করিয়াছেন—আর ইংরেজে ভারতবর্ষীয়ের মধ্যে যে বোঝাপড়ার অভাব দাঁড়াইয়াছে, সেজন্য আমাদের কী দুর্গতি ঘটিতেছে, তাহা প্রত্যহই প্রত্যক্ষ হইতেছে। প্রাচ্যজাতীয়ের প্রতি, ভারতবর্ষীয়ের প্রতি অবজ্ঞা ইংরেজি সাহিত্যের হাড়ে হাড়ে প্রবেশ করিয়াছে। ইংরেজ বালকদিগকে ইংরেজ-বীরত্বের দৃষ্টান্তে উৎসাহিত করিবার জন্য যে-সকল ছেলেভুলানো গল্প ঝুড়ি ঝুড়ি বাহির হইতেছে তাহাতে ম্যুটিনি-গল্পের উপলক্ষ্য করিয়া ভারতবর্ষীয়দিগকে রক্তপিপাসু পশুর মতো আঁকিয়া দেবচরিত্র ইংরেজের সহিত তাহাদের পার্থক্য প্রমাণ করিতেছে। ফরাসিকে ইংরেজের ঠিক বুঝিবার উপায় আছে—পরস্পরের আচার, ব্যবহার, ধর্ম, বর্ণ, একই প্রকার,—কিন্তু আমাদের

মধ্যে যথার্থই পার্থক্য বিদ্যমান। সেই পার্থক্য অতিক্রম করিয়া, এমন কি, সেই পার্থক্যবশতই পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা আকর্ষণ কবে ঘটিবে, তাহা বিধাতা জানেন। কিন্তু ইতিমধ্যে অত্যুক্তি ও মিথ্যার দ্বারা অন্ধতা, অবিচার ও নিষ্ঠুরতা সৃষ্টি করিতেছে।

বস্তুত এই অন্ধতা নেশনতন্ত্রেরই মূলগত ব্যাধি। মিথ্যা দ্বারাই হউক, ভ্রমের দ্বারাই হউক, নিজেদের কাছে নিজেকে বড়ো করিয়া প্রমাণ করিতেই হইবে এবং সেই উপলক্ষ্যে অন্য নেশনকে ক্ষুদ্র করিতে হইবে, ইহা নেশনের ধর্ম, ইহা প্যাট্রিয়টিজমের প্রধান অবলম্বন। গায়ের জোর, ঠেলাঠেলি, অন্যায় ও সর্বপ্রকার মিথ্যাচারের হাত হইতে নেশন-তন্ত্রকে উপরে তুলিতে পারে, এমন সভ্যতার নিদর্শন তো আমরা এখনও য়ুরোপে দেখিতে পাই না।

পরস্পরকে যথার্থরূপ জানাশুনা কেমন করিয়া সম্ভব হইবে? নেশনের মেরুদণ্ডই যে স্বার্থ। স্বার্থের বিরোধ অবশ্যম্ভাবী, এবং স্বার্থের সংঘাতে মানুষকে অন্ধ করিবেই। ইংরেজ যদি সুদূর এশিয়ায় কোনোপ্রকার সুযোগ ঘটাইতে পারে, ফ্রান্স তখনই সচকিত হইয়া ভাবিতে থাকিবে, ইংরেজের বলবৃদ্ধি হইতেছে। প্রত্যক্ষ সংঘাত না হইলেও, পরস্পরের সমৃদ্ধিতেও পরস্পরের চিত্তকে বিষাক্ত করে। এক নেশনের প্রবলত্ব অন্য নেশনের পক্ষে সর্বদাই আশঙ্কাজনক। এ-স্থলে বিরোধ, বিদ্বেষ, অন্ধতা, মিথ্যাপবাদ, সত্যগোপন, এ-সমস্ত না ঘটিয়া থাকিতে পারে না।

সমাজের পক্ষে উদারতা সহজ। হিন্দুরা বলে, স্ব স্ব ধর্ম পালন করাই পুণ্য। অবস্থাভেদে আচারব্যবহারের পার্থক্য ঘটিতেই পারে এবং সে-পার্থক্য পরস্পরের পক্ষে মঙ্গলেরই কারণ, এ-কথা শান্তচিত্তে নির্মলজ্ঞানে অনুধাবন করিয়া দেখা যায় এবং ভিন্ন সমাজের প্রতি শ্রদ্ধাসম্মান সম্পূর্ণ রক্ষা করিয়াও স্বসমাজের কর্তব্যপালন করা কঠিন হয় না। সামাজিক উন্নতিতে মানুষের চারিত্রগত উন্নতি হয়—সে উন্নতিতে কাহারও সহিত স্বার্থের বিরোধ ঘটে না। সর্বপ্রকার বিদ্বেষ, অসত্য, হিংসা সেই উন্নতির প্রতিকূল। সদ্‌ভাব ও সত্যই সমাজের মূল আশ্রয়। নেশন অনেক সময় ধর্মকে উপেক্ষা ও উপহাস করা আবশ্যক বলিয়া জ্ঞান করে, বাহুবলকে ন্যায়ধর্মের অপেক্ষা বড়ো বলিয়া স্পষ্টতই ঘোষণা করে—সমাজ কদাপি তাহা করিতে পারে না; কারণ ধর্মই তাহার একমাত্র অবলম্বন, স্বার্থকে সর্বদা সংযত করাই তাহার আত্মরক্ষার একমাত্র উপায়।

আমরা যদি বাঁধিবোলে না ভুলি, যদি 'প্যাট্রিয়টি'কেই সর্বোচ্চ বলিয়া না মনে করি, যদি সত্যকে, ন্যায়কে, ধর্মকে, ন্যাশনালত্বের অপেক্ষাও বড়ো বলিয়া জানি, তবে আমাদের ভাবিবার বিষয় বিস্তর আছে। আমরা নিকৃষ্ট আদর্শের আকর্ষণে কপটতা, প্রবঞ্চনা ও

অসত্যের পথে পা বাড়াইয়াছি কি না, তাহা চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে। এবং ধর্মের দিকে না তাকাইলেও সুবুদ্ধির হিসাব হইতে এ-কথা পর্যালোচনা করিতে হইবে যে, ন্যাশনাল স্বার্থের আদর্শকে খাড়া করিলেই বিরোধের আদর্শকে খাড়া করা হয়—সেই আদর্শ লইয়া আমরা কি কোনো কালে য়ুরোপের মহাকায় স্বার্থদানবের সহিত লড়াই করিয়া উঠিতে পারিব ?

আমরা লড়াই করিতে পারি জ্ঞানে, ধর্মে। সেখানে আমাদের পৈতৃক মূলধন আছে। সেখানে কেহ আমাদিগকে ঠেকাইবে না—সেখানে পিতৃলোক এবং দেবতা আমাদের সহায় হইবেন এবং বাঁধিবোলে যদি না ভুলি, তবে ইহা জানা উচিত যে, সেখানে যে-মহত্বের উপাদান আছে, তাহা সকল মহত্বের উচ্চে।

কিন্তু এরূপ উপদেশ শুনা যায় যে, প্রকৃতির নিয়ম বিরোধ, অতএব বিরোধের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। বাহির যদি আমার বিরুদ্ধ হয়, তবে আমিও তাহার বিরুদ্ধ না হইলে বাঁচিতে পারিব না। এইজন্য শিশুকাল হইতে ভিন্নজাতির সহিত বিরোধভাবের একান্ত চর্চাই 'প্যাট্রিয়টি'র সাধনা। হিন্দুজাতি সেই পোলিটিকাল বিরোধভাবের চর্চাকেই সকল সাধনার অপেক্ষা প্রাধান্য দেয় নাই বলিয়াই নষ্ট হইয়াছে।

পূর্বোক্ত কথাটি যদি একান্তই স্বীকার করিতে হয়, তবে সেই সঙ্গে এ-কথাও বলিব আত্মরক্ষাই মানুষের অথবা লোকসম্প্রদায়ের সর্বোচ্চ ধর্ম নহে। ধর্মে যদি নাশ করে, তবে তাহাতেই মাথা পাতিয়া দিতে হইবে।

ন্যাশনালধর্মেও সকল সময়ে রক্ষা করে না। ক্ষুদ্র বোয়ারজাতি যে লড়িতে লড়িতে নিঃশেষ হইবার দিকে চলিয়াছে—কিসের জন্য ? তাহাদের হৃদয়ে ন্যাশনালধর্মের আদর্শ অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছে বলিয়াই। সে-ধর্মে তাহাদিগকে রক্ষা করিল কই ?

তা ছাড়া বিনাশের চেহারা অনেক সময় ছদ্মবেশী। অনেক সময় পরিপূর্ণ সম্পদ তাহার মুখোশের মতো। কথিত আছে, ক্ষয়কাশে রোগীর কপোলে রক্তিম-লাবণ্য ফুটিয়া উঠে। সম্প্রতি উত্তরোত্তর ব্যাপ্যমান মিলিটারিত্বের রক্তিমায় য়ুরোপের গণ্ডস্থল যে টকটকে হইয়া উঠিতেছে, সে কি স্বাস্থ্যের লক্ষণ ? তাহার ন্যাশনালত্বের ব্যাধি, অতিমেদস্ফীতির ন্যায় তাহার হৃদয়কে, তাহার মর্মস্থানকে, তাহার ধর্মনীতিকে আক্রমণ করিতেছে, ইহা কি আমরা প্রত্যহ দেখিতে পাইতেছি না ?

অধর্মেণৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রাণি পশ্যতি।
ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি।

অধর্মের দ্বারা আপাতত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, কুশল লাভ করে, শত্রুদিগকে জয় করিয়াও থাকে—কিন্তু সমূলে বিনষ্ট হইয়া যায়।

প্রকৃতির নিয়মের প্রতি প্রকৃতিতত্ত্ববিদ য়ুরোপের যেরূপ অটল বিশ্বাস, ধর্মের প্রতি ধর্মতত্ত্ববিদ হিন্দু সেইরূপ একান্ত বিশ্বাস প্রকাশ করিয়া পূর্বোক্ত শ্লোক উচ্চারণ করিয়াছেন। কেবলমাত্র প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যভিচারেই যে ধ্রুব মৃত্যু তাহা নহে, ধর্মনিয়মের ব্যভিচারেও ধ্রুব বিনাশ। ধার্মনীতিক নিয়মের অমোঘত্বে য়ুরোপ শ্রদ্ধা হারাইতেছে দেখিয়া, আমরাও যেন না হারাইয়া বসি। আমাদের রাজার এক চোখ কানা বলিয়া আমাদের দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন চোখের উপরে যেন পাগড়ি টানিয়া না দিই।

নদী তাহার দুই তটভূমির মধ্য দিয়া তটহীন সমুদ্রের দিকে চলিয়াছে। নদীকে যদি তাহার তটের মধ্যেই সম্পূর্ণ বদ্ধ করিবার জন্য বাঁধ দেওয়া যায়, তবে তাহা উচ্ছ্বসিত হইয়া তটকে প্লাবিত ও বিনষ্ট করে। প্রাকৃতিক নিয়ম জড় হইতে সচেতনে ধর্মপরিণামের দিকে নিয়ত ধাবিত। সেই পরিণামের দিকে তাহার গতিকে বাধা দিয়া যদি তাহাকে বর্তমানের আদর্শেই একেবারে বাঁধিয়া ফেলা যায়, তবে তাহা ভীষণ হইয়া প্রলয় সাধন করে। স্বার্থের আদর্শ, বিরোধের আদর্শ, যতই দৃঢ়, যতই উচ্চ, যতই রন্ধ্রহীন হইয়া ধর্মের গতিকে বাধা দিতে থাকে, ততই তাহার বিনাশ আসন্ন হইয়া আসে। য়ুরোপের নেশনতন্ত্রে এই স্বার্থ, বিরোধ ও বিদ্বেষের প্রাচীর প্রতিদিনই কঠিন ও উন্নত হইয়া উঠিতেছে। নেশনের মূলপ্রবাহকে অতি-নেশনত্বের দিকে বিশ্বনেশনত্বের দিকে যাইতে না দিয়া, নিজের মধ্যেই তাহাকে বদ্ধ করিবার চেষ্টা প্রত্যহ প্রবল হইতেছে। আগে আমার নেশন, তার পরে বাকি আর-সমস্ত কিছু, এই স্পর্ধা সমস্ত বিশ্ববিধানের প্রতি ভ্রূকুটিকুটিল কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতেছে। তাহার প্রলয়পরিণাম যদি বা বিলম্বে আসে, তথাপি তাহা যে কিরূপ নিঃসন্দেহ, কিরূপ সুনিশ্চিত, তাহা আর্যঋষি দৃঢ়কণ্ঠে বলিয়া গিয়াছেন—

অধর্মেণৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রাণি পশ্যতি।
ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি।

এই ধর্মবাণী সকল দেশের সকল কালের চিরন্তন সত্য, ন্যাশনালত্বের মূলমন্ত্র ইহার নিকট ক্ষুদ্র ও ক্ষণিক। নেশন শব্দের অর্থ যখন লোকে ভুলিয়া যাইবে, তখনও এ-সত্য অম্লান রহিবে এবং ঋষি-উচ্চারিত এই বাক্য স্পর্ধামদমত্ত মানবসমাজের ঊর্ধ্বে বজ্রমন্দ্রে আপন অনুশাসন প্রচার করিতে থাকিবে।

১৩০৮

রাষ্ট্রনীতি ও ধর্মনীতি

এলাহাবাদে সোমেশ্বর দাসের কারাবরোধের কথা সকলেই জানেন। কোনো ব্যক্তিবিশেষের প্রতি অবিচার মাসিকপত্রের আলোচ্য বিষয় নহে। কিন্তু বর্তমান ব্যাপারটি ব্যক্তিবিশেষকে অবলম্বন করিয়া সমস্ত ভারতবাসীর প্রতি লক্ষ্যনিবেশ করিয়াছে। সেইজন্য এ-সম্বন্ধে সংক্ষেপে গুটিকয়েক কথা বলিতে হইতেছে।

পায়োনিয়র লিখিতেছেন, ভারতবর্ষে নানাজাতীয় লোক একত্রে বাস করে। ইহাদের মধ্যে শান্তিরক্ষা করিয়া চলা ব্রিটিশ গবর্মেন্টের একটি দুরূহ কর্তব্য। সুতরাং যে-ঘটনায় ভিন্নজাতির মধ্যে সংঘর্ষ বাধিবার সম্ভাবনা হয়, সেটার প্রতি বিশেষ কঠিন বিধানের প্রয়োজন ঘটে। সে-হিসাবে সোমেশ্বর দাসের কারাদণ্ডকে গুরুদণ্ড বলা যায় না।

সুযোগ্য ইংরেজি সাপ্তাহিক "নিয়ু ইণ্ডিয়া" পত্রে পায়োনিয়রের এই সকল যুক্তির অযথার্থতা ভালোরূপেই দেখানো হইয়াছে। ইংরেজের যে-সকল ব্যবহারে ভারতবাসীর মনে বিক্ষোভ উপস্থিত হয়, ইংরেজ বিচারক তাহাকে যে কত লঘুভাবে দেখিয়া থাকে, তাহার শতশত প্রমাণ প্রত্যহ দেখিতে পাই। এই সেদিন একজন সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণকে কোনো ইংরেজ পাদুকা বহন করাইয়াছিল—দেশের উচ্চতর আদালতে পর্যন্ত স্থির হইয়া গেছে, ব্যাপারটা অত্যন্ত তুচ্ছ।[১] তুচ্ছ হইতে পারে, কিন্তু পায়োনিয়রের যুক্তি অনুসারে তুচ্ছ নহে। ভদ্র ব্রাহ্মণের এরূপ নিষ্ঠুর অপমান ভারতবাসীর কাছে অত্যন্ত গুরুতর।

তাহা হইলে কথাটা কী দাঁড়াইতেছে, বুঝিয়া দেখা যাক। যে-সকল জাতি law-abiding অর্থাৎ বিনা বিদ্রোহে আইন মানিয়া চলে, তাহাদেরই অপমান আদালতের কাছে তুচ্ছ। যাহারা কিছুতেই শান্তিভঙ্গ করিবে না, তাহাদিগকে অন্যায় আঘাত করাও অল্প অপরাধ। আর যাহারা অসহিষ্ণু, যাহারা নিজের আইন নিজে চালাইয়া বসে, সংগত কারণেও তাহাদের গায়ে হাত দিবার উপক্রমমাত্র অপরাধ। ব্রিটিশরাজ্যে বাঘে-গোরুতে একঘাটে জল খাওয়াইবার উপায় বাঘকে দমন করিয়া নহে, গোরুটারই শিং ভাঙিয়া।

কিন্তু পায়োনিয়রের এ-কথাটা লইয়া রাগ করিতে পারি না। পায়োনিয়র বন্ধুভাবে আমাদিগকে একটা শিক্ষা দিয়াছেন। বস্তুতই বারুদে আগুন দেওয়া যতবড়ো

---

[১] তুলনীয় "ব্রাহ্মণ", 'ভারতবর্ষ', রবীন্দ্র-রচনাবলী, চতুর্থ খণ্ড।

অপরাধ, ভিজা তুলায় আগুন দেওয়া ততবড়ো অপরাধ নহে। যাহারা চিরসহিষ্ণু, তাহাদের অপমানকে অপরাধ বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে না। অতএব আঘাত-অপমান সম্বন্ধে আমরা আইন বাঁচাইব, কিন্তু আইন আমাদিগকে বাঁচাইবে না। Mild Hindu-দের প্রতি পায়োনিয়রের ইহাই নিগূঢ় বক্তব্য।

আর-একটা কথা। বিচারের নিক্তিতে সক্ষম-অক্ষম এবং কালো-সাদায় ওজনের কমবেশি নাই। কিন্তু পোলিটিকাল প্রয়োজন বলিয়া একটা ভারী জিনিস আছে, সেটা যেদিকে ভর করে, সেদিকে নিক্তি হেলে। এ-দেশে ইংরেজের প্রতি দেশী লোকের অন্ধ সম্ভ্রম একটা পোলিটিকাল প্রয়োজন, অতএব সেরূপ স্থলে সূক্ষ্মবিচার অসম্ভব। ন্যায়বিচারের মতে এ-কথা ঠিক বটে যে, ইংরেজের প্রতি দেশী লোক যে-ব্যবহার করিয়া যে-দণ্ড পায়, দেশী লোকের প্রতিও ইংরেজ সেই ব্যবহার করিয়া সেই দণ্ডই পাইবে। আইনের বহিতেও এ সম্বন্ধে কোনো বিশেষ বিধি নাই। কিন্তু পোলিটিকাল প্রয়োজন ন্যায়বিচারের চেয়েও নিজেকে বড়ো বলিয়া জানে।

এ-কথা ঠিক বটে, পাশ্চাত্য সভ্যতার আধুনিক ধর্মশাস্ত্রে পলিটিক্‌স সর্বোচ্চে, ধর্ম তাহার নিচে। যেখানে পোলিটিকাল প্রয়োজন আসন ছাড়িয়া দিবে, সেইখানেই ধর্ম বসিবার স্থান পাইবে। পোলিটিকাল প্রয়োজনে সত্য কিরূপ বিকৃত হইয়া থাকে, অন্য প্রবন্ধে হার্বার্ট স্পেন্সরের গ্রন্থ হইতে তাহার প্রমাণ উদ্ধৃত করা গেছে। পোলিটিকাল প্রয়োজনে ন্যায়বিচারকেও বিকারপ্রাপ্ত হইতে হয়, পায়োনিয়র তাহা একপ্রকারে স্বীকার করিয়াছেন। জজ বার্কিট সোমেশ্বরের ব্যবহারকে audacity অর্থাৎ দুঃসাহস বলিয়াছেন। স্বত্বরক্ষার উপলক্ষ্যে ইংরেজকে বাধা দেওয়া যে দুঃসাহস, বিচারকই তাহা দেখাইয়াছেন, এবং এই সাহসিকতার অপরাধে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে কারাদণ্ড দিয়া বিচারক যে মানসিক গুণের পরিচয় দিয়াছেন, তাহাকে আমরা কোনো-মতেই সাহসের কোটায় ফেলিতে পারি না। বস্তুত তিনি অবান্তর কারণে সোমেশ্বরের প্রতি অপক্ষপাত ন্যায্য বিচার করিতে সাহসই করেন নাই। এ-স্থলে দণ্ডিত যদি audacious হয়, তবে দণ্ডদাতার প্রতি ইংরেজি কোন্‌ বিশেষণ প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

কিন্তু এইরূপ বিচারের ফলাফলকে আমরা তুচ্ছ বলিয়া সাপ্তাহিক পত্রের এক প্যারাগ্রাফের মধ্যে তাহার সমাধি দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি না। আমরা প্রতিদিন নানা দৃষ্টান্তের দ্বারা শিখিতেছি যে, পোলিটিকাল প্রয়োজনের যে বিধান, তাহা ন্যায়ের বিধান সত্যের বিধানের সঙ্গে ঠিক মেলে না।

ইহাতে আমাদের শিক্ষাদাতাদের ইষ্ট বা অনিষ্ট কী হইতেছে, তাহা লইয়া

দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইবার প্রয়োজন দেখি না। ভয়ের কারণ এই যে, আমাদের মন হইতে ধ্রুব ধর্মে বিশ্বাস শিথিল, সত্যের আদর্শ বিকৃত হইয়া যাইতেছে। আমরাও প্রয়োজনকে সকলের উচ্চে স্থান দিতে উদ্যত হইয়াছি। আমরাও বুঝিতেছি, পোলিটিকাল উদ্দেশ্যসাধনে ধর্মবুদ্ধিতে দ্বিধা অনুভব করা অনাবশ্যক। অপমানের দ্বারা যে-শিক্ষা অস্থিমজ্জার মধ্যে প্রবেশ করে, সে-শিক্ষার হাত হইতে নিজেকে রক্ষা করিব কী করিয়া? ধর্মকে যদি অকর্মণ্য বলিয়া ঠেলিয়া রাখিতে আরম্ভ করি, তবে কিসের উপর নির্ভর করিব? বিলাতি সভ্যতার আদর্শের উপর? বিশ্বজগতের মধ্যে এই সভ্যতাটাই কি সর্বাপেক্ষা স্থায়ী? দুর্ভাগ্যক্রমে, যে-জিনিসটা প্রত্যক্ষভাবে আমাদের বুকের উপরে চাপিয়া বসে, সেটা আমাদের পক্ষে পৃথিবীর সব-চেয়ে ভারী—আমাদের পক্ষে হিমালয়পর্বতও তাহার চেয়ে লঘু। সেই হিসাবে বিলাতি সভ্যতার নীতিই আমাদের পক্ষে সব-চেয়ে গৌরবান্বিত—তাহার কাছে ধর্মনীতি লাগে না।

অতএব ইচ্ছা করি আর না করি বিলাত আমাদিগকে ঠেসিয়া ধরিয়া যে-সকল শিক্ষা দিতেছে, তাহা গলাধঃকরণ করিতেই হইবে। আমরা ক্লাইভকে, হেস্টিংসকে, ড্যালহৌসিকে আদর্শ নরোত্তম বলিয়াই স্বীকার করিব,—ইংরেজের সহিত ন্যায্য-অন্যায্য সর্বপ্রকার সংঘাত-সংঘর্ষস্থলে আমরা ন্যায়বিচারের প্রত্যাশাই করিব না—যেখানে ভারতশাসনের প্রয়োজনবশত প্রেস্টিজের দোহাই পড়িবে সেখানে বিশ্ববিধাতার দোহাই মানিব না—ইহাই ঘাড় পাতিয়া লইলাম,—কিন্তু এই গুরুই যখন শিবাজির রাষ্ট্রনীতিকে অধর্ম বলিয়া আমাদের নিকট নীতিপ্রচার করিতে আসিবেন, তখন আমরা কী করিব? তখনও কি ইহাই বুঝিব যে, ধর্মনীতিশাস্ত্রও বর্তমান ক্ষমতাশালীকেই ভয় করিয়া নিজের রায় লিখিয়া থাকেন, অতএব ধিক শিবাজি।

১৩০৯

রাজকুটুম্ব

"নিয়ু ইণ্ডিয়া" ইংরেজি কাগজখানি আমরা শ্রদ্ধার সহিত পাঠ করি। ইহার রচনায় পাঠক ভুলাইবার বাঁধাবুলি ও সহজ কৌশলগুলি দেখি না। সম্পাদক যে-সমস্ত প্রবন্ধ লেখেন, তাহাতে রস অথচ গাম্ভীর্য আছে, তাহাতে বলের অভাব নাই অথচ পদে পদে সংযমের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার লেখা সাময়িক সংবাদের তুচ্ছতাকে অনেকদূর ছাড়াইয়া মাথা তুলিয়া থাকে।

১২ই মার্চের পত্রে সম্পাদক "ভারতবর্ষে য়ুরোপীয় ক্রিমিনাল" নাম দিয়া একটি উপাদেয় প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। বৃথা অনুবাদের চেষ্টা না করিয়া ক্রিমিনাল-শব্দটা আমরা বাংলায় গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি।

য়ুরোপীয় ক্রিমিনালদের সম্বন্ধে কেন যে সদ্‌বিচার হয় না, সম্পাদক বিচারকের মতো ধীরভাবে তাহার মীমাংসা করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন।

তিনি বলেন, একপক্ষে অপরিসীম সহিষ্ণুতা ও আর-একপক্ষে অপ্রতিহত শক্তি যেখানে সম্মুখীন হয়, সেখানে স্বভাবতই এইরূপ ঘটিতে বাধ্য। এ-স্থলে আমরা হইলেও এমনিই করিতাম—এমন কি, সম্পাদক টিপ্পনী দিয়া বলিয়াছেন, এশিয়াবাসী হয়তো সুযোগ পাইলে "রিফাইণ্ড" পাশবিকতায় য়ুরোপীয়কে জিনিতে পারিত।

শুদ্ধমাত্র প্রসঙ্গক্রমে আমরাও একটি মনস্তত্ত্বের কথা বলিয়া লই। সম্পাদকের এই টিপ্পনীটুকুতে একটি দুর্বলতা প্রকাশ পাইতেছে। তিনি নিজের বক্তব্যকে সবল করিবার জন্য অপক্ষপাতিতা দেখাইবার প্রলোভনটুকু সংবরণ করিতে পারেন নাই। স্বজাতির প্রতি অতিমাত্র পক্ষপাতও যেমন স্থলবিশেষে একপ্রকার কৌশলমাত্র, জাতিনির্বিশেষে একান্ত অপক্ষপাতও স্থলবিশেষে সেইরূপ কৌশল ছাড়া আর কিছু নহে। নিয়ু ইণ্ডিয়ার সম্পাদকের পক্ষে এটুকুর কোনো প্রয়োজন ছিল না, কারণ, তিনি দুর্বল নহেন।

প্রাচ্যদের সম্বন্ধে ইংরেজদের কতকগুলি বাঁধিবুলি আছে, আমাদের "রিফাইণ্ড" নিষ্ঠুরতা তাহার মধ্যে একটা। পূর্বদিকটা একটা মস্তদিক—এদিকে যাহারাই বাস করে, তাহাদের সকলকে এক নামের অধীনে একশ্রেণীতে ভুক্ত করিয়া ভূগোলবৃত্তান্ত রচনা করিলেই যে তাহারা দানা বাঁধিয়া এক হইয়া যায়, তাহা নহে। বিদেশীরা সামান্য বাহ্যসাদৃশ্যের ভিতর দিয়া বৈসাদৃশ্য ধরিতে পারে না। একজন ·চাষার চক্ষে এক গোরার সঙ্গে আর-এক গোরার ভেদ সহজে ধরা পড়ে না—ইংরেজের অনভ্যস্ত দৃষ্টিতে একজন বাঙালিও যেমন, আর-একজনও প্রায় সেইরূপ। এই কারণেই য়ুরোপীয়েরা সমস্ত প্রাচ্যজাতিকে একটা পিণ্ড পাকাইয়া দেখে এবং সকলের দোষগুণকে একটা নামের ঝোলার মধ্যে ভরিয়া "ওরিয়েণ্টাল" লেব্‌ল আঁটিয়া দেয়।

য়ুরোপীয়েরা আমাদের আধুনিক গুরু, সুতরাং তাঁহাদের কাছ হইতে আমাদের নিজেদের সম্বন্ধে অজ্ঞতাটুকুও আমরা শিখিয়াছি। রিফাইণ্ড পাশবিকতায় এশিয়া য়ুরোপীয়ের চেয়ে অধিক বাহাদুরি কী পাইতে পারে, ইতিহাস ঘাঁটিয়া তাহার প্রমাণ সংগ্রহ করিতে চাহি না। কিন্তু স্বজাতিপক্ষপাতের অপবাদটুকু শিরোধার্য করিয়া এ-কথা অন্তরের সহিত, দৃঢ়বিশ্বাসের সহিত বলিতে পারি যে, হিন্দুকে অকর্মণ্য বল,

অবোধ বল, দুর্বল বল সহ্য করিয়া যাইব, কারণ, সহ্য করা আমাদের অভ্যাস আছে। কিন্তু হিন্দুজাতির সত্যমিথ্যা নানা অপবশের মধ্যে রিকাইও পাশবিকতার অপবাদটা সব-চেয়ে অন্যায়। আর এশিয়াটিক-নামক বন্ধনবিহীন একটা প্রকাণ্ড বিচিত্র ব্যাপারের সহিত য়ুরোপীয় বলিয়া একটি ক্ষুদ্র ঐক্যবদ্ধ সম্প্রদায়ের পশুত্ব, মনুষ্যত্ব, বা দেবত্বর তুলনা একেবারেই অসংগত, অনর্থক। একটা মানকচুর সহিত একটা বাগানের তুলনা হইতেই পারে না।

এটা একটা অবান্তর কথা। মোটের উপর, সম্পাদক যে প্রবন্ধটি লিখিয়াছেন, তাহার প্রশংসা করিতেই হইবে। ইহার মধ্যে চাপা কথা ঢের আছে, তাহা চাপাই থাক্। আমরা কেবল একটি কথা যোগ করিতে চাই মাত্র।

যাহার হাতে শক্তি আছে, সে যে স্বসম্প্রদায়ের দিকে টানিয়া অবিচার করিবে, ইহা মানুষের স্বভাব। ইংরেজও মানুষ, তাই সে ইংরেজ-ক্রিমিনালকে সাজা দিয়া উঠিতে পারে না। যাহার হাতে শক্তি নাই, সে প্রবলের অন্যায়বিচার অগত্যা সহ্য করে, ইহাও মানুষের স্বভাব। আমরাও মানুষ, তাই আমাদিগকে ইংরেজের আক্রমণ চুপ করিয়া সহ্য করিতে হয়। এই এক জায়গায় মনুষ্যত্বের সমনিম্নভূমিতে ইংরেজের সঙ্গে আমরা একত্রে মিলিতে পারিয়াছি।

নূতন ইস্কুল হইতে বাহির হইয়া যখন সাম্য, স্বাধীনতা, মৈত্রী প্রভৃতি বিদেশী বচনগুলি বাংলায় তর্জমা করিবার ভার আমরা গ্রহণ করিয়াছিলাম, তখন আমরা এই জানিতাম যে, য়ুরোপ বাহুবলে প্রবল হইলেও মনুষ্যত্বের অধিকার সম্বন্ধে দুর্বলের সহিত আপনার সাম্য স্বীকার করেন। তখন আমরা ইস্কুলের উত্তীর্ণ ছেলেরা একেবারে অভিভূত হইয়া গিয়াছিলাম। বলিয়াছিলাম, ইহারা দেবতা। আমরা চিরকাল ইহাদিগকে পূজা করিব এবং ইহারা চিরকাল আমাদিগকে প্রসাদ বিতরণ করিবে—ইহাদের সহিত আমাদের এই সম্বন্ধই শাশ্বত। আমরা মনের ভিতর হইতে ইহাদের কাছে সম্পূর্ণ হার মানিয়াছিলাম।

আজ যখন বুঝিতেছি, ইহারা আমাদের অসমকক্ষ নহে—আমরাও দুর্বল, ইহারাও দুর্বল—আমাদের অক্ষমের দুর্বলতা, ইহাদের সক্ষমের দুর্বলতা—তখন অভিভূতির ভার কাটিয়া গিয়া আমরা মাথা তুলিতে পারি। ইংরেজ ক্রমাগত আমাদিগকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছে, ন্যায়পরতা প্রভৃতি সম্বন্ধে তোমাদের স্বশ্রেণীর কোনো জাতির সহিত আমাদের তুলনাই হয় না। এক সময়ে ইংরেজ যেন এই ধর্মশ্রেষ্ঠতার প্রেস্টিজ চালাইবার চেষ্টা করিয়াছিল। যে-ব্যক্তি অক্ষমের নিকট ধর্মরক্ষা করিয়া চলে, তাহার কাছে হার না মানিয়া থাকা যায় না—সেকালে আমাদের

মন হার মানিয়াছিল। এখন ইংরেজ প্রতাপের প্রেস্টিজ সর্বাগ্রগণ্য করিয়াছে—স্বদেশী ও এ-দেশীকে ধর্মের চক্ষে সমান করিবার বল ও সাহস এখন তাহার নাই—এখন ইংরেজের কাছে ইংরেজ-গবর্মেণ্ট দুর্বল। এখন ম্যাঞ্চেস্টার রাজা, বার্মিংহাম রাজা, নীলকর রাজা, চা-কর রাজা, চেম্বর অফ কমার্স রাজা,—তাই আজকাল আমাদের প্রতি ভয়-দ্বেষ-ঈর্ষার নানা লক্ষণ দেখিতে পাই। দেখি, এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হইতে আমরা তাড়া খাইতেছি, আপিস হইতে ভ্রষ্ট হইতেছি, ডাক্তারিশিক্ষায় বাধা পাইতেছি, বিজ্ঞানশিক্ষায় গূঢ়ভাবে প্রতিহত হইতেছি। ইহাতে আমাদের অনেক অসুবিধা আছে, কিন্তু এই সান্ত্বনাটুকু পাইতে পারি যে, কর্তারা আমাদের চেয়ে বেশি বড়ো নহে। ইহারা আমাদের অগ্রাহ্য করিয়া বাঁচে না—ইহাদের মনে এ-আশঙ্কাটুকু আছে যে, সুযোগ পাইলে আমরা বিদ্যায় ক্ষমতায় ইহাদের সমান হইয়া উঠিতে পারি। ইংরেজ-ক্রিমিনাল দেশীয়ের প্রতি অন্যায় করিয়া ন্যায়সংগত শাস্তি পাইলে ইংরেজকে দেশীয় আপন সমতুল্য বলিয়া জ্ঞান করিবে, এই ভয়টুকু যখন ইংরেজের মনে প্রবেশ করিয়াছে, তখন তাহার আত্মসম্মান নষ্ট হইয়াছে। এই উপলক্ষ্যে আমাদের চিত্তও ইংরেজের কাছে নতিস্বীকারের দায় হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিতেছে—প্রত্যহ তাহার প্রমাণ পাইতেছি।

সম্পাদকমহাশয় বলেন, আমরা যদি ঘুষির পরিবর্তে ঘুষি ফিরাইতে পারি, তবে রাস্তায়-ঘাটে ইংরেজকে অনেক অন্যায় হইতে নিরস্ত রাখিতে পারি। কথাটা সত্য—মুষ্টিযোগের মতো চিকিৎসা নাই—কিন্তু সম্পাদকের উপদেশ সহসা কেহ মানিতে রাজি হইবে না। তাহার গুটিকতক কারণ আছে।

একটি কারণ এই যে, আমরা একান্নবর্তী পরিবারে মানুষ হইয়াছি—পরস্পর মিলিয়া-মিশিয়া থাকিবার যত-কিছু আদেশ-উপদেশ-অনুশাসন সমস্তই শিশুকাল হইতে আমাদিগকে প্রত্যহ পালন করিতে হইয়াছে। ঘুষাঘুষি করা, বিবাদ করা, পরের অধিকারে হস্তক্ষেপ করা ও নিজের অধিকার লড়াই করিয়া রাখা, একান্নবর্তী পরিবারে কিছুতেই চলে না। আমাদের পরিবার ভালোমানুষ হইবার, পরস্পরের অনুকূলকারী হইবার, একটি কারখানাবিশেষ। অতএব ঘুষি শিক্ষা করিলেও মানুষের নাসিকাগ্রে ও চক্ষুতারকায় তাহা নির্বিচারে প্রয়োগ করিবার ক্ষিপ্রকারিতা আমাদের অভ্যাস হয় না। নিজের অসুবিধা করিয়াও পরস্পরের সহিত মিলিবার ভাবই আমাদের স্বভাব ও অভ্যাসসংগত—পরস্পরের সহিত লড়িবার ভাব আমাদের সমাজব্যবস্থার মধ্যে কোথাও স্ফূর্তি পাইবার স্থান পায় নাই।

এক, ইস্কুলের ছেলেদের মধ্যে যেটুকু বীররসের অবসর আছে, কর্তৃপক্ষ তাহা সহজে

প্রশ্রয় দিতে চান না। তাঁরা কেবলই বলেন, আমাদের ছাত্রদিগকে যথেষ্ট শাসনে রাখা হয় না। তাঁহাদের স্বদেশে ছাত্রেরা যে-ভাবে মানুষ হয়, এ-দেশের ছাত্রদের ব্যবহারে তাহার আভাসমাত্রও তাঁহারা সহ্য করিতে পারেন না। যাহা দলন করিতে হইবে, তাহা অঙ্কুরেই দলন করা ভালো, এ-কথা ইংরেজ জানে। একটা দৃষ্টান্ত দিই। কোনো কলেজের ছাত্র ফুটবল খেলিতে খেলিতে আহত হইয়াছিল। তাহার সঙ্গীরা শুশ্রূষার প্রয়োজনে কাছের একটি সরোবর হইতে কাপড়ে ভিজাইয়া জল লইয়াছিল। সেই সরোবর সাহেবদের পানীয় জলের জন্য সুরক্ষিত ছিল। সেখানে ছাত্রকে নাবিতে দেখিয়া পাহারাওআলা নিষেধ করে। সেই উপলক্ষ্যে উভয়পক্ষে বচসা, এমন কি, হাতাহাতিও হইয়া থাকিবে। ম্যাজিস্ট্রেট সেই ছাত্রকয়টিকে লইয়া দীর্ঘকাল তাঁহার ডিস্ট্রিক্টের যত দুর্গম স্থানে যে-কৌশলে ঘুরাইয়া-মারিয়া অবশেষে জরিমানা করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, তাহা সেই ছাত্রগণ ও তাহাদের অভিভাবকেরা কোনো-কালে ভুলিতে পারিবে না। বাল্যলীলার এরূপ দণ্ডবিধি ইংরেজের নিজের দেশে যে নাই, সে-কথা সকলেই জানেন। প্রেসিডেন্সি কলেজের মতো বিদ্যালয়েও, দেশীয় প্রিন্সিপালের বিচারেও, ছাত্রদিগকে যে-সকল লঘুপাপে গুরুদণ্ড সহ্য করিতে হয়, তাহাতে তাহাদের পৌরুষচর্চা হয় না।

এই তো গেল ঘরে এবং বিদ্যালয়ে। তাহার পরেও যদি ইংরেজ-অন্যায়কারীর গায়ে ঘুষি তুলিবার মতো স্ফূর্তি কাহারও থাকে, তবে বিচারালয় আছে। দেশীয়দের বিরুদ্ধ-চারী ইংরেজ-ক্রিমিনালের প্রতি ইংরেজ-বিচারকের মানবস্বভাবসংগত পক্ষপাত সম্পাদক মহাশয় স্বীকার করেন—সেই স্বাভাবিক পক্ষপাত দেশীয় অপরাধীর পক্ষে কী আকার ধারণ করিতে পারে, তাহা অনুমান করা কঠিন নহে। একজন সম্ভ্রান্ত মুসলমান-যুবা গড়ের মাঠে গাড়ি হইতে অন্য গাড়ির একজন ইংরেজকে চাবুক মারিয়া জেলে গিয়াছিল মনে আছে—এলাহাবাদের সোমেশ্বর দাসের কথাও আমরা ভুলিতে পারি না। ইংরেজের গায়ে হাত দিতে দিয়া গ্রামশুদ্ধ দোষী-নির্দোষী বহুতর লোকের কিরূপ অসহ্য লাঞ্ছনা ঘটে, তাহার দৃষ্টান্ত আছে। তাহার কারণ, এ-দেশে পোলিটিকাল নীতিতে অন্য নীতিকে জটিল করিয়া ফেলে। এদেশে ইংরেজকে মারার মধ্যে ব্যক্তিগত মার এবং পোলিটিকাল মার, দুই আছে—ইস্কুলের ছেলের তুচ্ছ ক্রীড়ার মধ্যে ভাবীকালের পোলিটিকাল সংকটের বীজ প্রচ্ছন্ন আছে—সুতরাং আমাদের ব্যক্তিগত অপমানের প্রতিকার করিতে গিয়া আমরা হঠাৎ পোলিটিকালের মধ্যে পা দিয়া ফেলি, তখন সহসা কাঁধের উপরে যে-দণ্ডটা আসিয়া পড়ে, তাহার সম্পূর্ণ তাৎপর্য বুঝিতে আমাদের কিছু বিলম্ব হয়। দেশীয়ের প্রতি উপদ্রব করিয়া ইংরেজ অল্প দণ্ড ও ইংরেজের গায়ে

হাত দিয়া আমরা গুরু দণ্ড পাই, ইহার মধ্যে শুধু যে মনুষ্যধর্ম আছে তাহা নহে, তাহার সঙ্গে রাজধর্মও যোগ দিয়াছে। এ-স্থলে ঘুষি তোলা কম কথা নহে।

মনুষ্যস্বভাবে সাহসের একটা সীমা আছে। জাহাজের একজন কাপ্তেন হাজার অন্যায়কারী হইলেও তাহার অধীনস্থ য়ুরোপীয় নাবিকদল সংখ্যাধিক্যসত্ত্বেও সকলপ্রকার অপমান ও দৌরাত্ম্য অগত্যা সহ্য করিয়াছে, এরূপ ঘটনার কথা অনেক শুনা গিয়াছে। আইনের শাসনকে উপেক্ষা করা শক্ত। জাষ্টিস হিল ইংরেজ-ক্রিমিনালকে উপদেশ দিবার প্রসঙ্গক্রমে বলিয়াছেন, তোমার স্বদেশীয় ভৃত্য তোমার এরূপ ব্যবহার সহ্য করিত না। না করিবার কারণ আছে। বিচারের চক্ষে স্বদেশীয় ভৃত্য ও স্বদেশীয় মনিব সম্পূর্ণ সমান। সে-স্থলে মনিবের দুর্ব্যবহার সহ্য না করিবার প্রভূত বল ভৃত্যের আছে। সে-বল ভৃত্যের একলার বল নহে, তাহা তাহার সমস্ত স্বজাতির বল। এই বিপুল বলের সহিত একজন দেশীয় ভৃত্যের একলার বলের তুলনা করা ঠিক নহে।

এখানেও একান্নবর্তী পরিবারের কথা পাড়িতে হয়। একজন ইংরেজের উপর অল্প লোকেরই নির্ভর—আমরা প্রত্যেকেই বহুতর আত্মীয়ের সহিত নানাসম্বন্ধে আবদ্ধ। সেই সকল সম্বন্ধ আমাদিগকে ত্যাগপরতা, সংযম, মঙ্গলনিষ্ঠা প্রভৃতি মনুষ্যত্বের উচ্চতর গুণে ভূষিত করিয়াছে—সেই সকল সম্বন্ধই হিন্দুজাতিকে রিকাইও ও অকৃত্রিম পাশবিকতা হইতে দূরে রাখিয়াছে—আমাদের পক্ষে হঠকারিতা সহজ হইতেই পারে না, আমাদিগকে জেলের দিকে আকর্ষণ করিলে অনেকগুলা শিকড়েই সাংঘাতিক টান পড়ে। অতএব আমাদের জীর্ণ প্লীহা ইংরেজের বুটাগ্রের পক্ষে যেরূপ সহজ লক্ষ্য, ইংরেজের নাসাগ্র আমাদের বদ্ধমুষ্টির পক্ষে সেরূপ সুন্দর সুগম নহে। সেজন্য ইংরেজ যদি নিজেকে আমাদের চেয়ে বেশি বাহাদুর মনে করেন তো করুন—কিন্তু আমরা কেন ইংরেজের তরফ হইতে স্বজাতিকে বিচার করি? যে-ভাবে আমরা চিরকাল মনুষ্যত্বচর্চা করিয়া আসিতেছি, ইংরেজের সহিত সংঘাতে তাহাতে আমাদের অসুবিধা ও অপমান ঘটিতেছে। তা হইতে পারে—কিন্তু তাই বলিয়া মনুষ্যত্বে আমরা খাটো, এ-কথা আমরা তো স্বীকার করিতে পারিব না। মানুষ হইতে গেলে দাঁত-নখের খর্বতা ঘটিয়া থাকে—তাই বলিয়া কি লজ্জা পাইব? রোমের সম্রাট নগ্ন-নিরস্ত্র খ্রীস্টানদিগকে ক্রীড়াঙ্গনে পশু দিয়া হত্যা করিয়াছিলেন—ধর্মরাজ যদি তাহার বিচার করিয়া থাকেন, তিনি কি রোমরাজের পৌরুষকেই সম্মান দিয়াছেন? আমরা যদি যথার্থভাবে সহ্য করিতে পারি, আমরা যদি সহিষ্ণুতার জন্য নিজেকে হেয় বলিয়া অন্যায় ভ্রম না করি, তবে ধর্ম আমাদের বিচার গ্রহণ করিবেন। কিন্তু রচনানীতির খাতিরে বা যে-কারণেই হউক, এ-কথা আমরা যেন অনায়াসেই উচ্চারণ করিয়া না বসি যে, আমরা হইলেও ঠিক

এইরূপ করিতাম বা ইহাদিগকেও ছাড়াইয়া যাইতাম। না, আমরা হইলে এরূপ করিতাম না। ইহাই আমাদের সান্ত্বনা। আমাদের সমাজের আমাদের ধর্মের যে-আদর্শ, আমাদের শাস্ত্রের যে-অনুশাসন, আমাদের স্বভাবের যে-গতি, তাহাতে অক্ষমকে আমরা আত্মীয়শ্রেণীভুক্ত করিয়া লইতাম। আমরা ভিক্ষুককে, দুর্বলকে, প্রাচীনকে কখনো অবজ্ঞা করি নাই।

রাজা এবং রাজকুটুম্ব ঠিক এক নহে, কিন্তু তবু রাজসম্পর্কের গন্ধ থাকিলেও কুটুম্বদের উৎপাত সহ্য করিতেই হয়। মৃচ্ছকটিকের রাজশ্যালকের কথা পাঠকগণ স্মরণ করিবেন। প্রভেদ এই যে, উক্ত কুটুম্ববর্গের সংখ্যা এখন অনেক বাড়িয়া গেছে।

মৃচ্ছকটিকের সেই রাজশ্যালকটি যতই উপদ্রব করুক না কেন, প্রজাবর্গের কাছে তাহার সম্মান ছিল না—সকলেই তাহাকে উৎপাত বলিয়াও জানিত, অথচ তাহাকে মনে-মুখে পরিহাস-বিদ্রূপ করিতে ছাড়িত না। এখনকার রাজশ্যালকগণের নিকট হইতে ঠিক সে-পরিমাণ হাস্যরস আদায় করা কঠিন, কিন্তু তাঁহাদের ব্যবহারে তাঁহারা প্রত্যহ আমাদের কাছে যে-পরিমাণে সম্ভ্রম হারাইতেছেন, তাহা যেন আমাদের মাথা তুলিবার সহায়তা করে।

১৩১০

ঘুষাঘুষি

গত বৈশাখমাসের বঙ্গদর্শনে "রাজকুটুম্ব"-শীর্ষক প্রবন্ধে নিয়ু ইণ্ডিয়ায় প্রকাশিত কোনো রচনার সমালোচনা করা হইয়াছিল। নিয়ু ইণ্ডিয়ার সম্পাদকমহাশয় আমাদিগকে ভুল বুঝিয়াছেন। তিনি স্থির করিয়াছেন, এক গালে চড় খাইয়া অন্য গাল ফিরাইয়া দেওয়া যদি বা আমাদের মত না হয়, অন্তত অশ্রুজলপ্রবাহে আহতগণ্ডের আঘাতবেদনার উপশমচেষ্টাই আমাদের মতে শ্রেয়।

ইংরেজের ঘুষিঘাষা খাইয়া নাকিস্তুরে নালিশ করা এ-দেশে কিছুকাল পূর্বে অত্যন্ত অধিকমাত্রায় প্রচলিত ছিল। একটা কাককে ঢেলা মারিলে পৃথিবীসুদ্ধ কাক যেমন চীৎকার করিয়া মরে, দেশী লোকের মার খাইবার খবরে আমাদের খবরের কাগজগুলি তেমনি করিয়া অবিশ্রাম বিলাপপরিতাপে আকাশ বিদীর্ণ করিত।

আমরাই সর্বপ্রথমে 'সাধনা' পত্রিকায় এই নাকিকান্নার বিরুদ্ধে বারংবার আপত্তি উত্থাপন করিয়াছি—এবং কথঞ্চিৎ ফললাভ করিয়াছি, তাহাও দেখা যাইতেছে। আজ হঠাৎ আত্মপ্রতিবাদের যে কোনো কারণ ঘটিয়াছে, তাহা বোধ হয় না।

ছবিতে যেমন চৌকা জিনিসের চারিটা পাশই একসঙ্গে দেখানো যায় না, তেমনি প্রবন্ধেও একসঙ্গে একটা বিষয়ের একটি, বড়োজোর, দুইটি দিক দেখানো চলে। "রাজকুটুম্ব" প্রবন্ধেও আমাদের বক্তব্য বিষয় খুব ফলাও নহে। নিয়ু ইণ্ডিয়ার সম্পাদক-মহাশয় যখন ভুল বুঝিয়াছেন, তখন সম্ভবত আমাদের রচনায় কোনো ত্রুটি থাকিতে পারে। এবারে ছোটো করিয়া এবং স্পষ্ট করিয়া বলিবার চেষ্টা করিব।

ভারতবর্ষে যে মারে এবং যে মার খায়, এই দুই পক্ষের অবস্থা লইয়া আমরা কিঞ্চিৎ তত্ত্বালোচনা করিয়াছিলাম মাত্র। আমরা কোনো পক্ষকেই কর্তব্যসম্বন্ধে কোনো উপদেশ দিই নাই।

যে লোক জলে পড়িয়াছে, ডাঙা হইতে তাহাকে ঢিল ছুঁড়িয়া মারা সহজ। অপর-পক্ষের সে-মার ফিরাইয়া দেওয়া শক্ত। এরূপ স্থলে কোন্ পক্ষকে কাপুরুষ বলিব? যে মারে, না যে মার ফিরাইয়া দেয় না?

ইংরেজের পক্ষে ভারতবর্ষীয়কে মারা নিতান্ত সহজ—কেবল তাহার গায়ে জোর আছে বলিয়া যে, তাহা নহে। সেও একটা কারণ বটে, কিন্তু সে-কারণকে উপেক্ষা করা যাইতে পারে। তাহার বাহুবল বেশি, কিন্তু তাহার পশ্চাতের বল আরও অনেক বেশি। তাহার দৃশ্যশক্তির সঙ্গে লড়াই চলে, কিন্তু তাহার অদৃশ্যশক্তি অত্যন্ত প্রবল। আমি যেমন একটি মানুষ, সে-ও যদি তেমনি একটি মানুষমাত্র হইত, তবে আমরা কতকটা সমকক্ষ হইতাম। কিন্তু এ-স্থলে আমি একটি ব্যক্তিমাত্র, আর সে ইংরেজ, সে রাজশক্তি। বিচারকালে, মানুষ বলিয়া আমার বিচার হইবে, আর তাহার বিচার হইবে ইংরেজ বলিয়া।

আর, আমি যখন ইংরেজকে মারি, তখন বিচারক সেটাকে এই বলিয়া দেখে যে, ভারতবর্ষের রাজশক্তিকে আমি আঘাত করিলাম, ইংরেজের প্রেষ্টিজকে আমি ক্ষুণ্ণ করিলাম—অতএব সামান্ত আঘাতকারী বলিয়া আমার বিচার হয় না।

আমাদের মধ্যে এই গুরুতর অসমকক্ষতা আছে বলিয়াই যে মার খায়, তাহার চেয়ে যে মারে, সেই কাপুরুষ বেশি। এই কাপুরুষতার জন্ত ইংরেজ আঘাতকারী বিচারে নিষ্কৃতি পাইয়াও যদি স্বজাতির কাছে ধিক্কারলাভ করিত, তাহা হইলে তাহাতেও আমরা একটু বল পাইতাম। কিন্তু দেখিতে পাই, উলটা তাহারা বেশি করিয়া সোহাগ পাইয়া থাকে। তাহাদের জন্ত চাঁদা ওঠে, স্বজাতীয় কাগজে আহা-উহুর অন্ত থাকে না। অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ায় এইরূপ কাপুরুষতার জন্ত কেবল প্রকাশ্তে ভিক্টোরিয়া ক্রস দেওয়া হয় না, এই পর্যন্ত।

সম্প্রতি একজন দেশী লোককে খুন করিয়া মার্টিন বলিয়া একজন ইংরেজের

দ্বিতীয়বার বিচারে তিন বৎসর জেল হইয়াছে। ইহার পর হইতে ইংলিশম্যান প্রভৃতি কাগজে কিরূপ আতঙ্কের আর্তনাদ উঠিয়াছে, তাহার নিম্নলিখিত নমুনাটি কৌতুকজনক :

There are some things that foreign Governments, and even Native States in India, manage better than we do ; one of these is the protection of their own kith and kin, and the maintenance of that prestige so necessary for upholding constituted authority. To the disinterested observer in India, it seems that the white man is becoming very much discounted under the ægis of the British "Raj." Time was when the Britisher, as conqueror and ruler of this land, enjoyed certain rights and privileges, and one of these was his right to be tried by jury. Quite recently we have had the spectacle of the unanimous verdicts of juries, acquitting Europeans, charged with offences triable by these tribunals, set aside, not because there was any outcry against such acquittals, or on the application of the prosecution, but on appeal by the Government against the acquittal. To quote one specific instance, we may refer to the trial of Mr. Rose, of Dulu Tea Estate, Cachar. The relations between Europeans and natives are becoming acutely antagonistic, and this racial gulf is being widened by the violent writings of the native press. The time has arrived to look into this question a little more closely. The unprovoked assaults on Europeans, especially soldiers, are becoming increasingly frequent. Europeans are insulted, abused and jeered at by the lowest type of natives and if they retaliate, they are set upon by a mob. If the European gets badly mauled, nothing is done, no one cares, but if in the brawl he happens to seriously hurt one of his numerous assailants, in the exercise of his right of self-defence, he is tried for his life and liberty. This we say is one-sided and it behoves the Government to look a little deeper into the causes at work that bring about these frequent conflicts between Europeans and natives.

দেখো, এই একটি সামান্য ঘটনায় ইংলিশম্যান কম্পান্বিত। অন্যায় করিবার অপ্রতিহত ক্ষমতা যদি কোনো উপায়ে একটু খর্ব হয়, তবে কী আতঙ্কের বিষয়! ইহা

হইতে এই প্রমাণ হয় যে, এ-দেশে ইংরেজ অবিচারের বলেই আপনাকে বলী মনে করে। সেই বলের পশ্চাতে নিরাপদে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাহারা অত্যাচার করিবার সহজ স্বত্বকে চিরস্থায়ী করিতে চাহে। করিতে পারে করুক—কিন্তু ইহার পরে ভীরুতার অপবাদ আমাদিগকে দেওয়া আর চলে না।

ইংরেজ ও ভারতবর্ষীয়ের মধ্যে অপক্ষপাত বিচারে "কঙ্করর" ও "রুলর"-দের যে প্রেস্টিজের হানি হয়, এ-আশঙ্কা এ-দেশের সাধারণ ইংরেজের মনে জাগিয়া আছে—জজ এবং জুরি নিতান্ত অসাধারণ না হইলে ইহার ব্যতিক্রম হয় না। অপক্ষপাতে সুবিচার করিতে যাহারা ভয় করে, তাহারা একদিকে আমাদের পক্ষে ভয়ানক, তেমনি আর-একদিকে তাহাদের এই ভীরুতাই আমাদের কাছে তাহাদের দুর্বলতা প্রতিপন্ন করে। আমাদের কাছে ইহাতে তাহাদের মর্যাদা কমিয়া গেছে। এখন আমরা ইংরেজকে ঘরে-ঘরে এবং মনে-মনে খাটো করিতেছি। পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতি অন্ধভক্তি এক সময়ে আমাদিগকে যেরূপ সম্পূর্ণ অভিভূত করিয়া দিয়াছিল, এখন আমরা ক্রমশই তাহা হইতে মুক্তিলাভ করিতেছি। আমাদের দেশের চিরন্তন ধর্মনীতির যে-আদর্শ, তাহা প্রত্যহ আমাদের কাছে উজ্জ্বলতর হইয়া আসিতেছে। আমরা পাশ্চাত্য বর্বরতার নগ্নমূর্তি যতই দেখিতেছি, ততই আশ্রয়লাভের জন্য আমাদের স্বদেশীয় কুলায়ের মধ্যেই একে একে ফিরিয়া আসিবার উপক্রম করিতেছি। এইরূপে আমাদের অপমানের মধ্য দিয়াও আত্মসম্মানের পথ কিরূপে উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে, আমার প্রবন্ধে তাহার আভাস ছিল।

আর-একটি কথা ছিল, বোধ হয় "নিয়ু ইণ্ডিয়া"-সম্পাদকমহাশয় সেইটেতেই আপত্তি করিয়াছেন। আমি বলিয়াছিলাম, আমাদের দেশে একান্নবর্তী পরিবার-প্রথা এমন যে, বাল্যকাল হইতে আমাদিগকে সর্বপ্রকারে বিরোধের অপেক্ষা মিলনের জন্যই প্রস্তুত করে। আমাদিগকে আত্মত্যাগ এবং ধৈর্যই শিক্ষা দিতে থাকে। আমরা যদি ক্ষমায় দীক্ষিত না হই, তবে এতগুলি লোকের একত্রে থাকা অসম্ভব হয়। অতএব আমরা যে খপ করিয়া কাহারও নাক-চোখের উপর ঘুষি মারিতে, বা ভূপতিত ব্যক্তির মুখের উপর বা রাগ করিয়া কাহারও তলপেটে উপর্যুপরি লাথি মারিতে পারি না, তাহার কারণ আমাদের সাহসের অভাব নহে—তাহার প্রধান কারণ, আমাদের দেশের সামাজিক আদর্শে আমাদিগকে নিরীহ করিয়াছে। ইংরেজ কথঞ্চিৎ পরিহাসের ভঙ্গিতে আমাদিগকে "mild Hindu" বলিয়া থাকে—বস্তুতই আমরা মাইল্‌ড হিন্দু। ইহাতে আমাদের অসুবিধা ঘটিতেছে, তাহা দেখিতেছি এবং এখন বর্তমান অবস্থায় কী করা কর্তব্য, তাহাও বিচার্য—কিন্তু মাইল্‌ড বলিয়া আমাদের লজ্জায় ঘাড় হেঁট

করিবার কথা নহে। ভারতবাসী মৃত্যুকে ভয় করে বলিয়া যে কাহাকেও আক্রমণ করে না, তাহা নহে—বোয়ার-যুদ্ধে ভারতবর্ষীয় ডুলিবাহকেরাও দেখাইয়াছে যে, তাহারা বিনা উত্তেজনাতেও অবিচলিতভাবে মৃত্যুর মুখের সম্মুখে আপনার কাজ করিয়া যাইতে পারে—[1] কিন্তু তাহার ধর্ম, তাহার সমাজ তাহার হিংস্রপ্রবৃত্তি লোপ করিয়া দিয়াছে—এতদূর করিয়াছে যে, তাহাতে তাহার স্বার্থহানি ও অসুবিধা ঘটে এবং তাহার মানহানি ঘটিতেছে। এই নিরীহতাকে যদি তিরস্কার করিতে হয়, তবে ভীরুতাকে যে-ভাষায় করিবে, ইহাকেও কি সেই ভাষায় করিবে?

যাহাই হউক, ইংরেজের মার খাইয়া মার ফিরাইয়া দেওয়া আমাদের পক্ষে কী কী কারণে সহজ নহে, "রাজকুটুম্ব" প্রবন্ধে তাহারই আলোচনার চেষ্টা করিয়াছিলাম। ফিরাইয়া দেওয়া উচিত কিনা, সে-কথা তুলি নাই। কর্তব্য দুঃসাধ্য হইলেও কর্তব্য—বরঞ্চ সে-কর্তব্যের গৌরব বেশি। এলাহাবাদের কোনো দেশীয় ধনী ব্যাঙ্কর স্বত্বরক্ষা উপলক্ষ্যে তাঁহার কোনো ইংরেজ ভাড়াটিয়াকে ফুলগাছের টব লইতে ভৃত্যদের দ্বারা বাধা দেন—সেই স্পর্ধায় তাঁহার কারাদণ্ড হয়। স্বত্বরক্ষা বা আত্মরক্ষা বা মানরক্ষার খাতিরে কোনো ইংরেজের গায়ে হাত তুলিলে তাহার পরিণাম সুখজনক না হইতে পারে এ-আশঙ্কা স্বীকার করিয়াও যখন আমাদের দেশের লোক আঘাতের পরিবর্তে আঘাত করিতে শিখিবে, তখনই ইংরেজের কাপুরুষতার সংশোধন হইবে—এই অত্যন্ত সহজ কথাটি যদি অস্বীকার করি, তবে স্বভাবের নিয়ম সম্বন্ধে আমার সুগভীর অজ্ঞতা প্রকাশ পাইবে।

স্বভাবের নিয়মের অপেক্ষা উচ্চতর নীতি আছে। কিন্তু সে-নীতি যতক্ষণ পর্যন্ত না সমস্ত বাধা পরাভূত করিয়া নিজেকে দুর্নিবারভাবে প্রত্যক্ষ করিয়া তোলে, ততক্ষণ পর্যন্ত স্বভাবের নিয়মকেই আশ্রয় করিতে হয়।

কিন্তু এ-কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, এই যে ঘুষাঘুষির উত্তেজনা আমাদের মনে জাগ্রত হইয়া উঠিতেছে, ইহা আমাদের ধর্মনীতিতে আঘাত না করিয়া থাকিতে

---

[1] স্যাভেজ ল্যাণ্ডর নামক ভ্রমণকারী যখন তিব্বতভ্রমণে গিয়াছিলেন, তখন তাঁহার সমুদয় ভৃত্যই প্রাণভয়ে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করে, কেবল চন্দনসিং ও মানসিং বলিয়া তাঁহার যে দুটিমাত্র হিন্দুভৃত্য ছিল, তাহারা কখনো পলায়নের চেষ্টামাত্রও করে নাই—তাহারা আসন্নমৃত্যুর শঙ্কায় এবং অসহ্য উৎপীড়নেও অবিচলিত থাকে—অথচ নূতন দেশ আবিষ্কারের উত্তেজনা, সমাজে যশের প্রত্যাশা বা ভ্রমণবৃত্তান্ত ছাপাইয়া অর্থলাভের প্রলোভন, তাহাদের কিছুই ছিল না। তাহাদের প্রভুও বিদেশী এবং অল্পদিনের—কিন্তু তাহারা হিন্দু, অন্যকে মারিবার জন্য তাহারা সর্বদাই উদ্যত নয়, অথচ মরিতে ভয় করে না।

পারে না। অশুভপ্রবৃত্তি প্রয়োজনটুকু সিদ্ধ করিয়াই অন্তর্ধান করে না। তাহাকে দাসত্বের ছুতায় আহ্বান করিলেও শেষে সে রাজত্ব করিতে চায়। কোনো কোনো দুর্বৃত্ত মদ না খাইলে যেমন কাজ করিতে পারে না বিদ্বেষ সেইরূপ অন্ধ না হইলে পুরাদমে কাজ করিতে পারে না। গুণ্ডাগিরিকে যদি একবার রীতিমতো জাগাইয়া তুলি, তবে সে অন্ধবিদ্বেষের নেশায় না মাতিয়া থাকিতে পারিবে না। তখন সে উঠিয়া-পড়িয়া কাজ আরম্ভ করিবে বটে, কিন্তু আমাদের উচ্চতন মনুষ্যত্বের বুকের রক্ত হইতে সে প্রতিদিন তাহার খোরাক আদায় করিতে থাকিবে। গুণ্ডাগিরি বল পাইয়া উঠিয়া মনুষ্যত্বকে শোষণ করে—বাহাদুরির নেশা জাগিয়া ওঠে।

এ-কথা স্বীকার করিতেই হইবে, শুষ্ক উপদেশে কোনো ফল হয় না—অভ্যাস তাহা অপেক্ষা দরকারি জিনিস। মারা উচিত বলিলেই মারা যায় না, মারা অভ্যাস করা চাই। যাহাদের ঘুষি প্রস্তুত হইয়া আছে, তাহারা শিশুকালে প্রতিবেশীর ছেলেকে মারে, বিদ্যালয়ে সহপাঠীকে মারে, কলেজে gownsman হইয়া townsmanকে মারে—এমনি করিয়া একেবারে এমন পাকিয়া যায় যে, তাহাদের ধর্মগ্রন্থের উপদেশ অরণ্যে রোদনে পরিণত হয়। তাই হার্বার্ট স্পেন্সার তাঁহার Facts and Comments গ্রন্থের ৩০তম পৃষ্ঠায় লিখিতেছেন :

> But the refusal to recognize the futility of mere instruction as a means to moralization, is most strikingly shown by ignoring the conspicuous fact that after two thousand years of Christian exhortations, uttered by a hundred thousand priests throughout Europe, pagan ideas and sentiments remain rampant, from emperors down to tramps. Principles admitted in theory are scorned in practice. Forgiveness is voted dishonourable. An insult must be wiped out by blood : the obligation being so peremptory that an officer is expelled from the army for even daring to question it. And in international affairs the sacred duty of revenge, supreme with the savage, is supreme also with the so-called civilized.

ইহা না হইয়া যায় না। চালের একটি খড় পোড়াইতে গেলেও সমস্ত চালে আগুন লাগে। কাড়াকাড়ি-ঘুষাঘুষিকে সমাজের সর্বত্র প্রচলিত করিলে, তবেই আবশ্যকের সময় তাহা অনায়াসপ্রাপ্য হয়।

ট্রুথ প্রভৃতি বিলাতি কাগজে পুলিস-আদালতের বিবরণে নিজের স্ত্রীকে, পুত্র-কন্যাকে, আত্মীয়-প্রতিবেশীকে যেরূপ নির্মম পাশবভাবে আঘাত করার উদাহরণ

দেখিতে পাই, আমাদের হিন্দুসমাজে তাহার সিকির সিকিও দেখা যায় না। শিকারি বিড়ালের গোঁফ দেখিলেই চেনা যায়;—কে পিলা ফাটাইবে এবং কাহার পিলা ফাটিবে, এই পুলিসের বিবরণী হইতেই তাহা স্পষ্ট দেখা যাইবে।

আমাদের দেশে ছেলেতে-ছেলেতে ঝগড়া যদি মারামারি পর্যন্ত ওঠে, তবে যাহাতে আঘাত গুরুতর না হয়, লড়াইকারীর সে-চেষ্টা বরাবর থাকে—গালে চড়, পিঠে চাপড়ের ঊর্ধ্বে প্রায় ওঠে না। সে আমাদের সমাজের শিক্ষা; দূর হইতে সুদূরে আত্মীয়তা বিস্তার করাই আমাদের অভ্যাস,—আমরা ঘনিষ্ঠ হইয়া বাস করি—আমরা যদি ক্ষমা না করি, ধৈর্য না ধরি, তবে আমাদের সমাজ ভাঙিয়া যায়, শাস্ত্রের শিক্ষা ব্যর্থ হয়।

অতএব আমাদের দুই জাতের দুইরকম আচরণ। য়ুরোপে শাস্ত্রের শিক্ষা ও সমাজের ব্যবহার পরস্পরবিরোধী। আমাদের সমাজ ক্ষমা, ধৈর্য, সন্তোষ ও সর্বভূতে দয়া, এই শাস্ত্রমতের অনুকূলে প্রতিষ্ঠিত। এই সমাজে সুদীর্ঘকাল হইতে আমাদের চরিত্র গঠিত। অতএব মারামারিতে আমাদিগকে ইংরেজের কাছে হঠিতে হয়—কেবল ভয়ে নহে, অনভ্যাসে।

যদি হঠিতে না চাও, তবে শিশুকাল হইতে ঘরে-পরে সর্বত্র তাহার আয়োজন করিতে হয়। যাহা আমার, তাহাতে কাহাকেও অংশ বসাইতে দিব না; যাহা পরের তাহা জবরদখল করিতে চেষ্টা করিব; দুর্বল সহপাঠীর উপর অন্যায় অত্যাচার করিব; ঘুষি মারিবার সময় কাহারও নাকচোখ বাঁচাইয়া চলিব না, এবং নিষ্ঠুরতায় বিমুখ হওয়াকে পৌরুষের অভাব বলিয়া গণ্য করিব।

এইরূপে যখন আমাদের আমূল পরিবর্তন হইবে, তখন ইংরেজে-দেশীতে হাতাহাতি সমানভাবে চলিবে। বাঘে-সিংহে থাবা-মারামারি যেমন অত্যন্ত আমোদজনক দৃশ্য, আমাদেরও দাঁত-ভাঙাভাঙি সেইরূপ পরমকৌতুকাবহ হইতে পারিবে।

নতুবা কী হইবে? যে-ব্যক্তি শিক্ষায় ও অভ্যাসে ও পুরুষানুক্রমে স্বভাববর্বর নহে, সে যদি কর্তব্যের অনুরোধে চোখকান বুজিয়া প্রকৃতিবিরুদ্ধ উদ্‌যোগে প্রবৃত্ত হয়, তবে যে ভীষণ বর্বরতাকে জাগাইয়া তুলিবে, তাহার সহিত প্রতিযোগিতা করিবার উপযুক্ত নখদন্ত কোথায় মিলিবে? আমরা উপদেশের তাড়নায় অত্যন্ত দুর্বলভাবে কাজ আরম্ভ করিব, কিন্তু যে নিষ্ঠুর বিদ্বেষ উন্মথিত হইয়া উঠিবে, সেই হলাহল অনায়াসে গলাধঃকরণ করিবার শক্তি ও অভ্যাস আমাদের নাই।

আমি এ-কথা ভয় হইতে বলিতেছি না। দাঁত ভাঙা, নাক থ্যাবড়ানো, জেলে যাওয়া অত্যন্ত গুরুতর অশুভ বলিয়া গণ্য না-ই হইল। কিন্তু যে-গরলকে পরিপাক

করিতে আমরা স্বাভাবিক কারণেই অক্ষম, সেই গরলকে উদ্রিক্ত করিয়া তোলা দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক কিনা, জানি না।

কিন্তু একটা অবস্থা আছে, যখন ফলাফল বিচার অসংগত এবং অন্যায়। ইংরেজ যখন অন্যায় করিয়া আমাকে অপমান করে, তখন যতটুকু আমার সামর্থ্য আছে, তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিকার করিয়া জেলে যাওয়া এবং মরাও উচিত। ইহা নিশ্চয় জানিতে হইবে যে, হয়তো ঘুষায় পারিব না এবং হয়তো বিচারশালাতেও দোষী সাব্যস্ত হইব; তথাপি অন্যায় দমন করিবার জন্য প্রত্যেক মানুষের যে স্বর্গীয় অধিকার আছে, যথাসময়ে তাহা যদি না খাটাইতে পারি, তবে মনুষ্যত্বের নিকট হেয় এবং ধর্মের নিকট পতিত হইব। নিজের দুঃখ ও ক্ষতি আমরা গণ্য না করিতে পারি, কিন্তু যাহা অন্যায়, তাহা সমস্ত জাতির প্রতি এবং সমস্ত মানুষের প্রতি অন্যায় এবং বিধাতার ন্যায়দণ্ডের ভার আমাদের প্রত্যেকের উপরেই আছে। বিদ্বেষ হইতে, বাহাদুরি হইতে, স্পর্ধা হইতে নিজেকে সর্বপ্রযত্নে বাঁচাইয়া, ন্যায়নীতির সীমার মধ্যে কঠিনভাবে নিজেকে সংবরণ করিয়া দুষ্টশাসনের কর্তব্য আমাদিগকে গ্রহণ করিতেই হইবে। শারীরিক কষ্ট, ক্ষতি বা অকৃতকার্যতা ভয়ের বিষয় নহে—ভয়ের বিষয় এই যে, ধর্মকে বিস্মৃত হইয়া প্রবৃত্তির হাতে পাছে আত্মসমর্পণ করি, পরকে দণ্ড দিতে গিয়া পাছে আপনাকে কলুষিত করি, বিচারক হইতে গিয়া পাছে গুণ্ডা হইয়া উঠি। আমরা দেখিয়াছি, দুই দিক বাঁচাইয়া চলা সাধারণ মানুষের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন, এইজন্য ভালোমন্দ ওজন করিয়া অনেক সময় আমাদিগকে একটা দিক অবলম্বন করিতে হয়। কিন্তু ধর্মের সঙ্গে সেরূপ রফা করিতে গেলেই সেই ছিদ্রযোগে শনি প্রবেশ করে—প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির যে সামঞ্জস্যপথ আছে, তাহা অত্যন্ত দুরূহ হইলেও তাহাই আমাদিগকে নিয়তযত্নে অনুসন্ধান ও অবলম্বন করিতে হইবে—নতুবা বিনাশপ্রাপ্ত হইতেই হইবে। ধর্মের এই অমোঘ নিয়ম হইতে য়ুরোপ বা এশিয়া কাহারও নিষ্কৃতি নাই।

অতএব ঘুষাঘুষি-মারামারির কথা যখন ওঠে, তখন সাবধান হইতে বলি। দেবতার তূণেও অস্ত্র আছে, দানবের তূণও শূন্য নহে—অপ্রমত্ত হইয়া অস্ত্র নির্বাচন যদি করিতে পারি, তবেই যুদ্ধের অধিকার জন্মে, তখন

কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।

১৩১০

বঙ্গবিভাগ

বঙ্গবিভাগ এবং শিক্ষাবিধি লইয়া আমাদের দেশে সম্প্রতি যে আন্দোলন হইয়া গেছে, তাহার মধ্যে একটি অপূর্বত্ব বিদেশী লোকেরাও লক্ষ্য করিয়াছে। সকলেই বলিতেছে, এবারকার বক্তৃতাদিতে রাজভক্তির ভড়ং নাই, সামলাইয়া কথা কহিবার প্রয়াস নাই, মনের কথা স্পষ্ট বলিবার একটা চেষ্টা দেখা গিয়াছে। তা ছাড়া, এ-কথাও কোনো কোনো ইংরেজি কাগজে দেখিয়াছি যে, রাজার কাছে দরবার করিয়া কোনো ফল নাই,—এমনতরো নৈরাশ্যের ভাবও এই প্রথম প্রকাশ পাইয়াছে।

কনগ্রেস প্রভৃতি রাষ্ট্রনৈতিক সভাস্থলে আমরা বরাবর দুই কূল বাঁচাইয়া কথা কহিবার চেষ্টা করিয়াছি। রাজভক্তির অজস্র গৌরচন্দ্রিকার দ্বারা আমরা সর্বপ্রথমেই গোরার মনোহরণব্যাপার সমাধা করিয়া তাহার পরে কালার তরফের কথা তুলিয়াছি। হতভাগ্য হতবল ব্যক্তিদের এইরূপ নানাপ্রকার নিষ্ফল কলকৌশল দেখিয়া নিষ্ঠুর অদৃষ্ট অনেকদিন হইতে হাস্য করিয়া আসিয়াছে।

এবারে কিন্তু দুর্বল ভীরুর স্বভাবসিদ্ধ ছলাকলা বিশেষ দেখা যায় নাই—প্রাজ্ঞ প্রবীণ ব্যক্তিরাও একেবারে হাল ছাড়িয়া দিয়া সোজা সোজা কথা কহিয়াছেন।

ইহার কারণ এই, যে-দুটো ব্যাপার লইয়া আলোচনা উপস্থিত হইয়াছে, সে দুটোই আমাদের মনে গোড়াতেই একটা অবিশ্বাস জন্মাইয়া দিয়াছে। এ-দুটো ব্যাপারের ভিত্তিই অবিশ্বাস।

এই অবিশ্বাসের যথার্থ হেতু আছে, কি না আছে, তাহা লইয়া তর্ক করা মিথ্যা—কারণ চাণক্য স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন, স্ত্রীলোক এবং রাজা উভয়ের মনস্তত্ত্ব সাধারণ লোকের পক্ষে দুর্জ্ঞেয়। এবং যাহা দুর্জ্ঞেয়, আত্মরক্ষার জন্য দুর্বল লোকে তাহাকে গোড়াতেই অবিশ্বাস করিয়া থাকে, ইহা স্বাভাবিক।

বর্তমান আন্দোলনে আমরা এই কথা বলিয়া আরম্ভ করিয়াছি যে, য়ুনিভার্সিটি বিলের দ্বারা তোমরা এ-দেশের উচ্চশিক্ষা, স্বাধীন শিক্ষার মূলোচ্ছেদ করিতে চাও এবং বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া তোমরা বাঙালিজাতিকে দুর্বল করিতে ইচ্ছা কর।

শিক্ষা এবং ঐক্য, এই দুটাই জাতিমাত্রেরই আত্মোন্নতি ও আত্মরক্ষার চরম সম্বল। এই দুটার প্রতি ঘা পড়িয়াছে, এমন যদি সন্দেহমাত্র মনে জন্মায়, তবে ব্যাকুল হইয়া উঠিবার কথা। বিশেষত যখন মনে জানি অপর পক্ষ বলিষ্ঠ, আমাদের হাতে কোনো উপায় নাই, এবং যাঁহারা আমাদিগকে আঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছেন তাঁহাদিগকেই আমাদের সহায় ও সখা বলিয়া আহ্বান করিতে হইবে।

কিন্তু বর্তমান ঘটনায় আমাদের কাছে সব-চেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এই মনে হয় যে, আমরা অবিশ্বাস প্রকাশ করিয়াছি, কিন্তু বিশ্বাসের বন্ধন ছেদন করিতে পারি নাই। ইহাকেই বলে ওরিয়েণ্টাল—এইখানেই পাশ্চাত্যদের সঙ্গে আমাদের প্রভেদ। য়ুরোপ কায়মনোবাক্যে অবিশ্বাস করিতে জানে। আমরা ক্ষণকালের জন্য রাগ করি আর যাই করি, অন্তরের মধ্যে আমরা পুরাপুরি অবিশ্বাস করিতে পারি না। যোলো আনা অবিশ্বাসকে জাগাইয়া রাখিবার যে-শক্তি, তাহা আমাদের নাই—আমরা ভুলিতে চাই, আমরা বিশ্বাস করিতে পারিলে বাঁচি।

আমি জানি, আমার একজন বাঙালি বন্ধুর বিরুদ্ধে কোনো ইংরেজ মিথ্যা চক্রান্ত করিয়াছিল। সেই মিথ্যা যখন প্রমাণ হইয়া গেল, তখন তাঁহাকে তাঁহার এক ইংরেজ সুহৃদ বলিয়াছিলেন, "Spare him not, crush him like a worm!" কিন্তু বাঙালি সে-সুযোগ সম্পূর্ণ গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হইয়াছিলেন এবং তাহার ফল এখনও ভোগ করিতেছেন। নিঃশেষে দলন করিতে, নিঃশেষে অবিশ্বাস করিতে, নিঃশেষে চুকাইয়া ফেলিতে আমরা জানি না—আমাদের চিরন্তন প্রকৃতি এবং শিক্ষা আমাদিগকে বাধা দেয়—এক জায়গায় আমাদের মন বলিয়া ওঠে, "আহা, আর কেন, আর কাজ নাই, আর থাক্।" পরিপূর্ণ অবিশ্বাসের মধ্যে যে একটা কাঠিন্য, যে একটা নির্দয়তা আছে, আমাদের গার্হস্থ্যপ্রধান, আমাদের মিলনমূলক সভ্যতা তাহা আমাদিগকে চর্চা করিতে দেয় নাই—সম্বন্ধবিস্তার করিবার জন্যই আমরা সর্বতোভাবে চিরদিন প্রস্তুত হইয়াছি, সম্বন্ধবিচ্ছেদ করিবার জন্য নহে। যাহা অনাবশ্যক তাহাকেও রক্ষা করিবার, যাহা প্রতিকূল তাহাকেও অঙ্গীভূত করিবার চেষ্টা করিয়াছি। কোনো জিনিসকেই ঝাড়ে-মূলে উপড়াইয়া একেবারে টান মারিয়া ফেলিয়া দিতে শিখি নাই—আত্মরক্ষার পক্ষে, স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে ইহা সুশিক্ষা নহে।

য়ুরোপ যাহা-কিছু পাইয়াছে, তাহা বিদ্রোহ করিয়া পাইয়াছে; আমাদের যাহা-কিছু সম্পত্তি, তাহা বিশ্বাসের ধন। এখন, বিদ্রোহপরায়ণ জাতির সহিত বিশ্বাসপরায়ণ জাতির বোঝাপড়া মুশকিল হইয়াছে। স্বভাববিদ্রোহী স্বভাববিশ্বাসীকে শ্রদ্ধা করে না।

চাণক্যপণ্ডিতের "স্ত্রীষু রাজকুলেষু চ" শ্লোক বাঙালির কণ্ঠস্থ—কিন্তু বাঙালির তদপেক্ষা কণ্ঠলগ্ন তাহার স্ত্রী। সেজন্য তাহাকে দোষ দেওয়া যায় না—কারণ, শুষ্ক পুঁথির চেয়ে সরস রক্তমাংসের প্রমাণ ঢের বেশি আদরণীয়। কিন্তু রাজকুল সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। হাতে-হাতেই তাহার দৃষ্টান্ত দেখো:

যদি সত্যই তোমার এই ধারণা হইয়া থাকে যে, বাঙালিজাতিকে দুর্বল করিবার

উদ্দেশেই বাংলাদেশকে খণ্ডিত করা হইতেছে, যদি সত্যই তোমার বিশ্বাস যে, য়ুনিভার্সিটি বিলের দ্বারা ইচ্ছাপূর্বক য়ুনিভার্সিটির প্রতি মৃত্যুবাণ বর্ষণ করা হইতেছে, তবে সে-কথায় উল্লেখ করিয়া তুমি কাহার করুণা আকর্ষণ করিতে ইচ্ছা করিতেছ? উদ্যত কুঠারকে গাছ যদি করুণস্বরে এই কথা বলে যে, “তোমার আঘাতে আমি ছিন্ন হইয়া যাইব,” তবে সেটা কি নিতান্ত বাহুল্য হয় না? গাছের মজ্জার মধ্যে কি এই বিশ্বাসই রহিয়াছে যে, কুঠার তাহাকে আলিঙ্গন করিতে আসিয়াছে, ছিন্ন করিতে নহে?

আর, মনের মধ্যে যদি অবিশ্বাস না জন্মিয়া থাকে, তবে অবিশ্বাস প্রকাশ করিতেছ কেন—অমন চড়াসুরে কথা কহিতেছ কেন—কেন বলিতেছ, “তোমাদের মতলব আমরা বুঝিয়াছি, তোমরা আমাদিগকে নষ্ট করিতে চাও।” এবং তাহার পরক্ষণেই কাঁদিয়া বলিতেছ, “তোমরা যাহা সংকল্প করিয়াছ, তাহাতে আমরা নষ্ট হইব, অতএব নিরস্ত হও।” বলিহারি এই “অতএব”।

আমাদের প্রকৃতি এবং শিক্ষার বৈষম্যে সকল বিষয়েই আমাদের এইরূপ দ্বিধা উপস্থিত হইয়াছে। আমরা মুখে অবিশ্বাস দেখাইতে পারি, কিন্তু আচরণে অবিশ্বাস করিতে পারি না। তাহাতে সকল দিকই নষ্ট হয়—ভিক্ষাধর্মও যথানিয়মে পালিত হয় না—স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিতেও প্রবৃত্তি থাকে না।

আমাদের মনে সত্যই যদি অবিশ্বাস জন্মিয়া থাকে, তবে অবিশ্বাসের মধ্য হইতে যেটুকু লাভের বিষয়, তাহা গ্রহণ না করি কেন? আমাদের শাস্ত্রে এবং সমাজে রাজায়-প্রজায় মিলনের নীতি ও প্রীতিসম্বন্ধই চিরকাল প্রচার করিয়া আসিয়াছে, সেইটেই আমরা বুঝি ভালো, সেইটেই আমাদের পক্ষে সহজ। সেরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের দ্বারা আমরা কী লাভ করিতে পারিতাম, তাহা বর্তমানে কল্পনা করিয়া কোনো ফল নাই।

কিন্তু ভারতবর্ষে সম্প্রতি রাজাপ্রজার মাঝখানে খুব যে একটা মন-কষাকষি চলিতেছে, তাহা এত স্পষ্ট, এত প্রত্যক্ষ যে, কোনো পলিসি উপলক্ষ্যেও তাহা গোপন করিবার চেষ্টা বৃথা এবং লজ্জাকর। আমরা যদি বা কপটভাষায় তাহা ঢাকিতে ইচ্ছা করি, কর্তৃপক্ষদের কাছে তাহা ঢাকা পড়ে না। কারণ, ইংরেজ ও দেশী কোনো পক্ষেই প্রেমের ছড়াছড়ি নাই—এমন অবস্থায় রাস্তার-ঘাটে, আপিসে-আদালতে, রেলে-ট্র্যামে, কাগজে-পত্রে, সভাসমিতিতে উত্তমরূপে পরস্পরের মন-জানাজানি হইয়া থাকে।

আমরা ঘরে ঘরে বলিয়া থাকি, বাঙালিজাতির প্রতি ইংরেজ অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছে এবং কর্তৃপক্ষেরা বাঙালিজাতিকে দমন করিতে উৎসুক। ইংরেজি সাহিত্যে

বিলাতি কাগজে বাঙালিজাতির প্রতি প্রায় মাঝে মাঝে তীব্রভাষা প্রয়োগ করিয়া আমাদিগকে বিশেষভাবে সম্মানিত করিয়া থাকে।

ইহাতে অধীন দুর্বলজাতির চাকরিবাকরি, সাংসারিক সুযোগ প্রভৃতি সম্বন্ধে নানাপ্রকার অসুবিধা ঘটিবার কথা। তাহা আক্ষেপের বিষয় হইতে পারে কিন্তু ইহা হইতে যেটুকু সুবিধা স্বভাবত প্রত্যাশা করা যাইতে পারিত, তাহারও কোনো লক্ষণ দেখিতে পাই না কেন? গালেও চড় পড়িবে, মশাও মরিবে না, আমাদের কি এমনি কপাল।

পরের কাছে সুস্পষ্ট আঘাত পাইলে পরতন্ত্রতা শিথিল হইয়া নিজেদের মধ্যে ঐক্য সুদৃঢ় হয়। সংঘাত ব্যতীত বড়ো কোনো জিনিস গড়িয়া উঠে না, ইতিহাসে তাহার অনেক প্রমাণ আছে।

কিন্তু আমরা আঘাত পাইয়া নিরাশ্বাস হইয়া কী করিলাম? বাহিরে তাড়া খাইয়া ঘরে কই আসিলাম? আবার তো সেই রাজদরবারেই ছুটিতেছি। এ-সম্বন্ধে আমাদের কী কর্তব্য, তাহার মীমাংসার জন্ম নিজেদের চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়া জুটিলাম না।

আন্দোলন যখন উত্তাল হইয়া উঠিয়াছিল, তখন আমরা কোনো কথা বলি নাই, এখন বলিবার সময় আসিয়াছে।

দেশের প্রতি আমাদের কথা এই—আমরা আক্ষেপ করিব না, পরের কাছে বিলাপ করিয়া আমরা দুর্বল হইব না। কেন এই রুদ্ধদ্বারে মাথা-খোঁড়াখুঁড়ি, কেন এই নৈরাশ্যের ক্রন্দন। মেঘ যদি জল বর্ষণ না করিয়া বিদ্যুৎকশাঘাত করে, তবে সেই লইয়াই কি হাহাকার করিতে হইবে। আমাদের দ্বারের কাছে নদী বহিয়া যাইতেছে না? সেই নদী শুষ্কপ্রায় হইলেও তাহা খুঁড়িয়া কিছু জল পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু চোখের জল খরচ করিয়া মেঘের জল আদায় করা যায় না।

আমাদের নিজের দিকে যদি সম্পূর্ণ ফিরিয়া দাঁড়াইতে পারি, তবে নৈরাশ্যের লেশমাত্র কারণ দেখি না। বাহিরের কিছুতে আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিবে এ-কথা আমরা কোনোমতেই স্বীকার করিব না। বিচ্ছেদের চেষ্টাতেই আমাদের ঐক্যানুভূতি দ্বিগুণ করিয়া তুলিবে। পূর্বে জড়ভাবে আমরা একত্র ছিলাম, এখন সচেতনভাবে আমরা এক হইব। বাহিরের শক্তি যদি প্রতিকূল হয়, তবেই প্রেমের শক্তি জাগ্রত হইয়া উঠিয়া প্রতিকারচেষ্টায় প্রবৃত্ত হইবে। সেই চেষ্টাই আমাদের যথার্থ লাভ। কৃত্রিম বিচ্ছেদ যখন মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইবে, তখনই আন্তরিক ঐক্য উদ্বেল হইয়া উঠিবে—তখনই আমরা যথার্থভাবে অনুভব করিব যে, বাংলার পূর্বপশ্চিমকে চিরকাল একই জাহ্নবী তাঁহার বহু বাহুপাশে বাঁধিয়াছেন, একই ব্রহ্মপুত্র তাঁহার প্রসারিত

ক্রোড়ে ধারণ করিয়াছেন, এই পূর্বপশ্চিম, হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ-বাম অংশের ন্যায় একই সনাতন রক্তস্রোতে সমস্ত বঙ্গদেশের শিরা-উপশিরায় প্রাণবিধান করিয়া আসিয়াছে। আমাদিগকে কিছুতে পৃথক করিতে পারে, এ-ভয় যদি আমাদের জন্মে, তবে সে-ভয়ের কারণ নিশ্চয়ই আমাদেরই মধ্যে আছে এবং তাহার প্রতিকার আমাদের নিজের চেষ্টা ছাড়া আর-কোনো কৃত্রিম উপায়ের দ্বারা হইতে পারে না। এখন হইতে সর্বতোভাবে সেই শঙ্কার কারণগুলিকে দূর করিতে হইবে, ঐক্যকে দৃঢ় করিতে হইবে, সুখে-দুঃখে নিজেদের মধ্যেই মিলন প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

এই হইল প্রাণের কথা,—ইহার মধ্যে সুবিধা-অসুবিধার কথা, লাভক্ষতির কথা যদি কিছু থাকে, যদি এমন সন্দেহ মনে জন্মিয়া থাকে যে, বঙ্গবিভাগসূত্রে ক্রমে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত লোপ পাইতে পারে, আমাদের চাকরিবাকরির ক্ষেত্র সংকীর্ণ হইতে পারে, তবে সে-সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, পারে বটে। কিন্তু কী করিবে? কর্তৃপক্ষ যদি মনে মনে একটা পলিসি আঁটিয়া থাকেন, তবে আজ হউক, কাল হউক, গোপনে হউক, প্রকাশ্যে হউক, সেটা তাঁহারা সাধন করিবেনই—আমাদের তর্ক শুনিয়া তাঁহারা ক্ষান্ত হইবেন কেন? মনে করো না কেন, কথামালার বাঘ যখন মেষশাবককে খাইতে ইচ্ছা করিয়া বলিল, "তুই আমার জল ঘোলা করিতেছিস, তোকে মারিব"—তখন মেষশাবক বাঘকে তর্কে পরাস্ত করিল, কহিল, "আমি ঝরনার নিচের দিকের জল খাইতেছি, তোমার উপরের জল ঘোলা হইল কী করিয়া?" তর্কে বাঘ পরাস্ত হইল, কিন্তু মেষশিশুর কি তাহাতে কোনো সুবিধা হইয়াছিল?

অনুগ্রহই যেখানে অধিকারের নির্ভর, সেখানে মমতা বাড়িতে দেওয়া কিছু নয়। ম্যুনিসিপালিটির স্বায়ত্তশাসন এক রাজপ্রতিনিধি আমাদিগকে দিয়াছিলেন, আর-এক রাজ-প্রতিনিধি তাহা স্বচ্ছন্দে কাড়িয়া লইলেন। উপরন্তু গাল দিলেন, বলিলেন, "তোমরা কোনো কর্মের নও।" আমরা হাহাকার করিয়া মরিলাম, "আমাদের অধিকার গেল।" অধিকার কিসের। এ মোহ কেন। মহারানী একসময়ে আমাদের একটা আশ্বাসপত্র দিয়াছিলেন যে, যোগ্যতা দেখাইতে পারিলে আমরাও রাজকার্যে প্রবেশলাভ করিতে পারিব—কালো চামড়ার অপরাধ গণ্য হইবে না। আজ যদি কর্মশালা হইতে বহিষ্কৃত হইতে থাকি, তবে সেই পুরাতন দলিলটির দোহাই পাড়িয়া লাভ কী? সেই দলিলের কথা কি রাজপুরুষের অগোচর আছে? ময়দানে মহারানীর প্রস্তরমূর্তি কি তাহাতে বিচলিত হইবে? চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আজও স্থায়ী আছে, সে কি আমাদের অধিকারের জোরে, না রাজার অনুগ্রহে। যদি পরে

এমন কথা উঠে যে, কোনো বন্দোবস্তই স্থায়ী হইতে পারে না, শাসনকার্যের সুবিধার উপরেই স্থায়িত্বের নির্ভর, তবে সত্যরক্ষার জন্য লর্ড কর্নওআলিসের প্রেতাত্মাকে কলিকাতা টাউনহল হইতে উদ্‌বেজিত করিয়া লাভ কী হইবে। এ-সমস্ত মোহ আমাদিগকে ছিন্ন করিতে হইবে, তবে আমরা মুক্ত হইব। নতুবা প্রতিদিনই পুনঃপুন বিলাপের আর অন্ত থাকিবে না।

কিন্তু যেখানে আমাদের নিজের জোর আছে, সেখানে আমরা দৃঢ় হইব। যেখানে কর্তব্য আমাদেরই, সেখানে আমরা সচেতন থাকিব। যেখানে আমাদের আত্মীয় আছে, সেইখানে আমরা নির্ভর স্থাপন করিব। আমরা কোনোমতেই নিরানন্দ নিরাশ্বাস হইব না। এ-কথা কোনোমতেই বলিব না যে, গবর্মেণ্ট একটা কী করিলেন বা না করিলেন বলিয়াই অমনি আমাদের সকল দিকে সর্বনাশ হইয়া গেল—তাহাই যদি হওয়া সম্ভবপর হইতে পারে, তবে কোনো কৌশললব্ধ সুযোগে, কোনো ভিক্ষালব্ধ অনুগ্রহে আমাদিগকে বেশিদিন রক্ষা করিতে পারিবে না। ঈশ্বর আমাদের নিজের হাতে যাহা দিয়াছেন, তাহার দিকে যদি তাকাইয়া দেখি তবে দেখিব, তাহা যথেষ্ট এবং তাহাই যথার্থ। মাটির নিচে যদি-বা তিনি আমাদের জন্য গুপ্তধন না দিয়া থাকেন, তবু আমাদের মাটির মধ্যে সেই শক্তিটুকু দিয়াছেন, যাহাতে বিধিমত কর্ষণ করিলে ফললাভ হইতে কখনোই বঞ্চিত হইব না।

ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট নানাবিধ অনুগ্রহের দ্বারা লালিত করিয়া কোনোমতেই আমাদিগকে মানুষ করিতে পারিবেন না, ইহা নিঃসন্দেহ—অনুগ্রহভিক্ষুদিগকে যখন পদে পদে হতাশ করিয়া তাঁহাদের দ্বার হইতে দূর করিয়া দিবেন, তখনই আমাদের নিজের ভাণ্ডারে কী আছে, তাহা আবিষ্কার করিবার অবসর হইবে,—আমাদের নিজের শক্তি দ্বারা কী সাধ্য, তাহা জানিবার সময় হইবে,—আমাদের নিজের পাপের কী প্রায়শ্চিত্ত, তাহাই বিশ্বগুরু বুঝাইয়া দিবেন। যাচিয়া মান কাঁদিয়া সোহাগ যখন কিছুতেই জুটিবে না, বাহির হইতে সুবিধা এবং সম্মান যখন ভিক্ষা করিয়া দরখাস্ত করিয়া অতি অনায়াসে মিলিবে না তখন ঘরের মধ্যে যে চিরসহিষ্ণু প্রেম লক্ষ্মীছাড়াদের গৃহপ্রত্যাবর্তনের জন্য গোধূলির অন্ধকারে পথ তাকাইয়া আছে, তাহার মূল্য বুঝিব—তখন মাতৃভাষায় ভ্রাতৃগণের সহিত সুখদুঃখ-লাভক্ষতির আলোচনায় প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতে পারিব, প্রোভিনশাল কনফারেন্সে দেশের লোকের কাছে বিদেশের ভাষায় দুর্বোধ্য বক্তৃতা করিয়া আপনাদিগকে কৃতকৃত্য জ্ঞান করিব না—এবং সেই শুভদিন যখন আসিবে, ইংরেজ যখন ঘাড়ে ধরিয়া আমাদিগকে আমাদের নিজের ঘরের দিকে, নিজের চেষ্টার দিকে জোর করিয়া ফিরাইয়া দিতে পারিবে, তখন ব্রিটিশ গবর্মেণ্টকে

বলিব ধন্য—তখনই অনুভব করিব, বিদেশীর এই রাজত্ব বিধাতারই মঙ্গলবিধান। হে রাজন, আমাদিগকে যাহা যাচিত ও অযাচিত দান করিয়াছ তাহা একে একে ফিরাইয়া লও, আমাদিগকে অর্জন করিতে দাও। আমরা প্রশ্রয় চাহি না, প্রতিকূলতার দ্বারাই আমাদের শক্তির উদ্বোধন হইবে। আমাদের নিদ্রার সহায়তা করিয়ো না, আরাম আমাদের জন্য নহে, পরবশতার অহিফেনের মাত্রা প্রতিদিন আর বাড়িতে দিয়ো না—তোমাদের রুদ্রমূর্তিই আমাদের পরিত্রাণ। জগতে জড়কে সচেতন করিয়া তুলিবার একইমাত্র উপায় আছে;—আঘাত, অপমান ও একান্ত অভাব; সমাদর নহে, সহায়তা নহে, সুভিক্ষ নহে।

১৩১১

দেশের কথা

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন শ্রীযুক্ত সখারাম দেউস্কর মহাশয়ের রচিত 'দেশের কথা' নামক পুস্তকের সমালোচনা আমাদের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। তাহার আরম্ভে তিনি লিখিতেছেন:

"এই পুস্তকের বিষয়গুলি মৌলিক নহে। ভারতহিতৈষী ডিগবি প্রভৃতি ইংরেজগণ এবং দাদাভাই নওরোজি, রমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি ভারতের সুসন্তানগণ যে-সকল বিষয় লইয়া বহুবৎসর যাবৎ আলোচনা করিতেছেন তাহাই মূলত অবলম্বন করিয়া এই পুস্তকখানি রচিত হইয়াছে। ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে অনেক তত্ত্ব অস্পষ্টভাবে আমাদের ধারণায় ছিল, এই পুস্তকখানি পড়িয়া তাহা সুস্পষ্ট, জীবন্ত এবং আকারপ্রাপ্ত হইয়া উঠিয়াছে।

"কোনো সাধুপুষ্পিত সুন্দর উদ্যান দাবদগ্ধ হইয়া গেলে কিংবা কোনো সুদর্শন পরিচিত বন্ধুর হঠাৎ কঙ্কাল দেখিলে মনের যেরূপ অবস্থা হয়, বর্তমান চিত্রে অঙ্কিত ভারতীয় শিল্পবাণিজ্যাদির অবস্থা দর্শনে সেইরূপ একটা ভাবের উদয় হইবে, অথচ দেউস্করমহাশয় কোনো উত্তেজিত বক্তৃতা প্রদান করেন নাই,—কতকগুলি সংখ্যাবাচক অঙ্ক এবং সেন্সাস ও স্ট্যাটিস্টিক্‌স হইতে সমুদ্ধৃত কথা নিঃশব্দে একটি মর্মচ্ছেদী দৃশ্য উদ্‌ঘাটন করিয়া দেখাইবে। এই দৃশ্য একটি বিয়োগান্ত নাটকের ন্যায়,—প্রভেদ এই যে, ইহাতে কাল্পনিক দুঃখের কথা নাই, ইহা আমাদের নিজেদের দুঃখদারিদ্র্য ও মৃত্যুর চিত্র প্রদর্শন করিতেছে। গ্রন্থকার ভিষকের ন্যায় আমাদের ক্ষতস্থানটি জাগাইয়া তুলিয়া বেদনাবোধের সঞ্চার করিয়াছেন।"

ইহার অনতিদূর পরেই তিনি লিখিতেছেন:

"দেউস্করমহাশয় বলেন, পুনঃপুন আন্দোলন করিলে গবর্মেন্ট অবশ্যই আমাদের কথায় কর্ণপাত করিবেন।"

শিক্ষাটা কি এই হইল? ইতিহাসে প্রমাণ হইতেছে, প্রবল জাতি ইচ্ছা করিয়া, চেষ্টা করিয়া দুর্বলজাতির স্বত্ব নষ্ট করিতেছে; ইহা হইতে কি এই সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, সেই প্রবলজাতির নিকট পুনঃপুন আন্দোলন করিলেই লোপ্ত্রদ্রব্য ফিরিয়া পাওয়া যায়? ব্যাপারটা এতই সহজ?

ইহার উত্তরে আন্দোলনের দল বলিবেন, তা ছাড়া আর কী করিব? একটা তো কিছু করা চাই।

আমরা বলি, কিছু যদি করিতেই হয় তো ওই অরণ্যে রোদনটা নয়। আমাদের যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, তোমরা এই ইতিহাস হইতে লাভ করিবার বিষয় কী দেখিলে? আমরা বলিব, লাভের বিষয় দেখিয়াছি, কিন্তু সেটা দরখাস্তপত্রিকা নহে। আমাদের লাভ এই যে: ইংরেজের আদর্শ আমাদের হৃদয় জয় করিয়াছিল—স্বদেশের সকল দিক হইতে আমাদের হৃদয় বিমুখ হইতেছিল। মুখে আস্ফালন করিয়া যাহাই বলি, আমাদের অন্তঃকরণ বলিতেছিল, বিলাতি সভ্যতার মতো সভ্যতা আর নাই। এই কারণে আমাদের দেশের আদর্শ কী, শক্তি কোথায়, তাহা যথার্থভাবে বিচার করিয়া বাহির করিতে পারিতেছিলাম না। প্যাট্রিয়টিজ্‌ম-মূলক সভ্যতার চেহারা ইতিহাসে উত্তরোত্তর যতই উৎকট হইয়া ফুটিয়া উঠিতেছে, ততই আমাদের হৃদয়ের উদ্ধার হইতেছে। ক্রমশই আমাদের দেশ যথার্থভাবে আমাদের হৃদয়কে পাইতেছে। ইহাই পরম লাভ। ধনলাভের চেয়ে ইহা অল্প লাভ নহে।

অন্যপক্ষ বলিবেন, তবে দেশহিতৈষিতাটাকে তোমরা ভালোই বল না। আমরা বলি, দেশহিতৈষিতা কাহাকে বলে, তাহা লইয়া এত তর্কের বিষয় আছে যে, কেবল ওই নামটাকে লইয়া মুখে মুখে লোফালুফি করিয়া কোনো ফল নাই। প্যাট্রিয়টিজমের প্রতিশব্দ দেশহিতৈষিতা নহে। জিনিসটা বিদেশী, নামটাও বিদেশী থাকিলে ক্ষতি নাই—যদি কোনো বাংলা শব্দই চালাইতে হয়, তবে "স্বাদেশিকতা" কথাটা ব্যবহার করা যাইতে পারে।

স্বাদেশিকতার ভাবখানা এই যে, স্বদেশের ঊর্ধ্বে আর কিছুকেই স্বীকার না করা। স্বদেশের লেশমাত্র স্বার্থে যেখানে বাধে না, সেইখানেই ধর্ম বল, দয়া বল, আপনার দাবি উত্থাপন করিতে পারে—কিন্তু যেখানে স্বদেশের স্বার্থ লইয়া কথা সেখানে সত্য দয়া মঙ্গল সমস্ত নিচে তলাইয়া যায়। স্বদেশীয় স্বার্থপরতাকে ধর্মের স্থান দিলে যে-ব্যাপারটা হয়, তাহাই প্যাট্রিয়টিজ্‌ম শব্দের বাচ্য হইয়াছে।

স্বার্থপরতা কখনোই ধর্মের জন্য আপনাকে সংযত করে না, স্বার্থের জন্যই করে। ইংরেজ কখনোই এ-কথা ভাবে না যে, পৃথিবীতে ফরাসি সভ্যতার একটা উপকারিতা

আছে, অতএব সে-সভ্যতায় আঘাত করিলে সমস্ত মানবের, সুতরাং আমাদেরও ক্ষতি ;—নিজের পেট ভরাইবার জন্য আবশ্যক হইলে ফরাসিকে সে বটিকার মতো গিলিয়া ফেলিতে পারে, দ্বিধামাত্র করে না। তাহার দ্বিধার একমাত্র কারণ, আমারও গায়ে জোর আছে, ফরাসিও নেহাত ক্ষীণজীবী নহে, অতএব কী জানি, লাভ করিতে গিয়া মূলধনসুদ্ধ হারানো অসম্ভব নহে। এ-স্থলে ক্ষুধানিবৃত্তির জন্য এশিয়া-আফ্রিকার ডালপালা সমস্ত মুড়াইয়া খাইলে কোনো দোষ দেখি না। অতএব তিব্বতে শান্তিদূত প্রেরণের ব্যবস্থাকালে কপোলযুগ লজ্জায় রক্তিমবর্ণ করিবার কোনো প্রয়োজন নাই।

ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইবে, স্বার্থপরতাকে যদি ধর্মের আসনের প্রান্তে বসাইয়া কিছুমাত্র প্রশ্রয় দেওয়া যায়, তবে অবশেষে সে একদিন ধর্মকে ঠেলা মারিয়া ফেলিবেই। স্বদেশীয় স্বার্থপরতা আজ সেইজন্য কেবলই পৃথিবীময় তাল ঠুকিয়া-ঠুকিয়া দেবতাকে শুদ্ধ ভয় দেখাইয়া স্তম্ভিত করিবার চেষ্টা করিতেছে।

বিখ্যাত ভ্রমণকারী স্বেন হেডিন Sven Hedin-এর নাম সকলেই শুনিয়াছেন ইংরেজের তিব্বত-আক্রমণপ্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন :

> "The English campaign in Tibet is a fresh proof of the Imperialist brutality which seems to characterise the political tendencies of our times, and in face of which the position of the smaller states appears precarious. A small state which does not possess the power to defend itself is doomed to decay, whether it is Christian or not. If our priests taught the people the meaning of the words "Love thy neighbours as thyself", "Thou shalt not steal", "Thou shalt do no murder", "Peace on earth and goodwill towards men", instead of losing themselves and their hearers in unfathomable and completely useless dogmas, such an injustice as the present one would be impossible. But probably such really Christian feelings are nonsense in modern policy. And the same Christians send our missionaries to Japan. In the name of truth one ought to protect the Asiatics from such Christianity."

এ-সকল কথার তাৎপর্য আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে। টেলিগ্রাফ, রেলগাড়ি ও বড়ো বড়ো ইস্কুলবই যে সভ্যতার প্রকৃত উপকরণ ও লক্ষণ নহে, তাহা নিশ্চয় জানিয়া যথার্থ মনুষ্যত্বলাভের জন্য অন্যত্র সন্ধান করিতে হইবে—তখন জ্ঞান হইতেও পারে যে, মনুষ্যত্বচর্চার জন্য পাশ্চাত্য শস্ত্রধারীদের ছাত্রত্ব স্বীকার করা আমাদের পক্ষে

অত্যাবশ্যক নহে। তখন নিজের দেশের আদর্শ ও নিজের শক্তিকে নিতান্ত অবজ্ঞেয় বলিয়া মনে হইবে না।

কিন্তু অন্নের অভাবে কৃশ হইয়া, তেজের অভাবে ম্লান হইয়া ঝরিয়া মরিয়া পড়িলে তখন তোমার দেশের আদর্শই বা কোথায়, ধর্মই বা কোথায়? আদর্শ রক্ষা করিতে গেলেও যে শক্তির প্রয়োজন হয়, তাহার অবাধ চর্চার স্থল কোথায়? কাজেই সেজন্যে দরখাস্ত করিতেই হয়—শুদ্ধ ইংরেজি ভাষায় রেজোল্যুশন পাস না করিলে চলেই না।

একদিকে স্বদেশীয় স্বার্থপরতার সংঘাত আক্রমণ করিলে অপরদিকেও স্বদেশীয় স্বার্থরক্ষার উদ্যম স্বভাবতই জাগিয়া উঠে। এমনি করিয়া ইংরেজিতে যাহাকে নেশন অর্থাৎ পোলিটিকাল স্বার্থবদ্ধ জনসম্প্রদায় বলে, তাহার উদ্ভব হইতে থাকে।

আমাদের দেশের বর্তমান অবস্থায় তাহার উদ্ভব না হইয়া থাকিতেই পারে না। সুতরাং এই সময়েই আমাদের মোহমুক্ত হওয়া দরকার। অনিবার্য প্রয়োজনে যাহা আমাকে লইতেই হইবে, তাহার সম্বন্ধে অতিমাত্রায় মুগ্ধভাব থাকা কিছু নয়। এ-কথা যেন না মনে করি, জাতীয় স্বার্থতন্ত্রই মনুষ্যত্বের চরম লাভ। তাহার উপরেও ধর্মকে রক্ষা করিতে হইবে,—মনুষ্যত্বকে ন্যাশনালত্বের চেয়ে বড়ো বলিয়া জানিতে হইবে। ন্যাশনালত্বের সুবিধার খাতিরে মনুষ্যত্বকে পদে পদে বিকাইয়া দেওয়া, মিথ্যাকে আশ্রয় করা, ছলনাকে আশ্রয় করা, নির্দয়তাকে আশ্রয় করা প্রকৃতপক্ষে ঠকা। সেইরূপ ঠকিতে ঠকিতে অবশেষে একদিন দেখা যাইবে, ন্যাশনালত্ব সুদ্ধ দেউলে হইবার উপক্রম হইয়াছে। কারণ স্বার্থপরতার স্বভাবই এই যে, সে ক্রমশই সংকীর্ণতার দিকে আকর্ষণ করে। তাহার প্রমাণ, বোয়ার যুদ্ধে ইংরেজের তরফের রসদের মধ্যে রাশি রাশি ভ্যাজাল। জাপানের সঙ্গে যুদ্ধে রাশিয়ার পক্ষেও সেইরূপ দেখা গেছে। মনুষ্যত্বের মঙ্গলকে যদি ন্যাশনালত্ব বিকাইয়া দেয়, তবে ন্যাশনালত্বের মঙ্গলকেও একদিন ব্যক্তিগত স্বার্থ বিকাইতে আরম্ভ করিবে। ইহার অন্যথা হইতেই পারে না। প্রাকৃতিক নিয়মই যে অমোঘ, ধর্মের নিয়ম যে অমোঘ নহে, তাহা নয়।

বাল্যশিক্ষার প্রভাব বড়ো কম নয়। ভারতবর্ষের অস্থিমাংস লইয়াও দীনেশবাবুর ন্যায় মনীষী ব্যক্তি 'দেশের কথা'র সমালোচনার ছলে এক জায়গায় লিখিয়াছেন :

> "গবর্মেণ্ট যখন এক চক্ষে ভারতবাসীর হিত ও ভাবী উন্নতির দিকে লক্ষ্য করেন, তখন তাঁহার আর-একটা চক্ষু সাগরমেখলা শ্বেতদ্বীপাধিষ্ঠাত্রী বাণিজ্যলক্ষ্মীর চরণনখরপ্রান্তে আবদ্ধ থাকিবে—ইহা আমরা কোনোক্রমেই অন্যায় বলিয়া মনে করিতে পারিব না।"

দুটি চোখের ঠিক একটি চোখ সাগরের এপারে এবং একটি চোখ ওপারে রাখিলে ন্যায়দণ্ড কতকটা সিধা থাকিত। কিন্তু দেউস্করমহাশয়ের গ্রন্থখানি কি তাহাই প্রমাণ করিয়াছে? আসল কথা, আজকাল অনেকেই মনে করি, ন্যাশনালিটির স্পর্শমণির স্পর্শে সমস্ত অন্যায় সোনার চাঁদ হইয়া উঠে।

যাহা হউক, আমাদিগকে নেশন বাঁধিতে হইবে—কিন্তু বিলাতের নকলে নহে। আমাদের জাতির মধ্যে যে-নিত্যপদার্থটি,যে-প্রাণপদার্থটি আছে, তাহাকেই সর্বতোভাবে রক্ষা করিবার জন্য আমাদিগকে ঐক্যবদ্ধ হইতে হইবে—আমাদের চিত্তকে, আমাদের প্রতিভাকে মুক্ত করিতে হইবে, আমাদের সমাজকে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও বলশালী করিতে হইবে। এ-কার্যে স্বদেশের দিকে আমাদের সম্পূর্ণ হৃদয়, স্বদেশের প্রতি আমাদের সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা চাই—যাহা শিক্ষা ও অবস্থার গুণে অন্যদিকে ধাবিত হইয়াছে, তাহাকে ঘরের দিকে ফিরাইতে হইবে। আশা করি, দেউস্করমহাশয়ের বইখানি আমাদিগকে সেইপথে যাত্রার সহায়তা করিবে—আমাদিগকে পুনঃপুন নিষ্ফল আন্দোলনের দিকেই উৎসাহিত করিবে না।

১৩১১

ব্যাধি ও প্রতিকার

কিছুকাল হইতে বাংলাদেশের মনটা বঙ্গবিভাগ উপলক্ষে খুবই একটা নাড়া পাইয়াছে। এইবার প্রথম দেশের লোক একটা কথা খুব স্পষ্ট করিয়া বুঝিয়াছে। সেটা এই যে, আমরা যতই গভীররূপে বেদনা পাই না কেন সে-বেদনার বেগ আমাদের গবর্মেন্টের নাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাকে কিছুমাত্র বিচলিত করিতে পারে না। গবর্মেন্ট আমাদের হইতে যে কতদূর পর তাহা আমাদের দেশের সর্বসাধারণ ইতিপূর্বে এমন স্পষ্ট করিয়া কোনোদিন বুঝিতে পারে নাই।

কর্তৃপক্ষ সমস্ত দেশের লোকের চিত্তকে এমন কঠোর ঔদ্ধত্যের সহিত অবজ্ঞা করিতে পারিল কোন্ সাহসে এই প্রশ্ন আমাদের মনকে কিছুকাল হইতে কেবলই পীড়িত করিয়াছে। ইহাতে আমাদের প্রতি মমত্বের একান্ত অভাব প্রকাশ পাইয়াছে—কিন্তু শুধু কি তাই? এই কি প্রবীণ রাষ্ট্রনীতিকের পন্থা? রাজাই যেন আমাদের পর কিন্তু রাষ্ট্রনীতি কি দেশের সমুদয় লোককে একেবারে নগণ্য করিয়া চলিতে পারে?

যখন দেখি পারে, তখন মনের মধ্যে কেবল অপমানের ব্যথা নহে একটা আতঙ্ক

জাগিয়া উঠে। আমাদের অবস্থা যে কিরূপ নিঃসহ উপায়বিহীন, কিরূপ সম্পূর্ণ পরের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া আছে, আমাদের নিজের শক্তি যে এতটুকুও অবশিষ্ট নাই যে রাষ্ট্রনীতির রথটা আমাদের প্রবল অনিচ্ছাকেও একটি ক্ষুদ্র বাধা জ্ঞান করিয়াও অল্পমাত্র বাঁকিয়া চলিবে ইহা যখন বুঝি তখন নিরুপায়ের মনেও উপায় চিন্তার জন্য একটা ক্ষোভ জন্মে।

কিন্তু আমাদের প্রতি রাষ্ট্রনীতির এতদূর উপেক্ষার কারণ কী? ইহার কারণ, আমাদের দ্বারা কোনো ক্ষতির আশঙ্কা নাই। কেন নাই? আমরা বিচ্ছিন্ন, বিভক্ত। আমাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার ঢেউ কাহাকেও জোরে আঘাত করিতে পারে না। সুতরাং কোনো কারণে ইহার সঙ্গে আপস করিবার কোনোই প্রয়োজন হয় না। এমন অবস্থায় আমাদের কোনো ইচ্ছা বা অনিচ্ছা আমরা যদি মনের আবেগে কিছু উচ্চকণ্ঠে প্রকাশ করি, তবে উচ্চ-আসনের লোকেরা সেই অশক্ত আস্ফালনকে কখনোই বরদাস্ত করিতে পারেন না। ইচ্ছার পশ্চাতে যেখানে শক্তি নাই সেখানে তাহা স্পর্ধা।

এমন অবস্থায় ক্ষতি করিবার শক্তি আমাদের কোথায় আছে তাহা একাগ্রমনে খুঁজিয়া দেখিবার ইচ্ছা হয়। ইহা স্বাভাবিক। এই ইচ্ছার তাড়নাতেই "স্বদেশী" উদ্‌যোগ হঠাৎ অল্পদিনের মধ্যেই আমাদের দেশে এমন প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। আমরা তোমাদের জিনিস কিনি বলিয়া তোমাদের কাছে ভারতবর্ষের এত দাম অতএব ওইখানে আমাদের একটা শক্তি আছে। আমাদের অস্ত্রশস্ত্র নাই কিন্তু যদি আমরা এক হইয়া বলিতে পারি যে, বরং কষ্ট সহিব তবু তোমাদের জিনিস আমরা কিনিব না, তবে সেখানে তোমাদিগকে হার মানিতে হইবে।

ইহার অনেক পূর্ব হইতেই স্বদেশী সামগ্রী দেশে চালাইবার চেষ্টা ভিতরে ভিতরে নানাস্থানে নানা আকারে দেখা দিতেছিল—সুতরাং ক্ষেত্র কতকটা প্রস্তুত ছিল। তাহা না থাকিলে শুদ্ধ কেবল একটা সাময়িক রাগারাগির মাথায় এই উদ্‌যোগ এমন অভাবনীয় বল পাইয়া উঠিত না।

কিন্তু সশস্ত্র ও নিরস্ত্র উভয়প্রকার যুদ্ধেই নিজের শক্তি ও দলবল বিচার করিয়া চলিতে হয়। আস্ফালন করাকেই যুদ্ধ করা বলে না। তা ছাড়া একমুহূর্তেই যুদ্ধং দেহি বলিয়া যে-পক্ষ রণক্ষেত্রে গিয়া দাঁড়ায় পরমুহূর্তেই তাহাকে ভঙ্গ দিয়া পালাইবার রাস্তা দেখিতে হয়। আমরা যখন দেশের পোলিটিকাল বক্তৃতাসভায় তাল ঠুকিয়া দাঁড়াইলাম, বলিলাম, এবার আমাদের লড়াই শুরু হইল, তখন আমরা নিজের অস্ত্রশস্ত্র-দলবলের কোনো হিসাবই লই নাই। তাহার প্রধান কারণ আমরা দেশকে যে যতই ভালোবাসি না কেন, দেশকে ঠিকমতো কেহ কোনোদিন জানি না।

চিরদিন আমাদিগকে দুর্বল বলিয়া ঘৃণা করিয়া আসাতে আমাদের প্রতিপক্ষ আমাদিগকে প্রথমে বিশেষ কোনো বাধা দেন নাই। মনে করিয়াছিলেন, এ সমস্তই কনগ্রেসি চাল, কেবল মুখের অভিমান, কেবল বাক্যের বড়াই।

কিন্তু যখন দেখা গেল, ঠিক কনগ্রেসের মলয়মারুতহিল্লোল নয়, দুটো একটা করিয়া লোকসানের দমকা বাড়িয়া উঠিতেছে তখন অপর পক্ষ হইতে শাসন-তাড়নের পালা পুরাদমে আরম্ভ হইল।

কিন্তু ইংরেজ আমাদিগকে যতই পর মনে করুক না কেন, প্রজাদের প্রতি হঠাৎ উৎপাত করিতে ইংরেজ নিজের কাছে নিজে লজ্জিত হয়। এ-প্রকার বেআইনি ভূতের কাণ্ড তাহাদের রাষ্ট্রনীতিপ্রথাবিরুদ্ধ। অল্পবয়সে অধীন জাতিকে শাসন করিবার জন্য যে-সব ইংরেজ এ-দেশে আসে তাহাদের মধ্যে এই ইংরেজি প্রকৃতি বিগড়িয়া যায়—এবং অধীন দেশের কর্তৃত্ব ধীরে ধীরে ইংরেজ জাতির মনকে আধিপত্যের নেশায় অভ্যস্ত করিয়া আনিতেছে। তবু আজিও ইংলণ্ডবাসী ইংরেজের মনে আইনের প্রতি একটা সম্ভ্রমের ভাব নষ্ট হয় নাই। এই কারণে অত্যন্ত ত্যক্ত হইয়া উঠিলেও ভারত-রাজ্যশাসন-ব্যাপারে হাঙ্গামার পালা সহজে আরম্ভ হয় না—ইংরেজই তাহাতে বাধা দেয়। এইজন্য ফুলার তাঁহার দলবল লইয়া একদা পূর্ববঙ্গে যেরূপ বে-ইংরেজি দাপাদাপি শুরু করিয়াছিলেন, তাহা ভদ্র ইংরেজ-পক্ষের দৃষ্টিতে বড়োই অশোভন হইয়া উঠিয়াছিল।

এখানকার ক্ষুদ্র ইংরেজদিগের ওই একটা ভারি মুশকিল আছে। তাহারা যখন খাপা হইয়া উঠিয়া আমাদের হাড় গুঁড়া করিয়া দিতে চায় তখন স্বদেশীয়ের সঙ্গেই তাহাদের ঠেলাঠেলি পড়ে। তাহারা বিলক্ষণ জানে আমাদের উপরে খুব কষিয়া হাত চালাইয়া লইতে কিছুমাত্র বীরত্বের দরকার করে না—কারণ অল্পে অল্পে আমাদেরই শিল এবং আমাদেরই নোড়া লইয়া আমাদেরই দাঁতের গোড়া একটি একটি করিয়া ভাঙিয়া দেওয়া হইয়াছে। অতএব তর্জনতাড়ন-ব্যাপারে হাত পাকাইবার এমন সম্পূর্ণ নিরাপদ ক্ষেত্র আমাদের দেশের মতো আর কোথাও নাই। কিন্তু সমুদ্রপারে যে-ইংরেজ বাস করিতেছে তাহাদের মধ্যে এখনও সেন্টিমেন্টের প্রভাব ঘোচে নাই, রাশিয়ান কায়দাকে লজ্জা করিবার সংস্কার এখনও তাহাদের আছে।

এই জন্য আমাদের মতো অস্ত্রহীন সহায়হীনেরা যখন কোনো একটা মর্মান্তিক আঘাত পাইয়া চাঞ্চল্য প্রকাশ করিতে থাকি, তখন ক্ষুদ্র ইংরেজের মধ্যে হাত-নিসপিস ও দাঁত-কিড়মিড়ের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হয়—তখন বৃহৎ ইংরেজের অবিচলিত সহিষ্ণুতা ও ঔদার্য তাহাদের কাছে অত্যন্ত অসহ্য হইতে থাকে। তাহারা বলে, ওরিয়েন্টালদের সঙ্গে

এ-রকম চাল ঠিক নয়—যেমন অস্ত্রশস্ত্র কাড়িয়া লইয়া ইহাদিগকে পৌরুষহীন করা হইয়াছে তেমনি টুঁটি চাপিয়া ধরিয়া ইহাদিগকে নির্বাক ও নিশ্চেষ্ট করিয়া রাখিলে তবে ইহারা নিজের ঠিক জায়গাটা বুঝিতে পারিবে।

এই কারণে বৃহৎ ইংরেজকে ভুলাইবার জন্য ক্ষুদ্র ইংরেজকে বিস্তর বাজে চাল চালিতে ও কাপুরুষতা অবলম্বন করিতে হয়। এই সমস্ত আধমরা লোকদিগকেও মারিবার জন্য মিথ্যা আয়োজন না করিলে চলে না; বোয়ার-যুদ্ধের পূর্বে এবং সেই সময়ে যে ভূরি ভূরি মিথ্যা গড়িয়া তোলা হইতেছিল তাহাও ইংরেজের সদ্‌বুদ্ধিকে পরাস্ত করিবার জন্য। কিন্তু আমরা যে এমন নিরুপায়, আমাদের সম্বন্ধেও গায়ের জ্বালা মিটাইতে এখানকার ক্ষুদ্র ইংরেজের দলকে যে এত ক্ষুদ্রতা প্রকাশ করিতে ও এত মিথ্যা খাড়া করিয়া তুলিতে হয় ইহাতে ইংরেজ ইংরেজকে হয়তো ভুলাইতে পারে কিন্তু এ-দেশের জনসাধারণের কাছে তাহাদের লজ্জা কিছুমাত্র ঢাকা পড়ে না। ইহাতে তাহাদের কাজ উদ্ধার হইতেও পারে কিন্তু চিরকালের মতো সম্ভ্রম নষ্ট হয়।

যাহা হউক এ সমস্তই যুদ্ধের চাল। বঙ্গবিভাগের সময় আমরা যখন কাঁদিয়া কাটিয়া কর্তাদের আসন তিলমাত্র নড়াইতে পারিলাম না তখন বয়কটের যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া দিলাম। এই স্পর্ধায় স্থানীয় ইংরেজের রক্ত আমরা যথেষ্ট গরম করিয়া তুলিয়াছি। তখন কি আমরা ঠাহরাইয়াছিলাম যুদ্ধ কেবল একপক্ষ হইতেই চলিবে, অপরপক্ষ শরশয্যা আশ্রয় করিবার অভিপ্রায়ে বুক পাতিয়া দিয়া দাঁড়াইয়া থাকিবে?

অপরপক্ষে অস্ত্র ধরিবে না এ-কথা মনে করিয়া যুদ্ধে নামা একটা কৌতুকের ব্যাপার, যদি না অশ্রুজলে তাহার পরিসমাপ্তি হয়। এখন দেখিতেছি আমরা সেই আশাই মনে রাখিয়াছিলাম। ইংরেজের ধৈর্যের উপরে, ইংরেজের আইনের উপরেই আমাদের সম্পূর্ণ ভরসা ছিল, নিজের শক্তির উপরে নহে। তাই যদি না হইবে, তবে আইনরক্ষকদের হাতে আইনের দণ্ড লেশমাত্র বিচলিত হইলেই, সামান্য দুই-একটা মাথা-কাটাকাটি ঘটিলেই আমরা এমন ভাব করি কেন, যেন মহাপ্রলয় উপস্থিত হইল? ভাবিয়া দেখো দেখি ইংরেজের উপরে আমাদের কতখানি শ্রদ্ধা কতখানি ভরসা জমিয়া উঠিয়াছে যে আমরা ঠিক করিয়া বসিয়াছিলাম যে, আমরা বন্দে মাতরম্‌ হাঁকিয়া তাহাদের দক্ষিণ হাতে আঘাত করিব তবু তাহাদের সেই হাতের ন্যায়দণ্ড অন্যায়ের দিকে কিছুমাত্র টলিবে না।

কিন্তু এই সত্যটা আমাদের জানা দরকার যে, ন্যায়দণ্ডটা মানুষের হাতেই আছে এবং ভয় বা রাগ উপস্থিত হইলেই সে-হাত টলে। আজ নিম্ন-আদালত হইতে শুরু করিয়া হাইকোর্ট পর্যন্ত স্বদেশী মামলায় ন্যায়ের কাঁটা যে নানা ডিগ্রির কোণ লইয়া

হেলিতেছে ইহাতে আমরা যতই আশ্চর্য হইতেছি ততই দেখা যাইতেছে আমরা হিসাবে ভুল করিয়াছিলাম।

অবশ্য তর্কে জিতিলেই যদি জিত হইত তবে এ-কথা বলা চলিত যে, রাগদ্বেষের দ্বারা আইনকে টলিতে দেওয়া উচিত নহে, তাহাতে অধর্ম হয়, অনিষ্ট হয় ইত্যাদি—এ সমস্তই সদ্‌যুক্তি তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহার উপর ভর দিয়া একেবারে দুই চক্ষু বুজিয়া থাকিলে চলে না। যাহা ঘটে, যাহা ঘটিতে পারে, যাহা স্বভাবসংগত, আমরা দুর্বল বলিয়াই যে আমাদের ভাগ্যে তাহার অন্যথা হইবে বিধাতার উপরে আমাদের এত-বড়ো কোনো দাবি নাই। সমস্ত বুঝিয়া, জোয়ারভাঁটা রৌদ্রবৃষ্টি সমস্ত বিচার ও স্বীকার করিয়া লইয়া যদি আমরা যাত্রা আরম্ভ করি তবে নৌকা লেশমাত্র টলিলেই অমনি যেন একটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটিল বলিয়া একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া পড়ি না।

অতএব গোড়ায় একটা সত্য আমাদিগকে মনে রাখিতেই হইবে যে, যে-কোনো কারণেই এবং যে-কোনো উপায়েই হউক ইংরেজের যদি আমরা কোনো ক্ষতি করিতে যাই তবে ইংরেজ তাহার প্রতিকারের চেষ্টা করিবেই এবং সে-চেষ্টা আমাদের সুখকর হইবে না। কথাটা নিতান্তই সহজ কিন্তু স্পষ্টই দেখা যাইতেছে এই সহজ কথাটা আমরা বিচার করি নাই এবং আমরা যখন উচ্চস্বরে নিজের বড়াই করিতেছিলাম তখন ইংরেজের মহত্ত্বের প্রতি উচ্চস্বরে আমাদের অটল শ্রদ্ধা ঘোষণা করিতেছিলাম—ইহাতে আমাদের সুবুদ্ধি অথবা পৌরুষ কোনোটারই প্রমাণ হয় নাই।

এই তো দেখিতেছি যুদ্ধের আরম্ভে আমরা বিপক্ষকে ভুল বুঝিয়াছিলাম, তার পরে আত্মপক্ষকে যে ঠিক বুঝি নাই সে-কথাও স্বীকার করিতে হইবে।

আজ আমরা সকলেই এই কথা বলিয়া আক্ষেপ করিতেছি যে, ইংরেজ মুসলমানদিগকে গোপনে হিন্দুর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া দিতেছে। কথাটা যদি সত্যই হয় তবে ইংরেজের বিরুদ্ধে রাগ করিব কেন ? দেশের মধ্যে যতগুলি সুযোগ আছে ইংরেজ তাহা নিজের দিকে টানিবে না ইংরেজকে আমরা এতবড়ো নির্বোধ বলিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিব এমন কী কারণ ঘটিয়াছে ?

মুসলমানকে যে হিন্দুর বিরুদ্ধে লাগানো যাইতে পারে এই তথ্যটাই ভাবিয়া দেখিবার বিষয়, কে লাগাইল সেটা তত গুরুতর বিষয় নয়। শনি তো ছিদ্র না পাইলে প্রবেশ করিতে পারে না ; অতএব শনির চেয়ে ছিদ্র সম্বন্ধেই সাবধান হইতে হইবে। আমাদের মধ্যে যেখানে পাপ আছে শত্রু সেখানে জোর করিবেই—আজ যদি না করে তো কাল করিবে, এক শত্রু যদি না করে তো অন্য শত্রু করিবে—অতএব শত্রুকে দোষ না দিয়া পাপকেই ধিক্‌কার দিতে হইবে।

হিন্দু-মুসলমানের সম্বন্ধ লইয়া আমাদের দেশের একটা পাপ আছে। এ পাপ অনেকদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। ইহার যা ফল তাহা না ভোগ করিয়া আমাদের কোনো মতেই নিষ্কৃতি নাই।

অভ্যস্ত পাপের সম্বন্ধে আমাদের চৈতন্য থাকে না। এইজন্য সেই শয়তান যখন উগ্রমূর্তি ধরিয়া উঠে তখন সেটাকে মঙ্গল বলিয়াই জানিতে হইবে। হিন্দু মুসলমানের মাঝখানটাতে কতবড়ো যে একটা কলুষ আছে এবার তাহা যদি এমন একান্ত বীভৎস আকারে দেখা না দিত তবে ইহাকে আমরা স্বীকারই করিতাম না, ইহার পরিচয়ই পাইতাম না।

পরিচয় তো পাইলাম কিন্তু শিক্ষা পাইবার কোনো চেষ্টা করিতেছি না। যাহা আমরা কোনোমতেই দেখিতে চাই নাই বিধাতা দয়া করিয়া আমাদিগকে কানে ধরিয়া দেখাইয়া দিলেন—তাহাতে আমাদের কর্ণমূল আরক্ত হইয়া উঠিল, অপমান ও দুঃখের একশেষ হইল;—কিন্তু দুঃখের সঙ্গে শিক্ষা যদি না হয় তবে দুঃখের মাত্রা কেবল বাড়িতেই থাকিবে।

আর মিথ্যাকথা বলিবার কোনো প্রয়োজন নাই। এবার আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে হিন্দু-মুসলমানের মাঝখানে একটা বিরোধ আছে। আমরা যে কেবল স্বতন্ত্র তাহা নয়। আমরা বিরুদ্ধ।

আমরা বহুশত বৎসর পাশে পাশে থাকিয়া এক খেতের ফল, এক নদীর জল, এক সূর্যের আলোক ভোগ করিয়া আসিয়াছি, আমরা এক ভাষায় কথা কই, আমরা একই সুখদুঃখে মানুষ—তবু প্রতিবেশীর সঙ্গে প্রতিবেশীর যে-সম্বন্ধ মনুষ্যোচিত, যাহা ধর্মবিহিত, তাহা আমাদের মধ্যে হয় নাই। আমাদের মধ্যে সুদীর্ঘকাল ধরিয়া এমন একটি পাপ আমরা পোষণ করিয়াছি যে একত্রে মিলিয়াও আমরা বিচ্ছেদকে ঠেকাইতে পারি নাই। এ পাপকে ঈশ্বর কোনোমতেই ক্ষমা করিতে পারেন না।

আমরা জানি বাংলাদেশের অনেক স্থানে এক ফরাশে হিন্দু-মুসলমানে বসে না—ঘরে মুসলমান আসিলে জাজিমে এক অংশ তুলিয়া দেওয়া হয়, হুঁকার জল ফেলিয়া দেওয়া হয়।

তর্ক করিবার বেলায় বলিয়া থাকি, কী করা যায় শাস্ত্র তো মানিতে হইবে। অথচ শাস্ত্রে হিন্দু-মুসলমান সম্বন্ধে পরস্পরকে এমন করিয়া ঘৃণা করিবার তো কোনো বিধান দেখি না। যদি বা শাস্ত্রের সেই বিধানই হয় তবে সে-শাস্ত্র লইয়া স্বদেশ-স্বজাতি-স্বরাজের প্রতিষ্ঠা কোনোদিন হইবে না। মানুষকে ঘৃণা করা যে-দেশে ধর্মের নিয়ম, প্রতিবেশীর হাতে জল খাইলে যাহাদের পরকাল নষ্ট হয়, পরকে অপমান করিয়া

যাহাদিগকে জাতিরক্ষা করিতে হইবে, পরের হাতে চিরদিন অপমানিত না হইয়া তাহাদের গতি নাই। তাহারা যাহাদিগকে ম্লেচ্ছ বলিয়া অবজ্ঞা করিতেছে সেই ম্লেচ্ছের অবজ্ঞা তাহাদিগকে সহ্য করিতে হইবেই।

মানুষকে মানুষ বলিয়া গণ্য করা যাহাদের অভ্যাস নহে, পরস্পরের অধিকার যাহারা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিবার কাজেই ব্যাপৃত; যাহারা সামান্য স্খলনেই আপনার লোককে ত্যাগ করিতেই জানে, পরকে গ্রহণ করিতে জানে না; সাধারণ মানুষের প্রতি সামান্ত শিষ্টতার নমস্কারেও যাহাদের বাধা আছে; মানুষের সংসর্গ নানা আকারে বাঁচাইয়া চলিতে যাহাদিগকে সর্বদাই সতর্ক হইয়া থাকিতে হয় মনুষ্যত্ব হিসাবে তাহাদিগকে দুর্বল হইতেই হইবে। যাহারা নিজেকেই নিজে খণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছে, ঐক্যনীতি অপেক্ষা ভেদবুদ্ধি যাহাদের বেশি, দৈন্ত অপমান ও অধীনতার হাত হইতে তাহারা কোনোদিন নিষ্কৃতি পাইবে না।

যাহা হউক "বয়কট"-যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া আমরা বাহির হইলাম এবং দেশধর্মগুরুর নিকট হইতে স্বরাজমন্ত্রও গ্রহণ করিলাম; মনে করিলাম এই সংগ্রাম্ ও সাধনার যত-কিছু বাধা সমস্তই বাহিরে, আমাদের নিজেদের মধ্যে আশঙ্কার কারণ কিছুই নাই। এমন সময় হঠাৎ আমাদের ভিতরকার বিচ্ছিন্ন অবস্থা বিধাতা এমন সুকঠোর সুস্পষ্ট আকারে দেখাইয়া দিলেন যে, আমাদের চমক লাগিয়া গেল। আমরা নিজেরাই নিজেদের দলনের উপায়, অগ্রসর হইবার প্রতিবন্ধক, এ-কথা যখন নিঃসংশয়রূপে ধরা পড়িল তখন এই কথাই আমাদিগকে বলিতে হইবে যে, স্বদেশকে উদ্ধার করিতে হইবে; কিন্তু কাহার হাত হইতে? নিজেদের পাপ হইতে।

ইংরেজ সমস্ত ভারতবর্ষের কাঁধের উপরে এমন করিয়া যে চাপিয়া বসিয়াছে সে কি কেবল নিজের জোরে? আমাদের পাপই ইংরেজের প্রধান বল। ইংরেজ আমাদের ব্যাধির একটা লক্ষণ মাত্র; লক্ষণের দ্বারা ব্যাধির পরিচয় পাইয়া ঠিকমতো প্রতিকার করিতে না পারিলে গায়ের জোরে অথবা বন্দেমাতরম্ মন্ত্র পড়িয়া সন্নিপাতের হাত এড়াইবার কোনো সহজ পথ নাই।

বিদেশী রাজা চলিয়া গেলেই দেশ যে আমাদের স্বদেশ হইয়া উঠিবে তাহা নহে। দেশকে আপন চেষ্টায় আপন দেশ করিয়া গড়িয়া তুলিতে হয়। অন্নবস্ত্র-সুখস্বাস্থ্য-শিক্ষাদীক্ষাদানে দেশের লোকই দেশের লোকের সর্বপ্রধান সহায়, দুঃখে বিপদে দেশের লোকই দেশের জন্ত প্রাণপণ করিয়া থাকে ইহা যেখানকার জনসাধারণে প্রত্যক্ষভাবে জানে সেখানে স্বদেশ যে কী তাহা বুঝাইবার জন্ত এত বকাবকি করিতে হয় না। আজ আমাদের ইংরেজিপড়া শহরের লোক যখন নিরক্ষর গ্রামের লোকের কাছে গিয়া

চেষ্টার যুগে আছে, এ-কথা যখন তাহার ব্যবহারে বুঝা যাইতেছে তখন দেশের যে-সকল যুবক উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছেন তাঁহাদের প্রতি একটিমাত্র পরামর্শ এই আছে, সমস্ত উত্তেজনাকে নিজের অস্থিমজ্জার মধ্যে নিস্তব্ধভাবে আবদ্ধ করিয়া ফেলো, স্থির হও, কোনো কথা বলিয়ো না, অহরহ অত্যুক্তিপ্রয়োগের দ্বারা নিজের চরিত্রকে দুর্বল করিয়ো না। আর কিছু না পার খবরের কাগজের সঙ্গে নিজের সমস্ত সম্পর্ক ঘুচাইয়া যে-কোনো একটি পল্লীর মাঝখানে বসিয়া যাহাকে কেহ কোনোদিন ডাকিয়া কথা কহে নাই তাহাকে জ্ঞান দাও, আনন্দ দাও, আশা দাও, তাহার সেবা করো, তাহাকে জানিতে দাও মানুষ বলিয়া তাহার মাহাত্ম্য আছে, সে জগৎসংসারের অবজ্ঞার অধিকারী নহে। অজ্ঞান তাহাকে নিজের ছায়ার কাছেও ত্রস্ত করিয়া রাখিয়াছে; সেই সকল ভয়ের বন্ধন ছিন্ন করিয়া তাহার বক্ষপট প্রশস্ত করিয়া দাও। তাহাকে অন্যায় হইতে, অনশন হইতে, অন্ধসংস্কার হইতে রক্ষা করো। নূতন বা পুরাতন কোনো দলেই তোমার নাম না জানুক, যাহাদের হিতের জন্য আত্মসমর্পণ করিয়াছ প্রতিদিন তাহাদের প্রতি অবজ্ঞা ও অবিশ্বাস ঠেলিয়া এক পা এক পা করিয়া সফলতার দিকে অগ্রসর হইতে থাকো। মিথ্যা আত্মপ্রকাশে আমরা যে-শক্তি কেবলই নষ্ট করিতেছি, সত্য আত্মপ্রয়োগে তাহাকে খাটাইতে হইবে। ইহাতে লোকে যদি আমাদিগকে সামান্য বলিয়া ছোটো বলিয়া অপবাদ দেয় উপহাস করে তবে তাহা অম্লানবদনে স্বীকার করিয়া লইবার বল যেন আমাদের থাকে। আমরা যে সামান্য কেহ নহি, আমরা যে কিছু-একটা করিতেছি ইহাই পরের কাছে দিনরাত প্রমাণ করিবার জন্য পাঁচকে পনেরো করিয়া ফলাইয়া কেবলই সাগরপারে টেলিগ্রাফ করাকেই নিজের একমাত্র কাজ বলিয়া যেন না মনে করি। দেশের এক-একটি জায়গায় এক-একটি মানুষ বিরলে বসিয়া নিজের সমস্ত জীবন দিয়া যে-কোনো একটি কর্মকে গড়িয়া তুলিয়া প্রতিষ্ঠিত করিতে থাকুন—এই আমাদের সাধনা। আমরা কিছুই গড়িয়া তুলিতে পারি না, আমাদের হাতে সমস্তই বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে, আমরা কর্মের নানা সূত্রকে টানিয়া বাঁধিয়া রাশ বাগাইয়া নিজের হাতে দৃঢ় করিয়া ধরিতে পারি না—এই কারণেই আমরা কামনা করি কিন্তু সাধনার বেলা চোখে অন্ধকার দেখিতে থাকি—কেবল সমিতির অধিবেশনে অতি সূক্ষ্ম নিয়মাবলী রচনা লইয়া আমাদের তর্কবিতর্কের অন্ত থাকে না, কিন্তু নিয়ম খাটাইয়া বাধা কাটাইয়া সিদ্ধির পথে চলিবার দৃঢ় সংকল্পশক্তি আপনার মধ্যে খুঁজিয়া পাই না। চরিত্রের এই দৈন্য আমাদিগকে ঘুচাইতে হইবে। উত্তেজনার দ্বারা তাহা ঘুচে না—কারণ উত্তেজনা আড়ম্বরের কাঙাল—এবং আড়ম্বর কর্ম নষ্ট করিবার শয়তান। আজ নানা স্থানে নানা কাজ লইয়া আমরা নানা লোকে যদি লাগিয়া থাকি তবেই গড়িয়া তুলিবার অভ্যাস

আমাদের পাকা হইতে হইবে। এমনি করিয়াই ভিতরে ভিতরে স্বদেশ গড়িয়া উঠিবে এবং স্বরাজগঠনের যথার্থ অবকাশ একদিন উপস্থিত হইবে। তখন সত্য উপকরণ ও প্রকৃত লোকের অভাব কেবলমাত্র কথার জোরে ঢাকিয়া দিবার কোনো প্রয়োজন থাকিবে না।

এ-কথা নিশ্চয় জানি অপমানের ক্ষোভে ব্যর্থ আশার আঘাতে আমাদের আত্মাভিমান জাগিয়া উঠে; এবং সেই আত্মাভিমান আমাদের আত্মশক্তি উদ্বোধনের একটা উপায়। বঙ্গবিভাগের বিরুদ্ধে বাঙালির সকল চেষ্টার নিষ্ফলতা যখন সুস্পষ্ট আকারে আমাদের কাছে প্রত্যক্ষগোচর হইল তখন আমাদের অভিমান আলোড়িত হইয়া উঠিল। এই অভিমানের তাড়নায় আমরা নিজেকে প্রবল বলিয়া প্রমাণ করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। অতএব ইহার মধ্যে যে মঙ্গলটুকু আছে তাহাকে অস্বীকার করিতে পারি না।

কিন্তু ইহার মধ্যে বিপদের কথাটা এই যে, অভিমানের সঙ্গে যদি ধৈর্যের দৃঢ়তা না থাকে তবে পরিণামে তাহা আমাদের দুর্বলতার কারণ হইবে। চরিত্রের জোর থাকিলে অভিমানকে আত্মসাৎ করিয়া আপনার শক্তিকে স্থায়ী ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সংকল্প জন্মে, কারণ, যতক্ষণ শক্তি সত্য হইয়া না উঠে ততক্ষণ অভিমানকে অতিমাত্রায় প্রকাশ করিতে থাকা লজ্জাকর এবং তাহা কেবল ব্যর্থতাই আনয়ন করে। নিজের আবেগের আতিশয্যকে এইরূপ নিষ্ফলভাবে অসময়ে প্রকাশ করিয়া বেড়ানো শিশুকেই শোভা পায়। অভিমান যখন বিলম্ব সহিতে না পারে, তখন তাহা কর্মকে তেজ না দিয়া কর্মের অঙ্কুরকে ছারখার করিয়া ফেলে। যেদিন হইতে আমাদের মনে রাগ হইল সেইদিন হইতেই আমরা আকাশ কাঁপাইয়া বড়াই করিতে আরম্ভ করিয়াছি, আমরা এ করিব, সে করিব, আমরা ম্যাঞ্চেস্টরের রুটি বন্ধ করিব, লিভারপুলের দুই চক্ষু জলে ভাসাইয়া দিব। অথচ মনে মনে আমাদের ভরসাস্থল কী? ইংরেজেরই আইন, ইংরেজেরই সহিষ্ণুতা। আইন বিচলিত হইলেই আমরা বলি এ যে মগের মুল্লুক হইল— মর্লির মুখে লিবারেল নীতির উলটা কথা শুনিলেই আমরা বলি এ কি পুবের সূর্য পশ্চিমে উঠিল।

আমার নিবেদন এই এমন অবস্থায় অভিমানকে নিজের মধ্যে দমন করিতে হইবে। সেই সংযত অভিমান মনের তলদেশ হইতে আমাদের শক্তির শিকড়ের মধ্যে তেজ সঞ্চার করিবে। এতদিন যে-সমস্ত কাজ আমাদের চেষ্টাকে টানিতে পারিত না, সেই সমস্ত কাজে আজ মন দিবার মতো ধৈর্য আমাদের জন্মিবে।

কাজের কি অন্ত আছে। আমরা কিছুই কি করিয়াছি। একবার সত্য করিয়া

ভাবিয়া দেখো দেশ আমাদের হইতে কত দূরে, কত সুদূরে। আমাদের "ঘর হইতে আঙিনা বিদেশ।" সমস্ত ভারতবর্ষের কথা ভাবিলে তো মাথা ঘুরিয়া যায়—শুদ্ধমাত্র বাংলাদেশের সঙ্গেও আমাদের সম্পর্ক কত ক্ষীণ। এই বাংলাদেশও জ্ঞানে প্রেমে কর্মে আমাদের প্রত্যেকের হইতে কতই দূরে। ইহার জন্য আমরা কতটুকুই বা দিতেছি, কতটুকুই বা করিতেছি এবং ইহাকে জানিবার জন্যই বা আমাদের চেষ্টা কত সামান্য। নিজের মন এবং ব্যবহার সত্যরূপে আলোচনা করিয়া সত্য করিয়া বলো দেশের প্রতি আমাদের ঔদাসীন্য কী সুগভীর। ইহার কোন্ দুঃখে কোন্ অভাবে কোন্ সৌন্দর্যে কোন্ সম্পদে আমাদের চিত্তকে এমন করিয়া আকর্ষণ করিয়াছে যে নানাদিক হইতে আমাদের নানা লোক তাহার প্রতি আপন সময় ও সামর্থ্যের বহুল অংশ ব্যয় করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। আমরা শিক্ষিত কয়েকজন এবং আমাদের দেশের বহুকোটি লোকের মাঝখানে একটা মহাসমুদ্রের ব্যবধান। ত্রেতাযুগের সেতুবন্ধনে কাঠবিড়ালি যতটুকু কাজ করিয়াছিল আমাদের মাঝখানের এই সমুদ্রে সেতু বাঁধিতে আমরা ততটুকুও করি নাই। সকল বিষয়ে সকল কাজই বাকি পড়িয়া আছে।

অথচ এমন সময়ে আমাদের মনে দুর্দান্ত অভিমান জাগিয়া উঠিয়াছে। ইংরেজকে ডাকিয়া বুক ফুলাইয়া বলিতে ইচ্ছা করিতেছে, আমরা সম্পূর্ণ সক্ষম, সমর্থ, প্রস্তুত। আমরা কোনোমতেই তোমাদের অবজ্ঞার পাত্র নই। তোমরা যদি আমাদিগকে অবজ্ঞা কর আমরাও তোমাদিগকে অবজ্ঞা করিতে পারি।

এই কটা কথা খুব জোরে বলিবার সুখই যদি আমাদের দেশের পক্ষে যথেষ্ট হয় তবে এই পালাই চলুক। কিন্তু এখনই আমরা সমস্তই পারি এই ভুলটা প্রচার করিয়া ও বিশ্বাস করিয়া ভবিষ্যতে আমরা যাহা পারিব তাহার গোড়া যদি মারিয়া দিই তবে আমাদের অদ্যকার সমস্ত আস্ফালন একদিন তিতুমীরের লড়াইয়ের সঙ্গে এক ইতিহাসে ভুক্ত হইবে।

বড়াই করিয়া নিজের ও অন্যের কাছে দুর্বলতা ঢাকিতে গিয়া সেই দুর্বলতাকে প্রতিপদে সপ্রমাণ করিতে থাকিলে এমন একদিন আসিবে যেদিন আমরা নিজেকে অন্যায়রূপে অবিশ্বাস করিব—নিজের মধ্যে যে-সম্ভাব্যতা আছে তাহাকে অস্বীকার করিব—স্বজাতিকে গালি পাড়িয়া নিষ্কর্মতাকে আড়ম্বরপূর্বক আশ্রয় করিব—অকালে উৎপীড়ন সহ্য করিয়া আরামের মধ্যে হাল ছাড়িয়া দিতে চেষ্টা করিব। অতএব পুরুষোচিত ধৈর্যের সহিত অভিমানের প্রমত্ততাকে একেবারে দূর করিয়া কাজে প্রবৃত্ত হইবে। দেশ আজ আমাদিগকে এই কথা বলিতেছে যে, আমরা কতখানি রাগ করিয়াছি আমরা কতবড়ো ভয়ংকর সে-আলোচনায় কাহারও কোনো লাভ নাই; কার্জন

আমাদিগকে কেমন করিয়া মারিয়াছেন এবং মর্লি আমাদের কান্নার উপর কতবড়ো অন্যায় ধমকটা দিলেন সে-কথা লইয়া অনবরত এক সভা হইতে আর-এক সভায় এক কাগজ হইতে আর-এক কাগজে মুষলধারে অশ্রুবর্ষণ করিয়া কোনো ফল নাই। এখন স্পষ্ট করিয়া বলো কী কাজ করিতে হইবে? আচ্ছা মানিলাম স্বরাজই আমাদের শেষলক্ষ্য, কিন্তু কোথাও তো তাহার একটা শুরু আছে, সেটা একসময়ে তো ধরাইয়া দিতে হইবে। স্বরাজ তো আকাশকুসুম নয়, একটা কার্যপরম্পরার মধ্য দিয়া তো তাহাকে লাভ করিতে হইবে—নূতন বা পুরাতন বা যে-দলই হউন তাঁহাদের সেই কাজের তালিকা কোথায়, তাঁহাদের প্ল্যান কী, তাঁহাদের আয়োজন কী? কর্মশূন্য উত্তেজনায় এবং অক্ষম আস্ফালনে একদিন একান্ত ক্লান্তি ও অবসাদ আনিবেই—ইহা মনুষ্যস্বভাবের ধর্ম—কেবলই মদ জোগাইয়া আমাদিগকে সেই বিপদের মধ্যে যেন লইয়া যাওয়া না হয়। যে-অসংযম চরিত্রদুর্বলতার বিলাসমাত্র তাহাকে সবলে ঘৃণা করিয়া কর্মের নিঃশব্দ নিষ্ঠার মধ্যে আপন পৌরুষকে নিবিষ্ট করিবার সময় আসিয়াছে—এ-সময়কে যেন আমরা নষ্ট না করি।

১৩১৪

যজ্ঞভঙ্গ

কনগ্রেস তো ভাঙিয়া গেল।

এবারকার কনগ্রেসে একটা উপদ্রব ঘটিবে এ-আশঙ্কা সকল পক্ষেরই মনে পূর্বে হইতেই জাগিয়াছে কিন্তু ঠিকমতো প্রতিকারের চেষ্টা কোনো পক্ষই করেন নাই। দুই দলই কেবল নিজের বলবৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিয়াছেন অর্থাৎ উপদ্রবের সংঘাতটা যাহাতে অত্যন্ত বাড়িয়া উঠে, সেইরূপ আয়োজন হইয়াছিল।

সমস্ত দেশকে লইয়া যে-যজ্ঞের অনুষ্ঠান হয় সেই যজ্ঞের কর্তারা কে কোন্ বক্তৃতার বিষয় কেমন করিয়া বলিবেন বা লিখিবেন তাহাই ঠিক করিয়া খালাস পাইতে পারেন না। চারিদিকের অবস্থা বিচক্ষণতার সঙ্গে বিচার করিয়া তদনুসারে কাজের ব্যবস্থা করার ভার তাঁহাদের উপর। কোনো কারণে কর্ম নষ্ট হইলে সেই কারণটাকে গালি দিয়া তাঁহারা নিষ্কৃতি পাইতে পারিবেন না। বারুদের ভাণ্ডারে দেশলাই জালাইতে দিলে অগ্নিকাণ্ড ঘটে ইহাতে সন্দেহ নাই—এরূপ দুর্ঘটনা ঘটিলে হয় দেশলাই

না হয় বারুদকেই কর্তৃপক্ষেরা আসামির দলে দাঁড় করাইয়া থাকেন—জগতের সর্বত্রই তাহার প্রমাণ দেখা যায়। মণিপুরী হত্যাকাণ্ড যাঁহারা ঘটাইয়াছিলেন, মণিপুরীদের দণ্ড দিয়া তাঁহারা ধর্মবুদ্ধিকে তৃপ্ত করিয়াছেন এবং আজ বাংলাদেশে যে বিচিত্র রকমের উৎপাত বাধিয়া উঠিয়াছে সেজন্য বাঙালিকেই বন্ধনপীড়ন সহ্য করিতে হইতেছে ওদিকে কার্জন ও মর্লির জয়ধ্বনির বিরাম নাই।

বস্তুত বারুদকে ও দেশলাইকে যাহারা সত্য বলিয়া জানে ও স্বীকার করে তাহারা এই দুটোর সংস্রবকে ঠেকাইবার জন্য সর্বপ্রকার উপায় উদ্‌ভাবন করিয়া থাকে। দোষ যাহারই হউক বা রাগ যাহার 'পরেই থাক্ সে-কথা লইয়া গরম না হইয়া হাতের কাজটা কী করিলে সিদ্ধ হয় এই ব্যবস্থা করিবার জন্যই তাহারা তৎপর হয়।

এবারকার কনগ্রেসের যাঁহারা অধ্যক্ষ ছিলেন তাঁহারা অপ্রিয় বা বিরুদ্ধ সত্যকে স্বীকার করিবেন না বলিয়া ঘর হইতে পণ করিয়া আসিয়াছিলেন। স্বীকার করিলেই পাছে তাহাকে খাতির করা হয় এই তাঁহাদের আশঙ্কা।

চরমপন্থী বলিয়া একটা দল যে-কারণেই হউক দেশে জাগিয়া উঠিয়াছে এ-কথা লইয়া আক্ষেপ করিতে পার কিন্তু ইহাকে অস্বীকার করিতে পার না। এই দলের ওজন কতটা তাহা বুঝিয়া তোমাকে চলিতেই হইবে। কিন্তু যখন স্বয়ং সভাপতি-মহাশয়ের মন্তব্যেও এই দলের প্রতি কটাক্ষপাত করা হইয়াছিল তখন স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে তিনি নিজের বিরক্তিপ্রকাশকেই কর্তব্যসিদ্ধি বলিয়া মনে করিয়াছেন—অবস্থা বিচার করিয়া মার বাঁচাইয়া কনগ্রেসের জাহাজকে কূলে পৌঁছাইয়া দেওয়া সম্বন্ধে তাঁহার চিন্তা ছিল না। ইহা যে ওকালতি নহে, বিরুদ্ধ পক্ষকে বক্তৃতার গদাঘাতে পাড়িয়া ফেলাই যে এই বৃহৎ কাজের পরিণাম নহে, দেশের সকল মতের লোককে একত্রে টানিয়া সকলেরই শক্তিকে দেশের মঙ্গলসাধনে নিয়োগ করিতে উৎসাহিত করাই যে ইহার সকলের চেয়ে বড়ো উদ্দেশ্য তাহা সাময়িক উত্তেজনায় তিনি মনে রাখেন নাই। তিনি এমন ভাবে কনগ্রেসের হালের কাছে দাঁড়াইয়াছিলেন যেন ওই চরমপন্থীর দলটা জলের একটা ঢেউমাত্র, উহা পাহাড় নহে, যেন কেবল প্রবল বাক্যবায়ুতে পাল উড়াইয়াই উহাকে ডিঙাইয়া যাওয়া চলিবে।

আবার চরমপন্থীরাও এমনভাবে কোমর বাঁধিয়া কনগ্রেসের রণক্ষেত্রের মধ্যে প্রবেশ করিলেন যেন, যে-মধ্যমপন্থীরা এতদিন ধরিয়া কনগ্রেসকে চালনা করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহারা এমন একটা বাধা যাহাকে ঠেলিয়া অভিভূত করিয়া চলিয়া যাইবেন, ইহাতে যাহা হয় তা হ'ক। এবং এটা এখনই করিতে হইবে—এইবারেই জয়ধ্বজা উড়াইয়া না গেলেই নয়। দেশের মধ্যে এবং কনগ্রেসের সভায় মধ্যমপন্থীর স্থানটা যে কী তাহা

সম্পূর্ণভাবে এবং ধীরতার সহিত স্বীকার না করিবার জন্য মনের মধ্যে যেন প্রচণ্ড আগ্রহ।

এই যে লুব্ধতা, এই যে অন্ধ নির্বন্ধ ইহা যদি দলবর্তী সাধারণ লোকের মধ্যেই বদ্ধ থাকে তাহা হইলে সেটাকে মার্জনীয় বলিয়া গণ্য করা যায়—কিন্তু যাঁহারা দলের কর্তৃপদে আছেন তাঁহারাও যদি না বুঝেন কোন্‌খানে রাশ টানিলে অগ্রসর হওয়া সহজ হয়, এবং কোন্‌খানে হার মানিলে তবেই যথার্থ জিতের সম্ভাবনা ঘটে, তবে ইহাই বলিতে হইবে সংসারে যাঁহারা বড়ো জিনিসকে গড়িয়া তুলিতে পারেন, যাঁহারা কার্যসিদ্ধির লক্ষ্যকে কোনোমতেই ভুলিতে পারেন না ইঁহারা সে-দলের লোক নহেন। ইঁহারা কবির লড়াইয়ের দলের মতো উপস্থিত বাহবা ও দুয়োকে অত্যন্ত বড়ো করিয়া দেখেন—দায়িত্বদৃষ্টিকে অবিচলিত ধৈর্যের সহিত সুদূরে প্রসারিত করেন না।

বিরুদ্ধ পক্ষের সত্তাকে যথেষ্ট সত্য বলিয়া স্বীকার না করিবার চেষ্টাতেই এবার কনগ্রেস ভাঙিয়াছে। এক গাড়ির এঞ্জিন যদি সামনের গাড়ির এঞ্জিনকে একেবারে নাই বলিতে চায়, এমন কি, ঠেকাঠেকি হইলেও তখনও পরস্পরকে অস্বীকার করিয়া যদি স্টীম চড়াইয়া দেওয়াকেই নিজের পথ খোলসার উপায় বলিয়া মনে করে তবে একটা চুরমার ব্যাপার না বাধিয়া থাকিতে পারে না। এ-অবস্থায় যাঁহারা চালক তাঁহাদিগকে প্রশংসাপত্র দেওয়া চলে না।

মধ্যমপন্থী ও চরমপন্থী এই উভয় দলই কনগ্রেস অধিকার করাকেই যদি দেশের কাজ করা বলিয়া একান্তভাবে না মনে করিতেন, যদি দেশের সত্যকার কর্মক্ষেত্রে ইঁহারা প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে থাকিতেন—দেশের শিক্ষা-স্বাস্থ্য-অন্নের অভাব মোচন করিবার জন্য যদি ইঁহারা নিজের শক্তিকে নানা পথে অহরহ একাগ্রমনে নিয়োজিত করিয়া রাখিতেন, দেশহিতের সত্যকার সাধনা ও সত্যকার সিদ্ধি কাহাকে বলে তাহার স্বাদ যদি পাইতেন এবং দেশের জনসাধারণের সঙ্গে কায়মনোবাক্যে যোগ দিয়া দেশের প্রাণকে দেশের শক্তিকে প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করিতেন তাহা হইলে কনগ্রেস-সভার মঞ্চ জিতিয়া লইবার চেষ্টায় এমন উন্মত্ত হইয়া উঠিতেন না। কনগ্রেসে হার হইলেও দেশের মধ্যে হার হয় না;—শনৈঃ শনৈঃ প্রত্যহ প্রত্যেকের অশ্রান্ত চেষ্টায় দেশের হৃদয়ের মধ্য দিয়া পথ করিয়া চলিলে তবেই তাহাকে চলা বলে এবং সেই পথের চরম গম্যস্থান সভাপতির আসন নহে, এমন কি, ওই মঞ্চটা তাহার পান্থশালাও নহে।

আর যদিই মনে কর কনগ্রেসের কর্তৃত্বলাভ দেশহিতসাধনের একটা চরিতার্থতা তবে কি এতবড়ো একটা সম্পদকে এমন অধৈর্য ও প্রমত্ততার সহিত কাড়াকাড়ি করিতে হয়। ইহাতে যাহাকে চাই তাহাকেই কি অপমান করা হয় না?

কাজির বিচারের কথা মনে আছে? দুই স্ত্রীলোক যখন একটি ছেলেকে নিজের ছেলে বলিয়া কাজির কাছে নালিশ করিয়াছিল তখন কাজি বলিয়াছিলেন ছেলেটাকে দুইভাগে কাটিয়া দুইজনকে দেওয়া হউক। এই কথা শুনিয়া যথার্থ মা বলিয়া উঠিল ছেলে আমি চাই না অপরকেই দেওয়া হউক। যে যথার্থ মা সে ছেলেকে নষ্ট করার চেয়ে নিজের দখল ত্যাগ করা এবং মকদ্দমায় হার মানা অনায়াসে স্বীকার করে।

এবারকার কাজির বিচারে কী দেখা গেল? দুই দিকেরই এই জিদ যে বরং কনগ্রেস ভাঙিয়া যায় সেও ভালো তবু হার মানিব না। ইহাতে এই প্রমাণ হয় কোনো পন্থীই কনগ্রেসকে তেমন সত্য ও তেমন বড়ো করিয়া মনে করেন না। ইহা যে একটা জীবধর্মী পদার্থ, বিচ্ছিন্ন হইলে ইহার প্রাণহানি ও আঘাত লাগিলে ইহা দুর্বল হয় তাহা কেহ নিজের প্রাণের মধ্যে তেমন করিয়া অনুভব করেন না। তাহার কারণ কি এই নহে এই জিনিসটাকে বিশ বৎসর তা' দিয়াও ইহার মধ্যে প্রাণপদার্থের পরিচয় পাওয়া যায় নাই? সেইজন্যই ইহা আমাদের দেশকে ত্যাগে, ধৈর্যে দীক্ষিত করে নাই। আমাদের 'পরে এইজন্যই কনগ্রেসের দাবি অত্যন্ত দুর্বল—ইহা অতি অল্পও যেটুকু ভয়ে ভয়ে আমাদের কাছে চায় তাহাও পুরামাত্রায় পায় না। আমাদের অর্থ-সামর্থ্য-অবসরের উদ্‌বৃত্ত হইতে অতি অকিঞ্চিৎকর পরিমাণেই এই কনগ্রেসের জন্য রাখিয়া থাকি এবং যাঁহারা রাখেন সেই কয়জনের সংখ্যাও এই বিশাল ভারতের জনসংখ্যার মধ্যে অতি যৎসামান্য।

এই প্রসঙ্গে আমাদের নিবেদন এই যে, কনগ্রেসকে সত্য করিয়া তুলিতে গেলে তাহা কনগ্রেসের মঞ্চে বসিয়াই করা যায় না। দেশের ভিতরে সত্য কার্যে প্রবৃত্ত হইলে, সমস্ত দেশের লোককে গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে গিয়া সত্যমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া তুলিলে তবেই সমস্ত দেশের যোগে ওই কনগ্রেস সত্য হইয়া উঠিবে—সেই দিকে চেষ্টা নিযুক্ত করিলে চেষ্টা সার্থক হইবে। কনগ্রেসকে দিনে দিনে বর্ষে বর্ষে দেশের ভিতর দিয়া সত্য করিয়া তুলিব এই চেষ্টাই কোনো এক পন্থীর হউক। তাহাকে এ-বৎসর বা ও-বৎসর কোনোরকমে দখল করিয়া বসিব এ-চেষ্টা এমন মহৎ চেষ্টা নহে যাহার জন্য দুই ভাইয়ে লড়াই করিয়া কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডের অভিনয় করা যাইতে পারে।

আমাদের পুরাণে একটি যজ্ঞভঙ্গের ইতিহাস আছে। দক্ষ যখন তাঁহার যজ্ঞে সতী অর্থাৎ সত্যকে অস্বীকার করিয়া মঙ্গলকে অপমানিত করিয়াছিলেন তখনই প্রচণ্ড উপদ্রব উপস্থিত হইয়া তাঁহার যজ্ঞ বিনষ্ট হইয়াছিল। দক্ষ কেবল নিজের দক্ষতার প্রতি অন্ধ অভিমানবশত জগতে যে-যুগে এবং যে-ক্ষেত্রেই সত্যকে এবং শিবকে স্বীকার করা অনাবশ্যক মনে করিয়াছে সেইকালে এবং সেইখানেই কেবল যে কর্ম পণ্ড হইয়াছে তাহা

নহে মহান্ অনর্থ ঘটিয়াছে। ক্ষমতাশালীর জিদ সত্যকে ক্ষণকালের জন্য নির্জীব করিয়া ফেলিতেও পারে কিন্তু রুদ্রকে কখনোই ঠেকাইতে পারে না—এ-কথা ইংরেজ ভুলিয়াছে বলিয়া আমরা অভিযোগ আনিয়াছি কিন্তু আমরা নিজেও যদি ভুলি, বল ও কলকৌশলকেই অবলম্বন জ্ঞান করিয়া সত্য ও শিবকে যদি অবমানিত করি তবে প্রলয়কে জাগ্রত করিয়া তুলিব তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। সত্যকে যদি আমরা রক্ষা করি ও মঙ্গলকে বিশ্বাস করি তবে ধৈর্য শান্তি ও উদারতা আমাদের পক্ষে সহজ হইবে; তবে বিলম্বে অসহিষ্ণু, পীড়নে ভীত ও পরাজয়ে হতাশ্বাস হইব না; বুদ্ধির পার্থক্য ও মতের অনৈক্যকে সহ্য করিব এবং স্বাধীনতা বা স্বরাজের যথার্থই অধিকার লাভ করিতে পারিব।

১৩১৪

দেশহিত

বঙ্গব্যবচ্ছেদের আঘাতে বাংলাদেশে স্বাদেশিকতার যে উদ্দীপনা জ্বলিয়া উঠিয়াছে তাহা যে অন্যদেশের এ-শ্রেণীয় উদ্দীপনার ঠিক নকল নহে, তাহা যে আমাদের দেশের স্বকীয় প্রকৃতি অনুসারে একটি বিশিষ্টতা লাভ করিয়াছে এমন কথা আমাদের দেশের কোনো বিখ্যাত ইংরেজি কাগজে পড়িয়াছি। লেখক বলেন যে, আমাদের দেশের এই স্বাদেশিকতার উৎসাহ গভীরতর আধ্যাত্মিক ভাবে পূর্ণ; এইজন্য ইহা একটা ধর্মসাধনার আকার ধারণ করিতেছে।

এ-কথা নিশ্চয় মনে রাখিতে হইবে যে, আমাদের দেশের কোনো উদ্‌যোগ যদি দেশের সর্বসাধারণকে আশ্রয় করিতে চায় তবে তাহা ধর্মকে অবলম্বন না করিলে কোনোমতেই কৃতকার্য হইবে না। কোনো দেশব্যাপী সুবিধা, কোনো রাষ্ট্রীয় স্বার্থসাধনের প্রলোভন কোনোদিন আমাদের দেশের সাধারণ লোকের মনে শক্তি সঞ্চার করে নাই।

অতএব আমাদের দেশের বর্তমান উদ্দীপনা যদি ধর্মের উদ্দীপনাই হইয়া দাঁড়ায়, দেশের ধর্মবুদ্ধিকে যদি একটা নূতন চৈতন্যে উদ্‌বোধিত করিয়া তোলে তবে তাহা সত্য হইবে, স্থায়ী হইবে, দেশের সর্বত্র ব্যাপ্ত হইবে সন্দেহ নাই।

আমাদের বর্তমান আন্দোলন সেই সত্যতা লাভ করিয়াছে অথবা করিবে কিনা তাহা নিশ্চয় নিরূপণ করিয়া বলিবার ক্ষমতা আমি রাখি না। এইটুকু বলা যায়

যে, দেশে যদি দুই-চারিজন মহাত্মাও এই আন্দোলনকে শিক্ষিতসম্প্রদায়ের পোলিটিকাল চাঞ্চল্য মাত্র বলিয়া অনুভব না করেন, তাঁহারা যদি ইহার নিগূঢ় কেন্দ্রস্থলে সেই ধর্মের অগ্নিকে প্রত্যক্ষ দেখিয়া থাকেন যে-অগ্নি সমস্ত মিথ্যাকে ভিতর হইতে দগ্ধ করিয়া ফেলে, সমস্ত দীনতাকে ভস্মসাৎ করিয়া দেয় এবং আমাদের যাহা-কিছু শ্রেষ্ঠ ও মহামূল্য তাহাকেই তপ্ত সুবর্ণের মতো উজ্জ্বল করিয়া তোলে—তবে তাঁহাদের সেই উপলব্ধি ও সাধনা নিশ্চয়ই নানাপ্রকার সাময়িক বিক্ষিপ্ততাকে ব্যর্থ করিয়া চরম সফলতা আনয়ন করিবে।

কিন্তু আমরা যে এই ধর্মের মূর্তিকে দেখিতে পাইয়াছি তাহার প্রমাণ কিসে পাওয়া যাইবে? যে ইহাকে দেখিয়াছে সে তো আর উদাসীন থাকিতে পারে না। সে একান্ত উদ্বেগ একান্ত সতর্কতার সহিত ইহাকে রক্ষা করিবার জন্য জাগ্রত থাকে—কোনো ভ্রষ্টতা কোনো ত্রুটি সে সহ্য করিতে পারে না সেই প্রাণান্তিক সতর্কতা যদি দেখিতে না পাই, যদি দেখি উপস্থিত কোনো উদ্দেশ্য সাধনের কৃপণতায় আমাদের দুর্বল চিত্তকে এমনি অভিভূত করে যে আমাদের সাধনার কেন্দ্রস্থিত ধর্মকে সর্বতোভাবে রক্ষা করার গুরুত্ব আমরা বিস্মৃত হই তবে ইহার মতো উৎকণ্ঠার বিষয় আর কিছুই হইতে পারে না। রাজার সন্দেহ জাগ্রত হইয়া আমাদের চারিদিকে যে শাসনজাল বিস্তার করিতেছে তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ আমরা সর্বদা উচ্চকণ্ঠেই প্রকাশ করিতেছি কিন্তু যেখানে আমাদের স্বদেশের লোক আমাদের যজ্ঞের পবিত্র হুতাশনে পাপ-পদার্থ নিক্ষেপ করিয়া আমাদের হোমকে নষ্ট করিতেছে তাহাদিগকে আমরা কেন সমস্ত মনের সহিত ভর্ৎসনা করিবার, তিরস্কৃত করিবার শক্তি অনুভব করিতেছি না? তাহারাই কি আমাদের সকলের চেয়ে ভয়ংকর শত্রু নহে?

চৈতন্যদেব একদিন বাংলাদেশে প্রেমের ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। কাম-জিনিসটা অতি সহজেই প্রেমের ছদ্মবেশ ধরিয়া দলে ভিড়িয়া পড়ে এইজন্য চৈতন্য যে কিরূপ একান্ত সতর্ক ছিলেন তাহা তাঁহার অনুগত শিষ্য হরিদাসের প্রতি অত্যন্ত কঠোর ব্যবহারে প্রমাণিত হইয়াছে। ইহাতে বুঝা যায় চৈতন্যের মনে যে প্রেমধর্মের আদর্শ ছিল তাহা কত উচ্চ, তাহা কিরূপ নিষ্কলঙ্ক। তাহার কোথাও লেশমাত্র কালিমাপাতের আশঙ্কায় তাঁহাকে কিরূপ অসহিষ্ণু ও কঠিন করিয়াছিল। নিজের দলের লোকের প্রতি দুর্বল মমতাকে তিনি মনে স্থান দেন নাই—ধর্মের উজ্জ্বলতাকে সর্বতোভাবে রক্ষা করার প্রতিই তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য ছিল।

আজ আমরা দেশে যদি শক্তিধর্মকেই প্রচার করিবার জন্য প্রবৃত্ত হইয়া থাকি তবে তাহারও কি কোথাও বিপদের কোনো সম্ভাবনা নাই? সে-বিপদ, কি কেবলই,

যাহাদিগকে আমরা শত্রুপক্ষ বলিয়া জানি তাহাদেরই নিকট হইতেই? উন্মত্ততা, অন্যায় ও অত্যাচার কি শক্তিরই ছদ্মবেশ ধরিয়া তাহার মূলে আঘাত করে না? যথার্থ দুর্বলতাই কি উচ্ছৃঙ্খলতার আকার ধারণ করিয়া প্রবলতার ভান করে না? যাহা শক্তি নহে কিন্তু শক্তির বিড়ম্বনা শক্তিধর্মসাধনায় তাহার মতো সর্বনেশে বিঘ্ন আর তো কিছুই নাই। বর্তমানে আমাদের দেশে তাহার অভ্যুদয়ের লক্ষণ চারিদিকে দেখা যাইতেছে কিন্তু আমাদের মধ্যে যাঁহারা তাহাকে স্পষ্টত প্রশ্রয় দিতেছেন না তাঁহারাও তাহাকে ক্ষমাহীন কঠোর শাসন ও ভর্ৎসনার দ্বারা দূরে ঠেকাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছেন না। যে-শক্তি ধর্ম, তিনি যদি আমাদের স্পষ্ট উপলব্ধিগোচর হইতেন তবে তাঁহার এই সকল নকল উৎপাতকে কখনো এক দণ্ডের জন্যও সহ্য করিতে পারিতাম না। আজ দস্যুবৃত্তি, তস্করতা, অন্যায় পীড়ন দেশহিতের নাম ধরিয়া চারিদিকে সঞ্চরণ করিতেছে এ কি এক মুহূর্তের জন্য তাঁহারা সহ্য করিতে পারেন যাঁহারা জানেন আত্মহিত, দেশহিত, লোকহিত, যে-কোনো হিতসাধনই লক্ষ্য হউক না কেন কেবলমাত্র বীর ও ত্যাগী ও তপস্বী তাহার যথার্থ সাধক। জাতির চরিত্রকে নষ্ট করিয়া আমরা জাতিকে গড়িয়া তুলিব এমন ভয়ংকর ভুলকে তিনি কখনোই এক মুহূর্তের জন্যও মনে স্থান দিতে পারেন না যিনি ধর্মকেই শক্তি বলিয়া নিশ্চয় জানেন।

আমাদের দেশের সকল অমঙ্গলের মূল কোথায়? যেখানে আমরা বিচ্ছিন্ন। অতএব আমাদের দেশে বহুকে এক করিয়া তোলাই দেশহিতের সাধনা। বহুকে এক করিয়া তুলিতে পারে কে? ধর্ম। প্রয়োজনের প্রলোভনে ধর্মকে বিসর্জন দিলেই বিশ্বাসের বন্ধন শিথিল হইয়া যায়। যে অধর্ম দ্বারা আমরা অন্যকে আঘাত করিতে চাই সেই অধর্মের হাত হইতে আমরা নিজেকে বাঁচাইব কী করিয়া, মিথ্যাকে অন্যায়কে যদি আমরা কোনো কারণেই প্রশ্রয় দিই তবে আমরা নিজেদের মধ্যেই সন্দেহ, বিশ্বাসঘাতকতা, ভ্রাতৃবিদ্রোহের বীজ বপন করিব—এমন একটি প্রদীপকে নিভাইয়া দিব যে-আলোকের অভাবে পুত্র মাতাকে আঘাত করিবে, ভাই ভাইয়ের পক্ষে বিভীষিকা হইয়া উঠিবে। যে-ছিদ্র দিয়া আমাদের দলের মধ্যে বিশ্বাসহীন চরিত্রহীন ধর্মসংশয়িগণ অবাধে প্রবেশ করিতে পারিবে সেই ছিদ্রকেই দলবৃদ্ধি-শক্তিবৃদ্ধির উপায় মনে করিয়া কি কোনো দূরদর্শী কোনো যথার্থ দেশহিতৈষী নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন? আমাদের দেশের যে দুইটি প্রাচীন মহাকাব্য আছে সেই দুই মহাকাব্যেই এই একটিমাত্র নীতি প্রচার করিয়াছে যে, অধর্ম যেখানে যে-নামে যে-বেশেই প্রবেশলাভ করিয়াছে সেইখানেই ভয়ংকর সর্বনাশ সাধন করিয়াছে, আমরা শনির সঙ্গে কলির সঙ্গে আপাতত সন্ধি করিয়া মহৎ কার্য উদ্ধার করিব এমন ভ্রম আমাদের দেশের কোথাও যদি প্রবেশ করে তবে

আমাদের দেশের মহাকবিদের শিক্ষা মিথ্যা ও আমাদের দেশের মহাঋষিদের সাধনা ব্যর্থ হইবে। আমাদের দেশের পূজনীয় শাস্ত্র ফলের আসক্তি ত্যাগ করিতে বলিয়াছেন। কারণ, ফল লক্ষ্য নহে, ধর্মই লক্ষ্য। দেশের কাজেও ভারতবর্ষ যেন এই শাস্ত্রবাক্য কদাচ বিস্মৃত না হয়। দেশের হিতসাধনের জন্য আমরা প্রাণ সমর্পণ করিব কেননা সেইরূপ মঙ্গলের জন্য প্রাণ সমর্পণ করাই ধর্ম; কিন্তু কোনো ফল—সে-ফলকে ইতিহাসে যত লোভনীয় বলিয়াই প্রচার করুক না—সেরূপ কোনো ফল লাভ করিবার জন্য ধর্মকে বিসর্জন দিব এরূপ নাস্তিকতাকে প্রশ্রয় দিলে রক্ষা পাইব না। বাইবেলে কথিত আছে, ফলের লোভে ধর্মকে ত্যাগ করিয়া আদিম মানব স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া মরণধর্ম লাভ করিয়াছে। ফললাভ চরম লাভ নহে, ধর্মলাভেই লাভ, এ-কথা যদি কেবল দেশহিতের বেলাতেই না খাটে তবে দেশহিত মানুষের যথার্থ হিত নহে।

১৩১৫

গ্রন্থপরিচয়

[রচনাবলীর বর্তমান খণ্ডে মুদ্রিত গ্রন্থগুলির প্রথম সংস্করণ, বর্তমানে স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রচলিত সংস্করণ, রচনাবলী-সংস্করণ, এই তিনটির পার্থক্য সংক্ষেপে ও সাধারণভাবে নির্দেশ করা গেল। এই খণ্ডে মুদ্রিত কোনো কোনো রচনা সম্বন্ধে কবির নিজের মন্তব্য, এবং অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্যও মুদ্রিত হইল। পূর্ণতর তথ্যসংগ্রহ সর্বশেষ খণ্ডে একটি পঞ্জীতে সংকলিত হইবে।]

উৎসর্গ

উৎসর্গ ১৩২১ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

উৎসর্গে প্রকাশিত সকল কবিতাই মোহিতচন্দ্র সেন সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থ (১৩১০) হইতে গৃহীত। এই কাব্যগ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের কবিতাবলী গ্রন্থানুক্রমে মুদ্রিত না হইয়া ভাবানুষঙ্গক্রমে বিভিন্ন বিভাগে সজ্জিত হইয়াছিল; এবং এই সকল বিভাগের প্রবেশকরূপে রবীন্দ্রনাথ অনেকগুলি নূতন কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, পুরাতন কোনো কোনো কবিতাও অবশ্য প্রবেশকরূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল। কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের সমসাময়িক কালে নূতন রচিত অনেক কবিতাও কাব্যগ্রন্থে প্রথম প্রকাশিত হয়, অন্য কোনো স্বতন্ত্র গ্রন্থে মুদ্রিত হয় নাই।

এই কাব্যগ্রন্থের প্রকাশ পরে যখন রহিত হয়, এবং পূর্বের ন্যায় স্বতন্ত্রভাবেই রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন কবিতা-গ্রন্থ মুদ্রিত হইতে থাকে তখন যে-সকল কবিতা শুধু কাব্যগ্রন্থেই প্রকাশিত হইয়াছিল কোনো স্বতন্ত্র পুস্তকে প্রকাশিত হয় নাই, সেগুলির একটি সংগ্রহ প্রকাশ করা আবশ্যক হয় এবং উৎসর্গ প্রকাশিত হয়।

১৩১০ সালের কাব্যগ্রন্থ হইতেই কবিতাগুলি সংকলিত বলিয়া, কাব্যগ্রন্থে প্রথম প্রকাশিত স্মরণ ও শিশুর পরেই রবীন্দ্র-রচনাবলীতে উৎসর্গ মুদ্রিত হইল।

কাব্যগ্রন্থের কোন্ বিভাগে কোন্ কবিতা প্রবেশকরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল পর-পৃষ্ঠায় তাহার একটি তালিকা মুদ্রিত হইল। ইহার মধ্যে যেগুলি উৎসর্গে মুদ্রিত হয় নাই, এবং যেগুলি স্বতন্ত্র সংস্করণ উৎসর্গে মুদ্রিত হইলেও রচনাবলী-সংস্করণ উৎসর্গে মুদ্রিত হয় নাই পাদটীকায় সেগুলির বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে।

বিভাগ	প্রবেশক
১. যাত্রা	কেবল তব মুখের পানে
২. হৃদয়-অরণ্য	কুঁড়ির ভিতরে
৩. নিষ্ক্রমণ	আঁধার আসিতে[১]
৪. বিশ্ব	আমি চঞ্চল হে
৫. সোনার তরী[২]	তোমায় চিনি বলে
৬. লোকালয়	হে রাজন তুমি আমারে
৭. নারী	সাজ হয়েছে রণ
৮. কল্পনা[২]	মোর কিছু ধন
৯. লীলা	তোমারে পাছে সহজে বুঝি
১০. কৌতুক	আপনারে তুমি করিবে গোপন
১১ যৌবনস্বপ্ন	পাগল হইয়া বনে বনে
১২. প্রেম	আকাশসিন্ধু মাঝে
১৩. কবিকথা	দুয়ারে তোমার
১৪. প্রকৃতিগাথা	তোমার বীণায় কত তার আছে
১৫. হতভাগ্য	পথের পথিক করেছ
১৬. সংকল্প	সেদিন কি তুমি এসেছিলে
১৭. স্বদেশ	হে বিশ্বদেব মোর কাছে তুমি
১৮. রূপক	ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে
১৯ কাহিনী	কত কী যে আসে
২০ কথা	কথা কও কথা কও[১]
২১ কণিকা	হায় গগন নহিলে
২২ মরণ	চিরকাল এ কী লীলা গো
২৩ নৈবেদ্য[২]	প্রতিদিন তব গাথা[২]
২৪. জীবন-দেবতা	আজ মনে হয় সকলের মাঝে
২৫ স্মরণ	...
২৬ শিশু	জগৎপারাবারের তীরে[৩]
২৭ গান	...
২৮ নাট্য	আঁধারে আসিয়া এরা

কাব্যগ্রন্থের বিভিন্ন বিভাগের অন্যত্র-অপ্রকাশিত অনেক কবিতাও উৎসর্গে সংগৃহীত হইয়াছিল :

বিভাগ	কবিতা
বিশ্ব	সব ঠাঁই মোর
সোনার তরী	মন্ত্রে সে যে পূত
নারী	যদি ইচ্ছা কর তবে
কবিকথা	বাহির হইতে দেখো না
	আছি আমি বিন্দুরূপে
প্রেম	আমি যারে ভালোবাসি
প্রকৃতিগাথা	শূন্য ছিল মন
	দেখো চেয়ে গিরির শিরে
	ওরে আমার কর্মহারা
	আমার খোলা জানালাতে
হতভাগ্য	আলো নাই দিন শেষ হল, ওরে
রূপক	ভোরের পাখি ডাকে
	আমার মাঝারে যে আছে
	না জানি কারে দেখিয়াছি
	আজিকে গহন কালিমা
	আমাদের এই পল্লীখানি
স্বদেশ	হে নিস্তব্ধ গিরিরাজ
	ক্লান্ত করিয়াছ
	আজি হেরিতেছি আমি
	তুমি আছ হিমাচল
	হে হিমাদ্রি, দেবতাত্মা
	ভারতসমুদ্র তার
	ভারতের কোন্ বৃদ্ধ
কাহিনী	নিবেদিল রাজভৃত্য
মরণ	অত চুপি চুপি কেন
	সে তো সেদিনের কথা
	নব নব প্রবাসেতে

১৩১০ সালের কাব্যগ্রন্থের যে-সকল কবিতা অন্য কোনো গ্রন্থে প্রকাশিত হয় নাই এবং উৎসর্গে সংকলিত হয় নাই, এবং ১৩১০ সালে ও তৎপূর্বে রচিত যে-সকল কবিতা অন্য কোনো গ্রন্থে প্রকাশিত হয় নাই, (বা প্রকাশিত হইলেও ঐসকল গ্রন্থে এখন মুদ্রিত হয় না, বা রবীন্দ্র-রচনাবলীতে ঐসকল গ্রন্থে মুদ্রিত হইবে না) কিন্তু সময়ানুক্রম বিবেচনায় কাব্যগ্রন্থে ও উৎসর্গে সংকলিত হইতে পারিত, এইরূপ কতকগুলি কবিতা উৎসর্গের সংযোজনে মুদ্রিত হইল।

কাব্যগ্রন্থ হইতে :

বিভাগ	কবিতা
যাত্রা	হে পথিক কোন্‌খানে[৮]
সোনার তরী	কত দিবা কত বিভাবরী
স্বদেশ	হে ভারত আজি নবীন বর্ষে[১]
	নববৎসরে করিলাম পণ[১]
নৈবেদ্য	রোগীর শিয়রে রাত্রে
	কাল যবে সন্ধ্যাকালে
	নানা গান গেয়ে ফিরি
লোকালয়	হে জনসমুদ্র আমি ভাবিতেছি[১]

সাময়িক পত্র ইত্যাদি হইতে :

ওরে পদ্মা ওরে মোর রাক্ষসী প্রেয়সী[১]
বিরহ-বৎসর পরে মিলনের বীণা[৮]
অচির বসন্ত হায়[৮] ;
দিয়েছ প্রশ্রয় মোরে করুণানিলয়[১]
কী কথা বলিব বলে

সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে লিখিত একটি পত্রে রবীন্দ্রনাথ "কুঁড়ির ভিতরে কাঁদিছে গন্ধ" কবিতার এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন :

> বাহিরে যাহার সার্থকতা, বাহিরে আসিবার পূর্বে সে তীব্র বেদনা অনুভব করে—বস্তুত এই বেদনাই জানায় যে তাহাকে বাহিরে আসিতে হইবে—ইহাই গর্ভবেদনা ; এবং মৃত্যুবেদনারও নিঃসন্দেহ এই তাৎপর্য। আমাদের সমস্ত প্রবৃত্তিরই সার্থকতা বাহিরের জগতের সহিত মিলনে—যতক্ষণ পর্যন্ত সেই মিলন সম্পূর্ণ না হয়, আমাদের প্রবৃত্তিগুলি বহির্মুখী হইয়া না আসে ততক্ষণ পর্যন্ত তাহারা আমাদের মধ্যে নানাপ্রকার পীড়ার সৃষ্টি করে—নিখিলের মধ্যে তাহারা

বাহির হইয়া আসিলেই সকল পীড়ার অবসান হয়। অতএব যখন আমরা পীড়া অনুভব করি তখন আমরা যেন না মনে করি এই পীড়াই চরম—ইহা মুক্তির বেদনা—একদিন যাহা বাহিরে আসিবার তাহা বাহিরে আসিবে এবং পীড়া অবসান হইবে—"কুঁড়ির ভিতরে কাঁদিছে গন্ধ অন্ধ হয়ে" কবিতাটির ভিতরকার তাৎপর্য আমার কাছে এইরূপ মনে হয়। সেইজন্য উহার নাম দিতেছি "মুমুক্ষু"। নামটা কিছু কড়া গোছের বটে—যদি অন্য কোনো সুশ্রাব্য নাম মনে উদয় হয় তবে চয়নিকার প্রকাশককে জানাইয়া দিয়ো।

খেয়া

খেয়া ১৩১৩ সালে প্রকাশিত হয়।

"আমার ধর্ম" প্রবন্ধে (সবুজ পত্র, আশ্বিন-কার্তিক, ১৩২৪) প্রসঙ্গক্রমে রবীন্দ্রনাথ খেয়ার কোনো কোনো কবিতার ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

> খেয়াতে "আগমন" বলে যে কবিতা আছে, সে কবিতায় যে মহারাজ এলেন তিনি কে? তিনি যে অশান্তি। সবাই রাত্রে দুয়ার বন্ধ করে শান্তিতে ঘুমিয়ে ছিল, কেউ মনে করেনি তিনি আসবেন। যদিও থেকে থেকে দ্বারে আঘাত লেগেছিল, যদিও মেঘগর্জনের মতো ক্ষণে ক্ষণে তাঁর রথচক্রের ঘর্ঘরধ্বনি স্বপ্নের মধ্যেও শোনা গিয়েছিল তবু কেউ বিশ্বাস করতে চাচ্ছিল না যে, তিনি আসছেন, পাছে তাদের আরামে ব্যাঘাত ঘটে। কিন্তু দ্বার ভেঙে গেল—এলেন রাজা।
>
> ঐ খেয়াতে "দান" বলে একটা কবিতা আছে। তার বিষয়টি এই যে, ফুলের মালা চেয়েছিলুম, কিন্তু কী পেলুম? "এ তো মালা নয় গো, এ যে তোমার তরবারি।"…
>
> এমন যে দান এ পেয়ে কি আর শান্তিতে থাকবার জো আছে? শান্তি যে বন্ধন যদি তাকে অশান্তির ভিতর দিয়ে না পাওয়া যায়।…

"অনাবশ্যক" কবিতা সম্বন্ধে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে একটি পত্রে (৪ অক্টোবর ১৯৩৩) রবীন্দ্রনাথ লেখেন :

> খেয়ার "অনাবশ্যক" কবিতার মধ্যে কোনো প্রচ্ছন্ন অর্থ আছে বলে মনে করি নে। আমাদের ক্ষুধার জন্যে যা অত্যাবশ্যক, তার কতই অপ্রয়োজনে ফেলাছড়া যায় জীবনের ভোজে, যে ভোজ উদাসীনের উদ্দেশে। আমাদের অনেক দান উৎসর্গ করি তার কাছে যার তাতে দৃষ্টি নেই—সেই আবশ্যক নিবেদনে আনন্দও পেয়ে থাকি; অথচ বঞ্চিত হয় সে, যে একান্ত আগ্রহ নিয়ে হাত পেতে মুখ

> চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চারদিকে প্রতিদিন দেখতে পাচ্ছি সংসারে যেখানে অভাব সত্য সেখান থেকে নৈবেদ্য প্রচুরপরিমাণেই বিক্ষিপ্ত হয় সেইদিকে যেখানে তার জন্যে প্রত্যাশা নেই ক্ষুধা নেই।

রাজা

রাজা ১৩১৬ সালের পৌষ মাসে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

> এই “রাজা” প্রথমে খাতায় যেমনটি লিখিয়াছিলাম তাহার কতকটা কাটিয়া ছাঁটিয়া বদল করিয়া [প্রথম সংস্করণ] ছাপানো হইয়াছিল। হয়তো তাহাতে কিছু ক্ষতি হইয়া থাকিবে এই আশঙ্কা করিয়া সেই মূল লেখাটি অবলম্বন করিয়া বর্তমান সংস্করণ ছাপানো হইল।—“লেখকের নিবেদন,” রাজা

এই “বর্তমান সংস্করণ”ই এখন প্রচলিত, রচনাবলীতেও এই সংস্করণ মুদ্রিত হইয়াছে।

রাজা অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথ পরে অন্যান্য নাট্য ইত্যাদি লিখিয়াছেন। অরূপ রতন (মাঘ ১৩২৬) “নাট্যরূপকটি রাজা নাটকের অভিনয়যোগ্য সংক্ষিপ্ত সংস্করণ—নূতন করিয়া পুনর্লিখিত।” “যে বৌদ্ধ আখ্যান অবলম্বন করে রাজা নাটক রচিত তারই আভাসে শাপমোচন কথিকাটি রচনা করা হল” (পৌষ ১৩৩৮)। রাজা নাটকটি রবীন্দ্রনাথ পুনর্লিখনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহা সম্পূর্ণ বা প্রকাশিত হয় নাই, পাণ্ডুলিপি-আকারে রক্ষিত আছে।

“আমার ধর্ম” প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গক্রমে রাজা নাটকের আলোচনা করিয়াছেন :

> “রাজা” নাটকে সুদর্শনা আপন অরূপ রাজাকে দেখতে চাইলে, রূপের মোহে মুগ্ধ হয়ে ভুল রাজার গলায় দিলে মালা—তার পরে সেই ভুলের মধ্যে দিয়ে পাপের মধ্যে দিয়ে যে অগ্নিদাহ ঘটালে, যে বিষম যুদ্ধ বাধিয়ে দিলে তা অন্তরে বাহিরে যে ঘোর অশান্তি জাগিয়ে তুললে তাতেই তো তাকে সত্য মিলনে পৌঁছিয়ে দিলে। প্রলয়ের মধ্যে দিয়ে সৃষ্টির পথ। তাই উপনিষদে আছে তিনি তাপের দ্বারা তপ্ত হয়ে এই সমস্ত কিছু সৃষ্টি করলেন। আমাদের আত্মা যা-কিছু সৃষ্টি করেছে তাতে পদে পদে ব্যথা। কিন্তু তাকে যদি ব্যথাই বলি তবে শেষ কথা বলা হল না, সেই ব্যথাতেই সৌন্দর্য তাতেই আনন্দ।

অরূপ রতনের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন

> সুদর্শনা রাজাকে বাহিরে খুঁজিয়াছিল। যেখানে বস্তুকে চোখে দেখা যায়, হাতে ছোঁওয়া যায়, ভাণ্ডারে সঞ্চয় করা যায়, যেখানে ধনজনখ্যাতি, সেইখানে সে বরমাল্য পাঠাইয়াছিল। বুদ্ধির অভিমানে সে নিশ্চয় স্থির করিয়াছিল যে,

বুদ্ধির জোরে সে বাহিরেই জীবনের সার্থকতা লাভ করিবে। তাহার সঙ্গিনী সুরঙ্গমা তাহাকে নিষেধ করিয়াছিল। বলিয়াছিল, অন্তরের নিভৃত কক্ষে যেখানে প্রভু স্বয়ং আসিয়া আহ্বান করেন সেখানে তাঁহাকে চিনিয়া লইলে তবেই বাহিরে সর্বত্র তাঁহাকে চিনিয়া লইতে ভুল হইবে না;—নহিলে যাহারা মায়ার দ্বারা চোখ ভোলায় তাহাদিগকে রাজা বলিয়া ভুল হইবে। সুদর্শনা এ-কথা মানিল না। সে সুবর্ণের রূপ দেখিয়া তাহার কাছে মনে মনে আত্মসমর্পণ করিল। তখন কেমন করিয়া তাহার চারিদিকে আগুন লাগিল, অন্তরের রাজাকে ছাড়িতেই কেমন করিয়া তাহাকে লইয়া বাহিরের নানা মিথ্যা-রাজার দলে লড়াই বাধিয়া গেল,—সেই অগ্নিদাহের ভিতর দিয়া কেমন করিয়া আপন রাজার সহিত তাহার পরিচয় ঘটিল, কেমন করিয়া দুঃখের আঘাতে তাহার অভিমান ক্ষয় হইল এবং অবশেষে কেমন করিয়া হার মানিয়া প্রাসাদ ছাড়িয়া পথে দাঁড়াইয়া তবে সে তাহার সেই প্রভুর সঙ্গলাভ করিল, যে-প্রভু কোনো বিশেষ রূপে বিশেষ স্থানে বিশেষ দ্রব্যে নাই, যে-প্রভু সকল দেশে সকল কালে; আপন অন্তরের আনন্দরসে যাঁহাকে উপলব্ধি করা যায়,—এ নাটকে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে।

শেষের কবিতা

শেষের কবিতা ১৩৩৬ সালের ভাদ্র মাসে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

শেষের কবিতা "নির্ঝরিণী" কবিতাটি স্বতন্ত্রভাবে পাঠ্যগ্রন্থে সংকলিত হইলে, কেহ কেহ তাহার অর্থব্যাখ্যানের আবশ্যকতা জ্ঞাপন করিয়া রবীন্দ্রনাথকে পত্র লেখেন। শ্রীসুনীলচন্দ্র সরকারের পত্রের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ লেখেন :

> শেষের কবিতা গ্রন্থে "নির্ঝরিণী" কবিতার বিশেষ উপলক্ষ্যে বিশেষ অর্থ ছিল। তার থেকে বিশ্লিষ্ট করে নেওয়াতে তার একটা সাধারণ অর্থ খুঁজে বের করা দরকার হয়। আমার মনে হয় সেটা এই যে, আমাদের বাইরে বিশ্বপ্রকৃতির একটি চিরন্তনী ধারা আছে, সে আপন সূর্য-চন্দ্র আলো-আঁধার নিয়ে সর্বজনের সর্বকালের। জ্যোতিষ্কলোকের ছায়া দোলে তার ঝরনার ছন্দে। জীবনে কোনো বিপুল প্রেমের আনন্দে এমন একটা পরম মুহূর্ত আসতে পারে, যখন আমার চৈতন্যের নিবিড়তা আপনাকে অসীমের মধ্যে উপলব্ধি করে, তখন বিশ্বের নিত্য-উৎসবের সঙ্গে মানবচিত্তের উৎসব মিলিত হয়ে যায়, তখন বিশ্বের বাণী তারই বাণী হয়ে ওঠে। ইতি ৫ বৈশাখ ১৩৪৩

এইরূপ অন্যান্য পত্রের উত্তরে “নির্ঝরিণী” সম্বন্ধে নিম্নমুদ্রিত মন্তব্য রবীন্দ্রনাথ আনন্দবাজার পত্রিকায় [১১] প্রকাশ করেন :

> শেষের কবিতায় নায়িকাকে সম্বোধন করে উপন্যাসের নায়ক বলছে, তুমি ঝরনার মতো, তোমার চিত্তের প্রবাহ স্বচ্ছ, বিশ্বের আনন্দ-আলোক তার মধ্যে অবাধে প্রতিফলিত হয়। তোমার সেই নির্মল হৃদয়ে আমার ছায়া পড়ুক, আমার চিন্তা তোমার হৃদয়ে দোলায়িত হতে থাক্‌,—তোমার মনে প্রতিবিম্বিত আমার ছবিটিকে বাণী দাও তোমার প্রেমের যে-বাণী নিত্যকালের। অর্থাৎ তোমার ভালোবাসার চিরন্তনতায় তাকে সার্থক করো, সত্য করো।
>
> তোমার অন্তরে পড়েছে আমার ছায়া, তার সঙ্গে মিলেছে তোমার আনন্দের দীপ্তি, তারই উপলব্ধিতে আমার অন্তরতম কবি উল্লসিত। পদে পদে তোমার আনন্দের ছটায় আমার প্রাণে করে ভাষার সঞ্চার। আমার মন জাগে তোমার ভালোবাসার প্রবাহবেগে, তার প্রেরণায় আমার যথার্থ স্বরূপকে জানি। তোমাতেই পাই আমার প্রকাশরূপিণী বাণীকে।
>
> এক কথায় এই কবিতার মর্মার্থ এই যে, অন্যের আনন্দের মধ্যে নিজেকে যখন প্রতিফলিত দেখি তখন নিজের আত্মোপলব্ধি ও আত্মপ্রকাশ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

রাজা প্রজা। সমূহ। পরিশিষ্ট

রাজা প্রজা ও সমূহ গদ্যগ্রন্থাবলীর দশম ও একাদশ ভাগরূপে ১৩১৫ সালে প্রকাশিত হয়।

আত্মশক্তি (রবীন্দ্র-রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড), ভারতবর্ষ (রবীন্দ্র-রচনাবলী, চতুর্থ খণ্ড) রাজা প্রজা, সমূহ ও স্বদেশ (গদ্যগ্রন্থাবলী, দ্বাদশ ভাগ ; রবীন্দ্র-রচনাবলী, একাদশ খণ্ড)—এই কয়খানি গ্রন্থে ১৩১৫ ও তৎপূর্ববর্তীকালে লিখিত রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক প্রবন্ধ প্রায় সমস্তই সন্নিবিষ্ট হয়। যে-সকল রচনা সম্ভবত একান্ত সাময়িক বলিয়াই রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন নাই, বা অন্য কোনো কারণে বাদ পড়িয়াছে, ১৩১৫ বা তাহার পূর্ববর্তীকালে লিখিত এইরূপ রাষ্ট্রনৈতিক রচনার অধিকাংশই বর্তমান খণ্ডের পরিশিষ্টে মুদ্রিত হইল। কতকগুলি রচনা রবীন্দ্রনাথের বলিয়া অনুমিত হইলেও সে-সম্বন্ধে এখনও নিঃসংশয় হওয়া যায় নাই ; পরে এগুলি রবীন্দ্রনাথের বলিয়া নিশ্চিতরূপে জানা গেলে এবং রবীন্দ্রনাথের বলিয়া পরিজ্ঞাত আরো রচনা সংগৃহীত হইলে, সেগুলি রবীন্দ্র-রচনাবলীর একটি বিশেষ খণ্ডে, গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত অন্যান্য রচনার সহিত মুদ্রিত হইবে।

রাজা প্রজা, সমূহ ও বর্তমান খণ্ডের পরিশিষ্টে মুদ্রিত প্রবন্ধাবলীর সাময়িক পত্রে প্রথম মুদ্রণের তালিকা নিচে প্রকাশিত হইল। প্রসঙ্গত ইহা উল্লেখযোগ্য যে, বিভিন্ন সময়ে রবীন্দ্রনাথ এই সকল সাময়িক পত্রের অনেকগুলির সম্পাদনাভার গ্রহণ করিয়াছিলেন (সাধনা, চতুর্থ বর্ষ, ১৩০১-০২ ; ভারতী, ১৩০৫ ; বঙ্গদর্শন, ১৩০৮-১২ ; ভাণ্ডার, ১৩১২-১৩—রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক পরিচালিত বা সম্পাদিত সাময়িক পত্রের ইহাও সম্পূর্ণ তালিকা নহে। সাধনার প্রথম তিন বৎসরের সম্পাদক সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় থাকিলেও রবীন্দ্রনাথই প্রধান লেখক ছিলেন), এবং এই রচনার অনেকগুলি সম্পাদকীয় মন্তব্যরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল।

রাজা প্রজা

ইংরেজ ও ভারতবাসী[১১]	সাধনা, আশ্বিন-কার্তিক, ১৩০০
রাজনীতির দ্বিধা	সাধনা, চৈত্র, ১৩০০
অপমানের প্রতিকার	সাধনা, ভাদ্র, ১৩০১
সুবিচারের অধিকার	সাধনা, অগ্রহায়ণ, ১৩০১
কণ্ঠরোধ	ভারতী, বৈশাখ, ১৩০৫
অত্যুক্তি[১৪]	বঙ্গদর্শন, কার্তিক, ১৩০৯
ইম্পীরিয়লিজম	ভারতী, বৈশাখ, ১৩১২
রাজভক্তি[১৩]	ভাণ্ডার, মাঘ, ১৩১২
বহুরাজকতা	ভাণ্ডার, আষাঢ়, ১৩১২
পথ ও পাথেয়[১২]	বঙ্গদর্শন, জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৫
সমস্যা	প্রবাসী, আষাঢ়, ১৩১৫

সমূহ

[১৫]স্বদেশী সমাজ[১৪]	বঙ্গদর্শন, ভাদ্র, ১৩১১
স্বদেশী সমাজ প্রবন্ধের পরিশিষ্ট[১৪]	বঙ্গদর্শন, আশ্বিন, ১৩১১
দেশনায়ক[১২]	বঙ্গদর্শন, জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৩
সফলতার সদুপায়[১৪]	বঙ্গদর্শন, চৈত্র, ১৩১১
পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনীর অভিভাষণ[১৩]	প্রবাসী, ফাল্গুন, ১৩১৪
সদুপায়	প্রবাসী, শ্রাবণ, ১৩১৫

পরিশিষ্ট

সার লেপেল গ্রিফিন	সাধনা, শ্রাবণ, ১২৯৯
ইংরেজের আতঙ্ক	সাধনা, পৌষ, ১৩০০

রাজা ও প্রজা	সাধনা, শ্রাবণ, ১৩০১
প্রসঙ্গ কথা ১—৫	ভারতী, জ্যৈষ্ঠ, শ্রাবণ, আশ্বিন, কার্তিক, অগ্রহায়ণ, ১৩০৫
মুখুজ্যে বনাম বাঁড়ুজ্যে	ভারতী, ভাদ্র, ১৩০৫
অপর পক্ষের কথা	ভারতী, আশ্বিন, ১৩০৫
আলট্রা কনসার্ভেটিভ	ভারতী, কার্তিক, ১৩০৫
বিরোধমূলক আদর্শ	বঙ্গদর্শন, আশ্বিন, ১৩০৮
রাষ্ট্রনীতি ও ধর্মনীতি	বঙ্গদর্শন, কার্তিক, ১৩০৯
রাজকুটুম্ব	বঙ্গদর্শন, বৈশাখ, ১৩১০
ঘুষাঘুষি	বঙ্গদর্শন, ভাদ্র, ১৩১০
বঙ্গবিভাগ	বঙ্গদর্শন, জ্যৈষ্ঠ, ১৩১১
দেশের কথা	বঙ্গদর্শন, শ্রাবণ, ১৩১১
ব্যাধি ও প্রতিকার[১৫]	প্রবাসী, শ্রাবণ, ১৩১৪
যজ্ঞভঙ্গ[১৬]	প্রবাসী, মাঘ, ১৩১৪
দেশহিত	বঙ্গদর্শন, আশ্বিন, ১৩১৫

স্বদেশী আন্দোলনের এক পর্বে যখন দেশে মতানৈক্য প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল তখন "দেশনায়ক" প্রবন্ধে (পশুপতিনাথ বসুর সৌধপ্রাঙ্গণে আহূত মহাসভায় পঠিত, ১৫ বৈশাখ ১৩১৩) রবীন্দ্রনাথ "দেশের সমস্ত উদ্যমকে বিক্ষেপের ব্যর্থতা হইতে একের দিকে ফিরাইয়া আনিবার একমাত্র উপায়"স্বরূপে "কোনো এক জনকে আমাদের অধিনায়ক বলিয়া স্বীকার" করিবার প্রস্তাব করেন,[১৭] এবং সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে "সকলে মিলিয়া প্রকাশ্যভাবে দেশনায়করূপে বরণ করিয়া লইবার জন্য" সমস্ত বঙ্গবাসীকে আহ্বান করেন :

> [১৮] অল্পকাল পূর্বে বাংলাদেশে স্বদেশী আন্দোলনের যখন প্রথম জোয়ার আসিয়াছিল, তখন ছাত্রদের মুখে এবং চারিদিকে "নেতা" "নেতা" "নেতা" রব উঠিয়াছিল। তখন এই নেতৃহীন দেশে অকস্মাৎ নেতা এতই অদ্ভুত সুলভ হইয়াছিল যে, আমাদের মত সাহিত্যরসবিহ্বল অকর্মণ্য লোকেরও নেতা হইবার সাংঘাতিক ফাঁড়া নিতান্তই অল্পের উপর দিয়া কাটিয়াছে। শান্তিপ্রিয় ভদ্রলোকদের তখন এমনি বিপদের দিন গেছে যে, "আমি নেতা নই" বলিয়া গলায় চাদর দিলেও সেই তাহার গলার চাদরটা ধরিয়াই তাহাকে নেতার কাঠগড়ায় টানিয়া আনিবার নির্দয় চেষ্টা করা হইয়াছে।
>
> হঠাৎ সমস্ত দেশের এইরূপ উৎকট 'নেতা'-বায়ুগ্রস্ত হইবার কারণ এই যে,

কাজের হাওয়া দিবামাত্রই স্বভাবের নিয়মে সর্ব-প্রথমে নেতাকে ডাক পড়িবেই। সেই ডাকে প্রথম ধাক্কায় বাজারে ছোটো-বড়ো ঝুঁটা-খাঁটি বহুবিধ নেতার আমদানি হয় এবং লোকে প্রাণের গরজে বিচার করিবার সময় পায় না,—নেতা লইয়া টানাটানি-কাড়াকাড়ি করিতে থাকে। ইহাতে করিয়া অনেক মিথ্যার, অনেক কৃত্রিমতার সৃষ্টি হয়, কিন্তু ইহার মধ্যে আসল সত্যটুকু এই যে, আমাদের নিতান্তই নেতা চাই—নহিলে আমাদের আশা-উদ্যম-আকাঙ্ক্ষা সমস্ত ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে।

যাহা হউক, একদিন যখন নেতাকে ডাকি নাই, কেবল বক্তৃতাসভার সভাপতিকে খুঁজিয়াছিলাম, সেদিন গেছে; তার পরে একদিন যখন "নেতা নেতা" করিয়া উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিলাম, সেদিনও আজ নাই; অতএব আজ অপেক্ষাকৃত স্থিরচিত্তে আমাদের একজন দেশনায়ক বরণ করিয়া লইবার প্রস্তাব পুনর্বার সর্বসমক্ষে উত্থাপন করিবার সময় হইয়াছে বলিয়া অনুভব করিতেছি। এ-সম্বন্ধে আজ কেবল যে আমাদের বোধশক্তি পরিষ্কার হইয়াছে, তাহা নহে, আমাদের ক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়াছে এবং দেশের হৃদয় নানা আন্দোলনের ও নানা পরিভ্রমণের পরেও অবশেষে যাঁহাকে নেতা বলিয়া স্বীকার করিতে চাহে, তাঁহার পরিচয় অদ্য যেন পরিস্ফুটতর হইয়া উঠিয়াছে।

আমি জানি, এই সভাস্থলে দেশনায়ক বলিয়া আমি যাঁহার নাম লইতে উদ্যত হইয়াছি, তাঁহার নাম আজ কেবল বাংলাদেশে নহে, ভারতবর্ষের সর্বত্র ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। আমি জানি, আজ বঙ্গলক্ষ্মী যদি স্বয়ংবরা হইতেন, তবে তাঁহারই কণ্ঠে বরমালা পড়িত। ব্রাহ্মণের ধৈর্য ও ক্ষত্রিয়ের তেজ যাঁহাতে একত্রে মিলিত, যিনি সরস্বতীর নিকট হইতে বাণী পাইয়াছেন এবং যাঁহার অক্লান্ত কর্মপটুতা স্বয়ং বিশ্বলক্ষ্মীর দান—আজ বাংলাদেশের দুর্যোগের দিনে যাঁহারা নেতা বলিয়া খ্যাত, সকলের উপরে যাঁহার মস্তক অভ্রভেদী গিরিশিখরের মতো বজ্রগর্ভ মেঘপুঞ্জের মধ্যে জাগিয়া উঠিয়াছে, সেই সুরেন্দ্রনাথকে সকলে মিলিয়া প্রকাশ্যভাবে দেশনায়করূপে বরণ করিয়া লইবার জন্য আমি সমস্ত বঙ্গবাসীকে আহ্বান করিতেছি।

সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার নবযৌবনের জ্যোতিঃপ্রদীপ্ত প্রভাতে দেশহিতের জাহাজে হাল ধরিয়া যেদিন যাত্রা আরম্ভ করিয়াছিলেন, সেদিন ইংরেজিশিক্ষাগ্রস্ত যুবকগণ একটিমাত্র বন্দরকেই আপনাদের গম্যস্থান বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন—সেই বন্দরের নাম রাজপ্রসাদ। সেখানে আছে সবই—লোকে যাহা কিছু কামনা করিতে পারে, অন্নবস্ত্র-পদমান সমস্তই রাজভাণ্ডারে বোঝাই করা রহিয়াছে।

আমরা ফর্দ ধরিয়া ধরিয়া উচ্চস্বরে চাহিতে আরম্ভ করিলাম—ডাঙা হইতে উত্তর আসিল, "এস না, তোমরা নামিয়া আসিয়া লইয়া যাও।" কিন্তু আমাদের নামিবার ঘাট নাই ; আর-আর সমস্ত বড়ো-বড়ো জাহাজে পথ আটক করিয়া নোঙর ফেলিয়া বসিয়া আছে, তাহারা এক-ইঞ্চি নড়িতে চায় না। এদিকে ফর্দ আওড়াইতে আওড়াইতে আমাদের গলা ভাঙিয়া গেল—দিন অবসান হইয়া আসিল। কখনো বা রাগ করিয়া যাহা মুখে আসে তাহাই বলি, কখনো বা চোখের জলে কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসে। কেহ নিষেধও করে না, কেহ পথও ছাড়ে না ; বাধাও নাই, সুবিধাও নাই। আর-আর সকলে দিব্য কেনাবেচা করিয়া যাইতেছে, নিশান উড়িতেছে, আলো জ্বলিতেছে, ব্যাণ্ড বাজিতেছে। আমরা সন্ধ্যাকাশের অবিচলিত নক্ষত্ররাজি ও রাজবাতায়নের অনিমেষ দীপমালার প্রতি লক্ষ্য করিয়া সকলের পশ্চাৎ হইতে আমাদের "দরিদ্রাণাং মনোরথাঃ" অক্ষুণ্ণ অধ্যবসায়ের সহিত অবিশ্রাম নিবেদন করিয়া চলিলাম।

এইভাবে কতদিন, কত বৎসর কাটিত, তাহা বলিতে পারি না। এমন সময় এই নিঃসহ নিশ্চলতার মধ্যে বিধাতার কৃপায় পশ্চিম-আকাশ হইতে হঠাৎ একটা বড়োরকম ঝড় উঠিল। আমাদের দেশহিতের জাহাজটাকে পূবের মুখে হুহু করিয়া ছুটাইয়া চলিল অবশেষে যেখানে আসিয়া তীর পাইয়া বাঁচিয়া গেলাম, চাহিয়া দেখিলাম, সে যে আমাদের ঘরের ঘাট। সেখানে নিশান উড়ে না, ব্যাণ্ড বাজে না, কিন্তু পুরলক্ষ্মীরা যে হুলুধ্বনি দিতেছেন, দেবালয়ে যে মঙ্গলশঙ্খ বাজিয়া উঠিল। এতদিন অভুক্ত থাকিয়া পরের পাকশালা হইতে কেবল বড়ো-বড়ো ভোজের গন্ধটা পাইতেছিলাম, আজ যে দেখিতে দেখিতে সম্মুখে পাত পাড়িয়া দিল। আমরা জানিতাম না, এ যজ্ঞে আমাদের মাতা আমাদের জন্য এতদিন সজলচক্ষে অপেক্ষা করিয়া ছিলেন। তিনিই আজ দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর সুরেন্দ্রনাথের শিরশ্চুম্বন করিয়া তাঁহাকে আপন কোলের দিকে টানিয়াছেন। আমরা আজ সুরেন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করি, তিনি সেই পশ্চিম-বন্দরের শাদা-পাথরে বাঁধানো সোনার দ্বীপে এমন সুস্নিগ্ধ সার্থকতা একদিনের জন্যও লাভ করিয়াছেন ? —এমন আশাপরিপূর্ণ অমৃতবাণী স্বপ্নেও শুনিয়াছেন ?

বিধাতার কৃপাঝড়ে সুরেন্দ্রনাথের সেই জাহাজকে যে ঘাটে আনিয়া ফেলিয়াছে, ইহার নাম আত্মশক্তি। এইখানে যদি আমরা কেনাবেচা করিতে পারিলাম, তো পারিলাম—নতুবা অতলস্পর্শ লবণাম্বুগর্তে ডুবিয়া মরাই আমাদের পক্ষে শ্রেয় হইবে। কাপ্তেন, এখানকার প্রত্যেক ঘাটে ঘাটে আমাদের বিস্তর

লেনাদেনা করিবার আছে—শিক্ষাদীক্ষা, সুখস্বাস্থ্য, অন্নবস্ত্র, সমস্ত আমাদিগকে বোঝাই করিয়া লইতে হইবে—এবারে আর সেই রাজ-অট্টালিকার শূন্যগর্ভ গুম্বজটার দিকে একদৃষ্টিতে দূরবীণ কষিয়া নোঙর ফেলিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। আমরা আজ যে-যাহার ছোটোখাটো মূলধন হাতে করিয়া ছুটিয়া আসিয়াছি—এবারে আর বাঁধাবন্দরে পুনঃপুন বন্দনাগীত গাওয়া নয়,—এবার পাহাড় বাঁচাইয়া, ঝড় কাটাইয়া আমাদিগকে পার করিতে হইবে কাপ্তেন।—তোমার উপরে অনেকের ভরসা আছে—হাল ধরিয়া তোমার হাত শক্ত, ঢেউ খাইয়া তোমার হাড় পাকিয়াছে। এতদিন যে-নামের দোহাই পাড়িতে পাড়িতে দিন কাটিয়া গেল, সে-নাম ছাড়িয়া আজ যথার্থ কাজের পথে পাড়ি দিবার বেলায় ঈশ্বরের নাম করো, আমরাও এককণ্ঠে তাঁহার জয়োচ্চারণ করিয়া সকলে তোমার চতুর্দিকে সম্মিলিত হই।···

[১৯] আপনাদের যদি অভিমত হয়, তবে আর কালবিলম্বমাত্র না করিয়া বঙ্গদেশের এই মঙ্গলমহাসনে সুরেন্দ্রনাথের অভিষেক করি। জানি, এরূপ কোনো প্রস্তাব কখনোই সর্ববাদিসম্মত হইতেই পারে না, কিন্তু তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিলে চিরদিন কেবল অপেক্ষা করিয়াই থাকা হইবে, তাহার বেশি আর কিছুই হইবে না। যাঁহারা প্রস্তুত আছেন, যাঁহারা সম্মত আছেন, তাঁহারা এই কাজ আরম্ভ করিয়া দিন। তাঁহারা সুরেন্দ্রনাথকে সমস্ত ক্ষুদ্রবন্ধন হইতে মুক্ত করুন, তাঁহাকে দেশনায়কের উপযুক্ত গৌরবরক্ষার সামর্থ্য দিন, সকলের যোগ্যতা মিলিত করিয়া তাঁহাকে এই পদের যোগ্য করিয়া তুলুন।···

[২০] যাঁহারা সাধক, যাহারা দেশের গুরু, তাঁহারা খ্যাতিপ্রতিপত্তির অপেক্ষা না রাখিয়া, বিরোধ-অবমাননার আশঙ্কা স্বীকার করিয়াও দেশের মতি ফিরাইতে চেষ্টা করিবেন—আর যাঁহারা দেশের নায়ক, তাঁহারা দেশকে গতিদান করিবেন। যে-সকল জাতি স্থির হইয়া বসিয়া নাই, যাহারা চলিতেছে, তাহারা এইভাবেই চলিতেছে। এক দল উপর হইতে তাহাদের শুভবুদ্ধিকে নিয়মিত করিতেছে, আর-এক দল বক্ষের মধ্যে থাকিয়া তাহাদের প্রাণশক্তি-গতিশক্তিকে প্রবর্তিত করিতেছে। এই উভয় দলের পরস্পরে অনেক সময়েই একমত হয় না, কিন্তু তাই বলিয়া যাহারা চালাইতেছে, তাহাদের বসিয়া থাকিলে চলে না। কারণ, শিক্ষা শুধু উপদেশে নহে, চলার মধ্যেই শিক্ষা আছে।

অতএব এতদিন যে সুরেন্দ্রনাথ বিনা নিয়োগে নিজের ক্ষমতাবলেই দেশকে সাধারণহিতের পথে চালনা করিয়া আসিয়াছেন, আজ তাঁহাকে নিয়োগপত্র দিয়া

> নায়কপদে অভিষিক্ত করিবার প্রস্তাব আমি উত্থাপন করিতেছি। নিয়োগপত্র দিলে তাঁহার ক্ষমতা সুনিশ্চিত এবং তাঁহার দায়িত্ব গভীরতর হইবে এবং তিনি কেবলমাত্র শিক্ষিতসম্প্রদায়ের ইংরেজিবিদ্যার অভ্যস্ত বুলির প্রতি কর্ণপাত না করিয়া আমাদের এই পুরাতন দেশের চিরন্তন প্রকৃতির প্রতি মনোযোগ করিবেন —যে-সকল পদার্থ পরদেশের সজীব কলেবরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, যথাস্থান হইতে ভ্রষ্ট হইলে এ-দেশে যাহা অসংগত আবর্জনারূপে গণ্য হইবে, অনুকরণের মোহে তাহাকে তিনি আদর করিবেন না,—বিরোধমূলক যে সংগ্রামশীলতা য়ুরোপীয় সভ্যতার স্বভাবগত, যাহা কখনোই এ-দেশের মৃত্তিকায় মূলবিস্তার করিয়া ফলবান হইবে না, তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া যে মঙ্গলময় মিলনপরতা, যে অবিচলিত ধর্মনিষ্ঠা ভারতবর্ষের চিরকালীন সাধনা, তাহাকেই বর্তমানকালের অবস্থান্তরের সহিত তিনি সংগত করিয়া লইবার চেষ্টা করিবেন। কিন্তু তিনি কী করিবেন না-করিবেন, এ-স্থলে তাহা অনুমান ও আলোচনা করা বৃথা—কেবল ইহাই সত্য যে, তাঁহার করার মধ্যে আমাদেরই কর্ম প্রকাশ পাইবে, দেশ তাঁহারই মধ্য দিয়া নিজেকে ব্যক্ত করিবে, তাঁহারই এক হস্ত দ্বারা নিজের প্রাপ্য গ্রহণ করিবে ও তাঁহারই অন্য হস্ত দ্বারা নিজের দান বিতরণ করিবে—ধর্মবিরুদ্ধ না হইলে, সত্যকে লঙ্ঘন না করিলে ইঁহার বিরুদ্ধে আমরা বিদ্রোহ করিব না এবং এই নিয়ম ও নিয়ন্তাকে স্বেচ্ছাকৃত সুতরাং অলঙ্ঘ্য বাধ্যতাসহকারে মান্য করাই আমাদের প্রত্যেকের পক্ষে আত্মসম্মান বলিয়া গণ্য হইবে। এইরূপে সমস্ত বলক্ষয়কর দ্বিধা ও সমস্ত আত্মাভিমানের কুশকণ্টক সবলে উৎপাটিত করিয়া যদি একের মধ্যে আমরা আমাদিগকে নিবিড়ভাবে একত্র করিতে পারি, তবে আর আমাদিগকে নিজের শক্তির অহংকার করিবার জন্য সর্বদা আস্ফালন করিতে হইবে না, পরের বিমুখতাকে ফিরাইবার জন্য প্রাণপণে অত্যুক্তির সৃষ্টি করিতে হইবে না—তবেই আমরা শান্তভাবে, বলিষ্ঠ ও ধীরভাবে মহৎ হইতে পারিব এবং নিজের দেশের মধ্যে নিজের যথার্থ স্থানটি অধিকার করিয়া কর্মগৌরবের মধ্যে সার্থকতা প্রাপ্ত হইয়া পোলিটিক্যাল ধনুষ্টংকারের অত্যুগ্র আক্ষেপ হইতে রক্ষা পাইব—আমরা সুস্থ হইব, স্বাভাবিক হইব, সংযত-আত্মসংবৃত হইব এবং নিজের চাপল্যবিহীন মর্যাদার মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া পরের উপেক্ষাকে অকাতরে উপেক্ষা করিতে পারিব।

“দেশনায়ক” প্রবন্ধ বরিশালে প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশনের **“ছত্রভঙ্গ”** হইবার পর লিখিত। এই সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধের উপক্রমণিকায় বলেন :

এবারে বরিশাল প্রাদেশিক সমিতিতে বাঙালি খুব একটা আঘাত পাইয়াছে, সে-কথা সকলেই জানেন। ভাতে মারার চেয়ে হাতে মারাটা উপস্থিতমতো গুরুতর বলিয়াই মনে হয়। আইন কলের রোলারের মতো নির্মমভাবে আমাদের অনেক আশা দলন করিতে পারে, কিন্তু পুলিসের সাক্ষাৎ হস্তক্ষেপ বলিতে কী বুঝায়, সশরীরে তাহার অভিজ্ঞতালাভ সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকদের সদাসর্বদা ঘটে না। এবারে অকস্মাৎ তাহার প্রত্যক্ষ পরিচয় পাইয়া দেশের মান্যগণ্য লোকের চিত্ত উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে।

একটা প্রতিকারের পথ, একটা কাজ করিবার ক্ষেত্র না পাইলে, বেদনা নিজের প্রতি উত্তেজনার সমস্ত বেগ আকর্ষণ করিয়া অসংযত হইয়া অপরিমিতরূপে বড়ো হইয়া উঠে। আমরা জানিতাম, ব্রিটিশরাজ্যে আইন-জিনিসটা ধ্রুব—এইজন্য সকল উপদ্রবের উপর আইনের দোহাই পাড়িতাম—কিন্তু আইন স্বয়ং বিচলিত হইয়া উপদ্রবের আকার ধারণ করিলে ক্ষণকালের জন্যও মনকে শান্ত করিবার কোনো উপায় খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। জলের মধ্যে তুফান উঠিলে লোকে ডাঙার দিকে ছোটে—কিন্তু ভূমিকম্পে ডাঙা যখন স্বয়ং দুলিতে আরম্ভ করে, যাহাকে অচল বলিয়া সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত ছিলাম, সে যখন চঞ্চল হইতে থাকে, তখনই বিভীষিকা একেবারে বীভৎস হইয়া উঠে।

এইরূপ সাধারণ চঞ্চলতার সময় সংপরামর্শের সময় নহে। আমিও এই দেশব্যাপী ক্ষোভের সময় স্থিরভাবে মন্ত্রণা দিতে অগ্রসর হইতাম না। কাল—যিনি নীরব, যিনি বিধাতার সুদৃঢ় দক্ষিণহস্ত, যিনি সকল কলকে ধৈর্যের সহিত পাকাইতে থাকেন, আমিও নিষ্ঠার সহিত তাঁহারই নিগূঢ় নিয়মের প্রতি নির্ভর করিয়া প্রতীক্ষা করিব স্থির করিয়াছিলাম, কিন্তু একটি মহান্ আশ্বাস এই অসময়েও আমাকে উৎসাহিত করিয়াছে।

এবারে কর্তৃপুরুষদের সহিত সংঘাতে বাঙালি জয়ী হইয়াছে। এই সংকটকালে বাঙালি যে-বলের পরিচয় দিয়াছে, সেই বলের দৃষ্টান্তই তাহার সম্মুখে স্থিরভাবে ধরিব বলিয়া এই সভাস্থলে আমি অদ্য উপস্থিত হইয়াছি।

সেদিনকার উপদ্রবে যাহারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা সকলেই আমাদের ছাত্রদলের, যুবকগণের ও নায়কবর্গের অবিচলিত ধৈর্য দেখিয়া বিস্ময়ান্বিত হইয়াছেন। যে উৎপাত কোনোমতে আশা করা যায় না, তাহা সহসা মাথার উপরে ভাঙিয়া পড়িলে তখনই মানুষের গভীরতর প্রকৃতি আপনাকে অনাবৃতভাবে

প্রকাশ করিয়া ফেলে। সেদিন বাঙালি নিজেকে যেরূপে ব্যক্ত করিয়াছে, তাহাতে আমাদের লজ্জার কোনো কারণ ঘটে নাই।

আপনারা সকলেই জানেন, সেদিন সভাপতিকে লইয়া যখন প্রতিনিধি ও সভাসদ্‌গণ মন্ত্রণাসভার পথে যাত্রা করিয়াছিলেন, তখন নায়কবর্গের আদেশ অনুসারে যাত্রিগণ কেহ একটি যষ্টিও গ্রহণ করেন নাই। এবং পুলিস যখন নিরস্ত্র-তাঁহাদের উপর পড়িয়া আঘাতবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল, তখনও নায়কদের উপদেশ স্মরণ করিয়া তাঁহারা দৃঢ়তার সহিত সমস্ত সহ্য করিয়াছেন।

আমি জানি, এ-সম্বন্ধে অবিচারের আশঙ্কা আছে।

"তেজস্বিন্যবলিপ্ততা মুখরতা বক্তর্যশক্তিঃ স্থিরে"

তেজস্বিতাকে অহংকার, বাগ্মিতাকে মুখরতা এবং স্থৈর্যকে অশক্তি বলিয়া নিন্দুকে নিন্দা করে। সময়বিশেষে স্থৈর্য অশক্তির লক্ষণরূপে প্রকাশ পায় বটে, কিন্তু যখন তাহা বীর্য হইতে প্রসূত হয়, তখন তাহা বীর্যের শ্রেষ্ঠলক্ষণ বলিয়াই গণ্য হয়। বরিশালে কর্তৃপক্ষ অসংযমের দ্বারা হাস্যকর কাপুরুষতা এবং আমরা স্থৈর্যের দ্বারা শক্তির গাম্ভীর্য প্রকাশ করিয়াছি, এ-বিষয়ে সন্দেহ নাই।

এই যে সাময়িক উৎপাতের দ্বারা আত্মবিস্মৃত না হইয়া সাধারণের মঙ্গলের উদ্দেশে আমরা উদ্বেল প্রবৃত্তিকে সম্পূর্ণ শাসনে রাখিয়াছিলাম, ইহার দ্বারাই আশান্বিত হইয়া উত্তেজনাশান্তির পূর্বেই অদ্যকার সভায় আমি দুই-একটি কথা বলিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

দেশের হিতসাধন একটা বৃহৎ মঙ্গলের ব্যাপার, নিজের প্রবৃত্তির উপস্থিত চরিতার্থতাসাধন তাহার কাছে নিতান্তই তুচ্ছ। যদি এই বৃহৎ লক্ষ্যটাকে আমাদের হৃদয়ের সম্মুখে যথার্থভাবে ধরিয়া রাখিতে পারি, তবে ক্ষণিক উত্তেজনা, ক্ষুদ্র অন্তর্দাহ আমাদিগকে পথভ্রষ্ট করিতে পারে না।

"বয়কট"-আন্দোলন সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধে বলেন :

“আপনাদের কাছে আমি স্পষ্টই স্বীকার করিতেছি, বাঙালীর মুখে"বয়কট" শব্দের আস্ফালনে আমি বারংবার মাথা হেঁট করিয়াছি। আমাদের পক্ষে এমন সংকোচজনক কথা আর নাই। বয়কট দুর্বলের প্রয়াস নহে, ইহা দুর্বলের কলহ। আমরা নিজের মঙ্গলসাধনের উপলক্ষ্যে নিজের ভালো করিলাম না, আজ পরের মন্দ করিবার উৎসাহেই নিজের ভালো করিতে বসিয়াছি, এ-কথা মুখে উচ্চারণ করিবার নহে। আমি অনেক বক্তাকে উচ্চৈঃস্বরে বলিতে শুনিয়াছি —"আমরা য়ুনিভর্সিটিকে বয়কট করিব।" কেন করিব? য়ুনিভর্সিটি যদি ভালো জিনিস

হয়, তবে তাহার সঙ্গে গায়ে পড়িয়া আড়ি করিয়া দেশের অহিত করিবার অধিকার আমাদের কাহারও নাই। যদি য়ুনিভর্সিটি অসম্পূর্ণ হয়, যদি তাহা আমাদিগকে অভীষ্টফল দান না করে, তবে তাহাকে বর্জন করাকে বয়কট করা বলে না। যে মনিব বেতন দেয় না, তাহার কর্ম ছাড়িয়া দেওয়াকে বয়কট করা বলে না। কচ দৈত্যগুরুর আশ্রমে আসিয়া দৈত্যদের উৎপীড়ন ও গুরুর অনিচ্ছাসত্ত্বেও ধৈর্য ও কৌশল অবলম্বনপূর্বক বিদ্যালাভ করিয়া দেবগণকে জয়ী করিয়াছেন। জাপানও য়ুরোপের আশ্রম হইতে এইরূপ কচের মতোই বিদ্যালাভ করিয়া আজ জয়যুক্ত হইয়াছেন। দেশের যাহাতে ইষ্ট, তাহা যেমন করিয়াই হউক সংগ্রহ করিতে হইবে, সেজন্য সমস্ত সহ্য করা পৌরুষেরই লক্ষণ--তাহার পর সংগ্রহকার্য শেষ হইলে স্বাতন্ত্র্যপ্রকাশ করিবার দিন আসিতে পারে। দেশের কাজে রাগারাগিটা কখনোই লক্ষ্য হইতে পারে না। দেশের কাজের মাহাত্ম্য যদি আমরা মনের মধ্যে ধারণ করিয়া রাখিতে পারি, তবে তাহারই উদ্দেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উত্তেজনা আমরা উপেক্ষা করিয়া কর্তব্যপথে স্থির থাকিতে পারিব।

আমাদের সৌভাগ্যক্রমে, দেশে স্বদেশী উদ্‌যোগ আজ যে এমন ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, বয়কট তাহার প্রাণ নহে। একটা তুচ্ছ কলহের ভাব কখনোই দেশের অন্তঃকরণকে এমন করিয়া টানিতে পারিত না। এই যে স্বদেশী উদ্‌যোগের আহ্বানমাত্রে দেশ একমুহূর্তে সাড়া দিয়াছে, কার্জনের সঙ্গে আড়ি তাহার কারণ হইতেই পারে না; জগতে কার্জন এতবড়ো লোক নহে; এই আহ্বান দেশের শুভবুদ্ধির সিংহদ্বারে আঘাত করিয়াছিল বলিয়াই আজ ইহা এত দ্রুত এমন সমাদর পাইয়াছে। আজ আমরা দেশের কাপড় পরিতেছি কেবল পরের উপর রাগ করিয়া, এই যদি সত্য হয়, তবে দেশের কাপড়ের এতবড়ো অবমাননা আর হইতেই পারে না। আজ আমরা স্বায়ত্তভাবে দেশের শিক্ষার উন্নতিসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছি, রাগারাগিই যদি তাহার ভিত্তিভূমি হয়, তবে এই বিদ্যালয়ে আমরা জাতীয় অগৌরবের স্মরণস্তম্ভ রচনা করিতেছি।

আরও লজ্জার কারণ এই যে, বয়কটের মধ্যে আমরা যে স্পর্ধা প্রকাশ করিতেছি, সেই স্পর্ধার শক্তিটা কোথায় অবস্থিত? সে কি আমাদের নিজের গায়ের জোরে, না ইংরেজশাসনতন্ত্রের ক্ষমাগুণে! যখনই সেই ক্ষমাগুণের লেশমাত্র বৈলক্ষণ্য দেখি, যখনই মানবধর্মবশত স্পর্ধার বিরুদ্ধে ক্ষমতাশালীর আক্রোশ আইনের বেড়ার কোনো-একটা অংশ একটুমাত্র আল্‌গা করিয়া ফেলে,

অমনি আমরা বিস্মিত ও উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠি এবং তৎক্ষণাৎ প্রমাণ করিয়া করিয়া দিই যে, পরের ধৈর্যের প্রতি বিশ্বাসস্থাপন করিয়াই আমরা পরকে উত্তেজিত করিতেছিলাম। আমাদের স্পর্ধা যদি যথার্থ আমাদেরই শক্তি হইতে উদ্ভূত হইত, তবে অপরপক্ষের স্বাভাবিক রোষ এবং শাসনের কাঠিন্য আমরা স্বীকার করিয়া লইতাম, তবে উদ্যতমুষ্টি দেখিবামাত্র তৎক্ষণাৎ আমরা মিণ্টো-মর্লির দোহাই পাড়িতে ও আদালতের আবদার কাড়িতে ছুটিতাম না।

এ-কথা মানিতেই হয় যে, স্বভাবের নিয়মে স্পর্ধার বিরুদ্ধে ক্রোধ উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং সক্ষমের ক্রোধ কোনো-না-কোনো উপায়ে হিংসার আকার ধারণ করে। যদি আমরা ইংরেজকে বলি, "তোমাকে জব্দ করিবার জন্যই আমরা দেশের ভালো করিতেছি" এবং তার পরে ইংরেজ রক্তচক্ষু হইবামাত্র বলি, "বাঃ, আমরা দেশের ভালো করিতেছি, তোমরা রাগ করিতেছ কেন", তবে গাম্ভীর্যরক্ষা করা কঠিন হয়।

জব্দ করিতে পারার একটা সুখ আছে, সন্দেহ নাই—কিন্তু দেশের ভালো করিতে পারার সুখ যদি তাহার চেয়ে বড়ো হয়, তবে তাহারই খাতির রাখিতে হয়। আমরা বয়কট করিয়াই দেশী কাপড় চালাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, এ-কথা বলিবামাত্র দেশী কাপড় চালানো বিঘ্নসংকুল হইয়া উঠে, সুতরাং জব্দ করিবার সুখ ভোগ করিতে গিয়া ভালো করিবার সুখ খর্ব করিতে হয়। দেশী কাপড় চালানো ইংরেজের বিরুদ্ধে আমাদের একটা লড়াই, এ-কথা বলিলেই যাহা আমাদের চিরন্তন মঙ্গলের পবিত্র ব্যাপার, তাহাকে মল্লবেশ পরাইয়া পোলিটিকাল্ আখড়ায় টানিয়া আনিতে হয়; ইংরেজ তখন এই উদ্‌যোগকে কেবল যে নিজের দেশের তাঁতির লোকসান বলিয়া দেখে, তাহা নয়, এই হারজিতের ব্যাপারকে একটা পোলিটিকাল সংগ্রাম বলিয়া গণ্য করে। ইহাতে ফল হয় এই যে, নিজের দুর্বল প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার উদ্দেশে আমরা স্বদেশের হিতকে ইচ্ছাপূর্বক বিপদের মুখে ফেলিয়া দিই। আমাদের দেশে তো অন্তরে-বাহিরে, নিজের চরিত্রে ও পরের প্রতিকূলতায় বিঘ্ন ভূরিভূরি আছে, তাহার 'পরে আস্ফালন করিয়া নূতন বিঘ্নকে হাঁক দিয়া ডাকিয়া আনিব, এতবড়ো অনাবশ্যক শক্তিক্ষয়ের উপযুক্ত সঞ্চয় যে আমাদের কোথায় আছে, তাহার সন্ধান তো আমি জানি না।

বড়ো-বড়ো স্বাধীনজাতিকেও বিবেচনা করিয়া চলিতে হয়, স্তব্ধ হইয়া থাকিতে হয়। স্বজাতির মঙ্গলসম্বন্ধে যাহাদের দায়িত্ববোধ আছে, তাহারা তেজস্বী হইলেও অনেক লাঙ্গুলমর্দন বিনম্রফণায় নিঃশব্দে স্বীকার করে—ইংলণ্ড-

> ফ্রান্স-জর্মনিতে ইহার অনেক দৃষ্টান্ত দেখা গেছে। জাপান চীনের সঙ্গে লড়াইয়ে জয়ী হইয়াও রাশিয়ার চক্রান্তে লড়াইয়ের ফল যখন ভোগ করিতে পারে নাই, তখন চুপ করিয়া ছিল—আজ রাশিয়াকে পরাস্ত করিয়াও বন্ধুদের মধ্যস্থতায় যখন রক্তপাতের পুরা মূল্য আদায় করিতে পারিল না, তখন হাস্যমুখে বন্ধুগণকে ধন্যবাদ জানাইল। কেন? ইহার কারণ, অসহিষ্ণু হইয়া তেজ দেখাইতে যাওয়াই দুর্বলতা, দেশের মঙ্গলকে শিরোধার্য করিয়া স্তব্ধ হইয়া থাকাই যথার্থ বীরত্ব। যদি ইংলণ্ড-ফ্রান্স-জাপানের পক্ষে এ-কথা সত্য হয়, যদি তাহারা ঔদ্ধত্যপ্রকাশ করিয়া উন্নতির যাত্রাপথে স্বজাতির বোঝা বাড়াইয়া তুলিতে সর্বদাই কুণ্ঠিত হয়, তবে আমাদের এই অতিক্ষুদ্র কর্মক্ষেত্রে কেবল কথায়-কথায় সশব্দে তাল ঠুকিয়া বেড়ানোই কি আমাদের পক্ষে সকলের চেয়ে বড়ো কাজ বলিয়া গণ্য করিতে হইবে? যথাসাধ্য মৌন থাকিয়া, স্তব্ধ থাকিয়া আমাদের চলিবার পথের বিপুলকায় বিঘ্নদৈত্যগুলিকে নিদ্রিত রাখাই কি আমাদের কর্তব্য হইবে না? অবশ্য, কারণ ঘটিলে ক্ষোভ অনুভব না করিয়া থাকা যায় না—কিন্তু অসময়ে অকিঞ্চিৎকরভাবে সেই ক্ষোভের অপব্যয় করা না-করা আমাদের আয়ত্তাধীন হওয়া উচিত।

১৯০৮ সালে (১৩১৪-১৫) মজঃফরপুরে বোমা-নিক্ষেপে দুইজন ইংরেজ মহিলা নিহত হইলে ও মানিকতলায় বোমার কারখানা আবিষ্কার হইলে রবীন্দ্রনাথ “পথ ও পাথেয়” প্রবন্ধ রচনা ও সভায় তাহা পাঠ করিয়া এ-বিষয়ে নিজের অভিমত প্রকাশ করেন। এই সম্পর্কে শ্রীমতী নির্ঝরিণী সরকারকে লিখিত এই পত্রগুলি উল্লেখযোগ্য :

> মাত ইহা নিশ্চয় মনে রাখিবে, নিজের বা পরিবারের বা দেশের কাজে ধর্মকে লঙ্ঘন করিলে ঈশ্বর ক্ষমা করেন না। যদি মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যও পাপকে আশ্রয় করি তবে তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতেই হইবে। বিধাতার এই নিয়মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা বৃথা। দেশের যে দুর্গতিদুঃখ আমরা আজ পর্যন্ত ভোগ করিয়া আসিতেছি তাহার গভীর কারণ আমাদের জাতির অভ্যন্তরে নিহিত হইয়া রহিয়াছে—গুপ্ত চক্রান্তের দ্বারা নরনারী হত্যা করিয়া আমরা সে কারণ দূর করিতে পারিব না আমাদের পাপের বোঝা কেবল বাড়িয়াই চলিবে। এই ব্যাপারে যে-সকল অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক ও বিচলিতবুদ্ধি যুবক দণ্ডনীয় হইয়াছে তাহাদের জন্য হৃদয় ব্যথিত না হইয়া থাকিতে পারে না—কিন্তু মনে রাখিতে হইবে এই দণ্ড আমাদের সকলের দণ্ড—ঈশ্বর আমাদিগকে এই বেদনা দিলেন—কারণ, বেদনা ব্যতীত পাপ দূর হইতেই পারেনা—সহিষ্ণুতার

সহিত এ সমস্তই আমাদিগকে বহন করিতে হইবে—এবং ধর্মের প্রশস্ততর পথকেই অবলম্বন করিতে হইবে। পাপের পথে পথ-সংক্ষেপ হয় বলিয়া আমরা ভ্রম করি সেইজন্যই অধৈর্য হইয়া আমরা সেইদিকে ধাবিত হই কিন্তু তাড়াতাড়ি করিতে গিয়াই সফলতাকে বিসর্জন দিই। আজ আমাদের পথ পূর্বের অপেক্ষা অনেক বাড়িয়া গেল—এখন আবার আমাদিগকে অনেক দুঃখ অনেক বাধা অনেক বিলম্বের মধ্য দিয়া যাইতে হইবে। ঈশ্বরের ইচ্ছার কাছে মাথা নত করিয়া পুনবার আমাদিগকে যাত্রা করিতে হইবে—যত কষ্ট হউক, যত দূরপথ হউক অবিচলিতচিত্তে যেন ধর্মেরই অনুসরণ করি। সমস্ত দুর্ঘটনা সমস্ত চিত্তক্ষোভের মধ্যে ঈশ্বর যেন আমাদিগকে সেই শুভবুদ্ধি দান করেন। ইতি
২৩ বৈশাখ ১৩১৫

মাত তুমি যে দুরূহ প্রশ্নের উত্তর জানিতে চাহিয়াছ পত্রের মধ্যে তাহা বিস্তারিতভাবে ব্যক্ত করা অসম্ভব। আমি এ-সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহাতে আমার মত যথাসম্ভব স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব। সম্ভবত ভারতীতে তাহা বাহির হইবে এবং যদি কর্তব্য বোধ করি, তবে কোনো সভাতেও তাহা পাঠ করিতে পারি। উদার দৃষ্টি দ্বারা জগদ্ব্যাপারকে বৃহৎ করিয়া দেখিতে থাকো—সমস্ত বিঘ্নবিপত্তি ও দুর্বিসহ দুঃখতাপের মধ্যেও ঈশ্বরের মঙ্গল-ইচ্ছার প্রতি বিশ্বাসকে স্থির করিয়া তোমার করুণাপূর্ণ ব্যথিত চিত্ত সান্ত্বনা লাভ করুক এই আশীর্বাদ করি। ইতি ২ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৫

…আমার প্রবন্ধ সভাস্থলে পড়া হয়ে গেছে। পুস্তিকা আকারে ছাপা হচ্ছে—তোমাকে দুই-একদিনের মধ্যেই পাঠিয়ে দেব। এই কথা মনে রেখো, নিজের জন্যেই কি দেশের জন্যেই কি, যা সকলের চেয়ে উচ্চ সত্য তাই একমাত্র সত্য। কোনো উপস্থিত ক্রোধে, লোভে বা কোনো ক্ষুদ্র প্রবৃত্তির উত্তেজনায় ধর্মকে খর্ব করতে গেলে কখনো মঙ্গল হতে পারে না। নিজের প্রয়োজন বা প্রবৃত্তি অনুসারে ধর্মের উপরে হস্তক্ষেপ না করে মরুভূমির পথে ধ্রুবতারার মতো একাগ্রলক্ষ্যে তার দিকে দৃষ্টি রাখলে দুঃখ পাই আর যাই পাই, পথ হারিয়ে বিনাশের মধ্যে পড়তে হবে না। ইতি ১৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৫

স্বদেশী আন্দোলনের সময় দমননীতি অবলম্বিত হইলে রবীন্দ্রনাথ যে "স্বদেশী আন্দোলনে নিগৃহীতদের প্রতি নিবেদন" প্রকাশ করেন তাহাও এইখানে মুদ্রিত হইল :

বাংলাদেশের বর্তমান স্বদেশী আন্দোলনে ঘূর্ণিত রাজদণ্ড যাঁহাদিগকে

পীড়িত করিয়াছে, তাঁহাদের প্রতি আমার নিবেদন এই যে, তাঁহাদের বেদনা যখন আজ সমস্ত বাংলাদেশ হৃদয়ের মধ্যে বহন করিয়া লইল, তখন এই বেদনা অমৃতে পরিণত হইয়া তাঁহাদিগকে অমর করিয়া তুলিয়াছে। রাজচক্রের যে অপমান তাঁহাদের অভিমুখে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, মাতৃভূমির করুণ করস্পর্শে তাহা বরমাল্য রূপ ধারণ করিয়া তাঁহাদের ললাটকে আজ ভূষিত করিয়াছে। যাঁহারা মহাব্রত গ্রহণ করিয়া থাকেন বিধাতা জগৎসমক্ষে তাঁহাদের অগ্নিপরীক্ষা করাইয়া সেই ব্রতের মহত্বকে উজ্জ্বল করিয়া প্রকাশ করেন। অদ্য কঠিনব্রতনিষ্ঠ বঙ্গভূমির প্রতিনিধিস্বরূপ যেই কয়জন এই দুঃসহ অগ্নিপরীক্ষার জন্য বিধাতা-কর্তৃক বিশেষরূপে নির্বাচিত হইয়াছেন তাঁহাদের জীবন সার্থক। রাজরোষরক্ত অগ্নিশিখা তাঁহাদের জীবনের ইতিহাসে লেশমাত্র কালিমাপাত না করিয়া বার বার সুবর্ণ অক্ষরে লিখিয়া দিয়াছে। বন্দে মাতরম্।

—ভাণ্ডার, ফাল্গুন, ১৩০২

---

[১] এই কবিতাটি নৈবেদ্য হইতে সংকলিত হইয়াছিল, কাব্যগ্রন্থের জন্য নূতন রচিত নহে; ইহা উৎসর্গের স্বতন্ত্র সংস্করণে নাই, রচনাবলীতেও ইহা নৈবেদ্যে মুদ্রিত হইয়াছে।

[২] এই নামের যে স্বতন্ত্র গ্রন্থ আছে তাহা কাব্যগ্রন্থের এই বিভাগ হইতে পৃথক।

[৩] স্বতন্ত্র কথা ও কাহিনীর কাহিনী বিভাগের প্রবেশক রূপেও মুদ্রিত হইয়া থাকে, রবীন্দ্র-রচনাবলীও সেইরূপ মুদ্রিত হইয়াছে বলিয়া রচনাবলী-সংস্করণ উৎসর্গে মুদ্রিত হইল না। স্বতন্ত্র সংস্করণ উৎসর্গে মুদ্রিত হইয়া থাকে।

[৪] স্বতন্ত্র কথা ও কাহিনীর কথা বিভাগের প্রবেশকরূপেও মুদ্রিত হইয়া থাকে; রবীন্দ্র-রচনাবলীতেও সেইরূপ মুদ্রিত হইয়াছে বলিয়া রচনাবলী-সংস্করণ উৎসর্গে মুদ্রিত হইল না। স্বতন্ত্র সংস্করণ উৎসর্গে মুদ্রিত হইয়া থাকে।

[৫] এই কবিতাটি স্বতন্ত্র সংস্করণ নৈবেদ্যে সর্বদা মুদ্রিত হইয়া আসিতেছে; রচনাবলীতে সেইরূপ মুদ্রিত হইয়াছে। ইহা স্বতন্ত্র সংস্করণ উৎসর্গে মুদ্রিত হয় না, রচনাবলী-সংস্করণ উৎসর্গেও মুদ্রিত হইল না।

[৬] এই কবিতাটি স্বতন্ত্র সংস্করণ শিশুতে মুদ্রিত হইয়া থাকে, রচনাবলীতেও সেইরূপ মুদ্রিত হইয়াছে। ইহা স্বতন্ত্র সংস্করণ উৎসর্গে মুদ্রিত হয় না, রচনাবলী-সংস্করণ উৎসর্গেও মুদ্রিত হইল না।

[৭] ইহা কথা ও কাহিনী ও উৎসর্গ উভয়েই প্রকাশিত হইয়া থাকে। রবীন্দ্র-রচনাবলীতে ইহা কথা ও কাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে বলিয়া উৎসর্গে মুদ্রিত হইল না।

স্বতন্ত্র সংস্করণ উৎসর্গে মুদ্রিত তিনটি কবিতা রচনাবলী-সংস্করণ উৎসর্গে বাদ গেল: "কত কী যে আসে;" "কথা কও কথা কও;" "নিবেদিল রাজভৃত্য।"

[৮] পূরবীর (প্রথম সংস্করণ, ১৩৩২) "সঞ্চিতা" অংশে সংকলিত হইয়াছিল ; পূরবীতে এই "সঞ্চিতা" অংশ এখন আর মুদ্রিত হয় না।

[৯] কাব্যগ্রন্থের অংশ, ও বর্তমানে স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশিত, সংকল্প ও স্বদেশে মুদ্রিত। সংকল্প ও স্বদেশের অধিকাংশ কবিতাই বিভিন্ন গ্রন্থ হইতে সংকলিত বলিয়া এগুলি রচনাবলীতে সংকল্প ও স্বদেশ নামে মুদ্রিত হইবে না।

[১০] আনন্দবাজার পত্রিকা সম্পাদক সমীপে। সবিনয় নিবেদন, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা বাংলা পাঠ্যগ্রন্থে আমার 'নির্ঝরিণী" কবিতাটি সংকলিত হয়েছে। ছাত্রেরা অনেকে জানাচ্ছেন মানে বোঝা গেল না। প্রত্যেককে স্বতন্ত্র পত্রে বোঝাতে গেলে অপরাধের চেয়ে শাস্তি বড়ো হয়ে ওঠে—অভিজ্ঞাদের কয়েদীর মতো শেষ মেয়াদ সম্বন্ধেও অনিশ্চিত থাকতে হয়। এজন্য আনন্দবাজার পত্রিকায় বক্তব্যটি পাঠানো গেল, অনুগ্রহপূর্বক প্রকাশ করে আমার দায় লাঘব করবেন। ইতি ৩ ভাদ্র ১৩৪৩।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[১১] চৈতন্য লাইব্রেরির অধিবেশনে বঙ্কিমচন্দ্রের সভাপতিত্বে পঠিত ; দ্রষ্টব্য রবীন্দ্র-রচনাবলী নবম খণ্ড, পৃ. ৫৫৫

[১২] ভারতবর্ষ গ্রন্থে পূর্বে প্রকাশিত ; রবীন্দ্র-রচনাবলী চতুর্থ খণ্ডে ভারতবর্ষে প্রবন্ধটি মুদ্রিত হইয়াছে বলিয়া রাজা প্রজা গ্রন্থে আর মুদ্রিত হইল না।

[১৩] স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারেও প্রকাশিত হইয়াছিল।

[১৪] আত্মশক্তি গ্রন্থে পূর্বে প্রকাশিত ; রবীন্দ্র-রচনাবলী তৃতীয় খণ্ডে আত্মশক্তিতে প্রবন্ধটি মুদ্রিত হইয়াছে বলিয়া সমূহ গ্রন্থে আর মুদ্রিত হইল না।

[১৫] রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় ১৩১৪ সালের আশ্বিনের প্রবাসীতে, রবীন্দ্রনাথের এই প্রবন্ধে নির্দিষ্ট "পথকেই আমাদের গন্তব্য পথ বলিয়া নির্দিষ্ট" করিয়াও "সেই পথেও বিনা বাধায় চলিতে পাইব কিনা" তাহা আলোচনা করেন, এবং প্রসঙ্গক্রমে রবীন্দ্রনাথের কোনো কোনো মন্তব্যের প্রতিবাদ করেন। তাঁহার প্রবন্ধের উপক্রমণিকা এইরূপ :

"দু-বৎসর ধরিয়া মাতামাতির পর কতকটা স্নায়বিক অবসাদে, কতকটা ইংরেজের ভ্রূকুটিদর্শনে আমরা এখন ঠাণ্ডা হইয়া পড়িতেছি। রবিবাবুও সময় বুঝিয়া আমাদিগকে বলিতেছেন, মাতামাতিতে বিশেষ কিছু হইবে না, এখন কাজ করো।

"আজ যিনি আমাদিগকে আস্ফালনে ক্ষান্ত হইবার জন্য উপদেশ দিতেছেন, বাংলার ইতিহাসে এই নূতন অধ্যায়ের আরম্ভে আমি তাঁহারই কৃতিত্ব দেখিতে পাইতেছি। ইংরেজের নিকট 'আবেদন নিবেদন' করিয়া তাহার প্রসাদ গ্রহণ করিলে কিছুই স্থায়ী লাভ হইবে না, ইংরেজের মুখাপেক্ষা না করিয়া আপনার বলে ও আপনার চেষ্টায় যেটুকু পাওয়া যায়, তাহাই স্থায়ী লাভ, বঙ্গবিভাগের কিছুদিন পূর্ব হইতে তাঁহার কণ্ঠস্বর অত্যন্ত উচ্চ ও অত্যন্ত তীব্র হইয়া মুহুর্মুহ ঐ কথা আমাদের কানে প্রবেশ করাইতেছিল।...

"স্বদেশীর আগুন যখন জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, তখন রবীন্দ্রনাথের লেখনী তাহাতে বাতাস দিতে ত্রুটি করে নাই। বেশ মনে আছে, ৩০শে আশ্বিনের পূর্ব হইতে হপ্তায় হপ্তায় তাঁহার এক একটা নূতন

গান বা কবিতা বাহির হইত, আর আমাদের স্নায়ুতন্ত্র কাঁপিয়া আর নাচিয়া উঠিত। নিষ্ফল ও অনাবশ্যক আন্দোলনে তিনি কখনোই উপদেশ দেন নাই; কিন্তু সে-সময়টায় যে উত্তেজনা ও উন্মাদনা ঘটিয়াছিল, তাহার জন্য রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব নিতান্ত অল্প ছিল না।

"উত্তেজনার বশে আমরা দুই বৎসর ধরিয়া ইংরেজের অনুগ্রহ লইব না, ইংরেজের শাসনযন্ত্র অচল করিয়া দিব বলিয়া লাফালাফি করিয়া আসিতেছি; এবং ইংরেজরাজা যখন সেই লাফালাফিতে ধৈর্যভ্রষ্ট হইয়া লগুড় তুলিয়া আমাদের গলা চাপিয়া ধরিয়াছেন, তখন আমাদের সেই অস্বাভাবিক আস্ফালনের নিষ্ফলতা দর্শনে ব্যথিত হইয়া রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন—ও-পথে চলিলে হইবে না—মাতামাতি-লাফালাফির কর্ম নহে, নীরবে ধীরভাবে কাজ করিতে হইবে।...

"রবিবাবু কেবল "কাজ করো" "কাজ করো" বলিয়া উপদেশ দিয়া চীৎকারের মাত্রাই বাড়াইতেছেন না বরং কোন্ পথে কাজ করা যাইতে পারে, তাহার দুই-একটা নমুনাও নিজের হাতে লইয়া দেখাইতেছেন।"...

[১৬] সুরাট কনগ্রেসে বিসংবাদের পরে লিখিত।

[১৭] তুলনীয়, "স্বদেশী সমাজ" প্রবন্ধে "সমাজপতি" নিয়োগের প্রস্তাব, রবীন্দ্র-রচনাবলী তৃতীয় খণ্ড

[১৮] পৃ. ৪৯২, ২৩শ ছত্রের পর

[১৯] পৃ. ৪৯১, ২৫শ ছত্রের পর

[২০] পৃ. ৪৯৬, ২য় ছত্রের পর

[২১] পৃ. ৪৮৭, ১২শ ছত্রের পর

সংযোজন : অচলিত সংগ্রহ দ্বিতীয় খণ্ড

মেঘনাদবধ কাব্যের যে-সমালোচনাটি অচলিত সংগ্রহ দ্বিতীয় খণ্ডে সমালোচনা গ্রন্থে মুদ্রিত হইয়াছে তাহার পূর্বেও রবীন্দ্রনাথ ভারতী পত্রে (১২৮৪) মেঘনাদবধ কাব্যের একটি সমালোচনা প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই দুইটি আলোচনার একটিও মেঘনাদবধ কাব্যের অনুকূল নহে। গ্রন্থপরিচয়ে জীবনস্মৃতি হইতে উদ্ধৃত অংশ মেঘনাদবধ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের প্রথম আলোচনাটির বিষয়েই বিশেষ ভাবে লিখিত হইলেও, মেঘনাদবধের প্রতি পূর্বতন বিরূপতা সম্বন্ধে পরে রবীন্দ্রনাথ কি মত পোষণ করিতেন, তাহারই নিদর্শনস্বরূপে সেটি উদ্ধৃত হইয়াছিল, বস্তুত ঐ উদ্ধৃতাংশের বক্তব্য দুইটি লেখা সম্বন্ধেই প্রযোজ্য।

কিন্তু ১২৮৪ সালে প্রকাশিত লেখাটি অধিকতর আলোচিত বলিয়া, স্বতন্ত্র উল্লেখ না থাকিলে পাঠকগণ সমালোচনায় মুদ্রিত লেখাটির সহিত সেটিকে ভুল করিতে পারেন; শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন এ বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় জানাইয়াছেন যে, অচলিত সংগ্রহ দ্বিতীয় খণ্ডে যে অনুবাদ-চর্চা গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার পরিপূরক গ্রন্থ *Selected Passages for Bengali Translation* মূল ইংরেজি বাক্যসমষ্টির সংকলন; ছাত্রেরা প্রথমে সেইগুলির বাংলা অনুবাদ করিবে ও অনুবাদ-চর্চার আদর্শ-বাংলার সহিত মিলাইয়া নিজেদের অনুবাদ মার্জিত করিবে, এবং সেই বাংলার ইংরেজি অনুবাদ করিয়া *Selected Passages*-এর ইংরেজি বাক্যাবলীর সহিত মিলাইয়া দেখিবে- এই বই দুইটির ব্যবহার-রীতি এইরূপ।

বর্ণানুক্রমিক সূচী

অচির বসন্ত হায় এল, গেল চলে ৮৭
অত চুপি চুপি কেন কথা কও ৭১
অনাবশ্যক ১১৯
অনাহত ১১৫
অনুমান ১৭৬
অন্ধকারের মাঝে আমায় ধরেছ দুই হাতে ২৬২
অপমানের প্রতিকার ৪১০
অপর পক্ষের কথা ৫৮৩
অবারিত ১২০
আকাশ ভেঙে বৃষ্টি পড়ে . .. ১৬২
আকাশ-সিন্ধু মাঝে এক ঠাঁই .. . ৩০
আগমন ১০৩
আছি আমি বিন্দুরূপে, হে অন্তরযামী ৩৮
আজ পুরবে প্রথম নয়ন মেলিতে ১৪৭
আজ বিকালে কোকিল ডাকে ১৫৮
আজ বুকের বসন ছিঁড়ে ফেলে ১৪৪
আজ মনে হয় সকলেরি মাঝে .. ২৪
আজি কমলমুকুলদল খুলিল ২১৭
আজিকে গহন কালিমা লেগেছে ৪৬
আজি দখিন দুয়ার খোলা .. . ২০৩
আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে . .. ২৬০
আজি হেরিতেছি আমি, হে হিমাদ্রি ৪২
আদি অন্ত হারিয়ে ফেলে ১২৬
আনিলাম অপরিচিতের নাম ২৭৯
আপনারে তুমি করিবে গোপন ১৩
আমরা যাব যেখানে কোনো ৩২৭

আমরা সবাই রাজা আমাদের এই … … ২০৬
আমাদের এই পল্লিখানি পাহাড় দিয়ে ঘেরা … … ৬৯
আমায় অমনি খুশি করে রাখো … … ১১৯
আমার এ গান শুনবে তুমি যদি … … ১৬৬
আমার খোলা জানালাতে … … ৫৫
আমার গোধূলি-লগন এল বুঝি কাছে … … ১২৩
আমার ঘুর লেগেছে—তাধিন তাধিন … … ২২৯
আমার নাই বা হল পারে যাওয়া … … ১০১
আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে … … ২০৯
আমার মাঝারে যে আছে … … ১৯
আমার সকল নিয়ে বসে আছি … … ২২৯
আমি এখন সময় করেছি … … ১৬৪
আমি কেবল তোমার দাসী … … ২৪৪
আমি কেমন করিয়া জানাব আমার … … ১৪১
আমি চঞ্চল হে … … ১৭
আমি তোমার প্রেমে হব সবার … … ২৪০
আমি বিকাব না কিছুতে আর … … ১৮৪
আমি ভিক্ষা করে ফিরতেছিলেম … … ১৩০
আমি যারে ভালোবাসি সে ছিল এই গাঁয়ে … … ৫১
আমি রূপে তোমায় ভোলাব না … … ২৩৬
আমি শরৎশেষের মেঘের মতো … … ১২৫
আলট্রা কনসার্ভেটিভ … … ৫৮৭
আলোকে আসিয়া এরা লীলা করে যায় … … ৫৭
আলো নাই, দিন শেষ হল, ওরে … … ৬৫
আহা তোমার সঙ্গে প্রাণের খেলা … … ২২৮
ইংরেজ ও ভারতবাসী … … ৩৭৯
ইংরেজের আতঙ্ক … … ৫৩৭
ইম্পীরিয়লিজ্‌ম … … ৪৩১
উৎসর্গ, খেয়া … … ৯৫
এ অন্ধকার ডুবাও তোমার … … ২৫১

এক রজনীর বরষনে শুধু … .. ১০৮
এ কী রহস্য এ কী আনন্দরাশি … .. ৩২৮
এ যে মোর আবরণ … … ১৯৭
ঐ তোমার ঐ বাঁশিখানি … … ১১৭
ওগো এমন সোনার মায়াখানি … .. ১৭৭
ওগো তোরা বল্‌ তো, এরে … … ১২০
ওগো নিশীথে কখন এসেছিলে তুমি … … ১০৭
ওগো বর, ওগো বঁধু … … ১১২
ওগো মা, রাজার দুলাল গেল চলি মোর … … ১০২
ওগো মা, রাজার দুলাল যাবে আজি মোর … … ১০১
ওরা চলেছে দিঘির ধারে … … ৯৮
ওরে আমার কর্মহারা … … ৫২
ওরে পদ্মা, ওরে মোর রাক্ষসী প্রেয়সী … … ৮৬
কণ্ঠরোধ … … ৪২৭
কত দিবা কত বিভাবরী … … ৮২
কত ধৈর্য ধরি … … ৩৪২
কাল যবে সন্ধ্যাকালে বন্ধুসভাতলে … … ৮৪
কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও … … ৩৭২
কাশের বনে শূন্য নদীর তীরে … … ১১৯
কী কথা বলিব বলে … … ৮১
কুঁড়ির ভিতরে কাঁদিছে গন্ধ … … ১৮
কুয়ার ধারে … … ১৩২
কৃপণ … … ১৩০
কৃষ্ণপক্ষে আধখানা চাঁদ … … ১৬৮
কেবল তব মুখের পানে … … ১০
কোকিল … … ১৫৮
কোথা ছায়ার কোণে দাঁড়িয়ে তুমি … … ১৭৪
কোথা বাইরে দূরে যায় রে উড়ে … … ২০১
ক্লান্ত করিয়াছ তুমি আপনারে … … ৪২
খেয়া … … ১৮৬

খোলো খোলো দ্বার ১৯৬
গান শোনা ১৬৬
গোধূলিলগ্ন ১২৩
ঘাটে ১০১
ঘাটের পথ ৯৮
ঘুষাঘুষি ৩০৫
চাঞ্চল্য ১৭২
চিরকাল এ কী লীলা গো ৫৮
চুমিয়া যেয়ো তুমি ৩৩২
ছাদের উপরে বহিয়ো নীরবে ৩৩৪
জাগরণ ১৩৪
জাগরণ ১৬৮
জুড়াল রে দিনের দাহ ১৬০
ঝড় ১৬২
ঝরনা তোমার স্ফটিক জলের ৩১৫
টিকা ১৭৭
তখন আকাশতলে ঢেউ তুলেছে ১২৭
তখন ছিল যে গভীর রাত্রিবেলা ১৮৩
তখন রাত্রি আঁধার হল ১০৩
তপ্ত হাওয়া দিয়েছে আজ ১৪৮
তব অন্তর্ধানপটে হেরি তব ৩৭১
তুমি আছ হিমাচল ভারতের অনন্তসঞ্চিত ৪৩
তুমি এপার-ওপার কর কে গো ১৮৬
তুমি যত ভার দিয়েছ, সে ভার ১৪৫
তোমায় চিনি বলে আমি ১৪
তোমার কাছে চাই নি কিছু ১৩২
তোমার বীণায় কত তার কাছে ৩৩
তোমার বীণার সাথে আমি ১৪২
তোমারে ছাড়িয়া যেতে হবে ৩৪৬
তোমারে দিই নি সুখ ৩৩৬

তোমারে পাছে সহজে বুঝি ··· ··· ১২
তোরা কেউ পারবি নে গো ··· ··· ১৩৫
তোরা যে যা বলিস ভাই ··· ··· ২১৩
ত্যাগ ··· ··· ১০২
দাঁড়িয়ে আছ আধেক খোলা ··· ··· ১১৫
দাম ··· ··· ১১০
দিদি ··· ··· ১৬০
দিনশেষ ··· ··· ১৫৬
দিনের শেষে ঘুমের দেশে ··· ··· ৯৭
দিয়েছ প্রশ্রয় মোরে, করুণানিলয় ··· ··· ৮৩
দুঃখমূর্তি ··· ··· ১০৬
দুখের বেশে এসেছ বলে ··· ··· ১০৬
দুয়ারে তোমার ভিড় করে যারা আছে ··· ··· ৩৫
দেখো চেয়ে গিরির শিরে ··· ··· ৪৮
দেশনায়ক ··· ··· ৪৮৭
দেশহিত ··· ··· ৬৩৯
দেশের কথা ··· ··· ৬১৯
ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধে ··· ··· ৩৩
নব বৎসরে করিলাম পণ ··· ··· ৯০
না জানি কারে দেখিয়াছি ··· ··· ২২
নানা গান গেয়ে ফিরি নানা লোকালয় ··· ··· ৮৫
নিরুদ্যম ··· ··· ১২৭
নিশ্বাস রুধে দু-চক্ষু মুদে ··· ··· ১৭২
নীড় ও আকাশ ··· ··· ১৫৩
নীড়ে বসে গেয়েছিলেম ··· ··· ১৫৩
পথ ও পাথেয় ··· ··· ৪৪৫
পথ চেয়ে তো কাটল নিশি ··· ··· ১৩৪
পথ বেঁধে দিল বন্ধনহীন গ্রন্থি ··· ··· ২৮৭
পথিক ··· ··· ১৩৯
পথিক, ওগো পথিক, যাবে তুমি ··· ··· ১৩৯

পথের নেশা আমায় লেগেছিল … … ১৫১
পথের পথিক করেছ আমায় … … ৬৪
পথের শেষ … … ১৫১
পাগল হইয়া বনে বনে ফিরি … … ১৬
পাছে দেখি তুমি আস নি, তাই … … ১৭৬
পুষ্প ফুটে কোন্ কুঞ্জবনে … … ২৩০
পূর্ণ প্রাণে চাবার যাহা … … ৩২৬
প্রচ্ছন্ন … … ১৭৪
প্রতীক্ষা … … ১৬৪
প্রভাতে … … ১০৮
প্রসঙ্গ-কথা ১--৫ … ৫৪৯, ৫৫৫, ৫৬২, ৫৬৬, ৫৭২
প্রার্থনা … … ১৮৪
ফুল ফোটানো … … ১৩৫
বঙ্গবিভাগ … … ৬১৩
বন্দী … … ১৩৮
বন্দী, তোরে কে বেঁধেছে … … ১৩৮
বদ্ধ হয়ে এল স্রোতের ধারা … … ১৫৭
বন্ধু, এ যে আমার লজ্জাবতী লতা … … ৯৫
বর্ষাপ্রভাত … … ১৭৭
বর্ষাসন্ধ্যা … … ১৭৯
বসন্তে কি শুধু কেবল … … ২২২
বহুরাজকতা … … ৪৪২
বাঁশি … … ১১৭
বালিকা বধূ … … ১১২
বাহির হইতে দেখো না এমন করে … … ৩৬
বিকাশ … … ১৪৪
বিচ্ছেদ … … ১৪২
বিদায় … … ১৫০
বিদায় দেহ ক্ষম আমায় ভাই … … ১৫০
বিধি যেদিন ক্ষান্ত দিলেন … … ১৭১

বিরহ-বৎসর পরে মিলনের বীণা … … ৮৬
বিরহ মধুর হল আজি … … ২২৪
বিরোধমূলক আদর্শ … … ৫৯২
বৈশাখে … … ১৪৮
ব্যাধি ও প্রতিকার … … ৬২৩
ভয়েরে মোর আঘাত করো … … ২৩৮
ভাঙা অতিথিশালা … … ১৫৬
ভার … … ১৪৫
ভারতসমুদ্র তার বাষ্পোচ্ছ্বাস নিশ্বসে গগনে … … ৪৪
ভারতের কোন্ বৃদ্ধ ঋষির তরুণ মূর্তি তুমি … … ৪৫
ভেবেছিলাম চেয়ে নেব … … ১১০
ভোর হল বিভাবরী … … ২৬৩
ভোরের পাখি ডাকে কোথায় … … ৭
মন্ত্রে সে যে পূত … … ৬২
মম চিত্তে নিতি নৃত্যে কে যে নাচে … … ২২০
মিছে কথার বাঁধুনি … … ৪৮৮
মিলন … … ১৪১
মুক্তিপাশ … … ১০৭
মুখুজ্যে বনাম বাঁড়ুজ্যে … … ৫৭৬
মেঘ … … ১২৬
মোদের কিছু নাই রে নাই … … ২১৮
মোদের হারের দলে বসিয়ে দিলে … … ১৩৭
মোর কিছু ধন আছে সংসারে .. … ১১
যজ্ঞভঙ্গ … … ৬৩৫
যদি ইচ্ছা কর তবে কটাক্ষে, হে নারী … … ৪৭
যা ছিল কালো ধলো … … ২২৭
যেখানে রূপের প্রভা নয়নলোভা … … ২০৫
রাজকুটুম্ব … … ৫৯৯
রাজনীতির দ্বিধা … … ৪০৪
রাজভক্তি … … ৪৩৫

রাজা ও প্রজা … … ৫৪২
রাষ্ট্রনীতি ও ধর্মনীতি … … ৫৯১
রে অচেনা, মোর মুষ্টি … … ৩০৫
রোগীর শিয়রে রাত্রে একা ছিনু জাগি … … ৮৪
লীলা … … ১২৫
শুভক্ষণ … … ১০১
শূন্য ছিল মন … … ৩৮
শেষ খেয়া … … ৯১
সকালবেলায় ঘাটে যেদিন … … ১৫৪
সদুপায় … … ৫২২
সব ঠাঁই মোর ঘর আছে … … ২৬
"সব-পেয়েছি"র দেশ … … ১৮১
সব-পেয়েছির দেশে কারো … … ১৮১
সভাপতির অভিভাষণ … … ৪৯৬
সমস্যা … … ৪৬৮
সমাপ্তি … … ১৫৭
সমুদ্রে … … ১৫৪
সাঙ্গ হয়েছে রণ … … ৬৭
সার লেপেল গ্রিফিন … … ৫৩৫
সার্থক নৈরাশ্য … … ১৮৩
সীমা … … ১৪৪
সুন্দর তুমি চক্ষু ভরিয়া … … ৩৩৭
সুন্দরী তুমি শুকতারা … … ৩৩৯
সুবিচারের অধিকার … … ৪১৮
সেটুকু তোর অনেক আছে … … ১৪৪
সে তো সেদিনের কথা, বাক্যহীন যবে … … ৭৪
সেদিন কি তুমি এসেছিলে, ওগো … … ৬০
হায় গগন নহিলে তোমারে ধরিবে কে বা … … ২৩
হার … … ১৩৭
হারাধন … … ১৭১

হে জনসমুদ্র, আমি ভাবিতেছি মনে … … ৮৭
হে নিস্তব্ধ গিরিরাজ, অভ্রভেদী তোমার সংগীত … … ৪১
হে পথিক কোন্‌খানে … … ৭৯
হে বিশ্বদেব, মোর কাছে তুমি … … ৩১
হে ভারত, আজি নবীন বর্ষে … … ৮৮
হে রাজন্, তুমি আমারে … … ৩৭
হে হিমাদ্রি, দেবতাত্মা, শৈলে শৈলে আজিও তোমার … ৪৩

রবীন্দ্র রচনাবলী

একাদশ খণ্ড

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

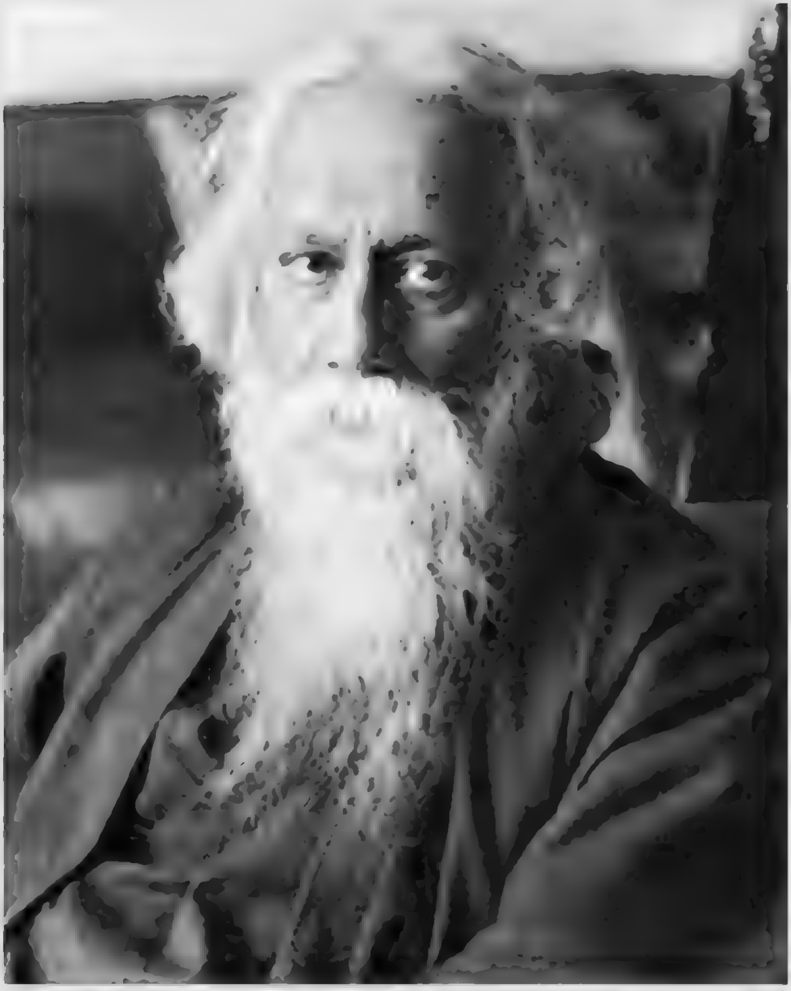

রবীন্দ্র রচনাবলী

একাদশ খণ্ড : প্রবন্ধ

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

বিশ্বভারতীর সৌজন্যে
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষে
শিক্ষাসচিব শ্রীধীরেন্দ্রমোহন সেন
কর্তৃক প্রকাশিত

২৫ বৈশাখ ১৩৬৮

শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড
কলিকাতা ৯ হইতে
শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহরায় কর্তৃক
মুদ্রিত

সূচীপত্র

পত্রাবলী ... ... **১—৩২২**

ছিন্নপত্রাবলী ... ... ৩—২৬১

ভানুসিংহের পত্রাবলী ... ... ২৬৩—৩২২

চারিত্রপূজা ... ... **৩২৩—৫৩২**

চারিত্রপূজা ... ... ৩২৫—৩৮০

বিদ্যাসাগর-চরিত ৩৩০; ভারতপথিক রামমোহন রায় ৩৫৫; মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৩৬৫।

ভারতপথিক রামমোহন রায় ... ... ৩৮১—৪৩৯

মহাত্মা গান্ধী ... ... ৪৪১—৪৬৫

বুদ্ধদেব ... ... ৪৬৭—৫০০

খৃস্ট ... ... ৫০১—৫৩২

শিক্ষা ... ... **৫৩৩—৮২৪**

শিক্ষা ... ... ৫৩৫—৭২২

শিক্ষার হেরফের ৫৩৭; ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ ৫৪৬; শিক্ষাসংস্কার ৫৫৪; শিক্ষাসমস্যা ৫৫৯; জাতীয় বিদ্যালয় ৫৭২; আবরণ ৫৭৯; তপোবন ৫৮৯; ধর্ম-শিক্ষা ৬০৬; শিক্ষাবিধি ৬২২; লক্ষ্য ও শিক্ষা ৬২৭; স্ত্রীশিক্ষা ৬৩২; শিক্ষার বাহন ৬৩৫; ছাত্রশাসনতন্ত্র ৬৪৭: অসন্তোষের কারণ ৬৫৮; বিদ্যার যাচাই ৬৫৯; বিদ্যাসমবায় ৬৬১; শিক্ষার মিলন ৬৬৪; বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ ৬৭৮: শিক্ষার বিকিরণ ৬৮৯; শিক্ষা ও সংস্কৃতি ৬৯৬: শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ ৬৯৯; আশ্রমের শিক্ষা ৭১১; ছাত্রসম্ভাষণ ৭১৫।

আশ্রমের রূপ ও বিকাশ ... ... ৭২৩—৭৪৪
বিশ্বভারতী ... ... ৭৪৫—৮১০
শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম ... ... ৮১১—৮২৪
প্রতিষ্ঠাদিবসের উপদেশ ৮১৩; প্রথম কার্যপ্রণালী ৮১৭।

পাঠকের সুবিধার জন্য, রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধসাহিত্যকে (১) আত্মপরিচয় (২) বিশ্বযাত্রী (৩) পত্রাবলী (৪) চারিত্রপূজা (৫) শিক্ষা (৬) ধর্ম (৭) স্বদেশ ও সমাজ (৮) ভাষা ও সাহিত্য (৯) বিবিধ প্রসঙ্গ—এই কয়টি অংশে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রত্যেক অংশের মধ্যে গ্রন্থপ্রকাশের কালানুক্রম অনুসৃত হয়েছে।

পত্রাবলী

ছিন্নপত্রাবলী

ইন্দিরাদেবীকে লিখিত পত্র। ৭ অক্টোবর ১৮৯৪

...তোকে আমি যে-সব চিঠি লিখেছি তাতে আমার মনের সমস্ত বিচিত্র ভাব যে রকম ব্যক্ত হয়েছে এমন আমার আর কোনো লেখায় হয় নি।...তোকে আমি যখন লিখি তখন আমার এ কথা কখনো মনে উদয় হয় না যে, তুই আমার কোনো কথা বুঝবি নে, কিম্বা ভুল বুঝবি, কিম্বা বিশ্বাস করবি নে, কিম্বা যেগুলো আমার পক্ষে গভীরতম সত্য কথা সেগুলোকে তুই কেবলমাত্র সুরচিত কাব্যকথা বলে মনে করবি। সেই জন্যে আমি যেমনটি মনে ভাবি ঠিক সেই রকমটি অনায়াসে বলে যেতে পারি। যখন মনে জানি পাঠকরা আমাকে ভালো করে জানে না, আমার অনেক কথাই তারা ঠিকটি বুঝবে না এবং নম্রভাবে বোঝবার চেষ্টাও করবে না, এবং যেটুকু তাদের নিজের মানসিক অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলবে না সেটুকু আমার উপর বিশ্বাস স্থাপন করে গ্রহণ করবে না— তখন মনের ভাবগুলি তেমন সহজে ভাষায় প্রবাহিত হতে চায় না এবং যতটুকু প্রকাশ হয় তার মধ্যে অনেকখানি ছদ্মবেশ থেকে যায়। এর থেকেই বেশ বুঝতে পারি আমাদের সব চেয়ে যা শ্রেষ্ঠ প্রকাশ সে আমরা কাউকে নিজের ইচ্ছা-অনুসারে দিতে পারি নে। আমাদের ভিতরে সব চেয়ে যা গভীরতম উচ্চতম অন্তরতম সে আমাদের আয়ত্তের অতীত; তা আমাদের দান-বিক্রয়ের ক্ষমতা নেই ... ... আমরা দৈবক্রমে প্রকাশ হই, আমরা ইচ্ছা করলে চেষ্টা করলেও প্রকাশ হতে পারি নে—চব্বিশ ঘণ্টা যাদের সঙ্গে থাকি তাদের কাছেও আপনাকে ব্যক্ত করা আমাদের সাধ্যের অতীত। ... ... তোর এমন একটি অকৃত্রিম স্বভাব আছে, এমন একটি সহজ সত্যপ্রিয়তা আছে যে, সত্য আপনি তোর কাছে অতি সহজেই প্রকাশ হয়। সে তোর নিজের গুণে। যদি কোনো লেখকের সব চেয়ে ভালো লেখা তার চিঠিতেই দেখা দেয় তা হলে এই বুঝতে হবে যে, যাকে চিঠি লেখা হচ্ছে তারও একটি চিঠি লেখাবার ক্ষমতা আছে। আমি তো আরও অনেক লোককে চিঠি লিখেছি, কিন্তু কেউ আমার সমস্ত লেখাটা আকর্ষণ করে নিতে পারে নি।... ... তোর অকৃত্রিম স্বভাবের মধ্যে একটি সরল স্বচ্ছতা আছে, সত্যের প্রতিবিম্ব তোর ভিতরে বেশ অব্যাহতভাবে প্রতিফলিত হয়।...

—রবীন্দ্রনাথ

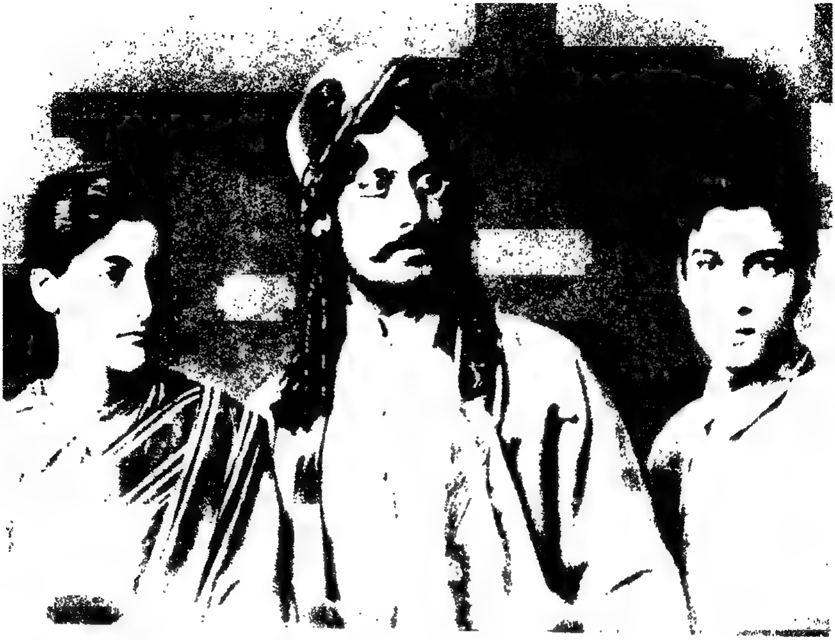

ইন্দিরা দেবী রবীন্দ্রনাথ সুরেন্দ্রনাথ

১

দার্জিলিং
। সেপ্টেম্বর ১৮৮৭।

এই তো দার্জিলিং এসে পড়লুম। পথে বেলি খুব ভালো রকম behave করেছে। বড়ো একটা কাঁদে নি। খুব চেঁচামেচি গোলমালও করেছে, উলুও দিয়েছে. হাতও ঘুরিয়েছে এবং পাখিকে ডেকেছে যদিও পাখি কোথায় দেখতে পাওয়া গেল না। সারা-ঘাটে স্টিমারে ওঠবার সময় মহা হাঙ্গাম। রাত্রি দশটা— জিনিস-পত্র সহস্র, কুলি গোটাকতক, মেয়ে মানুষ পাঁচটা এবং পুরুষ মানুষ একটিমাত্র। নদী পেরিয়ে একটি ছোটো রেলগাড়িতে ওঠা গেল— তাতে চারটে করে শয্যা, আমরা (মাখন-সুদ্ধ) ছটা মনিষ্যি। মেয়েদের এবং অন্যান্য জিনিস-পত্র ladies' compartmentএ তোলা গেল— কথাটা শুনতে যত সংক্ষেপ হল কাজে ঠিক তেমনটা হয় নি। ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি ছুটোছুটি নিতান্ত অল্প হয় নি— তবু নদিদি বলেন আমি কিছুই করি নি। অর্থাৎ, আমার মতো ডাগর পুরুষ মানুষের পক্ষে পাঁচজন মেয়ে নিয়ে এর চেয়ে ঢের বেশি ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি এবং ছুটোছুটি করা উচিত ছিল, মাঝে মাঝে যেখানে সেখানে নেবে হিন্দুস্থানি বুলিতে platform-ময় দাপিয়ে বেড়ানো উচিত ছিল। অর্থাৎ, একখান আস্ত মানুষ একেবারে আস্ত রকম ক্ষেপলে যে রকমটা হয় সেইপ্রকার মূর্তি ধারণ করলে ঠিক পুরুষ মানুষের উপযুক্ত হত। আমার ঠাণ্ডা ভাব দেখে নদিদি নিতান্ত disappointed। কিন্তু এই দু দিনে আমি এত বাক্স খুলেছি এবং বন্ধ করেছি এবং বেঞ্চির নিচে ঠেলে গুঁজেছি এবং উক্ত স্থান থেকে টেনে বের করেছি, এত বাক্স এবং পুঁটুলির পিছনে আমি ফিরেছি এবং এত বাক্স এবং পুঁটুলি আমার পিছনে অভিশাপের মতো ফিরেছে, এত হারিয়েছে এবং এত ফের পাওয়া গেছে এবং এত পাওয়া যায় নি এবং পাবার জন্যে এত চেষ্টা করা গেছে এবং যাচ্ছে যে, কোনো ছাব্বিশ বৎসর বয়সের ভদ্র সন্তানের অদৃষ্টে এমনটা ঘটে নি। আমার ঠিক বাক্স-phobia হয়েছে, বাক্স দেখলে আমার দাঁতে দাঁতে লাগে। যখন চার দিকে চেয়ে দেখি বাক্স, কেবলই বাক্স, ছোটো বড়ো মাঝারি হাল্কা এবং ভারী, কাঠের এবং টিনের এবং পশুচর্মের এবং কাপড়ের— নিচে একটা, উপরে একটা, পাশে একটা, পিছনে একটা— তখন আমার ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি এবং ছুটোছুটি করবার স্বাভাবিক শক্তি একেবারে চলে যায়— এবং তখন আমার শূন্যদৃষ্টি শুষ্কমুখ এবং দীনভাব দেখলে নিতান্ত কাপুরুষের মতো বোধ হয়— অতএব আমার সম্বন্ধে নদিদির যা মত দাঁড়িয়েছে তা ঠিক— আমি বিবিধ-বিচিত্র-মূর্তি বাক্সর মধ্যে পড়ে কী এক রকম হয়ে গিয়েছিলুম। সুরেনকে বলিস আমার এই অবস্থার একটা ছবি আঁকতে। যাক্। তার পরে আমি আর একটা গাড়িতে গিয়ে শুলুম। সে গাড়িতে আর দুটি বাঙালি ছিলেন। তাঁরা ঢাকা থেকে আসছেন, দেখেই কেমন ঢাকাই বলে মনে হয়— তাঁদের মধ্যে একজনের মাথা টাকে প্রায় পরিপূর্ণ এবং ভাষা অত্যন্ত বাঁকা— তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার পিতা দার্জিলিঙে ছিল?' লক্ষ্মী থাকলে এর

যথোচিত উত্তর দিতে পারত; সে হয়তো বলত, 'তিনি দার্জিলিং ছিল কিন্তু তখন দার্জিলিং বড়ো ঠান্ডা ছিলেন বলে তিনি বাড়ি ফিরে গেছে।' আমার উপস্থিতমত এ রকম বাংলা জোগালো না।

সিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিং পর্যন্ত ক্রমাগত সরলার উচ্ছ্বাস-উক্তি—exclamations। 'ওমা কী চমৎকার' 'কী আশ্চর্য' 'কী সুন্দর'—কেবলই আমাকে ঠেলে আর বলে, 'রবিমামা, দেখো দেখো।' কী করি, যা দেখায় তা দেখতেই হয়—কখনো বা গাছ, কখনো বা মেঘ, কখনো বা একটা দুর্জয় খাঁদা-নাক-ওয়ালী পাহাড়ী মেয়ে, কখনো বা এমন কত কী যা দেখতে না দেখতেই গাড়ি চলে যাচ্ছে এবং সরলা দুঃখ করছে যে রবিমামা দেখতে পেলে না, কিন্তু তার জন্যে রবিমামা কিছুমাত্র দুঃখিত নয়। গাড়ি চলতে লাগল। বেলি ঘুমোতে লাগল, বন পাহাড় পর্বত ঝর্না মেঘ এবং বিস্তর খাঁদা নাক এবং বাঁকা চোখ দেখা দিতে লাগল। ক্রমে ঠান্ডা, তার পরে মেঘ, তার পরে নদিদির সর্দি, তার পরে বড়দিদির হাঁচি, তার পরে শাল কম্বল বালাপোশ, মোটা মোজা, পা কন্‌কন্‌, হাত ঠান্ডা, মুখ নীল, গলা ভার-ভার, এবং ঠিক তার পরেই দার্জিলিং। আবার সেই বাক্স, সেই ব্যাগ, সেই বিছানা, সেই পুঁটুলি। মোটের উপর মোট, মুটের উপর মুটে। ব্রেক থেকে জিনিস-পত্র দেখে নেওয়া, চিনে নেওয়া, মুটের মাথায় চাপানো, সাহেবকে রসিদ দেখানো, সাহেবের সঙ্গে তর্কবিতর্ক, জিনিস খুঁজে না পাওয়া, এবং সেই হারানো জিনিস পুনরুদ্ধারের জন্যে বিবিধ বন্দোবস্ত করা—এতে আমার ঘণ্টা দুয়েক লেগেছিল, ততক্ষণ নদিদিরা ডুলিতে চড়ে, বাড়িতে গিয়ে, শালটি মুড়ি দিয়ে, সোফায় শুয়ে, বিশ্রাম করছিলেন এবং কল্পনা করছিলেন যে রবি ঠিক পুরুষ মানুষের মতো নয়।

কলকাতা
১৬ সেপ্টেম্বর ১৮৮৭

২

দার্জিলিং
।১৮৮৭।

আমার কোমরের সমস্ত খবর সুরির চিঠিতে পাবি। কোমরটা যে কেবলমাত্র কাছা এবং কোঁচা গুঁজে রাখবার জায়গা তা আর কক্‌খনো মনে করব না—মনুষ্যের মনুষ্যত্ব এই কোমর আশ্রয় করে আছে। আজকের এই চিঠিটা যদি একঘেয়ে (dull) রকম হয়, অর্থাৎ যদি এর মধ্যে কোনো movement না থাকে—বিষয় হতে বিষয়ান্তরে, ভাব হতে ভাবান্তরে, খবর হতে খবরান্তরে আমার কলম যদি ভালো করে না সরে—তবে জানবি সে আমার এই ভাঙা কোমরের দোষ—তার জন্যে আর কারও দোষ দেওয়া যায় না। এর উপরে আবার মাঝে মাঝে এক একটা বিপর্যয় হাঁচি বেরোচ্ছে—মনে হচ্ছে যেন শরীরের ঊর্ধ্বভাগ ভাঙা কোমর থেকে ছিটকে পড়ে যাবে। কিন্তু এই পর্যন্ত। কোমরের কথা আর লিখব না। প্রতিজ্ঞা করে বলছি কোমরের কথা আর লিখব না! ভারী তো কোমর তার আবার কথা! একে তো aestheticsএর সমস্ত আইন অবহেলা করে তিনি হাতে বহরে ক্রমিক

উন্নতি লাভ করছিলেন, তার উপরে আবার থেকে থেকে তাঁর সহস্র রকম বাহানা। এই কোমরের কথা যাকে বলি সেই হাসে, কারও করুণা আকর্ষণ করে না; কোমর ভাঙা যেন হৃদয় ভাঙা অপেক্ষা কোনো অংশে কম! কিন্তু চাই নে কাউকে বলতে— চাই নে কারও করুণা—

আমার কোমর আমারই কোমর,
বেচি নি তো তাহা কাহারও কাছে!
ভাঙাচোরা হোক, যা হোক তা হোক,
আমার কোমর আমারই আছে!

কিন্তু কবিতায় যতই অহংকার করি না কেন— সত্যি কথা বলতে কী, আমার খুব ইচ্ছে করছে আমার কোমর যদি আর কারও কোমর হত! নিজের চরকায় তেল দেওয়া ভালো বরাবর শুনে আসছি এবং স্বীকার করেও আসছি— কিন্তু কোমরের কথা যদি বল তো মুক্তকণ্ঠে বলতে হয় যে, নিজের কোমরে গরম সর্ষের তেল মালিশ করার চেয়ে পরের কোমরে তেল দেওয়া আমি ঢের prefer করি। এ বিষয়ে আমার sentiments সম্পূর্ণ unselfish, এমন-কি almost Christian! কিন্তু থাক্, কোমরের কথা যখন বলব না প্রতিজ্ঞা করেছি তখন বলব না। কারণ, কোমর ছাড়াও মানুষের অন্যান্য অংশ আছে, তার মন আছে, তার হৃদয় আছে, তার আত্মা আছে— কিন্তু যাই বলো, তার কোমরও আছে— এবং খুবই আছে—

প্রমোদে ঢালিয়া দিনু মন,
তবু কোমর কেন টন্‌টন্‌ করে রে!
চারি দিকে চলা ফেরা,
আমার কোমর কেন টন্‌টন্‌ করে রে!

হৃদয় ভেঙে গেলে লোকে সান্ত্বনালাভের জন্যে পাহাড়ে বেড়াতে আসে, কিন্তু কোমর ভেঙে গেলে সমতল ক্ষেত্রই সকলের চেয়ে ভালো। এ সময়ে পার্ক্ স্ট্রীটের সেই তাকিয়াগুলো মনে পড়ছে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে আরও গোটাকতক পূর্বস্মৃতি মনে আসছে— কিন্তু থাক্— কোমরের কোনো প্রসঙ্গ আর পাড়ব না— পূর্বে কবে কোমরে ব্যথা হয়েছিল সে একেবারে ভুলে যাব, কিন্তু এখন যে কোমরে ব্যথা হয়েছে সেটা ভুলি কী করে?—

বীণা তবে রেখে দে, গান আর গাস নে,
কেমনে যাবে বেদনা!

নদিদি বলছেন, এক উপায় আছে— 'Rush Tox 6th dilution দু ঘণ্টা অন্তর খাও'। আমিও তাই মনে করেছি। সরলা দাঁড়িয়ে আছে আমার চিঠি পড়ে contradict করবে। কিন্তু সে বেচারা ভারী নিরাশ হবে— আমার কোমরের মধ্যে কী হচ্ছে তা তার দেখবার জো নেই, সেখেনে তার মেয়েলি prying instinct প্রবেশ করবার জো নেই, সেখেনে no admittance except for সর্ষের তেল ointment। কিন্তু তবু সরলা যে ছাড়বে এমন বোধ হয় না। বিদেশে তোদের কাছ থেকে যে একটু sympathy পাব তা তার সহ্য হবে না। কিন্তু এবার তোকে স্বীকার করতেই হবে যে, আমার কোমরের সম্বন্ধে আমিই সব চেয়ে বিশ্বাসযোগ্য, এমন-কি সরলাও এ বিষয়ে আমার চেয়ে better authority নয়। কিন্তু বব, আমার কোমরের কথা তোরা কিছুই ভাবিস নে— আমার এই কোমরের কষ্ট আমিই নীরবে সমস্ত সহ্য করব। কিন্তু নীরবে ঠিক হয়ে উঠছে না, থেকে থেকে নড়তে

চড়তে এমন চীৎকার করছি যে তাকে ঠিক নীরব বলা যায় না। আর আজ তোকে যে চিঠি লিখলুম একেও ঠিক নীরব বলা যায় না। প্রথমে মনে করেছিলুম সুরেনের চিঠিতেই আমার কোমরের সমস্ত অবগত হবি— তোর কাছে আমার কোমরের কোনো কথা বলব না, তুলব না, পুরোনো তেল-মালিশের স্মৃতি আর জাগাব না—কিন্তু কী হতে কী হল! কিন্তু—

সেই সব সেই সব, সেই হাহাকার-রব,
সেই অশ্রুবারিধারা, কোমর-বেদনা।

কিন্তু আর কোমরের কথা বলব না—তার প্রধান কারণ হচ্ছে বলবার আর জায়গা নেই। যদি জায়গা থাকত তবে আমি আজ থেকে Doomsday পর্যন্ত বরাবর বলে যেতে পারতুম। কিন্তু Doomsdayর দিন কি এই কোমর নিয়ে উঠে দাঁড়াতে পারতুম! ভেঁপু বাজত, সবাই উঠত, আর আমি কোমরে হাত দিয়ে আর্তনাদ করতুম। কিন্তু এটা বোধ হচ্ছে ঠাট্টার বিষয় নয়, তুই একটুখানি চটতেও পারিস। যা হোক, কোমরের কথা এবং আমার চিঠি এইখেনে ফুরোলো।

কলকাতা। ১৮৮৭

৩

শিলাইদহ
।১৮৮৮।

শিলাইদহের অপর পারে একটা চরের সামনে আমাদের বোট লাগানো আছে। প্রকাণ্ড চর—ধু ধু করছে—কোথাও শেষ দেখা যায় না—কেবল মাঝে মাঝে এক এক জায়গায় নদীর রেখা দেখা যায়—আবার অনেক সময়ে বালি'কে নদী বলে ভ্রম হয়— গ্রাম নেই, লোক নেই, তরু নেই, তৃণ নেই—বৈচিত্র্যের মধ্যে জায়গায় জায়গায় ফাটল-ধরা ভিজে কালো মাটি, জায়গায় জায়গায় শুক্‌নো সাদা বালি—পূর্ব দিকে মুখ ফিরিয়ে চেয়ে দেখলে দেখা যায় উপরে অনন্ত নীলিমা আর নিচে অনন্ত পাণ্ডুরতা, আকাশ শূন্য এবং ধরণীও শূন্য, নিচে দরিদ্র শুষ্ক কঠিন শূন্যতা আর উপরে অশরীরী উদার শূন্যতা। এমনতর desolation কোথাও দেখা যায় না। হঠাৎ পশ্চিমে মুখ ফেরাবামাত্র দেখা যায় স্রোতোহীন ছোটো নদীর কোল, ও পারে উঁচু পাড়, গাছপালা, কুটির, সন্ধ্যাসূর্যালোকে আশ্চর্য স্বপ্নের মতো। ঠিক যেন এক পারে সৃষ্টি এবং আর এক পারে প্রলয়। সন্ধ্যাসূর্যালোক বলবার তাৎপর্য এই—সন্ধ্যার সময়ই আমরা বেড়াতে বেরোই এবং সেই ছবিটাই মনে অঙ্কিত হয়ে আছে। পৃথিবী যে বাস্তবিক কী আশ্চর্য সুন্দরী তা কলকাতায় থাকলে ভুলে যেতে হয়। এই-যে ছোটো নদীর ধারে শান্তিময় গাছপালার মধ্যে সূর্য প্রতিদিন অস্ত যাচ্ছে, এবং এই অনন্ত ধূসর নির্জন নিঃশব্দ চরের উপরে প্রতি রাতে শত সহস্র নক্ষত্রের নিঃশব্দ অভ্যুদয় হচ্ছে, জগৎ সংসারে এ-যে কী একটা আশ্চর্য মহৎ ঘটনা তা এখানে থাকলে তবে বোঝা যায়। সূর্য আস্তে আস্তে ভোরের বেলা পূর্ব দিক থেকে কী এক প্রকাণ্ড গ্রন্থের পাতা খুলে দিচ্ছে এবং সন্ধ্যা পশ্চিম থেকে ধীরে ধীরে আকাশের উপরে যে-এক প্রকাণ্ড পাতা উলটে দিচ্ছে সেই বা কী আশ্চর্য

লিখন— আর, এই ক্ষীণপরিসর নদী আর এই দিগন্তবিস্তৃত চর আর ওই ছবির মতন পরপারধরণীর এই উপেক্ষিত একটি প্রান্তভাগ— এই বা কী বৃহৎ নিস্তব্ধ নিভৃত পাঠশালা! যাক্। এ কথাগুলো রাজধানীতে অনেকটা 'পৈট্রি'র মতো শুনতে হবে, কিন্তু এখানকার পক্ষে কথাগুলো কিছুমাত্র বেখাপ নয়। যা হোক, সন্ধেবেলা এই বৃহৎ চরের মধ্যে ছাড়া পেয়ে আমরা সপরিবারে কিছুকাল বিচ্ছেদের পরম সুখ অনুভব করি— অনুচর-সমেত ছেলেরা এক দিকে যায়, বলু এক দিকে যায়, আমি এক দিকে যাই, দুটি রমণী আর-এক দিকে যায়।......ইতিমধ্যে সূর্য সম্পূর্ণ অস্ত যায়, আকাশের সুবর্ণ আভা মিলিয়ে যায়, অন্ধকারে চার দিক অস্পষ্ট হয়ে আসে, ক্রমে আপনার পাশের ক্ষীণ ছায়া দেখে বুঝতে পারি বাঁকা কৃশ চাঁদখানির আলো অল্প অল্প ফুটেছে— পাণ্ডুবর্ণ বালির উপরে এই পাণ্ডুবর্ণ জ্যোৎস্নায় চোখে আরও কেমন বিভ্রম জন্মিয়ে দেয়— কোথায় বালি কোথায় জল, কোথায় পৃথিবী কোথায় আকাশ, নিতান্ত অনুমান করে নিতে হয়। কাজেই সবটা জড়িয়ে ভারী একটা অবাস্তবিক মরীচিকাজগতের মতো বোধ হয়।......গতকল্য এই মায়া-উপকূলে অনেক ক্ষণ ধরে বিচরণ করে বোটে ফিরে গিয়ে দেখি— ছেলেরা ছাড়া আমাদের দলের আর কেউ ফেরেন নি। একবার ভাবলুম ডেকে পাঠাই, কিন্তু স্বার্থ এবং দয়া উভয়ে একত্রে মিলে আমাকে নিরস্ত করলে। অর্থাৎ, কতকটা নিজের সুখ এবং কতকটা তাঁদের সুখের প্রতি দৃষ্টি করে আমি একখানি easy chairএ স্থির হয়ে বসলুম— Animal Magnetism-নামক একখানা অত্যন্ত ঝাপসা subjectএর বই একখানি বাতির ঝাপসা আলোতে বসে পড়তে আরম্ভ করলুম। কিন্তু কেউ আর ফেরেন না।

...বইখানাকে খাটের উপরে উপুড় করে রেখে বেরোলুম। উপরে উঠে চার দিকে চেয়ে কালো মাথার কোনো চিহ্ন দেখতে পেলুম না— সমস্ত ফ্যাকাশে ধু ধু করছে। একবার বলু বলে পুরো জোরে চীৎকার করলুম— কণ্ঠস্বর হু হু করতে করতে দশ দিকে ছুটে গেল, কিন্তু কারও সাড়া পেলুম না, তখন বুকটা হঠাৎ চার দিক থেকে দমে গেল, একখানা বড়ো খোলা ছাতা হঠাৎ বন্ধ করে দিলে যেমনতর হয়। গফুর আলো নিয়ে বেরোল, প্রসন্ন বেরোল, বোটের মাঝিগুলো বেরোল, সবাই ভাগ করে ভিন্ন ভিন্ন দিকে চললুম— আমি এক দিকে 'বলু' 'বলু' করে চীৎকার করছি— প্রসন্ন আর-এক দিকে ডাক দিচ্ছে 'ছোটো মা'— মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে মাঝিরা 'বাবু' 'বাবু' করে ফুকরে উঠছে। সেই মরুভূমির মধ্যে নিস্তব্ধ রাত্রে অনেকগুলো আর্তস্বর উঠতে লাগল। কারও সাড়াশব্দ নেই। গফুর দুই-এক বার অতি দূর থেকে হেঁকে বললে 'দেখতে পেয়েছি', তার পরেই আবার সংশোধন করে বললে 'না' 'না'— আমার মানসিক অবস্থাটা একবার কল্পনা করে দেখ্। কল্পনা করতে গেলে নিঃশব্দ রাত্রি, ক্ষীণ চন্দ্রালোক, নির্জন নিস্তব্ধ শূন্য চর, দূরে গফুরের চলনশীল একটি লণ্ঠনের আলো— মাঝে মাঝে এক এক দিক থেকে কাতর কণ্ঠের আহ্বান এবং চতুর্দিকে তার উদাস প্রতিধ্বনি— মাঝে মাঝে আশার উন্মেষ এবং পরমুহূর্তেই সুগভীর নৈরাশ্য— এই সমস্তটা মনে আনতে হবে। অসম্ভব রকমের আশঙ্কা সকল মনে জাগতে লাগল। কখনো মনে হল চোরা বালিতে পড়েছে, কখনো মনে হল বলুর হয়তো হঠাৎ মূর্ছা কিম্বা কিছু একটা হয়েছে, কখনো বা নানাবিধ শ্বাপদ জন্তুর বিভীষিকা কল্পনায় উদয় হতে লাগল। মনে মনে হতে লাগল— 'আত্মরক্ষা-অসমর্থ যারা, নিশ্চিন্তে ঘটায় তারা পরের বিপদ।' স্ত্রী-স্বাধীনতার বিরুদ্ধে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে উঠলুম— বেশ বুঝতে পারলুম বলু

বেচারা ভালোমানুষ, দুই বন্ধনমুক্ত রমণীর পাল্লায় পড়ে বিপদে পড়েছে। এমন সময়ে ঘণ্টাখানেক পরে রব উঠল এঁরা চড়া বেয়ে বেয়ে ও পারে গিয়ে পড়েছেন, আর ফিরতে পারছেন না। তখন ছুটে বোট-অভিমুখে চললুম— বোটে গিয়ে পৌঁছতে অনেক ক্ষণ লাগল। বোট ও পারে গেল, বোট-লক্ষ্মী বোটে ফিরলেন— বলু বলতে লাগল, 'তোমাদের নিয়ে আমি আর কখনো বেরোব না।' সকলেই অনুতপ্ত, শ্রান্ত, কাতর, সুতরাং আমার ভালো ভালো উপাদেয় ভর্ৎসনাবাক্য হৃদয়েই রয়ে গেল— পরদিন প্রাতঃকালে উঠেও কোনোমতেই রাগতে পারলুম না। সুতরাং এত বড়ো একটা ব্যাপার পরস্পরে হেসেই উড়িয়ে দিলে, যেন ভারী একটা তামাশা হচ্ছিল। যা হোক, তোকে তিন দিন ধরে এই বিষয়টা বিস্তৃত করে লিখে আমার মন অনেকটা খোলসা হয়ে গেল।

ঐ রে! মৌলবী সাহেব এক দঙ্গল প্রজা নিয়ে এসে সেলাম করছে— আমার বলতে ইচ্ছে করছে—

'ধিক্ তুমি, ধিক্ প্রজা, ধিক্ জমিদারি—
জমিদারি গোল্লায় যাক মৌলবী লয়ে সাথে!'

কলকাতা
২ ডিসেম্বর ?
১৮৮৮

৪

কলকাতা
।জুন ১৮৮৯।

গাড়ি ছাড়বার পর বেলি চার দিক চেয়ে গম্ভীর হয়ে বসে রইল, ভাবলে দিদিরা কোথায় গেল, আমি কোথায় যাচ্ছি— এ সংসারে কোথা থেকে আগমন, কোথায় গতি, জীবনের উদ্দেশ্য কী— ভাবতে ভাবতে ক্রমে দেখলুম ঘন ঘন হাই তুলতে লাগল, তার পরে খানিক বাদে আয়ার কোলে মাথা রেখে পা ছড়িয়ে নিদ্রা আরম্ভ করে দিলে। আমার মনেও সংসারের সুখ দুঃখ সম্বন্ধে নানাবিধ চিন্তার উদয় হয়েছিল, কিন্তু ঘুম এল না। সুতরাং আপন মনে ভৈরবী আলাপ করতে লাগলুম। ভৈরবী সুরের মোচড়গুলো কানে এলে জগতের প্রতি এক রকম বিচিত্র ভাবের উদয় হয় তা বোধ হয় জানিস— মনে হয় একটা নিয়মের হস্ত অবিশ্রাম আর্গিন যন্ত্রের হাতা ঘোরাচ্ছে এবং সেই ঘর্ষণবেদনায় সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মর্মস্থল হতে একটা গম্ভীর কাতর করুণ রাগিণী উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে— সকাল বেলাকার সূর্যের সমস্ত আলো ম্লান হয়ে এসেছে, গাছপালারা নিস্তব্ধ হয়ে কী যেন শুনছে, এবং আকাশ একটা বিশ্বব্যাপী অশ্রুর বাষ্পে যেন আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে— অর্থাৎ, দূর আকাশের দিকে চাইলে মনে হয় যেন একটা অনিমেষ নীল চোখ কেবল ছল্ ছল্ করে চেয়ে আছে।... খিড়কি স্টেশনের কাছাকাছি আমাদের সেই আকের ক্ষেত, গাছের সার, টেনিস-ক্ষেত্র, কাঁচের-জানলা-মোড়া বাড়ি দেখতে পেলুম; দেখে মনটা হঠাৎ কেমন হু হু করে উঠল। এই এক আশ্চর্য! যখন এখানে বাস

করতুম তখন এ বাড়ির উপরে যে সবিশেষ স্নেহ ছিল তা নয়—যখন এ বাড়ি ছেড়ে তোদের সঙ্গে সোলাপুর গিয়েছিলুম তখনও যে বিশেষ কাতর হয়েছিলুম তাও বলতে পারি নে—অথচ দ্রুতগতি ট্রেনের বাতায়নে বসে যখন কেবল নিমেষের মতো দেখলুম সেই একলা বাড়ি তার খেলার জায়গা এবং ফাঁকা ঘরগুলো নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তখন সমস্ত হৃদয়টা বিদ্যুৎবেগে সেই বাড়ির উপরে ঝাঁপিয়ে গিয়ে পড়ল এবং মনে হতে লাগল তেমনি করে সকলে মিলে ঐ বাড়িটাতে গিয়ে জটলা করে বসলেই যেন আপাতত সংসারের সমস্ত অভাব দূর হয় এবং জীবনের উদ্দেশ্য অনেকটা সফল হয়।...যেমনি বাড়িটা দেখলুম অমনি একটা ঘা পড়ল—বুকের ভিতর বাঁ দিক থেকে ডান দিক পর্যন্ত ধক্ করে একটা শব্দ হল, হুস্ করে গাড়ি চলে গেল—আকের ক্ষেত মিলিয়ে গেল—বাস্, সমস্ত ফুরোল—কেবল হঠাৎ ঘা খাওয়ার দরুন মনের বড়ো বড়ো দু চারটে তার প্রায় দেড় সুর আন্দাজ নেবে গেল। কিন্তু গাড়ির এঞ্জিন এ-সকল বিষয়ে বড়ো-একটা চিন্তা করে না, সে লোহার রাস্তার উপর দিয়ে এক রোখে চলে যায়, কোন্ লোক কোথায় কী ভাবে যাচ্ছে সে বিষয়ে তার খেয়াল করবার সময় নেই—সে কেবল গল্ গল্ করে জল খায়, হুস্ হুস্ করে ধোঁওয়া ছাড়ে, গাঁ গাঁ করে চীৎকার করে এবং গড়্ গড়্ করে চলে যায়। সংসারের গতির সঙ্গে এর সুন্দর তুলনা দেওয়া যেতে পারত, কিন্তু সেটা এত পুরোনো এবং অনাবশ্যক যে কেবল একবার নির্দেশ করে ক্ষান্ত থাকা গেল। খাণ্ডালার কাছাকাছি এসে মেঘ এবং বৃষ্টি। সেই-সব পাহাড়গুলোর উপরে মেঘ জমে ঝাপসা হয়ে গেছে—ঠিক যেন কে পাহাড় এঁকে তার পরে রবার দিয়ে ঘষে দিয়েছে—খানিক-খানিক outline দেখা যাচ্ছে এবং খানিকটা পেন্সিলের দাগ চার দিকে ধেবড়ে গেছে।...অবশেষে গাড়ির ঘণ্টা দিলে—দূর থেকে গাড়ির নিদ্রা-হীন লাল চক্ষু দেখা গেল; ধরণী থর্ থর্ করে কাঁপতে লাগল; স্টেশনের কর্তারা চটিজুতো, ঘুন্টি-দেওয়া চাপকান এবং টিকির উপরে তক্মা-দেওয়া গোল টুপি নিয়ে নানা ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল—বিপুল হাতল্যাণ্ঠন চার দিকে আলো নিক্ষেপ করতে লাগল; খানসামাবর্গ সচকিত হয়ে যে যার জিনিস-পত্র আগলে দাঁড়ালে; বেলি ঘুমোতে লাগল; আমার বুক ধড়াস্ ধড়াস্ করতে লাগল।... আয়াকে বললুম, 'শীঘ্র বেলিকে কোলে করে নিয়ে এসো।' বেলি আসতে না আসতে দেখা গেল এক-জোড়া মেম-সাহেব দ্রুতগতিতে আমাকে উত্তীর্ণ হয়ে সেই খালি গাড়ির প্রতি লক্ষ্য করেছে—আমি মনে মনে বললুম 'যেমন করে হোক ও গাড়িতে আমি উঠবই'। মেমসাহেবও খালি গাড়ির সুমুখে দাঁড়ালেন আমিও দাঁড়ালুম, গার্ড্ এসে উপস্থিত—গার্ড্‌কে জিজ্ঞাসা 'এটা কি লেডিজাতীয় গাড়ি'। শুনে চট্ করে মেমটা তাকে বললে, 'অবিশ্যি আবশ্যক হলে এটা লেডিদের জন্যে reserve করা যেতে পারে।' গার্ড্‌টা সে কথার কোনো উত্তর না দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে আমি কোথায় যাচ্ছি, আমি বললুম কলকাতায়। সে বললে : You may get in sir ! মেয়েটাও সে গাড়িতে ওঠবার উদ্যোগ করতে লাগল, তার স্বামীটা তাকে বারণ করলে। এমন সময়ে গার্ড্‌টা আমাকে জিজ্ঞাসা করলে আমার লেডি কোথায়। আমি বললুম আমার লেডি নেই, একটা maid servant আছে—শুনে মেয়েটা কিছু দূরে গিয়ে হো হো করে হেসে উঠল এবং সাহেবকে বললে : His maid servant ! অর্থাৎ, ঐ কালো লোকটা যাকে maid servant বলছে সে might be his wife as well ! ...যা হোক, মনে মনে বললুম, হেসে নাও, আমিও খালি গাড়ি পেলুম। কিন্তু একটা মজা দেখলুম সাহেবটার ইচ্ছে নয়

আমার কোনোরকম অসুবিধে হয়। সে না থাকলে spite করে মেয়েটা গাড়িতে উঠে বসত— অথচ অন্য গাড়িতে জায়গা ছিল। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই-সব নাক-তোলা রূপসী ইংরেজ মেয়েগুলো যদি ভারতবর্ষে না আসত তা হলে ইংরেজরা আমাদের উপরে ঢের ভালো ব্যবহার করতে পারত; এরাই Anglo-Indian ভাবের মূল ভিত্তি। এরা নাকি বড্ড delicate, ভারী অল্পে মাথা ধরে এবং shocked হয়, তাই কালো জাতের উপরে এদের সহৃদয়তা জন্মাতে পারে না। হায় রে, এত সাবান মাখলুম, এত খানা খেলুম, এত *Cherry Blossom*এর শিশি খালি করলুম, তবু ঐ সাদা নাকগুলির ডগা কুঁচকেই রইল। অভিশাপ দিতে ইচ্ছে করে, 'তোরা যেন পরজন্মে দাক্ষিণাত্যে নারী হয়ে জন্মাস এবং স্বামীরা যেন ঐ নাকের ডগাগুলি ছেদন করে দেয়।'... বেলিটা অকারণে খুঁত খুঁত আরম্ভ করলে। বেলা বাড়তে লাগল, যদিও রোদ্দুর নেই তবুও গরম বোধ হতে লাগল।... কিন্তু সময় আর কাটে না। প্রত্যেক মিনিটকে যেন স্পর্শ করে ঠেলে ঠেলে এগুতে হচ্ছে।... Anna Karenina পড়তে গেলুম, এমনি বিশ্রী লাগল যে পড়তে পারলুম না—এ রকম সব sickly বই পড়ে কী সুখ বুঝতে পারি নে। আমি চাই বেশ সরল সুন্দর মধুর উদার লেখা— কূটকচালে অদ্ভুত গোলমেলে কাণ্ড আমার বেশিক্ষণ পোষায় না। সৌভাগ্যক্রমে খানিক দূর গিয়ে ঘোরতর বৃষ্টি আরম্ভ হল। চার দিক বন্ধ করে কাঁচের জানলার কাছে বসে মেঘ বৃষ্টি দেখতে বেশ লাগল। এক জায়গায় একটা বর্ষার নদীর কাণ্ড যে দেখলুম সে আর কী বলব। সে একেবারে ফুলে ফেঁপে, ফেনিয়ে, পাকিয়ে ঘুলিয়ে, ছুটে, মাথা খুঁড়ে, পাথরগুলোর উপরে পড়ে আছড়ে বিছড়ে, তাদের ডিঙিয়ে, তাদের চার দিকে ঘুরপাক খেয়ে একটা বিশ্রী কাণ্ড করতে লাগল। এ রকম উন্মত্ততা আর কোথাও দেখি নি। সোহাগপুরে বিকেলে এসে যখন ডিনার খেলুম তখন বৃষ্টি থেমেছে, যখন গাড়ি ছাড়লে তখন দেখলুম সূর্য অত্যন্ত রাঙা হয়ে মেঘের মধ্যে অস্ত যাচ্ছে। আমি প্রায় তোদের কথা মনে করছিলুম, ভাবছিলুম খাওয়াদাওয়া গল্পসল্প খেলাধুলো পড়াশুনোর মধ্যে তোদের সময় কেমন অলক্ষিতভাবে কেটে যাচ্ছে—সময় তোদের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছে, তার অস্তিত্বই তোরা টের পাচ্ছিস নে—আর আমি সময়ের উপরে সাঁতার কেটে চলেছি, সমস্ত অগাধ সময়টা আমার বুকে মুখে সর্বাঙ্গে লাগছে।...

যথাসময়ে গাড়ি হাওড়ায় গিয়ে পৌঁছল। প্রথমে বাড়ির জমাদার, তার পরে যোগিনী, তার পরে সত্য, একে একে দৃষ্টিপথে পড়ল। তার পরে সেকেণ্ড্ ক্লাসের ছাতের উপর গুটানো বিছানা, আয়ার দোমড়ানো টিনের বাক্স এবং নাবার টব (তার মধ্যে দুধের বোতল, লোটা, হাঁড়ি, টিন্‌পট, পুঁটুলি ইত্যাদি) চাপিয়ে বাড়ি পৌঁছন গেল। একটা কলরব, লোকের ভিড়, দরোয়ানদের সেলাম, চাকরদের প্রণাম, সরকারদের নমস্কার, আমাদের মধ্যে কে মোটা হয়েছি কে রোগা হয়েছি সে সম্বন্ধে সাধারণের সম্পূর্ণ মতভেদ, বেলাকে নিয়ে স্বয়ম্প্রভা এণ্ড্ কোম্পানির লুটোপুটি, চায়ের টেবিলে লোকসমাগম, স্নান, আহার ইত্যাদি—এ সমস্ত তুই বেশ কল্পনা করতে পারিস। হঠাৎ দাদা এসে সহজ জ্ঞান নিয়ে ঘোরতর বক্তৃতা দিতে লাগলেন— একটা ভারী গোলমাল বেধে গেল। খোকাকে দেখে ভারী নতুন রকম বোধ হল। মস্ত গোল মাথা, নিতান্ত হাঁদা, বেশ একটু কালো, মাথা নেড়া, ফুলো গাল, পরম নির্বুদ্ধির মতো চোখ মুখের ভাব সর্বদা টল্‌মল্, হাতগুলো ফুলো-ফুলো মোটা-মোটা মুঠো-করা—কোনো প্রকার অঙ্গভঙ্গী বা শব্দপ্রয়োগের দ্বারা

তার মনোযোগ আকর্ষণ করলে হাসে, চট্‌কে কিম্বা নেড়ে দিলে হো হোঃ শব্দে পরিতোষ প্রকাশ করে। এই তার general characteristics—কিন্তু এ সকল বিষয়ে তার সমবয়স্ক মানবসন্তানের সঙ্গে তার বিশেষ কোনো প্রভেদ দেখি নে।...

বিজাপুর
১২ জুন ১৮৮৯

৫

সাজাদপুর
।জানুয়ারি ১৮৯০।

এখানকার এন্‌ট্রান্স্‌ স্কুলের ছাত্রেরা একটা সুনীতিসঞ্চারিণী সভা করেছে, তাতে তারা নীতি সম্বন্ধে বক্তৃতা করে, সেই সভার মুখ উজ্জ্বল করবার জন্যে এখানকার মাস্টাররা আমাকে পাক্‌ড়াও করতে এসেছিলেন। আমার কবিত্ব এবং অন্যান্য বিবিধ সদ্‌গুণ সম্বন্ধে যখন তাঁরা সকলে মিলে লাগলেন—যখন সকল মাস্টার এবং সকল পণ্ডিতের মধ্যে আমার গুণব্যাখ্যা নিয়ে রীতিমত রোখ চেপে গেল, একজন যেখেনে থামেন আর-একজন সেখেন থেকে আরম্ভ করেন—একজন যদি বলেন কবি, আর-একজন বলেন শ্রেষ্ঠ কবি, আর-একজন বলেন যেমন ভাষা তেমনি ভাব, চতুর্থ বলেন সকলই নূতন, বাংলা সাহিত্যে ইতিপূর্বে এমন কিছু হয় নি—পঞ্চম যা বললেন তা লোকসমাজে প্রকাশযোগ্য নহে, ষষ্ঠের কথা শুনে আমার কর্ণাগ্রভাগ রক্তিমাবর্ণ ধারণ করলে—সপ্তম কিছু বলবার পূর্বেই আমি অগোণে তাঁদের সুনীতিসঞ্চারিণী সভায় উপস্থিত হতে সম্মতি দান করলুম। এখানকার স্কুলের সেকেন্ড্‌ মাস্টার আমার হেঁয়ালি নাট্যের বিশেষ ভক্ত। তিনি বললেন, আমার 'হেঁইলি নাট্য' বাংলা ভাষায় সম্পূর্ণ নূতন—'পড়্যা আমরা হেস্যা কুট্‌পাট্‌!' পরশুদিন সুনীতিসঞ্চারিণী সভায় যাওয়া গেল। ছেলেতে বুড়োতে মিলে শ' পাঁচ-ছয় লোক উপস্থিত—কেউ বা একরত্তি, পায়ে জুতো নেই, বেঞ্চির উপরে বসে পা দোলাচ্ছে আর থক্‌ থক্‌ করে কাশছে; কেউ বা মস্ত ডাগর, কালো আল্‌পাকার চাপকানের উপর ঘড়ির চেন, অর্থাৎ আমাদের মুন্সেফ উকিল ইত্যাদি। আমি নিতান্ত মুষড়ে বসে আছি, হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, মুখ লাল হয়ে উঠেছে—এমন সময়ে এক ব্যক্তি প্রস্তাব করলেন ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করুন্‌। মুন্সেফবাবু বললেন, 'আমি অনুমোদন করি।' বিনাবাক্যব্যয়ে সভাপতির আসন গ্রহণ করলুম। ছাত্রেরা আজ বিনয় সম্বন্ধে বক্তৃতা করবেন। সেই অপেক্ষা করে বসে আছি।... ... তার পরে ওরই মধ্যে একটি ডাগর-ডোগর ছেলে উঠে modesty সম্বন্ধে ইংরিজি ভাষায় একটি বক্তৃতা পাঠ করলে। বললে : Modesty is an ornament of mind. Modest men are praised and immodest men are blamed by all. Every man is pleased to see a modest man, but a proud man is very much disliked. Newton was a modest man. When his dog upset an ink bottle on his papers Newton said to his dog, 'My friend, you do not know what harm you did to me'—such was his modesty. Brethren, let us all be like Newton. One day Chaitanya was walking in the street—a dog was lying on his way—Chaitanya said, 'My friend, please move a little'—the dog moved away at once—such was the force of modesty. The dog required no beating. We should treat every man like this dog। এই রকম অনেক সদুপদেশ দিয়েছিল। দ্বিতীয় ছাত্র উঠে সুললিত বঙ্গভাষায় বলতে লাগল : একদা সঙ্গিগণ-সমভিব্যাহারে ভ্রমণ করিতেছিলাম। নিদাঘমার্তণ্ডতাপে পরিতাপিত হইয়া এক বিহঙ্গকূজিত মনোরম উপবনের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। (সুদীর্ঘ বর্ণনা।) এক স্থানে দেখিলাম একদল পুরুষ পরুষ বাক্য-উচ্চারণপূর্বক ঘোরতর কলহে প্রবৃত্ত হইয়াছে। জানিতে পারিলাম না ইহারা কে—সঙ্গিগণ পশ্চাদ্বর্তী হইয়া পড়াতে তাহাদিগকেও জিজ্ঞাসা করিতে পারিলাম না। আরও কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া এক কুমুদকহ্লারশোভিত হংস-সারসসেবিত সুশীতল সরোবরতীরে উপস্থিত হইলাম। (দীর্ঘ বর্ণনা।) সেখানে কতকগুলি অপূর্বসুন্দরী যুবতী জলক্রীড়া করিতেছে দেখিয়াই বোধ হইল তাহারা দেবকন্যা। পরে জানিতে পারিলাম পূর্বোক্ত পুরুষগণ ঔদ্ধত্য অহংকার এবং এই সুন্দরী যুবতীগণ বিনয়। বিনয়ের অশেষ গুণ। যতগুলি গুণে সৃষ্টিকর্তা জগদীশ্বর মানবকলেবর বিভূষিত করিয়াছেন তন্মধ্যে বিনয় সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ। আহা! মানবের মধ্যে বিনয়গুণ সন্দর্শন করিলে নয়ন আনন্দাশ্রুজলে প্লাবিত ও অন্তঃকরণ হর্ষপারাবারে নিমগ্ন হয়। ইত্যাদি। তার পরে আর একটি ছেলে উঠেই আরম্ভ করে দিলে—

বিনয়ের তুল্য গুণ আর কোথা নাই।
বিনয়ীর বশ হয় সর্বলোকে ভাই।
পিতামাতা সকলের বাধ্য হয়ে রবে—
তবে তো তোমারে সবে বিনয়ী কহিবে।
ইত্যাদি।

আর একটি ছেলে বিনয় থেকে আরম্ভ করলে, শেষ করলে প্রকৃত প্রেম কাকে বলে এবং ঈশ্বরের অনন্ত মহিমা। প্রত্যেক বক্তৃতার পরে খানিকক্ষণ চটাপট্ হাততালি পড়তে লাগল। আমি তো নিতান্ত হতবুদ্ধি হয়ে বসে আছি। এমন সময়ে Headmaster এসে বললেন, 'আরও অনেক রচনা আছে, কিন্তু আপনার বক্তৃতা শোনবার জন্যে সকলে উৎসুক হয়ে আছেন।' মুখটুক শুকিয়ে, হাত পা কালিয়ে, কানের মধ্যে ভোঁ ভোঁ করতে লেগে, কেশে কুশে দাঁড়িয়ে আরম্ভ করে দিলুম। বললুম, বিনয় সম্বন্ধে কিছু বলবার পূর্বেই একান্ত বিনীতভাবে বলা আবশ্যক, আমার বলবার শক্তি নেই—বিশেষতঃ বিনয় সম্বন্ধে আমি যে বেশি কথা বলতে পারব এমন সাধ্য আমি রাখি নে। বিনয় যে একটা সদ্গুণের মধ্যে সে সম্বন্ধে আমার পূর্ববক্তা ছাত্রবৃন্দের আমি সম্পূর্ণ অনুমোদন করি। নিউটন বিনয়ী ছিলেন বটে, তার আর কোন সন্দেহ নেই।—এইরকম তো ব্যাপার। ক্রমে ক্রমে বলতে বলতে দুটো চারটে কথা বেরিয়ে গেল। তার পরে আমি বসলে পর, পরে পরে দুজন উঠে আমার এবং আমার পিতৃপিতামহের গুণব্যাখ্যা করতে লাগল। প্রথমে উঠলেন হেড-পণ্ডিত। তিনি বললেন তাঁর বলবার ক্ষমতা নেই, কিন্তু আমার বক্তৃতা শুনে এমনি মুগ্ধ হয়েছেন যে সামলাতে পারছেন না—কবিত্বশক্তি বক্তৃতাশক্তি এবং তার

উপরে সংগীতশক্তি আমি ছাড়া আর কোথাও পাওয়া যায় না। এই বলে ধপ্‌ করে বসে পড়লেন। সেকেন্‌ড্‌-মাস্টার উঠে বললেন—‘পণ্ডিত মহাশয় যা বললেন তাতে আমার মন তৃপ্ত হল না, যথেষ্ট বলা হয় নি। যিনি আজ আমাদের সভায় উপস্থিত আছেন তিনি বড়ো সাধারণ লোক নন—স্বর্গীয় মহাত্মা (এইখেনে প্রায় পাঁচ মিনিট-কাল তাঁর নাম মনে পড়ল না, পাশের থেকে কে বলে দিলে) দ্বারকানাথ ঠাকুরের নাম কে না জানে, সমস্ত পৃথিবীতে তাঁর নাম রাষ্ট্র বললে অত্যুক্তি হয় না—তিনি এঁর পিতামহ—রাজর্ষি বললেও হয় মহর্ষি বললেও হয় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এঁর পিতা!’ তার পরে এল কবিত্বশক্তি এবং ‘হেঁইলি নাট্য’। আমি শুনে অপ্রস্তুত। তার পরে বললেন বিনয় সম্বন্ধে বক্তৃতা দেবার দরকার কী—Example is better than precept—ইনিই বিনয়ের দৃষ্টান্তস্থল। ইত্যাদি। ইত্যাদি। সবাই হাততালি দিলে। তার পরে সভা ভঙ্গ হল।

জোড়াসাঁকো
২৩ জানুয়ারি ১৮৯০
১১ মাঘ বৃহস্পতিবার

৬

সাজাদপুর
।জানুয়ারী ১৮৯০।

কাজেই দুপুর বেলা পাগড়ি পরে কার্ডে নাম লিখে পাল্কি চড়ে জমিদার বাবু চললেন। সাহেব তাঁবুর বারান্দায় বসে বিচার করছেন, দক্ষিণ পার্শ্বে পুলিসের চর। বিচারপ্রার্থীর দল মাঠে ঘাটে গাছতলায় পড়ে অপেক্ষা করে আছে—একবারে তার নাকের সামনে পাল্কি নাবালে, সাহেব খাতির করে চৌকিতে বসালে। ছোকরা-হেন, গোঁফের রেখা উঠেছে, চুল খুব কটা, মাঝে মাঝে একটু একটু কালো চুলের তালি দেওয়া, সে ভারী অদ্ভুত দেখতে হয়েছে—হঠাৎ মনে হয় বুড়ো মানুষ, অথচ মুখ নিতান্ত কাঁচা। সাহেবের সঙ্গে বিস্তর আপ্যায়িত করা গেল; বললুম, ‘কাল রাত্রে আমার সঙ্গে খেতে এসো।’ সে বললে, ‘আমি আজই আর-এক জায়গায় যাচ্ছি pig stickingএর জোগাড় করতে।’ (আমি মনে মনে উৎফুল্ল) বললুম, নিতান্ত দুঃখের বিষয়। সাহেব বললেন, ‘আবার সোমবারে ফিরে আসব।’ (শুনে মন বড্ড দমে গেল) বললুম, ‘তবে সোমবারেই খেয়ো।’ সে তৎক্ষণাৎ রাজি। যা হোক, সোমবারটা একটু তফাতে আছে মনে করে নিশ্বেস ফেলে বাড়ি চলে এলুম। ভয়ানক মেঘ করে এল—ঘোরতর ঝড়, মুষলধারে বৃষ্টি। বই ছুঁতে ইচ্ছে করছে না, কিছু লেখা অসম্ভব, মনের মধ্যে ভারী একটা চাঞ্চল্য উপস্থিত, যাকে কবিত্বের ভাষায় বলে—কী যেন নেই, কে যেন থাকলে বেশ হত, কিন্তু তাকে যেন কাছাকাছি কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না ইত্যাদি। এ ঘর থেকে ও ঘরে পায়চারি করে বেড়াতে লাগলুম—অন্ধকার হয়ে এসেছে, গড়্‌ গড়্‌ শব্দে মেঘ ডাকছে, বিদ্যুতের উপর বিদ্যুৎ, হু হু করে এক-একটা বাতাসের দম্‌কা আসছে আর আমাদের বারান্দার সামনের বড়ো লিচুগাছটার ঘাড় ধরে যেন তার দাড়ি-সুদ্ধ মাথাটা নাড়িয়ে দিচ্ছে—

দেখতে দেখতে বৃষ্টির জলে আমাদের শুকনো খালটা প্রায় পুরে এল।......ঐ রকম আরেকটা লিখতে ইচ্ছে করে, কিন্তু বোধ হয় আর কিছু লেখবার নেই। যাই হোক এই রকম করে বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ আমার মনে হল ম্যাজিস্ট্রেটকে এই বাদলায় আমাদের বাড়িতে আশ্রয় নিতে অনুরোধ করা আমার কর্তব্য। চিঠি লিখে দিলুম, 'সাহেব, এ বর্ষায় pig stickingএ বেরোনো তোমার কর্ম নয়— যদিও তুমি সাহেবের বাচ্চা, এবং তাঁবুতে বাস করাও স্থলচর-জাতীয় জীবের পক্ষে দুঃসাধ্য, অতএব শুকনো ডাঙা যদি ভালো মনে কর তো আমার আশ্রয়ে এসো।' চিঠি পাঠিয়ে দিয়ে ঘর তদারক করতে গিয়ে দেখি, সে ঘরে দুটো বাঁশের ঝোলার উপর তাকিয়া গদি ময়লা-লেপ টাঙানো— চাকরদের গুল টিকে তামাক, তাঁদেরই দুটো কাঠের সিন্দুক, তাঁদেরই মলিন লেপ, ওয়াড়হীন তৈলাক্ত বালিশ ও মসীবর্ণ মাদুর, এক টুক্‌রো ছেঁড়া চট ও তার উপরে বিচিত্রজাতীয় মলিনতা— কতকগুলো ... ... বাক্সর মধ্যে নানাবিধ জিনিসের ভগ্নাবশিষ্ট— যথা মর্চেপড়া কাৎলির ঢাক্‌নি, তলাহীন ভাঙা লোহার উনুন, অত্যন্ত ময়লা একটা দস্তার চাদানি, কতকগুলো কাঁচের ... ... গ্লাসের পায়া, ভাঙা সেজের কাঁচরাশি ও ময়লা শামাদান, দুটো ফিলটার, meat safe, একটা সুপ-প্লেটে খানিকটা পাতলা গুড়, ধুলো পড়ে পড়ে সেটা গাঢ় হয়ে এসেছে, অনেকগুলো ভাঙা এবং আস্ত প্লেট, গোটাকতক ময়লা কালীবর্ণ ভিজে ঝাড়ন— কোণে প্লেট ধোবার গামলা, গফুর মিয়ার একটা ময়লা কোর্তা এবং পুরোনো মক্‌মলের skull cap— একটা জীর্ণ পোকা-কাটা জলের দাগ- তেলের দাগ- দুধের দাগ- গুড়ের দাগ- কালো দাগ- brown দাগ- সাদা দাগ- এবং নানা মিশ্রিত দাগ-বিশিষ্ট আয়নাহীন dressing table— তার পারা-ওঠা ভাঙা আয়নাটা অন্যত্র দেয়ালে ঠেসান-দেওয়া— তার খোপের মধ্যে ধুলো, খড়কে, ন্যাপ্‌কিন, পুরোনো তালা, ভাঙা গেলাসের তলা এবং সোডা ওআটার বোতলের তার, কতকগুলো খাটের খুরো, ডান্ডা এবং চাল— একটা পায়া-ভাঙা washhand stand, একটা দুর্গন্ধ, দেয়ালময় অনেকগুলো দাগ এবং গোটাকতক পেরেক— ব্যাপার দেখে আমার চক্ষুস্থির।— 'ডাক্‌ লোকজন, নিয়ে আয় নায়েব, ডেকে আন্‌ খাজাঞ্চি, জোগাড় কর্‌ কুলি— আন্‌ ঝাঁটা, আন্‌ জল, মই লাগা, দড়ি খোল্‌, বাঁশ খোল্‌, তাকিয়া লেপ কাঁথা টেনে ফেল্‌, ভাঙা কাঁচের টুকরোগুলো খুঁটে খুঁটে তোল্‌, পেরেকগুলো একে একে উপড়ে ফেল্‌— ওরে তোরা সব হাঁ করে দাঁড়িয়ে রয়েছিস কেন, নে-না— একটা একটা করে জিনিস নে-না— ওরে ভাঙলে রে সব ভাঙলে— ঝন্‌ ঝন্‌ ঝনাৎ— তিনটে সেজ ভেঙে চুরমার— খুঁটে খুঁটে তোল্‌।' ভাঙা চুপড়িগুলো এবং ছেঁড়া চটটা বহুদিনসঞ্চিত ধুলোসমেত নিজের হাতে টেনে ফেলে দিলুম— নিচে থেকে পাঁচ-ছটা আর্সুলো সপরিবারে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লেন। তাঁরা আমারই সঙ্গে একান্নবর্তী হয়ে বাস করছিলেন— আমার গুড়, আমার পাঁউরুটি এবং আমারই বার্ণিশ-করা নতুন জুতোর বার্ণিশ তাঁদের উপজীবিকা ছিল। সাহেব লিখলেন, 'আমি এখনি যাচ্ছি, বড়ো বিপদে পড়েছি।' 'ওরে এল রে এল— চট্‌পট্‌ কর্‌।' তার পরে— ঐ এসেছে সাহেব। তাড়াতাড়ি চুল দাড়ি সমস্ত ঝেড়ে ফেলে ভদ্রলোক হয়ে, যেন কোনো কাজ ছিল না, যেন সমস্তদিন আরামে বসেছিলুম, এই রকম ভাবে হলের ঘরে বসে রইলুম। সাহেবের সঙ্গে ঈষৎ হেসে হাত নাড়ানাড়ি করে অত্যন্ত নিশ্চিন্ত ভাবে গল্প করতে লাগলুম। সাহেবের শোবার ঘরের কী হল— এই চিন্তা ক্রমাগত মনের মধ্যে ঠেলে ঠেলে উঠতে লাগল। গিয়ে দেখলুম এক রকম দাঁড়িয়ে গেছে। রাত্তিরটা ঘুমিয়ে কাটতেও পারে, যদি না সেই গৃহহীন আর্সুলাগুলো

রাত্তিরে তার পায়ের তেলোয় সুড়্‌সুড়ি দেয়। সাহেব বললে, ‘কাল সকালেই শিকারে বেরোব।’ আমি আর উচ্চবাচ্য করলুম না। সন্ধের সময় সাহেবের ভগ্ন পাইক এসে খবর দিলে ঝড়ে তাঁর তাঁবু ছিঁড়েখুঁড়ে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। তাঁর কাছারির তাঁবুও ভিজে যাচ্ছেতাই হয়ে গেছে— অতএব অন্য জন্তু শিকার স্থগিত রেখে জমিদার বাবুর এখেনেই স্থায়ী হতে হবে।...

কলকাতা
২৮ জানুয়ারি ১৮৯০

৭

লণ্ডন
৩ অক্টোবর। ১৮৯০।

এ দেশে এসে আমাদের সেই হতভাগ্য বেচারা ভারতভূমিকে সত্যি সত্যি আমার মা বলে মনে হয়। এ দেশের মতো তার এত ক্ষমতা নেই, এত ঐশ্বর্য নেই, কিন্তু আমাদের ভালোবাসে। আমার আজন্মকালের যা কিছু ভালোবাসা, যা কিছু সুখ, সমস্তই তার কোলের উপর আছে। এখানকার আকর্ষণ চাকচিক্য আমাকে কখনোই ভোলাতে পারবে না— আমি তার কাছে যেতে পারলে বাঁচি। সমস্ত সভ্যসমাজের কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত থেকে আমি যদি তারই এক কোণে বসে মৌমাছির মতো আপনার মৌচাকটি ভরে ভালোবাসা সঞ্চয় করতে পারি তা হলেই আর কিছু চাই নে।

৮

লণ্ডন
১০ অক্টোবর। ১৮৯০।

মানুষ কি লোহার কল, যে, ঠিক নিয়ম-অনুসারে চলবে? মানুষের মনের এত বিচিত্র এবং বিস্তৃত কাণ্ড-কারখানা— তার এত দিকে গতি— এবং এত রকমের অধিকার যে, এ দিকে -ও দিকে হেলতেই হবে। সেই তার জীবনের লক্ষণ, তার মনুষ্যত্বের চিহ্ন, তার জড়ত্বের প্রতিবাদ। এই দ্বিধা, এই দুর্বলতা যার নেই তার মন নিতান্ত সংকীর্ণ এবং কঠিন এবং জীবনবিহীন। যাকে আমরা প্রবৃত্তি বলি এবং যার প্রতি আমরা সর্বদাই কটুভাষা প্রয়োগ করি সেই আমাদের জীবনের গতিশক্তি— সেই আমাদের নানা সুখদুঃখ পাপপুণ্যের মধ্যে দিয়ে অনন্তের দিকে বিকশিত করে তুলছে। নদী যদি প্রতি পদে বলে ‘কই সমুদ্র কোথায়, এ যে মরুভূমি, ঐ যে অরণ্য, ঐ যে বালির চড়া, আমাকে যে শক্তি ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে সে বুঝি আমাকে ভুলিয়ে অন্য জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে’— তা হলে তার যে রকম ভ্রম হয়, প্রবৃত্তির উপরে একান্ত অবিশ্বাস করলে আমাদেরও কতকটা সেই রকম ভ্রম হয়।

আমরাও প্রতিদিন বিচিত্র সংশয়ের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছি, আমাদের শেষ আমরা দেখতে পাচ্ছি নে, কিন্তু যিনি আমাদের অনন্ত জীবনের মধ্যে প্রবৃত্তি-নামক প্রচণ্ড গতিশক্তি দিয়েছেন তিনিই জানেন তার দ্বারা আমাদের কী রকম করে চালনা করবেন। আমাদের সর্বদা এই একটা মস্ত ভুল হয় যে, আমাদের প্রবৃত্তি আমাদের যেখেনে নিয়ে এসেছে সেইখানেই বুঝি ছেড়ে দিয়ে চলে যাবে— আমরা তখন জানতে পারি নে সে আমাদের তার মধ্যে থেকে টেনে তুলবে। নদীকে যে শক্তি মরুভূমির মধ্যে নিয়ে আসে সেই শক্তিই সমুদ্রের মধ্যে নিয়ে যায়। ভ্রমের মধ্যে যে ফেলে ভ্রম থেকে সেই টেনে নিয়ে যায়। এই রকম করেই আমরা চলেছি। যার এই প্রবৃত্তি অর্থাৎ জীবনী শক্তির প্রাবল্য নেই, যার মনের রহস্যময় বিচিত্র বিকাশ নেই, সে সুখী হতে পারে, সাধু হতে পারে এবং তার সেই সংকীর্ণতাকে লোকে মনের জোর বলতে পারে, কিন্তু অনন্ত জীবনের পাথেয় তার বেশি নেই। আমি এই যে...

কলকাতা। ১৮৯০

৯

কালীগ্রাম
৫ মাঘ ১৮৯১

বেশ কুঁড়েমি করবার মতো বেলাটা। কেউ তাড়া দেবার লোক নেই, তা ছাড়া প্রজা এবং কাজের ভিড় এখনো চতুর্দিকে ছেঁকে ধরে নি। সব-সুদ্ধ খুব ঢিলে-ঢিলে একলা-একলা কী-এক রকম মনে হচ্ছে। যেন পৃথিবীতে অত্যাবশ্যক কাজ বলে একটা কিছুই নেই, এমন-কি, নাইলেও চলে না-নাইলেও চলে, এবং ঠিক-সময়-মত খাওয়াটা কলকাতার লোকের মধ্যে প্রচলিত একটা বহুদিনের কুসংস্কার বলে মনে হয়। এখানকার চতুর্দিকের ভাবগতিকও সেই রকম। একটা ছোট্ট নদী আছে বটে, কিন্তু তাতে কানাকড়ির স্রোত নেই। সে যেন আপন শৈবালদামের মধ্যে জড়ীভূত হয়ে অঙ্গ বিস্তার করে দিয়ে পড়ে পড়ে ভাবছে যে, যদি না চললেও চলে তবে আর চলবার দরকার কী? জলের মাঝে মাঝে যে লম্বা ঘাস এবং জলজ উদ্ভিদ জন্মেছে, জেলেরা জাল ফেলতে না এলে সেগুলো সমস্ত দিনের মধ্যে একটু নাড়া পায় না। পাঁচটা-ছটা বড়ো বড়ো নৌকো সারি সারি বাঁধা আছে, তার মধ্যে একটার ছাতের উপর একজন মাঝি আপাদমস্তক কাপড়ে মুড়ে রোদ্দুরে নিদ্রা দিচ্ছে— আর-একটার উপর একজন বসে বসে দড়ি পাকাচ্ছে এবং রোদ পোহাচ্ছে, দাঁড়ের কাছে একজন আধ-বৃদ্ধ লোক অনাবৃত গাত্রে বসে অকারণে আমাদের বোটের দিকে চেয়ে আছে। ডাঙার উপরে নানান রকমের নানান লোক অত্যন্ত মৃদুমন্দ অলস চালে কেন যে আসছে, কেন যে যাচ্ছে, কেন যে বুকের মধ্যে নিজের দুটো হাঁটুকে আলিঙ্গন করে ধরে উবু হয়ে বসে আছে, কেন যে অবাক হয়ে বিশেষ কোনো-কিছুর দিকে না তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তার কোনো অর্থ পাওয়া যায় না। কেবল গোটাকতক পাতিহাঁসের ওরই মধ্যে একটু ব্যস্ত ভাব দেখা যাচ্ছে— তারা ভারী কলরব করছে এবং ক্রমাগতই উৎসাহ-সহকারে জলের মধ্যে মাথা ডুবোচ্ছে

এবং তৎক্ষণাৎ মাথা তুলে নিয়ে সবলে ঝাড়া দিচ্ছে। ঠিক মনে হচ্ছে যেন তারা জলের নিচেকার নিগূঢ় রহস্য আবিষ্কার করবার জন্যে প্রতিক্ষণেই গলা বাড়িয়ে দিচ্ছে এবং তার পরে সবেগে মাথা নেড়ে বলছে 'কিছুই না— কিছুই না!' এখানকার দিনগুলো এই রকম বারো ঘণ্টা পড়ে পড়ে কেবল রোদ পোহায়, এবং অবশিষ্ট বারো ঘণ্টা খুব গভীর অন্ধকার মুড়ি দিয়ে নিঃশব্দে নিদ্রা দেয়। এখেনে সমস্ত ক্ষণ বাইরের দিকে চেয়ে চেয়ে কেবল নিজের মনের ভাবগুলোকে বসে বসে দোলা দিতে ইচ্ছে করে, তার সঙ্গে সঙ্গে একটু একটু গুন্ গুন্ করে গান গাওয়া যায়, মাঝে মাঝে বা ঘুমে চোখ একটু অলস হয়ে আসে। মা যেমন করে শীতকালের সারাবেলা রোদ্দুরে পিঠ দিয়ে ছেলে কোলে করে গুন্ গুন্ স্বরে দোলা দেয়, সেই রকম।...

কলকাতা। ১৮৯১

১০

Patisahr Katchari
via Atrai
৬ মাঘ, রবিবার

আমার বোট কাছারির কাছ থেকে অনেক দূরে এনে একটি নিরিবিলি জায়গায় বেঁধেছি। এ দেশে গোলমাল কোথাও নেই, ইচ্ছে করলে পাওয়া যায় না, কেবল হয়তো অন্যান্য বিবিধ জিনিসের সঙ্গে হাটে পাওয়া যেতে পারে। আমি এখন যেখানে এসেছি এ জায়গায় অধিকন্তু মানুষের মুখ দেখা যায় না। চারি দিকে কেবল মাঠ ধু ধু করছে— মাঠের শস্য কেটে নিয়ে গেছে, কেবল কাটা ধানের অবশিষ্ট হলদে বিচালিতে সমস্ত মাঠ আচ্ছন্ন। সমস্ত দিনের পর সূর্যাস্তের সময় এই মাঠে কাল একবার বেড়াতে বেরিয়েছিলুম।...সূর্য ক্রমেই রক্তবর্ণ হয়ে একেবারে পৃথিবীর শেষ রেখার অন্তরালে অন্তর্হিত হয়ে গেল। চারি দিক কী যে সুন্দর হয়ে উঠল সে আর কী বলব! বহু দূরে একেবারে দিগন্তের শেষ প্রান্তে একটু গাছপালার ঘের দেওয়া ছিল, সেখানটা এমন মায়াময় হয়ে উঠল— নীলেতে লালেতে মিশে এমন আবছায়া হয়ে এল— মনে হল ঐখেনে যেন সন্ধ্যার বাড়ি, ঐখেনে গিয়ে সে আপনার রাঙা আঁচলটি শিথিল ভাবে এলিয়ে দেয়, আপনার সন্ধ্যাতারাটি যত্ন করে জ্বালিয়ে তোলে, আপন নিভৃত নির্জনতার মধ্যে সিঁদুর পরে বধূর মতো কার প্রতীক্ষায় বসে থাকে, এবং বসে বসে পা দুটি মেলে তারার মালা গাঁথে এবং গুন্ গুন্ স্বরে স্বপ্ন রচনা করে। সমস্ত অপার মাঠের উপর একটি ছায়া পড়েছে— একটি কোমল বিষাদ— ঠিক অশ্রুজল নয়— একটি নির্নিমেষ চোখের বড়ো বড়ো পল্লবের নিচে গভীর ছল্‌ছলে ভাবের মতো। এমন মনে করা যেতে পারে— মা পৃথিবী লোকালয়ের মধ্যে আপন ছেলেপিলে এবং কোলাহল এবং ঘরকর্নার কাজ নিয়ে থাকে— যেখানে একটু ফাঁকা, একটু নিস্তব্ধতা, একটু খোলা আকাশ, সেইখানেই তার বিশাল হৃদয়ের অন্তর্নিহিত ঔদাস্য এবং বিষাদ ফুটে ওঠে; সেইখানেই তার গভীর দীর্ঘনিশ্বাস শোনা যায়। ভারতবর্ষের যেমন বাধাহীন পরিষ্কার

আকাশ, বহুদূরবিস্তৃত সমতলভূমি আছে, এমন য়ুরোপের কোথাও আছে কি না সন্দেহ। এইজন্যে আমাদের জাতি যেন বৃহৎ পৃথিবীর সেই অসীম ঔদাস্য আবিষ্কার করতে পেরেছে। এইজন্যে আমাদের পূরবীতে কিম্বা টোড়িতে সমস্ত বিশাল জগতের অন্তরের হাহাধ্বনি যেন ব্যক্ত করছে, কারও ঘরের কথা নয়। পৃথিবীর একটা অংশ আছে যেটা কর্মপটু, স্নেহশীল, সীমাবদ্ধ, তার ভাবটা আমাদের মনে তেমন প্রভাব বিস্তার করবার অবসর পায় নি। পৃথিবীর যে ভাবটা নির্জন, বিরল, অসীম, সেই আমাদের উদাসীন করে দিয়েছে। তাই সেতারে যখন ভৈরবীর মিড় টানে আমাদের ভারতবর্ষীয় হৃদয়ে একটা টান পড়ে। কাল সন্ধের সময় নির্জন মাঠের মধ্যে পূরবী বাজছিল, পাঁচ ছ ক্রোশের মধ্যে কেবল আমি একটি প্রাণী বেড়াচ্ছিলুম, এবং আর একটি প্রাণী বোটের কাছে পাগড়ি বেঁধে লাঠি হাতে অত্যন্ত সংযত ভাবে দাঁড়িয়ে ছিল। আমার বাঁ পাশে ছোট্ট নদীটি দুই ধারের উঁচু পাড়ের মধ্যে এঁকে বেঁকে খুব অল্প দূরেই দৃষ্টিপথের বার হয়ে গেছে, জলে ঢেউয়ের রেখামাত্র ছিল না, কেবল সন্ধ্যার আভা অত্যন্ত মুমূর্ষু হাসির মতো খানিক ক্ষণের জন্যে লেগে ছিল। যেমন প্রকাণ্ড মাঠ তেমনি প্রকাণ্ড নিস্তব্ধতা। কেবল এক রকম পাখি আছে, তারা মাটিতে বাসা করে থাকে---সেই পাখি যত অন্ধকার হয়ে আসতে লাগল তত আমাকে তার নিরালা বাসার কাছে ক্রমিক আনাগোনা করতে দেখে ব্যাকুল সন্দেহের স্বরে টী টী করে ডাকতে লাগল। ক্রমে এখনকার কৃষ্ণপক্ষের চাঁদের আলো ঈষৎ ফুটে উঠল---বরাবর নদীর ধারে ধারে মাঠের প্রান্ত দিয়ে একটা সংকীর্ণ পথচিহ্ন চলে গেছে, সেইখানে নতশিরে চলতে চলতে ভাবছিলুম।

কলকাতা। ১৮৯১

১১

Patisahr Katchari
via Atrai
৭ মাঘ, সোমবার

ছোটো নদীটি ঈষৎ বেঁকে এইখানে একটুখানি কোণের মতো, একটু কোলের মতো তৈরি করেছে—দুই ধারের উঁচু পাড়ের মধ্যে সেই কোলের কোণটুকুতে বেশ প্রচ্ছন্ন হয়ে থাকি, একটু দূর থেকে আমাদের আর দেখা যায় না—নৌকাওয়ালারা উত্তর দিক থেকে গুণ টেনে টেনে আসে, হঠাৎ একটা বাঁক ফিরেই এই জনহীন মাঠের ধারে অকারণে একটা মস্ত বোট বাঁধা দেখে আশ্চর্য হয়ে যায়।—'হাঁ গা, কাদের বজরা গা?' 'জমিদার বাবুর।' 'এখানে কেন? কাছারির সামনে কেন বাঁধ নি?' 'হাওয়া খেতে এসেছেন।'—এসেছি হাওয়ার চেয়ে আরও ঢের বেশি কঠিন জিনিসের জন্যে। যা হোক, এ রকম প্রশ্নোত্তর প্রায় মাঝে মাঝে শুনতে পাওয়া যায়। এইমাত্র খাওয়া শেষ করে বসেছি— এখন বেলা দেড়টা। বোট খুলে দিয়েছে, আস্তে আস্তে কাছারির দিকে চলেছে। বেশ একটু বাতাস দিচ্ছে। তেমন ঠাণ্ডা নয়—দুপুরবেলার তাতে অল্প গরম হয়ে উঠেছে। মাঝে মাঝে ঘন শৈবালের মধ্যে দিয়ে যেতে খস্‌ খস্‌ শব্দ হচ্ছে। সেই শৈবালের উপরে অনেকগুলো ছোটো ছোটো

কচ্ছপ আকাশের দিকে সমস্ত গলা বাড়িয়ে দিয়ে রোদ পোহাচ্ছে। অনেক দূরে দূরে একটা-একটা ছোটো-ছোটো গ্রাম আসছে। গুটিকতক খোড়ো ঘর, কতকগুলি চাল-শূন্য মাটির দেয়াল, দুটো-একটা খড়ের স্তূপ, কুলগাছ আমগাছ বটগাছ এবং বাঁশের ঝাড়, গোটা-তিনেক ছাগল চরছে, গোটা-কতক উলঙ্গ ছেলে মেয়ে— নদী পর্যন্ত একটি গড়ানে কাঁচা ঘাট, সেখানে কেউ কাপড় কাচছে, কেউ নাইছে, কেউ বাসন মাজছে; কোনো কোনো লজ্জাশীলা বধূ দুই আঙুলে ঘোমটা ঈষৎ ফাঁক করে ধরে কলসী কাঁখে জমিদার বাবুকে সকৌতুকে নিরীক্ষণ করছে, তার হাঁটুর কাছে আঁচল ধরে একটি সদ্যস্নাত তৈলচিক্কণ বিবস্ত্র শিশুও একদৃষ্টে বর্তমান পত্রলেখক সম্বন্ধে কৌতূহল নিবৃত্তি করছে— তীরে কতকগুলো নৌকো বাঁধা এবং একটা পরিত্যক্ত প্রাচীন জেলেডিঙি অর্ধনিমগ্ন অবস্থায় পুনরুদ্ধারের প্রতীক্ষা করছে। তার পরে আবার অনেকটা দূর শস্যশূন্য মাঠ— মাঝে মাঝে কেবল দুই-একজন রাখালশিশুকে দেখতে পাওয়া যায়, এবং দুটো-একটা গোরু নদীর ঢালু তটের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত এসে সরস তৃণ অন্বেষণ করছে দেখা যায়। এখানকার দুপুর-বেলার মতো এমন নির্জনতা নিস্তব্ধতা আর কোথাও নেই।

কলকাতা। ১৮৯১

১২

কালীগ্রাম
। জানুয়ারি ১৮৯১।

আমি যখন তোকে চিঠি লিখতে শুরু করেছি তখন এখানকার একজন আমলা তার দারিদ্র্যদুঃখ বেতনবৃদ্ধি এবং দারপরিগ্রহের আবশ্যকতা নিয়ে ভারী বক্‌ বক্‌ করছিল— সে বকে যাচ্ছিল আর আমি লিখে যাচ্ছিলুম, শেষে এক জায়গায় থেমে তাকে সংক্ষেপে এইটুকু বুঝিয়ে দিলুম যে, বুদ্ধিমান লোক যখন কোনো-একটা প্রার্থনা পূরণ করে তখন সেটা সংগত বলেই করে, একবারের জায়গায় পাঁচবার বলা হল বলে করে না। ভাবলুম এমন একটা সুন্দর জ্ঞানগর্ভ কথার পর সে লোকটা একেবারে নিরুত্তর হয়ে থাকবে, কিন্তু দেখলুম ফলে তার বিপরীত হয়ে দাঁড়ালো। উল্টে সে আমাকে প্রশ্ন করলে, বাপমায়ের কাছে ছেলে যদি সকল কথা না বলবে তবে কার কাছে গিয়ে বলবে? আমি উপস্থিতমত তার কোনো সদুত্তর দিতে পারলুম না। পুনশ্চ সেও বকে যেতে লাগল, আমিও লিখে যেতে লাগলুম। কোথাও কিছু নেই, খামকা বাপ-মা হয়ে বসার বিষম ল্যাঠা।— কাল যখন কাছারি করছি, গুটি পাঁচ ছেলে হঠাৎ অত্যন্ত সংযতভাবে আমার সামনে এসে দাঁড়ালে— কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে না করতে একেবারে বিশুদ্ধ বঙ্গভাষায় আরম্ভ করে দিলে, 'পিতঃ, অভাগ্য সন্তানগণের সৌভাগ্যবশতঃ জগদীশ্বরের কৃপায় হুজুরের পুনর্বার এতদ্দেশে শুভাগমন হইয়াছে।' এমনি করে আধ-ঘণ্টাকাল বক্তৃতা করে গেল; মাঝে মাঝে মুখস্থ বক্তৃতা ভুলে যাচ্ছিল, আবার আকাশের দিকে চেয়ে সংশোধন করে নিচ্ছিল। বিষয়টা হচ্ছে তাদের স্কুলে টুল এবং বেঞ্চির অপ্রতুল হয়েছে— সেই কাষ্ঠাসন-অভাবে 'আমরাই বা কোথায় উপবেশন করি,

আমাদের পূজনীয় শিক্ষক মহাশয়ই বা কোথায় উপবেশন করেন, এবং পরিদর্শক মহাশয় উপস্থিত হইলে তাঁহাকেই বা কোথায় আসন দান করা যায়!' ছোট্ট ছেলের মুখে হঠাৎ এই অনর্গল বক্তৃতা শুনে আমার এমনি হাসি পাচ্ছিল! বিশেষতঃ এই জমিদারি কাছারিতে, যেখানে অশিক্ষিত চাষারা নিতান্ত গ্রাম্যভাষায় আপনাদের যথার্থ দারিদ্র্যদুঃখ জানায়— যেখানে অতিবৃষ্টি দুর্ভিক্ষে গোরু বাছুর হাল লাঙল বিক্রি করেও উদরান্নের অনটনের কথা শোনা যাচ্ছে, যেখানে 'অহরহ' শব্দের পরিবর্তে 'রহরহ', 'অতিক্রমের' স্থলে 'অতিক্রয়' ব্যবহার, সেখানে টুল বেঞ্চির অভাবে সংস্কৃত বক্তৃতা কানে এমনি অদ্ভুত শোনায়। অন্যান্য আমলা এবং প্রজারা এই ছোকরার ভাষার প্রতি এতাদৃশ দখল দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল— তারা মনে মনে আক্ষেপ করছিল, 'বাপ-মা'রা আমাদের যত্ন করে লেখাপড়া শেখায় নি, নইলে আমরাও জমিদারের সামনে দাঁড়িয়ে এই রকম শুদ্ধ ভাষায় নিবেদন করতে পারতুম।' আমি শুনতে পেলুম একজন আর-একজনকে ঠেলে ঈষৎ বিদ্বেষের ভাবে বলছে, 'একে কে শিখিয়ে দিয়েছে।' আমি তার বক্তৃতা শেষ না হতেই তাকে থামিয়ে বললুম, 'আচ্ছা, তোমাদের টুল-বেঞ্চির বন্দোবস্ত করে দেব।' তাতেও সে ছোকরাটি দমল না। সে যেখানে বক্তৃতা ভঙ্গ করেছিল সেইখান থেকে আবার আরম্ভ করলে— যদিও আর আবশ্যক ছিল না, কিন্তু শেষ কথাটি পর্যন্ত চুকিয়ে প্রণাম করে বাড়ি ফিরে গেল। বেচারা অনেক কষ্টে মুখস্থ করে এসেছিল; আমি তার টুল বেঞ্চি না দিলে সে ক্ষুণ্ণ হত না, কিন্তু তার বক্তৃতা কেড়ে নিলে বোধ হয় অসহ্য হত। সেই জন্যে যদিও আমার অনেক গুরুতর কাজ ছিল, তবু খুব গম্ভীর ভাবে আদ্যোপান্ত শুনে গেলুম। সমঝদার লোক যদি আর একটি কেউ উপস্থিত থাকত তা হলে বোধ হয় আমি ছুটে অন্য ঘরে গিয়ে হেসে আসতুম, কিন্তু জমিদারিটা আসলেই হাস্যরসপ্রিয়তা প্রকাশের জায়গাই নয়— এখানে কেবল গাম্ভীর্য এবং বিজ্ঞতা।

কলকাতা। ২২ জানুয়ারি ১৮৯১

১৩

কালীগ্রাম
। জানুয়ারি ১৮৯১।

…ঐ-যে মস্ত পৃথিবীটা চুপ করে পড়ে রয়েছে ওটাকে এমন ভালোবাসি— ওর এই গাছপালা নদী মাঠ কোলাহল নিস্তব্ধতা প্রভাত সন্ধ্যা সমস্তটা -সুদ্ধ দু হাতে আঁকড়ে ধরতে ইচ্ছে করে। মনে হয় পৃথিবীর কাছ থেকে আমরা যে-সব পৃথিবীর ধন পেয়েছি এমন কি কোনো স্বর্গ থেকে পেতুম? স্বর্গ আর কী দিত জানি নে, কিন্তু এমন কোমলতা দুর্বলতা -ময়, এমন সকরুণ আশঙ্কা -ভরা, অপরিণত এই মানুষগুলির মতো এমন আদরের ধন কোথা থেকে দিত! আমাদের এই মাটির মা, আমাদের এই আপনাদের পৃথিবী, এর সোনার শস্যক্ষেত্রে এর স্নেহশালিনী নদীগুলির ধারে, এর সুখদুঃখময় ভালোবাসার লোকালয়ের মধ্যে এই-সমস্ত দরিদ্র মর্ত্য হৃদয়ের অশ্রুর ধনগুলিকে কোলে করে এনে দিয়েছে। আমরা হতভাগ্যরা

তাদের রাখতে পারি নে, বাঁচাতে পারি নে, নানা অদৃশ্য প্রবল শক্তি এসে বুকের কাছ থেকে তাদের ছিঁড়ে ছিঁড়ে নিয়ে যায়, কিন্তু বেচারা পৃথিবীর যতদূর সাধ্য তা সে করেছে। আমি এই পৃথিবীকে ভারী ভালোবাসি। এর মুখে ভারী একটি সুদূরব্যাপী বিষাদ লেগে আছে— যেন এর মনে মনে আছে, আমি দেবতার মেয়ে, কিন্তু দেবতার ক্ষমতা আমার নেই। আমি ভালোবাসি, কিন্তু রক্ষা করতে পারি নে। আরম্ভ করি, সম্পূর্ণ করতে পারি নে। জন্ম দিই, মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে পারি নে। এই জন্যে স্বর্গের উপর আড়ি করে আমি আমার দরিদ্র মায়ের ঘর আরো বেশি ভালোবাসি— এত অসহায়, অসমর্থ, অসম্পূর্ণ, ভালোবাসার সহস্র আশঙ্কায় সর্বদা চিন্তাকাতর বলেই।...

কলকাতা
২৪ জানুয়ারি ১৮৯১

১৪

সাজাদপুরের অনতিদূরে
১২ মাঘ। শনিবার

এখনো পথে আছি। ভোর থেকে আরম্ভ করে সন্ধে সাত-আটটা পর্যন্ত ক্রমাগতই ভেসে চলেছি। কেবলমাত্র গতির কেমন একটা আকর্ষণ আছে— দু ধারের তটভূমি অবিশ্রাম চোখের উপর দিয়ে সরে সরে যাচ্ছে, সমস্ত দিন তাই চেয়ে আছি, কিছুতে তার থেকে চোখ ফেরাতে পারছি নে— পড়তে মন যায় না, লিখতে মন যায় না, কোনো-কিছু কাজ নেই, কেবল চুপ করে চেয়ে বসে আছি। কেবল যে দৃশ্যের বৈচিত্র্যের জন্যে তা নয়— হয়তো দু ধারে কিছুই নেই, কেবল তরুহীন তটের রেখামাত্র চলে গেছে— কিন্তু ক্রমাগতই চলছে এই হচ্ছে তার প্রধান আকর্ষণ। আমার নিজের কোনো চেষ্টা নেই, পরিশ্রম নেই, অথচ বাইরের একটা অশ্রান্ত গতি মনটাকে বেশ মৃদু প্রশান্ত ভাবে ব্যাপৃত করে রাখে। মনের পরিশ্রমও নেই, বিশ্রামও নেই, এই রকমের একটা ভাব। চৌকিতে বসে বসে অলস অন্যমনস্ক ভাবে পা-দোলানো যে রকম এও সেই রকম; শরীরটা মোটের উপর বিশ্রাম করছে, অথচ শরীরের যে অতিরিক্ত উদ্যমটুকু কোনো কালে স্থির থাকতে চায় না তাকেও একটা একঘেয়ে রকম কাজ দিয়ে ভুলিয়ে রাখা হয়েছে।...আমাদের কালীগ্রামের সেই মুমূর্ষুর নাড়ীর মতো অতিক্ষীণস্রোত নদী কাল কোন্ কালে ছাড়িয়ে এসেছি। আমি মনে করতুম সে নদীর একেবারে স্রোত নেই, কিন্তু সেখানকার বিশ্বস্তসূত্রে শুনেছি, অত্যন্ত মৃদু একটুখানি স্রোত আছে— আজন্মকাল যারা তীরে বাস করে আসছে কেবল তারাই জানতে পারে। সেই নদী থেকে ক্রমে একটা স্রোতস্বিনী নদীতে এসে পড়া গেল। সেটা বেয়ে ক্রমে এমন এক জায়গায় এসে পড়লুম যেখানে ডাঙায় জলে একাকার হয়ে গেছে। নদী এবং তীর উভয়ের আকার প্রকারের ভেদ ক্রমশই ঘুচে গেছে, দুটি অল্প বয়সের ভাই বোনের মতো। তীর এবং জল মাথায় মাথায় সমান— একটুও পাড় নেই। ক্রমে নদীর সেই ছিপ্‌ছিপে আকারটুকু আর থাকে না— নানা দিকে নানা রকমে ভাগ হয়ে ক্রমে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল। এই খানিকটা সবুজ ঘাস এই খানিকটা স্বচ্ছ জল, চতুর্দিকে যত দূর চেয়ে দেখি খানিকটা জল

খানিকটা ডাঙা। দেখে পৃথিবীর শিশুকাল মনে পড়ে—অসীম জলরাশির মধ্যে যখন স্থল সবে একটুখানি মাথা তুলেছে—জলস্থলের অধিকার নির্দিষ্ট হয়ে যায় নি। চার দিকে জেলেদের বাঁশ পোঁতা—জেলেদের জাল থেকে মাছ ছোঁ মেরে নেবার জন্যে চিল উড়ছে, পাঁকের উপরে নিরীহ বক দাঁড়িয়ে আছে—নানা রকমের জলচর পাখি—জলে শেওলা ভাসছে এবং তার এক রকম গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে—মাঝে মাঝে পাঁকের ক্ষেতের মধ্যে অযত্নসম্ভূত ধানের গাছ, স্থির জলের উপর ঝাঁকে ঝাঁকে মশা উড়ছে।...ভোরের বেলা বোট ছেড়ে দিয়ে কাঁচিকাঠায় গিয়ে পড়া গেল। কাঁচিকাঠা ব্যাপারটা হচ্ছে একটি বারো-তেরো হাত সংকীর্ণ খালের মতো, ক্রমাগত এঁকে বেঁকে গেছে—সমস্ত বিলের জল তারই ভিতর দিয়ে প্রবল বেগে নিষ্ক্রান্ত হচ্ছে—এর মধ্যে আমাদের এই প্রকাণ্ড বোট নিয়ে বিষম বিপদ—জলের স্রোত বিদ্যুতের মতো বোটটাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, দাঁড়িরা লগি হাতে করে সামলাবার চেষ্টা করছে, পাছে ডাঙার উপর বোটটাকে আছড়ে ভেঙে ফেলে। এ দিকে হুহু করে বাদলার বাতাস দিচ্ছে—ঘন মেঘ করে রয়েছে, মাঝে মাঝে বৃষ্টি হচ্ছে, শীতে সবাই কাঁপছে—এক-একবার প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও বোটটা ডাঙায় ঠেকে মড়্‌মড়্‌ শব্দে একেবারে কাত হবার উপক্রম করছে—এমনিতর 'গেল গেল' শব্দ করতে করতে খোলা নদীতে এসে পড়লুম। শীতকালে মেঘাচ্ছন্ন ভিজে দিন ভারী বিশ্রী লাগে। সকালবেলাটা তাই নিতান্ত নির্জীবের মতো ছিলুম। বেলা দুটোর সময় রোদ উঠল। তার পর থেকে চমৎকার। খুব উঁচু পাড়—বরাবর দুই ধারে গাছপালা লোকালয়—এমন শান্তিময়, এমন সুন্দর, এমন নিভৃত—দুই ধারে স্নেহ সৌন্দর্য বিতরণ করে নদীটি বেঁকে বেঁকে চলে গেছে—আমাদের বাংলাদেশের একটি অপরিচিত অন্তঃপুরচারিণী নদী। কেবল স্নেহ এবং কোমলতা এবং মাধুর্যে পরিপূর্ণ। চাঞ্চল্য নেই, অথচ অবসরও নেই। গ্রামের যে মেয়েরা ঘাটে জল নিতে আসে, এবং জলের ধারে বসে বসে অতি যত্নে গামছা দিয়ে আপনার শরীরখানি মেজে তুলতে চায়—তাদের সঙ্গে এর যেন প্রতিদিন মনের কথা এবং ঘরকন্নার গল্প চলে।...

আজ সন্ধেবেলায় নদীর বাঁকের মুখে ভারী একটি নিরালা জায়গায় বোট লাগিয়েছে। পূর্ণিমার চাঁদ উঠেছে, জলে একটিও নৌকো নেই—জ্যোৎস্না জলের উপর ঝিক্‌ ঝিক্‌ করছে—পরিষ্কার রাত্রি—নির্জন তীর—বহুদূরে ঘনবৃক্ষবেষ্টিত গ্রামটি সুষুপ্ত—কেবল ঝিঁঝি ডাকছে—আর কোনো শব্দ নেই।

কলকাতা
১৮৯১

১৫

সাজাদপুর
রবিবার, ২০ মাঘ। ১২৯৭।

সকালে উঠে অনেক ক্ষণ ধরে বসে বসে বিস্তর গড়িমসি করতে করতে সেই ডায়ারিটা লিখছিলুম—ঘণ্টা দুয়েক হল দেড়পাতা-খানেক লিখেছিলুম—এমতকালে বেলা দশটার সময় হঠাৎ রাজকার্য উপস্থিত হল—প্রধানমন্ত্রী এসে মৃদুস্বরে বললেন,

একবার রাজসভায় আসতে হচ্ছে। কী করা যায়— লক্ষ্মীর তলব শুনে সরস্বতীকে ছেড়ে তাড়াতাড়ি উঠতে হল। সেখানে ঘণ্টাখানেক দুরূহ রাজকার্য সম্পন্ন করে এইমাত্র আসছি। আমার মনে মনে হাসি পায়— আমার নিজের অপার গাম্ভীর্য এবং অতলস্পর্শ বুদ্ধিমানের চেহারা কল্পনা করে সমস্তটা একটা প্রহসন বলে মনে হয়। প্রজারা যখন সসম্ভ্রম কাতরভাবে দরবার করে, এবং আমলারা বিনীত করযোড়ে দাঁড়িয়ে থাকে, তখন আমার মনে হয় এদের চেয়ে এমনি আমি কী মস্ত লোক যে আমি একটু ইঙ্গিত করলেই এদের জীবনরক্ষা এবং আমি একটু বিমুখ হলেই এদের সর্বনাশ হয়ে যেতে পারে। আমি যে এই চৌকিটার উপরে বসে বসে ভান করছি যেন এই-সমস্ত মানুষের থেকে আমি একটা স্বতন্ত্র সৃষ্টি, আমি এদের হর্তাকর্তাবিধাতা, এর চেয়ে অদ্ভুত আর কী হতে পারে! অন্তরের মধ্যে আমিও যে এদেরই মতো দরিদ্র সুখদুঃখকাতর মানুষ, পৃথিবীতে আমারও কত ছোটো ছোটো বিষয়ে দরবার, কত সামান্য কারণে মর্মান্তিক কান্না, কত লোকের প্রসন্নতার উপরে জীবনের নির্ভর! এই-সমস্ত ছেলে-পিলে গোরু-লাঙল-ঘরকন্না-ওয়ালা সরল-হৃদয় চাষাভুষোরা আমাকে কী ভুলই জানে! আমাকে এদের সমজাতি মানুষ বলেই জানে না। সেই ভুলটি রক্ষে করবার জন্যে কত সরঞ্জাম রাখতে এবং কত আড়ম্বর করতে হয়। বোট থেকে কাছারি পর্যন্ত আমি হেঁটে আসবার প্রস্তাব করেছিলুম, নায়েব বিজ্ঞভাবে বললেন— কাজ নেই! কী জানি যদি ঐ ভুলে আঘাত লাগে! prestige মানে হচ্ছে মানুষ সম্বন্ধে মানুষের ভুল বিশ্বাস! আমাকে এখানকার প্রজারা যদি ঠিক জানত, তা হলে আপনাদের একজন বলে চিনতে পারত, সেই ভয়ে সর্বদা মুখোশ পরে থাকতে হয়। সাধারণ ইতর মানুষের মতো পদযুগল চালনা করে এই ইতর পৃথিবীর উপর দিয়ে চলি নে, বন্দুক ঘাড়ে বরকন্দাজ হুহুংকারে সম্মুখ থেকে সকলকে হাঁকিয়ে দিয়ে চলেছে— যেন আমার চেয়ে অগ্রবর্তী হওয়া লোকের পক্ষে একটা বেআদাব। কিন্তু ছদ্মবেশ করলেও মন থেকে বিশ্বাস দূর হয় না যে, আমাকে আমারই মতো দেখাচ্ছে— এবং আমি যেমন অভিনয় করছি ওরা তেমনি অভিনয়মাত্র করছে। ওরা বলছে, ‘আঃ কাজ কী গোলমালে! নাহয় রাজাই সাজালে!’ কেবল আমিই আমার আপনাকে বলছি, ‘আছে তোমার বিদ্যেসাধ্যি জানা!’—

কলকাতা
৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৯১

১৬

সাজাদপুর
। ফেব্রুয়ারি ১৮৯১।

আমার সামনে নানা রকম গ্রাম্য দৃশ্য দেখতে পাই, সেগুলো আমার দেখতে বেশ লাগে। ঠিক আমার জানলার সম্মুখে, খালের ও পারে, একদল বেদে বাখারির উপর খানকতক দর্মা এবং কাপড় টাঙিয়ে দিয়ে তারই মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। গুটিতিনেক খুব ছোট্ট ছোট্ট ছাউনি মাত্র— তার মধ্যে মানুষের দাঁড়াবার জো নেই।

ঘরের বাইরেই তাদের সমস্ত গৃহকর্ম চলে— কেবল রাত্তিরে সকলে মিলে কোনো-প্রকারে জড়পুঁটুলি হয়ে সেই ঘরের মধ্যে ঘুমোতে যায়। বেদে জাতটাই এই রকম। কতকটা gipsyদের মতো। কোথাও বাড়ি ঘর নেই, কোনো জমিদারকে খাজনা দেয় না। একদল শুয়োর, গোটা দুয়েক কুকুর এবং কতকগুলো ছেলেমেয়ে নিয়ে যেখানে-সেখানে ঘুরে বেড়ায়। পুলিস সর্বদা এদের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখে। আমাদের এখানে যারা আছে, আমি জানলায় দাঁড়িয়ে প্রায় তাদের কাজ-কর্ম দেখি। এদের দেখতে মন্দ নয়, হিন্দুস্থানি ধরনের। কালো বটে, কিন্তু বেশ শ্রী আছে; বেশ জোরালো সুডোল শরীর। মেয়েদেরও বেশ দেখতে। বেশ ছিপ্‌ছিপে লম্বা— আঁটসাঁট, অনেকটা ইংরেজ মেয়েদের মতো শরীরের স্বাধীন ভঙ্গী। অর্থাৎ, বেশ অসংকোচ চাল-চলন, নড়াচড়ার মধ্যে সহজ সরল দ্রুত তাল আছে— আমার তো ঠিক মনে হয় কালো ইংরেজের মেয়ে। পুরুষটা রান্না চড়িয়ে দিয়ে বসে বসে বাঁশ চিরে চিরে ধামা চাঙারি কুলো প্রভৃতি তৈরি করছে— মেয়েটা কোলের উপর একটি ছোট্ট আয়না নিয়ে অত্যন্ত সাবধানে যত্নে সিঁথেটি কেটে চুল আঁচড়াচ্ছে। কেশবিন্যাস সমাধা হলে পরে একটি গামছা ভিজিয়ে মুখটি বিশেষ যত্নের সঙ্গে দু-তিনবার করে মোছা হল, তার পরে আঁচল-টাঁচলগুলো একটু ইতস্তত টেনেটুনে সেরেসুরে নিয়ে বেশ ফিট্‌ফাট হয়ে পুরুষটার কাছে গিয়ে উবু হয়ে বসল; তার পরে একটু-আধটু কাজে হাত দিতে লাগল। দেখে আমার বেশ মজা মনে হয়। এই এরা, যারা নিতান্তই মাটির সন্তান, যারা নিতান্তই পৃথিবীর গায়ের সঙ্গে লেগে আছে, এদের মধ্যেও সৌন্দর্যের আকর্ষণ এবং পরস্পরের মনোরঞ্জনের চেষ্টা আছে। যেখানে-সেখানে জন্মাচ্ছে, পথে পথেই বেড়ে উঠছে, এবং যেখানে-সেখানে মরছে— এদের ঠিক অবস্থাটা, ঠিক মনের ভাবটা ভারী জানতে ইচ্ছে করে। দিনরাত খোলা আকাশে, খোলা বাতাসে, অনাবৃত মৃত্তিকার উপরে এ এক-রকম নতুন রকমের জীবন; অথচ এরই মধ্যে কাজকর্ম ভালোবাসা ছেলেপিলে ঘরকর্না সমস্তই আছে। কেউ যে এক দণ্ড কুঁড়ে হয়ে বসে আছে তা দেখলুম না— একটা-না-একটা কাজে আছেই। যখন হাতের কাজ ফুরলো তখন থপ্‌ করে একজন মেয়ে আর একজন মেয়ের পিঠের কাছে বসে তার ঝুঁটি খুলে দিয়ে মনোযোগের সঙ্গে উকুন বাছতে আরম্ভ করে দিলে এবং বোধ করি সেই সঙ্গে ঐ ছোটো তিনটে দর্মা-ছাউনির ঘরকন্না সম্বন্ধে বক্‌ বক্‌ করে গল্প জুড়ে দিলে, সেটা আমি এত দূর থেকে ঠিক নিশ্চিত বলতে পারি নে, তবে অনেকটা অনুমান করা যেতে পারে। আজ সকালবেলায় এই নিশ্চিন্ত বেদের পরিবারের মধ্যে একটা বিষম অশান্তি এসে জুটেছিল। তখন বেলা সাড়ে-আটটা নটা হবে— রাত্রে শোবার কাঁথা এবং ছেঁড়া নেকড়াগুলো বের করে এনে দর্মার চালের উপর রোদ্দুরে মেলে দিয়েছে। শুয়োরগুলো বাচ্ছাকাচ্ছা-সমেত সকলে গায়ে গায়ে লাগাও হয়ে একটা গর্তর মতো করে তার মধ্যে মস্ত এক তাল কাদার মতো পড়ে ছিল— সমস্ত রাত শীতের পর সকাল বেলাকার রোদ্দুরে বেশ একটু আরাম বোধ করছিল— তাদেরই এক পরিবারভুক্ত কুকুর দুটো এসে ঘাড়ের উপর পড়ে ঘেউ ঘেউ করে তাদের উঠিয়ে দিলে। বিরক্তির স্বর প্রকাশ করে তারা প্রাতঃকালের ছোটো-হাজরি -অন্বেষণে চতুর্দিকে চলে গেল। আমি আমার ডায়ারি লিখছি এবং মাঝে মাঝে সম্মুখের পথের দিকে অন্যমনস্ক হয়ে চেয়ে দেখছি— এমন সময় বিষম একটা হাঁক-ডাক শোনা গেল। আমি উঠে জানলার কাছে গিয়ে দেখলুম— বেদে-আশ্রমের সম্মুখে লোক জড়ো হয়েছে এবং ওরই মধ্যে একটু

ভদ্রগোছের একজন লাঠি আস্ফালন করে বিষম গালমন্দ দিচ্ছে—কর্তা বেদে দাঁড়িয়ে নিতান্ত ভীত কম্পিত ভাবে কৈফিয়ত দেবার চেষ্টা করছে। বুঝতে পারলুম কী-একটা সন্দেহের কারণ হয়েছে, তাই পুলিসের দারোগা এসে উপদ্রব বাধিয়ে দিয়েছে। মেয়েটা বসে বসে আপন-মনে বাখারি ছুলে যাচ্ছে, যেন সে একলা বসে আছে—এবং কোথাও কিছু গোলমাল নেই। হঠাৎ সে উঠে দাঁড়িয়ে পরমনির্ভীক চিত্তে দারোগার মুখের সামনে বারবার বাহু আন্দোলন করে উচ্চৈঃস্বরে বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করলে। দেখতে দেখতে দারোগার তেজ প্রায় বারো আনা পরিমাণ কমে গেল—অত্যন্ত মৃদুভাবে দুটো একটা কথা বলবার চেষ্টা করলে, কিন্তু একটুও অবসর পেলে না। যে ভাবে এসেছিল সে ভাব অনেকটা পরিবর্তন করে ধীরে ধীরে চলে যেতে হল—অনেকটা দূরে গিয়ে চেঁচিয়ে বললে, 'আমি এই বলে গেলাম, তোমাদের এখান হৎকে যাবার লাগবে।' আমি ভাবলুম আমার বেদে-প্রতিবেশীরা এখনি বুঝি খুঁটি দর্মা তুলে পুঁটুলি বেঁধে ছানাপোনা নিয়ে শুয়োর তাড়িয়ে এখান থেকে প্রস্থান করবে। কিন্তু তার কোনো লক্ষণ নেই—এখনো তারা নিশ্চিন্ত ভাবে বসে বসে বাখারি চিরছে, রাঁধছে-বাড়ছে, উকুন বাচছে।

আমার দরবারেও দেখেছি যখন কোনো মেয়ের নালিশ থাকে, সে ঘোমটায় আচ্ছন্ন হয়ে আসে বটে, কিন্তু তারই ভিতর থেকে কাঁশির মতো যে গলাটি বের করে তার মধ্যে ভয় সংকোচ কিম্বা কাকুতি-মিনতির ভাব লেশমাত্র নেই। একেবারে পুরো আবদার এবং পরিষ্কার তর্ক। পষ্ট করে বলে, 'নায়েবমশায় আমার সুক্ষ্ম বেচার করে না!' তাকে উচিত-অনুচিত ন্যায়-অন্যায় কিছুই বুঝিয়ে উঠতে পারা যায় না; সে কেবলই বলে, 'আমি ব্যাধবা, আমার নাবালক ছাওয়াল।' তার আর কোনো উত্তর নেই। তার সঙ্গে তর্ক করব কি আমার হাসি পায়। সে আবার আধখানা মুখ ফিরিয়ে ঘোমটার মধ্যে থেকে আড়চোখে আড়চোখে আমার মুখের ভাব দেখে। দরবারের মধ্যে যেদিন একটা মেয়ে আসে সেদিন আসর সরগরম হয়ে ওঠে, পেয়াদার হাঁক-ডাক কমে যায়, অন্যান্য পুরুষ প্রার্থীদের নিজ নিজ নিবেদন জানাবার অবসর থাকে না।

যা হোক, আমার এই খোলা জানলার মধ্যে দিয়ে নানা দৃশ্য দেখতে পাই। সবসুদ্ধ বেশ লাগে। কিন্তু এক-একটা দেখে ভারী মন বিগড়ে যায়। গাড়ির উপর অসম্ভব ভার চাপিয়ে যখন গোরুকে কাঠির বাড়ি খোঁচা দিতে থাকে তখন আমার নিতান্ত অসহ্য বোধ হয়। আজ সকালে দেখছিলুম একজন মেয়ে তার একটি ছোটো উলঙ্গ শীর্ণ কালো ছেলেকে এই খালের জলে নাওয়াতে এনেছে। আজ ভয়ংকর শীত পড়েছে—জলে দাঁড় করিয়ে যখন ছেলেটার গায়ে জল দিচ্ছে তখন সে করুণ স্বরে কাঁদছে আর কাঁপছে, ভয়ানক কাশিতে তার গলা খন্ খন্ করছে। মেয়েটা হঠাৎ তার গালে এমন একটা চড় মারলে যে আমি আমার ঘর থেকে তার শব্দ স্পষ্ট শুনতে পেলুম।...ছেলেটা বেঁকে পড়ে হাঁটুর উপর হাত দিয়ে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল, কাশিতে তার কান্না বেধে যাচ্ছিল। তার পরে ভিজে গায়ে সেই উলঙ্গ কম্পান্বিত ছেলের নড়া ধরে টেনে বাড়ির দিকে টেনে নিয়ে গেল। এই ঘটনাটা এমন নিদারুণ পৈশাচিক বলে বোধ হল! ছেলেটা নিতান্ত ছোটো, আমার খোকার বয়সী। এ রকম একটা দৃশ্য দেখলে হঠাৎ মানুষের যেন একটা idealএর উপর আঘাত লাগে, বিশ্বস্ত চিত্তে চলতে চলতে খুব একটা হুঁচোট লাগার মতো। ছোটো ছেলেরা কী ভয়ানক অসহায়! তাদের প্রতি অবিচার করলে তারা নিরুপায় কাতরতার সঙ্গে কেঁদে নিষ্ঠুর হৃদয়কে আরও বিরক্ত করে তোলে, ভালো করে

আপনার নালিশ জানাতেও পারে না। মেয়েটা শীতে সর্বাঙ্গ আচ্ছন্ন করে এসেছে আর ছেলেটার গায়ে এক টুকরো কাপড়ও নেই—তার উপরে কাশি, তার উপরে এই ডাকিনীর হাতের মার!

কলকাতা
৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৯১

১৭

সাদাজপুর

এখানকার পোস্ট্‌মাস্টার এক-একদিন সন্ধের সময় এসে আমার সঙ্গে এই রকম ডাকের চিঠি-যাতায়াত সম্বন্ধে নানা গল্প জুড়ে দেয়। আমাদের এই কুঠিবাড়ির এক তলাতেই পোস্ট্‌ আপিস—বেশ সুবিধে, চিঠি আসবামাত্রই পাওয়া যায়। পোস্ট্‌মাস্টারের গল্প শুনতে আমার বেশ লাগে। বিস্তর অসম্ভব কথা বেশ গম্ভীর ভাবে বলে যায়। কাল বলছিল, এ দেশের লোকের গঙ্গার উপর এমনি ভক্তি যে, এদের কোনো আত্মীয় মরে গেলে তার হাড় গুঁড়ো করে রেখে দেয়, কোনো কালে গঙ্গার জল খেয়েছে এমন লোকের যদি সাক্ষাৎ পায় তা হলে তাকে পানের সঙ্গে সেই হাড় গুঁড়ো খাইয়ে দেয় আর মনে করে তার আত্মীয়ের একটা অংশের গঙ্গা লাভ হল। আমি হাসতে হাসতে বললুম, ‘এটা বোধ হয় গল্প?’ সে খুব গম্ভীর ভাবে চিন্তা করে স্বীকার করলে, ‘হুজুর, তা হতে পারে।’

কলকাতা
১০ ফেব্রুয়ারি ১৮৯১

১৮

শিলাইদহ
।ফেব্রুয়ারি ১৮৯১।

মৌলবী এবং আমলাগুলো গিয়ে, কাছারির পরপারের নির্জন চরে বোট লাগিয়ে বেশ আরাম বোধ হচ্ছে। দিনটা এবং চারিদিকটা এমনি সুন্দর ঠেকছে তোকে সে আর কী বলব। অনেক দিন পরে আবার এই বড়ো পৃথিবীটার সঙ্গে যেন দেখা-সাক্ষাৎ হল। সেও বললে, ‘এই-যে!’ আমিও বললুম, ‘এই-যে!’ তার পরে দুজনে পাশাপাশি বসে আছি—আর কোনো কথাবার্তা নেই, জল ছল্‌ ছল্‌ করছে এবং তার উপরে রোদ্দুর চিক্‌চিক্‌ করছে, বালির চর ধু ধু করছে, তার উপরে ছোটো ছোটো বনঝাউ উঠেছে। জলের শব্দ, দুপুর বেলাকার নিস্তব্ধতার ঝাঁ-ঝাঁ, এবং ঝাউঝোপ থেকে দুটো-একটা পাখির চিক্‌ চিক্‌ শব্দ, সবসুদ্ধ মিলে খুব একটা স্বপ্নময় ভাব।...খুব লিখে যেতে ইচ্ছে করছে—কিন্তু আর কিছু নয়, এই

জলের শব্দ, এই রোদ্দুরের দিন, এই বালির চর। মনে হচ্ছে তোকে রোজই ঘুরে ফিরে এই কথাই লিখতে হবে—কেননা, আমার যখন নেশার মতন হয় তখন আমি বারবার এক কথা নিয়েই বকি।...বড়ো বড়ো নদী কাটিয়ে আমাদের বোটটা একটা ছোটো নদীর মুখে প্রবেশ করেছে। দুই ধারে মেয়েরা স্নান করছে, কাপড় কাচছে, এবং ভিজে কাপড়ে এক-মাথা ঘোমটা দিয়ে জলের কলসী নিয়ে বাঁ হাত দুলিয়ে ঘরে চলেছে—ছেলেরা কাদা মেখে জল ছুঁড়ে মাতামাতি করছে, এবং একটা ছেলে বিনা সুরে গান গাচ্ছে 'একবার দাদা বলে ডাক্‌ রে লক্ষ্মণ!' উঁচু পাড়ের উপর দিয়ে অদূরবর্তী গ্রামের খড়ের চাল এবং বাঁশবনের ডগা দেখা যাচ্ছে। আজ মেঘ কেটে গিয়ে রোদ্দুর দেখা দিয়েছে। যে মেঘগুলো আকাশের প্রান্তভাগে অবশিষ্ট আছে সেগুলো সাদা তুলোর রাশের মতো দেখাচ্ছে। বাতাস ঈষৎ গরম হয়ে বচ্ছে। ছোটো নদীতে বড়ো বেশি নৌকো নেই—দুটো একটা ছোটো ডিঙি, শুকনো গাছের ডাল এবং কাঠকুটো বোঝাই নিয়ে শ্রান্তভাবে ছপ্‌ ছপ্‌ দাঁড় ফেলে চলেছে—ডাঙায় বাঁশের উপর জেলেদের জাল শুকোচ্ছে—পৃথিবীর সকালবেলাকার কাজকর্ম খানিক ক্ষণের জন্যে বন্ধ হয়ে আছে—

কলকাতা
১২ ফেব্রুয়ারি ১৮৯১

১৯

চুহালি। জলপথে
১৬ জুন ১৮৯১

এখন পাল তুলে দিয়ে যমুনার মধ্যে দিয়ে চলেছি। আমার বাঁ ধারে মাঠে গোরু চরছে, দক্ষিণ ধারে একেবারে কূল দেখা যাচ্ছে না। নদীর তীব্র স্রোতে তীর থেকে ক্রমাগতই ঝুপ্‌ ঝুপ্‌ করে মাটি খসে পড়ছে। আশ্চর্য এই, এত বড়ো প্রকাণ্ড এই নদীটার মধ্যে আমাদের বোট ছাড়া আর দ্বিতীয় একটি নৌকো দেখা যাচ্ছে না—চারি দিকে জলরাশি ক্রমাগতই ছল্‌ ছল্‌ খল্‌ খল্‌ শব্দ করছে, আর বাতাসের হুহু শব্দ শোনা যাচ্ছে।...কাল সন্ধের সময় একটা চরের উপর বোট লাগিয়েছিলুম—নদীটি ছোট্ট, যমুনার একটি শাখা, এক পারে বহু দূর পর্যন্ত সাদা বালি ধু ধু করছে, জনমানবের সম্পর্ক নেই—আর এক পারে সবুজ শস্যক্ষেত্র এবং বহু দূরে একটি গ্রাম। তোকে আর কতবার বলব—এই নদীর উপরে, মাঠের উপরে, গ্রামের উপরে সন্ধেটা কী চমৎকার, কী প্রকাণ্ড, কী প্রশান্ত, কী অগাধ সে কেবল স্তব্ধ হয়ে অনুভব করা যায়, কিন্তু ব্যক্ত করতে গেলেই চঞ্চল হয়ে উঠতে হয়। ক্রমে যখন অন্ধকারে সমস্ত অস্পষ্ট হয়ে এল, কেবল জলের রেখা এবং তটের রেখায় একটা প্রভেদ দেখা যাচ্ছিল, এবং গাছপালা কুটির সমস্ত একাকার হয়ে একটা ঝাপসা জগৎ চোখের সামনে বিস্তৃত পড়ে ছিল তখন ঠিক মনে হচ্ছিল এ-সমস্ত যেন ছেলেবেলাকার রূপকথার জগৎ—যখন এই বৈজ্ঞানিক জগৎ সম্পূর্ণ গঠিত হয়ে ওঠে নি, অল্পদিন হল সৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে, প্রদোষের অন্ধকারে এবং একটি ভীতি-বিস্ময়পূর্ণ ছম্‌-ছম্‌-নিস্তব্ধতায় সমস্ত বিশ্ব আচ্ছন্ন—যখন সাত সমুদ্র তেরো নদীর

পারে মায়াপুরে পরমাসুন্দরী রাজকন্যা চিরনিদ্রায় নিদ্রিত, যখন রাজপুত্র এবং পাত্তরের পুত্র তেপান্তরের মাঠে একটা অসম্ভব উদ্দেশ্য নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে—এ যেন তখনকার সেই অতি সুদূরবর্তী অর্ধ-অচেতনায় মোহাচ্ছন্ন মায়ামিশ্রিত বিস্মৃত জগতের একটি নিস্তব্ধ নদীতীর—এমন মনে করা যেতেও পারে আমি সেই রাজপুত্র একটা অসম্ভবের প্রত্যাশায় সন্ধ্যারাজ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছি—এই ছোটো নদীটি সেই তেরো নদীর মধ্যে একটা নদী, এখনো সাত সমুদ্র বাকি আছে—এখনো অনেক দূর, অনেক ঘটনা, অনেক অন্বেষণ বাকি—এখনো কত অজ্ঞাত নদীতীরে কত অপরিচিত সমুদ্রসীমায় কত ক্ষীণ চন্দ্রালোকিত অনাগত রাত্রি অপেক্ষা করে আছে—তার পরে হয়তো অনেক ভ্রমণ, অনেক রোদন, অনেক বেদনের পর হঠাৎ একদিন আমার কথাটি ফুরোলো, নটে শাকটি মুড়োলো—হঠাৎ মনে হবে এতক্ষণ একটা গল্প চলছিল, সেই রূপকথার সুখ দুঃখ নিয়ে কখনো হাসছিলুম কখনো কাঁদছিলুম, এখন গল্প ফুরিয়েছে, এখন অনেক রাত্রি, এখন ছোটো ছেলের ঘুমোবার সময়।

কলকাতা
১৮৯১

২০

চুহালি
১৯ জুন ১৮৯১

কাল পনেরো মিনিট বাইরে বসতে না বসতে পশ্চিমে ভয়ানক মেঘ করে এল—খুব কালো গাঢ় আলুথালু রকমের মেঘ, তারই মাঝে মাঝে চোরা আলো পড়ে রাঙা হয়ে উঠেছে—এক-একটা ঝড়ের ছবিতে যেমন দেখা যায় ঠিক সেই রকমের। দুটো একটা নৌকো তাড়াতাড়ি যমুনা থেকে এই ছোটো নদীর মধ্যে প্রবেশ করে দড়িদড়া নোঙর দিয়ে মাটি আঁকড়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বসল—যারা মাঠে শস্য কাটতে এসেছিল তারা মাথায় এক-এক বোঝা শস্য নিয়ে বাড়ির দিকে ছুটে চলেছে—গোরুও ছুটেছে, তার পিছনে পিছনে বাছুর লেজ নেড়ে নেড়ে সঙ্গে সঙ্গে দৌড়োবার চেষ্টা করছে। খানিক বাদে একটা আক্রোশের গর্জন শোনা গেল—কতকগুলো ছিন্নভিন্ন মেঘ ভগ্নদূতের মতো সুদূর পশ্চিম থেকে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এল—তার পরে বিদ্যুৎবজ্র ঝড়বৃষ্টি সমস্ত এক সঙ্গে এসে পড়ে খুব একটা তুর্কিনাচন নাচতে আরম্ভ করে দিলে। বাঁশগাছগুলো হাউ হাউ শব্দে একবার পূর্বে একবার পশ্চিমে লুটিয়ে লুটিয়ে পড়তে লাগল, ঝড় যেন সোঁ সোঁ করে সাপুড়েদের মতো বাঁশি বাজাতে লাগল। আর জলের ঢেউগুলো তিন লক্ষ সাপের মতো ফণা তুলে তালে তালে নৃত্য আরম্ভ করে দিলে। কালকের সে যে কাণ্ড সে আর কী বলব। বজ্রের যে শব্দ সে আর থামে না—আকাশের কোন্‌খানে যেন একটা আস্ত জগৎ ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে। বোটের খোলা জানলার উপর মুখ রেখে প্রকৃতির সেই রুদ্রতালে আমিও বসে বসে মনটাকে দোলা দিচ্ছিলুম। সমস্ত ভিতরটা যেন ছুটি-পাওয়া স্কুলের ছেলের মতো ঝাঁপিয়ে উঠেছিল। শেষকালে বৃষ্টির ছাঁটে যখন বেশ

একটু আর্দ্র হয়ে ওঠা গেল তখন জানলা এবং কবিত্ব বন্ধ করে খাঁচার পাখির মতো অন্ধকারে চুপচাপ বসে রইলুম।

কলকাতা

২৯

জলপথে। সাজাদপুর
২০ জুন ১৮৯১

কাল তোদের টেলিগ্রামের উত্তর পেয়ে আমাদের সমস্ত কাজ সেরে সন্ধের সময় নৌকো ছেড়ে দিলুম। আকাশে মেঘ ছিল না, চাঁদ উঠেছিল, অল্প অল্প হাওয়া দিচ্ছিল— ঝুপ্ ঝুপ্ দাঁড় ফেলে স্রোতের মুখে ছোটো নদীটির মধ্যে ভেসে যাওয়া যাচ্ছিল। চারি দিক পরীস্থান বলে মনে হচ্ছিল। সে সময়ে অন্যান্য সমস্ত নৌকো ডাঙায় কাছি বেঁধে পাল গুটিয়ে চন্দ্রালোকে স্তব্ধ হয়ে নিদ্রা দিচ্ছিল। অবশেষে ছোটো নদীটা যেখানে যমুনার মধ্যে গিয়ে পড়েছে তারই কাছে একটা খুব নিরাপদ স্থানে গিয়ে নৌকো বাঁধলে। কিন্তু নিরাপদ স্থানের অনেক দোষ— হাওয়া পাওয়া যায় না, ঝুপ্সির ভিতরে, অন্যান্য নৌকোর কাছে, জঙ্গলের গন্ধ ইত্যাদি। আমি মাঝিকে বললুম, 'এ পারে হাওয়া পাওয়া যাবে না, ও পারে চল্।' ও পারে উঁচু পাড় নেই— জলে স্থলে সমান, এমন-কি ধানের ক্ষেতের উপর এক-হাঁটু জল উঠেছে। রাজাজ্ঞায় মাঝি সেইখানেই নৌকো নিয়ে বাঁধলে। তখন আমাদের পিছন দিকের আকাশে একটু বিদ্যুৎ চিক্‌মিক্ করতে আরম্ভ করেছে। আমি বিছানায় ঢুকে জানলার কাছে মুখ রেখে ক্ষেতের দিকে চেয়ে আছি, এমন সময় রব উঠল— ঝড় আসছে। 'কাছি ফেল্' 'নোঙর ফেল্' 'এ কর্' 'সে কর্' করতে করতে এক প্রলয় ঝড় ছুটে এল। মাঝি থেকে থেকে বলতে লাগল, 'ভয় কোরো না ভাই, আল্লার নাম করো— আল্লা মালেক।' থেকে থেকে সকলে 'আল্লা' 'আল্লা' করতে লাগল। আমাদের বোটের দুই পাশের পর্দা বাতাসে আছাড় খেয়ে খেয়ে শব্দ করতে লাগল, আমাদের বোটটা যেন একটা শিকলি-বাঁধা পাখির মতো পাখা ঝাপটে ঝট্‌পট্ ঝট্‌পট্ করছিল— ঝড়টা থেকে থেকে চীঁহি চীঁহি শব্দ করে একটা বিপর্যয় চিলের মতো হঠাৎ এসে পড়ে বোটের ঝুঁটি ধরে ছোঁ মেরে ছিঁড়ে নিয়ে যেতে চায়, বোটটা অমনি সশব্দে ধড়্‌ফড়্ করে ওঠে। অনেক ক্ষণ বাদে বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে ঝড় থেমে গেল। আমি হাওয়া খেতে চেয়েছিলুম— হাওয়াটা কিছু বেশি খাইয়ে দিলে, একেবারে আশাতিরিক্ত। যেন কে ঠাট্টা করে বলে যাচ্ছিল, 'এইবার পেট ভরে হাওয়া খেয়ে নাও, তার পরে সাধ মিটলে কিঞ্চিৎ জল খাওয়াব— তাতে এমনি পেট ভরবে যে ভবিষ্যতে আর কিছু খেতে হবে না।' আমরা কিনা প্রকৃতির নাতি-সম্পর্ক, তাই তিনি মধ্যে মধ্যে এই রকম একটু-আধটু তামাশা করে থাকেন। আমি তো পূর্বেই বলেছি জীবনটা একটা গম্ভীর বিদ্রূপ, এর মজাটা বোঝা একটু শক্ত— কারণ, যাকে নিয়ে মজা করা হয়, মজার রসটা সে তেমন গ্রহণ করতে পারে না। এই মনে কর্, দুপুর রাত্রে খাটে শুয়ে আছি, হঠাৎ পৃথিবীটা ধরে এমনি নাড়া দিলে যে কে কোথায় পালাবে পথ পায় না। মতলবটা

খুব নতুন রকমের এবং মজার তার আর সন্দেহ নেই— খুব একটা বড়ো-গোছ পয়লা এপ্রেলের রহস্যের উপযোগী। বড়ো বড়ো সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকদের অর্ধেক রাত্রে ঊর্ধ্বশ্বাসে অসম্বৃত অবস্থায় বিছানার বাইরে দৌড় করানো কি কম মজা! এবং দুটো-একটা সদ্যোনিদ্রোত্থিত হতবুদ্ধি নিরীহ লোকের মাথার উপরে বাড়ির আস্ত ছাদটা ভেঙে আনা কি কম ঠাট্টা! হতভাগ্য লোকটা যেদিন ব্যাঙ্কে চেক লিখে রাজমিস্ত্রির বিল শোধ করছিল, রহস্যপ্রিয়া প্রকৃতি সেই দিন বসে বসে কত হেসেছিল!

কলকাতা
১৮৯১

২২

সাজাদপুর
২২ জুন ১৮৯১

আজকাল আমার এখানে এমন চমৎকার জ্যোৎস্নারাত্রি হয় সে আর কী বলব। অবিশ্যি, তোদের ওখানেও যে জ্যোৎস্নারাত্রি হয় না তা বলা আমার অভিপ্রায় নয়— স্বীকার করতেই হবে তোদের সেখানে সেই ময়দানের উপর, সেই গির্জের চূড়ার উপর, সম্মুখের নিস্তব্ধ গাছপালার উপর, ধীরে ধীরে জ্যোৎস্না আপনার নীরব অধিকার বিস্তার করে। কিন্তু তোদের জ্যোৎস্না ছাড়াও অন্য পাঁচটা বস্তু আছে— তোদের হার্মনি এবং ডিস্‌কর্ড্ আছে, টেনিস আছে, মার্বলের টেবিল আছে, ড্রয়িংরুমে গান-বাজনার আড্ডা আছে— কিন্তু আমার এই নিস্তব্ধ রাত্রি ছাড়া আর কিছুই নেই। একলা বসে বসে আমি যে এর ভিতরে কী অনন্ত শান্তি এবং সৌন্দর্য দেখতে পাই সে আর ব্যক্ত করতে পারি নে। এক দল আছে তারা ছট্‌ফট্ করে 'জগতের সকল কথা জানতে পারছি নে কেন', আর এক দল ছট্‌ফটিয়ে মরে 'মনের সকল ভাব প্রকাশ করতে পারছি নে কেন'— মাঝের থেকে জগতের কথা জগতেই থেকে যায় এবং অন্তরের কথা অন্তরেই থাকে।...মাথাটা জানলার উপর রেখে দিই— বাতাস প্রকৃতির স্নেহহস্তের মতো আস্তে আস্তে আমার চুলের মধ্যে আঙুল বুলিয়ে দেয়, জল ছল্ ছল্ শব্দ করে বয়ে যায়, জ্যোৎস্না ঝিক্ ঝিক্ করতে থাকে এবং অনেক সময় 'জলে নয়ন আপনি ভেসে যায়'। অনেক সময় মনের আন্তরিক অভিমান, একটু স্নেহের স্বর শুনলেই অমনি অশ্রুজলে ফেটে পড়ে। এই অপরিতৃপ্ত জীবনের জন্যে প্রকৃতির উপর আমাদের যে আজন্মকালের অভিমান আছে, যখনি প্রকৃতি স্নেহমধুর হয়ে ওঠে তখনি সেই অভিমান অশ্রুজল হয়ে নিঃশব্দে ঝরে পড়তে থাকে। তখন প্রকৃতি আরো বেশি করে আদর করে এবং তার বুকের মধ্যে অধিকতর আবেগের সহিত মুখ লুকোই, এক প্রকার 'বিরাগ-ভরা বিবেকের' বিষণ্ণ শান্তি লাভ করা যায়। এই তো আমার সন্ধে।

কলকাতা
১৮৯১

২৩

শাজাদপুর
২৩ জুন ১৮৯১

আজকাল দুপুর বেলাটা বেশ লাগে বব্। রৌদ্রে চারি দিক বেশ নিঃঝুম হয়ে থাকে— মনটা ভারী উড়ু-উড়ু করে, বই হাতে নিয়ে আর পড়তে ইচ্ছে করে না। তীরে যেখানে নৌকো বাঁধা আছে সেইখান থেকে এক রকম ঘাসের গন্ধ এবং থেকে থেকে পৃথিবীর একটা গরম ভাপ গায়ের উপরে এসে লাগতে থাকে— মনে হয় এই জীবন্ত উত্তপ্ত ধরণী আমার খুব নিকটে থেকে নিশ্বাস ফেলছে, বোধ করি আমারও নিশ্বাস তার গায়ে গিয়ে লাগছে। ছোটো ছোটো ধানের গাছগুলো বাতাসে ক্রমাগত কাঁপছে— পাতিহাঁস জলের মধ্যে নেবে ক্রমাগত মাথা ডুবোচ্ছে এবং চঞ্চু দিয়ে পিঠের পালক সাফ করছে। আর কোনো শব্দ নেই, কেবল জলের বেগে বোটটা যখন ধীরে ধীরে বেঁকতে থাকে তখন কাছিটা এবং বোটের সিঁড়িটা এক রকম সকরুণ মৃদু শব্দ করতে থাকে। অনতিদূরে একটা খেয়াঘাট আছে। বটগাছের তলায় নানাবিধ লোক জড়ো হয়ে নৌকোর জন্যে অপেক্ষা করছে, নৌকো আসবামাত্রই তাড়াতাড়ি উঠে পড়ছে— অনেক ক্ষণ ধরে এই নৌকো-পারাপার দেখতে বেশ লাগে। ও পারে হাট, তাই খেয়ানৌকোয় এত ভিড়। কেউ বা ঘাসের বোঝা, কেউ বা একটা চুপড়ি, কেউ বা একটা বস্তা কাঁধে করে হাটে যাচ্ছে এবং হাট থেকে ফিরে আসছে, ছোটো নদীটি এবং দুই পারের দুই ছোটো গ্রামের মধ্যে নিস্তব্ধ দুপুর বেলায় এই একটুখানি কাজকর্ম, মনুষ্যজীবনের এই একটুখানি স্রোত অতি ধীরে ধীরে চলছে। আমি বসে বসে ভাবছিলুম, আমাদের দেশের মাঠ ঘাট আকাশ রোদ্দুরের মধ্যে এমন একটা সুগভীর বিষাদের ভাব কেন লেগে আছে? তার কারণ এই মনে হল, আমাদের দেশে প্রকৃতিটা সব চেয়ে বেশি চোখে পড়ে— আকাশ মেঘমুক্ত, মাঠের সীমা নেই, রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করছে, এর মধ্যে মানুষকে অতি সামান্য মনে হয়— মানুষ আসছে এবং যাচ্ছে, এই খেয়া নৌকোর মতো পারাপার হচ্ছে, তাদের অল্প অল্প কলরব শোনা যাচ্ছে, এই সংসারের হাটে ছোটোখাটো সুখ দুঃখের চেষ্টায় একটুখানি আনাগোনা দেখা যায়— কিন্তু এই অনন্তপ্রসারিত প্রকাণ্ড উদাসীন প্রকৃতির মধ্যে সেই মৃদুগুঞ্জন, সেই একটু-আধটু গীতধ্বনি, সেই নিশিদিন কাজকর্ম কী সামান্য, কী ক্ষণস্থায়ী, কী নিষ্ফল কাতরতা-পূর্ণ মনে হয়। এই নিশ্চেষ্ট, নিস্তব্ধ, নিশ্চিন্ত, নিরুদ্দেশ প্রকৃতির মধ্যে এমন একটি বৃহৎসৌন্দর্যপূর্ণ নির্বিকার উদার শান্তি দেখতে পাওয়া যায় এবং তারই তুলনায় আপনার মধ্যে এমন একটা সততসচেষ্ট পীড়িত জর্জরিত ক্ষুদ্র নিত্যনৈমিত্তিক অশান্তি দেখতে পাওয়া যায় যে, ঐ অতিদূর নদীতীরের ছায়াময় নীল বনরেখার দিকে চেয়ে নিতান্ত উন্মনা হয়ে যেতে হয়। ‘ছায়াতে বসিয়া সারা দিনমান তরুমর্মর পবনে’ ইত্যাদি। যেখানে মেঘে কুয়াশায় বরফে অন্ধকারে প্রকৃতি আচ্ছন্ন, সংকুচিত, সেখানে মানুষের খুব কর্তৃত্ব— মানুষ সেখানে আপনার সকল ইচ্ছা সকল চেষ্টাকে চিরস্থায়ী মনে করে; আপনার সকল কাজকে চিহ্নিত করে রেখে দেয়— পস্টারিটির দিকে তাকায়, কীর্তিস্তম্ভ তৈরি করে; জীবনচরিত লেখে, এবং মৃতদেহের উপরেও পাষাণের চিরস্মরণগৃহ নির্মাণ করে— তার

পরে অনেক চিহ্ন ভেঙে যায় এবং অনেক নাম বিস্মৃত হয়, কিন্তু সময়াভাবে সেটা কারও খেয়ালে আসে না।—

কলকাতা
১৮৯১

২৪

সাজাদপুর
। জুন ১৮৯১।

বিকেল বেলায় আমি এখানকার গ্রামের ঘাটের উপরে বোট লাগাই। অনেকগুলো ছেলেয় মিলে খেলা করে, বসে বসে দেখি। কিন্তু আমার সঙ্গে সঙ্গে নিশিদিন যে পদাতিক সৈন্য লেগে থাকে তাদের জ্বালায় আর আমার মনে সুখ নেই। ছেলেদের খেলা তারা বেয়াদবি মনে করে; মাঝিরা যদি আপনাদের মধ্যে মন খুলে হাসি গল্প করে সেটা তারা রাজার প্রতি অসম্মান জ্ঞান করে; চাষারা যদি ঘাটে গোরুকে জল খাওয়াতে নিয়ে আসে তারা তৎক্ষণাৎ লাঠি হাতে করে রাজমর্যাদা রক্ষা করতে ধাবিত হয়। অর্থাৎ, রাজার চর্তুর্দিকটা হাসিহীন খেলাহীন শব্দহীন জনহীন ভীষণ মরুভূমি করতে পারলে তাদের মনের মতো রাজসম্ভ্রম রক্ষে হয়— ইদিকে হতভাগ্য রাজার প্রাণ ত্রাহি ত্রাহি করতে থাকে। কালও তারা ছেলেদের তাড়া করতে উদ্যত হয়েছিল, আমি আমার রাজমর্যাদা জলাঞ্জলি দিয়ে তাদের নিবারণ করলুম। ঘটনাটা হচ্ছে এই—

ডাঙার উপর একটা মস্ত নৌকোর মাস্তুল পড়ে ছিল— গোটাকতক বিবস্ত্র ক্ষুদে ছেলে মিলে অনেক বিবেচনার পর ঠাওরালে যে, যদি যথোচিত কলরব-সহকারে সেইটেকে ঠেলে ঠেলে গড়ানো যেতে পারে তা হলে খুব একটা নতুন এবং আমোদজনক খেলার সৃষ্টি হয়। যেমন মনে আসা অমনি কার্যারম্ভ। 'শাবাশ জোয়ান হেঁইয়ো! মারো ঠেলা হেঁইয়ো!' সব কটায় মিলে চীৎকার এবং ঠেলা। মাস্তুল যেমনি এক পাক ঘুরছে অমনি সকলের আনন্দের উচ্চহাস্য। কিন্তু এই ছেলেদের মধ্যে যে দুটি-একটি মেয়ে আছে, তাদের ভাব আর-এক রকম। সঙ্গী-অভাবে ছেলেদের সঙ্গে মিশতে বাধ্য হয়েছে, কিন্তু এইসকল শ্রমসাধ্য উৎকট খেলায় তাদের মনের যোগ নেই। একটি ছোটো মেয়ে বিনাবাক্যব্যয়ে গম্ভীর প্রশান্ত ভাবে সেই মাস্তুলটার উপর গিয়ে চেপে বসল। ছেলেদের এমন সাধের খেলা মাটি। দু-একজন ভাবলে এমন স্থলে হার মানাই ভালো। তফাতে গিয়ে ম্লানমুখে দাঁড়িয়ে সেই মেয়েটির অটল গাম্ভীর্য নিরীক্ষণ করতে লাগল। ওদের মধ্যে একজন এসে পরীক্ষাচ্ছলে মেয়েটাকে একটু একটু ঠেলতে লাগল। কিন্তু সে নীরবে নিশ্চিন্তমনে বিশ্রাম করতে লাগল। সর্বজ্যেষ্ঠ ছেলেটি এসে তাকে বিশ্রামের জন্যে অন্যস্থান নির্দেশ করে দিলে, সে তাতে সতেজে মাথা নেড়ে কোলের উপর দুটি হাত জড়ো করে নড়ে চড়ে আবার বেশ গুছিয়ে বসল। তখন সেই ছেলেটা শারীরিক যুক্তি প্রয়োগ করতে আরম্ভ করলে এবং অবিলম্বে কৃতকার্য হল। আবার অভ্রভেদী আনন্দধ্বনি উঠল, পুনর্বার মাস্তুল গড়াতে লাগলো—এমন-কি

খানিকক্ষণ বাদে মেয়েটাও তার নারীগৌরব এবং সুমহৎ নিশ্চেষ্ট স্বাতন্ত্র্য ত্যাগ করে কৃত্রিম উৎসাহের সঙ্গে ছেলেদের এই অর্থহীন চপলতায় যোগ দিলে। কিন্তু বেশ বোঝা যাচ্ছিল সে মনে মনে বলছিল, ছেলেরা খেলা করতে জানে না, কেবল যত রাজ্যের ছেলেমানুষি। হাতের কাছে যদি একটা খোঁপাওয়ালা হলদে রঙের মাটির বেনে পুতুল থাকত তা হলে কি সে আর এই অপরিণতবুদ্ধি নিতান্ত শিশুদের সঙ্গে মাস্তুল ঠেলার মতো এমন একটা বাজে খেলায় যোগ দিত! এমন সময় আর-এক রকমের খেলা তাদের মনে এল, সেটাও খুব মজার। দুজন ছেলেতে মিলে একটা ছেলের হাত পা ধরে ঝুলিয়ে তাকে দোলা দেবে। এর ভিতরে খুব একটা রহস্য আছে সন্দেহ নেই; কারণ, ছেলেরা বেজায় উৎফুল্ল হয়ে উঠল। কিন্তু মেয়েটার পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠল। সে অবজ্ঞাভরে ক্রীড়াক্ষেত্র ত্যাগ করে ঘরে চলে গেল। কিন্তু একটা দুর্ঘটনা ঘটল। যাকে দোলাচ্ছিল সে পড়ে গেল। সেই অভিমানে সে সঙ্গীদের ত্যাগ করে বহুদূরে গিয়ে হাতের উপর মাথা রেখে তৃণশয্যায় শুয়ে পড়ল। এই রকম ভাব জানালে—এই পাষাণহৃদয় জগৎ-সংসারের সঙ্গে সে আর কোনো সম্পর্ক রাখবে না, কেবল একলা চীৎ হয়ে শুয়ে আকাশের তারা গণনা করবে, মেঘের খেলা দেখে হাতে মাথা রেখে জীবন কাটিয়ে দেবে এবং 'যাবৎ জীবন রবে কারো সঙ্গে খেলিব না'। তার এই রকম অকালে পরম বৈরাগ্য দেখে বড়ো ছেলেটা তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে, কোলের উপর তার মাথাটা নিয়ে, সানুনয় স্বরে অনুতাপ প্রকাশ করে বলতে লাগল—'আয়-না ভাই, ওঠ্-না ভাই! লেগেছে ভাই!' অনতিকাল পরেই দুই কুকুরশাবকের মতো দুজনের হাত-কাড়াকাড়ি খেলা বেধে গেল এবং দু মিনিট না যেতে যেতে দেখি সেই ছেলে ফের দুলতে আরম্ভ করেছে! এমনি মানুষের প্রতিজ্ঞা! এমনি তার মনের বল! এমনি তার বুদ্ধির স্থিরতা! খেলা ছেড়ে একবার দূরে গিয়ে চীৎ হয়ে শোয়, আবার ধরা দিয়ে হেসে হেসে মোহদোলায় দুলতে থাকে! এ মানুষের মুক্তি কী করে হবে! এমন কজন ছেলে আছে যে খেলাঘর ছেড়ে মাথায় হাত দিয়ে কেবল চীৎ হয়ে পড়ে থাকে—সেই সব ভালো ছেলেদের জন্যে গোলোকধামে বাসা তৈরি হচ্ছে।

কলকাতা
২৬ জুন ১৮৯১

২৫

সাজাদপুর
।জুন ১৮৯১।

কাল রাত্তিরে ভারী একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছিলুম। সমস্ত কলকাতা শহরটা যেন মহা একটা ভীষণ অথচ আশ্চর্য ভাবের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে আছে—বাড়ি ঘর সমস্তই একটা অন্ধকার কালো কুয়াশার ভিতর থেকে দেখা যাচ্ছে—এবং তার ভিতর তুমুল কী একটা কান্ড চলছে। আমি একটা ভাড়াটে গাড়ি করে পার্ক্ স্ট্রীটের ভিতর দিয়ে যাচ্ছি—যেতে যেতে দেখলুম সেণ্ট্‌জেভিয়ার কলেজটা দেখতে দেখতে হু হু করে বেড়ে উঠছে—সেই অন্ধকার কুয়াশার মধ্যে অসম্ভব উঁচু হয়ে উঠছে। তার

পরে ক্রমে জানতে পারলুম এক দল অদ্ভুত লোক এসেছে, তারা টাকা পেলে কী এক কৌশলে এই রকম অপূর্ব ব্যাপার করতে পারে। জোড়াসাঁকোর বাড়ি এসে দেখি সেখানেও তারা এসেছে— বদ দেখতে, কতকটা মোঙ্গোলিয়ান ধাঁচের চেহারা— সরু গোঁফ, গোটা দশ বারো দাড়ি মুখের এ দিকে ও দিকে খোঁচা খোঁচা রকম বেরিয়েছে। তারা মানুষকেও বড়ো করে দিতে পারে। তাই আমাদের দেউড়িতে আমাদের বাড়ির সব মেয়েরা লম্বা হবার জন্যে উমেদার হয়েছেন— তারা এঁদের মাথায় কী একটা গুঁড়ো দিচ্ছে আর এঁরা হুশ করে লম্বা হয়ে উঠছেন। আমি কেবলই বলছি, কী আশ্চর্য, এ যেন ঠিক স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে। তার পরে, কে একজন প্রস্তাব করলে আমাদের বাড়িটা উঁচু করে দিতে। তারা রাজি হয়ে কতকটা ভাঙতে আরম্ভ করলে। খানিকটা ভেঙে চুরে বললে, এইবার এত টাকা চাই, নইলে বাড়িতে হাত দেব না। কুঞ্জ সরকার বললে, সে কি হয়, কাজ না হলে কী করে টাকা দেওয়া যায়! বলতেই তারা চটে উঠল— বাড়িটা সমস্তই এক রকম বেঁকে চুরে বিশ্রী হয়ে গেল এবং মাঝে মাঝে দেখা গেল, আধখানা মানুষ দেয়ালের মধ্যে গাঁথা রয়েছে, আধখানা বেরিয়ে। সমস্ত দেখে শুনে মনে হল এ সব শয়তানী কাণ্ড। বড়োদাদাকে বললুম, 'বড়দা, দেখছেন ব্যাপারটা! আসুন একবার উপাসনা করা যাক।' দালানে গিয়ে খুব একাগ্রমনে উপাসনা করা গেল। বেরিয়ে এসে মনে করলুম ঈশ্বরের নাম করে তাদের ভর্ৎসনা করব— কিন্তু বুক ফেটে যেতে লাগল, কিন্তু তবু গলা দিয়ে কথা বেরোল না। তার পর কখন জেগে উঠলুম ঠিক মনে পড়ছে না। ভারী অদ্ভুত স্বপ্ন, না? সমস্ত কলকাতা শহরে শয়তানের প্রাদুর্ভাব— সবাই তার সাহায্যে বেড়ে ওঠবার চেষ্টা করছে, একটা অন্ধকার নারকী কুজ্ঝটিকার মধ্যে সমস্ত শহরের ভয়ঙ্কর শ্রীবৃদ্ধি হচ্ছে। কিন্তু ওর মধ্যে একটু পরিহাসও ছিল— এত দেশ থাকতে জেসুয়িটদের ইস্কুলটার উপরেই শয়তানের এত অনুগ্রহ কেন?...

তার পরে এখানকার সাজাদপুরের ইংরিজি স্কুলের মাস্টারেরা হুজুরের দর্শনাভিলাষী হয়ে এসে উপস্থিত। তারা কিছুতেই উঠতে চায় না, অথচ আমার আবার তেমন কথা জোগায় না— পাঁচ মিনিট অন্তর দুই-এক কথা জিজ্ঞাসা করি, তার এক-আধটা উত্তর পাই, তার পরে বোকার মতো বসে থাকি, কলম নাড়ি, মাথা চুলকোই— জিজ্ঞাসা করি এবার এখানে শস্য কিরকম হয়েছে। স্কুল-মাস্টাররা শস্য সম্বন্ধে কিছুই জানে না— ছাত্র সম্বন্ধে যা কিছু জ্ঞাতব্য বিষয় তা আরম্ভেই হয়ে গেছে। ফের আবার গোড়ার কথা পাড়লুম; জিজ্ঞাসা করলুম, 'আপনাদের স্কুলে কজন ছাত্র?' এক জন বললে আশি জন। আর এক জন বললে, না, এক শো পঁচাত্তর জন। মনে করলুম দুজনের মধ্যে খুব একটা তর্ক বেধে যাবে। কিন্তু দেখলুম, তৎক্ষণাৎ মতের ঐক্য হয়ে গেল। তার পরে, দেড় ঘণ্টা পরে কেন যে তাদের মনে পড়ল 'আজ তবে আসি' তা ঠিক বোঝা শক্ত। আর এক ঘণ্টা পূর্বেও মনে হতে পারত, আর বারো ঘণ্টা পরেও মনে হতে পারত, দেখা যাচ্ছে এর ভিতরে কোনো একটা নিয়ম নেই— অন্ধ দৈবঘটনা মাত্র।

কলকাতা
৩০ জুন ১৮৯১

২৬

সাজাদপুর
শনিবার, ৪ জুলাই ১৮৯১

আমাদের ঘাটে একটি নৌকো লেগে আছে, এবং এখানকার অনেকগুলি 'জনপদবধূ' তার সম্মুখে ভিড় করে দাঁড়িয়েছে।... বোধ হয় একজন কে কোথায় যাচ্ছে এবং তাকে বিদায় দিতে সবাই এসেছে। অনেকগুলি কচি ছেলে, অনেকগুলি ঘোমটা এবং অনেকগুলি পাকাচুল একত্র হয়েছে। কিন্তু ওদের মধ্যে একটি মেয়ে আছে, তার প্রতিই আমার মনোযোগটা সর্বাপেক্ষা আকৃষ্ট হচ্ছে। বোধ হয় বয়েস বারো-তেরো হবে, কিন্তু একটু হৃষ্টপুষ্ট হওয়াতে চোদ্দ-পনেরো দেখাচ্ছে। মুখখানি বেড়ে। বেশ কালো অথচ বেশ দেখতে। ছেলেদের মতো চুল ছাঁটা, তাতে মুখটি বেশ দেখাচ্ছে। এমন বুদ্ধিমান এবং সপ্রতিভ এবং পরিষ্কার সরল ভাব। একটা ছেলে কোলে করে এমন নিঃসংকোচ কৌতূহলের সঙ্গে আমাকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল।...বাস্তবিক, তার মুখখানি এবং সমস্ত শরীর দেখতে বেশ, কিছু যেন নির্বুদ্ধিতা কিম্বা অসরলতা কিম্বা অসম্পূর্ণতা নেই। বিশেষতঃ আধা ছেলে আধা মেয়ের মতো হয়ে আরও একটু বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করে। ছেলেদের মতো আত্ম সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অচেতন ভাব এবং তার সঙ্গে মাধুরী মিশে ভারী নতুন রকমের একটি মেয়ে তৈরি হয়েছে। বাংলা দেশে যে এ রকম ছাঁদের 'জনপদবধূ' দেখা যাবে এমন প্রত্যাশা করি নি। দেখছি এদের বংশটাই তেমন বেশি লাজুক নয়। একজন মেয়ে ডাঙায় দাঁড়িয়ে রৌদ্রে চুল এলিয়ে দশাঙ্গুলি-দ্বারা জটা ছাড়াচ্ছে এবং নৌকোর আর-একটি রমণীর সঙ্গে উচ্চৈঃস্বরে ঘরকর্নার আলাপ হচ্ছে। শোনা গেল তার একটিমাত্র 'মায়্যা', অন্য 'ছাওয়াল নাই'—কিন্তু সে মেয়েটির বুদ্ধিসুদ্ধি নেই—'কারে কী কয় কারে কী হয় আপন পর জ্ঞান নেই'... আরও অবগত হওয়া গেল গোপাল সা'র জামাইটি তেমন ভালো হয় নি, মেয়ে তার কাছে যেতে চায় না। অবশেষে যখন যাত্রার সময় হল তখন দেখলুম আমার সেই চুল-ছাঁটা, গোলগাল হাতে-বালা-পরা উজ্জ্বল-সরল-মুখশ্রী মেয়েটিকে নৌকোয় তোলবার অনেক চেষ্টা হচ্ছে, কিন্তু সে কিছুতেই যেতে চাচ্ছে না—অবশেষে বহুকষ্টে তাকে টেনেটুনে নৌকোয় তুললে। বুঝলুম, বেচারা বোধ হয় বাপের বাড়ি থেকে স্বামীর বাড়ি যাচ্ছে—নৌকো যখন ছেড়ে দিলে মেয়েরা ডাঙায় দাঁড়িয়ে চেয়ে রইল, দুই একজন আঁচল দিয়ে ধীরে ধীরে নাক চোখ মুছতে লাগল। একটি ছোটো মেয়ে, খুব এঁটে চুল বাঁধা, একটি বর্ষীয়সীর কোলে চড়ে তার গলা জড়িয়ে তার কাঁধের উপর মাথাটি রেখে নিঃশব্দে কাঁদতে লাগল। যে গেল সে বোধ হয় এ বেচারির দিদিমণি, এর পুতুল খেলায় বোধ হয় মাঝে মাঝে যোগ দিত, বোধ হয় দুষ্টুমি করলে মাঝে মাঝে টিপিয়েও দিত। সকাল বেলাকার রৌদ্র এবং নদীতীর এবং সমস্ত এমন গভীর বিষাদে পূর্ণ বোধ হতে লাগল। সকাল বেলাকার একটা অত্যন্ত হতাশ্বাস করুণ রাগিণীর মতো মনে হল সমস্ত পৃথিবীটা এমন সুন্দর অথচ এমন বেদনায় পরিপূর্ণ! ... এই অজ্ঞাত ছোটো মেয়েটির ইতিহাস আমার যেন অনেকটা পরিচিত হয়ে গেল। বিদায়কালে এই নৌকো করে নদীর স্রোতে ভেসে যাওয়ার মধ্যে যেন আরও একটু বেশি করুণা আছে। অনেকটা যেন মৃত্যুর মতো—তীর থেকে প্রবাহে ভেসে যাওয়া—যারা

দাঁড়িয়ে থাকে তারা আবার চোখ মুছে ফিরে যায়, যে ভেসে গেল সে অদৃশ্য হয়ে গেল। জানি, এই গভীর বেদনাটুকু, যারা রইল এবং যে গেল উভয়েই ভুলে যাবে, হয়তো এতক্ষণে অনেকটা লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। বেদনাটুকু ক্ষণিক এবং বিস্মৃতিই চিরস্থায়ী। কিন্তু ভেবে দেখতে গেলে— এই বেদনাটুকুই বাস্তবিক সত্যি, বিস্মৃতি সত্যি নয়। এক-একটা বিচ্ছেদ এবং এক-একটা মৃত্যুর সময় মানুষ সহসা জানতে পারে এই ব্যথাটা কী ভয়ংকর সত্যি। জানতে পারে যে, মানুষ কেবল ভ্রমক্রমেই নিশ্চিন্ত থাকে, আশঙ্কা এবং শোকই জগতের ভিতরকার সত্য। কেউ থাকে না, কিছুই থাকে না, সেটা এমনি সত্য যে স্মরণও থাকে না, শোকও থাকে না— এবং সেইটে মনে করলে মানুষ আরও ব্যাকুল হয়ে ওঠে যে, কেবল যে থাকব না তা নয়, কারও মনেও থাকব না। একেবারে জগতের অন্তর বাহির থেকে লোপ। বাস্তবিক, আমাদের দেশের করুণ রাগিণী ছাড়া সমস্ত মানুষের পক্ষে, চিরকালের মানুষের পক্ষে, আর কোনো গান সম্ভবে না।

কলকাতা
৭ জুলাই ১৮৯১

২৭

কটকাভিমুখ জলপথে
। অগস্ট ১৮৯১।

পরিধেয় বস্ত্র প্রতিদিন মলিন এবং অসহ্য হয়ে আসছে অথচ কাপড়ের ব্যাগটি নেই, এ কথা চিত্তের মধ্যে অহর্নিশ জাগরূক থাকলে ভদ্রলোকের আত্মসম্ভ্রম দূর হয়ে যায়। সেই ব্যাগটি থাকলে যে রকম উন্নত মস্তকে সতেজে জনসমাজে বিচরণ করতে পারতুম, এখন আর তা পারছি নে। কোনোমতে নিজেকে প্রচ্ছন্ন এবং সাধারণের দৃষ্টির অন্তরালে রাখতে ইচ্ছে করছে। এই কাপড় পরেই রাত্রে শয়ন করছি, এবং প্রাতঃকালে প্রকাশিত হচ্ছি। স্টীমারে আবার সর্বত্রই কয়লার গুঁড়ো এবং মলিনতা, এবং মধ্যাহ্নের অসহ্য উত্তাপে সর্বশরীর বাষ্পাকুল হয়ে উঠছে। এই-সমস্ত অবস্থা এবং আমার একান্ত নিরীহ স্বভাব স্মরণ করে তোরা কথঞ্চিৎ হাস্য সম্বরণ করবার চেষ্টা করিস। তা ছাড়া স্টীমারে যে সুখে আছি সে কথা তোদের লিখে আর কী করব! কত রকমের যে সঙ্গী জুটেছে তার আর সংখ্যা নেই। অঘোর বাবু বলে একটি কে এসেছে, সে পৃথিবীর সমস্ত জড় এবং চেতন পদার্থকে মামাশ্বশুরের ভাগনে বলে উল্লেখ করছে। আর একটি সংগীতকুশল লোক অর্ধেক রাত্রে ভৈঁরো আলাপ করতে লাগল। বিবিধ কারণে সেটা নিতান্ত অসাময়িক বলে বোধ হতে লাগল। একটা সুঁড়ি খালের মধ্যে জাহাজ আটকে কাল বিকেল থেকে আজ নটা পর্যন্ত যাপন করা গেছে। সমস্ত যাত্রীর ভিড়ের মধ্যে ডেকের এক ধারে নির্জীব এবং বিমর্ষভাবে শুয়ে ছিলুম। খানসামাজিকে বলেছিলুম রাত্রে লুচি তৈরি করতে— সে কতকগুলি আকারপ্রকারহীন ভাজা ময়দা তৈরি করে এনেছিল, তার সঙ্গে ছোকা কিম্বা ভাজাভুজির উপলক্ষ মাত্র ছিল না। দেখে আমি কিঞ্চিৎ বিস্ময় এবং আক্ষেপ প্রকাশ করলুম। সে ব্যক্তি তটস্থ হয়ে বললে, 'হম আবি বনা দেতা।'

রাত্রের আধিক্য দেখে আমি তাতে অসম্মত হয়ে যথাসাধ্য শুষ্ক লুচি খেয়ে পেণ্টলুন পরে আলো এবং লোকজনের মধ্যে শুয়ে পড়লুম— শূন্যে মশা এবং চতুষ্পার্শ্বে আর্সোলা সঞ্চরণ করছে— ঠিক পায়ের কাছেই আর-এক ব্যক্তি শয়ন করেছে, তার গায়ে মাঝে মাঝে আমার পা ঠেকছে, চারটে-পাঁচটা নাক অবিশ্রাম ডাকছে, মশকদষ্ট বীতনিদ্র হতভাগ্যগণ তামাক টানছে এবং এরই মধ্যে ভৈঁরো রাগিণী। রাত যখন সাড়ে তিনটে তখন কতকগুলি ব্যস্তবাগীশ লোক পরস্পরকে জাগ্রত এবং প্রাতঃকৃত্যে প্রবৃত্ত হতে উৎসাহিত করতে লাগল। আমি নিতান্ত কাতরভাবে শয্যা ত্যাগ করে আমার চৌকিটাতে ঠেস দিয়ে প্রভাতের প্রতীক্ষায় বসে রইলুম। একটা বিচিত্র অভিশাপের মতো রাতটা কেটে গেল। একজন খালাসীর কাছে সংবাদ পেলুম, স্টীমার এমনি আটকে গেছে আজ সমস্ত দিন নড়বে না। একজন কর্মচারীকে জিজ্ঞাসা করলুম, কলকাতামুখী কি কোনো জাহাজ ইতিমধ্যে পাওয়া যাবে। সে হেসে বললে, এই জাহাজই গম্য স্থানে পৌঁছে পুনশ্চ কলকাতায় ফিরবে, অতএব ইচ্ছে করলে এই জাহাজে করেই ফিরতে পারি। সৌভাগ্যক্রমে অনেক টানাটানির পর প্রায় দশটার কাছাকাছি জাহাজ চলতে আরম্ভ করলে।

কলকাতা
৩১ অগাস্ট ১৮৯১

২৮

চাঁদনি চক। কটক
৩ সেপ্টেম্বর ১৮৯১

আমাদের উকিল হরিবল্লভবাবু খুব মোটাসোটা বর্ধিষ্ণু চেহারার লোক— তাঁর ভাবখানা খুব একজন লম্বাচৌড়া কৃষ্ণবন্ধুর মতো। বয়স যথেষ্ট হয়েছে। একখানি কোঁচানো চাদর কাঁধে, ফিট্‌ফাট সাজ, গায়ে এসেন্সের গন্ধ, দু-থাক চিবুক, প্রমাণসই গোঁফ, কপাল গড়ানে, বড়ো বড়ো ড্যাবা চোখ আত্মম্ভরিতায় অর্ধনিমীলিত, কথা কবার সময় চোখের তারা আকাশের দিকে ওঠে— জলদগম্ভীর স্বরে অতি মৃদুমন্দ সুস্থ সহাস্যভাবে কথা কয়— সময় যেন অনুগত ভৃত্যের মতো তাঁর অবসর-অপেক্ষায় এক পাশে স্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছে— কোনো বিষয়ে তিলমাত্র তাড়া নেই। চোখ দুটো উল্টে আমাকে একবার জিজ্ঞাসা করলে, 'জ্যোতি এখন কোথায় আছে?' প্রশ্নকর্তার অবিচলিত গাম্ভীর্যে আমার অন্তঃকরণ সসম্ভ্রমে শশব্যস্ত হয়ে উঠল— আমি মৃদু বিনীতভাবে আমার দাদার রাজধানীতে অবস্থান জ্ঞাপন করলুম। তিনি বললেন 'বীরেন্দ্রের সঙ্গে আমি একসঙ্গে পড়েছি।' শুনে আমার চিত্ত আরও অভিভূত হয়ে পড়ল। এর উপরে যখন তিনি— কারও পরামর্শের অপেক্ষা না রেখে অকস্মাৎ অসময়ে এখানে আসা সম্বন্ধে আমার বালকোচিত অবিবেচনার উল্লেখ করলেন তখন আমি কী রকম ম্লান অপ্রতিভ হয়ে গেলুম তুই কতকটা অনুমান করতে পারবি। আমি কেবলই নতমুখে বারবার করে বলতে লাগলুম— আমি প্রকৃত অবস্থা কিছুই জানতুম না, আর কখনো আসি নি, এই প্রথম আসছি। তার থেকে তর্ক উঠল 'জ্যোতি কখন এসেছিল'। সময় নির্ণয় সম্বন্ধে বরদার সঙ্গে তাঁর ঘোর অনৈক্য হল। তিনি 74|75 বলেন, বরদা বলে

তার পূর্বে। এর থেকে বুঝতে পারবি ইতিহাস লেখা কত শক্ত। তাই মনে করছি এইবার থেকে আমার চিঠিতে তারিখ দিতে হবে।

কলকাতা। ৬ সেপ্টেম্বর ১৮৯১

২৯

তিরন
৭ সেপ্টেম্বর ১৮৯১

বালিয়ার ঘাটটি বেশ দেখতে। দুই ধারে বেশ বড়ো বড়ো গাছ— সব-সুদ্ধ খালটা দেখে সেই পুনার ছোটো নদীটি মনে পড়ে।... আমি ভালো করে ভেবে দেখলুম এই খালটাকে যদি নদী বলে জানতুম তা হলে ঢের বেশি ভালো লাগত। দুই তীরে বড়ো বড়ো নারকেলগাছ, আমগাছ এবং নানাজাতীয় ছায়াতরু, ঢালু পরিষ্কার তট সুন্দর সবুজ ঘাস এবং অসংখ্য নীল পুষ্পিত লজ্জাবতীলতায় আচ্ছন্ন; কোথাও বা কেয়াবন; যেখানে গাছগুলি একটু বিরল সেইখান থেকে দেখা যায় খালের উঁচু পাড়ের নিচে একটা অপার মাঠ ধু ধু করছে, বর্ষাকালে শস্যক্ষেত্র এমনি গাঢ় সবুজ হয়েছে যে, দুটি চোখ যেন একেবারে ডুবে যায়; মাঝে মাঝে খেজুর এবং নারকেল গাছের মণ্ডলীর মধ্যে ছোটো ছোটো গ্রাম; এবং এই-সমস্ত দৃশ্য বর্ষাকালের স্নিগ্ধ মেঘাচ্ছন্ন আনত আকাশের নিচে শ্যামচ্ছায়াময় হয়ে আছে। খালটি তার দুই পরিষ্কার সবুজ শষ্পতটের মাঝখান দিয়ে সুন্দর ভঙ্গীতে বেঁকে বেঁকে চলে গেছে। মৃদু মৃদু স্রোত; যেখানে খুব সংকীর্ণ হয়ে এসেছে সেখানে জলের কিনারার কাছে কাছে কুমুদবন এবং বড়ো বড়ো ঘাস দেখা দিয়েছে। সবসুদ্ধ ... একটা ইংরিজি streamএর মতো। কিন্তু তবু মনের মধ্যে একটা আক্ষেপ থেকে যায় এটা একটা কাটা খাল বৈ নয়— এর জলকলধ্বনির মধ্যে অনাদি প্রাচীনত্ব নেই, এ কোনো দূর দুর্গম জনহীন পর্বতগুহার রহস্য জানে না— কোনো-একটি প্রাচীন স্ত্রীনাম ধারণ করে অতি অজ্ঞাতকাল থেকে দুই তীরের গ্রামগুলিকে স্তন্য দান করে আসে নি— এ কখনো কুলুকুলু করে বলতে পারে না—

মেন মে কাম অ্যান্‌ড্‌ মেন মে গো
বাট আই গো অন ফর এভার।

প্রাচীনকালের বড়ো বড়ো দিঘিও এর চেয়ে ঢের বেশি গৌরব লাভ করেছে। এর থেকেই বেশ বোঝা যায় একটা প্রাচীন বড়ো বংশ অনেক বিষয়ে হীন হলেও কেন এত সমাদর লাভ করে। তাদের উপরে যেন বহুকালের একটা সম্পদ্‌শ্রীর আভা থাকে। একজন সোনার ব্যাপারী হঠাৎ বড়ো মানুষ হয়ে উঠলে অনেক সোনা পায়, কিন্তু সেই সোনার লাবণ্যটুকু শীঘ্র পায় না। যা হোক, আর একশো বৎসর পরে যখন এই তীরের গাছগুলো আরও অনেক বড়ো হয়ে উঠবে, তক্‌তোকে সাদা মাইলস্টোন্‌গুলো অনেকটা ক্ষয়ে গিয়ে শৈবালাচ্ছন্ন ম্লান হয়ে আসবে, ফলকের উপরে ক্ষোদিত 1871 তারিখ যখন অনেক দূরবর্তী বলে মনে হবে, তখন যদি আমি আমার প্রপৌত্র-জন্ম লাভ করে এই খালের মধ্যে বোট নিয়ে আমাদের পাণ্ডুয়া জমিদারি তদন্ত করতে যেতে পারি তখন আমার মনের মধ্যে অনেকটা ভিন্ন রকম ভাবোদয় হতে পারে সন্দেহ নেই। কিন্তু, হায় আমার প্রপৌত্র! তার

ভাগ্যে কী আছে কে জানে! হয়তো একটা অজ্ঞাত অখ্যাত কেরানিগিরি। ঠাকুর-বংশের একটা ছিন্ন টুকরো, বহুদূরে প্রক্ষিপ্ত হয়ে একটা মৃত উল্কাখণ্ডের মতো হয়তো জ্যোতির্হীন নির্বাপিত। কিন্তু আমার উপস্থিত দুর্দশা এত আছে যে আমার প্রপৌত্রের জন্যে বিলাপ করবার কোনো আবশ্যক নেই।... চারটের সময়ে তারপুরে পৌঁছনো গেল। এইখানে আমাদের পাল্কিযাত্রা আরম্ভ হল। মনে করলুম ছ ক্রোশ পথ, সন্ধে আটটার মধ্যেই আমাদের কুঠিতে পৌঁছতে পারব। মাঠের পর মাঠ, গ্রামের পর গ্রাম, মাইলের পর মাইল কেটে যাচ্ছে—ছ ক্রোশ পথ আর ফুরোয় না। সন্ধে সাড়ে সাতটার সময় বেহারাদের জিজ্ঞাসা করলুম আর কতদূর, ওরা বললে—আর বেশি নেই, তিন ক্রোশের কিছু উপর বাকি আছে। শুনে পাল্কির মধ্যে একটু নড়েচড়ে বসলুম। পাল্কিতে আমার আধখানা বৈ ধরে না—কোমর টন্‌ টন্‌ করছে, পা ঝিন্‌ ঝিন্‌ করছে, মাথা ঠক্‌ ঠক্‌ করছে—যদি নিজেকে তিন চার ভাঁজ করে মুড়ে রাখবার কোনো উপায় থাকত তা হলেই এই পাল্কিতে কিছু সুবিধে হতে পারত। রাস্তা অতি ভয়ানক। সর্বত্রই এক-হাঁটু কাদা—এক এক জায়গায় পিছলের ভয়ে বেহারারা অতি সাবধানে এক-এক পা করে পা ফেলছে। তিন-চার বার তাদের পা হড়কে গিয়েছিল, তাড়াতাড়ি সামলে নিলে। মাঝে মাঝে রাস্তা নেই— ধানের ক্ষেতে অনেকখানি করে জল দাঁড়িয়েছে—তারই উপর দিয়ে ছপ্‌ ছপ্‌ শব্দ করে এগোচ্ছি। মেঘে রাত খুব অন্ধকার হয়ে এসেছে, টিপ্‌ টিপ্‌ করে বৃষ্টি পড়ছে, তৈলাভাবে মশালটা মাঝে মাঝে নিভে যাচ্ছে—আবার অনেক ফুঁ দিয়ে দিয়ে জ্বালাতে হচ্ছে, বেহারারা সেই আলোকের অভাব নিয়ে ভারী বকাবকি বাধিয়ে দিয়েছে। এমনি করে খানিক দূরে এলে পর বরকন্দাজ জোড় হস্তে নিবেদন করলে—একটা নদী এসেছে, এইখানে পাল্কি নৌকো করে পার করতে হবে, কিন্তু এখনো নৌকো এসে পৌঁছোয় নি, অবিলম্বে এল বলে—অতএব খানিক ক্ষণ এইখানে পাল্কি রাখতে হবে। পাল্কি তো রাখলে। তার পরে নৌকো আর কিছুতে এসে পৌঁছয় না। আস্তে আস্তে মশালটা নিভে গেল। সেই অন্ধকার নদীতীরে বরকন্দাজগুলো ভাঙা গলায় ঊর্ধ্বশ্বাসে নৌকোওয়ালাকে ডাকতে লাগল—নদীর পরপার থেকে তার প্রতিধ্বনি ফিরে আসতে লাগল, কিন্তু কোনো নৌকোওয়ালা সাড়া দিলে না। ‘মুকুন্দো-ও-ও-ও’! ‘বালকৃষ্ণ-অ-অ-অ-অ’! ‘নীলকণ্ঠ-অ-অ-অ-অ’! অমন কাতর-স্বরে আহ্বান করলে গোলোকধাম থেকে মুকুন্দ এবং কৈলাসশিখর থেকে নীলকণ্ঠ নেমে আসতেন—কিন্তু আমাদের কর্ণধার কর্ণ রোধ করে অবিচলিত ভাবে নিজ নিকেতনে বিশ্রাম করতে লাগল। নির্জন নদীতীরে একটি কুঁড়েঘর মাত্রও নেই, কেবল পথপার্শ্বে চালক এবং বাহন -হীন একটি শূন্য গোরুর গাড়ি পড়ে রয়েছে—আমাদের বেহারাগুলো তারই উপর চেপে বসে বিজাতীয় ভাষায় কলরব করতে লাগল। মক্‌ মক্‌ শব্দে ব্যাঙ ডাকছে এবং ঝিঁঝির ডাকে সমস্ত রাত্রি পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। আমি মনে করলুম এইখানেই পাল্কির মধ্যে বেঁকেচুরে দুমড়ে আজ রাতটা কাটাতে হবে—মুকুন্দ এবং নীলকণ্ঠ বোধ হয় কাল প্রভাতে এসে উপস্থিত হতেও পারে। মনে মনে গাইতে লাগলুম—

ওগো, যদি নিশিশেষে আসে হেসে হেসে
মোর হাসি আর রবে কি!
এই জাগরণে ক্ষীণ বদনমলিন
আমারে হেরিয়া কবে কী!

যাই হোক-না কেন উড়ে ভাষায় কবে, আমি কিছুই বুঝতে পারব না। কিন্তু মুখে যে আমার হাসি থাকবে না সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। অনেক ক্ষণ এই ভাবে কেটে গেল। এমন সময় হুঁই-হাঁই হুঁই-হাঁই শব্দে বরদার পাল্কি এসে উপস্থিত হল। বরদা নৌকো আসার কোনো সম্ভাবনা না দেখে হুকুম দিলেন, পাল্কি মাথায় করে নদী পার করতে হবে। শুনে বেহারারা অনেক ইতস্ততঃ করতে লাগল এবং আমার মনেও দয়া এবং কিঞ্চিৎ দ্বিধা উপস্থিত হতে লাগল। যা হোক, অনেক বাক্-বিতণ্ডার পর তারা হরিনাম উচ্চারণ করতে করতে পাল্কি মাথায় করে নদীর মধ্যে নাবলে। বহু কষ্টে নদী পার হল। তখন রাত সাড়ে দশটা। আমি কোনো রকম গুটিসুটি মেরে শুয়ে পড়লুম। বেশ খানিকটা নিদ্রাকর্ষণ হয়েছে এমন সময়ে হঠাৎ একটা বেহারার পা পিছলে গিয়ে পাল্কিটা খুব একটা নাড়া পেলে— অকস্মাৎ ঘুম ভেঙে গিয়ে বুকের ভিতর ভারী ধড়াস্ ধড়াস্ করতে লাগল। তার পর থেকে অর্ধ-ঘুম অর্ধ-জাগরণে রাত্তির দুপুরের সময় আমাদের পাণ্ডুয়ার কুঠিতে এসে উত্তীর্ণ হলুম।

কলকাতা
১১ সেপ্টেম্বর ১৮৯১

৩০

তিরন
৯ সেপ্টেম্বর ১৮৯১

অনেক দিন পরে কাল মেঘবৃষ্টি কেটে গিয়ে শরতের সোনার রোদ্দুর উঠেছিল। পৃথিবীতে যে রোদ্দুর আছে সে কথা যেন একেবারে ভুলে গিয়েছিলুম; হঠাৎ যখন কাল দশটা এগারোটার পর রোদ্দুর ভেঙে পড়ল তখন যেন একটা নতুন জিনিস দেখে মনে অপূর্ব বিস্ময়ের উদয় হল। দিনটি বড়ো চমৎকার হয়েছিল। আমি দুপুর বেলায় স্নানাহারের পর বারান্দার সামনে একটি আরাম-কেদারার উপরে পা ছড়িয়ে দিয়ে অর্ধশয়ান অবস্থায় জাগ্রত স্বপ্নে নিযুক্ত ছিলুম। আমার চোখের সামনে আমাদের বাড়ির কম্‌পাউন্‌ডের কতকগুলি নারকোল গাছ— তার ওদিকে যতদূর দৃষ্টি যায় কেবলই শস্যক্ষেত্র, শস্যক্ষেত্রের একেবারে প্রান্তভাগে গাছপালার একটুখানি ঝাপসা নীল আভাস মাত্র। ঘুঘু ডাকছে এবং মাঝে মাঝে গোরুর গলার নূপুর শোনা যাচ্ছে। কাঠবিড়ালি একবার ল্যাজের উপর ভর দিয়ে বসে মাথা তুলে চকিতের মধ্যে এ দিক ও দিক নিরীক্ষণ করে আবার চট্ করে পিঠের উপর ল্যাজ তুলে দিয়ে গাছের গুঁড়ি বেয়ে ডালপালার মধ্যে অদৃশ্য হচ্ছে। খুব একটা নিঃঝুম নিস্তব্ধ নিরালা ভাব। বাতাস অবাধে হু হু করে বয়ে আসছে —নারকোল গাছের পাতা ঝরঝর শব্দ করে কাঁপছে। দু-চার জন চাষা মাঠের এক জায়গায় জটলা করে ধানের ছোটো ছোটো চারা উপড়ে নিয়ে আঁটি করে বাঁধছে। কাজকর্মের মধ্যে এইটুকু কেবল দেখা যাচ্ছে।

কলকাতা
১৩ সেপ্টেম্বর ১৮৯১

৩১

শিলাইদহ
১ অক্টোবর ১৮৯১

বেলায় উঠে দেখলুম চমৎকার রোদ্দুর উঠেছে এবং শরতের পরিপূর্ণ নদীর জল তল্-তল্ থৈ-থৈ করছে। নদীর জল এবং তীর প্রায় সমতল—ধানের ক্ষেত সুন্দর সবুজ এবং গ্রামের গাছপালাগুলি বর্ষার স্নানে সতেজ এবং নিবিড় হয়ে উঠেছে। এমন সুন্দর লাগল সে আর কী বলব। দুপুর বেলা খুব এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল। তার পরে বিকেলে পদ্মার ধারে আমাদের নারকোল-বনের মধ্যে সূর্যাস্ত হল। আমি নদীর ধারে উঠে আস্তে আস্তে বেড়াচ্ছিলুম। আমার সামনের দিকে দূরে আমবাগানে সন্ধের ছায়া পড়ে আসছে এবং আমার ফেরবার মুখে নারকোল গাছগুলির পিছনে আকাশ সোনায় সোনালি হয়ে উঠেছে। পৃথিবী যে কী আশ্চর্য সুন্দরী এবং কী প্রশস্ত প্রাণ এবং গভীর ভাবে পরিপূর্ণ তা এইখানে না এলে মনে পড়ে না। যখন সন্ধেবেলা বোটের উপর চুপ করে বসে থাকি, জল স্তব্ধ থাকে, তীর আবছায়া হয়ে আসে, এবং আকাশের প্রান্তে সূর্যাস্তের দীপ্তি ক্রমে ক্রমে ম্লান হয়ে যায়, তখন আমার সর্বাঙ্গে এবং সমস্ত মনের উপর নিস্তব্ধ নতনেত্র প্রকৃতির কী-একটা বৃহৎ উদার বাক্যহীন স্পর্শ অনুভব করি। কী শান্তি, কী স্নেহ, কী মহত্ত্ব, কী অসীম করুণাপূর্ণ বিষাদ! এই লোকনিলয় শস্যক্ষেত্র থেকে ঐ নির্জন নক্ষত্রলোক পর্যন্ত একটা স্তম্ভিত হৃদয়রাশিতে আকাশ কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে, আমি তার মধ্যে অবগাহন করে অসীম মানসলোকে একলা বসে থাকি—কেবল মৌলবিটা পাশে দাঁড়িয়ে অবিশ্রাম বক্ বক্ করে আমাকে ব্যথিত করে তোলে।

কলকাতা
২ অক্টোবর ১৮৯১

৩২

শিলাইদহ
মঙ্গলবার, ২০ আশ্বিন। ১২৯৮।

আজ দিনটি বেশ হয়েছে বব্। ঘাটে দুটি একটি করে নৌকো লাগছে—বিদেশ থেকে প্রবাসীরা পুজোর ছুটিতে পোঁটলা পুঁটলি বাক্স ধামা বোঝাই করে নানা উপহার সামগ্রী নিয়ে সম্বৎসর পরে বাড়ি ফিরে আসছে। দেখলুম একটি বাবু ঘাটের কাছাকাছি নৌকো আসতেই পুরোনো কাপড় বদলে একটি নতুন কোঁচানো ধুতি পরলে, জামার উপর সাদা রেশমের একখানি চায়না কোট গায়ে দিলে, আর একখানি পাকানো চাদর বহু যত্নে কাঁধের উপর ঝুলিয়ে ছাতা ঘাড়ে করে গ্রামের অভিমুখে চলল। ধানের ক্ষেত মর্ মর্ করে কাঁপছে—আকাশে সাদা সাদা মেঘের স্তূপ—তারই উপর আম এবং নারকোল গাছের মাথা উঠেছে—নারকোলের পাতা বাতাসে ঝুর্ ঝুর্ করছে—চরের উপর দুটো একটা করে কাশ ফুটে ওঠবার উপক্রম করেছে—সব-সুদ্ধ বেশ একটা সুখের দৃশ্য। বিদেশ থেকে যে লোকটি এইমাত্র

গ্রামে ফিরে এল তার মনের ভাব, তার ঘরের লোকদের মিলনের আগ্রহ, এবং শরৎকালের এই আকাশ, এই পৃথিবী, সকাল বেলাকার এই ঝির্‌ঝিরে বাতাস এবং গাছপালা তৃণগুল্ম নদীর তরঙ্গ সকলের ভিতরকার একটি অবিশ্রাম সঘন কম্পন, সমস্ত মিশিয়ে বাতায়নবর্তী এই একক যুবকটিকে সুখে দুঃখে এক রকম অভিভূত করে ফেলছিল। পৃথিবীতে জানলার ধারে একলা বসে চোখ মেলে দেখলেই মনে নতুন নতুন সাধ জন্মায়—নতুন সাধ ঠিক নয়—পুরোনো সাধ নানা নতুন মূর্তি ধারণ করতে আরম্ভ করে। পরশুদিন অমনি বোটের জানলার কাছে চুপ করে বসে আছি, একটা জেলেডিঙিতে একজন মাঝি গান গাইতে গাইতে চলে গেল—খুব যে সুস্বর তা নয়—হঠাৎ মনে পড়ে গেল বহুকাল হল ছেলেবেলায় বাবামশায়ের সঙ্গে বোটে করে পদ্মায় আসছিলুম—একদিন রাত্তির প্রায় দুটোর সময় ঘুম ভেঙে যেতেই বোটের জানলাটা তুলে ধরে মুখ বাড়িয়ে দেখলুম নিস্তরঙ্গ নদীর উপরে ফুট্‌ফুটে জ্যোৎস্না হয়েছে, একটি ছোট্ট ডিঙিতে একজন ছোকরা একলা দাঁড় বেয়ে চলেছে, এমনি মিষ্টি গলায় গান ধরেছে—গান তার পূর্বে তেমন মিষ্টি কখনো শুনি নি। হঠাৎ মনে হল, আবার যদি জীবনটা ঠিক সেইদিন থেকে ফিরে পাই! আর একবার পরীক্ষা করে দেখা যায়—এবার তাকে আর তৃষিত শুষ্ক অপরিতৃপ্ত করে ফেলে রেখে দিই নে—কবির গান গলায় নিয়ে একটি ছিপ্‌ছিপে ডিঙিতে জোয়ারের বেলায় পৃথিবীতে ভেসে পড়ি, গান গাই এবং বশ করি এবং দেখে আসি পৃথিবীতে কোথায় কী আছে; আপনাকেও একবার জানান দিই, অন্যকেও একবার জানি; জীবনে যৌবনে উচ্ছ্বসিত হয়ে বাতাসের মতো একবার হু হু করে বেড়িয়ে আসি, তার পরে ঘরে ফিরে এসে পরিপূর্ণ প্রফুল্ল বার্ধক্য কবির মতো কাটাই। খুব যে একটা উঁচু আইডিয়াল তা নয়। জগতের হিত করা এবং যিশুখৃস্টের মতো মরা এর চেয়ে ঢের বেশি বড়ো আইডিয়াল হতে পারে—কিন্তু আমি সব-সুদ্ধ যে রকম লোক আমার ওটা মনেও উদয় হয় না, এবং ও রকম করে শুকিয়ে মরতে ইচ্ছেও করে না।...উপবাস করে, আকাশের দিকে তাকিয়ে, অনিদ্র থেকে, সর্বদা মনে মনে বিতর্ক করে, পৃথিবীকে এবং মনুষ্যত্বকে কথায় কথায় বঞ্চিত করে, স্বেচ্ছারচিত দুর্ভিক্ষে এই দুর্লভ জীবন ত্যাগ করতে চাই নে। পৃথিবী যে সৃষ্টিকর্তার একটা ফাঁকি এবং শয়তানের একটা ফাঁদ তা না মনে করে একে বিশ্বাস করে, ভালোবেসে এবং যদি অদৃষ্টে থাকে তো ভালোবাসা পেয়ে, মানুষের মতো বেঁচে এবং মানুষের মতো মরে গেলেই যথেষ্ট—দেবতার মতো হাওয়া হয়ে যাবার চেষ্টা করা আমার কাজ নয়।

মানিকগঞ্জ
৮ অক্টোবর ১৮৯১

৩৩

শিলাইদহ
২৯ আশ্বিন। ১২৯৮।

কাল সন্ধের সময় নদীর ধারে একবার পশ্চিম দিকের সোনার সূর্যাস্ত এবং একবার পূর্ব দিকের রূপোর চন্দ্রোদয়ের দিকে ফিরে গোঁফে তা দিতে দিতে পায়চারি করে

বেড়াচ্ছিলুম—রুগ্ন ছেলের দিকে মা যেমন করে তাকায় প্রকৃতি সেই রকম সুগভীর স্তব্ধ এবং স্নিগ্ধ বিষাদের সঙ্গে আমার মুখের দিকে চেয়ে ছিল—নদীর জল আকাশের মতো স্থির, এবং আমাদের দুটি বাঁধা নৌকো জলচর পাখির মতো মুখের উপর পাখা ঝেঁপে স্থির ভাবে ঘুমিয়ে আছে। এমন সময় মৌলবি এসে আমাকে ভীতকণ্ঠে চুপিচুপি খবর দিলে ‘কলকাতার ভজিয়া আয়ছে’।...এক মুহূর্তের মধ্যে কত রকম অসম্ভব আশঙ্কা যে মনে উদয় হল তা আর বলতে পারি নে।...যা হোক, মনের চাঞ্চল্য দমন করে গম্ভীর স্থির ভাবে আমার রাজচৌকিতে এসে বসে ভজিয়াকে ডেকে পাঠালুম—ভজিয়া যখন ঘরে প্রবেশ করেই কাঁদুনির সুর ধরে আমার পা জড়িয়ে ধরলে তখনি বুঝলুম দুর্ঘটনা যদি কারও হয়ে থাকে তো সে ভজিয়ার। তার পরে তার সেই ফাঁকা বাংলার সঙ্গে নাকের সুর এবং চোখের জল মিশিয়ে বিস্তর অসংলগ্ন ঘটনা বলে যেতে লাগল। বহু কষ্টে তার যা সার সংগ্রহ করা গেল সেটি হচ্ছে এই—ভজিয়া এবং ভজিয়ার মায়ে প্রায়ই ঝগড়া বেধে থাকে—কিছুই আশ্চর্য নয়—কারণ, দুজনেই আমাদের পশ্চিম আর্যাবর্তের বীরাঙ্গনা, কেউ হৃদয়ের কোমলতার জন্যে প্রসিদ্ধ নয়। এর মধ্যে একদিন সন্ধেবেলায় মায়ে-ঝিয়ে মুখোমুখি থেকে হাতাহাতি বেধে গিয়েছিল—স্নেহালাপ থেকে যে আলিঙ্গন তা নয়, গালাগালি থেকে মারামারি। সেই বাহুযুদ্ধে তার মায়েরই পতন হয়—এবং সে কিছু গুরুতর আহতও হয়েছিল। ভজিয়া বলে, তার মা তাকে একটা কাঁসার বাটি নিয়ে মস্তক লক্ষ্য করে তাড়া করে, সে আত্মরক্ষার চেষ্টা করাতে দৈবাৎ তার বালাটা তার মায়ের মাথায় না কোথায় লেগে রক্তপাত হয়। যা হোক, এই-সব ব্যাপারে ছোটোবউ সেই মুহূর্তেই তাকে তেতালা থেকে নিম্নলোকে নির্বাসিত করে দেন। তার পরে কিছুতেই আর ক্ষমা করছেন না। দেখ্ দেখি বব্, এখানকার সিকস্তি পয়স্তি খোদ্‌কস্ত পাইকস্ত ওজরি বেওজরির মধ্যে কলকাতার তেতালা থেকে এক নাকী সুরের গৃহবিপ্লব এসে উপস্থিত। ব্যাপারটা তিন-চার দিন হয়েছে, কিন্তু আমি কোনো খবরই পাই নি—মাথার উপরে একেবারে হঠাৎ বিনা নোটিশে ভজিয়াঘাত।

মানিকগঞ্জ
১৮ অক্টোবর ১৮৯১

৩৪

শিলাইদহ
২ কার্তিক ১২৯৮।

আমার বোধ হয় কলকাতা ছেড়ে বেরিয়ে এলেই মানুষের নিজের স্থায়িত্ব এবং মহত্ত্বের উপর বিশ্বাস অনেকটা হ্রাস হয়ে আসে। এখানে মানুষ কম এবং পৃথিবীটাই বেশি—চারি দিকে এমন সব জিনিস দেখা যায় যা আজ তৈরি করে কাল মেরামত করে পরশু দিন বিক্রি করে ফেলবার নয়, যা মানুষের জন্মমৃত্যু ক্রিয়াকলাপের মধ্যে চিরদিন অটলভাবে দাঁড়িয়ে আছে—প্রতিদিন সমানভাবে যাতায়াত করছে এবং চিরকাল অবিশ্রান্ত ভাবে প্রবাহিত হচ্ছে। পাড়াগাঁয়ে এলে

আমি মানুষকে স্বতন্ত্রমানুষ-ভাবে দেখি নে— যেমন নানা দেশ দিয়ে নদী চলেছে, মানুষের স্রোতও তেমনি কলরব-সহকারে গাছপালা গ্রাম নগরের মধ্যে দিয়ে এঁকে বেঁকে চিরকাল ধরে চলেছে— এ আর ফুরোয় না। মেন মে কাম অ্যান্ড মেন মে গো বাট আই গো অন ফর এভার— কথাটা ঠিক সংগত নয়। মানুষও নানা শাখা প্রশাখা নিয়ে নদীর মতোই চলেছে— তার এক প্রান্ত জন্মশিখরে আর-এক প্রান্ত মরণসাগরে, দুই দিকে দুই অন্ধকার রহস্য, মাঝখানে বিচিত্র লীলা এবং কর্ম এবং কলধ্বনি— কোনোকালে এর আর শেষ নেই। ওই শোন্ মাঠে চাষা গান গাচ্ছে, জেলেডিঙি ভেসে চলেছে, বেলা যাচ্ছে, রৌদ্র ক্রমেই বেড়ে উঠছে— ঘাটে কেউ স্নান করছে কেউ জল নিয়ে যাচ্ছে— এমনি করে এই শান্তিময়ী নদীর দুই তীরে গ্রামের মধ্যে গাছের ছায়ায় শত শত বৎসর গুন্ গুন্ শব্দ করতে করতে ছুটে চলেছে— এবং সকলের মধ্যে থেকে একটা করুণ ধ্বনি জেগে উঠছে, আই গো অন ফর এভার! দুপুর বেলার নিস্তব্ধতার মধ্যে যখন কোনো রাখাল দূর থেকে ঊর্ধ্বকণ্ঠে তার সঙ্গীকে ডাক দেয়, এবং একটা নৌকো ছপ্ ছপ্ শব্দ করে ঘরের দিকে ফিরে যায়, এবং মেয়েরা ঘড়া দিয়ে জল ঠেলে দেয় তারই ছল্‌ছল্ শব্দ ওঠে, তার সঙ্গে মধ্যাহ্নপ্রকৃতির নানা রকম অনির্দিষ্ট ধ্বনি— দুই-একটা পাখির ডাক, মৌমাছির গুন্ গুন্, বাতাসে বোটটা আস্তে আস্তে বেঁকে যেতে থাকে তারই এক রকম কাতর সুর— সব-সুদ্ধ এমন একটা করুণ ঘুমপাড়ানি গান— যেন মা সমস্ত বেলা বসে বসে তার ব্যথিত ছেলেকে ঘুম পাড়িয়ে ভুলিয়ে রাখতে চেষ্টা করছে— বলছে, আর ভাবিস নে, আর কাঁদিস নে, আর কাড়াকাড়ি মারামারি করিস নে, আর তর্ক বিতর্ক রাখ্— একটুখানি ভুলে থাক্, একটুখানি ঘুমো! বসে তপ্ত কপালে আস্তে আস্তে করাঘাত করছে।

মানিকগঞ্জ
২০ অক্টোবর ১৮৯১

৩৫

শিলাইদহ
সোমবার, ৩ কার্তিক। ১২৯৮।

কোজাগর পূর্ণিমার দিন...নদীর ধারে ধারে আস্তে আস্তে বেড়াচ্ছিলুম— আর মনের মধ্যে স্বগত কথোপকথন চলছিল— ঠিক 'কথোপকথন' বলা যায় না— বোধ হয় আমি একলাই বকে যাচ্ছিলুম আর আমার সেই কাল্পনিক সঙ্গীটি অগত্যা চুপ্‌চাপ করে শুনে যাচ্ছিল; নিজের হয়ে একটা জবাব দেওয়াও সে বেচারার জো ছিল না —আমি তার মুখে যদি একটা নিতান্ত অসংগত কথাও বসিয়ে দিতুম তা হলেও তার কোনো উপায় ছিল না। কিন্তু কী চমৎকার হয়েছিল! কী আর বলব! কতবার বলেছি, কিন্তু সম্পূর্ণ কিছুতেই বলা যায় না। নদীতে একটি রেখামাত্র ছিল না— ও—ই সেই চরের পরপারে যেখানে পদ্মার জলের শেষ প্রান্ত দেখা যাচ্ছে সেখান থেকে আর এ পর্যন্ত একটি প্রশস্ত জ্যোৎস্নারেখা ঝিক্ ঝিক্ করছে— একটি লোক নেই, একটি নৌকো নেই— ও পারের নতুন চরে একটি গাছ নেই,

একটি তৃণ নেই—মনে হয় যেন একটি উজাড় পৃথিবীর উপরে একটি উদাসীন চাঁদের উদয় হচ্ছে—জনশূন্য জগতের মাঝখান দিয়ে একটি লক্ষ্যহীন নদী বহে চলেছে, মস্ত একটা পুরাতন গল্প এই পরিত্যক্ত পৃথিবীর উপরে শেষ হয়ে গেছে, আজ সেই-সব রাজা রাজকন্যা পাত্র মিত্র স্বর্ণপুরী কিছুই নেই, কেবল সেই গল্পের 'তেপান্তরের মাঠ' এবং 'সাত সমুদ্র তেরো নদী' ম্লান জ্যোৎস্নায় ধূ ধূ করছে।... আমি যেন এই মুমূর্ষু পৃথিবীর একটিমাত্র নাড়ীর মতো আস্তে আস্তে চলছিলুম। আর তোরা ছিলি আর-এক পারে, জীবনের পারে—সেখানে এই বৃটিশ গবর্মেণ্ট্ এবং উনবিংশ শতাব্দী এবং চা এবং চুরোট। সেখান থেকে একটি ছোটো নৌকো করে কাণ্ডকে যদি তাতে তুলে নিয়ে এই বসতিহীন জ্যোৎস্নালোকে উপস্থিত করতে পারতুম, এই উঁচু পাড়ের উপর দাঁড়িয়ে এই প্রান্তহীন জল এবং বালুকারাশির দিকে চেয়ে দেখতুম এবং চারি দিকে অগাধ রাত্রি ঝাঁ ঝাঁ করত। কতদিন থেকে কত লোক আমার মতো এই রকম একলা দাঁড়িয়ে অনুভব করেছে এবং কত কবি প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছে, কিন্তু হে অনির্বচনীয়, এ কী, এ কিসের জন্যে, এ কিসের উদ্‌বেগ, এই নিরুদ্দেশ নিরাকুলতার নাম কী, অর্থ কী—হৃদয়ের ঠিক মাঝখানটা বিদীর্ণ করে কবে সেই সুর বেরোবে যার দ্বারা এর সংগীত ঠিক ব্যক্ত হবে!

মানিকগঞ্জ
২১ অক্টোবর ১৮৯১

৩৬

শিলাইদহ
শনিবার, ৬ অগ্রহায়ণ। ১২৯৮।

সম্প্রির একখানা চিঠি পেয়েছি। সে আমার ভগ্নহৃদয় এবং রুদ্রচণ্ড সমালোচনা করে লিখেছে। পূর্বে ভগ্নহৃদয়ের পক্ষ অবলম্বন করে সে আমার সঙ্গে অনেক তর্ক করত—এবার আমার সঙ্গে তার মতের ঐক্য হয়েছে। অর্থাৎ ভগ্নহৃদয়ের অনেক নিন্দে করেছে। বলেছে ওর কবি মুরলা চপলা প্রভৃতিরা একটা কল্পনা-কাননের লোক...

কলকাতা
২২ নভেম্বর ১৮৯১

৩৭

শিলাইদহ
রবিবার, ৪ জানুয়ারি। ১৮৯২।

কিছু আগেই পাবনা থেকে এঞ্জিনিয়ার তার মেম এবং কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে এসে উপস্থিত। জানিস তো বব্, আতিথ্য করাটা আমার তেমন সহজে আসে না—

মাথা একেবারে ঘুলিয়ে যায়— তা ছাড়া গোটা দুয়েক বাচ্চা সঙ্গে করে নিয়ে আসবে তা আমি জানতুম না। এবারে আমি একলা থাকব বলে খাদ্যদ্রব্যও বিশেষ কিছু সঙ্গে নেই। যা হোক, চোখ কান বুজে যেমন-তেমন করে চালাবার চেষ্টায় আছি। মেম আবার চা খায়, আমার চা নেই— মেম ছেলেবেলা থেকে ডাল দুচক্ষে দেখতে পারে না, আমি অন্য খাদ্যের অভাবে ডাল তৈরি করতে দিয়েছি; মেম ইয়ার্‌স্‌ এন্‌ড্‌ টু ইয়ার্‌স্‌ এন্‌ড্‌ মাছ ছোঁয় না, আমি মাগুর মাছের ঝোল রাঁধিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে আছি। কী ভাগ্যি কান্‌ট্রি সুইট্‌স্‌ ভালোবাসে, তাই একটা বহু-কালের শক্ত শুকনো সন্দেশ বহুকষ্টে কাঁটা দিয়ে ভেঙে খেলে। এক বাক্স বিস্কুট গতবারের রসদের অবশেষস্বরূপে ছিল, সেটা কাজে লাগবে। আমি আবার একটা মস্ত গলদ করেছি— আমি সাহেবকে বলেছি, তোমার মেম চা খায়, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমার চা নেই, কোকো আছে। সে বললে, 'আমার মেম চায়ের চেয়ে কোকো বেশি ভালোবাসে।' আমি আলমারি ঘেঁটে দেখি কোকো নেই— সবগুলোই কলকাতায় ফিরে গেছে। আবার তাকে বলতে হবে, চা'ও নেই কোকোও নেই, পদ্মার জল আর চায়ের কাৎলি আছে— দেখি কিরকম মুখের ভাব হয়। সাহেবের ছেলে দুটো এমন দুরন্ত এবং দুষ্টু দেখতে সে আর কী বলব? মেমটাকে যত বদ দেখতে এবং ছাঁটা-চুল মনে করেছিলুম ততটা নয়— মাঝারি রকম চেহারা। মাঝে মাঝে সাহেবে মেমেতে খুব গুরুতর ঝগড়া হয়ে যাচ্ছে আমি এ বোট থেকে শুনতে পাচ্ছি। ছেলেদের কান্না, চাকর-বাকরদের চেঁচামেচি, এবং দম্পতির তর্ক বিতর্কের জ্বালায় অস্থির হয়ে আছি। আজ আর কোনো কাজকর্ম লেখাপড়ার সুবিধে দেখছি নে। (মেমটা তার ছেলেকে ধমকাচ্ছে : What a little শুয়ার you are!) দেখ্ তো আমার ঘাড়ে এসব উপদ্রব কেন? মেমটা আবার আজ বিকেলে উপরে উঠে বেড়াতে যাবে, আমাকে সঙ্গে যেতে বলছে— এমনি ঝালাফালা হয়ে বসে আছি, আমাকে দেখলে তুই বোধ হয় হেসে অস্থির হয়ে যেতিস— আমি নিজেই এক-একবার আপনার কথা ভেবে বড়ো দুঃখের হাসি হাসছি। একটা মেম বগলে করে জমিদারিতে বেড়ানো কখনো কল্পনা করি নি। প্রজারা খুব আশ্চর্য হয়ে যাবে সন্দেহ নেই। কাল সকালে এদের কোনোমতে বিদায় করতে পারলে বাঁচা যায়, যদি বলে আর একটা দিন থেকে যাব তা হলে মরে যাব বব্।

কলকাতা
৫ জানুয়ারি ১৮৯২

৩৮

শিলাইদহ
সোমবার, ৬ জানুয়ারি। ১৮৯২।

সন্ধে হয়ে গেছে। গরমের সময় যখন বোটে ছিলুম, এই সময়টা বোটের জানলার কাছে বসে আলো নিবিয়ে দিয়ে চুপচাপ পড়ে থাকতুম; নদীর শব্দে, সন্ধ্যার বাতাসে, নক্ষত্র-ভরা আকাশের নিস্তব্ধতায় মনের সমস্ত কল্পনা মধুর আকার ধরে আমাকে ঘিরে বসত; অনেক রাত পর্যন্ত এক প্রকার নিবিড় নির্জন দুঃখ এবং আনন্দে কেটে

যেত। শীতকালের সন্ধেবেলায় সমস্ত প্রকৃতিকে বাইরে ফেলে জানলা দরজা বন্ধ করে বোটের এই ক্ষুদ্র কাষ্ঠময় গহ্বরের মধ্যে একটি বাতি জ্বেলে মনটাকে তেমন দৌড় দিতে পারি নে—যেন নিজের সঙ্গে নিজেকে বড়ো বেশি ঘেঁষাঘেঁষি ঠাসাঠাসি করে থাকতে হয়। এ রকম অবস্থায় আপনার মনটিকে নিয়ে থাকা বড়ো শক্ত। ... সাহিত্যের মধ্যে দুটি মাত্র গল্পের বই এনেছিলুম, কিন্তু এমনি আমার পোড়া কপাল, আজ বিদায় নেবার সময় এঞ্জিনিয়ার সাহেবের মেম সেই দুটি বই ধার নিয়ে গেছেন, কবে শোধ করবেন তার কোনো ঠিকানা নেই। বই দুটো হাতে তুলে নিয়ে সলজ্জ কাকুতির ভাবে তিনি বলতে আরম্ভ করলেন 'মিস্টার টাগোর বুড্ ইয়ু'—কথাটা শেষ করতে না করতে আমি খুব সজোরে ঘাড় নেড়ে বললুম 'সার্টেন্‌লি'। এতে কতটা দূর কী বোঝায় ঠিক বলতে পারি নে। আসলে, তাঁরা তখন বিদায় নিচ্ছিলেন, সেই উৎসাহে আমি আমার আর্ধেক রাজত্ব দিয়ে ফেলতে পারতুম (যে পেত তার যে খুব বেশি লাভ হত তা নয়।) যা হোক, তারা আজ গেছে বব্, আমার এই দুটো দিন একেবারে ঘুলিয়ে দিয়ে গেছে—আবার থিতিয়ে নিতে দুদিন যাবে—মেজাজটা এমনি খারাপ হয়ে আছে যে ভয়ে ভয়ে আছি পাছে কাউকে অন্যায় অকারণে তাড়না করে উঠি—এত বেশি সাবধানে আছি যে সহজ অবস্থায় যখন একজনকে ধমক দিতুম এখন তাকে খুব নরম নরম করে বলছি—মেজাজ বিগড়ে গেলে অনেক সময় আমার এই রকম উল্টো রকম ব্যাপার হয় যে, সে সময়ে ছেলেরা কাছে থাকলে ভয় হয়...পাছে তাদের লঘু দোষে গুরু দণ্ড দিই এই জন্য তাদের দণ্ডই দিই নে, খুব দৃঢ় করে সহিষ্ণুতা অবলম্বন করে থাকি।

কলকাতা
৭ জানুয়ারি ১৮৯২

৩৯

শিলাইদহ
বৃহস্পতিবার, ৯ জানুয়ারি। ১৮৯২।

দুই-এক দিন থেকে এখানকার প্রকৃতি শীত এবং বসন্তের মধ্যে ইতস্ততঃ করছে—সকালে হয়তো উত্তুরে বাতাসে জলে স্থলে হী হী ধরিয়ে দিয়ে গেল—সন্ধেবেলায় শুক্ল পক্ষের জ্যোৎস্নায় দক্ষিনে বাতাসে চারিদিক হু হু করে উঠল। বসন্ত অনেকটা কাছে এসে পৌঁচেছে বেশ বোঝা যাচ্ছে। অনেক দিন পরে আজকাল ও পারের বাগান থেকে একটা পাপিয়া ডাকতে আরম্ভ করেছে। মানুষের মনটাও কতকটা বিচলিত হয়ে উঠছে। আজকাল সন্ধে হলে, ও পারের গ্রাম থেকে গান-বাজনার শব্দ শুনতে পাওয়া যায়—এর থেকে বোঝা যাচ্ছে লোকে দরজা জানলা বন্ধ করে মুড়িসুড়ি দিয়ে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়বার জন্যে তেমন উৎসুক নয়। আজ পূর্ণিমা রাত—ঠিক আমার বাঁ দিকের খোলা জানলার উপরেই একটা মস্ত চাঁদ উঠে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে—বোধ হয় দেখছে আমি চিঠিতে তার সম্বন্ধে কোনো নিন্দে করছি কি না। সে হয়তো মনে করে তার জ্যোৎস্নার চেয়ে তার কলঙ্কের কথা নিয়েই পৃথিবীর লোকে বেশি কানাকানি করে। নিস্তব্ধ চরে

একটা টিটি পাখি ডাকছে—নদী স্থির—নৌকো নেই—জলের উপর স্থির ছায়া ফেলে ও পারের ঘনীভূত বন স্তম্ভিত হয়ে রয়েছে—ঘুমন্ত চোখ খোলা থাকলে যেমন দেখতে হয়, এই প্রকাণ্ড পূর্ণিমার আকাশ সেই রকম ঈষৎ ঝাপসা দেখাচ্ছে। কাল সন্ধ্যা থেকে আবার ক্রমে ক্রমে অন্ধকারের সূত্রপাত হবে—কাল কাছারি সেরে এই ছোটো নদীটি পার হবার সময় দেখতে পাব আমার সঙ্গে আমার এই প্রবাসের প্রণয়িনীর একটুখানি বিচ্ছেদ হয়েছে—কাল যে আমার কাছে আপনার রহস্যময় অপার হৃদয় উদ্ঘাটন করে দিয়েছিল আজ তার মনে যেন একটু সন্দেহ উপস্থিত হয়েছে, যেন তার মনে হচ্ছে একেবারে অতখানি আত্মপ্রকাশ কি ভালো হয়েছিল, তাই হৃদয় আবার একটু একটু করে বন্ধ করছে। বাস্তবিক, বিদেশে বিজন অবস্থায় প্রকৃতি বড়ো কাছাকাছির জিনিস—আমি সত্যি সত্যি দু-তিন দিন ধরে মাঝে মাঝে ভেবেছি, পূর্ণিমার পরদিন থেকে আমি আর এ জ্যোৎস্না পাব না—আমি যেন বিদেশ থেকে আরো একটু বিদেশে চলে যাব, কাজকর্মের পরে প্রতিদিন সন্ধেবেলায় যে-একটি শান্তিময় পরিচিত সৌন্দর্য আমার জন্যে নদীর তীরে অপেক্ষা করে থাকত সে আর থাকবে না—অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে বোটে ফিরে আসতে হবে। ... কিন্তু আজ পূর্ণিমা, এ বৎসরকার বসন্তের এই প্রথম পূর্ণিমা, এর কথাটা লিখে রেখে দিলুম—হয়তো অনেক দিন পরে এই নিস্তব্ধ রাত্রিটি মনে পড়বে—ঐ টিটি পাখির ডাক -সুদ্ধ এবং ও পারের ঐ বাঁধা নৌকোয় যে আলোটি জ্বলছে সেটি-সুদ্ধ—এই একটুখানি উজ্জ্বল নদীর রেখা, ঐ একটুখানি অন্ধকার বনের একটা পোঁচ—এবং ঐ নির্লিপ্ত উদাসীন পাণ্ডুবর্ণ আকাশ—

কলকাতা
১২ জানুয়ারি ১৮৯২

৪০

শিলাইদহ
বুধবার, ১২ ফেব্রুয়ারি। ১৮৯২।

সেদিন একটা কাগজে কালিদাসের একটা শ্লোক তুলে দিয়েছে, পড়ে একটু আশ্চর্য বোধ হল—

রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্
পর্যুৎসুকীভবতি যৎ সুখিতোঽপি জন্তুঃ।
তচ্চেতসা স্মরতি ন নূনমবোধপূর্বং
ভাবস্থিরাণি জননান্তরসৌহৃদানি॥

অস্যার্থ। রম্য বস্তু দেখে এবং মধুর শব্দ শুনে সুখী লোকের প্রাণও এমন পর্যুৎসুক হয় কেন? নিশ্চয়ই মনের অজ্ঞাতসারে পূর্বজন্মের কোনো বন্ধুর কথা মনে পড়ে। কালিদাসের মনটা যে মাঝে মাঝে অকারণে বিকল হয়ে উঠত তা বেশ বোঝা যায়। মেঘদূতেও কবি বলেছেন 'মেঘালোকে ভবতি সুখিনোঽপ্যন্যথাবৃত্তি চেতঃ'—মেঘ দেখলে সুখী লোকেরাও কেমন আনমনা হয়ে যায়। সৌন্দর্য যে মনের মধ্যে একটা নিগূঢ় রহস্যময় অসীম আকাঙ্ক্ষার উদ্রেক করে, যা মনকে জন্ম

থেকে জন্মান্তর পর্যন্ত আকর্ষণ করে নিয়ে যায়, কালিদাসের কবিতার মধ্যে এই ভাবটা পড়ে আমার ভারী আনন্দ হল।...

কলকাতা
১৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৯২

৪১

শিলাইদহ
শুক্রবার, ৭ এপ্রিল। ১৮৯২।

সকাল থেকে সুন্দর বাতাস দিচ্ছে। কোনো কাজ করতে ইচ্ছে করছে না। বোধ হয় এগারোটা কিম্বা সাড়ে এগারোটা বেজে গেছে। কিন্তু এ পর্যন্ত লেখাপড়া কিম্বা কোনো কাজে হাত দিই নি। সকাল থেকে একটি চৌকিতে স্থির হয়ে বসে আছি। মাথার মধ্যে কত টুকরো টুকরো লাইন এবং কত অসমাপ্ত ভাব যাতায়াত করছে, কিন্তু সেগুলোকে একত্র করে বাঁধি কিম্বা পরিস্ফুট করে তুলি এমন শক্তি অনুভব করছি নে। তোর সেই গানটা মনে পড়ছে পায়েরিয়া বাজে ঝনক ঝনক ঝন ঝন-নন নন নন—সুন্দর সকাল বেলায় মধুর বাতাসে নদীর মাঝখানে মাথার মধ্যে সেই রকম ঝননন নূপুর বাজছে, কিন্তু সে কেবল এ দিক ও দিক থেকে, অন্তরালে—কেউ ধরা দিচ্ছে না, দেখা দিচ্ছে না। তাই চুপচাপ করে বসে আছি। কিরকম জায়গায় আছি জানিস? নদীর জল অনেকটা শুকিয়ে এসেছে, কোথাও এক কোমরের বেশি জল আর প্রায় নেই, তাই বোটটাকে নদীর প্রায় মাঝখানে বেঁধে রাখা কিছুই শক্ত হয় নি। আমার ডান দিকের পারে চরের উপর চাষারা চাষ করছে এবং মাঝে মাঝে গোরুকে জল খাইয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আমার বাম পারে শিলাইদহের নারকেল এবং আম -বাগান, ঘাটে মেয়েরা কাপড় কাচছে, জল তুলছে, স্নান করছে, এবং উচ্চৈঃস্বরে বাঙাল ভাষায় হাস্যালাপ করছে—যারা অল্পবয়সী মেয়ে তাদের জলক্রীড়া আর শেষ হয় না—একবার স্নান সেরে উপরে উঠছে আবার ঝুপ্‌ করে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ছে—তাদের নিশ্চিন্ত উচ্চহাস্য শুনতে বেশ লাগে। পুরুষরা গম্ভীর ভাবে এসে গোটাকতক ডুব মেরে তাদের নিত্যকর্ম সমাপ্ত করে চলে যায়—কিন্তু মেয়েদের যেন জলের সঙ্গে বেশি ভাব। পরস্পরের যেন একটা সাদৃশ্য এবং সখিত্ব আছে—জল এবং মেয়ে উভয়েই বেশ সহজে ছল্‌ছল্‌ জ্বল্‌-জ্বল্‌ করতে থাকে, একটা বেশ সহজ গতি ছন্দ তরঙ্গ এবং সংগীত আছে—সকল পাত্রেই আপনাকে স্থাপন করতে পারে—দুঃখতাপে অল্পে অল্পে শুকিয়ে যেতে পারে কিন্তু আঘাতে একেবারে জন্মের মতো দুখানা হয়ে ভেঙে যায় না। সমস্ত কঠিন পৃথিবীকে সে বাহুবন্ধনে আলিঙ্গন করে আছে, পৃথিবী তার অন্তরের গভীর রহস্য বুঝতে পারে না; সে নিজে শস্য উৎপাদন করে না, কিন্তু ভিতরে ভিতরে সে না থাকলে পৃথিবীতে একটি ঘাসও গজাতে পারত না। মেয়েকে পুরুষের সঙ্গে তুলনা করে টেনিসন বলেছেন : water unto wine। আমার আজকের মনে হচ্ছে : জল unto স্থল। তাই জন্যে মেয়েতে জলেতে বেশ মিশ খায়—অন্য অনেক রকম ভার বহন মেয়েকে শোভা পায় না, কিন্তু উৎস থেকে, কুয়ো থেকে, ঘাট থেকে জল তুলে নিয়ে যাওয়া কোনো কালেই মেয়েদের পক্ষে অসংগত মনে হয় না। গা

ধোওয়া, স্নান করা, পুকুরের ঘাটে এক-কোমর জলে বসে পরস্পর গল্প করা, এ সমস্ত মেয়েদের পক্ষে কেমন শোভনীয়। আমি দেখেছি মেয়েরা জল ভালোবাসে, কেননা উভয়ে স্বজাত। অবিশ্রাম সহজ প্রবাহ এবং কলধ্বনি জল এবং মেয়ে ছাড়া আর কারও নেই। ইচ্ছে করলে আরও অনেক সাদৃশ্য দেখানো যেতে পারত, কিন্তু বেলাও বোধ করি অনেক হয়েছে, এবং একটা কথাকে নিয়ে বেশি নেংড়ানো কিছু নয়।

কলকাতা
৮ এপ্রিল ১৮৯২

৪২

শিলাইদহ
শনিবার, ৮ এপ্রিল। ১৮৯২।

এখানে এসে আমি এত এলিমেন্ট্‌স্‌ অফ পলিটিক্স্‌ এবং প্রব্লেম্‌স্‌ অফ দি ফ্যুচার পড়ছি শুনে বোধ হয় তোর খুব আশ্চর্য ঠেকতে পারে। আসল কথা, ঠিক এখানকার উপযুক্ত কোনো কাব্য নভেল খুঁজে পাই নে। যেটা খুলে দেখি সেই ইংরিজি নাম, ইংরিজি সমাজ, লন্‌ডনের রাস্তা এবং ড্রয়িংরুম, এবং যতরকম হিজিবিজি হাঙ্গাম। বেশ সাদাসিধে সহজ সুন্দর উন্মুক্ত দরাজ এবং অশ্রুবিন্দুর মতো উজ্জ্বল কোমল সুগোল করুণ কিছুই খুঁজে পাই নে। কেবল প্যাঁচের উপর প্যাঁচ, অ্যানালিসিসের উপর অ্যানালিসিস—কেবল মানবচরিত্রকে মুচড়ে নিংড়ে কুঁচকে-মুচকে তাকে সজোরে পাক দিয়ে দিয়ে তার থেকে নতুন নতুন থিয়োরি এবং নীতিজ্ঞান বের করবার চেষ্টা। সেগুলো পড়তে গেলে আমার এখানকার এই গ্রীষ্মশীর্ণ ছোটো নদীর শান্ত স্রোত, উদাস বাতাসের প্রবাহ, আকাশের অখণ্ড প্রসারতা, দুই কূলের অবিরল শান্তি, এবং চারি দিকের নিস্তব্ধতাকে একেবারে ঘুলিয়ে দেবে। এখানে পড়বার উপযোগী রচনা আমি প্রায় খুজে পাই নে, এক বৈষ্ণব কবিদের ছোটো ছোটো পদ ছাড়া। বাংলার যদি কতকগুলি ভালো ভালো মেয়েলি রূপকথা জানতুম এবং সরল ছন্দে সুন্দর করে ছেলেবেলাকার ঘোরো স্মৃতি দিয়ে সরস করে লিখতে পারতুম তা হলে ঠিক এখানকার উপযুক্ত হত। বেশ ছোটো নদীর কলরবের মতো, ঘাটের মেয়েদের উচ্চহাসি মিষ্টকণ্ঠস্বর এবং ছোটোখাটো কথাবার্তার মতো, বেশ নারকেলপাতার ঝুরুঝুরু কাঁপুনি আম-বাগানের ঘন ছায়া এবং প্রস্ফুটিত সর্ষেক্ষেতের গন্ধের মতো—বেশ সাদাসিধে অথচ সুন্দর এবং শান্তিময়—অনেকখানি আকাশ আলো নিস্তব্ধতা এবং সকরুণতায় পরিপূর্ণ! মারামারি হানাহানি যোঝাযুঝি কান্নাকাটি সে-সমস্ত এই ছায়াময় নদীস্নেহবেষ্টিত প্রচ্ছন্ন বাংলাদেশের নয়। যাই হোক, এলিমেন্ট্‌স্‌ অফ পলিটিক্স্‌ জলের উপরে তেলের মতো এখানকার নিস্তব্ধ শান্তির উপর দিয়ে অবাধে ভেসে চলে যায়, একে কোনো রকমে নাড়া দিয়ে ভেঙে দেয় না। ... নদীর মাঝখানে বসে আছি, দিনরাত্রি হু হু করে বাতাস দিচ্ছে, দুই দিকের দুই পার পৃথিবীর দুটি আরম্ভ-রেখার মতো বোধ হচ্ছে, ওখানে জীবনের কেবল আভাস মাত্র দেখা দিয়েছে, জীবন সুতীব্র ভাবে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে নি—যারা জল

তুলছে, স্নান করছে, নৌকো বাচ্ছে, গোরু চরাচ্ছে, মেঠো পথ দিয়ে আসছে যাচ্ছে, তারা যেন যথেষ্ট জীবন্ত সত্য নয়। অন্য জায়গায় মানুষরা ভিড় করে, তারা সামনে উপস্থিত হলে চিন্তার ব্যাঘাত করে, তাদের অস্তিত্বই যেন কনুই দিয়ে ঠেলা দেয়, তারা প্রত্যেকে এক-একটি পজিটিভ মানুষ; এখানকার এরা সম্মুখে আনাগোনা চলাবলা কাজকর্ম করছে— কিন্তু মনকে ঠেলা দিয়ে যাচ্ছে না। কৌতূহলে সামনে দাঁড়িয়ে দেখছে, কিন্তু সেই সরল কৌতূহল ভিড় করে গায়ের উপর এসে পড়ছে না। যা হোক, বেশ লাগছে।

কলকাতা
৯ এপ্রিল ১৮৯২

৪৩

বোলপুর
শনিবার, ২ জ্যৈষ্ঠ। ১২৯৯।

জগৎসংসারে অনেকগুলো প্যারাডক্স্ আছে, তার মধ্যে এও একটি যে, যেখানে বৃহৎ দৃশ্য, অসীম আকাশ, নিবিড় মেঘ, গভীর ভাব, অর্থাৎ যেখানে অনন্তের আবির্ভাব সেখানে তার উপযুক্ত সঙ্গী এক জন মানুষ— অনেকগুলো মানুষ ভারী ক্ষুদ্র এবং খিজিবিজি। অসীমতা এবং একটি মানুষ উভয়ে পরস্পরের সমকক্ষ— আপন আপন সিংহাসনে পরস্পর মুখোমুখি বসে থাকবার যোগ্য। আর, কতকগুলো মানুষে একত্রে থাকলে তারা পরস্পরকে ছেঁটে ছুঁটে অত্যন্ত খাটো করে রেখে দেয়— একজন মানুষ যদি আপনার সমস্ত অন্তরাত্মাকে বিস্তৃত করতে চায় তা হলে এত বেশি জায়গার আবশ্যক করে যে কাছাকাছি পাঁচ ছ জনের স্থান থাকে না। আমার বিবেচনায়, যদি বেশ ভালো করে ধরাতে চাও, তা হলে বিশ্বসংসারে খুব অন্তরঙ্গ দুটি মাত্রকে ধরে— তার বেশি জায়গা নেই— তার অধিক লোক জোটাতে গেলেই পরস্পরের অনুরোধে আপনাকে সংক্ষেপ করতে হয়— যেখানে যতটুকু ফাঁক সেইখানে ততটুকু মাথা গলাতে হয়। মাঝের থেকে, দুই বাহু প্রসারিত ক'রে দুই অঞ্জলি পূর্ণ করে প্রকৃতির এই অগাধ অনন্ত বিস্তীর্ণতাকে গ্রহণ করতে পারছি নে।

কলকাতা
১৬ মে ১৮৯২

৪৪

বোলপুর
১৫ মে ১৮৯২

বেলি স্পষ্টই বলছে সে বিলেতের নিচেই বোলপুর ভালোবাসে, খোকাও সেই মতে ডিটো দিয়ে যাচ্ছে— রেণুকা কোনোপ্রকার ব্যক্ত শব্দে আপন মনের ভাব প্রকাশ

করতে পারছে না। দিবানিশি নানা প্রকার অব্যক্ত ধ্বনি উচ্চারণ করছে, এবং তাকে সামলে রাখা দায় হয়েছে।—সে কেবল চতুর্দিকেই অঙ্গুলিনির্দেশ করছে এবং অঙ্গুলির অনুগামী হবার চেষ্টা করছে—আমার সঙ্গে যে এক রেজিমেন্ট্ ভৃত্য এসেছে সকলেই প্রায় সেই ক্ষুদ্র মহাপ্রভুকে নিয়েই নিযুক্ত আছে—এই ভৃত্যদের কর্তৃক তার দুরন্ত বেগবান ইচ্ছাসকল ক্রমাগত প্রতিহত হয়ে প্রতি মুহূর্তে তীব্র আর্তনাদে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে।—আমার পুত্রসন্তানটি নিস্তব্ধ নীরব স্থিরভাবে নির্নিমেষে তাকিয়ে আছে—কী ভাবছে তা কারও বোঝবার জো নাই।...

কলকাতা
১৬ মে ১৮৯২

৪৫

বোলপুর
মঙ্গলবার, ৫ জ্যৈষ্ঠ। ১২৯৯।

‘জগতে কেহ নাই, সবাই প্রাণে মোর’—ও একটা বয়সের একটা বিশেষ অবস্থা। যখন হৃদয়টা সব-প্রথম জাগ্রত হয়ে দুই বাহু বাড়িয়ে দেয় তখন মনে করে সে যেন সমস্ত জগৎটাকে চায়। যেমন নবদন্তোদ্‌গতা রেণুকা মনে করছেন সমস্ত বিশ্বসংসার তিনি গালে দিতে পারেন—ক্রমে ক্রমে বুঝতে পারা যায় মনটা যথার্থ কী চায় এবং কী চায় না। তখন সেই পরিব্যাপ্ত হৃদয়বাষ্প সংকীর্ণ সীমা অবলম্বন করে, জ্বলতে এবং জ্বালাতে আরম্ভ করে। একেবারে সমস্ত জগৎটা দাবি করে বসলে কিছুই পাওয়া যায় না—অবশেষে একটা কোনো-কিছুর ভিতরে সমস্ত প্রাণ মন দিয়ে নিবিষ্ট হতে পারলে তবেই অসীমের মধ্যে প্রবেশ লাভ করা যায়। প্রভাতসংগীতে আমার অন্তর্‌প্রকৃতির প্রথম বহির্মুখী উচ্ছ্বাস, সেই জন্যে ওটাতে আর কিছুমাত্র বাচবিচার বাধাব্যবধান নেই। এখনো আমি সমস্ত পৃথিবীকে এক রকম ভালোবাসি—কিন্তু সে এ রকম উদ্দামভাবে নয়—আমার ভালোবাসার জ্যোতিষ্কলোক থেকে একটা দীপ্তি প্রতিফলিত হয়ে সমস্ত মানবের উপর পড়ে—সেই দীপ্তিতে এক-এক সময় পৃথিবীটা ভারী সুন্দর এবং ভারী আপনার বোধ হয়। যাদের খুব ভালোবাসা যায় তারা সীমাবদ্ধভাবে আমাদের মনের গতিরোধ করে না, তাদের মধ্যে আমাদের হৃদয় চিরকাল সঞ্চরণ করতে পারে—যাদের আমরা ততটা ভালোবাসি নে, তারা আমাদের কাছে অসীম নয়। তাদের আমরা আংশিকভাবে দেখি, তারা যতটুকু প্রতীয়মান কেবল ততটুকু, এই জন্যে তারা ঘেঁষাঘেঁষি করে থাকলে অস্বচ্ছ দেয়ালের মতো আমাদের চার দিক থেকে রুদ্ধ করে রাখে, মনকে কোনো-একটা চিন্তার প্রসারতার মধ্যে ব্যাপ্ত করতে গেলে পদে পদে তাদের উপরে গিয়ে ঠেকে যায়, এবং আপনার মধ্যে সে বিরক্তভাবে ফিরে আসে। এই জন্যে সকল সময়ে সাধারণের সঙ্গ ভালো লাগে না। যখন ঘরে আছি তখন দেয়াল বেশ লাগে, এমন-কি, তখন দেয়াল না হলে চলে না। যখন বাইরে গেছি তখন সঙ্গে সঙ্গে দেয়াল চললে আদবে ভালো লাগে না। অতএব লোকারণ্যের উপর বিরক্তি প্রকাশ করছি বলে মনে করিস নে আমি একেবারে

মিস্যান্‌থ্রোপ্‌' হয়ে গেছি—আমি কেবল এইটুকু বলতে চাই, এক-একটা সময় আসে যখন এতগুলো লোক না থাকলে বেশ চলে যায়।...আমার যে কিছুমাত্র ধৈর্য নেই বব্‌। সেটা বোধ হয় পুরুষ-মানুষের একটা লক্ষণ—তারা একেবারে হুড়মুড় করে সমস্তটা নিকেশ করে ফেলতে চায়, বেশ ধীরে নিঃশব্দে সুচারু সুনিপুণ সুন্দররূপে কিছু করে উঠতে পারে না—পৃথিবীতে চিরকাল মজুরের কাজ করে করে তাদের এই দশা হয়েছে। মেয়েরা আজকাল পুরুষদের এই-সকল মজুরি কার্যভার লাঘব করবার চেষ্টায় আছে, তা হলে আমাদের পরুষ নীরস স্বজাতীয়ের পক্ষে মন্দ হয় না—একটুখানি চারুতা চর্চা করবার অবকাশ পাওয়া যায়—কিন্তু এই প্রকাণ্ডকায় হতভাগারা সে দিকে যে বেশি মন দেবে তা মনে হয় না—বোধ হয় অধিক সময় পেলে অজগরের মতো আহার করবে এবং অজগরের মতো নিদ্রা দেবে। অদূর ভবিষ্যতে পুরুষ-জাতির ভারী একটা লাঞ্ছনার সময় আসছে বলে মনে হয়। সভ্যতা ক্রমেই এমন সুকুমার সূক্ষ্মতার দিকে যাচ্ছে যে, এই মোটা জন্তুগুলো ভারী ফাঁপরে পড়বে। পৃথিবীর আদিম অবস্থাতেই ম্যামথ্‌ ম্যাস্টডন প্রভৃতি বিপুলকায় প্রাণীর প্রাদুর্ভাব ছিল—তাদের জোরই বা কত—চামড়াই বা কী শক্ত—তারা তো সব উচ্ছন্ন গেল। এখন কঁচি-চামড়া সাড়েতিন-হাত মনুষ্য পৃথিবীর রাজা। কিন্তু আমাদের সময় প্রায় হয়ে এসেছে—এখন আরও কঁচির আবশ্যক।...

কলকাতা
১৮ মে ১৮৯২

৪৬

বোলপুর
বুধবার, ৬ জ্যৈষ্ঠ। ১২৯৯।

সেদিন সন্ধেবেলায় খোকাতে বেলাতে একটা বিষয় নিয়ে তর্ক হয়ে গেছে, সেটা উদ্‌ধৃত করবার যোগ্য। খোকা বললে—'বেলা, আমার জল ক্ষিধে পেয়েছে।' বেলা বললেন—'দূর ফোক্‌লা, জল ক্ষিধে বুঝি বলে! জল তেষ্টা।' খোকা অত্যন্ত দৃঢ়স্বরে—'না, জল ক্ষিধে।' বেলা—'অ্যাঁ খোকা! আমি তোর চেয়ে তিন বছরের বড়ো, তুই আমার চেয়ে দু বছরের ছোটো, তা জানিস! আমি তোর চেয়ে কত বেশি জানি!' খোকা সন্দিগ্ধভাবে—'তুমি এত বড়ো!' বেলা—'আচ্ছা, বাবাকে জিজ্ঞাসা কর্‌।' খোকা অকস্মাৎ উৎসাহিত হয়ে উঠে—'তেমনি আমি যে দুধ খাই, তুমি যে দুধ খাও না।' বেলা অবজ্ঞাভরে—'তাতে কী! মা তো দুধ খায় না, তাই বলে কি মা তোর চেয়ে বড় নয়!' খোকা সম্পূর্ণ নিরুত্তর, এবং বালিশে মাথা রেখে চিন্তান্বিত। তখন বেলা বকতে আরম্ভ করলে, 'O father, একজনের সঙ্গে আমার ভয়ানক ভয়ানক friendship। সে পাগলি, সে এমন মিষ্টি! Oh I can eat her up!' বলে ছুটে রেণুকে গিয়ে এক পত্তন চট্‌কে চুমো খেয়ে কাঁদিয়ে দিয়ে এল।

কালকের বেলা বড়ো ব্যথিত হয়ে এসেছিল। ঘটনাটা হচ্ছে, কাল স্বয়ম্প্রভারা

ছোটো বাংলাতে মাছের তরকারি রাঁধতে গিয়েছিল। সেখানে একটা পাগল কতকগুলো আম নিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল— ছোটোবউ স্বয়ম্প্রভারা ভয় পেয়ে তাকে বিদায় করে দেয়। আমি দোতলার ঘরে চুপ্‌চাপ্‌ শুয়েছিলুম। বেলা ছোটো বাংলা থেকে ফিরে এসে আমাকে কাতরভাবে বলতে লাগল, 'বাবা, একজন ভারী গরিব লোক, বেচারার ক্ষিধে পেয়েছে, তাই আম নিয়ে নিচের বাংলায় বসেছিল, তাকে লাঠি নিয়ে তাড়িয়ে দিলে।' বারবার করে বলতে লাগল, 'বেচারা ভারী গরিব, তার কিচ্ছু নেই, এতটুকু একটু কাপড় পরা, বোধ হয় শীতকালে কিচ্ছু পরতে পায় না, তার শীত করে। সে তো কিচ্ছু দোষ করে নি। তার নাম জিজ্ঞাসা করলে, সে নাম বললে। বললে সে স্বর্গে থাকে। তাকে তাড়িয়ে দিলে, সে বেচারা কিচ্ছু বললে না। অমনি চলে গেল।'— আমার এমনি মিষ্টি লাগল! বেলিটার বাস্তবিক ভারী দয়া। কাল সে এমন সত্যিকার কাতরতার সঙ্গে বললে— এই অনর্থক নিষ্ঠুরতা তার কাছে এমনি অকারণ বোধ হয়েছিল! শুনে আমার মনটা ভারী আর্দ্র হয়েছিল। বেলিটা বড়ো হলে খুব স্নেহময়ী সরলস্বভাব লক্ষ্মী মেয়ে হবে। খোকাটারও ভারী স্নেহশীল ভাব। রেণুকে সে এমনি ভালোবাসে। এমনি মিষ্টি মিষ্টি করে আদর করে, তার সমস্ত উপদ্রব এমন সহিষ্ণুভাবে সহ্য করে যায় যে, অনেক মাও এমন পারে না।

কলকাতা
১৯ মে ১৮৯২

৪৭

বোলপুর
শুক্রবার, ৮ জ্যৈষ্ঠ। ১২৯৯।

রসিকতা জিনিসটা বড়ো বিপদের জিনিস— ও যদি প্রসন্ন সহাস্য মুখে আপনি ধরা দিলে তো অতি উত্তম, আর ওকে নিয়ে যদি টানাটানি করা যায় তবে বড়োই 'ব্যাভ্রম' হবার সম্ভাবনা। হাস্যরস প্রাচীন কালের ব্রহ্মাস্ত্রের মতো, যে ওর প্রয়োগ জানে সে ওকে নিয়ে একেবারে কুরুক্ষেত্র বাধিয়ে দিতে পারে— আর যে হতভাগ্য ছুঁড়তে জানে না অথচ নাড়তে যায়, তার বেলায় 'বিমুখ ব্রহ্মাস্ত্র আসি অস্ত্রীকেই বধে', হাস্যরস তাকেই হাস্যজনক করে তোলে।... মেয়েরা রসিকতা করতে গিয়ে যদি মুখরা হয়ে পড়ে তবে সেটা ভারী অশোভন দেখতে হয়। আমার তো মনে হয় 'কমিক' হতে চেষ্টা করে সফল হলেও মেয়েদের সাজে না— নিষ্ফল হলেও মেয়েদের সাজে না। কারণ 'কমিক' জিনিসটা ভারী গাব্‌দা এবং প্রকাণ্ড। 'সাব্লিমিটি'র সঙ্গে 'কমিক্যালিটি'র একটা আত্মীয়তার সম্পর্ক আছে— সেই জন্যে হাতি কমিক, উট কমিক, জিরাফ কমিক, স্থূলতা কমিক। সৌন্দর্যের সঙ্গে বরঞ্চ প্রখরতা শোভা পায়, যেমন ফুলের সঙ্গে কাঁটা— তেমনি শাণিত কথা মেয়েদের মুখে বড্ড বাজে বটে তেমনি সাজেও বটে। কিন্তু যে-সকল বিদ্রূপে কোনো রকম স্থূলত্বের আভাসমাত্র দেয় তার দিক দিয়েও মেয়েদের যাওয়া উচিত হয় না; সে হচ্ছে আমাদের সাব্লাইম (চন্দ্রনাথ বাবুর ভাষায়— 'বিরাট') স্বজাতীয়ের জন্যে।

পুরুষ ফল্‌স্টাফ আমাদের হাসিয়ে নাড়ী ছিঁড়ে দিতে পারে, কিন্তু মেয়ে ফল্‌স্টাফ আমাদের গা জ্বালিয়ে দিত।

কলকাতা
২১ মে ১৮৯২

৪৮

বোলপুর
শনিবার, ৯ জ্যৈষ্ঠ। ১২৯৯।

কাল যে ঝড় সে আর কী বলব। আমার সাধনার নিত্যনৈমিত্তিক লেখা সেরে চা খাবার জন্যে উপরে যাচ্ছি, এমন সময়ে প্রচণ্ড ঝড় এসে উপস্থিত। ধুলোয় আকাশ আচ্ছন্ন হয়ে গেল এবং বাগানের যত শুকনো পাতা একত্র হয়ে লাটিমের মতো বাগান-ময় ঘুরে ঘুরে নেচে নেচে বেড়াতে লাগল—যেন অরণ্যের যত প্রেতাত্মাগুলো হঠাৎ জেগে উঠে ভুতুড়ে নাচন নাচতে আরম্ভ করে দিলে। বাগানের সমস্ত গাছপালা পায়ে-শিকলি-বাঁধা প্রকাণ্ড জটায়ু পাখির মতো ডানা আছড়ে ঝট্‌পট্‌ ঝট্‌পট্‌ করতে লাগল। সে কী গর্জন, কী মাতামাতি, কী একটা হুটোপুটি ব্যাপার! ঝড়টা দেখে আমার মনে পড়ছিল, অ্যামেরিকার ranch সম্বন্ধে মাঝে মাঝে যে রকম বর্ণনা পড়া যায়—হঠাৎ কোনো-একটা বেড়া ভেঙে ফেলে ছ-সাত শো বুনো ঘোড়া ধুলো উড়িয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালাচ্ছে, আর তার পিছনে পিছনে তাদের তাড়িয়ে ফিরিয়ে আনবার জন্যে বড়ো বড়ো ফাঁস হাতে অনেকগুলো অশ্বারোহী ছুটেছে— মাঝে মাঝে যেখানে যাকে পাচ্ছে সাঁই সাঁই শব্দে দিচ্ছে চাব্‌কে—বোলপুরের অবারিত আকাশ এবং মাঠের মধ্যে যেন সেই রকমের একটা উচ্ছৃঙ্খল পলায়ন এবং পশ্চাদ্ধাবন চলছে—দৌড় দৌড়, ধর্‌ ধর্‌, পালা পালা, হুড়্‌হুড়্‌ দুড়্‌দাড়্‌ ব্যাপার। এখানকার যত চাকর-বাকর সব মন্দির সামলাতে ব্যস্ত—পাছে সেই রঙিন কাঁচের বুদ্‌বুদটি ভেঙেচুরে ফেটে যায়। তাকে খুব মজবুত কাপড়ের বড়ো বড়ো পর্দা দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে—কিন্তু ঝড়ের চোটে পর্দা কুটিকুটি হয়, দড়ি টুকরো টুকরো হয়ে ছিঁড়ে যায়, পর্দার কাষ্ঠদণ্ডগুলো ভেঙে খান্‌খান্‌ হয় এবং সেইগুলো আছড়ে আছড়ে মন্দিরের কাঁচ চুর্‌মার হয়ে যায়। ইতিপূর্বে একটা ঝড়ের সময় সেই পর্দার লাঠি খেয়ে মন্দিররক্ষকের মাথা ফেটে গিয়েছিল। উপরে গিয়ে দেখি এই ঘোরতর বিপ্লবের সময়ে আমার পুত্রটি উত্তরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে রেলিঙের মধ্যে তাঁর ক্ষুদ্র অপরিণত নাসিকাটি প্রবেশ করিয়ে দিয়ে নিস্তব্ধভাবে এই ঝড়ের আঘ্রাণ এবং আস্বাদ গ্রহণে নিযুক্ত আছেন। বেগে বৃষ্টি পড়তে লাগল, আমি খোকাকে বললুম, 'খোকা, তোর গায়ে জলের ছাঁট লাগবে, এইখানে এসে চৌকিতে বোস্‌'—খোকা তার মাকে ডেকে বললে, 'মা, তুমি চৌকিতে বোসো, আমি তোমার কোলে বসি।' বলে মায়ের কোল অধিকার করে নীরবে বর্ষাদৃশ্য সম্ভোগ করতে লাগল। খোকা যে চুপচাপ করে বসে বসে কী ভাবে এবং আপন মনে হাসে এবং মুখভঙ্গী করে এক-এক সময় তার আভাস পাওয়া যায়—বোঝা যায় সেও তার এই অতি ক্ষুদ্র জীবনের

যৎসামান্য গুটিকতক পূর্বস্মৃতি নিয়ে নাড়াচাড়া করে। দেখেছি এক-এক সময়ে কোনো কথা নেই বার্তা নেই হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে বসে, 'বাবা, শিলাইদয়ে নদী ছিল—না?' অনেক চিন্তার অবসানে হঠাৎ মাকে বলে, 'মা, শিলাইদয়ে আমরা বেশ ছিলুম।' সেদিন ছোটোবউকে জিজ্ঞাসা করছিল, 'আজ কী বার?' ছোটো-বউ বললেন রবিবার। খোকা বললে, 'আজ তা হলে শিলাইদয়ে স্টীমার চলছে না।' সব চেয়ে, খোকাতে রেণুতে যে রকম কাণ্ড চলে দেখতে বেশ লাগে। রেণু যদি দেখলে খোকা কোথাও চুপচাপ করে শুয়ে আছে অমনি তার ঘাড়ের উপর পড়ে তার মুখের উপর মুখ রেখে তাকে চুমো খেয়ে তার চুল ধরে টেনে তাকে মেরে তার প্রতি ভয়ানক সোহাগের উৎপীড়ন আরম্ভ করে দেয়—খোকাটা এমনি স্নেহময় মিষ্টি করে তাকে 'রানী' 'রানী' বলে আদর করে এবং সমস্ত সহ্য করে! খোকাটাকে ঘুমোতে দেখলেই রেণুটা তাকে মারপিট টানাটানি ঠেলাঠেলি করতে থাকে—খোকা তাকে অনুনয় করে বলে, 'রানী, আমাকে একটু ঘুমোতে দে।' কিন্তু যখন দেখে রেণু কিছুতেই তাকে ছাড়ে না তখন উঠে বসে তার সঙ্গে খেলা করতে আরম্ভ করে, কিছুমাত্র বিরক্তি প্রকাশ করে না। কিন্তু বেলির সঙ্গে ওদের দুজনের তেমন বিশেষ ভাব নেই—রেণু তো প্রায় সর্বদাই অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাবে বেলির প্রতি আপনার রাজকীয় অসন্তোষ প্রকাশ করে থাকে। মনে হয় বেলির সঙ্গে যেন ওদের স্বভাবের মিল নেই—বেলিটা ওদের দল ছাড়া।

কলকাতা
২২ মে ১৮৯২

৪৯

বোলপুর
রবিবার, ১০ জ্যৈষ্ঠ। ১২৯৯।

কাল বিকেলে ভয়ানক বৃষ্টি বাদল দুর্যোগ গেছে, সেটা আক্ষেপের বিষয় নয়। বরঞ্চ ভালোই; গাছপালাগুলো এবং পৃথিবীর তৃণ-আবরণ বেশ একটু সবুজ চিক্‌চিকে টস্‌টসে হয়ে উঠুক। দেখে চোখ জুড়োক। আকাশের এক প্রান্ত থেকে আর-এক প্রান্ত স্নিগ্ধ সজল মেঘে আচ্ছন্ন হয়ে যাক—বনভূমি গাঢ় ছায়ায় অন্ধকার হয়ে আসুক, অবিরল বৃষ্টিধারা দিক্‌বধূদের অবগুণ্ঠন রচনা করে দিক, ঘন পল্লবের উপর ঝর্‌ঝর্‌ বৃষ্টিপতনের শব্দে অরণ্য মুখরিত হয়ে উঠুক, ছোটো বড়ো ক্ষণজীবন জলস্রোত বিচিত্র লীলা ও কলরবে নিশ্চল বিস্তীর্ণ ভূমিকে চারি দিক থেকে শৈশবচাঞ্চল্যে সজীব করে তুলুক। হয়েওছে সেই রকম। আজ সকালে সমস্ত আকাশ জলভারাক্রান্ত মেঘে যেন নত হয়ে পড়ছে, এবং দিগ্‌বিদিক্‌ বর্ষার ছায়ায় সুস্নিগ্ধ হয়ে রয়েছে।... ...খোকাটা ভালো করে কথা কইতে পারে না বলে ওর মনের যা কিছু মনেই থেকে যায়, এবং সমস্ত উদ্যম মনের ভিতরে ক্রমিক কাজ করে, এইজন্যে ওর মনে চিন্তার রেখাগুলো খুব গভীর হয়ে পড়ে। বেলা ক্রমিক কথা কয়ে কয়ে ভালো করে কিছু ভাববার এবং ধারণা করবার অবসর পায় না—ওর সমস্ত মানসিক শক্তি অবিরল বাক্য রচনা করতেই নিঃশেষিত হয়ে

যায়। কিন্তু ওর মনটি ভারী দয়ার্দ্র—খোকা সেদিন একটা পিঁপড়ে মারতে যাচ্ছিল দেখে ও নিষেধ করবার কত চেষ্টা করলে। দেখে আমার ভারী আশ্চর্য বোধ হল—আমার ছেলেবেলায় ঠিক ঐ রকম ভাব ছিল, কীটপতঙ্গকেও কষ্ট দেওয়া আমি সহ্য করতে পারতুম না। কিন্তু বড়ো হয়ে তার চেয়ে কত কঠিন হয়ে গেছি। মনে আছে তখন পরদুঃখে বড়ো মর্মান্তিক ক্লেশ পেতুম। এখন আর কৈ তেমন হয়? বেলা বড় হয়ে এলেও কি এই রকম ক্রমশঃ কঠিন হয়ে আসবে? তা না হতেও পারে—ও কিনা মেয়ে। এক তো ওকে নিজের হাতে কোনো নিষ্ঠুরতার কাজ করতে হবে না, তা ছাড়া মেয়েদের মনে চিরকালই একটা ইল্যাস্টিসিটি থাকে, একেবারে পেকে শক্ত হয়ে যায় না। আমি ছেলেবেলায় জীবের কষ্ট সম্বন্ধে যে রকম অতিসচেতন ছিলুম সে রকম ভাব এখনও থাকলে পৃথিবীতে পদক্ষেপ করা দায় হয়ে উঠত; বোধ হয় পিয়ের লটির মতো কেবলই বেদনা ও মৃত্যুর দ্বারা আহত হয়ে পদে পদে কেবল ঐ নিয়েই বিলাপ পরিতাপ করতুম। সে বড়ো উৎপাত! তা ছাড়া, যে-সকল বিষয়ে সাধারণতঃ লোকে কোনো ব্যথা অনুভব করে না সে সম্বন্ধে নিজের বেদনা প্রকাশ করলে অন্য লোকে অত্যন্ত চটে ওঠে; তারা মনে করে, এ লোকটা আমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠতা প্রকাশ করবার চেষ্টা করছে। মনে আছে, আমার বড়োরা যখন দয়ার পাত্রকে দয়া করতেন না তখন আমার একটা কিছু যথাসাধ্য বলতে কিম্বা করতে ইচ্ছে করত, কিন্তু ঐ লজ্জায় করতে পারতুম না—পাছে তাঁরা মনে করতেন, 'ইস্, ইনি যে ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির হয়ে আমাদের সকলের উপরে টেক্কা দিতে এসেচেন!' মানসিক অনুভবশক্তি সম্বন্ধে নিজের চতুর্দিকের চেয়ে অধিক চেতনাসম্পন্ন হওয়া ভারী আপদের। প্রথমে সেটাকে গোপন করা এবং অবশেষে সেটাকে কমিয়ে আনাই হচ্ছে সুযুক্তিসংগত। মনে আছে, ছেলেবেলায় একদিন জ্যোতিদাদার সঙ্গে গাড়িতে যাচ্ছি, পথিমধ্যে একজন ব্রাহ্মণ পথিক আমাদের গাড়ি থামিয়ে বললে, 'আপনারা আমাকে গাড়িতে একটু স্থান দিতে পারেন? আমি পথের মধ্যে নেবে যাব।' জ্যোতিদাদা ভারী রাগ করে তাকে তাড়িয়ে দিলেন। আমি সেই ঘটনায় ভয়ানক মর্মাহত হয়েছিলুম—একে তো বেচারা শ্রান্ত পথিক, তাতে সে অপমানিত লজ্জিত ও নিরাশ হয়ে চলে গেল। কিন্তু জ্যোতিদাদা যেখানে দয়া অনুভব করলেন না সেখানে দয়া প্রকাশ করতে আমার ভারী লজ্জা করল—আমি অত্যন্ত কষ্টেও কিছু বলতে পারলুম না, কিন্তু আমার ভ্রাতৃভক্তিতে খুব আঘাত লেগেছিল।

কলকাতা
২৩ মে ১৮৯২

৫০

বোলপুর
মঙ্গলবার, ১২ জ্যৈষ্ঠ। ১২৯৯।

তোকে পূর্বেই লিখেছি, অপরাহ্ণে আমি আপন মনে একাকী ছাতের উপর বেড়াই; কাল সন্ধেবেলায় আমার দুই বন্ধুকে দুই পার্শ্বে নিয়ে অঘোরকে আমার পথপ্রদর্শক

করে তাঁদের এখানকার প্রাকৃতিক শোভা সন্দর্শন করানো আমার কর্তব্যকর্ম মনে করে বেরিয়ে পড়া গেল। তখন সূর্য অস্ত গেছে কিন্তু অন্ধকার হয় নি। একেবারে দিগন্তের প্রান্তে যেখানে গাছের সার নীলবর্ণ হয়ে দেখা যাচ্ছে, তারই উপরেই ঠিক একটি রেখামাত্র খুব গাঢ় নীল মেঘ উঠে খুব চমৎকার দেখতে হয়েছে—আমি ওরই মধ্যে একটুখানি কবিত্ব করে বললুম, ঠিক যেন নীল চোখের পাতার উপরে নীল সুর্মা লাগিয়েছে। সঙ্গীরা কেউ কেউ শুনতে পেলে না, কেউ কেউ বুঝতে পারলে না—কেউ কেউ সংক্ষেপে বললে, 'হাঁ, দিব্যি দেখতে হয়েছে।' তার পর থেকে দ্বিতীয়বার আর কবিত্ব করতে আমার উৎসাহ হল না। প্রায় মাইলখানেক গিয়ে একটা বাঁধের ধারে এক সার তালবন, এবং তালবনের কাছে একটি মেঠো ঝর্নার মতো আছে, সেইটে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছি এমন সময়ে দেখি উত্তরে সেই নীল মেঘ অত্যন্ত প্রগাঢ় এবং স্ফীত হয়ে চলে আসছে এবং মধ্যে মধ্যে বিদ্যুদ্দন্ত বিকাশ করছে। আমাদের সকলেরই মত হল এ রকম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ঘরের মধ্যে বসে দেখাই সর্বাপেক্ষা নিরাপদ। বাড়িমুখে যেমন ফিরেছি অমনি প্রকাণ্ড মাঠের উপর দীর্ঘ পদক্ষেপ করতে করতে সরোষ গর্জনে একটা ঝড় আমাদের ঘাড়ের উপর এসে পড়ল। আমরা যখন প্রকৃতিসুন্দরীর চোখের সুর্মার বাহার নিয়ে তারিফ করছিলুম তখন তিলমাত্র আশঙ্কা করি নি যে তিনি রোষাবিষ্টা গৃহিণীর মতো এত বড়ো একটা প্রকাণ্ড চপেটাঘাত নিয়ে আমাদের উপর ছুটে আসবেন। ধুলোয় এমনি অন্ধকার হয়ে এল যে পাঁচ হাত দূরে কিছু দেখা যায় না। বাতাসের বেগ ক্রমেই বাড়তে লাগল—কাঁকরগুলো বায়ুতাড়িত হয়ে ছিটে-গুলির মতো আমাদের বিঁধতে লাগল—মনে হল বাতাস পিছন থেকে ঘাড় ধরে আমাদের ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে—ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টিও পিট্ পিট্ করে মুখের উপর সবেগে আঘাত করতে লাগল। দৌড় দৌড়। মাঠ সমান নয়। এক-এক জায়গায় আবার খোয়াইয়ের ভিতর নাবতে হয়, সেখানে সহজ অবস্থাতেই চলা শক্ত, এই ঝড়ের বেগে চলা আরও মুশকিল। পথের মধ্যে আবার পায়ে কাঁটা-সুদ্ধ একটা শুকনো ডাল বিঁধে গেল—সেটা ছাড়াতে গিয়ে বাতাস আবার পিছন থেকে ঠেলা দিয়ে মুখ থুবড়ে ফেলবার চেষ্টা করে। বাড়ির যখন প্রায় কাছাকাছি এসেছি তখন দেখি, তিন-চারটে চাকর-বাকর মহা সোরগোল করে দ্বিতীয় আর-একটা ঝড়ের মতো আমাদের উপরে এসে পড়ল! কেউ হাত ধরে, কেউ আহা-উহু বলে, কেউ পথ দেখাতে চায়, কেউ আবার মনে করে বাবু বাতাসে উড়ে যাবেন—বলে পিঠের দিক থেকে জড়িয়ে ধরে। এই-সমস্ত অনুচরদের দৌরাত্ম্য কাটিয়ে-কুটিয়ে এলোথেলো চুলে, ধূলিমলিন দেহে, সিক্তবস্ত্রে, হাঁপিয়ে বাড়িতে এসে তো পড়লুম। যা হোক, একটা খুব শিক্ষা লাভ করেছি—হয়তো কোন্ দিন কোন্ কাব্যে কিম্বা উপন্যাসে বর্ণনা করতে বসতুম একজন নায়ক মাঠের মধ্যে দিয়ে ভীষণ ঝড়বৃষ্টি ভেঙে নায়িকার মধুর মুখচ্ছবি স্মরণ করে অকাতরে চলে যাচ্ছে—কিন্তু এখন আর এ রকম মিথ্যে কথা লিখতে পারব না। ঝড়ের সময় কারও মধুর মুখ মনে রাখা অসম্ভব, কী করলে চোখে কাঁকর ঢুকবে না সেই চিন্তাই সর্বাপেক্ষা প্রবল হয়ে ওঠে। আমার আবার চোখে eye glasses ছিল। সেটা বাতাসে উড়িয়ে নিয়ে ফেলে, কিছুতেই রাখতে পারি নে। এক হাতে চশমা ধরে আর-এক হাতে ধুতির কোঁচা সামলে পথের কাঁটাগাছ এবং গর্ত বাঁচিয়ে চলছি। মনে কর্, যদি এখানকার কোপাই নদীর ধারে আমার কোনো প্রণয়িনীর বাড়ি থাকত, আমার চশমা এবং কোঁচা সামলাতুম, না, তার স্মৃতি সামলাতুম! বাড়িতে ফিরে এসে কাল অনেক

ক্ষণ ভাবলুম— বৈষ্ণব কবিরা গভীর রাত্রে ঝড়ের সময় রাধিকার অকাতর অভিসার সম্বন্ধে অনেক ভালো ভালো মিষ্টি কবিতা লিখেছেন, কিন্তু একটা কথা ভাবেন নি এ রকম ঝড়ে কৃষ্ণের কাছে তিনি কী মূর্তি নিয়ে উপস্থিত হতেন। চুলগুলোর অবস্থা যে কী রকম হত সে তো তোরা বেশ বুঝতে পারবি। বেশবিন্যাসেরই বা কিরকম দশা! ধুলোতে লিপ্ত হয়ে, তার উপর বৃষ্টির জলে কাদা জমিয়ে কুঞ্জবনে কিরকম অপরূপ মূর্তি করে গিয়েই দাঁড়াতেন! এসব কথা কিন্তু বৈষ্ণব কবিদের লেখা পড়বার সময় মনে হয় না— কেবল মানস চক্ষে ছবির মতো দেখতে পাওয়া যায় একজন সুন্দরী রমণী শ্রাবণের অন্ধকার রাত্রে বিকশিত কদম্ববনের ছায়া দিয়ে যমুনার তীরপথে প্রেমের আকর্ষণে ঝড়বৃষ্টির মাঝে আত্মবিহ্বল হয়ে স্বপ্নগতার মতো চলেছেন; পাছে শোনা যায় বলে পায়ের নূপুর বেঁধে রেখেছেন, পাছে দেখা যায় বলে নীলাম্বরী কাপড় পরেছেন, কিন্তু পাছে ভিজে যান বলে ছাতা নেন নি, পাছে পড়ে যান বলে বাতি আনা আবশ্যক বোধ করেন নি। হায়, আবশ্যকীয় জিনিসগুলো আবশ্যকের সময় এত বেশি দরকার, অথচ কবিত্বের বেলায় এত উপেক্ষিত। আবশ্যকের শতলক্ষ দাসত্ব-বন্ধন থেকে আমাদের মুক্তি দেবার জন্যে কবিতা মিথ্যে ভান করছে। ছাতা জুতো জামাজোড়া চিরকাল থাকবে। বরঞ্চ শোনা যায় সভ্যতার উন্নতি-সহকারে কাব্য ক্রমে লোপ পাবে, কিন্তু ছাতা জুতোর নতুন নতুন পেটেন্ট্ বেরোতে থাকবে।

কলকাতা
২৫ মে ১৮৯২

৫১

বোলপুর
শনিবার, ১৬ জ্যৈষ্ঠ। ১২৯৯।

কাল বিকেলে যে এক-পাত্র চা খেয়েছিলুম সেটা কিছু কড়া-গোছ হয়েছিল- তার উপরে কাল রাত্রে তোকে যে চিঠিটা লিখেছিলুম তারও বিষয়টা বেশি মানসিক উত্তাপ লেগে খুব টক্‌টকে কড়া গোছের হয়ে মস্তিষ্কের মধ্যে অনেক ক্ষণ খুব ঝাঁ ঝাঁ করেছিল— তাই বিছানায় শুয়ে কাল আর্ধেক রাত্রের বেশি একেবারে বিশুদ্ধ অনিদ্রায় যাপন করেছিলুম। এখানে রাত্রে কোনো গির্জের ঘড়িতে ঘণ্টা বাজে না—এবং কাছাকাছি কোনো লোকালয় না থাকাতে পাখিরা গান বন্ধ করবামাত্রই সন্ধের পর থেকে একেবারে পরিপূর্ণ নিস্তব্ধতা আরম্ভ হয়— প্রথম রাত্রি এবং অর্ধরাত্রে বিশেষ কোনো প্রভেদ নেই। কলকাতায় অনিদ্রার রাত্রি মস্ত একটা অন্ধকার নদীর মতো, খুব ধীরে ধীরে চলতে থাকে; বিছানায় চক্ষু মেলে চিত হয়ে পড়ে তার গতিশব্দ মনে মনে গণনা করা যেতে পারে— এখানকার রাত্রিটা যেন একটা প্রকাণ্ড নিস্তরঙ্গ হ্রদের মতো আগাগোড়া সমান থম্ থম্ করছে— কোথাও কিছু গতি নেই। যতই এপাশ ফিরি এবং যতই ওপাশ ফিরি একটা মস্ত যেন অনিদ্রার গুমোট করে ছিল, তার মধ্যে প্রবাহের লেশমাত্র পাওয়া যায় না। আজ সকালে কিছু বিলম্বে শয্যাত্যাগ করে আমার নিচেকার ঘরের তাকিয়া ঠেসান দিয়ে বুকের

উপর স্লেট রেখে পায়ের উপর পা তুলে দিয়ে সকালের বাতাস এবং পাখির ডাকের মধ্যে একটি কবিতা লিখতে প্রবৃত্ত হয়েছিলুম। বেশ জমে এসেছিল— মুখ সহাস্য, চক্ষু ঈষৎ মুদ্রিত, মাথা ঘন ঘন আন্দোলিত এবং গুন্‌ গুন্‌ আবৃত্তি উত্তরোত্তর পরিস্ফুট হয়ে উঠছিল— এমন সময় তোর একখানি চিঠি, একখানি সাধনা, একখানি সাধনার প্রুফ এবং একখানি Monist কাগজ পাওয়া গেল। তোর চিঠিখানি পড়লুম এবং সাধনার পাতাগুলোর মধ্যে চোখ দুটোকে একবার সবেগে ঘোড়দৌড় করিয়ে নিয়ে এলুম। তার পরে পুনশ্চ শিরশ্চালন করে অস্ফুট গুঞ্জনস্বরে কবিত্বে প্রবৃত্ত হলুম। শেষ করে ফেলে তবে অন্য কথা। একটি কবিতা লিখে ফেললে যেমন আনন্দ হয় হাজার গদ্য লিখলেও তেমন হয় না কেন তাই ভাবছি। কবিতায় মনের ভাব বেশ একটি সম্পূর্ণতা লাভ করে, বেশ যেন হাতে করে তুলে নেবার মতো। আর, গদ্য যেন এক বস্তা আলগা জিনিস— একটি জায়গায় ধরলে সমস্তটি অমনি স্বচ্ছন্দে উঠে আসে না— একেবারে একটা বোঝা-বিশেষ। রোজ রোজ যদি একটি করে কবিতা লিখে শেষ করতে পারি তা হলে জীবনটা বেশ এক রকম আনন্দে কেটে যায়। কিন্তু এতদিন ধরে সাধনা করে আসছি, ও জিনিসটা এখনো তেমন পোষ মানে নি, প্রতিদিন লাগাম পরাতে দেবে তেমন পক্ষীরাজ ঘোড়াটি নয়। আর্টের একটা প্রধান আনন্দ হচ্ছে স্বাধীনতার আনন্দ— বেশ আপনাকে অনেক দূরে নিয়ে যাওয়া যায়, তার পরে আবার এই ভবকারাগারের মধ্যে ফিরে এসেও অনেক ক্ষণ কানের মধ্যে একটা ঝংকার, মনের মধ্যে একটা স্ফূর্তি লেগে থাকে। এই ছোটো ছোটো কবিতাগুলো আপনা-আপনি এসে পড়ছে বলে আর নাটকে হাত দিতে পারছি নে। নইলে দুটো-তিনটে ভাবী নাটকের উমেদার মাঝে মাঝে দরজা ঠেলাঠেলি করছে। শীতকাল ছাড়া বোধ হয় সেগুলোতে হাত দেওয়া হয়ে উঠবে না। চিত্রাঙ্গদা ছাড়া আমার আর-সব নাটকই শীতকালে লেখা। সে সময়ে গীতিকাব্যের আবেগ অনেকটা ঠাণ্ডা হয়ে আসে— অনেকটা ধীরে সুস্থে নাটক লেখা যায়।

কলকাতা
৩০ মে ১৮৯২

৫২

বোলপুর
৩১ মে। ১৮৯২।

এখনো পাঁচটা বাজে নি— কিন্তু আলো হয়েছে, বেশ বাতাস দিচ্ছে এবং বাগানের সমস্ত পাখিগুলো জেগে উঠে গান জুড়ে দিয়েছে। কোকিলটা তো সারা হয়ে গেল— সে কেন যে এত অবিশ্রাম ডাকে এ পর্যন্ত বোঝা গেল না— অবশ্য, আমাদের শ্রুতি-বিনোদনের জন্যে নয়, বিরহিণীকে পীড়ন করবার অভিপ্রায়েও নয়— তার নিজের একটা পার্সোনাল উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই আছে— কিন্তু হতভাগার সে উদ্দেশ্য কি কিছুতেই সিদ্ধ হচ্ছে না! ছাড়েও না তো— কুউ কুউ চলছেই— আবার এক-একবার যেন দ্বিগুণ অস্থির হয়ে দ্রুতবেগে কুহুধ্বনি করছে। এর মানে কী?

আবার আর খানিকটা দূরে আর-একটা কী পাখি নিতান্ত মৃদুস্বরে কেবলই কুক্ কুক্ করছে—তাতে কিছুমাত্র উৎসাহ-আগ্রহের ঝাঁজ নেই—লোকটা যেন নেহাৎ মন-মরা হয়ে গেছে, সমস্ত আশা ভরসা ছেড়ে দিয়েছে, কিন্তু তবু ছায়ায় বসে সমস্ত দিন ওই একটুখানি কুক্-কুক্ কুক্-কুক্ ওটুকু ছাড়তে পারছে না। বাস্তবিক ঐ ডানাওয়ালা ছোটো ছোটো নিরীহ জীবগুলি, অতি কোমল গ্রীবাটুকু বুকটুকু এবং পাঁচমিশালি রঙ নিয়ে গাছের ছায়ায় বসে আপন-আপন ঘরকন্না করছে—ওদের আসল বৃত্তান্ত কিছুই জানি নে। বাস্তবিক, বুঝতে পারি নে ওদের এত ডাকবার কী আবশ্যক। কোনো কোনো প্রাণিতত্ত্ববিৎ বলেন প্রণয়িনীকে আহ্বান করবার জন্যে। ওদের প্রণয়িনীরাও মানুষের চেয়ে কম নয় দেখছি—ভদ্রলোকটাকে এই ভোরের বেলাতেও একেবারে ক্ষেপিয়ে তুলেছে—কোকিল-মহিলাটির যদি আসবার ইচ্ছে থাকে তা হলে দুই ডাকে এলেই হয়—অনুরক্ত ভক্তটিকে এমন ঊর্ধ্বশ্বাসে ডাক ছাড়াচ্ছে কেন?

কলকাতা। ৩১ মে ১৮৯২

৫৩

শিলাইদহ
রবিবার, ১২ জুন। ১৮৯২।

কালকের চিঠিতে জীবনের কর্তব্য সম্বন্ধে যা লিখেছিস তা ঠিক কথা। আমরা যে যেখানে এসে পড়েছি আমাদের যথাসাধ্যমত সেই জায়গাটুকু সুখে শান্তিতে উজ্জ্বল করে তোলাই আমাদের প্রধান কর্তব্য। তোদের প্রসন্ন প্রফুল্ল সুন্দর মুখে, নিঃস্বার্থ সেবা স্নেহ ভালবাসায় তোরা তাই করিস—তার চেয়ে আর-কিছু করবার নেই। আমরা সবাই তা পারি নে। আমরা অভিশপ্ত জীব, এমন একটা দুর্দান্ত অশান্তি সাথের সাথি নিয়ে জন্মগ্রহণ করি যে, সহজভাবে সুন্দরভাবে পৃথিবীকে সুখী করা, স্নিগ্ধ করা আমাদের দ্বারা হয়ে ওঠে না; আমরা কেবল ধড়্ফড়্ করে যে জায়গাটাতে থাকি তার চতুর্দিক ঘুলিয়ে তুলি—জগৎকে মধুর করতে জানি নে—ঠিক তার বিপরীত। পুরুষ জাতটাকে আমি শতসহস্র ধিক্কার দিই, পৃথিবীতে এমন জঞ্জাল আর নেই।

কলকাতা
১৩ জুন ১৮৯২

৫৪

শিলাইদহ
সোমবার [৩২] জ্যৈষ্ঠ। ১২৯৯।

এ-সব শিষ্টাচার আর ভালো লাগে না—আজকাল প্রায় বসে বসে আওড়াই—‘ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুইন!’ বেশ একটা সুস্থ সবল উন্মুক্ত

অসভ্যতা! দিনরাত্রি বিচার আচার বিবেক বুদ্ধি নিয়ে কতকগুলো বহুকেলে জীর্ণতার মধ্যে শরীর মনকে অকালে জরাগ্রস্ত না করে একটা দ্বিধাহীন চিন্তাহীন প্রাণ নিয়ে খুব একটা প্রবল জীবনের আনন্দ লাভ করি। মনের সমস্ত বাসনা ভাবনা, ভালোই হোক মন্দই হোক, বেশ অসংশয় অসংকোচ এবং প্রশস্ত— প্রথার সঙ্গে বুদ্ধির, বুদ্ধির সঙ্গে ইচ্ছার, ইচ্ছার সঙ্গে কাজের কোনোরকম অহর্নিশি খিটিমিটি নেই। একবার যদি এই রুদ্ধ জীবনকে খুব উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল ভাবে ছাড়া দিতে পারতুম, একেবারে দিগ্‌বিদিকে ঢেউ খেলিয়ে ঝড় বাধিয়ে দিতুম, একটা বলিষ্ঠ বুনো ঘোড়ার মতো কেবল আপনার লঘুত্বের আনন্দ-আবেগে ছুটে যেতুম!

কিন্তু আমি বেদুইন নই, বাঙালি। আমি কোণে বসে বসে খুঁতখুঁত করব, বিচার করব, তর্ক করব, মনটাকে নিয়ে একবার ওল্টাব একবার পাল্টাব—যেমন করে মাছ ভাজে— ফুটন্ত তেলে একবার এপিঠ চিড়্‌বিড়্ করে উঠবে, একবার ওপিঠ চিড়্‌বিড়্ করবে। যাক গে! যখন রীতিমত অসভ্য হওয়া অসাধ্য তখন রীতিমত সভ্য হবার চেষ্টা করাই সংগত। সভ্যতা এবং বর্বরতার মধ্যে লড়াই বাধাবার দরকার নেই।...

এমনি আমি স্বভাবতঃ অসভ্য— মানুষের ঘনিষ্ঠতা আমার পক্ষে নিতান্ত দুঃসহ। অনেকখানি ফাঁকা চতুর্দিকে না পেলে আমি আমার মনটিকে সম্পূর্ণ unpack করে বেশ হাত পা ছড়িয়ে গুছিয়ে নিতে পারি নে। আশীর্বাদ করি মনুষ্যজাতির কল্যাণ হোক, কিন্তু আমাকে তাঁরা ঠেসে না ধরুন। ... বোধ হয় আমাকে সম্পূর্ণ বাদ দিলেও মনুষ্যসাধারণ ভালো ভালো সদ্‌বন্ধু খুঁজে পেতে পারবেন। তাঁদের সান্ত্বনার অভাব হবে না।

কলকাতা
১৪ জুন ১৮৯২

৫৫

শিলাইদহ
বুধবার, ২ আষাঢ়। ১২৯৯।

কাল আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে বর্ষার নব রাজ্যাভিষেক বেশ রীতিমত আড়ম্বরের সঙ্গে সম্পন্ন হয়ে গেছে। দিনের বেলাটা খুব গরম হয়ে বিকেলের দিকে ভারী ঘনঘটা মেঘ করে এল।... কাল ভাবলুম, বর্ষার প্রথম দিনটা, আজ বরঞ্চ ভেজাও ভালো তবু অন্ধকূপের মধ্যে দিনযাপন করব না— জীবনে '৯৯ সাল আর দ্বিতীয়বার আসবে না— ভেবে দেখতে গেলে পরমায়ুর মধ্যে আষাঢ়ের প্রথম দিন আর কবারই বা আসবে— সবগুলো কুড়িয়ে যদি ত্রিশটা দিন হয় তা হলেও খুব দীর্ঘ জীবন বলতে হবে। মেঘদূত লেখার পর থেকে আষাঢ়ের প্রথম দিনটা একটা বিশেষ চিহ্নিত দিন হয়ে গেছে— নিদেন আমার পক্ষে। আমি প্রায়ই এক-এক সময়ে ভাবি, এই-যে আমার জীবনে প্রত্যহ একটি একটি করে দিন আসছে, কোনোটি সূর্যোদয় সূর্যাস্তে রাঙা, কোনোটি ঘনঘোর মেঘে স্নিগ্ধ নীল, কোনোটি পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায় সাদা ফুলের মতো প্রফুল্ল, এগুলি কি আমার কম সৌভাগ্য! এবং এরা কি কম মূল্যবান! হাজার বৎসর পূর্বে কালিদাস সেই-যে আষাঢ়ের

প্রথম দিনকে অভ্যর্থনা করেছিলেন এবং প্রকৃতির সেই রাজসভায় বসে অমর ছন্দে মানবের বিরহসংগীত গেয়েছিলেন, আমার জীবনেও প্রতি বৎসরে সেই আষাঢ়ের প্রথম দিন তার সমস্ত আকাশ-জোড়া ঐশ্বর্য নিয়ে উদয় হয়—সেই প্রাচীন উজ্জয়িনীর প্রাচীন কবির, সেই বহু-বহু-কালের শত শত সুখ দুঃখ বিরহ মিলন -ময় নরনারীদের আষাঢ়স্য প্রথম দিবস! সেই অতি পুরাতন আষাঢ়ের প্রথম মহাদিন আমার জীবনে প্রতি বৎসর একটি একটি করে কমে যাচ্ছে, অবশেষে এক সময় আসবে, যখন এই কালিদাসের দিন, এই মেঘদূতের দিন, এই ভারতবর্ষের বর্ষার চিরকালীন প্রথম দিন, আমার অদৃষ্টে আর একটিও অবশিষ্ট থাকবে না। এ কথা ভালো করে ভাবলে পৃথিবীর দিকে আবার ভালো করে চেয়ে দেখতে ইচ্ছে করে—ইচ্ছে করে জীবনের প্রত্যেক সূর্যোদয়কে সজ্ঞানভাবে অভিবাদন করি এবং প্রত্যেক সূর্যাস্তকে পরিচিত বন্ধুর মতো বিদায় দিই। আমি যদি সাধু প্রকৃতির লোক হতুম তা হলে হয়তো মনে করতুম জীবন নশ্বর, অতএব প্রতিদিন বৃথা ব্যয় না করে সৎকার্যে এবং হরিনামে যাপন করি। আমার সে প্রকৃতি নয়—তাই আমার মাঝে মাঝে মনে হয় এমন সুন্দর দিনরাত্রিগুলি আমার জীবন থেকে প্রতিদিন চলে যাচ্ছে—এর সমস্তটা গ্রহণ করতে পারছি নে! এই সমস্ত রঙ, এই আলো এবং ছায়া, এই আকাশব্যাপী নিঃশব্দ সমারোহ, এই দ্যুলোক ভূলোকের মাঝখানে সমস্ত-শূন্য-পরিপূর্ণ-করা শান্তি এবং সৌন্দর্য, এর জন্যে কি কম আয়োজনটা চলছে! কত বড়ো উৎসবের ক্ষেত্রটা! এত বড়ো আশ্চর্য কাণ্ডটা প্রতিদিন আমাদের বাইরে হয়ে যাচ্ছে, আর আমাদের ভিতরে ভালো করে তার সাড়া পাওয়াই যায় না! জগৎ থেকে এতই তফাতে আমরা বাস করি! লক্ষ লক্ষ যোজন দূরে থেকে লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরে অনন্ত অন্ধকারের পথে যাত্রা করে একটি তারার আলো এই পৃথিবীতে এসে পৌঁছয় আর আমাদের অন্তরে এসে প্রবেশ করতে পারে না, সে যেন আরও লক্ষযোজন দূরে! রঙিন সকাল এবং রঙিন সন্ধ্যাগুলি দিগ্‌বধূদের ছিন্ন কণ্ঠহার থেকে এক-একটি মানিকের মতো সমুদ্রের জলে খসে খসে পড়ে যাচ্ছে। আমাদের মনের মধ্যে একটাও এসে পড়ে না! সেই বিলেত যাবার পথে লোহিতসমুদ্রের স্থির জলের উপরে যে-একটি অলৌকিক সূর্যাস্ত দেখেছিলুম, সে কোথায় গেছে! কিন্তু ভাগ্যিস্‌ আমি দেখেছিলুম, আমার জীবনে ভাগ্যিস্‌ সেই একটি সন্ধ্যা উপেক্ষিত হয়ে ব্যর্থ হয়ে যায় নি—অনন্ত দিনরাত্রির মধ্যে সেই একটি অত্যাশ্চর্য সূর্যাস্ত আমি ছাড়া পৃথিবীর আর কোনো কবি দেখে নি। আমার জীবনে তার রঙ রয়ে গেছে। অমন এক-একটি দিন এক-একটি সম্পত্তির মতো। আমার সেই পেনেটির বাগানের গুটিকতক দিন, তেতালার ছাতের গুটিকতক রাত্রি, পশ্চিম ও দক্ষিণের বারান্দার গুটিকতক বর্ষা, চন্দননগরের গঙ্গার গুটিকতক সন্ধ্যা, দার্জিলিঙে সিঞ্চল শিখরের একটি সূর্যাস্ত ও চন্দ্রোদয়—এই রকম কতকগুলি উজ্জ্বল সুন্দর ক্ষণখণ্ড আমার যেন ফাইল করা রয়েছে। সৌন্দর্য আমার পক্ষে সত্যিকার নেশা! আমাকে সত্যি সত্যি ক্ষেপিয়ে তোলে। ছেলেবেলায় বসন্তের জ্যোৎস্নারাত্রে যখন ছাদে পড়ে থাকতুম তখন জ্যোৎস্না যেন মদের শুভ্র ফেনার মতো একেবারে উপচে পড়ে নেশায় আমাকে ডুবিয়ে দিত।... যে পৃথিবীতে এসে পড়েছি এখানকার মানুষগুলো সব অদ্ভুত জীব—এরা কেবলই দিনরাত্রি নিয়ম এবং দেয়াল গাঁথছে, পাছে দুটো চোখে কিছু দেখতে পায় এই জন্যে বহু যত্নে পর্দা টাঙিয়ে দিচ্ছে—বাস্তবিক পৃথিবীর জীবগুলো ভারী অদ্ভুত! এরা যে ফুলের গাছে এক-একটি ঘ্যাটাটোপ পরিয়ে রাখে নি, চাঁদের নিচে চাঁদোয়া খাটায় নি, সেই আশ্চর্য। এই স্বেচ্ছা-অন্ধগুলো বন্ধ

পাল্কির মধ্যে চড়ে পৃথিবীর ভিতর দিয়ে কী দেখে চলে যাচ্ছে! যদি বাসনা এবং সাধনা -অনুরূপ পরকাল থাকে তা হলে এবার আমি এই ওয়াড়-পরানো পৃথিবী থেকে বেরিয়ে গিয়ে যেন এক উদার উন্মুক্ত সৌন্দর্যের আনন্দলোকে গিয়ে জন্মগ্রহণ করতে পারি। যারা সৌন্দর্যের মধ্যে সত্যি সত্যি নিমগ্ন হতে অক্ষম তারাই সৌন্দর্যকে কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়ের ধন বলে অবজ্ঞা করে— কিন্তু এর মধ্যে যে অনির্বচনীয় গভীরতা আছে, তার আস্বাদ যারা পেয়েছে তারা জানে— সৌন্দর্য ইন্দ্রিয়ের চূড়ান্ত শক্তিরও অতীত; কেবল চক্ষু কর্ণ দূরে থাক্, সমস্ত হৃদয় নিয়ে প্রবেশ করলেও ব্যাকুলতার শেষ পাওয়া যায় না। কী আমি ভদ্রলোক সেজে শহরের বড়ো রাস্তায় আনাগোনা করছি! পরিপাটি ভদ্রলোকদের সঙ্গে ভদ্রভাবে কথাবার্তা কয়ে জীবন মিথ্যে কাটিয়ে দিচ্ছি! আমি আন্তরিক অসভ্য, অভদ্র— আমার জন্যে কোথাও কি একটা ভারী সুন্দর অরাজকতা নেই! কতকগুলো ক্ষ্যাপা লোকের আনন্দমেলা নেই! কিন্তু আমি কী এ-সমস্ত কবিত্ব করছি— কাব্যের নায়কেরা এই রকম সব কথা বলে— কনভেন্‌শনালিটির উপরে তিন-চার-পাত-জোড়া স্বগত উক্তি প্রয়োগ করে, আপনাকে সমস্ত মানবসমাজের চেয়ে বড়ো মনে করে। বাস্তবিক, এসব কথা বলতে লজ্জা করে। এর মধ্যে যে সত্যটা আছে সে বহুকাল থেকে ক্রমাগত কথা চাপা পড়ে আসছে। পৃথিবীতে সবাই ভারী কথা কয়— তার মধ্যে আমি একজন অগ্রগণ্য— হঠাৎ এতক্ষণে সে বিষয়ে চেতনা হল।...

পুঃ— আসল যে কথাটা বলতে গিয়েছিলুম সেটা বলে নিই— ভয় পাস নে, আবার চার পাতা জুড়ব না— কথাটা হচ্ছে, পয়লা আষাঢ়ের দিন বিকেলে খুব মুষলধারে বৃষ্টি হয়ে গেছে। বাস্।

কলকাতা
১৬ জুন?
১৮৯২

৫৬

শিলাইদহ
[বৃহস্পতিবার] ১৬ জুন। ১৮৯২।

যতই একলা আপন মনে নদীর উপরে কিম্বা পাড়াগাঁয়ে কোনো খোলা জায়গায় থাকা যায় ততই প্রতিদিন পরিষ্কার বুঝতে পারা যায়, সহজ ভাবে আপনার জীবনের প্রাত্যহিক কাজ করে যাওয়ার চেয়ে সুন্দর এবং মহৎ আর কিছু হতে পারে না! মাঠের তৃণ থেকে আকাশের তারা পর্যন্ত তাই করছে; কেউ গায়ের জোরে আপনার সীমাকে অত্যন্ত বেশি অতিক্রম করবার জন্যে চেষ্টা করছে না বলেই প্রকৃতির মধ্যে এমন গভীর শান্তি এবং অপার সৌন্দর্য— অথচ প্রত্যেকে যেটুকু করছে সেটুকু বড়ো সামান্য নয়— ঘাস আপনার চূড়ান্ত শক্তি প্রয়োগ করে তবে ঘাস-রূপে টিকে থাকতে পারে, তার শিকড়ের শেষ প্রান্তটুকু পর্যন্ত দিয়ে তাকে রসাকর্ষণ করতে হয়। সে যে নিজের শক্তি লঙ্ঘন করে নিজের কাজ অবহেলা করে বটগাছ হবার নিষ্ফল চেষ্টা করছে না, এই জন্যেই পৃথিবী এমন

সুন্দর শ্যামল হয়ে রয়েছে। বাস্তবিক, বড়ো বড়ো উদ্যোগ এবং লম্বাচোড়া কথার দ্বারা নয়, কিন্তু প্রাত্যহিক ছোটো ছোটো কর্তব্য-সমাধা-দ্বারাই মানুষের সমাজে যথাসম্ভব শোভা এবং শান্তি আছে। কবিত্বই বলো, বীরত্বই বলো, কোনোটাই আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ নয়। কিন্তু একটি অতি ক্ষুদ্র কর্তব্যের মধ্যেও তৃপ্তি এবং সম্পূর্ণতা আছে। বসে বসে হাঁস্‌ফাঁস্‌ করা, কল্পনা করা, কোনো অবস্থাকেই আপনার যোগ্য মনে না করা, এবং ইতিমধ্যে সম্মুখ দিয়ে সময়কে চলে যেতে দেওয়া, ছোটো বড়ো সমস্ত কর্তব্যকে প্রতিদিন অলক্ষিতভাবে বয়ে যেতে দেওয়া, এর চেয়ে হেয় আর-কিছু হতে পারে না। যখন মনে মনে প্রতিজ্ঞা করা যায় আপনার চারিদিককার সুখ এবং মঙ্গলের উদ্দেশে সুখদুঃখের ভিতর দিয়ে নিজের সাধ্যায়ত্ত সমস্ত কর্তব্য সত্যের সঙ্গে, বলের সঙ্গে, হৃদয়ের সঙ্গে পালন করে যাব এবং যখন বিশ্বাস হয় তা করতে পারব, তখন সমস্ত জীবন আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে, ছোটোখাটো দুঃখ বেদনা একেবারে দূর হয়ে যায়। অবশ্য, আমার জীবনের প্রতিদিন এবং প্রত্যেক মুহূর্ত আমার সম্মুখে এখন প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত নেই, তাই হয়তো দূরে থেকে হঠাৎ একটা কাল্পনিক আশার উচ্ছ্বাসে স্ফীত হয়ে উঠছি, সমস্ত খুঁটিনাটি খিটিমিটি সংকট এবং সংঘর্ষ বাদ দিয়ে ভাবী জীবনের একটা মোটামুটি চিত্র অঙ্কিত করে এতটা ভরসা পাচ্ছি, কিন্তু তা ঠিক নয়।...

কলকাতা
১৭ জুন ১৮৯২

৫৭

শিলাইদহ
শুক্রবার, ৪ আষাঢ়। ১২৯৯।

আজকাল আমি বিকেলে সন্ধের দিকে ডাঙায় উঠে অনেকক্ষণ বেড়াতে থাকি— পূর্ব দিকে যখন ফিরি এক রকম দৃশ্য দেখতে পাই, পশ্চিমে যখন ফিরি আর-এক রকম দেখতে পাই— আকাশ থেকে আমার মাথার উপরে যেন সান্ত্বনা বৃষ্টি হতে থাকে, আমার দুই মুগ্ধ চোখের ভিতর দিয়ে যেন একটি স্বর্ণময় মঙ্গলের ধারা আমার অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করতে থাকে। এই বাতাসে আকাশে এবং আলোকে প্রতিক্ষণে আমার মন ছেয়ে যেন নতুন পাতা গজিয়ে উঠছে— আমি নতুন প্রাণ এবং বলে পরিপূর্ণ হয়ে উঠছি। সংসারের সমস্ত কাজ করা এবং লোকের সঙ্গে ব্যবহার করা আমার পক্ষে ভারী সহজ হয়ে পড়েছে। আসলে সবই সোজা —একটিমাত্র সিধে রাস্তা আছে, চোখ চেয়ে সেই রাস্তা ধরে গেলেই হল; নানা রকম বুদ্ধিপূর্বক short cut খোঁজবার দরকার দেখি নে— সুখ দুঃখ সকল রাস্তাতেই আছে, কোনো রাস্তা দিয়েই তাদের এড়িয়ে যাবার জো নেই— কিন্তু শান্তি কেবল এই বড়ো রাস্তাতেই আছে।

কলকাতা
১৮ জুন ১৮৯২

৫৮

গোয়ালন্দের পথে
২১ জুন ১৮৯২

আজ সমস্ত দিন নদীর উপরে ভেসে চলেছি। আশ্চর্য এই বোধ হচ্ছে যে, কতবার এই রাস্তা দিয়ে গেছি, এই বোটে চড়ে জলে জলে বেড়িয়েছি—এবং নদীর দুই তীরের মাঝখান দিয়ে ভেসে যাবার যে একটা বিশেষ আনন্দ আছে সে উপভোগ করেছি—কিন্তু দিন দুই ডাঙায় বসে থাকলে সেটা ঠিকটা আর মনে থাকে না। এই-যে একলাটি চুপ করে বসে চেয়ে থাকা—দুই ধারে গ্রাম ঘাট শস্যক্ষেত্র চর বিচিত্র ছবি দেখা দিচ্ছে এবং চলে যাচ্ছে, আকাশে মেঘ ভাসছে এবং সন্ধের সময় নানা রকম রঙ ফুটছে—নৌকো চলেছে, জেলেরা মাছ ধরছে, অহর্নিশি জলের এক প্রকার আদরপরিপূর্ণ তরল শব্দ শোনা যাচ্ছে—সন্ধেবেলায় বিস্তৃত জলরাশি শ্রান্ত নিদ্রিত শিশুর মতো একেবারে স্থির হয়ে যাচ্ছে এবং উন্মুক্ত আকাশের সমস্ত তারা মাথার উপরে জেগে চেয়ে আছে—গভীর রাত্রে যেদিন ঘুম নেই সেদিন উঠে বসে দেখি অন্ধকারাচ্ছন্ন দুই কূল নিদ্রিত—মাঝে মাঝে কেবল গ্রামের বনে শৃগাল ডাকছে এবং পদ্মার নীরব খরস্রোতে ঝুপ্‌ঝাপ্‌ করে পাড় খসে খসে পড়ছে—এই-সমস্ত পরিবর্তমান ছবি যেমন যেমন চোখে পড়তে থাকে অমনি মনের ভিতরে একটা কল্পনার স্রোত বইতে থাকে এবং তার দুই পারে সুদূর তটদৃশ্যের মতো নব নব আকাঙ্ক্ষার চিত্র দেখা দিতে থাকে। হয়তো সম্মুখের দৃশ্যটা খুব একটা চমৎকার কিছু নয়—একটা হলদে রকমের তৃণতরুশূন্য বালির চর ধু ধু করছে, তারই গায়ে একটা জনশূন্য নৌকো বাঁধা রয়েছে এবং আকাশের ছায়ায় ফিকে-নীলবর্ণ নদী বয়ে চলে যাচ্ছে—দেখে মনের ভিতরে কী রকম করে বলতে পারি নে—বোধ হয় সেই ছেলেবেলায় যখন আরব্য-উপন্যাস পড়তুম, সিন্ধ্‌বাদ নানা নূতন দেশে বাণিজ্য করতে বাহির হত, ভৃত্য-শাসিত আমি তোষাখানার মধ্যে রুদ্ধ হয়ে বসে বসে দুপুর বেলায় সিন্ধ্‌বাদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াতুম, তখন যে আকাঙ্ক্ষাটা মনের মধ্যে জন্মেছিল সেটা যেন এখনো বেঁচে আছে—এই বালিচরে নৌকো বাঁধা দেখলে সেই যেন চঞ্চল হয়ে ওঠে। ছেলেবেলায় যদি আরব্য-উপন্যাস রবিন্‌সন্‌ক্রুসো না পড়তুম, রূপকথা না শুনতুম, তা হলে নিশ্চয় বলতে পারি ঐ নদীতীর এবং মাঠের প্রান্তের দূর দৃশ্য দেখে ঠিক এমন ভাব মনে উদয় হত না সমস্ত পৃথিবীর চেহারা আমার পক্ষে আর-এক রকম হয়ে যেত। এইটুকু মানুষের মনের ভিতরে বাস্তবিকে কাল্পনিকে জড়িয়ে-জড়িয়ে কী-যে একটা জাল পাকিয়ে আছে! কিসের সঙ্গে যে কী গেঁথে গেছে—কত গল্পের সঙ্গে, ছবির সঙ্গে, ঘটনার সঙ্গে, সামান্যের সঙ্গে, বড়োর সঙ্গে, জড়িয়ে গিঁট পড়ে আছে—প্রতিদিন অজ্ঞাতে জড়িয়ে যাচ্ছে—একটা মানুষের একটা বৃহৎ জীবনের জাল খুলতে পারলে কত ছোটো এবং কত বড়োর মিশোল আলাদা করা যায়—কী-একটা হেটেরোজিনিয়াস স্তূপ হয়!

কলকাতা
২২ জুন ১৮৯২

৫৯

শিলাইদহ
সোমবার, ২২ জুন। ১৮৯২।

আজ খুব ভোরে বিছানায় শুয়ে শুয়ে শুনছিলুম ঘাটে মেয়েরা উলু দিচ্ছে—শুনে মনটা কেমন ঈষৎ বিকল হয়ে গেল, অথচ তার কারণ ভেবে পাওয়া শক্ত। বোধ হয় এই রকমের একটা আনন্দধ্বনিতে হঠাৎ অনুভব করা যায় পৃথিবীতে একটা বৃহৎ কর্মপ্রবাহ চলছে যার অধিকাংশের সঙ্গে আমার যোগ নেই—পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ আমার কেউ নয়, অথচ তাদের কত কাজকর্ম সুখদুঃখ উৎসব-আনন্দ চলছে—কী বৃহৎ পৃথিবী! কী বিপুল মানবসংসার! কত সুদূর থেকে জীবনের ধ্বনি প্রবাহিত হয়ে আসে—সম্পূর্ণ অপরিচিত ঘরের একটুখানি বার্তা পাওয়া যায়। মানুষ যখন বুঝতে পারে 'আমার কাছে আমি যত বড়োই হই আমাকে দিয়ে সমস্ত বিশ্ব পরিপূর্ণ করতে পারি নে—অধিকাংশ জগৎই আমার অজ্ঞাত, অজ্ঞেয়, অনাত্মীয়, আমা-হীন'—তখন এই প্রকাণ্ড ঢিলে জগতের মধ্যে আপনাকে অত্যন্ত খাটো এবং এক রকম পরিত্যক্ত এবং প্রান্তবর্তী বলে মনে হয়—তখনি মনের মধ্যে এই রকমের একটা ব্যাপ্ত বিষাদের উদয় হয়। তা ছাড়া এই উলুধ্বনিতে নিজের অতীত ভবিষ্যৎ সমস্ত জীবনটা একটি অতি সুদীর্ঘ পথের মতো চোখের সম্মুখে উদয় হল এবং তারই এক-একটি সুদূর ছায়াময় প্রান্ত থেকে এই উলুধ্বনি কানে এসে পৌঁছতে লাগল। এই রকম ভাবে তো আজ দিনটা আরম্ভ করেছি। এখনি সদর-নায়েব আমলাবর্গ এবং প্রজারা উপস্থিত হলে এই উলুধ্বনির প্রতিধ্বনিটুকু পাড়া ছেড়ে পালাবে, অতি ক্ষীণ ভূত ভবিষ্যৎকে দুই কনুই দিয়ে ঠেলে ফেলে জোয়ান বর্তমান নিজমূর্তি ধরে সেলাম ঠুকে এসে দাঁড়াবে—খাজনা আদায়ে মন দিতে হবে।……

কাল আমার নাটকটাকে শেষ পোঁচ দেওয়া সমাপ্ত করেছি। একটু-আধটু বদল-সদল হয়েছে—নাটকে আবার খুব বেশি হাত ছেড়ে দেওয়া যায় না—কাজটা অনেকটা চৌঘুড়ি হাঁকানোর মতো—অনেকগুলো ঘোড়াকে এক গাড়িতে জুতে, এক রাস্তা দিয়ে, এক উদ্দেশ্যের দিকে নিয়ে যাওয়া। সুতরাং ওর মধ্যে কোনো-একটা ঘোড়াকে বেশি লাগাম ছেড়ে দেওয়া যায় না, সব কটাকে সমান গতিতে ছোটানো চাই।…বিদেশী বন্ধুর সঙ্গে চিঠিতে বন্ধুত্ব জাগিয়ে রাখা সম্বন্ধে তোর সঙ্গে আমার মতের অনৈক্য নেই—দূর থেকে মাঝে মাঝে কেবল পত্রব্যজন করে বন্ধুত্ববহ্নিকে ভস্মগ্রাস থেকে রক্ষা করা বিষম বিরক্তির কাজ এবং প্রায় অসাধ্য বললেই হয়। পৃথিবীতে ছোটোখাটো আত্মীয়তা প্রতিদিন আসছে এবং যাচ্ছে—আমার সঙ্গে তাদের জীবনের প্রধান বন্ধন কিছুই নেই—তাদের যেখানে সংসারের কেন্দ্র, তাদের গুরুতর সুখ দুঃখ যার চার দিকে আবর্তিত হচ্ছে, আমার পক্ষে সে এক রকম সম্পূর্ণ অপরিচিত। এমন স্থলে সকল রকম বাধা অতিক্রম করে পরস্পরকে টানাটানি করে রাখবার কী এমন অত্যাবশ্যক পড়েছে!

কলকাতা
২৩ জুন ১৮৯২

৬০

সাজাদপুর
সোমবার, ২৭ জুন। ১৮৯২।

কাল বিকেলের দিকে এমনি করে এল, আমার ভয় হল। এমনতর রাগী চেহারার মেঘ আমি কখনো দেখেছি বলে মনে হয় না—গাঢ় নীল মেঘ দিগন্তের কাছে একেবারে থাকে থাকে ফুলে উঠেছে, একটা প্রকাণ্ড হিংস্র দৈত্যের রোষস্ফীত গোঁফ-জোড়াটার মতো। এই ঘন নীলের ঠিক পাশেই দিগন্তের সব শেষে ছিন্ন মেঘের ভিতর থেকে একটা টক্‌টকে রক্তবর্ণ আভা বেরোচ্ছে—একটা আকাশব্যাপী প্রকাণ্ড অলৌকিক ‘বাইসন’ মোষ যেন ক্ষেপে উঠে রাঙা চোখ দুটো পাকিয়ে ঘাড়ের নীল কেশরগুলো ফুলিয়ে বক্রভাবে মাথাটা নিচু করে দাঁড়িয়েছে, এখনি পৃথিবীকে শৃঙ্গাঘাত করতে আরম্ভ করে দেবে এবং এই আসন্ন সংকটের সময় পৃথিবীর সমস্ত শস্যক্ষেত এবং গাছের পাতা হী হী করছে, জলের উপরিভাগ শিউরে শিউরে উঠছে, কাকগুলো অশান্তভাবে উড়ে উড়ে কা কা করে ডাকছে।

কলকাতা
২৯ জুন ১৮৯২

৬১

সাজাদপুর
২৮ জুন। ১৮৯২।

তোর আজকের চিঠির মধ্যে এক জায়গায় অভির গানের একটুখানি উল্লেখ আছে —পড়ে মনটা কেমন হঠাৎ হুহু করে উঠল—জীবনের অনেকগুলি ছোটো ছোটো উপেক্ষিত সুখ, যারা শহরের গোলমালের মধ্যে কোনো আমল পায় না, বিদেশে এলে তারা সময় বুঝে হৃদয়ের কাছে আপন আপন দরখাস্ত পাঠিয়ে দেয়। আমি গান বাজনা এত ভালোবাসি, এবং শহরেও এত কণ্ঠ এবং বাদ্য আছে, কিন্তু দিনের পর দিন চলে যায় একদিনও প্রায় গান বাজনায় কর্ণপাত করি নে। যদিও সব সময়ে বুঝতে পারি নে কিন্তু মনের ভিতরটা কি তৃষিত হয়ে থাকে না! তোর চিঠি পড়বামাত্রই অভির মিষ্টি গান শোনবার জন্যে আমার এমনি ইচ্ছে করে উঠল যে তখনি বুঝতে পারলুম, আমার প্রকৃতির অনেকগুলি ক্রন্দনের মধ্যে এও একটা ক্রন্দন ভিতরে ভিতরে চাপা ছিল। বড়ো বড়ো দুরাশার মোহে জীবনের ছোটো ছোটো আনন্দগুলিকে উপেক্ষা করে আমাদের জীবনকে কী উপবাসী করেই রাখি! যখন বিলেতে যাচ্ছিলুম আমার একটা কল্পনার সুখের ছবি এই ছিল যে, তোরা কেউ পিয়ানো বাজাচ্ছিস, খোলা দরজা-জানলার ভিতর দিয়ে আলো এবং বাতাস আসছে এবং খানিকটা সুদূর আকাশ ও গাছপালা দেখা যাচ্ছে—আমি একটা খোলা জানলার কাছে কৌচের উপর পড়ে বাইরে চোখ রেখে শুনছি। এটা যে খুবই একটা দুর্লভ দুরাশা তা বলতে পারি নে, কিন্তু তিনশো পঁয়ষট্টি দিনের মধ্যে কদিন অদৃষ্টে এ সুখ পাওয়া যায়! এই-সমস্ত সুলভ আনন্দের

অপরিতৃপ্ত জীবনের হিসাবে প্রতিদিন বেড়ে উঠছে, এর পরে এমন একটা দিন আসতেও পারে যখন মনে হবে যদি আবার জীবনটা সমস্তটা ফিরে পাই তা হলে আর কিছু অসাধ্য সাধন করতে চাই নে, কেবল জীবনের এই প্রতিদিনের অযাচিত ছোটো ছোটো আনন্দগুলি প্রতিদিন উপভোগ করে নিই। যা হোক, মোদ্দা কথাটা হচ্ছে, এবারে যখন কলকাতায় ফিরব তখন মাঝে মাঝে অভির গান শুনব এবং তোরা যখন বাজনা বাজাতে ইচ্ছে করবি আমাকে শ্রোতার মধ্যে গণ্য করে নিস। এবারে কলকাতায় গিয়ে কত কী যে করব তার ঠিক নেই—কাজ করব, গান করব, হাসব, গল্প করব, ভালো বাসব, রাত্তিরে গভীর নিদ্রা দেব এবং সকালে উঠে নব নব সূর্যোদয়কে আনন্দে অভ্যর্থনা করে প্রতিদিনের কাজের মধ্যে প্রবেশ করব—বিক্ষিপ্ত জীবনকে সংহত করে এনে বেশ একটি ছায়াময় শান্তিময় সংগীতময় ছোটো স্রোতের মধ্যে প্রবাহিত করে দেব। লেখার চেয়ে করা কিঞ্চিৎ শক্ত হবে, কিন্তু সেই কঠিন হবে বলেই সুখ আছে।

কলকাতা
৩০ জুন?
১৮৯২

৬২

সাজাদপুর
২৯ জুন। ১৮৯২।

তোকে চিঠিতে লিখেছিলেম কাল 7 p. m.এর সময় কবি কালিদাসের সঙ্গে একটা এন্‌গেজমেণ্ট্‌ করা যাবে। বাতিটি জ্বালিয়ে টেবিলের কাছে কেদারাটি টেনে যখন বেশ প্রস্তুত হয়ে বসেছি, হেনকালে কবি কালিদাসের পরিবর্তে এখানকার পোস্ট্‌মাস্টার এসে উপস্থিত। মৃত কবির চেয়ে একজন জীবিত পোস্ট্‌মাস্টারের দাবি ঢের বেশি—আমি তাকে বলতে পারলুম না 'আপনি এখন যান, কালিদাসের সঙ্গে আমার একটু বিশেষ আবশ্যক আছে'—বললেও সে লোকটা ভালো বুঝতে পারত না। অতএব পোস্ট্‌মাস্টারকে চৌকিটি ছেড়ে দিয়ে কালিদাসকে আস্তে আস্তে বিদায় নিতে হল। এই লোকটির সঙ্গে আমার একটু বিশেষ যোগ আছে। যখন আমাদের এই কুঠিবাড়ির একতলাতেই পোস্ট্‌ আফিস ছিল এবং আমি এঁকে প্রতিদিন দেখতে পেতুম, তখনি আমি একদিন দুপুর বেলায় এই দোতলায় বসে সেই পোস্ট্‌মাস্টারের গল্পটি লিখেছিলুম, এবং সে গল্পটি যখন হিতবাদীতে বেরোল তখন আমাদের পোস্ট্‌মাস্টারবাবু তার উল্লেখ করে বিস্তর লজ্জামিশ্রিত হাস্য বিস্তার করেছিলেন। যাই হোক, এই লোকটিকে আমার বেশ লাগে। বেশ নানারকম গল্প করে যায়, আমি চুপ করে বসে শুনি। ওর মধ্যে আবার বেশ একটুখানি হাস্যরসও আছে। তাই জন্যে খুব শীঘ্র জমিয়ে তুলতে পারে। সমস্ত দিন চুপচাপ একলা বসে থেকে মাঝে মাঝে এইরকম জীবন্ত মানুষের সংঘাতে আবার যেন সমস্ত জীবনটা তরঙ্গিত হয়ে ওঠে।... তিনি আমাদের মুন্সেফ বাবুর গল্প করছিলেন। ব্যাপারটা শুনে এবং তাঁর বলবার ভঙ্গী দেখে আমি হেসে হেসে শ্রান্ত হয়ে পড়েছিলুম। কথাটা হচ্ছে এই, মুন্সেফ বাবু হঠাৎ

একটা গাছের গুঁড়ির মধ্যে শিব দেখতে পেয়েছেন। প্রথম দিন দেখলেন শিব, তার পরদিন দেখলেন কালী, তার পরদিন রাধাকৃষ্ণ ইত্যাদি—সমস্ত বৈকুণ্ঠপুরী আমাদের সাজাদপুরের বটতলায় হঠাৎ নেবে এসেছে। তিনি সকলকেই ধরে ধরে বলছেন—'ঐ দেখুন, ঐ দেখুন, দেখতে পাচ্ছেন না! ঐ চোখ! ঐ জিব!' যারা তাঁর আমলা এবং অনুগত লোক তারা কাজে-কাজেই দেখতে পাচ্ছে, আর যাদের তাঁর প্রতি কিছু নির্ভর নেই তারা কিছুতেই দেখতে পাচ্ছে না। আমাদের পোস্ট্‌মাস্টার সেই শ্রেণীর লোক। যেদিন ক্ষীর এবং কাঁঠাল দিয়ে ঠাকুরের ভোগ হয় সেই দিন তিনি দেখতে পান—কিন্তু ক্ষীরটুকু নিঃশেষ হয়ে গেলেই তিনি মুন্সেফকে জিজ্ঞাসা করেন, 'আপনি কোন্‌টাকে চোখ বলছিলেন মশায়?' মুন্সেফ বলেন, 'দেখতে পাচ্ছেন না? ঐ যে ঐ উপরে!' পোস্ট্‌মাস্টার গম্ভীরভাবে বলেন, 'বটে! আমি ঠিক ঐটেকেই মাথা মনে করেছিলুম।' কোনোদিন বা মুন্সেফ তাঁকে বলেন, 'আচ্ছা মশায়, আপনি ওটা কি লক্ষ্য করে দেখছিলেন? আজ আরতির সময় কাঁসর ঘণ্টা বাজবামাত্র কী যেন একটা গাছের উপর এসে বসল আর উপর থেকে দু-চার ফোঁটা জল পড়ল!' পোস্ট্‌মাস্টার ভালোমানুষের মতো মুখ করে উত্তর দেন, 'আজ্ঞে হাঁ—গাছটা নড়েছিল বটে।' সে গাছটার চার দিক বাঁধিয়ে ফেলা হয়েছে—মুন্সেফ সেখানে দু বেলা পুজো দিচ্ছেন, শাঁখ ঘণ্টা বাজছে, একজন সন্ন্যাসী সেখানে বসে গাঁজা টানছে এবং চোখ বুজে বলছে 'ঐ কালী মায়ীকে দেখতে পাচ্ছি'। এক-একটা লোক আবার সেখানে গিয়ে মূর্ছা যায়, এবং মূর্ছিত অবস্থায় দৈববাণী বলতে থাকে। বিবিধপ্রকার বুজ্‌রুকি হতে আরম্ভ হয়েছে। পোস্ট্‌মাস্টার বলছিলেন, 'আপনাদের জমিদারিতে ম্যাজিস্ট্রেট এলে আপনারা দেখা করতে যান, আর এতগুলো দেবতা বটতলায় এসে আশ্রয় নিলেন—আপনার উচিত একবার ভিজিট পে করে আসা।' আমিও মনে করছি একবার মজাটা দেখে এলে হয়। যাই হোক, কিছুদিন এই হুজুকটা চললে সাজাদপুর একটা তীর্থস্থান হয়ে উঠতে পারে। তাতে আমাদের লাভ আছে। পোস্ট্‌মাস্টার চলে গেলে সেই রাত্রে আবার রঘুবংশ নিয়ে পড়লুম। ইন্দুমতীর স্বয়ম্বর পড়ছিলুম। সভায় সিংহাসনের উপর সারি সারি সুসজ্জিত সুন্দর-চেহারা রাজারা বসে গেছেন—এবং এক সময়ে শঙ্খ এবং তূরী -ধ্বনির মধ্যে বিবাহবেশ পরে সুনন্দার হাত ধরে ইন্দুমতী তাঁদের মাঝখানের সভাপথে এসে দাঁড়ালেন। ছবিটি মনে করতে এমনি সুন্দর লাগে! তার পরে সুনন্দা এক-এক জনের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে আর ইন্দুমতী অনুরাগহীন এক-একটি প্রণাম করে চলে যাচ্ছেন। এই প্রণাম করাটি কেমন সুন্দর! যাকে ত্যাগ করছেন তাকে যে নম্রভাবে সম্মান করে যাচ্ছেন এতে কতটা মানিয়ে যাচ্ছে! ইংরাজ গর্বিণীর ঔদ্ধত্যের চেয়ে এ ঢের ভালো। সকলেই রাজা এবং সকলেই তার চেয়ে বয়সে বড়ো, ইন্দুমতী একটি বালিকা, সে যে তাঁদের একে একে অতিক্রম করে যাচ্ছে এই অবশ্য রূঢ়তাটুকু যদি একটি একটি সুন্দর সবিনয় প্রণাম দিয়ে না মুছে দিয়ে যেত তা হলে এই দৃশ্যের সৌন্দর্য থাকত না। কিন্তু অজের গলায় মালা দেবার পূর্বেই অনেক রাত হওয়াতে শুতে যেতে হল—তাই কাল প্রিয়র বিয়ের সঙ্গে সঙ্গেই ইন্দুমতীর বিয়েটা সমাধা হয়ে উঠল না।

কলকাতা
১ জুলাই ১৮৯২

৬৩

সাজাদপুর
৩০ জুন। ১৮৯২।

মেয়েদের নূতন জীবনে প্রবেশ করার যে কী ভাব তা পুরুষের পক্ষে বোঝা একটু শক্ত—বিশেষতঃ আমাদের মতো হাড়পাকা বুড়ো লোকের। বোধ হয় ওর মধ্যে খুব একটা নেশা আছে—ঈষৎ আশঙ্কা মিশ্রিত থাকাতে ওর তীব্রতা আরও অনেকটা বাড়িয়ে তোলে।...সেই বন্ধনমুক্তির মধ্যে অনেকখানি উল্লাস এবং একটুখানি দুঃখও আছে বোধ হয়। আমার পক্ষে কল্পনা করা দুরূহ, একজন অপরিচিত পুরুষের সঙ্গে অপরিচিত স্থানে দিন রাত কেমন করে কাটে! মনে করলে অসহ্য শ্রান্তি বোধ হয়। তার কারণ আমি নিজে পুরুষমানুষ। মেয়েরা সৃষ্টিকাল পর্যন্ত ঐ কাজ করে আসছে। ওটা তাদের নিতান্ত স্বাভাবিক হয়ে গেছে। একটা নতুন স্বামীকে হাতে করে নিয়ে তার সুখ দুঃখ তার ইচ্ছা অনিচ্ছা বিচার করে একটা সুগম্ভীর পুতুলখেলা করতে বোধ হয় বেশ লাগে—বিশেষতঃ সেটাই যখন জীবনের একমাত্র কর্তব্য কার্য। আমরা বৃদ্ধবয়সে জীবনের অনেকগুলো বৈরাগ্যের মধ্যে রুদ্ধালোকে বসে বসে ফিলজফি করছি, আমরা কী করে ঠিক বুঝব একজন নবীনা তার সমস্ত প্রস্ফুটিত হৃদয়মন নিয়ে যখন একটা জীবন থেকে আর-একটা নূতন আশাপূর্ণ জীবনের উপরে গিয়ে পড়ে তখন সেই প্রথম মুহূর্তে তার সমস্ত অস্তিত্ব কিরকম একটা দীপ্তিতে উজ্জ্বল উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে! আর একজনের নবীন জীবনের নব আশার কথা আমার মতো লোকের কাছে একটা বহুদূরের দৃশ্যের মতো বোধ হয়—সে জায়গা থেকে আমরা যেন অনেক কাল হল চলে এসেছি। কিন্তু আমাদেরও একটা বৃহৎ নবজীবন আছে—সম্মুখে এক-একবার খুব একটা প্রশস্ত আশার সংগীত শুনতে পাই, যেন দূরে আকাশব্যাপী একটা অর্গান থেকে আসছে। আমাদের নবজীবন হচ্ছে যখন সুখ ছেড়ে সন্তোষের বৃহৎ-রাজ্যে প্রবেশ করি—বৃথা সন্ধান পরিত্যাগ করে সমস্ত কর্তব্যগুলিকে অকাতরে গ্রহণ করি। সেও একটা বৃহৎ স্বাতন্ত্র্য লাভ করা, আপনার সমস্ত বোঝা এবং পাথেয় স্কন্ধে করে রাজপথে বেরিয়ে পড়া। এখন আমাদের সামনের নহবৎখানা থেকে ঠিক সাহানা বাজছে না। কানাড়ার তান দিয়েছে—রাত্রি যতই গভীর হবে ততই সেটা মধুর শোনাবে। পিছন ফিরে পৃথিবীটাকে দেখতে এখন বেশ লাগে—তোরা সবাই এখনকার নতুন কালের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসে জীবনের নানা দিকে নানা ভাবে প্রবাহিত হতে যাচ্ছিস, সব-সুদ্ধ মিলে তার একটা ভারী মধুর সংগীত আছে—তোদের ঐ নবজীবনের বিচিত্র আনন্দধ্বনি আমি যেন বেশ স্নিগ্ধশীতল শান্ত হৃদয়ে শুনতে পারি এবং আমার জীবনদিগন্ত থেকে একটি সুন্দর স্নেহ-আনন্দের আভা তোদের নবীন সংসারের উপরে যেন শান্তিবচনের মতো পড়ে। মঙ্গল আমার হৃদয় থেকে প্রতিফলিত হয়ে তোদের ললাটে গিয়ে পড়ুক।

কলকাতা
২ জুলাই ১৮৯২

৬৪

সাজাদপুর
৩ জুলাই। ১৮৯২।

কাল রাত্তিরে আমি বেশ একটা নতুন রকমের স্বপ্ন দেখেছি। যেন কোথায় এক জায়গায় লেপ্‌টেনেন্ট্‌ গবর্নর এসেছে এবং তার অভ্যর্থনা-উপলক্ষ্যে উৎসব হচ্ছে। অন্যান্য নানারকম আমোদের মধ্যে একটা তাম্বুতে একজন বিখ্যাত বুড়ো গাইয়ে গান গাচ্ছে। আমি সে তাম্বুর ভিতরে বসে নেই, কিন্তু বাইরে থেকে সমস্ত শুনতে পাচ্ছি। গাইয়েটা একটা বড়োরকম ইমনকল্যাণ গান গাচ্ছিল। গাইতে গাইতে হঠাৎ এক জায়গায় সে ভুলে গেল। দুবার সেটা ফিরে ফিরে মনে করবার চেষ্টা করলে— তার পর তৃতীয় বারের বার নিরাশ হয়ে তার কথাগুলো ছেড়ে দিয়ে অমনি কেবল সুরটা ভেঁজে যেতে যেতে হঠাৎ তার সুরটা কেমন করে কান্নায় পরিবর্তিত হয়ে গেল— সবাই মনে করছিল সে গান গাচ্ছে, হঠাৎ দেখলে সে কান্না। তার কান্না শুনে বড়দাদা 'আহা আহা' করে উঠলেন, একজন প্রকৃত আর্টিস্টের মনে এরকম ঘটনায় কতখানি আঘাত লাগতে পারে তিনি যেন সেটা বেশ পরিষ্কার বুঝতে পারলেন— বাইরে থেকে তার সেই আন্তরিক শোকের স্বর শুনে আমারও ভারী কষ্ট হতে লাগল— পাছে শ্রোতাদের মধ্যে এমন ঢের লোক থাকে যারা এই গায়কের হঠাৎ এই শোকোচ্ছ্বাস ভারী অদ্ভুত বলে মনে করে, এর যথার্থ মর্মটুকু না বুঝতে পেরে লোকটার উপর আধা বিরক্তি আধা পরিহাস প্রকাশ করে, আমার ইচ্ছে করছিল কোনো রকমে তাকে আড়াল করে রাখতে। তার পরে নানারকম অসংলগ্ন হিজিবিজি কী হল এবং বাংলা মুল্লুকের লেপ্‌টেনেন্ট গবর্নর যে কোথায় উড়ে গেল তার কিছুই মনে নেই। যা হোক, স্বপ্নের এই প্রথমাংশটুকু বেশ লাগল।

কলকাতা। ৫ জুলাই ১৮৯২

সাজাদপুর
৪ জুলাই। ১৮৯২।

আজ সাজাদপুরে স্কুলের ছাত্রসভায় আমাকে যেতে হয়েছিল।...বেলা চারটের সময় সভাগৃহে গিয়ে উপস্থিত হলুম। আমাকে গিয়ে সভাপতির আসনে বসতে হল। যদিও আমার সভ্যেরা সমস্তই প্রায় অপ্রাপ্তবয়স্ক অজাতশ্মশ্রু পাড়াগেঁয়ে ছাত্র, তবু দাঁড়িয়ে উঠে বক্তৃতা করবার আসন্ন সম্ভাবনায় সমস্ত ক্ষণ আমার বুকে ব্যথা করতে লাগল— মনকে নানারকম ভরসা দিয়ে কিছুতেই সেটা নিবারণ করতে পারলুম না। প্রথম ছাত্রটি অতি অদ্ভুত ইংরিজিতে স্বাস্থ্যের উপকারিতা সম্বন্ধে বলতে লাগল; বললে : Used key is not dirty. Great men always take care of their health. Take for instance Pundit Vidyasagar & Keshab Chandra

Sen. They took great care of their health. If you do not take care of your health you get ill and you cannot study or do anything। এই রকম সব জ্ঞানগর্ভ বাক্যাবলী ইংরাজিতে এবং বাংলাতে শোনা গেল। অবশেষে আমাকেও এক সময়ে উঠে দাঁড়াতে হল— আমি যথাসাধ্য সংক্ষেপে সেরে দিলুম। গম্ভীরস্বরে বললুম— ছাত্রগণ! আজ তোমরা যে প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করলে সেই জিনিসটা এবং মৌখিক আলোচনা করবার শক্তি উভয়েরই অভাব থাকাতে আমি আজ অধিক কিছু বলতে পারব না— তা ছাড়া বিষয়টা এমনি যে ও বিষয়ে নূতন কথা বলা ভারী শক্ত। কিন্তু শরীর অসুস্থ হলে কী কষ্ট এবং সুস্থ থাকলে কী সুখ, অনুমান করি, সে বিষয়ে তোমরা এমনি পরিষ্কার বুঝেছ যে আমি ও সম্বন্ধে কোনো নতুন কথা না বললেও তোমরা স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যে চেষ্টা করবে— ইত্যাদি ইত্যাদি। বলতে বলতে আরও দুটো-চারটে কথা বেরিয়ে পড়ল, এবং বক্তৃতাটা নিতান্ত সংক্ষিপ্ত হয় নি।

কলকাতা
৬ জুলাই ১৮৯২

সাজাদপুর
৫ জুলাই। ১৮৯২।

আজ আমাদের এখানে পুণ্যাহ। কাল রাত্তির থেকে বাজনা বাজছে। কাল সন্ধের সময় এখানে হঠাৎ কোথা থেকে একটা Brass Band এসে উপস্থিত— ইংরিজি ধাঁচের দিশি সুর বাজায় কতকটা থিয়েটারের কন্সর্টের মতো— ভ্যাঁপ্পো ভ্যাঁপ্পো করে এবং খুব প্রাণপণ জোরে ড্রাম পিটোয়, বেশিক্ষণ সহ্য হয় না। কিন্তু আজ সকালে একটা সানাইয়েতে ভৈরবী বাজাচ্ছিল, এমনি অতিরিক্ত মিষ্টি লাগছিল যে সে আর কী বলব— আমার চোখের সামনেকার শূন্য আকাশ এবং বাতাস পর্যন্ত একটা অন্তর্নিরুদ্ধ ক্রন্দনের আবেগে যেন স্ফীত হয়ে উঠছিল— বড়ো কাতর কিন্তু বড়ো সুন্দর— সেই সুরটাই গলায় কেন যে তেমন করে আসে না বুঝতে পারি নে। মানুষের গলার চেয়ে কাঁসার নলের ভিতরে কেন এত বেশি ভাব প্রকাশ করে! এখন আবার তারা মুলতান বাজাচ্ছে— মনটা বড়োই উদাস করে দিয়েছে— পৃথিবীর এই সমস্ত সবুজ দৃশ্যের উপরে একটি অশ্রুবাষ্পের আবরণ টেনে দিয়েছে— একপর্দা মুলতান রাগিণীর ভিতর দিয়ে সমস্ত জগৎ দেখা যাচ্ছে। যদি সব সময়েই এইরকম এক-একটা রাগিণীর ভিতর দিয়ে জগৎ দেখা যেত তা হলে বেশ হত। আমার আজকাল ভারী গান শিখতে ইচ্ছে করে— বেশ অনেকগুলো ভূপালী ... এবং করুণ বর্ষার সুর— অনেক বেশ ভালো ভালো হিন্দুস্থানী গান— গান প্রায় কিচ্ছুই জানি নে বললে হয়।

কলকাতা
৭ জুলাই ১৮৯২

৬৭

শিলাইদহ
২০ জুলাই। ১৮৯২।

আজ এই মাত্র প্রাণটা যাবার জো হয়েছিল। কী করে যে বাঁচল ঠিক বুঝতে পারছি নে। যা হোক, বেঁচেছে সে জন্য দুঃখিত নই। পাণ্টি থেকে আজ শিলাইদহে যাচ্ছিলুম—বেশ পাল পেয়েছিলুম, খুব হুহুঃ শব্দে চলে আসছিলুম—বর্ষার নদী চার দিকে থৈ থৈ করছে এবং হৈ হৈ শব্দে ঢেউ উঠছে—আমি মাঝে মাঝে তাকিয়ে দেখছি এবং মাঝে মাঝে লেখাপড়া করছি। বেলা সাড়ে দশটার সময় গড়ুই নদীর ব্রিজ দেখা গেল। বোটের মাস্তুল ব্রিজে বাধবে কি না তাই নিয়ে মাঝিদের মধ্যে তর্ক পড়ে গেল, ইতিমধ্যে বোট ব্রিজের অভিমুখে চলেছে। মাঝিদের আশা ছিল যে, আমরা স্রোতের বিপরীত মুখে যখন চলেছি তখন ভাবনা নেই, কারণ ব্রিজের কাছাকাছি এসেও যদি দেখা যায় যে মাস্তুল বাধবে তখনই পাল নাবিয়ে দিলে বোট স্রোতে পিছিয়ে যাবে। কিন্তু ব্রিজের কাছে এসে আবিষ্কার করা গেল মাস্তুল ব্রিজে ঠেকবে এবং সেখানে একটা আওড় (আবর্ত) আছে। সেই আওড় থাকাতে সেখানে স্রোতের গতি বিপরীত মুখে হয়েছে। তখন বোঝা গেল সামনে একটি সর্বনাশ উপস্থিত। কিন্তু বেশিক্ষণ চিন্তা করবার সময় ছিল না—দেখতে দেখতে বোটটা ব্রিজের উপর গিয়ে পড়ল। মাস্তুল মড়্ মড়্ করে ক্রমেই কাত হতে লাগল—আমি হতবুদ্ধি মাঝিদের ক্রমাগত বলছি, 'তোরা ওখান থেকে সর্, মাস্তুল ভেঙে তোদের মাথার উপর পড়বে।'—এমন সময় আর-একটা নৌকো তাড়াতাড়ি দাঁড় বেয়ে এসে আমাকে তুলে নিলে এবং রশি নিয়ে আমাদের বোটটাকে টানতে লাগল। তপ্‌সি এবং আর-একজন মাঝি রশি দাঁতে কামড়ে ধরে সাঁতরে ডাঙায় গিয়ে টানতে লাগল। ডাঙায় আরও অনেক লোক জমা হয়ে বোট টেনে তুললে। কিন্তু কারও কোনো আশা ছিল না। মাস্তুল যত কাত হচ্ছিল বোটও তত কাত হয়ে পড়ছিল—যদি সময়মত নৌকো না আসত আর বেশিক্ষণ টিকত না। সকলে ডাঙায় ভিড় করে এসে বললে, 'আল্লা বাঁচিয়ে দিয়েছেন, নইলে বাঁচবার কোনো কথা ছিল না।' সমস্ত জড় পদার্থের কাণ্ড কিনা! আমরা হাজার কাতর হই, চেঁচাই, লোহাতে যখন কাঠ ঠেকল এবং নিচের থেকে জল যখন ঠেলতে লাগল তখন যা হবার তা হবেই—জলও এক মুহূর্ত থামল না, মাস্তুলও এক চুল মাথা নিচু করলে না, লোহার ব্রিজও যেমন তেমনি দাঁড়িয়ে রইল। আমি যখন অন্য নৌকোয় চড়ে ডাঙায় এসেছি তখনও বোটটা যায়-যায়—সৌভাগ্যক্রমে ডাঙার এতটা কাছাকাছি এসেছিল যে কারও ডোববার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু বোটটা যেত এবং সেই সঙ্গে আমার খাতাগুলো এবং অন্যান্য লেখাগুলো যেত। মাঝিরা বলছে এ যাত্রাটাই ভালো নয়—তিনবার এই রকম হল। কুষ্টিয়ার ঘাটে মাস্তুল তোলবার সময় দাঁড় ছিঁড়ে মাস্তুল পড়ে যায়, আর একটু হলেই ফুলচাঁদ মাঝি মারা পড়ত। তার পরে সেই পাণ্টির খালের মধ্যে বটগাছে মাস্তুল বেধে গিয়েছিল, সেও যে নিতান্ত কম বিপদ হয়েছিল তা নয়। সেখানে স্রোতের খুব তীব্র বেগ ছিল। তার পরে এই ব্রিজ-বিভ্রাট। আমার একটা এই তৃপ্তি বোধ হচ্ছে, খুব সংকটের সময়েও আমি কেবল মাল্লাদের সাবধান করে দিয়েছি, নিজের জন্যে কিছু-মাত্র হাঁউমাউ করি নি, বুদ্ধি স্থির ছিল। মাস্তুলটা যে কিরকম ভীষণভাবে ভেঙে

পড়বে তার জন্যে প্রতি মুহূর্তে প্রস্তুত ছিলুম—মাল্লাদের যা যা করতে প্রবৃত্ত করিয়েছিলুম তার কোনোটাই অসংগত হয় নি। উঃ! তোরা থাকলে এই বিপদে আমার প্রাণটা কিরকম হত!

কলকাতা
২১ জুলাই ?
১৮৯২

৬৮

শিলাইদহ
২১ জুলাই। ১৮৯২।

কাল বিকেলে শিলাইদহে পৌঁচেছিলুম, আজ সকালে আবার পাবনায় চলেছি। আজকাল নদীর আর সে মূর্তি নেই—তোরা যখন এসেছিলি তখন নদীতে প্রায় একতলা-সমান উঁচু পাড় দেখেছিলি, এখন সে সমস্ত ভরে গিয়ে হাত-খানেক দেড়েক বাকি আছে মাত্র। নদীর যে রোখ! যেন লেজ-দোলানো কেশর-ফোলানো ঘাড়-বাঁকানো তাজা বুনো ঘোড়ার মতো। গতিগর্বে ঢেউ তুলে ফুলে ফুলে চলেছে—এই ক্ষ্যাপা নদীর উপরে চড়ে আমরা দুলতে দুলতে চলেছি। এর মধ্যে ভারী একটা উল্লাস আছে। এই ভরা নদীর যে কলরব সে আর কী বলব! ছল্‌ছল্‌ খল্‌খল্‌ করে কিছুতে যেন আর ক্ষান্ত হতে পারছে না—ভারী একটা যৌবনের মত্ততার ভাব। এ তবু গড়ুই নদী। এখান থেকে আবার পদ্মায় গিয়ে পড়তে হবে—তার বোধ হয় আর কূল-কিনারা দেখবার জো নেই। সে মেয়ে বোধ হয় একেবারে উন্মাদ ক্ষেপে নেচে বেরিয়ে চলেছে, সে আর কিছুর মধ্যেই থাকতে চায় না। তাকে মনে করলে আমার কালীর মূর্তি মনে হয়—নৃত্য করছে, ভাঙছে, এবং চুল এলিয়ে দিয়ে ছুটে চলেছে। মাঝিরা বলছিল, নতুন বর্ষায় পদ্মার খুব 'ধার' হয়েছে। ধার কথাটা কিন্তু ঠিক। তীব্র স্রোত যেন চক্‌চকে খড়্গের মতো, পাতলা ইস্পাতের মতো একেবারে কেটে চলে যায়। প্রাচীন ব্রিটনবাসীদের যুদ্ধরথের চাকায় যেমন কুঠার বাঁধা থাকত, পদ্মার দ্রুতগামী বিজয়রথের দুই চাকায় তেমনি তীব্র খরধার স্রোত শাণিত কুঠারের মতো বাঁধা—দুই ধারের তীর একেবারে অবহেলায় ছারখার করে দিয়ে চলেছে।... এ সময় না হলে নদীর আনন্দ দেখা যায় না! আমরা প্রায়ই শীতের শেষে কিম্বা গ্রীষ্মের আরম্ভে আসি, তখন শীর্ণ নদী নিস্তেজভাবে পোষ মেনে থাকে—দুরন্তপনা একেবারেই থাকে না। তাতেই তোর মা কত ভয় পেয়েছিলেন, এখনকার নদী দেখলে বোধ হয় ডাঙায় থাকতেও ভয় পেতেন। ভয়ের যে কোনো কারণ আছে তা নয়। কাল যে কাণ্ডটি হয়েছিল সে বরঞ্চ কিছু গুরুতর বটে। কাল যমরাজের সঙ্গে এক রকম হাউ-ড্যু-ড করে আসা গিয়েছে। মৃত্যু যে ঠিক আমাদের নেক্‌স্‌ট্‌-ডোর নেবার এ রকম ঘটনা না হলে সহজে মনে হয় না। হয়েও বড়ো মনে পড়ে না। কাল চকিতের মধ্যে যাঁর আভাস পাওয়া গিয়েছিল আজ তাঁর মূর্তিখানা কিছুই স্মরণ হচ্ছে না। অপ্রিয় অনাবশ্যক বন্ধুর মতো একেবারে অনাহূত ঘাড়ে এসে না পড়লে তাঁর বিষয়ে আমরা

বড়ো একটা ভাবি নে! যদিও তিনি আড়াল থেকে আমাদের সর্বদাই খোঁজ খবর নিয়ে থাকেন। যা হোক, তাঁকে আমি বহুত বহুত সেলাম দিয়ে জানিয়ে রাখছি তাঁকে আমি এক কানাকড়ির কেয়ার করি নে— তা তিনি জলে ঢেউই তুলুন আর আকাশ থেকে ফুঁই দিন— আমি আমার পাল তুলে চললুম— তিনি যতদূর করতে পারেন তা পৃথিবীসুদ্ধ সকলেরই জানা আছে, তার বেশি আর কী করবেন! যেমনি হোক, হাঁউমাউ করব না।

কলকাতা
২২ জুলাই ১৮৯২

৬৯

শিলাইদহ
বৃহস্পতিবার
৩ ভাদ্র। ১২৯৯।

এমন সুন্দর শরতের সকাল বেলা! চোখের উপরে যে কী সুধা বর্ষণ করছে সে আর কী বলব। তেমনি সুন্দর বাতাস দিচ্ছে এবং পাখি ডাকছে। এই ভরা নদীর ধারে, বর্ষার জলে প্রফুল্ল নবীন পৃথিবীর উপর শরতের সোনালি আলো দেখে মনে হয় যেন আমাদের এই নবযৌবনা ধরণীসুন্দরীর সঙ্গে কোন্-এক জ্যোতির্ময় দেবতার ভালোবাসা-বাসি চলছে— তাই এই আলো এবং এই বাতাস, এই অর্ধ-উদাস অর্ধ-সুখের ভাব, গাছের পাতা এবং ধানের ক্ষেতের মধ্যে এই অবিশ্রাম স্পন্দন— জলের মধ্যে এমন অগাধ পরিপূর্ণতা, স্থলের মধ্যে এমন শ্যামশ্রী, আকাশে এমন নির্মল নীলিমা। স্বর্গে মর্ত্যে একটা বৃহৎ গভীর অসীম প্রেমাভিনয়। প্রেমের যেমন একটা গুণ আছে তার কাছে জগতের মহা মহা ঘটনাকেও তুচ্ছ মনে হয়, এখানকার আকাশের মধ্যে তেমনি যে-একটি ভাব ব্যাপ্ত হয়ে আছে তার কাছে কলকাতার দৌড়ধাপ হাঁস্‌ফাঁস্ ধড়্‌ফড়ানি ঘড়্‌ঘড়ানি ভারী ছোটো এবং অত্যন্ত সুদূর মনে হয়। চার দিক থেকে আকাশ আলো বাতাস এবং গান এক রকম মিলিত ভাবে এসে আমাকে অত্যন্ত লঘু করে আপনাদের সঙ্গে যেন মিশিয়ে ফেলছে— আমার সমস্ত মনটাকে কে যেন তুলিতে করে তুলে নিয়ে এই রঙিন শরৎ-প্রকৃতির উপর আর-এক পোঁচ রঙের মতো মাখিয়ে দিচ্ছে, তাতে করে এই সমস্ত নীল সবুজ এবং সোনার উপরে আর-একটা যেন নেশার রঙ লেগে গেছে। বেশ লাগছে। 'কী জানি পরান কী যে চায়' বলতে লজ্জা বোধ হয় এবং শহরে থাকলে বলতুম না— কিন্তু ওটা ষোলো আনা কবিত্ব হলেও এখানে বলতে দোষ নেই। অনেক পুরোনো শুকনো কবিতা, কলকাতায় যাকে উপহাসানলে জ্বালিয়ে ফেলবার যোগ্য মনে হয় তারা এখানে আসবামাত্র দেখতে দেখতে মুকুলিত পল্লবিত হয়ে ওঠে।

কলকাতা
১৯ অগস্ট, ১৮৯২

৭০

শিলাইদহ
২০ অগস্ট। ১৮৯২।

রোজ সকালে চোখ চেয়েই আমার বাঁ দিকে জল এবং ডান দিকে নদীতীর সূর্যকিরণে প্লাবিত দেখতে পাই। অনেক সময়ে ছবি দেখলে যে মনে হয়, আহা, এইখানে যদি থাকতুম— ঠিক সেই ইচ্ছেটা এখানে পরিতৃপ্ত হয়। মনে হয় একটি জাজ্বল্যমান ছবির মধ্যে আমি বাস করছি, বাস্তব জগতের কোনো কঠিনতাই এখানে যেন নেই। ছেলেবেলায় রবিন্‌সন্‌ক্রুশো পোলভার্জিনি প্রভৃতি বইয়ে গাছপালা সমুদ্রের ছবি দেখে মন ভারী উদাসীন হয়ে যেত— এখানকার রৌদ্রে আমার সেই ছবি দেখার বাল্যস্মৃতি ভারী জেগে ওঠে। এর যে কী মানে আমি ঠিক ধরতে পারি নে, এর সঙ্গে যে কী একটা আকাঙ্ক্ষা জড়িত আছে আমি ঠিক বুঝতে পারি নে— এ যেন এই বৃহৎ ধরণীর প্রতি একটা নাড়ীর টান— এক সময়ে যখন আমি এই পৃথিবীর সঙ্গে এক হয়ে ছিলুম, যখন আমার উপর সবুজ ঘাস উঠত, শরতের আলো পড়ত, সূর্যকিরণে আমার সুদূরবিস্তৃত শ্যামল অঙ্গের প্রত্যেক রোমকূপ থেকে যৌবনের সুগন্ধি উত্তাপ উত্থিত হতে থাকত, আমি কত দূর দূরান্তর কত দেশ দেশান্তরের জল স্থল পর্বত ব্যাপ্ত করে উজ্জ্বল আকাশের নিচে নিস্তব্ধভাবে শুয়ে পড়ে থাকতুম, তখন শরৎ-সূর্যালোকে আমার বৃহৎ সর্বাঙ্গে যে-একটি আনন্দরস একটি জীবনীশক্তি অত্যন্ত অব্যক্ত অর্ধচেতন এবং অত্যন্ত প্রকাণ্ড বৃহৎ ভাবে সঞ্চারিত হতে থাকত, তাই যেন খানিকটা মনে পড়ে— আমার এই-যে মনের ভাব এ যেন এই প্রতিনিয়ত অঙ্কুরিত মুকুলিত পুলকিত সূর্যসনাথা আদিম পৃথিবীর ভাব। যেন আমার এই চেতনার প্রবাহ পৃথিবীর প্রত্যেক ঘাসে এবং গাছের শিকড়ে শিকড়ে শিরায় শিরায় ধীরে ধীরে প্রবাহিত হচ্ছে, সমস্ত শস্যক্ষেত্র রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছে এবং নারকেল গাছের প্রত্যেক পাতা জীবনের আবেগে থর্‌থর্‌ করে কাঁপছে। এই পৃথিবীর উপর আমার যে-একটি আন্তরিক আত্মীয়-বৎসলতার ভাব আছে ইচ্ছে করে সেটা ভালো করে প্রকাশ করতে, কিন্তু ওটা বোধ হয় অনেকেই ঠিকটি বুঝতে পারবে না— কী-একটা কিম্ভূত রকমের মনে করবে। সেই জন্যে চেষ্টা করতে প্রবৃত্তি হয় না।

কলকাতা
২১ অগস্ট্‌ ১৮৯২

৭১

বোয়ালিয়া
১৮ নভেম্বর। ১৮৯২।

তুই কি এখন রেলগাড়িতে? সমস্ত রাত্তিরের কন্‌কনে শীত ভোগ করে তুই বোধ হয় এখন জেগে উঠে মুখ ধুয়ে এসে পায়ের উপর একখানি কম্বল চাপিয়ে বসেছিস। যদি জব্বলপুর লাইন দিয়ে যেতিস তা হলে আমি বেশ কল্পনা করতে

পারতুম এতক্ষণ তোরা কিরকম দৃশ্যের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিস। এই সময়টা সকাল বেলায় নওয়াড়ির কাছে উঁচুনিচু প্রস্তরকঠিন তরুবিরল পৃথিবীর উপরে সূর্যোদয় হয়। তোদের নাগপুর লাইনেও বোধ হয় সেই রকম হওয়ার সম্ভব। বোধ হয় নবীন রৌদ্রে চারি দিক উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, মাঝে মাঝে আকাশপটে নীল পর্বতের আভাস দেখা যাচ্ছে—শস্যক্ষেত্র বড়ো-একটা নেই—দৈবাৎ দুই-এক জায়গায় সেখানকার বুনো চাষারা মহিষ নিয়ে চাষ আরম্ভ করেছে—দুই ধারে বিদীর্ণ পৃথিবী, কালো কালো পাথর, শুকনো জলস্রোতের নুড়ি-ছড়ানো পথচিহ্ন, ছোটো ছোটো অসম্পূর্ণ শাল গাছ এবং টেলিগ্রাফের তারের উপর কালো-লেজ-ঝোলানো চঞ্চল ফিঙে পাখি। একটা যেন বৃহৎ বন্যপ্রকৃতি পোষ মেনে একটি জ্যোতির্ময় নবীন দেবশিশুর উজ্জ্বল কোমল করস্পর্শ সর্বাঙ্গে অনুভব করে শান্ত স্থির ভাবে শুয়ে পড়ে আছে। কিরকম ছবিটা আমার মনে আসে জানিস? কালিদাসের শকুন্তলায় পড়েছিস দুষ্মন্তের ছেলে শিশু ভরত একটা সিংহশাবক নিয়ে কিরকম খেলা করত। সে যেন একদিন পশুবৎসলভাবে সিংহশাবকের বড়ো বড়ো রোঁওয়ার মধ্যে দিয়ে আস্তে আস্তে আপনার শুভ্রকোমল অঙ্গুলিগুলি চালনা করছে, আর বৃহৎ জন্তুটা স্থির হয়ে পড়ে আছে এবং মাঝে মাঝে সস্নেহে এবং একান্ত নির্ভরের ভাবে আপনার মানববন্ধুর প্রতি আড়চক্ষে চেয়ে দেখছে। আর ওই-যে শুকনো স্রোতের নুড়ি-ছড়ানো পথের কথা বললুম ওতে আমার কী মনে পড়ে জানিস? বিলিতি রূপকথায় পড়া যায় বিমাতা যখন তার সতিনের মেয়েকে এবং ছেলেকে ঘর থেকে তাড়িয়ে ছল করে একটা অচেনা অরণ্যের মধ্যে পাঠিয়ে দিলে তখন দুই ভাই বোনে বনের ভিতর চলতে চলতে বুদ্ধিপূর্বক একটা একটা করে নুড়ি ফেলে আপনাদের পথ চিহ্নিত করে রেখেছিল। ছোটো ছোটো স্রোতগুলি যেন সেই রকম ছোটো ছোটো ছেলে মেয়ে, তারা খুব তরুণ শৈশবে এই অচেনা বৃহৎ পৃথিবীর মধ্যে বেরিয়ে পড়ে, তাই জন্যে চলতে চলতে আপনাদের পথের উপর ছোটো ছোটো নুড়ি ছড়িয়ে রেখে যায়—আবার যখন ফিরে আসবে আবার আপনার এই গৃহপথটি ফিরে পাবে। আজ সকালবেলায় উঠে অবধি আমি মনে মনে তোদের গাড়ির জানলার পাশে বসে তোদের সঙ্গে রেলের দুই পার্শ্বের রৌদ্রোজ্জ্বল চিত্রগুলি দেখে যাবার চেষ্টা করছি। আমার বহুদিনের রেলভ্রমণের নানা স্মৃতি নানা খণ্ড খণ্ড দৃশ্যগুলি আমার মনের দুই পাশে সাজাচ্ছি, বসাচ্ছি, তাদের উপরে হেমন্তের সকাল বেলাকার রোদ্দুর মেলিয়ে দিচ্ছি এবং মাঝে মাঝে তোর সঙ্গে তাই নিয়ে কথাবার্তা কচ্ছি।

সোলাপুর
২২ নভেম্বর ১৮৯২

৭২

নাটোর
১ ডিসেম্বর। ১৮৯২।

কাল তো লোকেনে আমাতে বেরিয়ে পড়া গেল। ঘোড়ার গাড়িতে দীর্ঘ পথ যেতে হয়। সম্মুখে আটাশ মাইল পথ এবং কেবল 'আমরা দুজনে যাত্রী'। লোকেন

একটা সিগারেট এবং একখানা বই আরম্ভ করে দিলে— আমি গুন্ গুন্ স্বরে 'সুন্দরী রাধে আওয়ে বনি' গান ধরলুম—এইরকম করে যখন প্রায় মাইল দশেক অতিক্রম করেছি এবং সূর্য ক্ষীণজ্যোতি হয়ে অস্তাচলের খুব কাছে গিয়ে পৌঁচেছে এমন সময় লোকেন আমার ঐ গানটা উপলক্ষ্য করে বৈষ্ণব কবিদের বিরুদ্ধে তর্ক আরম্ভ করে দিল। সে তর্ক কোনো কালে শেষ হত কি না জানি নে, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে আমাদের তর্কের মাঝখানে একটি কৃশকায়া নদী এসে একটি লম্বা দাঁড়ি টেনে দিলে। সেই নদীতীরে গাড়ি থেকে নেবে একটি নৌসেতু পদব্রজে পার হয়ে ও পারে যেতে হল—ও পারে গিয়ে হঠাৎ আবিষ্কার করা গেল, আকাশে আধখানি চাঁদ উঠেছে এবং সুন্দর জ্যোৎস্না। দুজনে পরামর্শ করা গেল, হেঁটে যতটা দূর পারা যায় যাওয়া যাক। তখন তর্ক বন্ধ করে সেই জ্যোৎস্না এবং গাছের ছায়ায় খচিত নিস্তব্ধ রাস্তা দিয়ে আমরা দুই পথিক নিঃশব্দে মন্দগমনে চলতে লাগলুম। কাল বুধবারে অদূরবর্তী গ্রামে একটা হাট ছিল, সেখানে হাট সেরে দুই-চারজন গ্রামবাসী এবং জনপদবধূ গল্প করতে করতে গৃহে ফিরে যাচ্ছিল। একখানি শূন্য-বোঝাই গোরুর গাড়িতে গাড়োয়ান র‍্যাপার মুড়ি দিয়ে নিদ্রামগ্ন এবং গোরু দুটি আপন মনে আস্তে আস্তে বিশ্রামশালার দিকে চলেছে। মাঝে মাঝে এক-একটা ঘন গাছপালায় আচ্ছন্ন গ্রামের কাছাকাছি আসছি—সেখানে গোয়ালঘর থেকে খড়-জ্বালানো ধোঁওয়া বায়ুহীন শীতরাত্রে উপরে উঠতে না পেরে হিমভারাক্রান্ত হয়ে স্তরে স্তরে বাঁশঝাড়ের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে রয়েছে। এমন করে মাইল দুয়েক গিয়ে তার পরে আমরা আবার গাড়িতে উঠলুম।...ঘড়িতে প্রায় একটা বাজে। তার পরে অনেক কাকুতি মিনতি করে স্থির হল মহারাজ আমাদের একটা ড্রাইভ দিয়ে তার পরে বাড়ি পৌঁছে দেবেন। সকলেই বললে : Such a night was not meant for sleep। বাস্তবিক সুন্দর রাতটি হয়েছিল। রাস্তায় লোক ছিল না এবং রাজবাড়ির প্রশান্ত সরোবরগুলির উপর জ্যোৎস্না এবং তার ধারে ধারে ঘন গাছের ছায়া চমৎকার দেখাচ্ছিল। বোধ হয় রাত্তির দেড়টার সময় বাড়িতে এসে শুয়েছিলুম।

সোলাপুর
৫ ডিসেম্বর ১৮৯২

৭৩

নাটোর
২ ডিসেম্বর। ১৮৯২।

কাল ব্রেক্‌ফাস্ট্‌ খেয়ে মহারাজার ওখানে গিয়েছিলুম, বিকেলে সকলে মিলে বেড়াতে গিয়েছিলুম। দুই ধারে মাঠের মাঝখান [দিয়ে] রাস্তাটা আমার বেশ লেগেছিল। বাংলা দেশের ধু ধু জনহীন মাঠ এবং তার প্রান্তবর্তী গাছপালার মধ্যে সূর্যাস্ত সে কী সুন্দর সে আমি কিছুতে [বলতে] পারি নে—কী একটি বিশাল শান্তি এবং কোমল করুণা—আমাদের এই আপনাদের পৃথিবীর সঙ্গে আর ঐ বহুদূরবর্তী আকাশের সঙ্গে কী-একটি [স্নেহভারবিনত] মৌন ম্লান মিলন!

অনন্তের মধ্যে যে-একটি প্রকাণ্ড অখণ্ড চিরবিরহবিষাদ আছে সে এই সন্ধেবেলাকার পরিত্যক্ত পৃথিবীর উপরে কী-একটি [উদাস] আলোকে আপনাকে ঈষৎ প্রকাশ করে দেয়—সমস্ত জলে স্থলে আকাশে কী-একটি ভাষাপরিপূর্ণ নীরবতা—অনেকক্ষণ চুপ করে অনিমেষনেত্রে চেয়ে দেখতে [দেখতে] মনে হয় যদি এই চরাচরব্যাপ্ত পূর্ণনীরবতা আপনাকে আর ধারণ করতে না পারে, সহসা তার অনাদি ভাষা যদি বিদীর্ণ হয়ে প্রকাশ পায়, [তা হলে] কী-একটা গভীর গম্ভীর শান্ত সুন্দর সকরুণ সংগীত পৃথিবী থেকে নক্ষত্রলোক পর্যন্ত বেজে ওঠে! আসলে তাই হচ্ছে। কেননা, জগতের যে কম্পন আমাদের [চক্ষে] এসে আঘাত করছে তাই আলোক, আর যে কম্পন কানে এসে আঘাত করছে তাই শব্দ। আমরা একটু নিবিষ্টচিত্তে স্থির হয়ে চেষ্টা করলে জগতের সমস্ত [সম্মি]লিত আলোক এবং বর্ণের বৃহৎ হার্মনিকে মনে মনে একটি বিপুল সংগীতে খানিকটা তর্জমা করে নিতে পারি। এই জগৎব্যাপী দৃশ্যপ্রবাহের অবিশ্রাম [কম্পন] ধ্বনিকে কেবল একবার চোখ বুজে মনের কান দিয়ে শুনতে হয়। কিন্তু তোকে আমি এই সূর্যোদয় আর সূর্যাস্তের কথা কতবার লিখব! আমি নিত্য নূতন [করে] অনুভব করি কিন্তু নিত্য নূতন করে কি প্রকাশ করতে পারি!

সোলাপুর
৬ ডিসেম্বর ১৮৯২

খাতার কাগজে ধার ছিন্ন হওয়ায় কোনো কোনো শব্দ অবলুপ্ত; অনুমানে বা পূর্বমুদ্রিত 'ছিন্নপত্র' মিলাইয়া যে পাঠ স্থির হয় তাহাই বন্ধনীমধ্যে দেওয়া হইয়াছে।

৭৪

শিলাইদহ
৯ ডিসেম্বর। ১৮৯২।

এখন একলাটি আমার সেই বোটের জানলার কাছে অধিষ্ঠিত হয়ে বহুদিন পরে একটু মনের শান্তি পেয়েছি। স্রোতের অনুকূলে বোট চলছে, তার উপর পাল পেয়েছে—দুপুরবেলাকার রোদ্দুরে শীতের দিনটা ঈষৎ তেতে উঠেছে, পদ্মায় নৌকো নেই শূন্য বালির [চর] হলদে রঙ, এক দিকে নদীর নীল আর এক দিকে আকাশের নীলের মাঝে একটি রেখার মতো আঁকা রয়েছে—জল কেবল উত্তরে বাতাসে খুব অল্প অল্প চিক্ চিক্ করে কাঁপছে, ঢেউ নেই। আমি এই খোলা জানলার ধারে হেলান দিয়ে বসে আছি; আমার মাথায় অল্প অল্প বাতাস লাগছে, বেশ আরাম করছে। অনেক দিন তীব্র রোগভোগের পর শরীরটা শিথিল দুর্বল অবস্থায় আছে, এই রকম সময় প্রকৃতির এই ধীর স্নিগ্ধ শুশ্রূষা ভারী মধুর লাগছে—এই শীতশীর্ণ নদীর মতো আমার সমস্ত অস্তিত্ব যেন মৃদু রৌদ্রে পড়ে অলসভাবে ঝিক্ ঝিক্ করছে, এবং যেন আর্ধেক-আনমনে তোকে চিঠি লিখে যাচ্ছি। প্রতিবার এই পদ্মার উপর আসবার আগে ভয় হয় আমার পদ্মা বোধ হয়

পুরোনো হয়ে গেছে। কিন্তু, যখনই বোট ভাসিয়ে দিই, চার দিকে জল কুল্‌কুল্‌ করে ওঠে—চারি দিকে একটা স্পন্দন কম্পন আলোক আকাশ মৃদুকলধ্বনি, একটা সুকোমল নীল বিস্তার, একটি সুনবীন শ্যামল রেখা, বর্ণ এবং নৃত্য এবং সংগীত এবং সৌন্দর্যের একটি নিত্য উৎসব উদ্ঘাটিত হয়ে যায়, তখন আবার নতুন করে আমার হৃদয় যেন অভিভূত হয়ে যায়। এই পৃথিবীটি আমার অনেক দিনকার এবং অনেক জন্মকার ভালোবাসার লোকের মতো আমার কাছে চিরকাল নতুন; আমাদের দুজনকার মধ্যে একটা খুব গভীর এবং সুদূরব্যাপী চেনাশোনা আছে। আমি বেশ মনে করতে পারি বহু যুগ পূর্বে যখন তরুণী পৃথিবী সমুদ্রস্নান থেকে সবে মাথা তুলে উঠে তখনকার নবীন সূর্যকে বন্দনা করছেন, তখন আমি এই পৃথিবীর নূতন মাটিতে কোথা থেকে এক প্রথম জীবনোচ্ছ্বাসে গাছ হয়ে পল্লবিত হয়ে উঠেছিলুম। তখন পৃথিবীতে জীবজন্তু কিছুই ছিল না, বৃহৎ সমুদ্র দিনরাত্রি দুলছে, এবং অবোধ মাতার মতো আপনার নবজাত ক্ষুদ্র ভূমিকে মাঝে মাঝে উন্মত্ত আলিঙ্গনে একেবারে আবৃত করে ফেলছে। তখন আমি এই পৃথিবীতে আমার সমস্ত সর্বাঙ্গ দিয়ে প্রথম সূর্যালোক পান করেছিলুম, নবশিশুর মতো একটা অন্ধজীবনের পুলকে নীলাম্বরতলে আন্দোলিত হয়ে উঠেছিলুম, এই আমার মাটির মাতাকে আমার সমস্ত শিকড়গুলি দিয়ে জড়িয়ে এর স্তন্যরস পান করেছিলুম। একটা মূঢ় আনন্দে আমার ফুল ফুটত এবং নবপল্লব উদ্‌গত হত। যখন ঘনঘটা করে বর্ষার মেঘ উঠত তখন তার ঘনশ্যাম ছায়া আমার সমস্ত পল্লবকে একটি পরিচিত করতলের মতো স্পর্শ করত। তার পরেও নব নব যুগে এই পৃথিবীর মাটিতে আমি জন্মেছি। আমরা দুজনে একলা মুখোমুখি করে বসলেই আমাদের সেই বহুকালের পরিচয় যেন অল্পে অল্পে মনে পড়ে। আমার বসুন্ধরা এখন 'একখানি রৌদ্রপীত হিরণ্য-অঞ্চল' পরে ঐ নদীতীরের শস্যক্ষেত্রে বসে আছেন, আমি তাঁর পায়ের কাছে কোলের কাছে গিয়ে লুটিয়ে পড়েছি—অনেক ছেলের মা যেমন অর্ধমনস্ক অথচ নিশ্চল সহিষ্ণুভাবে আপন শিশুদের আনাগোনার প্রতি তেমন দৃক্‌পাত করেন না—তেমনি আমার পৃথিবী এই দুপুর বেলায় ঐ আকাশপ্রান্তের দিকে চেয়ে বহু আদিমকালের কথা ভাবছেন, আমার দিকে তেমন লক্ষ্য করছেন না: আর আমি কেবল অবিশ্রাম বকে যাচ্ছি। এই ভাবে এক রকম কেটে যাচ্ছে। প্রায় বিকেল হয়ে এল। এখন শীতের বেলা কিনা, দেখতে দেখতে রোদ্দুর পড়ে যায়।

সোলাপুর। ১৪ ডিসেম্বর?
১৮৯২

৭৫

শিলাইদহ
১৮ ডিসেম্বর। ১৮৯২।

যেমন বজ্র পড়ে গেলে তবে তার আওয়াজ পাওয়া যায়, তেমনি পরস্পর দূরে থাকলে যথাসময়ে কোনো আওয়াজ পাবার যো নেই; ঘটনা নিঃশেষ হয়ে গেলে

পর তখন চিঠিতে তার আলোচনা করতে হয়। আমার দাঁত-কানের ব্যথার খবর এত দিনে বুঝি তোদের কানে গিয়ে পৌঁছল? যখন সুকোমল তুলোর স্তর দিয়ে আচ্ছন্ন করে নিজের কপোলদেশ বহুযত্নে লালন পালন করছিলুম— পীড়িত শিশু-সন্তানকে যেমন ঢেকে-ঢুকে ঘিরে-ঘেরে রাখে নিজের এই মুখমণ্ডলটিকে তেমনি করে রেখেছিলুম তখন পৃথিবীর লোক আমাকে সুখী এবং সুস্থ -জ্ঞানে দিব্যি নিশ্চিন্ত ছিল। আর, এখন যখন তার স্মৃতিমাত্র এবং কষের দাঁতের ফুলোর ঈষৎ মাত্র অবশিষ্ট আছে তখন ভয় ভাবনা ভর্ৎসনা নানারকম শোনা যাচ্ছে। এখন সেই হতভাগ্য কপোলে চপেটাঘাত করে বলতে ইচ্ছে করছে, 'তোর এমন দুর্লভ বেদনাটা যদুবাবুর উপর দিয়েই কাটালি! এমন একটা বৃহৎ উপসর্গ ন দেবায় ন ধর্মায় গেল!'... ব্যামো করে আজকাল কোনো ফল নেই, তাই আজকাল শরীর ভালো রাখবার প্রতি একটু বিশেষ দৃষ্টি আছে। কিন্তু শরীরের রহস্য প্রায় মনের রহস্যেরই অনুরূপ। এই ত্রিশটা বৎসর ধরে পোড়া শরীরটার সঙ্গে এক প্রকারের পরিচয় হয়েছে— যা করলে যা হয়, না হয়, কতকটা বুঝে নিয়েছিলুম। এবং বহু অভিজ্ঞতার পর সেই ভাবে সবে চলতে আরম্ভ করেছি। এমন সময় একত্রিশ বৎসরের সময় দেখা গেল পূর্বে যা করলে যা না হত, এখন তা করলে তা হয়— আবার ফের নতুন শিক্ষা, নতুন পরিচয়। আবার ত্রিশটা-পঁয়ত্রিশটা বৎসর ঠেকে ঠেকে নতুন নতুন আবিষ্কার করে যখন সবে শিখেছি কখন ফ্ল্যানেল পরতে হবে, কখন দরজা জানলা বন্ধ করতে হবে, কখন গরম জলে নাইতে হবে, কখন ভুষির তাপ কখন পুল্‌টিস্‌, কখন গলা ভাত কখন মৌরলা মাছের ঝোল— তখন সে বহুমূল্য বহুদিনলব্ধ অভিজ্ঞতা খাটাবার আর বড়ো বেশি দিন বাকি থাকবে না।... জিজ্ঞাসা করি, এই দাঁতে ব্যথা, কানে ব্যথা, গলায় ব্যথা, এগুলো এতকাল ছিল কোথায়? পূর্বাহ্ণে যদি একটু নোটিশ পেতুম তা হলে পৃথিবীর মধ্যে এত দেশ থাকতে নাটোরে এ কুকীর্তি হবে কেন? মানুষের মনটা তো যথেষ্ট আন্‌রীজ্‌নেব্‌ল্‌, বিবেচনা করে দেখতে গেলে শরীরটা তার নিচেই। আচ্ছা, বব, রীজ্‌ন্‌-নামক পদার্থটা তা হলে আছে কোথায়? কেবল সালির সাইকলজির মধ্যে? আজ তোর চিঠি পড়ে আমার মাথায় এই রকমের অনেকগুলো সুগভীর সমস্যার উদয় হচ্ছে।

সোলাপুর
২২ ডিসেম্বর ১৮৯২

৭৬

...আত্মপীড়নও আমরা সহ্য করতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু তবু মনের জড়ত্ব চাই নে। এর থেকেই বোঝা যায় মানুষ সুখ চায় না, উন্নতি চায়— দুঃখ তার তেমন অপ্রিয় নয় যেমন অবনতি।

৭৭

।ফেব্রুয়ারি ১৮৯৩।

একে তো ভারতবর্ষীয় ইংরেজগুলোকে আমি দুচক্ষে দেখতে পারি নে। তারা স্বভাবতই আমাদের বড়ো অবজ্ঞার ভাবে দেখে, আমাদের উপর তাদের কানাকড়ির সিম্প্যাথি নেই, তার উপরে আবার তাদের কাছে নিজেকে exhibit করা আমার পক্ষে বড়োই কষ্টকর। এমন-কি, ওদের থিয়েটার প্রভৃতি আমোদের স্থলে এবং দোকানেও আমার পারতপক্ষে ঢুকতে ইচ্ছে করে না—(কেবল থ্যাকারের দোকান ছাড়া)। ইংরেজের ঘরে যত বড়ো গোরুই জন্মাক-না কেন সে যে আমাদের দেশের সকল লোকের চেয়ে শ্রেষ্ঠত্ব অনুভব করে সেটা মনের ভিতর বড়ো আঘাত করে। আমাদের মধ্যে একটা কোনো পদার্থ আছে এটা যতক্ষণে ওরা স্বীকার না করবে ততক্ষণ ওদের কাছে যেতে গেলে হয় অবনতি স্বীকার করে যেতে হবে, নয় অপমান অনুভব করতে হবে। এক-এক সময় আমাদের দেশের লোকের উপর আমার এমন অসহ্য রাগ হয়! ইংরেজগুলোকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছে না বলে নয়, কিন্তু কোনো বিষয়ে কিছু করছে না বলে—এমন একটা কিছুই নেই যাতে আপনার মর্যাদা দেখাতে পারছে। মনের মধ্যে সে লক্ষ্যমাত্র নেই—কেবল ইংরেজের কুড়োনো পেখম লেজে গুঁজে অদ্ভুত ভঙ্গীতে নেচে নেচে বেড়াতে একটুখানি লজ্জা কিম্বা হীনতা অনুভব করে না। এরা দেশের লোককে কিছু শেখাতে চায় না, দেশের ভাষাকে অবজ্ঞা করে, যে-কোনো বিষয়ে ইংরেজের চোখ পড়ে না সে-সকল বিষয়ে উদাসীন—এরা মনে করে কন্‌গ্রেস করে সকলে মিলে দুই হাত তুলে গবর্নমেণ্টের দোহাই পেড়ে এরা বড়োলোক হবে। আমি তো বলি যতদিন না আমরা একটা কিছু করে তুলতে পারব ততদিন আমাদের অজ্ঞাতবাস ভালো। কেননা, আমরা যখন সত্যই অবমাননার যোগ্য তখন কিসের দোহাই দিয়ে পরের কাছে আত্মসম্মান রক্ষা করব? তাদের মতো অবিকল পেখম নাড়তে শিখলেই কি হবে? পৃথিবীর মধ্যে যখন আমাদের একটা কোনো প্রতিষ্ঠাভূমি হবে, পৃথিবীর কাজে যখন আমাদের একটা কোনো হাত থাকবে, তখন আমরা ওদের সঙ্গে হাসিমুখে কথা কইতে পারব। ততদিন লুকিয়ে থেকে চুপ মেরে আপনার কাজ করে যাওয়াই ভালো। দেশের লোকের ঠিক এর উল্টো ধারণা—যা-কিছু ভিতরকার কাজ, যা গোপনে থেকে করতে হবে, সে তারা তুচ্ছ জ্ঞান করে, যেটা নিতান্ত ক্ষণিক অস্থায়ী আস্ফালন এবং আড়ম্বর মাত্র, সেইটেতেই তাদের যত ঝোঁক। আমাদের এ বড়ো হতভাগা দেশ। এখানে মনের মধ্যে কাজ করবার বল রাখা বড়ো শক্ত। যথার্থ সাহায্য করবার লোক কেউ নেই। যার সঙ্গে দুটো কথা কয়ে একটুখানি প্রাণ সঞ্চয় করা যায় এমন মানুষ দশ-বিশ ক্রোশের মধ্যে একটি পাওয়া যায় না—কেউ চিন্তা করে না, অনুভব করে না, কাজ করে না; বৃহৎ কার্যের যথার্থ জীবনের কোনো অভিজ্ঞতা কারও নেই; বেশ একটি পরিণত মনুষ্যত্ব কোথাও পাওয়া যায় না। সমস্ত মানুষগুলো যেন উপছায়ার মত ঘুরে বেড়াচ্ছে। খাচ্ছে-দাচ্ছে, আপিস যাচ্ছে, ঘুমচ্ছে, তামাক টানছে, আর নিতান্ত নির্বোধের মত বক্‌ বক্‌ করে বকছে। যখন ভাবের কথা বলে তখন সেণ্টিমেণ্টাল হয়ে পড়ে, আর যখন যুক্তির কথা পাড়ে তখন ছেলেমানুষি করে। যথার্থ মানুষের একটা সংস্রব

পাবার জন্যে মানুষের মনে ভারী একটা তৃষ্ণা থাকে, ইচ্ছা করে মানুষের সঙ্গে ভাবের আদানপ্রদান দ্বন্দ্বপ্রতিদ্বন্দ্ব চলে। কিন্তু সত্যিকার রক্তমাংসের শক্তসমর্থ মানুষ তো নেই— সমস্ত উপছায়া, পৃথিবীর সঙ্গে অসংলগ্নভাবে বাষ্পের মতো ভাসছে। আমাদের দেশে যার মাথায় দুটো-চারটে আইডিয়া আছে তার মতো সঙ্গীহীন একক প্রাণী দুনিয়ায় আর নেই বোধ হয়। কী কথা থেকে কী কথা উঠল তার ঠিক নেই— কিন্তু এ আমার অন্তরের আক্ষেপ। জীবনের অনেকটা অবসাদ এই মানুষের অভাবে।

সোলাপুর
ফেব্রুয়ারি ১৮৯৩

৭৮

বালিয়া
মঙ্গলবার। ৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৩।

আমার কিন্তু আর ভ্রমণ করতে ইচ্ছে করছে না— ভারী ইচ্ছে করছে একটি কোণের মধ্যে আড্ডা করে একটু নিরিবিলি হয়ে বসি। ভারতবর্ষের দুটি অংশ আছে— এক অংশ গৃহস্থ, আর-এক অংশ সন্ন্যাসী; কেউ বা ঘরের কোণ থেকে নড়ে না, কেউ বা একেবারে গৃহহীন। আমার মধ্যে ভারতবর্ষের সেই দুই ভাগই আছে। ঘরের কোণও আমাকে টানে, ঘরের বাহিরও আমাকে আহ্বান করে। খুব ভ্রমণ করে দেখে বেড়াব ইচ্ছে করে, আবার উদ্‌ভ্রান্ত শ্রান্ত মন একটি নীড়ের জন্যে লালায়িত হয়ে ওঠে। পাখির মতো ভাব আর-কি। থাকবার জন্যে যেমন ছোট্ট নীড়টি, ওড়বার জন্যে তেমনি মস্ত আকাশ। আমি যে কোণটি ভালোবাসি, সে কেবল মনকে শান্ত করবার জন্যে। আমার মনটা ভিতরে ভিতরে এমনি অশ্রান্ত ভাবে কাজ করতে চায়, লোকজনের ভিড়ের মধ্যে তার কর্মোদ্যম এমনি পদে পদে প্রতিহত হতে থাকে, যে, সে অস্থির হয়ে ওঠে— খাঁচার ভিতর থেকে আমাকে কেবলই যেন আঘাত করতে থাকে। একটু নিরালা পেলে সে বেশ সাধ মিটিয়ে ভাবতে পারে, চার দিকে চেয়ে দেখতে পারে, ভাবগুলিকে খুব মনের মতো ইনিয়ে-বিনিয়ে প্রকাশ করতে পারে। এতদূর পর্যন্ত তার বাড়াবাড়ি যে,... আমার সঙ্গে এসেছে তাও যেন সে সহ্য করতে পারছে না। দিবারাত্রি সে একেবারে অখণ্ড অবসর চায়। সমস্তদিন কারও সঙ্গে যদি আমার একটিমাত্র কথাও না হয় তা হলে সে সুখে থাকে। সৃষ্টিকর্তা আপনার সৃষ্টির মধ্যে যেমন একাকী সে আপনার ভাবরাজ্যের মধ্যখানে তেমনি একলা বিরাজ করতে চায়। নইলে যেন তার সমস্ত ক্ষমতা সমস্ত অস্তিত্ব ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে।... একে কি মিস্যান্‌থ্রোপি বলে? তা ঠিক নয়। আমি লোক ভালোবাসি নে বলে যে আমি লোকের কাছ থেকে তফাত থাকতে চাই তা নয়, আমার মন নড়বার-চড়বার এবং কাজ করবার জন্যে অনেকখানি জায়গা চায়।

সোলাপুর
১৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৩

৭১

১০ ফেব্রুয়ারি। ১৮৯৩।

খোঁড়ার পা খানায় পড়ে। আমি একে অ্যাংলো ইন্‌ডিয়ান্‌গুলোকে দেখতে পারি নে, তার উপরে আবার কাল ডিনার-টেবিলে তাদের রূঢ় স্বভাবের বিশেষ পরিচয় পাওয়া গেল। এখানকার কলেজের প্রিন্সিপাল একটা উৎকট ইংরেজ—প্রকাণ্ড নাক, ধূর্ত চোখ, দেড় হাত চিবুক, গোঁফ দাড়ি কামানো, মোটা গলা, র-অক্ষর-বিহীন জ্যাব্‌ড়ানো উচ্চারণ—সবসুদ্ধ জড়িয়ে একটা পূর্ণপরিণত জন্‌বুষ। সে আমাদের দেশের লোকের উপর বড্ড লেগেছিল। জানিস বোধ হয় গবর্মেণ্ট্‌ আমাদের দেশের জুরি প্রথার উপর হস্তক্ষেপ করতে চেয়েছিল বলে চার দিকে ভারী একটা আপত্তি উঠেছে। লোকটা জোর করে সেই বিষয়ে কথা তুলে বো—বাবুর সঙ্গে তর্ক করতে লাগল। বললে এ দেশের moral standard low, এখানকার লোকের lifeএর sacredness সম্বন্ধে যথেষ্ট বিশ্বাস নেই, এরা জুরি হবার যোগ্য নয়। আমার যে কী রকম করছিল সে তোকে কী বলব! আমার বুকের মধ্যে রক্ত একেবারে ফুটছিল, কিন্তু কথা খুঁজে পাচ্ছিলুম না। বিছানায় শুয়ে শুয়ে কত কথাই মনে এল, কিন্তু তখন যেন একেবারে বোবা হয়ে গিয়েছিলুম। ভেবে দেখ্‌ দেখি [বব] একজন বাঙালির নিমন্ত্রণে এসে বাঙালির মধ্যে বসে যারা এ রকম করে বলতে কুণ্ঠিত হয় না তারা আমাদের কী চক্ষে দেখে! আর কেন! সিম্প্যাথি চুলোয় যাক্‌ গে, যারা আমাদের সঙ্গে ভদ্রতা করাও বাহুল্য বিবেচনা করে তাদের কাছে আমরা হেসে হেসে, ঘেঁষে ঘেঁষে, যেচে মান কেঁদে সোহাগ কেন নিতে যাই [বব]? ওদের একটুখানি অনুগ্রহের করস্পর্শ পেলেই অমনি কেন আমাদের সর্বাঙ্গ সর্বান্তঃকরণ একতাল jelly-পিণ্ডের মতো আহ্লাদে আগাগোড়া টল্‌-টল্‌ থল্‌-থল্‌ করে দুলে ওঠে! উঃ, ওদের কী গর্ব, কী অবজ্ঞা! আর, আমাদের কী দৈন্য, কী হীনতা! অপমান চুপ করে সয়ে থাকাই যথেষ্ট হেয়, কিন্তু তার উপরে আবার ওদের কাছে গায়ে পড়ে আদর কাড়তে যাওয়া আমার বোধ হয় অবনতির একশেষ। আমাদের এই দরিদ্র উপেক্ষিত অপমানিত ভারতবর্ষকে আমরা বুকের কাছে টেনে নিই, এর যত দোষ যত দুর্বলতা যত মালিন্য আছে সমস্ত অন্তরের সঙ্গে মার্জনা করতে এবং একান্ত যত্নে মার্জন করতে চেষ্টা করি—এর সমস্ত ভাব সমস্ত ব্যবহার আমাদের মনের সঙ্গে ঠিক মিলছে না বলে একে যেন হৃদয় থেকে দূর না করি! আমাদের স্বদেশ যদি কোনো ভ্রান্তসংস্কারবশতঃ আমাদের দূরে রাখতে চেষ্টা করে তা হলে অম্‌নি তখনি বিনা বাক্যব্যয়ে আমরা কেন সরে যাই, আর সাহেবরা প্রকাশ্যভাবে আমাদের সহস্রবার করে লাথি ঝাঁটা মারে তবু তো এই নাছোড়বান্দার দলকে কিছুতেই তাদের চরণতল তাদের দ্বারপ্রান্ত থেকে নির্মুক্ত করে ফেলতে পারে না। যেখানে জুতো পরে যেতে দেয় না সেখানে জুতো খুলে যাই, যেখানে মাথা তুলে যেতে দেয় না সেখানে সেলাম করতে করতে ঢুকি, যেখানে আমাদের স্বজাতির প্রবেশ নিষেধ সেখানে সাহেবের ছদ্মবেশ পরে হাজির হই। ওরা চায় না ওদের সভায় গিয়ে আমরা বসি, ওদের আমোদে গিয়ে আমরা যোগ দিই, ওদের কাজের মধ্যে আমরা হস্তক্ষেপ করি—কিন্তু তবু আমরা চেষ্টা করে, ফিকির করে, সুযোগ বুঝে, খোষামোদ করে, আপনার

লোককে দূরে রেখে, স্বজাতির নিন্দায় যোগ দিয়ে, স্বদেশের সমস্ত অবমাননা পরিপাক করে, যে-কোনো প্রকারে হোক ওদের একটু সংস্রব পেলে বেঁচে যাই। আমি এক্‌সেপ্‌শন্‌ সাজতে চাই নে—যদি আমাদের জাতের প্রতি তোমাদের কোনো শ্রদ্ধা না থাকে, তা হলে আমি সভ্যামি করে তোমাদের পুষ্যি হতে যেতে চাই নে। আমি আমার হৃদয়ের সমস্ত প্রীতির সঙ্গে আমার সেই স্বজাতির মধ্যে থেকে আমার যা কর্তব্য তা করব—সে তোমাদের চোখেও পড়বে না, তোমাদের কানেও উঠবে না। তোমাদের উচ্ছিষ্ট তোমাদের আদরের টুক্‌রোর জন্যে আমার তিলমাত্র প্রত্যাশা নেই, আমি তাতে পদাঘাত করি। মুসলমানের শূকর যেমন, তোমাদের আদর আমার পক্ষে তেমনি। তাতে আমার জাত যায়, সত্যি জাত যায় —যাতে আত্মাবমাননা করা হয় তাতেই যথার্থ জাত যায়, নিজের কৌলীন্য এক মুহূর্তে নষ্ট হয়ে যায়—তার পরে আর আমার কিসের গৌরব! যে আপনার অন্তরের যথার্থ সম্মান নষ্ট করে বাইরের জাঁকজমক কেনে তাকে যেন আমরা কিছুমাত্র সম্মান না করি। আমাদের ভারতবর্ষের সব চেয়ে জীর্ণতম কুটীরের মলিনতম চাষীকে আমি আমাদের আপনার লোক মনে করতে কুণ্ঠিত হব না, আর যারা ফিট্‌ফাট্‌ কাপড় পরে dogcart হাঁকায় আর আমাদের নিগার বলে, তারা যতই সভ্য যতই উন্নত হোক, আমি যদি কখনো তাদের সংস্রবের জন্যে লালায়িত হই তবে যেন আমার মাথার উপরে জুতো পড়ে। কাল আমার বুকের ভিতরে মাথার ভিতরে এমনি কষ্ট হচ্ছিল যে কিছুতেই সমস্ত রাত ঘুমতে পারি নি—কেবল এপাশ ওপাশ ছট্‌ফট্‌ করেছি। যখন ড্রয়িংরুমের এক কোণে এসে বসলুম আমার চোখে সমস্ত ছায়ার মতো ঠেকছিল—আমি যেন আমার চোখের সামনে সমস্ত বৃহৎ ভারতবর্ষ বিস্তৃত দেখতে পাচ্ছিলুম, আমাদের এই গৌরবহীন বিষণ্ণ হতভাগ্য জন্মভূমির ঠিক শিয়রের কাছে আমি যেন বসে ছিলুম—এমন একটা বিপুল বিষাদ আমার সমস্ত হৃদয়কে আচ্ছন্ন করেছিল সে আর কী বলব। অথচ চোখের সামনে ইভ্‌নিং-ড্রেস-পরা মেমসাহেব এবং কানের কাছে ইংরিজি হাস্যালাপের গুঞ্জনধ্বনি—সবসুদ্ধ এমনি অসংগত! আমাদের চিরকালের ভারতবর্ষ আমার কাছে কতখানি সত্যি আর এই ডিনার-টেবিলের বিলিতি মিষ্টিহাসি—ইংরিজি শিষ্টালাপ আমাদের পক্ষে কত ফাঁকা, কত ফাঁকি, কী সুগভীর মিথ্যে! মেয়েরা যখন মৃদুমিষ্টি সাধা গলায় কথা কচ্ছিল তখন আমার ভারতবর্ষের ধন তোদের আমি মনে করছিলুম। তোরা তো এই ভারতবর্ষের।

সোলাপুর
১৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৩

৮০

পুরীর পথে ?
[১১] ফেব্রুয়ারি। ১৮৯৩।

তার পরে তাঁর অন্যান্য দুটো-চারটে কবিতাও পড়া গেল। ভদ্রতার মিথ্যা প্রশংসা-বাক্য কিছুতেই আমার মুখ দিয়ে বেরোয় না, আবার বিনা নোটিশে ফস্‌ করে

নিন্দার কণ্টকটুকু যথাসম্ভব মোচন করে গুছিয়ে কথা বলা ভারী শক্ত। ক্রমাগত মূঢ়ের মতো অ্যাঁ-ওঁ করতে হয়। আমাকে যখন জিজ্ঞাসা করলেন 'আমি কি তবে কবিতা লেখা চালাব', আমি বললুম, 'কেন চালাবেন না? কবিতা কি কেবল অন্য লোককে শোনাবার জন্যে? ওতে তো নিজের একটা খুব আনন্দ আছে। পরের প্রশংসা যদি না মেলে তো সেই নিজের আনন্দই তো আমার মনে হয় যথেষ্ট পুরস্কার।' আমার এই উৎসাহ-বাক্যে তিনি যে খুব বেশি উৎসাহিত হয়ে উঠলেন, এমনতর আমার বোধ হয় না। তাঁর কবিতাগুলো যে খুব খারাপ তা নয়, কেবল চলনসই মাত্র। কেউ কেউ যেমন প্রথম শ্রেণীতে পাস করে, কেউ কেউ তেমনি প্রথম শ্রেণীতে ফেল করে। কিন্তু যারা পাস করে তাদেরই ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী নির্দিষ্ট হয়, যারা ফেল করে তাদের মধ্যে শ্রেণীনির্দেশ করা কেউ আবশ্যক মনে করে না— তারা সবাই এক দলের মধ্যে পড়ে যায়। আমি যদি এঁকে বলতুম, কবিতা লেখায় যে-সমস্ত অপ্রকাশিত অজ্ঞাতনামারা ফেল করেছেন আপনি তাঁদের মধ্যে প্রথম কিম্বা দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত, তাতে কি তিনি কিছুমাত্র সান্ত্বনা লাভ করতেন? সার্টিফিকেট্‌টি না দিয়ে চুপ করে থাকাই ভালো। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় যেমন অনেক ভালো ছেলে অঙ্কে ফেল করে, তেমনি কাব্যে যারা ফেল তাদের অধিকাংশই সংগীতে ফেল। তাদের ভাব আছে, কথা আছে, রকম-সকম আছে, আয়োজনের কোনো ত্রুটি নেই, কেবল সেই সংগীতটি নেই যাতে মুহূর্তের মধ্যে সমস্তটি কবিতা হয়ে ওঠে। সেইটেই চোখে আঙুল দিয়ে দেখানো ভারী শক্ত। কাঠও আছে ফুঁও আছে --কেবল সেই আগুনের স্ফুলিঙ্গটুকু নেই যাতে সবটা ধরে উঠে আগুন হয়ে ওঠে। এর মধ্যে কাঠের বোঝাটা নানা স্থান থেকে পরিশ্রমপূর্বক সংগ্রহ করে আনা যায়, কিন্তু সেই অগ্নিকণাটুকু নিজের অন্তরের মধ্যে আছে—সেইটুকু না থাকলে পর্বতপ্রমাণ স্তূপ ব্যর্থ হয়ে যায়। কামিনী সেনের কবিতা সম্বন্ধেও আমি এই কথা বলেছিলুম। তাঁর লেখায় বড়ো ভাব এবং নতুন ভাব ঢের থাকতে পারে, কিন্তু তাতে আগুন ধরে ওঠে নি। যদি কেউ তর্ক করে, বলে যে 'না না, ওর মধ্যে ঢের কবিত্ব আছে', তা হলে কে তার প্রতিবাদ করতে পারে? এই জন্যে প্রশংসা করবার না থাকলে আমি কাব্যের সমালোচনা করতে চাই নে।—কিন্তু !বব!, কালকের সেই ইংরেজটার স্পর্ধার কথাগুলো এখনো আমি ভুলি নি। অম্লান মুখে বললে কিনা sacredness of life সম্বন্ধে আমাদের ধারণা নেই! যারা অ্যামেরিকার Red Indianদের উচ্ছিন্ন করে দিলে, যারা নিঃসহায় দুর্বল অস্ট্রেলিয়ান্‌দের মেয়েদের পর্যন্ত জন্তু-শিকারের মতো বিনা দোষে বিনা কারণে গুলি করে করে মারত, যারা আমাদের দেশী লোককে খুন করলে স্বজাতীয় বিচারকের কাছে দণ্ডযোগ্য হয় না, তারা নিরীহ করুণপ্রকৃতি হিন্দুদের কাছে sacredness of life এবং high standard of morals preach করতে আসে? যা হোক, সে কথা নিয়ে আক্ষেপ করে আর কী হবে?

সোলাপুর
২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৩

এ চিঠি সম্ভবতঃ ১৩ ফেব্রুয়ারি তারিখে, পুরী পৌঁছিয়া, ডাকে ফেলা হয়।

৮১

পুরী
১৪ ফেব্রুয়ারি। ১৮৯৩।

কারও কারও মন ফোটোগ্রাফের wet plate-এর মতো; যে ছবিটা ওঠে সেটাকে তখনি ফুটিয়ে কাগজে না ছাপিয়ে নিলে নষ্ট হয়ে যায়। আমার মন সেই জাতের। যখন যে-কোনো ছবি দেখি অমনি মনে করি, এটাকে চিঠিতে ভালো করে লিখতে হবে। তার পরে কখন তার উপরে নতুন নতুন ছাপ পড়ে সেটা মিলিয়ে যায় টের পাই নে। কটক থেকে পুরী পর্যন্ত এলুম, এই ভ্রমণের কত-কী বর্ণনা করবার আছে তার ঠিক নেই। যেদিন যা দেখছি সেইদিনই সেগুলো লেখবার যদি সময় পেতুম তা হলে ছবি বেশ ফুটে উঠতে পারত—কিন্তু মাঝে দুই-এক দিন গোলেমালে কেটে গেল, ইতিমধ্যে ছবির খুঁটিনাটি রেখাগুলি অনেকটা অস্পষ্ট হয়ে এসেছে। তার একটা প্রধান কারণ, পুরীতে এসে পৌঁছে সামনে অহর্নিশি সমুদ্র দেখছি, সেই আমার সমস্ত মন হরণ করে রেখেছে—আমাদের দীর্ঘ ভ্রমণ-পথের দিকে পশ্চাৎ ফিরে চাইবার আর অবসর পাওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু সে ক'টা দিন তোর চিঠি থেকে একেবারে বাদ দিতে ইচ্ছে করছে না। আমার দৈনিক বিবরণের মাঝখানে হঠাৎ একটা বিচ্ছেদ না দিয়ে এ ক'দিনের সংক্ষেপ ইতিহাসটুকু লিখে দিই।

শনিবার মধ্যাহ্নে আহারাদি করে বলু আমি বিহারীবাবু একটি ভাড়াটে ফিট্‌ন্‌ গাড়িতে আমাদের কম্বল বিছানা পেতে তিনটি পিঠের কাছে তিন বালিশ রেখে কোচ্‌বাক্সে একটি চাপরাশি চড়িয়ে যাত্রা আরম্ভ করে দিলুম।...এখানকার নদীগুলি বর্ষা চলে গেলেই প্রায় শুষ্কপ্রায় হয়ে যায়, কটক সেই রকমের দুই নদীর ধারে অবস্থিত। একটার নাম মহানদী, আর-একটার নাম কাঠযুড়ি। কাঠযুড়ি পেরিয়ে আমাদের পথ। সেখানে গাড়ি থেকে নেবে আমাদের পালকিতে উঠতে হল। ধূসর বালুকা ধু ধু করছে। ইংরিজিতে যে একে নদীর বিছানা বলে, বিছানাই বটে। সকালবেলাকার পরিত্যক্ত বিছানার মতো—নদীর স্রোত যেখানে যেমন পাশ ফিরেছিল, যেখানে যেমন ভার দিয়েছিল, তার বালুশয্যায় সেখানে তেমনি উঁচু-নিচু হয়ে আছে—সেই বিশৃঙ্খল শয়ন কেউ আর যত্ন করে হাত দিয়ে সমান করে বিছিয়ে রাখে নি, সমস্ত এলোমেলো বন্ধুর হয়ে আছে—এই বিস্তীর্ণ বালির ও পারে একটি প্রান্তে একটুখানি শীর্ণ স্ফটিকস্বচ্ছ জল ক্ষীণ স্রোতে বয়ে চলে যাচ্ছে। কালিদাসের মেঘদূতে বিরহিণীর বর্ণনায় আছে যে, যক্ষপত্নী বিরহশয়নের একটি প্রান্তে লীন হয়ে আছে, যেন পূর্বদিকের শেষ সীমায় কৃষ্ণপক্ষের কৃশতম চাঁদটুকুর মতো। বর্ষাশেষের এই নদীটুকু দেখে বিরহিণীর আর-একটি উপমা যেন দেখা যায়।...

কটক থেকে পুরী পর্যন্ত পথটি খুব ভালো। এমনি যত্ন করে রাখা হয়েছে যে কোথাও চাকার চিহ্ন পড়তে পায় না। পথটা উঁচু—তার দুই ধারে নিম্নক্ষেত্র। বড়ো বড়ো গাছে ছায়াময়। অধিকাংশ আম গাছ। এই সময়ে সমস্ত আম গাছে মুকুল ধরেছে, গন্ধে পথ আকুল হয়ে আছে। ঘন দীর্ঘ তরুশ্রেণীর মাঝখান দিয়ে গাঢ় গেরুয়া রঙের দিব্যি তক্‌তকে পরিষ্কার পথটি চলে গেছে—দু ধারে চষা মাঠ নেবে গেছে। আম অশ্বত্থ বট নারিকেল এবং খেজুর গাছ-ঘেরা এক-একটি

গ্রাম দেখা যাচ্ছে। আমাদের বাংলাদেশের মতো জঙ্গল পানাপুকুর ডোবা এবং বাঁশঝাড় নেই—সমস্ত দেশটি যেন ব্রাহ্মণভোজনের জন্যে পরিষ্কার করে রাখা হয়েছে, সবসুদ্ধ বেশ একটি তীর্থের ভাব আছে। মাঝে সর্দাইপুর বলে একটা জায়গায় ডাকবাংলাতে আমাদের থামবার কথা আছে। সেখানে যেতে পথে আমাদের আবার দুটো নদী পার হতে হল। একটার নাম বালুহস্তা, আর-একটার নাম ভার্গবী। তার মধ্যে নদীর অংশ বড়ো কিছু ছিল না—শুষ্ক বালির মাঝে-মাঝে এক-এক জায়গায় একটু-একটু স্বচ্ছ জল ঝিক্‌ঝিক্‌ করছে। তীরে বালির উপর অনেকগুলো ছাপরওয়ালা গোরুর গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, গোলপাতার ছাউনির নিচে মেঠাইয়ের দোকান বসেছে—পথের ধারে গাছের তলায় এবং শ্রেণীবদ্ধ কুঁড়েঘরের মধ্যে যাত্রীরা খাওয়া-দাওয়া করছে, এবং ভিক্ষুকের দল নতুন যাত্রী ও গাড়ি পাল্কি দেখবামাত্র বিচিত্র কণ্ঠে ও ভাষায় আর্তনাদ করতে আরম্ভ করছে।

আমরা বিকেলে সর্দাইপুরের বাংলায় গিয়ে পৌঁছলুম। এখানকার বাংলাগুলি বেশ। ছোটোখাটো, পরিষ্কার, গাছপালার মধ্যে ঢাকা, নিরালা—ইচ্ছে করে এই-সব বিশ্রামশালায় দিনকতক করে থেকে সত্যি-সত্যি বিশ্রাম করে যাই। চা খেয়ে আমরা সবাই বেড়াতে বেরলুম। তখন সূর্য সবে অস্ত গেছে—গোধূলির আলোতে সমস্ত আকাশ, বৃহৎ মাঠ, দূরের পাহাড় এবং পাহাড়ের উপরকার একটি ভাঙা মন্দির শান্তিময় সুন্দর মহিমায় অভিষিক্ত হয়ে গেছে। সে আর তোকে বেশি করে কী বলব, এই রকম সন্ধ্যার দৃশ্য আমার যে কী সুনিবিড় সুগভীরভাবে ভালো লাগে সে তোর চিঠিতে আমি বারবার প্রকাশ করেছি। গাছের সারির মাঝখানকার সেই দীর্ঘ স্তব্ধ পথ এবং দুই পার্শ্বের বিস্তৃত নিম্নভূমির মধ্যে একটি জনপ্রাণী দেখা যাচ্ছে না; আমার ইচ্ছে করছিল আমরাও চুপ করে মাথাটি নিচু করে এই নিস্তব্ধতার মাঝখান দিয়ে আস্তে আস্তে যাই—কিন্তু কথাবার্তার বিরাম ছিল না।...

রবিবার সকালে উঠে দেখি খুব মেঘ করেছে। আমরা চা রুটি খেয়ে প্রাতঃস্নান করে গাড়িতে উঠলুম। ফিট্‌নের ঘোমটা খুলে দেওয়া গেল, মেঘে সূর্য ঢাকা ছিল। যত পুরীর নিকটবর্তী হচ্ছি তত পথের মধ্যে যাত্রীর সংখ্যা বেশি দেখতে পাচ্ছি। ঢাকা গোরুর গাড়ি misfortuneএর ঝাঁকের মতো সারি সারি চলেছে। রাস্তার ধারে গাছের তলায় পুকুরের পাড়ে লোক শুয়ে আছে, রাঁধছে, জটলা করে রয়েছে। কিন্তু এর আগে সমস্ত পথে যাত্রী প্রায় দেখি নি। এক-এক সময় আসে যখন এই দীর্ঘ পথ লোকে একেবারে ভরে যায় এবং পূর্বকালে এই পথের দুই ধার মড়কে, উপবাসে, মৃত যাত্রীদের দেহে আচ্ছন্ন হয়ে থাকত। এখনও ভিড়ের সময় বিস্তর লোক রোগে পথকষ্টে উপবাসে মারা যায়।...

পুরীর যত কাছাকাছি হচ্ছি পথের দুই ধারের গাছপালা ততই কমে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে মন্দির আসছে এবং পান্থশালা ও বড়ো বড়ো পুষ্করিণী খুব ঘন ঘন পাওয়া যাচ্ছে। সন্ন্যাসী ভিক্ষুক এবং যাত্রীও ঢের দেখা দিচ্ছে। এক-এক জন ভিক্ষুক প্রায় আধঘণ্টাকাল আমাদের গাড়ির পিছন-পিছন অবিশ্রাম দৌড়ে জগন্নাথজি আমাদের মঙ্গলবিধান করবেন এই রকম আশ্বাস দিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে ভিক্ষে চেয়ে চলেছে। তারা প্রায় বেশ হৃষ্টপুষ্ট সুস্থ সবল ব্রাহ্মণ। পুরী সমুদ্রের ধারে বলে এর কাছাকাছি তেমন বেশি গাছপালা নেই। পথের ডান দিকে একটা খুব দীর্ঘ বিলের মতো আছে, তার ও পারে পশ্চিমে গাছের মাথার উপর

জগন্নাথের মন্দির-চূড়া দেখা যাচ্ছে। পথের ধারে ধারে ক্রমেই খুব ঘন ঘন মন্দিরের সার এবং পথিকের ভিড় দেখে বুঝতে পারলুম পুরী খুব কাছে এসেছে। আমরা সার্কিট হৌসে থাকব, সেটা শহরের বাইরে। হঠাৎ এক জায়গায় গাছপালার মধ্যে থেকে বেরিয়ে পড়েই সুবিস্তীর্ণ বালির তীর এবং ঘন নীল সমুদ্রের রেখা দেখতে পাওয়া গেল। তীরে দুটি-চারটি বিচ্ছিন্ন সাদা সাদা বাড়ি, একটি chapel এবং কতকগুলি বাঁধানো পাতকুয়ো। বালির মধ্যে মধ্যে শান-বাঁধানো রাস্তা এবং এক-একটি করে বসবার বেঞ্চি। পুরীর সমুদ্র যে আমার কত ভালো লাগছে সে আমি প্রকাশ করে বলতে পারব না—এই পর্যন্ত বললেই যথেষ্ট হবে আমার মতো দরিদ্র ব্যক্তি ধার করে এখানে সমুদ্রের ধারে একটি বাংলা তৈরি করবার উদ্যোগ করছে। উড়িষ্যার এই পথটা দেখে আমার ক্রমাগত কালিদাসের মেঘদূত মনে পড়ছিল। কেয়াগাছের-বেড়া-দেওয়া দশার্ণ গ্রামের কথা মেঘদূতে আছে, এখানেও অনেক গ্রাম কেয়ার বেড়া দেওয়া। বরাবর দিগন্তের ধারে ধারে নীলবর্ণ পাহাড় দেখা যাচ্ছে আর মেঘদূতে যাকে নগনদী বলে লেখা আছে, অর্থাৎ পাহাড়ে নদী, যে-সব নদীতে কেবল বর্ষাকালে পাহাড়ের জলস্রোত আসে, গ্রীষ্মকালে বালি এবং নুড়ি পড়ে থাকে, সেরকম নদী এখানে অনেক। তার উপরে আবার আমাদের এই পুরী-যাত্রার সমস্ত পথই প্রায় মেঘ করে ছিল, বড়ো বড়ো নারকোল-বন মন্দির এবং কৃষিক্ষেত্রের উপর মেঘের গাঢ় ছায়া পড়েছিল, দিগন্তের পাহাড়ের রেখা মেঘের রেখার সঙ্গে একাকার হয়ে গিয়েছিল। আমরা আবার আজ রাত্রে কনারকে সূর্যমন্দিরের ভগ্নাবশেষ দেখতে যাচ্ছি।

সোলাপুর
২১ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৩

৮২

কটক
২৫ ফেব্রুয়ারি। ১৮৯৩।

দেখিস আমার লেখা আজ হু হু করে এগিয়ে যাবে—চৈত্র মাসের সাধনার জন্যে যে ডায়ারিটা লিখতে আরম্ভ করেছিলুম এবং যা ভাঙা রাস্তায় বহুভারগ্রস্ত গোরুর গাড়ির মতো কিছুতে এগোতে পারছিল না, আজ সেটা নিশ্চয় শেষ করে ফেলব। যখন মন একটু খারাপ থাকে তখনই সাধনাটা অত্যন্ত ভারের মতো বোধ হয়। মন ভালো থাকলে মনে হয়, সমস্ত ভার আমি একলা বহন করতে পারি। তখন মনে হয়, আমি দেশের কাজ করব এবং কৃতকার্য হব। তখন লোকের উৎসাহ এবং অবস্থার অনুকূলতা কিছুই আবশ্যক মনে হয় না, মনে হয় আমার নিজের কাজের পক্ষে আমি নিজেই যথেষ্ট। তখন এক-এক সময়ে আমি নিজেই খুব দূর ভবিষ্যতের যেন ছবি দেখতে পাই—আমি দেখতে পাই, আমি বৃদ্ধ পক্ককেশ হয়ে গেছি, একটি বৃহৎ বিশৃঙ্খল অরণ্যের প্রায় শেষ প্রান্তে গিয়ে পৌঁচেছি, অরণ্যের মাঝখান দিয়ে বরাবর সুদীর্ঘ একটি পথ কেটে দিয়ে গেছি এবং অরণ্যের অন্য প্রান্তে আমার পরবর্তী পথিকেরা সেই পথের মুখে কেউ কেউ প্রবেশ করতে

আরম্ভ করেছে, গোধূলির আলোকে দুই-এক জনকে মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে। আমি নিশ্চয় জানি 'আমার সাধনা কভু না নিষ্ফল হবে'। ক্রমে ক্রমে অল্পে অল্পে আমি দেশের মন হরণ করে আনব— নিদেন আমার দু-চারটি কথা তার অন্তরে গিয়ে সঞ্চিত হয়ে থাকবে। এই কথা যখন মনে আসে তখন আবার সাধনার প্রতি আকর্ষণ আমার বেড়ে ওঠে। তখন মনে হয় সাধনা আমার হাতের কুঠারের মতো, আমাদের দেশের বৃহৎ সামাজিক অরণ্য ছেদন করবার জন্যে এ'কে আমি ফেলে রেখে মরচে পড়তে দেব না— এ'কে আমি বরাবর হাতে রেখে দেব। যদি আমি আরও আমার সহায়কারী পাই তো ভালোই, না পাই তো কাজেই আমাকে একলা খাটতে হবে।

পুনা
৩ মার্চ ১৮৯৩

৮৩

কটক
২৭ ফেব্রুয়ারি। ১৮৯৩।

কিন্তু … … বলে যিনি বেদীতে বসেছিলেন তিনি এমন সুদীর্ঘ বক্তৃতা দিয়েছিলেন যে, শ্রোতাদের কিছুমাত্র ধৈর্য ছিল না। ওরকম ক্রমাগত কথা শুনতে শুনতে মন একেবারে যেন উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে যায়— উপাসনার ঠিক বিপরীত ফল হয়। এর চেয়ে ঘরে বসে তাস পাশা খেললে মন ভালো থাকে। ব্রাহ্মসমাজের সাপ্তাহিক উপাসনায় এই জন্যেই যেতে ইচ্ছে করে না। সব জিনিসেরই ভালোমন্দ অধিকার-অনধিকার আছে। যে-কেউ ধর্ম সম্বন্ধে যেমন তেমন করে বলুক তাই যে প্রতি সপ্তাহে ধৈর্যসহকারে শুনে যাওয়া একটা কর্তব্যের মধ্যে, তা কিছুতেই বলা যায় না। বরং তাতে মনের ভিতরে একটা অশান্তি এবং বিদ্রোহের ভাব উপস্থিত হয়। যে ভালো করে বলতে পারে সেই বলবে এবং তারই কথা শুনব— এই হচ্ছে নিয়ম। বিষয় যত উচ্চ বলবার লোকের ক্ষমতাও তত বেশি হওয়া চাই। কিন্তু হয়ে পড়েছে এমনি যে প্রায় ধর্মবক্তৃতাই অযোগ্য বক্তার হাতে। তার কারণ, লোকে মনে করে ধর্মের কথা কানে উঠলেই যেন একটা পুণ্য আছে, এইজন্যে একটা উচ্চ প্রস্তরখণ্ডের উপরে চড়ে যে যেমন করে বলুক লোকে নীরবে শুনে কর্তব্য পালন করে যায়। এইজন্যে ধর্মবক্তা সম্বন্ধে আর যোগ্যতা-বিচার হয় না। আমার তো মনে হয়, এ নিতান্ত অন্যায়। যার যে বিষয়ে রসবোধ বেশি আছে সেই বিষয়ে সে গোঁজামিলন সইতে পারে না। যাদের ধর্মবোধ এবং সাহিত্যবোধ কিছু আছে তারা যে ভাবহীন রসহীন অনর্গল পুরোনো বাজে কথা কী রকম করে সহ্য করে আমি তো ভেবে পাই নে। যাদের সে বোধ নেই তাদের যে এরকম বক্তৃতায় বোধ জন্মাবে তারও সম্ভাবনা দেখি নে। আসল, George Eliot যাকে other-worldliness বলেন ধর্ম সম্বন্ধে অনেকের অজ্ঞাতসারে সেই ভাবটা আছে— তারা মনে করে, যে সময়টা যে-কোনোরকম ধর্মসম্পর্কীয় ব্যাপারে ব্যয় করা গেল সেটা যেন একটা investmentএর মতো, কোনো-একটা খাতায় জমা হয়ে যেন তার সুদ

বাড়তে চলল। কিন্তু আমার মনে হয়, ভালো প্রসঙ্গ যদি কেউ ভালো করে ব্যক্ত না করে তবে সেটা শোনা একটা মহৎ লোকসান। তাতে কেবল মানসিক স্বাদ খারাপ হয়ে যায়— অন্তরের একটি স্বাভাবিক সচেতন বোধশক্তি নষ্ট হয়ে যায়। নিয়মিত বেসুরো গান শোনা মানুষের পক্ষে যেমন অশিক্ষা, নিয়মিত অনুপযুক্ত ধর্মবক্তৃতা শোনা মানুষের পক্ষে তেমনি একটা ক্ষতিজনক কাজ। এইজন্যে আমি নিজেও বেদীতে উঠে বলতে চাই নে, জানি সে বিষয়ে আমার স্বাভাবিক ক্ষমতা নেই, মনের মধ্যে একটা অনিবার্য আহ্বান নেই— এবং প্রতি বুধবারে নিয়মিত ... ...র বক্তৃতা শুনে আসাও আমার কর্তব্য জ্ঞান করি নে— বড়দাদা যখন একটা কিছু বলেন তখন আমার সমস্ত চিত্ত আকৃষ্ট হয় এবং উপকার হয়। অক্ষম লোকে যখন বলতে আরম্ভ করে তখন মনের মধ্যে যে-একটা অসহ্য অধৈর্য এবং বিরক্তি উপস্থিত হয় তাতে কেবল অপকার হয়।

সোলাপুর
৫ মার্চ ১৮৯৩

৮৪

কটক
মঙ্গলবার
।২৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৩।

তুই যা বলেছিস আমার সঙ্গে তার মতের কোনো অনৈক্য নেই। তোকে কী লিখেছিলুম কিছু মনে নেই, হয়তো মনের আক্ষেপে কিছু বেশি মাত্রায় বলে থাকব। কিন্তু আমার মত হচ্ছে এই যে, এখন বহুকাল আমাদের অজ্ঞাতবাস বিজনবাস আবশ্যক। এখন আমাদের প্রস্তুত হবার সময়, এই অসম্পূর্ণ অবস্থায় নিজেকে সকলের চোখের সামনে নাচিয়ে নিয়ে বেড়াবার কাল নয়। যে সময় গঠন হতে থাকে সেই সময়টা অত্যন্ত গোপনীয় সময়। নিতান্ত কিশোর বয়সের বালকবালিকাদের যেমন প্রাপ্তবয়স্ক লোকদের আমোদপ্রমোদ এবং কার্যসভায় সর্বদা আত্মপ্রকাশ করতে দিলে তাদের উন্নতির পথ রুদ্ধ হয়; দুটো-একটা ক্লেভার কথা কয়ে, বয়োজ্যেষ্ঠদের কৌতুকজনক অনুকরণ করে, বাহবা এবং প্রশংসাহাস্য পেয়ে তারা মনে করে 'আমরা সম্পূর্ণতা লাভ করেছি, আমরা আমাদের জ্যেষ্ঠতাতদেরই সমকক্ষ'— তেমনি আমাদের জাতীয় কৈশোর বয়সে আমরাও যদি দুটো-একটা বাহ্য চাকচিক্য, দুটো-একটা ইংরিজি ধরনধারণ ভড়ং এবং চটুলতা দেখিয়ে ছোটোখাটো বাহবা এবং সভাপ্রান্তে একটু-আধটু স্থান লাভ করি তা হলে আমাদের ভ্রম হবে যে, আমাদের সব হয়ে গেছে। যে-সমস্ত আশু-পুরস্কার-হীন কঠিন কাজ, দুরূহ কর্তব্য, একান্ত প্রাণসমর্পণ-ব্যতীত জাতির চরিত্র গঠিত হয় না সেগুলোকে অনাবশ্যক এবং তুচ্ছতর মনে হবে। একটা উদাহরণ দেখ্‌-না, যে-সমস্ত পেট্রিয়ট ভালো ইংরিজি বক্তৃতা করে একবার বাহবা পেয়েছে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে সে কত উপেক্ষা করে। তার ইংরিজি বক্তৃতায় যে ক্ষণিক উপকারটুকু হয় সেই উপেক্ষার তুলনায় তা কত সামান্য। ইন্‌ডিয়া অথবা বেঙ্গল কৌন্সিলে

আসন পাবার সম্মান যে একবার পেয়েছে সে তার তুলনায় সমাজের ভিতরকার কাজ করাকে কত তুচ্ছ জ্ঞান করে! ইংরেজ সেজে যে ইংরেজের টেবিলের ধারে একটুখানি বসতে পেয়েছে স্বজাতির হৃদয় পাবার জন্য তার ঔদাসীন্য কী সুগভীর! এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক। কিন্তু স্বাভাবিক বলেই আমাদের বেশি সতর্ক হওয়া উচিত। আমি জানি, গবর্নর-সাহেব যদি দুদিন আমার তেতালায় গিয়ে আমার সেই বড়ো কেদারায় হেলান দিয়ে আমাকে 'মাই ডিয়ার' বলে আধখানা চুরোট ফুঁকে আসে তা হলে আমি-যে এই এহেন রবি আজ মধ্যাহ্নমার্তণ্ডের মতো অগ্নিচক্র হয়ে উঠেছি আমাকেও সেই ল্যান্স্‌ডাউনের ম্লেচ্ছাধরোৎক্ষিপ্ত একটিমাত্র ধূম্র-কুণ্ডলীতে পূর্ণগ্রাস করে দিতে পারে। তখন আমার মুখমণ্ডল ব্যাপ্ত করে কী-একটি পরিতৃপ্ত হাস্য এবং আমার সমস্ত ভাষার উপর মধুরতার দ্রবধারা চিটে-গুড়ের মতো লিপ্ত হয়ে যায়! সেই তো প্রধান আশঙ্কা! সেইজন্যেই তো তেতালার ছাত বন্ধ করে রাখা আবশ্যক (পাছে আমাদের গবর্নর-সাহেব তাঁর পরমবন্ধু ট্যাগোরের টিনের ছাতের নিচে চুরোট খেতে আসেন!)! কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হবার সময় পাণ্ডবরা এক বৎসর অজ্ঞাতবাস যাপন করেছিলেন —গুরুগোবিন্দ তাঁর গুরুপদ গ্রহণ করবার পূর্বে বহুকাল লোকচক্ষুর অন্তরালে নির্জনে প্রস্তুত হয়েছিলেন। আমাদের এখন সেই সময়। এখন যদি গা-ঢাকা দিয়ে নিজের কর্মশালার মধ্যে বসে গভীর গম্ভীর নিবিষ্ট ভাবে নিজের লোক ও নিজের সমাজের কাজ না করি—যদি একবার আপনার চিত্তকে বিক্ষিপ্ত হতে দিই, সম্পূর্ণতা লাভ করবার পূর্বেই ক্রমাগত নিজের অসমাপ্ত কাজ দেখিয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাহবা নেবার ইচ্ছে করি—তা হলে কিছুই হবে না। গাছ যেমন রৌদ্রে পুষ্ট হয়, কিন্তু বীজ তাতে শুকিয়ে মৃতভাবে থাকে, সেই রকম কর্মের প্রথম আরম্ভ বাহিরের নিন্দাপ্রশংসা ও আঘাতব্যাঘাতের যোগ্য নয়—খানিকটা পরিণত হলে তবে সে মাটির বাহিরে আসে, রৌদ্র বৃষ্টি গ্রহণ করে এবং সেই উপায়েই শক্ত হয়ে ওঠে। ইংরেজ আমাদের নিন্দা করুক, প্রশংসা করুক, যাই করুক—আমাদের প্রতি বিমুখ হোক বা প্রসন্ন হোক, সে দিকে দৃক্‌পাতমাত্র না করে আমাদের উপেক্ষিত দেশ, আমাদের উপেক্ষিত ভাষা, আমাদের অপমানিত লোকদের কাজে জীবন সমর্পণ করতে হবে। যেখানে কেবল অপমান উপেক্ষা এবং অখ্যাতি সেই অন্ধকার নিম্নদ্বারের মধ্যে প্রবেশ করা কি সহজ কথা! খ্যাতিসম্মানের বিলাসে একবার অভ্যস্ত হলে কি আর দৈন্যের মধ্যে টেকা যায়! তখন ক্রমাগত মনে হয় কিসে আমার বইটা ইংরেজে পড়বে। কিসে আমার পৃষ্ঠদেশে ইংরেজে চাপড় মারবে। কিসে আমার ঘৃণিত দেশের লোক আমাকে তার স্বাজাতীয় বলে সন্দেহ না করে, এবং কিসে ইংরেজ আমাকে আমাদের দেশের মহৎ এক্সেপ্‌শন্‌ বলে গ্রহণ করে। যারা ইংরেজ-সংসর্গ-সম্মানের স্বাদ একবার পেয়েছে তারা যে সেটাকে বহুমূল্য জ্ঞান করে সেজন্যে আমি তাদের দোষ দিই নে—এ আকর্ষণ এ প্রলোভন খুব গুরুতর সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই জন্যেই আমি নিজের কোটরে লুকোতে চাই। … …রের রাজা যে স্বদেশে বসে রাজত্ব করার চেয়ে সিমলায় গিয়ে সাহেবের সঙ্গে টেনিস খেলতে এবং মেমের সঙ্গে নাচতে ভালোবাসে—সাহেব-মেমেরা তাকে দ্বারভাঙ্গার রাজার চেয়ে ঢের বেশি প্রশংসা করে, বলে যে একজন ইংরেজের সঙ্গে এর কোনো প্রভেদ নেই—এখন তার পক্ষে …রে বসে রাজত্ব করা কি কম কঠিন! আমি হলেও হয়তো ঠিক ঐ রকম হতুম—আমিও বাঙালি, আমারও স্বাধীন তেজ নেই। সেই জন্যেই সেটা গোপনে সঞ্চয় এবং বহুযত্নে পালন করতে হবে—সেটা

যতক্ষণে না সবল ও আত্মরক্ষণক্ষম হয়ে উঠবে ততদিন তাকে অন্তরালে রেখে কাঠখড় যোগাতে হবে। তার পরে আর কাউকে ভয় করি নে, তার পরে আর নিজের জন্যে লজ্জা নেই— এখন নিজেকে বিশ্বাস নেই।

সোলাপুর
৬ মার্চ্‌ ১৮৯৩

৮৫

বালিয়া
শুক্রবার
।৩ মার্চ্‌ ১৮৯৩।

আমরা এখনো বোটেই আছি। ছোট্ট বোটখানি। একটি বড়ো জালিবোটের উপর ছাত তৈরি করে এই বোটটি হয়েছে— আমার মতো লম্বা লোকের দৈর্ঘ্যগর্ব খর্ব করাই এর মুখ্য উদ্দেশ্য দেখতে পাচ্ছি— ভ্রমক্রমে মাথা একটুখানি তুলতে গেলেই অমনি কাষ্ঠফলকের প্রচণ্ড চপেটাঘাত মাথার উপর এসে পড়ে, হঠাৎ একেবারে দমে যেতে হয়— সেই জন্যে কাল থেকে নতশিরে যাপন করছি। তোকে বলা বাহুল্য, মাথা ঠোকা, হুঁচট খাওয়া, হাত পা কাটা প্রভৃতি বেদনাজনক ব্যাপার খুব নিরাপদ স্থানেও আমার দ্বারা অত্যন্ত অবলীলাক্রমে সম্পন্ন হয়ে থাকে; সে অবস্থায় এই সাড়ে চার ফুট বোটের মধ্যে ছ ফুট অন্যমনস্ক লোকের অহরহ কিরকম দুর্গতি হচ্ছে তা কল্পনা করা শক্ত নয়। কপালে যত দুঃখ যত ব্যথা ছিল তার উপরে আবার প্রত্যেকবার দাঁড়াতে গিয়ে নতুন ব্যথা বাড়ছে। সেজন্যে আমি তত আপত্তি করি নে— কিন্তু কাল সমস্ত রাত্তির মশার জ্বালায় ঘুম হয় নি সেটা আমার ভারী অন্যায় মনে হচ্ছে। সকল রকম ঘা খাওয়া আমার অভ্যাস আছে, কিন্তু অনিদ্রাটা আমার তেমন সয়ে যায় নি। সেই জন্যে আজ সমস্ত শরীরগ্রন্থি যেন শিথিল হয়ে গেছে— বিছানার উপর কাত হয়ে পড়ে বাম কনুইয়ের উপর দেহভার রেখে একটা বালিশের উপর পোর্ট্‌ফোলিয়ো বিছিয়ে নিতান্ত অলসভাবে তোকে লিখে যাচ্ছি। এ দিকে আবার শীত কেটে গিয়ে গরম পড়ে এসেছে— রৌদ্র উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে এবং পাশের জানলা দিয়ে মন্দ মন্দ সজল শীতল বাতাস পিঠের উপর এসে লাগছে। আজ আর শীত কিম্বা সভ্যতার কোনো খাতির নেই— বনাতের চাপকান এবং চোগা হুকের উপর উদ্‌বন্ধনে ঝুলছে— নীল-লোহিত-রেখাঙ্কিত জিনের রাত্রিবস্ত্র পরে নিঃসংকোচে প্রভাতযাপন করছি, ঘণ্টাও বাজছে না, সসজ্জিত খানসামা এসেও সেলাম করছে না— অর্ধসভ্যতার অপরিচ্ছন্ন শৈথিল্য এবং আরাম উপভোগ করছি। পাখিগুলো ডাকছে এবং তীরে দুটো বড়ো বড়ো বট গাছের পাতা বাতাসে ঝর্‌ঝর্‌ করে শব্দ করছে, কম্পিত জলের উপরকার রৌদ্রালোক আমাদের বোটের ভিতরে এসে চিক্‌মিক্‌ করে উঠছে, বেলাটা এক রকম ঢিলে ভাবেই চলেছে। কটকে থাকতে ছেলেদের ইস্কুল এবং বিহারীবাবুর আদালতে যাবার তাড়া দেখে সময়ের দুর্মূল্যতা এবং সভ্য মানবসমাজের ব্যস্ততা খুব

অনুভব করা যেত। এখানে সময়ের ছোটো ছোটো নির্দিষ্ট সীমা নেই— কেবল দিন এবং রাত্রি এই দুটি বড়ো বড়ো বিভাগ।

সোলাপুর
১১ মার্চ ১৮৯৩

৮৬

তীরতল
শুক্রবার
।৩ মার্চ ১৮৯৩।

এই মেঘবৃষ্টি পাকা কোঠার মধ্যে অতি ভালো, কিন্তু ছোট্ট বোটটির মধ্যে দুটি বুদ্ধ প্রাণীর পক্ষে মনোরম নয়। একে তো উঠতে বসতে মাথা ঠোকে, তার উপরে আবার যদি মাথায় জল পড়তে থাকে, তা হলে বেদনার কিঞ্চিৎ উপশম হতেও পারে, কিন্তু আমার 'দুর্দশার পেয়ালা' একেবারে পূর্ণ হয়ে ওঠে। মনে করেছিলুম বৃষ্টি বাদলা এক রকম ফুরোলো, এখন স্নাত পৃথিবীসুন্দরী কিছুদিন রৌদ্রে পিঠ দিয়ে আপনার ভিজে এলোচুল শুকোবে, আপনার সিক্ত সবুজ শাড়িখানি রৌদ্রে গাছের ডালে টাঙিয়ে দেবে, মাঠের মধ্যে মেলে দেবে— বসন্তী আঁচলখানি শুকিয়ে বেশ ফুর্‌ফুরে হয়ে বাতাসে উড়তে থাকবে। কিন্তু রকমটা এখনো সে ভাবের নয়— বাদলার পর বাদলা, এর আর বিরাম নেই। আমি তো দেখেশুনে এই ফাল্গুন মাসের শেষ ভাগে কটকের এক ব্যক্তির কাছ থেকে একখানি মেঘদূত ধার করে নিয়ে এসেছি— আমাদের পাণ্ডুয়ার কুঠির সম্মুখবর্তী অবারিত শস্যক্ষেত্রের উপরে আকাশ যেদিন আর্দ্র স্নিগ্ধ সুনীলবর্ণ হয়ে উঠবে, ভালোবাসার ছলছল মুগ্ধ দৃষ্টির মতো, সেদিন বারান্দায় বসে আবৃত্তি করা যাবে। দুর্ভাগ্যক্রমে আমার কিছুই মুখস্থ হয় না— কবিতা ঠিক উপযুক্ত সময়ে মুখস্থ আবৃত্তি করে যাওয়া একটা পরম সুখ, সেটা আমার অদৃষ্টে নেই। যখন আবশ্যক হয় তখন বই হাতড়ে সন্ধান করে পড়তে গিয়ে আবশ্যক ফুরিয়ে যায়। মনে কর্ মনে ব্যথা লেগে ভারী কাঁদতে ইচ্ছে হয়েছে, তখন যদি দরোয়ান পাঠিয়ে বাথ্‌গেটের বাড়ি থেকে শিশি করে চোখের জল আনতে হত তা হলে কী মুশকিলই হত। ঐ জন্যে মফস্বলে যখন যাই তখন অনেকগুলো বই সঙ্গে নিতে হয়— তার সবগুলোই যে প্রতিবার পড়ি তা নয়, কিন্তু কখন্ কোন্‌টা দরকার বোধ হবে আগে থাকতে জানবার জো নেই, তাই সমস্ত সরঞ্জাম হাতে রাখতে হয়। মানুষের মনের যদি নির্দিষ্ট ঋতুভেদ থাকত তা হলে অনেক সুবিধে হত— যেমন শীতের সময় কেবল শীতের কাপড় নিয়ে যাই এবং গরমের সময় আল্‌স্টার নেবার কোনো দরকার থাকে না, তেমনি যদি জানতুম মনে কখন শীত কখন বসন্ত আসবে তা হলে আগে থাকতে সেইরকম গদ্য কিম্বা পদ্যের জোগাড় করা যেতে পারত। কিন্তু মনের ঋতু আবার ছটা নয়, একেবারে বাহান্নটা— এক প্যাকেট তাসের মতো— কখন্ কোন্‌টা হাতে আসে তার কিচ্ছু ঠিক নেই— অন্তরে বসে বসে কোন্ খামখেয়ালি খেলোয়াড় যে এই তাস ডীল করে এই খামখেয়ালি খেলা খেলে তার পরিচয়

জানি নে। সেইজন্য মানুষের আয়োজনের শেষ নেই— তাকে যে কত রকমের কত-কী হাতে রাখতে হয় তার ঠিক নেই। সেই জন্যে আমার সঙ্গে ‘নেপালীজ বুদ্ধিস্টিক লিটারেচর’ থেকে আরম্ভ করে শেক্‌স্‌পীয়র পর্যন্ত কত রকমেরই যে বই আছে তার আর ঠিকানা নেই। এর মধ্যে অধিকাংশ বইই ছোঁব না, কিন্তু কখন্‌ কী আবশ্যক হবে বলা যায় না। অন্য বার বরাবর আমার বৈষ্ণবকবি এবং সংস্কৃত বই আনি; এবার আনি নি, সেই জন্যে ঐ দুটোরই আবশ্যক বেশি অনুভব হচ্ছে। যখন পুরী খণ্ডগিরি প্রভৃতি ভ্রমণ করছিলুম তখন যদি মেঘদূতটা হাতে থাকত ভারী সুখী হতুম। কিন্তু মেঘদূত ছিল না, তার বদলে Caird's Philosophical Essays ছিল, একেই বলে ‘হেরফের’।

সোলাপুর
১১ মার্চ্‌ ১৮৯৩

৮৭

কটক
সোমবার। ৬ মার্চ্‌ ১৮৯৩।

পুরীর ম্যাজিস্ট্রেটের বাড়িতে প্রশংসালাভ করে আমি খুশি হয়েছি কি না তুই জিজ্ঞাসা করেছিস। তোকে সমস্ত কথা খুলে লিখি নি বলে তোর এই প্রশ্ন মনে উদয় হয়েছে। তবে বিস্তারিত বিবরণটা দেওয়া যাক। প্রথমে যখন বিহারীবাবুরা পুরীর ম্যাজিস্ট্রেটের উপর call করতে আমাকে অনুরোধ করলেন তখন আমি অনেক ইতস্তত করেছিলেম, কিন্তু তাঁরা আশ্বাস দেওয়াতে এবং ইচ্ছা প্রকাশ করাতে আমি অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজি হলুম। দুখানি কার্ডে আমার নাম লিখে বিহারীবাবুদের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লুম। তাঁদের সঙ্গে কার্ড্‌ ছিল না— তাঁরা খবর পাঠিয়ে দিলেন এবং আমার কার্ড্‌ দুটোও সেই সঙ্গে পাঠালেন। মিনিট পাঁচেক পরে খবর এল— তার পরদিন সকালে এলে সাহেবের সঙ্গে মুলাকাৎ হবে। বিহারীবাবু মিসেস গুপ্ত অবাক হয়ে গেলেন। আমরা তো সুড়্‌ সুড়্‌ করে ম্যাজিস্ট্রেটের দরজা থেকে বেরিয়ে চলে গেলুম। বিহারীবাবুরা তো মহা বিরক্ত। হেনকালে সন্ধের সময় চিঠি এল যে মিসেস ওয়াল্‌স্‌ (ম্যাজিস্ট্রেটের নাম ওয়াল্‌স্‌) ভারী দুঃখিত। জজসাহেব এবং তাঁর মেমসাহেব যে খবর পাঠিয়েছিলেন তাঁর চাপরাশি সে কথা তাঁকে জানায় নি। আমিও তাই মনে করেছিলুম। কিন্তু এর ভিতরকার কথাটা হচ্ছে এই যে, ম্যাজিস্ট্রেট যদিও জজসাহেবকে অমান্য করতে চায় না— কিন্তু কোনো ‘নেটিভ’ ভদ্রলোক গেলে তাকে তার পরদিন সকালবেলা মুলাকাৎ করতে আসতে বলে। বোধ হয় মিসেস ম্যাজিস্ট্রেটকে কার্ড্‌ পাঠানো স্পর্ধা মনে করে। অবিশ্যি বলতে পারে সেদিন তার সময় নেই, কিন্তু তার নির্দিষ্ট-সময়-মত সময় করে আমি যে সেলাম করতে আসব তিনি এমনি কী নবাবের পুত্র! অবিশ্যি, আমাদেরই দেশের লোকের দোষ— তারা পেটের দায়ে মানের দায়ে উমেদারি করতে, সেলাম করতে যায়, সাহেবের আদিষ্ট সময়ে দ্বারদেশে অপেক্ষা করে থাকে— সুতরাং আমি বঙ্গনামধারী এক ব্যক্তি যে আস্ফালন করে

ম্যাজিস্ট্রেট এবং মিসেস ম্যাজিস্ট্রেটের উপর সামাজিক কর্তব্যরক্ষাস্বরূপ 'কল' করতে যাব এ তাদের মনেও উদয় হয় নি। সুতরাং এ নিয়ে সাহেবের উপর অভিমান করতে বসা আমার পক্ষে নিতান্ত বাড়াবাড়ি হয়। কিন্তু এ কথা মনে স্বতই উদয় হয়, ওদের কাছে সোহাগ করে লৌকিকতা করতে যাওয়া ঝকমারির একশেষ। আমি যতই ভদ্রলোক এবং সম্ভ্রান্ত লোক হই-না কেন, ওদের কাছে তার কোনো মূল্য নেই। যতক্ষণ না আমাদের জাতীয় বিশেষত্ব ঘুচিয়ে ফেলে ওদের প্রদত্ত একটা কৃত্রিম সম্মান পরিধান করব ততক্ষণ ওদের কাছে আমার কোনো আমল নেই। এই দেখ্-না কেন, আমাদের দেশের ব্যারিস্টারেরা যতই ইংরেজ-সোহাগ-প্রিয় বিলিতি-মেজাজী হোক-না কেন তাঁরা তো এ দেশে এসে সাহেবদের সঙ্গে তেমন কুটুম্বিতে করে উঠতে পারেন না। তাঁরা তো বার-লাইব্রেরিরও মধ্যে পূর্ণচন্দ্রের কলঙ্করেখার মতো একটি স্বতন্ত্র কৃষ্ণসীমার মধ্যে স্বভাবতই বিচ্ছিন্ন হয়ে বাস করেন। কাজ কী বাপু, আমাদের এমনি কী দায় পড়েছে! আমাদের নিজের ঘরে এতই কি অতিষ্ঠ হয়েছি! আমাদের কৃষ্ণ-কুটুম্বরা যতই কৃষ্ণ হোন-না কেন, তাঁরা তো আর আমাদের চেয়ে কৃষ্ণতর নন। যতক্ষণ ইংরেজ আমাকে আমাদের জাতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে সম্মান করে ততক্ষণ সে সম্মান আমার পক্ষে অপমান এবং অগ্রাহ্য।—পুরীর ম্যাজিস্ট্রেট পরদিন আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে এবং আমাকে নিমন্ত্রণ করলে আমি কি তাতে ভারী খুশি হয়েছিলুম? তা মনেও করিস নে। নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করলে বড়ো বেশি স্পষ্টরূপে অভিমান প্রকাশ করা হয় এবং তাতে যথার্থ অভিমানের খর্বতা হয়—তা ছাড়া বিহারীবাবুদের বিশেষ ক্ষুণ্ণ করা হয়। তাই খেতে গেলুম, ম্যাজিস্ট্রেটের শ্যালীর পাণিগ্রহণ করে সহাস্যমুখে টেবিলে বসলুম—সমুদ্রতীরদৃশ্যের সৌন্দর্য সম্বন্ধে পার্শ্ববর্তিনীর সঙ্গে একমত হলুম এবং পুরীতে সমুদ্রবায়ুপ্রবাহ-জন্য গ্রীষ্মের অনাধিক্যবশত আনন্দ প্রকাশ করলুম। তার পরে গান শুনলুম, গান শোনালুম, তালি দিলুম এবং তালি পেলুম। এই-যে বাহবাটুকু পাওয়া যায় একি যথার্থ হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করে? একি কতকটা কৌতূহলপরিতৃপ্তি নয়? আমাদের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটি জীবের মুখে আমাদের কোন্ খাবারটি একটু রুচিজনক মনে হয় তাই কি পরীক্ষা করে দেখা নয়? সত্যি কি আমার যা ভালো লাগে ওদের তাই ভালো লাগে? এবং ওদের যা ভালো লাগে না তাই বাস্তবিক ভালো নয়? তাই যদি না হয় তবে শুভ্র করতলের তালিতে আমার এতই কি সুখ হবে? ইংরেজের তালিকে যদি আমরা অতিরিক্ত মূল্য দিতে আরম্ভ করি তা হলে আমাদের দেশের অনেক ভালোকে ত্যাগ করতে এবং ওদের দেশের অনেক মন্দকে গ্রহণ করত হয়। তা হলে পায়ের মোজাটি খুলে বেরতে আমাদের হয়তো লজ্জা হবে, কিন্তু ওদের নাচের কাপড় পরতে লজ্জা হবে না। আমাদের দেশের শিষ্টাচার সম্পূর্ণ লঙ্ঘন করতে কিছুই সংকোচ হবে না এবং ওদের দেশের কোনো প্রচলিত অশিষ্টাচারও অম্লান-মুখে গ্রহণ করতে পারব। আমাদের দেশের আচ্‌কানকে সম্পূর্ণ মনের মতো ভালো দেখতে নয় বলে ত্যাগ করব, কিন্তু ওদের দেশের টুপিকে বদ দেখতে হলেও শিরোধার্য করব। শুভ্র হস্তের করস্পন্দন ও করতালি আমাদের পক্ষে বড়ো ভয়ানক —ওতে আমরা অতি সামান্য বাহ্য সম্মান পাই, কিন্তু আমাদের যথার্থ আত্মসম্মান তলে তলে নষ্ট করে ফেলে। আমরা জ্ঞাত এবং অজ্ঞাতসারে ঐ করতালির নির্দেশমত আপনার জীবনটা গঠিত করতে থাকি এবং তাকে অত্যন্ত ক্ষুদ্র করে ফেলি। আমি নিজেকে সম্বোধন করে বলি—'হে মৃৎপাত্র, ঐ কাংস্যপাত্রের কাছ থেকে দূরে

থেকো ; ও যদি রাগ করে তোমাকে আঘাত করে তাতেও তুমি চূর্ণ হয়ে যাবে আর ও যদি সোহাগ করে তোমার পিঠে চাপড় মারে তাতেও তুমি ফুটো হয়ে অতলে মগ্ন হয়ে যাবে— অতএব বৃদ্ধ ঈশপের উপদেশ শোনো, তফাত থাকাই সার কথা। উনি থাকুন বড়ো ঘরে আর আমার সামান্য ঘরে সামান্য পাত্রের হয়তো ছোটোখাটো কাজ আছে, কিন্তু সে যদি আপনাকে ভেঙে ফেলে তবে তার বড়ো ঘরও নেই ছোটো ঘরও নেই— তবে সে মাটির সমান হয়ে যাবে। তখন হয়তো আমাদের বড়ো-ঘর-ওয়ালা ঐ খণ্ড জিনিসটিকে তাঁর ড্রয়িংরুমের ক্যাবিনেটের এক পার্শ্বে সাজিয়ে রাখতে পারেন, সে কিন্তু ক্যুরিয়সিটির স্বরূপে— তার চেয়ে ক্ষুদ্র গ্রামের কুলবধূর কক্ষে বিরাজ করেও গৌরব আছে।'

সোলাপুর
১৩ মার্চ ১৮৯৩

৮৮

কটক
মঙ্গলবার। ৭ মার্চ ১৮৯৩।

সুরি বেচারা এক্‌জামিন পাস করবার জন্যে সৃষ্ট হয় নি। ওর উচিত ছিল আমার মত পাশ-কাটানো 'লিটারেরি' হওয়া। কিন্তু তার পক্ষে একটা ব্যাঘাত হয়েছে এই যে, ও যেমন আপনার ইজিচেয়ারটির মধ্যে নিমগ্ন হয়ে দিব্যি আরামে আছে, ওর মনটিও তেমনি ওর অন্তঃকুহরটির মধ্যে দিব্যি গট্‌ হয়ে বসে আছে— তার অগাধ সন্তোষ কিছুতেই বিচলিত হয় না। আমরা কুনো অকর্মণ্য এবং সংসারের সকল বিষয়ে অকৃতকার্য বটে, কিন্তু আমাদের মনটা কুনো নয়, সে সর্বদাই উড়ু উড়ু করছে— তাকে এক মুহূর্ত বেঁধে রাখা দায়। ঐটেই হচ্ছে খ্যাপামির প্রধান লক্ষণ। সুরির কোনো খ্যাপামি নেই, ও ভারী স্নিগ্ধ। প্রকৃতির মুখশ্রীতে যেমন একটা গভীর নিশ্চিন্ত ত্বরাহীনতার ভাব আছে, ওর সেই রকম। আমার মতো নিত্য অস্থিরস্বভাবের লোকের পক্ষে নির্জন প্রকৃতি এবং সুরির মতো অচল সুস্থিরতার সংসর্গ ভারী আবশ্যক। ও যখন ওর স্বাভাবিক শান্ত স্নিগ্ধভাবে আমাকে ওর বাহুর দ্বারা বেষ্টন করে ধরে, আমার সমস্ত ছট্‌ফটানির চার দিকে যেন একটি বাঁধ তুলে দেয়। এক-একজন লোক আছে যারা কোনো কিছু না করলেও যেন আশাতীত ফল দান করে; সুরি সেই দলের লোক। ও যে খুব পাস করবে, প্রাইজ পাবে, লিখবে, বড়ো কাজ কিম্বা ভালো চাকরি করবে, তা যেন তেমন আবশ্যকই মনে হয় না— মনে হয় যেন কিছু না করলেও ওর মধ্যে একটা চরিতার্থতা আছে। অধিকাংশ লোককেই অকর্মণ্য হয়ে থাকা শোভা পায় না, তাতে তাদের অপদার্থতা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। কিন্তু সুরি কিচ্ছুই না করলেও ওকে কেউ অযোগ্য বলে ঘৃণা করতে পারবে না। কাজকর্মের ব্যস্ততা মানুষের পক্ষে একটা আচ্ছাদনের মতো। সমস্ত কমন্‌প্লেস্‌ লোকের সেটা ভারী আবশ্যক, তাতে তাদের দৈন্য তাদের শীর্ণতা ঢাকা পড়ে। কিন্তু যারা স্বভাবতই পরিপূর্ণ প্রকৃতির লোক তারা সমস্ত কর্মাবরণমুক্ত হলেও একটি শোভা এবং সম্ভ্রম রক্ষা

করতে পারে। সুরির মতন অমন ষোলো-আনা শৈথিল্য আর কোনো ছেলের দেখলে নিশ্চয় অসহ্য বোধ হত, কিন্তু সুরির কুঁড়েমিতে একটি মাধুর্য আছে। সে আমি ওকে ভালোবাসি বলে নয়— তার প্রধান কারণ হচ্ছে চুপচাপ বসে থেকেও ওর মনটি বেশ পরিণত হয়ে উঠছে এবং ওর আত্মীয়স্বজনদের প্রতি ওর কিছুমাত্র ঔদাসীন্য নেই। যে কুঁড়েমিতে মূঢ়তা এবং অন্যের প্রতি অবহেলা ক্রমাগত স্ফীত হয়ে গোলগাল তেল-চুক্‌চুকে হয়ে উঠতে থাকে সেইটেই যথার্থ ঘৃণ্য। সুরি-সাহেব একটি সহৃদয় এবং সুবুদ্ধি আলস্যের দ্বারা যেন মধুররসসিক্ত হয়ে আছে। যে গাছে সুগন্ধ ফুল ফোটে সে গাছে আহার্য ফল না ধরলেও চলে। আমি প্রায়ই মাঝে মাঝে এ কথা ভাবি যে, আমার যদি কবিত্ব প্রভৃতি দুই-একটা স্বাভাবিক শক্তি না থাকত, তা হলে আমার মতো অসহ্য কণ্টকময় নিষ্ফলতা পৃথিবীতে অল্পই পাওয়া যেত। আমিও জন্ম-অকর্মণ্য, কিন্তু লেখবার শক্তি স্বাভাবিক থাকাতে আমি এ যাত্রা এক রকম করে তরে গেলুম। নইলে তোরা আমাকে কেউ কিছু ভালোবাসতে পারতিস্ নে [বব]। সে আমি নিশ্চয় জানি। সুরিকে যে সকলে ভালোবাসে সে ওর কোনো কাজের দরুন, ক্ষমতার দরুন, চেষ্টার দরুন নয়— ওর প্রকৃতির অন্তর্গত একটি সামঞ্জস্য ও সৌন্দর্যের দরুন। কিন্তু সংসার পুরুষমাত্রেরই কাছে স্বভাবনির্বিচারে কাজ প্রত্যাশা করে— সেইজন্যে এক-একবার ইচ্ছে করে সুরি যদি কোনো-একটা নাড়া খেয়ে আর-একটু সচেতন সচেষ্ট হয়ে উঠতে পারে— আমাদের জন্যে নয়, বাইরের লোকের জন্যে। যখন বাইরের লোক জিজ্ঞাসা করবে 'আপনি কী করেন?' তখন সুরেন কেন উত্তর দেবে 'কিছু করি নে'! তারা তো ওর মর্যাদা বুঝতে পারবে না। ওর মধ্যে একটি সহজ সরল মহত্ত্ব আছে, যে জন্যে ও ওর সমস্ত আত্মীয় এবং বন্ধুর কাছে ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে, যে জন্যে পরিচিতদের কাছে ও একটি দৃষ্টান্তস্বরূপে কাজ করে। কিন্তু পুরুষ মানুষ যতক্ষণ না সর্বসাধারণের মধ্যে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করে ততক্ষণ তার সম্পূর্ণ সার্থকতা নেই। তা বলে কী করা যাবে? সকলের তো সব হবার শক্তি নেই। সুরি যা আছে তাতেই আমি সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট আছি। পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে তোদের যে আত্মীয়রূপে কাছে পেয়েছি এজন্যে আমি তোদের উপর যেন কৃতজ্ঞ আছি। তোরা যে আমার কত উপকার করেছিস তা আমিই জানি। যারা ভালো তাদের ভালোবাসার যে কত মূল্য তা তারা নিজে জানে না। তুই আর সুরি আমাকে যে ভালোবাসিস, এ আমি যদিও আশাও করি তবু আমার কাছে যেন ভারী আশ্চর্যের মতো মনে হয়। ভালো করে ভেবে দেখলে আপনাকে কোনো ভালো জিনিসেরই যোগ্য মনে হয় না, সবগুলিই বিশেষ অনুগ্রহ— এত অনায়াসে এত পাই যে তারা যে কী অপরিমেয় অপরিসীম তা বুঝতে পারি নে, তবু যদি একটু কিছু কম পড়ে তবে সেটাকে ভারী একটা অন্যায় বঞ্চনা মনে হয়! মানুষের অযোগ্যতার সেই একটা প্রধান লক্ষণ— অকৃতজ্ঞতা।

সোলাপুর
১৪ মার্চ ১৮৯৩

৮৯

কলকাতা
১৬ মার্চ্। ১৮৯৩।

অনেক দিন পরে আজ একটুখানি রোদ্দুর দেখা দিয়েছে— বাঁচা গেছে— এতদিন মেঘলা দিনগুলো যেন কালো ভিজে কম্বল মুড়ি দিয়ে পড়ে ছিল, আজ বেশ একখানি বসন্তী রঙের কাপড় পরে প্রফুল্ল সুস্থ মুখে বেরিয়ে এসেছে। মনে কর্, চৈত্রমাস পড়েছে তবু এবার কিছু গরম পড়ে নি— দিনের বেলায় মোটা চাপকান জোব্বা পরে থাকি এবং রাত্রিকালে শালকম্বল মুড়ি দিই— খোলা ছাতে নক্ষত্রালোকে দক্ষিনে বাতাসে সতরঞ্চ পেতে জটলা করা কল্পনাতেও উদয় হয় না। সকলেই বলছে, এরকম অভূতপূর্ব ব্যাপার এ দেশে কখনো ঘটে নি। বর্ষার সময় বর্ষা হল না, শীতের সময় যথেষ্ট শীত নেই, এমন শোনা গেছে— কিন্তু বাঙলাদেশের গর্মিকে ফাঁকি দেওয়া বড়ো আশ্চর্য কথা।...

সু... বেশ রীতিমত পাকা স্টাইলে আলাপ চালাচ্ছিল। কাছে ঘেঁষে ঝুঁকে পড়ে খুব সমনোযোগ অথচ সপ্রতিভ ভাবে ঈষৎ-হাস্য-মুখে বক্রগ্রীবায় ইংরাজি ভাষায় কথোপকথন, অ্যাল্‌বম খুলে ছবি দেখানো ইত্যাদি ঠিক-দস্তুর-মত চাল চালছিল। বাঙালি ঘরের ছেলে এরকম অবস্থায় যেরকম লজ্জাভিভূত সংকুচিত ভাব ধারণ করে এতে তার তিলার্ধ মাত্র প্রকাশ পেল না।

আমার দেখে ভারী কৌতুক এবং বিস্ময় বোধ হচ্ছিল। আমি বোধ হয় আমার এই প্রায় বত্রিশ বৎসর বয়সেও অমন নিতান্ত সহজ মধুর সুনিশ্চিতভাবে অবলা-জাতির সঙ্গে বাক্যালাপ করতে পারি নে। চলতে গেলে হুঁচোট খাই, বলতে গেলে বেধে যায়, হাত দুটো কোথায় রাখি ভেবে পাই নে, লম্বা পা দুখানা সম্বন্ধে একটা কোনো ব্যবস্থা করা কর্তব্য বোধ করি অথচ কিছুই করে ওঠা হয় না— দুটোকে গুটিয়ে রাখব কি ছড়িয়ে রাখব কি আগুপিছু করে রাখব তার মীমাংসা করতে করতে ঠিক কথার ঠিক জবাবটা দিয়ে ওঠা হয় না। ঘরে তিনটে গ্যাসের শিখা এবং এক-ঘর লোক থাকতে যে সট্ করে চুম্বকাকৃষ্ট লোহখণ্ড-বৎ বিনা দ্বিধায় কোনো কিশোরীর পার্শ্বসংলগ্ন হয়ে অটল প্রতিষ্ঠা লাভ করা সে আমাদের মতো সংশয়াতুর ভীরু প্রাণীদের দ্বারা হওয়া অসম্ভব। ... ... আমাদের ছেলেগুলি কার্তিকের মতো চেহারা নিয়ে সসম্ভ্রমে নেপথ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কেবল লজ্জায় রাঙা টক্‌টকে হয়ে উঠছে— কনুই দিয়ে ভিড় ঠেলে যে বেশ একটি নরম জায়গা বেছে গরম হয়ে বসবে সে যোগ্যতা তাদের আর রইল না। এর চেয়ে ধিক্কারের বিষয় আর কী হতে পারে!

সোলাপুর
১৯ মার্চ্ ১৮৯৩

৯০

কলকাতা
৬ এপ্রিল। ১৮৯৩।

মো...র সঙ্গে আজকাল আমার মাঝে মাঝে নানা বিষয়ে কথাবার্তা হয়, আমার বড়ো ভালো লাগে। এই রকম আলোচনা করবার জন্যে আমার মন অনুক্ষণ তৃষিত হয়ে থাকে। এই হতভাগা জনশূন্য দেশে মনটা যেন নিশিদিন উপবাসী হয়ে আছে—কেবল ভিতর থেকে আপনাকে আপনি আহার করছে। কে বা জীবন ধারণ করে, কে বা ভাবে, কে বা কথা কয়—কেই বা প্রতিবাদ করে, কেই বা উৎসাহ দেয়, কেই বা তোমার কথা শোনে, কেই বা তোমার ভাব বোঝে—কেই বা অন্তরের মধ্যে তলিয়ে দেখতে চেষ্টা করে। কেউ বা আমোদ করছে, কেউ বা আলস্য করছে, কেউ বা আপিসে যাচ্ছে, মানুষের মন বলে যে একটি প্রাণী আছে সেটা যে শুকিয়ে শুকিয়ে আধমরা হয়ে যাচ্ছে তার জন্যে কারও কানাকড়ির মাথাব্যথা নেই। আমি আজ সকালে প্রি... বাবুর ওখানে গিয়েছিলুম, অনেকটা যেন আহার পান করে আসা গেল।

বম্বে
৯ এপ্রিল ১৮৯৩

৯১

কলকাতা
১৬ এপ্রিল। ১৮৯৩।

তোদের ভ্রমণের গোলমালের মধ্যে হোটেলে বসে এটা পড়ে কিরকম লাগবে সন্দেহ আছে। কোথায় সেই পুরীর সমুদ্র আর কোথায় তোদের আগ্রার হোটেল! এই পৃথিবীর সঙ্গে, সমুদ্রের সঙ্গে, আমাদের যে-একটা বহুকালের গভীর আত্মীয়তা আছে, নির্জনে প্রকৃতির সঙ্গে মুখোমুখি করে অন্তরের মধ্যে অনুভব না করলে সে কি কিছুতেই বোঝানো যায়! পৃথিবীতে যখন মাটি ছিল না সমুদ্র একেবারে একলা ছিল, আমার আজকেকার এই চঞ্চল হৃদয় তখনকার সেই জনশূন্য জলরাশির মধ্যে অব্যক্তভাবে তরঙ্গিত হতে থাকত; সমুদ্রের দিকে চেয়ে তার একতান কলধ্বনি শুনলে তা যেন বোঝা যায়। আমার অন্তরসমুদ্রও আজ একলা বসে বসে সেইরকম তরঙ্গিত হচ্ছে, তার ভিতরে ভিতরে কী-একটা যেন সৃজিত হয়ে উঠছে—কত অনির্দিষ্ট আশা, অকারণ আশঙ্কা, কত রকমের সৃষ্টি, কত রকমের প্রলয়, কত স্বর্গ নরক, কত বিশ্বাস সন্দেহ, কত লোকাতীত প্রত্যক্ষাতীত প্রমাণাতীত অনুভব এবং অনুমান, সৌন্দর্যের অপার রহস্য, প্রেমের অতল অতৃপ্তি—মানবমনের জড়িত জটিল সহস্র রকমের অপূর্ব অপরিমেয় ব্যাপার। বৃহৎ সমুদ্রের তীরে কিম্বা মুক্ত আকাশের নিচে একলা না বসলে সেই আপনার অন্তরের গোপন মহারহস্য ঠিক অনুভব করা যায় না। কিন্তু তা নিয়ে আমার মাথা খুঁড়ে মরবার দরকার

নেই— আমার যা মনে উদয় হয়েছে আমি তাই বলে খালাস— তার পরে সমুদ্র সমভাবে তরঙ্গিত হতে থাকুক আর মানুষ হাঁস্‌ ফাঁস্‌ করে ঘুরে ঘুরে বেড়াক।

আগ্রা
১৮ এপ্রিল ১৮৯৩

৯২

কলকাতা
৩০ এপ্রিল। ১৮৯৩।

কাল তাই রাত্তির দশটা পর্যন্ত ছাতে পড়ে থাকতে পেরেছিলুম। চতুর্দশীর চাঁদ উঠেছিল— চমৎকার হাওয়া দিচ্ছিল— ছাতে আর কেউ ছিল না। আমি একলা পড়ে পড়ে আমার সমস্ত জীবনের কথা ভাবছিলুম। এই তেতালার ছাত, এইরকম জ্যোৎস্না, এইরকম দক্ষিণের বাতাস জীবনের স্মৃতিতে কত রকমে মিশ্রিত হয়ে আছে। দক্ষিণের বাগানের শিশুগাছের পাতা ঝর্‌ ঝর্‌ শব্দ করছিল, আমি অর্ধেক চোখ বুজে আমার ছেলেবেলাকার মনের ভাবগুলিকে মনে আনবার চেষ্টা করছিলুম। পুরোনো স্মৃতিগুলো মদের মতো -- যত বেশিদিন মনের মধ্যে সঞ্চিত হয়ে থাকে, ততই তার বর্ণ এবং স্বাদ এবং নেশা যেন মধুর হয়ে আসে। আমাদের এই স্মৃতির বোতলগুলি বুড়ো বয়সের জন্যে 'in deep-delved earth' ঠাণ্ডা করে রেখে দেওয়া যাচ্ছে— তখন বোধ হয় ছাতের উপর জ্যোৎস্না-রাতে এক-এক ফোঁটা করে আস্বাদ করতে বেশ লাগবে। অল্প বয়সে মানুষ কেবলমাত্র কল্পনা এবং স্মৃতিতে সন্তুষ্ট থাকে না; কেননা তখন তার রক্তের জোর, তার শরীরের তেজ, তাকে কিছু-একটা কাজে প্রবৃত্ত করতে চায়। কিন্তু বুড়ো বয়সে যখন স্বভাবতই আমরা কাজে অক্ষম, শরীরের যৌবনের অতিরিক্ত তেজ আমাদের কোনোরকম তাড়না করছে না, তখন স্মৃতি বোধ হয় আমাদের পক্ষে যথেষ্ট -- তখন জ্যোৎস্নারাত্রের স্থির জলাশয়ের মতো আমাদের অচঞ্চল মনে পূর্বস্মৃতির ছায়া এমনি পরিষ্কার স্পষ্টভাবে পড়ে যে বর্তমান ব্যাপারের সঙ্গে তার প্রভেদ বোঝা শক্ত।

সিমলা
৩ মে ১৮৯৩

৯৩

শিলাইদহ
মঙ্গলবার। ২ মে ১৮৯৩।

এখন আমি বোটে। এই যেন আমার নিজের বাড়ি। এখানে আমিই একমাত্র কর্তা— এখানে আমার উপরে, আমার সময়ের উপরে, আর-কারও কোনো অধিকার নেই। এই বোটটি আমার পুরোনো ড্রেসিং গাউনের মতো— এর মধ্যে প্রবেশ

করলে খুব একটি ঢিলে অবসরের মধ্যে প্রবেশ করা যায়—যেমন ইচ্ছা ভাবি, যেমন ইচ্ছা কল্পনা করি, যত খুশি পড়ি, যত খুশি লিখি, এবং যত খুশি নদীর দিকে চেয়ে টেবিলের উপর পা তুলে দিয়ে আপন-মনে এই আকাশপূর্ণ আলোকপূর্ণ আলস্যপূর্ণ দিনের মধ্যে নিমগ্ন হয়ে থাকি।…

এখন প্রথম দিনকতক আমার এই পূর্বপরিচিতের সঙ্গে পুনর্মিলনের নতুন বাধো-বাধো ভাবটা কাটাতেই যাবে। তার পরে নিয়মিত লিখতে পড়তে নদীর ধারে বেড়াতে বেড়াতে আমাদের পুরাতন সখ্য আবার বেশ সহজ হয়ে আসবে। বাস্তবিক, পদ্মাকে আমি বড়ো ভালোবাসি। ইন্দ্রের যেমন ঐরাবত আমার তেমনি পদ্মা—আমার যথার্থ বাহন—খুব বেশি পোষ-মানা নয়, কিছু বুনো-রকম—কিন্তু ওর পিঠে এবং কাঁধে হাত বুলিয়ে ওকে আমার আদর করতে ইচ্ছে করে। এখন পদ্মার জল অনেক কমে গেছে—বেশ স্বচ্ছ কৃশকায় হয়ে এসেছে—একটি পাণ্ডুবর্ণ ছিপ্‌ছিপে মেয়ের মতো, নরম শাড়িটি গায়ের সঙ্গে বেশ সংলগ্ন। সুন্দর ভঙ্গীতে চলে যাচ্ছে আর শাড়িটি বেশ গায়ের গতির সঙ্গে সঙ্গে বেঁকে যাচ্ছে। আমি যখন শিলাইদহে বোটে থাকি, তখন পদ্মা আমার পক্ষে সত্যিকার একটি স্বতন্ত্র মানুষের মতো। অতএব তার কথা যদি কিছু বাহুল্য করে লিখি তবে সে কথাগুলো চিঠিতে লেখবার অযোগ্য মনে করিস নে। সেগুলো হচ্ছে এখানকার পার্সোনাল খবরের মধ্যে।

এক দিনেই কলকাতার সঙ্গে ভাবের কত তফাত হয়ে যায়! কাল বিকেলে সেখানে ছাতে বসে ছিলুম সে এক-রকম, আর আজ এখানে দুপুর-বেলায় বোটে বসে আছি এ এক-রকম। কলকাতার পক্ষে যা সেণ্টিমেণ্টাল, পোয়েটিকাল, এখানকার পক্ষে তা কতখানি সত্যিকার সত্যি! পাব্লিক-নামক গ্যাসালোক-জ্বালা স্টেজের উপর আর নাচতে ইচ্ছে করে না—এখানকার এই স্বচ্ছ দিবালোক এবং নিভৃত অবসরের মধ্যে গোপনে আপনার কাজ করে যেতে ইচ্ছে করে। নেপথ্যে এসে রঙচঙগুলো ধুয়ে মুছে না ফেললে মনের শ্রান্তি আর যায় না। সাধনা চালানো, সাধারণের উপকার করা এবং হাঁস্‌ ফাঁস্‌ করে মরাটা অনেকটা অনাবশ্যক বলে মনে হয়—তার ভিতরে অনেক জিনিস থাকে যা খাঁটি সোনা নয়, যা খাদ—আর, এই প্রসারিত আকাশ আর সুবিস্তীর্ণ শান্তির মধ্যে যদি কারও প্রতি দৃক্‌পাত না করে আপনার গভীর আনন্দে আপনার কাজ করে যাই তা হলেই যথার্থ কাজ হয়।

সিমলা
৬ মে ১৮৯৩

৯৪

শিলাইদহ
৮ মে। ১৮৯৩।

কবিতা আমার বহুকালের প্রেয়সী। বোধ হয় যখন আমার রথীর মতো বয়স ছিল তখন থেকে আমার সঙ্গে বাক্‌দত্তা হয়েছিল—তখন থেকে আমাদের পুকুরের

ধার, বটের তলা, বাড়ি-ভিতরের বাগান, বাড়ি-ভিতরের এক তলার অনাবিষ্কৃত ঘরগুলো, এবং সমস্ত বাইরের জগৎ এবং দাসীদের মুখের সমস্ত রূপকথা এবং ছড়াগুলো, আমার মনের মধ্যে ভারী একটা মায়াজগৎ তৈরি করছিল, তখনকার সেই আবছায়া অপূর্ব মনের ভাব প্রকাশ করা ভারী শক্ত— কিন্তু এই পর্যন্ত বেশ বলতে পারি কল্পনার সঙ্গে তখন থেকেই মালা-বদল হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ও মেয়েটি পয়মন্ত নয় তা স্বীকার করতে হয়— আর যাই হোক, সৌভাগ্য নিয়ে আসেন না। সুখ দেন না বলতে পারি নে, কিন্তু স্বস্তির সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। যাকে বরণ করেন তাকে নিবিড় আনন্দ দেন, কিন্তু এক-এক-সময় কঠিন আলিঙ্গনে হৃৎপিণ্ডটি নিংড়ে রক্ত বের করে নেন। যে লোককে তিনি নির্বাচন করেন, সংসারের মাঝখানে ভিত্তিস্থাপন করে গৃহস্থ হয়ে স্থির হয়ে আয়েস করে বসা সে লক্ষ্মীছাড়ার পক্ষে একেবারে অসম্ভব। কিন্তু আমার আসল জীবনটি তার কাছেই বন্ধক আছে। সাধনাই লিখি আর জমিদারিই দেখি, যেমনি কবিতা লিখতে আরম্ভ করি অমনি আমার চিরকালের যথার্থ আপনার মধ্যে প্রবেশ করি— আমি বেশ বুঝতে পারি এই আমার স্থান। জীবনে জ্ঞাত এবং অজ্ঞাতসারে অনেক মিথ্যাচরণ করা যায়, কিন্তু কবিতায় কখনও মিথ্যা কথা বলি নে— সেই আমার জীবনের সমস্ত গভীর সত্যের একমাত্র আশ্রয়স্থান।…

রবিবর্মার ছবি দেখতে দেখতে সমস্ত সকালবেলাটা গেল। আমার সত্যি বেশ লাগে। হাজারই হোক, আমাদের দিশি বিষয় এবং দিশি মূর্তি ও ভাব আমাদের কাছে যে কতখানি, এই ছবিগুলি দেখলে তা বেশ বোঝা যায়। অনেকগুলো ছবির হাত পা, দেহের পরিমাণ, খুব অসমান আছে, কিন্তু মোটের উপর সবসুদ্ধ জড়িয়ে খুব মনের ভিতরে প্রবেশ করে। তার প্রধান কারণ, আমাদের মনটা চিত্রকরের সহযোগিতা করতে থাকে। সে কী বলতে চাচ্ছে আমরা আগে থাকতে বুঝে নিই— তার চেষ্টাটুকু দেখলেই বাকিটুকু পূরণ করে নিতে পারি। এর ভিতর থেকে খুঁত বের করা খুব সহজ, তার জন্যে বেশি ক্ষমতার দরকার করে না, কিন্তু যখন ভেবে দেখা যায় কোনো বিষয়ে একটা স্পষ্ট কল্পনা করা কতই শক্ত— মনে আমাদের যে ছবিটা উদয় হয় তা প্রায়ই আধা-আধি, মোটামুটি গোঁজামিলন-দেওয়া— কিন্তু ছবি আঁকতে গেলে একটি সামান্যতম রেখা পর্যন্ত ছাড়বার জো নেই, প্রধান অপ্রধান সমস্তই একেবারে যথাযথ করে ভেবে নিতে হবে, কল্পনার মতো অমন একটা নিয়ত-পরিবর্তমান জিনিসকে প্রত্যক্ষের কঠিন ছাঁচে ঢেলে দিতে হবে— সে কি সামান্য ব্যাপার!

সিমলা
১২ মে ১৮৯৩

৯৫

শিলাইদহ
১০ মে। ১৮৯৩।

ইতিমধ্যে দেখছি খুব ফুলো ফুলো বড়ো বড়ো কতকগুলো মেঘ চতুর্দিক থেকে জমে এসেছে— আমার এই চারি দিকের দৃশ্যপট থেকে কাঁচা সোনালি রোদ্দুরটুকু

যেন মোটা মোটা ব্লটিং প্যাড দিয়ে একেবারে চুপসে তুলে নিয়েছে। আবার যদি বৃষ্টি আরম্ভ হয় তা হলে ধিক্ ইন্দ্রদেবকে! মেঘগুলোর তেমন ফাঁকা দরিদ্র চেহারা দেখছি নে, ... বাবুদের মতো দিব্যি সজলশ্যামল টেবো-টোবো নধরনন্দন ভাব। এখনি বৃষ্টি আরম্ভ হল বলে—হাওয়াটাও সেই রকম কাঁদো-কাঁদো ভিজে-ভিজে ঠেকছে। এখানে এই মেঘরৌদ্রের যাওয়া-আসা ব্যাপারটা যে কতটা গুরুতর, আকাশের দিকে যে কত লোক হাঁ করে তাকিয়ে আছে, তোদের সেই অভ্রভেদী পর্বতশৃঙ্গে বসে তোরা তা ঠিকটি কল্পনা করতে পারবি নে। আমার এই দরিদ্র চাষী প্রজাগুলোকে দেখলে আমার ভারী মায়া করে—এরা যেন বিধাতার শিশু-সন্তানের মতো—নিরুপায়—তিনি এদের মুখে নিজের হাতে কিছু তুলে না দিলে এদের আর গতি নেই। পৃথিবীর স্তন যখন শুকিয়ে যায় তখন এরা কেবল কাঁদতে জানে; কোনোমতে একটুখানি খিদে ভাঙলেই আবার তখনি সমস্ত ভুলে যায়। সোসিয়ালিস্ট্‌রা যে সমস্ত পৃথিবীময় ধন বিভাগ করে দেয় সেটা সম্ভব কি অসম্ভব ঠিক জানি নে—যদি একেবারেই অসম্ভব হয় তা হলে বিধির বিধান বড়ো নিষ্ঠুর, মানুষ ভারী হতভাগ্য! কেননা, পৃথিবীতে যদি দুঃখ থাকে তো থাক্, কিন্তু তার মধ্যে এতটুকু একটু ছিদ্র একটু সম্ভাবনা রেখে দেওয়া উচিত যাতে সেই দুঃখমোচনের জন্যে মানুষের উন্নত অংশ অবিশ্রাম চেষ্টা করতে পারে, একটা আশা পোষণ করতে পারে। যারা বলে, কোনো কালে পৃথিবীর সকল মানুষকে জীবনধারণের কতকগুলি মূল আবশ্যকীয় জিনিসও বণ্টন করে দেওয়া নিতান্ত অসম্ভব অমূলক কল্পনা মাত্র, কখনোই সকল মানুষ খেতে পরতে পাবে না, পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ চিরকালই অর্ধাশনে কাটাবেই, এর কোনো পথ নেই—তারা ভারী কঠিন কথা বলে। কিন্তু এ-সমস্ত সামাজিক সমস্যা এমন কঠিন! বিধাতা আমাদের এমনি একটি ক্ষুদ্র জীর্ণ দীন বস্ত্রখণ্ড দিয়েছেন, পৃথিবীর এক দিক ঢাকতে গিয়ে আর-এক দিক বেরিয়ে পড়ে—দারিদ্র্য দূর করতে গেলে ধন চলে যায় এবং ধন গেলে সমাজের কত-যে শ্রী সৌন্দর্য উন্নতির কারণ চলে যায় তার আর সীমা নেই।

কিন্তু আবার এক-একবার রোদ্দুর উঠছে, পশ্চিমে মেঘও যথেষ্ট জমে আছে। পশ্চিমে মেঘ হলে বৃষ্টি হবেই এই তো প্রবাদে কয়।

সিমলা
১৪ মে ১৮৯৩

৯৬

শিলাইদহ
১১ মে। ১৮৯৩।

কাল বিকেলের দিকে খুব ঘনঘটা করে মেঘ করে খানিকটা বৃষ্টি হয়ে আবার পরিষ্কার হয়ে গেছে। আজ খানকত দলভ্রষ্ট বিচ্ছিন্ন মেঘ সূর্যালোকে শুভ্র হয়ে খুব নিরীহ নিরপরাধী ভাবে আকাশের ধারে ধারে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, দেখে তো মনে হয় এদের বর্ষণের অভিপ্রায় কিছুমাত্র নেই—কিন্তু চাণক্য তাঁর সুবিখ্যাত শ্লোকে যাদের যাদের বিশ্বাস করতে নিষেধ করেছেন তার মধ্যে দেব্‌তাকেও ধরা

উচিত ছিল। কিন্তু আজ সকাল বেলাটি বড়ো সুন্দর হয়ে উঠেছে— আকাশ পরিষ্কার নীল, নদীর জলে রেখামাত্র নেই এবং ডাঙার কাছে গড়ানে জায়গায় যে ঘাসগুলি হয়েছে তাতে পূর্বদিনকার বৃষ্টির কণাগুলি লেগে আছে, সেগুলি ঝক্ ঝক্ করছে। এই-সমস্ত মিলে সূর্যালোকে আজকের প্রকৃতিকে ভারী একটি শুভ্রবসনা মহিমাময়ী মহেশ্বরীর মতো দেখাচ্ছে। সকাল বেলাটি এমনি নিস্তব্ধ হয়ে রয়েছে— কেন জানি নে নদীতে একটি নৌকো নেই, বোটের নিকটবর্তী ঘাটে কেউ জল নিতে স্নান করতে আসে নি; নায়েব সকাল-সকাল কাজ সেরে চলে গেছে— খানিকটা চুপ করে কান পেতে থাকলে কী-একটা ঝাঁ ঝাঁ শব্দ শোনা যায় এবং এই রৌদ্রালোক আর আকাশ আস্তে আস্তে প্রবেশ করে মাথার ভিতরটি একেবারে ভরে ওঠে, এবং সেখানকার সমুদয় ভাব এবং চিন্তাগুলিকে একটি নীল এবং সোনালি রঙে রাঙিয়ে দেয়। বোটের এক পাশে একটা বাঁকা কৌচ আনিয়ে রেখেছি; এই রকম সকাল বেলায় তার মধ্যে শরীরটা ছড়িয়ে দিয়ে সমস্ত কাজ ফেলে চুপচাপ করে পড়ে থাকতে ইচ্ছে করে; মনে হয়—

'নাই মোর পূর্বাপর,
যেন আমি একদিনে উঠেছি ফুটিয়া
অরণ্যের পিতৃমাতৃহীন ফুল।'

যেন আমি এই আকাশের, এই নদীর, এই পুরাতন শ্যামল পৃথিবীর। বোটে আমার এই রকম করে কাটে। পড়ে পড়ে পরিচিত প্রকৃতির কত রকমের যে ভাবের পরিবর্তন দেখি তার ঠিক নেই। এখানে আমার আর-একটি সুখ আছে। এক-এক সময় এক-একটি সরল ভক্ত বৃদ্ধ প্রজা আসে, তাদের ভক্তি এমনি অকৃত্রিম, তারা সত্যি সত্যি আমাদের এত ভালোবাসে যে আমার চোখ ছল ছল করে আসে। এই মাত্র কালীগ্রাম থেকে একটি বুড়ো প্রজা তার ছেলেকে সঙ্গে করে আমার কাছে এসেছিল— সে যেন তার সমস্ত সরল আর্দ্র হৃদয়খানি দিয়ে আমার পা-দুটো মুছিয়ে দিয়ে গেল। ভাগবতে কৃষ্ণ বলেছেন 'আমার চেয়ে আমার ভক্ত বড়ো', সে কথার মানে খানিকটা বোঝা যায়। বাস্তবিক এর সুন্দর সরলতা এবং আন্তরিক ভক্তিতে এ লোকটি আমার চেয়ে কত বড়ো! আমিই যেন এ ভক্তির অযোগ্য, কিন্তু এ ভক্তিটি তো বড়ো সামান্য জিনিস নয়। এদের চাষার ভাষা, এদের স্নেহের সম্বোধন এমন মিষ্টি লাগে! ছোটো ছেলেদের উপর যেরকম ভালোবাসা এই বৃদ্ধ ছেলেদের উপর অনেকটা সেইরকম— কিন্তু কিছু প্রভেদ আছে। এরা তাদের চেয়েও ছোটো! কেননা তারা বড়ো হবে, এরা আর কোনো কালেও বড়ো হবে না— এদের এই জীর্ণ শীর্ণ কুঞ্চিত বলিত বৃদ্ধ দেহখানির মধ্যে কী-একটি শুভ্র সরল কোমল মন রয়েছে! শিশুদের মনে কেবল সরলতা আছে মাত্র, কিন্তু এমন স্থিরবিশ্বাসপূর্ণ একাগ্র নিষ্ঠা নেই। আমি কি এই বৃদ্ধটির রাজা হবার যোগ্য! মানুষে মানুষে যদি সত্যি একটা আধ্যাত্মিক যোগ থাকে তা হলে আমার এই অন্তরের মঙ্গল-ইচ্ছা ওর হয়তো কিছু কাজে লাগতে পারে— তা ছাড়া জমিদার হয়ে যা করতে পারি তা তো করবই। কিন্তু সব প্রজা এরকম নয়, সেরকম প্রত্যাশা করাও যায় না। সব চেয়ে যা ভালো সব চেয়ে তা দুর্লভ— কিন্তু বিধাতার পৃথিবীতে সেরকমটি হওয়া উচিত ছিল না।

সিমলা
১৫ মে ১৮৯৩

৯৭

শিলাইদহ
শনিবার। ১৩ মে ১৮৯৩।

আজ তোর কাছ থেকে টেলিগ্রাম পেলুম যে : Missing gown lying Post Office। এর দুটো অর্থ হতে পারে। এক অর্থ হচ্ছে হারা গাত্রবস্ত্র ডাকঘরে শুয়ে আছেন। আর-এক অর্থ হচ্ছে— গাউনটা মিসিং এবং পোস্ট অফিসটা লাইং। দুই অর্থই সম্ভব হতে পারে, কিন্তু যেপর্যন্ত প্রতিবাদ [না] শুনি সেপর্যন্ত প্রথম অর্থটাই গ্রহণ করা গেল। কিন্তু মজা হচ্ছে এই— সঙ্গে সঙ্গে যে চিঠিখানি এসেছে তাতে পরিষ্কার করে বলা আছে একটা গাউন যে পাওয়া যায় নি তাতে আর কোনো সন্দেহ নেই।...

বেচারা চিঠি! তার জিম্মায় যে-ক'টি কথা লেফাফায় পুরে দেওয়া হয়েছে সেই ক'টি কথা কাঁধে করে নিয়ে দীর্ঘ পথ ঢিকোতে ঢিকোতে চলে আসছে— ইতিমধ্যে যে পৃথিবীতে কত-কী হয়ে যাচ্ছে তা সে জানে না, এবং তার ছোটো ভাই যে এক লম্ফে তাকে ডিঙিয়ে তার সমস্ত কথার একটিমাত্র সংক্ষেপ রূঢ় প্রতিবাদ নিয়ে এসে হাজির হল তারও সে জবাব দিতে পারে না; সে ভালোমানুষের মতো বলে, 'আমি কিছু জানি নে বাপু, আমাকে সে যা বলে দিয়েছে আমি তাই বয়ে এনেছি।' বাস্তবিক এনেছে বটে। একটি কথার এদিক ওদিক হয় নি— সমস্ত পথটি মাড়িয়ে, দীর্ঘ পথের কত চিহ্ন আষ্টেপৃষ্ঠে কত ছাপ নিয়েই বেচারা ঠিক সময়ে এসে উপস্থিত হয়েছে। তা হোক তার খবর ভুল, আমি তাকে ভালোবাসি। আর তারে চড়ে চক্ষের পলকে টেলিগ্রাফ এলেন— কোথাও পথশ্রমের কোনো চিহ্ন নেই, লেফাফাখানি একেবারে রাঙা টক্‌টক্‌ করছে— হড়্‌বড়্‌ তড়্‌বড়্‌ করে যে-দুটো কথা বললেন তার ভিতর থেকে আটটা-দশটা কথা পড়ে গেছে— তার মধ্যে ব্যাকরণ নেই, ভদ্রতা নেই, কিছু নেই— একটা সম্বোধন নেই, একটা বিদায়ের শিষ্টতাও নেই, আমার প্রতি যেন তার কিছুমাত্র বন্ধুতার ভাব নেই, কেবল কোনোমতে তাড়াতাড়ি কথাটা যেমন-তেমন করে বলে ফেলে দায় কাটিয়ে চলে যেতে পারলে বাঁচে। যাই হোক, গাউনটা যে পোস্ট্‌-অফিসে এতকাল শীতযাপন করছেন এটা যদিচ বিস্তর বিলম্বে শোনা গেল তবু টেলিগ্রাফ না থাকলে আরও বিলম্বে শুনতে হত, অতএব তাকে ধন্যবাদ।

সিমলা
১৭ মে ১৮৯৩

৯৮

শিলাইদহ
১৬ মে। ১৮৯৩।

আমি বিকেলে, বেলা সাড়ে ছ'টার পর, স্নান করে ঠাণ্ডা এবং পরিষ্কার হয়ে চরের উপর নদীর ধারে ঘণ্টাখানেক বেড়াই, তার পর আমাদের নতুন জলিবোটটাকে নদীর

মধ্যে টেনে নিয়ে গিয়ে তার উপরে বিছানাটি পেতে ঠান্ডা হাওয়ায় সন্ধ্যার অন্ধকারে চিত হয়ে চুপচাপ পড়ে থাকি। শৈ... [আমার] কাছে বসে নানা কথা বকে যায়। চোখের উপরে আকাশ তারায় একেবারে খচিত হয়ে যায়— আমি প্রায় রোজই মনে করি, এই তারাময় আকাশের নিচে আবার কি কখনও জন্মগ্রহণ করব? যদি করি, আর কি কখনও এমন প্রশান্ত সন্ধ্যাবেলায় এই নিস্তব্ধ গোরাই নদীটির উপর বাংলাদেশের এই সুন্দর একটি কোণে এমন নিশ্চিন্ত মুগ্ধ মনে জলিবোটের উপর বিছানা পেতে পড়ে থাকতে পাব? হয়তো আর-কোনো জন্মে এমন একটি সন্ধেবেলা আর-কখনও ফিরে পাব না। তখন কোথায় দৃশ্য-পরিবর্তন হবে— আর, কিরকম মন নিয়েই বা জন্মাব! এমন সন্ধ্যা হয়তো অনেক পেতেও পারি, কিন্তু সে সন্ধ্যা এমন নিস্তব্ধভাবে তার সমস্ত কেশপাশ ছড়িয়ে দিয়ে আমার বুকের উপরে এত সুগভীর ভালোবাসার সঙ্গে পড়ে থাকবে না। আমি কি ঠিক এমনি মানুষটি তখন থাকব! আশ্চর্য এই আমার সবচেয়ে ভয় হয় পাছে আমি য়ুরোপে গিয়ে জন্মগ্রহণ করি। কেননা সেখানে সমস্ত চিত্তটিকে এমন উপরের দিকে উদ্ঘাটিত রেখে পড়ে থাকবার জো নেই এবং পড়ে থাকাও সকলে ভারী দোষের বিবেচনা করে। হয়তো একটা কারখানায় নয়তো ব্যাঙ্কে নয়তো পার্ল্যামেণ্টে সমস্ত দেহ মন প্রাণ দিয়ে খাটতে হবে— শহরের রাস্তা যেমন ব্যাবসা-বাণিজ্য গাড়িঘোড়া চলবার জন্যে ইঁটে-বাঁধানো কঠিন, তেমনি মনটা স্বভাবটা বিজ্‌নেস্‌ চালাবার উপযোগী পাকা করে বাঁধানো— তাতে একটি কোমল তৃণ একটি অনাবশ্যক লতা গজাবার ছিদ্রটুকু নেই। ভারী ছাঁটাছোঁটা গড়াপেটা আইনে-বাঁধা মজবুত রকমের ভাব। কী জানি, তার চেয়ে আমার এই কল্পনাপ্রিয় অকর্মণ্য আত্মনিমগ্ন বিস্তৃত-আকাশ-পূর্ণ মনের ভাবটি কিছুমাত্র অগৌরবের বিষয় বলে মনে হয় না। জলিবোটে পড়ে পড়ে জগতের সেই কাজের লোকের কাছে আপনাকে কিছুমাত্র খাটো মনে হয় না। বরঞ্চ আমিও যদি কোমর বেঁধে কাজে লাগতুম তা হলে হয়তো সেই-সমস্ত বড়ো-বড়ো-ওক-গাছ-কাটা জোয়ান লোকদের কাছে আপনাকে ভারী যৎসামান্য মনে হত। কিন্তু তাই বলে কি সত্যিই এই জলিবোট-শায়ী বিমুগ্ধ যুবক রামমোহন রায়ের চেয়ে বড়লোক?

সিমলা
২০ মে ১৮৯৩

৯৯

কলকাতা
২১ জুন। ১৮৯৩।

এবারকার ডায়ারিটা তো ঠিক প্রকৃতির স্তব নয়— মন-নামক একটা সৃষ্টিছাড়া চঞ্চল পদার্থ কোনো গতিকে আমাদের শরীরের মধ্যে প্রবেশ করাতে যে কিরকম একটা উৎপাত হয়েছে তৎসম্বন্ধে আলোচনা করা গেছে। আসলে, আমরা খাব, পরব, বেঁচে থাকব, এই রকম কথা ছিল— আমরা যে বিশ্বের আদিকারণ অনুসন্ধান করি, ইচ্ছেপূর্বক খুব শক্ত একটা ছন্দ বানিয়ে তারই মধ্যে খুব শক্ত একটা ভাব ব্যক্ত

করবার প্রয়াস করি, আবার তার মধ্যে পদে পদে মিল থাকা চাই, আপাদমস্তক ঋণে নিমগ্ন হয়েও মাসে মাসে ঘরের কড়ি খরচ করে সাধনা বের করি, এর কী আবশ্যক ছিল—ও দিকে নারায়ণ সিং দেখো ঘি দিয়ে আটা দিয়ে বেশ মোটা মোটা রুটি বানিয়ে তার সঙ্গে দধি সংযোগ করে আনন্দমনে ভোজন-পূর্বক দু-এক ছিলিম তামাক টেনে দুপুর বেলাটা কেমন স্বচ্ছন্দে নিদ্রা দিচ্ছে এবং সকালে বিকালে লো [কেনে] র সামান্য দু-চারটে কাজ করে রাত্রে অকাতরে বিশ্রাম লাভ করছে; জীবনটা যে ব্যর্থ হল, বিফল হল, এমন কখনো তার স্বপ্নেও মনে হয় না—পৃথিবীর যে যথেষ্ট দ্রুতবেগে উন্নতি হচ্ছে না সেজন্যে সে নিজেকে কখনও দায়িক করে না। জীবনের সফলতা কথাটার কোনো মানে নেই—প্রকৃতির একমাত্র আদেশ হচ্ছে 'বেঁচে থাকো'। নারায়ণ সিং সেই আদেশটির প্রতি লক্ষ্য রেখেই নিশ্চিন্ত আছে—আর, যে হতভাগার বক্ষের মধ্যে মন-নামক একটা প্রাণী গর্ত খুঁড়ে বাসা করেছে তার আর বিশ্রাম নেই, কর্তব্যের শেষ নেই, মনের সন্তোষ নেই; তার পক্ষে কিছুই যথেষ্ট নয়, তার চতুর্দিক্‌বর্তী অবস্থার সঙ্গে সমস্ত সামঞ্জস্য নষ্ট হয়ে গেছে; সে যখন জলে থাকে তখন স্থলের জন্যে লালায়িত হয়, যখন স্থলে থাকে তখন জলে সাঁতার দেবার জন্যে তার 'অসীম আকাঙ্ক্ষা'র উদ্রেক হয়। এই দুরন্ত অসন্তুষ্ট মনটাকে প্রকৃতির অগাধ প্রশান্তির মধ্যে বিসর্জন করে একটুখানি স্থির হয়ে বসতে পারলে বাঁচা যায়—কথাটা হচ্ছে এই।

সিমলা
২৪ জুন ১৮৯৩

১০০

কলকাতা
২২ জুন। ১৮৯৩।

তুই আমাকে সেদিনকার চিঠিতে খোঁটা দিয়েছিস, বিয়ে প্রভৃতি বিষয় আমরা কিছু বেশি থিওরেটিক্যালি দেখি—তোর সে কথাটা আমি ইতিমধ্যে অনেকবার ভেবে দেখেছি, এবং সবিশেষ পর্যালোচনা করে তার সত্যতা সম্বন্ধে আমার মনে আর কোনো সন্দেহ নেই। বাস্তবিক, আমার মতো লোক পৃথিবীর অধিকাংশ জিনিস কিছু দূর থেকে দেখে—স্বভাবত প্রত্যেক বিষয়টাই চিন্তা করে দেখতে চায়। মন জিনিসটা বুল্‌স্‌-আই লণ্ঠনের মতো। যে সময়ে যে পদার্থের উপর চিন্তার আলোক নিক্ষেপ করে তার পাশের জিনিসটাকে দেখতে পায় না—এমন-কি সেটাকে আরও দ্বিগুণ অন্ধকার করে দিয়ে কেবল একটি জিনিসকেই অতিরিক্ত জাজ্বল্যমান করে তোলে। এরকম করে দেখার বিস্তর দোষ। আশপাশের সঙ্গে বেশ মিলিয়ে-জুলিয়ে দেখলে সব জিনিসই চোখে এবং মনে এক রকম সহ্য বোধ হয়—বৃহৎ সংসারের একটি অংশকে সমস্ত বৃহৎ সংসারের সঙ্গে যোগ করে দেখলে তাকে আর তেমন গুরুতর বলে বোধ হয় না। স্ব...র বিয়ের সম্বন্ধে আমি যে-সব ফিলজফাইজ করেছিলুম সেটা কোনো কাজেরই না। সুখ দুঃখ সকল অবস্থাতেই আছে, কোনোটা একেবারে অতিরিক্ত পরিমাণে নেই—মোটের উপরে দুটি

নরনারী পরস্পরের জীবনে গ্রন্থি বদ্ধ করে মিলে-মিশে সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকবারই কথা— পৃথিবীটা পৃথিবীর চেয়ে বেশি নয়, এই মনে রেখে সমস্ত মিলিয়ে দেখলে হিসেবে কিছু কমি দেখা যায় না। এই দেখ্-না স্ব...রা বেশ আনন্দেই আছে— অবশ্য এ উচ্ছ্বাস কিছুদিন বাদে কমে আসবে, তখন অভ্যাসবন্ধনে স্নেহবন্ধনে বদ্ধ হয়ে জীবনটি বিস্তৃত ব্যাপ্ত হয়ে ধীরে ধীরে প্রবাহিত হতে থাকবে। আমাদের মতো লক্ষ্মীছাড়া ‘চিন্তাশীল’ লোকেরা এইটে ঠিকটি বুঝতে পারে না। আমরা নিজের সম্বন্ধেও কেবল চিন্তা করে কল্পনা করে নিজেকে ব্যর্থ বিফল করে ফেলেছি— প্রত্যেক খণ্ড অবস্থাই আমাদের কাছে বড়ো বেশি প্রাধান্য ধারণ করে। সুখ অত্যন্ত অধিক সুখ হয় এবং দুঃখ একান্ত তীব্র হয়ে ওঠে. কিন্তু জীবনের যে প্রধান সুখ প্রধান শান্তি আপনার আদ্যোপান্তের মধ্যে একটি সামঞ্জস্য একটি ঐক্য সেটি নেই— তাই জন্যে অবিশ্রাম এই খণ্ড খণ্ড বিচ্ছিন্ন সুখদুঃখের উপর দিয়ে চলতে চলতে জীবন একেবারে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ে— মনে হয় সুখ দুঃখ আর কিছুই চাই নে, এখন দীর্ঘকালের জন্যে যদি প্রশান্ত নিশ্চেষ্টভাবে এই উদার উন্মুক্ত সুন্দর শান্ত প্রকৃতির উপরে পড়ে পড়ে রোদ পোহাতে পারি তা হলে বাঁচা যায়। কিন্তু যারা মন-পদার্থের দ্বারা অতিমাত্র উৎপীড়িত নয়, পৃথিবীতে কোনো অবস্থাতেই তাদের বিশেষ আশঙ্কা নেই— তারা সুখী হবেই. সুখী করবেই. এবং জীবনের সমস্ত কর্তব্য সম্পন্ন করা তাদের পক্ষে অত্যন্ত সহজ। আমার এই জীর্ণ হৃদয়ের রুগ্ন চিন্তাগুলো প্রকাশ করে সংসারটা তোদের কাছে অমূলক-বিভীষিকা-পরিপূর্ণ করে তোলা ভয়ানক অন্যায়। তোদের জন্যে পৃথিবীতে অনেক সুখ. জীবনে অনেক নব নব দৃশ্য এবং নব নব পরিবর্তন আছে —সে-সমস্ত তোরা আনন্দমনে পূর্ণহৃদয়ে ভোগ করতে পারবি।

সিমলা
২৫ জুন ১৮৯৩

১০১

শিলাইদহ
রবিবার। ২ জুলাই ১৮৯৩।

কোনো জিনিস যথার্থ উপভোগ করতে গেলে তার চতুর্দিকে অবসরের বেড়া দিয়ে ঘিরে নিতে হয়— তাকে বেশ অনেকখানি মেলিয়ে দিয়ে, ছড়িয়ে দিয়ে, চতুর্দিকে বিছিয়ে দিয়ে, তবে তাকে ষোলো-আনা আয়ত্ত করা যায়। মফস্বলে একলা থাকবার সময় যে চিঠিপত্র এত ভালো লাগে তার একটা প্রধান কারণ হচ্ছে— চিঠির প্রত্যেক অক্ষরটি পর্যন্ত একটি একটি ফোঁটার মতো করে নিঃশেষপূর্বক গ্রহণ করবার অবসর পাওয়া যায়, মনের কল্পনা ওর প্রত্যেক কথায় কথায় ইনিয়ে-বিনিয়ে লতিয়ে-লতিয়ে জড়িয়ে-জড়িয়ে ওঠে— বেশ অনেক ক্ষণ ধরে কল্পনার একটা গতি অনুভব করা যায়। অতি লোভে তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে সেই সুখ থেকে বঞ্চিত হতে হয়। সুখের ইচ্ছেটা এমনি তাড়াতাড়ি এগিয়ে এগিয়ে চলে যে, অনেক সময়ে সুখটাকেই ডিঙিয়ে চলে যায় এবং চক্ষের পলকে সমস্ত ফুরিয়ে ফেলে। এই রকম

জমি-জমা আমলা-মামলার মধ্যে কোনো চিঠিকেই যথেষ্ট মনে হয় না— মনে হয় যেন ক্ষুধার যোগ্য অন্ন পাওয়া গেল না। কিন্তু যত বয়স হচ্ছে তত এইটে দেখছি পাওয়াটা নিজের ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। অন্যে কতটা দিতে পারে তা নিয়ে নালিশ-ফরিয়াদি করা ভুল, আমি কতটা নিতে পারি এইটেই হচ্ছে আসল কথা। যা হাতের কাছে আসে তাকেই পুরোপুরি হস্তগত করে নেওয়া, অনেক শিক্ষা সাধনা এবং সংযমের দ্বারা হয়। সে শিক্ষা লাভ করতে জীবনের প্রায় বারো আনা কাল চলে যায়, তার পরে সে শিক্ষার ফলভোগ করবার আর বড়ো সময় পাওয়া যায় না। ইতি সুখতত্ত্ব শাস্ত্রের প্রথম অধ্যায়।

সিমলা
৬ জুলাই ১৮৯৩

১০২

শিলাইদহ
সোমবার। ৩ জুলাই ১৮৯৩।

কাল সমস্ত রাত তীব্র বাতাস পথের কুকুরের মতো হুহু করে কেঁদেছিল— আর, বৃষ্টিও অবিশ্রাম চলছে। মাঠের জল ছোটো ছোটো নির্ঝরের মতো নানা দিক থেকে কল্ কল্ করে নদীতে এসে পড়ছে। চাষারা ওপারের চর থেকে ধান কেটে আনবার জন্যে কেউ বা টোগা মাথায় কেউ বা একখানা কচুপাতা মাথার উপর ধরে ভিজতে ভিজতে খেয়া নৌকোয় পার হচ্ছে— বড়ো বড়ো বোঝাই নৌকোর মাথার উপর মাঝি হাল ধরে বসে বসে ভিজছে, আর মাল্লারা গুণ কাঁধে করে ডাঙার উপর ভিজতে ভিজতে চলেছে। এমন দুর্যোগ তবু পৃথিবীর কাজকর্ম বন্ধ থাকবার জো নেই; পাখিরা বিমর্ষ মনে তাদের নীড়ের মধ্যে বসে আছে, কিন্তু মানুষের ছেলেরা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে। আমার বোটের সামনে দুটি রাখাল-বালক এক পাল গোরু নিয়ে এসে চরাচ্ছে; গোরুগুলি কচর্-মচর্ শব্দ করে এই বর্ষা-সতেজ সরস শ্যামল সিক্ত ঘাসগুলির মধ্যে মুখ ভরে দিয়ে ল্যাজ নেড়ে পিঠের মাছি তাড়াতে তাড়াতে স্নিগ্ধ শান্ত নেত্রে আহার করে করে বেড়াচ্ছে— তাদের পিঠের উপর বৃষ্টি এবং রাখাল-বালকের যষ্টি অবিশ্রাম পড়ছে, দুইই তাদের পক্ষে সমান অকারণ অন্যায় এবং অনাবশ্যক, এবং দু'ই তারা সহিষ্ণুভাবে বিনা-সমালোচনায় সয়ে যাচ্ছে এবং কচর্-মচর্ করে ঘাস খাচ্ছে। এই গোরুগুলির চোখের দৃষ্টি কেমন বিষণ্ণ শান্ত সুগম্ভীর স্নেহময়— মাঝের থেকে মানুষের কর্মের বোঝা এই বড়ো বড়ো জন্তুগুলোর ঘাড়ের উপর কেন পড়ল? নদীর জল প্রতিদিনই বেড়ে উঠছে। পরশু দিন বোটের ছাতের উপর থেকে যতখানি দেখা যেত, আজ বোটের জানলায় বসে প্রায় ততটা দেখা যাচ্ছে— প্রতিদিন সকালে উঠে দেখি তটদৃশ্য অল্প অল্প করে প্রসারিত হয়ে যাচ্ছে। এতদিন সামনে ঐ দূর গ্রামের গাছপালার মাথাটা সবুজ পল্লবের মেঘের মতো দেখা যেত, আজ সমস্ত বনটা আগাগোড়া আমার সম্মুখে এসে উপস্থিত হয়েছে— ডাঙা এবং জল দুই লাজুক প্রণয়ীর মতো অল্প অল্প করে পরস্পরের কাছে অগ্রসর হচ্ছে— লজ্জার সীমা উপচে এল বলে,

প্রায় গলাগলি হয়ে এসেছে। এই ভরা বাদরে ভরা নদীর মধ্য দিয়ে নৌকো করে যেতে বেশ লাগবে -- বাঁধা বোট ছেড়ে দেবার জন্যে মনটা অধীর হয়ে আছে।

সিমলা
৭ জুলাই ১৮৯৩

১০৩

শিলাইদহ
মঙ্গলবার। ৪ জুলাই ১৮৯৩।

আজ সকাল বেলায় অল্প অল্প রৌদ্রের আভাস দিচ্ছে। কাল বিকেল থেকে বৃষ্টি ধরে গেছে, কিন্তু আকাশের ধারে ধারে স্তরে স্তরে এত মেঘ জমে আছে যে বড়ো আশা নেই— ঠিক যেন মেঘের কালো কার্পেটটা সমস্ত আকাশ থেকে গুটিয়ে নিয়ে এক প্রান্তে পাকিয়ে জড়ো করেছে। এখনি একটা ব্যস্তবাগীশ বাতাস এসে আবার সমস্ত আকাশময় বিছিয়ে দিয়ে যাবে, তখন নীলাকাশ এবং সোনালি রৌদ্রের কোনো চিহ্নমাত্র দেখা যাবে না। এবারে এত জলও আকাশে ছিল! আমাদের চরের মধ্যে নদীর জল প্রবেশ করেছে। চাষারা নৌকো বোঝাই করে কাঁচা ধান কেটে নিয়ে আসছে -- আমার বোটের পাশ দিয়ে তাদের নৌকো যাচ্ছে আর ক্রমাগত হাহাকার শুনতে পাচ্ছি। যখন আর চার দিন থাকলে ধান পাকত তখন কাঁচা ধান কেটে আনা চাষার পক্ষে যে কী নিদারুণ তা বেশ বুঝতেই পারছিস। যদি ঐ শিষের মধ্যে দুটো-চারটে ধান একটু শক্ত হয়ে থাকে এই তাদের আশা। প্রকৃতির কার্যপ্রণালীর মধ্যে দয়া জিনিসটা কোনো এক জায়গায় আছে অবিশ্যি, নইলে আমরা পেলুম কোথা থেকে— কিন্তু সেটা যে ঠিক কোন্‌খানে আছে খুঁজে পাওয়া শক্ত। এই শত সহস্র নির্দোষী হতভাগ্যের নালিশ কোনো জায়গায় গিয়ে পোঁচচ্ছে না— বৃষ্টি যেমন পড়বার তেমনি পড়ছে, নদী যেমন বাড়বার তেমনি বাড়ছে, বিশ্বসংসারে এ সম্বন্ধে কারও কাছে কোনো দরবার পাবার জো নেই। মনকে বোঝাতে হয় যে, কিছু বোঝবার জো নেই। কিন্তু এত বুদ্ধিই যদি মানুষকে দেওয়া হল তা হলে জগতে যে দয়া এবং ন্যায়বিচার আছে এটুকু বোঝবার বুদ্ধিও দেওয়া উচিত ছিল, কেননা ওটুকু বোঝা নিতান্ত আবশ্যক। কিন্তু এ-সমস্ত মিথ্যে খুঁতখুঁত মাত্র— কেননা সৃষ্টি কখনোই সুখের হতে পারে না। যতক্ষণ অপূর্ণতা ততক্ষণ অভাব, ততক্ষণ দুঃখ থাকবেই। জগৎ যদি জগৎ না হয়ে ঈশ্বর হত তা হলেই কোথাও কোনো খুঁত থাকত না -- কিন্তু ততটা দূর পর্যন্ত দরবার করতে সাহস হয় না। ভেবে দেখলে সকল কথাই গোড়ায় গিয়ে ঠেকে যে, সৃষ্টি হল কেন। কিন্তু সেটা সম্বন্ধে কোনো আপত্তি যদি না করা যায়, তা হলে জগতে দুঃখ রইল কেন এ নালিশ উত্থাপন করা মিথ্যা। সেইজন্যে বৌদ্ধেরা একেবারে গোড়া ঘেঁষে কোপ মারতে চায়; তারা বলে যতক্ষণ অস্তিত্ব আছে ততক্ষণ দুঃখের সংশোধন হতে পারে না, একেবারে নির্বাণ চাই। খৃস্টানরা বলে দুঃখটা খুব উচ্চ জিনিস, ঈশ্বর স্বয়ং মানুষ হয়ে আমাদের জন্যে দুঃখ বহন করেছেন। তাতে যতটা সান্ত্বনা হয়। কিন্তু নৈতিক দুঃখ এক, আর পাকা ধান ডুবে যাওয়ার দুঃখ আর। আমি বলি যা হয়েছে বেশ হয়েছে;

এই-যে আমি হয়েছি এবং এই আশ্চর্য জগৎ হয়েছে, বড়ো তোফা হয়েছে— এমন জিনিসটা নষ্ট না হলেই ভালো। বুদ্ধদেব তদুত্তরে বলেন, এ জিনিসটা যদি রক্ষা করতে চাও তা হলে দুঃখ সইতে হবে। আমি নরাধম তদুত্তরে বলি, ভালো জিনিস এবং প্রিয় জিনিস রক্ষা করতে যদি দুঃখ সইতেই হয় তা হলে দুঃখ সব— তা, আমি থাকি আর আমার জগৎটি থাকুক। মাঝে মাঝে অন্নবস্ত্রের কষ্ট, মনঃক্ষোভ, নৈরাশ্য বহন করতে হবে; কিন্তু সে দুঃখের চেয়ে যখন অস্তিত্ব ভালোবাসি এবং অস্তিত্বের জন্যই সে দুঃখ বহন করি, তখন তো আর কোনো কথা বলা শোভা পায় না।

সিমলা
৮ জুলাই ১৮৯৩

১০৪

ইছামতী
বৃহস্পতিবার। ৬ জুলাই ১৮৯৩।

কাল সমস্ত দিন বেশ পরিষ্কার ছিল। অনেক দিন পরে মেঘ কেটে নতুন রৌদ্রে দশ দিক উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল; প্রকৃতি যেন স্নানের পর নতুন-ধোওয়া বাসন্তী রঙের কাপড়টি পরে পরিচ্ছন্ন প্রসন্ন প্রফুল্ল মুখে ভিজে চুলটি মৃদুমন্দ বাতাসে শুকোচ্ছিলেন— [তবে] কেবল আমার মনটি ভারী উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ছিল। ঠিক যেন একান্ত কারায় [বদ্ধ] ভাবটা। কিন্তু আজ দিনের কাজকর্মের ভিড়ে সে ভাবটাকে মনের মধ্যে লালন করবার বড়ো বেশি সময় পাওয়া যায় নি। কাজ সেরে বেলা সাড়ে চারটে-পাঁচটার সময় যখন বোট ছেড়ে দিলুম তখন পূর্ব দিকে খুব একটা গাঢ় মেঘ উঠল। ক্রমশ একটু বাতাস এবং বৃষ্টিও যে হয় নি তা নয়। সেই শাখা-নদীটার ভিতরে যখন ঢুকলুম বৃষ্টি ধরে গেল। জলে চর ভেসে গেছে— মানুষ-প্রমাণ লম্বা ঘাস এবং ঝাউবনের ভিতর দিয়ে সর্ সর্ শব্দে গুণ টেনে বোট চলতে লাগল। খানিক দূরে গিয়ে অনুকূল বাতাস পাওয়া গেল। পাল তুলে দিতে বললুম; পাল তুলে দিলে। দু দিকে ঢেউ কেটে কল্ কল্ শব্দ তুলে বোট সগর্বে চলে যেতে লাগল। আমি বাইরে চৌকি নিয়ে বসলুম। সেই নিবিড় নীলমেঘের অন্তরালে অর্ধনিমগ্ন জনশূন্য চর এবং পরিপূর্ণ দিগন্তপ্রসারিত নদীর মধ্যে সূর্যাস্ত যে কী চমৎকার সে আমি বর্ণনা করতে চেষ্টা করব না। বিশেষত আকাশের অতি দূর প্রান্তে পদ্মার জলরেখার ঠিক উপরেই মেঘের যেখানে ফাঁক পড়েছে সেখানটা এমনি অতিমাত্রায় সূক্ষ্মতম সোনালিতম সুদূরতম হয়ে দেখা দিয়েছিল, সেই স্বর্ণপটের উপর সারি সারি লম্বা কৃশ গাছগুলির মাথা এমনি সুকোমল সুনীল রেখায় অঙ্কিত হয়েছিল— প্রকৃতি সেখানে যেন আপনার চরম পরিণতিতে পৌঁছে একটা কল্পলোকের মধ্যে শেষ হয়ে গেছে। মাঝি জিজ্ঞাসা করলে, 'চরের কাছারি-ঘাটে রাখব কি?' আমি বললুম, 'না, পদ্মা পেরিয়ে চল্।' মাঝি পাড়ি দিলে— বাতাস বেগে বইতে লাগল, পদ্মা নৃত্য করতে লাগল, পাল ফুলে উঠল, দিনের আলো মিলিয়ে এল, আকাশের ধারের মেঘগুলি ক্রমে আকাশের

মাঝখানে ঘনঘটা করে জমে গেল, চার দিকে পদ্মার উদ্দাম চঞ্চল জল করতালি দিচ্ছে— সম্মুখে দূরে নীল মেঘস্তূপের নিচে পদ্মাতটের নীল বনরেখা দেখা যাচ্ছে —নদীর মাঝখানে আমাদের বোট ছাড়া আর একটিও নৌকো নেই— তীরের কাছে দুই-একটা জেলেডিঙি ছোটো ছোটো পাল উড়িয়ে গৃহমুখে চলেছে— আমি যেন প্রকৃতির রাজার মতো বসে আছি আর আমাকে তার দুরন্ত ফেনিলমুখ রাজ-অশ্ব সনৃত্য গতিতে বহন করে নিয়ে চলেছে।

সিমলা
১১ জুলাই ১৮৯৩

১০৫

সাজাদপুর
৭ জুলাই। ১৮৯৩।

ছোটোখাটো গ্রাম, ভাঙাচোরা ঘাট, টিনের-ছাত-ওয়ালা বাজার, বাখারির-বেড়া-দেওয়া গোলাঘর, বাঁশঝাড়, আম কাঁঠাল কুল খেজুর শিমুল কলা আকন্দ ভেরেণ্ডা ওল কচু লতাগুল্ম তৃণের সমষ্টি-বদ্ধ ঝোপঝাড় জঙ্গল, ঘাটে-বাঁধা মাস্তুল-তোলা বৃহদাকার নৌকোর দল, নিমগ্নপ্রায় ধান এবং অর্ধমগ্ন পাটের ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে ক্রমাগত এঁকে বেঁকে কাল সন্ধের সময় সাজাদপুরে এসে পৌঁচেছি। এখন কিছুদিনের মতো এইখানেই স্থায়ী হওয়া গেল। অনেক দিন বোটে থাকার পর সাজাদপুরের বাড়িটা বেশ লাগে ভালো— একটা যেন নূতন স্বাধীনতা পাওয়া যায়— যতটা খুশি নড়বার চড়বার এবং শরীর প্রসারণ করবার জায়গা পাওয়া মানুষের মানসিক সুখের যে একটা প্রধান অঙ্গ সেটা হঠাৎ আবিষ্কার করা যায়। আজ প্রাতে মাঝে মাঝে বেশ একটুখানি রৌদ্র দেখা দিচ্ছে, বাতাসটি চঞ্চল বেগে বচ্ছে, ঝাউ এবং লিচু গাছ ক্রমাগত সর্‌সর্‌ মর্‌মর্‌ করে দুলছে, নানা জাতির পাখি নানা ভাষা নানা সুরে ডেকে ডেকে প্রাতঃকালের আরণ্য মজলিস সর্‌গরম্‌ করে তুলেছে— আমি আমাদের দোতলার এই সঙ্গীহীন প্রশস্ত নির্জন আলোকিত উন্মুক্ত ঘরের মধ্যে বসে জানলা থেকে খালের উপরকার নৌকাশ্রেণী, ও পারের তরুমধ্যগত গ্রাম, এবং এ পারের অনতিদূরবর্তী লোকালয়ের মৃদুকর্মপ্রবাহ নিরীক্ষণ করে বেশ একটুখানি মনের আনন্দে আছি। পাড়াগাঁয়ের কর্মস্রোত খুব বেশি তীব্রও নয়, অথচ নিতান্ত নিশ্চেষ্ট নির্জীবও নয়। কাজ এবং বিশ্রাম দুই যেন পাশাপাশি মিলিত হয়ে হাত ধরাধরি করে চলেছে। খেয়ানৌকো পারাপার করছে, পান্থরা ছাতা হাতে করে খালের ধারের রাস্তা দিয়ে চলেছে, মেয়েরা ধুচুনি ডুবিয়ে চাল ধুচ্ছে, চাষারা আঁটিবাঁধা পাট মাথায় করে হাটে আসছে— দুটো লোক একটা গাছের গুঁড়ি মাটিতে ফেলে কুড়ুল নিয়ে ঠক্‌ ঠক্‌ শব্দে কাঠ চেলা করছে, একটা ছুতোর অশথ গাছের তলায় জেলেডিঙি উলটে ফেলে বাটালি হাতে মেরামত করছে, গ্রামের কুকুরটা খালের ধারে ধারে উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে, গুটিকতক গোরু বর্ষার ঘাস অপর্যাপ্ত পরিমাণে আহার-পূর্বক অলসভাবে রৌদ্রে মাটির উপর পড়ে কান এবং লেজ নেড়ে মাছি তাড়াচ্ছে এবং কাক এসে তাদের মেরুদণ্ডের উপর বসে যখন বড়ো বেশি বিরক্ত করছে তখন একবার পিঠের দিকে

মাথাটা নেড়ে আপত্তি জানাচ্ছে। এখানকার এই দুই-একটা একঘেয়ে ঠক্‌ঠক্‌ ঠুক্‌ঠাক্‌ শব্দ, উলঙ্গ ছেলেমেয়েদের খেলার কল্লোল, রাখালের করুণ উচ্চস্বরে গান, দাঁড়ের ঝুপ্‌ঝাপ ধ্বনি, কলুর ঘানির তীক্ষ্ণকাতর নিখাদ স্বর, সমস্ত কর্ম-কোলাহল একত্র মিলে এই পাখির ডাক এবং পাতার শব্দের সঙ্গে কিছুমাত্র অসামঞ্জস্য হচ্ছে না—সমস্তটাই যেন একটা শান্তিময় স্বপ্নময় করুণা-মাখা একটা বড়ো সোনাটার অন্তর্গত, কতকটা সোপ্যাঁর ধাঁচায়, কিন্তু খুব একটা বিস্তৃত বৃহৎ অথচ সংযত মাত্রায় বাঁধা। আমার মাথার মধ্যে সূর্যের আলোক এবং এই-সমস্ত শব্দ একেবারে যেন কানায় কানায় ভরে এসেছে অতএব... চিঠি বন্ধ করে খানিকক্ষণ পড়ে থাকা যাক।

সিমলা
১১ জুলাই ১৮৯৩

১০৬

সাজাদপুর
১০ জুলাই। ১৮৯৩।

আমার গানগুলো পেয়েছিস। ‘বড়ো বেদনার মতো’ গানের সুরটা ঠিক হয়তো মজলিসি বৈঠকি নয়।... এ-সব গান যেন একটু নিরালায় গাবার মতো। সুরটা যে মন্দ হয়েছে এমন আমার বিশ্বাস নয়, এমন-কি ভালো হয়েছে বললে খুব বেশি অত্যুক্তি হয় না। ও গানটা আমি নাবার ঘরে অনেক দিন একটু একটু করে সুরের সঙ্গে সঙ্গে তৈরি করেছিলুম—নাবার ঘরে গান তৈরি করবার ভারী কতকগুলি সুবিধা আছে। প্রথমত নিরালা, দ্বিতীয়ত অন্য কোনো কর্তব্যের কোনো দাবি থাকে না—মাথায় এক-টিন জল ঢেলে পাঁচ মিনিট গুন্‌ গুন্‌ করলে কর্তব্যজ্ঞানে বিশেষ আঘাত লাগে না—সব চেয়ে সুবিধা হচ্ছে কোনো দর্শক-সম্ভাবনা-মাত্র না থাকাতে সমস্ত মন খুলে মুখভঙ্গী করা যায়। মুখভঙ্গী না করলে গান তৈরি করবার পুরো অবস্থা কিছুতেই আসে না। ওটা কিনা ঠিক যুক্তি-তর্কের কাজ নয়, নিছক ক্ষিপ্তভাব। এ গানটা আমি এখনও সর্বদা গেয়ে থাকি—আজ প্রাতঃকালেও অনেক ক্ষণ গুন্‌গুন্‌ করেছি, গাইতে গাইতে গভীর একটা ভাবোন্মাদও জন্মায়। অতএব এটা যে আমার একটা প্রিয় গান সে বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই।... এখানে আমি একলা খুব মুগ্ধ এবং তদ্গত চিত্তে অর্ধ-নিমীলিত নেত্রে গেয়ে থাকি, এবং জীবন ও পৃথিবীটা একটি সূর্যকরোজ্জ্বল অতি সূক্ষ্ম অশ্রুবাষ্পে আবৃত হয়ে সাতরঙা ইন্দ্রধনুরেখায় রঞ্জিত হয়ে দেখা দেয়—প্রতিদিনের সত্যকে চিরদিনের সৌন্দর্যের মধ্যে তর্জমা করে দেওয়া যায়, দুঃখকষ্টও আভাময় হয়ে ওঠে। অনতিবিলম্বেই খাজাঞ্চি দুইটা আন্ডা, এক ছটাক মাখন, এক পোয়া ঘি ও ছয় পয়সার সর্ষপ তৈলের হিসাব এনে উপস্থিত করে। আমার এখানকার ইতিহাস এই রকম।...

সিমলা
১৪ জুলাই ১৮৯৩

১০৭

সাজাদপুর
৩০ আষাঢ়। ১৩০০।

আজকাল কবিতা লেখাটা আমার পক্ষে যেন একটা গোপন নিষিদ্ধ সুখসম্ভোগের মতো হয়ে পড়েছে— এ দিকে আগামী মাসের সাধনার জন্যে একটি লাইন লেখা হয় নি, ও দিকে মধ্যে মধ্যে সম্পাদকের তাড়া আসছে, অনতিদূরে আশ্বিন-কার্তিকের যুগল সাধনা রিক্তহস্তে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ভর্ৎসনা করছে, আর আমি আমার কবিতার অন্তঃপুরে পালিয়ে পালিয়ে আশ্রয় নিচ্ছি। রোজ মনে করি আজ একটা দিন বৈ তো নয়— এমনি করে কত দিন কেটে গেল। আমি বাস্তবিক ভেবে পাই নে কোন্‌টা আমার আসল কাজ। এক-এক সময় মনে হয় আমি ছোটো ছোটো গল্প অনেক লিখতে পারি এবং মন্দ লিখতে পারি নে— লেখবার সময় সুখও পাওয়া যায়। এক-এক সময় মনে হয়— আমার মাথায় এমন অনেকগুলো ভাবের উদয় হয় যা ঠিক কবিতায় ব্যক্ত করবার যোগ্য নয়, সেগুলো ডায়ারি প্রভৃতি নানা আকারে প্রকাশ করে রেখে দেওয়া ভালো, বোধ হয় তাতে ফলও আছে আনন্দও আছে। এক-এক সময় সামাজিক বিষয় নিয়ে আমাদের দেশের লোকের সঙ্গে ঝগড়া করা খুব দরকার, যখন আর কেউ করছে না তখন তো কাজেই আমাকে এই অপ্রিয় কর্তব্যটা গ্রহণ করতে হয়। আবার এক-এক সময় মনে হয়, দূর হোক গে ছাই, পৃথিবী আপনার চরকায় আপনি তেল দেবে এখন— মিল করে ছন্দ গেঁথে ছোটো ছোটো কবিতা লেখাটা আমার বেশ আসে, সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে আপনার মনে আপনার কোণে সেই কাজই করা যাক। মদগর্বিতা যুবতী যেমন তার অনেকগুলি প্রণয়ীকে নিয়ে কোনোটিকেই হাতছাড়া করতে চায় না, আমার কতকটা যেন সেই দশা হয়েছে। মিউজদের মধ্যে আমি কোনোটিকেই নিরাশ করতে চাই নে— কিন্তু তাতে কাজ অত্যন্ত বেড়ে যায় এবং হয়তো 'দীর্ঘ দৌড়ে' কোনোটিই পরিপূর্ণভাবে আমার আয়ত্ত হয় না। সাহিত্য-বিভাগেও কর্তব্যবুদ্ধির অধিকার আছে, কিন্তু অন্য বিভাগের কর্তব্যবুদ্ধির সঙ্গে তার একটু প্রভেদ আছে। কোন্‌টাতে পৃথিবীর সব চেয়ে উপকার হবে সাহিত্য-কর্তব্যজ্ঞানে সে কথা ভাববার দরকার নেই, কিন্তু কোন্‌টা আমি সব চেয়ে ভালো করতে পারি সেইটেই হচ্ছে বিচার্য। বোধ হয় জীবনের সকল বিভাগেই তাই। আমার বুদ্ধিতে যতটা আসে তাতে তো বোধ হয় কবিতাতেই আমার সকলের চেয়ে বেশি অধিকার। কিন্তু আমার ক্ষুধানল বিশ্বরাজ্য ও মনোরাজ্যের সর্বত্রই আপনার জ্বলন্ত শিখা প্রসারিত করতে চায়। যখন গান তৈরি করতে আরম্ভ করি তখন মনে হয় এই কাজেই যদি লেগে থাকা যায় তা হলে তো মন্দ হয় না। আবার যখন একটা কিছু অভিনয়ে প্রবৃত্ত হওয়া যায় তখন এমনি নেশা চেপে যায় যে মনে হয় যে, চাই-কি, এটাতেও একজন মানুষ আপনার জীবন নিয়োগ করতে পারে। আবার যখন 'বাল্যবিবাহ' কিম্বা 'শিক্ষার হেরফের' নিয়ে পড়া যায় তখন মনে হয় এই হচ্ছে জীবনের সর্বোচ্চ কাজ। কী মুশকিলেই পড়েছি [বব]! আবার লজ্জার মাথা খেয়ে সত্যি কথা যদি বলতে হয় তো এটা স্বীকার করতে হয় যে, ঐ-যে চিত্রবিদ্যা বলে একটা বিদ্যা আছে তার প্রতিও আমি সর্বদা হতাশ প্রণয়ের লুব্ধ দৃষ্টিপাত করে থাকি— কিন্তু আর পাবার আশা নেই, সাধনা করবার

বয়স চলে গেছে। অন্যান্য বিদ্যার মতো তাঁকে তো সহজে পাবার জো নেই—তাঁর একেবারে ধনুক-ভাঙা পণ; তুলি টেনে টেনে একেবারে হয়রান না হলে তাঁর প্রসন্নতা লাভ করা যায় না। আমার অবস্থাটা দ্রৌপদীর মতো হয়েছে—তিনি মনে করেছিলেন যে, আহা, সেই যদি আমার পাঁচটি স্বামীই হল তবে ঐ কর্ণকে-সুদ্ধ নিয়ে ছটি হলেই দিব্যি হত। আমার বিশ্বাস যদি কর্ণকেও পেতেন তা হলে দুর্যোধন-দুঃশাসনকেও হাতছাড়া করতে ইচ্ছে হত না। কারণ, হয় এক, নয় অসংখ্য—এর মাঝখানে আর কোথাও বেশ স্বাভাবিক বিরামের স্থান নেই। পাঁচ বললে ছয় আপনি এগিয়ে আসে এবং ছয়ের পরে সাত আট নয় দশ প্রভৃতি সমস্ত সংখ্যাগুলি সার বেঁধে অনিমেষ লোচনে মুখের দিকে [চেয়ে] অপেক্ষা করে থাকে। অতএব একলা কবিতাটিকে নিয়ে থাকাই আমার পক্ষে সব চেয়ে সুবিধে—বোধ হয় যেন উনিই আমাকে সব চেয়ে বেশি ধরা দিয়েছেন—আমার ছেলেবেলাকার ভালোবাসা, আমার বহুকালের অনুরাগিণী সঙ্গিনী।...

তুই যে নীরব কবি সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিস সে সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, সরব এবং নীরবের মধ্যে অনুভূতির পরিমাণ সমান থাকতে পারে, কিন্তু আসল কবিত্ব জিনিসটি স্বতন্ত্র। কেবল ভাষার ক্ষমতা বলে নয়, গঠন করবার শক্তি। একটা অলক্ষিত অচেতন নৈপুণ্যবলে ভাবগুলি কবির হাতে বিচিত্র আকার ধারণ করে। সেই সৃজনক্ষমতাই কবিত্বের মূল। ভাষা ভাব এবং অনুভাব তার সরঞ্জাম মাত্র। কারও বা ভাষা আছে, কারও বা অনুভাব আছে, কারও বা ভাষা এবং অনুভাব দুই আছে, কিন্তু আর-একটি ব্যক্তি আছে যার ভাষা অনুভাব এবং সৃজনী শক্তি আছে—এই শেষোক্ত লোকটিকে কবি নাম দেওয়া যেতে পারে। প্রথমোক্ত তিনটি লোক নীরবও হতে পারেন সরবও হতে পারেন, কিন্তু তাঁরা কবি নন। তাঁদের মধ্যে কাউকে কাউকে ভাবুক বললেই ঠিক বিশেষণটা প্রয়োগ করা হয়। তাঁরাও জগতে অত্যন্ত দুর্লভ এবং কবির তৃষিত চিত্ত সর্বদাই তাঁদের জন্যে ব্যাকুল হয়ে আছে।

উপরের এই ভূমিকার পরে আমার সেই 'জাল ফেলা' কবিতাটার ব্যাখ্যা একটু সহজ হবে। সেটার মানে তুই জিজ্ঞাসা করেছিস। লেখাটা চোখের সামনে থাকলে তার মানে নিজে একটু ভালো করে বুঝে বোঝাবার চেষ্টা করতে পারতুম—তবু একটা ঝাপসা রকমের ভাব মনে আছে। মনে কর্‌ একজন ব্যক্তি তার জীবনের প্রভাতকালে সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সূর্যোদয় দেখছিল—সে সমুদ্রটা তার আপনার মন কিম্বা ঐ বাহিরের বিশ্ব কিম্বা উভয়ের সীমানা-মধ্যবর্তী একটি ভাবের পারাবার, সে কথা স্পষ্ট করে বলা হয় নি। যাই হোক, সেই অপূর্ব সৌন্দর্যময় অগাধ সমুদ্রের দিকে চেয়ে চেয়ে লোকটার মনে হল এই রহস্যপাথারের মধ্যে জাল ফেলে দেখা যাক-না কী পাওয়া যায়। এই বলে তো সে ঘুরিয়ে জাল ফেললে। নানা রকমের অপরূপ জিনিস উঠতে লাগল— কোনোটা বা হাসির মতো শুভ্র, কোনোটা বা অশ্রুর মতো উজ্জ্বল, কোনোটা বা লজ্জার মতো রাঙা। মনের উৎসাহে সে সমস্ত দিন ধরে ঐ কাজই কেবল করলে—গভীর তলদেশে যে-সকল সুন্দর রহস্য ছিল সেইগুলিকে তীরে এনে রাশীকৃত করে তুললে। এমনি করে জীবনের সমস্ত দিনটি যাপন করলে। সন্ধ্যার সময় মনে করলে এবারকার মতো তো যথেষ্ট হয়েছে, এখন এইগুলি নিয়ে তাকে দিয়ে আসা যাক্‌গে। কাকে যে, সে কথাটা স্পষ্ট করে বলা হয় নি—হয়তো তার প্রেয়সীকে, হয়তো তার স্বদেশকে। কিন্তু সে তো এ-সমস্ত অপূর্ব জিনিস কখনও দেখে নি। সে

ভাবলে এগুলো কী, এর আবশ্যকই বা কী, এতে কী অভাব দূর হবে, দোকানদারের কাছে যাচিয়ে দেখলে এর কতই বা মূল্য হতে পারবে? এক কথায়, এ বিজ্ঞান দর্শন ইতিহাস ভূগোল অর্থনীতি সমাজনীতি ধর্মনীতি তত্ত্বজ্ঞান প্রভৃতি কিছুই নয়—এ কেবল কতকগুলো রঙিন ভাব মাত্র, তারও যে কোন্‌টার কী নাম কী বিবরণ তাও ভালো পরিচয় পাওয়া যায় না। ফলত সমস্ত দিনের জাল-ফেলা অগাধ সমুদ্রের এই রত্নগুলি যাকে দেওয়া গেল সে বললে, এ আবার কী? জেলেরও মনে তখন অনুতাপ হল, 'সত্যি বটে, এ তো বিশেষ কিছু নয়, আমি কেবল জাল ফেলেছি আর তুলেছি—আমি তো হাটেও যাই নি পয়সা কড়িও খরচ করি নি, এর জন্যে তো আমাকে কাউকে এক পয়সা খাজনা কিম্বা মাশুল্ দিতে হয় নি!' সে তখন কিঞ্চিৎ বিষণ্নমুখে লজ্জিতভাবে সেগুলো কুড়িয়ে নিয়ে ঘরের দ্বারে বসে বসে একে একে রাস্তায় ফেলে দিলে। তার পরদিন সকালবেলায় পথিকরা এসে সেই বহুমূল্য জিনিসগুলি দেশে বিদেশে আপন আপন ঘরে নিয়ে গেল। বোধ হচ্ছে এই কবিতাটি যিনি লিখেছেন তিনি মনে করছেন, তাঁর গৃহকার্যনিরতা অন্তঃপুরবাসিনী জন্মভূমি, তাঁর সমসাময়িক পাঠকমণ্ডলী, তাঁর কবিতাগুলির ঠিক ভাবগ্রহণ করতে পারছে না—তার যে কতখানি মূল্য সে তাদের জ্ঞানগোচর নয়—অতএব এখনকার মতো এ-সমস্ত পথেই ফেলে দেওয়া যাচ্ছে, 'তোমরাও অবহেলা করো আমিও অবহেলা করি', কিন্তু এ রাত্রি যখন পোহাবে তখন 'পস্টারিটি' এসে এগুলি কুড়িয়ে নিয়ে দেশে বিদেশে চলে যাবে। কিন্তু তাতে ঐ জেলে লোকটার মনের আক্ষেপ কি মিটবে! যাই হোক, 'পস্টারিটি' যে অভিসারিণী রমণীর মতো দীর্ঘরাত্রি ধরে ধীরে ধীরে কবির দিকে অগ্রসর হচ্ছে এবং হয়তো নিশিশেষে এসে উপস্থিত হতেও পারে এ সুখকল্পনাটুকু কবিকে ভোগ করতে দিতে কারও বোধ হয় আপত্তি না হতেও পারে।

সেই মন্দিরের কবিতার ঠিক অর্থটা কী ভালো মনে পড়ছে না। বোধ হয় সেটা সত্যিকার মন্দির সম্বন্ধে। অর্থাৎ, যখন কোণে বসে বসে কতকগুলো কৃত্রিম কল্পনার দ্বারা আপনার দেবতাকে আচ্ছন্ন করে নিজের মনটাকেও একটা অস্বাভাবিক সুতীব্র অবস্থায় নিয়ে যাওয়া গেছে এমন সময় যদি হঠাৎ একটা সংশয়বজ্র পড়ে সেই-সমস্ত সুদীর্ঘকালের কৃত্রিম প্রাচীর ভেঙে যায়, তখন হঠাৎ প্রকৃতির শোভা, সূর্যের আলোক এবং বিশ্বজনের কল্লোলগান এসে আমার তন্ত্রমন্ত্র ধূপধুনার স্থান অধিকার করে এবং তখন দেখতে পাই সেই যথার্থ আরাধনা এবং তাতেই দেবতার তুষ্টি। বোধ হয় উড়িষ্যার মন্দিরগুলো দেখে দেখে আমার এই রকম একটা ভাব মনে এসে থাকবে। ভুবনেশ্বরের একটা মন্দিরের ভিতরে যেখানে দেবতা সেখানে ভয়ানক অন্ধকার, বন্ধ, ধূপের গন্ধে নিশ্বাসরোধ হয়—ঠাকুরের অভিষেক-জলে মেজে স্যাঁতসেঁতে, বাদুড় চামচিকে উড়ছে, সেখান থেকে বাইরের সুন্দর আলোতে হঠাৎ আসবামাত্র দেবতা যে কোন্‌খানে আছেন টের পাওয়া যায়।

সিমলা
১৭ জুলাই ১৮৯৩

১০৮

পতিসর
১১ অগস্ট্। ১৮৯৩।

অনেকগুলো বড়ো বড়ো বিলের মধ্যে দিয়ে আসতে হয়েছে। এই বিলগুলো ভারী অদ্ভুত—কোনো আকার আয়তন নেই, জলে স্থলে একাকার—পৃথিবী সমুদ্রগর্ভ থেকে নতুন জেগে ওঠবার সময় যেমন ছিল। কোথাও কিছু কিনারা নেই—খানিকটা জল, খানিকটা মগ্নপ্রায় ধান-ক্ষেতের মাথা, খানিকটা শেওলা এবং জলজ উদ্ভিদ ভাসছে—পানকৌড়ি সাঁতার দিচ্ছে, জাল ফেলবার জন্যে বড়ো বড়ো বাঁশ পোঁতা, তারই উপর কটা রঙের বড়ো বড়ো চিল বসে আছে—ভারী একাকার একঘেয়ে রকমের দৃশ্য। দ্বীপের মতো অতি দূরে গ্রামের রেখা দেখা যাচ্ছে—যেতে যেতে হঠাৎ আবার খানিকটা নদী, দু ধারে গ্রাম, পাটের ক্ষেত এবং বাঁশের ঝাড়, আবার কখন্ যে সেটা বিস্তৃত বিলের মধ্যে মিলিয়ে যাচ্ছে বোঝবার জো নেই।...

ঠিক সূর্যাস্তের কাছাকাছি সময় যখন একটি গ্রাম পেরিয়ে আসছিলুম, একটা লম্বা নৌকোয় অনেকগুলো ছোকরা ঝপ্ ঝপ্ করে দাঁড় ফেলছিল এবং সেই তালে গান গাচ্ছিল—

'যোবতী, ক্যান্ বা কর মন ভারী?
পাবনা থাক্যে আন্যে দেব টাকা দামের মোটরি।'

স্থানীয় কবিটি যে ভাব অবলম্বন করে সংগীত রচনা করেছেন—আমরাও ও ভাবের ঢের লিখেছি, কিন্তু কিছু ইতর-বিশেষ আছে। আমাদের যুবতী মন ভারী করলে তৎক্ষণাৎ জীবনটা দিতে কিম্বা নন্দনকানন থেকে পারিজাত এনে দিতে প্রস্তুত হই, কিন্তু এ অঞ্চলের লোক খুব সুখে আছে বলতে হবে—অল্প ত্যাগস্বীকারেই যুবতীর মন পায়। মোটরি জিনিসটি কী তা বলা আমার সাধ্য নয়, কিন্তু তার দামটাও নাকি পার্শ্বেই উল্লেখ করা আছে—তাতেই বোঝা যাচ্ছে খুব বেশি দুর্মূল্য নয় এবং নিতান্ত অগম্য স্থান থেকেও আনতে হয় না। গানটা শুনে বেশ মজার লাগল। যুবতীর মন ভারী হলে জগতে যে আন্দোলন উপস্থিত হয়, এই বিলের প্রান্তেও তার একটা সংবাদ পাওয়া গেল। এ গানটি কেবল অস্থানেই হাস্যজনক, কিন্তু দেশকালপাত্র-বিশেষে এর যথেষ্ট সৌন্দর্য আছে। আমার অজ্ঞাতনামা গ্রাম্য কবিভ্রাতার রচনাগুলিও এই গ্রামের লোকের সুখদুঃখের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক, আমার গানগুলি সেখানে কম হাস্যজনক নয়।

সিমলা
১৫ অগস্ট্ ১৮৯৩

১০৯

পতিসর
১৩ অগস্ট্। ১৮৯৩।

এবারে এই বিলের পথ দিয়ে কালীগ্রামে আসতে আসতে আমার মাথায় একটি ভাব বেশ পরিষ্কাররূপে ফুটে উঠেছে। কথাটা নতুন নয়, অনেক দিন থেকে জানি, কিন্তু তবু এক-একবার পুরোনো কথাও নতুন করে অনুভব করা যায়। দুই দিকে দুই তীর দিয়ে সীমাবদ্ধ না থাকলে জলস্রোতের তেমন শোভা থাকে না— অনির্দিষ্ট অনিয়ন্ত্রিত বিল একঘেয়ে শোভাশূন্য। ভাষার পক্ষে ছন্দের বাঁধন ঐ তীরের কাজ করে। ভাষাকে একটি বিশেষ আকার এবং বিশেষ শোভা দেয়; তার একটি সুন্দর চেহারা ফুটে ওঠে। তীরবদ্ধ নদীগুলির যেমন একটি বিশেষ ব্যক্তিত্ব আছে, তাদের যেমন এক-একটি স্বতন্ত্র লোকের মতো মনে হয়, ছন্দের দ্বারা কবিতা সেইরূপ এক-একটি মূর্তিমান অস্তিত্বের মতো দাঁড়িয়ে যায়। গদ্যের সেইরকম সুন্দর সুনির্দিষ্ট স্বাতন্ত্র্য নেই; সে একটা বৃহৎ বিশেষত্ববিহীন বিলের মতো। আবার তটের দ্বারা আবদ্ধ হওয়াতেই নদীর মধ্যে একটা বেগ আছে, একটা গতি আছে, কিন্তু প্রবাহহীন বিল কেবল বিস্তৃতভাবে দিগ্‌বিদিক গ্রাস করে পড়ে আছে। ভাষার মধ্যেও যদি একটা আবেগ একটা গতি দেবার আবশ্যক হয় তবে তাকে ছন্দের সংকীর্ণতার মধ্যে বেঁধে দিতে হয়; নইলে সে কেবল ব্যাপ্ত হয়ে পড়ে, কিন্তু সমস্ত বল নিয়ে এক দিকে ধাবিত হতে পারে না। বিলের জলকে পল্লিগ্রামের লোকেরা বলে বোবা জল— তার কোনো ভাষা নেই, আত্মপ্রকাশ নেই। তটবদ্ধ নদীর মধ্যে সর্বদা একটা কলধ্বনি শোনা যায়; ছন্দের মধ্যে বেঁধে দিলে কথাগুলোও সেইরকম পরস্পরের প্রতি আঘাত সংঘাত করে একটা সংগীতের সৃষ্টি করতে থাকে। সেইজন্যে ছন্দের ভাষা বোবা ভাষা নয়, তার মুখে সর্বদাই কলগান। বাঁধনের মধ্যে থাকাতেই গতির সৌন্দর্য, ধ্বনির সৌন্দর্য এবং আকারের সৌন্দর্য। বাঁধনের মধ্যে থাকাতে যেমন সৌন্দর্য তেমনি শক্তি। কবিতা যে স্বভাবতই ধীরে ধীরে একটি ছন্দের মধ্যে ধরা দিয়ে আপনাকে পরিস্ফুট করে তুলেছে, ওটা একটা কৃত্রিম-অভ্যাস-জাত সুখ দেবার জন্যে নয়— ওর একটি গভীর স্বাভাবিক সুখ আছে। অনেক মূর্খ মনে করে কবিতার ছন্দোবন্ধ কেবল একটা বাহাদুরি করা, ওতে কেবল সাধারণ লোকের বিস্ময় উৎপাদন করে সুখ দেয়— ও কেবল ভাষার ব্যায়াম মাত্র। কিন্তু সে ভারী ভুল। কবিতার ছন্দ যে নিয়মে উৎপন্ন হয়েছে বিশ্বজগতের সমস্ত সৌন্দর্যই সেই নিয়মে সৃষ্ট হয়েছে। একটি সুনির্দিষ্ট বন্ধনের মধ্যে দিয়ে বেগে প্রবাহিত হয়ে মনের মধ্যে আঘাত করে বলেই সৌন্দর্যের এমন অনিবার্য শক্তি। আর, সুষমার বন্ধন ছাড়িয়ে গেলেই সব একাকার হয়ে যায়, তার আর আঘাত করবার শক্তি থাকে না। বিল ছাড়িয়ে যেমনি নদীতে এবং নদী ছাড়িয়ে যেমনি বিলে গিয়ে পড়ছিলুম অমনি আমার মনে এই তথ্যটি দেদীপ্যমান হয়ে জেগে উঠছিল।

সিমলা
১৭ অগস্ট্ ১৮৯৩

১১০

পতিসর
২৬ শ্রাবণ?
।১৩০০।

শ্রাবণ মাসের ডায়ারিটা তুই ভালো বুঝতে পারিস নি [বব]? বোঝাতে গেলে একখানা গ্রন্থবিশেষ লিখতে হয়।...আমি অনেক দিন থেকে ভেবে দেখেছি পুরুষরা কিছু খাপছাড়া আর মেয়েরা বেশ সুসম্পূর্ণ। মেয়েদের কথাবার্তা বেশভূষা চালচলন আচারব্যবহার এবং জীবনের কর্তব্যের মধ্যে একটি অখণ্ড সামঞ্জস্য আছে। সমস্তটি যেন একটি অর্গ্যানিক হোল। তার প্রধান কারণ হচ্ছে যুগ যুগান্তর থেকে প্রকৃতি তাদের কর্তব্য নিজে নির্দিষ্ট করে দিয়ে তাদের আগাগোড়া সেই ভাবে সেই উদ্দেশ্যে গঠিত করে দিয়েছে—এ পর্যন্ত কোনো পরিবর্তন, কোনো রাষ্ট্রবিপ্লব, সভ্যতার কোনো ভাঙন-গড়নে তাদের সেই ঐক্য থেকে বিক্ষিপ্ত করে দেয় নি; তারা বরাবর সেবা করেছে, ভালোবেসেছে, আদর করেছে, আর কিছু করে নি। তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ভাষায়-ভঙ্গীতে সেই কাজের নৈপুণ্য এবং সৌন্দর্য যেন মিশে এক হয়ে গেছে। তাদের স্বভাব এবং তাদের কাজ যেন পুষ্প এবং পুষ্পের গন্ধের মতো সম্মিলিত হয়ে গেছে, তাদের মধ্যে সেইজন্যে কোনো দ্বিধা কোনো ইতস্তত নেই। পুরুষের চরিত্রের মধ্যে বিস্তর উঁচুনিচু; তারা যে নানা কার্য নানা শক্তি নানা পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে তৈরি হয়ে এসেছে, তার অঙ্গে এবং স্বভাবে তার যেন চিহ্ন রয়ে গেছে। কোথাও কিছু নেই কপালটা হয়তো বৃহৎ উঁচু হয়ে উঠল, মাঝের থেকে হয়তো নাকটা এমনি ঠেলে উঠল যে তাকে কার সাধ্য দাবিয়ে রাখে—চোয়াল দুটো হয়তো সৌষম্যের কোনো নিয়ম মানলে না। যদি চিরকাল পুরুষ এক ভাবে চালিত, এক কার্যে শিক্ষিত হয়ে আসত, তা হলে তাদেরও মুখে এবং স্বভাবে একটা সামঞ্জস্য দাঁড়িয়ে যেত—একটা ছাঁচ বহুকাল থেকে তৈরি হয়ে যেত—তা হলে তাদের আর বল প্রকাশ করে বহু চিন্তা করে কাজ করতে হত না। সকল কাজ সুন্দরভাবে সহজে সম্পন্ন হত—তা হলে তাদের একটা সহজ নীতিও দাঁড়িয়ে যেত। অর্থাৎ, বহু যুগ থেকে অবিচ্ছেদে যে কাজ করে আসছে সেই কাজের কাছে তার মন বশ মানত, সেই বহু যুগের অভ্যস্ত কর্তব্য থেকে কোনো সামান্য শক্তি তাদের বিক্ষিপ্ত করতে পারত না। স্ত্রীলোককে প্রকৃতি মা করে দিয়ে তাকে একেবারে ছাঁচে ঢালাই করে ফেলেছে। পুরুষের সে-রকম কোনো স্বাভাবিক আদিম বন্ধন নেই, সেইজন্যে একটি ধ্রুবকেন্দ্র-আশ্রয়ে পুরুষ সর্বতোভাবে তৈরি হয়ে যায় নি। সে চিরকাল ধরে কেবলই বিক্ষিপ্ত হয়ে হয়ে এসেছে, তার শতমুখী উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তি তাকে একটি সুন্দর সমগ্রতা গড়ে তুলতে দেয় নি। আমি তোকে সেদিনকার চিঠিতে বন্ধনকে সৌন্দর্যের কারণ বলে অনেকখানি লিখেছিলুম মনে আছে—মেয়েরা সেইরকম একটি স্বাভাবিক ছন্দের বন্ধনে সম্পূর্ণ সুন্দর হয়ে তৈরি হয়ে এসেছে। আর, পুরুষরা গদ্যের মতো বন্ধনহীন এবং সৌন্দর্যহীন, তাদের আগাগোড়ার মধ্যে কোনো-একটি ‘ছাঁদ নেই’। জানি নে আমি কিছু বোঝাতে পারলুম কি না, কিন্তু আমার মনে কথাটা খুব পরিস্ফুট। মেয়েদের সঙ্গে-যে লোকে চিরকাল সংগীতের, কবিতার, লতার, ফুলের, নদীর তুলনা দিয়ে এসেছে এবং কখনও

পুরুষের সঙ্গে দেবার কথা মনেও উদয় হয় নি তার কারণই এই। প্রকৃতির সমস্ত সুন্দর জিনিস যেমন সুসম্বদ্ধ সুসম্পূর্ণ সুসংহত সুসংযত, মেয়েরাও সেই রকম। তাদের মধ্যে কোনো দ্বিধা কোনো চিন্তা কোনো মন এসে তাদের ছন্দোভঙ্গ করে দিচ্ছে না, কোনো তর্ক এসে তাদের মিল নষ্ট করে দিচ্ছে না— তারা এক-একটি ছিপ্‌ছিপে মিষ্টি কবিতার মতো। গোড়ায় গলদের চন্দ্র যে-রকম বর্ণনা করেছিল সেইরকম। ডায়ারির চেয়ে চিঠি যে বেশি স্পষ্ট হল এমন মনে হচ্ছে না, কিন্তু এতে তো কোনো প্রত্যক্ষ পরিষ্কার প্রমাণ প্রয়োগ করবার জো নেই।

সিমলা
২২ অগস্ট্‌ ১৮৯৩

১১১

কলকাতা
২১ অগস্ট্‌। ১৮৯৩।

আজ তোর কাছ থেকে কতকগুলো খবরের কাগজের কাঁচি-ছাঁটা টুকরো পাওয়া গেল। কোথায় প্যারিসের আর্টিস্ট্‌-সম্প্রদায়ের উদ্দাম উন্মত্ততা আর কোথায় আমার কালীগ্রামের সরল চাষী প্রজাদের দুঃখদৈন্য-নিবেদন! আহা, এমন প্রজা আমি দেখি নি— এদের অকৃত্রিম ভালোবাসা এবং এদের অসহ্য কষ্ট দেখলে আমার চোখে জল আসে। আমার কাছে এই-সমস্ত দুঃখপীড়িত অটলবিশ্বাস-পরায়ণ অনুরক্ত ভক্ত প্রজাদের মুখে এমন একটি কোমল মাধুর্য আছে, এদের দিকে চেয়ে এবং এদের কথা শুনে সত্যি সত্যি বাৎসল্যে আমার হৃদয় বিগলিত হয়ে যায়। বাস্তবিক, এরা যেন আমার একটি দেশজোড়া বৃহৎ পরিবারের লোক। এই-সমস্ত নিঃসহায় নিরুপায় নিতান্তনির্ভরপর সরল চাষাভুষোদের আপনার লোক মনে করতে বড়ো একটা সুখ আছে। এদের ভাষা শুনতে আমার এমন মিষ্টি লাগে— তার ভিতর এমন স্নেহমিশ্রিত করুণা আছে! এরা যখন কোনো-একটা অবিচারের কথা বলে আমার চোখ ঝাপসা হয়ে আসে— অন্য নানা ছলে আমাকে সামলে নিতে হয়। এরা অনেক দুঃখ অনেক ধৈর্য-সহকারে সহ্য করেছে, তবু এদের ভালোবাসা কিছুতেই ম্লান হয় না। আজ একজন এসে বলছিল, 'সে বছর ভালো ধান হয় নি বলে চুঁচড়োয় বুড়ো বাপের কাছে এন্‌ছাপ নিতে গিয়েছিলুম। তা সে বললে, আমি তোদের কিছু ছেড়ে দিচ্ছি, তোরাও আমাকে কিছু খেতে দিস্‌। তার কাছে দরবার করতে গিয়েছিলুম বলে সেই মনোবাদে এখানকার আমিন আমাকে ফেরেবি মকদ্দমা করে তিন মাস জেল খাটিয়েছিল। আমি তখন তোমার মাটিকে সেলাম করে ভিন এলাকায় গিয়েছিলুম।' কিন্তু তবু তার এমনি ভক্তি যে সেই ভিন এলাকার জমিদার আমাদের কতক জমি চুরি করে ভোগ করছিল বলে সে এখানকার সেরেস্তায় জানিয়ে যায়, সেই রাগে তার নতুন জমিদার তার ধান-সুদ্ধ জমি কেড়ে নিয়েছে। সে বলে, 'আমি যার মাটিতে বুড়োকাল পর্যন্ত মানুষ হয়েছি তার হিতের কথা তাকে আমি বলতে পাব না!' এই বলে সে চোখ থেকে দুই-এক ফোঁটা জল মুছে ফেললে। তুই যদি তাকে দেখ্‌তিস, তার কথা শুনতিস, সে যে

কেমন সহজে কোনোরকম চাতুরি না করে যেন একটা খবর দিয়ে যাবার মতো সমস্তটা বলে গেল, তা দেখলে এই ব্যাপারটার যথার্থ গভীরতা বুঝতে পারতিস। এদের উপর যে আমার কতখানি শ্রদ্ধা হয়, আপনার চেয়ে যে এদের কতখানি ভালো মনে হয়, তা এরা জানে না। কিন্তু তবু প্যারিসের সভ্যতা থেকে কত তফাত! সে এর চেয়ে কত কঠিন, কত উজ্জ্বল, কত সুগঠিত! তবু এখানকার মানুষের মধ্যে যে জিনিসটি আছে সে বড়ো অনাদরের নয়। যতক্ষণ না সভ্যতার মাঝখানে এই স্বচ্ছ সরলতার প্রতিষ্ঠা হয় ততক্ষণ সভ্যতা কখনোই সম্পূর্ণ এবং সুন্দর হবে না। য়ুরোপের সভ্যতা ক্রমে যেন মর্বিড হয়ে আসছে, সে কেবল এই জিনিষটির অভাবে। তার ভিতরে একটা অস্বাস্থ্য একটা কীট তাকে ক্রমাগত দংশন করে জীর্ণ করে ফেলছে। সরলতাই মানুষের স্বাস্থ্যের একমাত্র উপায়— সে যেন গঙ্গার মতো, তার মধ্যে স্নান করে সংসারের অনেক তাপ দূর হয়ে যায়। আর, য়ুরোপ সমস্ত তাপকে যেন লালন করে তুলছে এবং তার উপরে আবার সহস্রবিধ মাদকতার কৃত্রিম উত্তাপে আপনাকে রাত্রিদিন উত্তেজিত করে তুলছে। খবরের কাগজের যে-ক'টি টুকরো পাঠিয়েছিস প্রত্যেকটিতেই ঐ প্রমাণ দেয়।

সিমলা
২৪ অগস্ট্ ১৮৯৩

১১২

কর্মাঠার
শনিবার, ৯ সেপ্টেম্বর। ১৮৯৩।

গোলাপ ফুলে বাগান একেবারে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। একটা শিরীষ ফুলের গাছ আগাগোড়া ফুলে ভরে আছে, গন্ধে ভুর্‌ভুর্‌ করছে। শিরীষ ফুল যেমন চমৎকার দেখতে তেমনি সুন্দর গন্ধ।... টেবিলে আমার সামনে গুটিকতক ফুল জড়ো হয়ে আছে, একেবারে যেন নরম মিষ্টি আদরের মতো, চোখের ঘুমের মতো।... শিরীষ ফুল কালিদাসের প্রিয় ফুল ছিল। কালিদাসের বইয়ে শিরীষ ফুল সৌকুমার্যের তুলনাস্থল ছিল।...

তুই আমাকে পূর্বের একটা চিঠিতে জিজ্ঞাসা করেছিস মানুষের সঙ্গ কেন আমার ভালো লাগে না। একটা কারণ এই বলতে পারি, মন যখন চিন্তা করে কিম্বা ভাব অনুভব করে তখন কিছুতে তার কোনো ব্যাঘাত করলে মনের সেই নিজের ভিতরে বাধাপ্রাপ্ত নিষ্ফল চেষ্টায় ভারী শ্রান্তি উপস্থিত হয়—মানুষের প্রতি মনোযোগ এবং আপনার ভাবনা ভাবা এই দুটো কাজই এক সঙ্গে করার চেষ্টা করতে গিয়ে মনটা যেন তিতিবিরক্ত হয়ে ওঠে। তবে মানুষটি যদি এমন হয় যে সে আর-সমস্ত চিন্তা ও চেষ্টা দূর করে দিয়ে একমাত্র নিজের দিকেই সমগ্র মনটি আকর্ষণ করে নিতে পারে তা হলে বড়ো আরাম পাওয়া যায়। আসল কথা এই, আমি একাগ্রভাবে কিছুতে নিবিষ্ট না থাকলে কিছুতে সুস্থির হতে পারি নে; যে-সমস্ত জিনিস এ বয়সে আমার সমস্ত মনটা না নেয় তারা আমাকে বড়ো ক্লান্ত করে— যেন মনের সমস্ত ভার রাখবার জায়গা পাওয়া যায় না, মাঝখানে ঝুলতে হয়।... আমাকে চিঠি লিখেছিল— অনুরোধ করেছিল তার সঙ্গে আর-একটু জমিয়ে

বন্ধুত্ব এবং ঘনিয়ে চিঠি-লেখালেখি করতে। আমি তাকে পাকে-প্রকারে লিখেছি যে, আমার শৌখিনভাবের বন্ধুত্ব করবার সময় নেই। এ বয়সে কেবল কাজ করতে হবে, এবং পুরাতন যা-কিছু আছে তাকেই প্রাণের গভীর ভাবে উপভোগ ও আশ্রয় করতে হবে। এখন টুকিটাকির শখ মেটাতে আর প্রবৃত্তি হয় না।

সিমলা
১২ সেপ্টেম্বর ১৮৯৩

১১৩

পতিসর
রবিবার?
১৯ ফেব্রুয়ারি। ১৮৯৪।

যে পারে বোট লাগিয়েছি এ পারে খুব নির্জন—গ্রাম নেই, বসতি নেই, চষা মাঠ ধু ধু করছে, নদীর ধারে ধারে খানিকটা করে শুকনো ঘাসের মতো আছে, সেই ঘাসগুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে গোটাকতক মোষ চরে বেড়াচ্ছে। আর, আমাদের দুটো হাতি আছে তারাও এ পারে চরতে আসে। তাদের দেখতে বেশ মজা লাগে। একটা পা উঠিয়ে ঘাসের গোড়ায় দু-চারবার একটু একটু ঠোকর মারে, তার পরে শুঁড় দিয়ে টান মারতেই বড়ো বড়ো ঘাসের চাপড়া একেবারে মাটিসুদ্ধ উঠে আসে। সেই চাপড়াগুলো শুঁড়ে করে দুলিয়ে দুলিয়ে ঝাড়ে, তার মাটিগুলো ঝরে ঝরে পড়ে যায়, তার পরে মুখের মধ্যে পুরে দিয়ে খেয়ে ফেলে। আবার এক-এক সময় খেয়াল যায়, খানিকটা ধুলো শুঁড়ে করে নিয়ে ফুঁ দিয়ে নিজের পেটে পিঠে সর্বাঙ্গে হুস করে ছড়িয়ে দেয়—এই রকম তো হাতির প্রসাধনক্রিয়া। বৃহৎ শরীর, বিপুল বল, শ্রীহীন আয়তন, অত্যন্ত নিরীহ—এই প্রকাণ্ড জন্তুটাকে দেখতে আমার বেশ লাগে। এর এই প্রকাণ্ডত্ব এবং বিশ্রীত্বর জন্যেই যেন এর প্রতি একটা কী বিশেষ স্নেহের উদ্রেক হয়—এর সর্বাঙ্গের অসৌষ্ঠব (awkwardness) থেকে একে একটা মস্ত শিশুর মতো মনে হয়—বেড়াল কুকুর ঘোড়ার চেয়ে যেন এদের প্রতি একটু বেশি মমতার সঞ্চার হয়। তা ছাড়া জন্তুটা বড়ো উদার প্রকৃতির, শিব ভোলানাথের মতো—যখন খ্যাপে তখন খুব খ্যাপে, যখন ঠাণ্ডা হয় তখন অগাধ শান্তি। আমি এক-একবার ভাবছিলুম হাতির প্রতি আমার মনের এই স্নেহরসার্দ্র ভাব, অনেকটা হয়তো পুরুষজাতির প্রতি মেয়েদের মনের ভাবের মতো। বড়োত্বর সঙ্গে সঙ্গে যে-এক-রকম শ্রীহীনত্ব আছে তাতে অন্তরকে বিমুখ করে না, বরঞ্চ আকর্ষণ করে আনে। আমার ঘরে যে বেঠোভেনের ছবি আছে, অনেক সুন্দর মুখের সঙ্গে তুলনা করলে তাকে দর্শনযোগ্য মনে না হতে পারে, কিন্তু আমি যখন তার দিকে চাই সে আমাকে খুব টেনে নিয়ে যায়—ঐ উস্কোখুস্কো মাথাটার ভিতরে কত বড়ো একটা শব্দহীন শব্দজগৎ! এবং কী একটা অপরিসীম বেদনা রুদ্ধ ঝড়ের মতো ঐ লোকটার ভিতরে ঘূর্ণ্যমান হত। ব...কে দেখলেও আমার ঐ রকমের একটা সসম্ভ্রম করুণার উদয় হয়—ওঁর সমস্ত অপরিচ্ছন্ন অনবধানের মধ্যে একটা অশান্ত অসম্পূর্ণ ক্লিষ্ট প্রতিভা প্রকাশ পায়। সব পুরুষ বেঠোভেন কিম্বা ব... নয়, এবং বেঠোভেন ও ব...কে যে মেয়েরা ভালোবাসে তাও নয়—কিন্তু

ওঁদের মধ্যে আমি খুব একটা সৌন্দর্য দেখতে পাই। সাধারণত পুরুষদের বলের সঙ্গে সঙ্গে একটা অকওয়ার্ড্ অসহায়তা এবং বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বহুল পরিমাণে জড়বুদ্ধিত্ব মিশল আছে বলে তাদের প্রতি মেয়েদের মনে কিয়ৎপরিমাণে শ্রদ্ধার সহিত অনেকটা পরিমাণে মাতৃস্নেহের উদ্রেক হয়। আমার বোধ হয় ছেলেরা যত বেশি মাতৃস্নেহ জাগ্রত করতে পারে এমন মেয়েরা নয়। যা হোক্, এ সব কথা অনেকটা আনুমানিক— নিজের প্রকৃতির মধ্যে যে-একটা মেয়েলি অংশ আছে তারই কাছ থেকে যেটুকু আভাস পাওয়া যায়।

কলকাতা। ২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৪

রবীন্দ্রনাথ ১১৩-সংখ্যক পত্রে এবং পরবর্তী বহু পত্রে যুগপৎ বার ও তারিখ লিখিয়াছিলেন; শতাব্দপঞ্জী মিলাইয়া দেখিলে উভয়ের সংগতি দেখা যায় না। রবিবার, শুক্রবার, মঙ্গলবার— যথাক্রমে শনি, বৃহস্পতি, সোম হইলে অমিল হইত না। ১৮৯৪ সনের পরিবর্তে ১৮৯৩ সনের ডায়ারি দেখিলে বারে ও তারিখে আশ্চর্য মিল দেখা যায়— ইহাও বিবেচনার বিষয়।

১১৪

পতিসর
রবিবার ?
২৬ ফেব্রুয়ারি। ১৮৯৪।

মাঝে মাঝে মেঘ করছে, মাঝে মাঝে পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে— থেকে থেকে হঠাৎ হুহু করে একটা হাওয়া এসে আমার বোটের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে বিচিত্র ক্যাঁ-ক্যোঁঃ শব্দে আর্তনাদ তুলছে— আজ দুপুর বেলাটা এমনি ভাবে চলছে।... এখন বেলা একটা বেজেছে— তোরা যথানিয়মে আহারাদি করে হিসেবপত্র দেখে এতক্ষণ বোধ হয় রুদ্ধদ্বার শয়নালয়ে নিদ্রা দিতে গেছিস। পাড়াগেঁয়ে মধ্যাহ্নের এই হাঁসের ডাক, পাখির ডাক, কাপড় কাচার শব্দ, নৌকো-চলা জলের ছল্ ছল্ ধ্বনি, দূরে গোরুর পাল পার করবার হৈ হৈ রব, এবং আপনার মনের ভিতরকার একটা উদাস আলস্যপূর্ণ স্বগত সংগীতস্বর কলকাতার চৌকি-টেবিল-সমাকীর্ণ বর্ণবৈচিত্র্য-বিহীন নিত্যনৈমিত্তিকতার মধ্যে কল্পনাও করতে পারি নে। কলকাতাটা বড়ো ভদ্র এবং বড়ো ভারী, গবর্মেন্টের আপিসের মতো। জীবনের প্রত্যেক দিনটাই যেন একই আকারে একই ছাপ নিয়ে টাঁকশাল থেকে তক্‌তকে হয়ে কেটে কেটে বেরিয়ে আসছে— নীরস মৃত দিন, কিন্তু খুব ভদ্র এবং সমান ওজনের। এখানে আমি দলছাড়া, এবং এখানকার প্রত্যেক দিন আমার নিজের দিন— নিত্য-নিয়মিত-দম-দেওয়া কলের সঙ্গে কোনো যোগ নেই। আমার আপনার মনের ভাবনাগুলি এবং অখণ্ড অবসরটিকে হাতে করে নিয়ে মাঠের মধ্যে বেড়াতে যাই— সময় কিম্বা স্থানের মধ্যে কোনো বাধা নেই। সন্ধেটা জলে স্থলে আকাশে ঘনিয়ে আসতে থাকে, আমি মাথাটা নিচু করে আস্তে আস্তে বেড়াতে থাকি।

কলকাতা
২৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৪

১১৫

পতিসর
শুক্রবার রাত্রি?
[১৭ মার্চ্‌ ১৮৯৪]

জ্যোৎস্না প্রতি রাত্রেই অল্প অল্প করে ফুটে উঠছে। আমি তাই আজকাল সন্ধের পরেও অনেক ক্ষণ বাইরে বেড়াই। নদীর এ পারের মাঠে কোথাও কিছু সীমাচিহ্ন নেই, গাছপালা নেই— চষা মাঠে একটি ঘাসও নেই, কেবল নদীর ধারের ঘাসগুলো প্রখর রৌদ্রে শুকিয়ে হলদে হয়ে এসেছে। জ্যোৎস্নায় এই ধু ধু শূন্য মাঠ ভারী অপূর্ব দেখতে হয়— সমুদ্র এই রকম অসীম বলে মনে হয়, কিন্তু তার একটা অবিশ্রাম গতি এবং শব্দ আছে— এই মাটির সমুদ্রের কোথাও কিছু গতি নেই, শব্দ নেই, বৈচিত্র্য নেই, প্রাণ নেই— ভারী একটা উদাস মৃত শূন্যতা— চলবার মধ্যে কেবল এক প্রান্তে আমি একটি প্রাণী চলছি এবং আমার পায়ের কাছে একটি ছায়া চলে বেড়াচ্ছে। বহুদূরের মাঠে এক-এক জায়গায় যেখানে গত শস্যের শুকনো গোড়া কিছু অবশিষ্ট ছিল সেইখানে চাষারা আগুন লাগিয়ে দিয়েছে, মাঝে মাঝে কেবল সেই আগুনের শ্রেণী দেখা যাচ্ছে। এমন একটা প্রকাণ্ড বিস্তারিত প্রাণহীনতার উপর যখন অস্পষ্ট চাঁদের আলো এসে পড়ে তখন যেন একটা বিশ্বব্যাপী বিচ্ছেদশোকের ভাব মনে আসে— যেন একটি মরুময় বৃহৎ গোরের উপরে একটি সাদা-কাপড়-পরা মেয়ে উপুড় হয়ে মুখ ঢেকে মূর্ছিতপ্রায় নিস্তব্ধ পড়ে রয়েছে।

কলকাতা
১৯ মার্চ ১৮৯৪

১১৬

পতিসর
২১ মার্চ্‌। ১৮৯৪।

এখানকার প্রজাদের উপর বাস্তবিক মনের স্নেহ উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে— এদের কোনোরকম কষ্ট দিতে আদবে ইচ্ছে করে না— এদের সরল ছেলেমানুষের মতো অকৃত্রিম স্নেহের আবদার শুনলে বাস্তবিক মনটা আর্দ্র হয়ে ওঠে। যখন তুমি বলতে বলতে তুই বলে ওঠে, যখন আমাকে ধমকায় তখন ভারী মিষ্টি লাগে। এক-এক সময় আমি ওদের কথা শুনে হাসি, তাই দেখে ওরাও হাসে। সেদিন আমি সন্ধের সময় বেড়াচ্ছিলুম একজন প্রজা এসে বললে 'একটু খাড়া হও তুমি'— আমি কিছু আশ্চর্য হয়ে চুপ করে দাঁড়ালুম। সে আমার পায়ের ধুলো নিয়ে বুকে মাথায় মেখে বললে, 'আমার জনম সার্থক হল'। সে বললে, তার কাশি এবং জ্বর হয়েছিল, তিন দিন লঙ্ঘন দিয়ে (অর্থাৎ উপবাস করে) ছিল, আজ অন্ন পথ্য করে আমার পদধূলি নিতে এসেছে। তার সরল ভক্তির গুণে আমার পায়ের

ধুলোর যদি কোনো ফল ফলে বলতে পারি নে। ভক্তি ভালোবাসা স্নেহ অযথা পরিমাণে এবং অযোগ্য পাত্রে পড়লেও তার এমন একটি আশ্চর্য সৌন্দর্য আছে— আমার এখানকার প্রজারা সেই পরিপূর্ণ ভক্তির সরলতায় সুন্দর। তাদের রেখাঙ্কিত বৃদ্ধমুখের মধ্যেও একটি শৈশবের সৌকুমার্য আছে। কিন্তু এসব কথা তোকে পূর্বের চিঠিতে অনেকবার বলেছি— অতএব দূর থেকে তোর কাছে এ-সমস্তই পুরাতন পুনরুক্তি মনে হতে পারে। কিন্তু আমার কাছে প্রতিদিন প্রতিবার নতুন করে ঠেকে। এই প্রাচীন পৃথিবীতে কেবল সৌন্দর্য এবং মানুষের হৃদয়ের জিনিসগুলো কোনোকালেই কিছুতেই পুরোনো হয় না, তাই এই পৃথিবীটা তাজা রয়েছে এবং কবির কবিতা কোনোকালেই একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায় না।

কলকাতা। ২২ মার্চ্ ১৮৯৪

১১৭

পতিসর
বুধবার ?
২২ মার্চ্। ১৮৯৪।

‘পশুপ্রীতি’ বলে ব [লু] একটা প্রবন্ধ লিখে পাঠিয়েছে, আজ সমস্ত সকাল বেলায় সেইটে নিয়ে পড়েছিলুম। কাল আমি বোটে বসে জানলার বাইরে নদীর দিকে চেয়ে আছি এমন সময় হঠাৎ দেখি— একটা কী পাখি সাঁতরে তাড়াতাড়ি ওপারের দিকে চলে যাচ্ছে আর তার পিছনে মহা ধর্-ধর্ মার্-মার্ রব উঠেছে। শেষকালে দেখি একটি মুরগি— তার আসন্ন মৃত্যুকালে আমার বাবুর্চিখানার নৌকো থেকে হঠাৎ কিরকম ছাড়া পেয়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে পেরিয়ে যাবার চেষ্টা করছিল, ঠিক যেই তীরের কাছে গিয়ে পৌঁচেছে অমনি যমদূত মানুষ ক্যাঁক্ করে তার গলা টিপে ধরে আবার নৌকো করে ফিরিয়ে নিয়ে এল। আমি ফটিককে ডেকে বললুম আমার জন্যে আজ মাংস হবে না। এমন সময় ডাকে বলুর ‘পশুপ্রীতি’ লেখাটা এসে পৌঁছল, আমি পেয়ে কিছু আশ্চর্য হলুম। আমার তো আর মাংস খেতে রুচি হয় না [বব্]। আমরা যে কী অন্যায় এবং কী নিষ্ঠুর কাজ করি তা ভেবে দেখি নে বলে মাংস গলাধঃকরণ করতে পারি। পৃথিবীতে অনেক কাজ আছে যার দূষণীয়তা মানুষের স্বহস্তে গড়া— যার ভালোমন্দ অভ্যাসপ্রথা-দেশাচার-লোকাচার-সমাজনিয়মের উপর নির্ভর করে, কিন্তু নিষ্ঠুরতা সে রকম নয়। এটা একেবারে আদিম দোষ - এর মধ্যে কোনো তর্ক নেই, কোনো দ্বিধা নেই; হৃদয় যদি আমাদের অসাড় না হয়, হৃদয়কে যদি চোখ বেঁধে অন্ধ করে না রেখে দিই তা হলে নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে নিষেধ একেবারে স্পষ্ট শুনতে পাই। অথচ ওটা আমরা হেসে খেলে সকলে মিলে খুব অনায়াসে আনন্দ-সহকারে করে থাকি; এমন-কি, যে না করে তাকে কিছু অদ্ভুত বলে মনে হয়। পাপপুণ্য সম্বন্ধে মানুষের এমনি একটা কৃত্রিম অপূর্ব ধারণা। আমার বোধ হয় সকল ধর্মের শ্রেষ্ঠ ধর্ম সর্ব জীবে দয়া। প্রেম হচ্ছে সমস্ত ধর্মের মূল ভিত্তি। জগতে আমা হতে যেন দুঃখের সৃজন না

হয়ে সুখের বিস্তার হতে থাকে। আমি যেন সকল প্রাণীর সুখ দুঃখ বেদনা বুঝে নিজের স্বার্থের জন্যে কাউকে আঘাত না করি—এই যথার্থ ধর্ম, এই যথার্থ ঈশ্বরচরিত্রের আদর্শে আপনাকে গঠিত করা। সেদিন একটা ইংরিজি কাগজে পড়লুম, পঞ্চাশ হাজার পৌন্‌ড্‌ মাংস ইংলন্‌ড্‌ থেকে আফ্রিকার কোনো-এক সেনানিবাসে পাঠানো হয়েছিল। মাংসটা খারাপ হওয়াতে তারা ফিরে পাঠিয়ে দেয়, তার পরে সেই মাংস পোর্‌ট্‌স্‌মাউথে পাঁচ-ছ শো টাকায় নিলেম হয়ে যায়—ভেবে দেখ্‌ দেখি [বব] জীবের জীবনের কী ভয়ানক অপব্যয় এবং কী অল্প মূল্য! আমরা যখন একটা খানা দিই তখন কত প্রাণী কেবলমাত্র ডিশ-পূরণের জন্যে আত্মবিসর্জন দেয়; হয়তো কেবল ফিরে ফিরে যায়, কেউ নেয় না। যতক্ষণ আমরা অচেতন ভাবে থাকি এবং অচেতন ভাবে হিংসা করি ততক্ষণ আমাদের কেউ দোষ দিতে পারে না। কিন্তু যখন মনে দয়া উদ্রেক হয় তখন যদি সেই দয়াটাকে গলা টিপে মেরে দশজনের সঙ্গে মিশে হিংস্রভাবে কাজ করে যাই, তা হলেই যথার্থ আপনার সমস্ত সাধুপ্রকৃতিকে অপমান করা হয়। আমি তো মনে করেছি [বব] আরও একবার নিরামিষ খাওয়া ধরে দেখব।...

আমার একটি নির্জনের প্রিয়বন্ধু জুটেছে—আমি লো [কেনে] র ওখেন থেকে তার একখানা Amiel's Journal ধার করে এনেছি—যখনি সময় পাই সেই বইটা উল্টে-পাল্টে দেখি। ঠিক মনে হয় তার সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে কথা কচ্ছি—এমন অন্তরঙ্গ বন্ধু আর খুব অল্প ছাপার বইয়ে পেয়েছি। অনেক বই এর চেয়ে ভালো লেখা আছে এবং এ বইয়ের অনেক দোষ থাকতে পারে, কিন্তু এ বইটি আমার মনের মতো বই। অনেক সময় আসে যখন সব বই ছুঁয়ে ছুঁয়ে ফেলে দিতে হয়, কোনো বই ঠিক আরামের বোধ হয় না—যেমন রোগের সময় অনেক সময় বিছানায় ঠিক আরামের অবস্থাটি পাওয়া যায় না, নানা রকমে পাশ ফিরে দেখতে ইচ্ছে করে, কখনো বালিশের উপর বালিশ চাপাই, কখনো বালিশ ফেলে দিই—সেই রকম মানসিক অবস্থায় আমিয়েলের যেখানেই খুলি সেখানেই মাথাটি ঠিক গিয়ে পড়ে, শরীরটা ঠিক বিশ্রাম পায়। আমার সেই অন্তরঙ্গ বন্ধু আমিয়েল পশুদের প্রতি মানুষের নিষ্ঠুরতা সম্বন্ধে এক জায়গায় লিখেছে—[বলুর] লেখায় আমি সেইটে সমস্তটা নোট বসিয়ে দিয়েছি। সব-সুদ্ধ [বলুর] এ লেখাটা আমার তেমন ভালো লাগে নি—অনেকটা যেন টেনেটুনে গড়ে পিটে লিখেছে। ঠিক যেন সমস্ত মনের সঙ্গে লেখে নি—ইনিয়ে-বিনিয়ে বানিয়ে-বানিয়ে লিখেছে—সহৃদয়তাপূর্ণ অত্যুক্তিশূন্য সত্যের সরলতার সুর দিচ্ছে না।... বানানো কথা অনেক স্থলে দূষণীয় নয়, কিন্তু এ রকম জিনিস ঠিক খাঁটি না হলে মনটা ভারী বিমুখ ও বিরক্ত হয়ে ওঠে। কাদম্বরীর সেই মৃগয়া-বর্ণনা থেকে অনেকটা আমি [বলুকে] তর্জমা করতে বলে দিয়েছি। পাখিরাও যে কতটা আমাদেরই মতো—একটা জায়গা আছে যেখানে তাতে আমাতে প্রভেদ নেই—পাখির সন্তান-বাৎসল্য প্রাণের মমতা ঠিক আমাদেরই মতো—এইটে বাণভট্ট আপন করুণ কল্পনাশক্তির দ্বারা অনুভব ও প্রকাশ করেছেন—সেই touch of nature makes the whole world kin!

কলকাতা
২৩ মার্চ, ১৮৯৪

১১৮

পতিসর
২৪ মার্চ্। ১৮৯৪।

আজকাল আমার সন্ধ্যাভ্রমণের একমাত্র সঙ্গীটির অভাব হয়েছে, সেটি আর কেউ নয়, আমাদের শুক্লপক্ষের চাঁদ। কাল থেকে আর তাঁর দেখা নেই। ভারী অসুবিধে হয়েছে, শীঘ্রই অন্ধকার হয়ে যায়, যথেষ্ট বেড়াবার পক্ষে একটু ব্যাঘাত জন্মায়।... ... আজকাল ভোরের বেলায় চোখ মেলেই ঠিক আমার খোলা জানলার সামনেই শুকতারা দেখতে পাই, তাকে আমার ভারী মিষ্টি লাগে— সেও আমার দিকে চেয়ে থাকে, ঠিক তোদের কারও একজনের মতো মনে হয়, যেন বহুকালের আমার আপনার লোক। মনে আছে যখন শিলাইদহে কাছারি করে সন্ধেবেলায় নৌকো করে নদী পার হতুম এবং রোজ আকাশে সন্ধ্যাতারা দেখতে পেতুম, আমার ভারী একটা সান্ত্বনা বোধ হত— ঠিক মনে হত আমার নদীটি যেন আমার ঘর সংসার, এবং আমার সন্ধ্যাতারাটি আমার এই ঘরের গৃহলক্ষ্মী, আমি কখন্ কাছারি থেকে ফিরে আসব এই জন্যে সে উজ্জ্বল হয়ে সেজে বসে আছে। তার কাছ থেকে এমন একটি চোখের দৃষ্টি এমন একটি স্নেহস্পর্শ পেতুম! তখন নদীটি নিস্তব্ধ হয়ে থাকত, বাতাসটি ঠাণ্ডা, কোথাও কিছু শব্দ নেই, ভারী যেন একটা ঘনিষ্ঠতার ভাবে আমার সেই প্রশান্ত সংসারটি পরিপূর্ণ হয়ে থাকত। আমার সেই শিলাইদহে প্রতি সন্ধ্যায় নিস্তব্ধ অন্ধকারে নদী পার হওয়াটা খুব সুস্পষ্টরূপে প্রায়ই মনে পড়ে। ভোরের বেলায় প্রথম দৃষ্টিপাতেই শুকতারাটি দেখে, তাকে আমার একটি বহুপরিচিত সহাস্যসহচরী না মনে করে থাকতে পারি নে— সে যেন একটি চিরজাগ্রত কল্যাণকামনার মতো ঠিক আমার নিদ্রিত মুখের উপর প্রফুল্ল স্নেহ বিকিরণ করতে থাকে।...

আজ বেড়িয়ে বোটে ফিরে এসে দেখি বাতির কাছে এত বেশি পতঙ্গের ভিড় হয়েছে যে টেবিলে বসা অসাধ্য। আজ তাই বাতি নিবিয়ে দিয়ে বাইরে কেদারা নিয়ে অন্ধকারে বসেছিলুম— আকাশের সমস্ত জ্যোতির্জগৎ সমস্ত লোকলোকান্তর অনন্ত রহস্যের অন্তঃপুরবাসিনী মেয়ের দলের মতো উপরের তলার খড়্খড়ি থেকে আমাকে দেখছিল, আমি তাদের কিছুই জানি নে এবং কোনোকালেই জানতে পাব কিনা তাও জানি নে— অথচ ঐ জ্যোতির্মণ্ডলীর মধ্যে বিচিত্র জীবনের অনন্ত ইতিহাস প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছে। আজ সন্ধের সময় তোকে আর চিঠি লেখা হয়ে ওঠে নি, তাই এখন লিখছি। এখন কত রাত হবে বল্ দেখি? এগারোটা। এখন বোধ হয় তুই বিছানার মধ্যে অগাধ নিদ্রায় আচ্ছন্ন। যখন চিঠিটা পাবি তখন দিনের বেলাকার প্রখর আলোকে খুবই সজাগ সচঞ্চল, নানান কাজে ব্যস্ত — তখন কোথায় এই সুষুপ্ত নিস্তব্ধ রাত্রি, কোথায় ঐ অনন্ত বিশ্বলোকের জ্যোতির্ময় শব্দহীন বার্তা! এত সুতীব্র প্রভেদ! কিছুতে ঠিক ভাবটি মনে আনা যায় না। মানুষের মনের ক্ষমতা এত সামান্য। যে খুবই পরিচিত, চোখ বুজে তার আকৃতির প্রত্যেক রেখাটি মনে আনা যায় না— এক সময় যা সর্বপ্রধান আর-এক সময় তা যথার্থরূপে স্মৃতিগম্য করাও শক্ত হয়ে ওঠে। দিনের বেলায় রাতকে ভুলি, রাতের বেলায় দিনকে ভুলি। আমার এ চিঠি পড়ে বেশ বুঝতে পারবি এটা অর্ধরাত্রির চিঠি।... ...

চাঁদের খণ্ড অনেক ক্ষণ হল উঠেছে— চতুর্দিক একেবারে নিস্তব্ধ নিদ্রিত, কেবল গ্রামের গোটা-দুই কুকুর ওপার থেকে ডাকছে, আমার এই বোটে কেবল একটি বাতি জ্বলছে, আর সব জায়গায় আলো নিবেছে। নদীতে একটু গতি মাত্র নেই, তাতেই মনে হয় মাছগুলো রাত্তিরে ঘুমোয়। জলের ধারে সুপ্ত গ্রাম এবং জলের উপর গ্রামের সুপ্ত ছায়া।

কলকাতা
২৫ মার্চ্ ১৮৯৪

১১৯

পতিসর
মঙ্গলবার ?
২৮ মার্চ্। ১৮৯৪।

এ দিকে গরমটাও বেশ পড়েছে। কিন্তু রৌদ্রের উত্তাপটাকে আমি বড়ো একটা গ্রাহ্য করি নে, সে বোধ হয় তুই জানিস। তপ্ত বাতাস ধুলোবালি খড়কুটো উড়িয়ে নিয়ে হুহু শব্দ করে ছুটেছে— প্রায়ই হঠাৎ এক-এক জায়গায় একটা আজগবি ঘূর্ণি বাতাস দাঁড়িয়ে উঠে শুকনো পাতা এবং ধুলোর ওড়না ঘুরিয়ে ঘুরতে-ঘুরতে নেচে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে— সেটা দেখতে বেশ লাগে। নদীর ধারে বাগান থেকে পাখিগুলো ভারী মিষ্টি করে ডাকছে— মনে হচ্ছে ঠিক বসন্তই বটে, খোলা থেকে একেবারে গরম গরম নাবিয়ে এনেছে। কিন্তু গরমটা কিঞ্চিৎপরিমাণে বেশি, আর একটুখানি জুড়িয়ে আনলে বিশেষ ক্ষতি ছিল না। কিন্তু আজ সকাল বেলাটায় হঠাৎ দিব্যি ঠাণ্ডা পড়েছিল— এমন-কি প্রায় শীতকালেরই মতো, স্নান করবার সময় মনে খুব প্রবল উৎসাহ ছিল না। এই প্রকৃতি-নামক একটা বৃহৎ ব্যাপারের মধ্যে কখন যে কী হচ্ছে তার হিসেব পাওয়া শক্ত— কোথায় তার কোন্ অজ্ঞাত কোণে কী-একটা কাণ্ড ঘটছে আর অকস্মাৎ চার দিকের সমস্ত ভাবখানা বদলে যাচ্ছে। আমি কাল ভাবছিলুম মানুষের মনখানাও ঠিক ঐ প্রকাণ্ড প্রকৃতির মতো রহস্যময়। চতুর্দিকে শিরা উপশিরা স্নায়ু মস্তিষ্ক মজ্জার ভিতর কী এক অবিশ্রাম ইন্দ্রজাল চলছে— হু হুঃ শব্দে রক্তস্রোত ছুটেছে, স্নায়ুগুলো কাঁপছে, হৃৎপিণ্ড উঠছে পড়ছে, আর এই রহস্যময়ী মানবপ্রকৃতির মধ্যে ঋতুপরিবর্তন হচ্ছে। কোথা থেকে কখন্ কী হাওয়া আসে আমরা কিছুই জানি নে। আজ মনে করলুম জীবনটা দিব্যি চালাতে পারব— বেশ বল আছে, সংসারের দুঃখযন্ত্রণাগুলোকে একেবারে ডিঙিয়ে চলে যাব। এই ভেবে সমস্ত জীবনের প্রোগ্রামটি ছাপিয়ে এনে শক্ত করে বাঁধিয়ে পকেটে রেখে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছি— কাল দেখি কোন্ অজ্ঞাত রসাতল থেকে আর-একটা হাওয়া দিয়েছে, আকাশের ভাবগতিক সমস্ত বদলে গেছে, তখন আর কিছুতেই মনে হয় না এ দুর্যোগ কোনোকালে কাটিয়ে উঠতে পারব। এ-সব উৎপত্তি কোন্‌খানে? কোন্ শিরার মধ্যে স্নায়ুর মধ্যে কী একটা নড়্‌চড়্ হয়ে গেছে, মাঝের থেকে আমি আমার সমস্ত বলবুদ্ধি নিয়ে আর কুলিয়ে উঠতে পারি নে। নিজের ভিতরকার এই অপার রহস্যের কথা মনে করলে ভারী ভয় হয়— কী করতে পারব না-পারব কিছুই জোর করে বলতে পারি

নে—মনে হয়, কিছুই না জেনে আমি এ কী একটা প্রকাণ্ড কাণ্ড সর্বদাই স্কন্ধে বহন করে নিয়ে বেড়াই, আয়ত্তও করতে পারি নে, অথচ এর হাতও কিছুতেই এড়াতে পারি নে—জানি নে এ আমাকে কোথায় নিয়ে যাবে, আমিই বা একে কোথায় নিয়ে যাব—আমার স্কন্ধে এই ভয়ংকর রহস্যভারটা যোজনা করে দেবার কী আবশ্যক ছিল! বুকের ভিতর কী হয়, শিরার মধ্যে কী চলছে, মস্তিষ্কের মধ্যে কী নড়ছে, কত কী অসংখ্য কাণ্ড আমাকে অবিশ্রাম আচ্ছন্ন করে ঘটছে, আমি দেখতেও পাচ্ছি নে, আমার সঙ্গে পরামর্শও করছে না, অথচ সব-সুদ্ধ নিয়ে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে কর্তাব্যক্তির মতো মুখ করে মনে করছি আমি একজন আমি! তুমি তো ভারী তুমি—তোমার নিজের কতটুকুই বা জানো তার ঠিক নেই। আমি তো অনেক ভেবেচিন্তে এইটুকু ঠিক করেছি আমি নিজেকে কিছুই জানি নে। আমি একটা সজীব পিয়ানো যন্ত্রের মতো—ভিতরে অন্ধকারের মধ্যে অনেকগুলো তার এবং কল-বল আছে; কখন কে এসে বাজায় কিছুই জানি নে, কেন বাজে তাও সম্পূর্ণ বোঝা শক্ত, কেবল কী বাজে সেইটেই জানি—সুখ বাজে কি ব্যথা বাজে, কড়ি বাজে কি কোমল বাজে, তালে বাজে কি বেতালে বাজে এইটুকুই বুঝতে পারি। আর জানি আমার অক্টেভ নিচের দিকেই বা কতদূর উপরের দিকেই বা কতদূর। না, তা'ও কি ঠিক জানি? আমি সিম্‌প্যাথেটিক গ্র্যান্‌ড্‌ পিয়ানো কি কটেজ পিয়ানো সে সম্বন্ধেও ভ্রম হয়।

কলকাতা
২৯ মার্চ ১৮৯৪

১২০

পতিসর
বৃহস্পতিবার ?
৩০ মার্চ। ১৮৯৪।

এত অকারণ আশঙ্কা এবং কষ্ট মানুষের অদৃষ্টে থাকে! ছোটো বড়ো এত সহস্র বিষয়ের উপর আমাদের মনের সুখ শান্তি নির্ভর করে! কাল অনর্থক অনেক ক্ষণ পর্যন্ত নিরুপায় ভাবে দুঃখ ভোগ করেছি। অনেক দুঃখ আছে যা আমার নিজকৃত এবং যা সবিনয়ে সহিষ্ণুভাবে বহন করা কর্তব্য মনে হয়; কিন্তু চিঠি না পেয়ে যখন আশঙ্কা হয় যে বুঝি একটা-কিছু বিপদ কিম্বা ব্যামো হয়েছে তখন কষ্টটাকে শান্ত করবার জন্যে হাতের কাছে কোনো ফিলজফিই পাওয়া যায় না। তখন বুদ্ধিটাও একেবারে কাজের বার হয়ে যায়। কাল সমস্ত ক্ষণ বেড়াতে বেড়াতে এমন-সকল অসম্ভব এবং অসংগত কল্পনা মনে উদয় হচ্ছিল এবং বুদ্ধি তার কোনো প্রতিবাদ করছিল না যে, আজ তা স্মরণ করে হাসিও পাচ্ছে লজ্জাও বোধ হচ্ছে। অথচ স্থির নিশ্চয় জানি যে, আসছে বারে যেদিন এই রকম ঘটনা হবে, ঠিক আবার এরই পুনরাবৃত্তি হবে। আমি তো তোকে অনেকবার বলেছি—বুদ্ধিটা মানুষের নিজস্ব জিনিস নয়, ওটা এখনও আমাদের মনের মধ্যে ন্যাচরলাইজ্‌ড্‌ হয়ে যায় নি।...

যখন মনে করি জীবনের পথ সুদীর্ঘ এবং দুঃখকষ্টের কারণ অসংখ্য এবং

অবশ্যম্ভাবী তখন এক-এক সময় মনের বল রক্ষা করা প্রাণপণ কঠিন হয়ে পড়ে। যখন দুদিন কোনো কারণে চিঠি না পেলে এতটা বেশি অধৈর্য উপস্থিত হয় তখন নিজের উপর বিশ্বাস চলে যায়। অনেক সময় সন্ধের সময় একলা বসে বসে টেবিলের বাতির আলোর দিকে দৃষ্টি নিবিষ্ট করে মনে করি জীবনটাকে বীরের মতো অবিচলিত ভাবে নীরবে এবং বিনা অভিযোগে বহন করব— সেই কল্পনায় মনটা উপস্থিতমত অনেকখানি স্ফীত হয়ে ওঠে এবং আপনাকে হাতে হাতে একজন মস্ত বীরপুরুষ বলে ভ্রম হয়। তার পরে পথ চলতে পায়ে যেই কুশের কাঁটাটি ফোটে অমনি যখন লাফিয়ে উঠি তখন ভবিষ্যতের পক্ষে ভারী সন্দেহ উপস্থিত হয়, তখন আবার জীবনটাকে সুদীর্ঘ এবং আপনাকে সম্পূর্ণ অযোগ্য মনে হয়। কিন্তু সে যুক্তিটা বোধ হয় ঠিক নয়— বাস্তবিক, বোধ হয় কুশের কাঁটায় বেশি অস্থির করে। মনের ভিতরে একটি গোছালো গিন্নিপনা দেখা যায়— সে দরকার বুঝে ব্যয় করে, সামান্য কারণে বলের অপব্যয় করতে চায় না। সে যেন বড়ো বড়ো সংকট এবং আত্মত্যাগের জন্যে আপনার সমস্ত বল কৃপণের মতো সযত্নে সঞ্চয় করে রাখে। ছোটো ছোটো বেদনায় হাজার কান্নাকাটি করলেও তার রীতিমত সাহায্য পাওয়া যায় না। কিন্তু যেখানে দুঃখ গভীরতম সেখানে তার আলস্য নেই। এই জন্যে জীবনে একটা প্যারাডক্স্‌ প্রায়ই দেখা যায় যে, বড়ো দুঃখের চেয়ে ছোটো দুঃখ যেন বেশি দুঃখকর। তার কারণ, বড়ো দুঃখে হৃদয়ের যেখানটা বিদীর্ণ হয়ে যায় সেইখান থেকেই একটা সান্ত্বনার উৎস উঠতে থাকে, মনের সমস্ত দলবল সমস্ত ধৈর্য এক হয়ে আপনার কাজ করতে থাকে— তখন দুঃখের মাহাত্ম্যের দ্বারাই তার সহ্য করবার বল বেড়ে যায়। মানুষের হৃদয়ে এক দিকে যেমন সুখলাভের ইচ্ছা তেমনি আর-এক দিকে আত্মত্যাগের ইচ্ছাও আছে; সুখের ইচ্ছা যখন নিষ্ফল হয় তখন আত্মত্যাগের ইচ্ছা বলিষ্ঠ হয়ে ওঠে এবং সেই ইচ্ছার চরিতার্থতা সাধন করবার অবসর পেয়ে মনের ভিতরে একটা উদার উৎসাহ সঞ্চার হয়। ছোটো দুঃখের কাছে আমরা কাপুরুষ, কিন্তু বড়ো দুঃখ আমাদের বীর করে তোলে, আমাদের যথার্থ মনুষ্যত্বকে জাগ্রত করে দেয়। তার ভিতরে একটা সুখ আছে। দুঃখের সুখ বলে একটা কথা অনেক দিন থেকে প্রচলিত আছে, সেটা নিতান্ত বাক্‌চাতুরী নয়— এবং সুখের অসন্তোষ একটা আছে সেও সত্যি। তার মানে বেশি শক্ত নয়। যখন আমরা নিছক সুখভোগ করতে থাকি তখন আমাদের মনের একার্ধ অকৃতার্থ থাকে, তখন একটা কিছুর জন্যে দুঃখভোগ এবং ত্যাগ স্বীকার করতে ইচ্ছে করে, নইলে আপনাকে সুখলাভের অযোগ্য বলে মনে হয়— এই কারণেই যে সুখের সঙ্গে দুঃখ মিশ্রিত সেই সুখই স্থায়ী এবং সুগভীর, তাতেই যথার্থ আমাদের সমস্ত প্রকৃতির চরিতার্থতা-সাধন হয়।

কিন্তু সুখদুঃখের ফিলজফি ক্রমেই বেড়ে চলতে লাগল। সুন্দররূপে জীবন ধারণ করাটাকে যদি একটা আর্টের মধ্যে গণ্য করতে হয় তা হলে এ ফিলজফির বিশেষ আবশ্যক আছে, কিন্তু চিঠি লেখাটারও একটা আর্ট্‌ আছে— সেটাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা উচিত হয় না। অনেক জিনিস আছে যা নিজের আবশ্যকীয়: সুখ দুঃখ সম্বন্ধে সমস্ত কথা বেশ পাকাপাকি করে বেঁধে নিতে পারলে আমার অনেক সাহায্যে লাগে, সেই জন্যে চিঠি লেখার উপলক্ষ্যে নিজের স্বগত উক্তিকে সুব্যক্ত পরিস্ফুট করে তোলবার ইচ্ছে হয়— কিন্তু সে কাজটা সব সময়ে ঠিক সংগত হয় না।...

কিন্তু এত ঠিকঠাক হিসেব মিলিয়ে আশা করতে গেলে কপালে দুঃখ ঘটবার সম্ভাবনা—অতএব আগামী কল্য চিঠি পাব না এইরকমই স্থির করলুম। কাল না পাই পরশু তো পাবই—কিন্তু ঐ 'পাবই' শব্দের 'ই' অক্ষরটা বড়ো ভালো নয়, ঐ 'ই' অক্ষরটাতেই কাল আমাকে বিশেষ নাকাল করেছে। জীবনের সমস্ত হিসাব থেকে যত্নপূর্বক সাবধানে ঐ 'ই' অক্ষরটা বাদ দেওয়া কর্তব্য—জীবনধারণ-রূপ আর্টের এই একটা প্রধান নিয়ম। ওর হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া বড়ো শক্ত—একেবারে জোঁকের মতো লেগে থাকে, এবং রক্তও শুষে খায়।

কলকাতা। ৩১ মার্চ ১৮৯৪

১২১

শিলাইদহ
২৪ জুন। ১৮৯৪।

সবে দিন চারেক হল এখানে এসেছি, কিন্তু মনে হচ্ছে যেন কতদিন আছি তার ঠিক নেই—মনে হচ্ছে আজই যদি কলকাতায় যাই তা হলে যেন অনেক বিষয়ে অনেক পরিবর্তন দেখতে পাব...আমিই কেবল সময়স্রোতের বাইরে একটি জায়গায় স্থির হয়ে আছি, আর সমস্ত জগৎ আমার অজ্ঞাতে একটু একটু করে ঠাঁই বদল করছে। আসলে, কলকাতা থেকে এখানে এলে সময়টা চতুর্গুণ দীর্ঘ হয়ে আসে—কেবল আপনার মনোরাজ্যে বাস করতে হয়, সেখানে ঘড়ি ঠিক চলে না। ভাবের তীব্রতা -অনুসারে মানসিক সময়ের পরিমাপ হয়—কোনো কোনো ক্ষণিক সুখ দুঃখ মনে হয় যেন অনেক ক্ষণ ধরে ভোগ করছি। যেখানে বাইরের লোকপ্রবাহ এবং বাইরের ঘটনা এবং দৈনিক কার্যপরম্পরা আমাদের সর্বদা সময়-গণনায় নিযুক্ত না রাখে সেখানে, স্বপ্নের মতো, ছোটো মুহূর্ত দীর্ঘকালে এবং দীর্ঘকাল ছোটো মুহূর্তে সর্বদাই পরিবর্তিত হতে থাকে। তাই আমার মনে হয় খণ্ড কাল এবং খণ্ড আকাশ আমাদের মনের ভ্রম। প্রত্যেক পরমাণু অসীম এবং প্রত্যেক মুহূর্তই অনন্ত। এ সম্বন্ধে পারস্য উপন্যাসে খুব ছেলেবেলায় একটা গল্প পড়েছিলুম, সেটা আমার ভারী ভালো লেগেছিল—এবং তখন যদিও খুব ছোটো ছিলুম তবু তার ভিতরকার ভাবটা এক রকম করে বুঝতে পেরেছিলুম। কালের পরিমাণটা যে কিছুই নয় সেইটে দেখাবার জন্যে একজন ফকির একটা টবের মধ্যে মন্ত্রঃপূত জল রেখে বাদশাকে বললে, 'তুমি এর মধ্যে ডুব দিয়ে স্নান করো।' বাদশা ডুব দেবা-মাত্র দেখলে সে এক সমুদ্রের ধারে নতুন দেশে গিয়ে উপস্থিত; সেখানে সে দীর্ঘ জীবন ধরে নানা ঘটনা নানা অবস্থার মধ্যে দিয়ে নানা সুখ দুঃখ অতিবাহন করলে। তার বিয়ে হল, তার একে একে অনেকগুলি ছেলে হল, ছেলেরা মরে গেল, স্ত্রী মরে গেল, টাকাকড়ি সব নষ্ট হয়ে গেল এবং সেই শোকে যখন সে একেবারে অধীর হয়ে পড়েছে এমন সময় হঠাৎ দেখলে সে আপন রাজসভায় জলের টবের মধ্যে। ফকিরের উপর খুব ক্রোধ প্রকাশ করাতে সভাসদ্‌রা সকলেই বললে, 'মহারাজ, আপনি কেবলমাত্র জলে ডুব দিয়েই মাথা তুলেছেন।'

আমাদের সমস্ত জীবনটা এবং জীবনের সমস্ত সুখ দুঃখ এইরকম এক

মুহূর্তের মধ্যে বদ্ধ— আমরা সেটাকে যতই সুদীর্ঘ এবং যতই সুতীব্র মনে করি, যেমনি সংসারের টব থেকে মাথা তুলব অমনি সমস্তটা মুহূর্তকালের স্বপ্নের মতো ক্ষুদ্র হয়ে যাবে। কালের ছোটো বড়ো কিছুই নেই— আমরাই ছোটো বড়ো। কেবল তোর চিঠি পাওয়ার সময় নির্ণয় করতে গিয়ে যে আমার এত কথা মনে হল তা নয়— থেকে থেকে এই কথাটা আমার মনে হয়, এবং জীবনের তীব্রতম সুখ দুঃখ বাসনাও যে স্থায়ী নয় এ কথার কোনো উত্তর দিতে না পেরে ভারী কষ্ট হয়। এর একটা উত্তর এই যে, সুখ দুঃখ স্থায়ী না হোক তার ফল স্থায়ী হতে পারে। কিন্তু আমাকে ভুলিয়ে আমাকে মিথ্যা ফাঁকি দিয়ে ফলভোগ কেন করাচ্ছে? আমাকে কেন বলছে 'ভালোবাসার ধন চিরকালের'? মানুষকে এমন মিথ্যা আশ্বাস কে দিয়েছে যে প্রেম মৃত্যুর উপরেও জয়লাভ করে, যে মিথ্যা আশ্বাসের প্রলোভনে মানুষ নিজে সাবিত্রী সত্যবানের গল্প রচনা করে নিজে সান্ত্বনা লাভ করছে? ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি।

কাল দিনের বেলাটা বেশ ছিল। আমার এই নদীর জলরেখা, বালির চর, এবং ও পারের বনদৃশ্যের উপরে মেঘ এবং রৌদ্রের মুহুর্মুহু নতুন খেলা চলছিল— খোলা জানলার ভিতর দিয়ে যে দিকেই চোখ পড়ছিল এমন সুন্দর দেখাচ্ছিল! স্বপ্নের মতো! সুন্দরকে কেন যে স্বপ্নের মতো বলে ঠিক জানি নে, বোধ হয় নিছক সৌন্দর্যটা প্রকাশ করবার জন্যে, অর্থাৎ ওর মধ্যে যেন realityর ভারটুকু মাত্র নেই— অর্থাৎ, এই শস্যক্ষেত্র থেকে যে আহার সংগ্রহ করতে হয়, এই নদী দিয়ে যে পাটের নৌকো যাবার রাস্তা, এই চর যে জমিদারের সঙ্গে খাজনা দিয়ে বন্দোবস্ত করে নিতে হয় ইত্যাদি শত সহস্র কথা মন থেকে দূর করে দিয়ে কেবলমাত্র হিসাবহীন আবশ্যকহীন বিশুদ্ধ আনন্দময় সৌন্দর্যের ছবি যখন আমরা উপভোগ করি তখন আমরা সেটাকে স্বপ্নের মতো বলি। অন্য সময়ে আমরা জগৎকে প্রধানত সত্য বলে দেখি, তার পরে তাকে আমরা সুন্দর অথবা অন্যরূপে জানি। কিন্তু যে সময়ে তাকে আমরা প্রধানত সুন্দর হিসাবে দেখি, তার পরে সত্য হোক না-হোক লক্ষ্য করি নে, তখন আমরা তাকে বলি 'স্বপ্নের মতো'।... সত্য এবং সুন্দরকে মানুষ মাঝে মাঝে পৃথক করে নেয়— science সত্য থেকে সুন্দরকে বাদ দেয় এবং কাব্য সুন্দরকে সত্য-হিসাবে খাতির করে না। scienceএ যে সৌন্দর্য পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে সত্যের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য সৌন্দর্য, কাব্যে যে সত্য পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে সৌন্দর্যের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য সত্য। স্থান অল্প বলে তুই এ যাত্রায় অনেক বকুনির হাত থেকে বেঁচে গেলি।

কলকাতা
২৫ জুন ১৮৯৪

১২২

শিলাইদহ
২৬ জুন। ১৮৯৪।

আজ সকালে বিছানা থেকে উঠেই দেখি পাংশুবর্ণ মেঘে আকাশ অন্ধকার এবং অবনত, বাদলার ভিজে হাওয়া দিচ্ছে, টিপ টিপ করে অবিশ্রাম বৃষ্টি পড়ছে,

নদীতে নৌকো বেশি নেই, ধান কাটবার জন্যে কাস্তে হাতে চাষারা মাথায় টোকা পরে গায়ে চট মুড়ি দিয়ে খেয়ানৌকোয় পার হচ্ছে, মাঠে গোরু চরছে না এবং ঘাটে স্নানার্থিনী জনপদবধূদের বাহুল্য নেই—অন্যদিন এতক্ষণ আমি তাদের উচ্চকণ্ঠের কলধ্বনি এ পার থেকে শুনতে পেতুম, আজ সে-সমস্ত কাকলি এবং পাখির গান নীরব। যে দিক থেকে বৃষ্টির ছাঁট আসবার সম্ভাবনা সে দিককার জানলা এবং পর্দা ফেলে দিয়ে অন্য দিককার জানলা খুলে আমি এতক্ষণ কাজের প্রত্যাশায় বসে ছিলুম। অবশেষে ক্রমেই আমার ধারণা হচ্ছে আজ এ বাদলায় আমলারা ঘরের বার হবে না—হায়, আমিও শ্যাম নই, তারাও রাধিকা নয়—বর্ষাভিসারের এমন সুযোগ মাঠে মারা গেল। তা ছাড়া বাঁশি যদি বাজাতুম এবং রাধিকার যদি কিছুমাত্র সুরবোধ থাকত তা হলে বৃকভানুনন্দিনী বিশেষ 'হর্ষিত' হত না। যাই হোক, অবস্থাগতিকে যখন রাধিকাও আসছেন না, আমলারাও আসছেন না এবং আমার 'Muse'ও সম্প্রতি আমাকে পরিত্যাগ করে বাপের বাড়ি চলে গেছেন, তখন বসে বসে একখণ্ড চিঠি লেখা যেতে পারে। আসল, হয়েছে কী, এতক্ষণ কোনো কাজ না থাকাতে নদীর দিকে চেয়ে গুন্ গুন্ স্বরে ভৈরবী টোড়ি রামকেলি মিশিয়ে একটা প্রভাতী রাগিণী সৃজন-পূর্বক আপন-মনে আলাপ করছিলুম, তাতে অকস্মাৎ মনের ভিতরে এমন একটা সুতীব্র অথচ সুমধুর চাঞ্চল্য জেগে উঠল, এমন একটা অনির্বচনীয় ভাবের এবং বাসনার আবেগ উপস্থিত হল, এক মুহূর্তের মধ্যেই আমার এই বাস্তবিক জীবন এবং বাস্তবিক জগৎ আগাগোড়া এমন একটা মূর্তিপরিবর্তন করে দেখা দিলে, অস্তিত্বের সমস্ত দুরূহ সমস্যার এমন একটা সংগীতময় ভাবময় অথচ ভাষাহীন অর্থহীন অনির্দেশ্য উত্তর কানে এসে বাজতে লাগল, এবং সেই সুরের ছিদ্র দিয়ে নদীর উপর জলের তরল পতনশব্দ অবিশ্রাম ধ্বনিত হয়ে এমন একটা পুলক সঞ্চার করতে লাগল—জগতের প্রান্তবর্তী এই সঙ্গীহীন একটিমাত্র প্রাণীকে ঘিরে আষাঢ়ের অশ্রুসজল ঘনঘোর শ্যামল মেঘের মতো 'সুখমিতি বা দুঃখমিতি বা' এমনি স্তরে স্তরে ঘনিয়ে এল যে, হঠাৎ এক সময়ে বলে উঠতে হল যে, 'থাক্, আর কাজ নেই, এইবার Criticisms on Contemporary Thought and Thinkers পড়তে বসা যাক।' কিন্তু বাদলার সকালে একেবারে অতটা-দূর পর্যন্ত বীরত্ব দেখানো আমার মতো দুর্বল লোকের কর্ম নয়। সেই জন্যে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে দোয়াত কলম নিয়ে চিঠি লিখতে বসাই স্থির করেছি।

আজকাল আমার নিজের কতবার ইচ্ছে করে যে, কোনোমতে নির্জন নিঃশব্দ খ্যাতিহীনতার মধ্যে ফিরে যাই। নিদেন, আমি যতদিন বেঁচে থাকি আমার জীবনের সমস্ত খ্যাতিকীর্তি কেবল আপনার মধ্যে বদ্ধ থাকে। তা হলে বেশ আরামে থাকতে পারি। অবশ্য, তোদের মানসিক প্রকৃতি-অনুসারে আমার সব লেখা তোদের কাছে ভালো না লাগতে পারে, এমন-কি, অনেক ভালো লেখাও অনাদৃত হতে পারে—কিন্তু তবু আর বাইরে বেরতে ইচ্ছা করে না।

কলকাতা
২৭ জুন ১৮৯৪

১২৩

শিলাইদহ
মঙ্গলবার ?
২৭ জুন। ১৮৯৪।

কাল থেকে হঠাৎ আমার মাথায় একটা হ্যাপি থট এসেছে। আমি চিন্তা করে দেখলুম, পৃথিবীর উপকার করব ইচ্ছা থাকলেও কৃতকার্য হওয়া যায় না, কিন্তু তার বদলে যেটা করতে পারি সেইটে করে ফেললে অনেক সময় আপনি পৃথিবীর উপকার হয়, নিদেন একটা কাজ সম্পন্ন হয়ে যায়। আজকাল মনে হচ্ছে, যদি আমি আর কিছু না করে ছোটো ছোটো গল্প লিখতে বসি তা হলে কতকটা মনের সুখে থাকি এবং কৃতকার্য হলে বোধ হয় পাঁচজন পাঠকেরও মনের সুখের কারণ হওয়া যায়। সাধনায় উচ্চ বিষয়ে প্রবন্ধ লিখে বঙ্গদেশকে উন্নতিপথে লগি ঠেলে নিয়ে যাওয়া খুব মহৎ কাজ সন্দেহ নেই, কিন্তু সম্প্রতি তাতে আমি তেমন সুখ পাচ্ছি নে এবং পেরেও উঠছি নে। গল্প লেখবার একটা সুখ এই, যাদের কথা লিখব তারা আমার দিনরাত্রির সমস্ত অবসর একেবারে ভরে রেখে দেবে, আমার একলা মনের সঙ্গী হবে, বর্ষার সময় আমার বদ্ধ ঘরের বিরহ দূর করবে এবং রৌদ্রের সময় পদ্মাতীরের উজ্জ্বল দৃশ্যের মধ্যে আমার চোখের 'পরে বেড়িয়ে বেড়াবে। আজ সকালবেলায় তাই গিরিবালা-নাম্নী উজ্জ্বলশ্যামবর্ণ একটি ছোটো অভিমানিনী মেয়েকে আমার কল্পনারাজ্যে অবতারণ করা গেছে। সবেমাত্র পাঁচটি লাইন লিখেছি, এবং সে পাঁচটি লাইনে কেবল এই কথা বলেছি যে, কাল বৃষ্টি হয়ে গেছে, আজ বর্ষণ-অন্তে চঞ্চল মেঘ এবং চঞ্চল রৌদ্রের পরস্পর শিকার চলছে, হেনকালে পূর্বসঞ্চিত বিন্দু-বিন্দু বারিশীকর -বর্ষী তরুতলে গ্রামপথে উক্ত গিরিবালার আসা উচিত ছিল, তা না হয়ে আমার বোটে আমলাবর্গের আগমন হল-- তাতে করে সম্প্রতি গিরিবালাকে কিছুক্ষণের জন্যে অপেক্ষা করতে হল। তা হোক, তবু সে মনের মধ্যে আছে। দিনযাপনের আজ আর-এক রকম উপায় পরীক্ষা করে দেখা গেছে। আজ বসে বসে ছেলেবেলাকার স্মৃতি এবং তখনকার মনের ভাব খুব স্পষ্ট প্রত্যক্ষবৎ মনে আনবার চেষ্টা করছিলুম। যখন পেনেটির বাগানে ছিলুম, যখন পৈতের নেড়া মাথা নিয়ে বাবামশায়ের সঙ্গে প্রথমবার বোলপুরের বাগানে গিয়েছিলুম, যখন পশ্চিমের বারান্দার সব-শেষের ঘরে আমাদের ইস্কুল-ঘর ছিল এবং আমি একটা নীল কাগজের ছেঁড়া খাতায় বাঁকা লাইন কেটে বড়ো বড়ো কাঁচা অক্ষরে প্রকৃতির বর্ণনা লিখতুম— যখন সেজদাদাদের ঘরে তোষাখানা ছিল এবং চিন্তা বলে একটা চাকর শীতকালের সকালে গুন্‌ গুন্‌ স্বরে গান করতে করতে কয়লার আগুনে জ্যোতিদাদার জন্যে মাখন দিয়ে রুটি তোষ করত--- তখন আমাদের গরম কাপড় ছিল না, একখানা কামিজ পরে সেই আগুনের কাছে বসে শীত নিবারণ করতুম এবং সেই সশব্দ-বিগলিত-নবনী-সুগন্ধি রুটিখণ্ডের উপরে লুব্ধদুরাশ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে চুপ করে বসে চিন্তার গান শুনতুম (সে সুরটা এখনও মনে আছে, তাকে মধুকানের সুর বলে)— সেই-সমস্ত দিনগুলিকে ঠিক বর্তমানের মতো করে দেখছিলুম এবং সেই-সমস্ত দিনগুলির সঙ্গে এই রৌদ্রালোকিত পদ্মা এবং পদ্মার চর ভারী এক রকম সুন্দরভাবে মিশ্রিত হচ্ছিল, ঠিক যেন আমার সেই ছেলেবেলাকার খোলা জানলার ধারে

বসে এই পদ্মার একটি দৃশ্যখণ্ড দেখছি বলে মনে হচ্ছিল। তার পরে ভাবলুম আমার হাতে কত ক্ষমতা আছে— আমি ইচ্ছা করলে গল্প লিখতে পারি, ইচ্ছা করলে আপনাকে বর্তমান থেকে অনেক দূর দেশে দূর কালে প্রত্যক্ষবৎ নিয়ে যেতে পারি, আমি কোনো বাস্তবিক সামগ্রী না নিয়েও আপনাকে অনেকটা সুখী করতে পারি। তার পরেই মনে পড়ল, প্রবাদ আছে : nothing succeeds like success। 'টাকায় টাকা আসে', তেমনি সুখে সুখ আনে। আমরা সুখের সময় মনে করি আমাদের সুখী হবার অসীম ক্ষমতা আছে— তার পরে দুঃখের সময় দেখি কোনো ক্ষমতাই কোনো কাজ করছে না, কিছুই হাতের কাছে পাওয়া যায় না, সব কল একেবারেই বিগড়ে গেছে। কাল বোধ হয় একটু কিছু সুখের জিনিস মনের ভিতরে রী রী করে উঠেছিল, তাই সমস্ত কলগুলো একেবারে চলতে আরম্ভ করেছিল— জীবনের অতীত স্মৃতি এবং প্রকৃতির বর্তমান শোভা এক-সঙ্গে সজীব হয়ে উঠেছিল, তাই সকালে আজ জেগে উঠেই মনে হল আমি কবি— আমার ক্ষমতার অন্ত নেই, আমি আমার রচনায় কল্পনায় আনন্দে পৃথিবী প্লাবিত করে দিতে পারি। যতই কবিত্ব থাক্, যতই ক্ষমতার গর্ব করি, মানুষ ভয়ানক পরাধীন। পৃথিবীর ভিতর থেকে এই কাঙাল জীবগুলো লম্বা হয়ে খাড়া হয়ে শীর্ণ হয়ে বেড়াচ্ছে— আস্ত স্বর্গ চায়, তার পরে টুকরো-টাকরা যা পায় তাতেই ক্ষুধানিবৃত্তির চেষ্টা করে, অবশেষে ভিক্ষাপ্রসারিত ঊর্ধ্বগামী দেহ ধূলিলুণ্ঠিত হয়ে পড়ে এবং মৃত্যুকে স্বর্গপ্রাপ্তি বলে রটনা করে। যেটুকু সুখে জীবনের সমস্ত কলগুলো চলে সেইটুকু সুখ যদি চিরকাল ধরে রাখা যায়, তা হলে সমস্ত শক্তি বিকশিত, সমস্ত কাজ সমাধা করে যাওয়া যেতে পারে। আজ গিরিবালা অনাহূত এসে উপস্থিত হয়েছেন, কাল বড়ো আবশ্যকের সময় বোধ হয় তাঁর দোদুল্যমান বেণীর সূচ্যগ্রভাগটুকুও দেখা যাবে না। কিন্তু সে কথা নিয়ে আজ আন্দোলনের আবশ্যক নেই। শ্রীমতী গিরিবালার তিরোধান-সম্ভাবনা থাকে তো থাক্— আজ যখন তাঁর শুভাগমন হয়েছে তখন সেটা আনন্দের বিষয় তার আর সন্দেহ নেই।...

তোর এবারকার পত্রে অবগত হওয়া গেল আমার ঘরের ক্ষুদ্রতমটি তাঁর ক্ষুদ্র ঠোঁট ফুলিয়ে অভিমান করতে শিখেছেন। আমি সে চিত্র বেশ দেখতে পাচ্ছি; তার সেই নরম নরম মুঠোর আঁচড়ের জন্যে আমার মুখটা নাকটা চোখটা যেন তৃষার্ত হয়ে আছে। সে যেখানে-সেখানে আমাকে মুঠো করে ধরে টল্‌মলে মাথাটা নিয়ে হাম করে খেতে আসত, এবং ক্ষুদে ক্ষুদে আঙুলগুলোর মধ্যে আমার চশমার হারটা জড়িয়ে নিতান্ত নির্বোধ নিশ্চিন্ত গম্ভীর ভাবে গাল ফুলিয়ে চেয়ে থাকত। তার মোটা মোটা ফুলো হাতটা গায়ের উপর এমনি মিষ্টি লাগে!

কলকাতা
২৮ জুন ১৮৯৪

১২৪

শিলাইদহ
[২৮ জুন ১৮৯৪

তবু আমার চিঠির কোনোরকম গোলমাল হলে ভারী ব্যস্ত হয়ে পড়ি। বোধ হয় ওর ভিতরেও খানিকটা নিজের সুখ আছে...নিয়মিত সময়ে আমার বকুনিগুলো তোদের কাছে গিয়ে পৌঁচচ্ছে এইটে কল্পনা করার একটা সুখ আছে। হঠাৎ সেই প্রবাহটা ভেঙে গেলে মনটা ছট্‌ফট্‌ করে ওঠে। আমার বোধ হয় দুঃখ-মাত্রেই ঐ একই কারণে। জীবনের সমস্ত প্রবাহ যে অভিমুখে সহজে ধাবিত হচ্ছে সেখানে বাধা পেলেই আহত হয়ে ফেনিল হয়ে নিজের মধ্যে বিভক্ত হয়ে ক্রন্দন করে ওঠে। নদী যেমন চলতে চলতে আপনার রাস্তা সুগম এবং সুগভীর করে খনন করে ফেলে আমাদের জীবনের শত সহস্র অভ্যাস সেইরকম বারম্বার চলতে চলতে আপনার পথ প্রস্তুত করে রাখে, সেই পথে হঠাৎ বাধা পেলে সে পীড়িত হয়ে পড়ে। আমার বাড়ি, আমার বন্ধু, আমার প্রিয়জন—প্রত্যেকেই আমার জীবনপ্রবাহের চিরপরিচিত সহজ পথ। আমার ইচ্ছা, আমার কল্পনা, আমার কাজ তাদের উপর দিয়ে শত-সহস্র ধারায় প্রবাহিত হচ্ছে। জীবনপ্রবাহের প্রত্যেক পথই যে আমার অভ্যাসরচিত পথ তা না হতেও পারে, স্বাভাবিক পথও আছে। নির্ঝর যেমন উপত্যকার দিকে যায়—উপত্যকা তার নিজের রচিত নয়। তেমনি প্রত্যেক মানুষের জীবননির্ঝরের এক-একটা বিশেষ উপত্যকা আছে—তার সমস্ত শক্তি সমস্ত গতি সেই দিকে ধাবমান হয়—তা যদি না হতে পায়, কোথাও যদি রুদ্ধ হয়ে পড়ে, তা হলে তার সমস্ত গতি, তার শক্তি, তার প্রাণ ব্যর্থ হয়ে পড়ে। তোর গেল চিঠিতে সুখদুঃখের প্রশ্ন তুলেছিস, তাই প্রসঙ্গক্রমে কথাটা বেশি ফলাও হয়ে পড়ছে। জীবনের সমস্ত শক্তির বিকাশ সমস্ত অংশের গতিকেই বলে সুখ এবং চরিতার্থতা। ভালোবাসা বল্‌, ঈশ্বরে ভক্তি বল্‌, পৃথিবীর উপকার বল্‌, নানা লোকে নানা উপায়ে আপনার জীবনকে গতি দেয়; যার যেটা নিকটবর্তী, যার যেটা সহজসাধ্য, যার যেটাতে অধিকাংশ জীবনের পরিতৃপ্তি, সে সেইটেই অবলম্বন করতে চেষ্টা করে—এ বিষয়ে বক্তৃতা দেওয়া বৃথা। সুখের উপায় পৃথিবীতে অনেক থাকতে পারে, কিন্তু সব উপায় সকলের কাছে নেই। যে দুর্ভাগ্য কোনো উপায়েই আপনার রুদ্ধ জীবনকে উন্মুক্ত করতে পারলে না তার কানের কাছে নীতিশাস্ত্র আউড়ে কী করব! হিমালয়ের শিখরে গঙ্গোত্রী আছে বলে আমাদের কালীগ্রামের রক্তদহর বিলকে গতি দিতে পারি নে। পৃথিবীতে চিরদুঃখী অনেক আছে, সে কথা অস্বীকার করবার জো নেই। কর্তব্যপালন করলেই সুখ হয় এ কথা নীতিশাস্ত্রের প্রতারণা, যেমন শিশুশিক্ষায় পড়তুম—

লেখাপড়া করে যেই
গাড়ি ঘোড়া চড়ে সেই।

এখন জানি লেখাপড়া করেও ট্র্যাম-গাড়ি চড়বার পয়সা অনেককে চেয়ে চিন্তে নিতে হয়, তেমনি অনেক হতভাগ্যকে সুখ না পেয়েও, এমন-কি দুঃখ পেয়েও কর্তব্য কর্ম করে যেতে হয়। তার পরে অভ্যাসের দ্বারা পথ ক্ষয়ে আসে; দুঃখের পথেও

ক্রমশ অভ্যাসে কিয়ৎপরিমাণে জীবনের সুগম রাস্তা কেটে আসে— প্রতিকূলতার পথেও খানিকটা অভ্যাসের রেখা পড়ে আসে, তার পরে হয়তো সমুদ্রের মধ্যে চরিতার্থতা লাভ না করে সমস্ত জীবন অর্ধপথে মরুভূমির মধ্যে শোষিত হয়ে যেতে পারে। এমন ঢের হয়ে থাকে, এগুলো হচ্ছে fact, এর উপরে মাথা খুঁড়ে মলেও একে মিথ্যা বলে প্রমাণ করা যায় না এবং বেদ পুরাণ কোরান বাইবেল থেকে শ্লোক উদ্ধৃত করে দেখালেও দুঃখ দুঃখই থেকে যাবে। পৃথিবীতে শত শত ফুল কুঁড়ি-অবস্থা থেকে আরম্ভ করে কীটের দংশনে জর্জরীভূত হয়ে কোনো ফল প্রসব না করেই ঝরে পড়ে মাটি হয়ে যায়— কৈফিয়ত জিজ্ঞাসা করলে উত্তর দেওয়া যায় না বলে ঘটনাটা অস্বীকার করবার দরকার দেখি নে। পৃথিবীতে শত শত অকৃতার্থ জীবন পরম দুঃখে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, কোথায় তাদের কী সান্ত্বনা আছে জানি নে। মানুষেরা আদিমকাল থেকে নানাবিধ সান্ত্বনা রচনা করে আসছে —কতরকম অনুমান কতকরকম কল্পনা স্তূপাকার করে তুলছে তার আর সংখ্যা নেই। আমি একদিন বোটে বসে ভাবছিলুম— মানুষ ভারাক্রান্ত জীব, তার সমস্ত আবশ্যকীয় জিনিসেরই ভার আছে, এমন-কি মনের ভাব প্রকাশ করে বই লিখেছে তাও পার্শেল পোস্টে পাঠাতে মাশুল দিতে প্রাণ বেরিয়ে যায়— কাপড়চোপড় বাসস্থান আহার প্রভৃতি তার সমস্ত জিনিস শত শত মুটের বোঝা। এইজন্যে এই-সকল ভার রক্ষা করেও কী উপায়ে ভার লাঘব করা যেতে পারে মানুষের এই এক প্রধান চেষ্টা। গাড়ির চাকা একটা মস্ত উপায়; অনেক ভার চাকার উপরে ফেলে সহজে নিয়ে যেতে পারে। জলের উপরে নৌকো এক মস্ত উপায় বেরিয়েছে; বিস্তর ভার অনায়াসে স্রোতের উপর সমর্পণ করে দেশ-বিদেশে নিয়ে যাওয়া যাচ্ছে। আমাদের ধর্মশাস্ত্র নীতিশাস্ত্র সমাজ সেইরকম ভারলাঘবের উপায়। অভাব বিচ্ছেদ মৃত্যু মানুষকে দুঃখভারে আক্রান্ত করবেই; এইজন্যে মানুষ আপনার ধর্মমত আপনার সমাজকে এমন করে গড়বার চেষ্টা করছে যাতে সেই ভারকে যথাসম্ভব হাল্কা করে ভাসিয়ে দেওয়া যায়। ভারগুলো যদি নিজের উপর স্থাপন করি তা হলে দুঃসহ হয়, যদি ধর্মের উপর সামাজিক কর্তব্যের উপর স্থাপন করি তা হলে অনেকটা আরাম পাওয়া যায়। কোনো একটা বৃহৎ ideaর গুণ হচ্ছে— বড়ো নদীর মতো তার একটা ভারবহনের এবং ভারচালনের শক্তি আছে; আমরা তার মধ্যে আপনাদের নিক্ষেপ করবামাত্র অনেকটা হাল্কা হয়ে যাই, আমাদের নিজের দুঃখকণ্টকে আর নিজের স্কন্ধে বহন করতে হয় না। যে বিষয়ের অবতারণা করা গেছে এর আর শেষ নাই। অথচ রাত্রি অনেক হয়ে আসছে এবং চিঠিও বাড়ছে। আর, আমার মনে হচ্ছে যে-সব কথার ভালো মীমাংসা নেই সে-সব কথা মানুষ চেপে রাখতেই ভালোবাসে— বেশি খোলসা করে বলতে গেলে শ্রোতার বিরক্তি বোধ হতে পারে।

কলকাতা
২৯ জুন ১৮৯৪

১২৫

শিলাইদহ
শনিবার, ৩০ জুন। ১৮৯৪।

আমি মনে করেছিলুম, সমস্ত গোলমাল একদিনে সেরে ফেলাই ভালো। নির্জনতার একটা প্রোগ্র্যাম ক্রমশই পাকাপাকি বাঁধা হয়ে যায়, তখন তার অখণ্ড সম্পূর্ণতাটুকু মাঝে মাঝে ভাঙতে কিছুতেই ইচ্ছা করে না— কেননা একবার এক দিনের মতোও ভেঙে গেলে আবার তার সূত্রগুলো জুড়ে নেওয়া কঠিন হয়ে ওঠে। বরঞ্চ প্রথম দিনকতক মনটা যখন নূতন নীড়ে আপনার স্থান করে নিতে পারে না বলে উড়ু-উড়ু করতে থাকে তখন বন্ধুসঙ্গ সহ্য হয়। এখন আমি আমার কাজের অবসরগুলি কল্পনা দিয়ে ভরাট করে নিয়েছি— সে জায়গায় হঠাৎ মানুষ এসে পড়লে ভারী একটা গোলোযোগ বেধে যায়। কল্পনা-জীবটি হরিণীর মতো ভীরুস্বভাব; প্রথমটা তাকে পোষ মানিয়ে আপনার করে নিতে কিছু সময় যায়, তার পরে আবার যদি তার বিচরণের স্থানে মানুষ এসে দাঁড়ায় তা হলে কিছুকালের মতো আবার তার দর্শন পাওয়া দুর্ঘট হয়ে ওঠে। সেই জন্যে আমার এই নির্জন রাজ্যে যেখানে আমার শরীরের চেয়ে মন ঢের বেশি জায়গা অধিকার করে থাকে, সেখানে হয় এমন লোক আসুক যে আমার কল্পনার চেয়ে প্রিয়, নয় এমন লোক আসুক যার প্রতি আমার মনোনিবেশ করবার তিলমাত্র আবশ্যক নেই। এর মাঝামাঝি হলেই মুশকিল। আমার এই ক্ষুদ্র নির্জনতাটি আমার মনের work-shopএর মতো, তার নানাবিধ অদৃশ্য যন্ত্রতন্ত্র এবং সমাপ্ত ও অসমাপ্ত কাজ চার দিকে ছড়ানো রয়েছে— বন্ধু যখন আসেন তখন সেগুলি তাঁর চোখে পড়ে না, কখন্ কোথায় পা ফেলেন তার ঠিক নেই, দিব্যি অজ্ঞানে হাস্যমুখে বিশ্বসংসারের খবর আলোচনা করতে করতে আমার অবসরের-তাঁতে-চড়ানো অনেক সাধনার সূক্ষ্ম সূত্রগুলি পট্ পট্ করে ছিঁড়তে থাকেন— যখন স্টেশনে তাঁকে পৌঁছে দিয়ে পুনর্বার একাকী আমার কর্মশালায় ফিরে আসি তখন দেখতে পাই আমার কত লোকসান হয়েছে। আমি ঠিক কিরকম ভাবে আমার জীবনটিকে রচনা করছি অন্য লোকে তা কী করে বুঝবে! যখন অন্য লোকের সঙ্গে একত্র বাস করা যায় তখন পরস্পর পরস্পরকে রচনা করে থাকি— তখন পরস্পরের জন্যে যথেষ্ট জায়গা রেখে দিই, এমন-কি নিজের জন্যে অতি অল্পই বাকি থাকে। কিন্তু যখন সম্পূর্ণ একলা থাকি— আমার সম্পূর্ণ 'আমি' কারও জন্যে কোনো মার্জিন না রেখে সম্পূর্ণ নিজের রচনা বিস্তার করতে থাকে, অনেকগুলি সূক্ষ্ম সুকুমার জিনিস নির্ভয়ে চারি দিকে বিছিয়ে দেয়— সেগুলি নিয়ে মহা বিপদ।... অনেক কথা, অনেক কাজ, অনেক আলোচনা আছে, যা অন্যের পক্ষে সামান্য এবং জনতার মধ্যে স্বাভাবিক— কিন্তু আমার নির্জন-জীবনের পক্ষে ভারী আঘাতজনক। তার কারণ, নির্জনে আমাদের সমস্ত গোপন অংশ, গভীর অংশ, বিচ্ছিন্ন অংশ সমগ্র হয়ে জেগে ওঠে— সে অনেকটা নিজের মতো, সুতরাং সৃষ্টিছাড়া অদ্ভুত হয়— সে অবস্থায় সে লোকসঙ্গের অনুপযোগী হয়ে ওঠে এবং তার সমস্ত প্রকৃতি একটা ঐক্য লাভ করাতে, যা-কিছু সেই ঐক্য ভেঙে দেয় তাই তাকে আঘাত করে।...বাহ্যপ্রকৃতির একটা মস্ত গুণ এই, সে অগ্রসর হয়ে মনের সঙ্গে কোনো বিরোধ করে না; তার নিজের মন বলে কোনো বালাই না থাকাতে আমার মনটিকে তার সমস্ত স্থান ছেড়ে

দিতে রাজি আছে— সঙ্গীর মতো নিয়ত সঙ্গ দান করে, অনন্ত স্থান অধিকার করে থাকে, অথচ আমার একতিল জায়গা জোড়ে না—নির্বোধের মতো বকে না, সুবুদ্ধির মতো তর্ক করে না, আমার মীরার মতো আকাশের কোলে শুয়ে থাকে, যখন শান্তভাবে থাকে সেও মিষ্টি লাগে, যখন গর্জন করে হাত পা ছুঁড়তে থাকে সেও মিষ্টি লাগে—বিশেষত যখন তার স্নান পান বেশপরিবর্তনের আশ্চর্য সুবন্দোবস্ত আছে, আমার উপরে তার কোনো ভার নেই, তখন সেই ভাষাহীন মনোহীন প্রকাণ্ড পরিপুষ্ট সুন্দর শিশুটি আমার নির্জনের পক্ষে বেশ। ভাষা-পরিপূর্ণ বুদ্ধিমান বয়ঃপ্রাপ্ত মনুষ্য লোকালয়েই অত্যন্ত উপাদেয়। এ-সব অসামাজিক কথা প্রকাশ না করাই উচিত, কিন্তু যে ভাবে বলছি সে ভাবটি গ্রহণ করলে ব্যাপারটা তত বেশি দোষাবহ মনে হবে না।

সাতারা
৫ জুলাই ১৮৯৪

১২৬

শিলাইদহ
৫ জুলাই। ১৮৯৪।

নতুনের মতো এমন স্বল্পস্থায়ী জিনিস আর কিছুই নেই। মানুষের হৃদয়টা সৌভাগ্যক্রমে এমন তরল যে প্রায় প্রত্যেক পাত্রেই অল্পকালের মধ্যেই সে আপনাকে মাপে মিলিয়ে নিতে পারে— কেবল কখনো কখনো ছোটো পাত্রে তাকে ধরে না এবং বড়ো পাত্রে তার ঢিলে বোধ হয়। এবং দৈবাৎ দু-চারটে হৃদয় পাওয়া যায় যারা পুরাতনের মধ্যে জমে শক্ত হয়ে যায়— তাদের নূতন পাত্রে পুরতে গেলে ভেঙে ফেলতে হয়।

সাতারা
১০ জুলাই ?
১৮৯৪

১২৭

শিলাইদহ
বৃহস্পতিবার ?
৬ জুলাই। ১৮৯৪।

কাল দুপুরবেলা সবেমাত্র একটুখানি জমিয়ে লিখতে বসেছি, পাঁচ লাইন লিখেছি কি না, এমন সময় মৌলবী এসে উপস্থিত। সে আমাকে লিখতে দেখে প্রথমে আশ্বাস দিলে যে কেবল 'দোঠো কথা' বলে সে চলে যাবে— তার পরে সেই 'দোঠো

কথা' বলতে ঠিক দোঠো ঘণ্টা কাটিয়ে সে যেমন চলে যাচ্ছে অমনি ডাঙা থেকে এক চীৎকারধ্বনি শোনা গেল—'মহারাজ, আজ এক-সপ্তাহ-কাল দর্শন-প্রার্থী হয়ে আছি, কিন্তু দৌবারিকগণ নিষেধ করছে।' ভাষা শুনেই বোঝা গেল লোকটি যে-সে নন। 'দৌবারিক'কে নিষেধ করতে নিষেধ করলুম। তখন একটি গেরুয়া-বসন ও তিলকধারী দীর্ঘশ্মশ্রু বিরলকেশ উচ্চললাট প্রসন্ন-প্রশান্ত-মূর্তি ব্রাহ্মণ আমার সম্মুখে এসে দাঁড়িয়ে এক মস্ত কাগজ বের করলে। ভাবলুম দরখাস্ত। তার পরে দেখি স্বয়ং সেটি উচ্চস্বরে পড়তে আরম্ভ করে দিলে। প্রথম ছত্র পড়বা-মাত্রই বোঝা গেল সেটি কবিতা। তাতে ব্রাহ্মণ বৈকুণ্ঠনিবাসী হরির গুণগান করছেন। আমি গম্ভীর হয়ে বসে শুনতে লাগলুম। যতক্ষণ হরি বৈকুণ্ঠে ছিলেন ততক্ষণ কবিতা ত্রিপদীতে চলছিল, তার পরে দেখি হরি হঠাৎ 'জগৎসংসারে-খ্যাতা রাজধানী কলিকাতা'য় ঠাকুর উপাধি রক্ষাপূর্বক দ্বারকানাথ হয়ে পৃথিবীতে নেমে এসেছেন—কবিতাও ত্রিপদী থেকে ক্রমে পয়ারে নেমে এল। পয়ার ক্রমে দেবেন্দ্রনাথের স্তব সমাধা করে যখন রবীন্দ্রনাথে এসে দাঁড়ালো তখন আমি মনে মনে অস্থির হয়ে উঠলুম। আমার কবিত্ব আমার বদান্যতা যে বিশ্বজগতে রবিকিরণের মতো বিকীর্ণ হচ্ছে এবং তাতে করে অজ্ঞান এবং দারিদ্র্য-অন্ধকার দূরীভূত হচ্ছে, এ তুলনাটা যতই সুন্দর হোক, এ সংবাদটা আমার কাছে নূতন বলে ঠেকল। আর যাই হোক, বদান্যতার খ্যাতিটা প্রচার হওয়া কিছু না। আমি তাঁকে বলে দিলুম, 'কাছারিতে যাও, আমার অন্য কাজ আছে।' সে লোকটি বললে, 'আপনার কাজ আপনি করে যান আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ আপনার মুখচন্দ্রমা নিরীক্ষণ করি'—বলে বিস্ময়ের ভঙ্গী ধারণ করে আমার সামনে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে অত্যন্ত অবোধ জন্তুর মতো আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল; আমার সংকুচিত অন্তরাত্মা সমস্ত শরীরের ভিতর যেন সুড়্‌সুড়্‌ করতে লাগল। তাকে বারম্বার যেতে বললুম। তখন সে বললে, 'কী দিতে ইচ্ছে করেন এই কাগজে লিখে দিন, আমি নায়েব মশায়ের কাছে নিয়ে যাই এবং তাঁকেও শুনিয়ে আসি।' আমি মনে মনে ভাবলুম, আমারও এই ব্যাবসা, আমি কবিতা শুনিয়ে পয়সা পেয়ে থাকি। কিন্তু আমাকেও অনেক দ্বার থেকে রিক্ত হস্তে ফিরে আসতে হয়—ব্রাহ্মণকেও ফিরতে হল। শ্রীহরির চারি হস্তে শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম আছে। শ্রীহরির এই অবতারটি, যে হস্তে গদা কেবল সেই হস্তটা ব্রাহ্মণকে দেখিয়ে বিদায় করে দিলেন। সে বোটের বার হতে না হতে দ্বারী মজুমদার বলে এই বিরাহিমপুরের একটি সুবিখ্যাত বক্তা এসে উপস্থিত। আমি বক্ষের উপর দুই হস্ত আবদ্ধ করে চৌকিতে হেলান দিয়ে কঠিন প্রস্তরমূর্তির মতো আড়ষ্ট হয়ে বসে রইলুম। সে প্রথমে আরম্ভ করে দিলে—'মহারাজ, পুরাকালে যুধিষ্ঠিরের হিস্টিরিয়া (হিস্ট্রি) পাঠ করে অনেকেই অবিশ্বাস করে থাকেন; তাঁরা বলেন এতদূর কি কখনো সম্ভব হতে পারে, কিন্তু এতকাল পরে আপনাকে চাক্ষুষ দেখে যুধিষ্ঠিরের কীর্তিকলাপের প্রতি তাঁদের সন্দেহভঞ্জন হয়েছে।'—এই রকম ভাবে চলল। আমি যখন তাকে বললুম 'এইবার তুমি কাছারিতে বিশ্রাম করো গে' সে বললে, 'আজ আর আমার বিশ্রাম কিসের! আজ কতদিন পরে হুজুরের দর্শন পেয়েছি, আজ প্রায় সাত আট ন মাস অপেক্ষা করে অবশেষে শ্রীচরণ দেখতে পেলুম—দেখতে যে পাব সে কি আর আশা ছিল!' বলতে বলতে তার কণ্ঠস্বর কম্পিত এবং রুদ্ধ হয়ে এল, বার বার শুষ্ক চক্ষু চাদরে মুছতে লাগল; ক্রমে, তার প্রতি তার পূর্বপ্রভু জ্যোতি-দাদার যে অসীম স্নেহ এবং বিশ্বাস ছিল তাই মনে পড়ে তার চিত্ত উত্তরোত্তর

অধিকতর উদ্‌বেলিত হয়ে উঠতে লাগল।......সে কী কী কাজ করেছিল, কী কী ঘটনা ঘটেছিল, তার মনিবরা কী কী কথা বলেছিল এবং সে তার কী কী উত্তর দিয়েছিল তার কোনোটাই বাদ না দিয়ে সমস্তই আনুপূর্বিক বলে যেতে লাগল। সূর্য অস্ত গেল, সন্ধ্যা হল; পাখিরা নীড়ে, গাভীরা গোষ্ঠে, চাষারা কুটীরে ফিরে গেল—দ্বারী মজুমদার বোট থেকে নড়ে না। এমন সময় কুষ্টিয়া থেকে আর-একটি দর্শনপ্রার্থী যখন এল তখন সে 'কাল প্রাতঃকালে' বাকি কথাগুলো বলতে আসবে বলে আমাকে সান্ত্বনা করে চলে গেল। এখনো সে আসে নি, কিন্তু তারই সমান বক্তা একজন এসে আমার পার্শ্ববর্তী বেঞ্চিতে বসে বক্তৃতার অবসর-প্রতীক্ষায় আছেন।

সাতারা
১১ জুলাই ১৮৯৪

১২৮

সাহাজাদপুর-পথে
শুক্রবার?
[৭ জুলাই ১৮৯৪]

আমি এখন পথে। কাল যখন দুপুরবেলায় বোট ছাড়তে যাচ্ছি একজন আমলা এসে করযোড়ে বললে, 'ধর্মাবতার, আজকে বোট না ছেড়ে কাল সকালবেলায় ছাড়লে ভালো হয়।' আমি তার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে বললে, ত্র্যহস্পর্শ পড়েছে, আজ বড়ো অযাত্রা। আমি বললুম, আমি প্রমাণ করে দেব আজ যাত্রা শুভ-- আমি নির্বিঘ্নে সাজাদপুরে পৌঁছব। এই বলে গ্রহ তারা তিথির মুখের উপর তুড়ি মেরে বেরিয়ে পড়লুম। পথে স্থানে স্থানে পদ্মার ভয়ানক স্রোত---জল ঘুরে-ঘুরে ফুলে-ফুলে ডাঙার উপর গিয়ে ঠেসে পড়ছে; বোট কিছুতেই এগোতে চায় না, তার সমস্ত পাঁজরা থর্‌থর্‌ করে কাঁপে, যারা গুণ টানছে তারা সবলে মাটির উপর ঝুঁকে পড়েও প্রায় কিছুতেই পা রাখতে পারে না; আমি ভাবলুম গ্রহ তারা তিথি এইবার বুঝি আমার নাকের উপরে তুড়ি দিচ্ছে। খানিকটা দূর গিয়ে গড়ুই পেরিয়ে যখন আসল পদ্মায় পড়লুম তখন পাল পাওয়া গেল—তখন সগর্বে সবেগে প্রতিকূল স্রোতের বক্ষ বিদীর্ণ করে ঢেউয়ের উপর দিয়ে নাচতে নাচতে চলে যেতে লাগলুম। বিকেলে পাঁচটা-ছটা বেলায় ইছামতী নদীর মধ্যে প্রবেশ করা গেল।...

সন্ধেবেলায় পাবনা শহরের একটি খেয়া ঘাটের কাছে বোট বাঁধা গেল। ও পার থেকে জন-কতক লোক বাঁয়াতবলার সঙ্গে গান গাচ্ছে, একটা মিশ্রিত কলরব কানে এসে প্রবেশ করছে, রাস্তা দিয়ে স্ত্রী-পুরুষ যারা চলেছে তাদের ব্যস্ত ভাব, গাছপালার ভিতর দিয়ে সব দীপালোকিত কোঠাবাড়ি দেখা যাচ্ছে, খেয়াঘাটে ভদ্র অভদ্র নানা শ্রেণীর লোকের ভিড়। আকাশে খুব নিবিড় একটা একরঙা মেঘ, সন্ধ্যাও অন্ধকার হয়ে এসেছে; ও পারে সার-বাঁধা মহাজনি নৌকোয় আলো জ্বলে উঠল, মন্দির থেকে সন্ধ্যারতির কাঁসর ঘণ্টা বাজতে লাগল—বাতি নিবিয়ে দিয়ে বোটের জানলায় বসে আমার মনে ভারী একটা অপূর্ব ভাবের আবেগ উপস্থিত হল।

অন্ধকারের আবরণের মধ্যে দিয়ে এই লোকালয়ের একটি যেন সজীব হৃৎস্পন্দন আমার বক্ষের উপর এসে আঘাত করতে লাগল। এই মেঘলা আকাশের নিচে নিবিড় সন্ধ্যার মধ্যে কত লোক, কত ইচ্ছা, কত কাজ, কত গৃহ, গৃহের মধ্যে জীবনের কত রহস্য—মানুষে মানুষে কাছাকাছি ঘেঁষাঘেঁষি কত শত সহস্র প্রকারের ঘাত প্রতিঘাত! বৃহৎ জনতার সমস্ত ভালোমন্দ সমস্ত সুখদুঃখ এক হয়ে তরুলতাবেষ্টিত ক্ষুদ্র বর্ষানদীর দুই তীর থেকে একটি সকরুণ সুন্দর রাগিণীর মতো আমার হৃদয়ে এসে প্রবেশ করতে লাগল। আমার 'শৈশবসন্ধ্যা' কবিতাটায় বোধ হয় কতকটা এই ভাব প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছিলুম। কথাটা সংক্ষেপে বোধ হয় এই যে, মানুষ ক্ষুদ্র এবং ক্ষণস্থায়ী, অথচ ভালোমন্দ এবং সুখদুঃখ-পরিপূর্ণ জীবনের প্রবাহ সেই পুরাতন সুগভীর কলস্বরে চিরদিন চলছে এবং চলবে—নগরের প্রান্তে সন্ধ্যার অন্ধকারে সেই চিরন্তন কলধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়। তখন মানুষের দৈনিক জীবনের ক্ষণিকতা এবং স্বাতন্ত্র্য সেই অবিচ্ছিন্ন সুরের সঙ্গে মিলিয়ে যায়—সব-সুদ্ধ খুব একটা বৃহৎ বিস্তৃত বিষাদপূর্ণ রহস্যময় আদি-অন্ত-শূন্য প্রশ্নোত্তরহীন নিরুদ্দেশ মহাসমুদ্রের একতান শব্দের মতো অন্তরের নিস্তব্ধতার মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করতে থাকে। কাল সন্ধ্যাবেলায় আমার মনের ভিতরে যেরকম করছিল সে বোধ হয় বর্ণনাদ্বারা ঠিক বোঝাতে পারব না। এক-এক সময়ে কোথাকার কোন্ ছিদ্র দিয়ে জগতের বড়ো বড়ো প্রবাহ আমাদের হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করে, তার যে-একটা ধ্বনি হতে থাকে সেটাকে কথায় তর্জমা করা অসাধ্য। সেই জন্যে দেখেছি আমার মনের অনেক সুতীব্র সুগভীর ভাব কবিতায় লেখা হয় নি। হয়তো আমার লেখার মধ্যে মাঝে মাঝে আভাসের মতো প্রকাশ পেয়ে থাকবে।

সাতারা
১৩ জুলাই ১৮৯৪

১২৯

সাহাজাদপুর-পথে
৭ জুলাই। ১৮৯৪।

The Jew বলে একটা Polish নভেল পড়ে দিন কাটাতে হল। অদৃষ্টক্রমে সে নভেলটা নিতান্তই অপাঠ্য—কেবলমাত্র আরম্ভ করেছিলুম বলে প্রাণপণে শেষ করে ফেললুম। আরম্ভ করেছি বলেই যে শেষ করতে হবে এ কর্তব্যবোধের অর্থ বোঝা শক্ত। ওটা ঠিক কর্তব্যবোধ নয়—লো[কেন] যে বলে আমাদের সমস্ত মনোবৃত্তির একটা অহংকার আছে সেটা কতকটা ঠিক। তারা কেউ সহজে স্বীকার করতে চায় না আমরা সামান্য বা ক্ষণস্থায়ী বা অল্প বাধাতেই পরাভূত—এই জন্যে অনেক সময়ে তারা নিজেকে ধুইয়ে ধুইয়ে জাগিয়ে রাখে। আমাদের ইচ্ছাশক্তিরও একটা গর্ব আছে—সে একটা জিনিস নিজে আরম্ভ করেছে বলেই অবশেষে নিজের বিরুদ্ধেও সেটা শেষ করতে চায়। সেই একগুঁয়ে অনাবশ্যক অহংকার-বশত একটা বাজে-বকুনি-ভরা অসংলগ্ন প্রকাণ্ড অপাঠ্য গ্রন্থ একটি দীর্ঘ বর্ষাদিনে বন্ধ ঘরে

বসে শেষ করলুম—শেষ করবার মহৎ সুখ ছাড়া আর কোনো সুখ পেলুম না। লেখবার বাসনা ছিল, কিন্তু অবরুদ্ধ স্যাঁতসেঁতে অবস্থায় লেখা হয় না। আমি ভাবছিলুম, এই সংকীর্ণ বাঁকা ইছামতীর ভিতর দিয়ে আমি যতবার গেছি তোকে রোজ চিঠি লিখেছি—এবারেও লিখছি। আমার মফস্বলের চিঠিগুলো ঠিক সেই একই স্থান, একই দৃশ্য, একই অবস্থার মধ্যে বারম্বার লেখা—সবগুলো মিলিয়ে দেখলে বোধ হয় কতই যে পুনরাবৃত্তি পাওয়া যায় তার আর সংখ্যা নেই। বোধ হয় কতবার অবিকল একই ভাষা ব্যবহার করেছি। কলকাতায় থাকলে নিত্য নতুন কথা বলা সহজ—কিন্তু পাড়াগাঁয়ে কেবল দুটি মাত্র বিষয় আছে, প্রকৃতি এবং স্বয়ং আমি—এই দুটি বিষয়ই আমার পক্ষে যথেষ্ট আনন্দদায়ক—এবং এই দুটি বিষয়ের মধ্যে বৈচিত্র্যেরও অভাব নেই—কিন্তু মানুষের 'পএণ্ট্ অফ্ ভিয়ু' এবং প্রকাশ করবার ভাষা এবং ক্ষমতা সীমাবদ্ধ—কাজেই সহস্রবার পুনরুক্তি করা ছাড়া আর উপায় নেই। বারম্বার একই কথা শুনে শুনে তোর বোধ হয় আমার মফস্বলের মনের ভাব এবং দৈনিক জীবন এক রকম কণ্ঠস্থ হয়ে গেছে—তুই বোধ হয় অনায়াসে আমার মফস্বলের চিঠি জাল করে লিখতে পারিস। এবারে যদি বৃষ্টি না হয়ে রৌদ্র হত এবং জানলার কাছে বসে সমস্তদিন নদীতীরের দৃশ্য দেখতে পেতুম, তা হলে নিশ্চয় এই বাঁকা নদী সম্বন্ধে এমন সব কথা লিখতুম যা পূর্বে নিদেন চারবার লিখেছি; এবং মনে করতুম যেন এ-সব কথা এই প্রথম লিখছি। কেবল তাই নয়, মনে হত—ইছামতীর নদীতীর দেখে আমার মনে অনির্বচনীয় ভাবোদ্রেক যেমন আমার কাছে তেমনি তোর কাছে একটা অসামান্য মস্ত খবর—সেটাকে ঠিক যথার্থ ভাবে এবং সম্পূর্ণ ভাবে প্রকাশ করা, সেটাকে দুর্গম মনোরাজ্য থেকে সমূলে সংগ্রহ করা এবং আদ্যোপান্ত তোর কাছে পাঠিয়ে দেওয়া একটা প্রাণপণ আবশ্যকীয় কাজ। আজকাল প্রমাণ হয়েছে যারা জাত-লেখক তারা পাগলের রূপান্তর। আমার সেটা অনেকটা ঠিক বোধ হয়। মনের ভাব ব্যক্ত করতে না পারলে দুঃখ অনুভব করা, ওটা একটা পাগলামি মাত্র।

ব[ড়দাদা] তাঁর বক্সোমেট্রি না লিখে থাকতে পারেন না। বী[রেন্দ্র] দেয়ালে দেয়ালে এবং তেতালার প্রত্যেক টবে সূর্য এঁকে তার মাঝখানে লিখে রাখছেন 'সূর্য'—কত ধরে ধরে, কতবার মুছে, কত যত্ন করে যে আঁকেন তার ঠিক নেই। ঐ সূর্যটি ঠিক প্রকাশ করার উপরে তাঁর এবং পৃথিবীর কী সুখ নির্ভর করছে তা অন্তর্যামী জানেন। আমারও সেই একই পাগলামি, কেবল বিষয়ভেদ এবং প্রকারভেদ।

যারা সম্পূর্ণ অথবা বারো-আনা পাগল তারা নিজের পাগলামি বুঝতে পারে না। আমি জানি আমার এক অংশ পাগল—যতই ইচ্ছা করি, চেষ্টা করি, আমি ইহজীবনে কিছুতেই তাকে বাঁধতে পারব না; আমার সহজ অংশ যা প্রতিজ্ঞা করে আমার পাগল তা রক্ষা করে না, ভেঙে দেয়।

সাতারা
১৩ জুলাই ১৮৯৪

১৩০

সাহাজাদপুর
১০ জুলাই। ১৮৯৪।

যারা আমাদের কাছাকাছির লোক এবং যাদের চিরদিন কাছাকাছি রাখতে ভালোবাসি তাদের জীবনের কোনো অংশ দৃষ্টিপথাতীত করতে ইচ্ছে করে না— কিন্তু ভালো করে ভেবে দেখলে হাসি পায় যে, অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা থাকলেও ইহজীবনে দুটো মানুষে কতটুকু অংশ রেখায় রেখায় সংলগ্ন। যাকে দশ বৎসর জানি, সেই দশ বৎসরের কত সুদীর্ঘ অংশ তাকে জানি নে— বোধ হয় আজীবন সম্পর্কের জমা খরচ হিসাব করলে খুব একটা বড়ো রকম অঙ্ক হাতে থাকে না। এই তো কেবল চোখের জানা, তার পরে মনের জানার তো কথাই নেই। সে কথা ভেবে দেখলে সবাইকেই অপরিচিত বলে বোধ হয় এবং তখন বুঝতে পারি আমাদের মধ্যে খুব বেশি পরিচয় হবার কোনো কথা নেই— কেননা আমাদের দুদিন পরে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হতে হবে, এবং আমাদের পূর্বে কোটি কোটি লোক এই সূর্যালোকে নীলাকাশের নিচে জীবনের পান্থশালায় মিলেছে এবং বিচ্ছিন্ন হয়ে বিস্মৃত হয়ে অপসৃত হয়ে গেছে। এ রকম করে ভেবে দেখলে কোনো কোনো প্রকৃতিতে হয়তো বৈরাগ্যের উদয় হয়, মনে হয় ‘তবে আর কেন’— কিন্তু আমার ঠিক উল্টো হয়। আমার আরও বেশি করে দেখতে, বেশি করে জানতে, বেশি করে পেতে ইচ্ছে করে। এক-এক সময় মনে হয়, এই-যে আমরা গুটিকতক সচেতন প্রাণী জড়মহাসমুদ্রের মধ্যে মাথা তুলে বুদ্‌বুদের মতো ভেসে উঠেছি এবং কাছাকাছি এসে ঠেকেছি এ একটা আকস্মিক সংযোগ— এই সংযোগটুকুর মধ্যে যত বিস্ময় যত প্রেম যত আনন্দ তা আবার অনন্তকালের মধ্যে গড়ে উঠবে কি না সন্দেহ। বসন্তরায়ের কবিতায় এক জায়গায় একটা লাইন আছে—

নিমিখে শতেক যুগ হারাই হেন বাসি।

বাস্তবিক মানুষের এক নিমেষের মধ্যে শত যুগের সংযোগ বিয়োগ ঘটতে পারে। সেই জন্যে নিমেষগুলোকে দুর্মূল্য বলে বোধ হয়। কথাগুলো নতুন নয়, কিন্তু আমার কাছে এক-এক সময় এমন আশ্চর্য নতুন বলে ঠেকে। এবারে চলে আসবার আগে যেদিন একদিন দুপুরবেলায় স... পার্ক স্ট্রীটে এসেছিলেন, তুই পিয়ানোয় বসেছিলি, আমি গান গাবার উদ্যোগ করছিলুম, হঠাৎ তোদের দিকে চেয়ে আমার মনে হল, এই-যে তুই দুপুরবেলায় চুল বেঁধে কাপড় পরে একটি বিশেষ মেঘলা দিনে খোলা জানলার সামনে পিয়ানোর কাছে বসেছিস, আমি-নামক এক ব্যক্তি পিয়ানোর ডালার উপর হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছি, স... গান শোনবার অপেক্ষা করে বসে আছেন— অনন্তকালের অসীম ঘটনাপরম্পরার মধ্যে এই একটুখানি আশ্চর্য ব্যাপার। মনে হল এর মধ্যে যেটুকু সৌন্দর্য আছে এবং আনন্দ আছে তার আর সীমা নেই, এই-যে মেঘলা আকাশের আলোটুকু আসছে এ এক অসাধারণ লাভ। প্রতিদিনের অভ্যাসের জড়ত্ব হঠাৎ এক মুহূর্তের জন্যে এক-এক সময়ে কেন যে একটুখানি ছিঁড়ে যায় জানি নে; তখন যেন সদ্যোজাত হৃদয় দিয়ে আপনাকে, সম্মুখবর্তী দৃশ্যকে এবং বর্তমান ঘটনাকে অনন্তকালের চিত্রপটের উপর প্রতিফলিত দেখতে পাই। তখন তোরা যে তোরা এবং আমি যে আমি— এবং আমি যে তোদের চেয়ে দেখছি এবং তোদের কথা শুনছি এবং তোদের আপন

ভাবছি এবং তোরা আমাকে আপন ভাবছিস, অনন্তকালের মাঝখানে এই একটি আশ্চর্য ঘটনা নূতন করে বৃহৎ করে দেখতে পাই। এমন আশ্চর্য ঘটনা আবার কখনও হতে পারবে কি না কে জানে! আমি অনেক সময়েই এক রকম করে জীবনটাকে এবং পৃথিবীটাকে দেখি যাতে করে মনে অপরিসীম বিস্ময়ের উদ্রেক হয়—সে আমি হয়তো আর কাউকে ঠিক বোঝাতে পারব না। সেই জন্যে আমার কাছে অনেক জিনিস এমন বেশি হয়ে ওঠে যা অন্যের কাছে অস্বাভাবিক আতিশয্য বলে মনে হতে পারে। 'সকল-তাতেই বাড়াবাড়ি'। অভ্যাসের একটা গুণ আছে যে, অনেকগুলো জিনিসকে কমিয়ে এনে হাল্কা করে দিয়ে যায়, বর্মের মতো আচ্ছন্ন করে বাইরের অনেকগুলো সংস্পর্শ থেকে মনকে রক্ষা করে, কিন্তু সেই অভ্যাস আমার মনকে সম্পূর্ণ আবৃত করতে পারে না—আমার কাছে পুরাতন প্রতিদিন নূতন করে ঠেকে। সেইজন্যে অন্য লোকের সঙ্গে ক্রমশ আমার মনের perspective আলাদা হয়ে যায়; ভয়ে ভয়ে পরীক্ষা করে দেখতে হয় কে কোন্‌খানে আছি।

সাতারা
১৫ জুলাই ১৮৯৪

১৩১

কলকাতা-পথে
১৩ জুলাই ?
১৮৯৪।

ইছামতীর ভিতরে ঢোকা গেল। কী সুন্দর উজ্জ্বল দিনটি হয়েছিল! ছোটো নদীটির দুই ধারের দৃশ্য দেখে চোখ ফেরানো যায় না। আকাশে মেঘ প্রায় নেই—নদীর ধারের বনগুলি এবং গাঢ়সবুজ শস্যক্ষেত্র রৌদ্রে প্রফুল্ল হয়ে রয়েছে, বাতাসটি বেশ মিষ্টি লাগছে—বিছানার উপরে জানলার কাছে গোটা পাঁচ-ছয় বালিশ উঁচু করে রাজার মতো আরামে বসে রইলুম, চোখের উপরে কে যেন স্বপ্ন মাখিয়ে দিয়েছে—জেলেরা মাছ ধরছে, মেয়েরা কাপড় কাচছে, ছেলেরা জলের মধ্যে পড়ে তোলপাড় করছে, গোরুগুলো চরছে, জলমগ্ন ধানের ক্ষেতে বক বসে রয়েছে, সমস্ত ছবির মতো দেখাচ্ছে। কেন যে এমন অত্যন্ত ভালো লাগছিল তা বর্ণনা করে বোঝাবার জো নেই। সুন্দর জিনিসকে যে কারণে স্বপ্নের মতো বলি ঠিক সেই কারণে তাকে ছবির মতো বলি। নইলে কথাটা আসলে একটু অদ্ভুত—জিনিসের মতো ছবি বললে অন্যায় হয় না, কিন্তু ছবির মতো জিনিস বললে এক হিসাবে কথাটা উল্টো হয়। কিন্তু প্রকৃত অর্থটা হচ্ছে এই যে, ছবিতে জিনিসের কেবল একটিমাত্র অংশ আমাদের চোখের সামনে ধরে দেওয়াতে শুদ্ধমাত্র দৃশ্য-সৌন্দর্যের উপভোগটাই আমাদের মনে তীব্র হয়ে ওঠে। আমার বোধ হয় আর্ট্‌মাত্রেরই কাজ হচ্ছে বিশ্বের যেটুকু আমাদের মনোহরণ করে সেইটুকুকে সযত্নে তার অন্য অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে আমাদের কাছে অবিমিশ্র উজ্জ্বল করে ধরা। সত্যের উপরিভাগ থেকে সেইটুকু ছেঁকে নেওয়া—সাজিয়ে তোলা আর্টিস্টের

কাজ। সেইজন্যে আমার মনে হয় বিশুদ্ধ আর্ট্‌ হচ্ছে ছবি এবং গান— সাহিত্য নয়। মানুষের ভাষা, মানুষের তুলি এবং কণ্ঠের চেয়ে ঢের বেশি মুখর বলে সাহিত্যে আমরা অনেক জিনিস মিশিয়ে ফেলি— সৌন্দর্যপ্রকাশের উপলক্ষে খবর দিই, উপদেশ দিই, নানা কথা বলে নিই। যাই হোক, আমরা 'ছবির মতো' 'গানের মতো' 'স্বপ্নের মতো' কথা বার বার ব্যবহার করে থাকি— কিন্তু ওটা কথার কথা নয়। আমরা সত্যের চেয়ে সৌন্দর্য, জ্ঞানের চেয়ে আনন্দ বেশি স্বর্গীয় বলে বোধ করি।—

কিন্তু এ দিকে আমার বোট এগোচ্ছে না। যে বাতাস যমুনায় আমাদের বাধা দিচ্ছিল সেই বাতাস ইছামতীতে আমাদের অনুকূল হতে পারত, সেই ভরসায় এ পথে প্রবেশ করেছিলুম। কিন্তু বাতাসের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা সুবুদ্ধির কাজ নয়। পাগলামি ঊনপঞ্চাশ শ্রেণীতে বিভক্ত করে লোকে তাকে ঊনপঞ্চাশ বায়ু নাম দিয়েছে। বাস্তবিক পঞ্চভূতের মধ্যে বায়ুতে যে পরিমাণে পাগলামি আছে এমন আর কোনোটাতে নেই।

সাতারা
১৮ জুলাই ?
১৮৯৪

১৩২

কলকাতা
১৫ জুলাই। ১৮৯৪।

স্টীমার যখন ইছামতী থেকে বেরিয়ে সন্ধ্যাবেলায় পদ্মার মধ্যে এসে পড়ল তখন যে কী সুন্দর শোভা দেখেছিলুম সে আর কী বলব। কোথাও কোনো কূল কিনারা দেখা যাচ্ছে না— ঢেউ নেই, সমস্ত প্রশান্ত গম্ভীর পরিপূর্ণ। ইচ্ছা করলে যে এখনই প্রলয় করে দিতে পারে সে যখন সুন্দর প্রসন্ন মূর্তি ধারণ করে, সে যখন তার প্রকাণ্ড প্রবল ক্ষমতাকে সৌম্য মাধুর্যে প্রচ্ছন্ন করে রেখে দেয়, তখন তার সৌন্দর্য এবং মহিমা একত্র মিশে একটি চমৎকার উদার সম্পূর্ণতা ধারণ করে। ক্রমে যখন গোধূলি ঘনীভূত হয়ে চন্দ্র উঠল তখন আমার মুগ্ধ হৃদয়ের মধ্যে সমস্ত তারগুলো যেন বেজে উঠতে লাগল।

সাতারা
১৯ জুলাই ১৮৯৪

১৩৩

কলকাতা
১৬ জুলাই। ১৮৯৪।

সদ্যোনিদ্রোত্থিত তেতালার ঘরে গিয়ে দেখি, আমার কনিষ্ঠ শাবকটি শয়নগৃহের মেজের মাদুরের উপরে পড়ে পড়ে কলরব করবার চেষ্টায় আছে। সেটা প্রায় ঠিক পূর্ববৎই আছে, গাল-দুটো সেইরকম ফুলো-ফুলো, চোখ-দুটো সেইরকম অবুঝভাবে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করছে—ঘাড়ের উপর মাথাটা সেইরকম সর্বদাই টল্‌টল্ ঢল্‌ঢল্ করছে। সব-সুদ্ধ ক্ষুদ্র ব্যক্তিটি নলিনীদলগত শিশিরবিন্দুর মতো বৃহৎ পৃথিবীটার উপর টলমল করছে। তাকে কোলে তুলে নেওয়া গেল। প্রথমটা খানিক ক্ষণ যেন পূর্বপরিচয়ের স্মৃতি মনে আনবার চেষ্টা করছিল—অল্প একটুখানি থম্‌থমে ভাবে আমাকে কপোলনিমগ্ন দুই চক্ষুর দ্বারা পর্যালোচনা করতে লাগল। মাঝে মাঝে, কোনো বিশেষ কারণ না থাকা সত্ত্বেও, একটু একটু করে স্মিতহাস্য চলছিল। ক্রমে অনতিকাল মধ্যেই থরনথরসুদ্ধ মোটা মোটা নরম নরম করতল দিয়ে নাক মুখ চোখ চুল গোঁফ দাড়ি যা সম্মুখে পড়তে লাগল তাতেই হস্তক্ষেপ করতে আরম্ভ করে দিলে, কেবল তাই নয়, হুংকারশব্দ-পূর্বক আগ্রহসহকারে নাক চোখ ধরে মুখের মধ্যে পুরে দিতে চেষ্টা করতে লাগল। বিছানার উপর উপুড় হয়ে পড়ে টল্‌টলে মাথা এবং মোটা মোটা হাত পা দিয়ে খানিকক্ষণ সানন্দে সন্তরণও হল। পরিবর্তনের মধ্যে মনে হল যেন, প বর্গের দুটো-একটা অক্ষর বহুকষ্টে আজকাল উচ্চারণ করতে সক্ষম হয়েছে এবং চক্ষুতারকায় একটুখানি বুদ্ধিজ্যোতি পরিস্ফুট হয়েছে। নিজের নামের শব্দটা চিনেছে এবং আত্মীয়স্বজনদেরও কতক কতক পরিচয় লাভ করতে পেরেছে। তার গায়ের গন্ধটিও সেইরকম কাঁচা-কাঁচা আছে। কলকাতায় এসে অবধি আমার অধিকাংশ সময় তারই সঙ্গে হাস্যালাপে কেটে যাচ্ছে।

সাতারা
২০ জুলাই ১৮৯৪

১৩৪

কলকাতা
১৯ জুলাই। ১৮৯৪।

মীরার জন্যে আমার কোনো কাজ হবার জো নেই [বব]। ... ...সেই ছোটো ব্যক্তিটি বিছানার উপরে চিত হয়ে পড়ে আপনার পা দুখানিকে দুর্লভ সামগ্রীর মতো একবার আকাশে তুলে দিয়ে তার পরে নিজের মুখের মধ্যে পুরে দিয়ে যখন উচ্চকলস্বরে আঃ বাঃ বাঃ বাঃ শব্দে চীৎকার আরম্ভ করে দেন তখন আমার পক্ষে লেখাপড়া কিম্বা কোনো কাজ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। তার পাশে এক জায়গায় উপুড় হয়ে পড়ি. সে বিবিধ চঞ্চল ভঙ্গীতে তার বাহু দুটি বিক্ষেপ করে

আমার গোঁফ দাড়ি চুল নাক কান চশমা ঘড়ির-চেন নিয়ে মহা উপদ্রব করতে থাকে, এবং ক্রমশই উত্তেজিত হয়ে গর্জন করতে আরম্ভ করে। এমনি ভাবে আমার সময় চলে যায়। এক-একদিন রাত্রে শুনতে পাই, সে বিছানায় জেগে উঠে কলরব করতে আরম্ভ করেছে—কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেই একটুখানি হাসি হয়; ভাবটা এই যে, একজন খেলবার সঙ্গী পাওয়া গেল। তার পর অনেক ক্ষণ ধরে আর কিছুতেই ঘুম নেই, উপুড় হয়ে পড়ে বিছানাময় সাঁতরে বেড়াতে থাকে।

সাতারা
২৩ জুলাই ১৮৯৪

১৩৫

কলকাতা
২১ জুলাই। ১৮৯৪।

আমার ভারী ইচ্ছে—আমার ঘরের কাছে একজন কেউ গান বাজনা করবার লোক থাকে। বে[লি] যদি দিশী এবং ইংরাজি সংগীতে বেশ ওস্তাদ হয়ে ওঠে তা হলে আমার অনেকটা সাধ মিটবে। কিন্তু ওস্তাদও হয়ে উঠবে আর আমার ঘর থেকেও অমনি চলে যাবে। সেদিন অ[ভী] যখন গান করছিল আমি ভাবছিলুম মানুষের সুখের উপকরণগুলি যে খুব দুর্লভ তা নয়—পৃথিবীতে মিষ্টিগলার গান নিতান্ত অসম্ভব আইডিয়ালের মধ্যে নয়, অথচ ওতে যে আনন্দ পাওয়া যায় তা অত্যন্ত গভীর। কিন্তু জিনিসটি যতই সুলভ হোক, ওর জন্যে যথোপযুক্ত অবকাশ করে নেওয়া ভারী শক্ত। যে ইচ্ছাপূর্বক গান গাবে এবং যে ইচ্ছাপূর্বক গান শুনবে পৃথিবীতে কেবল এই দুটি মাত্র লোক নেই, চতুর্দিকে অধিকাংশ লোক আছে যারা গান গাবেও না গান শুনবেও না। তাই সব-সুদ্ধ মিশিয়ে ও আর হয়েই ওঠে না; দিনের পর দিন চলে যায়, অন্তঃকরণটা তৃষিত হয়ে উঠতে থাকে, সংসারটা যেন জীর্ণ অস্থিচর্মসার হয়ে আসে। আমি অনেক সময় ভাবি যে, আমাদের বড়ো বড়ো ইচ্ছাগুলো সফল হয় না বলে আমরা দুঃখ পাই সত্য, কিন্তু আমাদের ছোটো ছোটো ক্ষুধাতৃষ্ণাগুলি দিনে দিনে মুহূর্তে মুহূর্তে অতৃপ্ত থেকে যায় বলে আমাদের অজ্ঞাতসারে আমাদের প্রকৃতি ক্রমশ শীর্ণ শুষ্ক হয়ে আসতে থাকে—আমরা সেটাকে সব সময় গণ্য করি নে, কিন্তু পরিমাণে সে জিনিসটি সামান্য নয়। অন্তঃকরণ যখন তার নানা খাদ্য থেকে বঞ্চিত হয়ে উপবাসী হয়ে থাকে তখন দুঃখভার বহন করা তার পক্ষে বড়ো বেশি দুঃসহ হয়ে পড়ে। আমি জানি, আমার প্রকৃতি সংগীত চায়, শিল্প চায়, সৌন্দর্য চায়, ভাবুক মানুষের সঙ্গ চায়, সাহিত্যের আলোচনা চায়—কিন্তু এ দেশে আমার বৃথা আকাঙ্ক্ষা, বৃথা চেষ্টা। এখানকার লোকেরা বিশ্বাসও করতে পারে না যে, এ জিনিসগুলো কারও পক্ষে অত্যাবশ্যক। আমিও ক্রমে ভুলে যেতে আরম্ভ করি যে, আমার প্রকৃতির প্রায় কোনো শিকড়ই কোনো খাদ্য পাচ্ছে না। শেষকালে হঠাৎ যেদিন কোনো একটা খাদ্য কিছু পরিমাণে জোটে তখন হৃদয়ের তীব্র আগ্রহ

দেখে মনে পড়ে যে, এতদিন আমি উপবাস করে ছিলুম, এ জিনিসটা আমার প্রকৃতির জীবনধারণের পক্ষে আবশ্যক।

সাতারা
২৫ জুলাই ১৮৯৪

১৩৬

কলকাতা
১ অগস্ট্। ১৮৯৪।

শরৎচন্দ্র রায় বলে একজন কে দেখা করতে এসেছিল, আমি দেখা করলুম না। বাঙালির ছেলেকে একবার ঘরের মধ্যে ঢোকালে, বের করে দেওয়া দায় হয়ে ওঠে। কিন্তু বাঙালির মেয়ে মীরাটিও বড়ো কম নন— তিনিও একবার কলরব-সহকারে আমার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলে আর শীঘ্র বের হন না। আমাকে থাবড়ে থুবড়ে, আমার বুকের উপর নৃত্য করে— আমার দাড়ি গোঁফ, চুলের সিঁথে, লেখবার খাতা, গল্পের প্লট, ভাবের অনুবৃত্তি সমস্ত দুই ক্ষুদ্র হাতে ঘেঁটে নাস্তানাবুদ করে দিয়ে তবে তিনি আমার গৃহ হতে নিঃসৃত হন। আবার মুশকিল এই যে, সে না এলে আমাকে তার কাছে যেতে হয়— পাশের ঘর থেকে সে চেঁচাতে আরম্ভ করে, নিকটবর্তী যার কানে সেই চীৎকারধ্বনি প্রবেশ করতে থাকে সেই উতলা হয়ে কাজকর্ম সমস্ত ফেলে শব্দ-অভিমুখে ছুটতে থাকে— গিয়ে দেখে একটি মোটাসোটা গোলাকার উপুড়মূর্তি প্রকাণ্ড বিছানাটার মাঝখানে পড়ে বালিশ চাপড়াচ্ছে এবং অকারণ আনন্দভরে কল্লোল করছে। অভ্যাগতকে দেখবামাত্রই তৎক্ষণাৎ মুখখানি হাস্যবিকশিত হয়ে ওঠে, কখনো বা যথাসাধ্য হাঁ করে কী একটা অব্যক্ত ভাবকে প্রকাশ করবার চেষ্টা করে নিরস্ত হয়। অবশেষে তার ক্ষুদ্র দেহটির পাশে আপনার বিপুল দেহটি প্রসারিত করে অনেক ক্ষণ পর্যন্ত তার সঙ্গে নিতান্তই অর্থহীন অসম্বদ্ধ মিষ্টালাপ করে তবে আপনার কর্তব্যকার্যে মনোযোগ দিতে পারি। বড়োলোকের সঙ্গে আলাপ করতে গেলে ক্রমে আলাপের বিষয় ফুরিয়ে যায়, সুতরাং শীঘ্র ছুটি পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু যে স্থলে কোনো বিষয়মাত্র নেই অথচ আলাপ আছে সেখানে কোথায় থামতে হবে কিছুই ভেবে ঠিক করা যায় না— মীরাতে আমাতে সদাসর্বদা যে-সকল টেট-আ-টেট হয়ে থাকে তার কোনো জায়গায় ভাবের বিরাম পাওয়া যায় না, সুতরাং থামতে গেলে নিতান্তই গায়ের জোরে থামতে হয়।

সাতারা
৫ অগস্ট্ ১৮৯৪

১৩৭

কলকাতা
২ অগস্ট্। ১৮৯৪।

প্রি[য়]বাবুর সঙ্গে দেখা করে এলে আমার একটা মহৎ উপকার এই হয় যে, সাহিত্যটাকে পৃথিবীর মানব-ইতিহাসের একটা মস্ত জিনিস বলে প্রত্যক্ষ দেখতে পাই এবং তার সঙ্গে এই ক্ষুদ্র ব্যক্তির ক্ষুদ্র জীবনের যে অনেকখানি যোগ আছে তা অনুভব করতে পারি। তখন আপনার জীবনটাকে রক্ষা করবার এবং আপনার কাজগুলো সম্পন্ন করবার যোগ্য বলে মনে হয়— তখন আমি কল্পনায় আপনার ভবিষ্যৎ জীবনের একটা অপূর্ব ছবি দেখতে পাই। দেখি যেন আমার দৈনিক জীবনের সমস্ত ঘটনা সমস্ত শোকদুঃখের মধ্যস্থলে একটি অত্যন্ত নির্জন নিস্তব্ধ জায়গা আছে, সেইখানে আমি নিমগ্নভাবে বসে সমস্ত বিস্মৃত হয়ে আপনার সৃষ্টিকার্যে নিযুক্ত আছি— সুখে আছি। সমস্ত বড়ো চিন্তার মধ্যেই একটি উদার বৈরাগ্য আছে। যখন অ্যাস্ট্রনমি পড়ে নক্ষত্রজগতের সৃষ্টির রহস্যশালার মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ানো যায় তখন জীবনের ছোটো ছোটো ভারগুলো কতই লঘু হয়ে যায়! তেমনি আপনাকে যদি একটা বৃহৎ ত্যাগস্বীকার কিম্বা পৃথিবীর একটা বৃহৎ ব্যাপারের সঙ্গে আবদ্ধ করে দেওয়া যায় তা হলে তৎক্ষণাৎ আপনার অস্তিত্বভার অনায়াসে বহনযোগ্য বলে মনে হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকদের মধ্যেও ভাবের সমীরণ চতুর্দিকে সঞ্চারিত সমীরিত নয়, জীবনের সঙ্গে ভাবের সংস্রব নিতান্তই অল্প, সাহিত্য যে মানবলোকে একটা প্রধান শক্তি তা আমাদের দেশের লোকের সংসর্গে কিছুতেই অনুভব করা যায় না— নিজের মনের আদর্শ অন্য লোকের মধ্যে উপলব্ধি করবার একটা ক্ষুধা চিরদিন থেকে যায়।

সাতারা
৬ অগস্ট্ ১৮৯৪

১৩৮

শিলাইদহ
৪ অগস্ট্। ১৮৯৪।

দৃশ্য পরিবর্তন হয়েছে। কোথায় সেই কলকাতা, সেই তেতালার ছাত, সেই বিশৃঙ্খল খাট পালং চৌকির নিবিড়তার মধ্যে নিয়মিত জীবনযাত্রা, সেই পাশের ঘরে পিয়ানোর স্কেল-প্র্যাক্‌টিস— সেই মীরা, যিনি অতি ক্ষুদ্র হয়েও আমার পক্ষে জগতে অত্যন্ত বৃহৎ স্থান অধিকার করে আছেন! হঠাৎ স্বপ্নের মতো চার দিকের অভ্রভেদী অট্টালিকাগুলি বায়ুতরঙ্গিত শ্যামল ধান্যক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে, চিৎপুরের বড়ো রাস্তাটি প্রশস্ত প্রসারিত তরলকলগীতিময় তরঙ্গিণীরূপে প্রবাহিত, ধূলিপূর্ণ ঘন বাতাস নির্মল স্বচ্ছ হয়ে অবাধ মুক্ত আকাশময় প্রাণহিল্লোল সঞ্চার করে দিচ্ছে— একটি উন্মুক্তবাতায়ন তরণীর মধ্যে একটি ক্যাম্প্‌-টেবিলের

শীর্ষদেশে বেত্রাসনে প্রধান নায়ক শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ প্রভাতে পত্রলিখনে নিযুক্ত এবং তাঁহার সম্মুখভাগে অপর বেত্রাসনে তদীয় বন্ধু শ্রীযুক্ত… সাধনার জন্যে গল্পরচনায় একাগ্রমনে প্রবৃত্ত। আজকের দিনের দৃশ্য তো এমনি ভাবে আরম্ভ হয়েছে। এখনি অনতিবিলম্বে নায়েব এবং পেশকারের খাতা এবং বান্‌ডিলবন্ধ কাগজপত্র হস্তে প্রবেশ হবে, তার পরে যে ভাবে ডায়ালগ আরম্ভ হবে কোনো মানবনাট্যকারের হাতে ভার থাকলে এমন দৃশ্যে এমন কালে সেরকম ডায়ালগ রচিত হত না এবং হলেও সমালোচকবৃন্দের দ্বারা নিন্দিত হত। কিন্তু যে অদৃষ্ট কবি আমাদের জীবননাট্যকে প্রতিদিন নব নব গর্ভাঙ্কে বিভক্ত করে পঞ্চম অঙ্কের পরিণামের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন, তিনি দেশকালপাত্রের সংগতি, রচনাকৌশল, ঘটনা-সংস্থানের প্রতি দৃক্‌পাত মাত্র করেন না; তিনি পদ্মাতরঙ্গচঞ্চল সাধের তরণীর মধ্যে আমলার সমাবেশ করেন, নায়ক-নায়িকার আলাপের মধ্যে পদে পদে ব্যাকরণ এবং অলংকার-দোষ ঘটিয়ে থাকেন এবং যদি বা শুভাদৃষ্টক্রমে নায়কের ভাগ্যে অলংকারশাস্ত্রসম্মত কবিত্বপূর্ণ প্রেমপত্রিকা জোটে, তার লেখক পুরুষ হয়ে দাঁড়ায়।

আজ সুন্দর দৃশ্য, সুন্দর আলো এবং সুন্দর বাতাস। ইচ্ছা করছে বেশ মধুরভাবে মগ্ন হয়ে একটা কিছু লিখি বা গুন্‌ গুন্‌ করে গান তৈরি করি, কিম্বা বেশ একটি সরল সুন্দর অতিশয়বৈচিত্র্যবিহীন এবং বিশ্লেষণশূন্য গল্পের বই পড়ি—আরামে চৌকিতে হেলান দিয়ে জগৎসংসার বিস্মৃত হয়ে যাই, পড়তে পড়তে চোখের কোণে তীরের শ্যামল রেখা একটু একটু পড়বে এবং কানে জলের তরল কলশব্দ অবিরল প্রবেশ করতে থাকবে। কিন্তু এই-সমস্ত অপেক্ষাকৃত সুলভ সাধও আপাতত পূর্ণ হবার সম্ভাবনা দেখছি নে। কারণ, চিঠি লিখতে লিখতে ইতিমধ্যেই নায়েব ও মৌলবী এসে প্রবেশ করেছেন। নায়েব আমাদের জমিদারি-প্রচলিত হিসাবপত্রের পদ্ধতি শ্রী… বাবুকে বোঝাতে আরম্ভ করেছে; তাই নিয়ে যে জমিদারিক ভাষার আন্দোলন উপস্থিত হয়েছে তার কণামাত্র যদি এই পত্রপ্রান্তে নমুনাস্বরূপ উদ্‌ধৃত করে দিই তা হলে বোধ হয় ইহজন্মে তুই আর আমাকে মার্জনা করবি নে—সেই জন্যে বিরত হলুম।

সাতারা
৯ অগস্ট্‌ ১৮৯৪

১৩৭

শিলাইদহ
৫ অগস্ট্‌। ১৮৯৪।

কাল সমস্ত রাত্রি বৃষ্টি খুব অজস্র ধারে হয়ে গেছে—আজ ভোরে যখন উঠলুম তখনও অশ্রান্ত বৃষ্টি চলছে এবং চতুর্দিক ম্লান হয়ে আছে। এই মাত্র স্নানের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দেখি পশ্চিম দিকে আউশ ধানের ক্ষেতের উপর খুব সজল শ্যামল অবনত মেঘ স্তূপে স্তূপে স্তরে স্তরে জমে রয়েছে এবং পূর্বদক্ষিণ দিকে মেঘ খানিকটা বিচ্ছিন্ন হয়ে রোদ্‌দুর ওঠবার চেষ্টা হচ্ছে, রোদ্‌দুরে বৃষ্টিতে খানিক ক্ষণের জন্যে যেন সন্ধি হয়েছে। যে দিকে ছিন্ন মেঘের ভিতর দিয়ে সকাল

বেলাকার আলো বিচ্ছুরিত হয়ে বেরিয়ে আসছে সে দিকে অপার পদ্মা-দৃশ্যটি বড়ো চমৎকার হয়েছে—জলের রহস্যগর্ভ থেকে একটি স্নানশুভ্র অলৌকিক জ্যোতিঃপ্রতিমা উদিত হয়ে নীরব মহিমায় দাঁড়িয়ে আছে আর ডাঙার উপরে কালো মেঘ স্ফীতকেশর সিংহের মতো ভ্রূকুটি করে ধান্যক্ষেত্রের মধ্যে থাবা মেলে দিয়ে চুপ করে বসে আছে, সে যেন একটি সুন্দরী দিব্যশক্তির কাছে হার মেনেছে, কিন্তু এখনও পোষ মানে নি—দিগন্তের একটি কোণে আপনার সমস্ত রাগ এবং অভিমান গুটিয়ে নিয়ে বসে আছে। এখনি আবার বৃষ্টি হবে তার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, রীতিমত শ্রাবণের বর্ষণের উপক্রম হচ্ছে—সুপ্তোত্থিত সহাস্য জ্যোতীরশ্মি যে মুক্তদ্বারের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল সেই দ্বারটি আবার আস্তে আস্তে রুদ্ধ হয়ে আসছে—পদ্মার ঘোলা জলরাশি ছায়ায় আচ্ছন্ন হয়ে এসেছে, নদীর এক তীর থেকে আর-এক তীর পর্যন্ত মেঘের সঙ্গে মেঘ আবদ্ধ হয়ে সমস্ত আকাশ অধিকার করে নিয়েছে—খুব নিবিড় রকমের আয়োজনটা হয়েছে।...

এতদিনে আউশধান এবং পাটের ক্ষেত শূন্যপ্রায় হয়ে যাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু এবারে দেব্‌তার গতিকে ক্ষেতের সমস্ত শস্য ক্ষেতেই আন্দোলিত হচ্ছে। দেখতে ভারী সুন্দর হয়েছে—বর্ষার আকাশ সজল মেঘে স্নিগ্ধ এবং সমস্ত পৃথিবী হিল্লোলিত সরস শ্যাম শস্যে কোমলা—উপরে একটি গাঢ় রঙ, নিচেও আর-একটি গাঢ় রঙের প্রলেপ—মাটি কোথাও অনাবৃত নয়, মাটির আসল রঙটি কেবল এই মাঝখানে প্রবাহিত ঘোলা নদীর জলের মধ্যে দেখা যাচ্ছে। নদী বিষম ঘোলা। পদ্মা এক-একটি দেশ প্রদেশ বহন করে নিয়ে চলেছে: ওর জলের মধ্যে কত জমিদারের জমিদারি গুলিয়ে রয়েছে। পদ্মা ভীষণ কৌতুকে এক রাজার রাজ্য হরণ করে আপন গেরুয়া আঁচলের মধ্যে লুকিয়ে অন্য রাজার দরজায় রাতারাতি ধুয়ে আসছে—শেষে প্রাতঃকালে রাজায় রাজায় মহা লাঠালাঠি বেধে যাচ্ছে।

সাতারা
১০ অগস্ট ১৮৯৪

১৪০

শিলাইদহ
৮ অগস্ট্‌। ১৮৯৪।

আজ সমস্ত দিন ...বাবু নেই, আজ সমস্ত দিন নদীর কল্লোল শোনা গেছে। কোনো অসংলগ্ন প্রশ্নের অনাবশ্যক উত্তর দিতে হয় নি। একটিমাত্র মানুষ কেবলমাত্র সামনে উপস্থিত থাকলেই প্রকৃতির অর্ধেক কথা কানে আসে না। আমি দেখেছি থেকে থেকে টুকরো-টুকরো কথাবার্তা কওয়ার চেয়ে মানসিক শক্তির অপব্যয় আর কিছুতে হয় না। যদি কোনো একটা সৃজনে প্রবৃত্ত হবার পূর্বে বুদ্ধিশক্তি কল্পনাশক্তি তাজা রাখা আবশ্যক হয় তা হলে অনেক ক্ষণ সম্পূর্ণ নীরব থাকা আবশ্যক। নিজের কথার দ্বারা মন নিজে ভারী উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়ে। দিনের পর দিন কথা না কয়ে কাটছে এমন অভিজ্ঞতা তোদের বোধ হয় কখনও হয় নি। যদি হত তা হলে বুঝতে পারতিস সেই অবস্থায় আপনার চতুর্দিক্‌কে গ্রহণ করবার এবং উপভোগ করবার ক্ষমতা আশ্চর্য বেড়ে ওঠে—তখন হঠাৎ টের পাওয়া যায়

আমাদের চতুর্দিক্‌ই কথা কচ্ছে, কেবল যদি কিছু ক্ষণের জন্যে আমাদের অন্তহীন বক্‌বক্‌ থামে তা হলেই সেই-সমস্ত বিচিত্র ভাষা আমাদের কানে আসে। আজ নদীর কলধ্বনির প্রত্যেক তরল লকার আমার সর্বাঙ্গে যেন কোমল আদর বর্ষণ করছে— আমার মনটি আজ অত্যন্ত নির্জন এবং সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ, মেঘমুক্ত আলোক-পূর্ণ শস্যহিল্লোলিত জলকল্লোলিত উদার চতুর্দিকের সঙ্গে মুখোমুখি বিশ্রব্ধ প্রীতিসম্মিলনের উপযুক্ত একটি নীরব গোপনতা আমার মধ্যে স্থিরভাবে বিরাজ করছে— আমি জানি আজ সন্ধের সময় যখন কেদারা টেনে বোটের ছাতের উপর একলাটি বসব তখন আমার আকাশে আমার সেই সন্ধ্যাতারাটি ঘরের লোকের মতো দেখা দেবে! আমার এই পদ্মার উপরকার সন্ধ্যাটি আমার অনেক দিনের পরিচিত —আমি শীতের সময় যখন এখানে আসতুম এবং কাছারি থেকে ফিরতে অনেক দেরি হত, আমার বোট ও পারে বালির চরের কাছে বাঁধা থাকত, ছোটো জেলেডিঙি চড়ে নিস্তব্ধ নদীটি পার হতুম, তখন এই সন্ধ্যাটি সুগম্ভীর অথচ সুপ্রসন্ন মুখে আমার জন্যে অপেক্ষা করে থাকত; আমার জন্যে একটি শান্তি, একটি কল্যাণ, একটি বিশ্রাম সমস্ত আকাশময় প্রস্তুত থাকত; সন্ধ্যাবেলাকার নিস্তরঙ্গ পদ্মার উপরকার নিস্তব্ধতা এবং অন্ধকার ঠিক যেন নিতান্ত আমার অন্তঃপুরের ঘরের মতো বোধ হত। এখানকার প্রকৃতির সঙ্গে সেই আমার একটি মানসিক ঘরকন্নার সম্পর্ক, সেই একটি অন্তরঙ্গ আত্মীয়তা আছে— যা ঠিক আমি ছাড়া আর কেউ জানে না। সেটা যে কতখানি সত্য তা বললেও কেউ উপলব্ধি করতে পারবে না। জীবনের যে গভীরতম অংশ সর্বদা মৌন এবং সর্বদা গোপন— সেই অংশটি আস্তে আস্তে বের হয়ে এসে এখানকার অনাবৃত সন্ধ্যা এবং অনাবৃত মধ্যাহ্নের মধ্যে নীরবে এবং নির্ভয়ে সঞ্চরণ করে বেড়িয়েছে। এখানকার দিনগুলি তার সেই অনেক কালের পদচিহ্ন-দ্বারা যেন অঙ্কিত।

আমাদের দুটো জীবন আছে— একটা মনুষ্যলোকে আর-একটা ভাবলোকে। সেই ভাবলোকের জীবনবৃত্তান্তের অনেকগুলি পৃষ্ঠা আমি এই পদ্মার উপরকার আকাশে লিখে গেছি। যখনি আসি এবং যখনি একলা হতে পাই, তখনি সেগুলি চোখে পড়ে। এখানে যখন আসি তখন বেশ বুঝতে পারি— আমার কবিতায় আমি কিছুই লিখতে পারি নি। যা অনুভব করি তা ব্যক্ত করতে পারি নে। কারণ, ভাষা তো কেবল আমার একলার নয়— ভাষা সাধারণের ব্যবহারের জন্যে, আমি আমার সমস্ত প্রকৃতি দিয়ে যা অনুভব করি সাধারণে তা করে না এবং সাধারণের ভাষাও সে সম্বন্ধে কোনো কথা স্পষ্ট করে বলতে চায় না।

সাতারা
১৩ অগস্ট্‌ ১৮৯৪

১৪১

শিলাইদহ
৯ অগস্ট্‌?। ১৮৯৪।

নদী একেবারে কানায় কানায় ভরে এসেছে। ও পারটা প্রায় দেখা যায় না। জল এক-এক জায়গায় টগ্‌বগ্‌ করে ফুটছে, আবার এক-এক জায়গায় কে যেন অস্থির

জলকে দুই হাত দিয়ে চেপে চেপে সমান করে মেলে দিয়ে যাচ্ছে। আজকাল প্রায়ই দেখতে পাই ছোটো ছোটো মৃত পাখি স্রোতে ভেসে আসছে—তাদের মৃত্যুর ইতিহাস বেশ স্পষ্ট বোঝা যায়। কোন্‌-এক গ্রামের ধারের আমবাগানের আম্রশাখায় তাদের বাসা ছিল। তারা সন্ধের সময় বাসায় ফিরে এসে পরস্পরের নরম নরম গরম ডানাগুলি একত্র করে শ্রান্ত দেহে ঘুমিয়ে ছিল; হঠাৎ রাত্রে পদ্মা একটু খানি পাশ ফিরেছেন, অমনি গাছের নিচেকার মাটি ধসে পড়ে গেছে, গাছ তার সমস্ত ব্যাকুল প্রসারিত শিকড়গুলো নিয়ে জলে পড়ে গেছে, নীড়চ্যুত পাখিগুলি হঠাৎ রাত্রে এক মুহূর্তের জন্যে জেগে উঠল—তার পরে আর জাগতে হল না। এই ভাসমান মৃত পাখিগুলিকে দেখলে হঠাৎ মনের মধ্যে ভারী একটা আঘাত লাগে। বুঝতে পারি আমরা যে প্রাণকে সব চেয়ে ভালোবাসি প্রকৃতির কাছে তার মূল্য যৎসামান্য। আমি দেখেছি আমি যখন মফস্বলে থাকি তখন পশুপক্ষী জীবজন্তু আমার ভারী নিকটবর্তী হয়ে আসে—আপনাকে তাদের চেয়ে খুব বেশি স্বতন্ত্র কিম্বা উঁচুদরের মনে হয় না। একটি বৃহৎ সর্বগ্রাসী রহস্যময়ী প্রকৃতির কাছে আমার সঙ্গে অন্য জীবের প্রভেদ অকিঞ্চিৎকর সামান্য বলে উপলব্ধি হয়। এই পাখিগুলি যে অবহেলায় মরেছে এবং অবহেলায় ভেসে চলেছে সে আমার মৃত্যুর চেয়ে কম শোচনীয় বলে মনে হয় না। শহরে মনুষ্যসমাজ এত জটিল এবং মনুষ্যকীর্তি এত জাজ্বল্যমান যে, মানুষ সেখানে অত্যন্ত প্রধান হয়ে ওঠে—সে সেখানে নিষ্ঠুরভাবে আপনার সুখদুঃখের কাছে অন্য কোনো প্রাণীর সুখদুঃখ গণনার মধ্যেই আনে না। য়ুরোপেও মানুষ এত জটিল এবং এত প্রধান যে তারা জন্তুদের বড়ো বেশি জন্তু মনে করে। ভারতবর্ষীয়েরা জন্মক্রমে মানুষ থেকে জন্তু এবং জন্তু থেকে মানুষ হওয়া কিছুই মনে করে না—কীটপতঙ্গ পর্যন্ত প্রাণী মাত্রেরই একটা সমশ্রেণিতা আছে, সেটা তারা খুব অনুভব করে—এই জন্যে আমাদের শাস্ত্রে সর্বভূতে দয়াটা একটা অসম্ভব আতিশয্য বলে পরিত্যক্ত হয় নি। মফস্বলের উদার প্রকৃতির মাঝখানে এলে, তার সঙ্গে দেহে দেহে ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শ হলে আমার সেই ভারতবর্ষীয় স্বভাবটি জাগ্রত হয়ে ওঠে—আমি জীবজন্তুর সুখদুঃখের মধ্যে প্রবেশ করতে পারি। সামান্য ক্ষুধানিবারণের জন্যে পাখির মাংস খেতে গেলে, আমার নিজের শাবকদের কথা মনে পড়ে। একটি পাখির সুকোমল পালকে আবৃত স্পন্দমান ক্ষুদ্র বক্ষটুকুর মধ্যে জীবনের আনন্দ যে কত প্রবল তা আর আমি অচেতন ভাবে ভুলে থাকতে পারি নে। সেইজন্যে প্রতিবারেই মফস্বলে এসে মাংস খাওয়ার প্রতি আমার আন্তরিক ধিক্কার জন্মে, আবার কলকাতায় জনসমাজের মধ্যে গিয়ে মাংসাশী হয়ে উঠি। সেখানে মানুষ ছাড়া সমস্ত সজীব প্রাণী জড়ের সমান হয়ে আসে। পাড়াগাঁয়ে আমি ভারতবাসী হই, আর কলকাতায় গিয়ে আমি য়ুরোপীয় হয়ে যাই। কোন্‌টা আমার যথার্থ প্রকৃতি কে জানে?

সাতারা
১৪ অগস্ট্‌ ১৮৯৪

১৪২

শিলাইদহ
১০ অগস্ট্। ১৮৯৪।

কাল খানিক রাত্রে জলের শব্দে আমার ঘুম ভেঙে গেল। নদীর মধ্যে হঠাৎ একটা তুমুল কল্লোল এবং প্রবল চঞ্চলতা উপস্থিত হয়েছে। বোধ হয় অকস্মাৎ একটা নতুন জলের স্রোত এসে পড়েছে। রোজই প্রায় এই রকম ব্যাপার ঘটছে। বসে আছি আছি হঠাৎ দেখতে পাই নদী ছল্‌ছল্‌ কল্‌কল্‌ করে জেগে উঠেছে আর সব-সুদ্ধ খুব একটা ধুমধাম পড়ে গেছে। বোটের তক্তার উপর পা রাখলে বেশ স্পষ্ট বোঝা যায় তার নিচে দিয়ে কত রকমের বিচিত্র গতি অবিশ্রাম চলছে— খানিকটা কাঁপছে, খানিকটা টলছে, খানিকটা ফুলছে, খানিকটা আছাড় খেয়ে পড়ছে। ঠিক যেন আমি সমস্ত দেশের নাড়ীর স্পন্দন অনুভব করছি। কাল অর্ধেক রাত্রে হঠাৎ একটা চঞ্চল উচ্ছ্বাস এসে নাড়ীর নৃত্য অত্যন্ত বেড়ে উঠেছিল। আমি অনেক ক্ষণ জানলার ধারে বেঞ্চের উপর বসে রইলুম। খুব এক রকম ঝাপসা আলো ছিল, তাতে করে সমস্ত উতলা নদীকে আরও যেন পাগলের মতো দেখাচ্ছিল। আকাশে মাঝে মাঝে মেঘ। একটা খুব জ্বল্‌জ্বলে মস্ত তারার ছায়া দীর্ঘতর হয়ে জলের মধ্যে অনেক দূর পর্যন্ত একটা জ্বালাময় বিদ্ধ বেদনার মতো থরথর করে কাঁপছিল। নদীর দুই তীর অস্পষ্ট আলোকে এবং গাঢ় নিদ্রায় আচ্ছন্ন অচেতন। মাঝখান দিয়ে একটা নিদ্রাহীন উন্মত্ত অধীরতা ভরপুর বেগে একেবারে নিরুদ্দেশ হয়ে চলেছে। অর্ধেক রাত্রে ঐ রকম দৃশ্যের মধ্যে জেগে উঠে বসে থাকলে আপনাকে এবং জগৎকে কী-এক নতুন রকমের মনে হয়— দিনের বেলাকার লোকসংসর্গের জগৎটা সম্পূর্ণ মিথ্যা হয়ে যায়। আবার আজ সকালে উঠে, আমার সেই গভীর রাত্রের জগৎ স্বপ্নের মতো কত দূরবর্তী এবং লঘু হয়ে গেছে। মানুষের পক্ষে দুটোই সত্য, অথচ দুটোই বিষম স্বতন্ত্র। আমার মনে হয়, দিনের জগৎটা য়ুরোপীয় সংগীত, সুরে-বেসুরে খণ্ডে-অংশে মিলে একটা গতিশীল প্রকাণ্ড হার্মনির জটলা— আর রাত্রের জগৎটা আমাদের ভারতবর্ষীয় সংগীত, একটি বিশুদ্ধ করুণ গম্ভীর অমিশ্র রাগিণী। দুটোই আমাদের বিচলিত করে, অথচ দুটোই পরস্পরবিরোধী। কী করা যাবে—প্রকৃতির গোড়ায় একটা দ্বিধা একটা মস্ত বিরোধ আছে, রাজা এবং রানীর মধ্যে সমস্ত বিভক্ত। দিন এবং রাত্রি, বিচিত্র এবং অখণ্ড, পরিব্যক্ত এবং অনাদি। আমরা ভারতবর্ষীয়েরা সেই রাত্রির রাজত্বে থাকি। আমরা অখণ্ড অনাদির দ্বারা অভিভূত। আমাদের নির্জন এককের গান, য়ুরোপের সজন লোকালয়ের গান। আমাদের গানে শ্রোতাকে মনুষ্যের প্রতিদিনের সুখদুঃখের সীমা থেকে বের করে নিয়ে নিখিলের মূলে যে-একটি সঙ্গীহীন বৈরাগ্যের দেশ আছে সেইখানে নিয়ে যায়, আর য়ুরোপের সংগীত মনুষ্যের সুখদুঃখের অনন্ত উত্থান-পতনের মধ্যে বিচিত্রভাবে নৃত্য করিয়ে নিয়ে চলে।

সাতারা
১৫ অগস্ট্ ১৮৯৪

১৪৩

শিলাইদহ
১২ অগস্ট্। ১৮৯৪।

গেটের জীবনীটা তোর ভাল লাগছে? একটা তুই লক্ষ্য করে দেখে থাকবি— গেটে যদিও এক হিসাবে খুব নির্লিপ্ত প্রকৃতির লোক ছিল, তবু সে মানুষের সংস্রব পেত, মানুষের মধ্যে মগ্ন ছিল। সে যে রাজসভায় থাকত সেখানে সাহিত্যের জীবন্ত আদর ছিল, জর্মানিতে তখন খুব একটা ভাবের মন্থন আরম্ভ হয়েছিল— হের্ডের শ্লেগেল হুম্বোল্ট্ শিলার কাণ্ট্ প্রভৃতি বড়ো বড়ো চিন্তাশীল এবং ভাবুকগণ দেশের চারি দিকে জেগে উঠছিল, তখনকার মানুষের সংসর্গ এবং দেশব্যাপী ভাবের আন্দোলন খুব প্রাণপরিপূর্ণ ছিল। আমরা হতভাগ্য বাঙালি লেখকেরা মানুষের ভিতরকার সেই প্রাণের অভাব একান্ত মনে অনুভব করি— আমরা আমাদের কল্পনাকে সর্বদাই সত্যের খোরাক দিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে পারি নে, নিজের মনের সঙ্গে বাইরের মনের একটা সংঘাত হয় না বলে আমাদের রচনাকার্য অনেকটা পরিমাণে আনন্দবিহীন হয়। আমাদের দেশের লোক এত যে ইংরাজি সাহিত্য পড়েছে, কিন্তু তাদের অস্থিমজ্জার মধ্যে ভাবের প্রভাব প্রবেশ করতে পারে নি— তাদের ভাবের ক্ষুধাই জন্মায় নি, তাদের জড়শরীরের ভিতরে একটা মানসশরীর এখনো গঠিত হয়ে ওঠে নি, সেইজন্যে তাদের মানসিক আবশ্যক বলে একটা আবশ্যকবোধ নিতান্তই কম— অথচ মুখের কথায় সেটা বোঝবার জো নেই, কেননা বোলচাল সমস্তই ইংরাজি থেকে শিখে নিয়েছে। এরা খুব অল্প অনুভব করে, অল্প চিন্তা করে এবং অল্পই কাজ করে— সেইজন্যে এদের সংসর্গে মনের কোনো সুখ নেই। গেটের পক্ষেও যদি শিলারের বন্ধুত্ব আবশ্যক ছিল তা হলে আমাদের মতো লোকের পক্ষে একজন যথার্থ খাঁটি ভাবুকের প্রাণসঞ্চারক সঙ্গ যে কত অত্যাবশ্যক তা আর কী করে বোঝাব! আমাদের সমস্ত জীবনের সফলতাটা যে জায়গায় সেইখানে একটা প্রেমের স্পর্শ, একটা মনুষ্যসঙ্গের উত্তাপ সর্বদা পাওয়া আবশ্যক— নইলে তার ফুলফলে যথেষ্ট বর্ণ গন্ধ এবং রস সঞ্চারিত হয় না।

সাতারা
১৭ অগস্ট্ ১৮৯৪

১৪৪

শিলাইদহ
১৩ অগস্ট্। ১৮৯৪।

যদিও আমার এমন অনেক লেখা বেরোয় যা তুচ্ছ, যা কেবলমাত্র সাধনার স্থান পোরাবার জন্যে লিখি, তবু তার মধ্যেও আমি যথাসাধ্য এবং যথাসম্ভব যত্ন প্রয়োগ করে থাকি। লেখার মধ্যে আমার ভিতরকার সত্য যথোচিত শ্রদ্ধা এবং অকৃত্রিমতার সঙ্গে প্রকাশ করবার চেষ্টা করি— আমার সরস্বতীকে আমি কোনো অবস্থাতেই অবহেলা করতে পারি নে। সম্প্রতি...ইংরাজি লেখা পড়েছিলুম— তার...লেখক...

খ্যাতিপ্রাপ্ত একজন আর্টিস্ট্। তার সঙ্গে আমার অনেক বিষয়ে অনেক অনৈক্য আছে, কিন্তু দুটি বিষয়ে আমাদের মিল দেখলুম। এক হচ্ছে এই চতুর্দিকের বাস্তবিক জগতের অসম্পূর্ণতার মধ্যেই আপনার সৌন্দর্যের আদর্শকে আপনার প্রতিভাকে চরিতার্থ করা, দ্বিতীয় হচ্ছে নিজেকে প্রকাশ করবার একটা প্রবল ইচ্ছা। অহমিকার প্রভাবে যে নিজের কথা বলতে চাই তা নয়; কিন্তু যেটা যথার্থ চিন্তা করব, যথার্থ অনুভব করব, যথার্থ প্রাপ্ত হব, যথার্থরূপে প্রকাশ করাই তার একমাত্র স্বাভাবিক পরিণাম—এটা একেবারে আমার প্রকৃতিসিদ্ধ—ভিতরকার একটা চঞ্চল শক্তি ক্রমাগতই সেই দিকে কাজ করছে। অথচ সে শক্তিটা যে আমারই তা ঠিক মনে হয় না, মনে হয় সে একটা জগৎব্যাপ্ত শক্তি আমার ভিতর দিয়ে কাজ করছে। প্রায় আমার সমস্ত রচনাই আমার নিজের ক্ষমতার অতীত বলে মনে হয়—এমন-কি, আমার অনেক সামান্য গদ্য লেখাও। যে-সমস্ত তর্কযুক্তি আমি আগে থাকতে ভেবে রাখি, তার মধ্যেও আমার আয়ত্তের বহির্ভূত আর-একটি পদার্থ এসে নিজের স্বভাব-মত কাজ করে এবং সমস্ত জিনিষটাকে মোটের উপরে আমার অচিন্ত্যপূর্ব করে দাঁড় করিয়ে দিয়ে যায়। সেই শক্তির হাতে মুগ্ধভাবে আত্মসমর্পণ করাই আমার জীবনের প্রধান আনন্দ। সে আমাকে কেবল যে প্রকাশ করায় তা নয়, অনুভব করায়, ভালোবাসায়। সেই জন্যে আমার অনুভূতি আমার নিজের কাছেই প্রত্যেকবার নূতন এবং বিস্ময়জনক। প্রকৃতির মধ্যে এসে আমার নিজের মনে যে ভাবোদয় হয় সেটা মনে হয় যেন আমার স্বভাবের, আমার শক্তির অতিরিক্ত একটা ব্যাপার। সেইজন্যে মনে হয় আমি সেটা কাউকে বোঝাতে এবং বিশ্বাস করাতে পারব না। আমার সব অনুভূতির মধ্যে ঐ রকম আমার অতিরিক্ত একটা উপাদান আছে। মীরাটাকে যখন আমার ভালো লাগে তখন তার মধ্যে আমি এমন একটা অসীম রহস্য অনুভব করি যে, সে কেবল আর আমার কন্যা মীরা থাকে না—সে বিশ্বের সমস্ত মূলরহস্য মূলসৌন্দর্যের অঙ্গ হয়ে পড়ে, আমার স্নেহ-উচ্ছ্বাস একটা উপাসনার মতো হয়ে আসে। আমার বিশ্বাস আমাদের সব স্নেহ সব ভালোবাসাই রহস্যময়ের পূজা—কেবল সেটা আমরা অচেতন ভাবে করি। ভালোবাসা মাত্রই আমাদের ভিতর দিয়ে বিশ্বজগতের অন্তরস্থিত শক্তির সজাগ আবির্ভাব—যে নিত্য-আনন্দ নিখিল জগতের মূলে সেই আনন্দের ক্ষণিক উপলব্ধি। নইলে ওর কোনোই অর্থ থাকে না। যে জগৎব্যাপী আকর্ষণশক্তিতে সমস্ত ভ্রাম্যমাণ বিশ্বজগৎ এক সূত্রে বাঁধা, সেই আকর্ষণেই আপেল ফল গাছ থেকে মাটিতে এসে পড়ে। বাহ্য জগতে যেমন এই আকর্ষণ, মনোজগতে সেই রকম একটা বিশ্বব্যাপী আনন্দের আকর্ষণ আছে—সেই আকর্ষণেই আমরা বিশ্বের মধ্যে সৌন্দর্য, হৃদয়ের মধ্যে প্রেম অনুভব করি—জগতের ভিতরকার একটা অনন্ত আনন্দের ক্রিয়া আমার মনের ভিতরেও কার্য করে। আমরা সেটাকে যদি বিচ্ছিন্নভাবে দেখি তবে তার যথার্থ কোনো অর্থ থাকে না। প্রকৃতির মধ্যে মানুষের মধ্যে আমরা আনন্দ কেন পাই (সে আনন্দ যতই ক্ষুদ্র যতই চঞ্চল হোক)—তার একটি মাত্র সদুত্তর হচ্ছে : আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি। এ কথা নিজে না বুঝলে কাউকে বোঝাবার জো নেই।

নাটোর
১৮ অগস্ট্ ১৮৯৪

১৪৫

শিলাইদহ
১৬ অগস্ট্‌। ১৮৯৪।

এখন শুক্লপক্ষ কিনা, বেড়াবার সময় চমৎকার জ্যোৎস্না পাই—তার পরে বোটে ফিরে এসে বাইরে কেদারায় পা ছড়িয়ে বসি। ঈষৎ শারীরিক শ্রান্তির পর সেই চৌকি, সেই জ্যোৎস্না, সেই জলের কল্লোল স্বর্গসুখ বহন করে আনে। নদী বেড়ে উঠে প্রায় ডাঙার সমান রেখায় এসে দাঁড়িয়েছে, তাই বোটের উপর বসে তীরের এবং জলের সমস্ত দৃশ্য একেবারে চোখের সম্মুখে প্রসারিত দেখতে পাই। আমার দক্ষিণে সুবিস্তীর্ণ মাঠ, মাঝে মাঝে আউশ ধান হয়েছে—অধিকাংশই সবুজ ঘাস, এক প্রান্ত দিয়ে একটি পদচিহ্নরচিত সংকীর্ণ মেঠো রাস্তা, সম্মুখে পূর্বদিকে হাটের গোলাঘর, সামনে স্তূপাকার খড় জমা হয়ে রয়েছে—জ্যোৎস্নায় সেই জীর্ণ কুটির এবং খড়ের স্তূপ ভারী সুন্দর ছবির মতো দেখতে হয়। সন্ধেবেলাটি আমার মাথার উপর, আমার চোখের সামনে, আমার পায়ের তলায়, আমার চতুর্দিকে এমন সুন্দর, এমন শান্তিময়, এমন নির্জন নিস্তব্ধ, অথচ এমন পরিপূর্ণ হয়ে উদয় হয়, মানুষের মতো এমন নিবিড়ভাবে আমার নিকটবর্তী হয়ে আসে যে, আকাশের নক্ষত্রলোক থেকে আর পদ্মার সুদূর ছায়াময় তীররেখা পর্যন্ত সমস্ত বৃহৎ দৃশ্যটি আমার চতুর্দিকে একটি নিভৃত আরামের গোপন গৃহের মতো ছোটো হয়ে ঘিরে দাঁড়ায়—আমার মধ্যে যে-দুটি প্রাণী আছে, আমি এবং আমার সেই অন্তঃপুরবাসী আত্মা, এই দুটিতে মিলে সমস্ত ঘরটি দখল করে বসে থাকি—এই দৃশ্যের মধ্যগত সমস্ত পশু পক্ষী প্রাণী আমাদের দুজনের অন্তর্গত হয়ে যায়—কানে জলের কলশব্দ আসতে থাকে, মুখের উপর মাথার উপর জ্যোৎস্নার শুভ্রহস্ত আদরের স্পর্শ করতে থাকে, আকাশে চকোর পাখি ডেকে চলে যায়, জেলের নৌকো পদ্মার মাঝখানে খরস্রোতের উপর দিয়ে বিনা চেষ্টায় অনায়াসে পিছ্‌লে বহে যেতে থাকে, আকাশব্যাপী স্নিগ্ধ রাত্রি আমার রোমে রোমে প্রবেশ করে ধীরে ধীরে শরীরের উত্তাপ জুড়িয়ে দেয়— চোখ বুজে, কান পেতে, দেহ প্রসারিত করে প্রকৃতির একমাত্র যত্নের জিনিষের মতো পড়ে থাকি : তার সহস্র সহচরী আমার সেবা করে। মনের কল্পনারও কোনো বাধা থাকে না, সেও তার দুটি হস্তে থালা সাজিয়ে অনেকগুলি ছায়াময়ী মায়াসেবিকা-পরিবৃত হয়ে আমার পাশে এসে দাঁড়ায়—মৃদুমন্দ বাতাসের সঙ্গে তার কোমল অঙ্গুলির স্পর্শ আমার চুলের মধ্যে অনুভব করি।

সাতারা
২১ অগস্ট্‌ ১৮৯৪

১৪৬

শিলাইদহ
১৯ অগস্ট্। ১৮৯৪।

এবারে আমার সঙ্গে আমি রামমোহন রায়ের বাংলা গ্রন্থাবলী এনেছি—তাতে গুটি-তিনেক সংস্কৃত বেদান্ত গ্রন্থ এবং তার অনুবাদ আছে; তার থেকে আমার অনেকটা সাহায্যলাভ হয়েছে। বেদান্তপাঠে বিশ্ব এবং বিশ্বের আদিকারণ সম্বন্ধে অনেকেই নিঃসংশয় হয়ে থাকেন। রামমোহন রায়ের মতো অত বড়ো একজন প্রখরবুদ্ধিমান লোকও বৈদান্তিক ছিলেন, ডয়্‌সেন-সাহেবও আগাগোড়া বেদান্তের খুব প্রশংসা করে গেছেন, কিন্তু আমার মনের কোনো সংশয় দূর হয় নি। এক হিসাবে অন্য অনেক মতের অপেক্ষা বেদান্ত-মত সরল; কারণ, দুইয়ের চেয়ে এক সরল। সৃষ্টি এবং সৃষ্টিকর্তা কথাটা শুনতে খুব সংগত এবং সহজ, কিন্তু এমন জটিল সমস্যা মানুষের বুদ্ধির পক্ষে আর কিছু নেই। বেদান্ত গর্ডান গ্রন্থি ছেদন করে দুইয়ে মিলিয়ে এক করে বসে আছেন; আর কিছু না হোক, সমস্যাটাকে আধখানা ছেঁটে দিয়েছে। সৃষ্টি একেবারেই নেই, আমরা কেউ নেই—আছেন কেবল এক ব্রহ্ম, আর মনে হচ্ছে যেন আমরা আছি। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, মানুষ এ কথা মনে স্থান দিতে পারে—আরও আশ্চর্য এই কথাটা কানে শুনতে যতটা বেশি অদ্ভুত হয় আসলে তা নয়। বস্তুত, কিছু যে আছে এইটে প্রমাণ করাই ভারী শক্ত। ঐ বৈদান্তিক মতটা আজকাল য়ুরোপেও অনেকটা ব্যাপ্ত হচ্ছে, কিন্তু সে দেশের জল-হাওয়ায় ওটা ঠিক টিকতে পারবে কি না সন্দেহ। কিম্বা হয়তো একটা নতুন মূর্তি পরিগ্রহ করে বসবে। যাই হোক, আজকাল সন্ধেবেলায় যখন জ্যোৎস্না ওঠে, এবং আমি যখন অর্ধনিমীলিত চোখে বোটের বাইরে লম্বা কেদারায় পা ছড়িয়ে বসি এবং স্নিগ্ধ সন্ধ্যাসমীরণ আমার চিন্তাক্লান্ত তপ্ত ললাট স্পর্শ করতে থাকে, তখন এই জল স্থল আকাশ, এই নদীকল্লোল, ডাঙার উপর দিয়ে কদাচিৎ এক-আধজন পথিক এবং জলের উপর দিয়ে কদাচিৎ এক-আধখানা জেলেডিঙির গতায়াত, জ্যোৎস্নালোকে অপরিস্ফুট মাঠের প্রান্ত এবং দূরে অন্ধকারমিশ্রিত বনশ্রেণীবেষ্টিত সুপ্তপ্রায় গ্রাম, সমস্তই ছায়ার মতো মায়ারই মতো বোধ হয়, অথচ সে মায়া সত্যের চেয়ে বেশি সত্য হয়ে জীবন মনকে জড়িয়ে ধরে—এবং এই মায়ার হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়াই যে মানবাত্মার মুক্তি এ কথা কিছুতে মনে হয় না। দার্শনিক বলতে পারেন, সন্ধ্যাবেলায় জগৎকে যে পরিমাণে মায়া বলে উপলব্ধি করা হয় সেই পরিমাণে মুক্তি লাভ করা যায় এবং আমি যে আনন্দ পেতে থাকি সেটা যথার্থত মুক্তিরই আনন্দ—অর্থাৎ জগৎটাকে সত্য জ্ঞান করার দরুন দিনের বেলায় আমার যে একটা দৃঢ় বন্ধন থাকে, সন্ধ্যাবেলায় সমস্ত ছায়াময় হয়ে আসাতে সেই বন্ধন অনেকটা পরিমাণে শিথিল হয়ে আসে; যখন জগৎটাকে একেবারে সম্পূর্ণই অসৎ বলে অন্তরের মধ্যে দৃঢ় উপলব্ধি জন্মাবে তখন যে-একটি পরিপূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করব সেই স্বাধীনতায় আমি ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হব। এ কথাটা আমি অতি ঈষৎ অনুমান এবং অনুভব করতে পারি; হয়তো কোন্‌দিন দেখব বৃদ্ধ বয়সের পূর্বে আমি জীবন্মুক্ত হয়ে বসে আছি।

সাতারা
২৪ অগস্ট্ ১৮৯৪

১৪৭

কুষ্টিয়ার পথে
২৪ অগস্ট্। ১৮৯৪।

আমাদের এখানে নদীর জল যতদূর বাড়বার তার সীমা পর্যন্ত গেছে, বরঞ্চ আধ হাত আন্দাজ ছাড়িয়ে গেছে— জলে স্থলে প্রায় সমান হয়ে এসেছে। পদ্মাকে এখন খুব জাঁকালো দেখতে হয়েছে, একেবারে বুক ফুলিয়ে চলেছে— ও পারটা একটি মাত্র কাজলের নীল রেখার মতো দেখা যাচ্ছে। আমার ডান দিকের জানলা দিয়ে যতদূর চেয়ে দেখি নিবিড়সবুজ শস্যক্ষেত্র, বাম দিকের জানলা দিয়ে চেয়ে দেখি অপার উদার জলরাশি। ডান দিকে শস্যের মৃদুমন্দ আন্দোলন আর বাম দিকে আগাগোড়া একটা প্রকাণ্ড প্রচণ্ড ধাবমান গতি। আমি এই জলের দিকে চেয়ে চেয়ে অনেক সময় ভাবি— বস্তু থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে গতিকে যদি কেবল গতিভাবেই উপলব্ধি করতে ইচ্ছা করি তা হলে নদীর স্রোতে সেটি পাওয়া যায়। মানুষ পশু এবং তরুলতার মধ্যে যে চলাচল তাতে খানিকটা গতি খানিকটা বিশ্রাম, একটা অংশের গতি আর-একটা অংশের নিশ্চলতা। কিন্তু নদীর আগাগোড়াই চলছে— সেইজন্যে আমাদের মনের সঙ্গে, আমাদের চেতনার সঙ্গে তার একটা সাদৃশ্য পাওয়া যায়। আমাদের শরীর আংশিক ভাবে পদচালনা করে অঙ্গচালনা করে চলে— আমাদের মন স্বভাবতই সমগ্রতই চলছে। সেই জন্যে এই ভাদ্রমাসের পদ্মাকে একটা প্রবল মানসশক্তির মতো বোধ হয়— সে মনের ইচ্ছার মতো ভাঙছে চুরছে এবং চলেছে, মনের ইচ্ছার মতো সে আপনাকে বিচিত্র তরঙ্গভঙ্গে এবং অস্ফুট কলসংগীতে নানাপ্রকারে প্রকাশ করবার চেষ্টা করছে। বেগবান একাগ্রগামিনী নদী আমাদের মনের ইচ্ছার মতো— আর স্থির শান্ত সুবিস্তীর্ণ বিচিত্রশস্যশালিনী ভূমি আমাদের ইচ্ছার সামগ্রীর মতো। আমি মাঝখানে বোট নিয়ে আমার বামে ইচ্ছার তীব্র বেগ ও ক্রন্দন এবং দক্ষিণে সফলতার শান্ত সৌন্দর্য এবং মৃদু মর্মর বিভক্ত করে বসে আছি। আমাদের বোট ছেড়ে দিয়েছে। স্রোতের মুখে বোট ছুটে চলেছে। তীরটা এখন বামে পড়েছে— এমন সুন্দর দেখতে হয়েছে সে আর কী বলব! খুব নিবিড় প্রচুর সরস সবুজের উপর খুব ঘননীল সজল মেঘরাশি মাতৃস্নেহের মতো অবনত হয়ে রয়েছে। মাঝে মাঝে গুরু গুরু মেঘ ডাকছে। বৈষ্ণব পদাবলীতে বর্ষাকালের যমুনাবর্ণনা মনে পড়ে— প্রকৃতির অনেক দৃশ্যই আমার মনে বৈষ্ণবকবির ছন্দোঝংকার এনে দেয়— তার প্রধান কারণ, এই-সমস্ত সৌন্দর্য আমার কাছে শূন্য সৌন্দর্য নয়— এর মধ্যে মানব-ইতিহাসের যেন সমস্ত পুরাকালীন প্রীতিসম্মিলনগাথা পূর্ণ হয়ে রয়েছে, এর মধ্যে যেন একটি চিরন্তন হৃদয়ের লীলা অভিনীত হচ্ছে, এই সৌন্দর্যের মধ্যে বৈষ্ণবকবিদের সেই অনন্ত-বৃন্দাবন রয়ে গেছে। বৈষ্ণবকবিতার যথার্থ মর্মের ভিতরে যে প্রবেশ করেছে সে সমস্ত প্রকৃতির ভিতর সেই বৈষ্ণবকবিতার ধ্বনি শুনতে পায়। কিন্তু অধিকাংশ পাঠক সে রকম করে বৈষ্ণবপদ পড়ে না— বাইরে থেকে নিতান্ত সমালোচকভাবে দেখে তারা প্রত্যেক লাইন প্রত্যেক পদ স্বতন্ত্র করে দেখে, সেইজন্যে অনেক দোষ দেখতে পায়। সেগুলো চোখে পড়াই উচিত নয়— stranger অনেক জিনিস দেখতে পায় যা অন্তরঙ্গ আত্মীয় দেখতে

পায় না, তেমনি আত্মীয় যে জিনিসটি দেখতে পায় strangerএর তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে তা পড়ে না।

সাতারা
২৯ অগস্ট্ ১৮৯৪

১৪৮

কলকাতা
২৯ অগস্ট্। ১৮৯৪।

আজ সকালে বসে বসে আমার একটা নতুন গানে সুর দিচ্ছিলুম—সুরটা যে খুব নতুন তা নয়, এক রকম কীর্তনের ধরনের ভৈরবী। কিন্তু তবু ছন্দে ছন্দে গাইতে গাইতে শরীরের সমস্ত রক্তের মধ্যে একটা সংগীতের মাদকতা প্রবেশ করতে থাকে—সমস্ত শরীর এবং সমস্ত মন আগাগোড়া একটা বাজনার যন্ত্রের মতো কম্পিত এবং গুঞ্জরিত হয়ে উঠতে থাকে এবং সেই সুরের স্পন্দন আমার শরীর মন থেকে সমস্ত বাইরের জগতে সঞ্চারিত এবং ব্যাপ্ত হয়ে বিশ্বের সঙ্গে আমার সঙ্গে একটা স্বরসম্মিলন স্থাপিত হয়ে যায়। বীণার তার যখন বাজতে থাকে তখন সেটা যেমন আবছায়া দেখতে হয়, গানের সুরে সমস্তজগৎটা সেইরকম বাষ্পময় এবং ঝংকারপূর্ণ হয়ে ওঠে। কিন্তু এই রকম করে গাইতে গাইতে কাজকর্মের সময় অতিবাহিত হয়ে গেল, প্রুফগুলো পড়ে রইল, দুপুর বেজে গেল, রৌদ্রের আলোক এবং তাপ ক্রমেই তীব্র হয়ে মস্তিষ্কের মধ্যে প্রবেশ করতে লাগল—আজ আর কিছু হল না। ও দিকে রেণু এবং খোকা একটা শব্দওয়ালা খেলনা কিনে পশ্চিমের বারান্দায় চড়্‌বড়্ শব্দ করে খেলা করছে শুনতে পাচ্ছি, কাক চড়ুই প্রভৃতি অনেকগুলি পাখির শব্দ মিশ্রিত হয়ে আকাশে একটা অনির্দিষ্ট শব্দ হচ্ছে, মদনবাবুর গলি দিয়ে ফেরিওয়ালা করুণসুরে ডেকে যাচ্ছে—পিঠের দিক থেকে অল্প অল্প দক্ষিনে বাতাস এসে লাগছে—কলিকাতার বিচিত্র রকমের সুর এবং শব্দ মধ্যাহ্নের রৌদ্রে একটা গভীর ঔদাস্য এবং শ্রান্তি প্রকাশ করছে। এখনো আমার ভাত কেন এল না জানি নে, বামুনটাও সকালে ভাতের কাঠি ফেলে সুর বাঁধতে বসেছিল কিনা কে জানে, কিন্তু কারও কোনো সাড়াশব্দ শুনতে পাচ্ছি নে—মনে হচ্ছে যেন চাকর মনিব জগৎসংসার সমস্তই আজ ছুটি নিয়েছে।

সাতারা। ২ সেপ্টেম্বর ১৮৯৪

১৪৯

সাজাদপুর
৫ সেপ্টেম্বর। ১৮৯৪।

অনেক কাল বোটের মধ্যে বাস করে হঠাৎ সাজাদপুরের বাড়িতে এসে উত্তীর্ণ হলে বড়ো ভালো লাগে। বড়ো বড়ো জানলা দরজা, চার দিক থেকে অবারিত ভাবে

আলো এবং বাতাস আসতে থাকে—যে দিকে চেয়ে দেখি সেই দিকেই গাছের সবুজ ডাল চোখে পড়ে এবং পাখির ডাক শুনতে পাই—দক্ষিণের বারান্দায় বেরোবা-মাত্র কামিনী ফুলের গন্ধে মস্তিষ্কের সমস্ত রন্ধ্রগুলি পূর্ণ হয়ে ওঠে। হঠাৎ বুঝতে পারি এতদিন বৃহৎ আকাশের জন্যে ভিতরে ভিতরে একটা ক্ষুধা ছিল, সেটা এখানে এসে পেট ভরে পূর্ণ করে নেওয়া গেল। আমি চারটি বৃহৎ ঘরের একলা মালিক—সমস্ত দরজাগুলি খুলে বসে থাকি। এখানে যেমন আমার মনে লেখবার ভাব এবং লেখবার ইচ্ছা আসে এমন আর কোথাও না। বাইরের জগতের একটা জীবন্ত প্রভাব আমার সমস্ত মুক্ত দ্বার দিয়ে অবাধে প্রবেশ করতে থাকে—আলোতে আকাশে বাতাসে শব্দে গন্ধে সবুজহিল্লোলে এবং আমার মনের নেশায় মিশিয়ে অনেক রকম গল্প তৈরি হয়ে উঠতে থাকে। বিশেষত এখানকার দুপুর বেলাকার মধ্যে বড়ো একটি নিবিড় মোহ আছে। রৌদ্রের উত্তাপ, নিস্তব্ধতা, নির্জনতা, পাখিদের বিশেষত কাকের ডাক, এবং সুদীর্ঘ সুন্দর অবসর—সব-সুদ্ধ জড়িয়ে আমাকে ভারী উদাস এবং আকুল করে। কেন জানি নে, মনে হয় এই রকম সোনালি-রৌদ্রে-ভরা দুপুর বেলা দিয়ে আরব্য উপন্যাস তৈরি হয়েছে—অর্থাৎ সেই পারস্য এবং আরব্য দেশ, ডামাস্ক্‌ সমরকন্দ্‌ বুখারা—আঙুরের গুচ্ছ, গোলাপের বন, বুলবুলের গান, শিরাজের মদ—মরুভূমির পথ, উটের সার, ঘোড়সওয়ার পথিক, ঘন খেজুরের ছায়ায় স্বচ্ছ জলের উৎস—নগর, মাঝে মাঝে চাঁদোয়া-খাটানো সংকীর্ণ রাজপথ, পথের প্রান্তে পাগড়ি এবং ঢিলে কাপড়-পরা দোকানি খরমুজ এবং মেওয়া বিক্রি করছে—পথের ধারে বৃহৎ রাজপ্রাসাদ, ভিতরে ধূপের গন্ধ, জানলার কাছে বৃহৎ তাকিয়া এবং কিংখাপ বিছানো—জরির চটি ফুলো পায়জামা এবং রঙিন কাঁচলি -পরা আমিনা জোবেদি সুফি, পাশে পায়ের কাছে কুণ্ডলায়িত গুড়গুড়ির নল গড়াচ্ছে, দরজার কাছে জমকালো-কাপড়-পরা কালো হাবসি পাহারা দিচ্ছে—এবং এই রহস্যপূর্ণ অপরিচিত সুদূর দেশে, এই ঐশ্বর্যময় সৌন্দর্যময় অথচ ভয়ভীষণ বিচিত্র প্রাসাদে, মানুষের হাসিকান্না আশা-আশঙ্কা নিয়ে কত শত সহস্র রকমের সম্ভব অসম্ভব গল্প তৈরি হচ্ছে। আমার এই সাজাদপুরের দুপুর বেলা গল্পের দুপুর বেলা—মনে আছে ঠিক এই সময়ে এই টেবিলে বসে আপনার মনে ভোর হয়ে পোস্ট্‌মাস্টার গল্পটা লিখেছিলুম। আমিও লিখছিলুম এবং আমার চার দিকের আলো এবং বাতাস এবং তরুশাখার কম্পন তাদের ভাষা যোগ করে দিচ্ছিল। এই রকম চতুর্দিকের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিশে গিয়ে নিজের মনের মতো একটা-কিছু রচনা করে যাওয়ার যে সুখ তেমন সুখ জগতে খুব অল্পই আছে। আজ সকালে বসে 'ছড়া' সম্বন্ধে একটা লেখা লিখতে প্রবৃত্ত হয়েছিলুম—সেটার ভিতরে বেশ সম্পূর্ণ নিমগ্ন হতে পেরেছিলুম, বড়ো ভালো লাগছিল। 'ছড়া'র একটা স্বতন্ত্র রাজ্য আছে, সেখানে কোনো আইন কানুন নেই—মেঘ-রাজ্যের মতো। দুর্ভাগ্যক্রমে, যে রাজ্যে আইন-কানুনের প্রাবল্য বেশি সেই বৈষয়িক রাজ্য সর্বত্রই পিছনে পিছনে অনুসরণ করেন। লিখতে লিখতে হঠাৎ মাঝখানে আমলাদের একটা উপপ্লব উপস্থিত হল, আমার মেঘরাজ্য ঝড়ে উড়িয়ে নিয়ে গেল। সেই-সমস্ত ব্যাপার নিয়ে আহারের সময় এল। দুপুর বেলায় পেট ভরে খাওয়ার মতো এমন জড়ত্বজনক জিনিস আর কিছু নেই, ওতে মানুষের কল্পনাশক্তি এবং উচ্চ অঙ্গের সমস্ত হৃদয়বৃত্তি একেবারে অভিভূত করে ফেলে। বাঙালিরা প্রচুর পরিমাণে মধ্যাহ্নভোজন করে বলেই মধ্যাহ্নের একটি নিবিড় ভাব-সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারে না—দরজা বন্ধ করে তামাক খেতে খেতে পান

চিবোতে চিবোতে অত্যন্ত পরিতৃপ্ত পরিপূর্ণভাবে নিদ্রার আয়োজন করতে থাকে। তাতে করেই দিব্যি চিক্‌চিকে গোলগাল হয়ে ওঠে। কিন্তু বাংলাদেশের বৈচিত্র্য-বিহীন অসীম সমতল শস্যক্ষেত্রের মধ্যে জনহীন শ্রান্ত মধ্যাহ্ন যেমন বৃহৎভাবে নিস্তব্ধভাবে বিস্তীর্ণ হতে পারে এমন আর কোথাও না। আমাকে খুব ছেলেবেলা থেকে এই মধ্যাহ্নকাল ব্যাকুল করে আসছে। তখন বাইরের তেতালায় কেউ থাকত না, সেখানে খোলা দরজায় উত্তপ্ত বাতাসে বাঁকা কৌচে আমি একলাটি পড়ে থাকতুম —সমস্ত দীর্ঘ দিন কী কল্পনায়, কী অব্যক্ত আকাঙ্ক্ষায়, কী রকম করে কাটত।

সাতারা
১০ সেপ্টেম্বর ১৮৯৪

১৫০

সাজাদপুর
৭ সেপ্টেম্বর। ১৮৯৪।

আমি চিঠি পাই সন্ধের সময়, আর আমি চিঠি লিখি দুপুর বেলায়। রোজ একই কথা লিখতে ইচ্ছা করে—এখানকার এই দুপুর বেলাকার কথা। কেননা, আমি এর মোহ থেকে কিছুতেই আপনাকে ছাড়াতে পারি নে। এই আলো, এই বাতাস, এই স্তব্ধতা আমার রোমকূপের মধ্যে প্রবেশ করে আমার রক্তের সঙ্গে মিশে গেছে—এ আমার প্রতিদিনকার নতুন নেশা, এর ব্যাকুলতা আমি নিঃশেষ করে বলে উঠতে পারি নে। প্রতিদিনের শরৎকালের দুপুর বেলা আমার কাছে রোজ একই ভাবে উদয় হয়—পুরাতন প্রতিদিনই নূতন করে আসে, এবং আমার ঠিক সেই কালকের মনোভাব আজ আবার তেমনি করে জেগে ওঠে। প্রকৃতি প্রতিদিন পুনরাবৃত্তি করতে কিছুমাত্র সংকোচ বোধ করে না। আমাদেরই সংকোচ বোধ হয়, মনে হয় আমাদের ভাষার মধ্যে সেই অনন্ত উদারতা নেই যাতে রোজ এক ভাবকে নতুন করে দেখাতে পারে। অথচ সকল কবিই চিরকাল উল্টেপাল্টে প্রায় একই কথা বলে আসছে এবং সেই এক কথাই সহস্র আকার ধারণ করছে। কোনো কোনো ক্ষুদ্র কবি কিছু জবরদস্তি করে নূতনত্ব আনবার চেষ্টা করে—তাতে এই প্রমাণ হয় যে, পুরাতনের মধ্যে যে চিরনূতনত্ব আছে তার ক্ষুদ্র কল্পনায় সেটা আর অনুভব করতে পারে না, সেইজন্যে সৃষ্টিছাড়া নূতনত্বের জন্যে ঘুরে বেড়ায়। অনেক বোধশক্তি-বিহীন পাঠক আছে যারা নূতনকে কেবলমাত্র তার নূতনত্বের জন্যই পছন্দ করে। কিন্তু আসল ভাবুকরা এই-সকল নূতনত্বের ফাঁকিকে তুচ্ছ প্রবঞ্চনা বলে ঘৃণা করে। তারা এ নিশ্চয় জানে যে, যা আমরা যথার্থ অনুভব করি তা কোনো কালেই পুরোনো হতে পারে না। কিন্তু যখনি একটা জিনিস আমাদের অনুভব থেকে বিচ্যুত হয়ে কেবলমাত্র আমাদের জ্ঞানে এসে দাঁড়ায়, তখনি তার জরা উপস্থিত হয়। তখন তাকে মৃত্যুর হস্ত থেকে রক্ষা করা কারও সাধ্য নয়। সেই জন্যে যারা জ্ঞানের দ্বারা একটা জিনিসকে সুন্দর বলে জানে অথচ সম্পূর্ণ অনুভব করে না, তারা সে সম্বন্ধে বাড়াবাড়ি করে, খুব একটা প্রবল কিম্বা খুব একটা নতুন কথা বলবার চেষ্টা করে—কিন্তু যথার্থ প্রবল কথা এবং যথার্থ নতুন কথা তাদের মুখ দিয়ে বেরোয় না। আমি ছোটো কবি কি বড়ো কবি সে বিষয়ে

আলোচনা করবার কোনো দরকার দেখি নে— কিন্তু এটা আমি বারম্বার দেখেছি, পৃথিবীর কোনো জিনিসকেই যেন আমি শেষ করতে পারি নি। যা আমার একবার মনে লেগেছে তা আমার চিরকালই মনে লাগে, এবং প্রত্যেক দিনই তার নূতনত্বে আমাকে নিবিড় বিস্ময়ে পূর্ণ করতে থাকে। আমার পুনঃপুনঃ স্পর্শ লেগে কোনো জিনিস জীর্ণ হয় না; বরঞ্চ প্রতিবারেই তার উজ্জ্বলতা বেড়ে ওঠে, অথচ সে উজ্জ্বলতার মধ্যে অমূলক বা কাল্পনিক কিছু নেই— মিথ্যা কাল্পনিকতাকে আমি ভারী ঘৃণা করি। আমি সমস্ত জিনিসের বাস্তবিকতাটুকু স্পষ্ট দেখতে পাই; অথচ তারই ভিতরে, তার সমস্ত ক্ষুদ্রতা এবং সমস্ত আত্মবিরোধের মধ্যেও আমি একটা অনির্বচনীয় স্বর্গীয় রহস্যের আভাস পাই। আমার বয়স এবং অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে সেই রহস্যের বিস্ময় এবং আনন্দ যেন বাড়ছে বৈ কমছে না— তার থেকেই আমি প্রতিদিন বুঝতে পারছি, যারা আমাকে আনন্দ দিচ্ছে তারা কোনো অংশে ফাঁকি নয়, তারা কিছুমাত্র সামান্য নয়, তাদের মধ্যে অনন্তসত্য অনন্ত-আনন্দ আছে। এ কথা পরিষ্কার করে বললে অধিকাংশ লোক অবাক হয়, কিন্তু যারা নিজের জীবন দিয়ে এ-সব কথা অনুভব করে নি তাদের শুধু মুখের কথায় আমি কী করে অনুভব করাব! তারা ছোটো ছোটো বাঁধি গতের বেড়া বেঁধে সেই বেড়ার মধ্যেকার জমিটুকুকেই জগৎসংসার মনে করে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছে, অনন্তের আলোক তাদের সেই ক্ষুদ্র দম্ভের উপর কোনোদিন আঘাত করে নি। তারা সুখে আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু যদি আত্মা বলে কিছু থাকে তবে নিশ্চয়ই সে সুখ প্রার্থনীয় নয় এবং যখন সেই সাংসারিক বাঁধি সুখকে ক্ষুদ্র বলে মনে হয় এবং দুঃখের মধ্যে একটা আন্তরিক বন্ধনমুক্তি দেখা যায় তখনি বুঝতে পারি— আত্মা বলে একটা জিনিস আছে, সে জিনিস এক জিনিসই স্বতন্ত্র।

সাতারা
১২ সেপ্টেম্বর ১৮৯৪

১৫১

সাজাদপুর
৭ সেপ্টেম্বর। ১৮৯৪।

যখন এইরকম লিখতে লিখতে লেখা বেড়ে যায়, এবং প্রতিদিন সকালে বিছানা থেকে উঠেই মনে হয় কাল সেই লেখাটা কোথায় ছেড়ে দিয়েছিলুম এবং আজ কোথা থেকে আরম্ভ করতে হবে, তখন ভারী ভালো লাগে— দিনগুলিকে বেশ লেখায় পরিপূর্ণ করে ভরা কলসীর মতো সন্ধেবেলায় ঘরে নিয়ে গিয়ে তুলি, এবং সেই-সব লেখার ধ্বনি প্রতিধ্বনির রেশ সমস্ত শরীর মনের মধ্যে বাজতে থাকে। আজকাল এই ছড়ার রাজ্যে ভ্রমণ করতে করতে আমি কত রকমের ছবি এবং কত রকমের সুখ দুঃখ ও হৃদয়বৃত্তির ভিতর দিয়ে ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলে যাচ্ছি তার আর ঠিকানা নেই। এমন-কি লিখতে লিখতে এক-এক সময় চোখ ছল্‌ ছল্‌ করে ওঠে, আবার এক-এক সময় মুখে হাসিও দেখা দেয়। আজ বেড়াতে বেড়াতে ভাবছিলুম এতে আমার এত আনন্দ কিসের? আসল কথা হচ্ছে, অনুভব করাতেই আমাদের হৃদয়ের ক্ষমতা প্রকাশ হয়— আমি যখন একটা প্রাচীন স্মৃতির জন্য হৃদয়ের মধ্যে

ব্যথা পাই তখন সেই ব্যথার মধ্যে আনন্দ এইটুকু যে, স্মৃতিটুকুকে আমি উপলব্ধি করতে পারছি, সেটা আমার কাছে আসছে— প্রত্যক্ষ থেকে অপ্রত্যক্ষ অবধি, বর্তমান থেকে অতীত পর্যন্ত আমার হৃদয়ের বোধশক্তি প্রসারিত হয়ে যাচ্ছে। বরঞ্চ সুখের চেয়ে দুঃখে সেই বোধশক্তি আমরা বেশি করে অনুভব করি, যে কল্পনা আমাদের ব্যথা দেয় সে আমাদের কাছে গভীরতর এবং স্পষ্টতররূপে প্রতীয়মান হয়— এইজন্যে আর্টের এলাকায় দুঃখের ব্যাপ্তিই কিছু বেশি। দয়া, সৌন্দর্যবোধ, ভালোবাসা, এ-সমস্ত হৃদয়বৃত্তিতে আমরা নিজের দ্বারা অন্যকে লাভ করি, এইজন্যে এদের ভিতরকার দুঃখকষ্টেও একটা আনন্দের অভাব নেই; কিন্তু বীভৎসকল্পনাজনিত ঘৃণা কিম্বা নিষ্ঠুরকল্পনাজনিত পীড়ায় আমাদের বিমুখ করে দেয়, আমাদের হৃদয়ের স্বাধীনগতিকে বাধা দিতে থাকে, এইজন্যে সে-সকল বৃত্তিতে আমাদের কোনো আনন্দ নেই। ওথেলোর মধ্যে যেটুকু করুণা আছে সেটুকু আমাদের আকর্ষণ করে, কিন্তু ওর শেষ অংশে যেটা বর্বর নিষ্ঠুরতা সেটা আমাকে ওথেলো থেকে বিমুখ করে দেয়— মনে হয় যেন সেটা আর্টের সীমার বাইরে। কিন্তু বড়ো সংগীতের হার্মনিতে যেমন অনেক সময় সুরটাকে বিচিত্র এবং জাজ্বল্যমান করবার জন্যে বেসুরো মিশিয়ে দেয় তেমনি বড়ো বড়ো কাব্যে খানিকটা পরিমাণে অকাব্যও মেশানো থাকে; তাতে মোটের উপরে হয়তো কাব্যাংশটা বেশি স্ফূর্তি পায়— সেইজন্যে ওরকম একটা অংশ ধরে কিছু বলা যায় না। কিন্তু তবু আমি নিজের কথা বলতে পারি, উঁচুদরের সাহিত্যের মধ্যে ওথেলো এবং কেনিল্‌ওয়ার্থ্‌ আমার দ্বিতীয়বার পড়তে কিছুতেই মন ওঠে না। এর মধ্যে একটা প্রশ্ন আছে এই যে, বাস্তব জগতের সুখদুঃখ এবং কাব্যজগতের সুখদুঃখে আনন্দের অনেক প্রভেদ আছে, তার কারণ কী? তার কারণ হচ্ছে— বাস্তব জগতের সুখদুঃখ ভারী জটিল এবং মিশ্রিত। তার সঙ্গে আমাদের স্বার্থ আমাদের শরীরের চেষ্টা প্রভৃতি অনেক জিনিস জড়িত। কাব্যজগতের সুখদুঃখ বিশুদ্ধরূপে মানসিক, তার সঙ্গে আমাদের অন্য কোনো দায় নেই, স্বার্থ নেই, জড়জগতের বাধা নেই, শারীরিক তৃপ্তি বা শ্রান্তি নেই। আমাদের হৃদয় স্বাধীনভাবে সম্পূর্ণভাবে অমিশ্রভাবে অনুভব করবার অবসর পায়— কাব্যে আমাদের আনন্দ একেবারে অব্যবহিত; কোনো প্রয়োজনের মধ্য দিয়ে, কোনো ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়ে তার সাক্ষাৎকার লাভ করতে হয় না— আমরা দেহবদ্ধ অধীন মানুষ হয়েও কেবলমাত্র আমাদের হৃদয় দিয়ে একটা মানসিক জগতে অবাধে বিচরণ করতে পারি। এই জন্যে কাব্যের আনন্দে আমাদের আনন্দের সীমায় নিয়ে গিয়ে ঠোকর খাইয়ে ফিরিয়ে নিয়ে আসে না, প্রত্যেক আনন্দের সঙ্গে একটা অশ্রান্তি অতৃপ্তি এবং অসীমতার আস্বাদ দেয়।... নিজের মনের কথাও আমাদের নিজের কাছে ভারী দুরূহ— আমরা ঠিক কী ভাবছি তা আমরা সম্পূর্ণ জানতে পারি নে, তার অর্ধেক কথা কেবলমাত্র অন্তর্যামীই জানেন। আমি নিজের কথা প্রকাশ করে বলতে গিয়ে নিজের কাছ থেকে নিজে শিক্ষা লাভ করি— আমার অধিকাংশ শিক্ষাই এমনি করে হয়েছে, আমার মুখ বন্ধ করে দিলেই আমার বিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যায়। সেইজন্যে এবং নিজের মনের ঝোঁকে তোর কাছে বসে বসে আমার প্রতিদিনের বকুনি বকে যাই।

সাতারা
১২ সেপ্টেম্বর ১৮৯৪

১৫২

পতিসর
১০ সেপ্টেম্বর। ১৮৯৪।

কাল সকাল থেকে জলপথে রয়েছি। চারি দিকেই কেবল বিল, ধানের ডগাগুলি জেগে রয়েছে—গুটিকতক ঘনবদ্ধ কুটির নিয়ে গ্রামগুলি দূরে দূরে ভাসছে—মৃদু সুগন্ধবিশিষ্ট সবুজ শৈবাল অনেক দূর পর্যন্ত জমাট বেঁধে রয়েছে, হঠাৎ ডাঙা বলে বোধ হয়; তারই মধ্যে বিচিত্র জলচর পাখির আড্ডা। ভাদ্র মাসের দিন, বাতাস বেশি নেই, বোটের শিথিল পাল ঝুলে ঝুলে পড়ছে এবং নৌকোটি সমস্তদিন আলস্যমন্থর গমনে নিতান্ত উদাসীনের মতো চলেছে। এই শৈবালবিকীর্ণ সুবিস্তীর্ণ জলরাজ্যের মধ্যে শরতের উজ্জ্বল রৌদ্র পড়েছে, আমি জানলার কাছে এক চৌকিতে বসে আর-এক চৌকিতে পা তুলে দিয়ে সমস্তদিন কেবল গুন্‌গুন্‌ করে গান করছি। রামকেলি প্রভৃতি সকাল বেলাকার যে-সমস্ত সুর কলকাতায় নিতান্ত অভ্যস্ত এবং প্রাণহীন বোধ হয়, এখানে তার একটু আভাসমাত্র দিলেই অমনি তার সমস্তটা সজীব হয়ে ওঠে। তার মধ্যে এমন একটা অপূর্ব সত্য এবং নবীন সৌন্দর্য দেখা দেয়, এমন একটা বিশ্বব্যাপী গভীর করুণা বিগলিত হয়ে চারি দিককে বাষ্পাকুল করে তোলে যে, এই রাগিণীকে সমস্ত আকাশ এবং সমস্ত পৃথিবীর গান বলে মনে হতে থাকে। এ একটা ইন্দ্রজাল, একটা মায়ামন্ত্রের মতো। আমার সুরের সঙ্গে কত টুকরো টুকরো কথা যে আমি জুড়ি তার আর সংখ্যা নেই—এমন এক লাইনের গান সমস্ত দিন কত জমছে এবং কত বিসর্জন দিচ্ছি। রীতিমত বসে সেগুলোকে পুরো গানে বাঁধতে ইচ্ছা করছে না। এই চৌকিটাতে বসে আকাশ থেকে সোনালি রোদ্দুরটুকু পান করতে করতে এবং জলের উপরকার সরস শৈবালের নবীন কোমলতার উপর চোখ দুটো স্নেহস্পর্শের মতো বুলোতে বুলোতে যতটুকু অনায়াস আলস্যভরে আপনিই মনে উদয় হয় তার বেশি চেষ্টা করা আপাতত আমার সাধ্যাতীত। আজ সমস্ত সকাল নিতান্ত সাদাসিধা ভৈরবী রাগিণীতে যে গোটা দুই-তিন ছত্র ক্রমাগত আবৃত্তি করছিলুম সেটুকু মনে আছে এবং নমুনাস্বরূপে নিম্নে উদ্‌ধৃত করা যেতে পারে।—

ওগো তুমি নব নব রূপে এসো প্রাণে!
(আমার নিত্যনব!)
এসো গন্ধ বরন গানে!
আমি যে দিকে নিরখি তুমি এসো হে
আমার মুগ্ধ মুদিত নয়ানে!

সাতারা
১৫ সেপ্টেম্বর ১৮৯৪

১৫৩

দিঘপতিয়া জলপথে
২০ সেপ্টেম্বর। ১৮৯৪।

পদ্মার ও দিকে এখন জল কমে যাচ্ছে, কিন্তু এ দিকে জল বাড়বার এই সময়। চতুর্দিকে তার পরিচয় পাচ্ছি। বড়ো বড়ো গাছ জলের মধ্যে তার সমস্ত গুঁড়িটি ডুবিয়ে দিয়ে শাখাপ্রশাখা জলের উপর অবনত করে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে— আমগাছ বটগাছের অন্ধকার জঙ্গলের ভিতরে নৌকো বাঁধা এবং তারই মধ্যে প্রচ্ছন্ন হয়ে গ্রামের লোকেরা স্নান করছে। এক-একটি কুঁড়েঘর স্রোতের মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তার চারি পার্শ্বের সমস্ত প্রাঙ্গণ জলমগ্ন। কোথাও মাঠের চিহ্ন দেখবার জো নেই, কেবল ধানের ডগা জলের উপরে একটুখানি মাথা তুলে রয়েছে। বিল-খাল নদী-নালা কত রকম জলপথের মধ্যে দিয়েই যে চলেছি তার ঠিক নেই। ধানের ক্ষেতের ভিতর দিয়ে বোট সর্‌সর্‌ শব্দে যেতে যেতে হঠাৎ একটা পুকুরের মধ্যে গিয়ে পড়ে— সেখানে আর ধান নেই— নালবনের মধ্যে সাদা সাদা নাল ফুল ফুটে রয়েছে এবং কালোবর্ণ পানকৌড়ি জলের ভিতরে ডুব দিয়ে দিয়ে মাছ ধরছে। আবার যেতে যেতে হঠাৎ এক জায়গায় ছোটো নদীর মধ্যে এসে পড়ে— সেখানে এক তীরে ধানের ক্ষেত, আর-এক তীরে ঘন ঝোপঝাড়ের মধ্যে গ্রাম— মাঝখান দিয়ে একটি পরিপূর্ণ জলস্রোত এঁকে বেঁকে চলে গেছে। জল যেখানে সুবিধে পাচ্ছে সেইখানেই প্রবেশ করছে— স্থলের এমন পরাভব তোরা বোধ হয় কখনও দেখিস নি। বড়ো বড়ো গোল মাটির গামলার মধ্যে বসে একখণ্ড বাখারিকে দাঁড়ের মতো ব্যবহার করে গ্রামের লোকেরা ইতস্তত যাতায়াত করছে— ডাঙাপথ একেবারেই নেই। আর-একটু জল বাড়লেই ঘরের ভিতরে জল প্রবেশ করবে— তখন মাচা বেঁধে তার উপরে বাস করতে হবে, গোরুগুলো দিনরাত্রি এক হাঁটু জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মরবে, তাদের খাবার যোগ্য ঘাস ক্রমেই দুর্লভ হয়ে দাঁড়াবে, সাপগুলো তাদের জলমগ্ন গর্ত পরিত্যাগ করে কুঁড়েঘরের চালের মধ্যে এসে আশ্রয় নেবে এবং যত রাজ্যের গৃহহীন কীটপতঙ্গ সরীসৃপ মানুষের সহবাস গ্রহণ করবে। একে গ্রামের চতুর্দিক ঘন জঙ্গলে আচ্ছন্ন এবং অন্ধকার— তাতে আবার তারই মধ্যে জল প্রবেশ করে সমস্ত পাতা লতা গুল্ম পচতে থাকে, গোয়ালঘর এবং মানবগৃহের আবর্জনা সমস্ত চার দিকে ভাসতে থাকে, পাট-পচা দুর্গন্ধ জলের রঙ নীল হয়ে ওঠে, উলঙ্গ পেট-মোটা পা-সরু রুগ্ন ছেলেমেয়েগুলো যেখানে সেখানে জলে কাদায় মাখামাখি ঝাঁপাঝাঁপি করতে থাকে, মশার ঝাঁক স্থির পচা জলের উপর একটি বাষ্পস্তরের মতো ঝাঁক বেঁধে ভন্‌ ভন্‌ করতে থাকে— এ অঞ্চলের বর্ষার গ্রামগুলি এমন অস্বাস্থ্যকর আরামহীন আকার ধারণ করে যে তার পাশ দিয়ে যেতে গা কেমন করে। যখন দেখতে পাই গৃহস্থের মেয়েরা একখানা ভিজে শাড়ি গায়ে জড়িয়ে বাদলার ঠাণ্ডা হাওয়ায় বৃষ্টির জলে ভিজতে ভিজতে হাঁটুর উপর কাপড় তুলে জল ঠেলে ঠেলে সহিষ্ণু জন্তুর মতো ঘরকর্‌নার নিত্যকর্ম করছে, তখন সে দৃশ্য কিছুতেই ভালো লাগে না। এত কষ্ট এত অনারাম মানুষের কী করে সয় আমি ভেবে পাই নে— এর উপরে প্রতি ঘরে ঘরে বাতে ধরছে, পা ফুলছে, সর্দি হচ্ছে, জ্বর হচ্ছে, পিলেওয়ালা ছেলেগুলো অবিশ্রাম ঘ্যান্‌ ঘ্যান্‌ করে কাঁদছে, কিছুতেই তাদের বাঁচাতে পারছে না— একটা একটা করে মরে যাচ্ছে। এত

অবহেলা অস্বাস্থ্য অসৌন্দর্য দারিদ্র্য বর্বরতা মানুষের আবাসস্থলে কিছুতেই শোভা পায় না। সকল রকম ক্ষমতার কাছেই আমরা পরাভূত হয়ে আছি— প্রকৃতি যখন উপদ্রব করে তাও সয়ে থাকি, রাজা যখন উপদ্রব করে তাও সয়ে থাকি, এবং শাস্ত্র চিরকাল ধরে যে-সমস্ত দুঃসহ উপদ্রব করে আসছে তার বিরুদ্ধেও কথাটি বলতে সাহস হয় না। এরকম জাতের পৃথিবী ছেড়ে একেবারে পলাতকা হওয়া উচিত— এদের দ্বারা জগতের কোনো সুখও নেই, শোভাও নেই, এবং সুবিধেও নেই।

সাতারা
২৫ সেপ্টেম্বর ১৮৯৪

১৫৪

বোয়ালিয়া-পথে
বৃহস্পতিবার?
২২ সেপ্টেম্বর। ১৮৯৪।

আজ চতুর্দিক নির্মল হয়ে ভারী সুন্দর রোদ উঠেছে [বব]। ছোটো নদী, সুতীব্র স্রোত, তারই প্রতিকূলে গুণ টেনে চলাতে ক্রমাগত কল্‌কল্‌ ছল্‌ছল্‌ শব্দ কানে আসছে। এতদিন বৃষ্টিতে ভেজার পর আজ শরতের নবীন রৌদ্রে নদীর দুই ধারের গাছপালা এবং গ্রামগুলি এমন একটি আরামপুলকের ভাব প্রকাশ করছে! আজ আকাশ এবং পৃথিবী থেকে দুর্দিনের স্মৃতি সমস্ত একেবারে মুছে গেছে। যেন জগতে কোনো কালেই আনন্দের অবসান ছিল না। এই আকাশ-ভরা সোনার রৌদ্রটি আজ আমারও মনের উপর সম্পূর্ণ বিস্তারিত হয়েছে—সেখানে আমার জীবনের সমস্ত সুখস্মৃতির দেশটি শরতের আলোতে এক অপরূপ মায়া-রাজ্যের মতো দেখাচ্ছে। যখন ভেবে দেখি এ জীবনে কেবলমাত্র বত্রিশটি শরৎকাল এসেছে এবং গেছে তখন ভারী আশ্চর্য বোধ হয়— অথচ মনে হয় আমার স্মৃতিপথ ক্রমেই অস্পষ্টতর হয়ে কুহেলিকাময় অনাদিকালের দিকে চলে গেছে, এবং এই-সমস্ত বৃহৎ মানস রাজ্যের উপর যখন মেঘমুক্ত সুন্দর প্রভাতের রৌদ্রটি এসে পড়ে তখন আমি যেন আমার এক মায়া-অট্টালিকার বাতায়নে বসে এক সুদূরবিস্তৃত মায়াময়ী মরীচিকা-রাজ্যের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকি, এবং আমার কপালে যে বাতাসটি এসে লাগতে থাকে সে যেন অতীতের সমস্ত অস্পষ্ট মিশ্রিত মৃদু গন্ধ-প্রবাহ বহন করে আনতে থাকে। আমি আলো এবং আকাশ এত ভালোবাসি! বোধ হয় আমার নামের সার্থকতার জন্যে! গেটে মরবার সময় বলেছিলেন : More light!— আমার যদি সে সময় কোনো ইচ্ছা প্রকাশ করবার থাকে তো আমি বলি : More light and more space! আমার একটা কবিতায় আমি ইচ্ছা প্রকাশ করেছি—

শূন্য ব্যোম অপরিমাণ,
মদ্যসম করিব পান
মুক্ত করি রুদ্ধ প্রাণ
ঊর্ধ্ব নীলাকাশে।

এই আকাশ পান করে আমার এ পর্যন্ত তৃপ্তি হয় নি। অনেকে বাংলাদেশকে সমতলভূমি বলে আপত্তি প্রকাশ করে, কিন্তু সেই জন্যেই বাংলাদেশের মাঠের দৃশ্য, নদীতীরের দৃশ্য, আমার এত বেশি ভালো লাগে। যখন সন্ধ্যার আলোক এবং সন্ধ্যার শান্তি উপর থেকে নামতে থাকে তখন সমস্ত অনবরুদ্ধ আকাশটি একটি নীলকান্ত মণির পেয়ালার মতো আগাগোড়া পরিপূর্ণ হয়ে উঠতে থাকে, যখন স্তিমিত শান্ত নীরব মধ্যাহ্ন তার সমস্ত সোনার আঁচলটি বিছিয়ে দেয় তখন কোথাও সে বাধা পায় না— চেয়ে চেয়ে দেখবার এবং দেখে দেখে মনটা ভরে নেবার এমন জায়গা আর নেই। আমি সেই জন্যে পর্বতের চেয়ে সমুদ্রতীর ঢের বেশি ভালোবাসি। পুরীতে যে দিন সমুদ্রতীরে গিয়ে উপস্থিত হলুম— এক দিকে ধূসর বালি ধু ধু করছে, আর-এক দিকে গাঢ়নীল সমুদ্র এবং পাণ্ডুনীল আকাশ দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত প্রসারিত হয়ে গেছে— সেদিন সমস্ত অন্তঃকরণ যে কী রকম পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল সে ঠিক বলা যায় না। তাই আমার ভারী ইচ্ছে হয়েছিল— পুরীতে সমুদ্রতীরে একটি ছোটো বাড়ি তৈরি করে পড়ে থাকি। এখনও সেই গৃহহারা তরঙ্গের গর্জনশব্দ দূরে স্বপ্নের মতো কানে এসে লাগে। সন্ন্যাসীরা যে রকম করে বেড়িয়ে বেড়ায় তেমনি করে ভ্রমণ করা যদি আমার পক্ষে সহজ হত তা হলে এই অবারিত পৃথিবীর হাতে আপনাকে সমর্পণ করে দিয়ে একবার দেশে দেশান্তরে ঘুরে আসতুম। কিন্তু আকাশও দুই হাত বাড়িয়ে ডাকে, এবং গৃহও দুই হাত ধরে টেনে নিয়ে আসে। উভচর জীব হয়ে আমি ভারী মুশকিলে পড়েছি। সকল বিষয়েই আমি উভচর— মানসজগৎ এবং বস্তুজগৎ দুইয়ের মধ্যেই আমার সমান বন্ধন।

সাতারা
২৭ সেপ্টেম্বর ১৮৯৪

১৫৫

বোয়ালিয়া
সোমবার, ২৪ সেপ্টেম্বর। ১৮৯৪।

তুই যে লিখেছিস যাদের অনুভাব বেশি প্রবল তারা জগতে বেশি দুঃখী হয়, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না— কারণ, দুঃখভোগ করবার ক্ষমতা অনুভবশক্তির উপরেই নির্ভর করে। কিন্তু আমি অনেক সময়ে ভেবে দেখেছি সুখী হলুম কি দুঃখী হলুম সেইটে আমার পক্ষে শেষ কথা নয়। আমাদের অন্তরতম প্রকৃতি সমস্ত সুখদুঃখের ভিতরে নিজের একটা বৃদ্ধি অনুভব করতে থাকে। আমাদের ক্ষণিক জীবন এবং চিরজীবন দুটো একত্র সংলগ্ন হয়ে আছে মাত্র, কিন্তু দুটো এক নয়, এ আমি মাঝে মাঝে স্পষ্ট উপলব্ধি করতে পারি। আমাদের ক্ষণিক জীবন যে সুখ দুঃখ ভোগ করে আমাদের চিরজীবন তার থেকে সারাংশ গ্রহণ করে। তুই বোধ হয় জানিস গাছের সবুজ পাতা সূর্যকিরণকে বিশ্লেষণ করে তার থেকে কার্বন-নামক অঙ্গারপদার্থ-সঞ্চয়ের সাহায্য করে, যে কার্বন থাকাতে গাছ পোড়ালে আগুন হয়। গাছের পাতা প্রতিদিন রৌদ্রে প্রসারিত হয়ে শুষ্ক হয়ে ঝরে যাচ্ছে, আবার নতুন নতুন পাতা গজাচ্ছে— গাছের ক্ষণিক জীবন কেবল

রৌদ্র ভোগ করছে এবং সেই উত্তাপেই শুকিয়ে পড়ে যাচ্ছে— আর গাছের চিরজীবন তার ভিতর থেকে দাহহীন চির-অগ্নি সঞ্চয় করছে। আমাদেরও প্রতিদিনের প্রতি মুহূর্তের পল্লবরাশি চতুর্দিকে প্রসারিত হয়ে জগতের সমস্ত প্রবহমান সুখ দুঃখ ভোগ করছে এবং সেই সুখদুঃখের উত্তাপে শুষ্ক হয়ে দগ্ধ হয়ে ঝরে ঝরে পড়ছে, কিন্তু আমাদের চিরজীবনকে সেই প্রতি মুহূর্তের দাহ স্পর্শ করতে পারে না— অথচ তার তেজটুকু সে আপনার অন্তরে ক্রমাগতই অলক্ষিত অচেতন ভাবে সঞ্চয় করতে থাকে। যে গাছের পাতা সবুজ নয় সে গাছ উচ্চশ্রেণীর গাছ নয়, তার কার্বন-সঞ্চয়ও সামান্য। যে মানুষের প্রতি মুহূর্তের অনুভব-শক্তি সুখদুঃখ-ভোগ-শক্তি সামান্য, তার দাহও অল্প, তার চিরপ্রাণের সঞ্চয়ও অতি অকিঞ্চিৎকর। তার ক্ষণিক জীবনটা সুখদুঃখের তাপ থেকে সংরক্ষিত হয়ে অনেকদিন স্থায়ী হয়— অর্থাৎ প্রায় দেখা যায়, প্রতিদিনের ক্ষুদ্র সংসার, সংকীর্ণ জীবনযাত্রার অতি সংকীর্ণ সীমা, তাদের কাছে চিরকাল যথেষ্ট থাকে; সেটা তাদের শুষ্ক হয় না, ঝরে যায় না। তারা অচেতনতার আবরণে ক্ষণিককে অপেক্ষাকৃত স্থায়ী করে রাখে; দুদিনকে এমন তাজা রেখে দেয় যে দেখে মনে হয় তা চিরদিনের; সংসারের সামান্য ব্যাপারকে এমন করে তোলে যেন তা অসামান্য। কিন্তু সংসারের সর্বত্রই ক্ষতিপূরণের একটা নিয়ম আছে, যাকে বলে 'law of compensation'। প্রতিদিনকে সজীবভাবে সংরক্ষণ করতে চেষ্টা করলে চিরদিনকে নির্জীব করা হয়। যারা অনুভবশক্তির জড়ত্ব-বশত সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট সেই সংসারী বিষয়ী লোকেরা ক্ষণিকজীবনের সন্তোষসুখে হৃষ্টপুষ্ট হয়ে ওঠে, কিন্তু চিরজীবনের সুগভীর আনন্দ তাদের কল্পনার অতীত, ধারণার অগম্য— তারা সেটাকে কবিতার অলংকার বলে জ্ঞান করে, মনের সঙ্গে বিশ্বাস করে না। সেই জন্য, যে সুখ সাংসারিক সুখ নয় এবং যে দুঃখ সাংসারিক দুঃখ সেইটেকে পরিত্যাগ করে চলাই জীবনযাত্রার আদর্শ বলে জ্ঞান করে এবং কারও সাধ্য নেই তাদের মনে এর চেয়ে উচ্চতর আদর্শের যথার্থ উপলব্ধি জন্মিয়ে দেওয়া-- তাদের বুঝিয়ে দেওয়া যে, যারা অত্যন্ত বৃহৎ দুঃখের দ্বারা দুঃখ পাচ্ছে তারাও তোমার মতো কৃপাপাত্র নয়। আমি আমার ভাবটা ঠিক পরিষ্কার করতে পেরেছি কিনা জানি নে [বব]। আমাদের মনের যেগুলো যথার্থ কথা সেগুলো এত অন্তরে বসতি করে যে অন্যের কাছে তাদের ঠিক পরিদৃশ্যমান করে তোলা, ঠিক সত্যরূপে প্রতীয়মান করে তোলা, ভারী কঠিন বলে মনে হয়— সেই জন্যে গোড়ায় চেষ্টা করতেই ভয় হয়। যা আমার পক্ষে সর্বাপেক্ষা গভীরতম সত্য— যা আমাদের জীবনের মর্মস্থানে বিরাজ করে— তাকে আমরা নানা আকারে, নানা কথায়, নানা কাজে, অজ্ঞাতসারে খণ্ড খণ্ড করে প্রকাশ করি। কিন্তু একেবারে সমগ্রভাবে তাকে অন্যের কাছে, এমন-কি নিজের কাছে প্রত্যক্ষগ্রাহ্য করা বড়ো শক্ত— ভয় হয় পাছে, যে জিনিসটা অন্তঃকরণের পক্ষে একান্ত সত্য সেইটেই বাইরে বেরোতে গেলে কাল্পনিক বেশ ধারণ করে আসে।

সাতারা
২৯ সেপ্টেম্বর ১৮৯৪

১৫৬

বোয়ালিয়া
২৪ সেপ্টেম্বর। ১৮৯৪।

আমার স্বীকার করতে লজ্জা করে এবং ভেবে দেখতে দুঃখ বোধ হয়— সাধারণত মানুষের সংসর্গ আমাকে বড়ো বেশি উদ্‌ভ্রান্ত করে দেয়, আমাকে ভিতরে ভিতরে পীড়ন করতে থাকে— সকলের মতো হয়ে, সকল মানুষের সঙ্গে বেশ সহজভাবে মিলেমিশে, সহজ আমোদপ্রমোদে আনন্দ লাভ করবার জন্যে আমার মনকে আমি প্রতিদিন দীর্ঘ উপদেশ দিয়ে থাকি, কিন্তু আমার চারি দিকেই এমন একটি গণ্ডি আছে আমি কিছুতেই সে লঙ্ঘন করতে পারি নে। লোকের মধ্যে আমি নতুন প্রাণী, কিছুতেই তাদের সঙ্গে আমার সঙ্গে সম্পূর্ণ পরিচয় হয় না— আমার যারা বহুকালের বন্ধু তাদের কাছ থেকেও আমি বহু দূরে। যখন আমি স্বভাবতই দূরে তখন সামাজিকতার খাতিরে জোর করে নিকটে থাকা মনের পক্ষে বড়োই শ্রান্তিজনক। অথচ মানুষের সঙ্গ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকাও যে আমার পক্ষে স্বাভাবিক তাও নয়; থেকে থেকে সকলের মাঝখানে গিয়ে পড়তে ইচ্ছে করে —কোথায় কী কাজকর্ম হচ্ছে, কী আন্দোলন চলছে, তাতে আমারও যোগ দিতে, সাহায্য করতে ইচ্ছে হয়— মানুষের সঙ্গের যে জীবনোত্তাপ সেও যেন মনের প্রাণধারণের পক্ষে আবশ্যক। এই দুই বিরোধের সামঞ্জস্য হচ্ছে— এমন নিতান্ত আত্মীয় লোকের সহবাস যারা সংঘর্ষের দ্বারা মনকে শ্রান্ত করে দেয় না, এমন-কি, যারা আনন্দদান করে মনের সমস্ত স্বাভাবিক ক্রিয়াগুলিকে সহজে এবং উৎসাহের সহিত পরিচালিত করবার সহায়তা করে।

সাতারা
২৯ সেপ্টেম্বর ১৮৯৪

১৫৭

বোয়ালিয়া
২৫ সেপ্টেম্বর। ১৮৯৪।

ভেবে দেখ্, আমরা যখন খুব বড়ো রকমের আত্মবিসর্জন করি সেটা কেন করি। একটা মহৎ আবেগে আমাদের তুচ্ছ ক্ষণিক জীবনটা আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তার সুখ দুঃখ আমাদের স্পর্শই করতে পারে না। আমরা হঠাৎ দেখতে পাই আমরা সুখদুঃখের চেয়েও বড়ো, আমরা নিত্যনৈমিত্তিক তুচ্ছ বন্ধন থেকে মুক্ত। সুখের চেষ্টা এবং দুঃখের পরিহার এই আমাদের ক্ষণিক জীবনের প্রধান নিয়ম; কিন্তু এক-একটা সময় আসে যখন আমরা আবিষ্কার করতে পারি যে, আমাদের ভিতরে এমন একটি জায়গা আছে যেখানে সে নিয়ম খাটে না— যেখানে দুঃখ দুঃখই নয় এবং সুখ একটা উদ্দেশ্যের মধ্যেই গণ্য হয় না— যেখানে আমরা সমস্ত ক্ষুদ্র নিয়মের অতীত, স্বাধীন। তখন আমরা আমাদের ক্ষণিক জীবনটাকে পরাভূত করেই একটা আনন্দ পাই, দুঃখকে গলার হার করে নিয়ে পরেই একটা উল্লাস পাই— তখন মনে হয় আমার ভিতরকার সেই স্বাধীন পুরুষের বলেই আমি চিরকাল সমস্ত সুখদুঃখের ভিতর দিয়ে আনন্দে আমার প্রকৃতির সফলতা সাধন

করব। কিন্তু আবার চারি দিকের সংসার, লোকের সংসর্গ, প্রতিদিনের কথাবার্তা ক্ষুধাতৃষ্ণা প্রবল হয়ে বেড়ে উঠে আমাদের সেই অন্তরতম স্বাধীনতার ক্ষেত্র আমাদের চোখ থেকে ঢেকে ফেলে— তখন আবার আত্মবিসর্জন সুকঠিন হয়ে ওঠে, স্বার্থসুখ প্রবল হয়ে দেখা দেয়। মহৎ লোকের সঙ্গে ইতর লোকের প্রধান প্রভেদ এই যে, মহৎ লোকেরা অধিকাংশ সময়ে আপনার ভিতরকার সেই স্বাধীনতার ক্ষেত্রে সেই চিরজীবনের ভিতরে বাস করতে পারে, ইতর লোকের পক্ষে সে জায়গাটা অধিকাংশ সময়ে দুর্গম এবং অজ্ঞাত। [বব], আমি যখন একলা মফস্বলে থাকি তখন প্রকৃতির ভিতরকার সৌন্দর্য আনন্দ আমার অন্তরের সেই নিগূঢ় আনন্দনিকেতনের দ্বার খুলে দিয়ে ভিতরে বাইরে এক করে দেয়, তখন সংসারের ক্ষণিক মূর্তি আমার কাছ থেকে দূরে চলে যায়— গানের সুরের দ্বারা গানের তুচ্ছ কথাগুলো যেমন অমরতা প্রাপ্ত হয় তেমনি প্রতিদিনের সংসারের বাহ্য আকারটা আমার মনের ভিতরকার চিরানন্দরাগিণীর দ্বারা একটা চিরমহিমা লাভ করে। আমাদের সমস্ত স্নেহপ্রীতির সম্বন্ধ একটা বিনম্র আত্মবিস্মৃত ধর্মোপাসনার ভাবে জ্যোতির্ময় হয়ে ওঠে— দুঃখের দুঃখত্বটা যে চলে যায় তা নয়, কিন্তু সে আমার স্বার্থের সীমা অতিক্রম করে এমন সুবৃহৎ আকাশে ব্যাপ্ত হয়ে যায় যে, সেখানে সে একটা সৌন্দর্য বিকিরণ করতে থাকে— যেমন সূর্যাস্তের আলোক সমস্ত জলে স্থলে আকাশে একটা বিষাদের ছায়া ফেলে বটে, কিন্তু তার মধ্যে একটি উত্তাপবিহীন সুকোমল সৌন্দর্যের আনন্দ মিশ্রিত থাকে। এবার বোটে থাকতে আমি অন্তর্যামী-নামক একটি কবিতা লিখেছি, তাতে আমি আমার এই অন্তরজীবনের কথা অনেকটা প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছি। কৃতকার্য হয়েছি কি না জানি নে— কারণ, প্রকাশ হওয়া লেখকের ক্ষমতার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে না, পাঠকের অভিজ্ঞতার উপরেও অনেকটা নির্ভর করে। কিছুদিন হল তোর একখানি চিঠিতে এই অন্তরজীবনের প্রকাশ দেখে আমি ভারী খুশি হয়েছিলুম— নিশ্চয় তুই অনেক সময় তোর নিজের ভিতরকার এই যথার্থ স্বরূপ অনুভব করিস, কিন্তু নিজের প্রতি অবিশ্বাস করে প্রকাশ করতে চাস নে। তোর সন্দেহ হয় যে, এক-এক দিনের সেই ভাবটাই সত্য, না, প্রতিদিনের তুচ্ছতাই সত্য। সে রকম সন্দেহ করিস নে [বব]। কারণ, সত্যকে সন্দেহ করলে অনেক সময় সত্যকে নষ্ট করা হয়। যে-সমস্ত শুভমুহূর্তে আমরা নিজেকে খুব বড়ো বলে অনুভব করি সেই মুহূর্তগুলিকে চিহ্নিত করে রেখে দিলে তারা স্মৃতির সাহায্য করে ভবিষ্যতে পথপ্রদর্শনের উপায় হয়। আমি আমার সৌন্দর্য-উজ্জ্বল আনন্দের মুহূর্তগুলিকে ভাষার দ্বারা বারম্বার স্থায়ীভাবে মূর্তিমান করাতেই ক্রমশই আমার অন্তর্জীবনের পথ সুগম হয়ে এসেছে— সেই মুহূর্তগুলি যদি ক্ষণিক সম্ভোগেই ব্যয় হয়ে যেত তা হলে তারা চিরকালই অস্পষ্ট সুদূর মরীচিকার মতো থাকত, ক্রমশ এমন দৃঢ় বিশ্বাস এবং সুস্পষ্ট অনুভবের মধ্যে সুপরিস্ফুট হয়ে উঠত না। অনেক দিন থেকে জ্ঞাতসারে এবং অজ্ঞাতসারে ভাষার দ্বারা চিহ্নিত করে এসে জগতের অন্তর্জগৎ, জীবনের অন্তর্জীবন, স্নেহপ্রীতির দিব্যত্ব আমার কাছে আজ আকার ধারণ করে উঠছে— নিজের কথা আমার নিজেকে সহায়তা করেছে— অন্যের কথা থেকে আমি এ জিনিস কিছুতে পেতুম না।

সাতারা
৩০ সেপ্টেম্বর ১৮৯৪

১৫৮

কলকাতা
২৯ সেপ্টেম্বর। ১৮৯৪।

আশ্চর্য এই যে, আজকাল আমার কবিতার প্রশংসা শুনলে আমার মনে সেরকম একটা পুলকসঞ্চার হয় না। আসল, তার কারণ, যে আমাকে লোকে প্রশংসা করছে সেই আমিই যে কবিতা লিখে থাকে এ আমার সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম হয় না। আমি জানি, যে-সমস্ত ভালো কবিতা আমি লিখেছি সে আমি ইচ্ছে করলেই লিখতে পারি নে— তার একটা লাইন হারিয়ে গেলেও বহু চেষ্টায় সে লাইন গড়তে পারি কিনা সন্দেহ। প্রশংসা শুনলেই মনে হয় এ প্রশংসার যোগ্য আমি হতে পারব কিনা— ভালো লেখা যা-কিছু লিখেছি হয়তো সেরকম আর কখনো লিখতে পারব না। কারণ, যে শক্তি আমাকে লেখায় সে আমার ক্ষমতার বাইরে। তোকে একখানা কাগজ থেকে আমার একটা সমালোচনা পাঠিয়ে দিচ্ছি। এ লোকটা কিছু ওরিজিনাল চাল চেলেছে। এ আমার কবিতাগুলোকে গাল দিয়ে আমার গল্পগুলোকে আকাশে তুলে দিয়েছে। আবার এক সম্প্রদায়ের লোক আছে যারা ঠিক এর উল্টো দিক দিয়ে যায়। মধ্যখানে আমি বিস্ময়ান্বিত হয়ে সকৌতুকভাবে বসে থাকি। লেখকজীবন যতদিন থাকবে ততদিন কত রকম-বেরকম কথাই যে শুনতে হবে তার আর ঠিক নেই। আবার, একদল লোক আছে যারা বলে আমার অন্য সব রচনা ক্ষণস্থায়ী, কেবল একমাত্র গানই আমাকে লোকসমাজে অমর করে রেখে দেবে। আমি ভাবি, যদি খ্যাতিলাভ মানুষের দুরাকাঙ্ক্ষার শেষ লক্ষ্য হয় তবে আমার আর ভাবনা নেই— অন্ধকার অমরতাকে লক্ষ্য করে আমি অনেকগুলো ঢিল ছুঁড়তে বসেছি, যেটা হোক একটা লেগে যেতেও পারে। কিন্তু একবার দৈবাৎ লাগা এক, আর চিরকাল লেগে থাকা এক। চিরকাল কোন্ জিনিসটা থাকবে না-থাকবে তা কেউ বলতে পারে না এবং আমিও সে সম্বন্ধে কোনোরকম তর্ক-বিতর্ক করতে চাই নে— নিজের মনের ভিতর যখন একটা সফলতার আনন্দ অনুভব করা যায় সেইটেই লেখকের পক্ষে যথার্থ অমরতা। দুর্ভাগ্যক্রমে সে আনন্দ খুব ভালো লেখক থেকে খুব খারাপ লেখক পর্যন্ত প্রায় সকলেই ন্যূনাধিক পরিমাণে অনুভব করে থাকে।

সাতারা
৩ অক্টোবর ১৮৯৪

১৫৯

কলকাতা
৫ অক্টোবর। ১৮৯৪।

কাল সমস্ত বৃষ্টি বাদলা শেষ হয়ে গেছে। আজ সকালে সুন্দর রোদ্দুর উঠেছে। আজ সকালের বাতাসের মধ্যে অতি ঈষৎ শীতের সঞ্চার হয়েছে, একটুখানি যেন শিউরে ওঠার মতো। কাল দুর্গাপুজো আরম্ভ হবে, আজ তার সুন্দর সূচনা

হয়েছে। ঘরে ঘরে সমস্ত দেশের লোকের মনে যখন একটা আনন্দের হিল্লোল প্রবাহিত হচ্ছে তখন তাদের সঙ্গে সামাজিক বিচ্ছেদ থাকা সত্ত্বেও সে আনন্দ মনকে স্পর্শ করে। পরশু দিন সকালে [সুরেশ সমাজপতির] বাড়ি যাবার সময় দেখছিলুম রাস্তার দু ধারে প্রায় বড়ো বড়ো বাড়ির দালান মাত্রেই দুর্গার দশ-হাত-তোলা প্রতিমা তৈরি হচ্ছে—এবং আশে পাশে সমস্ত বাড়ির ছেলের দল ভারী চঞ্চল হয়ে উঠেছে। দেখে আমার মনে হল দেশের ছেলেবুড়ো সকলেই হঠাৎ দিনকতকের মতো ছেলেমানুষ হয়ে উঠে সবাই মিলে একটা বড়ো গোছের পুতুল-খেলায় প্রবৃত্ত হয়েছে। ভালো করে ভেবে দেখতে গেলে সমস্ত উচ্চ-অঙ্গের আনন্দ মাত্রই পুতুল-খেলা, অর্থাৎ তাতে কোনো উদ্দেশ্য নেই, লাভ নেই—বাইরে থেকে দেখে মনে হয় বৃথা সময় নষ্ট। কিন্তু, সমস্ত দেশের লোকের মনে যাতে করে একটা ভাবের আন্দোলন, একটা বৃহৎ উচ্ছ্বাস এনে দেয়, সে জিনিসটি কখনোই নিষ্ফল এবং সামান্য নয়। সমাজের মধ্যে কত লোক আছে যারা কঠিন নীরস বিষয়ী লোক, যাদের কাছে কবিতা সংগীত প্রভৃতি সমস্তই তুচ্ছ, তারাও এই উৎসব-উপলক্ষে একটা সর্বব্যাপী ভাবের দ্বারা বিচলিত হয়ে সকলের সঙ্গে এক হয়ে যায়। প্রতি বৎসরের এই ভাবের প্লাবনে নিশ্চয়ই মানুষকে অনেকটা পরিমাণে humanize করে দেয়; কিছুকালের জন্যে মনের এমন একটি অনুকূল আর্দ্র অবস্থা এনে দেয় যাতে স্নেহ প্রীতি দয়া সহজে অঙ্কুরিত হতে পারে—আগমনী বিজয়ার গান, প্রিয়সম্মিলন, নহবতের সুর, শরতের রৌদ্র এবং আকাশের স্বচ্ছতা, সমস্তটা মিলে মনের ভিতরে একটি আনন্দময় সৌন্দর্যকাব্য রচনা করে দেয়। আমার এবারকার 'মেয়েলি ছড়া' প্রবন্ধটাতে কতকটা বলেছি যে, ছেলেদের যে আনন্দ সেইটেই বিশুদ্ধ আনন্দের আদর্শ। তারা একটা তুচ্ছ উপলক্ষ্য নিয়ে সেইটেকে নিজের মনের ভাবে পরিপূর্ণ করে তুলতে পারে—তারা সামান্য একটা কদাকার অসম্পূর্ণ পুতুলকে নিজের প্রাণ এবং নিজের সুখ দুঃখে জীবন্ত করে তোলে। সে ক্ষমতাটা যে লোক বড়ো বয়স পর্যন্ত রাখতে পারে তাকেই আমরা ভাবুক বলি। তার কাছে চতুর্দিক্‌বর্তী সমস্ত জিনিস নিতান্ত কেবল জিনিস নয়, কেবল দৃষ্টিগোচর বা শ্রুতিগোচর নয়, কিন্তু ভাবগোচর—তার সমস্ত সংকীর্ণতা এবং অসম্পূর্ণতা সে একটি সংগীতের দ্বারা পূর্ণ করে নেয়। সেই ভাবুকতা দেশের সমস্ত লোকের কাছে কখনোই আশা করা যায় না, কিন্তু এই রকম উৎসবের সময় ভাবস্রোত দেশের অধিকাংশ লোকের মন অধিকার করে নেয়। তখন, যেটাকে আমরা দূরে থেকে শুষ্ক হৃদয়ে সামান্য পুতুলমাত্র দেখছি সেইটে কল্পনায় মণ্ডিত হয়ে পুতুল-আকার ত্যাগ করে; তখন তার মধ্যে এমন একটি বৃহৎ ভাবের এবং প্রাণের সঞ্চার হয় যে, দেশের রসিক-অরসিক সকল লোকই তার সেই অমৃতধারায় অভিষিক্ত হয়ে ওঠে। তার পরে আবার পুতুল যখন পুতুল হয়ে আসে তখন সেটাকে জলে ফেলে দেয়। পৃথিবীর সকল জিনিসই এই পুতুল। আমরা যাকে ভালোবাসি, অন্য লোকের কাছে সে একটি দৃশ্যমান আকারবিশিষ্ট মানুষ মাত্র—কিন্তু আমার কাছে সে একটি অপরূপ ভাবের জ্যোতিতে দীপ্যমান, আমার কাছে সে অসীম অনন্ত। যার কান নেই তার কাছে গান শব্দমাত্র, আমার কাছে সেই শব্দ সংগীত। পৃথিবীর সৌন্দর্য যে দেখতে পায় না পৃথিবী তার কাছে: মৃৎপিণ্ডো জলরেখয়া বলয়িতঃ। কিন্তু সেই জলরেখাবলয়িত মৃৎপিণ্ডই আমার কাছে পৃথিবী। অতএব এক রকম করে দেখতে গেলে সব জিনিসই পুতুল, কিন্তু হৃদয়ের ভিতর দিয়ে, কল্পনার ভিতর

দিয়ে দেখতে গেলে তাদের দেবতা বলে চেনা যায়— তাদের সীমা পাওয়া যায় না। এই কারণে, সমস্ত বাংলাদেশের লোক যাকে উপলক্ষ্য করে আনন্দে ভক্তিতে প্লাবিত হয়ে উঠেছে, তাকে আমি মাটির পুতুল বলে যদি দেখি তবে তাতে কেবল আমারই ভাবের অভাব প্রকাশ পায়।

সাতারা
৯ অক্টোবর ১৮৯৪

১৬০

কলকাতা
৭ অক্টোবর। ১৮৯৪।

আমিও জানি [বব] তোকে আমি যে সব চিঠি লিখেছি তাতে আমার মনের সমস্ত বিচিত্র ভাব যে রকম ব্যক্ত হয়েছে এমন আমার আর কোনো লেখায় হয় নি। আমার প্রকাশিত লেখা আমি যাদের দিই, ইচ্ছা করলেও আমি তাদের এ-সমস্ত দিতে পারি নে। সে আমার ক্ষমতার মধ্যে নেই। তোকে আমি যখন লিখি তখন আমার এ কথা কখনো মনে উদয় হয় না যে, তুই আমার কোনো কথা বুঝবি নে, কিম্বা ভুল বুঝবি, কিম্বা বিশ্বাস করবি নে, কিম্বা যেগুলো আমার পক্ষে গভীরতম সত্য কথা সেগুলোকে তুই কেবলমাত্র সুরচিত কাব্যকথা বলে মনে করবি। সেই জন্যে আমি যেমনটি মনে ভাবি ঠিক সেই রকমটি অনায়াসে বলে যেতে পারি। যখন মনে জানি পাঠকরা আমাকে ভালো করে জানে না, আমার অনেক কথাই তারা ঠিকটি বুঝবে না এবং নম্রভাবে বোঝবার চেষ্টাও করবে না, এবং যেটুকু তাদের নিজের মানসিক অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলবে না সেটুকু আমার উপর বিশ্বাস স্থাপন করে গ্রহণ করবে না— তখন মনের ভাবগুলি তেমন সহজে ভাষায় প্রবাহিত হতে চায় না এবং যতটুকু প্রকাশ হয় তার মধ্যে অনেকখানি ছদ্মবেশ থেকে যায়। এর থেকেই বেশ বুঝতে পারি আমাদের সব চেয়ে যা শ্রেষ্ঠ প্রকাশ সে আমরা কাউকে নিজের ইচ্ছা-অনুসারে দিতে পারি নে। আমাদের ভিতরে সব চেয়ে যা গভীরতম উচ্চতম অন্তরতম সে আমাদের আয়ত্তের অতীত; তা আমাদের দান-বিক্রয়ের ক্ষমতা নেই; মূল্য নিয়ে বিক্রি করতে চেষ্টা করলেই তার উপরকার আবরণটি কেবল পাওয়া যায়, আসল জিনিসটি হাত থেকে সরে যায়। নিজের যা সর্বোৎকৃষ্ট তা ক'জন লোক পৃথিবীতে রেখে যেতে পেরেছে? ক'জনই বা তাকে নিজে ধরতে পেরেছে? সেই জন্যেই তো আমি জীবন-চরিতে বিশ্বাস করি নে। আমরা দৈবক্রমে প্রকাশ হই, আমরা ইচ্ছা করলে চেষ্টা করলেও প্রকাশ হতে পারি নে— চব্বিশ ঘণ্টা যাদের সঙ্গে থাকি তাদের কাছেও আপনাকে ব্যক্ত করা আমাদের সাধ্যের অতীত। তুই আমাকে অনেক দিন থেকে জেনে আসছিস বলেই যে তোর কাছে আমার মনের ভাব ভালো করে ব্যক্ত হয় তা নয়; তোর এমন একটি অকৃত্রিম স্বভাব আছে, এমন একটি সহজ সত্যপ্রিয়তা আছে যে, সত্য আপনি তোর কাছে অতি সহজেই প্রকাশ হয়। সে তোর নিজের গুণে। যদি কোনো লেখকের সব চেয়ে ভালো লেখা তার চিঠিতেই দেখা দেয় তা হলে এই বুঝতে হবে যে, যাকে

চিঠি লেখা হচ্ছে তারও একটি চিঠি লেখাবার ক্ষমতা আছে। আমি তো আরও অনেক লোককে চিঠি লিখেছি, কিন্তু কেউ আমার সমস্ত লেখাটা আকর্ষণ করে নিতে পারে নি। তার একটা প্রধান কারণ হচ্ছে এই যে, নানান লোকের নানান ধরন, নানান রকম-সকম, সেই রকম-সকম-গুলোকে বাঁচিয়ে চলতে হয়। ধরন-ধারণ-ওয়ালা মানুষের কাছে কথাবার্তাগুলো সহজেই বেঁকেচুরে প্রকাশ পায়— তারা নিজেও সমস্ত জিনিস নিজের ধরনে দেখে এবং তাদের নিকটবর্তী সকলেও তাদের কাছে কেবল তাদেরই মাপে আপনাকে প্রকাশ করে। তোর অকৃত্রিম স্বভাবের মধ্যে একটি সরল স্বচ্ছতা আছে, সত্যের প্রতিবিম্ব তোর ভিতরে বেশ অব্যাহতভাবে প্রতিফলিত হয়। সেই জর্মন মেয়েটি যে তোর কাছে তার মনের সমস্ত গভীর ভাব ব্যক্ত করে সুখী হয়, তোর স্বাভাবিক প্রশান্ত স্বচ্ছতাই তার কারণ। সহজে সত্য আকর্ষণ করে নেবার ক্ষমতাটি তোর আছে। সত্য মানে হচ্ছে অকৃত্রিম ভিতরের কথাটি, যে কথাটি সব সময়ে আমরা নিজেও জানতে পারি নে—কেবল গল্প-গুজব আলাপ-পরিচয় হাসি-তামাশা নয়। বায়্‌রন মুর'কে যে-সমস্ত চিঠিপত্র লিখেছিল তাতে কেবল বায়্‌রনের স্বভাব প্রকাশ পায় নি, মুরের স্বভাবও প্রকাশ পেয়েছে— সে-সব চিঠি যত ভালোই হোক তাতে বায়্‌রনের আন্তরিক স্বভাব সম্পূর্ণ প্রকাশ পায় নি, মুরের স্বভাবের উপর প্রতিহত হয়ে সে এক বিশেষ মূর্তি ধারণ করেছে। যে শোনে এবং যে বলে এই দুজনে মিলে তবে রচনা হয়—

'তটের বুকে লাগে জলের ঢেউ,
তবে সে কলতান উঠে।
বাতাসে বনসভা শিহরি কাঁপে,
তবে সে মর্মর ফুটে।'

সাতারা
১১ অক্টোবর ১৮৯৪

১৬১

কলকাতা
৯ অক্টোবর। ১৮৯৪।

শাস্ত্রে আছে অনেকগুলি আবরণের দ্বারা আমরা নির্মিত। যথা, অন্নময় কোষ, প্রাণময় কোষ, মনোময় কোষ, বিজ্ঞানময় কোষ এবং আনন্দময় কোষ। আমি যখন কলকাতায় থাকি তখন অন্নময় প্রাণময় কোষটাই প্রবল হয়ে উঠে অন্য সমস্ত সূক্ষ্ম কোষগুলিকে অভিভূত করে ফেলে। বাংলাদেশের অধিকাংশ লোকের মতো খাইদাই, ঘুমোই বেড়াই, গল্প করি, নিত্যনিয়মিত জড় অভ্যাসের জালে প্রতিদিন জড়ীভূত হয়ে পড়ি— ভাববার, অনুভব করবার, কল্পনা করবার, মনের ভাব প্রকাশ করবার অবসর এবং উত্তেজনা অল্পে অল্পে চলে যায়— সমস্ত যেন ভাত-চাপা পড়ে যায়। অবশ্য ভিতরে ভিতরে দিনরাত্তির একটা অবিশ্রাম খুঁতখুঁত চলতে থাকে— জড়ত্বের ভার প্রতি মুহূর্তেই দুর্বহ হয়ে ওঠে। সাদাসিধা রকমের খাওয়া পরা

এবং উচ্চ রকমের ভাবাচিন্তা এইটেই বাস্তবিক আমার মনের আদর্শ। আরাম এবং সাজসরঞ্জাম এবং ছোটোখাটো নিয়মিত অভ্যাস আমাকে যেন গরম রাত্রে পালক-ভরা লেপের মতো হাঁপ ধরিয়ে দিতে থাকে। চতুর্দিকটা বেশ সাদাসিধা ফাঁকা হলে মনের জন্যে অনেকখানি জায়গা পাওয়া যায়, নইলে যতই জিনিস-পত্র চাকর-বাকর উদ্যোগ-আয়োজন বাড়তে থাকে ততই মানসিক দৃষ্টির পার্‌স্‌পেক্‌টিভ অবরুদ্ধ হয়ে যায় এবং আনন্দের চেয়ে আরামটাই প্রচুর হয়ে ওঠে। জাপানিদের গৃহসজ্জা যেরকম শোনা যায়— ধব্‌ধবে পরিষ্কার একটিমাত্র মাদুর, দেয়ালের একটি ফুলদানিতে একটিমাত্র পুষ্পমঞ্জরী, আর কোনো-কিছু আসবাবের ভিড় নেই—সে আমার মনে করতে বেশ লাগে। যদি চোখের সুখ দিতে চাও তবে এমন বন্দোবস্ত করো যাতে জানলাটি খুলে আকাশটি অবারিত এবং চারি দিকটি গাছপালায় মনোরম দেখতে পাওয়া যায়। নিজের শরীরের চারি দিকেই অর্থহীন জিনিসপত্রের ঘেঁষাঘেঁষিটা বড়ো শ্রান্তিজনক— কারণ, জিনিসপত্র কর্তা হয়ে উঠলে মনের পক্ষে সেটা বড়োই অসহ্য। আমি তো এখান থেকে পালাই-পালাই করছি। শীঘ্রই বোলপুরে যাব সংকল্প করেছি। আমি বেশ বুঝতে পারছি সেখানে যখন সেই গাড়িবারান্দার ছাতের উপর বড়ো কেদারা পেতে একলাটি শরতের সন্ধ্যালোকে বোলপুরের দিগন্তপ্রসারিত সবুজ মাঠের উপর আমার অন্তঃকরণের সমস্ত ভাঁজগুলি খুলে দিয়ে তাকে বিস্তৃত করে দিতে পারব তখন অগাধ শান্তিরসে আমার সমস্ত জীবন অভিষিক্ত হয়ে উঠবে।

সাতারা
১৩ অক্টোবর ১৮৯৪

১৬২

কলকাতা
বুধবার ?
১১ অক্টোবর। ১৮৯৪।

আজ শরৎকালের সুন্দর সকাল বেলাটা চুপচাপ করে কৌচে পড়ে কাটিয়েছি— আমার টবের গাছপালাগুলোকে কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে সুন্দর বাতাস এসে গায়ে লাগছিল। আমার ভারী ইচ্ছা করছিল আমি এই রকম করে শুয়ে থাকি আর পাশের ঘর থেকে কেউ আপন ইচ্ছামত পিয়ানোতে একটার পর একটা বাজনা বাজিয়ে যায়। তার মধ্যে আমার সেই Chopinটাও থাকে। মনের ভিতর এই রকম যে-একটা ইচ্ছা জন্মায়, সেই ইচ্ছাটা অপরিতৃপ্ত থাকলেও তার ভিতরে এক রকম সুখ আছে। সব চেয়ে কষ্টের অবস্থা— যখন মনেতে ইচ্ছাও জন্মায় না। মনটা যখন অসাড় জড়বৎ হয়ে যায়। প্রকৃতির মধ্যে সর্বদা যে-একটি বাজনা বাজছে আমাদের মনের ভিতরে সেইটেই বিচিত্র ব্যাকুল ইচ্ছা-আকারে সংগীত রচনা করে—সেই ইচ্ছাগুলির একটি সুন্দর রাগিণী আছে, খুব কোমল-সুর-ওয়ালা সকাল বেলাকার গানের মতো— সেই রাগিণীর দ্বারা সেই অতৃপ্ত ইচ্ছাগুলির বিষাদটিও সান্ত্বনাময় লাবণ্যময় হয়ে ওঠে। যখন বিশ্বপ্রকৃতির সেই বীণাধ্বনি

মনের অত্যন্ত ছায়াময় দূর দূরান্তর পর্যন্ত সকরুণ হা হা স্বরে প্রতিধ্বনিত হয়ে না ওঠে তখনি মনটা যথার্থ নিরানন্দ নিশ্চেষ্ট নির্জীব হয়ে পড়ে। তখন মনের বিশেষ কোনো বেদনা না থাকতে পারে, কিন্তু তার ভারটা জগদ্দল পাথরের মতো চেপে থাকে।......

বীণটা ভারী চমৎকার বাজিয়েছিল। অনেকটা সেই বদ্রির মতো—মুচড়ে-মুচড়ে নিংড়ে-নিংড়ে কাঁদিয়ে-কাঁদিয়ে সুর বের করতে লাগল—এক-একবার সরু মোটা সব ক'টা তারের প্রবল ঝংকারে মনের এক দিক থেকে আর-একটা দিক পর্যন্ত দ্রুতপদে অনেকগুলো ঢেউ তুলে দিয়ে চলে গেল, আবার খানিক বাদে অত্যন্ত মৃদু করুণ মিলিতপ্রায় মর্মরধ্বনিতে দুখানি সুকোমল করতল দিয়ে মনের সর্বশেষ প্রান্ত পর্যন্ত সমস্ত ঢেউগুলিকে যেন সমান মসৃণ করে দিয়ে গেল। যন্ত্রটা যে কত রকমের কথা কইতে লাগল তার সব কথা কে বুঝতে পারবে—একেবারে যেন বুকের ভিতরে মুখ দিয়ে তার যা-কিছু বলবার ছিল সমস্ত বলে গেল—এক-একবার যখন মোটা তারটার পুরুষকণ্ঠোচিত গাম্ভীর্যের ভিতর থেকে একটা উদার করুণা ভেঙে ভেঙে পড়তে লাগল তখন মনে হতে লাগল সংসারের সমস্তই সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং মিথ্যা বলেই এমন অনন্তবেদনাময় এবং এমন অসীম-সুন্দর, তাই তার মধ্যে এত রাগিণী এবং এত মূর্ছনা।... ... ...

কাল রাত জেগে আজ সকাল বেলায় সর্বাঙ্গে একটি ক্লান্তি নিয়ে কৌচে পড়ে ছিলুম—তাই অর্ধনিমীলিত চোখে রোদ্‌দুর এবং গাছের কম্পন এবং শ্রান্ত শরীরে বাতাসটি খুব মিষ্টি লাগছিল। আজ শরতের সকালটি প্রতিমাবিসর্জন এবং উৎসবের স্মৃতি -দ্বারা পূর্ণ হয়ে যেন ছল্‌ ছল্‌ করছিল; যেন যে-সমস্ত নহবতের বাজনা থেমে গেছে তারা আজ নীরবভাবে সমস্ত নির্মল আকাশে ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে এবং উৎসব-আনন্দের অবসানে যে-একটি দীর্ঘনিশ্বাসজড়িত কর্মবিহীন ক্লান্তি এবং অবসাদ উপস্থিত হয় তাই আজ শরতের রৌদ্রে মিশ্রিত বিস্তৃত হয়ে সমস্ত জল স্থল আকাশকে একটি নিস্তব্ধ বিষাদে মণ্ডিত করে রেখেছে।

সাতারা
১৫ অক্টোবর ১৮৯৪

১৬৩

কলকাতা
১৭ অক্টোবর। ১৮৯৪।

কাল 'ব...র' সঙ্গে 'মেয়েলি ছড়া' প্রবন্ধ নিয়ে কথা হচ্ছিল। তিনি বলছিলেন, অমন একটা তুচ্ছ উদ্দেশ্যবিহীন বিষয় নিয়ে আমি কেন সাধারণের কাছে বক্তৃতা দিতে গেলুম তিনি বুঝতে পারেন নি। আমি বললুম, কালিদাস শকুন্তলা কেন লিখেছিলেন এবং সেটা আজ পর্যন্ত কেন টিকে আছে? আমাদের চার দিকে যে-সমস্ত ছোটো বড়ো জিনিস আছে এবং প্রতি মুহূর্তে এসে পড়ছে তাদের কত রকম ভাবে দেখা যেতে পারে, তাদের ভিতর থেকে কত রকম সুখ আবিষ্কার করা যেতে পারে —এইটেই হচ্ছে মানুষের সব-প্রধান চর্চার বিষয়। যে শিক্ষায়

মানুষের মনকে সচেতন করে দেয়, বিশ্বসংসারকে নানাভাবে অনুভব করবার শক্তি সঞ্চার করে, সেইটেই হচ্ছে মানুষের পক্ষে খুব একটা মূল্যবান শিক্ষা। সাহিত্যে আর কোনো প্রত্যক্ষ ফল নেই, কিন্তু সে মানুষের প্রকৃতিকে সব দিকে সচেতন করে তোলে—তার অর্থ, সে মানুষের প্রকৃতিকে বৃহৎ করে দেয়, পূর্বে যেখানে তার কোনো অধিকার ছিল না সেখানেও তার অধিকার বিস্তার হতে থাকে। প্রাপ্ত ফলের অপেক্ষা পাবার শক্তিটা ঢের বড়ো—সেই জন্যে সাহিত্যে অবলম্ব্য বিষয়ের দিকে ততটা বেশি মনোযোগ দেয় না যেমন তার রচনার দিকে, কল্পনার দিকে, প্রকাশের দিকে। কিন্তু এ সমস্ত কথা ব... ঠিক বুঝতে পারলেন কি না ঠিক বলতে পারি নে।

সাতারা
২১ অক্টোবর ১৮৯৪

১৬৪

বোলপুর
১৮ অক্টোবর। ১৮৯৪।

কাল সন্ধের সময় বোলপুরে এসে উপস্থিত হয়েছি। আজ ভোরে উঠে স্নান করে দক্ষিণের ঘরে এসে বসেছি, আমার মনের সমস্ত গ্লানি যেন দূর হয়ে গেছে। সকাল বেলাটি এমনি গভীর নিস্তব্ধ এবং সুন্দর এবং উজ্জ্বল যে, আমার মনে হচ্ছে আমার মনটা যেন একটি স্বচ্ছ এবং শীতল আলোকের মধ্যে সুগভীর ভাবে অবগাহন করে নির্মল নিরাময় হয়ে উঠছে। আমার পাশে একটি প্লেটের উপর শৈশবের মতো নবীন এবং যৌবনের মতো পরিস্ফুট রাশীকৃত শিউলিফুল রেখে দিয়েছে—বারান্দার উপর শরতের রৌদ্র এসে পড়েছে, বিছানার চাদরটি সাদা ধব্‌ধব্‌ করছে, সমস্ত পরিষ্কার এবং ফাঁকা, লোকজনের ভিড় নেই, নিত্যনৈমিত্তিক কাজ নেই, পাখির ডাক শোনা যাচ্ছে, সামনে তরুশ্রেণীর অবকাশপথে অনেকখানি সবুজ মাঠ চোখে পড়ছে। সিমলের সেই রৌদ্রোত্তপ্ত বারান্দাটিতে গিয়ে দাঁড়ালে পল্লবভূষণা নীলাম্বরী প্রকৃতি ঠিক যেমন একেবারে চোখের বুকের কোলের সামনে এসে দেখা দিত, এখানকার এই দক্ষিণের ঘরটিতে বসেও ঠিক সেইরকমটি মনে হচ্ছে। সমস্তটা ঠিক সেই রকমটি নয়, কিন্তু মনের মধ্যে সেই শান্তি এবং সৌন্দর্যের ভাবটি অবতীর্ণ হচ্ছে। মনে হচ্ছে তোরা যেন সেই রকম পাশের ঘরে রয়েছিস, তোদের স্নেহ এবং তোদের সেবা আমার জন্যে প্রস্তুত হয়ে রয়েছে। আমার পক্ষে তোদের সেই স্নেহ এখন প্রকৃতির মধ্যে মিশে গেছে—এই শরৎপ্রভাতের মৃদুশীতল বাতাসের মধ্যে তোদের সেই সেবাপূর্ণ স্নেহকরস্পর্শ রয়ে গেছে।—চারি দিকে কী গভীর নিস্তব্ধতা [বব]! অনন্ত নির্মল স্নিগ্ধ নীলাকাশ যেন কেবল একলা আমার অন্তরাত্মাকে নীরবে আলিঙ্গন করে রয়েছে। আর এই শিউলি ফুলগুলির সুকোমল সরস শুভ্রতা আমার দুই চোখের উপর স্নেহ বর্ষণ করছে। আমাকে যদি আমার দেবতা আমার সমস্ত কর্মশৃঙ্খল থেকে বিচ্ছিন্ন করে এইখানে নির্বাসিত করে দেন, তা হলে বেশ ধীর শান্তভাবে বাহিরের আকাশ এবং আপন অন্তরের

মধ্যে সম্পূর্ণ নিমগ্ন হয়ে আপনার কাজ করে যেতে পারি। ... ... ঘরের জাজিমের উপর লুটিয়ে পড়ে একটা পেন্সিল এবং খাতা হাতে একটা কোনো রচনার মধ্যে প্রবেশ করতে ইচ্ছা করছে। সকাল বেলাটি বেশ স্নিগ্ধ এবং নবীন আছে, এই বেলা আরম্ভ করে দেওয়াই ভালো। ... ... মন এমন পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে যে তাকে যেন স্পর্শ-দ্বারা অনুভব করতে পারছি, তার ধ্বনি খুব নিকটে শোনা যাচ্ছে।

সাতারা
২২ অক্টোবর ১৮৯৪

১৬৫

বোলপুর
শুক্রবার, ১৯ অক্টোবর। ১৮৯৪।

কাল কেবল বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ে একখানি ছোটো কবিতা লিখেছি এবং একটি তিব্বত-ভ্রমণের বই পড়েছি। এই রকম নির্জন জায়গায় একলা বসে ভ্রমণের বই পড়তে আমার ভারী ভালো লাগে। এ রকম জায়গায় নভেল আমি ছুঁতে পারি নে। এই জনশূন্য মাঠের মধ্যে, শালবনের ভিতর, সমস্ত-দরজা-খোলা জাজিম-পাতা দোতলার একলা ঘরে, পাখিদের করুণকলধ্বনিপূর্ণ স্বপ্নাবেশময় শরৎ-মধ্যাহ্নে বিলিতি নভেল কোনোমতেই খাপ খায় না। ভ্রমণবৃত্তান্তের একটা মস্ত সুবিধা এই যে, তার মধ্যে অবিশ্রাম গতি আছে, অথচ প্লটের বন্ধন নেই— মনের একটি অবারিত স্বাধীনতা পাওয়া যায়। এখানকার জনহীন মাঠের মাঝখান দিয়ে একটি রাঙা রাস্তা চলে গেছে— সেই রাস্তা দিয়ে যখন দুই-চার জন লোক অথবা দুটো-একটা গোরুর গাড়ি অত্যন্ত মন্থর গমনে চলতে থাকে তার একটা ভারী আকর্ষণ আছে, বোধ করি তাতে করে চারি দিকের গতিহীন লোকহীনতা আরও বেশি করে ফুটিয়ে দেয়— মাঠ আরও ধু ধু করে ওঠে এবং মনে হয় এই মানুষগুলো যে কোথায় যাচ্ছে তার যেন আর ঠিকানা নেই। ভ্রমণবৃত্তান্তের বইও আমার এই মানসিক নিরালার মধ্যে সেই রকম একটি গতিপ্রবাহের ক্ষীণ রেখা অঙ্কিত করে দিয়ে চলে যেতে থাকে— তাতে করে আমার মনের সুবিস্তীর্ণ নিস্তব্ধ নির্জন আকাশটি আরও যেন বেশি করে অনুভব করতে পারি। ভ্রমণকারী একটি ফরাসী, সেই জন্যে সে ভ্রমণ করতেও জানে এবং লিখতেও জানে। এক জায়গায় পাহাড় থেকে হঠাৎ মরুভূমির মধ্যে এসে পড়ে লোকটার মনে 'sensation of the desert' বলে একটা ভাবের উদয় হয়েছিল— সেইখানে সে বলেছে পাহাড়-পর্বতের চেয়ে এই রকম প্রশস্ত মরুভূমি তার লাগে ভালো : Solitude is a true balm, which heals up the many wounds that the chances of life have inflicted; its monotony has a calming effect upon nerves made over-sensitive from having vibrated too much; its pure air acts as a douche which drives petty ideas out of the head. In the desert too the mind sees more clearly, and mental processes are carried on more easily।—মন যখন সংসারক্ষেত্রে

কর্মক্ষেত্রে থাকে তখন সে আপনার সমস্ত শক্তি সংহত করে অনেকটা ক্ষুদ্র মূর্তি ধারণ করে। কিন্তু সে যখন বিশ্রাম করতে চায় তখন তাকে শয়ন করাবার জন্যে দিক হতে দিগন্ত পর্যন্ত প্রকাণ্ড একটি শয্যা বিছিয়ে দেওয়া আবশ্যক হয়ে পড়ে— তখন সে একা একটি দেশ জুড়ে পড়ে থাকতে চায়; তখন সমস্ত শহর ঘুরে সে আর জায়গা খুঁজে পায় না, অবারিত আকাশ এবং প্রান্তর এবং সমুদ্র না হলে তার আর চলে না। কোনো ইংরাজ ভ্রমণকারী এই sensation of the desertকে ঠিক সুখকর বলে মনে করত কিনা আমি সন্দেহ করি। ইংরাজ ভ্রমণকারীদের যতগুলো বই পড়েছি প্রায় সবগুলোতেই তাদের উদ্ধত পাশব প্রকৃতির এবং আত্মাভিমানের পরিচয় পাওয়া যায়। তারা অন্য জাতের প্রতি সুবিচার করতে এবং ভালোবাসা দিতে পারে না। অথচ বিধাতা এদের উপরে যত ভিন্ন জাতের ভার সমর্পণ করেছেন এমন আর কারও উপর করেন নি।

সাতারা
২৩ অক্টোবর ১৮৯৪

১৬৬

বোলপুর
শনিবার, ২০ অক্টোবর। ১৮৯৪।

কাল রাত্তির থেকে অল্প অল্প মেঘ করে আসছে। কিন্তু রোদ্দুরও আছে। আকাশের ধারে ধারে স্তূপাকার কালো মেঘ জমেছে এবং সূর্যালোকে তাদের পাড়গুলো শুভ্র জ্যোতির্ময় হয়ে উঠেছে। মাঠের চারি দিক নতুন আমন ধানের গাঢ় এবং সরস সবুজবর্ণ ধারণ করেছে, তার উপরে স্নিগ্ধ মেঘের আভা দেখাচ্ছে ভালো। মনে পড়ছে, আমি যখন প্রথম বাবামশায়ের সঙ্গে বোলপুরে আসি তখন আমার বয়স ন-দশ বৎসর হবে— তখন মাঠে ধান কিরকম দেখতে হয় কখনো চক্ষে দেখি নি, সেটা দেখবার জন্যে ভারী একটা কৌতূহল ছিল। রাত্তিরে বোলপুরে এসে পৌঁছলুম; পাল্কি করে আসবার সময় দু দিকে ভালো করে চেয়ে দেখলুম না, পাছে সেই অস্পষ্ট আলোতেই কৌতূহলের খানিকটা নিবৃত্তি হয়। ভোরের বেলা উঠেই বাইরে এসে দেখলুম— চারি দিকেই মাঠ, কোথাও ধানের চিহ্ন নেই। জায়গায় জায়গায় মাটি খোঁড়া, শুনলুম সেই-সব জায়গায় চাষ হয়েছে। তখন মনের মধ্যে রাশীকৃত কৌতূহল ছিপি-আঁটা শ্যাম্পেনের মতো চাপা ছিল— এখন তো পৃথিবীর মোটামুটি সবই এক রকম দেখে নিয়েছি, কিন্তু তবু আনন্দের হ্রাস হয় নি, বরঞ্চ তার গাঢ়তা ঢের বেশি বেড়েছে। সেই প্রথম বোলপুর-দর্শনের কত কথাই মনে পড়ে। তখনো কবিতা লিখতুম। মনে ধারণা ছিল— খোলা আকাশে গাছের তলায় বসে কবিতা লিখলে ঠিক দস্তুরমত কবিত্ব করা হয়। তাই ভোরে উঠেই একখানা পুরোনো Letts' Diary এবং পেন্সিল হাতে বাগানের প্রান্তে একটি ছোটো নারকোল গাছের তলায় বসে 'পৃথ্বীরাজের পরাজয়' বলে একটা বীররসাত্মক কবিতা লিখেছিলুম। সেটা লিখতে দিন সাতেক লেগেছিল। কোথায় সে খাতা এবং সে কবিতা! তার একটা লাইনও মনে নেই। কেবল মনে আছে

বড়দাদা সেই কবিতাটা পছন্দ করেছিলেন। কবির যেরকমটি হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে তখন আমার বিশেষ দৃষ্টি ছিল—দুপুর বেলায় মাঠের ভিতর খোয়াইয়ের মধ্যে একটা গুহার ছায়ায় পা ছড়িয়ে দিয়ে বসতুম, সামনে দিয়ে ক্ষীণ জলস্রোত বালির উপর দিয়ে বয়ে যেত, আপনাকে রীতিমত কবি বলে মনে হত। বুনো খেজুর গাছে ছোটো ছোটো খেজুর ফলে থাকত, সেগুলো খেতে আদবেই ভালো লাগত না, কিন্তু তবু মরুপ্রান্তরের মধ্যে বুনো গাছ থেকে বুনো ফল স্বহস্তে পেড়ে খাচ্ছি এই মনে করে একটা বিশেষ গর্ব অনুভব করতুম। এই খোয়াইয়ের মধ্যে আমানিডোবা বলে একটি ছোট্ট ডোবা ছিল, তার মধ্যে খুব ছোট্ট মাছ থাকত, কাপড়-চোপড় খুলে সেই ডোবার মধ্যে গিয়ে পড়তুম—মনে হত নির্ঝরের জলে স্নান করছি। কোনো লোকজন কেউ কোথাও নেই, কোনো বন্ধন নেই, শাসন নেই, মাঠের ভিতরকার সেই গুহাগুলোর মধ্যে সমস্ত দিন একলা আপন মনে কবিত্ব-খেলা করতুম—এক-একদিন ডাকাতের ভয় হত, কিন্তু সেই ভয়ের মধ্যেও কবিত্ব ছিল। এখনো কবিতা লিখি বটে, কিন্তু নিজেকে উপন্যাসে ইতিহাসে বর্ণনযোগ্য কবি বলে আর অনুভব করি নে—বরঞ্চ নিজের কবিতা পড়ে মনে হয় যেন সে কবিতা আমি নিজে লিখি নি; যেন আমি দৈবাৎ ভালো কবিতা লিখি, কিন্তু ইচ্ছা করলে ভালো কবিতা লিখতে পারি নে। আর কিছু না হোক, এখন গাছের তলায় বসে কবিতা লেখা আমার পক্ষে অসম্ভব; মন চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে।

যাই হোক, সেই Letts' Diaryটা যদি খুঁজে পাই তা হলে আবার একবার ভোরের বেলায় সেই নারকেল-তলায় বসে সেই 'পৃথ্বীরাজের পরাজয়'টা পড়ে দেখতে ইচ্ছে করে।

সাতারা
২৫ অক্টোবর ১৮৯৪

১৬৭

শান্তিনিকেতন
মঙ্গলবার, ৩০ অক্টোবর। ১৮৯৪।

পরশু থেকে খুব অল্প অল্প শীত পড়ে চারি দিক আরও যেন প্রফুল্ল হয়ে উঠেছে। বাতাসের ভিতর থেকে সেই ক্লান্তির ভাবটা চলে গেছে। সকাল বেলায় স্নান করে সাফ কাপড়টি পরে এসে বসে যখন গায়ে এই প্রভাতের ঠাণ্ডা বাতাসটি লাগতে থাকে তখন সর্বাঙ্গে আরও যেন খানিকটা নির্মলতার সঞ্চার হয়—চোখের উপরে যে আলোটি এসে পড়ে মনে হয় স্নিগ্ধ শিশিরে অভিষিক্ত এবং শিউলি ফুলের সুশীতল গন্ধে পরিপূর্ণ। আকাশ নীল, গাছপালাগুলি ঝল্‌মল্‌ করছে, মাঠের মাঝে মাঝে সবুজ ধানের ক্ষেত রৌদ্রে কোমল পাণ্ডু আভায় মণ্ডিত হয়েছে, বাতাস কতদূর থেকে অবারিত বেগে শিশিরসিক্ত তৃণাগ্রভাগ চুম্বন করে চলে আসছে তার সন্ধান নেই—শূন্য মাঠের মাঝখানে জনহীন রাঙা বাঁকা রাস্তাখানি কোথা দিয়ে কোথায় চলে গেছে তার শেষ দেখা যাচ্ছে না—আমি এরই মাঝখানে হেমন্তের তুষারনির্মল আলোকপ্লাবনের মধ্যে নিমগ্ন হয়ে, শিশিরস্নিগ্ধ বাতাসের

দ্বারা সর্বাঙ্গমনে অভিনন্দিত হয়ে, সম্মুখে একটি-প্লেট স্তূপাকার শিউলি ফুল নিয়ে পুলকিত হয়ে বসে আছি— আমাকে কেউ বিরক্ত করবার নেই, দোতলার তিনটি ঘর সম্পূর্ণ আমার এবং দিবসের অষ্টপ্রহর আমার স্বাধীন অধিকারের মধ্যে। মাঝের বড়ো ঘরের বিস্তীর্ণ ধব্‌ধবে বিছানাটি তাকিয়া বালিশ নিয়ে আমার আরামের জন্যে অপেক্ষা করে আছে— আমার নিজেকে নবাব বলে বোধ হচ্ছে। মনে আছে স... আমাকে বলেছিল, 'মুসলমান নবাবদের মতো তোমার মধ্যে একটা বিলাসের ভাব আছে।' কথাটা সম্পূর্ণ সত্য নয়; অর্থাৎ আমার নবাবি মানসিক নবাবি— সেখানে আমি আপনার রাজত্বে কোনো রকম বাধা রাখতে চাই নে, সেখানে আমার অপ্রতিহত অধিকার চাই। কিন্তু নবাবরা যেরকম নবাবি করত তাতে সেই মানসিক নবাবির ব্যাঘাত হত; তাতে এত জিনিস-পত্র লোক-লস্কর সাজ-সরঞ্জামের আবশ্যক হত যে বস্তুরাশিতে মনকে নিশ্বাস রোধ করে বিনাশ করে ফেলত। আমি বস্তুর উপদ্রব এড়াবার জন্যে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াই— প্রমোদের উত্তেজনার মধ্যে থাকলে আমার অন্তঃকরণ ভিতরে ভিতরে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে; আমার মনের অন্তঃপুরের ভিতরে যেন কে একজন আছে, যে আমাকে বাইরের সংস্রবে আসতে দেখলে ঈর্ষান্বিত হয়ে ওঠে।

সাতারা
২৭ অক্টোবর ১৮৯৪

১৬৮

শান্তিনিকেতন
বুধবার, ২৪ অক্টোবর। ১৮৯৪।

সত্যি কথা বলতে কী, যখন একবার বিষয়কার্যের মধ্যে ভালো করে মনোনিবেশ করা যায় তখন তার একটা নেশা ক্রমে মনটাকে অধিকার করে নেয়। বহুবিধ পরামর্শ উপায়চিন্তা এবং ভবিষ্যৎ-ভাবনায় বেশ এক রকম ভোর হয়ে যেতে হয়। যখন নারকেল-কুঞ্জে বসে ছেঁড়া Letts' Diary নিয়ে 'পৃথ্বীরাজের পরাজয়' লিখতুম তখন বোধ হয় এমন একটা অকবিজনোচিত কথা স্বীকার করতে লজ্জা বোধ হত। কিন্তু ভাবপ্রকাশই কী আর বিষয়কর্মই কী, দুয়ের ভিতরে একটা ঐক্য আছে এবং সেইখানেই আনন্দটা পাওয়া যায়। অব্যক্ত থেকে ব্যক্তি, অসমাপ্ত থেকে সমাপ্তি, chaos থেকে সৃষ্টি শৃঙ্খলা উদ্ভাবনা করার একটা মস্ত সুখ আছে। সমস্ত বাধা অতিক্রম করে মনের ভাবকে সুসমাপ্ত ভাষায় বিন্যাস করতে পারলে একটা সৃষ্টিসুখ পাওয়া যায়; সুবৃহৎ জমিদারি কার্যটাকেও ক্রমশ নিয়মে বদ্ধ এবং শৃঙ্খলায় পরিণত করতে পারলে সেইরকম সৃষ্টিসুখ লাভ করা যায়। আয় বাড়ছে বলে তো একটা সুখ থাকতেই পারে, কিন্তু তার চেয়ে বেশি সুখ একটা কার্য সম্পন্ন হচ্ছে বলে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমি যদি ব্যারিস্টার কিম্বা সিভিলিয়ান হয়ে আসতুম তা হলে আমি আমার নির্দিষ্ট কাজের মধ্যে নিমগ্ন হয়ে যেতুম— সাহিত্যচর্চায় মন দেবার কোনো আবশ্যক অনুভব করতুম না। আইনের কূটমর্ম-উদ্ভাবন, বিপক্ষ পক্ষের যুক্তি-খণ্ডন, বিশৃঙ্খল সাক্ষ্যের মধ্যে থেকে একটা

সুসংগত ইতিহাস এবং মত রচনা করে তোলা, এতেই আমার সমস্ত মন অহর্নিশি নিবিষ্ট থেকে একটা বিশেষ আনন্দ এবং আত্মবিস্মৃতি লাভ করত। ভাগ্যি আমি ব্যারিস্টার হয়ে আসি নি!

সাতারা
২৮ অক্টোবর ১৮৯৪

১৬৯

বোলপুর
২৫ অক্টোবর। ১৮৯৪।

কাল রাত্তির থেকে খুব ঘন বর্ষা করে এসেছে। কাল সমস্ত রাত্তির সবেগে বাতাস দিয়ে সশব্দে বৃষ্টি হয়ে গেছে—আজ সকাল বেলায় বাতাস নেই, কিন্তু সমস্ত আকাশ মেঘাচ্ছন্ন করে বৃষ্টি হচ্ছে। একে তো বোলপুর নির্জন, তাতে চতুর্দিকের আকাশমণ্ডপে কালো মেঘের পর্দা টেনে দিয়ে আরও গভীর নিভৃত বলে বোধ হচ্ছে। গাছের পাতার উপর বৃষ্টির ঝর্‌ঝর্‌ শব্দ শোনা যাচ্ছে। এমন দিনে কি হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গা নিয়ে পোলিটিকাল প্রবন্ধ লিখতে ইচ্ছা করে! মনের ভিতরে একটা উতলা উন্মনা ভাব নিয়ে আজ প্রাতঃকাল থেকে পদরত্নাবলীর পাত ওল্টাচ্ছি—বৃন্দাবন-নামক বিরহমিলনের একটা মানসরাজ্যে দেখতে পাচ্ছি—

গগনহি নিমগন দিনমণিকাঁতি।
লখই না পারিয়ে কিয়ে দিনরাতি॥
চৌদিকে অথির পবন তরুদোল।
জগভরি শীকরনিকরহিলোল॥
চলইতে গোরি নগরপুরবাট।
মন্দিরে মন্দিরে লাগল কপাট॥

বর্ষার দিনে ঘরে ঘরে দ্বার বন্ধ, মেঘছায়াচ্ছন্ন বৃন্দাবনের জনশূন্য পথ দিয়ে গৌরী চলেছেন—অস্থির পবনে গাছপালা দুলছে এবং সমস্ত জগৎ ভরে বৃষ্টির ছাঁট উড়ে চলেছে—সূর্য কোথায় ডুবে আছে তার সন্ধান নেই, দিনে রাত্রে যেন একাকার হয়ে আছে। এই বৈষ্ণবপদগুলির মোহমন্ত্রটি যে কী সেইটি ব্যাখ্যা করে একটি প্রবন্ধ লেখবার ইচ্ছা আছে, কিন্তু সে আজ থাক্‌—আজ একটি অর্ধসমাপ্ত পোলিটিকাল্‌ প্রবন্ধ শেষ করতে হবে।...লিখে যে কী ফল হবে তা অন্তর্যামীই জানেন। ভগবদ্গীতায় আছে কর্মেই আমাদের অধিকার আছে, ফলে অধিকার নেই—অর্থাৎ, ফল পাব কি না পাব সে কথা না ভেবে কাজ করতে হবে। ফল পাব না মনে করেই আমাদের দেশে কাজ করতে হয়।

বেলা যত বাড়ছে বৃষ্টিও তত চেপে আসছে—বাদলার অন্ধকারে বেলা এগচ্ছে কি না ঠিক বোঝা যাচ্ছে না, সময় যেন আজ সমস্ত দিনের মতো ছুটি নিয়েছে। ছেলেবেলায় যখন নর্মাল ইস্কুলে পড়তুম এই রকম বাদলার দিনে ঘর অন্ধকার হয়ে যেত বলে পণ্ডিতমশায় পড়া বন্ধ করতেন—যদিও ক্লাসের বাইরে যেতে পারতুম না, তবু বই বন্ধ করে বৃষ্টির শব্দ এবং মেঘের অন্ধকার পুলকিতমনে

উপভোগ করতুম। বোধ হয় তখনকার সেই অভ্যাস-বশত আজও এমন বাদলার দিনে কর্তব্য-নামক কঠিন ইস্কুল-মাস্টারের কাছ থেকে ছুটি নিয়ে সমস্ত পুঁথিপত্র বন্ধ করে দিয়ে আপনার মনে আপনার খেয়ালে থাকতে ইচ্ছা করে। কিন্তু সাধনা ছাপাখানায় দেবার সময় হয়ে এসেছে, এবং পোলিটিকাল প্রবন্ধটা আজ যেমন করেই হোক শেষ করতেই হবে।

সাতারা
২৯ অক্টোবর ১৮৯৪

১৭০

বোলপুর
শুক্রবার [২৬ অক্টোবর ১৮৯৪]

তুই দূর থেকে যে মনে করেছিস, আমি আজকাল সাধারণের সঙ্গে মিলে মিশে, আলাপ আতিথ্য করে খুব একজন দিগ্‌গজ পাব্লিক-ম্যান হয়ে উঠেছি সেটা অত্যন্ত ভুল। হাঁস এবং মাছ দুই ভিন্নজাতীয় জীব—যদিও হাঁস মাঝে মাঝে জলে ডুব মারে এবং মাছ মাঝে মাঝে আকাশে লাফিয়ে উঠে এক গ্রাস হাওয়া খেয়ে নেয়। দূর থেকে অনেক সময় মনে করি এবার আমি খুব লোকজনের সঙ্গে মিশে তাদের সমস্ত কাজের এবং আন্দোলনের মধ্যে আন্দোলিত হয়ে বেড়াব, কিন্তু সে কেবল কল্পনাতেই থেকে যায়। অনেক সময় যেমন কল্পনা করতে বেশ লাগে যে, খুব তরঙ্গিত সমুদ্রের বক্ষ বিদীর্ণ করে আমি পালের জাহাজে বায়ুভরে চলেছি—অথচ তরঙ্গিত সমুদ্রে মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত অন্তরিন্দ্রিয় উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ওঠে—তেমনি লোকসমুদ্রের আন্দোলনে মুহূর্তকাল থাকলেই আমার অন্তরাত্মা পীড়িত হয়ে ওঠে, তার পরে আবার দ্বিগুণ আগ্রহের সঙ্গে আপন নির্জনতার মধ্যে ফিরে আসতে হয়।...তুই লিখেছিস লোকের সঙ্গে মিশলে আমার পার্সোনাল্ ইনফ্লুয়েন্সের দ্বারা অনেকটা উপকার সাধন করতে পারি। কিন্তু পার্সোনাল্ ইন্‌ফ্লুয়েন্স ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতিতে ভিন্ন উপায়ে বিকিরিত হয়ে থাকে—কেউ বা সম্মুখে বর্তমান থেকে মুখের কথায় এবং চরিত্রের বলে লোককে অভিপ্রেত পথে নিয়ে যেতে পারে, কেউ বা অপ্রত্যক্ষ থেকে কেবল আপনার প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ অংশকে সুন্দরভাবে প্রকাশ করে লোকের হৃদয় গ্রহণ করতে পারে। যাদের মনের উপরে সকল রকম শক্তিই কার্য করে, যাদের স্নায়ুতন্ত্রী ছোটো বড়ো সকল-প্রকার আঘাতেই ঝন্ ঝন্ করে বেজে ওঠে, তারা লোকসমাজের মাঝখানে থেকে কখনোই আপনার প্রভাব বিস্তার করতে পারে না, বরঞ্চ তারা অনেক ক্ষতি করে এবং আপনার প্রভাব নষ্ট করতে থাকে—লোকসমাজ থেকে পালিয়ে গিয়ে তাদের নিজের সুখ দুঃখ বেদনা নিজের ভিতরে সম্পূর্ণ প্রচ্ছন্ন করে রেখে নিরাপদে নির্জনে প্রশান্তভাবে ইহজীবন কাজ করে গেলে তবে তাদের কাজের গৌরব রক্ষিত হতে পারে। নইলে তাদের জীবনের সহস্রবিরোধপূর্ণ সমস্যার সমন্বয় করে তাদের প্রকৃতির যথার্থ অর্থটুকু বুঝে নেবার জন্যে কার এত মাথাব্যথা! যারা অনেকটা পরিমাণে

নির্লিপ্ত নিশ্চেতন হয়ে লোকের মাঝখানে থাকে তারাই লোকের উপর আপন প্রভাব বিস্তার করতে পারে। 'মায়ার খেলা'র সে গানটা এ স্থলেও খাটে—

তারে কেমনে ধরিবে, সখি, যদি ধরা দিলে!

সাতারা
৩০ অক্টোবর ১৮৯৪

খাতায় লেখা বা রবীন্দ্রনাথের লিখিত '২৬ কার্তিক ১৩০১' (১১ নবেম্বর ১৮৯৪, রবিবার) লেখার ভুল সন্দেহ নাই; অপর পক্ষে ২৬ অক্টোবর (শুক্রবার) হইলে সাতারায় চিঠি পাওয়ার তারিখের সহিতও সংগতি হয়।

১৭১

বোলপুর
শনিবার
২৬ অক্টোবর ?। ১৮৯৪।

একে আমরা ভারতবর্ষীয় হিন্দু, তাতে আবার যদি মোটা হয়ে উঠি তা হলে একেবারে সশরীরে নির্বাণমুক্তি। আমি দেখেছি মনের ভিতর থেকে বৈরাগ্য এবং ঔদাসীন্যকে খেদিয়ে রাখতে সর্বদাই চেষ্টা করতে হয়। প্রায়ই এক-একবার ধ্যানের অবস্থা এসে কর্মের উৎসাহকে ম্লান করে দিয়ে যায়। আবার মুশকিল হয়েছে এই যে, জগৎসংসারে বৈরাগ্যটা খুব যুক্তিসংগত। সত্যই সমস্ত অনিত্য, মৃত্যু মানুষের জীবনের চেষ্টাকে প্রশান্ত হাস্যে পরিহাস করছে—একটা জাতি নিজের বংশপরম্পরাগত প্রকৃতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে কোনো-একটা বৃহৎ দুঃসাধ্য চেষ্টাকে সফল করে তুলতে পারে কি না সন্দেহ। এই-সমস্ত ফিলজফি মনের মধ্যে আপনি উদয় হয়।

সাতারা
৩১ অক্টোবর ১৮৯৪

২৬ অক্টোবর শুক্রবার ছিল; বর্তমান পত্র শনিবারে লেখা হইয়া থাকিলে তারিখ ২৭ অক্টোবর হওয়াই সম্ভব।

১৭২

বোলপুর
২৮ অক্টোবর। ১৮৯৪।

এখনও আটটা বাজে নি, তবু মনে হচ্ছে যেন অর্ধরাত্রি, সমস্ত গভীর নিস্তব্ধ এবং নিষুপ্ত— কেবল ঝিল্লিধ্বনি শোনা যাচ্ছে। তোরা এখন কী করছিস আমি কিছুই

জানি নে এবং কিছু কল্পনাও করতে পারি নে। পৃথিবীতে আমরা যাদের জানি সবাইকেই ফুটকি-লাইনে জানি; অর্থাৎ মাঝে মাঝে অনেকখানি করে ফাঁক—সেই ফাঁকগুলো নিজের মনে যেমন তেমন করে পূরিয়ে নিতে হয়। যাদের মনে করি সব চেয়ে ভালো জানি তাদেরও সঙ্গে বহুল পরিমাণে নিজের কল্পনা মিশিয়ে নিতে হয়। কত জায়গায় ভাঙা পড়ে যায়, পথচিহ্ন লুপ্ত হয়ে যায়, অনিশ্চিত অস্পষ্ট এবং অন্ধকার থেকে যায়, তবু সৃজন-শক্তি-বিশিষ্ট মন সমস্ত ভাঙাচোরা জোড়া দিয়ে সমগ্র করে তুলে নিজের আয়ত্ত করে রাখতে চায়। খুব সুপরিচিত লোকেরাও যদি আমাদের কল্পনাসূত্রে গাঁথা ছিন্ন অংশ মাত্র হয় তা হলে কার সঙ্গে, কিসের সঙ্গেই বা আমার পরিচয় আছে—আমাকেই বা কে সম্পূর্ণভাবে অবিচ্ছিন্ন রেখায় জানে? প্রত্যেক মানুষ কেবল তার ঈশ্বরের কাছেই সম্পূর্ণ, আর-সকলের কাছেই বিচ্ছিন্ন। কিন্তু হয়তো বিচ্ছিন্ন বলেই, হয়তো তাদের মধ্যে আমাদের নিজের কল্পনা যোজনা করবার স্থান আছে বলেই, তারা এক হিসাবে আমাদের বেশি অন্তরঙ্গ—সেই জন্যেই পরস্পর হয়তো অনেকটা মিশিয়ে নিতে পারি। নইলে অপরিচ্ছিন্ন ব্যক্তি হিসাবে বোধ হয় সকলেই অন্তর্যামী ছাড়া আর সকলের কাছেই দুষ্প্রবেশ্য। আমরা নিজেকেও অংশ অংশ করে জানি, কল্পনা দিয়ে পূরিয়ে নিয়ে একটা স্বরচিত গল্পের নায়ক করে নিই মাত্র—খণ্ড উপকরণ নিয়ে আমরা নিজেকে নিজে সৃষ্টি করে তুলব বলে বিধাতা এই বিচ্ছেদগুলি রেখে দিয়েছেন।

সাতারা। ১ নবেম্বর ১৮৯৪

১৭৩

বোলপুর
৩০ অক্টোবর। ১৮৯৪।

বোলপুরের মতো এমন সুগভীর শান্তি এবং বিরাম আর কোথাও পাওয়া যেত না। দার্জিলিঙের স্যানিটোরিয়মে বিপরীত ভিড়, পরগনাতেও কাজ এবং লোক এসে পড়ে, বোলপুরে কোনো কর্তব্যও নেই লোকের উপদ্রবও নেই—অবিশ্রাম পাখির গান ছাড়া শব্দটি নেই এবং কাঠবিড়ালি ছাড়া আমার দোতলায় আর কোনো প্রাণীই আসে না। দুপুরবেলায় ভ্রমরগুঞ্জনের মতো একটি গুঞ্জনধ্বনি শুনতে পাই—মনে হয় আমার জীবনের সমস্ত সুখস্মৃতি অত্যন্ত দূর থেকে তাদের বিচিত্র মিশ্রিত মর্মরধ্বনি বহন করে নিয়ে আসছে। দুপুর বেলাটি এমন সুগভীর নিস্তব্ধ নির্জন এবং পরিপূর্ণ যে, আমার সমস্ত অন্তঃকরণটিকে একেবারে আবিষ্ট করে রেখে দেয়—লিখি, পড়ি, ভাবি, যাই করি, এই সুবিস্তীর্ণ সুবৃহৎ সকরুণ মধ্যাহ্ন আমাকে নীরবে সস্নেহে বেষ্টন করে থাকে। আজকাল শীত পড়াতে হাত পা একটু ঠাণ্ডা হয়ে আসলেই দক্ষিণের বারান্দাটিতে গিয়ে বসি এবং মাতৃক্রোড়ের মতো প্রকৃতির একটি আতপ্ত স্পর্শে আমাকে আবৃত করে ফেলে; পায়ের কাছে রোদ্দুরটি এসে পড়ে, সবুজ মাঠের অতি দূর নীলাভ প্রান্তটি পর্যন্ত দেখা যায়, চারি দিকের গাছপালা থেকে পতঙ্গদের একটি অশ্রান্ত গুন্ গুন্ শব্দ আসতে

থাকে, মনে হয় যেন সকলের স্নেহ এবং সেবা চার দিক থেকে এসে আমার শরীরের মধ্যে জীবন সঞ্চার করে দিচ্ছে।

সাতারা
৩ নবেম্বর ১৮৯৪

১৭৪

বোলপুর
মঙ্গলবার ?
৩১ অক্টোবর। ১৮৯৪।

প্রথম শীতের আরম্ভে সমস্ত দিন ধরে যে-একটা উত্তুরে বাতাস দিতে থাকে সেইটে আজ সকাল থেকে আরম্ভ হয়েছে— বাতাসটা হী হী করতে করতে আসছে আর শ্রেণীবদ্ধ আমলকী গাছের পাতাগুলি হলদে হয়ে উঠে কাঁপতে কাঁপতে ঝরে ঝরে পড়ে যাচ্ছে এবং গাছের তলা একেবারে ছেয়ে ফেলছে— এই বাতাসে মুখের চামড়া শুকিয়ে যাচ্ছে এবং হাতের চামড়া থেকে খড়ি উঠছে। এখানকার বনরাজ্যের মধ্যে যেন জমিদারের পেয়াদা এসেছে— সমস্ত কাঁপছে এবং ঝরছে এবং দীর্ঘনিশ্বাসে আকুলিত হয়ে উঠছে। দুপুর বেলাকার রোদ্দুরটি বেশ লাগছে, এক-রকম বিশ্রামপূর্ণ ঔদাসীন্যে নিমগ্ন করে দিয়েছে, এবং ঘন আম্রবনের ভিতরে ঘুঘুর অবিশ্রাম কূজনে সমস্ত মাঠ এবং আকাশ এবং বাতাস এবং মধ্যাহ্নের স্বপ্নাতুর ছায়া-রৌদ্রময় সুদীর্ঘ প্রহরগুলোকে যেন বিরহবিধুর করে তুলছে— আমার টেবিলের উপরকার ঘড়ির শব্দটাও মধ্যাহ্ন-প্রকৃতির সমস্ত মর্মরধ্বনির সকরুণ ঔদাস্যের সঙ্গে মিশে গেছে। আমার ঘরের ভিতরে সমস্ত দুপুর বেলাটা কেবল কাঠবিড়ালির ছুটোছুটি চলে। খাওয়া-দাওয়ার পর অনেক ক্ষণ পর্যন্ত অলসভাবে বসে বসে এই জন্তুগুলির বিচিত্র ভঙ্গি নিরীক্ষণ করে দেখা আমার প্রতিদিনের একটা নিয়মিত কাজের মধ্যে হয়ে গেছে। ফুলো ন্যাজ, কালো এবং ধূসর রেখায় অঙ্কিত রোমশ নরম গা, ছোট্ট দুটি কালো ফোঁটার মতো দুটি চঞ্চল চোখ, নিতান্ত নিরীহ অথচ অত্যন্ত ব্যস্তভাব— দেখে মনের মধ্যে ভারী একটা স্নেহের উদয় হয়। এই ঘরের কোণে লোহার-জাল-দেওয়া আল্‌মারির মধ্যে ডাল চাল পাঁউরুটি প্রভৃতি আহার্য দ্রব্যগুলি এই-সকল লুব্ধস্বভাব চপল প্রাণীদের কাছ থেকে গোপন করে রাখা হয়— কৌতূহলপূর্ণ নাসিকাটি নিয়ে তারা সমস্তদিন এই আল্‌মারিটার চতুর্দিকে ছিদ্র অন্বেষণ করে বেড়াচ্ছে। যে-সব ডাল এবং চালের কণা আল্‌মারির বাইরে ছড়ানো থাকে সেইগুলি সন্ধান করে বের করে সামনের গুটিচারেক ছোটো তীক্ষ্ন দন্ত দিয়ে কুট্‌কুট্‌ করে পরম তৃপ্তি-সহকারে আহার করা হয়— মাঝে মাঝে লাঙুলের উপর ভর দিয়ে সোজা হয়ে বসে সামনের দুটি ক্ষুদ্র হাত যোড় করে সেই ক্ষুদ্র শস্যকণাগুলিকে মুখের মধ্যে গুছিয়ে-গাছিয়ে জুত করে নেওয়া হয়— এমন সময় আমি একটু নড়েছি কি অমনি চকিতের মধ্যে ন্যাজটি পিঠের উপর তুলে দিয়ে দে-দৌড়— যেতে যেতে হঠাৎ একবার অর্ধপথে পাপোষটার উপর থেমে একটা পা তুলে ফস্‌ করে একটা কান চুলকে নিয়ে আবার এসে উপস্থিত— এমনি সমস্ত

বেলাই কুট্‌কাট্‌ দুড়্‌দুড়্‌ এবং প্লেট কাঁটা চামচের মধ্যে ঠুংটাং ঝুন্‌ ঝুন্‌ চলছেই।...

এখান থেকে যেতে আমার মন-কেমন করছে— কলকাতায় ফিরে গিয়ে এখানকার প্রফুল্ল সকাল বেলা এবং নির্জন দুপুর বেলা আমার সর্বদাই মনে পড়বে— এখানকার শান্তি এবং সৌন্দর্যস্মৃতি আমাকে আকর্ষণ করতে থাকবে। কিন্তু কী করা যাবে! স্বার্থপরতাকে দমন করে প্রফুল্লচিত্তে কর্তব্যক্ষেত্রে যাওয়া যাক। ছেড়ে যাবার সময় সৌন্দর্যগুলো আরও যেন মনোহর হয়ে ওঠে। আজকের দিনটা এমনি একটি করুণাপূর্ণ রাগিণীতে আপ্লুত হয়ে উঠেছে।

সাতারা
৪ নবেম্বর ১৮৯৪

১৭৫

কলকাতা
১৯ নবেম্বর। ১৮৯৪।

ছেলেবেলা থেকে দেখেছি ঐ ফেরিওয়ালার হাঁকগুলো আমাকে কেমন একটু বিচলিত করে— নির্জন নিস্তব্ধ দুপুর বেলায় চিলের তীক্ষ্ণ ডাকটাও আমাকে ভারী আঘাত করত, অনেক দিন আর সেই ডাকটা কানে আসে নি। আজকালকার চিল যে ডাকে না তা বোধ হয় না, আমারই বোধ করি এখন অনেক চিন্তা এবং অনেক কাজ— প্রকৃতির সঙ্গে আর আমার সে রকম ঘনিষ্ঠ যোগ নেই। এক সময় ছিল একলা সমস্ত দুপুর বেলা চুপ করে তেতালার ঘরের দক্ষিণের দরজার কাছে কৌচে পড়ে কাটিয়ে দিয়েছি— তখন দীর্ঘ দুপুর বেলাকার প্রত্যেক শব্দটি কম্পনটি এবং ওর ভিতরকার সমস্ত করুণরসটুকু নিঃশেষে অনুভব করতুম। এখন অতখানি সময় ফেলে রাখা অসম্ভব; মনে হয় একটা কিছু পড়ি কিম্বা লিখি। যদি বা মনের গতিকে কোনো বিশেষ কাজ করতে প্রবৃত্তি না হয় তবু একটা কাজের চেষ্টা করতে হয়, নিদেন অন্যমনস্কভাবেও একটা বই পড়বার চেষ্টা করা দরকার হয়। এটা কিন্তু কলকাতায়। মফস্বলে গেলে চুপ করে চেয়ে বসে থাকলেও হৃদয় পরিপূর্ণ হয়ে আসে, কাজের অন্ধ দাসত্ব করতে হয় না। এক রকম কাজ আছে যা কর্তব্যবোধে কাজ, তার বিরুদ্ধে কিছু বলবার নেই, কিন্তু যখন উপস্থিত কোনো কাজ হাতে নেই কিম্বা কোনো কারণে ভালো করে কাজ সম্পন্ন করবার শক্তি নেই তখনও যদি কেবল অভ্যাসবশত কেবল সময়-যাপনের জন্যে একটা কাজ খুঁজে বেড়াতে হয়— তখনও যদি কেবলমাত্র আপনাকে নিয়ে আপনি শান্তি না পাওয়া যায়, আপনার চতুর্দিক থেকে একটি সঙ্গ আকর্ষণ করতে না পারা যায়— তা হলে অবস্থাটা খারাপ হয়েছে বলতে হবে। কাজ একটা উদ্দেশ্যসাধনের উপায় মাত্র। মানুষ তো আর কাজের যন্ত্র নয়। পরিপূর্ণ তৃপ্তির সঙ্গে বিরাম লাভ করবার যে শক্তি সেটুকু হারানো কিছু নয়— কারণ, সেটুকুর মধ্যে অনেকখানি উচ্চ-অঙ্গের মনুষ্যত্ব আছে। কাজ খুব ভালো জিনিস সন্দেহ নেই— কিন্তু কাজের একটা সংকীর্ণতা আছে— তাতে মানুষকে আচ্ছাদন করে রাখে। দিন এবং রাত্রি

কাজ এবং বিরামের ঠিক উপমা। দিনের বেলা পৃথিবী ছাড়া আমাদের কাছে আর কিছুই নেই—রাত্রে গ্রহনক্ষত্রমণ্ডলের মধ্যে অনন্ত জগতের সঙ্গে আমাদের যোগ স্থাপন হয়। কাজের সময় আমরা পৃথিবীর মানুষ, বিশ্রামের সময় আমরা জগতের লোক। যখন কাজ করব তখন যুক্তি তর্ক বিজ্ঞানের আলোকে পৃথিবীটাকে পরিষ্কার করে দেখে নেওয়া দরকার, যখন বিশ্রাম করব তখন পৃথিবীটাকে হ্রাস করে দেওয়াই দরকার—তখন অনন্তের সঙ্গে আমাদের যে অনন্ত যোগ আছে সেইটাকেই বড়ো করে দেখা চাই। তখন সমস্ত কাজের চেষ্টাকে বহুদূরে রেখে দিয়ে পৃথিবীর সমস্ত শব্দ গন্ধ বর্ণ স্পর্শের মধ্যে যে-একটি নিত্য সৌন্দর্য যে-একটি অসীমতার আভাস আছে সেইটেকেই কায়মনে অনুভব করা চাই। এই দুটো ভাবের মধ্যে কোনোটাকেই বাদ দেওয়া উচিত হয় না। সকাল বেলা উঠে জানা চাই আমরা পৃথিবীর লোক এবং দিন অবসান হয়ে গেলে অনুভব করা চাই যে আমরা জগৎবাসী। যারা বড়ো বেশি কাজের লোক তাদের কাছে বৃহৎ জগৎটা চিরকাল গোপন থেকে যায়।

সাতারা
২৩ নবেম্বর ১৮৯৪

১৭৬

কলকাতা
মঙ্গলবার, ২০ নবেম্বর। ১৮৯৪।

কাল তোর চিঠিতে যে কথাটা উত্থাপন করেছিলুম তারই অনুবৃত্তিস্বরূপে মনে হচ্ছে যে, দিনে এবং রাত্রে যেমন কাজ এবং বিরামকে ভাগ করে নিয়েছে, সাহিত্যে গদ্যে এবং পদ্যেও সেই রকম মানুষের ঐ দুটি অংশকে ভাগ করেছে। গদ্য পরিষ্কার কাজের এবং পদ্য সুবৃহৎ বিশ্রামের। সেই জন্যে পদ্যে আবশ্যক কথার কোনো আবশ্যক নেই। পদ্যে আমাদের জন্যে যে জগৎ সৃজন করে সে জগতের কাছে আমাদের দৈনিক সংসার অত্যন্ত লুপ্তপ্রায় দেখায়। তাই যদি না দেখাত তা হলে নিত্যসৌন্দর্যের জগৎ, ভাবজগৎ, আমাদের কাছে দৃষ্টিগোচর হত না। মানুষের জীবনে এই দুটো জিনিসই যখন সত্য, এবং দুটো সত্য যখন দিন এবং রাত্রির ন্যায় একসঙ্গে দেখবার উপায় নেই, তখন গদ্য পদ্য দুয়েরই আবশ্যক আছে। সেইজন্যে ছন্দে বন্ধে ভাষায় পদ্য প্রাত্যহিক সংসারের সমস্ত সংস্রব দূর করে দিয়েছে, আবশ্যকের স্থানে সৌন্দর্যের অবতারণা করেছে—আমাদের আবশ্যক-ক্ষেত্রের সম্পূর্ণ বাইরেও-যে একটি অনন্ত আনন্দসমুদ্র অকূলের দিকে প্রসারিত রয়েছে সেই বার্তাটা নানা ভাবে এবং নানা ভঙ্গীতে দেবার চেষ্টা করেছে। এই গদ্য-পদ্যর ভেদ ও সেই প্রভেদের আবশ্যকতা সম্বন্ধে অল্পকাল হল [ঠাকুরদাস] মুখুজ্জের সঙ্গে আমার আলোচনা চলছিল। তাঁর মতে ভবিষ্যতে গদ্য এতদূর পর্যন্ত সুন্দর হয়ে উঠবে যে, পদ্যর বিশেষ প্রয়োজনীয়তা দূর হয়ে যাবে। কথাটা যদি বিশুদ্ধ তর্কের হত তা হলে অনেকটা সহজ হত, কিন্তু এর মধ্যে ভাবের কথা বহুল পরিমাণে আছে বলে মুখে মুখে বোঝানো বড়ো শক্ত হয়। আমি সংক্ষেপে

কেবল বললুম—সমতল পৃথিবী সাধারণ সমস্ত কাজের পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী এ কথা কেউ অস্বীকার করতে পারে না, কিন্তু অভিনয় করতে গেলে একটা স্বতন্ত্র স্টেজের আবশ্যক করে; দর্শকদের মাঝখানে নেবে এসে অভিনয় করলে তাদের মনে সেই বিভ্রমটা উৎপন্ন হয় না। অভিনয়ের বিষয়টাকে চতুর্দিক থেকে বিচ্ছিন্ন করে একটু উপরের দিকে উঠিয়ে দিয়ে আলোক এবং দৃশ্যপট এবং সংগীতের দ্বারা বেশ জাজ্বল্যমান করে সম্মুখে ধরা চাই, তবে সেটা সমগ্রভাবে এবং স্বতন্ত্রভাবে কল্পনাপটে মুদ্রিত হয়ে যায়। কবিতার ভাষা ও ছন্দ সেই স্টেজ এবং সংগীতের মতো—বিষয়টি সেই-সমস্ত সুন্দর বেষ্টনের দ্বারা বিচ্ছিন্ন হওয়াতেই আমাদের মনে এমন সমগ্রভাবে এবং প্রবলভাবে আঘাত করতে পারে, চারি দিকের দরিদ্র সংসার থেকে সৌন্দর্যলোকে আমাদের আকর্ষণ করে নিয়ে যেতে পারে, প্রথম দৃষ্টিতেই আমরা বুঝতে পারি যে এখন আমরা আমাদের কর্মক্ষেত্রের মধ্যে নেই—এক মুহূর্তেই প্রস্তুত হয়ে নিতে পারি। কিন্তু এ-সমস্ত কথা ঠিকটি বোঝানো শক্ত। ঠা [কুরদাস] বাবুও বোধ হয় আমার কথা মানলেন না। ভাবে বোধ হল তাঁর বিশ্বাস, আমার গদ্যে আমার পদ্যের চেয়ে ঢের বেশি কবিত্ব পরিস্ফুটভাবে প্রকাশ পায় এবং সেইটেই তাঁর মতে স্বাভাবিক। তিনি আমার শেষ দিককার লেখা কতকগুলি কবিতার বই চেয়েছেন—বোধ হয় কোনো প্রবন্ধে প্রমাণ করবেন যে আমার পদ্যই গদ্য এবং গদ্যই পদ্য।

সাতারা
২৪ নবেম্বর ১৮৯৪

১৭৭

কলকাতা
২১ নবেম্বর। ১৮৯৪।

অ [ভিজ্ঞা ?] ও বাড়িতে তাদের এক তলার ঘরে বসে এস্‌রাজে ভৈরবী আলাপ করছে, আমি আমার তেতলার কোণের ঘরে বসে স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি। তোর চিঠিতেও তুই মাটাঙ্গের ভৈরবী আলাপের কথা লিখেছিস। আজকাল সকালে দেখতে দেখতে বেলা দশটা-এগারোটা দুপুর হয়ে যায়—দিনটা যতই উত্তপ্ত হয়ে উঠতে থাকে মনটাও ততই এক রকম উদাসীন হয়ে আসে; তার উপর কানে যখন বারম্বার ভৈরবীর অত্যন্ত করুণ মিনতির খোঁচ লাগতে থাকে তখন আকাশের মধ্যে, রৌদ্রের মধ্যে, একটা প্রকান্ড বৈরাগ্য ব্যাপ্ত হয়ে যায়। কর্মক্লিষ্ট সন্দেহপীড়িত বিয়োগশোককাতর সংসারের ভিতরকার যে চিরস্থায়ী সুগভীর দুঃখটি—ভৈরবী রাগিণীতে সেইটিকে একেবারে বিগলিত করে বের করে নিয়ে আসে। মানুষে মানুষে সম্পর্কের মধ্যে যে-একটি নিত্যশোক নিত্যভয় নিত্যমিনতির ভাব আছে, আমাদের হৃদয় উদ্‌ঘাটন করে ভৈরবী সেই কান্নাটিকে মুক্ত করে দেয়, আমাদের বেদনার সঙ্গে জগদ্‌ব্যাপী বেদনার সম্পর্ক স্থাপন করে দেয়। সত্যিই তো আমাদের কিছুই স্থায়ী নয়; কিন্তু প্রকৃতি কী এক অদ্ভুত মন্ত্রবলে সেই কথাটিই আমাদের সর্বদা ভুলিয়ে রেখেছে, সেইজন্যেই আমরা উৎসাহের সহিত সংসারের কাজ করতে

পারি। ভৈরবীতে সেই চিরসত্য, সেই মৃত্যুবেদনা প্রকাশ হয়ে পড়ে; আমাদের এই কথা বলে দেয় যে, আমরা যা-কিছু জানি তার কিছুই থাকবে না এবং যা চিরকাল থাকবে তার আমরা কিছুই জানি নে।

সাতারা
২৫ নবেম্বর ১৮৯৪

১৭৮

শিলাইদহ
শনিবার ?
২৫ নবেম্বর। ১৮৯৪।

গো... এ যাত্রায় বেঁচে গেল। পরশু প্রায় সমস্ত রাত আমার ঘুম হয় নি। আমার বোটের পিছনেই তার নৌকো ছিল— মাঝে মাঝে তার কাতর শব্দ শুনতে পাচ্ছিলুম আর তার আসন্ন মৃত্যুর কথা ভেবে মনটা উদ্‌বিগ্ন হয়ে উঠছিল। তখন নিস্তব্ধ রাত্রি, আমার ঘর সমস্ত অন্ধকার। বিছানার মধ্যে পড়ে পড়ে মানুষের জীবনমৃত্যুটাকে ভীষণ একটা রহস্যে আচ্ছন্ন বলে মনে হচ্ছিল— আমাদের চতুর্দিকে একটি নিস্তব্ধ নির্বাক্‌ অনন্তকাল দাঁড়িয়ে রয়েছে, এক-এক সময় তাকে বড়ো নিষ্ঠুর বলে মনে হয়। তার তুলনায় আমাদের প্রাণটুকু, আমাদের বৃহত্তম সুখদুঃখ, আমাদের মহত্তম আশা-আকাঙ্ক্ষা কত তুচ্ছ— আমি আজ মরি আর কাল মরি সে তার কাছে কিছুই নয়। আমি একলা মরি আর লক্ষ প্রাণী বন্যায় ভেসে যাক্‌ সেও তার কাছে কিছুই নয়। সূর্য একদিন তার সমস্ত সৌরজগৎ-সুদ্ধ নিবে গিয়ে, বরফে জমে গিয়ে, একেবারে মরে যাবে, সেও তার কাছে কিছুই নয়— এমন কত জগৎ আপন লক্ষকোটি বৎসরের জীবজননলীলা সম্বরণ করে আজ নির্বাপিত মৃত অবস্থায় আকাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পৃথিবীর স্তরে স্তরে কত লুপ্ত জীববংশের কঙ্কাল পড়ে আছে, আজ তাদের একটি বংশধরও বর্তমান নেই। তাই আমি বিছানার ভিতর পড়ে পড়ে ভাবছিলুম এই অনন্ত অন্ধকারের মধ্যে এই মুমূর্ষু মানুষটার হয়ে কার কাছে বলব 'আহা, বেচারা বড়ো কষ্ট পাচ্ছে'? আমরা অক্ষম মানুষরা ছাড়া তার জীবনের মূল্য কে বোঝে! তার বেদনা কার কাছে সত্য! মৃত্যু যখন প্রত্যেক জীবের পক্ষে অনিবার্য অবশ্যসম্ভব ঘটনা তখন এমন অসহ্য কষ্ট পাবার কী আবশ্যক ছিল! আমাদের যেগুলো নিতান্ত ব্যক্তিগত মর্মগত সুখ দুঃখ বাসনা, এক জায়গায় কোথাও তার একটা অনন্ত অবলম্বন আছে, একটা চিরন্তন সমবেদনার আধার আছে, এ কথা মনে না করলে সমস্তই এমন একটা নিষ্ঠুর প্রহসন বলে মনে হয়! মার কাছে তার ছেলের মৃত্যু অত্যন্ত দুঃসহ দুঃখের আকর, কিন্তু অনন্তের কাছে তার যদি কোনো অর্থই না থাকে তবে এ মায়া কেন! আমার কাছে আমার ভালোবাসা কতই নিরতিশয়, কিন্তু অনন্তের মধ্যে তার যদি কোনো স্থান না থাকে তবে তো সে স্বপ্নমাত্র! আমরা দেশের জন্যে প্রাণপণ করছি, মানুষের উন্নতির জন্যে প্রাণ দিচ্ছি। কিন্তু দেশ আমাদেরই কাছে দেশ, অর্থাৎ সমস্ত জগতের চেয়ে বড়ো— মানুষ আমাদেরই কাছে মানুষ, অর্থাৎ বিশ্বের

সমস্ত জীবের চেয়ে বেশি— আমাদের বাইরে থেকে দেখতে গেলে এই ভাবগুলো এবং তার সঙ্গে আমাদের সমস্ত প্রাণপণ চেষ্টাগুলো নিতান্তই উপহাসের বিষয়। গো...র আসন্ন মৃত্যুটা আমার কাছে অত্যন্ত গম্ভীর অত্যন্ত গুরুতর বলে মনে হচ্ছিল; কিন্তু সে কেবলমাত্র আমি মানুষ বলে, আমি তার পরিচিত এবং নিকটবর্তী বলে— ওর ভিতরে কি সত্যকার কোনো গাম্ভীর্য এবং গৌরব আছে? এই তো পিঁপড়ে মরছে, মশা মরছে, তাকে আমরা এত তুচ্ছ মনে করি কেন? একটা পাতা শুকিয়ে পড়ে গেলে, একটা প্রদীপ বাতাসে নিবে গেলে, সেই বা শোকের কারণ কেন না হয়! সেও তো কম পরিবর্তন নয়। অনন্তের কাছে, একটা সৌরজগৎ নিবে যাওয়া, পাতা ঝরে যাওয়া, মানুষ মরে যাওয়া, সব সমান— অতএব আমাদের শোক এবং সুখদুঃখ সব আমাদেরই। আমার এক-এক সময় মনে হয় জগৎটা দুই বিরোধী শক্তির রঙ্গভূমি— একজন আমাদের মধ্যে থেকে নিত্য বাঁচবার চেষ্টা করছে, আর একজন তাকে নিত্য বধ করবার উদ্যম করছে— তা যদি না হত তা হলে মৃত্যু আমাদের পক্ষে নিতান্ত স্বাভাবিক মনে হত, কিছুমাত্র শোচনীয় বোধ হত না— এক সময় এক রকম ছিলুম আর-এক সময় আর-এক রকম হয়ে গেলুম এটার সঙ্গে কোনো রকম দুঃখশোক বিস্ময় জড়িত থাকত না। কিন্তু আমাদের প্রকৃতির ভিতর থেকে বলছে 'বেঁচে থাকব', বলছে 'মৃত্যু আমার বিরোধী পক্ষ— তাকে জয় করতেই হবে'— অথচ কোনোকালে কেউ তাকে জয় করতে পারে নি। কিন্তু তবুও চেষ্টার ত্রুটি নেই। সেইজন্যেই মৃত্যুযন্ত্রণা, মৃত্যুশোক— বেঁচে থাকবার একটা চিরসম্ভাবনা আছে, মৃত্যু তাকে বারম্বার পরাভূত করছে।

সাতারা
৩০ নবেম্বর ১৮৯৪

১৭৯

শিলাইদহ
বুধবার, ২৮ নবেম্বর। ১৮৯৪।

প্রথম বৎসর যখন শিলাইদহ বোটে এসেছিলুম তখন যে রকম এ পারে বালির চরের সীমা দেখা যেত না, এবারে ঠিক সেইরকম চর পড়েছে। দিগন্তের শেষ সীমা পর্যন্ত সাদা বালির চর ধু ধু করছে; তাতে না আছে ঘাস, না আছে গাছ, না আছে বাড়ি ঘর, না আছে কিছু— সেবারকার চরে মাঝে মাঝে বনঝাউ ছিল, এবার তাও নেই। এত বড়ো প্রকাণ্ড শূন্যতার ভাব চোখে না দেখলে ঠিক কল্পনা করতে পারবি নে। আকাশের শূন্যতা, সমুদ্রের শূন্যতা আমাদের অভ্যস্ত হয়ে গেছে, সেখানে আর-কিছু প্রত্যাশা করি নে; কিন্তু ভূমির শূন্যতাকে সব চেয়ে বেশি শূন্য বলে মনে হয়— কোথাও গতি নেই, জীবন নেই, বর্ণের বৈচিত্র্য নেই, কোমলতার আভাসটুকু মাত্র নেই— যেখানে শস্যে তৃণে তরুলতায় পশুপক্ষীতে ভরে যেতে পারত সেখানে একটি কুশের অঙ্কুর পর্যন্ত নেই— কেবল একটা উদাস কঠিন অসীম বৈধব্যের বন্ধ্যাদশা— পাশ দিয়ে পদ্মা নদী চলে যাচ্ছে, ও পারে ঘাট, বাঁধা নৌকো, স্নানরত লোকজন, নারকেল এবং আমের বাগান— সন্ধ্যাবেলায় নদীর ধারের হাট থেকে কলধ্বনি শোনা যায়, বহুদূরে পাবনার পারের তরুশ্রেণী ঘননীল

রেখার মতো দেখা যায়—কোথাও গাঢ়নীল কোথাও পাণ্ডুনীল, কোথাও সবুজ, আর মাঝখানে ঐ রক্তহীন মৃত্যুর মতো ফ্যাকাশে সাদা—নিস্তব্ধ, নিশ্চেষ্ট, জনহীন। সন্ধ্যাবেলা সূর্যাস্তের সময় যখন আমি এই চরের উপর উঠে বেড়াই, সমস্ত অন্তঃকরণের একটা পরম প্রসারতা এবং অবাধ স্বাধীনতা অনুভব করি। কিছু নেই, কেউ নেই, কেবল আমি একলা। আমার যত কথা আছে সমস্ত আমি এই চিহ্নশূন্য বাধাশূন্য ধরণীর উপর ছড়িয়ে ছড়িয়ে ফেলতে পারি; আমি আমার সঙ্গী, আমার সুখ, সমস্তই সৃজন করে নিতে পারি। কাল আমি ভাবছিলুম, যখন আমাদের ইন্দ্রিয় কিছুই অনুভব করতে পারে না, আমাদের মনই সমস্ত অনুভব করে, ইন্দ্রিয় কেবল মনের কাছে উপস্থিত হবার দ্বার মাত্র, তখন ইন্দ্রিয়-সাহায্য-ব্যতিরেকেও আমাদের মনের সম্মুখে যা-কিছু উপস্থিত হয় তাকেই বা সত্য না মনে করি কেন? কিম্বা তার থেকেই বা সত্যের মতো সমান সুখ না পাই কেন? আমার বোধ হয় ওটা কেবল অভ্যাস মাত্র। আমরা প্রথম থেকেই ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়েই সমস্ত অনুভূতিগুলি প্রাপ্ত হয়ে এসেছি। এখন যদিচ কল্পনার সাহায্যে মন স্বাধীনভাবে অনেক জিনিস গড়তে পারে, তবু সমস্ত সুখদুঃখ ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে ভোগ না করলে স্পষ্টরূপে ভোগ করতে পারে না। যেমন, যদিও মন লেখে, কলম লেখে না, তবু যাদের বরাবর কলমে লেখা অভ্যাস তারা কলম হাতে নিয়ে যেমন ভাবগুলো গুছিয়ে নিতে পারে এমন মুখে মুখে পারে না। আমার স্পষ্ট মনে হয় আমরা যদি একটু মনঃসংযোগ করে সাধন করি, অভ্যাস করি, তা হলে কল্পনার সামগ্রীকে ইন্দ্রিয়গোচর সামগ্রীর মতো অত্যন্ত নিকট অত্যন্ত অধিগম্যরূপে উপলব্ধি করতে পারি। দুর্ভাগ্যক্রমে সকল সময়ে কল্পনা-শক্তির সেই স্বচ্ছতা, সেই সূক্ষ্মতা, সেই স্পষ্টতা থাকে না। মফস্বলে আমার সেই শক্তি খুব বিকশিত হয়, আমি দেশকালের ব্যবধানকে আমার কল্পনার দ্বারা পরিপূর্ণ করে তুলতে পারি: কিন্তু কলকাতার আবিলতার মধ্যে সেই মায়াশক্তি কোথায় অন্তর্ধান করে, তখন ইন্দ্রিয়ের দ্বারে শরণাপন্ন হয়ে ক্রন্দন করে মরতে হয়।

সাতারো
৩ ডিসেম্বর ১৮৯৪

১৪০

শিলাইদহ
বুধবার?
৬ ডিসেম্বর। ১৮৯৪।

সাধারণত অন্যদিন এই সময়টা কিছু গরম হয়ে ওঠে, জোব্বাটা খুলে ফেলতে হয়—আজ ঠিক উল্টো দেখছি। বাইরে বাতাসটা সোঁ সোঁ শব্দে শিস লাগিয়েছে, নদীর জল কলকল ছলছল শব্দে চঞ্চল হয়ে উঠেছে—অথচ মেঘের কোনো লক্ষণ নেই, রৌদ্র চমৎকার উজ্জ্বল, জলের ধারে কাদা-চরের উপর কাদাখোঁচা পাখিগুলো ল্যাজ নাচিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে এবং শুশুকগুলো থেকে থেকে খামকা জলের উপরে গুব্‌ করে ডিগ্‌বাজি খেলে যাচ্ছে। যদি সন্ধের সময়ও এইরকম বাতাসটা থাকে তা হলে আমার আজ আর বেড়ানোটা হবে না। আমি আজকাল

একটু স্থানপরিবর্তন করেছি। নদীর ঠিক মাঝখানে একটা চরের মতো জেগে উঠেছে, সেই চরে আমি বোট নিয়ে এসে বেঁধেছি। সেই ছড়াটা মনে আছে?—

এপার গঙ্গা, ও পার গঙ্গা, মধ্যিখানে চর।
তারই মধ্যে বসে আছে শিব-সদাগর।

আমি ঠিক সেই শিব-সদাগর হয়ে বসে আছি। বিকেলে যখন ডাঙায় বেড়াতে যাই তখন জলিবোটে খানিকটা দাঁড় টেনে বেয়ে যেতে হয়; এই সূত্রে আমার দাঁড় টানাও হয় বেড়ানোও হয়। আজকাল শুক্লপক্ষ— খানিকটা বেড়াতে বেড়াতেই চাঁদের আলো ফুটে ওঠে, তখন চরের সীমাহীন ধূসর বালি চাঁদের আলোতে এমন একটা ছায়ারচিত কাল্পনিক আকার ধারণ করে, মনে হয়, এ যেন বাস্তবিক পৃথিবী নয়— আমারই মনের একটা অপরূপ ভাব। কোন্‌কালে ছেলেবেলায় তিনকড়িদাসীর কাছে রাত্রে মশারির মধ্যে শুয়ে রূপকথার প্রসঙ্গে একটা বর্ণনা শুনেছিলেম, 'তেপান্তর মাঠ— জোচ্ছনায় ফুল ফুটে রয়েছে'— যখনি জ্যোৎস্নারাত্রে চরে বেড়াই তিনকড়িদাসীর এই কথাটি মনে পড়ে। ছেলেবেলায় সেই রাত্রে তিনকড়ির এই একটি কথায় আমার মনটা ভারী চঞ্চল হয়ে উঠেছিল— প্রকাণ্ড মাঠ ধূ ধূ করছে, তারই মধ্যে ধব্‌ধবে জ্যোৎস্না হয়েছে, আর রাজপুত্র অনির্দেশ্য কারণে ঘোড়ায় চড়ে ভ্রমণে বেরিয়েছে— শুনে মনটা এমনি উতলা হয়েছিল! তা ছাড়া, রাজপুত্রের ভাগ্যে প্রায়ই পরমাসুন্দরী রাজকন্যা জুটত কিনা, সেটাতে মনটা আরও ক্ষুব্ধ হত। মনের ভিতরে কেমন একটা দুরাশা বদ্ধমূল হয়েছিল যে, বড়ো হলে এই ধরনের একটা কোনো অদ্ভুত ঘটনা আমার দ্বারাও সম্ভব এবং নানা বিঘ্নবিপদের পারে কোনো-এক জায়গায় কোনো-একটি পরমাসুন্দরীও নিতান্ত দুর্লভ না হতে পারে। জ্যোৎস্নারাত্রে চরে বেড়াতে বেড়াতে ছেলেবেলাকার সেই মশারির ভিতরকার পুলকিত হৃদয়ের মোহ জেগে ওঠে; চারি দিকের সমস্তই এমন অবাস্তব দেখতে হয় যে যা-কিছু অসম্ভব সেইগুলোই আকার ধারণ করে ওঠে; নিজের কল্পনার মরীচিকার মধ্যে নিজে মুগ্ধভাবে ঘুরে ঘুরে বেড়াই— তার আর কোথাও সীমা নেই, বাধা নেই।

সাতারা
১১ ডিসেম্বর ১৮৯৪

১৮১

শিলাইদহ
৭ ডিসেম্বর। ১৮৯৪।

চরের উপর সন্ধেবেলাটা আজকাল এমন চমৎকার হয় সে আমার বর্ণনার অতীত। আমি যখন একলা বেড়াই, খানিক বাদে শৈ... প্রায়ই আমার সঙ্গ নিতে আসে এবং কাজকর্মের আলোচনা করে। কালও সে এসেছিল। খানিক ক্ষণ ধরে খারিজ দাখিল বন্দোবস্ত প্রভৃতি সম্বন্ধে কথা কওয়ার পরে যেই একটু চুপ করেছি— অমনি হঠাৎ দেখতে পেলুম অনন্ত জগৎ সেই সন্ধ্যার আকাশে নীরবে আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে। তখন আমার আশ্চর্য বোধ হল, কানের কাছে একটা মানুষের সামান্য কণ্ঠস্বরে এই অনন্ত-আকাশ-ভরা নিঃশব্দতা ডুবে গিয়েছিল— ঐ উদ্ঘাটিত

নিস্তব্ধ জগৎ-চরাচরের মধ্যে খারিজ দাখিল এবং বিরাহিম্‌পুরের জমিদারি সেরেস্তা কোন্‌খানে! আমি শৈ...র কথার কোনো উত্তর দিলুম না, সে মনে করলে আমি বুঝি শুনতে পাই নি। ফের আবার প্রশ্ন করলে, আমি ফের নিরুত্তরে সে কথা কাটিয়ে দিলুম। তখন সে ভারী আশ্চর্য হয়ে চুপ করে গেল। যেই চুপ করলে, অমনি দেখতে দেখতে সমস্ত নিস্তব্ধ নক্ষত্রলোক থেকে শান্তি নেমে এসে আমার হৃদয় পরিপূর্ণ করে তুললে। যে সভার মধ্যে অনন্তকোটি জ্যোতিষ্ক নীরবে সমাগত হয়েছে আমিও সেই সভার এক প্রান্তে স্থান পেলুম। ঐ অসীম শূন্যের মধ্যে তারাও যেমন এক-একটি, এই পদ্মার ধারে দিগন্তবিস্তীর্ণ নির্জন বালির চরের মধ্যে আমিও তেমনি একটি; অস্তিত্ব-নামক এক মহাশ্চর্য ব্যাপারের মধ্যে ওরা এবং আমি স্থান পেয়েছি। অনেক রাত্রি পর্যন্ত জ্যোৎস্নায় চরের মধ্যে বেড়িয়ে শেষকালে বোটের মধ্যে ফিরে এসে বাতি জ্বালিয়ে দরজা বন্ধ করে লম্বা কেদারায় পা ছড়িয়ে বসে ফের আবার বিরাহিমপুরের খারিজ দাখিলের সম্বন্ধে আলোচনা উত্থাপিত হল। নতুন খেজুরেগুড়-সহযোগে চারি খণ্ড লুচি এবং এক গ্লাস দুগ্ধও খাওয়া গেল। তার পরে খানিকটা সাহিত্যসমালোচনা করে শয্যাশায়ী হয়ে পড়া গেল।

সাতারা
১২ ডিসেম্বর ১৮৯৪

১৮২

শিলাইদহ
১১ ডিসেম্বর। ১৮৯৪।

আজকাল ...র ভয়ে খুব সকাল-সকাল বেড়াতে বেরই; অনেক ক্ষণ একলা বেড়াবার পরে শৈ... এসে হাজির হয়। ততক্ষণ আমি মনটিকে শান্ত এবং শীতল করে নিই এবং দিনের সমস্ত চিন্তা ও কাজের ছিন্ন আবর্জনাগুলো একেবারে ঝেঁটিয়ে সুদূরে ফেলে দিই। তখন নিদেন খানিক ক্ষণের জন্যে মনে হয় সংসারের সমস্ত লাভক্ষতি এবং সুখদুঃখ কিছুই কিছু নয়। তার পরে হঠাৎ শৈ... এসে যখনি জিজ্ঞাসা করে 'আজ দুধ খেয়ে আপনার কোনো অসুখ করে নি তো' কিম্বা 'নায়েব-মশায় ঠাকুরবাড়ির সমস্ত হিসেব পেশ করেছিলেন কি'—সেগুলো এমনি অদ্ভুত খাপছাড়া শুনতে হয়! আমরা নিত্য এবং অনিত্য-নামক এমন দুটি অসীম বিরোধের ঠিক মাঝখানে বাস করি! যদিও তারা চিরসংলগ্ন চিরপ্রতিবেশী তবু পরস্পরের কাছে পরস্পর এমনি হাস্যজনক! যখন আধ্যাত্মিক কথা হচ্ছে তখন গায়ের কাপড় এবং পেটের ক্ষিধের কথা আনলে ভারী অসংগত মনে হয়, অথচ আত্মা এবং পেটের ক্ষিধে চিরকাল একত্রে যাপন করে আসছে। যেখানে চন্দ্রালোক পড়ছে সেইখানেই আমার জমিদারি; অথচ জ্যোৎস্না বলছে 'তোমার জমিদারি মিথ্যে', জমিদারি বলছে জ্যোৎস্না সমস্তই ফাঁকি! আমি ব্যক্তি ঠিক মাঝখানে।

সাতারা
১৬ ডিসেম্বর ১৮৯৪

১৪৩

শিলাইদহ
মঙ্গলবার ?
১২ ডিসেম্বর। ১৮৯৪।

তুই যে লিখেছিস [বব] 'ভবের সাথে ভাবের মিলন হবে কবে?'— সম্পূর্ণ মিলন কোনোকালেই হবে না। কারণ, ভবও যতটা ভাবের কাছে অগ্রসর হতে থাকবে আবার ভাবও ততটা সম্মুখে অগ্রসর হয়ে চলবে। ঠিক যেন ভাবটা ভবের বড়ো ভাই, উভয়ের সমান বয়স হবার কোনো সম্ভাবনা নেই। অতএব উপস্থিতমত যেটা মন্দের ভালো পৃথিবীতে কোনো গতিকে সেইটেই আধা-খেঁচড়া করে করে যেতে পারলেই লোকে জীবনকে সার্থক জ্ঞান করে। বিশেষত যখন সব সময় বুঝতেই পারি নে highest ideal কোন্‌টা—হয়তো যেটা nighest সেইটেই highest, হয়তো নিজের ideal sacrifice করাই অনেক সময় higher ideal, হয়তো জীবনকে যেখানে তুলে রেখে দিতে চাই সেখানে থাকলে জীবনটা নিষ্ফল হবে, হয়তো আর-একটু নেবে এলে আমার নিজের সাধ্যমত এই সংসারে খানিকটা সফলতা লাভ করতে পারি। এ-সমস্ত বিষয়ের মীমাংসা প্রত্যেকের নিজের কাছে [বব]। সবসুদ্ধ জগৎটা এমনি জটিল যে, কোনো দিকে কাউকে পথ নির্দেশ করে দিতে সাহস হয় না, কেননা প্রকৃতিভেদে প্রত্যেকের চলবার প্রণালী এত তফাত! হয়তো খুব বেশি না ভেবে যেটা সব চেয়ে নিকটবর্তী সেই পথটা অবলম্বন করে তার পরে প্রতিদিন যে প্রশ্ন সম্মুখে উপস্থিত হবে সেইটের ভালোরকম মীমাংসা করে চলাই সব চেয়ে সুবিধা। আমাদের এই জীবনটাকে যিনি একটা বিষম সমস্যা করে তুলেছেন অবশেষে তিনি হয়তো এর খুব একটা সহজ মীমাংসা করে দেবেন, তখন হয়তো আমরা এত বেশি ভেবেছিলুম বলে হাসি পাবে।

সাতারা। ১৭ ডিসেম্বর ১৮৯৪

১৪৪

শিলাইদহ
১৪ ডিসেম্বর। ১৮৯৪।

আজ মনে করলুম সকাল বেলায় চরের উপর খানিকটা বেড়িয়ে আসি, কিন্তু কুয়াশা দেখে পিছিয়ে আসা গেল। আকাশেও কালপরশুকার মতো অল্প অল্প মেঘের টুকরো ভাসছে। কাল কিন্তু সূর্যাস্তের সময় এই মেঘের টুকরোগুলোতে সন্ধ্যার আভা লেগে কী-যে চমৎকার দেখতে হয়েছিল সে আমি বলতে পারি নে। পশ্চিম দিকের এক জায়গায় ছোটো ছোটো কোঁচানো কোঁক্‌ড়ানো মেঘ সোনালি হয়ে উঠে এক নতুন রকম শোভা ধারণ করেছিল। কত রকমেরই যে রঙ চতুর্দিকে ফুটে উঠেছিল সে আমার মতো সুবিখ্যাত রঙকানা লোকের পক্ষে বর্ণনা করতে বসা

ধৃষ্টতা মাত্র। কেবল আকাশে নয়, পদ্মার জলে এবং বালির চরেও কাল হঠাৎ রঙের ইন্দ্রজাল লেগে গিয়েছিল। আবার নীল পদ্মার জল উত্তরে বাতাসে আগাগোড়া অল্প অল্প কম্পিত শিহরিত হচ্ছিল— সেই জন্যে সমস্ত নদীতে সূর্যরশ্মির সমস্ত বর্ণের এবং আভার এমন একটি আশ্চর্য স্পন্দন হচ্ছিল যে আমার মনের মধ্যে বিস্ময়ের সীমা ছিল না। আবার পদ্মার মাঝে মাঝে যে-সকল জায়গায় জলের নিচে চর পড়েছে সে জায়গায় জল শান্ত ছিল; সেই-সব স্থির জলে পরিষ্কার সোনার লাবণ্য একেবারে মসৃণ তরল উজ্জ্বল কোমল নির্মল হয়ে পড়েছিল— চারি দিকে বিচিত্র রঙের বিচিত্র নৃত্যের মাঝে মাঝে সেই স্থির বিষণ্ণ সূর্যাস্তের নিশ্চল আভা অপূর্ব সুন্দর হয়ে উঠেছিল। তার পরে আবার বালির চরের উপরেও সূর্যাস্তের বিচিত্র তুলি পড়েছিল। এই চরগুলো এক সময় জলের নিচে ছিল কিনা, সেই জন্যে এক-এক জায়গায় অনেক দূর পর্যন্ত বালির উপর জলের সেই ঢেউ-খেলানো পদচিহ্ন পড়ে আছে— আবার অনেক জায়গায় সমতল ধু ধু করছে। সেই-সমস্ত ঢেউ-খেলানো স্তরে-স্তরে-কোঁচানো বালির উপর নানা রঙের চিকন আভা পড়ে ঠিক যেন একটা প্রকাণ্ড সাপের নানা-রঙা খোলসের মতো দেখাচ্ছিল। আমি মনে করলুম— পদ্মা তো একটা প্রকাণ্ড নাগিনীই বটে, সে এক সময় এই বৃহৎ চরের উপর বাস করত, এখন কেবল তার একটা বৃহদাকার খোলস বালির উপর পড়ে চিক্ চিক্ করছে— বর্ষার সময় সে আপনার সহস্র ফণা তুলে ডাঙার উপর ছোবল মারতে মারতে গর্জন করতে করতে কেমন করে আপনার প্রকাণ্ড বাঁকা লেজ আছড়াতে আছড়াতে ফুলতে ফুলতে চলত সে দৃশ্যটাও মনে পড়ল— এখন সে শীতকালের সাপের মতো বিবরের মধ্যে অর্ধপ্রবিষ্ট হয়ে সুদীর্ঘ শীতনিদ্রায় প্রতিদিন ক্ষীণতর হয়ে যাচ্ছে। বেড়াতে বেড়াতে ক্রমে এত বিচিত্র রঙ কখন আস্তে আস্তে মিলিয়ে এল, কেবল জ্যোৎস্নার একরঙা শুভ্রতায় জলস্থল আকাশ সমস্ত মণ্ডিত হয়ে গেল— এক সময় যে পূর্বদিকে দিনের উদয় হয়েছিল জগতের কোনো জায়গায় তার তিলমাত্র চিহ্ন রইল না।

সাতারা
১৯ ডিসেম্বর ১৮৯৪

১৮৫

কলকাতা
১৪ জানুয়ারি। ১৮৯৫।

অল্প অল্প করে বসন্ত পড়বার উপক্রম করছে। কাল সমস্ত দিন বেশ গরম পড়েছিল— কাজকর্মে মন লাগছিল না, সমস্ত দিনটা একরকম উদ্‌ভ্রান্তের মতো ঘুরে ঘুরে কাটিয়ে দেওয়া গেছে। কাল অ... এসেছিল, তার সঙ্গে শিষ্টালাপ করাটাও আমার পক্ষে দুঃসাধ্য হয়েছিল। এতদিন শীত ছিল, কাজের উৎসাহ ছিল— মনে করতুম চিরজীবন সাধনার এডিটরি করে কাটিয়ে দেব। এখন একটু গরম হাওয়া পড়বা মাত্রই মনে হচ্ছে, এডিটরি করার চেয়ে আমি সেই-যে কবি ছিলুম সে ছিলুম ভাল। ইচ্ছে করছে একটা খোলা জানলার কাছে পড়ে পড়ে একটা স্লেট হাতে করে ছন্দ মিলিয়ে মিলিয়ে গুন্ গুন্ করে করে

কবিতা লিখে যাই—চোখের সামনে উজ্জ্বল আকাশের গায়ে খানিকটা সবুজ ডালপালা দেখা যায় এবং বাতাসটি এসে সর্বাঙ্গে লাগতে থাকে। কবিতা যদি বা না লিখি গান তৈরি করা একটা কাজ আছে, সেটাও এরকম অবস্থায় বেশ লাগে ভালো। গানের সুরের দ্বারা জগতের সমস্ত চেহারা একেবারে বদলে যায় এবং মাথার ভিতরে একটা অপরূপ নেশা জমে ওঠে। কিন্তু সেরকম নেশাতুর ব্যাকুল এবং আত্মবিস্মৃত পাগলের মতো তৃষার্ত উন্মনা আনন্দচঞ্চল হয়ে থাকার চেয়ে গম্ভীর শান্তভাবে সাবধানে সাধনার এডিটরি করাই আমার পক্ষে ভালো। গানের এবং কাব্যের জগতে একটা চিরযৌবন আছে, জীবনের সঙ্গে সেটার সব সময় সামঞ্জস্য হয় না। এক-এক দিন বেলাটা যখন গরম হয়ে আসে হঠাৎ দরজার বাইরে রোদ্দুরের দিকে চাইবা মাত্র মনের ভিতরটা পুলকিত অথচ পীড়িত হয়ে ওঠে—তখন আমার ভয় হয় এবং নৈরাশ্য আসে, বুঝতে পারি এ কবিত্ব আমার হাড়ের মজ্জার মধ্যে—এ আমার সঙ্গের সঙ্গী, প্রতি বৎসরে নিদেন একবার করেও আমার হাড়ের ভিতর থেকে পল্লবিত বিকশিত হয়ে উঠবে—এবং আমাকে ভুলিয়ে দেবে যে, আমার অন্তর্জগতের সঙ্গে আমার বহির্জগতের পরস্পর আনুকূল্য নেই।

সাতারা
১৮ জানুয়ারি ১৮৯৫

১৪৬

শিলাইদহ
৪ ফেব্রুয়ারি। ১৮৯৫।

এখানে ভারী শীত পড়েছে [বব]—ইচ্ছা করছে এই জবড়জঙ্গি শীতটা ঘুচে গিয়ে একবার প্রাণ খুলে বসন্তের বাতাস দেয়, এই আচ্‌কানের বোতামগুলো খুলে একবার খোলা জলিবোটের উপর বিছানা পেতে দিয়ে পা ছড়িয়ে বসি এবং কর্তব্যের রাস্তা ছেড়ে দিয়ে দিন-কতক সম্পূর্ণ অকেজো কাজে মন দিই। বছরের মধ্যে ছ মাস আমি এবং ছ মাস আর-কেউ যদি সাধনার সম্পাদক থাকে তা হলে ঠিক সুবিধামত বন্দোবস্ত হয়—কারণ, সম্বৎসর পাগলামি করবার ক্ষমতা মানুষের হাতে নেই এবং সম্বৎসর sanity বজায় রেখে চলাও আমার মতো লোকের পক্ষে দুঃসাধ্য। এত বড়ো বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, দু মাস অন্তর তার ঋতু-পরিবর্তন হচ্ছে, আমরা ক্ষুদ্র মনুষ্য বারো মাস সমভাবে ভদ্রতা রক্ষা করে চলি কী করে! মানুষের মহা মুশকিল এই, প্রকৃতির বিরুদ্ধে সমাজের আইন-অনুসারে তাকে তিনশো পঁয়ষট্টি দিন ঠিক এক ভাবে চলতে হয়—আসলে তার ভিতরে যে-একটা চিরনূতন চিররহস্য আছে সেটাকে সলজ্জে সভয়ে গোপন করে নিজেকে সর্বসাধারণের কাছে নিতান্ত চিরাভ্যস্ত-রুটিন-চালিত যন্ত্রনির্মিতবৎ দেখাতে হবে। সেই জন্যে থেকে থেকে মানুষ এমন বিগড়ে যায়, বিদ্রোহী হয়ে ওঠে; সেই জন্যে মানুষ যথার্থ আপনাকে উপলব্ধি করতে সাহিত্যের আশ্রয় গ্রহণ করতে চায়; কর্মক্ষেত্রে আপনাকে বদ্ধ করে রাখে এবং ভাবরাজ্যে আপনাকে মুক্তি দিতে চেষ্টা করে। সেই জন্যে সাহিত্য conventional হলে সাহিত্যের একটা মহৎ উদ্দেশ্য সংকীর্ণ হয়ে আসে; সেই জন্যে ড্রইংরুম-শিষ্টালাপে যে-সকল কথা উত্থাপন করা

যায় না, সাহিত্যে সেগুলি গভীরতা এবং উদারতা লাভ করে অসংকোচে এবং সুন্দর ভাবে আপনাকে প্রকাশ করতে পারে। এমন-কি, ড্রইংরুম-চা-পান-সভার সুসভ্য সীমার মধ্যে সাহিত্যকে বদ্ধ করতে গেলে উদার বিশ্বপ্রকৃতিকে ছিটের গাউন পরানোর মতো হয়।

সাতারা
৯ ফেব্রুয়ারি। ১৮৯৫

১৮৭

শিলাইদহ
১ ফাল্গুন?
[১১ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৫]

এ পারে সন্ধের সময় আমার একটি বেড়াবার সঙ্গী পাওয়া গেছে। লোকটির নাম ঠা...; বেশ বুদ্ধিমান, প্রৌঢ়বয়স্ক, সাহিত্যানুরাগী, চিন্তাশীল, স্পষ্টবক্তা এবং জমিদারি কাজকর্মে বহুদর্শী।... রোজ বেড়াবার সময় এঁর সঙ্গে আমার নানা ভাবের আলোচনা হয়ে থাকে। আমি যে কী ভাবে জগৎসংসারকে দেখে থাকি, সমস্ত প্রকৃতির সঙ্গে আমার যে খুব একটা নিগূঢ় অন্তরঙ্গ সত্যিকার সজীব সম্পর্ক আছে, এবং সেই প্রীতি সেই আত্মীয়তাকেই যে আমি যথার্থ এবং সর্বোচ্চ ধর্ম বলে জ্ঞান এবং অনুভব করি এবং আমার এই অন্তরপ্রকৃতিটি না বুঝলে যে আমার অধিকাংশ কবিতার রসাস্বাদন, এমন-কি, অর্থগ্রহণ করা যায় না— এই কথাটা আমি তাঁকে বোঝাচ্ছিলুম। দেখলুম তিনি বেশ বুঝলেন— কেবল বোঝা নয়, বেশ মশ্‌গুল্‌ হয়ে গেলেন। জগৎসংসার থেকে আমার নেশাটিকে যে আমি কোন্‌খান থেকে আদায় করে থাকি সেটা তিনি ঠিক উপলব্ধি করতে পারলেন। আমার যে ধর্ম এটা নিত্যধর্ম, এর উপাসনা নিত্য-উপাসনা। কাল রাস্তার ধারে একটা ছাগ-মাতা গম্ভীর অলস স্নিগ্ধভাবে ঘাসের উপরে বসে ছিল এবং তার ছানাটা তার গায়ের উপরে ঘেঁষে পরম নির্ভরে গভীর আরামে পড়ে ছিল— সেটা দেখে আমার মনে যে-একটা সুগভীর রসপরিপূর্ণ প্রীতি এবং বিস্ময়ের সঞ্চার হল আমি সেইটেকেই আমার ধর্মালোচনা বলি। এই-সমস্ত ছবিতে চোখ পড়বা মাত্রই সমস্ত জগতের ভিতরকার আনন্দ এবং প্রেমকে আমি অত্যন্ত প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎভাবে আমার অন্তরে অনুভব করি। এ ছাড়া অন্যান্য যা-কিছু dogma আছে, যা আমি কিছুই জানি নে এবং বুঝি নে এবং বোঝবার সম্ভাবনা দেখি নে, তা নিয়ে আমি কিছুমাত্র ব্যস্ত হই নে। যেটুকু আমি positively জানতে পারছি সেই আমার পক্ষে যথেষ্ট, তাতেই আমাকে পরিপূর্ণ সুখ দেয়। তার সঙ্গে মিথ্যা অনুমান বিচার মিশিয়ে তাকে একটা systemএ পরিণত করতে গিয়ে তার ভিতরকার প্রত্যক্ষ সত্যটিকেও সংশয়াপন্ন করে তোলা হয়। আমি এইটুকু জানি যে, জগতে একটা আনন্দ এবং প্রেম আছে— তার বেশি জানবার কোনো দরকার নেই।

সাতারা
১৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৫

১৪৮

শিলাইদহ
১৬ ফেব্রুয়ারি। ১৮৯৫।

এবারে পৃথিবীর হঠাৎ কেমন তাপক্ষয় হয়েছে। খবরের কাগজে শোনা যাচ্ছে য়ুরোপ বরফে আদ্যোপান্ত মণ্ডিত হয়েছে, ইংলন্ডে মেরুপ্রদেশের মতো শীত পড়েছে, বোধ করি সেই ধাক্কার কিয়দংশ বঙ্গোপসাগরের কূলে এসেও পৌঁচেছে। ফাল্গুন মাসে এরকম অসংগত শীত বাংলাদেশে তো কখনো মনে পড়ে না। মনে আছে ছেলেবেলায় বাবামশায়ের সঙ্গে যখন অমৃতসরে গিয়েছিলুম তখন এই ফাল্গুন-চৈত্র মাসে এইরকম শীত বোধ হত, এবং রোজ সকালে স্নানের সময় বড়ো আক্ষেপ উপস্থিত হত। শীতের চোটে সেই বহুদিনকার পূর্বস্মৃতি মনে পড়ছে এবং সেইসঙ্গে মনে পড়ছে—সেখানে দীর্ঘ দুপুর বেলায় একলা বসে অদূরে ইঁদারা থেকে যন্ত্রযোগে গোরুদের জল তোলবার সকরুণ ক্যাঁ-কোঁ শব্দ শুনতে পেতুম, চাষীরা অত্যন্ত উচ্চ সপ্তম সুরে একটা একঘেয়ে তান ছাড়ত, ইঁদারার উপরে একটা তুঁতের গাছ ঝুঁকে পড়েছিল, সেইটে থেকে পাকা তুঁত পেড়ে এনে খেতুম এবং বাড়ির জন্য মন কেমন করতে থাকত। তার থেকে ক্রমে মনে পড়ে সেই ড্যালহৌসিতে ওঠবার সময় প্রথম হিমালয়ের দৃশ্য। তখন আমার মনটা ছোটো ছিল কিনা, বিস্ময়ের পরিমাণ তার মধ্যে কিছুতেই যেন কুলোত না। সেখানকার একটা অন্ধকার নির্জন নিস্তব্ধ গম্ভীর ঠান্ডা ছায়াময় প্রকাণ্ড পাইনের বন এখনো মনে পড়ে। আমার সেই ড্যালহৌসিতে আর-একবার যেতে ইচ্ছে করে; দেখতে ইচ্ছে করে আমার সেই বাল্যকালের প্রথম বিস্ময়ের সঙ্গে এখনকার কিছু মিল পাওয়া যায় কি না। তখন একটা মস্ত সুবিধে ছিল যে, নিজের জন্যে নিজেকে কিছুই ভাবতে হত না।

সাতারা
২১ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৫

১৪৯

শিলাইদহ
১৭ ফেব্রুয়ারি। ১৮৯৫।

আজ সকালবেলায় যদিও শীত যথেষ্ট আছে তবু অন্য দিনের মতো প্রবল উত্তুরে বাতাস নেই—নদীর জলে তরঙ্গের রেখাটি মাত্র দেখা যাচ্ছে না, একেবারে আয়নাটির মতো স্থির হয়ে আছে। ঐ ওপারে একটি নৌকো ধীরে ধীরে চলেছে, তিনটি মানুষ ধূসর বালির চরের উপরে তিনটি কালো রেখাপাত করে গুণ টেনে নিয়ে যাচ্ছে—বাস্, আর কোথাও কর্মস্রোতের কোনো চাঞ্চল্য নেই, কোনো শব্দ নেই, গতি নেই—জলের উপরে এবং বালির চরের উপর সকালবেলাকার রৌদ্র এসে স্থিরভাবে পড়ে রয়েছে, বেলা যেন এগোচ্ছে না, এক রকম শ্রান্ত শান্ত-ভাবে নিস্তব্ধ

বিশ্রাম করছে। আমার এতক্ষণে অনেক কাজ সেরে ফেলা উচিত ছিল, কিন্তু আমিও আজকের এই প্রভাতের অলস সৌন্দর্য অলসভাবে উপভোগ করছিলুম— এবং এক-একবার ভাবছিলুম ঐ যে গুটি-দুই-তিন লোক ও পারে জনশূন্য বালির চরের উপর দিয়ে ধীরে ধীরে গুণ টেনে নিয়ে চলেছে, ওটা আমার চোখে এমন বিশেষ সুন্দর ঠেকছে কেন। যারা টানছে তারা পেটের দায়ে রীতিমত কাজ করছে; আমার চোখে যে তারা একটি শান্তি এবং সন্তোষের ছবি এঁকে দিয়ে যাচ্ছে তাদের মনে ঠিক সেই শান্তি সন্তোষ এবং সৌন্দর্যটুকু নেই। যাই হোক, এ-সমস্ত চিন্তার কোনো মীমাংসা হোক বা না হোক সেজন্যে আমার কোনো মাথাব্যথা ছিল না— প্রভাতের এই সর্বব্যাপী নিস্তব্ধতার একটি প্রান্তভাগে ঐ ধীরগতিতে গুণ টানা যেমন একটুখানি ভঙ্গ, তেমনি আমার মনেরও শান্ত উপভোগের একটি দূর তীরভাগে ঐ একটুখানি মৃদু অলস চিন্তা একটু ভঙ্গমাত্র, তাতে শান্তিটিকে ঈষৎ বৈচিত্র্য দান করছে। আজকাল প্রতিদিন 'সাধনা' লেখার চিন্তায় মনটিকে সেরকম নিশ্চেষ্ট করে তুলে সর্বতোভাবে এই প্রকাণ্ড প্রকৃতির মুখোমুখি করে দাঁড় করাবার অবসর পাই নে— নিজের ভিতরে অহরহ একটা-না-একটা-কিছু প্রক্রিয়া চলছে, বাইরে যে কিছু আছে এ কথা ভুলে থাকতে হয়। সৌন্দর্য জিনিসটাও কিছু jealous, সম্পূর্ণ মনটিকে না পেলে সে সম্পূর্ণভাবে ধরা দেয় না। আমি তো সেইজন্যেই বলি কবিতা কিম্বা সাহিত্যের কোনো সুন্দর সৃষ্টি যথার্থ বোঝবার এবং উপভোগ করবার জন্যে যথেষ্ট নির্জনতা এবং শান্তির আবশ্যক— তাড়াতাড়ির কর্ম নয়, দুটো কাজের মাঝখানকার অল্প অবসরের মধ্যে তাকে চট্‌ করে একটুখানি চেখে নেবার জো নেই। সেই জন্যেই এত অল্প লোকের যথার্থ কবিতা ভালো লাগে। তাদের মনের মধ্যে অপর্যাপ্ত স্থান এবং অবসর নেই— অল্প জায়গাটুকুর মধ্যে বড্ড বেশি ভিড়। মফস্বলে না এলে কলকাতায় কোনো কবিতার বই খুলতে আমার ভয় হয়। মনে হয় সে জিনিসটা নষ্ট হয়ে যাবে, হয়তো উপযুক্ত সময়েও আর ভালো লাগবে না। কলকাতায় কবিতার মতো জিনিস বড়ো সংকুচিত হয়ে যায়— সেখানে তাকে বড়ো সামান্য মনে হয়। এখানে নির্জনে তার অতলস্পর্শ গভীরতা এবং সত্যতা ঠিক মনের সঙ্গে উপলব্ধি করতে পারি। বুঝতে পারি আমাদের প্রকৃতির পক্ষে ওটা কত একান্ত আবশ্যক এবং এতদিন শহরের মধ্যে মনটা কিরকম উপবাসী হয়েই ছিল।

সাতারা
২২ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৫

১১০

শিলাইদহ
১৮ ফেব্রুয়ারি। ১৮৯৫।

আজকের দিনটি এমনি নিস্তব্ধ এবং সুন্দর যে, পরিপূর্ণ আলস্যরসে নিমগ্ন হবার জন্যে মনটা ব্যাকুল হয়ে আছে। কিন্তু সাধনার জন্যে 'সংক্ষিপ্ত সমালোচনা' এখনো বাকি আছে। দুখানা অপাঠ্য বই পড়ে তার উপরে অপ্রিয় কথা লিখতে হবে।

নিতান্ত বাজে কাজ—এ রকম কাজ এমন দিনে করা অন্যায়। কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাস-বশত ফাল্গুনের এই প্রশান্ত মধ্যাহ্নে এই নির্জন অবসরে এই নিস্তরঙ্গ পদ্মার উপরে এই নিভৃত বোটের মধ্যে বসে, সম্মুখে সোনার রৌদ্র সুনীল আকাশ এবং ধূসর বালুর চর নিয়ে, শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সাধু-কর্তৃক প্রকাশিত দেওয়ান-গোবিন্দরামের সমালোচনা করতে প্রবৃত্ত হতে হচ্ছে। সে বইও কেউ পড়বে না, সে সমালোচনাও কেউ পড়বে না, মাঝের থেকে আজকের এই দুর্লভ দিনটা নষ্ট হবে। ভেবে দেখতে গেলে জীবনে এরকম দিন ক'টাই বা আসে! অধিকাংশ দিনগুলোই ভাঙাচোরা, জোড়াতাড়া—আজকের দিনটি এই স্তব্ধ নদীর উপরে একটি পরিস্ফুট পদ্মের মতো প্রশান্ত-সম্পূর্ণ-ভাবে ফুটে উঠেছে, আমার মনটিকে তার নিভৃত মর্মকোষের মধ্যে আকর্ষণ করে নিচ্ছে। আবার হয়েছে কী, একটা হলদে-কোমরবন্ধ-পরা স্নিগ্ধ নীল রঙের মস্ত ভ্রমর আমার বোটের চার দিকে গুঞ্জনধ্বনি-সহকারে চঞ্চলভাবে উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে। বসন্তকালে ভ্রমরগুঞ্জনে বিরহিণীদের বিরহবেদনা বৃদ্ধি পেয়ে থাকে এ কথাটাকে আমি চিরকাল মনে মনে পরিহাস করে এসেছি। কিন্তু ভ্রমরগুঞ্জনের যথার্থ মাধুর্য এবং মর্ম আমি একদিন দুপুরবেলায় বোলপুরে প্রথম আবিষ্কার করেছিলুম। সেদিন এক রকম খ্যাপাটে ভাবে সেখানকার দক্ষিণের বারান্দাটায় নিষ্কর্মার মতো বেড়াচ্ছিলুম—মধ্যাহ্নটা মাঠের উপর প্রসারিত হয়ে পড়েছিল এবং গাছের নিবিড় নিভৃত পল্লবরাশির মধ্যে একটি শ্রান্ত নিস্তব্ধতা ছায়া বিস্তার করে বিরাজ করছিল—বুকের ভিতরে একটা ব্যথা বোধ হচ্ছিল, আর সেই সময়ে বারান্দার নিকটবর্তী একটা নিম গাছের কাছে ভ্রমরের অলস গুঞ্জনধ্বনি সমস্ত উদাস উদার মধ্যাহ্নের একটা সুর বেঁধে দিচ্ছিল। সেইদিন বেশ বুঝতে পারলুম, মধ্যাহ্নের সমস্ত অনির্দিষ্ট শ্রান্ত সুরের মূল সুরটা হচ্ছে ঐ ভ্রমরের গুঞ্জন। বেশ বুঝতে পারা গেল—ওতে করে বিরহিণীদের বিরহব্যথা বেড়ে ওঠা কিছুই অসম্ভব নয়। আসল কথাটা হচ্ছে, ঘরের মধ্যে যদি একটা ভ্রমর এসে পড়েই ভোঁ ভোঁ করতে আরম্ভ করে তাতে কারও ব্যথা বা সুখের বৃদ্ধি হয় না, কিন্তু গাছপালার মধ্যে খোলা আকাশে সে যে সুরটি লাগায় সেটি ঠিক লাগে। আজকের আমার এই সোনার-মেখলা-পরা ভ্রমরীটিও ঠিক সুর দিচ্ছে—নিশ্চয় বোধ হচ্ছে কোনো গ্রন্থের সমালোচনা করছে না, কিন্তু কেন যে আমার বোটের চার পাশে ঘুর ঘুর করে মরছে আমি তো বুঝতে পারছি নে। আমি যদি শকুন্তলা হতুম তা হলেও একটা মানে বোঝা যেত, কিন্তু অপক্ষপাতী ব্যক্তি মাত্রেই বলবে আমি শকুন্তলা নই। এইমাত্র আমার বোটের পাশ দিয়ে একটা নৌকো চলে গেল। তার একজন মুসলমান দাঁড়ি বুকের উপর এক বই নিয়ে চিত হয়ে পড়ে উচ্চৈঃস্বরে সুর করে করে একটি কাব্য পাঠ করছে। ও লোকটারও বেশ রসবোধ আছে—ওকে বোধ হয় ধরে পিটলেও দেওয়ান গোবিন্দরামের সমালোচনা করতে বসতে পারে না।

সাতারা
২৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৫

১৯১

শিলাইদহ
২২ ফেব্রুয়ারি। ১৮৯৫।

এই-সকল কারণে খানিকটা বিষয়কর্ম করে, খানিকটা চিঠি লিখে, খানিকটা খবরের কাগজ পড়ে, খানিকটা প্রবন্ধ সংশোধন করে আজকের দিনটা কেটে গেছে। এখন চারটে বেজে গেছে, রোদ্দুরটা পড়ে গেলেই বেড়াতে বেরব। যে-সব দিনে পুরোপুরি কাজ কিম্বা পুরোপুরি বিশ্রাম দুয়ের কোনোটাই হয় না, সে-সব দিন নিতান্তই ফেলা যায়। আমাদের মুলতান রাগিণীটা এই চারটে-পাঁচটা বেলাকার রাগিণী, তার ঠিক ভাবখানা হচ্ছে— 'আজকের দিনটা কিচ্ছুই করা হয়নি'। বোধ হয় দুপুরবেলায় ঘুমিয়ে উঠে কোনো ওস্তাদ ঐ রাগিণীর সৃষ্টি করেছিল। আজ আমি এই অপরাহ্নের ঝিক্‌মিকি আলোতে জলে স্থলে শূন্যে সব জায়গাতেই সেই মুলতান রাগিণীটাকে তার করুণ চড়া অন্তরা-সুদ্ধ প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছি— না সুখ, না দুঃখ, কেবল আলস্যের অবসাদ এবং তার ভিতরকার একটা মর্মগত বেদনা। দুঃখের এক রকম ব্যথা আছে, কিন্তু তার ভিতরেও একটু রস থাকে। আর, এক রকম দুঃখহীন অনুভূতিহীন অসাড়তার অন্তঃশীলা ব্যথা আছে— সেটা ভারী নীরস, তার ভিতরে একটা উদারতা এবং কল্পনার সৌন্দর্য নেই। আর-একটা বড়ো বিপদ্ হয়েছে— ভারী মশা হয়েছে। তাতে করে মনটাকে নিতান্ত বিক্ষিপ্ত করে দেয়। সর্বদাই গা হাত পা চাপড়াতে গেলে চিন্তার গভীরতা কিম্বা ভাবের মাধুর্য কিছুতেই রক্ষা করা যায় না; একটা হিংস্র প্রবৃত্তি মনের মধ্যে জেগে থাকে, অথচ সেটা উপযুক্ত পরিমাণে চরিতার্থ হতে পারে না। এই রকমের সামান্য পীড়নে, মশার কামড়ে, সহযোগীসাহিত্যসমালোচনে, মোহনভোগের মধ্যে বালিতে, মানুষকে কোনোরকম বীরত্ব শিক্ষা দেয় না সে আমি বলতে পারি। এই জন্যে আরও পারি যে, আজই আমার মোহনভোগে বালি ছিল— আমার মনের ভাব কী রকম হয়েছিল স্পষ্ট মনে আছে, সে মনের ভাব খৃস্টান কিম্বা ব্রাহ্মের উপযুক্ত নয়, ... ভালো মুসলমানেরও অযোগ্য।

সাতারা
২৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৫

১৯২

শিলাইদহ
২৩ ফেব্রুয়ারি। ১৮৯৫।

এইবার বসন্ত কালটা পড়ল। এই সময়টা যদি আমার কোনো দায়ে-পড়া কাজ ঘাড়ে না থাকত, যদি বন্ধনমুক্ত থাকতুম, তা হলে বেশ হত। তা হলে কল্পনার রাশ ঢিলে করে দিয়ে পূর্ণ অবসরের মধ্যে দিয়ে ছুটিয়ে নিয়ে চলে যেতে পারতুম। বড়ো আরামে জানলাটির কাছে গিয়ে বসতুম এবং লেখা পড়া ভাবনা সবই বেশ

ভরপুর ভাবে হতে পারত। এখন সাধনার জন্যে লিখতে লিখতে কিরকম অন্যমনস্ক হয়ে যাই, বাইরে যা-কিছু ঘটে তাতেই মনকে আকর্ষণ করে নেয়—নৌকো চলে যায় মুখ তুলে দেখি—খেয়া পারাপার করে তাই দেখেও অনেকটা সময় চলে যায়—ডাঙায় আমার বোটের খুব কাছে মন্থরগতি মোষগুলো তাদের বড়ো বড়ো মুখ তৃণগুল্মের মধ্যে পুরে দিয়ে সেগুলো নেড়েচেড়ে নিয়ে ফোঁস্ ফোঁস্ নিশ্বেস ফেলে কচ্ কচ্ শব্দ করতে করতে খেতে খেতে লেজের ঝাপটায় পিঠের মাছি তাড়াতে তাড়াতে চলতে থাকে, তার পরে একটা অতি ক্ষুদ্র শীর্ণ দুর্বল উলঙ্গপ্রায় ছেলে এসে এই প্রশান্তপ্রকৃতি বৃহৎ জন্তুটার পিঠে একটা ছোটো লাঠির গুঁতো মেরে হঠ্ হঠ্ শব্দ করতে থাকে। জন্তুটা তার বড়ো বড়ো চোখে এক-একবার এই ক্ষীণ মনুষ্যশাবকের প্রতি কটাক্ষপাত করে পথের মধ্যে দুই-এক গ্রাস ঘাস পাতা ছিঁড়ে নিয়ে অব্যাকুলচিত্তে মৃদুমন্দগমনে খানিকটা দূর সরে যায়—এবং ছেলেটা মনে করে তার রাখালের কর্তব্যকর্ম করা হল। আমি রাখাল ছেলেদের এই সাইকলজির রহস্য এ পর্যন্ত ভেদ করে উঠতে পারলুম না—গোরু কিম্বা মোষ যেখানে নিজে ইচ্ছাপূর্বক পরিতৃপ্ত সন্তুষ্ট-ভাবে আহার করছে, অকারণে মার-ধোর করে সেখান থেকে তাড়িয়ে আর খানিক দূরে নিয়ে গিয়ে তাদের কী উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় আমি তো বুঝতে পারি নে। বোধ হয় জন্তুদের উপরে প্রভুত্ব করা। পোষ-মানা সবল প্রাণীদের উপর অনাবশ্যক উৎপীড়ন করে নিজের ক্ষমতাগর্ব অনুভব করা বোধ হয় মানুষের একটা স্বভাব। আমার কিন্তু এই রাখাল ছেলেগুলোর উপর ভারী রাগ ধরে। খুব ঘন সরস তৃণগুল্মের মধ্যে গোরু-মোষের খাওয়া দেখতে আমার বেশ লাগে। যাদের মধ্যে উন্নততর প্রকৃতি বলে একটা কোনো উপসর্গ নেই, তাদের খাওয়া শোওয়া বসা প্রভৃতি সামান্য ব্যাপারগুলোও বেশ দেখবার যোগ্য বলে বোধ হয়। গরিব ছোটোলোকেরা যখন সামান্য ডাল ভাত নিয়ে উবু হয়ে বসে খেতে থাকে তখন সেটা দেখে বেশ একটু সুখ অনুভব করা যায়। কিন্তু বড়োমানুষ বড়োলোকের ছত্রিশ ব্যঞ্জনের সুদীর্ঘ ভোজন ব্যাপার ভারী বিরক্তিজনক। কী কথা বলতে কী কথা উঠল দেখ্। আমি বলতে যাচ্ছিলুম যে, সাধনার পাঠকদের জন্যে যখন আমি উচ্চ অঙ্গের খোরাক-সংগ্রহে নিযুক্ত তখন নদীর ধারে তৃণগুল্মরাশির উপরে গোরু মোষ চরার সামান্য দৃশ্য আমার সমস্ত মনোযোগ আকর্ষণ করে নিয়ে যায়। তোকে পূর্বপত্রে বলেছি বোধ হয়—কদিন ধরে গোটা-দুয়েক ভ্রমর প্রায়ই মাঝে মাঝে আমার বোটের চার দিকে এবং আমার বোটের মধ্যে এসে অত্যন্ত চঞ্চল ভাবে ব্যর্থ গুঞ্জনে এবং বৃথা অন্বেষণে ঘুরে বেড়াচ্ছে। রোজই বেলা নটা-দশটার সময় তাদের দেখা যায়—তাড়াতাড়ি একবার আমার টেবিলের কাছে, ডেস্কের নিচে, রঙিন সার্শির উপরে, আমার মাথার ধারে ঘুরে আবার হুস্ করে বেরিয়ে চলে যায়। আমি অনায়াসে মনে করতে পারি লোকান্তর থেকে কোনো অতৃপ্ত প্রেতাত্মা রোজ সেই একই সময়ে ভ্রমর-আকারে একবার করে আমাকে দেখেশুনে প্রদক্ষিণ করে চলে যায়। কিন্তু আমি তা মনে করি নে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ওটা সত্যিকার ভ্রমর, মধুপ, সংস্কৃতে যাকে কখনো কখনো বলে দ্বিরেফ।

সাতারা। ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৫

১১৩

শিলাইদহ
বুধবার, ১৬ ফাল্গুন ১৩০১

কাল বিকেলে সাধনার জন্যে একটা গল্প লেখা শেষ করে আজ কতকটা নিশ্চিন্ত হয়ে বসেছি। দুপুরবেলাটিও খুব নিস্তব্ধ এবং গরম এবং শান্ত এবং স্থির হয়ে আছে— খুব ছেলেবেলায় ইস্কুলে একটার সময় ছুটি হলে নির্জন ক্লাসে জানলার কাছে বসে কলকাতার বাড়িগুলোর শূন্য নিস্তব্ধ ছাদশ্রেণীর দিকে চেয়ে এবং বহুদূরে আকাশের চিলের তীক্ষ্ণ আওয়াজ শুনে যে রকম মন-কেমন করতে থাকত, আজও ঠিক সেই রকম ভাবটা মনে উদয় হয়েছে। নিজের সেই সুগভীর স্বপ্নাবিষ্ট বাল্যকালের উদ্‌ভ্রান্ত কল্পনাগুলির কথা মনে পড়ছে— খুব বেশিদিনের কথা বলে মনে হচ্ছে না। অথচ এবারকার মানবজন্মের অর্ধেক দিন তো চলে গেছেই। আমরা প্রত্যেক মুহূর্ত প্রত্যেক দিন মাড়িয়ে মাড়িয়ে জীবনটা সম্পূর্ণ করি, কিন্তু মোটের উপরে সবটা খুবই ছোটো। দুটি ঘণ্টা কালের নির্জন চিন্তার মধ্যে সমস্তটাকে ধারণ করা যেতে পারে। শেলি ত্রিশটা বৎসর প্রতিদিন সহস্র কাজে সহস্র প্রয়াসে জীবন ধারণ করে দুটি ভল্যুম জীবনচরিত গড়েছেন মাত্র, তার মধ্যেও ডাউডেন সাহেবের বাজে কথা বাজে তর্ক ঢের আছে— দুখানা বই এক হপ্তার মধ্যে অনায়াসেই শেষ করে ফেলা যায়। আমাদের এই ত্রিশটা বৎসরে বোধ করি দুখানা ভল্যুমও হয় না। এই তো ব্যাপার— এইটুকুমাত্র কান্ড, কিন্তু এর কতই আয়োজন— কত দ্বন্দ্ব, কত সংগ্রাম, কত দুশ্চেষ্টা! এইটুকুর রসদ জোগাবার জন্যে কত ব্যাবসা, কত জমিদারি, কত লোকজন! আছি এই দেড়হাত চৌকিতে চুপচাপ করে বসে— কিন্তু কত রকমে পৃথিবীর কত স্থানের কত জায়গাই জুড়ে আছি! সেই সমস্ত বাদ-সাদ পড়ে বাকি থাকে কেবল, দুটি ঘণ্টার চিন্তা— তাও বেশি দিনের জন্যে নয়। আজ আমার সেই ছেলেবেলাকার পুকুরের ধারের দক্ষিণ দিকের তোষাখানাটা মনে পড়ছে। তখন ই [রু] খুব ছোটো ছিল, সেও আমাদের দলের একটি ছিল। তোষাখানার সেই ক্ষুদ্র কেন্দ্রটি থেকে সেই ই [রু] কোথায় কতদূরে চলে গেছে, আমিও আর-এক লাইনে বহুদূরে এসেছি। তার পরে এমনি করে লাইন যদি বরাবর সোজা টেনে চলা যায় তা হলে সেই দক্ষিণদ্বারী জোড়াসাঁকোর তোষাখানার ঘর থেকে কোন্‌ রহস্যান্ধকারের মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করতে হয় তার ঠিকানা নেই। আজকের আমার এই একলা বোটের দুপুর বেলাকার মনের ভাব, এই চিন্তা, এই একটা দিনের কুঁড়েমি এবং কল্পনা সেই বৃহৎ লাইনের মধ্যে কোন্‌খানে পড়ে— কোথায় অদৃশ্য হয়ে যায়। এই নিস্তরঙ্গ পদ্মার ধারের নিস্তব্ধ বালির চরের উপরকার নির্জন পরিপূর্ণ মধ্যাহ্নটি আমার অনন্ত অতীত এবং অনন্ত ভবিষ্যতের মধ্যে কি কোথাও একটি অতি ক্ষুদ্র সোনালি রেখার চিহ্ন রেখে দেবে? ভারতবর্ষের রোদ্‌দুরটার মধ্যে কী-যে একটা বৈরাগ্য আছে সে কারও সাধ্য নেই এড়াতে পারে।

সাতারা
৫ মার্চ ১৮৯৫

বুধবার ১৬ ফাল্গুন— ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৫ তারিখ। পরবর্তী চিঠিতে এই চিঠিরই উল্লেখ আছে মনে করিলে, সম্ভবতঃ উভয়েরই রচনা ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৫ তারিখে।

১১৪

শিলাইদহ
বুধবার ?
২৮ ফেব্রুয়ারি। ১৮৯৫।

আজ আমি এক অনামিকা চিঠি পেয়েছি। তার আরম্ভই হচ্ছে—

পরের পায়ে ধরে প্রাণ দান করা
সকল দানের সার!

তার পরে অনেক উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছে। আমাকে সে কখনো দেখে নি, কিন্তু আজকাল আমার 'সাধনা'র মধ্যে সে আমাকে দেখতে পায়। তাই লিখেছে—'তোমার সাধনায় রবিকর পড়িয়াছে, তাই রবি-উপাসক যত ক্ষুদ্র যত দূরে থাকুক তবুও তার জন্যেও আজি রবিকর বিকীর্ণ হইতেছে। তুমি জগতের কবি, তবুও সে ভাবিতেছে আজি তুমি তাহারও কবি।' ইত্যাদি ইত্যাদি। মানুষ ভালোবাসার জন্যে এতই ব্যাকুল যে, শেষকালে নিজের আইডিয়াকে নিয়ে ভালোবাসতে থাকে। আইডিয়াকে রিয়ালিটির চেয়ে কম সত্য মনে করা আমাদের একটা মোহ মাত্র। ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আমরা যা পাচ্ছি, বিজ্ঞান এবং দর্শন বলছে, সেটা আমাদের ইন্দ্রিয়ের তৈরি; প্রকৃত সেটা কী কেউ জানে না—আমরা আইডিয়ার দ্বারা যা পাই সেটা আমাদের মনের সৃষ্টি, তারও প্রকৃত সত্তা কেউ বলতে পারে না। তবু মনের সৃষ্টির চেয়ে ইন্দ্রিয়ের সৃষ্টিকে লোকে বেশি বিশ্বাস করে। যারা আমাকে ইন্দ্রিয়-দ্বারা, সঙ্গসাক্ষাৎ-দ্বারা জানে, তারাও আমার প্রকৃত সত্য থেকে অসীম দূরে আছে—আর এই আমার অনামক ভক্তটি তার আইডিয়ার দ্বারা আমাকে যে রকম করে অনুভব করছে সেটা হয়তো অপেক্ষাকৃত সত্য। প্রত্যেক মানুষের ভিতরেই একটি আইডিয়াল মানুষ আছে; সেটা কেবল ভক্তি প্রীতি স্নেহের দ্বারা খানিকটা নাগাল পাওয়া যায়, প্রত্যেক ছেলের মধ্যে যে-একটি অসীম আইডিয়াল আছে সে কেবল ছেলের মা তার সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে অনুভব করে—অন্যের ছেলের মধ্যে সে সেই আইডিয়াল সত্তাটি সেই অনির্বচনীয় সত্যটি দেখতে পায় না। রিয়ালিটিতে সেই আইডিয়াল সত্যকে অনেক সময় আচ্ছন্ন করে ফেলে। আমরা হয়তো কল্পনাবলে শিশুজাতিকে মনে মনে স্নেহ করতে পারি, কিন্তু একটা সত্যিকার ছেলের মলিনতা কুশ্রীতা কাঁদুনিতা দেখে আমরা কিছুতেই কল্পনা করতে পারি নে তার মধ্যে এমন কী আছে যে জন্যে তার মা তার জন্যে প্রাণ সমর্পণ করতে পারে—পৃথিবীর সব চেয়ে তাকে প্রিয়তম সুন্দরতম মনে করতে পারে! মা তার ছেলেকে যা মনে করে প্রাণ দেয় সেইটেই কি মিথ্যা আর আমি তার ছেলেকে যা মনে করে তার জন্যে প্রাণ দিতে পারি নে সেইটেই কি বেশি সত্য? আমি এই কথা বলি, প্রত্যেক ছেলে এবং প্রত্যেক বুড়োর মধ্যে এমন একটা জিনিস আছে যার জন্যে প্রাণ সমর্পণ করতে পারা যায়। আমাদের স্বভাবে যথেষ্ট প্রেম নেই বলে আমরা সেই আইডিয়ালকে আবিষ্কার করতে পারি নে। সমস্ত মানুষ এবং প্রত্যেক মানুষের জন্যে যিশুখৃস্টের প্রাণসমর্পণের মধ্যে সেই সত্যটা গোপন আছে। প্রত্যেক জীবই অনন্ত কালের অনন্ত যত্নের ধন, তার মধ্যে একটি অনন্ত সৌন্দর্য আছে। কী কথা থেকে কী কথা উঠল দেখ্। আসল কথাটা হচ্ছে—এক হিসাবে আমি আমার এই ভক্তটির প্রীতি-উপহার গ্রহণ করবার যোগ্য নই, হয়তো সে যদি আমাকে প্রতিদিন

ঘনিষ্ঠভাবে জানত তা হলে এ রকম প্রীতি করতে সক্ষম হত না; আর-এক হিসাবে আমিও এই রকম, এমন-কি, এর চেয়ে ঢের বেশি প্রীতি পাবার অধিকারী। এই কথাটাই হচ্ছে খৃস্টানধর্মের এবং বৈষ্ণবধর্মের মর্মের কথা। আজ দুপুরবেলায় একখানা চিঠিতে অনেক বৈরাগ্যের কথা লিখেছি, আবার সন্ধ্যার সময় আর-একখানা চিঠি লিখতে গিয়ে অনুরাগের কথা এসে পড়ল!

সাতারা
৫ মার্চ ১৮৯৫

১১৫

শিলাইদহ
১ মার্চ। ১৮৯৫।

এক-একদিন চিঠি না পেয়ে তার পরদিন পেলে একটা বিশেষ নতুন আনন্দ পাওয়া যায়— হঠাৎ মনের এবং সেই সঙ্গে দৈনিক কাজের কলটা যে বিগড়ে ছিল সেইটে আবার যখন হঠাৎ উৎসাহের সঙ্গে চলতে আরম্ভ করে তখন বেশ একটা উল্লাস অনুভব করা যায়। পৃথিবীটা ঠিক আমার মনের মতো নয় এইটে মনে করে অনেক সময় বিষণ্ন হয়ে থাকা যায়, কিন্তু এক-এক দিন আসে যখন পৃথিবীটা ঠিক পূর্বের মতোই আছে এইটে মনে করে বুকের মধ্যে রক্ত দ্রুতবেগে বইতে আরম্ভ করে। ক্রিস্টিনা রসেটির যে কবিতা পাঠিয়ে দিয়েছিস সেটা বেশ লাগল। কিন্তু তার প্রথম চার লাইনই ভালো এবং ঐ চার লাইনেই সমস্ত কথাটা সম্পূর্ণরূপে শেষ হয়ে গেছে। তার পরে যেটা জুড়ে দেওয়া হয়েছে তাতে করে ভাবটা অগ্রসর হয় নি, বরঞ্চ কিছু দুর্বল হয়ে পড়েছে। এক-একটা গান যেমন আছে যার আস্থায়ীটা বেশ, কিন্তু অন্তরাটা ফাঁকি— আস্থায়ীতেই সুরের সমস্ত বক্তব্যটা সম্পূর্ণরূপে শেষ হওয়াতে কেবল নিয়মের বশ হয়ে একটা অনাবশ্যক অন্তরা জুড়ে দিতে হয়। যেমন আমার সেই 'বাজিল কাহার বীণা মধুর স্বরে' গানটা— তাতে সুরের কথাটা গোড়াতেই শেষ হয়ে গেছে, অথচ কবির মনের কথাটা শেষ না হওয়াতে গান যেখানে থামতে চাচ্ছে কথাকে তার চেয়ে বেশি দূর টেনে নিয়ে যাওয়া গেছে। কবিতাতেও একটা সুর আছে, ক্রিস্টিনা রসেটির এই কবিতায় সেই আসল সুরটুকু প্রথম চার লাইনেই শেষ হয়ে গেছে। তুই লিখেছিস, 'আমি এপর্যন্ত বুঝতে পারলুম না যে, আসল, ভালো ভাব ভালো প্রকাশ করেছে বলে আমার কোনো কবিতা ভালো লাগে— না শুধু একটু 'ধরণে'র জন্যে, শুধু একটু ঘুরিয়ে চুট্‌ করে বলা একটু ভাষার চালাকির জন্যে।' আসল কথাটা হচ্ছে এই যে, অধিকাংশ ভাবই আমাদের কাছে পুরাতন; এবং আমাদের মনের ধর্মই এই যে, পুরাতন অভ্যস্ত জিনিসগুলির সম্পূর্ণ সৌন্দর্য এবং রস আমাদের অনুভব করবার ক্ষমতা নেই— সেই জন্যে কোনো কবি যখন পুরাতন ভাবের মধ্যে ভাষা ছন্দ এবং বলবার নতুন ধরনের দ্বারা আমাদের মনকে আকর্ষণ করে আনে তখন আবার আমরা নতুন করে সেই জিনিসটির আসল রসটুকু আস্বাদন করতে পারি— তখন চিরকেলে শোনা কথাটা নতুন সংগীতে কানের মধ্যে মনের মধ্যে বাজতে থাকে। কবিদের একটা প্রধান কাজ,

পৃথিবীটাকে সর্বদা তাজা রেখে দেওয়া—গাছের সবুজ, আকাশের নীল, সন্ধ্যাবেলাকার সোনালি, সমস্ত এতদিনে ধুলো পড়ে অনেকটা ম্যাড়্‌মেড়ে হয়ে আসত, যদি না কবিরা সর্বদাই তার উপরে আপনাদের কল্পনাপাত করে আসত। মানুষের মনটা চিন্তার তাপে শীঘ্র শীঘ্র পেকে যায় বলে কবিত্বের কাজ হচ্ছে কল্পনার অমৃত সিঞ্চন করে তাকে অনন্তকাল সজীব সরস করে রাখা। সে নতুন জিনিস কিছুই দেয় না, সে কেবল মনটাকে নতুন করে রাখতে চেষ্টা করে।

সাতারা
৬ মার্চ্‌ ১৮৯৫

১৯৬

শিলাইদহ
৬ মার্চ্‌। ১৮৯৫।

সৌন্দর্যের চর্চা কিম্বা সুবিধার চর্চা এর মধ্যে কোন্‌টাকে প্রাধান্য দিতে হবে এই নিয়ে তোর আজকের চিঠিতে একটুখানি তর্ক আছে—ওটা অনেকটা অবস্থা এবং অসুবিধার পরিমাণের উপরে নির্ভর করে। ফর ইন্‌স্‌টান্‌স্‌, ছাতা মাথায় দিয়ে ঘোড়ায় চড়ার তুই যে উদাহরণ দিয়েছিস সেটার মধ্যে প্রকৃত পক্ষে সৌন্দর্যের কোনো তর্ক নেই। কেননা, হয়তো ঘোড়ায় চড়ে ছাতা মাথায় দিলে অসুন্দর না হতেও পারে, এ দিকে আবার ঘোড়া চালাবারও অসুবিধে হতে পারে। কিন্তু আমার মতে ওটা অসংগত। ঘোড়ায় চড়ার সঙ্গে পৌরুষের একটা অ্যাসোসিয়েশন আছে; সেই জন্যে লোকের সহজেই মনে হয়, যদি ঘোড়ায় চড়তেই বসলে তবে আবার ছাতা মাথায় কেন? অসুবিধা অসুন্দর এবং অসংগত এই তিনটেকেই এড়িয়ে চলা আবশ্যক; কিন্তু বোধ হয় শেষটাকে সব চেয়ে বেশি। মেয়েদের মতো শাড়ি পরলে যদি কোনো পুরুষকে সুন্দর দেখতেও হয় এবং অসুবিধাও না হয়, তবু সে অদ্ভুত কাজে না যাওয়াই সংগত। সে সম্বন্ধে লজ্জাটা একটা স্বাভাবিক লজ্জা। আসলে, নিজেকে বেশি করে কারও চোখে ফেলতে একটা স্বভাবতই সংকোচ হয়—ইংরাজিতে যে-সমস্ত আচরণকে 'লাউড' বলে সেটা ঐ কারণেই নিন্দনীয় এবং যথার্থ ভদ্রতার স্বভাবই হচ্ছে অপ্রগল্‌ভ। অসংগত অদ্ভুত ব্যবহারে লোকের দৃষ্টি যে রকম অধিক করে আকর্ষণ করে তাতে লোকের লজ্জা অনুভব করাই উচিত—যেমন নিজের সম্বন্ধে খুব বেশি করে সচেতন থাকাটা কিছু নয় তেমনি পরের চেতনার উপর প্রবল আঘাতে নিজেকে আছড়ে ফেলতে বিশেষ একটা অপ্রবৃত্তি থাকা উচিত। আমি যদি রাত-কাপড় পরে ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করি তা হলে মহাভারত অশুদ্ধ হয় না এবং হয়তো সুন্দর দেখতে হতেও পারে, কিন্তু অসংগত ব্যবহারের দ্বারা খামকা লোককে আঘাত দেওয়া ঠিক শিষ্টাচার নয়। এর একটা সীমা আছে, কিন্তু সে সীমা অনেক দূরে। যখন কোনো প্রচলিত নিয়ম —কোনো দেশব্যাপী অভ্যাস—আমি অন্যায় এবং সাধারণের অনিষ্টজনক মনে করি, কিম্বা কোনো নূতন প্রথা যদি হিতকর বলে মনে হয়, তখন সে বিষয়ে সাধারণকে গুরুতর আঘাত দিতে কুণ্ঠিত হওয়া উচিত হয় না; তখন সংগত

অসংগতর তর্কটা ভারী ছোটো। কিন্তু মনের সেই স্থির লক্ষ্য এবং উচ্চ অভিপ্রায়টা থাকা চাই। আমাদের দেশের মেয়েরা ছাতা মাথায় এবং জুতো পায়ে দেয় না, অতএব যে মেয়ে এ কাজ প্রথমে করবে তাকে সকলের বিদ্রূপ-চোখে পড়তেই হবে —কিন্তু তাই বলে সে লোকব্যবহারকে খাতির করে চললে চলে না। কিন্তু সাধারণত সাধারণ মানুষের মতো চলার সুবিধে এই যে, তাতে অন্য লোকেরও চলার বাধা হয় না, নিজেরও চলার সুবিধে হয়— নইলে অন্য লোককেও ব্যাঘাত করা হয় নিজেরও অনর্থক ব্যাঘাতের কারণ হয়। ছোটোখাটো সুবিধা অসুবিধার জন্যেও যদি সাধারণের অভ্যাস এবং সংস্কারের সঙ্গে বিরোধ করে চলতে হয়, তা হলে সেটা ঠিক মশা মারতে কামান পাতার মতো একটা অদ্ভুত অসংগত কাণ্ড হয়। সেই অসংগতির মধ্যে যে-একটা হাস্য অথবা বিরক্তি-জনকতা আছে, সেটা অতিক্রম করবার উপযুক্ত কোনো উচ্চ অভিপ্রায় তার মধ্যে পাওয়া যায় না। তা হলে তো ভদ্রবেশে ভদ্রসমাজে গিয়ে গরম বোধ করবামাত্র চাপকান এবং কামিজ খুলে ফেলে দিব্যি গা'টি অনাবৃত করে বসা যায়— ফিলজফাইজ করতে গেলে, তাতেই বা দোষ কী! লোকে কী মনে করবে বলে আমি গরমে শরীরকে অসুস্থ করব কেন? আমি বক্তৃতা দিচ্ছি বটে, কিন্তু লোকব্যবহারবিরুদ্ধ আচরণ আমি নিজে অনেক করেছি। কিন্তু তার স্বপক্ষে আমি কোনো কথা বলতে চাই নে— আমি জানি সে আমার খেয়াল, আমার পাগলামি। ব[ড়দা]রও উল্টো জোব্বা এবং ট্রাইসিক্‌লের বেশটাও যে খুব সর্বসম্মত তা কেউ বলবে না, কিন্তু যখন প্রিন্সিপ্‌ল্‌ নিয়ে তর্ক হচ্ছে তখন ব্যক্তিগত আচরণের কথা তোলবার দরকার নেই। যেখানে কেবলমাত্র নিজেকে নিয়ে কথা সেখানে সুবিধা এবং সৌন্দর্যের সামঞ্জস্য করবার চেষ্টা করা আবশ্যক, যেখানে সমাজকে নিয়ে কথা সেখানে সুবিধা সৌন্দর্য এবং সুসংগতি এই তিনটেরই সামঞ্জস্য করা আবশ্যক— এইটে হচ্ছে স্থূল কথা। তর্কেই চিঠি পুরে এল— চিঠির কাগজ ছোটো হওয়ার সুবিধা এই যে তর্ককেও ছোটো করতে হয়, নইলে বড়ো প্রবন্ধ হয়ে উঠত।

সাতারা
১১ মার্চ্‌ ১৮৯৫

১১৭

শিলাইদহ
৭ মার্চ্‌। ১৮৯৫।

তোর কালকের সেই চিঠিটা পড়ে আমি ভাবছিলুম যে, এটা সত্যি বটে মেয়েরা আপনার চতুর্দিকে সৌন্দর্যরক্ষার প্রতি পুরুষদের চেয়ে ঢের বেশি যত্ন করে, কিন্তু সত্যি-সত্যি পুরুষদের চেয়ে কি তাদের সৌন্দর্যপ্রিয়তা বেশি আছে? এ-সব বিষয়ে সাধারণভাবে কোনো মীমাংসা করা যায় না; কারণ, মেয়ে পুরুষ উভয় জাতির মধ্যেই লোকবিশেষে সকল গুণের ইতরবিশেষ আছে— এরকম বিষয়ে যখন আমরা কোনো কথা বলি তখন প্রায় নিজেকেই নিজের জাতের প্রতিনিধি-স্বরূপে ধরে নেওয়া যায়। আমি যদিচ নিজের চারি দিককে সুন্দর করে রাখতে

ইচ্ছে করি, কিন্তু অনেক সময়েই নানা কারণে তাতে অবহেলা প্রকাশ করে থাকি—অনেক সময় সব অগোছালো হয়ে যায় এবং সর্বদা নিজেকেও যে পরিপাটী করে রাখি তা নয়। কিন্তু সৌন্দর্য যে আমাকে পাগল করে দেয় সে বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই—সৌন্দর্য এবং ভালোবাসার মধ্যে আমি যতটা অনন্ত গভীরতা হৃদয়ের সঙ্গে অনুভব করি এমন আর কিছুতে না, এবং যখন যথার্থ সেই ভাবাবেশে নিমগ্ন থাকা যায় তখন নিজের ব্যক্তিগত সাজসজ্জা এবং পারিপাট্যকে তেমন বেশি কিছু মনে হয় না—যখন মনটা সৌন্দর্যরসে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে তখন সেইটেই যথেষ্ট হয়। আমার বি[হারীলাল]কে মনে পড়ে; লোকটি নেহাত অসজ্জিত ঢিলেঢালা অপরিপাটী—কিন্তু তার লেখা পড়লে এ বিষয়ে সন্দেহ থাকে না যে, সে একটি সৌন্দর্যের মাতাল ছিল। ব[ড়দাদা] যে এক সময়ে যথার্থ কবির মতো সমুদয় সৌন্দর্য উপভোগ করতেন সে বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু তিনি যে কোনোকালে তাঁর চারি দিক সুন্দর করে রাখতেন না এবং সুন্দর হয়ে থাকতেন না সেও নিশ্চয়। নিজের সম্বন্ধীয় সমস্ত জিনিস এবং সমস্ত ব্যাপারের সঙ্গে একটা সৌন্দর্যের অ্যাসোসিয়েশন থাকে এ ইচ্ছাটা মেয়েদের স্বাভাবিক। যখনই তাকে মনে পড়বে অমনি তার সঙ্গে সুগন্ধ সুদৃশ্য সুপারিপাট্য মনে উদয় হবে, লক্ষ্মীর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সোনার পদ্মটিও চোখে পড়বে এটা খুব আবশ্যক। নিজেকে সৌন্দর্যের আদর্শ করতে হলে চারি দিককে সুন্দর করে তোলা চাই। ফুল প্রভৃতি সমস্ত সুন্দর জিনিসের প্রতি মেয়েদের একটি মমতাপূর্ণ স্নেহ আছে—সে-সমস্ত যেন তাদের নিজের বিশেষ জিনিস, তারা তাদের সঙ্গে সম্বন্ধে বদ্ধ। কিন্তু সৌন্দর্যের প্রতি পুরুষের মনের ভাব কিছু যেন স্বতন্ত্র প্রকৃতির—আমাদের কাছে সৌন্দর্যের আকর্ষণ ঢের বেশি প্রবল, সৌন্দর্যের অর্থ ঢের বেশি গভীর। আমি হয়তো ঠিক প্রকাশ করতে পারব না এবং প্রকাশ করতে গেলে হয়তো অলীক কবিত্বের মতো শোনাতে পারে—সৌন্দর্য আমার কাছে প্রত্যক্ষ দেবতা—যখন মনটা বিক্ষিপ্ত না থাকে এবং যখন ভালো করে চেয়ে দেখি তখন এক-প্লেট গোলাপ-ফুল আমার কাছে সেই ভূমানন্দের মাত্রা যার সম্বন্ধে উপনিষদে আছে : এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি। সৌন্দর্যের ভিতরকার এই অনন্ত গভীর আধ্যাত্মিকতা এটা কেবল পুরুষরা উপলব্ধি করতে পেরেছে। এই জন্যে পুরুষের কাছে মেয়ের সৌন্দর্যের একটা বিশ্বব্যাপকতা আছে। সেদিন শঙ্করাচার্যের আনন্দলহরী বলে একটা কাব্যগ্রন্থ পড়ছিলুম, তাতে সে সমস্ত জগৎসংসারকে স্ত্রীমূর্তিতে দেখছে—চন্দ্র সূর্য আকাশ পৃথিবী সমস্তই স্ত্রীসৌন্দর্যে পরিব্যাপ্ত করে দিয়েছে—অবশেষে সমস্ত বর্ণনা সমস্ত কবিতাকে একটা স্তবে একটা ধর্মোচ্ছ্বাসে পরিণত করে তুলেছে। বিহারী চক্রবর্তীর সারদামঙ্গল সংগীতটাও ঐ শ্রেণীর। শেলির এপিসিকিডিয়নেরও ঐ অর্থ। কীট্সের অধিকাংশ কবিতা পড়লে মনে ঐ ভাবটার উদ্রেক হয়। কেবল চক্ষুকে কিম্বা কল্পনাকে নয়—সৌন্দর্য যখন একেবারে সাক্ষাৎভাবে আত্মাকে স্পর্শ করতে থাকে তখনই তার ঠিক মানেটি বোঝা যায়। আমি যখন একলা থাকি তখন প্রতিদিনই তার সুস্পষ্ট স্পর্শ অনুভব করি, সে যে অনন্ত দেশকালে কতখানি জাগ্রত সত্য তা বেশ বুঝতে পারি—এবং যা বুঝতে পারি তার অর্ধেকের অর্ধেকও বোঝাতে পারি নে।

সাতারা
১২ মার্চ ১৮৯৫

১১৮

শিলাইদহ
৮ মার্চ্‌। ১৮৯৫।

সাজাদপুরে গিয়ে একেবারে অনেক চিঠি জমে আছে দেখতে পাব। পৃথিবীতে অনেক মহামূল্য উপহার আছে, কিন্তু সামান্য চিঠিখানি কম জিনিস নয়। পোস্ট্‌ আফিস হয়ে মানুষের এই একটা নতুন সুখবৃদ্ধি হয়েছে। এ একটা নতুন জাতের সুখ। আমি সুবিধার কথা বলছি নে, সে তো আছেই। কিন্তু চিঠির দ্বারা পৃথিবীতে একটা নতুন আনন্দের সৃষ্টি হয়েছে। মানুষের সঙ্গে মানুষের আর-একটা বন্ধন যোগ করে দিয়েছে। আমরা মানুষকে দেখে যতটা লাভ করি, তার সঙ্গে কথাবার্তা কয়ে যতটা লাভ করি, আবার চিঠিপত্র পেয়ে আর-এক দিক থেকে তাকে আর-এক রকম করে পাই। চিঠিপত্র-দ্বারা যে আমরা কেবল প্রত্যক্ষ আলাপের অভাব দূর করি, অসাক্ষাতে থেকেও কথাবার্তা কই, তা নয়, তার মধ্যে আরও একটু রস আছে— ঠিক সেটা প্রতিদিনের দেখাসাক্ষাৎ কথাবার্তার মধ্যে নেই। মানুষ মুখের কথায় আপনাকে যতখানি এবং যে রকম করে প্রকাশ করে লেখার কথায় ঠিক ততখানি করে না, আবার লেখায় যতখানি করে মুখের কথায় ততখানি করে না। উভয়ের মধ্যেই খানিকটা অসম্পূর্ণতা আছে যা কেবল উভয়ে মিলে পূরণ করতে পারে। এই জন্যে মানুষের পরস্পর সম্বন্ধের মধ্যে চিঠিপত্র একটা নতুন-জাতীয় সুখ এবং বার্তা বহন করছে, যা পূর্বে ছিল না। এ যেন মানুষকে দেখবার জন্যে এবং পাবার জন্যে একটা নতুন ইন্দ্রিয়বৃদ্ধি হয়েছে। সামান্য কথাবার্তা এবং আলোচনা চিঠির মধ্যে বাঁধা পড়ে একটা নতুন চেহারা বার করে—কথায় যে জিনিসটা এড়িয়ে যায় এবং প্রবন্ধে যে জিনিসটা কৃত্রিম হয়ে ওঠে, চিঠিতে সেইটে অতি সহজে আপনাকে ধরা দেয়। আমার মনে হয়, যারা চিরকাল অবিচ্ছেদে চব্বিশ ঘণ্টা পরস্পর কাছাকাছি যাপন করেছে, যাদের মধ্যে কখনো চিঠিপত্র লেখালেখির অবসর হয় নি, তারা পরস্পরকে অসম্পূর্ণভাবে জানে, পরস্পরের চরিত্রের অনেক ডেলিকেট অনেক সত্য এবং সুগভীর জিনিস তাদের জানবার কোনো উপায়ই হয় না। যেমন বাছুর কাছে এলে গোরুর বাঁটে আপনি দুধ জুগিয়ে আসে, তেমনি মনের বিশেষ বিশেষ রস কেবল বিশেষ বিশেষ উত্তেজনায় আপনি সঞ্চারিত হয়, অন্য উপায়ে হবার জো নেই—এই চার পৃষ্ঠার চিঠি মনের ঠিক যে জায়গাটি দোহন করতে পারে, কথা কিম্বা প্রবন্ধের প্রভাব ঠিক সে জায়গায় কখনো পৌঁছতে পারে না। আমার বোধ হয় ঐ লেফাফার মধ্যে একটি মোহ আছে, লেফাফাটি চিঠির একটি প্রধান অঙ্গ— ওটা একটা মস্ত আবিষ্কার। বোধ হয় ফরাসী জাতিকে এ জন্যে ধন্যবাদ দিতে হয়।

সাতারা
১৩ মার্চ্‌ ১৮৯৫

১১৯

শিলাইদহ
১০ মার্চ্। ১৮৯৫।

এবারে মনে মনে স্থির করেছি কলকাতায় গিয়ে কোনো গোলমালের মধ্যে প্রবেশ করব না, চুপচাপ করে স্থির শান্ত চিত্তে লেখাপড়া করব। তার চেয়ে সুখের অবস্থা আর কিছু নেই। আজ বোধ হচ্ছে ত্রয়োদশী—খুব জ্যোৎস্না হবে—এই দু-চার দিন জ্যোৎস্নালোকে আমার পদ্মাপারের চরটাকে যতটা পারি অন্তরের মধ্যে বোঝাই করে নিয়ে যেতে হবে। খুব সম্ভব আসছে বারে যখন এখানে আসব তখন এই বিস্তীর্ণ শুভ্র চরখানি আর থাকবে না। তখন হয় ওখানে পদ্মার জল নয় চষা মাটি। আজকাল আর আমার একলা বেড়ানো হয় না। সঙ্গে প্রায়ই শৈ...এবং ঠা...বাবু থাকেন। তাঁদের কথাবার্তার মাঝে হঠাৎ এক-একবার অল্পক্ষণের মতো সমস্ত জ্যোৎস্নামণ্ডিত শান্তিপূর্ণ দৃশ্যটি এবং অনন্ত-আকাশ-পূর্ণ নিস্তব্ধতা আমার সম্মুখে এসে উপস্থিত হয়—আমার সেই চিরপরিচিতটি পর্দা সরিয়ে দিয়ে এক-একবার আমাকে দেখা দিয়ে যায়। তখন সমস্ত মনের মধ্যে এক আশ্চর্য পরিপূর্ণতা এসে উপস্থিত হয়—একটা যেন সুবৃহৎ সুকোমল সুগভীর আলিঙ্গনে আমার মনের আকণ্ঠ প্রচ্ছন্ন হয়ে যায়, একটা নিঃশব্দ নিস্তব্ধ একান্ত প্রেম আমাকে নক্ষত্রলোক থেকে এসে আবৃত করে দেয়। হঠাৎ সেই-সব কাজের কথা এবং শুকনো কথার মাঝখানে ক্ষণকালের জন্যে এই একটা সুগম্ভীর সুবিশাল আবির্ভাব আমার নিজের কাছেই আশ্চর্য বোধ হয়, আমার দুই পাশের দুই সঙ্গীকে তখন ভারী অসংগত মনে হয়। আমরা তিনজনে একত্রে বেড়াচ্ছি অথচ, কিছুক্ষণের জন্যে, তারা যেখানে বেড়াচ্ছে আমি সেখানে নেই। আমাকে আমার জ্যোৎস্নামগ্ন গম্ভীর মৌন জগৎ কথাবার্তার ক্ষণিক অবসরে হঠাৎ জানিয়ে দেয়, মনে কোরো না তোমার সঙ্গী কেবল দুজন আছে, আমরাও যেমন সেই চিরদিন দাঁড়িয়ে থাকি তেমনি আজও দাঁড়িয়ে আছি—

আমি   নিশিদিন হেথা বসে আছি,
তোমার   যখন মনে পড়ে আসিয়ো।

আমি কৌতুকহাস্যের কথা সাধনায় লিখেছি। আমি যখন জ্যোৎস্নারাত্রে পদ্মার ধারের নির্জন চরে ঠা...বাবুর মুখ থেকে এখানকার সেরেস্তার রিপোর্ট্ শুনতে থাকি এবং সেই রিপোর্টের ফাঁকে ফাঁকে নক্ষত্রভরা আকাশ উঁকি মারতে থাকে, তখন তার কৌতুকটা আমি এক-একবার অনুভব করতে পারি—ওর মধ্যে কোনো-একজন লোকের একটা মিষ্টি দুষ্টুমির হাসি আছে।

সাতারা
১৫ মার্চ্ ১৮৯৫

২০০

শিলাইদহ
১১ মার্চ্। ১৮৯৫।

আমার কাছে অনেকগুলো জিনিস কোনোকালে পুরোনো হয় না—হয়তো যখন তফাতে থাকি তখন অন্যান্য জড় জিনিসের চাপে সেগুলোর উজ্জ্বলতা হ্রাস হয়ে যায়, কিন্তু যেই আবার তাদের সম্মুখবর্তী হই অমনি সমস্ত পুরোনো ভাব একেবারে নতুন হয়ে মনে জেগে ওঠে। আমার এই মফস্বলের প্রবাসটি কলকাতায় অনেকসময় ম্লান স্মৃতিরূপে মনে থাকে, তখন মনে হয় আমার সেই পদ্মাতীর হয়তো পুরোনো হয়ে গেছে—কিন্তু আশ্চর্য এই, যেই এখানে পা ফেলি অমনি দেখতে পাই সবই সেই প্রথম শুভদৃষ্টির সময়টির মতোই উজ্জ্বল বিস্ময়পূর্ণ হয়ে আছে। রোজই সন্ধ্যার সময় চরে বেড়াবার সময় আমার এই কথাটা মনে উদয় হয় যে, অন্যদিন যেটা আমার কাছে নতুন বলে ঠেকেছিল আজও ঠিক সেইটে আমার কাছে নতুন ঠেকছে—ঠিক সেই ভাবটা সেই রকম করে বুকের মধ্যে পুরে আসছে, যেন আজ এখানে এই প্রথম এলুম। এইটেই আমার কাছে ভারী পুলকের এবং বিস্ময়ের কারণ। আমার বোধ হয় বহুকাল থেকে তোকে আমি এ-সব জায়গা থেকে যে-সকল চিঠি লিখেছি সকলেরই ভাবখানা এক। বারম্বার আমি একই কথা একই আগ্রহকে প্রায় একই ভাষায় প্রকাশ করেছি। আমার আর অন্য উপায় নেই—কারণ, আমি ঠিক একই ভাব প্রতিবারেই নতুন করে অনুভব করি। আমার অনেক সময় ইচ্ছা করে তোকে যে-সমস্ত চিঠি লিখেছি সেইগুলো নিয়ে পড়তে পড়তে আমার অনেক দিনকার সঞ্চিত অনেক সকাল দুপুর সন্ধ্যার ভিতর দিয়ে আমার চিঠির সরু রাস্তা বেয়ে আমার পুরাতন পরিচিত দৃশ্যগুলির মাঝখান দিয়ে চলে যাই। কত দিন কত মুহূর্তকে আমি ধরে রাখবার চেষ্টা করেছি, সেগুলো বোধ হয় তোর চিঠির বাক্সর মধ্যে ধরা আছে—আমার চোখে পড়লেই আবার সেই-সমস্ত দিন আমাকে ঘিরে দাঁড়াবে। ওর মধ্যে যা-কিছু আমার ব্যক্তিগত জীবন-সংক্রান্ত সেটা তেমন বহুমূল্য নয়—কিন্তু যেটাকে আমি বাইরের থেকে সঞ্চয় করে এনেছি, যেটা এক-একটা দুর্লভ সৌন্দর্য, দুর্মূল্য সম্ভোগের সামগ্রী, যেগুলো আমার জীবনের অসামান্য উপার্জন—যা হয়তো আমি ছাড়া আর কেউ দেখে নি, যা কেবল আমার সেই চিঠির পাতার মধ্যে রয়েছে, জগতের আর কোথাও নেই—তার মর্যাদা আমি যেমন বুঝব এমন বোধ হয় আর কেউ বুঝবে না। আমাকে একবার তোর চিঠিগুলো দিস [বব], আমি কেবল ওর থেকে আমার সৌন্দর্য-সম্ভোগগুলো একটা খাতায় টুকে নেব। কেননা, যদি দীর্ঘকাল বাঁচি তা হলে এক সময় নিশ্চয় বুড়ো হয়ে যাব; তখন এই-সমস্ত দিনগুলো স্মরণের এবং সান্ত্বনার সামগ্রী হয়ে থাকবে। তখন পূর্বজীবনের সমস্ত সঞ্চিত সুন্দর দিনগুলির মধ্যে তখনকার সন্ধ্যার আলোকে ধীরে ধীরে বেড়াতে ইচ্ছে করবে। তখন আজকেকার এই পদ্মার চর এবং স্নিগ্ধ শান্ত বসন্তজ্যোৎস্না ঠিক এমনি টাটকা-ভাবে ফিরে পাব। আমার গদ্যে পদ্যে কোথাও আমার সুখদুঃখের দিনরাত্রিগুলি এরকম করে গাঁথা নেই।

সাতারা
১৬ মার্চ্ ১৮৯৫

২০১

কলকাতা
১৫ মার্চ্। ১৮৯৫।

আজ সকালবেলাটা যে কী করে কাটিয়েছি তা বলতে পারি নে। কোনো কাজই করি নি, বোধ হয় বিশেষ কিছু ভাবিও নি। বেশ দক্ষিণের বাতাস দিচ্ছিল এবং গরমে শরীরের সমস্ত গ্রন্থি শিথিল হয়ে এসেছিল, চুপচাপ করে একলাটি পড়ে ছিলুম, গড়াচ্ছিলুম, খবরের কাগজের পাত ওল্টাচ্ছিলুম— মনে জানি যে, চিঠিপত্র লেখা আছে, প্রুফ্‌শিট্‌-সংশোধন আছে, সাধনার লেখা আছে, কাছারির কাজ আছে, বাবামশায়ের কাছে হিসেব শোনাতে যাবার কথা আছে, কিন্তু তবু আলস্যের জন্যে মনে অনুতাপ-মাত্র নেই— বোধ হয় অনুতাপ করবার মতো উদ্যম শরীরমনে ছিল না। কিন্তু এই বসন্ত-প্রভাতের বাতাসে আমাকে বড়ো মাটি করে দেয়। কেবল এই উদার উত্তপ্ত বাতাসটিকে সর্বশরীরে লাগানোই একটা যথেষ্ট কর্তব্য কাজ বলে মনে হয়— মনে হয়, এই মিষ্টি বাতাসের প্রবাহটি যেন আমার প্রতি বাইরের প্রকৃতির একটা প্রত্যক্ষ আলাপচারি। পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছিলুম, বসন্তের বাতাসটি গায়ে লেগেছিল, কনকচাঁপার গন্ধে মস্তিষ্ক ভরে গিয়েছিল, মাঝে মাঝে এক-একটা সকালবেলা এক-একটা দৈববাণীর মতো আমার কাছে এসে উপনীত হয়েছিল— একজন স্বল্পজীবী মানুষের পক্ষে এই বা কম কথা কী! কেবল কবিতা লেখা এবং সাধনার এডিটারি করা নয়, এই-সমস্ত আত্মবিস্মৃত অচেতন ক্ষণগুলিও জীবনের সার্থকতার একটা প্রধান অঙ্গ। সেই জন্যে মাঝে মাঝে এরকম ভরপুর অকর্মণ্যতায় মনে কিছুমাত্র পরিতাপ জন্মায় না। এতক্ষণ একটা ভালো গান শুনলেও তো পরিতাপ হত না। আমার পক্ষে এক-একদিন বাইরের প্রকৃতি সম্পূর্ণরূপে গানের কাজ করে। এই হাওয়া এবং আলো এবং ছোটোখাটো নানা প্রকার শব্দ আমাকে সর্বপ্রকারে নিশ্চেষ্ট করে ফেলে। তখন বেশ বুঝতে পারি কেবলমাত্র 'হওয়া'তেই একটা আনন্দ আছে— 'আছি' এই কাণ্ডটাই একটা প্রকাণ্ড ব্যাপার, সমস্ত প্রকৃতির এইটেই আদিম এবং সর্বব্যাপী আনন্দ। এই রকম সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট মনের অবস্থায় বাইরের সঙ্গে নিজের যোগটা সর্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠতম হয়।

সাতারা
১৯ মার্চ্ ১৮৯৫

২০২

কলকাতা
১৬ মার্চ্। ১৮৯৫।

ভালো-মন্দর তর্ক কোনোকালে শেষ হবার না [বব]। মনের গঠন, কিম্বা কাজের ফলাফল, কোন্‌টা থেকে মানুষের ভালোমন্দ বিচার করতে হবে? শুদ্ধমাত্র কাজের ফল থেকে আমরা যদি বিচার করতুম তা হলে যে মানুষ দৈবাৎ একজনকে আঘাত করেছে আর যে ইচ্ছাপূর্বক করেছে, উভয়কে আমরা সমান দোষী করতুম— যে

লোক রাগের মাথায় একটা কঠোর কাজ করেছে আর যে লোক শান্তচিত্তে করেছে, উভয়কে আমরা একই দণ্ড দিতুম। অবশ্য, কোন্ কাজটা ভালো অথবা মন্দ সে একটা কথা, আর কোন্ মানুষটা ভালো অথবা মন্দ সে আর-এক কথা। আমরা অন্তর্যামী নই, আমরা অনেক সময় বাধ্য হয়ে কাজের থেকে মানুষকে বিচার করি সে কথা সত্যি। কিন্তু সেই জন্যেই অনেক সময় আমরা ঠিক বিচার করি নে। কিন্তু শেলির জীবন থেকে তুই যে উদাহরণ দিয়েছিস সেটা স্বতন্ত্রজাতীয়— তাতে এই প্রমাণ হয় যে, একজন মানুষ অনেক বিষয়ে খুব ভালো হলেও হয়তো কোনো কোনো বিষয়ে তার ধর্মবুদ্ধির অসাড়তা থাকে, সে হয়তো বিশেষ স্থলে নিজের সুখে অন্ধ হয়ে পরকে কষ্ট দেয়— সেটা তার পক্ষে কোনো কারণেই প্রশংসার বিষয় নয়। শেলির স্বভাবে যা দোষ ছিল সে দোষকে গুণ বলে প্রমাণ করতে বসবার কোনো ন্যায্য কারণ নেই। এখন কথা এই যে, দোষ ছিল বলে যে তার কোনো গুণ ছিল না তাও নয়। তার চেয়ে অনেক কম গুণবান লোকও তার মতন অমন লোককে কষ্ট দেয় নি। শেলির জীবন থেকে এটা প্রমাণ হয় না যে, লোকবিশেষে দোষও গুণ হয়। কিন্তু এই প্রমাণ হয় যে, কোনো লোকই সম্পূর্ণ ভালো নয়। প্রত্যেক লোকেরই দোষগুণের ওজন করে যেটা বেশি হয় সেইটার অনুসারেই তাকে ভালো কিম্বা মন্দ আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে। নিজের নিজের প্রকৃতি-অনুসারে শেলিকে কেউ বা খুব প্রশংসা করে, কেউ বা গাল দেয়— কিন্তু আসল শেলিকে কেবল অন্তর্যামীই জানেন। মানুষদের সঙ্গে যখন মানুষের ক্ষণিক সম্বন্ধ তখন কেবল সেই ক্ষণিক জীবনের ফলাফল থেকেই মানুষেরা মানুষকে বিচার করবে এইটেই স্বাভাবিক, যাঁর সঙ্গে মানুষের অনন্তকালের সম্বন্ধ তাঁর বিচারের পদ্ধতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। খুব সম্ভব, অনেক সাধুর চেয়ে অনেক অসাধু উচ্চতম বিচারালয়ে উচ্চাসন পাবে। সেণ্ট্ পল, সেণ্ট্ অগস্টিন, যদি অল্প বয়সে মারা যেতেন তা হলে তাঁদের যথার্থ মহত্ত্ব কে জানতে পেত? কিন্তু তাই বলে সেই কথা বলে নিজেকে ভোলাবার কোনো দরকার নেই। দোষ-মাত্রেই দোষ— পৃথিবীতে যখন অল্প দিনের জন্যে এসেছি তখন যথাসাধ্য পরস্পরকে সুখী করে এবং সংসারে স্থায়ী সুখের সৃষ্টি করে যেতে পারলেই ভালো। আমরা কেবল এক সন্ধ্যার জন্যে একটি পান্থশালায় একত্র হয়েছি, এইটুকু সময় যদি সুখে সান্ত্বনায় সাহায্যে সকলকে পরিতৃপ্ত করে যেতে পারি তা হলেই আমি ভালো লোক। নিজের সুখের জন্যে যাকে আমি অন্যায় কষ্ট দেব সেই আমাকে মন্দ লোক বলবে, এবং কোনো কূটতর্কের দ্বারা সেটা অপ্রমাণ করতে বসা সংগত বোধ করি না।

সাতারা
২০ মার্চ্ ১৮৯৫

২০৩

কলকাতা
সোমবার, ১৮ মার্চ্। ১৮৯৫।

মাঘ মাসের সাধনার সেই গল্পটা সাধারণত অধিকাংশ পাঠকের বিশেষ ভালো লেগে গিয়েছিল— সেই কারণে সাহিত্যের সমালোচনা পড়ে অনেকে চটে গেছে। অন্যের

ভালো-লাগা মন্দ-লাগা সম্বন্ধে কিছু বোঝবার জো নেই—বুঝলেও সে অনুসারে নিজের ক্ষমতাকে গড়ে তোলা যায় না। সেই জন্যে বাইরের লোকের সমালোচনা আমার কাছে সম্পূর্ণ নিষ্ফল এবং অনেক সময়েই হানিজনক মনে হয়। নিজের ভিতরে যে-একটা আদর্শ আছে সেইটেই মানুষের ধ্রুব আশ্রয়। পড়ে শুনে ভেবে, সাহিত্যচর্চা করে, সেই আদর্শটিকে যথাসাধ্য উন্নত করে তোলা আবশ্যক। আমাদের দেশে যে ভাবে সমালোচনা হয় তাতে কোনো শিক্ষা নেই। 'ভালো লাগিল' বা 'ভালো লাগিল না' সে কথা শুনে কোনো ফল নেই। তাতে কেবল লোকবিশেষের একটা মত পাওয়া গেল, কিন্তু মতবিশেষের সত্যতা পাওয়া গেল না। সে মতও যদি যথার্থ রসজ্ঞ বা সাহিত্যব্যাপারে অভিজ্ঞ লোকের কাছ থেকে পাওয়া যায়, তা হলেও খানিকটা ভাবিয়ে দিতে পারে। কিন্তু যে-কোনো লোকের মত মাত্রের কোনো মূল্য নেই। আমাদের দেশে ভালো সমালোচনা নেই—তার প্রধান কারণ, আমাদের দেশের লোকের সাহিত্যের সঙ্গে যথার্থ ঘনিষ্ঠ পরিচয় নেই। তারা সাহিত্যের সৃজনকার্যের মাঝখানে বাস করছে না। তারা যথার্থ অভিজ্ঞতাদ্বারা জানে না কোন্‌টা সহজ কোন্‌টা কঠিন, কোন্‌টা খাঁটি কোন্‌টা মেকি, কোন্‌টা অনিত্য কোন্‌টা নিত্য, কোন্‌টা সেণ্টিমেণ্ট্ এবং কোন্‌টা সেণ্টিমেণ্টালিজ্‌ম্। আমাদের সাহিত্যে অনেকগুলো এবং অনেক রকমের ভালো লেখা না বেরোলে সমালোচনার সময় উপস্থিত হবে না। প্রথমে একটা আদর্শ দাঁড় করানো চাই, তার পরে সেই আদর্শ থেকে সমালোচকের শিক্ষা আরম্ভ হবে। যেমন জল না থাকলে সাঁতার শেখা যায় না, তেমনি ভালো সাহিত্য না থাকলে সমালোচনা অসম্ভব। আমি দেখছি, যতই বয়স বাড়ছে অন্য লোকের মতামতের মুখাপেক্ষা ততই কমে যাচ্ছে—প্রশংসা এবং নিন্দা তেমন গভীর ভাবে আঘাত করে না—বোধ হয় দুটোই অনেকটা পরিমাণে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। নিজের বিচারের উপর নিজের বিশ্বাসও ক্রমে বোধ হয় দৃঢ় বদ্ধমূল হয়ে যাচ্ছে।

সাতারা
২২ মার্চ্‌ ১৮৯৫

২০৪

কলকাতা
২০ মার্চ। ১৮৯৫।

শেলিকে অন্যান্য অনেক বড়োলোকের চেয়ে বিশেষরূপে কেন ভালো লাগে জানিস? ওর চরিত্রে কোনোরকম দ্বিধা ছিল না, ও কখনো আপনাকে কিম্বা আর কাউকে বিশ্লেষণ করে দেখে নি—ওর একরকম অখণ্ড প্রকৃতি। শিশুদের, এবং অনেক স্থলে মেয়েদের, এই জন্যে বিশেষরূপে ভালো লাগে—তারা সহজ স্বাভাবিক, তারা নিজের মনের বিতর্ক কিম্বা থিয়োরি-দ্বারা নিজেকে ভেঙেচুরে গড়ে নি। শেলির স্বভাবের যে সৌন্দর্য তার মধ্যে তর্ক বিতর্ক আলোচনার লেশ নেই। সে যা হয়েছে, সে কেবল নিজের ভিতরকার এক অনিবার্য সৃজনশক্তির প্রভাবেই হয়েছে। সে নিজের জন্যে নিজে কিছুমাত্র দায়ী নয়—সে জানেও না সে

কাকে কখন্ আঘাত দিচ্ছে, কাকে কখন্ সুখী করছে—তাকেও কোনো বিষয়ে নিশ্চয়রূপে কারও জানবার জো নেই। কেবল এইটুকু স্থির যে, ও যা ও তাই, তা ছাড়া ওর আর-কিছু হবার জো ছিল না। ও বাইরের প্রকৃতির মতো স্বভাবতই উদার এবং সুন্দর এবং স্বভাবতই নিজের এবং পরের সম্বন্ধে চিন্তা ও দ্বিধা-মাত্র-হীন। এই রকম অখণ্ড প্রকৃতির লোকের ভারী একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে। এদের সকলেই মাপ করে এবং মায়া করে—কোনো দোষ এদের স্বভাবে যেন স্থায়ীভাবে লিপ্ত হতে পারে না। এদের স্বভাব প্রথম যুগের আদম ইভের মতো আবরণহীন এবং সেই জন্যেই এক হিসাবে পরমরহস্যময়। এরা এখনো জ্ঞান-বৃক্ষের ফল খায় নি বলে একটি নিত্য সত্যযুগে বাস করছে। যারা চিন্তা করে, আলোচনা করে, যারা বিবেচনা করে কাজ করে, যারা জানে ভালোমন্দ কাকে বলে, তাদের সহজে ভালোবাসা ভারী শক্ত। তারা শ্রদ্ধা ভক্তি বিশ্বাস পেতে পারে, কিন্তু তারা অনায়াস ভালোবাসা পায় না। তারা আত্মবিসর্জন করতে পারে, কিন্তু তারা আত্মবিসর্জন আকর্ষণ করতে পারে না। আমি তো আমার অনেক প্রবন্ধে লিখেছি মানুষের মন-নামক পদার্থটি শ্রদ্ধার যোগ্য, কিন্তু ভালোবাসার পাত্র নয়—আসল খাঁটি বড়ো লোকেরা মনোবিহীন, তারা স্বতঃস্ফূর্তিবিশিষ্ট, তারা বিনা চেষ্টায় বিনা যুক্তিতে অনিবার্য বলে লোককে আকর্ষণ করে নেয়।

সাতারা
২৪ মার্চ্ ১৮৯৫

২০৫

কলকাতা
২ এপ্রিল। ১৮৯৫।

আজও সমস্ত দিন সেই বক্তৃতাটা নিয়ে পড়েছিলুম। বাংলায় নিজের মনের ভাবটি ঠিক মনের মতো করে প্রকাশ করা এমনি শক্ত যে, লেখাটা একটা লড়াই-বিশেষ। শক্ত হবার কারণ কেবল ভাষার অক্ষমতা নয়—যারা লেখাটা শুনবে তাদের সাধারণত কোনো বিষয়ে কোনো কথা ভালো করে ভাবা অভ্যাস নেই, সেই জন্যে সব কথাই ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে বিস্তারিত করে লেখা দরকার হয়ে পড়ে। যে কথাটাকে সংহত সংক্ষিপ্ত করে লিখলে তার ওরিজিন্যালিটি, তার উজ্জ্বলতা পরিস্ফুট হত সে কথাটাকে জল মিশিয়ে ব্যাখ্যা করে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর করে তুলতে হয়—তার পরে নিজের মনে ভারী একটা অসন্তোষের উদয় হয়। আমি বারম্বার দেখেছি বাঙালিরা একটা কোনো ভাবের সূত্র মনে মনে সহজে অনুসরণ করতে পারে না, তারা এক-দম ফীলিঙ্গে মেতে উঠতে চায়—একটা বক্তৃতা এবং প্রবন্ধের মধ্যে যে কত শত জিনিস ব্যর্থ হয়ে যায় তার ঠিকানা নেই।

সাতারা
৬ এপ্রিল ১৮৯৫

২০৬

কলকাতা
৪ এপ্রিল। ১৮৯৫।

আমি আজকাল কাজের তাড়ায় দোতলায় নেবে এসেছি। দক্ষিণের বারান্দার কোণে আমি যে একটি অলিন্দবেষ্টিত কাষ্ঠনীড় রচনা করে নিয়েছিলেম, সেইখানে আড্ডা করে নিয়েছি। ঘরে আর কোনো আস্‌বাব নেই, কেবল মাঝখানে তোদের প্রদত্ত সেই চীনে ডেস্ক এবং একটি মাত্র চৌকি। এ আমার পক্ষে একটি নতুন আবিষ্কার বললেই হয়—আমার তেতালার ঘরে কিছুতেই মন বসিয়ে লিখতে পারতুম না, মনে করতুম কলকাতার দোষ, কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছি এ ঘরে এসে লেখার কোনো ব্যাঘাত হচ্ছে না, বেশ মন দিতে পারছি।...ঘরে কোনো আসবাব না থাকাও একটা মস্ত সহায়। আমি দেখছি plain living, high thinkingএর পক্ষে নিতান্তই দরকার—জড় পদার্থের বন্ধন যতটা পারা যায় ছেদন করে ফেলা আবশ্যক। জড় জিনিসগুলো মনের সঙ্গে কোনো মানসিক সম্বন্ধ স্থাপন করে না, তারা মনের মধ্যে কোনো নিত্যনূতন সংবাদ আনয়ন করে না—আসবাবগুলো চিরকালই একরূপ আকার ধারণ করে থাকে, কেবল উত্তরোত্তর মলিনতা সঞ্চয় করে, ওরা অলক্ষিতভাবে মনের পক্ষে ভার এবং বাধার স্বরূপ কাজ করে। আস্‌বাবের মধ্যে চারি দিকে যতটা সম্ভব আলোক এবং আকাশ সংগ্রহ করে রাখলে মনটা বেশ স্ফূর্তির সঙ্গে অবাধে আপন কাজ করতে থাকে। সামনে গ[গন]দের বাগানটিও আমার পক্ষে বড়ো সুবিধে হয়েছে। গঙ্গার ধারে আমার একটি বাগান থাকে—এবং নদীর ধারেই এক কোণে একটি পাথরে বাঁধানো পরিষ্কার তক্‌তকে নির্মল স্নিগ্ধ ঘর থাকে, ঠেসান দিয়ে বসবার মতো একটি কৌচ এবং লেখবার মতো একটি ডেস্ক থাকে, এবং বাকি সমস্তই কেবল বাগান এবং জল এবং আকাশ—ফুটন্ত ফুলের গন্ধ এবং পাখির ডাক—তা হলে চুপচাপ করে আপন কবির কর্তব্য করে যেতে পারি। এর চেয়ে ঢের কমেও পৃথিবীতে বেশ চলে যায়, এবং ঢের বেশিতেও অনেকে তিলমাত্র সুখ পায় না।

সাতারা
৮ এপ্রিল?
১৮৯৫

২০৭

কলকাতা
৬ এপ্রিল। ১৮৯৫।

আমি যে মাঝে মাঝে ভারতবর্ষের হাওয়ার দোহাই দিয়ে কর্তব্য-পালনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের প্রস্তাব করে থাকি, তার মধ্যে একটু গভীর অর্থ আছে [বব]। এক শ্রেণীর কাজ আছে আলস্য যার অঙ্গ, বহুল পরিমাণে আলস্যের থেকে রসাকর্ষণ

না করলে সে বাড়তে পারে না। আমার সমস্ত শিক্ষা এবং প্রকৃতি থেকে মনে হয় আমি সেই-জাতীয় কাজের জন্যে জন্মেছিলুম— ঘন ঘন কাজে অনুক্ষণ লিপ্ত থাকলে আমার জীবনের যা স্বাভাবিক এবং যথার্থ কর্তব্য তার ব্যাঘাত হতে পারে। কাজকে কর্তব্যকে গজে মেপে বিচার করা উচিত হয় না— যদি সেই রকম বিচার করতে হত তা হলে মাটি চষার কাজ সকলের চেয়ে ফার্স্ট ক্লাস প্রাইজ পেত। সাধনার জন্যে, সংসারের জন্যে, সমাজের হিতের জন্যে কাজ করতে করতে এক-এক সময় আমার স্বাভাবিক অন্তরপ্রকৃতি নিজের দাবি উত্থাপন করে; সে বলে, 'তোমার কাজকর্ম পরে হবে, আপাতত এই আকাশ এবং বাতাস এবং পৃথিবী থেকে অত্যন্ত অলসভাবে কেবল পরিপূর্ণরূপে রসাকর্ষণ করে নেও।' সেটাকে বাইরে থেকে আলস্য এবং কর্তব্যের অবহেলা বলে মনে হতে পারে, কিন্তু যার মন সে জানে এই আলস্যসম্ভোগ তার প্রকৃতির খাদ্য— এটুকু না হলে তার সমস্ত পত্র পুষ্প ফল বিকশিত হয়ে উঠতে পারবে না। শুষ্ক কাষ্ঠস্বরূপ হয়েও গাছ উনুন জ্বালাবার কাজে লাগে, কিন্তু সজীবভাবে থেকে আপনার ফুল ফলকে জন্ম দেওয়াই তার প্রধান কাজ এবং সে কাজ করতে গেলে তার অনেকটা অবকাশ আকাশ এবং আলোকের আবশ্যক। এখন কথাটা কেবল এই যে, যদি মজুরি করার চেয়ে কোনো শ্রেষ্ঠতর কাজ আমার দ্বারা হওয়া সম্ভব হয় তবে সেই আমার প্রধান কর্তব্য কি না। শ্রেষ্ঠ কাজ মাত্রই খুব বড়ো বনস্পতির ন্যায় অনেকখানি স্থান এবং সময় চায়— তাকেই আমি আলস্য বলি, বৈরাগ্য বলি, ধ্যান বলি।

সাতারা
১০ এপ্রিল?
১৮৯৫

২০৮

কলকাতা
৯ এপ্রিল। ১৮৯৫।

ঢং ঢং শব্দে দশটা বাজল। চৈত্র মাসের দশটা নিতান্ত কম বেলা নয়— রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করে উঠেছে, কাকগুলো কেন যে এত ডাকাডাকি করছে জানি নে, লকেট কমলালেবু এবং কাঁচামিঠে আম-ওয়ালা চুপড়ি মাথায় উচ্চস্বরে সুর করে আমাদের দেউড়ির কাছ দিয়ে ডেকে যাচ্ছে, মুখ একটু শুকিয়ে এসেছে— ইচ্ছে করছে খানিকটে বরফ দিয়ে এক-গ্লাস ঠাণ্ডা দইয়ের সরবৎ খাই।...ইচ্ছা করছে কোনো-একটা বিদেশে যেতে। বেশ একটা ছবির মতো দেশ— পাহাড় আছে, ঝর্না আছে, পাথরের গায়ে খুব ঘন শৈবাল হয়েছে, দূরে পাহাড়ের ঢালুর উপরে গোরু চরছে, আকাশের নীল রঙটি খুব স্নিগ্ধ এবং সুগভীর, পাখি পতঙ্গ পল্লব এবং জলধারার একটা বিচিত্র মৃদু শব্দমিশ্র উঠে মস্তিষ্কের উপর ধীরে ধীরে তরঙ্গাভিঘাত করছে। দূর হোক গে ছাই, আজ আর কিছুতে হাত না দিয়ে দ্বি[পু]দের দক্ষিণের ঘরে একলাটি হাত পা ছড়িয়ে একটা কোনো ভ্রমণবৃত্তান্তের বই নিয়ে পড়ব মনে করছি, বেশ অনেকগুলো ছবিওয়ালা নতুন-পাত-কাটা বই। একটা চীনদেশের ভ্রমণ হাতে

আছে, কিন্তু চীনটা অনেক বইয়েতে পড়েছি। একটা মেয়ের লেখা পারস্য আছে, কিন্তু মেয়েরা ভালো ভ্রমণকারী নয় এবং তাতে যথেষ্ট ছবি নেই। তিব্বত পড়া হয়ে গেছে, আফ্রিকা পড়েছি। যদি দক্ষিণ-আমেরিকার খুব-ছবি-ওয়ালা ভালো বই থাকত তো পড়তুম। কিন্তু থ্যাকারের দোকানে মনের মতো বই খুঁজে পাই নি। আলোচনা করবার মতো, মনের উন্নতিসাধন করবার মতো, শিক্ষা করবার মতো বই পৃথিবীতে অসংখ্য আছে। কিন্তু কুঁড়েমি করবার মতো বই ভারী কম। সে রকম বই লিখতে বিশেষ ক্ষমতার আবশ্যক এবং সে ক্ষমতা ভারী বিরল। অবকাশের অবকাশত্ব নষ্ট করবে না, বরং তাকে একটু রঙিন এবং রসালো করে তুলবে অথচ পড়ার খোরাক দেবে, এই দুই দিক বাঁচিয়ে লেখা ভারী শক্ত। স্টীল পেনে লিখে মনের উপরে দাগ করে দেবে না, পালকের কলমে লিখে লেখাটা মনের উপর দিয়ে উড়িয়ে নিয়ে যাবে—মনের চার দিকে একটা সুবিস্তীর্ণ দেশ কাল বর্ণ এবং রসের সৃষ্টি করে দেবে। ভালো ভ্রমণবৃত্তান্ত জিনিসটা সব চেয়ে ভারহীন এবং অবকাশের সময় পড়বার সব চেয়ে উপযোগী। কিন্তু কলকাতায় ও-সব বই হাতে করতে ইচ্ছে করে না—কারণ, কলকাতায় সে রকম সুন্দর অবিচ্ছিন্ন অবসর নেই। ও-সব বই আমি মফস্বলের জন্যে জমিয়ে রেখে দিই। সম্পূর্ণ নিরিবিলি মধ্যাহ্নে কিম্বা সন্ধ্যায় ঐ রকম মোটা বই হাতে নিয়ে বসা ভারী আরামের—এমন নবাবিয়ানা পৃথিবীতে অতি অল্প আছে। স[ত্য] বলত আমার স্বভাবের মধ্যে নবাবি আছে—তা, আছে বটে।

সাতারা
১৩ এপ্রিল?
১৮৯৫

২০৯

কলকাতা
১৪ এপ্রিল। ১৮৯৫।

কাল সমস্ত দিন খুব ঘুরে বেড়াতে হয়েছে। ... অন্য কোনো দিন হলে আধমরা হয়ে পড়তুম কিন্তু কাল খুব ঠাণ্ডা ছিল—আকাশ ঘন-মেঘাচ্ছন্ন, মাঝে মাঝে টিপ্ টিপ্ করে বৃষ্টি পড়ছে, বেশ লাগছিল। যদিও নিমন্ত্রণ সেরে এবং সভাপতিত্ব করে বেড়ানোর মধ্যে কিছুমাত্র কবিত্ব নেই, তবু কাল একটা জায়গা থেকে আর-একটা জায়গায় যাবার মধ্যবর্তী সময়টুকুতে মনের মধ্যে ভারী একটা অপরূপ কবিত্ব-বেদনার সঞ্চার হচ্ছিল—ঠিক যেন একটা গান শুনছিলুম এবং মনের মধ্যে যে-একটা অনির্বচনীয় ভাবের উদয় হচ্ছিল তার কোনো অর্থ বুঝতে পারছিলুম না। যতদিন যত কবিতা পড়েছি এবং গান শুনেছি এবং আপন মনে কল্পনা করেছি, তার সমস্ত রস মনের কোন্-এক জায়গায় সঞ্চিত আছে। মাঝে মাঝে এক-একদিন কেন তার মদিরতাপূর্ণ সমস্ত লোভনীয় সৌরভ বেরিয়ে পড়ে কিছুই বুঝতে পারি নে এবং এ রস নিয়ে কী করব, কোথায় কার কী কাজে লাগবে কিছুই জানি নে—এর কোনো আধ্যাত্মিক তাৎপর্য, কোনো আধ্যাত্মিক পরিতৃপ্তি আছে কি না তাও

বুঝি নে। কিন্তু এর এক অসীমতা গভীরতা এবং রহস্যপূর্ণ পরম ব্যাকুলতায় মনকে উতলা করে দেয় এবং এ জিনিসটাকে কিছুতেই অসত্য এবং অস্থায়ী বলে মনে হয় না—এর মধ্যে যে-একটা আকাঙ্ক্ষার অধীরতা আছে সেও ভালো। কলকাতা শহরের জড় আরাম এবং সন্তোষ এর তুলনায় খুব নিকৃষ্ট মনে হয়। কাল রাত্রে জ্যো [তিদাদা] দের ওখানে অ [ভি] একটা এস্‌রাজ হাতে করে বসল—বাইরে বৃষ্টি পড়ছে এবং বাতাসে গাছের পাতার শব্দ হচ্ছে। আমি প্রথমে 'ভরা বাদর' গাইলুম। তার পরে গাইলুম 'আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে'—গলাটাও বেশ ছিল, মনটাও বেশ পরিপূর্ণ ছিল, নববর্ষাটিও বেশ অনুকূল ছিল, বেশ জমে উঠেছিল—ভাবছিলুম এই-যে সুরের এবং ভাবের একটা অপূর্ব রাজ্য এ কি কেবলই আমার মনের? এর অনুরূপ আর কোথাও কিছুই নেই? এ কি কেবলই মরীচিকা?

সাতারা
১৮ এপ্রিল?
১৮৯৫

২১০

কলকাতা
২৪ এপ্রিল। ১৮৯৫।

আজ সকাল বেলা থেকে সুগভীর আলস্যে আমাকে আক্রমণ করেছে।...আমাদের জোড়াসাঁকোর দোতলার নির্জন ঘর এবং বারান্দায় অকর্মণ্যভাবে কেবলই ঘুর ঘুর করে বেড়িয়েছি। শরীরের সমস্ত সন্ধিগুলো যেন শিথিল হয়ে পড়েছিল, কোনো লেখা অথবা পড়ায় হাত দেবার কিছুমাত্র শক্তি ছিল না। এ দিকে দেখতে দেখতে সমস্ত আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে এসে গুর্‌ গুর্‌ করে মেঘ ডাকতে লাগল এবং মাঝে মাঝে প্রবল বাতাসে দক্ষিণের বাগানের ছোটো বড়ো সমস্ত গাছগুলো হুস্‌ হাস্‌ করে নিশ্বাস ফেলতে লাগল। মধ্যাহ্নটি স্নিগ্ধ ছায়াচ্ছন্ন হয়ে চারি দিকে খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে এল। মনের ভিতরটা একটা অকারণ চঞ্চলতায় বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল—তার হাতে যে কাজই দেওয়া যায় সে সমস্তই ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিতে লাগল।...মনের গতিক আকাশের গতিকের মতো—কিছুই বলা যায় না। মাসের মধ্যে ঊনত্রিশ দিন সে ছোটোখাটো উপস্থিত কাজ নিয়ে বেশ চালিয়ে দেয়, কোনো গোল করে না—হঠাৎ ত্রিশ দিনের দিন সে-সমস্ত কাজে সে পদাঘাত করতে থাকে। বলে, 'আমাকে এমন একটা-কিছু দাও যা খুব মস্ত—যাতে আমার সমস্ত দিনরাত্রি, সমস্ত ছোটো বড়ো, সমস্ত ভূত ভবিষ্যৎ একেবারে গ্রাস করে ফেলতে পারে।' তখন হাতের কাছে কোথায় বা কী পাওয়া যায়—কেবল ঘরে ঘরে বারান্দায় বারান্দায় ঘুর ঘুর করে বেড়ানো যায়। কতকগুলো ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন খণ্ড-বিখণ্ড সামাজিক কর্তব্যের মধ্যে মনটা যখন লাফ দিয়ে দিয়ে বেড়ায় তখনি তার সুস্থ অবস্থা বলি, আর যখন সে একটা প্রবল আবেগে একটা বৃহৎ কর্মের মধ্যে একটা আত্মবিস্মৃত ঐক্য লাভ করবার জন্যে অধীর হয়ে ওঠে তখন তাকে অসুস্থ মনে করি! কিন্তু আমি মনে

করি মানুষের যথার্থ স্বাভাবিক অবস্থাই হচ্ছে সেই একটি প্রবল নিষ্ঠার মধ্যে আপনার সমস্ত জীবনকে ঐক্যবন্ধনে বদ্ধ করবার ইচ্ছা— সকলের সেই ঐক্যলাভের ক্ষমতা নেই, সেই জন্যে সমাজের বিচ্ছিন্ন যন্ত্রবৎ কাজগুলো তাদের পক্ষে উপযোগী —কিন্তু মনের সুগভীর আকাঙ্ক্ষা সেই সুবিশাল ঐক্যের দিকে। সেই জন্যেই প্রতিদিন সমাজের মধ্যে থেকে, এক-একদিন মনে হয়—

আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে!

পুনা
৩০ এপ্রিল ১৮৯৫

২১১

কলকাতা
২ মে। ১৮৯৫।

আজ কোথা থেকে একটা নহবত শোনা যাচ্ছে। সকাল বেলাকার নহবতে মনটা বড়োই ব্যাকুল করে তোলে। আমি এ পর্যন্ত কিছুতেই ঠিক করে উঠতে পারলুম না, সংগীত শুনলে মনের ভিতরে যে অনির্বচনীয় ভাবের উদ্রেক করে তার ঠিক তাৎপর্যটা কী। অথচ প্রত্যেক বারেই মন আপনার এই ভাবটাকে বিশ্লেষণ করে দেখতে চেষ্টা করে। আমি দেখেছি গানের সুর ভালো করে বেজে উঠলেই নেশাটি ঠিক ব্রহ্মরন্ধ্রের কাছে ধরে ওঠবা মাত্রই, এই জন্মমৃত্যুর সংসার, এই আনাগোনার দেশ, এই কাজকর্মের আলো-আঁধারের পৃথিবীটি বহুদূরে— যেন একটি প্রকাণ্ড পদ্মানদীর পরপারে গিয়ে দাঁড়ায়— সেখান থেকে সমস্তই যেন ছবির মতো বোধ হতে থাকে। আমাদের কাছে আমাদের প্রতিদিনের সংসারটা ঠিক সামঞ্জস্যময় নয়— তার কোনো তুচ্ছ অংশ হয়তো অপরিমিত বড়ো, ক্ষুধাতৃষ্ণা ঝগড়াঝাঁটি আরামব্যারাম টুকিটাকি খুঁটিনাটি খিটিমিটি এইগুলিই প্রত্যেক বর্তমান মুহূর্তকে কণ্টকিত করে তুলছে, কিন্তু সংগীত তার নিজের ভিতরকার সুন্দর সামঞ্জস্যের দ্বারা মুহূর্তের মধ্যে যেন কী-এক মোহমন্ত্রে সমস্ত সংসারটিকে এমন একটি পার্‌স্‌পেক্‌টিভের মধ্যে দাঁড় করায় যেখানে ওর ক্ষুদ্র ক্ষণস্থায়ী অসামঞ্জস্যগুলো আর চোখে পড়ে না— একটা সমগ্র একটা বৃহৎ একটা নিত্য সামঞ্জস্য-দ্বারা সমস্ত পৃথিবী ছবির মতো হয়ে আসে এবং মানুষের জন্মমৃত্যু হাসিকান্না ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমানের পর্যায় একটি কবিতার সকরুণ ছন্দের মতো কানে বাজে। সেই সঙ্গে আমাদেরও নিজ নিজ ব্যক্তিগত প্রবলতা তীব্রতার হ্রাস হয়ে আমরা অনেকটা লঘু হয়ে যাই এবং একটি সংগীতময়ী বিস্তীর্ণতার মধ্যে অতি সহজে আত্মবিসর্জন করে দিই। ক্ষুদ্র এবং কৃত্রিম সমাজবন্ধনগুলি সমাজের পক্ষে বিশেষ উপযোগী, অথচ সংগীত এবং উচ্চ অঙ্গের আর্ট্‌ মাত্রেই সেইগুলির অকিঞ্চিৎকরতা মুহূর্তের মধ্যে উপলব্ধি করিয়ে দেয়— সেই জন্যে আর্ট্‌ মাত্রেরই ভিতর খানিকটা সমাজনাশকতা আছে— সেই জন্যে ভালো গান কিম্বা কবিতা শুনলে আমাদের মধ্যে একটা চিত্তচাঞ্চল্য জন্মে, সমাজের লৌকিকতার বন্ধন ছেদন

করে নিত্যসৌন্দর্যের স্বাধীনতার জন্যে মনের ভিতরে একটা নিষ্ফল সংগ্রামের সৃষ্টি হতে থাকে— সৌন্দর্য মাত্রেই আমাদের মনে অনিত্যের সঙ্গে নিত্যের একটা বিরোধ বাধিয়ে দিয়ে অকারণ বেদনার সৃষ্টি করে।

পুনা
৬ মে ১৮৯৫

২১২

পতিসর-পথে
১ জুন। ১৮৯৫।

অনেক দিনের পরে আমার নির্জন বোটটির মধ্যে এসে আমার ভারী আরাম বোধ হচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন বিদেশ থেকে বাড়ি ফিরে এসেছি এবং কে একজন থেকে থেকে বলছে— 'তুমি এসেছ, তোমাকে দেখে আমি বড়ো খুশি হয়েছি।' নির্জনতা যেন আমার গায়ে মাথায় সর্বাঙ্গে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। আজ দিনের বেলাটা তেমন গরম ছিল না— রোদ্দুর উঠেছিল, কিন্তু ঠাণ্ডা বাতাসটি বেশ মধুর লাগছিল। নদীটি ছোটো— দুই তীর ঘাসে সবুজ হয়ে গড়িয়ে এসেছে, গোরু চরছে, মেয়েরা জল তুলছে, গা ধুচ্ছে, উলঙ্গ ছেলেগুলো বোট দেখে চীৎকারস্বরে দূরস্থ সঙ্গীদের ডাকাডাকি করছে। ছোটোবড়ো নানাবিধ গ্রাম, তার নানা রকমের নাম— দেখতে দেখতে যাই আর ভাবি যে, আমার কাছে এই গ্রামগুলি এক মুহূর্তের ছবিমাত্র কিন্তু কত লোকের কাছে এইই সমস্ত পৃথিবী। যারা ঐ জলে নেমে স্নান করছে এবং ডাঙায় বসে বাখারি ছুলছে তারা যথাসময়ে ঐ ঘন গাছগুলোর আড়ালে কোন্‌-একটা জায়গায় তাদের বাড়িতে যাবে। সেইখানেই তাদের নিত্যকর্ম এবং চিরজীবনের রঙ্গভূমি। সেখানকার অখ্যাতনামা অকৃতকীর্তি লোকরা তাদের সর্বাপেক্ষা পরিচিত এবং প্রভাবসম্পন্ন প্রতিবেশী। এই চিন্তাগুলি খুব যে অপূর্ব এবং অসামান্য তা বলতে পারি নে, কিন্তু তবু এরকম করে ভেবে দেখতে গেলে একটু নতুন রকমের ঠেকে— আমরা সকলে নিজেদের পক্ষে কত বৃহৎ অথচ সাধারণের পক্ষে কত ছোটো সেইটে ভালো করে মনে উদয় হয়। এখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে— দুই ধারের গ্রাম আপন-আপন ঘরে প্রদীপ জ্বেলে নিভৃত নিষ্কর্মা হয়ে বসেছে, গল্প করছে, তামাক খাচ্ছে, ঘুমচ্ছে— কেবল আমার একটিমাত্র বোট মাঝখানে দাঁড় ফেলে ঝুপ্‌ঝুপ্‌ শব্দ করে চলেছে, দু ধারের লোকালয়ের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্কই নেই।

খড়কি
৬ জুন ১৮৯৫

২১৩

পতিসর
৩ জুন। ১৮৯৫।

এমন সময় 'গহন ঘন ছাইল গগন ঘনাইয়া'—যেমন ঝড় তেমনি বৃষ্টি। বাতাস কখনো পূর্ব দিক থেকে কখনো পশ্চিম দিক থেকে আসছে—বৃষ্টি যেন একেবারে ছিটেগুলির মতো বিষম জোরে ছট্‌ছট্‌ শব্দে বোটের একটা পাশে আঘাত করছে… বাতাস ক্ষিপ্ত জন্তুর মতো সমস্ত আকাশ জুড়ে রাগে গোঙ্‌রাচ্ছে। … বিদ্যুৎ এবং বজ্রেরও বিরাম নেই। আমার জানলা সার্শি সমস্ত বন্ধ—কেবল যে দিকে বাতাস নেই সেই দিককার একটি খড়খড়ি খুলে মেঘাবৃত ক্ষীণ আলোকে লিখছি। বর্ষাটা এমনি জমে এসেছে যে, ইচ্ছে করছে গদ্যে না লিখে পদ্যে চিঠি লিখে যাই—কিন্তু পদ্যে লিখতে বসলে বোধ হয় লেখা শেষ হবার পূর্বেই ঝড় শেষ হয়ে যাবে। ঝড়কে তো আর অক্ষর মিলিয়ে চলতে হয় না। এই সময়ে বেশ ফেঁদে বসে একটা গল্প লিখতেও বেশ। তাই লিখতুম, কিন্তু পাশে শৈ… বসে আছে—কেউ কাছে বসে থাকলে লেখা হয় না। কিন্তু মনের ভিতর ভারী একটা উল্লাস হচ্ছে—এই ঝড়ের আঘাতে, মেঘের ছায়ায়, বৃষ্টির ঝর্ঝর শব্দে, বজ্রের গর্জনে আমার বুকের ভিতর একটা তুফান উঠছে—একটা-কিছু করতে ইচ্ছে করছে, নিদেন খুব সুখের ভাবনা খুব অসম্ভব কল্পনা ভাবতে ইচ্ছে করছে, নিদেন খুব গলা ছেড়ে দিয়ে একটা কানাড়া কিম্বা মল্লার গেয়ে দিলেও সময়টা বেশ কাটে—কত মেঘলার দিন, কত তেতালার ছাতের উপরকার আকাশ, কত পূর্বস্মৃতি মনের ভিতর দিয়ে ছিন্ন ভিন্ন মেঘের মতো হু হু করে উড়ে যাচ্ছে!

সাতারা
৮ জুন ১৮৯৫

২১৪

পতিসর
৬ জুন। ১৮৯৫।

তার পরে সকলকে বিদায় করে দিয়ে সাধনার জন্যে একটা গল্প লিখতে বসেছিলুম—মাস তো প্রায় শেষ হয়ে এল। তাই দৃঢ় সংকল্প করে খুব নিবিড় ভাবে মনঃসংযোগপূর্বক এইমাত্র লেখা শেষ করে ফেললুম। এখন সাতটা বেজে গেছে। কিন্তু এখন গ্রীষ্মের বেলা খুব দীর্ঘ, তাই এখনো সূর্যালোক বেশ স্পষ্ট আছে। যতক্ষণ একটা লেখা চলতে থাকে ততক্ষণ মনটা বেশ শান্তিতে থাকে—সেটা শেষ হয়ে যাবা-মাত্রই আবার একটা নতুন বিষয়ের অন্বেষণে নিতান্ত দিশেহারার মতো, লক্ষ্মীছাড়ার মতো, চারি দিকে ঘুরে বেড়াতে হয়। … এত চিন্তা করে চেষ্টা করে কষ্ট সয়ে একজনকে লিখতে হয়, অথচ পাঠকেরা কতই অবহেলার সঙ্গে মূঢ়তার সঙ্গে সেগুলো পড়ে এবং অধিকাংশ স্থলেই পড়ে না। সেজন্যে

আক্ষেপ করা কাপুরুষতা, অনেক সময়েই করি নে। কিন্তু যখন সমস্ত দিন পরিশ্রমের পর একলা সন্ধ্যাবেলায় শরীর মনকে ক্লান্তি এসে আক্রমণ করে তখন একটা ক্ষণিক ঔদাস্যের হাত কিছুতেই এড়ানো যায় না। রণে ভঙ্গ দিয়ে খ্যাতিহীন নির্জনে আপন মনের মতো কাজ এবং মনের মতো বিশ্রামের মধ্যে আপনাকে সম্পূর্ণ গোপন করে রাখতে ইচ্ছে করে। মানুষের পক্ষে মানুষের জনতার মতো এমন শ্রান্তিজনক আর কিছুই নেই। প্রকৃতির উদারতা এবং প্রেমের গভীরতা তার একমাত্র বিশ্রামের স্থান—আর-সমস্তই ক্লান্তি বহন করে আনে।

সাতারা
১১ জুন ১৮৯৫

২১৫

কলকাতা
সোমবার, ১১ আষাঢ়। ১৩০২।

ক'দিন খুব রীতিমত বৃষ্টি বাদল হয়ে আজ মেঘ কেটে রৌদ্র দেখা দিয়েছে। মনে আছে এক সময় এই রকম দিনগুলো আমাকে ভারী অভিভূত করত। ভিতরে ভিতরে এমন একটা কম্পান্বিত রকমের আনন্দ উপস্থিত হত সে আমি ঠিক ব্যক্ত করতে পারব না। আজ সেইটে মনে পড়ে গেল। আজ সকালে বাবামশায়ের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে পার্ক্ স্ট্রীটে গিয়েছিলুম। যাবার সময় বরাবর এক অমৃতবাজার পড়তে পড়তে যাচ্ছিলুম, ফেরবার সময় হঠাৎ গড়ের মাঠের দিকে দৃষ্টি পড়ল—এবং পৃথিবীটা অনেকটা সেই আগেকার মতোই আছে, কেবল আমার আজকাল অবসর নেই—মাঠের উপর সকালবেলাকার সুকুমার রোদ্দুরটি বিষাদ শান্তি এবং সৌন্দর্যে স্নিগ্ধ সরস নির্মল নবীন শ্যামলশ্রীকে মণ্ডিত করে রেখেছে। মনের ভিতরটাতে সেই আগেকার মতো খানিক ক্ষণের জন্যে একটি অনির্বচনীয় কোমল সুন্দর রাগিণী কম্পিত হয়ে বেজে উঠতে লাগল। এখন এত রকমের বিষয় আমার চার দিকে ব্যূহ বেঁধে রয়েছে যে, জগৎটাকে সম্মুখে দেখতে পাই নে—একেবারে সচেতন মনের সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির প্রত্যক্ষ সংযোগ ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শ আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছে—বিশ্ববীণার যে যন্ত্রী নদীতে তরঙ্গ জাগিয়ে তোলে, দেখতে দেখতে বসন্তের ফুল ফুটিয়ে দেয় এবং জলে স্থলে শূন্যে গানে গুঞ্জনে কাকলীতে কুহরিত মুখরিত করে তোলে, সেই যন্ত্রীর সজীব সচেতন কম্পিত অঙ্গুলিগুলি আমার মনের তারকে স্বয়ং স্পর্শ করে আঘাত করছে না। ভয় হয় পাছে এইরকম অনেক দিন হতে হতে মনের যে তারগুলো সর্বদাই বেজে বেজে উঠত সেগুলোতে ধুলো পড়ে মরচে পড়ে যায়, মনের ভিতরটা ক্রমে বুড়ো হয়ে অসাড় হয়ে আসে। অবিশ্রাম কাজকর্মে মানুষকে শক্ত এবং প্রবীণ করে দেয়। সেটুকু শক্ত হওয়া দরকার জানি—সংসারক্ষেত্রের উপযোগী হতে গেলে সে পরিমাণে প্রবীণতা অত্যাবশ্যক, কিন্তু তবু সেটা আমার কাছে ভারী অপ্রিয় বোধ হয়। কিন্তু 'সুখং বা যদি বা দুঃখং প্রিয়ং যদি বাপ্রিয়ং' ইত্যাদি শ্লোক স্মরণ করে অবশ্যসম্ভাবনার বিরুদ্ধে বৃথা পরিতাপ পরিত্যাগ করে আপনাকে চারি

দিকের সমস্ত অবস্থা এবং উপস্থিত সমস্ত কার্যের জন্যে প্রস্তুত করে নিতে হবে। এখন অনেকটা তাই হয়েছে—কর্তব্যচক্রের ঘানিগাছের [সঙ্গে] মনটাকে শক্ত দড়িতে বেঁধে দেওয়া গেছে—এবং তার চোখেও ঠুলি পড়েছে, কেবল অন্ধ হয়ে প্রতিদিন নিয়মিত ঘুরপাকে যথাসাধ্য তেল বের করে দিয়ে পৃথিবীতে একজন দরকারী জীব হয়ে উঠেছি। সংগীতের চেয়ে তেলে অনেক কাজ দেয়—তাতে আহার চলে, সন্ধ্যার সময় আলোও জ্বলে। অতএব এক্ষণে চিঠি সমাপ্ত করে দিয়ে পুনশ্চ আমার ঘানিগাছে লাগি [বব]—কাছারির চিঠিগুলি সম্মুখে পেশ হয়েছে, সাধনার প্রুফও স্তূপাকার জমেছে।

সাতারা
২৮ জুন ১৮৯৫

২১৬

সাজাদপুর
২৮ জুন। ১৮৯৫।

বসে বসে সাধনার জন্যে একটা গল্প লিখছি, একটু আষাঢ়ে গোছের গল্প। লেখাটা প্রথম আরম্ভ করতে যতটা প্রবল অনিচ্ছা ও বিরক্তি বোধ হচ্ছিল এখন আর সেটা নেই। এখন তারই কল্পনাস্রোতের মাঝখানে গিয়ে পড়েছি—একটু একটু করে লিখছি এবং বাইরের প্রকৃতির সমস্ত ছায়া আলোক এবং বর্ণ এবং শব্দ আমার লেখার সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। আমি যে-সকল দৃশ্য এবং লোক এবং ঘটনা কল্পনা করছি তারই চারি দিকে এই রৌদ্রবৃষ্টি, নদীস্রোত এবং নদীতীরের শরবন, এই বর্ষার আকাশ, এই ছায়াবেষ্টিত গ্রাম, এই জলধারাপ্রফুল্ল শস্যের ক্ষেত ঘিরে দাঁড়িয়ে তাদের সত্যে এবং সৌন্দর্যে সজীব করে তুলছে—আমার নিজের মনের কল্পনা আমার নিজের কাছে বেশ রমণীয় হয়ে উঠছে। কিন্তু পাঠকেরা এর অর্ধেক জিনিসও পাবে না। তারা কেবল কাটা শস্য পায়, কিন্তু শস্যক্ষেত্রের আকাশ এবং বাতাস, শিশির এবং শ্যামলতা, সবুজ এবং সোনালি এবং নীল সে-সমস্তই বাদ দিয়ে পায়। আমার গল্পের সঙ্গে সঙ্গে যদি এই মেঘমুক্ত বর্ষাকালের স্নিগ্ধ রৌদ্ররঞ্জিত ছোটো নদীটি এবং নদীর তীরটি, এই গাছের ছায়া এবং গ্রামের শান্তিটি, এমনি অখণ্ডভাবে তুলে দিতে পারতুম তা হলে গল্পটি কেমন সুমিষ্ট সজীব হয়ে দেখা দিত! তা হলে সবাই তার মর্মের সত্যটুকু কেমন অতি সহজেই বুঝতে পারত! তা হলে কেউ তাকে সমালোচনা করতে সাহস করত না। অনেকটা রস মনের মধ্যেই থেকে যায়, সবটা কিছুতেই পাঠককে দেওয়া যায় না। যা নিজের আছে তাও পরকে দেবার ক্ষমতা বিধাতা মানুষকে সম্পূর্ণ দেন নি।

সাতারা
৩ জুলাই ?
১৮৯৫

২১৭

সাজাদপুর
২ জুলাই। ১৮৯৫।

কাল থেকে সাহাজাদপুরের কুঠিবাড়িতে উঠে এসেছি। যা মনে করেছিলুম তাই। বেশ লাগছে। মাথার উপরে ছাদটা অনেক উঁচুতে এবং দুই পাশে দুই খোলা বারান্দা থাকাতে আকাশের অজস্র আলো আমার মাথার উপরে বর্ষণ হতে থাকে—এবং সেই আলোতে লিখতে পড়তে এবং বসে বসে ভাবতে ভারী মধুর লাগে। আর-একটি বেশ লাগে—কাজ করতে করতে কোনো-এক দিকে মুখ ফিরোলেই দেখতে পাই নীল আকাশের সঙ্গে মিশ্রিত সবুজ পৃথিবীর একটা অংশ একেবারে আমার ঘরের লাগাও হাজির। যেন প্রকৃতি কুতূহলী পাড়াগেঁয়ে মেয়ের মতো সর্বদাই আমার জানলা-দরজার কাছে উঁকি মারছে। আমার ঘরের এবং মনের—আমার কাজের এবং অবসরের চারি দিক প্রসন্ন প্রফুল্ল, সরস এবং সজীব, নবীন এবং সুন্দর হয়ে আছে। এই বর্ষণমুক্ত আকাশের আলোকে এই গ্রাম এবং জলের রেখা, এ পার এবং ও পার, খোলা মাঠ এবং ভাঙা রাস্তা, একটা স্বর্গীয় কবিতায়—অ্যাপলোদেবের স্বর্ণবীণাধ্বনিতে মণ্ডিত হয়ে উঠেছে। আমি আকাশ এবং আলো এত অন্তরের সঙ্গে ভালোবাসি! আকাশ আমার সাকী, নীল স্ফটিকের স্বচ্ছ পেয়ালা উপুড় করে ধরেছে, সোনার আলো মদের মতো আমার রক্তের সঙ্গে মিশে গিয়ে আমাকে দেবতাদের সমান করে দিচ্ছে। যেখানে আমার এই সাকীর মুখ প্রসন্ন এবং উন্মুক্ত, যেখানে আমার এই সোনার মদ সব চেয়ে সোনালি এবং স্বচ্ছ, সেইখানে আমি কবি, সেইখানে আমি রাজা, সেইখানে আমার বত্রিশ-সিংহাসন। এই আকাশের মধ্যে আমি একটি সুগভীর নিস্তব্ধ অন্তরঙ্গ ভালোবাসা এবং অনন্ত শান্তিরসপূর্ণ সান্ত্বনা অত্যন্ত প্রত্যক্ষভাবে সর্বাঙ্গে এবং সর্বমনে অনুভব করি। এই আকাশের ভাণ্ডার, এই আলোক, এই শান্তি কখনো ফুরোবে না—আমার সঙ্গে বরাবর যদি ঐ সুনীল নির্মল জ্যোতির্ময় অসীমতার এই রকম অব্যবহিত প্রত্যক্ষ যোগ থাকে তা হলে আমার জীবন কখনোই সম্পূর্ণ নীরস হবে না।

সাতারা
৭ জুলাই ?
১৮৯৫

২১৮

সাহাজাদপুর
৫ জুলাই। ১৮৯৫।

কাল অনেক রাত পর্যন্ত নহবতে কীর্তনের সুর বাজিয়েছিল সে বড়ো চমৎকার লাগছিল, আর ঠিক এই পাড়াগাঁয়ের উপযুক্ত হয়েছিল—যেমন সাদাসিধে তেমনি

সকরুণ। কাল রাত্রে বেশ মৃদুমন্দ বাতাস এবং পরিপূর্ণ জ্যোৎস্না ছিল, আর নহবতটি খুব ইনিয়ে-বিনিয়ে বাজছিল। কাল জানলা খুলে সেই বাজনা শুনতে শুনতে নিদ্রা দিয়েছি। আজ ভোরের বেলায় সেই বাজনার শব্দে জেগে উঠেছি। সেকালের রাজাদের বৈতালিক ছিল— তারা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে গান গেয়ে প্রহর জানিয়ে দিত, এই নবাবিটা আমার লোভনীয় মনে হয়। ছেলেবেলায় পেনেটির বাগানে থাকতুম, পাশে দক্ষিণেশ্বর শিবমন্দির থেকে দিনরাত্রির মধ্যে তিন-চার বার করে নহবত বাজত— আমার তখন মনে হত আমি বড়ো হয়ে স্বাধীন হবা মাত্রই একটা এইরকম নহবত রাখব। যে পাষাণদেবতা কাঁসর ঘণ্টার অসহ্য কোলাহল সম্পূর্ণ বধির ভাবে শুনতে পারে, তার পক্ষে চার বেলা নহবতের রাগিণী -আলাপ সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। তার চেয়ে আমাদের মতো ঠাকুরের জন্যে যদি কোনো পুণ্যবান্ সদাশয় এই রকম নহবতের ব্যবস্থা করে দেন তা হলে সংগীতটা ব্যর্থ হয় না। তা হলে দৈনিক তুচ্ছ জীবনটা এখনকার চেয়ে ঢের বেশি রমণীয় হয়ে ওঠে এবং দিনের কাজকর্মগুলোতে এমন দুঃসহ ক্লান্তি এবং বৈরাগ্য আনয়ন করে না। গান বাজনা শুনলেই তখনি বুঝতে পারি এতদিন আমি সংগীতের জন্যে তৃষিত হয়ে ছিলুম— সেই জন্যে আমার ভারী ইচ্ছে করে আমার খুব একজন কাছের লোক বেশ ভালোরকম বাজনা শিখে নেয়।

সাতারা
১০ জুলাই?
১৮৯৫

২১৯

সাহাজাদপুর
৬ জুলাই। ১৮৯৫।

কাল আমাদের এখানকার পুণ্যাহ শেষ হয়ে গেল। বিস্তর প্রজা এসেছিল। আমি বসে বসে লিখছিলুম, এমন সময় প্রজারা দলে দলে রাজদর্শন করতে এল— ঘর বারান্দা সমস্ত পূর্ণ হয়ে গেল। আমার একটি বুড়ো ভক্ত আছে তার নাম রূপচাঁদ মৃধা— সে একটি ডাকাত-বিশেষ, লম্বা জোয়ান সত্যবাদী অত্যাচারী রাজভক্ত প্রজা। আমাকে যেন সে পরমাত্মীয়ের মতো ভালোবাসে— সে আমার পায়ের ধুলো নিয়ে সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে বললে, 'তোমার চাঁদমুখ দেখতে এসেছি।' চাঁদমুখ এ কথায় বোধ করি কিঞ্চিৎ রক্তিমবর্ণ হবার উপক্রম করলে। রূপচাঁদ বললে, 'কতদিন পরে দেখা— এক বৎসর তোমায় দেখি নি!' মেয়েদের ভালোবাসা অবশ্য খুব মধুর লাগতে পারে, কিন্তু এই রকম সরল সবল পুরুষমানুষের অকৃত্রিম অটল নিষ্ঠা এরও একটি অপূর্ব সৌন্দর্য আছে— এর মধ্যে মানবপ্রকৃতির একেবারে অমিশ্রিত আদিম সহৃদয়তাটুকু প্রকাশ পায়— এর সঙ্গে সঙ্গে যে-একটা বল এবং কাঠিন্য আছে, যে-একটা ঋজুতা এবং directness প্রকাশ পায়, সেইটের জন্যেই এই সরস সুন্দর অনুরক্তি আরও এমন বহুমূল্য বোধ হয়। শিশুর মতো সরল এবং মনের-ভাব-প্রকাশে-অক্ষম সব দাড়ি-ওয়ালা পুরুষমানুষ একে একে এসে

আমার পায়ের ধুলো নিয়ে চুমো খেতে লাগল—কখনো কখনো এরা কেউ কেউ একেবারে পায়ে চুমো খায়। একদিন কালীগ্রামে মাঠে চৌকি নিয়ে বসে আছি, সেখানে হঠাৎ এক মেয়ে এসে আমার দুই পায়ে মাথা রেখে চুমো খেলে—বলা আবশ্যক সে অল্পবয়স্কা নয়। পুরুষ প্রজারাও অনেকে পদচুম্বন করে। আমি যদি আমার প্রজাদের একমাত্র জমিদার হতুম তা হলে আমি এদের বড়ো সুখে রাখতুম—এবং এদের ভালোবাসায় আমিও সুখে থাকতুম।

সাতারা। ১২ জুলাই ১৮৯৫

২২০

পাবনা-পথে
৯ জুলাই। ১৮৯৫।

এই আঁকাবাঁকা ইছামতী নদীর মধ্যে দিয়ে চলেছি। এই নদীর ভিতর দিয়ে যাবার পথে এবং আসবার পথে তোকে অনেকবার অনেক চিঠি লিখেছি। এই ছোটো খামখেয়ালি নদী, দুই ধারে সবুজ ঢালু ঘাট, দীর্ঘ ঘন কাশবন, পাটের ক্ষেত আর আখের ক্ষেত, আর সারি সারি গ্রাম—এ যেন একই কবিতার লাইন আমি বারম্বার আবৃত্তি করে যাচ্ছি এবং প্রতিবারেই নতুন বোধ হচ্ছে। পদ্মা প্রভৃতি বড়ো বড়ো নদীগুলি এত বড়ো যে, সে যেন ঠিক কণ্ঠস্থ করে নেওয়া যায় না। আর, এই বর্ষাকালের ছোটো বাঁকা নদীটি যেন বিশেষ করে আমার হয়ে যাচ্ছে—এ নদীতে স্টীমার নেই, নৌকোর ভিড় নেই, আমারই বোট এই পাড়াগেঁয়ে নদীটির উপরে যেন রাজত্ব বিস্তার করে চলে যায়। কাল থেকে আকাশ খুব মেঘাচ্ছন্ন হয়ে আছে। সমস্ত স্নিগ্ধ এবং শ্যামল, দুই তীর শান্তিপূর্ণ। পদ্মানদীর কাছে মানুষের লোকালয় তুচ্ছ, কিন্তু ইছামতী মানুষ-ঘেঁষা নদী—তার শান্ত জলপ্রবাহের সঙ্গে মানুষের দৈনিক কর্মপ্রবাহগুলি বেশ সুন্দরভাবে এসে মিশছে। সে ছেলেদের মাছ ধরবার এবং মেয়েদের স্নান করবার নদী—স্নানের সময় মেয়েরা যে-সমস্ত গল্পগুজব নিয়ে আসে সেগুলি এই নদীর হাস্যময় কলস্বরের সঙ্গে বেশ মিশে যায়। আশ্বিন মাসে মেনকার ঘরের মেয়ে পার্বতী যেমন কৈলাসশিখর ছেড়ে একবার তার বাপের বাড়ি দেখেশুনে যায়, ইছামতী তেমনি সম্বৎসর অদর্শন থেকে বর্ষার কয়েক মাস আনন্দহাস্য করতে করতে তার আত্মীয় লোকালয়গুলির তত্ত্ব নিতে আসে—তার পরে ঘাটে ঘাটে মেয়েদের কাছে প্রত্যেক গ্রামের সমস্ত নতুন খবরগুলি শুনে নিয়ে তাদের সঙ্গে মাখামাখি সখিত্ব করে আবার চলে যায়।

সাতারা
১৪ জুলাই ১৮৯৫

২২১

শিলাইদহ
১০ জুলাই। ১৮৯৫।

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে— আকাশ মেঘে অন্ধকার। গুরুগুরু মেঘ ডাকছে এবং ঝোড়ো বাতাসে তীরের বনঝাউগুলো আন্দোলিত হচ্ছে। বনের মধ্যে শেয়াল ডাকছে, নদীতে নৌকো নেই— মেয়েরা ঘাট পরিত্যাগ করেছে, ডাঙায় জনমানব নেই— গুটি দুই-তিন গোরু বাবলা-বনের ভিতর দিয়ে গৃহমুখে চলেছে। ডাঙায় বাঁশঝাড়ের মধ্যে ঘন কালীর মতো অন্ধকার এবং জলের উপর গোধূলির একটা বিবর্ণ ধূসর আলো পড়ে একটা অস্বাভাবিক উত্তেজনার মতো দেখতে হয়েছে। আমি সেই ক্ষীণালোকে কাগজের উপর ঝুঁকে পড়ে চিঠি লিখছি— উচ্ছৃঙ্খল বাতাসে টেবিলের সমস্ত কাগজপত্র উড়িয়ে ছড়িয়ে ফেলবার উপক্রম করছে। এ দিকে নদীর চাঞ্চল্যে যে-একটু দোলা দিচ্ছে তাতেও লাইন ঠিক রেখে লেখা একটু কষ্টসাধ্য হয়ে উঠেছে। কিন্তু এই ছোটো নদীর উপরে ঘনবর্ষার সমারোহ বড়ো ভালো লাগছে— এই সময়ে বসে বসে চিঠি লিখতে ইচ্ছা করছে। এই গোধূলির মেঘলা অন্ধকারে নির্জন ছোটো ঘরের মধ্যে বসে মৃদুমন্দস্বরে গল্প করে যাবার মতো চিঠি। কিন্তু সেটা একটা ইচ্ছা মাত্র— কী করলে সে ইচ্ছাকে কার্যে পরিণত করা যায় তা ঠিক জানি নে। অর্থাৎ, চিঠিকে ঠিক সেই নির্জন ঘরের গল্পে পরিণত করার মতো ক্ষমতা নেই। আমাদের মনের খুব সহজ ইচ্ছাগুলিই বাস্তবিক দুঃসাধ্য। সেগুলি হয় আপনি পূর্ণ হয়, নয় কিছুতে পূর্ণ হয় না। অনেক সময় যুদ্ধ জমানো সহজ, কিন্তু গল্প জমানো সহজ নয়।

সাতারা
১৫ জুলাই ১৮৯৫

২২২

কলকাতা
২০ জুলাই। ১৮৯৫।

এবারে আমার পাঞ্চভৌতিকে নিদেন একটা চিন্তা করবার যোগ্য নূতন ভাব আছে, সেটা আমি দেখলুম কোনো পাঠকেই ঠিক গ্রহণ করতে পারে নি। আমি বলি যে, মৃত্যু যদি না থাকত তা হলে বস্তুজগতের মধ্যেই আমাদের কল্পনার অবসান হত, জগতের মধ্যে অনন্তের suggestion থাকত না। বস্তুজগৎটা হচ্ছে অটল reality —তার মধ্যে আমাদের কল্পনা এবং আমাদের ধর্মবুদ্ধির পরিতৃপ্তি হয় না। তার পরিতৃপ্তিসাধন করতে হলেই একটা ideal জগতের সৃজন করতে হয়, সেই ideal জগৎ স্থাপন করব কোথায়? মৃত্যু যেখানে এই বস্তুজগতের মধ্যে ফাঁক করে দিয়েছে। সেই মৃত্যুর পারেই আমাদের স্বর্গ, আমাদের দেবতাসম্মিলন, আমাদের সম্পূর্ণতা, আমাদের অমরতা। বস্তুজগৎ যদি অটল কঠিন প্রাচীরে আমাদের ঘিরে রেখে দিত,

এবং মৃত্যু যদি তার মধ্যে মধ্যে বাতায়ন খুলে না রেখে দিত তা হলে আমরা যা আছে তারই দ্বারা সম্পূর্ণ বেষ্টিত হয়ে থাকতুম। এ ছাড়া আর যে কিছু হতে পারে তা আমরা কল্পনাও করতে পারতুম না। মৃত্যু আমাদের কাছে অনন্ত সম্ভাবনার দ্বার খুলে রেখে দিয়েছে। মৃত্যুর পরে কী হতে পারি তার আর সীমা নেই, এবং মৃত্যু পুরাতনকে অপসারিত করে দেয় বলেই অনাগত অসীম নূতন আমাদের ideal আশাকে পোষণ করতে থাকে। ভালো কবিতার প্রধান কবিত্ব হচ্ছে তার suggestiveness। জগৎরচনার মধ্যে সেই suggestiveness মৃত্যুর মধ্যে— সেইখানেই আমরা অনুভব করে থাকি যে, আরও ঢের আছে এবং আরও ঢের হতে পারে। যেমন অন্ধকার রাত্রেই আকাশে অসীম জগতের আভাস দেখা যায়, দিনের আলোকে কেবল এই পৃথিবীই জাজ্বল্যমান হয়ে ওঠে— তেমনি মৃত্যুতে অনন্তের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ আমরা অনুভব এবং অনুমান করি; যদি মৃত্যু না থাকত তা হলে আপনার দীনহীন অস্তিত্বের মধ্যেই সংকীর্ণ ভাবে বদ্ধ হয়ে থাকতুম; মানবাত্মার সর্বাপেক্ষা মহৎ কবিত্বের স্থান, পরলোক এবং দেবলোক, যা আমাদের ধর্মবুদ্ধি এবং সৌন্দর্যবোধের প্রধান পরিতৃপ্তির স্থান, তার আমরা আভাস বা উদ্দেশ পেতুম না। তা ছাড়া আমাদের অস্তিত্ব, মাঝে মাঝে যদি ছেদ না পেত তা হলে বিপর্যয় কুৎসিত হয়ে উঠত। এক দিকে পরিষ্কার definiteness আর-এক দিকে অসীম suggestiveness— এই দুইয়ে মিলে যথার্থ সৌন্দর্য গঠিত হয়— মৃত্যুতেই যেমন আমাদের জীবনকে এক দিকে সীমাবদ্ধ করে তেমনি সেই মৃত্যুতেই আমাদের জীবনকে আর-এক দিকে সীমামুক্ত করে দেয়। ব্যক্তিগত হিসাবে দেখতে গেলে মৃত্যুটা উৎকট এবং তার মধ্যে কোনো সান্ত্বনা নেই। কিন্তু বিশ্বজগতের হিসাবে দেখতে গেলে মৃত্যুটা অতি সুন্দর এবং মানবাত্মার যথার্থ সান্ত্বনাস্থল।

কিন্তু আমি বারম্বার দেখেছি পাঞ্চভৌতিকে আমি যে-সকল চিন্তার অবতারণ করি তার ঠিক মর্মটি প্রায় কেউ গ্রহণ করে না। আসলে বোধ হয় আমি ভালো করে বোঝাতে পারি নে— বোঝানোও বিষম শক্ত।

সাতারা
২৪ জুলাই ১৮৯৫

২২৩

কলকাতা
৩ অগস্ট্। ১৮৯৫।

লোকের খ্যাতির মধ্যে খুব একটা মাদকতা আছে সে কথা স্বীকার করতেই হবে, কিন্তু সর্ববিধ মাদকতার মতো খ্যাতির মাদকতারও ভারী একটা অবসাদ এবং শ্রান্তি আছে। প্রথম উচ্ছ্বাসের পরেই সমস্ত শূন্য এবং মিথ্যা মনে হয়— মনে হয় এই আত্মাবমাননাজনক আত্মাবনতিকর মোহ থেকে সর্বপ্রযত্নে দূরে থাকা উচিত, এই জিনিসটা যাতে অন্তরাত্মার একটা অত্যাবশ্যক নেশার মতো না দাঁড়িয়ে যায় সে জন্যে বিশেষ সাবধান থাকা উচিত। প্রথমত লোকের খ্যাতি পেলেই নিজের

যোগ্যতা সম্বন্ধে একটা অবিশ্বাস জন্মে, তার পরে সেই অনেকখানি মিথ্যা জিনিস ফাঁকি দিয়ে পাচ্ছি বলে ভারী একটা অসন্তোষের উদয় হয়— অথচ আমি যে বাংলার পাঠক-সাধারণের অনাদরের যোগ্য তাও আমার আন্তরিক বিশ্বাস নয় এই এক আশ্চর্য ব্যাপার। কিন্তু দিন-দিন যতই আমার খ্যাতি বাড়ছে ততই এক দিকে আমি খুশি হচ্ছি অন্য দিকে সব ছেড়েছুড়ে লোকের ভিড় ঠেলেঠুলে নিজের যথার্থ প্রাইভেট বাসস্থানের নিভৃত কোণে ঢোকবার প্রবল ইচ্ছা বোধ হচ্ছে। সাধনায় প্রতি মাসে লোকচক্ষে নিজের নামটার পুনরাবৃত্তি করতে একেবারে বিরক্ত ধরে গেছে। এটা আমি বেশ বুঝতে পারছি খ্যাতি জিনিসটা ভালো নয়— ওতে অন্তরাত্মার কিছুমাত্র ক্ষুধানিবৃত্তি হয় না, কেবল তৃষ্ণা বেড়ে ওঠে।

সাতারা
৭ অগস্ট্ ১৮৯৫

২২৪

শিলাইদহ
১৪ অগস্ট্। ১৮৯৫।

যত বিচিত্র রকমের কাজ আমি হাতে নিচ্ছি, কাজ জিনিসটার প্রতি আমার শ্রদ্ধা মোটের উপর ততই বাড়ছে। অবশ্য, সাধারণভাবে জানতুম যে, কর্ম অতি উৎকৃষ্ট শ্রেষ্ঠ পদার্থ। কিন্তু সে-সমস্ত পুঁথিগত বিদ্যা। এখন বেশ স্পষ্টরূপে বুঝতে পারছি কাজের মধ্যে পুরুষের যথার্থ চরিতার্থতা। কর্মের মধ্যে পুরুষের অনেকগুলি বৃত্তিকে সর্বদাই নিয়োগ করে রাখতে হয়— জিনিস চিনতে হয়, মানুষ চিনতে হয়, বৃহৎ কর্মক্ষেত্রের সঙ্গে পরিচয় রাখতে হয়। এখন আমার কাছে একটা নূতন রাজ্য খুলে গেছে। দেশ দেশান্তরের লক্ষ লক্ষ লোক যে-এক বৃহৎ বাণিজ্যক্ষেত্রের মধ্যে অহর্নিশি প্রাণপণ প্রয়াসে প্রবৃত্ত আমি তারই মধ্যে অবতীর্ণ হয়েছি— মানুষের পরস্পরের শৃঙ্খলাবদ্ধ সম্বন্ধ এবং কর্মের সুদূরবিস্তৃত উদারতা আমার প্রত্যক্ষগোচর হয়েছে। সমস্ত চিনতে এবং শিখতে, খাটতে এবং চিন্তা করতে, বেশ একটি গৌরব অনুভব করা যায়। পুরুষের কাজের একটা এই মাহাত্ম্য যে, কাজের খাতিরে তাকে নিজের ব্যক্তিগত সুখ দুঃখকে অবজ্ঞা করে সংক্ষেপ করে নিয়ে চলতে হয়। মনে আছে, সাজাদপুরে থাকতে সেখানকার খানসামা একদিন সকালে দেরি করে আসাতে আমি ভারী রাগ করেছিলুম; সে এসে তার নিত্যনিয়মিত সেলামটি করে ঈষৎ অবরুদ্ধ কণ্ঠে বললে, 'কাল রাত্রে আমার আট বছরের মেয়েটি মারা গেছে।' এই বলে সে ঝাড়নটি কাঁধে করে আমার বিছানাপত্র ঝাড়পোঁচ করতে গেল। আমার ভারী কষ্ট হল— কঠিন কর্মক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা অন্তরঙ্গ শোকেরও অবসর নেই। কিন্তু সে অবসরটা নিয়ে ফল কী? কর্ম যদি মানুষকে বৃথা অনুশোচনার বন্ধন থেকে মুক্ত করে সম্মুখে প্রবাহিত করে নিয়ে যেতে পারে তবে তার চেয়ে ভালো শিক্ষা আর কী আছে! যা হবার নয় সে তো আয়ত্তের অতীত, যা হতে পারে তা সংসারে যথেষ্ট এবং তা এখনি হাতের কাছে প্রস্তুত। যে মেয়ে মরে গেছে তার জন্যে শোক ছাড়া আর কিছুই করতে

পারি নে, কিন্তু যে ছেলে বেঁচে আছে তার জন্যে রীতিমত খাটতে হবে। কল্পনানেত্রে এই পৃথিবীব্যাপী পুরুষের কর্মক্ষেত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করি—সংসারের রাজপথের দুই ধারে সকলে কঠিন পরিশ্রমে কাজ করছে—কেউ চাকরি করছে, কেউ ব্যাবসা করছে, কেউ চাষ করছে, কেউ মজুরি করছে—অথচ এই কর্মক্ষেত্রের নিচে দিয়ে প্রত্যহই কত মৃত্যু কত শোক দুঃখ নৈরাশ্য গোপনে অন্তঃশীলা বহে যাচ্ছে, যদি তারা জয়ী হতে পারত তা হলে মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত কর্মচক্র বন্ধ হয়ে যেত। ব্যক্তিগত শোক দুঃখ নিচে দিয়ে চলে যায় এবং তার উপরে কঠিন পাথরের ব্রিজ বেঁধে লক্ষলোকপূর্ণ কর্মের রেলগাড়ি আপন লৌহপথে হুহুঃ শব্দে চলে যায়—নির্দিষ্ট স্থান ছাড়া কারও খাতিরে কোথাও থামে না। কর্মের এই নিষ্ঠুরতার মধ্যে একটা কঠোর সান্ত্বনা আছে।

সাতারা
১৯ অগস্ট্ ১৮৯৫

২২৫

শিলাইদহ
১৮ অগস্ট্। ১৮৯৫।

কুটীরবাসের একটা অভিজ্ঞতা আমার মন্দ লাগল না—যদিও টেবিল চৌকি ক্যাম্প্‌খাট নিয়ে ঠিক রীতিমত কুটীরবাস হয় না। তবু ডাঙার উপরে উঠে বর্ষার সবুজ পৃথিবীটা একবার দেখে আসা গেল, সেটা বেশ লাগল। বসে বসে অনেক ক্ষণ প্রচুর ভিজে ঘাসের মধ্যে গোরু এবং ছাগলের চরাটা এবং তার সঙ্গে রাখাল বালিকাদের পর্যবেক্ষণ করে অনেকটা সময় কাটত। মানুষের যে অবস্থাটা গাছপালা শস্য গোরু বাছুর এবং একতলা মেটে ঘরের সঙ্গে সংলগ্ন—এবং ধান কাটা, নৌকোয় খেয়া দেওয়া, জল তোলা, কাপড় কাচার সঙ্গে জড়িত—সেইটে নিকট থেকে দেখলে বেশ একটি মাধুর্য অনুভব করা যায়। অনেকে বলে, ওদের মধ্যে যে সুখ আমরা কল্পনা করি সেটা ঠিক সমূলক নয়। কিন্তু সে কথা মিথ্যা। ওরা অনেকটা ছেলেমানুষের মতো, সেই জন্যে ওরা সমগ্র হৃদয় দিয়ে সুখ সন্তোষ উপভোগ করতে পারে। আমাদের সুখ বড়ো জটিল এবং দুর্লভ এবং বহুল পরিমাণে কৃত্রিম হয়ে পড়েছে। আমাদের মনে সহজে মোহ উৎপন্ন হয় না, আমরা আত্মবিস্মৃত হতে পারি নে, স্বল্পটুকুকে সরল কল্পনার দ্বারা বাড়িয়ে নিতে পারি নে—বরং অনেকখানিকে অসন্তুষ্ট বিশ্লেষণের দ্বারা কমিয়ে নিই। তাই বলে আবার চাষা হতেও চাই নে—কেবল ওদের সন্তোষ এবং সরলতাটুকু চাই আর সমস্ত বুদ্ধিবিদ্যা নিজের যা পুঁজি আছে তাও ছাড়তে চাই নে।

সাতারা
২০ অগস্ট্ ১৮৯৫

২২৬

শিলাইদহ
২০ অগস্ট্। ১৮৯৫।

মেঘবৃষ্টি কেটে গিয়ে কাল থেকে নির্মল উজ্জ্বল সুন্দর শরৎকালের ভাব দেখা দিয়েছে। এ ক'দিন নদীর জল কমে গিয়ে নদী হঠাৎ খুব প্রশান্ত নিস্তরঙ্গ ভাব ধারণ করেছে, ও পারে চরের কাছে জেলেরা এক-কোমর জলে নেবে মাছ ধরছে, এ পারে নদীর ধারে গোরু চরছে—একটি সুবিস্তীর্ণ সুন্দর সমুজ্জ্বল শান্তি জলে স্থলে শূন্যে আপন উদার মাতৃক্রোড় প্রসারিত করে বসে আছে, অত্যন্ত নিকটে এসে আমার মস্তক চুম্বন করছে। এইরকম সকালবেলায় অতীতকালের সমুদয় সুমধুর দিনগুলিকে আজকের দিনের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়ে অখণ্ডসমগ্রভাবে দেখতে পাওয়া যায়। তোকে পূর্বে একবার বলেছিলুম, [বব], আমার ইচ্ছে করে আমার সমুদয় চিঠিগুলো থেকে সমস্ত তুচ্ছ ব্যক্তিগত কথা বাদ দিয়ে, কেবল মতামত বর্ণনা এবং সৌন্দর্যসম্ভোগ, কেবল চিন্তা এবং কল্পনাগুলিকে বেছে নিয়ে একত্র গেঁথে গেলে আমার অধিকাংশ জীবিতকালের সমস্ত মাধুর্য একেবারে ঘনীভূতভাবে পাওয়া যেতে পারে—আমার পক্ষে সে একটা বৃহৎ বিস্তীর্ণ উপবনের মতো বেড়াবার জায়গা হয়—যদি এক সময়ে মনের সূক্ষ্ম সম্ভোগশক্তি হ্রাস হয়ে আসে, যদি নূতন জগৎ তার দ্বারগুলি একে একে আমার কাছে রুদ্ধ করতে থাকে, তা হলে আমার সেই অমূল্য পুরাতন জগৎটি আমার কাছে পরম আশ্রয়ের মতো থাকে। বিশ্বজগতের সঙ্গে আমার অন্তরঙ্গ আত্মীয়তার কথা আমার অন্য কোনো লেখায় তেমন যথার্থ সত্যভাবে নেই যেমন আমার চিঠির মধ্যে আছে—সেই অংশগুলি যদি পাই তা হলে আমার জীবন অনেকটা বৃহত্তর হয়ে ওঠে।

সাতারা
২৫ অগস্ট্ ১৮৯৫

২২৭

শিলাইদহ
২৩ অগস্ট্। ১৮৯৫।

এই বর্ষার বিপুল নদীস্রোত তার অবিশ্রাম কলশব্দ নিয়ে আমাকে এমন পরিপূর্ণ সঙ্গদান করে কেন তাই ভাবছিলুম। তার কারণ আমি বেশ বুঝতে পারছি, কিন্তু প্রকাশ করে বলা শক্ত। নদীটা যেন একটা সুবৃহৎ প্রাণপদার্থের মতো—একটা প্রবল উদ্যমরাশি বহুদূর হতে গর্বভরে কলস্বরে অবহেলে চলে আসছে। তাই দেখে আমাদের প্রাণের মধ্যে একটা আত্মীয়তার স্পন্দন অনুভূত হতে থাকে। একটা দুর্ধর্ষ বন্য ঘোড়াকে যদি প্রান্তরের মধ্যে স্বাধীনতার উদ্দাম আনন্দে ছুটতে দেখা যায় তা হলে সেই দেখে আমাদের ভিতরকার প্রাণের উদ্যম আন্দোলিত হয়ে ওঠে। আমি অনেকবার ভেবে দেখেছি, প্রকৃতির মধ্যে যে এমন একটা গূঢ় গভীর

আনন্দ পাওয়া যায় সে কেবল তার সঙ্গে আমাদের একটা সুবৃহৎ আত্মীয়তার সাদৃশ্য অনুভব করে—এই নিত্যসঞ্জীবিত সবুজ সরস তৃণলতা-তরুগুল্মে, এই জলধারা, এই বায়ুপ্রবাহ, এই সতত ছায়ালোকের আবর্তন, এই ঋতুচক্র, এই অনন্ত-আকাশ-পূর্ণ জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর প্রবহমান স্রোত, পৃথিবীর অনন্ত প্রাণিপর্যায়, এই সমস্তের সঙ্গেই আমাদের নাড়ীর রক্তচলাচলের যোগ রয়েছে—সমস্ত বিশ্বচরাচরের সঙ্গে আমরা একই ছন্দে বসানো—এই ছন্দের যেখানে যতি পড়ছে, যেখানে ঝংকার উঠছে, সেইখানেই আমাদের মনের ভিতর থেকে সায় পাওয়া যাচ্ছে—প্রকৃতির সমস্ত অণুপরমাণু যদি আমাদের সগোত্র না হত, যদি প্রাণে সৌন্দর্যে এবং নিগূঢ় একটা আনন্দে অনন্তকাল স্পন্দমান হয়ে না থাকত, তা হলে কখনোই এই বাহ্য জগতের সংসর্গে আমাদের এমন একটা আন্তরিক আনন্দ ঘটত না। যাকে আমরা অন্যায়পূর্বক জড় বলে থাকি সেই জগতের সঙ্গে আমাদের চেতনার একটা যোগাযোগের গোপন পথ আছে; নইলে কখনোই নির্জীবের প্রতি জীবনের, জড়ের প্রতি মনের, বাইরের প্রতি অন্তরের এমন একটা অনিবার্য ভালোবাসার বন্ধন থাকতেই পারে না। আমার সঙ্গে এই বিশ্বের ক্ষুদ্রতম পরমাণুর বাস্তবিক কোনো জাতিভেদ নেই, সেই জন্যেই এই জগতে আমরা একত্রে স্থান পেয়েছি—নইলে আমাদের উভয়ের জন্যে দুই ভিন্ন জগৎ সৃজিত হয়ে উঠত। আমি যখন মাটির সঙ্গে মাটি হয়ে যাব, তখনও আমার অনন্ত প্রাণময় বিশ্বাত্মীয়ের সঙ্গে বন্ধন বিচ্ছিন্ন হবে না—আমি আমার নিজের ভিতরকার সহজ আনন্দ থেকে এইটে অনুভব করি। আমার আর-কোনো যুক্তি নেই।

সাতারা
২৮ অগস্ট ১৮৯৫

২২৮

শিলাইদহ
২৪ অগস্ট। ১৮৯৫।

এই-যে অনাদি অনন্ত আকাশ-পূর্ণ নিত্য স্পন্দমান ঘূর্ণ্যমান অণুপরমাণুর সঙ্গে আমাদের একটা নিগূঢ় আনন্দময় আত্মীয়তার বন্ধন আছে এ সত্যটা মাঝে মাঝে আমার মন থেকে ম্লান হয়ে অদৃশ্যপ্রায় হয়ে যায়—হয়তো অনেক দিনের অভ্যাস-বশত কথাটা আমার স্মৃতিপটে লেখা থাকে, কিন্তু সেটাকে প্রত্যক্ষ দীপ্যমান-ভাবে অন্তরাত্মার মধ্যে অনুভব করতে পারি নে। তখন ওটাকে কবিকল্পনা বলে ভ্রম হয়। নিজের মধ্যে নিজে অনুভব করার মতো সত্যের এমন প্রত্যক্ষ প্রমাণ আর কী আছে? কিন্তু অনেক সময় মন নানা কাজে নানা চিন্তায় বিক্ষিপ্ত উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে যায়, কল্পনার সূক্ষ্ম অনুভবশক্তি রসাভাবে শুষ্ক হয়ে আসে, তখন অন্তঃকরণের সেই প্রশান্তগভীর পরিপূর্ণ প্রসারতা থাকে না যার অপার নিস্তব্ধতার মধ্যে সত্যের সমস্ত দূরাগত ধ্বনিগুলি নিজেরই ভিতরকার কথাগুলির মতো অত্যন্ত স্পষ্টরূপে শোনা যায়। তখন সমস্তই জড়িয়ে মিশিয়ে ঘুলিয়ে যায়, তখন কেবল বাইরের গোলমালগুলোকেই সত্য বলে মনে হয় এবং অন্তরের চিরন্তন কথাগুলিকেই

স্বপ্নদর্শীর কাল্পনিকতা বলে ভ্রম হতে থাকে। তা যদি না হত, যদি এই অনন্ত বিশ্বের সজীব আকর্ষণ চিরকাল স্পষ্ট এবং একান্ত সত্যভাবে অনুভব করতে পারতুম, তা হলে এমন চিরশান্তি এমন চিরসান্ত্বনা আর কিসে থাকত? তা হলে পৃথিবীর প্রাণময়ী মাটিকে বুকের মধ্যে আলিঙ্গন করে ধরে হৃদয়কে এই জগদ্‌ব্যাপী সৌন্দর্যের মধ্যে প্রসারিত করে দিতে পারতুম। দুঃখের বিষয় এই যে, ভিতরে খানিকটা শান্তি না থাকলে এই অখণ্ড শান্তিকে আপনার মধ্যে প্রতিফলিত দেখা যায় না, নিজের খানিকটা আনন্দ না থাকলে এই অখণ্ড আনন্দের সঙ্গে যোগ রক্ষা করতে পারা যায় না। সেই জন্যেই মাঝে মাঝে মফস্বলে এলে হঠাৎ এই বৃহৎ সত্য আমার সম্মুখে এক মুহূর্তে প্রতিভাত হয়ে ওঠে। কিন্তু যদি কালক্রমে আমার কল্পনার এই সজীবতা চলে যায়, বাহ্যপ্রকৃতি আমার মনেরই জড়ত্ব-বশত জড়বৎ প্রতিভাত হয়, তা হলে আজ যে কথাটাকে এমন অন্তরঙ্গ সত্য বলে জানছি সেইটেকে যৌবনকালের এক সময়ের একটা খেয়াল বলে মনে হবে— মনে হবে, বেশ একটি সুন্দর থিয়োরি— হয়তো প্রবীণ বয়সের শুষ্ক হাস্য উদ্রেক করবে। কিন্তু আমার এই প্রত্যক্ষ-অনুভূত গভীর আনন্দ তোর অনেক চিঠিতে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে, সেইগুলো দেখলে বোধ হয় শুষ্ক চিত্তের মধ্যে সরসতার সঞ্চার হতে পারবে —আমার প্রকৃতিনিহিত ধর্মটি (religion) ফিরে পাব।

কলকাতা
২ সেপ্টেম্বর ১৮৯৫

২২৯

শিলাইদহ
২০ সেপ্টেম্বর। ১৮৯৫।

আজ সেই ঝড়ের ভাবটা থেমে গিয়ে সকালে অল্প অল্প রোদ্দুর ওঠবার চেষ্টা করছে, কিন্তু এখনো সম্পূর্ণ কৃতকার্য হতে পারে নি। মেঘ আকাশময় ছড়ানো, পুবে হাওয়া খুব বেগে বইছে। ও পারে বিকশিত কাশবন আগুনের শিখার মতো ক্রমাগত কাঁপছে। এখান থেকে দূরের পদ্মার গর্জন শোনা যাচ্ছে। কাল পরশু দুদিন ঠিক আমার সেই নতুন গানের মতো দৃশ্যটা হয়েছিল—

ঝরঝর বরষে বারিধারা—
ফিরে বায়ু হাহাস্বরে জনহীন অসীম প্রান্তরে—
অধীরা পদ্মা তরঙ্গ-আকুলা—
নিবিড় নীরদ গগনে—
ইত্যাদি।

তার মধ্যে এই হতভাগ্য গৃহহারা ব্যক্তিটি স্টীমারের ছাতের উপরে আপাদমস্তক ভিজে একেবারে কাদা হয়ে গিয়েছিল। গায়ে সেই আমার মস্ত রেশমের আলখাল্লা পরা ছিল, সেটা ঝোড়ো বাতাসে চতুর্দিকে অত্যন্ত হাস্যকরভাবে উড়ে বেড়াতে লাগল— চোখের চশমা জল লেগে ঝাপসা হয়ে এল— হাতে যে বই ছিল তার মলাটটা আমার করকমলে অবিরল রঙিন অশ্রুপাত করতে লাগল। আমি কাল

পরশু প্রায় মাঝে মাঝে সেই গানটা গাচ্ছিলুম। গাওয়ার দরুন বৃষ্টির ঝরঝর, বাতাসের হাহাকার, গোরাই নদীর তরঙ্গধ্বনি একটা নূতন জীবন পেয়ে উঠতে লাগল—চারি দিকে তাদের একটা ভাষা পরিস্ফুট হয়ে উঠল এবং আমিও এই ঝড়-বৃষ্টি-বাদলের সুবিশাল গীতিনাট্যের একজন প্রধান অভিনেতার মধ্যে দাঁড়িয়ে গেলুম। সংগীতের মতো এমন আশ্চর্য ইন্দ্রজালবিদ্যা জগতে আর কিছুই নেই—এ এক নূতন সৃষ্টিকর্তা। আমি তো ভেবে পাই নে, সংগীত একটা নতুন মায়াজগৎ সৃষ্টি করে না এই পুরাতন জগতের অন্তরতম অপরূপ নিত্যরাজ্য উদ্‌ঘাটিত করে দেয়। গান প্রভৃতি কতকগুলি জিনিস আছে যা মানুষকে এই কথা বলে যে, 'তোমরা জগতের সকল জিনিসকে যতই পরিষ্কার বুদ্ধিগম্য করতে চেষ্টা করো-না কেন এর আসল জিনিসটাই অনির্বচনীয় এবং তারই সঙ্গে আমাদের মর্মের মর্মান্তিক যোগ—তারই জন্যে আমাদের এত দুঃখ, এত সুখ, এত ব্যাকুলতা।'

কলকাতা
২১ সেপ্টেম্বর ১৮৯৫

২৩০

শিলাইদহ
২১ সেপ্টেম্বর। ১৮৯৫।

আমি নিশ্চয় জানি যে, একবার যদি আমি নিজেকে ঘাড় ধরে কোনো একটা রচনাকার্যে নিযুক্ত করাতে পারি তা হলে লেখা বেশ হু হু করে এগোতে থাকে, এবং যতই সে লেখার মধ্যে মন নিবিষ্ট হতে থাকে ততই মনটা একটা বিশুদ্ধ আনন্দের দ্বারা পরিব্যাপ্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, প্রথম লিখতে প্রবৃত্ত হবার পূর্বে কিছুতেই মনকে লওয়াতে পারি নে। মন বলে, 'আমার লেখা-ফেখা সব ফুরিয়ে গেছে, আর আমার লেখবার বিষয়ও কিছু নেই, আমার লেখবার ক্ষমতাও প্রায় শেষ হয়ে এল—এ অবস্থায় তুমি আমাকে খোঁচা দিয়ে লিখিয়ে সাধারণের সামনে অপদস্থ কোরো না।' আমি তাকে বলি, 'ঐ কথা তো তুমি বরাবর বলছ, কিন্তু লিখতেও তো কসুর করো না।' আমার মন একশ্রেণীয় ঘোড়ার মতো যারা প্রথম গাড়িতে জোৎবামাত্র লাথি ছুঁড়ে পিছন হঠতে থাকে, কিন্তু একবার যদি মেরে-কেটে বাপুবাছা বলে দুই পা এগিয়ে দেওয়া যায় তা হলে বাকি রাস্তাটা একেবারে চার পা তুলে ছুটতে থাকে। এখন সে কেবলই তার কলকাতার আস্তাবলটার দিকে ঝুঁকছে—আবার একবার যখন সে আপনার রচনার এবং কল্পনার মধ্যে আপনার পূর্ণ অধিকার ফিরে পাবে, খানিকটা দূর এগিয়ে যাবে, তখন মনে করবে এই কল্পনালোকের মধ্যে আমার বাস্তবলোক প্রকৃতভাবে আছে। লিখতে গিয়ে আপনার নিগূঢ় মানসরাজ্যের মধ্যে গভীর ভাবে প্রবেশলাভ হতে থাকে এবং সেখানে গিয়ে দেখি, জীবনে আমার বাঞ্ছিত পুষ্প থেকে যত মধু আহরণ করেছিলুম তার অধিকাংশই সেখানে সঞ্চিত হয়ে আছে। মনের সেই নিত্যরাজ্যের মধ্যে প্রবেশ করবার দ্বার সব সময়ে খুঁজে পাওয়া যায় না।

(কাল থেকে মেঘ কেটে গিয়ে নবীন শরৎকাল আমার চতুর্দিককে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে, তাই আমাকে এক রকম স্মৃতিশিশিরসিক্ত করে তুলেছে।)

কলকাতা
২২ সেপ্টেম্বর ১৮৯৫

২৩১

শিলাইদহ
২৫ সেপ্টেম্বর। ১৮৯৫।

মানুষ আপনাদের সমাজটাকে নিজের হাতে এমনি জড়িয়ে পাকিয়ে তুলেছে যে, এ সমাজে সুখী হওয়া এবং সুখী করা বিষম একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু দুঃখটা হয়তো মানুষের পক্ষে অত্যন্ত দরকারী জিনিস। যুদ্ধ করা, চেষ্টা করা, সহ্য করা, ত্যাগ করা—হয়তো সুখী হওয়ার চেয়ে বেশি আবশ্যক। কষ্টে মানুষকে মানুষ করে তুলতে থাকে, এবং সে মনুষ্যত্বের মূল্য কোথাও না কোথাও আছে। ধর্মব্যবসায়ীরা বলে, ঈশ্বর যাকে ভালোবাসেন তাকে পীড়া দেন। কথাটা অনেক সময় কপট 'ক্যাণ্ট্'এর মতো শুনতে হয়, কিন্তু তাই বলে ওটা একেবারে অমূলক নয়। কষ্টই আমাদের আত্মার আমাদের প্রেমের আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদের একমাত্র মূল্য।...দুর্ভাগ্যের বিষয় আমাদের এমন সংগতি নেই যে কারও দুঃখ দূর করতে পারি। সেই জন্যে টাকা করা কাজটাকে ছোটো মনে হয় না। যদি আমাদের এই ব্যবসায়ে কিছু টাকা সংগ্রহ করে উঠতে পারি তা হলে অনেক মনের আক্ষেপ মেটাতে পারব—এই মেটিয়ারিয়ল পৃথিবীতে কেবলমাত্র কামনার দ্বারা ভালোবাসার দ্বারা কারও দুঃখ দূর করা যায় না।

কলকাতা
২৬ সেপ্টেম্বর ১৮৯৫

২৩২

শিলাইদহ
২৬ সেপ্টেম্বর। ১৮৯৫।

যদিও ঝড় হবার কোনো লক্ষণ দেখছি নে—আকাশে মেঘ অতি অল্প, নদী অতি প্রশান্ত, দিবালোক নির্মল এবং উজ্জ্বল—স্রোতের মুখে বোট হুহুঃশব্দে ভেসে চলেছে, মৃদুমন্দ বাতাস দিচ্ছে, শরীর এবং মনের মধ্যে একটি পুলকমিশ্রিত জড়িমার সঞ্চার হচ্ছে।) আজ আমার নির্জনবাসের শেষ দিন; কাল থেকে অন্যান্য কাজের মধ্যে আতিথ্যে মন দিতে হবে...আমার সাধনা লেখার কাজে এখনও হাত দিই নি। কেবল সংগীত-আলোচনায় সরস্বতীর সঙ্গে খানিকটা সম্বন্ধ রেখেছি।

এখানে প্রকৃতি এত নিকটবর্তিনী, তার হৃৎকম্প এবং তার নিশ্বাস-হিল্লোল এত কাছে অনুভব করা যায় যে, সংগীত ছাড়া আর কোনোরকম চেষ্টাসাধ্য উপায়ে ভাবপ্রকাশ করতে ইচ্ছা হয় না। প্রকৃতির সঙ্গে গানের যত নিকট সম্পর্ক এমন আর কিছু না— আমি নিশ্চয় জানি এখনি যদি আমি জানলার বাইরে দৃষ্টি রেখে রামকেলি ভাঁজতে আরম্ভ করি তা হলে এই রৌদ্ররঞ্জিত সুদূরবিস্তৃত শ্যামলনীল প্রকৃতি মন্ত্রমুগ্ধ হরিণীর মতো আমার মর্মের কাছে এসে আমাকে অবলেহন করতে থাকবে। যতবার পদ্মার উপর বর্ষা হয় ততবারই মনে করি মেঘমল্লারে একটা নতুন বর্ষার গান রচনা করি, কিন্তু ক্ষমতা কৈ? এবং শ্রোতাদের সম্মুখে তো এই বর্ষার নিত্যমোহ নেই, তাদের কাছে একঘেয়ে ঠেকবে। কারণ, কথা তো ঐ একই—বৃষ্টি পড়ছে, মেঘ করেছে, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। কিন্তু তার ভিতরকার নিত্য-নূতন আবেগ, অনাদি-অনন্ত বিরহবেদনা, সেটা কেবল গানের সুরে খানিকটা প্রকাশ পায়।

কলকাতা
২৭ সেপ্টেম্বর ১৮৯৫

২৩৩

শিলাইদহ
৩০ সেপ্টেম্বর। ১৮৯৫।

তুই 'আমরা ও তোমরা' -লেখকের উপর ভয়ানক চটেছিস দেখলুম। লোকটা কিন্তু 'খুব মজা করেছি' মনে করে বসে আছে। মুশকিল এই-যে, রস যে বোঝে না তাকে বোঝানো যায় না; কারণ, রসবোধ ইন্দ্রিয়বোধের মতো প্রত্যক্ষবোধ। এমন-কি, ভালোমন্দ বিচারের সময় রসজ্ঞ ব্যক্তিদের মধ্যেই মতভেদ হয়। এই জন্যে সমালোচনার কাজটাকে ঝক্‌মারি মনে হয় এবং রচনার কাজটাও প্রায় তথৈবচ। কিন্তু তবুও তো সংসারে মোটের উপরে ভালোমন্দের বিচার এক রকম চলে যাচ্ছে এবং নিতান্ত মন্দ চলছে না—যদিচ ব্যক্তিগত মতবৈষম্যের অপ্রতুল নেই, তবুও তো কালক্রমে সাধারণ মতের অনেকটা ঐক্য দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। কতকটা natural selectionএর মতো—বৈষম্য (variation) প্রতিদিন নানা আকারে দেখা দিচ্ছে, কিন্তু যেগুলো টেকবার নয় সেগুলো নানা উপায়ে নষ্ট হচ্ছে এবং যেগুলো টেকসই সেগুলোর মধ্যে একটা ঐক্য দেখা যায়। আমরা লেখকরা যে-সমস্ত বীজ বপন করে যাচ্ছি যদি মানুষের মনের পক্ষে তার যথার্থ স্থায়ী উপযোগিতা থাকে তা হলে যে সমালোচক যেমনি নিন্দা করুন বীজ ব্যর্থ হবে না। আসল কথাটা এই যে, মানুষের মন জিনিসটা তেমন সুপরিচিত নয়— আমার মনে আপাতত কোন্‌টা ভালো লাগল বা না লাগল তা আমি বলতে পারি এবং মোটামুটি অন্য লোকের কী ভালো লাগবে বা না লাগবে তাও বলতে পারি, কিন্তু ব্যাপারটা একটু সূক্ষ্ম বা জটিল হলেই খুব নিপুণ সমঝদার ব্যতীত কেউ হিসাব করে বলতে পারে না। এবং নিপুণ সমঝদারের হিসাবেও মাঝে মাঝে ভুল থেকে যায়। সমঝদার লোকের লক্ষণ এই যে, তার বোধশক্তি যেমন সূক্ষ্ম সমবেদনাশক্তি তেমনি ব্যাপক, এবং সাহিত্য-অভিজ্ঞতাও খুব বিস্তৃত। নিজের ব্যক্তিগত ভালোমন্দ লাগাকে অতিক্রম

করে সমবেদনাশক্তি-প্রভাবে ভিন্ন রুচি এবং ভিন্ন অবস্থার মধ্যে প্রবেশ থাকা চাই। সে রকম লোক বড়ো দুর্লভ। বরঞ্চ লেখক অনেক ভালো পাওয়া যায়, কিন্তু প্রকৃত সমঝদার দুর্লভ। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই, তবুও উপযুক্ত-শিক্ষা-প্রাপ্ত সাধারণ পাঠকের কাছে সাধারণত ভালো জিনিসেরই আদর দাঁড়িয়ে যায়। অতএব রুচির কোনো প্রকৃত আদর্শ আছে কি না তা নিয়ে তর্কের দ্বারা কোনো সূক্ষ্ম মীমাংসা করা যায় না, অথচ ব্যবহারত মানুষের সমাজে একটা রুচির আদর্শ দাঁড়িয়ে যাচ্ছে এবং সম্পূর্ণ কদর্যতা কখনোই সৌন্দর্যরূপে টিকে যাচ্ছে না—ভ্রম হচ্ছে এবং তা সংশোধনও হয়ে যাচ্ছে। তাই যদি না হত, তা হলে সৌন্দর্য-সৃষ্টির সম্পূর্ণতাসাধনের জন্যে চিরকাল থেকে গুণিবর্গের এত প্রাণপণ চেষ্টা থাকত না—রুচির অমোঘ আদর্শ তারা প্রমাণ করতে পারে না, অথচ তার সত্যতার প্রতি তাদের অটল নিষ্ঠা।

কলকাতা
১ অক্টোবর ১৮৯৫

২৩৪

শিলাইদহ
৪ অক্টোবর। ১৮৯৫।

মেঘ বৃষ্টি কেটে গিয়ে আজ অতি সুন্দর দিন হয়েছে। আজ থেকে বোধ হয় শরৎকালটা ঠিক রীতিমত প্রতিষ্ঠিত হল। সুন্দর কথাটা অনেকবার অনেক জিনিসে ব্যবহার হয়—সেই জন্যে ও কথাটা অব্যবহার্য হয়ে এসেছে; অথচ ওর প্রতিশব্দও বড়ো বেশি নেই। যাই হোক, আজকের দিনটি দুর্লভ দিন—আমার মনটা এই আলোকে, স্তব্ধতায়, এই নির্মল শুভ্র স্বচ্ছ আকাশে একেবারে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। কে একজন জাদুকরী তার কোমল হস্তে আমার দুই চক্ষে একটি অমৃতময় মোহ মাখিয়ে দিয়ে গেছে, এই মধ্যাহ্নের নিস্তরঙ্গ নদী এবং ও পারের প্রফুল্ল-কাশবন-শোভিত বালির চর আমার কাছে একটি সুদূর পূর্বস্মৃতির মতো মনোহর লাগছে। বোটে লোকজন এলে আমার এই শরতের সুগভীর দিনগুলি আর এমন অখণ্ডভাবে পাব না বলে মনের ভিতরে ভারী একটা স্বার্থপর পরিতাপ উপস্থিত হচ্ছে। বোধ হয় সেই ব্যাঘাতের সম্ভাবনা আসন্ন হওয়াতেই আজকের এই নিস্তব্ধ নিভৃত উপভোগটি মনের মধ্যে এমন নিবিড়তর হয়ে এসেছে। যেন আমার কাছে আমার এই অভিমানিনী প্রবাসসঙ্গিনী করুণ-অনিমেষ-নেত্রে বিদায় নিতে এসেছে। আমাকে যেন বলছে, 'কিসের তোমার ঘরকন্না এবং আত্মীয়তাবন্ধন—আমি তোমার অনন্তকালের সাধনা, তোমার সহস্রজন্মপূর্বের প্রিয়তমা, অনন্ত জীবনের অসংখ্য খণ্ডপরিচয়ের মধ্যে তোমার একমাত্র চিরপরিচিতা—কোনো কারণেই আমার দুর্লভ সঙ্গ তুমি অবহেলা কোরো না, তোমার অন্তরাত্মা আমি ছাড়া আর কারও হাত থেকে সুখ দুঃখ সৌন্দর্যের চরমতম ফল গ্রহণ করে না।' কিন্তু বর্তমানের কর্মক্ষেত্রে এবং প্রত্যক্ষ সংসারে এ-সমস্ত কথা অলীক অমূলক শোনাবে—যদিও একটু দূর থেকে এবং একটু গভীর ভাবে পর্যালোচনা করে

দেখলে কথাটাকে তেমন লঘু মনে হয় না। এই শরতের অপর্যাপ্ত শান্তির মধ্যে আমার আত্মাকে স্তরে স্তরে সিক্ত করে নেওয়া আমার পক্ষে সামান্য ব্যাপার নয়। আমি যদি পাটের ব্যবসায়-উপলক্ষে কোনো দুর্গম স্থানে গিয়ে একলা পড়ে থাকি তা হলে লোকে আমার প্রশংসা করবে এবং আমারও কর্তব্যবুদ্ধি শান্ত থাকবে, কিন্তু যদি বিনা কার্যে কিছুদিন নিরুদ্দেশ থাকি তা হলে আপনাকে এবং পরকে ভুলিয়ে রাখা শক্ত হয়। এ জীবনে আমার যা-কিছু গভীরতম তৃপ্তি এবং প্রীতি, সে কেবল এই রকম নির্জনে সুন্দর মুহূর্তে পুঞ্জীভূতভাবে আমার কাছে ধরা দেয় —খণ্ডভাবে মিশ্রিতভাবে সংসার থেকে সেগুলো সংগ্রহ করা আমার পক্ষে অসম্ভব হয়েছে। আমার জীবনের অন্তস্তলে ক্রমশই একটা নূতন সত্যের উন্মেষ হচ্ছে— কেবল তার আভাস পাই। আমার পক্ষে সে একটা স্থায়ী নিত্য সম্বল, আমার সমস্ত জীবনখনিজ-গলানো খাঁটি সোনাটুকু—আমার সমস্ত দুঃখ কষ্ট বেদনার ভিতরকার অমৃতশস্য—সেটাকে যদি স্পষ্ট পরিস্ফুট নির্ভরযোগ্য দৃঢ় আকারে পাই তা হলে সে আমার টাকাকড়ি খ্যাতি-প্রতিপত্তি সুখ-সম্পদ সব চেয়ে বেশি জিনিস হয়—যদি সম্পূর্ণ নাও পাই তবু সেই দিকে চিত্তের স্বাভাবিক অনিবার্য প্রবাহ এও একটা পরম লাভ। যদি চিরকাল সুখে থাকতুম, মনের আশা মিটিয়ে নিয়ে দিনের সমস্ত কাজগুলি সেরে সহজেই দিন কাটত, তা হলে এই মানবজন্মে কতটুকুই বা পেতুম—কী বা জানতুম!

কলকাতা
৫ অক্টোবর ১৮৯৫

২৩৫

শিলাইদহ
৪ অক্টোবর। ১৮৯৫।

(দিনগুলি আজকাল অত্যন্ত সুমধুর হয়ে এসেছে—বাতাস সুশীতল, আকাশ সমুজ্জ্বল, তটরেখা শ্যামল, নদী সুপ্রশান্ত, মন স্বপ্নাতুর, কাজকর্ম স্বল্প, লেখা-টেথা বন্ধ, চারি দিকে ছুটি, এবং অন্তরে বাহিরে সৌন্দর্যপ্রবাহ। জলের কলস্বরে যেন কার অত্যন্ত সুকোমল আদরের কণ্ঠ মাখা রয়েছে; স্বচ্ছ নীলাকাশও স্নেহভারে আবিষ্ট এবং স্নিগ্ধ সমীরণও প্রীতিসুধায় পরিপূর্ণ; এইসব রঙগুলি—এই জলের গেরুয়া, এ পারের সাদা, ও পারের সবুজ, আকাশের নীল, রৌদ্রের সোনা, এ-সমস্ত কতই বেশভূষা দৃষ্টিহাসির অজস্রতারূপে আমার চতুর্দিকে শরৎকিরণে ঝলকিত হচ্ছে!) সমস্ত আকাশ যেন হৃদয়পুঞ্জের মতো আমাকে বেষ্টন করে ধরেছে। আশ্চর্য এই যে, পরশু আমার এখানে যখন জনসমাগম হবে তখন এরা যেন আর এখানে থাকবে না—মানুষ এলে যেন প্রকৃতির মধ্যে আর প্রকৃতির স্থান থাকবে না। মানুষ এত বেশি জায়গা জোড়ে, চতুর্দিকে এতটা জিনিসের অপব্যয় করে!

কলকাতা
৫ অক্টোবর ১৮৯৫

২৩৬

কুষ্টিয়া
৫ অক্টোবর। ১৮৯৫।

কে আমাকে গভীর গম্ভীর ভাবে সমস্ত জিনিস দেখতে বলছে, কে আমাকে অভিনিবিষ্ট স্থিরকর্ণে সমস্ত বিশ্বাতীত সংগীত শুনতে প্রবৃত্ত করছে, কে আমার উপরে একটি উদার বিষাদমন্ত্র পাঠ করে আমার সমস্ত চাপল্য প্রতিদিন মিলিয়ে নিয়ে আসছে এবং বাইরের সঙ্গে আমার সমস্ত সূক্ষ্ম ও প্রবলতম যোগসূত্রগুলিকে নিভৃত নিস্তব্ধ সজাগ সচেতন ভাবে অনুভব করতে দিচ্ছে! জীবনে অনেকবার অনেকদিন উপবাসী থেকে অনেক দুঃখব্রত উদ্‌যাপন করেছি—সেই তপস্যার ফলেই বিশ্বজগতের অনন্ত রহস্যময় গভীরতা আমার সম্মুখে প্রায় সর্বদাই সমুদ্রের মতো প্রসারিত হয়ে রয়েছে। হৃদয়ের প্রাত্যহিক পরিতৃপ্তিতে মানুষের কোনো ভালো হয় না, তাতে প্রচুর উপকরণের অপব্যয় হয়ে কেবল অল্প সুখ উৎপন্ন করে, এবং কেবল আয়োজনেই সময় চলে যায়—উপভোগের অবসর থাকে না। কিন্তু ব্রতযাপনের মতো জীবনযাপন করলে দেখা যায় অল্প সুখও প্রচুর সুখ এবং সুখই একমাত্র সুখকর জিনিস নয়। চিত্তের দর্শন স্পর্শন শ্রবণ মনন-শক্তিকে যদি সচেতন রাখতে হয়, যা-কিছু পাওয়া যায় তাকে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করবার শক্তিকে যদি উজ্জ্বল রাখতে হয়, তা হলে হৃদয়টাকে সর্বদা আধ-পেটা খাইয়ে রাখতে হয়—নিজেকে প্রাচুর্য থেকে বঞ্চিত করতে হয়। Goetheর একটি কথা আমি মনে করে রেখে দিয়েছি—সেটা শুনতে খুব সাদাসিধে, কিন্তু আমার কাছে বড়ো গভীর বলে মনে হয়—

Entbehren sollst du, sollst entbehren.
Thou must do without, must do without.

কেবল হৃদয়ের আহার নয়, বাইরের সুখস্বাচ্ছন্দ্য জিনিসপত্রও আমাদের অসাড় করে দেয়—বাইরের সমস্ত যখন বিরল তখনি নিজেকে ভালোরকমে পাওয়া যায়। সেই জন্যে কলকাতার অপেক্ষাকৃত স্বাচ্ছন্দ্য আমাকে অল্পকালের মধ্যেই পীড়ন করতে থাকে, সেখানকার ছোটোখাটো সুখসম্ভোগের মধ্যে আমার যেন নিশ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসে।

কিন্তু তপস্যা আমার স্বেচ্ছাকৃত নয়, সুখ আমার কাছে অত্যন্ত প্রিয়, তবু বিধাতা যখন বলপূর্বক আমাকে তপশ্চরণে প্রবৃত্ত করিয়েছেন তখন বোধ হয় আমার দ্বারা তিনি একটা বিশেষ কিছু ফল পেতে চান—শুকিয়ে গুঁড়িয়ে পুড়ে ঝুড়ে সব-শেষে বোধ হয় এ জীবনের থেকে একটা কিছু কঠিন জিনিস থেকে যাবে। মাঝে মাঝে তার আবছায়া-রকম অনুভব পাই। আমরা বাইরের শাস্ত্র থেকে যে ধর্ম পাই সে কখনো আমার ধর্ম হয়ে ওঠে না, তার সঙ্গে কেবল একটা অভ্যাসের যোগ দৃঢ় হয়ে আসে—যে ধর্ম আমার জীবনের ভিতরে সংসারের দুঃসহতাপে ক্রিস্টলাইজ্‌ড্‌ হয়ে ওঠে সেই আমার যথার্থ। আর-কাউকে তা ঠিক বোঝানো যাবে না, এবং বোঝাবার দরকারও নেই—তারা তার ঠিক মর্ম গ্রহণ করতে পারবে না এবং গ্রহণ করলেও বিকৃত করে ফেলবে—কিন্তু সেই জিনিসটাকে নিজের মধ্যে উদ্‌ভূত করে তোলাই মানুষের পক্ষে মনুষ্যত্বের চরম ফল। চরম বেদনায় তাকে

জন্মদান করতে হয়, নিজের শোণিত দিয়ে তাকে প্রাণদান করতে হয়—তার পরে জীবনে সর্বতোভাবে সুখী না হয়েও চরিতার্থ হয়ে মরা যেতে পারে।—

Entbehren sollst du, sollst entbehren.

কলকাতা
৬ অক্টোবর ১৮৯৫

২৩৭

কুষ্টিয়া
৬ অক্টোবর। ১৮৯৫।

আমার দিনগুলি রথীর কাগজের নৌকোর মতো আলস্যস্রোতে একটি একটি করে ভাসিয়ে দিচ্ছি। কেবল মাঝে মাঝে একটি আধটি করে গান তৈরি করছি এবং চৌকিটাতে অকর্মণ্যভাবে বসে সুর গুন্‌গুন্‌ করা যাচ্ছে; সুর ভুলছি এবং তৈরি করছি এবং সুখস্মৃতিময় বিষাদ-কোমল প্রশান্ত শরৎকালের মধ্যে কুণ্ডলায়িত হয়ে পড়ে রয়েছি। কবে থেকে যে কোমর বেঁধে রীতিমত কাজ আরম্ভ করতে পারব তা তো বুঝতে পারছি নে। এই বিস্তীর্ণ জল এবং নদীতীর থেকে একটি নিশ্বাস আমার গায়ের উপর এসে পড়ছে—একটি অত্যন্ত নিকটবর্তী প্রাণময় প্রীতিময় ভাবময় সঙ্গ আমার অন্তরে বাহিরে সংলগ্ন হয়ে রয়েছে, তাকে আমি কিছুতেই যেতে বলতে পারছি নে। এই অপর্যাপ্ত জ্যোতির্ময় নীলাকাশ আমার হৃদয়ের মধ্যে যেন অবনত হয়ে পড়েছে, এই আলোক আমার রক্তের মধ্যে প্রবেশ করছে, সর্বব্যাপী নিস্তব্ধতা আমার বক্ষকে দুই হাতে বেষ্টন করে ধরেছে, একটি সকরুণ অশ্রুসজল শান্তি আমার চোখের উপরে ললাটের উপরে চুম্বন করছে—আমি একটি পরিব্যাপ্ত অথচ নিভৃত সৌন্দর্যের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে রয়েছি। পুজোর ছুটিতে সবাই কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে বাড়িতে এসেছে, আমারও এই বাড়ি—আমার বাড়ির লোকটি আমার সমস্ত খাতাপত্র কেড়েকুড়ে নিয়ে বলছে, 'তুমি কাজ ঢের করেছ, এখন একটুখানি থামো।' আমিও নিরাপত্তিতে থেমে আছি, এর পরে কর্ম যখন আবার আমাকে একবার হাতে পাবেন তখন টুঁটি চেপে ধরবেন—তখন আমার এই ঘরের লোকটি, আমার এই ছুটির কর্ত্রী যে কোথায় থাকবেন, তাঁর আর কোনো উদ্দেশ পাওয়া যাবে না। এখন প্রায় মাঝে মাঝে মনে করি সাধনা, ত্রৈমাসিক এবং মাসিক, এই পদ্মার জলে ভাসিয়ে দিয়ে যাব। কিন্তু জানি, ভাসিয়ে দিলেও তিনি আমাকে পিছন-পিছন টেনে নিয়ে যাবেন।

কলকাতা
৭ অক্টোবর ১৮৯৫

২০৮

শিলাইদহ
১০ অক্টোবর। ১৮৯৫।

ঠিক যাকে সাধারণত ধর্ম বলে সেটা যে আমি আমার নিজের মধ্যে সুস্পষ্ট দৃঢ়রূপে লাভ করতে পেরেছি তা বলতে পারি নে, কিন্তু মনের ভিতরে ভিতরে ক্রমশ যে-একটা সজীব পদার্থ সৃষ্ট হয়ে উঠছে তা অনেক সময় অনুভব করতে পারি। বিশেষ কোনো-একটা নির্দিষ্ট মত নয়—একটা নিগূঢ় চেতনা, একটা নূতন অন্তরিন্দ্রিয়। আমি বেশ বুঝতে পারছি আমি ক্রমশ আপনার মধ্যে আপনার একটা সামঞ্জস্য স্থাপন করতে পারব, আমার সুখ-দুঃখ অন্তর-বাহির বিশ্বাস-আচরণ সমস্তটা মিলে জীবনটাকে একটা সমগ্রতা দিতে পারব। শাস্ত্রে যা লেখে তা সত্য কি মিথ্যা বলতে পারি নে, কিন্তু সে-সমস্ত সত্য অনেক সময় আমার পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী—বস্তুত আমার পক্ষে তার অস্তিত্ব নাই বললেই হয়। আমার সমস্ত জীবন দিয়ে যে জিনিসটাকে সম্পূর্ণ আকারে গড়ে তুলতে পারব সেই আমার চরম সত্য। জীবনের সমস্ত সুখদুঃখকে যখন বিচ্ছিন্ন ক্ষণিকভাবে অনুভব করি তখন আমাদের ভিতরকার এই অনন্ত সৃজনরহস্য ঠিক বুঝতে পারি নে—প্রত্যেক কথাটা বানান করে পড়তে হলে যেমন সমস্ত পদটার অর্থ এবং ভাবের ঐক্য বোঝা যায় না। কিন্তু নিজের ভিতরকার এই সৃজনশক্তির অখণ্ড ঐক্যসূত্র যখন একবার অনুভব করা যায় তখন এই সৃজ্যমান অনন্ত বিশ্বচরাচরের সঙ্গে নিজের যোগ উপলব্ধি করি; বুঝতে পারি, যেমন গ্রহ নক্ষত্র চন্দ্র সূর্য জ্বলতে জ্বলতে ঘুরতে ঘুরতে চিরকাল ধরে তৈরি হয়ে উঠছে, আমার ভিতরেও তেমনি অনাদিকাল ধরে একটা সৃজন চলছে—আমার সুখ-দুঃখ বাসনা-বেদনা তার মধ্যে আপনার স্থান গ্রহণ করছে—এর থেকে কী হয়ে উঠবে জানি নে, কারণ আমরা একটি ধূলিকণাকেও জানি নে, কিন্তু নিজের প্রবহমান জীবনটাকে যখন নিজের বাইরে অনন্ত দেশকালের সঙ্গে যোগ করে দেখি তখন জীবনের সমস্ত দুঃখগুলিকেও একটা বৃহৎ আনন্দ-সূত্রের মধ্যে গ্রথিত দেখতে পাই—আমি আছি, আমি হচ্ছি, আমি চলছি, এইটেকেই একটা বিরাট বৃহৎ ব্যাপার বলে বুঝতে পারি। আমি আছি এবং আমার সঙ্গে আর-সমস্তই আছে, আমাকে ছেড়ে এই অসীম জগতের একটি অণু পরমাণুও থাকতে পারে না; আমার আত্মীয়দের সঙ্গে আমার যে যোগ, এই সুস্নিগ্ধ সুন্দর শরৎপ্রভাতের সঙ্গে তার চেয়ে কিছু কম ঘনিষ্ঠ যোগ নয়, সেই জন্যে এই জ্যোতির্ময় শূন্যে আমার অন্তরাত্মাকে তার নিজের মধ্যে এমন করে পরিব্যাপ্ত করে নেয়—নইলে সে কি আমার মনকে তিলমাত্র স্পর্শ করতে পারত? নইলে তাকে কি আমি সুন্দর বলে অনুভব করতুম? আমার সমস্ত বাসনাস্বপ্নকে তার মধ্যে পরিপূর্ণ আকারে প্রতিফলিত করতে পারতুম? আমার সঙ্গে আর অনন্ত জগৎপ্রাণের সঙ্গে যে চিরকালের নিগূঢ় সম্বন্ধ সেই সম্বন্ধের প্রত্যক্ষগম্য বিচিত্র ভাষা হচ্ছে বর্ণ গন্ধ গীত—চতুর্দিকে এই ভাষার অবিশ্রাম বিকাশ আমাদের মনকে লক্ষ্য অলক্ষ্যভাবে ক্রমাগতই আন্দোলিত করছে—কথাবার্তা দিনরাত্রিই চলছে।

কলকাতা
১১ অক্টোবর ১৮৯৫

২৩৯

শিলাইদহ
১৫ অক্টোবর। ১৮৯৫।

রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করছে, জল ঝিক্‌মিক্‌ করছে, একটু একটু শীতের বাতাস দিচ্ছে, নদীর জল আয়নার মতো স্থির, মাঝে মাঝে এক-আধটা নৌকো পাশ দিয়ে ছল্‌ ছল্‌ শব্দে চলে যাচ্ছে। যদি একলা থাকতুম তা হলে এই সময়টাতে জানলার কাছে লম্বা কেদারায় আবিষ্টচিত্তে পড়ে থাকতুম— দিবাস্বপ্ন দেখতুম, এই রৌদ্রোজ্জ্বল আকাশের ভিতরকার একটি গভীর বেলাবলী রাগিণী শুনতে পেতুম এবং নিজের অস্তিত্বকে এই রৌদ্র জল বায়ুর ভিতরে সম্মিশ্রিত পরিব্যাপ্ত হিল্লোলিত অনুভব করতুম— নিজেকে অখণ্ড অনন্তকালের শয্যাতলে শয়ান উপলব্ধি করতুম— সমস্ত পৃথিবী জুড়ে তৃণগুল্ম তরুলতা পশুপক্ষী-রূপে যে জীবনরাশি উচ্ছ্বসিত হচ্ছে নিজেকে সেই কলধ্বনিমুখরিত চির-নির্ঝরের মধ্যে প্রবাহিত বোধ করতুম— আমার নিজের ব্যক্তিগত নিজস্ব-আবরণ এই শরতের রৌদ্রে বিগলিত হয়ে এই স্বচ্ছ আকাশের সঙ্গে মিশে যেত এবং আমি দেশকালের অতীত হয়ে যেতুম। কিন্তু এখন এ অবস্থায় ঠিক সেই আত্মবিস্মৃত ভাবের মধ্যে নিমগ্ন হওয়া শক্ত। আমি যে আমি, অর্থাৎ অমুকের বাপ, অমুকের স্বামী, অমুকের বন্ধু, শ্রীযুক্ত অমুক, সে সম্বন্ধে বিচিত্র প্রমাণ চতুর্দিকেই বর্তমান।

কলকাতা
১৬ অক্টোবর ১৮৯৫

২৪০

শিলাইদহ
১৬ অক্টোবর। ১৮৯৫।

কাল অনেক রাত পর্যন্ত ঘুম হয় নি, অনেক ক্ষণ জলিবোটে পড়েছিলুম— তার পরে বোটে আমার শোবার ঘরে এসে জানলার ধারে বেঞ্চিতে বসে অনেক দিন পরে একাকী যাপন করেছিলুম। নদীর জল স্থির আয়নার মতো ছিল— তারার আলোতে রাত্রের অন্ধকার স্বচ্ছ হয়ে এসেছিল, যেন একটা কালো কাঁচের ভিতর দিয়ে বিশ্বজগৎ দেখা যাচ্ছিল। রাত্রি যদিও গভীর ছিল কিন্তু সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ ছিল না, কারণ, আমার পাশের বোট থেকে আমার দুই প্রতিবেশিনী বিছানায় পড়ে পড়ে হাস্যালাপ করছিলেন এবং তখনো দুই-একটা নৌকো এসে গোলমাল করছিল— ও পারটা বেশ একটি স্নিগ্ধ অন্ধকারে আবৃত শান্তিময় দেখাচ্ছিল— আমাদের কুঠিবাড়ির বাগানের দীর্ঘ নারকেল গাছগুলি প্রহরীর মতো স্থির দাঁড়িয়ে ছিল এবং খুব দূর থেকে একটা কীর্তনের শব্দ শোনা যাচ্ছিল। একটুও বাতাস ছিল না। আমাদের জনপ্রাণীহীন বালির চরের উপর কাশবন তাদের শুভ্র পুষ্পস্তবকগুলি নম্র করে যেন ঘুমে ঢুলে পড়েছিল— অবশেষে অনেক ক্ষণ বসে বসে যখন আমার মাথাটাও নিদ্রা-

ভারে সেই রকম অবনত হয়ে এল তখন আমি বিছানার মধ্যে শুয়ে পড়লুম। আজ সকালে স্নানের পর মনে হচ্ছে যথেষ্ট ঘুম হয় নি। শরীরে যে-একটা ক্লান্তি বোধ হচ্ছে সেটা বেশ লাগছে— বেশ বুঝতে পারছি, এখনি যদি বিছানার উপর পা ছড়িয়ে দিয়ে পড়ি, হাতে একখানা ভ্রমণের বই তুলে নিই, গায়ে এই অল্প-অল্প শীতের বাতাসটি লাগতে থাকে, তা হলে ভারী আরাম করবে। সেই জন্যে সকালবেলাকার এই রকম ক্লান্তি আমার বড়ো ভালো লাগে— বেশ বিনা পরিতাপে হাতের সমস্ত কাজ ফেলে দিয়ে এক বেলার মতো ছুটি নেওয়া যায়। আজকাল আমার ছুটি বাঁধা— কিন্তু এরকম অকর্মণ্য দশা ভালো লাগে না। শরীরটা যখন সম্পূর্ণ সক্ষম থাকে তখন সে আপনিই কর্ম অন্বেষণ করে, মানুষকে অস্থির করে তোলে। কিন্তু আজ সে বেশ শান্ত আছে, নিজের পৃষ্ঠের মেরুদণ্ডটাই তার ভার বোধ হচ্ছে, সেটাকে শয্যার উপর বিস্তার করে দিতে পারলে সে নিশ্চিন্ত হয়।

কলকাতা
১৭ অক্টোবর ১৮৯৫

২৪১

পতিসর-পথে
২২ নবেম্বর। ১৮৯৫।

ছোট্ট নদীটির মধ্যে দিয়ে আমার বোট চলেছে— সমস্ত দিন একলা রয়েছি, কারও সঙ্গে একটিমাত্র কথাও কইতে হয় নি। এখানকার নদীতে স্রোত প্রায় নেই, শৈবাল ভাসছে, তার থেকে এক রকম নতুন ধরনের সুগন্ধ আসছে। পালে অত্যন্ত মৃদুমন্দ বাতাস লেগেছে— বোট খুব আস্তে আস্তে চলেছে, জলের উপর যে-একটি সুকোমল আলো পড়েছে এবং অদূরবর্তী তীরের উপর যে বিচিত্র সজীব সবুজ রঙের পর্যায় এবং নিভৃত গ্রামদৃশ্য শ্রেণীবদ্ধ হয়ে দেখা দিচ্ছে তাতে আমাকে আমার অহমিকা থেকে ক্রমশই বাইরে আকর্ষণ করে আনছে, জীবনের জটিল গ্রন্থিগুলি যেন একে একে উন্মোচিত হয়ে যাচ্ছে এবং আত্মগত হৃদয়ের তীব্রতা ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে আসছে। কলকাতার নানান কঠিন করস্পর্শের অনুরণন এখনো সমস্ত স্নায়ুর মধ্যে রীরী করছে— কিন্তু বেশ বুঝতে পারছি, ক্রমে ক্রমে সে সমস্তই থেমে যাবে, জগৎকে অনন্তবৃহৎ বলে জানব এবং জগতের সঙ্গে আমার সমস্ত সম্বন্ধ সহজ ও সরল হয়ে আসবে। এই সুস্নিগ্ধ অগাধ জনহীনতার মধ্যে প্রথম ঝাঁপ দিয়ে পড়বার সময় অনেকগুলি বন্ধনে টান পড়ে এবং কিছু ক্ষণের জন্যে বেদনা বোধ হয়— তার পরে অতল সান্ত্বনার মধ্যে যখন একটি অসীম স্নেহের আলিঙ্গন অনুভব করি, অত্যন্ত নিবিড় নিভৃত অন্তরতম আত্মীয়তার উদার বক্ষের মধ্যে নিজেকে ঘনিষ্ঠরূপে আবদ্ধ বোধ করি, তখন অন্তঃকরণের চিরসঞ্চিত উত্তাপ গভীর দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে মুক্তি লাভ করে; বুঝতে পারি 'সুখ অতি সহজ সরল', যথার্থ পরিতৃপ্তি নিজের অন্তরাত্মার মধ্যে এবং তার থেকে কোনো বিমুখ অদৃষ্ট আমাকে বঞ্চিত করতে পারে না। অহমিকার বাইরে একবার পদক্ষেপ করবা মাত্রই দেখা যায় সম্মুখে আনন্দময় প্রকাণ্ড জগৎ জীবনে যৌবনে সৌন্দর্যে সুবিস্তীর্ণ হয়ে রয়েছে— তখন মনে হয়

আমি এ জগতে জন্মগ্রহণ করেছি বলে ধন্য, এ জগতে অনন্তকাল থাকব বলে আমি ধন্য—আমি যা জেনেছি, যা পেয়েছি, যা অনুভব করেছি, তা একটিমাত্র হৃদয়ের পক্ষে আশ্চর্য বৃহৎ।

কলকাতা
২৩ নবেম্বর ১৮৯৫

২৪২

পতিসর
২৫ নবেম্বর। ১৮৯৫।

আমরা এম্নি গৃহপালিত প্রাণী যে, কলকাতা থেকে দুই পা বাড়িয়ে এই কালীগ্রামটিতে এসে মনে করছি একটা কী বিরাট ব্যাপার করে বসেছি। বাড়ির খুঁটির সঙ্গে এম্নি ছোটো দড়িতে আমাদের পা বাঁধা যে একটুখানি নড়লে-চড়লেই অমনি টান পড়ে—কেনই বা এত চিঠিপত্র লেখা এবং চিঠিপত্রের প্রত্যাশা! আমি সরে আসবামাত্রই আমার আত্মীয়সংসার একেবারে অগাধ সমুদ্রের মধ্যে পড়ে নি সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এই বৃহৎ পৃথিবীর মধ্যে মুক্তভাবে আনন্দে সঞ্চরণ করে বেড়াবার অধিকার বিধাতা বাঙালির ছেলেদের দেন নি—আমরা সব গোয়ালের গোরু, বড়ো জোর গ্রামের মাঠ পর্যন্ত আমাদের চরে বেড়াবার সীমা—তাও সর্বদাই রাখাল বালক লাঠি হাতে পিছন-পিছন লেগেই থাকে। কাল সন্ধেবেলায় গেটের উপর ডাউডেনের একটি প্রবন্ধ পড়ছিলুম—তাতে দেখছিলুম গেটে দুই বৎসরের জন্যে সমস্ত ছেড়েছুড়ে দিয়ে ইটালিতে গিয়ে নিবিষ্টমনে শিল্পালোচনা এবং সৌন্দর্যসম্ভোগ করে কী-এক নূতন প্রাণ এবং নূতন সম্পদ লাভ করেছিলেন, তাতে করে তাঁর প্রতিভা সহসা কী-এক অপূর্ব পরিণতি প্রাপ্ত হয়েছিল, তাঁর সমস্ত প্রকৃতি কী-একটা বিস্তীর্ণ শান্তি এবং বৃহৎ মর্যাদা অর্জন করেছিল। পড়লে আমাদের মতো কারাবাসীর চিত্ত বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে—মনে হয়, যা হতে পারা যেত তার অর্ধেকও হওয়া যায় নি, শিক্ষা এবং সাধনার অনেক বাকি আছে। মনে হয়, যদি গেটের মতো শুভাদৃষ্ট আমার হত, যদি এই বাংলাদেশে আমি জন্মগ্রহণ না করতুম, যদি এ দেশে মানবপ্রকৃতিবিকাশের উপযোগী সমস্ত খাদ্য থাকত, তা হলে আমি সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে অমরতা লাভ করতে পারতুম—এখন আমি অনেকটা পরিমাণে কৃপাপাত্র দীন। যদি পারি তো আমিও এক সময়ে জগতে বেরিয়ে পড়ব—এই আমার নিতান্ত ইচ্ছা।

কলকাতা
২৬ নবেম্বর ১৮৯৫

২৪৩

পতিসর
২৮ নবেম্বর?। ১৮৯৫।

একটা কোনো লেখায় হাত দেব দেব করছি, কিন্তু এখনও কিছুতেই মনটাকে কাজে নিবিষ্ট করতে পারছি নে—এই সুগভীর ঔদাসীন্য দূর করতে কতদিন যাবে জানি নে, আবার ততদিনে হয়তো কলকাতায় ফেরবার সময় এসে পড়বে। মনে হচ্ছে যেন অনেক দিন হল মফস্বলে এসেছি এবং এতদিন অবিচ্ছেদে অকর্মণ্য-ভাবে কাটিয়েছি—যদি গান তৈরি করবার সেই ঝোঁকটা থাকত তা হলে অবিশ্রাম গুন্ গুন্ শব্দে দিনগুলো উন্মত্তভাবে চলে যেত, সংগীতের নেশায় অচেতনভাবে বেলা কাটিয়ে দিতুম। সম্প্রতি জমিদারি কাজ দেখছি, খবরের কাগজ পড়ছি, বই পড়ছি এবং আহার করছি। কোনোমতে ঘাড় ধরে নিজেকে একবার লেখার স্রোতের মাঝখানে টেনে এনে ফেলতে পারলে আমি আর জগৎসংসারকে কেয়ার করি নে—তখন আমার জগৎ আমার নিজেরই জগৎ, সেখানে আমি একমাত্র রাজা, সেখানে আমি সমস্ত সুখ দুঃখ সৌন্দর্যের বিধাতাপুরুষ। আমি কত দিনেরই বা, আমার সুখ দুঃখ কত ক্ষণই বা থাকবে—কিন্তু আইডিয়ার প্রবাহ অনাদি উৎস থেকে উচ্ছ্বসিত হয়ে শত সহস্র মনের মধ্যে দিয়ে অনন্তকালের দিকে প্রবাহিত হয়ে চলেছে, সেই সূত্রে আমার সঙ্গে সমস্ত অতীতকালের এবং অনাগতকালের যোগ—সেই ভাবরাজ্যে আমি সমস্ত মনুষ্য, আমি রবি-নামক ব্যক্তিবিশেষ নই—সেখানে আমার আনন্দ এবং বেদনা বিশ্বব্যাপী। দুঃখের বিষয় এই যে, সেই ভাবরাজ্যের অধিষ্ঠাত্রীদেবী, চঞ্চলা লক্ষ্মীর চেয়ে ঢের বেশি চঞ্চলা—আমি যখন তাঁকে চাই তখন তিনি সব সময়ে দেখা দেন না, কিন্তু তিনি যখন আমাকে চান তখন আর আমার এক মুহূর্ত বিলম্ব করবার জো নেই। তখন দুনিয়ার সমস্ত জরুরি কাজ ফেলে দিয়ে তাঁর পদপ্রান্তে গিয়ে হাজির হতে হয়। কলকাতায় যখন নানাপ্রকার সংঘাত-সংঘর্ষে উদ্‌ভ্রান্ত ক্লিষ্ট হয়ে পড়ি তখন মনে মনে কল্পনা করি, সুদূর নির্জনে আমার জন্যে আমার ভাবলক্ষ্মী সুধাপাত্র নিয়ে বসে আছেন—যখন সেখানে এসে উপস্থিত হই তখন দেখি পাষাণী কলকাতাও আমার পিছনে পিছনে এসেছে এবং আমার ভাবলক্ষ্মী সুদূরতর নির্জনে গিয়ে লুকিয়েছেন। একদিন সন্ধ্যাবেলায় হয়তো নক্ষত্রালোকে বোটের ছাতের উপর আমার পিছনে নিঃশব্দপদে এসে দাঁড়াবেন এবং আমার কাঁধের উপর তাঁর কোমল হস্তখানি ধীরে ধীরে স্থাপিত করবেন, এবং আমি আস্তে আস্তে মুখ তুলে অনন্ত মৌন আকাশের মধ্যে তাঁর সেই মৌনমুখখানি দেখতে পাব—এবং তার পরে আমার আর কোনো অসম্পূর্ণতা থাকবে না।

কলকাতা
২৯ নবেম্বর?
১৮৯৫

২৪৪

পতিসর
২৯ নবেম্বর। ১৮৯৫।

কালীগ্রাম জায়গাটির কথা অবশ্য আমার অনেক চিঠিতে অনেক বার পেয়েছিস তার আর সন্দেহ নেই, কিন্তু তবু পুনরুক্তি না করলে চিঠিপত্র লেখা চলে না এবং হয়তো ঠিক পুনরুক্তি হবে না— কারণ, পুরাতন জিনিসও আমাকে নূতন করে আঘাত করে; আমার চিরপরিচিত প্রিয়পদার্থগুলির সঙ্গে প্রত্যেক পুনর্মিলনের মধ্যে একটা অংশ থাকে যেটা প্রথম মিলন, প্রত্যেক বারেই একটা নূতন বিস্ময় কোথা থেকে আবির্ভূত হয়। কালীগ্রাম স্থানটি ঠিক আমার প্রিয়পদার্থের মধ্যে নয়, কিন্তু তবু এখানে একবার এসে উপস্থিত হলে এর পুরাতন মুখশ্রী আমার কাছে একটি নবীন মনোহারিতা আনয়ন করে। এই অতি ছোটো নদী এবং নিতান্ত ঘোরো রকমের বহিঃপ্রকৃতি আমার কাছে বেশ লাগছে। ঐ অদূরেই নদী বেঁকে গিয়েছে— ওখানটিতে একটি ছোটোগ্রাম এবং গুটিকতক গাছ, এক তীরে পরিপক্কপ্রায় ধানের ক্ষেত, নদীর উঁচু পাড়ের উপর পাঁচ-ছটি গোরু ল্যাজ দিয়ে মাছি তাড়াতে তাড়াতে কচ্‌মচ্‌ শব্দে ঘাস খাচ্ছে, অন্য তীরে শূন্য মাঠ ধু ধু করছে— নদীর জলে শ্যাওলা ভাসছে, মাঝে মাঝে জেলেদের বাঁশ পোঁতা, বাঁশের উপর মাছরাঙা পাখি ছবির মতো স্থির হয়ে বসে রয়েছে, আকাশে উজ্জ্বল রৌদ্রে এক পাল চিল উড়ছে। দুপুর বেলা, সামনে গয়লাদের বাড়ির কাছে এক-খণ্ড সর্ষের ক্ষেতে বিকশিত সর্ষে ফুল একেবারে যেন আগুন করে রয়েছে— তাদের বাড়ির মেয়েরা জল তুলে নিয়ে গোরুর জাবনা দিচ্ছে, মাটি দিয়ে নিকোনো আঙিনায় বাঁধা গোরু গামলার মধ্যে মুখ ডুবিয়ে জাব খাচ্ছে, খড় স্তূপাকার করা রয়েছে, গয়লাদের বাড়ির কাছে আমাদের কাছারির একটা পুষ্করিণী-খনন হচ্ছে, রঙিন-কাপড়-পরা হিন্দুস্থানি মেয়েরা মাথায় ঝুড়ি করে মাটি নিয়ে একটা ডোবার মধ্যে ফেলে যাচ্ছে। এখানে সমস্তই খুব কাছাকাছি। নদীটির এ দিকে, ও দিকে, দু দিকেই ব্যাঁকের অন্তরালে অদৃশ্য হয়ে গিয়ে একটি অনতিদীর্ঘ ঝিলের মতো দেখতে— এই ঝিলের দুই প্রান্তে দুটিমাত্র গ্রাম। আমি এই ঝিলটির মাঝখানে বসে দুটি গ্রামের সমস্ত দৈনন্দিন কার্যকলাপের দ্বারা বেষ্টিত। এই আমার সমস্ত জগৎ। এরা দাওয়ায় বসে তামাক খাচ্ছে, স্নান করছে, কাপড় কাচছে, ছোটো ডোঙায় চড়ে হাত দিয়ে জল কেটে ছোটো নদী পার হচ্ছে, অপরাহ্নে গৃহভিত্তির যে দিকটাতে ছায়া পড়ে সেই দিকে দীর্ঘকাল স্থিরভাবে বসে দুই-একটি কর্মহীন মেয়ে সম্মুখজগতের চলাচল দেখে বেলা কাটিয়ে দিচ্ছে, গ্রাম্য পাঠশালার ছেলেরা মলিন খাতাপত্রের পুঁটুলি হাতে বাড়ি ফিরছে— সন্ধ্যাবেলায় ঘরে আলো জ্বালছে, গোয়ালে ধোঁওয়া দিচ্ছে, দুটি গ্রাম দুটি নীড়ের মতো নিস্তব্ধ হয়ে যাচ্ছে— আমি খড়্‌খড়েগুলো তুলে দিয়ে ভাইমার রাজসভায় গেটের কীর্তিকাহিনী অধ্যয়ন করছি। কোথায় নদীতীরে পতিসর, বোটের মধ্যে আমি, আর কোথায় বিচিত্র-কর্মসংকুল ভাইমার রাজসভার রাজকবি গেটে!

কলকাতা
৩০ নবেম্বর ১৮৯৫

২৪৫

সাহাজাদপুর
১৯ অগ্রহায়ণ। ১৩০২।

সকাল থেকে অত্যন্ত একটা পুরাতন কথা ক্রমাগতই মনে উদয় হচ্ছে যে, সংসারটা অনিত্য। কিন্তু তবু শোক দুঃখ মৃত্যু এমনভাবে আমাদের আঘাত করে, যেন সংসারটা নিত্য। সমস্ত মরীচিকা হোক, মায়া হোক, যাই হোক, তবু তো বিধবা স্ত্রীকে আপন শিশুসন্তানগুলিকে মানুষ করে তুলতে হবে—বেদান্তদর্শনে তো মায়ের মন থেকে স্নেহকে উড়িয়ে দিতে পারে না! মৃত্যু যতই অপ্রতিহত ক্ষমতাবান্ হোক, ভালোবাসার বন্ধন তো কম প্রবল নয়। অনাদিকাল থেকে পদে পদে পরাজয়ের পরেও স্থিরনিশ্চয়ের সঙ্গে বিফল বাসনার এই অনন্ত বিরোধ লেশমাত্র শিথিল হয় না কেন? আমি বসে বসে কল্পনাকে আর এক-শো-বৎসর-পরবর্তী ভবিষ্যতের মধ্যে প্রেরণ করছিলুম। ভাবছিলুম এক-শো বৎসরের আগের দিন, ১৭৯৫ খৃস্টাব্দের অগ্রহায়ণের সকাল বেলাটা ঠিক আমাদের আজকের দিনের মতো এই রকম প্রত্যক্ষ বর্তমান ছিল— এই রকম শীত, এই রকম রৌদ্র, এই রকম জনকোলাহল— কিন্তু আজকের সকালে সেই সকালের ছায়ামাত্রও নেই। তখনকার দিনেও কত উৎসব, কত শোক, কত জন্মমৃত্যু, কত হাসিকান্না জাজ্বল্যমান সত্য-রূপে দেখা দিয়েছিল। আবার ১৯৯৫ খৃস্টাব্দে একদিন ১৯শে অগ্রহায়ণের সকাল বেলাটি ঠিক যথাসময়ে জগৎসংসারের উপর প্রকাশিত হবে। এইরকম শিশিরসিক্ত ঘাস, এইরকম শীতের হাওয়া, এইরকম মৃদু রৌদ্র— কিন্তু সেদিন জ্ঞা...র মৃত্যু, তার অনাথা বিধবা এবং পিতৃহীন সন্তানদের কঠোরতম শোকদুঃখের ছায়ামাত্র স্মৃতিমাত্র থাকবে না— এবং আমিও এক-শো বৎসর আগের দিনে সকালে সম্পূর্ণ সজীব সত্য আকারে নিজেকে অসীম জগৎ ও অনাদিকালের কেন্দ্রবর্তী জ্ঞান করে আমার আত্মীয় বান্ধব ও প্রিয়পরিজনদের মধ্যে নিজেকে চিরপ্রতিষ্ঠিত অনুভব করছিলুম, সেদিন সকালের সমস্ত জাগ্রত মানবহৃদয়ের স্মৃতির মধ্যে আমার রেখামাত্র কোথায় থাকবে! আমার সেদিন শোক নেই, বাসনা নেই, পরিতাপ নেই— অথচ এই পৃথিবী এবং এই আকাশ আছে।

কলকাতা
৫ ডিসেম্বর ১৮৯৫

২৪৬

কালীগ্রাম
[৬ ডিসেম্বর ১৮৯৫]

তোকে লিখেছিলুম কালীগ্রামের সমস্ত ছোটোখাটো এবং কাছাকাছি। কিন্তু সে কেবল যখন এই নদীর উপর বোটের মধ্যে থাকি। নদীটি ছোটো, দুই পাড় উঁচু, বোটটিও সংকীর্ণ, সেই জন্যে চারি দিকে বেশি দূর দেখা যায় না—কেবল একটি

ক্ষুদ্রায়তন গ্রাম্য ছবি চোখে পড়ে। কাল অনেক দিন পরে সূর্যাস্তের পর ওপারে পাড়ের উপর উঠে বেড়াতে গিয়েছিলুম—সেখানে উঠেই হঠাৎ দেখলুম আকাশের আদি অন্ত নেই, জনহীন মাঠ দিগ্‌দিগন্ত ব্যাপ্ত করে হা হা করছে—কোথায় আমার সেই দুটি ক্ষুদ্র গ্রাম! কোথায় এক প্রান্তে সংকীর্ণ একটু জলের রেখা! শিলাইদহের মাঠে গাছপালা গ্রাম বনের দর্শন পাওয়া যায়—এখানে কোথাও কিছু নেই, কেবল নীল আকাশ এবং ধূসর পৃথিবী, এবং তারই মাঝখানে একটি সঙ্গীহীন গৃহহীন অসীম সন্ধ্যা—মনে হয় যেন একটি সোনার-চেলি-পরা বধূ অনন্ত প্রান্তরের মধ্যে মাথায় একটুখানি ঘোমটা টেনে একলা চলেছে। ধীরে ধীরে কত সহস্র গ্রাম নদী প্রান্তর পর্বত সাগর নগর বনের উপর দিয়ে যুগ যুগান্তর কাল সমস্ত গোল পৃথিবীটি, একাকিনী, স্তম্ভিত অশ্রুপূর্ণ ম্লান দৃষ্টিতে, মৌন মুখে, শ্রান্ত পদে, প্রদক্ষিণ করে আসছে—তার বর যদি নেই তবে তাকে এমন সোনার বিবাহবেশে কে সাজিয়ে দিলে! কোন্‌ অনন্ত পশ্চিমের পারে তার পতিগৃহ! কাল হঠাৎ সেই মাঠের উপরে উঠে মাথার মধ্যে যেন একটা ছন্দ এবং সংগীত এবং কবিতা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। কিন্তু তাকে আকারবদ্ধ করা হল না এবং করাও বোধ হয় অসম্ভব। সন্ধ্যার সমস্ত ঝিকিমিকি'কে গলিয়ে নিয়ে একটি সোনার প্রতিমা তৈরি করা যেমন অসাধ্য এও তেমনি অসাধ্য। আমার সেই অন্তরের উচ্ছ্বাস, পতিসরের প্রান্তরের উপর কালকের সেই নিঃশব্দ নিস্তব্ধ নির্জন সন্ধ্যার মধ্যে বিকীর্ণ হয়ে তারই সঙ্গে অস্তমিত হয়েছে। সেই সন্ধ্যাকাশের অসীম চিত্রপটের উপরে আমার মন যদি তার নিজের দুই-একটা সোনালি রেখা এঁকে থাকে, সে কি আর দেখা যাবে? আবার আজ যখন সেই মাঠের মধ্যে সেই সন্ধ্যা দেখা দেবে তখন কালকের চিহ্ন সঙ্গে আনবে না।

কলকাতা
৭ ডিসেম্বর ১৮৯৫

২৪৭

জলপথে
শনিবার
[৭ ডিসেম্বর ১৮৯৫]

বোট আজ ভোরের বেলায় ছেড়ে দেওয়া গেছে—সংকীর্ণ নদী ছাড়িয়ে এখন বিস্তীর্ণ বিলের মধ্যে এসে পড়েছি। উজ্জ্বল রৌদ্র এবং কন্‌কনে শীতের হাওয়াটা বেশ লাগছে। সকাল বেলাকার ফুলের মতো শিশিরোজ্জ্বল জগৎটি আকাশের মধ্যে নববিকশিত দেখাচ্ছে। অনেক দিন পরে পতিসরের সেই ছোটো নদীগহ্বরটির মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসে আমার মন আজকে তার সমস্ত ডানা আকাশে মেলে দিয়েছে, আমার বোট ভেসে চলেছে, আমি যেন এই স্নিগ্ধ নির্মল রৌদ্রের মধ্যে দিয়ে উড়ে চলেছি। এ জায়গাটাও অপূর্ব রকমের। স্থলে জলে সংলগ্ন যমজ ভাই-বোনের মতন—উভয়ের মধ্যে বিশেষ প্রভেদ নেই, জলস্থল সমতল, খানিকটা ইস্পাতের মতো রৌদ্রে ঝিক্‌ ঝিক্‌ করছে আবার খানিকটা

নানাপ্রকার শ্যাওলায় ঘাসে উদ্ভিদ্‌মিশ্র মাটির স্তরে সবুজ হয়ে আছে। সাদা থেকে পাট্‌কিলে পর্যন্ত নানা জাতের বক ও চিল উড়ে বেড়াচ্ছে, পানকৌড়ি তার চিক্‌চিকে কালো লম্বা গ্রীবাটি নিয়ে একবার করে জলে ডুব মারছে এবং তার পরে বুক ফুলিয়ে অবলীলাগতিতে ভেসে বেড়াচ্ছে, বাঁশের উপরে জেলেদের জাল খাটানো রয়েছে—তারই উপর যত লম্বচঞ্চু মাছরাঙার আড্ডা। দেখতে দেখতে কোথায় এক জায়গায় দুই ধারের ডাঙা উঁচু হয়ে উঠল—জলে স্থলে ভাগ হয়ে গেল—মাঝখানে নদী, দুইধারে তীর, তীরে অঘ্রান মাসের হলদে ধানের ক্ষেত, উঁচু পাড়ের উপর একমনে ঘাড় হেঁট করে গোরু চরছে এবং তাদেরই মুখের গ্রাসের কাছাকাছি শালিখ পাখি নৃত্য করতে করতে কীটশিকারে প্রবৃত্ত—দ্বীপের মতো এক-এক খণ্ড উচ্চভূমির উপর গুটিকতক কলাগাছ এবং কুলগাছের মধ্যে কুষ্মাণ্ড-লতায় সমাকীর্ণ গুটি দুই-তিন খোড়ো ঘর, তারই অঙ্গনে দাঁড়িয়ে উলঙ্গ শিশু এবং কৌতূহলী বধূগণ বিস্মিত দৃষ্টিতে আমার বোট নিরীক্ষণ করছে—সাদা-কালো রঙের পাতিহাঁস জলের ধারে দল বেঁধে ঠোঁটের খোঁচা দিয়ে শশব্যস্তে পিঠের পালকগুলি পরিষ্কার করছে, দূরে বাঁশঝাড় এবং ঘনতরুশ্রেণী দিগন্ত অবরোধ করে দাঁড়িয়ে আছে—খানিকটা দূরে দুই ধারে শূন্য মাঠ—আবার হঠাৎ এক জায়গায় ছেলেদের চেঁচামেচি, স্নানার্থিনী মেয়েদের কলহাস্যালাপ, শোকাতুরা প্রৌঢ়ার বিলাপধ্বনি, কাপড় কাচার ছপ্‌ছপ্‌—স্নানাভিহত জলের ছল্‌ছল্‌ শব্দ শুনে মুখ তুলে দেখি ঘনচ্ছায়া গ্রামের ধারে একটি ঘাট এসেছে, গোটা দুয়েক নৌকো বাঁধা আছে এবং অনিচ্ছুক রোরুদ্যমান ছেলের নড়া ধরে তার মা জোর করে স্নান করাচ্ছে।

কলকাতা
৮ ডিসেম্বর ১৮৯৫

২৪৮

শিলাইদহ-জলপথে
[রবিবার, ৮ ডিসেম্বর ১৮৯৫]

কাল থেকে জলপথেই আছি। আশা ছিল আজ শিলাইদহে পৌঁছব, কিন্তু তার কোনো লক্ষণ দেখছি নে। সেজন্যে দুঃখ করতে চাই নে—পথের মধ্যে যে ক'টা দিন পাওয়া যায় সেই ক'দিন আমার পক্ষে অবিমিশ্র ছুটি—স্বেচ্ছাকৃত চিন্তা এবং কাজ ছাড়া কোনো কর্তব্যই নেই। দুই জানলা দিয়ে চেয়ে দেখছি, পড়ছি এবং লিখছি—চারি দিকে ধূসর চর এবং ঈষৎ নীল জল, দূরে সবুজ গ্রাম এবং ঊর্ধ্বে নীল আকাশ। মাঝে মাঝে দু-চার জায়গায় আশঙ্কার স্পর্শও পাওয়া গিয়েছিল—শীতে পদ্মার জল কমে আসছে কিনা, সেই জন্যে সংকীর্ণ প্রবাহ স্থানে স্থানে প্রচণ্ড বেগ ধারণ করেছে। জল যেন ইস্পাতের করাতের মতো বোটের তলাটা খর্‌খর্‌ শব্দে কাটতে কাটতে চলেছে। সেই তীব্রগতি জলের দিকে চেয়ে দেখলে চোখের ত্বকে যেন আঘাত লাগতে থাকে। সমস্ত দিন আমার খসড়া কবিতার খাতাটা খুলে পেন্সিল হাতে যখন-তখন দু-চার লাইন করে লিখছি, এবং তার

পরে অলসভাবে কোনো একটা দিকে চেয়ে আছি। আজ ভোর চারটের সময় ঘুম ভেঙে গেল—উঠে কতকগুলো গরম কাপড় জড়িয়ে বাতি জ্বেলে উর্বশী-নামক একটা কবিতা শেষ করে ফেললুম, যখন সাড়ে সাতটা তখন স্নান করতে গেলুম—এমনি করে এই দু দিনে দুটি বেশ বড়োসড়ো রকমের কবিতা শেষ করে ফেলেছি। সমস্ত দিন খোলা আকাশ এবং অজস্র আলোকের মধ্যে এই রকম অবিশ্রাম অখণ্ড অবসর পেলে তবে প্রকৃতি যে রকম করে তার ফুল ফোটায় এবং ফল পাকায় সেই রকম করে সমস্ত রঙ ফলিয়ে এবং রস রসিয়ে কবিতার পরিণতি সাধন করা যায়। নইলে ভিতরে ভিতরে সর্বদা একটা তাড়া থাকে—ইচ্ছাক্রমে এবং অনিচ্ছাক্রমে মন এমন-সকল পথ এবং বিপথে ধাবিত ও তাড়িত হয় যেখানে কল্পনার সহায়কারী কিছুই নেই। তাই এক-একবার মনে করি, বোটে করে যদি মাসখানেক মাস-দেড়েকের মতো একেবারে পশ্চিমে চলে যাই—বাড়ির সমস্ত খবর এবং কাজকর্মের সমস্ত আলোচনা থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে দিই—বিস্মৃতি এবং বিরামের মধ্যে, সুদূরে উড্ডীয়মান পাখির মতো একেবারে অদৃশ্য হয়ে যাই—তা হলে প্রভূত অবসরের মধ্যে কতকগুলো লেখা শেষ করে আসতে পারি। লেখার চেয়ে প্রবলতর কর্তব্য আমার আর কিছুই নেই। আমার অন্তঃকরণের ভিতরে এই অনুশাসনটি গ্রহণ করে আমি সংসারক্ষেত্রে এসেছি—যখন সেটা পালন করি তখন সুখদুঃখ সমস্তই লঘু হয়ে আসে, যখন না করি তখন সুখদুঃখের দল এক-পাল ডালকুত্তার মতো একেবারে কণ্ঠ চেপে ধরতে আসে—মানুষের উপর এ এক বিষম জুলুম!

কলকাতা
১৪ ডিসেম্বর [?]
১৮৯৫

২৪৯

সাহাজাদপুর-পথে
[১১ ডিসেম্বর ১৮৯৫]

ওরে বাস্‌ রে! কী তুমুল ব্যাপার! এইমাত্র কাঁচিকাটা পার হওয়া গেল—একটা মস্ত ফাঁড়া কেটে গেল। এ জায়গাটা একটা সংকীর্ণ খালের মতো, আঁকাবাঁকা—এইটুকুর ভিতর দিয়ে বিপুল জলস্রোত ফেনিয়ে ফুলে একেবারে যেন ঝর্নার মতো ঝরে পড়ছে—ক্রুদ্ধ জল সমস্ত বোটটাকে একেবারে কেড়ে-ছিঁড়ে ঝুঁটি ধরে টেনে নিয়ে চলে—বিদ্যুতের মতো ছুটে যায়, কী হল কী হচ্ছে কিছু বোঝবার অবসর পাওয়া যায় না—মাঝিমাল্লার মধ্যে একটা কেবল হৈ-হৈ হাঁ-হাঁ রব ওঠে—জল কল্‌কল্‌ গল্‌গল্‌ করতে থাকে, বুকের মধ্যে প্রাণটা নিশ্বাস রুদ্ধ করে স্তম্ভিত হয়ে থাকে, তার পরে মিনিট দশেকের মধ্যে সংকটের জায়গা উত্তীর্ণ হয়ে নিরাপদের ক্রোড়ের মধ্যে একেবারে ঝাঁপিয়ে এসে পড়তে হয়। কালীগ্রামের বিলগুলো ছাড়িয়ে এবারে নদীর মধ্যে এসেছি। এখন আঁকাবাঁকা উঁচু পাড়ের মাঝখান দিয়ে দুই তীরে পাকা ধান এবং বিকশিত সর্ষেক্ষেতের প্রান্ত দিয়ে অনুকূল স্রোতে

হুহুঃশব্দে চলে যাব। এই সর্ষেক্ষেতের গন্ধটি আমাকে ভারী মুগ্ধ করে, আমার মনে কী-একটা ছবি এবং সৌন্দর্যের আবেশ আনয়ন করে— যেন অনেক দিনের দেখা একটা রৌদ্ররঞ্জিত মাঠ, শীতল স্নিগ্ধ বাতাস, পুষ্করিণীর ধার দিয়ে বাঁকা গ্রামের পথ, ঘটকক্ষ অবগুণ্ঠিত বধূ এবং সেই সঙ্গে ঐ সর্ষেক্ষেতের মৃদু সুগন্ধে অনুপ্রবিষ্ট একটি উদার নির্মল আকাশ মনে পড়ে— যেন কোন্‌-এক সময়ের পরিতৃপ্ত প্রেম এবং পরিপূর্ণ শান্তির সুগভীর সুখস্মৃতি ঐ সর্ষেফুলের গন্ধের সঙ্গে জড়িত আছে।

কলকাতা
১২ ডিসেম্বর ১৮৯৫

২৫০

শিলাইদহ
১২ ডিসেম্বর। ১৮৯৫।

সেদিন একটা অতি সামান্য এবং ছোটো ঘটনায় আমার হঠাৎ ভারী চমক লেগে গিয়েছিল। আমি তোকে পূর্বেই লিখেছি আজকাল আমি সন্ধ্যার সময় বোটের মধ্যে বাতি জেলে, যতক্ষণ না ঘুম পায়, বসে বসে পড়ি— কারণ, নিজের বিজন সঙ্গ সকল সময়, বিশেষত সন্ধ্যার সময়, সকল অবস্থায় প্রার্থনীয় নয়। প্রবাদ আছে, কাজ না থাকলে লোকে জ্যাঠাইমার গঙ্গাযাত্রা করে— সুবিধামত অনাবশ্যক জ্যাঠাইমা প্রায়ই হাতের কাছে পাওয়া যায় না, তখন নিজের মনটাকেই নিয়ে পড়তে হয়— আমি তার চেয়ে বই নিয়ে পড়াই শ্রেয়স্কর মনে করি। সেদিন সন্ধ্যাবেলায় একখানা ইংরাজি সমালোচনার বই নিয়ে কবিতা সৌন্দর্য আর্ট্‌ প্রভৃতি মাথামুণ্ডু নানা কথার নানা তর্ক পড়া যাচ্ছিল— এক-এক সময় এই সমস্ত মর্মগত কথার বাজে আন্দোলন পড়তে পড়তে শ্রান্তচিত্তে সমস্তই মরীচিকাবৎ শূন্য বোধ হয়— মনে হয় এর বারো-আনা কথা বানানো, শুধু কথার উপরে কথা। সেদিনও পড়তে পড়তে মনটার ভিতরে একটা নীরস শ্রান্তির উদ্রেক হয়ে একটা বিদ্রূপপরায়ণ সন্দেহ-শয়তানের আবির্ভাব হয়েছিল। এ দিকে রাত্রিও অনেক হওয়াতে বইটা ধাঁ করে মুড়ে ধপ্‌ করে টেবিলের উপর ফেলে দিয়ে শুতে যাবার উদ্দেশে এক ফুৎকারে বাতি নিবিয়ে দিলুম। নিবিয়ে দেবা মাত্রই হঠাৎ চারি দিকের সমস্ত খোলা জানলা থেকে বোটের মধ্যে জ্যোৎস্না একেবারে বিচ্ছুরিত হয়ে উঠল। এমন অপূর্ব আশ্চর্য বোধ হল! আমার ক্ষুদ্র একরত্তি বাতির শিখা শয়তানের মতো নীরস হাসি হাসছিল, অথচ সেই অতিক্ষুদ্র বিদ্রূপহাসিতে এই বিশ্বব্যাপী গভীর প্রেমের অসীম হাসি একেবারে আড়াল করে রেখেছিল! নীরস গ্রন্থের বাক্যরাশির মধ্যে কী খুঁজে বেড়াচ্ছিলুম— যাকে খুঁজছিলুম সে কতক্ষণ থেকে বাইরে সমস্ত আকাশ পরিপূর্ণ করে নীরবে দাঁড়িয়ে ছিল। যদি দৈবাৎ না দেখে অন্ধকারের মধ্যে শুতে যেতুম, তা হলেও সে আমার সেই ক্ষুদ্র বর্তিকাশিখার কিছুমাত্র প্রতিবাদ না করে নীরবেই অস্ত যেত। যদি ইহজীবন নিমেষের জন্যও তাকে না দেখতে পেতুম এবং শেষ দিনের অন্ধকারের মধ্যে শেষ বারের মতো শুতে যেতুম তা হলেও সেই বাতির

আলোরই ভিতর থেকে যেত, অথচ সে সমস্ত বিশ্ব ব্যাপ্ত করে সেই রকম নীরবে সেই রকম মধুর মুখেই হাস্য করত— আপনাকে গোপনও করত না, আপনাকে প্রকাশও করত না।

তার পর থেকে আজকাল সন্ধ্যাবেলায় বাতির আলো নিবোতে আরম্ভ করেছি।

কলকাতা
১৩ ডিসেম্বর ১৮৯৫

২৫১

শিলাইদহ
১৪ ডিসেম্বর। ১৮৯৫।

আজকাল আমি আমার লেখা এবং আলস্যের মাঝে মাঝে কবি কীট্‌সের একটি ক্ষুদ্র জীবনচরিত অল্প অল্প করে পাঠ করি। পাছে এক দমে একেবারে শেষ হয়ে যায় সেই জন্যে রেখে রেখে রয়ে রয়ে পড়ি— পড়তে বেশ লাগে। আমি যত ইংরাজ কবি জানি সব চেয়ে কীট্‌সের সঙ্গে আমার আত্মীয়তা আমি বেশি করে অনুভব করি। তার চেয়ে অনেক বড়ো কবি থাকতে পারে, অমন মনের মতো কবি আর নেই। দুর্ভাগ্যক্রমে বেচারা অল্প দিন বেঁচে ছিল, এবং অল্পই লিখতে সময় পেয়েছিল। ...কীট্‌সের ভাষার মধ্যে যথার্থ আনন্দসম্ভোগের একটি আন্তরিকতা আছে। ওর আর্টের সঙ্গে আর হৃদয়ের সঙ্গে বেশ সমতানে মিশেছে— যেটি তৈরি করে তুলেছে সেটির সঙ্গে বরাবর তার হৃদয়ের একটি নাড়ীর যোগ আছে। টেনিসন সুইন্‌বর্‌ন্‌ প্রভৃতি অধিকাংশ আধুনিক কবির অধিকাংশ কবিতার মধ্যে একটা পাথরে-খোদা ভাব আছে— তারা কবিত্ব করে লেখে এবং সে লেখার প্রচুর সৌন্দর্য আছে, কিন্তু কবির অন্তর্যামী সে লেখার মধ্যে নিজের স্বাক্ষর-করা সত্যপাঠ লিখে দেয় না। টেনিসনের 'মড' কবিতায় যে-সমস্ত লিরিকের উচ্ছ্বাস আছে সেগুলি বিচিত্র এবং সুতীব্র হৃদয়বৃত্তি-দ্বারা উচ্ছলরূপে পরিপূর্ণ বটে, কিন্তু তবু মিসেস ব্রাউনিঙের সনেটগুলি তার চেয়ে ঢের বেশি অন্তরঙ্গরূপে সত্য। টেনিসনের অচেতন কবি যে-সমস্ত ছত্র লেখে টেনিসনের সচেতন আর্টিস্ট্‌ তার উপর নিজের রঙিন তুলি বুলিয়ে সেটাকে ক্রমাগতই আচ্ছন্ন করে ফেলতে থাকে। কীট্‌সের লেখায় কবিহৃদয়ের স্বাভাবিক সুগভীর আনন্দ তার রচনার কলানৈপুণ্যের ভিতর থেকে একটা সজীব উজ্জ্বলতার সঙ্গে বিচ্ছুরিত হতে থাকে। সেইটে আমাকে ভারী আকর্ষণ করে। কীট্‌সের লেখা সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ নয় এবং তার প্রায় কোনো কবিতারই প্রথম ছত্র থেকে শেষ ছত্র পর্যন্ত চরমতা প্রাপ্ত হয় নি, কিন্তু একটি অকৃত্রিম সুন্দর সজীবতার গুণে আমাদের সজীব হৃদয়কে এমন ঘনিষ্ঠ সঙ্গদান করতে পারে। কলকাতায় ফিরে গিয়ে কীট্‌সের জীবনচরিতটি তোকে পড়তে দেব। ওর অসম্পূর্ণ ক্ষুদ্র জীবনটি বড়ো সকরুণ।

কলকাতা
১৫ ডিসেম্বর ১৮৯৫

২৫২

শিলাইদহ
১৫ ডিসেম্বর। ১৮৯৫।

দিনটা এই রকম কাটে। তার পরে সন্ধ্যাবেলায় দাঁড় টেনে ও পারে চরে গিয়ে বেড়িয়ে ফিরে আসতে আসতে রাত হয়ে যায়। ও পার থেকে নিস্তরঙ্গ নিস্তব্ধ নদী এবং পরপারের গাছপালার উপর সন্ধ্যাবেলাটি যে কী অপরূপ সুন্দর তা অনেকবার বর্ণনা করবার চেষ্টা করেছি, কিন্তু সে বর্ণনার অতীত—সেই সৌন্দর্য এবং শান্তি দূরে থেকে কল্পনা করাই যায় না। কলকাতায় গিয়ে আমিই হয়তো ঠিক মনে আনতে পারব না। কাল সন্ধ্যাবেলায় যখন এই সান্ধ্যপ্রকৃতির মধ্যে সমস্ত অন্তঃকরণ পরিপ্লুত হয়ে জলিবোটে করে সোনালি অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে আস্তে আস্তে ফিরে আসছি এমন সময়ে হঠাৎ দূরের এক অদৃশ্য নৌকো থেকে বেহালা যন্ত্রে প্রথমে পূরবী ও পরে ইমনকল্যাণে আলাপ শোনা গেল—সমস্ত স্থির নদী এবং স্তব্ধ আকাশ মানুষের হৃদয়ে একেবারে পরিপূর্ণ হয়ে গেল। ইতিপূর্বে আমার মনে হচ্ছিল মানুষের জগতে এই সন্ধ্যাপ্রকৃতির তুলনা বুঝি কোথাও নেই—যেই পূরবীর তান বেজে উঠল অমনি অনুভব করলুম এও এক আশ্চর্য গভীর এবং অসীম সুন্দর ব্যাপার, এও এক পরম সৃষ্টি—সন্ধ্যার সমস্ত ইন্দ্রজালের সঙ্গে এই রাগিণী এমনি সহজে বিস্তীর্ণ হয়ে গেল, কোথাও কিছুই ভঙ্গ হল না—আমার সমস্ত বক্ষস্থল ভরে উঠল। বোটে ফিরে এসে অনেক দিন পরে আবার একবার হার্মোনিয়মটা নিয়ে বসলুম। একে একে নতুন-তৈরি-করা অনেকগুলো গান নিচু সুরে আস্তে আস্তে গেয়ে গেলুম—ইচ্ছে হল আবার কতকগুলো গান তৈরি করে ফেলি, কিন্তু সে আর হয়ে উঠছে না।

কলকাতা
১৬ ডিসেম্বর ১৮৯৫

ভানুসিংহের পত্রাবলী

ভূমিকা

পত্রধারার দ্বিতীয় পর্যায়ের চিঠিগুলি লেখা হয়েছিল একটি বালিকাকে। সে চিঠির বেশির ভাগ লেখা শান্তিনিকেতন থেকে। তাই সেগুলির মধ্যে দিয়ে স্বতই বয়ে চলেছে শান্তিনিকেতনের জীবনযাত্রার চলচ্ছবি। এগুলিতে মোটা সংবাদ বেশি কিছু নেই, হাসিতামাশায় মিশিয়ে আছে সেখানকার আবহাওয়া, জড়িয়ে আছে সাংসারিক ব্যাপারে আনাড়ি মেয়েটির ছেলেমানুষির আভাস; আর তারই সঙ্গে লেখকের সকৌতুক স্নেহ। বিশেষ কিছু বলতে হবে না মনে করে হালকা মনে আটপৌরে রীতিতে যা বলা যেতে পারে তাকে কোনো শান-বাঁধানো পাকা সাহিত্যিক রাস্তায় প্রকাশ করবার উপায় নেই।

১৩৪৫ **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর**

উৎসর্গ

এই পত্রগুলি দিয়ে যে পত্রপুট গাঁথা হয়েছে
তার মধ্যে রানুর প্রতি ভানুদাদার
আশীর্বাদ পূর্ণ রইল

১

শান্তিনিকেতন

তোমার চিঠির জবাব দেব বলে চিঠিখানি যত্নসহকারে রেখেছিলুম, কিন্তু কোথায় রেখেছিলুম সে কথা ভুলে যাওয়াতে এতদিন দেরি হয়ে গেল। আজ হঠাৎ খুঁজতেই ডেস্কের ভিতর হতে আপনিই বেরিয়ে পড়ল।

কবি-শেখরের কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করেচ। রাজকন্যার সঙ্গে নিশ্চয় তার বিয়ে হত, কিন্তু তার পূর্বেই সে মরে গিয়েছিল। মরাটা তার অত্যন্ত ভুল হয়েছিল, কিন্তু সে আর এখন শোধরাবার উপায় নেই। যে-খরচে রাজা তার বিয়ে দিত সেই খরচে খুব ধুম করে তার অন্ত্যেষ্টি সৎকার হয়েছিল।

ক্ষুধিত পাষাণে ইরাণী বাঁদির কথা জানবার জন্যে আমারও খুব ইচ্ছে আছে কিন্তু যে-লোকটা বলতে পারত আজ পর্যন্ত তার ঠিকানা পাওয়া গেল না।

তোমার নিমন্ত্রণ আমি ভুলব না— হয়তো তোমাদের বাড়িতে একদিন যাব, কিন্তু তার আগে তুমি যদি আর-কোনো বাড়িতে চলে যাও? সংসারে এই রকম করেই গল্প ঠিক জায়গায় সম্পূর্ণ হয় না।

এই দেখ না কেন, খুব শীঘ্রই তোমার চিঠির জবাব দেব বলে ইচ্ছা করেছিলুম, কিন্তু এমন হতে পারত তোমার চিঠি আমার ডেস্কের কোণেই লুকিয়ে থাকত, এবং কোনোদিনই তোমার ঠিকানা খুঁজে পেতুম না।

যেদিন বড়ো হয়ে তুমি আমার সব বই পড়ে বুঝতে পারবে তার আগেই তোমার নিমন্ত্রণ সেরে আসতে চাই। কেননা যখন সব বুঝবে তখন হয়তো সব ভালো লাগবে না— তখন যে-ঘরে তোমার ভাঙা পুতুল থাকে সেই ঘরে রবিবাবুকে স্থান দেবে।

ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। ইতি ৩রা ভাদ্র ১৩২৪।

২

কলিকাতা

আমার একদিন ছিল যখন আমি ছোটো ছিলুম— তখন আমি ঘন ঘন এবং বড়ো বড়ো চিঠি লিখতুম। তুমি যদি তার আগে জন্মাতে, যদি অনর্থক এত দেরি না করতে, তাহলে আমার চিঠির উত্তরের জন্য একদিনও সবুর করতে হত না। আজ আর চিঠি লেখবার সময় পাইনে। তোমার বয়স আমার যখন ছিল তখন নিজের ইচ্ছেয় চিঠি লিখতুম, এখন অন্যের ইচ্ছেয় এত বেশি লিখতে হয় যে, নিজের ইচ্ছেটা মারাই গেল। তারপরে আবার ভয়ানক কুঁড়ে হয়ে গেছি। যত বেশি কাজ করতে হচ্ছে ততই কুঁড়েমি আরো বেড়ে যাচ্ছে। এখন লিখে যাওয়ার চেয়ে বকে যাওয়া ঢের বেশি সহজ মনে হয়। যদি তেমন সুবিধে হত

দেখিয়ে দিতুম বকুনিতে তুমি কখনো আমার সঙ্গে পেরে উঠতে না। সেটা তোমার ভালো লাগত কিনা বলতে পারিনে। কেননা তোমার যতগুলি পুতুল আছে তারা কেউ তোমার কথার জবাব করে না। তুমি যা বল তাই তারা চুপ করে শুনে যায়। আমার দ্বারা কিন্তু সেটা হবার জো নেই—অন্যের কথা শোনার চেয়ে অন্যকে কথা শোনানো আমার অভ্যেস হয়ে গেছে। আমার বড়ো মেয়ে যখন ছোটো ছিল তখন বকুনিতে তার সঙ্গে পারতুম না, কিন্তু এখন সে বড়ো হয়ে শ্বশুর-বাড়ি চলে গেছে। তারপর থেকে আমার সমকক্ষ কাউকে পাইনি। তোমাকে পরীক্ষা করে দেখতে আমার খুব ইচ্ছে রইল। একদিন হয়তো তোমাদের শহরে যাব। তুমি লিখেচ আমাকে গাড়িতে করে নিয়ে যাবে। কিন্তু আগে থাকতে বলে রাখি আমাকে দেখতে নারদ মুনির মতো—মস্ত বড়ো পাকা দাড়ি। ভয় কোরো না, আমি তার মতোই ঝগড়াটেও বটে, কিন্তু ছোটো মেয়েদের সঙ্গে ঝগড়া করা আমার স্বভাব নয়। তোমার কাছে খুব ভালো মানুষটির মতো থাকবার আমি খুব চেষ্টা করব—এমন কি কবিশেখরের সঙ্গে রাজকন্যার বিয়েতে যদি তোমার মত থাকে আমি স্বয়ং তার ঘটকালি করে দিতে রাজি আছি। ইতি ২১শে ভাদ্র, ১৩২৪।

৩

কলিকাতা

তোমার সঙ্গে চিঠি লিখে জিততে পারব না এ আমি আগে থাকতে বলে রাখ্‌চি। তোমার মতো বাসন্তী রঙের কাগজ আমি খুঁজে পেলুম না। সামান্য সাদা কাগজই সব সময় খুঁজে পাইনে। তোমাকে তো আগেই বলেচি, আমি কুঁড়ে। তারপরে, আমি ভারি এলোমেলো,—কোথায় কী রাখি তার কোনো ঠিকানা পাইনে। এমন আমার আরো অনেক দোষ আছে। এই তো চিঠির কাগজের কথা। তারপরে ভেবেছিলুম ছবি এঁকে তোমার সচিত্র চিঠির উপযুক্ত জবাব দেব—চেষ্টা করতে গিয়ে দেখলুম অহংকার বজায় থাকবে না। এ বয়সে নতুন করে হাঁস আঁকতে বসা আমার পক্ষে চলবে না। গ—অক্ষরের পেটের নিচে খণ্ডত জুড়েও সুবিধে করতে পারলুম না—সেটা এই রকম বিশ্রী দেখতে হল। অনেক সময় পদ্মার চরে কাটিয়েচি; সেখানে হাঁসের দল ছাড়া আমার আর সঙ্গী ছিল না। তাদের প্রতি আমার মনের কৃতজ্ঞতা থাকাতেই আমাকে আজ থেমে যেতে হল—এবারকার মতো তোমার হাঁসেরই জিত রইল। এই ত গেল ছবি, তারপরে সময়। তাতেও তোমার সঙ্গে আমার তুলনাই হয় না। তাই ভয় হচ্চে শেষকালে তুমি রাগ করে আর-কোনো গল্প-লিখিয়ে গ্রন্থকারের সঙ্গে ভাব করবে —কিন্তু নিমন্ত্রণ আমার পাকা রইল।

৪

কলিকাতা

তুমি দেরি করে আমার চিঠির উত্তর দিয়েছিলে এতে আমার রাগ করাই উচিত ছিল, কিন্তু রাগ করতে সাহস হয় না—কেননা আমার স্বভাবে অনেক দোষ আছে—দেরি করে উত্তর দেওয়া তার মধ্যে একটি। আমি জানি তুমি লক্ষ্মী মেয়ে, তুমি অনেক সহ্য করতে পার; আমার কুঁড়েমি, আমার ভোলা-স্বভাব, আমার এই সাতান্ন বছর বয়সের যত রকম শৈথিল্য সব তোমাকে সহ্য করতে হবে। আমার মতো অন্যমনস্ক অকেজো মানুষের সঙ্গে ভাব রাখতে হলে খুব সহিষ্ণুতা থাকা চাই—চিঠির উত্তর যত পাবে তার চেয়ে বেশি চিঠি লেখবার মতো শক্তি যদি তোমার না থাকে, দেনাপাওনা সম্বন্ধে তোমার হিসাব যদি খুব বেশি কড়াক্কড় হয় তাহলে একদিন আমার সঙ্গে হয়তো ঝগড়া হতেও পারে, এই কথা মনে করে ভয়ে ভয়ে আছি। কিন্তু এ কথা আমি জোর করে বলচি যে, ঝগড়া যদি কোনোদিন বাধে তার অপরাধটা আমার দিকে ঘটতে পারে, কিন্তু রাগটা তোমার দিকেই হবে। আর যা হোক আমি রাগী নই। তার কারণ এ নয় যে, আমি খুব ভালোমানুষ, তার কারণ এই যে, আমার স্মরণশক্তি ভারি কম। রাগ করবার কারণ কী ঘটেচে সে আমি কিছুতেই মনে রাখতে পারি নে। তুমি মনে করো না কেবল পরের সম্বন্ধেই আমার এই দশা, নিজের দোষের কথা আমি আরো বেশি ভুলি। চিঠির জবাব দিতে যখন ভুলে যাই তখন মনেও থাকে না যে ভুলে গেছি; কর্তব্য করতে ভুলি, ভুল সংশোধন করতেও ভুলি, সংশোধন করতে ভুলেচি তাও ভুলি। এমন অদ্ভুত মানুষের সঙ্গে যদি বন্ধুত্ব কর এবং সে বন্ধুত্ব যদি স্থায়ী রাখতে চাও তাহলে তোমাকেও অনেক ভুলতে হবে, বিশেষত চিঠির হিসাবটা।

পদ্মার ধারের হাঁসেদের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হল কী করে জিজ্ঞাসা করেচ। বোধ হয় তার কারণ এই যে, বোবার শত্রু নেই। ওরা যখন খুব দল বেঁধে চেঁচামেচি করে আমি চুপ করে শুনি, একটিও জবাব দিইনে। আমি এত বেশি শান্ত হয়ে থাকি যে, ওরা আমাকে মানুষ বলেই গণ্যই করে না—আমাকে বোধ হয় পাখির অধম বলেই জানে—কেননা আমার দুই পা আছে বটে কিন্তু ডানা নেই। আর যাই হোক ওদের সঙ্গে আমার চিঠিপত্র চলে না—যদি চলত তাহলে আমাকেই হার মানতে হত—কেননা ওদের ডানাভরা কলম আছে, আর ওদের সময়ের টানাটানি খুব কম।

তোমাকে-যে এত বড়ো চিঠি লিখলুম আমার ভয় হচ্ছে পাছে বিশ্বাস না কর যে আমার সময় কম। অনেক কাজ পড়ে আছে—কাজ ফাঁকি দিয়েই তোমাকে চিঠি লিখচি—কাজ যদি না থাকত তাহলে কাজ ফাঁকি দেওয়াও চলত না।

বেলা অনেক হয়ে গেছে—অনেক আগে স্নান করতে যাওয়া উচিত ছিল—হাঁসেদের কথায় হঠাৎ স্নানের কথাটা মনে পড়ে গেল—তাহলে আজ চললুম। আজ রাত্রে বোলপুর যেতে হবে। ইতি ৬ই কার্তিক, ১৩২৪।

৫

শান্তিনিকেতন

তোমাদের বইয়ে বোধ হয় পড়ে থাকবে, পাখিরা মাঝে মাঝে বাসা ছেড়ে দিয়ে সমুদ্রের ওপারে চলে যায়। আমি হচ্চি সেই-জাতের পাখি। মাঝে মাঝে দূর পার থেকে ডাক আসে, আমার পাখা ধড়ফড় করে ওঠে। আমি এই বৈশাখ মাসের শেষ দিকে জাহাজে চড়ে প্রশান্ত মহাসাগরে পাড়ি দেব বলে আয়োজন করচি। যদি কোনো বাধা না ঘটে তাহলে বেরিয়ে পড়ব। পশ্চিম দিকের সমুদ্রপথ আজকাল যুদ্ধের দিনে সকল সময়ে পারের দিকে পৌঁছিয়ে দেয় না, তলার দিকেই টানে। পূর্ব দিকের সমুদ্রপথ এখনো খোলা আছে—কোন্‌দিন হয়তো দেখব সেখানেও যুদ্ধের ঝড় এসে পৌঁছেচে। যাই হোক তোমার কাশীর নিমন্ত্রণ-যে ভুলেচি তা মনে কোরো না; তুমি আয়োজন ঠিক করে রেখো, আমি কেবল একবার পথের মধ্যে অস্ট্রেলিয়া, জাপান, আমেরিকা প্রভৃতি দুটো চারটে জায়গায় নিমন্ত্রণ চট্‌ করে সেরে নিয়ে তারপরে তোমার ওখানে গিয়ে বেশ আরাম করে বসব—আমার জন্যে কিন্তু ছাতু কিংবা রুটি, অড়রের ডাল এবং চাটনির বন্দোবস্ত করলে চলবে না; তোমাদের মহারাজ নিশ্চয়ই খুব ভালো রাঁধে, কিন্তু তুমি যদি নিজে স্বহস্তে শুকতানি থেকে আরম্ভ করে পায়স পর্যন্ত রেঁধে না খাওয়াও তাহলে সেই মুহূর্তেই আমি—কী করব এখনো তা ঠিক করিনি—ভাবছিলুম না খেয়েই সেই মুহূর্তেই আবার অস্ট্রেলিয়া চলে যাব—কিন্তু প্রতিজ্ঞা রাখতে পারব কিনা একটু সন্দেহ আছে সেইজন্যেই এখন কিছু বললুম না। কিন্তু রান্না অভ্যাস হয়নি বুঝি? তাই বল। কেবলি পড়া মুখস্থ করচ? আচ্ছা, অন্তত এক বছর সময় দিলুম—এর মধ্যেই মার কাছে শিখে নিয়ো। তাহলে সেই কথা রইল, আপাতত আমাকে কলকাতায় যেতে হবে, বাক্সগুলো গুছিয়ে ফেলা চাই। আমি খুব ভালো গোছাতে পারি। কেবল আমার একটু যৎসামান্য দোষ আছে—প্রধান-প্রধান দরকারী জিনিসগুলো প্যাক করতে প্রায়ই ভুলে যাই—যখন তাদের দরকার হয় ঠিক সেই সময় দেখি তাদের আনা হয়নি। এতে বিষম অসুবিধা হয় বটে কিন্তু গোছাবার ভারি সুবিধে—কেননা বাক্সের মধ্যে যথেষ্ট জায়গা পাওয়া যায়, আর বোঝা কম হওয়াতে রেলভাড়া জাহাজভাড়া অনেক কম লাগে। দরকারী জিনিস না নিয়ে অদরকারী জিনিস সঙ্গে নেবার আর-একটা মস্ত সুবিধে হচ্চে এই যে—সেগুলো বারবার বের-করাকরির দরকার হয় না, বেশ গোছানোই থেকে যায়; আর যদি হারিয়ে যায় কিংবা চুরি যায় তাহলেও কাজের বিশেষ ব্যাঘাত কিংবা মনের অশান্তি ঘটে না। আজ আর বেশি লেখবার সময় নেই, কেননা আজ তিনটের গাড়িতেই রওনা হতে হবে। গাড়ি ফেল করবার আশ্চর্য ক্ষমতা আমার আছে, কিন্তু সে ক্ষমতাটা আজকে আমার পক্ষে সুবিধার হবে না; অতএব তোমাকে নববর্ষের আশীর্বাদ জানিয়ে আমি টিকিট কিনতে দৌড়লুম। ইতি ২রা বৈশাখ, ১৩২৫।

৬

শান্তিনিকেতন

কাল সন্ধ্যাবেলায় স্তরে স্তরে গাঢ় নীল মেঘে আকাশ ছেয়ে গেল— তখন নিচের সেই পূর্বদিকের বারান্দায় সাহেবে আমাতে মিলে খাচ্ছিলুম—আমার আর-সব খাওয়া হয়ে গিয়ে যখন চিঁড়েভাজা খেতে আরম্ভ করেচি এমন সময় পশ্চিম দিক থেকে সোঁ সোঁ করে হাওয়া এসে সমস্ত কালো মেঘ আকাশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত বিছিয়ে দিলে। কতদিন পরে ঐ সজল মেঘ দেখে আমার চোখ জুড়িয়ে গেল। যদি আমি তোমাদের কাশীর হিন্দুস্থানী মেয়ে হতুম তাহলে কাজ্‌রি গাইতে গাইতে শিরীষগাছের দোলাটাতে দুলতে যেতুম। কিন্তু এণ্ডরুজ্‌ কিংবা আমি, আমাদের দুজনের কারো হিন্দুস্থানী মেয়ের মতো আকৃতি প্রকৃতি কিংবা চালচলন নয়, তা ছাড়া সে কাজ্‌রি গান জানে না, আমিও যা জানতুম ভুলে গেচি। তাই দু-জনে মিলে উপরে আমার ছাদের সামনেকার বারান্দায় এসে বসলুম। দেখতে দেখতে ঘনবৃষ্টি নেমে এল—জলে বাতাসে মিলে আকাশময় তোলপাড় করে বেড়াতে লাগল। আমার ছাদের সামনেকার পেঁপে গাছটার লম্বা পাতাগুলোকে ধরে ঠিক যেন কানমলা দিতে লাগল। শেষকালে বৃষ্টি প্রবল হয়ে গায়ে যখন ছাঁট লাগতে আরম্ভ হল, তখন আমার সেই কোণটাতে এসে আশ্রয় নিলুম। এমন সময় চোখ ধাঁদিয়ে কড়কড় শব্দে প্রকাণ্ড একটা বাজ পড়ল। আমাদের মনে হল বাগানের মধ্যেই কোথাও পড়েচে, তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গিয়ে দেখি হরিচরণ পণ্ডিতের বাসার দিকে ছেলেরা ছুটচে। সেই বাড়িতেই বাজ পড়েছিল। তখন তাঁর বড়ো মেয়ে উনানে দুধ জ্বাল দিচ্ছিলেন, তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। ছেলেরা দূর থেকে দেখতে পেলে চালের উপর থেকে ধোঁয়া উঠতে আরম্ভ হয়েচে। তারা তো সব চালের উপর চড়ে 'জল জল' করে চীৎকার করতে লাগল। ছেলেরা কুয়ো থেকে জল ভরে এনে চালের উপর আগুন নিবিয়ে ফেললে। ভাগ্যে, হরিচরণের বাড়ির কাউকে আঘাত লাগেনি। কেবল হরিচরণের মেয়ের হাত একটু পুড়ে ফোসকা পড়েছিল। কিন্তু সবচেয়ে ভালো লেগেছিল আমার ছেলেদের উদ্‌যোগ দেখে। তাদের না আছে ভয়, না আছে ক্লান্তি। নির্ভয়ে হাতে করে করে চালের খড় ছিঁড়ে ছিঁড়ে ফেলে দিতে লাগল। আর দূরের কুয়ো থেকে দৌড়ে দৌড়ে সার বেঁধে জলভরা ঘড়া এনে উপস্থিত করতে লাগল। ওরা যদি না দেখত এবং না এসে জুটত তাহলে মস্ত একটা অগ্নিকাণ্ড হত। এমনি করে কাল অনেক রাত্রি পর্যন্ত ঝড়-বাদল হয়ে আজ অনেকটা ঠাণ্ডা আছে। আকাশ এখনো মেঘে লেপে আছে, হয়তো আজও বিকেলে একচোট বৃষ্টি শুরু হবে। ইতি ৫ই শ্রাবণ, ১৩২৫।

৭

শান্তিনিকেতন

তুমি আজকাল খুব পড়ায় লেগে গেছ, কিন্তু আমি-যে চুপচাপ করে বসে থাকি তা মনে কোরো না। আমার কাজ চলচে। সকালে তুমি তো জান সেই আমার তিন

ক্লাসের পড়ান আছে। তারপরে স্নান করে খেয়ে, যেদিন চিঠি লেখবার থাকে চিঠি লিখি। তারপরে বিকেলে খাবার খবর দেবার আগে পর্যন্ত ছেলেদের যা পড়াতে হয় তাই তৈরি করে রাখি। তারপরে সন্ধ্যার সময় ছাতে চুপচাপ বসে থাকি—কিন্তু এক-একদিন ছেলেরা আমার কাছে কবিতা শুনতে আসে। তারপরে অন্ধকার হয়ে আসে—তারাগুলিতে আকাশ ছেয়ে যায়—দিনুর ঘর থেকে ছেলেদের গলা শুনতে পাই—তারা গান শেখে—তারপরে গান বন্ধ হয়ে যায়। তখন আদ্যবিভাগের ছেলেদের ঘর থেকে হারমোনিয়ম্ এবং বাঁশির শব্দের সঙ্গে সঙ্গে গানের ধ্বনি উঠতে থাকে। ক্রমে রাত্রি আরো গভীর হয়, তখন ছেলেদের ঘরের গানও বন্ধ হয়ে যায়, আর দূরে গ্রামের রাস্তার ভিতর দিয়ে দুই একটা আলো চলচে দেখতে পাই। তারপরে সে আলোও থাকে না, কেবলমাত্র আকাশজোড়া তারার আলো। তারপরে বসে থাকতে থাকতে ঘুম পেয়ে আসে, তখন আস্তে আস্তে উঠে শুতে যাই। তারপরে কখন এক সময়ে আমার পূর্বদিকের দরজার সম্মুখে আকাশের অন্ধকার অল্প অল্প ফিকে হয়ে আসে দুটো একটা শালিকপাখি উসখুস করে ওঠে, মেঘের গায়ে গায়ে সোনালি আভা ফোটে, খানিক বাদেই সাড়ে চারটার সময় আদ্যবিভাগে ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজতে থাকে, অমনি আমি উঠে পড়ি। মুখ ধুয়ে এসে আমার সেই পূর্বদিকের বারান্দায় পাথরের চৌকির উপর আসন পেতে উপাসনায় বসি। সূর্য ধীরে ধীরে উঠে তার আলোকের স্পর্শে আমাকে আশীর্বাদ করে। আজকাল সকাল সকাল খেতে যেতে হয়, কেননা সাড়ে ছটার সময় আশ্রমের সকল বালকবৃদ্ধ আমরা বিদ্যালয়ের সামনের মাঠে একত্র হই, একটি কোনো গান হয়ে তার পরে আমাদের স্কুলের কাজ আরম্ভ হয়। ঠিক প্রথম ঘণ্টায় আমার ক্লাস নেই। কিন্তু সেই সময়ে আমি আমার কোণটাতে এসে একবার আমার পড়াবার বই ও খাতাপত্র দেখে শুনে ঠিক করে নিই—তারপরে আমার কাজ। এই আমার দিনরাতের হিসাব তোমার কাছে দিলুম। কেমন শান্তিতে দিন চলে যায়। ঐ ছেলেদের কাজ করতে আমার খুব ভালো লাগে। কেননা ওরা জানে না যে, আমরা ওদের জন্য যে-কাজ করি তার কোনো মূল্য আছে। ওরা যেমন অনায়াসে সূর্যের কাছ থেকে তার আলো নেয় আমাদের হাত থেকে তেমনি অনায়াসে সেবা নেয়। হাটে দোকানদারদের কাছ থেকে যেমন দরদস্তুর করে জিনিস কিনতে হয় তেমন করে নয়। এরা যখন বড়ো হবে, যখন সংসারের কাজে প্রবেশ করবে, তখন হয়তো মনে পড়বে—এই আশ্রমের প্রান্তর, এখানকার শালের বীথিকা, এখানকার আকাশের উদার আলো এবং উন্মুক্ত সমীরণ এবং প্রতিদিন সকালে বিকালে এখানে আকাশতলে নীরবে বসে ঠাকুরকে প্রণাম। ইতি ১২ই শ্রাবণ, ১৩২৫।

৮

শান্তিনিকেতন

দিনগুলো আজকাল শরৎকালের মতো সুন্দর হয়ে উঠেচে। আকাশের ছিন্ন মেঘগুলো উদাসীন সন্ন্যাসীর মতো ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্চে। আমলকীগাছের পাতাগুলিকে ঝরঝরিয়ে দিয়ে বাতাস বয়ে যাচ্চে, তার মধ্যে একটা আলস্যের

সুর বাজচে আর বৃষ্টিতে-ধোওয়া রোদ্দুরটি যেন সরস্বতীর বীণার তারগুলো থেকে বেজে-ওঠা গানের মতো সমস্ত আকাশ ছেয়ে ফেলেচে। আমার ঠিক চোখের উপরেই সন্তোষবাবুর বাড়ির সামনেকার সবুজ খেত রৌদ্রে ঝলমল করে উঠেচে; আর তারই একপাশ দিয়ে বোলপুর যাবার রাঙা রাস্তাটা চলে গেচে—ঠিক যেন একটি সোনালি সবুজ শাড়ির রাঙা পাড়ের মতো। খুব ছেলেবেলা থেকেই এই বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে আমার গলাগলি ভাব—তাই আমার জীবনের কত কালই নদীর নির্জন চরে কাটিয়েচি। তারপরে কতদিন গেচে এখানকার নির্জন প্রান্তরে। তখন এখানে বিদ্যালয় ছিল না, তখন শান্তিনিকেতনের বাড়ির গাড়ি-বারান্দায় বসে খুব বৃহৎ একটি নিস্তব্ধতার মধ্যে ডুবে যেতে পারতুম;—রাত্রে ঐ বারান্দায় যখন শুয়ে থাকতুম তখন আকাশের সমস্ত তারা যেন আমার পাড়াপড়শির মতো তাদের জানলা থেকে আমার মুখের দিকে চেয়ে কী বলত, তাদের কথা শোনা যেত না, কিন্তু তাদের মুখ-চোখের হাসি আমাকে এসে স্পর্শ করত। বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে ভাব করার একটা মস্ত সুবিধা এই যে, সে আনন্দ দেয়, কিন্তু কিছু দাবি করে না; সে তার বন্ধুত্বকে ফাঁসের মতো বেঁধে ফেলতে চেষ্টা করে না, সে মানুষকে মুক্তি দেয়, তাকে দখল করে নিতে চায় না। ১৮ই শ্রাবণ, ১৩২৫।

৯

শান্তিনিকেতন

আজ সকাল থেকে ঘন ঘোর মেঘ করে প্রবল বেগে বর্ষণ চলচে, সকালে কোনো মাস্টার তাই ক্লাস নেননি। কিন্তু থার্ড ক্লাসের ছেলেদের আমি ছুটি দিতে পারলুম না—তাদের পড়া খুব শক্ত, মাঝে মাঝে ফাঁক পড়লে সমস্ত আলগা হয়ে যাবে, তাই সেই বৃষ্টির মধ্যেও তাদের সংগ্রহ করে আনা গেল। পড়াতে পড়াতে বৃষ্টির বেগ বেড়ে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে ঝড়। আমার শোবার ঘরে ক্লাস হয়—ঘরে ছাঁট আসতে লাগল। শার্সি বন্ধ করে দিলুম—পাঠ্য শেষ হয়ে গেল, কিন্তু বৃষ্টি শেষ হয় না—এই বৃষ্টিতে তাদের তো ছেড়ে দিতে পারিনে। শেষকালে ওরা আমাকে ধরে পড়ল, মুখে মুখে একটা গল্প বানিয়ে ওদের শোনাতে। কিন্তু ভেবে দেখো আমার বয়স এখন সাতান্ন বছর হয়েচে, এখন কি ইচ্ছা করলেই অনর্গল গল্প বলতে পারি? শেষকালে আমি করলুম কী, একটা গল্পের কেবল গোড়া ধরিয়ে দিয়ে ওদের বললুম সেইটে এক সপ্তাহের মধ্যে সম্পূর্ণ করে লিখে আনতে। ওরা তো উৎসাহের সঙ্গে রাজি হল, কিন্তু ওদের গল্প যে কী রকম হবে তা কল্পনা করে আমার মনে কিছুমাত্র উৎসাহ বোধ হচ্চে না। যাকগে ওরা তো সেই গল্প মাথায় নিয়ে ভিজতে ভিজতে চেঁচাতে চেঁচাতে ওদের ঘরে চলে গেল—আমি গেলুম স্নান করতে। স্নান করে খেয়ে এসে আজ তাকিয়ায় একটু হেলান দিয়ে পড়েছিলুম। কিন্তু সমস্ত দিন তো কুঁড়েমি করে কাটাতে পারিনে। অন্য দিন হলে উঠে আমার তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ক্লাসের জন্য পড়ার বই লিখতে বসতুম, কিন্তু আজ বাদলার দিনে সেটা ভালো লাগল না, তাই “বিদায়-অভিশাপ”টা ইংরেজিতে তর্জমা করতে বসে গিয়েছিলুম। বেশ ভালোই লাগছিল; পাতা দুয়েক যখন শেষ হয়ে গেচে, এমন সময় চিঠি হাতে করে এক হরকরার প্রবেশ। কাজেই এখন

কিছুক্ষণের জন্য দেবযানীকে অপেক্ষা করতে হচ্চে। বৃষ্টি থেমে গেচে কিন্তু জলভারাবনত মেঘে আকাশ ভরা। এতদিন শ্রাবণের দেখা ছিল না, যেই বিশে একুশে হয়েচে অমনি যেন কোনোমতে ছুটতে ছুটতে শেষ ট্রেনটা ধরে হঠাৎ হাঁপাতে হাঁপাতে এসে হাজির। কম হাঁপাচ্চে না,— তার হাঁপানির বেগে আমাদের শালবন বিচলিত, আমলকীবন কম্পান্বিত, তালবন মর্মরিত, বাঁধের জল কল্লোলিত, কাঁচ ধানের খেত হিল্লোলিত, আর আমার এই জানলার খড়খড়িগুলো ক্ষণে ক্ষণে খড়খড়ায়িত। ইতি ২১শে শ্রাবণ, ১৩২৫।

১০

শান্তিনিকেতন

তোমার চিঠি আজ এইমাত্র পেলুম। এইমাত্র বলতে কী বোঝায় বলি। দুপুর বেলাকার খাওয়া হয়ে গেছে। সেই কোণটাতে তাকিয়া ঠেসান দিয়ে বসেছিলুম। আকাশ ঘন মেঘে অন্ধকার হয়ে গেছে— পশ্চিম দিক থেকে মাঝে মাঝে সোঁ সোঁ করে ঝোড়ো বাতাস বইচে। ইন্দ্রের ঐরাবতের বাচ্চাগুলোর মতো মোটা মোটা কালো মেঘ আকাশময় ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্চে। মাঝে মাঝে গুরু গুরু গর্জন শোনা যায়। সামনে সবুজ মাঠের উপরে মেঘলা দিনের ছায়া, নিবিড় স্নিগ্ধতার মধ্যে চোখ ডুবে গেচে। তোমাকে লিখতে লিখতে বৃষ্টি নেমে এল— বৃষ্টি একটুমাত্র দেখা দিলেই আমার এই বারান্দায় তার পায়ের শব্দ তখনি শোনা যায়। দূরে ভুবনডাঙার দিকে বাঁধের কাছে যে ঘন বনশ্রেণী দেখা যায়, বৃষ্টির ধারায় সেটা একটু ঝাপসা হয়ে এসেচে— বনলক্ষ্মী যেন তার পাতলা ওড়্‌নাটাকে মুখের উপর ঘোমটা টেনে দিয়েচে। ক-টা বেজেচে, ঠিক বলতে পারিনে। আমার সামনের দেয়ালে যে-ঘড়িটা ছিল তাকে নির্বাসিত করে দিয়েচি। ইদানীং তার ব্যবহারে এমন হয়ে এসেছিল-যে, তাকে বিশ্বাস করার জো ছিল না— সে চলতেও ভুল বলতেও ভুল, তার পরামর্শমতো খেতে শুতে গিয়ে আমি অনেকবার ঠকেচি। তবু উপযুক্ত উপায়ে তাকে-যে সংশোধন করা যেত না তা বলতে পারিনে— কিন্তু সময়ের জন্যই ঘড়ি, ঘড়ির জন্য সময় নষ্ট করা আমার পোষায় না। যাই হোক আন্দাজে মনে হচ্ছে একটা দেড়টা হয়ে গেচে। আর একটু বাদেই আমাকে একটা ক্লাস পড়াতে হবে। আজকাল প্রায় জন পনেরো গুজরাটি ছেলে এসেছে, কী করে তাদের বাংলা পড়াতে হবে সেইটে আজ আমি দেখিয়ে দেব— বৌমা আর শৈল ওদের দুপুর বেলায় একঘণ্টা করে বাংলা পড়াতে রাজি হয়েচেন।

ইতিমধ্যে এন্ডরুজ্‌ সাহেবের খুব অসুখ করেছিল। আমাদের ভাবনা হয়েছিল। একদিন তো রাত্রে তাঁর নিজের মনে হল তাঁর ওলাউঠা হয়েছে। সেই রাত্রি একটার সময় বর্ধমানে ডাক্তার ডাকতে লোক পাঠিয়ে দিলুম। কিন্তু ইতিমধ্যে আমার ওষুধ খেয়ে এতটা ভালো হয়ে উঠলেন যে, ভোরের বেলায় আবার টেলিগ্রাফ করে ডাক্তার আনা বন্ধ করে দিলুম। তুমি তো জানই আমার হাতের রেখায় লেখা আছে— আমি ডাক্তারি করতে পারি। যাই হোক, এখন সাহেব আবার সেরে উঠে পূর্বের মতোই চারিদিকে দৌড়ে দৌড়ে বেড়াচ্চেন। কিন্তু তিনি সেই-যে জাপানি ঝোলা কাপড়টা পরতেন সেটা আজকাল আর দেখতে পাইনে।

বৃষ্টি একটুখানি হয়েই থেমে গেল। বাতাসটাও বন্ধ হয়েচে। কিন্তু পূবের দিকে খুব একটা ঘন নীল মেঘ ভ্রূকুটি করে থমকে দাঁড়িয়ে রয়েচে— এখনি বোধ হয় বরুণ-বাণ বর্ষণ করতে লেগে যাবে। আমরা আশ্রমে অনেক নতুন গাছ লাগিয়েছি, ভালো করে বৃষ্টি হলে ভালোই হয়। কিন্তু আজকাল শরৎকালের মতো হয়েচে— রৌদ্রে বৃষ্টিতে মিলে ক্ষণে ক্ষণে খেলা শুরু হয়ে গেচে। তোমরা গান-বাজনা শিখতে শুরু করেচ শুনে খুব সুখী হলুম। আজ আমার আর সময়ও নেই, কাগজও ফুরল, পাড়া জুড়োল বর্গি এল ক্লাসে।

১১

শান্তিনিকেতন

আজ বুধবার। কদিন খুব বৃষ্টি-বাদলের পর আজ সকালের আকাশে সূর্যের আলো নির্মল হয়ে ফুটে উঠেচে। শিশু যেমন দোলায় শুয়ে শুয়ে অকারণ আনন্দে হাত-পা ছুঁড়ে চিত হয়ে শুয়ে কলহাস্য করতে থাকে, তেমনি করে আশ্রমের গাছপালাগুলি আজ তাদের ডালপালা দুলিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে কেবলি ঝিলমিল করে উঠচে। এখন সকাল বেলা— স্নিগ্ধ বাতাস বইচে, পাখির ডাকে এখানকার শালবন এবং আমবাগান মুখরিত। আমাদের মন্দিরের উপাসনা হয়ে গেচে। তারপরে এতক্ষণ আমার জানালার ধারে সেই কোণটিতে শুয়েছিলুম। প্রতি বুধবারে উপাসনার পরে এণ্ডরুজ একবার এসে, আমি কী বলেচি, আমার কাছে ইংরেজিতে তাই বুঝিয়ে নেন। বুঝিয়ে নিয়ে খুশি হয়ে তিনি চলে গেচেন। আমি কী বলেছিলুম জানো? এই সৃষ্টির দিকে প্রথম তাকালে কী দেখতে পাই? এর আগাগোড়া সমস্ত নিয়মে বাঁধা, এর সমস্ত অণু-পরমাণুর মধ্যে নিয়মের ফাঁক এতটুকুও নেই। কেমন জান। যেমন একটি সহস্র-তারবাঁধা বীণা যন্ত্র। এই বীণার প্রত্যেক তারটি খুব খাঁটি হিসাব করে বাঁধা অর্থাৎ এই বীণাটির তুম্বী থেকে আরম্ভ করে এর সূক্ষ্মতম তারটি পর্যন্ত সমস্তই সত্য। কিন্তু না-হয় সত্যই হল, তাতে আমার কী। বীণার তার বাঁধার খাঁটি নিয়ম নিয়ে আমি কী করব। তেমনি এই জগতে সূর্যচন্দ্রগ্রহ অণু-পরমাণু সমস্তই ঠিক সময় রেখে ঠিক নিয়ম রেখে চলচে— এই কথাটা যত বড়ো কথাই হোক না, কেবল তাতে আমাদের মন ভরে না। আমরা এই কথা বলি, শুধু বীণার নিয়ম চাইনে, বীণার সংগীত চাই। সংগীতটি যখন শুনতে পাই, তখনি ঐ বীণাযন্ত্রের শেষ অর্থটি পাই— তা নইলে ও কেবল খানিকটা কাঠ এবং পিতল। জগতের এই বীণাযন্ত্রে আমরা সংগীতও শুনেচি; শুধু কেবল নিয়ম নয়। সকাল বেলার আলোতে আমরা শুধু কেবল মাটিজল, শুধু কেবল কতকগুলো জিনিস দেখতে পাই, তা নয়। সকাল বেলার শান্তি, স্নিগ্ধতা, সৌন্দর্য, পবিত্রতা সে তো কেবল বস্তু নয় সেই হচ্চে সকালের বীণাযন্ত্রের সংগীত। তারই সুরে আমাদের হৃদয় পাখির সঙ্গে মিলে গান গাইতে চায়। যেখানে বীণা শুধু বীণা সেখানে সে বস্তুমাত্র— কিন্তু যেখানে বীণার সংগীত ওঠে, সেখানে বীণার পিছনে আমাদের ওস্তাদজি আছেন। সেই ওস্তাদজির আনন্দই গানের ভিতর দিয়ে আমাদের আনন্দ দেয়। সৃষ্টির বীণা তো ওস্তাদজি বাজিয়ে চলেচেন, কিন্তু আমাদের নিজের চিত্তের বীণাও যদি সুরে না বাজে তাহলে

আমাদের হৃদয়বীণার ওস্তাদজিকে চিনব কী করে। তাঁর আনন্দরূপ দেখব কী করে। না যদি দেখি তাহলে কেবল বেসুর, কেবল ঝগড়া-বিবাদ, কেবল ঈর্ষা-বিদ্বেষ, কেবল কৃপণতা, স্বার্থপরতা, কেবল লোভ এবং ভোগের লালসা। আমাদের জীবনের মধ্যে যখন সংগীত বাজে তখন নিজেকে ভুলে যাই। আমাদের জীবন-যন্ত্রের ওস্তাদজিকেই দেখতে পাই। তখন দুঃখ আমাদের অভিভূত করে না, ক্ষতি আমাদের দরিদ্র করে দেয় না, তখন ওস্তাদজির আনন্দের মধ্যে আমাদের জীবনের শেষ অর্থটি দেখতে পাই। সেইটি দেখতে পাওয়াই মুক্তি। সেইজন্যই তো চিত্ত-বীণায় সত্যসুরে তার বাঁধতে চাই, সেইজন্যে কঠিন চেষ্টায় মনকে বশ করতে চাই, চৈতন্যকে নির্মল করে তুলতে চাই—সেইজন্যে নিজের স্বার্থ নিজের ক্ষুদ্র আকাঙ্ক্ষা ভুলে হৃদয়কে শুদ্ধ করতে চাই—তা হলেই আমার সুরবাঁধা যন্ত্র ওস্তাদের হাতে বেজে উঠবে: আমাদের প্রার্থনা হচ্চে এই :—"তব অমল পরশ রস অন্তরে দাও।" তাঁর সেই স্পর্শের রসই হচ্চে আমাদের অন্তরের সংগীত। তুমিও জান, আমি সন্ধ্যাবেলায় প্রায়ই গান করি—

বীণা বাজাও হে, মম অন্তরে।
সজনে বিজনে, বন্ধু, সুখে দুঃখে বিপদে
আনন্দিত তান শুনাও হে, মম অন্তরে।

দুপুর বেলা খেতে গিয়ে দেখি, খাবার টেবিলে তোমার চিঠি আর সেই হিন্দি খবরের কাগজ রয়েচে। তোমরা আলমোড়ায় যাচ্চ। ওখানে আমি অনেকদিন ছিলুম। তোমাদের ঠিকানা পেলে সেই ঠিকানায় লিখব। আমি ভেবেছিলুম, তোমাদের স্কুলের ছুটির আগে তোমরা কোথাও যাবে না। কিন্তু দেখচি আমার ছেলেবেলাকার হাওয়া তোমাদের লেগেচে—তখন আমি কেবলি ইস্কুল পালিয়েচি। কিন্তু সাবধান আমার মতো মূর্খ হলে চলবে না—নামতা মনে থাকা চাই, আর সাইবীরিয়ার রাস্তা ভুললে কষ্ট পাবে।

১২

শান্তিনিকেতন

তুমি বোধ হয় এই প্রথম হিমালয়ে যাচ্চ। আমিও প্রায় তোমার বয়সে আমার পিতৃদেবের সঙ্গে হিমালয়ে গিয়েছিলুম। তার আগে ভূগোলে পড়েছিলুম, পৃথিবীতে হিমালয়ের চেয়ে উঁচু জিনিস আর কিছু নেই, তাই হিমালয় সম্বন্ধে মনে মনে কত কী-যে কল্পনা করেছিলুম তার ঠিক নেই। বাড়ি থেকে বেরবার সময় মনটা একেবারে তোলপাড় করেছিল। অমৃতসর হয়ে ডাকের গাড়ি চড়ে প্রথমে পাঠানকোটে গিয়ে পড়লুম। সেখানে পাহাড়ের বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ। তুমি কাঠগোদাম দিয়ে উপরে উঠচ,—পাঠানকোট সেই রকম কাঠগোদামের মতো। সেখানকার ছোটো ছোটো পাহাড়গুলো, "কর, খল" "জল পড়ে, পাতা নড়ে",—এর বেশি আর নয়। তারপরে ক্রমে ক্রমে যখন উপরে উঠতে লাগলুম, তখন কেবল এই কথাই মনে হতে লাগল, হিমালয় যত বড়োই হোক না, আমার কল্পনা তার চেয়ে তাকে অনেক দূর ছাড়িয়ে গিয়েচে: মানুষের প্রত্যাশার কাছে হিমালয় পাহাড়ই বা লাগে কোথায়। আসল কথা, পাহাড়টা থাকে-থাকে উপরে উঠেচে

বলে, ডান্ডি করে চড়তে চড়তে, পর্বতরাজের রাজমহিমা ক্রমে ক্রমে মনের মধ্যে সয়ে আসে। যে-জিনিসটা খুব বড়ো, আমরা একেবারে তার সমস্তটা তো দেখতে পাইনে—পর্বত ক্রমে ক্রমে দেখি, সমুদ্র ক্রমে ক্রমে দেখি—এমন কি, যে-মানুষ আমার চেয়ে বয়সে অনেক বেশি তার সেই বড়ো বয়সের সুদীর্ঘ বিস্তারটা এক সঙ্গে দেখতে পাওয়া যায় না। এই জন্যে অজ্ঞাত জিনিসটা কল্পনায় যত বড়ো, প্রত্যক্ষে তত বড়ো নয়। অর্থাৎ বড়ো হলেও বড়ো দেখা যায় না। আমাদের যে-ঠাকুরকে আমরা প্রণাম করি, তিনি যত বড়ো তার সমস্তটা যদি সম্পূর্ণ আমাদের সামনে আসত, তাহলে সে আমরা সইতেই পারতুম না। কিন্তু হিমালয় পাহাড়ের মতো আমরা তাঁর বুকের উপর দিয়ে ক্রমে ক্রমে উঠি। যতই উঠি না কেন, তিনি আমাদের একেবারে ছাড়িয়ে যান না,—বরাবর আমাদের সঙ্গী হয়ে তিনি আমাদের আপনি উঠিয়ে নিতে থাকেন; বুঝিতে বুঝতে পারি তিনি আমাদের ছাড়িয়ে আছেন, কিন্তু ব্যবহারে বরাবর তাঁর সঙ্গে আমাদের সহজ আনাগোনা চলতে থাকে। তাই তো তাঁকে বন্ধু বলতে আমাদের কিছু ঠেকে না—তিনিও তাঁর উপরের থেকে হেসে আমাদের বন্ধু বলেন। এত উপরে চড়ে যান না-যে, তাঁর সঙ্গে কথা কওয়া দায় হয়ে ওঠে। তুমি যত জোরের সঙ্গে আমাকে সাতাশ বছরের করে নিয়েচ, আমরা তার চেয়ে ঢের বেশি জোরে তাঁকে সাতও করতে পারি সাতাশও করতে পারি—আবার সাতাশ কোটি করলেও চলে; তিনি যে আমাদের জন্য সবই হতে পারেন, তা নইলে তাঁকে দিয়ে আমাদের চলতই না। তোমার পাহাড় কেমন লাগল, আমাকে লিখো। হিমালয়ে আলমোড়া-পাহাড়ের চেয়ে ভালো পাহাড় ঢের আছে, আলমোড়া ভারি নেড়া পাহাড়; ওর গাছপালা নেই আর ওখানে থেকে হিমালয়ের তুষার-দৃশ্য তেমন ভালো করে দেখা যায় না। ইতি ১লা ভাদ্র, ১৩২৫।

১৩

শান্তিনিকেতন

আজ সকালে তোমার চিঠি পেলুম। তখন তো আমার সময় থাকে না, তাই এখন খাওয়ার পরে লিখতে বসেচি। আর খানিক পরে ম্যাট্রিক-ক্লাসের ছেলেরা দল বেঁধে খাতাপত্র নিয়ে হাজির হবে। তুমি যে-নিয়ম করে দিয়ে গিয়েছিলে, আজকাল সে আর পালন করা হয়ে ওঠে না; খাওয়ার পরে দুপুর-বেলায় শোওয়া একেবারে ছেড়ে দিয়েচি—সেই ডেস্কের সামনে সেই চৌকি নিয়ে আমার দিন কাটে। সেজন্যে আমার নালিশ নেই, কাজের দরকার পড়লেই কাজ করতে হবে। পৃথিবীতে ঢের লোক আমার চেয়ে ঢের বেশি কাজ করে—সেও আবার অফিসের কাজ—অর্থাৎ সে-কাজ পেটের দায়ে, মনের আনন্দে নয়। আমি-যে ছেলেদের পড়াই, সে তো দায়ে পড়ে নয়, সে নিজের ইচ্ছায়—অতএব এ রকম কাজ করতে পারা তো সৌভাগ্য। কিন্তু তবু এক-একবার দরজার ফাঁকের ভিতর দিয়ে এই সবুজ পৃথিবীর একটা আভাস যখন দেখতে পাই তখন মনটা উতলা হয়ে ওঠে। আমি-যে জন্মকুঁড়ে। যেমন বাঁশির ফাঁকের ভিতর দিয়ে সুর বেরয়, তেমনি আমার কুঁড়েমির ভিতর থেকেই আমার যেটি আসল কাজ সেইটি জেগে ওঠে। আমার সেই আসল কাজই হচ্চে বাণীর কাজ। সময়টাকে কর্তব্য দিয়ে ভরাট করে

একেবারে নিরেট করে দিলে বাণী চাপা পড়ে যায়। সেইজন্যই আমাকে কেবল কাজ থেকে নয়, সংসারের নানা জটিল বন্ধন থেকে যথাসম্ভব মুক্ত থাকতে হয়। কাজই হোক, আর মানুষই হোক, আমাকে একেবারে চাপা দিলে বা বেঁধে ফেললে আমার জীবন ব্যর্থ হতে থাকে। আমার মন ওড়বার জন্যে শূন্যকে চায়। তাকে খাঁচায় বাঁধবার আয়োজন যতবার হয়েচে, সেই আয়োজনের শিকল ছিন্ন হয়ে পড়ে গেচে। হঠাৎ একদিন দেখতে পাবে আমার কাজকর্মের দাঁড়খানা তার শিকল নিয়ে কোথায় পড়ে আছে, আর আমি অত্যুচ্চ অবকাশের আগডালের উপর অসীম ফাঁকার মধ্যে একলা বসে গান জুড়ে দিয়েচি। তাই বলচি—দরজা-জানলার আড়াল থেকে ঐ নীলে-সবুজে-সোনালিতে মেশানো ফাঁকার একটা অংশ যেমনি দেখতে পাই, অমনি আমার মন ডেস্কের ধার থেকে বলে ওঠে—ঐখানেই তো আমার জায়গা, ঐ ফাঁকাটাকে যে আমার আনন্দ দিয়ে, গান দিয়ে ভরে তুলতে হবে। পুকুর আছে মাটির বাঁধ দিয়ে ঘেরা—সেইখানেই তার কাজ, কেউবা স্নান করচে, কেউবা জল তুলচে, কেউবা বাসন মাজচে। কিন্তু আমি হচ্চি মেঘের মতো; আমাকে তো তটের ঘের দিলে চলবে না, আমাকে বাঁধতে গেলে তো বাঁধা পড়ব না—আমাকে যে ঐ শূন্যের ভিতর দিয়ে বর্ষণ করতে হবে। সব সময়েই যে বৃষ্টি ভরে আসে তা নয়, অনেক সময়ে অলস-স্বপ্নের মতো সূর্যের আলোতে রাঙিয়ে উঠে কিছুই না করে ঘুরে বেড়াই, কিন্তু এই কুঁড়েমিটুকু উপর থেকে আমার জন্যে বরাদ্দ হয়ে গেচে, এজন্যে আমি কারো কাছে দায়িক নই। সবই তো বুঝলুম, কিন্তু কুঁড়েমি করি কখন বল তো? তুমি তো দেখেই গেচ কাজের আর অন্ত নেই। ঘোড়াকে বিধাতা বাতাসের মতো দ্রুতগামী এবং মুক্ত করে সৃষ্টি করেছিলেন, কিন্তু সেই ঘোড়াকেই মানুষ জিনে লাগামে আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে ফেলে। আমারও সেই দশা। বিধাতার ইচ্ছা ছিল—আমি ভরপুর কুঁড়েমি করে কাটাই, কিন্তু যে-গ্রহের হাতে পড়েচি, সে আমাকে কষে খাটিয়ে নিচ্চে। বয়স যখন অল্প ছিল, তখন খাটুনি এড়িয়ে, ইস্কুল পালিয়ে পদ্মার নির্জন চরে বোটের মধ্যে লুকিয়ে বেশ চালাচ্ছিলুম—কিন্তু যখন থেকে তোমার পঞ্জিকা অনুসারে আমার 'সাতাশ' বছর হয়েচে, তখন থেকেই কাজের টানে আপনি ধরা দিয়ে কেটে বেরবার আর পথ পাইনে। নইলে আগেকার মতো হলে আমার পক্ষে আলমোড়ায় যেতে কতক্ষণ লাগত বলো? তবু তোমরা সেই পাহাড়ের উপরে মুক্ত হাওয়ায় স্বাস্থ্য এবং আনন্দ ভোগ করচ এ কথা মনে করে ভালো লাগচে; তোমার চিঠি সেখানকার লাল ফুলের পাপড়িতে রাগ-রক্ত হয়ে আমার হাতে এসে পৌঁচচ্চে। সেখানকার ফুলে যে-রক্তিমা দেখতে পাচ্চি, তোমার গালে সেই রক্তিমা সংগ্রহ করে আনবে—এই আশা করে আছি। আজ আর সময় নেই—অতএব ইতি। ১১ই ভাদ্র, ১৩২৫।

১৪

শান্তিনিকেতন

আমাদের এখানে প্রায়ই খুব বৃষ্টি হচ্চে। এক-একদিন বিষম জোরে বাতাস দেয় আর বৃষ্টির ধারাগুলো বেঁকে একেবারে তীরের মতো সিধে ঘরের মধ্যে চলে আসে। এখানে গরম নেই বললেই হয়—আর চারিদিকের মাঠ একেবারে ঘন সবুজ

হয়ে উঠেচে। বোলপুরকে এত সবুজ আমি আর কখনোই দেখিনি। গাছগুলো নিবিড় পাতার ভারে থাকে-থাকে ফুলে উঠেচে—ঠিক যেন সবুজ মেঘের ঘটার মতো। আমাদের বিদ্যালয়ের কুয়োগুলো প্রায় কানায় কানায় ভরা। এবারে চারিদিকে অনেক গাছ পুঁতে দিয়েচি। সেগুলো যখন বড়ো হয়ে উঠবে, তখন আমাদের আশ্রম আরও সুন্দর হয়ে উঠবে। কিন্তু এখানকার শুক্‌নো বেলেমাটিতে গাছপালা ভারি দেরিতে বেড়ে ওঠে—আমি আটাশ বছরে পড়বার আগে এ সব গাছে ফুলধরা দেখতে পাব না। তুমি যদি নবেম্বরে আমাদের আশ্রমে আস, তাহলে ততদিনে এখানে অনেক বদল দেখতে পাবে। এ বৎসরটা আমাদের আশ্রমের পক্ষে খুব তেজের বৎসর;—যেমন ঘন ঘন বৃষ্টিতে গাছপালা দেখতে দেখতে পূর্ণ হয়ে উঠচে, তেমনি এখানকার কাজের দিকেও খুব একটা উৎসাহ পড়ে গেচে। পড়াশুনো কাজকর্ম যেন নতুন জোর পেয়েচে; সেইজন্যে ছেলেদের মধ্যেও খুব একটা আনন্দ জেগে উঠেচে। আমি-যে আমেরিকায় যাবার টিকিট কিনেও গেলুম না, এখানে থেকে গেলুম, তার পুরস্কার পেয়েচি। আমাদের আশ্রম-লক্ষ্মী বোধ হয় আমার অদৃষ্টের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে আমার বিদেশে-যাওয়া কাটিয়ে দিয়েচেন। খুব ভালোই হয়েচে। আমি “লক্ষ্মীর পরীক্ষা” ইংরেজিতে তর্জমা করেচি, তা জানো; এণ্ডরুজ সে-টা পড়ে খুব হেসেচেন, আর খুব লাফালাফি করেচেন। ইতি ১৬ই ভাদ্র, ১৩২৫।

১৫

শান্তিনিকেতন

কাল রাত্রি থেকে আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন—মাঝে মাঝে প্রবল জোরে বর্ষণ নেমে আসচে—অমনি দেখতে দেখতে সমস্ত মাঠ জলে ছল ছল করে উঠচে—থেকে থেকে অশান্ত বাতাস সোঁ সোঁ করে হুহু করে আমাদের শালবনের ডালপালাগুলোর মধ্যে আছড়ে আছড়ে লুটিয়ে পড়চে—ঠিক যেন আকাশের অনেক দিনের একটা চাপা বেদনা কিছুতেই আর চাপা থাকচে না। ওদিকে দিগন্তের কোণে কোণে রাগী-রকমের ভ্রূকুটি দেখা দিয়েচে—আর তার মধ্য দিয়ে একটা ফ্যাকাশে আলো দারুণ হাসির মতো। সবসুদ্ধ জলে-স্থলে একটা খ্যাপাটে রকমের ভাব। মনে হচ্ছে যেন ছুটন্ত উচ্চৈঃশ্রবার উপরে চড়ে ইন্দ্রদেব একটা ঘূর্ণাঝড়ের চক্র পৃথিবীর দিকে ছুঁড়ে মেরেচেন। বাতাসের আর্তনাদ আর তার বেগ ক্রমেই বেড়ে উঠচে—একটা রীতিমতো ঝড়ের আয়োজন বলেই বোধ হচ্চে। আমার এই দোতালার কোণটি ঝড়ের পক্ষে খুব-যে ভালো আশ্রয়—তা নয়। আধুনিক কালের যুদ্ধক্ষেত্রের trench-এর মতো যথেষ্ট প্রকাশ্যও নয়, যথেষ্ট প্রচ্ছন্নও নয়—ভালো করে ঝড়টা দেখতে পাচ্চিনে, অথচ ঝড়ের ঝাপট থেকে ভালো করে রক্ষাও পাচ্চিনে। সিঁড়ির সামনের দরজাটা বন্ধ করতে হয়েচে, ঘরের দরজাও সব বন্ধ—অন্ধকার, কোথা থেকে বেঁকে-চুরে একটু বৃষ্টির ঝাপটও আসচে। রুদ্রদেবের তাণ্ডবনৃত্যের এই ডমরু-ধ্বনির মধ্যে বসে তোমাকে চিঠি লিখচি।

সেদিন তুমি আমাকে লিখেছিলে-যে, তুমি আমার অনেক নতুন নতুন নাম ঠিক করে রেখেচ। ক্রমে একে একে বোধ হয় শুনতে পাব, কিন্তু আমার আসল নামটা

যেন একেবারে চাপা না পড়ে যায়,— কেননা, ঐ নামটা নিয়ে এতদিন একরকম কাজ চালিয়ে এসেচি। তা ছাড়া ওর একটা মস্ত সুবিধা এই-যে, কবির সঙ্গে রবির একটা মিল আছে;—এর পরে যারা আমার নামে কবিতা লিখবে, তাদের অনেকটা কষ্ট বাঁচবে। ইতি ২০শে ভাদ্র, ১৩২৫।

১৬

শান্তিনিকেতন

আজ সকালে তোমার চিঠি এইমাত্র পেলুম। আজ আমার চতুর্থ এবং পঞ্চম বর্গের পুরাতন পড়ার দিন, আজ সন্তোষের হাতে তাদের ভার; এইজন্যে আমার সকালের কাজের প্রথম দুই ভাগ আমার ছুটি, তাই এখনি তোমার চিঠির জবাব দিতে বসবার সময় পেলুম। সেদিন যখন তোমাকে লিখছিলুম, তখন আকাশ জুড়ে মেঘের হাঁকডাক এবং মাঠে-বনে পাগলা হাওয়ার দৌরাত্ম্য চলছিল; আজ সকালে তার আর কোনো চিহ্ন নেই, আজ শরৎকালের প্রসন্ন মূর্তি প্রকাশ পেয়েচে —শিবের জটা ছাপিয়ে যেন গঙ্গা ঝরে পড়চে,—আকাশে তেমনি আজ আলোকের নির্মল ধারা ঢেলে দিয়েচে, পৃথিবী আজ মাথা নত করে তার অশ্রু-আর্দ্র হৃদয়খানি মেলে দিয়েচে, আর আকাশের কোন্ তরুণ দেবতা হাসিমুখে তার উপরে এসে দাঁড়িয়েচে। জলস্থল শূন্যতল আজ একটি জ্যোতির্ময় মহিমায় পূর্ণ হয়ে উঠেচে। সেই পরিপূর্ণতায় চারিদিক শান্ত স্তব্ধ, অথচ গোলমাল-যে কিছু নেই, তা নয়। জাগ্রত প্রভাতের কাজকর্মের কলধ্বনি উঠেচে। আমার ঠিক সামনেই 'দিনুবাবুর' ঘরের দোতালায় রাজমিস্ত্রী ও মজুরের দল নানারকম ডাকহাঁক এবং ঠুকঠাক লাগিয়ে দিয়েচে। দূরে থেকে ছেলেদের কণ্ঠস্বরও শোনা যাচ্চে, পূর্বদিকের সদর রাস্তা দিয়ে সার-বাঁধা গোরুর গাড়ি ইটের বোঝা নিয়ে আসচে, তারই অনিচ্ছুক চাকার আর্তনাদ এবং গাড়োয়ানের তর্জন-ধ্বনির বিরাম নেই, তার উপরে ঠিক আমার পিছনের জানালার বাইরে সুধাকান্তর ঘরের চালের উপরে বসে একদল চড়ুইপাখি কিচিমিচি করে কী-যে বিষম তর্ক বাধিয়ে দিয়েচে, তার একবর্ণ বোঝবার জো নেই,— প্রায় ন্যায়শাস্ত্রেরই তর্কের মতো। কিন্তু তবু আজ আলোকে অভিষিক্ত আকাশের এই অন্তরতর স্তব্ধতা কিছুতেই যেন ভাঙতে পারচে না। গায়ের উপর দিয়ে হাজার হাজার যেসব ঝরনা ঝরে পড়চে, তাতে যেমন হিমালয়ের অভ্রভেদী স্তব্ধতাকে বিচলিত করে না, এও ঠিক সেই রকম। একটি তপঃ-প্রদীপ্ত অপরিমেয় মৌনকে বেষ্টন করে এই সমস্ত ছোটো ছোটো শব্দের দল খেলা করে চলেচে— তাতে তপস্যার গভীরতা আরো বড়ো হয়ে প্রকাশ পাচ্চে, নষ্ট হচ্চে না। শরতের বনতল যেমন নিঃশব্দে-ঝরে-পড়া শিউলিফুলে আকীর্ণ হয়ে ওঠে, তেমনি করেই আমার মনের মধ্যে আজ শরৎ-আকাশের এই আলো শুভ্র শান্তি বর্ষণ করচে। ইতি ২৪শে ভাদ্র, ১৩২৫।

১৭

শান্তিনিকেতন

গেল বুধবারে সকালে আমি মন্দিরে কী বলেছিলুম, শুনবে? আমি বলেছিলুম, মানুষের ছোটো আর বড়ো—দুই-ই আছে। সেই ছোটো মানুষটি জন্ম আর মৃত্যুর মাঝখানে কয়দিনের জন্যে আপনার একটি ছোটো সংসার পেতেচে—সেইখানে তার যত খেলার পুতুল সাজানো—সেইখানে তার প্রতিদিনের আহরণ জমা হচ্চে আর ক্ষয় হচ্চে। কিন্তু মানুষের ভিতরকার বড়োটি জন্ম-মৃত্যুর বেড়া ডিঙিয়ে চিরদিনের পথে চলেচে, এই চলবার পথে তার কত সুখ-দুঃখ, কত লাভ-ক্ষতি ঝরে পড়ে মিলিয়ে যাচ্চে। পৃথিবীর দুটি আবর্তন আছে,—একটি আহ্নিক, একটি বার্ষিক। একটি আবর্তনে সে আপনাকেই ঘুরচে, আর একটিতে সে নিজের চিরপথের কেন্দ্রস্থিত আলোকের উৎসকে প্রদক্ষিণ করচে। নিজেকে ঘোরবার সময় সূর্যের দিকে পিঠ ফেরাতেই দেখতে পায়-যে, তার নিজের কোনো আলো নেই, তার নিজের দিকে অন্ধতা, ভয়, জড়তা,—কিন্তু নিজের সেই অন্ধকারটুকুকে না জানলে সূর্যের সঙ্গে তার সম্বন্ধের পূর্ণ পরিচয় সে পেত না। আমরাও আমাদের ছোটো আবর্তনে নিজেকে ঘুরি; এ ঘোরাতেই জানতে পারি, আমার দিকে অন্ধকার, বিভীষিকা, মোহ, আমার দিকে ক্ষুদ্রতা; কিন্তু সেই জানার সঙ্গে সঙ্গেই যখন সেই অমৃতের উৎসকে জানি, তখন অসত্য থেকে সত্যে, অন্ধকার থেকে আলোকে, মৃত্যু থেকে অমৃতে আমরা যেতে থাকি। এইজন্যে আপনাকে আর তাঁকে দুইকেই একসঙ্গে জানতে থাকলে তবেই আমরা আমাদের বন্ধনকে নিয়ত অতিক্রম করতে করতে, মুক্তির স্বাদ পেতে পেতে, অমৃতের পাথেয় সংগ্রহ করতে করতে চিরদিনের পথে চলতে পারি। আমাদের ক্ষুদ্র-প্রতিদিন আমাদের বৃহৎ-চিরদিনকে প্রণাম করতে করতে চলতে থাকবে, আমাদের ক্ষুদ্র-প্রতিদিন তার সমস্ত আহরণগুলিকে বৃহৎ-চিরদিনের চরণে সমর্পণ করতে করতে চলবে। কিন্তু ক্ষুদ্র প্রতিদিন যদি এমন কথা বলে বসে-যে, আমি যা পাই, যা আনি, সব আমি নিজে জমাব, তাহলেই বিপদ বাধে—কেননা, তার জমাবার জায়গা কোথায়? তার মধ্যে এত ধরে কোথায়? তার এমন অক্ষয় পাত্র আছে কোন্‌খানে? পৃথিবী যেমন তার সোনায়-ভরা সকালটিকে এবং সোনায়-ভরা সন্ধ্যাটিকে নিজে জমিয়ে রেখে দেয় না, পূজার স্বর্ণকমলের মতো আপন সূর্য-প্রদক্ষিণের পথে প্রত্যহ প্রণাম করে উৎসর্গ করতে করতে চলেচে, আমাদেরও তেমনি এই ক্ষুদ্র জীবনের সমস্ত সুখ-দুঃখ ভালোবাসাকে চিরদিনের চলবার পথে চিরদিনের দেবতাকে উৎসর্গ করতে করতে যেতে হবে :—তাহলেই ছোটো-আমির সঙ্গে বড়ো-আমির মিল হবে, তাহলেই আমাদের ক্ষুদ্র জীবন সার্থক হবে; আপনার দিকে সমস্ত টানতে গেলেই সে-টান টেকে না, সেই বিদ্রোহে ছোটো-আমিকে একদিন পরাস্ত হতেই হয়। এইজন্য ছোটো-আমি জোড়হাতে প্রার্থনা করচে নমস্তেঽস্তু,—বড়োকে আমার নমস্কার সত্য হোক্, নিজের ক্ষুদ্রতা থেকে মুক্তি পাই। ইতি ২৯শে ভাদ্র, ১৩২৫।

১৮

শান্তিনিকেতন

আজ সকালে তোমার চিঠি পেয়েছিলুম, কিন্তু তখনি তার জবাব দেবার সময় পাইনি। দুপুর বেলাতেও খাবার পরে কিছু কাজ ছিল, তাই এখন বিকেলে তোমাকে তাড়াতাড়ি লিখতে বসেচি—ডাক যাবার আগে শেষ করে ফেলতে হবে। আজকাল আর বৃষ্টির কোনো লক্ষণ নেই—আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেচে। আমার সেই লেখবার কোণটা তো তুমি জানো—সেটা হচ্চে পশ্চিমের বারান্দা; সেখানে বিকেলের দিকে হেলে-পড়া সূর্যের সমস্ত কিরণ বন্ধ-দরজার উপরে ঘা দিতে থাকে—সশরীরে ঢুকতে পায় না বটে, কিন্তু তার প্রতাপ অনুভব করতে পারি। তুমি এখন যেখানে আছ, সেখান থেকে আমার পিঠের দিকের বর্তমান অবস্থা ঠিক আন্দাজ করতে পারবে না। কিন্তু আমার আকাশের মিতাটি আমার সঙ্গে যেমনি ব্যবহার করুন, তাঁর সঙ্গে আমার কখনই বন্ধুত্বের বিচ্ছেদ হয়নি। আমি চিরদিন আলো ভালোবাসি। গাজিপুরে, পশ্চিমের গরমেও, আমি দুপুর বেলায় আমার ঘরের দরজা বন্ধ করিনি। অনেক দিন বর্ষার আচ্ছাদনের পর সেই আলো পেয়েচি,—সেই আলো আজ আমার দেহের মধ্যে, মগজের মধ্যে, মনের মধ্যে প্রবেশ করচে। আমার সামনে পূর্বদিকের ঐ খোলা দরজা দিয়ে ঐ আলো নীল আকাশ থেকে আমার ললাটে এসে পড়েচে, আর সবুজ খেতের উপর দিয়ে এসে আমার দুই চোখের সঙ্গে সঙ্গে যেন কানে-কানে কথা বলচে। পৃথিবীর ইতিহাসে কত হানা-হানি কাটাকাটি হয়ে গেল, মানুষের ঘরে-ঘরে কত সুখ-দুঃখ, কত মিলন-বিচ্ছেদ, কত যাওয়া-আসার বিচিত্র লীলা প্রতিদিন বিস্মৃতির মধ্যে মিলিয়ে গেল, কিন্তু এই শরতের সবুজটি পৃথিবীর প্রসারিত অঞ্চলের উপরে যুগে-যুগে বর্ষে-বর্ষে আপন আসন অধিকার করেচে,—কিছুতেই এই সুগভীর শান্তি সৌন্দর্যের 'পরে, এই রসপরিপূর্ণ নির্মলতার উপরে, কোনো আঘাত করতে পারেনি। সেই কথা যখন মনে করি, তখন সামনের ঐ আকাশের দিকে চেয়ে যুগযুগান্তরের সেই শান্তি আমার ব্যক্তিগত জীবনের সমস্ত ক্ষোভকে আপন অসীমতার মধ্যে মিশিয়ে নেয়।

আমি বুধবারে কী বলি তাই তুমি শুনতে চেয়েচ। যা বলি তা আমার ভালো মনে থাকে না। এণ্ডরুজ উপাসনার পরেই আমার কাছে এসে একবার ইংরেজিতে তার ভাবখানা শুনে নেন, তাই খানিকটা মনে পড়ে। এবারে বলেছিলুম, জগতে একটা খুব বড়ো শক্তি হচ্চে প্রাণ, অথচ সেই শক্তি বাইরের দিক থেকে কত ছোটো, কত সুকুমার, একটু আঘাতেই ম্লান হয়ে যায়। এমন জিনিসটা প্রতি মুহূর্তে বিপুল জড়-বিশ্বের ভারাকর্ষণের সঙ্গে প্রতি মুহূর্তে লড়াই করে দাঁড়িয়ে আছে, বেড়িয়ে বেড়াচ্চে।

বালক অভিমন্যু যেমন সপ্তরথীর ব্যূহে ঢুকে লড়াই করেছিল, আমাদের সুকুমার প্রাণ তেমনি অসংখ্য মৃত্যুর সৈন্যদলের মধ্যে দিয়ে অহর্নিশি লড়াই করে চলেচে। বস্তুর দিক থেকে দেখলে দেখা যায়, এই প্রাণের উপকরণ অতি তুচ্ছ,—খানিকটা জল, খানিকটা কয়লা, খানিকটা ছাই, খানিকটা ঐ রকম সামান্য কিছু, অথচ প্রাণ আপনার ঐ বস্তুর পরিমাণকে বহু পরিমাণে অতিক্রম করে আছে। মৃত-দেহে সজীব-দেহে বস্তুপিণ্ডের পরিমাণের তফাত নেই, অথচ উভয়ের মধ্যকার তফাত অপরিসীম। শুধু তাই নয়, সজীব বীজের বর্তমান আবরণের মধ্যে

মহারণ্য লুকিয়ে আছে। ছোটোর মধ্যে এই-যে বড়োর প্রকাশ, এই হচ্ছে আশ্চর্য। আরেক শক্তি হচ্ছে, মনের শক্তি। এই মনটি পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় নিয়ে এই অসীম জগতের রহস্য আবিষ্কার করতে বেরিয়েচে। সেই ইন্দ্রিয়গুলি নিতান্ত দুর্বল। চোখ কতটুকুই দেখে, কান কতটুকুই শোনে, স্পর্শ কতটুকুই বোধ করে! কিন্তু মন এই আপন ক্ষুদ্রতাকে কেবলি ছাড়িয়ে যাচ্চে— অর্থাৎ সে যা, সে তার চেয়ে অনেক বড়ো। তার উপকরণ সামান্য হলেও সে অতি ক্ষুদ্র এবং অতি-বৃহৎ অতি-নিকট এবং অতি-দূরকে কেবলি অধিকার করচে। তা ছাড়া, তার মধ্যে যে-ভবিষ্যৎ প্রচ্ছন্ন, সেও অপরিমেয়। একটি ছোটো শিশুর মনের মধ্যেই নিউটনের, সেক্‌স্‌পীয়ারের মন লুকিয়ে ছিল। বর্বরতার যে-মন পাঁচের বেশি গণনা করতে পারত না, তারি মধ্যে আজকের সভ্যতার মন জ্ঞানের সাধনায় অভাবনীয় সিদ্ধিলাভ করেচে। শুধু তাই নয়, আরো ভবিষ্যতে সে-যে আরো কী আশ্চর্য চরিতার্থতা লাভ করবে, আজ আমরা তা কোনোমতেই কল্পনা করতে পারিনে। তা-হলেই দেখা যাচ্চে আমাদের এই-যে মন, যা এক দিকে খুব ছোটো, খুব দুর্বল দেখতে, আর-একদিকে তার মধ্যে যে-ভূমা আছে, হিমালয়-পর্বতের প্রকাণ্ড আয়তনের মধ্যে তা নেই। তেমনি আমাদের আত্মা ছোটো-দেহ, ছোটো-মন, ছোটো-সব প্রবৃত্তি দিয়ে ঘেরা, অনেক সময় তাকে যেন দেখতেই পাওয়া যায় না। কিন্তু তবু তার মধ্যেই সেই ভূমা আছেন। সেইজন্যেই তো এক দিকে আমাদের ক্ষুধা-তৃষ্ণা, আমাদের রাগ-বিরাগ যখন আমাদের কাছে অন্ন-বস্ত্র ও অন্য হাজার-রকম বাসনার জিনিসের জন্যে দরবার করচে, সেই মুহূর্তেই এই প্রবৃত্তির দাস, এই বাসনার বন্দী, বিশ্বের সমস্ত সম্পদ পায়ের নিচে ফেলে, উঠে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করেচে,— অসত্য থেকে আমাকে সত্যে নিয়ে যাও, যা অসীম একেবারে তাকেই চাই। এত বড়ো চাওয়ার জোর এতটুকুর মধ্যে আছে কোথায়? সে-জোর যদি না থাকত, তবে এত বড়ো কথা তার মুখ দিয়ে বেরোত কেমন করে। এ-কথার কোনো মানে সে বুঝত কী করে। আশ্চর্য ব্যাপার হচ্চে এই যে, মানবের আত্মা যা নিয়ে দেখচে, শুনচে, ছুঁচ্চে, খাওয়া-পরা করচে, তাকেই চরম সত্য বলতে চাচ্চে না;— যাকে চোখে দেখল না, হাতে পেল না, তাকেই বলচে সত্য। তার একটি মাত্র কারণ, ছোটোর মধ্যেই বড়ো আছেন, সেই বড়োই ছোটোর ভিতর থেকে মানুষের আত্মাকে কেবলি মুক্তির দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্চেন— তাই মানুষের আশার অন্ত নেই। এখন প্রত্যেক মানুষের কাজ হচ্ছে কী। নিজের কথায়, চিন্তায়, ব্যবহারে এইটেই যেন প্রকাশ করি যে, আমাদের মধ্যে সেই বড়োই সত্য। তা না করে যদি মানুষের ছোটোটার উপরেই ঝোঁক দিই,— যে-সব বাসনা তার শিকল, তার গণ্ডি, যাতে তাকে খর্ব করে, আচ্ছন্ন করে, তাকেই যদি কেবল প্রশ্রয় দিই,— তাহলে মানুষকে তার সত্য পরিচয় থেকে ভোলাই। আত্মা-যে অমর, আত্মা-যে অভয়, আত্মা-যে সমস্ত সুখ-দুঃখ, ক্ষতি-লাভের চেয়ে বড়ো, অসীমের মধ্যেই-যে আত্মার আনন্দনিকেতন, এই কথাটি প্রকাশ করাই হচ্ছে মানুষের সমস্ত জীবনের অর্থ; এইজন্যেই আমরা এত শক্তি নিয়ে এত বড়ো জগতে জন্মেচি,— আমরা ছোটোখাটো এটা-ওটা-সেটা নিয়ে ভেবে কেঁদে মরতে আসিনি। ইতি ৪ঠা আশ্বিন, ১৩২৫।

১১

শান্তিনিকেতন

তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করেচ, “রবিদাদা” না বলে আমাকে আর একটা কোনো নামে সম্ভাষণ করতে পার কিনা। মহাভারতের সময়ে মানুষের এক-একজনের দশ-বিশটা করে নাম থাকত, যার যেটা পছন্দ বেছে নিতে পারত। কিম্বা যে-ছন্দে যেটা মেলাবার সুবিধে, লাগিয়ে দিত। অর্জুনের কত নাম-যে ছিল, তা অর্জুনকে রোজ বোধ হয় নামতা মুখস্থ করার মত মুখস্থ করতে হত। আমার যে আকাশের মিতাটি আছেন, তাঁরও নামের অভাব নেই। যদি তাঁর দুটো-একটা নাম ধার করে নিতে চাও, তাহলে বোধ হয় তাঁর বিশেষ কিছু লোকসান হবে না। কিন্তু যখন নামকরণ করবে, তখন আমার সম্মতি নিলে ভালো হয়। প্রথম যখন আমার নামকরণ হয়, তখন কেউ আমার সম্মতি নেয়নি, তবু দেখতে পাচ্চি নামটা মন্দ হয়নি,— কিন্তু হঠাৎ যদি তোমার মার্তণ্ড নামটাই পছন্দ হয়, তাহলে কিন্তু আমি আপত্তি করব। ‘ভানু’ নামটা যদিচ খুব সুশ্রাব্য নয়, তবু ওটা আমি একবার নিজেই গ্রহণ করেছিলুম। আর এক হতে পারে, যদি “কবিদাদা” বলো। নামটা ঠিক সংগত হোক বা না হোক, ওটা আমার নিজের কাজের সঙ্গে মেলে—

এক-যে ছিল রবি,
সে গুণের মধ্যে কবি।

কিন্তু একটা কথা তোমাকে বলে রাখি, “প্রিয় কবিদাদা” বললে চলবে না। প্রথম কারণ হচ্ছে এই—যে, তোমার প্রিয় কবি-যে কে, তা আমি ঠিক জানিনে। খুব সম্ভব যে-লোকটা সেই আশ্চর্য হিন্দী দোঁহা লিখেছিল সেই হবে। তার সঙ্গে ছ-অক্ষরের অনুপ্রাসে আমি-যে কোনোদিন পাল্লা দিতে পারব, এমন শক্তি বা আশা আমার নেই। দ্বিতীয় কারণ হচ্চে এই-যে, ইংরেজিতে ‘প্রিয়’ বলে না এমন মানুষই নেই—সে অমানুষ হলেও তাকে বলে,—এমন কি সে যদি দোঁহা না লিখতে পারে তবুও। আমার মত হচ্চে এই-যে, রাস্তা-ঘাটের সবাইকেই যদি ‘প্রিয়’ বলতে হবে এমন নিয়ম থাকে, তবে দুই-এক জায়গায় সে-নিয়মটা বাদ দেওয়া দরকার। অতএব আমাকে যদি শুধু “রবিদাদা” বল, তাহলে আমি বারণ করব না। এমন কি, যদি তোমার মার্তণ্ড নামটাই পছন্দ হয়, তাহলে “প্রিয় মার্তণ্ড দাদা” লিখো না। তাহলে বরঞ্চ লিখো, “মার্তণ্ডদাদা, প্রচণ্ড প্রতাপেষু।” যদি কোনোদিন তোমার সঙ্গে রাগারাগি করি, তাহলে ঐ নামে ডাকলেই হবে।

আমাদের আশ্রমের আকাশে শারদোৎসব আরম্ভ হয়েচে—শিউলিবন সাড়া দিয়েছে, মালতীলতার পাতায় পাতায় শুভ্রফুলের অসংখ্য অনুপ্রাস, কিন্তু রাত্রে চাঁদের আলোয় আকাশ-জোড়া একখানি মাত্র শুভ্রতা। আমাদের লাল রাস্তার দুইধারে কাশের গুচ্ছ সার বেঁধে দাঁড়িয়ে বাতাসে মাথা নত করে করে পথিকদের শারদ-সংগীত শুনিয়ে দিচ্চে। সমস্ত সবুজ মাঠে, সমস্ত শিশির-সিক্ত বাতাসে উৎসবের আনন্দ-হিল্লোল বয়ে যাচ্চে। অন্তরে বাইরে ছুটি, ছুটি, ছুটি—এই রব উঠেচে। ছুটিরও আর কেবল দুই সপ্তাহ বাকি আছে। আমাদের যখন ছুটি আরম্ভ, তখন তোমাদের শৈলপ্রবাস বোধ হয় সাঙ্গ হবে। পার্বতী যখন হিমালয়ে তাঁর পিতৃভবনে যাবেন, তখন তোমরা তাঁকে অভ্যর্থনা করবার জন্যে সেখানে থাকবে না। হিমালয়ের খবর আমরা রাখিনে, কৈলাসের তো নয়ই; আমরা তো

এই স্পষ্ট দেখতে পাচ্চি, স্বর্ণকিরণচ্ছটায় শারদা আমাদেরই ঘর উজ্জ্বল করে দাঁড়িয়েচেন। গোটাকতক মেঘ দিগন্তের কোণে মাঝে মাঝে জটলা করে; কিন্তু তাদের নন্দী-ভৃঙ্গীর মতো কালো চেহারা নয়, তারাও শ্বেতকিরণের মালা পরেচে, শ্বেত চন্দনের ছাপ লাগিয়েচে—ললাটে ভ্রূকুটির লেশ নেই। ইতি ৬ই আশ্বিন, ১৩২৫।

২০

শান্তিনিকেতন

প্রথম যখন তোমার চিঠি পেয়েছিলুম, তোমার চিঠিতে "প্রিয় রবিবাবু" পড়ে ভারি মজা লেগেছিল। ভাবলুম রবিবাবু আবার "প্রিয়" হবে কেমন করে? যদি হত "প্রিয় মিস্টার ট্যাগোর", তাহলে তেমন বেমানান হত না; কেননা রবিবাবু প্রিয়ও হতে পারে, অপ্রিয়ও হতে পারে। এবং প্রিয় অপ্রিয় দুইয়ের বাহিরও হতে পারে। তুমি যখন চিঠি লিখেছিলে, তখন রবিবাবু প্রিয়ও ছিল না, অপ্রিয়ও ছিল না, নিতান্ত কেবলমাত্র রবিবাবুই ছিল। কিন্তু চিঠির ভাষায় মিস্টার ট্যাগোরের 'প্রিয়' ছাড়া আর কিছু হবার জো নেই, তা আমার সঙ্গে তোমার ঝগড়াই থাক্ আর ভাবই থাক্। আজকাল রবিবাবু পরীক্ষায় একেবারে দু-তিন ক্লাস উঠে "রবিদাদা" হয়েছে কিন্তু যদি "প্রিয় রবিদাদা" লেখো, তবে তোমার সঙ্গে আমার ঝগড়া হবে। আর যদি বিশুদ্ধ বাংলামতে 'প্রিয়' লেখা হয়, তাহলে আপত্তি নেই বটে, তবু যখন আমি "রবিদাদা" তখন ওটা বাদ দিলেও চলে—ও যেন সকালবেলায় বাতি জ্বালানো, যেন, যার ফাঁসি হয়েচে, তাকে কুড়ি বৎসর দ্বীপান্তর দেওয়া। অতএব আমি যেন থানধুতি-পরা ঠাকুরদাদা, আমার কোনো পাড় নেই, আমি নিতান্তই যেন সাদা "রবিদাদা," কী বলো।

তোমরা মুক্তেশ্বরে গেচ শুনে সুখী হলুম। আমি ভ্রমণ করতে ভালোবাসি, কিন্তু ভ্রমণের কল্পনা করতে আমার আরো ভালো লাগে। কেননা, কল্পনার বেলায় রেলগাড়ি ঘটর ঘটর করে না, বেরেলিতে তিন চার ঘণ্টা বসে থাকতে হয় না, ডান্ডি অতি অনায়াসে এবং ঠিক সময়েই মেলে। তুমি তোমার নবীন দৃষ্টি নিয়ে নতুন নতুন দৃশ্য দেখচ, তোমার সেই আনন্দ আমি মনে মনে অনুভব করচি। আমি আমার এই খোলা ছাদে লম্বা কেদারায় শুয়ে শুয়ে, গিরিতটে তোমার দেবদারুবনে ভ্রমণের সুখ মনে মনে সঞ্চয় করি। আমিও প্রায় তোমার বয়সেই হিমালয়ে গিয়েছিলুম,—ড্যাল্‌হৌসীতে বক্রোটা শিখরের উপরে থাকতুম। এক একদিন আমাদের বাড়ির খানিক নিচে এক দেবদারুবনে সকালে একলা বেড়াতে যেতুম। আমি ছিলুম ছোট্ট (তখন লম্বায় ছ-ফুট ছিলাম না), তাই গাছগুলোকে এত প্রকান্ড বড়ো মনে হত—সে আর কী বলব। সেই সব গাছের সুদীর্ঘ ছায়ার মধ্যে নিজেকে দৈত্যলোকের অতি ক্ষুদ্র এক অতিথি বলে মনে হোত। কিন্তু সেই আমার ছেলেবেলাকার পর্বত, ছেলেবেলাকার বন এখন আর পাবো কোথায়? এখন আমার মনটা এই জগতের পথে এত নিজের সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে চলে-যে, নিজের চলার ধুলোয় এবং নিজের রথের ছায়ায় জগৎটা বারো আনা ঢাকা পড়ে যায়— বাজে ভাবনার ঝোঁকের মধ্য দিয়ে জগৎটাকে আর তেমন করে দেখা যায় না। তাই আজ

তুমি যে-পাহাড়ের মধ্যে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছ, মনে হচ্ছে সে আমার সেই অল্প বয়সের পৃথিবীর পাহাড়, আমার সেই ৪৫।৪৬ বৎসরের আগেকার। আমরা পুরানো হয়ে উঠে নিজের হাজার রকম চিন্তায় এই পৃথিবীটাকে যতই জীর্ণ করে দিই না কেন, মানুষ আবার ছেলেমানুষ হয়ে, নূতন হয়ে, চির নূতন পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে। শুধু একদল মানুষ যদি চিরকাল বৃদ্ধ হতে হতে পৃথিবীতে বাস করত, তাহলে বিধাতার এই পৃথিবী তাদের নস্যে, তামাকের ধোঁয়ায়, তাদের পাকা বুদ্ধির আওতায়, একেবারে আচ্ছন্ন হয়ে যেত, স্বয়ং বিধাতা তাঁর নিজের সৃষ্টি ঐ পৃথিবীকে চিনতে পারতেন না। কিন্তু জগতে শিশুর ধারা কেবলি আসচে। নবীন চোখ, নবীন স্পর্শ, নবীন আনন্দ ফিরে ফিরে মানুষের ঘরে অবতীর্ণ হচ্ছে। তাই প্রাচীনদের অসাড়তার আবর্জনা দিনে-দিনে, বারে-বারে, ধুয়ে-মুছে পৃথিবীর চিররহস্যময় নবীন রূপকে উজ্জ্বল করে রাখছে। অন্য মানুষের সঙ্গে কবিদের তফাত কী, জানো? বিধাতার নিজের হাতে তৈরী শৈশব কবিদের মন থেকে কিছুতে ঘোচে না। কোনোদিন তাদের চোখ বুড়ো হয় না, মন বুড়ো হয় না। তাই চিরনবীন এই পৃথিবীর সঙ্গে তাদের চিরদিনের বন্ধুত্ব থেকে যায়, তাই চিরদিনই তারা ছোটোদের সমবয়সী হয়ে থাকে। সংসারে বিষয়ের মধ্যে যারা বুড়ো হয়ে গেছে, তারা চন্দ্রসূর্য গ্রহ-তারার চেয়ে বয়সে বড়ো হয়ে ওঠে, তারা হিমালয়ের চেয়ে বড়োবয়সের। কিন্তু কবিরা সূর্য, চন্দ্র, তারার ন্যায় চিরদিনই কাঁচাবয়সী—হিমালয়ের মতোই তারা সবুজ থাকে, ছেলেমানুষীর ঝরনাধারা কোনোদিনই তাদের শুকোয় না; লোকালয়ে বিশ্বজগতের নবীনতার বার্তা এবং সংগীত চিরদিন তাজা রাখবার জন্যেই কবিদের দরকার—নইলে তারা আর সকল বিষয়েই অদরকারী।

উচ্চ-হাসে সকৌতুকে   চির-প্রাচীন গিরির বুকে
ঝরে পড়ে চির-নূতন ঝরনা;
নৃত্য করে তালে তালে   প্রাচীন বটের ডালে ডালে
নবীন পাতা ঘন-শ্যামল-বর্ণা।
পুরানো সেই শিবের প্রেমে   নূতন হয়ে এল নেমে
দক্ষসুতা ধরি উমার অঙ্গ,
এমনি করে সারাবেলা   চলছে লুকোচুরি খেলা
নূতন পুরাতনের চিররঙ্গ।

ইতি ১৪ই আশ্বিন, ১৩২৫।

২১

শান্তিনিকেতন

আচ্ছা বেশ, রাজি। ভানুদাদা নামই বহাল হল। এ নামে আজ পর্যন্ত আমাকে কেউ ডাকেনি, আর কেউ যদি ডাকে তবে তার উত্তর দেব না। সিণ্ডারেলার গল্প জান তো? তার একপাটি জুতো নিয়ে রাজার ছেলে পা মেপে বেড়াতে লাগল।

আমার ভানু নামটা সেই রকম একপাটি; যদি কেউ ব্যবহার করতে যায়, আমি তখন বলতে পারব—আচ্ছা আগে নিজের নামের পাটির সঙ্গে মিলিয়ে দেখো। যার নাম সুরবালা, সে বলবে সুরো সুরু সুরি—কিছুতেই ভানুর সঙ্গে মিলবে না, যার নাম মাতঙ্গিনী সে বলবে মাতু, মাতি, মাত্রে—কিছুতেই মিলবে না, তিনকড়িরও সেই দশা; কাত্যায়নীরও তাই; জগদম্বা, পীতাম্বরী, গুরুদাসী, শঙ্খেশ্বরী, নগেন্দ্রমোহিনী, কারোই কাছে ঘেঁষবার জো নেই। ভারি সুবিধে হয়েছে। কেবল আমার মনে ভারি ভয় রয়ে গেল, পাছে কারো নাম থাকে “কানু বিলাসিনী।” তবে তাকে কী বলে ঠেকাব? তুমি ভেবে রেখে দিয়ো।

ছুটির দিন এল—পরশু ছুটি, তারপরে কী করব? তখন কেবল শিউলিবন, শিশির-ভেজা ঘাস, আর দিগন্ত-প্রসারিত মাঠ আমার মুখ তাকিয়ে থাকবে। তারা তো আমার কাছে ইংরেজি শিখতে চায় না—তারা চায় আমার মনের মধ্যে যে আনন্দের সোনার কাঠি আছে সেইটে ছুঁইয়ে দিয়ে তাদের জাগিয়ে তুলব এবং আমার চেতনার সঙ্গে তাদের সৌন্দর্যকে মিলিয়ে দেব। আমার জাগরণের ছোঁয়াচ না লাগলে পরে প্রকৃতি জাগবে কী করে? নীলাকাশের কিরণকমলের উপরে শারদলক্ষ্মী আসন গ্রহণ করেন, কিন্তু আমার আনন্দ-দৃষ্টি না পড়লে পরে সে-পদ্মই ফোটে না।

আজ বুধবার। আজ মন্দিরে ছুটির ঠাকুরের কথা বলেচি। যখন আমরা কাজ করতে থাকি, তখন শক্তির সমুদ্র থেকে আমাদের মধ্যে জোয়ার আসে, তখন আমরা মনে করি এ শক্তি আমারই এবং এই শক্তির জোরেই আমরা বিশ্বজয় করব। কিন্তু শক্তিকে বরাবর খাটাতে তো পারিনে—সন্ধ্যা যখন আসে তখন তো কাজ বন্ধ হয়, তখন তো আর গাণ্ডীব তুলতে পারিনে। তাই জোয়ার ভাঁটার ছন্দকে জীবের মেনে চলা চাই। একবার আমি, একবার তুমি। সেই তুমিকে বাদ দিয়ে যখন মনে করি আমিই কর্তা, তখনই জগতে মারামারি বেধে যায়—রক্তে ধরণী পঙ্কিল হয়ে ওঠে। মা তাঁর মেয়েকে ডেকে বলেন, সংসারের কাজে তুমি আমার সঙ্গে লেগে যাও, মেয়ে তখন কোমর বেঁধে লাগে, কিন্তু সে যখন ভুলে যায়-যে, এই কাজ তার মায়ের সংসারেরই কাজ, যখন অহংকার করে ভাবে ‘আমি যেমন ইচ্ছা তাই করব,’ তখন সে সংসারের ব্যবস্থাকে উলট পালট্‌ করে জঞ্জাল জমিয়ে তোলে—অবশেষে এমন হয়-যে, মা ঝাঁটা হাতে নিয়ে সমস্ত আবর্জনা ঝেঁটিয়ে ফেলেন। মেয়ের সেই কাজটুকুর উপরে ঝাঁটা পড়ে না—যখন সে-কাজ মায়ের সংসার-ব্যবস্থার সঙ্গে মেলে। সংসার-স্থিতির সঙ্গে এই-যে মিলিয়ে কাজ করা, এতে আমাদের যথেষ্ট স্বাধীনতা আছে—অর্থাৎ মিল রেখেও আমরা তার মধ্যে নিজের স্বাতন্ত্র্য রাখতে পারি—তাতেই সৃষ্টির বৈচিত্র্য। মেয়ের হাতের কাজটুকু মায়ের অভিপ্রায়কে প্রকাশ করেও নিজেকে বিশিষ্টভাবে প্রকাশ করতে পারে। যখন তাই সে করে তখন তার সেই সৃষ্টি মায়ের সৃষ্টির সঙ্গে মিলে স্থিতি লাভ করে। বিশ্বকর্মার কাজে আমরা যখন যোগ দিই তখন যে-পরিমাণে তাঁর সঙ্গে মিল রেখে, ছন্দ রেখে চলি সেই পরিমাণে আমাদের কাজ অক্ষয়কীর্তি হয়ে ওঠে,—যে-পরিমাণে বাধা দিই সেই পরিমাণে আমরা প্রলয়কে ডেকে আনি। নিজের জীবনকে এই প্রলয় থেকে যদি বাঁচাতে চাই তাহলে প্রতিদিনই আমি-তুমির ছন্দ মিলিয়ে চলতে হবে—সেই ছন্দেই মানুষের সৃষ্টি, মানুষের ইতিহাস অমরতা লাভ করে। দেখচ তো. মা আজ পশ্চিমের ঘরে কী রকম প্রলয়ের সম্মার্জনী নিয়ে বেরিয়েচেন। পশ্চিমের সভ্যতা মনে করছিল, তার শক্তি তার নিজেরই ভোগ নিজেরই সমৃদ্ধির জন্যে।

সে আমি-তুমির ছন্দকে একেবারে মানেনি। কিছুদূর পর্যন্ত সে বেড়ে উঠল। মনে করল সে বেড়েই চলবে— এমন সময়ে ছন্দের অমিল ঘোচাবার জন্যে হঠাৎ এক মুহূর্তেই মায়ের প্রলয় অনুচর এসে হাজির। এখন কান্না, আর বক্ষে করাঘাত। ইতি ১৬ই আশ্বিন, ১৩২৫।

২২

শান্তিনিকেতন

মাদ্রাজের দিকে যে-দিন যাত্রা করেছিলুম সে-দিন শনিবার এবং সপ্তমী, অন্যান্য অধিকাংশ বিদ্যারই মতো দিনক্ষণের বিদ্যা আমার জানা নেই। বলতে পারিনে আমার যাত্রার সময় লক্ষকোটি যোজন দূরে গ্রহনক্ষত্রের বিরাট সভায় আমার এই ক্ষুদ্র মাদ্রাজ ভ্রমণ সম্বন্ধে কী রকম আলোচনা হয়েছিল, কিন্তু তার ফলের থেকে বোঝা যাচ্ছে জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর মধ্যে ঘোরতর মতভেদ হয়েছিল। সেইজন্যে আমার ভ্রমণপথের হাজার মাইলের মধ্যে ছ-শো মাইল পর্যন্ত আমি সবেগে সগর্বে এগোতে পেরেছিলুম। কিন্তু বিরুদ্ধ জ্যোতিষ্কের দল কোমর বেঁধে এমনি অ্যাজিটেশন করতে লাগল যে, বাকি চারশো মাইলটুকু আর পেরোতে পারা গেল না। জ্যোতিষ্ক-সভায় কেবলমাত্র আমারই যাত্রা সম্বন্ধেই-যে বিচার হয়েছিল তা নয়— বেঙ্গল-নাগপুর রেলোয়ে লাইনের যে এঞ্জিনটা আমার গাড়ি টেনে নিয়ে যাবে, মঙ্গল, শনি এবং অন্যান্য ঝগড়াটে গ্রহেরা তার সম্বন্ধেও প্রতিকূল মন্তব্য প্রকাশ করেছিল— যদি বল সে-সভায় তো আমাদের খবরের কাগজের কোনো রিপোর্টার উপস্থিত ছিল না তবে আমি খবর পেলুম কোথা থেকে, তবে তার উত্তর হচ্ছে এই যে আইনকর্তারা তাঁদের মন্ত্রণা-সভায় কী আইন পাশ করেছেন তা তাঁদের পেয়াদার গুঁতো খেলেই সবচেয়ে পরিষ্কার বোঝা যায়। যে মুহূর্তে হাওড়া স্টেশনে আমার রেলের এঞ্জিন বাঁশি বাজালে, সে-বাঁশির আওয়াজে কত তেজ, কত দর্প। আর রবীন্দ্রনাথ ওরফে ভানুদাদা নামক যে-ব্যক্তি তোরঙ্গ বাক্স ব্যাগ বিছানা গাড়িতে বোঝাই করে তার তক্তর উপরে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হয়ে ইলেকট্রিক পাখার চলচ্চক্র-গুঞ্জন-মুখর রথকক্ষে একাধিপত্য বিস্তার করলেন, তারই বা কত আশ্বস্ততা। তার পরে কত গড় গড়, খড় খড়, ঝর ঝর, ভোঁ ভোঁ, ঢং ঢং, স্টেশনে স্টেশনে কত হাঁকডাক, হাঁসফাঁস, হন্ হন্, হট্ হট্, আমাদের গাড়ির দক্ষিণে বামে কত মাঠ বাট বন জঙ্গল নদী নালা গ্রাম শহর মন্দির মসজিদ কুটীর ইমারত— যেন বাঘে তাড়া করা গোরুর পালের মতো ঊর্ধ্বশ্বাসে আমাদের বিপরীত দিকে ছুটে পালাতে লাগল। এমনি ভাবে চলতে চলতে যখন পিঠাপুরমে পৌঁছতে মাঝে কেবল একটা স্টেশন মাত্র আছে, এমন সময় এঞ্জিনটার উপরে নক্ষত্র-সভার অদৃশ্য পেয়াদা তার অদৃশ্য পরোয়ানা হাতে নিয়ে নেবে পড়ল, আর অমনি কোথায় গেল তার চাকার ঘুরনি, তার বাঁশির ডাক, তার ধুমোদ্গার, তার পাথুরে কয়লার ভোজ! পাঁচ মিনিট যায়, দশ মিনিট যায়, বিশ মিনিট যায়, এক ঘণ্টা যায়, স্টেশন থেকে গাড়ি আর নড়েই না। সাড়ে পাঁচটায় পিঠাপুরমে পৌঁছবার কথা কিন্তু সাড়ে ছটা, সাড়ে সাতটা বাজে তবু এমনি সমস্ত স্থির হয়ে রইল যে, "চরাচরমিদং সর্বং" যে চঞ্চল, এ কথাটা মিথ্যা বলে বোধ হল। এমন সময় হাঁপাতে হাঁপাতে ধক্ ধক্ ধুক্ ধুক্

করতে করতে আর একটা এঞ্জিন এসে হাজির। তার পরে রাত্রি সাড়ে আটটার সময় আমি যখন পিঠাপুরমে রাজবাড়িতে গিয়ে উঠলুম তখন আমার মনের অবস্থাটা দেখি ঠিক সেই এঞ্জিনেরই মতো। মনকে জিজ্ঞাসা করলুম, "কেমন হে, মাদ্রাজে যাচ্ছ তো? সেখান থেকে কাঞ্চি মদ্র অন্ধ্র পৌণ্ড্র প্রভৃতি কত দেশ দেশান্তর দেখবার আছে, কত মন্দির কত গুহা, কত তীর্থ ইত্যাদি ইত্যাদি",—আমার মন সেই এঞ্জিনটার মতো চুপ করে গম্ভীর হয়ে রইল, সাড়াই দেয় না। স্পষ্ট বোঝা গেল, দক্ষিণের দিকে সে আর এক পাও বাড়াবে না। মনের সঙ্গে বেঙ্গল-নাগপুরের এঞ্জিনের একটা মস্ত প্রভেদ এই যে, এঞ্জিন বিগড়ে গেলে আর একটা এঞ্জিন টেলিফোন করে আনিয়ে নেওয়া যায়, কিন্তু মন বিগড়োলে সুবিধামতো আর একটা মন পাই কোথা থেকে। সুতরাং মাদ্রাজ চারশো মাইল দূরে পড়ে রইল আর আমি গতকল্য শনিবার মধ্যাহ্নে সেই হাবড়ায় ফিরে এলুম। যে শনিবার একদা তার কৌতুকহাস্য গোপন করে মাদ্রাজের গাড়িতে চড়িয়ে দিয়েছিল সেই শনিবারই আর একদিন আমাকে হাওড়ায় নামিয়ে দিয়ে তার নিঃশব্দ অট্টহাস্যে মধ্যাহ্ন আকাশ প্রতপ্ত করে তুললে। এই তো গেল আমার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত। কিন্তু তুমি যখন হিমালয় যাত্রায় বেরিয়েছিলে তখন নক্ষত্র-সভায় তোমার সম্বন্ধেও তো ভালো রেজোল্যুশন্ পাস হয়নি। আমরা সবাই স্থির করলুম, গিরিরাজের শুশ্রূষায় তুমি সেরে আসবে। কিন্তু তারাগুলো কেন কুমন্ত্রণা করতে লাগল। আমার বিশ্বাস কী জানো, অনেকগুলো ঈর্ষাপরায়ণ তারা আছে, তারা তোমার ভানুদাদাকে একেবারেই পছন্দ করে না। প্রথমত, আমার নামটাই তাদের অসহ্য বোধ হয় এইজন্যে বদনাম করবার সুবিধা পেলে ছাড়ে না। তারপরে দেখেছে আমার সঙ্গে আকাশের মিতার খুব ভাব আছে সেইজন্যে নক্ষত্রগুলো আমাকে তাদের শত্রুপক্ষ বলে ঠিক করেছে। যাই হোক, আমি ওদের কাছে হার মানবার ছেলে নই। ওরা যা করবার করুক, আমি দিনের আলোর দলে রইলুম। তোমাকে কিন্তু কুচক্রী নক্ষত্রগুলোর উপরে টেক্কা দিতে হবে। বেশ শরীরটাকে সেরে নিয়ে, মনটাকে প্রফুল্ল করে হৃদয়টাকে শান্ত করো, জীবনটাকে পূর্ণ করো। তারপরে লক্ষ্যকে ঊর্ধ্বে রেখে অপরাজিত চিত্তে সংসারের সুখ-দুঃখের ভিতর দিয়ে চলে যাও—কল্যাণ লাভ করো এবং কল্যাণ দান করো। নিজের বাসনাকে উদ্দাম করে না তুলে মঙ্গলময়ের শুভ ইচ্ছাকে নিজের অন্তরে বাহিরে সার্থক করো। ইতি ২০ অক্টোবর, ১৯১৮।

২৩

শান্তিনিকেতন

আমার ভ্রমণ শেষ হল। যেখান থেকে যাত্রা আরম্ভ করেছিলুম সেইখানেই আবার এসে ফিরেছি। সকলেই পরামর্শ দিয়ে থাকে, ছুটি পেলেই স্থান এবং বায়ু পরিবর্তন করা দরকার কিন্তু দেখা গেল, সেটা যে অনাবশ্যক এবং ক্লেশকর—সেইটে ভালো করে বুঝে দেখবার জন্যেই কেবল পরিবর্তনের দরকার। আসল দরকার, যেখানে আছি সেইখানেই মনটাকে সম্পূর্ণ এবং সচেতন ভাবে ঢেলে দেওয়া। এই-যে মাঠ আমার চোখে পড়ছে এর কি দেখবার যোগ্য রস ফুরিয়ে গেছে। আর এই যে শিশিরার্দ্র সকালবেলাটি তার কিরণ দলের মাঝখানে আমার মনকে মধুপান-

রত স্তব্ধ ভ্রমরের মতো স্থান দিয়েছে, এ কি কোনোকালে এর বৃন্ত থেকে ঝরে পড়বে। আসল কথা, মনটা অসাড় হলেই তাকে সাড়া দেবার জন্যে নাড়া দিতে হয়। তাই আমাদের সাধনা হওয়া উচিত, কী করলে আমাদের মন অসাড় না হয় তাহলেই নিজের মধ্যে নিজের সম্পদ লাভ করতে পারি, কেবলি বাইরের জন্যে ছটফট করতে হয় না। আমাদের যা-কিছু সবচেয়ে বড়ো সম্পদ, সবচেয়ে বড়ো আনন্দ—তার ভাণ্ডার যদি বাইরে থাকে তাহলে আমাদের ভারি মুশকিল, কেননা, বাইরের পথে বাধা ঘটবেই, বাইরের দরজা মাঝে মাঝে বন্ধ হবেই। বাইরের কাছে থেকে ভিক্ষা চাওয়ার অভ্যাস আমাদের ছেড়ে দিতে হবে। আমাদের ইচ্ছা বাইরের দিকে বাধা পেলেও আমরা যেন অন্তরের মধ্যে পূর্ণতা অনুভব করে শান্তি পেতে পারি। নইলে, নিজেও অশান্ত হই—চারিদিককেও অশান্ত করে তুলি। এই সংসার থেকে যে-প্রীতি, যে-কল্যাণ আমরা অন্তরের মধ্যে পেয়েচি সেই আমাদের অন্তরতম লাভের জন্যে যেন আমরা গভীরভাবে কৃতজ্ঞ হই। বাইরের দিকে যে-কিছু জিনিস পাইনি, সে-দিক থেকে যা-কিছু বাধা আসচে, তারই ফর্দটাকে লম্বা করে তুলে যদি খুঁতখুঁত করি, ছটফট করতে থাকি তাহলে অকৃতজ্ঞতা হয় এবং সেই চঞ্চলতা নিতান্তই বৃথা নিজের অন্তর-বাহিরকে আবৃত করে মাত্র। স্থির হব, প্রশান্ত হব, মনকে প্রসন্ন রাখব তাহলেই আমাদের মন এমন একটি স্বচ্ছ আকাশে বাস করবে যাতে করে অমৃতলোক থেকে আনন্দ-জ্যোতি আমাদের মনকে স্পর্শ করতে বাধা পাবে না। তোমার প্রতি তোমার ভানুদাদার এই আশীর্বাদ যে, তুমি আপনার ইচ্ছাকে একান্ত তীব্র করে চিত্তকে কাঙালবৃত্তিতে দীক্ষিত কোরো না—বিধাতার কাছ থেকে যা-কিছু দান পেয়েচ তাকে অন্তরের মধ্যে নম্রভাবে গ্রহণ এবং অবিচলিতভাবে রক্ষা কোরো। শান্তি হচ্ছে সত্য উপলব্ধি করবার সর্বাপেক্ষা অনুকূল অবস্থা—সংসারের অনিবার্য আঘাতে ব্যাঘাতে, ইচ্ছার অনিবার্য নিষ্ফলতায় সেই সুস্নিগ্ধ শান্তি যেন তোমার মধ্যে বিক্ষুব্ধ না হয়। ইতি ১০ই কার্তিক, ১৩২৫।

২৪

শান্তিনিকেতন

এতক্ষণ তুমি রেলগাড়িতে ধক্ ধক্ করতে করতে চলেচ, কত স্টেশন পার হয়ে চলে গিয়েচ—আমাদের এই লাল মাটির, এই তালগাছের দেশ হয়তো ছাড়িয়ে গেছ বা। আমার পূর্বদিকের দরজার সামনে সেই মাঠে রৌদ্র ধু ধু করচে এবং সেই রৌদ্রে নানা রঙের গোরুর পাল চরে বেড়াচ্চে। এক-একটা তালগাছ তাদের ঝাঁকড়া মাথা নিয়ে পাগলার মতো দাঁড়িয়ে আছে। আজ দিনে আমার সেই বড়ো চৌকিতে বসা হল না—খাওয়ার পর এন্ডরুজ্ সাহেব এসে আমার সঙ্গে বিদ্যালয়ের ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান সম্বন্ধে বহুবিধ আলোচনা করলেন তাতে অনেকটা সময় চলে গেল। তারপরে নগেনবাবু নামক এখানকার একজন মাস্টার তাঁর এক মস্ত তর্জমা নিয়ে আমার কাছে সংশোধন করবার জন্যে আনলেন, তাতেও অনেকটা সময় চলে গেল। সুতরাং বেলা তিনটে বেজে গেচে তবু আমি আমার সেই ডেস্কে বসে আছি। বই, কাগজ, খাতা, দোয়াত, কলম, ওষুধের শিশি এবং

অন্য হাজার রকম জবড়জঙ্গ্ জিনিসে আমার ডেস্ক পরিপূর্ণ। তার মধ্যে এমন অনেক আবর্জনা আছে, যা এখনি টেনে ফেলে দিলেই চলে; কিন্তু কুঁড়ে মানুষের মুশকিল এই-যে, আবশ্যকের জিনিস সে খুঁজে পায় না আর অনাবশ্যক জিনিস না খুঁজলেও তার সঙ্গে লেগেই থাকে। এমন অনেক ছেঁড়া লেফাফা কাগজ চাপা দিয়ে জমানো রয়েচে যার ভিতরকার চিঠিরই কোনো উদ্দেশ পাওয়া যায় না। মনে আছে, আমাকে তোমার রূপকথা পাঠিয়ে দিতে হবে সেই অলাবু-নন্দিনীর "কাহিনী" আর সেই "চম্‌কিলা" "সোনেকিতরহ" চুলওয়ালী রাজকুমারীর কথা। তা ছাড়া, আর একটি কথা মনে রাখতে হবে, মন খারাপ কোরো না—লক্ষ্মী মেয়ে হয়ে প্রসন্ন হাসি হেসে ঘর উজ্জ্বল করে থাকবে। সকলেই বলবে, তুমি এমন সোনেকিতরহ হাসি পেয়েচ কোন্ পারিজাতের গন্ধ থেকে, কোন্ নন্দন-বীণার ঝংকার থেকে, কোন্ প্রভাত-তারার আলোক থেকে, কোন্ সুর-সুন্দরীর সুখস্বপ্ন থেকে, কোন্ মন্দাকিনীর চলোর্মি কল্লোল থেকে, কোন্—কিন্তু আর দরকার নেই, এখনকার মতো এই ক-টাতেই চলে যাবে—কেননা কাগজ ফুরিয়ে এসেচে, দিনও অবসন্ন-প্রায়, অপরাহ্নের ক্লান্ত রবির আলোক ম্লান হয়ে এসেচে।
২ অগ্রহায়ণ, ১৩২৫।

২৫

শান্তিনিকেতন

কাল তোমার চিঠি পেয়েচি, আমার চিঠিও নিশ্চয় তুমি পেয়েচ। এতক্ষণে নিশ্চয়ই বেশ হাসিমুখে সেই বাংলা মহাভারত এবং চারুপাঠ পড়চ। যে তোমাকে দেখচে, সেই মনে করচে—চারুপাঠের মধ্যে খুব মনোহর গল্প এবং তোমার শিশু-মহাভারতের মধ্যে খুব মজার কথা কিছু বুঝি আছে। কিন্তু তারা জানে না, প্রায় দু-শো ক্রোশ তফাত থেকে ভানুদাদা তোমাকে খুশি পাঠিয়ে দিচ্চে—এত খুশি-যে, কার সাধ্য তোমাকে বিরক্ত করে, বা রাগায়, বা দুঃখ দেয়। আমি প্রায় সন্ধ্যাবেলায় সেই-যে গান গাই,—"বীণা বাজাও মম অন্তরে" সেই গানটি তোমার মনের মধ্যে বরাবরকার মতো স্বরলিপি করে লিখে রেখে দেবার ইচ্ছা আছে—মনটি গানের সুরে এমনি বোঝাই হয়ে থাকবে যে, বাহিরের তুফানে তোমাকে নাড়া দিতে পারবে না। শুধু তোমাকে বলচিনে, আমারও ভারি ইচ্ছে, নিজের ভরা মনটির মাঝখানে বেশ নিবিষ্ট হয়ে বসে বাইরের সমস্ত যাওয়া-আসা কাঁদা-হাসার অনেক উপরে স্থির হয়ে থাকতে পারি। আপনার ভিতরে আপনার চেয়ে বড়ো কাউকে যদি ধরে রাখা যায় তাহলেই সেই ভিতরের গৌরবে বাহিরের ধাক্কাকে একটুও কেয়ার না করবার শক্তি আপনিই আসে। সেই ভিতরের ধনকে ভিতরে পেয়ে ভিতরে ধরে রাখবার জন্যেই আকাঙ্ক্ষা করচি। বাইরের কাছে যখনই কাঙালপনা করতে যাই তখনই সে পেয়ে বসে, তার আর দৌরাত্ম্যের অন্ত থাকে না—সে যতটুকু দেয় তার চেয়ে দাবি ঢের বেশি করে—সে এমন মহাজন-যে, শতকরা পাঁচশো টাকা সুদ আদায় করতে চায়। সে শাইলক্, সামান্য টাকা দেয় কিন্তু ছুরি বসিয়ে রক্তে মাংসে তার শোধ নেবার দাবি করে। তাই ইচ্ছে করি, বাহিরটাকে ধার দেব কিন্তু ওর কাছ থেকে সিকি পয়সা ধার নেব না। এই আমার মতলবের কথাটা তোমার কাছে বলে

রাখলুম। তোমার গণনামতে আমার যখন আটাশ বৎসর বয়স হবে ততদিনে যদি মতলব সিদ্ধি হয় তাহলে বেশ মজা হবে। এখানকার খবর সব ভালো, সাহেব গেচে বাঁকিপুরে, দিনু, কমল এসেচে আমার ঘরের একতলায়, আমি সেই অনুবাদের কাজে ভূতের মতো খাটচি। কিন্তু ভূত-যে খুব বেশি খাটে—এ অখ্যাতি তার কেন হল বল দেখি। কথাটা সত্য হলে তো মরেও শান্তি নেই।

২৬

শান্তিনিকেতন

এখনও আমার কাজের ভিড় কিছুই কমেনি। সবাই মনে করে—আমি কবি মানুষ, দিনরাত্রি আকাশের দিকে তাকিয়ে মেঘের খেলা দেখি, হাওয়ার গান শুনি, চাঁদের আলোয় ডুব দিই, ফুলের গন্ধে মাতাল হই, পল্লব-মর্মরে থর থর করে কাঁপি, ভ্রমর-গুঞ্জনে ক্ষুধা-তৃষ্ণা ভুলে যাই ইত্যাদি ইত্যাদি। এ সব হল হিংসের কথা। তারা জাঁক করে বলতে চায়-যে তারা কবিতা লেখে না বটে কিন্তু হপ্তায় সাতদিন করে আফিসে যায়, আদালত করে, খবরের কাগজ চালায়, বক্তৃতা দেয়, ব্যাবসা করে, তারা এত বড়ো ভয়ংকর কাজের লোক। আফিসের ছুটি নিয়ে তারা একবার এসে দেখে যাক—আমি কাজ করি কিনা। আচ্ছা, তারা খুব কাজ করতে পারে—আমি না হয় মেনে নিলুম, কিন্তু খুব কাজ না করতে পারে এমন শক্তি কি তাদের আছে। যেই তাদের হাতে কাজ না থাকে অমনি তারা হয় ঘুমোয়, নয় তাস খেলে, নয় মদ খায়, নয় পরের নিন্দে করে, কী করে যে সময় কাটাবে, ভেবেই পায় না। আমার সুবিধা এই-যে, যখন কাজ থাকে তখন রীতিমতো কাজ করি, আবার, যখন কাজ না থাকে তখন খুব কষে কাজ না করতে পারি—তার কাছে কোথায় লাগে তোমার বাবার কমিটি-মীটিং। যখন কাজ না-করার ভিড় পড়ে তখন তার চাপে আমাকে একেবারে রোগা করে দেয়। সম্প্রতি কিন্তু কাজ করাটাই আমার ঘাড়ে চেপেচে, তাই সেই নাটকটা আর এক অক্ষরও লিখতে পারিনি। এই গোলমালের মধ্যে যদি লিখতে যাই আর যদি তাতে গান বসাই তবে তার ছন্দ আর মিল অনেকটা তোমার শিশু-মহাভারতেরই মতো হয়ে উঠবে। চিঠিতে যে-ছবি এঁকেচ—খুব ভালো হয়েচে। মেয়েটিকে দেখে বোধ হচ্চে—ওর ইস্কুলে যাবার তাড়া নেই, ঘরকন্নার কাজের ভিড়ও বেশি আছে বলে মনে হচ্চে না; ওর চুলের সমস্ত কাঁটা রাস্তায় পড়ে গেচে, আর “গহনা ওয়ছনা” “চুনারি উনারি”র কোনোও ঠিকানা নেই। “কদু”র ভিতর থেকে-যে “দুলহীন” বেরিয়ে এসেছিল এ মেয়ে বোধ হয় সে নয়, এর নাম কী লিখে পাঠিয়ো। ইতি ৯ অগ্রহায়ণ, ১৩২৫।

২৭

শান্তিনিকেতন

আজকের তোমাকে সব খবরগুলি দেওয়া যাক্। অনেক দিন পরে আজ আমার ইস্কুল খুলেচে, আজ থেকে ইস্কুল-মাস্টারি ফের শুরু হল। আজ সকালে তিনটে ক্লাস নিয়েচি। কিন্তু ছেলেরা সব আসেনি, খুব কম এসেচে। বোধ হয়, ব্যামোর ভয়ে আসচে না। আমার বৌমা হঠাৎ কোথায় হারিয়ে গেছেন, জিজ্ঞাসা করেচ। তিনি পাড়াতেই আছেন। আমি যে ঘরে থাকি—তার সামনে এক লাল রাস্তা আছে, তার ঠিক ওধারেই এক দোতলা ইমারত তৈরি হচ্চে—তারই একতলা ঘরে তিনি বাস করেন। শ্রীমতী তুলসীমঞ্জরী তাঁকে অচ্ছী অচ্ছী কাহিনী শুনাতী হৈ, কিন্তু আমি সেটা আন্দাজে বলচি। কিছুকাল থেকে তার কণ্ঠস্বরও শুনিনি, তাকে দেখতেও পাইনি—তাই আশঙ্কা হচ্চে সে হয়তো তার সেই রূপকথার "কদু"র মধ্যে ঢুকে পড়েচে। যাই হোক, পাড়ার সমস্ত খবর রাখবার সময় আমি পাইনে, আমি কখনও বা আমার সেই কোণের ডেস্কে কখনও বা সেই লাইব্রেরি ঘরের টেবিলে ঘাড় হেঁট করে কলম চালিয়ে দিনযাপন করচি। সামনেকার খাতাপত্রের বাইরে যে-একটি প্রকাণ্ড জগৎ আছে, তার প্রতি ভালো করে চোখ তুলে-যে দেখা, সে আর দিনের আলো থাকতে ঘটে উঠচে না। সন্ধ্যার পরে সেই নিচের বারান্দায় খাবার টেবিলটা ঘিরেই বৈঠক হয়, সেখানে তর্ক হয় বিতর্ক হয় এবং মাঝে মাঝে গানও হয়ে থাকে। কারণ—আজকাল ফের আবার দুটি একটি করে গান জমচে। সন্ধ্যার পরে সেই আমার কোণের বিছানায় তাকিয়া ঠেস দিয়ে কেরোসিনের আলোয় মৃদুমন্দস্বরে খাতা পেনসিল হাতে গান করি আর পশ্চিমের উন্মুক্ত বাতায়ন থেকে—তুমি ভাবচ সেই বাতায়ন থেকে স্বর্গের অপ্সরীরা আমার গান শুনতে আসেন—ঠিক তা নয়—সেই উন্মুক্ত বাতায়ন থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে কীটপতঙ্গ আসতে থাকে,—তাও যদি তারা আমার গান শুনে মুগ্ধ হয়ে আসত তাহলেও আমি মনে মনে একটু অহংকার করতে পারতুম,—তারা আসে ঐ ডীটজ লণ্ঠনের কেরোসিন আলোটা লক্ষ্য করে। উন্মুক্ত বাতায়ন থেকে হঠাৎ এক-একবার—আন্দাজ করে বল দেখি কী শুনতে পাই। তুমি ভাবচ, নক্ষত্র-লোক থেকে অনাহত বীণার অশ্রুত গীত-ধ্বনি? তা নয়:—এক সঙ্গে ভোঁদা, দানু, টম, রঞ্জু এবং এ মুল্লুকের যত দিশি কুকুরের তুমুল চীৎকার-শব্দ। যদি এরা আমার গান শুনে বাহবা দেবার জন্যে এই আওয়াজ করত তাহলেও বুঝতুম—কবির গানে চতুষ্পদ জন্তুরা পর্যন্ত মুগ্ধ—কিন্তু তা নয়, তারা স্বজাতি আগন্তুকের প্রতি অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করে স্বর্গ-মর্ত্যকে চঞ্চল করে তোলে—কবির গানে তারা কর্ণপাতও করে না। যাই হোক, ভূতলের কুকুর থেকে আকাশের তারা পর্যন্ত সবাই যদিচ উদাসীন তবুও দুটো একটা করে গান জমচে। ১৭ই অগ্রহায়ণ, ১৩২৫।

২৮

শান্তিনিকেতন

আজ দুপুরবেলায় যখন খেতে বসেচি, এমন সময়— রোসো, আগে বলোনি কী খাচ্ছিলুম— খুব প্রকাণ্ড মোটা একটা রুটি— কিন্তু মনে কোরো না তার সবটাই আমি খাচ্ছিলুম। রুটিটাকে যদি পূর্ণিমার চাঁদ বলে ধরে নেও তাহলে আমার টুকরোটি দ্বিতীয়ার চাঁদের চেয়ে বড়ো হবে না। সেই রুটির সঙ্গে কিছু ডাল ছিল, আর ছিল চাটনি আর একটা তরকারিও ছিল। যা হোক, বসে বসে রুটি চিবোচ্চি, এমন সময়— রোসো, আগে বলে নিই রুটি, ডাল, চাটনি এল কোথা থেকে।— তুমি বোধ হয় জান, আমার এখানে প্রায় পঁচিশজন গুজরাটি ছেলে আছে— আমাকে খাওয়াবে বলে তাদের হঠাৎ ইচ্ছা হয়েছিল। তাই আজ সকালে আমার লেখা সেরে স্নানের ঘরের দিকে যখন চলেচি, এমন সময় দেখি, একটি গুজরাটি ছেলে থালা হাতে করে আমার দ্বারে এসে হাজির। যা হোক, নিচের ঘরে টেবিলে বসে বসে রুটির টুকরো ভাঙচি আর খাচ্চি, আর তার সঙ্গে একটু একটু চাটনিও মুখে দিচ্চি, এমন সময়— রোসো, আগে বলে নিই, খাবার কী রকম হয়েছিল। রুটিটা বেশ শক্ত-গোছের ছিল; যদি আমাকে সম্পূর্ণ চিবিয়ে সবটা খেতে হত তাহলে আমার একলার শক্তিতে কুলিয়ে উঠত না, মজুর ডাকতে হত। কিন্তু ছিঁড়তে যত শক্ত মুখের মধ্যে ততটা নয়। আবার রুটিটা মিষ্টি ছিল; ডাল তরকারি দিয়ে মিষ্টি রুটি খাওয়া আমাদের আইনে লেখে না, কিন্তু খেয়ে দেখা গেল-যে, খেলে-যে বিশেষ অপরাধ হয় তা নয়। সেই রুটি খাচ্চি, এমন সময়— রোসো, ওর মধ্যে একটা কথা বলতে একেবারেই ভুলে গেচি, দুটো পাঁপর-ভাজাও ছিল; সে-দুটো, আমি যাকে বলে থাকি সুশ্রাব্য— অর্থাৎ খেতে বেশ ভালো লাগে। শুনে তুমি হয়তো আশ্চর্য হবে এবং আমাকে হয়তো মনে মনে পেটুক ঠাউরে রেখে দেবে— এবং যখন আমি কাশীতে যাব তখন হয়তো সকালে বিকালে আমাকে চাটনি দিয়ে কেবলি পাঁপর-ভাজা খাওয়াবে। তবু সত্য গোপন করব না, দুখানা পাঁপর-ভাজা সম্পূর্ণই খেয়েছিলুম। যা হোক সেই পাঁপর মচ মচ শব্দে খাচ্চি, এমন সময়— রোসো, মনে করে দেখি সে-সময়ে কে উপস্থিত ছিল। তুমি ভাবচ, তোমার বউমা তোমার ভানুদাদার পাঁপর-ভাজা খাওয়া দেখে অবাক হয়ে হতবুদ্ধি হয়ে টেবিলের এক কোণে বসে মনে মনে ঠাকুর-দেবতার নাম করছিলেন, তা নয়— তিনি তখন কোথায় আমি জানিনে। আর কমল? সেও-যে তখন কোথায় বসে রোদ পোয়াচ্ছিল তা আমি জানিনে। তাহলে দেখচি টেবিলে আমি একলা ছাড়া কেউই ছিল না। যাই হোক দুখানা পাঁপর-ভাজার পরে প্রায় সিকিটুকরো রুটির পোনে চার আনা যখন শেষ করেচি, এমন সময়— হাঁ, হাঁ, একটা কথা বলতে ভুলে গেচি— আমি লিখেচি খাবার সময়ে কেউ ছিল না, কথাটা সত্য নয়। ভোঁদা কুকুরটা একদৃষ্টে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে লালায়িত জিহ্বায় চিন্তা করছিল-যে, আমি যদি মানুষ হতুম তাহলে সকাল থেকে রাত্তির পর্যন্ত ঐ রকম মুচ মুচ মুচ মুচ মুচ মুচ করে কেবলি পাঁপর-ভাজা খেতুম; ইতিহাসও পড়তুম না, ভূগোলও পড়তুম না— শিশু-মহাভারত, চারুপাঠের কোনো ধার ধারতুম না। যা হোক যখন দুখানা পাঁপর-ভাজা এবং কিছু রুটি ও চাটনি খেয়েচি, এমন সময়— কিন্তু ডালটা খাইনি, সেটা নারকোল দিয়ে এবং অনেকখানি কুয়োর জল

দিয়ে তৈরি করেছিল তাতে ডালের চেয়ে কুয়োর জলের স্বাদটাই বেশি ছিল, আর তরকারিটাও খাইনি—কেননা, আমি মোটের উপর তরকারি প্রভৃতি বড়ো বেশি খাইনে। যাই হোক, যখন রুটি এবং পাঁপর-ভাজা খাওয়া প্রায় শেষ হয়েচে, এমন সময়ে ডাক-হরকরা আমার হাতে কাশীর ছাপমারা একখানা চিঠি দিয়ে গেল।

২৯

শান্তিনিকেতন

দেরি করে তোমার চিঠির উত্তর দিয়েচি—তুমি আমাকে এত বড়ো অপবাদ দেবে আর আমি তাই যে নীরবে সহ্য করে যাব, এতবড়ো কাপুরুষ আমাকে পাওনি। কখখনো দেরি করিনি,—এ আমি তোমার মুখের সামনে বলচি। এতে তুমি রাগই কর আর যাই কর। দেরি করিনি, দেরি করিনি, দেরি করিনি,—এই তিনবার খুব চেঁচিয়েই বলে রাখলুম—দেখি, তুমি এর জবাব কী দাও। যত দোষ সব আমার, আর তোমার অগস্ত্যকুণ্ডের পোস্টমাস্টারটি বুঝি আটত্রিশটি গুনের আধার? ভালো কথা মনে পড়ল, তোমাকে শেষবারে চিঠি লেখার পর আমি খোঁজ নিয়ে শুনলুম—শ্রীমতী তুলসীমঞ্জরীকে বৌমা বিদায় করে দিয়েচেন। কী অন্যায় দেখো দেখি। তার অপরাধটা কী?—না, সে যতটা কাজ করে তার চেয়ে কথা কয় বেশি। তাই যদি হয়, তাহলে তোমার ভানুদাদার কী হবে বলো তো। আমি তো জন্মকাল থেকে কেবল কথাই কয়ে আসচি, তুলসীমঞ্জরী যেটুকু কাজ করেচে—আমি তাও করিনি। বৌমা তাই রেগেমেগে হঠাৎ যদি আমার খোরাকি বন্ধ করে দেন তাহলে আমার কী দশা হবে? যাই হোক এই কথাটা নিয়ে এখন থেকে ভাবনা করে কোনও লাভ নেই—সময় যখন উপস্থিত হবে তখন তোমাকে খবর দেওয়া যাবে, আমার যা কপালে থাকে তাই হবে। কিন্তু তোমার গুরুমা তোমাকে যে-ছাঁদে বাংলা-চিঠি লেখাতে চান, আমাকে সেই ছাঁদে লিখলে চলবে না—তা আমার নামের আগে শুধু না-হয় একটা মাত্র "শ্রী"-ই দেবে কিংবা "শ্রী" নাই বা দিলে। আমার বিলেত যাবার একটা কথা উঠচে কিন্তু শুধু কথায় যদি বিলেত যাওয়া যেত তাহলে আমার ভাবনা ছিল না; কথা একলা যদি না জোটাতে পারতুম তাহলে তুলসীমঞ্জরীকে ডেকে পাঠাতুম। কিন্তু মুশকিল হচ্চে এই-যে, বিলেত যেতে জাহাজের দরকার করে, যুদ্ধের উৎপাতে সেই জাহাজের সংখ্যা কমে গেচে অথচ যাবার লোকের সংখ্যা বেড়ে গেচে—তাই এখন—

ঘাটে বসে আছি আনমনা,
যেতেচে বহিয়া সুসময়।

এদিকে রোজ আমার একটা করে নতুন গান বেড়েই চলেচে। গানের সুবিধা এই-যে তার জন্যে জাহাজের দরকার হয় না, কথাতেই অনেকটা কাজ হয়। প্রায় পনেরোটা গান শেষ হয়ে গেল। তুমি দেরি করে যদি আস তাহলে ততদিনে এত গান জমে উঠবে-যে, শুনতে শুনতে তোমার চারুপাঠ তৃতীয়ভাগ আর পড়া হবে না—তোমার শিশু-মহাভারত বৃদ্ধ-মহাভারত হয়ে উঠবে। তুমি হয়তো এম এ পাস করার সময় পাবে না। ইতি ২৪শে অগ্রহায়ণ, ১৩২৫।

৩০

শান্তিনিকেতন

তুমি ভাবচ—মজা কেবল তোমাদেরই হয়েচে তাই তোমাদের ইস্কুলের প্রাইজের মজার ফর্দ আমাকে লিখে পাঠিয়েচ, কিন্তু এত সহজে আমাকে হার মানাতে পারচ না। মজা আমাদের এখানেও হয় এবং যথেষ্ট বেশি করেই হয়। আচ্ছা, তোমাদের প্রাইজে কত লোক জমেছিল?—পঞ্চাশ জন? কিন্তু আমাদের এখানে মেলায় অন্ততঃ দশ হাজার লোক তো হয়েইছিল। তুমি লিখেচ, একটি ছোটো মেয়ে তার দিদির কাছে গিয়ে খুব চীৎকার করে তোমাদের সভা খুব জমিয়ে তুলেছিল—আমাদের এখানকার মাঠে যা-চীৎকার হয়েছিল তাতে কত রকমেরই আওয়াজ মিলেছিল, তার কি সংখ্যা ছিল। ছোটো ছেলের কান্না, বড়োদের হাঁকডাক, ডুগডুগির বাদ্য, গোরুর গাড়ির ক্যাঁচকোঁচ, যাত্রার দলের চীৎকার, তুবড়িবাজির সোঁ সোঁ, পটকার ফুটফাট, পুলিস-চৌকিদারের হৈ হৈ,—হাসি, কান্না, গান, চেঁচামেচি, ঝগড়া ইত্যাদি ইত্যাদি। ৭ই পৌষে মাঠে খুব বড়ো হাট বসেছিল—তাতে গালার খেলনা, ফলের মোরব্বা, মাটির পুতুল, তেলে-ভাজা ফুলুরি, চিনেবাদাম ভাজা প্রভৃতি আশ্চর্য আশ্চর্য জিনিস বিক্রি হল। এক-এক পয়সা দিয়ে ছেলেমেয়েরা সব নাগরদোলায় দুলল; চাঁদোয়ার নিচে নীলকণ্ঠ মুখুজ্যের কংসবধ যাত্রার পালা গান হচ্ছিল—সেইখানে একেবারে ঠেলাঠেলি ভিড়। তারপরে ৯ই পৌষে আমাদের মেয়েরা আবার এক মেলা করেছিলেন—তাতে সিঙাড়া, আলুর-দমের দোকান বসিয়েছিলেন—এক-একটা আলুর দম এক-এক পয়সায় বিক্রি হল। সুকেশী বউমা চিনে-বাদামের পুতুল গড়েছিলেন, তার এক-একটা ছ-আনা দামে বিক্রি হয়ে গেল। কমল কাদা দিয়ে একটা ঘর বানিয়েছিল—তার খড়ের চাল, চারিদিকে মাটির পাঁচিল, আঙিনায় শিব-স্থাপন করা আছে—সেটা কেউ কিনতে চায় না, তাই কমল আমাকে সেটা জোর করে তিন টাকায় বিক্রি করেচে। ভেবে দেখো—কী রকম ভয়ানক মজা। ছোটো মেয়েরা একটুকরো নেকড়া ছিঁড়ে তার চারিদিকে পাড় সেলাই করে আমার কাছে এনে বললে, “এটা রুমাল, এর দাম আট আনা, আপনাকে নিতেই হবে”—বলে সেটা আমার পকেটে পুরে দিলে—এমন ভয়ানক মজা। ওঁদের বাজারে এইরকম শ্রেণীর সব ভয়ানক মজা হয়ে গেচে—তোমরা যে-সব প্রাইজ পেয়েচ, সে এর কাছে কোথায় লাগে। তারপরে মজা,—মেলা যখন ভেঙে গেল, সমস্ত রাত ধরে চেঁচাতে চেঁচাতে বেসুরো গান গাইতে গাইতে দলে দলে লোক ঠিক আমার শোবার ঘরের সামনের রাস্তা দিয়েই যেতে লাগল—মজায় একটুও ঘুম হল না—নিচে যতগুলো কুকুর ছিল, সবাই মিলে ঊর্ধ্বশ্বাসে চেঁচাতে লাগল, এমন মজা। তারপরে কলকাতার অনেক মেয়ে তাঁদের ছোটো ছেলেমেয়ে নিয়ে এসেছিলেন—তাঁদের কারো কাশি কারো জ্বর। নিশ্চয়ই তোমাদের প্রাইজে এমন ধুমধাম, গোলমাল, কাশি-সর্দি, অসুখ-বিসুখ আট আনায় রুমাল বেচা প্রভৃতি হয়নি—অতএব আমারই জিত রইল।

৩১

শান্তিনিকেতন

নাঃ, তোমার সঙ্গে পারলুম না—হার মানলুম। তুমি-যে ইস্কুলে যেতে যেতে একেবারে রাস্তার মাঝখানে গাড়ি সুদ্ধ, একগাড়ি মেয়ে সুদ্ধ, তোমাদের মোটা দিদিমণি সুদ্ধ একেবারে উলটে কাত হয়ে পড়বে,—এত বড়ো ভয়ংকর মজা করবে, এ কী করে জানব বলো। তারপরে আর-এক ভদ্রলোককে বেচারার এক্কা-গাড়ি থেকে নামিয়ে তার গাড়িতে চড়ে বসবে, এত মজাতেও সন্তুষ্ট নও, আবার এক-পাটি জুতো রাস্তার মাঝখানে ফেলে আসবে আর সেই জুতোর পিছনে কাশীবাসী ভদ্রলোকটিকে দৌড় করাবে—তারো উপরে আবার ইস্কুলে পৌঁচে কান্না—কী মজা। যদি সেই জুতো-শিকারী বেচারা ভদ্রলোকটি কাঁদত তাহলেও বুঝতুম—কিন্তু তুমি! বিনা ভাড়ায় পরের এক্কাগাড়িতে চড়ে, বিনা আয়াসে পরকে দিয়ে হারানো চটিজুতো খুঁজিয়ে নিয়ে—তারপরে কিনা কান্না। একেই না বলে লঙ্কা-কান্ডের পরেও আবার উত্তরকান্ড। তুমি লিখেচ, আমিও যদি তোমাদের গাড়ির মধ্যে থাকতুম আর হাত, পা, মাথা, বুদ্ধি-সুদ্ধি সমস্ত একেবারে উলটে পালটে যেত তাহলে তোমাদের মতোই বাবারে মরলুমরে করে চীৎকার করতুম। এ কথা আমি কিছুতেই স্বীকার করব না—নিশ্চয়ই পা দুটো উপরে আর মাথাটা নিচে করে আমি তানা-নানা শব্দে কানাড়া রাগিণীতে গান ধরতুম।

হায়রে হায়, সারে গামা পাধা নিসা।
আমার গাড়ির হলো উলটো মতি,
কোথায় হবে আমার গতি—
    খুঁজে আমি না পাই দিশা।
    সারে গামা পাধা নিসা।

যখন কাশীতে যাব আমার গাড়িটা উলটে দিয়ে বরঞ্চ পরীক্ষা করে দেখো। ইস্কুলে গিয়ে কাঁদব না, তোমার মাথার সামনে দাঁড়িয়ে হাত-পা নেড়ে তান লাগিয়ে দেব···

যদিও আঘাত গায়ে লাগেনি।
    তবুও করুণ সুরে,
    দেব আমি গান জুড়ে
ঝাঁপতালে ভৈরবী রাগিণী।
শোনো সবে দিদিমণি, মামা,
সারে সারে সারে গারে গামা।

এই তো গেল মজার কথা। এইবার কাজের কথা। পরশু চললুম মৈসুরে, মাদ্রাজে, মাদুরায় এবং মদনা-পল্লীতে। ফিরতে বোধ হয় জানুয়ারি কাবার হয়ে ফেব্রুয়ারি শুরু হবে—ইতিমধ্যে ঐ দুটো গানের সুর বসিয়ে এসরাজে অভ্যাস করে নিয়ো। আবার যদি বিশ্বেশ্বরের গোরু, গাড়ি উলটে দিয়ে নন্দী-ভৃঙ্গীর গোয়ালের দিকে দৌড় মারে তাহলে পথের মাঝখানে কাজে লাগাতে পারবে। আর যে-ব্যক্তি তোমার একপাটি চটি জুতো নিয়ে আসবে তাকে উচ্চৈঃস্বরে তানে, মানে, লয়ে চমৎকৃত করে দিতে পারবে। ততদিন কিন্তু ডাকঘরের পালা বন্ধ। আমার চিঠি ফুরল, নটে শাকটি মুড়ল ইত্যাদি। ১৯শে পৌষ, ১৩২৫।

৩২

শান্তিনিকেতন

তোমার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত এইমাত্র পাওয়া গেল। আমি ভাবচি, তোমার এমন চিঠির বেশ সমান ওজনের জবাবটি দিই কী করে। তুমি চলিষ্ণু, আমি স্তব্ধ; তুমি আকাশের পাখি, আমি বনান্তের অশথগাছ; কাজেই তোমার গানে আর আমার মর্মরে ঠিক সমকক্ষ হতে পারে না। এক জায়গায় তোমার সঙ্গে আমার মিলেচে; তুমিও গেচ হাওয়া বদল করতে, আমিও এসেচি হাওয়া বদল করতে। তুমি গেচ কাশী থেকে সোলনে, আমি এসেচি আমার লেখবার ডেস্ক থেকে আমার জানলার ধারের লম্বা কেদারায়। খুব বদল,—তোমাদের বিশ্বেশ্বরের মন্দির থেকে আর তাঁর শ্বশুরবাড়ি যত বদল তার চেয়ে অনেক বেশি। আমি যে-হাওয়ায় ছিলুম, এ হাওয়া তার থেকে সম্পূর্ণ তফাত। তবে কিনা, তোমার ভ্রমণে আমার ভ্রমণে একটি মূলগত প্রভেদ আছে, তুমি নিজে চলে চলে ভ্রমণ করচ কিন্তু আমি নিজে থাকি স্থির আর আমার সামনে যা-কিছু চলচে, তাদের চলায় আমার চলা। এই হচ্চে রাজার উপযুক্ত ভ্রমণ—অর্থাৎ আমার হয়ে অন্যে ভ্রমণ করচে, চলবার জন্যে আমার নিজেকে চলতে হচ্চে না। ঐ দেখো না, আজ রবিবার হাটবার, সামনে দিয়ে গোরুর গাড়ি চলেচে—আমার দুই চক্ষু সেই গোরুর গাড়িতে সওয়ার হয়ে বসল। ঐ চলেচে সাঁওতালের মেয়েরা মাথায় খড়ের আঁটি, ঐ চলেচে মোষের দল তাড়িয়ে সন্তোষ বাবুর গোষ্ঠের রাখাল। ঐ চলেচে ইস্টেশনের দিক থেকে গোয়ালপাড়ার দিকে কারা এবং কিসের জন্যে—তা কিছুই জানিনে; একজনের হাতে ঝুলচে এক থেলোহুঁকো, একজনের মাথায় ছেঁড়া ছাতি, একজনের কাঁধে চড়ে বসেচে একটা উলঙ্গ ছেলে। ঐ আসচে ভুবনডাঙার গ্রাম থেকে কলসী-কাঁখে মেয়ের দল, তারা শান্তিনিকেতনের কুয়ো থেকে জল নিয়ে যাবে। ঐ সব চলার স্রোতের মধ্যে আমার মনটাকে ভাসিয়ে দিয়ে আমি চুপ করে বসে আছি। আকাশ দিয়ে মেঘ চলেচে, কাল রাত্রিবেলাকার ঝড়-বৃষ্টির ভগ্ন-পাইকের দল--অত্যন্ত ছেঁড়া খোঁড়া রকমের চেহারা।

এরাই দেখব আজ সন্ধ্যাবেলায় নীল, লাল, সোনালি, বেগনি, উর্দি পরে কালবৈশাখীর নকিবের মতো গুরু গুরু দামামা বাজাতে বাজাতে উত্তর-পশ্চিম থেকে কুচ-কাওয়াজ করে আসতে থাকবে—তখন আর এমনতরো ভালোমানুষি চেহারা থাকবে না।

আমাদের বিদ্যালয় বন্ধ, এখন আশ্রমে যা-কিছু আসর জমিয়ে রেখেচে শালিখপাখির দল, আরো অনেক রকমের পাখি জুটেচে—বটের ফল পেকেচে তাই সব অনাহূতের দল জমেচে। বনলক্ষ্মী হাসিমুখে সবার জন্যেই পাত পেড়ে দিয়েচেন। ইতি ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৬।

৩৩

শান্তিনিকেতন

তোমার চিঠিতে যে-রকম ঠান্ডা এবং মেঘলা দিনের বর্ণনা করেচ তাতে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, তুমি তোমার ভানুদাদার এলাকার অনেক তফাতে চলে গেচ। বেশি না হোক, অন্তত দু-তিন ডিগ্রির মতোও ঠান্ডা যদি ডাকযোগে এখানে পাঠাতে পার তাহলে তোমাদেরও আরাম, আমাদেরও আরাম। বেয়ারিং পোস্টে পাঠালেও আপত্তি করব না, এমন কি ভ্যালুপেবলেও রাজি আছি। আসল কথা, ক-দিন থেকে এখানে রীতিমতো খোট্টাই ফেশানের গরম পড়েচে। সমস্ত আকাশটা যেন তৃষ্ণার্ত কুকুরের মতো জিব বের করে হাঃ হাঃ করে হাঁপাচ্চে। আর এই-যে দুপুর-বেলাকার হাওয়া, এ-যে কী রকম—সে তোমাকে বেশি বোঝাতে হবে না—এই বললেই বুঝবে যে, এ প্রায় বেনারসি হাওয়া, আগুনের লকলকে জরির সুতো দিয়ে আগাগোড়া ঠাস বুনোনি;—দিক-লক্ষ্মীরা পরেচেন, তাঁরা দেবতার মেয়ে বলেই সইতে পারেন, কিন্তু ওর আঁচলা যখন মাঝে মাঝে উড়ে আমাদের গায়ে এসে পড়ে তখন নিজেকে মর্ত্যের ছেলে বলেই খুব বুঝতে পারি। আমি কিন্তু আমার ঐ আকাশের ভানুদাদার দূতগুলিকে ভয় করিনে; এই দুপুরে দেখবে, ঘরে ঘরে দুয়োর বন্ধ কিন্তু আমার ঘরের সব দরজা-জানলা খোলা। তপ্ত হাওয়া হুহু করে ঘরে ঢুকে আমাকে আগাগোড়া ঘ্রাণ করে যাচ্চে,—এমনি তার ঘ্রাণ-যে, ঘ্রাণেন অর্ধভোজনং। গরমের ঝাঁজে আকাশ ঝাপসা হয়ে আছে—কেমন যেন ঘোলা নীল—ঠিক যেন মূর্ছিত মানুষের ঘোলা চোখটার মতো। সকলেই থেকে থেকে বলে বলে উঠচে, "উঃ, আঃ,—কী গরম।" আমি তাতে আপত্তি করে বলচি, গরম তাতে সন্দেহ নেই কিন্তু তার সঙ্গে আবার ওই তোমার উঃ আঃ জুড়ে দিলে কেন। যাই হোক, আকাশের এই প্রতাপ আমি একরকম করে সইতে পারি কিন্তু মর্ত্যের প্রতাপ আর সহ্য হয় না। তোমরা তো পাঞ্জাবে আছ, পাঞ্জাবের দুঃখের খবর বোধ হয় পাও। এই দুঃখের তাপ আমার বুকের পাঁজর পুড়িয়ে দিলে। ভারতবর্ষে অনেক পাপ জমেছিল তাই অনেক মার খেতে হচ্চে। মানুষের অপমান ভারতবর্ষে অভ্রভেদী হয়ে উঠেচে। তাই কতশত বৎসর ধরে মানুষের কাছ থেকে ভারতবর্ষ এত অপমান সইচে কিন্তু আজও শিক্ষা শেষ হয়নি। ইতি ৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৬।

৩৪

কলিকাতা

মাঝে তোমার একটা চিঠির জবাব দিতে পারিনি, কলকাতায় এসেচি। কেন এসেচি, হয়তো খবরের কাগজ থেকে ইতিমধ্যে কতকটা জানতে পারবে। তবু একটু খোলসা করে বলি। তোমার লেফাফায় তুমি যখন আমার ঠিকানা লেখ, আমি ভাবলুম ঐ পদবীটা তোমার পছন্দ নয়। তাই কলকাতায় এসে বড়োলাটকে চিঠি লিখেচি—আমার ঐ ছার পদবীটা ফিরিয়ে নিতে। কিন্তু চিঠিতে আসল কারণটা দিইনি—তোমার নামের একটুও উল্লেখ করিনি। বানিয়ে বানিয়ে অন্য নানা কথা

লিখেচি। আমি বলেচি, বুকের মধ্যে অনেক ব্যথা জমে উঠেছিল, তারই ভার আমার পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠেচে— তাই ভারের উপরে আমার ঐ উপাধির ভার আর বহন করতে পারচিনে; তাই ওটা মাথার উপর থেকে নামিয়ে দেবার চেষ্টা করচি। যাক্, এ সব কথা আর বলতে ইচ্ছা করে না--আবার অন্য কথাও ভাবতে পারিনে। ১লা জুন, ১৯১৯।

৩৫

শান্তিনিকেতন

কাল ছিলুম কলকাতায়, আজ বোলপুরে। এসে দেখি, তোমার একখানি চিঠি আমার জন্যে অপেক্ষা করে আছে। আর দেখি, আকাশে ঘন ঘোর মেঘ,— বর্ষার আয়োজন সমস্তই রয়েচে কেবল আমি আসিনি বলেই বৃষ্টি আরম্ভ হয়নি। বর্ষার মেঘের ইচ্ছা ছিল, আমাকে তার কাজরী গান শুনিয়ে দেবে— তারপরে আমিও তাকে আমার গানে জবাব দেব। তাই এতক্ষণ পরে আমি দুপুরবেলায় যখন খেয়ে এসে বসলুম তখন বৃষ্টি শুরু করে দিয়েছে এক মাঠ থেকে আর-এক মাঠে। আর তার কল-সংগীতে আকাশে কোথাও যেন ফাঁক রইল না। নববর্ষার জল-স্থলের আনন্দ-উৎসব দেখতে চাও তাহলে এসো আমাদের মাঠের ধারে, বসো এই জানলাটিতে চুপ করে। পাহাড়ে বর্ষার চেহারা স্পষ্ট দেখবার জো নেই, সেখানে পাহাড়েতে মেঘেতে ঘেঁষাঘেঁষি মেশামেশি একাকার কাণ্ড। সমস্ত আকাশটা বুজে যায়; সৃষ্টিটা যেন সর্দিতে, কাশিতে জবুস্থবু হয়ে কম্বল মুড়ি দিয়ে পড়ে থাকে। পাহাড় আমার কেন ভালো লাগে না বলি— সেখানে গেলে মনে হয়, আকাশটাকে যেন আড়কোলা করে ধরে একদল পাহারাওয়ালার হাতে জিম্মা করে দেওয়া হয়েচে, সে একেবারে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। আমরা মর্ত্যবাসী মানুষ— সীমাহীন আকাশে আমরা মুক্তির রূপটি দেখতে পাই— সেই আকাশটাকেই যদি তোমার হিমালয় পাহাড় একপাল মহিষের মতো শিং গুঁতিয়ে মারতে চায় তাহলে সেটা আমি সইতে পারিনে। আমি খোলা আকাশের ভক্ত,— সেইজন্যে বাংলাদেশের বড়ো বড়ো দিল্-দরাজ নদীর ধারে অবারিত আকাশকে ওস্তাদ মেনে তার কাছে আমার গানের গলা সেধে এসেচি, এই কারণেই দূর হতে তোমাদের সোলন পর্বতকে নমস্কার করি। যা হোক, বর্ষা বিদায় হবার পূর্বেই তোমরা আমার প্রান্তরে আতিথ্য নেবে শুনে আমি খুশি হয়েচি। তোমাদের জন্যে কিছু গান সংগ্রহ করে রাখব,— আর পাকা জাম, আর কেয়াফুল, আর পদ্মবন থেকে শ্বেতপদ্ম, আর যদি পারি গোটাকতক আষাঢ়ে গল্প। অতএব খুব বেশি দেরি কোরো না, পর্বত থেকে ঝরনা যেমন নেমে আসে তেমনি দ্রুতপদে নেমে এসো। ইতি আষাঢ়স্য তৃতীয় দিবসে, ১৩২৬।

৩৬

শান্তিনিকেতন

তোমার আজকের চিঠি পেয়ে বড়ো লজ্জা পেলুম। কেন বলব? এর আগে তোমার একখানি চিঠি পেয়েছিলুম— তার জবাব দেব-দেব করচি, এমন সময় তোমার এই চিঠি, আজ তোমার কাছে আমার হার মানতে হল। আমি এত বড়ো লেখক, বড়ো বড়ো পাঁচ ভল্যুম কাব্যগ্রন্থ লিখেচি,—এহেন-যে আমি—যার উপাধিসমেত নাম হওয়া উচিত শ্রীরবীন্দ্রনাথ শর্মা রচনা-লবণাম্বুধি কিংবা সাহিত্য-অজগর কিংবা বাগক্ষৌহিণীনায়ক কিংবা রচনা-মহামহোপদ্রব কিংবা কাব্যকলাকল্পদ্রুম কিংবা—ফস্ করে এখন মনে পড়চে না, পরে ভেবে বলব—একরত্তি মেয়ে, "সাতাশ" বছর বয়স লাভ করতে যাকে অন্ততঃ প'য়ত্রিশ বছর সাধনা করতে হবে, তারই কাছে পরাভব—Two goals to nil! তারপরে আবার তুমি যে-সব বিপজ্জনক ভ্রমণবৃত্তান্ত লিখচ, আমার এই ডেস্কে বসে তার সঙ্গে পাল্লা দিই কী করে। আজ সকালে তাই ভাবছিলুম, পারুলবনের সামনে দিয়ে যে রেলের রাস্তা আছে সেখানে গিয়ে রাত্রে দাঁড়িয়ে থাকব—তারপরে বুকের উপর দিয়ে প্যাসেঞ্জার ট্রেনটা চলে গেলে পর যদি তখনো হাত চলে তাহলে সেই মুহূর্তে সেইখানে বসে তোমাকে যদি চিঠি লিখতে পারি তবে তোমাকে টেক্কা দিতে পারব। এ সম্বন্ধে এখনো বউমার সঙ্গে পরামর্শ করিনি, এণ্ডরুজ সাহেবকেও জানাইনি। আমার কেমন মনে মনে সন্দেহ হচ্চে, ওঁরা হয়তো কেউ সম্মতি দেবেন না, তাছাড়া আমার নিজের মনেও একটা কেমন ধোঁকা লাগচে; মনে হচ্চে যদি গাড়িটার চাপে বুড়ো আঙুলটা কিছু জখম করে তাহলে হয়তো লেখা ঘটেই উঠবে না। আর যদি না ঘটে তাহলে অনন্তকালের মতো ঐ দু-খানা চিঠির জিত তোমার রয়েই যাবে, অতএব থাক্।

অল্পদিনের মধ্যে আমাদের এখানে ভয়ংকর ব্যাপার একটাও ঘটেনি। ঝড়-বৃষ্টি অল্প-স্বল্প হয়েচে কিন্তু তাতে আমাদের বাড়ির ছাদ ভাঙেনি, আমাদের কারো মাথায়-যে সামান্য একটা বজ্র পড়বে তাও পড়ল না। বন্দুক নিয়ে ছোরাছুরি নিয়ে দেশের নানা জায়গায় ডাকাতি হচ্চে; কিন্তু আমাদের অদৃষ্ট এমনি মন্দ-যে, আজ পর্যন্ত অবজ্ঞা করে আমাদের আশ্রমে তারা কিংবা তাদের দূর-সম্পর্কের কেউ পদার্পণ করলে না। না, না, ভুল বলচি। একটা রোমহর্ষণ ঘটনা অল্পদিন হল ঘটেচে। সেটা বলি। আমাদের আশ্রমের সামনে দিয়ে নির্জন প্রান্তরের প্রান্ত বেয়ে একটি দীর্ঘ পথ বোলপুর-স্টেশন পর্যন্ত চলে গেচে। সেই পথের পশ্চিমে একটি দোতলা ইমারত। সেই ইমারতের একতলায় একটি বঙ্গ-রমণী একাকিনী বাস করেন। সঙ্গে কেবল কয়েকটি দাসদাসী, বেহারা, গোয়ালা, পাচক-ব্রাহ্মণ এবং উপরের তলায় এণ্ডরুজ সাহেব নামক একটি ইংরেজ থাকেন। সমস্ত বাড়িটাতে এ-ছাড়া আর জন-প্রাণী নেই। সেদিন মেঘাচ্ছন্ন রাত্রি, মেঘের আড়াল থেকে চন্দ্র ম্লান কিরণ বিকীর্ণ করচেন। এমন সময় রাত্রি যখন সাড়ে এগারটা, যখন কেবলমাত্র দশবারো জন লোক নিয়ে একাকিনী রমণী বিশ্রাম করচেন, এমন সময়ে ঘরের মধ্যে কে ঐ পুরুষ প্রবেশ করলে? কোন্ অপরিচিত যুবক? কোথায় ওর বাড়ি, কী ওর অভিসন্ধি? হঠাৎ সেই নিস্তব্ধ নিদ্রিত ঘরের নিঃশব্দতা সচকিত করে তুলে সে জিজ্ঞাসা করলে,—"ইস্কুল কোথায়?" অকস্মাৎ জাগরণে উক্ত রমণীর ঘন ঘন হৃৎকম্প হতে লাগল; রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে বললেন, "ইস্কুল ঐ

পশ্চিম দিকে।” তখন যুবক জিজ্ঞাসা করলে, “হেডমাস্টারের ঘর কোথায়?” রমণী বললেন, “জানিনে।”

তারপরে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। ঐ যুবক সেই ম্লান জ্যোৎস্নালোকে সেই ঝিল্লি-মুখরিত মধ্যরাত্রে আবার আশ্রমের কঙ্কর-বিকীর্ণ পথে আশ্রম কুক্কুরবৃন্দের তার-তিরস্কার শব্দ উপেক্ষা করে দ্বিতীয় একটি নিঃসহায়া অবলার গৃহের মধ্যে প্রবেশ করলে। সেই ঘরে তৎকালে উক্ত রমণীর পূর্ণবয়স্ক একটি স্বামীমাত্র ছিল, আর জন-প্রাণীও না। সেখানেও পূর্ববৎ সেই দুটি মাত্র প্রশ্ন। সেই প্রশ্নের শব্দে স্তিমিত-দীপালোকিত সেই নির্জনপ্রায় কক্ষটি আতঙ্কে নিস্তব্ধ হয়ে রইল। লোকটা বহুদূর দেশ থেকে হেডমাস্টারকে খুঁজতে খুঁজতে কেন এখানে এল। তার সঙ্গে কিসের শত্রুতা। সেই রাত্রে স্বামীসনাথা ঐ একটি রমণী এবং স্বামী-দূরগতা অন্য অবলা না জানি তাদের সরল কোমল হৃদয়ে কী আশঙ্কা বহন করে ঘুমিয়ে পড়ল। পরদিন প্রভাতে হেড-মাস্টারের মাস্টার বাদ দিয়ে বাকি ছিন্ন অংশ কি কোথাও পাওয়া যাবে— তাঁরা আশঙ্কা করেছিলেন?

তারপরে তৃতীয় পরিচ্ছেদ। পরদিন প্রথমা নারীটি আমাকে বললেন, “তাত, মধ্যরাত্রে একটি যুবক— ইত্যাদি।” শুনে আমার পাঠিকা বিস্মিতা হবেন না-যে, আমি আশ্রম ছেড়ে পালাইনি; এমন কি, আমি তরবারিও কোষোন্মুক্ত করলুম না। করবার ইচ্ছে থাকলেও তরবারি ছিল না, থাকবার মধ্যে একটা কাগজ-কাটা ছুরি ছিল। সঙ্গে কোনো পদাতিক বা অশ্বারোহী না নিয়েই আমি সন্ধান করতে বেরলুম, কোন্ অপরিচিত যুবা কাল নিশীথে “হেডমাস্টার কোথায়” বলে অবলা রমণীর নিদ্রা ভঙ্গ করেচে?

তারপরে উপসংহার। যুবককে দেখা গেল, তাকে প্রশ্ন করা গেল। উত্তরে জানা গেল— এখানে তার কোনো একটি আত্মীয়-বালককে সে ভর্তি করে দিতে চায়। ইতি সমাপ্ত। ২৬ আষাঢ়, ১৩২৬।

৩৭

আমার জ্যোতিষ্ক-মিতাটি আকাশ নইলে বিচরণ করতে পারেন না— তাঁরি নামধারী আমি অবকাশ নইলে টিকতে পারিনে। আমার যদি কোনো আলো থাকে তবে সেই আলো প্রচুর অবকাশের মধ্যেই প্রকাশ পায়; সেইজন্যেই আমি ছুটির দরবার করি— কেননা, ছুটিতেই আমার যথার্থ কাজ। তাই লোক-সমাগম দেখে আমি আশ্রম ছেড়ে দৌড় দিয়েচি। অথচ এই সময়ই উজ্জ্বল সূর্যের আলোয়, রঙিন মেঘের ঘটায়, ঘাসে ঘাসে মেঠো ফুলের প্রাচুর্যে, হাওয়ায় হাওয়ায় দিকে দিকে কাশ-মঞ্জরির উল্লাস-হাস্য-হিল্লোলে আশ্রম খুব রমণীয় হয়ে উঠেছিল। স্টেশনের দিকে যখন গাড়ি চলেছিল তখন পিছনের দিকে মন টানছিল। কিন্তু স্টেশনে ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজল আর রেলগাড়িটা আমাদের আশ্রমকে যেন টিট্‌কারি দিয়ে পোঁ করে বাঁশি বাজিয়ে আমাকে টেনে নিয়ে চলে এল। রাত এগারটায় হাওড়ায় উপস্থিত। এসে শুনি, হাওড়ার ব্রিজ খুলে দিয়েচে। নৌকায় গঙ্গা পার হতে হবে। মালপত্র ঘাড়ে নিয়ে ঘাটে গেলেম। সবে জোয়ার এসেচে— ডিঙ্গি নৌকো ঘাট থেকে একটু তফাতে। একটা মাল্লা এসে আমাকে আড়কোলা করে তুলে নিয়ে চলল। নৌকোর কাছাকাছি এসে আমাকে সুদ্ধ ঝপাস করে পড়ে গেল। আমার

সেই ঝোলা-কাপড় নিয়ে সেইখানে জলে কাদায় লুটোপুটি ব্যাপার। গঙ্গা-মৃত্তিকায় লিপ্ত এবং গঙ্গাজলে অভিষিক্ত হয়ে নিশীথ রাত্রে বাড়ি এসে পৌঁচানো গেল। গঙ্গাতীরে বাস তবু ইচ্ছে করে বহুকাল গঙ্গাস্নান করিনি—ভীষ্ম-জননী ভাগীরথী সেই রাত্রে তার শোধ তুললেন। আজ বিকেলের গাড়িতে শিলং-পাহাড় যাত্রা করব; আশা করি এবারকার যাত্রাটা গতবারের গঙ্গাযাত্রার মতো হবে না। কিন্তু মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হয়েছে আর ঘন মেঘের আবরণে দিগঙ্গনার মুখ অবগুণ্ঠিত। পূর্ণিমা, আশ্বিন, ১৩২৬।

৩৮

ব্রুকসাইড
শিলং

কাল এসে পৌঁচেচি শিলং-পর্বতে, পথে কত-যে বিঘ্ন ঘটল তার ঠিক নেই। মনে আছে—বোলপুর থেকে আসবার সময় মা-গঙ্গা আমাকে জল-কাদার মধ্যে হিঁচড়ে এনে সাবধান করে দিয়েছিলেন? কিন্তু মানলুম না, বৃহস্পতিবারের বার-বেলায় কৃষ্ণপ্রতিপদ তিথিতে রেলে চড়ে বসলুম। দুদিন আগে রথী আমাদের একখানা মোটরগাড়ি গৌহাটি-স্টেশনে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, ইচ্ছা ছিল—সেই গাড়িতে করে পাহাড়ে চড়ব। সঙ্গে আমাদের আছেন দিনুবাবু এবং কমলবোঠান, এবং আছেন সাধুচরণ, এবং আছে বাক্স তোরঙ্গ নানা আকার ও আয়তনের এবং সঙ্গে সঙ্গে চলেচেন আমাদের ভাগ্যদেবতা; তাঁকে টিকিট কিনতে হয়নি। সান্তাহার স্টেশনে আসাম মেলে চড়লুম, এমনি কসে ঝাঁকানি দিতে লাগল-যে, দেহের রস-রক্ত যদি হত দই, তাহলে ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই প্রাণটা তার থেকে মাখন হয়ে ছেড়ে বেরিয়ে আসত। অর্ধেক রাত্রে বজ্রনাদ সহকারে মুষল-ধারে বৃষ্টি হতে লাগল। গৌহাটির নিকটবর্তী স্টেশনে যখন খেয়া-জাহাজে ব্রহ্মপুত্রে ওঠা গেল তখন আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন কিন্তু বৃষ্টি নেই। ওপারে গিয়েই মোটরগাড়িতে চড়ব বলে খেয়ে-দেয়ে সেজে-গুজে গুছিয়ে-গাছিয়ে বসে আছি—গিয়ে শুনি, ব্রহ্মপুত্রে বন্যা এসেচে বলে এখনো ঘাটে মোটর নামাতে পারেনি। এদিকে বলে, দুটোর পরে মোটর ছাড়তে দেয় না। অনেক বকাবকি দাপাদাপি ছুটোছুটি হাঁকডাক করে বেলা আড়াইটের সময় গাড়ি এল। কিন্তু সময় গেল। তীরের কাছে একটা শূন্য জাহাজ বাঁধা ছিল, সেইটেতে উঠে মুটের সাহায্যে কয়েক বালতি ব্রহ্মপুত্রের জল তুলিয়ে আনা গেল; স্নান করবার ইচ্ছা। ভূগোলে পড়া গেচে—পৃথিবীর তিন ভাগ জল এক ভাগ স্থল, কিন্তু বন্যার ব্রহ্মপুত্রের ঘোলা স্রোতে সেদিন তিনভাগ স্থল একভাগ জল। তাতে দেহ স্নিগ্ধ হল বটে কিন্তু নির্মল হল বলতে পারিনে। বোলপুর থেকে রাত্রি এগারটার সময় হাওড়ার তীরে কাদার মধ্যে পড়ে যেমন গঙ্গাস্নান হয়েছিল, সেদিন ব্রহ্মপুত্রের জলে স্নানটাও তেমনি পঙ্কিল। তা হোক, এবার আমার ভাগ্য আমাকে ঘাড়ে ধরে পুণ্যতীর্থোদকে স্নান করিয়ে দিলেন। কোথায় রাত্রি যাপন করতে হবে তারি সন্ধানে আমাদের মোটরে চড়ে গৌহাটি শহরের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়া গেল। কিছু দূরে গিয়ে দেখি, আমাদের গাড়িটা হঠাৎ ন যযৌ ন তস্থৌ। বোঝা গেল, আমাদের ভাগ্যদেবতা বিনা অনুমতিতে আমাদের এ গাড়িতেও চড়ে

বসেচেন, তিনিই আমাদের কলের প্রতি কটাক্ষ-পাত করতেই সে বিকল হয়েচে। অনেক যত্নে যখন তাকে একটা মোটরগাড়ির কারখানায় নিয়ে যাওয়া গেল তখন সূর্যদেব অস্তমিত। কারখানার লোকেরা বললে, “আজ কিছু করা অসম্ভব, কাল চেষ্টা দেখা যাবে।” আমরা জিজ্ঞাসা করলুম, “রাত্রে আশ্রয় পাই কোথায়।” তারা বললে, “ডাকবাংলায়।”

ডাকবাংলায় গিয়ে দেখি, সেখানে লোকের ভিড়-- একটিমাত্র ছোটো ঘর খালি, তাতে আমাদের পাঁচজনকে পুরলে পঞ্চত্ব সুনিশ্চিত। সেখান থেকে সন্ধান করে অবশেষে গোয়ালন্দগামী স্টীমার-ঘাটে একটা জাহাজে আশ্রয় নেওয়া গেল। সেখানে প্রায় সমস্ত রাত বৌমা এবং কমলের ঘোরতর কাশি আর হাঁপানি। রাতটা এই রকম দুঃখে কাটল। পরদিনে প্রভাতে আকাশে ঘন মেঘ করে বৃষ্টি হতে লাগল। কথা আছে সকাল সাড়ে সাতটার সময় মোটর-কোম্পানীর একটি মোটর-গাড়ি এসে আমাদের বহন করে পাহাড়ে নিয়ে যাবে; সে-গাড়িখানা আর-একজন আর-এক জায়গায় নিয়ে যাবে বলে ঠিক করে রেখেছিল। সেখানা না পেলে দুঃখ আরো নিবিড়তর হবে-- তাই রথী গিয়ে নানা লোকের কাছে নানা কাকুতি মিনতি করে সেটা ঠিক করে এসেচেন। ভাড়া লাগবে একশো পঁচিশ টাকা— আমাদের সেই হাতী-কেনার চেয়ে বেশি। যা হোক, পৌনে আটটার সময় গাড়ি এল— তখন বৃষ্টি থেমেচে। গাড়ি তো বায়ু বেগে চলল, কিছুদূর গিয়ে দেখি, একখানা বড়ো মোটরের মালগাড়ি ভগ্ন অবস্থায় পথপার্শ্বে নিশ্চল হয়ে আছে। পূর্বদিনে আমাদের জিনিসপত্র এবং সাধুচরণকে নিয়ে এই গাড়ি রওনা হয়েছিল; এই পর্যন্ত এসে তিনি স্তব্ধ হয়েচেন। জিনিস তার মধ্যেই আছে, সাধু ভাগ্যক্রমে একটা প্যাসেঞ্জার গাড়ি পেয়ে চলে গেচে। জিনিস রইল পড়ে আমরা এগিয়ে চললুম। বিদেশে, বিশেষত শীতের দেশে, জিনিসে-মানুষে বিচ্ছেদ সুখকর নয়। সইতে হল। যা হোক, শিলং-পাহাড়ে এসে দেখি, পাহাড়টা ঠিক আছে; আমাদের গ্রহবৈগুণ্যে বাঁকেনি, চোরেনি, নড়ে যায়নি; আমাদের জিওগ্রাফিতে তার যেখানে স্থান ঠিক সেই জায়গাটিতে সে স্থির দাঁড়িয়ে আছে। দেখে আশ্চর্য বোধ হল, এখনো পাহাড়টা ঠিক আছে; তাই তোমাকে চিঠি লিখচি কিন্তু আর বেশি লিখলে ডাক পাওয়া যাবে না। অতএব ইতি— কৃষ্ণ তৃতীয়া, ১৩২৬।

৩৯

ব্রুকসাইড
শিলং

আমি যেদিন এখানে এসে পৌঁচলুম সেদিন থেকেই বৃষ্টিবাদলা কেটে গিয়েচে। আজ এই সকালে উজ্জ্বল রৌদ্রালোকে চারিদিক প্রসন্ন; মোটা মোটা গোটাকতক মেঘ পাহাড়ের গা আঁকড়ে ধরে চুপচাপ রোদ পোয়াচে; তাদের এমনি বেজায় কুঁড়ে রকমের চেহারা-যে, শীঘ্র তারা বৃষ্টি বর্ষণে লাগবে এমন মনেই হয় না।

আমার এখানকার লেখবার ঘরের সঙ্গে শান্তিনিকেতনের সেই কোণটার কোনো তুলনাই হয় না। বেশ বড়ো ঘর—নানা রকমের চৌকি, টেবিল, সোফা, আরাম-কেদারায় আকীর্ণ। জানলাগুলো সমস্তই শার্সির, তার ভিতর থেকে দেখতে পাচ্ছি,

দেওদার গাছগুলো লম্বা হয়ে দাঁড়িয়ে উঠে বাতাসে মাথা নেড়ে নেড়ে আকাশের মেঘের সঙ্গে ইশারায় কথা বলবার চেষ্টা করচে। বাগানের ফুলগাছের চানকায় কত রঙ বেরঙের ফুল-যে ফুটেচে তার ঠিক নেই,—কত চামেলি কত চন্দ্রমল্লিকা, কত গোলাপ,—আরো কত অজ্ঞাত-কুলশীল ফুল। আমি ভোরে সূর্য ওঠবার আগেই রাস্তার দুইধারের সেই সব ফোটা ফুলের মাঝখান দিয়ে পায়চারি করে বেড়াই—তারা আমার পাকা দাড়ি আর লম্বা জোব্বা দেখে একটুও ভয় পায় না—হাসাহাসি করে।

এই পর্যন্ত লিখেচি, এমন সময়ে সাধু এসে খবর দিলে, স্নানের জল তৈরি। অমনি কলম রেখে চৌকি ছেড়ে রবিঠাকুর দ্রুতপদবিক্ষেপে স্নানযাত্রায় গমন করলেন। স্নান করে বেরিয়ে এসে খবর পাওয়া গেল—কী খবর বলো দেখি। আন্দাজ করে দেখো। খবর পাওয়া গেল-যে, রবিঠাকুরের ভোগ প্রস্তুত—শ্রীযুক্ত তুলসী নামক উৎকলবাসী পাচকের স্বহস্তে পাক-করা। আহার সমাধা করে এই আসচি—সুতরাং চিঠির ওভাগে পূর্বাহ্ন ছিল, এ ভাগে অপরাহ্ন পড়েচে—এখন ঘড়ির কাঁটা বেলা একটার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করচে। সেই মোটা মেঘগুলো সাদা-কালো রঙের কাবুলি বেড়ালের মতো এখনো অলসভাবে স্তব্ধ হয়ে রৌদ্রে পিঠ লাগিয়ে পড়ে আছে। পাখি ডাকচে আর জানালার ভিতর দিয়ে চামেলি ফুলের গন্ধ আসচে।

ঐ মেঘগুলোর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে একটা লম্বা কেদারা আশ্রয় করে নিস্তব্ধভাবে জানালার কাছে যদি বসতে পারতুম তাহলে সুখী হতুম কিন্তু অনেক চিঠি লিখতে বাকি আছে। অতএব গিরি-শিখরে এই শরতের অপরাহ্ন আমার চিঠি লিখেই কাটবে। তুমি ছবি আঁকচ কিনা লিখো; আর সেই এসরাজের উপর তোমার ছড়ি চলবে কিনা তাও জানতে চাই। ইতি ২৮শে আশ্বিন, ১৩২৬ (তারিখ ভুল করিনি—পাঁজি দেখে লিখেচি)।

৪০

শান্তিনিকেতন

তুমি এত দেরিতে কেন আমার চিঠি পেয়েচ, ঠিক বুঝতে পারলুম না। আজ তোমার চিঠি পেতে দেরি হল দেখে ভাবলুম হয়তো অমৃতসর কংগ্রেসে তোমাকে ডেলিগেট করেচে কিংবা হাওয়া-জাহাজে কাপ্তেন রসের সঙ্গে তুমি অস্ট্রেলিয়ায় পাড়ি দিয়েচ। কিংবা হিমালয়ের পর্বত-শৃঙ্গে কোনো পওহারী বাবার শিষ্য হয়ে মাটির নিচে বসে একমনে নিজের নাকের ডগা নিরীক্ষণ করচ কিংবা লয়েড জর্জের প্রাইভেট সেক্রেটারির সর্দি হয়েচে খবর পেয়েই তুমি সেই পদের জন্য দরখাস্ত করতে ইংলণ্ডে চলে গিয়েচ। আমি পার্লামেণ্টে লয়েড জর্জকে টেলিগ্রাফ করতে যাচ্চি ঠিক এমন সময়ে তোমার চিঠি পেলুম। পড়ে দেখি, তুমি ঝরনার ধারে কোথায় বেড়াতে গিয়ে আর একটু হলেই কুয়োর মধ্যে পড়ে গিয়েছিলে। আশ্চর্য—দেখো, কাল সন্ধ্যাবেলায় আমারো প্রায় সেই রকম দুর্ঘটনা ঘটেছিল। তখন রাত্তির ন-টা। মুখ ধুয়ে বিছানায় শুতে যাচ্চি, এমন সময় কী বলো দেখি। কুয়ো? সেই রকমই বটে। এক কপি নৌকাডুবি বলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা

এক গল্পের বই,—হঠাৎ তারি মধ্যে একবার হুঁচট খেয়ে পড়ে গেলুম। একেবারে শেষ পাতা পর্যন্ত তলিয়ে গেলুম। এত বড়ো বিপদ ঘটবার কারণ হচ্ছে, বিলাত থেকে একজন ইংরেজ ঐ বইটা তর্জমা করবার অনুমতি নিয়েছিলেন। আবার সেদিন আর-একজন ইংরেজ ঐটে তর্জমা করতে চেয়ে আমাকে চিঠি লিখেছেন। তাতেই আমার দেখবার ইচ্ছা হল, ওটার মধ্যে কী আছে। কিন্তু সেই ইচ্ছেটা রাত ন-টার সময় হঠাৎ উদয় হওয়া কোনো শুভগ্রহের প্রভাবে নয়। কারণ এই কুয়োটা থেকে উদ্ধার হতে রাত তিনটা বেজে গেল। তার মানে আমার পরমায়ু থেকে একটা রাতের বারো আনার ঘুম গেল অনন্তকালের মতো হারিয়ে। আজ সকালবেলা আমার মুখ-চোখ দেখে সি. আই. ডি পুলিস সন্দেহ করচে কাল রাত্রে আমি কোথায় সিঁধ কাটতে গিয়েছিলুম।

ঐ-যে ডাক-হরকরা আসচে। একরাশ চিঠি দিয়ে গেল। তোমার বাবার হাতের লেখা এক লেফাফা দেখতে পাচ্ছি,—তার মধ্যে তোমাদের আধুনিক ইতিহাস কিছু পাওয়া যাবে। ওদিকে আবার কাল রাত্রে এক ইংরেজ অতিথি এসেচেন—আজ সমস্ত দিন তিনি বিদ্যালয় পর্যবেক্ষণ করবেন, সেই সঙ্গে আমাকেও পর্যবেক্ষণ করবেন বলে বোধ হচ্ছে। যখন করবেন তখন হয়তো ঢুলব—আর তিনি তাঁর নোটবুকে লিখে নিয়ে যাবেন-যে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সমস্ত দিন ধরে কেবল ঢোলেন। এমনি করেই জীবন-চরিত লেখা হয়। সাহেব যখন আমার জীবন-চরিতে এই কথা লিখবেন তখন তুমি খুব জোরের সঙ্গে প্রতিবাদ কোরো,—বোলো, আমার অনেক দোষ থাকতে পারে, দিনে ঢোলা অভ্যাস একেবারেই নেই। যাই হোক, তুমি লয়েড জর্জের প্রাইভেট সেক্রেটারির পদ গ্রহণ করনি, এইটাতে আমার মন অনেকটা আশ্বস্ত হয়েচে। ইতি ২৮শে পৌষ, ১৩২৬।

৪১

সামনে তোমার পরীক্ষা—এখন দিনরাত তোমার মাথায় সেই ভাবনা লেগে আছে। অ্যালজেব্রা নিয়ে পড়ে থাকবে, তোমার ভয় হবে—আমার কাছে থাকলে পাছে তোমার নামতা ভুল হয়ে যায়, আর পাছে Animal বানান করতে গিয়ে Annie mull লিখে বস। এই কথা মনে করেই আমি উদাস হয়ে একেবারে অজন্তা-গুহার মধ্যে চলে যাচ্ছিলুম। তুমি যদি আমাকে আটকে রাখতে চাও, তাহলে কিন্তু অ্যালজেব্রার বইখানা তোমার ব্যাগের মধ্যে লুকিয়ে রাখতে হবে।

দেখো, এবারকার চিঠিতে তোমাকে একটুও ঠাট্টা করিনি—ভয়ংকর গম্ভীর ভাষায় তোমাকে লিখলুম। তুমি পরীক্ষা দিতে যাচ্ছ, আমি কোনো দিন পরীক্ষা দিইনি—এইজন্যে ভয়ে, সম্ভ্রমে, ভক্তিতে, শ্রদ্ধায় আমার মুখ থেকে একটিও ঠাট্টার কথা বেরতে চাচ্ছে না—আমি নতশিরে এই কথাই কেবল আবৃত্তি করচি—

যা দেবী পাঠ্যগ্রন্থেষু ছাত্রীরূপেণ সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ।

ইতি ১লা আশ্বিন, ১৩২৮।

৪২

একটা বিষয়ে আমার মনে বড়ো খটকা লেগেচে, তুমি চিঠিতে লিখেচ—আমি নিশ্চয়ই তোমার দিদির চেয়ে বেশি ইংরেজি জানি। এটা কি উচিত। তোমার জ্যেষ্ঠা সহোদরা, কলেজে পড়ে, তার ইংরেজি জ্ঞানের প্রতি এত বড়ো অবজ্ঞা প্রকাশ কি ভালো হয়েচে। সে যদি জানতে পারে তাহলে তার মনে কত বড়ো আঘাত লাগবে—একবার ভেবে দেখো দেখি। আমার চিঠি পেয়েই তার কাছে তুমি ক্ষমা প্রার্থনা কোরো।

তার মতো আমি যদি ইংরেজিতে পরীক্ষা পাস করতে পারতুম তাহলে কি এমন বেকার বসে থাকতুম। তাহলে অন্ততঃ পুলিসের দারোগাগিরি জোগাড় করতে পারতুম। চিরদিন স্কুল পালিয়ে কাটালুম, কুঁড়েমি করেই এমন মানবজন্মের সাতাশটা বছর[1] বৃথা নষ্ট করলুম—এইজন্যে পাছে আমার কুদৃষ্টিতে তোমাদের হঠাৎ বানান-ভুলে পেয়ে বসে তাই তো শহর ছেড়ে তোমাদের কাছে দূরে দূরে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াই। এবারকার মতো যা হবার তা হল, আর জন্মে ম্যাট্রিকুলেশন যদি বা না পারি তো অন্ততঃ মাইনর ইস্কুলের ছাত্রবৃত্তি নিয়ে তবে ছাড়ব। কিছু না হোক, অন্ততঃ ত্রৈরাশিক পর্যন্ত অঙ্ক কষবই, আর ফার্স্ট সেকেণ্ড দুটো রীডার যদি শেষ করতে পারি তাহলে গাঁয়ের প্রাইমারি ইস্কুলের হেডমাস্টারি করতে পারব, আর তারি সঙ্গে সঙ্গে মাসিক সাড়ে আট টাকা বেতনে ব্রাঞ্চ পোস্ট-আফিসের পোস্টমাস্টারি-পদটাও জোগাড় করে নেবার চেষ্টা করব। নেহাত না পাই যদি, তবে জমিদারবাবুর কনিষ্ঠ ছেলেটির প্রাইভেট টিউটরের কাজটা নিশ্চয় জুটবে। ইতি ৭ই আশ্বিন, ১৩২৮।

৪৩

আজ বুধবার—আজ ছুটির দিনে আমার বারান্দার সেই কোণটায় বসে তোমাকে লিখচি। মাঘের দুপুরবেলাকার রৌদ্রে আমার ঐ আমলকী-বীথিকার মধ্যে দিনটি রমণীয় লাগচে। এইরকম দিনে কাজ করতে ইচ্ছে করে না—আমার সমস্ত মনটি ঐ ডালের উপরে বসা ফিঙে পাখিটির মতো চুপ করে রোদ পোহায়। আজ উত্তরে হাওয়া থেকে থেকে উতলা হয়ে উঠচে—শালবনের পাতায় পাতায় কাঁপুনি ধরেচে—একটা মস্ত কালো ভ্রমর মাঝে মাঝে অকারণ আমার কাছে এসে গুনগুনিয়ে আবার বেরিয়ে চলে যাচ্চে—একটা কাঠবিড়ালি এই বারান্দার কাঠের খুঁটি বেয়ে চালের কাছে উঠে কিসের ব্যর্থসন্ধানে চঞ্চল চক্ষে এদিক ওদিক তাকিয়ে আবার তখনি পিঠের ওপর ল্যাজ তুলে দুড় দুড় করে নেমে যাচ্চে। এই শীতের মধ্যাহ্নে যেন আজ কারো কিছু কাজ নেই।

আমি সমস্ত সপ্তাহ ধরে একটা নাটক লিখছিলুম—শেষ হয়ে গেচে তাই আজ আমার ছুটি। এ নাটকটা “প্রায়শ্চিত্ত” নয়, এর নাম “পথ”। এতে কেবল

---

[1] ভানুসিংহের বয়স-যে সাতাশ বছরে এসে চিরকালের মতো ঠেকে গেচে, বালিকার এই একটি স্বরচিত বয়ঃপঞ্জীর বিধান ছিল।

প্রায়শ্চিত্ত-নাটকের সেই ধনঞ্জয় বৈরাগী আছে, আর কেউ নেই— সে গল্পের কিছু এতে নেই, সুরমাকে এতে পাবে না।

তুমি পরীক্ষা নিয়ে ব্যস্ত আছ— আমার এই কুঁড়েমির চিঠিতে পাছে তোমার জিওমেট্রির ধ্যান ভঙ্গ করে, এই ভয় আছে। ৪ঠা মাঘ, ১৩২৮।

৪৪

তুমি রোজ দুটো করে ডিম খেয়ে একটিমাত্র ক্লাসে পড়চ খবর পেয়েই খুশি হয়ে তোমাকে চিঠি লিখতে বসেচি। আমিও ঠিক দুটি করে ডিম খাই আর একটি মাত্র ক্লাসেও পড়িনে। সেইটেতে আমার মুশকিল বেধেচে, কেননা, যদি আমার ক্লাস থাকত, যদি আমাকে নামতা মুখস্থ করতে হত তাহলে সব সময়ই আমার কাছে লোক আনাগোনা করতে পারত না; আমি বলতে পারতুম, আমার সময় নেই, আমাকে এক্‌জামিন দিতে হবে। তোমার ভারি সুবিধে— তোমার কাছে কইম্বাটুর থেকে ত্রিম্বাকটু থেকে কাঞ্জিভ্যারাম থেকে কামস্কাটা থেকে মক্কা থেকে মদিনা মস্কট থেকে যখন-তখন নানালোক মানবজাতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে পরামর্শ নিতে আসেন না— তাঁরা জানেন-যে, মার্চ মাসে তোমাকে ম্যাট্রিকুলেশন দিতে হবে। আমি তাই এক-একবার মনে করি— আমি ম্যাট্রিকুলেশন দেব— দিলে নিশ্চয়ই ফেল করব— ফেল করার সুবিধে এই-যে ফি-বৎসরেই ম্যাট্রিকুলেশন দেওয়া যায় আর তাহলে ত্রিম্বাকটু থেকে নিজ্‌নি-নবগরড থেকে বেচুয়ানাল্যান্ড থেকে সদাসর্বদা লোক-আসা বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

লেভি সাহেব আমার বন্ধু হয়েও তোমার কাছে হেমনলিনীর কথাটা ফাঁস করে দিয়েচেন, এতে আমি মনে বড়ো দুঃখ পেয়েচি— এ কথা সত্য-যে, আমি তারই সাধনায় প্রবৃত্ত আছি। কিন্তু সেই স্বর্ণ-শতদলের পাপড়িগুলি হচ্চে bank notes। সাধনায় বিশেষ-যে সিদ্ধিলাভ করতে পেরেচি— তা মনেও কোরো না, তোমরা কামনা কোরো এই হেমনলিনী যেন আমার পাণিগ্রহণ করেন। কিন্তু কপালক্রমে আমার পঞ্জিকায় অকাল পড়েচে— শুভলগ্ন আর আসেই না, তাই গান গাচ্চি—

ওগো হেমনলিনী
আমার দুঃখের কথা কারো কাছে বলিনি।
লক্ষ্মীর চরণতলে ফুটে আছ শতদলে
সে-পথ করিয়া লক্ষ্য কেন আমি চলিনি।

ইতি ১০ ফাল্গুন, ১৩২৮।

৪৫

আমি নদী-পথে কয়েকদিন কাটিয়ে এলুম— কাল রাত্রে ফিরে এসেচি। আজ সকালে দেখি, এখানে তোমার চিঠি আমার জন্যে অপেক্ষা করছিল। তুমি জান— আমি নদী ভালোবাসি। কেন, বলব? আমরা যে-ডাঙার উপরে বাস করি, সে

ডাঙা তো নড়ে না, স্তব্ধ হয়ে পড়ে থাকে, কিন্তু নদীর জল দিনরাত্রি চলে, তার একটা বাণী আছে। তার ছন্দের সঙ্গে আমাদের রক্ত-চলাচলের ছন্দ মেলে, আমাদের মনে নিরন্তর যে-চিন্তাস্রোত বয়ে যাচ্চে সেই স্রোতের সঙ্গে তার সাদৃশ্য আছে—এইজন্যে নদীর সঙ্গে আমার এত ভাব। বয়স যখন আরো কম ছিল, তখন কতকাল নৌকায় কাটিয়েচি, কোনো জনমানব আমার কাছেও থাকত না, পদ্মার চরের উপরকার আকাশে সন্ধ্যাতারা আমার জন্যে অপেক্ষা করে থাকত; প্রতিবেশী ছিল চক্রবাকের দল; তাদের কলালাপ থেকে আর কিছু বুঝি বা না বুঝি, এটুকু জানতুম আমার সম্বন্ধে কোনো জনরব তারা রটাত না—এমন কি, আমার জয়-পরাজয় নামক গল্পের নায়ক-নায়িকার পরিণাম সম্বন্ধে তারা লেশমাত্র কৌতূহল প্রকাশ করত না।

যা হোক, "তে হি নো দিবসা গতাঃ,"—এখন বোলপুরের শুষ্ক ধূসর মাঠের মধ্যে বসে ইস্কুল-মাস্টারি করচি; ছেলেগুলোর কলরব চক্রবাকের কল-কোলাহলকে ছাড়িয়ে গেচে। তুমি মনে কোরো না, এখানে কোনো স্রোত নেই; এখানে অনেকগুলি জীবনের ধারা মিলে একটি সৃষ্টির স্রোত চলেচে; তার ঢেউ প্রতি মুহূর্তে উঠচে, তার বাণীর অন্ত নেই। সেই স্রোতের দোলায় আমার জীবন আন্দোলিত হচ্চে, আপনার পথ সে কাটচে, দুইতটকে গড়ে তুলচে। সে কোন্ এক অলক্ষ্য মহাসমুদ্রের দিকে চলেচে, দূর থেকে আমরা তার বার্তার আভাস পাই মাত্র। ইতি ২২শে পৌষ, ১৩২৮।

৪৬

শিলাইদা

তুমি আমাকে চিঠি লিখেচ শান্তিনিকেতনে, আমি সেটি পেলুম এখানে অর্থাৎ শিলাইদহে।

তুমি কখনো এখানে আসনি, সুতরাং জানতে পারবে না—জায়গাটা কী রকম। বোলপুরের সঙ্গে এখানকার চেহারার কিছুমাত্র মিল নেই। সেখানকার রৌদ্র বিরহীর মতো, মাঠের মধ্যে একা বসে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলচে, সেই তপ্ত নিশ্বাসে সেখানকার ঘাসগুলো শুকিয়ে হলদে হয়ে উঠেচে। এখানে সেই রৌদ্র তার সহচরী ছায়ার সঙ্গে মিলেচে; তাই চারিদিকে এত সরসতা। আমাদের বাড়ির সামনে শিশু-বীথিকায় তাই দিনরাত মর্মরধ্বনি শুনচি, আর কনকচাঁপার গন্ধে বাতাস বিহ্বল, কয়েতবেলের শাখায় প্রশাখায় নতুন চিকন পাতাগুলি ঝিলমিল করচে, আর ঐ বেণুবনের মধ্যে চঞ্চলতার বিরাম নেই। সন্ধ্যার সময় টুকরো চাঁদ যখন ধীরে ধীরে আকাশে উঠতে থাকে তখন সুপুরিগাছের শাখাগুলি ঠিক যেন ছোটো ছেলের হাত নাড়ার মতো চাঁদমামাকে টী দিয়ে যাবার জন্যে ইশারা করে ডাকতে থাকে। এখন চৈত্রমাসের ফসল সমস্ত উঠে গিয়েচে, ছাদের থেকে দেখতে পাচ্চি, চষা মাঠ দিক-প্রান্ত ছাড়িয়ে পড়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে কিছু বৃষ্টির জন্যে। মাঠের যে-অংশে বাবলাবনের নিচে চাষ পড়েনি সেখানে ঘাসে ঘাসে একটুখানি স্নিগ্ধ সবুজের প্রলেপ, আর সেইখানে গ্রামের গোরুগুলো চরচে। এই উদার-বিস্তৃত চষা মাঠের মাঝে মাঝে ছায়াবগুণ্ঠিত এক-একটি পল্লী—সেইখান থেকে আঁকাবাঁকা পায়ে-চলা পথ বেয়ে গ্রামের মেয়েরা ঝকঝকে পিতলের কলসী

নিয়ে দুটি তিনটি করে সার বেঁধে প্রায় সমস্ত বেলাই জলাশয় থেকে জল নিতে চলেচে। আগে পদ্মা কাছে ছিল—এখন নদী বহুদূরে সরে গেচে—আমার তেতালা ঘরের জানালা দিয়ে তার একটুখানি আভাস যেন আন্দাজ করে বুঝতে পারি, অথচ একদিন এই নদীর সঙ্গে আমার কত ভাব ছিল। শিলাইদহে যখনই আসতুম তখন দিনরাত্তির ঐ নদীর সঙ্গেই আমার আলাপ চলত; রাত্রে আমার স্বপ্নের সঙ্গে ঐ নদীর কলধ্বনি মিশে যেত আর নদীর কলস্বরে আমার জাগরণের প্রথম অভ্যর্থনা শুনতে পেতেম। তারপরে কত বৎসর বোলপুরের মাঠে মাঠে কাটল, কতকাল সমুদ্রের এপারে ওপারে পাড়ি দিলুম—এখন এসে দেখি সে-নদী যেন আমাকে চেনে না। ছাদের উপরে দাঁড়িয়ে যতদূর দৃষ্টি চলে তাকিয়ে দেখি, মাঝখানে কত মাঠ, কত গ্রামের আড়াল, সবশেষে উত্তর-দিগন্তে আকাশের নীলাঞ্চলের নীলতর পাড়ের মতো একটি বনরেখা দেখা যায়। সেই নীল রেখাটির কাছে ঐ-যে একটি ঝাপসা বাষ্পলেখাটির মতো দেখতে পাচ্চি, জানি ঐ আমার সেই পদ্মা। আজ সে আমার কাছে অনুমানের বিষয় হয়েচে। এই তো মানুষের জীবন। ক্রমাগতই কাছের জিনিস দূরে চলে যায়, জানা জিনিস ঝাপসা হয়ে আসে, আর যে-স্রোত বন্যার মতো প্রাণমনকে প্লাবিত করেচে, সেই স্রোত একদিন অশ্রুবাষ্পের একটি রেখার মতো জীবনের একান্তে অবশিষ্ট থাকে।

এখন বেলা ফুরিয়ে এসেচে, অল্প একটুখানি মেঘেতে আকাশ ঢাকা, দিনাবসানেও বাগানে পাখির ডাকে একটুও ক্লান্তি দেখচিনে। দুই কোকিলের কেবলি জবাব চলেচে, কেউ হার মানতে চাচ্চে না—তা ছাড়া আরও অনেক পাখি ডাকচে, তাদের ডাক স্পষ্ট করে চেনা যায় না। সকলের ডাক মিশিয়ে জড়িয়ে গেচে, অন্য দিনের মতো বাতাস আজ দুরন্ত নয়, ঝাউগাছগুলি স্তব্ধ এবং নিঃশব্দ হয়ে গেচে। আজ অষ্টমীর চাঁদ দেখচি মেঘের পর্দার আড়ালে রাত্রি যাপন করবে।

আমার ঘরের দক্ষিণদিকে ঐ ছাদে একটি কেদারা পাতা আছে—ঐখানে সন্ধ্যার সময় আমি গিয়ে বসি। এ কয়দিন দ্বিতীয়ার চাঁদ থেকে আরম্ভ করে অষ্টমীর চাঁদ পর্যন্ত প্রত্যেকেই উদয়কালে এই কবির সঙ্গে মুকাবিলা করেচে। ঐ চাঁদ হচ্চে আমার জন্মদিনের অধিপতি। আমি যখন ছাদে বসি তখন আমার বামে পূর্ব আকাশ থেকে বৃহস্পতি আমার মুখের দিকে তাকায় আর পশ্চিম আকাশ থেকে চন্দ্রমা।—এইবার ক্রমে একটু অন্ধকার হয়ে আসচে—ঘরের মধ্যকার এই ঘোলা আলোয় আর দৃষ্টি চলচে না, বাইরে গিয়ে বসবার সময় হল।

তুমি আমার কাছে বড়ো চিঠি চেয়েছিলে, বড়ো চিঠিই লিখলুম। লিখতে পারলুম, তার কারণ এখানে অবকাশ আছে। কিন্তু এই চিঠি যখন ডাকে দেব, অর্থাৎ কাল বৃহস্পতিবারে,—কলকাতায় রওনা হব। সেখানে ট্রাম আছে, মোটর আছে, ইলেকট্রিক-পাখা আছে; সময় নেই। তারপরে বোলপুরে যাব,—সেখানে শালের বনে ফুল ফুটেচে, আমবাগানে ফল ধরেচে; সেখানে মাঠ আছে বিস্তীর্ণ, আকাশ আছে অবারিত, কিন্তু সেখানেও অবকাশ নেই।

চিঠি জিনিসটা ছোট্ট, মালতী-ফুলের মতো, কিন্তু সেই চিঠি যে-আকাশের মধ্যে ফুটে ওঠে সেই আকাশ মালতী-লতারই মতো বড়ো। আমাদের যত কেজো লোকের অবকাশ টবের গাছ, তার থেকে যে-সব পত্রোদ্গম হয় সে তো পোস্টকার্ডের চেয়ে বড়ো হতে চায় না। ইতি ২২ চৈত্র, ১৩২৮।

৪৭

শান্তিনিকেতন

এতদিনে তুমি কাশী পৌঁছেচ, পথের মধ্যে ভিড় পাওনি তো? এখন কেমন আছ—লিখো। তোমার যাবার পরদিন থেকেই বিদ্যালয়ের কাজ রীতিমতো আরম্ভ হয়ে গেচে, রোজই কমিটি, মিটিং এবং ক্লাসের কাজও চলচে। ছেলেরা অনাবৃষ্টির পরে আষাঢ়ের ধারার মতো কলরব করতে করতে এখানকার শূন্য ঘর সব পূর্ণ করে দিয়েচে। এখন আমার কাজের আর অন্ত নেই।

মেয়েরা সকলেই পরশুরাম হয়ে উঠেচে—কুড়ুল দিয়ে ঠকাঠক্ গাছ কাটতে লেগে গেচে। তারা আছে ভালো। এদিকে আকাশে মেঘ ও রৌদ্রের লুকোচুরি শুরু হয়েচে, আর বৃষ্টিস্নাত স্নিগ্ধ উজ্জ্বল রোদ্দুর তার পরশপাথর ঠেকিয়ে সমস্ত আকাশকে সোনা করে তুলেচে। আমি আমার সামনের খোলা জানলা দিয়ে ঐ শাল, তাল, শিরীষ, মহুয়া, ছাতিমের দল-বাঁধা বনের দিকে প্রায় তাকিয়ে থাকি। এখন আমার ঘড়িতে সাড়ে দুপুর, অর্থাৎ সাধারণ ঘড়িতে দুপুর। ছেলেরা তাদের মধ্যাহ্নভোজন শেষ করে দলে দলে কুয়োতলায় মুখ ধুতে আসচে—দীর্ঘ ছুটির দুঃখ-দিনের পরে কাকগুলো এঁটো শালপাতার উপর শ্রাদ্ধবাড়ির ভিখিরীর পালের মতো এসে পড়েচে। বাতাসটি মধুর হয়ে বইচে, জাম গাছের চিকন পাতার ঘনিমার উপর রৌদ্র ঝিলমিল করে উঠচে, পাটল রঙের দুটো গোরু ল্যাজ দিয়ে পিঠের মাছি তাড়াতে তাড়াতে ধীর মন্দ গমনে ঘাস খেয়ে বেড়াচ্চে—আমি চেয়ে চেয়ে দেখচি আর ভাবচি। ইতি ১ জুলাই ১৩২৯।

৪৮

কলকাতা

কলকাতা শহরটা আমি মোটেই পছন্দ করিনে—মনে হয় যেন ইঁট-কাঠের একটা মস্ত জন্তু আমাকে একেবারে গিলে ফেলেচে। তার উপরে আবার আকাশ মেঘে লেপা, রাত্তির থেকে টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়চে। শান্তিনিকেতনের মাঠে যখন বৃষ্টি নামে তখন তার ছায়ায় আকাশের আলো করুণ হয়ে আসে, ঘাসে ঘাসে পুলক লাগে, গাছগুলি যেন কথা কইতে চায়, আমার মনের মধ্যে গান জেগে ওঠে আর তার সুর গিয়ে পৌঁছয় দিনুর ঘরে। আর এখানে নববর্ষা বাড়ির ছাদে ঠোকর খেতে খেতে খোঁড়া হয়ে পড়ে,—কোথায় তার নৃত্য, কোথায় তার গান, কোথায় তার সবুজ রঙের উত্তরীয়, কোথায় তার পুবে বাতাসে উড়ে-পড়া জটাজাল।

কথা হচ্চে, এবার শ্রাবণ মাসে আর বছরের মতো কলকাতায় বর্ষামঙ্গল গান হবে। কিন্তু যে-গান শান্তিনিকেতনের মাঠে তৈরি সে-গান কি কলকাতা শহরের হাটে জমবে। এখানে অনুরোধে পড়ে কখনো কখনো আমার নতুন বর্ষার গান গাইতে হয়েচে। কিন্তু এখানকার বৈঠকখানায় সেই গানের সুর ঠিক মতো বাজে না। তোমাদের ওখানে এতদিনে বোধ হয় বর্ষা নেমেচে, অতএব তোমার নতুন শেখা বর্ষার গান কখনো কখনো গুন্‌গুন্ স্বরে গাইতে পারবে, কখনো বা এসরাজে

বাজিয়ে তুলবে। তুমি যাওয়ার পর আরো কিছু কিছু নতুন গান আমার সেই খাতায় জমে উঠেচে, কলকাতায় না এলে আরো জমত। এদিকে দিনুবাবুও দাঁত তোলাবার জন্যে দু-তিন দিন হল কলকাতায় এসেচেন;—আষাঢ় মাসের বর্ষাকে এ শহরে যেমন মানায় না, দিনুবাবুকেও তেমনি। আজ সকালেই সে পালাবে স্থির করেচে। ইতি ২৯ আষাঢ়, ১৩২৯।

৪৯

আত্রাই নামক একটি নদীর উপর বোটে করে ভেসে চলেচি। বর্ষার মেঘ ঘন হয়ে আকাশ আচ্ছন্ন করেচে, একটু ঝোড়ো বাতাসের মতো বইচে, পাল তুলে দিয়েচে। নদী কূলে কূলে পরিপূর্ণ, স্রোত খরতর, দলে দলে শৈবাল ভেসে আসচে। পল্লীর আঙিনার কাছ পর্যন্ত জল উঠেচে; ঘন বাঁশের ঝাড়; আম কাঁঠাল তেঁতুল কুল শিমুল নিবিড় হয়ে উঠে গ্রামগুলিকে আচ্ছন্ন করে ফেলেচে; মাঝে মাঝে নদীর তীরে তীরে কাঁচা ধানের খেতে জল উঠেচে, কচি ধানের মাথা জলের উপর জেগে আছে। দুই তটে স্তরে স্তরে সবুজ রঙের ঘনিমা ফুলে ফুলে উঠেচে, তারি মাঝখান দিয়ে বর্ষার খোলা নদীটি তার গেরুয়া রঙের ধারা বহন করে ব্যস্ত হয়ে চলেচে, সমস্তটার উপর বাদল-সায়াহ্নের ছায়া। বৃষ্টি নেমে এল—দূরে মেঘের ফাঁক দিয়ে সূর্যাস্তের একটা ম্লান আভা এই বৃষ্টিধারার আবেগের উপর যেন সান্ত্বনার ক্ষীণ প্রয়াসের মতো এসে পড়েচে।

আমার এই বোট ছাড়া নদীতে আর নৌকো নেই। এই জলস্থল আকাশের ছায়াবিষ্ট নিভৃত শ্যামলতার সঙ্গে মিল করে একটি গান তৈরি করতে ইচ্ছে করচে, কিন্তু হয়তো হয়ে উঠবে না। আমার দুই চক্ষু এখন বাইরের দিকে চেয়ে থাকতে চায়,—খাতার দিকে চোখ রাখবার এখন সময় নয়। অনেক দিন বোলপুরে শুকনো ডাঙায় কাটিয়ে এসেচি, এখন এই নদীর উপর এসে মনে হচ্চে,—পৃথিবীর যেন মনের কথাটি শুনতে পাওয়া যাচ্চে। নদী আমি ভারি ভালোবাসি; আর ভালোবাসি আকাশ। নদীতে আকাশে চমৎকার মিলন, রঙে রঙে, আলোয় ছায়ায়,—ঠিক যেন আকাশের প্রতিধ্বনির মতো। আকাশ পৃথিবীতে আর কোথাও আপনার সাড়া পায় না এই জলের উপর ছাড়া।

আজ রাত্রের গাড়িতেই কলকাতায় যাব মনে করে ভালো লাগছে না। ইতি ২ শ্রাবণ, ১৩২৯।

৫০

আজ বুধবারে সকালে মন্দিরের কাজ শেষ করে যেই আমার কুটীরের সামনে উত্তরদিকের বারান্দায় বসেচি অমনি নানাবিধ চিঠি ও খবরের কাগজের সঙ্গে তোমার চিঠি এসে পৌঁচল। এর আগে দু-এক দিন খুব ঘন বৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল, আজও স্তূপাকার কালো মেঘ আকাশক্ষেত্রের এদিকে ওদিকে ভ্রূকুটি করে বসে আছে; এখনি তারা বৃষ্টিবাণ বর্ষণ করবে বলে ভয় দেখাচ্চে। কিন্তু আজ প্রথম সকালের মেঘের ফাঁক দিয়ে অরুণোদয় খুব সুন্দর হয়ে দেখা দিয়েছিল।

আমি তখন পূর্বদিকের বারান্দায় বসেছিলুম, আমার মনের সঙ্গে যেন তার মুখোমুখি কথা চলছিল। মন যেদিন তার চোখ মেলে, সেদিন প্রত্যেক সকালবেলাটিই তার কাছে অপূর্ব হয়ে দেখা দেয়। বিশ্বলক্ষ্মী তাঁর অন্দরের দ্বারের কাছে রোজই দাঁড়িয়ে থাকেন, যেদিন আমরা প্রস্তুত হয়ে তাঁর কাছে গিয়ে হাত পাতি, সেদিন তাঁর দান মুঠো ভরে পেয়ে থাকি। পৃথিবী থেকে যাবার সময় আমি এই কথা বলে যেতে পারব যে, এমন দান আমি অনেক পেয়েচি।

সেপ্টেম্বরের আরম্ভে আমার বোম্বাই যাবার কোনো সম্ভাবনা নেই। কেননা, সেপ্টেম্বরের ১৫ই তারিখে কলকাতায় আমাদের শারদোৎসবের পালা বসবে—আমাকে সাজতে হবে সন্ন্যাসী। আমার এই সন্ন্যাসী সাজবার আর কোনো অর্থ নেই—অর্থ-সংগ্রহ ছাড়া। শুনে তোমরা বিস্মিত হোয়ো না, তোমাদের বারাণসীধামে এমন অনেক লোক আছেন যাঁরা সন্ন্যাসী সেজেচেন অর্থের প্রত্যাশায়, আর যাঁদের প্রত্যাশা নিরর্থক হয়নি।

এলম্‌হার্স্ট সাহেব এসেচেন। তাঁর কাছে শুনলুম তুমিও নাকি আসক্তি-বন্ধন ছেদন করে সন্ন্যাসিনী হবার চেষ্টায় আছ। সেইজন্যেই কি লজিক-পড়া শুরু করেচ। কিন্তু লজিক জিনিসটা হচ্চে কাঁটা-গাছের বেড়া, তাতে করে মানসক্ষেত্রের ফসলকে নির্বোধ গোরু-বাছুরের উৎপাত থেকে রক্ষা করা চলে; কিন্তু আকাশ থেকে যে-সব বর্ষণ হয়, রৌদ্রই বল, বৃষ্টিই বল, তার থেকে নিরাপদ হবার উপায় তোমার ঐ ন্যায়শাস্ত্রের বেড়া নয়। তুমি আমাকে ভয় দেখিয়েচ-যে, এবার আমার সঙ্গে দেখা হলে তুমি আমার লজিকের পরীক্ষা নেবে। আমি আগে থাকতেই হার মেনে রাখচি। পৃথিবীতে দুই জাতের মানুষ আছে। একদলকে লজিকের নিয়ম পদে পদে মিলিয়ে চলতে হয়, কেননা তারা পায়ে হেঁটে চলে,—আর একদল ন্যায়শাস্ত্রের উপর দিয়ে চলে যায়, ঊনপঞ্চাশ বায়ু তাদের বাহন, তারা এপক্ষ ওপক্ষের বিরোধ খণ্ডন করতে করতে নিজের পথ খুঁজে মরে না,—তারা এককালে নিজেরই দুই পক্ষ বিস্তার করে সেই পথ দিয়ে চলে যায়, যে-পথ হচ্চে রবি-কিরণের পথ।

এই প্রসঙ্গে, এই পত্র-লেখক কোন্‌ জাতের লোক তার একটু আভাসমাত্র যদি দিই তাহলে তুমি বলে বসবে—তিনি ভারি অহংকারী। যারা লজিকের অহংকার করে তাল ঠুকে বেড়ায় তারাই নন্‌লজিক্যাল্‌দের ব্যোমপথ-যাত্রার পক্ষবিধূননের মাহাত্ম্য খর্ব করবার চেষ্টা করে। কিন্তু সে-মহিমা তো যুক্তির দ্বারা আত্মসমর্থনের অপেক্ষা করে না;—সে আপন অচিহ্নিত পথে আপন গতিবেগের দ্বারাই সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়।

আজ এইখানেই ইতি। ১৩ই ভাদ্র, ১৩২৯।

৫১

তুমি যে তোমার লজিকের খাতার পাতা ছিঁড়ে আমাকে চিঠি লিখেচ তাতে বুঝতে পারচি, লজিক সম্বন্ধে আলোচনা পড়ে তোমার উপকার হয়েচে। লজিক যেমনি পড়া হয়ে যায় অমনি তার আর কোনো প্রয়োজন থাকে না। যে-কলাপাতায় খাওয়া হয়ে যায়, সে-কলাপাতা ফেলে দিলে ক্ষতি হয় না; কিন্তু যে-তালপাতার উপর মেঘদূত লেখা হয়েচে সেটা ফেলবার জিনিস নয়।

আমরা এবার দু-তিন দিন ধরে বর্ষামঙ্গল করেচি। তার ফল কী হয়েচে, একবার দেখো। আজ ভাদ্রমাসের আঠারই তারিখ, অর্থাৎ শরৎকালের আরম্ভ, কিন্তু বর্ষার আয়োজন এখনো ভরপুরে রয়েচে। আকাশ ঘন মেঘে কালো হয়ে আছে,—থেকে থেকে ঝমাঝম বৃষ্টি হচ্চে। আমার কবিত্বের এই আশ্চর্য প্রভাব দেখে আমি নিজেই অবাক হয়ে গেচি। এমন কি, শুনতে পাই, আমার এই বর্ষামঙ্গলের জোর কাশী পর্যন্ত পৌঁচেচে। সেখানেও বৃষ্টি চলচে। বোধ হচ্চে, আমরা যখন শারদোৎসব করব তারপর থেকেই শরতের আরম্ভ হবে। শারদোৎসবের রিহার্সালে আমাকে অস্থির করেচে। রোজ দুপুরবেলায় বিভূতি এসে একবার করে আমার কাছ থেকে আগাগোড়া পাঠ নিয়ে যায়; ছোটো ছেলেরা যে-রকম পড়া মুখস্থ করে আমাকে তাই করতে হয়। কিন্তু এমনি আমার বুদ্ধি, তবু রিহার্সালের সময় কেবল ভুলি—ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরা পর্যন্ত হাসে—এত অপমান সে আর কী বলব।

যাই হোক, যদি তুমি আমার শারদোৎসব দেখতে আস তাহলে বোধ হয় দেখবে, ঠিক ঠিক মুখস্থ বলে যাচ্চি। তোমার বাবাকে শারদোৎসব দেখবার জন্যে আসতে বলে দিয়েচি। কিন্তু যে-রকম ব্যস্ত মানুষ, তাঁর মনে থাকলে হয়। ঐ বিভূতি এল—এইবার আমার পড়া দিইগে যাই। ১৪ই ভাদ্র, ১৩২৯।

৫২

কলকাতা

কলকাতায় সব দলবল নিয়ে উপস্থিত হয়েচি। আমাদের জোড়াসাঁকোর বাড়ি একতলা থেকে তিনতলা পর্যন্ত কলরবে মুখরিত হয়ে উঠেচে; পা ফেলতে সাবধান হতে হয়, পাছে একটা না একটা ছেলেকে মাড়িয়ে দিই, এমনি ভিড়। আমি অন্যমনস্ক মানুষ, কোন্ দিকে তাকিয়ে চলি তার ঠিক নেই। ওরা যখন-তখন কোনো খবর না দিয়ে আমার পায়ের কাছে এসে পড়ে প্রণাম করে। কখন তাদের মাটির সঙ্গে চ্যাপটা করে দিয়ে তাদের উপর দিয়ে চলে যাব এই ভয়ে এই ক-দিন ধুলোর দিকে চেয়ে চেয়ে চলচি।

মেয়ের দলও এবার নেহাত কম নয়। নুটু থেকে আরম্ভ করে অতিসূক্ষ্ম অতি ক্ষুদ্র লতিকা পর্যন্ত। ননীবালা তাদের দিনরাত সামলাতে হয়রান হয়ে পড়েচে। কিন্তু আমাকে দেখবার লোক কেউ নেই; স্বয়ং এন্ডরুজ সাহেব পাঞ্জাবে আকালীদের নাকাল সম্বন্ধে তদন্ত করতে অমৃতসরে চলে গেছেন। লেভি সাহেবেরা গেছেন বোম্বাই; বৌমা আছেন শান্তিনিকেতনে। সুতরাং আমাকে ঠিকমতো শাসনে রাখতে পারে এমন অভিভাবক কেউ না থাকাতে আমি হয়তো উচ্ছৃঙ্খল হয়ে যেতে পারি এমন আশঙ্কা আছে। আপাতত যা-তা বই পড়তে আরম্ভ করেচি, কেউ নেই আমাকে ঠেকায়। তার মধ্যে লজিকের বই একখানাও নেই। এমনি করে পড়া ফাঁকি দিয়ে বাজে পড়া পড়ে সাতাশ বছর কেটে গেল, এখন চেতনা হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তার কোনো লক্ষণ নেই।

আমি ভেবেছিলুম—সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি তোমাদের ছুটি; তা যখন নেই তখন শারদোৎসব দেখা তোমাদের পক্ষে অসম্ভব; কারণ ওটা হচ্চে ছুটির নাটক।

ওর সময়ও ছুটির, ওর বিষয়ও ছুটির। রাজা ছুটি নিয়েচে রাজত্ব থেকে, ছেলেরা ছুটি নিয়েচে পাঠশালা থেকে। তাদের আর কোনো মহৎ উদ্দেশ্য নেই কেবল একমাত্র হচ্চে—"বিনা কাজে বাজিয়ে বাঁশি কাটবে সকল বেলা।" ওর মধ্যে একটা উপনন্দ কাজ করচে, কিন্তু সেও তার ঋণ থেকে ছুটি পাবার কাজ।

তোমরা যখন ছুটি পাবে, আমরা তখন বোম্বাই অভিমুখে রেলপথে ছুটচি। কিন্তু সে-পথ মোগলসরাই দিয়ে যায় না, সে হচ্চে বেঙ্গল নাগপুর লাইন। তারপরে বোম্বাই হয়ে মাদ্রাজ, মাদ্রাজ হয়ে মালাবার, মালাবার হয়ে সিংহল, সিংহল হয়ে পুনশ্চ বোম্বাই। এমনি বোঁ বোঁ শব্দে ঘুরপাক খেতে খেতে অবশেষে একদিন নভেম্বর মাসের কোন্ তারিখে শান্তিনিকেতনে এসে একখানা লম্বা কেদারার উপর চিত হয়ে পড়ব। তারপরেই আবার শুরু হবে সাতই পৌষের পালা। তারপরে আরো কত কী আছে তার ঠিক নেই। ছুটির নাটক লিখলেই কি ছুটি পাওয়া যায়। আমি ইস্কুল পালিয়েও ছুটি পেলুম না, ইস্কুলের আবর্তের মধ্যে লাটিমের মতো ঘুরতে লাগলুম। অঙ্ক কষতে ঢিলেমি করলুম, আজ চাঁদার অঙ্কের ধ্যান করতে করতে আহার নিদ্রা বন্ধ। ইংরেজি প্রবাদে এই রকম ব্যাপারকেই বলে থাকে ভাগ্যের বিদ্রূপ।

এতদিন পরে আমাদের এখানে রৌদ্রোজ্জ্বল চেহারা দেখা দিয়েচে। মাঝে মাঝে বৃষ্টি হচ্চে কিন্তু সে শরতের ক্ষণিক বৃষ্টি। দিন সুন্দর, রাত্রি নির্মল, মেঘ রঙিন, বাতাস শিশির-স্নিগ্ধ। এ হেন কালে অতলস্পর্শ অকর্মণ্যতার মধ্যে ডুবে থাকাই ছিল বিধির বিধি, কিন্তু ভাগ্যের লিখন বিধির বিধিকেও অতিক্রম করে, এই কথা স্মরণ করে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে এই পত্র সমাপন করি। ইতি ২৪ ভাদ্র, ১৩২৯।

৫৩

শান্তিনিকেতন

ইতিমধ্যে আমার দৈনিক কার্যকলাপের একটুখানি scene বদলে গেচে। সেই বড়ো ঘরটা ছেড়ে দিয়েচি, সেটা রাস্তার ধারে থাকাতে যখন-তখন যে-সে এসে উৎপাত করত। এখন এসেচি দক্ষিণের বারান্দার পূর্ব কোণে, না'বার ঘরটার ঠিক বিপরীত প্রান্তে, একটি ছোটো ঘরে। এ ঘরটার গোড়াপত্তন তুমি বোধ হয় দেখেছিলে। আমার সেই কালো স্লেট-বাঁধানো লেখবার টেবিলে ঘরের প্রায় সমস্ত জায়গা জুড়ে গিয়েচে, কেবল আর-একটিমাত্র চৌকি আছে। ঘরের মধ্যে লোকের ভিড় হবার জায়গা রাখিনি।

এখন মধ্যাহ্ন, ক-টা বেজেচে ঠিক বলতে পারিনে, কারণ আমার ঘড়ি বন্ধ। বন্ধ না থাকলেও-যে ঠিক সময় পাওয়া যেত তা নয়; তুমি আমার সেই ঘড়ির পরিচয় জান। এইটুকু বলতে পারি, কিছু পূর্বেই একখানা পরোটা ডাল ও তরকারি সংযোগে আহার করে লিখতে বসেচি।

রৌদ্র প্রখর, শরতের সাদা মেঘ স্তরে স্তরে আকাশের যেখানে-সেখানে স্ফীত হয়ে পড়ে আছে, বাইরে থেকে শালিখ পাখির ডাক শুনতে পাচ্ছি, বামের রাস্তা দিয়ে ক্যাঁচ ক্যাঁচ করতে করতে মন্দগমনে গোরুর গাড়ি চলেচে, আমার ডানদিকের

দক্ষিণের জানালা দিয়ে কাঁচ ধানের খেতের প্রান্তে সুদূরে তালগাছের সার দেখা যাচ্ছে, তন্দ্রালস ধরণীর দীর্ঘনিশ্বাসটি নিয়ে আতপ্ত হাওয়া ধীরে ধীরে আমার পিঠে এসে লাগচে।

এ রকম দিনে কাজ করতে ইচ্ছে করে না, এই মেঘগুলোর মতোই অকেজো হাওয়ায় মনটা বিনা কারণে দিগন্ত পার হয়ে ভেসে যেতে চায়। জানলার বাইরে মাঝে মাঝে যখন চোখ ফেরাই তখন মনে হয় যেন সুর-বালকেরা স্বর্গের পাঠশালা থেকে গুরুমহাশয়কে না বলে পালিয়ে এসেচে। আকাশের এ-কোণ ও-কোণ থেকে সবুজ পৃথিবীর দিকে তা'রা উঁকি মারচে। হাওয়ায় হাওয়ায় তাদের কানাকানি শুনে আমার মনটাও উতলা হয়ে দৌড় মারবার চেষ্টা করচে।

কিন্তু আমরা-যে পৃথিবীর ভারাকর্ষণের টানে বাঁধা; মাটি আমাদের পা জড়িয়ে থাকে, কিছুতেই ছাড়তে চায় না। অতএব মনের একটা ভাগ জানলার বাইরে দিয়ে যতই উড়তে থাক্, আর-একটা ভাগ ডেস্কের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পত্ররচনায় ব্যস্ত। দূরে কোথাও যদি যাবার ব্যবস্থা হয়, মনটাকে রেলভাড়ার কথা ভাবতে হয়; দেবতার মতো শরতের মেঘের উপর চড়ে মালতী-সুগন্ধি হাওয়ার হিল্লোলে বেণুবনের পাতায় পাতায় দোল খেয়ে খেয়ে বিনা ব্যয়ে ভ্রমণ করে বেড়াতে পারে না। ইতি ৩১ ভাদ্র, ১৩৩০।

৫৪

মাদ্রাজ

এইমাত্র মাদ্রাজে এসে পৌঁচেচি। আজ রাত্রে কলম্বো রওয়ানা হব। ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা ও নানা ঘূর্ণিপাকের আঘাতে দেহ মন ভেঙে ছিঁড়ে বেঁকে চুরে গিয়েছিল, ক্লান্তি ও অবসাদের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে এসে বেরিয়েছিলুম।

গাড়ি যখন সবুজ প্রান্তরের মাঝখান দিয়ে চলছিল তখন মনে হচ্ছিল যেন নিজের কাছ থেকে নিজে দৌড়ে ছুটে পালাচ্চি। একদিন আমার বয়স অল্প ছিল; আমি ছিলুম বিশ্বপ্রকৃতির বুকের মাঝখানে; নীল আকাশ আর শ্যামল পৃথিবী আমার জীবন-পাত্রে প্রতিদিন নানা রঙের অমৃত রস ঢেলে দিত; কল্পলোকের অমরাবতীতে আমি দেবশিশুর মতোই আমার বাঁশি হাতে বিহার করতুম।

সেই শিশু সেই কবি আজ ক্লিষ্ট হয়েচে, লোকালয়ের কোলাহলে তার মন উদ্‌ভ্রান্ত, তারই পথের ধুলায় তার চিত্ত ম্লান। সে আপন ক্লান্ত বিক্ষত চরণ নিয়ে তার সেই সৌন্দর্যের স্বপ্নরাজ্যে ফিরে যেতে চাচ্চে। তার জীবনের মধ্যাহ্নে কাজও সে অনেক করেচে, ভুলও কম করেনি; আজ তার কাজ করবার শক্তি নেই, ভুল করবার সাহস নেই। আজ জীবনের সন্ধ্যাবেলায় সে আর-একবার বিশ্বপ্রকৃতির আঙিনায় দাঁড়িয়ে আকাশের তারার সঙ্গে সুর মিলিয়ে শেষ বাঁশি বাজিয়ে যেতে চায়। যে-রহস্যলোক থেকে এই মর্ত্যলোকে একদিন সে এসেছিল সেখানে ফিরে যাবার আগে শান্তি-সরোবরে ডুব দিয়ে স্নান করতে চায়। তেমন করে ডুব দিতে যদি পারে তাহলে তার জীর্ণতা তার ম্লানতা সমস্ত ঘুচে যাবে; আবার তার মধ্য থেকে সেই চিরশিশু বাহির হয়ে আসবে।

সংসারের জটিলতার ঘিরে ঘিরে আমাদের চিত্তের উপর যে জীর্ণতার আবরণ

সৃষ্টি করে সেটা তো ধ্রুব সত্য নয়, সেটা মায়া। সেটা যে-মুহূর্তে কুহেলিকার মতো মিলিয়ে যায় অমনি নবীন নির্মল প্রাণ আপনাকে ফিরে পায়। এমনি করে বারে বারে আমরা নূতন জীবনে নূতন শিশুর রূপ ধরি। সেই নূতন জীবনের সরল বাল্যমাধুর্যের জন্যে আমার সমস্ত মন আগ্রহে উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠেচে।

আজ আমি চলেচি সমুদ্র পারে কাজের ক্ষেত্রে; যখন সেই কাজের ভিড়ে থাকব তখন হয়তো আমার ভিতরকার কর্মী আর-সকল কথা ভুলিয়ে দেবে। কিন্তু তবু সেই সুদূর গানের ঝরনাতলায় বাঁশির বেদনা ভিতরে ভিতরে আমাকে নিশ্চয়ই ডাকবে;—ডাকবে সেই নির্জন নির্মল নিভৃত ঝরনাতলার দিকেই। সেই ডাক আমার সমস্ত ক্লান্তি ও অবসাদের ভিতর দিয়ে আমার বুকের মধ্যে আজ এসে কুহরিত হচ্চে। বলচে, সেখানে ফিরে যাবার পথ এখনো সম্পূর্ণ হয়নি, এখনো আমার সুরের পাথেয় সম্পূর্ণ নিঃশেষ হয়ে যায়নি, এখনো সেই নব নব বিস্ময়ে দিশাহারা বালককে কোনো এক ভিতরমহলে খুঁজে পাওয়া যায়।

তাই, যদিও আজ চলেচি পশ্চিম-সমুদ্রের তীরে, আমার মন খুঁজে বেড়াচ্চে আর-এক তীরে সকল-কাজভোলা সেই বালকটাকে। পুরবী গানে সে আপন লীলা শেষ করতে না পারলে সন্ধ্যা ব্যর্থ হবে, এখন সে কোথায় ঘুরে মরচে। ফিরে আয়, ফিরে আয়, বলে ডাক পড়েচে। একজন কে তার গান শুনতে ভালোবাসে। আকাশের মাঝখানে তার আসন পাতা, সেই তো শিশুকালে তাকে বাঁশির দীক্ষা দিয়েছিল, নিশীথরাতের শেষ রাগিণী বাজানো হলে তারপরে তার বাঁশি ফিরে নেবে। আজ কেবলি সেই কথাই আমার মনে পড়চে। ইতি ২০ সেপ্টেম্বর, ১৯২৪।

৫৫

কলকাতা

আজ সন্ধ্যাবেলায় ঘন মেঘ করে খুব একচোট বৃষ্টি হয়ে গেচে। এখন বৃষ্টি নেই কিন্তু আকাশে মেঘ কালো হয়ে জমে আছে। প্রশান্ত আর রানী কোথায় চলে গেচে— বাড়িতে কেউ কোথাও নেই— আমি টেবিলের উপর ইলেকট্রিক আলো জ্বালিয়ে দিয়ে তোমাকে চিঠি লিখতে বসেচি। সমস্ত দিন নানা কাজে, নানা লোকের সঙ্গে দেখাসাক্ষাতে, নানা লেখায় কেটে গিয়েচে। এক মুহূর্ত বিশ্রাম করতে পাইনি— লেখার মাঝে মাঝে খুব ঘুম পেয়েছিল, কিন্তু কষে ঝাঁকানি দিয়ে ঘুম তাড়িয়ে কাজ করে গেচি। নিজেকে একরকম করে খুঁচিয়ে কাজ করানো একেবারেই ভালো নয় জানি। তাতে কাজও-যে ভালো হয় তা নয় আর বিশ্রামও মাটি হয়ে যায়। কিন্তু আমার কুষ্ঠিতে কর্ম-স্থানে শনি আছে, সে আমাকে দয়ামায়া একটুও করে না— কষে খাটিয়ে নেয়, মজুরিও যথেষ্ট দেয় না। কাল দিনেরবেলায় আবার নানারকম কাজের পালা আরম্ভ হবে— তাই এখন চিঠি লিখতে বসেচি। এখন সন্ধে সাড়ে আটটা— তোমার ওখানে হয়তো তুমি এখন পড়ার বই নিয়ে বসে গেচ। আজকাল আমাকে যে-রকম দায়ে পড়ে খাটতে হয়, যদি তোমাদের বয়সে সেইরকম পরীক্ষার পড়ায় খাটতুম তাহলে এতদিনে হয়তো আই. এ. পরীক্ষা পাসের তকমা পরে কন্যাকর্তাদের মহলে বুক ফুলিয়ে বেড়াতে পারতুম। তাহলে

পণের টাকায় বিশ্বভারতীর ঝুলি ভর্তি করে দিনে-দুপুরে নাকে তেল দিয়ে নিদ্রা দিতে একটুও দ্বিধা বোধ হত না। আমার কলকাতার কাজ শেষ হয়ে এল, পরশু কিংবা শনিবার শান্তিনিকেতনে ফিরে যাব, সেখানে এতদিনে শরৎকালের রৌদ্দুরে আকাশে সোনার রং ধরেচে আর শিউলি ফুলের গন্ধে বাতাস ভোর হয়ে আছে। আজ বুধবার; আজ থেকে ছেলেরা সব হো হো করতে করতে বাড়িমুখো দৌড়েচে —কাল পর্শুর মধ্যে আশ্রম প্রায় শূন্য হয়ে যাবে। এদিকে শুক্লপক্ষ এসে পড়ল, দিনে দিনে সন্ধ্যার পেয়ালাটি চাঁদের আলোয় ভর্তি হয়ে উঠতে থাকবে। আমি বারান্দায় আরাম কেদারার উপর পা তুলে দিয়ে একলা চুপ করে বসব— চাঁদ আমার মনের ভাবনাগুলির 'পরে আপন রুপোর কাঠি ছুঁইয়ে তাদের স্বপ্নময় করে তুলবে,— ছাতিমতলায় ঝরে-পড়া মালতী ফুলের গন্ধ জ্যোৎস্নার সঙ্গে মিশে যাবে। সেই সুগন্ধি শুক্লরাত আমার মনের একোণ-ওকোণে উঁকি দিয়ে কোনো নতুন গানের সুর খুঁজে বেড়াবে— বেহাগ কিংবা সিন্ধু কিংবা কানাড়া। থাক্— সে-সব কথা পরে হবে, আপাতত চিঠি বন্ধ করে এখানকার বারান্দায় মেঘাবৃত রাত্রির নিস্তব্ধতার মধ্যে মনটাকে ডুবিয়ে দিয়ে একটু বিশ্রাম করতে যাই। যদি ক্লান্তির ঘুমে চোখ বুজে আসে তাহলে তাকে তাড়া দিয়ে দেশছাড়া করব না।

৫৬

বোম্বাই

তুমি লিখেচ, তোমার সব কথার জবাব দিতে; অতএব তোমার চিঠি সামনে রেখে জবাব দিতে বসেচি— এবারে বোধ হয় পুরো মার্ক পাব। তোমার প্রথম প্রশ্ন— আমি এখন কোথায় আছি। ছিলুম নানা জায়গায়, প্রধানত কাঠিয়াবাড়ে, তারপরে আমেদাবাদে, তারপরে বরোদায়, আজ সকালে এসেচি বোম্বাইয়ে। এতকাল ঘুরে বেড়াচ্ছিলুম বলে সমস্ত চিঠি এখানে জমা হচ্ছিল, তারমধ্যে তোমার দু-খানা চিঠি। লেফাফার সর্বাঙ্গে নানাপ্রদেশের নানা ডাকঘরের কালো কালো চাকা চাকা ছাপ। এখানে বেশিদিন থাকা হবে বলে বোধ হচ্চে না, কারণ ৭ই পৌষ নিকটবর্তী। অতএব দু-চার দিনের মধ্যে সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাং বঙ্গভূমিকে প্রণাম করতে যাত্রা করব। ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে পড়েচি, যাই হোক খ্রীস্টমাসের পূর্বেই ফিরব। তোমার বাবাকে লিখে দিয়েচি, তোমাকে শান্তিনিকেতনে নিয়ে আসতে। এই পর্যন্ত তোমায় উত্তর দিয়ে তোমার চিঠি খুঁজে দেখলুম, আর কোনো প্রশ্ন নেই।

এলম্‌হার্স্ট আমার সঙ্গে ঘুরতে ঘুরতে বরোদায় এসে জ্বরে পড়েছিল। সেখানে তিন দিন বিছানায় পড়েছিল, এখানে এসে সেরে উঠেচে। আর আমার সঙ্গে আছে গোরা। এবারে সাধুচরণের সঙ্গ ও সেবা থেকে বঞ্চিত আছি। বনমালী নামধারী উৎকলবাসী সেবক বৌমার আদেশক্রমে এসেচে। সে সর্বদাই ভয়ে ভয়ে আছে। সবচেয়ে ভয় আমাকে, অথচ আমি বিশেষ ভয়ংকর নই। দ্বিতীয় ভয়, পাছে রাজবাড়ির অন্নপানে বিদেশে গঙ্গাতীর হতে দূরবর্তী দেশে অকালমৃত্যু ঘটে। তৃতীয় ভয়, রেলগাড়িতে বিদেশীয় জনতাকে,— তারা ওর সঙ্গে হিন্দী বলে, ও বলে বাংলা— তাতে কথোপকথন উভয় পক্ষেই দুর্বোধ হয়ে ওঠে। ওর বিশ্বাস,

এ জন্য বিদেশীরাই দায়িক। ওর আর একটা বিশেষ গুণ এই-যে, ওকে যদি কোনো কাপড় বের করে দিতে বলি তাহলে সিন্দুক থেকে একে একে সব কাপড় বের করে তবে সেটা নির্বাচন করতে পারে, আবার সবগুলো তাকে একে একে ফিরে গোচাতে হয়। মানুষের আয়ু যখন অল্প, সময় যখন সীমাবদ্ধ, তখন এরকম চাকর নিয়ে মর্ত্যলোকে অসুবিধায় পড়তে হয়। ওর একটা মস্ত গুণ এই-যে, ও ঠাট্টা করলে বুঝতে পারে, ঠিক সময়ে হাসতে জানে; আমার late lamented সাধুচরণের সে বালাই ছিল না। আমার আবার স্বভাব এমন-যে, ঠাট্টা না করে বাঁচিনে, তাই ও যতক্ষণ কাপড় বের করচে আর গোচাচ্চে, আমি ততক্ষণ সেই সুদীর্ঘ সময় ঠাট্টা করে অতিবাহন করি। যাই হোক, ওকে বিদেশী হাওয়া, বিদেশী খাওয়া, বিদেশী ভিড় থেকে ফিরে নিয়ে গিয়ে কোনোমতে বৌমার হাতে আস্তটি ফিরে দিতে পারলে নিরুদ্‌বিগ্ন হই। আমার-যে কতবড়ো দায়িত্ব, সে ওকে না দেখলে ভালো করে অনুধাবন করতেই পারবে না। একে আমার বিশ্বভারতী, তার উপর বনমালী। ভাবনার আর অন্ত নাই।

আমি বোধ হয় দুই তিন দিনের মধ্যেই রওনা হব, অতএব যদি চিঠি লেখ তো শান্তিনিকেতনের ঠিকানায় লিখো। ইতি বোধ হচ্চে ১০ই ডিসেম্বর।

৫৭

জাহাজ প্রায় ন-টার সময় ছাড়ল। সেই আমাদের পুরোনো গঙ্গাতীর—এই তীর ছেলেবেলায় আমাকে কতদিন কী গভীর আনন্দ দিয়েচে। ধীরে ধীরে যখন সেই শান্ত সুন্দর নিভৃত শ্যামল শোভা দেখি আর এই উদার গঙ্গার কলধ্বনি শুনি তখন আমার সমস্ত মন একে আঁকড়ে ধরে;—ছোটো শিশু যেমন করে মাকে ধরে। আমি জীবনের কতকাল-যে এই নদীর বাণী থেকেই আমার বাণী পেয়েচি, মনে হয় সে যেন আমি আমার আগামী জন্মেও ভুলব না। বস্তুত এই জীবনেই আমার সেই জন্ম কেটে গিয়েচে।

ছেলেবেলায় যখন সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে এই জলস্থল আকাশের মহাপ্রাঙ্গণে আমার খেলা আরম্ভ করেছিলুম, সেই খেলার দিন আজ ফুরিয়ে গেচে। আজ এই বিপুল বিচিত্র মাতৃ-অঙ্গন থেকে বহুদূরে এসেচি। সকালবেলাকার ফুলের সব শিশির শুকিয়ে গেচে—আজ প্রখর মধ্যাহ্নের কর্তব্যক্ষেত্রে প্রবেশ করচি। আমার কর্মের সঙ্গে পাখির গান, নদীর কল্লোল, পাতার মর্মর আপনার সুর যোগ করে দিতে পারচে না—অন্যমনস্ক হয়ে আছি। নীলাকাশের অনিমেষ দৃষ্টি আমার দৃষ্টিতে এসে তেমন অবারিত আত্মীয়তায় মিলচে না, কর্মশালার জানলা-দরজার ফাঁক দিয়ে এই বিশ্বের হৃদয় আগেকার মতো তেমন সম্পূর্ণ করে আমার বুকের উপর এসে পড়ে না, মাঝখানে কত রকমের চিন্তার, কত রকমের চেষ্টার ব্যবধান। এই তো দেখচি সেদিনকার লীলা-লোক থেকে আজকের দিনের কর্মলোকে জন্মান্তর গ্রহণ করেচি, তবু সেদিনকার ভোরবেলায় সানাইয়ের সুরে ভৈরবী আলাপ এখনো ক্ষণে ক্ষণে মনে পড়ে মনকে উতলা করে দেয়।

কাল গঙ্গার উপর দিয়ে ভেসে যাচ্ছিলুম। তখন কেবলি জলের থেকে আকাশ থেকে তরুচ্ছায়াচ্ছন্ন গ্রামগুলি থেকে এই প্রশ্ন আমার কানে আসছিল, “মনে পড়ে

কি।” এবারকার এই দেহের ক্ষেত্র থেকে যখন বেরিয়ে চলে যাব, তখনো কি এই প্রশ্ন ক্ষণে ক্ষণে আমার হৃদয়ের উপর হাওয়ায় ভেসে আসবে। এবারকার এই জীবনের এই ধরণীর সমস্ত “জন্মান্তর-সৌহৃদানি”!

কাল দোল-পূর্ণিমা গঙ্গার উপরেই দেখা দিল। জাহাজ বালির চরে জোয়ারের অপেক্ষায় রাত্রি সাতটা পর্যন্ত আটকে পড়েছিল। সমুদ্রে যদি দোল-পূর্ণিমার আবির্ভাব হত তা হলেই তার নাম সার্থক হত—তাহলে দোলনও থাকত, আর নীলের সঙ্গে শুভ্রের, সাগরের সঙ্গে জ্যোৎস্নার মিলনও দেখতুম।

আজ ভোরে উঠে দেখলুম, জাহাজ কূলরেখাহীন জলরাশির উপরে ভেসে চলেচে—“মধুর বহিছে বায়ু।” আজ শনিবার; সোমবারে শুনচি রেঙ্গুনে পৌঁচব। সেখানে দিন-দুয়েক সভাসমিতি, অভ্যর্থনা, মাল্যচন্দন, বক্তৃতা, জনতার করতালিতে আমাকে চেপে মারবার চেষ্টা। তারপরে বোধ হয় বুধবারে কোনো এক সময়ে মুক্তি। ইতি চৈত্র ১৩৩০।

৫৮

কলম্বো

ভারতবর্ষ ছেড়ে এই খানিকক্ষণ হল সিংহলে এসেচি। কাল সকালে আমাদের জাহাজ ছাড়বে। আকাশ অন্ধকার। ঘন বাদলার মেঘ সকালবেলার সোনার আলো গণ্ডূষ ভরে পান করেচে, কেবল তার তলানি ছায়াটুকু বাকি। দেশে থাকলে সকালবেলায় দিনের এই ছায়াবগুণ্ঠন ভালোই লাগত। ইচ্ছে করত, কাজকর্ম বন্ধ করে মাঠের দিকে তাকিয়ে স্বপ্নরাজ্যে মনটাকে পথহারা করে ছেড়ে দিই, কিংবা হয়তো গুন-গুন সুরে নতুন একটা গান ধরে মেঘদূতের কবির সঙ্গে যথাসাধ্য পাল্লা দিতে বসতুম।

কিন্তু এখানে মনটা বিরাগী, তার একতারাটা কোথায় হারিয়ে গেচে। “গানহারা মোর হৃদয়তলে” এই অন্ধকার যেন একটা স্তূপাকার মূর্ছার মতো উপুড় হয়ে পড়ে আছে। সুদূর এবং সুদীর্ঘ যাত্রার দিনের মুখে আকাশ থেকে সূর্যের আলো দেবতার অভিনন্দনের মতো বোধ হয়। আজ মনে হচ্চে যেন আমার সেই জয়যাত্রার অধিদেবতা নীরব। গগন-বীণার থেকে যে-বাণী পাথেয় স্বরূপ সংগ্রহ করে সমুদ্রে পাড়ি দিতুম, সেই আকাশভরা বাণী আজ কোথায়।

কালম্বোতে যে-বাড়িতে এসে আছি, এ একজন লক্ষপতির বাড়ি। প্রকাণ্ড প্রাসাদ। আরামে বাস করবার পক্ষে অত্যন্ত বেশি ঢিলে, ঘরগুলোর প্রকাণ্ড হাঁ মানুষকে গিলে ফেলে। যে-ঘরে বসে আছি, তার জিনিসগুলো এত বেশি ফিটফাট-যে, মনে হয় সেগুলো ব্যবহার করবার জন্যে নয়, সাজিয়ে রাখবার জন্যে। বসবার শোবার আসবাবগুলো শুচিবায়ুগ্রস্ত গৃহিণীর মতো; সন্তর্পণে থাকে, কাছে গেলে যেন মনে মনে সরে যায়। এই ধনী-ঘরের অতিপারিপাট্য এও যেন একটা আবরণের মতো।

আমার সেই তেতালা ঘরের চেহারা মনে পড়ে তো? সমস্ত এলোমেলো। সেখানে শোবার বসবার জন্যে একটুও সাবধান হবার দরকার হয় না;—তার অপরিচ্ছন্নতাই যেন তার প্রসারিত বাহু, তার অভ্যর্থনা। সে-ঘর ছোটো, কিন্তু

সেখানে সবাইকেই ধরে। মানুষকে ঠিক মতো ধরবার পক্ষে হয় ছোট্ট একটি কোণ, নয় অসীম বিস্তৃত আকাশ। ছেলেবেলায় যখন আমি পদ্মার কোলে বাস করতুম, তখন পাশাপাশি আমার দুই রকম বাসাই ছিল। একদিকে ছিল আমার নৌকোর ছোটো ঘরটি, আর-একদিকে ছিল দিগন্ত প্রসারিত বালুর চর। ঘরের মধ্যে আমার অন্তরাত্মার নিশ্বাস, আর চরের মধ্যে তার প্রশ্বাস। একদিকে তার অন্দরের দরজা, আর একদিকে তার সদর দরজা।

৫৯

শান্তিনিকেতন

পৃথিবীতে অধিকাংশ বড়ো বড়ো জ্ঞানীলোকেরা এই গূঢ় তত্ত্ব আবিষ্কার করেচেন-যে, রাত্রিটা নিদ্রা দেবার জন্যে। নিজেদের এই মত সমর্থন করবার জন্যে তাঁরা স্বয়ং সূর্যের দোহাই দেন। তাঁরা আশ্চর্য গবেষণা এবং যুক্তি-নৈপুণ্য প্রয়োগ করে বলেচেন, রাত্রে নিদ্রাই যদি প্রকৃতির অভিপ্রায় না হবে তবে রাত্রে অন্ধকার হয় কেন, অন্ধকারে দর্শন মনন শক্তির হ্রাস হয় কেন, উক্ত শক্তির হ্রাস হলে কেনই বা আমাদের দেহ তন্দ্রালস হয়ে আসে।

গভীর অভিজ্ঞতা-প্রসূত এই সকল অকাট্য যুক্তির কোনো উত্তর দেওয়া যায় না, কাজেই পরাস্ত হয়ে ঘুমোতে হয়। তাঁরা সব শাস্ত্র ও তার সব ভাষ্য ঘেঁটে বলেচেন-যে, রাত্রে ঘুম না হওয়াকেই বলে অনিদ্রা, ঘুম হলে অনিদ্রা বলে জগতে কোনো পদার্থ থাকতই না। এতবড়ো কথার সমস্ত তাৎপর্য বুঝতেই পারি না, আমাদের তো দিব্যদৃষ্টি নেই, আমরা যথোচিত পরিমাণে ধ্যান-ধারণা-নিদিধ্যাসন করিনি, সেই জন্যে সংশয়-কলুষিত চিত্তে আমরা তর্ক করে থাকি-যে, রাত্রে কয়েক ঘণ্টা না ঘুমোলেই সেটাকে লোকে অনিদ্রা বলে নিন্দা করে, অথচ দিনে অন্তত বারো ঘণ্টাই-যে কেউ ঘুমোইনে সেটাকে ডাক্তারিশাস্ত্রে বা কোনো শাস্ত্রেই তো অনিদ্রা বলে না। শুনে প্রবীণ লোকেরা আমাদের অর্বাচীন বলে হাস্য করেন; বলেন আজকালকার ছেলেরা দু চার পাতা ইংরেজি পড়ে তর্ক করতে আসে, জানে না-যে, "বিশ্বাসে মিলয়ে নিদ্রা, তর্কে বহু দূর।"

কথাটা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না, কারণ বারবার পরীক্ষা করে দেখা গেচে-যে, তর্ক যতই করতে থাকি নিদ্রা ততই চড়ে যায়, বিনা তর্কে তার হাতে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করাই শ্রেয়। অতএব আজকের মতো চিঠি বন্ধ করে শুতে যাই। যদি সম্ভবপর হয় তাহলে কাল সকালে চিঠি লিখব।

চিঠি বন্ধ করা যাক, কেরোসিন প্রদীপটা নিবিয়ে দেওয়া যাক, ঝপ করে বিছানাটার মধ্যে গিয়ে পড়া যাক। শীত,—বেশ একটু রীতিমতো শীত,—উত্তর-পশ্চিমের দিক থেকে হিমের হাওয়া বইচে। দেহটা বলে উঠচে, "ওহে কবি, আর বাড়াবাড়ি ভালো নয়, তোমার বাজে কথার কারবার বন্ধ করে মোটা কম্বলটা মুড়ি দিয়ে একবার চক্ষু বোজো, অনন্যগতি আমি তোমার আজন্মকালের অনুগত, আর আমরণ কালের সহচর, তাই বলেই কি আমাকে এত দুঃখ দিতে হবে। দেখচ না, পা দুটো কী রকম ঠাণ্ডা হয়ে এসেচে, আর মাথাটা হয়েচে গরম? বুঝচ না কি, এটা তোমার রাত্রিকালের উপযোগী মন্দাক্রান্তা ছন্দের যতি-ভঙ্গের লক্ষণ,—এসময়ে

মস্তিষ্কের মধ্যে শার্দূলবিক্রীড়িতের অবতারণা করা কি প্রকৃতিস্থ লোকের কর্ম।”—কায়ার এই অভিযোগ শুনে তার প্রতি অনুরক্ত আমার মন বলে উঠচে, “ঠিক ঠিক। একটুও অত্যুক্তি নেই।” ক্লান্ত দেহ এবং উদ্‌ভ্রান্ত মন উভয়ের সম্মিলিত এই বেদনাপূর্ণ আবেদনকে আর উপেক্ষা করতে পারিনে, অতএব চললুম শুতে।

প্রভাত হয়েচে। তুমি আমাকে বড়ো চিঠি লিখতে অনুরোধ করেচ। সে-অনুরোধ পালন করা আমার সহজ-স্বভাব-সংগত নয়, পল্লবিত করে পত্র লেখার উৎসাহ আমার একটুও নেই। আমি কখনো মহাকাব্য লিখিনি বলে আমার স্বদেশী অনেক পাঠক আমাকে অবজ্ঞা করে থাকেন,—মহাচিঠিও আমি সচরাচর লিখতে পারিনে। কিন্তু যেহেতু আমার চীনপ্রয়াণের সময় নিকটবর্তী, এবং তখন আমার চিঠিও অগত্যা যথেষ্ট বিরল হয়ে আসবে, সেইজন্যে আগামী অভাব পূরণ করবার উদ্দেশ্যে বড়ো চিঠি লিখচি। সে-অভাব যে অত্যন্ত গুরুতর অভাব এবং সেটা পূরণ করবার আর কোনো উপায় নেই, এটা কল্পনা করচি নিছক অহংকারের জোরে। আসল কথাটা এই-যে, এবার তুমি যে চিঠিটা লিখেচ সেটা তোমার সাধারণ চিঠির আদর্শ অনুসারে কিছু বড়ো, সেইজন্যে তোমার সঙ্গে পাল্লা দেবার গর্বে বড়ো চিঠি লিখচি। তুমি নামতায় আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ, লজিকেও তোমার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা আমার কর্ম নয়, কিন্তু বাগ্‌বিস্তার বিদ্যায় কিছুতেই আমাকে পেরে উঠবে না। এই একটি মাত্র জায়গায় যেখানে আমার জিত আছে, সেইখানে তোমার অহংকার খর্ব করবার ইচ্ছা আমার মনে এল। ইতি ৫ই ফাল্গুন, ১৩৩০।

চারিত্রপূজা

চারিত্রপূজা

আমাদের দেশে আমরা বলিয়া থাকি, মহাত্মাদের নাম প্রাতঃস্মরণীয়। তাহা কৃতজ্ঞতার ঋণ শুধিবার জন্য নহে—ভক্তিভাজনকে দিবসারম্ভে যে ব্যক্তি ভক্তিভাবে স্মরণ করে তাহার মঙ্গল হয়—মহাপুরুষদের তাহাতে উৎসাহ বৃদ্ধি হয় না, যে ভক্তি করে সে ভালো হয়। ভক্তি করা প্রত্যেকের প্রাত্যহিক কর্তব্য।

কিন্তু তবে তো একটা লম্বা নামের মালা গাঁথিয়া প্রত্যহ আওড়াইতে হয় এবং সে মালা ক্রমশই বাড়িয়া চলে। তাহা হয় না। যথার্থ ভক্তিই যেখানে উদ্দেশ্য সেখানে মালা বেশি বাড়িতে পারে না। ভক্তি যদি নির্জীব না হয় তবে সে জীবনের ধর্ম অনুসারে গ্রহণ-বর্জন করিতে থাকে, কেবলই সঞ্চয় করিতে থাকে না।

পুস্তক কতই প্রকাশিত হইতেছে—কিন্তু যদি অবিচারে সঞ্চয় করিবার প্রবৃত্তি না থাকে, যদি মনে করি, কেবল যে-বইগুলি যথার্থই আমার প্রিয়, যাহা আমার পক্ষে চিরদিন পড়িবার যোগ্য, সেইগুলিই রক্ষা করিব, তবে শত বৎসর পরমায়ু হইলেও আমার পাঠ্যগ্রন্থ আমার পক্ষে দুর্ভর হইয়া উঠে না।

আমার প্রকৃতি যে মহাত্মাদিগকে প্রত্যহস্মরণযোগ্য বলিয়া ভক্তি করে তাঁহাদের নাম যদি উচ্চারণ করি তবে কতটুকু সময় লয়। প্রত্যেক পাঠক যদি নিজের মনে চিন্তা করিয়া দেখেন তবে কয়টি নাম তাঁহাদের মুখে আসে। ভক্তি যাঁহাদিগকে হৃদয়ে সজীব করিয়া না রাখে, বাহিরে তাঁহাদের পাথরের মূর্তি গড়িয়া রাখিলে আমার তাহাতে কী লাভ।

তাঁহাদের তাহাতে লাভ আছে এমন কথা উঠিতেও পারে। লোকে দল বাঁধিয়া প্রতিমা স্থাপন করিবে, অথবা মৃতদেহ বিশেষ স্থানে সমাহিত হইয়া গৌরব প্রাপ্ত হইবে, এই আশা স্পষ্টত বা অলক্ষ্যে মনকে উৎসাহ দিতেও পারে। কবরের দ্বারা খ্যাতিলাভ করিবার একটা মোহ আছে।

কিন্তু মহাত্মাদিগকে সেই বেতন দিয়া বিদায় করা নিজেরই ভক্তিকে বঞ্চিত করা। মাহাত্ম্যের অর্ঘ্য সম্পূর্ণ বিনা-বেতনের। ভারতবর্ষে অধ্যাপক সমাজের নিকট হইতে ব্রাহ্মণের প্রাপ্য দান-দক্ষিণা গ্রহণ করিয়া থাকেন, কিন্তু এমন দিন ছিল যখন অধ্যাপনার বেতন শোধ করিয়া দিয়া আমাদের সমাজ তাঁহাদিগকে অপমানিত করিত না। মঙ্গলকর্ম যিনি করিবেন তিনি নিজের মঙ্গলের জন্যই করিবেন, ইহাই প্রকৃষ্ট আদর্শ। কোনো বাহ্যমূল্য লইতে গেলেই মঙ্গলের মূল্য কমিয়া যায়।

দলের একটা উৎসাহ আছে, তাহা সংক্রামক—তাহা মূঢ়ভাবে পরস্পরের মধ্যে সঞ্চারিত হয়—তাহার অনেকটা অলীক। ‘গোলে হরিবোল’ ব্যাপারে হরিবোল যতটা থাকে, গোলের মাত্রা তাহা অপেক্ষা অনেক বেশি হইয়া পড়ে। দলের আন্দোলনে অনেক সময় তুচ্ছ উপলক্ষে ভক্তির ঝড় উঠিতে পারে—তাহার সাময়িক প্রবলতা যতই হোক-না কেন, ঝড় জিনিসটা কখনোই স্থায়ী নহে। সংসারে এমন কতবার কতশত দলের দেবতার অকস্মাৎ সৃষ্টি হইয়াছে এবং জয়ঢাক বাজিতে বাজিতে অতলস্পর্শ বিস্মৃতির মধ্যে তাঁহাদের বিসর্জন হইয়াছে। পাথরের মূর্তি গড়িয়া জবরদস্তি করিয়া কি কাহাকেও মনে রাখা যায়। ওয়েস্ট্‌মিন্‌স্টার-অ্যাবিতে কি এমন অনেকের নাম পাথরে খোদা হয় নাই, ইতিহাসে যাহাদের নামের অক্ষর প্রত্যহ ক্ষুদ্র ও ম্লান হইয়া আসিতেছে। এই-সকল ক্ষণকালের দেবতাগণকে দলীয়

উৎসাহে চিরকালের আসনে বসাইবার চেষ্টা করা, না দেবতার পক্ষে ভালো, না দলের পক্ষে শুভকর। দলগত প্রবল উত্তেজনা যুদ্ধে বিগ্রহে এবং প্রমোদ-উৎসবে উপযোগী হইতে পারে, কারণ ক্ষণিকতাই তাহার প্রকৃতি, কিন্তু ভক্তির পক্ষে সংযত-সমাহিত শান্তিই শোভন এবং অনুকূল, কারণ তাহা অকৃত্রিমতা এবং ধ্রুবতা চাহে, উন্মত্ততায় তাহা আপনাকে নিঃশেষিত করিতে চাহে না।

য়ুরোপেও আমরা কী দেখিতে পাই। সেখানে দল বাঁধিয়া যে ভক্তি উচ্ছ্বসিত হয় তাহা কি যথার্থ ভক্তিভাজনের বিচার করে। তাহা কি সাময়িক উপকারকে চিরন্তন উপকারের অপেক্ষা বড়ো করে না। তাহা কি গ্রাম্যদেবতাকে বিশ্বদেবতার চেয়ে উচ্চে বসায় না। তাহা মুখর দলপতিগণকে যত সম্মান দেয়, নিভৃতবাসী মহাতপস্বীদিগকে কি তেমন সম্মান দিতে পারে। শুনিয়াছি, লর্ড পামার্‌স্টোনের সমাধিকালে যেরূপ বিরাট সম্মানের সমারোহ হইয়াছিল, এমন ক্বচিৎ হইয়া থাকে। দূরে হইতে আমাদের মনে এ কথা উদয় হয় যে, এই ভক্তিই কি শ্রেয়। পামার্‌স্টোনের নামই কি ইংলন্ডের প্রাতঃস্মরণীয়ের মধ্যে, সর্বাগ্রগণনীয়ের মধ্যে স্থান পাইল। দলের চেষ্টায় যদি কৃত্রিম উপায়ে সেই উদ্দেশ্য কিয়ৎপরিমাণে সাধিত হইয়া থাকে তবে দলের চেষ্টাকে প্রশংসা করিতে পারি না, যদি না হইয়া থাকে তবে সেই বৃহৎ আড়ম্বরে বিশেষ গৌরব করিবার এমন কী কারণ আছে।

যাঁহাদের নামস্মরণ আমাদের সমস্ত দিনের বিচিত্র মঙ্গলচেষ্টার উপযুক্ত উপক্রমণিকা বলিয়া গণ্য হইতে পারে তাঁহারাই আমাদের প্রাতঃস্মরণীয়। তাহার অধিক আর বোঝাই করিবার কোনো দরকার নাই। ব্যয়কাতর কৃপণের ধনের মতো, ছোটো বড়ো মাঝারি, ক্ষণিক এবং চিরন্তন, সকলপ্রকার মাহাত্ম্যকেই সাদা পাথর দিয়া লাঞ্ছিত করিবার প্রবৃত্তি যদি আমাদের না হয়, তবে তাহা লইয়া লজ্জা না করিলেও চলে। ভক্তিকে যদি প্রতিদিনের ব্যবহারযোগ্য করিতে হয় তবে তাহা হইতে প্রতিদিনের অভ্যাগত অনাবশ্যক ভারগুলি বিদায় করিবার উপায় রাখিতে হয়, তাহার বিপরীত প্রণালীতে সমস্তই স্তূপাকার করিবার চেষ্টা না করাই ভালো।

যাহা বিনষ্ট হইবার তাহাকে বিনষ্ট হইতে দিতে হইবে, যাহা অগ্নিতে দগ্ধ হইবার তাহা ভস্ম হইয়া যাক। মৃতদেহ যদি লুপ্ত হইয়া না যাইত তবে পৃথিবীতে জীবিতের অবকাশ থাকিত না, ধরাতল একটি প্রকাণ্ড কবরস্থান হইয়া থাকিত। আমাদের হৃদয়ের ভক্তিকে পৃথিবীর ছোটো এবং বড়ো, খাঁটি এবং ঝুঁটা, সমস্ত 'বড়ো'ত্বের গোরস্থান করিয়া রাখিতে পারি না। যাহা চিরজীবী তাহাই থাক্‌, যাহা মৃতদেহ, আজ বাদে কাল কীটের খাদ্য হইবে, তাহাকে মুগ্ধস্নেহে ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা না করিয়া শোকের সহিত অথচ বৈরাগ্যের সহিত শ্মশানে ভস্ম করিয়া আসাই বিহিত। পাছে ভুলি এই আশঙ্কায় নিজেকে উত্তেজিত রাখিবার জন্য কল বানাইবার চেয়ে ভোলাই ভালো। ঈশ্বর আমাদিগকে দয়া করিয়াই বিস্মরণশক্তি দিয়াছেন।

সঞ্চয় নিতান্ত অধিক হইয়া উঠিতে থাকিলে বাছাই করা দুঃসাধ্য হয়। তাহা ছাড়া সঞ্চয়ের নেশা বড়ো দুর্জয় নেশা, একবার যদি হাতে কিছু জমিয়া যায় তবে জমাইবার ঝোঁক আর সামলানো যায় না। আমাদের দেশে ইহাকেই বলে নিরেনব্বইয়ের ধাক্কা। য়ুরোপ বড়োলোক জমাইতে আরম্ভ করিয়া এই নিরেনব্বইয়ের আবর্তের মধ্যে পড়িয়া গেছে। য়ুরোপে দেখিতে পাই, কেহ বা ডাকের টিকিট জমায়, কেহ বা দেশালাইয়ের বাক্সের কাগজের আচ্ছাদন জমায়, কেহ বা পুরাতন জুতা, কেহ বা বিজ্ঞাপনের ছবি জমাইতে থাকে—সেই নেশার রোখ যতই চড়িতে

থাকে, ততই এই-সকল জিনিসের একটা কৃত্রিম মূল্য অসম্ভবরূপে বাড়িয়া উঠে। তেমনি য়ুরোপে মৃত বড়োলোক জমাইবার যে-একটা প্রচণ্ড নেশা আছে তাহাতে মূল্যের বিচার আর থাকে না। কাহাকেও আর বাদ দিতে ইচ্ছা করে না। যেখানে একটুমাত্র উচ্চতা বা বিশেষত্ব আছে সেইখানেই য়ুরোপ তাড়াতাড়ি সিঁদুর মাখাইয়া দিয়া ঘণ্টা নাড়িতে থাকে। দেখিতে দেখিতে দল জুটিয়া যায়।

বস্তুত মাহাত্ম্যের সঙ্গে ক্ষমতা বা প্রতিভার প্রভেদ আছে। মহাত্মারা আমাদের কাছে এমন একটি আদর্শ রাখিয়া যান যাহাতে তাঁহাদিগকে ভক্তিভরে স্মরণ করিলে জীবন মহত্ত্বের পথে আকৃষ্ট হয়। কিন্তু ক্ষমতাশালীকে স্মরণ করিয়া আমরা যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইতে পারি তাহা নহে। ভক্তিভরে শেক্‌স্‌পিয়রের স্মরণমাত্র আমাদিগকে শেক্‌স্‌পিয়রের গুণের অধিকারী করে না, কিন্তু যথার্থভাবে কোনো সাধুকে অথবা বীরকে স্মরণ করিলে আমাদের পক্ষে সাধুত্ব বা বীরত্ব কিয়ৎ পরিমাণেও সরল হইয়া আসে।

তবে গুণী সম্বন্ধে আমাদের কী কর্তব্য। গুণীকে তাঁহার গুণের দ্বারা স্মরণ করাই আমাদের স্বাভাবিক কর্তব্য। শ্রদ্ধার সহিত তানসেনের গানের চর্চা করিয়াই গুণমুগ্ধ গায়কগণ তানসেনকে যথার্থভাবে স্মরণ করে। ধ্রুপদ শুনিলে যাহার গায়ে জ্বর আসে সেও তানসেনের প্রতিমা গড়িবার জন্য চাঁদা দিয়া ঐহিক-পারত্রিক কোনো ফললাভ করে, এ কথা মনে করিতে পারি না। সকলকেই যে গানে ওস্তাদ হইতে হইবে এমন কোনো অবশ্যবাধ্যতা নাই। কিন্তু সাধুতা বা বীরত্ব সকলেরই পক্ষে আদর্শ। সাধুদিগের এবং মহৎকর্মে-প্রাণবিসর্জনপর বীরদিগের স্মৃতি সকলেরই পক্ষে মঙ্গলকর। কিন্তু দল বাঁধিয়া ঋণশোধ করাকে সেই স্মৃতিপালন কহে না; স্মরণব্যাপার প্রত্যেকের পক্ষে প্রত্যহের কর্তব্য।

য়ুরোপে এই ক্ষমতা এবং মাহাত্ম্যের প্রভেদ লুপ্তপ্রায়। উভয়েরই জয়ধ্বজা একই রকম, এমন-কি মাহাত্ম্যের পতাকাই যেন কিছু খাটো। পাঠকগণ অনুধাবন করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন, বিলাতে অভিনেতা আর্ভিঙের সম্মান পরম-সাধুর প্রাপ্য সম্মান অপেক্ষা অল্প নহে। রামমোহন রায় আজ যদি ইংলণ্ডে যাইতেন তবে তাঁহার গৌরব ক্রিকেট-খেলোয়াড় রঞ্জিতসিংহের গৌরবের কাছে খর্ব হইয়া থাকিত।

য়ুরোপে ক্ষমতাশালী লোকের জীবনচরিত লেখার একটা নিরতিশয় উদ্যম আছে। য়ুরোপকে চরিত-বায়ুগ্রস্ত বলা যাইতে পারে। কোনোমতে, একটা যে-কোনো প্রকারের বড়োলোকত্বের সুদূর গন্ধটুকু পাইলেই তাহার সমস্ত চিঠিপত্র, গল্পগুজব, প্রাত্যহিক ঘটনার সমস্ত আবর্জনা সংগ্রহ করিয়া মোটা দুই ভল্যুমে জীবনচরিত লিখিবার জন্য লোকে হাঁ করিয়া বসিয়া থাকে। যে নাচে তাহার জীবনচরিত, যে গান করে তাহার জীবনচরিত, যে হাসাইতে পারে তাহার জীবন-চরিত—জীবন যাহার যেমনই হোক, যে লোক কিছু-একটা পারে তাহারই জীবন-চরিত! কিন্তু যে মহাত্মা জীবনযাত্রার আদর্শ দেখাইয়াছেন তাঁহারই জীবনচরিত সার্থক; যাঁহারা সমস্ত জীবনের দ্বারা কোনো কাজ করিয়াছেন তাঁহাদেরই জীবন আলোচ্য। যিনি কবিতা লিখিয়াছেন, গান তৈরি করিয়াছেন, তিনি কবিতা এবং গানই দান করিয়া গেছেন, তিনি জীবন দান করিয়া যান নাই, তাঁহার জীবনচরিতে কাহার কী প্রয়োজন। টেনিসনের কবিতা পড়িয়া আমরা টেনিসন্‌কে যত বড়ো করিয়া জানিয়াছি, তাঁহার জীবনচরিত পড়িয়া তাঁহাকে তাহা অপেক্ষা অনেক ছোটো করিয়া জানিয়াছি মাত্র।

কৃত্রিম আদর্শে মানুষকে এইরূপ নির্বিবেক করিয়া তোলে, মেকি এবং খাঁটির এক দর হইয়া আসে। আমাদের দেশে আধুনিক কালে পাপপুণ্যের আদর্শ কৃত্রিম হওয়াতে তাহার ফল কী হইয়াছে। ব্রাহ্মণের পায়ের ধুলা লওয়া এবং গঙ্গায় স্নান করাও পুণ্য, আবার অচৌর্য ও সত্যপরায়ণতাও পুণ্য, কিন্তু কৃত্রিমের সহিত খাঁটি পুণ্যের কোনো জাতি-বিচার না থাকাতে, যে ব্যক্তি নিত্য গঙ্গাস্নান ও আচারপালন করে, সমাজে অলুব্ধ ও সত্যপরায়ণের অপেক্ষা তাহার পুণ্যের সম্মান কম নহে, বরঞ্চ বেশি। যে ব্যক্তি যবনের অন্ন খাইয়াছে আর যে ব্যক্তি জাল মকদ্দমায় যবনের অন্নের উপায় অপহরণ করিয়াছে উভয়েই পাপীর কোঠায় পড়ায় প্রথমোক্ত পাপীর প্রতি ঘৃণা ও দণ্ড যেন মাত্রায় বাড়িয়া উঠে।

যথার্থ ভক্তির উপর পূজার ভার না দিয়া লোকারণ্যের উপর পূজার ভার দিলে দেবপূজার ব্যাঘাত ঘটে। বারোয়ারির দেবতার যত ধুম গৃহদেবতা-ইষ্টদেবতার তত ধুম নহে। কিন্তু বারোয়ারির দেবতা কি মুখ্যত একটা অবান্তর উত্তেজনার উপলক্ষমাত্র নহে।

আমাদের দেশে আধুনিক কালের বারোয়ারির শোকের মধ্যে—বারোয়ারির স্মৃতিপালনচেষ্টার মধ্যে, গভীর শূন্যতা দেখিয়া আমরা পদে পদে ক্ষুব্ধ হই। নিজের দেবতাকে কোন্ প্রাণে এমন কৃত্রিম সভায় উপস্থিত করিয়া পূজার অভিনয় করা হয় বুঝিতে পারি না। সেই অভিনয়ের আয়োজনে যদি মালমসলা কিছু কম হয় তবে আমরা পরস্পরকে লজ্জা দিই—কিন্তু লজ্জার বিষয় গোড়াতেই। যিনি ভক্ত তিনি মহতের মাহাত্ম্যকীর্তন করিবেন ইহা স্বাভাবিক এবং সকলের পক্ষেই শুভফলপ্রদ; কিন্তু মহাত্মাকে লইয়া সকলে মিলিয়া একদিন বারোয়ারির কোলাহল তুলিয়া কর্তব্যসমাধার চেষ্টা লজ্জাকর এবং নিষ্ফল।

আমরা বলি—কীর্তির্যস্য স জীবতি। যিনি ক্ষমতাপন্ন লোক তিনি নিজের কীর্তির মধ্যেই নিজে বাঁচিয়া থাকেন। কৃত্তিবাসের জন্মস্থানে বাঙালি একটা কোনোপ্রকারের ধুমধাম করে নাই বলিয়া বাঙালি কৃত্তিবাসকে অবজ্ঞা করিয়াছে এ কথা কেমন করিয়া বলিব। যেমন 'গঙ্গা পূজি গঙ্গাজলে', তেমনি বাংলাদেশে মুদির দোকান হইতে রাজার প্রাসাদ পর্যন্ত কৃত্তিবাসের কীর্তি-দ্বারাই কৃত্তিবাস কত শতাব্দী ধরিয়া প্রত্যহ পূজিত হইয়া আসিতেছেন। এমন প্রত্যক্ষপূজা আর কিসে হইতে পারে।

১৩০৮ চৈত্র

বিদ্যাসাগর-চরিত

বিদ্যাসাগরের চরিত্রে যাহা সর্বপ্রধান গুণ, যে গুণে তিনি পল্লী-আচারের ক্ষুদ্রতা, বাঙালিজীবনের জড়ত্ব সবলে ভেদ করিয়া একমাত্র নিজের গতিবেগপ্রাবল্যে কঠিন প্রতিকূলতার বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া—হিন্দুত্বের দিকে নহে, সাম্প্রদায়িকতার দিকে নহে—করুণার অশ্রুজলপূর্ণ উন্মুক্ত অপার মনুষ্যত্বের অভিমুখে আপনার দৃঢ়নিষ্ঠ একাগ্র একক জীবনকে প্রবাহিত করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন, আমি যদি অদ্য তাঁহার সেই গুণকীর্তন করিতে বিরত হই তবে আমার কর্তব্য একেবারেই

অসম্পন্ন থাকিয়া যায়। কারণ, বিদ্যাসাগরের জীবনবৃত্তান্ত আলোচনা করিয়া দেখিলে এই কথাটি বারম্বার মনে উদয় হয় যে, তিনি যে বাঙালি বড়োলোক ছিলেন তাহা নহে, তিনি রীতিমত হিন্দু ছিলেন তাহাও নহে—তিনি তাহা অপেক্ষাও অনেক বেশি বড়ো ছিলেন, তিনি যথার্থ মানুষ ছিলেন। বিদ্যাসাগরের জীবনীতে এই অনন্যসুলভ মনুষ্যত্বের প্রাচুর্যই সর্বোচ্চ গৌরবের বিষয়। তাঁহার সেই পর্বতপ্রমাণ চরিত্রমাহাত্ম্যে তাঁহারই কৃত কীর্তিকেও খর্ব করিয়া রাখিয়াছে।

তাঁহার প্রধান কীর্তি বঙ্গভাষা। যদি এই ভাষা কখনো সাহিত্য-সম্পদে ঐশ্বর্যশালিনী হইয়া উঠে, যদি এই ভাষা অক্ষয় ভাবজননীরূপে মানবসভ্যতার ধাত্রীগণের ও মাতৃগণের মধ্যে গণ্য হয়—যদি এই ভাষা পৃথিবীর শোকদুঃখের মধ্যে এক নূতন সান্ত্বনাস্থল, সংসারের তুচ্ছতা ও ক্ষুদ্র স্বার্থের মধ্যে এক মহত্ত্বের আদর্শলোক, দৈনন্দিন মানবজীবনের অবসাদ ও অস্বাস্থ্যের মধ্যে সৌন্দর্যের এক নিভৃত নিকুঞ্জবন রচনা করিতে পারে, তবেই তাঁহার এই কীর্তি তাঁহার উপযুক্ত গৌরব লাভ করিতে পারিবে।

বাংলাভাষার বিকাশে বিদ্যাসাগরের প্রভাব কিরূপ কার্য করিয়াছে এখানে তাহা স্পষ্ট করিয়া নির্দেশ করা আবশ্যক।

বিদ্যাসাগর বাংলাভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী ছিলেন। তৎপূর্বে বাংলায় গদ্যসাহিত্যের সূচনা হইয়াছিল, কিন্তু তিনিই সর্বপ্রথমে বাংলাগদ্যে কলানৈপুণ্যের অবতারণা করেন। ভাষা যে কেবল ভাবের একটা আধারমাত্র নহে, তাহার মধ্যে যেন-তেন-প্রকারেণ কতকগুলা বক্তব্য বিষয় পুরিয়া দিলেই যে কর্তব্যসমাপন হয় না, বিদ্যাসাগর দৃষ্টান্তদ্বারা তাহাই প্রমাণ করিয়াছিলেন। তিনি দেখাইয়াছিলেন যে, যতটুকু বক্তব্য, তাহা সরল করিয়া, সুন্দর করিয়া এবং সুশৃঙ্খল করিয়া ব্যক্ত করিতে হইবে। আজিকার দিনে এ কাজটিকে তেমন বৃহৎ বলিয়া মনে হইবে না, কিন্তু সমাজবন্ধন যেমন মনুষ্যত্ববিকাশের পক্ষে অত্যাবশ্যক, তেমনি ভাষাকে কলাবন্ধনের দ্বারা সুন্দররূপে সংযমিত না করিলে সে ভাষা হইতে কদাচ প্রকৃত সাহিত্যের উদ্ভব হইতে পারে না। সৈন্যদলের দ্বারা যুদ্ধ সম্ভব, কেবলমাত্র জনতার দ্বারা নহে; জনতা নিজেকেই নিজে খণ্ডিত প্রতিহত করিতে থাকে, তাহাকে চালনা করাই কঠিন। বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যভাষার উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে সুবিভক্ত, সুবিন্যস্ত, সুপরিচ্ছন্ন এবং সুসংযত করিয়া তাহাকে সহজ গতি এবং কার্যকুশলতা দান করিয়াছেন। এখন তাহার দ্বারা অনেক সেনাপতি ভাবপ্রকাশের কঠিন বাধাসকল পরাহত করিয়া সাহিত্যের নব নব ক্ষেত্র আবিষ্কার ও অধিকার করিয়া লইতে পারেন, কিন্তু যিনি এই সেনার রচনাকর্তা, যুদ্ধজয়ের যশোভাগ সর্বপ্রথমে তাঁহাকেই দিতে হয়।

বাংলাভাষাকে পূর্বপ্রচলিত অনাবশ্যক সমাসাড়ম্বরভার হইতে মুক্ত করিয়া, তাহার পদগুলির মধ্যে অংশযোজনার সুনিয়ম স্থাপন করিয়া, বিদ্যাসাগর যে বাংলা গদ্যকে কেবলমাত্র সর্বপ্রকার-ব্যবহার-যোগ্য করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন তাহা নহে, তিনি তাহাকে শোভন করিবার জন্যও সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। গদ্যের পদগুলির মধ্যে একটা ধ্বনিসামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া তাহার গতির মধ্যে একটি অনতিলক্ষ্য ছন্দঃস্রোত রক্ষা করিয়া, সৌম্য এবং সরল শব্দগুলি নির্বাচন করিয়া, বিদ্যাসাগর বাংলা-গদ্যকে সৌন্দর্য ও পরিপূর্ণতা দান করিয়াছেন। গ্রাম্য পাণ্ডিত্য এবং গ্রাম্য বর্বরতা, উভয়ের হস্ত হইতেই উদ্ধার করিয়া তিনি ইহাকে পৃথিবীর ভদ্রসভার উপযোগী আর্যভাষারূপে গঠিত করিয়া গিয়াছেন। তৎপূর্বে বাংলা গদ্যের যে

অবস্থা ছিল তাহা আলোচনা করিয়া দেখিলে এই ভাষাগঠনে বিদ্যাসাগরের শিল্প প্রতিভা ও সৃষ্টিক্ষমতার প্রচুর পরিচয় পাওয়া যায়।

কিন্তু প্রতিভাসম্পন্ন বলিয়া বিদ্যাসাগরের সম্মান নহে। বিশেষত বিদ্যাসাগর যাহার উপর আপন প্রতিভা প্রয়োগ করিয়াছিলেন তাহা প্রবহমান, পরিবর্তনশীল। ভাষা নদীস্রোতের মতো—তাহার উপরে কাহারও নাম খুদিয়া রাখা যায় না। মনে হয়, যেন সে চিরকাল এবং সর্বত্র স্বভাবতই এইভাবে প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে। বাস্তবিক সে যে কোন্ কোন্ নির্ঝরধারায় গঠিত ও পরিপুষ্ট তাহা নির্ণয় করিতে হইলে উজানমুখে গিয়া পুরাবৃত্তের দুর্গম গিরিশিখরে আরোহণ করিতে হয়। বিশেষ গ্রন্থ অথবা চিত্র অথবা মূর্তি চিরকাল আপনার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া আপন রচনাকর্তাকে স্মরণ করাইয়া দেয়, কিন্তু ভাষা ছোটো বড়ো অসংখ্য লোকের নিকট হইতে জীবনলাভ করিতে করিতে ব্যাপ্ত হইয়া পূর্ব ইতিহাস বিস্মৃত হইয়া চলিয়া যায়, বিশেষরূপে কাহারও নাম ঘোষণা করে না।

কিন্তু সেজন্য আক্ষেপ করিবার প্রয়োজন নাই; কারণ, বিদ্যাসাগরের গৌরব কেবলমাত্র তাঁহার প্রতিভার উপর নির্ভর করিতেছে না।

প্রতিভা মানুষের সমস্তটা নহে, তাহা মানুষের একাংশ মাত্র। প্রতিভা মেঘের মধ্যে বিদ্যুতের মতো, আর মনুষ্যত্ব চরিত্রের দিবালোক, তাহা সর্বত্রব্যাপী ও স্থির। প্রতিভা মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ অংশ, আর মনুষ্যত্ব জীবনের সকল মুহূর্তেই সকল কার্যেই আপনাকে ব্যক্ত করিতে থাকে। প্রতিভা অনেক সময়ে বিদ্যুতের ন্যায় আপনার আংশিকতাবশতই লোকচক্ষে তীব্রতররূপে আঘাত করে, এবং চরিত্রমহত্ত্ব আপনার ব্যাপকতাগুণেই প্রতিভা অপেক্ষা ম্লানতর বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কিন্তু চরিত্রের শ্রেষ্ঠতাই যে যথার্থ শ্রেষ্ঠতা, ভাবিয়া দেখিলে সে বিষয়ে কাহারও সংশয় থাকিতে পারে না।

ভাষা প্রস্তর অথবা চিত্রপটের দ্বারা সত্য এবং সৌন্দর্য প্রকাশ করা ক্ষমতার কার্য সন্দেহ নাই; তাহাতে বিচিত্র বাধা অতিক্রম এবং অসামান্য নৈপুণ্য প্রয়োগ করিতে হয়। কিন্তু নিজের সমগ্র জীবনের দ্বারা সেই সত্য ও সৌন্দর্য প্রকাশ করা তদপেক্ষা আরও বেশি দুরূহ, তাহাতে পদে পদে কঠিনতর বাধা অতিক্রম করিতে হয় এবং তাহাতে স্বাভাবিক সূক্ষ্ম বোধশক্তি ও নৈপুণ্য, সংযম ও বল অধিকতর আবশ্যক হয়।

এই চরিত্ররচনার প্রতিভা কোনো সাম্প্রদায়িক শাস্ত্র মানিয়া চলে না। প্রকৃত কবির কবিত্ব যেমন অলংকারশাস্ত্রের অতীত, অথচ বিশ্বহৃদয়ের মধ্যে বিধিরচিত নিগূঢ়নিহিত এক অলিখিত অলংকারশাস্ত্রের কোনো নিয়মের সহিত তাহার স্বভাবত কোনো বিরোধ হয় না; তেমনি যাঁহারা যথার্থ মনুষ্য তাঁহাদের শাস্ত্র তাঁহাদের অন্তরের মধ্যে, অথচ বিশ্বব্যাপী মনুষ্যত্বের সমস্ত নিত্যবিধানগুলির সঙ্গে সে শাস্ত্র আপনি মিলিয়া যায়। অতএব, অন্যান্য প্রতিভায় যেমন 'ওরিজিন্যালিটি' অর্থাৎ অনন্যতন্ত্রতা প্রকাশ পায়, মহচ্চরিত্রবিকাশেও সেইরূপ অনন্যতন্ত্রতার প্রয়োজন হয়।—অনেকে বিদ্যাসাগরের অনন্যতন্ত্র প্রতিভা ছিল না বলিয়া আভাস দিয়া থাকেন; তাঁহারা জানেন, অনন্যতন্ত্রত্ব কেবল সাহিত্যে এবং শিল্পে, বিজ্ঞানে এবং দর্শনেই প্রকাশ পাইয়া থাকে। বিদ্যাসাগর এই অকৃতকীর্তি অকিঞ্চিৎকর বঙ্গসমাজের মধ্যে নিজের চরিত্রকে মনুষ্যত্বের আদর্শরূপে প্রস্ফুট করিয়া যে এক অসামান্য অনন্যতন্ত্রত্ব প্রকাশ করিয়াছেন তাহা বাংলার ইতিহাসে অতিশয় বিরল; এত বিরল যে, এক শতাব্দীর মধ্যে কেবল আর দুই-একজনের নাম মনে পড়ে এবং তাঁহাদের মধ্যে রামমোহন রায় সর্বশ্রেষ্ঠ।

অনন্যতন্ত্রতা শব্দটা শুনিবামাত্র তাহাকে সংকীর্ণতা বলিয়া ভ্রম হইতে পারে; মনে হইতে পারে, তাহা ব্যক্তিগত বিশেষত্ব, সাধারণের সহিত তাহার যোগ নাই। কিন্তু সে কথা যথার্থ নহে। বস্তুত আমরা নিয়মের শৃঙ্খলে, জটিল কৃত্রিমতার বন্ধনে এতই জড়িত ও আচ্ছন্ন হইয়া থাকি যে, আমরা সমাজের কল-চালিত পুত্তলের মতো হইয়া যাই; অধিকাংশ কাজই সংস্কারাধীনে অন্ধভাবে সম্পন্ন করি; নিজত্ব কাহাকে বলে জানি না, জানিবার আবশ্যকতা রাখি না। আমাদের ভিতরকার আসল মানুষটি জন্মাবধি মৃত্যুকাল পর্যন্ত প্রায় সুপ্তভাবেই কাটাইয়া দেয়, তাহার স্থানে কাজ করে একটা নিয়ম-বাঁধা যন্ত্র। যাঁহাদের মধ্যে মনুষ্যত্বের পরিমাণ অধিক, চিরাগত প্রথা ও অভ্যাসের জড় আচ্ছাদনে তাঁহাদের সেই প্রবল শক্তিকে চাপা দিয়া রাখিতে পারে না। ইঁহারাই নিজের চরিত্রপুরীর মধ্যে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার প্রাপ্ত হন। অন্তরস্থ মনুষ্যত্বের এই স্বাধীনতার নামই নিজত্ব। এই নিজত্ব ব্যক্তভাবে ব্যক্তিবিশেষের, কিন্তু নিগূঢ়ভাবে সমস্ত মানবের। মহৎ ব্যক্তিরা এই নিজত্বপ্রভাবে এক দিকে স্বতন্ত্র, একক—অন্য দিকে সমস্ত মানবজাতির সবর্ণ, সহোদর। আমাদের দেশে রামমোহন রায় এবং বিদ্যাসাগর উভয়ের জীবনেই ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। এক দিকে যেমন তাঁহারা ভারতবর্ষীয়, তেমনি অপর দিকে য়ুরোপীয় প্রকৃতির সহিত তাঁহাদের চরিত্রের বিস্তর নিকটসাদৃশ্য দেখিতে পাই। অথচ তাহা অনুকরণগত সাদৃশ্য নহে। বেশভূষায় আচার-ব্যবহারে তাঁহারা সম্পূর্ণ বাঙালি ছিলেন; স্বজাতির শাস্ত্রজ্ঞানে তাঁহাদের সমতুল্য কেহ ছিল না; স্বজাতিকে মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের মূলপত্তন তাঁহারাই করিয়া গিয়াছেন—অথচ নির্ভীক বলিষ্ঠতা, সত্যচারিতা, লোকহিতৈষা, দৃঢ়প্রতিজ্ঞা এবং আত্মনির্ভরতায় তাঁহারা বিশেষরূপে য়ুরোপীয় মহাজনদের সহিত তুলনীয় ছিলেন। য়ুরোপীয়দের তুচ্ছ বাহ্য অনুকরণের প্রতি তাঁহারা যে অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতেও তাঁহাদের য়ুরোপীয়সুলভ গভীর আত্মসম্মানবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। য়ুরোপীয় কেন, সরল সত্যপ্রিয় সাঁওতালেরাও যে অংশে মনুষ্যত্বে ভূষিত, সেই অংশে বিদ্যাসাগর তাঁহার স্বজাতীয় বাঙালির অপেক্ষা সাঁওতালের সহিত আপনার অন্তরের যথার্থ ঐক্য অনুভব করিতেন।

মাঝে মাঝে বিধাতার নিয়মের এরূপ আশ্চর্য ব্যতিক্রম হয় কেন, বিশ্বকর্মা যেখানে চার কোটি বাঙালি নির্মাণ করিতেছিলেন সেখানে হঠাৎ দুই-একজন মানুষ গড়িয়া বসেন কেন, তাহা বলা কঠিন। কী নিয়মে বড়োলোকের অভ্যুত্থান হয় তাহা সকল দেশেই রহস্যময়—আমাদের এই ক্ষুদ্রকর্মা ভীরুহৃদয়ের দেশে সে রহস্য দ্বিগুণতর দুর্ভেদ্য। বিদ্যাসাগরের চরিত্রসৃষ্টিও রহস্যাবৃত—কিন্তু ইহা দেখা যায়, সে চরিত্রের ছাঁচ ছিল ভালো। ঈশ্বরচন্দ্রের পূর্বপুরুষের মধ্যে মহত্ত্বের উপকরণ প্রচুর পরিমাণে সঞ্চিত ছিল।

বিদ্যাসাগরের জীবনবৃত্তান্ত আলোচনা করিলে প্রথমেই তাঁহার পিতামহ রামজয় তর্কভূষণ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। লোকটি অনন্যসাধারণ ছিলেন তাহাতে সন্দেহমাত্রই নাই।

মেদিনীপুর জেলায় বনমালীপুরে তাঁহার পৈতৃক বাসভবন ছিল। তাঁহার পিতার মৃত্যুর পরে বিষয়বিভাগ লইয়া সহোদরদের সহিত মনান্তর হওয়ায় তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। বহুকাল পরে তর্কভূষণ দেশে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন তাঁহার স্ত্রী দুর্গাদেবী ভাশুর ও দেবরগণের অনাদরে প্রথমে শ্বশুরালয় হইতে বীরসিংহগ্রামে পিত্রালয়ে পরে সেখানেও ভ্রাতা ও ভ্রাতৃজায়ার

লাঞ্ছনায় বৃদ্ধপিতার সাহায্যে পিতৃভবনের অনতিদূরে এক কুটিরে বাস করিয়া, চরকা কাটিয়া দুই পুত্র ও চারি কন্যা-সহ বহুকষ্টে দিনপাত করিতেছেন। তর্কভূষণ ভ্রাতাদের আচরণ শুনিয়া নিজের স্বত্ব ও তাঁহাদের সংস্রব ত্যাগ করিয়া ভিন্নগ্রামে দারিদ্র্য অবলম্বন করিয়া রহিলেন। কিন্তু যাঁহার স্বভাবের মধ্যে মহত্ত্ব আছে, দারিদ্র্যে তাঁহাকে দরিদ্র করিতে পারে না। বিদ্যাসাগর স্বয়ং তাঁহার পিতামহের যে চরিত্র বর্ণনা করিয়াছেন স্থানে স্থানে তাহা উদ্ধৃত করিতে ইচ্ছা করি।—

> তিনি নিরতিশয় তেজস্বী ছিলেন; কোনো অংশে কাহারও নিকট অবনত হইয়া চলিতে, অথবা কোনোপ্রকারে অনাদর বা অবমাননা সহ্য করিতে পারিতেন না। তিনি সকল স্থলে, সকল বিষয়ে, স্বীয় অভিপ্রায়ের অনুবর্তী হইয়া চলিতেন, অন্যদীয় অভিপ্রায়ের অনুবর্তন তদীয় স্বভাব ও অভ্যাসের সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। উপকার-প্রত্যাশায় অথবা অন্য কোনো কারণে, তিনি কখনও পরের উপাসনা বা আনুগত্য করিতে পারেন নাই।[1]

ইহা হইতেই শ্রোতৃগণ বুঝিতে পারিবেন, একান্নবর্তী পরিবারে কেন এই অগ্নিখণ্ডটিকে ধরিয়া রাখিতে পারে নাই। তাঁহারা পাঁচ সহোদর ছিলেন, কিন্তু তিনি একাই নীহারিকাচক্র হইতে বিচ্ছিন্ন জ্যোতিষ্কের মতো আপন বেগে বাহিরে বিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন। একান্নবর্তী পরিবারের বহুভারাক্রান্ত যন্ত্রেও তাঁহার কঠিন চরিত্রস্বাতন্ত্র্য পেষণ করিয়া দিতে পারে নাই।

> তাঁহার শ্যালক রামসুন্দর বিদ্যাভূষণ গ্রামের প্রধান বলিয়া পরিগণিত এবং সাতিশয় গর্বিত ও উদ্ধতস্বভাব ছিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন, ভগিনীপতি রামজয় তাঁহার অনুগত হইয়া থাকিবেন। কিন্তু তাঁহার ভগিনীপতি কিরূপ প্রকৃতির লোক তাহা বুঝিতে পারিলে তিনি সেরূপ মনে করিতে পারিতেন না। রামজয় রামসুন্দরের অনুগত হইয়া না চলিলে রামসুন্দর নানাপ্রকারে তাঁহাকে জব্দ করিবেন, অনেকে তাঁহাকে এই ভয় দেখাইয়াছিলেন; কিন্তু রামজয় কোনো কারণে ভয় পাইবার লোক ছিলেন না; তিনি স্পষ্টবাক্যে বলিতেন, বরং বাসত্যাগ করিব, তথাপি শালার অনুগত হইয়া চলিতে পারিব না। শ্যালকের আক্রোশে তাঁহাকে সময়ে সময়ে, প্রকৃতপ্রস্তাবে, একঘরিয়া হইয়া থাকিতে ও নানাপ্রকার অত্যাচার-উপদ্রব সহ্য করিতে হইত, তিনি তাহাতে ক্ষুব্ধ বা চলচিত্ত হইতেন না।[1]

তাঁহার তেজস্বিতার উদাহরণস্বরূপে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, জমিদার যখন তাঁহাদের বীরসিংহগ্রামের নূতন বাস্তুবাটী নিষ্করব্রহ্মোত্তর করিয়া দিবেন মানস করিয়াছিলেন, তখন রামজয় দানগ্রহণ করিতে সম্মত হন নাই। গ্রামের অনেকেই বসতবাটী লাখেরাজ করিবার জন্য তাঁহাকে অনেক উপদেশ দিয়াছিল, কিন্তু তিনি কাহারও অনুরোধ রক্ষা করেন নাই। এমন লোকের পক্ষে দারিদ্র্যও মহৈশ্বর্য, ইহাতে তাঁহার স্বাভাবিক সম্পদ্ জাজ্বল্যমান করিয়া তোলে।[2]

কিন্তু তর্কভূষণ যে আপন স্বাতন্ত্র্যগর্বে সর্বসাধারণকে অবজ্ঞা করিয়া দূরে থাকিতেন তাহা নহে। বিদ্যাসাগর বলেন—

> তর্কভূষণমহাশয় নিরতিশয় অমায়িক ও নিরহংকার ছিলেন; কি ছোটো, কি বড়ো, সর্ববিধ লোকের সহিত, সমভাবে সদয় ও সাদর ব্যবহার করিতেন। তিনি যাঁহাদিগকে কপটাচারী মনে করিতেন তাঁহাদের সহিত সাধ্যপক্ষে আলাপ করিতেন না। তিনি স্পষ্টবাদী ছিলেন, কেহ রুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হইবেন ইহা ভাবিয়া স্পষ্ট কথা বলিতে ভীত বা সংকুচিত হইতেন না। তিনি যেমন স্পষ্টবাদী তেমনই যথার্থবাদী ছিলেন।

কাহারও ভয়ে বা অনুরোধে, অথবা অন্য কোনো কারণে তিনি কখনও কোনো বিষয়ে অযথা নির্দেশ করেন নাই। তিনি যাঁহাদিগকে আচরণে ভদ্র দেখিতেন তাঁহাদিগকেই ভদ্র বলিয়া গণ্য করিতেন; আর যাঁহাদিগকে আচরণে অভদ্র দেখিতেন, বিদ্বান্ ধনবান্ ও ক্ষমতাপন্ন হইলেও তাঁহাদিগকে ভদ্রলোক বলিয়া জ্ঞান করিতেন না।[১]

এ দিকে তর্কভূষণমহাশয়ের বল এবং সাহসও আশ্চর্য ছিল। সর্বদাই তাঁহার হস্তে একখানি লৌহদণ্ড থাকিত। তখন দস্যুভয়ে অনেকে একত্র না হইয়া স্থানান্তরে যাইতে পারিত না, কিন্তু তিনি একা এই লৌহদণ্ড-হস্তে অকুতোভয়ে সর্বত্র যাতায়াত করিতেন; এমন-কি, দুইচারিবার আক্রান্ত হইয়া দস্যুদিগকে উপযুক্তরূপ শিক্ষা দিয়াছিলেন। একুশ বৎসর বয়সে একবার তিনি এক ভালুকের সম্মুখে পড়িয়াছিলেন।

ভালুক নখরপ্রহারে তাঁহার সর্বশরীর ক্ষতবিক্ষত করিতে লাগিল, তিনিও অবিশ্রান্ত লৌহযষ্টি প্রহার করিতে লাগিলেন। ভালুক ক্রমে নিস্তেজ হইয়া পড়িলে, তিনি তদীয় উদরে উপর্যুপরি পদাঘাত করিয়া তাহার প্রাণসংহার করিলেন।[১]

অবশেষে শোণিতপ্লুত বিক্ষতদেহে চারি ক্রোশ পথ হাঁটিয়া মেদিনীপুরে এক আত্মীয়ের গৃহে শয্যা আশ্রয় করেন; দুই মাস পরে সুস্থ হইয়া বাড়ি ফিরিতে পারেন।

আর একটিমাত্র ঘটনা উল্লেখ করিলে তর্কভূষণের চরিত্রচিত্র সম্পূর্ণ হইবে।

১৭৪২ শকের ১২ই আশ্বিন মঙ্গলবারে বিদ্যাসাগরের পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় অদূরে কোমরগঞ্জে মধ্যাহ্নে হাট করিতে গিয়াছিলেন। রামজয় তর্কভূষণ তাঁহাকে ঘরের একটি শুভসংবাদ দিতে বাহির হইয়াছিলেন। পথের মধ্যে পুত্রের সহিত দেখা হইলে বলিলেন, 'একটি এঁড়ে বাছুর হয়েছে।' শুনিয়া ঠাকুরদাস ঘরে আসিয়া গোয়ালের অভিমুখে গমন করিতেছিলেন; তর্কভূষণ হাসিয়া কহিলেন, 'ও দিকে নয়, এ দিকে এসো।' বলিয়া সূতিকাগৃহে লইয়া নবপ্রসূত শিশু ঈশ্বরচন্দ্রকে নির্দেশ করিয়া দেখাইলেন।

এই কৌতুকহাস্যরশ্মিপাতে রামজয়ের বলিষ্ঠ উন্নতচরিত্র আমাদের নিকট প্রভাতের গিরিশিখরের ন্যায় রমণীয় বোধ হইতেছে। এই হাস্যময় তেজোময় নির্ভীক ঋজুস্বভাব পুরুষের মতো আদর্শ বাংলাদেশে অত্যন্ত বিরল না হইলে বাঙালির মধ্যে পৌরুষের অভাব হইত না। আমরা তাঁহার চরিত্রবর্ণনা বিস্তারিতরূপে উদ্ধৃত করিলাম, তাহার কারণ, এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ তাঁহার পৌত্রকে আর কোনো সম্পত্তি দান করিতে পারেন নাই, কেবল যে অক্ষয়সম্পদের উত্তরাধিকারবণ্টন একমাত্র ভগবানের হস্তে, সেই চরিত্র-মাহাত্ম্য অখণ্ডভাবে তাঁহার জ্যেষ্ঠপৌত্রের অংশে রাখিয়া গিয়াছিলেন।

পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ও সাধারণ লোক ছিলেন না। যখন তাঁহার বয়স চৌদ্দ-পনেরো বৎসর, এবং যখন তাঁহার মাতা দুর্গাদেবী চরকায় সুতা কাটিয়া একাকিনী তাঁহার দুই পুত্র এবং চারি কন্যার ভরণপোষণে প্রবৃত্ত ছিলেন, তখন ঠাকুরদাস উপার্জনের চেষ্টায় কলিকাতায় প্রস্থান করিলেন।

কলিকাতায় আসিয়া প্রথমে তিনি তাঁহার আত্মীয় জগন্মোহন তর্কালংকারের বাড়িতে উঠিলেন। ইংরেজি শিখিলে সওদাগর সাহেবদের হৌসে কাজ জুটিতে পারিবে জানিয়া প্রত্যহ সন্ধ্যাবেলায় এক শিপ্-সরকারের বাড়ি ইংরেজি শিখিতে যাইতেন। যখন বাড়ি ফিরিতেন তখন তর্কালংকারের বাড়িতে উপরি-লোকের আহারের কাণ্ড শেষ হইয়া যাইত, সুতরাং তাঁহাকে রাত্রে অনাহারে থাকিতে হইত।

অবশেষে তিনি তাঁহার শিক্ষকের এক আত্মীয়ের বাড়ি আশ্রয় লইলেন। আশ্রয়দাতার দারিদ্র্যনিবন্ধন এক-একদিন তাঁহাকে সমস্তদিন উপবাসী থাকিতে হইত। এক দিন ক্ষুধার জ্বালায় তাঁহার যথাসর্বস্ব একখানি পিতলের থালা ও একটি ছোটো ঘটি কাঁসারির দোকানে বেচিতে গিয়াছিলেন। কাঁসারিরা তাহার পাঁচসিকা দর স্থির করিয়াছিল, কিন্তু কিনিতে সম্মত হইল না; বলিল, অজানিত লোকের নিকট হইতে পুরানো বাসন কিনিয়া মাঝে মাঝে বড়ো ফেসাদে পড়িতে হয়।[১]

আর একদিন ক্ষুধার যন্ত্রণা ভুলিবার অভিপ্রায়ে মধ্যাহ্নে ঠাকুরদাস বাসা হইতে বাহির হইয়া পথে পথে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

> বড়বাজার হইতে ঠন্ঠনিয়া পর্যন্ত গিয়া এত অভিভূত হইলেন যে, আর তাঁর চলিবার ক্ষমতা রহিল না। কিঞ্চিৎ পরেই তিনি এক দোকানের সম্মুখে উপস্থিত ও দণ্ডায়মান হইলেন; দেখিলেন এক মধ্যবয়স্কা বিধবা নারী ঐ দোকানে বসিয়া মুড়িমুড়কি বেচিতেছেন। তাঁহাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া ঐ স্ত্রীলোক জিজ্ঞাসা করিলেন, বাপাঠাকুর, দাঁড়াইয়া আছ কেন। ঠাকুরদাস তৃষ্ণার উল্লেখ করিয়া পানার্থে জল প্রার্থনা করিলেন। তিনি, সাদর ও সস্নেহ বাক্যে ঠাকুরদাসকে বসিতে বলিলেন এবং ব্রাহ্মণের ছেলেকে শুধু জল দেওয়া অবিধেয়, এই বিবেচনা করিয়া কিছু মুড়কি ও জল দিলেন। ঠাকুরদাস যেরূপ ব্যগ্র হইয়া মুড়কিগুলি খাইলেন তাহা একদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়া ঐ স্ত্রীলোক জিজ্ঞাসা করিলেন, বাপাঠাকুর, আজ বুঝি তোমার খাওয়া হয় নাই। তিনি বলিলেন, না মা, আজ আমি এখন পর্যন্ত কিছুই খাই নাই। তখন সেই স্ত্রীলোক ঠাকুরদাসকে বলিলেন, বাপাঠাকুর, জল খাইয়ো না, একটু অপেক্ষা করো। এই বলিয়া নিকটবর্তী গোয়ালার দোকান হইতে সত্বর দই কিনিয়া আনিলেন, এবং আরও মুড়কি দিয়া ঠাকুরদাসকে পেট ভরিয়া ফলার করাইলেন; পরে তাঁহার মুখে সবিশেষ সমস্ত অবগত হইয়া জিদ করিয়া বলিয়া দিলেন, যেদিন তোমার এরূপ ঘটিবেক, এখানে আসিয়া ফলার করিয়া যাইবে।[১]

এইরূপ কষ্টে কিছু ইংরাজি শিখিয়া ঠাকুরদাস প্রথমে মাসিক দুই টাকা ও তাহার দুই-তিন বৎসর পরে মাসিক পাঁচ টাকা বেতন উপার্জন করিতে লাগিলেন। অবশেষে জননী দুর্গাদেবী যখন শুনিলেন তাঁহার ঠাকুরদাসের মাসিক আট টাকা মাহিনা হইয়াছে তখন তাঁহার আহ্লাদের সীমা রহিল না এবং ঠাকুরদাসের সেই তেইশ-চব্বিশ বৎসর বয়সে গোঘাটনিবাসী রামকান্ত তর্কবাগীশের দ্বিতীয়া কন্যা ভগবতী দেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ দিলেন।

বঙ্গদেশের সৌভাগ্যক্রমে এই ভগবতী দেবী এক অসামান্যা রমণী ছিলেন। শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের রচিত বিদ্যাসাগর-গ্রন্থে লিথোগ্রাফ-পটে এই দেবীমূর্তি প্রকাশিত হইয়াছে। অধিকাংশ প্রতিমূর্তিই অধিকক্ষণ দেখিবার দরকার হয় না, তাহা যেন মুহূর্তকালের মধ্যেই নিঃশেষিত হইয়া যায়। তাহা নিপুণ হইতে পারে, সুন্দর হইতে পারে, তথাপি তাহার মধ্যে চিত্তনিবেশের যথোচিত স্থান পাওয়া যায় না, চিত্রপটের উপরিতলেই দৃষ্টির প্রসার পর্যবসিত হইয়া যায়। কিন্তু ভগবতী দেবীর এই পবিত্র মুখশ্রীর গভীরতা এবং উদারতা বহুক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়াও শেষ করিতে পারা যায় না। উন্নত ললাটে তাঁহার বুদ্ধির প্রসার, সুদূরদর্শী স্নেহবর্ষী আয়ত নেত্র, সরল সুগঠিত নাসিকা, দয়াপূর্ণ ওষ্ঠাধর, দৃঢ়তাপূর্ণ চিবুক, এবং সমস্ত মুখের একটি মহিমময় সুসংযত সৌন্দর্য দর্শকের হৃদয়কে বহু দূরে এবং বহু ঊর্ধ্বে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যায়— এবং ইহাও বুঝিতে পারি, ভক্তিবৃত্তির চরিতার্থতা-সাধনের জন্য কেন বিদ্যাসাগরকে

এই মাতৃদেবী ব্যতীত কোনো পৌরাণিক দেবীপ্রতিমার মন্দিরে প্রবেশ করিতে হয় নাই।

ভগবতী দেবীর অকুণ্ঠিত দয়া তাঁহার গ্রাম, পল্লী, প্রতিবেশকে নিয়ত অভিষিক্ত করিয়া রাখিত। রোগার্তের সেবা, ক্ষুধার্তকে অন্নদান এবং শোকাতুরের দুঃখে শোক প্রকাশ করা তাঁহার নিত্যনিয়মিত কার্য ছিল। অগ্নিদাহে বীরসিংহগ্রামের বাসস্থান ভস্মীভূত হইয়া গেলে বিদ্যাসাগর যখন তাঁহার জননীদেবীকে কলিকাতায় লইয়া যাইবার চেষ্টা করেন, তিনি বলিলেন, 'যে-সকল দরিদ্র লোকের সন্তানগণ এখানে ভোজন করিয়া বীরসিংহবিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করে, আমি এ স্থান পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে প্রস্থান করিলে তাহারা কী খাইয়া স্কুলে অধ্যয়ন করিবে?'[২]

দয়াবৃত্তি আরও অনেক রমণীর মধ্যে দেখা যায়, কিন্তু ভগবতী দেবীর দয়ার মধ্যে একটি অসাধারণত্ব ছিল, তাহা কোনোপ্রকার সংকীর্ণ সংস্কারের দ্বারা বদ্ধ ছিল না। সাধারণ লোকের দয়া দিয়াশলাই-শলাকার মতো কেবল বিশেষরূপ সংঘর্ষেই জ্বলিয়া উঠে এবং তাহা অভ্যাস ও লোকাচারের ক্ষুদ্র বাক্সের মধ্যেই বদ্ধ। কিন্তু ভগবতী দেবীর হৃদয় সূর্যের ন্যায় আপনার বুদ্ধি-উজ্জ্বল দয়ারশ্মি স্বভাবতই চতুর্দিকে বিকীর্ণ করিয়া দিত, শাস্ত্র বা প্রথা-সংঘর্ষের অপেক্ষা করিত না। বিদ্যাসাগরের তৃতীয় সহোদর শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় তাঁহার ভ্রাতার জীবন-চরিতে লিখিয়াছেন যে, একবার বিদ্যাসাগর তাঁহার জননীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'বৎসরের মধ্যে একদিন পূজা করিয়া ছয় সাত শত টাকা বৃথা ব্যয় করা ভালো, কি গ্রামের নিরুপায় অনাথ লোকদিগকে ঐ টাকা অবস্থানুসারে মাসে মাসে কিছু কিছু সাহায্য করা ভালো?' ইহা শুনিয়া জননীদেবী উত্তর করেন, 'গ্রামের দরিদ্র নিরুপায় লোক প্রত্যহ খাইতে পাইলে পূজা করিবার আবশ্যক নাই।' এ কথাটি সহজ কথা নহে। তাঁহার নির্মল বুদ্ধি এবং উজ্জ্বল দয়া, প্রাচীন সংস্কারের মোহাবরণ যে এমন অনায়াসে বর্জন করিতে পারে, ইহা আমার নিকট বড়ো বিস্ময়কর বোধ হয়। লৌকিক প্রথার বন্ধন রমণীর কাছে যেমন দৃঢ়, এমন আর কার কাছে। অথচ কী আশ্চর্য, স্বাভাবিক চিত্তশক্তির দ্বারা তিনি জড়তাময় প্রথাভিত্তি ভেদ করিয়া নিত্যজ্যোতির্ময় অনন্ত বিশ্বধর্মাকাশের মধ্যে উত্তীর্ণ হইলেন। এ কথা তাঁহার কাছে এত সহজ বোধ হইল কী করিয়া যে, মনুষ্যের সেবাই যথার্থ দেবতার পূজা। তাহার কারণ, সকল সংহিতা অপেক্ষা প্রাচীনতম সংহিতা তাঁহার হৃদয়ের মধ্যে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত ছিল।

সিবিলিয়ান হ্যারিসন সাহেব যখন কার্যোপলক্ষে মেদিনীপুর জেলায় গমন করেন তখন ভগবতী দেবী তাঁহাকে স্বনামে পত্র পাঠাইয়া বাড়িতে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছিলেন; তৎসম্বন্ধে তাঁহার তৃতীয় পুত্র শম্ভুচন্দ্র নিম্নলিখিত বর্ণনা প্রকাশ করিয়াছেন—

> জননীদেবী সাহেবের ভোজনসময়ে উপস্থিত থাকিয়া তাঁহাকে ভোজন করাইয়াছিলেন। তাহাতে সাহেব আশ্চর্যান্বিত হইয়াছিলেন যে, অতি বৃদ্ধা হিন্দুস্ত্রীলোক সাহেবের ভোজন-সময়ে চিয়ারে উপবিষ্টা হইয়া কথাবার্তা কহিতে প্রবৃত্ত হইলেন।... সাহেব হিন্দুর মতো জননীকে ভূমিষ্ঠ হইয়া মাতৃভাবে অভিবাদন করেন। তদনন্তর নানা বিষয়ের কথাবার্তা হইল। জননীদেবী প্রবীণ হিন্দুস্ত্রীলোক, তথাপি তাঁহার স্বভাব অতি উদার, মন অতিশয় উন্নত, এবং মনে কিছুমাত্র কুসংস্কার নাই। কি ধনশালী কি দরিদ্র, কি বিদ্বান্ কি মূর্খ, কি উচ্চজাতীয় কি নীচজাতীয়, কি পুরুষ কি স্ত্রী, কি হিন্দুধর্মাবলম্বী কি অন্যধর্মাবলম্বী, সকলেরই প্রতি সমদৃষ্টি।[২]

শম্ভুচন্দ্র অন্যত্র লিখিতেছেন—

> ১২৬৬ সাল হইতে ৭২ সাল পর্যন্ত ক্রমিক বিস্তর বিধবা কামিনীর বিবাহকার্য সমাধা হয়। ঐ-সকল বিবাহিত লোককে বিপদ হইতে রক্ষার জন্য অগ্রজমহাশয় বিশেষরূপে যত্নবান ছিলেন। উহাদিগকে মধ্যে মধ্যে আপন দেশস্থ ভবনে আনাইতেন। বিবাহিতা ঐ-সকল স্ত্রীলোককে যদি কেহ ঘৃণা করে এ-কারণে জননীদেবী ঐ-সকল বিবাহিতা ব্রাহ্মণজাতীয়া স্ত্রীলোকের সহিত একত্র এক পাত্রে ভোজন করিতেন।[2]

অথচ তখন বিধবাবিবাহের আন্দোলনে দেশের পুরুষেরা বিদ্যাসাগরের প্রাণসংহারের জন্য গোপনে আয়োজন করিতেছিল, এবং দেশের পণ্ডিতবর্গ শাস্ত্র মন্থন করিয়া কুযুক্তি এবং ভাষা মন্থন করিয়া কটূক্তি বিদ্যাসাগরের মস্তকের উপর বর্ষণ করিতেছিলেন। আর, এই রমণীকে কোনো শাস্ত্রের কোনো শ্লোক খুঁজিতে হয় নাই; বিধাতার স্বহস্তলিখিত শাস্ত্র তাঁহার হৃদয়ের মধ্যে রাত্রিদিন উদ্‌ঘাটিত ছিল। অভিমন্যু জননী-জঠরে থাকিতে যুদ্ধবিদ্যা শিখিয়াছিলেন, বিদ্যাসাগরও বিধিলিখিত সেই মহাশাস্ত্র মাতৃগর্ভবাসকালেই অধ্যয়ন করিয়া আসিয়াছিলেন।

আশঙ্কা করিতেছি, সমালোচক মহাশয়েরা মনে করিতে পারেন যে, বিদ্যাসাগর-সম্বন্ধীয় ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাঁহার জননী সম্বন্ধে এতখানি আলোচনা কিছু পরিমাণবহির্ভূত হইয়া পড়িতেছে। কিন্তু এ কথা তাঁহারা স্থির জানিবেন, এখানে জননীর চরিতে এবং পুত্রের চরিতে বিশেষ প্রভেদ নাই, তাঁহারা যেন পরস্পরের পুনরাবৃত্তি। তাহা ছাড়া, মহাপুরুষের ইতিহাস বাহিরের নানা কার্যে এবং জীবনবৃত্তান্তে স্থায়ী হয়, আর মহৎ নারীর ইতিহাস তাঁহার পুত্রের চরিত্রে, তাঁহার স্বামীর কার্যে রচিত হইতে থাকে— এবং সে লেখায় তাঁহার নামোল্লেখ থাকে না। অতএব, বিদ্যাসাগরের জীবনে তাঁহার মাতার জীবনচরিত কেমন করিয়া লিখিত হইয়াছে, তাহা ভালোরূপে আলোচনা না করিলে উভয়েরই জীবনী অসম্পূর্ণ থাকে। আর আমরা যে মহাত্মার স্মৃতিপ্রতিমাপূজার জন্য এখানে সমবেত হইয়াছি, যদি তিনি কোনোরূপ সূক্ষ্ম চিন্ময় দেহে অদ্য এই সভায় আসন গ্রহণ করিয়া থাকেন, এবং যদি এই অযোগ্যভক্তকর্তৃক তাঁহার চরিত-কীর্তন তাঁহার শ্রুতিগোচর হয়, তবে এই রচনার যে অংশে তাঁহার জীবনী অবলম্বন করিয়া তাঁহার মাতৃদেবীর মাহাত্ম্য মহীয়ান হইয়াছে, সেইখানেই তাঁহার দিব্যনেত্র হইতে প্রভূততম পুণ্যাশ্রুবর্ষণ হইতে থাকিবে তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই।

বিদ্যাসাগর তাঁহার বর্ণপরিচয় প্রথম-ভাগে গোপাল-নামক একটি সুবোধ ছেলের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, তাহাকে বাপ-মায়ে যাহা বলে সে তাহাই করে। কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র নিজে যখন সেই গোপালের বয়সী ছিলেন তখন গোপালের অপেক্ষা কোনো কোনো অংশে রাখালের সঙ্গেই তাঁহার অধিকতর সাদৃশ্য দেখা যাইত। পিতার কথা পালন করা দূরে থাক্, পিতা যাহা বলিতেন তিনি ঠিক তাহার উল্‌টা করিয়া বসিতেন। শম্ভুচন্দ্র লিখিয়াছেন—

> পিতা তাঁহার স্বভাব বুঝিয়া চলিতেন। যেদিন সাদা বস্ত্র না থাকিত সেদিন বলিতেন, আজ ভালো কাপড় পরিয়া কালেজে যাইতে হইবে। তিনি হঠাৎ বলিতেন, না, আজ ময়লা কাপড় পরিয়া যাইব। যেদিন বলিতেন, আজ স্নান করিতে হইবে, শ্রবণমাত্র দাদা বলিতেন যে, আজ স্নান করিব না; পিতা প্রহার করিয়াও স্নান করাইতে পারিতেন না। সঙ্গে করিয়া ট্যাকশালের ঘাটে নামাইয়া দিলেও দাঁড়াইয়া থাকিতেন। পিতা চড় চাপড় মারিয়া জোর করিয়া স্নান করাইতেন।[2]

পাঁচ-ছয় বৎসর বয়সের সময় যখন গ্রামের পাঠশালায় পড়িতে যাইতেন তখন

প্রতিবেশী মথুরমণ্ডলের স্ত্রীকে রাগাইয়া দিবার জন্য যে প্রকার সভ্যবিগর্হিত উপদ্রব তিনি করিতেন, বর্ণপরিচয়ের সর্বজননিন্দিত রাখাল বেচারাও বোধ করি এমন কাজ কখনও করে নাই।

নিরীহ বাংলাদেশে গোপালের মতো সুবোধ ছেলের অভাব নাই। এই ক্ষীণতেজ দেশে রাখাল এবং তাহার জীবনীলেখক ঈশ্বরচন্দ্রের মতো দুর্দান্ত ছেলের প্রাদুর্ভাব হইলে বাঙালিজাতির শীর্ণচরিত্রের অপবাদ ঘুচিয়া যাইতে পারে। সুবোধ ছেলেগুলি পাস করিয়া ভালো চাকরি-বাকরি ও বিবাহকালে প্রচুর পণ লাভ করে সন্দেহ নাই, কিন্তু দুষ্ট অবাধ্য অশান্ত ছেলেগুলির কাছে স্বদেশের জন্য অনেক আশা করা যায়। বহুকাল পূর্বে একদা নবদ্বীপের শচীমাতার এক প্রবল দুরন্ত ছেলে এই আশা পূর্ণ করিয়াছিলেন।

কিন্তু একটা বিষয়ে রাখালের সহিত তাহার জীবনচরিত-লেখকের সাদৃশ্য ছিল না। রাখাল পড়িতে যাইবার সময় পথে খেলা করে, মিছামিছি দেরি করিয়া সকলের শেষে পাঠশালায় যায়। কিন্তু পড়াশুনায় বালক ঈশ্বরচন্দ্রের কিছুমাত্র শৈথিল্য ছিল না। যে প্রবল জিদের সহিত তিনি পিতার আদেশ ও নিষেধের বিপরীত কাজ করিতে প্রবৃত্ত হইতেন, সেই দুর্দম জিদের সহিত তিনি পড়িতে যাইতেন। সেও তাঁহার প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে নিজের জিদ-রক্ষা। ক্ষুদ্র একগুঁয়ে ছেলেটি মাথায় এক মস্ত ছাতা তুলিয়া তাঁহাদের বড়োবাজারের বাসা হইতে পটলডাঙায় সংস্কৃতকালেজে যাত্রা করিতেন, লোকে মনে করিত একটা ছাতা চলিয়া যাইতেছে। এই দুর্জয় বালকের শরীরটি খর্ব, শীর্ণ, মাথাটা প্রকাণ্ড—স্কুলের ছেলেরা সেইজন্য তাঁহাকে ‘যশুরে কৈ’, ও তাহার অপভ্রংশে ‘কসুরে জৈ’ বলিয়া খেপাইত; তিনি তখন তোৎলা ছিলেন, রাগিয়া কথা বলিতে পারিতেন না।[২]

এই বালক রাত্রি দশটার সময় শুইতে যাইতেন। পিতাকে বলিয়া যাইতেন, রাত্রি দুই প্রহরের সময় তাঁহাকে জাগাইয়া দিতে। পিতা আর্মানিগির্জার ঘড়িতে বারোটা বাজিলেই ঈশ্বরচন্দ্রকে জাগাইতেন, বালক অবশিষ্ট রাত্রি জাগিয়া পড়া করিতেন। ইহাও একগুঁয়ে ছেলের নিজের শরীরের প্রতি জিদ। শরীরও তাহার প্রতিশোধ তুলিতে ছাড়িত না। মাঝে মাঝে কঠিন সাংঘাতিক পীড়া হইয়াছিল, কিন্তু পীড়ার শাসনে তাঁহাকে পরাভূত করিতে পারে নাই।

ইহার উপরে গৃহকর্মও অনেক ছিল। বাসায় তাঁহার পিতা ও মধ্যমভ্রাতা ছিলেন। দাসদাসী ছিল না। ঈশ্বরচন্দ্র দুইবেলা সকলের রন্ধনাদি কার্য করিতেন। সহোদর শম্ভুচন্দ্র তাহার বর্ণনা করিয়াছেন। প্রত্যুষে নিদ্রাভঙ্গ হইলে ঈশ্বরচন্দ্র কিয়ৎক্ষণ পুস্তক আবৃত্তি করিয়া গঙ্গার ঘাটে স্নান করিয়া কাশীনাথবাবুর বাজারে বাটামাছ ও আলু-পটল-তরকারি ক্রয় করিয়া আনিতেন। বাটনা বাটিয়া উনান ধরাইয়া রন্ধন করিতেন। বাসায় তাঁহারা চারিজন খাইতেন। আহারের পর উচ্ছিষ্ট মুক্ত ও বাসন ধৌত করিয়া তবে পড়িতে যাইবার অবসর পাইতেন। পাক করিতে করিতে ও স্কুলে যাইবার সময় পথে চলিতে চলিতে পাঠানুশীলন করিতেন।

এই তো অবস্থা। এ দিকে ছুটির সময় যখন জল খাইতে যাইতেন তখন স্কুলের ছাত্র যাহারা উপস্থিত থাকিত, তাহাদিগকে মিষ্টান্ন খাওয়াইতেন। স্কুল হইতে মাসিক যে বৃত্তি পাইতেন, ইহাতেই তাহা ব্যয় হইত। আবার, দরোয়ানের নিকট ধার করিয়া দরিদ্র ছাত্রদিগকে নূতন বস্ত্র কিনিয়া দিতেন। পূজার ছুটির পর দেশে গিয়া—

> দেশস্থ যে-সকল লোকের দিনপাত হওয়া দুষ্কর দেখিতেন তাহাদিগকে যথাসাধ্য

সাহায্য করিতে ক্ষান্ত থাকিতেন না। অন্যান্য লোকের পরিধেয় বস্ত্র না থাকিলে গামছা পরিধান করিয়া নিজের বস্ত্রগুলি তাহাদিগকে বিতরণ করিতেন।[২]

যে অবস্থায় মানুষ নিজের নিকট নিজে প্রধান দয়ার পাত্র, সে অবস্থায় ঈশ্বরচন্দ্র অন্যকে দয়া করিয়াছেন। তাঁহার জীবনে প্রথম হইতে ইহাই দেখা যায় যে, তাঁহার চরিত্র সমস্ত প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে ক্রমাগতই যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করিয়াছে। তাঁহার মতো অবস্থাপন্ন ছাত্রের পক্ষে বিদ্যালাভ করা পরম দুঃসাধ্য, কিন্তু এই গ্রাম্যবালক শীর্ণ খর্ব দেহ এবং প্রকান্ড মাথা লইয়া আশ্চর্য অল্পকালের মধ্যেই বিদ্যাসাগর-উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার মতো দরিদ্রাবস্থার লোকের পক্ষে দান করা, দয়া করা বড়ো কঠিন, কিন্তু তিনি যখন যে অবস্থাতেই পড়িয়াছেন, নিজের কোনোপ্রকার অসচ্ছলতায় তাঁহাকে পরের উপকার হইতে বিরত করিতে পারে নাই, এবং অনেক মহৈশ্বর্যশালী রাজা রায়বাহাদুর প্রচুর ক্ষমতা লইয়া যে উপাধি লাভ করিতে পারে নাই, এই দরিদ্র পিতার দরিদ্র সন্তান সেই 'দয়ার সাগর' নামে বঙ্গদেশে চিরদিনের জন্য বিখ্যাত হইয়া রহিলেন।

কলেজ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া বিদ্যাসাগর প্রথমে ফোর্ট্ উইলিয়ম-কলেজের প্রধান পণ্ডিত ও পরে সংস্কৃত কলেজের অ্যাসিস্টাণ্ট্ সেক্রেটারির পদে নিযুক্ত হন। এই কার্যোপলক্ষে তিনি যে-সকল ইংরাজ প্রধান কর্মচারীদের সংস্রবে আসিয়াছিলেন, সকলেরই পরম শ্রদ্ধা ও প্রীতি-ভাজন হইয়াছিলেন। আমাদের দেশে প্রায় অনেকেই নিজের এবং স্বদেশের মর্যাদা নষ্ট করিয়া ইংরাজের অনুগ্রহ লাভ করেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর সাহেবের হস্ত হইতে শিরোপা লইবার জন্য কখনও মাথা নত করেন নাই; তিনি আমাদের দেশের ইংরাজপ্রসাদগর্বিত সাহেবানুজীবীদের মতো আত্মাবমাননার মূল্যে বিক্রীত সম্মান ক্রয় করিতে চেষ্টা করেন নাই। একটা উদাহরণে তাহার প্রমাণ হইবে।—একবার তিনি কার্যোপলক্ষে হিন্দুকলেজের প্রিন্সিপল্ কার্-সাহেবের সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলেন। সভ্যতাভিমানী সাহেব তাঁহার বুট-বেষ্টিত দুই পা টেবিলের উপরে ঊর্ধ্বগামী করিয়া দিয়া বাঙালি ভদ্রলোকের সহিত ভদ্রতারক্ষা করা বাহুল্য বোধ করিয়াছিলেন। কিছুদিন পরে ঐ কার্-সাহেব কার্যবশত সংস্কৃতকলেজে বিদ্যাসাগরের সহিত দেখা করিতে আসিলে বিদ্যাসাগর চটিজুতা-সমেত তাঁহার সর্বজনবন্দনীয় চরণযুগল টেবিলের উপর প্রসারিত করিয়া এই অহংকৃত ইংরেজ অভ্যাগতের সহিত আলাপ করিলেন। বোধ করি শুনিয়া কেহ বিস্মিত হইবেন না, সাহেব নিজের এই অবিকল অনুকরণ দেখিয়া সন্তোষলাভ করেন নাই।

ইতিমধ্যে কলেজের কার্যপ্রণালীসম্বন্ধে তাঁহার সহিত কর্তৃপক্ষের মতান্তর হওয়ায় ঈশ্বরচন্দ্র কর্মত্যাগ করিলেন। সম্পাদক রসময় দত্ত এবং শিক্ষাসমাজের অধ্যক্ষ ময়েট্-সাহেব অনেক উপরোধ-অনুরোধ করিয়াও কিছুতেই তাঁহার পণ ভঙ্গ করিতে পারিলেন না। আত্মীয়-বান্ধবেরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'তোমার চলিবে কী করিয়া।' তিনি বলিলেন, 'আলুপটল বেচিয়া, মুদির দোকান করিয়া দিন চালাইব।' তখন বাসায় প্রায় কুড়িটি বালককে তিনি অন্নবস্ত্র দিয়া অধ্যয়ন করাইতেছিলেন—তাহাদের কাহাকেও বিদায় করিলেন না। তাঁহার পিতা পূর্বে চাকরি করিতেন—বিদ্যাসাগরের সবিশেষ অনুরোধে কার্যত্যাগ করিয়া বাড়ি বসিয়া সংসার-খরচের টাকা পাইতেছিলেন। বিদ্যাসাগর কাজ ছাড়িয়া দিয়া প্রতিমাসে ধার করিয়া পঞ্চাশ টাকা বাড়ি পাঠাইতে লাগিলেন। এই সময় ময়েট্-সাহেবের অনুরোধে বিদ্যাসাগর কাপ্তেন ব্যাঙ্ক্-নামক একজন ইংরেজকে কয়েকমাস বাংলা

ও হিন্দি শিখাইতেন। সাহেব যখন মাসিক পঞ্চাশ টাকা হিসাবে বেতন দিতে গেলেন, তিনি বলিলেন, "আপনি ময়েট্-সাহেবের বন্ধু এবং ময়েট্-সাহেব আমার বন্ধু— আপনার কাছে আমি বেতন লইতে পারি না।"

১৮৫০ খৃস্টাব্দে বিদ্যাসাগর সংস্কৃতকলেজের সাহিত্য-অধ্যাপক ও ১৮৫১ খৃস্টাব্দে উক্ত কলেজের প্রিন্সিপল-পদে নিযুক্ত হন। আট-বৎসর দক্ষতার সহিত কাজ করিয়া শিক্ষাবিভাগের নবীন কর্তা এক তরুণ সিবিলিয়ানের সহিত মনান্তর হইতে থাকায় ১৮৫৮ খৃস্টাব্দে তিনি কর্মত্যাগ করেন। বিদ্যাসাগর স্বভাবতই সম্পূর্ণ স্বাধীনতন্ত্রের লোক ছিলেন। অব্যাহতভাবে আপন ইচ্ছা চালনা করিতে পাইলে তবে তিনি কাজ করিতে পারিতেন। উপরিতন কর্তৃপক্ষের মতের দ্বারা কোনোরূপ প্রতিঘাত প্রাপ্ত হইলে তদনুসারে আপন সংকল্পের প্রবাহ তিলমাত্র পরিবর্তন করিতে পারিতেন না। কর্মনীতির নিয়মে ইহা তাঁহার পক্ষে প্রশংসনীয় ছিল না। কিন্তু বিধাতা তাঁহাকে একাধিপত্য করিবার জন্য পাঠাইয়াছিলেন, অধীনে কাজ চালাইবার গুণগুলি তাঁহাকে দেন নাই। উপযুক্ত অধীনস্থ কর্মচারী বাংলাদেশে যথেষ্ট আছে, বিদ্যাসাগরকে দিয়া তাহাদের সংখ্যাবৃদ্ধি করা বিধাতা অনাবশ্যক ও অসংগত বোধ করিয়াছিলেন।

বিদ্যাসাগর যখন সংস্কৃতকলেজে নিযুক্ত তখন কলেজের কাজকর্মের মধ্যে থাকিয়াও এক প্রচণ্ড সমাজসংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। একদিন বীরসিংহবাটীর চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া ঈশ্বরচন্দ্র তাঁহার পিতার সহিত বীরসিংহস্কুল সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলেন, এমন সময় তাঁহার মাতা রোদন করিতে করিতে চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়া একটি বালিকার বৈধব্য সংঘটনের উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "তুই এতদিন এত শাস্ত্র পড়িলি, তাহাতে বিধবার কি কোনো উপায় নাই।"[১] মাতার পুত্র উপায়-অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন।

স্ত্রীজাতির প্রতি বিদ্যাসাগরের বিশেষ স্নেহ অথচ ভক্তি ছিল। ইহাও তাঁহার সুমহৎ পৌরুষের একটি প্রধান লক্ষণ। সাধারণত আমরা স্ত্রীজাতির প্রতি ঈর্ষাবিশিষ্ট; অবলা স্ত্রীলোকের সুখ স্বাস্থ্য স্বচ্ছন্দতা আমাদের নিকট পরম পরিহাসের বিষয়, প্রহসনের উপকরণ। আমাদের ক্ষুদ্রতা ও কাপুরুষতার অন্যান্য লক্ষণের মধ্যে ইহাও একটি।

বিদ্যাসাগর শৈশবে জগদ্দুর্লভবাবুর বাসায় আশ্রয় পাইয়াছিলেন। জগদ্দুর্লভের কনিষ্ঠা ভগিনী রাইমণির সম্বন্ধে তিনি স্বরচিত জীবনবৃত্তান্তে যাহা লিখিয়াছেন তাহা এ স্থলে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে।

> রাইমণির অদ্ভুত স্নেহ ও যত্ন আমি কস্মিনকালেও বিস্মৃত হইতে পারিব না। তাঁহার একমাত্র পুত্র গোপালচন্দ্র ঘোষ আমার প্রায় সমবয়স্ক ছিলেন। পুত্রের উপর জননীর যেরূপ স্নেহ ও যত্ন থাকা উচিত ও আবশ্যক, গোপালচন্দ্রের উপর রাইমণির স্নেহ ও যত্ন তদপেক্ষা অধিকতর ছিল, তাহার সংশয় নাই। কিন্তু আমার আন্তরিক দৃঢ়বিশ্বাস এই যে, স্নেহ ও যত্ন বিষয়ে আমায় ও গোপালে রাইমণির অণুমাত্র বিভিন্নভাব ছিল না। ফলকথা, এই স্নেহ, দয়া, সৌজন্য, অমায়িকতা, সদ্‌বিবেচনা প্রভৃতি সদ্‌গুণবিষয়ে রাইমণির সমকক্ষ স্ত্রীলোক এ পর্যন্ত আমার নয়নগোচর হয় নাই। এই দয়াময়ীর সৌম্যমূর্তি আমার হৃদয়মন্দিরে দেবীমূর্তির ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া বিরাজমান রহিয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে তাঁহার কথা উত্থাপিত হইলে তদীয় অপ্রতিমগুণের কীর্তন করিতে করিতে অশ্রুপাত না করিয়া থাকিতে পারি না। আমি স্ত্রীজাতির পক্ষপাতী বলিয়া অনেকে নির্দেশ করিয়া থাকেন। আমার বোধ হয়, সে নির্দেশ অসংগত নহে। যে ব্যক্তি রাইমণির স্নেহ, দয়া, সৌজন্য, প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করিয়াছে এবং ঐ-সমস্ত সদ্‌গুণের ফলভোগী

হইয়াছে, সে যদি স্ত্রীজাতির পক্ষপাতী না হয় তাহা হইলে তাহার তুল্য কৃতঘ্ন পামর ভূমণ্ডলে নাই।

স্ত্রীজাতির স্নেহ-দয়া-সৌজন্য হইতে বঞ্চিত হইয়াছে, আমাদের মধ্যে এমন হতভাগ্য কয়জন আছে। কিন্তু ক্ষুদ্রহৃদয়ের স্বভাব এই যে, সে যে পরিমাণে অযাচিত উপকার প্রাপ্ত হয় সেই পরিমাণে অকৃতজ্ঞ হইয়া উঠে। যাহা-কিছু সহজেই পায় তাহাই আপনার প্রাপ্য বলিয়া জানে; নিজের দিক হইতে যে কিছুমাত্র দেয় আছে তাহা সহজেই ভুলিয়া যায়। আমরাও সংসারে মাঝে মাঝে রাইমণিকে দেখিতে পাই; এবং তিনি যখন সেবা করিতে আসেন তখন তাঁহার সমস্ত যত্ন এবং প্রীতি অবহেলাভরে গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে পরম অনুগ্রহ করিয়া থাকি; তিনি যখন চরণপূজা করিতে আসেন তখন আপন পঙ্ককলঙ্কিত পদযুগল অসংকোচে প্রসারিত করিয়া দিয়া অত্যন্ত নির্লজ্জ স্পর্ধাভরে সত্যসত্যই আপনাদিগকে নরদেবতারূপে নারীসম্প্রদায়ের পূজাগ্রহণের অধিকারী বলিয়া জ্ঞান করি। কিন্তু এই-সকল সেবক-পূজক অবলাগণের দুঃখমোচন এবং সুখস্বাস্থ্যবিধানে আমাদের মতো মর্ত্যদেবগণের সুমহৎ ঔদাসীন্য কিছুতেই দূর হয় না; তাহার কারণ, নারীদের কৃত সেবা কেবল আমরা আমাদের সাংসারিক স্বার্থসুখের সহিত জড়িত করিয়া দেখি, তাহা আমাদের হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কৃতজ্ঞতা উদ্রেক করিবার অবকাশ পায় না।

বিদ্যাসাগর প্রথমত বেথুন-সাহেবের সহায়তা করিয়া বঙ্গদেশে স্ত্রীশিক্ষার সূচনা ও বিস্তার করিয়া দেন। অবশেষে যখন তিনি বালবিধবাদের দুঃখে ব্যথিত হইয়া বিধবাবিবাহ-প্রচলনের চেষ্টা করেন তখন দেশের মধ্যে সংস্কৃত শ্লোক ও বাংলা গালি-মিশ্রিত এক তুমুল কলকোলাহল উত্থিত হইল। সেই মুষলধারে শাস্ত্র ও গালি-বর্ষণের মধ্যে এই ব্রাহ্মণবীর বিজয়ী হইয়া বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত প্রমাণ করিলেন এবং তাহা রাজবিধিসম্মত করিয়া লইলেন।

বিদ্যাসাগর এই সময়ে আরো একটি ক্ষুদ্র সামাজিক যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলেন, এ স্থলে তাহারও সংক্ষেপে উল্লেখ আবশ্যক। তখন সংস্কৃতকলেজে কেবল ব্রাহ্মণেরই প্রবেশ ছিল, সেখানে শূদ্রেরা সংস্কৃত পড়িতে পাইত না। বিদ্যাসাগর সকল বাধা অতিক্রম করিয়া শূদ্রদিগকে সংস্কৃতকলেজে বিদ্যাশিক্ষার অধিকার দান করেন।

সংস্কৃতকলেজের কর্ম ছাড়িয়া দিবার পর বিদ্যাসাগরের প্রধানকীর্তি মেট্রোপলিটন ইন্‌স্টিট্যুশন্‌। বাঙালির নিজের চেষ্টায় এবং নিজের অধীনে উচ্চতর শিক্ষার কলেজ স্থাপন এই প্রথম। আমাদের দেশে ইংরাজিশিক্ষাকে স্বাধীনভাবে স্থায়ী করিবার এই প্রথম ভিত্তি বিদ্যাসাগর-কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইল। যিনি দরিদ্র ছিলেন তিনি দেশের প্রধান দাতা হইলেন; যিনি লোকাচাররক্ষক ব্রাহ্মণপণ্ডিতের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তিনি লোকাচারের একটি সুদৃঢ় বন্ধন হইতে সমাজকে মুক্ত করিবার জন্য সুকঠোর সংগ্রাম করিলেন—এবং সংস্কৃতবিদ্যায় যাঁহার অধিকারের ইয়ত্তা ছিল না তিনিই ইংরাজিবিদ্যাকে প্রকৃতপ্রস্তাবে স্বদেশের ক্ষেত্রে বদ্ধমূল করিয়া রোপণ করিয়া গেলেন।

বিদ্যাসাগর তাঁহার জীবনের অবশিষ্টকাল এই স্কুল ও কলেজটিকে একাগ্রচিত্তে প্রাণাধিক যত্নে পালন করিয়া, দীনদরিদ্র রোগীর সেবা করিয়া, অকৃতজ্ঞদিগকে মার্জনা করিয়া, বন্ধুবান্ধবদিগকে অপরিমেয় স্নেহে অভিষিক্ত করিয়া, আপন পুষ্পকোমল এবং বজ্রকঠিন বক্ষে দুঃসহ বেদনাশল্য বহন করিয়া, আপন আত্ম-

নির্ভরপর উন্নত বলিষ্ঠ চরিত্রের মহান্‌ আদর্শ বাঙালিজাতির মনে চিরাঙ্কিত করিয়া দিয়া ১২৯৮ সালের ১৩ই শ্রাবণ রাত্রে ইহলোক হইতে অপসৃত হইয়া গেলেন।

বিদ্যাসাগর বঙ্গদেশে তাঁহার অক্ষয় দয়ার জন্য বিখ্যাত। কারণ, দয়াবৃত্তি আমাদের অশ্রুপাতপ্রবণ বাঙালি-হৃদয়কে যত শীঘ্র প্রশংসায় বিচলিত করিতে পারে, এমন আর কিছুই নহে। কিন্তু বিদ্যাসাগরের দয়ায় কেবল যে বাঙালিজন-সুলভ হৃদয়ের কোমলতা প্রকাশ পায় তাহা নহে, তাহাতে বাঙালি-দুর্লভ চরিত্রের বলশালিতারও পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার দয়া কেবল একটা প্রবৃত্তির উত্তেজনামাত্র নহে, তাহার মধ্যে একটা সচেষ্ট আত্মশক্তির অচল কর্তৃত্ব সর্বদা বিরাজ করিত বলিয়াই তাহা এমন মহিমশালিনী। এ দয়া অন্যের কষ্টলাঘবের চেষ্টায় আপনাকে কঠিন কষ্টে ফেলিতে মুহূর্তকালের জন্য কুণ্ঠিত হইত না। সংস্কৃত-কলেজে কাজ করিবার সময় ব্যাকরণ-অধ্যাপকের পদ শূন্য হইলে বিদ্যাসাগর তারানাথ তর্কবাচস্পতির জন্য মার্শাল-সাহেবকে অনুরোধ করেন। সাহেব বলিলেন, তাঁহার চাকরি লইবার ইচ্ছা আছে কি না, অগ্রে জানা আবশ্যক। শুনিয়া বিদ্যাসাগর সেই দিনই ত্রিশ ক্রোশ পথ দূরে কালনায় তর্কবাচস্পতির চতুষ্পাঠি-অভিমুখে পদব্রজে যাত্রা করিলেন। পর দিনে তর্কবাচস্পতির সম্মতি ও তাঁহার প্রশংসাপত্রগুলি লইয়া পুনরায় পদব্রজে যথাসময়ে সাহেবের নিকট উপস্থিত হইলেন।[২] পরের উপকারকার্যে তিনি আপনার সমস্ত বল ও উৎসাহ প্রয়োগ করিতেন। ইহার মধ্যেও তাঁহার আজন্মকালের একটা জিদ প্রকাশ পাইত। সাধারণত আমাদের দয়ার মধ্যে এই জিদ না থাকাতে তাহা সংকীর্ণ ও স্বল্পফলপ্রসূ হইয়া বিশীর্ণ হইয়া যায়, তাহা পৌরুষমহত্ত্ব লাভ করে না।

কারণ, দয়া বিশেষরূপে স্ত্রীলোকের নহে; প্রকৃত দয়া যথার্থ পুরুষেরই ধর্ম। দয়ার বিধান পূর্ণরূপে পালন করিতে হইলে দৃঢ় বীর্য এবং কঠিন অধ্যবসায় আবশ্যক, তাহাতে অনেক সময় সুদূরব্যাপী সুদীর্ঘ কর্মপ্রণালী অনুসরণ করিয়া চলিতে হয়; তাহা কেবল ক্ষণকালের আত্মত্যাগের দ্বারা প্রবৃত্তির উচ্ছ্বাসনিবৃত্তি এবং হৃদয়ের ভারলাঘব করা নহে, তাহা দীর্ঘকাল ধরিয়া নানা উপায়ে নানা বাধা অতিক্রম করিয়া দুরূহ উদ্দেশ্য-সিদ্ধির অপেক্ষা রাখে।

একবার গবর্মেণ্টের কোনো অত্যুৎসাহী ভৃত্য জাহানাবাদ-মহকুমায় ইন্‌কম্‌-ট্যাক্স্‌ ধার্যের জন্য উপস্থিত হন। আয়ের স্বল্পতাপ্রযুক্ত যে-সকল ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ইন্‌কম্‌ট্যাক্সের অধীনে না আসিতে পারে, গবর্মেণ্টের এই সুচতুর শিকারী তাহাদের দুই-তিন জনের নাম একত্র করিয়া ট্যাক্সের জালে বদ্ধ করিতেছিলেন। বিদ্যাসাগর ইহা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ খড়ার গ্রামে অ্যাসেসর-বাবুর নিকট আসিয়া আপত্তি প্রকাশ করেন। বাবুটি তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া অভিযোগকারীদিগকে ধমক দিয়া বাধ্য করিলেন। বিদ্যাসাগর তৎক্ষণাৎ কলিকাতায় আসিয়া লেফ্‌টেনেণ্ট্‌ গবর্নরের নিকট বাদী হইলেন। লেফ্‌টেনেণ্ট্‌ গবর্নর বর্ধমানের কালেক্টর হ্যারিসন-সাহেবকে তদন্ত-জন্য প্রেরণ করেন। বিদ্যাসাগর হ্যারিসনের সঙ্গে গ্রামে গ্রামে ব্যবসায়ীদের খাতাপত্র পরীক্ষা করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। এইরূপে দুই-মাস-কাল অনন্যমনা ও অনন্যকর্মা হইয়া তিনি এই অন্যায়নিবারণে কৃতকার্য হইয়াছিলেন।[২]

বিদ্যাসাগরের জীবনে এরূপ দৃষ্টান্ত আরও অনেক দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু এরূপ দৃষ্টান্ত বাংলায় অন্যত্র হইতে সংগ্রহ করা দুষ্কর। আমাদের হৃদয়

অত্যন্ত কোমল বলিয়া আমরা প্রচার করিয়া থাকি, কিন্তু আমরা কোনো ঝঞ্ঝাটে যাইতে চাহি না। এই অলস শান্তিপ্রিয়তা আমাদিগকে অনেক সময়েই স্বার্থপর নিষ্ঠুরতায় অবতীর্ণ করে। একজন জাহাজী গোরা কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া মজ্জমান ব্যক্তির পশ্চাতে জলে ঝাঁপ দিয়া পড়ে; কিন্তু একখানা নৌকা যেখানে বিপন্ন, অন্য নৌকাগুলি তাহার কিছুমাত্র সাহায্য-চেষ্টা না করিয়া চলিয়া যায়, এরূপ ঘটনা আমাদের দেশে সর্বদাই শুনিতে পাই। দয়ার সহিত বীর্যের সম্মিলন না হইলে সে দয়া অনেক স্থলেই অকিঞ্চিৎকর হইয়া থাকে।

কেবল যে সংকট এবং অধ্যবসায়ের ক্ষেত্রে আমাদের অন্তঃপুরচারিণী দয়া প্রবেশ করিতে চাহে না তাহা নহে। সামাজিক কৃত্রিম শুচিতা রক্ষার নিয়ম-লঙ্ঘনও তাহার পক্ষে দুঃসাধ্য। আমি জানি, কোনো এক গ্রাম্য মেলায় এক বিদেশী ব্রাহ্মণের মৃত্যু হইলে ঘৃণা করিয়া কেহই তাহার অন্ত্যেষ্টিসংকারের ব্যবস্থা করে নাই, অবশেষে তাহার অনুপস্থিত আত্মীয়পরিজনের অন্তরে চিরশোকশল্য নিহিত করিয়া ডোমের দ্বারা মৃতদেহ শ্মশানে শৃগালকুক্কুরের মুখে ফেলিয়া আসা হয়। আমরা অতি সহজেই 'আহা উহু' এবং অশ্রুপাত করিতে পারি, কিন্তু কর্মক্ষেত্রে পরোপকারের পথে আমরা সহস্র স্বাভাবিক এবং কৃত্রিম বাধার দ্বারা পদে পদে প্রতিহত। বিদ্যাসাগরের কারুণ্য বলিষ্ঠ—পুরুষোচিত। এইজন্য তাহা সরল এবং নির্বিকার; তাহা কোথাও সূক্ষ্মতর্ক তুলিত না, নাসিকাকুঞ্চন করিত না, বসন তুলিয়া ধরিত না; একেবারে দ্রুতপদে, ঋজুরেখায়, নিঃশঙ্কে, নিঃসংকোচে আপন কার্যে গিয়া প্রবৃত্ত হইত। রোগের বীভৎস মলিনতা তাঁহাকে কখনো রোগীর নিকট হইতে দূরে রাখে নাই। এমন-কি, (চণ্ডীচরণবাবুর গ্রন্থে লিখিত আছে) কার্মাটাড়ে এক মেথর জাতীয়া স্ত্রীলোক ওলাউঠায় আক্রান্ত হইলে বিদ্যাসাগর স্বয়ং তাহার কুটিরে উপস্থিত থাকিয়া স্বহস্তে তাহার সেবা করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। বর্ধমান-বাস-কালে তিনি তাঁহার প্রতিবেশী দরিদ্র মুসলমান-গণকে আত্মীয়নির্বিশেষে যত্ন করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় তাঁহার সহোদরের জীবনচরিতে লিখিতেছেন—

> অন্নসত্রে ভোজনকারিণী স্ত্রীলোকদের মস্তকের কেশগুলি তৈলাভাবে বিরূপ দেখাইত। অগ্রজমহাশয় তাহা অবলোকন করিয়া দুঃখিত হইয়া তৈলের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। প্রত্যেককে দুই পলা করিয়া তৈল দেওয়া হইত। যাহারা তৈলবিতরণ করিত তাহারা, পাছে মুচি হাড়ি ডোম প্রভৃতি অপকৃষ্টজাতীয় স্ত্রীলোক স্পর্শ করে এই আশঙ্কায় তফাত হইতে তৈল দিত, ইহা দেখিয়া অগ্রজমহাশয় স্বয়ং উক্ত অপকৃষ্ট ও অস্পৃশ্য জাতীয় স্ত্রীলোকদের মাথায় তৈল মাখাইয়া দিতেন।

এই ঘটনা শ্রবণে আমাদের হৃদয় যে ভক্তিতে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে তাহা বিদ্যাসাগরের দয়া অনুভব করিয়া নহে—কিন্তু তাঁহার দয়ার মধ্য হইতে যে-একটি নিঃসংকোচ বলিষ্ঠ মনুষ্যত্ব পরিস্ফুট হইয়া উঠে তাহা দেখিয়া আমাদের এই নীচজাতির প্রতি চিরাভ্যস্ত ঘৃণাপ্রবণ মনও আপন নিগূঢ় মানবধর্ম-বশত ভক্তিতে আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারে না।

তাঁহার কারুণ্যের মধ্যে যে পৌরুষের লক্ষণ ছিল তাহার অনেক উদাহরণ দেখা যায়। আমাদের দেশে আমরা যাঁহাদিগকে ভালোমানুষ অমায়িক প্রকৃতি বলিয়া প্রশংসা করি, সাধারণত তাঁহাদের চক্ষুলজ্জা বেশি। অর্থাৎ, কর্তব্যস্থলে তাঁহারা কাহাকেও বেদনা দিতে পারেন না। বিদ্যাসাগরের দয়ায় সেই কাপুরুষতা ছিল না। ঈশ্বরচন্দ্র যখন কলেজের ছাত্র ছিলেন তখন তাঁহাদের বেদান্ত-অধ্যাপক

শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতির সহিত তাঁহার বিশেষ প্রীতিবন্ধন ছিল। বাচস্পতি মহাশয় বৃদ্ধবয়সে পুনরায় দারপরিগ্রহ করিবার ইচ্ছা করিয়া তাঁহার প্রিয়তম ছাত্রের মত জিজ্ঞাসা করিলে ঈশ্বরচন্দ্র প্রবল আপত্তি প্রকাশ করিলেন। গুরু বারম্বার কাকুতিমিনতি করা সত্ত্বেও তিনি মত পরিবর্তন করিলেন না। তখন বাচস্পতি মহাশয় ঈশ্বরচন্দ্রের নিষেধে কর্ণপাত না করিয়া এক সুন্দরী বালিকাকে বিবাহপূর্বক তাহাকে আশু বৈধব্যের তটদেশে আনয়ন করিলেন। শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার 'বিদ্যাসাগর' গ্রন্থে এই ব্যাপারের যে পরিণাম বর্ণন করিয়াছেন তাহা এই স্থলে উদ্ধৃত করি—

> বাচস্পতিমহাশয় ঈশ্বরচন্দ্রের হাত ধরিয়া বলিলেন, 'তোমার মাকে দেখিয়া যাও।' এই বলিয়া দাসীকে নববধূর অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিতে বলিলেন। তখন বাচস্পতিমহাশয়ের নববিবাহিতা পত্নীকে দেখিয়া ঈশ্বরচন্দ্র অশ্রুসংবরণ করিতে পারিলেন না। সেই জননীস্থানীয়া বালিকাকে দর্শন করিয়া ও এই বালিকার পরিণাম চিন্তা করিয়া বালকের ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন। তখন বাচস্পতিমহাশয় 'অকল্যাণ করিস না রে' বলিয়া তাঁহাকে লইয়া বাহিরবাটীতে আসিলেন এবং নানাপ্রকার শাস্ত্রীয় উপদেশের দ্বারা ঈশ্বরচন্দ্রের মনের উত্তেজনা ও হৃদয়ের আবেগ রোধ করিতে ও তাহাকে শান্ত করিতে প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। এইরূপ বহুবিধ প্রবোধবাক্যে শান্ত করিতে প্রয়াস পাইয়া শেষে ঈশ্বরচন্দ্রকে কিঞ্চিৎ জল খাইতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু পাষাণতুল্যকঠিন প্রতিজ্ঞাপরায়ণ ঈশ্বরচন্দ্র জলযোগ করিতে সম্পূর্ণ অসম্মত হইয়া বলিলেন, 'এ ভিটায় আর কখনও জলস্পর্শ করিব না।'

বিদ্যাসাগরের হৃদয়বৃত্তির মধ্যে যে বলিষ্ঠতা দেখা যায়, তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তির মধ্যেও তাহার পরিপূর্ণ প্রভাব প্রকাশ পায়। বাঙালির বুদ্ধি সহজেই অত্যন্ত সূক্ষ্ম। তাহার দ্বারা চুল চেরা যায়, কিন্তু বড়ো বড়ো গ্রন্থি ছেদন করা যায় না। তাহা সুনিপুণ, কিন্তু সবল নহে। আমাদের বুদ্ধি ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ার মতো অতি সূক্ষ্ম তর্কের বাহাদুরিতে ছোটে ভালো, কিন্তু কর্মের পথে গাড়ি লইয়া চলে না। বিদ্যাসাগর যদিচ ব্রাহ্মণ, এবং ন্যায়শাস্ত্রও যথোচিত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তথাপি যাহাকে বলে কাণ্ডজ্ঞান সেটা তাঁহার যথেষ্ট ছিল। এই কাণ্ডজ্ঞানটি যদি না থাকিত তবে যিনি এক সময় ছোলা ও বাতাসা জলপান করিয়া পাঠশিক্ষা করিয়াছিলেন তিনি অকুতোভয়ে চাকরি ছাড়িয়া দিয়া, স্বাধীনজীবিকা অবলম্বন করিয়া, জীবনের মধ্যপথে সচ্ছলস্বচ্ছন্দাবস্থায় উত্তীর্ণ হইতে পারিতেন না। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, দয়ার অনুরোধে যিনি ভূরি ভূরি স্বার্থত্যাগ করিয়াছেন, যিনি স্বার্থের অনুরোধে আপন মহোচ্চ আত্মসম্মানকে মুহূর্তের জন্য তিলমাত্র অবনত হইতে দেন নাই, যিনি আপনার ন্যায়সংকল্পের ঋজুরেখা হইতে কোনো মন্ত্রণায় কোনো প্রলোভনে দক্ষিণে বামে কেশাগ্রপরিমাণ হেলিতে চাহেন নাই, তিনি কিরূপ প্রশস্তবুদ্ধি এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞার বলে সংগতিসম্পন্ন হইয়া সহস্রের আশ্রয়দাতা হইয়াছিলেন। গিরিশৃঙ্গের দেবদারুদ্রুম যেমন শুষ্ক শিলান্তরের মধ্যে অঙ্কুরিত হইয়া, প্রাণঘাতক হিমানীবৃষ্টি শিরোধার্য করিয়া, নিজের আভ্যন্তরীণ কঠিনশক্তির দ্বারা আপনাকে প্রচুর সরস-শাখাপল্লব-সম্পন্ন সরলমহিমায় অভ্রভেদী করিয়া তুলে—তেমনি এই ব্রাহ্মণতনয় জন্মদারিদ্র্য এবং সর্বপ্রকার প্রতিকূলতার মধ্যেও কেবল নিজের মজ্জাগত অপর্যাপ্তবলবুদ্ধির দ্বারা নিজেকে যেন অনায়াসেই এমন সরল, এমন প্রবল, এমন সমুন্নত, এমন সর্বসম্পৎশালী করিয়া তুলিয়াছিলেন।

মেট্রোপলিটান-বিদ্যালয়কে তিনি যে একাকী সর্বপ্রকার বিঘ্নবিপত্তি হইতে

রক্ষা করিয়া তাহাকে সগৌরবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সংযুক্ত করিয়া দিলেন— ইহাতে বিদ্যাসাগরের কেবল লোকহিতৈষা ও অধ্যবসায় নহে, তাঁহার সজাগ ও সহজ কর্মবুদ্ধি প্রকাশ পায়। এই বুদ্ধিই যথার্থ পুরুষের বুদ্ধি, এই বুদ্ধি সুদূরসম্ভবপর কাল্পনিক বাধাবিঘ্ন ও ফলাফলের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচারজালের দ্বারা আপনাকে নিরুপায় অকর্মণ্যতার মধ্যে জড়ীভূত করিয়া বসে না। এই বুদ্ধি, কেবল সূক্ষ্মভাবে নহে, প্রত্যুত প্রশস্তভাবে সমগ্রভাবে কর্ম ও কর্মক্ষেত্রের আদ্যোপান্ত দেখিয়া লইয়া, দ্বিধা বিসর্জন দিয়া মুহূর্তের মধ্যে উপস্থিত বাধার মর্মস্থল আক্রমণ করিয়া, বীরের মতো কাজ করিয়া যায়। এই সবল কর্মবুদ্ধি বাঙালির মধ্যে বিরল।

যেমন কর্মবুদ্ধি তেমনি ধর্মবুদ্ধির মধ্যেও একটা সবল কাণ্ডজ্ঞান থাকিলে তাহার দ্বারা যথার্থ কাজ পাওয়া যায়। কবি বলিয়াছেন : ধর্মস্য সূক্ষ্মা গতিঃ। ধর্মের গতি সূক্ষ্ম হইতে পারে, কিন্তু ধর্মের নীতি সরল ও প্রশস্ত। কারণ, তাহা বিশ্বসাধারণের এবং নিত্যকালের, তাহা পণ্ডিতের এবং তার্কিকের নহে। কিন্তু মনুষ্যের দুর্ভাগ্যক্রমে মানুষ আপন সংস্রবের সকল জিনিসকেই অলক্ষিতভাবে কৃত্রিম ও জটিল করিয়া তুলে। যাহা সরল, যাহা স্বাভাবিক, যাহা উন্মুক্ত উদার, যাহা মূল্য দিয়া কিনিতে হয় না, বিধাতা যাহা আলোক ও বায়ুর ন্যায় মনুষ্যসাধারণকে অযাচিত দান করিয়াছেন, মানুষ আপনি তাহাকে দুর্মূল্যদুর্গম করিয়া দেয়। সেইজন্য সহজ কথা ও সরল ভাব প্রচারের জন্য লোকোত্তর মহত্ত্বের অপেক্ষা করিতে হয়।

বিদ্যাসাগর বালবিধবাবিবাহের ঔচিত্য সম্বন্ধে যে প্রস্তাব করিয়াছেন তাহাও অত্যন্ত সহজ, তাহার মধ্যে কোনো নূতনত্বের অসামান্য নৈপুণ্য নাই। তিনি প্রত্যক্ষ ব্যাপারকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া এক অমূলক-কল্পনালোক সৃজন করিতে আপন শক্তির অপব্যয় করেন নাই। তিনি তাঁহার 'বিধবাবিবাহ' গ্রন্থে আমাদিগকে সম্বোধন করিয়া যে আক্ষেপোক্তি প্রকাশ করিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করিলেই আমার কথাটি পরিষ্কার হইবে।—

> হা ভারতবর্ষীয় মানবগণ!...অভ্যাসদোষে তোমাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্মপ্রবৃত্তিসকল এরূপ কলুষিত হইয়া গিয়াছে ও অভিভূত হইয়া রহিয়াছে যে, হতভাগা বিধবাদিগের দুরবস্থাদর্শনে, তোমাদের চিরশুষ্ক হৃদয়ে কারুণ্যরসের সঞ্চার হওয়া কঠিন, এবং ব্যভিচারদোষের ও ভ্রূণহত্যাপাপের প্রবল স্রোতে দেশ উচ্ছলিত হইতে দেখিয়াও, মনে ঘৃণার উদয় হওয়া অসম্ভাবিত। তোমরা প্রাণতুল্য কন্যা প্রভৃতিকে অসহ্য বৈধব্যযন্ত্রণানলে দগ্ধ করিতে সম্মত আছ; তাহারা দুর্নিবার রিপুবশীভূত হইয়া, ব্যভিচারদোষে দূষিত হইলে তাহার পোষকতা করিতে সম্মত আছ; ধর্মলোপভয়ে জলাঞ্জলি দিয়া কেবল লোকলজ্জাভয়ে তাহাদের ভ্রূণহত্যার সহায়তা করিয়া স্বয়ং সপরিবারে পাপপঙ্কে কলঙ্কিত হইতে সম্মত আছ; কিন্তু, কী আশ্চর্য! শাস্ত্রের বিধি অবলম্বনপূর্বক পুনরায় বিবাহ দিয়া তাহাদিগকে দুঃসহ বৈধব্যযন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ করিতে, এবং আপনাদিগকেও সকল বিপদ হইতে মুক্ত করিতে, সম্মত নহ। তোমরা মনে কর, পতিবিয়োগ হইলেই স্ত্রীজাতির শরীর পাষাণময় হইয়া যায়; দুঃখ আর দুঃখ বলিয়া বোধ হয় না; যন্ত্রণা আর যন্ত্রণা বলিয়া বোধ হয় না; দুর্জয় রিপুবর্গ এককালে নির্মূল হইয়া যায়। কিন্তু তোমাদের এই সিদ্ধান্ত যে নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক, পদে পদে তাহার উদাহরণ প্রাপ্ত হইতেছ। ভাবিয়া দেখ, এই অনবধানদোষে, সংসারতরুর কী বিষময় ফলভোগ করিতেছ!

রমণীর দেবীত্ব ও বালিকার ব্রহ্মচর্যমাহাত্ম্যের সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর আকাশগামী

ভাবুকতার ভূরিপরিমাণ সজল বাষ্প সৃষ্টি করিতে বসেন নাই; তিনি তাঁহার পরিষ্কার সবল বুদ্ধি ও সরল সহৃদয়তা লইয়া সমাজের যথার্থ অবস্থা ও প্রকৃত বেদনায় সকরুণ হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। কেবলমাত্র মধুর বাক্যরসে চিঁড়াকে সরস করিতে সেই চায় যাহার দধি নাই। কিন্তু বিদ্যাসাগরের দধির অভাব না থাকাতে বাক্‌পটুতার প্রয়োজন হয় নাই। দয়া আপনি দুঃখের স্থানে গিয়া আকৃষ্ট হয়। বিদ্যাসাগর স্পষ্ট দেখিতেছেন যে, প্রকৃত সংসারে বিধবা হইবামাত্র বালিকা হঠাৎ দেবী হইয়া উঠে না এবং আমরাও তাহার চতুর্দিকে নিষ্কলঙ্ক দেবলোক সৃষ্টি করিয়া বসিয়া নাই; এমন অবস্থায় সেও দুঃখ পায়, সমাজেরও রাশি রাশি অমঙ্গল ঘটে, ইহা প্রতিদিনের প্রত্যক্ষ সত্য। সেই দুঃখ সেই অকল্যাণ-নিবারণের উপযুক্ত উপায় অবলম্বন না করিয়া বিদ্যাসাগর থাকিতে পারেন না, আমরা সে স্থলে সুনিপুণ কাব্যকলা প্রয়োগপূর্বক একটা স্বকপোলকল্পিত জগতের আদর্শ-বৈধব্য কল্পনা করিয়া তৃপ্তিলাভ করি। কারণ, তাঁহার সরল ধর্মবুদ্ধিতে তিনি সহজেই যে বেদনা বোধ করিয়াছেন, আমরা সেই বেদনা যথার্থরূপে হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করি না। সেইজন্য এ সম্বন্ধে আমাদের রচনায় নৈপুণ্য প্রকাশ পায়, সরলতা প্রকাশ পায় না। যথার্থ সবলতার সঙ্গে সঙ্গেই একটা সুবৃহৎ সরলতা থাকে।

এই সরলতা, কেবল মতামতে নহে, লোকব্যবহারেও প্রকাশ পায়। বিদ্যাসাগর পিতৃদর্শনে কাশীতে গমন করিলে সেখানকার অর্থলোলুপ কতকগুলি ব্রাহ্মণ তাঁহাকে টাকার জন্য ধরিয়া পড়িয়াছিল। বিদ্যাসাগর তাহাদের অবস্থা ও স্বভাব দৃষ্টে তাহাদিগকে দয়া অথবা ভক্তির পাত্র বলিয়া জ্ঞান করেন নাই, সেইজন্য তৎক্ষণাৎ অকপটচিত্তে উত্তর দিলেন, 'এখানে আছেন বলিয়া আপনাদিগকে যদি আমি ভক্তি বা শ্রদ্ধা করিয়া বিশ্বেশ্বর বলিয়া মান্য করি, তাহা হইলে আমার মতো নরাধম আর নাই।' ইহা শুনিয়া কাশীর ব্রাহ্মণেরা ক্রোধান্ধ হইয়া বলেন, 'তবে আপনি কী মানেন।' বিদ্যাসাগর উত্তর করিলেন, 'আমার বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণা উপস্থিত এই পিতৃদেব ও জননীদেবী বিরাজমান।'[২]

যে বিদ্যাসাগর হীনতম শ্রেণীর লোকেরও দুঃখমোচনে অর্থব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না, তিনি কৃত্রিম কপট ভক্তি দেখাইয়া কাশীর ব্রাহ্মণের প্রার্থনা পূর্ণ করিতে পারিলেন না। ইহাই বলিষ্ঠ সরলতা, ইহাই যথার্থ পৌরুষ।

নিজের অশনবসনেও বিদ্যাসাগরের একটি অটল সরলতা ছিল। এবং সেই সরলতার মধ্যেও দৃঢ় বলের পরিচয় পাওয়া যায়। পূর্বেই দৃষ্টান্ত দেখানো গিয়াছে, নিজের তিলমাত্র সম্মানরক্ষার প্রতিও তাঁহার লেশমাত্র শৈথিল্য ছিল না। আমরা সাধারণত প্রবল সাহেবি অথবা প্রচুর নবাবি দেখাইয়া সম্মানলাভের চেষ্টা করিয়া থাকি। কিন্তু আড়ম্বরের চাপল্য বিদ্যাসাগরের উন্নত-কঠোর আত্মসম্মানকে কখনো স্পর্শ করিতে পারিত না। ভূষণহীন সারল্যই তাঁহার রাজভূষণ ছিল। ঈশ্বরচন্দ্র যখন কলিকাতায় অধ্যয়ন করিতেন তখন তাঁহার দরিদ্রা 'জননীদেবী চরকাসুতা কাটিয়া পুত্রদ্বয়ের বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া কলিকাতায় পাঠাইতেন।'[২] সেই মোটা কাপড়, সেই মাতৃস্নেহমণ্ডিত দারিদ্র্য তিনি চিরকাল সগৌরবে সর্বাঙ্গে ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার বন্ধু তদানীন্তন লেফ্‌টেনাণ্ট্‌ গবর্নর হ্যালিডে-সাহেব তাঁহাকে রাজ-সাক্ষাতের উপযুক্ত সাজ করিয়া আসিতে অনুরোধ করেন। বন্ধুর অনুরোধে বিদ্যাসাগর কেবল দুই-একদিন চোগা-চাপকান পরিয়া সাহেবের সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন। কিন্তু সে লজ্জা আর সহ্য করিতে পারিলেন না। বলিলেন, 'আমাকে যদি এই বেশে আসিতে হয় তবে এখানে আর আমি আসিতে

পারিব না।' হ্যালিডে তাঁহাকে তাঁহার অভ্যস্তবেশে আসিতে অনুমতি দিলেন। ব্রাহ্মণপণ্ডিত যে চটিজুতা ও মোটা ধুতিচাদর পরিয়া সর্বত্র সম্মান লাভ করেন বিদ্যাসাগর রাজদ্বারেও তাহা ত্যাগ করিবার আবশ্যকতা বোধ করেন নাই। তাঁহার নিজের সমাজে যখন ইহাই ভদ্রবেশ তখন তিনি অন্য সমাজে অন্য বেশ পরিয়া আপন সমাজের ও সেইসঙ্গে আপনার অবমাননা করিতে চাহেন নাই। সাদা ধুতি ও সাদা চাদরকে ঈশ্বরচন্দ্র যে গৌরব অর্পণ করিয়াছিলেন, আমাদের বর্তমান রাজাদের ছদ্মবেশ পরিয়া আমরা আপনাদিগকে সে গৌরব দিতে পারি না; বরঞ্চ এই কৃষ্ণচর্মের উপর দ্বিগুণতর কৃষ্ণকলঙ্ক লেপন করি। আমাদের এই অপমানিত দেশে ঈশ্বরচন্দ্রের মতো এমন অখণ্ড পৌরুষের আদর্শ কেমন করিয়া জন্মগ্রহণ করিল আমরা বলিতে পারি না। কাকের বাসায় কোকিলে ডিম পাড়িয়া যায়— মানব-ইতিহাসের বিধাতা সেইরূপ গোপনে কৌশলে বঙ্গভূমির প্রতি বিদ্যাসাগরকে মানুষ করিবার ভার দিয়াছিলেন।

সেইজন্য বিদ্যাসাগর এই বঙ্গদেশে একক ছিলেন। এখানে যেন তাঁহার স্বজাতি সোদর কেহ ছিল না। এ দেশে তিনি তাঁহার সমযোগ্য সহযোগীর অভাবে আমৃত্যুকাল নির্বাসন ভোগ করিয়া গিয়াছেন। তিনি সুখী ছিলেন না। তিনি নিজের মধ্যে যে-এক অকৃত্রিম মনুষ্যত্ব সর্বদাই অনুভব করিতেন চারি দিকের জনমণ্ডলীর মধ্যে তাহার আভাস দেখিতে পান নাই। তিনি উপকার করিয়া কৃতঘ্নতা পাইয়াছেন, কার্যকালে সহায়তা প্রাপ্ত হন নাই। তিনি প্রতিদিন দেখিয়াছেন— আমরা আরম্ভ করি, শেষ করি না; আড়ম্বর করি, কাজ করি না; যাহা অনুষ্ঠান করি তাহা বিশ্বাস করি না; যাহা বিশ্বাস করি তাহা পালন করি না; ভূরিপরিমাণ বাক্যরচনা করিতে পারি, তিলপরিমাণ আত্মত্যাগ করিতে পারি না; আমরা অহংকার দেখাইয়া পরিতৃপ্ত থাকি, যোগ্যতালাভের চেষ্টা করি না; আমরা সকল কাজেই পরের প্রত্যাশা করি, অথচ পরের ত্রুটি লইয়া আকাশ বিদীর্ণ করিতে থাকি; পরের অনুকরণে আমাদের গর্ব, পরের অনুগ্রহে আমাদের সম্মান, পরের চক্ষে ধূলিনিক্ষেপ করিয়া আমাদের পলিটিক্স্, এবং নিজের বাক্চাতুর্যে নিজের প্রতি ভক্তিবিহ্বল হইয়া উঠাই আমাদের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। এই দুর্বল, ক্ষুদ্র, হৃদয়হীন, কর্মহীন, দাম্ভিক, তার্কিক জাতির প্রতি বিদ্যাসাগরের এক সুগভীর ধিক্কার ছিল। কারণ, তিনি সর্ববিষয়েই ইহাদের বিপরীত ছিলেন। বৃহৎ বনস্পতি যেমন ক্ষুদ্র বনজঙ্গলের পরিবেষ্টন হইতে ক্রমেই শূন্য আকাশে মস্তক তুলিয়া উঠে, বিদ্যাসাগর সেইরূপ বয়োবৃদ্ধিসহকারে বঙ্গসমাজে সমস্ত অস্বাস্থ্যকর ক্ষুদ্রতাজাল হইতে ক্রমশই শব্দহীন সুদূর নির্জনে উত্থান করিয়াছিলেন; সেখান হইতে তিনি তাপিতকে ছায়া এবং ক্ষুধিতকে ফলদান করিতেন; কিন্তু আমাদের শতসহস্র ক্ষণজীবী সভাসমিতির ঝিল্লিঝংকার হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিলেন। ক্ষুধিত-পীড়িত অনাথ-অসহায়দের জন্য আজ তিনি বর্তমান নাই, কিন্তু তাঁহার মহৎ চরিত্রের যে অক্ষয়বট তিনি বঙ্গভূমিতে রোপণ করিয়া গিয়াছেন তাহার তলদেশ সমস্ত বাঙালিজাতির তীর্থস্থান হইয়াছে। আমরা সেইখানে আসিয়া আমাদের তুচ্ছতা, ক্ষুদ্রতা, নিষ্ফল আড়ম্বর ভুলিয়া— সূক্ষ্মতম তর্কজাল এবং স্থূলতম জড়ত্ব বিচ্ছিন্ন করিয়া— সরল সবল অটল মাহাত্ম্যের শিক্ষা লাভ করিয়া যাইব। আজ আমরা বিদ্যাসাগরকে কেবল বিদ্যা ও দয়ার আধার বলিয়া জানি; এই বৃহৎ পৃথিবীর সংস্রবে আসিয়া যতই আমরা মানুষ হইয়া উঠিব, যতই আমরা পুরুষের মতো দুর্গমবিস্তীর্ণ কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে থাকিব, বিচিত্র শৌর্য-

বীর্য-মহত্ত্বের সহিত যতই আমাদের প্রত্যক্ষ সন্নিহিতভাবে পরিচয় হইবে, ততই আমরা নিজের অন্তরের মধ্যে অনুভব করিতে থাকিব যে, দয়া নহে, বিদ্যা নহে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চরিত্রে প্রধান গৌরব তাঁহার অজেয় পৌরুষ, তাঁহার অক্ষয় মনুষ্যত্ব—এবং যতই তাহা অনুভব করিব ততই আমাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ ও বিধাতার উদ্দেশ্য সফল হইবে এবং বিদ্যাসাগরের চরিত্র বাঙালির জাতীয়জীবনে চিরদিনের জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিবে।[3]

১৩০২ ভাদ্র

২

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় বিদ্যাসাগরের জীবনী সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন তাহার আরম্ভে যোগবাশিষ্ঠ হইতে নিম্নলিখিত শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন—

তরবোঽপি হি জীবন্তি জীবন্তি মৃগপক্ষিণঃ।
স জীবতি মনো যস্য মননেন হি জীবতি॥

তরুলতাও জীবনধারণ করে, পশুপক্ষীও জীবনধারণ করে; কিন্তু সে-ই প্রকৃতরূপে জীবিত যে মননের দ্বারা জীবিত থাকে।

মনের জীবন মননক্রিয়া এবং সেই জীবনেই মনুষ্যত্ব।

প্রাণ সমস্ত দেহকে ঐক্যদান করিয়া তাহার বিচিত্র কার্যসকলকে একতন্ত্রে নিয়মিত করে। প্রাণ চলিয়া গেলে দেহ পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হয়, তাহার ঐক্য ছিন্ন হইয়া মাটির অংশ মাটিতে, জলের অংশ জলে মিশিয়া যায়। নিয়তক্রিয়াশীল নিরলস প্রাণই এই শরীরটাকে মাটি হইতে, জল হইতে উচ্চ করিয়া, স্বতন্ত্র করিয়া, এক করিয়া, স্বতশ্চালিত এক অপূর্ব ইন্দ্রজাল রচনা করে।

মনের যে জীবন, শাস্ত্রে যাহাকে মনন বলিতেছে, তাহাও সেইরূপ মনকে এক করিয়া তাহাকে তাহার সমস্ত তুচ্ছতা, সমস্ত অসম্বদ্ধতা হইতে উদ্ধার করিয়া খাড়া করিয়া গড়িয়া তোলে. সেই মনন দ্বারা ঐক্যপ্রাপ্ত মন বিচ্ছিন্নভাবে বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে না, সে মন বাহ্যপ্রবাহের মুখে জড়পুঞ্জের মতো ভাসিয়া যায় না।

কোনো মনস্বী ইংরাজলেখক বলিয়াছেন, 'এমন লোকটি পাওয়া দুর্লভ, যিনি নিজের পায়ের উপর খাড়া হইয়া দাঁড়াইতে পারেন, যিনি নিজের চিত্তবৃত্তিসম্বন্ধে সচেতন, কর্মস্রোতকে প্রবাহিত এবং প্রতিহত করিবার মতো বল যাঁহার আছে, যিনি ধাবমান জনতা হইতে আপনাকে ঊর্ধ্বে রাখিতে পারেন এবং সেই জনতা-প্রবাহ কোথা হইতে আসিতেছে ও কোথায় তাহার গতি, তৎসম্বন্ধে যাঁহার একটি পরিষ্কৃত সংস্কার আছে।'

উক্ত লেখক যাহা বলিয়াছেন তাহাকে সংক্ষেপে বলিতে হইলে বলা যায় যে, এমন লোক দুর্লভ 'মনো যস্য মননেন হি জীবতি'।

---

[1] স্বরচিত বিদ্যাসাগর-চরিত [2] শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন-প্রণীত বিদ্যাসাগর-জীবনচরিত

[3] বর্তমান প্রবন্ধ, ১৩০২ সালের ১৩ই শ্রাবণ অপরাহ্ণে বিদ্যাসাগরের স্মরণার্থসভার সাংবৎসরিক অধিবেশনে এমারেল্ড থিএটার রঙ্গমঞ্চে পঠিত।

সাধারণ লোকের মধ্যে মন-নামক যে একটা ব্যাপার আছে বলিয়া ভ্রম হয় তাহাকে খাড়া রাখিয়াছে কিসে। কেবল প্রথা এবং অভ্যাসে। তাহার জড় অঙ্গগুলি অভ্যাসের আটা দিয়া জোড়া—তাহা প্রাণের বন্ধনে এক হইয়া নাই। তাহার গতি চিরকালপ্রবাহিত দশজনের গতি, তাহার অদ্যতন দিন কল্যতন দিনের অভ্যস্ত অন্ধ পুনরাবৃত্তিমাত্র।

জলের মধ্যে তৃণ যেমন করিয়া ভাসিয়া যায়, মাছ তেমন করিয়া ভাসে না। জলের পথ এবং মাছের পথ সর্বদাই এক নহে। মাছকে খাদ্যের অনুসরণে, আত্মরক্ষার উত্তেজনায় নিয়ত আপনার পথ আপনি খুঁজিয়া লইতে হয়। তৃণ সে প্রয়োজন অনুভবই করে না।

মননক্রিয়া-দ্বারা যে মন জীবিত তাহাকেও আত্মরক্ষার জন্যই নিজের পথ নিজে খুঁজিয়া বাহির করিতে হয়। দশজনের মধ্যে ভাসিয়া চলা তাহার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব।

সাধারণ বাঙালির সহিত বিদ্যাসাগরের যে একটি জাতিগত সুমহান্‌ প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায় সে প্রভেদ শাস্ত্রীমহাশয় যোগবাশিষ্ঠের একটিমাত্র শ্লোকের দ্বারা পরিস্ফুট করিয়াছেন। আমাদের অপেক্ষা বিদ্যাসাগরের একটা জীবন অধিক ছিল। তিনি কেবল দ্বিজ ছিলেন না, তিনি দ্বিগুণ-জীবিত ছিলেন।

সেইজন্য তাঁহার লক্ষ্য, তাঁহার আচরণ, তাঁহার কার্যপ্রণালী আমাদের মতো ছিল না। আমাদের সম্মুখে আছে আমাদের ব্যক্তিগত সুখদুঃখ, ব্যক্তিগত লাভক্ষতি। তাঁহার সম্মুখেও অবশ্য সেগুলা ছিল; কিন্তু তাহার উপরেও ছিল তাঁহার অন্তর্জীবনের সুখদুঃখ, মনোজীবনের লাভক্ষতি। সেই সুখদুঃখ লাভক্ষতির নিকট বাহ্য সুখদুঃখ লাভক্ষতি কিছুই নহে।

আমাদের বহির্জীবনেরও একটা লক্ষ্য আছে, তাহাকে সমস্ত জড়াইয়া এক কথায় স্বার্থ বলা যায়। আমাদের খাওয়া পরা শোওয়া, কাজকর্ম করা, সমস্ত স্বার্থের অঙ্গ। ইহাই আমাদের বহির্জীবনের মূলগ্রন্থি।

মননের দ্বারা আমরা যে অন্তর্জীবন লাভ করি তাহার মূল লক্ষ্য পরমার্থ। এই আম্‌মহল ও খাস্‌মহলের দুই কর্তা—স্বার্থ ও পরমার্থ। ইহাদের সামঞ্জস্য-সাধন করিয়া চলাই মানবজীবনের আদর্শ। কিন্তু মধ্যে মধ্যে সংসারের বিপাকে পড়িয়া যে অবস্থায় 'অর্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ' তখন পরমার্থকে রাখিয়া স্বার্থই পরিত্যাজ্য, এবং যাঁহার মনোজীবন প্রবল তিনি অবলীলাক্রমে সেই কাজ করিয়া থাকেন।

অধিকাংশের মন সজীব নয় বলিয়া শাস্ত্রে এবং লোকাচারে আমাদের মনঃপুত্তলী-যন্ত্রে দম দিয়া তাহাকে একপ্রকার কৃত্রিম গতি দান করে। কেবল সেই জোরে আমরা বহুকাল ধরিয়া দয়া করি না, দান করি; ভক্তি করি না, পূজা করি; চিন্তা করি না, কর্ম করি; বোধ করি না অথচ সেইজন্যই কোন্‌টা ভালো ও কোন্‌টা মন্দ তাহা অত্যন্ত জোরের সহিত অতিশয় সংক্ষেপে চোখ বুজিয়া ঘোষণা করি। ইহাতে সজীব-দেবতা-স্বরূপ পরমার্থ আমাদের মনে জাগ্রত না থাকিলেও তাহার জড়-প্রতিমা কোনোমতে আপনার ঠাট বজায় রাখে।

এই নির্জীবতা ধরা পড়ে বাঁধা নিয়মের নিশ্চেষ্ট অনুসরণ-দ্বারা। যে সমাজে একজন অবিকল আর-একজনের মতো এবং এক কালের সহিত অন্য কালের বিশেষ প্রভেদ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, সে সমাজে পরমার্থ সজীব নাই এবং মননক্রিয়া একেবারে বন্ধ হইয়া গেছে এ কথা নিশ্চয় বলা যাইতে পারে।

আমাদের দেশের কবি তাই বলিয়াছেন, 'গতানুগতিকো লোকো ন লোকঃ পারমার্থিকঃ'। অর্থাৎ লোকে গতানুগতিক হইয়া থাকে, পারমার্থিক লোক দেখা যায় না। গতানুগতিক লোক যে পারমার্থিক নহে এবং পারমার্থিক লোক গতানুগতিক হইয়া থাকিতে পারেন না, কবি এই নিগূঢ় কথাটি অনুভব করিয়াছেন।

বিদ্যাসাগর আর যাহাই হউন, গতানুগতিক ছিলেন না। কেন ছিলেন না। তাহার প্রধান কারণ, মননজীবনই তাঁহার মুখ্যজীবন ছিল।

অবশ্য, সকল দেশেই গতানুগতিকের সংখ্যা বেশি। কিন্তু যে দেশে স্বাধীনতার স্ফূর্তি ও বিচিত্র কর্মের চাঞ্চল্য সর্বদা বর্তমান সেখানে লোকসমাজমন্থনে সেই অমৃত উঠে—যাহাতে মনকে জীবনদান করে, মননক্রিয়াকে সতেজ করিয়া তোলে।

তথাপি সকলেই জানেন, কার্লাইলের ন্যায় লেখক তাঁহাদের দেশের সাধারণ জনসমাজের অন্ধ মূঢ়তাকে কিরূপ সুতীব্র ভর্ৎসনা করিয়াছেন। কার্লাইল যাহাকে hero অর্থাৎ বীর বলেন, তিনি কে।—

> The hero is he who lives in the inward sphere of things, in the True, Divine and Eternal, which exists always, unseen to most, under the Temporary, Trival: his being is in That; he declares That abroad; by act or speech as it may be, in declaring himself abroad.

অর্থাৎ, তিনিই বীর যিনি বিষয়পুঞ্জের অন্তরতর রাজ্যে সত্য এবং দিব্য এবং অনন্তকে আশ্রয় করিয়া আছেন—যে সত্য দিব্য ও অনন্ত পদার্থ অধিকাংশের অগোচরে চারি দিকের তুচ্ছ এবং ক্ষণিক ব্যাপারের অভ্যন্তরে নিত্যকাল বিরাজ করিতেছেন; সেই অন্তররাজ্যেই তাঁর অস্তিত্ব; কর্মদ্বারা অথবা বাক্যদ্বারা নিজেকে বাহিরে প্রকাশ করিয়া তিনি সেই অন্তররাজ্যকেই বাহিরে বিস্তার করিতেছেন।

কার্লাইলের মতে ইঁহারা কাপড় ঝুলাইবার আলনা বা হজম করিবার যন্ত্র নহেন, ইঁহারাই সজীব মনুষ্য, অর্থাৎ সেই একই কথা, 'স জীবতি মনো যস্য মননেন হি জীবতি'। অথবা, অন্য কবির ভাষায় ইঁহারা গতানুগতিকমাত্র নহেন, ইঁহারা পারমার্থিক।

আমরা স্বার্থকে যেমন সহজে এবং সুতীব্রভাবে অনুভব করি, মননজীবিগণ পরমার্থকে ঠিক তেমনি সহজে অনুভব করেন এবং তাহার দ্বারা তেমনি অনায়াসে চালিত হন। তাঁহাদের দ্বিতীয় জীবন, তাঁহাদের অন্তরতর প্রাণ যে খাদ্য চায়, যে বেদনা বোধ করে, যে আনন্দামৃতে সাংসারিক ক্ষতি এবং মৃত্যুর বিরুদ্ধেও অমর হইয়া উঠে, আমাদের নিকট তাহার অস্তিত্বই নাই।

পৃথিবীর এমন একদিন ছিল যখন সে কেবল আপনার দ্রবীভূত ধাতুপ্রস্তরময় ভূপিণ্ড লইয়া সূর্যকে প্রদক্ষিণ করিত। বহুযুগ পরে তাহার নিজের অভ্যন্তরে এক অপরূপ প্রাণশক্তির বিকাশে জীবনে এবং সৌন্দর্যে তাহার স্থলজল পরিপূর্ণ হইয়া গেল।

মানবসমাজেও মননশক্তিদ্বারা মনঃসৃষ্টি বহুযুগের এক বিচিত্র ব্যাপার। তাহার সৃষ্টিকার্য অনবরত চলিতেছে, কিন্তু এখনও সর্বত্র যেন দানা বাঁধিয়া উঠে নাই। মাঝে মাঝে এক এক স্থানে যখন তাহা পরিস্ফুট হইয়া উঠে তখন চারি দিকের সহিত তাহার পার্থক্য অত্যন্ত বেশি বোধ হয়।

বাংলাদেশে বিদ্যাসাগরকে সেইজন্য সাধারণ হইতে অত্যন্ত পৃথক দেখিতে হইয়াছে। সাধারণত আমরা-যে পরমার্থের প্রভাব একেবারেই অনুভব করি না,

বিবাহের মধ্য দিয়া অতি অবাধে প্রবাহিত হইয়াছিল; মাঝে মাঝে পোর্ট্‌মদিরার অতিসেবা ছাড়া আর কিছুতেই তাঁহার নাড়ী ও তাঁহার মেজাজকে চঞ্চল করিতে পারে নাই। কিন্তু আর-একজন কঠিন বৃদ্ধ তীর্থযাত্রী যিনি অন্তর এবং বাহিরের দুঃখরাশি সত্ত্বেও যুদ্ধ করিয়া জীবনকে শান্তির পথে লইয়া গেছেন, যিনি এই সংসারের মায়ার হাটে উপহসিত হইয়া মৃত্যুচ্ছায়ার অন্ধগুহামধ্যে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং যিনি নৈরাশ্য-দৈত্যের বন্ধন হইতে বহু চেষ্টায় বহু কষ্টে উদ্ধার পাইয়াছিলেন, তাঁহার মৃত্যুশয্যায় আমাদের মনে গভীরতর ভাবাবেগ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। যখন দেখিতে পাই, এই লোকের অন্তিমকালের হৃদয়বৃত্তি কিরূপ কোমল গম্ভীর এবং সরল তখন আমরা স্বতই অনুভব করি যে, যে নিরীহ ভদ্রলোকটি পরম শিষ্টাচার রক্ষা করিয়া বাঁচিয়াছিলেন ও মরিয়াছিলেন তাঁহার অপেক্ষা উন্নততর সত্তার সন্নিধানে বর্তমান আছি।

এই বর্ণনা পাঠ করিলে বিদ্যাসাগরের সহিত জন্‌সনের সাদৃশ্য সহজেই মনে পড়ে। বিদ্যাসাগরও কেবল ক্ষুদ্র সংকীর্ণ অভ্যস্ত ভব্যতার মধ্য দিয়া চলিতে পারেন নাই; তাঁহারও স্নেহ ভক্তি দয়া, তাঁহার বিপুলবিস্তীর্ণ হৃদয়, সমস্ত আদবকায়দাকে বিদীর্ণ করিয়া কেমন অসামান্য আকারে ব্যক্ত হইত তাহা তাঁহার জীবনচরিতে নানা ঘটনায় প্রকাশ পাইয়াছে।

এইখানে জন্‌সন্‌ সম্বন্ধে কার্লাইল যাহা লিখিয়াছেন তাহার কিয়দংশ অনুবাদ করি।—

তিনি বলিষ্ঠচেতা এবং মহৎ-লোক ছিলেন। শেষ পর্যন্তই অনেক জিনিস তাঁহার মধ্যে অপরিণত থাকিয়া গিয়াছিল। অনুকূল উপকরণের মধ্যে তিনি কী না হইতে পারিতেন— কবি, ঋষি, রাজাধিরাজ। কিন্তু মোটের উপরে, নিজের ‘উপকরণ’ নিজের ‘কাল’ এবং ঐগুলা লইয়া নালিশ করিবার প্রয়োজন কোনো লোকেরই নাই; উহা একটা নিষ্ফল আক্ষেপমাত্র। তাঁহার কালটা খারাপ ছিল, ভালোই; তিনি সেটাকে আরও ভালো করিবার জন্যই আসিয়াছেন। জন্‌সনের কৈশোরকাল ধনহীন, সঙ্গহীন, আশাহীন এবং দুর্ভাগ্যজালে বিজড়িত ছিল। তা থাক্‌, কিন্তু বাহ্য অবস্থা অনুকূলতম হইলেও জন্‌সনের জীবন দুঃখের জীবন হওয়া ছাড়া আর কিছু হওয়া সম্ভবপর হইত না। প্রকৃতি তাঁহার মহত্ত্বের প্রতিদানস্বরূপ তাঁহাকে বলিয়াছিল, রোগাতুর দুঃখরাশির মধ্যে বাস করো। না, বোধ করি, দুঃখ এবং মহত্ত্ব ঘনিষ্ঠভাবে, এমন-কি, অচ্ছেদ্যভাবে পরস্পর জড়িত ছিল। যে কারণেই হউক অভাগা জন্‌সনকে নিয়তই রোগাবিষ্টতা, শারীরিক ও আধ্যাত্মিক বেদনা, কোমরে বাঁধিয়া ফিরিতে হইত। তাঁহাকে একবার কল্পনা করিয়া দেখো, তাঁহার সেই রুগ্নশরীর, তাঁহার ক্ষুধিত প্রকাণ্ড হৃদয় এবং অনির্বচনীয় উদ্‌বর্তিত চিন্তাপুঞ্জ লইয়া পৃথিবীতে বিপদাকীর্ণ বিদেশীর মতো ফিরিতেছেন, ব্যগ্রভাবে গ্রাস করিতেছেন যে-কোনো পারমার্থিক পদার্থ সম্মুখে আসিয়া পড়ে, আর যদি কিছুই না পান, তবে অন্তত বিদ্যালয়ের ভাষা এবং কেবলমাত্র ব্যাকরণের ব্যাপার! সমস্ত ইংলণ্ডের মধ্যে বিপুলতম অন্তঃকরণ যাহা ছিল তাঁহারই ছিল, অথচ তাঁহার জন্য বরাদ্দ ছিল সাড়ে চার আনা করিয়া প্রতিদিন। তবু সে হৃদয় ছিল অপরাজিত মহাবলী, প্রকৃত মনুষ্যের হৃদয়! অক্‌স্‌ফোর্ডে তাঁহার সেই জুতাজোড়ার গল্পটা সর্বদাই মনে পড়ে; মনে পড়ে, কেমন করিয়া সেই, দাগ-কাটা মুখ, হাড়-বাহির-করা, কলেজের দীন ছাত্র শীতের সময় জীর্ণ জুতা লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; কেমন করিয়া এক কৃপালু সচ্ছল ছাত্র গোপনে একজোড়া জুতা তাহার দরজার কাছে রাখিয়া দিল; এবং সেই হাড়-বাহির-করা দরিদ্র ছাত্র সেটা তুলিল, কাছে আনিয়া তাহার বহুচিন্তাজালে অস্ফুট দৃষ্টির নিকট ধরিল এবং তাহার পরে জানালার বাহিরে দূর করিয়া ছুঁড়িয়া ফেলিল। ভিজা পা বলো, পঙ্ক বলো, বরফ বলো, ক্ষুধা বলো, সবই সহ্য হয়, কিন্তু ভিক্ষা নহে; আমরা ভিক্ষা সহ্য করিতে পারি না। এখানে কেবল রূঢ় আত্মসহায়তা। দৈন্যমালিন্য, উদ্‌ভ্রান্ত বেদনা এবং অভাবের অন্ত নাই, তথাপি অন্তরের মহত্ত্ব এবং পৌরুষ! এই-যে জুতা

ছুঁড়িয়া ফেলা, ইহাই এ মানুষটির জীবনের ছাঁচ। একটি স্বকীয়তন্ত্র (original) মানুষ, এ তোমার গতানুগতিক, ঋণপ্রার্থী ভিক্ষাজীবী লোক নহে। আর যাই হউক, আমরা আমাদের নিজের উপরেই যেন স্থিতি করি— সেই জুতা পায়ে দিয়াই দাঁড়ানো যাক যাহা আমরা নিজে জোটাইতে পারি। যদি তেমনই ঘটে, তবে পাঁকের উপর চলিব, বরফের উপরেই চলিব, কিন্তু উন্নতভাবে চলিব; প্রকৃতি আমাদিগকে যে সত্য দিয়াছেন, তাহারই উপর চলিব; অপরকে যাহা দিয়াছেন তাহারই নকলের উপর চলিব না।

কার্লাইল যাহা লিখিয়াছেন তাহার ঘটনা সম্বন্ধে না মিলুক, তাহার মর্মকথাটুকু বিদ্যাসাগরে অবিকল খাটে। তিনি গতানুগতিক ছিলেন না; তিনি স্বতন্ত্র, সচেতন, পারমার্থিক ছিলেন। শেষ দিন পর্যন্ত তাঁহার জুতা তাঁহার নিজেরই চটিজুতা ছিল। আমাদের কেবল আক্ষেপ এই যে, বিদ্যাসাগরের বস্‌ওয়েল্‌ কেহ ছিল না; তাঁহার মনের তীক্ষ্ণতা, সবলতা, গভীরতা ও সহৃদয়তা তাঁহার বাক্যালাপের মধ্যে প্রতিদিন অজস্র বিকীর্ণ হইয়া গেছে, অদ্য সে আর উদ্ধার করিবার উপায় নাই। বস্‌ওয়েল্‌ না থাকিলে জন্‌সনের মনুষ্যত্ব লোকসমাজে স্থায়ী আদর্শ দান করিতে পারিত না। সৌভাগ্যক্রমে বিদ্যাসাগরের মনুষ্যত্ব তাঁহার কাজের মধ্যে আপনার ছাপ রাখিয়া যাইবে, কিন্তু তাঁহার অসামান্য মনস্বিতা, যাহা তিনি অধিকাংশ সময়ে মুখের কথায় ছড়াইয়া দিয়াছেন, তাহা কেবল অপরিস্ফুট জনশ্রুতির মধ্যে অসম্পূর্ণ আকারে বিরাজ করিবে।

১৩০৫

ভারতপথিক রামমোহন রায়

ইতিহাসে দেখি অনেক বড়ো বড়ো প্রাচীন সভ্যতা দেশের নদীর সঙ্গে নাড়ীর যোগে প্রাণবান। নদী দেশকে দেয় জল, দেয় ফল; কিন্তু সব চেয়ে বড়ো তার দান, দেশকে সে দেয় গতি। দূরের সঙ্গে বাহিরের সঙ্গে সম্বন্ধ শাখায়িত করে নদী, স্থাবরের মর্মের মধ্যে নিয়ে আসে প্রাণের চলৎপ্রবাহ।

নদীমাতৃক দেশে নদী যদি একেবারে শুকিয়ে যায় তা হলে তার মাটিতে ঘটে কৃপণতা, তার অন্ন-উৎপাদনের শক্তি ক্ষীণ হয়। দেশের আপন জীবিকা যদি-বা কোনোমতে চলে, কিন্তু যে অন্নপ্রাচুর্যের দ্বারা বাইরের বৃহৎ জগতের সঙ্গে তার যোগ সেটা যায় দরিদ্র হয়ে। সে না পারে দিতে, না পারে নিতে। নিজের মধ্যে সে রুদ্ধ হয়ে থাকে, বিভক্ত হয় তার ঐক্যধারা, তার আত্মীয়মিলনের পথ হয় দুর্গম। বাহিরের সঙ্গে সে হয় পৃথক, অন্তরের মধ্যে সে হয় খণ্ডিত।

যেমন বিশেষ দেশ নদীমাতৃক, তেমনি বিশেষ জনচিত্ত আছে যাকে নদীমাতৃক বলা চলে। সে চিত্তের এমন নিত্যপ্রবাহিত মননধারা যার যোগে বাহিরকে সে আপনার মধ্যে টেনে আনে, নিজের মধ্যেকার ভেদ বিভেদ তার ভেসে যায়— যে প্রবাহ চিন্তার ক্ষেত্রকে নব নব সফলতায় পরিপূর্ণ করে, নিরন্তর অন্ন জোগায় সকল দেশকে, সকল কালকে।

একদা সেই চিত্ত ছিল ভারতের, তার ছিল বহমান-মনন-ধারা। সে বলতে পেরেছিল 'আয়ন্তু সর্বতঃ স্বাহা', সকলে আসুক সকল দিক থেকে। 'শৃণ্বন্তু বিশ্বে', শুনুক বিশ্বের লোক। বলেছিল 'বেদাহম্‌', আমি জানি— এমন কিছু

জানি যা বিশ্বের সকলকে আমন্ত্রণ করে জানাবার। যে তারা জ্যোতিহীন তাকে নিখিল নক্ষত্রলোক স্বীকার করে না। প্রাচীন ভারত নিত্যকালের মধ্যে আপন পরিচয়কে দীপ্যমান করেছে; বিশ্বলোকে সে প্রকাশিত হয়েছে প্রভূত দাক্ষিণ্যে, আপনাকে দান করার দ্বারা। সেদিন সে ছিল না অকিঞ্চনরূপে অকিঞ্চিৎকর।

শত শত বৎসর চলে গেল—ইতিহাসের পুরোগামিনী গতি হল নিস্তব্ধ, ভারতবর্ষের মনোলোকে চিন্তার মহানদী গেল শুকিয়ে। তখন দেশ হয়ে পড়ল স্থবির, আপনার মধ্যে আপনি সংকীর্ণ, তার সজীব চিত্তের তেজ আর বিকীর্ণ হয় না দূর-দূরান্তরে। শুকনো নদীতে যখন জল চলে না তখন তলাকার অচল পাথরগুলো পথ আগলে বসে; তারা অসংলগ্ন, তারা অর্থহীন, পথিকদের তারা বিঘ্ন। তেমনি দুর্দিন যখন এল এই দেশে তখন জ্ঞানের চলমান গতি হল অবরুদ্ধ, নির্জীব হল নবনবোন্মেষশালিনী বুদ্ধি, উদ্ধত হয়ে দেখা দিল নিশ্চল আচারপুঞ্জ, আনুষ্ঠানিক নিরর্থকতা, মননহীন লোকব্যবহারের অভ্যস্ত পুনরাবৃত্তি। সর্বজনের প্রশস্ত রাজপথকে তারা বাধাগ্রস্ত করলে; খণ্ড খণ্ড সংকীর্ণ সীমানার বাইরে বিচ্ছিন্ন করলে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধকে।

ঘুমের অবস্থায় মনের জানলা যখন সব বন্ধ হয়ে যায়, মন হয় বন্দী। তখন যে-সব স্বপ্ন নিয়ে সে খেলা করে বিশ্বসত্যের সঙ্গে তাদের যোগ নেই, কেবলমাত্র সেই সুপ্ত মনের নিজের উপরেই তাদের প্রভাব এক কেন্দ্রে আবর্তিত, তা তারা যতই অদ্ভুত হোক, অসংগত হোক, উৎকট হোক। বাহিরের বাস্তবরাজ্য থেকে এই স্বপ্নরাজ্যে আর কারও প্রবেশের পথ নেই। একে বিদ্রূপ করা যায়, কিন্তু বিচার করা যায় না; কেননা এ থাকে যুক্তির বাহিরে।

তেমনি ছিল অর্থহারা আচারের স্বপ্নজালে জড়িত ভারতবর্ষ; তার আলো এসেছিল নিবে। তার আপনার কাছে আপন সত্যপরিচয় ছিল আচ্ছন্ন। এমন সময় রামমোহন রায়ের আবির্ভাব হল এই দেশে, সেই আত্মবিস্মৃত প্রদোষের অন্ধকারে। সেদিন তার ইতিহাস অগৌরবের কালিমায় আবৃত। ভারত আপন বাণী তখন হারিয়েছে, নিখিল পৃথিবীর এই নতুন কালের জন্যে তার কোনো বার্তা নেই, ঘরের কোণে বসে সে মৃত যুগের মন্ত্র জপ করছে।

যখন সে আপন দুর্বলতায় অভিভূত সেই অপমানের দিনে বাইরের লোক এল তার দ্বারে; আপন সম্মান রক্ষা করে তাকে অভ্যর্থনা করবে এমন আয়োজন ছিল না; অতিথিরূপে তাকে গৃহস্বামী ডাকতে পারে নি, দ্বার ভেঙে দস্যুরূপে সে প্রবেশ করলে তার স্বর্ণভাণ্ডারে।

ভারতের চিত্ত সেদিন মনের অন্ন নূতন করে উৎপাদন করতে পারছিল না, তার খেত ভরা ছিল আগাছার জঙ্গলে। সেই অজন্মার দিনে রামমোহন রায় জন্মেছিলেন সত্যের ক্ষুধা নিয়ে। ইতিহাসের প্রাণহীন আবর্জনায়— বাহ্যবিধির কৃত্রিমতায় কিছুতে তাঁকে তৃপ্ত করতে পারলে না। কোথা থেকে তিনি নিয়ে এলেন সেই জ্ঞানের আগ্রহে স্বভাবত উৎসুক মন, যা সম্প্রদায়ের বিচিত্র বেড়া ভেঙে বেরোল, চারি দিকের মানুষ যা নিয়ে ভুলে আছে তাতে যার বিতৃষ্ণা হল। সে চাইল মোহমুক্ত বুদ্ধির সেই অবারিত আশ্রয়, যেখানে সকল মানুষের মিলনতীর্থ।

এই বেড়া ভাঙার সাধনাই যথার্থ ভারতবর্ষের মিলনতীর্থকে উদ্ঘাটিত করা। এইজন্যেই এ সাধনা বিশেষভাবে ভারতবর্ষের, যেহেতু এর বিরুদ্ধতাই ভারতে এত প্রভূত, এত প্রবল। ইংলন্ড ক্ষুদ্র দ্বীপের সীমায় বদ্ধ, সেইজন্যেই তার সাধনা গেছে দ্বৈপায়নতার বিপরীত দিকে, বিশ্বে সে আপনাকে সুদূরে বিস্তার করেছে। দেশের

বিশেষ অবস্থার মধ্যেই দেশের অঞ্জলি পাতা রয়েছে, সেই অঞ্জলির অর্থই এই যে, তার শূন্যতাকে পূর্ণ করতে হবে।

প্রত্যেক জাতির মধ্যে আছে তার নিহিতার্থ, তার বিশেষ সমস্যা; সেই অর্থ তাকে পূরণ করতে হয় নিরন্তর প্রয়াসে। এই প্রয়াসের দ্বারাই তার চরিত্র সৃষ্ট হয়, তার উদ্ভাবনী শক্তি বললাভ করে। মানুষকে তার মনুষ্যত্ব প্রতিক্ষণে জয় করে নিতে হয়। প্রত্যেক জাতির ইতিহাস আপন জয়যাত্রার ইতিহাস। কঠিন বাধা দূর করবার পথেই তার স্বাস্থ্য, তার সম্পদ। এইজন্যেই বলেছে, বীরভোগ্যা বসুন্ধরা। দুর্গমকে সুগম করতে এসেছে মানুষ, দুর্লভকে উপলব্ধ। বিশেষ জাতিকে যে বিশেষ সমস্যা দিয়েছেন বিধাতা, তার সত্য উত্তর দিতে থাকার মধ্যেই তার পরিত্রাণ। যারা সমাধান করতে ভুল করেছে তারা মরেছে। আর দুর্গতিগ্রস্ত হয়েছে তারাই যারা মনে করেছে তাদের সমাধান করবার কিছুই নেই, সমস্ত সমাধা হয়ে গেছে। যতক্ষণ মানুষের প্রাণ আছে ততক্ষণই তার সমস্যা, অবিরত সমস্যার উত্তর দিতে থাকাই প্রাণনক্রিয়া। চারি দিকে জড়ের জটিল বাধা নিত্যই, সেই বাধা নিত্যই ভেদ করার দ্বারা প্রাণ আপনাকে সপ্রমাণ করে। ইতিহাসে যে জটা পাকিয়ে থাকে সেই গ্রন্থিকেই সনাতন বলে ভক্তি করলে সেটা মরণের ফাঁস হয়ে ওঠে।

মানব-ইতিহাসের প্রধান সমস্যাটা কোথায়। যেখানে কোনো অন্ধতায় কোনো মূঢ়তায় মানুষে মানুষে বিচ্ছেদ ঘটায়।—মানবসমাজের সর্বপ্রধান তত্ত্ব মানুষের ঐক্য। সভ্যতার অর্থই হচ্ছে মানুষের একত্র হবার অনুশীলনা। এই ঐক্যতত্ত্বের উপলব্ধি যেখানেই দুর্বল সেখানে সেই দুর্বলতা নানা ব্যাধির আকার ধরে দেশকে চারি দিক থেকে আক্রমণ করে।

ভারতবর্ষে তার সমস্যাটা সুস্পষ্ট। এখানে নানা জাতের লোক একত্রে এসে জুটেছে। পৃথিবীতে অন্য কোনো দেশে এমন ঘটে নি। যারা একত্র হয়েছে তাদের এক করতেই হবে, এই হল ভারতবর্ষের সর্বপ্রথম সমস্যা। এক করতে হবে বাহ্যিক ব্যবস্থায় নয়, আন্তরিক আত্মীয়তায়। ইতিহাস মাত্রেরই সর্বপ্রধান মন্ত্র হচ্ছে 'সং গচ্ছধ্বং সং বদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাম্'—এক হয়ে চলব, এক হয়ে বলব, সকলের মনকে এক বলে জানব। এই মন্ত্রের সাধনা ভারতবর্ষে যেমন অত্যন্ত দুরূহ এমন আর কোনো দেশেই নয়। যতই দুরূহ হোক, এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ ছাড়া রক্ষা পাবার অন্য কোনো পথ নেই।

অন্য কোনো দেশের শ্রীবৃদ্ধি দেখে যখন আমরা মুগ্ধ হই তখন অনেক সময়ে আমরা তার সিদ্ধির পরিণত রূপটার দিকেই লুব্ধদৃষ্টিপাত করি, তার সাধনার দুর্গম পথটা আমাদের চোখে পড়ে না। দেখতে পাওয়া গেল স্বাধীন দেশের রাষ্ট্রব্যবস্থা, মনে করি ঐ ব্যবস্থার একটি অনুরূপ প্রতিমা খাড়া করতে পারলেই আমাদের উদ্ধার। ভুলে যাই রাষ্ট্রব্যবস্থাটা দেহমাত্র—সেই দেহ নিরর্থক, যদি তার প্রাণ না থাকে। সেই প্রাণই জাতিগত ঐক্য। অন্য দেশে সেই ঐক্যেরই আন্তরিক শক্তিতে রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। সে-সব দেশেও সেই ঐক্যে যেখানে যে পরিমাণ বিকার ঘটে সেখানে সেই পরিমাণেই সমস্যা কঠিন হয়ে ওঠে। আমাদের দেশে জাতিতে জাতিতে পার্থক্য, পশ্চিম-মহাদেশে শ্রেণীতে শ্রেণীতে। সেই শ্রেণীগত পার্থক্যের মধ্যে আন্তরিক সামঞ্জস্য যদি না ঘটে তা হলে বাহ্য ব্যবস্থায় বিপদ-নিবারণ হবে না।

আমরা যদি কোনো ক্ষেত্রে দেখতে পাই প্রচুর ফসল তা হলে গোড়াতেই এ কথা মনে রাখতে হবে, এ ফসল বালিতে উৎপন্ন হয় নি, হয়েছে মাটিতে। মরুভূমিতে দেখা যায় উদ্ভিদ দূরে দূরে বিশ্লিষ্ট, তারা কাঁটার দ্বারা নিজেকে অত্যন্ত স্বতন্ত্র

করে রক্ষা করেছে। তাদের জননী ধরণী এক রসের দাক্ষিণ্যে সকলকে পরিপোষণ করে নি, তাদের পরস্পরের মধ্যে প্রাণের ঐক্যে কার্পণ্য। এর প্রধান কারণ হচ্ছে, মাটির কণায় কণায় বন্ধন আছে, বালির কণায় কণায় বিচ্ছেদ। আমরা যখন সমৃদ্ধিবান জাতির ইতিহাস চর্চা করি তখন ভরা ফসলের দিকে চোখ পড়ে, এবং কৃষিপ্রণালীর বিবরণও যত্ন করে মুখস্থ করে পরীক্ষা পাস করে থাকি; কেবল একটা কথা মনে রাখি নে, এই ফসলের ঐশ্বর্য সম্পূর্ণ অসম্ভব যদি তার ভূমিকাতেই থাকে বিচ্ছিন্নতা। কৃষির যন্ত্রকেও আমরা দাবি করি, ফসলেরও প্রত্যাশা করে থাকি, কিন্তু আমাদের ভূমির প্রকৃতিতেই যে বিচ্ছেদ তাকে চোখ বুজে আমরা নগণ্য বলেই জ্ঞান করি এবং ধর্মের নামে তাকে নিত্যরূপে রক্ষা করবার চেষ্টায় সতর্ক হয়ে থাকি। আমরা ইতিহাসের উপরকার মলাটটা পড়ি, ভিতরকার পাতাগুলো বাদ দিয়ে যাই, ভুলে যাই কোনো দেশেই সমাজগত বিশ্লিষ্টতার উপর রাষ্ট্রজাতিগত স্বাতন্ত্র্য আজ পর্যন্ত সংঘটিত ও সংরক্ষিত হয় নি। প্রজারা যেখানে বিভক্ত সেখানে ব্যক্তিবিশেষের একাধিপত্য তাদের বাইরের বন্ধনে বেঁধে রাখে। তাও বেশি দিন টেকে না, কেবলই হাতবদল হতে থাকে। যেখানে মানুষে মানুষে বিচ্ছেদ সেখানে কেবল রাষ্ট্রশক্তি নয়, বুদ্ধিবৃত্তিও শিথিল হয়ে যায়। সেখানে মাঝে মাঝে প্রতিভাশালীর অভ্যুদয় হয় না তা নয়, কিন্তু সেই প্রতিভার দান ধারণ ও পোষণ করবার উপযুক্ত আধার সর্বসাধারণের মধ্যে না থাকাতে কেবলই তা বিকৃত ও বিলুপ্ত হতে থাকে। ঐক্যের অভাবে মানুষ বর্বর হয়, ঐক্যের শৈথিল্যে মানুষ ব্যর্থ হয়, তার কারণ সমবায়ধর্ম মানুষের সত্যধর্ম, তার শ্রেষ্ঠতার হেতু।

ঐক্যবোধের উপদেশ উপনিষদে যেমন একান্তভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে এমন কোনো দেশে কোনো শাস্ত্রে হয় নি। ভারতবর্ষেই বলা হয়েছে, 'বিদ্বান্ ইতি সর্বান্তরস্থঃ স্বসংবিদ্রূপবিদ্ বিদ্বান্'—নিজেরই চৈতন্যকে সর্বজনের অন্তরস্থ করে যিনি জানেন তিনিই বিদ্বান্। অথচ এই ভারতবর্ষেই অসংখ্য কৃত্রিম অর্থহীন বিধি-বিধানের দ্বারা পরস্পরকে যেমন অত্যন্ত পৃথক করে জানা হয় পৃথিবীতে এমন আর কোনো দেশেই নেই। সুতরাং এ কথা বলতে হবে, ভারতবর্ষে এমন একটা বাহ্যস্থূলতা রয়ে গেছে যা ভারতবর্ষের অন্তরতর সত্যের বিরুদ্ধ, যার মর্মান্তিক আঘাত দীর্ঘকাল ধরে ভারতের ইতিহাসে প্রকাশ পাচ্ছে নানা দুঃখে দারিদ্র্যে অপমানে।

এই দ্বন্দ্বের মাঝখানে ভারতবর্ষের শাশ্বত বাণীকে জয়যুক্ত করতে কালে কালে যে মহাপুরুষেরা এসেছেন, বর্তমান যুগে রামমোহন রায় তাঁদেরই অগ্রণী। এর আগেও নিবিড়তম অন্ধকারের মধ্যে মাঝে মাঝে শোনা গিয়েছে ঐক্যবাণী। মধ্যযুগে অচল সংস্কারের পিঞ্জরদ্বার খুলে বেরিয়ে পড়েছেন প্রত্যুষের অতন্দ্রিত পাখি, গেয়েছেন তাঁরা আলোকের অভিবন্দন-গান সামাজিক জড়ত্বপুঞ্জের ঊর্ধ্ব আকাশে। তাঁরা সেই মুক্ত প্রাণের বার্তা এনেছেন, উপনিষদ যাকে সম্বোধন করে বলেছেন 'ব্রাত্যস্ত্বং প্রাণ'—হে প্রাণ, তুমি ব্রাত্য, তুমি সংস্কারে বিজড়িত স্থাবর নও। সেই মুক্তিদূতের মধ্যে একজন ছিলেন কবীর, তিনি নিজেকে ভারতপথিক বলে জানিয়েছেন। নানা জটিল জঙ্গলের মধ্যে এই ভারতপথকে যাঁরা দেখতে পেয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে আর-একজন ছিলেন দাদূ। তিনি বলেন—

ভাইরে ঐসা পংথ হমারা
দ্বৈপখরহিত পংথ গহি পূরা অবরণ এক অধারা।
ভাই রে, আমার পথ এই রকম, সে দুইপক্ষরহিত, বর্ণহীন, সে এক।

তিনি বলেছেন—

জাকোঁ মারণ জাইয়ে সোঈ ফিরি মারৈ,
জাকোঁ তারণ জাইয়ে সোঈ ফিরি তারৈ।
যাকে আমরা মারি সেই আমাদের ফিরে মারে, যাকে ত্রাণ
করি সেই আমাদের ফিরে ত্রাণ করে।

তিনি বলেছেন—

সব ঘট একৈ আতমা, ক্যা হিন্দু মুসলমান।

সেদিন আর-এক সাধু, ভারতের পথ যাঁর কাছে ছিল সুগোচর, তাঁর নাম রজ্জব, তিনি বলেন—

বুংদ বুংদ মিলি রস সিংধ হৈ, জুদা জুদা মরু ভায়।
অর্থাৎ বিন্দুর সঙ্গে বিন্দু যখন মেলে তখনই হয় রসসিন্ধু,
বিন্দুতে বিন্দুতে যখন পৃথক হয়ে যায় তখনই মরুভূমি প্রকাশ পায়।

এই রজ্জব বলেন—

হাথ জোড়ু গুরু সুঁ হোঁ মিলৈ হিন্দু মুসলমান।
গুরুর কাছে আমি করজোড় করছি যেন হিন্দু মুসলমান মিলে যায়।

এই ভারতপথিকেরা যে মিলনের কথা বলেছিলেন সে মিলন মনুষ্যত্বের সাধনায়, ভেদবুদ্ধির অহংকার থেকে মুক্তিলাভের সাধনায়, রাষ্ট্রীয় প্রয়োজন-সাধনায় নয়। এই ঐক্যের পথ যথার্থ ভারতের পথ। সেই পথের পথিক আধুনিক কালে রামমোহন রায়। তিনিও প্রয়োজনের দিক থেকে নয়, মানবাত্মার গভীরে যে মিলনের ধর্ম আছে সেই নিত্য আদর্শের দিক থেকে ভারতের ইতিহাসে শুভবুদ্ধিদ্বারা সংযুক্ত মানুষের এক মহদ্‌রূপ অন্তরে দেখেছিলেন। ভারতের উদার প্রশস্ত পন্থায় তিনি সকলকেই আহ্বান করেছেন, যে পন্থায় হিন্দু মুসলমান খৃস্টান সকলেই অবিরোধে মিলতে পারে। সেই বিপুল পন্থাই যদি ভারতের না হয়, যদি আচারের কাঁটার বেড়ায় বেষ্টিত সাম্প্রদায়িক শতখণ্ডতাই হয় ভারতের নিত্যপ্রকৃতিগত, তা হলে তো আমাদের বাঁচবার কোনো উপায় নেই। ঐ তো এসেছে মুসলমান, ঐ তো এসেছে খৃস্টান—

সাধন মাহি জোগ নহি জৈ, ক্যা সাধন পরমাণ।
ঐতিহাসিক সাধনায় এদের যদি যুক্ত করতে না পারি তা হলে
সাধনার প্রমাণ হবে কিসে?

এদের অঙ্গীভূত করে নেবার প্রাণশক্তি যদি ভারতের না থাকে পাথরের মতো কঠিন পিণ্ডীভূত হয়ে এদের বাইরে ঠেকিয়ে রাখাই যদি আমাদের ধর্ম হয়, তবে সেই পুঞ্জ পুঞ্জ অসংশ্লিষ্ট অনাত্মীয়তার নিদারুণ ভার সইবে কে?

প্রতিদিন কি এরা স্খলিত হয়ে পড়ছে না দলে দলে, সমাজের নিচের স্তরে কি গর্ত প্রসারিত হচ্ছে না। আপনার লোক যখন পর হয়ে যায় তখন সে যে নিদারুণ হয়ে ওঠে তার কি প্রমাণ পাচ্ছি নে? যাদের অবজ্ঞা করি তাদের আলগা করে রাখি, যাদের ছুঁই নে তাদের ধরতে পারি নে। আপনাকে পর করবার যে সহস্র পথ প্রশস্ত করে রেখেছি সেই পথ দিয়েই শনির যত চর দেশে প্রবেশ করেছে। আমাদের বিপুল জনতরণীর তক্তাগুলিকে সাবধানে ফাঁক ফাঁক করে রাখাকেই যদি ভারতের চিরকালীন ধর্ম বলে গণ্য করি, তা হলে বাইরের তরঙ্গগুলোকে শত্রু ঘোষণা করে কেন মিছে বিলাপ করা, তা হলে বিনাশের লবণাশ্রুসমুদ্রে তলিয়ে যাওয়াকেই ভারত-ইতিহাসের চরম লক্ষ্য বলে নিশ্চেষ্ট থাকাই শ্রেয়। সেচনী দিয়ে

ক্রমাগত জল সেঁচে সেঁচে কতদিন চলবে আমাদের জীর্ণ ভাগ্যের তরী বাওয়া?

আমাদের ইতিহাসের আধুনিক পর্বের আরম্ভ-কালেই এসেছেন রামমোহন রায়। তখন এ যুগকে কি বিদেশী কি স্বদেশী কেউ স্পষ্ট করে চিনতে পারে নি। তিনিই সেদিন বুঝেছিলেন, এ যুগের যে আহ্বান সে সুমহৎ ঐক্যের আহ্বান। তিনি জ্ঞানের আলোকে প্রদীপ্ত আপন উদার হৃদয় বিস্তার করে দেখিয়েছিলেন, সেখানে হিন্দু মুসলমান খৃস্টান কারও স্থানসংকীর্ণতা নেই। তাঁর সেই হৃদয় ভারতেরই হৃদয়, তিনি ভারতের সত্য পরিচয় আপনার মধ্যে প্রকাশ করেছেন। ভারতের সত্য পরিচয় সেই মানুষে যে মানুষের মধ্যে সকল মানুষের সম্মান আছে, স্বীকৃতি আছে।

সকল দেশেরই মধ্যে একটা বিরুদ্ধতার দ্বন্দ্ব দেখা যায়। এক ভাগে তার আপন শ্রেষ্ঠতাকে আপনি প্রতিবাদ, তার অন্ধতা অহমিকা দ্বারাই তার আত্মলাঘব: এই দিকটা অভাবার্থক, এই দিকে তার ক্ষতির বিভাগ, তার কৃষ্ণপক্ষের অংশ। আর-এক দিকে তার আলোক, তার নিহিতার্থ, তার চিরসত্য; এই দিকটাই ভাবার্থক, প্রকাশাত্মক। এই দিকে তার পরিচয় যদি ম্লান না হয়, নিঃশেষিত না হয়, তবেই সর্বকালে সে গৌরবান্বিত।

য়ুরোপের সকল দেশেই একদিন ডাইনির অস্তিত্ব বিশ্বাস করত। শত শত স্ত্রীলোক সেখানে নিরপরাধে পুড়ে মরেছে। কিন্তু এই অন্ধতার দিকটাই আন্তরিকভাবে য়ুরোপের একান্ত ছিল না। তাই লোকগণনায় এই বিশ্বাসের প্রসার পরিমাপ করে এর দ্বারা য়ুরোপকে চিনতে গেলে অবিচার হবে। একদিন য়ুরোপের ধর্মমূঢ়বুদ্ধি জিয়োর্ডানো ব্রুনোকে পুড়িয়ে মেরেছিল, কিন্তু সেদিন চিতায় জ্বলতে জ্বলতে একলা জিয়োর্ডানো দিয়েছিলেন য়ুরোপীয় চিত্তের পরিচয়, যে চিত্তকে সে যুগের সাম্প্রদায়িক জড়বুদ্ধি দল বেঁধে অস্বীকার করেছিল, কিন্তু যাকে আজ সর্বমানব সম্মানের সঙ্গে স্বীকার করে নিয়েছে। একদিন ইংরেজের সাহিত্যে, তার ইতিহাসে, ইংরেজের পরিচয় আমরা পেয়েছিলুম; দেখেছিলুম মানুষের প্রতি তার মৈত্রী, দাসপ্রথার 'পরে তার ঘৃণা, পরাধীনের মুক্তির জন্যে তার অনুকম্পা, ন্যায়বিচারের প্রতি তার নিষ্ঠা। আজ যদি ভারতের রাষ্ট্রাসন জুড়ে তার এই স্বভাবের নিষ্ঠুর প্রতিবাদ অজস্র দেখতে পাই তবু তার থেকে ইংরেজের চরম পরিচয় গ্রহণ করা সত্য হবে না। যে কারণেই হোক তার অভাবার্থক দিকটা প্রবল হয়ে উঠেছে, এসমস্ত তারই দুর্লক্ষণ। আজও ইংলন্ডে এমন মানুষ আছে ইংরেজ-স্বভাবের বিরুদ্ধগামী সমস্ত অন্যায় যাদের হৃদয়কে পীড়িত করছে। বস্তুত সব ইংরেজই যে ইংরেজ এ কথাটা মনে করাই ভুল। খাঁটি ইংরেজের সংখ্যা স্বল্প যদি-বা হয়, আর নিজের সমাজে তারা যদি-বা লাঞ্ছনা ভোগ করে, তবুও তারা সমস্ত ইংরেজেরই প্রতিনিধি।

তেমনি একদা যেদিন বাংলাদেশে প্রগাঢ় অন্ধতা, কৃত্রিমতা, সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতার মধ্যে রামমোহন রায়ের আগমন হল সেদিন এই বিমুখ দেশে তিনিই একলা ভারতের নিত্য পরিচয় বহন করে এসেছেন। তাঁর সর্বতোমুখী বুদ্ধি ও সর্বতঃপ্রসারিত হৃদয় সেদিনকার এই বাংলাদেশের অখ্যাত কোণে দাঁড়িয়ে সকল মানুষের জন্যে আসন পেতে দিয়েছিল। এ কথা মুক্তকণ্ঠে বলবার দিন এসেছে যে, যে আতিথ্যভ্রষ্ট আসন কৃপণঘরের রুদ্ধ কোণের জন্যে সে আসন নয়, যে আসনে সর্বজন অবাধে স্থান পেতে পারে সেই উদার আসনই চিরন্তন ভারতবর্ষের স্বরচিত: লক্ষ লক্ষ আচারবাদী তাকে যদি সংকুচিত করে, খণ্ড খণ্ড করে, সমস্ত

পৃথিবীর কাছে স্বদেশকে ধিক্‌কৃত করে ভারতসভ্যতার প্রতিবাদ করে তবু বলব এ কথা সত্য। মানুষের ঐক্যের বার্তা রামমোহন রায় একদিন ভারতের বাণীতেই ঘোষণা করেছিলেন, এবং তাঁর দেশবাসী তাঁকে তিরস্কৃত করেছিল— তিনি সকল প্রতিকূলতার মধ্যে দাঁড়িয়ে আমন্ত্রণ করেছিলেন মুসলমানকে, খৃস্টানকে, ভারতের সর্বজনকে হিন্দুর এক পঙ্‌ক্তিতে ভারতের মহা অতিথিশালায়। যে ভারত বলেছে—

> যস্তু সর্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি
> সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে।

> যিনি সকলের মধ্যে আপনাকে, আপনার মধ্যে সকলকে দেখেন, তিনি কাউকে ঘৃণা করেন না।

তাঁর মৃত্যুর পরে আজ একশত বৎসর অতীত হল। সেদিনকার অনেক কিছুই আজ পুরাতন হয়ে গেছে, কিন্তু রামমোহন রায় পুরাতত্ত্বের অস্পষ্টতায় আবৃত হয়ে যান নি। তিনি চিরকালের মতোই আধুনিক। কেননা তিনি যে কালকে অধিকার করে আছেন তার এক সীমা পুরাতন ভারতে, কিন্তু সেই অতীতকালেই তা আবদ্ধ হয়ে নেই—তার অন্য দিক চলে গিয়েছে ভারতের সুদূর ভাবীকালের অভিমুখে। তিনি ভারতের সেই চিত্তের মধ্যে নিজের চিত্তকে মুক্তি দিতে পেরেছেন যা জ্ঞানের পথে সর্বমানবের মধ্যে উন্মুক্ত। তিনি বিরাজ করছেন ভারতের সেই আগামী কালে, যে কালে ভারতের মহা ইতিহাস আপন সত্যে সার্থক হয়েছে, হিন্দু মুসলমান খৃস্টান মিলিত হয়েছে অখণ্ড মহাজাতীয়তায়। বায়ুপোতে অত্যূর্ধ্ব আকাশে যখন ওঠা যায় তখন দৃষ্টিচক্র যতদূর প্রসারিত হয়, তার এক দিকে থাকে যে দেশকে বহুদূরে অতিক্রম করে এসেছি, আর-এক দিক থাকে সম্মুখে যা এখনও আছে বহুযোজন দূরে। রামমোহন যে কালে বিরাজ করেন সে কাল তেমনি অতীতে অনাগতে পরিব্যাপ্ত, আমরা তাঁর সেই কালকে আজও উত্তীর্ণ হতে পারি নি।

আজ আমার অধিক বলবার শক্তি নেই, কেবল এই কথা মাত্র বলতে এসেছি যে, যদিও অজ্ঞানের অশক্তির জগদ্দল পাথর ভারতের বুকে চেপে আছে, লজ্জায় আমরা সংকুচিত, দুঃখে আমাদের দেহমন জীর্ণ, অপমানে আমাদের মাথা অবনত, বিদেশের পথিক আমাদের কলঙ্ক কুড়িয়ে নিয়ে দেশে দেশে নিন্দাপণ্যের ব্যাবসা চালাচ্ছে, তবু আমাদের সকল দুর্গতির উপরে সর্বোচ্চ আশার কথা এই যে, রামমোহন রায় এ দেশে জন্মেছেন, তাঁর মধ্যে ভারতের পরিচয়। তাঁকে দেশের বহুজনে সাম্প্রদায়িক ক্ষুদ্র অহমিকায় যদি অবজ্ঞা করে, আপন বলে স্বীকার না করে, তবুও চিরকালের ভারতবর্ষ তাঁকে গভীর অন্তরে নিশ্চিত স্বীকার করেছে। বর্তমান যুগ-রচনায় আজও তাঁর প্রভাব ক্রিয়াশালী, আজও তাঁর নীরব কণ্ঠ ভারতের অমর বাণীতে আহ্বান করছে তাঁকে—

> য একোঽবর্ণো বহুধা শক্তিযোগাৎ
> বর্ণান্‌ অনেকান্‌ নিহিতার্থো দধাতি
> বিচৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ স দেবঃ।

প্রার্থনা করছে—

> স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু॥

১৪ পৌষ ১৩৪০। রামমোহন-মৃত্যু-শতবার্ষিকীতে সভাপতির অভিভাষণ

২

আমাদের প্রাণ বিদ্রোহী। চারি দিকে জড়দানব তার প্রকাণ্ড শক্তি ও অসংখ্য বাহু বিস্তার করে বসে আছে। ক্ষুদ্র প্রাণ প্রতি মুহূর্তে নানা দিক থেকে তাকে নিরস্ত করে তবে আত্মপ্রকাশ করে। এই জড় তার চারি দিকে ক্লান্তির প্রাচীর তুলে তুলে তার প্রয়াসের পরিধিকে কেবলই সংকীর্ণ করে আনতে চায়। বারংবার এই প্রাচীরকে ভেঙে ভেঙে তবে প্রাণ আপন অধিকার রক্ষা করতে পারে। তাই আমাদের হৃৎপিণ্ড দিনে রাত্রে এক মুহূর্ত ছুটি নিতে পারে না, গুরুতর বস্তুপুঞ্জের নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে তার আক্রমণ ক্ষান্ত হলেই মৃত্যু।

প্রাণের এই নিত্য সচেষ্টতাতেই যেমন প্রাণের আত্মপ্রকাশ, মনেরও তাই। তার অনন্ত জিজ্ঞাসা। চার দিকে সত্যের রহস্য মূক হয়ে আছে। আপন শক্তিতে উত্তর আদায় করতে হয়। অল্প অনবধান হলেই ভুল উত্তর পাই। সেই ভুল উত্তরগুলিকে নিশ্চেষ্ট নিঃসংশয়ে স্বীকার করে নিলেই মনের সাংঘাতিক পরাভব। জিজ্ঞাসার শৈথিল্যেই মনের জড়ত্ব। যেমন জীবনীশক্তির নিরুদ্যমেই অস্বাস্থ্য, তাতেই যত রোগের উৎপত্তি, বিনাশের আয়োজন, তেমনি মননশক্তির অবসাদ ঘটলেই মানুষের জ্ঞানের রাজ্যে যত রকমের বিকার প্রবেশ করে। সত্যমিথ্যা ভালোমন্দ সমস্ত কিছুকেই বিনাপ্রশ্নে অলস ভীরু মন যখন মেনে নিতে থাকে তখনই মনুষ্যত্বের সকল প্রকার দুর্গতি। জড়ের মধ্যে যে অচল মূঢ়তা, মানুষের মন যখনই তার সঙ্গে আপোষে সন্ধি করে তখন থেকে জগতে মানুষ মন-মরা হয়ে থাকে, জড় রাজার খাজনা জুগিয়ে নিঃস্ব হয়ে পড়ে।

আমাদের দেশে একদিন মনের স্বরাজ গিয়েছে ধ্বংস হয়ে। পঙ্গু মনের ছিল না আত্মকর্তৃত্ব, প্রশ্ন করবার শক্তি ও ভরসা সে হারিয়েছিল। সে যা শুনেছে তাই মেনেছে, যে বুলি তার কানে দেওয়া হয়েছে সেই বুলিই সে আওড়িয়েছে। যখন কোনো উৎপাত এসে পড়েছে স্কন্ধে তখন তাকে বিধিলিপি বলে নিয়েছে মেনে। নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে নূতন প্রণালীতে বর্তমানকালীন সংসারসমস্যার সমাধান করা তার অধিকারবহির্ভূত বলে স্বীকার করার দ্বারা আত্মাবমাননায় তার সংকোচ ছিল না। মনের আত্মপ্রকাশের ধারা সেদিন এ দেশে অবরুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। দেশ তখন সামনের কালের দিকে চলে নি, পিছনের কালকেই ক্রমাগত প্রদক্ষিণ করেছে—চিন্তাশক্তি যেটুকু বাকি ছিল সে অনুসন্ধান করতে নয়, অনুসরণ করবার জন্যেই।

সুপ্তি যখন আবিষ্ট করে তখনই চুরি যাবার সময়। অন্তরের মধ্যে যখন অসাড়তা, বাইরের বিপদ তখনই প্রবল। চিত্তের মধ্যে যার স্বাধীনতা নেই বাইরের দিক থেকে সে কখনোই স্বাধীন হতে পারে না। অন্তরের দিকে সব কিছুকে যে অবিসম্বাদে মেনে নেয়, বাইরে অন্যায় প্রভুত্বকেও না মানবার শক্তি তার থাকে না—যে বুদ্ধি অসত্যকে ঠেকায় মনে, সেই বুদ্ধিই অমঙ্গলকে ঠেকায় বহিঃসংসারে—নির্জীব মন অন্তরে বাহিরে কোনো আক্রমণকেই ঠেকাতে পারে না। তাই সেদিনকার ভারতের ইতিহাসে বারে বারে দেখা গেল ভারতবর্ষ তার মর্মান্তিক পরাভবকে মেনে নিলে আর সেই সঙ্গে মেনে নিলে যা না-মানবার এমন হাজার হাজার জিনিস। এই-যে তার বাইরের দুর্দশার বোঝা পুঞ্জীভূত হয়ে উঠলো, এ তার অন্তরের অবুদ্ধির বোঝারই সামিল।

যখন আমাদের আর্থিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক শক্তি ক্ষীণতম, যখন আমাদের দৃষ্টিশক্তি মোহাবৃত, সৃষ্টিশক্তি আড়ষ্ট, বর্তমান যুগের কোনো প্রশ্নের নূতন উত্তর দেবার মতো বাণী যখন আমাদের ছিল না, আপন চিত্তদৈন্য সম্বন্ধে লজ্জা করবার মতো চেতনাও যখন দুর্বল, সেই দুর্গতির দিনেই রামমোহন রায়ের এ দেশে আবির্ভাব। প্রবল শক্তিতে তিনি আঘাত করেছিলেন সেই দুরবস্থার মূলে, যা মানুষের পরম সম্পদ স্বাধীনবুদ্ধিকে অবিশ্বাস করেছে। কিন্তু, তখন আমরা সেই দুরবস্থার কারণকেই পূজা করতে অভ্যস্ত, তাই সেদিন আমরাও তাঁকে শত্রু বলে দণ্ড উদ্যত করেছি। ডাক্তার বলেন, রোগ জিনিসটা দেহের অধিকার সম্বন্ধে দীর্ঘকালের দলিল দাখিল করলেও সে বাইরের আগন্তুক, স্বাস্থ্যতত্ত্বই দেহের অন্তর্নিহিত চিরন্তন সত্য। রামমোহন রায় তেমনি করেই বলেছিলেন আমাদের অজ্ঞানকে, আমাদের অন্ধতাকে কালের গণনায় সনাতন বলি, কিন্তু সত্যের দিক থেকে তাই আমাদের অনাত্মীয় আগন্তুক। তিনি দেখিয়েছিলেন, আমাদের দেশের অন্তরাত্মার মধ্যেই কোথায় আছে বিশুদ্ধ জ্ঞানের চিরপুরাতন চিরনূতন প্রতিষ্ঠা: মনের স্বাস্থ্যকে—আত্মার শক্তিকে—প্রবল করবার জন্যে, উজ্জ্বল করবার জন্যে, ভারতের একান্ত আপন যে সাধনসম্পদের ভাণ্ডার তারই দ্বার তিনি খুলে দিয়েছিলেন; সেদিনকার জনতা তাঁকে শত্রু বলে ঘোষণা করেছিল।

আজও কি রামমোহনকে আমরা শত্রু বলে অসম্মান করতে পারি। যার গৌরবে দেশ বিশ্বের কাছে আপন গৌরবের পরিচয় দিতে পারে এমন লোক কি আমাদের অনেক আছে। দেশের যথার্থ মহাপুরুষের নামে গৌরব করার অর্থই দেশের ভবিষ্যতের জন্যেই আশা করা। সে গৌরব প্রাদেশিক হলে, সাময়িক হলে, তার উপরে নির্ভর করা চলে না। সে গৌরব এমন হওয়া চাই সমস্ত পৃথিবী যার সমর্থন করে। রামমোহনের চিত্ত, তাঁর হৃদয়, স্থানিক ও ক্ষণিক পরিধিতে বদ্ধ ছিল না। যদি থাকত তবে দেশের সাধারণ লোকে অনায়াসে তাঁকে সমাদর করতে পারত। কারণ, যে মানদণ্ড আমাদের নিত্য ব্যবহারের দ্বারা সুপরিচিত তা বিশেষ দেশকালের, তা সর্বদেশ ও চিরন্তন কালের নয়। কিন্তু সেই পরিমাপের দ্বারা পরিমিত গৌরবের জোরে দেশ মাথা তুলতে পারবে না, সর্বদেশকালের সর্বলোকের কাছে তাকে আত্মপ্রকাশ করাতে পারবে না। তার মহত্ত্বকে নিম্নভূমিবর্তী জনতার আদর্শকে অনেক উপরে ছাড়িয়ে উঠতে হবে। তাতে করে বর্তমানকালের সাম্প্রতিক রুচি বিশ্বাস ও আচার তাকে নিষ্ঠুরভাবে আঘাত করতে পারে, কিন্তু তার চেয়ে বড়ো আঘাত চিরন্তন আদর্শের আঘাত। দিঙ্‌নাগাচার্যের স্থূলহস্তের আঘাত, সেই উপস্থিত মুহূর্তে নিজেই সদ্যোধ্বংসোন্মুখ, কিন্তু ভারতীয় সূক্ষ্ম ইঙ্গিতের আঘাত শাশ্বত কালের। সে আঘাতে যারা বিলুপ্ত হয়েছে তাদের সমসাময়িক জয়ধ্বনির তারস্বর মহাকালের মহাকাশে ক্ষীণতম স্পন্দনও রাখে নি।

ক্ষণিক অনাদরের তুফানে যাদের নাম তলিয়ে যায় রামমোহন রায় তো সেই শ্রেণীর লোক নন। বিস্মৃতি বা উপেক্ষার কুহেলিকা তাঁর স্মৃতিকে কিছুকালের জন্য আচ্ছন্ন রাখলেও সে আবরণ কেটে যাবেই। দেশে আজ নবজাগরণের হাওয়া যখন দিয়েছে, সরে যাচ্ছে বাষ্পের অন্তরাল, তখন সর্বপ্রথমেই দেখা যাবে রামমোহনের মহোচ্চ মূর্তি। নবযুগের উদ্‌বোধনের বাণী দেশের মধ্যে তিনিই তো প্রথম এনেছিলেন, সেই বাণী এই দেশেরই পুরাতন মন্ত্রের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল; সেই মন্ত্রে তিনি বলেছিলেন 'অপাবৃণু', হে সত্য, তোমার আবরণ অপাবৃত করো। ভারতের এই বাণী কেবল স্বদেশের জন্যে নয়, সকল দেশের সকল কালের জন্যে।

এই কারণেই ভারতবর্ষের সত্য যিনি প্রকাশ করবেন তাঁরই প্রকাশের ক্ষেত্র সর্বজনীন। রামমোহন রায় সেই সর্বকালের মানুষ। আমরা গর্ব করতে পারি স্থানিক ও সাময়িক ক্ষুদ্র মাপের বড়োলোককে নিয়ে, কিন্তু যাঁদের নিয়ে গৌরব করতে পারি তাঁরা ‘পূর্বাপরৌ তোয়নিধী বগাহ্য স্থিতঃ পৃথিব্যা ইব মানদণ্ডঃ’। তাঁদের মহিমা পূর্ব এবং পশ্চিম সমুদ্রকে স্পর্শ করে আছে।

ভারতবর্ষে রামমোহন রায়ের যাঁরা পূর্ববর্তী ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম কবীর নিজেকে বলেছিলেন ভারতপথিক। ভারতকে তিনি দেখতে পেয়েছিলেন মহাপথরূপে। এই পথে ইতিহাসের আদিকাল থেকে চলমান মানবের ধারা প্রবাহিত। এই পথে স্মরণাতীত কালে এসেছিল যারা, তাদের চিহ্ন ভূগর্ভে। এই পথে এসেছিল হোমাগ্নি বহন করে আর্যজাতি। এই পথে একদা এসেছিল মুক্তিতত্ত্বের আশায় চীনদেশ থেকে তীর্থযাত্রী। আবার কেউ এসেছে সাম্রাজ্যের লোভে, কেউ এল অর্থকামনায়। সবাই পেয়েছে আতিথ্য। এ ভারতে পথের সাধনা, পৃথিবীর সকল দেশের সঙ্গে যাওয়া-আসার নেওয়া-দেওয়ার সম্বন্ধ, এখানে সকলের সঙ্গে মেলবার সমস্যা সমাধান করতে হবে। এই সমস্যার সমাধান যতক্ষণ না হয়েছে ততক্ষণ আমাদের দুঃখের অন্ত নেই। এই মিলনের সত্য সমস্ত মানুষের চরম সত্য, এই সত্যকে আমাদের ইতিহাসে অঙ্গীভূত করতে হবে। রামমোহন রায় ভারতের এই পথের চৌমাথায় এসে দাঁড়িয়েছিলেন, ভারতের যা সর্বশ্রেষ্ঠ দান তাই নিয়ে। তাঁর হৃদয় ছিল ভারতের হৃদয়ের প্রতীক—সেখানে হিন্দু মুসলমান খৃস্টান সকলে মিলেছিল তাদের শ্রেষ্ঠ সত্তায়, সেই মেলবার আসন ছিল ভারতের মহা ঐক্যতত্ত্ব, একমেবাদ্বিতীয়ম্। আধুনিক যুগে মানবের ঐক্যবাণী যিনি বহন করে এনেছেন, তাঁরই প্রেরণায় উদ্‌বুদ্ধ হয়ে ভারতের আধুনিক কবি ভারতপথের যে গান গেয়েছে তাই উদ্‌ধৃত করে রামমোহনের প্রশস্তি শেষ করি—

হে মোর চিত্ত পুণ্য তীর্থে জাগো রে ধীরে
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।...

হেথা একদিন বিরামবিহীন মহা-ওংকারধ্বনি,
হৃদয়তন্ত্রে একের মন্ত্রে উঠেছিল রনরনি।
তপস্যাবলে একের অনলে বহুরে আহুতি দিয়া
বিভেদ ভুলিল, জাগায়ে তুলিল একটি বিরাট হিয়া।
সেই সাধনার সে আরাধনার যজ্ঞশালার খোলা আজি দ্বার,
হেথায় সবারে হবে মিলিবারে আনতশিরে
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে॥

এসো হে আর্য, এসো অনার্য, হিন্দু মুসলমান—
এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ, এসো এসো খৃস্টান।
এসো ব্রাহ্মণ, শুচি করি মন ধরো হাত সবাকার।
এসো হে পতিত, হোক অপনীত সব অপমানভার।
মার অভিষেকে এসো এসো ত্বরা,
মঙ্গলঘট হয় নি যে ভরা,
সবার-পরশে-পবিত্র-করা তীর্থনীরে—
আজি ভারতের মহামানবের সাগরতীরে॥

রামমোহন-মৃত্যু-শতবার্ষিকীর শেষ বক্তৃতা

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

পূজনীয় পিতৃদেবের আজ অষ্টাশীতিতম সাংবৎসরিক জন্মোৎসব। এই উৎসবদিনের পবিত্রতা আমরা বিশেষভাবে হৃদয়ের মধ্যে গ্রহণ করিব।

বহুতর দেশকে সঞ্জীবনস্পর্শে উর্বর করিয়া, পুণ্যধারায় বহুতর গ্রামনগরীর পিপাসা মিটাইয়া, অবশেষে জাহ্নবী যেখানে মহাসমুদ্রের প্রত্যক্ষসম্মুখে আপন সুদীর্ঘ পর্যটন অতলস্পর্শ-শান্তির মধ্যে সমাপ্ত করিতে উদ্যত হন, সেই সাগরসংগমস্থল তীর্থস্থান। পিতৃদেবের পূতজীবন অদ্য আমাদের সম্মুখে সেই তীর্থস্থান অবারিত করিয়াছে। তাঁহার পুণ্যকর্মরত দীর্ঘজীবনের একাগ্রধারা অদ্য যেখানে তটহীন সীমাশূন্য বিপুল বিরামসমুদ্রের সম্মুখীন হইয়াছে সেইখানে আমরা ক্ষণকালের জন্য নতশিরে স্তব্ধ হইয়া দণ্ডায়মান হইব। আমরা চিন্তা করিয়া দেখিব, বহুকাল পূর্বে একদিন স্বর্গ হইতে কোন্ শুভ সূর্যকিরণের আঘাতে অকস্মাৎ সুপ্তি হইতে জাগ্রত হইয়া কঠিন তুষারবেষ্টনকে অশ্রুধারায় বিগলিত করিয়া এই জীবন আপন কল্যাণযাত্রা আরম্ভ করিয়াছিল—তখন ইহার ক্ষীণ স্বচ্ছ ধারা কখনও আলোক কখনও অন্ধকার, কখনও আশা কখনও নৈরাশ্যের মধ্য দিয়া দুর্গমপথ কাটিয়া চলিতেছিল। বাধা প্রতিদিন বৃহদাকার হইয়া দেখা দিতে লাগিল—কঠিন প্রস্তরপিণ্ডসকল পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল—কিন্তু সে-সকল বাধায় স্রোতকে রুদ্ধ না করিতে প্যারিয়া দ্বিগুণবেগে উদ্‌বেল করিয়া তুলিল—দুঃসাধ্য দুর্গমতা সেই দুর্বার বলের নিকট মস্তক নত করিয়া দিল। এই জীবনধারা ক্রমশ বৃহৎ হইয়া, বিস্তৃত হইয়া, লোকালয়ের মধ্যে অবতরণ করিল; দুই কূলকে নবজীবনে অভিষিক্ত করিয়া চলিল; বাধা মানিল না, বিশ্রাম করিল না, কিছুতেই তাহাকে লক্ষ্য হইতে বিক্ষিপ্ত করিয়া দিল না—অবশেষে আজ সেই একনিষ্ঠ অনন্যপরায়ণ জীবনস্রোত সংসারের দুই কূলকে আচ্ছন্ন করিয়া, অতিক্রম করিয়া উঠিয়াছে—আজ সে তাহার সমস্ত চেষ্টা, সমস্ত চাঞ্চল্যকে পরমপরিণামের সম্মুখে প্রশান্ত করিয়া পরিপূর্ণ আত্মবিসর্জনের দিকে আপনাকে প্রসারিত করিয়াছে—অনন্ত জীবনসমুদ্রের সহিত সার্থক জীবনধারার এই সুগম্ভীর সম্মিলনদৃশ্য অদ্য আমাদের ধ্যাননেত্রের সম্মুখে উদ্ঘাটিত হইয়া আমাদিগকে ধন্য করুক।

অমৃতপিপাসা ও অমৃতসন্ধানের পথে ঐশ্বর্য একটি প্রধান অন্তরায়। সামান্য সোনার প্রাচীর উচ্চ হইয়া উঠিয়া আমাদের দৃষ্টি হইতে অনন্ত আকাশের অমৃত-আলোককে রুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইতে পারে। ধনসম্পদের মধ্যেই দীনহৃদয় আপনার সার্থকতা উপলব্ধি করিতে থাকে—সে বলে, এই তো আমি কৃতার্থ হইয়াছি, দশে আমার স্তব করিতেছে, দেশে আমার প্রতাপ বিকীর্ণ হইতেছে, বাহিরে আমার আড়ম্বর অভ্রভেদ করিতেছে, ঘরে আমার আরামশয়ন প্রতিদিন স্তরে স্তরে রাশীকৃত হইয়া উঠিতেছে, আমার আর কী চাই। হায় রে দরিদ্র, নিখিল মানবের অন্তরাত্মা যখন ক্রন্দন করিয়া উঠিয়াছে—যাহাতে আমি অমর না হইব, তাহা লইয়া আমি কী করিব—‘যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাম্’—সপ্তলোক যখন অন্তরীক্ষে ঊর্ধ্বকররাজি প্রসারিত করিয়া প্রার্থনা করিতেছে, আমাকে সত্য দাও, আলোক দাও, অমৃত দাও, ‘অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মামৃতং গময়’—তখন তুমি বলিতেছ আমার ধন আছে, আমার মান আছে, আমার আরাম আছে, আমি প্রভু, আমি অধিপতি, আমার আর কী চাই! ঐশ্বর্যের ইহাই

বিড়ম্বনা— দীনাত্মার কাছে ঐশ্বর্যই চরমসার্থকতার রূপ ধারণ করে। অদ্যকার উৎসবে আমরা যাঁহার মাহাত্ম্য স্মরণ করিবার জন্য সমবেত হইয়াছি—একদা প্রথম যৌবনেই তাঁহার অধ্যাত্মদৃষ্টি এই কঠিন ঐশ্বর্যের দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর অতিক্রম করিয়া অনন্তের দিকে উন্মীলিত হইয়াছিল—যখন তিনি ধনমানের দ্বারা নীরন্ধ্র ভাবে আবৃত আচ্ছন্ন ছিলেন, তখনই ধনসম্পদের স্থূলতম আবরণ ভেদ করিয়া, স্তাবকগণের বন্দনাগানকে অধঃকৃত করিয়া, আরাম-আমোদ-আড়ম্বরের ঘন যবনিকা বিচ্ছিন্ন করিয়া এই অমৃতবাণী তাঁহার কর্ণে কেমন করিয়া প্রবেশলাভ করিল যে, 'ঈশা বাস্যমিদং সর্বম্'—যাহা কিছু সমস্তকেই ঈশ্বরের দ্বারা আচ্ছন্ন দেখিবে, ধনের দ্বারা নহে, স্বার্থের দ্বারা নহে, আত্মাভিমানের দ্বারা নহে—যিনি 'ঈশানং ভূতভব্যস্য' —যিনি আমাদের অনন্তকালের ঈশ্বর, আমাদের ভূতভবিষ্যতের প্রভু—তাঁহাকে এই ধনিসন্তান কেমন করিয়া মুহূর্তের মধ্যে ঐশ্বর্যপ্রভাবের ঊর্ধ্বে, সমস্ত প্রভুত্বের উচ্চে আপনার একমাত্র প্রভু বলিয়া প্রত্যক্ষ করিতে পারিলেন—সংসারের মধ্যে তাঁহার নিজের প্রভুত্ব, সমাজের মধ্যে তাঁহার ধনমর্যাদার সম্মান, তাঁহাকে অন্ধ করিয়া রাখিতে পারিল না।

আবার যেদিন এই প্রভূত ঐশ্বর্য অকস্মাৎ এক দুর্দিনের বজ্রাঘাতে বিপুল আয়োজন আড়ম্বর লইয়া তাঁহার চতুর্দিকে সশব্দে ভাঙিয়া পড়িতে লাগিল—ঋণ যখন মুহূর্তের মধ্যেই বৃহদাকার ধারণ করিয়া তাঁহার গৃহদ্বার, তাঁহার সুখসমৃদ্ধি, তাঁহার অশনবসন, সমস্তই গ্রাস করিবার উপক্রম করিল— তখনও পদ্ম যেমন আপন মৃণালবৃন্ত দীর্ঘতর করিয়া জলপ্লাবনের ঊর্ধ্বে আপনাকে সূর্যকিরণের দিকে নির্মল সৌন্দর্যে উন্মেষিত করিয়া রাখে, তেমনি করিয়া তিনি সমস্ত বিপদ্‌বন্যার ঊর্ধ্বে আপনার অম্লানহৃদয়কে ধ্রুবজ্যোতির দিকে উদ্‌ঘাটিত করিয়া রাখিলেন। সম্পদ যাঁহাকে অমৃতলাভ হইতে তিরস্কৃত করিতে পারে নাই, বিপদ্‌ও তাঁহাকে অমৃতসঞ্চয় হইতে বঞ্চিত করিতে পারিল না। সেই দুঃসময়কেই তিনি আত্মজ্যোতির দ্বারা সুসময় করিয়া তুলিয়াছিলেন—যখন তাঁহার ধনসম্পদ ধূলিশায়ী তখনই তিনি তাঁহার দৈন্যের ঊর্ধ্বে দণ্ডায়মান হইয়া পরমাত্মসম্পদ্‌বিতরণের উপলক্ষে সমস্ত ভারতবর্ষকে মুহুর্মুহু আহ্বান করিতেছিলেন। সম্পদের দিনে তিনি ভুবনেশ্বরের দ্বারে রিক্ত হস্তে ভিক্ষু হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, বিপদের দিনে তিনি আত্মৈশ্বর্যের গৌরবে ব্রহ্মসত্র খুলিয়া বিশ্বপতির প্রসাদসুধাবণ্টনের ভারগ্রহণ করিয়া ছিলেন।

ঐশ্বর্যের সুখশয্যা হইতে তুলিয়া লইয়া ধর্ম ইঁহাকে তাহার পথের মধ্যে দাঁড় করাইয়া দিল—'ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি'—কবিরা বলেন, সেই পথ ক্ষুরধারনিশিত অতি দুর্গম পথ। লোকাচারপ্রচলিত চিরাভ্যস্ত ধর্ম, আরামের ধর্ম, তাহা অন্ধভাবে, জড়ভাবেও পালন করিয়া যাওয়া চলে, এবং তাহা পালন করিয়া লোকের নিকট সহজেই যশোলাভ করিতে পারা যায়। ধর্মের সেই আরাম, সেই সম্মানকেও পিতৃদেব পরিহার করিয়াছিলেন। ক্ষুরধারনিশিত দুরতিক্রম্য পথেই তিনি নির্ভয়ে পদনিক্ষেপ করিলেন। লোকসমাজের আনুগত্য করিতে গিয়া তিনি আত্মবিদ্রোহী, আত্মঘাতী হইলেন না।

ধনিগৃহে যাঁহাদের জন্ম, পৈতৃককাল হইতেই সমাজের নিকট সম্মানলাভে যাঁহারা অভ্যস্ত, সমাজপ্রচলিত সংস্কারের নিবিড়ব্যূহ ভেদ করিয়া নিজের অন্তর্লব্ধ সত্যের পতাকাকে শত্রুমিত্রের ধিক্কার লাঞ্ছনা ও প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে অবিচলিত দৃঢ়মুষ্টিতে ধারণ করিয়া রাখা তাঁহাদের পক্ষে কোনোমতেই সহজ নহে— বিশেষত

বৈষয়িক সংকটের সময় সকলের আনুকূল্য যখন অত্যাবশ্যক হইয়া উঠে তখন তাহা যে কিরূপ কঠিন, সে কথা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। সেই তরুণবয়সে, বৈষয়িক দুর্যোগের দিনে, সম্ভ্রান্তসমাজে তাঁহার যে বংশগত প্রভূত প্রতিপত্তি ছিল তাহার প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া, পিতৃদেব ভারতবর্ষের ঋষিবন্দিত চিরন্তন ব্রহ্মের, সেই অপ্রতিম দেবাদিদেবের আধ্যাত্মিক পূজা প্রতিকূল সমাজের নিকট মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিলেন।

তাহার পরে তাঁহার জীবনে আর-এক গুরুতর সংগ্রামের দিন উপস্থিত হইল। সকলেই জানেন, বৈচিত্র্যই জগতে ঐক্যকে প্রমাণ করে—বৈচিত্র্য যতই সুনির্দিষ্ট হয়, ঐক্য ততই সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। ধর্মও সেইরূপ নানা সমাজের ইতিহাসকে আশ্রয় করিয়া, নানা বিভিন্নকণ্ঠে নানা বিচিত্র আকারে এক নিত্যসত্যকে চারি দিক হইতে সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করিতেছে। ভারতবর্ষ বিশেষ সাধনায় বিশেষভাবে যাহা লাভ করিয়াছে, তাহার ভারতবর্ষীয় আকার বিলুপ্ত করিয়া, তাহাকে ভারতবর্ষের ইতিহাস হইতে উৎপাটিত করিয়া, তাহাকে অন্যদেশীয় আকৃতি-প্রকৃতির সহিত মিশ্রিত করিয়া দিবার চেষ্টা করিলে জগতের ঐক্যমূলক বৈচিত্র্যের ধর্মকে লঙ্ঘন করা হয়। প্রত্যেক লোক যখন আপনার প্রকৃতি-অনুসারে পরিপূর্ণ উৎকর্ষ লাভ করে তখনই সে মনুষ্যত্বলাভ করে—সাধারণ মনুষ্যত্ব ব্যক্তিগত বিশেষত্বের ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত। মনুষ্যত্ব হিন্দুর মধ্যে এবং খৃস্টানের মধ্যে বস্তুত একই, তথাপি হিন্দু-বিশেষত্ব মনুষ্যত্বের একটি বিশেষ সম্পদ, এবং খৃস্টান-বিশেষত্বও মনুষ্যত্বের একটি বিশেষ লাভ—তাহার কোনোটা সম্পূর্ণ বর্জন করিলে মনুষ্যত্ব দৈন্যপ্রাপ্ত হয়। ভারতবর্ষের যাহা শ্রেষ্ঠধন তাহাও সার্বভৌমিক, য়ুরোপের যাহা শ্রেষ্ঠধন তাহাও সার্বভৌমিক; তথাপি ভারতবর্ষীয়তা এবং য়ুরোপীয়তা উভয়ের স্বতন্ত্র সার্থকতা আছে বলিয়া উভয়কে একাকার করিয়া দেওয়া চলে না। মেঘ আকাশ হইতে জলবর্ষণ করে এবং সরোবর ভূতলে থাকিয়া জলদান করে—যদিও দানের সামগ্রী একই, তথাপি এই পার্থক্যবশতই মেঘ আপন প্রকৃতি-অনুসারে বিশেষভাবে ধন্য এবং সরোবরও আপন প্রকৃতি-অনুসারে বিশেষভাবে কৃতার্থ। ইহারা উভয়ে এক হইয়া গেলে জলের পরিমাণ মোটের উপর কমে না, কিন্তু জগতে ক্ষতির কারণ ঘটে।

তরুণ ব্রাহ্মসমাজ যখন পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার প্রভাবে এই কথা ভুলিয়াছিল, যখন ধর্মের স্বদেশীয় রূপ রক্ষা করাকে সে সংকীর্ণতা বলিয়া জ্ঞান করিত, যখন সে মনে করিয়াছিল বিদেশীয় ইতিহাসের ফল ভারতবর্ষীয় শাখায় ফলাইয়া তোলা সম্ভবপর এবং সেই চেষ্টাতেই যথার্থভাবে ঔদার্যরক্ষা হয়, তখন পিতৃদেব সার্বভৌমিক ধর্মের স্বদেশীয় প্রকৃতিকে একটা বিমিশ্রিত একাকারত্বের মধ্যে বিসর্জন দিতে অস্বীকার করিলেন—ইহাতে তাঁহার অনুবর্তী অসামান্যপ্রতিভাশালী ধর্মোৎসাহী অনেক তেজস্বী যুবকের সহিত তাঁহার বিচ্ছেদ ঘটিল। এই বিচ্ছেদ স্বীকার করিতে যে দৃঢ়তা, যে সাহস, যে বলের প্রয়োজন হয়, সমস্ত মতামতের কথা বিস্মৃত হইয়া আজ তাহাই যেন আমরা স্মরণ করি। আধুনিক হিন্দুসমাজের প্রচলিত লোকাচারের প্রবল প্রতিকূলতার মুখে আপন অনুবর্তী সমাজের ক্ষমতাশালী সহায়কগণকে পরিত্যাগ করিয়া নিজেকে সকল দিক হইতেই রিক্ত করিতে কে পারে, যাঁহার অন্তঃকরণ জগতের আদিশক্তির অক্ষয় নির্ঝরধারায় অহরহ পূর্ণ হইয়া না উঠিতেছে।

ইঁহাকে যেমন আমরা সম্পদে-বিপদে অভয়-আশ্রয়ে অবিচলিত দেখিয়াছি,

তেমনি একবার বর্তমান সমাজের প্রতিকূলে, আর-একবার হিন্দুসমাজের অনুকূলে তাঁহাকে সত্যে বিশ্বাসে দৃঢ় থাকিতে দেখিলাম—দেখিলাম, উপস্থিত গুরুতর ক্ষতির আশঙ্কা তাঁহাকে টলাইতে পারিল না। হিন্দুসমাজের মধ্যে তিনি পরম দুর্দিনেও একাকী দাঁড়াইয়াছিলেন, ব্রাহ্মসমাজে তিনি নব আশা, নব উৎসাহের অভ্যুদয়ের মুখে পুনর্বার সমস্ত ত্যাগ করিয়া একাকী দাঁড়াইলেন। তাঁহার কেবল এই প্রার্থনা রহিল, 'মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্যাং মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোৎ'—আমি ব্রহ্মকে ত্যাগ করিলাম না, ব্রহ্ম আমাকে ত্যাগ না করুন।

ধনসম্পদের স্বর্ণস্তূপরচিত ঘনান্ধকার ভেদ করিয়া নবযৌবনের অপরিতৃপ্ত প্রবৃত্তির পরিবেষ্টনের মধ্যে দিব্যজ্যোতি যাঁহার ললাটস্পর্শ করিয়াছিল, ঘনীভূত বিপদের ভ্রূকুটিকুটিল রুদ্রচ্ছায়ায় আসন্ন দারিদ্র্যের উদ্যত বজ্রদণ্ডের সম্মুখেও ঈশ্বরের প্রসন্ন মুখচ্ছবি যাঁহার অনিমেষ অন্তর্দৃষ্টির সম্মুখে অচঞ্চল ছিল, দুর্দিনের সময়েও সমস্ত লোকভয় অতিক্রম করিয়া যাঁহার কর্ণে ধর্মের 'মা ভৈঃ' বাণী সুস্পষ্ট ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছিল বলবুদ্ধি দলপুষ্টির মুখে যিনি বিশ্বাসের বলে সমস্ত সহায় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া নিঃসংকোচে পরমসহায়ের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, অদ্য তাঁহার পুণ্যচেষ্টাভূয়িষ্ঠ সুদীর্ঘ জীবনদিনের সায়াহ্নকাল সমাগত হইয়াছে। অদ্য তাঁহার ক্লান্তকণ্ঠের স্বর ক্ষীণ, কিন্তু তাঁহার সম্পূর্ণপ্রায় জীবনের নিঃশব্দবাণী সুস্পষ্টতর; অদ্য তাঁহার ইহজীবনের কর্ম সমাপ্ত, কিন্তু তাঁহার জীবনব্যাপী কর্মচেষ্টার মূলদেশ হইতে যে একাগ্রনিষ্ঠা ঊর্ধ্বলোকে উঠিয়াছে তাহা আজ নিস্তব্ধভাবে প্রকাশমান। অদ্য তিনি তাঁহার এই বৃহৎ সংসারের বহির্দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। কিন্তু সংসারের সমস্ত সুখদুঃখ বিচ্ছেদমিলনের মধ্যে যে অচলা শান্তি জননীর আশীর্বাদের ন্যায় চিরদিন তাঁহার অন্তরে ধ্রুব হইয়া ছিল, তাহা দিনান্তকালের রমণীয় সূর্যাস্তচ্ছটার ন্যায় অদ্য তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া উদ্‌ভাসিত। কর্মশালায় তিনি তাঁহার জীবনেশ্বরের আদেশপালন করিয়া অদ্য বিরামশালায় তিনি তাঁহার হৃদয়েশ্বরের সহিত নির্বাধমিলনের পথে যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। এই পুণ্যক্ষণে আমরা তাঁহাকে প্রণাম করিবার জন্য, তাঁহার সার্থক-জীবনের শান্তিসৌন্দর্যমণ্ডিত শেষ রশ্মিচ্ছটা মস্তক পাতিয়া গ্রহণ করিবার জন্য এখানে সমাগত হইয়াছি।

বন্ধুগণ, যাঁহার জীবন আপনাদের জীবনশিখাকে ক্ষণে ক্ষণে উজ্জ্বল করিয়াছে, যাঁহার বাণী অবসাদের সময় আপনাদিগকে বল ও বিষাদের সময় আপনাদিগকে সান্ত্বনা দিয়াছে তাঁহার জন্মদিনকে উৎসবের দিন করিয়া আপনারা ভক্তিকে চরিতার্থ করিতে আসিয়াছেন—এইখানে আমি পুত্রসম্বন্ধ লইয়া এই উৎসবদিনে যদি ক্ষণকালের জন্য পিতার নিকট বিশেষভাবে উপস্থিত হই, তবে আমাকে মার্জনা করিবেন। সন্নিকটবর্তী মহাত্মাকে সমগ্রভাবে সম্পূর্ণভাবে দেখিবার অবসর আত্মীয়দের প্রায় ঘটে না। সংসারের সম্বন্ধ—বিচিত্র সম্বন্ধ, বিচিত্র স্বার্থ, বিচিত্র মত, বিচিত্র প্রবৃত্তি—ইহার দ্বারা বিচারশক্তির বিশুদ্ধতা রক্ষা করা কঠিন হয়, ছোটো জিনিস বড়ো হইয়া উঠে, অনিত্য জিনিস নিত্য জিনিসকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে, সংসারের নানা ঘাতপ্রতিঘাতে প্রকৃত পরিচয় প্রত্যহ খণ্ডিত হইয়া যায়। এইজন্যই পিতৃদেবের এই জন্মদিনের উৎসব তাঁহার আত্মীয়দের পক্ষে একটি বিশেষ শুভ অবসর। যে পরিমাণ দূরে দাঁড়াইলে মহত্ত্বকে আদ্যোপান্ত অখণ্ড দেখিতে পাওয়া যায়, অদ্যকার এই উৎসবের সুযোগে বাহিরের ভক্তমণ্ডলীর সহিত একাসনে বসিয়া আমরা সেই পরিমাণ দূরে আসিব, তাঁহাকে ক্ষুদ্র সংসারের সমস্ত

তুচ্ছ সম্বন্ধজাল হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিব, আমাদের সংকীর্ণ জীবনের প্রাত্যহিক ব্যবহারোৎক্ষিপ্ত সমস্ত ধূলিরাশিকে অপসারিত করিয়া তাঁহাকে বৃহৎ আকাশের মধ্যে, নির্মল শান্তির মধ্যে, দেবপ্রসাদের অক্ষুণ্ন আনন্দরশ্মির মধ্যে, তাঁহার যথার্থ মহিমায় তাঁহাকে তাঁহার জীবনের নিত্যপ্রতিষ্ঠার উপরে সমাসীন দেখিব। সংসারের আবর্তে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া যত বিদ্রোহ, যত চপলতা, যত অন্যায় করিয়াছি, অদ্য তাহার জন্য তাঁহার শ্রীচরণে একান্তচিত্তে ক্ষমা প্রার্থনা করিব—আজ তাঁহাকে আমাদের সংসারের, আমাদের সর্বপ্রয়োজনের অতীত করিয়া তাঁহাকে বিশ্বভুবনের ও বিশ্বভুবনেশ্বরের সহিত বৃহৎ নিত্যসম্বন্ধে যুক্ত করিয়া দেখিব এবং তাঁহার নিকট এই আশীর্বাদ প্রার্থনা করিব যে, যে চিরজীবনের ধনকে তিনি নিজের জীবনের মধ্যে সঞ্চিত করিয়াছেন সেই সঞ্চয়কেই যেন আমরা সর্বপ্রধান পৈতৃক সম্পত্তি বলিয়া গণ্য করি, তাঁহার জীবনের দৃষ্টান্ত যেন আমাদিগকে ধনসম্পদের অন্ধতা হইতে রক্ষা করে, বিপদের বিভীষিকা হইতে উদ্ধার করে, বিশ্বাসের দৃঢ়তার মধ্যে আমাদিগকে ধারণ করিয়া রাখে এবং তিনি ঋষিদের যে মন্ত্র আমাদের কর্ণে ধ্বনিত করিয়াছেন, তাহা যেন কোনো আরামের জড়ত্বে, কোনো নৈরাশ্যের অবসাদে বিস্মৃত না হই—

মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্যাং মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোৎ
অনিরাকরণমস্তু অনিরাকরণং মেঽস্তু।

বন্ধুগণ, ভ্রাতৃগণ, এই সপ্তাশীতিবর্ষীয় জীবনের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আনন্দিত হও, আশান্বিত হও। ইহা জানো যে, ‘সত্যমেব জয়তে নানৃতম্’; ইহা জানো যে, ধর্মই ধর্মের সার্থকতা। ইহা জানো যে, আমরা যাহাকে সম্পদ বলিয়া উন্মত্ত হই তাহা সম্পদ নহে; যাহাকে বিপদ বলিয়া ভীত হই তাহা বিপদ নহে; আমাদের অন্তরাত্মা সম্পদ-বিপদের অতীত যে পরমা শান্তি, তাহাকে আশ্রয় করিবার অধিকারী। ‘ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ’—সমস্ত জীবন দিয়া ভূমাকেই জানিতে ইচ্ছা করো, এবং সমস্ত জীবনের মধ্যে ভূমাকেই সপ্রমাণ করো। এই প্রার্থনা করো, ‘আবিরাবীর্ম এধি’—হে স্বপ্রকাশ, আমার নিকটে প্রকাশিত হও। আমার নিকটে প্রকাশিত হইলে সেই প্রকাশ আমাকে অতিক্রম করিয়া সমস্ত মানবের নিকট সহজে দীপ্যমান হইয়া উঠিবে—এইরূপে আমার জীবন সমস্ত মানবের নিত্য-জীবনের মধ্যে উৎসর্গীকৃত হইয়া থাকিবে; আমার এই কয়দিনের মানবজন্ম চিরদিনের জন্য সার্থক হইবে।[১]

২

হে পরমপিতঃ, হে পিতৃতমঃ পিতৃণাম্, এ সংসারে যাঁহার পিতৃভাবের মধ্য দিয়া তোমাকে পিতা বলিয়া জানিয়াছি, অদ্য একাদশ দিন হইল তিনি ইহলোক হইতে অপসৃত হইয়াছেন। তাঁহার সমস্ত জীবন হোম-হুতাশনের ঊর্ধ্বমুখী পবিত্র শিখার ন্যায় তোমার অভিমুখে নিয়ত উত্থিত হইয়াছে। অদ্য তাঁহার সুদীর্ঘ জীবনযাত্রার অবসানে তুমি তাঁহাকে কী শান্তিতে, কী অমৃতে অভিষিক্ত করিয়াছ—যিনি স্বর্গ কামনা করেন নাই, কেবল ‘ছায়াতপয়োরিব’ ব্রহ্মলোকে তোমার সহিত

---

[১] ৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩১১ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জন্মোৎসবে পঠিত

যুক্ত হইবার জন্য যাঁহার চরমাকাঙ্ক্ষা ছিল, অদ্য তাঁহাকে তুমি কিরূপে সুধাময় চরিতার্থতার মধ্যে বেষ্টন করিয়াছ, তাহা আমাদের মননের অগোচর, তথাপি হে মঙ্গলময়, তোমার পরিপূর্ণ মঙ্গল-ইচ্ছার প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তোমাকে বারবার নমস্কার করি। তুমি অনন্তসত্য, তোমার মধ্যে আমাদের সমস্ত সত্যচিন্তা নিঃশেষে সার্থক হয়—তুমি অনন্তকল্যাণ, তোমার মধ্যে আমাদের সমস্ত শুভকর্ম সম্পূর্ণরূপে সফল হয়—আমাদের সমস্ত অকৃত্রিম প্রেম, হে আনন্দস্বরূপ, তোমারই মধ্যে সুন্দরভাবে ধন্য হয়—আমাদের পিতৃদেবের জীবনের সমস্ত সত্য, সমস্ত মঙ্গল, সমস্ত প্রেম তোমার মধ্যে অনির্বচনীয়রূপে পরিপূর্ণ হইয়াছে, ইহা জানিয়া আমরা ভ্রাতাভগিনীগণ করজোড়ে তোমার জয়োচ্চারণ করিতেছি।

পৃথিবীতে অধিকাংশ সম্বন্ধই দানপ্রতিদানের অপেক্ষা রাখে—কিন্তু পিতামাতার স্নেহ প্রতিদান-প্রত্যাশার অতীত। তাহা পাপ, অপরাধ, কদর্যতা, কৃতঘ্নতা, সমস্তকেই অতিক্রম করিয়া আপনাকে প্রকাশ করে। তাহা ঋণ নহে, তাহা দান। তাহা আলোকের ন্যায়, সমীরণের ন্যায়—তাহা শিশুকাল হইতে আমাদিগকে নিয়ত রক্ষা করিয়াছে, কিন্তু তাহার মূল্য কেহ কখনও চাহে নাই। পিতৃস্নেহের সেই অযাচিত, সেই অপর্যাপ্ত মঙ্গলের জন্য, হে বিশ্বপিতঃ, আজ তোমাকে প্রণাম করি।

আজ প্রায় পঞ্চাশ বৎসর অতীত হইল, আমাদের পিতামহের মৃত্যুর পরে এই গৃহের উপরে সহসা ঋণরাশিভারাক্রান্ত কী দুর্দিন উপস্থিত হইয়াছিল তাহা সকলেই জানেন। পিতৃদেব একাকী বহুবিধ প্রতিকূলতার মধ্যে দুস্তর ঋণসমুদ্র সন্তরণপূর্বক কেমন করিয়া যে কূলে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, আমাদের অদ্যকার অন্নবস্ত্রের সংস্থান কেমন করিয়া যে তিনি ধ্বংসের মুখ হইতে বাঁচাইয়া আমাদের জন্য রক্ষা করিয়াছেন, আজ তাহা আমাদের পক্ষে কল্পনা করাও কঠিন। সেই ঝঞ্ঝার ইতিহাস আমরা কী জানি। কতকাল ধরিয়া তাঁহাকে কী দুঃখ, কী চিন্তা, কী চেষ্টা, কী দশাবিপর্যয়ের মধ্য দিয়া প্রতিদিন প্রতিরাত্রি যাপন করিতে হইয়াছে, তাহা মনে করিতে গেলে শরীর কণ্টকিত হয়। তিনি অতুল বৈভবের মধ্যে লালিতপালিত হইয়াছিলেন—অকস্মাৎ ভাগ্যপরিবর্তনের সম্মুখে কেমন করিয়া তিনি অবিচলিত বীর্যের সহিত দণ্ডায়মান হইলেন! যাহারা অপর্যাপ্ত ধনসম্পদ ও বাধাহীন ভোগসুখের মধ্যে মানুষ হইয়া উঠে, দুঃখসংঘাতের অভাবে, বিলাস-লালিত্যের সংবেষ্টনে বাল্যকাল হইতে যাহাদের শক্তির চর্চা অসম্পূর্ণ, সংকটের সময় তাহাদের মতো অসহায় কে আছে! বাহিরের বিপদের অপেক্ষা নিজের অপরিণত চারিত্রবল ও অসংযত প্রবৃত্তি তাহাদের পক্ষে গুরুতর শত্রু। এই সময়ে এই অবস্থায় যে ধনপতির পুত্র নিজের চিরাভ্যাসকে খর্ব করিয়া, ধনিসমাজের প্রভূত প্রতিপত্তিকে তুচ্ছ করিয়া, শান্তসংযত শৌর্যের সহিত এই সুবৃহৎ পরিবারকে স্কন্ধে লইয়া দুঃসহ দুঃসময়ের বিরুদ্ধে যাত্রা করিয়াছেন ও জয়ী হইয়াছেন, তাঁহার সেই অসামান্য বীর্য, সেই সংযম, সেই দৃঢ়চিত্ততা, সেই প্রতিমুহূর্তের ত্যাগস্বীকার আমরা মনের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধিই বা করিব কী করিয়া এবং তদনুরূপ কৃতজ্ঞতাই বা কেমন করিয়া অনুভব করিব। আমাদের অদ্যকার সমস্ত অন্ন-বস্ত্র-আশ্রয়ের পশ্চাতে তাঁহার সেই বিপত্তিতে অকম্পিত বলিষ্ঠ দক্ষিণহস্ত ও সেই হস্তের মঙ্গল-আশিস্‌স্পর্শ আমরা যেন নিয়ত নম্রভাবে অনুভব করি।

আমাদের সর্বপ্রকার অভাবমোচনের পক্ষে প্রচুর এই-যে সম্পত্তি তিনি সম্পূর্ণ নিজের বলে রক্ষা করিয়াছেন, ইহা যদি অধর্মের সহায়তায় ঘটিত, তবে অদ্য

অন্তর্যামীর সম্মুখে সেই পিতার নিকটে শ্রদ্ধানিবেদন করিতে আমাদিগকে কুণ্ঠিত হইতে হইত। সর্বাগ্রে তিনি ধর্মকে রক্ষা করিয়া পরে তিনি ধন রক্ষা করিয়াছেন— অদ্য আমরা যাহা লাভ করিয়াছি তাহার সহিত তিনি অসত্যের গ্লানি মিশ্রিত করিয়া দেন নাই; আজ আমরা যাহা ভোগ করিতেছি তাহাকে দেবতার প্রসাদস্বরূপ নির্মলচিত্তে নিঃসংকোচে গ্রহণ করিবার অধিকারী হইয়াছি।

সেই বিপদের দিনে তাঁহার বিষয়ী বন্ধুর অভাব ছিল না; তিনি ইচ্ছা করিলে হয়তো কৌশলপূর্বক তাঁহার পূর্বসম্পত্তির বহুতর অংশ এমন করিয়া উদ্ধার করিতে পারিতেন যে, ধনগৌরবে বঙ্গীয় ধনীদের ঈর্ষাভাজন হইয়া থাকিতেন। তাহা করেন নাই বলিয়া আজ যেন আমরা তাঁহার নিকটে দ্বিগুণতর কৃতজ্ঞ হইতে পারি।

ঘোর সংকটের সময় একদিন তাঁহার সম্মুখে একই কালে শ্রেয়ের পথ ও প্রেয়ের পথ উদ্‌ঘাটিত হইয়াছিল। তখন সর্বস্ব হারাইবার সম্ভাবনা তাঁহার সম্মুখে ছিল— তাঁহার স্ত্রীপুত্র ছিল, তাঁহার মানসম্ভ্রম ছিল— তৎসত্ত্বে যেদিন তিনি শ্রেয়ের পথ নির্বাচন করিয়া লইলেন সেই মহাদিনের কথা আজ যেন আমরা একবার স্মরণ করিবার চেষ্টা করি, তাহা হইলে আমাদের বিষয়লালসার তীব্রতা শান্ত হইয়া আসিবে এবং সন্তোষের অমৃতে আমাদের হৃদয় অভিষিক্ত হইবে। অর্জনের দ্বারা তিনি যাহা আমাদিগকে দিয়াছেন তাহা আমরা গ্রহণ করিয়াছি; বর্জনের দ্বারা তিনি যাহা আমাদিগকে দিয়াছেন তাহাও যেন গৌরবের সহিত গ্রহণ করিবার যোগ্য আমরা হইতে পারি।

তিনি ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ ছিলেন। কিন্তু তিনি যদি শুদ্ধমাত্র বিষয়ী হইতেন তবে তাঁহার উদ্ধারপ্রাপ্ত সম্পত্তিখণ্ডকে উত্তরোত্তর সঞ্চয়ের দ্বারা বহুলরূপে বিস্তৃত করিতে পারিতেন। কিন্তু বিষয়বিস্তারের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ঈশ্বরের সেবাকে তিনি বঞ্চিত করেন নাই। তাঁহার ভাণ্ডার ধর্মপ্রচারের জন্য মুক্ত ছিল— কত অনাথ পরিবারের তিনি আশ্রয় ছিলেন, কত দরিদ্র গুণীকে তিনি অভাবের পেষণ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, দেশের কত হিতকর্মে তিনি বিনা আড়ম্বরে গোপনে সাহায্য দিয়াছেন। এই দিকে কৃপণতা করিয়া তিনি কোনোদিন তাঁহার সন্তানদিগকে বিলাসভোগ বা ধনাভিমানচর্চায় প্রশ্রয় দেন নাই। ধর্মপরায়ণ গৃহস্থ যেমন সমস্ত অতিথিবর্গের আহারশেষে নিজে ভোজন করেন, তিনি সেইরূপ তাঁহার ভাণ্ডারদ্বারের সমস্ত অতিথিবর্গের পরিবেষণশেষ লইয়া নিজের পরিবারকে প্রতিপালন করিয়াছেন। এইরূপে তিনি আমাদিগকে ধনসম্পদের মধ্যে রাখিয়াও আড়ম্বর ও ভোগোন্মত্ততার হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছেন, এবং এইরূপে যদি তাঁহার সন্তানগণের সম্মুখ হইতে লক্ষ্মীর স্বর্ণপিঞ্জরের অবরোধদ্বার কিছুমাত্র শিথিল হইয়া থাকে, যদি তাঁহারা ভাবলোকের মুক্ত-আকাশে অবাধবিহারের কিছুমাত্র অধিকারী হইয়া থাকেন, তবে নিশ্চয়ই তাঁহারা পিতার পুণ্যপ্রসাদে বহুতর লক্ষপতির অপেক্ষা সৌভাগ্যবান হইয়াছেন।

আজ এই কথা বলিয়া আমরা সকলের কাছে গৌরব করিতে পারি যে, এতকাল আমাদের পিতা যেমন আমাদিগকে দারিদ্র্য হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, তেমনি ধনের গণ্ডির মধ্যেও আমাদিগকে বদ্ধ করিয়া রাখেন নাই। পৃথিবী আমাদের সম্মুখে মুক্ত ছিল— ধনী দরিদ্র সকলেরই গৃহে আমাদের যাতায়াতের পথ সমান প্রশস্ত ছিল। সমাজে যাঁহাদের অবস্থা আমাদের অপেক্ষা হীন ছিল তাঁহারা সুহৃদ্‌ভাবেই আমাদের পরিবারে অভ্যর্থনা প্রাপ্ত হইয়াছেন, পারিষদভাবে নহে। ভবিষ্যতে

আমরা ভ্রষ্ট হইতে পারি, কিন্তু আমরা ভ্রাতাগণ দারিদ্র্যের অসম্মানকে এই পরিবারের ধর্ম বলিয়া জানিতে পাই নাই। ধনের সংকীর্ণতা ভেদ করিয়া মনুষ্য-সাধারণের অকুণ্ঠিত সংস্রবলাভ যাঁহার প্রসাদে আমাদের ঘটিয়াছে তাঁহাকে আজ আমরা নমস্কার করি।

তিনি আমাদিগকে যে কী পরিমাণে স্বাধীনতা দিয়াছেন তাহা আমরা ছাড়া আর কে জানিবে! যে ধর্মকে তিনি ব্যাকুল সন্ধানের দ্বারা পাইয়াছেন, যে ধর্মকে তিনি উৎকট বিপদের মধ্যেও রক্ষা করিয়াছেন, যে ধর্মের উদ্দেশে তিনি তাঁহার সমস্ত জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, সেই ধর্মকে তিনি আপনার গৃহের মধ্যেও শাসনের বস্তু করেন নাই। তাঁহার দৃষ্টান্ত আমাদের সম্মুখে ছিল, তাঁহার উপদেশ হইতে আমরা বঞ্চিত হই নাই, কিন্তু কোনো নিয়মের শাসনে তিনি আমাদের বুদ্ধিকে, আমাদের কর্মকে বদ্ধ করেন নাই। তিনি কোনো বিশেষ মতকে অভ্যাস বা অনুশাসনের দ্বারা আমাদের উপরে স্থাপন করিতে চান নাই—ঈশ্বরকে ধর্মকে স্বাধীনভাবে সন্ধান করিবার পথ তিনি আমাদের সম্মুখে মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। এই স্বাধীনতার দ্বারা তিনি আমাদিগকে পরম সম্মানিত করিয়াছেন—তাঁহার প্রদত্ত সেই সম্মানের যোগ্য হইয়া সত্য হইতে যেন স্খলিত না হই, ধর্ম হইতে যেন স্খলিত না হই, কুশল হইতে যেন স্খলিত না হই। পৃথিবীতে কোনো পরিবার কখনোই চিরদিন একভাবে থাকিতে পারে না, ধন ও খ্যাতিকে কোনো বংশ চিরদিন আপনার মধ্যে বদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে না, ইন্দ্রধনুর বিচিত্র বর্ণচ্ছটার ন্যায় এই গৃহের সমৃদ্ধি নিশ্চয়ই একদিন দিগন্তরালে বিলীন হইয়া যাইবে, ক্রমে নানা ছিদ্রযোগে বিচ্ছেদবিশ্লেষের বীজ প্রবেশ করিয়া কোন্-এক দিন এই পরিবারের ভিত্তিকে শতধা বিদীর্ণ করিয়া দিবে—কিন্তু এই পরিবারের মধ্য দিয়া যিনি অচেতন সমাজকে ধর্মজিজ্ঞাসায় সজীব করিয়া দিয়াছেন, যিনি নূতন ইংরেজিশিক্ষার ঔদ্ধত্যের দিনে শিশু বঙ্গভাষাকে বহুযত্নে কৈশোরে উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছেন, যিনি দেশকে তাহার প্রাচীন ঐশ্বর্যের ভাণ্ডার উদ্‌ঘাটিত করিতে প্রবৃত্ত করিয়াছেন, যিনি তাঁহার তপঃপরায়ণ একলক্ষ্য জীবনের দ্বারা আধুনিক বিষয়লুব্ধ সমাজে ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের আদর্শ পুনঃস্থাপিত করিয়া গিয়াছেন, তিনি এই পরিবারকে সমস্ত মনুষ্যপরিবারের সহিত সংযুক্ত করিয়া দিয়া, ইহার সর্বোচ্চ লাভকে সমস্ত মনুষ্যের লাভ করিয়া দিয়া, ইহার পরম ক্ষতিকে সমস্ত মনুষ্যের ক্ষতি করিয়া দিয়া, আমাদিগকে যে গৌরব দান করিয়াছেন, অন্য সমস্ত ক্ষুদ্র মানমর্যাদা বিস্মৃত হইয়া অদ্য আমরা তাহাই স্মরণ করিব ও একান্ত ভক্তির সহিত তাঁহার নিকটে আপনাকে প্রণত করিয়া দিব, ও যাঁহার মধ্যে তিনি আশ্রয়লাভ করিয়াছেন, সমস্ত ধনমানের ঊর্ধ্বে, খ্যাতিপ্রতিপত্তির ঊর্ধ্বে, তাঁহাকেই দর্শন করিব।

হে বিশ্ববিধাতঃ, আজ আমাদের সমস্ত বিষাদ-অবসাদ দূর করিয়া দাও—মৃত্যু সহসা যে যবনিকা অপসারণ করিয়াছে তাহার মধ্য দিয়া তোমার অমৃতলোকের আভাস আমাদিগকে দেখিতে দাও। সংসারের নিয়ত উত্থানপতন, ধনমানজীবনের আবির্ভাব-তিরোভাবের মধ্যে তোমার 'আনন্দরূপমমৃতম্' প্রকাশ করো। কত বৃহৎ সাম্রাজ্য ধূলিসাৎ হইতেছে, কত প্রবল প্রতাপ অস্তমিত হইতেছে, কত লোক-বিশ্রুত খ্যাতি বিস্মৃতিমগ্ন হইতেছে, কত কুবেরের ভাণ্ডার ভগ্নস্তূপের বিভীষিকা রাখিয়া অন্তর্হিত হইতেছে—কিন্তু হে আনন্দময়, এই-সমস্ত পরিবর্তনপরম্পরার মধ্যে 'মধু বাতা ঋতায়তে' বায়ু মধু বহন করিতেছে, 'মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ' সমুদ্র-সকল মধু ক্ষরণ করিতেছে—তোমার অনন্ত মাধুর্যের কোনো ক্ষয় নাই, তোমার

সেই বিশ্বব্যাপিনী মাধুরী সমস্ত শোকতাপবিক্ষোভের কুহেলিকা ভেদ করিয়া অদ্য আমাদের চিত্তকে অধিকার করুক।

মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ, মধু নক্তম্ উতোষসঃ, মধুমৎ পার্থিবং রজঃ, মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা, মধুমান্নো বনস্পতিঃ, মধুমান্ অস্তু সূর্যঃ, মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ।

ওষধিরা আমাদের পক্ষে মাধ্বী হউক, রাত্রি এবং ঊষা আমাদের পক্ষে মধু হউক, পৃথিবীর ধূলি আমাদের পক্ষে মধুমান্ হউক, এই-যে আকাশ পিতার ন্যায় সমস্ত জগৎকে ধারণ করিয়া আছে ইহা আমাদের পক্ষে মধু হউক, সূর্য মধুমান্ হউক এবং গাভীরা আমাদের জন্য মাধ্বী হউক।[1]

৩

জগতে যে-সকল মহাপুরুষ ধর্মসমাজ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন তাঁহারা যাহা দিতে চাহিয়াছেন তাহা আমরা নিতে পারি নাই, এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে। শুধু পারি নাই যে তাহা নয়, আমরা এক লইতে হয়তো আর লইয়া বসিয়াছি। ধর্মের আসনে সাম্প্রদায়িকতাকে বরণ করিয়া হয়তো নিজেকে সার্থক জ্ঞান করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া আছি।

তাহার একটা কারণ, আমাদের গ্রহণ করিবার শক্তি সকলের এক রকমের নয়। আমার মন যে পথে সহজে চলে, অন্যের মন সে পথে বাধা পায়। আমাদের এই মানসিক বৈচিত্র্যকে অস্বীকার করিয়া সকল মানুষের জন্য একই বাঁধা রাজপথ বানাইয়া দিবার চেষ্টা আমাদের মনে আসে। কারণ, তাহাতে কাজ সহজ হইয়া যায়। সে চেষ্টা এ পর্যন্ত সফল হয় নাই। সফল হওয়া যে অসাধ্য, তাহাও আমরা ভালো করিয়া বুঝিতে পারি নাই। সেইজন্য যে পথে আমি চলিয়া অভ্যস্ত বা আমার পক্ষে যাহা সহজ, সেই পথই যে সকলের একমাত্র পথ নয়, কাহারও পক্ষে যে তাহা দুর্গম হইতে পারে, এ কথা আমরা মনেও করিতে পারি না। এইজন্যই একই পথে সব মানুষকে টানা আমরা জগতের একমাত্র মঙ্গল বলিয়া মনে করি। এই টানাটানিতে কেহ আপত্তিপ্রকাশ করিলে আমরা আশ্চর্যবোধ করি, মনে করি—সে লোকটা হয় ইচ্ছা করিয়া নিজের হিত পরিত্যাগ করিতেছে, নয় তাহার মধ্যে এমন একটা হীনতা আছে যাহা অবজ্ঞার যোগ্য।

কিন্তু ঈশ্বর আমাদের মনের মধ্যে গতিশক্তির যে বৈচিত্র্য দিয়াছেন, আমরা কোনো কৌশলেই তাহাকে একাকার করিয়া দিতে পারিব না। গতির লক্ষ্য এক, কিন্তু তাহার পথ অনেক। সব নদীই সাগরের দিকে চলিয়াছে, কিন্তু সবাই এক নদী হইয়া চলে নাই। চলে নাই, সে আমাদের ভাগ্য।

ঈশ্বর কোনোমতেই আমাদের সকলকেই একটা বাঁধা পথে চলিতে দিবেন না। অনায়াসে চোখ বুজিয়া আমরা একজনের পশ্চাতে আর-একজন চলিব, ঈশ্বর আমাদের পথকে এত সহজ কোনোদিন করিবেন না। কোনো ব্যক্তি, তাঁহার যত বড়ো ক্ষমতাই থাক্, পৃথিবীর সমস্ত মানবাত্মার জন্য নিশ্চেষ্ট জড়ত্বের সুগমতা চিরদিনের জন্য বানাইয়া দিয়া যাইবেন, মানুষের এমন দুর্গতি বিশ্ববিধাতা কখনোই সহ্য করিতে পারেন না।

---

[1] মহর্ষির আদ্যকৃত্য উপলক্ষে প্রার্থনা। ১৩১১

এইজন্য প্রত্যেক মানুষের মনের গভীরতর স্তরে ঈশ্বর একটি স্বাতন্ত্র্য দিয়াছেন; অন্তত সেখানে একজনের উপর আর-একজনের কোনো অধিকার নাই। সেখানেই তাহার অমরতার বীজকোষ বড়ো সাবধানে রক্ষিত; সেখানেই তাহাকে নিজের শক্তিতে নিজে সার্থক হইতে হইবে। সহজের প্রলোভনে এই জায়গাটার দখল যে ব্যক্তিই ছাড়িয়া দিতে চায় সে লাভে-মূলে সমস্তই হারায়। সেই ব্যক্তিই ধর্মের বদলে সম্প্রদায়কে, ঈশ্বরের বদলে গুরুকে, বোধের বদলে গ্রন্থকে লইয়া চোখ বুজিয়া বসিয়া থাকে। শুধু বসিয়া থাকিলেও বাঁচিতাম, দল বাড়াইবার চেষ্টায় পৃথিবীতে অনেক ব্যর্থতা এবং অনেক বিরোধের সৃষ্টি করে।

এইজন্য বলিতেছিলাম, মহাপুরুষেরা ধর্মসম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করিয়া যান, আর আমরা তাহার মধ্য হইতে সম্প্রদায়টাই লই, ধর্মটা লই না। কারণ, বিধাতার বিধানে ধর্ম জিনিসটাকে নিজের স্বাধীন শক্তির দ্বারাই পাইতে হয়, অন্যের কাছ হইতে তাহা আরামে ভিক্ষা মাগিয়া লইবার জো নাই। কোনো সত্যপদার্থই আমরা আর-কাহারও কাছ হইতে কেবল হাত পাতিয়া চাহিয়া পাইতে পারি না। যেখানে সহজ রাস্তা ধরিয়া ভিক্ষা করিতে গিয়াছি সেখানেই ফাঁকিতে পড়িয়াছি। তেমন করিয়া যাহা পাইয়াছি তাহাতে আত্মার পেট ভরে নাই, কিন্তু আত্মার জাত গিয়াছে।

তবে ধর্মসম্প্রদায় ব্যাপারটাকে আমরা কী চোখে দেখিব। তাহাকে এই বলিয়াই জানিতে হইবে যে, তাহা তৃষ্ণা মিটাইবার জল নহে, তাহা জল খাইবার পাত্র। সত্যকার তৃষ্ণা যাহার আছে সে জলের জন্যই ব্যাকুল হইয়া ফিরে, সে উপযুক্ত সুযোগ পাইলে গণ্ডূষে করিয়াই পিপাসানিবৃত্তি করে। কিন্তু যাহার পিপাসা নাই সে পাত্রটাকেই সবচেয়ে দামী বলিয়া জানে। সেইজন্যই জল কোথায় পড়িয়া থাকে তাহার ঠিক নাই, পাত্র লইয়াই পৃথিবীতে বিষম মারামারি বাধিয়া যায়। তখন যে ধর্ম বিষয়বুদ্ধির ফাঁস আল্‌গা করিবে বলিয়া আসিয়াছিল তাহা জগতে একটা নূতনতর বৈষয়িকতার সূক্ষ্মতর জাল সৃষ্টি করিয়া বসে; সে জাল কাটানো শক্ত।

ধর্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতারা নিজের নিজের সাধ্যানুসারে আমাদের জন্য, মাটির হউক আর সোনার হউক, এক-একটা পাত্র গড়িয়া দিয়া যান। আমরা যদি মনে করি, সেই পাত্রটা গড়িয়া দিয়া যাওয়াই তাঁহাদের মাহাত্ম্যের সবচেয়ে বড়ো পরিচয়, তবে সেটা আমাদের ভুল হইবে। কারণ, পাত্রটি আমাদের কাছে যতই প্রিয় এবং যতই সুবিধাকর হউক, তাহা কখনোই পৃথিবীর সকলেরই কাছে সমান প্রিয় এবং সমান সুবিধাকর হইতে পারে না। ভক্তির মোহে অন্ধ হইয়া, দলের গর্বে মত্ত হইয়া, এ কথা ভুলিলে চলিবে না। কথামালার গল্প সকলেই জানেন— শৃগাল থালায় ঝোল রাখিয়া সারসকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল, লম্বা ঠোঁট লইয়া সারস তাহা খাইতে পারে নাই; তার পর সারস যখন সরুমুখ চোঙের মধ্যে ঝোল রাখিয়া শৃগালকে ফিরিয়া নিমন্ত্রণ করিল তখন শৃগালকে ক্ষুধা লইয়াই ফিরিতে হইয়াছিল। সেইরূপ এমন সর্বজনীন ধর্মসমাজ আমরা কল্পনা করিতে পারি না যাহা তাহার মত ও অনুষ্ঠান লইয়া সকলেরই বুদ্ধি রুচি ও প্রয়োজনকে পরিতৃপ্ত করিতে পারে।

অতএব শাস্ত্রীয় ধর্মমত ও আনুষ্ঠানিক ধর্মসমাজ স্থাপনের দিক হইতে পৃথিবীর ধর্মগুরুদিগকে দেখা তাঁহাদিগকে ছোটো করিয়া দেখা। তেমন করিয়া কেবল দলের লোকেরাই দেখিতে পারে এবং তাহাতে করিয়া কেবল দলাদলিকেই বাড়াইয়া তোলা হয়। তাঁহাদের মধ্যে নিশ্চয়ই এমন একটি দেখিবার আছে যাহা

লইয়া সকল দেশে সকল কালে সকল মানুষকেই আহ্বান করা যায়— যাহা প্রদীপমাত্র নহে, যাহা আলো।

সেটি কী। না, যেটি তাঁহারা নিজেরাই পাইয়াছেন। যাহা গড়িয়াছেন তাহা নহে। যাহা পাইয়াছেন সে তো তাঁহাদের নিজের সৃষ্টি নহে, যাহা গড়িয়াছেন তাহা তাঁহাদের নিজের রচনা।

আজ যাঁহার স্মরণার্থ আমরা সকলে এখানে সমবেত হইয়াছি তাঁহাকেও যাহাতে কোনো-একটা দলের দিক হইতে না দেখি, ইহাই আমার নিবেদন। সম্প্রদায়ভুক্ত লোকেরা সম্প্রদায়ের ধ্বজাকেই সর্বোচ্চ করিয়া ধরিতে গিয়া পাছে গুরুকেও তাহার কাছে খর্ব করিয়া দেন, এ আশঙ্কা মন হইতে কিছুতেই দূর হয় না— অন্তত আজিকার দিনে নিজেদের সেই সংকীর্ণতা তাঁহার প্রতি যেন আরোপ না করি।

অবশ্যই, কর্মক্ষেত্রে তাঁহার প্রকৃতির বিশেষত্ব নানা রূপে দেখা দিয়াছে। তাঁহার ভাষায়, তাঁহার ব্যবহারে, তাঁহার কর্মে তিনি বিশেষভাবে নিজেকে আমাদের কাছে প্রকাশ করিয়াছেন— তাঁহার সেই স্বাভাবিক বিশেষত্ব জীবনচরিত-আলোচনা-কালে উপাদেয় সন্দেহ নাই। সেই আলোচনায় তাঁহার সংস্কার, তাঁহার শিক্ষা, তাঁহার প্রতি তাঁহার দেশের ও কালের প্রভাব-সম্বন্ধীয় সমস্ত তথ্য, আমাদের কৌতূহল-নিবৃত্তি করে। কিন্তু সেই-সমস্ত বিশেষ ভাবকে আচ্ছন্ন করিয়া দিয়া তাঁহার জীবন কি আর-কাহাকেও আমাদের কাছে প্রকাশ করিতেছে না। আলো কি প্রদীপকে প্রকাশ করিবার জন্য, না প্রদীপ আলোকে প্রচার করিবার জন্য। তিনি যাঁহাকে দেখিতেছেন ও দেখাইতেছেন, যদি আজ সেইদিকেই আমাদের সমস্ত দৃষ্টি না যায়, আজ যদি তাঁহার নিজের বিশেষত্বের দিকে আমাদের দৃষ্টি কোনো অংশে ঠেকিয়া যায়, তবে গুরুর অবমাননা হইবে।

[মহর্ষি একদিন পরিপূর্ণ ভোগের মাঝখানে জাগিয়া উঠিয়া বিলাসমন্দিরের সমস্ত আলোকে অন্ধকার দেখিয়াছিলেন। সেইদিন তিনি তৃষার্ত চিত্ত লইয়া পিপাসা মিটাইবার জন্য দুর্গম পথে যাত্রা করিয়াছিলেন, সে কথা সকলেই জানেন। যেখান হইতে অমৃত-উৎস নিঃসৃত হইয়া সমস্ত জগৎকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে সেই তীর্থস্থানে তিনি না গিয়া ছাড়েন নাই। সেই তীর্থের জল তিনি আমাদের জন্যও পাত্রে ভরিয়া আনিয়াছিলেন। এ পাত্র আজ বাদে কাল ভাঙিয়া যাইতেও পারে, তিনি যে ধর্মসমাজ দাঁড় করাইয়াছেন তাহার বর্তমান আকৃতি স্থায়ী না হইতেও পারে; কিন্তু তিনি সেই-যে অমৃত-উৎসের ধারে গিয়া নিজের জীবনকে ভরিয়া লইয়াছেন, ইহাই আমাদের প্রত্যেকের লাভ। এই লাভ নষ্ট হইবে না, শেষ হইবে না।

পূর্বেই বলিয়াছি, ঈশ্বরকে আর-কাহারও হাত দিয়া আমরা পাইব না। তাঁহার কাছে নিজে যাইতে হইবে, তাঁহাকে নিজে পাইতে হইবে। দুঃসাধ্য হয় সেও ভালো, বিলম্ব হয় তাহাতে ক্ষতি নাই। অন্যের মুখে শুনিয়া, উপদেশ পাইয়া, সমাজ-বিহিত অনুষ্ঠান পালন করিয়া, আমরা মনে করি যেন আমরা চরিতার্থতা লাভ করিলাম; কিন্তু সে তো ঘটির জল, সে তো উৎস নহে। তাহা মলিন হয়, তাহা ফুরাইয়া যায়, তাহাতে আমাদের সমস্ত জীবন অভিষিক্ত হয় না এবং তাহা লইয়া আমরা বিষয়ী লোকের মতোই অহংকার ও দলাদলি করিতে থাকি। এমন ঘটির জলে আমাদের চলিবে না— সেই উৎসের কাছে আমাদের প্রত্যেককেই যাইতে হইবে, ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের নিজের একান্ত সম্বন্ধ তাঁহার সম্মুখে গিয়া আমাদিগকে নিজে স্বীকার করিতে হইবে।] সম্রাট যখন আমাকে দরবারে ডাকেন তখন

প্রতিনিধি পাঠাইয়া কি কাজ সারিতে পারি। ঈশ্বর যে আমাদের প্রত্যেককে ডাক দিয়াছেন, সেই ডাকে সাড়া দিয়া একেবারে সম্পূর্ণভাবে তাঁহার কাছে আত্মসমর্পণ করিতে না পারিলে কোনোমতেই আমাদের সার্থকতা নাই।

মহাপুরুষদের জীবন হইতে এই কথাটাই আমরা জানিতে পারি। যখন দেখি তাঁহারা হঠাৎ সকল কাজ ফেলিয়া তাড়াতাড়ি ছুটিয়াছেন তখন বুঝিতে পারি, তবে তো আহ্বান আসিতেছে— আমরা শুনিতে পাই নাই, কিন্তু তাঁহারা শুনিতে পাইয়াছেন। তখন চারি দিকের কোলাহল হইতে ক্ষণকালের জন্য মনটাকে টানিয়া লই, আমরাও কান পাতিয়া দাঁড়াই। অতএব মহাপুরুষদের জীবন হইতে আমরা প্রথমে স্পষ্ট জানিতে পারি, আত্মার প্রতি পরমাত্মার আহ্বান কতখানি সত্য। এই জানিতে পারাটাই লাভ।

তার পরে আর-একদিন তাঁহাদিগকে দেখিতে পাই, সুখে-দুঃখে তাঁহারা শান্ত, প্রলোভনে তাঁহারা অবিচলিত, মঙ্গলব্রতে তাঁহারা দৃঢ়প্রতিষ্ঠ। দেখিতে পাই, তাঁহাদের মাথার উপর দিয়া কত ঝড় চলিয়া যাইতেছে, কিন্তু তাঁহাদের হাল ঠিক আছে; সর্বস্বক্ষতির সম্ভাবনা তাঁহাদের সম্মুখে বিভীষিকারূপে আবির্ভূত হইয়াছে, কিন্তু তাঁহারা অনায়াসেই তাহাকে স্বীকার করিয়া ন্যায়পথে ধ্রুব হইয়া আছেন; আত্মীয়বন্ধুগণ তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিতেছে, কিন্তু তাঁহারা প্রসন্নচিত্তে সে-সকল বিচ্ছেদ বহন করিতেছেন— তখনই আমরা বুঝিতে পারি, আমরা কী পাই নাই আর তাঁহারা কী পাইয়াছেন। সে কোন্‌ শান্তি, কোন্‌ বন্ধু, কোন্‌ সম্পদ্‌। তখন বুঝিতে পারি, আমাদিগকেও নিতান্তই কী পাওয়া চাই, কোন্‌ লাভে আমাদের সকল অন্বেষণ শান্ত হইয়া যাইবে।

অতএব মহাপুরুষদের জীবনে আমরা প্রথমে দেখি, তাঁহারা কোন্‌ আকর্ষণে সমস্ত ত্যাগ করিয়া চলিয়াছেন; তাহার পরে দেখিতে পাই, কোন্‌ লাভে তাঁহাদের সমস্ত ত্যাগ সার্থক হইয়াছে। এই দিকে আমাদের মনের জাগরণটাই আমাদের লাভ। কারণ, এই জাগরণের অভাবেই কোনো লাভই সম্পন্ন হইতে পারে না।

তার পরে যদি ভাবিয়া দেখি, পাইবার ধন কোথায় পাওয়া যাইবে, কেমন করিয়া পাইব, তবে এই প্রশ্নই করিতে হইবে, তাঁহারা কোথায় গিয়াছেন, কেমন করিয়া পাইয়াছেন।

মহর্ষির জীবনে এই প্রশ্নের কী উত্তর পাই। দেখিতে পাই, তিনি তাঁহার পূর্বতন সমস্ত সংস্কার সমস্ত আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া একেবারে রিক্তহস্তে বাহির হইয়া পড়িয়াছেন। সমাজের প্রচলিত প্রথা তাঁহাকে ধরিয়া রাখে নাই, শাস্ত্র তাঁহাকে আশ্রয় দেয় নাই। তাঁহার ব্যাকুলতাই তাঁহাকে পথ দেখাইয়া চলিয়াছে। সে পথ তাঁহার নিজেরই প্রকৃতির গভীর গোপন পথ। সব পথ ছাড়িয়া সেই পথ তাঁহাকে নিজে আবিষ্কার করিয়া লইতে হইয়াছে। এ আবিষ্কার করিবার ধৈর্য ও সাহস তাঁহার থাকিত না, তিনিও পাঁচজনের পথে চলিয়া, ধর্ম না হউক, ধার্মিকতা লাভ করিয়া সন্তুষ্ট থাকিতেন— কিন্তু তাঁহার পক্ষে যে 'না পাইলে নয়' হইয়া উঠিয়াছিল, সেইজন্য তাঁহাকে নিজের পথ নিজেকে বাহির করিতে হইয়াছিল। সেজন্য তাঁহাকে যত দুঃখ, যত তিরস্কার হউক, সমস্ত স্বীকার করিতে হইয়াছিল— ইহা বাঁচাইবার জো নাই। ঈশ্বর যে তাহাই চান। তিনি বিশ্বের ঈশ্বর হইয়াও আমাদের প্রত্যেকের সঙ্গে একটি নিতান্ত একমাত্র স্বতন্ত্র সম্বন্ধে ধরা দিবেন— সেইজন্য আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে তিনি একটি দুর্ভেদ্য স্বাতন্ত্র্যকে চারি দিকের আক্রমণ হইতে নিয়ত রক্ষা করিয়াছেন। এই অতি নির্মল নির্জন নিভৃত স্বাতন্ত্র্যের

মধ্যেই তাঁহার সঙ্গে আমাদের মিলনের স্থান নির্দিষ্ট রহিয়াছে। সেইখানকার দ্বার যখন আমরা নিজের চেষ্টায় খুলিয়া তাঁহার কাছে আমাদের সেই চরম স্বাতন্ত্র্যের অধিকার একেবারে ছাড়িয়া দিব, বিশ্বের মধ্যে যাহা আমি ছাড়া আর-কাহারও নহে সেইটেই যখন তাঁহার কাছে সমর্পণ করিতে পারিব, তখনই আর আমার কিছু বাকি থাকিবে না, তখনই তাঁহাকে পাওয়া যাইবে। এই-যে আমাদের স্বাতন্ত্র্যের দ্বার ইহার প্রত্যেকের চাবি স্বতন্ত্র; একজনের চাবি দিয়া আর-একজনের দ্বার খুলিবে না। পৃথিবীতে যাঁহারা ঈশ্বরকে না পাওয়া পর্যন্ত থামেন নাই, তাঁহারা সকলেই ব্যাকুলতার নির্দেশ মানিয়া, নিজের চাবি নিজে যেমন করিয়া পারেন সন্ধান করিয়া বাহির করিয়াছেন। কেবল পরের প্রতি নির্ভর করিয়া আলস্যবশত এ যাঁহারা না করিয়াছেন তাঁহারা কোনো-একটা ধর্মমত ধর্মগ্রন্থ বা ধর্মসম্প্রদায়ে আসিয়া ঠেকিয়াছেন ও সেইখানেই তরঙ্গিত হইয়া উঠিয়া কলরব করিতেছেন, শেষ পর্যন্ত গিয়া পৌঁছেন নাই।

আমাদের শক্তি যদি ক্ষীণ হয়, আমাদের আকাঙ্ক্ষা যদি সত্য না হয়, তবে আমরা শেষ পর্যন্ত কবে গিয়া পৌঁছিব জানি না। কিন্তু মহাপুরুষদের জীবন যেদিন আলোচনা করিতে বসিব সেদিন যেন সেই শেষলক্ষ্যের কথাটাই সম্মুখে রাখি, তাঁহাদের স্মৃতি যেন আমাদিগকে পারের ঘাটের আলো দেখায়, তাহাকে যেন আমরা কোনোদিন সাম্প্রদায়িক অভিযানের মশাল করিয়া না তুলি। তাঁহাদের দৃষ্টান্ত আমাদিগকে বন্ধন হইতে উদ্ধার করিয়া দিবে, পরবশতা হইতে উত্তীর্ণ করিয়া দিবে; আমাদিগকে নিজের সত্যশক্তিতে সত্যচেষ্টায় সত্যপথে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিবে। আমাদিগকে ভিক্ষা দিবে না, সন্ধান দিবে; আশ্রয় দিবে না, অভয় দিবে; অনুসরণ করিতে বলিবে না, অগ্রসর হইতে উৎসাহিত করিবে। এক কথায়, মহাপুরুষ তাঁহার নিজের রচনার দিকে আমাদিগকে টানিতেছেন না, ঈশ্বরের দিকে আহ্বান করিতেছেন। আজ আমরা যেন মনকে স্তব্ধ করি, শান্ত করি; যাহা প্রতিদিন ভাঙিতেছে, গড়িতেছে, যাহা লইয়া তর্কবিতর্ক বিরোধবিদ্বেষের অন্ত নাই, যেখানে মানুষের বুদ্ধির রুচির অভ্যাসের অনৈক্য, সে-সমস্তকেই মৃত্যুর সম্মুখে যেন আজ ক্ষুদ্র করিয়া দেখিতে পারি; কেবল আমাদের আত্মার যে শক্তিকে ঈশ্বর আমাদের জীবনমৃত্যুর নিত্যসম্বলরূপে আমাদিগকে দান করিয়াছেন, তাঁহার যে বাণী আমাদের সুখে-দুঃখে উত্থানে-পতনে জয়ে-পরাজয়ে চিরদিন আমাদের অন্তরাত্মায় ধ্বনিত হইতেছে, তাঁহার যে সম্বন্ধ নিগূঢ়রূপে নিত্যরূপে একান্তরূপে আমারই, তাহাই আজ নির্মলচিত্তে উপলব্ধি করিব; মহাপুরুষের সমস্ত সাধনা যাঁহাতে সার্থক হইয়াছে, সমাপ্ত হইয়াছে—সমস্ত কর্মের খণ্ডতা, সমস্ত চেষ্টার ভঙ্গুরতা, সমস্ত প্রকাশের অসম্পূর্ণতা যে-এক পরম পরিণামের মধ্যে পরিপূর্ণ হইয়াছে—সেই দিকেই আজ আমাদের শান্তদৃষ্টিকে স্থির রাখিব। সম্প্রদায়ের লোকদিগকে এই কথা বিশেষভাবে স্মরণ করাইয়া দিয়া আমরা সেই পরলোকগত মহাত্মার নিকট আমাদের বিনম্র হৃদয়ের শ্রদ্ধা নিবেদন করি, তাঁহার স্মৃতিশিখরের ঊর্ধ্বে করজোড়ে সেই ধ্রুবতারার মহিমা নিরীক্ষণ করি—যে শাশ্বত জ্যোতি সম্পদ্-বিপদের দুর্গম সমুদ্রপথের মধ্য দিয়া দীর্ঘদিনের অবসানে তাঁহার জীবনকে তাহার চরম বিশ্রামের তীর্থে উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছে।[1]

---

[1] মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের শ্রাদ্ধসভায় পঠিত। ১৩১৩

৪

আজ পিতৃদেবের মৃত্যুর সাম্বৎসরিক দিন।

আমি যখন জন্মেছি তখন থেকে তিনি হিমালয়ে ও দূরে দূরে ভ্রমণ করেছেন। দু-তিন বছর পর পর তিনি যখন বাড়ি আসতেন তখন সমস্ত পরিবারে একটা পরিবর্তন অনুভব করতুম—সেটা আমার অল্প বয়সকে ভয়েতে সম্ভ্রমে অভিভূত করত। সেই আমার বালকবয়সে তাঁর সত্তার যে মূর্তি আমার কাছে প্রকাশিত হয়েছিল সে হচ্ছে তাঁর একক ও বিরাট নিঃসঙ্গতার রূপ। তাঁর এই ভাবটি আমায় খুব স্তম্ভিত করত—এ আমার স্মরণে আছে। কেমন যেন মনে হত যে, নিকটে থাকলেও তিনি যেন দূরে রয়েছেন। কাঞ্চনজঙ্ঘা যেমন সন্নিকটবর্তী গিরিশৃঙ্গসমূহ থেকে পৃথক হয়ে তার উত্তুঙ্গ তুষারকান্তি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, আমার কাছে ঠিক তেমনিভাবে আমার পিতৃদেবের আবির্ভাব হয়েছিল। সমবেত আত্মীয়স্বজন-পরিবারবর্গ থেকে তিনি অতি সহজে পৃথক সমুচ্চ শুভ্র নিষ্কলঙ্ক রূপে প্রতিভাত হতেন। তখন আমি ছোটো ছিলুম; ছোটো ছেলেকে লোকে যেমন কাছে ডেকে ছোটো প্রশ্ন শুধোয় সেইরকমভাবে তিনি তখন আমায় ডেকে দু-এক কথা জিজ্ঞেস করতেন। আমার অগ্রজেরা কেবলমাত্র নিজেদের জীবন সম্বন্ধে নয়, সংসারের নানাবিধ খুঁটিনাটি কাজ সম্পর্কেও তাঁর সান্নিধ্য লাভ করেছেন ও তাঁর কাছ থেকে নানাবিধ নির্দেশ পেয়েছেন—সে সুযোগ প্রথমবয়সে আমার ঘটে নি। তবু পিতৃদেবকে দেখে আমার ক্রমাগত উপনিষদের একটি কথা মনে হয়েছে, ‘বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ’, যিনি এক তিনি এই আকাশে বৃক্ষের মতো স্তব্ধ হয়ে আছেন।

এখন মনে হয়, তাঁর সেই নিঃসঙ্গতার অর্থ যেন কিছু কিছু বুঝতে পারি। এখন বুঝতে পারি যে, তিনি বিরাট নিরাসক্ততা নিয়েই জন্মেছিলেন। তাঁর পিতার বিপুল ঐশ্বর্যসম্ভার ছিল, বাহিরের দিক দিয়ে সেই ঐশ্বর্যের কতরকম প্রকাশ হত তার ইয়ত্তা নেই। আহারে বিহারে বিলাসে ব্যসনে কত ধুম, কত জনসমাগম। পিতৃদেব সেই ভিড়ের মধ্যে থেকেও ভিড় থেকে দূরে থাকতেন। আপনার ব্যক্তিত্বের মর্যাদা নিয়ে আপনাতে নিবিষ্ট থাকা, এই ছিল তাঁর স্বভাব। অথচ কর্মেও তাঁকে লিপ্ত থাকতে হয়েছে। আমার পিতামহের অধিকাংশ অর্থ যে ব্যাঙ্কে খাটত সেইখানে তাঁরই নির্দেশক্রমে সামান্য পারিশ্রমিকে আমার পিতাকে কাজ করতে হত। যাতে তিনি বিষয়কর্মে নিপুণ হয়ে ওঠেন তার জন্য পিতামহ যথেষ্ট আগ্রহ প্রকাশ করতেন। যদিও দায়িত্বজনক অনেক কাজ তিনি সুচারুরূপে নির্বাহ করতেন, তবু সমস্ত বিষয়কর্মের উপর তাঁর ঔদাসীন্য ও অনাসক্তি দেখে পিতামহ ক্ষুন্ন হতেন। তখন তাঁর যৌবনকাল, বাইরের আড়ম্বর ও চাকচিক্যে মুগ্ধ হয়ে পড়া হয়তো তাঁর মতো অবস্থায় বিশেষ আশ্চর্যকর হত না; কিন্তু সমস্ত কর্মের মধ্যে জড়িত থেকেও তিনি সকল কর্মের ঊর্ধ্বে ছিলেন। সামাজিক দিক দিয়েও আবিষ্ট হয়ে পড়ার মতো অনুকূল অবস্থা তখন তাঁর প্রবল ছিল; অনেক পদস্থ ও সম্ভ্রান্ত অভিজাত সম্প্রদায়ের লোক তখন পিতামহের কাছে বিষয় বা অন্যাবিধ ব্যাপার নিয়ে নিত্য উপস্থিত হতেন। উপরন্তু দর্পনারায়ণ ঠাকুরের বাড়ির এবং পাথুরেঘাটার রাজবাটির আত্মীয়সমবায় নিয়ে, সেই বহুদূর-পরিব্যাপ্ত সম্পর্কিত মণ্ডলীর সঙ্গে তাকে সংস্পর্শে আসতে হত। আমি ঠিক জানি নে

অবশ্য, তবে নিশ্চিত অনুভব করতে পারি যে, এই আর্থিক প্রতিপত্তি ও সামাজিক সমারোহের মধ্যেও তিনি সেই উপনিষদ-বর্ণিত একক পুরুষের মতো বৃক্ষের স্তব্ধ নিঃসঙ্গতা রক্ষা করে চলতেন। দ্বারকানাথ ঠাকুরের তৎকালীন বিপুল ঐশ্বর্যের আমরা যথাযথ ধারণাই করতে পারি না; পিতৃদেবের মুখে শুনেছি যে, পিতামহ যখন বিলাতে অবস্থান করতেন তখন মাসিক তাঁকে লক্ষাধিক টাকা পাঠানো হত। পিতামহের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই, প্রকাণ্ড এক ভূমিকম্পের ফলে যেন, সেই বিরাট ঐশ্বর্য এক মুহূর্তে ধূলিসাৎ হয়ে গেল। সেই সংকটের মধ্যেও পিতৃদেব অবিচলিত— বৃক্ষ ইব স্তব্ধঃ। তখন তিনি মন্ত্র গ্রহণ করেছেন; হয়তো তখনই সম্যক্ উপলব্ধি করতে পারলেন উপনিষদ যে মহৎ বাণী প্রচার করে গেছেন— ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।

আমার অভিজ্ঞতার মধ্যেই দেখেছি, অনেক শোকাবহ ব্যাপারে, আত্মীয়স্বজনের বিয়োগবিচ্ছেদে, তিনি তাঁর সেই তেতলার ঘরে আত্মসমাহিত হয়ে একা বসে আছেন। কেউ সাহস করত না তাঁকে সান্ত্বনা দিতে। বাইরের আনুকূল্যের তিনি কোনোদিন অপেক্ষা রাখেন নি; আপনি আপনার মধ্যে আনন্দ পেতেন।

আমার যখন উপনয়ন হল, দশ বছর বয়সে— মুণ্ডিত কেশ, তার জন্য একটু লজ্জিত ছিলেম— তিনি হঠাৎ আমায় ডেকে বললেন, "হিমালয়ে যেতে ইচ্ছে কর?" আমার তখনকার কী আনন্দ বলবার ভাষা নেই। সেকালে লুপ-লাইনটাই ছিল মেন-লাইন— রাস্তায় আমাদের প্রথম বিরামের জায়গা হল শান্তিনিকেতন। সে জায়গার সঙ্গে এখনকার এ জায়গার অনেক তফাত— ধুধু করছে প্রান্তর, শ্যামল বৃক্ষছায়ার অবকাশ নেই প্রায় কোথাও। সেই ঊষর রুক্ষ প্রান্তরের মধ্যে, আজকাল যেটা অতিথিশালা তারই একটা ছোটো ঘরে আমি থাকতুম, অন্যটাতে তিনি থাকতেন; তাঁর রোপণ-করা শালবীথিকা তখন বড়ো হতে আরম্ভ করেছে। তখন আমার কবিতা লেখার পাগ্‌লামো তার আদিপর্ব পেরিয়েছে; নাট্যঘরের পাশে একটা নারিকেলগাছ ছিল, তারই তলায় বসে 'পৃথ্বীরাজ-বিজয়'[১] নামে একটি কবিতা রচনা করে গর্ব অনুভব করেছিলাম। খোয়াইয়ে বেড়াতে গিয়ে নানা রকমের বিচিত্র নুড়ি সংগ্রহ করা, আর এ ধারে ও ধারে ঘুরে গুহাগহ্বর গাছপালা আবিষ্কার করাই ছিল আমার কাজ। ভোরবেলায় উঠিয়ে দিয়ে তিনি আমায় শ্রীভগবদ্গীতা থেকে তাঁর দাগ-দেওয়া শ্লোক নকল করতে দিতেন; রাত্রে সৌর জগতের গ্রহতারার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতেন। এ ছাড়া তখন তিনি আমাকে একটু-আধটু ইংরেজি ও সংস্কৃতও পড়াতেন। তবু তাঁর এত কাছে থেকেও সর্বদা মনে হত, তিনি যেন দূরে দূরে রয়েছেন। এই সময় দেখতুম যে, আশেপাশের লোকেরা কথায়-বার্তায় আলাপে-আলোচনায় তাঁর চিত্তবিক্ষেপ করতে সাহসই করত না। সকালবেলা অসমাপ্ত শুক্‌নো পুকুরের ধারে উঁচু জমিতে ও সন্ধ্যায় ছাতিমতলায় তাঁর যে ধ্যানের আত্মসমাহিত মূর্তি দেখতুম সে আমি কখনও ভুলব না।

তার পর হিমালয়ের কথা। তীব্র শীতের প্রত্যুষে প্রত্যহ ব্রাহ্মমুহূর্তে তাঁকে দেখতুম, বাতি হাতে। তাঁর দীর্ঘ দেহ লাল একটা শালে আবৃত করে তিনি আমায় জাগিয়ে দিয়ে উপক্রমণিকা পড়তে প্রবৃত্ত করতেন। তখন দেখতুম, আকাশে তারা, আর পর্বতের উপর প্রত্যুষের আবছায়া অন্ধকারে তাঁর পূর্বাস্য ধ্যানমূর্তি, তিনি যেন সেই শান্ত স্তব্ধ আবেষ্টনের সঙ্গে একাঙ্গীভূত। এই কদিন তাঁর নিবিড় সান্নিধ্য সত্ত্বেও এটা আমার বুঝতে দেরি হত না যে, কাছে থেকেও তাঁকে নাগাল পাওয়া যায় না। তার পরে স্বাস্থ্যভঙ্গের সময় তিনি যখন কলকাতায় ছিলেন তখন আমার

যুবক বয়সে তাঁর কাছে প্রায়ই বিষয়কর্মের ব্যাপার নিয়ে যেতে হত। প্রতি মাসের প্রথম তিনটে দিন ব্রাহ্মসমাজের খাতা, সংসারের খাতা, জমিদারির খাতা নিয়ে তাঁর কাছে কম্পান্বিত কলেবরে যেতুম। তাঁর শরীর তখন শক্ত ছিল না, চোখে কম দেখতেন, তবুও শুনে শুনে অঙ্কের সামান্য ত্রুটিও তিনি চট করে ধরে ফেলতেন। এই সময়েও তাঁর সেই স্বভাবসিদ্ধ ঔদাসীন্য ও নির্লিপ্ততা আমায় বিস্মিত করেছে।

আমাদের সকল আত্মীয়-পরিজনের মধ্যে তিনি ছিলেন তেমনি একা যেমন একা সৌরপরিবারে সূর্য— স্বীয় উপলব্ধির জ্যোতির্মণ্ডলের মধ্যে তিনি আত্মসমাহিত থাকতেন। তাঁর প্রকৃতিগত নিরাসক্তির প্রকৃত দান হল এই আশ্রম; জনতা থেকে দূরে অথচ কল্যাণসূত্রে জনতার সঙ্গে আবদ্ধ। প্রকৃতির সৌন্দর্যের মধ্যে যে আনন্দ, এবং আত্মার আনন্দ, এই দুইয়েরও প্রতীক হল এই আশ্রম। এই দুই আনন্দ মিলে তাঁর জীবনকে পরিপূর্ণ করেছিল। যে চিত্তবৃত্তি থাকলে মানুষকে সংঘবদ্ধ করা যায় সে তাঁর ছিল না। উপনিষদের মন্ত্র-উপলব্ধির আনন্দ তাঁর অন্তরে নিহিত ছিল— সাধারণের জন্যে সে আনন্দকে ছোটো করে বা জল মিশিয়ে পরিবেষণ করতে পারেন নি। এই-সকল কারণেই তাঁর চার দিকে বিশেষ কোনো-একটা সম্প্রদায় গড়ে ওঠে নি। আপনার চরিত্র ও জীবনের মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর জ্ঞান ও প্রেমের আদর্শ রেখে গেছেন। এর চেয়ে বেশি কিছু তিনি রেখে যান নি, কারণ জনতাকে বন্দী করার দুর্গপ্রতিষ্ঠা তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ ছিল।

তাঁর প্রকৃত দান এই আশ্রম; এই আশ্রমে আসতে হলে দীক্ষা নিতে হয় না, খাতায় নাম লিখতে হয় না— যে আসতে পারে সেই আসতে পারে, কারণ এ তো সম্প্রদায়ের নয়। এর ভিতরকার বাণীটা হল ‘শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্’। আশ্রমের মধ্যে যে গভীর শান্তি আছে সেটা কেউ মুক্তভাবে নিতে পারে তো নেয়। মোহমুগ্ধ করে তো সে আনন্দ দেওয়া যায় না। সেইজন্যেই কখনও বলেন নি যে, তাঁর বিশেষ একটা মত কাউকে পালন করতে হবে। তাঁর প্রাচীন সংস্কারের বিরুদ্ধে আমার আধুনিকপন্থী অগ্রজেরা অনেক বিরুদ্ধতা করেছেন, তিনি কিন্তু কখনও প্রতিবাদ করেন নি। আমার মধ্যেও অনেক-কিছু ছিল, অনেক মতবাদ, যার সঙ্গে তাঁর মতের মিল হয় নি, তবু তিনি শাসন করে তাঁর অনুবর্তী হতে কখনও আজ্ঞা করেন নি। তিনি জানতেন যে, সত্য শাসনের অনুগত নয়, তাকে পাওয়ার হলে পাওয়া যায়, নইলে যায়ই না। অত্যাচার করেন অনেক গুরু, নিজেদের মতবাদ দিয়ে অনুবর্তীদের আষ্টেপৃষ্ঠে বন্ধন করে গিঁট বাঁধতে গিয়ে তাঁরা সোনা হারান। আমার পিতৃদেব স্বতন্ত্র ছিলেন, আমাদের স্বাতন্ত্র্যও তিনি শ্রদ্ধা করতেন। কোনো দিন বাঁধতে চান নি। মরবার আগে তিনি বলে গিয়েছিলেন যে, শান্তিনিকেতন-আশ্রমে যেন তাঁর কোনো বাইরের চিহ্ন বা প্রতিকৃতি না থাকে। তাঁর এই অন্তিম বচনে সেই নিঃসংসক্ত আত্মার মুক্তির বাণী যেন ধ্বনিত হয়েছে। তিনি বুঝেছিলেন, যদি নিজেকে মুক্তি দিতে হয় তবে অন্যকেও মুক্তি দিতে হবে। যা বড়ো, কেবলমাত্র মুক্তির ক্ষেত্রেই তা থাকতে পারে। মুক্ত আকাশেই জ্যোতিষ্ক সঞ্চরণ করে। প্রদীপকেই কুটিরের মধ্যে সন্তর্পণে রাখতে হয়। এই মুক্তির শিক্ষা তাঁর কাছ থেকে আমি পেয়েছি। তাঁর কাছেই শিখেছি যে, সত্যকে জোর করে দেওয়া যায় না; বহু বিরুদ্ধতার ভিতর অপেক্ষা করে থাকতে হয়। এই আমার আজকের দিনের কথা।[২]

[১] ‘পৃথ্বীরাজের পরাজয়’? দ্রষ্টব্য, জীবনস্মৃতি, ‘হিমালয়যাত্রা’

[২] ৬ মাঘ ১৩৪২। মহর্ষির মৃত্যুবার্ষিকীতে শান্তিনিকেতনে কথিত

ভারতপথিক রামমোহন রায়

নানা দুঃখে চিত্তের বিক্ষেপে
যাহাদের জীবনের ভিত্তি যায় বারংবার কেঁপে,
যারা অন্যমনা, তারা শোনো,
আপনারে ভুলো না কখনো।
মৃত্যুঞ্জয় যাহাদের প্রাণ,
সব তুচ্ছতার ঊর্ধ্বে দীপ যারা জ্বালে অনির্বাণ,
তাহাদের মাঝে যেন হয়
তোমাদেরি নিত্য পরিচয়।
তাহাদের খর্ব কর যদি
খর্বতার অপমানে বন্দী হয়ে রবে নিরবধি।
তাদের সম্মানে মান নিয়ো
বিশ্বে যারা চিরস্মরণীয়।

১৩৪৭

ইতিহাসে দেখি অনেক বড়ো বড়ো প্রাচীন সভ্যতা দেশের নদীর সঙ্গে নাড়ীর যোগে প্রাণবান। নদী দেশকে দেয় জল, দেয় ফল; কিন্তু সবচেয়ে বড়ো তার দান, দেশকে সে দেয় গতি। দূরের সঙ্গে বাহিরের সঙ্গে সম্বন্ধ শাখায়িত করে নদী, স্থাবরের মর্মের মধ্যে নিয়ে আসে প্রাণের চলৎপ্রবাহ।

নদীমাতৃক দেশে নদী যদি একেবারে শুকিয়ে যায় তা হলে তার মাটিতে ঘটে কৃপণতা, তার অন্ন-উৎপাদনের শক্তি ক্ষীণ হয়। দেশের আপন জীবিকা যদি-বা কোনোমতে চলে, কিন্তু যে অন্নপ্রাচুর্যের দ্বারা বাইরের বৃহৎ জগতের সঙ্গে তার যোগ সেটা যায় দরিদ্র হয়ে। সে না পারে দিতে, না পারে নিতে। নিজের মধ্যে সে রুদ্ধ হয়ে থাকে, বিভক্ত হয় তার ঐক্যধারা, তার আত্মীয়মিলনের পথ হয় দুর্গম। বাহিরের সঙ্গে সে হয় পৃথক, অন্তরের মধ্যে সে হয় খণ্ডিত।

যেমন বিশেষ দেশ নদীমাতৃক, তেমনি বিশেষ জনচিত্ত আছে যাকে নদীমাতৃক বলা চলে। সে চিত্তের এমন নিত্য-প্রবাহিত মননধারা যার যোগে বাহিরকে সে আপনার মধ্যে টেনে আনে, নিজের মধ্যেকার ভেদ বিভেদ তার ভেসে যায়—যে প্রবাহ চিন্তার ক্ষেত্রকে নব নব সফলতায় পরিপূর্ণ করে, নিরন্তর অন্ন জোগায় সকল দেশকে, সকল কালকে।

একদা সেই চিত্ত ছিল ভারতের, তার ছিল বহমান-মনন-ধারা। সে বলতে পেরেছিল 'আয়ন্তু সর্বতঃ স্বাহা', সকলে আসুক সকল দিক থেকে। 'শৃণ্বন্তু বিশ্বে', শুনুক বিশ্বের লোক। বলেছিল 'বেদাহম্', আমি জানি—এমন কিছু জানি যা বিশ্বের সকলকে আমন্ত্রণ করে জানাবার। যে তারা জ্যোতির্হীন তাকে নিখিল নক্ষত্রলোক স্বীকার করে না। প্রাচীন ভারত নিত্যকালের মধ্যে আপন পরিচয়কে দীপ্যমান করেছে; বিশ্বলোকে সে প্রকাশিত হয়েছে প্রভূত দাক্ষিণ্যে, আপনাকে দান করার দ্বারা। সেদিন সে ছিল না অকিঞ্চনরূপে অকিঞ্চিৎকর।

শত শত বৎসর চলে গেল—ইতিহাসের পুরোগামিনী গতি হল নিস্তব্ধ, ভারতবর্ষের মনোলোকে চিন্তার মহানদী গেল শুকিয়ে। তখন দেশ হয়ে পড়ল স্থবির, আপনার মধ্যে আপনি সংকীর্ণ, তার সজীব চিত্তের তেজ আর বিকীর্ণ হয় না দূরদূরান্তরে। শুকনো নদীতে যখন জল চলে না তখন তলাকার অচল পাথরগুলো পথ আগলে বসে; তারা অসংলগ্ন, তারা অর্থহীন, পথিকদের তারা বিঘ্ন। তেমনি দুর্দিন যখন এল এই দেশে তখন জ্ঞানের চলমান গতি হল অবরুদ্ধ, নির্জীব হল নবনবোন্মেষশালিনী বুদ্ধি, উদ্ধত হয়ে দেখা দিল নিশ্চল আচারপুঞ্জ, আনুষ্ঠানিক নিরর্থকতা, মননহীন লোকব্যবহারের অভ্যস্ত পুনরাবৃত্তি। সর্বজনের প্রশস্ত রাজপথকে তারা বাধাগ্রস্ত করলে; খণ্ড খণ্ড সংকীর্ণ সীমানার বাইরে বিচ্ছিন্ন করলে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধকে।

ঘুমের অবস্থায় মনের জানলা যখন সব বন্ধ হয়ে যায়, মন হয় বন্দী। তখন যে-সব স্বপ্ন নিয়ে সে খেলা করে বিশ্বসত্যের সঙ্গে তাদের যোগ নেই, কেবলমাত্র সেই সুপ্ত মনের নিজের উপরেই তাদের প্রভাব এক কেন্দ্রে আবর্তিত, তা তারা যতই অদ্ভুত হোক, অসংগত হোক, উৎকট হোক। বাহিরের বাস্তবরাজ্য থেকে এই স্বপ্নরাজ্যে আর কারও প্রবেশের পথ নেই। একে বিদ্রূপ করা যায়, কিন্তু বিচার করা যায় না; কেননা এ থাকে যুক্তির বাহিরে।

তেমনি ছিল অর্থহারা আচারের স্বপ্নজালে জড়িত ভারতবর্ষ, তার আলো এসেছিল নিবে। তার আপনার কাছে আপন সত্যপরিচয় ছিল আচ্ছন্ন। এমন সময় রামমোহন রায়ের আবির্ভাব হল এই দেশে, সেই আত্মবিস্মৃত প্রদোষের অন্ধকারে। সেদিন তার ইতিহাস অগৌরবের কালিমায় আবৃত। ভারত আপন বাণী তখন হারিয়েছে, নিখিল পৃথিবীর এই নতুন কালের জন্যে তার কোনো বার্তা নেই, ঘরের কোণে বসে সে মৃত যুগের মন্ত্র জপ করছে।

যখন সে আপন দুর্বলতায় অভিভূত সেই অপমানের দিনে বাইরের লোক এল তার দ্বারে; আপন সম্মান রক্ষা করে তাকে অভ্যর্থনা করবে এমন আয়োজন ছিল না; অতিথিরূপে তাকে গৃহস্বামী ডাকতে পারে নি, দ্বার ভেঙে দস্যুরূপে সে প্রবেশ করলে তার স্বর্ণভাণ্ডারে।

ভারতের চিত্ত সেদিন মনের অন্ন নূতন করে উৎপাদন করতে পারছিল না, তার খেত ভরা ছিল আগাছার জঙ্গলে। সেই অজন্মার দিনে রামমোহন রায় জন্মেছিলেন সত্যের ক্ষুধা নিয়ে। ইতিহাসের প্রাণহীন আবর্জনায়—বাহ্যবিধির কৃত্রিমতায় কিছুতে তাঁকে তৃপ্ত করতে পারলে না। কোথা থেকে তিনি নিয়ে এলেন সেই জ্ঞানের আগ্রহে স্বভাবত উৎসুক মন, যা সম্প্রদায়ের বিচিত্র বেড়া ভেঙে বেরোল, চারি দিকের মানুষ যা নিয়ে ভুলে আছে তাতে যার বিতৃষ্ণা হল। সে চাইল মোহমুক্ত বুদ্ধির সেই অবারিত আশ্রয়, যেখানে সকল মানুষের মিলনতীর্থ।

এই বেড়া-ভাঙার সাধনাই যথার্থ ভারতবর্ষের মিলনতীর্থকে উদ্ঘাটিত করা। এইজন্যেই এ সাধনা বিশেষভাবে ভারতবর্ষের, যেহেতু এর বিরুদ্ধতাই ভারতে এত প্রভূত, এত প্রবল। ইংলণ্ড ক্ষুদ্র দ্বীপের সীমায় বদ্ধ, সেইজন্যেই তার সাধনা গেছে দ্বৈপায়নতার বিপরীত দিকে, বিশ্বে সে আপনাকে সুদূরে বিস্তার করেছে। দেশের বিশেষ অবস্থার মধ্যেই দেশের অঞ্জলি পাতা রয়েছে, সেই অঞ্জলির অর্থই এই যে, তার শূন্যতাকে পূর্ণ করতে হবে।

প্রত্যেক জাতির মধ্যে আছে তার নিহিতার্থ, তার বিশেষ সমস্যা; সেই অর্থ তাকে পূরণ করতে হয় নিরন্তর প্রয়াসে। এই প্রয়াসের দ্বারাই তার চরিত্র সৃষ্ট হয়, তার উদ্ভাবনী শক্তি বললাভ করে। মানুষকে তার মনুষ্যত্ব প্রতিক্ষণে জয় করে নিতে হয়। প্রত্যেক জাতির ইতিহাস আপন জয়যাত্রার ইতিহাস। কঠিন বাধা দূর করবার পথেই তার স্বাস্থ্য, তার সম্পদ। এইজন্যেই বলেছে, বীরভোগ্যা বসুন্ধরা। দুর্গমকে সুগম করতে এসেছে মানুষ, দুর্লভকে উপলব্ধ। বিশেষ জাতিকে যে বিশেষ সমস্যা দিয়েছেন বিধাতা, তার সত্য উত্তর দিতে থাকার মধ্যেই তার পরিত্রাণ। যারা সমাধান করতে ভুল করেছে তারা মরেছে। আর দুর্গতিগ্রস্ত হয়েছে তারাই যারা মনে করেছে তাদের সমাধান করবার কিছুই নেই, সমস্ত সমাধা হয়ে গেছে। যতক্ষণ মানুষের প্রাণ আছে ততক্ষণই তার সমস্যা, অবিরত সমস্যার উত্তর দিতে থাকাই প্রাণক্রিয়া। চারি দিকে জড়ের জটিল বাধা নিত্যই, সেই বাধা নিত্যই ভেদ করার দ্বারা প্রাণ আপনাকে সপ্রমাণ করে। ইতিহাসে যে জটা পাকিয়ে থাকে সেই গ্রন্থিকেই সনাতন বলে ভক্তি করলে সেটা মরণের ফাঁস হয়ে ওঠে।

মানব-ইতিহাসের প্রধান সমস্যাটা কোথায়? যেখানে কোনো অন্ধতায় কোনো মূঢ়তায় মানুষে মানুষে বিচ্ছেদ ঘটায়।—মানবসমাজের সর্বপ্রধান তত্ত্ব মানুষের ঐক্য। সভ্যতার অর্থই হচ্ছে মানুষের একত্র হবার অনুশীলনা। এই ঐক্যতত্ত্বের উপলব্ধি যেখানেই দুর্বল সেখানে সেই দুর্বলতা নানা ব্যাধির আকার ধরে দেশকে চারি দিক থেকে আক্রমণ করে।

ভারতবর্ষে তার সমস্যাটা সুস্পষ্ট। এখানে নানা জাতের লোক একত্রে এসে জুটেছে। পৃথিবীতে অন্য কোনো দেশে এমন ঘটে নি। যারা একত্র হয়েছে তাদের এক করতেই হবে, এই হল ভারতবর্ষের সর্বপ্রথম সমস্যা। এক করতে হবে বাহ্যিক ব্যবস্থায় নয়, আন্তরিক আত্মীয়তায়। ইতিহাস মাত্রেরই সর্বপ্রধান মন্ত্র হচ্ছে 'সং গচ্ছধ্বং সং বদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাম্'—এক হয়ে চলব, এক হয়ে বলব, সকলের মনকে এক বলে জানব। এই মন্ত্রের সাধনা ভারতবর্ষে যেমন অত্যন্ত দুরূহ এমন আর কোনো দেশেই নয়। যতই দুরূহ হোক, এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ ছাড়া রক্ষা পাবার অন্য কোনো পথ নেই।

অন্য কোনো দেশের শ্রীবৃদ্ধি দেখে যখন আমরা মুগ্ধ হই তখন অনেক সময়ে আমরা তার সিদ্ধির পরিণত রূপটার দিকেই লুব্ধদৃষ্টিপাত করি, তার সাধনার দুর্গম পথটা আমাদের চোখে পড়ে না। দেখতে পাওয়া গেল স্বাধীন দেশের রাষ্ট্রব্যবস্থা, মনে করি ঐ ব্যবস্থার একটি অনুরূপ প্রতিমা খাড়া করতে পারলেই আমাদের উদ্ধার। ভুলে যাই রাষ্ট্রব্যবস্থাটা দেহমাত্র—সেই দেহ নিরর্থক, যদি তার প্রাণ না থাকে। সেই প্রাণই জাতিগত ঐক্য। অন্য দেশে সেই ঐক্যেরই আন্তরিক শক্তিতে রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। সে-সব দেশেও সেই ঐক্যে যেখানে যে পরিমাণ বিকার ঘটে সেখানে সেই পরিমাণেই সমস্যা কঠিন হয়ে ওঠে। আমাদের দেশে জাতিতে জাতিতে পার্থক্য, পশ্চিম-মহাদেশে শ্রেণীতে শ্রেণীতে। সেই শ্রেণীগত পার্থক্যের মধ্যে আন্তরিক সামঞ্জস্য যদি না ঘটে তা হলে বাহ্য ব্যবস্থায় বিপদ-নিবারণ হবে না।

আমরা যদি কোনো ক্ষেত্রে দেখতে পাই প্রচুর ফসল তা হলে গোড়াতেই এ কথা মনে রাখতে হবে, এ ফসল বালিতে উৎপন্ন হয় নি, হয়েছে মাটিতে। মরুভূমিতে দেখা যায় উদ্ভিদ দূরে দূরে বিশ্লিষ্ট, তারা কাঁটার দ্বারা নিজেকে অত্যন্ত স্বতন্ত্র করে রক্ষা করেছে। তাদের জননী ধরণী এক রসের দাক্ষিণ্যে সকলকে পরিপোষণ করে নি, তাদের পরস্পরের মধ্যে প্রাণের ঐক্যে কার্পণ্য। এর প্রধান কারণ হচ্ছে, মাটির কণায় কণায় বন্ধন আছে, বালির কণায় কণায় বিচ্ছেদ। আমরা যখন সমৃদ্ধিমান জাতির ইতিহাস চর্চা করি তখন ভরা ফসলের দিকে চোখ পড়ে, এবং কৃষিপ্রণালীর বিবরণও যত্ন করে মুখস্থ করে পরীক্ষা পাস করে থাকি; কেবল একটা কথা মনে রাখি নে, এই ফসলের ঐশ্বর্য সম্পূর্ণ অসম্ভব যদি তার ভূমিকাতেই থাকে বিচ্ছিন্নতা। কৃষির যন্ত্রকেও আমরা দাবি করি, ফসলেরও প্রত্যাশা করে থাকি, কিন্তু আমাদের ভূমির প্রকৃতিতেই যে বিচ্ছেদ তাকে চোখ বুজে আমরা নগণ্য বলেই জ্ঞান করি এবং ধর্মের নামে তাকে নিত্যরূপে রক্ষা করবার চেষ্টায় সতর্ক হয়ে থাকি। আমরা ইতিহাসের উপরকার মলাটটা পড়ি, ভিতরকার পাতাগুলো বাদ দিয়ে যাই, ভুলে যাই কোনো দেশেই সমাজগত বিশ্লিষ্টতার উপর রাষ্ট্রজাতিগত স্বাতন্ত্র্য আজ পর্যন্ত সংঘটিত ও সংরক্ষিত হয় নি। প্রজারা যেখানে বিভক্ত সেখানে ব্যক্তিবিশেষের একাধিপত্য তাদের বাইরের বন্ধনে বেঁধে রাখে। তাও বেশি দিন টেকে না, কেবলই হাতবদল হতে থাকে। যেখানে মানুষে মানুষে বিচ্ছেদ সেখানে কেবল রাষ্ট্রশক্তি নয়, বুদ্ধিবৃত্তিও শিথিল হয়ে যায়। সেখানে মাঝে মাঝে প্রতিভাশালীর অভ্যুদয় হয় না তা নয়, কিন্তু সেই প্রতিভার দান ধারণ ও পোষণ করবার উপযুক্ত আধার সর্বসাধারণের মধ্যে না থাকাতে কেবলই তা বিকৃত ও বিলুপ্ত হতে থাকে। ঐক্যের অভাবে মানুষ বর্বর হয়, ঐক্যের শৈথিল্যে মানুষ ব্যর্থ হয়, তার কারণ সমবায়ধর্ম মানুষের সত্যধর্ম, তার শ্রেষ্ঠতার হেতু।

ঐক্যবোধের উপদেশ উপনিষদে যেমন একান্তভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে এমন কোনো দেশে কোনো শাস্ত্রে হয় নি। ভারতবর্ষেই বলা হয়েছে, 'বিদ্বান্ ইতি সর্বান্তরস্থঃ স্বসংবিদ্‌রূপবিদ্ বিদ্বান্'— নিজেরই চৈতন্যকে সর্বজনের অন্তরস্থ করে যিনি জানেন তিনিই বিদ্বান্। অথচ এই ভারতবর্ষেই অসংখ্য কৃত্রিম অর্থহীন বিধিবিধানের দ্বারা পরস্পরকে যেমন অত্যন্ত পৃথক করে জানা হয় পৃথিবীতে এমন আর কোনো দেশেই নেই। সুতরাং এ কথা বলতে হবে, ভারতবর্ষে এমন একটা বাহ্য স্থূলতা রয়ে গেছে যা ভারতবর্ষের অন্তরতর সত্যের বিরুদ্ধ, যার মর্মান্তিক আঘাত দীর্ঘকাল ধরে ভারতের ইতিহাসে প্রকাশ পাচ্ছে নানা দুঃখে দারিদ্র্যে অপমানে।

এই দ্বন্দ্বের মাঝখানে ভারতবর্ষের শাশ্বত বাণীকে জয়যুক্ত করতে কালে কালে যে মহাপুরুষেরা এসেছেন, বর্তমান যুগে রামমোহন রায় তাঁদেরই অগ্রণী। এর আগেও নিবিড়তম অন্ধকারের মধ্যে মাঝে মাঝে শোনা গিয়েছে ঐক্যবাণী। মধ্যযুগে অচল সংস্কারের পিঞ্জরদ্বার খুলে বেরিয়ে পড়েছেন প্রত্যুষের অতন্দ্রিত পাখি, গেয়েছেন তাঁরা আলোকের অভিবন্দন-গান সামাজিক জড়ত্বপুঞ্জের ঊর্ধ্ব আকাশে। তাঁরা সেই মুক্ত প্রাণের বার্তা এনেছেন, উপনিষদ যাকে সম্বোধন করে বলেছেন 'ব্রাত্যস্ত্বং প্রাণ'— হে প্রাণ, তুমি ব্রাত্য, তুমি সংস্কারে বিজড়িত স্থাবর নও। সেই মুক্তিদূতের মধ্যে একজন ছিলেন কবীর, তিনি নিজেকে ভারতপথিক বলে জানিয়েছেন। নানা জটিল জঙ্গলের মধ্যে এই ভারতপথকে যাঁরা দেখতে পেয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে আর-একজন ছিলেন দাদূ। তিনি বলেন—

ভাই রে ঐসা পংথ হমারা
দ্বৈপখরহিত পংথ গহি পূরা অবরণ এক অধারা।

ভাই রে, আমার পথ এইরকম, সে দুইপক্ষরহিত, বর্ণহীন, সে এক।

তিনি বলেছেন—

জাকোঁ মারণ জাইয়ে সোঈ ফিরি মারৈ,
জাকোঁ তারণ জাইয়ে সোঈ ফিরি তারৈ।

যাকে আমরা মারি সেই আমাদের ফিরে মারে, যাকে ত্রাণ করি সেই আমাদের ফিরে ত্রাণ করে।

তিনি বলেছেন—

সব ঘট একৈ আতমা, ক্যা হিন্দু মুসলমান।

সেদিন আর-এক সাধু, ভারতের পথ যাঁর কাছে ছিল সুগোচর, তাঁর নাম রজ্জব, তিনি বলেন—

বুংদ বুংদ মিলি রস সিংধ হৈ, জুদা জুদা মরু ভায়।

অর্থাৎ, বিন্দুর সঙ্গে বিন্দু যখন মেলে তখনই হয় রসসিন্ধু, বিন্দুতে বিন্দুতে যখন পৃথক হয়ে যায় তখনই মরুভূমি প্রকাশ পায়।

এই রজ্জব বলেন—

হাথ জোড়ু গুরুদ সুঁ হোঁ মিলৈ হিন্দু মুসলমান।

গুরুর কাছে আমি করজোড় করছি যেন হিন্দু মুসলমান মিলে যায়।

এই ভারতপথিকেরা যে মিলনের কথা বলেছিলেন সে মিলন মনুষ্যত্বের সাধনায়, ভেদবুদ্ধির অহংকার থেকে মুক্তিলাভের সাধনায়, রাষ্ট্রীয় প্রয়োজন-সাধনায় নয়। এই ঐক্যের পথ যথার্থ ভারতের পথ। সেই পথের পথিক আধুনিক কালে রামমোহন রায়। তিনিও প্রয়োজনের দিক থেকে নয়, মানবাত্মার

গভীরে যে মিলনের ধর্ম আছে সেই নিত্য আদর্শের দিক থেকে ভারতের ইতিহাসে শুভবুদ্ধিদ্বারা সংযুক্ত মানুষের এক মহদ্‌রূপ অন্তরে দেখেছিলেন। ভারতের উদার প্রশস্ত পন্থায় তিনি সকলকেই আহ্বান করেছেন, যে পন্থায় হি[illegible] মুসলমান খৃস্টান সকলেই অবিরোধে মিলতে পারে। সেই বিপুল পন্থাই যদি ভারতের না হয়, যদি আচারের কাঁটার বেড়ায় বেষ্টিত সাম্প্রদায়িক শতখণ্ডতাই হয় ভারতের নিত্যপ্রকৃতিগত, তা হলে তো আমাদের বাঁচবার কোনো উপায় নেই। ঐ তো এসেছে মুসলমান, ঐ তো এসেছে খৃস্টান—

> সাধন মাহি জোগ নহি জৈ, ক্যা সাধন পরমাণ।
>
> ঐতিহাসিক সাধনায় এদের যদি যুক্ত করতে না পারি তা হলে সাধনার প্রমাণ হবে কিসে?

এদের অঙ্গীভূত করে নেবার প্রাণশক্তি যদি ভারতের না থাকে, পাথরের মতো কঠিন পিণ্ডীভূত হয়ে এদের বাইরে ঠেকিয়ে রাখাই যদি আমাদের ধর্ম হয়, তবে সেই পুঞ্জ পুঞ্জ অসংশ্লিষ্ট অনাত্মীয়তার নিদারুণ ভার সইবে কে?

প্রতিদিন কি এরা স্খলিত হয়ে পড়ছে না দলে দলে, সমাজের নিচের স্তরে কি গর্ত প্রসারিত হচ্ছে না? আপনার লোক যখন পর হয়ে যায় তখন সে যে নিদারুণ হয়ে ওঠে তার কি প্রমাণ পাচ্ছি নে? যাদের অবজ্ঞা করি তাদের আলগা করে রাখি, যাদের ছুঁই নে তাদের ধরতে পারি নে। আপনাকে পর করবার যে সহস্র পথ প্রশস্ত করে রেখেছি সেই পথ দিয়েই শনির যত চর দেশে প্রবেশ করেছে। আমাদের বিপুল জনতরণীর তক্তাগুলিকে সাবধানে ফাঁক ফাঁক করে রাখাকেই যদি ভারতের চিরকালীন ধর্ম বলে গণ্য করি, তা হলে বাইরের তরঙ্গগুলোকে শত্রু ঘোষণা করে কেন মিছে বিলাপ করা, তা হলে বিনাশের লবণাশ্রুসমুদ্রে তলিয়ে যাওয়াকেই ভারত-ইতিহাসের চরম লক্ষ্য বলে নিশ্চেষ্ট থাকাই শ্রেয়। সেচনী দিয়ে ক্রমাগত জল সেঁচে সেঁচে কতদিন চলবে আমাদের জীর্ণ ভাগ্যের তরী বাওয়া?

আমাদের ইতিহাসের আধুনিক পর্বের আরম্ভ-কালেই এসেছেন রামমোহন রায়। তখন এ যুগকে কি বিদেশী কি স্বদেশী কেউ স্পষ্ট করে চিনতে পারে নি। তিনিই সেদিন বুঝেছিলেন, এ যুগের যে আহ্বান সে সুমহৎ ঐক্যের আহ্বান। তিনি জ্ঞানের আলোকে প্রদীপ্ত আপন উদার হৃদয় বিস্তার করে দেখিয়েছিলেন, সেখানে হিন্দু মুসলমান খৃস্টান কারও স্থান-সংকীর্ণতা নেই। তাঁর সেই হৃদয় ভারতেরই হৃদয়, তিনি ভারতের সত্য পরিচয় আপনার মধ্যে প্রকাশ করেছেন। ভারতের সত্য পরিচয় সেই মানুষে যে মানুষের মধ্যে সকল মানুষের সম্মান আছে, স্বীকৃতি আছে।

সকল দেশেরই মধ্যে একটা বিরুদ্ধতার দ্বন্দ্ব দেখা যায়। এক ভাগে তার আপন শ্রেষ্ঠতাকে আপনি প্রতিবাদ, তার অন্ধতা অহমিকা-দ্বারাই তার আত্মলাঘব; এই দিকটা অভাবার্থক, এই দিকে তার ক্ষতির বিভাগ, তার কৃষ্ণপক্ষের অংশ। আর-এক দিকে তার আলোক, তার নিহিতার্থ, তার চিরসত্য; এই দিকটাই ভাবার্থক, প্রকাশাত্মক। এই দিকে তার পরিচয় যদি ম্লান না হয়, নিঃশেষিত না হয়, তবেই সর্বকালে সে গৌরবান্বিত।

য়ুরোপের সকল দেশেই একদিন ডাইনির অস্তিত্ব বিশ্বাস করত। শত শত স্ত্রীলোক সেখানে নিরপরাধে পুড়ে মরেছে। কিন্তু এই অন্ধতার দিকটাই আন্তরিক-ভাবে য়ুরোপের একান্ত ছিল না। তাই লোকগণনায় এই বিশ্বাসের প্রসার পরিমাপ করে এর দ্বারা য়ুরোপকে চিনতে গেলে অবিচার হবে। একদিন য়ুরোপের

ধর্মমূঢ়বুদ্ধি জিয়োর্ডানো ব্রুনোকে পুড়িয়ে মেরেছিল, কিন্তু সেদিন চিতায় জ্বলতে জ্বলতে একলা জিয়োর্ডানো দিয়েছিলেন য়ুরোপীয় চিত্তের পরিচয়, যে চিত্তকে সে যুগের সাম্প্রদায়িক জড়বুদ্ধি দল বেঁধে অস্বীকার করেছিল, কিন্তু যাকে আজ সর্বমানব সম্মানের সঙ্গে স্বীকার করে নিয়েছে। একদিন ইংরেজের সাহিত্যে, তার ইতিহাসে, ইংরেজের পরিচয় আমরা পেয়েছিলুম; দেখেছিলুম মানুষের প্রতি তার মৈত্রী, দাসপ্রথার 'পরে তার ঘৃণা, পরাধীনের মুক্তির জন্যে তার অনুকম্পা, ন্যায়বিচারের প্রতি তার নিষ্ঠা। আজ যদি ভারতের রাষ্ট্রাসন জুড়ে তার এই স্বভাবের নিষ্ঠুর প্রতিবাদ অজস্র দেখতে পাই তবু তার থেকে ইংরেজের চরম পরিচয় গ্রহণ করা সত্য হবে না। যে কারণেই হোক তার অভাবার্থক দিকটা প্রবল হয়ে উঠেছে, এ-সমস্ত তারই দুর্লক্ষণ। আজও ইংলণ্ডে এমন মানুষ আছে ইংরেজ-স্বভাবের বিরুদ্ধগামী সমস্ত অন্যায় যাদের হৃদয়কে পীড়িত করছে। বস্তুত সব ইংরেজই যে ইংরেজ এ কথাটা মনে করাই ভুল। খাঁটি ইংরেজের সংখ্যা স্বল্প যদি-বা হয়, আর নিজের সমাজে তারা যদি-বা লাঞ্ছনা ভোগ করে, তবুও তারা সমস্ত ইংরেজেরই প্রতিনিধি।

তেমনি একদা যেদিন বাংলাদেশে প্রগাঢ় অন্ধতা, কৃত্রিমতা, সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতার মধ্যে রামমোহন রায়ের আগমন হল সেদিন এই বিমুখ দেশে তিনিই একলা ভারতের নিত্য পরিচয় বহন করে এসেছেন। তাঁর সর্বতোমুখী বুদ্ধি ও সর্বতঃপ্রসারিত হৃদয় সেদিনকার এই বাংলাদেশের অখ্যাত কোণে দাঁড়িয়ে সকল মানুষের জন্যে আসন পেতে দিয়েছিল। এ কথা মুক্তকণ্ঠে বলবার দিন এসেছে যে, যে আতিথ্যভ্রষ্ট আসন কৃপণঘরের রুদ্ধ কোণের জন্যে সে আসন নয়, যে আসনে সর্বজন অবাধে স্থান পেতে পারে সেই উদার আসনই চিরন্তন ভারতবর্ষের স্বরচিত: লক্ষ লক্ষ আচারবাদী তাকে যদি সংকুচিত করে, খণ্ড খণ্ড করে, সমস্ত পৃথিবীর কাছে স্বদেশকে ধিক্‌কৃত করে ভারতসভ্যতার প্রতিবাদ করে তবু বলব এ কথা সত্য। মানুষের ঐক্যের বার্তা রামমোহন রায় একদিন ভারতের বাণীতেই ঘোষণা করেছিলেন, এবং তাঁর দেশবাসী তাঁকে তিরস্কৃত করেছিল—তিনি সকল প্রতিকূলতার মধ্যে দাঁড়িয়ে আমন্ত্রণ করেছিলেন মুসলমানকে, খৃস্টানকে, ভারতের সর্বজনকে হিন্দুর এক পঙ্‌ক্তিতে ভারতের মহা অতিথিশালায়। যে ভারত বলেছে—

যস্তু সর্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি
সর্ব ভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্‌সতে।

যিনি সকলের মধ্যে আপনাকে, আপনার মধ্যে সকলকে দেখেন, তিনি কাউকে ঘৃণা করেন না।

তাঁর মৃত্যুর পরে আজ একশত বৎসর অতীত হল। সেদিনকার অনেক কিছুই আজ পুরাতন হয়ে গেছে, কিন্তু রামমোহন রায় পুরাতত্ত্বের অস্পষ্টতায় আবৃত হয়ে যান নি। তিনি চিরকালের মতোই আধুনিক। কেননা তিনি যে কালকে অধিকার করে আছেন তার এক সীমা পুরাতন ভারতে, কিন্তু সেই অতীতকালেই তা আবদ্ধ হয়ে নেই—তার অন্য দিক চলে গিয়েছে ভারতের সুদূর ভাবীকালের অভিমুখে। তিনি ভারতের সেই চিত্তের মধ্যে নিজের চিত্তকে মুক্তি দিতে পেরেছেন যা জ্ঞানের পথে সর্বমানবের মধ্যে উন্মুক্ত। তিনি বিরাজ করছেন ভারতের সেই আগামী কালে, যে কালে ভারতের মহা ইতিহাস আপন সত্যে সার্থক হয়েছে, হিন্দু মুসলমান খৃস্টান মিলিত হয়েছে অখণ্ড মহাজাতীয়তায়। বায়ুপোতে অত্যূর্ধ্ব আকাশে যখন ওঠা যায় তখন দৃষ্টিচক্র যতদূর প্রসারিত হয়,

তার এক দিকে থাকে যে দেশকে বহুদূরে অতিক্রম করে এসেছি, আর-এক দিক থাকে সম্মুখে যা এখনও আছে বহুযোজন দূরে। রামমোহন যে কালে বিরাজ করেন সে কাল তেমনি অতীতে অনাগতে পরিব্যাপ্ত, আমরা তাঁর সেই কালকে আজও উত্তীর্ণ হতে পারি নি।

আজ আমার অধিক বলবার শক্তি নেই, কেবল এই কথা মাত্র বলতে এসেছি যে, যদিও অজ্ঞানের অশক্তির জগদ্দল পাথর ভারতের বুকে চেপে আছে, লজ্জায় আমরা সংকুচিত, দুঃখে আমাদের দেহমন জীর্ণ, অপমানে আমাদের মাথা অবনত, বিদেশের পথিক আমাদের কলঙ্ক কুড়িয়ে নিয়ে দেশে দেশে নিন্দাপণ্যের ব্যাবসা চালাচ্ছে, তবু আমাদের সকল দুর্গতির উপরে সর্বোচ্চ আশার কথা এই যে, রামমোহন রায় এ দেশে জন্মেছেন, তাঁর মধ্যে ভারতের পরিচয়। তাঁকে দেশের বহুজনে সাম্প্রদায়িক ক্ষুদ্র অহমিকায় যদি অবজ্ঞা করে, আপন বলে স্বীকার না করে, তবুও চিরকালের ভারতবর্ষ তাঁকে গভীর অন্তরে নিশ্চিত স্বীকার করেছে। বর্তমান যুগ-রচনায় আজও তাঁর প্রভাব ক্রিয়াশালী, আজও তাঁর নীরব কণ্ঠ ভারতের অমর বাণীতে আহ্বান করছে তাঁকে—

> য একোঽবর্ণো বহুধা শক্তিযোগাৎ
> বর্ণান্ অনেকান্ নিহিতার্থো দধাতি
> বিচৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ স দেবঃ।

প্রার্থনা করছে—

> স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু॥

১৪ পৌষ ১৩৪০

২

আমাদের প্রাণ বিদ্রোহী। চার দিকে জড়দানব তার প্রকাণ্ড শক্তি ও অসংখ্য বাহু বিস্তার করে বসে আছে। ক্ষুদ্র প্রাণ প্রতি মুহূর্তে নানা দিক থেকে তাকে নিরস্ত করে তবে আত্মপ্রকাশ করে। এই জড় তার চারি দিকে ক্লান্তির প্রাচীর তুলে তুলে তার প্রয়াসের পরিধিকে কেবলই সংকীর্ণ করে আনতে চায়। বারংবার এই প্রাচীরকে ভেঙে ভেঙে তবে প্রাণ আপন অধিকার রক্ষা করতে পারে। তাই আমাদের হৃৎপিণ্ড দিনে রাত্রে এক মুহূর্ত ছুটি নিতে পারে না, গুরুভার বস্তুপুঞ্জের নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে তার আক্রমণ ক্ষান্ত হলেই মৃত্যু।

প্রাণের এই নিত্য সচেষ্টতাতেই যেমন প্রাণের আত্মপ্রকাশ, মনেরও তাই। তার অনন্ত জিজ্ঞাসা। চার দিকে সত্যের রহস্য মূক হয়ে আছে। আপন শক্তিতে উত্তর আদায় করতে হয়। অল্প অনবধান হলেই ভুল উত্তর পাই। সেই ভুল উত্তরগুলিকে নিশ্চেষ্ট নিঃসংশয়ে স্বীকার করে নিলেই মনের সাংঘাতিক পরাভব। জিজ্ঞাসার শৈথিল্যেই মনের জড়তা। যেমন জীবনীশক্তির নিরুদ্যমেই অস্বাস্থ্য, তাতেই যত রোগের উৎপত্তি, বিনাশের আয়োজন, তেমনি মননশক্তির অবসাদ ঘটলেই মানুষের জ্ঞানের রাজ্যে যত রকমের বিকার প্রবেশ করে। সত্যমিথ্যা ভালোমন্দ সমস্ত কিছুকেই বিনাপ্রশ্নে অলস ভীরু মন যখন মেনে নিতে থাকে তখনই মনুষ্যত্বের সকল প্রকার দুর্গতি। জড়ের মধ্যে যে অচল মূঢ়তা, মানুষের

মন যখনই তার সঙ্গে আপসে সন্ধি করে তখন থেকে জগতে মানুষ মনমরা হয়ে থাকে, জড় রাজার খাজনা জুগিয়ে নিঃস্ব হয়ে পড়ে।

আমাদের দেশে একদিন মনের স্বরাজ গিয়েছে ধ্বংস হয়ে। পঙ্গু মনের ছিল না আত্মকর্তৃত্ব, প্রশ্ন করবার শক্তি ও ভরসা সে হারিয়েছিল। সে যা শুনেছে তাই মেনেছে, যে বুলি তার কানে দেওয়া হয়েছে সেই বুলিই সে আউড়িয়েছে। যখন কোনো উৎপাত এসে পড়েছে স্কন্ধে তখন তাকে বিধিলিপি বলে নিয়েছে মেনে। নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে নূতন প্রণালীতে বর্তমানকালীন সংসারসমস্যার সমাধান করা তার অধিকার-বহির্ভূত বলে স্বীকার করার দ্বারা আত্মাবমাননায় তার সংকোচ ছিল না। মনের আত্মপ্রকাশের ধারা সেদিন এ দেশে অবরুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। দেশ তখন সামনের কালের দিকে চলে নি, পিছনের কালকেই ক্রমাগত প্রদক্ষিণ করেছে— চিন্তাশক্তি যেটুকু বাকি ছিল সে অনুসন্ধান করতে নয়, অনুসরণ করবার জন্যেই।

সুপ্তি যখন আবিষ্ট করে তখনই চুরি যাবার সময়। অন্তরের মধ্যে যখন অসাড়তা, বাইরের বিপদ তখনই প্রবল। চিত্তের মধ্যে যার স্বাধীনতা নেই বাইরের দিক থেকে সে কখনোই স্বাধীন হতে পারে না। অন্তরের দিকে সব কিছুকে যে অবিসম্বাদে মেনে নেয়, বাইরে অন্যায় প্রভুত্বকেও না মানবার শক্তি তার থাকে না— যে বুদ্ধি অসত্যকে ঠেকায় মনে, সেই বুদ্ধিই অমঙ্গলকে ঠেকায় বহিঃসংসারে— নির্জীব মন অন্তরে বাহিরে কোনো আক্রমণকেই ঠেকাতে পারে না। তাই সেদিনকার ভারতের ইতিহাসে বারে বারে দেখা গেল ভারতবর্ষ তার মর্মান্তিক পরাভবকে মেনে নিলে আর সেইসঙ্গে মেনে নিলে যা না-মানবার এমন হাজার হাজার জিনিস। এই-যে তার বাইরের দুর্দশার বোঝা পুঞ্জীভূত হয়ে উঠল, এ তার অন্তরের অবুদ্ধির বোঝারই সামিল।

যখন আমাদের আর্থিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক শক্তি ক্ষীণতম, যখন আমাদের দৃষ্টিশক্তি মোহাবৃত, সৃষ্টিশক্তি আড়ষ্ট, বর্তমান যুগের কোনো প্রশ্নের নূতন উত্তর দেবার মতো বাণী যখন আমাদের ছিল না, আপন চিত্তদৈন্য সম্বন্ধে লজ্জা করবার মতো চেতনাও যখন দুর্বল, সেই দুর্গতির দিনেই রামমোহন রায়ের এ দেশে আবির্ভাব। প্রবল শক্তিতে তিনি আঘাত করেছিলেন সেই দুরবস্থার মূলে, যা মানুষের পরম সম্পদ স্বাধীনবুদ্ধিকে অবিশ্বাস করেছে। কিন্তু, তখন আমরা সেই দুরবস্থার কারণকেই পূজা করতে অভ্যস্ত, তাই সেদিন আমরাও তাঁকে শত্রু বলে দণ্ড উদ্যত করেছি। ডাক্তার বলেন, রোগ জিনিসটা দেহের অধিকার সম্বন্ধে দীর্ঘকালের দলিল দাখিল করলেও সে বাহিরের আগন্তুক, স্বাস্থ্যতত্ত্বই দেহের অন্তর্নিহিত চিরন্তন সত্য। রামমোহন রায় তেমনি করেই বলেছিলেন আমাদের অজ্ঞানকে, আমাদের অন্ধতাকে কালের গণনায় সনাতন বলি, কিন্তু সত্যের দিক থেকে তাই আমাদের অনাত্মীয় আগন্তুক। তিনি দেখিয়েছিলেন, আমাদের দেশের অন্তরাত্মার মধ্যেই কোথায় আছে বিশুদ্ধ জ্ঞানের চিরপুরাতন চিরনূতন প্রতিষ্ঠা; মনের স্বাস্থ্যকে আত্মার শক্তিকে প্রবল করবার জন্যে, উজ্জ্বল করবার জন্যে, ভারতের একান্ত আপন যে সাধনসম্পদের ভাণ্ডার তারই দ্বার তিনি খুলে দিয়েছিলেন; সেদিনকার জনতা তাঁকে শত্রু বলে ঘোষণা করেছিল।

আজও কি রামমোহনকে আমরা শত্রু বলে অসম্মান করতে পারি? যার গৌরবে দেশ বিশ্বের কাছে আপন গৌরবের পরিচয় দিতে পারে এমন লোক কি আমাদের অনেক আছে? দেশের যথার্থ মহাপুরুষের নামে গৌরব করার অর্থই দেশের ভবিষ্যতের জন্যে আশা করা। সে গৌরব প্রাদেশিক হলে, সাময়িক হলে,

তার উপরে নির্ভর করা চলে না। সে গৌরব এমন হওয়া চাই সমস্ত পৃথিবী যার সমর্থন করে। রামমোহনের চিত্ত, তাঁর হৃদয়, স্থানিক ও ক্ষণিক পরিধিতে বদ্ধ ছিল না। যদি থাকত তবে দেশের সাধারণ লোকে অনায়াসে তাঁকে সমাদর করতে পারত। কারণ, যে মানদণ্ড আমাদের নিত্য ব্যবহারের দ্বারা সুপরিচিত তা বিশেষ দেশকালের, তা সর্বদেশ ও চিরন্তন কালের নয়। কিন্তু সেই পরিমাপের দ্বারা পরিমিত গৌরবের জোরে দেশ মাথা তুলতে পারবে না, সর্বদেশকালের সর্বলোকের কাছে তাকে আত্মপ্রকাশ করাতে পারবে না। তার মহত্ত্বকে নিম্নভূমিবর্তী জনতার আদর্শকে অনেক উপরে ছাড়িয়ে উঠতে হবে। তাতে করে বর্তমান-কালের সাম্প্রতিক রুচি বিশ্বাস ও আচার তাকে নিষ্ঠুরভাবে আঘাত করতে পারে, কিন্তু তার চেয়ে বড়ো আঘাত চিরন্তন আদর্শের আঘাত। দিঙ্‌নাগাচার্যের স্থূলহস্তের আঘাত উপস্থিতের আঘাত, সেই উপস্থিত মুহূর্তে নিজেই সদ্যোধ্বংসোন্মুখ, কিন্তু ভারতীয় সূক্ষ্ম ইঙ্গিতের আঘাত শাশ্বত কালের। সে আঘাতে যারা বিলুপ্ত হয়েছে তাদের সমসাময়িক জয়ধ্বনির তারস্বর মহাকালের মহাকাশে ক্ষীণতম স্পন্দনও রাখে নি।

ক্ষণিক অনাদরের তুফানে যাদের নাম তলিয়ে যায় রামমোহন রায় তো সেই শ্রেণীর লোক নন। বিস্মৃতি বা উপেক্ষার কুহেলিকা তাঁর স্মৃতিকে কিছুকালের জন্য আচ্ছন্ন রাখলেও সে আবরণ কেটে যাবেই। দেশে আজ নবজাগরণের হাওয়া যখন দিয়েছে, সরে যাচ্ছে বাষ্পের অন্তরাল, তখন সর্বপ্রথমেই দেখা যাবে রামমোহনের মহোচ্চ মূর্তি। নবযুগের উদ্‌বোধনের বাণী দেশের মধ্যে তিনিই তো প্রথম এনেছিলেন, সেই বাণী এই দেশেরই পুরাতন মন্ত্রের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল; সেই মন্ত্রে তিনি বলেছিলেন 'অপাবৃণু', হে সত্য, তোমার আবরণ অপাবৃত করো। ভারতের এই বাণী কেবল স্বদেশের জন্যে নয়, সকল দেশের সকল কালের জন্যে। এই কারণেই ভারতবর্ষের সত্য যিনি প্রকাশ করবেন তাঁরই প্রকাশের ক্ষেত্র সর্বজনীন। রামমোহন রায় সেই সর্বকালের মানুষ। আমরা গর্ব করতে পারি স্থানিক ও সাময়িক ক্ষুদ্র মাপের বড়োলোককে নিয়ে, কিন্তু যাঁদের নিয়ে গৌরব করতে পারি তাঁরা 'পূর্বাপরৌ তোয়নিধীবগাহ্য স্থিতঃ পৃথিব্যা ইব মানদণ্ডঃ'। তাঁদের মহিমা পূর্ব এবং পশ্চিম সমুদ্রকে স্পর্শ করে আছে।

ভারতবর্ষে রামমোহন রায়ের যাঁরা পূর্ববর্তী ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম কবীর, নিজেকে বলেছিলেন ভারতপথিক। ভারতকে তিনি দেখতে পেয়েছিলেন মহাপথরূপে। এই পথে ইতিহাসের আদিকাল থেকে চলমান মানবের ধারা প্রবাহিত। এই পথে স্মরণাতীত কালে এসেছিল যারা, তাদের চিহ্ন ভূগর্ভে। এই পথে এসেছিল হোমাগ্নি বহন করে আর্যজাতি। এই পথে একদা এসেছিল মুক্তিতত্ত্বের আশায় চীনদেশ থেকে তীর্থযাত্রী। আবার কেউ এসেছে সাম্রাজ্যের লোভে, কেউ এল অর্থকামনায়। সবাই পেয়েছে আতিথ্য। এ ভারতে পথের সাধনা, পৃথিবীর সকল দেশের সঙ্গে যাওয়া-আসার নেওয়া-দেওয়ার সম্বন্ধ, এখানে সকলের সঙ্গে মেলবার সমস্যা সমাধান করতে হবে। এই সমস্যার সমাধান যতক্ষণ না হয়েছে ততক্ষণ আমাদের দুঃখের অন্ত নেই। এই মিলনের সত্য সমস্ত মানুষের চরম সত্য, এই সত্যকে আমাদের ইতিহাসে অঙ্গীভূত করতে হবে। রামমোহন রায় ভারতের এই পথের চৌমাথায় এসে দাঁড়িয়েছিলেন, ভারতের যা সর্বশ্রেষ্ঠ দান তাই নিয়ে। তাঁর হৃদয় ছিল ভারতের হৃদয়ের প্রতীক—সেখানে হিন্দু মুসলমান খৃস্টান সকলে মিলেছিল তাদের শ্রেষ্ঠ সত্তায়, সেই মেলবার আসন ছিল ভারতের

মহা ঐক্যতত্ত্ব, একমেবাদ্বিতীয়ম্‌। আধুনিক যুগে মানবের ঐক্যবাণী যিনি বহন করে এনেছেন, তাঁরই প্রেরণায় উদ্‌বুদ্ধ হয়ে ভারতের আধুনিক কবি ভারতপথের যে গান গেয়েছে তাই উদ্‌ধৃত করে রামমোহনের প্রশস্তি শেষ করি—

হে মোর চিত্ত পুণ্য তীর্থে জাগো রে ধীরে
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।...

হেথা একদিন বিরামবিহীন মহা-ওংকারধ্বনি,
হৃদয়তন্ত্রে একের মন্ত্রে উঠেছিল রনরনি।
তপস্যাবলে একের অনলে বহুরে আহুতি দিয়া
বিভেদ ভুলিল, জাগায়ে তুলিল একটি বিরাট হিয়া।
সেই সাধনার সে আরাধনার যজ্ঞশালার খোলা আজি দ্বার,
হেথায় সবারে হবে মিলিবারে আনতশিরে
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে॥

এসো হে আর্য, এসো অনার্য, হিন্দু মুসলমান—
এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ, এসো এসো খৃস্টান।
এসো ব্রাহ্মণ, শুচি করি মন ধরো হাত সবাকার।
এসো হে পতিত, হোক অপনীত সব অপমানভার।
মার অভিষেকে এসো এসো ত্বরা,
মঙ্গলঘট হয় নি যে ভরা
সবার-পরশে-পবিত্র-করা তীর্থনীরে—
আজি ভারতের মহামানবের সাগরতীরে॥

১৬ পৌষ ১৩৪০

৩

আমাদের দেশে সাম্প্রদায়িক প্রতিকূল লোকমত প্রায়ই অত্যন্ত তীব্র হয়ে দেখা দেয়—ব্যক্তিগত কটুভাষণের সঙ্গে বিজড়িত হওয়াতে সেই তীব্রতার সামনে দাঁড়িয়ে আপন মত প্রকাশ করা সংকোচের বিষয় হয়ে ওঠে। আজ আমার পক্ষে সেই সংকোচের দিনের অবসান হয়েছে। কিছুদিন পূর্বে আমি মৃত্যুর গহনে অবতরণ করেছিলুম, এখনও তার বন্ধুর তটভাগে স্খলিত পদে চলেছি। আজ আমার পক্ষে লোকমতের প্রভাব আর প্রবল নয়—এখন নিরবধিকাল আমার সম্মুখে বর্তমান।

১১ই মাঘের উৎসব যে সত্যে প্রতিষ্ঠিত তাকে আমাদের দেশের জনসাধারণ স্বীকার করে নি। যা তারা স্বীকার করে না তাকে তারা কলঙ্কিত করে। যিনি পরম শ্রদ্ধেয়, যেমন মহাত্মা রামমোহন রায়, তাঁর সম্বন্ধে বিরোধের উত্তাপ আজও প্রশমিত হয় নি। এটা স্বাভাবিক সুতরাং অনিবার্য, অতএব তাই নিয়ে পরস্পরকে লাঞ্ছিত করা নিরর্থক। এ-সকল দ্বন্দ্ব-কোলাহল ভুলে গিয়ে, অদ্যকার উৎসবের মূলে যাঁর মহান্‌ চারিত্রশক্তি প্রতিষ্ঠিত, শান্তমনে তাঁকে স্মরণ করে তাঁর উদ্দেশে আমাদের ভক্তি নিবেদন করব। মতভেদ সত্ত্বেও এই শ্রদ্ধার কারণকে সত্য

বলে স্বীকার করবেন, এ কথা আমাদের দেশের সকলের কাছেই প্রত্যাশা করতে পারি। কারণ এই সম্মানে স্বদেশের প্রতিই সম্মান।

পরজাতীয়কে যখন আমরা আচার ধর্ম নিয়ে বিচার করি তখন স্বভাবত অত্যুক্তি করে থাকি, বিশেষত যেখানে তাদের সঙ্গে এমন সম্বন্ধ যা দুঃখ দেয় এবং অপমান করে। কিন্তু তাদের ধর্ম ব্যক্তিগত জীবনে অনেক মহত্ত্ব প্রকাশ করে থাকে তাতে সন্দেহ নেই। আমাদের দেশেও সামাজিক শত বাধা ভেদ করে মহাপুরুষের উদ্ভব হয়েছে, কিন্তু সংস্কারের আবিলতায় আমরা তাঁদের ক্ষুদ্র করেছি, তাঁদের সত্যস্বরূপ উপলব্ধি করতে পারি নি। জাতীয় চিত্তদৈন্যের এই বিকৃতি সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে প্রত্যহ আমাদের ইতিহাসে।

খৃস্টধর্ম মানুষকে শ্রদ্ধা করেছে, কেননা তাঁদের যিনি পূজনীয় তিনি মানবের রূপে মানবের ভাগ্য স্বীকার করেছিলেন। এই কারণে যাঁরা যথার্থ খৃস্টান তাঁদের মানবপ্রীতি অকৃত্রিমভাবে প্রকাশ পেয়ে থাকে দেশে বিদেশে, আমরা তার পরিচয় পেয়েছি। যদি তাঁদের ধর্মমতে কোনো অসম্পূর্ণতা থাকে বলে আমরা মনে করি, তবু এ কথা স্বীকার করতে হবে যে, অন্তত এক জায়গায় এই ধর্ম মানবজাতির সঙ্গে আত্মনিবেদনের যোগে তাঁদের সম্বন্ধযুক্ত করতে পেরেছে, সেটা ধর্মবুদ্ধির শ্রেষ্ঠ পরিচয়। তাঁদের সাহিত্য এবং ব্যবহারে যেখানে মাহাত্ম্য দেখেছি মানবিকতা সেখানে সমুজ্জ্বল। সেখানে দৈন্য নেই, সেখানে স্বার্থের সংঘাতের ঊর্ধ্বে একটি উদার সভ্যতার বিকাশ ঘটেছে। আমাদের দেশে ধর্ম মানুষের মধ্যে পরস্পরের সম্বন্ধকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে; আধ্যাত্মিক উপলব্ধির বাহন না হয়ে আধুনিক ভারতীয় ধর্মানুষ্ঠান দেশব্যাপী ভেদবুদ্ধির সৃষ্টি করেছে।

আচার যেখানে সাম্প্রদায়িক ধর্মে প্রতিষ্ঠিত নয় সেখানে তাই নিয়ে মানুষের পরস্পর অনৈক্য ঘটে না। যেমন চীনদেশে। চীন-সভ্যতায় ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে বিরোধ নেই মতের পার্থক্য সত্ত্বেও। আচারে ব্যবহারের ক্ষেত্রে ধর্মের নামে সমাজকে তারা নিপীড়িত করে নি। যখন এক সময়ে খৃস্টধর্ম ঈশ্বরের ক্রোধের দোহাই দিয়ে বাহুবলে নিজের প্রভুত্ববিস্তার-চেষ্টা করেছিল তখনই সে ভিন্নমতাবলম্বীদের নির্যাতন করেছে, কেননা তখনও তাদের ধর্ম শুভবুদ্ধিকে অমান্য করে সংস্কারকেই স্বীকার করেছিল। সর্বসাধারণের বিশ্বাসের কোনো বুদ্ধিসম্মত ভূমিকা তাতে দেখা দেয় নি শাস্ত্র-অনুশাসন ছাড়া। আজকের দিনে য়ুরোপীয় সভ্যতার বহু ত্রুটি সত্ত্বেও সমাজে ধর্মের অন্ধ আক্রমণ নেই, তাদের মধ্যে কেউ বৌদ্ধ বা মুসলমান হলে তাকে ধর্মের নাম নিয়ে অত্যাচার করা হয় না। আচার এবং ধর্মের মিশ্রণে তাদের সমাজ কলুষিত হয় নি— তাদের শক্তির একটি কারণ সেইখানে। আমাদের দেশে শক্তিক্ষয়ের প্রধান একটা হেতু, ধর্মের নাম নিয়ে প্রাত্যহিক জীবনে বহু নিরর্থক সংস্কারের আধিপত্য। এতে ধর্মের ভ্রষ্টতা এবং আচারের অত্যাচারপরায়ণ অন্যায় রূপ প্রকাশ পায়। দৃষ্টান্তস্বরূপে দক্ষিণ-মালাবারের একটি ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। কোনো ব্রাহ্মণেতর-জাতীয় ডাক্তারকে ব্রাহ্মণ গৃহস্থ আপন বাড়িতে নিয়েছিল চিকিৎসার জন্য, যে পথ দিয়ে গিয়েছিল সেটা কোনো পুষ্করিণীর তীরস্থ। তাতে মকদ্দমা উঠেছিল আদালত পর্যন্ত যে, সমস্ত পুষ্করিণীর জল দূষিত হয়েছে, অতএব তাকে শোধন করবার আইন জারি হোক অপরাধী গৃহস্থের উপর। এখানে দেখি দণ্ডদাতা আইন এবং আচারের সমবেত মূঢ় আক্রমণ, এর মধ্যে শাশ্বত ধর্মের পরিচয় নেই। অথচ ধর্মের নামে এইরকম অমানবিকতা আমাদের দেশে শ্রদ্ধা পেয়ে আসছে। মহাপুরুষ দৈবে

আমাদের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে এই অধার্মিক ধর্মবিশ্বাস এবং বুদ্ধিবিরোধী আচারের প্রতিপক্ষে দাঁড়িয়েছেন। তথাপি দেশের জনসাধারণের মধ্যে নিরর্থক অনুষ্ঠানের পুনরাবৃত্তিই ধর্মের মর্যাদা নিয়েছে এবং আজও ধর্মবোধহীন অমানবিকতার চাপে সমাজ মানুষকে অপমানিত করছে।

এইপ্রকার মিথ্যা ধর্মবিশ্বাসের অভিঘাতে সমাজ শতখণ্ডে ভেঙে পড়ল—তার নাম নিয়ে বেশির ভাগ দেশবাসীকে অবজ্ঞাভাজন করা হল, বলা হল অশুচি এবং অপাঙ্‌ক্তেয়। আচারের বেড়া গেঁথে যে বহুসংখ্যক মানুষকে দূরে সরিয়েছি তাদের দুর্বলতা এবং মূঢ়তা, তাদের আত্মাবমাননা সমগ্র দেশের উপর চেপে তাকে অকৃতার্থ করে রেখেছে সুদীর্ঘকাল। অথচ আমাদের যা বিশুদ্ধ, যা আমাদের সনাতন আধ্যাত্মিক সম্পদ তাতে মানুষের এবং সর্বজীবের মূল্য ভূরিপরিমাণ স্বীকার করেছে। আত্মবৎ সর্বভূতেষু য পশ্যতি স পশ্যতি—এত বড়ো কথা বোধ হয় কোনো শাস্ত্রে নেই। সকলের মধ্যে আত্মার এই সম্বন্ধস্বীকার এবং এই সমগ্রের দৃষ্টিকে আমরা হারিয়েছি। আনুষ্ঠানিক মোহে আচ্ছন্ন হয়ে ঘরে ঘরে আচারের এবং অনৈক্যের ব্যর্থতা বিস্তার করেছি। জাতীয় সত্তা শতধা বিখণ্ডিত হয়ে আজ আমাদের চরম দুরবস্থা উপস্থিত। এই দুর্গতিগ্রস্ত সমাজে একদিন একটি ব্রাহ্মণ-সন্তান জন্মগ্রহণ করেছিলেন, রামমোহন রায়। সমাজের সমস্ত অন্ধতাকে তিনি প্রতি পদে অস্বীকার করেছেন, নির্ভয়ে দাঁড়িয়েছেন মূঢ় সংস্কারের বিরুদ্ধে। সেজন্যে তিনি নিন্দাভাজন হয়েছেন এবং সেই নিন্দার আক্রমণ এখনও শান্ত হয় নি। এই দুর্গতির দিনেই আজ আমাদের পুনর্বার তাঁর বাণী স্মরণ করবার সময় এল। তাঁর মহাজীবনের মূল সাধনা কোন্‌খানে নিহিত তা আমাদের বুঝতে হবে।

উপনিষদের একটি মন্ত্র আছে—সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম; বিশ্ববিধাতার একটা রূপ আছে যা কেবলমাত্র সত্য, অর্থাৎ আছে ছাড়া তার অন্য বাণী নেই। তার পরবর্তী কথা হচ্ছে জ্ঞানং—সে কেবলমাত্র হওয়া নয়। সত্যবোধের উপরে জ্ঞানের উপলব্ধিতে মনুষ্যত্বের বড়ো পদবী লাভ হল। সেই জ্ঞানকে যেখানে অবজ্ঞা করা হয়েছে, বুদ্ধির মোহমুক্ত বহুধা শক্তিকে প্রয়োগ না করে মানবত্বকে যেখানে অস্বীকার করেছি, সেইখানে আমাদের অকৃতার্থতা। জ্ঞানের সোপান দিয়ে উপনীত হই পরমাত্মায়, কৃত্রিম কর্মের পথে নয়। তাঁর সামীপ্যে সর্বমানবের মিলন। ব্রহ্মকে উপনিষদ-কথিত বাণীতে উপলব্ধি করতে হলে বিশ্বসত্যকে স্বীকার করে জ্ঞানের ভিতর দিয়ে আধ্যাত্মিক সত্যে পৌঁছতে হবে।

সংপ্রাপ্যৈনম্ ঋষয়ো জ্ঞানতৃপ্তাঃ
কৃতাত্মানো বীতরাগাঃ প্রশান্তাঃ।
তে সর্বগং সর্বতঃ প্রাপ্য ধীরা
যুক্তাত্মানঃ সর্বমেবাবিশন্তি॥

সর্বব্যাপী আত্মার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে সকলের মধ্যে জ্ঞানতৃপ্ত ঋষিরা প্রবেশ করেন। আমাদের শাস্ত্রমতে এই হচ্ছে মানুষের চরম সার্থকতা। এই বাণী ফিরিয়ে আনলেন মহাত্মা রামমোহন রায়। আনুষ্ঠানিক কৃত্যের বন্ধনে বন্দী সমাজকে ধর্মভ্রষ্টতা হতে আত্মোপলব্ধির সাধনায় প্রবৃত্ত করলেন তিনি; ভারতকে শোনালেন ঐক্যমন্ত্র যাতে চরম মানবসত্যের উপলব্ধি দ্বারা মানুষের মধ্যে সত্য এবং জ্ঞানের যোগে কল্যাণময় সম্বন্ধ স্থাপিত হতে পারে। ধর্মের বিকার ভয়াবহ; বৈষয়িক ঈর্ষা-বিরোধে যে ক্ষতি করে তারও চেয়ে সাংঘাতিক ক্ষতি করেছে

ধার্মিকতা। আশ্চর্য ধীশক্তি নিয়ে রামমোহন দাঁড়ালেন জাতীয় ধর্মবিশ্বাসের কুহেলিকার অতীতে, সত্যের অকুণ্ঠিত প্রকাশে নিয়োগ করলেন তাঁর অতুলনীয় চারিত্রশক্তি। এই অধ্যবসায়ে তিনি ছিলেন একক, তিনি ছিলেন নিন্দিত। তাঁর সাধনাকে আজকের এই উৎসবে অন্তরে গ্রহণ করে নিজেকে এবং নিজের দেশকে যেন ধন্য করি।

মাঘ ১৩৪৭

৪

ভারতবর্ষের ভূ-সংস্থানের মধ্যে একটি ঐক্য আছে। এর উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে সমুদ্রের বেষ্টন, পূর্ব দিকে গভীর অরণ্য, কেবল পশ্চিমে দুর্গম গিরিসংকটের পথ। ভৌগোলিক আকৃতির দিক থেকে তার অখণ্ডতা, কিন্তু লোকবসতির দিক থেকে সে ছিন্নবিচ্ছিন্ন। আচারে বিচারে, ধর্মে ভাষায় ভারতবর্ষ পদে পদে খণ্ডিত। এখানে যারা পাশাপাশি আছে তারা মিলতে চায় না। এই দুর্বলতা দ্বারা ভারতবর্ষ ভারাক্রান্ত, আত্মরক্ষায় অক্ষম।

আর-একটি দুর্গতি স্থায়ী হয়ে এ দেশকে জীর্ণ করেছে। অশথ গাছ পুরাতন মন্দিরকে সর্বাঙ্গে বিদীর্ণ করে তাকে শিকড়ে শিকড়ে যেমন আঁকড়ে থাকে তেমনি ভারতবর্ষের আদিম অধিবাসীদের মূঢ় সংস্কার-জাল দেশের চিত্তকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে জড়িয়ে রয়েছে। আগাছার মতো অন্ধসংস্কারের একটা জোর আছে, তার জন্য চাষ-আবাদের প্রয়োজন হয় না, আপনি বেড়ে ওঠে, মরতে চায় না। কিন্তু বিশুদ্ধ জ্ঞানের ও ধর্মের উৎকর্ষের জন্য নিরন্তর সাধনা চাই। আমাদের দুর্ভাগ্য দেশে যেখানে উদার ক্ষেত্রে ফল ফলতে পারত সেখানে সর্বপ্রকার মুক্তির অন্তরায় উত্তুঙ্গ হয়ে উঠে অস্বাস্থ্যকর নিবিড় জঙ্গল হয়ে আছে। এমন-কি, এ দেশে যাঁরা বৈজ্ঞানিক শিক্ষায় শিক্ষিত তাঁদেরও বহু লোকের মন গূঢ়ভাবে আফিমের নেশার মতো তামসিকতার দ্বারা অভিভূত। এর সঙ্গে লড়াই করা দুঃসাধ্য।

আর্যজাতি যাদের এক দিন পরাজিত করেছিলেন, অবশেষে তাদেরই প্রকৃতি জয়ী হয়েছে। সমস্ত দেশ জুড়ে ঘটিয়ে তুলেছে মারাত্মক আত্মবিচ্ছেদ। পরস্পরকে অবজ্ঞা করা এবং পাশ কাটিয়ে চলার যে দুর্ব্যবহার তা এই দেশের সকল জাতিকেই যুগ যুগ ধরে আঘাত করছে।

আমরা যখন আজ রাষ্ট্রীয় ঐক্যের জন্য বদ্ধপরিকর তখন এ কথা আমাদের স্পষ্টভাবে বোঝা আবশ্যক যে, অন্তরের ঐক্য হারিয়ে শুধু বাহ্য বিধির ঐক্যদ্বারা কোনো দেশ কখনোই সর্বজনীন একত্ববোধে মহাজাতীয় সার্থকতা পায় নি। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র বহু উপরাষ্ট্রের সমবায়ে একটি প্রকাণ্ড রাষ্ট্র—যেন একটা বৃহৎ রেলোয়ে ট্রেন, অনেকগুলি ভিন্ন ভিন্ন গাড়ি পরস্পর সংবদ্ধ হয়ে চলেছে সুনির্দিষ্ট পথে। সম্ভব হয়েছে তার একমাত্র কারণ, সেখানে সকলে শিক্ষায় দীক্ষায় নিবিড়ভাবে মিলে একজাতি হয়ে উঠেছে, মোটের উপরে ভাবনা ও বেদনার এক বায়ুমণ্ডলীর দ্বারা সেখানে জনচিত্তকলেবর অধিকৃত। তারা পরস্পর পরস্পরের একপথে চলবার বাধা নয়, পরস্পরের সহায় তারা। তাদের শক্তি-সাফল্যের এই প্রধান কারণ।

খণ্ডিত মন ও আচরণ নিয়ে আমাদের ইতিহাসের গোড়া থেকে আমরা বরাবর হারতে হারতে এসেছি। আর, আজই কি আমরা সকল খণ্ডতা সত্ত্বেও জিতে যাব এমন দুরাশা পোষণ করতে পারি? বিদেশীর অপমান থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ঐক্যের দরকার আছে, এ কথা আমরা তর্কদ্বারা বুঝি, কিন্তু কোনোমতেই সেই অন্তর দিয়ে বুঝি নে যেখানে বিচ্ছেদের বিষ ছড়িয়ে আছে। বেহারের লোক, মাদ্রাজের লোক, মাড়োয়ারের লোককে আমরা পর বলেই জানি, তার প্রধান কারণ, যে আচারের দ্বারা আমাদের চিত্ত বিভক্ত সে আচার কেবল যে স্বীকার করে না বুদ্ধিকে তা নয়, বুদ্ধির বিরুদ্ধে যায়। আমাদের ভেদের রেখা রক্তের লেখা দিয়ে লিখিত। মূঢ়তার গণ্ডির মতো দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান আর কিছুই নেই।

আমাদের দেশের হরিজন-সমস্যা এবং হিন্দু-মুসলমান-সমস্যার মূলে যে মনোবিকার আছে তার মতো বর্বরতা পৃথিবীতে আর কী আছে জানি না। আমরা পরস্পরকে বিশ্বাস করতে পারি না, অথচ সে কথা স্বীকার না করে নিজেদের বঞ্চনা করতে যাই। মনে করি, ইংলণ্ড স্বাধীন হয়েছে পার্লামেণ্টের রীতি মেনে, আমরাও সেই পথ অনুসরণ করব। ভুলে যাই যে, সে দেশে পার্লামেণ্ট বাইরে থেকে আমদানি করা জিনিস নয়, অনুকূল অবস্থায় ভিতর থেকে সৃষ্ট হয়ে ওঠা জিনিস। এককালে ইংলণ্ডে প্রটেস্টাণ্ট এবং রোমান ক্যাথলিকদের মধ্যে প্রবল বিরোধ ছিল, কিন্তু বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি ও বিদ্যার প্রভাবে তা ক্ষীণ হয়ে দূর হয়েছে। ধর্মের তফাত সেখানে মানুষকে তফাত করে নি।

মনুষ্যত্বের বিচ্ছিন্নতাই প্রধান সমস্যা। সেইজন্যই আমাদের মধ্যে কালে কালে যে-সব সাধক চিন্তাশীল ব্যক্তিদের আবির্ভাব হয়েছে তাঁরা অনুভব করেছেন, মিলনের পন্থাই ভারতপন্থা। মধ্যযুগে যখন হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিচ্ছেদ বড়ো সমস্যা হয়ে উঠেছিল তখন দাদূ কবীর প্রভৃতি সাধকগণ সেই বিচ্ছেদের মধ্যে আধ্যাত্মিক ঐক্য-সেতু প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে গেছেন।

কিন্তু একটা কথা তাঁরাও ভাবেন নি। প্রদেশে প্রদেশে আজ যে ভেদজ্ঞান, একই প্রদেশের মধ্যে যে পরস্পর ব্যবধান, একই সম্প্রদায়ের মধ্যেও যে বিভক্ততা, এ দুর্গতি তখন তাঁদের চিন্তার বিষয় হয়ে ওঠে নি। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যকার বিচ্ছেদ আমাদের পীড়া দিচ্ছে। এই পীড়া উভয় পক্ষেই নিরতিশয় দুঃসহ দুর্বহ হয়ে উঠলে উভয়ের চেষ্টায় তার একটা নিষ্পত্তি হতে পারবে। কিন্তু এর চেয়ে দুঃসাধ্য সমস্যা হিন্দুদের, যারা শাশ্বত ধর্মের দোহাই দিয়ে একই সম্প্রদায়ের মধ্যে মানুষের প্রতি সুবুদ্ধিবিরুদ্ধ অসম্মানকর নিরর্থক ভাগ-বিভাগ নিত্য করে রাখে।

এইজন্যই মনে হয়, নিবিড় প্রদোষান্ধকারের মধ্যে আমাদের দেশে রামমোহন রায়ের জন্ম একটা বিস্ময়কর ব্যাপার। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার অনেক পূর্বেই তাঁর শিক্ষা ছিল প্রাচ্য বিদ্যায়। অথচ ঘোরতর বিচ্ছেদের মধ্যে ঐক্যের সন্ধান লাভ করবার মতো বড়ো মন তাঁর ছিল। বর্তমান কালে অন্তত বাংলা দেশে ভারতীয় সংস্কৃতির সর্বপ্রথম দূত ছিলেন তিনি। বেদ-বেদান্তে উপনিষদে তাঁর পারদর্শিতা ছিল, আরবি-পারসিতেও ছিল সমান অধিকার, শুধু ভাষাগত অধিকার নয়, হৃদয়ের সহানুভূতিও ছিল সেইসঙ্গে। যে বুদ্ধি, যে জ্ঞান দেশকালের সংকীর্ণতা ছাড়িয়ে যায় তারই আলোকে হিন্দু মুসলমান এবং খৃস্টান তাঁর চিত্তে এসে মিলিত হয়েছিল। অসাধারণ দূরদৃষ্টির সঙ্গে সার্বভৌমিক নীতি এবং সংস্কৃতিকে তিনি গ্রহণ করেছিলেন। শুধু ধর্ম এবং আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে নয়, কর্মের ক্ষেত্রেও তাঁর বুদ্ধি ছিল সর্বগ। এ দেশে রাষ্ট্রবুদ্ধির তিনিই প্রথম পরিচয় দিয়েছেন। আর

নারীজাতির প্রতি তাঁর বেদনাবোধের কথা কারও অবিদিত নেই। সতীদাহের মতো নিষ্ঠুর প্রথার নামে ধর্মের অবমাননা তাঁর কাছে দুঃসহভাবে অশ্রদ্ধেয় হয়েছিল। সেদিন এই দুর্নীতিকে আঘাত করতে যে পৌরুষের প্রয়োজন ছিল আজ তা আমরা সুস্পষ্টভাবে ধারণা করতে পারি নে।

রামমোহন রায়ের চিত্তভূমিতে বিভিন্ন সম্প্রদায় এসে মিলিত হতে পেরেছিল, এর প্রধান কারণ, ভারতীয় সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ উপদেশকে তিনি গ্রহণ করতে পেরেছিলেন। ভারতীয় বিদ্যা এবং ধর্মের মধ্যে যেখানে সবাই মিলতে পারে সেখানে ছিল তাঁর সাধনার ক্ষেত্র, সেখান থেকেই তিনি বাণী সংগ্রহ করেছিলেন। সেই ছিল তাঁর পাথেয়। ভারতের ঋষি যে আলো দেখেছিলেন অন্ধকারের পরপার হতে, সেই আলোই তিনি আপন জীবনযাত্রাপথের জন্য গ্রহণ করেছিলেন।

ভাবলেও বিস্ময় জন্মে যে, সেই সময়ে কী করে আমাদের দেশে তাঁর অভ্যাগম সম্ভবপর হয়েছে। তখন দেশে একটা দল ইংরেজি শিক্ষার অত্যন্ত বিরুদ্ধে ছিলেন, ম্লেচ্ছবিদ্যাতে অভিভূত হয়ে আমরা ধর্মচ্যুত হয়ে পড়ব, এই ছিল তাঁদের ভয়। এ কথা কেউ বলতে পারবে না যে, রামমোহন পাশ্চাত্য বিদ্যা দ্বারা বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন, প্রাচীন সংস্কৃত শাস্ত্রজ্ঞান তাঁর গভীর ছিল, অথচ তিনি সাহস করে বলতে পেরেছিলেন—দেশে বিজ্ঞানমূলক পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তার চাই। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিদ্যার যথার্থ সমন্বয় সাধন করতে তিনি চেয়েছিলেন। বুদ্ধি জ্ঞান এবং আধ্যাত্মিক সম্পদের ক্ষেত্রে তাঁর এই ঐক্যসাধনের বাণী ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক আশ্চর্য ঘটনা।

আজ যদি তাঁকে আমরা ভালো করে স্বীকার করতে না পারি, সে আমাদেরই দুর্বলতা। জীবিতকালে তাঁর প্রত্যেক কাজে আমরা তাঁকে পদে পদে ঠেকিয়েছি। আজও যদি আমরা তাঁকে খর্ব করবার জন্য উদ্যত হয়ে আনন্দ পাই সেও আমাদের বাঙালি চিত্তবৃত্তির আত্মঘাতী বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দেয়।

তাঁকে কোনো বিশেষ আচারী সম্প্রদায় সহ্য করতে পারে নি, এতেই তাঁর যথার্থ গৌরবের পরিচয়। প্রচলিত ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে আপনাকে সীমাবদ্ধ করে রাখলে তিনি অনায়াসে জয়ধ্বনি পেতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা না করে সবাইকে জড়িয়ে সমগ্র দেশের মধ্যে তাঁর বাণীকে প্রচার করে গেছেন। তাঁর এই কাজ সহজ কাজ নয়। এইজন্য তাঁকে আজ নমস্কার করি।

আমাদের অন্তরেও মুক্তি নেই, ঘরেও মুক্তি নেই। পর পর বিদেশী আমাদের স্বাধীনতা হরণ করতে উদ্যত হয়েছে। কেননা, অন্তরের সঙ্গে আমরা স্বাধীনতাকে স্বীকার করে নিতে পারি নি, সকলকে আমরা গ্রহণ করতে পারি নি। আমাদের এ কথা মনে রাখতে হবে যে, দুঃখ দারিদ্র্য এবং পরাভব যেখানে এত বড়ো সেখানে সকলকে গ্রহণ করার মতো বড়ো হৃদয়ও চাই। মহাপুরুষ রামমোহন রায়ের সেইরকম বড়ো হৃদয় ছিল। আজ তাঁকেই নমস্কার করব বলে এখানে এসেছি।

১০ আশ্বিন ১৩৪৩

৫

মানুষ সন্ধানী। আদিকাল হতে সে কেবল খুঁজে খুঁজেই বেড়িয়েছে। যখন তার সমস্ত চিত্তের উন্মেষ হয় নি তখনও সে আপনার সন্ধান-প্রবৃত্তিকে ক্রমাগত জাগিয়েছে। এই চলার পথে পরিশ্রান্ত হয়ে সে কত বার তার চার দিকে একটা গণ্ডি টেনে দিয়ে বলেছে— এই হল আমার গম্যস্থান, এখান থেকে আর এক পা'ও নড়ব না। অভ্যাস আর অনুষ্ঠানের বেড়া গড়ে তুলে নিজেকে বন্দী করে রেখেছে যাতে তাকে আর সাধনা করতে না হয়, সন্ধান করে বেড়াতে না হয়। মন্ত্রকে খুঁটির মতো তৈরি করে সে তার চার দিকে কেবলই ঘানির বলদের মতো ঘুরেছে। পরিচিত কতকগুলো অভ্যাস অবলম্বন করে মানুষ আরাম চেয়েছে।

কিন্তু মানুষ তো আরামের জীব নয়। স্থাণুর মতো স্থির হয়ে আপাত পরিতৃপ্তি নিয়ে সে যখন বসে থাকে তখন তার সেই আরামলোভী সমাজের মধ্যেই প্রকৃত মনুষ্যত্ব নিয়ে মহামানুষ জন্মায়। সে বলে— আমরা তো গহ্বরচর জীব নই, একটা নিত্যনিয়মিত গতিহারা রুদ্ধ জীবনের আহার বিহার ও আরাম নিয়ে সন্তুষ্ট থাকলে আমাদের চলবে না তো! মহাপুরুষ সাধনার পথকে স্বীকার করে নেন, সত্যকে সন্ধান করে তিনি সেই গভীরকে সেই অসীমকে উপলব্ধি করতে চান। সমস্ত ক্ষুদ্রতা ও তুচ্ছতার সীমা অতিক্রম করার জন্যে তিনি তাঁর বেড়াভাঙার বাণী নিয়ে আসেন। মনে করিয়ে দেন যে, আরামের মধ্যে আনন্দ নেই, আনন্দকে মিলবে কেবল সেই অসীমের প্রাঙ্গণে। লোকে বলে এতদিনকার অভ্যাস আর অনুষ্ঠান দিয়ে বেড়া তৈরি করেছি, এখন সে গণ্ডি ভাঙব কী করে? এসেছি আমরা আমাদের গম্যস্থানে, আরামে আছি, আর খুঁজে বেড়াতে চাই না। তারা তাদের মিথ্যাকেই আঁকড়ে ধরে মহাপুরুষের সত্যবাণীকে অস্বীকার করে; তাঁকে গাল দেয়, অপমানও করে। বিজ্ঞানের দিক দিয়েও আমরা দেখি মানুষ আরাম পাবার জন্যে তার বুদ্ধিকে একদা আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধেছে। প্রাচীনকালে লোক বলত যে, আকাশ একটা কঠিন গোলকার্ধ, তাতে নড়চড় নেই, মাথার উপর এই ফার্মামেণ্ট (firmament) কল্পনা করে নিয়ে এবং জগৎ-সংসারের সমস্ত নিয়ম একেবারে বেঁধে ফেলে মানুষ আরাম পেলে— যেন বিভ্রমের পথে তার ভ্রাম্যমাণ বুদ্ধির একটা স্থিতি হল। আমাদের দেশের জ্ঞানবৃদ্ধেরাও বলেছেন যে, সুমেরুশিখরের এক দিক দিয়ে সূর্য ওঠে এবং আর-এক দিকে নামে; কচ্ছপের খোলসের উপর আর বাসুকির মাথায় পৃথিবী অবস্থিত এই কল্পনা করে ভূমিকম্প ইত্যাদি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের তাঁরা একটা ব্যাখ্যা করে নিলেন। এতে করে তাঁদের বুদ্ধি আরাম পেলে। কিন্তু সে বাঁধা নিয়ম টিকল না তো! মানুষই তো শেষকালে বললে, পৃথিবীও চলছে। আরামপ্রিয় মানুষ এই সম্ভাবনায় হিংস্র হয়ে উঠল, সন্ধানের দুরূহ পথে পরিশ্রান্ত হবার ভয়ে সে বৈজ্ঞানিককে বললে, তার কথা প্রত্যাহার করতে। মানুষ কিন্তু অভ্যাসকে মানে নি, যদিও সে বাঁধামতওয়ালাদের কাছে অবমানিত হয়েছে, মার খেয়েছে। প্রাণ দিয়েও মানুষ সত্যকে দেখাবার প্রয়াস করেছে, ভয় পায় নি।

ধর্মেও দেখি সেইরকম বাঁধা নিয়ম, কত শুচিতা কত কৃত্রিম গণ্ডি। নিয়মপালন করে আচার আবৃত্তি আর অভ্যাস রক্ষা করে সে তার চিন্তাকে অবকাশ দিতে চেয়েছে বহুবিধ জটিলতা থেকে। মানুষ বলেছে যে, আদিকাল থেকে ব্রহ্মা যে নিয়ম বেঁধে দিয়েছেন, তার বাইরে যাবার জো নেই। ফলে নিত্য কৃত্রিমতার দরুন তার মন অসাড় হয়ে যায়, সে তখন নিত্যধর্ম অর্থাৎ সত্যকে মেনে নিতে দ্বিধাবোধ

করে। আমাদের দেশে ধর্মের যখন এইরকম নিঃসাড় অবস্থা তখন রামমোহন এসেছিলেন। বাঁধা নিয়মের পথ পরিত্যাগ করে তিনি দুর্গম পথের যাত্রী হয়েছিলেন। এ কথা বলা যাবে না যে, শাস্ত্রজ্ঞ না হয়ে তিনি অন্য পথ বেছে নিয়েছিলেন। আচার আবৃত্তি ও অনুষ্ঠানের মধ্যে মন তাঁর তৃপ্তি মানে নি, অসীমের সন্ধান করতে গিয়ে তিনি উপনিষদের দ্বারে এসে পৌঁচেছিলেন। অন্যান্য মহাপুরুষের মতো তিনিও এসেছিলেন সন্ধানের পথে মানুষকে মুক্তি দিতে। তাঁদের মতোই কত লাঞ্ছনা গঞ্জনা, কত অবমাননা তাঁকে সইতে হয়েছে, কিন্তু বিপদ কোনোদিন তাঁকে সত্যপথ থেকে বিচলিত করতে পারে নি।

অতি বড়ো শোক ও বেদনার মধ্যে পিতামহীর মৃত্যুর পর পিতা আমার শান্তি চেয়েছিলেন। তাঁর সেই পীড়িত ও শোকাতুর চিত্ত আকাশের দিকে হাত বাড়িয়েছিল; তিনিও প্রচলিত ধর্মের বাঁধন ছিঁড়ে এই উপনিষদের দ্বারে, সীমার ঊর্ধ্বে গিয়ে অসীমকে উপলব্ধি করার জন্যে এসেছিলেন। মুক্তির জন্যে তিনি রামমোহনের কাছে গিয়েছিলেন।

রামমোহন সম্পর্কে আজকের দিনটা একটা স্মরণীয় দিন। ছোটো একটা মণ্ডলী গড়ে উঠেছিল তাঁর চার দিকে; তাঁদের কাছে তিনি ধর্মপ্রচার করতে যান নি। তাঁদের সঙ্গে একসাথে সত্যের সাধনা করেছিলেন। অভ্যাসের টান এবং শাসন থেকে বন্ধন-মোচন করতে তিনি এসেছিলেন মুক্তির দূত হয়ে। নিজের বন্ধন মোচন করে অপরকে মুক্ত করার কর্তব্য তিনি করে গিয়েছেন। তিনি যদি ব্যর্থ হয়ে থাকেন তবে সে আমাদের নিজেদেরই ব্যর্থতা; যদি তাঁর সাধনার বীজ আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করে থাকে তবে তা হল সেই মহাপুরুষেরই কাজ।

১১ মাঘ [১৩৪২]

৬

আমাদের জীবনে যে-সব লাভ পরম লাভ মাঝে মাঝে তাই উপলব্ধি করবার জন্যে আমাদের উৎসবের দিন। সেদিন যা আমাদের শ্রেষ্ঠ, যা আমাদের সত্য, যা আমাদের গৌরবের, তারই জন্যে আসন প্রস্তুত হয়, অন্তরের আলো বড়ো করে জ্বালাই, যা আমাদের চিরন্তন সেদিন তাকে ভালো করে দেখে নেবার জন্যে আমরা মিলি।

পশুপাখিদেরও প্রাণের ঐশ্বর্য আছে। সে তাদের প্রাণশক্তিরই বিশেষ বিকাশ। পাখি উড়তে পারে, এ তার একটি সম্পদ। মাঝে মাঝে এই সম্পদকে সে উপলব্ধি করতে চায়, মাঝে মাঝে সে ওড়ে, কোনো প্রয়োজনে নয়, ওড়বারই জন্যে; সে তার পক্ষচালনা দিয়ে আকাশে এই কথা ঘোষণা করে যে, 'আমি পেয়েছি।' এই তার উৎসব। বুনো ঘোড়া খোলা মাঠে এক-এক সময় খুব করে দৌড়ে নেয়—কোনো কারণ নেই। সে নিজেকে বলে, আমার গতিবেগ আমার সম্পদ; 'আমি পেয়েছি।' এই উৎসাহ ঘোষণা করেই তার উৎসব। ময়ূর এক-একবার আপন মনে তার পুচ্ছ বিস্তার করে, আপন পুচ্ছশোভার প্রাচুর্য-গৌরব সে আপনারই কাছে প্রকাশ করে; আপন অস্তিত্বের ঐশ্বর্যকে উদ্‌ঘাটিত করে দিয়ে সে অনুভব করে যে, জীবলোকে তার একটি বিশেষ সম্মান আছে। সেও বলে, 'আমি পেয়েছি।'

কিন্তু মানুষের উৎসব তার প্রাণসম্পদের চেয়ে বেশি কিছু নিয়ে। যা সে সহজে পেয়েছে তাতে সে অন্য জীবজন্তুর সঙ্গে সমান, যা সে সাধনা করে পেয়েছে তাতেই সে মানুষ। সে আপনার ঐশ্বর্য আপনি যখন সৃষ্টি করে তখনই সে আপনাকে সত্য করে পায়। তখনই সে বলে, 'আমি পেয়েছি।' তার আনন্দ সৃষ্টির আনন্দ।

যা খুশি তাই বানিয়ে তোলা মাত্রকেই সৃষ্টি বলে না। কোনো বিশ্বসত্যকে লাভ করার যোগে প্রকাশ, ও প্রকাশ করার যোগে লাভ করাকেই বলে সৃষ্টি। সুতরাং সে কারও একলা নয়। পশুপক্ষীর যে উৎসবের কথা পূর্বে বলেছি সে তাদের একলার, মানুষের উৎসব সকলকে নিয়ে। লক্ষপতি তার ব্যবসায়ে মস্ত লাভ করতে পারে, তা নিয়ে সে ঘটা করে ভোজ দিতেও পারে, কিন্তু সেইখানেই সেটা ফুরাল, মানুষের উৎসবলোকে সে স্থান পেল না। সে আপন লাভকে অতি সতর্কতা ও কৃপণতার সঙ্গে লোহার সিন্দুকের মধ্যে বন্দী করে রাখে, তার পরে একদিন সে অতি কঠিন পাহারার ভিতর থেকেও শূন্যে অন্তর্ধান করে। সে নিজে সৃষ্টি নয় বলেই উৎসব সৃষ্টি করতে পারে না। সৃষ্টি মানে উৎসৃষ্টি, যা সকল ব্যয়কে অতিক্রম করে দানরূপে থেকে যায়।

চিরকালের ঐশ্বর্য যখন তার কাছে প্রকাশ পায় তখন মানুষ বড়ো করে বলতে চায় 'আমি পেয়েছি'। এ কথা সে বলতে চায় সকল দেশকে, সকল কালকে, কেননা পাওয়া তার একলার নয়। ঋষি একদিন বিশ্বকে বলেছিলেন, 'পেয়েছি, জেনেছি —বেদাহং।' ঋষি সেইসঙ্গেই বলেছেন, 'আমার পাওয়া তোমাদের সকলের পাওয়া —শৃণ্বন্তু বিশ্বে।' এই বাণীই উৎসবের বাণী। মানুষের উৎসবে চিরন্তন কালের আনন্দ ও আহ্বান।

ঘরে যখন কোনো শুভ ঘটনা ঘটে, যেমন সন্তানের জন্ম বা বিবাহ, সেটাতেও আমাদের দেশের মানুষ সকলকে ডাকে; বলে, 'আমার আনন্দে তোমরাও আনন্দ করো। আমার গৃহের উৎসব যখন বাইরে গিয়ে পৌঁছবে তখনই তা সম্পূর্ণ হবে।' বস্তুত মানুষের ব্যক্তিগত শুভ ঘটনা, যা মানব-সম্বন্ধের কোনো-একটি বিশেষ রূপকে প্রকাশ করে যেমন জননীর সন্তানলাভ বা নরনারীর প্রেম-সম্মিলন, তাও একান্ত ব্যক্তিগত নয়; নবজাত শিশু বা নবদম্পতি শুধু মাত্র ঘরের না, তারা সমস্ত সমাজের। এইজন্যে গৃহের উৎসবকে সর্বজনের উৎসব যখন করি তখনই তা সার্থক হয়।

আজকের উৎসবের বাণী হচ্ছে এই যে, সমস্ত মানবের হয়ে আমরা একটি ব্রত লাভ করেছি, ব্রতপতি আমাদের এই ব্রতকে সার্থক করুন। এ আমাদের মিলনের ব্রত। একটি মহৎ জীবনের ভিতর থেকে এই ব্রত উদ্ভাবিত—একজন মহামানব এর প্রতিষ্ঠা করে গেছেন, আমরা যেন একে গ্রহণ করি।

মানুষ তার যে জীবনকে সহজে পেয়েছে সেই জীবনকে সৃষ্টি করার দ্বারা বিশিষ্টতা দিলে তবেই তাকে যথার্থ করে পায়। তা করতে গেলেই কোনো একটি বড়ো সত্যকে আপন জীবনের কেন্দ্ররূপে আশ্রয় করা চাই। সেই কেন্দ্রস্থিত ধ্রুব সত্যের সঙ্গে আপন চিন্তাকে কর্মকে, আপন দিনগুলিকে সংযুক্ত করে জীবনকে সুসংযত ঐক্য দিতে পারলে তবেই তাকে বলে সৃষ্টি। এই সৃষ্টির কেন্দ্রটি না পেলে তার দিনগুলি হয় বিচ্ছিন্ন, তার কর্মগুলির মধ্যে কোনো নিত্যকালের তাৎপর্য থাকে না। তখন জীবনটা আপন উপকরণ নিয়ে স্তূপাকার হয়ে থাকে, রূপ পায় না। তাতেই মানুষের দুঃখ। এই বিশ্বসৃষ্টির যজ্ঞে যা-কিছু থাকে

অস্পষ্ট, বিক্ষিপ্ত, যা-কিছু রূপ না পায়, তাই হয় বর্জিত। একেই বলে বিনষ্টি। যাঁরা আপনার মধ্যে সৃষ্টির সার্থকতা পেয়েছেন, যাঁরা নিজের জীবনের মধ্যে সত্যকে বাস্তব করে তুলেছেন, তাকে রূপ দিতে পেরেছেন, অমৃতাস্তে ভবন্তি।

অধিকাংশ মানুষ বিষয়লাভের উদ্দেশ্যকেই জীবনের কেন্দ্র করে। তার অধিকাংশ উদ্যম এই এক উদ্দেশ্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এতেও জীবনকে ব্যর্থ করে, তার কারণ এই যে, মানুষ মহৎ, যতটুকু তার নিজের পোষণের জন্য, যতটুকু কেবল তার অদ্যতন, তাতে তার সমস্তটাকে ধরে না। এই সত্যটিকে প্রকাশ করবার জন্যে মানুষ দুটি শব্দ সৃষ্টি করেছে, অহং আর আত্মা। অহং মানুষের সেই সত্তা, যার সমস্ত আকাঙ্ক্ষা ও আয়োজন চিরকালের থেকে ক্ষণিকতার মধ্যে, সর্বলোকের থেকে এককের মধ্যে তাকে পৃথক করে রেখেছে। আর আত্মার মধ্যে তার সর্বজনীন ও সর্বকালীন সত্তা। সমস্ত জীবন দিয়ে যদি মানুষ অহংকেই প্রকাশ করে তবে সে সত্যকে পায় না; তার প্রমাণ, সে সত্যকে দেয় না। কেননা সত্যকে পাওয়া আর সত্যকে দেওয়া একই কথা, যেমন প্রদীপের পক্ষে আলোকে পাওয়া। মানুষের পক্ষে আত্মাকে উপলব্ধি ও আত্মাকে দান করা একই কথা। আপনার সৃষ্টিতে মানুষ আপনাকে পায় এবং আপনাকে দেয়। এই দান করার দ্বারাই সে সর্বকাল ও সর্বজনের মধ্যে নিত্য হয়।

আমাদের মধ্যে বিচিত্র অসংলগ্ন ও পরস্পর-বিরুদ্ধ কত প্রবৃত্তি রয়েছে। এগুলি প্রাকৃতিক—মাটি যেমন, শিলাখণ্ড যেমন প্রাকৃতিক। এরা সৃষ্টির উপকরণ। প্রকৃতির ক্ষেত্রে এদের অর্থ আছে, কিন্তু মানুষ এদের ভিতর থেকে আপন সংকল্পের বলে যখন একটি সম্পূর্ণ মূর্তি উদ্ভাবিত করে তখনই মানুষ এদের প্রতি আপন সার্থকতার মূল্য অর্পণ করে। বাঘের অস্তিত্বরক্ষায় প্রাকৃতিক প্রবৃত্তির প্রয়োজন আছে, তার হিংস্রতা তার জীবনযাত্রার উপযোগী, এইজন্য তার মধ্যে ভালোমন্দর মূল্যভেদ নেই। কিন্তু কেবলমাত্র জৈব অস্তিত্বরক্ষায় মানুষের সম্পূর্ণতা নয়; বহুযুগের ইতিহাসের ভিতর দিয়ে মানুষ আপনাকে সৃষ্টি করে তুলছে—সেই তার মনুষ্যত্ব। এই তার আপন সৃষ্টির পক্ষে তার প্রকৃতিগত যে উপাদান অনুকূল তাই ভালো, যা প্রতিকূল তাই রিপু। এইজন্যে মানুষের জীবনের মাঝখানে এমন একটি মূল সত্যের প্রতিষ্ঠা থাকা চাই যা তার সমস্ত বিচ্ছিন্নতা-বিরুদ্ধতাকে সমন্বয়ের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করে ঐক্যদান করতে পারে। তবেই সে আপনার পরিপূর্ণ চিরন্তন সত্যকে পায়। সেই সত্যকে পাওয়াই অমৃতকে পাওয়া, না পাওয়া মহতী বিনষ্টি। অর্থাৎ যে বিনাশ তার দৈহিক জীবনের অভাবের বিনাশ সে নয়, তার চেয়েও বেশি; যা তার অমৃত থেকে বঞ্চিত হওয়ার বিনাশ, তাই।

যেমন ব্যক্তিগত মানুষের পক্ষে তেমনি তার সমাজের পক্ষে একটি সত্যের কেন্দ্র থাকা চাই। নইলে সে বিচ্ছিন্ন হয়, দুর্বল হয়, তার অংশগুলি পরস্পর পরস্পরকে আঘাত করতে থাকে। সেই কেন্দ্রটি এমন একটি সর্বজনীন সত্য হওয়া চাই, যা তার সমস্ত বিচ্ছিন্নতাকে সর্বাঙ্গীণ ঐক্য দিতে পারে—নইলে তার না থাকে শান্তি, না থাকে শক্তি, না থাকে সমৃদ্ধি; সে এমন-কিছুকে উদ্ভাবন করতে পারে না যার চিরকালীন মূল্য আছে। সমাজ মানুষের সকলের চেয়ে বড়ো সৃষ্টি। সেইজন্যেই দেখি ইতিহাসের আরম্ভ হতেই যখন থেকে মানুষ দলবদ্ধ হতে আরম্ভ করেছে তখন থেকেই সে তার সম্মিলনের কেন্দ্রে এমন একটি সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে যা তার সমস্ত খণ্ডকে জোড়া দিয়ে এক করতে পারে। এইটের

উপরেই তার কল্যাণের নির্ভর। এইটেই তার সত্য, এইটেই তার অমৃত, নইলে তার বিনষ্টি।

বস্তুত এই ঐক্যের মূলে মানবজাতি এমন-কিছুকে অনুভব করে যার প্রতি তার ভক্তি জাগে, যার জন্যে সে প্রাণ দেয়, যাকে সে দেবতা বলে জানে। মানুষ বাহ্যত বিচ্ছিন্ন, অথচ তার অন্তরের মধ্যে পরস্পর-যোগের যে শক্তি নিয়ত কাজ করছে তা পরম রহস্যময়, তা অনির্বচনীয়; তা প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত, অথচ প্রত্যেক ব্যক্তিকেই দেশে কালে বহুদূরে অতিক্রম করে চলে।

বিশেষ বিশেষ উপজাতি আপনাদের ঐক্যবন্ধনের গোড়ায় যে দেবতাকে স্থাপিত করেছে সেই দেবতাই বিশেষ সমাজের মধ্যে ঐক্য বিস্তার করলেও অন্য সমাজের বিরুদ্ধে ভেদবুদ্ধিকে একান্ত উগ্র করে তোলে। ধর্মের ঐক্যতত্ত্বকে সংকীর্ণ সীমায় স্থানিক রূপ দেবা মাত্রই তা বাহিরের সঙ্গে বিচ্ছেদের সাংঘাতিক অস্ত্র হয়ে দাঁড়ায়। পৃথিবীতে প্রাকৃতিক বিভীষিকা অনেক আছে— ঝড়, বন্যা, অগ্ন্যুৎপাত, মারী— কিন্তু মানুষের ইতিহাস খুঁজে দেখলে দেখা যায় ধর্মের বিভীষিকার সঙ্গে তাদের তুলনাই হয় না। সর্বমানবের অন্তরতম যে গভীর ঐক্য, মানুষের ধর্মই তার সকলের চেয়ে বড়ো শত্রু ছিল, এবং সেই শত্রুতা যে আজও ঘুচে গেছে তা বলতে পারি নে।

তাই যুগে যুগে যাঁরা সাধকশ্রেষ্ঠ তাঁদের সাধনা এই যে, দেবতার সম্বন্ধে মানুষের যে বোধ স্থানে রূপে ও ভাবে খণ্ডিত তাকে অখণ্ড করা; সাম্প্রদায়িক কৃপণতা যে ধর্মকে আপন আপন বিশেষ বিশ্বাস বিধি ও ব্যবহারের দ্বারা বদ্ধ করেছে তাকে মুক্ত করে দিয়ে সর্বমানবের পূজাবেদিতে প্রতিষ্ঠিত করা। যখনই তা ঘটে তখনই সেই ধর্মের উৎসবে জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে সকল মানুষের প্রতি আহ্বান ধ্বনিত হয়, সেই উৎসবক্ষেত্র কোনো বিশেষ ঐতিহাসিক বেড়া দিয়ে ঘেরা থাকে না। তখন ধর্মবোধের সঙ্গে যে অবাধ ঐক্যতত্ত্ব একাত্ম তা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

ইতিহাসে দেখা গেছে, একদা য়িহুদিরা তাঁদের ঈশ্বরকে তাঁদের জাতিগত অধিকারের মধ্যে সংকীর্ণ করে রেখেছিলেন; তাঁদের ধর্ম তাঁদের দেবতার প্রসাদকে নিজেদের ইতিহাসের মধ্যে একান্ত পুঞ্জিত করে রাখবার ভাণ্ডারঘরের মতো ছিল। সেই দেবতার নামে ভিন্ন সম্প্রদায়ের সর্বনাশ করাকে নিজ দেবতার পূজার অঙ্গ বলেই তাঁরা মনে করেছিলেন। তাঁদের দেবতাকে হিংস্র, বিদ্বেষপরায়ণ, রক্তপিপাসু-রূপে ধ্যান করাই তাঁদের বিশেষ গৌরবের বিষয় ছিল। সেদিন তাঁদের ধর্মোৎসব তাঁদেরই মন্দিরের প্রাঙ্গণে ছিল সংকুচিত। সেখানে বিশ্বের অধিকাংশ মানুষই শুধু যে ছিল অনাহূত তা নয়, তারা শত্রু বলেই গণ্য হত।

যিশু এলেন ধর্মকে মুক্তি দিতে। ঈশ্বরকে তিনি সর্বমানবের পিতা বলে ঘোষণা করলেন— ধর্মে সকল মানুষের সমান অধিকার, ঈশ্বরে মানুষের পরম ঐক্য, এই সাধন-মন্ত্র যখন তিনি মানুষকে দান করলেন তখন এই সাধনার সম্পদ সকল মানুষের উৎসবের যোগ্য হল।

যিশুর শিষ্যেরা এই মন্ত্র সকলেই সত্যভাবে গ্রহণ করেছে এমন কথা বলতে পারি নে। মুখে যাই বলুক, পাশ্চাত্য জাতির ধর্মবুদ্ধি মোটের উপর ওল্ড্ টেস্টামেন্টের ভাবেই সংঘটিত। এইজন্য যুদ্ধবিগ্রহের সময় তারা ঈশ্বরকে নিজেদের দলভুক্ত বলেই গণ্য করে, যুদ্ধে প্রতিকূল পক্ষ বিনষ্ট হলে তাতে তারা ঈশ্বরের পক্ষপাত কল্পনা করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। ঈশ্বরের নামে যে য়ুরোপে হিংস্রতা

বহু শতাব্দী ধরে প্রশ্রয় পেয়েছে শুধু তাই নয়, যখন তারা যিশুর বাণীর প্রতিধ্বনি করে স্বর্গরাজ্য-স্থাপনের কথা বলে তখন সেইসঙ্গেই নিজেদের রাজার জন্যে দেশের জন্যে ঈশ্বরের কৃপায় সকলপ্রকার উপায়ে মর্ত্যরাজ্য-বিস্তারের আকাঙ্ক্ষাকেই জয়ী করতে চেষ্টা করে। এমন-কি, যুদ্ধবিগ্রহের সময় তাদের ধর্মযাজকেরা যত বিদ্বেষের উত্তেজনার অনুমোদন করেছে এমন সৈনিকেরাও নয়।

এর কারণ, বাইবেলে যে অংশে ঈশ্বর রাগদ্বেষচালিত দলপতিরূপে কল্পিত ও বর্ণিত সেই অংশই তাদের নিজের স্বাভাবিক প্রবৃত্তির সহায় হয়ে তাদের অহমিকা ও পরজাতিবিদ্বেষকে বল দিয়েছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও খৃস্টের বাণী যে কাজ করছে না তা হতেই পারে না। তার কাজ গূঢ় গভীর। বস্তুত আমাদের স্বাভাবিক অহংকার দেবতাকে ক্ষুদ্র করে আমাদের শুভবুদ্ধিকে খণ্ডিত করে বলেই পরম সত্যের অদ্বৈতরূপ উপলব্ধির জন্যে আমাদের আত্মার এত গভীর প্রয়োজন।

বুদ্ধদেব জাতিবর্ণ ও শাস্ত্রের সমস্ত ভাগবিভাগ অতিক্রম করে বিশ্বমৈত্রী প্রচার করেছিলেন। এই বিশ্বমৈত্রী যে মুক্তি বহন করে সে হচ্ছে অনৈক্য-বোধ থেকে মুক্তি। রিপুমাত্রই মানুষের সঙ্গে মানুষের ভেদ ঘটায়, কেননা ভেদ আমাদের অহং-এর মধ্যে, এবং আমাদের রিপুগুলি এই অহং-এরই অনুচর। তারা আত্মাকে অবরুদ্ধ করে। সাধকেরা যখন ঐক্যের বিশ্বক্ষেত্রে আত্মাকে মুক্তি দান করেন তখনই তার আনন্দকে তার উৎসবকে সর্বদেশে কালে প্রতিষ্ঠিত করেন।

ভারত-ইতিহাসের মধ্যযুগে যখন মুসলমান বাহির থেকে এল তখন সেই সংঘাতে দুই ধর্মের পরীক্ষা হয়েছিল। দেখা গেল এই দুই ধর্মের মধ্যেই এমন কিছু ছিল যাতে মানুষে মানুষে শান্তি না এনে নিদারুণ বিরোধ জাগিয়েছে। হিন্দুধর্ম সেদিন হিন্দুকেও ঐক্যদান করে নি, তাকে শতধা বিভক্ত করে তার বল হরণ করেছে। মুসলমান-ধর্ম আপন সম্প্রদায়কে এক করা দ্বারা বলীয়ান করেছিল, কিন্তু তার মধ্যে সাম্প্রদায়িক ভেদ-বোধ নির্দয়ভাবে প্রবল ছিল বলেই সাম্প্রদায়িক ভিন্নতার ভিতর দিয়েও মানুষের অন্তরতর ঐক্যকে উপলব্ধি করে নি। বাইরের দিক থেকে আঘাত করে মুসলমান মানুষের বাহ্যরূপের প্রভেদকে সবলে একাকার করে দিতে চেয়েছিল। অপর পক্ষে ধর্মের বাহ্যরূপের বেড়াকে বহুগুণিত করে হিন্দু, মানুষে মানুষে যে বাহ্যভেদ আছে তার উপর স্বয়ং ধর্মের স্বাক্ষর দিয়ে, তাকে নানা বিধি বিধান ও সংস্কারের দ্বারা আটঘাট বেঁধে পাকা করে দিয়েছিল। সেদিন এই দুই পক্ষে ধর্মবিরোধের অন্ত ছিল না— আজও সেই বিরোধ মিটতে চায় না।

সেদিন ভারতে যে-সব সাধক জন্মেছিলেন তাঁরা ভেদবুদ্ধির নিদারুণ প্রকাশ দেখেছেন। তাই মানুষের চিরকালীন সমস্যার সমন্বয় করবার জন্যে তাঁদের সমস্ত মন জেগেছিল। এই সমস্যা হচ্ছে, ধর্মের বলে ভেদের মধ্যে অভেদের সেতু স্থাপন করা। সে কেমন করে হতে পারে ? না, সকল ধর্মের বাহিরে দেশকালের আবর্জনা জমে উঠে তার সাম্প্রদায়িক রূপকে কঠিন করে তোলে, সে দিকে এক সম্প্রদায়ের লোক অন্য সম্প্রদায়কে বাধা দেয়, আঘাত দেয়, কিন্তু তাদের মধ্যে যে অন্তরতম সত্য সেখানে ভেদ নেই বাধা নেই। এক কথায় অবিদ্যার মধ্যেই বাধা অজ্ঞানের বাধা। যেখানে কোনো-এক শাস্ত্রে বলে, বাসুকির মাথার উপরে পৃথিবী স্থাপিত, সেখানে আর-এক শাস্ত্র বলে, দৈত্যের কাঁধের উপর পৃথিবী স্থাপিত; এই মতভেদ নিয়ে আমরা যদি খুনোখুনি করি তবে সেই অজ্ঞানের লড়াই বাইরের দিক থেকে কিছুতেই মিটতে পারে না। কিন্তু জ্ঞানের দিকে বিরোধ মেটে এইজন্যে যে,

সেখানে বিশ্বাসের যে আদর্শ সে বিশ্বজনীন বুদ্ধি; সে প্রথাগত বিশ্বাস নয়, লোক-মুখের কথা নয়।

আধ্যাত্মিক সাধনার মধ্যে বিশ্বজনীনতা আছে, সাম্প্রদায়িক প্রথার মধ্যে নেই। সেইজন্য ভারতবর্ষের ঐক্যসাধক ঋষিরা সকল ধর্মের মূলে যে চিরন্তন ধর্ম আছে তাকেই ভেদবোধপীড়িত মানুষের কাছে উদ্ঘাটিত করেছিলেন। শাস্ত্র সাময়িক ইতিহাসের; আত্মপ্রত্যয় চিরকালের। শাস্ত্র ভেদ ঘটায়, আত্মপ্রত্যয় মিলন আনে। দাদূ কবীর নানক প্রভৃতি মধ্যযুগের ভারতীয় সাধকেরা ধর্মের শাস্ত্রীয় বাহ্যরূপের বাধা ভেদ করে এক পরম সত্যের আধ্যাত্মিক রূপকে প্রচার করেছিলেন। সেইখানেই সকল বিরোধের সমন্বয়।

এই বিরোধ-সমন্বয়ের প্রয়োজন ভারতে যেমন এমন আর কোথাও নয়। এই ভারত-ইতিহাসে সকলের চেয়ে উজ্জ্বল নাম তাঁদেরই যাঁরা আধ্যাত্মিক সাধনার ক্ষেত্রে মানুষের বিরোধশান্তি করতে চেয়েছেন। তাঁদের যে গৌরব সে রাষ্ট্রনীতির কূটবুদ্ধির গৌরব নয়, সে গৌরব সহজ সাধনার। এ দেশে বড়ো বড়ো যোদ্ধা ও সম্রাটের জন্ম হয়েছিল, ঐতিহাসিক বহু অন্বেষণে কালের আবর্জনাস্তূপের মধ্য থেকে তাদের লুপ্তপ্রায় নাম উদ্ধার করে আনেন। কিন্তু এই যে-সব সাধক বাহ্যিকতার আবরণ দূর করে ধর্মের আধ্যাত্মিক সত্যকে সর্বজনের কাছে প্রকাশ করেছেন, তাঁরা একদা সর্বজনের কাছে যতই আঘাত ও প্রত্যাখ্যান পেয়ে থাকুন, দেশের চিত্ত থেকে তাঁদের নাম কিছুতে লুপ্ত হতে চায় না। এঁরা অনেকেই ছিলেন অবিদ্বান অন্ত্যজ-জাতীয়, কিন্তু এঁদের সম্মান সর্বকালের; এঁরা ভারতের সবচেয়ে বড়ো অভাব মেটাবার সাধনা করেছেন, এবং ভেবে দেখতে গেলে সেই অভাব সমস্ত মানুষের।

আধুনিক ভারতে সেই সাধনার ধারা বহন করে এনেছেন রামমোহন রায়। তিনি যখন এলেন তখন সমস্যা আরও জটিলতর, তখন প্রবল রাজশক্তির হাত ধরে খৃস্টান-ধর্মও এই ধর্মভারবিদীর্ণ দেশে এসে প্রবেশ করেছে। রামমোহন রায় অপমান ও অত্যাচার স্বীকার করে ধর্মের সর্বজনীন সত্যের যোগে মানুষের বিচ্ছিন্ন চিত্তকে মেলাবার উদ্দেশে তাঁর সমস্ত জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। মানব-লোকে যাঁরা মহাত্মা তাঁদের এই সর্বপ্রধান লক্ষ্য; মানুষের পরমসত্য হচ্ছে মানুষ এক, এই সত্যকে প্রশস্ত ও গভীরতম ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করাই তাঁদের কাজ। রামমোহন আত্মার দৃষ্টিতে সকল মানুষকে দেখেছিলেন এবং আত্মার যোগে সকল মানুষকে ধর্মসম্বন্ধে যুক্ত করতে চেয়েছিলেন।

সৌভাগ্যক্রমে আমাদের প্রাচীনতন সাধকরাও এই ঐক্যের বাণী চিরকালের মতো আমাদের দান করে গেছেন। তাঁরা বলেছেন, শান্তং শিবমদ্বৈতং— যিনি অদ্বৈত, যিনি এক, তাঁর মধ্যেই মানুষের শান্তি, তাঁর মধ্যেই মানুষের কল্যাণ। এই বাণী অনেক কাল ভারতে সাম্প্রদায়িক কোলাহলে প্রচ্ছন্ন হয়ে ছিল। তিনি তাকেই তাঁর জীবনে তাঁর কর্মে ধ্বনিত করে তুললেন। আজ প্রায় একশো বছর হল তিনি এই একের মন্ত্র ঘোষণা করেছিলেন। যে ইচ্ছা ভারতবর্ষের গূঢ়তম ইচ্ছা, সেই তার চিরকালের ইচ্ছার সঙ্গে আজকের দিনের যোগ আছে। ভারতের সেই ইচ্ছাই একশত বৎসর পূর্বে ভারতের এক বরপুত্রের জীবনে আবির্ভূত হয়েছিল এবং এইদিনেই তাকে তিনি সফলতার রূপ দিতে চেয়েছিলেন। জানি সকলে তাঁকে স্বীকার করবে না এবং অনেকে তাঁকে বিরুদ্ধতার দ্বারা আঘাত করবে। কিন্তু জীবনে যাঁরা অমৃত লাভ করেছেন, প্রাতিকূলতার সাময়িক কুহেলিকার তাঁদের দীপ্তিকে গ্রাস

করতে পারবে না। তাই যাঁদের মনে শ্রদ্ধা আছে তাঁরা ভারতের সনাতন ঐক্যবাণীর একটি উৎস-মুখ বলেই আজকের এই দিনের পবিত্রতাকে অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করবেন, এবং রামমোহনের মধ্যে যে প্রার্থনা ছিল সেই প্রার্থনাকে কায়মনোবাক্যে উচ্চারিত করবেন যে, ভারতবর্ষ বিচ্ছিন্নতা থেকে, জড়বুদ্ধি থেকে, বহিরন্তরের দাসত্বদশা থেকে, মুক্তিলাভ করুক—'য একঃ স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু।'

১১ মাঘ [১৩৩৫]

৭

বন্ধুগণ, জরার ক্লান্তিতে আজ আমি অভিভূত। একান্ত ইচ্ছা সত্ত্বেও এই স্মরণ-উৎসবে সম্পূর্ণভাবে যোগ দিতে পারি নি, সেজন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি।

আজ আমাদের উপাসনার একটি বিশেষ দিন। উপাসনার বিশেষ বিশেষ উপলক্ষ আমাদের কাছে সময় সময় উপস্থিত হয়। প্রকৃতির মধ্যেও দেখি, ঋতু-ঋতুতে নূতন নূতন উৎসব। প্রত্যেক ঋতু তার নিজের অর্ঘ্য-নিবেদন বহন করে আনে। শরৎ যখন তার শিশিরধৌত নির্মল সৌন্দর্যের প্রাচুর্য নিয়ে দেখা দেয়, তখন সে আমাদের আত্মাকে আহ্বান করে, তখন আমাদের একটি বিশেষ বন্দনার দিন উপস্থিত হয়। প্রকৃতির সৌন্দর্যের মধ্যে আমরা শুনতে পাই বহুবিচিত্রকে নিয়ে একটি অখণ্ড সুষমার বাণী। জলে স্থলে আকাশে রূপসম্মিলনের মধ্যে সেই অপরূপ একের সংগীত কেবল আমাদের আত্মার কাছেই পৌঁছায়— সে এমন একটি লিপি, যার ঠিকানা একমাত্র এইখানেই।

সৌন্দর্য অনির্বচনীয়। তাকে আমরা কোনোরকম ব্যাখ্যার দ্বারা বোঝাতে পারি না। আমাদের অন্তরতম উপলব্ধির দ্বারা তাকে আমরা শুধু স্বীকার করতে পারি। সংসারের সমস্ত-কিছু প্রয়োজনকে অতিক্রম করে এই সৌন্দর্য বিরাজমান। সৃষ্টি রক্ষা বা পালনের কোনো তাগিদ দিয়ে তার হিসাব পাওয়া যায় না। সকল প্রয়োজনের অতীত যে ঐশ্বর্য, বিশ্বজগতে আনন্দরূপের আবির্ভাবকে সে প্রকাশ করে। তাই সংসারযাত্রার প্রতিদিনের সমস্ত অব্যবহিত দাবি চুকিয়ে দিয়েও যে অসীম উদ্‌বৃত্ত সৌন্দর্য দেখা দেয় তার মধ্যেই আমাদের আত্মা বিশ্বের নিত্যোৎসবের মূল সুরটিকে উপলব্ধি করতে পারে।

জীবনযাত্রার ছোটোখাটো খুঁটিনাটির মধ্যে আমরা এই মূলসুরটিকে ছিন্ন বিক্ষিপ্ত করে দেখি বলে তাকে তার বৃহৎ তাৎপর্যের মধ্যে উপলব্ধি করতে পারি না। যদি আদ্যন্ত দেখতে পেতেম, যে দেখা নানা বাধায় নানা বিরুদ্ধতার দ্বারা খণ্ডিত নয় এমন একটি স্বচ্ছ সমগ্র দেখা দিয়ে যদি অনুভব করতে পারতেম, তবে আমাদের মন অহৈতুক আনন্দে অভিভূত হয়ে পড়ত। জানতে পারতেম, যে পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য আমরা শরৎকালের একটি শেফালির মধ্যে দেখতে পাচ্ছি তারই ছন্দ লোকে লোকে আকাশে আকাশে পরিব্যাপ্ত। প্রতিদিনকার কাজ চালাবার দেখার মধ্যে আমাদের আত্মার সেই দেখা চাপা পড়ে, আনন্দরূপের পূর্ণতাবোধ ক্ষণে ক্ষণে হারিয়ে ফেলি, তার পরে নতুন ঋতু যখন পুরাতন ঋতূৎসবের পালা বদল করার আয়োজন করে তখন তার রাগিণীতে সেই মূলসুরের ধুয়াটিকে নতুন করে পাই। চন্দ্রতারাখচিত নীল আকাশে বিশ্বের যে আশ্চর্য-সুন্দর শতদলটি আলোকের

সরোবরে ধীরে ধীরে বিকশিত হয়ে উঠছে তাকে সম্পূর্ণ করে সমগ্রভাবে যিনি দেখছেন তাঁর সেই স্থিরগম্ভীর আনন্দের আংশিক উপলব্ধি আমরা অনুভব করি।

এইরকম করেই আমাদের আর-একটি বন্দনার বিষয় হয় যখন আমরা কোনো মহাপুরুষের মধ্যে সেই মহতোমহীয়ানের পরিচয় পাই। এই পরিচয়ের মধ্যে একটি প্রতিবাদ আছে, যে প্রতিবাদ আমরা প্রকৃতির মহোৎসবের মধ্যেও দেখি। চারি দিকে শ্রীহীনতার অভাব নেই— কত কুৎসিত মলিনতা, কত আবর্জনা, কত অসম্পূর্ণতা প্রতিনিয়তই দেখতে পাই। কিন্তু তারই মধ্যে দেখি সুন্দরকে— দেখি ক্ষণজীবী প্রজাপতির ক্ষীণ সূক্ষ্ম সুকুমার পাখার রঙে-রেখায় আশ্চর্য নৈপুণ্য— তখন বুঝি যা-কিছু কুশ্রী তার বিরুদ্ধে চিরকাল ধরে চলেছে সৌন্দর্যের এই প্রতিবাদ। তখন বুঝি সমস্ত কুশ্রীতাকে অতিক্রম করে সৌন্দর্যই ধ্রুবসত্য। বিশ্বজগতের ভিতরে ভিতরে আমাদের আত্মা যখন ছন্দোময় সামঞ্জস্যকে আবিষ্কার করে তখন দেখি, অনন্ত আকাশে সৌন্দর্যের তপস্যার আসন বিস্তীর্ণ। যা কুশ্রী, যা নিরর্থক, যা খণ্ড, সে-সমস্তকে একটি আশ্চর্য সুষমার মধ্যে সুপরিমিত করে নেবার জন্যে বিশ্বজগতের অন্তরে অন্তরে একটি অবিশ্রাম প্রবর্তনা কাজ করছে। বিক্ষিপ্তকে সংযত, বিকৃতকে সংস্কৃত করবার এই বিশ্বব্যাপী সৌন্দর্যতত্ত্ব আশ্রয় করে আছে আনন্দস্বরূপকে অমৃতস্বরূপকে। বিশ্বভুবন পরিব্যাপ্ত করে আনন্দরূপমমৃতং প্রকাশমান বলেই এটি সম্ভবপর হয়েছে।

মানবাত্মার মধ্যেও কত দীনতা, কত কলুষ, কত হিংসা দ্বেষ সর্বদাই প্রকাশ পাচ্ছে জানি। কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গেই আশ্বাস আসে— এ-সমস্তকে অতিক্রম করে যিনি শিবং তিনি আছেন। মহাপুরুষের জীবনের মধ্যে আমরা এই ইঙ্গিত পাই। যা-কিছু অশিব তাকে পরাভূত করে সমস্ত বিরুদ্ধতার সম্মুখে এসে মহাপুরুষের জীবন যখন দাঁড়ায়, আঘাত-অপমানের মাঝখানে কল্যাণের তপস্যাকে সার্থক করে, তখন সেই আশ্চর্য আবির্ভাবের সম্পূর্ণ যে অর্থ তাকে দেখি। প্রমাণ পাই যে, যুগে যুগে কলুষ ক্ষয় করছেন যিনি, অকল্যাণকে দুঃখের মধ্য দিয়ে কল্যাণে উত্তীর্ণ করছেন যিনি, তিনিই মহাপুরুষের বাণীর ভিতর দিয়ে বিরোধ-সংঘাতের মধ্যে হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়কে, জাতির সঙ্গে জাতিকে, ইতিহাসের বিপদসংকুল বন্ধুর পথে একসূত্রে বেঁধে দিচ্ছেন, তখন জানি যে তাঁকে প্রণাম করার দিন উপস্থিত।

আমাদের উপাসনায় ধ্যানের যে মন্ত্র আমরা ব্যবহার করি— সত্যং জ্ঞানং অনন্তং— সেই মন্ত্রের গভীর অর্থ হচ্ছে এই যে, চোখের দেখায় সত্যকে পাওয়া যায় না। মানুষের আত্মা নিজের জানবার ধর্ম দিয়েই সত্যের স্বরূপকে দেখে। চোখের দেখা বিচ্ছিন্ন, আত্মার দেখা ঐক্যে বাঁধা। ইন্দ্রিয়বোধ সেই একের বোধ নয়। আত্মা নিজের মধ্যে দেশকালের ভূমিকায় দেশ ও কালকে সমগ্রভাবে অখণ্ডভাবে বিশ্বজগতের ঐক্যসূত্রটিকে আবিষ্কার করার দ্বারাই সত্যকে উপলব্ধি করে। চোখ দিয়ে যখন অসীমতাকে দেখতে যাই তখন আয়তনের মধ্যে সংখ্যার মধ্যে তাকে খুঁজি। এমন করে বাহিরের দিক থেকে অসীমের সত্যকে পাওয়া যায় না। যত ছোটো আয়তনের মধ্যেই হোক না কেন, পরিপূর্ণতাকে যখন আত্মার দৃষ্টি দিয়ে দেখি তখন পাই অনন্ত সত্যকে। শিবকে অশিবের মধ্যে দেখা— সেও হচ্ছে আত্মার দেখা। মহাপুরুষেরা এই দৃষ্টি নিয়ে আসেন। তাঁরা বিপদকে ভয় করেন না, নিন্দা-ক্ষতিকে গ্রাহ্য করেন না। অবমাননার ভিতর দিয়ে তাঁরা এগিয়ে চলেন। যাঁরা মহৎ ভগবান তাঁদের বাহিরের দিক থেকে দয়া করেন না। নিষ্ঠুর ভগবান মহাপুরুষকে সম্মানের পথে পুষ্পবৃষ্টির ভিতর দিয়ে আহ্বান করেন না,

দুঃখের কঠোর পথই তাঁদের জন্য নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। সেইজন্য দুঃখের মধ্যেই মহাপুরুষের জীবনের সার্থকতা তাঁর সত্যের প্রমাণ। এই নির্দয়তার মধ্যে আমরা দেখি ভগবানের দয়া— তখন ভয় যায়, তখন আমরা ভরসা পাই, তখন আমরা প্রণাম করি।

এই প্রণামের পরিপূর্ণ প্রার্থনা হচ্ছে ‘অসতো মা সদ্‌গময়’— অসত্য আছে জানি, তার মধ্যেই সত্য দেখা দাও। কে এই সত্যকে আমাদের কাছে উজ্জ্বল করে দেখায়? যখন বহুল উপকরণের প্রয়োজনকেও অস্বীকার করে মানুষ বলতে পারে, যা অমৃত নয় তা নিয়ে আমি কী করব। বীর যখন আঘাতের পর আঘাতেও অবসন্ন হন না তখন অসত্যের মাঝখানে সত্যের যে আবির্ভাব তাকে আমরা দেখতে পাই। মানব-ইতিহাসের সংকটময় নিত্য বাধাগ্রস্ত অভিযানের মধ্যে আমরা সত্যের প্রকাশকে দেখি। আবার নিজের মধ্যেও দেখি, বিরুদ্ধতাকে অতিক্রম করে অসত্যকে পরাভব করে সত্য প্রকাশ পায়। তখন এই বিরুদ্ধতার ভিতর দিয়েই আমাদের প্রণাম পৌঁছয়। তখন বলি ‘আবিরাবীর্ম এধি’— আমার অপ্রকাশের অস্বচ্ছতার মধ্যেই তোমার প্রকাশ উজ্জ্বল হোক। তখন আমরা বলি ‘তমসো মা জ্যোতির্গময়’ —অন্ধকারকে বিদীর্ণ করে আলোক প্রকাশ পাক। ‘মৃত্যোর্মামৃতং গময়’— মৃত্যুর মধ্যে অমৃত জাগ্রত হউক।

আজ যাঁকে আমরা স্মরণ করছি, রুদ্রের আহ্বান সেই মহাপুরুষকেও একদিন ডাক দিয়েছিল। রুদ্র নিজে তাঁকে আহ্বান করেছিলেন— সেই আহ্বানের মধ্যেই রুদ্রের প্রসন্নতা তাঁকে আশীর্বাদ করেছে। সুখ নয়, খ্যাতি নয়, বিরুদ্ধতার পথে অগ্রসর হওয়া এই ছিল তাঁর প্রতি রুদ্রের নির্দেশ। আজও সে আহ্বান ফুরোয় নি। আজ পর্যন্ত তাঁর অবমাননা চলেছে। তিনি যে সত্যকে বহন করে এনেছেন দেশ এখনও সে সত্যকে গ্রহণ করে নি। যত দিন না দেশ তাঁর সত্যকে গ্রহণ করবে ততদিন এই বিরুদ্ধতা চলতেই থাকবে। দিন-মজুরি দিয়ে জনতার স্তুতিবাক্যে তাঁর ঋণ শোধ হবে না— ক্ষুদ্রের হাতে তাঁকে অপমান সহ্য করতে হবে। এই হচ্ছে তাঁর রুদ্রের প্রসাদ। তাঁর জন্য কোনো ছোটো পুরস্কারের ব্যবস্থা হয় নি। নিন্দা-অপমানের ভিতর দিয়েই সত্যকে প্রকাশ করতে হবে, ক্ষতির মধ্যেই সত্যকে লাভ করতে হবে, মৃত্যুর মধ্যে অমৃতকে জাগ্রত করতে হবে।

তাই আজ আমাদের প্রার্থনা যেন ছোটো না হয়। ভীরুর মতো বলব না, আমাদের দুঃখ দূর করো। বীরের মতো বলব, দুঃখ দাও, বিপদ দাও, অপমানের পথে আমাদের নিয়ে যাও। কিন্তু দুঃখ বিপদ অপমানের মধ্যেও অন্তরে যেন তোমার প্রসন্নতার আশীর্বাদ অনুভব করি।

হে রুদ্র, ‘যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্‌’— তোমার যে প্রসন্নমুখ আমাদের দেখাও। ‘তমসো মা জ্যোতির্গময়’— অন্ধকারের মধ্যে তোমার জ্যোতি প্রকাশ করো। হে রুদ্র, হে নিষ্ঠুর, ক্ষতি-পরাভবের ভিতর দিয়ে আমাদের নিয়ে যাও। বাহিরের আঘাতের দ্বারা আমাদের শক্তিকে অন্তরে অন্তরে পুঞ্জিত করো।

আজ যাঁকে আমরা স্মরণ করছি, যিনি রুদ্রের এই জয়পতাকা বহন করে এনেছিলেন, যিনি আমার পরম পূজনীয়, যাঁর কাছ থেকে আমার জীবনের পূজা, আমার সমস্ত জীবনের সাধনা আমি গ্রহণ করেছি, আজ তাঁর কথা বলতে পারি এমন শক্তি আমার নেই, আজ আমার কণ্ঠ ক্ষীণ। যদি কিছুই না বলতে পারি এই মনে করে আমি কিছু লিখেছিলাম, সেই লেখাটুকু পড়ে আমার বক্তব্য শেষ করব।

মহাপুরুষ যখন আসেন তখন বিরোধ নিয়েই আসেন, নইলে তাঁর আসার কোনো সার্থকতা নেই। ভেসে-চলার দল মানুষের ভাঁটার স্রোতকেই মানে। যিনি উজিয়ে নিয়ে তরীকে ঘাটে পৌঁছিয়ে দেবেন তাঁর দুঃখের অন্ত নেই, স্রোতের সঙ্গে প্রতিকূলতা তাঁর প্রত্যেক পদেই। রামমোহন রায় যে সময়ে এ দেশে এসেছিলেন সেই সময়কার ভাঁটার বেলার স্রোতকে তিনি মেনে নেন নি, সেই স্রোতও তাঁকে আপন বিরুদ্ধ বলে প্রতিমুহূর্তে তিরস্কার করেছে। হিমালয়ের উচ্চতা তার নিম্নতলের সঙ্গে অসমানতারই মাপে। সময়ের বিরুদ্ধতা দিয়েই মহাপুরুষের মহত্ত্বের পরিমাপ।

কোনো জাতির ইতিহাসে মানুষের প্রাণ যতদিন প্রবল থাকে ততদিন সে আপন মর্মগত জাগ্রৎ শক্তিতে নিজেকে নিজে নিরন্তর সংশোধন করে জয়ী করে চলতে পারে। বস্তুত প্রাণের প্রক্রিয়াই তাই। সে তো নিত্য সংগ্রাম। আমরা চলি, সে তো প্রতি পদক্ষেপেই মাটির অবিশ্রাম আকর্ষণের সঙ্গে বিরোধ। জড়তার ব্যূহ চারি দিকেই, দেহের প্রত্যেক যন্ত্রই তার সঙ্গে লড়াইয়ে প্রবৃত্ত। হৃদ্‌যন্ত্র চলছে, দিনে রাত্রে, নিদ্রায় জাগরণে; জড় রাজ্যের প্রকাণ্ড নিষ্ক্রিয়তা সেই চলার বিরুদ্ধ, মুহূর্তে মুহূর্তেই সে ক্লান্তির বাঁধ বাঁধতে চায়, যতক্ষণ জোর থাকে হৃদ্‌যন্ত্র মুহূর্তে মুহূর্তেই সেই বাধাকে অপসারণ করে চলে। বাতাস আমাদের চারি দিকে আপন নিয়মে প্রবাহিত, তাকে প্রাণের ব্যবস্থাবিভাগ আপন নিয়মের পথে প্রতিক্ষণেই বলপূর্বক চালনা করে। রোগের কারণ ও বীজ অন্তরে বাহিরে সর্বত্রই, দেহের আরোগ্য-সেনানী তাকে সর্বদাই আক্রমণ করছে—এর আর অবসান নেই। জড়ধর্মের সঙ্গে জীবধর্মের, রোগশক্তির সঙ্গে আরোগ্যশক্তির নিরবচ্ছিন্ন যুদ্ধক্রিয়াকেই বলে প্রাণক্রিয়া। সেই সচেষ্ট শক্তি যদি ক্লান্ত হয়, এই প্রবল বিরোধে যদি শৈথিল্য ঘটে, দেহব্যবস্থায় চলার চেয়ে না-চলার প্রভাব যদি বেড়ে ওঠে, তবেই বিকৃতি ও মলিনতায় দেহ কেবলই অশুচি হতে থাকে, তখন মৃত্যুই করুণারূপে অবতীর্ণ হয়ে এই শ্রান্তসংগ্রাম পরাভবকে জীবজগৎ থেকে অপসারিত করে দেয়।

সমাজদেহও সজীব দেহ। জড়ত্বের মধ্যেই তার সমস্ত অমঙ্গল। সমাজের যুদ্ধকুশল প্রাণধর্মকে বুদ্ধির ম্লানতা, সংকল্পের দৈন্য, জ্ঞানের সংকীর্ণতা, প্রীতিমৈত্রীর দৌর্বল্যের সঙ্গে কেবলই বিরোধ জাগিয়ে রাখতে হয়। চিত্তের অসাড়তা তার সকলের চেয়ে বড়ো শত্রু। চিত্ত যখন আপন কর্তৃত্বকে খর্ব করে স্থাবর হয়ে বসতে চায় তখনই তার সর্বত্রই বিকৃতির আবর্জনা জমে উঠে তাকে অবরুদ্ধ করে দেয়। এই অবরোধেই মৃত্যুর আরম্ভ। এই সময়ে আসেন যে মহাপুরুষ তিনি জড়ত্বপুঞ্জের মধ্যে প্রবল বিরোধ নিয়ে আসেন, নির্বিচার প্রথার দ্বারা চালিত দীনাত্মা তাঁকে সহ্য করতে পারে না।

✓সুদীর্ঘকাল থেকেই ভারতবর্ষে ইতিহাস স্তম্ভিত হয়ে আছে। কতকাল এই দেশ নিজে চিন্তা করে নি, চেষ্টা করে নি, সৃষ্টি করে নি, বুদ্ধিপূর্বক নিজের অন্তর-বাহিরের সম্মার্জন করে নি, তার সক্রিয় সংকল্প-শক্তি নব নব ব্যবস্থার দ্বারা নব নব কালের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করে নি। স্বাস্থ্যদৈন্য, অন্নদৈন্য, জ্ঞানদৈন্য, একে একে তার প্রাণের প্রায় সকল শিখাই ম্লান করে এনেছে। শতাব্দী থেকে শতাব্দীতে তার পরাভব বিস্তীর্ণ হয়ে চলল। মানুষের পরাভব তাকেই বলে যখন তার আপন ইচ্ছায় অরাজকতা ঘটে এবং বাহিরের ইচ্ছা শূন্য সিংহাসন অধিকার করে বসে, যখন তার নিজের বুদ্ধি অবসর নেয়, বাহিরের বুদ্ধি তাকে চালনা করে—সেই বুদ্ধি তার স্বজাতির অতীত কাল থেকেই তাকে অভিভূত করুক, বা অন্যজাতির বর্তমান

কাল থেকে এসেই তাকে ঘুরিয়ে বেড়াক। মানুষের পরাভব তাকেই বলে যখন তার আত্মার কর্তৃত্ব আড়ষ্ট হয়, যখন সে কালপরম্পরাগত অভ্যাসযন্ত্রের চাকাগুলোকে অন্ধভাবে ঘুরিয়ে চলে, যখন সে যুক্তিকে স্বীকার করে না, উক্তিকে স্বীকার করে, আন্তরধর্মকে খর্ব করে বাহ্য কর্মকে প্রবল করে তোলে। কোনো কূট কৌশলের দ্বারা বাহিরের কোনো সংকীর্ণ সংক্ষিপ্ত পথে এই স্থবিরত্বভার-মন্থর মানুষের পরিত্রাণ নেই।

এমনতর বহুযুগব্যাপী অন্ধতার দিনে দেশ যখন নিশ্চলতাকেই পবিত্রতা বলে স্থির করে নিস্তব্ধ ছিল এমন সময়েই ভারতবর্ষে রামমোহনের আবির্ভাব। দেশকালের সঙ্গে অকস্মাৎ এমন প্রকাণ্ড বৈপরীত্য ইতিহাসে কদাচিৎ ঘটে। তাঁর দেশকাল তাঁকে উচ্চৈঃস্বরে অস্বীকার করেছিল। সেই অসহিষ্ণু অস্বীকৃতির দ্বারাই দেশ তার মহোচ্চতাকে সর্বকালের কাছে ঘোষণা করেছে। এই পুরুষকণ্ঠের গর্জনধ্বনির চেয়ে আর কোনো উপায়ে স্পষ্টতর করে বলা যায় না যে, তিনি এ দেশে অন্ধকারের বিপক্ষে আলোকের বিরোধ এনেছিলেন, তিনি অভ্যস্ত দুর্বল বচনের পুনরাবৃত্তি করে জড়বুদ্ধির অনুমোদন করেন নি; চাটুলুব্ধ জনতার খ্যাতি-গর্বিত অগ্রণীত্ব করার আত্মাবমাননাকে তিনি অগ্রাহ্য করেছিলেন; তিনি উদ্যতদণ্ড জনসংঘের মূঢ় প্রতিকূলতাকে ভয় করেন নি, এবং তাদের নিবেদিত অন্ধভক্তির প্রলোভনে সত্যপথ থেকে লেশমাত্র বিচলিত হওয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল। তিনি বহুযুগের পূজাবেদিতে আসীন জড়ত্বকে আঘাত করেছিলেন এবং জড়ত্ব তাঁকে ক্ষমা করে নি।

তিনি জানতেন সকলপ্রকার জড়ত্বের মূলে আত্মার প্রতি অশ্রদ্ধা। জন্তু পায় নি তার স্বরাজ, কেননা সংস্কারের দ্বারা সে চালিত। জ্ঞানালোকিত আত্মা মানুষের ধর্মকে কর্মকে, তার সৃষ্টিকে যে পরিমাণে অধিকার করে সেই পরিমাণেই তার স্বরাজ প্রসারিত হয়। সভ্যতার ইতিহাস মানুষের আত্মবুদ্ধি আত্মবিশ্বাস আত্মসম্মানের শক্তিতে স্বরাজ্যবিস্তারের ইতিহাস।

মনুষ্যত্বের সর্বোচ্চ শিখরে আত্মার জয়ঘোষণা এক দিন এই ভারতবর্ষে যেমন অসংশয়িত বাণীতে প্রকাশ পেয়েছিল এমন আর কোথাও পায় নি। সেই বাণীই ভারতবর্ষে যখন খণ্ডিত আচ্ছন্ন অবরুদ্ধ তখনই রামমোহন রায় তাকে পুনরায় নূতন করে নির্মল করে বহন করে আনলেন। তার পূর্বেই অধিকাংশ ভারতবর্ষ নিজেকে নিকৃষ্ট অধিকারী বলে স্বীকার করে নিয়ে আত্মোপলব্ধি ও আত্মপ্রকাশের দায়িত্ব বিস্মৃত হয়ে জ্ঞানে কর্মে তামসিকতাকে অবলম্বন করে আত্মাবমাননায় নিমগ্ন ছিল। তার প্রথাজড়ত্বের ব্যাধিস্ফীত মন মানুষের শ্রেষ্ঠ অধিকারকে কেবল যে অঙ্গীকার করলে না তা নয়, তাকে ভর্ৎসনা করলে, আঘাত করলে।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত দেশের ক্ষুদ্র সীমানার মধ্যেই তিনি আত্মার বাণীকে উদ্‌বোধিত করতে চেয়েছিলেন এমন নয়। যে-কোনো সম্প্রদায়ই আপন জড় বাহ্য রূপের দ্বারা, জ্ঞানবিরোধী অন্ধ আচারের দ্বারা আপন সত্যরূপকে আবৃত করেছে, তাকেই তিনি আধ্যাত্মিক আদর্শের দ্বারা বিচার করেছিলেন। তিনি মানুষের সমগ্রতাকে যেমন সমস্ত মনে প্রাণে, অনুভব ও ব্যবহারে প্রকাশ করেছেন, সেই যুগে সমস্ত পৃথিবীতে অতি অল্প লোকের পক্ষেই তা সম্ভবপর ছিল। তিনি জানতেন, কেবলমাত্র আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রেই সকল ধর্মের মধ্যে মানুষের আত্মার মিলন ঘটতে পারে। তিনি জানতেন, মানুষ যখন আপন ধর্মতত্ত্বের বাহ্য বেষ্টনীকে তার আত্মরূপের চেয়ে বেশি মূল্য দিয়েছে, তখনই

তাতে যেমন মানুষের ব্যবধান ঘটিয়েছে, তার ধর্মগত বিষয়বুদ্ধি অহংকার হিংসা বিদ্বেষ জাগিয়ে পৃথিবীকে রক্তে পঙ্কিল করেছে, এমন আর কিছুতেই করে নি। ধর্মের বিশ্বতত্ত্বের ভূমিকা তিনি সেই ধর্ম-সংকীর্ণতার দিনে আপন চিত্তের মধ্যে লাভ ও আপন জীবনের মধ্যে প্রকাশ করেছিলেন।

যদিও সেদিন বাহির থেকে পৃথিবীর মানুষ প্রত্যেক সভ্য মানুষের জ্ঞানের মধ্যে স্থান পেয়েছিল, তার প্রাণের মধ্যে প্রবেশ করে নি। মানুষের সম্বন্ধে বিশ্ববোধ আজও পৃথিবীতে নানা সংকীর্ণ সংস্কারে বাধাগ্রস্ত। আজও পৃথিবী এ কথা বলতে পাচ্ছে না যে, নূতন যুগ এল। সকল দিকেই এ যে অখণ্ডতার যুগ। এই যুগে জ্ঞানে কর্মে সব মানুষকে মিলিয়ে নেবার প্রশস্ত রাজপথ উদ্‌ঘাটিত হওয়া চাই। বিজ্ঞানরাজ্যে আজ জ্ঞানে জ্ঞানে অসবর্ণতা দূর করে মিলন আরম্ভ হয়েছে; বিশ্ববাণিজ্যের মধ্যে কর্মের মিলও বিস্তীর্ণ হল, যদিও সেই মিলনপথের বাঁকে বাঁকে আজও বাটপাড়ির ব্যাবসা চলে; যতই কঠিন বাধায় কণ্টকাকীর্ণ হোক, তবু বিশ্বরাষ্ট্রনীতির যে সূত্রপাত হয় নি এমন কথা বলা যায় না। এই নূতন যুগধর্মের উদ্‌বোধন বহন করে বাহিরের প্রতিকূলতা ও আত্মীয়ের লাঞ্ছনার মধ্যে যাঁরা এই পৃথিবীতে বুক পেতে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছেন তাঁদের প্রথম ও প্রধানদের মধ্যেই রামমোহন একজন। তিনি ভারতবর্ষের সেই দূত যিনি সর্বপ্রথমে বিশ্বক্ষেত্রে ভারতের বাণীকে বহন করে নিয়ে দাঁড়াতে পেরেছিলেন— সেই বাণী ভারতের স্বকীয় দৈন্য নিয়ে নয়, দুর্যোগ নিয়ে নয়, সমস্ত মানবের কাছে আপনার অর্ঘ্য নিয়ে। মানবসত্যকে তিনি সমগ্র করে দেখেছিলেন। তিনি যখন আপন ভাষায় বাঙালির আত্মপ্রকাশের উপাদানকে বলিষ্ঠ করবার জন্য প্রবৃত্ত ছিলেন তখন বাংলা গদ্য ভাষার অনুদ্‌ঘাটিত পথ তাঁকে প্রায় প্রথম থেকেই কঠিন প্রয়াসে খনন করতে হয়েছিল; যখন তিনি তত্ত্বজ্ঞানের আলোকে বাঙালির মন উদ্ভাসিত করতে চেয়েছিলেন তখন তিনি সেই অপরিণত গদ্যে দুরূহ অধ্যবসায়ে এমন-সকল পাঠকের কাছে বেদান্তের ভাষ্য করতে কুণ্ঠিত হন নি যাদের কোনো কোনো পণ্ডিতও উপনিষদ্‌কে কৃত্রিম বলে উপহাস করতে সাহস করেছেন, ও মহানির্বাণতন্ত্রকে মনে করেছিলেন রামমোহনেরই জাল-করা শাস্ত্র; সমাজে নারীর অধিকার সমর্থন করতে একলা যখন তিনি দাঁড়িয়েছিলেন তখন পশ্চিম মহাদেশেও নারী অবলাই ছিল এবং তার অধিকার ছিল সকল দিকেই সংকীর্ণ; যখন তিনি রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে স্বজাতির সম্মান দাবি করেছিলেন তখন দেশে রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের সূত্রপাতও হয় নি। মনুষ্যত্বের উপকরণ-বৈচিত্র্যকে তিনি তাঁর সকল শক্তি দিয়েই সম্মান করেছিলেন। মানুষকে তিনি কোনো দিকেই খর্ব করে দেখতে পারতেন না, কারণ তাঁর নিজের মধ্যেই মনুষ্যত্বের পূর্ণতা অসাধারণ ছিল।

এক শত বৎসর উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। এখনও তাঁর সত্য পরিচয় দেশের কাছে অসম্পূর্ণ, এখনও তাঁকে অসম্মান করা দেশের লোকের কাছে অসম্ভব নয়; যে উদার দৃষ্টিতে তাঁর মহত্ত্ব সুস্পষ্ট দেখা যেত সে দৃষ্টি এখনও কুহেলিকায় আচ্ছন্ন। কিন্তু এতে সেই কুহেলিকার স্পর্ধার কোনো কারণ নেই। জ্যোতিষ্ককে আবৃত করে সমস্ত প্রভাতকে যদি সে ব্যর্থ করে দেয় তবু সেই জ্যোতিষ্ক কুহেলিকার চেয়ে ধ্রুব ও মহৎ। মহত্ত্ব বাহিরের কর্কশ বাধার মধ্যে থেকেও কাজ করে, আলোকের অনাদরে তার বিলুপ্তি হয় না। রামমোহন যে শক্তিকে চালনা করে গেছেন সেই শক্তি আজও কাজ করছে, এবং অবশেষে এমন দিন আসবে যখন তাঁর অবিচলিত প্রতিষ্ঠাকে, তাঁর বীর্যবান্ অপ্রতিহত মহিমাকে সর্বান্তঃকরণে স্বীকার করবার

মতো অন্ধসংস্কারমুক্ত সবল বুদ্ধি ও নির্বিকার শ্রদ্ধার অবস্থায় দেশ উত্তীর্ণ হবে। আমরা যারা তাঁর কাছ থেকে মানুষকে প্রচুর বিঘ্নের মধ্যে দিয়েও সত্য করে দেখবার প্রেরণা লাভ করি, তাঁর প্রত্যেক অসম্মানে আমরা মর্মাহত হই; কিন্তু তাঁর জীবিতকালেও শত শত অবমাননাতেও তাঁর কল্যাণশক্তিকে কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ করে নি, এবং তাঁর মৃত্যুর পরেও সকল অবজ্ঞার মধ্যে সেই শক্তি জাগ্রত থেকে অকৃতজ্ঞতার অন্তরে অন্তরেও সফলতার বীজ বপন করবে।

৬ ভাদ্র ১৩৩৫

৮

রাজা রামমোহনের কর্মজীবনের বৈচিত্র্য নানা দিকে প্রকাশ পেয়েছিল। তাঁর জীবনের এই কর্মবৈচিত্র্য-বর্ণনায় আমি অসমর্থ। আমি কেবল তাঁর জীবনের একটি কথা আপনাদের নিকটে বলব। এ পর্যন্ত আমরা তাঁর স্মৃতিসভায় কেউ তাঁর রাজনীতি, কেউ শিক্ষা, কেউ সমাজসংস্কার এইরূপে খণ্ড খণ্ড করে তাঁর জীবনের এক-একটা দিক আলোচনা করেছি। এমন টুকরা টুকরা করে কোনো মহৎচরিত্র আলোচনা করা আমি অন্যায় বলে মনে করি, ইহাতে তাঁকে সম্মান না করে অপমান করা হয়। ঠিক আসল যে শক্তিটি তাঁর জীবনে সংগীতের মতো বেজে উঠেছিল তার দিকে আমাদের দৃষ্টি পড়ে না। বিশেষত যেখানে রাজা রামমোহনের মহত্ত্ব তাঁর সেই দিকটা বাদ দিয়ে আমরা যদি তাঁকে কেউ আট আনা কেউ বারো আনা স্বীকার করি তা হলে তাঁর অপমানই করা হবে। যাঁরা মহাপুরুষ তাঁদের হয় সম্মান করে ষোলো আনা স্বীকার করতে হবে, না হয় অস্বীকার করে অপমানিত করতে হবে; এর মাঝামাঝি অন্য পথ নেই। আমি মনে করি, সত্যকে স্বীকার করে রামমোহন তাঁর দেশবাসীর নিকটে তখন যে নিন্দা ও অসম্মান পেয়েছিলেন, সেই নিন্দা ও অপমানই তাঁর মহত্ত্ব বিশেষভাবে প্রকাশ করে। তিনি যে নিন্দা লাভ করেছিলেন সেই নিন্দাই তাঁর গৌরবের মুকুট। লোকে গোপনে তাঁর প্রাণবধেরও চেষ্টা করেছিল।

বৈদিক যুগে ঋষিরা এক সময়ে সূর্যকেই দেবতা বলে পূজা করতেন। আবার উপনিষদের ঋষি সেই সূর্যকেই বলেছেন, 'হে সূর্য, তুমি তোমার আবরণ অনাবৃত করো, তোমার মধ্যে আমরা সেই জ্যোতির্ময় সত্যদেবতাকে দেখি।'

সেকালে যতই পূজা, হোম, ক্রিয়া, অনুষ্ঠান থাকুক না কেন, সেই-সকলের আবরণ ভেদ করে ঋষিরা সত্যকে দেখেছিলেন। যে ঈশোপনিষদে ঋষি সূর্যকে অনাবৃত হতে আহ্বান করেছেন সেই উপনিষদেরই প্রথম শ্লোক হচ্ছে—

ঈশা বাস্যামিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা, মা গৃধঃ কস্যাস্বিদ্ধনং॥

সকলই দেখতে হবে সেই ঈশ্বরকে দিয়ে আচ্ছন্ন করে, তাঁর দান ভোগ করতে হবে।

রাজা রামমোহন এই এককে, অবিনাশীকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। এই এককেই তিনি দেশাচার লোকাচার প্রভৃতির জঞ্জাল হতে অনাবৃত করে, কেবল বাঙালিকে

নয়, ভারতবাসীকে নয়, পৃথিবীবাসীকে দেখালেন। তিনি তাঁকে জেনে প্রাচীন ঋষির মতো বললেন—

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ॥

এইখানেই তাঁর বিশেষত্ব। তিনি সমস্ত আবরণের মধ্য হতে এককে আবিষ্কার করেছেন। তিনি এক দিকে প্রাচীন ঋষি, আবার অন্য দিকে তিনি একেবারে আধুনিক, যতদূর পর্যন্ত আধুনিক হওয়া যায় তিনি তাই। আগে এই বিশ্বাস ছিল, এই ব্রহ্মকে সকলে জানতে পারে না। রামমোহন তাহা স্বীকার করলেন না, তিনি সকলকেই বললেন, 'ভাব সেই একে।'

আজকার সভার এই প্রারম্ভসংগীত—'ভাব সেই একে', ইহাই রামমোহনের হৃদয়ের অন্তর্নিহিত কথা।

যিনি যাহাতে বড়ো, তাঁকে সেই দিক দিয়ে সম্মান দেখাতে হয়; টাকায় বড়ো যিনি তিনি ধনী বলে সম্মান পান; বিদ্যায় বড়ো যিনি, তিনি বিদ্বান বলে সম্মান পান। রামমোহনকে সেই-সকল দিক দিয়ে দেখলে চলবে না; তিনি এককে, সত্যকে লাভ করেছেন, সেই সত্যই তাঁর জীবনের সকলের চেয়ে বড়ো জিনিস। তাঁকে স্বীকার করেই তিনি নিন্দার মুকুট উপহার পেয়েছেন।

পৃথিবীর অন্য-সব মহাপুরুষের মতো তিনি টাকাকড়ি বিদ্যা খ্যাতি কিছুর দিকে দৃষ্টিপাত করেন নি, তিনি তাঁর সমস্ত জীবন দিয়ে সেই এককে সত্যকেই চেয়েছিলেন।

ভীষণ মরুভূমির মধ্যে হঠাৎ এক জায়গায় একটা প্রস্রবণ প্রকাশ পায়। হোক-না সেটা মরুভূমি, তথাপি সেখানেও ধরিত্রীর বুকের ভিতরে প্রাণের রসধারা আছে: এই ধারা সর্বত্রই আছে। চারি দিকে শুষ্ক নির্জীব সমতল বালুর ক্ষেত্রের মধ্যে এই প্রস্রবণ একান্ত খাপছাড়া বলে মনে হবে সন্দেহ নাই। হয়তো চারি দিক বলবে, 'বেশ জড় নির্জীব শান্ত ছিলাম আমরা, হঠাৎ কোথেকে এল এই শ্যামলতা ও জলধারার কলধ্বনি।'

এই শুষ্ক নির্জীব দেশে মুক্তির বাণী ও জীবনের শ্যামলতা নিয়ে রামমোহন এসেছেন। আমরা জোর করে তাঁকে অস্বীকার করতে চাই কিন্তু সাধ্য কী তাঁকে অস্বীকার করি। যে দিকে তাকাই সেই দিকেই তাঁর জীবনধারা দেখতে পাই। আমরা এখন ফল পাচ্ছি, তাই অনায়াসে গাছের গোড়ার কথা অস্বীকার করছি। রামমোহন আমাদের কাছে আত্মার মুক্তির সংবাদ নিয়ে এসেছেন। আমরা এখন বিদেশী কলকব্জা শিখতে চাই, পশ্চিমের অনুকরণে বাইরে থেকে অপকৃষ্ট উপায়ে স্বাধীনতা চাই। সে অসম্ভব। সকল শক্তির যেখানে মধ্যবিন্দু ও প্রাণের যেখানে কেন্দ্র, সেখান থেকে আমরা জীবনধারা লাভ করতে না পারলে আমরা বাইরের চেষ্টায় মুক্তি পাব না।

অনেকের এই ধারণা আছে পশ্চিমে আধ্যাত্মিকতা নেই, তারা বস্তুতেই বড়ো হয়ে উঠেছে। আমি তা স্বীকার করি না। আধ্যাত্মিকতায় বড়ো না হয়ে মানুষ কিছুতেই বড়ো হতে পারে না। তাদের সেবা, তাদের প্রেম, তাদের ত্যাগের ইতিহাস যাঁরা জানেন তাঁরা এ কথা কিছুতেই বলতে পারেন না যে, পশ্চিমে আধ্যাত্মিকতা নেই।

রামমোহনকে সম্মান করতে হলে তাঁর জীবনের এই শ্রেষ্ঠ সত্যকে বরণ করতে হবে।

তাঁর জীবনের এই আসল কথাটিই আমার বক্তব্য। আর কিছু বলার সাধ্য আমার নেই।

কার্তিক ১৩২২

২

একদা পিতৃদেবের নিকট শুনিয়াছিলাম যে, বাল্যকালে অনেক সময়ে রামমোহন রায় তাঁহাকে গাড়ি করিয়া স্কুলে লইয়া যাইতেন; তিনি রামমোহন রায়ের সম্মুখবর্তী আসনে বসিয়া সেই মহাপুরুষের মুখ হইতে মুগ্ধদৃষ্টি ফিরাইতে পারিতেন না, তাঁহার মুখচ্ছবিতে এমন একটি সুগভীর সুগম্ভীর সুমহৎ বিষাদচ্ছায়া সর্বদা বিরাজমান ছিল।

পিতার নিকট বর্ণনা শ্রবণকালে রামমোহন রায়ের একটি অপূর্ব মানসী মূর্তি আমার মনে জাজ্বল্যমান হইয়া উঠে। তাঁহার মুখশ্রীর সেই পরিব্যাপ্ত বিষাদমহিমা, বঙ্গদেশের সুদূর ভবিষ্যৎকালের সীমান্ত পর্যন্ত, স্নেহচিন্তাকুল কল্যাণকামনার কোমল রশ্মিজালরূপে বিকীর্ণ দেখিতে পাই। আমরা বঙ্গবাসী নানা সফলতা এবং বিফলতা, দ্বিধা এবং দ্বন্দ্ব, আশা এবং নৈরাশ্যের মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে আপনার পথ নির্মাণ করিয়া চলিয়াছি। আমি দেখিতে পাইতেছি, এখনও আমাদের প্রতি সেই নব্যবঙ্গের আদি পুরুষ রামমোহন রায়ের দূরপ্রসারিত বিষাদদৃষ্টি নিস্তব্ধভাবে নিপতিত রহিয়াছে। এবং আমরা যখন আমাদের সমস্ত চেষ্টার অবসান করিয়া এই জীবলোকের কর্মক্ষেত্র হইতে অবসৃত হইব, যখন নবতর বঙ্গবাসী নব নব শিক্ষা এবং চেষ্টা এবং আশার রঙ্গভূমি-মধ্যে অবতীর্ণ হইবে, তখনও রামমোহন রায়ের সেই স্নিগ্ধ গম্ভীর বিষণ্নবিশাল দৃষ্টি তাহাদের সকল উদ্যোগের প্রতি আশীর্বাদ বিকীর্ণ করিতে থাকিবে। আমার পিতাকে যেদিন রামমোহন রায় সঙ্গে করিয়া বিদ্যালয়ে লইয়া যাইতেছিলেন, সেদিন আমাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকেই ইহসংসারে ছিলেন না—সেদিন যে পথ দিয়া তাঁহার শকট চলিয়াছিল অদ্য সে পথের মূর্তি-পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। তখন বঙ্গসমাজে একটি নূতন সন্ধ্যার আবির্ভাব হইয়াছিল—তখন পারস্য শিক্ষা অস্তপ্রায়, ইংরাজি শিক্ষার অরুণোদয় হইতেছে মাত্র; এবং সংস্কৃত শিক্ষা স্বল্পতৈল দীপশিখার ন্যায় উজ্জ্বল আলোকের অপেক্ষা ভূরি পরিমাণে মলিন ধূম্র বিকীর্ণ করিতেছিল। তখনও বঙ্গসমাজের অভ্যুদয় হয় নাই; তখন ছোটো ছোটো গ্রামসমাজ-পল্লিসমাজে বঙ্গদেশ বিচ্ছিন্ন বিভক্ত হইয়া ছিল; ব্যক্তিবিশেষের জাতিকুল, কার্য অকার্য, বেতন এবং উপরিপ্রাপ্য সংকীর্ণ গ্রাম্যমণ্ডলীর সর্বপ্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল—এমন সময়ে একদিন রামমোহন রায় তাঁহার মহৎ প্রকৃতির, তাঁহার বৃহৎ সংকল্পের সমস্ত অপরিমেয় বিষাদভার লইয়া আমার পিতাকে তাঁহার স্বপ্রতিষ্ঠিত নববিদ্যালয়ে পৌঁছাইয়া দিতেছিলেন।

অদ্য ইংরাজি শিক্ষা দশ দিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে, অদ্য বাঙলা দেশের প্রভাতবিহঙ্গেরা ইংরাজি-অনুবাদ-মিশ্রিত সংগীতে দিগ্‌বিদিক্‌ প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিয়াছেন, উষাসমীরণে শত শত সংবাদপত্র ইংরাজি ও বাঙলা ভাষায় মর্মরধ্বনি তুলিয়া অবিরাম আন্দোলিত হইতেছে। তখন গদ্য বাক্যবিন্যাস কী করিয়া বুঝিতে

হয়, রামমোহন রায় তাহা প্রথমে নির্দেশ করিয়া, তবে গদ্য লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। আজ দেখিতে দেখিতে বঙ্গসাহিত্যলতা গদ্যে পদ্যে পাঠ্যে অপাঠ্যে কোথাও বা কণ্টকিত কোথাও বা মঞ্জরিত হইয়া উঠিতেছে— আজ সভাসমিতি আবেদন-নিবেদন, আলোচনা-আন্দোলন বাদ-প্রতিবাদে বঙ্গভূমি শুকপক্ষী-কুলায়ের ন্যায় মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। ফলত, বঙ্গসমাজপুরীর পুরাতন রাজপথের আজ অনেক নূতন সংস্কার হইয়া গিয়াছে, পথ এবং জনতা উভয়েরই বহুল পরিমাণে রূপান্তর দেখা যাইতেছে, কিন্তু তথাপি আমি কল্পনা করিতেছি, যে শকটে রামমোহন রায় আমার পিতাকে বিদ্যালয়ে লইয়া গিয়াছিলেন সেই শকটে অদ্য আমরা তাঁহার সম্মুখবর্তী আসনে উপবিষ্ট রহিয়াছি, তাঁহার মুখ হইতে মুগ্ধ দৃষ্টি ফিরাইতে পারিতেছি না। দেখিতে পাইতেছি, এখনও তাঁহার সমুন্নত ললাট ও উদার নেত্রযুগল হইতে সেই পুরাতন বিষাদচ্ছায়া অপনীত হয় নাই, এখনও তিনি ভবিষ্যতের দিগন্তাভিমুখে তাঁহার সেই গভীর চিন্তাবিষ্ট দূরদৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন।

হিমালয়ের দুর্গম নির্জন অভ্রভেদী গিরিশৃঙ্গমালার মধ্যে যে একটি নির্মল নিস্তব্ধ নিঃশব্দ তপঃপরায়ণ বিষাদ বিরাজ করে রামমোহন রায়ের বিষাদ সেই বিষাদ —তাহা অবসাদ নহে, নৈরাশ্য নহে; তাহা দূরগামী সংকল্প, দূরপ্রসারিত দৃষ্টি, সুদূরব্যাপী মহৎ প্রকৃতির ধ্যানধৈর্যের বিশালতা, অনন্ত স্বচ্ছ আকাশের নীলিমা; অতলস্পর্শ নির্মল সরোবরে শ্যামলতা যেরূপ উজ্জ্বল তাঁহার বৃহৎ অন্তঃকরণের বিষাদ সেইরূপ জ্যোতির্ময়, সেইরূপ বহুদূরবিস্তীর্ণ। যে বঙ্গভূমি তাঁহার ধ্যানদৃষ্টির সম্মুখে নিয়ত প্রকাশ পাইতেছিল সে বঙ্গভূমি তখন কোথায় ছিল এবং এখনই বা কোথায় আছে! রামমোহন রায়ের সেই বঙ্গদেশ, তখনকার বঙ্গভূমির সমস্ত ক্ষুদ্রতা জড়তা সমস্ত তুচ্ছতা হইতে বহুদূরে পশ্চিমদিক্‌প্রান্তভাগে স্বর্ণপ্রভামণ্ডিত মেঘমালার মধ্যে ছায়াপুরীর মতো বিরাজ করিতেছিল। যখন বঙ্গদেশের পণ্ডিতগণ মূঢ়ের মতো তাঁহাকে গালি দিতেছিল তখন তিনি সেই মানস বঙ্গলোক হইতে দূরাগত সংগীতধ্বনির প্রতি কান পাতিয়াছিলেন; সমাজ যখন তাঁহাকে তিরস্কৃত করিবার উদ্দেশে আপন ক্ষুদ্র গৃহদ্বার অবরুদ্ধ করিতেছিল তখন তিনি প্রসারিতবাহু বিশ্ববন্ধুর ন্যায় সেই মানস বঙ্গসমাজের নিত্য-উন্মুক্ত উদার জ্যোতির্ময় সিংহদ্বারের প্রতি আপন উৎসুক দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াছিলেন। সে সংগীত, সে দৃশ্য, ভবিষ্যতের সেই স্বর্গীয় আশারাজ্য যাহাদের সম্মুখে বর্তমান ছিল না, তাহারা তাঁহার সেই উদার ললাটের উপর সততসঞ্চরমাণ ছায়ালোকের কোনো অর্থই বুঝিতে পারিত না। তাহাদের আশা ছিল না, ভাষা ছিল না, সাহিত্য ছিল না, জাতিকে তাহারা বর্ণ বলিয়া জানিত, দেশ বলিতে তাহারা নিজের পল্লীকে বুঝিত; বিশ্ব তাহাদের গৃহকোণকল্পিত মিথ্যা বিশ্ব, সত্য তাহাদের অন্ধ সংস্কার; ধর্ম তাহাদের লোকাচারপ্রচলিত ক্রিয়া কর্ম, মনুষ্যত্ব কেবলমাত্র অনুগত প্রতিপালন এবং পৌরুষ রাজদ্বারে সৎ ও অসৎ উপায়ে উচ্চ বেতন লাভ। রামমোহন রায় যদি কেবল ইহাদের মধ্যে আপনার দৃষ্টিকে নিবদ্ধ রাখিতেন, যদি সেই সংকীর্ণ বর্তমান কালের মধ্যেই আপনার সমস্ত আশাকে প্রতিহত হইতে দিতেন, তাহা হইলে কদাচ কাজ করিতে পারিতেন না— তাহা হইলে তাঁহার মাতৃভূমিকে আপন আদর্শলোকের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করা তাঁহার পক্ষে অসাধ্য ও অসম্ভব বলিয়া বোধ হইত।

যদিও একই পৃথিবী, একই মৃত্তিকা, তথাপি মহাপুরুষদিগের জন্মভূমি আমাদের হইতে অনেক স্বতন্ত্র। এই পৃথিবী, এই মৃত্তিকা আমাদের অজ্ঞাতসারে

অদৃশ্যভাবে তাঁহাদের পদতলে বহু ঊর্ধ্বে উন্নত হইয়া উঠে। যখন তাঁহারা আমাদের সহিত এক সমভূমিতে সঞ্চরণ করিতেছেন তখনও তাঁহারা পর্বতের শিখরাগ্রভাগে আছেন; সেইজন্য তাঁহারা গৃহের মধ্যে থাকিয়াও বিশ্বকে দেখিতে পান, বর্তমানের মধ্যে থাকিলেও ভবিষ্যৎ তাঁহাদিগকে আহ্বান করিতে থাকে, ইহলোকের মধ্যে থাকিয়াও পরলোক তাঁহাদের প্রত্যক্ষগোচর হয়। আমরা ভূগোলবিদ্যার সাহায্যে জ্ঞানে জানি যে, আমাদের ক্ষুদ্র পল্লীকে অতিক্রম করিয়াও বিশ্ব বিরাজ করিতেছে, কিন্তু আমরা সেই উচ্চ ভূমিতে নাই যেখান হইতে বিশ্বলোকের সহিত প্রত্যহ প্রত্যক্ষ পরিচয় হয়। আমরা কল্পনার সাহায্যে আমাদের ক্ষীণ দৃষ্টিকে ভবিষ্যৎ-অভিমুখে কিয়দ্দূর প্রেরণ করিতে পারি, কিন্তু আমরা সেই উন্নত লোকে বাস করি না যেখানে ভবিষ্যতের অনন্ত আশ্বাস-সামগীতি বিশ্ববিধাতার নীরব মাভৈঃ শব্দের সহিত নিরন্তর বিচিত্র স্বরে সম্মিলিত হইতেছে। আমাদের মধ্যে অনেকে পরলোকের প্রতি বিশ্বাসহীন নহি, কিন্তু আমরা সেই স্বাভাবিক সমুচ্চ আসনের উপর সর্বদা প্রতিষ্ঠিত নহি যেখান হইতে ইহলোক-পরলোকের জ্যোতির্ময় সংগমক্ষেত্র প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে অন্তরিন্দ্রিয়ের দৃষ্টিগোচর হইতে থাকে। সেইজন্য আমাদের এত সংশয়, এত দ্বিধা; সেইজন্যই আমাদের সংকল্প এমন দুর্বল, আমাদের উদ্যম এমন স্বল্পপ্রাণ; সেইজন্যই বিশ্বহিতের উদ্দেশে আত্মসমর্পণ আমাদের নিকট একটি সুমধুর কাব্যকথা মাত্র, সেইজন্য ক্ষুদ্র বাধা আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলে তাহাকে অতিক্রম করিয়া মহাসফলতার অনন্ত বিস্তীর্ণ উর্বরক্ষেত্র আর আমরা দেখিতেই পাই না। মর্ত্যসুখ যখন স্বর্ণমায়ামৃগের মতো আমাদিগকে প্রলুব্ধ করিয়া ধাবমান করে তখন অমৃতলোক আমাদের নিকট হইতে একেবারে অন্তর্হিত হইয়া যায়। আমাদের নিকট সংসারের ক্ষুদ্র সুখ দুঃখ, বর্তমানের উপস্থিত বাধা বিপত্তি, মর্ত্যসুখের বিচিত্র প্রলোভনই প্রত্যক্ষ সত্য, আর সমস্ত শূন্য কথা, শিক্ষালব্ধ মুখস্থবিদ্যা এবং ছায়াময় কল্পনা। কিন্তু মহাপুরুষদের নিকট আমাদের সেই-সকল ছায়ারাজ্য প্রত্যক্ষ সত্য; বস্তুত সেইখানেই তাঁহারা বাস করিতেছেন। আমাদের সংসার, আমাদের সুখদুঃখ, আমাদের বাধাবিপত্তি তাঁহাদিগকে চরম পরিণাম-স্বরূপে আবৃত করিয়া রাখে না।

রামমোহন রায় সেই মহাপুরুষ, যিনি বঙ্গদেশে অবতীর্ণ হইয়াও বিধাতার প্রসাদে নিত্য সত্যলোকে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেইজন্য তাঁহার শারীরিক জন্মস্থানের সহিত তাঁহার মানসিক জন্মভূমির বিরোধ তাঁহার সম্মুখে প্রধূমিত হইয়া উঠিল। তাঁহার অন্তরে নিত্যসত্যের স্বাভাবিক আদর্শ, বাহিরে চতুর্দিকেই অসত্য প্রাচীন ভক্তিভাজন বেশে সঞ্চরণ করিতেছে। সেই অসত্যের সহিত তিনি কোনোক্রমেই সন্ধিস্থাপন করিতে পারেন না। সেইজন্য দেশের বৃদ্ধেরা যখন প্রাণহীন ক্রিয়াকর্ম ও প্রথার মধ্যে জড়ত্বের শান্তিসুখ অনুভব করিতেছিল তখন বালক রামমোহন মরীচিকাভীরু তৃষাতুর মৃগশাবকের ন্যায় সত্যের অন্বেষণে দুর্গম প্রবাসে দেশদেশান্তরে ব্যাকুলভাবে পর্যটন করিতেছিলেন। কত লক্ষ লক্ষ লোক, যেখানে জন্মগ্রহণ করে সেখানকার জড়সংস্কারের পুরাতন লূতাতন্তুজালের মধ্যে অনায়াসে নির্বিরোধে আত্মসমর্পণ করিয়া আশ্রয়লাভ করে, তদ্দ্বারা অন্তরাত্মাকে খর্ব জীর্ণ জড়বৎ করিয়া রাখে, তাহা আমৃত্যুকাল জানিতেও পারে না, রামমোহন রায়ের আত্মা প্রথম হইতেই সেই-সকল জড় সংস্কারে জড়িত হইতে চাহিল না। নীড়চ্যুত তরুণ ঈগল্ পক্ষী যেমন স্বভাবতই পৃথিবীর সমস্ত নিম্নভূমি পরিহার করিয়া আপন অভ্রংলিহ শৈলকুলায়ের প্রতি ধাবমান হয়,

কিশোর রামমোহন রায় সেইরূপ বঙ্গসমাজের জীর্ণনীড় স্বভাবতই পরিত্যাগ করিয়া অভ্রভেদী অচলশিখর-প্রতিষ্ঠিত সত্য কুলায়ের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। লোকাচার, সামাজিক সংস্কার বহু পুরাতন হইতে পারে, কিন্তু সত্য তদপেক্ষা পুরাতন—সেই চিরপুরাতন সত্যের সহিত এই নবীন বাঙালি বালকের কোথায় পরিচয় হইয়াছিল? সেই সত্যের অভাবে গৃহবাস, সমাজের আশ্রয়, লৌকিক সুখশান্তি এই গৃহপালিত তরুণ বাঙালির নিকটে কেমন করিয়া এত তুচ্ছ বোধ হইল? সেই ভূমা সত্যসুখের আস্বাদ সে কবে কোথায় লাভ করিয়াছিল? বঙ্গমাতা এই বালককে তাহার অন্যান্য শিশুর ন্যায় জ্ঞান করিয়া আপনার চির-প্রচলিত ক্রীড়নকগুলি তাহার সম্মুখে একে একে আনিয়া উপস্থিত করিতে লাগিল; বালক কাতর কণ্ঠে বলিতে লাগিল, ইহা নহে ইহা নহে—আমি ধর্ম চাহি, ধর্মের পুত্তলি চাহি না; আমি সত্য চাহি, সত্যের প্রতিমা চাহি না। বঙ্গমাতা কিছুতেই এই বালকটিকে ভুলাইয়া রাখিতে পারিল না—সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া সত্যের সন্ধানে সে একাকী বিশ্বজগতে বাহির হইয়া গেল। সে কোন্-এক সময় কেমন করিয়া বাঙলাদেশের সমস্ত দেশাচার-লোকাচারের উপরে মস্তক তুলিয়া দেখিতে পাইয়াছিল যে, এই আচার-অনুষ্ঠানই চরম নহে, ইহার বাহিরে অসীম সত্য অনন্তকাল অমৃতপিপাসু ভক্ত মহাত্মাদের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া আছে। পূর্বেই বলিয়াছি, মহাপুরুষদের পদতলে ধরণী অদৃশ্যভাবে উন্নত হইয়া উঠিয়া তাঁহাদিগকে প্রত্যক্ষগোচর চরাচরের বহির্বর্তী অনন্ত দৃশ্য দেখাইয়া দেয়, তখন তাঁহারা বরঞ্চ নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অস্তিত্ব অবিশ্বাস করিতে পারেন কিন্তু সেই বিশ্ববেষ্টনকারী দৃশ্যাতীত অনন্ত সত্যালোকের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হইতে পারেন না।

নারিকেলের বহিরাবরণের ন্যায় সকল ধর্মেরই বাহ্যিক অংশ তাহার অন্তরস্থিত অমৃতরসকে ন্যূনাধিক পরিমাণে গোপন ও দুর্লভ করিয়া রাখে। তৃষার্ত রামমোহন রায় সেই-সকল কঠিন আবরণ স্বহস্তে ভেদ করিয়া ধর্মের রসশস্য আহরণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি নিজে সংস্কৃত শিখিয়া বেদ-পুরাণের গহন অরণ্যের মধ্যে আপনার পথ কাটিয়া লইলেন, হিব্রু ও গ্রীক ভাষা শিখিয়া খৃস্টধর্মের মূল আকরের মধ্যে অবতরণ করিলেন, আরব্য ভাষা শিখিয়া কোরানের মূল মন্ত্রগুলি স্বকর্ণে শ্রবণ করিয়া লইলেন। ইহাই সত্যের জন্য তপস্যা। সত্যের প্রতি যাহার প্রকৃত বিশ্বাস নাই সে বিনা চেষ্টায় যাহা হাতের কাছে প্রস্তুত দেখিতে পায় তাহাকেই আশ্রয় করিয়া অবহেলে জীবনযাপন করিতে চাহে—কর্তব্যবিমুখ অলস ধাত্রীর ন্যায় মোহ-অহিফেন-সেবনে অভ্যস্ত করাইয়া অন্তরাত্মার সমস্ত চেষ্টা সমস্ত ক্রন্দন নিরস্ত করিতে প্রয়াস পায় এবং জড়ত্বসাধনার দ্বারা আত্মাকে অভিভূত করিয়া সংসারাশ্রমে পরিপুষ্ট সুচিক্কণ হইয়া উঠে।

একদিন বহু সহস্র বৎসর পূর্বে সরস্বতীকূলে কোন্-এক নিস্তব্ধ তপোবনে কোন্-এক বৈদিক মহর্ষি ধ্যানাসনে বসিয়া উদাত্ত স্বরে গান গাহিয়া উঠিয়াছিলেন।

শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ।
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ॥

হে দিব্যধামবাসী অমৃতের পুত্রসকল, তোমরা শ্রবণ করো—আমি সেই তিমিরাতীত মহান্ পুরুষকে জানিয়াছি।

রামমোহন রায়ও একদিন উষাকালে নির্বাণদীপ তিমিরাচ্ছন্ন বঙ্গসমাজের গাঢ়নিদ্রামগ্ন নিশ্চেতন লোকালয়ের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিয়াছিলেন—হে

মোহশয্যাশায়ী পুরবাসিগণ, আমি সত্যের দর্শন পাইয়াছি—তোমরা জাগ্রত হও!

লোকাচারের পুরাতন শুষ্ক পর্ণশয্যায় সুখসুপ্ত প্রাণিগণ রক্তনেত্র উন্মীলন করিয়া সেই জাগ্রত মহাপুরুষকে রোষদৃষ্টিদ্বারা তিরস্কার করিতে লাগিল। কিন্তু সত্য যাহাকে একবার আশ্রয় করে সে কি আর সত্যকে গোপন করিতে পারে? দীপবর্তিকায় অগ্নি যখন ধরিয়া উঠে তখন সেই শিখা লুক্কায়িত করা প্রদীপের সাধ্যায়ত্ত নহে—আমরা রুষ্ট হই আর সন্তুষ্ট হই, সে ঊর্ধ্বমুখী হইয়া জ্বলিতে থাকিবে, তাহার অন্য গতি নাই।

রামমোহন রায়েরও অন্য গতি ছিল না—সত্যশিখা তাঁহার অন্তরাত্মায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল—সমাজ তাঁহাকে যত লাঞ্ছনা যত নির্যাতন করুক তিনি সে আলোক কোথায় গোপন করিবেন? তখন হইতে তাঁহার আর বিশ্রাম নাই, নিভৃতগৃহবাসসুখ নাই, বঙ্গসমাজের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে শেষ পর্যন্ত জ্যোতি বিকীর্ণ করিতে হইবে। তাঁহাকে সমস্ত বিরোধ বিদ্বেষ প্রতিকূলতার রোষগর্জনের ঊর্ধ্বে কণ্ঠ তুলিয়া বলিতে হইবে—মিথ্যা মিথ্যা! হে পৌরগণ, ইহাতে মুক্তি নাই, ইহাতে তৃপ্তি নাই, ইহা ধর্ম নহে, ইহা আত্মার উপজীবিকা নহে, ইহা মোহ, ইহা মৃত্যু! মিথ্যাকে স্তূপাকার করিয়া তুলিলেও তাহা সত্য হয় না, তাহা মহৎ হয় না; সত্যের প্রতি যদি বিশ্বাস থাকে তবে সাবধানে জ্ঞানালোকে তাহাকে অন্বেষণ করিয়া লইয়া তবে তাহার পূজা করো—যে ভক্তি যেখানে-সেখানে অর্ঘ্য-উপহার স্থাপন করিয়া দ্রুত তৃপ্তি লাভ করিতে চায় সে ভক্তি আত্মার আলস্য, তাহা আধ্যাত্মিক বিলাসিতা, তাহা তপস্যা নহে, তাহা যথার্থ আত্মোৎসর্গ নহে, তাহা অবহেলা, তাহাতে আত্মা বললাভ জ্যোতিলাভ মুক্তিলাভ করে না, কেবল উত্তরোত্তর জড়ত্বজালে জড়িত হইয়া সুপ্তিমগ্ন হইতে থাকে।

গ্রহণ করা এবং বর্জন করা জীবনের একটি প্রধান লক্ষণ। জীবনীশক্তি প্রবল থাকিলে এই গ্রহণবর্জন-ক্রিয়া অব্যাহতভাবে চলিতে থাকে; যখন ইহার ব্যাঘাত ঘটে তখন স্বাস্থ্য নষ্ট হয় এবং মৃত্যু আসিয়া অধিকার করে।

আমাদের শারীর প্রকৃতিতে এই গ্রহণবর্জন-ক্রিয়া আমাদের ইচ্ছার অপেক্ষা না রাখিয়া বহুলাংশে যন্ত্রবৎ চলিতে থাকে। আমরা অচেতনভাবে অম্লজান বায়ু গ্রহণ করি, অঙ্গারক বায়ু ত্যাগ করি; আমাদের দেহ প্রতিক্ষণে নূতন শারীর কোষ নির্মাণ করিতেছে এবং মৃত কোষ পরিত্যাগ করিতেছে—কী করিয়া যে তাহা আমরা জানি না।

আমাদের অন্তরপ্রকৃতিতেও বিচিত্র ক্রিয়া আমাদের অজ্ঞাতসারে গূঢ়ভাবে ঘটিয়া থাকে, কিন্তু সেখানে আমাদের কর্তৃত্বের অধিকার অপেক্ষাকৃত ব্যাপক এবং গুরুতর দায়িত্ব-পূর্ণ। ভালোমন্দ পাপপুণ্য শ্রেয়-প্রেয় আমাদিগকে নিজের সতর্ক চেষ্টায় গ্রহণ ও বর্জন করিতে হয়। ইহাতেই আত্মার মাহাত্ম্যও। এ কার্য যদি সম্পূর্ণ জড়বৎ যন্ত্রবৎ সম্পন্ন হইতে থাকিত তবে আমাদের মনুষ্যত্বের গৌরব থাকিত না—তবে ধর্ম ও নীতি শব্দ অর্থহীন হইত।

আত্মার গ্রহণ-বর্জন-কার্য এইরূপ স্বাধীন ইচ্ছার উপর নির্ভর করাতে অনেক সময়ে ইচ্ছা আপন কর্তব্য কার্য সতর্কভাবে সম্পন্ন করে না; অনেক পুরাতন আবর্জনা সঞ্চিত হইতে থাকে, অনেক নূতন পোষণপদার্থ দূরে পরিত্যক্ত হয়। শরীর আপন মৃত কোষকে যেমন নির্মমভাবে বর্জন করে আমরা আমাদের মৃত বস্তুগুলিকে তেমন অকাতরে পরিহার করিতে পারি না, এইজন্য সকল মনুষ্যসমাজ

এবং সকল ধর্মেরই চতুর্দিকে বহুযুগসঞ্চিত পরমপ্রিয় মৃতবস্তুগুলি উত্তরোত্তর স্তূপাকার হইয়া ক্রমে তাহার গতির পথ রোধ করিয়া দাঁড়ায়— অভ্যন্তরের বায়ুকে দূষিত করিয়া তোলে, বাহিরের স্বাস্থ্যকর বায়ুকে প্রবেশ করিতে দেয় না। যাহারা শনৈঃ শনৈঃ অলক্ষিত ভাবে এই বিষবায়ুর মধ্যে পালিত হইয়া উঠে তাহারা বুঝিতে পারে না যে, তাহারা কি আলোক কি স্বাস্থ্য কি মুক্তি হইতে আপনাকে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে। তাহারা মমত্ববশত ভস্মকে ত্যাগ করিতে পারে না, অবশেষে পবিত্র অগ্নি উত্তরোত্তর আচ্ছন্ন হইয়া কখন নির্বাপিত হইয়া যায় তাহা তাহারা জানিতেও পারে না।

ক্রমে এমন হয় যে, যাহা মুখ্য বস্তু, যাহা সার পদার্থ, তাহা লোকচক্ষুর অন্তরালে পড়িয়া অনভ্যস্ত হইয়া যায়, তাহার সহিত আর পরিচয় থাকে না, তাহাকে আমাদের আর একান্ত আবশ্যক বলিয়াই বোধ হয় না; যাহা গৌণ, যাহা ত্যাজ্য, তাহাই পদে পদে আমাদের চক্ষুগোচর হইয়া অভ্যাসজনিত প্রীতি আকর্ষণ করিতে থাকে।

এমন সময়ে সমাজে মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়। তিনি বজ্রস্বরে বলেন, যে মিথ্যা সত্যকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে সেই মিথ্যাকে সত্য অপেক্ষা প্রিয় জ্ঞান করিয়া উপাসনা করিয়ো না। তখন এই অতি পুরাতন কথা লোকের নিকট সম্পূর্ণ নূতন বলিয়া বোধ হয়। কেহ-বা বলে, সত্যকে মিথ্যা স্তূপের মধ্য হইতে অন্বেষণ করিয়া বাহির করিবার কষ্ট আমরা স্বীকার করিব না, আমরা যাহা সহজে পাই তাহাকেই সত্যজ্ঞানে সমাদর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে ইচ্ছা করি। অর্থাৎ, যাহা বর্জনীয় তাহা বর্জন করিতে চাহি না, যাহা গ্রহণীয় তাহাও গ্রহণ করিতে পারি না, আমাদের আধ্যাত্মিক মৃত্যুদশা উপস্থিত হইয়াছে। তখন সেই মহাপুরুষ বিধি-প্রেরিত উদ্যত বজ্রাগ্নি সেই মৃত আবর্জনাস্তূপের প্রতি নিক্ষেপ করেন। ধূর্জটি যখন মৃত সতীদেহ কোনোমতেই পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না, নিষ্ফল মোহে তাহাকে স্কন্ধে করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, তখন বিষ্ণু আপন সুদর্শন চক্র দ্বারা সেই মৃতদেহ ছিন্নভিন্ন করিয়া শিবকে মোহভার হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন। সেইরূপ মানবসমাজকে মোহমুক্ত করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে মহাপুরুষগণ বিষ্ণুর সুদর্শন চক্র লইয়া আবির্ভূত হন— সমাজ আপনার বহুকালের প্রিয় মোহভার হইতে বঞ্চিত হইয়া একেবারে উন্মত্ত হইয়া উঠে, কিন্তু দেবতার চক্রকে আপন কর্ম হইতে কে নিবৃত্ত করিতে পারে?

সর্বত্রই এইরূপ হইয়া থাকে। আমাদের দেশও তাহার ব্যতিক্রমস্থল নহে। বরঞ্চ যে জাতি সজীব সচেষ্ট, যাহারা স্বাধীনভাবে চিন্তা করে, সবলভাবে কার্য করে, সানন্দ মনে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে থাকে, যাহাদের সমাজে প্রাণের প্রবাহ কখনও অবরুদ্ধ থাকে না, তাহারা আপন গতিবেগের দ্বারা আপন ত্যাজ্য পদার্থকে বহুলাংশে দূরে লইয়া যায়, আপন দূষণীয়তা সংশোধন করিতে থাকে।

আমরা বহুকাল হইতে পরাধীন অধঃপতিত উৎপীড়িত জাতি; বহুদিন হইতে আমাদের সেই অন্তরের বল নাই যাহার সাহায্যে আমরা বাহিরের শত্রুকে বাহিরে রাখিতে পারি; সমাজের মধ্যে সেই জীবনীশক্তির ঐক্য নাই যদ্দ্বারা আমরা বিপৎকালে এক মুহূর্তে এক হইয়া গাত্রোত্থান করিতে পারি; আমাদের মধ্যে বহুকাল হইতে কোনো মহৎ সংকল্প সাধন কোনো বৃহৎ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয় নাই —সেইজন্য আমাদের অন্তরপ্রকৃতি ক্রমশ তন্দ্রামগ্ন হইয়া আসিয়াছিল। আমাদের হৃদয় রাজপুরুষদের অপ্রতিহত স্বেচ্ছাচারিতায় দলিত নিস্তেজ, আমাদের অন্তঃকরণ

বুদ্ধিবৃত্তির স্বাভাবিক সানন্দ পরিচালনার অভাবে জড়বৎ হইয়া আসিয়াছিল। এমন স্থলে আমাদের সমাজ আমাদের ধর্ম যে আপন আদিম বিশুদ্ধ উজ্জ্বলতা অক্ষুণ্ণভাবে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে ইহা কদাচ সম্ভবপর নহে। যদি রক্ষা করিত তবে সে উজ্জ্বলতা সকল অংশে সকল দিকেই প্রকাশ পাইত, তবে আমাদের মুখচ্ছবি মলিন, মেরুদণ্ড বক্র, মস্তক অবনত হইত না— তবে আমরা লোকসমাজে সর্বদা নির্ভীকভাবে অসংকোচে সঞ্চরণ করিতে পারিতাম। যাহার ধর্ম যাহার সমাজ সজীব সতেজ বিশুদ্ধ উন্নত, ত্রিভুবনে তাহার কাহাকেও ভয় করিবার নাই। বারুদ এবং সীসকের গোলক দ্বারা তাহার স্বাধীনতা অপহৃত হইতে পারে না। আগে আমাদের সমাজ নষ্ট হইয়াছে, ধর্ম বিকৃত হইয়াছে, বুদ্ধি পরবশ হইয়াছে, মনুষ্যত্ব মৃতপ্রায় হইয়াছে, তাহার পরে আমাদের রাষ্ট্রীয় দুর্গতির সূচনা হইয়াছে। সকল অবমাননা, সকল দুর্বলতার মূল সমাজের মধ্যে ধর্মের মধ্যে।

রামমোহন রায় সেই সমাজ সেই ধর্মের মধ্যে বিশুদ্ধ সত্যের আদর্শ স্থাপন করিলেন। তাঁহার নিজের আদর্শ নহে। তিনি এ কথা বলিলেন না যে, আমার এই নূতন রচিত মত সত্য, আমার এই নূতন উচ্চারিত আদেশ ঈশ্বরাদেশ। তিনি এই কথা বলিলেন, সত্য মিথ্যা বিচার করিয়া গ্রহণ করিতে হইবে, সতর্ক যুক্তি দ্বারা সমাজের সমস্ত অকল্যাণ দূর করিতে হইবে। যেমন বলের দ্বারা ধূম নিরস্ত হয় না, অগ্নিকে সম্পূর্ণ প্রজ্বলিত করিয়া তুলিলে ধূমরাশি আপনি অন্তর্হিত হয়— রামমোহন রায় সেইরূপ ধর্মের প্রচ্ছন্ন বিশুদ্ধ অগ্নিকে প্রজ্বলিত জাগ্রত করিয়া তুলিয়া তাহার ধূমজাল দূর করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি বেদ পুরাণ তন্ত্রের সারভাগ উদ্ধার করিয়া আনিয়া তাহার বিশুদ্ধ জ্যোতি আমাদের প্রত্যক্ষগোচর করিতে লাগিলেন। যে-সমস্ত নূতন কালিমা সেই পুরাতন জ্যোতিকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল তাহাকে তিনি সেই জ্যোতির আদর্শের দ্বারাই নিন্দিত করিতে লাগিলেন। কিন্তু হায়, আমাদের পক্ষে সেই পুরাতন জ্যোতিই নূতন, এই নূতন কালিমাই পুরাতন; সেই সনাতন বিশুদ্ধ সত্য শাস্ত্রের মধ্যে আছে, আর এই-সমস্ত অধুনাতন লোকাচার আমাদের ঘরে বাহিরে, আমাদের চিন্তায় কার্যে, আমাদের সুখে দুঃখে শত সহস্র চিহ্ন রাখিয়াছে— চক্ষু উন্মীলন করিলেই তাহাকে আমরা চতুর্দিকে দেখিতে পাই, শাস্ত্র উদ্ঘাটন না করিলে সনাতন সত্যের সাক্ষাৎ পাই না। অতএব হে রামমোহন রায়, তুমি যে মুক্তা আহরণ করিয়াছ তাহা শ্রেয় হইতে পারে, কিন্তু যে শুক্তি যুক্তি-অস্ত্রে বিদীর্ণ করিয়া ফেলিয়া দিতেছ তাহাই আমাদের প্রেয়, আমাদের পরিচিত; আমরা মুক্তাকে মুখে বহুমূল্য বলিয়া সম্মান করিতে সম্মত আছি, কিন্তু শুক্তিখণ্ডকেই হৃদয়ের মধ্যে বাঁধিয়া রাখিব।

তাহা হউক, সত্যকেও সময়ের অপেক্ষা করিতে হয়, কিন্তু একবার যখন সে প্রকাশ পাইয়াছে তখন তাহার সহিতও আমাদের ক্রমশ পরিচয় হইবে। সত্যের পথ যদি বাধাগ্রস্ত না হয় তবে সত্যকে আমরা সম্পূর্ণরূপে পরীক্ষা করিয়া চিনিয়া লইতে পারি না; সন্দেহের দ্বারা পীড়িত নিষ্পীড়িত করিয়া তবে আমরা সত্যের অজেয় বল, অটল স্থায়িতা বুঝিতে পারি। যে প্রিয় পুরাতন মিথ্যা আমাদের গৃহে আমাদের হৃদয়ে এতকাল সত্যের ছদ্মবেশে বিরাজ করিয়া আসিয়াছে তাহাকে কি আমরা এক মুহূর্তের মধ্যে অকাতরে বিদায় দিতে পারি? সত্য যখন আপন কল্যাণময় কঠিন হস্তে তাহাকে আমাদের বক্ষ হইতে একেবারে কাড়িয়া ছিনিয়া লইয়া যাইবে তখন তাহার জন্য আমাদের হৃদয়ের শোণিতপাত এবং অজস্র অশ্রু বর্ষণ করিতে হইবে। যে ব্যক্তি তাহার পুরাতন প্রেয় বস্তুকে আপন শিথিল মুষ্টি

হইতে অতি সহজেই ছাড়িয়া দিতে পারে সে লোক নূতন শ্রেয়কে তেমন সবলভাবে একান্তমনে ধারণ করিতে পারে না। পুরাতনের জন্য শোক যেখানে মৃদু, নূতনের জন্য আনন্দ সেখানে ম্লান। অবসন্ন রজনীর বিদায়-শিশিরাশ্রুজলের উপরেই প্রভাতের আনন্দ-অভ্যুদয় নির্মল উজ্জ্বল সুন্দর রূপে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে।

প্রথমে সকলেই বলিব—না না, ইহাকে চাহি না, ইহাকে চিনি না, ইহাকে দূর করিয়া দাও; তাহার পর একদিন বলিব, এসো এসো হে সর্বশ্রেষ্ঠ, এসো হে হৃদয়ের মহারাজ, এসো হে আত্মার জাগরণ, তোমার অভাবেই আমরা এতদিন জীবন্মৃত হইয়া ছিলাম।—

এসো গো নূতন জীবন।
এসো গো কঠোর নিঠুর নীরব,
এসো গো ভীষণ শোভন॥
এসো অপ্রিয় বিরস তিক্ত,
এসো গো অশ্রুসলিলসিক্ত,
এসো গো ভূষণবিহীন রিক্ত,
এসো গো চিত্তপাবন॥
থাক্ বীণাবেণু, মালতীমালিকা,
পূর্ণিমানিশি, মায়াকুহেলিকা—
এসো গো প্রখর হোমানলশিখা
হৃদয়শোণিতপ্রাশন।
এসো গো পরমদুঃখনিলয়,
মোহ-অঙ্কুর করো গো বিলয়,
এসো সংগ্রাম, এসো মহাজয়,
এসো গো মরণসাধন॥

প্রথমে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলাম বলিয়াই, যখন আবাহন করিব তখন একান্ত মনে সমস্ত হৃদয়ের সঙ্গে করিব—প্রবল দ্বন্দ্বের পর পরাজয় স্বীকার করিয়া যখন আত্মসমর্পণ করিব তখন সম্পূর্ণরূপেই করিব, তখন আর ফিরিবার পথ রাখিব না।

আমাদের দেশে এখনও সত্যমিথ্যার সেই দ্বন্দ্ব চলিতেছে। এই দ্বন্দ্বের অবতারণাই রামমোহন রায়ের প্রধান গৌরব। কারণ যে সমাজে সত্যমিথ্যার মধ্যে কোনো বিরোধ নাই সে সমাজের অবস্থা অতিশয় শোচনীয়; এমন-কি জড়ভাবে অন্ধভাবে সত্যকে গ্রহণ করিলেও সে সত্যের কোনো গৌরব থাকে না। সীতার ন্যায় সত্যকেও বারংবার অগ্নিপরীক্ষা সহ্য করিতে হয়।

অনেকে মনে মনে অধৈর্য প্রকাশ করিয়া থাকেন যে, রামমোহন রায় শাস্ত্র হইতে আহরণ করিয়া যে ধর্মকে বঙ্গসমাজে প্রেরণ করিয়াছিলেন এখনও তাহাকে সকলে গৃহে আহ্বান করিয়া লয় নাই; এমন-কি এক-এক সময়ে আশঙ্কা হয়, সমাজ সহসা সবেগে তাহার বিপরীত মুখে ধাবিত হইতেছে, এবং রামমোহন রায়ের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য সফল হইতেছে না। কিন্তু সে আশঙ্কায় মুহ্যমান হইবার আবশ্যক নাই। রামমোহন রায় যে ধর্মকে সত্য বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন সে ধর্মকে তিনি সত্য বলিয়া জানিয়াছিলেন—আমরাও অগ্রে সে ধর্মকে প্রকৃতরূপে সত্য বলিয়া জানিব তবে তাহাকে গ্রহণ করিব, ইহাই তাঁহার অভিপ্রায়; সত্যকে কেবল পঠিত মন্ত্রের ন্যায় গ্রহণ করিব না।

সত্যকে যথার্থ সত্য বলিয়া জানা সহজ নহে—অনেকে যাঁহারা মনে করেন

'জানিয়াছি' তাঁহারাও জানেন না। রামমোহন রায় যে নিদারুণ পিপাসার পর যে কঠোর তপস্যার দ্বারা ধর্মে বিশ্বাস লাভ করিয়াছিলেন আমাদের সে পিপাসাও নাই, সে তপস্যাও নাই; আমরা কেবল পরম্পরাগত বাক্য শ্রবণ করিয়া যাই এবং মনে করি যে তাহা সত্য এবং তাহা বুঝিলাম। কিন্তু আমাদের অন্তরাত্মা আকাঙ্ক্ষা দ্বারা তাহাকে আকর্ষণ করিয়া তাহার সমস্ত সত্যতা একান্তভাবে লাভ করে না।

এখনও আমাদের বঙ্গসমাজে সেই আধ্যাত্মিক ক্ষুৎপিপাসার সঞ্চার হয় নাই, সত্যধর্মের জন্য আমাদের প্রাণের দায় উপস্থিত হয় নাই; যে ধর্ম স্বীকার করি সে ধর্ম বিশ্বাস না করিলেও আমাদের চলে, যে ধর্মে বিশ্বাস করি সে ধর্ম গ্রহণ না করিলেও আমাদের ক্ষতিবোধ হয় না—আমাদের ধর্মজিজ্ঞাসার সেই স্বাভাবিক গভীরতা নাই বলিয়া সে সম্বন্ধে আমাদের এমন অবিনয়, এমন চাপল্য, এমন মুখরতা। কোনো সন্ধান, কোনো সাধনা না করিয়া, অন্তরের মধ্যে কোনো অভাব অনুভব বা কোনো অভিজ্ঞতা লাভ না করিয়া এমন অনায়াসে কোনো-এক বিশেষ পক্ষ অবলম্বনপূর্বক উকিলের মতো নিরতিশয় সূক্ষ্ম তর্ক করিয়া যাইতে পারি। এমন করিয়া কেহ আত্মার খাদ্য পানীয় আহরণ করে না। ইহা জীবনের সর্বোত্তম ব্যাপার লইয়া বাল্যক্রীড়া মাত্র।

দীর্ঘ সুপ্তির পর রামমোহন রায় আমাদিগকে নিদ্রোত্থিত করিয়া দিয়াছেন। এখন কিছুদিন আমাদের চিত্তবৃত্তির পরিপূর্ণ আন্দোলন হইলে পর তবে আমাদের আত্মার স্বাভাবিক সত্যক্ষুধা সঞ্চার হইবে—তখনই সে যথার্থ সত্যকে সত্যরূপে লাভ করিতে সক্ষম হইবে।

রামমোহন রায় এখন আমাদিগকে সেই সত্যলাভের পথে রাখিয়া দিয়াছেন। প্রস্তুত সত্য মুখে তুলিয়া দেওয়া অপেক্ষা এই সত্যলাভের পথে স্থাপন করা বহুগুণে শ্রেয়। এখন আমরা বহুকাল অলীক জল্পনা, নাস্তিক্যের অভিমান, বৃথা তর্কবিতর্ক এবং বহুবিধ কাল্পনিক যুক্তির মধ্যে অবিশ্রাম নৃত্য করিয়া ফিরিব, ধর্মের নানারূপ ক্রীড়ায় প্রভাত অতিবাহন করিব; অবশেষে সূর্য যখন মধ্যগগনে অধিরোহণ করিবে, যখন অন্তঃকরণ অমৃতসরোবরে সুধাস্নানের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিবে, ক্ষুধিত পিপাসিত অন্তরাত্মা তখন দেখিতে পাইবে, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তর্ক বিস্তার করিয়া শ্রান্তি বই পরিতৃপ্তি নাই—তখন যথার্থ অনুসন্ধান পড়িয়া যাইবে এবং যতক্ষণ আত্মার যথার্থ খাদ্যপানীয় না পাইব ততক্ষণ আপনাকে বৃথা বাক্যের ছলনায় ভুলাইয়া রাখিতে পারিব না। তখন রামমোহন রায় আত্মার স্বাধীন চেষ্টার যে রাজপথ বাঙালিকে নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন সেই পথযাত্রা সার্থক হইবে এবং তখন রামমোহন রায়ের সেই শকট আপন গম্যস্থানে আত্মার বিদ্যামন্দিরে আমাদিগকে উত্তীর্ণ করিয়া দিবে।

রামমোহন রায় তাঁহার যজুর্বেদীয় কঠোপনিষদের বঙ্গানুবাদের ভূমিকায় যে প্রার্থনা করিয়াছেন আমরাও সেই প্রার্থনা করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করি—

'হে অন্তর্যামিন্ পরমেশ্বর আমাদিগ্যে আত্মার অন্বেষণ হইতে বহির্মুখ না রাখিয়া যাহাতে তোমাকে এক অদ্বিতীয় অতীন্দ্রিয় সর্বব্যাপী এবং সর্বনিয়ন্তা করিয়া দৃঢ়রূপে আমরণান্ত জানি এমৎ অনুগ্রহ কর ইতি। ওঁ তৎসৎ॥'

আশ্বিন?, ১৩০৩

১০

মহাপুরুষেরা সমস্ত মানবজাতির গৌরবের ও আদর্শের স্থল বটেন, কিন্তু তাঁহারা জাতিবিশেষের বিশেষ গৌরবের স্থল তাহার আর সন্দেহ নাই। গৌরবের স্থল বলিলে যে কেবলমাত্র সামান্য অহংকারের স্থল বুঝায় তাহা নহে, গৌরবের স্থল বলিলে শিক্ষার স্থল, বললাভের স্থল বুঝায়। মহাপুরুষদিগের মহৎকার্যসকল দেখিয়া কেবলমাত্র সম্ভ্রমমিশ্রিত বিস্ময়ের উদ্রেক হইলেই যথেষ্ট ফললাভ হয় না— তাঁহাদিগকে যতই 'আমার' মনে করিয়া তাঁহাদের প্রতি যতই প্রেমের উদ্রেক হয় ততই তাঁহাদের কথা, তাঁহাদের কার্য, তাঁহাদের চরিত্র আমাদের নিকট জীবন্ত হইয়া উঠে। যাঁহাদিগকে লইয়া আমরা গৌরব করি তাঁহাদিগকে শুদ্ধমাত্র যে আমরা ভক্তি করি তাহা নহে, তাঁহাদিগকে 'আমার' বলিয়া মনে করি। এইজন্য তাঁহাদের মহত্ত্বের আলোক বিশেষরূপে আমাদেরই উপরে আসিয়া পড়ে, বিশেষরূপে আমাদেরই মুখ উজ্জ্বল করে। শিশু যেমন সহস্র বলবান ব্যক্তিকে ফেলিয়া বিপদের সময় পিতার কোলে আশ্রয় লইতে যায়, তেমনি আমরা দেশের দুর্গতির দিনে আর-সকলকে ফেলিয়া আমাদের স্বদেশীয় মহাপুরুষদিগের অটল আশ্রয় অবলম্বন করিবার জন্য ব্যাকুল হই। তখন আমাদের নিরাশ হৃদয়ে তাঁহারা যেমন বলবিধান করিতে পারেন এমন আর কেহই নহে। ইংলণ্ডের দুর্গতি কল্পনা করিয়া কবি ওআর্ড্‌স্‌ওআর্থ্‌ পৃথিবীর আর-সমস্ত মহাপুরুষকে ফেলিয়া কাতর স্বরে মিল্টনকেই ডাকিলেন, কহিলেন, 'মিল্টন, আহা, তুমি যদি আজ বাঁচিয়া থাকিতে! তোমাকে ইংলণ্ডের বড়োই আবশ্যক হইয়াছে।' যে জাতির মধ্যে স্বদেশীয় মহাপুরুষ জন্মান নাই সে জাতি কাহার মুখ চাহিবে— তাহার কী দুর্দশা! কিন্তু, যে জাতির মধ্যে মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তথাপি যে জাতি কল্পনার জড়তা, হৃদয়ের পক্ষাঘাত-বশত তাঁহার মহত্ত্ব কোনোমতে অনুভব করিতে পারে না, তাহার কী দুর্ভাগ্য!

আমাদের কী দুর্ভাগ্য! আমরা বঙ্গসমাজের বড়ো বড়ো যশোবুদ্‌বুদদিগকে বালুকার সিংহাসনের উপর বসাইয়া দুই দিনের মতো পুষ্পচন্দন দিয়া মহত্ত্ব-পূজার স্পৃহা খেলাচ্ছলে চরিতার্থ করিতেছি, বিদেশীয়দের অনুকরণে কথায় কথায় সভা ডাকিয়া চাঁদা তুলিয়া মহত্ত্বপূজার একটা ভান ও আড়ম্বর করিতেছি।

রামমোহন রায়ের চরিত্র আলোচনা করিবার একটি গুরুতর আবশ্যকতা আছে। আমাদের এখনকার কালে তাঁহার মতো আদর্শের নিতান্ত প্রয়োজন হইয়াছে। আমরা কাতর স্বরে তাঁহাকে বলিতে পারি, 'রামমোহন রায়, আহা, তুমি যদি আজ বাঁচিয়া থাকিতে! তোমাকে বঙ্গদেশের বড়োই আবশ্যক হইয়াছে। আমরা বাক্‌পটু লোক, আমাদিগকে তুমি কাজ করিতে শিখাও। আমরা আত্মম্ভরি, আমাদিগকে আত্মবিসর্জন দিতে শিখাও। আমরা লঘুপ্রকৃতি, বিপ্লবের স্রোতে চরিত্রগৌরবের প্রভাবে আমাদিগকে অটল থাকিতে শিখাও। আমরা বাহিরের প্রখর আলোকে অন্ধ, হৃদয়ের অভ্যন্তরস্থ চিরোজ্জ্বল আলোকের সাহায্যে ভালোমন্দ নির্বাচন করিতে ও স্বদেশের পক্ষে যাহা স্থায়ী ও যথার্থ মঙ্গল তাহাই অবলম্বন করিতে শিক্ষা দাও।'

রামমোহন রায় যথার্থ কাজ করিয়াছেন। তাঁহার সময়ে প্রগল্‌ভা রসনার এত শ্রীবৃদ্ধি হয় নাই, সুতরাং তাহার এত সমাদরও ছিল না। কিন্তু আর-একটা কথা দেখিতে হইবে। এক-একটা সময়ে কাজের ভিড় পড়িয়া যায়, কাজের হাট বসিয়া যায়, তখন কাজ করিতে অথবা কাজের ভান করিতে একটা আমোদ আছে। তখন

সেই কার্যাড়ম্বর নাট্যরস জন্মাইয়া মানুষকে মত্ত করিয়া তুলে, বিশেষত একটা তুমুল কোলাহলে সকলে বাহ্যজ্ঞান বিস্মৃত হইয়া একপ্রকার বিহ্বল হইয়া পড়েন। কিন্তু রামমোহন রায়ের সময়ে বঙ্গসমাজের সে অবস্থা ছিল না। তখন কাজে মত্ততাসুখ ছিল না; একাকী ধীরভাবে সমস্ত কাজ করিতে হইত। সঙ্গীহীন সুগম্ভীর সমুদ্রের গর্ভে যেমন নীরবে অতি ধীরে ধীরে দ্বীপ নির্মিত হইয়া উঠে, সংকল্প তেমনি অবিশ্রাম নীরবে গভীর হৃদয় পরিপূর্ণ করিয়া কার্য-আকারে পরিস্ফুট হইয়া উঠিত। মহত্ত্বের প্রভাবে, হৃদয়ের অনুরাগের প্রভাবে কাজ না করিলে, কাজ করিবার আর কোনো প্রবর্তনাই তখন বর্তমান ছিল না। অথচ কাজের ব্যাঘাত এখনকার চেয়ে ঢের বেশি ছিল। রামমোহন রায়ের যশের প্রলোভন কিছুমাত্র ছিল না। তিনি যতগুলি কাজ করিয়াছিলেন কোনো কাজেই তাঁহার সমসাময়িক স্বদেশীয়দিগের নিকট হইতে যশের প্রত্যাশা করেন নাই। নিন্দাগ্লানি শ্রাবণের বারিধারার ন্যায় তাঁহার মাথার উপরে অবিশ্রাম বর্ষিত হইয়াছে—তবুও তাঁহাকে তাঁহার কার্য হইতে বিরত করিতে পারে নাই। নিজের মহত্ত্বে তাঁহার কী অটল আশ্রয় ছিল, নিজের মহত্ত্বের মধ্যেই তাঁহার হৃদয়ের কী সম্পূর্ণ পরিতৃপ্তি ছিল, স্বদেশের প্রতি তাঁহার কী স্বার্থশূন্য সুগভীর প্রেম ছিল। তাঁহার স্বদেশীয় লোকেরা তাঁহার সহিত যোগ দেয় নাই, তিনিও তাঁহার সময়ের স্বদেশীয় লোকদের হইতে বহুদূরে ছিলেন, তথাপি তাঁহার বিপুল হৃদয়ের প্রভাবে স্বদেশের যথার্থ মর্মস্থলের সহিত আপনার সুদৃঢ় যোগ রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন। বিদেশীয় শিক্ষায় সে বন্ধন ছিন্ন করিতে পারে নাই এবং তদপেক্ষা গুরুতর যে স্বদেশীয়ের উৎপীড়ন তাহাতেও সে বন্ধন বিচ্ছিন্ন হয় নাই। এই অভিমানশূন্য বন্ধনের প্রভাবে তিনি স্বদেশের জন্য সম্পূর্ণ আত্মবিসর্জন করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি কী না করিয়াছিলেন! শিক্ষা বল, রাজনীতি বল, বঙ্গভাষা বল, বঙ্গসাহিত্য বল, সমাজ বল, ধর্ম বল, বঙ্গসমাজের যে-কোনো বিভাগে উত্তরোত্তর যতই উন্নতি হইতেছে, সে কেবল তাঁহারই হস্তাক্ষর কালের নূতন নূতন পৃষ্ঠায় উত্তরোত্তর পরিস্ফুটতর হইয়া উঠিতেছে মাত্র। বঙ্গসমাজের সর্বত্রই তাঁহার স্মরণস্তম্ভ মাথা তুলিয়া উঠিতেছে; তিনি এই মরুস্থলে যে-সকল বীজ রোপণ করিয়াছিলেন তাহারা বৃক্ষ হইয়া শাখাপ্রশাখায় প্রতিদিন বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে। তাহারই বিপুল ছায়ায় বসিয়া আমরা কি তাঁহাকে স্মরণ করিব না!

তিনি যাহা করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার মহত্ত্ব প্রকাশ পায়; আবার তিনি যাহা না করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার মহত্ত্ব আরও প্রকাশ পায়। তিনি যে এত কাজ করিয়াছেন কিছুরই মধ্যে তাঁহার আত্মপ্রতিষ্ঠা করেন নাই। তিনি যে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিয়াছেন তাহাতে নিজের অথবা আর-কাহারও প্রতিমূর্তি স্থাপন করিতে নিষেধ করিয়াছেন। তিনি গড়িয়া পিটিয়া একটা নূতন ধর্ম বানাইতে পারিতেন, তাহা না করিয়া পুরাতন ধর্ম প্রচার করিলেন। তিনি নিজেকে গুরু বলিয়া চালাইতে পারিতেন, তাহা না করিয়া প্রাচীন ঋষিদিগকে গুরু বলিয়া মানিলেন। তিনি তাঁহার কাজ স্থায়ী করিবার জন্য প্রাণপণ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার নাম স্থায়ী করিবার জন্য কিছুমাত্র চেষ্টা করেন নাই, বরং তাহার প্রতিকূলতা করিয়াছেন। এরূপ আত্মবিলোপ এখন তো দেখা যায় না। বড়ো বড়ো সংবাদপত্রপুট পরিপূর্ণ করিয়া অবিশ্রাম নিজের নামসুধাপানে একপ্রকার মত্ততা জন্মাইয়া আমাদের কাজের উৎসাহ জাগাইয়া রাখিতে হয়—দেশের জন্য যে সামান্য কাজটুকু করি তাহাও বিদেশী আকারে সমাধা করি, চেষ্টা করি যাহাতে সে কাজটা বিদেশীয়দের নয়ন-

আকর্ষণ পণ্যদ্রব্য হইয়া উঠে। স্তুতিকোলাহল ও দলস্থ লোকের অবিশ্রাম এক-মন্ত্রোচ্চারণশব্দে বিরত থাকিয়া স্থিরভাবে কোনো বিষয়ের যথার্থ ভালোমন্দ বুঝিবার শক্তিও থাকে না, ততটা ইচ্ছাও থাকে না, একটা গোলযোগের আবর্তের মধ্যে মহানন্দে ঘুরিতে থাকি ও মনে করিতে থাকি বিদ্যুৎ-বেগে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছি।

আমরা যে আত্মবিলোপ করিতে পারি না তাহার কারণ, আমরা আপনাকে ধারণ করিতে পারি না। সামান্য মাত্র ভাবের প্রবাহ উপস্থিত হইলেই আমরাই সর্বোপরি ভাসিয়া উঠি। আত্মগোপন করিতে পারি না বলিয়াই সর্বদা ভাবিতে হয়, আমাকে কেমন দেখিতে হইতেছে। যাঁহারা মাঝারি রকমের বড়ো লোক তাঁহারা নিজের শুভসংকল্প সিদ্ধ করিতে চান বটে, কিন্তু তৎসঙ্গে আপনাকেও প্রচলিত করিতে চান। এ বড়ো বিষম অবস্থা। আপনিই যখন আপনার সংকল্পের প্রতিযোগী হইয়া উঠে তখন সংকল্পের অপেক্ষা আপনার প্রতি আদর স্বভাবতই কিঞ্চিৎ অধিক হইয়া পড়ে। তখন সংকল্প অনেক সময়ে হীনবল লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। কথায় কথায় তাহার পরিবর্তন হয়। কিছু কিছু ভালো কাজ সম্পন্ন হয়, কিন্তু সর্বাঙ্গসুন্দর কাজটি হইয়া উঠে না। যে আপনার পায়ে আপনি বাধাস্বরূপ বিরাজ করিতে থাকে সংসারের সহস্র বাধা সে অতিক্রম করিবে কী করিয়া? যে ব্যক্তি আপনাকে ছাড়িয়া সংসারের মধ্যস্থলে নিজের শুভকার্য স্থাপন করে সে স্থায়ী ভিত্তির উপরে নিজের মঙ্গলসংকল্প প্রতিষ্ঠিত করে। আর যে নিজের উপরেই সমস্ত কার্যের প্রতিষ্ঠা করে সে যখন চলিয়া যায় তাহার অসম্পূর্ণ কার্যও তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া যায়; যদি বা বিশৃঙ্খল ভগ্নাবশেষ ধূলির উপরে পড়িয়া থাকে তবে তাহার ভিত্তি কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। রামমোহন রায় আপনাকে ভুলিয়া নিজের মহতী ইচ্ছাকে বঙ্গসমাজের মধ্যে রোপণ করিয়াছিলেন, এইজন্য তিনি না থাকিলেও আজ তাঁহার সেই ইচ্ছা সজীবভাবে প্রতিদিন বঙ্গসমাজের চারি দিকে অবিশ্রাম কাজ করিতেছে। সমস্ত বঙ্গবাসী তাঁহার স্মৃতি হৃদয়পট হইতে মুছিয়া ফেলিতে পারে, কিন্তু তাঁহার সেই অমর ইচ্ছার বংশ বঙ্গসমাজ হইতে বিলুপ্ত করিতে পারে না।

রামমোহন রায়ের আত্মধারণাশক্তি কিরূপ অসাধারণ ছিল তাহা কল্পনা করিয়া দেখুন। অতি বাল্যকালে যখন তিনি হৃদয়ের পিপাসায় ভারতবর্ষের চতুর্দিকে আকুল হইয়া ভ্রমণ করিতেছিলেন তখন তাঁহার অন্তরে বাহিরে কী সুগভীর অন্ধকার বিরাজ করিতেছিল! যখন এই মহানিশীথিনীকে মুহূর্তে দগ্ধ করিয়া ফেলিয়া তাঁহার হৃদয়ে প্রখর আলোক দীপ্ত হইয়া উঠিল তখন তাহাতে তাঁহাকে বিপর্যস্ত করিতে পারে নাই। সে তেজ, সে আলোক তিনি হৃদয়ে ধারণ করিতে পারিলেন। যুগযুগান্তরের সঞ্চিত অন্ধকারময় অঙ্গারের খনিতে যদি বিদ্যুৎশিখা প্রবেশ করে তবে সে কী কান্ডই উপস্থিত হয়, ভূগর্ভ শতধা বিদীর্ণ হইয়া যায়। তেমনি সহসা জ্ঞানের নূতন উচ্ছ্বাস কয়জন সহজে ধারণ করিতে পারেন? কিন্তু রামমোহন রায় অত্যন্ত মহৎ ছিলেন, এইজন্য এই জ্ঞানের বন্যায় তাঁহার হৃদয় অটল ছিল; এই জ্ঞানের বিপ্লবের মধ্যে মাথা তুলিয়া যাহা আমাদের দেশে ধ্রুব মঙ্গলের কারণ হইবে তাহা নির্বাচন করিতে পারিয়াছিলেন। এ সময়ে ধৈর্যরক্ষা করা যায় কি? আজিকার কালে আমরা তো ধৈর্য কাহাকে বলে জানিই না। কিন্তু রামমোহন রায়ের কী অসামান্য ধৈর্যই ছিল! তিনি আর-সমস্ত ফেলিয়া পর্বত-প্রমাণ স্তূপাকার ভস্মের মধ্যে আচ্ছন্ন যে অগ্নি ফুৎকার দিয়া তাহাকেই প্রজ্বলিত

করিতে চাহিয়াছিলেন; তাড়াতাড়ি চমক লাগাইবার জন্য বিদেশী দেশালাইকাঠি জ্বালাইয়া জাদুগিরি করিতে চাহেন নাই। তিনি জানিতেন, ভস্মের মধ্যে যে অগ্নিকণিকা অবশিষ্ট আছে তাহা ভারতবাসীর হৃদয়ের গূঢ় অভ্যন্তরে নিহিত, সে অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলে আর নিভিবে না।

রামমোহন রায় যখন ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেন তখন এখানে চতুর্দিকে কালরাত্রির অন্ধকার বিরাজ করিতেছিল। মিথ্যা ও মৃত্যুর বিরুদ্ধে তাঁহাকে সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। মিথ্যা ও মৃত্যু -নামক মায়াবী রাজাদের প্রকৃত বল নাই, অমোঘ অস্ত্র নাই, কোথাও তাহাদের দাঁড়াইবার স্থল নাই, কেবল নিশীথের অন্ধকার ও একপ্রকার অনির্দেশ্য বিভীষিকার উপরে তাহাদের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত। আমাদের অজ্ঞান—আমাদের হৃদয়ের দুর্বলতাই তাহাদের বল। অতি বড়ো ভীরুও প্রভাতের আলোকে প্রেতের নাম শুনিলে হাসিতে পারে, কিন্তু অন্ধকার নিশীথিনীতে একটি শুষ্ক পত্রের শব্দ, একটি তৃণের ছায়াও অবসর পাইয়া আমাদের হৃদয়ে নিষ্ঠুর আধিপত্য করিতে থাকে। যথার্থ দস্যুভয় অপেক্ষা সেই মিথ্যা অনির্দেশ্য ভয়ের শাসন প্রবলতর। অজ্ঞানের মধ্যে মানুষ যেমন নিরুপায়, যেমন অসহায়, এমন আর কোথায়? রামমোহন রায় যখন জাগ্রত হইয়া বঙ্গসমাজের চারি দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন তখন বঙ্গসমাজ সেই প্রেতভূমি ছিল। তখন শ্মশানস্থলে প্রাচীনকালের হিন্দুধর্মের প্রেতমাত্র রাজত্ব করিতেছিল। তাহার জীবন নাই, অস্তিত্ব নাই, কেবল অনুশাসন ও ভয় আছে মাত্র। সেই নিশীথে শ্মশানে, সেই ভয়ের বিপক্ষে 'মা ভৈঃ' শব্দ উচ্চারণ করিয়া যিনি একাকী অগ্রসর হইয়াছিলেন তাঁহার মাহাত্ম্য আমরা আজিকার এই দিনের আলোকে হয়তো ঠিক অনুভব করিতে পারিব না। যে ব্যক্তি সর্পবধ করিতে অগ্রসর হয় তাহার কেবলমাত্র জীবনের আশঙ্কা থাকে, কিন্তু যে ব্যক্তি বাস্তুসর্প মারিতে যায় তাহার জীবনের আশঙ্কার অপেক্ষা অনির্দেশ্য অমঙ্গলের আশঙ্কা বলবত্তর হইয়া উঠে। তেমনি রামমোহন রায়ের সময়ে হিন্দুসমাজের ভগ্নভিত্তির সহস্র ছিদ্রে সহস্র বাস্তু-অমঙ্গল উত্তরোত্তর পরিবর্ধমান বংশপরম্পরা লইয়া প্রাচীনতা ও জড়তার প্রভাবে অতিশয় স্থূলকায় হইয়া উঠিতেছিল। রামমোহন রায় সমাজকে এই সহস্র নাগপাশবন্ধন হইতে মুক্ত করিতে নির্ভয়ে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু এই নিদারুণ বন্ধন অনুরাগবন্ধনের ন্যায় সমাজকে জড়াইয়াছিল, এইজন্য সমস্ত বঙ্গসমাজ আর্তনাদ করিয়া রামমোহন রায়ের বিরুদ্ধে উত্থান করিল। আজি আমাদের বালকেরাও সেই-সকল মৃতসর্পের উপরে হাস্যমুখে পদাঘাত করে, আমরা তাহাদিগকে নির্বিষ ঢোঁড়া সাপ বলিয়া উপহাস করি—ইহাদের প্রবল প্রতাপ, ইহাদের চক্ষের মোহ-আকর্ষণ, ইহাদের সুদীর্ঘ লাঙ্গুলের ভীষণ আলিঙ্গনের আশঙ্কা আমরা বিস্মৃত হইয়াছি।

একবার ভাঙচুর করিতে আরম্ভ করিলে একটা নেশা চড়িয়া যায়। সৃজনের যেমন আনন্দ আছে প্রলয়ের তেমনি একপ্রকার ভীষণ আনন্দ আছে। যাঁহারা রাজনারায়ণবাবুর 'এ কাল ও সে কাল' পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা জানেন, নূতন ইংরাজি শিক্ষা লাভ করিয়া বাঙালি ছাত্রেরা যখন হিন্দুকালেজ হইতে বাহির হইলেন তখন তাঁহাদের কিরূপ মত্ততা জন্মিয়াছিল। তাঁহারা দলবদ্ধ হইয়া গুরুতর আঘাতে হিন্দুসমাজের হৃদয় হইতে রক্তপাত করিয়া তাহাই লইয়া প্রকাশ্য পথে আবীর খেলাইতেন। কঠোর অট্টহাস্য ও নিষ্ঠুর উৎসবের কোলাহল তুলিয়া তখনকার শ্মশানদৃশ্য তাঁহারা আরও ভীষণতর করিয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহাদের

নিকট হিন্দুসমাজের কিছুই ভালো কিছুই পবিত্র ছিল না; হিন্দুসমাজের যে-সকল কঙ্কাল ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ছিল তাহাদের ভালোরূপ সংকার করিয়া শেষ ভস্মমুষ্টি গঙ্গার জলে নিক্ষেপ করিয়া বিষণ্ণমনে যে গৃহে ফিরিয়া আসিবেন, প্রাচীন হিন্দুসমাজের স্মৃতির প্রতি তাঁহাদের ততটুকুও শ্রদ্ধা ছিল না। তাঁহারা কালভৈরবের অনুচর ভূতপ্রেতের ন্যায় শ্মশানের নরকপালে মদিরা পান করিয়া বিকট উল্লাসে উন্মত্ত হইতেন। সে সময়কার অবস্থা বিবেচনা করিলে তাঁহাদের ততটা দোষ দেওয়া যায় না। প্রথম বিপ্লবের সময় এইরূপই ঘটিয়া থাকে। একবার ভাঙিবার দিকে মন দিলে প্রলয়ের আনন্দ উত্তরোত্তর বাড়িয়া উঠে। সে সময়ে খানিকটা খারাপ লাগিলেই সমস্তটা খারাপ লাগে, বাহিরটা খারাপ লাগিলেই ভিতরটা খারাপ লাগে। কিন্তু বর্তমান বঙ্গসমাজে বিপ্লবের আগ্নেয় উচ্ছ্বাস সর্বপ্রথমে যিনি উৎসারিত করিয়া দিলেন, সেই রামমোহন রায়, তাঁহার তো এরূপ মত্ততা জন্মে নাই। তিনি তো স্থিরচিত্তে ভালোমন্দ সমস্ত পর্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন। তিনি আলোক জ্বালাইয়া দিলেন, কিন্তু চিতালোক তো জ্বালান নাই। ইহাই রামমোহন রায়ের প্রধান মহত্ত্ব। কেবলমাত্র বাহ্য অনুষ্ঠান ও জীবনহীন তন্ত্রমন্ত্রের মধ্যে জীবন্তে সমাহিত হিন্দুধর্মের পুনরুদ্ধার করিলেন। যে মৃতভারে আচ্ছন্ন হইয়া হিন্দুধর্ম দিন দিন অবসন্ন মুমূর্ষু হইয়া পড়িতেছিল, যে জড়পাষাণস্তূপে পিষ্ট হইয়া হিন্দুধর্মের হৃদয় হতচেতন হইয়া পড়িতেছিল, সেই মৃতভারে, সেই জড়স্তূপে রামমোহন রায় প্রচণ্ড বলে আঘাত করিলেন— তাহার ভিত্তি কম্পিত হইয়া উঠিল, তাহার আপাদমস্তক বিদীর্ণ হইয়া গেল। হিন্দুধর্মের বিপুলায়তন প্রাচীন মন্দির জীর্ণ হইয়া প্রতিদিন ভাঙিয়া পড়িতেছিল, অবশেষে হিন্দুধর্মের দেবপ্রতিমা আর দেখা যাইতেছিল না, কেবল মন্দিরেরই কাষ্ঠলোষ্ট্রধূলিস্তূপ অত্যন্ত উচ্চ হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার গর্ভের মধ্যে অন্ধকার ঘনীভূত হইতেছিল, ছোটোবড়ো নানাবিধ সরীসৃপগণ গুহা নির্মাণ করিতেছিল, তাহার ইতস্তত প্রতিদিন কণ্টকাকীর্ণ গুল্মসকল উদ্ভিন্ন হইয়া সহস্র শিকড়ের দ্বারা নূতন নূতন বন্ধনে সেই পুরাতন ভগ্নাবশেষকে একত্রে বাঁধিয়া রাখিতে চেষ্টা করিতেছিল। হিন্দুসমাজ দেবপ্রতিমাকে ভুলিয়া এই জড়স্তূপকে পূজা করিতেছিল ও পর্বতপ্রমাণ জড়ত্বের তলে পড়িয়া প্রতিদিন চেতনা হারাইতেছিল। রামমোহন রায় সেই ভগ্নমন্দির ভাঙিলেন। সকলে বলিল, তিনি হিন্দুধর্মের উপরে আঘাত করিলেন। কিন্তু তিনিই হিন্দুধর্মের জীবন রক্ষা করিলেন। সমস্ত ভারতবর্ষ এইজন্য তাঁহার নিকটে কৃতজ্ঞ। কী সংকটের সময়েই তিনি জন্মিয়াছিলেন! তাঁহার এক দিকে হিন্দুসমাজের তটভূমি জীর্ণ হইয়া পড়িতেছিল, আর-এক দিকে বিদেশীয় সভ্যতা-সাগরের প্রচণ্ড বন্যা বিদ্যুৎ-বেগে অগ্রসর হইতেছিল— রামমোহন রায় তাঁহার অটল মহত্ত্বে মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি যে বাঁধ নির্মাণ করিয়া দিলেন খৃস্টীয় বিপ্লব সেখানে আসিয়া প্রতিহত হইয়া গেল। সে সময়ে তাঁহার মতো মহৎ লোক না জন্মাইলে এতদিন বঙ্গদেশে হিন্দুসমাজে এক অতি শোচনীয় মহাপ্লাবন উপস্থিত হইত।

এইখানে রামমোহন রায়ের উদারতা সম্বন্ধে হয়তো দু-একটা কথা উঠিতে পারে। ভস্মস্তূপের মধ্যে ঋষিদের হৃদয়জাত যে অমর অগ্নি প্রচ্ছন্ন ছিল, ভস্ম উড়াইয়া দিয়া তিনি তাহাই বাহির করিয়াছেন। কিন্তু এত করিবার কী প্রয়োজন ছিল? তাহার উত্তর এই— বিজ্ঞান-দর্শনের ন্যায় ধর্ম যদি কেবলমাত্র জ্ঞানের বিষয় হইত— হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করিবার, লাভ করিবার, সঞ্চয় করিবার বিষয়

না হইত—ধর্ম যদি গৃহের অলংকারের ন্যায় কেবল গৃহভিত্তিতে দুলাইয়া রাখিবার সামগ্রী হইত, আমাদের সংসারের প্রত্যেক ক্ষুদ্র কাজের প্রবর্তক নিবর্তক না হইত—তাহা হইলে এরূপ না করিলেও চলিত; তাহা হইলে নানাবিধ বিদেশী অলংকারে গৃহ সাজাইয়া রাখা যাইত; কিন্তু ধর্ম নাকি হৃদয়ে পাইবার ও সংসারের কাজে ব্যবহার করিবার দ্রব্য, দূরে রাখিবার নহে, এইজন্যেই স্বদেশের ধর্ম স্বদেশের জন্য বিশেষ উপযোগী। ব্রহ্ম সমস্ত জগতের ঈশ্বর, কিন্তু তিনি বিশেষরূপে ভারতবর্ষেরই ব্রহ্ম। অন্য কোনো দেশের লোকে তাঁহাকে ব্রহ্ম বলিয়া জানে না, ব্রহ্ম বলিতে আমরা ঈশ্বরকে যেরূপ ভাবে বুঝি ঈশ্বরের অন্য কোনো বিদেশীয় নামে বিদেশীয়েরা কখনোই তাঁহাকে ঠিক সেরূপ ভাবে বুঝে না। বুঝে বা না বুঝে জানি না, কিন্তু ব্রহ্ম বলিতে আমাদের মনে যে ভাবের উদয় হইবে ঈশ্বরের অন্য কোনো বিদেশীয় নামে আমাদের মনে সে ভাব কখনোই উদয় হইবে না। ব্রহ্ম একটি কথার কথা নহে—যে ইচ্ছা পাইতে পারে না, যাহাকে ইচ্ছা দেওয়া যায় না। ব্রহ্ম আমাদের পিতামহদের অনেক সাধনার ধন; সমস্ত সংসার বিসর্জন দিয়া, সমস্ত জীবনক্ষেপণ করিয়া, নিভৃত অরণ্যে ধ্যানধারণা করিয়া আমাদের ঋষিরা আমাদের ব্রহ্মকে পাইয়াছিলেন। আমরা তাঁহাদের সেই আধ্যাত্মিক সম্পদের উত্তরাধিকারী। আর-কোনো জাতি ঠিক এমন সাধনা করে নাই, ঠিক এমন অবস্থায় পড়ে নাই, এইজন্য ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয় নাই। প্রত্যেক জাতি বিশেষ সাধনা-অনুসারে বিশেষ ফল প্রাপ্ত হয়, সেই ফল তাহারা অন্য জাতিকে দান করে। এইরূপে সমস্ত পৃথিবীর উপকার হয়। আমাদের এত সাধনার ফল কি আমরা ইচ্ছাপূর্বক অবহেলা করিয়া ফেলিয়া দিব?

উদ্ভিজ্জ ও পশুমাংসের মধ্যে যে জীবনীশক্তি আছে তাহা যে আমরা স্বায়ত্ত করিতে পারি তাহার কারণ, আমাদের নিজের জীবন আছে। আমাদের নিজের প্রাণ না থাকিলে আমরা নূতন প্রাণ উপার্জন করিতে পারি না। আমাদের প্রাণ না থাকিলে উদ্ভিজ্জ পশু পক্ষী কীট প্রভৃতি অন্য প্রাণীরা আমাদিগকে গ্রহণ করিত। এ জগতে মৃত টিকিতে পারে না, জীবিতের মধ্যে বিলীন হইয়া যায়। রামমোহন রায় যদি দেখিতেন আমাদের জীবন নাই, তবে পারসিক মৃতদেহের ন্যায় আমাদিগকে মৃতভবনে ফেলিয়া রাখিতে দিতেন, খৃস্টধর্ম প্রভৃতি অন্যান্য জীবিত প্রাণীর উদরস্থ হইতে দিতেন। কিন্তু তাহা না করিয়া তিনি চিকিৎসা শুরু করিয়া দিলেন। তিনি দেখিলেন, জীবন আমাদের মধ্যে আচ্ছন্ন হইয়া আছে। তাহাকেই তিনি জাগ্রত করিয়া তুলিলেন। আমাদের চেষ্টা হউক, আমাদের এই জীবনকে সতেজ করিয়া তুলি—তবে আমরা ক্রমে বিদেশীয় সত্য আপনার করিতে পারিব। এইজন্যই বলি, প্রাচীন ঋষিদের উপনিষদের ব্রহ্মনাম উচ্চারণ করিয়া আমাদের দেশে ঈশ্বরের সিংহাসন প্রতিষ্ঠা করিয়া লই, সার্বভৌমিকতা আপনিই তাহার মধ্যে বিরাজ করিবে। ঈশ্বর যেমন সকলের ঈশ্বর তেমনি তিনি প্রত্যেকের ঈশ্বর, যেমন তিনি জ্ঞানের ঈশ্বর তেমনি তিনি হৃদয়ের ঈশ্বর, তিনি যেমন সমস্ত জগতের দেবতা তেমনি আমাদের গৃহদেবতা। তাঁহাকে রাজা বলিয়াও দেখিতে পারি, তাঁহাকে পিতা বলিয়াও দেখিতে পারি। কিন্তু পিতা ঈশ্বর আমাদের যত নিকটের, তিনি আমাদের হৃদয়ের যত অভাব মোচন করেন, এমন রাজা ঈশ্বর নহেন। তেমনি ব্রহ্মই ভারতবর্ষের সাধনালব্ধ চিরন্তন আশ্রয়; জিহোবা, গড্ অথবা আল্লা সেরূপ নহেন। রামমোহন রায় হৃদয়ের উদারতা-বশতই ইহা বুঝিয়াছিলেন।

৫ মাঘ ১২৯১

রামমোহন-প্রসঙ্গ

একদিন যে সময়ে য়ুরোপের জ্ঞানের ঐশ্বর্য হঠাৎ আমাদের চোখের সম্মুখে খুলিয়া গিয়া আমাদের দেশের নূতন ইংরেজি-শিক্ষিত লোকদিগকে একেবারে অভিভূত করিয়া দিয়াছিল সেই সময়ে রামমোহন রায় আমাদের স্বজাতির পৈতৃক জ্ঞান-ভাণ্ডারের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। তখনকার নিতান্ত শিশু ও দুর্বল বাংলা গদ্যেও তিনি উপনিষৎ বেদান্ত প্রভৃতি অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তিনিই সেই ঘোরতর ইংরেজি-বিদ্যাভিমানের দিনে জ্ঞান ও ধর্ম সম্বন্ধে আমাদের দেশের দারিদ্র্যের লজ্জা দূর করিয়া দিবার জন্য প্রথম দাঁড়াইয়াছিলেন। যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের মন হইতে সেই অগৌরব অল্পমাত্রও দূর না হইয়াছিল ততক্ষণ আমরা নিতান্ত নিঃসম্বল ভিক্ষুকের অবস্থায় আমাদের ইংরেজি মাস্টারের মুখের দিকে চাহিয়া অঞ্জলি পাতিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম।

কিন্তু কোনো বড়ো জিনিসকে কখনোই ভিক্ষা করিয়া পাওয়া যায় না। নিজের ঘরের মূলধনটি আমরা যতটা পরিমাণে খাটাইব, বাহির হইতেও ততটা পরিমাণে লাভ করিবার অধিকারী হইব। বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী এবং ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ কথাটার অর্থই তাই। দুই কারণে ভিক্ষুকের দৈন্য ঘোচে না। এক তো পরের নিকট হইতে তাহার উদ্‌বৃত্তের অংশ পাওয়া যায়, কখনোই তাহার ঐশ্বর্য আশা করা যায় না; দ্বিতীয়ত ভিক্ষুক যতই ভিক্ষা করে ততই তাহার নিজের চেষ্টার প্রতি বিশ্বাস পর্যন্ত চলিয়া যায়। এইজন্য ইংরেজের দেশে সমাজের হিতের প্রতি লক্ষ্য করিয়া ভিক্ষাবৃত্তিকে দণ্ডনীয় করা হইয়াছে।

রামমোহন রায় ইহুদি খৃস্টান ও মুসলমানের ধর্মগ্রন্থ হইতে তাহার সার-সংকলন করিয়া স্বদেশীর সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছিলেন, কিন্তু এই-সমস্তকে গ্রহণ ও ধারণ করিবার জন্য লজ্জার সহিত ভিক্ষার পাত্র বাড়াইয়া ধরেন নাই, আমাদের লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের সোনার থাল বাহির করিয়াছিলেন। আমাদের অধিকার যে কোন্‌খানে ছিল তাহাই তিনি প্রকাশ করিয়াছেন।

এই আমাদের স্বদেশীয় অধিকারের পথেই যাত্রা করিয়া আজ বিবেকানন্দ প্রভৃতি মনস্বী এবং সেইসঙ্গে আমাদের সমস্ত দেশ, ইস্কুলের ছাত্রভাবকে কাটাইয়া পৃথিবীর জ্ঞানীসভায় নিজের গৌরবে প্রবেশ করিতেছে। এমনি করিয়া নিজের সম্পদে মাথা তুলিতে পারিলেই আমরা বিশ্বমানবের জ্ঞানশালায় নিঃসংকোচে আতিথ্য গ্রহণ করিতে পারি—নহিলে মুষ্টিভিক্ষা এবং উঞ্ছবৃত্তি করিয়াই দিন কাটাইতে হয়। সম্পদকে নিজের মধ্যে অনুভব করিলে কেবল যে গৌরব বৃদ্ধি হয় তাহা নহে, শক্তি বৃদ্ধি হয়।

পৌষ ?, ১৩১৪

২

অধুনাতন কালে দেশের মধ্যে যাঁহারা সকলের চেয়ে বড়ো মনীষী তাঁহারা পশ্চিমের সঙ্গে পূর্বকে মিলাইয়া লইবার কাজেই জীবনযাপন করিয়াছেন। তাহার দৃষ্টান্ত

রামমোহন রায়। তিনি মনুষ্যত্বের ভিত্তির উপরে ভারতবর্ষকে সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে মিলিত করিবার জন্য একদিন একাকী দাঁড়াইয়াছিলেন। কোনো প্রথা কোনো সংস্কার তাঁহার দৃষ্টিকে অবরুদ্ধ করিতে পারে নাই। আশ্চর্য উদার হৃদয় ও উদার বুদ্ধির দ্বারা তিনি পূর্বকে পরিত্যাগ না করিয়া পশ্চিমকে গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন। তিনিই একলা সকল দিকেই নব্যবঙ্গের পত্তন করিয়া গিয়াছিলেন। এইরূপে তিনিই স্বদেশের লোকের সকল বিরোধ স্বীকার করিয়া আমাদের জ্ঞানের ও কর্মের ক্ষেত্রকে পূর্ব হইতে পশ্চিমের দিকে প্রশস্ত করিয়া দিয়াছেন, আমাদিগকে মানবের চিরন্তন অধিকার, সত্যের অবাধ অধিকার দান করিয়াছেন— আমাদিগকে জানিতে দিয়াছেন আমরা সমস্ত পৃথিবীর; আমাদেরই জন্য বুদ্ধ খৃস্ট মহম্মদ জীবন গ্রহণ ও জীবন দান করিয়াছেন। ভারতবর্ষের ঋষিদের সাধনার ফল আমাদের প্রত্যেকের জন্যই সঞ্চিত হইয়াছে, পৃথিবীর যে দেশেই যে-কেহ জ্ঞানের বাধা দূর করিয়াছেন, জড়ত্বের শৃঙ্খল মোচন করিয়া মানুষের আবদ্ধ শক্তিকে মুক্তি দিয়াছেন, তিনি আমাদেরই আপন, তাঁহাকে লইয়া আমরা প্রত্যেকে ধন্য। রামমোহন রায় ভারতবর্ষের চিত্তকে সংকুচিত ও প্রাচীরবদ্ধ করেন নাই, তাহাকে দেশে ও কালে প্রসারিত করিয়াছেন, ভারতবর্ষ ও য়ুরোপের মধ্যে তিনি সেতু স্থাপন করিয়াছেন; এই কারণেই ভারতবর্ষের সৃষ্টিকার্যে আজও তিনি শক্তিরূপে বিরাজ করিতেছেন। কোনো অন্ধ অভ্যাস, কোনো ক্ষুদ্র অহংকার-বশত মহাকালের অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে মূঢ়ের মতো তিনি বিদ্রোহ করেন নাই; যে অভিপ্রায় কেবল অতীতের মধ্যে নিঃশেষিত নহে, যাহা ভবিষ্যতের দিকে উদ্যত, তাহারই জয়পতাকা সমস্ত বিঘ্নের বিরুদ্ধে বীরের মতো বহন করিয়াছেন।...

রামমোহন রায় যে পশ্চিমের ভাবকে আত্মসাৎ করিতে পারিয়াছিলেন তাহার প্রধান কারণ, পশ্চিম তাঁহাকে অভিভূত করে নাই; তাঁহার আপনার দিকে দুর্বলতা ছিল না। তিনি নিজের প্রতিষ্ঠাভূমির উপরে দাঁড়াইয়া বাহিরের সামগ্রী আহরণ করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের ঐশ্বর্য কোথায় তাহা তাঁহার অগোচর ছিল না এবং তাহাকে তিনি নিজস্ব করিয়া লইয়াছিলেন; এইজন্যই যেখান হইতে যাহা পাইয়াছেন তাহা বিচার করিবার নিক্তি ও মানদণ্ড তাঁহার হাতে ছিল; কোনো মূল্যে না বুঝিয়া তিনি মুগ্ধের মতো আপনাকে বিকাইয়া দিয়া অঞ্জলিপূরণ করেন নাই।

শ্রাবণ ১৩১৫

৩

এই নূতন যুগে পৃথিবীর মানবচিত্তে যে প্রভাত আসছে সেই নব প্রভাতের বার্তা বাংলাদেশে আজ আশি বৎসর হল প্রথম এসে উপস্থিত হয়েছিল। তখন পৃথিবীতে দেশের সঙ্গে দেশের বিরোধ, ধর্মের সঙ্গে ধর্মের সংগ্রাম; তখন শাস্ত্রবাক্য এবং বাহ্য প্রথার লৌহ সিংহাসনে বিভাগই ছিল রাজা— সেই ভেদবুদ্ধির প্রাচীররুদ্ধ অন্ধকারের মধ্যে রাজা রামমোহন যখন অদ্বিতীয় একের আলোক তুলে ধরলেন তখন তিনি দেখতে পেলেন যে, যে ভারতবর্ষে হিন্দু মুসলমান ও খৃস্টানধর্ম আজ একত্র সমাগত হয়েছে সেই ভারতবর্ষেই বহু পূর্ব যুগে এই বিচিত্র অতিথিদের একসভায় বসাবার জন্যে আয়োজন হয়ে গেছে। মানবসভ্যতা যখন দেশে দেশে

নব নব বিকাশের শাখাপ্রশাখায় ব্যাপ্ত হতে চলেছিল তখন এই ভারতবর্ষ বারংবার মন্ত্র জপ করছিলেন— এক! এক! এক! তিনি বলছিলেন— ‘ইহ চেৎ অবেদীৎ অথ সত্যমস্তি,’ এই এককেই যদি মানুষ জানে তবে সে সত্য হয়; ‘ন চেৎ ইহ অবেদীৎ মহতী বিনষ্টিঃ,’ এই এককে যদি না জানে তবে তার মহতী বিনষ্টি। এ পর্যন্ত পৃথিবীতে যত মিথ্যার প্রাদুর্ভাব হয়েছে সে কেবল এই মহান্ একের উপলব্ধি-অভাবে। যত ক্ষুদ্রতা নিষ্ফলতা দৌর্বল্য, সে এই একের থেকে বিচ্যুতিতে। যত মহাপুরুষের আবির্ভাব সে এই এককে প্রচার করতে। যত মহাবিপ্লবের আগমন সে এই এককে উদ্ধার করবার জন্যে।

মাঘ ১৩১৫

৪

পূর্ণ মনুষ্যত্বের সর্বাঙ্গীণ আকাঙ্ক্ষাকে বহন করে এ দেশে রামমোহন রায়ের আবির্ভাব হয়েছিল। ভারতবর্ষে তিনি যে কোনো নূতন ধর্মের সৃষ্টি করেছিলেন তা নয়, ভারতবর্ষে যেখানে ধর্মের মধ্যে পরিপূর্ণতার রূপ চিরদিনই ছিল, যেখানে বৃহৎ সামঞ্জস্য, যেখানে শান্তংশিবমদ্বৈতম্, সেইখানকার সিংহদ্বার তিনি সর্বসাধারণের কাছে উদ্ঘাটিত করে দিয়েছিলেন।

[১৩১৭]

৫

রামমোহন রায় আমাদের দেশের প্রাচীন ব্রহ্মসাধনাকে নবীন যুগে উদ্ঘাটিত করে দিলেন। ব্রহ্মকে তিনি নিজের জীবনের মধ্যে গ্রহণ করে জীবনের সমস্ত শক্তিকে বৃহৎ করে বিশ্বব্যাপী করে প্রকাশ করে দিলেন। তাঁর সকল চিন্তা সকল চেষ্টা, মানুষের প্রতি তাঁর প্রেম, দেশের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা, কল্যাণের প্রতি তাঁর লক্ষ্য, সমস্তই ব্রহ্মসাধনাকে আশ্রয় করে উদার ঐক্য লাভ করেছিল। ব্রহ্মকে তিনি জীবন থেকে এবং ব্রহ্মান্ড থেকে বিচ্ছিন্ন করে কেবলমাত্র ধ্যানের বস্তু জ্ঞানের বস্তু করে নিভৃতে নির্বাসিত করে রাখেন নি। ব্রহ্মকে তিনি বিশ্ব-ইতিহাসে বিশ্বধর্মে বিশ্বকর্মে সর্বত্রই সত্য করে দেখবার সাধনা নিজের জীবনে এমন করে প্রকাশ করলেন যে সেই তাঁর সাধনার দ্বারা আমাদের দেশে সকল বিষয়েই তিনি নূতন যুগের প্রবর্তন করে দিলেন।

রামমোহন রায়ের মুখ দিয়ে ভারতবর্ষ আপন সত্যবাণী ঘোষণা করেছে। বিদেশের গুরু যখন এই ভারতবর্ষকে দীক্ষা দেবার জন্য উপস্থিত হয়েছিল এই বাণী তখনই উচ্চারিত হয়েছে।

অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ঘরে বাহিরে তখন এই ব্রহ্মসাধনার কথা চাপা ছিল। আমাদের দেশে তখন ব্রহ্মকে পরমজ্ঞানীর অতি দূর গহন জ্ঞানদুর্গের মধ্যে কারারুদ্ধ করে রেখেছিল; চারি দিকে রাজত্ব করছিল আচার-বিচার-বাহ্য অনুষ্ঠান

এবং ভক্তি-রস-মাদকতার বিচিত্র আয়োজন। সেদিন রামমোহন রায় যখন ব্রহ্ম-সাধনকে পুঁথির অন্ধকার-সমাধি থেকে মুক্ত করে জীবনের ক্ষেত্রে এনে দাঁড় করালেন তখন দেশের লোক সবাই ক্ষুব্ধ হয়ে বলে উঠল, 'এ আমাদের আপন জিনিস নয়, এ আমাদের বাপ পিতামহের সামগ্রী নয়,' বলে উঠল, 'এ খৃস্টানি, একে ঘরে ঢুকতে দেওয়া হবে না।' শক্তি যখন বিলুপ্ত হয়, জীবন যখন সংকীর্ণ হয়ে আসে, জ্ঞান যখন গ্রাম্যগণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ হয়ে কাল্পনিকতাকে নিয়ে যথেচ্ছ বিশ্বাসের অন্ধকার ঘরে স্বপ্ন দেখে আপনাকে বিফল করতে চায় তখনই ব্রহ্ম সকলের চেয়ে সুদূর, এমন-কি সকলের চেয়ে বিরুদ্ধ হয়ে প্রতিভাত হন। এ দিকে য়ুরোপে মানবশক্তি তখন প্রবলভাবে জাগ্রত হয়ে বৃহৎভাবে আপনাকে প্রকাশ করছে। কিন্তু সে তখন আপনাকেই প্রকাশ করতে চাচ্ছে—আপনার চেয়ে বড়োকে নয়, সকলের চেয়ে শ্রেয়কে নয়। তার জ্ঞানের ক্ষেত্র বিশ্বব্যাপী, তার কর্মের ক্ষেত্র পৃথিবী-জোড়া, এবং সেই উপলক্ষে মানুষের সঙ্গে তার সম্বন্ধ সুদূরবিস্তৃত। কিন্তু তার ধ্বজপতাকায় লেখা ছিল 'আমি', তার মন্ত্র ছিল জোর যার মুলুক তার; সে যে অস্ত্রপাণি রক্তবসনা শক্তিদেবতাকে জগতে প্রচার করতে চলেছিল, তার বাহন ছিল পণ্যসম্ভার, অন্তহীন উপকরণরাশি।

কিন্তু এই বৃহৎ ব্যাপারকে কিসে ঐক্যদান করতে পারে? এই বিরাট যজ্ঞের যজ্ঞপতি কে? কেউ-বা বলে স্বাজাত্য, কেউ-বা বলে রাষ্ট্রব্যবস্থা, কেউ-বা বলে অধিকাংশের সুখসাধন, কেউ-বা বলে মানবদেবতা। কিন্তু কিছুতেই বিরোধ মেটে না, কিছুতেই ঐক্যদান করতে পারে না, প্রতিকূলতা পরস্পরের প্রতি ভ্রূকুটি করে পরস্পরকে শান্ত রাখতে চেষ্টা করে, এবং যাকে গ্রহণ করতে দলবদ্ধ স্বার্থের কোনোখানে বাধে তাকে একেবারে ধ্বংস করবার জন্যে সে উদ্যত হয়ে ওঠে। কেবল বিপ্লবের পর বিপ্লব আসছে, কেবল পরীক্ষার পর পরীক্ষা চলছে—কিন্তু এ কথা একদিন জানতেই হবে, বাহিরে যেখানে বৃহৎ অনুষ্ঠান অন্তরে সেখানে ব্রহ্মকে উপলব্ধি না করলে কিছুতেই কিছুর সমন্বয় হতে পারবে না; প্রয়োজনবোধকে যত বড়ো নাম দাও, স্বার্থসিদ্ধিকে যত বড়ো সিংহাসনে বসাও, নিয়মকে যত পাকা করে তোলো এবং শক্তিকে যত প্রবল করে দাঁড় করাও, সত্যপ্রতিষ্ঠা কিছুতেই নেই, শেষ পর্যন্ত কিছুই টিকতে এবং টেকাতে পারবে না। যা প্রবল অথচ প্রশান্ত, ব্যাপক অথচ গভীর, আত্মসমাহিত অথচ বিশ্বানুপ্রবিষ্ট, সেই আধ্যাত্মিক জীবন-সূত্রের দ্বারা না বেঁধে তুলতে পারলে অন্য কোনো কৃত্রিম জোড়াতাড়ার দ্বারা জ্ঞানের সঙ্গে জ্ঞান, কর্মের সঙ্গে কর্ম, জাতির সঙ্গে জাতি যথার্থভাবে সম্মিলিত হতে পারবে না। সেই সম্মিলন যদি না ঘটে তবে আয়োজন যতই বিপুল হবে তার সংঘাত-বেদনা ততই দুঃসহ হয়ে উঠতে থাকবে।

১২ মাঘ ১৩১৭

৬

যখন চারি দিক অচেতন, সমস্ত দ্বার রুদ্ধ, সমস্ত দীপ নির্বাপিত, অভাব যখন এতই অধিক যে অভাববোধ চলিয়া গিয়াছে, বাধা যখন এত নিবিড় যে মানুষ তাহাকে আপনার আশ্রয় বলিয়া অবলম্বন করিয়া ধরে, সেই সময়েই অভাবনীয়রূপে

প্রতিকারের দূত কোথা হইতে দ্বারে আসিয়া দাঁড়ায় তাহা বুঝিতেই পারি না। তাহাকে কেহ প্রত্যাশা করে না, কেহ চিনে না, সকলেই তাহাকে শত্রু বলিয়া উদ্‌বিগ্ন হইয়া উঠে। এ দেশে একদিন যখন রাশীকৃত প্রাণহীন সংস্কারের বাধা অনন্তের বোধকে আচ্ছন্ন করিয়া ধরিয়াছিল, মানুষের জীবনযাত্রাকে তুচ্ছ ও সমাজকে শতখণ্ড করিয়া তুলিয়াছিল, মনুষ্যত্বকে যখন আমরা সংকীর্ণ গ্রাম্যতার মধ্যেই আবদ্ধ করিয়া দেখিতেছিলাম, বিশ্বব্যাপারের কোথাও যখন আমরা একের অমোঘ নিয়ম দেখি নাই, কেবল দশের উৎপাতই কল্পনা করিতেছিলাম; উন্মত্তের দুঃস্বপ্নের মতো যখন সমস্ত জগৎকে বিচিত্র বিভীষিকায় পরিপূর্ণ দেখিতেছিলাম এবং কেবলই মন্ত্রতন্ত্র তাগাতাবিজ শান্তিস্বস্ত্যয়ন মানৎ ও বলিদানের দ্বারা ভীষণ শত্রুকল্পিত সংসারে কোনোমতে আত্মরক্ষা করিয়া চলিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলাম; এইরূপে যখন চিন্তায় ভীরুতা, কর্মে দৌর্বল্য, ব্যবহারে সংকোচ এবং আচারে মূঢ়তা সমস্ত দেশের পৌরুষকে শতদীর্ণ করিয়া অপমানের রসাতলে আমাদিগকে আকর্ষণ করিতেছিল—সেই সময়ে বাহিরের বিশ্ব হইতে আমাদের জীর্ণ প্রাচীরের উপরে একটা প্রচণ্ড আঘাত লাগিল, সেই আঘাতে যাঁহারা জাগিয়া উঠিলেন তাঁহারা একমুহূর্তেই নিদারুণ বেদনার সহিত বুঝিতে পারিলেন কিসের অভাব এখানে, কিসের এই অন্ধকার, এই জড়তা, এই অপমান, কিসের এই জীবিতমৃত্যুর আনন্দহীন সর্বব্যাপী অবসাদ! এখানে আকাশ খণ্ডিত, আলোক নিষিদ্ধ, অনন্তের প্রাণসমীরণ প্রতিহত; এখানে নিখিলের সহিত অবাধ যোগ সহস্র কৃত্রিমতার প্রাচীরে প্রতিরুদ্ধ। তাহাদের সমস্ত প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল—ভূমাকে চাই, ভূমাকে চাই!

এই কান্নাই সমস্ত মানুষের কান্না। পৃথিবীর সর্বত্রই মানুষ কোথাও-বা আপনার বহু প্রাচীন অভ্যাসের আবরণের দ্বারা আপনার মঙ্গলকে আড়াল করিয়া রাখিয়াছে, কোথাও-বা সে আপনার নানা রচনার দ্বারা সঞ্চয়ের দ্বারা কেবলই আপনাকে বড়ো করিতে গিয়া আপনার চেয়ে বড়োকে হারাইয়া ফেলিতেছে। কোথাও-বা সে নিষ্ক্রিয়ভাবে জড়তার দ্বারা, কোথাও-বা সে সক্রিয়ভাবে প্রয়াসের দ্বারাই মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ সার্থকতাকে বিস্মৃত হইয়া বসিয়াছে।

এই বিস্মৃতির গভীর তলদেশ হইতে আপনাকে উদ্ধার করিবার চেষ্টা, ইহাই আমরা ব্রাহ্মধর্মের ইতিহাসের আরম্ভেই দেখিতে পাই। মানুষের সমস্ত বোধকেই অনন্তের বোধের মধ্যে উদ্‌বোধিত করিয়া তুলিবার প্রয়াসই ব্রাহ্মধর্মের সাধনা রূপে প্রকাশ পাইয়াছে। সেইজন্যই আমরা দেখিতে পাইলাম, রামমোহন রায়ের জীবনের কর্মক্ষেত্র সমস্ত মনুষ্যত্ব। রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, ধর্মনীতি, সকল দিকেই তাঁহার চিত্ত পূর্ণবেগে ধাবিত হইয়াছে। কেবলমাত্র কর্মশক্তির স্বাভাবিক প্রাচুর্যই তাহার মূল প্রেরণা নহে—ব্রহ্মের বোধ তাঁহার সমস্ত শক্তিকে অধিকার করিয়াছিল। সেই বোধের মধ্য দিয়া তিনি মানুষকে দেখিয়াছিলেন বলিয়াই মানুষকে সকল দিকেই এমন বড়ো করিয়া এমন সত্য করিয়া দেখিয়াছিলেন; সেইজন্যই তাঁহার দৃষ্টি সমস্ত সংস্কারের বেষ্টন ছাড়াইয়া গিয়াছিল; সেইজন্য কেবল যে তিনি স্বদেশের চিত্তশক্তির বন্ধনমোচন কামনা করিয়াছিলেন তাহা নহে, মানুষ যেখানেই কোনো মহৎ অধিকার লাভ করিয়া আপনার মুক্তির ক্ষেত্রকে বড়ো করিতে পারিয়াছে সেইখানেই তিনি তৃপ্তিবোধ করিয়াছেন।

১১ পৌষ ১৩১৮

৭

ভারতবর্ষের পূর্বপ্রান্তে এই বাংলাদেশে আজ প্রায় শতবৎসর পূর্বে রামমোহন রায় পৃথিবীর সেই বাধামুক্ত ধর্মের পালটাকেই ঈশ্বরের প্রসাদবায়ুর সম্মুখে উন্মুক্ত করিয়া ধরিয়াছেন। ইহাও আশ্চর্যের বিষয় যে, মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগ, ধর্মের সঙ্গে ধর্মের ঐক্য তখন পৃথিবীর অন্য কোথাও মানবের মনে পরিস্ফুট হইয়া প্রকাশ পায় নাই। সেদিন রামমোহন রায় যেন সমস্ত পৃথিবীর বেদনাকে হৃদয়ে লইয়া পৃথিবীর ধর্মকে খুঁজিতে বাহির হইয়াছিলেন।

তিনি যে সময়ে ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তখন এ দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম আচ্ছন্ন হইয়াছিল। তিনি মূর্তিপূজার মধ্যেই জন্মিয়াছিলেন এবং তাহারই মধ্যে বাড়িয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু এই বহুকালব্যাপী সংস্কার ও দেশব্যাপী অভ্যাসের নিবিড়তার মধ্যে থাকিয়াও এই বিপুল এবং প্রবল এবং প্রাচীন সমাজের মধ্যে কেবল একলা রামমোহন মূর্তিপূজাকে কোনোমতেই স্বীকার করিতে পারিলেন না। তাহার কারণ এই, তিনি আপনার হৃদয়ের মধ্যে বিশ্বমানবের হৃদয় লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। মূর্তিপূজা সেই অবস্থারই পূজা যে অবস্থায় মানুষ বিশেষ দেশকে বিশেষ জাতিকে বিশেষ বিধিনিষেধসকলকে বিশ্বের সহিত অত্যন্ত পৃথক করিয়া দেখে—যখন সে বলে যাহাতে আমারই বিশেষ দীক্ষা তাহাতে আমারই বিশেষ মঙ্গল; যখন সে বলে আমার এই-সমস্ত বিশেষ শিক্ষাদীক্ষার মধ্যে বাহিরের আর কাহারও প্রবেশ করিয়া ফল নাই এবং কাহাকেও প্রবেশ করিতে দিবই না।

... ধর্মের সংস্কারকে সংকীর্ণ করিলে তাহা চিরশৃঙ্খলের মতো মানুষকে চাপিয়া ধরে—মানুষের সমস্ত আয়তন যখন বাড়িতেছে তখন সেই ধর্ম আর বাড়ে না, রক্তচলাচলকে বন্ধ করিয়া অঙ্গকে সে কৃশ করিয়াই রাখিয়া দেয়, মৃত্যু পর্যন্ত তাহার হাত হইতে নিস্তার পাওয়াই কঠিন হয়। সেই অতি কঠিন সংকীর্ণ ধর্মের প্রাচীন বন্ধনকে রামমোহন রায় যে কোনোমতেই আপনার আশ্রয় বলিয়া কল্পনা করিতে পারেন নাই তাহার কারণ এই যে, তিনি সহজেই বুঝিয়াছিলেন, যে সত্যের ক্ষুধায় মানুষ ধর্মকে প্রার্থনা করে সে সত্য ব্যক্তিগত নহে, জাতিগত নহে, তাহা সর্বগত। তিনি বাল্যকাল হইতেই অনুভব করিয়াছিলেন যে, যে দেবতা সর্বদেশে সর্বকালে সকল মানুষের দেবতা না হইতে পারেন, অর্থাৎ যিনি আমার কল্পনাকে তৃপ্ত করেন অন্যের কল্পনাকে বাধা দেন, যিনি আমার অভ্যাসকে আকর্ষণ করেন অন্যের অভ্যাসকে পীড়িত করেন, তিনি আমারও দেবতা হইতে পারেন না, কারণ সকল মানুষের সঙ্গে যোগ কোনোখানে বিচ্ছিন্ন করিয়া মানুষের পক্ষে পূর্ণ সত্য হওয়া একেবারেই সম্ভব হয় না এবং এই পূর্ণ সত্যই ধর্মের সত্য।

১১ মাঘ ১৩১৮

৮

আমাদের দেশে বর্তমানকালে, কী বলিয়া আপনার পরিচয় দিব তাহা লইয়া অন্তত ব্রাহ্মসমাজে একটা তর্ক উঠিয়াছে। অথচ এ তর্কটা রামমোহন রায়ের মনের মধ্যে

একেবারেই ছিল না দেখিতে পাই। এ দিকে তিনি সমাজপ্রচলিত বিশ্বাস ও পূজার্চনা ছাড়িয়াছেন, কোরান পড়িতেছেন, বাইবেল হইতে সত্যধর্মের সারসংগ্রহ করিতেছেন, অ্যাডাম্‌ সাহেবকে দলে টানিয়া ব্রাহ্মসভা স্থাপন করিয়াছেন; সমাজে নিন্দায় কান পাতিবার জো নাই, তাঁহাকে সকলেই বিধর্মী বলিয়া গালি দিতেছে এমন-কি যদি কোনো নিরাপদ সুযোগ মিলিত তবে তাঁহাকে মারিয়া ফেলিতে পারে এমন লোকের অভাব ছিল না— কিন্তু কী বলিয়া আপনার পরিচয় দিব সে বিষয়ে তাঁহার মনে কোনোদিন লেশমাত্র সংশয় ওঠে নাই। কারণ হাজার হাজার লোকে তাঁহাকে অহিন্দু বলিলেও তিনি হিন্দু এ সত্য যখন লোপ পাইবার নয় তখন এ সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া সময় নষ্ট করিবার কোনো দরকার ছিল না।

... রামমোহন রায় তাঁহার চারি দিকের বর্তমান অবস্থা হইতে যত উচ্চেই উঠিয়াছেন সমস্ত হিন্দুসমাজকে তিনি তত উচ্চেই তুলিয়াছেন। এ কথা কোনোমতেই বলিতে পারিব না যে তিনি হিন্দু নহেন, কেননা অন্যান্য অনেক হিন্দু তাঁহার চেয়ে অনেক নিচে ছিল, এবং নিচে থাকিয়া তাঁহাকে গালি পাড়িয়াছে। কেন বলিতে পারিব না? কেননা এ কথা সত্য নহে। কেননা তিনি যে নিশ্চিতই হিন্দু ছিলেন, অতএব তাঁহার মহত্ত্ব হইতে কখনোই হিন্দুসমাজ বঞ্চিত হইতে পারিবে না— হিন্দুসমাজের বহুশত লক্ষ লোক যদি এক হইয়া স্বয়ং এজন্য বিধাতার কাছে দরখাস্ত করে তথাপি পারিবে না। শেক্‌স্‌পিয়র-নিউটনের প্রতিভা অসাধারণ হইলেও তাহা যেমন সাধারণ ইংরেজের সামগ্রী, তেমনি রামমোহনের মত যদি সত্য হয় তবে তাহা সাধারণ হিন্দুসমাজেরই সত্য মত।

অতএব, যদি সমস্ত বিপুল হিন্দুসমাজের মধ্যে কেবলমাত্র আমার সম্প্রদায়ই সত্যধর্মকে পালন করিতেছে ইহাই সত্য হয় তবে এই সম্প্রদায়কেই আশ্রয় করিয়া সমস্ত হিন্দুসমাজ সত্যকে রক্ষা করিতেছে— তবে অপরিসীম অন্ধকারের মধ্যে একমাত্র এই পূর্বপ্রান্তে সমস্ত সমাজেরই অরুণোদয় হইয়াছে। আমি সেই রাত্রির অন্ধকার হইতে অরুণোদয়কে ভিন্ন কোঠায় স্বতন্ত্র করিয়া রাখিব না। বস্তুত ব্রাহ্মসমাজের আবির্ভাব সমস্ত হিন্দুসমাজেরই ইতিহাসের একটি অঙ্গ। হিন্দুসমাজেরই নানা ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্যে তাহারই বিশেষ একটি মর্মান্তিক প্রয়োজনবোধের ভিতর দিয়া তাহারই আন্তরিক শক্তির উদ্যমে এই সমাজ উদ্‌বোধিত হইয়াছে। ব্রাহ্মসমাজ আকস্মিক অদ্ভুত একটা খাপছাড়া কাণ্ড নহে। যেখানে তাহার উদ্ভব সেখানকার সমগ্রের সহিত তাহার গভীরতম জীবনের যোগ আছে। বীজকে বিদীর্ণ করিয়া গাছ বাহির হয় বলিয়াই সে গাছ বীজের পক্ষে একটা বিরুদ্ধ উৎপাত নহে। হিন্দুসমাজের বহুস্তরবদ্ধ কঠিন আবরণ একদা ভেদ করিয়া সতেজে ব্রাহ্মসমাজ মাথা তুলিয়াছিল বলিয়া তাহা হিন্দুসমাজের বিরুদ্ধ নহে, ভিতর হইতে যে অন্তর্যামী কাজ করিতেছেন তিনি জানেন তাহা হিন্দুসমাজেরই পরিণাম।

বৈশাখ ১৩১৯

৯

ভারতে সেই আধ্যাত্মিক সত্য সম্বন্ধের সাধনা আজিকার দিনেও নিশ্চেষ্ট হয় নাই। তাই এ কথা জোর করিয়া বলা যায় যে, রামমোহন রায়ের জন্ম এবং তাঁহার তপস্যা আধুনিক ভারতের সকল ঘটনার মধ্যে বড়ো ঘটনা; কারণ, পূর্ব ও পশ্চিম আপন অবিচ্ছিন্নতা অনুভব করিবে, আজ পৃথিবীতে ইহার প্রয়োজন সকলের চেয়ে গুরুতর। পশ্চিম যখন ভারতের দ্বারে আঘাত করিল তখন ভারত সর্বপ্রথমে রামমোহন রায়ের মধ্য দিয়াই সেই আঘাতের সত্যকার সাড়া দিয়াছিল। তিনি ভারতের তপস্যালব্ধ আধ্যাত্মিক সম্পদের মধ্যেই, অর্থাৎ পরমাত্মায় সকল আত্মার ঐক্য এই বিশ্বাসের মধ্যেই, সর্বমানবের মিলনের সত্যতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

[পৌষ] ১৩২৪

১০

...এক জনের নাম আজ আমার মনে পড়ছে— যিনি প্রাচীন কালের সঙ্গে ভাবী কালের, এক যুগের সঙ্গে অন্য যুগের সম্মিলনের সাধনা করেছিলেন। রাজা রামমোহন রায়ও বিদ্যাসাগরের মতো জীবনের আরম্ভকালে শাস্ত্রে অসামান্য পারদর্শী হয়েছিলেন এবং বাল্যকালে পাশ্চাত্ত্য বিদ্যা শেখেন নি। তিনি দীর্ঘকাল কেবল প্রাচ্য বিদ্যার মধ্যেই আবিষ্ট থেকে তাকেই একমাত্র শিক্ষার বিষয় করেছিলেন। কিন্তু তিনি এই সীমার মধ্যেই একান্ত আবদ্ধ হয়ে থাকতে পারলেন না। রামমোহন সত্যকে নানা দেশে, নানা শাস্ত্রে, নানা ধর্মে অনুসন্ধান করেছিলেন, এই নির্ভীক সাহসের জন্য তিনি ধন্য। যেমন ভৌগোলিক সত্যকে পূর্ণভাবে জানবার জন্য মানুষ নূতন নূতন দেশে নিষ্ক্রমণ করে অসাধারণ অধ্যবসায় ও চরিত্রবলের পরিচয় দিয়েছে, তেমনি মানসলোকের সত্যের সন্ধানে চিত্তকে প্রথার আবেষ্টন থেকে মুক্ত করে নব নব পথে ধাবিত করতে গিয়ে মহাপুরুষেরা আপন চরিত্রমহিমায় দুঃসহ কণ্টককে শিরোধার্য করে নিয়ে থাকেন।

১৭ শ্রাবণ ১৩২৯

১১

ভারতের বাণী বহন করে যে-সকল একের দূত এ দেশে জন্মেছেন তাঁরা যে প্রথম হতেই এখানে আদর পেয়েছেন তা নয়। ... আদর না পাওয়াই স্বাভাবিক, কেননা তাঁরা ভেদ-প্রবর্তক সনাতনবিধির বাহিরের লোক, যেমন খৃস্ট ছিলেন ইহুদি ফ্যারিসি গণ্ডির বাহিরে। কিন্তু বহুদিন তাঁরা অনাদরের অসাম্প্রদায়িক ছায়ায় প্রচ্ছন্ন ছিলেন বলে তাঁরাই যে অভারতীয় ছিলেন তা নয়। তাঁরাই ছিলেন যথার্থ ভারতীয়, কেননা তাঁরাই বাহিরের কোনো সুবিধা থেকে নয়, অন্তরের আত্মীয়তা থেকে, হিন্দুকে মুসলমানকে এক করে জেনেছিলেন; তাঁরাই ঋষিদের সেই বাক্যকে

সাধনার মধ্যে প্রমাণ করেছিলেন যে-বাক্য বলে, সত্যকে তিনিই জানেন যিনি আপনাকেই জানেন সকলের মধ্যে।

ভারতীয় এই সাধকদেরই সাধনাধারা বর্তমান কালে প্রকাশিত হয়েছে রামমোহন রায়ের জীবনে। এই যুগে তিনিই উপনিষদের ঐক্যতত্ত্বের আলোকে হিন্দু-মুসলমান-খৃস্টানকে সত্যদৃষ্টিতে দেখতে পেয়েছিলেন, তিনি কাউকেই বর্জন করেন নি। বুদ্ধির মহিমায় ও হৃদয়ের বিপুলতায় তিনি এই বাহ্যভেদের ভারতে আধ্যাত্মিক অভেদকে উজ্জ্বল করে উপলব্ধি করেছিলেন এবং সেই অভেদকে প্রচার করতে গিয়ে দেশের লোকের কাছে আজও তিনি তিরস্কৃত। যাঁর নির্মল দৃষ্টির কাছে হিন্দু-মুসলমান-খৃস্টানের শাস্ত্র আপন দুরূহ বাধা সরিয়ে দিয়েছিল তাঁকে আজ তারাই অভারতীয় বলতে স্পর্ধা করছে, পাশ্চাত্ত্য বিদ্যা ছাড়া আর কোনো বিদ্যায় যাদের অভিনিবেশ নেই। আজকের দিনেও রামমোহন রায় আমাদের দেশে যে জন্মেছেন তাতে এই বুঝতে পারি যে, কবীর নানক দাদূ ভারতের যে সত্য-সাধনাকে বহন করেছিলেন আজও সেই সাধনার প্রবাহ আমাদের প্রাণের ক্ষেত্র পরিত্যাগ করে নি। ভারতচিত্তের প্রকাশের পথ উদ্‌ঘাটিত হবেই।

ভাদ্র ১৩৩২

RAMMOHUN ROY

Rammohun Roy inaugurated the Modern Age in India. He was born at a time when our country, having lost its link with the inmost truths of its being, struggled under a crushing load of unreason, in abject slavery to circumstance. In social usage, in politics, in the realm of religion and art, we had entered the zone of uncreative habit, of decadent tradition, and ceased to exercise our humanity. In this dark gloom of India's degeneration Rammohun rose up, a luminous star in the firmament of India's history, with prophetic purity of vision, and unconquerable heroism of soul. He shed radiance all over the land; he rescued us from the penury of self-oblivion. Through the dynamic power of his personality, his uncompromising freedom of the spirit, he vitalized our national being with the urgency of creative endeavour, and launched it into the arduous adventure of realization. He is the great path-maker of this century who has removed ponderous obstacles that impeded our progress at every step, and initiated us into the present Era of world-wide co-operation of humanity.

Rammohun belongs to the lineage of India's great seers who age after age have appeared in the arena of our history with the message of Eternal Man. India's special genius has been to acknowledge the divine in human affairs, to offer hospitality to all that is imperishable in human civilization, regardless of racial and national divergence. From the early dawn of our history it has been India's privilege and also its problem, as a host, to harmonize the diverse elements of humanity which have inevitably been brought to our midst, to synthetize contrasting cultures in the light of a comprehensive ideal. The stupendous structure of our social system with its intricate arrangement of caste testifies to the vigorous attempt māde at an early stage of human civilization to deal with the complexity of our problem, to relegate to every class of our peoples however wide the cleavage between their levels of culture, a place in a cosmopolitan scheme of society. Rammohun's predecessors, Kabir, Nānak, Dādu, and innumerable saints and seers of medieval India, carried on much further India's great attempt to evolve a human adjustment of peoples and races; they broke through barriers of social and religious exclusiveness and brought together India's different communities on the genuine basis of spiritual reality. Now that our outworn social usages are yielding rapidly to the stress of an urgent call of unity, when rigid enclosures of caste and creed can no more obstruct the freedom of our fellowship, when India's spiritual need of faith and concord between her different peoples has become imperative and seems to have aroused a new stir of consciousness throughout the land, we must not forget that this emancipation of our manhood has been made possible by the indomitable personality of the great Unifier, Rammohun Roy. He paved the path for this reassertion of India's inmost truth of being, her belief in the equality of man in the love of the Supreme Person, who ever dwells in the hearts of all men and unites us in the bond of welfare.

Rammohun was the only person in his time, in the whole world of man, to realize completely the significance of the Modern Age. He knew that the ideal of human civilization does not lie in the isolation of independence, but in the brotherhood of interdependence of individuals as well as of nations in all spheres of thought and activity. He applied this principle of humanity with his extraordinary depth of scholarship and natural gift of intuition, to social, literary and religious affairs, never acknowledging limitations of circumstance, never deviating from his purpose lured by distractions of temporal excitement. His attempt was to establish our peoples on the full consciousness of their own cultural personality, to make them comprehend the reality of all that was unique and indestructible in their civilization, and simultaneously, to make them approach other civilizations in the spirit of sympathetic co-operation. With this view in his mind he tackled an amazingly wide range of social, cultural, and religious problems of our country, and through a long life spent in unflagging service to the cause of India's cultural reassertion, brought back the pure stream of India's philosophy to the futility of our immobile and unproductive national existence. In social ethics he was an uncompromising interpreter of the truths of human relationship, tireless in his crusade against social wrongs and superstition, generous in his co-operation with any reformer, both of this country and of outside, who came to our aid in a genuine spirit of comradeship. Unsparingly he devoted himself to the task of rescuing from the debris of India's decadence the true products of its civilization, and to make our people build on them, as the basis, the superstructure of an international culture. Deeply versed in Sanskrit, he revived classical studies, and while he imbued the Bengali literature and language with the rich atmosphere of our classical period, he opened its doors wide to the spirit of the Age, offering access to new words from other languages, and to new ideas. To every sphere of our national existence he brought the sagacity of a comprehensive vision, the spirit of self-manifestation of the unique in the light of the universal.

Let me hope that in celebrating his Centenary we shall take upon ourselves the task of revealing to our own and contemporaneous civilizations the multisided and perfectly balanced personality of this great man. We in this country, however, owe a special responsibility, not only of bringing to light his varied contributions to the Modern Age, but of proving our right of kinship with him by justifying his life, by maintaining in every realm of our national existence the high standard of truth which he set before us. Great men have been claimed by humanity by its persecution of them and wilful neglect. We evade our responsibility for those who are immeasurably superior to us by repudiating them. Rammohun suffered martyrdom in his time, and paid the price of his greatness. But out of his sufferings, his power of transmuting them to carry on further beneficent activities for the good of humanity, the Modern Age has gained an undying urge of life. If we fail him again in this day of our nation-building, if we do not observe perfect equity of human relationship offering uncompromising fight to all forms and conventions, however ancient they may be in usage, which separate man and man, we shall be pitiful in our failure, and shamed for ever in the history of man. Our futility will be in the measure of the greatness of Rammohun Roy.

18 February 1933

মহাত্মা গান্ধী

ঊর্ধ্বে গিরিচূড়ায় বসে আছে ভক্ত, তুষারশুভ্র নীরবতার মধ্যে;
আকাশে তার নিদ্রাহীন চক্ষু খোঁজে আলোকের ইঙ্গিত।
মেঘ যখন ঘনীভূত, নিশাচর পাখি চীৎকারশব্দে যখন উড়ে যায়,
সে বলে, 'ভয় নেই ভাই, মানবকে মহান বলে জেনো।'
ওরা শোনে না। বলে, পশুশক্তিই আদ্যাশক্তি। বলে, পশুই শাশ্বত।
বলে, সাধুতা তলে তলে আত্মপ্রবঞ্চক।
যখন ওরা আঘাত পায় বিলাপ করে বলে, 'ভাই, তুমি কোথায়।'
উত্তরে শুনতে পায়, 'আমি তোমার পাশেই।'
অন্ধকারে দেখতে পায় না; তর্ক করে, এ বাণী ভয়ার্তের মায়াসৃষ্টি,
আত্মসান্ত্বনার বিড়ম্বনা।
বলে, মানুষ চিরদিন কেবল সংগ্রাম করবে
মরীচিকার অধিকার নিয়ে
হিংসাকণ্টকিত অন্তহীন মরুভূমির মধ্যে।

মেঘ সরে গেল।
শুকতারা দেখা দিল পূর্বদিগন্তে,
পৃথিবীর বক্ষ থেকে উঠল আরামের দীর্ঘনিশ্বাস,
পল্লবমর্মর বনপথে-পথে হিল্লোলিত,
পাখি ডাক দিল শাখায় শাখায়।
ভক্ত বললে, সময় এসেছে।
কিসের সময়।
যাত্রার।
ওরা বসে ভাবলে।
অর্থ বুঝলে না, আপন আপন মনের মতো অর্থ বানিয়ে নিলে।
ভোরের স্পর্শ নামল মাটির গভীরে;
বিশ্বসত্তার শিকড়ে শিকড়ে কেঁপে উঠল প্রাণের চাঞ্চল্য।
কে জানে কোথা হতে একটি অতিসূক্ষ্ম স্বর
সবার কানে কানে বললে,
'চলো সার্থকতার তীর্থে।'
এই বাণী জনতার কণ্ঠে কণ্ঠে
একটি মহৎ প্রেরণায় বেগবান হয়ে উঠল।
পুরুষেরা উপরের দিকে চোখ তুললে।
জোড়হাত মাথায় ঠেকালে মেয়েরা।
শিশুরা করতালি দিয়ে হেসে উঠল।
প্রভাতের প্রথম আলো ভক্তের মাথায় সোনার রঙের চন্দন পরালে;
সবাই বলে উঠল, 'ভাই, আমরা তোমার বন্দনা করি।'

দয়াহীন দুর্গম পথ উপলখণ্ডে আকীর্ণ।
ভক্ত চলেছে, তার পশ্চাতে বলিষ্ঠ এবং শীর্ণ,
তরুণ এবং জরাজর্জর, পৃথিবী শাসন করে যারা
আর যারা অর্ধাশনের মূল্যে মাটি চাষ করে।
কেউ-বা ক্লান্ত বিক্ষতচরণ, কারও মনে ক্রোধ, কারও মনে সন্দেহ।
তারা প্রতি পদক্ষেপ গণনা করে আর শুধায়, কত পথ বাকি।
তার উত্তরে ভক্ত শুধু গান গায়।
শুনে তাদের ভ্রূ কুটিল হয়, কিন্তু ফিরতে পারে না;
চলমান জনপিণ্ডের বেগ এবং অনতিব্যক্ত আশার তাড়না
তাদের ঠেলে নিয়ে যায়।
ঘুম তাদের কমে এল, বিশ্রাম তারা সংক্ষিপ্ত করলে;
পরস্পরকে ছাড়িয়ে চলবার প্রতিযোগিতায় তারা ব্যগ্র;
ভয়, পাছে বিলম্ব করে বঞ্চিত হয়।
দিনের পর দিন গেল।
দিগন্তের পর দিগন্ত আসে,
অজ্ঞাতের আমন্ত্রণ অদৃশ্য সংকেতে ইঙ্গিত করে।
ওদের মুখের ভাব ক্রমেই কঠিন
আর ওদের গঞ্জনা উগ্রতর হতে থাকে।

রাত হয়েছে।
পথিকেরা বটতলায় আসন বিছিয়ে বসল।
একটা দমকা হাওয়ায় প্রদীপ গেল নিবে, অন্ধকার নিবিড়—
যেন নিদ্রা ঘনিয়ে উঠল মূর্ছায়।
জনতার মধ্য থেকে কে-একজন হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে
অধিনেতার দিকে আঙুল তুলে বললে,
'মিথ্যাবাদী, আমাদের প্রবঞ্চনা করেছ।'
ভর্ৎসনা এক কণ্ঠ থেকে আর-এক কণ্ঠে উদগ্র হতে থাকল।
তীব্র হল মেয়েদের বিদ্বেষ, প্রবল হল পুরুষদের তর্জন।
অবশেষে একজন সাহসিক উঠে দাঁড়িয়ে
হঠাৎ তাকে মারলে প্রচণ্ড বেগে।
অন্ধকারে তার মুখ দেখা গেল না।
একজনের পর একজন উঠল, আঘাতের পর আঘাত করলে,
তার প্রাণহীন দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।
রাত্রি নিস্তব্ধ।
ঝরনার কলশব্দ দূর থেকে ক্ষীণ হয়ে আসছে।
বাতাসে যূথীর মৃদু গন্ধ।

যাত্রীদের মন শঙ্কায় অভিভূত।
মেয়েরা কাঁদছে; পুরুষেরা উত্ত্যক্ত হয়ে ভর্ৎসনা করছে, 'চুপ করো!'
কুকুর ডেকে ওঠে; চাবুক খেয়ে আর্ত কাকুতিতে
তার ডাক থেমে যায়।

রাত্রি পোহাতে চায় না।
অপরাধের অভিযোগ নিয়ে মেয়ে পুরুষে তর্ক তীব্র হতে থাকে।
সবাই চীৎকার করে, গর্জন করে;
শেষে যখন খাপ থেকে ছুরি বেরোতে চায়
এমনসময় অন্ধকার ক্ষীণ হল,
প্রভাতের আলো গিরিশৃঙ্গ ছাপিয়ে আকাশ ভরে দিলে।
হঠাৎ সকলে স্তব্ধ।
সূর্যরশ্মির তর্জনী এসে স্পর্শ করল
রক্তাক্ত মৃত মানুষের শান্ত ললাট।
মেয়েরা ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠল, পুরুষেরা মুখ ঢাকল দুই হাতে।
কেউ-বা অলক্ষিতে পালিয়ে যেতে চায়, পারে না;
অপরাধের শৃঙ্খলে আপন বলির কাছে তারা বাঁধা।
পরস্পরকে তারা শুধায়, 'কে আমাদের পথ দেখাবে।'
পূর্বদেশের বৃদ্ধ বললে,
'আমরা যাকে মেরেছি সেই দেখাবে।'
সবাই নিরুত্তর ও নতশির।
বৃদ্ধ আবার বললে, 'সংশয়ে তাকে আমরা অস্বীকার করেছি,
ক্রোধে তাকে আমরা হনন করেছি,
প্রেমে এখন আমরা তাকে গ্রহণ করব—
কেননা, মৃত্যুর দ্বারা সে আমাদের সকলের জীবনের মধ্যে সঞ্জীবিত,
সেই মহামৃত্যুঞ্জয়।'
সকলে দাঁড়িয়ে উঠল; কণ্ঠ মিলিয়ে গান করলে,
'জয় মৃত্যুঞ্জয়ের জয়!'

তরুণের দল ডাক দিল, 'চলো যাত্রা করি, প্রেমের তীর্থে, শক্তির তীর্থে।'
হাজার কণ্ঠের ধ্বনিনির্ঝরে ঘোষিত হল,
'আমরা ইহলোক জয় করব এবং লোকান্তর।'
উদ্দেশ্য সকলের কাছে স্পষ্ট নয়, কেবল আগ্রহে সকলে এক;
মৃত্যুবিপদকে তুচ্ছ করেছে সকলের সম্মিলিত সঞ্চলমান ইচ্ছার বেগ।
তারা আর পথ শুধায় না; তাদের মনে নেই সংশয়,
চরণে নেই ক্লান্তি।
মৃত অধিনেতার আত্মা তাদের অন্তরে বাহিরে;
সে যে মৃত্যুকে উত্তীর্ণ হয়েছে
এবং জীবনের সীমাকে করেছে অতিক্রম।
তারা সেই ক্ষেত্র দিয়ে চলেছে যেখানে বীজ বোনা হল,
সেই ভাণ্ডারের পাশ দিয়ে যেখানে শস্য হয়েছে সঞ্চিত,
সেই অনুর্বর ভূমির উপর দিয়ে
যেখানে কঙ্কালসার দেহ বসে আছে প্রাণের কাঙাল;
তারা চলেছে প্রজাবহুল নগরের পথ দিয়ে,

চলেছে জনশূন্যতার মধ্যে দিয়ে
যেখানে বোবা অতীত তার ভাঙা কীর্তি কোলে নিয়ে নিস্তব্ধ;
চলেছে লক্ষ্মীছাড়াদের জীর্ণ বসতি বেয়ে
আশ্রয় যেখানে আশ্রিতকে বিদ্রূপ করে।

রৌদ্রদগ্ধ বৈশাখের দীর্ঘ প্রহর কাটল পথে পথে।
সন্ধ্যাবেলায় আলোক যখন ম্লান তখন তারা কালজ্ঞকে শুধায়,
'ওই কি দেখা যায় আমাদের চরম আশার তোরণচূড়া।'
সে বলে, 'না, ও যে সন্ধ্যাভ্রশিখরে অস্তগামী সূর্যের বিলীয়মান আভা।'
তরুণ বলে, 'থেমো না বন্ধু, অন্ধতমিস্র রাত্রির মধ্য দিয়ে
আমাদের পৌঁছতে হবে মৃত্যুহীন জ্যোতির্লোকে।'
অন্ধকারে তারা চলে।
পথ যেন নিজের অর্থ নিজে জানে।
পায়ের তলার ধূলিও যেন নীরব স্পর্শে দিক চিনিয়ে দেয়।
স্বর্গপথযাত্রী নক্ষত্রের দল মূক সংগীতে বলে, 'সাথি, অগ্রসর হও।'
অধিনেতার আকাশবাণী কানে আসে, 'আর বিলম্ব নেই।'

গান্ধী মহারাজ

গান্ধী মহারাজের শিষ্য
কেউ-বা ধনী, কেউ-বা নিঃস্ব,
এক জায়গায় আছে মোদের মিল—
গরিব মেরে ভরাই নে পেট,
ধনীর কাছে হই নে তো হেঁট,
আতঙ্কে মুখ হয় না কভু নীল।
ষণ্ডা যখন আসে তেড়ে
উঁচিয়ে ঘুষি ডাণ্ডা নেড়ে
আমরা হেসে বলি জোয়ানটাকে,
'ঐ যে তোমার চোখ-রাঙানো
খোকাবাবুর ঘুম-ভাঙানো,
ভয় না পেলে ভয় দেখাবে কাকে।'
সিধে ভাষায় বলি কথা,
স্বচ্ছ তাহার সরলতা,
ডিপ্লম্যাসির নাইকো অসুবিধে।
গারদখানার আইনটাকে
খুঁজতে হয় না কথার পাকে,
জেলের দ্বারে যায় সে নিয়ে সিধে।

দলে দলে হরিণবাড়ি
চলল যারা গৃহ ছাড়ি
ঘুচল তাদের অপমানের শাপ—
চিরকালের হাতকড়ি যে,
ধুলায় খসে পড়ল নিজে,
লাগল ভালে গান্ধীরাজের ছাপ।

উদয়ন। শান্তিনিকেতন
১৩ ডিসেম্বর ১৯৪০

মহাত্মা গান্ধী

ভারতবর্ষের একটি সম্পূর্ণ ভৌগোলিক মূর্তি আছে। এর পূর্বপ্রান্ত থেকে পশ্চিমপ্রান্ত এবং উত্তরে হিমালয় থেকে দক্ষিণে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত যে-একটি সম্পূর্ণতা বিদ্যমান, প্রাচীন কালে তার ছবি অন্তরে গ্রহণ করার ইচ্ছে দেশে ছিল, দেখতে পাই। একসময়, দেশের মনে নানা কালে নানা স্থানে যা বিচ্ছিন্ন হয়ে ছিল তা সংগ্রহ করে, এক করে দেখবার চেষ্টা, মহাভারতে খুব সুস্পষ্ট ভাবে জাগ্রত দেখি। তেমনি ভারতবর্ষের ভৌগোলিক স্বরূপকে অন্তরে উপলব্ধি করবার একটি অনুষ্ঠান ছিল, সে তীর্থভ্রমণ। দেশের পূর্বতম অঞ্চল থেকে পশ্চিমতম অঞ্চল এবং হিমালয় থেকে সমুদ্র পর্যন্ত সর্বত্র এর পবিত্র পীঠস্থান রয়েছে, সেখানে তীর্থ স্থাপিত হয়ে একটি ভক্তির ঐক্যজালে সমস্ত ভারতবর্ষকে মনের ভিতরে আনবার সহজ উপায় সৃষ্টি করেছে।

ভারতবর্ষ একটি বৃহৎ দেশ। একে সম্পূর্ণ ভাবে মনের ভিতর গ্রহণ করা প্রাচীন কালে সম্ভবপর ছিল না। আজ সার্ভে করে, মানচিত্র এঁকে, ভূগোলবিবরণ গ্রথিত করে ভারতবর্ষের যে ধারণা মনে আনা সহজ হয়েছে, প্রাচীন কালে তা ছিল না। এক হিসাবে সেটা ভালোই ছিল। সহজ ভাবে যা পাওয়া যায় মনের ভিতরে তা গভীর ভাবে মুদ্রিত হয় না। সেইজন্য কৃচ্ছ্রসাধন করে ভারত-পরিক্রমা দ্বারা যে অভিজ্ঞতা লাভ হত তা সুগভীর, এবং মন থেকে সহজে দূর হত না।

মহাভারতের মাঝখানে গীতা প্রাচীনের সেই সমন্বয়তত্ত্বকে উজ্জ্বল করে। কুরুক্ষেত্রের কেন্দ্রস্থলে এই-যে খানিকটা দার্শনিক ভাবে আলোচনা, এটাকে কাব্যের দিক থেকে অসংগত বলা যেতে পারে; এমনও বলা যেতে পারে যে, মূল মহাভারতে এটা ছিল না। পরে যিনি বসিয়েছেন তিনি জানতেন যে, উদার কাব্য-পরিধির মধ্যে, ভারতের চিত্তভূমির মাঝখানে এই তত্ত্বকথার অবতারণা করার প্রয়োজন ছিল। সমস্ত ভারতবর্ষকে অন্তরে বাহিরে উপলব্ধি করবার প্রয়াস ছিল ধর্মানুষ্ঠানেরই অন্তর্গত। মহাভারতপাঠ যে আমাদের দেশে ধর্মকর্মের মধ্যে গণ্য হয়েছিল তা কেবল তত্ত্বের দিক থেকে নয়, দেশকে উপলব্ধি করার জন্যও এর কর্তব্যতা আছে। আর, তীর্থযাত্রীরাও ক্রমাগত ঘুরে ঘুরে দেশকে স্পর্শ করতে করতে অত্যন্ত অন্তরঙ্গ ভাবে ক্রমশ এর ঐক্যরূপ মনের ভিতরে গ্রহণ করবার চেষ্টা করেছেন।

এ হল পুরাতন কালের কথা।

পুরাতন কালের পরিবর্তন হয়েছে। আজকাল দেশের মানুষ আপনার প্রাদেশিক কোণের ভিতর সংকীর্ণতার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকে। সংস্কার ও লোকাচারের জালে আমরা জড়িত, কিন্তু মহাভারতের প্রশস্ত ক্ষেত্রে একটা মুক্তির হাওয়া আছে। এই মহাকাব্যের বিরাট প্রাঙ্গণে মনস্তত্ত্বের কত পরীক্ষা। যাকে আমরা সাধারণত নিন্দনীয় বলি, সেও এখানে স্থান পেয়েছে। যদি আমাদের মন প্রস্তুত থাকে, তবে অপরাধ দোষ সমস্ত অতিক্রম করে মহাভারতের বাণী উপলব্ধি করতে পারা যেতে পারে। মহাভারতে একটা উদাত্ত শিক্ষা আছে; সেটা নঙর্থক নয়, সদর্থক, অর্থাৎ তার মধ্যে একটা হাঁ আছে। বড়ো বড়ো সব বীরপুরুষ আপন মাহাত্ম্যের গৌরবে উন্নতশির, তাঁদেরও দোষ ত্রুটি রয়েছে, কিন্তু সেই-সমস্ত দোষ ত্রুটিকে আত্মসাৎ করেই তাঁরা বড়ো হয়ে উঠেছেন। মানুষকে যথার্থ ভাবে বিচার করবার এই প্রকাণ্ড শিক্ষা আমরা মহাভারত থেকে পাই।

পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতির সঙ্গে আমাদের যোগ হবার পর থেকে আরও কিছু চিন্তনীয় বিষয় এসে পড়েছে যেটা আগে ছিল না। পুরাকালের ভারতে দেখি স্বভাবত বা কার্যত যারা পৃথক তাদের আলাদা শ্রেণীতে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। তবু খণ্ডিত করেও একটা ঐক্যসাধনের প্রচেষ্টা ছিল। সহসা পশ্চিমের সিংহদ্বার ভেদ করে শত্রুর আগমন হল। আর্যরা ওই পথেই এসে একদিন পঞ্চনদীর তীরে উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন, এবং তার পরে বিন্ধ্যাচল অতিক্রম করে ক্রমে ক্রমে সমস্ত ভারতবর্ষে নিজেদের পরিব্যাপ্ত করেছিলেন। ভারত তখন গান্ধার প্রভৃতি পারিপার্শ্বিক প্রদেশ-সুদ্ধ একটি সমগ্র সংস্কৃতিতে পরিবেষ্টিত থাকায়, বাইরের আঘাত লাগে নি। তার পরে একদিন এল বাইরের থেকে সংঘাত। সে সংঘাত বিদেশীর; তাদের সংস্কৃতি পৃথক। যখন তারা এল তখন দেখা গেল যে, আমরা একত্র ছিলুম, অথচ এক হই নি। তাই সমস্ত ভারতবর্ষে বিদেশী আক্রমণের একটা প্লাবন বয়ে গেল। তার পর থেকে আমাদের দিন কাটছে দুঃখ ও অপমানের গ্লানিতে। বিদেশী আক্রমণের সুযোগ নিয়ে একে অন্যের সঙ্গে যোগ দিয়ে নিজের প্রভাব বিস্তার করেছে কেউ, কেউ-বা খণ্ড খণ্ড জায়গায় বিশৃঙ্খল ভাবে বিদেশীদের বাধা দেবার চেষ্টা করেছে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করার জন্যে। কিছুতেই তো সফলকাম হওয়া গেল না। রাজপুতনায়, মারাঠায়, বাংলাদেশে, যুদ্ধবিগ্রহ অনেক কাল শান্ত হয় নি। এর কারণ এই যে, যত বড়ো দেশ ঠিক তত বড়ো ঐক্য হল না; দুর্ভাগ্যের ভিতর দিয়ে আমরা অভিজ্ঞতা লাভ করলেম বহু শতাব্দী পরে। বিদেশী আক্রমণের পথ প্রশস্ত হল এই অনৈক্যের সুবিধা নিয়ে। নিকটের শত্রুর পর হুড়মুড় করে এসে পড়ল সমুদ্র পাড়ি দিয়ে বিদেশী শত্রু তাদের বাণিজ্যতরী নিয়ে; এল পর্তুগীজ, এল ওলন্দাজ, এল ফ্রেঞ্চ, এল ইংরেজ। সকলে এসে সবলে ধাক্কা মারলে; দেখতে পেল যে, এমন কোনো বেড়া নেই যেটা দুর্লঙ্ঘ্য। আমাদের সম্পদ সম্বল সব দিতে লাগলুম, আমাদের বিদ্যাবুদ্ধির ক্ষীণতা এল, চিত্তের দিক দিয়ে সম্বলহীন রিক্ত হয়ে পড়লুম। এমনি করেই বাইরের নিঃস্বতা ভিতরেও নিঃস্বতা আনে।

এইরকম দুঃসময়ে আমাদের সাধক পুরুষদের মনে যে চিন্তার উদয় হয়েছিল সেটা হচ্ছে, পরমার্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে ভারতের স্বাতন্ত্র্য উদ্‌বোধিত করার একটা আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টা। তখন থেকে আমাদের সমস্ত মন গেছে পারমার্থিক পুণ্য-উপার্জনের দিকে। আমাদের পার্থিব সম্পদ পৌঁছয় নি সেখানে যেখানে যথার্থ

দৈন্য ও শিক্ষার অভাব। পারমার্থিক সম্বলটুকুর লোভে যে পার্থিব সম্বল খরচ করি সেটা যায় মোহান্ত ও পাণ্ডাদের গর্বস্ফীত জঠরের মধ্যে। এতে ভারতের ক্ষয় ছাড়া বৃদ্ধি হচ্ছে না।

বিপুল ভারতবর্ষের বিরাট জনসমাজের মধ্যে আর-এক শ্রেণীর লোক আছেন যাঁরা জপ তপ ধ্যান ধারণা করার জন্যে মানুষকে পরিত্যাগ করে দারিদ্র্য ও দুঃখের হাতে সংসারকে ছেড়ে দিয়ে চলে যান। এই অসংখ্য উদাসীনমণ্ডলীর এই মুক্তিকামীদের অন্ন জুটিয়েছে তারা যারা এঁদের মতে মোহগ্রস্ত সংসারাসক্ত। একবার কোনো গ্রামের মধ্যে এইরকম এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল। তাঁকে বলেছিলুম, ‘গ্রামের মধ্যে দুষ্কৃতিকারী, দুঃখী, পীড়াগ্রস্ত যারা আছে, এদের জন্যে আপনারা কিছু করবেন না কেন।’ আমার এই প্রশ্ন শুনে তিনি বিস্মিত ও বিরক্ত হয়েছিলেন; বললেন, ‘কী। যারা সাংসারিক মোহগ্রস্ত লোক, তাদের জন্যে ভাবতে হবে আমায়! আমি একজনা সাধক, বিশুদ্ধ আনন্দের জন্যে ওই সংসার ছেড়ে এসেছি, আবার ওর মধ্যে নিজেকে জড়াব!’ এই কথাটি যিনি বলেছিলেন তাঁকে এবং তাঁরই মতো অন্য সকল সংসারে-বীতস্পৃহ উদাসীনদের ডেকে জিগ্যেস করতে ইচ্ছে হয় যে, তাঁদের তৈলচিক্কণ নধর কান্তির পরিপুষ্টি সাধন করল কে। যাদেরকে ওঁরা পাপী ও হেয় বলে ত্যাগ করে এসেছেন সেই সংসারী লোকই ওঁদের অন্ন জুটিয়েছে। পরলোকের দিকে ক্রমাগত দৃষ্টি দিয়ে কতখানি শক্তির অপচয় হয়েছে তা বলা যায় না। বহু শতাব্দী ধরে ভারতের এই দুর্বলতা চলে আসছে। এর যা শাস্তি, ইহলোকের বিধাতা সে শাস্তি আমাদের দিয়েছেন। তিনি আমাদের হুকুম দিয়ে পাঠিয়েছেন সেবার দ্বারা, ত্যাগের দ্বারা, এই সংসারের উপযোগী হতে হবে। সে হুকুমের অবমাননা করেছি, সুতরাং শাস্তি পেতেই হবে।

সম্প্রতি ইউরোপে স্বাতন্ত্র্যপ্রতিষ্ঠার একটা চেষ্টা চলেছে। ইতালি এক সময়ে বিদেশীর কবলে ধিক্‌কৃত জীবন যাপন করেছিল; তার পরে ইতালির ত্যাগী যাঁরা, যাঁরা বীর, ম্যাজিনি ও গ্যারিবল্ডি, বিদেশীর অধীনতা-জাল থেকে মুক্তিদান করে নিজেদের দেশকে স্বাতন্ত্র্য দান করেছেন। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রেও দেখেছি এই স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করবার জন্যে কত দুঃখ, কত চেষ্টা, কত সংগ্রাম হয়েছে। মানুষকে মনুষ্যোচিত অধিকার দেবার জন্যে পাশ্চাত্ত্য দেশে কত লোক আপনাদের বলি দিয়েছে। বিভাগ সৃষ্টি করে পরস্পরকে যে অপমান করা হয়, সেটার বিরুদ্ধে পাশ্চাত্ত্যে আজও বিদ্রোহ চলছে। ও দেশের কাছে জনসাধারণ, সর্বসাধারণ, মানবগৌরবের অধিকারী; কাজেই রাষ্ট্রতন্ত্রের যাবতীয় অধিকার সর্বসাধারণের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হয়েছে। ও দেশের আইনের কাছে ধনী দরিদ্র ব্রাহ্মণ শূদ্রের প্রভেদ নেই। একতাবদ্ধ হয়ে স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার শিক্ষা আমরা পাশ্চাত্ত্যের ইতিহাস থেকে পেয়েছি। সমস্ত ভারতবাসী যাতে আপন দেশকে আপনি নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার পায়, এই যে ইচ্ছে এটা আমরা পশ্চিম থেকে পেয়েছি। এত দিন ধরে আমরা নিজেদের গ্রাম ও প্রতিবাসীদের নিয়ে খণ্ড খণ্ড ভাবে ছোটোখাটো ক্ষুদ্র পরিধির ভিতর কাজ করেছি ও চিন্তা করেছি। গ্রামে জলাশয় ও মন্দির প্রতিষ্ঠা করে নিজেদের সার্থক মনে করেছি, এবং এই গ্রামকেই আমরা জন্মভূমি বা মাতৃভূমি বলেছি। ভারতকে মাতৃভূমি বলে স্বীকার করার অবকাশ হয় নি। প্রাদেশিকতার জালে জড়িত ও দুর্বলতায় অভিভূত হয়ে আমরা যখন পড়ে ছিলুম তখন রানাডে সুরেন্দ্রনাথ, গোখলে প্রমুখ মহদাশয় লোকেরা এলেন জনসাধারণকে গৌরব দান করার জন্যে। তাঁদের আরব্ধ সাধনাকে যিনি প্রবল শক্তিতে দ্রুত বেগে আশ্চর্য

সিদ্ধির পথে নিয়ে গেছেন সেই মহাত্মার কথা স্মরণ করতে আমরা আজ এখানে সমবেত হয়েছি— তিনি হচ্ছেন মহাত্মা গান্ধী।

অনেকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন, ইনিই কি প্রথম এলেন। তার পূর্বে কংগ্রেসের ভিতরে কি আরও অনেকে কাজ করেন নি। কাজ করেছেন সত্য, কিন্তু তাঁদের নাম করলেই দেখতে পাই যে, কত ম্লান তাঁদের সাহস, কত ক্ষীণ তাঁদের কণ্ঠধ্বনি।

আগেকার যুগে কংগ্রেসওয়ালারা আমলাতন্ত্রের কাছে কখনও নিয়ে যেতেন আবেদন-নিবেদনের ডালা, কখনও-বা করতেন চোখরাঙানির মিথ্যে ভান। ভেবেছিলেন তাঁরা যে, কখনও তীক্ষ্ণ কখনও সুমধুর বাক্যবাণ নিক্ষেপ করে তাঁরা ম্যাজিনি-গ্যারিবল্ডির সমগোত্রীয় হবেন। সে ক্ষীণ অবাস্তব শৌর্য নিয়ে আজ আমাদের গৌরব করার মতো কিছুই নেই। আজ যিনি এসেছেন তিনি রাষ্ট্রীয় স্বার্থের কলুষ থেকে মুক্ত। রাষ্ট্রতন্ত্রের অনেক পাপ ও দোষের মধ্যে একটি প্রকাণ্ড দোষ হল এই স্বার্থান্বেষণ। হোক-না রাষ্ট্রীয় স্বার্থ খুব বড়ো স্বার্থ, তবু স্বার্থের যা পঙ্কিলতা তা তার মধ্যে না এসে পারেই না। পোলিটিশ্যান বলে একটা জাত আছে, তাদের আদর্শ বড়ো আদর্শের সঙ্গে মেলে না। তারা অজস্র মিথ্যা বলতে পারে; তারা এত হিংস্র যে নিজেদের দেশকে স্বাতন্ত্র্য দেবার অছিলায় অন্য দেশ অধিকার করার লোভ ত্যাগ করতে পারে না। পাশ্চাত্ত্য দেশে দেখি, এক দিকে তারা দেশের জন্যে প্রাণ দিতে পেরেছে, অন্য দিকে আবার দেশের নাম করে দুর্নীতির প্রশ্রয় দিয়েছে।

পাশ্চাত্ত্য দেশ একদিন যে মুষল প্রসব করেছে আজ তারই শক্তি ইউরোপের মস্তকের উপর উদ্যত হয়ে আছে। আজকে এমন অবস্থা হয়েছে যে সন্দেহ হয়, আজ বাদে কাল ইউরোপীয় সভ্যতা টিকবে কি না। তারা যাকে পেট্রিয়টিজ্‌ম্‌ বলছে সেই পেট্রিয়টিজ্‌ম্‌ই তাদের নিঃশেষে মারবে। তারা যখন মরবে তখন অবশ্য আমাদের মতো নির্জীব ভাবে মরবে না, ভয়ংকর অগ্নি উৎপাদন করে একটা ভীষণ প্রলয়ের মধ্যে তারা মরবে।

আমাদের মধ্যেও অসত্য এসেছে; দলাদলির বিষ ছড়িয়েছেন পোলিটিশ্যানের জাতীয় যাঁরা। আজ এই পলিটিক্স্‌ থেকেই ছাত্রছাত্রীর মধ্যেও দলাদলির বিষ প্রবেশ করেছে। পোলিটিশ্যানরা কেজো লোক; তাঁরা মনে করেন যে, কার্য উদ্ধার করতে হলে মিথ্যার প্রয়োজন আছে। কিন্তু বিধাতার বিধানে সে ছলচাতুরী ধরা পড়বে। পোলিটিশ্যানদের, এ-সব চতুর বিষয়ীদের, আমরা প্রশংসা করতে পারি কিন্তু ভক্তি করতে পারি না। ভক্তি করতে পারি মহাত্মাকে, যাঁর সত্যের সাধনা আছে। মিথ্যার সঙ্গে মিলিত হয়ে তিনি সত্যের সার্বভৌমিক ধর্মনীতিকে অস্বীকার করেন নি। ভারতের যুগসাধনায় এ একটা পরম সৌভাগ্যের বিষয়। এই একটি লোক যিনি সত্যকে সকল অবস্থায় মেনেছেন, তাতে আপাতত সুবিধে হোক বা না হোক; তাঁর দৃষ্টান্ত আমাদের কাছে মহৎ দৃষ্টান্ত। পৃথিবীতে স্বাধীনতা এবং স্বাতন্ত্র্য -লাভের ইতিহাস রক্তধারায় পঙ্কিল, অপহরণ ও দস্যুবৃত্তির দ্বারা কলঙ্কিত। কিন্তু পরস্পরকে হনন না করে, হত্যাকাণ্ডের আশ্রয় না নিয়েও যে স্বাধীনতা লাভ করা যেতে পারে, তিনি তার পথ দেখিয়েছেন। লোকে অপহরণ করেছে, বিজ্ঞান দস্যুবৃত্তি করেছে দেশের নামে। দেশের নাম নিয়ে এই-যে তাদের গৌরব, এ গর্ব টিকবে না তো। আমাদের মধ্যে এমন লোক খুব কমই আছেন যাঁরা হিংস্রতাকে মন থেকে দূর করে দেখতে পারেন। এই হিংসা-

প্রবৃত্তি স্বীকার না করেও আমরা জয়ী হব, এ কথা আমরা মানি কি। মহাত্মা যদি বীরপুরুষ হতেন কিংবা লড়াই করতেন তবে আমরা এমনি করে আজ ওঁকে স্মরণ করতুম না। কারণ, লড়াই করার মতো বীরপুরুষ এবং বড়ো বড়ো সেনাপতি পৃথিবীতে অনেক জন্মগ্রহণ করেছেন। মানুষের যুদ্ধ ধর্মযুদ্ধ, নৈতিক যুদ্ধ। ধর্মযুদ্ধের ভিতরেও নিষ্ঠুরতা আছে, তা গীতা ও মহাভারতে পেয়েছি। তার মধ্যে বাহুবলেরও স্থান আছে কি না এ নিয়ে শাস্ত্রের তর্ক তুলব না। কিন্তু এই-যে একটা অনুশাসন, মরব তবু মারব না, এবং এই করেই জয়ী হব—এ একটা মস্ত বড়ো কথা, একটা বাণী। এটা চাতুরী কিংবা কার্যোদ্ধারের বৈষয়িক পরামর্শ নয়। ধর্মযুদ্ধ বাইরে জেতবার জন্য নয়, হেরে গিয়েও জয় করবার জন্য। অধর্মযুদ্ধে মরাটা মরা। ধর্মযুদ্ধে মরার পরেও অবশিষ্ট থাকে; হার পেরিয়ে থাকে জিত, মৃত্যু পেরিয়ে অমৃত। যিনি এই কথাটা নিজের জীবনে উপলব্ধি করে স্বীকার করেছেন, তাঁর কথা শুনতে আমরা বাধ্য।

এর মূলে একটা শিক্ষার ধারা আছে। ইউরোপে আমরা স্বাধীনতার কলুষ ও স্বাদেশিকতার বিষাক্ত রূপ দেখতে পাই। অবশ্য, আরম্ভে তারা অনেক ফল পেয়েছে, অনেক ঐশ্বর্য লাভ করেছে। সেই পাশ্চাত্ত্য দেশে খৃস্টধর্মকে শুধু মৌখিক ভাবে গ্রহণ করেছে। খৃস্টধর্মে মানবপ্রেমের বড়ো উদাহরণ আছে: ভগবান মানুষ হয়ে মানুষের দেহে যত দুঃখ পাপ সব আপন দেহে স্বীকার করে নিয়ে মানুষকে বাঁচিয়েছেন—এই ইহলোকেই, পরলোকে নয়। যে সকলের চেয়ে দরিদ্র তাকে বস্ত্র দিতে হবে, যে নিরন্ন তাকে অন্ন দিতে হবে, এ কথা খৃস্টধর্মে যেমন সুস্পষ্ট ভাবে বলা হয়েছে এমন আর কোথাও নয়।

মহাত্মাজি এমন একজন খৃস্টসাধকের সঙ্গে মিলতে পেরেছিলেন, যাঁর নিয়ত প্রচেষ্টা ছিল মানবের ন্যায্য অধিকারকে বাধামুক্ত করা। সৌভাগ্যক্রমে সেই ইউরোপীয় ঋষি টলস্টয়ের কাছ থেকে মহাত্মা গান্ধী খৃস্টানধর্মের অহিংস্রনীতির বাণী যথার্থ ভাবে লাভ করেছিলেন। আরও সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, এ বাণী এমন একজন লোকের যিনি সংসারের বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতার ফলে এই অহিংস্রনীতির তত্ত্ব আপন চরিত্রে উদ্ভাবিত করেছিলেন। মিশনারি অথবা ব্যবসায়ী প্রচারকের কাছে মানবপ্রেমের বাঁধা বুলি তাঁকে শুনতে হয় নি। খৃস্টবাণীর এই একটি বড়ো দান আমাদের পাবার অপেক্ষা ছিল। মধ্যযুগে মুসলমানদের কাছ থেকেও আমরা একটি দান পেয়েছি। দাদূ, কবীর, রজ্জব প্রভৃতি সাধুরা প্রচার করে গিয়েছেন যে, যা নির্মল, যা মুক্ত, যা আত্মার শ্রেষ্ঠ সামগ্রী, তা রুদ্ধদ্বার মন্দিরে কৃত্রিম অধিকারীবিশেষের জন্যে পাহারা-দেওয়া নয়; তা নির্বিচারে সর্বমানবেরই সম্পদ। যুগে যুগে এইরূপই ঘটে। যাঁরা মহাপুরুষ তাঁরা সমস্ত পৃথিবীর দানকে আপন মাহাত্ম্য দ্বারাই গ্রহণ করেন, এবং গ্রহণ করার দ্বারা তাকে সত্য করে তোলেন। আপন মাহাত্ম্য দ্বারাই পৃথুরাজা পৃথিবীকে দোহন করেছিলেন রত্ন আহরণ করবার জন্যে। যাঁরা শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ তাঁরা সকল ধর্ম ইতিহাস ও নীতি থেকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দান গ্রহণ করেন।

খৃস্টবাণীর শ্রেষ্ঠ নীতি বলে যে, যারা নম্র তারা জয়ী হয়; আর খৃস্টানজাতি বলে, নিষ্ঠুর ঔদ্ধত্যের দ্বারা জয়লাভ করা যায়। এর মধ্যে কে জয়ী হবে ঠিক করে জানা যায় নি; কিন্তু উদাহরণস্বরূপ দেখা যায় যে, ঔদ্ধত্যের ফলে ইউরোপে কী মহামারীই না হচ্ছে। মহাত্মা নম্র অহিংস্রনীতি গ্রহণ করেছেন, আর চতুর্দিকে তাঁর জয় বিস্তীর্ণ হচ্ছে। তিনি যে নীতি তাঁর সমস্ত জীবন দিয়ে প্রমাণ করছেন,

সম্পূর্ণ পারি বা না পারি, সে নীতি আমাদের স্বীকার করতেই হবে। আমাদের অন্তরে ও আচরণে রিপু ও পাপের সংগ্রাম আছে, তা সত্ত্বেও পুণ্যের তপস্যার দীক্ষা নিতে হবে সত্যব্রত মহাত্মার নিকটে। আজকের দিন স্মরণীয় দিন, কারণ সমস্ত ভারতে রাষ্ট্রীয় মুক্তির দীক্ষা ও সত্যের দীক্ষা এক হয়ে গেছে সর্বসাধারণের কাছে।

শান্তিনিকেতন
১৬ আশ্বিন ১৩৪৪

গান্ধীজি

আজ মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিবসে আশ্রমবাসী আমরা সকলে আনন্দোৎসব করব। আমি আরম্ভের সুরটুকু ধরিয়ে দিতে চাই।

আধুনিক কালে এই রকমের উৎসব অনেকখানি বাহ্য অভ্যাসের মধ্যে দাঁড়িয়েছে। খানিকটা ছুটি ও অনেকখানি উত্তেজনা দিয়ে এটা তৈরি। এইরকম চাঞ্চল্যে এই-সকল উপলক্ষের গভীর তাৎপর্য অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করবার সুযোগ বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়।

ক্ষণজন্মা লোক যাঁরা তাঁরা শুধু বর্তমান কালের নন। বর্তমানের ভূমিকার মধ্যে ধরাতে গেলে তাঁদের অনেকখানি ছোটো করে আনতে হয়, এমনি করে বৃহৎকালের পরিপ্রেক্ষিতে যে শাশ্বত মূর্তি প্রকাশ পায় তাকে খর্ব করি। আমাদের আশু প্রয়োজনের আদর্শে তাঁদের মহত্ত্বকে নিঃশেষিত করে বিচার করি। মহাকালের পটে যে ছবি ধরা পড়ে, বিধাতা তার থেকে প্রাত্যহিক জীবনের আত্মবিরোধ ও আত্মখণ্ডনের অনিবার্য কুটিল ও বিচ্ছিন্ন রেখাগুলি মুছে দেন, যা আকস্মিক ও ক্ষণকালীন তাকে বিলীন করেন; আমাদের প্রণম্য যাঁরা তাঁদের একটি সংহত সম্পূর্ণ মূর্তি সংসারে চিরন্তন হয়ে থাকে। যাঁরা আমাদের কালে জীবিত তাঁদেরকেও এই ভাবে দেখবার প্রয়াসেই উৎসবের সার্থকতা।

আজকের দিনে ভারতবর্ষে যে রাষ্ট্রিক বিরোধ পরশুদিন হয়তো তা থাকবে না, সাময়িক অভিপ্রায়গুলি সময়ের স্রোতে কোথায় লুপ্ত হবে। ধরা যাক, আমাদের রাষ্ট্রিক সাধনা সফল হয়েছে, বাহিরের দিক থেকে চাইবার আর কিছুই নেই, ভারতবর্ষ মুক্তিলাভ করল—তৎসত্ত্বেও আজকের দিনের ইতিহাসের কোন্ আত্মপ্রকাশটি ধূলির আকর্ষণ বাঁচিয়ে উপরে মাথা তুলে থাকবে সেইটিই বিশেষ করে দেখবার যোগ্য। সেই দিক থেকে যখন দেখতে যাই তখন বুঝি, আজকের উৎসবে যাঁকে নিয়ে আমরা আনন্দ করছি তাঁর স্থান কোথায়, তাঁর বিশিষ্টতা কোন্‌খানে। কেবলমাত্র রাষ্ট্রনৈতিক প্রয়োজনসিদ্ধির মূল্য আরোপ করে তাঁকে আমরা দেখব না, যে দৃঢ়শক্তির বলে তিনি আজ সমগ্র ভারতবর্ষকে প্রবল ভাবে সচেতন করেছেন সেই শক্তির মহিমাকে আমরা উপলব্ধি করব। প্রচণ্ড এই শক্তি, সমস্ত দেশের বুকজোড়া জড়ত্বের জগদ্দল পাথরকে আজ নাড়িয়ে দিয়েছে; কয়েক বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষের যেন রূপান্তর জন্মান্তর ঘটে গেল। ইনি আসবার পূর্বে, দেশ ভয়ে আচ্ছন্ন, সংকোচে অভিভূত ছিল; কেবল ছিল অন্যের

অনুগ্রহের জন্য আবদার আবেদন, মজ্জায় মজ্জায় আপনার 'পরে আস্থাহীনতার দৈন্য।

ভারতবর্ষের বাহির থেকে যারা আগন্তুকমাত্র তাদেরই প্রভাব হবে বলশালী, দেশের ইতিহাস বেয়ে যুগপ্রবাহিত ভারতের প্রাণধারা চিত্তধারা সেইটেই হবে ম্লান, যেন সেইটেই আকস্মিক—এর চেয়ে দুর্গতির কথা আর কী হতে পারে। সেবার দ্বারা, জ্ঞানের দ্বারা, মৈত্রীর দ্বারা, দেশকে ঘনিষ্ঠ ভাবে উপলব্ধি করবার বাধা ঘটাতে যথার্থই আমরা পরবাসী হয়ে পড়েছি। শাসনকর্তাদের শিক্ষাপ্রণালী রাষ্ট্রব্যবস্থা, ওদের তলোয়ার বন্দুক নিয়ে, ভারতে ওরাই হল মুখ্য; আর আমরাই হলুম গৌণ—মোহাভিভূত মনে এই কথাটির স্বীকৃতি অল্প কাল পূর্ব পর্যন্ত আমাদের সকলকে তামসিকতায় জড়বুদ্ধি করে রেখেছিল। স্থানে স্থানে লোকমান্য তিলকের মতো জনকতক সাহসী পুরুষ জড়ত্বকে প্রাণপণে আঘাত করেছেন, এবং আত্মশ্রদ্ধার আদর্শকে জাগিয়ে তোলবার কাজে ব্রতী হয়েছেন, কিন্তু কর্মক্ষেত্রে এই আদর্শকে বিপুল ভাবে প্রবল প্রভাবে প্রয়োগ করলেন মহাত্মা গান্ধী। ভারতবর্ষের স্বকীয় প্রতিভাকে অন্তরে উপলব্ধি করে তিনি অসামান্য তপস্যার তেজে নূতন যুগগঠনের কাজে নামলেন। আমাদের দেশে আত্মপ্রকাশের ভয়হীন অভিযান এত দিনে যথোপযুক্ত রূপে আরম্ভ হল।

এত কাল আমাদের নিঃসাহসের উপরে দুর্গ বেঁধে বিদেশী বণিকরাজ সাম্রাজ্যিকতার ব্যাবসা চালিয়েছে। অস্ত্রশস্ত্র সৈন্যসামন্ত ভালো করে দাঁড়াবার জায়গা পেত না যদি আমাদের দুর্বলতা তাকে আশ্রয় না দিত। পরাভবের সবচেয়ে বড়ো উপাদান আমরা নিজের ভিতর থেকেই জুগিয়েছি। এই আমাদের আত্মকৃত পরাভব থেকে মুক্তি দিলেন মহাত্মাজি; নববীর্যের অনুভূতির বন্যাধারা ভারতবর্ষে প্রবাহিত করলেন। এখন শাসনকর্তারা উদ্যত হয়েছেন আমাদের সঙ্গে রফানিষ্পত্তি করতে; কেননা তাঁদের পরশাসনতন্ত্রের গভীরতর ভিত্তি টলেছে, যে ভিত্তি আমাদের বীর্যহীনতায়। আমরা অনায়াসে আজ জগৎসমাজে আমাদের স্থান দাবি করছি।

তাই আজ আমাদের জানতে হবে, যে মানুষ বিলেতে গিয়ে রাউন্ড্ টেব্‌ল্ কন্‌ফারেন্সে তর্কযুদ্ধে যোগ দিয়েছেন, যিনি খদ্দর চরকা প্রচার করেন, যিনি প্রচলিত চিকিৎসাশাস্ত্রে বৈজ্ঞানিক-যন্ত্রপাতিতে বিশ্বাস করেন বা করেন না—এই-সব মতামত ও কর্মপ্রণালীর মধ্যে যেন এই মহাপুরুষকে সীমাবদ্ধ করে না দেখি। সাময়িক যে-সব ব্যাপারে তিনি জড়িত তাতে তাঁর ত্রুটিও ঘটতে পারে, তা নিয়ে তর্কও চলতে পারে—কিন্তু, এহ বাহ্য। তিনি নিজে বারংবার স্বীকার করেছেন, তাঁর ভ্রান্তি হয়েছে; কালের পরিবর্তনে তাঁকে মত বদলাতে হয়েছে। কিন্তু এই-যে অবিচলিত নিষ্ঠা যা তাঁর সমস্ত জীবনকে অচলপ্রতিষ্ঠ করে তুলেছে এই-যে অপরাজেয় সংকল্পশক্তি, এ তাঁর সহজাত, কর্ণের সহজাত কবচের মতো—এই শক্তির প্রকাশ মানুষের ইতিহাসে চিরস্থায়ী সম্পদ। প্রয়োজনের সংসারে নিত্য-পরিবর্তনের ধারা বয়ে চলেছে, কিন্তু সকল প্রয়োজনকে অতিক্রম করে যে মহাজীবনের মহিমা আজ আমাদের কাছে উদ্‌ঘাটিত হল তাকেই যেন আমরা শ্রদ্ধা করতে শিখি।

মহাত্মাজির জীবনের এই তেজ আজ সমগ্র দেশে সঞ্চারিত হয়েছে, আমাদের ম্লানতা মার্জনা করে দিচ্ছে। তাঁর এই তেজোদ্দীপ্ত সাধকের মূর্তিই মহাকালের আসনকে অধিকার করে আছেন। বাধা-বিপত্তিকে তিনি মানেন নি, নিজের ভ্রমে

তাঁকে খর্ব করে নি, সাময়িক উত্তেজনার ভিতরে থেকেও তার ঊর্ধ্বে তাঁর মন অপ্রমত্ত। এই বিপুল চরিত্রশক্তির আধার যিনি তাঁকেই আজ তাঁর জন্মদিনে আমরা নমস্কার করি।

পরিশেষে আমার বলবার কথা এই যে, পূর্বপুরুষের পুনরাবৃত্তি করা মনুষ্যধর্ম নয়। জীবজন্তু তাদের জীর্ণ অভ্যাসের বাসাকে আঁকড়ে ধরে থাকে; মানুষ যুগে যুগে নব নব সৃষ্টিতে আত্মপ্রকাশ করে, পুরাতন সংস্কারে কোনো দিন তাকে বেঁধে রাখতে পারে না। মহাত্মাজি ভারতবর্ষের বহুযুগব্যাপী অন্ধতা মূঢ় আচারের বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ এক দিক থেকে জাগিয়ে তুলেছেন, আমাদের সাধনা হোক সকল দিক থেকেই তাকে প্রবল করে তোলা। জাতিভেদ, ধর্মবিরোধ, মূঢ় সংস্কারের আবর্তে যত দিন আমরা চালিত হতে থাকব তত দিন কার সাধ্য আমাদের মুক্তি দেয়। কেবল ভোটের সংখ্যা এবং পরস্পরের স্বত্বের চুলচেরা হিসাব গণনা করে কোনো জাত দুর্গতি থেকে উদ্ধার পায় না। যে জাতির সামাজিক ভিত্তি বাধায় বিরোধে শতছিদ্র হয়ে আছে, যারা পঞ্জিকায় ঝুড়ি ঝুড়ি আবর্জনা বহন করে বেড়ায়, বিচারশক্তিহীন মূঢ় চিত্তে বিশেষ ক্ষণের বিশেষ জলে পুরুষানুক্রমিক পাপক্ষালন করতে ছোটে, যারা আত্মবুদ্ধি-আত্মশক্তির অবমাননাকে আপ্তবাক্যের নাম দিয়ে আদরে পোষণ করছে, তারা কখনও এমন সাধনাকে স্থায়ী ও গভীর ভাবে বহন করতে পারে না যে সাধনায় অন্তরে বাহিরে পরদাসত্বের বন্ধন ছেদন করতে পারে, যার দ্বারা স্বাধীনতার দুরূহ দায়িত্বকে সকল শত্রুর হাত থেকে দৃঢ় শক্তিতে রক্ষা করতে পারে। মনে রাখা চাই, বাহিরের শত্রুর সঙ্গে সংগ্রাম করতে তেমন বীর্যের দরকার হয় না, আপন অন্তরের শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করাতেই মনুষ্যত্বের চরম পরীক্ষা। আজ যাঁকে আমরা শ্রদ্ধা করছি এই পরীক্ষায় তিনি জয়ী হয়েছেন; তাঁর কাছ থেকে সেই দুরূহ সংগ্রামে জয়ী হবার সাধনা যদি দেশ গ্রহণ না করে তবে আজ আমাদের প্রশংসাবাক্য, উৎসবের আয়োজন, সম্পূর্ণই ব্যর্থ হবে। আমাদের সাধনা আজ আরম্ভ হল মাত্র। দুর্গম পথ আমাদের সামনে পড়ে রয়েছে।

শান্তিনিকেতন
১৫ আশ্বিন ১৩৩৮

চৌঠা আশ্বিন

সূর্যের পূর্ণগ্রাসের লগ্নে অন্ধকার যেমন ক্রমে ক্রমে দিনকে আচ্ছন্ন করে তেমনি আজ মৃত্যুর ছায়া সমস্ত দেশকে আবৃত করছে। এমন সর্বদেশব্যাপী উৎকণ্ঠা ভারতের ইতিহাসে ঘটে নি, পরম শোকে এই আমাদের মহৎসান্ত্বনা। দেশের আপামর সাধারণকে আজকের দিনের বেদনা স্পর্শ করেছে। যিনি সুদীর্ঘকাল দুঃখের তপস্যার মধ্য দিয়ে সমস্ত দেশকে যথার্থ ভাবে, গভীর ভাবে, আপন করে নিয়েছেন, সেই মহাত্মা আজ আমাদের সকলের হয়ে মৃত্যুব্রত গ্রহণ করলেন।

দেশকে অস্ত্রশস্ত্র সৈন্যসামন্ত নিয়ে যারা বাহুবলে অধিকার করে, যত বড়ো হোক-না তাদের প্রতাপ, যেখানে দেশের প্রাণবান সত্তা সেখানে তাদের প্রবেশ

অবরুদ্ধ। দেশের অন্তরে সূচ্যগ্রপরিমাণ ভূমি জয় করবে এমন শক্তি নেই তাদের। অস্ত্রের জোরে ভারতবর্ষকে অধিকার করেছে কত বিদেশী কতবার। মাটিতে রোপণ করেছে তাদের পতাকা, আবার সে পতাকা মাটিতে পড়ে ধুলো হয়ে গেছে।

অস্ত্রশস্ত্রের কাঁটাবেড়া দিয়ে যারা বিদেশে আপন স্বত্বকে স্থায়ী করবার দুরাশা মনে লালন করে, একদিন কালের আহ্বানে যে মুহূর্তে তারা নেপথ্যে সরে দাঁড়ায়, তখনই ইঁটকাঠের ভগ্নস্তূপে পুঞ্জীভূত হয় তাদের কীর্তির আবর্জনা। আর যাঁরা সত্যের বলে বিজয়ী তাঁদের আধিপত্য তাঁদের আয়ুকে অতিক্রম করে দেশের মর্মস্থানে বিরাজ করে।

দেশের সমগ্র চিত্তে যাঁর এই অধিকার তিনি সমস্ত দেশের হয়ে আজ আরও একটি জয়যাত্রায় প্রবৃত্ত হয়েছেন, চরম আত্মোৎসর্গের পথে। কোন্ দুরূহ বাধা তিনি দূর করতে চান, যার জন্যে তিনি এত বড়ো মূল্য দিতে কুণ্ঠিত হলেন না, সেই কথাটি আজ আমাদের স্তব্ধ হয়ে চিন্তা করবার দিন।

আমাদের দেশে একটি ভয়ের কারণ আছে। যে পদার্থ মানসিক তাকে আমরা বাহ্যিক দক্ষিণা দিয়ে সুলভ সম্মানে বিদায় করি। চিহ্নকে বড়ো করে তুলে সত্যকে খর্ব করে থাকি। আজ দেশনেতারা স্থির করেছেন যে দেশের লোকেরা উপবাস করবে। আমি বলি, এতে দোষ নেই, কিন্তু ভয় হয় : মহাত্মাজি যে প্রাণপণ মূল্যের বিনিময়ে সত্যকে লাভ করবার চেষ্টা করছেন তার তুলনায় আমাদের কৃত্য নিতান্ত লঘু এবং বাহ্যিক হয়ে পাছে লজ্জা বাড়িয়ে তোলে। হৃদয়ের আবেগকে কোনো একটা অস্থায়ী দিনের সামান্য দুঃখের লক্ষণে ক্ষীণ রেখায় চিহ্নিত করে কর্তব্য মিটিয়ে দেবার মতো দুর্ঘটনা যেন না ঘটে।

আমরা উপবাসের অনুষ্ঠান করব, কেননা মহাত্মাজি উপবাস করতে বসেছেন— এই দুটোকে কোনো অংশেই যেন একত্রে তুলনা করবার মূঢ়তা কারও মনে না আসে। এ দুটো একেবারেই এক জিনিস নয়। তাঁর উপবাস, সে তো অনুষ্ঠান নয়, সে একটি বাণী, চরম ভাষার বাণী। মৃত্যু তাঁর সেই বাণীকে সমগ্র ভারতবর্ষের কাছে, বিশ্বের কাছে, ঘোষণা করবে চিরকালের মতো। সেই বাণীকেই যদি গ্রহণ করা আমাদের কর্তব্য হয় তবে তা যথোচিত ভাবে করতে হবে। তপস্যার সত্যকে তপস্যার দ্বারাই অন্তরে গ্রহণ করা চাই।

আজ তিনি কী বলছেন সেটা চিন্তা করে দেখো। পৃথিবীময় মানব-ইতিহাসের আরম্ভকাল থেকে দেখি এক দল মানুষ আর-এক দলকে নিচে ফেলে তার উপর দাঁড়িয়ে নিজের উন্নতি প্রচার করে। আপন দলের প্রভাবকে প্রতিষ্ঠিত করে অন্য দলের দাসত্বের উপরে। মানুষ দীর্ঘ কাল ধরে এই কাজ করে এসেছে। কিন্তু তবু বলব এটা অমানুষিক। তাই দাসনির্ভরতার ভিত্তির উপরে মানুষের ঐশ্বর্য স্থায়ী হতে পারে না। এতে কেবল যে দাসেদের দুর্গতি হয় তা নয়, প্রভুদেরও এতে বিনাশ ঘটায়। যাদের আমরা অপমানিত করে পায়ের তলায় ফেলি তারাই আমাদের সম্মুখপথে পদক্ষেপের বাধা। তারা গুরুভারে আমাদের নিচের দিকে টেনে রাখে। যাদের আমরা হীন করি তারা ক্রমশই আমাদের হেয় করে। মানুষ-খেগো সভ্যতা রোগে জীর্ণ হবে, মরবে। মানুষের দেবতার এই বিধান। ভারতবর্ষে মানুষোচিত সম্মান থেকে যাদের আমরা বঞ্চিত করেছি তাদের অগৌরবে আমরা সমস্ত ভারতবর্ষের অগৌরব ঘটিয়েছি।

আজ ভারতে কত সহস্র লোক কারাগারে রুদ্ধ, বন্দী। মানুষ হয়ে পশুর মতো তারা পীড়িত, অবমানিত। মানুষের এই পুঞ্জীভূত অবমাননা সমস্ত

রাজ্যশাসনতন্ত্রকে অপমানিত করছে, তাকে গুরুভারে দুরূহ করছে। তেমনি আমরাও অসম্মানের বেড়ার মধ্যে বন্দী করে রেখেছি সমাজের বৃহৎ এক দলকে। তাদের হীনতার ভার বহন করে আমরা এগোতে পারছি নে। বন্দীদশা শুধু তো কারাপ্রাচীরের মধ্যে নয়। মানুষের অধিকার-সংক্ষেপ করাই তো বন্ধন। সম্মানের খর্বতার মতো কারাগার তো নেই। ভারতবর্ষে সেই সামাজিক কারাগারকে আমরা খণ্ডে খণ্ডে বড়ো করেছি। এই বন্দীর দেশে আমরা মুক্তি পাব কী করে। যারা মুক্তি দেয় তারাই তো মুক্ত হয়।

এত দিন এইভাবে চলছিল; ভালো করে বুঝি নি আমরা কোথায় তলিয়ে ছিলাম। সহসা ভারতবর্ষ আজ মুক্তির সাধনায় জেগে উঠল। পণ করলাম, চিরদিন বিদেশী শাসনে মনুষ্যত্বকে পঙ্গু করে রাখার এ ব্যবস্থা আর স্বীকার করব না। বিধাতা ঠিক সেই সময় দেখিয়ে দিলেন কোথায় আমাদের পরাভবের অন্ধকার গহ্বরগুলো। আজ ভারতে মুক্তিসাধনার তাপস যাঁরা তাঁদের সাধনা বাধা পেল তাদেরই কাছ থেকে যাদের আমরা অকিঞ্চিৎকর করে রেখেছি। যারা ছোটো হয়েছিল তারাই আজ বড়োকে করেছে অকৃতার্থ। তুচ্ছ বলে যাদের আমরা মেরেছি তারাই আমাদের সকলের চেয়ে বড়ো মার মারছে।

এক ব্যক্তির সঙ্গে আর-এক ব্যক্তির শক্তির স্বাভাবিক উচ্চনীচতা আছে। জাতিবিশেষের মধ্যেও তেমন দেখা যায়। উন্নতির পথে সকলে সমান দূর এগোতে পারে নি। সেইটেকে উপলক্ষ্য করে সেই পশ্চাদ্‌বর্তীদেরকে অপমানের দুর্লঙ্ঘ্য বেড়া তুলে দিয়ে স্থায়ী ভাবে যখনই পিছিয়ে রাখা যায় তখনই পাপ জমা হয়ে ওঠে। তখনই অপমানবিষ দেশের এক অঙ্গ থেকে সর্ব অঙ্গে সঞ্চারিত হতে থাকে। এমনি করে মানুষের সম্মান থেকে যাদের নির্বাসিত করে দিলুম তাদের আমরা হারালুম। আমাদের দুর্বলতা ঘটল সেইখানেই, সেইখানেই শনির রন্ধ্র। এই রন্ধ্র দিয়েই ভারতবর্ষের পরাভব তাকে বারে বারে নত করে দিয়েছে। তার ভিতের গাঁথুনি আল্‌গা, আঘাত পাবা মাত্র ভেঙে ভেঙে পড়েছে। কালক্রমে যে ভেদ দূর হতে পারত তাকে আমরা চেষ্টা করে, সমাজরীতির দোহাই দিয়ে, স্থায়ী করে তুলেছি। আমাদের রাষ্ট্রিক মুক্তিসাধনা কেবলই ব্যর্থ হচ্ছে এই ভেদবুদ্ধির অভিশাপে।

যেখানেই এক দলের অসম্মানের উপর আর-এক দলের সম্মানকে প্রতিষ্ঠিত করা হয় সেইখানেই ভারসামঞ্জস্য নষ্ট হয়ে বিপদ ঘটে। এর থেকেই বোঝা যায়, সাম্যই মানুষের মূলগত ধর্ম। য়ুরোপে এক রাষ্ট্রজাতির মধ্যে অন্য ভেদ যদি বা না থাকে, শ্রেণীভেদ আছে। শ্রেণীভেদে সম্মান ও সম্পদের পরিবেষণ সমান হয় না। সেখানে তাই ধনিকের সঙ্গে কর্মিকের অবস্থা যতই অসমান হয়ে উঠছে ততই সমাজ টলমল করছে। এই অসাম্যের ভারে সেখানকার সমাজব্যবস্থা প্রত্যহই পীড়িত হচ্ছে। যদি সহজে সাম্য স্থাপন হয় তবেই রক্ষা, নইলে নিষ্কৃতি নেই। মানুষ যেখানেই মানুষকে পীড়িত করবে সেখানেই তার সমগ্র মনুষ্যত্ব আহত হবেই; সেই আঘাত মৃত্যুর দিকেই নিয়ে যায়।

সমাজের মধ্যেকার এই অসাম্য, এই অসম্মানের দিকে, মহাত্মাজি অনেক দিন থেকে আমাদের লক্ষ্য নির্দেশ করেছেন। তবুও তেমন একান্ত চেষ্টায় এই দিকে আমাদের সংস্কারকার্য প্রবর্তিত হয় নি। চরখা ও খদ্দরের দিকে আমরা মন দিয়েছি, আর্থিক দুর্গতির দিকে দৃষ্টি পড়েছে, কিন্তু সামাজিক পাপের দিকে নয়। সেইজন্যেই আজ এই দুঃখের দিন এল। আর্থিক দুঃখ অনেকটা এসেছে বাইরে থেকে, তাকে ঠেকানো একান্ত কঠিন না হতে পারে। কিন্তু যে সামাজিক

পাপের উপর আমাদের সকল শত্রুর আশ্রয় তাকে উৎপাটন করতে আমাদের বাজে, কেননা তার উপরে আমাদের মমত্ব। সেই প্রশ্রয়প্রাপ্ত পাপের বিরুদ্ধে আজ মহাত্মা চরম যুদ্ধ ঘোষণা করে দিলেন। আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে এই রণক্ষেত্রে তাঁর দেহের অবসান ঘটতেও পারে। কিন্তু সেই লড়াইয়ের ভার তিনি আমাদের প্রত্যেককে দান করে যাবেন। যদি তাঁর হাত থেকে আজ আমরা সর্বান্তঃকরণে সেই দান গ্রহণ করতে পারি তবেই আজকের দিন সার্থক হবে। এত বড়ো আহ্বানের পরেও যারা একদিন উপবাস করে তার পরদিন হতে উদাসীন থাকবে, তারা দুঃখ থেকে যাবে দুঃখে, দুর্ভিক্ষ থেকে দুর্ভিক্ষে। সামান্য কৃচ্ছ্রসাধনের দ্বারা সত্যসাধনার অবমাননা যেন না করি।

মহাত্মাজির এই ব্রত আমাদের শাসনকর্তাদের সংকল্পকে কী পরিমাণে ও কী ভাবে আঘাত করবে জানি নে। আজ সেই পোলিটিকাল তর্ক-অবতারণার দিন নয়। কেবল একটা কথা বলা উচিত বলে বলব। দেখতে পাচ্ছি, মহাত্মাজির এই চরম উপায়-অবলম্বনের অর্থ অধিকাংশ ইংরেজ বুঝতে পারছেন না। না পারবার একটা কারণ এই যে, মহাত্মাজির ভাষা তাঁদের ভাষা নয়। আমাদের সমাজের মধ্যে সাংঘাতিক বিচ্ছেদ ঘটাবার বিরুদ্ধে মহাত্মাজির এই প্রাণপণ প্রয়াস তাঁদের প্রয়াসের প্রচলিত পদ্ধতির সঙ্গে মেলে না বলেই এটাকে এত অদ্ভুত বলে মনে হচ্ছে। একটা কথা তাঁদের স্মরণ করিয়ে দিতে পারি— আয়ার্লণ্ড্ যখন ব্রিটিশ ঐক্যবন্ধন থেকে স্বতন্ত্র হবার চেষ্টা করেছিল তখন কী বীভৎস ব্যাপার ঘটেছিল। কত রক্তপাত, কত অমানুষিক নিষ্ঠুরতা। পলিটিক্‌সে এই হিংস্র পদ্ধতিই পশ্চিম-মহাদেশে অভ্যস্ত। সেই কারণে আয়ার্লণ্ডে রাষ্ট্রিক প্রয়াসের এই রক্তাক্ত মূর্তি তো কারও কাছে, অন্তত অধিকাংশ লোকের কাছে, আর যাই হোক, অদ্ভুত বলে মনে হয় নি। কিন্তু অদ্ভুত মনে হচ্ছে মহাত্মাজির অহিংস্র আত্মত্যাগী প্রয়াসের শান্ত মূর্তি। ভারতবর্ষের অবমানিত জাতির প্রতি মহাত্মাজির মমতা নেই, এত বড়ো অমূলক কথা মনে স্থান দেওয়া সম্ভব হয়েছে তার কারণ এই যে, এই ব্যাপারে তিনি আমাদের রাজসিংহাসনের উপর সংকটের ঝড় বইয়ে দিয়েছেন। রাজপুরুষদের মন বিকল হয়েছে বলেই এমন কথা তাঁরা কল্পনা করতে পেরেছেন। এ কথা বুঝতে পারেন নি, রাষ্ট্রিক অস্ত্রাঘাতে হিন্দুসমাজকে দ্বিখণ্ডিত হতে দেখা হিন্দুর পক্ষে মৃত্যুর চেয়ে কম বিপদের নয়। একদা বাহির থেকে কোনো তৃতীয় পক্ষ এসে যদি ইংলণ্ডে প্রটেস্টাণ্ট্ ও রোমান-ক্যাথলিকদের এই ভাবে সম্পূর্ণ বিভক্ত করে দিত তা হলে সেখানে একটা নরহত্যার ব্যাপার ঘটা অসম্ভব ছিল না। এখানে হিন্দুসমাজের পরম সংকটের সময় মহাত্মাজির দ্বারা সেই বহুপ্রাণঘাতক যুদ্ধের ভাষান্তর ঘটেছে মাত্র। প্রটেস্টাণ্ট্ ও রোমান-ক্যাথলিকদের মধ্যে বহুদীর্ঘকাল যে অধিকারভেদ চলে এসেছিল, সমাজই আজ স্বয়ং তার সমাধান করেছে; সেজন্য তুর্কির বাদশাকে ডাকে নি। আমাদের দেশের সামাজিক সমস্যা সমাধানের ভার আমাদের 'পরেই থাকার প্রয়োজন ছিল।

রাষ্ট্রব্যাপারে মহাত্মাজি যে অহিংস্রনীতি এতকাল প্রচার করেছেন আজ তিনি সেই নীতি নিজের প্রাণ দিয়ে সমর্থন করতে উদ্যত, এ কথা বোঝা অত্যন্ত কঠিন বলে আমি মনে করি নে।

শান্তিনিকেতন
৪ আশ্বিন ১৩৩৯

মহাত্মাজির পুণ্যব্রত

যুগে যুগে দৈবাৎ এই সংসারে মহাপুরুষের আগমন হয়। সব সময় তাঁদের দেখা পাই নে। যখন পাই সে আমাদের সৌভাগ্য। আজকের দিনে দুঃখের অন্ত নেই; কত পীড়ন, কত দৈন্য, কত রোগ শোক তাপ আমরা নিত্য ভোগ করছি; দুঃখ জমে উঠেছে রাশি রাশি। তবু সব দুঃখকে ছাড়িয়ে গেছে আজ এক আনন্দ। যে মাটিতে আমরা বেঁচে আছি, সঞ্চরণ করছি, সেই মাটিতেই একজন মহাপুরুষ, যাঁর তুলনা নেই, তিনি ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেছেন।

যাঁরা মহাপুরুষ তাঁরা যখন আসেন, আমরা ভালো করে চিনতে পারি নে তাঁদের। কেননা, আমাদের মন ভীরু, অস্বচ্ছ, স্বভাব শিথিল, অভ্যাস দুর্বল। মনেতে সেই সহজ শক্তি নেই যাতে করে মহৎকে সম্পূর্ণ বুঝতে পারি, গ্রহণ করতে পারি। বারে বারে এমন ঘটেছে, যাঁরা সকলের বড়ো তাঁদেরই সকলের চেয়ে দূরে ফেলে রেখেছি।

যাঁরা জ্ঞানী, গুণী, কঠোর তপস্বী, তাঁদের বোঝা সহজ নয়; কেননা আমাদের জ্ঞান বুদ্ধি সংস্কার তাঁদের সঙ্গে মেলে না। কিন্তু একটা জিনিস বুঝতে কঠিন লাগে না, সেটা ভালোবাসা। যে মহাপুরুষ ভালোবাসা দিয়ে নিজের পরিচয় দেন, তাঁকে আমাদের ভালোবাসায় আমরা একরকম করে বুঝতে পারি। সেজন্যে ভারতবর্ষে এই এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটল যে, এবার বুঝেছি। এমনটি সচরাচর ঘটে না। যিনি আমাদের মধ্যে এসেছেন তিনি অত্যন্ত উচ্চ, অত্যন্ত মহৎ। তবু তাঁকে স্বীকার করেছি, তাঁকে জেনেছি। সকলে বুঝেছে 'তিনি আমার'। তাঁর ভালোবাসায় উচ্চ-নীচের ভেদ নেই, মূর্খ-বিদ্বানের ভেদ নেই, ধনী-দরিদ্রের ভেদ নেই। তিনি বিতরণ করেছেন সকলের মধ্যে সমান ভাবে তাঁর ভালোবাসা। তিনি বলেছেন, সকলের কল্যাণ হোক, সকলের মঙ্গল হোক। যা বলেছেন, শুধু কথায় নয়, বলেছেন দুঃখের বেদনায়। কত পীড়া, কত অপমান তিনি সয়েছেন। তাঁর জীবনের ইতিহাস দুঃখের ইতিহাস। দুঃখ অপমান ভোগ করেছেন কেবল ভারতবর্ষে নয়, দক্ষিণ-আফ্রিকায় কত মার তাঁকে মৃত্যুর ধারে এনে ফেলেছে। তাঁর দুঃখ নিজের বিষয়সুখের জন্যে নয়, স্বার্থের জন্যে নয়, সকলের ভালোর জন্যে। এই-যে এত মার খেয়েছেন, উল্টে কিছু বলেন নি কখনও, রাগ করেন নি। সমস্ত আঘাত মাথা পেতে নিয়েছেন। শত্রুরা আশ্চর্য হয়ে গেছে ধৈর্য দেখে, মহত্ত্ব দেখে। তাঁর সংকল্প সিদ্ধ হল, কিন্তু জোর-জবরদস্তিতে নয়। ত্যাগের দ্বারা, দুঃখের দ্বারা, তপস্যার দ্বারা তিনি জয়ী হয়েছেন। সেই তিনি আজ ভারতবর্ষের দুঃখের বোঝা নিজের দুঃখের বেগে ঠেলবার জন্যে দেখা দিয়েছেন।

তোমরা সকলে তাঁকে দেখেছ কি না জানি না। কারও কারও হয়তো তাঁকে দেখার সৌভাগ্য ঘটেছে। কিন্তু তাঁকে জান সকলেই, সমস্ত ভারতবর্ষ তাঁকে জানে। সবাই জান, সমস্ত ভারতবর্ষ কিরকম করে তাঁকে ভক্তি দিয়েছে; একটি নাম দিয়েছে—মহাত্মা। আশ্চর্য, কেমন করে চিনলে। মহাত্মা অনেককেই বলা হয়, তার কোনো মানে নেই। কিন্তু এই মহাপুরুষকে যে মহাত্মা বলা হয়েছে, তার মানে আছে। যাঁর আত্মা বড়ো, তিনিই মহাত্মা। যাদের আত্মা ছোটো, বিষয়ে বদ্ধ, টাকাকড়ি-ঘরসংসারের চিন্তায় যাদের মন আচ্ছন্ন, তারা দীনাত্মা। মহাত্মা তিনিই, সকলের সুখ দুঃখ যিনি আপনার করে নিয়েছেন, সকলের ভালোকে যিনি আপনার

ভালো বলে জানেন। কেননা, সকলের হৃদয়ে তাঁর স্থান, তাঁর হৃদয়ে সকলের স্থান। আমাদের শাস্ত্রে ঈশ্বরকে বলে মহাত্মা, মর্ত্যলোকে সেই দিব্য ভালোবাসা সেই প্রেমের ঐশ্বর্য দৈবাৎ মেলে। সেই প্রেম যাঁর মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে তাঁকে আমরা মোটের উপর এই বলে বুঝেছি যে, তিনি হৃদয় দিয়ে সকলকে ভালোবেসেছেন। কিন্তু সম্পূর্ণ বুঝতে পারি না, ভালো করে চিনতে একটু বাধা লাগে। বাঁকা হয়ে গেছে আমাদের মন। সত্যকে স্বীকার করতে ভীরুতা দ্বিধা সংশয় আমাদের জাগে। বিনা ক্লেশে যা মানতে পারি তাই মানি, কঠিনটাকে সরিয়ে রেখে দিই এক পাশে। তাঁর সকলের চেয়ে বড়ো সত্যটাকে নিতে পারলুম না। এইখানেই তাঁকে মারলুম। তিনি এসেছেন, ফিরে গেলেন, শেষ পর্যন্ত তাঁকে নিতে পারলুম না।

খৃস্টানশাস্ত্রে পড়েছি, আচারনিষ্ঠ য়িহুদিরা যিশুখৃস্টকে শত্রু বলে মেরেছিল। কিন্তু মার কি শুধু দেহের। যিনি প্রাণ দিয়ে কল্যাণের পথ খুলে দিতে আসেন, সেই পথকে বাধাগ্রস্ত করা সেও কি মার নয়। সকলের চেয়ে বড়ো মার সেই। কী অসহ্য বেদনা অনুভব করে তিনি আজকের দিনে মৃত্যুব্রত গ্রহণ করেছেন। সেই ব্রতকে যদি আমরা স্বীকার করে না নিই, তবে কি তাঁকে আমরা মারলুম না। আমাদের ছোটো মনের সংকোচ, ভীরুতা, আজ লজ্জা পাবে না? আমরা কি তাঁর সেই বেদনাকে মর্মের মধ্যে ঠিক জায়গায় অনুভব করতে পারব না। গ্রহণ করতে পারব না তাঁর দান? এত সংকোচ, এত ভীরুতা আমাদের? সে ভীরুতার দৃষ্টান্ত তো তাঁর মধ্যে কোথাও নেই। সাহসের অন্ত নেই তাঁর; মৃত্যুকে তিনি তুচ্ছ করেছেন। কঠিন কারাগার, তার সমস্ত লোহার শিকল নিয়ে তাঁর ইচ্ছাকে ঠেকাতে পারে নি। সেই তিনি এসেছেন আজ আমাদের মাঝখানে। আমরা যদি ভয়ে পিছিয়ে পড়ি, তবে লজ্জা রাখবার ঠাঁই থাকবে না। তিনি আজ মৃত্যুব্রত গ্রহণ করেছেন ছোটো-বড়োকে এক করবার জন্যে। তাঁর সেই সাহস, তাঁর সেই শক্তি, আসুক আমাদের বুদ্ধিতে, আমাদের কাজে। আমরা যেন আজ গলা ছেড়ে বলতে পারি, 'তুমি যেয়ো না, আমরা গ্রহণ করলাম তোমার ব্রত।' তা যদি না পারি, এত বড়ো জীবনকে যদি ব্যর্থ হতে দিই, তবে তার চেয়ে বড়ো সর্বনাশ আর কী হতে পারে।

আমরা এই কথাই বলে থাকি যে, বিদেশীরা আমাদের শত্রুতা করছে। কিন্তু তার চেয়ে বড়ো শত্রু আছে আমাদের মজ্জার মধ্যে, সে আমাদের ভীরুতা। সেই ভীরুতাকে জয় করার জন্যে বিধাতা আমাদের শক্তি পাঠিয়ে দিয়েছেন তাঁর জীবনের মধ্য দিয়ে; তিনি আপন অভয় দিয়ে আমাদের ভয় হরণ করতে এসেছেন। সেই তাঁর দান-সুদ্ধ তাঁকে আজ কি আমরা ফিরিয়ে দেব। এই কৌপীনধারী আমাদের দ্বারে দ্বারে আঘাত করে ফিরেছেন, তিনি আমাদের সাবধান করেছেন কোন্‌খানে আমাদের বিপদ। মানুষ যেখানে মানুষের অপমান করে, মানুষের ভগবান সেইখানেই বিমুখ। শত শত বছর ধরে মানুষের প্রতি অপমানের বিষ আমরা বইয়ে দিয়েছি ভারতবর্ষের নাড়ীতে নাড়ীতে। হীনতার অসহ্য বোঝা চাপিয়ে দিয়েছি শত শত নত মস্তকের উপরে; তারই ভারে সমস্ত দেশ আজ ক্লান্ত, দুর্বল। সেই পাপে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছি নে। আমাদের চলবার রাস্তায় পদে পদে পঙ্ককুন্ড তৈরি করে রেখেছি; আমাদের সৌভাগ্যের অনেকখানি তলিয়ে যাচ্ছে তারই মধ্যে। এক ভাই আর-এক ভাইয়ের কপালে স্বহস্তে কলঙ্ক লেপে দিয়েছে, মহাত্মা সইতে পারেন নি এই পাপ।

সমস্ত অন্তঃকরণ দিয়ে শোনো তাঁর বাণী। অনুভব করো, কী প্রচন্ড তাঁর

সংকল্পের জোর। আজ তপস্বী উপবাস আরম্ভ করেছেন, দিনের পর দিন তিনি অন্ন নেবেন না। তোমরা দেবে না তাঁকে অন্ন? তাঁর বাণীকে গ্রহণ করাই তাঁর অন্ন, তাই দিয়ে তাঁকে বাঁচাতে হবে। অপরাধ অনেক করেছি, পাপ পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে। ভাইয়ের সঙ্গে ব্যবহার করেছি দাসের মতো, পশুর মতো। সেই অপমানে সমস্ত পৃথিবীর কাছে ছোটো করে রেখেছে আমাদের। যদি তাদের প্রাপ্য সম্মান দিতাম তা হলে আজ এত দুর্গতি হত না আমাদের। পৃথিবীর অন্য-সব সমাজকে লোকে সম্মান করে, ভয় করে, কেননা তারা পরস্পর ঐক্যবন্ধনে বদ্ধ। আমাদের এই হিন্দুসমাজকে আঘাত করতে, অপমান করতে, কারও মনে ভয় নেই, বার বার তার প্রমাণ পাই। কিসের জোরে তাদের এই স্পর্ধা সে কথাটা যেন এক মুহূর্তে না ভুলি।

যে সম্মান মহাত্মাজি সবাইকে দিতে চেয়েছেন, সে সম্মান আমরা সকলকে দেব। যে পারবে না দিতে, ধিক্ তাকে। ভাইকে ভাই বলে গ্রহণ করতে বাধা দেয় যে সমাজ, ধিক্ সেই জীর্ণ সমাজকে। সব চেয়ে বড়ো ভীরুতা তখনই প্রকাশ পায় যখন সত্যকে চিনতে পেরেও মানতে পারি নে। সে ভীরুতার ক্ষমা নেই।

অভিশাপ অনেক দিন থেকে আছে দেশের উপর। সেইজন্যে প্রায়শ্চিত্ত করতে বসেছেন একজন। সেই প্রায়শ্চিত্তে সকলকে মিলতে হবে, সেই মিলনেই আমাদের চিরমিলন শুরু হবে। মৃত্যুর বৃহৎ পাত্রে তাঁর প্রায়শ্চিত্ত তিনি আমাদের সকলের সামনে ধরলেন, এগিয়ে দিলেন আমাদের হাতের কাছে। গ্রহণ করো সকলে, ক্ষালন করো পাপ। মঙ্গল হবে। তাঁর শেষ কথা আজ আমি তোমাদের শোনাতে এসেছি। তিনি দূরে আছেন, কিন্তু তিনি দূরে নেই। তিনি আমাদের অন্তরেই আছেন। যদি জীবন দিতে হয় তাঁকে আমাদের জন্যে তবে অন্ত থাকবে না পরিতাপের।

মাথা হেঁট হয়ে যাবে আমাদের। তিনি আমাদের কাছে যা চেয়েছেন, তা দুরূহ, দুঃসাধ্য ব্রত। কিন্তু তার চেয়ে দুঃসাধ্য কাজ তিনি করেছেন, তার চেয়ে কঠিন ব্রত তাঁর। সাহসের সঙ্গে যেন গ্রহণ করতে পারি তাঁর দেওয়া ব্রত। যাকে আমরা ভয় করছি সে কিছুই নয়। সে মায়া, মিথ্যা। সে সত্য নয়; মানব না আমরা তাকে। বলো আজ সবাই মিলে, আমরা মানব না সেই মিথ্যাকে। বলো, আজ সমস্ত হৃদয় দিয়ে বলো, ভয় কিসের। তিনি সমস্ত ভয় হরণ করে বসে আছেন। মৃত্যুভয়কে জয় করেছেন। কোনো ভয় যেন আজ থাকে না আমাদের। লোকভয়, রাজভয়, সমাজভয়, কিছুতেই যেন সংকুচিত না হই আমরা। তাঁর পথে তাঁরই অনুবর্তী হয়ে চলব, পরাভব ঘটতে দেব না তাঁর। সমস্ত পৃথিবী আজ তাকিয়ে আছে। যাদের মনে দরদ নেই তারা উপহাস করছে। এত বড়ো ব্যাপারটা সত্যই উপহাসের বিষয় হবে, যদি আমাদের উপরে কোনো ফল না হয়। সমস্ত পৃথিবী আজ বিস্মিত হবে, যদি তাঁর শক্তির আগুন আমাদের সকলের মনের মধ্যে জ্বলে ওঠে; যদি সবাই বলতে পারি, 'জয় হোক তপস্বী, তোমার তপস্যা সার্থক হোক।' এই জয়ধ্বনি সমুদ্রের এক পার থেকে পৌঁছবে আর-এক পারে; সকলে বলবে, সত্যের বাণী অমোঘ। ধন্য হবে ভারতবর্ষ। আজকের দিনেও এত বড়ো সার্থকতায় যে বাধা দেবে সে অত্যন্ত হেয়; তাকে তোমরা ভয়ে যদি মান তবে তার চেয়ে হেয় হবে তোমরা।

জয় হোক সেই তপস্বীর যিনি এই মুহূর্তে বসে আছেন মৃত্যুকে সামনে নিয়ে, ভগবানকে অন্তরে বসিয়ে, সমস্ত হৃদয়ের প্রেমকে উজ্জ্বল করে জ্বালিয়ে।

তোমরা জয়ধ্বনি করো তাঁর, তোমাদের কণ্ঠস্বর পৌঁছক তাঁর আসনের কাছে। বলো, 'তোমাকে গ্রহণ করলেম, তোমার সত্যকে স্বীকার করলেম।'

আমি কী-ই-বা বলতে পারি। আমার ভাষায় জোর কোথায়। তিনি যে-ভাষায় বলছেন সে কানে শোনবার নয়, সে প্রাণে শোনবার; মানুষের সেই চরম ভাষা, নিশ্চয়ই তোমাদের অন্তরে পৌঁচেছে।

আমাদের সকলের চেয়ে বড়ো সৌভাগ্য, পর যখন আপন হয়। সকলের চেয়ে বড়ো বিপদ, আপন যখন পর হয়। ইচ্ছে করেই যাদের আমরা হারিয়েছি, ইচ্ছে করেই আজ তাদের ফিরে ডাকো; অপরাধের অবসান হোক, অমঙ্গল দূর হয়ে যাক। মানুষকে গৌরবদান করে মনুষ্যত্বের সগৌরব অধিকার লাভ করি।

শান্তিনিকেতন
৫ আশ্বিন ১৩৩৯

ব্রত উদ্‌যাপন

গভীর উদ্‌বেগের মধ্যে, মনে আশা নিয়ে, পুনা অভিমুখে যাত্রা করলেম। দীর্ঘ পথ, যেতে যেতে আশঙ্কা বেড়ে ওঠে, পৌঁছে কী দেখা যাবে। বড়ো স্টেশনে এলেই আমার সঙ্গী দুজনে খবরের কাগজ কিনে দেন, উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়ে দেখি। সুখবর নয়। ডাক্তারেরা বলছে, মহাত্মাজির শরীরের অবস্থা danger zoneএ পৌঁচেছে। দেহেতে মেদ বা মাংসের উদ্‌বৃত্ত এমন নেই যে দীর্ঘ কালের ক্ষয় সহ্য হয়, অবশেষে মাংসপেশী ক্ষয় হতে আরম্ভ করেছে। apoplexy হয়ে অকস্মাৎ প্রাণহানি ঘটতে পারে। সেই সঙ্গে কাগজে দেখছি, দিনের পর দিন দীর্ঘকাল ধরে জটিল সমস্যা নিয়ে তাঁকে স্বপক্ষ প্রতিপক্ষের সঙ্গে গুরুতর আলোচনা চালাতে হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত হিন্দুসমাজের অন্তর্গত রূপেই অনুন্নত সমাজকে রাষ্ট্রনৈতিক বিশেষ অধিকার বিষয়ে দুই পক্ষকে তিনি রাজি করেছেন। দেহের সমস্ত যন্ত্রণা দুর্বলতাকে জয় করে তিনি অসাধ্য সাধন করেছেন; এখন বিলেত হতে এই ব্যবস্থা মঞ্জুর হওয়ার উপর সব নির্ভর করছে। মঞ্জুর না হওয়ার কোনো সংগত কারণ থাকতে পারে না; কেননা প্রধান মন্ত্রীর কথাই ছিল, অনুন্নত সমাজের সঙ্গে একযোগে হিন্দুরা যে ব্যবস্থা মেনে নেবে তাকে তিনিও স্বীকার করতে বাধ্য।

আশানৈরাশ্যে আন্দোলিত হয়ে ছাব্বিশে সেপ্টেম্বর প্রাতে আমরা কল্যাণ স্টেশনে পৌঁছলেম। সেখানে শ্রীমতী বাসন্তী ও শ্রীমতী ঊর্মিলার সঙ্গে দেখা হল। তাঁরা অন্য গাড়িতে কলকাতা থেকে কিছু পূর্বে এসে পৌঁচেছেন। কালবিলম্ব না করে আমাদের ভাবী গৃহস্বামিনীর প্রেরিত মোটরগাড়িতে চড়ে পুনার পথে চললেম।

পুনার পার্বত্য পথ রমণীয়। পুরদ্বারে যখন পৌঁছলেম, তখন সামরিক অভ্যাসের পালা চলেছে—অনেকগুলি armoured car, machine gun, এবং পথে পথে সৈন্যদলের কুচকাওয়াজ চোখে পড়ল। অবশেষে শ্রীযুক্ত বিঠলভাই থ্যাকার্‌সে মহাশয়ের প্রাসাদে গাড়ি থামল। তাঁর বিধবা পত্নী সৌম্যসহাস্য মুখে

আমাদের অভ্যর্থনা করে নিয়ে চললেন। সিঁড়ির দু পাশে দাঁড়িয়ে তাঁর বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা গান করে অভিনন্দন জানালেন।

গৃহে প্রবেশ করেই বুঝেছিলেম, গভীর একটি আশঙ্কায় হাওয়া ভারাক্রান্ত। সকলের মুখেই দুশ্চিন্তার ছায়া। প্রশ্ন করে জানলেম, মহাত্মাজির শরীরের অবস্থা সংকটাপন্ন। বিলাত হতে তখনও খবর আসে নি। প্রধান মন্ত্রীর নামে আমি একটি জরুরি তার পাঠিয়ে দিলেম।

দরকার ছিল না পাঠাবার। শীঘ্রই জনরব কানে এল, বিলাত থেকে সম্মতি এসেছে। কিন্তু জনরব সত্য কি না তার প্রমাণ পাওয়া গেল বহু ঘণ্টা পরে।

মহাত্মাজির মৌনাবলম্বনের দিন আজ। একটার পরে কথা বলবেন। তাঁর ইচ্ছা, সেই সময়ে আমি কাছে থাকি। পথে যেতে যারবেদা জেলের খানিক দূরে আমাদের মোটর গাড়ি আটকা পড়ল; ইংরেজ সৈনিক বললে, কোনো গাড়ি এগোতে দেবার হুকুম নেই। আজকের দিনে জেলখানায় প্রবেশের পথ ভারতবর্ষে প্রশস্ত বলেই তো জানি। গাড়ির চতুর্দিকে নানা লোকের ভিড় জমে উঠল।

আমাদের পক্ষ হতে লোক জেলের কর্তৃপক্ষের কাছে অনুমতি নিতে খানিক এগিয়ে যেতেই শ্রীমান দেবদাস এসে উপস্থিত, জেল-প্রবেশের ছাড়পত্র তাঁর হাতে। পরে শুনলেম, মহাত্মাজি তাঁকে পাঠিয়েছিলেন। কেননা তাঁর হঠাৎ মনে হয়, পুলিস কোথাও আমাদের গাড়ি আটকেছে—যদিও তার কোনো সংবাদ তাঁর জানা ছিল না।

লোহার দরজা একটার পর একটা খুলল, আবার বন্ধ হয়ে গেল। সামনে দেখা যায় উঁচু দেয়ালের ঔদ্ধত্য, বন্দী আকাশ, সোজা-লাইন-করা বাঁধা রাস্তা, দুটো চারটে গাছ।

দুটো জিনিসের অভিজ্ঞতা আমার জীবনে বিলম্বে ঘটেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের গেট পেরিয়ে ঢুকেছি সম্প্রতি। জেলখানায় প্রবেশে আজ বাধা ঘটলেও অবশেষে এসে পৌঁছনো গেল।

বাঁ দিকে সিঁড়ি উঠে, দরজা পেরিয়ে, দেয়ালে-ঘেরা একটি অঙ্গনে প্রবেশ করলেম। দূরে দূরে দু-সারি ঘর। অঙ্গনে একটি ছোটো আমগাছের ঘনছায়ায় মহাত্মাজি শয্যাশায়ী।

মহাত্মাজি আমাকে দুই হাতে বুকের কাছে টেনে নিলেন, অনেক ক্ষণ রাখলেন। বললেন, কত আনন্দ হল।

শুভ সংবাদের জোয়ার বেয়ে এসেছি, এ জন্যে আমার ভাগ্যের প্রশংসা করলেম তাঁর কাছে। তখন বেলা দেড়টা। বিলাতের খবর ভারতময় রাষ্ট্র হয়ে গেছে; রাজনৈতিকের দল তখন সিমলায় দলিল নিয়ে প্রকাশ্য সভায় আলোচনা করছিলেন, পরে শুনলেম। খবরের কাগজওয়ালারাও জেনেছে। কেবল যাঁর প্রাণের ধারা প্রতি মুহূর্তে শীর্ণ হয়ে মৃত্যুসীমায় সংলগ্নপ্রায় তাঁর প্রাণসংকট-মোচনের যথেষ্ট সত্বরতা নেই। অতি দীর্ঘ লাল ফিতের জটিল নির্মমতায় বিস্ময় অনুভব করলেম। সওয়া চারটে পর্যন্ত উৎকণ্ঠা প্রতিক্ষণ বেড়ে চলতে লাগল। শুনতে পাই, দশটার সময় খবর পুনায় এসেছিল।

চতুর্দিকে বন্ধুরা রয়েছেন। মহাদেব, বল্লভভাই, রাজাগোপালাচারী, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, এঁদের লক্ষ্য করলেম। শ্রীমতী কস্তুরীবাঈ এবং সরোজিনীকে দেখলেম। জওহরলালের পত্নী কমলাও ছিলেন।

মহাত্মাজির স্বভাবতই শীর্ণ শরীর শীর্ণতম, কণ্ঠস্বর প্রায় শোনা যায় না।

জঠরে অম্ল জমে উঠেছে, তাই মধ্যে মধ্যে সোডা মিশিয়ে জল খাওয়ানো হচ্ছে। ডাক্তারদের দায়িত্ব অতিমাত্রায় পৌঁচেছে।

অথচ চিত্তশক্তির কিছুমাত্র হ্রাস হয় নি। চিন্তার ধারা প্রবহমান, চৈতন্য অপরিশ্রান্ত। প্রায়োপবেশনের পূর্ব হতেই কত দুরূহ ভাবনা, কত জটিল আলোচনায় তাঁকে নিয়ত ব্যাপৃত হতে হয়েছে। সমুদ্রপারের রাজনৈতিকদের সঙ্গে পত্রব্যবহারে মনের উপর কঠোর ঘাত-প্রতিঘাত চলেছে। উপবাসকালে নানান দলের প্রবল দাবি তাঁর অবস্থার প্রতি মমতা করে নি, তা সকলেই জানেন। কিন্তু মানসিক জীর্ণতার কোনো চিহ্নই তো নেই। তাঁর চিন্তার স্বাভাবিক স্বচ্ছ প্রকাশধারায় আবিলতা ঘটে নি। শরীরের কৃচ্ছ্রসাধনের মধ্য দিয়েও আত্মার অপরাজিত উদ্যমের এই মূর্তি দেখে আশ্চর্য হতে হল। কাছে না এলে এমন করে উপলব্ধি করতেম না, কত প্রচণ্ড শক্তি এই ক্ষীণদেহ পুরুষের।

আজ ভারতবর্ষের কোটি প্রাণের মধ্যে পৌঁছল মৃত্যুর বেদীতল-শায়ী এই মহৎ প্রাণের বাণী। কোনো বাধা তাকে ঠেকাতে পারল না—দূরত্বের বাধা, ইঁটকাঠ-পাথরের বাধা, প্রতিকূল পলিটিক্‌সের বাধা। বহু শতাব্দীর জড়ত্বের বাধা আজ তার সামনে ধূলিসাৎ হল।

মহাদেব বললেন, আমার জন্যে মহাত্মাজি একান্তমনে অপেক্ষা করছিলেন। আমার উপস্থিতি দ্বারা রাষ্ট্রিক সমস্যার মীমাংসা-সাধনে সাহায্য করতে পারি এমন অভিজ্ঞতা আমার নেই। তাঁকে যে তৃপ্তি দিতে পেরেছি, এই আমার আনন্দ।

সকলে ভিড় করে দাঁড়ালে তাঁর পক্ষে কষ্টকর হবে মনে করে আমরা সরে গিয়ে বসলেম। দীর্ঘ কাল অপেক্ষা করছি কখন খবর এসে পৌঁছবে। অপরাহ্নের রৌদ্র আড় হয়ে পড়েছে ইঁটের প্রাচীরের উপর। এখানে ওখানে দু-চারজন শুভ্র-খদ্দর-পরিহিত পুরুষ নারী শান্ত ভাবে আলোচনা করছেন।

লক্ষ্য করবার বিষয়, কারাগারের মধ্যে এই জনতা। কারও ব্যবহারে প্রশ্রয়জনিত শৈথিল্য নেই। চরিত্রশক্তি বিশ্বাস আনে, জেলের কর্তৃপক্ষ তাই শ্রদ্ধা করেই এঁদেরকে সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে মেলামেশা করতে দিতে পেরেছেন। এঁরা মহাত্মাজির প্রতিশ্রুতির প্রতিকূলে কোনো সুযোগ গ্রহণ করেন নি। আত্মমর্যাদার দৃঢ়তা এবং অচাঞ্চল্য এঁদের মধ্যে পরিস্ফুট। দেখলেই বোঝা যায়, ভারতের স্বরাজ্য-সাধনার যোগ্য সাধক এঁরা।

অবশেষে জেলের কর্তৃপক্ষ গবর্মেণ্টের ছাপ-মারা মোড়ক হাতে উপস্থিত হলেন। তাঁর মুখেও আনন্দের আভাস পেলুম। মহাত্মাজি গম্ভীর ভাবে ধীরে ধীরে পড়তে লাগলেন। সরোজিনীকে বললেম, এখন ওঁর চার পাশ থেকে সকলের সরে যাওয়া উচিত। মহাত্মাজি পড়া শেষ করে বন্ধুদের ডাকলেন। শুনলেম, তিনি তাঁদের আলোচনা করে দেখতে বললেন। এবং নিজের তরফ থেকে জানালেন, কাগজটা ডাক্তার আম্বেদকরকে দেখানো দরকার; তাঁর সমর্থন পেলে তবেই তিনি নিশ্চিন্ত হবেন।

বন্ধুরা এক পাশে দাঁড়িয়ে চিঠিখানি পড়লেন। আমাকেও দেখালেন। রাষ্ট্র-বুদ্ধির রচনা সাবধানে লিখিত, সাবধানেই পড়তে হয়। বুঝলেম, মহাত্মাজির অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধ নয়। পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জ্‌রুর 'পরে ভার দেওয়া হল চিঠিখানার বক্তব্য বিশ্লেষণ করে মহাত্মাজিকে শোনাবেন। তাঁর প্রাঞ্জল ব্যাখ্যায় মহাত্মাজির মনে আর কোনো সংশয় রইল না। প্রায়োপবেশনের ব্রত উদ্‌যাপন হল।

প্রাচীরের কাছে ছায়ায় মহাত্মাজির শয্যা সরিয়ে আনা হল। চতুর্দিকে জেলের কম্বল বিছিয়ে সকলে বসলেন। লেবুর রস প্রস্তুত করলেন শ্রীমতী কমলা নেহেরু। Inspector-General of Prisons—যিনি গবর্মেণ্টের পত্র নিয়ে এসেছেন—অনুরোধ করলেন, রস যেন মহাত্মাজিকে দেন শ্রীমতী কস্তুরীবাঈ নিজের হাতে। মহাদেব বললেন 'জীবন যখন শুকায়ে যায় করুণাধারায় এসো' গীতাঞ্জলির এই গানটি মহাত্মাজির প্রিয়। সুর ভুলে গিয়েছিলেম। তখনকার মতো সুর দিয়ে গাইতে হল। পণ্ডিত শ্যামশাস্ত্রী বেদ পাঠ করলেন। তার পর মহাত্মাজি শ্রীমতী কস্তুরীবাঈয়ের হাত হতে ধীরে ধীরে লেবুর রস পান করলেন। পরিশেষে সবরমতী-আশ্রমবাসিগণ এবং সমবেত সকলে 'বৈষ্ণব জন কো' গানটি গাইলেন। ফল ও মিষ্টান্ন বিতরণ হল, সকলে গ্রহণ করলেম।

জেলের অবরোধের ভিতর মহোৎসব। এমন ব্যাপার আর কখনও ঘটে নি। প্রাণোৎসর্গের যজ্ঞ হল জেলখানায়, তার সফলতা এইখানেই রূপ ধারণ করলে। মিলনের এই অকস্মাৎ আবির্ভূত অপরূপ মূর্তি, একে বলতে পারি যজ্ঞসম্ভবা।

রাত্রে পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরু প্রমুখ পুনার সমবেত বিশিষ্ট নেতারা এসে আমাকে ধরলেন, পরদিন মহাত্মাজির বার্ষিকী উৎসবসভায় আমাকে সভাপতি হতে হবে; মালব্যজিও বোম্বাই হতে আসবেন। মালব্যজিকেই সভাপতি করে আমি সামান্য দু-চার কথা লিখে পড়ব, এই প্রস্তাব করলেম। শরীরের দুর্বলতাকেও অস্বীকার করে শুভদিনের এই বিরাট জনসভায় যোগ দিতে রাজি না হয়ে পারলেম না।

বিকালে শিবাজিমন্দির-নামক বৃহৎ মুক্ত অঙ্গনে বিরাট জনসভা। অতি কষ্টে ভিতরে প্রবেশ করলেম। ভাবলেম, অভিমন্যুর মতো প্রবেশ তো হল, বেরোবার কী উপায়। মালব্যজি উপক্রমণিকায় সুন্দর করে বোঝালেন তাঁর বিশুদ্ধ হিন্দি ভাষায় যে, অস্পৃশ্যবিচার হিন্দুশাস্ত্রসংগত নয়। বহু সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করে তাঁর যুক্তি প্রমাণ করলেন। আমার কণ্ঠ ক্ষীণ, সাধ্য নেই এত বড়ো সভায় আমার বক্তব্য শ্রুতিগোচর করতে পারি। মুখে মুখে দু-চারটি কথা বললেম, পরে রচনা পাঠ করবার ভার নিলেন পণ্ডিতজির পুত্র গোবিন্দ মালব্য। ক্ষীণ অপরাহ্নের আলোকে অদৃষ্টপূর্ব রচনা অনর্গল অমন সুস্পষ্ট কণ্ঠে পড়ে গেলেন, এতে বিস্মিত হলেম।

আমার সমগ্র রচনা কাগজে আপনারা দেখে থাকবেন। সভায় প্রবেশ করবার অনতিপূর্বে তার পাণ্ডুলিপি জেলে গিয়ে মহাত্মাজির হাতে দিয়ে এসেছিলেম।

মতিলাল নেহেরুর পত্নী কিছু বললেন তাঁর ভ্রাতা-ভগিনীদের উদ্দেশ করে, সামাজিক সাম্যবিধানের ব্রত-রক্ষায় তাঁদের যেন একটুও ত্রুটি না ঘটে। শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারী, রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রমুখ অন্যান্য নেতারাও অন্তরের ব্যথা দিয়ে দেশবাসীকে সামাজিক অশুচি দূর করতে আবাহন করলেন। সভায় সমবেত বিরাট জনসংঘ হাত তুলে অস্পৃশ্যতানিবারণের প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করলেন। বোঝা গেল, সকলের মনে আজকের বাণী পৌঁচেছে। কিছু দিন পূর্বেও এমন দুরূহ সংকল্পে এত সহস্র লোকের অনুমোদন সম্ভব ছিল না।

আমার পালা শেষ হল। পরদিন প্রাতে মহাত্মাজির কাছে অনেক ক্ষণ ছিলেম। তাঁর সঙ্গে এবং মালব্যজির সঙ্গে দীর্ঘকাল নানা বিষয়ে আলোচনা হল। এক দিনেই মহাত্মাজি অপ্রত্যাশিত বল লাভ করেছেন। কণ্ঠস্বর তাঁর দৃঢ়তর, blood pressure প্রায় স্বাভাবিক। অতিথি অভ্যাগত অনেকেই আসছেন প্রণাম করে আনন্দ জানিয়ে যেতে। সকলের সঙ্গেই হেসে কথা কইছেন। শিশুর দল ফুল নিয়ে আসছে, তাদের নিয়ে তাঁর কী আনন্দ। বন্ধুদের সঙ্গে সামাজিক সাম্যবিধান প্রসঙ্গে নানাবিধ আলোচনা চলছে। এখন তাঁর প্রধান চিন্তার বিষয় হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ-ভঞ্জন।

আজ যে মহাত্মার জীবন আমাদের কাছে বিরাট ভূমিকায় উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিল, তাতে সর্বমানুষের মধ্যে মহামানুষকে প্রত্যক্ষ করবার প্রেরণা আছে। সেই প্রেরণা সার্থক হোক ভারতবর্ষের সর্বত্র।

মুক্তিসাধনার সত্য পথ মানুষের ঐক্যসাধনায়। রাষ্ট্রিক পরাধীনতা আমাদের সামাজিক সহস্র ভেদবিচ্ছেদকে অবলম্বন করেই পুষ্ট।

জড়প্রথার সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে দিয়ে উদার ঐক্যের পথে মানবসভ্যতা অগ্রসর হবে, সেইদিন আজ সমাগত।

বুদ্ধদেব

আমি যাঁকে অন্তরের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মানব বলে উপলব্ধি করি আজ এই বৈশাখী পূর্ণিমায় তাঁর জন্মোৎসবে আমার প্রণাম নিবেদন করতে এসেছি। এ কোনো বিশেষ অনুষ্ঠানের উপকরণগত অলংকার নয়, একান্তে নিভৃতে যা তাঁকে বার-বার সমর্পণ করেছি সেই অর্ঘ্যই আজ এখানে উৎসর্গ করি।

একদিন বুদ্ধগয়াতে গিয়েছিলাম মন্দিরদর্শনে, সেদিন এই কথা আমার মনে জেগেছিল— যাঁর চরণস্পর্শে বসুন্ধরা একদিন পবিত্র হয়েছিল তিনি যেদিন সশরীরে এই গয়াতে ভ্রমণ করছিলেন, সেদিন কেন আমি জন্মাই নি, সমস্ত শরীর মন দিয়ে প্রত্যক্ষ তাঁর পুণ্যপ্রভাব অনুভব করি নি?

তখনি আবার এই কথা মনে হল যে, বর্তমান কালের পরিধি অতি সংকীর্ণ, সদ্য উৎক্ষিপ্ত ঘটনার ধূলি-আবর্তে আবিল, এই অল্পপরিসর অস্বচ্ছ কালের মধ্যে মহামানবকে আমরা পরিপূর্ণ করে উপলব্ধি করতে পারি নে ইতিহাসে বার-বার তার প্রমাণ হয়েছে। বুদ্ধদেবের জীবিতকালে ক্ষুদ্র মনের কত ঈর্ষা, কত বিরোধ তাঁকে আঘাত করেছে; তাঁর মাহাত্ম্য খর্ব করবার জন্যে কত মিথ্যা নিন্দার প্রচার হয়েছিল। কত শত লোক যারা ইন্দ্রিয়গত ভাবে তাঁকে কাছে দেখেছে তারা অন্তরগত ভাবে নিজেদের থেকে তাঁর বিপুল দূরত্ব অনুভব করতে পারে নি, সাধারণ লোকালয়ের মাঝখানে থেকে তাঁর অলৌকিকত্ব তাদের মনে প্রতিভাত হবার অবকাশ পায় নি। তাই মনে করি, সেদিনকার প্রত্যক্ষ ধাবমান ঘটনাবলীর অস্পষ্টতার মধ্যে তাঁকে যে দেখি নি সে ভালোই হয়েছে। যাঁরা মহাপুরুষ তাঁরা জন্মমুহূর্তেই স্থান গ্রহণ করেন মহাযুগে, চলমান কালের অতীত কালেই তাঁরা বর্তমান, দূরবিস্তীর্ণ ভাবী কালে তাঁরা বিরাজিত। এ কথা সেদিন বুঝেছিলুম সেই মন্দিরেই। দেখলুম, দূর জাপান থেকে সমুদ্র পার হয়ে একজন দরিদ্র মৎস্যজীবী এসেছে কোনো দুষ্কৃতির অনুশোচনা করতে। সায়াহ্ন উত্তীর্ণ হল নির্জন নিঃশব্দ মধ্যরাত্রিতে, সে একাগ্রমনে করজোড়ে আবৃত্তি করতে লাগল : আমি বুদ্ধের শরণ নিলাম। কত শত শতাব্দী হয়ে গেছে, একদা শাক্যরাজপুত্র গভীর রাত্রে মানুষের দুঃখ দূর করবার সাধনায় রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করে বেরিয়েছিলেন; আর সেদিনকার সেই মধ্যরাত্রে জাপান থেকে এল তীর্থযাত্রী গভীর দুঃখে তাঁরই শরণ কামনা করে। সেদিন তিনি ঐ পাপপরিতপ্তের কাছে পৃথিবীর সকল প্রত্যক্ষ বস্তুর চেয়ে প্রত্যক্ষতম, অন্তরতম; তাঁর জন্মদিন ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে ঐ মুক্তিকামীর জীবনের মধ্যে। সেদিন সে আপন মনুষ্যত্বের গভীরতম আকাঙ্ক্ষার দীপ্তশিখায় সম্মুখে দেখতে পেয়েছে তাঁকে যিনি নরোত্তম। যে বর্তমান কালে ভগবান বুদ্ধের জন্ম হয়েছিল সেদিন যদি তিনি প্রতাপশালী রাজরূপে, বিজয়ী বীররূপেই প্রকাশ পেতেন, তা হলে তিনি সেই বর্তমান কালকে অভিভূত করে সহজে সম্মান লাভ করতে পারতেন; কিন্তু সেই প্রচুর সম্মান আপন ক্ষুদ্র কালসীমার মধ্যেই বিলুপ্ত হত। প্রজা বড়ো করে জানত রাজাকে, নির্ধন জানত ধনীকে, দুর্বল জানত প্রবলকে— কিন্তু মনুষ্যত্বের পূর্ণতাকে সাধনা করছে যে মানুষ সেই স্বীকার করে, সেই অভ্যর্থনা করে মহামানবকে। মানবকর্তৃক মহামানবের স্বীকৃতি মহাযুগের ভূমিকায়। তাই আজ ভগবান বুদ্ধকে দেখছি যথাস্থানে মানবমনের মহাসিংহাসনে মহাযোগের বেদীতে, যার মধ্যে অতীত কালের মহৎপ্রকাশ বর্তমানকে

অতিক্রম করে চলেছে। আপনার চিত্তবিকারে আপন চরিত্রের অপূর্ণতায় পীড়িত মানুষ আজও তাঁরই কাছে বলতে আসছে : বুদ্ধের শরণ কামনা করি। এই সুদূর কালে প্রসারিত মানবচিত্তের ঘনিষ্ঠ উপলব্ধিতেই তাঁর যথার্থ আবির্ভাব।

আমরা সাধারণ লোক পরম্পরের যোগে আপনার পরিচয় দিয়ে থাকি; সে পরিচয় বিশেষ শ্রেণীর, বিশেষ জাতির, বিশেষ সমাজের। পৃথিবীতে এমন লোক অতি অল্পই জন্মেছেন যাঁরা আপনাতে স্বতই প্রকাশবান্, যাঁদের আলোক প্রতিফলিত আলোক নয়, যাঁরা সম্পূর্ণ প্রকাশিত আপন মহিমায়, আপনার সত্যে। মানুষের খণ্ড প্রকাশ দেখে থাকি অনেক বড়ো লোকের মধ্যে; তাঁরা জ্ঞানী, তাঁরা বিদ্বান, তাঁরা বীর, তাঁরা রাষ্ট্রনেতা; তাঁরা মানুষকে চালনা করেছেন আপন ইচ্ছামত; তাঁরা ইতিহাসকে সংঘটন করেছেন আপন সঙ্কল্পের আদর্শে। কেবল পূর্ণ মনুষ্যত্বের প্রকাশ তাঁরই, সকল দেশের সকল কালের সকল মানুষকে যিনি আপনার মধ্যে অধিকার করেছেন, যাঁর চেতনা খণ্ডিত হয় নি রাষ্ট্রগত জাতিগত দেশকালের কোনো অভ্যস্ত সীমানায়।

মানুষের প্রকাশ সত্যে। এই সত্য যে কী তা উপনিষদে বলা হয়েছে : আত্মবৎ সর্বভূতেষু য পশ্যতি স পশ্যতি। যিনি সকল জীবকে আপনার মতো করে জানেন তিনিই সত্যকে জানেন। আপনার মধ্যে সত্যকে যিনি এমনি করে জেনেছেন তাঁর মধ্যে মনুষ্যত্ব প্রকাশিত হয়েছে, তিনি আপন মানবমহিমায় দেদীপ্যমান।

যস্তু সর্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি
চাত্মানং সর্বভূতেষু ন ততো বিজুগুপ্সতে।

সকলের মধ্যে আপনাকে ও আপনার মধ্যে সকলকে যিনি দেখতে পেয়েছেন, তিনি আর গোপন থাকতে পারেন না, সকল কালে তাঁর প্রকাশ।

মানুষের এই প্রকাশ জগতে আজ অধিকাংশ লোকের মধ্যে আবৃত। কিছু কিছু দেখা যায়, অনেকখানি দেখা যায় না। পৃথিবীসৃষ্টির আদি যুগে ভূমণ্ডল ঘন বাষ্প-আবরণে আচ্ছন্ন ছিল। তখন এখানে সেখানে উচ্চতম পর্বতের চূড়া অবারিত আলোকের মধ্যে উঠতে পেরেছে। আজকের দিনে তেমনি অধিকাংশ মানুষ প্রচ্ছন্ন, আপন স্বার্থে, আপন অহঙ্কারে, অবরুদ্ধ চৈতন্যে। যে সত্যে আত্মার সর্বত্র প্রবেশ সেই সত্যের বিকাশ তাদের মধ্যে অপরিণত।

মানুষের সৃষ্টি আজও অসম্পূর্ণ হয়ে আছে। এই অসমাপ্তির নিবিড় আবরণের মধ্যে থেকে মানুষের পরিচয় আমরা পেতুম কী করে যদি না মানব সহসা আমাদের কাছে আবির্ভূত হত কোনো প্রকাশবান্ মহাপুরুষের মধ্যে? মানুষের সেই মহাভাগ্য ঘটেছে, মানুষের সত্যস্বরূপ দেদীপ্যমান হয়েছে ভগবান বুদ্ধের মধ্যে, তিনি সকল মানুষকে আপন বিরাট হৃদয়ে গ্রহণ করে দেখা দিয়েছেন। ন ততো বিজুগুপ্সতে— আর তাঁকে গোপন করবে কিসে, দেশকালের কোন্ সীমাবদ্ধ পরিচয়ের অন্তরালে, কোন্ সদ্যপ্রয়োজন-সিদ্ধির প্রলুব্ধতায়?

ভগবান বুদ্ধ তপস্যার আসন থেকে উঠে আপনাকে প্রকাশিত করলেন। তাঁর সেই প্রকাশের আলোকে সত্যদীপ্তিতে প্রকাশ হল ভারতবর্ষের। মানব-ইতিহাসে তাঁর চিরন্তন আবির্ভাব ভারতবর্ষের ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম করে ব্যাপ্ত হল দেশে দেশান্তরে। ভারতবর্ষ তীর্থ হয়ে উঠল, অর্থাৎ স্বীকৃত হল সকল দেশের দ্বারা, কেননা বুদ্ধের বাণীতে ভারতবর্ষ সেদিন স্বীকার করেছে সকল মানুষকে। সে কাউকে অবজ্ঞা করে নি, এইজন্যে সে আর গোপন রইল না। সত্যের বন্যায় বর্ণের বেড়া দিলে ভাসিয়ে; ভারতের আমন্ত্রণ পৌঁছল দেশ-বিদেশের সকল জাতির

কাছে। এল চীন ব্রহ্মদেশ জাপান, এল তিব্বত মঙ্গোলিয়া। দুস্তর গিরি-সমুদ্র পথ ছেড়ে দিলে অমোঘ সত্যবার্তার কাছে। দূর হতে দূরে মানুষ বলে উঠল, মানুষের প্রকাশ হয়েছে, দেখেছি— মহান্তং পুরুষং তমসঃ পরস্তাৎ। এই ঘোষণাবাক্য অক্ষয় রূপ নিল মরুপ্রান্তরে প্রস্তরমূর্তিতে। অদ্ভুত অধ্যবসায়ে মানুষ রচনা করলে বুদ্ধবন্দনা, মূর্তিতে, চিত্রে, স্তূপে। মানুষ বলেছে, যিনি অলোকসামান্য দুঃসাধ্য সাধন করেই তাঁকে জানাতে হবে ভক্তি। অপূর্ব শক্তির প্রেরণা এল তাদের মনে; নিবিড় অন্ধকারে গুহাভিত্তিতে তারা আঁকল ছবি, দুর্বহ প্রস্তরখণ্ডগুলোকে পাহাড়ের মাথায় তুলে তারা নির্মাণ করলে মন্দির, শিল্পপ্রতিভা পার হয়ে গেল সমুদ্র, অপরূপ শিল্পসম্পদ রচনা করলে, শিল্পী আপনার নাম করে দিলে বিলুপ্ত, কেবল শাশ্বত কালকে এই মন্ত্র দান করে গেল : বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি। জাভাদ্বীপে বরোবুদরে দেখে এলুম সুবৃহৎ স্তূপ পরিবেষ্টন করে শত শত মূর্তি খুদে তুলেছে বুদ্ধের জাতককথার বর্ণনায়; তার প্রত্যেকটিতেই আছে কারুনৈপুণ্যের উৎকর্ষ, কোথাও লেশমাত্র আলস্য নেই, অনবধান নেই; একে বলে শিল্পের তপস্যা, একই সঙ্গে এই তপস্যা ভক্তির— খ্যাতিলোভহীন নিষ্কাম কৃচ্ছ্রসাধনায় আপন শ্রেষ্ঠশক্তিকে উৎসর্গ করা চিরবরণীয়ের চিরস্মরণীয়ের নামে। কঠিন দুঃখ স্বীকার করে মানুষ আপন ভক্তিকে চরিতার্থ করেছে; তারা বলেছে, যে প্রতিভা নিত্যকালের সর্বমানবের ভাষায় কথা বলে সেই অকৃপণ প্রতিভার চূড়ান্ত প্রকাশ না করতে পারলে কোন্ উপায়ে যথার্থ করে বলা হবে 'তিনি এসেছিলেন সকল মানুষের জন্যে সকল কালের জন্যে'? তিনি মানুষের কাছে সেই প্রকাশ চেয়েছিলেন, যা দুঃসাধ্য, যা চিরজাগরূক, যা সংগ্রামজয়ী, যা বন্ধনচ্ছেদী। তাই সেদিন পূর্ব মহাদেশের দুর্গমে দুস্তরে বীর্যবান পূজার আকারে প্রতিষ্ঠিত হল তাঁর জয়ধ্বনি, শৈলশিখরে, মরুপ্রান্তরে, নির্জন গুহায়। এর চেয়ে মহত্তর অর্ঘ্য এল ভগবান বুদ্ধের পদমূলে যেদিন রাজাধিরাজ অশোক শিলালিপিতে প্রকাশ করলেন তাঁর পাপ, অহিংস্র ধর্মের মহিমা ঘোষণা করলেন, তাঁর প্রণামকে চিরকালের প্রাঙ্গণে রেখে গেলেন শিলাস্তম্ভে।

এত বড়ো রাজা কি জগতে আর কোনো দিন দেখা দিয়েছে! সেই রাজাকে মাহাত্ম্য দান করেছেন যে গুরু তাঁকে আহ্বান করবার প্রয়োজন আজ যেমন একান্ত হয়েছে এমন সেদিনও হয় নি যেদিন তিনি জন্মেছিলেন এই ভারতে। বর্ণে বর্ণে, জাতিতে জাতিতে, অপবিত্র ভেদবুদ্ধির নিষ্ঠুর মূঢ়তা ধর্মের নামে আজ রক্তে পঙ্কিল করে তুলেছে এই ধরাতল; পরস্পর হিংসার চেয়ে সাংঘাতিক পরস্পর ঘৃণায় মানুষ এখানে পদে পদে অপমানিত। সর্বজীবে মৈত্রীকে যিনি মুক্তির পথ বলে ঘোষণা করেছিলেন সেই তাঁরই বাণীকে আজ উৎকণ্ঠিত হয়ে কামনা করি এই ভ্রাতৃবিদ্বেষকলুষিত হতভাগ্য দেশে। পূজার বেদীতে আবির্ভূত হোন মানবশ্রেষ্ঠ, মানবের শ্রেষ্ঠতাকে উদ্ধার করবার জন্যে। সকলের চেয়ে বড়ো দান যে শ্রদ্ধাদান, তার থেকে কোনো মানুষকে তিনি বঞ্চিত করেন নি। যে দয়াকে, যে দানকে তিনি ধর্ম বলেছেন সে কেবল দূরের থেকে স্পর্শ বাঁচিয়ে অর্থদান নয়, সে দান আপনাকে দান— যে দানধর্মে বলে 'শ্রদ্ধয়া দেয়ম্'। নিজের শ্রেষ্ঠতাভিমান, পুণ্যাভিমান, ধনাভিমান প্রবেশ করে দানকে অপমানকর অধর্মে পরিণত করতে পারে এই ভয়ের কারণ আছে; এইজন্যে উপনিষদ্ বলেন : ভিয়া দেয়ম্। ভয় করে দেবে। যে ধর্মকর্মের দ্বারা মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা হারাবার আশঙ্কা আছে তাকেই ভয় করতে হবে। আজ ভারতবর্ষে ধর্মবিধির প্রণালীযোগে মানুষের প্রতি

অশ্রদ্ধার পথ চারি দিকে প্রসারিত হয়েছে। এরই ভয়ানকত্ব কেবল আধ্যাত্মিক দিকে নয়, রাষ্ট্রীয় মুক্তির দিকে সর্বপ্রধান অন্তরায় হয়েছে এ প্রত্যক্ষ দেখছি। এই সমস্যার কি কোনো দিন সমাধান হতে পারে রাষ্ট্রনীতির পথে কোনো বাহ্য উপায়ের দ্বারা?

ভগবান্ বুদ্ধ একদিন রাজসম্পদ ত্যাগ করে তপস্যা করতে বসেছিলেন। সে তপস্যা সকল মানুষের দুঃখমোচনের সংকল্প নিয়ে। এই তপস্যার মধ্যে কি অধিকারভেদ ছিল? কেউ ছিল কি ম্লেচ্ছ? কেউ ছিল কি অনার্য? তিনি তাঁর সব-কিছু ত্যাগ করেছিলেন দীনতম মূর্খতম মানুষেরও জন্যে। তাঁর সেই তপস্যার মধ্যে ছিল নির্বিচারে সকল দেশের সকল মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা। তাঁর সেই এত বড়ো তপস্যা আজ কি ভারতবর্ষ থেকে বিলীন হবে?

জিজ্ঞাসা করি, মানুষে মানুষে বেড়া তুলে দিয়ে আমরা কী পেরেছি ঠেকাতে? ছিল আমাদের পরিপূর্ণ ধনের ভাণ্ডার; তার দ্বার, তার প্রাচীর, বাইরের আঘাতে ভেঙে পড়ে নি কি? কিছু কি তার অবশিষ্ট আছে? আজ প্রাচীরের পর প্রাচীর তুলেছি মানুষের প্রতি আত্মীয়তাকে অবরুদ্ধ করে, আজ দেবতার মন্দিরের দ্বারে পাহারা বসিয়েছি দেবতার অধিকারকেও কৃপণের মতো ঠেকিয়ে রেখে। দানের দ্বারা, ব্যয়ের দ্বারা, যে ধনের অপচয় হয় তাকে বাঁচাতে পারলুম না; কেবল দানের দ্বারা যার ক্ষয় হয় না, বৃদ্ধি হয়, মানুষের প্রতি সেই শ্রদ্ধাকে সাম্প্রদায়িক সিন্দুকের মধ্যে তালা বন্ধ করে রাখলুম। পুণ্যের ভাণ্ডার বিষয়ীর ভাণ্ডারের মতোই আকার ধরল। একদিন যে ভারতবর্ষ মানুষের প্রতি শ্রদ্ধার দ্বারা সমস্ত পৃথিবীর কাছে আপন মনুষ্যত্ব উজ্জ্বল করে তুলেছিল আজ সে আপন পরিচয়কে সঙ্কুচিত করে এনেছে; মানুষকে অশ্রদ্ধা করেই সে মানুষের অশ্রদ্ধাভাজন হল। আজ মানুষ মানুষের বিরুদ্ধ হয়ে উঠেছে; কেননা মানুষ আজ সত্যভ্রষ্ট, তার মনুষ্যত্ব প্রচ্ছন্ন। তাই আজ সমস্ত পৃথিবী জুড়ে মানুষের প্রতি মানুষের এত সন্দেহ, এত আতঙ্ক, এত আক্রোশ। তাই আজ মহামানবকে এই বলে ডাকবার দিন এসেছে: তুমি আপনার প্রকাশের দ্বারা মানুষকে প্রকাশ করো।

ভগবান্ বুদ্ধ বলেছেন, অক্রোধের দ্বারা ক্রোধকে জয় করবে। কিছুদিন পূর্বেই পৃথিবীতে এক মহাযুদ্ধ হয়ে গেল। এক পক্ষের জয় হল, সে জয় বাহুবলের। কিন্তু যেহেতু বাহুবল মানুষের চরম বল নয়, এইজন্যে মানুষের ইতিহাসে সে জয় নিষ্ফল হল, সে জয় নূতন যুদ্ধের বীজ বপন করে চলেছে। মানুষের শক্তি অক্রোধে, ক্ষমাতে, এই কথা বুঝতে দেয় না সেই পশু যে আজও মানুষের মধ্যে মরে নি। তাই মানবের সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা করে মানবের গুরু বলেছেন: ক্রোধকে জয় করবে অক্রোধের দ্বারা, নিজের ক্রোধকে এবং অন্যের ক্রোধকে। এ না হলে মানুষ ব্যর্থ হবে, যেহেতু সে মানুষ। বাহুবলের সাহায্যে ক্রোধকে প্রতিহিংসাকে জয়ী করার দ্বারা শান্তি মেলে না, ক্ষমাই আনে শান্তি, এ কথা মানুষ আপন রাষ্ট্রনীতিতে সমাজনীতিতে যতদিন স্বীকার করতে না পারবে ততদিন অপরাধীর অপরাধ বেড়ে চলবে; রাষ্ট্রগত বিরোধের আগুন কিছুতে নিভবে না; জেলখানার দানবিক নিষ্ঠুরতায় এবং সৈন্যনিবাসের সশস্ত্র ভ্রূকুটিবিক্ষেপে পৃথিবীর মর্মান্তিক পীড়া উত্তরোত্তর দুঃসহ হতে থাকবে—কোথাও এর শেষ পাওয়া যাবে না। পাশবতার সাহায্যে মানুষের সিদ্ধিলাভের দুরাশাকে যিনি নিরস্ত করতে চেয়েছিলেন, যিনি বলেছিলেন 'অক্কোধেন জিনে কোধং', আজ সেই মহাপুরুষকে স্মরণ করে মনুষ্যত্বের জগদ্ব্যাপী এই অপমানের যুগে বলবার দিন

এল : বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি। তাঁরই শরণ নেব যিনি আপনার মধ্যে মানুষকে প্রকাশ করেছেন। যিনি সেই মুক্তির কথা বলেছেন, যে মুক্তি নঞর্থক নয়, সদর্থক; যে মুক্তি কর্মত্যাগে নয়, সাধুকর্মের মধ্যে আত্মত্যাগে; যে মুক্তি রাগদ্বেষবর্জনে নয়. সর্বজীবের প্রতি অপরিমেয় মৈত্রীসাধনায়। আজ স্বার্থক্ষুধান্ধ বৈশ্যবৃত্তির নির্মম নিঃসীম লুব্ধতার দিনে সেই বুদ্ধের শরণ কামনা করি যিনি আপনার মধ্যে বিশ্বমানবের সত্যরূপ প্রকাশ করে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

[বৈশাখী পূর্ণিমা : ৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪২]

ব্রহ্মবিহার

ব্রহ্মবিহারের এই সাধনার পথে বুদ্ধদেব মানুষকে প্রবর্তিত করবার জন্যে বিশেষরূপে উপদেশ দিয়েছেন। তিনি জানতেন কোনো পাবার যোগ্য জিনিস ফাঁকি দিয়ে পাওয়া যায় না, সেইজন্যে তিনি বেশি কথা না বলে একেবারে ভিত খোঁড়া থেকে কাজ আরম্ভ করে দিয়েছেন।

তিনি বলেছেন, শীল গ্রহণ করাই মুক্তিপথের পাথেয় গ্রহণ করা। চরিত্র শব্দের অর্থই এই যাতে করে চলা যায়। শীলের দ্বারা সেই চরিত্র গড়ে ওঠে; শীল আমাদের চলবার সম্বল।

পাণং ন হানে : প্রাণীকে হত্যা করবে না—এই কথাটি শীল। ন চাদিন্নমাদিয়ে : যা তোমাকে দেওয়া হয় নি তা নেবে না—এই একটি শীল। মুসা ন ভাসে : মিথ্যা কথা বলবে না—এই একটি শীল। ন চ মজ্জপো সিয়া : মদ খাবে না—এই একটি শীল। এমনি করে যথাসাধ্য একটি একটি করে শীল সঞ্চয় করতে হবে।

আর্যশ্রাবকেরা প্রতিদিন নিজেদের এই শীলকে স্মরণ করেন : ইধ অরিয়সাবকো অত্তনো সীলানি অনুস্সরতি।

শীলসকলকে কী বলে অনুস্মরণ করেন?

অখণ্ডানি, অচ্ছিদ্দানি, অসবলানি, অকম্মাসানি, ভুজিস্সানি, বিঞ্ঞুপ্পসত্থানি, অপরামট্ঠানি, সমাধিসংবত্তনিকানি।

অর্থাৎ, আমার এই শীল খণ্ডিত হয় নি, এতে ছিদ্র হয় নি, আমার এই শীল জোর করে রক্ষিত হয় নি, অর্থাৎ ইচ্ছা করেই রাখছি, এই শীলে পাপ স্পর্শ করে নি, এই শীল ধন মান প্রভৃতি কোনো স্বার্থসাধনের জন্য আচরিত নয়, এই শীল বিজ্ঞজনের অনুমোদিত, এই শীল বিদলিত হয় নি এবং এই শীল মুক্তিপ্রবর্তন করবে। এই বলে আর্যশ্রাবকগণ নিজ নিজ শীলের গুণ বারম্বার স্মরণ করেন।

এই শীলগুলিই হচ্ছে মঙ্গল। মঙ্গললাভই প্রেম ও মুক্তিলাভের সোপান। বুদ্ধদেব কাকে যে মঙ্গল বলেছেন তা মঙ্গলসুত্তে কথিত আছে। সেটি অনুবাদ করে দিই—

বহূ দেবা মনুস্সা চ মঙ্গলানি অচিন্তয়ুং
আকঙ্খমানা সোত্থানং ব্রূহি মঙ্গলমুত্তমং।

বুদ্ধকে প্রশ্ন করা হচ্ছে যে, 'বহু দেবতা বহু মানুষ যাঁরা শুভ আকাঙ্ক্ষা করেন তাঁরা মঙ্গলের চিন্তা করে এসেছেন, সেই মঙ্গলটি কী বলো।'

বুদ্ধ উত্তর দিচ্ছেন—

অসেবনা চ বালানং পণ্ডিতানঞ্চ সেবনা
পূজা চ পূজনেয়্যানং এতং মঙ্গলমুত্তমং।

অসংগণের সেবা না করা, সজ্জনের সেবা করা, পূজনীয়কে পূজা করা—এই হচ্ছে উত্তম মঙ্গল।

পতিরূপদেসবাসো পুব্বে চ কতপুঞ্‌ঞতা
অত্তসম্মাপণিধি চ এতং মঙ্গলমুত্তমং।

যে দেশে ধর্মসাধন বাধা পায় না সেই দেশে বাস, পূর্বকৃত পুণ্যকে বর্ধিত করা, আপনাকে সৎকর্মে প্রণিধান করা—এই উত্তম মঙ্গল।

বহুসচ্চঞ্চ সিপ্‌পঞ্চ বিনয়ো চ সুসিক্‌খিতো
সুভাসিতা চ যা বাচা এতং মঙ্গলমুত্তমং।

বহু-শাস্ত্র-অধ্যয়ন, বহু-শিল্প-শিক্ষা, বিনয়ে সুশিক্ষিত হওয়া এবং সুভাষিত বাক্য বলা—এই উত্তম মঙ্গল।

মাতাপিতু-উপট্‌ঠানং পুত্তদারস্‌স সংগহো
অনাকুলা চ কম্মানি এতং মঙ্গলমুত্তমং।

মাতাপিতাকে পূজা করা, স্ত্রীপুত্রের কল্যাণ করা, অনাকুল কর্ম করা—এই উত্তম মঙ্গল।

দানঞ্চ ধম্মচরিয়ঞ্চ ঞ্‌ঞাতকানঞ্চ সংগহো
অনবজ্জানি কম্মানি এতং মঙ্গলমুত্তমং।

দান, ধর্মচর্যা, জ্ঞাতিবর্গের উপকার, অনিন্দনীয় কর্ম—এই উত্তম মঙ্গল।

আরতী বিরতি পাপা মজ্জপানা চ সঞ্‌ঞমো
অপ্‌পমাদো চ ধম্মেসু এতং মঙ্গলমুত্তমং।

পাপে অনাসক্তি এবং বিরতি, মদ্যপানে বিতৃষ্ণা, ধর্মকর্মে অপ্রমাদ—এই উত্তম মঙ্গল।

গারবো চ নিবাতো চ সন্তুট্‌ঠী চ কতঞ্‌ঞুতা
কালেন ধম্মসবনং এতং মঙ্গলমুত্তমং।

গৌরব অথচ নম্রতা, সন্তুষ্টি, কৃতজ্ঞতা, যথাকালে ধর্মকথাশ্রবণ—এই উত্তম মঙ্গল।

খন্তী চ সোবচস্‌সতা সমণানঞ্চ দস্‌সনং
কালেন ধম্মসাকচ্ছা এতং মঙ্গলমুত্তমং।

ক্ষমা, প্রিয়বাদিতা, সাধুগণকে দর্শন, যথাকালে ধর্মালোচনা—এই উত্তম মঙ্গল।

তপো চ ব্রহ্মচরিয়ঞ্চ অরিয়সচ্চান দস্‌সনং
নিব্বানসচ্ছিকিরিয়া এতং মঙ্গলমুত্তমং।

তপস্যা, ব্রহ্মচর্য, শ্রেষ্ঠ সত্যকে জানা, মুক্তিলাভের উপযুক্ত সৎকার্য—এই উত্তম মঙ্গল।

ফুট্‌ঠস্‌স লোকধম্মেহি চিত্তং যস্‌স ন কম্পতি
অসোকং বিরজং খেমং এতং মঙ্গলমুত্তমং।

লাভ ক্ষতি নিন্দা প্রশংসা প্রভৃতি লোকধর্মের দ্বারা আঘাত পেলেও যার চিত্ত কম্পিত হয় না, যার শোক নেই, মলিনতা নেই, যার ভয় নেই—সে উত্তম মঙ্গল পেয়েছে।

এতাদিসানি কত্বান সব্বত্থমপরাজিতা
সব্বত্থ সোত্থি গচ্ছন্তি তং তেসং মঙ্গলমুত্তমন্তি।

এই রকম যারা করেছে তারা সর্বত্র অপরাজিত, তারা সর্বত্র স্বস্তি লাভ করে, তাদের উত্তম মঙ্গল হয়।

যারা বলে ধর্মনীতিই বৌদ্ধধর্মের চরম তারা ঠিক কথা বলে না। মঙ্গল একটা উপায় মাত্র। তবে নির্বাণই চরম? তা হতে পারে, কিন্তু সেই নির্বাণটি কী? সে কি শূন্যতা?

যদি শূন্যতাই হত তবে পূর্ণতার দ্বারা তাতে গিয়ে পেঁাছনো যেত না। তবে কেবলই সমস্তকে অস্বীকার করতে করতে, ‘নয় নয় নয়’ বলতে বলতে, একটার পর একটা ত্যাগ করতে করতেই, সেই সর্বশূন্যতার মধ্যে নির্বাপণ লাভ করা যেত।

কিন্তু, বৌদ্ধধর্মে সে পথের ঠিক উল্টা পথ দেখি যে। তাতে কেবল তো মঙ্গল দেখছি নে, মঙ্গলের চেয়েও বড়ো জিনিসটি দেখছি যে।

মঙ্গলের মধ্যেও একটা প্রয়োজনের ভাব আছে। অর্থাৎ, তাতে একটা কোনো ভালো উদ্দেশ্য সাধন করে, কোনো-একটা সুখ হয় বা সুযোগ হয়।

কিন্তু, প্রেম যে সকল প্রয়োজনের বাড়া। কারণ, প্রেম হচ্ছে স্বতই আনন্দ, স্বতই পূর্ণতা; সে কিছুই নেওয়ার অপেক্ষা করে না, সে যে কেবলই দেওয়া।

যে দেওয়ার মধ্যে কোনো নেওয়ার সম্বন্ধ নেই সেইটেই হচ্ছে শেষের কথা, সেইটেই ব্রহ্মের স্বরূপ— তিনি নেন না।

এই প্রেমের ভাবে, এই আদানবিহীন প্রদানের ভাবে আত্মাকে ক্রমশ পরিপূর্ণ করে তোলবার জন্যে বুদ্ধদেবের উপদেশ আছে, তিনি তার সাধনপ্রণালীও বলে দিয়েছেন।

এ তো বাসনাসংহরণের প্রণালী নয়, এ তো বিশ্ব হতে বিমুখ হবার প্রণালী নয়, এ যে সকলের অভিমুখে আত্মাকে ব্যাপ্ত করবার পদ্ধতি। এই প্রণালীর নাম ‘মেত্তিভাবনা’—মৈত্রীভাবনা।

প্রতিদিন এই কথা ভাবতে হবে : সব্বে সত্তা সুখিতা হোন্তু, অবেরা হোন্তু, অব্যাপজ্‌ঝা হোন্তু, সুখী অত্তানং পরিহরন্তু, সব্বে সত্তা মা যথালদ্ধসম্পত্তিতো বিগচ্ছন্তু।

সকল প্রাণী সুখিত হোক, শত্রুহীন হোক, অহিংসিত হোক, সুখী আত্মা হয়ে কালহরণ করুক। সকল প্রাণী আপন যথালব্ধ সম্পত্তি হতে বঞ্চিত না হোক।

মনে ক্রোধ দ্বেষ লোভ ঈর্ষা থাকলে এই মৈত্রীভাবনা সত্য হয় না, এইজন্য শীলগ্রহণ শীলসাধন প্রয়োজন। কিন্তু, শীলসাধনার পরিণাম হচ্ছে সর্বত্র মৈত্রীকে দয়াকে বাধাহীন করে বিস্তার। এই উপায়েই আত্মাকে সকলের মধ্যে উপলব্ধি করা সম্ভব হয়।

এই মৈত্রীভাবনার দ্বারা আত্মাকে সকলের মধ্যে প্রসারিত করা, এ তো শূন্যতার পন্থা নয়।

তা যে নয় তা বুদ্ধ যাকে ব্রহ্মবিহার বলছেন তা অনুশীলন করলেই বোঝা যাবে।

করণীয় মত্থ কুসলেন
যন্তং সন্তং পদং অভিসমেচ্চ
সক্কো উজূ চ সুহুজূচ
সুবচো চস্স মুদু অনতিমানী।

শান্তপদ লাভ করে পরমার্থকুশল ব্যক্তির যা করণীয় তা এই—তিনি শক্তিমান, সরল, অতি সরল, সুভাষী, মৃদু, নম্র এবং অনভিমানী হবেন।

সন্তুস্সকো চ সুভরো চ,
অপ্পকিচ্চো চ সল্লহুকবুত্তি
সন্তিন্দ্রিয়ো চ নিপকো চ
অপ্পগব্ভো কুলেসু অননুগিদ্ধো।

তিনি সন্তুষ্টহৃদয় হবেন, অল্পেই তাঁর ভরণ হবে; তিনি নিরুদ্বেগ, অল্পভোজী, শান্তেন্দ্রিয়, সদ্বিবেচক, অপ্রগল্ভ এবং সংসারে অনাসক্ত হবেন।

ন চ খুদ্দং সমাচরে কিঞ্চি
যেন বিঞ্ঞূপরে উপবদেয্যুং।
সুখিনো বা খেমিনো বা
সব্বে সত্তা ভবন্তু সুখিতত্তা।

এমন ক্ষুদ্র অন্যায়ও কিছু আচরণ করবেন না যার জন্যে অন্যে তাঁকে নিন্দা করতে পারে। তিনি কামনা করবেন সকল প্রাণী সুখী হোক, নিরাপদ হোক, সুস্থ হোক।

যে কেচি পাণভূতত্থি
তসা বা থাবরা বা অনবসেসা।
দীঘা বা যে মহন্তা বা
মজ্ঝিমা রস্সকা অণুকথূলা।
দিট্ঠা বা যে চ অদিট্ঠা
যে চ দূরে বসন্তি অবিদূরে।
ভূতা বা সম্ভবেসী বা
সব্বে সত্তা ভবন্তু সুখিতত্তা।

যে কোনো প্রাণী আছে, কী সবল কী দুর্বল, কী দীর্ঘ কী প্রকাণ্ড, কী মধ্যম কী হ্রস্ব, কী সূক্ষ্ম কী স্থূল, কী দৃষ্ট কী অদৃষ্ট, যারা দূরে বাস করছে বা যারা নিকটে, যারা জন্মেছে বা যারা জন্মাবে, অনবশেষে সকলেই সুখী-আত্মা হোক।

ন পরোপরং নিকুব্বেথ
নাতিমঞ্ঞেথ কত্থচি ন কঞ্চি
ব্যারোসনা পটিঘ সঞ্ঞা
নঞ্ঞমঞ্ঞস্স দুক্খমিচ্ছেয্য।

পরস্পরকে বঞ্চনা কোরো না, কোথাও কাউকে অবজ্ঞা কোরো না, কায়ে বাক্যে বা মনে ক্রোধ করে অন্যের দুঃখ ইচ্ছা কোরো না।

মাতা যথা নিযং পুত্তং
আয়ুসা একপুত্তমনুরক্খে
এবম্পি সব্বভূতেসু
মানসং ভাবয়ে অপরিমাণং।

মা যেমন একটিমাত্র পুত্রকে নিজের আয়ু দিয়ে রক্ষা করেন সমস্ত প্রাণীতে সেইপ্রকার অপরিমিত মানস রক্ষা করবে।

মেত্তঞ্চ সব্বলোকস্মিং
মানসং ভাবয়ে অপরিমাণং।

উদ্ধং অধো চ তিরিয়ঞ্চ
অসম্বাধং অবেরমসপত্তং।

উর্ধ্বে অধোতে চার-দিকে সমস্ত জগতের প্রতি বাধাহীন হিংসাহীন শত্রুতাহীন অপরিমিত মানস এবং মৈত্রী রক্ষা করবে।

তিট্‌ঠং চরং নিসিন্নো বা
সয়ানো বা যাবতস্‌স বিগতমিদ্ধো
এতং সতিং অধিট্‌ঠেয্যং
ব্রহ্মমেতং বিহারমিধমাহু।

যখন দাঁড়িয়ে আছ বা চলছ, বসে আছ বা শুয়ে আছ, যে পর্যন্ত না নিদ্রা আসে সে পর্যন্ত, এইপ্রকার স্মৃতিতে অধিষ্ঠিত হয়ে থাকাকে ব্রহ্মবিহার বলে।

অপরিমিত মানসকে প্রীতিভাবে মৈত্রীভাবে বিশ্বলোকে ভাবিত করে তোলাকে ব্রহ্মবিহার বলে। সে প্রীতি সামান্য প্রীতি নয়—মা তাঁর একটিমাত্র পুত্রকে যেরকম ভালোবাসেন সেইরকম ভালোবাসা।

ব্রহ্মের অপরিমিত মানস যে বিশ্বের সর্বত্রই রয়েছে, এক পুত্রের প্রতি মাতার যে প্রেম সেই প্রেম যে তাঁর সর্বত্র। তাঁরই সেই মানসের সঙ্গে মানস, প্রেমের সঙ্গে প্রেম না মেশালে সে তো ব্রহ্মবিহার হল না।

কথাটা খুব বড়ো। কিন্তু, বড়ো কথাই যে হচ্ছে, বড়ো কথাকে ছোটো কথা করে তো লাভ নেই। ব্রহ্মকে চাওয়াই যে সকলের চেয়ে বড়োকে চাওয়া। উপনিষৎ বলেছেন : ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ। ভূমাকেই, সকলের চেয়ে বড়োকেই, জানতে চাইবে।

সেই চাওয়া সেই পাওয়ার রূপটা কী সে তো স্পষ্ট করে, পরিষ্কার করে সম্মুখে ধরতে হবে। ভগবান্ বুদ্ধ ব্রহ্মবিহারকে সুস্পষ্ট করে ধরেছেন; তাকে ছোটো করে, ঝাপসা করে, সকলের কাছে চলনসই করবার চেষ্টা করেন নি।

অপরিমিত মানসে অপরিমিত মৈত্রীকে সর্বত্র প্রসারিত করে দিলে ব্রহ্মের বিহারক্ষেত্রে ব্রহ্মের সঙ্গে মিলন হয়।

এই তো হল লক্ষ্য। কিন্তু, এ তো আমরা একেবারে পারব না। এই দিকে আমাদের প্রত্যহ চলতে হবে। এই লক্ষ্যের সঙ্গে তুলনা করে প্রত্যহ বুঝতে পারব আমরা কতদূর অগ্রসর হলুম।

ঈশ্বরের প্রতি আমার প্রেম জন্মাচ্ছে কি না সে সম্বন্ধে আমরা নিজেকে নিজে ভোলাতে পারি। কিন্তু সকলের প্রতি আমার প্রেম বিস্তৃত হচ্ছে কি না, আমার শত্রুতা ক্ষয় হচ্ছে কি না, আমার মঙ্গলভাব বাড়ছে কি না তার পরিমাণ স্থির করা শক্ত নয়।

একটা-কোনো নির্দিষ্ট সাধনার সুস্পষ্ট পথ পাবার জন্যে মানুষের একটা ব্যাকুলতা আছে। বুদ্ধদেব এক দিকে উদ্দেশ্যকে যেমন খর্ব করেন নি তেমনি তিনি পথকেও খুব নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। কেমন করে ভাবতে হবে এবং কেমন করে চলতে হবে তা তিনি খুব স্পষ্ট করে বলেছেন। প্রত্যহ শীলসাধনার দ্বারা তিনি আত্মাকে মোহ থেকে মুক্ত করতে উপদেশ দিয়েছেন এবং মৈত্রীভাবনা-দ্বারা আত্মাকে ব্যাপ্ত করবার পথ দেখিয়েছেন। প্রতিদিন এই কথা স্মরণ করো যে, আমার শীল অখণ্ড আছে, অচ্ছিদ্র আছে এবং প্রতিদিন চিত্তকে এই ভাবনায় নিবিষ্ট করো যে, ক্রমশ সকল বিরোধ কেটে গিয়ে আমার আত্মা সর্বভূতে প্রসারিত হচ্ছে। অর্থাৎ, এক দিকে বাধা কাটছে আর-এক দিকে স্বরূপলাভ হচ্ছে। এই

পদ্ধতিকে তো কোনোক্রমেই শূন্যতালাভের পদ্ধতি বলা যায় না। এই তো নিখিললাভের পদ্ধতি, এই তো আত্মলাভের পদ্ধতি, পরমাত্মলাভের পদ্ধতি।

১১ চৈত্র [১৩১৫]

বৌদ্ধধর্মে ভক্তিবাদ

ডাক্তার রিচার্ড্ দীর্ঘকাল চীনদেশে বাস করিতেছেন। তিনি খৃস্টান মিশনরি।

তিনি লিখিতেছেন, একবার তিনি কার্যবশত ন্যান্‌কিং শহরে গিয়াছিলেন। সেখানে একটি বৌদ্ধশাস্ত্রপ্রকাশ-সভা আছে। টাইপিং বিপ্লবের সময় যে-সকল গ্রন্থ নষ্ট হইয়াছে তাহাই পুনরুদ্ধার করা এই সভার উদ্দেশ্য।

এই সভার প্রধান উদ্যোগী যিনি তাঁহার নাম য়াঙ্ বেন্ হুই। তিনি চীনের রাজপ্রতিনিধির অনুচররূপে দীর্ঘকাল য়ুরোপে যাপন করিয়াছেন। কন্‌ফুসীয় শাস্ত্র-শিক্ষায় তিনি উচ্চ-উপাধি-ধারী।

ডাক্তার রিচার্ড্ তাঁহাকে যখন জিজ্ঞাসা করিলেন 'আপনি কন্‌ফুসীয় উপাধি লইয়া কী করিয়া বৌদ্ধ হইলেন', তিনি উত্তর করিলেন, 'আপনি 'মিশনরি' হইয়া আমাকে এমন প্রশ্ন করিলেন, ইহাতে আমি বিস্মিত হইতেছি। আপনি তো জানেন, কেবলমাত্র সাংসারিক ব্যাপারের প্রতিই কন্‌ফুসীয় ধর্মের লক্ষ্য—যাহা সংসারের অতীত তাহার প্রতি তাহার দৃষ্টি নাই।' রিচার্ড্‌সাহেব কহিলেন, 'যাহা সংসারের অতিবর্তী, তাহার সম্বন্ধে মানবমনের যে প্রশ্ন, বৌদ্ধধর্মে তাহার কি কোনো সত্য মীমাংসা আছে?' তিনি কহিলেন, 'হাঁ।' পাদ্রিসাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কোথায় তাহা পাওয়া যায়?' বেন্ হুই উত্তর করিলেন, 'ভক্তি-উদ্‌বোধন-নামক একটি গ্রন্থে পাইবেন। এই পুস্তক পড়িয়াই কন্‌ফুসীয় ধর্ম ছাড়িয়া আমি বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হইয়াছি।'

ডাক্তার রিচার্ড্ এই বই আনাইলেন। পড়িতে আরম্ভ করিয়া প্রায় সমস্ত রাত্রি বই ছাড়িতে পারিলেন না। আর-একজন মিশনরি রাত্রি জাগিয়া তাঁহার পাশে কাজ করিতেছিলেন; তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন, 'এ আমি আশ্চর্য একটি খৃস্টান বই পড়িতেছি।'

ডাক্তার রিচার্ড্ যে বইটির কথা বলিয়াছেন তাহার মূল গ্রন্থটি সংস্কৃত, অশ্বঘোষের রচনা। এই সংস্কৃত গ্রন্থ লুপ্ত হইয়াছে; কেবল চীন ভাষায় ইহার অনুবাদ এখন বর্তমান আছে।[১]

বৌদ্ধধর্ম জিনিসটা কী সে সম্বন্ধে আমরা একটা ধারণা করিয়া লইয়াছি। আমাদের বিশ্বাস এই যে, এই ধর্মে ধর্মের আর-সমস্ত অঙ্গই আছে, কেবল ইহার মধ্যে ঈশ্বরের কোনো স্থান নাই। জ্ঞানে ইহার ভিত্তি এবং কর্মে ইহার মন্দিরটি গড়া।

---

[১] 'শ্রদ্ধোৎপাদশাস্ত্র' বা 'মহাযানশ্রদ্ধোৎপাদশাস্ত্র'। এই গ্রন্থের মূল সংস্কৃত এখন পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই। ইহার ইংরেজি অনুবাদ Asvaghosha's Discourse on the Awakening of Faith in the Mahāyāna, translated for the first time from the Chinese version by Teitaro Suzuki, Chicago, 1900.

পাদটীকা শান্তিনিকেতন চীন-ভবনের শ্রীসুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়ের সৌজন্যে।

কিন্তু মন্দিরের মধ্যে কেহ নাই; সেখানে নির্বাণের অন্ধকার, ভক্তি সেখান হইতে নির্বাসিত।

আমরা তো বৌদ্ধধর্মকে এইভাবে দেখি, অথচ দেখিতে পাইতেছি—বৌদ্ধশাস্ত্র হইতে খৃস্টান এমন-কিছু লাভ করিতেছেন যাহার সঙ্গে তিনি আপন ধর্মের প্রভেদ দেখিতেছেন না এবং যাহার রসে আকৃষ্ট হইয়া কন্‌ফুসীয় শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া তাহার প্রচারে উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছেন।

ইহার উত্তরে কেহ কেহ বলিবেন, 'হাঁ, চরিত্রনীতির উপদেশে খৃস্টান-ধর্মের সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের মিল আছে, এ কথা সকলেই স্বীকার করে।' কিন্তু একটি কথা মনে রাখা উচিত, চারিত্রনীতির উপদেশ জিনিসটা মনোরম নহে; তাহা ঔষধ, তাহা খাদ্য নহে; তাহার সাড়া পাইলে ছুটিয়া লোক জড়ো হয় না, বরঞ্চ উল্টাই হয়। বৌদ্ধধর্মের মধ্যে যদি এমন-কিছু থাকে যাহা আমাদের হৃদয়কে টানে এবং পরিতৃপ্ত করে, তবে জানিব, তাহার মর্মটি, তাহার ধর্মটি সেই জায়গাতেই আছে।

ডাক্তার রিচার্ড্‌ অশ্বঘোষের গ্রন্থটির মধ্যে এমন-কিছু দেখিয়াছিলেন যাহা নীতি-উপদেশের অপেক্ষা গভীরতর, পূর্ণতর; যাহা দার্শনিক তত্ত্ব নহে, যাহা আচার-অনুষ্ঠানের পদ্ধতিমাত্র নহে। সেই জিনিসটি কোথা হইতে আসিল?

সম্প্রতি ইংলণ্ডে কোনো সভায় কয়েকজন ভিন্নজাতীয় ব্যক্তি আপন আপন ধর্ম লইয়া আলোচনা করিয়াছিলেন। একজন জাপানী বক্তা তাঁহার দেশের বিখ্যাত বৌদ্ধ আচার্যের ধর্মোপদেশ হইতে স্থানে স্থানে উদ্‌ধৃত করিয়া বৌদ্ধমতের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। এই বৌদ্ধ আচার্যের নাম সোয়েন শাকু; ইনি কামাকুরার এঙ্গাকুজি এবং কেঙ্কোজি মঠের অধ্যক্ষ। ইনি এক স্থানে বলিয়াছেন—

'আমরা বস্তুমাত্রের সীমাবদ্ধ বিশেষ সত্তা মানিয়া থাকি। সকল বস্তুই দেশে কালে বদ্ধ হইয়া কার্যকারণের নিয়মে চালিত হয়। বিষয়রাজ্যের বহুত্ব আমরা স্বীকার করি। এই সংসার বাস্তব, ইহা শূন্য নহে; এই জীবন সত্য, ইহা স্বপ্ন নহে। আমরা বৌদ্ধরা একটি আদিকারণ মানি যাহা সর্বশক্তিমান সর্বজ্ঞ ও সর্বপ্রেমী। এই জগৎ সেই মহাপ্রজ্ঞা মহাপ্রাণের প্রকাশ। ইহার সকল বস্তুতেই সেই আদিকারণের প্রকৃতির অংশ আছে। কেবল মনুষ্যে নহে, পশু ও জড় বস্তুতেও আদিকারণের দিব্য স্বভাব প্রকাশমান হইতেছে।

'ইহা হইতেই বুঝা যাইবে, আমাদের মতে একই বহু এবং বহুই এক। এই জীবন এবং জগতের বাহিরে জগতের কারণকে খুঁজিতে যাওয়া ভ্রম। তাহা আমাদের মধ্যে অধিষ্ঠিত। কিন্তু তাই বলিয়া এই জগতের মধ্যেই তাহার শেষ নহে, জগতের সমস্ত পদার্থসমষ্টিকে অতিক্রম করিয়াও সে আছে। সংক্ষেপে বলিতে গেলে বৌদ্ধেরা বিশ্বাস করে যে, এই বিষয়রাজ্য অসত্য নহে, ইহার মূল কারণ জ্ঞানস্বরূপ এবং তাহা সমস্ত জগতে পরিব্যাপ্ত।'

উপরে যাহা উদ্‌ধৃত করা গেল তাহা হইতে বুঝা যাইবে যে, বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে সাধারণত আমাদের যে ধারণা তাহার সহিত এই বৌদ্ধাচার্যের মতের মিল নাই। সম্ভবত কোনো কোনো বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মতের সঙ্গেও ইহার অনৈক্য হইবে।

কিন্তু ভাবিয়া দেখিবার বিষয় এই যে, কোনো কোনো বৌদ্ধসমাজে বৌদ্ধধর্ম এইরূপ পরিণতি লাভ করিয়াছে এবং নামান্তর গ্রহণ না করিয়া ইহা বৌদ্ধধর্ম বলিয়াই পরিচিত। ইতিহাসের কোনো-একটা বিশেষ স্থানে যাহা থামিয়া গিয়াছে তাহাকেই বৌদ্ধধর্ম বলিব— আর, যাহা মানুষের জীবনের মধ্যে নব নব কালে প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে, নব নব খাদ্যকে আত্মসাৎ করিয়া আপন জীবনকে

পরিপুষ্ট প্রশস্ত করিয়া তুলিতেছে, তাহাকে বৌদ্ধধর্ম বলিব না—এই যদি পণ করিয়া বসি তবে কোনো জীবিত ধর্মকে ধর্ম নাম দেওয়া চলে না।

কোনো বৃহৎ ধর্মই একটিমাত্র সরল সূত্র নহে, তাহাতে নানা সূত্র জড়াইয়া আছে। সেই ধর্মকে যাহারা আশ্রয় করে তাহারা আপনার প্রকৃতির বিশেষত্ব-অনুসারে তাহার কোনো একটা সূত্রকেই বিশেষ করিয়া বা বেশি করিয়া বাছিয়া লয়। খৃস্টান-ধর্মে রোমান ক্যাথলিকদের সঙ্গে ক্যাল্‌ভিন-পন্থীদের অনেক প্রভেদ আছে। দুই ধর্মের মূল এক জায়গায় থাকিলেও তাহার পরিণতিতে গুরুতর পার্থক্য ঘটিয়াছে। আমরা যদি কেবলমাত্র ক্যাল্‌ভিন-পন্থীদের মত হইতে খৃস্টান-ধর্মকে বিচার করি, তবে নিশ্চয়ই তাহা অসম্পূর্ণ হইবে।

বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধেও সেইরূপ। সকলেই জানেন এই ধর্ম হীনযান এবং মহাযান এই দুই শাখায় বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। এই দুই শাখার মধ্যে প্রভেদ গুরুতর। আমরা সাধারণত হীনযানমতাবলম্বী বৌদ্ধদের ধর্মকেই বিশুদ্ধ বৌদ্ধধর্ম বলিয়া গণ্য করিয়া লইয়াছি।

তাহার একটা কারণ, মহাযান-সম্প্রদায়ী বৌদ্ধদিগকে ভারতবর্ষে আমরা দেখিতে পাই না। দ্বিতীয় কারণ, যে পালি-সাহিত্য অবলম্বন করিয়া য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন, তাহার মধ্যে মহাযান সম্প্রদায়ের মতগুলি পরিণত আকার ধারণ করে নাই।

ধর্মকে চিনিতে গেলে তাহাকে জীবনের মধ্যে দেখিতে হয়। পুরাতত্ত্ব-আলোচনার দ্বারা তাহার ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহ করা যাইতে পারে, কিন্তু তাহার পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় না। অনেক সময় মিশনরিরা যখন আমাদের ধর্ম সম্বন্ধে বিচার করেন, তখন দেখিতে পাই, তাঁহারা কেবলমাত্র বই পড়িয়া বা সাময়িক বিকৃতির প্রতি লক্ষ্য করিয়া বিদেশীর ধর্ম সম্বন্ধে যে জ্ঞান লাভ করেন তাহা নিতান্তই অঙ্গহীন। বস্তুত শাস্ত্রবচন খুঁটিয়া লইয়া, টুকরা জোড়া দিয়া, ধর্মকে চেনা যায় না। তাহার একটি সমগ্র ভাব আছে। সেই ভাবটিকে ঠিকমত ধরা শক্ত এবং ধরিলেও তাহাকে পরিস্ফুট করিয়া নির্দেশ করা সহজ নহে।

আমাদের দেশে যাঁহারা খৃস্টান-ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করেন তাঁহাদের একটা মস্ত সুবিধা এই যে, খৃস্টানের মুখ হইতেই তাঁহারা খৃস্টান-ধর্মের কথা শুনিতে পান, এইজন্য তাহার ভিতরকার সুরটা তাঁহাদের কানে গিয়া পৌঁছায়। যদি কেবল প্রাচীন শাস্ত্র পড়িয়া, বচন জোড়া দিয়া, তাঁহাদিগকে এই কাজটি করিতে হইত তবে অন্ধ যেমন হাত বুলাইয়া রূপ নির্ণয় করে তাঁহাদেরও সেই দশা ঘটিত। অর্থাৎ, মোটামুটি একটা আকৃতির ধারণা হইত, কিন্তু সেই ধারণাটাই সর্বোচ্চ ধারণা নহে। রূপের সঙ্গে যে বর্ণ, যে লাবণ্য, যে-সকল অনির্বচনীয় প্রকাশ আছে, তাহা তাঁহাকে সম্পূর্ণ এড়াইয়া যাইত।

বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে আমাদের সেই দশা ঘটিয়াছে। পুঁথি-পড়া বিদেশী পুরাতত্ত্ব-বিৎ পণ্ডিতদের গ্রন্থের শুষ্কপত্র হইতে আমরা এই ধর্মের পরিচয় গ্রহণ করি। এই ধর্মের রসধারায় সেই পণ্ডিতদের চিত্ত স্তরে স্তরে অভিষিক্ত নহে। এক প্রদীপের শিখা হইতে আর-এক প্রদীপ যেমন করিয়া শিখা গ্রহণ করে তেমন করিয়া তাঁহারা এই ধর্মকে সমগ্রভাবে লাভ করেন নাই। এমন অবস্থায় তাঁহাদের কাছ হইতে আমরা যাহা পাই তাহা নিতান্ত মোটা জিনিস; তাহা আলোকহীন, চক্ষুহীন, স্পর্শগত অনুভব মাত্র।

এইজন্য এইরূপ শাস্ত্র-পড়া বৌদ্ধধর্ম হইতে আমরা এমন জিনিস পাই না

যাহা আমাদের অন্তঃকরণের গভীর ক্ষুধার খাদ্য জোগাইতে পারে। একজন ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি অনেক কাল পালি গ্রন্থ আলোচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার মুখের কথায় আভাসে একদিন বুঝিয়াছিলাম যে, তিনি এই আলোচনায় রস পান নাই, তাঁহার সময় মিথ্যা কাটিয়াছে।

অথচ এই ধর্ম হইতে কেহ রস পায় নাই এমন কথা বলিতে পারি না। ইহার মধ্যে একটি গভীর রসের প্রস্রবণ আছে যাহা ভক্তচিত্তকে আনন্দে মগ্ন করিয়াছে। দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীতে জাপানে বৌদ্ধধর্মকে অবলম্বন করিয়া যে ভক্তির বন্যা দেশকে প্লাবিত করিয়াছিল তাহার সঙ্গে আমাদের দেশে বৈষ্ণবধর্মের আন্দোলনের বিশেষ প্রভেদ দেখি না।

আমাদের দেশে এক বেদান্তসূত্রকে অবলম্বন করিয়া দুই বিপরীত মতবাদ দেখা দিয়াছে, শঙ্করের অদ্বৈতবাদ আর বৈষ্ণবের দ্বৈতবাদ। শঙ্করের অদ্বৈতবাদকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত বলিয়া কেহ কেহ নিন্দা করিয়াছেন। ইহা হইতে অন্তত এ কথা বুঝা যায় যে, বৌদ্ধদর্শনের সংঘাতে এবং অনেক পরিমাণে তাহার সহায়তায় শংকরের এই মতের উৎপত্তি হইয়াছে।

কিন্তু সেই দ্রাবিড় হইতেই যে প্রেমের ধর্মের স্রোত সমস্ত ভারতবর্ষে একদিন ব্যাপ্ত হইয়াছে সেই বৈষ্ণবধর্মকেও কি এই বৌদ্ধধর্মই সঞ্জীবিত করিয়া তোলে নাই? আমরা দেখিয়াছি বৌদ্ধ মন্দিরে বৈষ্ণব দেবতা স্থান লইয়াছে, এককালে যাহা বুদ্ধের পদচিহ্ন বলিয়া পূজিত হইত তাহাই বিষ্ণুপদচিহ্ন বলিয়া গণ্য হইয়াছে, রথযাত্রা প্রভৃতি বৌদ্ধ উৎসবকে বৈষ্ণব আত্মসাৎ করিয়াছে।

বৌদ্ধযুগের পূর্বে আমরা যে বৈদিক দেবতাদিগকে দেখি তাঁহারা স্বর্গবাসী দিব্যপুরুষ। সংসারপাশে আবদ্ধ মানুষকে মুক্তিদান করিবার জন্য পরমদয়া যে মানবরূপে মর্ত্যলোকে আবির্ভূত— এই ভাবটির উদ্ভব কি সর্বপ্রথমে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যেই নহে? বৈদিক যুগে কি কোথাও আমরা ইহার কোনো আভাস পাইয়াছি?

জাপানী অধ্যাপক আনেসাকি 'হিবার্ট্ জর্নালে' খৃস্টান ও বৌদ্ধ ধর্মের তুলনা করিয়া এক জায়গায় লিখিয়াছেন যে, এই দুই ধর্মধারার মূলে আমরা একটি জিনিস দেখিতে পাই— উভয় স্থানেই সত্য মানবরূপ গ্রহণ করিয়াছে, ভক্তি নরদেহ ধারণ করিয়াছে, প্রেমেতে এবং ভক্তিতে সত্যকে সম্মিলিত করিয়া উপলব্ধি করিবার জন্য বিশ্বমানবের প্রতিনিধিস্বরূপ একজন মানুষের প্রয়োজন হইয়াছে।

বস্তুত বৌদ্ধধর্মেই সর্বপ্রথমে কোনো-একজন মানুষকে মানুষের চেয়ে অনেক বেশি করিয়া দেখা হইয়াছিল। বৌদ্ধধর্মের যিনি প্রতিষ্ঠাতা তিনি তাঁহার ভক্তদের চক্ষে মানুষের সমস্ত স্বাভাবিক সীমা অতিক্রম করিয়াই যেন প্রতিভাত হইয়াছেন। তিনি যে অসামান্য শক্তিসম্পন্ন গুরু তাহা নহে— তিনি যেন মূর্তিমান অসীমপ্রজ্ঞা, অসীমকরুণা। তিনি মুক্ত হইয়াও কেবল জীবকে দুঃখ হইতে ত্রাণ করিবার জন্যই বন্ধন স্বীকার করিয়াছেন— সে তাঁহার কর্মফলের অনিবার্য বন্ধন নহে; সে তাঁহার প্রেমের দ্বারা, দয়ার দ্বারা স্বেচ্ছারচিত বন্ধন।

কোনো বিশেষ একজন মানুষকে এমন করিয়া অসীম করিয়া দেখা বৌদ্ধধর্মে প্রথম প্রবর্তিত হইয়াছিল এবং বিষ্ণুকে ত্রাণকর্তা অবতাররূপে স্বীকার করা যে এই বৌদ্ধ মতেরই অনুসরণ করিয়া ঘটে নাই তাহা বলিতে পারি না। বৌদ্ধধর্মের এই অবতারবাদ, এই ভক্তিবাদের দিকটাই বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করিয়া ভারতে বৌদ্ধধর্মের পরিবর্তরূপে বিরাজ করিতেছে এইরূপ আমার বিশ্বাস।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে সাধু হোনেন জাপানে বৌদ্ধধর্মের মধ্য হইতে যে ভক্তির উৎস উৎসারিত করিয়াছিলেন তাহার বিবরণ অধ্যাপক আনেসাকি ধর্ম-ইতিহাস-আলোচনার আন্তর্জাতিক সম্মিলনসভায় বিবৃত করিয়াছিলেন। ভাগবত ধর্মের সঙ্গে তাঁহার সে ভক্তিধর্মের মর্মগত প্রভেদ নাই বলিলেই হয়। তিনি বলিয়াছেন, অমিত বুদ্ধের দয়াতেই জীবের মুক্তি। এই অমিত সুখাবতী-নামক বৌদ্ধশাস্ত্রের আনন্দলোকের অধীশ্বর। ইঁনি সর্বশক্তিমান, করুণাময়, মুক্তিদাতা। যে-কেহ ব্যাকুলচিত্তে তাঁহার শরণ গ্রহণ করিবে সে বুদ্ধকে মনশ্চক্ষুতে দেখিতে পাইবে ও মৃত্যুকালে সমস্ত পার্ষদমণ্ডলী-সহ অমিত আসিয়া তাহাকে আদরে গ্রহণ করিবেন। এই অমিতাভের জ্যোতি বিশ্বজগতে ব্যাপ্ত, দৃষ্টি মেলিলেই দেখা যায়; এই অমিতায়ুর প্রাণ মুক্তিধামে নিত্যকাল উপলব্ধ, যিনি ইচ্ছা করেন লাভ করিতে পারেন।

ইহা হইতে পাঠকেরা দেখিতে পাইবেন, বুদ্ধ যেখানেই মানুষের জ্ঞানকে ছাড়াইয়া তাহার ভক্তিকে অধিকার করিয়াছেন সেখানেই তাঁহার মানবভাব বিলুপ্ত হইয়াছে; সেখানে তাঁহার ধারণার সঙ্গে ভগবানের ধারণা এক হইয়া গিয়াছে।

বৌদ্ধধর্মের তিনটি মুখ—বুদ্ধ, ধর্ম এবং সংঘ। তাহার ধর্মে জ্ঞান, সংঘে কর্ম ও বুদ্ধে ভক্তি আশ্রিত হইয়া আছে। যদিও এই তিনের পরিপূর্ণ সম্মিলনই বৌদ্ধধর্মের পূর্ণ আদর্শ, তবু দেশ কাল পাত্রের প্রকৃতি -অনুসারে সে আদর্শ বিভক্ত হইয়া পড়ে এবং তখন ইহার কোনো-একটা দিকই প্রবল হইয়া দেখা দেয়। হীনযান ও মহাযানে তাহারই প্রমাণ পাওয়া যায়। হীনযানের দিকে যখন দেখি তখন মনে হয় বৌদ্ধধর্মে পূজাভক্তি বুঝি নাই, প্রত্যক্ষের অতীত কোনো মহৎ-সত্তাকে বৌদ্ধধর্ম বুঝি একেবারেই অস্বীকার করে—আবার মহাযানের দিকে তাকাইলে মনে হয় ভক্তির প্রবল উচ্ছ্বাসে বৌদ্ধধর্ম নানা বিচিত্র রূপ রস সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে, কোথাও তাহার জ্ঞানের সংযম নাই।

কিন্তু আসল কথা, বৌদ্ধধর্মের মধ্যে এই দুটা দিকই আছে। সমস্ত বাসনা ও কর্ম নিঃশেষে ধ্বংস করিয়া নির্বাণমুক্তির মধ্যেই আপনাকে একেবারে 'না' করিয়া দেওয়াই যে বৌদ্ধধর্মের চরম লক্ষ্য নহে তাহা একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে। সর্বভূতের প্রতি প্রেম জিনিসটি শূন্য পদার্থ নহে। এমন বিশ্বব্যাপী প্রেমের অনুশাসন কোনো ধর্মেই নাই। প্রেমের দ্বারা সমস্ত সম্বন্ধ সত্য এবং পূর্ণ হয়, কোনো সম্বন্ধ ছিন্ন হয় না। অতএব প্রেমের চরমে যে বিনাশ ইহা কোনো-মতেই শ্রদ্ধেয় নহে।

এক দিকে স্বার্থপর বাসনাকে ক্ষয় ও অন্য দিকে স্বার্থত্যাগী প্রেমকে সমস্ত সীমা অবলুপ্ত করিয়া বিস্তার করা এই দুই শিক্ষাই যেখানে প্রবল মাত্রায় একত্র মিলিত হইয়াছে, বুঝিতেই হইবে, শূন্যতাই সেখানে লক্ষ্য নহে। কোনো-এক সম্প্রদায়ের বৌদ্ধদলের বা কোনো বিশেষ বৌদ্ধগ্রন্থের মধ্যে পোষক প্রমাণ থাকিলেও আমরা তাহাকেই সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিব না। মাটি চাষ করাটাকেই মুখ্য বলিয়া গণ্য করিব এবং ফসল বোনাটাকেই গৌণ বলিয়া উপেক্ষা করিব, ইহা হইতেই পারে না।

এই ফসলের কথাটা যেখানে আছে সেইখানেই মানুষের মন বিশেষ করিয়া আকৃষ্ট হইয়াছে এবং সেই আকর্ষণেই কঠিন সাধনার দুঃখ মানুষ মাথায় করিয়া লইয়াছে। এক-দল তার্কিক এমনভাবে তর্ক করে যে, যেহেতু ক্ষেত্রকে দীর্ণ বিদীর্ণ করিতে বলা হইয়াছে, অতএব সমস্ত ফসল নষ্ট করিয়া ফেলাই এই উপদেশের

তাৎপর্য। আগাছা উৎপাটন করিয়া ফেলাই যে তাহার উদ্দেশ্য সে কথা বুঝিতে বাকি থাকে না যখন শুনিতে পাই 'প্রেমের বীজ মুঠা মুঠা দিকে দিকে ছড়াইয়া দিবে'। এই প্রেমের ফসল নির্বাণ নহে, আনন্দ, সে কথা বলাই বাহুল্য।

শ্রাবণ মাসের প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় দেখাইয়া দিয়াছেন যে, বুদ্ধদেব শূন্যবাদী ছিলেন না ও তিনি ব্রহ্মকে স্বীকার করিয়াছেন। লেখক বলিয়াছেন, ইতিবুত্তকং -নামক পালিগ্রন্থে লিখিত আছে যে, এক সময়ে ভগবান বুদ্ধ নিম্নলিখিত গাথা উচ্চারণ করিয়াছিলেন—

যস্‌স রাগো চ দোসো চ অবিজ্জা চ বিরাজিতা
তম্‌ ভাবিতত্তঞ্‌ঞতরম্‌ ব্রহ্মভূতম্‌ তথাগতম্‌
বুদ্ধম্‌ বেরভয়াতীতম্‌ আহু সব্বপহায়িনন্তি।

যাঁহার রাগ দ্বেষ এবং অবিদ্যা তিরোহিত হইয়াছে তাঁহাকে ধর্মে সুপ্রতিষ্ঠিত, ব্রহ্মভূত, তথাগত এবং বৈর ও ভয়াতীত এবং সর্বত্যাগী বুদ্ধ বলা হয়।

ব্রহ্মভূত শব্দের অর্থ এই যে, যিনি ব্রহ্মস্বরূপে বিরাজ করেন।

মহেশবাবু যে শ্লোকটি উদ্‌ধৃত করিয়াছেন তাহাতে ব্রহ্মভূত ব্যক্তির যে-সকল লক্ষণ ব্যক্ত হইয়াছে তাহা ত্যাগমূলক। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম কেবলমাত্র ত্যাগের ধর্ম নহে। তা যদি হইত তবে তাহার মধ্যে প্রেমের কোনো স্থান থাকিত না।

বস্তুত বৌদ্ধধর্মের বিশেষত্বই এই যে, এক দিকে তাহার যেমন কঠোর ত্যাগ অন্য দিকে তাহার তেমনি উদার প্রেম। ইহা কেবলমাত্র জ্ঞানের ধর্ম, ধ্যানের ধর্ম নহে। বুদ্ধদেব নিজের জীবনেই তাহা সপ্রমাণ করিয়াছেন। তিনি যখন দীর্ঘকাল তপস্যার পর তপস্যা পরিত্যাগ করিলেন তখন যাহারা তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাবান হইয়াছিল তাহাদের শ্রদ্ধা তিনি হারাইলেন। কারণ, তখনকার বিশ্বাস ছিল এই যে, তপশ্চরণের দ্বারা সমাধিপ্রাপ্তিই ব্রহ্মলাভ, তাহাই চরম সিদ্ধি। কিন্তু যখন বুদ্ধদেব বুদ্ধত্ব লাভ করিলেন তখনই তিনি কর্মে প্রবৃত্ত হইলেন। সে কর্ম বিশুদ্ধ কর্ম, কারণ তাহাতে ভয় লোভ মোহ হিংসা নাই; তাহা স্বার্থবন্ধনের অতীত; তাহা দয়ার কর্ম, প্রেমের কর্ম।

অতএব যেখানে বাসনার ক্ষয় হয় সেখানে যে কিছুই বাকি থাকে না তাহা নহে। সেখানে সমস্ত আসক্তি ও রিপুর আকর্ষণ দূর হইয়া যায় বলিয়াই দয়া প্রেম আনন্দ পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। সেই পরিপূর্ণতাই ব্রহ্মের স্বরূপ। অতএব যিনি ব্রহ্মভূত হইবেন, ব্রহ্মের স্বরূপে বিরাজ করিবেন, তাঁহাকে কেবল ত্যাগের রিক্ততা নহে, ত্যাগের দ্বারা প্রেমের পূর্ণতা লাভ করিতে হইবে।

এইজন্যই ব্রহ্মবিহার কাহাকে বলে বুদ্ধ তৎসম্বন্ধে বলিয়াছেন—

মাতা যথা নিযং পুত্তং আয়ুসা একপুত্তমনুরক্‌খে
এবম্পি সব্বভূতেসু মানসম্ভাবয়ে অপরিমাণং।
মেত্তঞ্চ সব্বলোকস্মিং মানসম্ভাবয়ে অপরিমাণং
উদ্ধং অধো চ তিরিযঞ্চ অসম্বাধং অবেরমসপত্তং।
তিট্‌ঠঞ্চরং নিসিন্নো বা সয়ানো বা যাবতস্‌স বিগতমিদ্ধো
এতং সতিং অধিট্‌ঠেয্যং ব্রহ্মমেতং বিহারমিধমাহু।

মাতা যেমন প্রাণ দিয়াও নিজের পুত্রকে রক্ষা করেন সেইরূপ সকল প্রাণীর প্রতি অপরিমাণ দয়াভাব জন্মাইবে। ঊর্ধ্বদিকে অধোদিকে চতুর্দিকে সমস্ত জগতের প্রতি বাধাশূন্য হিংসাশূন্য শত্রুতাশূন্য মানসে অপরিমাণ দয়াভাব জন্মাইবে।

কী দাঁড়াইতে কী চলিতে, কী বসিতে কী শুইতে, যাবৎ নিদ্রিত না হইবে এই মৈত্রভাবে অধিষ্ঠিত থাকিবে—ইহাকেই ব্রহ্মবিহার বলে।

এইরূপ বিশ্বব্যাপী প্রেমের মধ্যে চিত্তকে প্রসারিত করাকেই বুদ্ধ ব্রহ্মবিহার বলিয়াছেন। ইহাতে প্রমাণ হইতেছে, বুদ্ধ ব্রহ্মকে প্রেমস্বরূপ বলিয়াই জানিয়াছেন, ব্রহ্ম তাঁহার কাছে শূন্যতা নহে।

এই প্রেমকেই যদি সর্বব্যাপী পরম সত্য বলিয়া গণ্য করা হয় তবে সংসারকে একেবারে বাদ দিয়া বসিলে চলিবে কেন?

করুণা বলো, প্রেম বলো, আপনাকে লইয়া আপনি থাকিতে পারে না। প্রেমের বিষয়কে বাদ দিয়া প্রেমের সত্যতা নাই।

মহাযান-সম্প্রদায়ীরা এ সম্বন্ধে যাহা বলেন তাহা প্রণিধানের যোগ্য। পরে আমরা তাহা আলোচনা করিব।

যিনি নিজে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী অথচ যিনি আধুনিক কালের পাঠকসমাজের কাছে নিজের মত সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিবার যোগ্যতা লাভ করিয়াছেন তাঁহারই নিকট হইতে আমরা এ সম্বন্ধে সহায়তা প্রত্যাশা করিতে পারি।

জাপানী বৌদ্ধ পণ্ডিত অইতারো সুজুকির নিকট হইতে এ বিষয়ে আমরা জ্ঞানলাভ করিতে পারিব। তিনি অশ্বঘোষের গ্রন্থের অনুবাদ করিয়াছেন এবং মহাযান বৌদ্ধ মতেরও ব্যাখ্যা করিয়া বই লিখিয়াছেন।

তাঁহার গ্রন্থগুলি আমরা দেখিবার সুযোগ পাই নাই। কিন্তু তাঁহার পুস্তক অবলম্বন করিয়া ইংরেজি Quest পত্রে সম্পাদক-মহাশয় যে বিস্তৃত প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে ইহা বুঝা যায় যে, যেমন বেদান্তদর্শন সম্বন্ধে কেবলমাত্র শাঙ্কর ভাষ্য পড়িলে ভারতে প্রচলিত বেদান্তকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করা হইল মনে করা যায় না, সেইরূপ পালিগ্রন্থে বৌদ্ধধর্মের যে পরিচয় পাওয়া যায় এবং যাহা অবলম্বন করিয়া সাধারণত য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা অনেক দিন ধরিয়া আলোচনা করিতেছেন, বৌদ্ধধর্মের মর্মগত সত্য-সন্ধানের পক্ষে তাহাই যথেষ্ট নহে।

এ কথা স্পষ্টই মনে হয়, ভারতবর্ষের চিত্ত হইতে জ্ঞানের ধারা এবং প্রেমের ধারাকে বুদ্ধদেব একত্রে আকর্ষণ করিয়া একদিন মিলাইয়াছিলেন। সেই মিলনের বন্যায় একদিন পৃথিবীর দেশ বিদেশ ভাসিয়া গিয়াছিল। তাহার পরে এত বড়ো মিলনের একটি বিপুল শক্তি ভারতবর্ষ হইতে যে একেবারে অন্তর্হিত হইয়াছে তাহা নহে। বৌদ্ধযুগের পরবর্তী দর্শনে পুরাণে কোথাও বা নবীনরূপে, কোথাও বা পুরাতনকে নূতন আকার দিয়া, সেই ধারা নানা শাখা প্রশাখায় নানা নামে আজও প্রবাহিত হইতেছে।

আমরা পূর্বে এক স্থানে আভাস দিয়াছি, ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে বৈষ্ণব-ধর্মের একটা সম্মিলন ঘটিয়াছিল। বস্তুত বৌদ্ধধর্ম বৈষ্ণবধর্মকে সৃষ্টি করে নাই। তাহার পুষ্টিসাধন করিয়াছে। গুরুতে দেবতা জ্ঞান করা এবং তাঁহার প্রসাদেই মুক্তি এই কথা স্বীকার করা, আমাদের আধুনিক পৌরাণিক ধর্মে দেখা যায়—আমার বিশ্বাস, এইরূপ গুরুবাদের উৎপত্তি বৌদ্ধধর্ম হইতে। ইহার কারণ এই যে, মানুষের ভক্তিবৃত্তি একটা সত্য পদার্থ, তাহাকে খাদ্য জোগাইতেই হইবে। যে ধর্মের যেমন মতই হউক-না কেন, ভক্তির আশ্রয় কাড়িয়া লইলে ভক্তি যেমন করিয়া হউক আপনার একটা আশ্রয় খাড়া করিয়া লয়। বুদ্ধদেব তাঁহার উপদেশে স্পষ্ট করিয়া ভক্তির কোনো চরম আশ্রয় নির্দেশ করেন নাই। এইজন্য তাঁহার অনুবর্তী-

দের ভক্তিবৃত্তি তাঁহাকেই বেষ্টন করিয়া ধরিয়াছে এবং ভক্তির স্বাভাবিক চরম গতি যে পরমপুরুষে, বুদ্ধকে তাঁহার সঙ্গেই মিলাইয়া লইয়াছে। এইরূপে বৌদ্ধধর্মে মানুষের ভক্তি অগত্যা মানুষকেই আশ্রয় করিয়াছে এবং সেই সমস্ত সীমাকে ভেদ করিয়া, বিদীর্ণ করিয়া, ভগবানের মধ্যে উত্তীর্ণ হইবার চেষ্টা করিয়াছে। অশ্বত্থ গাছ যখন মন্দিরের ভিত্তিতে জন্মায় তখন সেই মন্দিরকে নিজের প্রয়োজন-অনুসারে ভাঙিয়া-চুরিয়া নানাখানা করিয়া ফেলে— কেননা, যেখানে তাহার খাদ্য, যেমন করিয়া হউক, সেখানে তাহাকে শিকড় পাঠাইতে হইবে। বৌদ্ধধর্ম একদা দেবতাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল বলিয়াই এই ধর্মে ভক্তি মানুষকে আশ্রয় করিয়াছিল; কিন্তু মানুষের মধ্যে তাহার সম্পূর্ণ খাদ্য নাই, এই কারণে সে বাঁকিয়া-চুরিয়া যেমন করিয়া পারে আপন আশ্রয়কে অতিক্রম করিয়া নিত্য আশ্রয়ের মধ্যে মুক্তিলাভের চেষ্টা করিয়াছে। এমনি করিয়া এইখানে গুরুবাদের উৎপত্তি ঘটিয়াছে।

মুক্তির পক্ষে আত্মশক্তিই প্রধান এই কথার উপরেই বৌদ্ধধর্মে বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছে। তাহার কারণও ছিল। ভারতবর্ষে যে সময় বুদ্ধের আবির্ভাব সে সময়ে যাগ যজ্ঞ প্রভৃতি বাহ্য ক্রিয়াকাণ্ডের দ্বারা মুক্তি হইতে পারে এই কথার খুব প্রভাব ছিল। হোমাদি করিয়া দেবতাদিগকে খুশি করিতে পারিলেই তাঁহাদের অলৌকিক শক্তি-দ্বারা মানুষ সহজেই সদ্‌গতি লাভ করিবে এই প্রকার তখন বিশ্বাস ছিল। ইহারই বিরুদ্ধে বুদ্ধদেবকে বিশেষ করিয়া বলিতে হইয়াছিল, সাধু চিন্তা, সাধু বাক্য, সাধু কর্মের দ্বারাই মুক্তির পথ সুগম হয়। মুক্তি যথার্থ সাধনার দ্বারাই সাধ্য, এখানে অল্পমাত্রও ফাঁকি চলে না।

কিন্তু মানুষ জানে আত্মশক্তিই পর্যাপ্ত নহে। শুধু চোখ দিয়া আমরা দেখি না, বাহিরের আলো নহিলে আমাদের দেখা চলে না। তাহার একটা দিক আছে শক্তির দিক, আর-একটা দিক আছে নির্ভরের দিক। এই দুইয়ের যোগ বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলে, ইহার একটাকেই একান্ত করিয়া দিলে, এমন একটা প্রতিক্রিয়ার বিপ্লব উপস্থিত হয় যে উল্টা দিকটা অতিমাত্র প্রবল হইয়া উঠে।

বৌদ্ধধর্ম আত্মশক্তিতে মানুষকে বলিষ্ঠ করিয়া তুলিবার পক্ষে যত জোরে টান দিয়াছিল তত জোরেই সে দৈবশক্তির দিকে ছুটিয়াছে। এমন দিন আসিল যেদিন মুক্তিলাভের জন্য বুদ্ধের প্রতি বৌদ্ধের নির্ভরের আর সীমা রহিল না। হোনেন বলিয়াছেন, বড়ো বড়ো ভারী পাথর যেমন জাহাজকে আশ্রয় করিয়া অনায়াসে সমুদ্র পার হইয়া যায়, তেমনি পর্বতাকার পাপের বোঝা -সত্ত্বেও আমরা অমিত বুদ্ধের দয়াবলেই জন্মমৃত্যুর সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে পারি। হোনেন স্পষ্টই বলেন, ‘কখনো মনে করিয়ো না আমরা স্বকর্মের বলে নিজের আন্তরিক ক্ষমতাতেই পুণ্যলোক প্রাপ্ত হইতে পারি, অসাধুও বুদ্ধের শক্তি-প্রভাবে পরমগতি লাভ করে।’

এই-যে কথা উঠিল, বুদ্ধের প্রসাদ এবং শক্তিই আমাদিগকে ত্রাণ করিতে পারে, এইখানেই মানবগুরুর অলৌকিক ক্ষমতা প্রথম স্বীকার করা হইয়াছে। অবশ্য, মানবকে এখানে যেভাবে কল্পনা করা হয় তাহাতে তাহার মানবত্বই থাকে না, সর্বত্রই গুরুবাদের সেই বিশেষত্ব; গুরুর মধ্যে এমন শক্তির আরোপ করা হয় যাহা মানুষের শক্তি নহে।

সুফিধর্মেও গুরুবাদের এইরূপ প্রবলতা দেখা যায়। অথচ বিশুদ্ধ মুসলমান-ধর্ম এই প্রকার গুরুবাদের বিরুদ্ধ। আমার বিশ্বাস, এশিয়াখণ্ডে মানবগুরুকে

দৈবশক্তিসম্পন্ন ত্রাণকর্তা বলিয়া পূজা করিবার যে প্রথা চলিয়াছে বৌদ্ধধর্ম হইতেই তাহার উৎপত্তি। সুফিধর্মের এই গুরুবাদ পুনশ্চ আমাদের দেশেই বাউল ও কর্তাভজা সম্প্রদায়ের মধ্যে নূতন করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। এমনি করিয়া বৌদ্ধধর্ম হইতে জন্মলাভ করিয়া গুরুবাদ ও অবতারবাদ নব নব আকারে আবর্তিত হইতেছে।

বৌদ্ধধর্মেই মানবকে দেবতার স্থান প্রথম দেওয়া হইয়াছে। তাহার পর হইতে মানব সেই দেবসিংহাসনের অধিকার আর সহজে ছাড়িতে পারিতেছে না। মানুষের মন একবার যখন এই অদ্ভুত কল্পনায় অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে তখন এই পথে চিন্তা প্রবাহিত হওয়ার বাধা সে আর দেখিতেছে না।

নাম জপ করা এবং নামাবলী-আবৃত্তিও আমরা মহাযান-বৌদ্ধসম্প্রদায়ে দেখিতে পাই। হোনেন বলিয়াছেন, যে-কেহ সর্বান্তঃকরণে অমিতের নাম স্মরণ করিবে তাহাদের কেহই পুণ্যজীবনলাভে বঞ্চিত হইবে না। যে-কোনো প্রাণী বুদ্ধের নাম স্মরণ করে তাহাকে পরমাত্মীয় বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে, ইহাও হোনেনের উপদেশ। বস্তুত বুদ্ধই যখন বৌদ্ধের ভক্তির একমাত্র ও চরম লক্ষ্য তখন তাঁহার অবর্তমানে তাঁহার নামই তাহাদের প্রধান সম্বল হইয়াছিল। তিনি নাই, কিন্তু তাঁহার নাম আছে। মানুষের অভাবে মানুষের এই নামকে আশ্রয় না করিয়া উপায় কী?

বৌদ্ধধর্মে একদিন মুক্তির পথ অত্যন্ত দুর্গম ছিল, সংযম এবং ত্যাগের কঠোরতার সীমা ছিল না। এই বৌদ্ধধর্ম করুণাকে আদর করিয়াছে, কিন্তু ভক্তিকে অস্বীকার করিয়াছিল। সেই ভক্তি আসিয়া একদিন আপন অবমাননার প্রতিশোধ লইয়াছে। সাধনার সমস্ত কঠোরতা সে অপহরণ করিয়াছে। পাপের বোঝা লইয়াও মানুষ উদ্ধার পাইবে এই কথা প্রচার করিয়াছে, কেবল নাম-স্মরণে ও উচ্চারণেই মুক্তি হইতে পারে এই আশ্বাস দিয়া মানুষের পুণ্যচেষ্টাকে শিথিল করিয়া দিয়াছে। অবশেষে এই নামের মাহাত্ম্যে নির্ভর এত দূর পর্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছে যে, অজ্ঞানে ভ্রমক্রমে নাম-উচ্চারণ করিলেও মহাপাপী উদ্ধার পায় এমন বিশ্বাস ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে।

মানবপ্রকৃতির অন্তর্নিহিত কোনো সত্যকে অবজ্ঞা করিয়া কোনো ধর্ম বাঁচে না। জ্ঞানকে হতমান করিলে সে তাহার শোধ লয়, ভক্তিকে অপমান করিলে সে তাহা ক্ষমা করে না। যেখানে অভাব আছে পূরণ করিতে করিতে, যেখানে ত্রুটি আছে সংশোধন করিতে করিতে, ধর্ম অগ্রসর হইয়া চলে। যদি না চলে তবে মানুষের উপায় নাই। এইজন্যই কোনো বড়ো ধর্মকে কোনো এক কালে এক অবস্থায় এক ভাবে আবদ্ধ করিয়া দেখিলে ঠিক দেখা হয় না। এক দিকে হেলিলে অন্য দিকে হেলিয়া সে আপনার ভারসামঞ্জস্য উদ্ধার করে, কিন্তু তাই বলিয়া সেই দিকেই সে হেলিয়া থাকিতে পারে না—মধ্যপথকে আশ্রয় করিবার জন্যই তাহার চেষ্টা। একেবারেই না যদি করে তবে নৌকাডুবি।

বৌদ্ধধর্ম যে কী, তাহা নির্ণয় করিবার বেলায় তাহার সচলতার প্রতি লক্ষ্য করিতে হইবে। হীনযানও পূর্ণ বৌদ্ধধর্ম নহে, মহাযানও পূর্ণ বৌদ্ধধর্ম নহে। বৌদ্ধধর্ম সংসারের অতীত কোনো পূজনীয় সত্তাকে স্বীকার যে করে না এ কথাকে আমরা বৌদ্ধধর্মের নিত্য সত্য বলিয়া মানি না—এবং বৌদ্ধধর্ম যে আত্মশক্তির সাধনাকে ভক্তির জলে ডুবাইয়া মারিয়াছে এ কথাও তাহার চিরসত্য নহে। বৌদ্ধধর্ম এখনো মানুষের জ্ঞান ভক্তি কর্মের মধ্যে আপনার অমর সত্যকে বাধামুক্ত

করিয়া তুলিবার জন্য সেই লক্ষ্য-অভিমুখে চলিয়াছে সকল ধর্মেরই গম্যস্থান যেখানে।

১৩১৮

বুদ্ধদেব-প্রসঙ্গ

ভারতবর্ষে বুদ্ধদেব মানবকে বড়ো করিয়াছিলেন। তিনি জাতি মানেন নাই, যাগযজ্ঞের অবলম্বন হইতে মানুষকে মুক্তি দিয়াছিলেন, দেবতাকে মানুষের লক্ষ্য হইতে অপসৃত করিয়াছিলেন। তিনি মানুষের আত্মশক্তি প্রচার করিয়াছিলেন। দয়া এবং কল্যাণ তিনি স্বর্গ হইতে প্রার্থনা করেন নাই, মানুষের অন্তর হইতে তাহা তিনি আহ্বান করিয়াছিলেন।

এমনি করিয়া শ্রদ্ধার দ্বারা, ভক্তির দ্বারা, মানুষের অন্তরের জ্ঞান শক্তি ও উদ্যমকে তিনি মহীয়ান করিয়া তুলিলেন। মানুষ যে দীন দৈবাধীন হীন পদার্থ নহে, তাহা তিনি ঘোষণা করিলেন।

এমন সময় হিন্দুর চিত্ত জাগ্রত হইয়া কহিল, 'সে কথা যথার্থ—মানুষ দীন নহে, হীন নহে, কারণ মানুষের যে শক্তি—যে শক্তি মানুষের মুখে ভাষা দিয়াছে, মনে ধী দিয়াছে, বাহুতে নৈপুণ্য দিয়াছে, যাহা সমাজকে গঠিত করিতেছে, সংসারকে চালনা করিতেছে, তাহাই দৈবী শক্তি।'

বুদ্ধদেব যে অভ্রভেদী মন্দির রচনা করিলেন, নবপ্রবুদ্ধ হিন্দু তাহারই মধ্যে তাঁহার দেবতাকে লাভ করিলেন। বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্মের অন্তর্গত হইয়া গেল। মানবের মধ্যে দেবতার প্রকাশ, সংসারের মধ্যে দেবতার প্রতিষ্ঠা, আমাদের প্রতি-মুহূর্তের সুখদুঃখের মধ্যে দেবতার সঞ্চার, ইহাই নব-হিন্দুধর্মের মর্মকথা হইয়া উঠিল। শাক্তের শক্তি, বৈষ্ণবের প্রেম ঘরের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িল—মানুষের ক্ষুদ্র কাজে কর্মে শক্তির প্রত্যক্ষ হাত, মানুষের স্নেহপ্রীতির সম্বন্ধের মধ্যে দিব্যপ্রেমের প্রত্যক্ষলীলা, অত্যন্ত নিকটবর্তী হইয়া দেখা দিল। এই দেবতার আবির্ভাবে ছোটোবড়োর ভেদ ঘুচিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। সমাজে যাহারা ঘৃণিত ছিল তাহারাও দৈবশক্তির অধিকারী বলিয়া অভিমান করিল; প্রাকৃত পুরাণগুলিতে তাহার ইতিহাস রহিয়াছে।

১৩১০

২

সন্তানের জন্য আমরা মানুষকে দুঃসাধ্যকর্মে প্রবৃত্ত হইতে দেখিয়াছি, অনেক জন্তুকেও সেরূপ দেখিয়াছি; স্বদেশীয়-স্বদলের জন্যও আমরা মানুষকে দুরূহ চেষ্টা প্রয়োগ করিতে দেখিয়াছি, পিপীলিকাকেও মধুমক্ষিকাকেও সেরূপ দেখিয়াছি। কিন্তু মানুষের কর্ম যেখানে আপনাকে, আপনার সন্তানকে এবং আপনার দলকেও অতিক্রম করিয়া গেছে, সেইখানেই আমরা মনুষ্যত্বের পূর্ণশক্তির

বিকাশে পরম গৌরব লাভ করিয়াছি। বুদ্ধদেবের করুণা সন্তান-বাৎসল্য নহে, দেশানুরাগও নহে— বৎস যেমন গাভীমাতার পূর্ণস্তন হইতে দুগ্ধ আকর্ষণ করিয়া লয়, সেইরূপ ক্ষুদ্র অথবা মহৎ কোনো শ্রেণীর স্বার্থপ্রবৃত্তি সেই করুণাকে আকর্ষণ করিয়া লইতেছে না। তাহা জলভারাক্রান্ত নিবিড় মেঘের ন্যায় আপনার প্রভূত প্রাচুর্যে আপনাকে নির্বিশেষে সর্বলোকের উপরে বর্ষণ করিতেছে। ইহাই পরিপূর্ণতার চিত্র, ইহাই ঐশ্বর্য। ঈশ্বর প্রয়োজনবশত নহে, শক্তির অপরিসীম প্রাচুর্য-বশতই আপনাকে নির্বিশেষে নিয়তই বিশ্বরূপে দান করিতেছেন। মানুষের মধ্যেও যখন আমরা সেইরূপ শক্তির প্রয়োজনাতীত প্রাচুর্য ও স্বতঃপ্রবৃত্ত উৎসর্জন দেখিতে পাই, তখনই মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের প্রকাশ বিশেষভাবে অনুভব করি।

বুদ্ধদেব বলিয়াছেন—

> মাতা যথা নিযং পুত্তং আয়ুসা একপুত্তমনুরক্খে
> এবম্পি সব্বভূতেসু মানসম্ভাবয়ে অপরিমাণং।
> মেত্তঞ্চ সব্বলোকস্মিং মানসম্ভাবয়ে অপরিমাণং
> উদ্ধং অধো চ তিরিযঞ্চ অসম্বাধং অবেরমসপত্তং॥
> তিট্‌ঠঞ্চরং নিসিন্নো বা সয়ানো বা যাবতস্‌স বিগতমিদ্ধো
> এতং সতিং অধিট্‌ঠেয্যং ব্রহ্মমেতং বিহারমিধমাহু॥

মাতা যেমন প্রাণ দিয়াও নিজের পুত্রকে রক্ষা করেন, এইরূপ সকল প্রাণীর প্রতি অপরিমাণ দয়াভাব জন্মাইবে। ঊর্ধ্বদিকে অধোদিকে চতুর্দিকে সমস্ত জগতের প্রতি বাধাশূন্য হিংসাশূন্য শত্রুতাশূন্য মানসে অপরিমাণ দয়াভাব জন্মাইবে। কী দাঁড়াইতে কী চলিতে, কী বসিতে কী শুইতে, যাবৎ নিদ্রিত না হইবে, এই মৈত্রভাবে অধিষ্ঠিত থাকিবে— ইহাকেই ব্রহ্মবিহার বলে।

এই-যে ব্রহ্মবিহারের কথা ভগবান বুদ্ধ বলিয়াছেন, ইহা মুখের কথা নহে, ইহা অভ্যস্ত নীতিকথা নহে; আমরা জানি, ইহা তাঁহার জীবনের মধ্যে হইতে সত্য হইয়া উদ্ভূত হইয়াছে। ইহা লইয়া অদ্য আমরা গৌরব করিব। এই বিশ্বব্যাপী চিরজাগ্রত করুণা, এই ব্রহ্মবিহার, এই সমস্ত-আবশ্যকের-অতীত অহেতুক অপরিমেয় মৈত্রীশক্তি, মানুষের মধ্যে কেবল কথার কথা হইয়া থাকে নাই, ইহা কোনো-না-কোনো স্থানে সত্য হইয়া উঠিয়াছিল। এই শক্তিকে আর আমরা অবিশ্বাস করিতে পারি না; এই শক্তি মনুষ্যত্বের ভাণ্ডারে চিরদিনের মতো সঞ্চিত হইয়া গেল। যে মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের অপর্যাপ্ত দয়াশক্তির এমন সত্যরূপে বিকাশ হইয়াছে, আপনাকে সেই মানুষ জানিয়া উৎসব করিতেছি।

১৩১১

৩

বুদ্ধদেব যখন বেদনাপূর্ণচিত্তে ধ্যানদ্বারা এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছিলেন যে, মানুষের বন্ধন বিকার বিনাশ কেন, দুঃখ জরা মৃত্যু কেন, তখন তিনি কোন্ উত্তর পেয়ে আনন্দিত হয়ে উঠেছিলেন? তখন তিনি এই উত্তরই পেয়েছিলেন যে, মানুষ আত্মাকে উপলব্ধি করলেই, আত্মাকে প্রকাশ করলেই, মুক্তিলাভ করবে। সেই প্রকাশের বাধাতেই তার দুঃখ, সেইখানেই তার পাপ।

এইজন্যে তিনি প্রথমে কতকগুলি নিষেধ স্বীকার করিয়ে মানুষকে শীল গ্রহণ

করতে আদেশ করেন। তাকে বললেন, 'তুমি লোভ কোরো না, হিংসা কোরো না, বিলাসে আসক্ত হোয়ো না।' যে-সমস্ত আবরণ তাকে বেষ্টন করে ধরেছে সেইগুলি প্রতিদিনের নিয়ত অভ্যাসে মোচন করে ফেলবার জন্যে তাকে উপদেশ দিলেন। সেই আবরণগুলি মোচন হলেই আত্মা আপনার বিশুদ্ধ স্বরূপটি লাভ করবে।

সেই স্বরূপটি কী? শূন্যতা নয়, নৈষ্কর্ম্য নয়। সে হচ্ছে মৈত্রী, করুণা, নিখিলের প্রতি প্রেম। বুদ্ধ কেবল বাসনা ত্যাগ করতে বলেন নি, তিনি প্রেমকে বিস্তার করতে বলেছেন। কারণ, এই প্রেমকে বিস্তারের দ্বারাই আত্মা আপন স্বরূপকে পায়। সূর্য যেমন আলোককে বিকীর্ণ করার দ্বারাই আপনার স্বভাবকে পায়।

৯ চৈত্র ১৩১৫

৪

বুদ্ধদেব যে দুঃখনিবৃত্তির পথ দেখিয়ে দিয়েছেন সে পথের একটা সকলের চেয়ে বড়ো আকর্ষণ কী? সে এই যে, অত্যন্ত দুঃখ স্বীকার করে এই পথে অগ্রসর হতে হয়। এই দুঃখ-স্বীকারের দ্বারা মানুষ আপনাকে বড়ো করে জানে। খুব বড়ো রকম করে ত্যাগ, খুব বড়ো রকম করে ব্রত-পালনের মাহাত্ম্য মানুষের শক্তিকে বড়ো করে দেখায় বলে মানুষের মন তাতে ধাবিত হয়।

১৪ চৈত্র [১৩১৫]

৫

বুদ্ধদেব শূন্যকে মানতেন কি পূর্ণকে মানতেন সে তর্কের মধ্যে যেতে চাই নে। কিন্তু তিনি মঙ্গলসাধনার দ্বারা প্রেমকে বিশ্বচরাচরে মুক্ত করতে উপদেশ দিয়েছিলেন। তাঁর মুক্তির সাধনাই ছিল স্বার্থত্যাগ অহংকারত্যাগ ক্রোধত্যাগের সাধনা, ক্ষমার সাধনা, দয়ার সাধনা, প্রেমের সাধনা। এমনি করে প্রেম যখন অহং-এর শাসন অতিক্রম করে বিশ্বের মধ্যে অনন্তের মধ্যে মুক্ত হয় তখন সে যা পায় তাকে যে নামই দাও-না কেন, সে কেবল ভাষার বৈচিত্র্য মাত্র, কিন্তু সেই-ই মুক্তি। এই প্রেম যা যেখানে আছে কিছুকেই ত্যাগ করে না; সমস্তকেই সত্যময় করে, পূর্ণতম করে উপলব্ধি করে। নিজেকে পূর্ণের মধ্যে সমর্পণ করবার কোনো বাধাই মানে না।

৭ বৈশাখ [১৩১৬]

৬

বিশেষ স্থানে গিয়ে, বিশেষ মন্ত্র পড়ে, বিশেষ অনুষ্ঠান করে মুক্তিলাভ করা যায়, এই বিশ্বাসের অরণ্যে যখন মানুষ পথ হারিয়েছিল তখন বুদ্ধদেব এই অত্যন্ত সহজ কথাটি আবিষ্কার ও প্রচার করবার জন্যে এসেছিলেন যে, স্বার্থত্যাগ করে,

সর্বভূতে দয়া বিস্তার করে, অন্তর থেকে বাসনাকে ক্ষয় করে ফেললে তবেই মুক্তি হয়; কোনো স্থানে গেলে, বা জলে স্নান করলে, বা অগ্নিতে আহুতি দিলে, বা মন্ত্র উচ্চারণ করলে হয় না। এই কথাটি শুনতে নিতান্তই সরল, কিন্তু এই কথাটির জন্যে একটি রাজপুত্রকে রাজ্যত্যাগ করে বনে বনে, পথে পথে, ফিরতে হয়েছে।

৭ পৌষ [১৩১৬]

৭

বুদ্ধদেবের আসল কথাটা কী সেটা দেখতে গেলে তাঁর শিক্ষার মধ্যে যে অংশটা নেগেটিভ সে দিকে দৃষ্টি দিলে চলবে না— যে অংশ পজিটিভ সেইখানেই তাঁর আসল পরিচয়। যদি দুঃখ-দূরই চরম কথা হয় তা হলে বাসনালোপের দ্বারা অস্তিত্বলোপ করে দিলেই সংক্ষেপে কাজ শেষ হয়— কিন্তু মৈত্রীভাবনা কেন? মৃত্যুদণ্ডই যার উপর বিধান তার আর ভালোবাসা কেন, দয়া কেন? এর থেকে বোঝা যায় যে, এই ভালোবাসাটার দিকেই আসল লক্ষ্য— আমাদের অহং, আমাদের বাসনা স্বার্থের দিকে টানে— বিশুদ্ধ প্রেমের দিকে, আনন্দের দিকে নয়— এইজন্যই অহংকে নির্বাপিত করে দিলেই সহজেই সেই আনন্দলোক পাওয়া যাবে। আমার ‘পূর্ণিমা’ বলে চিত্রার একটা কবিতা পড়েছ? তাতে আছে, একদিন সন্ধ্যার সময় বোটে বসে সৌন্দর্যতত্ত্ব সম্বন্ধে একটি ইংরেজি বই পড়তে পড়তে ক্লান্ত ও বিরক্ত হয়ে যেমনি বাতি নিবিয়ে দিলুম অমনি দেখি নৌকার সমস্ত জানলা দিয়ে জ্যোৎস্নার ধারা এসে আমার কক্ষ প্লাবিত করে দিলে। ঐ ছোট্ট একটি বাতি আমার টেবিলে জ্বলছিল বলে আকাশ-ভরা জ্যোৎস্না আমার ঘরে প্রবেশ করতেই পারে নি— বাইরে যে এত অজস্র সৌন্দর্য দ্যুলোক ভূলোক আচ্ছন্ন করে অপেক্ষা করছিল তা আমি জানতেও পারি নি। অহং আমাদের সেইরকম জিনিস— অত্যন্ত কাছে এই জিনিসটা আমাদের সমস্ত বোধশক্তিকে চার দিক থেকে এমনি আবৃত করে রেখেছে যে অনন্ত-আকাশ-ভরা অজস্র আনন্দ আমরা বোধ করতেই পারছি নে— এই অহংটার যেমনি নির্বাণ হবে অমনি অনির্বচনীয় আনন্দ এক মুহূর্তে আমাদের কাছে পরিপূর্ণরূপে প্রত্যক্ষ হবেন। সেই আনন্দই যে বুদ্ধদেবের লক্ষ্য তা বোঝা যায় যখন দেখি তিনি লোকলোকান্তরের জীবের প্রতি মৈত্রী বিস্তার করতে বলছেন। জগতে যে অনন্ত আনন্দ বিরাজমান তারও যে ওই প্রকৃতি— সে যে যেখানে যা-কিছু আছে সমস্তর প্রতি অপরিমেয় প্রেম। এই জগদ্‌ব্যাপী প্রেমকে সত্যরূপে লাভ করতে গেলে নিজের অহংকে নির্বাপিত করতে হয়, এই শিক্ষা দিতেই বুদ্ধদেব অবতীর্ণ হয়েছিলেন— নইলে মানুষ বিশুদ্ধ আত্মহত্যার তত্ত্বকথা শোনবার জন্য কখনোই তাঁর চার দিকে ভিড় করে আসত না।

১ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮

৮

বৌদ্ধধর্ম বিষয়াসক্তির ধর্ম নহে, এ কথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। অথচ ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের অভ্যুদয়কালে এবং তৎপরবর্তী যুগে সেই বৌদ্ধসভ্যতার

প্রভাবে এ দেশে শিল্প বিজ্ঞান বাণিজ্য এবং সাম্রাজ্যশক্তির যেমন বিস্তার হইয়াছিল এমন আর কোনো কালে হয় নাই।

তাহার কারণ এই, মানুষের আত্মা যখন জড়ত্বের বন্ধন হইতে মুক্ত হয় তখনই আনন্দে তাহার সকল শক্তিই পূর্ণ বিকাশের দিকে উদ্যম লাভ করে। আধ্যাত্মিকতাই মানুষের সকল শক্তির কেন্দ্রগত, কেননা তাহা আত্মারই শক্তি; পরিপূর্ণতাই তাহার স্বভাব। তাহা অন্তর বাহির কোনো দিকেই মানুষকে খর্ব করিয়া আপনাকে আঘাত করিতে চাহে না।

১৩১৯

২

বৌদ্ধযুগ ভারত-ইতিহাসের একটি প্রধান যুগ। ইহা আর্য-ভারতবর্ষ ও হিন্দু-ভারতবর্ষের মাঝখানকার যুগ। আর্যযুগে ভারতের আগন্তুক ও আদিম অধিবাসীদের মধ্যে বিরোধ চলিতেছিল। বৌদ্ধযুগে সেই-সকল বিরুদ্ধ জাতিদের মাঝখানকার বেড়াগুলি একধর্মবন্যায় ভাঙিয়াছিল— শুধু তাই নয়, বাহিরের নানা জাতি এই ধর্মের আহ্বানে ভারতবাসীদের সঙ্গে মিশিয়াছিল। তার পরে এই মিশ্রণকে যথাসম্ভব স্বীকার করিয়া এবং ইহাকে লইয়া একটা ব্যবস্থা খাড়া করিয়া আধুনিক হিন্দুযুগ মাথা তুলিয়াছে। বৈদিকযুগ ও হিন্দুযুগের মধ্যে আচারে ও পূজাতন্ত্রে যে গুরুতর পার্থক্য আছে তাহার মাঝখানের সন্ধিস্থল বৌদ্ধযুগ। এই যুগে আর্য ও অনার্য এক গণ্ডির মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছিল। ইহার ফলে উভয়ের মানসপ্রকৃতি ও বাহ্য আচারের মধ্যে আদান-প্রদান ও রফানিষ্পত্তির চেষ্টা হইতে থাকে। কাজটা অত্যন্ত কঠিন; তাই সকল দিকেই বেশ সুসংগত রকমে রফা হইয়া গিয়াছে তাহাও বলিতে পারি না। আভ্যন্তরিক নানা অসংগতির জন্য আমরা অন্তরে বাহিরে দুর্বল রহিয়াছি; সামাজিক ব্যবহারে এবং ধর্মবিশ্বাসে পদে পদেই বিচারবুদ্ধিকে অন্ধ করিয়া আমাদিগকে চলিতে হয়— যাহা-কিছু আছে তাহাকে বুদ্ধির দ্বারা মিলাইয়া লওয়া নহে, অভ্যাসের দ্বারা মানিয়া লওয়াই আমরা প্রধানত আশ্রয় করিয়াছি।

যাহাই হউক, আমাদের এই বর্তমান যুগকে যদি ঠিকমত চিনিতে হয় তবে পূর্ববর্তী সন্ধিযুগের সঙ্গে আমাদের ভালোরূপ পরিচয় হওয়া চাই। একটা কারণে আমাদের দেশে এই পরিচয়ের ব্যাঘাত ঘটিয়াছে। ইংরেজ ঐতিহাসিকেরা বৌদ্ধধর্মের যে সম্প্রদায়ের রূপটিকে বিশেষ প্রাধান্য দিয়া আলোচনা করিয়া থাকেন তাহা হীনযান সম্প্রদায়। এই সম্প্রদায় বৌদ্ধধর্মের তত্ত্বজ্ঞানের দিকেই বেশি ঝোঁক দিয়াছে। মহাযান সম্প্রদায়ে বৌদ্ধধর্মের হৃদয়ের দিকটা প্রকাশ করে। সেইজন্য মানব-ইতিহাসের সৃষ্টিতে এই সম্প্রদায়ই প্রধানতর। শ্যাম, চীন, জাপান, জাভা প্রভৃতি দেশে এই মহাযান সম্প্রদায়ই প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। এইজন্যই মহাযান সম্প্রদায় এমন একটা প্রণালীর মতো হইয়াছিল যাহার ভিতর দিয়া নানা জাতির নানা ক্রিয়াকর্ম মন্ত্রতন্ত্র পূজার্চনা ভারতে প্রবাহিত এবং এক মন্থনদণ্ডের দ্বারা মথিত হইয়াছে।

এই মহাযান সম্প্রদায়ের শাস্ত্রগুলিকে আলোচনা করিয়া দেখিলে আমাদের পুরাণগুলির সঙ্গে সকল বিষয়েই তাহার আশ্চর্য সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়।

এই সাদৃশ্যের কিছু অংশ বৌদ্ধধর্মের নিজেরই বিশুদ্ধ স্বরূপগত, কিন্তু অনেকটা ভারতের অবৈদিক সমাজের সহিত মিশ্রণ-জনিত। এই মিশ্রণের উপাদানগুলি নূতন নহে; ইহারাও অনেক কালের পুরাতন, মানবের শিশুকালের সৃষ্টি। দিনের বেলার যেমন তারা দেখা যায় না তেমনি বৈদিক কালের সাহিত্যে এগুলি প্রকাশ পায় নাই, দেশের মধ্যে ইহারা ছড়ানো ছিল। বৌদ্ধযুগে যখন নানা জাতির সম্মিশ্রণ হইল তখন ক্রমশ ইহাদের প্রভাব জাগিয়া উঠিল এবং বৌদ্ধযুগের শেষ ভাগে ইহারাই আর-সমস্তকে ঠেলিয়া ভিড় করিয়া দাঁড়াইল। সেই ভিড়ের মধ্যে শৃঙ্খলা করিবার চেষ্টা, যাহা নিতান্ত অনার্য তাহাকে আর্যবেশ পরাইবার প্রয়াস, ইহাই হিন্দুযুগের ঐতিহাসিক সাধনা।

১৩২৬

১০

একদিন বুদ্ধ বললেন, আমি সমস্ত মানুষের দুঃখ দূর করব। দুঃখ তিনি সত্যই দূর করতে পেরেছিলেন কি না সেটি বড়ো কথা নয়; বড়ো কথা হচ্ছে তিনি এটি ইচ্ছা করেছিলেন, সমস্ত জীবের জন্য নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন। ভারতবর্ষ ধনী হোক, প্রবল হোক, এ তাঁর তপস্যা ছিল না; সমস্ত মানুষের জন্য তিনি সাধনা করেছিলেন। আজ ভারতের মাটিতে আবার সেই সাধনা জেগে উঠুক, সেই ইচ্ছাকে ভারতবর্ষ থেকে কি দূর করে দেওয়া চলে!

১৭ ভাদ্র ১৩৩১

১১

ভারতবর্ষের সত্যের ঐশ্বর্যকে জানতে হলে সমুদ্রপারে ভারতবর্ষের সুদূর দানের ক্ষেত্রে যেতে হয়। আজ ভারতবর্ষের ভিতরে বসে ধূলিকলুষিত হাওয়ার ভিতর দিয়ে ভারতবর্ষকে যা দেখি তার চেয়ে স্পষ্ট ও উজ্জ্বল করে ভারতবর্ষের নিত্য-কালের রূপ দেখতে পাব ভারতবর্ষের বাইরে থেকে।

চীনে গেলাম। দেখলাম জাত হিসাবে তারা আমাদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। নাকে চোখে ভাষায় ব্যবহারে তাদের সঙ্গে আমাদের কোনো মিলই নেই। কিন্তু তাদের সঙ্গে এমন একটি গভীর আত্মীয়তার যোগ অনুভব করা গেল, যা ভারতবর্ষীয় অনেকের সঙ্গে করা কঠিন হয়ে উঠেছে। এই যোগ রাজশক্তির দ্বারা স্থাপন করা হয় নি; এই যোগ উদ্যত তরবারির জোরেও নয়; এই যোগ কাউকে দুঃখ দিয়ে নয়, নিজে দুঃখ স্বীকার করে। অত্যন্ত পরের মধ্যেও যে সত্যের বলে অত্যন্ত আত্মীয়তা স্বীকার করা সম্ভব হয় সেই সত্যের জোরেই চীনের সঙ্গে সত্যভারতের চিরকালের যোগবন্ধন বাঁধা হয়েছে। এই সত্যের কথা বিদেশী পলিটিক্‌সের ইতিহাসে স্থান পায় নি বলে আমরা একে অন্তরের সঙ্গে বিশ্বাস করি নে। কিন্তু একে বিশ্বাস করবার প্রমাণ ভারতের বাইরে সুদূর দেশে আজও রয়ে গেছে।

জাপানে প্রতিদিনের ব্যবহারে জাপানির সুগভীর ধৈর্য, আত্মসংযম, তার

রসবোধের বিচিত্র পরিচয়ে যখন বিস্মিত হতেছিলাম তখন এ কথা কতবার শুনেছি যে, এই-সকল গুণের প্রেরণা অনেকখানি বৌদ্ধধর্মের যোগে ভারতবর্ষ থেকে এসেছে। সেই মূল প্রেরণা স্বয়ং ভারতবর্ষ থেকে আজ লুপ্তপ্রায় হল। সত্যের যে বন্যা একদিন ভারতবর্ষের দুই কূল উপ্‌চিয়ে দেশে দেশে বয়ে গিয়েছিল ভারতবর্ষের প্রবাহিণীতে আজ তা তলায় নেমে আসছে, কিন্তু তার জলসঞ্চয় আজও দূরের নানা জলাশয়ে গভীর হয়ে আছে। এই কারণেই সেই-সকল জায়গা আধুনিক ভারতবাসীর পক্ষে তীর্থস্থান। কেননা, ভারতবর্ষের ধ্রুব পরিচয় সেই-সব জায়গাতেই।

শ্রাবণ ১৩৩৪

১২

বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে জনসাধারণের প্রতি শ্রদ্ধা প্রবল হয়ে প্রকাশ পেয়েছে; এর মধ্যে শুদ্ধ মানুষের নয়, অন্য জীবেরও, যথেষ্ট স্থান আছে। জাতককাহিনীর মধ্যে খুব একটা মস্ত কথা আছে: তাতে বলেছে, যুগ-যুগ ধরে বুদ্ধ সর্বসাধারণের মধ্য দিয়েই ক্রমশ প্রকাশিত। প্রাণিজগতে নিত্যকাল ভালো-মন্দ'র যে দ্বন্দ্ব চলেছে সেই দ্বন্দ্বের প্রবাহ ধরেই ধর্মের শ্রেষ্ঠ আদর্শ বুদ্ধের মধ্যে অভিব্যক্ত। অতি সামান্য জন্তুর ভিতরেও অতি সামান্য রূপেই এই ভালোর শক্তি মন্দ'র ভিতর দিয়ে নিজেকে ফুটিয়ে তুলছে; তার চরম বিকাশ হচ্ছে অপরিমেয় মৈত্রীর শক্তিতে আত্মত্যাগ। জীবে জীবে লোকে লোকে সেই অসীম মৈত্রী অল্প অল্প করে নানা দিক থেকে আপন গ্রন্থি মোচন করছে, সেই দিকেই মোক্ষের গতি। জীব মুক্ত নয়, কেননা আপনার দিকেই তার টান; সমস্ত প্রাণীকে নিয়ে ধর্মের যে অভিব্যক্তি তার প্রণালী-পরম্পরায় সেই আপনার দিকে টানের 'পরে আঘাত লাগছে। সেই আঘাত যে পরিমাণে যেখানেই দেখা যায় সেই পরিমাণে সেখানেই বুদ্ধের প্রকাশ। মনে আছে, ছেলেবেলায় দেখেছিলুম, দড়িতে বাঁধা ধোপার বাড়ির গাধার কাছে এসে একটি গাভী স্নিগ্ধ চক্ষে তার গা চেটে দিচ্ছে; দেখে আমার বড়ো বিস্ময় লেগেছিল। বুদ্ধই যে তাঁর কোনো-এক জন্মে সেই গাভী হতে পারেন, এ কথা বলতে জাতককথা-লেখকের একটুও বাধত না। কেননা, গাভীর এই স্নেহেরই শেষ গিয়ে পৌঁচেছে মুক্তির মধ্যে। জাতককথায় অসংখ্য সামান্যের মধ্যে দিয়েই চরম অসামান্যকে স্বীকার করেছে। এতেই সামান্য এত বড়ো হয়ে উঠল। সেইজন্যেই এত বড়ো মন্দিরভিত্তির গায়ে গায়ে তুচ্ছ জীবনের বিবরণ এমন সরল ও নির্মল শ্রদ্ধার সঙ্গে চিত্রিত। ধর্মেরই প্রকাশচেষ্টার আলোতে সমস্ত প্রাণীর ইতিহাস বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে মহিমান্বিত।

২৬ সেপ্টেম্বর ১৯২৭ [১৩৩৪]

১৩

বুদ্ধদেব উপদেশ দিলেন, সমস্ত জগতের প্রতি বাধাশূন্য হিংসাশূন্য শত্রুতাশূন্য মানসে অপরিমাণ মৈত্রী পোষণ করবে। দাঁড়াতে বসতে চলতে শুতে যাবৎ

নিদ্রিত না হবে, এই মৈত্রীস্মৃতিতে অধিষ্ঠিত থাকবে—একেই বলে ব্রহ্মবিহার।

এত বড়ো উপদেশ মানুষকেই দেওয়া চলে। কেননা, মানুষের মধ্যে গভীর হয়ে আছে সোঽহংতত্ত্ব। সে কথা বুদ্ধদেব নিজের মধ্য থেকেই জেনেছেন, তাই বলেছেন, অপরিমাণ প্রেমেই আপনার অন্তরের অপরিমেয় সত্যকে মানুষ প্রকাশ করে।

অথর্ববেদ বলেন, তস্মাদ্‌ বৈ বিদ্বান্‌ পুরুষমিদং ব্রহ্মেতি মন্যতে—যিনি বিদ্বান্‌ তিনি মানুষকে তার প্রত্যক্ষের অতীত বৃহৎ বলেই জানেন। সেইজন্যে তিনি তার কাছে প্রত্যাশা করতে পারেন দুঃসাধ্য কর্মকে, অপরিমিত ত্যাগকে। যে পুরুষে ব্রহ্ম বিদুস্তে বিদুঃ পরমেষ্ঠিনম্‌—যাঁরা ভূমাকে জানেন মানুষে, তাঁরা জানেন পরম দেবতাকেই। সেই মানবদেবতাকে মানুষের মধ্যে জেনেছিলেন বলেই বুদ্ধদেব উপদেশ দিতে পেরেছিলেন—

মাতা যথা নিযং পুত্তং আয়ুসা একপুত্তমনুরক্‌খে
এবম্পি সব্বভূতেসু মানসম্ভাবয়ে অপরিমাণং।

মা যেমন আপন আয়ু ক্ষয় করেই নিজের একমাত্র পুত্রকে রক্ষা করে তেমনি সকল প্রাণীর প্রতি মনে অপরিমাণ দয়াভাব জন্মাবে। মাথা গনে বলব না, কজন এই উপদেশ পালন করতে পারে। সেই গণনায় নয় সত্যের বিচার।

মানুষের অসীমতা যিনি নিজের মধ্যে অনুভব করেছিলেন তাঁকে অপেক্ষা করতে হয় নি মাথা গোনবার। তিনি অসংকোচে মানুষের মহামানবকে আহ্বান করেছিলেন; বলেছিলেন, অপরিমাণ ভালোবাসায় প্রকাশ করো আপনার অন্তরে ব্রহ্মকে। এই বাণী অসংকোচে সকলকে শুনিয়ে তিনি মানুষকে শ্রদ্ধা করেছিলেন।

[১৩৩৯]

বুদ্ধজন্মোৎসব

হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী, নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্ব,
ঘোরকুটিল পন্থ তার, লোভজটিল বন্ধ।
নূতন তব জন্ম লাগি কাতর যত প্রাণী,
কর ত্রাণ মহাপ্রাণ, আন অমৃতবাণী,
বিকশিত কর প্রেমপদ্ম চিরমধুনিষ্যন্দ।
শান্ত হে, মুক্ত হে, হে অনন্তপুণ্য,
করুণাঘন, ধরণীতল কর কলঙ্কশূন্য।

এস দানবীর, দাও ত্যাগকঠিন দীক্ষা—
মহাভিক্ষু, লও সবার অহংকারভিক্ষা।
লোক লোক ভুলুক শোক, খণ্ডন কর মোহ,
উজ্জ্বল কর জ্ঞানসূর্য-উদয়-সমারোহ—
প্রাণ লভুক সকল ভুবন, নয়ন লভুক অন্ধ।
শান্ত হে, মুক্ত হে, হে অনন্তপুণ্য,
করুণাঘন, ধরণীতল কর কলঙ্কশূন্য।

ক্রন্দনময় নিখিলহৃদয় তাপদহনদীপ্ত,
বিষয়বিষবিকারজীর্ণ খিন্ন অপরিতৃপ্ত।
দেশ দেশ পরিল তিলক রক্তকলুষগ্লানি,
তব মঙ্গলশঙ্খ আন তব দক্ষিণ পাণি—
তব শুভসংগীতরাগ, তব সুন্দর ছন্দ।
শান্ত হে, মুক্ত হে, হে অনন্তপুণ্য,
করুণাঘন, ধরণীতল কর কলঙ্কশূন্য।

২১ ফাল্গুন ১৩৩৩

সংস্কৃত ছন্দের নিয়ম-অনুসারে পঠনীয়

সকলকলুষতামসহর

সকল কলুষতামস হর,
জয় হোক তব জয়।
অমৃতবারি সিঞ্চন কর
নিখিলভুবনময়।
মহাশান্তি, মহাক্ষেম,
মহাপুণ্য, মহাপ্রেম!

জ্ঞানসূর্য-উদয়ভাতি
ধ্বংস করুক তিমিররাতি,
দুঃসহ দুঃস্বপ্ন ঘাতি
অপগত কর ভয়।
মহাশান্তি, মহাক্ষেম,
মহাপুণ্য, মহাপ্রেম!

মোহমলিন অতিদুর্দিন—
শঙ্কিতচিত পান্থ
জটিলগহনপথসংকট-
সংশয়-উদ্‌ভ্রান্ত।
করুণাময়, মাগি শরণ—
দুর্গতিভয় করহ হরণ,
দাও দুঃখবন্ধতরণ
মুক্তির পরিচয়।
মহাশান্তি, মহাক্ষেম,
মহাপুণ্য, মহাপ্রেম!

বৈশাখী পূর্ণিমা
১৩০৮

বুদ্ধদেবের প্রতি

সারনাথে মূলগন্ধকুটীবিহার-প্রতিষ্ঠা-উপলক্ষে রচিত

ওই নামে একদিন ধন্য হল দেশে দেশান্তরে
তব জন্মভূমি।
সেই নাম আরবার এ দেশের নগরে প্রান্তরে
দান করো তুমি।
বোধিদ্রুমতলে তব সেদিনের মহাজাগরণ
আবার সার্থক হোক, মুক্ত হোক মোহ-আবরণ--
বিস্মৃতির রাত্রিশেষে এ ভারতে তোমারে স্মরণ
নবপ্রাতে উঠুক কুসুমি।

চিত্ত হেথা মৃতপ্রায়, অমিতাভ, তুমি অমিতায়ু,
আয়ু করো দান।
তোমার বোধনমন্ত্রে হেথাকার তন্দ্রালস বায়ু
হোক প্রাণবান্‌।
খুলে যাক রুদ্ধ দ্বার, চৌদিকে ঘোষুক শঙ্খধ্বনি
ভারত-অঙ্গনতলে আজি তব নব আগমনী,
অমেয় প্রেমের বার্তা শত কণ্ঠে উঠুক নিঃস্বনি—
এনে দিক অজেয় আহ্বান।

দার্জিলিং
২৪ অক্টোবর ১৯৩১ [১৩৩৮]

বোরোবুদুর

সেদিন প্রভাতে সূর্য এইমত উঠেছে অম্বরে
অরণ্যের বন্দনমর্মরে;
নীলিম বাষ্পের স্পর্শ লভি
শৈলশ্রেণী দেখা দেয় যেন ধরণীর স্বপ্নচ্ছবি।

নারিকেলবনপ্রান্তে নরপতি বসিল একাকী
ধ্যানমগ্ন-আঁখি।
উচ্চে উচ্ছ্বসিত প্রাণ অন্তহীন আকাঙ্ক্ষাতে,
কী সাহসে চাহিল পাঠাতে
আপন পূজার মন্ত্র যুগ-যুগান্তরে।

অপরূপ অমৃত অক্ষরে
লিখিল বিচিত্র লেখা; সাধকের ভক্তির পিপাসা
রচিল আপন মহাভাষা—
সর্বকাল সর্বজন
আনন্দে পড়িতে পারে যে ভাষার লিপির লিখন।

সে লিপি ধরিল দ্বীপ আপন বক্ষের মাঝখানে,
সে লিপি তুলিল গিরি আকাশের পানে।
সে লিপির বাণী সনাতন
করেছে গ্রহণ
প্রথম-উদিত সূর্য শতাব্দীর প্রত্যহ প্রভাতে।

অদূরে নদীর কিনারাতে
আল-বাঁধা মাঠে
কত যুগ ধরে চাষী ধান বোনে আর ধান কাটে—
আঁধারে আলোয়
প্রত্যহের প্রাণলীলা সাদায় কালোয়
ছায়ানাট্যে ক্ষণিকের নৃত্যচ্ছবি যায় লিখে লিখে,
লুপ্ত হয় নিমিখে নিমিখে।
কালের সে লুকাচুরি, তারি মাঝে সংকল্প সে কার
প্রতিদিন করে মন্ত্রোচ্চার,
বলে অবিশ্রাম—
'বুদ্ধের শরণ লইলাম'।

প্রাণ যার দু দিনের, নাম যার মিলালো নিঃশেষে
সংখ্যাতীত বিস্মৃতের দেশে,
পাষাণের ছন্দে ছন্দে বাঁধিয়া গেছে সে
আপনার অক্ষয় প্রণাম—
'বুদ্ধের শরণ লইলাম'।

কত যাত্রী কত কাল ধরে
নম্রশিরে দাঁড়ায়েছে হেথা করজোড়ে।
পূজার গভীর ভাষা খুঁজিতে এসেছে কতদিন
তাদের আপন কণ্ঠ ক্ষীণ।
বিপুল ইঙ্গিতপুঞ্জ পাষাণের সংগীতের তানে
আকাশের পানে
উঠেছে তাদের নাম,
জেগেছে অনন্ত ধ্বনি 'বুদ্ধের শরণ লইলাম'।

অর্থ আজ হারায়েছে সে যুগের লিখা,
নেমেছে বিস্মৃতিকুহেলিকা।

অর্ঘ্যশূন্য কৌতূহলে দেখে যায় দলে দলে আসি
ভ্রমণবিলাসী—
বোধশূন্য দৃষ্টি তার নিরর্থক দৃশ্য চলে গ্রাসি।
চিত্ত আজি শান্তিহীন লোভের বিকারে,
হৃদয় নীরস অহংকারে।
ক্ষিপ্রগতি বাসনার তাড়নায় তৃপ্তিহীন ত্বরা,
কম্পমান ধরা।
বেগ শুধু বেড়ে চলে ঊর্ধ্বশ্বাসে মৃগয়া-উদ্দেশে—
লক্ষ্য ছোটে পথে পথে, কোথাও পৌঁছে না পরিশেষে।

অন্তহারা সঞ্চয়ের আহুতি মাগিয়া
সর্বগ্রাসী ক্ষুধানল উঠেছে জাগিয়া।
তাই আসিয়াছে দিন,
পীড়িত মানুষ মুক্তিহীন,
আবার তাহারে
আসিতে হবে যে তীর্থদ্বারে
শুনিবারে
পাষাণের মৌনতটে যে বাণী রয়েছে চিরস্থির—
কোলাহল ভেদ করি শত শতাব্দীর
আকাশে উঠিছে অবিরাম
অমেয় প্রেমের মন্ত্র 'বুদ্ধের শরণ লইলাম'।

বোরোবুদুর। যবদ্বীপ
২৩ সেপ্টেম্বর ১৯২৭ [১৩৩৪]

সিয়াম

প্রথম দর্শনে

ত্রিশরণ মহামন্ত্র যবে
বজ্রমন্দ্ররবে
আকাশে ধ্বনিতেছিল পশ্চিমে পূরবে,
মরুপারে, শৈলতটে, সমুদ্রের কূলে উপকূলে,
দেশে দেশে চিত্তদ্বার দিল যবে খুলে
আনন্দমুখর উদ্‌বোধন—
উদ্দাম ভাবের ভার ধরিতে নারিল যবে মন,
বেগ তার ব্যাপ্ত হল চারি ভিতে,
দুঃসাধ্য কীর্তিতে কর্মে, চিত্রপটে মন্দিরে মূর্তিতে,

আত্মদানসাধনস্ফূর্তিতে,
উচ্ছ্বসিত উদার উক্তিতে,
স্বার্থঘন দীনতার বন্ধনমুক্তিতে—
সে মন্ত্র অমৃতবাণী, হে সিয়াম, তব কানে
কবে এল কেহ নাহি জানে
অভাবিত অলক্ষিত আপনাবিস্মৃত শুভক্ষণে
দূরাগত পান্থ সমীরণে।

সে মন্ত্র তোমার প্রাণে লভি প্রাণ
বহুশাখাপ্রসারিত কল্যাণে করেছে ছায়াদান।
সে মন্ত্র-ভারতী
দিল অস্খলিত গতি
কত শত শতাব্দীর সংসারযাত্রারে—
শুভ আকর্ষণে বাঁধি তারে
এক ধ্রুবকেন্দ্র-সাথে
চরম মুক্তির সাধনাতে—
সর্বজনগণে তব এক করি একাগ্র ভক্তিতে—
এক ধর্ম, এক সংঘ, এক মহাগুরুর শক্তিতে।

সে বাণীর সৃষ্টিক্রিয়া নাহি জানে শেষ,
নবযুগযাত্রাপথে দিবে নিত্য নূতন উদ্দেশ।
সে বাণীর ধ্যান
দীপ্যমান করি দিবে নব নব জ্ঞান
দীপ্তির ছটায় আপনার,
এক সূত্রে গাঁথি দিবে তোমার মানসরত্নহার।

হৃদয়ে হৃদয়ে মিল করি
বহু যুগ ধরি
রচিয়া তুলেছ তুমি সুমহৎ জীবনমন্দির,
পদ্মাসন আছে স্থির,
ভগবান বুদ্ধ সেথা সমাসীন
চিরদিন—
মৌন যাঁর শান্তি অন্তহারা,
বাণী যাঁর সকরুণ সান্ত্বনার ধারা।

আমি সেথা হতে এনু যেথা ভগ্নস্তূপে
বুদ্ধের বচন রুদ্ধ দীর্ণকীর্ণ মূক শিলারূপে,
ছিল যেথা সমাচ্ছন্ন করি
বহু যুগ ধরি
বিস্মৃতিকুয়াশা
ভক্তির-বিজয়স্তম্ভে-সমুৎকীর্ণ অর্চনার ভাষা।

সে অর্চনা সেই বাণী
আপন সজীব মূর্তিখানি
রাখিয়াছে ধ্রুব করি শ্যামল সরস বক্ষে তব,
আজি আমি তারে দেখি লব।

ভারতের যে মহিমা
ত্যাগ করি আসিয়াছে আপন-অঙ্গন-সীমা
অর্ঘ্য দিব তারে
ভারত-বাহিরে তব দ্বারে।
স্নিগ্ধ করি প্রাণ
তীর্থজলে করি যাব স্নান
তোমার জীবনধারাস্রোতে,
যে নদী এসেছে বহি ভারতের পুণ্যযুগ হতে—
যে যুগের গিরিশৃঙ্গ-'পর
একদা উদিয়াছিল প্রেমের মঙ্গলদিনকর।

ব্যাংকক
১১ অক্টোবর ১৯২৭ [১৩৩৪]

খৃষ্ট

যিশুচরিত

বাউল সম্প্রদায়ের একজন লোককে একবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, 'তোমরা সকলের ঘরে খাও না?' সে কহিল, 'না।' কারণ জিজ্ঞাসা করাতে সে কহিল, 'যাহারা আমাদের স্বীকার করে না আমরা তাহাদের ঘরে খাই না।' আমি কহিলাম, 'তারা স্বীকার না করে নাই করিল, তোমরা স্বীকার করিবে না কেন?' সে লোকটি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সরল ভাবে কহিল, 'তা বটে, ঐ জায়গাটাতে আমাদের একটু প্যাঁচ আছে।'

আমাদের সমাজে যে ভেদবুদ্ধি আছে তাহারই দ্বারা চালিত হইয়া কোথায় আমরা অন্ন গ্রহণ করিব আর কোথায় করিব না তাহারই কৃত্রিম গণ্ডিরেখা-দ্বারা আমরা সমস্ত পৃথিবীকে চিহ্নিত করিয়া রাখিয়াছি। এমন-কি, যে-সকল মহাপুরুষ সমস্ত পৃথিবীর সামগ্রী, তাঁহাদিগকেও এইরূপ কোনো-না-কোনো একটা নিষিদ্ধ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ করিয়া পর করিয়া রাখিয়াছি। তাঁহাদের ঘরে অন্ন গ্রহণ করিব না বলিয়া স্থির করিয়া বসিয়া আছি। সমস্ত জগৎকে অন্ন বিতরণের ভার দিয়া বিধাতা যাঁহাদিগকে পাঠাইয়াছেন আমরা স্পর্ধার সঙ্গে তাঁহাদিগকেও জাতে ঠেলিয়াছি।

মহাত্মা যিশুর প্রতি আমরা অনেক দিন এইরূপ একটা বিদ্বেষভাব পোষণ করিয়াছি। আমরা তাঁহাকে হৃদয়ে গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক।

কিন্তু এজন্য একলা আমাদিগকেই দায়ী করা চলে না। আমাদের খৃস্টের পরিচয় প্রধানত সাধারণ খৃস্টান মিশনারিদের নিকট হইতে। খৃস্টকে তাঁহারা খৃস্টানি-দ্বারা আচ্ছন্ন করিয়া আমাদের কাছে ধরিয়াছেন। এ পর্যন্ত বিশেষভাবে তাঁহাদের ধর্মমতের দ্বারা আমাদের ধর্মসংস্কারকে তাঁহারা পরাভূত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। সুতরাং আত্মরক্ষার চেষ্টায় আমরা লড়াই করিবার জন্যই প্রস্তুত হইয়া থাকি।

লড়াইয়ের অবস্থায় মানুষ বিচার করে না। সেই মত্ততার উত্তেজনায় আমরা খৃস্টানকে আঘাত করিতে গিয়া খৃস্টকেও আঘাত করিয়াছি। কিন্তু যাঁহারা জগতের মহাপুরুষ, শত্রু কল্পনা করিয়া তাঁহাদিগকে আঘাত করা আত্মঘাতেরই নামান্তর। বস্তুত শত্রুর প্রতি রাগ করিয়া আমাদেরই দেশের উচ্চ আদর্শকে খর্ব করিয়াছি— আপনাকে ক্ষুদ্র করিয়া দিয়াছি।

সকলেই জানেন ইংরাজি শিক্ষার প্রথমাবস্থায় আমাদের সমাজে একটা সংকটের দিন উপস্থিত হইয়াছিল। তখন সমস্ত সমাজ টলমল, শিক্ষিতের মন আন্দোলিত। ভারতবর্ষে পূজার্চনা সমস্তই বয়ঃপ্রাপ্ত শিশুর খেলামাত্র— এ দেশে ধর্মের কোনো উচ্চ আদর্শ, ঈশ্বরের কোনো সত্য উপলব্ধি কোনো কালে ছিল না— এই বিশ্বাসে তখন আমরা নিজেদের সম্বন্ধে লজ্জা অনুভব করিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। এইরূপে হিন্দু সমাজের কূল যখন ভাঙিতেছিল, শিক্ষিতদের মন যখন ভিতরে ভিতরে বিদীর্ণ হইয়া দেশের দিক হইতে ধসিয়া পড়িতেছিল, স্বদেশের প্রতি অন্তরের অশ্রদ্ধা যখন বাহিরের আক্রমণের সম্মুখে আমাদিগকে দুর্বল করিয়া

তুলিতেছিল, সেই সময়ে খৃস্টান মিশনারি আমাদের সমাজে যে বিভীষিকা আনয়ন করিয়াছিল তাহার প্রভাব এখনও আমাদের হৃদয় হইতে সম্পূর্ণ দূর হয় নাই।

কিন্তু সেই সংকট আজ আমাদের কাটিয়া গিয়াছে। সেই ঘোরতর দুর্যোগের সময় রামমোহন রায় বাহিরের আবর্জনা ভেদ করিয়া আমাদের দেশের নিত্য সম্পদ সংশয়াকুল স্বদেশবাসীর নিকট উদ্ঘাটিত করিয়া দিলেন। এখন ধর্মসাধনায় আমাদের ভিক্ষাবৃত্তির দিন ঘুচিয়াছে। এখন হিন্দুধর্ম কেবলমাত্র কতকগুলি অদ্ভুত কাহিনী এবং বাহ্য-আচার-রূপে আমাদের নিকট প্রকাশমান নহে। এখন আমরা নির্ভয়ে সকল ধর্মের মহাপুরুষদের মহাবাণী-সকল গ্রহণ করিয়া আমাদের পৈতৃক ঐশ্বর্যকে বৈচিত্র্যদান করিতে পারি।

কিন্তু দুর্গতির দিনে মানুষ যখন দুর্বল থাকে তখন সে এক দিকের আতিশয্য হইতে রক্ষা পাইলে আর-এক দিকের আতিশয্যে গিয়া উত্তীর্ণ হয়। বিকারের জ্বরে মানুষের দেহের তাপ যখন উপরে চড়ে তখনও ভয় লাগাইয়া দেয় আবার যখন নিচে নামিতে থাকে তখনও সে ভয়ানক। আমাদের দেশের বর্তমান বিপদ আমাদের পূর্বতন বিপদের উল্টাদিকে উন্মত্ত হইয়া ছুটিতেছে।

আমাদের দেশের মহত্ত্বের মূর্তিটি প্রকাশ করিয়া দিলেও তাহা গ্রহণ করিবার বাধা আমাদের শক্তির জীর্ণতা। আমাদের অধিকার পাকা হইল না, কিন্তু আমাদের অহংকার বাড়িল। পূর্বে একদিন ছিল যখন আমরা কেবল সংস্কারবশত আমাদের সমাজ ও ধর্মের সমস্ত বিকারগুলিকে পুঞ্জীভূত করিয়া তাহার মধ্যে আবদ্ধ হইয়া বসিয়াছিলাম। এখন অহংকারবশতই সমস্ত বিকৃতিকে জোর করিয়া স্বীকার করাকে আমরা বলিষ্ঠতার লক্ষণ বলিয়া মনে করি। ঘরে ঝাঁট দিব না, কোনো আবর্জনাকেই বাহিরে ফেলিব না, যেখানে যাহা-কিছু আছে সমস্তকেই গায়ে মাখিয়া লইব, ধুলামাটির সঙ্গে মণিমাণিক্যকে নির্বিচারে একত্রে রক্ষা করাকেই সমন্বয়নীতি বলিয়া গণ্য করিব—এই দশা আমাদের ঘটিয়াছে। ইহা বস্তুত তামসিকতা। নির্জীবতাই যেখানে যাহা-কিছু আছে সমস্তকেই সমান মূল্যে রক্ষা করে। তাহার কাছে ভালোও যেমন মন্দও তেমন, ভুলও যেমন সত্যও তেমনি।

জীবনের ধর্মই নির্বাচনের ধর্ম। তাহার কাছে নানা পদার্থের মূল্যের তারতম্য আছেই। সেই অনুসারে সে গ্রহণ করে, ত্যাগ করে। এবং যাহা তাহার পক্ষে যথার্থ শ্রেয় তাহাকেই সে গ্রহণ করে এবং বিপরীতকেই বর্জন করিয়া থাকে।

পশ্চিমের আঘাত খাইয়া আমাদের দেশে যে জাগরণ ঘটিয়াছে তাহা মুখ্যত জ্ঞানের দিকে। এই জাগরণের প্রথম অবস্থায় আমরা নিজের সম্বন্ধে বার বার ইহাই লক্ষ্য করিয়া আসিতেছিলাম যে, আমরা জ্ঞানে যাহা বুঝি ব্যবহারে তাহার উল্টা করি। ইহাতে ক্রমে যখন আত্মধিক্কারের সূত্রপাত হইল তখন নিজের বুদ্ধির সঙ্গে ব্যবহারের সামঞ্জস্য-সাধনের অতি সহজ উপায় বাহির করিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। আমাদের যাহা-কিছু আছে সমস্তই ভালো, তাহার কিছুই বর্জনীয় নহে, ইহাই প্রমাণ করিতে বসিয়াছি।

এক দিকে আমরা জাগিয়াছি। সত্য আমাদের দ্বারে আঘাত করিতেছেন তাহা আমরা জানিতে পারিয়াছি। কিন্তু দ্বার খুলিয়া দিতেছি না—সাড়া দিতেছি, কিন্তু পাদ্য-অর্ঘ্য আনিয়া দিতেছি না। ইহাতে আমাদের অপরাধ প্রতিদিন কেবল বাড়িয়া চলিতেছে। কিন্তু সেই অপরাধকে ঔদ্ধত্যের সহিত অস্বীকার করিবার যে অপরাধ সে আরও গুরুতর। লোকভয়ে এবং অভ্যাসের আলস্যে সত্যকে

আমরা যদি দ্বারের কাছে দাঁড় করাইয়া লজ্জিত হইয়া বসিয়া থাকিতাম তাহা হইলেও তেমন ক্ষতি হইত না, কিন্তু 'তুমি সত্য নও— যাহা অসত্য তাহাই সত্য' ইহাই প্রাণপণ শক্তিতে প্রমাণ করিবার জন্য যুক্তির কুহক বিস্তার করার মতো এত বড়ো অপরাধ আর কিছুই হইতে পারে না। আমরা ঘরের পুরাতন জঞ্জালকে বাঁচাইতে গিয়া সত্যকে বিনাশ করিতে কুণ্ঠিত হইতেছি না।

এই চেষ্টার মধ্যে যে দুর্বলতা প্রকাশ পায় তাহা মূলত চরিত্রের দুর্বলতা। চরিত্র অসাড় হইয়া আছে বলিয়াই আমরা কাজের দিকটাতে আপনাকে ও সকলকে ফাঁকি দিতে উদ্যত। যে-সকল আচার বিচার বিশ্বাস পূজাপদ্ধতি আমাদের দেশের শতসহস্র নরনারীকে জড়তা মূঢ়তা ও নানা দুঃখে অভিভূত করিয়া ফেলিতেছে, যাহা আমাদিগকে কেবলই ছোটো করিতেছে, ব্যর্থ করিতেছে, বিচ্ছিন্ন করিতেছে, জগতে আমাদিগকে সকলের কাছে অপমানিত ও সকল আক্রমণে পরাভূত করিতেছে, কোনোমতেই আমরা সাহস করিয়া স্পষ্ট করিয়া তাহাদের অকল্যাণরূপ দেখিতে এবং ঘোষণা করিতে চাহি না— নিজের বুদ্ধির চোখে সূক্ষ্ম ব্যাখ্যার ধূলা ছড়াইয়া নিশ্চেষ্টতার পথে স্পর্ধা করিয়া পদচারণ করিতে চাই। ধর্মবুদ্ধি চরিত্রবল যখন জাগিয়া উঠে তখন সে এই-সকল বিড়ম্বনা-সৃষ্টিকে প্রবল পৌরুষের সহিত অবজ্ঞা করে। মানুষের যে-সকল দুঃখ দুর্গতি সম্মুখে স্পষ্ট বিদ্যমান তাহাকে সে হৃদয়হীন ভাবুকতার সূক্ষ্ম কারুকার্যে মনোরম করিয়া তোলার অধ্যবসায়কে কিছুতেই আর সহ্য করিতে পারে না।

ইহা হইতেই আমাদের প্রয়োজন বুঝা যাইবে। জ্ঞানবৃদ্ধির দ্বারা আমাদের সম্পূর্ণ বলবৃদ্ধি হইতেছে না। আমাদের মনুষ্যত্বকে সমগ্রভাবে উদ্‌বোধিত করিয়া তোলার অভাবে আমরা নির্ভীক পৌরুষের সহিত পূর্ণশক্তিতে জীবনকে মঙ্গলের সরল পথে প্রবাহিত করিতে পারিতেছি না।

এই দুর্গতির দিনে সেই মহাপুরুষেরাই আমাদের সহায় যাঁহারা কোনো কারণেই কোনো প্রলোভনেই আপনাকে এবং অন্যকে বঞ্চনা করিতে চান নাই, যাঁহারা প্রবল বলে মিথ্যাকে অস্বীকার করিয়াছেন এবং সমস্ত পৃথিবীর লোকের নিকট অপমানিত হইয়াও সত্যকে যাঁহারা নিজের জীবন দিয়া সপ্রমাণ করিয়াছেন। তাঁহাদের চরিত চিন্তা করিয়া সমস্ত কৃত্রিমতা কুটিলতর্ক ও প্রাণহীন বাহ্য-আচারের জটিল বেষ্টন হইতে চিত্ত মুক্তিলাভ করিয়া রক্ষা পায়।

যিশুর চরিত আলোচনা করিলে দেখিতে পাইব যাঁহারা মহাত্মা তাঁহারা সত্যকে অত্যন্ত সরল করিয়া সমস্ত জীবনের সামগ্রী করিয়া দেখেন— তাঁহারা কোনো নূতন পন্থা, কোনো বাহ্য প্রণালী, কোনো অদ্ভুত মত প্রচার করেন না। তাঁহারা অত্যন্ত সহজ কথা বলিবার জন্য আসেন— তাঁহারা পিতাকে পিতা বলিতে ও ভাইকে ভাই ডাকিতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারা এই অত্যন্ত সরল বাক্যটি অত্যন্ত জোরের সঙ্গে বলিয়া যান যে, যাহা অন্তরের সামগ্রী তাহাকে বাহিরের আয়োজনে পুঞ্জীকৃত করিবার চেষ্টা করা বিড়ম্বনা মাত্র। তাঁহারা মনকে জাগাইতে বলেন, তাঁহারা দৃষ্টিকে সরল করিয়া সম্মুখে লক্ষ্য করিতে বলেন, অন্ধ অভ্যাসকে তাঁহারা সত্যের সিংহাসন হইতে অপসারিত করিতে আদেশ করেন। তাঁহারা কোনো অপরূপ সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া আনেন না, কেবল তাঁহাদের দীপ্ত নেত্রের দৃষ্টিপাতে আমাদের জীবনের মধ্যে তাঁহারা সেই চিরকালের আলোক নিক্ষেপ করেন যাহার আঘাতে আমাদের দুর্বল জড়তার সমস্ত ব্যর্থ জাল-বুনানির মধ্য হইতে আমরা লজ্জিত হইয়া জাগিয়া উঠি।

জাগিয়া উঠিয়া আমরা কী দেখি? আমরা মানুষকে দেখিতে পাই। আমরা নিজের সত্যমূর্তি সম্মুখে দেখি। মানুষ যে কত বড়ো সে কথা আমরা প্রতিদিন ভুলিয়া থাকি; স্বরচিত ও সমাজরচিত শত শত বাধা আমাদিগকে চারি দিক হইতে ছোটো করিয়া রাখিয়াছে, আমরা আমাদের সমস্তটা দেখিতে পাই না। যাঁহারা আপনার দেবতাকে ক্ষুদ্র করেন নাই, পূজাকে কৃত্রিম করেন নাই, লোকাচারের দাসত্বচিহ্ন ধূলায় ফেলিয়া দিয়া যাঁহারা আপনাকে অমৃতের পুত্র বলিয়া সগৌরবে ঘোষণা করিয়াছেন, তাঁহারা মানুষের কাছে মানুষকে বড়ো করিয়া দিয়াছেন। ইহাকেই বলে মুক্তি দেওয়া। মুক্তি স্বর্গ নহে, সুখ নহে। মুক্তি অধিকারবিস্তার, মুক্তি ভূমাকে উপলব্ধি।

সেই মুক্তির আহ্বান বহন করিয়া নিত্যকালের রাজপথে ঐ দেখো কে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। তাঁহাকে অনাদর করিয়ো না, আঘাত করিয়ো না, ‘তুমি আমাদের কেহ নও’ বলিয়া আপনাকে হীন করিয়ো না। ‘তুমি আমাদের জাতির নও’ বলিয়া আপনার জাতিকে লজ্জা দিয়ো না। সমস্ত জড়সংস্কারজাল ছিন্ন করিয়া বাহির হইয়া আইস, ভক্তিনম্র চিত্তে প্রণাম করো, বলো— ‘তুমি আমাদের অত্যন্ত আপন, কারণ, তোমার মধ্যে আমরা আপনাকে সত্যভাবে লাভ করিতেছি।’

যে সময়ে কোনো দেশে কোনো মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন সে সময়কে আমরা তাঁহার আবির্ভাবের অনুকূল সময় বলিয়া গণ্য করি। এ কথা এক দিক হইতে সত্য হইলেও, এ সম্বন্ধে আমাদের ভুল বুঝিবার সম্ভাবনা আছে। সাধারণত যে লক্ষণগুলিকে আমরা অনুকূল বলিয়া মনে করি তাহার বিপরীতকেই প্রতিকূল বলিয়া গণ্য করা চলে না। অভাব অত্যন্ত কঠোর হইলে মানুষের লাভের চেষ্টা অত্যন্ত জাগ্রত হয়। অতএব একান্ত অভাবকেই লাভসম্ভাবনার প্রতিকূল বলা যাইতে পারে না। বাতাস যখন অত্যন্ত স্থির হয় তখনই ঝড়কে আমরা আসন্ন বলিয়া থাকি। বস্তুত মানুষের ইতিহাসে আমরা বরাবর দেখিয়া আসিতেছি— প্রতিকূলতা যেমন আনুকূল্য করে এমন আর কিছুতেই নহে। যিশুর জন্মগ্রহণকালের প্রতি লক্ষ্য করিলেও আমরা এই সত্যটির প্রমাণ পাইব।

মানুষের প্রতাপ ও ঐশ্বর্য যখন চোখে দেখিতে পাই তখন আমাদের মনের উপর তাহার প্রভাব যে কিরূপ প্রবল হইয়া উঠে তাহা বর্তমান যুগে আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি। সে আপনার চেয়ে বড়ো যেন আর কাহাকেও স্বীকার করিতে চায় না। মানুষ এই ঐশ্বর্যের প্রলোভনে আকৃষ্ট হইয়া কেহ বা ভিক্ষাবৃত্তি, কেহ বা দাস্যবৃত্তি, কেহ বা দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিয়া সমস্ত জীবন কাটাইয়া দেয়— এক মুহূর্ত অবকাশ পায় না।

যিশু যখন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তখন রোম-সাম্রাজ্যের প্রতাপ অভ্রভেদী হইয়া উঠিয়াছিল। যে কেহ যে দিকে চোখ মেলিত এই সাম্রাজ্যেরই গৌরবচূড়া সকল দিক হইতেই চোখে পড়িতে থাকিত; ইহারই আয়োজন উপকরণ সকলের চিত্তকে অভিভূত করিয়া দিতেছিল। রোমের বিদ্যাবুদ্ধি বাহুবল ও রাষ্ট্রীয় শক্তির মহাজালে যখন বিপুল সাম্রাজ্য চারি দিকে আবদ্ধ, সেই সময়ে সাম্রাজ্যের এক প্রান্তে দরিদ্র ইহুদি মাতার গর্ভে এই শিশু জন্মগ্রহণ করিলেন।

তখন রোম-সাম্রাজ্যে ঐশ্বর্যের যেমন প্রবল মূর্তি, ইহুদি-সমাজে লোকাচার ও শাস্ত্রশাসনেরও সেইরূপ প্রবল প্রভাব।

ইহুদিদের ধর্ম স্বজাতির মধ্যে গণ্ডিবদ্ধ। তাহাদের ঈশ্বর জিহোভা বিশেষভাবে তাহাদিগকে বরণ করিয়া লইয়াছেন এইরূপ তাহাদের বিশ্বাস। তাঁহার নিকট

তাহারা কতকগুলি সত্যে বদ্ধ, এই সত্যগুলি বিধিরূপে তাহাদের সংহিতায় লিখিত। এই বিধি পালন করাই ঈশ্বরের আদেশ-পালন।

বিধির অচল গণ্ডির মধ্যে নিয়ত বাস করিতে গেলে মানুষের ধর্মবুদ্ধি কঠিন ও সংকীর্ণ না হইয়া থাকিতে পারে না। কিন্তু ইহুদিদের সনাতন-আচার-নিষ্পেষিত চিত্তে নূতন প্রাণ সঞ্চার করিবার উপায় ঘটিয়াছিল। মাঝে মাঝে তাহাদের পাথরের প্রাচীর ভেদ করিয়া তাহাদের মধ্যে এক-একজন ঋষি আসিয়া দেখা দিতেন। ধর্মের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি বহন করিয়াই তাঁহাদের অভ্যুদয়। তাঁহারা স্মৃতিশাস্ত্রের মৃতপত্র-মর্মরকে আচ্ছন্ন করিয়া দিয়া অমৃতবাণী প্রচার করিতেন। এই ইসায়া জেরেমায়া প্রভৃতি ইহুদি ঋষিগণ পরমদুর্গতির দিনে আলোক জ্বালাইয়াছেন, তাঁহাদের তীব্র জ্বালাময় বাক্যের বজ্রবর্ষণে স্বজাতির বদ্ধ জীবনের বহুদিনসঞ্চিত কলুষরাশি দগ্ধ করিয়াছেন।

শাস্ত্র ও আচারধর্মের দ্বারাই ইহুদিদের সমস্ত জীবন নিয়মিত। যদিচ তাহারা সাহসিক যোদ্ধা ছিল, তবু রাষ্ট্ররক্ষা-ব্যাপারে তাহাদের পটুত্ব প্রকাশ পায় নাই। এই জন্য রাষ্ট্র সম্বন্ধে বিদেশী প্রতিবেশীদের হাতে তাহারা দুর্গতিলাভ করিয়াছিল।

যিশুর জন্মের কিছুকাল পূর্ব হইতে ইহুদিদের সমাজে ঋষি-অভ্যুদয় বন্ধ ছিল। কালের গতি প্রতিহত করিয়া, প্রাণের প্রবাহ অবরুদ্ধ করিয়া, পুরাতনকে চিরস্থায়ী করিবার চেষ্টায় তখন সকলে নিযুক্ত ছিল। বাহিরকে একেবারে বাহিরে ঠেকাইয়া, সমস্ত দ্বার জানালা বন্ধ করিয়া, দেয়াল গাঁথিয়া তুলিবার দলই তখন প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। নবসংকলিত তাল্‌মদ্‌ শাস্ত্রে বাহ্য আচারবন্ধনের আয়োজন পাকা হইল, এবং ধর্মপালনের মূলে যে-একটি মুক্ত বুদ্ধি ও স্বাধীনতা-তত্ত্ব আছে তাহাকে স্থান দেওয়া হইল না।

জড়ত্বের চাপ যতই কঠোর হউক মনুষ্যত্বের বীজ একেবারে মরিতে চায় না। অন্তরাত্মা যখন পীড়িত হইয়া উঠে, বাহিরে যখন সে কোনো আশার মূর্তি দেখিতে পায় না, তখন তাহার অন্তর হইতেই আশ্বাসের বাণী উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে—সেই বাণীকে সে হয়তো সম্পূর্ণ বোঝে না, অথচ তাহাকে প্রচার করিতে থাকে। এই সময়টাতে ইহুদিরা আপনা-আপনি বলাবলি করিতেছিল মর্ত্যে পুনরায় স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠার কাল আসিতেছে। তাহারা মনে করিতেছিল তাহাদেরই দেবতা তাহাদের জাতিকেই এই স্বর্গরাজ্যের অধিকার দান করিবেন—ঈশ্বরের বরপুত্র ইহুদি জাতির সত্যযুগ পুনরায় আসন্ন হইয়াছে।

এই আসন্ন শুভ মুহূর্তের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে এই ভাবটিও জাতির মধ্যে কাজ করিতেছিল। এই জন্য মরুস্থলীতে বসিয়া অভিষেকদাতা যোহন্‌ যখন ইহুদিদিগকে অনুতাপের দ্বারা পাপের প্রায়শ্চিত্ত ও জর্ডনের তীর্থজলে দীক্ষা গ্রহণ করিবার জন্য আহ্বান করিলেন তখন দলে দলে পুণ্যকামিগণ তাঁহার নিকট আসিয়া সমবেত হইতে লাগিল। ইহুদিরা ঈশ্বরকে প্রসন্ন করিয়া পৃথিবীতে আপনাদের অপমান ঘুচাইতে চাহিল, ধরাতলের রাজত্ব এবং সকলের শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিবার আশ্বাসে তাহারা উৎসাহিত হইয়া উঠিল।

এমন সময়ে যিশুও মর্ত্যলোকে ঈশ্বরের রাজ্যকে আসন্ন বলিয়া ঘোষণা করিলেন। কিন্তু ঈশ্বরের রাজ্য যিনি স্থাপন করিতে আসিবেন তিনি কে? তিনি তো রাজা, তাঁহাকে তো রাজপদ গ্রহণ করিতে হইবে। রাজপ্রভাব না থাকিলে সর্বত্র ধর্মবিধি প্রবর্তন করিবে কী করিয়া? একবার কি মরুস্থলীতে মানবের

মঙ্গল ধ্যান করিবার সময় যিশুর মনে এই দ্বিধা উপস্থিত হয় নাই? ক্ষণকালের জন্য কি তাঁহার মনে হয় নাই রাজপীঠের উপরে ধর্মসিংহাসন প্রতিষ্ঠা করিলে তবেই তাঁহার ক্ষমতা অপ্রতিহত হইতে পারে? কথিত আছে, শয়তান তাঁহার সম্মুখে রাজ্যের প্রলোভন বিস্তার করিয়া তাঁহাকে মুগ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছিল। সেই প্রলোভনকে নিরস্ত করিয়া তিনি জয়ী হইয়াছিলেন। এই প্রলোভনের কাহিনীকে কাল্পনিক বলিয়া উড়াইয়া দিবার হেতু নাই। রোমের জয়পতাকা তখন রাজগৌরবে আকাশে আন্দোলিত হইতেছিল এবং সমস্ত ইহুদি জাতি রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার সুখস্বপ্নে নিবিষ্ট হইয়াছিল। এমন অবস্থায় সমস্ত জনসাধারণের সেই অন্তরের আন্দোলন যে তাঁহারও ধ্যানকে গভীরভাবে আঘাত করিতে থাকিবে ইহাতে আশ্চর্যের কথা কিছুই নাই।

কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই যে, এই সর্বব্যাপী মায়াজালকে ছেদন করিয়া তিনি ঈশ্বরের সত্যরাজ্যকে সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষ করিলেন। ধনমানের মধ্যে তাহাকে দেখিলেন না, মহাসাম্রাজ্যের দৃপ্ত প্রতাপের মধ্যে তাহাকে দেখিলেন না; বাহ্য উপকরণহীন দারিদ্র্যের মধ্যে তাহাকে দেখিলেন এবং সমস্ত বিষয়ী লোকের সম্মুখে একটা অদ্ভুত কথা অসংকোচে প্রচার করিলেন যে, যে নম্র পৃথিবীর অধিকার তাহারই। তিনি চরিত্রের দিক দিয়া এই যেমন একটা কথা বলিলেন, উপনিষদের ঋষিরা মানুষের মনের দিক দিয়া ঠিক এই প্রকারই অদ্ভুত একটা কথা বলিয়াছেন : যাহারা ধীর তাহারাই সকলের মধ্যে প্রবেশের অধিকার লাভ করে। ধীরাঃ সর্বমেবাবিশন্তি।

যাহা অত্যন্ত প্রত্যক্ষ এবং যাহা সর্বজনের চিত্তকে অভিভূত করিয়া বর্তমান, তাহাকে সম্পূর্ণ ভেদ করিয়া, সাধারণ মানবের সংস্কারকে অতিক্রম করিয়া, ঈশ্বরের রাজ্যকে এমন একটি সত্যের মধ্যে তিনি দেখিলেন যেখানে সে আপনার আন্তরিক শক্তিতে আপনি প্রতিষ্ঠিত— বাহিরের কোনো উপাদানের উপর তাহার আশ্রয় নহে। সেখানে অপমানিতেরও সম্মান কেহ কাড়িতে পারে না, দরিদ্রেরও সম্পদ কেহ নষ্ট করিতে পারে না। সেখানে যে নত সেই উন্নত হয়, যে পশ্চাদ্‌বর্তী সেই অগ্রগণ্য হইয়া উঠে। এ কথা তিনি কেবল কথায় রাখিয়া যান নাই। যে দোর্দণ্ডপ্রতাপ সম্রাটের রাজদণ্ড অনায়াসে তাঁহার প্রাণবিনাশ করিয়াছে তাহার নাম ইতিহাসের পাতার এক প্রান্তে লেখা আছে মাত্র। আর যিনি সামান্য চোরের সঙ্গে একত্রে ক্রুশে বিদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন, মৃত্যুকালে সামান্য কয়েকজন ভীত অখ্যাত শিষ্য যাঁহার অনুবর্তী, অন্যায় বিচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার সাধ্যমাত্র যাঁহার ছিল না, তিনি আজ মৃত্যুহীন গৌরবে সমস্ত পৃথিবীর হৃদয়ের মধ্যে বিরাজ করিতেছেন এবং আজও বলিতেছেন, 'যাহারা দীন তাহারা ধন্য; কারণ, স্বর্গরাজ্য তাহাদের। যাহারা নম্র তাহারা ধন্য; কারণ, পৃথিবীর অধিকার তাহারাই লাভ করিবে।'

এইরূপে স্বর্গরাজ্যকে যিশু মানুষের অন্তরের মধ্যে নির্দেশ করিয়া মানুষকেই বড়ো করিয়া দেখাইয়াছেন। তাহাকে বাহিরের উপকরণের মধ্যে স্থাপিত করিয়া দেখাইলে মানুষের বিশুদ্ধ গৌরব খর্ব হইত। তিনি আপনাকে বলিয়াছেন মানুষের পুত্র। মানবসন্তান যে কে তাহাই তিনি প্রকাশ করিতে আসিয়াছেন।

তাই তিনি দেখাইয়াছেন, মানুষের মনুষ্যত্ব সাম্রাজ্যের ঐশ্বর্যেও নহে, আচারের অনুষ্ঠানেও নহে; কিন্তু মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের প্রকাশ আছে এই সত্যেই সে সত্য। মানবসমাজে দাঁড়াইয়া ঈশ্বরকে তিনি পিতা বলিয়াছেন। পিতার সঙ্গে পুত্রের যে সম্বন্ধ তাহা আত্মীয়তার নিকটতম সম্বন্ধ— আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ। তাহা আদেশ-

পালনের ও অঙ্গীকার-রক্ষার বাহ্য সম্পর্ক নহে। ঈশ্বর পিতা এই চিরন্তন সম্বন্ধের দ্বারাই মানুষ মহীয়ান, আর কিছুর দ্বারা নহে। তাই ঈশ্বরের পুত্ররূপে মানুষ সকলের চেয়ে বড়ো, সাম্রাজ্যের রাজারূপে নহে। তাই শয়তান আসিয়া যখন তাঁহাকে বলিল 'তুমি রাজা' তিনি বলিলেন, 'না, আমি মানুষের পুত্র।' এই বলিয়া তিনি সমস্ত মানুষকে সম্মানিত করিয়াছেন।

তিনি এক জায়গায় ধনকে নিন্দা করিয়াছেন, বলিয়াছেন ধন মানুষের পরিত্রাণের পথে প্রধান বাধা। ইহা একটা নিরর্থক বৈরাগ্যের কথা নহে। ইহার ভিতরকার অর্থ এই যে, ধনী ধনকেই আপনার প্রধান অবলম্বন বলিয়া জানে— অভ্যাসের মোহ-বশত ধনের সঙ্গে সে আপনার মনুষ্যত্বকে মিলাইয়া ফেলে। এমন অবস্থায় তাহার প্রকৃত আত্মশক্তি আবৃত হইয়া যায়। যে আত্মশক্তিকে বাধামুক্ত করিয়া দেখে সে ঈশ্বরের শক্তিকেই দেখিতে পায় এবং সেই দেখার মধ্যেই তাহার যথার্থ পরিত্রাণের আশা। মানুষ যখন যথার্থভাবে আপনাকে দেখে তখনই আপনার মধ্যে ঈশ্বরকে দেখে; আর আপনাকে দেখিতে গিয়া যখন সে কেবল ধনকে দেখে, মানকে দেখে, তখনই আপনাকে অবমানিত করে এবং সমস্ত জীবনযাত্রার দ্বারা ঈশ্বরকে অস্বীকার করিতে থাকে।

মানুষকে এই মানবপুত্র বড়ো দেখিয়াছেন বলিয়াই মানুষকে যন্ত্ররূপে দেখিতে চান নাই। বাহ্য ধনে যেমন মানুষকে বড়ো করে না তেমনি বাহ্য আকারে মানুষকে পবিত্র করে না। বাহিরের স্পর্শ বাহিরের খাদ্য মানুষকে দূষিত করিতে পারে না; কারণ, মানুষের মনুষ্যত্ব যেখানে, সেখানে তাহার প্রবেশ নাই। যাহারা বলে বাহিরের সংস্রবে মানুষ পতিত হয় তাহারা মানুষকে ছোটো করিয়া দেয়। এইরূপে মানুষ যখন ছোটো হইয়া যায় তখন তাহার সংকল্প, তাহার ক্রিয়াকর্ম, সমস্তই ক্ষুদ্র হইয়া আসে; তাহার শক্তি হ্রাস হয় এবং সে কেবলই ব্যর্থতার মধ্যে ঘুরিয়া মরে। এই জন্যই মানবপুত্র আচার ও শাস্ত্রকে মানুষের চেয়ে বড়ো হইতে দেন নাই এবং বলিয়াছেন, বলি-নৈবেদ্যের দ্বারা ঈশ্বরের পূজা নহে, অন্তরের ভক্তির দ্বারাই তাঁহার ভজনা। এই বলিয়াই তিনি অস্পৃশ্যকে স্পর্শ করিলেন, অনাচারীর সহিত একত্রে আহার করিলেন, এবং পাপীকে পরিত্যাগ না করিয়া তাহাকে পরিত্রাণের পথে আহ্বান করিলেন।

শুধু তাই নয়, সমস্ত মানুষের মধ্যে তিনি আপনাকে এবং সেই যোগে ভগবানকে উপলব্ধি করিলেন। তিনি শিষ্যদিগকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, 'দরিদ্রকে যে খাওয়ায় সে আমাকেই খাওয়ায়, বস্ত্রহীনকে যে বস্ত্র দেয় সে আমাকেই বসন পরায়।' ভক্তিবৃত্তিকে বাহ্য অনুষ্ঠানের দ্বারা সংকীর্ণরূপে চরিতার্থ করিবার উপদেশ ও দৃষ্টান্ত তিনি দেখান নাই। ঈশ্বরের ভজনা ভক্তিরস-সম্ভোগ করার উপায়মাত্র নহে। তাঁহাকে ফুল দিয়া, নৈবেদ্য দিয়া, বস্ত্র দিয়া, স্বর্ণ দিয়া, ফাঁকি দিলে যথার্থ আপনাকেই ফাঁকি দেওয়া হয়; ভক্তি লইয়া খেলা করা হয় মাত্র এবং এইরূপ খেলায় যতই সুখ হউক তাহা মনুষ্যত্বের অবমাননা। যিশুর উপদেশ যাঁহারা সত্যভাবে গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারা কেবল মাত্র পূজার্চনা-দ্বারা দিনরাত কাটাইয়া দিতে পারেন না; মানুষের সেবা তাঁহাদের পূজা, অতি কঠিন তাঁহাদের ব্রত। তাঁহারা আরামের শয্যা ত্যাগ করিয়া, প্রাণের মমতা বিসর্জন দিয়া, দূর দেশ-দেশান্তরে নরখাদকদের মধ্যে, কুষ্ঠরোগীদের মধ্যে, জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন —কেননা, যাঁহার নিকট হইতে তাঁহারা দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন তিনি মানবপুত্র, তাঁহার আবির্ভাবে মানবের প্রতি ঈশ্বরের দয়া সুস্পষ্ট প্রকাশমান হইয়াছে। কারণ,

এই মহাপুরুষ সর্বপ্রকারে মানবের মাহাত্ম্য যেমন করিয়া প্রচার করিয়াছেন এমন আর কে করিয়াছেন?

তাঁহাকে তাঁহার শিষ্যেরা দুঃখের মানুষ বলেন। দুঃখ-স্বীকারকে তিনি মহৎ করিয়া দেখাইয়াছেন। ইহাতেও তিনি মানুষকে বড়ো করিয়াছেন। দুঃখের উপরেও মানুষ যখন আপনাকে প্রকাশ করে তখনই মানুষ আপনার সেই বিশুদ্ধ মনুষ্যত্বকে প্রচার করে যাহা আগুনে পোড়ে না যাহা অস্ত্রাঘাতে ছিন্ন হয় না।

সমস্ত মানুষের প্রতি প্রেমের দ্বারা যিনি ঈশ্বরের প্রেম প্রচার করিয়াছেন, সমস্ত মানুষের দুঃখভার স্বেচ্ছাপূর্বক গ্রহণ করিবার উপদেশ তাঁহার জীবন হইতে আপনিই নিঃশ্বসিত হইয়া উঠিবে ইহাতে আর আশ্চর্য কী আছে। কারণ, স্বেচ্ছায় দুঃখবহন করিতে অগ্রসর হওয়াই প্রেমের ধর্ম। দুর্বলের নির্জীব প্রেমই ঘরের কোণে ভাবাবেশের অশ্রুজলপাতে আপনাকে আপনি আর্দ্র করিতে থাকে। যে প্রেমের মধ্যে যথার্থ জীবন আছে সে আত্মত্যাগের দ্বারা, দুঃখস্বীকারের দ্বারা গৌরব লাভ করে। সে গৌরব অহংকারের গৌরব নহে; কারণ, অহংকারের মদিরায় নিজেকে মত্ত করা প্রেমের পক্ষে অনাবশ্যক— তাহার নিজের মধ্যে স্বত-উৎসারিত অমৃতের উৎস আছে।

মানুষের মধ্যে ভগবানের প্রকাশ— যিশুর এই বাণী কেবলমাত্র তত্ত্বকথারূপে কোনো-একটি শাস্ত্রের শ্লোকের মধ্যে বন্দী হইয়া বাস করিতেছে না। তাঁহার জীবনের মধ্যে তাহা একান্ত সত্য হইয়া দেখা দিয়াছিল বলিয়াই আজ পর্যন্ত তাহা সজীব বনস্পতির মতো নব নব শাখা প্রশাখা বিস্তার করিতেছে। মানবচিত্তের শত সহস্র সংস্কারের বাধা প্রতিদিনই সে ক্ষয় করিবার কাজে নিযুক্ত আছে। ক্ষমতার মদে মাতাল প্রতিদিন তাহাকে অপমান করিতেছে, জ্ঞানের গর্বে উদ্ধত প্রতিদিন তাহাকে উপহাস করিতেছে, শক্তি-উপাসক তাহাকে অক্ষমের দুর্বলতা বলিয়া অবজ্ঞা করিতেছে, কঠোর বিষয়ী তাহাকে কাপুরুষের ভাবুকতা বলিয়া উড়াইয়া দিতেছে— তবু সে নম্র হইয়া নীরবে মানুষের গভীরতম চিত্তে ব্যাপ্ত হইতেছে, দুঃখকেই আপনার সহায় এবং সেবাকে আপনার সঙ্গিনী করিয়া লইয়াছে— যে পর তাহাকে আপন করিতেছে, যে পতিত তাহাকে তুলিয়া লইতেছে, যাহার কাছ হইতে কিছুই পাইবার নাই তাহার কাছে আপনাকে নিঃশেষে উৎসর্গ করিয়া দিতেছে। এমনি করিয়া মানবপুত্র পৃথিবীকে, সকল মানুষকেই বড়ো করিয়া তুলিয়াছেন— তাহাদের অনাদর দূর করিয়াছেন, তাহাদের অধিকার প্রশস্ত করিয়াছেন, তাহারা যে তাঁহাদের পিতার ঘরে বাস করিতেছে এই সংবাদের দ্বারা অপমানের সংকোচ মানবসমাজ হইতে অপসারিত করিয়াছেন— ইহাকেই বলে মুক্তিদান করা।

শান্তিনিকেতন
২৫ ডিসেম্বর ১৯১০

খৃস্টধর্ম

সম্প্রদায় এই বলে অহংকার করে যে, সত্য আর-সকলকে ত্যাগ করে তাকেই আশ্রয় করেছে। সেই অহংকারে সে সত্যের মর্যাদা যতই তোলে নিজের বাহ্যরূপকে ততই পল্লবিত করতে থাকে। ধনের অহংকার ধনীর যতই বাড়ে ধনেরই আড়ম্বর তার ততই বিস্তৃত হয়, মনুষ্যত্বের গৌরব তার ততই খর্ব হয়ে যায়।

বিষয়ীলোক বিষয়কে নিয়ে অহংকার করে তাতে ক্ষতি হয় না; কারণ, বিষয়কে আপনার মধ্যে বদ্ধ রাখাই তার লক্ষ্য। কিন্তু সম্প্রদায় যখন তার সত্যটিকে আপন অহংকারের বিষয় করে তোলে, তখন সেই সত্য সে দান করতে এলে অন্যের পক্ষে তা গ্রহণ করা কঠিন হয়।

খৃস্টান খৃস্টধর্মকে নিয়ে যখনই অহংকার করে তখনই বুঝতে পারি তার মধ্যে এমন খাদ মিশিয়েছে যা তার ধর্ম নয়, যা তার আপনি। এই জন্যে সে যখন দাতাবৃত্তি করতে আসে তখন তার হাত থেকে ভিক্ষুকের মতো সত্যকে গ্রহণ করতে আমরা লজ্জা বোধ করি। অহংকারের প্রতিঘাতে অহংকার জেগে ওঠে— এবং যে অহংকার অহংকৃতের দানগ্রহণে কুণ্ঠিত সে নিন্দনীয় নয়।

এই জন্যেই মানুষকে সাম্প্রদায়িক খৃস্টানের হাত থেকে খৃস্টকে, সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবের হাত থেকে বিষ্ণুকে, সাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মের হাত থেকে ব্রহ্মকে উদ্ধার করে নেবার জন্যে বিশেষ ভাবে সাধনা করতে হয়।

আমাদের আশ্রমে আমরা সম্প্রদায়ের উপর রাগ করে সত্যের সঙ্গে বিরোধ করব না। আমরা খৃস্টধর্মের মর্মকথা গ্রহণ করবার চেষ্টা করব— খৃস্টানের জিনিস বলে নয়; মানবের জিনিস বলে।

বেদে ঈশ্বরের একটি নাম 'আবিঃ'; অর্থাৎ, আবির্ভাবই তাঁর স্বভাব, সৃষ্টিতে তিনি আপনাকে প্রকাশ করছেন সেই তাঁর ধর্ম। ভারতবর্ষের ঋষিরা দেখেছেন, জলে স্থলে শূন্যে সেই তাঁর নিরন্তর আনন্দধারা।

বদ্ধ ঘরে কেরোসিন জ্বলছে, সমস্ত রাত সেখানে অনেকে মিলে ঘুমোচ্ছে, দূষিত বাষ্পে ঘর ভরা— তখন যদি দরজা জানলা খুলে দিয়ে বদ্ধ-আকাশকে অসীম-আকাশের সঙ্গে যুক্ত করা যায় তা হলে সমস্ত সঞ্চিত তাপ এবং গ্লানি তখনি দূর হয়ে যায়। তেমনি আপনার বদ্ধ চিত্তকে ভূলোক ভুবর্লোক স্বর্লোকে পরম চৈতন্যের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করে দিলেই তার চারি দিকের পাপসঞ্চয় সহজেই বিলীন হয়— এই মুক্তির সাধনা ভারতবর্ষের।

ভারতবর্ষ যেমন ব্রহ্মের প্রকাশকে সর্বত্র উপলব্ধি করে আপন চৈতন্যকে সর্বত্র ব্যাপ্ত করবার সাধনা করেছে, তেমনি ঈশ্বরের যে প্রকাশ মানবে সেইটির মধ্যে বিশেষভাবে আপন অনুভূতি প্রীতি ও চেষ্টাকে ব্যাপ্ত করার প্রতি খৃস্টধর্মের লক্ষ্য।

বিশ্বে তাঁর প্রকাশ সরল, কিন্তু মানুষের মধ্যে প্রকাশে বিরোধ আছে। কারণ, সেখানে ইচ্ছার মধ্যে ইচ্ছার প্রকাশ। যতক্ষণ না প্রেম জাগে ততক্ষণ এই ইচ্ছা পরম-ইচ্ছাকে বাধা দিতে থাকে।

অভাব হতে জীব দুঃখ পায়, কিন্তু এই বিরোধ হতে মানুষের অকল্যাণ। দুঃখ পশুও পায়, কিন্তু এই অকল্যাণ বিশেষ ভাবে মানুষের। যে অংশে মানুষ পশু সে অংশে অভাবের দুঃখ তাকে কষ্ট দেয়, যে অংশে মানুষ মানুষ সে অংশে অকল্যাণের আঘাত তার অন্য সকল আঘাতের চেয়ে বেশি। তাই মানুষের পশু-

অংশ বলে, 'সঞ্চয় করে করে আমি অভাবের দুঃখ দূর করব'; মানুষের মানুষ-অংশ বলে, 'ত্যাগ করে করে আমার ক্ষুদ্র ইচ্ছাকে পরম ইচ্ছায় উৎসর্গ করব—বাসনাকে দগ্ধ করে প্রেমে সমুজ্জ্বল করে তুলব। সেই প্রেমেই আমার মধ্যে পরম-ইচ্ছার পূর্ণ প্রকাশ।'

সকল দুঃখের চেয়ে বড়ো দুঃখ মানুষের এই যে, তার বড়ো তার ছোটোর দ্বারা নিত্য পীড়া পাচ্ছে। এই তার পাপ। সে আপনার মধ্যে আপনার সেই বড়োকে প্রকাশ করতে পাচ্ছে না, সেই বাধাই তার কলুষ।

অন্নবস্ত্রের ক্লেশ সহ্য করা সহজ। কিন্তু আপনার ভিতরে আপনার সেই বড়ো কষ্ট পাচ্ছেন প্রকাশের অভাবে, এ কি মানুষ সইতে পারে? মানুষের ইতিহাসে এত যুদ্ধ কেন? কিসের খেদে উন্মত্ত হয়ে মানুষ আপন শতবৎসরের পুরাতন ব্যবস্থাকে ধূলিসাৎ করে দিয়ে আবার নূতন সৃষ্টিতে প্রবৃত্ত হয়? তার কান্না এই যে, আমার ছোটো আমার বড়োকে ঠেকিয়ে রাখছে।

এই ব্যথা যখন মানুষের মধ্যে এত সত্য তখন নিশ্চয়ই তার ঔষধ আছে। সে ঔষধ কোনো স্নানে পানে, বাহ্যিক কোনো আচারে অনুষ্ঠানে নয়। মানুষের মধ্যে ভূমার প্রকাশ যে কেমন করে বাধাহীন হতে পারে, যাঁরা মহামানুষ তাঁরা আপন জীবনের মধ্যে দিয়ে তাই দেখিয়ে দিয়ে গেছেন।

তাঁরা এই একটি আশ্চর্য ব্যাপার দেখিয়েছেন যে, মানুষ আপনার চেয়ে আপনি বড়ো; সেইজন্যে মানুষ মৃত্যুকে দুঃখকে ক্ষতিকে অগ্রাহ্য করতে পারে। এ যদি ক্ষণে ক্ষণে নিদারুণ স্পষ্টরূপে দেখতে না পেতুম তা হলে ক্ষুদ্র মানুষের মধ্যে যে বিরাট রয়েছেন এ কথা বিশ্বাস করতুম কেমন করে?

মানুষের সেই বড়োর সঙ্গে মানুষের ছোটোর নিয়ত সংঘাতে যে দুঃখ জন্মাচ্ছে সেই দুঃখ পান করছেন কে? সেই বড়ো, সেই শিব। রাগ কাকে মারছে? চিরদিন ক্ষমা যে করে তার উপরেই সমস্ত মার গিয়ে পড়ছে। লোভ কার ধন হরণ করছে? যে কেবলই ক্ষতিস্বীকার করে এবং চোরাই মাল ফিরে আসবে বলে ধৈর্যের সঙ্গে অপেক্ষা করতে থাকে। পাপ কাকে কাঁদাতে চায়? যার প্রেমের অবধি নেই, পাপ যে তাকেই কাঁদাচ্ছে।

এ যে আমরা চারি দিকে প্রত্যক্ষ দেখি। দুর্বৃত্ত সন্তান অন্য সকলকে যে আঘাত দেয় সেই আঘাতে আপন মাকেই সকলের চেয়ে ব্যথিত করে, তাই তো দুষ্প্রবৃত্তির পাপ এতই বিষম। অকল্যাণের দুঃখ জগতের সকল দুঃখের বাড়া; কেননা, সেই দুঃখে যিনি কাঁদছেন তিনি যে বড়ো, তিনি যে প্রেম। খৃস্টধর্ম জানাচ্ছে, সেই পরমব্যথিতই মানুষের ভিতরকার ভগবান।

এই কথাটা বিশেষ কোনো ঐতিহাসিক কাহিনীর সঙ্গে জড়িয়ে বিশেষ দেশকাল-পাত্রের মধ্যে ক্ষুদ্র করে দেখলে সত্যকে তার আপন গৃহ থেকে নির্বাসিত করে কারাশৃঙ্খলে বেঁধে মারবার চেষ্টা করা হবে।

আসল সত্য এই যে, আমার মধ্যে যিনি বড়ো, যিনি আমার হাতে চিরদিন দুঃখ পেয়ে আসছেন, তিনি বলছেন, 'জগতের সমস্ত পাপ আমাকেই মারে, কিন্তু আমাকে মারতে পারে না। আজ পর্যন্ত সব চেয়ে বড়ো চোর কি সব ধন হরণ করতে পেরেছে? মানুষের পরম সম্পদের কি ক্ষয় হল? বিশ্বাসঘাতক আছে, কিন্তু সংসারে বিশ্বাস মরে নি। হিংসক আছে, কিন্তু ক্ষমাকে সে মারতে পারলে না।'

সেই বড়ো যিনি, তিনি তাঁর বেদনায় অমর। কিন্তু সেই ব্যথাই যদি চরম সত্য হত তা হলে কি রক্ষা ছিল? বড়োর মধ্যে আনন্দের অমৃত আছে বলেই তো

বেদনা সহ্য হল। ছোটো কি লেশমাত্র ব্যথা সইতে পারে? সে কি তিলমাত্র কিছু ছাড়তে পারে? কেন পারে না? তার আছে কী যে পারবে? তার প্রেম কোথায়, আনন্দ কোথায়?

আমরা তো ভারে ভারে কলুষ এনে জমাচ্ছি। যে বড়ো সে ক্রমাগত তাই ক্ষালন করছে—আপন রক্ত দিয়ে, দুঃখ দিয়ে, অশ্রু দিয়ে। প্রতিদিন এই হচ্ছে ঘরে ঘরে। বড়ো বলছেন, 'আমায় মারো, মারো, মারো! তোমার মার আমি ছাড়া আর কেউ সইবে না।' তখন আমরা কেঁদে বলছি, 'তোমাকে আর মারব না—তুমি যে আমার চেয়ে বেশি। তোমার প্রকাশে ধুলো দিয়েছি—অশ্রুজলে সব ধোব। আজ হতে বসলুম তোমার আসনে, তোমার দুঃখ আমি বইব। তুমি নাও, নাও, নাও, আমার সব নাও। তুমি ভালোবেসেছ, আমিও বাসব।' এমনি করে তবে বিরোধ মেটে। তিনি যখন শাস্তি নেন তখন সেই শাস্তির দারুণ দুঃখ আর সহ্য হয় না, তবেই তো পাপের মূল মরে; নরকদণ্ডে তো মরে না।

যিনি বড়ো তিনি যে প্রেমিক। ছোটোকে নিয়ে তাঁর প্রেমের সাধ্যসাধনা। আকাশের আলো দিয়ে, পৃথিবীর লক্ষ্মীশ্রী দিয়ে, মানুষের প্রেমের সম্বন্ধের মধ্য দিয়ে তিনি আমাকে সাধছেন। আপনার সেই বড়োটিকে দেখে মন মুগ্ধ হয়েছে বলেই কবি কবিতা লিখেছে, শিল্পী কারু রচনা করেছে, কর্মী কর্মে আপনাকে ঢেলে দিয়েছে। মানুষের সকল রচনা এই বলেছে—'তোমার মতো এমন সুন্দর আর দেখলুম না। ক্ষুধা লোভ কাম ক্রোধ এ-যে সব কালো—কিন্তু তুমি কী সুন্দর, কী পবিত্র তুমি, তুমি আমার।'

মানুষের মধ্যে মানুষের এই-যে বড়োর আবির্ভাব; যিনি মানুষের হাতের সমস্ত আঘাত সহ্য করছেন এবং যাঁর সেই বেদনা মানুষের পাপের একেবারে মূলে গিয়ে বাজছে—এই আবির্ভাব তো ইতিহাসের বিশেষ কোনো একটি প্রান্তে নয়। সেই মানুষের দেবতা মানুষের অন্তরেই—তাঁরই সঙ্গে বিরোধেই মানুষের পাপ, তাঁরই সঙ্গে যোগেই মানুষের পাপের নিবৃত্তি। মানুষের সেই বড়ো, নিয়ত আপনার প্রাণ উৎসর্গ করে মানুষের ছোটোকে প্রাণদান করছেন।

রূপকের আকারে এই সত্য খৃস্টধর্মে প্রকাশ হচ্ছে।

শান্তিনিকেতন
২৫ ডিসেম্বর ১৯১৪

খৃস্টোৎসব

তাই তোমার আনন্দ আমার 'পর, তুমি তাই এসেছ নীচে।
আমায় নইলে, ত্রিভুবনেশ্বর তোমার প্রেম হত যে মিছে।

দুইয়ের মধ্যে একের যে প্রকাশ তাই হল যথার্থ সৃষ্টির প্রকাশ। নানা বিরোধে যেখানে এক বিরাজমান সেখানেই মিলন, সেখানেই এককে যথার্থভাবে উপলব্ধি করা যায়। আমাদের দেশের শাস্ত্রে তাই, এক ছাড়া দুইকে মানতে চায় নি। কারণ, দুইয়ের মধ্যে একের যে ভেদ তার অবকাশকে পূর্ণ করে দেখলেই এককে যথার্থভাবে পাওয়া যায়। এইটিই হচ্ছে সৃষ্টির লীলা। উপরের সঙ্গে নিচের যে মিলন,

বিশ্বকর্মার কর্মের সঙ্গে ক্ষুদ্র আমাদের কর্মের যে মিলন, বিশ্বে নিরন্তর তারই লীলা চলছে। তার দ্বারা সব পূর্ণ হয়ে রয়েছে।

যাঁরা বিচ্ছেদের মধ্যে সত্যের এই অখণ্ড রূপকে এনে দেন তাঁরা জীবনে নিয়ত আনন্দবার্তা বহন করে এনেছেন। ইতিহাসে এই-সকল মহাপুরুষ বলেছেন যে, কোনোখানে ফাঁক নেই, প্রেমের ক্রিয়া নিত্য চলেছে। মানুষের মনের দ্বার উদ্ঘাটিত যদি না'ও হয় তবু এই প্রক্রিয়ার বিরাম নেই। তার অস্ফুট চিত্তকমলের উপর আলোকপাত হয়েছে, তাকে উদ্‌বোধিত করবার প্রয়াসের বিশ্রাম নেই। মানুষ জানুক বা নাই জানুক, সমস্ত আকাশ ব্যাপ্ত করে সেই অস্ফুট কুঁড়িটির বিকাশের জন্যে আলোকের মধ্যেও প্রেমের প্রতীক্ষা আছে।

তেমনি ভাবে এক মহাপুরুষ বিশেষ করে তাঁর জীবন দিয়ে এই কথা বলেছিলেন যে, লোকলোকান্তরে যিনি তাঁর অভ্রচুম্বিত আলোকমালার প্রাসাদ সৃষ্টি করেছেন সেই বিচিত্র বিশ্বের অধিপতিই আমার পিতা, আমার কোনো ভয় নেই। এই বিরাট আকাশের তলে যাঁর প্রতাপে পৃথিবী ঘূর্ণ্যমান হচ্ছে তাঁর শক্তির অন্ত নেই, তা অতিপ্রচণ্ড—তার তুলনায় আমরা মানুষ কত নগণ্য সামান্য জীব। কিন্তু আমাদের ভয় নেই; এই-সকলের অন্তর্যামী-নিয়ন্তা আমারই পরম আত্মীয়, আমারই পিতা। বিশ্বের মূলে এই পরম সম্বন্ধ যা শূন্যকে পূর্ণতা দান করছে, মৃত্যুশোকের উপর আনন্দধারা প্রবাহিত করছে, সেই মধুর সম্বন্ধটি আজ আমাদের অন্তরে অনুভব করতে হবে। আমাদের পরম পিতা যিনি তিনি বলছেন যে, 'ভয় নেই, সূর্যচন্দ্রের মধ্যে আমার অখণ্ড রাজত্ব, আমার অমোঘ নিয়ম অলঙ্ঘ্য, কিন্তু তুমি যে আমারই, তোমাকে আমার চাই।' যুগে যুগে এই মাভৈঃ বাণী যাঁরা পৃথিবীতে আনয়ন করেন তাঁরা আমাদের প্রণম্য।

এমনি করেই একজন মানবসন্তান একদিন বলেছিলেন যে, আমরা সকলে বিশ্বপিতার সন্তান, আমাদের অন্তরে যে প্রেমের পিপাসা আছে তা তাঁকে স্পর্শ করেছে। এ কথা হতেই পারে না যে, আমাদের বেদনা-আকাঙ্ক্ষার কোনো লক্ষ্য নেই, কারণ তিনি সত্যই আমাদের পরমসখা হয়ে তাঁর সাড়া দিয়ে থাকেন। তাই সাহস করে মানুষ তাঁকে আনন্দদায়িনী মা, মানবাত্মার কল্যাণবিধায়ক পিতারূপে জেনেছে। মানুষ যেখানে বিশ্বকে কেবল বাহিরের নিয়মযন্ত্রের অধীন বলে জানছে সেখানে সে কেবলই আপনাকে দুর্বল অশক্ত করছে, কিন্তু যেখানে সে প্রেমের বলে সমস্ত বিশ্বলোকে আত্মীয়তার অধিকার বিস্তার করেছে সেখানেই সে যথার্থ ভাবে আপনার স্বরূপকে উপলব্ধি করেছে।

এই বার্তা ঘোষণা করতে এক দিন মহাত্মা যিশু লোকালয়ের দ্বারে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। তিনি তো অস্ত্রে শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে যোদ্ধৃবেশে আসেন নি, তিনি তো বাহুবলের পরিচয় দেন নি—তিনি ছিন্নচীর পরে পথে পথে ঘুরেছিলেন। তিনি সম্পদবান্ ও প্রতাপশালীদের কাছ থেকে আঘাত অপমান প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তিনি যে বার্তা নিয়ে এসেছিলেন তার বদলে বাইরের কোনো মজুরি পান নি, কিন্তু তিনি পিতার আশীর্বাদ বহন করেছিলেন। তিনি নিষ্কিঞ্চন হয়ে দ্বারে দ্বারে এই বার্তা বহন করে এনেছিলেন যে, ধনের উপর আশ্রয় করলে চলবে না, পরম আশ্রয় যিনি তিনি বিশ্বকে পূর্ণ করে রয়েছেন। তিনি দেশ কাল পূর্ণ করে বিরাজমান। তিনি 'পরম-আনন্দঃ পরমাগতিঃ' এই কথা উপলব্ধি করবার জন্য যে ত্যাগের দরকার যারা তা শেখে নি তারা মৃত্যুর ভয়ে, ক্ষতির ভয়ে, প্রাণকে বুকে করে নিয়ে ফিরেছে—অন্তরের ভয় লোভ মোহের দ্বারা শ্রদ্ধাহীনতা প্রকাশ

করেছে। এই মহাপুরুষ তাই আপনার জীবনে ত্যাগের দ্বারা মৃত্যুর দ্বারে উপস্থিত হয়ে মানুষের কাছে এই বাণী এনে দিয়েছিলেন। তাই তিনি মানবাত্মার পরম পথকে উন্মুক্ত করবার জন্য এক দিন দরিদ্র বেশে পথে বার হয়েছিলেন। যে-সব সরল প্রকৃতির মানুষ তাঁর অনুগমন করেছিল তারা সম্পূর্ণরূপে তাঁর বাণীর মর্ম বুঝতে পারে নি। তারা কিসের স্পর্শ পেয়েছিল জানি নে, কিন্তু ভক্তিভরে তাদের মাথা অবনত হয়ে গিয়েছিল। তাদের মাথা নিচুই ছিল—কারণ তাদের পরিচয় নাম ধাম কেউ জানত না, তারা সামান্য ধীবর ছিল। তারা যিশুর বাণীর প্রেরণা অনুভব করেছিল, একটি অব্যক্ত মধুর রসে তাদের অন্তর আপ্লুত হয়েছিল। এমনি করে যাদের কিছু নেই তারা পেয়ে গেল। কিন্তু যারা গর্বিত তারা এই পরমা বার্তাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল।

এই মহাত্মার বাণী যে তাঁর ধর্মাবলম্বীরাই গ্রহণ করেছিল তা নয়। তারা বারে বারে ইতিহাসে তাঁর বাণীর অবমাননা করেছে, রক্তের চিহ্নের দ্বারা ধরাতল রঞ্জিত করে দিয়েছে—তারা যিশুকে এক বার নয়, বার-বার ক্রুশেতে বিদ্ধ করেছে। সেই খৃস্টান নাস্তিকদের অবিশ্বাস থেকে যিশুকে বিচ্ছিন্ন করে তাঁকে আপন শ্রদ্ধার দ্বারা দেখলেই যথার্থ ভাবে সম্মান করা হবে। খৃস্টের আত্মা তাই আজ চেয়ে আছে। বড়ো বড়ো গির্জায় তাঁর বাণী প্রচারিত হবে বলে তিনি পথে পথে ফেরেন নি, কিন্তু যার অন্তরে ভক্তিরস বিশুষ্ক হয়ে যায় নি তারই কাছে তিনি তাঁর সমস্ত প্রত্যাশা নিয়ে একদিন উপনীত হয়েছিলেন। তিনি সেদিনকার কালের সব চেয়ে অখ্যাত দরিদ্র অভাজনদের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে বিশ্বের অধিপতিকে বলেছিলেন যে 'পিতা নোঽসি'—তুমি আমাদের পিতা।

মানুষ জীবন ও মৃত্যুকে বিচ্ছিন্ন করে দেখে, এই দুইয়ের মধ্যে সে একের মিল দেখে না। যেমন তার দেহে পিঠের দিকে চোখ নেই বলে কেবল সামনেরই অঙ্গকে মেনে নেওয়া বিষম ভুল, তেমনি জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে আপাত-অনৈক্যকেই সত্য বলে জানলে জীবনকে খণ্ডিত করে দেখা হয়। এই মিথ্যা মায়া থেকে যারা মুক্তিলাভ করে অমৃতকে সর্বত্র দেখেছেন তাঁদের আমরা প্রণাম করি। তাঁরা মৃত্যুর দ্বারা অমৃতকে লাভ করেছেন, এই মর্ত্যলোকেই অমরাবতী সৃজন করেছেন। অমর ধামের তেমন এক যাত্রী একদিন পৃথিবীতে অমর লোকের বাণী নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন, সেই কথা স্মরণ করে আমরাও যেন মৃত্যুর তমোরাশির উপর অমৃত আলোর সম্পাত দেখতে পাই। রাত্রিতে সূর্য অস্তমিত হলে মূঢ় যে সে ভাবে যে, আলো বুঝি নির্বাপিত হল, সৃষ্টি লোপ পেল। এমন সময় সে অন্তরীক্ষে চেয়ে দেখে যে সূর্য অপসারিত হলে লোকলোকান্তরের জ্যোতির্ধাম উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে— মহারাজার এক দরবার ছেড়ে আর-এক দরবারে আলোর সংগীত ধ্বনিত হচ্ছে। সেই সংগীতে আমাদেরও নিমন্ত্রণ বেজে উঠেছে। মহা আলোকের মিলনে যেন আমরা পূর্ণ করে দেখি। জীবন ও মৃত্যুর মাঝখানকার এই অখণ্ড যোগসূত্র যেন আমরা না হারাই। যে মহাপুরুষ তাঁর জীবনের মধ্যেই অমৃতলোকের পরিচয় দিয়েছিলেন, তাঁর মৃত্যুর দ্বারা অমৃতরূপ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল, আজ তাঁর মৃত্যুর অন্তর্নিহিত সেই পরম সত্যটিকে যেন আমরা স্পষ্ট আকারে দেখতে পাই।

শান্তিনিকেতন
২৫ ডিসেম্বর ১৯২৩

মানবসম্বন্ধের দেবতা

এই সংসারে একটা জিনিস অস্বীকার করতে পারি নে যে, আমরা বিধানের বন্ধনে আবদ্ধ। আমাদের জীবন, আমাদের অস্তিত্ব বিশ্বনিয়মের দ্বারা দৃঢ়ভাবে নিয়ন্ত্রিত। এ-সমস্ত নিয়মকে সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করতেই হবে, নইলে নিষ্কৃতি নেই। নিয়মকে যে পরিমাণে জানি ও মানি সেই পরিমাণেই স্বাস্থ্য পাই, সম্পদ পাই, ঐশ্বর্য পাই। কিন্তু জীবনে একটা সত্য আছে যা এই নিয়মের মধ্যে আপনাকে দেখতে পায় না। কেননা, নিয়মের মধ্যে পাই বন্ধন, আত্মার মধ্যে চাই সম্বন্ধকে। বন্ধন এক-তরফা, সম্বন্ধে দুই পক্ষের সমান যোগ। যদি বলি বিশ্বব্যাপারে আমার আত্মার কোনো অসীম সম্বন্ধের ক্ষেত্র নেই, শুধু কতকগুলি বাহ্যসম্পর্কসূত্রেই সে ক্ষণকালের জন্য জড়িত— তা হলে জানব তার মধ্যে যে-একটি গভীর ধর্ম আছে নিখিলের মধ্যে তার কোনো নিত্যকালীন সাড়া নেই। কেননা, তার মধ্যে যা আছে তা কেবল সত্তার নিয়ম নয়, সত্তার আনন্দ। এই-যে তার আনন্দ এ কি কেবল সংকীর্ণভাবে তারই মধ্যে? অসীমের মধ্যে কোথাও তার প্রতিষ্ঠা নেই? এর সত্যটা তা হলে কোন্‌খানে? সত্যকে আমরা একের মধ্যে খুঁজি। হাত থেকে লাঠি পড়ে গেল, গাছ থেকে ফল পড়ল, পাহাড়ের উপর থেকে ঝরনা নিচে নেমে এল, এ-সমস্ত ঘটনাকে যেই এক তত্ত্বের মধ্যে দেখতে পেলে অমনি মানুষের মন বললে ‘সত্যকে দেখেছি’। যতক্ষণ এই ঘটনাগুলি আমাদের কাছে বিচ্ছিন্ন ততক্ষণ আমাদের কাছে তারা নিরর্থক। তাই বৈজ্ঞানিক বলেন, তথ্যগুলি বহু, কিন্তু তারা সত্য হয়েছে অবিচ্ছিন্ন ঐক্যে।

এই তো গেল বস্তুরাজ্যের নিয়মক্ষেত্র, কিন্তু অধ্যাত্মরাজ্যের আনন্দক্ষেত্রে কি এই ঐক্যতত্ত্বের কোনো স্থান নেই?

আমরা আনন্দ পাই বন্ধুতে, সন্তানে, প্রকৃতির সৌন্দর্যে। এগুলি ঘটনার দিক থেকে বহু, কিন্তু কোনো অসীম সত্যে কি এদের চরম ঐক্য নেই? এ প্রশ্নের উত্তর বৈজ্ঞানিক দেন না, দেন সাধক। তিনি বলেন, ‘বেদাহমেতম্, আমি যে এঁকে দেখেছি, রসো বৈ সঃ, তিনি যে রসের স্বরূপ— তিনি যে পরিপূর্ণ আনন্দ।’ নিয়মের বিধাতাকে তো পদে পদেই দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু ঋষি যাঁকে বলছেন ‘স নো বন্ধুর্জনিতা’, কে সেই বন্ধু, কে সেই পিতা? যিনি সত্যদ্রষ্টা তিনি ‘হৃদা মনীষা মনসা’ সকল বন্ধুর ভিতর দিয়ে সেই এক বন্ধুকে, সকল পিতার মধ্য দিয়ে সেই এক পিতাকে দেখছেন। বৈজ্ঞানিকের উত্তরে প্রশ্নের যেটুকু বাকি থাকে তার উত্তর তিনিই দেন। তখন আত্মা বলে, ‘আমার জগৎকে পেলুম, আমি বাঁচলুম।’ আমাদের অন্তরাত্মার এই প্রশ্নের উত্তর যাঁরা দিয়েছেন তাঁদেরই মধ্যে একজনের নাম যিশুখৃস্ট। তিনি বলেছেন, ‘আমি পুত্র, পুত্রের মধ্যেই পিতার আবির্ভাব।’ পুত্রের সঙ্গে পিতার শুধু কার্যকারণের যোগ নয়, পুত্রে পিতারই আত্মস্বরূপের প্রকাশ। খৃস্ট বলেছেন ‘আমাতে তিনিই আছেন’, প্রেমিক-প্রেমিকা যেমন বলতে পারে ‘আমাদের মধ্যে কোনো ফাঁক নেই’। অন্তরের সম্বন্ধ যেখানে নিবিড়, বিশুদ্ধ, সেখানেই এমন কথা বলতে পারা যায়; সেখানেই মহাসাধক বলেন, ‘পিতাতে আমাতে একাত্মতা।’ এ কথাটি নূতন না হতে পারে, এ বাণী হয়তো আরও অনেকে বলেছেন। কিন্তু যে বাণী সফল হল জীবনের ক্ষেত্রে, নানা ফল ফলালো, তাকে নমস্কার করি। খৃস্ট বলেছিলেন, ‘আমার মধ্যে আমার পিতারই

প্রকাশ।' এই ভাবের কথা ভারতবর্ষেও উচ্চারিত হয়েছে, কিন্তু সেটি শাস্ত্রবচনের সীমানা উত্তীর্ণ হয়ে প্রাণের সীমায় যতক্ষণ না পৌঁছয় ততক্ষণ সে কথা বন্ধ্যা। যতই বড়ো ভাষায় তাকে স্বীকার করি ব্যবহারের দৈন্যে তাকে ততই বড়ো আকারে অপমানিত করি। খৃস্টান সম্প্রদায় পদে পদে তা করে থাকেন। কথার বেলায় যাকে তারা বলে 'প্রভু', সেবার বেলায় তাকে দেয় ফাঁকি। সত্য কথার দাম দিতে হয় সত্য সেবাতেই। যদি সেই দিকেই দৃষ্টি রাখি তবে বলতে হয় যে, খৃস্টের জন্ম ব্যর্থ হয়েছে; বলতে হয়, ফুল ফুটেছে সুন্দর, তার মাধুর্য উপভোগ করেছি, কিন্তু পরিণামে তাতে ফল ধরল না। এ দিকে চোখে দেখেছি বটে হিংসা রিপুর প্রাবল্য খৃস্টীয় সমাজে। তৎসত্ত্বেও মানুষের প্রতি প্রেম, লোকহিতের জন্য আত্মত্যাগ খৃস্টীয় সমাজের সাফল্য দেখিয়েছে—এ কথাটি সাম্প্রদায়িকতার মোহে পড়ে যদি না মানি তবে সত্যকেই অস্বীকার করা হবে। খৃস্টানের ধর্মবুদ্ধি প্রতিদিন বলছে— মানুষের মধ্যে ভগবানের সেবা করো, তাঁর নৈবেদ্য নিরন্নের অন্নথালিতে, বস্ত্রহীনের দেহে। এই কথাটিই খৃস্টধর্মের বড়ো কথা। খৃস্টানরা বিশ্বাস করেন—খৃস্ট আপন মানবজন্মের মধ্যে ভগবান ও মানবের একাত্মতা প্রতিপন্ন করেছেন।

ধনী তাঁর গ্রামের লোকের জলাভাবকে উপেক্ষা করে পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা দিলেন পুত্রের অন্নপ্রাশনে দেবমন্দিরে দেবপ্রতিমার গলায় রত্নহার পরাতে। এই কথাটি তাঁর হৃদয়ে পৌঁছয় নি যে, যেখানে সূর্যের তেজ সেখানে দীপশিখা আনা মূঢ়তা, যেখানে গভীর সমুদ্র সেখানে জলগণ্ডূষ দেওয়া বালকোচিত। অথচ মানুষের তৃষ্ণার মধ্য দিয়ে ভগবান যে জল চাইছেন সে চাওয়া অতি স্পষ্ট, অতি তীব্র: সেই চাওয়ার প্রতি বধির হয়ে এরা দেবালয়ে রত্নালংকারের জোগান দেয়।

পুত্রের মধ্যে পিতাকে বিড়ম্বিত করে দানের দ্বারা তাঁকে ভোলাবার চেষ্টায় মানুষ তাঁকে দ্বিগুণ অপমানিত করতে থাকে। দেখেছি ধনী মহিলা পাণ্ডার দুই পা সোনার মোহর দিয়ে ঢাকা দিয়ে মনে করেছে স্বর্গে পৌঁছবার পুরো মাশুল চুকিয়ে দেওয়া হল; অথচ সেই মোহরের জন্য দেবতা যেখানে কাঙাল হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন সেই মানুষের প্রতি দৃষ্টিই পড়ল না।

আজ প্রাতে আমাদের আশ্রমবন্ধু অ্যান্‌ড্রুজের চিঠি পেলুম। তিনি যে কাজ করতে গেছেন সে তাঁর আত্মীয়স্বজনের কাজ নয়, বরং তাদের প্রতিকূল। বাহ্যত যারা তাঁর অনাত্মীয়, যারা তাঁর স্বজাতীয় নয়, তাদের জন্য তিনি কঠিন দুঃখ সইছেন, স্বজাতীয়দের বিরুদ্ধে প্রবল সংগ্রাম করে দুঃখপীড়া পাচ্ছেন। এবার সেখানে যাবা মাত্র তিনি দেখলেন বসন্তমারীতে বহু ভারতীয় পীড়িত, মৃত্যুগ্রস্ত; তাঁর কাজ হল তাদের সেবা করা। মারীর মধ্যে ভারতীয় বণিক্‌দের এই যে তিনি সেবা করেছেন, এতে কিসে তাঁকে বল দিয়েছে? মানবসন্তানের সেবায় বিশ্বপিতার সেবার উপদেশ খৃস্টানদেশের মধ্যে এতকাল ধরে এত গভীররূপে প্রবেশ করেছে যে সেখানে আজ যাঁরা নিজেকে নাস্তিক বলে প্রচার করেন তাঁদেরও নাড়ির রক্তে এই বাণী বহমান। তাঁরাও মানুষের জন্য প্রাণান্তকর দুঃখ স্বীকার করাকে আপন ধর্ম বলে প্রমাণ করেছেন। এ ফল কোন্‌ বৃক্ষে ফলল? কে এতে রসসঞ্চার করে? এ প্রশ্নের উত্তরে এ কথা অস্বীকার করতে পারি নে যে, সে খৃস্টধর্ম।

লক্ষ্যে অলক্ষ্যে বিবিধ আকারে এই ধর্ম পশ্চিম মহাদেশে কাজ করছে। যাকে সেখানকার লোকে হিউম্যান ইণ্টরেস্‌ট্‌ অর্থাৎ মানবের প্রতি ঔৎসুক্য বলে তা

জ্ঞানবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ইউরোপে যেমন জাগরূক তেমন আর কোথাও দেখি নি। সে দেশে সর্বত্রই মানুষকে সেখানকার লোকে সম্পূর্ণরূপে চেনবার জন্য তথ্য অন্বেষণ করে বেড়াচ্ছে। যারা নরমাংস খায় তাদেরও মধ্যে গিয়ে জিজ্ঞাসা করেছে, 'তুমি মানুষ, তুমি কী কর, তুমি কী ভাব?' আর আমরা? আমাদের পাশের লোকেরও খবর নিই নে। তাদের সম্বন্ধে না আছে কৌতূহল, না আছে শ্রদ্ধা। উপেক্ষা ও অবজ্ঞার কুহেলিকায় আচ্ছন্ন করে দিয়ে অধিকাংশ প্রতিবেশীর সম্বন্ধে অজ্ঞান হয়ে আছি। কেন এমন হয়? মানুষকে যথোচিত মূল্য দিই নে বলেই আজকের দিনে আমাদের এই দুর্দশা। খৃস্ট বাঁচিয়েছেন পৃথিবীর অনেককে, বাঁচিয়েছেন মানুষের ঔদাসীন্য থেকে মানুষকে। আজকে যারা তাঁর নাম নেয় না, তাঁকে অপমান করতেও কুণ্ঠিত হয় না, তারাও তাঁর সে বাণীকে কোনো-না-কোনো আকারে গ্রহণ করেছে।

মানুষ যে বহুমূল্য, তার সেবাতেই যে ভগবানের সেবা সার্থক, এই কথা ইউরোপ যেখানে মানে নি সেখানেই সে মার খেয়েছে। এ কথার মূল্য যে পরিমাণে ইউরোপ দিয়েছে সেই পরিমাণেই সে উন্নত হয়েছে। মানুষের প্রতি খৃস্টধর্ম যে অসীম শ্রদ্ধা জাগরূক করেছে আমরা যেন নিরভিমানচিত্তে তাকে গ্রহণ করি এবং যে মহাপুরুষ সে সত্যের প্রচার করেছিলেন তাঁকে প্রণাম করি।

শান্তিনিকেতন
২৫ ডিসেম্বর ১৯২৬

বড়োদিন

যাঁকে আমরা পরম মানব বলে স্বীকার করি তাঁর জন্ম ঐতিহাসিক নয়, আধ্যাত্মিক। প্রভাতের আলো সদ্য-প্রভাতের নয়, সে চিরপ্রভাতের। আমরা যখনই তাকে দেখি তখনই সে নূতন, কিন্তু তবু সে চিরন্তন। নব নব জাগরণের মধ্যে দিয়ে সে প্রকাশ করে অনাদি আলোককে। জ্যোতির্বিদ্ জানেন নক্ষত্রের আলো যেদিন আমাদের চোখে এসে পৌঁছয় তার বহু যুগ পূর্বেই সে যাত্রা করেছে। তেমনি সত্যের দূতকে যেদিন আমরা দেখতে পাই সেইদিন থেকেই তাঁর বয়সের আরম্ভ নয়—সত্যের প্রেরণা রয়েছে মহাকালের অন্তরে। কোনো কালে অন্ত নেই তাঁর আগমনের এই কথা যেন জানতে পারি।

বিশেষ দিনে বিশেষ পূজা-অনুষ্ঠান করে যাঁরা নরোত্তম তাঁদের শ্রদ্ধা জানানো সুলভে মূল্য চুকিয়ে দেওয়া। তিন শত চৌষট্টি দিন অস্বীকার করে তিন-শত-পঁয়ষট্টি-তম দিনে তাঁর স্তব দ্বারা আমরা নিজের জড়ত্বকে সান্ত্বনা দিই। সত্যের সাধনা এ নয়, দায়িত্বকে অস্বীকার করা মাত্র। এমনি করে মানুষ নিজেকে ভোলায়। নামগ্রহণের দ্বারা কর্তব্য রক্ষা করি, সত্যগ্রহণের দুরূহ অধ্যবসায় পিছনে পড়ে যায়। কর্মের মধ্যে তাঁকে স্বীকার করলেম না, স্তবের মধ্যে সহজ নৈবেদ্য দিয়েই খালাস। যাঁরা এলেন বাহ্যিকতা থেকে আমাদের মুক্তি দিতে তাঁদেরকে বন্দী করলেম বাহ্যিক অনুষ্ঠানের পুনরাবৃত্তির মধ্যে।

আজ আমি লজ্জা বোধ করেছি এমন করে এক দিনের জন্যে আনুষ্ঠানিক কর্তব্য সমাধা করবার কাজে আহূত হয়ে। জীবন দিয়ে যাঁকে অঙ্গীকার করাই সত্য, কথা দিয়ে তাঁর প্রাপ্য চুকিয়ে দেওয়া নিরতিশয় ব্যর্থতা।

আজ তাঁর জন্মদিন এ কথা বলব কি পঞ্জিকার তিথি মিলিয়ে? অন্তরে যে দিন ধরা পড়ে না সে দিনের উপলব্ধি কি কালগণনায়? যেদিন সত্যের নামে ত্যাগ করেছি, যেদিন অকৃত্রিম প্রেমে মানুষকে ভাই বলতে পেরেছি, সেইদিনই পিতার পুত্র আমাদের জীবনে জন্মগ্রহণ করেছেন, সেইদিনই বড়োদিন—যে তারিখেই আসুক। আমাদের জীবনে তাঁর জন্মদিন দৈবাৎ আসে, কিন্তু ক্রুশে বিদ্ধ তাঁর মৃত্যু সে তো আসে দিনের পর দিন। জানি আজ বিশেষ দিনে দেশে দেশে গির্জায় গির্জায় তাঁর স্তবধ্বনি উঠছে, যিনি পরমপিতার বার্তা এনেছেন মানবসন্তানের কাছে—আর সেই গির্জার বাইরে রক্তাক্ত হয়ে উঠছে পৃথিবী ভ্রাতৃহত্যায়। দেবালয়ে স্তবমন্ত্রে তাঁকে আজ যারা ঘোষণা করছে তারাই কামানের গর্জনে তাঁকে অস্বীকার করছে, আকাশ থেকে মৃত্যুবর্ষণ করে তাঁর বাণীকে অতি ভীষণ ব্যঙ্গ করছে। লোভ আজ নিদারুণ, দুর্বলের অন্নগ্রাস আজ লুণ্ঠিত, প্রবলের সামনে দাঁড়িয়ে খৃস্টের দোহাই দিয়ে মার বুকে পেতে নিতে সাহস নেই যাদের তারাই আজ পূজাবেদীর সামনে দাঁড়িয়ে মৃত্যুশূলবিদ্ধ সেই কারুণিকের জয়ধ্বনি করছে অভ্যস্ত বচন আবৃত্তি করে। তবে কিসের উৎসব আজ? কেমন করে জানব খৃস্ট জন্মেছেন পৃথিবীতে? আনন্দ করব কী নিয়ে? এক দিকে যাঁকে মারছি নিজের হাতে, আর-এক দিকে পুনরুজ্জীবন প্রচার করব শুধু মাত্র কথায়? আজও তিনি মানুষের ইতিহাসে প্রতিমুহূর্তে ক্রুশে বিদ্ধ হচ্ছেন।

তিনি ডেকেছিলেন মানুষকে পরমপিতার সন্তান বলে, ভাইকে মিলতে বলেছিলেন ভাইয়ের সঙ্গে। প্রাণোৎসর্গ করলেন এই মানবসত্যের বেদীতে। চিরদিনের জন্যে এই মিলনের আহ্বান রেখে গেলেন আমাদের কাছে।

তাঁর আহ্বানকে আমরা যুগে যুগে প্রত্যাখ্যান করেছি। বেড়েই চলল তাঁর বাণীর প্রতিবাদ করবার অতি বিপুল আয়োজন।

বেদমন্ত্রে আছে তিনি আমাদের পিতা : পিতা নোহসি। সেইসঙ্গে প্রার্থনা আছে : পিতা নো বোধি। তিনি যে পিতা এই বোধ যেন আমাদের মনে জাগে। সেই পিতার বোধ যিনি দান করতে এসেছিলেন তিনি ব্যর্থ হয়ে, উপহসিত হয়ে, ফিরছেন আমাদের দ্বারের বাইরে—সেই কথাকে গান গেয়ে স্তব করে চাপা যেন না দিই। আজ পরিতাপ করবার দিন, আনন্দ করবার নয়। আজ মানুষের লজ্জা সমস্ত পৃথিবী ব্যাপ্ত করে। আজ আমাদের উদ্ধত মাথা ধুলায় নত হোক, চোখ দিয়ে অশ্রু বয়ে যাক। বড়োদিন নিজেকে পরীক্ষা করবার দিন, নিজেকে নম্র করবার দিন।

শান্তিনিকেতন
২৫ ডিসেম্বর ১৯৩২

খৃস্ট

আমাদের এই ভূলোককে বেষ্টন করে আছে ভুবর্লোক, আকাশমণ্ডল, যার মধ্য দিয়ে আমাদের প্রাণের নিশ্বাসবায়ু সমীরিত হয়। ভূলোকের সঙ্গে সঙ্গে এই ভুবর্লোক আছে বলেই আমাদের পৃথিবী নানা বর্ণসম্পদে গন্ধসম্পদে সংগীতসম্পদে সমৃদ্ধ —পৃথিবীর ফল শস্য সবই এই ভুবর্লোকের দান। এক সময় পৃথিবী যখন দ্রবপ্রায় অবস্থায় ছিল তখন তার চার দিকে বিষবাষ্প ছিল ঘন হয়ে, সূর্যকিরণ এই আচ্ছাদন ভালো করে ভেদ করতে পারত না। ভূগর্ভের উত্তাপ অসংযত হয়ে জলস্থলকে ক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। ক্রমশ এই তাপ শান্ত হয়ে গেলে আকাশ নির্মল হয়ে এল, মেঘপুঞ্জ হল ক্ষীণ, সূর্যকিরণ পৃথিবীর ললাটে আশীর্বাদটিকা পরিয়ে দেবার অবকাশ পেল। ভুবর্লোককে আচ্ছন্ন করেছিল যে কালিমা তা অপসারিত হলে পৃথিবী হল সুন্দর, জীবজন্তু হল আনন্দিত। মানবলোকসৃষ্টিও এই পদ্ধতি অবলম্বন করেছে। মানবচিত্তের আকাশমণ্ডলকে মোহকালিমা থেকে নির্মুক্ত করবার জন্য, সমাজকে শোভন বাসযোগ্য করবার জন্য, মানুষকে চলতে হয়েছে দুঃখস্বীকারের কাঁটাপথ দিয়ে। অনেক সময় সে চেষ্টায় মানুষ ভুল করেছে, কালিমা শোধন করতে গিয়ে অনেক সময় তাকে ঘনীভূত করেছে। পৃথিবী যখন তার সৃষ্টি-উপাদানের সামঞ্জস্য পায় নি তখন কত বন্যা, ভূকম্প, অগ্নি-উচ্ছ্বাস, বায়ুমণ্ডলে কত আবিলতা। কত স্বার্থপরতা, হিংস্রতা, লুব্ধতা, দুর্বলকে পীড়ন আজও চলছে; আদিম কালে রিপুর অন্ধবেগের পথে শুভবুদ্ধির বাধা আরও অল্প ছিল। এই-যে বিষনিশ্বাসে মানুষের ভুবর্লোক আবিল মেঘাচ্ছন্ন, এই-যে কালিমা আলোককে অবরুদ্ধ করে, তাকে নির্মল করবার চেষ্টায় কত সমাজতন্ত্র ধর্মতন্ত্র মানুষ রচনা করেছে। যতক্ষণ এই চেষ্টা শুধু নিয়ম-শাসনে আবদ্ধ থাকে ততক্ষণ তা সফল হতে পারে না। নিয়মের বল্‌গায় প্রমত্ত রিপুর উচ্ছৃঙ্খলতাকে কিছু পরিমাণে দমন করতে পারে; কিন্তু তার ফল বাহ্যিক।

মানুষ নিয়ম মানে ভয়ে; এই ভয়টাতে প্রমাণ করে তার আত্মিক দুর্বলতা। ভয়দ্বারা চালিত সমাজে বা সাম্রাজ্যে মানুষকে পশুর তুল্য অপমানিত করে। বাহিরের এই শাসনে তার মনুষ্যত্বের অমর্যাদা। মানবলোকে এই ভয়ের শাসন আজও আছে প্রবল।

মানুষের অন্তরের বায়ুমণ্ডল মলিনতামুক্ত হয় নি বলেই তার এই অসম্মান সম্ভবপর হয়েছে। মানুষের অন্তরলোকের মোহাবরণ মুক্ত করবার জন্যে যুগে যুগে মহৎ প্রাণের অভ্যুদয় হয়েছে। পৃথিবীর একটা অংশ আছে, যেখানে তার সোনারুপার খনি, যেখানে মানুষের অশনবসনের আয়োজনের ক্ষেত্র; সেই স্থূল ভূমিকে আমাদের স্বীকার করতেই হবে। কিন্তু সেই স্থূল মৃত্তিকাভাণ্ডারই তো পৃথিবীর মাহাত্ম্যভাণ্ডার নয়। যেখানে তার আলোক বিচ্ছুরিত, যেখানে নিশ্বসিত তার প্রাণ, যেখানে প্রসারিত তার মুক্তি, সেই ঊর্ধ্বলোক থেকেই প্রবাহিত হয় তার কল্যাণ; সেইখান থেকেই বিকশিত হয় তার সৌন্দর্য। মানবপ্রকৃতিতেও আছে স্থূলতা, যেখানে তার বিষয়বুদ্ধি, যেখানে তার অর্জন এবং সঞ্চয়; তারই প্রতি আসক্তিই যদি কোনো মূঢ়তায় সর্বপ্রধান হয়ে ওঠে তা হলে শান্তি থাকে না, সমাজ বিষবাষ্পে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। সমস্ত পৃথিবী জুড়ে আজ তারই পরিচয় পাচ্ছি, আজ বিশ্বব্যাপী লুব্ধতা প্রবল হয়ে উঠে মানুষে মানুষে হিংস্রবুদ্ধির

আগুন জ্বালিয়ে তুলেছে। এমন দিনে স্মরণ করি সেই মহাপুরুষদের যাঁরা মানুষকে সোনারুপার ভাণ্ডারের সন্ধান দিতে আসেন নি, দুর্বলের বুকের উপর দিয়ে প্রবলের ইস্পাত-বাঁধানো বড়ো রাস্তা পাকা করবার মন্ত্রণাদাতা যাঁরা নন-- মানুষের সব চেয়ে বড়ো সম্পদ যে মুক্তি সেই মুক্তি দান করা যাঁদের প্রাণপণ ব্রত।

এমন মহাপুরুষ নিশ্চয়ই পৃথিবীতে অনেক এসেছেন, আমরা তাঁদের সকলের নামও জানি না। কিন্তু নিশ্চয়ই এমন অনেক আছেন এখনও যাঁরা এই পৃথিবীকে মার্জনা করছেন, আমাদের জীবনকে সুন্দর উজ্জ্বল করছেন। বিজ্ঞানে জেনেছি, জন্তুরা যে বিষনিশ্বাস পরিত্যাগ করে গাছপালা সে নিশ্বাস গ্রহণ করে প্রাণদায়ী অক্সিজেন প্রশ্বসিত করে দেয়। তেমনি মানুষের চরিত্র প্রতিনিয়ত যে বিষ উদ্গার করছে নিয়ত তা নির্মল হচ্ছে পবিত্রজীবনের সংস্পর্শে। এই শুভ চেষ্টা মানবলোকে যাঁরা জাগ্রত রাখছেন তাঁদের যিনি প্রতীক, যদ্ভদ্রং তন্ন আসুব এই বাণী যাঁর মধ্যে উজ্জ্বল পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে, তাঁকে প্রণাম করার যোগেই সেই সাধুদের সকলকে একসঙ্গে প্রণাম জানাই—যাঁরা আত্মোৎসর্গের দ্বারা পৃথিবীতে কল্যাণ বিতরণ করছেন।

আজকের দিন যাঁর জন্মদিন বলে খ্যাত সেই যিশুর নিকটেই উপস্থিত করি জগতে যাঁরা প্রণম্য তাঁদের সকলের উদ্দেশে প্রণাম। আমরা মানবের পরিপূর্ণ কল্যাণরূপ দেখতে পেয়েছি কয়েক জনের মধ্যে। এই কল্যাণের দূত আমাদের ইতিহাসে অল্পই এসেছেন, কিন্তু পরিমাণ দিয়ে কল্যাণের বিচার তো হতে পারে না।

ভারতবর্ষে উপনিষদের বাণী মানুষকে বল দিয়েছে। কিন্তু সে তো মন্ত্র, ধ্যানের বিষয়। যাঁদের জীবনে রূপ পেয়েছে সেই বাণী তাঁরা যদি আমাদের আপন হয়ে আমাদের প্রত্যক্ষ হয়ে আসেন তবে সে আমাদের মস্ত সুযোগ। কেননা শাস্ত্রবাক্য তো কথা বলে না, মানুষ বলে। আজকে আমরা যাঁর কথা স্মরণ করছি তিনি অনেক আঘাত পেয়েছেন, বিরুদ্ধতা শত্রুতার সম্মুখীন হয়েছেন, নিষ্ঠুর মৃত্যুতে তাঁর জীবনান্ত হয়েছিল। এই-যে পরম দুঃখের আলোকে মানুষের মনুষ্যত্ব চিরকালের মতো দেদীপ্যমান হয়ে আছে এ তো বইপড়া ব্যাপার নয়। এখানে দেখছি মানুষকে দুঃখের আগুনে উজ্জ্বল। এঁকে উপলব্ধি করা সহজ; শাস্ত্রবাক্যকে তো আমরা ভালোবাসতে পারি নে। সহজ হয় আমাদের পথ, যদি আমরা ভালোবাসতে পারি তাঁদের যাঁরা মানুষকে ভালোবেসেছেন। বুদ্ধ যখন অপরিমেয় মৈত্রী মানুষকে দান করেছিলেন তখন তো তিনি কেবল শাস্ত্র প্রচার করেন নি, তিনি মানুষের মনে জাগ্রত করেছিলেন ভক্তি। সেই ভক্তির মধ্যেই যথার্থ মুক্তি। খৃস্টকে যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে ভালোবাসতে পেরেছেন তাঁরা শুধু একা বসে রিপু দমন করেন নি, তাঁরা দুঃসাধ্য সাধন করেছেন। তাঁরা গিয়েছেন দূর-দূরান্তরে, পর্বত সমুদ্র পেরিয়ে মানবপ্রেম প্রচার করেছেন। মহাপুরুষেরা এইরকম আপন জীবনের প্রদীপ জ্বালান; তাঁরা কেবল তর্ক করেন না, মত প্রচার করেন না। তাঁরা আমাদের দিয়ে যান মানুষরূপে আপনাকে।

খৃস্টের প্রেরণা মানবসমাজে আজ ছোটো বড়ো কত প্রদীপ জ্বালিয়েছে, অনাথ-পীড়িতদের দুঃখ দূর করবার জন্যে তাঁরা অপরিসীম ভালোবাসা ঢেলে দিয়েছেন। কী দানবতা আজ চার দিকে, কলুষে পৃথিবী আচ্ছন্ন—তবু বলতে হবে : স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ। এই বিরাট কলুষনিবিড়তার মধ্যে দেখা যায় না তাঁদের যাঁরা মানবসমাজের পুণ্যের আকর। কিন্তু তাঁরা নিশ্চয়ই

আছেন—নইলে পৃথিবী অভিশপ্ত হত, সমস্ত সৌন্দর্য ম্লান হয়ে যেত, সমস্ত মানবলোক অন্ধকারে অবলুপ্ত হত।

শান্তিনিকেতন
২৫ ডিসেম্বর ১৯০৬

খৃস্ট-প্রসঙ্গ

খৃস্টান শাস্ত্রে বলে, ঈশ্বর মানবগৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া বেদনার ভার বহন ও দুঃখের কণ্টককিরীট মাথায় পরিয়াছিলেন। মানুষের সকলপ্রকার পরিত্রাণের একমাত্র মূল্যই সেই দুঃখ। মানুষের নিতান্ত আপন সামগ্রী যে দুঃখ, প্রেমের দ্বারা তাহাকে ঈশ্বরও আপন করিয়া এই দুঃখসংগমে মানুষের সঙ্গে মিলিয়াছেন, দুঃখকে অপরিসীম মুক্তিতে ও আনন্দে উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছেন—ইহাই খৃস্টানধর্মের মর্মকথা।

[১১ মাঘ] ১৩১৪

২

যিশু কোন্ অখ্যাত গ্রামের প্রান্তে কোন্-এক পশুরক্ষণশালায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন—কোনো পণ্ডিতের ঘরে নয়, কোনো রাজার প্রাসাদে নয়, কোনো মহৈশ্বর্যশালী রাজধানীতে নয়, কোনো মহাপুণ্যক্ষেত্র তীর্থস্থানে নয়। যারা মাছ ধরে জীবিকা অর্জন করত এমন কয়েকজন মাত্র ইহুদি যুবক তাঁর শিষ্য হয়েছিল— যেদিন তাঁকে রোমরাজের প্রতিনিধি অনায়াসেই ক্রুশে বিদ্ধ করবার আদেশ দিলেন সেই দিনটি জগতের ইতিহাসে যে চিরদিন ধন্য হবে এমন কোনো লক্ষণ সেদিন কোথাও প্রকাশ পায় নি। তাঁর শত্রুরা মনে করলে সমস্তই চুকেবুকে গেল, এই অতি ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গটিকে একেবারে দলন করে নিবিয়ে দেওয়া গেল। কিন্তু, কার সাধ্য নেবায়! ভগবান যিশু তাঁর ইচ্ছাকে তাঁর পিতার ইচ্ছার সঙ্গে যে মিলিয়ে দিয়েছিলেন—সেই ইচ্ছার মৃত্যু নেই, তার স্বাভাবিকী ক্রিয়ার ক্ষয় নেই। অত্যন্ত কৃশ এবং দীন ভাবে যা নিজেকে প্রকাশ করেছিল তাই আজ দুই সহস্র বৎসর ধরে বিশ্বজয় করছে।

১১ ফাল্গুন [১৩১৫]

৩

আর-এক মহাপুরুষ যিনি তাঁর পিতার মহিমা প্রচার করতে জগতে এসেছিলেন তিনি বলেছেন, 'তোমার পিতা যেরকম সম্পূর্ণ তুমি তেমনি সম্পূর্ণ হও।'

এ কথাটিও ছোটো কথা নয়। মানবাত্মার সম্পূর্ণতার আদর্শকে তিনি পরমাত্মার মধ্যে স্থাপন করে সেই দিকেই আমাদের লক্ষ্য স্থির করতে বলেছেন।

সেই সম্পূর্ণতার মধ্যেই আমাদের ব্রহ্মবিহার, কোনো ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে নয়। পিতা যেমন সম্পূর্ণ পুত্র তেমনি সম্পূর্ণ হতে নিয়ত চেষ্টা করবে। এ না হলে পিতাপুত্রে সত্যযোগ হবে কেমন করে?

এই সম্পূর্ণতার যে-একটি লক্ষণ নির্দেশ করেছেন সেও বড়ো কম নয়। যেমন বলেছেন, তোমার প্রতিবেশীকে তোমার আপনার মতো ভালোবাসো। কথাটাকে লেশমাত্র খাটো করে বলেন নি। বলেন নি যে, প্রতিবেশীকে ভালোবাসো: বলেছেন, প্রতিবেশীকে আপনারই মতো ভালোবাসো। যিনি ব্রহ্মবিহার কামনা করেন তাঁকে এই ভালোবাসায় গিয়ে পৌঁছতে হবে—এই পথেই তাঁকে চলা চাই।

ভগবান যিশু বলেছেন, শত্রুকেও প্রীতি করবে। শত্রুকে ক্ষমা করবে বলে ভয়ে-ভয়ে মাঝপথে থেমে যান নি। শত্রুকে প্রীতি করবে বলে তিনি ব্রহ্মবিহার পর্যন্ত লক্ষ্যকে টেনে নিয়ে গিয়েছেন। বলেছেন, যে তোমার গায়ের জামা কেড়ে নেয় তাকে তোমার উত্তরীয় পর্যন্ত দান করো।

সংসারী লোকের পক্ষে এগুলি একেবারে অত্যুক্তি। তার কারণ, সংসারের চেয়ে বড়ো লক্ষ্যকে সে মনের সঙ্গে বিশ্বাস করে না। সংসারকে সে তার জামা ছেড়ে উত্তরীয় পর্যন্ত দিয়ে ফেলতে পারে যদি তাতে তার সাংসারিক প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। কিন্তু, ব্রহ্মবিহারকে সে যদি প্রয়োজনের চেয়ে ছোটো বলে জানে তবে জামাটুকু দেওয়াও শক্ত হয়।

কিন্তু, যাঁরা জীবের কাছে সেই ব্রহ্মকে, সেই সকলের চেয়ে বড়োকেই ঘোষণা করতে এসেছেন, তাঁরা তো সংসারী লোকের দুর্বল বাসনার মাপে ব্রহ্মকে অতি ছোটো করে দেখাতে চান নি। তাঁরা সকলের চেয়ে বড়ো কথাকেই অসংকোচে একেবারে শেষ পর্যন্ত বলেছেন।

এই বড়ো কথাকে এত বড়ো করে বলার দরুন তাঁরা আমাদের একটা মস্ত ভরসা দিয়েছেন। এর দ্বারা তাঁরা প্রকাশ করেছেন মনুষ্যত্বের গতি এত দূর পর্যন্তই যায়, তার প্রেম এত বড়োই প্রেম, তার ত্যাগ এত বড়োই ত্যাগ।

১২ চৈত্র [১৩১৫]

৪

ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের যে গ্রন্থিবন্ধনের প্রয়োজন আছে মন্ত্র তার সহায়তা করে। এই মন্ত্রকে অবলম্বন করে আমরা তাঁর সঙ্গে একটা-কোনো বিশেষ সম্বন্ধকে পাকা করে নেব।

সেইরূপ একটি মন্ত্র হচ্ছে : পিতা নোঽসি।

এই সুরে জীবনটাকে বাঁধলে সমস্ত চিন্তায় ও কর্মে একটি বিশেষ রাগিণী জেগে উঠবে। আমি তাঁর পুত্র এইটেই মূর্তি ধরে আমার সমস্তের মধ্যেই এই কথাটাই প্রকাশ করবে যে, আমি তাঁর পুত্র।

আজ আমি কিছুই প্রকাশ করছি নে। আহার করছি, কাজ করছি, বিশ্রাম করছি, এই পর্যন্তই। কিন্তু, অনন্ত কালে অনন্ত জগতে আমার পিতা যে আছেন তার কোনো লক্ষণই প্রকাশ পাচ্ছে না। অনন্তের সঙ্গে আজও আমার কোনো গ্রন্থি কোথাও বাঁধা হয় নি।

ওই মন্ত্রটিকে দিয়ে জীবনের তার আজ বাঁধা যাক। আহারে বিহারে শয়নে স্বপনে ওই মন্ত্রটি বারম্বার আমার মনের মধ্যে বাজতে থাক্ : পিতা নোঽসি। জগতে আমার পিতা আছেন এই কথাটি সকলেই জানুক, কারও কাছে গোপন না থাক্।

ভগবান যিশু ওই সুরটিকে পৃথিবীতে বাজিয়ে গিয়েছেন। এমনি ঠিক করে তাঁর জীবনের তার বাঁধা ছিল যে মরণান্তিক যন্ত্রণার দুঃসহ আঘাতেও সেই তার লেশমাত্র বেসুর বলে নি, সে কেবলই বলেছে : পিতা নোঽসি।

সেই-যে সুরের আদর্শটি তিনি দেখিয়ে গেছেন সেই খাঁটি আদর্শের সঙ্গে একান্ত যত্নে মিশিয়ে তারটি বাঁধতে হবে, যাতে আর ভাবতে না হয়, যাতে সুখে দুঃখে প্রলোভনে আপনিই সে গেয়ে ওঠে : পিতা নোঽসি।

২৭ চৈত্র [১৩১৫]

৫

ইহুদিদের মধ্যে ফ্যারিসি-সম্প্রদায়ের অনুশাসনে যখন বাহ্য নিয়মপালনই ধর্ম বলে গণ্য হয়ে উঠেছিল, যখন তারা নিজের গণ্ডির বাইরে অন্য জাতি অন্য ধর্মপন্থীদের ঘৃণা করে তাদের সঙ্গে একত্রে আহার বিহার বন্ধ করাকেই ঈশ্বরের বিশেষ অভিপ্রায় বলে স্থির করেছিল, যখন ইহুদির ধর্মানুষ্ঠান ইহুদিজাতিরই নিজস্ব স্বতন্ত্র সামগ্রী হয়ে উঠেছিল, তখন যিশু এই অত্যন্ত সহজ কথাটি বলবার জন্যেই এসেছিলেন যে,—ধর্ম অন্তরের সামগ্রী, ভগবান অন্তরের ধন, পাপপুণ্য বাহিরের কৃত্রিম বিধিনিষেধের অনুগত নয়; সকল মানুষই ঈশ্বরের সন্তান, মানুষের প্রতি ঘৃণাহীন প্রেম ও পরমেশ্বরের প্রতি বিশ্বাসপূর্ণ ভক্তির দ্বারাই ধর্মসাধনা হয়; বাহ্যিকতা মৃত্যুর নিদান, অন্তরের সার পদার্থেই প্রাণ পাওয়া যায়। কথাটি এতই অত্যন্ত সরল যে শোনবামাত্রই সকলকেই বলতে হয় যে 'হাঁ', কিন্তু তবুও এই কথাটিকেই সকল দেশেই মানুষ এতই কঠিন করে তুলেছে যে এর জন্যে যিশুকে মরুপ্রান্তরে গিয়ে তপস্যা করতে এবং ক্রুশের উপরে অপমানিত মৃত্যুদণ্ডকে গ্রহণ করতে হয়েছে।

৭ পৌষ ১৩১৬

৬

মানুষের যাঁরা শ্রেষ্ঠ তাঁরা এমন জায়গায় সকলের সঙ্গে সমান হয়ে দাঁড়ান যেখানে সর্বব্যাপীর সঙ্গে তাঁদের আত্মার যোগস্থাপন হয়। যেখানে মানুষ সকলকে ঠেলে-ঠুলে নিজে বড়ো হয়ে উঠতে চায় সেখানেই তাঁর সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটে। সেইজন্যেই যাঁরা মানবজন্মের সফলতা লাভ করেছেন উপনিষৎ তাঁদের ধীর বলেছেন, যুক্তাত্মা বলেছেন। অর্থাৎ, তাঁরা সকলের সঙ্গে মিলে আছেন বলেই শান্ত, তাঁরা সকলের সঙ্গে মিলে আছেন বলেই সেই পরম-একের সঙ্গে তাঁদের বিচ্ছেদ নেই, তাঁরা যুক্তাত্মা।

খৃস্টের উপদেশবাণীর মধ্যেও এই কথাটির আভাস আছে। তিনি বলেছেন,

সূচির ছিদ্রের ভিতর দিয়ে যেমন উট প্রবেশ করতে পারে না, ধনীর পক্ষে মুক্তিলাভও তেমনি দুঃসাধ্য।

তার মানে হচ্ছে এই যে, ধন বলো, মান বলো, যা কিছু আমরা জমিয়ে তুলি তার দ্বারা আমরা স্বতন্ত্র হয়ে উঠি; তার দ্বারা সকলের সঙ্গে আমাদের যোগ নষ্ট হয়। তাকেই বিশেষভাবে আগলাতে সামলাতে গিয়ে সকলকে দূরে ঠেকিয়ে রাখি। সঞ্চয় যতই বাড়তে থাকে ততই সকলের চেয়ে নিজেকে স্বতন্ত্র বলে গর্ব হয়। সেই গর্বের টানে এই স্বাতন্ত্র্যকে কেবলই বাড়িয়ে নিয়ে চলতে চেষ্টা হয়। এর আর সীমা নেই— আরও বড়ো, আরও বড়ো; আরও বেশি, আরও বেশি। এমনি করে মানুষ সকলের সঙ্গে যোগ হারাবার দিকেই চলতে থাকে, তার সর্বত্র প্রবেশের অধিকার কেবল নষ্ট হয়। উট যেমন সূচির ছিদ্রের মধ্যে দিয়ে গলতে পারে না সেও তেমনি কেবলই স্থূল হয়ে উঠে নিখিলের কোনো পথ দিয়েই গলতে পারে না; সে আপনার 'বড়ো'ত্বের মধ্যেই বন্দী। সে ব্যক্তি মুক্তস্বরূপকে কেমন করে পাবে যিনি এমন প্রশস্ততম জায়গায় থাকেন যেখানে জগতের ছোটোবড়ো সকলেরই সমান স্থান।

[১৩১৬]

৭

ধর্মান্দোলনের ইতিহাসে এইটি বরাবর দেখা গেছে, ধর্ম যখন আপনার রসের মূর্তি প্রকাশ করে তখনই সে বাঁধন ভাঙে এবং সকল মানুষকে এক করবার দিকে ধাবিত হয়। খৃস্ট যে প্রেম-ভক্তিরসের বন্যাকে মুক্ত করে দিলেন তা ইহুদিধর্মের কঠিন শাস্ত্রবন্ধনের মধ্যে নিজেকে বদ্ধ রাখতে পারলে না এবং সেই ধর্ম আজ পর্যন্ত প্রবল জাতির স্বার্থের শৃঙ্খলকে শিথিল করবার জন্য নিয়ত চেষ্টা করছে, আজ পর্যন্ত সমস্ত সংস্কার এবং অভিমানের বাধা ভেদ করে মানুষের সঙ্গে মানুষকে মেলাবার দিকে তার আকর্ষণশক্তি প্রয়োগ করছে।

[১৩১৬]

৮

মানবসংসারের মধ্যেই সেই ভীষণকে সুন্দর করে দেখতে চাও? তা হলে নিজের স্বার্থপর ছয়-রিপু-চালিত ক্ষুদ্র জীবন থেকে দূরে এসো। মানবচরিতকে যেখানে বড়ো করে দেখতে পাওয়া যায় সেই মহাপুরুষদের সামনে এসে দাঁড়াও। ওই দেখো শাক্যরাজবংশের তপস্বী। তাঁর পুণ্যচরিত আজ কত ভক্তের কণ্ঠে, কত কবির গাথায় উচ্চারিত হচ্ছে— তাঁর চরিত ধ্যান করে কত দীনচেতা ব্যক্তিরও মন আজ মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছে। কী তার দীপ্তি, কী তার সৌন্দর্য, কী তার পবিত্রতা! কিন্তু, সেই জীবনের প্রত্যেক দিনকে একবার স্মরণ করে দেখো। কী দুঃসহ! কত দুঃখের দারুণ দাহে ওই সোনার প্রতিমা তৈরি হয়ে উঠেছে! সেই দুঃখগুলিকে স্বতন্ত্র করে যদি পুঞ্জীভূত করে দেখানো যেত তা হলে সেই নিষ্ঠুর দৃশ্যে মানুষের মন একেবারে বিমুখ হয়ে যেত। কিন্তু, সমস্ত দুঃখের সঙ্গে সঙ্গেই তার

আদিতে ও অন্তে যে ভূমানন্দ আছে তাকে আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি বলেই এই চরিত এত সুন্দর, মানুষ একে এত আদরে অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করেছে।

ভগবান ঈশাকে দেখো। সেই একই কথা। কত আঘাত, কত বেদনা! সমস্তকে নিয়ে তিনি কত সুন্দর! শুধু তাই নয়, তাঁর চারি দিকে মানুষের সমস্ত নিষ্ঠুরতা সংকীর্ণতা ও পাপ সেও তাঁর চরিত্রমূর্তির উপকরণ; পঙ্ককে পঙ্কজ যেমন সার্থক করে তেমনি মানবজীবনের সমস্ত অমঙ্গলকে তিনি আপনার আবির্ভাবের দ্বারা সার্থক করে দেখিয়েছেন।

ভীষণ শক্তির প্রচণ্ড লীলাকে আজ আমরা যেমন এই সন্ধ্যাকাশে শান্ত সুন্দর করে দেখতে পাচ্ছি, মহাপুরুষদের জীবনেও মহদ্‌দুঃখের ভীষণ লীলাকে সেইরকম বৃহৎ করে সুন্দর করে দেখতে পাই। কেননা, সেখানে আমরা দুঃখকে পরিপূর্ণ সত্যের মধ্যে দেখি, এইজন্য তাকে দুঃখরূপে দেখি নে, আনন্দরূপেই দেখি।

১৫ চৈত্র ১৩১৭

৯

খৃস্টের জীবনবৃক্ষ হইতে যে ধর্মবীজ য়ুরোপের চিত্তক্ষেত্রে পড়িয়াছে তাহাই সেখানে এমন করিয়া ফলবান হইয়া উঠিয়াছে। সেই বীজের মধ্যে যে জীবনীশক্তি আছে সেটি কী? সেটি দুঃখকে পরম ধন বলিয়া গ্রহণ করা।

স্বর্গের দয়া যে মানুষের প্রেমে মানুষের সমস্ত দুঃখকে আপনার করিয়া লয়, এই কথাটি আজ বহুশত বৎসর ধরিয়া নানা মন্ত্রে অনুষ্ঠানে সংগীতে য়ুরোপ শুনিয়া আসিতেছে। শুনিতে শুনিতে এই আইডিয়াটি তাহার এমন একটি গভীর মর্মস্থানকে অধিকার করিয়া বসিয়াছে যাহা চেতনারও অন্তরালবর্তী অতিচেতনার দেশ—সেইখানকার গোপন নিস্তব্ধতার মধ্য হইতে মানুষের সমস্ত বীজ অঙ্কুরিত হইয়া উঠে—সেই অগোচর গভীরতার মধ্যেই মানুষের সমস্ত ঐশ্বর্যের ভিত্তি স্থাপিত হয়।

সেইজন্য আজ য়ুরোপে সর্বদা এই একটা আশ্চর্য ঘটনা দেখিতে পাই, যাহারা মুখে খৃস্টধর্মকে অমান্য করে এবং জড়বাদের জয় ঘোষণা করিয়া বেড়ায় তাহারাও সময় উপস্থিত হইলে ধনে প্রাণে আপনাকে এমন করিয়া ত্যাগ করে, নিন্দাকে দুঃখকে এমন বীরের মতো বহন করে যে, তখনই বুঝা যায় তাহারা নিজের অজ্ঞাতসারেও মৃত্যুর উপরে অমৃতকে স্বীকার করে এবং সুখের উপরে মঙ্গলকেই সত্য বলিয়া মানে।

টাইটানিক জাহাজে যাঁহারা নিজের প্রাণকে নিশ্চিতভাবে অবজ্ঞা করিয়া পরের প্রাণকে রক্ষার চেষ্টা করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই যে নিষ্ঠাবান ও উপাসনারত খৃস্টান তাহা নহে, এমনকি তাঁহাদের মধ্যে নাস্তিক বা আজ্ঞেয়িকও কেহ কেহ থাকিতে পারেন, কিন্তু তাঁহারা কেবলমাত্র মতান্তর গ্রহণের দ্বারা সমস্ত জাতির ধর্মসাধনা হইতে নিজেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন করিবেন কী করিয়া? কোনো জাতির মধ্যে যাঁহারা তাপস তাঁহারা সে জাতির সকলের হইয়া তপস্যা করেন। এইজন্য সেই জাতির পনেরো-আনা মূঢ়ও যদি সেই তাপসদের গায়ে ধুলা দেয় তথাপি তাহারাও তপস্যার ফল হইতে একেবারে বঞ্চিত হয় না।

ভগবানের প্রেমে মানুষের ছোটো বড়ো সমস্ত দুঃখ নিজে বহন করিবার শক্তি ও সাধনা আমাদের দেশে পরিব্যাপ্তভাবে দেখিতে পাই না, এ কথা যতই অপ্রিয় হউক তথাপি ইহা আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে। প্রেমভক্তির মধ্যে যে ভাবের আবেগ, যে রসের লীলা, তাহা আমাদের যথেষ্ট আছে; কিন্তু প্রেমের মধ্যে যে দুঃখস্বীকার, যে আত্মত্যাগ, যে সেবার আকাঙ্ক্ষা আছে, যাহা বীর্যের দ্বারাই সাধ্য, তাহা আমাদের মধ্যে ক্ষীণ। আমরা যাহাকে ঠাকুরের সেবা বলি তাহা দুঃখ-পীড়িত মানুষের মধ্যে ভগবানের সেবা নহে। আমরা প্রেমের রসলীলাকেই একান্তভাবে গ্রহণ করিয়াছি, প্রেমের দুঃখলীলাকে স্বীকার করি নাই।

দুঃখকে লাভের দিক দিয়া স্বীকার করার মধ্যে আধ্যাত্মিকতা নাই; দুঃখকে প্রেমের দিক দিয়া স্বীকার করাই আধ্যাত্মিকতা। কৃপণ ধনসঞ্চয়ের যে দুঃখ ভোগ করে, পারলৌকিক সদ্‌গতির লোভে পুণ্যকামী যে দুঃখব্রত গ্রহণ করে, মুক্তি-লোলুপ মুক্তির জন্য যে দুঃখসাধন করে, এবং ভোগী ভোগের জন্য যে দুঃখকে বরণ করে, তাহা কোনোমতেই পরিপূর্ণতার সাধনা নহে। তাহাতে আত্মার অভাবকেই, দৈন্যকেই প্রকাশ করে। প্রেমের জন্য যে দুঃখ তাহাই যথার্থ ত্যাগের ঐশ্বর্য; তাহাতেই মানুষ মৃত্যুকে জয় করে ও আত্মার শক্তিকে ও আনন্দকে সকলের ঊর্ধ্বে মহীয়ান করিয়া তুলে।

এই দুঃখলীলার ক্ষেত্রেই আমরা আপনাকে ছাড়িয়া বিশ্বকে সত্যভাবে গ্রহণ করিতে পারি। সত্যের মূল্যই এই দুঃখ। এই দুঃখসম্পদই মানবাত্মার প্রধান ঐশ্বর্য। এই দুঃখের দ্বারাই তাহার বল প্রকাশ হয় এবং এই দুঃখের দ্বারাই সে আপনাকে এবং অন্যকে লাভ করে। তাই শাস্ত্রে বলে : নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ। অর্থাৎ, দুঃখ স্বীকার করিবার বল যাহার নাই সে আপনাকে সত্যভাবে উপলব্ধি করিতে পারে না।...

মানুষকে এইরূপ সত্য বলিয়া দেখা, ইহা আত্মার সত্যদৃষ্টি, অর্থাৎ, প্রেমের দ্বারাই ঘটে। তত্ত্বজ্ঞান যখন বলে, সর্বভূতই এক, সে একটা বাক্যমাত্র; সেই তত্ত্বকথার দ্বারা সর্বভূতকে আত্মবৎ করা যায় না। প্রেম-নামক আত্মার যে চরমশক্তি, যাহার ধৈর্য অসীম, আপনাকে ত্যাগ করাতেই যাহার স্বাভাবিক আনন্দ, সেই সেবাতৎপর প্রেম না হলে আর কিছুতেই পরকে আপন করা যায় না; এই শক্তির দ্বারাই দেশপ্রেমিক পরমাত্মাকে সমস্ত দেশের মধ্যে উপলব্ধি করেন, মানবপ্রেমিক পরমাত্মাকে সমস্ত মানবের মধ্যে লাভ করেন।

য়ুরোপের ধর্ম য়ুরোপকে সেই দুঃখপ্রদীপ্ত সেবাপরায়ণ প্রেমের দীক্ষা দিয়াছে। ইহার জোরেই সেখানে মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলন সহজ হইয়াছে। ইহার জোরেই সেখানে দুঃখ-তপস্যার হোমাগ্নি নিবিতেছে না এবং জীবনের সকল বিভাগেই শত শত তাপস আত্মাহুতির যজ্ঞ করিয়া সমস্ত দেশের চিত্তে অহরহ তেজ সঞ্চার করিতেছেন। সেই দুঃসহ যজ্ঞহুতাশন হইতে যে অমৃতের উদ্‌ভব হইতেছে তাহার দ্বারাই সেখানে শিল্প বিজ্ঞান সাহিত্য বাণিজ্য রাষ্ট্রনীতির এমন বিরাট বিস্তার হইতেছে; ইহা কোনো কারখানাঘরে লোহার যন্ত্রে তৈরি হইতেই পারে না; ইহা তপস্যার সৃষ্টি এবং সেই তপস্যার অগ্নিই মানুষের আধ্যাত্মিক শক্তি, মানুষের ধর্মবল।

১০

আজ খৃস্ট্‌মাস্‌। এইমাত্র ভোরের বেলা আমরা আমাদের খৃস্টোৎসব সমাধা করে উঠেছি।...আমরা তিনজনে আমাদের শোবার ঘরের একটি কোণে বসে আমাদের উৎসব করলুম— কিছু অভাব বোধ হল না— উৎসবের যিনি দেবতা তিনি যদি আসন গ্রহণ করেন তা হলে কোনো আয়োজনের ত্রুটি চোখে পড়েই না। তাঁকে আজ আমরা প্রণাম করেছি, তাঁর আশীর্বাদ আমরা গ্রহণ করেছি। আমরা একান্তমনে প্রার্থনা করেছি যদ্‌ভদ্রং তন্ন আসুব। আমাদের সমস্ত ইচ্ছাকে নিঃশেষে পরাস্ত করে দিয়ে তাঁর ইচ্ছাকে আমাদের জীবনে জয়ী করুন, জীবন একেবারে পরিপূর্ণরূপে সত্য হোক। সেজন্য যত ত্যাগ যত দুঃখদাহ সমস্তই যেন মাথা নত করে স্বীকার করে নিতে পারি। এই ইচ্ছা তাঁকে জানিয়েছি— এই ইচ্ছার মধ্যে কিছুমাত্র মিথ্যা যেন না থাকে এই কামনা করছি— যদি মিথ্যা থাকে তবে তা চূর্ণবিচূর্ণ হোক, বজ্রাগ্নিতে দগ্ধ হয়ে যাক! এই সত্যের পথে যাবার পক্ষে মানুষই মানুষের পক্ষে সকলের চেয়ে বড়ো বাধা, তেমনি মানুষই মানুষের পক্ষে পরম সহায়— সেই মানুষটিই আজ জন্মেছিলেন, তিনিই আজ আমাদের জীবনের মধ্যে জন্মগ্রহণ করুন— নিষ্কলঙ্ক শুভ্র শিশুটি হয়ে, একেবারে নিরুপায় পিতার সন্তানটি হয়ে, একেবারে নিঃসম্বল নিষ্কিঞ্চন হয়ে। মনুষ্যত্বের পরম অধিকার লাভ করবার প্রার্থনা অনেকদিন জানিয়েছি— দুর্যোগের মুখে, বিঘ্নের মুখে, মোহান্ধতার মুখে এই আমার প্রার্থনা— এ প্রার্থনা ব্যর্থ হতেই পারে না— বিপুল ইন্ধনের তলায় যখন আগুন ধরে তখন সে কি চোখে পড়ে? সে নিতান্তই ছোটো, কিন্তু তার শক্তি কি কম? আজ সকালে তাঁর দরবারে আর-একবার দাঁড়িয়েছি। সমস্ত মানুষের হয়ে মানুষের বড়ো ভাই এই প্রার্থনা করে গিয়েছেন : Thy Kingdom come! আমাদের ঋষিরাও এই কথাই আর-এক ভাষায় বলেছেন : আবিরাবীর্ম এধি! সমস্ত মানুষের সেই অন্তরতম প্রার্থনাকে নিজের জীবনের মধ্যে সত্য করে তোলবার চেষ্টায় যদি বিরত হই তা হলে আমাদের প্রতিদিনের অন্ন চুরি করে খাওয়া হবে— তা হলে আমাদের মানবজন্মটা একটা অপরিশোধিত ঋণের স্বরূপ হয়ে আমাদের চিরদায়িক করে রেখে দেবে।

Urbana : Illinois
১০ পৌষ ১৩১৯

১১

খৃস্টধর্ম যে কাঠামোর ভিতর দিয়ে এসে যে রূপটি পেয়েছে তার সঙ্গে বর্তমান জ্ঞানবিজ্ঞানের অনেক জায়গাতেই অনৈক্য হচ্ছে। তাতে করে পুরোনো ধর্মবিশ্বাস একেবারে গোড়া ঘেঁষে উন্মূলিত করে দেওয়া হচ্ছে। প্রতিদিন যা 'বিশ্বাস করি' বলে মানুষকে স্বীকার করতে হয় তা স্বীকার করা সে দেশের অধিকাংশ শিক্ষিত লোকের পক্ষে অসম্ভব। অনেকের পক্ষে চর্চে যাওয়া অসাধ্য হয়েছে। ধর্ম মানুষের জীবনের বাইরে পড়ে রয়েছে; লোকের মনকে তা আর আশ্রয় দিতে পারছে না। সেইজন্য ফরাসীস্‌ বিদ্রোহ থেকে আরম্ভ করে দেখা গিয়েছে যে, ধর্মকে আঘাত দেবার উদ্যম সেখানকার বুদ্ধিমান লোকদের পেয়ে বসেছে। অথচ

ধর্মকে আঘাতমাত্র দিয়ে মানুষ আশ্রয় পাবে কেমন করে? তাতে কিছুদিনের মতো মানুষ প্রবৃত্ত থাকতে পারে, কিন্তু তাতে ধর্ম সম্বন্ধে মানুষের অন্তরে যে স্বাভাবিক পিপাসা রয়েছে তার কোনোই তৃপ্তি হয় না।

এখনকার কালে সেই পিপাসার দাবি জেগে উঠেছে। তার নানা লক্ষণ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। নাস্তিকতা নিয়ে যেদিন জ্ঞানী লোকেরা দম্ভ করতেন সেদিন চলে গিয়েছে। ধর্মকে আবৃত করে অন্ধ সংস্কারগুলো যখন প্রবল হয়ে ওঠে তখন সেগুলিকে ঝেঁটিয়ে ফেলার একটা দরকার হয়, নাস্তিকতা ও সংশয়বাদের সেই কারণে প্রয়োজন হয়।...ইউরোপের লোকেরা ধর্মবিশ্বাসের একটা প্রত্যক্ষগম্য প্রমাণের অনুসন্ধান করছে—যেমন ভূতের বিশ্বাস, টেলিপ্যাথি প্রভৃতি কতগুলো অতীন্দ্রিয় রাজ্যের ব্যাপার নিয়ে তারা উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। তাতে ও দেশের লোকেরা মনে করছে যে, ওই-সব প্রমাণ সংগৃহীত হলে ধর্মবিশ্বাস তার ভিত্তি পাবে।...একজন ইংরাজ কবি একদিন আমাকে বললেন যে, তাঁর ধর্মবিশ্বাস অত্যন্ত শিথিল হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু রেডিয়মের আবিষ্কারে তাঁর বিশ্বাসকে ফিরিয়েছে। তার মানে, ওরা বাইরের দিক থেকে ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তিকে পাকা করবার চেষ্টা করে। সেইজন্য ওরা যদি কখনো দেখে যে, মানুষের ভক্তির গভীরতার মধ্যেই একটা প্রমাণ রয়েছে—যেমন চোখ দিয়ে বাহ্য ব্যাপারকে দেখছি বলে তার প্রমাণ পাচ্ছি তেমনি একটা অধ্যাত্মদৃষ্টির দ্বারা আধ্যাত্মিক সত্যকে প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করা যায়—তা হলে ওরা একটা ভরসা পায়। প্রফেসর জেম্‌স্ প্রভৃতি দেখিয়েছেন যে, মিস্টিক বলে যাঁরা গণ্য তাঁরা তাঁদের ধর্মবিশ্বাসকে কেমন করে প্রকাশ করেছেন। তাঁদের সব জীবনের সাক্ষ্য থেকে তিনি দেখিয়েছেন যে, তাঁরা সবাই একই কথা বলেছেন, তাঁদের সকলেরই অভিজ্ঞতা একই পথ দিয়ে গিয়েছে। বিভিন্ন দেশে নানা অবস্থার নানা লোক একই বাণী নানা কালে ব্যক্ত করেছেন। এ বড়ো আশ্চর্য।

৭ পৌষ ১৩২০

১২

খৃস্টধর্ম মানুষকে শ্রদ্ধা করেছে, কেননা তাঁদের যিনি পূজনীয় তিনি মানবের রূপে মানবের ভাগ্য স্বীকার করেছিলেন। এই কারণে যাঁরা যথার্থ খৃস্টান তাঁদের মানবপ্রীতি অকৃত্রিমভাবে প্রকাশ পেয়ে থাকে দেশে বিদেশে, আমরা তার পরিচয় পেয়েছি। যদি তাঁদের ধর্মমতে কোনো অসম্পূর্ণতা থাকে বলে আমরা মনে করি, তবু এ কথা স্বীকার করতে হবে যে, অন্তত এক জায়গায় এই ধর্ম মানবজাতির সঙ্গে আত্মনিবেদনের যোগে তাঁদের সম্বন্ধযুক্ত করতে পেরেছে, সেটা ধর্মবুদ্ধির শ্রেষ্ঠ পরিচয়। তাঁদের সাহিত্য এবং ব্যবহারে যেখানে মাহাত্ম্য দেখেছি মানবিকতা সেখানে সমুজ্জ্বল। সেখানে দৈন্য নেই, সেখানে স্বার্থের সংঘাতের ঊর্ধ্বে একটি উদার সভ্যতার বিকাশ ঘটেছে।

১১ মাঘ ১৩৪৭

মানবপুত্র

মৃত্যুর পাত্রে খৃস্ট যেদিন মৃত্যুহীন প্রাণ উৎসর্গ করলেন
রবাহূত অনাহূতের জন্যে,
তার পরে কেটে গেছে বহুশত বৎসর।
আজ তিনি একবার নেমে এলেন নিত্যধাম থেকে মর্ত্যধামে।
চেয়ে দেখলেন,
সে কালেও মানুষ ক্ষতবিক্ষত হত যে-সমস্ত পাপের মারে—
যে উদ্ধত শেল ও শল্য, যে চতুর ছোরা ও ছুরি,
যে ক্রূর কুটিল তলোয়ারের আঘাতে,
বিদ্যুদ্‌বেগে আজ তাদের ফলায় শান দেওয়া হচ্ছে
হিস্‌হিস্‌ শব্দে স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে
বড়ো বড়ো মসীধূমকেতন কারখানাঘরে।

কিন্তু দারুণতম যে মৃত্যুবাণ নূতন তৈরি হল,
ঝক্‌ ঝক্‌ করে উঠল নরঘাতকের হাতে,
পূজারি তাতে লাগিয়েছে তাঁরই নামের ছাপ
তীক্ষ্ম নখে আঁচড় দিয়ে।
খৃস্ট বুকে হাত চেপে ধরলেন—
বুঝলেন, শেষ হয় নি তাঁর নিরবচ্ছিন্ন মৃত্যুর মুহূর্ত,
নূতন শূল তৈরি হচ্ছে বিজ্ঞানশালায়,
বিঁধছে তাঁর গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে।
সেদিন তাঁকে মেরেছিল যারা
ধর্মমন্দিরের ছায়ায় দাঁড়িয়ে
তারাই আজ নূতন জন্ম নিল দলে দলে,
তারাই আজ ধর্মমন্দিরের বেদির সামনে থেকে
পূজামন্ত্রের সুরে ডাকছে ঘাতক সৈন্যকে—
বলছে, 'মারো! মারো!'

মানবপুত্র যন্ত্রণায় বলে উঠলেন ঊর্ধ্বে চেয়ে:
'হে ঈশ্বর, হে মানুষের ঈশ্বর,
কেন আমাকে ত্যাগ করলে!'

শ্রাবণ ১৩৩৯

বড়োদিন

একদিন যারা মেরেছিল তাঁরে গিয়ে
  রাজার দোহাই দিয়ে
এ যুগে তারাই জন্ম নিয়েছে আজি,
মন্দিরে তারা এসেছে ভক্ত সাজি—
  ঘাতক সৈন্যে ডাকি
    'মারো মারো' ওঠে হাঁকি।
গর্জনে মিশে পূজামন্ত্রের স্বর—
মানবপুত্র তীব্র ব্যথায় কহেন, 'হে ঈশ্বর!
এ পানপাত্র নিদারুণ বিষে ভরা
দূরে ফেলে দাও, দূরে ফেলে দাও ত্বরা।'

বড়োদিন ১৯৩৯

পূজালয়ের অন্তরে ও বাহিরে

  গির্জাঘরের ভিতরটি স্নিগ্ধ,
    সেখানে বিরাজ করে স্তব্ধতা,
রঙিন কাচের ভিতর দিয়ে সেখানে প্রবাহিত রমণীয় আলো।
  এইখানে আমাদের প্রভুকে দেখি তাঁর ন্যায়াসনে,
      মুখশ্রীতে বিষাদ-দুঃখ,
   বিচারকের বিরাট মহিমায় তিনি মুকুটিত।
তিনি যেন বলছেন,
    "তোমরা যারা চলে যাচ্ছ,
      তোমাদের কাছে এ কি কিছুই নয়?
    তাকাও দেখি, বলো দেখি,
    কোনো দুঃখ কি আছে আমার দুঃখের তুল্য?"
পুণ্য দীক্ষা অনুষ্ঠান শেষ হল।
  মনে জাগল তাঁর প্রেমের গৌরব, তাঁর আশ্বাসবাণী—
    "এসো আমার কাছে, যারা কর্মক্লিষ্ট,
    এসো যারা ভারাক্রান্ত,
      আমি তোমাদের বিরাম দেব।"
  এই বাক্যে শান্তি এবং আনন্দ আনল আমাদের মনে,
  ক্ষণকালের জন্য সঙ্গ পেলুম তাঁর স্বর্গলোকে।
  শুনলুম, "ঊর্ধ্বে তোলো তোমার হৃদয়কে।"
উত্তর দিলুম, "প্রভু, আমরা হৃদয় তুলে ধরেছি তোমারই দিকে।"

চলে এলুম বাইরে।
গির্জাঘর থেকে ফেরবার পথে
দেখা গেল সেই দীর্ঘ জনশ্রেণী।
তারা দেহকে পীড়ন করে চলেছে
ক্লান্ত আক্রান্ত গুরুভারে,
তাদের জন্যে নেই স্বর্গ, নেই হৃদয়কে ঊর্ধ্বে উদ্‌বাহন,
ঈশ্বরের সুন্দর সৃষ্টিতে নেই তাদের রোমাঞ্চিত আনন্দ,
নেই তাদের শান্তি, নেই বিশ্রাম।
কেবল আরামহীন পরিশ্রম দিনের পর দিন,
ক্ষুধিত তৃষার্ত তারা, ছিন্ন বসন, জীর্ণ আবাস,
পরিপোষণহীন দেহ।
এ দিকে তাঁর বিষণ্ণ দুঃখাভিভূত মুখশ্রী,
উদার বিচারের মহিমায় তিনি মুকুটিত।
গম্ভীর অভিযোগে আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন—
“আমার এই ভাইদের মধ্যে তুচ্ছতমের প্রতি যে নির্মমতা
সে আমারই প্রতি।”

মংপু। দার্জিলিং
২২ এপ্রিল ১৯৪০

শিক্ষা

শিক্ষা

অধ্যাপনারত রবীন্দ্রনাথ

অধ্যাপনারত সিলভ্যাঁ লেভি

শিক্ষার হেরফের

যতটুকু অত্যাবশ্যক কেবল তাহারই মধ্যে কারারুদ্ধ হইয়া থাকা মানবজীবনের ধর্ম নহে। আমরা কিয়ৎপরিমাণে আবশ্যক-শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া থাকি এবং কিয়ৎপরিমাণে স্বাধীন। আমাদের দেহ সাড়ে তিন হাতের মধ্যে বদ্ধ, কিন্তু তাই বলিয়া ঠিক সেই সাড়ে তিন হাত পরিমাণ গৃহ নির্মাণ করিলে চলে না। স্বাধীন চলাফেরার জন্য অনেকখানি স্থান রাখা আবশ্যক, নতুবা আমাদের স্বাস্থ্য এবং আনন্দের ব্যাঘাত হয়। শিক্ষা সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। যতটুকু কেবলমাত্র শিক্ষা, অর্থাৎ অত্যাবশ্যক, তাহারই মধ্যে শিশুদিগকে একান্ত নিবদ্ধ রাখিলে কখনোই তাহাদের মন যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িতে পারে না। অত্যাবশ্যক শিক্ষার সহিত স্বাধীন পাঠ না মিশাইলে ছেলে ভালো করিয়া মানুষ হইতে পারে না— বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেও বুদ্ধিবৃত্তি সম্বন্ধে সে অনেকটা পরিমাণে বালক থাকিয়াই যায়।

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের হাতে কিছুমাত্র সময় নাই। যত শীঘ্র পারি বিদেশীয় ভাষা শিক্ষা করিয়া, পাস দিয়া, কাজে প্রবিষ্ট হইতে হইবে। কাজেই শিশুকাল হইতে ঊর্ধ্বশ্বাসে, দ্রুত বেগে, দক্ষিণে বামে দৃক্‌পাত না করিয়া, পড়া মুখস্থ করিয়া যাওয়া ছাড়া আর কোনো-কিছুর সময় পাওয়া যায় না। সুতরাং ছেলেদের হাতে কোনো শখের বই দেখিলেই সেটা তৎক্ষণাৎ ছিনাইয়া লইতে হয়।

শখের বই জুটিবেই বা কোথা হইতে? বাংলায় সেরূপ গ্রন্থ নাই। এক রামায়ণ মহাভারত আছে, কিন্তু ছেলেদের এমন করিয়া বাংলা শেখানো হয় না যাহাতে তাহারা আপন ইচ্ছায় ঘরে বসিয়া কোনো বাংলা কাব্যের যথার্থ স্বাদ গ্রহণ করিতে পারে। আবার, দুর্ভাগারা ইংরাজিও এতটা জানে না যাহাতে ইংরাজি বাল্যগ্রন্থের মধ্যে প্রবেশ লাভ করে। বিশেষত, শিশুপাঠ্য ইংরাজি গ্রন্থ এরূপ খাস ইংরাজি, তাহাতে এত ঘরের গল্প, ঘরের কথা যে, বড়ো বড়ো বি.এ. এম.এ.-দের পক্ষেও তাহা সকল সময় সম্পূর্ণরূপে আয়ত্তগম্য হয় না।

কাজেই বিধির বিপাকে বাঙালির ছেলের ভাগ্যে ব্যাকরণ অভিধান এবং ভূগোলবিবরণ ছাড়া আর-কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। বাঙালির ছেলের মতো এমন হতভাগ্য আর কেহ নাই। অন্য দেশের ছেলেরা যে বয়সে নবোদ্গত দন্তে আনন্দমনে ইক্ষু চর্বণ করিতেছে, বাঙালির ছেলে তখন ইস্কুলের বেঞ্চির উপর কোঁচা-সমেত দুইখানি শীর্ণ খর্ব চরণ দোদুল্যমান করিয়া শুদ্ধমাত্র বেত হজম করিতেছে, মাস্টারের কটু গালি ছাড়া তাহাতে আর কোনোরূপ মশলা মিশানো নাই।

তাহার ফল হয় এই, হজমের শক্তিটা সকল দিক হইতেই হ্রাস হইয়া আসে। যথেষ্ট খেলাধুলা এবং উপযুক্ত আহারাভাবে বঙ্গসন্তানের শরীরটা যেমন অপুষ্ট থাকিয়া যায় মানসিক পাকযন্ত্রটাও তেমনি পরিণতি লাভ করিতে পারে না। আমরা যতই বি.এ. এম.এ. পাস করিতেছি, রাশি রাশি বই গিলিতেছি, বুদ্ধিবৃত্তিটা তেমন বেশ বলিষ্ঠ এবং পরিপক্ক হইতেছে না। তেমন মুঠা করিয়া কিছু ধরিতে

পারিতেছি না, তেমন আদ্যোপান্ত কিছু গড়িতে পারিতেছি না, তেমন জোরের সহিত কিছু দাঁড় করাইতে পারিতেছি না। আমাদের মতামত কথাবার্তা এবং আচার-অনুষ্ঠান ঠিক সাবালকের মতো নহে। সেইজন্য আমরা অত্যুক্তি আড়ম্বর এবং আস্ফালনের দ্বারা আমাদের মানসিক দৈন্য ঢাকিবার চেষ্টা করি।

ইহার প্রধান কারণ, বাল্যকাল হইতে আমাদের শিক্ষার সহিত আনন্দ নাই। কেবল যাহা-কিছু নিতান্ত আবশ্যক তাহাই কণ্ঠস্থ করিতেছি। তেমন করিয়া কোনোমতে কাজ চলে মাত্র, কিন্তু বিকাশলাভ হয় না। হাওয়া খাইলে পেট ভরে না, আহার করিলে পেট ভরে; কিন্তু আহারটি রীতিমত হজম করিবার জন্য হাওয়া খাওয়ার দরকার। তেমনি একটা শিক্ষাপুস্তককে রীতিমত হজম করিতে অনেকগুলি পাঠ্যপুস্তকের সাহায্য আবশ্যক। আনন্দের সহিত পড়িতে পড়িতে পড়িবার শক্তি অলক্ষিতভাবে বৃদ্ধি পাইতে থাকে; গ্রহণশক্তি ধারণাশক্তি চিন্তাশক্তি বেশ সহজে এবং স্বাভাবিক নিয়মে বললাভ করে।

কিন্তু এই মানসিক-শক্তি-হ্রাসকারী নিরানন্দ শিক্ষার হাত বাঙালি কী করিয়া এড়াইবে, কিছুতেই ভাবিয়া পাওয়া যায় না।

এক তো, ইংরাজি ভাষাটা অতিমাত্রায় বিজাতীয় ভাষা। শব্দবিন্যাস পদবিন্যাস সম্বন্ধে আমাদের ভাষার সহিত তাহার কোনোপ্রকার মিল নাই। তাহার ’পরে আবার ভাববিন্যাস এবং বিষয়প্রসঙ্গও বিদেশী। আগাগোড়া কিছুই পরিচিত নহে, সুতরাং ধারণা জন্মিবার পূর্বেই মুখস্থ আরম্ভ করিতে হয়। তাহাতে না চিবাইয়া গিলিয়া খাইবার ফল হয়। হয়তো কোনো-একটা শিশুপাঠ্য রীডারে hay-making সম্বন্ধে একটা আখ্যান আছে; ইংরাজ ছেলের নিকট সে ব্যাপারটা অত্যন্ত পরিচিত, এইজন্য বিশেষ আনন্দদায়ক। অথবা snowball খেলায় চার্লি এবং কেটির মধ্যে যে কিরূপ বিবাদ ঘটিয়াছিল তাহার ইতিহাস ইংরাজ-সন্তানের নিকট অতিশয় কৌতুকজনক। কিন্তু আমাদের ছেলেরা যখন বিদেশী ভাষায় সেগুলা পড়িয়া যায় তখন তাহাদের মনে কোনোরূপ স্মৃতির উদ্রেক হয় না, মনের সম্মুখে ছবির মতো করিয়া কিছু দেখিতে পায় না, আগাগোড়া অন্ধভাবে হাতড়াইয়া চলিতে হয়।

আবার নিচের ক্লাসে যে-সকল মাস্টার পড়ায় তাহারা কেহ এন্‌ট্রেন্‌স্‌ পাস, কেহ বা এন্‌ট্রেন্‌স্‌ ফেল; ইংরাজি ভাষা ভাব আচার ব্যবহার এবং সাহিত্য তাহাদের নিকট কখনোই সুপরিচিত নহে। তাহারাই ইংরাজির সহিত আমাদের প্রথম পরিচয় সংঘটন করাইয়া থাকে। তাহারা না জানে ভালো বাংলা, না জানে ভালো ইংরাজি; কেবল তাহাদের একটা সুবিধা এই যে, শিশুদিগকে শিখানো অপেক্ষা ভুলানো ঢের সহজ কাজ এবং তাহাতে তাহারা সম্পূর্ণ কৃতকার্যতা লাভ করে।

বেচারাদের দোষ দেওয়া যায় না।—Horse is a noble animal: বাংলায় তর্জমা করিতে গেলে বাংলারও ঠিক থাকে না, ইংরাজিও ঘোলাইয়া যায়। কথাটা কেমন করিয়া প্রকাশ করা যায়? ঘোড়া একটি মহৎ জন্তু, ঘোড়া অতি উঁচুদরের জানোয়ার, ঘোড়া জন্তুটা খুব ভালো—কথাটা কিছুতেই তেমন মনঃপূত-রকম হয় না; এমন স্থলে গোঁজামিলন দেওয়াই সুবিধা। আমাদের প্রথম ইংরাজি শিক্ষায় এইরূপ কত গোঁজামিলন চলে তাহার আর সীমা নাই। ফলত, অল্প বয়সে আমরা যে ইংরাজিটুকু শিখি তাহা এত যৎসামান্য এবং এত ভুল যে, তাহার ভিতর হইতে কোনো প্রকারের রস আকর্ষণ করিয়া লওয়া বালকদের পক্ষে অসম্ভব হয়, কেহ

তাহা প্রত্যাশাও করে না; মাস্টারও বলে ছাত্রও বলে, 'আমার রসে কাজ নাই, টানিয়া বুনিয়া কোনোমতে একটা অর্থ বাহির করিতে পারিলে এ যাত্রা বাঁচিয়া যাই, পরীক্ষায় পাস হই, আপিসে চাকরি জোটে।' সচরাচর যে অর্থটা বাহির হয় তৎসম্বন্ধে শঙ্করাচার্যের এই বচনটি খাটে—

অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যং
নাস্তি ততঃ সুখলেশঃ সত্যম্।

অর্থকে অনর্থ বলিয়া জানিয়ো, তাহাতে সুখও নাই এবং সত্যও নাই।

তবে ছেলেদের ভাগ্যে বাকি রহিল কী? যদি কেবল বাংলা শিখিত তবে রামায়ণ মহাভারত পড়িতে পাইত; যদি কিছুই না শিখিত তবে খেলা করিবার অবসর থাকিত—গাছে চড়িয়া, জলে ঝাঁপাইয়া, ফুল ছিঁড়িয়া, প্রকৃতিজননীর উপর সহস্র দৌরাত্ম্য করিয়া, শরীরের পুষ্টি, মনের উল্লাস এবং বাল্যপ্রকৃতির পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারিত। আর ইংরাজি শিখিতে গিয়া না হইল শেখা, না হইল খেলা, প্রকৃতির সত্যরাজ্যে প্রবেশ করিবারও অবকাশ থাকিল না, সাহিত্যের কল্পনারাজ্যে প্রবেশ করিবারও দ্বার রুদ্ধ রহিল। অন্তরে এবং বাহিরে যে দুইটি উদার এবং উন্মুক্ত বিহারক্ষেত্র আছে, মনুষ্য যেখান হইতে জীবন বল এবং স্বাস্থ্য সঞ্চয় করে—যেখানে নানা বর্ণ, নানা রূপ, নানা গন্ধ, বিচিত্র গতি এবং গীতি, প্রীতি ও প্রফুল্লতা সর্বদা হিল্লোলিত হইয়া আমাদিগকে সর্বাঙ্গসচেতন এবং সম্পূর্ণবিকশিত করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছে—সেই দুই মাতৃভূমি হইতে নির্বাসিত করিয়া হতভাগ্য শিশুদিগকে কোন্ বিদেশী কারাগারে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখা হয়? ঈশ্বর যাহাদের জন্য পিতামাতার হৃদয়ে স্নেহসঞ্চার করিয়াছেন, জননীর কোল কোমল করিয়া দিয়াছেন, যাহারা আকারে ক্ষুদ্র তবু সমস্ত গৃহের সমস্ত শূন্য অধিকার করিয়াও তাহাদের খেলার জন্য যথেষ্ট স্থান পায় না, তাহাদিগকে কোথায় বাল্য যাপন করিতে হয়? বিদেশী ভাষার ব্যাকরণ এবং অভিধানের মধ্যে। যাহার মধ্যে জীবন নাই, আনন্দ নাই, অবকাশ নাই, নবীনতা নাই, নড়িয়া বসিবার একতিল স্থান নাই, তাহারই অতি শুষ্ক কঠিন সংকীর্ণতার মধ্যে। ইহাতে কি সে ছেলের কখনো মানসিক পুষ্টি, চিত্তের প্রসার, চরিত্রের বলিষ্ঠতা লাভ হইতে পারে? সে কি একপ্রকার পাণ্ডুবর্ণ রক্তহীন শীর্ণ অসম্পূর্ণ হইয়া থাকে না? সে কি বয়ঃপ্রাপ্তিকালে নিজের বুদ্ধি খাটাইয়া কিছু বাহির করিতে পারে, নিজের বল খাটাইয়া বাধা অতিক্রম করিতে পারে, নিজের স্বাভাবিক তেজে মস্তক উন্নত করিয়া রাখিতে পারে? সে কি কেবল মুখস্থ করিতে, নকল করিতে এবং গোলামি করিতে শেখে না?

এক বয়স হইতে আর-এক বয়স পর্যন্ত একটা যোগ আছে। যৌবন যে বাল্যকাল হইতে ক্রমশ পরিণত হইয়া উঠে, এ কথা নূতন করিয়া বলাই বাহুল্য। যৌবনে সহসা কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াই যখন যাহা আবশ্যক অমনি যে হাতের কাছে পাওয়া যায় তাহা নহে—জীবনের যথার্থ নির্ভরযোগ্য এবং একান্ত আবশ্যক জিনিস হস্তপদের মতো আমাদের জীবনের সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়া উঠিতে থাকে। তাহারা কোনো প্রস্তুত সামগ্রীর মতো নহে যে, প্রয়োজনের সময়ে অখণ্ড আকারে বাজার হইতে কিনিতে পারা যাইবে।

চিন্তাশক্তি এবং কল্পনাশক্তি জীবনযাত্রা-নির্বাহের পক্ষে দুইটি অত্যাবশ্যক শক্তি, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অর্থাৎ, যদি মানুষের মতো মানুষ হইতে হয় তবে ঐ দুটা পদার্থ জীবন হইতে বাদ দিলে চলে না। অতএব বাল্যকাল হইতে

চিন্তা ও কল্পনার চর্চা না করিলে কাজের সময় যে তাহাকে হাতের কাছে পাওয়া যাইবে না, এ কথা অতি পুরাতন।

কিন্তু আমাদের বর্তমান শিক্ষায় সে পথ একপ্রকার রুদ্ধ। আমাদিগকে বহুকাল পর্যন্ত শুদ্ধমাত্র ভাষাশিক্ষায় ব্যাপৃত থাকিতে হয়। পূর্বেই বলিয়াছি, ইংরাজি এতই বিদেশীয় ভাষা এবং আমাদের শিক্ষকেরা সাধারণত এত অল্পশিক্ষিত যে, ভাষার সঙ্গে সঙ্গে ভাব আমাদের মনে সহজে প্রবেশ করিতে পারে না। এইজন্য ইংরাজি ভাবের সহিত কিয়ৎপরিমাণে পরিচয় লাভ করিতে আমাদিগকে দীর্ঘকাল অপেক্ষা করিতে হয় এবং ততক্ষণ আমাদের চিন্তাশক্তি নিজের উপযুক্ত কোনো কাজ না পাইয়া নিতান্ত নিশ্চেষ্টভাবে থাকে। এন্‌ট্রেন্‌স্‌ এবং ফার্স্ট্‌-আর্ট্‌স্‌ পর্যন্ত কেবল চলনসই রকমের ইংরাজি শিখিতেই যায়; তার পরেই সহসা বি.এ. ক্লাসে বড়ো বড়ো পুঁথি এবং গুরুতর চিন্তাসাধ্য প্রসঙ্গ আমাদের সম্মুখে ধরিয়া দেওয়া হয়; তখন সেগুলা ভালো করিয়া আয়ত্ত করিবার সময়ও নাই, শক্তিও নাই— সবগুলা মিলাইয়া এক-একটা বড়ো বড়ো তাল পাকাইয়া একেবারে এক-এক গ্রাসে গিলিয়া ফেলিতে হয়।

যেমন যেমন পড়িতেছি অমনি সঙ্গে সঙ্গে ভাবিতেছি না ইহার অর্থ এই যে স্তূপ উঁচা করিতেছি, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নির্মাণ করিতেছি না। ইঁট সুরকি কড়ি বরগা বালি চুন যখন পর্বতপ্রমাণ উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে এমন সময় বিশ্ববিদ্যালয় হইতে হুকুম আসিল একটা তেতালার ছাদ প্রস্তুত করো। অমনি আমরা সেই উপকরণ-স্তূপের শিখরে চড়িয়া দুই বৎসর ধরিয়া পিটাইয়া তাহার উপরিভাগ কোনোমতে সমতল করিয়া দিলাম, কতকটা ছাদের মতো দেখিতে হইল। কিন্তু ইহাকে কি অট্টালিকা বলে? ইহার মধ্যে বায়ু এবং আলোক প্রবেশ করিবার কি কোনো পথ আছে? ইহার মধ্যে মনুষ্যের চিরজীবনের বাসযোগ্য কি কোনো আশ্রয় আছে? ইহা কি আমাদিগকে বহিঃ-সংসারের প্রখর উত্তাপ এবং অনাবরণ হইতে রীতিমত রক্ষা করিতে পারে? ইহার মধ্যে কি কোনো একটা শৃঙ্খলা সৌন্দর্য এবং সুষমা দেখিতে পাওয়া যায়?

মাল-মশলা যাহা জড়ো হইতেছে তাহা প্রচুর তাহার আর সন্দেহ নাই; মানসিক অট্টালিকা-নির্মাণের উপযুক্ত এত ইঁট-পাটকেল পূর্বে আমাদের আয়ত্তের মধ্যে ছিল না। কিন্তু সংগ্রহ করিতে শিখিলেই যে নির্মাণ করিতে শেখা হইল ধরিয়া লওয়া হয়, সেইটেই একটা মস্ত ভুল। সংগ্রহ এবং নির্মাণ যখন একই সঙ্গে অল্পে অল্পে অগ্রসর হইতে থাকে তখনই কাজটা পাকা রকমের হয়।

অর্থাৎ, সংগ্রহযোগ্য জিনিসটা যখনই হাতে আসে তখনই তাহার ব্যবহারটি জানা, তাহার প্রকৃত পরিচয়টি পাওয়া, জীবনের সঙ্গে সঙ্গে জীবনের আশ্রয়স্থলটি গড়িয়া তোলাই রীতিমত শিক্ষা। মানুষ এক দিকে বাড়িতেছে, আর তাহার বিদ্যা আর-এক দিকে জমা হইতেছে; খাদ্য এক দিকে ভাণ্ডারকে ভারাক্রান্ত করিতেছে, পাকযন্ত্র আর-এক দিকে আপনার জারক রসে আপনাকে জীর্ণ করিয়া ফেলিতেছে —আমাদের দেশে এই একপ্রকার অভূতপূর্ব কাণ্ড চলিতেছে।

অতএব, ছেলে যদি মানুষ করিতে চাই তবে ছেলেবেলা হইতেই তাহাকে মানুষ করিতে আরম্ভ করিতে হইবে; নতুবা সে ছেলেই থাকিবে, মানুষ হইবে না। শিশুকাল হইতেই, কেবল স্মরণশক্তির উপর সমস্ত ভর না দিয়া, সঙ্গে সঙ্গে যথা-পরিমাণে চিন্তাশক্তি ও কল্পনাশক্তির স্বাধীন পরিচালনার অবসর দিতে হইবে। সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত কেবলই লাঙল দিয়া চাষ এবং মই দিয়া ঢেলা ভাঙা,

কেবলই ঠেঙালাঠি মুখস্থ এবং এক্জামিন— আমাদের এই 'মানব-জনম'-আবাদের পক্ষে, আমাদের এই দুর্লভ ক্ষেত্রে সোনা ফলাইবার পক্ষে যথেষ্ট নহে। এই শুষ্ক ধূলির সঙ্গে, এই অবিশ্রাম কর্ষণ-পীড়নের সঙ্গে রস থাকা চাই। কারণ, মাটি যত সরস থাকে ধান তত ভালো হয়। তাহার উপর আবার এক-একটা বিশেষ সময় আসে যখন ধান্যক্ষেত্রের পক্ষে বৃষ্টি বিশেষরূপে আবশ্যক। সে সময়টি অতিক্রম হইয়া গেলে হাজার বৃষ্টি হইলেও আর তেমন সুফল ফলে না। বয়োবিকাশেরও তেমনি একটা বিশেষ সময় আছে যখন জীবন্ত ভাব এবং নবীন কল্পনাসকল জীবনের পরিণতি এবং সরসতা-সাধনের পক্ষে অত্যাবশ্যক, ঠিক সেই সময়টিতে যদি সাহিত্যের আকাশ হইতে খুব এক পশলা বর্ষণ হইয়া যায় তবে 'ধন্য রাজা পুণ্য দেশ'। নবোদ্ভিন্ন হৃদয়াঙ্কুরগুলি যখন অন্ধকার মাতৃভূমি হইতে বিপুল পৃথিবী এবং অনন্ত নীলাম্বরের দিকে প্রথম মাথা তুলিয়া দেখিতেছে, প্রচ্ছন্ন জন্মান্তঃপুরের দ্বারদেশে আসিয়া বহিঃসংসারের সহিত তাহার নূতন পরিচয় হইতেছে— যখন নবীন বিস্ময়, নবীন প্রীতি, নবীন কৌতূহল চারি দিকে আপন শীর্ষ প্রসারণ করিতেছে— তখন যদি ভাবের সমীরণ এবং চিরানন্দলোক হইতে আলোক এবং আশীর্বাদধারা নিপতিত হয়, তবেই তাহার সমস্ত জীবন যথাকালে সফল সরস এবং পরিণত হইতে পারে। কিন্তু সেই সময় যদি কেবল শুষ্ক ধূলি এবং তপ্ত বালুকা, কেবল নীরস ব্যাকরণ এবং বিদেশী অভিধান তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, তবে পরে মুষলধারায় বর্ষণ হইলেও— য়ুরোপীয় সাহিত্যের নব নব জীবন্ত সত্য, বিচিত্র কল্পনা এবং উন্নত ভাবসকল লইয়া দক্ষিণে বামে ফেলাছড়া করিলেও— সে আর তেমন সফলতা লাভ করিতে পারে না, সাহিত্যের অন্তর্নিহিত জীবনীশক্তি আর তাহার জীবনের মধ্যে তেমন সহজভাবে প্রকাশ করিতে পারে না।

আমাদের নীরস শিক্ষায় জীবনের সেই মাহেন্দ্র ক্ষণ অতীত হইয়া যায়। আমরা বাল্য হইতে কৈশোর এবং কৈশোর হইতে যৌবনে প্রবেশ করি কেবল কতকগুলা কথার বোঝা টানিয়া। সরস্বতীর সাম্রাজ্যে কেবলমাত্র মজুরি করিয়া মরি; পৃষ্ঠের মেরুদণ্ড বাঁকিয়া যায় এবং মনুষ্যত্বের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ হয় না। যখন ইংরাজি ভাবরাজ্যের মধ্যে প্রবেশ করি তখন আর সেখানে তেমন যথার্থ অন্তরঙ্গের মতো বিহার করিতে পারি না। যদি-বা ভাবগুলা একরূপ বুঝিতে পারি, কিন্তু সেগুলাকে মর্মস্থলে আকর্ষণ করিয়া লইতে পারি না; বক্তৃতায় এবং লেখায় ব্যবহার করি, কিন্তু জীবনের কার্যে পরিণত করিতে পারি না।

এইরূপে বিশ-বাইশ বৎসর ধরিয়া আমরা যে-সকল ভাব শিক্ষা করি আমাদের জীবনের সহিত তাহার একটা রাসায়নিক মিশ্রণ হয় না বলিয়া আমাদের মনের ভারী একটা অদ্ভুত চেহারা বাহির হয়। শিক্ষিত ভাবগুলি কতক আটা দিয়া জোড়া থাকে, কতক কালক্রমে ঝরিয়া পড়ে। অসভ্যেরা যেমন গায়ে রঙ মাখিয়া, উল্কি পরিয়া পরম গর্ব অনুভব করে, স্বাভাবিক স্বাস্থ্যের উজ্জ্বলতা এবং লাবণ্য আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, আমাদের বিলাতি বিদ্যা আমরা সেইরূপ গায়ের উপর লেপিয়া দম্ভভরে পা ফেলিয়া বেড়াই; আমাদের যথার্থ আন্তরিক জীবনের সহিত তাহার অল্পই যোগ থাকে। অসভ্য রাজারা যেমন কতকগুলা সস্তা বিলাতি কাচখণ্ড পুঁতি প্রভৃতি লইয়া শরীরের যেখানে সেখানে ঝুলাইয়া রাখে এবং বিলাতি সাজসজ্জা অযথাস্থানে বিন্যাস করে, বুঝিতেও পারে না কাজটা কিরূপ অদ্ভুত এবং হাস্যজনক হইতেছে, আমরাও সেইরূপ কতকগুলা সস্তা চক্চকে বিলাতি কথা

লইয়া ঝল্‌মল্‌ করিয়া বেড়াই এবং বিলাতি বড়ো বড়ো ভাবগুলি লইয়া হয়তো সম্পূর্ণ অযথাস্থানে অসংগত প্রয়োগ করি; আমরা নিজেও বুঝিতে পারি না অজ্ঞাতসারে কী একটা অপূর্ব প্রহসন অভিনয় করিতেছি এবং কাহাকেও হাসিতে দেখিলে তৎক্ষণাৎ য়ুরোপীয় ইতিহাস হইতে বড়ো বড়ো নজির প্রয়োগ করিয়া থাকি।

বাল্যকাল হইতে যদি ভাষাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ভাবশিক্ষা হয় এবং ভাবের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত জীবনযাত্রা নিয়মিত হইতে থাকে তবেই আমাদের সমস্ত জীবনের মধ্যে একটা যথার্থ সামঞ্জস্য স্থাপিত হইতে পারে, আমরা বেশ সহজ মানুষের মতো হইতে পারি এবং সকল বিষয়ের একটা যথাযথ পরিমাণ ধরিতে পারি।

যখন আমরা একবার ভালো করিয়া ভাবিয়া দেখি যে, আমরা যে ভাবে জীবন নির্বাহ করিব আমাদের শিক্ষা তাহার আনুপাতিক নহে, আমরা যে গৃহে আমৃত্যুকাল বাস করিব সে গৃহের উন্নত চিত্র আমাদের পাঠ্যপুস্তকে নাই, যে সমাজের মধ্যে আমাদিগকে জন্মযাপন করিতেই হইবে সেই সমাজের কোনো উচ্চ আদর্শ আমাদের নূতনশিক্ষিত সাহিত্যের মধ্যে লাভ করি না, আমাদের পিতা মাতা— আমাদের সুহৃৎ বন্ধু— আমাদের ভ্রাতা ভগ্নীকে তাহার মধ্যে প্রত্যক্ষ দেখি না, আমাদের দৈনিক জীবনের কার্যকলাপ তাহার বর্ণনার মধ্যে কোনো স্থান পায় না, আমাদের আকাশ এবং পৃথিবী— আমাদের নির্মল প্রভাত এবং সুন্দর সন্ধ্যা— আমাদের পরিপূর্ণ শস্যক্ষেত্র এবং দেশলক্ষ্মী স্রোতস্বিনীর কোনো সংগীত তাহার মধ্যে ধ্বনিত হয় না, তখন বুঝিতে পারি, আমাদের শিক্ষার সহিত আমাদের জীবনের তেমন নিবিড় মিলন হইবার কোনো স্বাভাবিক সম্ভাবনা নাই; উভয়ের মাঝখানে একটা ব্যবধান থাকিবেই থাকিবে; আমাদের শিক্ষা হইতে আমাদের জীবনের সমস্ত আবশ্যক অভাবের পূরণ হইতে পারিবেই না। আমাদের সমস্ত জীবনের শিকড় যেখানে সেখান হইতে শত হস্ত দূরে আমাদের শিক্ষার বৃষ্টিধারা বর্ষিত হইতেছে; বাধা ভেদ করিয়া যেটুকু রস নিকটে আসিয়া পৌঁছিতেছে সেটুকু আমাদের জীবনের শুষ্কতা দূর করিবার পক্ষে যথেষ্ট নহে। আমরা যে শিক্ষায় আজন্মকাল যাপন করি সে শিক্ষা কেবল যে আমাদিগকে কেরানিগিরি অথবা কোনো-একটা ব্যবসায়ের উপযোগী করে মাত্র, যে সিন্দুকের মধ্যে আমাদের আপিসের শামলা এবং চাদর ভাঁজ করিয়া রাখি সেই সিন্দুকের মধ্যেই যে আমাদের সমস্ত বিদ্যাকে তুলিয়া রাখিয়া দিই, আটপৌরে দৈনিক জীবনে তাহার যে কোনো ব্যবহার নাই, ইহা বর্তমান শিক্ষাপ্রণালীগুণে অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিয়াছে। এজন্য আমাদের ছাত্রদিগকে দোষ দেওয়া অন্যায়। তাহাদের গ্রন্থজগৎ এক প্রান্তে আর তাহাদের বসতিজগৎ অন্য প্রান্তে, মাঝখানে কেবল ব্যাকরণ-অভিধানের সেতু। এইজন্য যখন দেখা যায় একই লোক এক দিকে য়ুরোপীয় দর্শন বিজ্ঞান এবং ন্যায়শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, অন্য দিকে চিরকুসংস্কারগুলিকে সযত্নে পোষণ করিতেছেন— এক দিকে স্বাধীনতার উজ্জ্বল আদর্শ মুখে প্রচার করিতেছেন, অন্য দিকে অধীনতার শত সহস্র লূতাতন্তুপাশে আপনাকে এবং অন্যকে প্রতি মুহূর্তে আচ্ছন্ন ও দুর্বল করিয়া ফেলিতেছেন— এক দিকে বিচিত্রভাবপূর্ণ সাহিত্য স্বতন্ত্রভাবে সম্ভোগ করিতেছেন, অন্য দিকে জীবনকে ভাবের উচ্চ শিখরে অধিরূঢ় করিয়া রাখিতেছেন না, কেবল ধনোপার্জন এবং বৈষয়িক উন্নতি-সাধনেই ব্যস্ত— তখন আর আশ্চর্য বোধ হয় না। কারণ, তাঁহাদের বিদ্যা এবং ব্যবহারের মধ্যে একটা সত্যকার দুর্ভেদ্য ব্যবধান আছে, উভয়ে কখনো সুসংলগ্নভাবে মিলিত হইতে পায় না।

তাহার ফল হয় এই, উভয়ে উভয়ের প্রতি উত্তরোত্তর বাম হইতে থাকে। যেটা আমাদের শিক্ষিত বিদ্যা আমাদের জীবন ক্রমাগতই তাহার প্রতিবাদ করিয়া চলাতে সেই বিদ্যাটার প্রতিই আগাগোড়া অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধা জন্মিতে থাকে। মনে হয়, ও জিনিসটা কেবল ভুয়া এবং সমস্ত য়ুরোপীয় সভ্যতা ঐ ভুয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত। আমাদের যাহা আছে তাহা সমস্তই সত্য এবং আমাদের শিক্ষা যে দিকে পথ নির্দেশ করিয়া দিতেছে সে দিকে সভ্যতা-নামক একটি মায়াবিনী মহামিথ্যার সাম্রাজ্য। আমাদের অদৃষ্টক্রমে বিশেষ কারণবশতই যে আমাদের শিক্ষা আমাদের নিকট নিষ্ফল হইয়া উঠিয়াছে তাহা না মনে করিয়া আমরা স্থির করি, উহার নিজের মধ্যে স্বভাবতই একটা বৃহৎ নিষ্ফলতার কারণ বর্তমান রহিয়াছে। এইরূপে আমাদের শিক্ষাকে আমরা যতই অশ্রদ্ধা করিতে থাকি আমাদের শিক্ষাও আমাদের জীবনের প্রতি ততই বিমুখ হইতে থাকে, আমাদের চরিত্রের উপর তাহার সম্পূর্ণ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না; এইরূপে আমাদের শিক্ষার সহিত জীবনের গৃহবিচ্ছেদ ক্রমশ বাড়িয়া উঠে, প্রতি মুহূর্তে পরস্পর পরস্পরকে সুতীব্র পরিহাস করিতে থাকে এবং অসম্পূর্ণ জীবন ও অসম্পূর্ণ শিক্ষা লইয়া বাঙালির সংসারযাত্রা দুই সঙের প্রহসন হইয়া দাঁড়ায়।

এইরূপে জীবনের একতৃতীয়াংশকাল যে শিক্ষায় যাপন করিলাম তাহা যদি চিরকাল আমাদের জীবনের সহিত অসংলগ্ন হইয়া রহিল এবং অন্য শিক্ষালাভের অবসর হইতেও বঞ্চিত হইলাম, তবে আর আমরা কিসের জোরে একটা যাথার্থ্য লাভ করিতে পারিব?

আমাদের এই শিক্ষার সহিত জীবনের সামঞ্জস্যসাধনই এখনকার দিনের সর্বপ্রধান মনোযোগের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

কিন্তু এ মিলন কে সাধন করিতে পারে? বাংলা ভাষা, বাংলা সাহিত্য। যখন প্রথম বঙ্কিমবাবুর বঙ্গদর্শন একটি নূতন প্রভাতের মতো আমাদের বঙ্গদেশে উদিত হইয়াছিল তখন দেশের সমস্ত শিক্ষিত অন্তর্জগৎ কেন এমন একটি অপূর্ব আনন্দে জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছিল? য়ুরোপের দর্শনে বিজ্ঞানে ইতিহাসে যাহা পাওয়া যায় না এমন কোনো নূতন তত্ত্ব, নূতন আবিষ্কার বঙ্গদর্শন কি প্রকাশ করিয়াছিল? তাহা নহে। বঙ্গদর্শনকে অবলম্বন করিয়া একটি প্রবল প্রতিভা আমাদের ইংরাজি শিক্ষা ও আমাদের অন্তঃকরণের মধ্যবর্তী ব্যবধান ভাঙিয়া দিয়াছিল, বহুকাল পরে প্রাণের সহিত ভাবের একটি আনন্দসম্মিলন সংঘটন করিয়াছিল, প্রবাসীকে গৃহের মধ্যে আনিয়া আমাদের গৃহকে উৎসবে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছিল। এতদিন মথুরায় কৃষ্ণ রাজত্ব করিতেছিলেন, বিশ-পঁচিশ বৎসর কাল দ্বারীর সাধ্যসাধন করিয়া তাঁহার সুদূর সাক্ষাৎলাভ হইত; বঙ্গদর্শন দৌত্য করিয়া তাঁহাকে আমাদের বৃন্দাবনধামে আনিয়া দিল। এখন আমাদের গৃহে, আমাদের সমাজে, আমাদের অন্তরে একটা নূতন জ্যোতি বিকীর্ণ হইল। আমরা আমাদের ঘরের মেয়েকে সূর্যমুখী কমলমণি-রূপে দেখিলাম, চন্দ্রশেখর এবং প্রতাপ বাঙালি পুরুষকে একটা উচ্চতর ভাবলোকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিল, আমাদের প্রতিদিনের ক্ষুদ্র জীবনের উপরে একটি মহিমরশ্মি নিপতিত হইল।

বঙ্গদর্শন সেই-যে এক অনুপম নূতন আনন্দের আস্বাদ দিয়া গেছে তাহার ফল হইয়াছে এই যে, আজকালকার শিক্ষিত লোকে বাংলা ভাষায় ভাব প্রকাশ করিবার জন্য উৎসাহী হইয়া উঠিয়াছে। এটুকু বুঝিয়াছে যে, ইংরাজি আমাদের পক্ষে কাজের ভাষা, কিন্তু ভাবের ভাষা নহে। প্রত্যক্ষ দেখিয়াছে যে, যদিও আমরা

শৈশবাবধি এত একান্ত যত্নে একমাত্র ইংরাজি ভাষা শিক্ষা করি, তথাপি আমাদের দেশীয় বর্তমান স্থায়ী সাহিত্য যাহা-কিছু তাহা বাংলা ভাষাতেই প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার প্রধান কারণ, বাঙালি কখনোই ইংরাজি ভাষার সহিত তেমন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-ভাবে পরিচিত হইতে পারে না যাহাতে সাহিত্যের স্বাধীন ভাবোচ্ছ্বাস তাহার মধ্যে সহজে প্রকাশ করিতে পারে। যদি বা ভাষার সহিত তাহার তেমন পরিচয় হয় তথাপি বাঙালির ভাব ইংরাজের ভাষায় তেমন জীবন্ত-রূপে প্রকাশিত হয় না। যে-সকল বিশেষ মাধুর্য, বিশেষ স্মৃতি আমাদিগকে প্রকাশচেষ্টায় উত্তেজিত করে, যে-সকল সংস্কার পুরুষানুক্রমে আমাদের সমস্ত মনকে একটা বিশেষ গঠন দান করিয়াছে, তাহা কখনোই বিদেশী ভাষার মধ্যে যথার্থ মুক্তি লাভ করিতে পারে না।

অতএব আমাদের শিক্ষিত লোকেরা যখনই ভাব প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করেন তখনই বাংলা ভাষা অবলম্বন করিতে তাঁহাদের একটা কাতরতা জন্মে। কিন্তু হায় অভিমানিনী ভাষা, সে কোথায়! সে কি এত দীর্ঘকাল অবহেলার পর মুহূর্তের আহ্বানে অমনি তৎক্ষণাৎ তাহার সমস্ত সৌন্দর্য, তাহার সমস্ত গৌরব লইয়া একজন শিক্ষাভিমানী গর্বোদ্ধত পুরুষের নিকট আত্মসমর্পণ করিবে? হে সুশিক্ষিত, হে আর্য, তুমি কি আমাদের এই সুকুমারী সুকোমলা তরুণী ভাষার যথার্থ মর্যাদা জান? ইহার কটাক্ষে যে উজ্জ্বল হাস্য, যে অশ্রুম্লান করুণা, যে প্রখর তেজ-স্ফুলিঙ্গ, যে স্নেহ প্রীতি ভক্তি স্ফুরিত হয়, তাহার গভীর মর্ম কি কখনো বুঝিয়াছ? হৃদয়ে গ্রহণ করিয়াছ? তুমি মনে কর, 'আমি যখন মিল-স্পেন্সার পড়িয়াছি, সব কটা পাস করিয়াছি, আমি যখন এমন একজন স্বাধীন চিন্তাশীল মেধাবী যুবাপুরুষ, যখন হতভাগ্য কন্যাদায়গ্রস্ত পিতাগণ আপন কুমারী কন্যা এবং যথাসর্বস্ব লইয়া আমার দ্বারে আসিয়া সাধ্যসাধনা করিতেছে, তখন ঐ অশিক্ষিত সামান্য গ্রাম্য লোকদিগের ঘরের তুচ্ছ ভাষাটার উচিত ছিল আমার ইঙ্গিতমাত্রে আমার শরণাপন্ন হইয়া কৃতকৃতার্থ হওয়া। আমি যে ইংরাজি পড়িয়া বাংলা লিখি ইহা অপেক্ষা বাংলার সৌভাগ্য কী হইতে পারে! আমি যখন ইংরাজি ভাষায় আমার অনায়াসপ্রাপ্য যশ পরিহার করিয়া আমার এত বড়ো বড়ো ভাব এই দরিদ্র দেশে হেলায় বিসর্জন দিতেছি, তখন জীর্ণবস্ত্র দীন পান্থগণ রাজাকে দেখিলে যেমন সসম্ভ্রমে পথ ছাড়িয়া দেয় তেমনি আমার সম্মুখ হইতে সমস্ত তুচ্ছ বাধাবিপত্তির শশব্যস্ত হইয়া সরিয়া যাওয়া উচিত ছিল। একবার ভাবিয়া দেখো, আমি তোমাদের কত উপকার করিতে আসিয়াছি! আমি তোমাদিগকে পোলিটিক্যাল ইকনমি সম্বন্ধে দুই-চারি কথা বলিতে পারিব, জীবরাজ্য হইতে আরম্ভ করিয়া সমাজ এবং আধ্যাত্মিক জগৎ পর্যন্ত এভোলুশনের নিয়ম কিরূপে কার্য করিতেছে তৎসম্বন্ধে আমি যাহা শিখিয়াছি তাহা তোমাদের নিকট হইতে সম্পূর্ণ গোপন করিব না, আমার ঐতিহাসিক এবং দার্শনিক প্রবন্ধের ফুট্‌নোটে নানা ভাষার দুরূহ গ্রন্থ হইতে নানা বচন ও দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিয়া দেখাইতে পারিব, এবং বিলাতি সাহিত্যের কোন্‌ পুস্তক সম্বন্ধে কোন্‌ সমালোচক কী কথা বলেন তাহাও বাঙালির অগোচর থাকিবে না— কিন্তু যদি তোমাদের এই জীর্ণচীর অসম্পূর্ণ ভাষা আদেশমাত্র অগ্রসর হইয়া আমাকে সমাদর করিয়া না লয় তবে আমি বাংলায় লিখিব না; আমি ওকালতি করিব; ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হইব; ইংরাজি খবরের কাগজে লীডার লিখিব; তোমাদের যে কত ক্ষতি হইবে তাহার আর ইয়ত্তা নাই।'

বঙ্গদেশের পরমদুর্ভাগ্যক্রমে তাহার এই লজ্জাশীলা অথচ তেজস্বিনী নন্দিনী বঙ্গভাষা অগ্রবর্তিনী হইয়া এমন-সকল ভালো ভালো ছেলের সমাদর করে না এবং ভালো ছেলেরাও রাগ করিয়া বাংলা ভাষার সহিত কোনো সম্পর্ক রাখে না। এমন-কি, বাংলায় চিঠিও লেখে না, বন্ধুদের সহিত সাক্ষাৎ হইলে যতটা পারে বাংলা হাতে রাখিয়া ব্যবহার করে এবং বাংলা গ্রন্থ অবজ্ঞাভরে অন্তঃপুরে নির্বাসিত করিয়া দেয়। ইহাকে বলে, লঘু পাপে গুরু দণ্ড।

পূর্বে বলিয়াছি, আমাদের বাল্যকালের শিক্ষায় আমরা ভাষার সহিত ভাব পাই না। আবার বয়স হইলে ঠিক তাহার বিপরীত ঘটে; যখন ভাব জুটিতে থাকে তখন ভাষা পাওয়া যায় না। এ কথাও পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, ভাষাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ভাবশিক্ষা একত্র অবিচ্ছেদ্যভাবে বৃদ্ধি পায় না বলিয়াই য়ুরোপীয় ভাবের যথার্থ নিকটসংসর্গ আমরা লাভ করি না এবং সেইজন্যই আজকাল আমাদের অনেক শিক্ষিত লোকে য়ুরোপীয় ভাবসকলের প্রতি অনাদর প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। অন্য দিকেও তেমনি ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই আপনার মাতৃভাষাকে দৃঢ়-সম্বদ্ধ রূপে পান নাই বলিয়া মাতৃভাষা হইতে তাঁহারা দূরে পড়িয়া গেছেন এবং মাতৃভাষার প্রতি তাঁহাদের একটি অবজ্ঞা জন্মিয়া গেছে। বাংলা তাঁহারা জানেন না সে কথা স্পষ্টরূপে স্বীকার না করিয়া তাঁহারা বলেন, 'বাংলায় কি কোনো ভাব প্রকাশ করা যায়? এ ভাষা আমাদের মতো শিক্ষিত মনের উপযোগী নহে।' প্রকৃত কথা, আঙুর আয়ত্তের অতীত হইলে তাহাকে টক বলিয়া উপেক্ষা আমরা অনেক সময় অজ্ঞাতসারে করিয়া থাকি।

যে দিক হইতে যেমন করিয়াই দেখা যায়, আমাদের ভাব ভাষা এবং জীবনের মধ্যকার সামঞ্জস্য দূর হইয়া গেছে। মানুষ বিচ্ছিন্ন হইয়া নিষ্ফল হইতেছে, আপনার মধ্যে একটি অখণ্ড ঐক্যলাভ করিয়া বলিষ্ঠ হইয়া দাঁড়াইতে পারিতেছে না, যখন যেটি আবশ্যক তখন সেটি হাতের কাছে পাইতেছে না। একটি গল্প আছে, একজন দরিদ্র সমস্ত শীতকালে অল্প অল্প ভিক্ষা সঞ্চয় করিয়া যখন শীতবস্ত্র কিনিতে সক্ষম হইত তখন গ্রীষ্ম আসিয়া পড়িত, আবার সমস্ত গ্রীষ্মকাল চেষ্টা করিয়া যখন লঘুবস্ত্র লাভ করিত তখন অগ্রহায়ণ মাসের মাঝামাঝি; দেবতা যখন তাহার দৈন্য দেখিয়া দয়ার্দ্র হইয়া বর দিতে চাহিলেন তখন সে কহিল, 'আমি আর কিছু চাহি না, আমার এই হেরফের ঘুচাইয়া দাও। আমি-যে সমস্ত জীবন ধরিয়া গ্রীষ্মের সময় শীতবস্ত্র এবং শীতের সময় গ্রীষ্মবস্ত্র লাভ করি, এইটে যদি একটু সংশোধন করিয়া দাও তাহা হইলেই আমার জীবন সার্থক হয়।'

আমাদেরও সেই প্রার্থনা। আমাদের হেরফের ঘুচিলেই আমরা চরিতার্থ হই। শীতের সহিত শীতবস্ত্র, গ্রীষ্মের সহিত গ্রীষ্মবস্ত্র, কেবল একত্র করিতে পারিতেছি না বলিয়াই আমাদের এত দৈন্য; নহিলে আছে সকলই। এখন আমরা বিধাতার নিকট এই বর চাহি, আমাদের ক্ষুধার সহিত অন্ন, শীতের সহিত বস্ত্র, ভাবের সহিত ভাষা, শিক্ষার সহিত জীবন কেবল একত্র করিয়া দাও। আমরা আছি যেন—

পানীমে মীন পিয়াসী
শুনত শুনত লাগে হাসি।

আমাদের পানিও আছে পিয়াসও আছে দেখিয়া পৃথিবীর লোক হাসিতেছে এবং আমাদের চক্ষে অশ্রু আসিতেছে, কেবল আমরা পান করিতে পারিতেছি না।

পৌষ ১২৯৯

ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ

পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে এমন দিন ছিল যখন ইংরেজি পাঠশালা হইতে আমাদের একেবারে ছুটি ছিল না। বাড়ি আসিতাম, সেখানেও পাঠশালা পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিয়া আসিত। বন্ধুকেও সম্ভাষণ করিতাম ইংরেজিতে, পিতাকেও পত্র লিখিতাম ইংরেজিতে, প্রাণের কথা বলিতাম ইংরেজি কাব্যে, দেশের লোককে সভায় আহ্বান করিতাম ইংরেজি বক্তৃতায়। আজ যখন সেই পাঠশালা হইতে, একেবারে না হউক, ক্ষণে ক্ষণে ছুটি পাইয়া থাকি, তখন সেই ছুটির সময়টাতে আনন্দ করিব কোথায়? মাতার অন্তঃপুরে নহে কি? দিনের পড়া তো শেষ হইল, তার পরে ক্রিকেট-খেলাতেও নাহয় রণজিৎ হইয়া উঠিলাম। তার পরে? তার পরে গৃহবাতায়ন হইতে মাতার স্বহস্তজ্বালিত সন্ধ্যাদীপটি কি চোখে পড়িবে না? যদি পড়ে তবে কি অবজ্ঞা করিয়া বলিব 'ওটা মাটির প্রদীপ'? ঐ মাটির প্রদীপের পশ্চাতে কি মাতার গৌরব নাই? যদি মাটির প্রদীপই হয় তো সে দোষ কার? মাতার কক্ষে সোনার প্রদীপ গড়িয়া দিতে কে বাধা দিয়াছে? যেমনি হউক-না কেন, মাটিই হউক আর সোনাই হউক, যখন আনন্দের দিন আসিবে তখন ঐখানেই আমাদের উৎসব; আর যখন দুঃখের অন্ধকার ঘনাইয়া আসে তখন রাজপথে দাঁড়াইয়া চোখের জল ফেলা যায় না, তখন ঐ গৃহ ছাড়া আর গতি নাই।

আজ এখানে আমরা সেই পাঠশালার ফেরত আসিয়াছি। আজ সাহিত্য-পরিষদ্‌ আমাদিগকে যেখানে আহ্বান করিয়াছেন তাহা কলেজ-ক্লাস হইতে দূরে, তাহা ক্রিকেট-ময়দানেরও সীমান্তরে, সেখানে আমাদের দরিদ্র জননীর সন্ধ্যা-বেলাকার মাটির প্রদীপটিই জ্বলিতেছে।

পরীক্ষাশালা হইতে আজ তোমরা সদ্য আসিতেছ, সেইজন্য ঘরের কথা আজই তোমাদিগকে স্মরণ করাইবার যথার্থ অবকাশ উপস্থিত হইয়াছে; সেইজন্যই বঙ্গবাণীর হইয়া বঙ্গীয়-সাহিত্যপরিষদ্‌ আজ তোমাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন।

কলেজের বাহিরে যে দেশ পড়িয়া আছে তাহার মহত্ত্ব একেবারে ভুলিলে চলিবে না। কলেজের শিক্ষার সঙ্গে দেশের একটা স্বাভাবিক যোগ স্থাপন করিতে হইবে।

অন্য দেশে সে যোগ চেষ্টা করিয়া স্থাপন করিতে হয় না। সে-সকল দেশের কলেজ দেশেরই একটা অঙ্গ—সমস্ত দেশের আভ্যন্তরিক প্রকৃতি তাহাকে গঠিত করিয়া তোলাতে দেশের সহিত কোথাও তাহার কোনো বিচ্ছেদের রেখা নাই। আমাদের কলেজের সহিত দেশের ভেদচিহ্নহীন সুন্দর ঐক্য স্থাপিত হয় নাই।

এমন অবস্থায় আমাদের বিশেষ চিন্তার বিষয় এই হইয়াছে, কী করিলে বিদেশী-চালিত কলেজের শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রদিগকে একটা স্বাধীন শিক্ষায় নিযুক্ত করিয়া শিক্ষাকার্যকে যথার্থভাবে সম্পূর্ণ করা যাইতে পারে। তাহা না করিলে শিক্ষাকে কোনোমতে পুঁথির গণ্ডির বাহিরে আনা দুঃসাধ্য হইবে।

নানা আলোচনা, নানা বাদ-প্রতিবাদের ভিতর দিয়া পাঠ্যবিষয়গুলি যেখানে প্রত্যহ প্রস্তুত হইয়া উঠিতেছে—যাঁহারা আবিষ্কার করিতেছেন, সৃষ্টি করিতেছেন, প্রকাশ করিতেছেন, তাঁহারাই যেখানে শিক্ষা দিতেছেন সেখানে শিক্ষা জড় শিক্ষা নহে। সেখানে কেবল যে বিষয়গুলিকেই পাওয়া যায় তাহা নহে, সেই সঙ্গে দৃষ্টির শক্তি, মননের উদ্যম, সৃষ্টির উৎসাহ পাওয়া যায়। এমন অবস্থায় পুঁথিগত বিদ্যার

অসহ্য জুলুম থাকে না, গ্রন্থ হইতে যেটুকু লাভ করা যায় তাহারই মধ্যে একান্তভাবে বদ্ধ হইতে হয় না।

আমাদের দেশেও পুঁথিকে মনের রাজা না করিয়া মনকে পুঁথির উপর আধিপত্য দিবার উপায় একটু বিশেষভাবে চিন্তা ও একটু বিশেষ উদ্‌যোগের সহিত সম্পন্ন করিতে হইবে। এই কাজের জন্য আমি বঙ্গীয়-সাহিত্যপরিষদ্‌কে অনুরোধ করিতেছি — আমার অনুনয়, বাঙালি ছাত্রদের জন্য তাঁহারা যথাসম্ভব একটি স্বাধীন শিক্ষার ক্ষেত্র প্রসারিত করিয়া দিন, যে ক্ষেত্রে ছাত্রগণ কিঞ্চিৎপরিমাণেও নিজের শক্তিপ্রয়োগ ও বুদ্ধির কর্তৃত্ব অনুভব করিয়া চিত্তবৃত্তিকে স্ফূর্তিদান করিতে পারিবে।

বাংলাদেশের সাহিত্য ইতিহাস ভাষাতত্ত্ব লোকবিবরণ প্রভৃতি যাহা-কিছু আমাদের জ্ঞাতব্য, সমস্তই বঙ্গীয়-সাহিত্যপরিষদের অনুসন্ধান ও আলোচনার বিষয়। দেশের এই-সমস্ত বৃত্তান্ত জানিবার ঔৎসুক্য আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক হওয়া উচিত ছিল; কিন্তু তাহা না হইবার কারণ, আমরা শিশুকাল হইতে ইংরেজি বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক, যাহা ইংরেজ ছেলেদের জন্য রচিত, তাহাই পড়িয়া আসিতেছি। ইহাতে নিজের দেশ আমাদের কাছে অস্পষ্ট এবং পরের দেশের জিনিস আমাদের কাছে অধিকতর পরিচিত হইয়া আসিয়াছে।

এজন্য কাহাকেও দোষ দেওয়া যায় না। আমাদের দেশের যথার্থ বিবরণ আজ পর্যন্ত প্রস্তুত হইয়া উঠে নাই; সেইজন্য যদিও আমরা স্বদেশে বাস করিতেছি তথাপি স্বদেশ আমাদের জ্ঞানের কাছে সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র হইয়া আছে।

এইরূপে স্বদেশকে মুখ্যভাবে সম্পূর্ণভাবে আমাদের জ্ঞানের আয়ত্ত না করিবার একটা দোষ এই যে, স্বদেশের সেবা করিবার জন্য আমরা কেহ যথার্থভাবে যোগ্য হইতে পারি না। আর-একটা কথা এই, জ্ঞানশিক্ষা নিকট হইতে দূরে, পরিচিত হইতে অপরিচিতের দিকে গেলেই তাহার ভিত্তি পাকা হইতে পারে। যে বস্তু চতুর্দিকে বিস্তৃত নাই, যে বস্তু সম্মুখে উপস্থিত নাই, আমাদের জ্ঞানের চর্চা যদি প্রধানত তাহাকে অবলম্বন করিয়াই হইতে থাকে তবে সে জ্ঞান দুর্বল হইবেই। যাহা পরিচিত তাহাকে সম্পূর্ণরূপে যথার্থভাবে আয়ত্ত করিতে শিখিলে তবে যাহা অপ্রত্যক্ষ, যাহা অপরিচিত, তাহাকে গ্রহণ করিবার শক্তি জন্মে।

আমাদের বিদেশী গুরুরা প্রায়ই আমাদিগকে খোঁটা দিয়া বলেন যে, ‘এতদিন যে তোমরা আমাদের পাঠশালে এত করিয়া পড়িলে, কিন্তু তোমাদের উদ্ভাবনাশক্তি জন্মিল না, কেবল কতকগুলো মুখস্থ বিদ্যা সংগ্রহ করিলে মাত্র।’

যদি তাঁহাদের এ অপবাদ সত্য হয় তবে ইহার প্রধান কারণ এই, বস্তুর সহিত বহির সহিত আমরা মিলাইয়া শিখিবার অবকাশ পাই না। আমাদের অধিকাংশ শিক্ষা যে-সকল দৃষ্টান্ত আশ্রয় করে তাহা আমাদের দৃষ্টিগোচর নহে। আমরা ইতিহাস পড়ি; কিন্তু যে ইতিহাস আমাদের দেশের জনপ্রবাহকে অবলম্বন করিয়া প্রস্তুত হইয়া উঠিয়াছে, যাহার নানা লক্ষণ নানা স্মৃতি আমাদের ঘরে বাহিরে নানা স্থানে প্রত্যক্ষ হইয়া আছে, তাহা আমরা আলোচনা করি না বলিয়া ইতিহাস যে কী জিনিস তাহার উজ্জ্বল ধারণা আমাদের হইতেই পারে না। আমরা ভাষাতত্ত্ব মুখস্থ করিয়া পরীক্ষায় উচ্চ স্থান অধিকার করি; কিন্তু আমাদের নিজের মাতৃভাষা কালে কালে প্রদেশে প্রদেশে কেমন করিয়া যে নানা রূপান্তরের মধ্যে নিজের ইতিহাস প্রত্যক্ষ নিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে তাহা তেমন করিয়া দেখি না বলিয়াই ভাষারহস্য আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হইয়া উঠে না। এক ভারতবর্ষে সমাজ ও ধর্মের

যেমন বহুতর অবস্থাবৈচিত্র্য আছে, এমন বোধ হয় আর কোনো দেশে নাই। অনুসন্ধানপূর্বক অভিনিবেশপূর্বক সেই বৈচিত্র্য আলোচনা করিয়া দেখিলে সমাজ ও ধর্মের বিজ্ঞান আমাদের কাছে যেমন উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে এমন দূরদেশের ধর্ম ও সমাজ-সম্বন্ধীয় বই পড়িয়া মাত্র কখনো হইতেই পারে না।

ধারণা যখন অস্পষ্ট ও দুর্বল থাকে তখন উদ্ভাবনাশক্তির আশা করা যায় না; এমন-কি, তখনকার সমস্ত উদ্ভাবনা অবাস্তবিক অদ্ভুত আকার ধারণ করে। এইজন্যই আমরা কেতাবে ইতিহাস শিখিয়াও ঐতিহাসিক বিচার তেমন করিয়া আয়ত্ত করিতে পারি নাই, কেতাবে বিজ্ঞান শিখিয়াও অদ্ভুতপূর্ব কাল্পনিকতাকে বিজ্ঞান বলিয়া চালাইয়া থাকি, ধর্ম সমাজ এমন-কি সাহিত্য-সমালোচনাতেও অপ্রমত্ত পরিমাণবোধ রক্ষা করিতে পারি না।

বাস্তবিকতাবিবর্জিত হইলে আমাদের মনই বলো, হৃদয়ই বলো, কল্পনাই বলো, কৃশ এবং বিকৃত হইয়া যায়। আমাদের দেশহিতৈষা ইহার প্রমাণ। দেশের লোকের হিতের সঙ্গে এই হিতৈষার যোগ নাই। দেশের লোক রোগে মরিতেছে, দারিদ্র্যে জীর্ণ হইতেছে, অশিক্ষা ও কুশিক্ষায় নষ্ট হইতেছে—ইহার প্রতিকারের জন্য যাহারা কিছুমাত্র নিজের চেষ্টা প্রয়োগ করিতে প্রবৃত্ত হয় না তাহারা বিদেশী সাহিত্য-ইতিহাসের পুঁথিগত প্যাট্রিয়টিজ্‌ম্‌ নানাপ্রকার অসংগত অনুকরণের দ্বারা 'লাভ করিয়াছি' বলিয়া কল্পনা করে। এইজন্যই, এত কাল গেল, তথাপি এই প্যাট্রিয়টিজ্‌ম্‌ আমাদিগকে যথার্থ কোনো ত্যাগস্বীকারে প্রবৃত্ত করিতে পারিল না। যে দেশে প্যাট্রিয়টিজ্‌ম্‌ অবাস্তব নহে, পুঁথিগত অনুকরণ-মূলক নহে, সেখানকার লোক দেশের জন্য অনায়াসে প্রাণ দিতেছে; আমরা সামান্য অর্থ দিতে পারি না, সময় দিতে পারি না, আমাদের দেশ যে কিরূপ তাহা সন্ধানপূর্বক জানিবার জন্য উৎসাহ অনুভব করি না। যোশিদা তোরাজিরো জাপানের একজন বিখ্যাত প্যাট্রিয়ট ছিলেন। তিনি তাঁহার প্রথমাবস্থায় চালচিঁড়া বাঁধিয়া পায়ে হাঁটিয়া ক্রমাগতই সমস্ত দেশ কেবল ভ্রমণ করিয়া বেড়াইয়াছেন। এইরূপে দেশকে তন্ন তন্ন করিয়া জানিয়া তাহার পরে ছাত্র পড়াইবার কাজে নিযুক্ত হন; শেষ দশায় তাঁহাকে দেশের কাজে প্রাণ দিতে হইয়াছিল। এরূপ প্যাট্রিয়টিজ্‌মের অর্থ বুঝা যায়। দেশের বাস্তবিক জ্ঞান এবং দেশের বাস্তবিক কাজের উপরে যখন দেশহিতৈষা প্রতিষ্ঠিত হয় তখনই তাহা মাটিতে বদ্ধমূল গাছের মতো ফল দিতে থাকে।

অতএব এ কথা যদি সত্য হয় যে, প্রত্যক্ষ বস্তুর সহিত সংস্রব ব্যতীত জ্ঞানই বলো, ভাবই বলো, চরিত্রই বলো, নির্জীব ও নিষ্ফল হইতে থাকে, তবে আমাদের ছাত্রদের শিক্ষাকে সেই নিষ্ফলতা হইতে যথাসাধ্য রক্ষা করিতে চেষ্টা করা অত্যাবশ্যক।

বাংলাদেশ আমাদের নিকটতম—ইহারই ভাষা সাহিত্য ইতিহাস সমাজতত্ত্ব প্রভৃতিকে বঙ্গীয়-সাহিত্যপরিষদ্‌ আপনার আলোচ্য বিষয় করিয়াছেন। পরিষদের নিকট আমার নিবেদন এই যে, এই আলোচনাব্যাপারে তাঁহারা ছাত্রদিগকে আহ্বান করিয়া লউন। তাহা হইলে প্রত্যক্ষ বস্তুর সম্পর্কে ছাত্রদের বীক্ষণশক্তি ও মননশক্তি সবল হইয়া উঠিবে এবং নিজের চারি দিককে, নিজের দেশকে ভালো করিয়া জানিবার অভ্যাস হইলে অন্য সমস্ত জানিবার যথার্থ ভিত্তিপত্তন হইতে পারিবে। তা ছাড়া, নিজের দেশকে ভালো করিয়া জানার চর্চা নিজের দেশকে যথার্থভাবে প্রীতির চর্চার অঙ্গ।

বাংলাদেশে এমন জিলা নাই যেখান হইতে কলিকাতায় ছাত্রসমাগম না হইয়াছে।

দেশের সমস্ত বৃত্তান্ত-সংগ্রহে ইঁহাদের যদি সহায়তা পাওয়া যায় তবে সাহিত্য-পরিষদ্ সার্থকতা লাভ করিবেন। এ সাহায্য কিরূপ এবং তাহার কত দূর প্রয়োজনীয়তা তাহার দুই-একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে।

বাংলাভাষায় একখানি ব্যাকরণ-রচনা সাহিত্যপরিষদের একটি প্রধান কাজ। কিন্তু কাজটি সহজ নহে। এই ব্যাকরণের উপকরণ-সংগ্রহ একটি দুরূহ ব্যাপার। বাংলাদেশের ভিন্ন ভিন্ন অংশে যতগুলি উপভাষা প্রচলিত আছে তাহারই তুলনাগত ব্যাকরণই যথার্থ বাংলার বৈজ্ঞানিক ব্যাকরণ। আমাদের ছাত্রগণ সমবেতভাবে কাজ করিতে থাকিলে এই বিচিত্র উপভাষার উপকরণগুলি সংগ্রহ করা কঠিন হইবে না।

বাংলায় এমন প্রদেশ নাই যেখানে স্থানে স্থানে প্রাকৃত লোকদের মধ্যে নূতন নূতন ধর্মসম্প্রদায়ের সৃষ্টি না হইতেছে। শিক্ষিত লোকেরা এগুলির কোনো খবরই রাখেন না। তাঁহারা এ কথা মনেই করেন না প্রকাণ্ড জনসম্প্রদায় অলক্ষ্য-গতিতে নিঃশব্দচরণে চলিয়াছে, আমরা অবজ্ঞা করিয়া তাহাদের দিকে তাকাই না বলিয়া যে তাহারা স্থির হইয়া বসিয়া আছে তাহা নহে; নূতন কালের নূতন শক্তি তাহাদের মধ্যে পরিবর্তনের কাজ করিতেছেই, সে পরিবর্তন কোন্ পথে চলিতেছে, কোন্ রূপ ধারণ করিতেছে, তাহা না জানিলে দেশকে জানা হয় না। শুধু যে দেশকে জানাই চরম লক্ষ্য তাহা আমি বলি না। যেখানেই হউক-না কেন, মানব-সাধারণের মধ্যে যা-কিছু ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া চলিতেছে তাহা ভালো করিয়া জানারই একটা সার্থকতা আছে, পুঁথি ছাড়িয়া সজীব মানুষকে প্রত্যক্ষ পড়িবার চেষ্টা করাতেই একটা শিক্ষা আছে; তাহাতে শুধু জানা নয়, কিন্তু জানিবার শক্তির এমন একটা বিকাশ হয় যে কোনো ক্লাসের পড়ায় তাহা হইতেই পারে না। পরিষদের অধিনায়কতায় ছাত্রগণ যদি স্ব স্ব প্রদেশের নিম্নশ্রেণীর লোকের মধ্যে যে-সমস্ত ধর্মসম্প্রদায় আছে তাহাদের বিবরণ সংগ্রহ করিয়া আনিতে পারেন, তবে মন দিয়া মানুষের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবার যে-একটা শিক্ষা তাহাও লাভ করিবেন এবং সেই সঙ্গে দেশেরও কাজ করিতে পারিবেন।

আমরা নৃতত্ত্ব অর্থাৎ ethnologyর বই যে পড়ি না তাহা নহে। কিন্তু যখন দেখিতে পাই সেই বই পড়ার দরুন আমাদের ঘরের পাশে যে হাড়ি ডোম কৈবর্ত বাগ্দি রহিয়াছে তাহাদের সম্পূর্ণ পরিচয় পাইবার জন্য আমাদের লেশমাত্র ঔৎসুক্য জন্মে না তখনই বুঝিতে পারি, পুঁথি সম্বন্ধে আমাদের কত বড়ো একটা কুসংস্কার জন্মিয়া গেছে, পুঁথিকে আমরা কত বড়ো মনে করি এবং পুঁথি যাহার প্রতিবিম্ব তাহাকে কতই তুচ্ছ বলিয়া জানি। কিন্তু জ্ঞানের সেই আদিনিকেতনে একবার যদি জড়ত্ব ত্যাগ করিয়া প্রবেশ করি তাহা হইলে আমাদের ঔৎসুক্যের সীমা থাকিবে না। আমাদের ছাত্রগণ যদি তাঁহাদের এইসকল প্রতিবেশীদের সমস্ত খোঁজে একবার ভালো করিয়া নিযুক্ত হন তবে কাজের মধ্যেই কাজের পুরস্কার পাইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

সন্ধান ও সংগ্রহ করিবার বিষয় এমন কত আছে তাহার সীমা নাই। আমাদের ব্রতপার্বণগুলি বাংলার এক অংশে যেরূপ অন্য অংশে সেরূপ নহে। স্থানভেদে সামাজিক প্রথার অনেক বিভিন্নতা আছে। এ ছাড়া গ্রাম্য ছড়া, ছেলে ভুলাইবার ছড়া, প্রচলিত গান প্রভৃতির মধ্যে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় নিহিত আছে। বস্তুত দেশবাসীর পক্ষে দেশের কোনো বৃত্তান্তই তুচ্ছ নহে, এই কথা মনে রাখিয়াই সাহিত্যপরিষদ্ নিজের কর্তব্য নিরূপণ করিয়াছেন।

আমাদের ছাত্রগণকে পরিষদের কর্মশালায় সহায়স্বরূপে আকর্ষণ করিবার জন্য

আমার অনুরোধ পরিষদ্ গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়াই অদ্যকার এই সভায় আমি ছাত্রগণকে আমন্ত্রণ করিবার ভার লইয়াছি। সেই কাজে প্রবৃত্ত হইবার সময় আমাদের তরুণাবস্থার কথা আমার মনে পড়িতেছে।

আমাদের তরুণাবস্থা বলিলে যে অত্যন্ত সুদূর কালের কথা বোঝায় এত বড়ো প্রাচীনত্বের দাবি আমি করিতে পারি না; কিন্তু আমাদের তখনকার দিনের সঙ্গে এখনকার দিনের এমন একটা পরিবর্তন দেখিতে পাই যে, সেই অদূরবর্তী সময়কে যেন একটা যুগান্তর বলিয়া মনে হয়। এই পরিবর্তনটা বয়সের দোষে আমি দেখিতেছি অথবা এই পরিবর্তনটা সত্যই ঘটিয়াছে, তাহা ভাবিবার বিষয়। একটু বয়স বেশি হইলেই প্রাচীনতর লোকেরা তাঁহাদের সে কালের সঙ্গে তুলনা করিয়া এ কালকে খোঁটা দিতে বসেন তাহার একটা কারণ, সে কাল তাঁহাদের আশা করিবার কাল ছিল এবং এ কালটা তাঁহাদের হিসাব বুঝিবার দিন। তাঁহারা ভুলিয়া যান, এ কালের যুবকেরাও আশা করিয়া জীবন আরম্ভ করিতেছে, এখনো তাহারা চশমা-চোখে হিসাব মিটাইতে বসে নাই। অতএব আমাদের সেদিনকার কালের সঙ্গে অদ্যকার কালের যে প্রভেদটা আমি দেখিতেছি তাহা যথার্থ কি না তাহার বিচারক একা আমি নহি, তোমাদিগকেও তাহা বিচার করিয়া দেখিতে হইবে।

সত্যমিথ্যা নিশ্চয় জানি না, কিন্তু মনে হয়, এখনকার ছেলেদের চেয়ে তখন আমরা অনেক বেশি ছেলেমানুষ ছিলাম। সেটা ভালো কি মন্দ তাহার দুই পক্ষেই বলিবার কথা আছে, কিন্তু ছেলেমানুষ থাকিবার একটা গুণ এই ছিল যে, আমাদের আশার অন্ত ছিল না, ভবিষ্যতের দিকে কী চোখে যে চাহিতাম— কিছুই অসাধ্য এবং অসম্ভব বলিয়া মনে হইত না। তখন আমরা এমন-সকল সভা করিয়াছিলাম, এমন-সকল দল বাঁধিয়াছিলাম, এমন-সকল সংকল্পে বদ্ধ হইয়াছিলাম, যাহা এখনকার দিনে তোমরা শুনিলে নিশ্চয় হাস্য সম্বরণ করিতে পারিবে না— এবং আমাদের সাহিত্যে কোনো কোনো স্থলে আমাদের সেদিনকার চিত্র হাস্যরসরঞ্জিত তুলিকায় চিত্রিত হইয়াছে বলিয়া আমার বিশ্বাস।

কিন্তু সব কথা যদি খুলিয়া বলি তবে তোমরা এই মনে করিয়া বিস্মিত হইবে যে, আমাদের সে কালে আমরা, বালকেরা, সকলেই যে একবয়সি ছিলাম তাহা নহে, আমাদের মধ্যে পক্ককেশের অভাব ছিল না এবং তাঁহাদের আশা ও উৎসাহ আমাদের চেয়ে যে কিছুমাত্র অল্প ছিল তাহাও বলিতে পারি না। তখন আমরা নবীনে প্রবীণে মিলিয়া ভয় লজ্জা নৈরাশ্য কেমন নিঃশেষে বিসর্জন দিয়াছিলাম তাহা আজও ভুলিতে পারিব না।

সে দিনের চেয়ে নিঃসন্দেহই আজ আমরা অনেক বিষয়ে অগ্রসর হইয়াছি, কিন্তু আজ আকাশে আশার আলোক যেন ম্লান এবং পথিকের হস্তে আনন্দের পাথেয় যেন অপ্রচুর।

কেন এমনটা ঘটিল, তাহার জবাবদিহি এখনকার কালের নহে, আমাদিগকেই তাহার কৈফিয়ত দিতে হইবে। যে আশার সম্বল লইয়া যাত্রা আরম্ভ করিয়াছিলাম তাহা পথের মধ্যে কোন্‌খানে উড়াইয়া পুড়াইয়া দিয়া আজ এমন রিক্ত হইয়া বসিয়া আছি?

অপরিমিত আশা উৎসাহ আমাদের অল্প বয়সের প্রথম সম্বল; কর্মের পথে যাত্রা করিবার আরম্ভকালে বিধাতৃমাতা এইটে আমাদের অঞ্চলপ্রান্তে বাঁধিয়া আশীর্বাদ করিয়া প্রেরণ করেন। কিন্তু অর্থ যেমন খাদ্য নহে, তাহা ভাঙাইয়া তবে খাইতে হয়, তেমনি আশা-উৎসাহ মাত্র আমাদিগকে সার্থক করে না, তাহাকে

বিশেষ কাজে খাটাইয়া তবে ফললাভ করি। সে কথা ভুলিয়া আমরা বরাবর ঐ আশা-উৎসাহেই পেট ভরাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম।

শিশুরা শুইয়া শুইয়াই হাত পা ছুঁড়িতে থাকে, তাহাদের সেই শরীর-সঞ্চালনের কোনো লক্ষ্য নাই। প্রথমাবস্থায় শক্তির এইরূপ অনির্দিষ্ট বিক্ষেপের একটা অর্থ আছে, কিন্তু সেই অকারণ হাত-পা ছোঁড়া ক্রমে যদি তাহাকে সকারণ চেষ্টার জন্য প্রস্তুত করিয়া না তোলে তবে তাহা ব্যাধি বলিয়াই গণ্য হইবে।

আমাদেরও অল্প বয়সের উদ্যমগুলি প্রথমে কেবলমাত্র নিজের আনন্দেই বিক্ষিপ্তভাবে উদ্দামভাবে চারি দিকে সঞ্চালিত হইতেছিল; তখনকার পক্ষে তাহা অদ্ভুত ছিল না, তাহা বিদ্রূপের বিষয় ছিল না। কিন্তু ক্রমেই যখন দিন যাইতে লাগিল, এবং আমরা কেবল পড়িয়া পড়িয়া অঙ্গসঞ্চালন করিতে লাগিলাম, কিন্তু চলিতে লাগিলাম না, শরীরের আক্ষেপবিক্ষেপকেই অগ্রসর হইবার উপায় বলিয়া কল্পনা করিতে লাগিলাম, তখন আর আনন্দের কারণ রহিল না—এবং এক সময়ে যাহা আবশ্যক ছিল অন্য সময়ের পক্ষে তাহাই দুশ্চিন্তার বিষয় হইয়া উঠিল।

আমাদের প্রথম বয়সে ভারতমাতা ভারতলক্ষ্মী প্রভৃতি শব্দগুলি বৃহদায়তন লাভ করিয়া আমাদের কল্পনাকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল। কিন্তু মাতা যে কোথায় প্রত্যক্ষ আছেন তাহা কখনো স্পষ্ট করিয়া ভাবি নাই; লক্ষ্মী দূরে থাকুন, তাঁহার পেচকটাকে পর্যন্ত কখনো চক্ষে দেখি নাই। আমরা বায়রনের কাব্য পড়িয়াছিলাম, গ্যারিবল্ডির জীবনী আলোচনা করিয়াছিলাম এবং প্যাট্রিয়টিজ্‌মের ভাবরস-সম্ভোগের নেশায় একেবারে তলাইয়া গিয়াছিলাম।

মাতালের পক্ষে মদ্য যেরূপ খাদ্যের অপেক্ষা প্রিয় হয়, আমাদের পক্ষেও দেশহিতৈষার নেশা স্বয়ং দেশের চেয়েও বড়ো হইয়া উঠিয়াছিল। যে দেশ প্রত্যক্ষ তাহার ভাষাকে বিস্মৃত হইয়া, তাহার ইতিহাসকে অপমান করিয়া, তাহার সুখ-দুঃখকে নিজের জীবনযাত্রা হইতে বহু দূরে রাখিয়াও আমরা দেশহিতৈষী হইতেছিলাম। দেশের সহিত লেশমাত্র লিপ্ত না হইয়াও বিদেশীয় রাজদরবারকেই দেশহিতৈষিতার একমাত্র কার্যক্ষেত্র বলিয়া গণ্য করিতেছিলাম। এমন অবস্থাতেও, এমন ফাঁকি দিয়াও, ফললাভ করিব, আনন্দলাভ করিব, উৎসাহকে বরাবর বজায় রাখিব, এমন আশা করিতে গেলে বিশ্ববিধাতার চক্ষে ধুলা দিবার আয়োজন করিতে হয়।

'আইডিয়া' যত বড়োই হউক, তাহাকে উপলব্ধি করিতে হইলে একটা নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধ জায়গায় প্রথম হস্তক্ষেপ করিতে হইবে। তাহা ক্ষুদ্র হউক, দীন হউক, তাহাকে লঙ্ঘন করিলে চলিবে না। দূরকে নিকট করিবার একমাত্র উপায় নিকট হইতে সেই দূরে যাওয়া। ভারতমাতা যে হিমালয়ের দুর্গম চূড়ার উপরে শিলাসনে বসিয়া কেবলই করুণ সুরে বীণা বাজাইতেছেন, এ কথা ধ্যান করা নেশা করা মাত্র। কিন্তু ভারতমাতা যে আমাদের পল্লীতেই পঙ্কশেষ পানাপুকুরের ধারে ম্যালেরিয়া-জীর্ণ প্লীহারোগীকে কোলে লইয়া তাহার পথ্যের জন্য আপন শূন্য ভাণ্ডারের দিকে হতাশ দৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন, ইহা দেখাই যথার্থ দেখা। যে ভারতমাতা ব্যাস বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের তপোবনে শমীবৃক্ষমূলে আলবালে জলসেচন করিয়া বেড়াইতেছেন তাঁহাকে করজোড়ে প্রণাম করিলেই যথেষ্ট, কিন্তু আমাদের ঘরের পাশে যে জীর্ণচীরধারিণী ভারতমাতা ছেলেটাকে ইংরেজিবিদ্যালয়ে শিখাইয়া কেরানিগিরির বিড়ম্বনার মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া দিবার জন্য অর্ধাশনে পরের

পাকশালে রাঁধিয়া বেড়াইতেছেন তাঁহাকে তো অমন কেবলমাত্র প্রণাম করিয়া সারা যায় না।

যাহাই হউক, কিছুই হইল না। বিজয়ীর মতো বাহির হইলাম, ভিখারির মতো পরের দ্বারে দাঁড়াইলাম, অবশেষে সংসারী হইয়া দাওয়ায় বসিয়া সেভিংস্-ব্যাঙ্কের খাতা খুলিলাম। কারণ, যে ভারতমাতা, যে ভারতলক্ষ্মী কেবল সাহিত্যের ইন্দ্রধনুবাষ্পে রচিত, যাহা পরানুসরণের মৃগতৃষ্ণিকার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত, তাহার চেয়ে নিজের সংসারটুকু যে ঢের বেশি প্রত্যক্ষ, নিজের জঠরগহ্বরটা যে ঢের বেশি সুনির্দিষ্ট। এবং ভারতমাতার অশ্রুধারা ঝিঁঝিটখাম্বাজ রাগিণীতে যতই মর্মভেদী হউক-না, ডেপুটিগিরিতে মাসে মাসে যে স্বর্ণঝংকারমধুর বেতনটি মিলে তাহাতে সম্পূর্ণ সান্ত্বনা পাওয়া যায়, ইহা পরীক্ষিত। এমনি করিয়া যে মানুষ একদিন উদারভাবে বিস্ফারিত হইয়া দিন আরম্ভ করে সে যখন সেই ভাবপুঞ্জকে কোনো প্রত্যক্ষ বস্তুতে প্রয়োগ করিতে না পারে, তখন সে আত্মম্ভরি স্বার্থপর হইয়া ব্যর্থভাবে দিনশেষ করে; একদিন যে ব্যক্তি নিজের ধনপ্রাণ সমস্তই হঠাৎ দিয়া ফেলিবার জন্য প্রস্তুত হয় সে যখন দান করিবার কোনো লক্ষ্য নির্ণয় করিতে পারে না, কেবল সংকল্পকল্পনার বিলাসভোগেই আপনাকে পরিতৃপ্ত করে, সে একদিন এমন কঠিনহৃদয় হইয়া উঠে যে উপবাসী স্বদেশকে যদি সুদূর পথে দেখে তবে টাকা ভাঙাইয়া সিকিটি বাহির করিবার ভয়ে দ্বার রুদ্ধ করিয়া দেয়। ইহার কারণ এই যে, শুষ্কমাত্র ভাব যত বড়োই হউক, ক্ষুদ্রতম প্রত্যক্ষ বস্তুর কাছে তাহাকে পরাস্ত হইতে হইবে।

এইজন্যই বলিতেছিলাম, যাহা আমরা পুঁথি হইতে পড়িয়া পাইয়াছি, যাহাকে আমরা ভাবসম্ভোগ বা অহংকারতৃপ্তির উপায়স্বরূপ করিয়া রসালস জড়ত্বের মধ্যে উপস্থিত হইয়াছি ও ক্রমে অবসাদের মধ্যে অবতরণ করিতেছি, তাহাকে প্রত্যক্ষতার মূর্তি, বাস্তবিকতার গুরুত্ব দান করিলে তবে আমরা রক্ষা পাইব। শুধু বড়ো জিনিস কল্পনা করিলেও হইবে না, বড়ো দান ভিক্ষা করিলেও হইবে না, এবং ছোটো মুখে বড়ো কথা বলিলেও হইবে না, দ্বারের পার্শ্বে নিতান্ত ছোটো কাজ শুরু করিতে হইবে। বিলাতের প্রাসাদে গিয়া রোদন করিলে হইবে না, স্বদেশের ক্ষেত্রে বসিয়া কণ্টক উৎপাটন করিতে হইবে। ইহাতে আমাদের শক্তির চর্চা হইবে—সেই শক্তির চর্চামাত্রেই স্বাধীনতা, এবং স্বাধীনতামাত্রেই আনন্দ।

আজ তোমাদের তারুণ্যের মধ্যে আমার অবারিত প্রবেশাধিকার নাই, তোমাদের আশা আকাঙ্ক্ষা আদর্শ যে কী তাহা স্পষ্টরূপে অনুভব করা আজ আমার পক্ষে অসম্ভব; কিন্তু নিজেদের নবীন কৈশোরের স্মৃতিটুকুও তো ভস্মাবৃত অগ্নিকণার মতো পক্ককেশের নিচে এখনো প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে। সেই স্মৃতির বলে ইহা নিশ্চয় জানিতেছি যে, মহৎ আকাঙ্ক্ষার রাগিণী মনে যে তারে সহজে বাজিয়া উঠে তোমাদের অন্তরের সেই সূক্ষ্ম, সেই তীক্ষ্ম, সেই প্রভাতসূর্যরশ্মিনির্মিত তন্তুর ন্যায় উজ্জ্বল তন্ত্রীগুলিতে এখনো অব্যবহারের মরিচা পড়িয়া যায় নাই; উদার উদ্দেশ্যের প্রতি নির্বিচারে আত্মবিসর্জন করিবার দিকে মানুষের মনের যে-একটা স্বাভাবিক ও সুগভীর প্রেরণা আছে তোমাদের অন্তঃকরণে এখনো তাহা ক্ষুদ্র বাধার দ্বারা বারংবার প্রতিহত হইয়া নিস্তেজ হয় নাই; আমি জানি, স্বদেশ যখন অপমানিত হয়, আহত অগ্নির ন্যায় তোমাদের হৃদয় উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে; নিজের ব্যবসায়ের সংকীর্ণতা ও স্বার্থসাধনের চেষ্টা তোমাদের সমস্ত মনকে গ্রাস করে নাই, দেশের অভাব ও অগৌরব যে কেমন করিয়া দূর হইতে পারে সেই চিন্তা

নিশ্চয়ই মাঝে মাঝে তোমাদের রজনীর বিনিদ্র প্রহর ও দিবসের নিভৃত অবকাশকে আক্রমণ করে; আমি জানি, ইতিহাসবিশ্রুত যে-সকল মহাপুরুষ দেশহিতের জন্য, লোকহিতের জন্য আপনাকে উৎসর্গ করিয়া মৃত্যুকে পরাস্ত, স্বার্থকে লজ্জিত ও দুঃখক্লেশকে অমর মহিমায় সমুজ্জ্বল করিয়া গেছেন তাঁহাদের দৃষ্টান্ত তোমাদিগকে যখন আহ্বান করে তখন তাহাকে আজও তোমরা বিজ্ঞ বিষয়ীর মতো বিদ্রূপের সহিত প্রত্যাখ্যান করিতে চাও না— তোমাদের সেই অনাঘ্রাতপুষ্প অখণ্ডপুণ্যের ন্যায় নবীন হৃদয়ের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষাকে আমি আজ তোমাদের দেশের সারস্বতবর্গের নামে আহ্বান করিতেছি, ভোগের পথে নহে, ভিক্ষার পথে নহে, কর্মের পথে। কর্মশালার প্রবেশদ্বার অতি ক্ষুদ্র, রাজপ্রাসাদের সিংহদ্বারের ন্যায় ইহা অভ্রভেদী নহে; কিন্তু গৌরবের বিষয় এই যে, এখানে নিজের শক্তি সম্বল করিয়া প্রবেশ করিতে হয়, ভিক্ষাপাত্র লইয়া নহে। গৌরবের বিষয় এই যে, এখানে প্রবেশের জন্য দ্বারীর অনুমতির অপমান স্বীকার করিতে হয় না, ঈশ্বরের আদেশ শিরোধার্য করিয়া আসিতে হয়। এখানে প্রবেশ করিতে গেলে মাথা নত করিতে হয় বটে, কিন্তু সে কেবল নিজের উচ্চ আদর্শের নিকট, দেশের নিকট, যিনি নত ব্যক্তিকে উন্নত করিয়া দেন সেই মঙ্গলবিধাতার নিকট। তোমাদিগকে আহ্বান করিয়া এপর্যন্ত কেহ তো সম্পূর্ণ নিরাশ হন নাই; দেশ যখন বিলাতি পিনাক বাজাইয়া ভিক্ষা করিতে বাহির হইয়াছিল তখন তোমরা পশ্চাৎপদ হও নাই, প্রাচীন শ্লোকে যে স্থানটাকে শ্মশানের ঠিক পূর্বেই বসাইয়াছেন সেই রাজদ্বারে তোমরা যাত্রা করিয়া আপনাকে সার্থক জ্ঞান করিয়াছ। আর আজ সাহিত্যপরিষদ্ তোমাদিগকে যে আহ্বান করিতেছেন তাহার ভাষা মাতৃভাষা ও তাহার কার্য মাতার অন্তঃপুরের কার্য বলিয়াই কি তাহা ব্যর্থ হইবে— দেশের কাব্যে গানে ছড়ায়, প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষে, কীটদষ্ট পুঁথির জীর্ণ পত্রে, গ্রাম্য পার্বণে, ব্রতকথায়, পল্লীর কৃষিকুটিরে পরিষদ্ যেখানে স্বদেশকে সন্ধান করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছেন সেখানে বিদেশী লোকে কোনোদিন বিস্ময়দৃষ্টিপাত করে না, সেখান হইতে সংবাদপত্রবাহন খ্যাতি সমুদ্রপারে জয়ঘোষণা করিতে যায় না, সেখানে তোমাদের কোনো প্রলোভন নাই— কিন্তু তোমাদের মধ্যে কেহ মাতার নিঃশব্দ আশিস্মাত্রকে যদি রাজমহিষীর ভোজ্যাবশেষের চেয়ে অধিক মনে করিতে পারো তবে মাতার নিভৃত অন্তঃপুরচারী এই-সকল মাতৃসেবকদের পার্শ্বে আসিয়া দণ্ডায়মান হও এবং দিনের পর দিন বিনা বেতনে, বিনা পুরস্কারে, খ্যাতিবিহীন কর্মে স্বদেশপ্রেমকে সার্থক করো। তাহা হইলে অন্তত এইটুকু বুঝিবে যে, যদি শক্তি থাকে তবে কর্মও আছে, যদি প্রীতি থাকে তবে সেবার উপলক্ষের অভাব নাই, সেজন্য গবর্মেন্টের কোনো আইন-পাসের অপেক্ষা করিতে হয় না এবং কোনো অধিকার-ভিক্ষার প্রত্যাশায় রুদ্ধ দ্বারের কাছে অনন্যকর্মা হইয়া দিনরাত্রি যাপন করা অত্যাবশ্যক নহে।

আমার আশঙ্কা হইতেছে, অদ্যকার বক্তব্য বিষয় সম্বন্ধে আমি ঠিক মাত্রারক্ষা করিতে পারি নাই। কথাটা তো শুদ্ধমাত্র এই যে, দেশী ভাষার ব্যাকরণ চর্চা করো, অভিধান সংকলন করো, পল্লী হইতে দেশের আভ্যন্তরিক বিবরণ সংগ্রহ করো। এই সামান্য প্রস্তাবের অবতারণার জন্য এমন করিয়া উচ্চভাবের দোহাই দিয়া দীর্ঘ ভূমিকা রচনা করা কিছু যেন অসংগত হইয়াছে। হইয়াছে স্বীকার করি, কিন্তু কালের গতিকে এইরূপ অসংগত ব্যাপার আমাদের দেশে আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে ইহাই আমাদের দুর্ভাগ্যের লক্ষণ। বর্তমান কালে আমাদের দেশে যদি বলা যায়

যে, দেশের জন্য বক্তৃতা করো, সভা করো, তর্ক করো, তবে তাহা সকলে অতি সহজেই বুঝিতে পারেন; কিন্তু যদি বলা হয় 'দেশকে জানো ও তাহার পরে স্বহস্তে যথাসাধ্য দেশের সেবা করো' তবে দেখিয়াছি, অর্থ বুঝিতে লোকের বিশেষ কষ্ট হয়। এমন অবস্থায় দেশের প্রতি কর্তব্য সম্বন্ধে দুটো-একটা সামান্য কথা বলিতে যদি অসামান্য বাক্যব্যয় করিয়া থাকি, তবে মার্জনা করিতে হইবে। বস্তুত সকাল বেলায় যদি ঘন কুয়াশা হইয়া থাকে তবে অধীর হইয়া ফল নাই, এবং হতাশ হইবারও প্রয়োজন দেখি না; সূর্য সে কুয়াশা ভেদ করিবেনই এবং করিবামাত্র সমস্ত পরিষ্কার হইয়া যাইবে। আজ আমি অধীরভাবে অধিক আকাঙ্ক্ষা করিব না; অবিচলিত আশার সহিত, আনন্দের সহিত এই কথাই বলিব, নিবিড় কুজ্‌ঝটিকার মাঝে মাঝে ঐ-যে বিচ্ছেদ দেখা যাইতেছে, সূর্যরশ্মির ছটা খরধার কৃপাণের মতো আমাদের দৃষ্টির আবরণ তিন চারি জায়গায় ভেদ করিয়াছে, আর ভয় নাই, গৃহদ্বারের সম্মুখেই আমাদের যাত্রাপথ অনতিবিলম্বে পরিস্ফুটরূপে প্রকাশিত হইয়া পড়িবে, তখন দিগ্‌বিদিক্‌ সম্বন্ধে দশজন মিলিয়া দশ প্রকারের মত লইয়া ঘরে বসিয়া বাদবিতণ্ডা করিতে হইবে না— তখন সকলে আপন-আপন শক্তি-অনুসারে আপন-আপন পথ নির্বাচন করিয়া তর্কসভা হইতে, পুঁথির রুদ্ধকক্ষ হইতে বাহির হইয়া পড়িব—তখন নিকটের কাজকে দূর মনে হইবে না এবং অত্যাবশ্যক কাজকে ক্ষুদ্র বলিয়া অবজ্ঞা জন্মিবে না। এই শুভক্ষণ আসিবে বলিয়া আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস আছে। সেইজন্য, পরিষদের অদ্যকার আহ্বান যদি তোমাদের অন্তরে স্থান না পায়, বাংলাদেশের ঘরের কথা জানাকে যদি তোমরা বেশি একটা কিছু বলিয়া না মনে করো, তবু আমি ক্ষুব্ধ হইব না এবং আমার যে মাতৃভূমি এত দিন তাঁহার সন্তানগণের গৃহপ্রত্যাগমনের জন্য অনিমেষ দৃষ্টিতে প্রতীক্ষা করিয়া আছেন তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিব, 'জননী, সময় নিকটবর্তী হইয়াছে, ইস্কুলের ছুটি হইয়াছে, সভা ভাঙিয়াছে, এইবার তোমার কুটীরপ্রাঙ্গণের অভিমুখে তোমার ক্ষুধিত সন্তানদের পদধ্বনি ঐ শুনা যাইতেছে—এখন বাজাও তোমার শঙ্খ, জ্বালো তোমার প্রদীপ, তোমার প্রসারিত শীতলপাটির উপরে আমাদের ছোটো-বড়ো সকল ভাইয়ের মিলনকে তোমার অশ্রুগদ্‌গদ আশীর্বচনের দ্বারা সার্থক করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকো।'

বৈশাখ ১৩১২

শিক্ষাসংস্কার

যাহারা খবরের কাগজ পড়েন তাঁহারা জানেন, ইংলন্‌ডে ফ্রান্‌সে শিক্ষা সম্বন্ধে খুব একটা গোলমাল চলিতেছে। শিক্ষা লইয়া আমরাও নিশ্চিন্ত নাই তাহাও কাহারও অবিদিত নাই।

এমন সময়ে স্পীকার-নামক বিখ্যাত ইংরেজি সাপ্তাহিক পত্রে আইরিশ শিক্ষা-সংস্কার সম্বন্ধে যে প্রস্তাব আলোচিত হইয়াছে, তাহা আমাদের মনোযোগপূর্বক চিন্তা করিয়া দেখিবার বিষয়।

য়ুরোপের যে যুগকে অন্ধকার যুগ বলে, যখন বর্বর-আক্রমণের ঝড়ে রোমের

বাতি নিবিয়া গেল, সেই সময়ে য়ুরোপের সকল দেশের মধ্যে কেবলমাত্র আয়র্লন্‌ডেই বিদ্যার চর্চা জাগিয়া ছিল। তখন য়ুরোপের ছাত্রগণ আয়র্লন্‌ডের বিদ্যালয়ে আসিয়া পড়াশুনা করিত। সপ্তম শতাব্দীতে যখন বহুতর বিদ্যার্থী এখানে আসিয়া জুটিয়াছিল তখন তাহারা আহার বাসা পুঁথি এবং শিক্ষা বিনা মূল্যেই পাইত। কতকটা আমাদের দেশের টোলের মতো আর-কি।

য়ুরোপের অধিকাংশ দেশেই আইরিশ বৈরাগিগণ বিদ্যা এবং খৃস্টধর্মের নির্বাণপ্রায় শিখা আবার উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছেন। ফ্রান্‌সের রাজা শার্‌ল্‌মান অষ্টম শতাব্দীতে পারিস য়ুনিভর্সিটির প্রতিষ্ঠাভার বিখ্যাত আইরিশ পণ্ডিত ক্লেমেন্‌সের হাতে দিয়াছিলেন। এরূপ আরো অনেক দৃষ্টান্ত আছে।

প্রাচীন আইরিশ বিদ্যালয়ে যদিচ লাটিন গ্রীক এবং হিব্রু শেখানো হইত তবু সেখানে শিখাইবার ভাষা ছিল আইরিশ। গণিতজ্যোতিষ ফলিতজ্যোতিষ এবং তখনকার কালে যে-সকল বিজ্ঞান প্রচলিত ছিল তাহা আইরিশ ভাষা দ্বারাই শেখানো হইত, সুতরাং এ ভাষায় পারিভাষিক শব্দের দৈন্য ছিল না।

যখন দিনেমার এবং ইংরেজেরা আয়র্লন্‌ড্‌ আক্রমণ করে তখন এই-সকল বিদ্যালয়ে আগুন লাগাইয়া বিপুলসঞ্চিত পুঁথিপত্র জ্বালাইয়া দেওয়া হয় এবং অধ্যাপক ও ছাত্রগণ হত ও বিক্ষিপ্ত হইতে থাকে। কিন্তু আয়র্লন্‌ডের যে যে স্থান এই-সকল উৎপাত হইতে দূরে থাকিয়া ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত দেশীয় রাজাদের অধীন ছিল সে-সকল স্থানের বড়ো বড়ো বিদ্যাগারে শিক্ষাকার্য সম্পূর্ণ আইরিশ প্রণালীতেই নির্বাহিত হইত। অবশেষে এলিজাবেথের কালে লড়াই হইয়া যখন সমস্ত সম্পত্তি অপহৃত হইল তখন আয়র্লন্‌ডের স্বায়ত্ত বিদ্যা ও বিদ্যালয় একেবারে নষ্ট করিয়া দেওয়া হইল।

এইরূপে আয়র্লন্‌ড্‌বাসীরা জ্ঞানচর্চা হইতে বঞ্চিত হইয়া রহিল। তাহাদের ভাষা নিকৃষ্ট সমাজের ভাষা বলিয়া অবজ্ঞা প্রাপ্ত হইতে থাকিল। অবশেষে ঊনবিংশ শতাব্দীতে 'ন্যাশনাল স্কুল' প্রণালীর সূত্রপাত হইল। জ্ঞানপিপাসু আইরিশগণ এই প্রণালীর দোষগুলি বিচারমাত্র না করিয়া ব্যগ্রভাবে ইহাকে অভ্যর্থনা করিয়া লইল। কেবল একজন বড়োলোক, টুয়ামের আর্চ্‌বিশপ জন ম্যাক্‌হেল, এই প্রণালীর বিরুদ্ধে আপত্তি প্রকাশ করেন এবং ইহার দ্বারা ভবিষ্যতে যে অমঙ্গল হইবে তাহা ব্যক্ত করেন।

আইরিশদিগকে জোর করিয়া স্যাক্‌সনের ছাঁচে ঢালা এবং ইংরেজ করিয়া তোলাই ন্যাশনাল স্কুল-প্রণালীর মতলব ছিল। ফলে এই চেষ্টার ব্যর্থতা প্রমাণ হইল। ভালোই বলো আর মন্দই বলো, প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন জাতিকে এমন ভিন্ন রকম করিয়া গড়িয়াছেন যে এক জাতকে ভিন্ন জাতের কাঠামোর মধ্যে পুরিতে গেলে সমস্ত খাপছাড়া হইয়া যায়।

যে সময়ে এই শিক্ষাপ্রণালীর প্রবর্তন করা হয় তখন আয়র্লন্‌ডের শতকরা আশিজন লোক আইরিশ ভাষায় কথা কহিত। যদি শিক্ষা দেওয়াই ন্যাশনাল বোর্ডের উদ্দেশ্য হইত, তবে আইরিশ ছাত্রদিগকে আগে নিজের ভাষায় পড়িতে শুনিতে শিখাইয়া তাহার পরে সেই মাতৃভাষার সাহায্যে তাহাদিগকে বিদেশী ভাষা শিক্ষা দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তাহা না করিয়া নানা প্রকার কঠিন শাস্তি দ্বারা বালকদিগকে তাহাদের মাতৃভাষা ব্যবহার করিতে একেবারে নিরস্ত করিয়া দেওয়া হইল।

শুধু ভাষা নয়, আইরিশ ইতিহাস পড়ানো বন্ধ হইল। আইরিশ ভূবৃত্তান্তও

প্রতিবাদ করিবে না, ও পরের কাজের জোগানদার হইয়া থাকিবে মাত্র, এমন মানুষ তৈরির বিধান অনুরূপ। আমরা স্বভাবত স্বজাতিকে স্বাতন্ত্র্যের জন্য প্রস্তুত করিতে ইচ্ছা করিব, সে কথা বলাই বাহুল্য। ইংলন্ডের যখন সুদিন ছিল তখন ইংলন্ডও কোনো জাতি সম্বন্ধেই এই আদর্শে বাধা দিত না, ভারতবর্ষে শিক্ষানীতি সম্বন্ধে মেকলের মন্তব্য তাহার প্রমাণ। এখন কালের পরিবর্তন হইয়াছে— এইজন্যই শিক্ষার আদর্শ লইয়া কর্তৃপক্ষদের সঙ্গে স্বদেশ-ভক্তদের বিরোধ অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িয়াছে। আমরা বিদ্যালয়ের সাহায্যে এ দেশে তাঁবেদারির চিরস্থায়ী ভিত্তিপত্তন করিতে কিছুতেই রাজি হইতে পারি না। কাজেই, সময় উপস্থিত হইয়াছে, এখন বিদ্যাশিক্ষাকে যেমন করিয়া হউক নিজের হাতে গ্রহণ করিতেই হইবে।

গবর্মেন্ট্-প্রতিষ্ঠিত সেনেটে সিন্ডিকেটে বাঙালি থাকিলেই যে বিদ্যাশিক্ষার ভার আমাদের নিজের হাতে রহিল তাহা আমি মনে করি না। গবর্মেন্টের আমাদের কাছে জবাবদিহি না থাকিয়া দেশের লোকের কাছে জবাবদিহি থাকা চাই। আমরা গবর্মেন্টের সম্মতির অধীনে যখন বাহ্যস্বাতন্ত্র্যের একটা বিড়ম্বনা লাভ করি তখনই আমাদের বিপদ সব চেয়ে বেশি। তখন প্রসাদলব্ধ সেই মিথ্যা স্বাতন্ত্র্যের মূল্য যাহা দিতে হয় তাহাতে মাথা বিকাইয়া যায়। বিশেষত দেশী লোককে দিয়াই দেশের মঙ্গল দলন করা গবর্মেন্টের পক্ষে কিছুমাত্র কঠিন নহে, নহিলে এ দেশের দুর্গতি কিসের! অতএব, চাকরির অধিকার নহে, মনুষ্যত্বের অধিকারের যোগ্য হইবার প্রতি যদি লক্ষ্য রাখি, তবে শিক্ষা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য-চেষ্টার দিন আসিয়াছে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। দেশের লোককে শিশুকাল হইতে মানুষ করিবার সদুপায় যদি নিজে উদ্ভাবন এবং তাহার উদ্যোগ যদি নিজে না করি তবে আমরা সর্ব প্রকারে বিনাশপ্রাপ্ত হইব, অন্নে মরিব, স্বাস্থ্যে মরিব, বুদ্ধিতে মরিব, চরিত্রে মরিব— ইহা নিশ্চয়। বস্তুত আমরা প্রত্যহই মরিতেছি, অথচ তাহার প্রতিকারের উপযুক্ত চেষ্টামাত্র করিতেছি না, তাহার চিন্তামাত্র যথার্থরূপে আমাদের মনেও উদয় হইতেছে না, এই-যে নিবিড় মোহাবৃত নিরুদ্যম ও চরিত্রবিকার— বাল্যকাল হইতে প্রকৃত শিক্ষা ব্যতীত কোনো অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের দ্বারা ইহা নিবারণের কোনো উপায় নাই।

বর্তমান কালে যে একটিমাত্র সাধক য়ুরোপে গুরুর আসনে বসিয়া নিরন্তর অরণ্যে রোদন করিয়া মরিতেছেন সেই টল্স্টয় রুশিয়ার শিক্ষানীতি সম্বন্ধে যে কথা বলিয়াছেন তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করি।—

It seems to me that it is now specially important to do what is right quietly and persistently, not only without asking permission from Government but consciously avoiding its participation. The strength of the Government lies in the people's ignorance, and the Government knows this, and will therefore always oppose true enlightenment. It is time we realized that fact. And it is most undesirable to let the Government, while it is spreading darkness, pretend to be busy with the enlightenment of the people. It is doing this now by means of all sorts of pseudo-educational establishments which it controls : schools, high schools, universities, academies, and all kinds of committees and congresses. But good is good and enlightenment is enlightenment, only when it is quite good and quite enlightened and not when it is toned down to meet the requirements of Delyanof's or Dournovo's circulars. And I am extremely sorry when I see valuable, disinterested, and self-sacrificing efforts spent unprofitably. It is strange to see good, wise people spending their strength in a struggle against the Government, but carrying on that struggle on the basis of whatever laws the Government itself likes to make.

আষাঢ় ১৩১৩

শিক্ষাসমস্যা

জাতীয় শিক্ষাপরিষদের সভ্য আমার কয়েক জন শ্রদ্ধেয় সুহৃদ্ এই পরিষদের স্কুল-বিভাগের একটি গঠনপত্রিকা তৈরি করিবার জন্য আমার উপরে ভার দিয়াছিলেন।

তাঁহাদের অনুরোধ রক্ষা করিতে বসিয়া দেখিলাম কাজটি সহজ নহে। কেননা, গোড়ায় জানা উচিত এই সংকল্পিত বিদ্যালয়ের কারণবীজটি কী, ইহার মূলে কোন্ ভাব আছে। আমার তাহা জানা নাই।

আমাদের শাস্ত্রে বলে, বাসনাই জন্মপ্রবাহের কারণ, বস্তুপুঞ্জের আকস্মিক সংঘটনই জন্মের হেতু নহে। যদি বাসনার ছেদ হয় তবে গোড়া কাটা পড়িয়া জন্মমৃত্যুর অবসান হইয়া যায়।

তেমনি বলা যাইতে পারে, ভাব জিনিসটাই সকল অনুষ্ঠানের গোড়ায়। যদি ভাব না থাকে তবে নিয়ম থাকিতে পারে, টাকা থাকিতে পারে, কমিটি থাকিতে পারে, কিন্তু কর্মের শিকড় কাটা পড়িয়া তাহা শুকাইয়া যায়।

তাই গোড়াতেই মনে প্রশ্ন উদয় হয় যে, জাতীয় শিক্ষাপরিষৎটি কোন্ ভাবের প্রেরণায় জন্মগ্রহণ করিতেছে। দেশে সম্প্রতি যে-সকল বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা আছে তাহার মধ্যে কোন্ ভাবের অভাব ছিল যাহাতে সেই শিক্ষা সম্পূর্ণ হইতেছিল না, এবং প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ে সেই ভাবটিকে কোথায় স্থান দেওয়া হইতেছে।

জাতীয় শিক্ষাপরিষৎ শুধু যদি কারুবিদ্যালয়-স্থাপনের জন্য প্রতিষ্ঠিত হইত তাহা হইলে বুঝিতাম যে, একটা বিশেষ সংকীর্ণ প্রয়োজন সাধন করাই ইহার উদ্দেশ্য। কিন্তু যখন দেখা যাইতেছে সাধারণত দেশের সমস্ত শিক্ষার প্রতি পরিষৎ দৃষ্টি রাখিতে চান তখন এই জিজ্ঞাসা মনে উঠে যে, কোন্ ভাবে এই শিক্ষাকার্য চলিবে। কোন্ নিয়মে চলিবে এবং কী কী বই পড়ানো হইবে, সে-সমস্ত বাহিরের কথা।

ইহার উত্তরে যদি কেহ বলেন 'জাতীয়' ভাবে শিক্ষা দেওয়া হইবে তবে প্রশ্ন উঠিবে, শিক্ষা সম্বন্ধে জাতীয় ভাব বলিতে কী বুঝায়? 'জাতীয়' শব্দটার কোনো সীমানির্দেশ হয় নাই, হওয়াও শক্ত। কোন্‌টা জাতীয় এবং কোন্‌টা জাতীয় নহে, শিক্ষা সুবিধা ও সংস্কার-অনুসারে ভিন্ন লোকে তাহা ভিন্ন রকমে স্থির করেন।

অতএব শিক্ষাপরিষদের মূল ভাবটি সম্বন্ধে গোড়াতেই দেশের লোকে সকলে মিলিয়া একটা বোঝাপড়া হওয়া দরকার। ইংরেজ সরকারের প্রতি রাগ করিয়া

আমরা এই কাজে প্রবৃত্ত হইয়াছি, এ কথা এক মুহূর্তের জন্য মনে স্থান দিতে পারি না। দেশের অন্তঃকরণ একটা-কিছু অভাব বোধ করিয়াছিল, একটা-কিছু চায়, সেইজন্যই আমরা দেশের সেই ক্ষুধানিবৃত্তি করিতে একত্র হইয়াছি এই কথাই সত্য।

আমরা চাই, কিন্তু কী চাই তাহা বাহির করা যে সহজ তাহা মনে করি না। এই সম্বন্ধে সত্য-আবিষ্কারের 'পরেই আমাদের উদ্ধার নির্ভর করে। যদি ভুল করি—যেটা হাতের কাছেই আছে, আমরা যেটাতে অভ্যস্ত, জড়ত্ববশত যদি সেইটেকেই সত্য মনে করি, তবে বড়ো বড়ো নাম আমাদিগকে বিফলতা হইতে রক্ষা করিতে পারিবে না।

এইজন্য শিক্ষাপরিষদের প্রতিষ্ঠাতাগণ যখন উদ্যোগে প্রবৃত্ত আছেন তখন দেশের সর্বসাধারণের তরফ হইতে নিজের চিত্ত, নিজের অভাব, বুঝিবার জন্য একটা আলোচনা হওয়া উচিত।

সেই আলোচনাকে জাগাইয়া তোলাই আমার এই রচনার প্রধান উদ্দেশ্য। এই উপলক্ষে, যে ভাবটি আমার মনের সম্মুখে জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে তাহাকে দেশের দরবারে উপস্থিত করা আমার কর্তব্য। যদি শিক্ষিত সমাজের প্রচলিত সংস্কারের সঙ্গে ইহার বিরোধ বাধে তবে ইহা গ্রাহ্য হইবে না, জানি। যদি গ্রাহ্য না হয় তবে আপনাদের একটা সুবিধা আছে—আপনারা সমস্তটাকে কবিকল্পনার আকাশকুসুম বলিয়া অতি সংক্ষেপেই বর্জন করিতে পারিবেন এবং আমিও ব্যর্থ কবিদের সান্ত্বনাস্থল 'পস্টারিটি' অর্থাৎ কোনো-একটা অনির্দিষ্ট উত্তরকালের মধ্যে আমার অনাদৃত প্রস্তাবটির ভাবী সদ্গতি কল্পনা করিয়া আশ্বাসলাভের চেষ্টা করিব। কিন্তু তৎপূর্বে আজ আপনাদের নিকট বহুল পরিমাণে ধৈর্য ও ক্ষমা সানুনয়ে প্রার্থনা করি।

ইস্কুল বলিতে আমরা যাহা বুঝি সে একটা শিক্ষা দিবার কল। মাস্টার এই কারখানার একটা অংশ। সাড়ে দশটার সময় ঘণ্টা বাজাইয়া কারখানা খোলে। কল চলিতে আরম্ভ হয়, মাস্টারেরও মুখ চলিতে থাকে। চারটের সময় কারখানা বন্ধ হয়, মাস্টার-কলও তখন মুখ বন্ধ করেন; ছাত্ররা দুই-চার পাত কলে-ছাঁটা বিদ্যা লইয়া বাড়ি ফেরে। তার পর পরীক্ষার সময় এই বিদ্যার যাচাই হইয়া তাহার উপরে মার্কা পড়িয়া যায়।

কলের একটা সুবিধা, ঠিক মাপে, ঠিক ফর্মাশ-দেওয়া জিনিসটা পাওয়া যায়; এক কলের সঙ্গে আর-এক কলের উৎপন্ন সামগ্রীর বড়ো একটা তফাত থাকে না, মার্কা দিবার সুবিধা হয়।

কিন্তু এক মানুষের সঙ্গে আর-এক মানুষের অনেক তফাত। এমন-কি, একই মানুষের এক দিনের সঙ্গে আর-এক দিনের ইতর-বিশেষ ঘটে।

তবু মানুষের কাছ হইতে মানুষ যাহা পায় কলের কাছ হইতে তাহা পাইতে পারে না। কল সম্মুখে উপস্থিত করে, কিন্তু দান করে না; তাহা তেল দিতে পারে, কিন্তু আলো জ্বালাইবার সাধ্য তাহার নাই।

য়ুরোপে মানুষ সমাজের ভিতরে থাকিয়া মানুষ হইতেছে, ইস্কুল তাহার কথঞ্চিৎ সাহায্য করিতেছে। লোকে যে বিদ্যা লাভ করে সে বিদ্যাটা সেখানকার মানুষ হইতে বিচ্ছিন্ন নহে; সেইখানেই তাহার চর্চা হইতেছে, সেইখানেই তাহার বিকাশ হইতেছে, সমাজের মধ্যে নানা আকারে নানা ভাবে তাহার সঞ্চার হইতেছে, লেখাপড়ায় কথাবার্তায় কাজে-কর্মে তাহা অহরহ প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিতেছে।

সেখানে জনসমাজ যাহা কালে কালে নানা ঘটনায় নানা লোকের দ্বারায় লাভ করিয়াছে, সঞ্চয় করিয়াছে এবং ভোগ করিতেছে, তাহাই বিদ্যালয়ের ভিতর দিয়া বালকদিগকে পরিবেষণের একটা উপায় করিয়াছে মাত্র।

এইজন্য সেখানকার বিদ্যালয় সমাজের সঙ্গে মিশিয়া আছে, তাহা সমাজের মাটি হইতেই রস টানিতেছে এবং সমাজকেই ফলদান করিতেছে।

কিন্তু বিদ্যালয় যেখানে চারি দিকের সমাজের সঙ্গে এমন এক হইয়া মিশিতে পারে নাই— যাহা বাহির হইতে সমাজের উপরে চাপাইয়া দেওয়া তাহা শুষ্ক, তাহা নির্জীব, তাহার কাছ হইতে যাহা পাই তাহা কষ্টে পাই, এবং সে বিদ্যা প্রয়োগ করিবার বেলা কোনো সুবিধা করিয়া উঠিতে পারি না। দশটা হইতে চারটে পর্যন্ত যাহা মুখস্থ করি, জীবনের সঙ্গে, চারি দিকের মানুষের সঙ্গে, ঘরের সঙ্গে, তাহার মিল দেখিতে পাই না। বাড়িতে বাপ মা ভাই বন্ধুরা যাহা আলোচনা করেন বিদ্যালয়ের শিক্ষার সঙ্গে তাহার যোগ নাই, বরঞ্চ অনেক সময়ে বিরোধ আছে। এমন অবস্থায় বিদ্যালয় একটা এঞ্জিনমাত্র হইয়া থাকে; তাহা বস্তু জোগায়, প্রাণ জোগায় না।

এইজন্য বলিতেছি, য়ুরোপের বিদ্যালয়ের অবিকল বাহ্য নকল করিলেই আমরা যে সেই একই জিনিস পাইব এমন নহে। এই নকলে সেই বেঞ্চি, সেই টেবিল, সেই প্রকার কার্যপ্রণালী সমস্তই ঠিক মিলাইয়া পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা আমাদের পক্ষে বোঝা হইয়া উঠে।

পূর্বে যখন আমরা গুরুর কাছে বিদ্যা পাইতাম, শিক্ষকের কাছে নহে— মানুষের কাছে জ্ঞান চাহিতাম, কলের কাছে নয়— তখন আমাদের শিক্ষার বিষয় এত বিচিত্র ও বিস্তৃত ছিল না এবং তখন আমাদের সমাজে-প্রচলিত ভাব ও মতের সঙ্গে পুঁথির শিক্ষার কোনো বিরোধ ছিল না। ঠিক সে দিনকে আজ ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিলে সেও একটা নকল হইবে মাত্র, তাহার বাহ্য আয়োজন বোঝা হইয়া উঠিবে, কোনো কাজেই লাগিবে না।

অতএব আমাদের এখনকার প্রয়োজন যদি আমরা ঠিক বুঝি তবে এমন ব্যবস্থা করিতে হইবে, যাহাতে বিদ্যালয় ঘরের কাজ করিতে পারে, যাহাতে পাঠ্য বিষয়ের বিচিত্রতার সঙ্গে অধ্যাপনার সজীবতা মিশিতে পারে, যাহাতে পুঁথির শিক্ষাদান এবং হৃদয়মনকে গড়িয়া তোলা দুই ভারই বিদ্যালয় গ্রহণ করে। দেখিতে হইবে আমাদের দেশে বিদ্যালয়ের সঙ্গে বিদ্যালয়ের চতুর্দিকের যে বিচ্ছেদ, এমন-কি বিরোধ আছে, তাহার দ্বারা যেন ছাত্রদের মন বিক্ষিপ্ত হইয়া না যায় ও এইরূপে বিদ্যাশিক্ষাটা যেন কেবল দিনের মধ্যে কয়েক ঘণ্টা মাত্র সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হইয়া উঠিয়া বাস্তবিকতাসম্পর্কশূন্য একটা অত্যন্ত গুরুপাক আব্‌স্ট্রাক্ট্‌ ব্যাপার হইয়া না দাঁড়ায়।

বিদ্যালয়ে ঘর বানাইলে তাহা বোর্ডিং ইস্কুল-আকার ধারণ করে। এই বোর্ডিং ইস্কুল বলিতে যে ছবি মনে জাগিয়া উঠে তাহা মনোহর নয়; তাহা বারিক, পাগ্‌লাগারদ, হাসপাতাল বা জেলেরই এক গোষ্ঠী-ভুক্ত।

অতএব বিলাতের নজির একেবারে ছাড়িতে হইবে; কারণ, বিলাতের ইতিহাস, বিলাতের সমাজ আমাদের নহে। আমাদের দেশের লোকের মনকে কোন্‌ আদর্শ বহু দিন মুগ্ধ করিয়াছে, আমাদের দেশের হৃদয়ে রসসঞ্চার হয় কিসে, তাহা ভালো করিয়া বুঝিতে হইবে।

বুঝিবার বাধা যথেষ্ট আছে। আমরা ইংরেজি ইস্কুলে পড়িয়াছি, যে দিকে

তাকাই ইংরেজের দৃষ্টান্ত আমাদের চোখের সামনে প্রত্যক্ষ। ইহার আড়ালে আমাদের দেশের ইতিহাস, আমাদের স্বজাতির হৃদয়, অস্পষ্ট হইয়া আছে। আমরা ন্যাশনাল পতাকাটাকে উচ্চে তুলিয়া যখন স্বাধীন চেষ্টায় কাজ করিব বলিয়া কোমর বাঁধিয়া বসি তখনো বিলাতের বেড়ি কোমরবন্ধ হইয়া আমাদিগকে বাঁধিয়া ফেলে, আমাদিগকে নজিরের বাহিরে নড়িতে দেয় না।

আমাদের একটা মুশকিল এই যে, আমরা ইংরেজি বিদ্যা ও বিদ্যালয়ের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজি সমাজকে, অর্থাৎ সেই বিদ্যা ও বিদ্যালয়কে, তাহার যথাস্থানে দেখিতে পাই না। আমরা ইহাকে সজীব লোকালয়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া জানি না। এইজন্য সেই বিদ্যালয়ের এদেশী প্রতিরূপটিকে কেমন করিয়া আমাদের জীবনের সঙ্গে মিলাইয়া লইতে হইবে তাহাই জানি না, অথচ ইহাই জানা সব চেয়ে প্রয়োজনীয়। বিলাতের কোন্‌ কলেজে কোন্‌ বই পড়ানো হয় এবং তাহার নিয়ম কী, ইহা লইয়া তর্কবিতর্কে কালক্ষেপ করা সময়ের সম্পূর্ণ সদ্‌ব্যবহার নহে।

এ সম্বন্ধে আমাদের হাড়ের মধ্যে একটা অন্ধ সংস্কার প্রবেশ করিয়াছে। যেমন তিব্বতী মনে করে যে লোক ভাড়া করিয়া তাহাকে দিয়া একটা মন্ত্রলেখা চাকা চালাইলেই পুণ্যলাভ হয় তেমনি আমরাও মনে করি, কোনোমতে একটা সভা স্থাপন করিয়া কমিটির দ্বারা যদি সেটা চালাইয়া যাই তবেই আমরা ফললাভ করিব। বস্তুত সেই স্থাপন করাটাই যেন লাভ। আমরা অনেক দিন হইল একটা বিজ্ঞানসভা স্থাপন করিয়াছি; তাহার পরে বৎসরে বৎসরে বিলাপ করিয়া আসিয়াছি দেশের লোকে বিজ্ঞানশিক্ষায় উদাসীন। কিন্তু একটা বিজ্ঞানসভা স্থাপন করা এক, আর দেশের লোকের চিত্তকে বিজ্ঞানশিক্ষায় নিবিষ্ট করা আর। সভা ফাঁদিলেই তাহার পরে দেশের লোক বিজ্ঞানী হইয়া উঠিবে, এরূপ মনে করা ঘোর কলিযুগের কলনিষ্ঠার পরিচয়।

আসল কথা, মানুষের মন পাইতে হইবে। তাহা হইলে যেটুকু আয়োজন করা যায় সেইটুকুই পুরা ফল দেয়। ভারতবর্ষ যখন শিক্ষা দিত তখন মন পাইয়াছিল কী করিয়া সে কথাটা ভাবিয়া দেখা চাই—বিদেশী য়ুনিভার্সিটির ক্যালেণ্ডার খুলিয়া তাহার রস বাহির করিবার জন্য তাহাতে পেন্সিলের দাগ দিতে নিষেধ করিব না, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই বিচারটাও উপেক্ষার বিষয় নহে। কী শিখাইব তাহা ভাবিবার বটে, কিন্তু যাহাকে শিখাইব তাহার সমস্ত মনটা কী করিয়া পাওয়া যাইতে পারে সেও কম কথা নয়।

একদিন তপোবনে ভারতবর্ষের গুরুগৃহ ছিল, এইরূপ একটা পুরাণকথা আমাদের দেশে প্রচলিত আছে। অবশ্য তপোবনের যে একটা পরিষ্কার ছবি আমাদের মনে আছে তাহা নহে এবং তাহা অনেক অলৌকিকতার কুহেলিকায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে।

যে কালে এই-সকল আশ্রম সত্য ছিল সে কালে তাহারা ঠিক কিরূপ ছিল তাহা লইয়া তর্ক করিব না, করিতে পারিব না। কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে, এই-সকল আশ্রমে যাঁহারা বাস করিতেন, তাঁহারা গৃহী ছিলেন এবং শিষ্যগণ সন্তানের মতো তাঁহাদের সেবা করিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে বিদ্যা গ্রহণ করিতেন। এই ভাবটাই আমাদের দেশের টোলেও আজ কতকটা পরিমাণে চলিয়া আসিয়াছে।

এই টোলের প্রতি লক্ষ্য করিলেও দেখা যাইবে, চতুষ্পাঠীতে কেবলমাত্র পুঁথির পড়াটাই সব চেয়ে বড়ো জিনিস নয়, সেখানে চারি দিকেই অধ্যয়ন-অধ্যাপনার হাওয়া বহিতেছে। গুরু নিজেও ঐ পড়া লইয়াই আছেন। শুধু তাই নয়, সেখানে

জীবনযাত্রা নিতান্ত সাদাসিধা; বৈষয়িকতা বিলাসিতা মনকে টানাছেঁড়া করিতে পারে না, সুতরাং শিক্ষাটা একেবারে স্বভাবের সঙ্গে মিশ খাইবার সময় ও সুবিধা পায়। য়ুরোপের বড়ো বড়ো শিক্ষাগারেও যে এই ভাবটি নাই, সে কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নহে।

প্রাচীন ভারতবর্ষের মতে, যত দিন অধ্যয়নের কাল তত দিন ব্রহ্মচর্যপালন এবং গুরুগৃহে বাস আবশ্যক।

ব্রহ্মচর্যপালন বলিতে যে কৃচ্ছ্রসাধন বুঝায় তাহা নহে। সংসারের মাঝখানে যাহারা থাকে তাহারা ঠিক স্বভাবের পথে চলিতে পারে না। নানা লোকের সংঘাতে নানা দিক হইতে নানা ঢেউ আসিয়া অনেক সময়ে অনাবশ্যকরূপে তাহাদিগকে চঞ্চল করিতে থাকে—যে সময়ে যে-সকল হৃদয়বৃত্তি ভ্রূণ অবস্থায় থাকিবার কথা তাহারা কৃত্রিম আঘাতে অকালে জন্মগ্রহণ করে; ইহাতে কেবলই শক্তির অপব্যয় হয় এবং মন দুর্বল এবং লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া পড়ে।

অথচ জীবনের আরম্ভকালে বিকৃতির সমস্ত কৃত্রিম কারণ হইতে স্বভাবকে প্রকৃতিস্থ রাখা নিতান্তই আবশ্যক। প্রবৃত্তির অকাল-বোধন এবং বিলাসিতার উগ্র উত্তেজনা হইতে মনুষ্যত্বের নবোদ্গমের অবস্থাকে স্নিগ্ধ করিয়া রক্ষা করাই ব্রহ্মচর্যপালনের উদ্দেশ্য।

বস্তুত এই স্বভাবের নিয়মের মধ্যে থাকা বালকদের পক্ষে সুখের অবস্থা। ইহাতে তাহাদের পূর্ণ বিকাশের সহায়তা করে, ইহাতেই তাহারা যথার্থভাবে স্বাধীনতার আনন্দলাভ করিতে পায়। ইহাতে তাহাদের নবাঙ্কুরিত নির্মল সতেজ মন সমস্ত শরীরের মধ্যে দীপ্তির সঞ্চার করে।

ব্রহ্মচর্যপালনের পরিবর্তে আজকাল নীতিপাঠের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। যে-কোনো উপলক্ষে ছাত্রদিগকে নীতি-উপদেশ দিতে হইবে, দেশের অভিভাবকদের এইরূপ অভিপ্রায়।

ইহাও ঐ কলের ব্যাপার। নিয়মিত প্রত্যহ খানিকটা করিয়া সালসা খাওয়ানোর মতো খানিকটা নীতি-উপদেশ—ইহা একটা বরাদ্দ, শিশুকে ভালো করিয়া তুলিবার এই একটা বাঁধা উপায়।

নীতি-উপদেশ জিনিসটা একটা বিরোধ। ইহা কোনোমতেই মনোরম হইতে পারে না। যাহাকে উপদেশ দেওয়া হয় তাহাকে আসামির কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়। উপদেশ হয় তাহার মাথা ডিঙাইয়া চলিয়া যায় নয় তাহাকে আঘাত করে। ইহাতে যে কেবল চেষ্টা ব্যর্থ হয় তাহা নয়, অনেক সময় অনিষ্ট করে। সৎ কথাকে বিরস ও বিফল করিয়া তোলা মনুষ্যসমাজের যেমন ক্ষতিকর এমন আর-কিছুই নয়—অথচ অনেক ভালো লোক এই কাজে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন, ইহা দেখিয়া মনে আশঙ্কা হয়।

সংসারে কৃত্রিম জীবনযাত্রায় হাজার রকমের অসত্য ও বিকৃতি যেখানে প্রতি মুহূর্তে রুচি নষ্ট করিয়া দিতেছে সেখানে ইস্কুলে দশটা-চারটের মধ্যে গোটাকতক পুঁথির বচনে সমস্ত সংশোধন করিয়া দিবে ইহা আশাই করা যায় না। ইহাতে কেবল ভূরি ভূরি ভানের সৃষ্টি হয় এবং নৈতিক জ্যাঠামি, যাহা সকল জ্যাঠামির অধম, তাহা সুবুদ্ধির স্বাভাবিকতা ও সৌকুমার্য নষ্ট করিয়া দেয়।

ব্রহ্মচর্যপালনের দ্বারা ধর্ম সম্বন্ধে সুরুচিকে স্বাভাবিক করিয়া দেওয়া হয়। উপদেশ দেওয়া নহে, শক্তি দেওয়া হয়। নীতিকথাকেই বাহ্য ভূষণের মতো জীবনের উপরে চাপাইয়া দেওয়া নহে, জীবনকেই ধর্মের সঙ্গে গড়িয়া তোলা এবং

এইরূপে ধর্মকে বিরুদ্ধ পক্ষে দাঁড় না করাইয়া তাহাকে অন্তরঙ্গ করিয়া দেওয়া হয়। অতএব জীবনের আরম্ভে মনকে চারিত্রকে গড়িয়া তুলিবার সময়, উপদেশ নহে, অনুকূল অবস্থা এবং অনুকূল নিয়মই সকলের চেয়ে বেশি আবশ্যক।

শুধু এই ব্রহ্মচর্যপালন নয়, তাহার সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির আনুকূল্য থাকা চাই। শহর ব্যাপারটা মানুষের কাজের প্রয়োজনেই তৈরি হইয়াছে; তাহা আমাদের স্বাভাবিক আবাস নয়। ইঁট কাঠ পাথরের কোলে ভূমিষ্ঠ হইয়া আমরা মানুষ হইব, বিধাতার এমন বিধান ছিল না। আপিসের কাছে এবং এই আপিসের শহরের কাছে পুষ্পপল্লব-চন্দ্রসূর্যের কোনো দাবি নাই—তাহা সজীব সরস বিশ্বপ্রকৃতির বক্ষ হইতে ছিনাইয়া লইয়া আমাদিগকে তাহার উত্তপ্ত জঠরের মধ্যে গিলিয়া পরিপাক করিয়া ফেলে। যাহারা ইহাতেই অভ্যস্ত এবং যাহারা কাজের নেশায় বিহ্বল তাহারা এ সম্বন্ধে কোনো অভাবই অনুভব করে না—তাহারা স্বভাব হইতে ভ্রষ্ট হইয়া বৃহৎ জগতের সংস্রব হইতে প্রতি দিনই দূরে চলিয়া যায়।

কিন্তু কাজের ঘূর্ণির মধ্যে ঘাড়মুড় ভাঙিয়া পড়িবার পূর্বে, শিখিবার কালে, বাড়িয়া উঠিবার সময়ে, প্রকৃতির সহায়তা নিতান্তই চাই। গাছপালা, স্বচ্ছ আকাশ, মুক্ত বায়ু, নির্মল জলাশয়, উদার দৃশ্য—ইহারা বেঞ্চি এবং বোর্ড, পুঁথি এবং পরীক্ষার চেয়ে কম আবশ্যক নয়।

চিরদিন উদার বিশ্বপ্রকৃতির ঘনিষ্ঠ সংস্রবে থাকিয়াই ভারতবর্ষের মন গড়িয়া উঠিয়াছে। জগতের জড় উদ্ভিদ্ চেতনের সঙ্গে নিজেকে একান্তভাবে ব্যাপ্ত করিয়া দেওয়া ভারতবর্ষের স্বভাবসিদ্ধ হইয়াছে। ভারতবর্ষের তপোবনে দ্বিজ বটুগণ এই মন্ত্র আবৃত্তি করিয়াছেন—

যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ
য ওষধিষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ।

যে দেবতা অগ্নিতে, যিনি জলে, যিনি বিশ্বভুবনে আবিষ্ট হইয়া আছেন, যিনি ওষধিতে, যিনি বনস্পতিতে, সেই দেবতাকে নমস্কার করি, নমস্কার করি।

অগ্নি বায়ু জল স্থল বিশ্বকে বিশ্বাত্মা দ্বারা সহজে পরিপূর্ণ করিয়া দেখিতে শেখাই যথার্থ শেখা। এই শিক্ষা শহরের ইস্কুলে ঠিকমত সম্ভবে না; সেখানে বিদ্যাশিক্ষার কারখানা-ঘরে জগৎকে আমরা একটা যন্ত্র বলিয়াই শিখিতে পারি।

কিন্তু এখনকার দিনের কাজের-লোকেরা এ-সকল কথা মিস্টিসিজ্ম্ বা ভাবকুহেলিকা বলিয়া উড়াইয়া দিবেন, অতএব ইহা লইয়া সমস্ত আলোচনাটাকে অশ্রদ্ধাভাজন করিবার প্রয়োজন নাই।

তথাপি খোলা আকাশ, খোলা বাতাস এবং গাছপালা মানবসন্তানের শরীর-মনের সুপরিণতির জন্য যে অত্যন্ত দরকার এ কথা বোধ হয় কেজো লোকেরাও একেবারেই উড়াইয়া দিতে পারিবেন না। বয়স যখন বাড়িবে, আপিস যখন টানিবে, লোকের ভিড় যখন ঠেলিয়া লইয়া বেড়াইবে, মন যখন নানা মতলবে নানা দিকে ফিরিবে, তখন বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ হৃদয়ের যোগ অনেকটা বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে। তাহার পূর্বে যে জলস্থল-আকাশবায়ুর চিরন্তন ধাত্রীক্রোড়ের মধ্যে জন্মিয়াছি তাহার সঙ্গে যথার্থভাবে পরিচয় হইয়া যাক, মাতৃস্তন্যের মতো তাহার অমৃতরস আকর্ষণ করিয়া লই, তাহার উদার মন্ত্র গ্রহণ করি—তবেই সম্পূর্ণরূপে মানুষ হইতে পারিব। বালকদের হৃদয় যখন নবীন আছে, কৌতূহল যখন সজীব এবং সমুদয় ইন্দ্রিয়শক্তি যখন সতেজ, তখনই তাহাদিগকে মেঘ ও রৌদ্রের লীলাভূমি অবারিত আকাশের তলে খেলা করিতে দাও—তাহাদিগকে এই ভূমার

আলিঙ্গন হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়ো না। স্নিগ্ধ নির্মল প্রাতঃকালে সূর্যোদয় তাহাদের প্রত্যেক দিনকে জ্যোতির্ময় অঙ্গুলির দ্বারা উদ্‌ঘাটিত করুক এবং সূর্যাস্তদীপ্ত সৌম্য গম্ভীর সায়াহ্ন তাহাদের দিবাবসানকে নক্ষত্রখচিত অন্ধকারের মধ্যে নিঃশব্দে নিমীলিত করিয়া দিক। তরুলতার শাখাপল্লবিত নাট্যশালায় ছয় অঙ্কে ছয় ঋতুর নানারসবিচিত্র গীতিনাট্যাভিনয় তাহাদের সম্মুখে ঘটিতে দাও। তাহারা গাছের তলায় দাঁড়াইয়া দেখুক, নববর্ষা প্রথম-যৌবরাজ্যে-অভিষিক্ত রাজপুত্রের মতো তাহার পুঞ্জ পুঞ্জ সজলনিবিড় মেঘ লইয়া আনন্দগর্জনে চিরপ্রত্যাশী বনভূমির উপরে আসন্ন বর্ষণের ছায়া ঘনাইয়া তুলিতেছে— এবং শরতে অন্নপূর্ণা ধরিত্রীর বক্ষে শিশিরে সিঞ্চিত, বাতাসে চঞ্চল, নানা বর্ণে বিচিত্র, দিগন্তব্যাপ্ত শ্যামল সফলতার অপর্যাপ্ত বিস্তার স্বচক্ষে দেখিয়া তাহাদিগকে ধন্য হইতে দাও। হে প্রবীণ অভিভাবক, হে বিষয়ী, তুমি কল্পনাবৃত্তিকে যতই নির্জীব, হৃদয়কে যতই কঠিন করিয়া থাক, দোহাই তোমার, এ কথা অন্তত লজ্জাতেও বলিয়ো না যে, ইহার কোনো আবশ্যক নাই— তোমার বালকদিগকে বিশাল বিশ্বের মধ্য দিয়া বিশ্বজননীর প্রত্যক্ষলীলাস্পর্শ অনুভব করিতে দাও— তাহা তোমার ইন্‌স্‌পেক্টরের তদন্ত এবং পরীক্ষকের প্রশ্নপত্রিকার চেয়ে যে কত বেশি কাজ করে তাহা অন্তরে অনুভব কর না বলিয়াই তাহাকে নিতান্ত উপেক্ষা করিয়ো না।

মন যখন বাড়িতে থাকে তখন তাহার চারি দিকে একটা বৃহৎ অবকাশ থাকা চাই। বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে সেই অবকাশ বিশালভাবে বিচিত্রভাবে সুন্দরভাবে বিরাজমান। কোনোমতে সাড়ে-নয়টা দশটার মধ্যে তাড়াতাড়ি অন্ন গিলিয়া বিদ্যা-শিক্ষার 'হরিণবাড়ি'র মধ্যে হাজিরা দিয়া কখনোই ছেলেদের প্রকৃতি সুস্থভাবে বিকাশ লাভ করিতে পারে না। শিক্ষাকে দেয়াল দিয়া ঘিরিয়া, গেট দিয়া রুদ্ধ করিয়া, দরোয়ান দিয়া পাহারা বসাইয়া, শাস্তি দ্বারা কণ্টকিত করিয়া, ঘণ্টা দ্বারা তাড়া দিয়া, মানবজীবনের আরম্ভে এ কী নিরানন্দের সৃষ্টি করা হইয়াছে! শিশু যে অ্যাল্‌জেব্রা না কষিয়াই, ইতিহাসের তারিখ না মুখস্থ করিয়াই মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াছে, সেজন্য সে কি অপরাধী? তাই সে হতভাগ্যদের নিকট হইতে তাহাদের আকাশ বাতাস, তাহাদের আনন্দ অবকাশ, সমস্ত কাড়িয়া লইয়া শিক্ষাকে সর্বপ্রকারেই তাহাদের পক্ষে শাস্তি করিয়া তুলিতে হইবে? না জানা হইতে ক্রমে ক্রমে জানিবার আনন্দ পাইবে বলিয়াই কি শিশুরা অশিক্ষিত হইয়া জন্মগ্রহণ করে না? আমাদের অক্ষমতা ও বর্বরতা-বশত জ্ঞানশিক্ষাকে যদি আমরা আনন্দজনক করিয়া না তুলিতে পারি, তবু চেষ্টা করিয়া, ইচ্ছা করিয়া, নিতান্ত নিষ্ঠুরতাপূর্বক নিরপরাধ শিশুদের বিদ্যাগারকে কেন আমরা কারাগারের আকৃতি দিই? শিশুদের জ্ঞানশিক্ষাকে বিশ্বপ্রকৃতির উদার রমণীয় অবকাশের মধ্য দিয়া উন্মেষিত করিয়া তোলাই বিধাতার অভিপ্রায় ছিল; সেই অভিপ্রায় আমরা যে পরিমাণে ব্যর্থ করিতেছি সেই পরিমাণেই ব্যর্থ হইতেছি। হরিণবাড়ির প্রাচীর ভাঙিয়া ফেলো, মাতৃগর্ভের দশ মাসে পণ্ডিত হইয়া উঠে নাই বলিয়া শিশুদের প্রতি সশ্রম কারা-দণ্ডের বিধান করিয়ো না— তাহাদিগকে দয়া করো।

তাই আমি বলিতেছি, শিক্ষার জন্য এখনো আমাদের বনের প্রয়োজন আছে এবং গুরুগৃহও চাই। বন আমাদের সজীব বাসস্থান এবং গুরু আমাদের সহৃদয় শিক্ষক। এই বনে এই গুরুগৃহে আজও বালকদিগকে ব্রহ্মচর্যপালন করিয়া শিক্ষা সমাধা করিতে হইবে। কালে আমাদের অবস্থার যতই পরিবর্তন হইয়া থাক, এই

শিক্ষানিয়মের উপযোগিতার কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই ; কারণ এ নিয়ম মানবচরিত্রের নিত্যসত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত।

অতএব, আদর্শ-বিদ্যালয় যদি স্থাপন করিতে হয় তবে লোকালয় হইতে দূরে নির্জনে মুক্ত আকাশ ও উদার প্রান্তরে গাছপালার মধ্যে তাহার ব্যবস্থা করা চাই। সেখানে অধ্যাপকগণ নিভৃতে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় নিযুক্ত থাকিবেন এবং ছাত্রগণ সেই জ্ঞানচর্চার যজ্ঞক্ষেত্রের মধ্যেই বাড়িয়া উঠিতে থাকিবে।

যদি সম্ভব হয় তবে এই বিদ্যালয়ের সঙ্গে খানিকটা ফসলের জমি থাকা আবশ্যক ; এই জমি হইতে বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয় আহার্য সংগ্রহ হইবে, ছাত্ররা চাষের কাজে সহায়তা করিবে। দুধ ঘি প্রভৃতির জন্য গোরু থাকিবে এবং গোপালনে ছাত্রদিগকে যোগ দিতে হইবে। পাঠের বিশ্রাম-কালে তাহারা স্বহস্তে বাগান করিবে, গাছের গোড়া খুঁড়িবে, গাছে জল দিবে, বেড়া বাঁধিবে। এইরূপে তাহারা প্রকৃতির সঙ্গে কেবল ভাবের নহে, কাজের সম্বন্ধও পাতাইতে থাকিবে।

অনুকূল ঋতুতে বড়ো বড়ো ছায়াময় গাছের তলায় ছাত্রদের ক্লাস বসিবে। তাহাদের শিক্ষার কতক অংশ অধ্যাপকের সহিত তরুশ্রেণীর মধ্যে বেড়াইতে বেড়াইতে সমাধা হইবে। সন্ধ্যার অবকাশ তাহারা নক্ষত্রপরিচয়ে, সংগীতচর্চায়, পুরাণকথা ও ইতিহাসের গল্প শুনিয়া যাপন করিবে।

অপরাধ করিলে ছাত্রগণ আমাদের প্রাচীন প্রথা অনুসারে প্রায়শ্চিত্ত পালন করিবে। শাস্তি পরের নিকট হইতে অপরাধের প্রতিফল, প্রায়শ্চিত্ত নিজের দ্বারা অপরাধের সংশোধন। দণ্ডস্বীকার করা যে নিজেরই কর্তব্য এবং না করিলে যে গ্লানিমোচন হয় না, এই শিক্ষা বাল্যকাল হইতেই হওয়া চাই—পরের নিকটে নিজেকে দণ্ডনীয় করিবার হীনতা মনুষ্যোচিত নহে।

যদি অভয় পাই তবে এই প্রসঙ্গে সাহসে ভর করিয়া আর-একটা কথা বলিয়া রাখি। এই বিদ্যালয়ে বেঞ্চি টেবিল চৌকির প্রয়োজন নাই। আমি ইংরেজি সামগ্রীর বিরুদ্ধে গোঁড়ামি করিয়া এই কথা বলিতেছি, এমন কেহ যেন না মনে করেন। আমার বক্তব্য এই যে, আমাদের বিদ্যালয়ে অনাবশ্যককে খর্ব করিবার একটা আদর্শ সর্বপ্রকারে স্পষ্ট করিয়া তুলিতে হইবে। চৌকি টেবিল ডেস্ক্ সকল মানুষের সকল সময়ে জোটা সহজ নহে, কিন্তু ভূমিতল কেহ কাড়িয়া লইবে না। চৌকি-টেবিলে সত্যসত্যই ভূমিতলকে কাড়িয়া লয়। এমন দশা ঘটে যে, ভূমিতল ব্যবহার করিতে বাধ্য হইলে সুখ পাই না, সুবিধা হয় না। ইহা একটা প্রকাণ্ড ক্ষতি। আমাদের দেশ শীতের দেশ নহে, আমাদের বেশভূষা এমন নয় যে আমরা নিচে বসিতে পারি না, অথচ পরদেশের অভ্যাসে আমরা আসবাবের বাহুল্য সৃষ্টি করিয়া কষ্ট বাড়াইতেছি। অনাবশ্যককে যে পরিমাণে অত্যাবশ্যক করিয়া তুলিব সেই পরিমাণে আমাদের শক্তির অপব্যয় ঘটিবে। অথচ ধনী য়ুরোপের মতো আমাদের সম্বল নাই ; তাহার পক্ষে যাহা সহজ আমাদের পক্ষে তাহা ভার। কোনো একটা সৎকর্মের অনুষ্ঠান করিতে গেলেই গোড়াতে ঘরবাড়ি ও আসবাব-পত্রের হিসাব খতাইয়া চক্ষে অন্ধকার দেখিতে হয়। এই হিসাবের মধ্যে অনাবশ্যকের দৌরাত্ম্য বারো আনা। আমরা কেহ সাহস করিয়া বলিতে পারি না—আমরা মাটির ঘরে কাজ আরম্ভ করিব, আমরা নিচে আসন পাতিয়া সভা করিব। এ কথা বলিতে পারিলে আমাদের অর্ধেক ভার লাঘব হইয়া যায়, অথচ কাজের বিশেষ তারতম্য হয় না। কিন্তু যে দেশে শক্তির সীমা নাই, যে দেশে ধন কানায় কানায় ভরিয়া উপচিয়া পড়িতেছে, সেই দেশের আদর্শে সমস্ত কাজের পত্তন না করিলে

আমাদের লজ্জা দূর হয় না, আমাদের কল্পনা তৃপ্ত হয় না। ইহাতে আমাদের ক্ষুদ্র শক্তির অধিকাংশই আয়োজনে নিঃশেষিত হইয়া যায়, আসল জিনিসকে খোরাক জোগাইতে পারি না। যত দিন মেঝেতে খড়ি পাতিয়া হাত পাকাইয়াছি তত দিন পাঠশালা স্থাপন করিতে আমাদের ভাবনা ছিল না; এখন বাজারে স্লেট পেন্সিলের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, কিন্তু পাঠশালা হওয়াই মুশকিল। সকল দিকেই ইহা দেখা যাইতেছে। পূর্বে আয়োজন যখন অল্প ছিল, সামাজিকতা অধিক ছিল; এখন আয়োজন বাড়িয়া চলিয়াছে এবং সামাজিকতায় ভাঁটা পড়িতেছে। আমাদের দেশে এক দিন ছিল যখন আসবাবকে আমরা ঐশ্বর্য বলিতাম কিন্তু সভ্যতা বলিতাম না; কারণ তখন দেশে যাঁহারা সভ্যতার ভাণ্ডারী ছিলেন তাঁহাদের ভাণ্ডারে আসবাবের প্রাচুর্য ছিল না। তাঁহারা দারিদ্র্যকে সুভদ্র করিয়া সমস্ত দেশকে সুস্থ স্নিগ্ধ রাখিয়াছিলেন। অন্তত শিক্ষার দিনে যদি আমরা এই আদর্শে মানুষ হইতে পারি তবে আর-কিছু না হউক ইহাতে আমরা কতকগুলি ক্ষমতা লাভ করি— মাটিতে বসিবার ক্ষমতা, মোটা পরিবার মোটা খাইবার ক্ষমতা, যথাসম্ভব অল্প আয়োজনে যথাসম্ভব বেশি কাজ চালাইবার ক্ষমতা। এগুলি কম ক্ষমতা নহে, এবং ইহা সাধনার অপেক্ষা রাখে। সুগমতা, সরলতা, সহজতাই যথার্থ সভ্যতা; বহু আয়োজনের জটিলতা, বর্বরতা; বস্তুত তাহা গলদ্‌ঘর্ম অক্ষমতার স্তূপাকার জঞ্জাল। কতকগুলা জড়বস্তুর অভাবে মনুষ্যত্বের সম্ভ্রম যে নষ্ট হয় না, বরঞ্চ অধিকাংশ স্থলেই স্বাভাবিক দীপ্তিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠে, এ শিক্ষা শিশুকাল হইতে বিদ্যালয়ে লাভ করিতে হইবে— নিষ্ফল উপদেশের দ্বারা নহে, প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দ্বারা। এই নিতান্ত সহজ কথাকে সকল প্রকারে সাক্ষাৎভাবে ছেলেদের কাছে স্বাভাবিক করিয়া দিতে হইবে। এ শিক্ষা নাহিলে শুধু যে আমরা নিজের হাতকে পা'কে, ঘরের মেঝেকে, মাটিকে অবজ্ঞা করিতে অভ্যস্ত হইব তাহা নহে— আমাদের পিতা পিতামহকে ঘৃণা করিব এবং প্রাচীন ভারতবর্ষের সাধনার মাহাত্ম্য যথার্থভাবে অনুভব করিতেই পারিব না।

এইখানে কথা উঠিবে, বাহিরের চিকনচাকনকে যদি তুমি খাতির করিতে না চাও তবে ভিতরের জিনিসটাকে বিশেষভাবে মূল্যবান করিয়া তুলিতে হইবে— সে মূল্য দিবার সাধ্য কি আমাদের আছে? প্রথমেই, জ্ঞানশিক্ষার আশ্রম স্থাপন করিতে হইলে গুরুর প্রয়োজন। শিক্ষক কাগজে বিজ্ঞাপন দিলেই জোটে, কিন্তু গুরু তো ফর্মাশ দিলেই পাওয়া যায় না।

এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, আমাদের সংগতি যাহা আছে তাহার চেয়ে বেশি আমরা দাবি করিতে পারি না এ কথা সত্য। অত্যন্ত প্রয়োজন হইলেও সহসা আমাদের পাঠশালায় গুরুমহাশয়ের আসনে যাজ্ঞবল্ক্য ঋষির আমদানি করা কাহারও আয়ত্তাধীন নহে। কিন্তু এ কথাও বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে, আমাদের যে সংগতি আছে অবস্থাদোষে তাহার পুরাটা দাবি না করিয়া আমরা সম্পূর্ণ মূলধন খাটাইতে পারি না এমন ঘটনাও ঘটে। ডাকের টিকিট লেফাফায় আঁটিবার জন্যই যদি জলের ঘড়া ব্যবহার করি তবে তাহার অধিকাংশ জলই অনাবশ্যক হয়, আবার স্নান করিতে হইলে সেই ঘড়ার জলই সম্পূর্ণ নিঃশেষ করা যায়— একই ঘড়ার উপযোগিতা ব্যবহারের গুণে কমে বাড়ে। আমরা যাঁহাকে ইস্কুলের শিক্ষক করি তাঁহাকে এমন করিয়া ব্যবহার করি যাহাতে তাঁহার হৃদয়মনের অতি অল্প অংশই কাজে খাটে— ফোনোগ্রাফ যন্ত্রের সঙ্গে একখানা বেত এবং কতকটা পরিমাণ মগজ জুড়িয়া দিলেই ইস্কুলের শিক্ষক তৈরি করা যাইতে পারে।

কিন্তু এই শিক্ষককেই যদি গুরুর আসনে বসাইয়া দাও তবে স্বভাবতই তাঁহার হৃদয়মনের শক্তি সমগ্রভাবে শিষ্যের প্রতি ধাবিত হইবে। অবশ্য, তাঁহার যাহা সাধ্য তাহার চেয়ে বেশি তিনি দিতে পারিবেন না, কিন্তু তাহার চেয়ে কম দেওয়াও তাঁহার পক্ষে লজ্জাকর হইবে। এক পক্ষ হইতে যথার্থভাবে দাবি না উত্থাপিত হইলে অন্য পক্ষে সম্পূর্ণ শক্তির উদ্‌বোধন হয় না। আজ ইস্কুলের শিক্ষকরূপে দেশের যেটুকু শক্তি কাজ করিতেছে, দেশ যদি অন্তরের সঙ্গে প্রার্থনা করে তবে গুরুরূপে তাহার চেয়ে অনেক বেশি শক্তি খাটিতে থাকিবে।

আজকাল প্রয়োজনের নিয়মে শিক্ষকের গরজ ছাত্রের কাছে আসা, কিন্তু স্বভাবের নিয়মে শিষ্যের গরজ গুরুকে লাভ করা। শিক্ষক দোকানদার, বিদ্যাদান তাঁহার ব্যবসায়। তিনি খরিদ্দারের সন্ধানে ফেরেন। ব্যাবসাদারের কাছে লোকে বস্তু কিনিতে পারে, কিন্তু তাহার পণ্যতালিকার মধ্যে স্নেহ শ্রদ্ধা নিষ্ঠা প্রভৃতি হৃদয়ের সামগ্রী থাকিবে এমন কেহ প্রত্যাশা করিতে পারে না। এই প্রত্যাশা অনুসারেই শিক্ষক বেতন গ্রহণ করেন ও বিদ্যাবস্তু বিক্রয় করেন—এইখানেই ছাত্রের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক শেষ। এইরূপ প্রতিকূল অবস্থাতেও অনেক শিক্ষক দেনাপাওনার সম্বন্ধ ছাড়াইয়া উঠেন, সে তাঁহাদের বিশেষ মাহাত্ম্যগুণে। এই শিক্ষকই যদি জানেন যে তিনি গুরুর আসনে বসিয়াছেন, যদি তাঁহার জীবনের দ্বারা ছাত্রের মধ্যে জীবনসঞ্চার করিতে হয়, তাঁহার জ্ঞানের দ্বারা তাহার জ্ঞানের বাতি জ্বালিতে হয়, তাঁহার স্নেহের দ্বারা তাহার কল্যাণসাধন করিতে হয়, তবেই তিনি গৌরবলাভ করিতে পারেন; তবে তিনি এমন জিনিস দান করিতে বসেন যাহা পণ্যদ্রব্য নহে, যাহা মূল্যের অতীত; সুতরাং ছাত্রের নিকট হইতে শাসনের দ্বারা নহে, ধর্মের বিধানে, স্বভাবের নিয়মে, তিনি ভক্তিগ্রহণের যোগ্য হইতে পারেন। তিনি জীবিকার অনুরোধে বেতন লইলেও তাহার চেয়ে অনেক বেশি দিয়া আপন কর্তব্যকে মহিমান্বিত করেন। এবারে বাংলাদেশের বিদ্যালয়গুলির 'পরে রাজচক্রের শনির দৃষ্টি পড়িবামাত্র কত প্রবীণ এবং নবীন শিক্ষক জীবিকালুব্ধ শিক্ষকবৃত্তির কলঙ্ককালিমা নির্লজ্জভাবে সমস্ত দেশের সম্মুখে প্রকাশ করিয়াছেন তাহা কাহারও অগোচর নাই। তাঁহারা যদি গুরুর আসনে থাকিতেন তবে পদগৌরবের খাতিরে এবং হৃদয়ের অভ্যাস-বশতই ছোটো ছোটো ছেলেদের উপরে কন্‌স্টেবলি করিয়া নিজের ব্যবসায়কে এরূপ ঘৃণ্য করিয়া তুলিতে পারিতেন না। এই শিক্ষা-দোকানদারির নীচতা হইতে দেশের শিক্ষককে ও ছাত্রগণকে কি আমরা রক্ষা করিব না?

কিন্তু, এ-সকল বিস্তারিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া বোধ করি বৃথা হইতেছে। বোধ হয় গোড়ার কথাতেই অনেকের আপত্তি আছে। আমি জানি অনেকের মত এই যে, লেখাপড়া শিখাইবার জন্য ঘর হইতে ছাত্রদিগকে দূরে পাঠানো তাহাদের পক্ষে হিতকর নহে।

এ সম্বন্ধে প্রথম বক্তব্য কথা এই যে, লেখাপড়া শেখানো বলিতে আমরা আজকাল যাহা বুঝি তাহার জন্য বাড়ির গলির কাছে যে-কোনো একটা সুবিধামত ইস্কুল এবং তাহার সঙ্গে বড়োজোর একটা প্রাইভেট টিউটার রাখিলেই যথেষ্ট। কিন্তু এইরূপ 'লেখাপড়া করে যেই গাড়ি ঘোড়া চড়ে সেই' শিক্ষার দীনতা ও কার্পণ্য মানবসন্তানের পক্ষে যে অযোগ্য তাহা আমি একপ্রকার ব্যক্ত করিয়াছি।

দ্বিতীয় কথা এই, শিক্ষার জন্য বালকদিগকে ঘর হইতে দূরে পাঠানো উচিত নহে, এ কথা মানিতে পারি যদি ঘর তেমনি ঘর হয়। কামার কুমার তাঁতি প্রভৃতি

শিল্পিগণ ছেলেদিগকে নিজের কাছে রাখিয়াই মানুষ করে— তাহার কারণ, তাহারা যেটুকু শিক্ষা দিতে চায় তাহা ঘরে রাখিয়াই ভালোরূপে চলিতে পারে। শিক্ষার আদর্শ আর-একটু উন্নত হইলে ইস্কুলে পাঠাইতে হয়— তখন এ কথা কেহ বলে না যে বাপ-মায়ের কাছে শেখানোই সর্বাপেক্ষা শ্রেয়; কেননা, নানা কারণে তাহা সম্ভবপর হয় না। শিক্ষার আদর্শকে আরও যদি উচ্চে তুলিতে পারি, যদি কেবল পরীক্ষাফললোলুপ পুঁথির শিক্ষার দিকেই না তাকাইয়া থাকি, যদি সর্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্বের ভিত্তিস্থাপনকেই শিক্ষার লক্ষ্য বলিয়া স্থির করি তবে তাহার ব্যবস্থা ঘরে এবং ইস্কুলে করা সম্ভবই হয় না।

সংসারে কেহ বা বণিক, কেহ বা উকিল, কেহ বা ধনী জমিদার, কেহ বা আর-কিছু। ইঁহাদের প্রত্যেকের ঘরের রকমসকম আবহাওয়া স্বতন্ত্র। ইঁহাদের ঘরে ছেলেরা শিশুকাল হইতে বিশেষ একটা ছাপ পাইতে থাকে।

জীবনযাত্রার বৈচিত্র্যে মানুষের আপনি যে একটা বিশেষত্ব ঘটে তাহা অনিবার্য এবং এইরূপে এক-একটা ব্যবসায়ের বিশেষ আকারপ্রকার লইয়া মানুষ এক-একটা কোঠায় বিভক্ত হইয়া যায়, কিন্তু বালকেরা সংসারক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার পূর্বে অজ্ঞাতসারে তাহাদের অভিভাবকদের ছাঁচে তৈরি হইতে থাকা তাহাদের পক্ষে কল্যাণকর নহে।

উদাহরণস্বরূপ দেখা যাক, ধনীর ছেলে। ধনীর ঘরে ছেলে জন্মগ্রহণ করে বটে, কিন্তু ধনীর ছেলে বলিয়া বিশেষ একটা-কিছু হইয়া কেহ জন্মায় না। ধনীর ছেলে এবং দরিদ্রের ছেলে কোনো প্রভেদ লইয়া আসে না। জন্মের পরদিন হইতে মানুষ সেই প্রভেদ নিজের হাতে তৈরি করিয়া তুলিতে থাকে।

এমন অবস্থায় বাপ-মায়ের উচিত ছিল গোড়ায় সাধারণ মনুষ্যত্বে পাকা করিয়া তাহার পরে আবশ্যকমতে ছেলেকে ধনীর সন্তান করিয়া তোলা। কিন্তু তাহা ঘটে না, সে সম্পূর্ণরূপে মানবসন্তান হইতে শিখিবার পূর্বেই ধনীর সন্তান হইয়া উঠে। ইহাতে দুর্লভ মানবজন্মের অনেকটাই তাহার অদৃষ্টে বাদ পড়িয়া যায়, জীবনধারণের অনেক রসাস্বাদের ক্ষমতাই তাহার বিলুপ্ত হয়। প্রথমেই তো বদ্ধ-ডানা খাঁচার পাখির মতো বাপ-মা ধনীর ছেলেকে, হাত পা সত্ত্বেও একেবারে পঙ্গু করিয়া ফেলেন। তাহার চলিবার জো নাই, গাড়ি চাই: সামান্য বোঝাটুকু বহিবার জো নাই, মুটে চাই: নিজের কাজ চালাইবার জো নাই, চাকর চাই। শুধু যে শারীরিক ক্ষমতার অভাবে এরূপ ঘটে তাহা নহে, লোকলজ্জায় সে হতভাগ্য সুস্থ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সত্ত্বেও পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়া থাকে। যাহা সহজ তাহা তাহার পক্ষে কষ্টকর, যাহা স্বাভাবিক তাহা তাহার পক্ষে লজ্জাকর হইয়া উঠে। দলের লোকের মুখ চাহিয়া তাহাকে যে-সকল অনাবশ্যক শাসনে বদ্ধ হইতে হয় তাহাতে সে সহজ মনুষ্যের বহুতর অধিকার হইতে বঞ্চিত হয়। পাছে তাহাকে কেহ ধনী না মনে করে এইটুকু লজ্জা সে সহিতে পারে না: ইহার জন্য পর্বতপ্রমাণ ভার তাহাকে বহন করিতে হয় এবং এই ভারে পৃথিবীতে সে পদে পদে আবদ্ধ হইয়া থাকে। তাহাকে কর্তব্য করিতে হইলেও এই-সকল ভার বহিয়া করিতে হয়, আরাম করিতে হইলেও এই-সকল ভার লইয়া করিতে হয়, ভ্রমণ করিতে হইলে সঙ্গে সঙ্গে এই-সকল ভার টানিয়া বেড়াইতে হয়। সুখ যে মনে, আয়োজনে নহে, এই সরল সত্যটুকু তাহাকে সর্বপ্রকার চেষ্টার দ্বারা ভুলিতে দিয়া তাহাকে সহস্রবিধ জড়পদার্থের দাসানুদাস করিয়া তোলা হয়। নিজের সামান্য প্রয়োজনগুলিকে সে এত বাড়াইয়া তোলে যে, তাহার পক্ষে ত্যাগস্বীকার অসাধ্য হয়, কষ্টস্বীকার করা অসম্ভব হইয়া

উঠে। জগতে এত বড়ো বন্দী, এত বড়ো পঙ্গু আর-কেহ নাই। তবু কি বলিতে হইবে— এই-সকল অভিভাবক, যাহারা কৃত্রিম অক্ষমতাকে গর্বের সামগ্রী করিয়া দাঁড় করাইয়া পৃথিবীর শস্যক্ষেত্রগুলিকে কাঁটার গাছে ছাইয়া ফেলিল তাহারাই সন্তানদের হিতৈষী? যাহারা বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া স্বেচ্ছাপূর্বক বিলাসিতাকে বরণ করিয়া লয় তাহাদিগকে বাধা দেওয়া কাহারও সাধ্য নয়। কিন্তু শিশুরা, যাহারা ধুলামাটিকে ঘৃণা করে না, যাহারা রৌদ্রবৃষ্টিবায়ুকে প্রার্থনা করে, যাহারা সাজসজ্জা করাইতে গেলে পীড়া বোধ করে, নিজের সমস্ত ইন্দ্রিয় চালনা করিয়া জগৎকে প্রত্যক্ষভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখাতেই যাহাদের সুখ— নিজের স্বভাবে স্থিতি করিয়া যাহাদের লজ্জা নাই, সংকোচ নাই, অভিমান নাই— তাহাদিগকে চেষ্টার দ্বারা বিকৃত করিয়া দিয়া চিরদিনের মতো অকর্মণ্য করিয়া দেওয়া কেবল পিতামাতার দ্বারাই সম্ভব; সেই পিতামাতার হাত হইতে এই নিরপরাধগণকে রক্ষা করো।

আমরা জানি, অনেকের ঘরে বালকবালিকা সাহেবিয়ানায় অভ্যস্ত হইতেছে। তাহারা আয়ার হাতে মানুষ হয়, বিকৃত হিন্দুস্থানি শেখে, বাংলা ভুলিয়া যায় এবং বাঙালির ছেলে বাংলাসমাজ হইতে যে শত-সহস্র ভাবসূত্রে আজন্মকাল বিচিত্র রস আকর্ষণ করিয়া পরিপুষ্ট হয় সেই-সকল স্বজাতীয় নাড়ির যোগ হইতে তাহারা বিচ্ছিন্ন হয়— অথচ ইংরেজি সমাজের সঙ্গে তাহাদের সম্বন্ধ থাকে না। তাহারা অরণ্য হইতে উৎপাটিত হইয়া বিলাতি টিনের টবের মধ্যে বড়ো হইতেছে। আমি স্বকর্ণে শুনিয়াছি এই শ্রেণীর একটি ছেলে দূর হইতে কয়েকজন দেশীভাবাপন্ন আত্মীয়কে দেখিয়া তাহার মাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছে : Mamma, Mamma, look, lot of Babus are coming। বাঙালির ছেলের এমন দুর্গতি আর কী হইতে পারে! বড়ো হইয়া স্বাধীন রুচি ও প্রবৃত্তি-বশত যাহারা সাহেবি চাল অবলম্বন করে তাহারা করুক, কিন্তু তাহাদের শিশু-অবস্থায় যে-সকল বাপ-মা বহু অপব্যয়ে ও বহু অপচেষ্টায় সন্তানদিগকে সকল সমাজের বাহির করিয়া দিয়া স্বদেশে অযোগ্য এবং বিদেশে অগ্রাহ্য করিয়া তুলিতেছে, সন্তানদিগকে কেবলমাত্র কিছুকাল নিজের উপার্জনের নিতান্ত অনিশ্চিত আশ্রয়ের মধ্যে বেষ্টন করিয়া রাখিয়া ভবিষ্যৎ দুর্গতির জন্য বিধিমতে প্রস্তুত করিতেছে, এই-সকল অভিভাবকদের নিকট হইতে বালকগণ দূরে থাকিলেই কি অত্যন্ত দুশ্চিন্তার কারণ ঘটিবে?

আমি শেষোক্ত দৃষ্টান্তটি যে দিলাম, তাহার একটু কারণ আছে। সাহেবিয়ানায় যাঁহারা অভ্যস্ত নন এই দৃষ্টান্ত তাঁহাদিগকে প্রবলভাবে আঘাত করিবে। তাঁহারা নিশ্চয়ই মনে মনে ভাবিবেন, লোকে কেন এটুকু বুঝিতে পারে না, কেন সমস্ত ভবিষ্যৎ ভুলিয়া কেবল নিজের কতকগুলা বিকৃত অভ্যাসের অন্ধতায় ছেলেদের এমন সর্বনাশ করিতে বসে!

কিন্তু মনে রাখিবেন, যাঁহারা সাহেবিয়ানায় অভ্যস্ত, তাঁহারা এই কাণ্ড অতি সহজেই করিয়া থাকেন, তাঁহারা সন্তানদের যে কোনো প্রকার অভ্যাস-দোষ ঘটাইতেছেন তাহা মনেও করিতে পারেন না। ইহাতে এইটুকু বোঝা উচিত, আমাদের নিজেদের মধ্যে যে-সকল বিশেষ বিকৃতি আছে তাহার সম্বন্ধে আমরা অনেকটা অচেতন— তাহা আমাদিগকে এত বেশি পাইয়া বসিয়াছে যে, তাহাতে করিয়া আর-কাহারও অনিষ্ট অসুবিধা হইলেও আমরা উদাসীন থাকি। আমরা মনে করি, পরিবারের মধ্যে নানা প্রকার রোষ-দ্বেষ অন্যায়-পক্ষপাত বিবাদ-বিরোধ নিন্দা-গ্লানি কু-অভ্যাস কুসংস্কারের প্রাদুর্ভাব থাকিলেও পরিবার হইতে দূরে

থাকাই ছেলেদের পক্ষে সর্বাপেক্ষা বিপদ। আমরা যাহার মধ্যে মানুষ হইয়াছি তাহারই মধ্যে আর-কেহ মানুষ হইলে ক্ষতি আছে, এ কথা আমাদের মনেও আসে না। কিন্তু মানুষ করিবার আদর্শ যদি খাঁটি হয়, যদি ছেলেকে আমাদের মতোই চলনসই কাজের লোক করাকেই আমরা যথেষ্ট না মনে করি, তবে এ কথা আমাদের মনে উদয় হইবেই যে, ছেলেদিগকে শিক্ষাকালে এমন জায়গায় রাখা কর্তব্য যেখানে তাহারা স্বভাবের নিয়মে বিশ্বপ্রকৃতির সহিত ঘনিষ্ঠ হইয়া ব্রহ্মচর্যপালনপূর্বক গুরুর সহবাসে জ্ঞানলাভ করিয়া মানুষ হইয়া উঠিতে পারে।

ভ্রূণকে গর্ভের মধ্যে এবং বীজকে মাটির মধ্যে নিজের উপযুক্ত খাদ্যের দ্বারা পরিবৃত হইয়া গোপনে থাকিতে হয়। তখন দিনরাত্রি তাহার একমাত্র কাজ খাদ্যশোষণ করিয়া নিজেকে আকাশের জন্য আলোকের জন্য প্রস্তুত করা। তখন সে আহরণ করে না, চারি দিক হইতে শোষণ করে। প্রকৃতি তাহাকে অনুকূল অন্তরালের মধ্যে আহার দিয়া বেষ্টন করিয়া রাখে; বাহিরের নানা আঘাত অপঘাত তাহার নাগাল পায় না এবং নানা আকর্ষণে তাহার শক্তি বিভক্ত হইয়া পড়ে না।

ছাত্রদের শিক্ষাকালও তাহাদের পক্ষে এইরূপ মানসিক ভ্রূণ-অবস্থা। এই সময়ে তাহারা জ্ঞানের একটি সজীব বেষ্টনের মধ্যে দিনরাত্রি মনের খোরাকের মধ্যেই বাস করিয়া বাহিরের সমস্ত বিভ্রান্তি হইতে দূরে গোপনে যাপন করিবে, ইহাই স্বাভাবিক বিধান। এই সময়ে চতুর্দিকে সমস্তই তাহাদের অনুকূল হওয়া চাই, যাহাতে তাহাদের মনের একমাত্র কাজ হয়— জানিয়া এবং না জানিয়া খাদ্য-শোষণ, শক্তিসঞ্চয় এবং নিজের পুষ্টিসাধন করা।

সংসার কাজের জায়গা এবং নানা প্রবৃত্তির লীলাভূমি। সেখানে এমন অনুকূল অবস্থার সংঘটন হওয়া বড়ো কঠিন যাহাতে শিক্ষাকালে অক্ষুব্ধভাবে ছেলেরা শক্তিলাভ এবং পরিপূর্ণ জীবনের মূলপত্তন করিতে পারে। শিক্ষা সমাধা হইলে গৃহী হইবার যথার্থ ক্ষমতা তাহাদের জন্মিবে। কিন্তু সংসারের সমস্ত প্রবৃত্তি-সংঘাতের মধ্যে যথেচ্ছ মানুষ হইলে গৃহস্থ হইবার উপযুক্ত মনুষ্যত্ব লাভ করা যায় না— বিষয়ী হওয়া যায়, ব্যবসায়ী হওয়া যায়, কিন্তু মানুষ হওয়া কঠিন হয়। একদিন গৃহধর্মের আদর্শ আমাদের দেশে অত্যন্ত উচ্চ ছিল বলিয়াই সমাজে তিন বর্ণকে সংসারপ্রবেশের পূর্বে ব্রহ্মচর্যপালনের দ্বারা নিজেকে প্রস্তুত করিবার উপদেশ ও ব্যবস্থা ছিল। অনেক দিন হইতেই সে আদর্শ হীন হইয়াছে এবং তাহার স্থলে কোনো মহৎ-আদর্শই গ্রহণ করি নাই বলিয়া আজ আমরা কেরানি সেরেস্তাদার দারোগা ডেপুটি-ম্যাজিস্ট্রেট হইয়াই সন্তুষ্ট থাকি; তাহার বেশি হওয়াকে মন্দ বলি না, তবে বাহুল্য বলি।

কিন্তু তাহার অনেক বেশিও বাহুল্য নয়। আমি কেবল হিন্দুর তরফে বলিতেছি না, কোনো দেশেই কোনো সমাজেই বাহুল্য নয়। অন্য দেশে ঠিক এইরূপ শিক্ষাপ্রণালী অবলম্বিত হয় নাই অথচ তাহারা লড়াই করিতেছে, বাণিজ্য করিতেছে, টেলিগ্রাফের তার খাটাইতেছে, রেলগাড়ির এঞ্জিন চালাইতেছে— এ দেখিয়া আমরা ভুলিয়াছি। এ ভুল যে সভাস্থলে কোনো-একটা প্রবন্ধের আলোচনা করিয়াই ভাঙিবে এমন আশা করিতে পারি না। অতএব আশঙ্কা হয় আজ আমরা 'জাতীয়' শিক্ষাপরিষৎ রচনা করিবার সময় নিজের দেশ নিজের ইতিহাস ছাড়া সর্বত্রই নজির খুঁজিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া আরো একটা ছাঁচে-ঢালা কলের ইস্কুল তৈরি করিয়া বসিব। আমরা প্রকৃতিকে বিশ্বাস করি না, মানুষের প্রতি ভরসা রাখি না, কল বৈ আমাদের গতি নাই। আমরা মনে বুঝিয়াছি, নীতিপাঠের কল

পাতিলেই মানুষে সাধু হইয়া উঠিবে এবং পুঁথি পড়াইবার বড়ো ফাঁদ পাতিলেই মানুষের তৃতীয় চক্ষু যে জ্ঞাননেত্র তাহা আপনি উদ্‌ঘাটিত হইয়া যাইবে।

দস্তুরমত একটা ইস্কুল ফাঁদার চেয়ে জ্ঞানদানের উপযুক্ত আশ্রম স্থাপন কঠিন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই কঠিনকে সহজ করাই ভারতবর্ষের কাজ হইবে। কারণ, এই আশ্রমের আদর্শ আমাদের কল্পনা হইতে এখনো যায় নাই এবং য়ুরোপের নানাপ্রকার বিদ্যাও আমাদের গোচর হইয়াছে। বিদ্যালাভ ও জ্ঞানলাভের প্রণালীর মধ্যে আমাদিগকে সামঞ্জস্যস্থাপন করিতে হইবে। ইহাই যদি না পারিলাম তবে কেবলই নকলের দিকে মন রাখিয়া আমরা সর্বপ্রকারে ব্যর্থ হইব। অধিকার লাভ করিতে গেলেই আমরা পরের কাছে হাত পাতি এবং গড়িয়া তুলিতে গেলেই আমরা নকল করিতে বসিয়া যাই— নিজের শক্তি এবং নিজের মনের দিকে, দেশের প্রকৃতি ও দেশের যথার্থ প্রয়োজনের দিকে তাকাই না, তাকাইতে সাহসই হয় না। যে শিক্ষার ফলে আমাদের এই দশা হইতেছে সেই শিক্ষাকেই নূতন একটা নাম দিয়া স্থাপন করিলেই যে তাহা নূতন ফল প্রসব করিতে থাকিবে, এরূপ আশা করিয়া নূতন আর-একটা নৈরাশ্যের মুখে অগ্রসর হইতে প্রবৃত্তি হয় না। এ কথা আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে, যেখানে মুষলধারায় চাঁদার টাকা আসিয়া পড়ে সেইখানেই যে শিক্ষা বেশি করিয়া জমা হইতে থাকে তাহা নহে, মনুষ্যত্ব টাকায় কেনা যায় না; যেখানে কমিটির নিয়মধারা অহরহ বর্ষিত হয় সেইখানেই যে শিক্ষা-কল্পলতা তাড়াতাড়ি বাড়িয়া উঠে তাহাও নহে— শুদ্ধমাত্র নিয়মাবলী অতি উত্তম হইলেও তাহা মানুষের মনকে খাদ্য দান করে না। বহুবিধ বিষয়-পাঠনার ব্যবস্থা করিলেই যে শিক্ষায় লাভের অঙ্ক অগ্রসর হয় তাহা নহে, মানুষ যে বাড়ে সে 'ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন'। যেখানে নিভৃতে তপস্যা হয় সেইখানেই আমরা শিখিতে পারি। যেখানে গোপনে ত্যাগ, যেখানে একান্তে সাধনা, সেইখানেই আমরা শক্তিলাভ করি। যেখানে সম্পূর্ণভাবে দান সেইখানেই সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ সম্ভবপর। যেখানে অধ্যাপকগণ জ্ঞানের চর্চায় স্বয়ং প্রবৃত্ত সেইখানেই ছাত্রগণ বিদ্যাকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পায়। বাহিরে বিশ্বপ্রকৃতির আবির্ভাব যেখানে বাধাহীন, অন্তরে সেইখানেই মন সম্পূর্ণ বিকশিত। ব্রহ্মচর্যের সাধনায় চরিত্র যেখানে সুস্থ এবং আত্মবশ, ধর্মশিক্ষা সেইখানেই সরল ও স্বাভাবিক। আর, যেখানে কেবল পুঁথি ও মাস্টার, সেনেট ও সিন্‌ডিকেট, ইঁটের কোঠা ও কাঠের আসবাব, সেখানে আজও আমরা যত বড়ো হইয়া উঠিয়াছি কালও আমরা তত বড়োটা হইয়াই বাহির হইব।

আষাঢ় ১৩১৩

জাতীয় বিদ্যালয়

জাতীয় বিদ্যালয় তো বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল, এখন, এই বিদ্যালয়ের উপযোগিতা যে কী সে কি যুক্তি দিয়া বুঝাইবার আর-কোনো প্রয়োজন আছে?

যুক্তির অভাবে পৃথিবীতে খুব অল্প জিনিসই ঠেকিয়াছে। প্রয়োজন আছে এ কথা বুঝাইয়া দিলেই যে প্রয়োজনসিদ্ধি হয়, অন্তত আমাদের দেশে তাহার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। আমাদের অভাব তো অনেক আছে, অভাব আছে

এ কথা বুঝাইবার লোকও অনেক আছে এবং এ কথা মানিবার লোকেরও অভাব নাই, তবু ইহাতে ইতর-বিশেষ কিছুই ঘটে না।

আসল কথা, যুক্তি কোনো বড়ো জিনিসের সৃষ্টি করিতে পারে না। স্ট্যাটিস্‌টিক্‌সের তালিকা-যোগে লাভ সুবিধা প্রয়োজনের কথা বুঝাপড়া করিতে করিতে কেবল গলা ভাঙে, তাহাতে কিছু গড়ে না। শ্রোতারা গবেষণার প্রশংসা করে, আর-কিছু করা আবশ্যক বোধ করে না।

আমাদের দেশের একটা মুশকিল এই হইয়াছে, শিক্ষা বলো, স্বাস্থ্য বলো, সম্পদ বলো, আমাদের উপরে-যে কিছু নির্ভর করিতেছে এ কথা আমরা এক রকম ভুলিয়াছিলাম। অতএব এ-সকল বিষয়ে আমাদের বোঝা না-বোঝা দুইই প্রায় সমান ছিল। আমরা জানি দেশের সমস্ত মঙ্গলসাধনের দায়িত্ব গবর্মেন্‌টের, অতএব আমাদের অভাব কী আছে না-আছে তাহা বোঝার দরুন কোনো কাজ অগ্রসর হইবার কোনো সম্ভাবনা নাই। এমনতরো দায়িত্ববিহীন আলোচনায় পৌরুষের ক্ষতি করে। ইহাতে পরের উপর নির্ভর আরো বাড়াইয়া তোলে।

স্বদেশ যে আমাদেরই কর্মক্ষেত্র এবং আমরাই যে তাহার সর্বপ্রধান কর্মী, এমন-কি অন্যে অনুগ্রহপূর্বক যতই আমাদের কর্মভার লাঘব করিবে, আমাদের স্বচেষ্টার কঠোরতাকে যতই খর্ব করিবে, ততই আমাদিগকে বঞ্চিত করিয়া কাপুরুষ করিয়া তুলিবে— এ কথা যখন নিঃসংশয়ে বুঝিব তখনই আর-আর কথা বুঝিবার সময় হইবে।

ইংরেজিতে একটা প্রবাদ শুনিতে পাই, ইচ্ছা যেখানে পথ সেখানেই আছে। এ কথা কেহ বলে না, যুক্তি যেখানে আছে পথ সেইখানেই। কিন্তু, আমাদের ইচ্ছা যে আমাদের পথ রচনা করিতে পারে, পুরুষোচিত এই কথার প্রতি আমাদের বিশ্বাস ছিল না। আমরা জানিতাম, ইচ্ছা আমরা করিব, কিন্তু পথ করা না-করা সে অন্যের হাত, তাহাতে আমাদের হাত কেবল দরখাস্তে সই করিবার বেলায়।

এইজন্য উপযোগিতা বিচার করিয়া, অভাব বুঝিয়া, এতদিন আমরা কিছুই করি নাই। পরিণামবিহীন আন্দোলন-আলোচনার দ্বারা আমাদের প্রকৃতি যথার্থ বললাভ করে নাই। এইজন্যই ইচ্ছাশক্তির প্রভাব যে কিরূপ অব্যর্থ আমাদের নিজের মধ্যে তাহার পরিচয় পাইবার বড়োই প্রয়োজন ছিল। রাজা যে আমাদের পক্ষে কত বড়ো অনুকূল তাহা নহে, কিন্তু ইচ্ছা যে আমাদের মধ্যে কত বড়ো শক্তি ইহাই নিশ্চয় বুঝিবার জন্য আমাদের একান্ত অপেক্ষা ছিল।

বিধাতার প্রসাদে আজ কেমন করিয়া সেই পরিচয় পাইয়াছি। আজ আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম ইচ্ছাই ঈশ্বরের ঐশ্বর্য, সমস্ত সৃষ্টির গোড়াকার কথাটা ইচ্ছা। যুক্তি নহে, তর্ক নহে, সুবিধা-অসুবিধার হিসাব নহে, আজ বাঙালির মনে কোথা হইতে একটা ইচ্ছার বেগ উপস্থিত হইল এবং পরক্ষণেই সমস্ত বাধা-বিপত্তি সমস্ত দ্বিধাসংশয় বিদীর্ণ করিয়া অখণ্ড পুণ্যফলের ন্যায় আমাদের জাতীয় বিদ্যাব্যবস্থা আকারগ্রহণ করিয়া দেখা দিল। বাঙালির হৃদয়ের মধ্যে ইচ্ছার যজ্ঞহুতাশন জ্বলিয়া উঠিয়াছিল এবং সেই অগ্নিশিখা হইতে চরু হাতে করিয়া আজ দিব্যপুরুষ উঠিয়াছেন— আমাদের বহুদিনের শূন্য আলোচনার বন্ধ্যাত্ব এইবার বুঝি ঘুচিবে। যাহা চেষ্টা করিয়া, কষ্ট করিয়া, তর্ক করিয়া দীর্ঘ কালেও হইবার নহে, পূর্বতন সমস্ত হিসাবের খাতা খতাইয়া দেখিলে বিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই যাহাকে অসাময়িক অসম্ভব অসংগত বলিয়া সবলে পক্বশীর্ষ চালনা করিতেন, তাহা কত সহজে কত অল্প সময়ে আজ সত্যরূপে আবির্ভূত হইল।

অনেক দিন পরে আজ বাঙালি যথার্থভাবে একটা-কিছু পাইল। এই পাওয়ার মধ্যে কেবল-যে একটা উপস্থিত লাভ আছে তাহা নহে, ইহা আমাদের একটা শক্তি। আমাদের যে পাইবার ক্ষমতা আছে সে ক্ষমতাটা যে কী এবং কোথায়, আমরা তাহাই বুঝিলাম। এই পাওয়ার আরম্ভ হইতে আমাদের পাইবার পথ প্রশস্ত হইল। আমরা বিদ্যালয়কে পাইলাম যে তাহা নহে, আমরা নিজের সত্যকে পাইলাম, নিজের শক্তিকে পাইলাম।

আমি আপনাদের কাছে আজ সেই আনন্দের জয়ধ্বনি তুলিতে চাই। আজ বাংলাদেশে যাহার আবির্ভাব হইল তাহাকে কিভাবে গ্রহণ করিতে হইবে তাহা যেন আমরা না ভুলি। আমরা পাঁচ জনে যুক্তি করিয়া কাঠখড় দিয়া কোনোমতে কোনো-একটা সুবিধার খেলনা গড়িয়া তুলি নাই—আমাদের বঙ্গমাতার সূতিকা-গৃহে আজ সজীব মঙ্গল জন্মগ্রহণ করিয়াছে; সমস্ত দেশের প্রাঙ্গণে আজ যেন আনন্দশঙ্খ বাজিয়া উঠে; আজ যেন উপঢৌকন প্রস্তুত থাকে, আজ আমরা যেন কৃপণতা না করি।

সুযোগ-সুবিধার কথা কালক্রমে চিন্তা করিবার অবসর আসিবে, আজ আমাদিগকে গৌরব অনুভব করিয়া উৎসব আরম্ভ করিতে হইবে। আমি ছাত্রদিগকে বলিতেছি, আজ তোমরা গৌরবে সমুদয় হৃদয় পরিপূর্ণ করিয়া স্বদেশের বিদ্যামন্দিরে প্রবেশ করো; তোমরা অনুভব করো বাঙালি জাতির শক্তির একটি সফলমূর্তি তাঁহার সিংহাসনের সম্মুখে তোমাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন, তাঁহাকে যে পরিমাণে যথার্থরূপে তোমরা মানিবে তিনি সেই পরিমাণে তেজ লাভ করিবেন এবং সেই তেজে আমরা সকলে তেজস্বী হইব। এই-যে জাতীয় শক্তির তেজ ইহার কাছে ব্যক্তিগত সামান্য ক্ষতিবৃদ্ধি সমস্তই তুচ্ছ। তোমরা যদি এই বিদ্যাভবনের জন্য গৌরব অনুভব কর তবেই ইহার গৌরববৃদ্ধি হইবে। বড়ো বাড়ি, মস্ত জমি বা বৃহৎ আয়োজনে ইহার গৌরব নহে; তোমাদের শ্রদ্ধা, তোমাদের নিষ্ঠা, বাঙালির আত্মসমর্পণে ইহার গৌরব। বাঙালির ইচ্ছায় ইহার সৃষ্টি, বাঙালির নিষ্ঠায় ইহার রক্ষা—ইহাই ইহার গৌরব এবং এই গৌরবই আমাদের গৌরব।

আমাদের অন্তঃকরণে যতক্ষণ পর্যন্ত গৌরববোধ না জন্মে ততক্ষণ কেবলই অন্যের সঙ্গে আমাদের অনুষ্ঠানের তুলনা করিয়া আমরা পদে পদে লজ্জিত ও হতাশ হইতে থাকি। ততক্ষণ আমাদের বিদ্যালয়ের সঙ্গে অন্য দেশের বিদ্যালয় মিলাইয়া দেখিবার প্রবৃত্তি হয়; যেটুকু মেলে সেইটুকুতেই গর্ববোধ করি, যেটুকু না মেলে সেইটুকুতেই খাটো হইয়া যাই।

কিন্তু এরূপ তুলনা কেবল নির্জীব পদার্থ সম্বন্ধেই খাটে। গজকাঠিতে বা ওজনের বাটখারায় জীবিত বস্তুর পরিমাপ হয় না। আজ আমাদের দেশে এই-যে জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, আমি বলিতেছি, ইহা নির্জীব ব্যাপার নহে—আমরা প্রাণ দিয়া প্রাণসৃষ্টি করিয়াছি। সুতরাং যেখানে ইহাকে দাঁড় করানো হইল সেইখানেই ইহার শেষ নহে; ইহা বাড়িবে, ইহা চলিবে—ইহার মধ্যে বিপুল ভবিষ্যৎ রহিয়াছে, তাহার ওজন কে করিতে পারে! যে-কোনো বাঙালি নিজের প্রাণের মধ্যে এই বিদ্যালয়ের প্রাণ অনুভব করিবে, সে কোনোমতেই ইঁটকাঠের দরে ইহার মূল্যনিরূপণ করিবে না; সে ইহার প্রথম আরম্ভের মধ্যে চরম পরিণামের মহতী সম্পূর্ণতা অনুভব করিবে, সে ইহার ব্যক্ত ও অব্যক্ত সমস্তটাকে এক করিয়া সজীব সত্যের সেই সমগ্রমূর্তির নিকট আনন্দের সহিত আত্মসমর্পণ করিবে।

তাই আজ আমি ছাত্রদিগকে অনুরোধ করিতেছি, এই বিদ্যালয়ের প্রাণকে

অনুভব করো, সমস্ত বাঙালি জাতির প্রাণের সঙ্গে এই বিদ্যালয়ের যে প্রাণের যোগ হইয়াছে তাহা নিজের অন্তঃকরণের মধ্যে উপলব্ধি করো—ইহাকে কোনোদিন একটা ইস্কুলমাত্র বলিয়া ভ্রম করিয়ো না। তোমাদের উপরে এই একটি মহৎ দায়িত্ব রহিল। স্বদেশের একটি পরম ধনের রক্ষণভার আজ তোমাদের উপরে যতটা পরিমাণে ন্যস্ত হইল, তোমাদিগকে একান্ত ভক্তির সহিত, নম্রতার সহিত তাহা বুঝিয়া লইতে হইবে। ইহাতে তপস্যার প্রয়োজন হইবে। ইতিপূর্বে অন্য কোনো বিদ্যালয় তোমাদের কাছে এত কঠোরতা দাবি করিতে পারে নাই। এই বিদ্যালয় হইতে কোনো সহজ সুবিধা আশা করিয়া ইহাকে ছোটো হইতে দিয়ো না। বিপুল চেষ্টার দ্বারা ইহাকে তোমাদের মস্তকের ঊর্ধ্বে তুলিয়া ধরো, ইহার ক্লেশসাধ্য আদর্শকে মহত্তম করিয়া রাখো; ইহাকে কেহ যেন লজ্জা না দেয়, উপহাস করিতে না পারে; সকলেই যেন স্বীকার করে যে, আমরা শৈথিল্যকে প্রশ্রয় দিবার জন্য, জড়ত্বকে সম্মানিত করিবার জন্য বড়ো নাম দিয়া একটা কৌশল অবলম্বন করি নাই। তোমাদিগকে পূর্বাপেক্ষা যে দুরূহতর প্রয়াস, যে কঠিনতর সংযম আশ্রয় করিতে হইবে, তাহা ব্রতস্বরূপ, ধর্মস্বরূপ গ্রহণ করিয়ো। কারণ, এ বিদ্যালয় তোমাদিগকে বাহিরের কোনো শাসনের দ্বারা, কোনো প্রলোভনের দ্বারা আবদ্ধ করিতে পারিবে না—ইহার বিধানকে অগ্রাহ্য করিলে তোমরা কোনো পদ বা পদবীর ভরসা হইতে ভ্রষ্ট হইবে না—কেবল তোমাদের স্বদেশকে, তোমাদের ধর্মকে শিরোধার্য করিয়া, স্বজাতির গৌরব এবং নিজের চরিত্রের সম্মানকে নিয়ত স্মরণে রাখিয়া তোমাদিগকে এই বিদ্যালয়ের সমস্ত কঠিন ব্যবস্থা স্বেচ্ছাপূর্বক অনুদ্ধত আত্মোৎসর্গের সহিত নতশিরে বহন করিতে হইবে।

আমাদের এই বিদ্যালয় সম্বন্ধে যখন চিন্তা করিবে তখন এই কথা ভাবিয়া দেখিয়ো যে, যে দেশে জলাশয় নাই সে দেশে আকাশের বৃষ্টিপাত ব্যর্থ হইয়া যায়। জল ধরিবার স্থান না থাকিলে বৃষ্টিধারার অধিকাংশ ব্যবহার নষ্ট হইতে থাকে। আমাদের দেশে যে জ্ঞানী, গুণী, ক্ষমতাসম্পন্ন লোক জন্মগ্রহণ করেন না তাহা নহে; কিন্তু তাঁহাদের জ্ঞান গুণ ও ক্ষমতা ধরিয়া রাখিবার কোনো ব্যবস্থা আমাদের দেশে নাই। তাঁহারা চাকরি করেন, ব্যাবসা করেন, রোজগার করেন, পরের হুকুম মানিয়া চলেন, তাহার পরে পেন্সন লইয়া ভাবিয়া পান না কেমন করিয়া দিন কাটিবে। এমন প্রত্যহ কত রাশি রাশি সামর্থ্য দেশের উপর দিয়া গড়াইয়া, বহিয়া, উবিয়া চলিয়া যাইতেছে। ইহা আমরা নিশ্চয় জানি, বিধাতার অভিশাপে আমাদের দেশে যে শক্তির চিরন্তন অনাবৃষ্টি ঘটিয়াছে তাহা নহে—দেশের শক্তিকে দেশের কাজে ব্যবহারে লাগাইবার, তাহাকে কোথাও একত্রে সংগ্রহ করিবার কোনো বিধান আমরা করি নাই। এইজন্য যে শক্তি আছে সে শক্তিকে প্রত্যক্ষ করিবার, অনুভব করিবার কোনো উপায় আমাদের হাতে নাই। যদি আমাদের প্রতি কেহ শক্তিহীনতার অপবাদ দেয় তবে রাজসরকারের চাকরির ইতিবৃত্ত হইতে রায়বাহাদুরের তালিকা খুঁজিয়া বেড়াইতে হয়, নিতান্ত তুচ্ছ সাময়িক প্রতিপত্তির উঞ্ছ খুঁটিয়া নিজেদের সামর্থ্য সপ্রমাণ করিবার জন্য চেষ্টা করিতে হয়; কিন্তু তাহাতে আমরা সান্ত্বনা পাই না এবং নিজেদের প্রতি বিশ্বাস আন্তরিক হইয়া উঠে না।

এমন দুর্দশার দিনে এই জাতীয় বিদ্যালয় আমাদের বিধিদত্ত শক্তিসঞ্চয়ের একটি উপায়স্বরূপে আবির্ভূত হইয়াছে। দেশের মহত্ত্ব এইখানে স্বভাবতই আকৃষ্ট হইয়া বাঙালি জাতির চিরদিনের সম্বলের মতো এই ভাণ্ডে, এই ভাণ্ডারে

রক্ষিত ও বর্ধিত হইতে থাকিবে। অতি অল্প কালের মধ্যেই কি তাহার প্রমাণ আমরা পাই নাই? এই বিদ্যালয়ে দেখিতে দেখিতে দেশের যে-সকল প্রভাবসম্পন্ন পূজ্য ব্যক্তিগণকে আমরা একত্রে লাভ করিয়াছি তাঁহাদের প্রচুর সামর্থ্য কি কেবলমাত্র আহ্বানেরই অভাবে, কেবলমাত্র যজ্ঞক্ষেত্রেরই অবর্তমানে ক্ষীণভাবে বিক্ষিপ্ত হইয়া যাইত না? এ কি আমাদের কম সৌভাগ্য! দেশের গুরুজনেরা যেখানে স্বেচ্ছাপূর্বক উৎসাহের সহিত সমবেত হইতেছেন সেইখানেই দেশের ছাত্রগণের শিক্ষালাভের ব্যবস্থা হইয়াছে, এ কি আমাদের সামান্য কল্যাণ! উপযুক্ত দাতাসকলে শ্রদ্ধার সহিত দান করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিতেছেন, উপযুক্ত গ্রহীতারাও শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিবার জন্য করজোড়ে দাঁড়াইয়াছেন, এমন শুভযোগ যেখানে সেখানে দাতাও ধন্য, গ্রহীতাও ধন্য এবং সেই যজ্ঞভূমিও পুণ্যস্থান।

আমরা আক্ষেপ করিয়া থাকি যে, আমাদের দেশের লোক দেশহিতকর কাজে ত্যাগস্বীকার করিতে পারে না। কেন পারে না? তাহার কারণ, হিতকর কার্য তাহাদের সম্মুখে সত্য হইয়া দেখা দেয় না। কতকগুলি কাজের মতো কাজ আমাদের নিকটে বর্তমান থাকে, ইহা আমাদের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়। না থাকিলে প্রতিদিনের তুচ্ছ স্বার্থ আমাদের কাছে অত্যন্ত বেশি সত্য হইয়া, বড়ো হইয়া উঠে। স্বীকার করি, আমরা এ পর্যন্ত দেশের মঙ্গলের জন্য তেমন করিয়া ত্যাগ করিতে পারি নাই। কিন্তু মঙ্গল যদি মূর্তি ধরিয়া আমাদের প্রাঙ্গণে দাঁড়াইত তবে তাহাকে না চিনিয়া এবং না দিয়া কি থাকিতে পারিতাম? ত্যাগস্বীকার মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক, কিন্তু সেই ত্যাগে প্রবৃত্ত করাইবার উপলক্ষ কেবল কথার কথা হইলে চলে না; চাঁদার খাতা এবং অনুষ্ঠানপত্র আমাদের মন এবং অর্থে টান দিতে পারে না।

যে জাতি আপনার ঘরের কাছে সত্যভাবে প্রত্যক্ষভাবে আত্মত্যাগের উপলক্ষ রচনা করিতে পারে নাই তাহার প্রাণ ক্ষুদ্র, তাহার লাভ সামান্য। সে কোম্পানির কাগজ, ব্যাঙ্কের ডিপজিট ও চাকরির সুযোগকেই সকলের চেয়ে বড়ো করিয়া দেখিতে বাধ্য। সে কোনো মহৎ ভাবকে মনের সহিত বিশ্বাস করে না; কারণ, ভাব যেখানে কেবলই ভাবমাত্র, কর্মের মধ্যে যাহার আকার নাই, সে সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য নহে, সম্পূর্ণ সত্যের প্রবল দাবি সে করিতে পারে না। সুতরাং তাহার প্রতি আমরা অনুগ্রহের ভাব প্রকাশ করি, তাহাকে ভিক্ষুকের মতো দেখি; কখনো বা কৃপা করিয়া তাহাকে কিঞ্চিৎ দিই, কখনো বা অবজ্ঞা ও অবিশ্বাস করিয়া তাহাকে প্রত্যাখ্যান করি। যে দেশে মহৎ ভাব ও বৃহৎ কর্তব্যগুলি এমন কৃপাপাত্ররূপে দ্বারে দ্বারে হাত পাতিয়া বেড়ায় সে দেশের কল্যাণ নাই।

আজ জাতীয় বিদ্যালয় মঙ্গলের মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া আমাদের কাছে দেখা দিয়াছে। ইহার মধ্যে মন বাক্য এবং কর্মের পূর্ণ সম্বন্ধ প্রকাশ পাইয়াছে। ইহাকে আমরা কখনোই অস্বীকার করিতে পারিব না। ইহার নিকটে আমাদিগকে পূজা আহরণ করিতেই হইবে। এইরূপ পূজার বিষয়-প্রতিষ্ঠার দ্বারাই জাতি বড়ো হইয়া উঠে। অতএব জাতীয় বিদ্যালয় যে কেবল আমাদের ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিয়া কল্যাণসাধন করিবে তাহা নহে, কিন্তু দেশের মাঝখানে একটি পূজার যোগ্য প্রকৃত মহৎ ব্যাপারের উপস্থিতিই লক্ষ্যে অলক্ষ্যে আমাদিগকে মহত্ত্বের দিকে লইয়া যাইবে।

এই কথা মনে রাখিয়া আজ আমরা ইহাকে আবাহন ও অভিবাদন করিব।

এই কথা মনে রাখিয়া আমরা ইহাকে রক্ষা করিব ও মান্য করিব। ইহাকে রক্ষা করা আত্মরক্ষা, ইহাকে মান্য করাই আত্মসম্মান।

কিন্তু যদি এই কথাই সত্য হয় যে আমরা আমাদের অস্থিমজ্জার মধ্যে দাসখত বহন করিয়া জন্মগ্রহণ করিয়া থাকি, যদি সত্য হয় যে পরের দ্বারা তাড়িত না হইলে আমরা চলিতেই পারিব না, তবেই আমরা স্বেচ্ছাপূর্বক স্বদেশের মান্য ব্যক্তিদের শাসনে অসহিষ্ণু হইব; তবেই আমরা তাঁহাদের নিয়মের মধ্যে আপনাকে আবদ্ধ করিতে গৌরববোধ করিব না; তবেই অন্যত্র সামান্য সুযোগের জন্য আমাদের মন প্রলুব্ধ হইতে থাকিবে এবং সংযম ও শিক্ষার কঠোরতার জন্য আমাদের চিত্ত বিদ্রোহী হইয়া উঠিবে।

কিন্তু এ-সকল অশুভ কল্পনাকে আজ মনে স্থান দিতে চাই না। সম্মুখে পথ সুদীর্ঘ এবং পথ দুর্গম; আশার পাথেয় দ্বারা হৃদয়কে পরিপূর্ণ করিয়া আজ যাত্রা আরম্ভ করিতে হইবে। উদয়াচলের অরুণচ্ছটার ন্যায় এই আশা এবং বিশ্বাসই পৃথিবীর সমস্ত সৌভাগ্যবান জাতির মহদ্দিনের প্রথম সূচনা করিয়াছে। এই আশাকে, এই বিশ্বাসকে আমরা আজ কোথাও লেশমাত্র ক্ষুণ্ণ হইতে দিব না। এই আশার মধ্যে কোথাও যেন দুর্বলতা, বিশ্বাসের মধ্যে কোথাও যেন সাহসের অভাব না থাকে। নিজের মধ্যে নিজেকে যেন আজ দীন বলিয়া অনুভব না করি। ইহা যেন পূর্ণভাবে বুঝিতে পারি, আমাদের দেশের মধ্যে, আমাদের দেশবাসী প্রত্যেকের মধ্যে বিধাতার একটি অপূর্ব অভিপ্রায় নিহিত আছে। সে অভিপ্রায় আর-কোনো দেশের আর-কোনো জাতির দ্বারা সিদ্ধ হইতেই পারে না। আমরা পৃথিবীকে যাহা দিব তাহা আমাদের নিজের দান হইবে, তাহা অন্যের উচ্ছিষ্ট হইবে না। আমাদের পিতামহগণ তপোবনের মধ্যে সেই দানের সামগ্রী প্রস্তুত করিতেছিলেন। আমরাও নানা দুঃখের দাহে, নানা দুঃসহ আঘাতের তাড়নায়, সেই সামগ্রীর বিচিত্র উপকরণকে একত্রে বিগলিত করিয়া তাহাকে গঠনের উপযোগী করিয়া তুলিতেছি; তাঁহাদের সেই তপস্যা, আমাদের এই দুর্বহ দুঃখ কখনোই ব্যর্থ হইবে না।

জগতের মধ্যে ভারতবাসীর যে-একটি বিশেষ অধিকার আছে সেই অধিকারের জন্য আমাদের জাতীয় বিদ্যালয় আমাদিগকে প্রস্তুত করিবে, আজ এই মহতী আশা হৃদয়ে লইয়া আমরা এই নূতন বিদ্যাভবনের মঙ্গলাচরণে প্রবৃত্ত হইলাম। সুশিক্ষার লক্ষণ এই যে, তাহা মানুষকে অভিভূত করে না, তাহা মানুষকে মুক্তিদান করে। এতদিন আমরা ইস্কুল-কলেজে যে শিক্ষালাভ করিতেছিলাম তাহাতে আমাদিগকে পরাস্ত করিয়াছে। আমরা তাহা মুখস্থ করিয়াছি, আবৃত্তি করিয়াছি, শিক্ষালব্ধ বাঁধি বচনগুলিকে নিঃসংশয়ে চূড়ান্ত সত্য বলিয়া প্রচার করিতেছি। যে ইতিহাস ইংরেজি কেতাবে পড়িয়াছি তাহাই আমাদের একমাত্র ইতিহাসের বিদ্যা, যে পোলিটিকাল ইকনমি মুখস্থ করিয়াছি তাহাই আমাদের একমাত্র পোলিটিকাল ইকনমি। যাহা-কিছু পড়িয়াছি তাহা আমাদিগকে ভূতের মতো পাইয়া বসিয়াছে; সেই পড়া বিদ্যা আমাদের মুখ দিয়া কথা বলাইতেছে, বাহির হইতে মনে হইতেছে যেন আমরাই কথা বলিতেছি। আমরা মনে করিতেছি, পোলিটিকাল সভ্যতা ছাড়া সভ্যতার আর-কোনো আকার হইতেই পারে না। আমরা স্থির করিয়াছি, য়ুরোপীয় ইতিহাসের মধ্য দিয়া যে পরিণাম প্রকাশ পাইয়াছে জাতিমাত্রেরই সেই একমাত্র সদ্গতি। যাহা অন্য দেশের শাস্ত্রসম্মত তাহাকেই আমরা হিত বলিয়া জানি এবং আগাগোড়া অন্য দেশের প্রণালী অনুসরণ করিয়া আমরা স্বদেশের হিতসাধন করিতে ব্যগ্র।

মানুষ যদি এমন করিয়া শিক্ষার নিচে চাপা পড়িয়া যায় সেটাকে কোনো-মতেই মঙ্গল বলিতে পারি না। আমাদের যে শক্তি আছে তাহারই চরম বিকাশ হইবে, আমরা যাহা হইতে পারি তাহাই সম্পূর্ণভাবে হইব, ইহাই শিক্ষার ফল। আমরা চলন্ত পুঁথি হইব, অধ্যাপকের সজীব নোট্‌বুক হইয়া বুক ফুলাইয়া বেড়াইব, ইহা গর্বের বিষয় নহে। আমরা জগতের ইতিহাসকে নিজের স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে দেখিতে সাহস করিলাম কৈ, আমরা পোলিটিকাল ইকনমিকে নিজের স্বাধীন গবেষণার দ্বারা যাচাই করিলাম কোথায়? আমরা কী, আমাদের সার্থকতা কিসে, ভারতবর্ষকে বিধাতা যে ক্ষেত্রে দাঁড় করাইয়াছেন সে ক্ষেত্র হইতে মহাসত্যের কোন্ মূর্তি কী ভাবে দেখা যায়, শিক্ষার দ্বারা বলপ্রাপ্ত হইয়া তাহা আমরা আবিষ্কার করিলাম কৈ? আমরা কেবল—

ভয়ে ভয়ে যাই, ভয়ে ভয়ে চাই,
ভয়ে ভয়ে শুধু পুঁথি আওড়াই।

হায়, শিক্ষা আমাদিগকে পরাভূত করিয়া ফেলিয়াছে।

আজ আমি আশা করিতেছি, এবারে আমরা শিক্ষার নাগপাশ কাটিয়া ফেলিয়া শিক্ষার মুক্ত অবস্থায় উত্তীর্ণ হইব। আমরা এতকাল যেখানে নিভৃতে ছিলাম আজ সেখানে সমস্ত জগৎ আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, নানা জাতির ইতিহাস তাহার বিচিত্র অধ্যায় উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে, দেশ দেশান্তর হইতে যুগ-যুগান্তরের আলোকতরঙ্গ আমাদের চিন্তাকে নানা দিকে আঘাত করিতেছে—জ্ঞানসামগ্রীর সীমা নাই, ভাবের পণ্য বোঝাই হইয়া উঠিল। এখন সময় আসিয়াছে, আমাদের দ্বারের সম্মুখবর্তী এই মেলায় আমরা বালকের মতো হতবুদ্ধি হইয়া কেবল পথ হারাইয়া ঘুরিয়া বেড়াইব না; সময় আসিয়াছে যখন ভারতবর্ষের মন লইয়া এই-সকল নানা স্থানের বিক্ষিপ্ত বিচিত্র উপকরণের উপর সাহসের সহিত গিয়া পড়িব, তাহাদিগকে সম্পূর্ণ আপনার করিয়া লইব, আমাদের চিত্ত তাহাদিগকে একটি অপূর্ব ঐক্যদান করিবে, আমাদের চিন্তাক্ষেত্রে তাহারা যথাযথ স্থানে বিভক্ত হইয়া একটি অপরূপ ব্যবস্থায় পরিণত হইবে; সেই ব্যবস্থার মধ্যে সত্য নূতনদীপ্তি নূতনব্যাপ্তি লাভ করিবে এবং মানবের জ্ঞানভাণ্ডারে তাহা নূতন সম্পত্তির মধ্যে গণ্য হইয়া উঠিবে। ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ী জানিয়াছিলেন, উপকরণের মধ্যে অমৃত নাই। বিদ্যারই কি আর বিষয়েরই কি, উপকরণ আমাদিগকে আবদ্ধ করে, আচ্ছন্ন করে। চিত্ত যখন সমস্ত উপকরণকে জয় করিয়া অবশেষে আপনাকেই লাভ করে তখনই সে অমৃতলাভ করে। ভারতবর্ষকেও আজ সেই সাধনা করিতে হইবে; নানা তথ্য নানা বিদ্যার ভিতর দিয়া পূর্ণতররূপে নিজেকে উপলব্ধি করিতে হইবে। পাণ্ডিত্যের বিদেশী বেড়ি ভাঙিয়া ফেলিয়া পরিণত জ্ঞানে জ্ঞানী হইতে হইবে। আজ হইতে ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবাঃ। হে দেবগণ, আমরা কান দিয়া যেন ভালো করিয়া শুনি, বই দিয়া না শুনি। ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ। হে পূজ্যগণ, আমরা চোখ দিয়া যেন ভালো করিয়া দেখি, পরের বচন দিয়া না দেখি। জাতীয় বিদ্যালয় আবৃত্তিগত ভীরু বিদ্যার গণ্ডি হইতে বাহির করিয়া আমাদের বন্ধনজর্জর বুদ্ধির মধ্যে উদার সাহস ও স্বাতন্ত্র্যের সঞ্চার করিয়া যেন দেয়। পাঠ্যপুস্তকটির সঙ্গে আমাদের যে কথাটি না মিলিবে তাহার জন্য আমরা যেন লজ্জিত না হই। এমন-কি আমরা ভুল করিতেও সংকোচ বোধ করিব না। কারণ, ভুল করিবার অধিকার যাহার নাই সত্যকে আবিষ্কার করিবার অধিকারও সে পায় নাই। পরের শত শত ভুল জড়ভাবে মুখস্থ করিয়া রাখার চেয়ে সচেষ্টভাবে নিজে ভুল করা অনেক

ভালো। কারণ, যে চেষ্টা ভুল করায় সেই চেষ্টাই ভুলকে লঙ্ঘন করাইয়া লইয়া যায়। যাহাই হউক, যেমন করিয়াই হউক, শিক্ষার দ্বারা আমরা যে পূর্ণপরিণত আমরাই হইব, আমরা যে ইংরেজি লেক্‌চারের ফোনোগ্রাফ, বিলিতি অধ্যাপকের শিকল-বাঁধা দাঁড়ের পাখি হইব না, এই একান্ত আশ্বাস হৃদয়ে লইয়া আমি আমাদের নূতনপ্রতিষ্ঠিত জাতীয় বিদ্যামন্দিরকে আজ প্রণাম করি। এখানে আমাদের ছাত্রগণ যেন শুদ্ধমাত্র বিদ্যা নহে, তাহারা যেন শ্রদ্ধা, যেন নিষ্ঠা, যেন শক্তি লাভ করে; তাহারা যেন অভয় প্রাপ্ত হয়; দ্বিধাবর্জিত হইয়া তাহারা যেন নিজেকে নিজে লাভ করিতে পারে; তাহারা যেন অস্থিমজ্জার মধ্যে উপলব্ধি করে : সর্বং পরবশং দুঃখং সর্বমাত্মবশং সুখম্। তাহাদের অন্তরে যেন এই মহামন্ত্র সর্বদাই ধ্বনিত হইতে থাকে : ভূমৈব সুখম্, নাল্পে সুখমস্তি। যাহা ভূমা, যাহা মহান্, তাহাই সুখ; অল্পে সুখ নাই।

ভারতবর্ষের প্রাচীন তপোবনে ব্রহ্মবিদ্যাপরায়ণ গুরু মুক্তিকাম ছাত্রগণকে যে মন্ত্রে আহ্বান করিয়াছিলেন সে মন্ত্র বহুদিন এ দেশে ধ্বনিত হয় নাই। আজ আমাদের বিদ্যালয় সেই গুরুর স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া ব্রহ্মপুত্র এবং ভাগীরথীর তীরে তীরে এই বাণী প্রেরণ করিতেছেন : যথাপঃ প্রবতা যন্তি যথা মাসা অহর্জরম্ এবং মাং ব্রহ্মচারিণো ধাতরায়ন্তু সর্বতঃ স্বাহা। জলসকল যেমন নিম্নদেশে গমন করে, মাসসকল যেমন সংবৎসরের দিকে ধাবিত হয়, তেমনি সকল দিক হইতে ব্রহ্মচারিগণ আমার নিকটে আসুন—স্বাহা। সহ বীর্যং করবাবহৈ। আমরা উভয়ে মিলিত হইয়া যেন বীর্যপ্রকাশ করি। তেজস্বি নাবধীতমস্তু। তেজস্বীভাবে আমাদের অধ্যয়ন-অধ্যাপনা হউক। মা বিদ্বিষাবহৈ। আমরা পরস্পরের প্রতি যেন বিদ্বেষ না করি। ভদ্রম্নো অপি বাতয় মনঃ। হে দেব, আমাদের মনকে মঙ্গলের প্রতি সবেগে প্রেরণ করো।

ভাদ্র ১৩১৩

আবরণ

পায়ের তেলোটি এমন করিয়া তৈরি হইয়াছিল যে, খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়া পৃথিবীতে চলিবার পক্ষে এমন ব্যবস্থা আর হইতে পারে না। যে দিন হইতে জুতা পরিতে শুরু করিলাম সেই দিন হইতে তেলোকে মাটির সংস্রব হইতে বাঁচাইয়া তাহার প্রয়োজনকেই মাটি করিয়া দেওয়া গেল। পদতল এতদিন অতি সহজেই আমাদের ভার বহন করিতেছিল; এখন হইতে পদতলের ভার আমাদিগকে লইতে হইল, এখন খালি পায়ে পথে চলিতে হইলে পদতল আমাদের সহায় না হইয়া পদে পদে দুঃখের কারণ হইয়া উঠে। শুধু তাই নয়, ওটাকে লইয়া সর্বদাই সতর্ক থাকিতে হয়; মনকে নিজের পদতলের সেবায় নিযুক্ত না রাখিলে বিপদ ঘটে। ওখানে ঠান্ডা লাগিলেই হাঁচি, জল লাগিলেই জ্বর; অবশেষে মোজা চটি গোড়তোলা-জুতা বুট প্রভৃতি বিবিধ উপচারে এই প্রত্যঙ্গটির পূজা করিয়া ইহাকে সকল কর্মের বাহির করিয়া দেওয়া হয়। ঈশ্বর আমাদিগকে ক্ষুর দেন নাই বলিয়া ইহা তাঁহার প্রতি একপ্রকার অনুযোগ।

এইরূপে বিশ্বজগৎ এবং আমাদের স্বাধীন শক্তির মাঝখানে আমরা সুবিধার প্রলোভনে অনেকগুলা বেড়া তুলিয়া দিয়াছি। এইরূপে সংস্কার ও অভ্যাস-ক্রমে সেই কৃত্রিম আশ্রয়গুলাকেই আমরা সুবিধা এবং নিজের স্বাভাবিক শক্তিগুলিকেই অসুবিধা বলিয়া জানিয়াছি। কাপড় পরিয়া পরিয়া এমনি করিয়া তুলিয়াছি যে, কাপড়টাকে নিজের চামড়ার চেয়ে বড়ো করা হইয়াছে। এখন আমরা বিধাতার সৃষ্ট আমাদের এই আশ্চর্য সুন্দর অনাবৃত শরীরকে অবজ্ঞা করি।

কিন্তু কাপড়-জুতাকে একটা অন্ধ সংস্কারের মতো জড়াইয়া ধরা আমাদের এই গরম দেশে ছিল না। এক তো সহজেই আমাদের কাপড় বিরল ছিল। তাহার 'পরে বালককালে ছেলেমেয়েরা অনেক দিন পর্যন্ত কাপড় জুতা না পরিয়া উলঙ্গ শরীরের সঙ্গে উলঙ্গ জগতের যোগ অসংকোচে অতি সুন্দর ভাবে রক্ষা করিয়াছে। এখন আমরা ইংরেজের নকল করিয়া শিশুদেহের জন্যও লজ্জা বোধ করিতে আরম্ভ করিয়াছি। শুধু বিলাত-ফেরত নহে, শহরবাসী সাধারণ বাঙালি গৃহস্থও আজকাল বাড়ির বালককে অতিথির সামনে অনাবৃত দেখিলে সংকোচ বোধ করেন এবং এইরূপে ছেলেটাকেও নিজের দেহ সম্বন্ধে সংকুচিত করিয়া তোলেন।

এমনি করিয়া আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকদের মধ্যে একটা কৃত্রিম লজ্জার সৃষ্টি হইতেছে। যে বয়স পর্যন্ত শরীর সম্বন্ধে আমাদের কোনো কুণ্ঠা থাকা উচিত নয় সে বয়স আর পার হইতে দিতে পারিতেছি না; এখন আজন্মকাল মানুষ আমাদের পক্ষে লজ্জার বিষয় হইয়া উঠিতেছে। শেষকালে কোন্ একদিন দেখিব, চৌকি-টেবিলের পায়া ঢাকা না দেখিলেও আমাদের কর্ণমূল আরক্ত হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

শুধু লজ্জার উপর দিয়াই যদি যাইত আক্ষেপ করিতাম না। কিন্তু ইহা পৃথিবীতে দুঃখ আনিতেছে। আমাদের লজ্জার দায়ে শিশুরা মিথ্যা কষ্ট পায়। এখনো তাহারা প্রকৃতির খাতক, সভ্যতার ঋণ তাহারা গ্রহণ করিতেই চায় না। কিন্তু বেচারাদের জোর নাই, এক কান্না সম্বল। অভিভাবকদের লজ্জানিবারণ ও গৌরববৃদ্ধি করিবার জন্য লেস ও সিল্কের আবরণে বাতাসের সোহাগ ও আলোকের চুম্বন হইতে বঞ্চিত হইয়া তাহারা চীৎকারশব্দে বধির বিচারকের কর্ণে শিশুজীবনের অভিযোগ উত্থাপিত করিতে থাকে। জানে না, বাপ-মায়ে এক্‌জিক্যুটিভ ও জুডিশ্যাল একত্র হওয়াতে তাহার সমস্ত আন্দোলন ও আবেদন বৃথা হইয়া যায়।

আর, দুঃখ অভিভাবকের। অকাল লজ্জার সৃষ্টি করিয়া অনাবশ্যক উপসর্গ বাড়ানো হইল। যাহারা ভদ্রলোক নহে, সরল শিশুমাত্র, তাহাদিগকেও একেবারে শুরু হইতেই অর্থহীন ভদ্রতা ধরাইয়া অর্থের অপব্যয় করা আরম্ভ হইল। উলঙ্গতার একটা সুবিধা, তাহার মধ্যে প্রতিযোগিতা নাই। কিন্তু কাপড় ধরাইলেই শখের মাত্রা, আড়ম্বরের আয়োজন, রেষারেষি করিয়া বাড়িয়া চলিতে থাকে। শিশুর নবনীতকোমল সুন্দর দেহ ধনাভিমানপ্রকাশের উপলক্ষ হইয়া উঠে; ভদ্রতার বোঝা অকারণে অপরিমিত হইতে থাকে।

এ-সমস্ত ডাক্তারির বা অর্থনীতির তর্ক তুলিব না। আমি শিক্ষার দিক হইতে বলিতেছি। মাটি জল বাতাস আলোর সঙ্গে সম্পূর্ণ যোগ না থাকিলে শরীরের শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। শীতে গ্রীষ্মে কোনো কালে আমাদের মুখটা ঢাকা থাকে না, তাই আমাদের মুখের চামড়া দেহের চামড়ার চেয়ে বেশি শিক্ষিত; অর্থাৎ, বাহিরের সঙ্গে কী করিয়া আপনার সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিতে হয় তাহা সে

ঠিক জানে। সে আপনাতেই আপনি সম্পূর্ণ; তাহাকে কৃত্রিম আশ্রয় প্রায় লইতে হয় না।

এ কথা বলা বাহুল্য, আমি ম্যাঞ্চেস্টারকে ফতুর করিবার জন্য ইংরেজের রাজ্যে উলঙ্গতা প্রচার করিতে বসি নাই। আমার কথা এই যে, শিক্ষা করিবার একটা বয়স আছে, সেটা বাল্যকাল। সেই সময়টাতে আমাদের শরীরমনের পরিণতি-সাধনের জন্য প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের বাধাবিহীন যোগ থাকা চাই। সে সময়টা ঢাকাঢাকির সময় নয়, তখন সভ্যতা একেবারেই অনাবশ্যক। কিন্তু সেই বয়স হইতেই শিশুর সঙ্গে সভ্যতার সঙ্গে লড়াই আরম্ভ হইতেছে দেখিয়া বেদনাবোধ করি। শিশু আচ্ছাদন ফেলিয়া দিতে চায়, আমরা তাহাকে আচ্ছন্ন করিতে চাই। বস্তুত এ ঝগড়া তো শিশুর সঙ্গে নয়, এ ঝগড়া প্রকৃতির সঙ্গে। প্রকৃতির মধ্যে যে পুরাতন জ্ঞান আছে তাহাই কাপড় পরাইবার সময় শিশুর ক্রন্দনের মধ্য হইতে প্রতিবাদ করিতে থাকে; আমরাই তো তাহার কাছে শিশু।

যেমন করিয়া হউক, সভ্যতার সঙ্গে একটা রফা দরকার। অন্তত একটা বয়স পর্যন্ত সভ্যতার এলেকাকে সীমাবদ্ধ করা চাই। আমি খুব কম করিয়া বলিতেছি, সাত বছর। সে-পর্যন্ত শিশুর সজ্জায় কাজ নাই, লজ্জায় কাজ নাই। সে-পর্যন্ত বর্বরতার যে অত্যাবশ্যক শিক্ষা, তাহা প্রকৃতির হাতে সম্পন্ন হইতে দিতে হইবে। বালক তখন যদি পৃথিবী-মায়ের কোলে গড়াইয়া ধুলো মাটি না মাখিয়া লইতে পারে তবে কবে তাহার সে সৌভাগ্য হইবে? সে তখন যদি গাছে চড়িয়া ফল পাড়িতে না পায় তবে হতভাগা ভদ্রতার লোকলজ্জায় চিরজীবনের মতো গাছ-পালার সঙ্গে অন্তরঙ্গ সখ্য-সাধনে বঞ্চিত হইবে। এই সময়টায় বাতাস আকাশ মাঠ গাছপালার দিকে তাহার শরীরমনের যে একটা স্বাভাবিক টান আছে, সব জায়গা হইতেই তার যে একটা নিমন্ত্রণ আসে, সেটাতে যদি কাপড়-চোপড় দরজা-দেয়ালের ব্যাঘাত স্থাপন করা যায় তবে ছেলেটার সমস্ত উদ্যম অবরুদ্ধ হইয়া তাহাকে ইঁচড়ে পাকায়। খোলা পাইলে যে উৎসাহ স্বাস্থ্যকর হইত বদ্ধ হইয়া তাহাই দূষিত হইতে থাকে।

ছেলেকে কাপড় পরাইলেই কাপড়ের জন্য তাহাকে সাবধানে রাখিতে হয়। ছেলেটার দাম আছে কি না সে কথা সব সময়ে মনে থাকে না, কিন্তু দর্জির হিসাব ভোলা শক্ত। এই কাপড় ছিঁড়িল, এই কাপড় ময়লা হইল, আহা সেদিন এত টাকা দিয়া এমন সুন্দর জামা করাইয়া দিলাম---লক্ষ্মীছাড়া কোথা হইতে তাহাতে কালী মাখাইয়া আনিল, এই বলিয়া যথোচিত চপেটাঘাত ও কান-মলার যোগে শিশুজীবনের সকল খেলা সকল আনন্দের চেয়ে কাপড়কে যে কী প্রকারে খাতির করিয়া চলিতে হয় শিশুকে তাহা শিখানো হইয়া থাকে। যে কাপড়ে তাহার কোনো প্রয়োজন নাই সে কাপড়ের জন্য বেচারাকে এ বয়সে এমন করিয়া দায়ী করা কেন! বেচারাদের জন্য ঈশ্বর বাহিরে যে-কয়টা অবাধ সুখের আয়োজন এবং মনের মধ্যে অব্যাহত সুখসম্ভোগের ক্ষমতা দিয়াছিলেন অতি অকিঞ্চিৎকর পোশাকের মমতায় তাহার জীবনারম্ভের সেই সরল আনন্দের লীলাক্ষেত্রকে অকারণে এমন বিঘ্নসংকুল করিয়া তুলিবার কী প্রয়োজন ছিল! মানুষ কি সকল জায়গাতেই নিজের ক্ষুদ্র বুদ্ধি ও তুচ্ছ প্রবৃত্তির শাসন বিস্তার করিয়া কোথাও স্বাভাবিক সুখশান্তির স্থান রাখিবে না! আমার ভালো লাগে, অতএব যেমন করিয়া হউক উহারও ভালো লাগা উচিত, এই জবরদস্তির যুক্তিতে কি জগতের চারি দিকে কেবলই দুঃখ বিস্তার করিতে হইবে!

যাই হউক, প্রকৃতির দ্বারা যেটুকু করিবার তাহা আমাদের দ্বারা কোনোমতেই হয় না, অতএব মানুষের সমস্ত ভালো কেবল আমরা বুদ্ধিমানেরাই করিব এমন পণ না করিয়া প্রকৃতিকেও খানিকটা পথ ছাড়িয়া দেওয়া চাই। সেইটে গোড়ায় হইলেই ভদ্রতার সঙ্গে কোনো বিরোধ বাধে না এবং ভিত্তি পাকা হয়। এই প্রাকৃতিক শিক্ষা যে কেবল ছেলেদের তাহা নহে, ইহাতে আমাদেরও উপকার আছে। আমরা নিজের হাতের কাজে সমস্ত আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়া সেইটেতেই আমাদের অভ্যাসকে এমন বিকৃত করি যে, স্বাভাবিককে আর কোনোমতেই সহজ দৃষ্টিতে দেখিতে পারি না। আমরা যদি মানুষের সুন্দর শরীরকে নির্মল বাল্য অবস্থাতেও উলঙ্গ দেখিতে সর্বদাই অভ্যস্ত না থাকি, তবে বিলাতের লোকের মতো শরীর সম্বন্ধে যে একটা বিকৃত সংস্কার মনের মধ্যে বদ্ধমূল হয় তাহা যথার্থই বর্বর এবং লজ্জার যোগ্য।

অবশ্য ভদ্রসমাজে কাপড়চোপড় জুতামোজার একটা প্রয়োজন আছে বলিয়াই ইহাদের সৃষ্টি হইয়াছে; কিন্তু এই-সকল কৃত্রিম সহায়কে প্রভু করিয়া তুলিয়া তাহার কাছে নিজেকে কুণ্ঠিত করিয়া রাখা সংগত নয়। এই বিপরীত ব্যাপারে কখনোই ভালো ফল হইতে পারে না। অন্তত ভারতবর্ষের জলবায়ু এরূপ যে, আমাদের এই-সকল উপকরণের চিরদাস হওয়ার কোনো প্রয়োজন নাই; কোনো কালে আমরা ছিলামও না। আমরা প্রয়োজনমত কখনো বা বেশভূষা ব্যবহার করিয়াছি, কখনো বা তাহা খুলিয়াও রাখিয়াছি। বেশভূষা-জিনিসটা যে নৈমিত্তিক, ইহা আমাদের প্রয়োজন সাধন করে মাত্র, এই প্রভুত্বটুকু আমাদের বরাবর ছিল। এইজন্য খোলা গায়ে আমরা লজ্জিত হইতাম না এবং অন্যকে দেখিলেও আমাদের রাগ হইত না। এ সম্বন্ধে বিধাতার প্রসাদে য়ুরোপীয়দের চেয়ে আমাদের বিশেষ সুবিধা ছিল। আমরা আবশ্যকমত লজ্জারক্ষাও করিয়াছি, অথচ অনাবশ্যক অতিলজ্জার দ্বারা নিজেকে ভারগ্রস্ত করি নাই।

এ কথা মনে রাখিতে হইবে, অতিলজ্জা লজ্জাকে নষ্ট করে। কারণ, অতিলজ্জাই বস্তুত লজ্জাজনক। তা ছাড়া, অতি'র বন্ধন মানুষ যখন একবার ছিঁড়িয়া ফেলে তখন তাহার আর বিচার থাকে না। আমাদের মেয়েরা গায়ে বেশি কাপড় দেয় না মানি, কিন্তু তাহারা কোনোক্রমেই ইচ্ছা করিয়া সচেষ্টভাবে বুকপিঠের আবরণের বারো-আনা বাদ দিয়া পুরুষসমাজে বাহির হইতে পারে না। আমরা লজ্জা করি না, কিন্তু লজ্জাকে এমন করিয়া আঘাতও করি না।

কিন্তু লজ্জাতত্ত্ব সম্বন্ধে আমি আলোচনা করিতে বসি নাই, অতএব ও কথা থাক্। আমার কথা এই, মানুষের সভ্যতা কৃত্রিমের সহায়তা লইতে বাধ্য, সেইজন্য এই কৃত্রিম যাহাতে অভ্যাসদোষে আমাদের কর্তা হইয়া না উঠে, যাহাতে আমরা নিজের গড়া সামগ্রীর চেয়ে সর্বদাই উপরে মাথা তুলিয়া থাকিতে পারি, এ দিকে আমাদের দৃষ্টি রাখা দরকার। আমাদের টাকা যখন আমাদিগকেই কিনিয়া বসে, আমাদের ভাষা যখন আমাদের ভাবের নাকে দড়ি দিয়া ঘুরাইয়া মারে, আমাদের সাজ যখন আমাদের অঙ্গকে অনাবশ্যক করিবার জো করে, আমাদের নিত্য যখন নৈমিত্তিকের কাছে অপরাধীর মতো কুণ্ঠিত হইয়া থাকে, তখন সভ্যতার সমস্ত বুলিকে অগ্রাহ্য করিয়া এ কথা বলিতেই হইবে : এটা ঠিক হইতেছে না। ভারতবাসীর খালি গা কিছুমাত্র লজ্জার নহে; যে সভ্যব্যক্তির চোখে ইহা অসহ্য সে আপনার চোখের মাথা খাইয়া বসিয়াছে।

শরীর সম্বন্ধে কাপড় জুতা মোজা যেমন আমাদের মন সম্বন্ধে বই জিনিসটা

ঠিক তেমনি হইয়া উঠিয়াছে। বই-পড়াটা যে শিক্ষার একটা সুবিধাজনক সহায়মাত্র তাহা আর আমাদের মনে হয় না, আমরা বই-পড়াটাকেই শিক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়া ঠিক করিয়া বসিয়া আছি। এ সম্বন্ধে আমাদের সংস্কারকে নড়ানো বড়োই কঠিন হইয়া উঠিয়াছে।

মাস্টার বই হাতে করিয়া শিশুকাল হইতেই আমাদিগকে বই মুখস্থ করাইতে থাকেন। কিন্তু বইয়ের ভিতর হইতে জ্ঞানসঞ্চয় করা আমাদের মনের স্বাভাবিক ধর্ম নহে। প্রত্যক্ষ জিনিসকে দেখিয়া-শুনিয়া নাড়িয়া-চাড়িয়া সঙ্গে সঙ্গেই অতি সহজেই আমাদের মননশক্তির চর্চা হওয়া স্বভাবের বিধান ছিল। অন্যের অভিজ্ঞাত ও পরীক্ষিত জ্ঞান, তাও লোকের মুখ হইতে শুনিলে তবে আমাদের সমস্ত মন সহজে সাড়া দেয়। কারণ, মুখের কথা তো শুধু কথা নহে, তাহা মুখের কথা; তাহার সঙ্গে প্রাণ আছে। চোখমুখের ভঙ্গি, কণ্ঠের স্বরলীলা, হাতের ইঙ্গিত— ইহার দ্বারা কানে শুনিবার ভাষা, সংগীত ও আকার লাভ করিয়া, চোখ কান দুয়েরই সামগ্রী হইয়া উঠে। শুধু তাই নয়, আমরা যদি জানি, মানুষ তাহার মনের সামগ্রী সদ্য মন হইতে আমাদিগকে দিতেছে, সে একটা বই পড়িয়া মাত্র যাইতেছে না, তাহা হইলে মনের সঙ্গে মনের প্রত্যক্ষ সম্মিলনে জ্ঞানের মধ্যে রসের সঞ্চার হয়।

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের মাস্টাররা বই পড়াইবার একটা উপলক্ষমাত্র; আমরাও বই পড়িবার একটা উপসর্গ। ইহাতে ফল হইয়াছে এই, আমাদের শরীর যেমন কৃত্রিম জিনিসের আড়ালে পড়িয়া পৃথিবীর সঙ্গে গায়ে গায়ে যোগটা হারাইয়াছে এবং হারাইয়া এমন অভ্যস্ত হইয়াছে যে সে যোগটাকে আজ ক্লেশকর লজ্জাকর বলিয়া মনে করে, তেমনি আমাদের মন এবং বাহিরের মাঝখানে বই আসিয়া পড়াতে আমাদের মন জগতের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগের স্বাদশক্তি অনেকটা হারাইয়া ফেলিয়াছে। সব জিনিসকে বইয়ের ভিতর দিয়া জানিবার একটা অস্বাভাবিক অভ্যাস আমাদের মধ্যে বদ্ধমূল হইয়া গেছে। পাশেই যে জিনিসটা আছে সেইটেকেই জানিবার জন্য বইয়ের মুখ তাকাইয়া থাকিতে হয়। নবাবের গল্প শুনিয়াছি— জুতাটা ফিরাইয়া দিবার জন্য চাকরের অপেক্ষা করিয়া শত্রুহস্তে বন্দী হইয়াছিল। বই-পড়া বিদ্যার গতিকে আমাদেরও মানসিক নবাবি তেমনি অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছে। তুচ্ছ বিষয়টুকুর জন্যও বই নহিলে মন আশ্রয় পায় না। বিকৃত সংস্কারের দোষে এইরূপ নবাবিয়ানা আমাদের কাছে লজ্জাকর না হইয়া গৌরবজনক হইয়া উঠে এবং বইয়ের ভিতর দিয়া জানাকেই আমরা পাণ্ডিত্য বলিয়া গর্ব করি। জগৎকে আমরা মন দিয়া ছুঁই না বই দিয়া ছুঁই।

মানুষের জ্ঞান ও ভাবকে বইয়ের মধ্যে সঞ্চিত করিবার যে একটা প্রচুর সুবিধা আছে, সে কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। কিন্তু সেই সুবিধার দ্বারা মনের স্বাভাবিক শক্তিকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলে বুদ্ধিকে বাবু করিয়া তোলা হয়। বাবু-নামক জীব চাকর-বাকর জিনিসপত্রের সুবিধার অধীন। নিজের চেষ্টাপ্রয়োগে যেটুকু কষ্ট, যেটুকু কাঠিন্য আছে, সেইটুকুতেই যে আমাদের সুখ সত্য হয়, আমাদের লাভ মূল্যবান হইয়া উঠে, বাবু তাহা বোঝে না। বই-পড়া বাবুয়ানাতেও জ্ঞানকে নিজে পাওয়ার যে একটা আনন্দ, সত্যকে তাহার যথাস্থানে কঠিন প্রেমাভিসারের দ্বারা লাভ করার যে একটা সার্থকতা, তাহা থাকে না। ক্রমে মনের সেই স্বাভাবিক স্বাধীনশক্তিটাই মরিয়া যায়; সুতরাং সেই শক্তিচালনার সুখটাও থাকে না, বরঞ্চ চালনা করিতে বাধ্য হইলে তাহা কষ্টের কারণ হইয়া উঠে।

এইরূপে বই-পড়ার আবরণে মন শিশুকাল হইতে আপাদমস্তক আবৃত হওয়াতে আমরা মানুষের সঙ্গে সহজভাবে মেলামেশা করিবার শক্তি হারাইতেছি। আমাদের কাপড়-পরা শরীরের যেমন একটা সংকোচ জন্মিয়াছে আমাদের মনেরও তেমনি ঘটিয়াছে; সে বাহিরে আসিতেই চায় না। লোকজনদের সহজে আদর-অভ্যর্থনা করা, তাহাদের সঙ্গে আপন-ভাবে মিলিয়া কথাবার্তা কওয়া, আমাদের শিক্ষিত লোকদের পক্ষে ক্রমশই কঠিন হইয়া উঠিতেছে তাহা আমরা লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি। আমরা বইয়ের লোককে চিনি, পৃথিবীর লোককে চিনি না; বইয়ের লোক আমাদের পক্ষে মনোহর, পৃথিবীর লোক শ্রান্তিকর। আমরা বিরাট সভায় বক্তৃতা করিতে পারি, কিন্তু জনসাধারণের সঙ্গে কথাবার্তা কহিতে পারি না। যখন আমরা বড়ো কথা, বইয়ের কথা লইয়া আলোচনা করিতে পারি, কিন্তু সহজ আলাপ, সামান্য কথা আমাদের মুখ দিয়া ঠিকমত বাহির হইতে চায় না, তখন বুঝিতে হইবে, দৈবদুর্যোগে আমরা পণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছি, কিন্তু আমাদের মানুষটি মারা গেছে। মানুষের সঙ্গে মানুষভাবে আমাদের অবারিত গতিবিধি থাকিলে ঘরের বার্তা, সুখদুঃখের কথা, ছেলেপুলের খবর, প্রতিদিনের আলোচনা, আমাদের পক্ষে সহজ ও সুখকর হয়। বইয়ের মানুষ তৈরি-করা কথা বলে, তাহারা যে-সকল কথায় হাসে তাহা প্রকৃতপক্ষেই হাস্যরসাত্মক, তাহারা যাহাতে কাঁদে তাহা করুণরসের সার। কিন্তু সত্যকার মানুষ-যে রক্তমাংসের প্রত্যক্ষগোচর মানুষ, সেইখানেই যে তাহার মস্ত জিত; এইজন্য তাহার কথা, তাহার হাসিকান্না অত্যন্ত পয়লা নম্বরের না হইলেও চলে। বস্তুত সে স্বভাবত যাহা তাহার চেয়ে বেশি হইবার আয়োজন না করিলেই সুখের বিষয় হয়। মানুষ বই হইয়া উঠিবার চেষ্টা করিলে তাহাতে মানুষের স্বাদ নষ্ট হইয়া যায়।

চাণক্য বুঝি বলিয়া গেছেন, বিদ্যা যাহাদের নাই তাহারা ‘সভামধ্যে ন শোভন্তে’। কিন্তু সভা তো চিরকাল চলে না। এক সময়ে তো সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়া আলো নিবাইয়া দিতেই হয়। মুশকিল এই যে, আমাদের দেশের এখনকার বিদ্বানরা সভার বাহিরে ‘ন শোভন্তে’; তাঁহারা বই পড়ার মধ্যে মানুষ, তাই মানুষের মধ্যে তাঁহাদের কোনো সোয়াস্তি নাই।

এরূপ অবস্থার স্বাভাবিক পরিণাম নিরানন্দ। একটা সৃষ্টিছাড়া মানসিক ব্যাধি য়ুরোপের সাহিত্যে সমাজে সর্বত্র প্রকাশ পাইতেছে; তাহাকে সে দেশের লোকে বলে world-weariness। লোকের স্নায়ু বিকল হইয়া গেছে, জীবনের স্বাদ চলিয়া গেছে, নব নব উত্তেজনা সৃষ্টি করিয়া নিজেকে ভুলাইবার চেষ্টা চলিতেছে। এই অসুখ, এই বিকলতা যে কিসের জন্য কিছুই বুঝিবার জো নাই। এই অবসাদ মেয়ে পুরুষ উভয়কেই পাইয়া বসিয়াছে।

স্বভাব হইতে ক্রমশই অনেক দূরে চলিয়া যাওয়া ইহার কারণ। কৃত্রিম সুবিধা উত্তরোত্তর আকাশপ্রমাণ হইয়া জগতের জীবকে জগৎছাড়া করিয়া দিয়াছে। পুঁথির মধ্যে মন, আসবাবের মধ্যে শরীর প্রচ্ছন্ন হইয়া আত্মার সমস্ত দরজা-জানালাগুলাকে অবরুদ্ধ করিয়াছে। যাহা সহজ, যাহা নিত্য, যাহা মূল্যহীন বলিয়াই সর্বাপেক্ষা মূল্যবান, তাহার সঙ্গে আনাগোনা বন্ধ হওয়াতে তাহা গ্রহণ করিবার ক্ষমতা চলিয়া গেছে। যে-সকল জিনিস উত্তেজনার নব নব তাড়নায় উদ্ভাবিত হইয়া দুই-চারিদিন ফ্যাশানের আবর্তে আবিল হইয়া উঠে এবং তাহার পরেই অনাদরে আবর্জনার মধ্যে জমা হইয়া সমাজের বাতাসকে দূষিত করে তাহাই কেবল পুনঃপুনঃ লক্ষ লক্ষ গুণী ও মজুরের চেষ্টাকে সমস্ত সমাজ জুড়িয়া ঘানির বলদের মতো ঘুরাইয়া মারিতেছে।

এক বই হইতে আর-এক বই উৎপন্ন হইতেছে, এক কাব্যগ্রন্থ হইতে আর-এক কাব্যগ্রন্থের জন্ম, একজনের মত মুখে-মুখে সহস্র লোকের মত হইয়া দাঁড়াইতেছে, অনুকরণ হইতে অনুকরণের প্রবাহ চলিয়াছে—এমনি করিয়া পুঁথি ও কথার অরণ্য মানুষের চার দিকে নিবিড় হইয়া উঠিতেছে। প্রাকৃতিক জগতের সঙ্গে ইহার সম্বন্ধ ক্রমশই দূরে চলিয়া যাইতেছে। মানুষের অনেকগুলি মনের ভাব উৎপন্ন হইতেছে যাহা কেবল পুঁথির সৃষ্টি। এই-সকল বাস্তবতাবর্জিত ভাবগুলা ভূতের মতো মানুষকে পাইয়া বসে, তাহার মনের স্বাস্থ্য নষ্ট করে, তাহাকে অত্যুক্তি এবং আতিশয্যের দিকে লইয়া যায়, সকলে মিলিয়া ক্রমাগতই একই ধুয়া ধরিয়া কৃত্রিম উৎসাহের দ্বারা সত্যের পরিমাণ নষ্ট করিয়া তাহাকে মিথ্যা করিয়া তোলে। দৃষ্টান্তস্বরূপে বলিতে পারি প্যাট্রিয়টিজ্‌ম্‌-নামক পদার্থ, ইহার মধ্যে যেটুকু সত্য ছিল প্রতিদিন সকলে পড়িয়া সেটাকে তুলা ধুনিয়া একটা প্রকাণ্ড মিথ্যা করিয়া তুলিয়াছে; এখন এই তৈরি বুলিটাকে প্রাণপণ চেষ্টায় সত্য করিয়া তুলিবার জন্য কত কৃত্রিম উপায়, কত অলীক উদ্দীপনা, কত অন্যায় শিক্ষা, কত গড়িয়া-তোলা বিদ্বেষ, কত কূট যুক্তি, কত ধর্মের ভান সৃষ্ট হইতেছে তাহার সীমা সংখ্যা নাই। এই-সকল স্বভাবভ্রষ্ট কুহেলিকার মধ্যে মানুষ বিভ্রান্ত হয়; সরল ও উদার, প্রশান্ত ও সুন্দর হইতে সে কেবল দূরে চলিয়া যাইতে থাকে। কিন্তু বুলির মোহ ভাঙানো বড়ো শক্ত। বস্তুকে আক্রমণ করিয়া ভূমিসাৎ করা যায়, বুলির গায়ে ছুরি বসে না। এইজন্য বুলি লইয়া মানুষে মানুষে যত ঝগড়া, যত রক্তপাত হইয়াছে, এমন তো বিষয় লইয়া হয় নাই।

সমাজের সরল অবস্থায় দেখিতে পাই, লোকে যেটুকু জানে তাহা মানে। সেটুকুর প্রতি তাহাদের নিষ্ঠা অটল; তাহার জন্য ত্যাগস্বীকার, কষ্টস্বীকার তাহাদের পক্ষে সহজ। ইহার কতকগুলি কারণ আছে, কিন্তু একটি প্রধান কারণ, তাহাদের হৃদয় মন মতের দ্বারা আবৃত হইয়া যায় নাই; যতটুকু সত্য বলিয়া গ্রহণ করিবার অধিকার ও শক্তি তাহাদের আছে ততটুকুই তাহারা গ্রহণ করিয়াছে। মন যাহা সত্যরূপে গ্রহণ করে, হৃদয় তাহার জন্য অনেক ক্লেশ অনায়াসেই সহিতে পারে; সেটাকে সে বাহাদুরি বলিয়া মনেই করে না।

সভ্যতার জটিল অবস্থায় দেখা যায়, মতের বহুতর স্তর জমিয়া গেছে। কোনোটা চার্চের মত, চর্চার মত নহে; কোনোটা সভার মত, ঘরের মত নহে; কোনোটা দলের মত, অন্তরের মত নহে; কোনো মতে চোখ দিয়া জল বাহির হয়, পকেট হইতে টাকা বাহির হয় না; কোনো মতে টাকাও বাহির হয়, কাজও চলে, কিন্তু হৃদয়ে তাহার স্থান নাই, ফ্যাশানে তাহার প্রতিষ্ঠা। এই-সকল অবিশ্রাম-উৎপন্ন ভূরি ভূরি সত্যবিকারের মাঝখানে পড়িয়া মানুষের মন সত্য মতকেও অবিচলিতসত্যরূপে গ্রহণ করিতে পারে না। এইজন্য তাহার আচরণ সর্বত্র সর্বতোভাবে সত্য হইতে পারে না। সে সরলভাবে আপন শক্তি ও প্রকৃতি-অনুযায়ী কোনো পন্থা নির্বাচন করিবার অবকাশ না পাইয়া বিভ্রান্তভাবে দশের কথার পুনরাবৃত্তি করিতে থাকে; অবশেষে কাজের বেলায় তাহার প্রকৃতির মধ্যে বিরোধ বাধিয়া যায়। সে যদি নিজের স্বভাবকে নিজে পাইত তবে সেই স্বভাবের ভিতর দিয়া যাহা-কিছু পাইত তাহা ছোটো হউক বড়ো হউক খাঁটি জিনিস হইত। তাহা তাহাকে সম্পূর্ণ বল দিত, সম্পূর্ণ আশ্রয় দিত; সে তাহাকে সর্বতোভাবে কাজে না খাটাইয়া থাকিতে পারিত না। এখন তাহাকে গোলেমালে পড়িয়া পুঁথির মত, মুখের মত, সভার মত, দলের মত লইয়া ধ্রুবলক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া

কেবল বিস্তর কথা আওড়াইয়া বেড়াইতে হয়। সেই কথা আওড়াইয়া বেড়ানোকে সে হিতকর্ম বলিয়া মনে করে। সেজন্য সে বেতন পায়; তাহা বেচিয়া সে লাভ করে। এই-সকল কথার একটুখানি এ দিক-ও দিক লইয়া সে অন্য সম্প্রদায় অন্য জাতিকে হেয় এবং নিজের জাতি ও দলকে শ্রদ্ধেয় বলিয়া প্রচার করে।

মানুষের মনের চারি দিকে এই-যে অতিনিবিড় পুঁথির অরণ্যে বুলির বোল ধরিয়াছে ইহার মোদো গন্ধে আমাদিগকে মাতাল করিতেছে; শাখা হইতে শাখান্তরে কেবলই চঞ্চল করিয়া মারিতেছে; কিন্তু যথার্থ আনন্দ, গভীর তৃপ্তি দিতেছে না। নানাপ্রকার বিদ্রোহ ও মনোবিকার উৎপন্ন করিতেছে।

সহজ জিনিসের গুণ এই যে, তাহার স্বাদ কখনোই পুরাতন হয় না, তাহার সরলতা তাহাকে চিরদিন নবীন করিয়া রাখে। যাহা যথার্থ স্বভাবের কথা তাহা মানুষ যতবার বলিয়াছে ততবারই নূতন লাগিয়াছে। পৃথিবীতে গুটিদুইতিন মহাকাব্য আছে যাহা সহস্রবৎসরেও ম্লান হয় নাই; নির্মল জলের মতো তাহা আমাদের পিপাসা হরণ করিয়া তৃপ্তি দেয়, মদের মতো তাহা আমাদিগকে উত্তেজনার ডগার উপরে তুলিয়া শুষ্ক অবসাদের মধ্যে আছাড় মারিয়া ফেলে না। সহজ হইতে দূরে আসিলেই একবার উত্তেজনা ও একবার অবসাদের মধ্যে কেবলই ঢেঁকি-কোটা হইতে হয়। উপকরণবহুল অতি-সভ্যতার ইহাই ব্যাধি।

এই জঙ্গলের ভিতর দিয়া পথ বাহির করিয়া, এই রাশীকৃত পুঁথি ও বচনের আবরণ ভেদ করিয়া, সমাজের মধ্যে, মানুষের মনের মধ্যে, স্বভাবের বাতাস ও আলোক আনিবার জন্য মহাপুরুষ এবং হয়তো মহাবিপ্লবের প্রয়োজন হইবে। অত্যন্ত সহজ কথা, অত্যন্ত সরল সত্যকে হয়তো রক্তসমুদ্র পাড়ি দিয়া আসিতে হইবে। যাহা আকাশের মতো ব্যাপক, যাহা বাতাসের মতো মূল্যহীন, তাহাকে কিনিয়া, উপার্জন করিয়া লইতে হয়তো প্রাণ দিতে হইবে। য়ুরোপের মনোরাজ্যে ভূমিকম্প ও অগ্ন্যুৎপাতের অশান্তি মাঝে মাঝে প্রায়ই দেখা দিতেছে; স্বভাবের সঙ্গে জীবনের, বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে অন্তঃপ্রকৃতির প্রকাণ্ড অসামঞ্জস্যই ইহার কারণ।

কিন্তু য়ুরোপের এই বিকৃতি কেবল অনুকরণের দ্বারা, কেবল ছোঁয়াচ লাগিয়া আমরা পাইতেছি। ইহা আমাদের দেশজ নহে। আমরা শিশুকাল হইতে বিলাতি বই মুখস্থ করিতে লাগিয়া গেছি, যাহা আবর্জনা তাহাও লাভ মনে করিয়া লইতেছি। আমরা যে-সকল বিদেশী বুলি সর্বদাই অসন্দিগ্ধমনে পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে ব্যবহার করিয়া চলিতেছি, জানি না, তাহার প্রত্যেকটিকে অবিশ্বাসের সহিত আদিসত্যের নিকষপাথরে ঘষিয়া যাচাই করিয়া লওয়া চাই; তাহার বারো-আনা কেবল পুঁথির সৃষ্টি, কেবল তাহারা মুখে-মুখেই বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে, দশ জনে পরস্পরের অনুকরণ করিয়া বলিতেছে বলিয়া আর-দশ জনে তাহাকে ধ্রুবসত্য বলিয়া গণ্য করিতেছে। আমরাও সেই-সকল বাঁধিগৎ এমন করিয়া ব্যবহার করিতেছি যেন তাহার সত্য আমরা আবিষ্কার করিয়াছি, যেন তাহা বিদেশী ইস্কুল-মাস্টারের আবৃত্তির জড় প্রতিধ্বনিমাত্র নহে।

আবার, যাহারা নূতন পড়া আওড়াইতেছে তাহাদের উৎসাহ কিছু বেশি হইয়া থাকে। সুশিক্ষিত টিয়াপাখি যত উচ্চস্বরে কানে তালা ধরায় তাহার শিক্ষকের গলা তত চড়া নয়। শুনা যায়, যে-সব জাতির মধ্যে বিলাতি সভ্যতা নূতন প্রবেশ করে তাহারা বিলাতের মদ ধরিয়া একেবারে মারা পড়িবার জো হয়, অথচ যাহাদের অনুকরণে তাহারা মদ ধরে তাহারা মদে এত বেশি অভিভূত হয় না। তেমনি দেখা যায়, যে-সকল কথার মোহে কথার সৃষ্টিকর্তারা অনেকটা পরিমাণে অবিচলিত

থাকে, আমরা তাহাতে একেবারে ধরাশায়ী হইয়া যাই। সেদিন কাগজে দেখিলাম, বিলাতের কোন্‌-এক সভায় আমাদের দেশী লোকেরা একজনের পর আর একজন উঠিয়া ভারতবর্ষে স্ত্রীশিক্ষার অভাব ও সেই অভাবপূরণ সম্বন্ধে অতি পুরাতন বিলাতি বুলি দাঁড়ের পাখির মতো আওড়াইয়া গেলেন; শেষকালে একজন ইংরেজ উঠিয়া ভারতবর্ষের মেয়েদের ইংরেজি কায়দায় শেখানোই যে একমাত্র 'শিক্ষা' নামের যোগ্য এবং সেই শিক্ষাই আমাদের স্ত্রীলোকের পক্ষে যে একমাত্র শ্রেয় সে সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিলেন। আমি দুই পক্ষের তর্কের সত্যমিথ্যা সম্বন্ধে কোনো কথা তুলিতেছি না। কিন্তু, বিলাতে প্রচলিত দস্তুর ও মত যে গন্ধমাদনের মতো আদ্যোপান্ত উৎপাটন করিয়া আনিবার যোগ্য এ সম্বন্ধে আমাদের মনে বিচারমাত্র উপস্থিত হয় না, তাহার কারণ, ছেলেবেলা হইতে এ-সব কথা আমরা পুঁথি হইতেই শিখিয়াছি এবং আমাদের যাহা-কিছু শিক্ষা সমস্তই পুঁথির শিক্ষা।

বুলি ও পুঁথির বিবরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আমাদের দেশেও শিক্ষিত লোকের মধ্যে নিরানন্দ দেখা দিয়াছে। কোথায় হৃদ্যতা, কোথায় মেলা-মেশা, কোথায় সহজ হাস্যকৌতুক! জীবনযাত্রার ভার বাড়িয়া গেছে বলিয়াই যে এতটা অবসন্নতা তাহা নহে। সে একটা কারণ বটে সন্দেহ নাই, আমাদের সহিত সর্বপ্রকার সামাজিক যোগ-বিহীন আত্মীয়তাশূন্য রাজশক্তির অহরহ অলক্ষ্য চাপও আর একটা কারণ; কিন্তু সেই সঙ্গে আমাদের অত্যন্ত কৃত্রিম লেখাপড়ার তাড়নাও কম কারণ নহে। নিতান্ত শিশুকাল হইতে তাহার পেষণ আরম্ভ হয়; এই জ্ঞানলাভের সঙ্গে মনের সঙ্গে যোগ অতি অল্প। এ জ্ঞান আনন্দের জন্যও নহে, এ কেবল প্রাণের দায়ে এবং কতকটা মানের দায়েও বটে।

আমরা মন খাটাইয়া সজীবভাবে যে জ্ঞান উপার্জন করি তাহা আমাদের মজ্জার সঙ্গে মিশিয়া যায়; বই মুখস্থ করিয়া যাহা পাই তাহা বাহিরে জড়ো হইয়া সকলের সঙ্গে আমাদের বিচ্ছেদ ঘটায়। তাহাকে আমরা কিছুতেই ভুলিতে পারি না বলিয়া অহংকার বাড়িয়া উঠে; সেই অহংকারের যেটুকু সুখ সেই আমাদের একমাত্র সম্বল। নহিলে জ্ঞানের স্বাভাবিক আনন্দ আমরা যদি লাভ করিতাম তবে এতগুলি শিক্ষিত লোকের মধ্যে অন্তত গুটিকয়েককেও দেখিতে পাইতাম যাঁহারা জ্ঞানচর্চার জন্য নিজের সমস্ত স্বার্থকে খর্ব করিয়াছেন। কিন্তু দেখিতে পাই, সায়ান্সের পরীক্ষায় প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া ডেপুটি ম্যাজিস্‌ট্রেট হইয়া সমস্ত বিদ্যা আইন-আদালতের অতলস্পর্শ নিরর্থকতার মধ্যে চিরদিনের মতো বিসর্জন করিতে সকলে ব্যগ্র, এবং কতকগুলা পাস করিয়া কেবল হতভাগা কন্যার পিতাকে ঋণের পঙ্কে ডুবাইয়া মারাই তাঁহাদের একমাত্র স্থায়ী কীর্তি হইয়া থাকে। দেশে বড়ো বড়ো শিক্ষিত উকিল জজ কেরানির অভাব নাই, কিন্তু জ্ঞানতপস্বী কোথায়? ✓

কথায় কথায় কথা অনেক বাড়িয়া গেল। উপস্থিতমত আমার যেটুকু বক্তব্য সে এই, বই পড়াটাই যে শেখা, ছেলেদের মনে এই অন্ধসংস্কার যেন জন্মিতে দেওয়া না হয়। প্রকৃতির অক্ষয় ভাণ্ডার হইতেই যে বইয়ের সঞ্চয় আহরিত হইয়াছে, অন্তত হওয়া উচিত, এবং সেখানে যে আমাদেরও অধিকার আছে, এ কথা পদে পদে জানানো চাই। বইয়ের দৌরাত্ম্য অত্যন্ত বেশি হইয়াছে বলিয়াই বেশি করিয়া জানানো চাই। এ দেশে অতি পুরাকালে, যখন লিপি প্রচলিত ছিল, তখনো তপোবনে পুঁথি ব্যবহার হয় নাই। তখনো গুরু শিষ্যকে মুখে-মুখেই শিক্ষা দিতেন এবং ছাত্র তাহা খাতায় নহে, মনের মধ্যেই লিখিয়া লইত। এমনি করিয়া এক দীপশিখা হইতে আর-এক দীপশিখা জ্বলিত। এখন ঠিক এমনটি হইতে

পারে না। কিন্তু যথাসম্ভব ছাত্রদিগকে পুঁথির আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে হইবে। পারতপক্ষে ছাত্রদিগকে পরের রচনা পড়িতে দেওয়া নহে, তাহারা গুরুর কাছে যাহা শিখিবে তাহাদের নিজেকে দিয়া তাহাই রচনা করাইয়া লইতে হইবে; এই স্বরচিত গ্রন্থই তাহাদের গ্রন্থ। এমন হইলে তাহারা মনেও করিবে না, গ্রন্থগুলা আকাশ হইতে পড়া বেদবাক্য। ‘আর্যরা মধ্য-এশিয়া হইতে ভারতে আসিয়াছেন’, ‘খৃস্ট-জন্মের দুই হাজার বৎসর পূর্বে বেদরচনা হইয়াছে’, এ-সকল কথা আমরা বই হইতে পড়িয়াছি। বইয়ের অক্ষরগুলো কাটকুট-হীন নির্বিকার, তাহারা শিশুবয়সে আমাদের উপরে সম্মোহন প্রয়োগ করে; তাই আমাদের কাছে আজ এ-সমস্ত কথা একেবারে দৈববাণীর মতো। ছেলেদের প্রথম হইতেই জানিতে হইবে, এই-সকল আনুমানিক কথা কতকগুলা যুক্তির উপর নির্ভর করিতেছে। সেই-সকল যুক্তির মূল উপকরণগুলি যথাসম্ভব তাহাদের সম্মুখে ধরিয়া তাহাদের নিজেদের অনুমান-শক্তির উদ্রেক করিতে হইবে। বইগুলা যে কী করিয়া তৈরি হইতে থাকে তাহা প্রথম হইতেই অল্পে-অল্পে ক্রমে-ক্রমে তাহারা নিজেদের মনের মধ্যে অনুভব করিতে থাকুক; তাহা হইলেই বইয়ের যথার্থ ফল তাহারা পাইবে, অথচ তাহার অন্ধ শাসন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে এবং নিজের স্বাধীন উদ্যমের দ্বারা জ্ঞানলাভ করিবার যে স্বাভাবিক মানসিক শক্তি তাহা ঘাড়ের-উপরে-বাহির-হইতে-বোঝা-চাপানো বিদ্যার দ্বারায় আচ্ছন্ন ও অভিভূত হইবে না, বইগুলোর উপরে মনের কর্তৃত্ব অক্ষুণ্ণ থাকিবে। বালক অল্পমাত্রও যেটুকু শিখিবে তখনই তাহা প্রয়োগ করিতে শিখিবে, তাহা হইলে শিক্ষা তাহার উপরে চাপিয়া বসিবে না; শিক্ষার উপরে সেই চাপিয়া বসিবে। এ কথায় সায় দিয়া যাইতে অনেকে দ্বিধা করেন না, কিন্তু কাজে লাগাইবার বেলা আপত্তি করেন। তাঁহারা মনে করেন, বালকদিগকে এমন করিয়া শিক্ষা দেওয়া অসম্ভব। তাঁহারা যাহাকে শিক্ষা বলেন তাহা এমন করিয়া দেওয়া অসম্ভব বটে। তাঁহারা কতকগুলা বই ও কতকগুলা বিষয় বাঁধিয়া দেন, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট প্রণালীতে তাহার পরীক্ষা লওয়া হয় —ইহাকেই তাঁহারা বিদ্যাশিক্ষা দেওয়া বলেন এবং যেখানে সেইরূপ শিক্ষা দেওয়া হয় তাহাকেই বিদ্যালয় বলা হয়। বিদ্যা জিনিসটা যেন একটা স্বতন্ত্র পদার্থ, শিশুর মন হইতে সেটাকে যেন তফাত করিয়া দেখিতে হয়; সেটা যেন বইয়ের পাতা এবং অক্ষরের সংখ্যা; তাহাতে ছাত্রের মন যদি পিষিয়া যায়, সে যদি পুঁথির গোলাম হয়, তাহার স্বাভাবিক বুদ্ধি যদি অভিভূত হইয়া পড়ে—সে যদি নিজের প্রাকৃতিক ক্ষমতাগুলি চালনা করিয়া জ্ঞান অধিকার করিবার শক্তি অনভ্যাস ও উৎপীড়ন-বশত চিরকালের মতো হারায়—তবু ইহা বিদ্যা, কারণ, ইহা এতটুকু ইতিহাসের অংশ, এতগুলি ভূগোলের পাতা, এতক'টা অঙ্ক এবং এতটা পরিমাণ বি-এল-এ ব্লে, সি-এল-এ ক্লে! শিশুর মন যতটুকু শিক্ষার উপরে সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব লাভ করিতে পারে অল্প হইলেও সেইটুকু শিক্ষাই শিক্ষা; আর যাহা শিক্ষা নাম ধরিয়া তাহার মনকে আচ্ছন্ন করিয়া দেয় তাহাকে পড়ানো বলিতে পার, কিন্তু তাহা শেখানো নহে। মানুষের 'পরে মানুষ অনেক অত্যাচার করিবে জানিয়াই বিধাতা তাহাকে শক্ত করিয়া গড়িয়াছেন; সেইজন্য গুরুপাক অখাদ্য খাইয়া অজীর্ণে ভুগিয়াও মানুষ বাঁচিয়া থাকে এবং শিশুকাল হইতে শিক্ষার দুর্বিষহ উৎপীড়ন সহ্য করিয়াও সে খানিকটা পরিমাণে বিদ্যালাভও করে ও তাহা লইয়া গর্বও করিতে পারে। এই তাড়নায় ও পীড়নে তাহাকে যে কতটা লোকসান দিতে হয়, কী বিপুল মূল্য দিয়া সে যে কত অল্পই ঘরে আনিতে পায়, তাহা কেহ বা বুঝেন

না; কেহ বা বুঝেন, স্বীকার করেন না; কেহ বা বুঝেন ও স্বীকার করেন, কিন্তু কাজের বেলায় যেমন চলিয়া আসিতেছে তাহাই চালাইতে থাকেন।

ভাদ্র ১৩১৩

তপোবন

আধুনিক সভ্যতালক্ষ্মী যে পদ্মের উপর বাস করেন সেটি ইঁট-কাঠে তৈরি, সেটি শহর। উন্নতির সূর্য যতই মধ্যগগনে উঠছে ততই তার দলগুলি একটি একটি করে খুলে গিয়ে ক্রমশই চার দিকে ব্যাপ্ত হয়ে পড়ছে। চুন-সুরকির জয়যাত্রাকে বসুন্ধরা কোথাও ঠেকিয়ে রাখতে পারছে না।

এই শহরেই মানুষ বিদ্যা শিখছে, বিদ্যা প্রয়োগ করছে, ধন জমাচ্ছে, ধন খরচ করছে, নিজেকে নানা দিক থেকে শক্তি ও সম্পদে পূর্ণ করে তুলছে। এই সভ্যতায় সকলের চেয়ে যা-কিছু শ্রেষ্ঠ পদার্থ তা নগরের সামগ্রী।

বস্তুত, এ ছাড়া অন্যরকম কল্পনা করা শক্ত। যেখানে অনেক মানুষের সম্মিলন সেখানে বিচিত্র বুদ্ধির সংঘাতে চিত্ত জাগ্রত হয়ে ওঠে এবং চার দিক থেকে ধাক্কা খেয়ে প্রত্যেকের শক্তি গতি প্রাপ্ত হয়। এমনি করে চিত্তসমুদ্রের মন্থন হতে থাকলে মানুষের নিগূঢ় সারপদার্থসকল আপনিই ভেসে উঠতে থাকে।

তার পরে মানুষের শক্তি যখন জেগে ওঠে তখন সে সহজেই এমন ক্ষেত্র চায় যেখানে আপনাকে ফলাও রকম করে প্রয়োগ করতে পারে। সে ক্ষেত্র কোথায়? যেখানে অনেক মানুষের অনেকপ্রকার উদ্যম নানা সৃষ্টিকার্যে সর্বদাই সচেষ্ট হয়ে রয়েছে। সেই ক্ষেত্রই হচ্ছে শহর।

গোড়ায় মানুষ যখন খুব ভিড় করে এক জায়গায় শহর সৃষ্টি করে বসে তখন সেটা সভ্যতার আকর্ষণে নয়। অধিকাংশ স্থলেই শত্রুপক্ষের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্যে কোনো সুরক্ষিত সুবিধার জায়গায় মানুষ একত্র হয়ে থাকবার প্রয়োজন অনুভব করে। কিন্তু যে কারণেই হোক, অনেকে একত্র হবার একটা উপলক্ষ ঘটলেই সেখানে নানা লোকের প্রয়োজন এবং বুদ্ধি একটা কলেবরবদ্ধ আকার ধারণ করে, এবং সেইখানেই সভ্যতার অভিব্যক্তি আপনি ঘটতে থাকে।

কিন্তু ভারতবর্ষে এই একটি আশ্চর্য ব্যাপার দেখা গেছে, এখানকার সভ্যতার মূল প্রস্রবণ শহরে নয়, বনে। ভারতবর্ষের প্রথমতম আশ্চর্য বিকাশ যেখানে দেখতে পাই সেখানে মানুষের সঙ্গে মানুষ অত্যন্ত ঘেঁষাঘেঁষি করে একেবারে পিণ্ড পাকিয়ে ওঠে নি। সেখানে গাছপালা নদীসরোবর মানুষের সঙ্গে মিলে থাকবার যথেষ্ট অবকাশ পেয়েছিল। সেখানে মানুষও ছিল, ফাঁকাও ছিল; ঠেলাঠেলি ছিল না। অথচ এই ফাঁকায় ভারতবর্ষের চিত্তকে জড়প্রায় করে দেয় নি, বরঞ্চ তার চেতনাকে আরো উজ্জ্বল করে দিয়েছিল। এরকম ঘটনা জগতে আর কোথাও ঘটেছে বলে দেখা যায় না।

আমরা এই দেখেছি, যে-সব মানুষ অবস্থাগতিকে বনের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়ে তারা বুনো হয়ে ওঠে। হয় তারা বাঘের মতো হিংস্র হয়, নয় তারা হরিণের মতো নির্বোধ হয়।

কিন্তু প্রাচীন ভারতবর্ষে দেখতে পাই অরণ্যের নির্জনতা মানুষের বুদ্ধিকে

অভিভূত করে নি, বরঞ্চ তাকে এমন একটি শক্তি দান করেছিল যে সেই অরণ্যবাস-নিঃসৃত সভ্যতার ধারা সমস্ত ভারতবর্ষকে অভিষিক্ত করে দিয়েছে, এবং আজ পর্যন্ত তার প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায় নি।

এই রকমে আরণ্যকদের সাধনা থেকে ভারতবর্ষ সভ্যতার যে প্রৈতি (energy) লাভ করেছিল সেটা নাকি বাইরের সংঘাত থেকে ঘটে নি, নানা প্রয়োজনের প্রতিযোগিতা থেকে জাগে নি, এইজন্যে সেই শক্তিটা প্রধানত বহিরভিমুখী হয় নি। সে ধ্যানের দ্বারা বিশ্বের গভীরতার মধ্যে প্রবেশ করেছে, নিখিলের সঙ্গে আত্মার যোগ স্থাপন করেছে। সেইজন্যে ঐশ্বর্যের উপকরণেই প্রধানভাবে ভারতবর্ষ আপনার সভ্যতার পরিচয় দেয় নি। এই সভ্যতার যাঁরা কাণ্ডারী তাঁরা নির্জনবাসী, তাঁরা বিরলবসন তপস্বী।

সমুদ্রতীর যে জাতিকে পালন করেছে তাকে বাণিজ্যসম্পদ দিয়েছে, মরুভূমি যাদের অল্পস্তন্যদানে ক্ষুধিত করে রেখেছে তারা দিগ্‌বিজয়ী হয়েছে—এমনি করে এক-একটি বিশেষ সুযোগে মানুষের শক্তি এক-একটি বিশেষ পথ পেয়েছে।

সমতল আর্যাবর্তের অরণ্যভূমিও ভারতবর্ষকে একটি বিশেষ সুযোগ দিয়েছিল। ভারতবর্ষের বুদ্ধিকে সে জগতের অন্তরতম রহস্যালোক-আবিষ্কারে প্রেরণ করেছিল। সেই মহাসমুদ্রতীরের নানা সুদূর দ্বীপ দ্বীপান্তর থেকে সে যে-সমস্ত সম্পদ আহরণ করে এনেছিল সমস্ত মানুষকেই দিনে দিনে তার প্রয়োজন স্বীকার করতেই হবে। যে ওষধি-বনস্পতির মধ্যে প্রকৃতির প্রাণের ক্রিয়া দিনে রাত্রে ও ঋতুতে ঋতুতে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে এবং প্রাণের লীলা নানা অপরূপ ভঙ্গীতে ধ্বনিতে ও রূপবৈচিত্র্যে নিরন্তর নূতন নূতন ভাবে প্রকাশিত হতে থাকে, তারই মাঝখানে ধ্যানপরায়ণ চিত্ত নিয়ে যাঁরা ছিলেন তাঁরা নিজের চারি দিকেই একটি আনন্দময় রহস্যকে সুস্পষ্ট উপলব্ধি করেছিলেন। সেইজন্যে তাঁরা এত সহজে বলতে পেরেছিলেন: যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতং। এই যা-কিছু সমস্তই পরমপ্রাণ হতে নিঃসৃত হয়ে প্রাণের মধ্যেই কম্পিত হচ্ছে। তাঁরা স্বরচিত ইঁট কাঠ লোহার কঠিন খাঁচার মধ্যে ছিলেন না, তাঁরা যেখানে বাস করতেন সেখানে বিশ্বব্যাপী বিরাট জীবনের সঙ্গে তাঁদের জীবনের অবারিত যোগ ছিল। এই বন তাঁদের ছায়া দিয়েছে, ফল ফুল দিয়েছে, কুশ সমিধ্‌ জুগিয়েছে; তাঁদের প্রতি দিনের সমস্ত কর্ম অবকাশ ও প্রয়োজনের সঙ্গে এই বনের আদানপ্রদানের জীবনময় সম্বন্ধ ছিল। এই উপায়েই নিজের জীবনকে তাঁরা চারি দিকের একটি বড়ো জীবনের সঙ্গে যুক্ত করে জানতে পেরেছিলেন। চতুর্দিককে তাঁরা শূন্য বলে, নির্জীব বলে, পৃথক্‌ বলে জানতেন না। বিশ্বপ্রকৃতির ভিতর দিয়ে আলোক বাতাস অন্নজল প্রভৃতি যে-সমস্ত দান তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন সেই দানগুলি যে মাটির নয়, গাছের নয়, শূন্য আকাশের নয়, একটি চেতনাময় অনন্ত আনন্দের মধ্যেই তার মূল প্রস্রবণ, এইটি তাঁরা একটি সহজ অনুভবের দ্বারা জানতে পেরেছিলেন; সেইজন্যেই নিশ্বাস আলো অন্নজল সমস্তই তাঁরা শ্রদ্ধার সঙ্গে, ভক্তির সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন। এইজন্যই নিখিলচরাচরকে নিজের প্রাণের দ্বারা, চেতনার দ্বারা, হৃদয়ের দ্বারা, বোধের দ্বারা, নিজের আত্মার সঙ্গে আত্মীয়রূপে এক করে পাওয়াই ভারতবর্ষের পাওয়া।

এর থেকেই বোঝা যাবে, বন ভারতবর্ষের চিত্তকে নিজের নিভৃত ছায়ার মধ্যে, নিগূঢ় প্রাণের মধ্যে, কেমন করে পালন করেছে। ভারতবর্ষে যে দুই বড়ো বড়ো প্রাচীন যুগ চলে গেছে, বৈদিক যুগ ও বৌদ্ধ যুগ, সে দুই যুগকে বনই ধাত্রীরূপে

ধারণ করেছে। কেবল বৈদিক ঋষিরা নন, ভগবান্ বুদ্ধও কত আম্রবন কত বেণুবনে তাঁর উপদেশ বর্ষণ করেছেন; রাজপ্রাসাদে তাঁর স্থান কুলায় নি, বনই তাঁকে বুকে করে নিয়েছিল।

ক্রমশ ভারতবর্ষে রাজ্য-সাম্রাজ্য নগর-নগরী স্থাপিত হয়েছে; দেশবিদেশের সঙ্গে তার পণ্য-আদান-প্রদান চলেছে; অন্নলোলুপ কৃষিক্ষেত্র অল্পে অল্পে ছায়া-নিভৃত অরণ্যগুলিকে দূর হতে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। কিন্তু সেই প্রতাপশালী ঐশ্বর্যপূর্ণ যৌবনদৃপ্ত ভারতবর্ষ বনের কাছে নিজের ঋণ স্বীকার করতে কোনোদিন লজ্জাবোধ করে নি। তপস্যাকেই সে সকল প্রয়াসের চেয়ে বেশি সম্মান দিয়েছে এবং বনবাসী পুরাতন তপস্বীদেরই আপনাদের আদিপুরুষ বলে জেনে ভারতবর্ষের রাজা-মহারাজাও গৌরব বোধ করেছেন। ভারতবর্ষের পুরাণকথায় যা-কিছু মহৎ আশ্চর্য পবিত্র, যা-কিছু শ্রেষ্ঠ এবং পূজ্য, সমস্ত সেই প্রাচীন তপোবনস্মৃতির সঙ্গেই জড়িত। বড়ো বড়ো রাজার রাজত্বের কথা সে মনে করে রাখবার জন্যে চেষ্টা করে নি, কিন্তু নানা বিপ্লবের ভিতর দিয়েও বনের সামগ্রীকেই তার প্রাণের সামগ্রী করে আজ পর্যন্ত সে বহন করে এসেছে। মানব-ইতিহাসে এইটেই হচ্ছে ভারতবর্ষের বিশেষত্ব।

ভারতবর্ষের বিক্রমাদিত্য যখন রাজা, উজ্জয়িনী যখন মহানগরী, কালিদাস যখন কবি, তখন এ দেশে তপোবনের যুগ চলে গেছে। তখন মানবের মহামেলার মাঝখানে এসে আমরা দাঁড়িয়েছি; তখন চীন হূন শক পারসিক গ্রীক রোমক সকলে আমাদের চার দিকে ভিড় করে এসেছে; তখন জনকের মতো রাজা এক দিকে স্বহস্তে লাঙল নিয়ে চাষ করছেন, অন্য দিকে দেশ-দেশান্তর হতে আগত জ্ঞানপিপাসুদের ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা দিচ্ছেন, এ দৃশ্য দেখবার আর কাল ছিল না। কিন্তু সেদিনকার ঐশ্বর্যমদগর্বিত যুগেও তখনকার শ্রেষ্ঠ কবি তপোবনের কথা কেমন করে বলেছেন তা দেখলেই বোঝা যায় যে, তপোবন যখন আমাদের দৃষ্টির বাহিরে গেছে তখনো কতখানি আমাদের হৃদয় জুড়ে বসেছে।

কালিদাস যে বিশেষভাবে ভারতবর্ষের কবি তা তাঁর তপোবনচিত্র থেকেই সপ্রমাণ হয়। এমন পরিপূর্ণ আনন্দের সঙ্গে তপোবনের ধ্যানকে আর কে মূর্তিমান করতে পেরেছে!

রঘুবংশ কাব্যের যবনিকা যখনই উদ্ঘাটিত হল তখন প্রথমেই তপোবনের শান্ত সুন্দর পবিত্র দৃশ্যটি আমাদের চোখের সামনে প্রকাশিত হয়ে পড়ল।

সেই তপোবনে বনান্তর হতে কুশ সমিধ্ ফল আহরণ করে তপস্বীরা আসছেন এবং যেন একটি অদৃশ্য অগ্নি তাঁদের প্রত্যুদ্গমন করছে। সেখানে হরিণগুলি ঋষিপত্নীদের সন্তানের মতো, তারা নীবারধান্যের অংশ পায় এবং নিঃসংকোচে কুটীরের দ্বার রোধ করে পড়ে থাকে। মুনিকন্যারা গাছে জল দিচ্ছেন এবং আলবাল যেমনি জলে ভরে উঠছে অমনি তাঁরা সরে যাচ্ছেন, পাখিরা নিঃশঙ্কমনে আলবালের জল খেতে আসে এই তাঁদের অভিপ্রায়। রৌদ্র পড়ে এসেছে, নীবারধান্য কুটীরের প্রাঙ্গণে রাশীকৃত এবং সেখানে হরিণরা শুয়ে রোমন্থন করছে। আহুতির সুগন্ধধূম বাতাসে প্রবাহিত হয়ে এসে আশ্রমোন্মুখ অতিথিদের সর্বশরীর পবিত্র করে দিচ্ছে।

তরুলতা পশুপক্ষী সকলের সঙ্গে মানুষের মিলনের পূর্ণতা, এই হচ্ছে এর ভিতরকার ভাব।

সমস্ত অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকের মধ্যে ভোগলালসানিষ্ঠুর রাজপ্রাসাদকে

ধিক্কার দিয়ে যে-একটি তপোবন বিরাজ করছে তারও মূল সুরটি হচ্ছে ওই—চেতন অচেতন সকলেরই সঙ্গে মানুষের আত্মীয়সম্বন্ধের পবিত্র মাধুর্য।

কাদম্বরীতে তপোবনের বর্ণনায় কবি লিখছেন—সেখানে বাতাসে লতাগুলি মাথা নত করে প্রণাম করছে, গাছগুলি ফুল ছড়িয়ে পূজা করছে, কুটীরের অঙ্গনে শ্যামাক ধান শুকোবার জন্যে মেলে দেওয়া আছে, সেখানে আমলক লবলী লবঙ্গ কদলী বদরী প্রভৃতি ফল সংগ্রহ করা হয়েছে, বটুদের অধ্যয়নে বনভূমি মুখরিত, বাচাল শুকেরা অনবরত-শ্রবণের দ্বারা অভ্যস্ত আহুতিমন্ত্র উচ্চারণ করছে, অরণ্য-কুক্কুটেরা বৈশ্বদেববলিপিণ্ড আহার করছে, নিকটে জলাশয় থেকে কলহংসশাবকেরা এসে নীবারবলি খেয়ে যাচ্ছে, হরিণীরা জিহ্বাপল্লব দিয়ে মুনিবালকদের লেহন করছে।

এর ভিতরকার কথাটা হচ্ছে ওই। তরুলতা জীবজন্তুর সঙ্গে মানুষের বিচ্ছেদ দূর করে তপোবন প্রকাশ পাচ্ছে, এই পুরানো কথাই আমাদের দেশে বরাবর চলে এসেছে।

কেবল তপোবনের চিত্রেই যে এই ভাবটি প্রকাশ পেয়েছে তা নয়। মানুষের সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির সম্মিলনই আমাদের দেশের সমস্ত প্রসিদ্ধ কাব্যের মধ্যে পরিস্ফুট। যে-সকল ঘটনা মানবচরিত্রকে আশ্রয় করে ব্যক্ত হতে থাকে তাই নাকি প্রধানত নাটকের উপাদান, এইজন্যেই অন্য দেশের সাহিত্যে দেখতে পাই বিশ্বপ্রকৃতিকে নাটকে কেবল আভাসে রক্ষা করা হয় মাত্র, তার মধ্যে তাকে বেশি জায়গা দেবার অবকাশ থাকে না। আমাদের দেশের প্রাচীন যে নাটকগুলি আজ পর্যন্ত খ্যাতি রক্ষা করে আসছে তাতে দেখতে পাই, প্রকৃতিও নাটকের মধ্যে নিজের অংশ থেকে বঞ্চিত হয় না।

মানুষকে বেষ্টন করে এই-যে জগৎপ্রকৃতি আছে, এ যে অত্যন্ত অন্তরঙ্গভাবে মানুষের সকল চিন্তা সকল কাজের সঙ্গে জড়িত হয়ে আছে। মানুষের লোকালয় যদি কেবলই একান্ত মানবময় হয়ে ওঠে, এর ফাঁকে ফাঁকে যদি প্রকৃতি কোনোমতে প্রবেশাধিকার না পায়, তা হলে আমাদের চিন্তা ও কর্ম ক্রমশ কলুষিত ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে নিজের অতলস্পর্শ আবর্জনার মধ্যে আত্মহত্যা করে মরে। এই-যে প্রকৃতি আমাদের মধ্যে নিত্যনিয়ত কাজ করছে অথচ দেখাচ্ছে যেন সে চুপ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে, যেন আমরাই সব মস্ত কাজের লোক আর সে বেচারা নিতান্তই একটা বাহার মাত্র—এই প্রকৃতিকে আমাদের দেশের কবিরা বেশ করে চিনে নিয়েছেন। এই প্রকৃতি মানুষের সমস্ত সুখদুঃখের মধ্যে যে অনন্তের সুরটি মিলিয়ে রাখছে সেই সুরটিকে আমাদের দেশের প্রাচীন কবিরা সর্বদাই তাঁদের কাব্যের মধ্যে বাজিয়ে রেখেছেন।

ঋতুসংহার কালিদাসের কাঁচা বয়সের লেখা, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এর মধ্যে তরুণতরুণীর যে মিলনসংগীত আছে তাতে স্বরগ্রাম লালসার নিচের সপ্তক থেকেই শুরু হয়েছে, শকুন্তলা-কুমারসম্ভবের মতো তপস্যার উচ্চতম সপ্তকে গিয়ে পৌঁছয় নি।

কিন্তু কবি নবযৌবনের এই লালসাকে প্রকৃতির বিচিত্র ও বিরাট সুরের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে মুক্ত আকাশের মাঝখানে তাকে ঝংকৃত করে তুলেছেন। ধারাযন্ত্র-মুখরিত নিদাঘদিনান্তের চন্দ্রকিরণ এর মধ্যে আপনার সুরটুকু যোজনা করেছে, বর্ষায় নবজলসেকে-ছিন্নতাপ বনান্তে পবনচালিত কদম্বশাখা এর ছন্দে আন্দোলিত, আপক্বশালিরুচিরা শারদলক্ষ্মী তাঁর হংসরবনূপুরধ্বনিকে এর তালে তালে

মন্দ্রিত করেছেন এবং বসন্তের দক্ষিণবায়ুচঞ্চল কুসুমিত আম্রশাখার কলমর্মর এরই তানে তানে বিস্তীর্ণ।

বিরাট প্রকৃতির মাঝখানে যেখানে যার স্বাভাবিক স্থান সেখানে তাকে স্থাপন করে দেখলে তার অত্যুগ্রতা থাকে না; সেইখান থেকে বিচ্ছিন্ন করে এনে কেবলমাত্র মানুষের গণ্ডির মধ্যে সংকীর্ণ করে দেখলে তাকে ব্যাধির মতো অত্যন্ত উত্তপ্ত এবং রক্তবর্ণ দেখতে হয়। শেক্‌স্‌পিয়রের দুই-একটি খণ্ডকাব্য আছে, নরনারীর আসক্তি তার বর্ণনীয় বিষয়; কিন্তু সেই-সকল কাব্যে আসক্তিই একেবারে একান্ত। তার চার দিকে আর-কিছুরই স্থান নেই, আকাশ নেই, বাতাস নেই, প্রকৃতির যে গীতগন্ধবর্ণবিচিত্র বিশাল আবরণে বিশ্বের সমস্ত লজ্জা রক্ষা করে আছে তার কোনো সম্পর্ক নেই। এইজন্যে সেই-সকল কাব্যে প্রবৃত্তির উন্মত্ততা অত্যন্ত দুঃসহরূপে প্রকাশ পাচ্ছে।

কুমারসম্ভবে তৃতীয় সর্গে যেখানে মদনের আকস্মিক আবির্ভাবে যৌবনচাঞ্চল্যের উদ্দীপনা বর্ণিত হয়েছে সেখানে কালিদাস উন্মত্ততাকে একটি সংকীর্ণ সীমার মধ্যেই সর্বময় করে দেখাবার প্রয়াসমাত্র পান নি। আতশকাঁচের ভিতর দিয়ে একটি বিন্দুমাত্র সূর্যকিরণ সংহত হয়ে পড়লে সেখানে আগুন জ্বলে ওঠে; কিন্তু সেই সূর্যকিরণ যখন আকাশের সর্বত্র স্বভাবত ছড়িয়ে থাকে তখন সে তাপ দেয় বটে, কিন্তু দগ্ধ করে না। কালিদাস বসন্তপ্রকৃতির সর্বব্যাপী যৌবনলীলার মাঝখানে হরপার্বতীর মিলনচাঞ্চল্যকে নিবিষ্ট করে তার সম্ভ্রম রক্ষা করেছেন।

অকালবসন্তসমাগমে বনস্থলীতে যখন অশোকের গাছে গুঁড়ি থেকে একেবারে পল্লব পর্যন্ত আচ্ছন্ন করে ফুল ফুটে উঠল, সহকারের শাখা নতুন কিশলয়ে ছেয়ে গেল, তখন মধুকর তার প্রিয়ার সঙ্গে এক পুষ্পপাত্রে মধুপান করতে বসে গেল; কৃষ্ণসার হরিণ স্পর্শনিমীলিতাক্ষী মৃগীর গায়ে শিঙ দিয়ে কণ্ডূয়ন করে দিতে লাগল; তখন হস্তিনী পদ্মরেণুগন্ধি গণ্ডূষজল হস্তীকে পান করিয়ে দিলে এবং চক্রবাক আধখানা মৃণাল নিজে খেয়ে বাকি আধখানা চক্রবাকীকে খাইয়ে দিতে লাগল। এমনি করে, কালিদাস পুষ্পধনুর জ্যানির্ঘোষকে বিশ্বসংগীতের সুরের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন ও বেসুরো করে বাজান নি, যে পটভূমিকার উপরে তিনি তাঁর ছবিটি এঁকেছেন সেটি তরুলতা-পশুপক্ষীকে নিয়ে সমস্ত আকাশে অতি বিচিত্র বর্ণে বিস্তারিত।

কেবল তৃতীয় সর্গ নয়, সমস্ত কুমারসম্ভব কাব্যটিই একটি বিশ্বব্যাপী পটভূমিকার উপরে অঙ্কিত। এই কাব্যের ভিতরকার কথাটি একটি গভীর এবং চিরন্তন কথা। যে পাপদৈত্য প্রবল হয়ে উঠে হঠাৎ স্বর্গলোককে কোথা থেকে ছারখার করে দেয় তাকে পরাভূত করবার মতো বীরত্ব কোন্‌ উপায়ে জন্মগ্রহণ করে?

এই সমস্যাটি মানুষের চিরকালের সমস্যা, প্রত্যেক লোকের জীবনের সমস্যাও এই বটে, আবার এই সমস্যা সমস্ত জাতির মধ্যে নূতন নূতন মূর্তিতে নিজেকে প্রকাশ করে।

কালিদাসের সময়েও একটি সমস্যা ভারতবর্ষে অত্যন্ত উৎকট হয়ে দেখা দিয়েছিল, তা কবির কাব্য পড়লেই স্পষ্ট বোঝা যায়। প্রাচীনকালে হিন্দুসমাজে জীবনযাত্রায় যে-একটি সরলতা ও সংযম ছিল তখন সেটি ভেঙে এসেছিল। রাজারা তখন রাজধর্ম বিস্মৃত হয়ে আত্মসুখপরায়ণ ভোগী হয়ে উঠেছিলেন। এ দিকে শকদের আক্রমণে ভারতবর্ষ তখন বারম্বার দুর্গতিপ্রাপ্ত হচ্ছিল।

তখন বাহিরের দিক থেকে দেখলে ভোগবিলাসের আয়োজনে, কাব্য সংগীত শিল্পকলার আলোচনায়, ভারতবর্ষ সভ্যতার প্রকৃষ্টতা লাভ করেছিল। কালিদাসের কাব্যকলার মধ্যেও তখনকার সেই উপকরণবহুল সম্ভোগের সুর যে বাজে নি তা নয়। বস্তুত তাঁর কাব্যের বহিরংশ তখনকার কালেরই কারুকার্যে খচিত হয়েছিল। এইরকম এক দিকে তখনকার কালের সঙ্গে তখনকার কবির যোগ আমরা দেখতে পাই।

কিন্তু এই প্রমোদভবনের স্বর্ণখচিত অন্তঃপুরের মাঝখানে বসে কাব্যলক্ষ্মী বৈরাগ্যবিকল চিত্তে কিসের ধ্যানে নিযুক্ত ছিলেন? হৃদয় তো তাঁর এখানে ছিল না। তিনি এই আশ্চর্যকারুবিচিত্র মাণিক্যকঠিন কারাগার হতে কেবলই মুক্তি-কামনা করছিলেন।

কালিদাসের কাব্যে বাহিরের সঙ্গে ভিতরের, অবস্থার সঙ্গে আকাঙ্ক্ষার একটা দ্বন্দ্ব আছে। ভারতবর্ষে যে তপস্যার যুগ তখন অতীত হয়ে গিয়েছিল ঐশ্বর্যশালী রাজসিংহাসনের পাশে বসে কবি সেই নির্মল সুদূর কালের দিকে একটি বেদনা বহন করে তাকিয়ে ছিলেন।

রঘুবংশ কাব্যে তিনি ভারতবর্ষের পুরাকালীন সূর্যবংশীয় রাজাদের চরিত-গানে যে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, তার মধ্যে কবির সেই বেদনাটি নিগূঢ় হয়ে রয়েছে। তার প্রমাণ দেখুন।

আমাদের দেশের কাব্যে পরিণামকে অশুভকর ভাবে দেখানো ঠিক প্রথা নয়। বস্তুত যে রামচন্দ্রের জীবনে রঘুর বংশ উচ্চতম চূড়ায় অধিরোহণ করেছে সেইখানেই কাব্য শেষ করলে তবেই কবির ভূমিকার বাক্যগুলি সার্থক হত।

তিনি ভূমিকায় বলেছেন : সেই যাঁরা জন্মকাল অবধি শুদ্ধ, যাঁরা ফলপ্রাপ্তি অবধি কর্ম করতেন, সমুদ্র অবধি যাঁদের রাজ্য এবং স্বর্গ অবধি যাঁদের রথবর্ত্ম গিয়েছিল; যথাবিধি যাঁরা অগ্নিতে আহুতি দিতেন, যথাকাম যাঁরা প্রার্থীদের অভাব পূর্ণ করতেন, যথাপরাধ যাঁরা দণ্ড দিতেন এবং যথাকালে যাঁরা জাগ্রত হতেন; যাঁরা ত্যাগের জন্যে অর্থ সঞ্চয় করতেন, যাঁরা সত্যের জন্য মিতভাষী, যাঁরা যশের জন্য জয় ইচ্ছা করতেন এবং সন্তানলাভের জন্য যাঁদের দারগ্রহণ; শৈশবে যাঁরা বিদ্যাভ্যাস করতেন, যৌবনে যাঁদের বিষয়সেবা ছিল, বার্ধক্যে যাঁরা মুনিবৃত্তি গ্রহণ করতেন এবং যোগান্তে যাঁদের দেহত্যাগ হত— আমি বাক্‌সম্পদে দরিদ্র হলেও সেই রঘুরাজদের বংশ কীর্তন করব, কারণ তাঁদের গুণ আমার কর্ণে প্রবেশ করে আমাকে চঞ্চল করে তুলছে।

কিন্তু গুণকীর্তনেই এই কাব্যের শেষ নয়। কবিকে যে কিসে চঞ্চল করে তুলেছে তা রঘুবংশের পরিণাম দেখলেই বোঝা যায়।

রঘুবংশ যাঁর নামে গৌরবলাভ করেছে তার জন্মকাহিনী কী? তাঁর আরম্ভ কোথায়?

তপোবনে দিলীপদম্পতির তপস্যাতেই এমন রাজা জন্মেছেন। কালিদাস তাঁর রাজপ্রভুদের কাছে এই কথাটি নানা কাব্যে নানা কৌশলে বলেছেন যে, কঠিন তপস্যার ভিতর দিয়ে ছাড়া কোনো মহৎফললাভের কোনো সম্ভাবনা নেই। যে রঘু উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিমের সমস্ত রাজাকে বীরতেজে পরাভূত করে পৃথিবীতে একচ্ছত্র রাজত্ব বিস্তার করেছিলেন তিনি তাঁর পিতামাতার তপঃসাধনার ধন। আবার যে ভরত বীর্যবলে চক্রবর্তী সম্রাট হয়ে ভারতবর্ষকে নিজ নামে ধন্য

করেছেন তাঁর জন্মঘটনায় অবারিত প্রবৃত্তির যে কলঙ্ক পড়েছিল কবি তাকে তপস্যার অগ্নিতে দগ্ধ এবং দুঃখের অশ্রুজলে সম্পূর্ণ ধৌত না করে ছাড়েন নি।

রঘুবংশ আরম্ভ হল রাজোচিত ঐশ্বর্যগৌরবের বর্ণনায় নয়। সুদক্ষিণাকে বামে নিয়ে রাজা দিলীপ তপোবনে প্রবেশ করলেন। চতুঃসমুদ্র যাঁর অনন্যশাসনা পৃথিবীর পরিখা সেই রাজা অবিচলিত নিষ্ঠায় কঠোর সংযমে তপোবনধেনুর সেবায় নিযুক্ত হলেন।

সংযমে তপস্যায় তপোবনে রঘুবংশের আরম্ভ, আর মদিরায় ইন্দ্রিয়মত্ততায় প্রমোদভবনে তার উপসংহার। এই শেষ সর্গের চিত্রে বর্ণনার উজ্জ্বলতা যথেষ্ট আছে, কিন্তু যে অগ্নি লোকালয়কে দগ্ধ করে সর্বনাশ করে সেও তো কম উজ্জ্বল নয়। এক পত্নীকে নিয়ে দিলীপের তপোবনে বাস শান্ত এবং অনতিপ্রকট বর্ণে অঙ্কিত, আর বহু নায়িকা নিয়ে অগ্নিবর্ণের আত্মঘাতসাধন অসম্বৃত বাহুল্যের সঙ্গে যেন জ্বলন্ত রেখায় বর্ণিত।

প্রভাত যেমন শান্ত, যেমন পিঙ্গলজটাধারী ঋষিবালকের মতো পবিত্র, প্রভাত যেমন মুক্তাপাণ্ডুর সৌম্য আলোকে শিশিরস্নিগ্ধ পৃথিবীর উপরে ধীরপদে অবতরণ করে এবং নবজীবনের অভ্যুদয়বার্তায় জগৎকে উদ্‌বোধিত করে তোলে, কবির কাব্যেও তপস্যার দ্বারা সুসমাহিত রাজমাহাত্ম্য তেমনি স্নিগ্ধ তেজে এবং সংযত বাণীতে মহোদয়শালী রঘুবংশের সূচনা করেছিল। আর, নানাবর্ণবিচিত্র মেঘজালের মধ্যে আবিষ্ট অপরাহ্ণ আপনার অদ্ভুত রশ্মিচ্ছটায় পশ্চিম-আকাশকে যেমন ক্ষণকালের জন্যে প্রগল্‌ভ করে তোলে এবং দেখতে দেখতে ভীষণ ক্ষয় এসে তার সমস্ত মহিমা অপহরণ করতে থাকে, অবশেষে অনতিকালেই বাক্যহীন কর্মহীন অচেতন অন্ধকারের মধ্যে সমস্ত বিলুপ্ত হয়ে যায়, কবি তেমনি করেই কাব্যের শেষ সর্গে বিচিত্র ভোগায়োজনের ভীষণ সমারোহের মধ্যেই রঘুবংশজ্যোতিষ্কের নির্বাপণ বর্ণনা করেছেন।

কাব্যের এই আরম্ভ এবং শেষের মধ্যে কবির একটি অন্তরের কথা প্রচ্ছন্ন আছে। তিনি নীরব দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে বলছেন, ছিল কী আর হয়েছে কী! সে কালে যখন সম্মুখে ছিল অভ্যুদয় তখন তপস্যাই ছিল সকলের চেয়ে প্রধান ঐশ্বর্য, আর এ কালে যখন সম্মুখে দেখা যাচ্ছে বিনাশ তখন বিলাসের উপকরণ-রাশির সীমা নেই আর ভোগের অতৃপ্ত বহ্নি সহস্র শিখায় জ্বলে উঠে চারি দিকের চোখ ধাঁদিয়ে দিচ্ছে।

কালিদাসের অধিকাংশ কাব্যের মধ্যেই এই দ্বন্দ্বটি সুস্পষ্ট দেখা যায়। এই দ্বন্দ্বের সমাধান কোথায় কুমারসম্ভবে তাই দেখানো হয়েছে। কবি এই কাব্যে বলেছেন, ত্যাগের সঙ্গে ঐশ্বর্যের, তপস্যার সঙ্গে প্রেমের সম্মিলনেই শৌর্যের উদ্ভব; সেই শৌর্যেই মানুষ সকলপ্রকার পরাভব হতে উদ্ধার পায়।

অর্থাৎ ত্যাগের ও ভোগের সামঞ্জস্যেই পূর্ণ শক্তি। ত্যাগী শিব যখন একাকী সমাধিমগ্ন তখনো স্বর্গরাজ্য অসহায়, আবার সতী যখন তাঁর পিতৃভবনের ঐশ্বর্যে একাকিনী আবদ্ধ তখনো দৈত্যের উপদ্রব প্রবল।

প্রবৃত্তি প্রবল হয়ে উঠলেই ত্যাগের ও ভোগের সামঞ্জস্য ভেঙে যায়।

কোনো-একটি সংকীর্ণ জায়গায় যখন আমরা অহংকারকে বা বাসনাকে ঘনীভূত করি তখন আমরা সমগ্রের ক্ষতি করে অংশকে বড়ো করে তুলতে চেষ্টা করি। এর থেকে ঘটে অমঙ্গল। অংশের প্রতি আসক্তিবশত সমগ্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, এই হচ্ছে পাপ।

এইজন্যেই ত্যাগের প্রয়োজন। এই ত্যাগ নিজেকে রিক্ত করবার জন্যে নয়, নিজেকে পূর্ণ করবার জন্যেই। ত্যাগ মানে আংশিককে ত্যাগ সমগ্রের জন্য, ক্ষণিককে ত্যাগ নিত্যের জন্য, অহংকারকে ত্যাগ প্রেমের জন্য, সুখকে ত্যাগ আনন্দের জন্য। এইজন্যেই উপনিষদে বলা হয়েছে, ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ। ত্যাগের দ্বারা ভোগ করবে, আসক্তির দ্বারা নয়।

প্রথমে পার্বতী মদনের সাহায্যে শিবকে চেয়েছিলেন, সে চেষ্টা ব্যর্থ হল; অবশেষে ত্যাগের সাহায্যে তপস্যার দ্বারাতেই তাঁকে লাভ করলেন।

কাম হচ্ছে কেবল অংশের প্রতিই আসক্ত, সমগ্রের প্রতি অন্ধ; কিন্তু শিব হচ্ছেন সকল দেশের, সকল কালের— কামনাত্যাগ না হলে তাঁর সঙ্গে মিলন ঘটতেই পারে না।

তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ, ত্যাগের দ্বারাই ভোগ করবে, এইটি উপনিষদের অনুশাসন। এইটেই কুমারসম্ভব কাব্যের মর্মকথা এবং এইটেই আমাদের তপোবনের সাধনা— লাভ করবার জন্যে ত্যাগ করবে।

Sacrifice এবং resignation, আত্মত্যাগ এবং দুঃখস্বীকার, এই দুটি পদার্থের মাহাত্ম্য আমরা কোনো কোনো ধর্মশাস্ত্রে বিশেষভাবে বর্ণিত দেখেছি। জগতের সৃষ্টিকার্যে উত্তাপ যেমন একটি প্রধান জিনিস, মানুষের জীবনগঠনে দুঃখও তেমনি একটি খুব বড়ো রাসায়নিক শক্তি; এর দ্বারা চিত্তের দুর্ভেদ্য কাঠিন্য গলে যায় এবং অসাধ্য হৃদয়গ্রন্থির ছেদন হয়। অতএব সংসারে যিনি দুঃখকে দুঃখরূপেই নম্রভাবে স্বীকার করে নিতে পারেন তিনি যথার্থ তপস্বী বটেন।

কিন্তু কেউ যেন মনে না করেন এই দুঃখস্বীকারকেই উপনিষৎ লক্ষ্য করছেন। ত্যাগকে দুঃখরূপে অঙ্গীকার করে নেওয়া নয়, ত্যাগকে ভোগরূপেই বরণ করে নেওয়া উপনিষদের অনুশাসন। উপনিষৎ যে ত্যাগের কথা বলছেন সেই ত্যাগই পূর্ণতর গ্রহণ, সেই ত্যাগই গভীরতর আনন্দ। সেই ত্যাগই নিখিলের সঙ্গে যোগ, ভূমার সঙ্গে মিলন। অতএব, ভারতবর্ষের যে আদর্শ তপোবন সে তপোবন শরীরের বিরুদ্ধে আত্মার, সংসারের বিরুদ্ধে সন্ন্যাসের একটা নিরন্তর হাতাহাতি যুদ্ধ করবার মল্লক্ষেত্র নয়। যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ, অর্থাৎ যা-কিছু-সমস্তের সঙ্গে, ত্যাগের দ্বারা বাধাহীন মিলন— এইটেই হচ্ছে তপোবনের সাধনা। এইজন্যেই তরুলতা-পশুপক্ষীর সঙ্গে ভারতবর্ষের আত্মীয়সম্বন্ধের যোগ এমন ঘনিষ্ঠ যে অন্য দেশের লোকের কাছে সেটা অদ্ভুত মনে হয়।

এইজন্যেই আমাদের দেশের কবিত্বে যে প্রকৃতিপ্রেমের পরিচয় পাওয়া যায় অন্য দেশের কাব্যের সঙ্গে তার যেন একটা বিশিষ্টতা আছে। আমাদের এ প্রকৃতির প্রতি প্রভুত্ব করা নয়, প্রকৃতিকে ভোগ করা নয়, এ প্রকৃতির সঙ্গে সম্মিলন।

অথচ এই সম্মিলন অরণ্যবাসীর বর্বরতা নয়। তপোবন আফ্রিকার বন যদি হত তা হলে বলতে পারতুম, প্রকৃতির সঙ্গে মিলে থাকা একটা তামসিকতা মাত্র। কিন্তু মানুষের চিত্ত যেখানে সাধনার দ্বারা জাগ্রত আছে সেখানকার মিলন কেবলমাত্র অভ্যাসের জড়ত্বজনিত হতে পারে না। সংস্কারের বাধা ক্ষয় হয়ে গেলে যে মিলন স্বাভাবিক হয়ে ওঠে তপোবনের মিলন হচ্ছে তাই।

আমাদের কবিরা সকলেই বলেছেন, তপোবন শান্তরসাস্পদ। তপোবনের যে-একটি বিশেষ রস আছে সেটি শান্তরস। শান্তরস হচ্ছে পরিপূর্ণতার রস। যেমন সাতটা বর্ণরশ্মি মিলে গেলে তবে সাদা রঙ হয় তেমনি চিত্তের

প্রবাহ নানা ভাগে বিভক্ত না হয়ে যখন অবিচ্ছিন্নভাবে নিখিলের সঙ্গে আপনার সামঞ্জস্যকে একেবারে কানায় কানায় ভরে তোলে তখনই শান্তরসের উদ্ভব হয়।

তপোবনে সেই শান্তরস। এখানে সূর্য অগ্নি বায়ু জলস্থল আকাশ তরুলতা মৃগপক্ষী সকলের সঙ্গেই চেতনার একটি পরিপূর্ণ যোগ। এখানে চতুর্দিকের কিছুর সঙ্গেই মানুষের বিচ্ছেদ নেই এবং বিরোধ নেই।

ভারতবর্ষের তপোবনে এই-যে একটি শান্তরসের সংগীত বাঁধা হয়েছিল, এই সংগীতের আদর্শেই আমাদের দেশে অনেক মিশ্র রাগরাগিণীর সৃষ্টি হয়েছে। সেইজন্যেই আমাদের কাব্যে মানবব্যাপারের মাঝখানে প্রকৃতিকে এত বড়ো স্থান দেওয়া হয়েছে; এ কেবল সম্পূর্ণতার জন্যে আমাদের যে-একটি স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা আছে সেই আকাঙ্ক্ষাকে পূরণ করবার উদ্দেশে।

অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকে যে দুটি তপোবন আছে সে দুটিই শকুন্তলার সুখ-দুঃখকে একটি বিশালতার মধ্যে সম্পূর্ণ করে দিয়েছে। তার একটি তপোবন পৃথিবীতে, আর-একটি স্বর্গলোকের সীমায়। একটি তপোবনে সহকারের সঙ্গে নবমল্লিকার মিলনোৎসবে নবযৌবনা ঋষিকন্যারা পুলকিত হয়ে উঠছেন, মাতৃহীন মৃগশিশুকে তাঁরা নীবারমুষ্টি দিয়ে পালন করছেন, কুশসূচিতে তার মুখ বিদ্ধ হলে ইঙ্গুদীতৈল মাখিয়ে শুশ্রূষা করছেন—এই তপোবনটি দুষ্যন্ত-শকুন্তলার প্রেমকে সারল্য সৌন্দর্য এবং স্বাভাবিকতা দান করে তাকে বিশ্বসুরের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়েছে।

আর, সন্ধ্যামেঘের মতো কিম্পুরুষপর্বত যে হেমকূট, যেখানে সুরাসুরগুরু মরীচি তাঁর পত্নীর সঙ্গে মিলে তপস্যা করছেন, লতাজালজড়িত যে হেমকূট পক্ষিনীড়খচিত অরণ্যজটামণ্ডল বহন করে যোগাসনে অচল শিবের মতো সূর্যের দিকে তাকিয়ে ধ্যানমগ্ন, যেখানে কেশর ধরে সিংহশিশুকে মাতার স্তন থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে যখন দুরন্ত তপস্বিবালক তার সঙ্গে খেলা করে তখন পশুর সেই দুঃখ ঋষিপত্নীর পক্ষে অসহ্য হয়ে ওঠে—সেই তপোবন শকুন্তলার অপমানিত বিচ্ছেদদুঃখকে অতি বৃহৎ শান্তি ও পবিত্রতা দান করেছে।

এ কথা স্বীকার করতে হবে, প্রথম তপোবনটি মর্ত্যলোকের, আর দ্বিতীয়টি অমৃতলোকের। অর্থাৎ, প্রথমটি হচ্ছে যেমন-হয়ে-থাকে, দ্বিতীয়টি হচ্ছে যেমন-হওয়া-ভালো। এই যেমন-হওয়া-ভালোর দিকে যেমন-হয়ে-থাকে চলেছে। এরই দিকে চেয়ে সে আপনাকে শোধন করছে, পূর্ণ করছে। যেমন-হয়ে-থাকে হচ্ছেন সতী অর্থাৎ সত্য, আর যেমন-হওয়া-ভালো হচ্ছেন শিব অর্থাৎ মঙ্গল। কামনা ক্ষয় করে তপস্যার মধ্য দিয়ে এই সতী ও শিবের মিলন হয়। শকুন্তলার জীবনেও যেমন-হয়ে-থাকে তপস্যার দ্বারা অবশেষে যেমন-হওয়া-ভালোর মধ্যে এসে আপনাকে সফল করে তুলেছে। দুঃখের ভিতর দিয়ে মর্ত্য শেষকালে স্বর্গের প্রান্তে এসে উপনীত হয়েছে।

মানস লোকের এই-যে দ্বিতীয় তপোবন এখানেও প্রকৃতিকে ত্যাগ করে মানুষ স্বতন্ত্র হয়ে ওঠে নি। স্বর্গে যাবার সময় যুধিষ্ঠির তাঁর কুকুরকে সঙ্গে নিয়েছিলেন। প্রাচীন ভারতের কাব্যে মানুষ যখন স্বর্গে পৌঁছয় প্রকৃতিকে সঙ্গে নেয়, বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজে বড়ো হয়ে ওঠে না। মরীচির তপোবনে মানুষ যেমন তপস্বী হেমকূটও তেমনি তপস্বী; সিংহও সেখানে হিংসা ত্যাগ করে, গাছপালাও সেখানে ইচ্ছাপূর্বক প্রার্থীর অভাব পূরণ করে। মানুষ একা নয়, নিখিলকে নিয়ে সে

সম্পূর্ণ; অতএব, কল্যাণ যখন আবির্ভূত হয় তখন সকলের সঙ্গে যোগেই তার আবির্ভাব।

রামায়ণে রামের বনবাস হল। কেবল রাক্ষসের উপদ্রব ছাড়া সে বনবাসে তাঁদের আর কোনো দুঃখই ছিল না। তাঁরা বনের পর বন, নদীর পর নদী, পর্বতের পর পর্বত পার হয়ে গেছেন; তাঁরা পর্ণকুটীরে বাস করেছেন, মাটিতে শুয়ে রাত্রি কাটিয়েছেন, কিন্তু তাঁরা ক্লেশ বোধ করেন নি। এই-সমস্ত নদী-গিরি-অরণ্যের সঙ্গে তাঁদের হৃদয়ের মিলন ছিল; এখানে তাঁরা প্রবাসী নন।

অন্য দেশের কবি রাম লক্ষ্মণ সীতার মাহাত্ম্যকে উজ্জ্বল করে দেখাবার জন্যেই বনবাসের দুঃখকে খুব কঠোর করেই চিত্রিত করতেন। কিন্তু বাল্মীকি একেবারেই তা করেন নি, তিনি বনের আনন্দকেই বারম্বার পুনরুক্তিদ্বারা কীর্তন করে চলেছেন।

রাজৈশ্বর্য যাঁদের অন্তঃকরণকে অভিভূত করে আছে বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মিলন কখনোই তাঁদের পক্ষে স্বাভাবিক হতে পারে না। সমাজগত সংস্কার ও চিরজন্মের কৃত্রিম অভ্যাস পদে পদেই তাঁদের বাধা না দিয়ে থাকতে পারে না। সেই-সকল বাধার ভিতর থেকে প্রকৃতিকে তাঁরা কেবল প্রতিকূলই দেখতে থাকেন।

আমাদের রাজপুত্র ঐশ্বর্যে পালিত কিন্তু ঐশ্বর্যের আসক্তি তাঁর অন্তঃকরণকে অভিভূত করে নি। ধর্মের অনুরোধে বনবাস স্বীকার করাই তার প্রথম প্রমাণ। তাঁর চিত্ত স্বাধীন ছিল, শান্ত ছিল, এইজন্যেই তিনি অরণ্যে প্রবাসদুঃখ ভোগ করেন নি; এইজন্যেই তরুলতা পশুপক্ষী তাঁর হৃদয়কে কেবলই আনন্দ দিয়েছে। এই আনন্দ প্রভুত্বের আনন্দ নয়, ভোগের আনন্দ নয়, সম্মিলনের আনন্দ। এই আনন্দের ভিত্তিতে তপস্যা, আত্মসংযম। এর মধ্যেই উপনিষদের সেই বাণী, তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ।

কৌশল্যার রাজগৃহবধূ সীতা বনে চলেছেন—

একৈকং পাদপং গুল্মং লতাং বা পুষ্পশালিনীম্
অদৃষ্টরূপাং পশ্যন্তী রামং পপ্রচ্ছ সাবলা।
রমণীয়ান্ বহুবিধান্ পাদপান্ কুসুমোৎকরান্
সীতাবচনসংরব্ধ আনয়ামাস লক্ষ্মণঃ।
বিচিত্রবালুকাজলাং হংসসারসনাদিতাম্
রেমে জনকরাজস্য সুতা প্রেক্ষ্য তদা নদীম্।

যে-সকল তরুগুল্ম কিম্বা পুষ্পশালিনী লতা সীতা পূর্বে কখনো দেখেন নি তাদের কথা তিনি রামকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। লক্ষ্মণ তাঁর অনুরোধে তাঁকে পুষ্পমঞ্জরীতে ভরা বহুবিধ গাছ তুলে এনে দিতে লাগলেন। সেখানে বিচিত্রবালুকাজলা হংসসারসমুখরিতা নদী দেখে জানকী মনে আনন্দবোধ করলেন।

প্রথম বনে গিয়ে রাম চিত্রকূট পর্বতে যখন আশ্রয় গ্রহণ করলেন, তিনি—

সুরম্যমাসাদ্য তু চিত্রকূটং নদীঞ্চ তাং মাল্যবতীং সুতীর্থাং
ননন্দ হৃষ্টো মৃগপক্ষিজুষ্টাং জহৌ চ দুঃখং পুরবিপ্রবাসাৎ।

সেই সুরম্য চিত্রকূট, সেই সুতীর্থা মাল্যবতী নদী, সেই মৃগপক্ষিসেবিতা বনভূমিকে প্রাপ্ত হয়ে পুরবিপ্রবাসের দুঃখকে ত্যাগ করে হৃষ্টমনে রাম আনন্দ করতে লাগলেন।

দীর্ঘকালোষিতস্তস্মিন্ গিরৌ গিরিবনপ্রিয়ঃ

গিরিবনপ্রিয় রাম দীর্ঘকাল সেই গিরিতে বাস করে, একদিন সীতাকে চিত্রকূট-শিখর দেখিয়ে বলছেন—

> ন রাজ্যভ্রংশনং ভদ্রে ন সুহৃদ্‌ভির্বিনাভবঃ
> মনো মে বাধতে দৃষ্ট্বা রমণীয়মিমং গিরিম্‌।

রমণীয় এই গিরিকে দেখে রাজ্যভ্রংশনও আমাকে দুঃখ দিচ্ছে না, সুহৃদ্‌গণের কাছ থেকে দূরে বাসও আমার পীড়ার কারণ হচ্ছে না।

সেখান থেকে রাম যখন দণ্ডকারণ্যে গেলেন সেখানে গগনে সূর্যমণ্ডলের মতো দুর্দর্শ প্রদীপ্ত তাপসাশ্রমমণ্ডল দেখতে পেলেন। এই আশ্রম 'শরণ্যং সর্বভূতানাম্‌'। ইহা ব্রাহ্মী লক্ষ্মী-দ্বারা সমাবৃত। কুটিরগুলি সুমার্জিত, চারি দিকে কত মৃগ কত পক্ষী।

রামের বনবাস এমনি করেই কেটেছিল, কোথাও বা রমণীয় বনে কোথাও বা পবিত্র তপোবনে।

রামের প্রতি সীতার ও সীতার প্রতি রামের প্রেম তাঁদের পরস্পর থেকে প্রতিফলিত হয়ে চারি দিকের মৃগপক্ষীকে আচ্ছন্ন করেছিল। তাঁদের প্রেমের যোগে তাঁরা কেবল নিজেদের সঙ্গে নয়, বিশ্বলোকের সঙ্গে যোগযুক্ত হয়েছিলেন; এইজন্য সীতাহরণের পর রাম সমস্ত অরণ্যকেই আপনার বিচ্ছেদ-বেদনার সহচর পেয়েছিলেন। সীতার অভাব কেবল রামের পক্ষে নয়, সমস্ত অরণ্যই যে সীতাকে হারিয়েছে। কারণ, রামসীতার বনবাসকালে অরণ্য একটি নূতন সম্পদ পেয়েছিল, সেটি হচ্ছে মানুষের প্রেম। সেই প্রেমে তার পল্লবঘনশ্যামলতাকে, তার ছায়াগম্ভীর গহনতার রহস্যকে, একটি চেতনার সঞ্চারে রোমাঞ্চিত করে তুলেছিল।

শেক্‌স্‌পীয়রের As You Like It নাটক একটি বনবাসকাহিনী—Tempestও তাই, Midsummer Night's Dreamও অরণ্যের কাব্য। কিন্তু সে-সকল কাব্যে মানুষের প্রভুত্ব ও প্রবৃত্তির লীলাই একেবারে একান্ত, অরণ্যের সঙ্গে সৌহার্দ দেখতে পাই নে। অরণ্যবাসের সঙ্গে মানুষের চিত্তের সামঞ্জস্যসাধন ঘটে নি; হয় তাকে জয় করবার নয় তাকে ত্যাগ করবার চেষ্টা সর্বদাই রয়েছে, হয় বিরোধ নয় বিরাগ নয় ঔদাসীন্য। মানুষের প্রকৃতি বিশ্বপ্রকৃতিকে ঠেলেঠুলে স্বতন্ত্র হয়ে উঠে আপনার গৌরব প্রকাশ করেছে।

মিল্‌টনের Paradise Lost কাব্যে আদি মানবদম্পতির স্বর্গারণ্যে বাস বিষয়টি এমন যে অতি সহজেই সেই কাব্যে মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির মিলনটি সরল প্রেমের সম্বন্ধে বিরাট ও মধুর হয়ে প্রকাশ পাবার কথা। কবি প্রকৃতিসৌন্দর্যের বর্ণনা করেছেন, জীবজন্তুরা সেখানে হিংসা পরিত্যাগ করে একত্রে বাস করছে তাও বলেছেন, কিন্তু মানুষের সঙ্গে তাদের কোনো সাত্ত্বিক সম্বন্ধ নেই। তারা মানুষের ভোগের জন্যেই বিশেষ করে সৃষ্ট, মানুষ তাদের প্রভু। এমন আভাসটি কোথাও পাই নে যে এই আদিদম্পতি প্রেমের আনন্দপ্রাচুর্যে তরুলতা পশুপক্ষীর সেবা করছেন, ভাবনাকে কল্পনাকে নদী গিরি অরণ্যের সঙ্গে নানা লীলায় সম্মিলিত করে তুলছেন। এই স্বর্গারণ্যের যে নিভৃত নিকুঞ্জটিতে মানবের প্রথম পিতামাতা বিশ্রাম করতেন সেখানে—

> Beast, bird, insect, or worm, durst enter none
> Such was their awe of Man. . . .

অর্থাৎ, পশুপক্ষী কীটপতঙ্গ কেউ প্রবেশ করতে সাহস করত না, মানুষের প্রতি এমনি তাদের একটি সভয় সম্ভ্রম ছিল।

এই-যে নিখিলের সঙ্গে মানুষের বিচ্ছেদ, এর মূলে একটি গভীরতর বিচ্ছেদের কথা আছে। এর মধ্যে ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ, জগতে যা-কিছু আছে সমস্তকেই ঈশ্বরের দ্বারা সমাবৃত করে জানবে, এই বাণীটির অভাব আছে। এই পাশ্চাত্ত্য কাব্যে ঈশ্বরের সৃষ্টি ঈশ্বরের যশোকীর্তন করবার জন্যেই, ঈশ্বর স্বয়ং দূরে থেকে তাঁর এই বিশ্বরচনা থেকে বন্দনা গ্রহণ করছেন।

মানুষের সঙ্গেও আংশিক পরিমাণে প্রকৃতির সেই সম্বন্ধ প্রকাশ পেয়েছে, অর্থাৎ প্রকৃতি মানুষের শ্রেষ্ঠতা প্রচারের জন্যে।

ভারতবর্ষও যে মানুষের শ্রেষ্ঠতা অস্বীকার করে তা নয়। কিন্তু প্রভুত্ব করাকেই, ভোগ করাকেই সে শ্রেষ্ঠতার প্রধান লক্ষণ বলে মানে না; মানুষের শ্রেষ্ঠতার সর্বপ্রধান পরিচয়ই হচ্ছে এই যে, মানুষ সকলের সঙ্গে মিলিত হতে পারে। সে মিলন মূঢ়তার মিলন নয়; সে মিলন চিত্তের মিলন, সুতরাং আনন্দের মিলন। এই আনন্দের কথাই আমাদের কাব্যে কীর্তিত।

উত্তরচরিতে রাম ও সীতার যে প্রেম সেই প্রেম আনন্দের প্রাচুর্যবেগে চারি দিকের জল স্থল আকাশের মধ্যে প্রবেশ করেছে। তাই রাম দ্বিতীয়বার গোদাবরীর গিরিতট দেখে বলে উঠেছিলেন 'যত্র দ্রুমা অপি মৃগা অপি বন্ধবো মে'; তাই সীতাবিচ্ছেদকালে তিনি তাঁদের পূর্বনিবাসভূমি দেখে আক্ষেপ করেছিলেন যে, 'মৈথিলী তাঁর করকমলবিকীর্ণ জল নীবার ও তৃণ দিয়ে যে-সকল গাছ পাখি ও হরিণদের পালন করেছিলেন তাদের দেখে আমার হৃদয় পাষাণ গলার মতো গলে যাচ্ছে।'

মেঘদূতে যক্ষের বিরহ নিজের দুঃখের টানে স্বতন্ত্র হয়ে একলা কোণে বসে বিলাপ করছে না। বিরহদুঃখই তার চিত্তকে নববর্ষায়-প্রফুল্ল পৃথিবীর সমস্ত নদনদী-অরণ্য-নগরীর মধ্যে পরিব্যাপ্ত করে দিয়েছে। মানুষের হৃদয়বেদনাকে কবি সংকীর্ণ করে দেখান নি, তাকে বিরাটের মধ্যে বিস্তীর্ণ করেছেন; এইজন্যেই প্রভুশাপগ্রস্ত একজন যক্ষের দুঃখবার্তা চিরকালের মতো বর্ষাঋতুর মর্মস্থান অধিকার করে প্রণয়ীহৃদয়ের খেয়ালকে বিশ্বসংগীতের ধ্রুপদে এমন করে বেঁধে দিয়েছে।

ভারতবর্ষের এইটেই হচ্ছে বিশেষত্ব। তপস্যার ক্ষেত্রেও এই দেখি, যেখানে তার হৃদয়বৃত্তির লীলা সেখানেও এই দেখতে পাই।

মানুষ দুই রকম করে নিজের মহত্ত্ব উপলব্ধি করে— এক স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে, আর-এক মিলনের মধ্যে; এক ভোগের দ্বারা, আর-এক যোগের দ্বারা। ভারতবর্ষ স্বভাবতই শেষের পথ অবলম্বন করেছে। এইজন্যেই দেখতে পাই, যেখানেই প্রকৃতির মধ্যে কোনো বিশেষ সৌন্দর্য বা মহিমার আবির্ভাব সেইখানেই ভারতবর্ষের তীর্থস্থান; মানবচিত্তের সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির মিলন যেখানে স্বভাবতই ঘটতে পারে সেই স্থানটিকেই ভারতবর্ষ পবিত্র তীর্থ বলে জেনেছে। এ-সকল জায়গায় মানুষের প্রয়োজনের কোনো উপকরণই নেই— এখানে চাষও চলে না, বাসও চলে না; এখানে পণ্যসামগ্রীর আয়োজন নেই, এখানে রাজার রাজধানী নয়; অন্তত সেই-সমস্তই এখানে মুখ্য নয়, এখানে নিখিল প্রকৃতির সঙ্গে মানুষ আপনার যোগ উপলব্ধি করে আত্মাকে সর্বগ ও বৃহৎ বলে জানে। এখানে প্রকৃতিকে নিজের প্রয়োজন-সাধনের ক্ষেত্র বলে মানুষ জানে না, তাকে আত্মার উপলব্ধি-সাধনের ক্ষেত্র বলেই মানুষ অনুভব করে, এইজন্যেই তা পুণ্য স্থান।

ভারতবর্ষের হিমালয় পবিত্র, ভারতবর্ষের বিন্ধ্যাচল পবিত্র, ভারতবর্ষের যে

নদীগুলি লোকালয়-সকলকে অক্ষয়ধারায় স্তন্য দান করে আসছে তারা সকলেই পুণ্যসলিলা। হরিদ্বার পবিত্র, হৃষীকেশ পবিত্র, কেদারনাথ বদরিকাশ্রম পবিত্র, কৈলাস পবিত্র, মানসসরোবর পবিত্র, পুষ্কর পবিত্র, গঙ্গার মধ্যে যমুনার মিলন পবিত্র, সমুদ্রের মধ্যে গঙ্গার অবসান পবিত্র। যে বিরাট প্রকৃতির দ্বারা মানুষ পরিবেষ্টিত, যার আলোক এসে তার চক্ষুকে সার্থক করেছে, যার উত্তাপ তার সর্বাঙ্গে প্রাণকে স্পন্দিত করে তুলছে, যার জলে তার অভিষেক, যার অন্নে তার জীবন, যার অভ্রভেদী রহস্যনিকেতনের নানা দ্বার দিয়ে নানা দূত বেরিয়ে এসে শব্দে গন্ধে বর্ণে ভাবে মানুষের চৈতন্যকে নিত্যনিয়ত জাগ্রত করে রেখে দিয়েছে, ভারতবর্ষ সেই প্রকৃতির মধ্যে আপনার ভক্তিবৃত্তিকে সর্বত্র ওতপ্রোত করে প্রসারিত করে দিয়েছে। জগৎকে ভারতবর্ষ পূজার দ্বারা গ্রহণ করেছে, তাকে কেবলমাত্র উপভোগের দ্বারা খর্ব করে নি; তাকে ঔদাসীন্যের দ্বারা নিজের কর্মক্ষেত্রের বাইরে দূরে সরিয়ে রেখে দেয় নি: এই বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে পবিত্র যোগেই ভারতবর্ষ আপনাকে বৃহৎ করে সত্য করে জেনেছে, ভারতবর্ষের তীর্থস্থানগুলি এই কথাই ঘোষণা করছে।

বিদ্যালাভ করা কেবল বিদ্যালয়ের উপরেই নির্ভর করে না, প্রধানত ছাত্রের উপরেই নির্ভর করে। অনেক ছাত্র বিদ্যালয়ে যায়, এমন-কি উপাধিও পায়, অথচ বিদ্যা পায় না। তেমনি তীর্থে অনেকেই যায়, কিন্তু তীর্থের যথার্থ ফল সকলে লাভ করতে পারে না। যারা দেখবার জিনিসকে দেখবে না, পাবার জিনিসকে নেবে না, শেষ পর্যন্তই তাদের বিদ্যা পুঁথিগত ও ধর্ম বাহ্য আচারে আবদ্ধ থাকে। তারা তীর্থে যায় বটে, কিন্তু যাওয়াকেই তারা পুণ্য মনে করে, পাওয়াকে নয়। তারা বিশেষ জল বা বিশেষ মাটির কোনো বস্তুগুণ আছে বলেই কল্পনা করে। এতে মানুষের লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়, যা চিত্তের সামগ্রী তাকে বস্তুর মধ্যে নির্বাসিত করে নষ্ট করে। আমাদের দেশে সাধনামার্জিত চিত্তশক্তি যতই মলিন হয়েছে এই নিরর্থক বাহ্যিকতা ততই বেড়ে উঠেছে, এ কথা স্বীকার করতেই হবে। কিন্তু আমাদের এই দুর্গতির দিনের জড়ত্বকেই আমি কোনোমতেই ভারতবর্ষের চিরন্তন অভিপ্রায় বলে গ্রহণ করতে পারি নে।

কোনো-একটি বিশেষ নদীর জলে স্নান করলে নিজের অথবা ত্রিকোটি-সংখ্যক পূর্বপুরুষের পারলৌকিক সদ্গতি ঘটার সম্ভাবনা আছে, এ বিশ্বাসকে আমি সমূলক বলে মেনে নিতে রাজি নই এবং এ বিশ্বাসকে আমি বড়ো জিনিস বলে শ্রদ্ধা করি নে। কিন্তু অবগাহন-স্নানের সময় নদীর জলকে যে ব্যক্তি যথার্থ ভক্তির দ্বারা সর্বাঙ্গে এবং সমস্ত মনে গ্রহণ করতে পারে, আমি তাকে ভক্তির পাত্র বলেই জ্ঞান করি। কারণ, নদীর জলকে সামান্য তরল পদার্থ বলে সাধারণ মানুষের যে একটা স্থূল সংস্কার, একটা তামসিক অবজ্ঞা আছে, সাত্ত্বিকতার দ্বারা অর্থাৎ চৈতন্যময়তার দ্বারা সেই জড় সংস্কারকে সে লোক কাটিয়ে উঠেছে—এইজন্যে নদীর জলের সঙ্গে কেবলমাত্র তার শারীরিক ব্যবহারের বাহ্যসংস্রব ঘটে নি, তার সঙ্গে তার চিত্তের যোগসাধন হয়েছে। এই নদীর ভিতর দিয়ে পরমচৈতন্য তার চেতনাকে এক ভাবে স্পর্শ করেছেন। সেই স্পর্শের দ্বারা স্নানের জল কেবল তার দেহের মলিনতা নয়, তার চিত্তেরও মোহপ্রলেপ মার্জনা করে দিচ্ছে।

অগ্নি জল মাটি অন্ন প্রভৃতি সামগ্রীর অনন্ত রহস্য পাছে অভ্যাসের দ্বারা আমাদের কাছে একেবারে মলিন হয়ে যায় এইজন্যে প্রত্যহই নানা কর্মে, নানা অনুষ্ঠানে তাদের পবিত্রতা আমাদের স্মরণ করবার বিধি আছে; যে লোক চেতন-

ভাবে তাই স্মরণ করতে পারে, তাদের সঙ্গে যোগে ভূমার সঙ্গে আমাদের যোগ এ কথা যার বোধশক্তি স্বীকার করতে পারে, সে লোক খুব একটি মহৎসিদ্ধি লাভ করেছে। স্নানের জলকে আহারের অন্নকে শ্রদ্ধা করবার যে শিক্ষা সে মূঢ়তার শিক্ষা নয়, তাতে জড়ত্বের প্রশ্রয় হয় না। কারণ, এই-সমস্ত অভ্যস্ত সামগ্রীকে তুচ্ছ করাই হচ্ছে জড়তা; তার মধ্যেও চিত্তের উদ্‌বোধন এ কেবল চৈতন্যের বিশেষ বিকাশেই সম্ভবপর। অবশ্য, যে ব্যক্তি মূঢ়, সত্যকে গ্রহণ করতে যার প্রকৃতিতে স্থূল বাধা আছে, সমস্ত সাধনাকেই সে বিকৃত করে এবং লক্ষ্যকে সে কেবলই ভুল জায়গায় স্থাপন করতে থাকে, এ কথা বলাই বাহুল্য।

বহুকোটি লোক, প্রায় একটি সমগ্র জাতি, মৎস্যমাংস-আহার একেবারে পরিত্যাগ করেছে, পৃথিবীতে কোথাও এর তুলনা পাওয়া যায় না। মানুষের মধ্যে এমন জাতি দেখি নে যে আমিষ আহার না করে।

ভারতবর্ষ এই-যে আমিষ পরিত্যাগ করেছে সে কৃচ্ছ্রব্রতসাধনের জন্যে নয়, নিজের শরীরকে পীড়া দিয়ে কোনো শাস্ত্রোপদিষ্ট পুণ্যলাভের জন্যে নয়; তার একমাত্র উদ্দেশ্য, জীবের প্রতি হিংসা ত্যাগ করা।

এই হিংসা ত্যাগ না করলে জীবের সঙ্গে জীবের যোগসামঞ্জস্য নষ্ট হয়। প্রাণীকে যদি আমরা খেয়ে ফেলবার, পেট ভরাবার জিনিস বলে দেখি তবে কখনোই তাকে সত্যরূপে দেখতে পারি নে। তবে প্রাণ জিনিসটাকে এতই তুচ্ছ করে দেখা অভ্যস্ত হয়ে যায় যে, কেবল আহারের জন্য নয়, শুদ্ধমাত্র প্রাণীহত্যা করাই আমাদের অঙ্গ হয়ে ওঠে এবং নিদারুণ অহৈতুকী হিংসাকে জলে-স্থলে আকাশে গুহায়-গহ্বরে দেশে-বিদেশে মানুষ ব্যাপ্ত করে দিতে থাকে।

এই যোগভ্রষ্টতা এই বোধশক্তির অসাড়তা থেকে ভারতবর্ষ মানুষকে রক্ষা করবার জন্যে চেষ্টা করেছে।

মানুষের জ্ঞান বর্বরতা থেকে অনেক দূরে অগ্রসর হয়েছে, তার একটি প্রধান লক্ষণ কী? না, মানুষ বিজ্ঞানের সাহায্যে জগতের সর্বত্রই নিয়মকে দেখতে পাচ্ছে। যতক্ষণ পর্যন্ত তা না দেখতে পাচ্ছিল ততক্ষণ পর্যন্ত তার জ্ঞানের সম্পূর্ণ সার্থকতা ছিল না। ততক্ষণ বিশ্বচরাচরে সে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাস করছিল; সে দেখছিল জ্ঞানের নিয়ম কেবল তার নিজের মধ্যেই আছে, আর এই বিরাট বিশ্বব্যাপারের মধ্যে নেই। এইজন্যেই তার জ্ঞান আছে বলেই সে যেন জগতে একঘরে হয়ে ছিল। কিন্তু আজ তার জ্ঞান অণু হতে অণুতম ও বৃহৎ হতে বৃহত্তম সকলের সঙ্গেই নিজের যোগস্থাপনা করতে প্রবৃত্ত হয়েছে, এই হচ্ছে বিজ্ঞানের সাধনা।

ভারতবর্ষ যে সাধনাকে গ্রহণ করেছে সে হচ্ছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে চিত্তের যোগ, আত্মার যোগ, অর্থাৎ সম্পূর্ণ যোগ। কেবল জ্ঞানের যোগ নয়, বোধের যোগ।

গীতা বলেছেন—

ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরাবুদ্ধির্যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ।

ইন্দ্রিয়গণকে শ্রেষ্ঠ পদার্থ বলা হয়ে থাকে, কিন্তু ইন্দ্রিয়ের চেয়ে মন শ্রেষ্ঠ, আবার মনের চেয়ে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, আর বুদ্ধির চেয়ে যা শ্রেষ্ঠ তা হচ্ছেন তিনি।

ইন্দ্রিয়সকল কেন শ্রেষ্ঠ? না, ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিশ্বের সঙ্গে আমাদের যোগসাধন হয়। কিন্তু, সে যোগ আংশিক। ইন্দ্রিয়ের চেয়ে মন শ্রেষ্ঠ, কারণ, মনের দ্বারা যে জ্ঞানময় যোগ ঘটে তা ব্যাপকতর। কিন্তু, জ্ঞানের যোগেও সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ দূর হয় না। মনের চেয়ে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, কারণ, বোধের দ্বারা যে চৈতন্যময় যোগ তা

একেবারে পরিপূর্ণ। সেই যোগের দ্বারাই আমরা সমস্ত জগতের মধ্যে তাঁকেই উপলব্ধি করি যিনি সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

এই সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠকে সকলের মধ্যেই বোধের দ্বারা অনুভব করা ভারতবর্ষের সাধনা।

অতএব, যদি আমরা মনে করি ভারতবর্ষের এই সাধনাতেই দীক্ষিত করা ভারতবাসীর শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত তবে এটা মনে স্থির রাখতে হবে যে, কেবল ইন্দ্রিয়ের শিক্ষা নয়, কেবল জ্ঞানের শিক্ষা নয়, বোধের শিক্ষাকে আমাদের বিদ্যালয়ে প্রধান স্থান দিতে হবে। অর্থাৎ, কেবল কারখানায় দক্ষতাশিক্ষা নয়; স্কুল-কলেজে পরীক্ষায় পাস করা নয়; আমাদের যথার্থ শিক্ষা তপোবনে, প্রকৃতির সঙ্গে মিলিত হয়ে তপস্যার দ্বারা পবিত্র হয়ে।

আমাদের স্কুল-কলেজেও তপস্যা আছে, কিন্তু সে মনের তপস্যা, জ্ঞানের তপস্যা; বোধের তপস্যা নয়।

জ্ঞানের তপস্যায় মনকে বাধামুক্ত করতে হয়। যে-সকল পূর্বসংস্কার আমাদের মনের ধারণাকে এক-ঝোঁকা করে রাখে তাদের ক্রমে ক্রমে পরিষ্কার করে দিতে হয়। যা নিকটে আছে বলে বড়ো এবং দূরে আছে বলে ছোটো, যা বাইরে আছে বলেই প্রত্যক্ষ এবং ভিতরে আছে বলেই প্রচ্ছন্ন, যা বিচ্ছিন্ন করে দেখলে নিরর্থক, সংযুক্ত করে দেখলেই সার্থক— তাকে তার যাথার্থ্য রক্ষা করে দেখবার শিক্ষা দিতে হয়।

বোধের তপস্যার বাধা হচ্ছে রিপুর বাধা। প্রবৃত্তি অসংযত হয়ে উঠলে চিত্তের সাম্য থাকে না, সুতরাং বোধ বিকৃত হয়ে যায়। কামনার জিনিসকে আমরা শ্রেয় দেখি; সে জিনিসটা সত্যই শ্রেয় বলে নয়, আমাদের কামনা আছে বলেই। লোভের জিনিসকে আমরা বড়ো দেখি; সে জিনিসটা সত্যই বড়ো বলে নয়, আমাদের লোভ আছে বলেই।

এইজন্য ব্রহ্মচর্যের সংযমের দ্বারা বোধশক্তিকে বাধামুক্ত করবার শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক; ভোগবিলাসের আকর্ষণ থেকে অভ্যাসকে মুক্তি দিতে হয়, যে-সমস্ত সাময়িক উত্তেজনা লোকের চিত্তকে ক্ষুব্ধ এবং বিচারবুদ্ধিকে সামঞ্জস্যভ্রষ্ট করে দেয় তার ধাক্কা থেকে বাঁচিয়ে বুদ্ধিকে সরল করে বাড়তে দিতে হয়।

যেখানে সাধনা চলছে, যেখানে জীবনযাত্রা সরল ও নির্মল, যেখানে সামাজিক সংস্কারের সংকীর্ণতা নেই, যেখানে ব্যক্তিগত জাতিগত বিরোধবুদ্ধিকে দমন করবার চেষ্টা আছে, সেইখানেই ভারতবর্ষ যাকে বিশেষভাবে বিদ্যা বলেছে তাই লাভ করবার স্থান।

আমি জানি অনেকেই বলে উঠবেন, এ একটা ভাবুকতার উচ্ছ্বাস, কাণ্ডজ্ঞান-বিহীনের দুরাশা মাত্র। কিন্তু, সে আমি কোনোমতেই স্বীকার করতে পারি নে। যা সত্য তা যদি অসাধ্য হয় তবে তা সত্যই নয়। অবশ্য, যা সকলের চেয়ে শ্রেয় তাই যে সকলের চেয়ে সহজ তা নয়, সেইজন্যেই তার সাধনা চাই। আসলে, প্রথম শক্ত হচ্ছে সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা করা। টাকা জিনিসটার দরকার আছে, এই বিশ্বাস যখন ঠিক মনে জন্মায় তখন এ আপত্তি আমরা আর করি নে যে, টাকা উপার্জন করা শক্ত। তেমনি ভারতবর্ষ যখন বিদ্যাকেই নিশ্চয়রূপে শ্রদ্ধা করেছিল তখন সেই বিদ্যালাভের সাধনাকে অসাধ্য বলে হেসে উড়িয়ে দেয় নি; তখন তপস্যা আপনি সত্য হয়ে উঠেছিল।

অতএব, প্রথমত দেশের সেই সত্যের প্রতি দেশের লোকের শ্রদ্ধা যদি জন্মে তবে দুর্গম বাধার মধ্য দিয়েও তার পথ আপনিই তৈরি হয়ে উঠবে।

বর্তমানকালে এখনই দেশে এইরকম তপস্যার স্থান, এইরকম বিদ্যালয় যে অনেকগুলি হবে, আমি এমনতরো আশা করি নে। কিন্তু আমরা যখন বিশেষভাবে জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করবার জন্যে সম্প্রতি জাগ্রত হয়ে উঠেছি তখন ভারতবর্ষের বিদ্যালয় যেমনটি হওয়া উচিত অন্তত তার একটিমাত্র আদর্শ দেশের নানা চাঞ্চল্য নানা বিরুদ্ধ ভাবের আন্দোলনের ঊর্ধ্বে জেগে ওঠা দরকার হয়েছে।

ন্যাশনাল বিদ্যাশিক্ষা বলতে য়ুরোপ যা বোঝে আমরা যদি তাই বুঝি তবে তা নিতান্তই বোঝার ভুল হবে। আমাদের দেশের কতকগুলি বিশেষ সংস্কার, আমাদের জাতের কতকগুলি লোকাচার, এইগুলির দ্বারা সীমাবদ্ধ করে আমাদের স্বাজাত্যের অভিমানকে অত্যুগ্র করে তোলবার উপায়কে আমি কোনোমতে ন্যাশনাল শিক্ষা বলে গণ্য করতে পারি নে। জাতীয়তাকে আমরা পরম পদার্থ বলে পূজা করি নে এইটেই হচ্ছে আমাদের জাতীয়তা। ভূমৈব সুখং, নাল্পে সুখমস্তি, ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ—এইটিই হচ্ছে আমাদের জাতীয়তার মন্ত্র।

প্রাচীন ভারতের তপোবনে যে মহাসাধনার বনস্পতি একদিন মাথা তুলে উঠেছিল এবং সর্বত্র তার শাখাপ্রশাখা বিস্তার করে সমাজের নানা দিককে অধিকার করে নিয়েছিল, সেই ছিল আমাদের ন্যাশনাল সাধনা। সেই সাধনা যোগসাধনা। যোগসাধনা কোনো উৎকট শারীরিক মানসিক ব্যায়ামচর্চা নয়। যোগসাধনা মানে সমস্ত জীবনকে এমনভাবে চালনা করা যাতে স্বাতন্ত্র্যের দ্বারা বিক্রমশালী হয়ে ওঠাই আমাদের লক্ষ্য না হয়, মিলনের দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে ওঠাকেই আমরা চরম পরিণাম বলে মানি; ঐশ্বর্যকে সঞ্চিত করে তোলা নয়, আত্মাকে সত্যে উপলব্ধি করাই আমরা সফলতা বলে স্বীকার করি।

বহুপ্রাচীনকালে একদিন অরণ্যসংকুল ভারতবর্ষে আমাদের আর্যপিতামহেরা প্রবেশ করেছিলেন। আধুনিক ইতিহাসে য়ুরোপীয় দল ঠিক তেমনি করেই নূতন-আবিষ্কৃত মহাদ্বীপের মহারণ্যে পথ উদ্‌ঘাটন করেছেন। তাঁদের মধ্যে সাহসিকগণ অগ্রগামী হয়ে অপরিচিত ভূখণ্ডসকলকে অনুবর্তীদের জন্যে অনুকূল করে নিয়েছেন। আমাদের দেশেও অগস্ত্য প্রভৃতি ঋষিরা অগ্রগামী ছিলেন। তাঁরা অপরিচিত দুর্গমতার বাধা অতিক্রম করে গহন অরণ্যকে বাসোপযোগী করে তুলেছিলেন। পূর্বতন অধিবাসীদের সঙ্গে প্রাণপণ লড়াই তখনো যেমন হয়েছিল এখনো তেমনি হয়েছে। কিন্তু এই দুই ইতিহাসের ধারা যদিও ঠিক একই অবস্থার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে তবু একই সমুদ্রে এসে পৌঁছয় নি।

আমেরিকার অরণ্যে যে তপস্যা হয়েছে তার প্রভাবে বনের মধ্যে থেকে বড়ো বড়ো শহর ইন্দ্রজালের মতো জেগে উঠেছে। ভারতবর্ষেও তেমন করে শহরের সৃষ্টি হয় নি তা নয়, কিন্তু ভারতবর্ষ সেই সঙ্গে অরণ্যকেও অঙ্গীকার করে নিয়েছিল। অরণ্য ভারতবর্ষের দ্বারা বিলুপ্ত হয় নি, ভারতবর্ষের দ্বারা সার্থক হয়েছিল; যা বর্বরের আবাস ছিল তাই ঋষির তপোবন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আমেরিকায় অরণ্য যা অবশিষ্ট আছে তা আজ আমেরিকার প্রয়োজনের সামগ্রী, কোথাও বা তা ভোগের বস্তুও বটে, কিন্তু যোগের আশ্রম নয়; ভূমার উপলব্ধি দ্বারা এই অরণ্যগুলি পুণ্য স্থান হয়ে ওঠে নি; মানুষের শ্রেষ্ঠতর অন্তরতর প্রকৃতির সঙ্গে এই আরণ্য প্রকৃতির পবিত্র মিলন স্থাপিত হয় নি। অরণ্যকে নব্য আমেরিকা আপনার বড়ো জিনিস কিছুই দেয় নি, অরণ্যও তাকে আপনার বড়ো পরিচয়

থেকে বঞ্চিত করেছে। নূতন আমেরিকা যেমন তার পুরাতন অধিবাসীদের প্রায় লুপ্তই করেছে, আপনার সঙ্গে যুক্ত করে নি, তেমনি অরণ্যগুলিকে আপনার সভ্যতার বাইরে ফেলে দিয়েছে, তার সঙ্গে মিলিত করে নেয় নি। নগরনগরীই আমেরিকার সভ্যতার প্রকৃষ্ট নিদর্শন; এই নগরস্থাপনার দ্বারা মানুষ আপনার স্বাতন্ত্র্যের প্রতাপকে অভ্রভেদী করে প্রচার করেছে। আর, তপোবনই ছিল ভারতবর্ষের সভ্যতার চরম নিদর্শন; এই বনের মধ্যে মানুষ নিখিল প্রকৃতির সঙ্গে আত্মার মিলনকেই শান্ত সমাহিত ভাবে উপলব্ধি করেছে।

কেউ না মনে করেন, ভারতবর্ষের এই সাধনাকেই আমি একমাত্র সাধনা বলে প্রচার করতে ইচ্ছা করি। আমি বরঞ্চ বিশেষ করে এই কথাই জানাতে চাই যে, মানুষের মধ্যে বৈচিত্র্যের সীমা নেই। সে তালগাছের মতো একটিমাত্র ঋজুরেখায় আকাশের দিকে ওঠে না, সে বটগাছের মতো অসংখ্য ডালে-পালায় আপনাকে চার দিকে বিস্তীর্ণ করে দেয়। তার যে শাখাটি যে দিকে সহজে যেতে পারে তাকে সেই দিকেই সম্পূর্ণভাবে যেতে দিলে তবেই সমগ্র গাছটি পরিপূর্ণতা লাভ করে, সুতরাং সকল শাখারই তাতে মঙ্গল।

মানুষের ইতিহাস জীবধর্মী। সে নিগূঢ় প্রাণশক্তিতে বেড়ে ওঠে। সে লোহা-পিতলের মতো ছাঁচে ঢালবার জিনিস নয়। বাজারে কোনো বিশেষ কালে কোনো বিশেষ সভ্যতার মূল্য অত্যন্ত বেড়ে গেছে বলেই সমস্ত মানবসমাজকে একই কারখানায় ঢালাই করে ফ্যাশনের বশবর্তী মূঢ় খরিদ্দারকে খুশি করে দেবার দুরাশা একেবারেই বৃথা।

ছোটো পা সৌন্দর্য বা আভিজাত্যের লক্ষণ, এই মনে করে কৃত্রিম উপায়ে তাকে সংকুচিত করে চীনের মেয়ে ছোটো পা পায় নি, বিকৃত পা পেয়েছে। ভারতবর্ষও হঠাৎ জবরদস্তি দ্বারা নিজেকে য়ুরোপীয় আদর্শের অনুগত করতে গেলে প্রকৃত য়ুরোপ হবে না, বিকৃত ভারতবর্ষ হবে মাত্র।

এ কথা দৃঢ়রূপে মনে রাখতে হবে, এক জাতির সঙ্গে অন্য জাতির অনুকরণ-অনুসরণের সম্বন্ধ নয়, আদান-প্রদানের সম্বন্ধ। আমার যে জিনিসের অভাব নেই তোমারও যদি ঠিক সেই জিনিসটাই থাকে তবে তোমার সঙ্গে আমার আর অদল-বদল চলতে পারে না, তা হলে তোমাকে সমকক্ষভাবে আমার আর প্রয়োজন হয় না। ভারতবর্ষ যদি খাঁটি ভারতবর্ষ হয়ে না ওঠে তবে পরের বাজারে মজুরিগিরি করা ছাড়া পৃথিবীতে তার আর কোনো প্রয়োজনই থাকবে না। তা হলে তার আপনার প্রতি আপনার সম্মানবোধ চলে যাবে এবং আপনাতে আপনার আনন্দও থাকবে না।

তাই আজ আমাদের অবহিত হয়ে বিচার করতে হবে যে, যে সত্যে ভারতবর্ষ আপনাকে আপনি নিশ্চিন্তভাবে লাভ করতে পারে সে সত্যটি কী। সে সত্য প্রধানত বণিগ্‌বৃত্তি নয়, স্বারাজ্য নয়, স্বাদেশিকতা নয়, সে সত্য বিশ্বজাগতিকতা। সেই সত্য ভারতবর্ষের তপোবনে সাধিত হয়েছে, উপনিষদে উচ্চারিত হয়েছে, গীতায় ব্যাখ্যাত হয়েছে; বুদ্ধদেব সেই সত্যকে পৃথিবীতে সর্বমানবের নিত্য-ব্যবহারে সফল করে তোলবার জন্যে তপস্যা করেছেন এবং কালক্রমে নানাবিধ দুর্গতি ও বিকৃতির মধ্যেও কবীর নানক প্রভৃতি ভারতবর্ষের পরবর্তী মহাপুরুষগণ সেই সত্যকেই প্রকাশ করে গেছেন। ভারতবর্ষের সত্য হচ্ছে জ্ঞানে অদ্বৈততত্ত্ব, ভাবে বিশ্বমৈত্রী এবং কর্মে যোগসাধনা। ভারতবর্ষের অন্তরের মধ্যে যে উদার তপস্যা গভীরভাবে সঞ্চিত হয়ে রয়েছে সেই তপস্যা আজ হিন্দু

মুসলমান বৌদ্ধ এবং ইংরেজকে আপনার মধ্যে এক করে নেবে বলে প্রতীক্ষা করছে —দাসভাবে নয়, জড়ভাবে নয়, সাত্ত্বিকভাবে, সাধকভাবে। যতদিন তা না ঘটবে ততদিন আমাদের দুঃখ পেতে হবে, অপমান সইতে হবে, ততদিন নানা দিক থেকে আমাদের বারম্বার ব্যর্থ হতে হবে। ব্রহ্মচর্য, ব্রহ্মজ্ঞান, সর্বজীবে দয়া, সর্বভূতে আত্মোপলব্ধি—একদিন এই ভারতে কেবল কাব্যকথা, কেবল মতবাদ-রূপে ছিল না; প্রত্যেকের জীবনের মধ্যে একে সত্য করে তোলবার জন্যে অনুশাসন ছিল। সেই অনুশাসনকে আজ যদি আমরা বিস্মৃত না হই, আমাদের সমস্ত শিক্ষা-দীক্ষাকে সেই অনুশাসনের যদি অনুগত করি, তবেই আমাদের আত্মা বিরাটের মধ্যে আপনার স্বাধীনতা লাভ করবে এবং কোনো সাময়িক বাহ্য অবস্থা আমাদের সেই স্বাধীনতাকে বিলুপ্ত করতে পারবে না।

প্রবলতার মধ্যে সম্পূর্ণতার আদর্শ নেই। সমগ্রের সামঞ্জস্য নষ্ট করে প্রবলতা নিজেকে স্বতন্ত্র করে দেখায় বলেই তাকে বড়ো মনে হয়, কিন্তু আসলে সে ক্ষুদ্র। ভারতবর্ষ এই প্রবলতাকে চায় নি, সে পরিপূর্ণতাকেই চেয়েছিল। এই পরিপূর্ণতা নিখিলের সঙ্গে যোগে; এই যোগ অহংকারকে দূর করে বিনম্র হয়ে। এই বিনম্রতা একটি আধ্যাত্মিক শক্তি, এ দুর্বল স্বভাবের অধিগম্য নয়। বায়ুর যে প্রবাহ নিত্য, শান্ততার দ্বারাই ঝড়ের চেয়ে তার শক্তি বেশি। এইজন্যেই ঝড় চিরদিন টিকতে পারে না, এইজনোই ঝড় কেবল সংকীর্ণ স্থানকেই কিছুকালের জন্য ক্ষুব্ধ করে, আর শান্ত বায়ুপ্রবাহ সমস্ত পৃথিবীকে নিত্যকাল বেষ্টন করে থাকে। যথার্থ নম্রতা, যা সাত্ত্বিকতার তেজে উজ্জ্বল, যা ত্যাগ ও সংযমের কঠোর শক্তিতে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত, সেই নম্রতাই সমস্তের সঙ্গে অবাধে যুক্ত হয়ে সত্যভাবে নিত্যভাবে সমস্তকে লাভ করে। সে কাউকে দূর করে না, বিচ্ছিন্ন করে না, আপনাকে ত্যাগ করে এবং সকলকেই আপন করে। এইজন্যেই ভগবান যিশু বলেছেন যে, যে বিনম্র সেই পৃথ্বীবিজয়ী, শ্রেষ্ঠধনের অধিকার একমাত্র তারই।

পৌষ ১৩১৬

ধর্মশিক্ষা

বালক-বালিকাদিগকে গোড়া হইতেই ধর্মশিক্ষা কেমন করিয়া দেওয়া যাইতে পারে, এ তর্ক আজকাল খৃস্টান মহাদেশে খুবই প্রবল হইয়া উঠিয়াছে এবং বোধ করি কতকটা একই কারণে এ চিন্তা আমাদের দেশেও জাগ্রত হইবার উপক্রম করিতেছে। ব্রাহ্মসমাজে এই ধর্মশিক্ষার কিরূপ আয়োজন হইতে পারে সেই বিষয়ে আলোচনা করিবার জন্য বন্ধুগণ আমাকে অনুরোধ করিয়াছেন।

ধর্ম সম্বন্ধে আমাদের অধিকাংশ লোকের একটা সংকট এই দেখিতে পাই যে, আমাদের একটা মোটামুটি সংস্কার আছে যে ধর্ম জিনিসটা প্রার্থনীয়, অথচ তাহার প্রার্থনাটা আমাদের জীবনে সত্য হইয়া উঠে নাই। এইজন্য তাহা আমরা চাহিও বটে, কিন্তু যতদূর সম্ভব সস্তায় পাইতে চাই—সকল প্রয়োজনের শেষে উদ্‌বৃত্তটুকু দিয়া কাজ সারিয়া লইবার চেষ্টা করি।

সস্তা জিনিস পৃথিবীতে অনেক আছে, তাহাদিগকে অল্প চেষ্টাতেই পাওয়া যায়। কিন্তু মূল্যবান জিনিস কী করিয়া বিনা মূল্যে পাওয়া যাইতে পারে এ কথা

যদি কেহ জিজ্ঞাসা করিতে আসে তবে বুঝিতে হইবে, সে ব্যক্তি সিঁধ কাটিবার বা জাল করিবার পরামর্শ চাহে; সে জানে উপার্জনের বড়ো রাস্তাটা প্রশস্ত এবং সেই বড়ো রাস্তা ধরিয়াই জগতের মহাজনেরা চিরকাল মহাজনি করিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু সেই রাস্তায় চলিবার মতো সময় দিতে বা পাথেয় খরচ করিতে সে রাজি নহে।

তাই ধর্মশিক্ষা সম্বন্ধে আমরা সত্যই কিরূপ পরামর্শ চাহিতেছি সেটা একটু ভালো করিয়া ভাবিয়া দেখা দরকার। কারণ, গীতায় বলিয়াছেন, আমাদের ভাবনাটা যেরূপ তাহার সিদ্ধিও সেইরূপ হইয়া থাকে। আমাদের ভাবনাটা কী? যদি এমন কথা আমাদের মনে থাকে যে, যেমন যাহা আছে এমনিই সমস্ত থাকিবে, তাহাকে বেশি-কিছুই নাড়াচাড়া করিব না অথচ তাহাকেই পূর্ণভাবে সফল করিয়া তুলিব, তবে পিতলকে সোনা করিয়া তুলিবার আশা দেওয়া যে-সকল চতুর লোকের ব্যবসায় তাহাদেরই শরণাপন্ন হইতে হয়।

কিন্তু, এমন অবস্থা আছে যখন ধর্মশিক্ষা নিতান্তই সহজ। একেবারে নিশ্বাসগ্রহণের মতোই সহজ। তবে কিনা, যদি কোথাও বাধা ঘটে তবে নিশ্বাসগ্রহণ এমনি কঠিন হইতে পারে যে বড়ো বড়ো ডাক্তারেরা হাল ছাড়িয়া দেয়। যখনই মানুষ বলে 'আমার নিশ্বাস লওয়ার প্রয়োজন ঘটিয়াছে' তখনই বুঝিতে হইবে, ব্যাপারটা শক্ত বটে।

ধর্ম সম্বন্ধেও সেইরূপ। সমাজে যখন ধর্মের বোধ যে কারণেই হউক উজ্জ্বল হয় তখন স্বভাবতই সমাজের লোক ধর্মের জন্য সকলের চেয়ে বড়ো ত্যাগ করিতে থাকে; তখন ধর্মের জন্য মানুষের চেষ্টা চারি দিকেই নানা আকারে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিতে থাকে, তখন দেশের ধর্মমন্দির ধনীর ধনের অধিকাংশকে এবং শিল্পীর শিল্পের শ্রেষ্ঠ প্রয়াসকে অনায়াসে আকর্ষণ করিয়া আনে, তখন ধর্ম যে কত বড়ো জিনিস তাহা সমাজের ছেলেমেয়েদের বুঝাইবার জন্য কোনো-প্রকার তাড়না করিবার দরকার হয় না। সেই সমাজে অনেকেই আপনিই ধর্মসাধনার কঠোরতাকে আনন্দের সহিত বরণ করিয়া লইতে পারে। আমাদের দেশের ইতিহাস অনুসরণ করিলে এরূপ সমাজের আদর্শকে নিতান্ত কাল্পনিক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না।

ধর্ম যেখানে পরিব্যাপ্ত ধর্মশিক্ষা সেইখানেই স্বাভাবিক। কিন্তু যেখানে তাহা জীবনযাত্রার কেবল একটা অংশমাত্র সেখানে মন্ত্রীরা বসিয়া যতই মন্ত্রণা করুক-না কেন, ধর্মশিক্ষা যে কেমন করিয়া যথার্থরূপে দেওয়া যাইতে পারে ভাবিয়া তাহার কিনারা পাওয়া যায় না।

পৃথিবীর প্রায় সকল সমাজেই আধুনিকদের যে দশা ব্রাহ্মসমাজেও তাহাই লক্ষিত হইতেছে। আমাদের বুদ্ধির এবং ইচ্ছার টান বাহিরের দিকেই এত অত্যন্ত যে, অন্তরের দিকে রিক্ততা আসিয়াছে। এই অসামঞ্জস্য যে কী নিদারুণ তাহা উপলব্ধি করিবার অবকাশই পাই না; বাহিরের দিকে ছুটিয়া চলিবার মত্ততা দিনরাত্রি আমাদিগকে দৌড় করাইতেছে। এমন-কি, আমাদের ধর্মসমাজ-সম্বন্ধীয় চেষ্টাগুলিও নিরন্তর-ব্যস্ততা-ময় উত্তেজনাপরম্পরার আকার ধারণ করিতেছে। অন্তরের দিকে একটুও তাকাইবার যদি অবসর পাইতাম তবে দেখিতাম, তাহা গ্রীষ্মকালের বালুকাবিস্তীর্ণ নদীর মতো—সেখানে অগভীর ধর্মবোধ আমাদের জীবনযাত্রার নিতান্ত এক পাশে আসিয়া ঠেকিয়াছে, তাহাকে আমরা অধিক জায়গা ছাড়িয়া দিতে চাই না। আমরা নবযুগের মানুষ, আমাদের জীবনযাত্রায় সরলতা নাই; আমাদের ভোগের আয়োজন প্রচুর এবং তাহার অভিমানও

অত্যন্ত প্রবল; ধর্ম আমাদের অনেকের পক্ষেই সামাজিকতার একটা অঙ্গমাত্র। এমন-কি, সমাজে এমন লোক দেখিয়াছি যাঁহারা যথার্থ ধর্মনিষ্ঠাকে চিত্তের দুর্বলতা বলিয়া অন্তরের সহিত অবজ্ঞা করিয়া থাকেন।

এইরূপে ধর্মকে যদি আমাদের জীবনের এক কোণে সরাইয়া রাখি, অথচ এই অবস্থায় ছেলেমেয়েদের জন্য ধর্মশিক্ষা কী করিয়া অল্পমাত্রায় ভদ্রতারক্ষার পরিমাণে বরাদ্দ করা যাইতে পারে সে কথা চিন্তা করিয়া উদ্‌বিগ্ন হইয়া উঠি, তবে সেই উদ্‌বেগ অত্যন্ত সহজে কী উপায়ে নিবারণ করা যাইতে পারে তাহা বলা অত্যন্ত কঠিন। তবু বর্তমান অবস্থাকে স্বীকার করিয়া লইয়াই ব্যবস্থা চিন্তা করিতে হইবে। অতএব, এ সম্বন্ধে আমাদের আলোচনা করিয়া দেখা কর্তব্য তাহাতে সন্দেহ নাই।

এক সময়ে পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই শিক্ষাব্যাপারটা ধর্মাচার্যগণের হাতে ছিল। তখন রাষ্ট্রব্যবস্থার মধ্যে এমন একটা অনিশ্চয়তা ছিল যে, দেশের সর্বসাধারণে দীর্ঘকাল শান্তি ভোগ করিবার অবসর পাইত না। এইজন্য জাতিগত সমস্ত বিদ্যা ও ধর্মকে অবিচ্ছিন্নভাবে রক্ষা করিবার জন্য স্বভাবতই এমন একটি বিশেষ শ্রেণীর সৃষ্টি হইয়াছিল যাহার প্রতি ধর্মালোচনা ও শাস্ত্রালোচনা ছাড়া আর কোনোপ্রকার সামাজিক দাবি ছিল না, তাহার জীবিকার ভারও সমাজ গ্রহণ করিয়াছিল। সুতরাং এই শ্রেণীর লোকেরাই সমাজের শিক্ষক ছিলেন। তখন শিক্ষার বিষয় ছিল সংকীর্ণ, শিক্ষার্থীও ছিল অল্প, এবং শিক্ষকের দলও ছিল একটি সংকীর্ণ সীমায় বদ্ধ। এই কারণে শিক্ষাসমস্যা তখন বিশেষ জটিল ছিল না, তাই তখনকার ধর্মশিক্ষা ও অন্যান্য শিক্ষা অনায়াসে একত্র মিলিত হইয়াছিল।

এখন অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়াছে। রাষ্ট্রব্যবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের শিক্ষালাভের ইচ্ছা চেষ্টা ও সুযোগ প্রশস্ত হইয়া উঠিতেছে; সেই সঙ্গে বিদ্যার শাখাপ্রশাখাও চারি দিকে অবাধে বাড়িয়া চলিয়াছে। এখন কেবল ধর্মযাজকগণের রেখাঙ্কিত গণ্ডির ভিতর সমস্ত শিক্ষাব্যাপার বদ্ধ হইয়া থাকিতে চাহিতেছে না।

তবু সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেলেও পুরাতন প্রথা সহজে মরিতে চায় না। তাই বিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষা কোনোমতে এ পর্যন্ত ধর্মশিক্ষার সঙ্গে ন্যূনাধিক পরিমাণে জড়িত হইয়া চলিয়া আসিয়াছে। কিন্তু, সমস্ত য়ুরোপখণ্ডেই আজ তাহাদের বিচ্ছেদসাধনের জন্য তুমুল চেষ্টা চলিতেছে। এই বিচ্ছেদকে কোনোমতেই স্বাভাবিক বলিতে পারি না, কিন্তু তবু বিশেষ কারণে ইহা অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছে।

কেননা, সেখানকার ইতিহাসে ইহা দেখা গিয়াছে যে, একদিন যে ধর্মসম্প্রদায় দেশের বিদ্যাকে পালন করিয়া আসিয়াছে পরে তাহারাই সে বিদ্যাকে বাধা দিবার সর্বপ্রধান হেতু হইয়া উঠিল। কারণ, বিদ্যা যতই বাড়িয়া উঠিতে থাকে ততই সে প্রচলিত ধর্মশাস্ত্রের সনাতন সীমাকে চারি দিকেই অতিক্রম করিতে উদ্যত হয়। শুধু যে বিশ্বতত্ত্ব ও ইতিহাস সম্বন্ধেই সে ধর্মশাস্ত্রের বেড়া ভাঙিতে বসে তাহা নহে, মানুষের চারিত্রনীতিগত নূতন উপলব্ধির সঙ্গেও প্রাচীন শাস্ত্রানুশাসনের আগাগোড়া মিল থাকে না।

এমন অবস্থায় হয় ধর্মশাস্ত্রকে নিজের ভ্রান্তি কবুল করিতে হয়, নয় বিদ্রোহী বিদ্যা স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করে; উভয়ের এক অন্নে থাকা আর সম্ভবপর হয় না।

কিন্তু ধর্মশাস্ত্র যদি স্বীকার করে যে কোনো অংশে তাহার জ্ঞান অসম্পূর্ণ ও

ভ্রান্ত, তবে তাহার প্রতিষ্ঠাই চলিয়া যায়। কারণ, সে বিশুদ্ধ দৈববাণী এবং তাহার সমস্ত দলিল ও পরোয়ানার উপর স্বয়ং সর্বজ্ঞ দেবতার শিলমোহরের স্বাক্ষর আছে, এই বলিয়াই সে আপন শাসন পাকা করিয়া আসিয়াছে। বিদ্যা তখন বিশ্বেশ্বরের বিশ্বশাস্ত্রকে সাক্ষী মানে, আর ধর্মসম্প্রদায় তাহাদের সনাতন ধর্মশাস্ত্রকে সাক্ষী খাড়া করিয়া তোলে— উভয়ের সাক্ষ্যে এমনি বিপরীত অমিল ঘটিতে থাকে যে, ধর্মশাস্ত্র ও বিশ্বশাস্ত্র যে একই দেবতার বাণী এ কথা আর টেঁকে না এবং এ অবস্থায় ধর্মশিক্ষা ও বিদ্যাশিক্ষাকে জোর করিয়া মিলাইয়া রাখিতে গেলে হয় মূঢ়তাকে নয় কপটতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়।

প্রথম কিছুদিন মারিয়া কাটিয়া, বাঁধিয়া, পুড়াইয়া, একঘরে করিয়া, বিদ্যার দলকে চিরকেলে দাঁড়ে বসাইয়া চিরদিন আপনার পুরাতন বুলি বলাইবার জন্য ধর্মের দল উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিল। কিন্তু, বিদ্যার পক্ষ যতই প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল ধর্মের পক্ষ ততই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যাখ্যার দ্বারা আপনার বুলিকে বৈজ্ঞানিক বুলির সঙ্গে অভিন্ন প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা শুরু করিয়া দিল। এখন এমন একটা অসামঞ্জস্য আসিয়া দাঁড়াইয়াছে যে, বর্তমান কালে য়ুরোপে রাজা বা সমাজ ধর্মবিশ্বাসকে কঠোর শাসনে আটে-ঘাটে বাঁধিয়া রাখিবার আশা একেবারেই ছাড়িয়া দিয়াছে। এইজন্যই পাশ্চাত্তদেশে প্রায় সর্বত্রই বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে ধর্মশিক্ষার যোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইবার আয়োজন চলিতেছে। এইজন্য সেখানে সন্তানদিগকে বিনা ধর্মশিক্ষায় মানুষ করিয়া তোলা ভালো কি মন্দ, সে তর্ক কিছুতেই মিটিতে চাহিতেছে না।

আমাদের দেশেও আধুনিক কালে সে সমস্যা ক্রমশই দুরূহ হইয়া উঠিতেছে। কেননা, বিদ্যাশিক্ষার দ্বারাতেই আমাদের ধর্মবিশ্বাস শিথিল হইয়া পড়িতেছে। উভয়ের মধ্যে এক জায়গায় বিরোধ ঘটিয়াছে। কারণ, আমাদের দেশেও সৃষ্টিতত্ত্ব ইতিহাস ভূগোল প্রভৃতি অধিকাংশ বিদ্যাই পৌরাণিক ধর্মশাস্ত্রের অন্তর্গত। দেবদেবীদের কাহিনীর সঙ্গে তাহারা এমন করিয়া জড়িত যে, কোনোপ্রকার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার সাহায্যেও তাহাদিগকে পৃথক করা অসম্ভব বলিলেই হয়। যখনই আমাদের দেশের আধুনিক ধর্মাচার্য বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা-দ্বারা পৌরাণিক কাহিনীর সত্যতা প্রমাণ করিতে বসেন তখনই তাঁহারা বিপদকে উপস্থিতমত ঠেকাইতে গিয়া তাহাকে বদ্ধমূল করিয়া দেন। কারণ, বিজ্ঞানকে যদি একবার বিচারক বলিয়া মানেন তবে কেবলমাত্র ওকালতির জোরে চিরদিন মকদ্দমায় জিত হইবার আশা নাই। বরাহ অবতার যে সত্যসত্যই বরাহবিশেষ নহে, তাহা ভূকম্প-শক্তির রূপকমাত্র, এ কথা বলাও যা আর ধর্মবিশ্বাসের শাস্ত্রীয় ভিত্তিকে কোনো-প্রকারে ভদ্রতা রক্ষা করিয়া বিদায় করাও তা। কেবলমাত্র শাস্ত্রলিখিত মত ও কাহিনীগুলি নহে, শাস্ত্রীয় সামাজিক অনুশাসনগুলিকেও আধুনিক কালের বুদ্ধি অভিজ্ঞতা ও অবস্থান্তরের সহিত সংগতরূপে মিলাইয়া তোলাও একেবারে অসাধ্য। অতএব, বিজ্ঞান ইতিহাস ও সামাজিক আচারকে আমরা কোনোমতেই শাস্ত্রসীমার মধ্যে খাপ খাওয়াইয়া রাখিতে পারিব না। এমন অবস্থায় আমাদের দেশেও প্রচলিত ধর্মশিক্ষার সহিত অন্য শিক্ষার প্রাণান্তিক বিরোধ ঘটিতে বাধ্য এবং আমাদের জ্ঞাত ও অজ্ঞাত-সারে সেরূপ বিরোধ ঘটিতেছেই। এইজন্য এ দেশে হিন্দুবিদ্যালয়-সম্বন্ধীয় নূতন যে-সকল উদ্যোগ চলিতেছে তাহার প্রধান চিন্তা এই যে, বিদ্যাশিক্ষার মাঝখানে ধর্মশিক্ষাকে স্থান দেওয়া যায় কী করিয়া।

আধুনিক কালের জ্ঞান বিজ্ঞান ও মনুষ্যত্বের সর্বাঙ্গীণ আদর্শের সহিত প্রাচীন

ধর্মশাস্ত্রের যে বিরোধ ঘটিয়াছে তাহার উল্লেখ করিলাম। কিন্তু, সেই বিরোধের কথাটা যদি ছাড়িয়া দিই, যদি শিথিলভাবে চিন্তা ও অন্ধভাবে বিশ্বাস করাটাকে দোষ বলিয়া গণ্য না করি, যদি সত্যকে যথাযথরূপে গ্রহণ করিবার ইচ্ছা ও অভ্যাসকে আমাদের প্রকৃতিতে সুদৃঢ় করিয়া তোলা মনুষ্যত্বলাভের পক্ষে নিতান্তই আবশ্যক বলিয়া মনে না হয়, তবে এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে, এইরূপ বাঁধা ধর্মশাস্ত্রের একটা সুবিধা আছে। ধর্ম সম্বন্ধে বালকদিগকে কী শিখাইব, কেমন করিয়া শিখাইব, তাহা লইয়া বেশি-কিছু ভাবিতে হয় না; তাহাদের বুদ্ধি-বিচারকে উদ্‌বোধিত করিবার প্রয়োজন হয় না, এমন-কি না-করারই প্রয়োজন হয়; কতকগুলি নির্দিষ্ট মত কাহিনী ও আচারকে ধ্রুব সত্য বলিয়া তাহাদের মনে সংস্কার বদ্ধ করিয়া দিলেই যথোচিত ধর্মশিক্ষা দেওয়া হইল বলিয়া নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।

বস্তুত, ব্রাহ্মসমাজে ধর্মশিক্ষা সম্বন্ধে যে সমস্যা দাঁড়াইয়াছে তাহা এইখানেই। আমরা মানুষের মনকে বাঁধিব কী দিয়া? তাহাকে ব্যাপৃত করিব কিরূপে? তাহাকে আকর্ষণ করিব কী উপায়ে? যেমন কেবলমাত্র বৃষ্টিবর্ষণ হইলেই তাহাকে সম্পূর্ণ কাজে লাগানো যায় না, তাহাকে ধরিয়া রাখিবার জন্য নানাপ্রকার পাকা ব্যবস্থা থাকা চাই, তেমনি কেবলমাত্র ধর্মবক্তৃতায় যদি বা ক্ষণকালের জন্য মনকে একটু ভিজায় কিন্তু তাহা গড়াইয়া চলিয়া যায়—মধ্যাহ্নের পিপাসায়, গৃহদাহের দুর্বিপাকে তাহাকে খুঁজিয়া পাই না। তা ছাড়া, মন জিনিসটা কতকটা জলের মতো, তাহাকে কেবল এক দিকে চাপিয়া ধরিলেই ধরা যায় না, তাহাকে সকল দিক দিয়া ঘিরিয়া ধরিতে হয়।

কিন্তু, ব্রাহ্মসমাজে মানুষের মনকে নানা দিক দিয়া আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধিয়া ধরিবার বাঁধা পদ্ধতি নাই। তাই আমরা কেবলই আক্ষেপ করিয়া থাকি, ছেলেদের মন যে আলগা হইয়া খসিয়া খসিয়া যাইতেছে। তথাপি এইপ্রকার অনির্দিষ্টতার যে অসুবিধা আছে তাহা আমাদিগকে স্বীকার করিয়া লইতেই হইবে, কিন্তু সাম্প্রদায়িক অতিনির্দিষ্টতার যে সাংঘাতিক অকল্যাণ তাহা স্বীকার করা ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে প্রকৃতিবিরুদ্ধ।

ব্রাহ্মধর্মের ভিতরকার এই অনির্দিষ্টতাকে যথাসম্ভব দূর করিয়া তাহাকে এক জায়গায় চিরন্তনরূপে স্থির রাখিবার জন্য আজকাল ব্রাহ্মসমাজের কেহ কেহ ব্রাহ্মধর্মকে একটি ধর্মতত্ত্ব, একটি বিশেষ ফিলজফি, বলিতে ইচ্ছা করেন। ইহার মধ্যে কতটুকু দ্বৈত, কতটুকু অদ্বৈত, কতটুকু দ্বৈতাদ্বৈত—ইহার মধ্যে শংকরের প্রভাব কতটা, কতটা কাণ্টের, কতটা হেগেল বা গ্রীনের, তাহা একেবারে পাকা করিয়া একটা-কোনো বিশেষ তত্ত্বকেই চিরকালের মতো ব্রাহ্মধর্ম নাম দিয়া সমাপ্ত করিয়া দিবার জন্য তাঁহারা উদ্যত হইয়াছেন। বস্তুত, ব্রাহ্মসমাজের প্রতি যাঁহাদের শ্রদ্ধা নাই তাঁহারা অনেকেই এই কথা বলিয়াই ব্রাহ্মধর্মকে নিন্দা করিয়াছেন যে উহা ধর্মই নহে, উহা একটা ফিলজফি মাত্র। ইঁহারা সেই কলংককেই গৌরব বলিয়া বরণ করিয়া লইতে চাহেন।

অথচ ইহা আমরা স্পষ্টই প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে, ব্রাহ্মধর্ম অন্যান্য বিশ্বজনীন ধর্মেরই ন্যায় ভক্তের জীবনকে আশ্রয় করিয়াই ইতিহাসে অবতীর্ণ হইয়াছে। ইহা কোনো ধর্মবিদ্যালয়ের টেক্‌স্ট বুক-কমিটির সংকলিত সামগ্রী নহে এবং ইহ গ্রন্থের পরিচ্ছেদে পরিচ্ছেদে পরিচ্ছন্ন হইয়া কোনো দপ্তরির হাতে মজবুত করিয় বাঁধাই হইয়া যায় নাই।

যাহা জীবনের সামগ্রী তাহা বাড়িবে, তাহা চলিবে। একটা পাথরকে দেখাইয়া বলিতে পার ইহাকে যেমনটি দেখিতেছ ইহা তেমনিই, কিন্তু একটা বীজ সম্বন্ধে সে কথা খাটে না। তাহার মধ্যে এই একটি আশ্চর্য রহস্য আছে যে, সে যেমনটি সে তাহার চেয়ে অনেক বড়ো। এই রহস্যকে যদি অনির্দিষ্টতা বলিয়া নিন্দা কর তবে ইহাকে জাঁতায় ফেলিয়া পেষো—ইহার জীবধর্মকে নষ্ট করিয়া ফেলো। কিন্তু, যিনি যাহাই বলুন, ব্রাহ্মধর্ম কোনো-একটি বিশেষ নির্দিষ্ট সুপ্রণালীবদ্ধ তত্ত্ববিদ্যা নহে। কারণ, আমরা ইহাকে ভক্তের জীবন-উৎস হইতে উৎসারিত হইতে দেখিয়াছি। তাহা ডোবা নহে, বাঁধানো সরোবর নহে, তাহা কালের ক্ষেত্রে ধাবিত নদী; তাহার রূপ প্রবহমান রূপ, তাহা বাধাহীন বেগে নব নব যুগকে আপন অমৃতধারা পান করাইয়া চলিবে। নব নব হেগেল ও গ্রীন তাহার মধ্যে নব নব পাথরের ঘাট বাঁধাইয়া দিতে থাকিবে, কিন্তু সে-সকল ঘাটকেও তাহা বহু দূরে ছাড়াইয়া চলিবে; কোনো স্পর্ধিত তত্ত্বজ্ঞানীকে সে এমন কথা কদাচ বলিতে দিবে না যে ইহাই তাহার শেষ তত্ত্ব। কোনো দর্শনতত্ত্ব এই ধর্মকে একেবারে বাঁধিয়া ফেলিবার জন্য যদি ইহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ফাঁস লইয়া ছোটে তবে এ কথা তাহাকে মনে রাখিতে হইবে যে, যদি ইহাকে বন্দী করিতে হয় তবে তাহার আগে ইহাকে বধ করিতে হইবে।

তাই যদি হইল তবে ব্রাহ্মধর্মের ভাবাত্মক লক্ষণটি কী? তাহা একটা মোটা কথা— তাহা অনন্তের ক্ষুধাবোধ, অনন্তের রসবোধ। এই অনন্তের জ্ঞানকে বিশ্লেষণ করিয়া যিনি যেরূপ তত্ত্ব ব্যাখ্যা করুন তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই, কারণ, এরূপ ব্যাখ্যা চিরকালই চলিবে, এ রহস্যের অন্ত পাওয়া যাইবে না; কিন্তু আসল কথা এই যে, রামমোহন রায় হইতে কেশবচন্দ্র সেন পর্যন্ত সকলেরই জীবনে আমরা এই অনন্তের ক্ষুধাবোধের আনন্দ প্রত্যক্ষ করিয়াছি। দেশের প্রচলিত আচার ও ধর্মবিশ্বাস যে তাঁহাদের জ্ঞানকে আঘাত দিয়াছে তাহা নহে, তাঁহাদের প্রাণকে আঘাত দিয়াছে।

কিন্তু, ব্রাহ্মধর্মকে কয়েকজন মানুষের জীবনের মধ্য দিয়া দেখিতে গেলেও তাহাকে ছোটো করিয়া দেখা হইবে। বস্তুত ইহা মানব-ইতিহাসের সামগ্রী। মানুষ আপনার গভীরতম অভাব-মোচনের জন্য নিয়ত যে গূঢ় চেষ্টা করিতেছে ব্রাহ্মসমাজের সৃষ্টির মধ্যে আমরা তাহারই পরিচয় পাই। মানুষ যতবারই কৃত্রিম আচারপদ্ধতির দ্বারা অনন্তকে ছোটো করিয়া আপনার সুবিধার মতো করিয়া লইতে চেষ্টা করিয়াছে ততবারই সে সোনা ফেলিয়া আঁচলে গ্রন্থি বাঁধিয়াছে। আমি একবার অত্যন্ত অদ্ভুত এই একটা স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম যে, মা তাহার কোলের ছেলেটিকে সর্বত্র অতি সহজে বহন করিবার সুবিধা করিতে গিয়া তাহার মুণ্ডটা কাটিয়া লইয়াছিল। ইহা স্বপ্ন বটে, কিন্তু মানুষ এমন কাজ করিয়া থাকে। আইডিয়াকে সহজসাধ্য করিবার জন্য সে তাহার মাথা কাটিয়া তাহাকে দিব্য সংক্ষিপ্ত করিয়া লয়; ইহাতে মুণ্ডটাকে করতলন্যস্ত আমলকবৎ আয়ত্ত করা যায় বটে, কিন্তু প্রাণটাকেই বাদ দিতে হয়। এমনি করিয়া মানুষ যেটাকে সব চেয়ে বেশি চায় সেইটে হইতেই আপনাকে সব চেয়ে বেশি ফাঁকি দিতে থাকে। এইরূপ অবস্থায় মানুষের মধ্যে দুই দল হইয়া পড়ে। এক দল আপনার সাধনার সামগ্রীকে খেলার সামগ্রী করিয়া সেই খেলাটাকেই সিদ্ধি মনে করে, আর-এক দল ইহাদের খেলার বিঘ্ন না করিয়া অতিদূরে নিভৃতে গিয়া আপনার সাধনার বিশুদ্ধতা রক্ষা করিবার চেষ্টা করে।

কিন্তু এমন করিয়া কখনোই চিরদিন চলে না। যখন চারি দিক অচেতন, সমস্ত দ্বার রুদ্ধ, সমস্ত দীপ নির্বাপিত, অভাব যখন এতই অধিক যে অভাববোধ চলিয়া গিয়াছে, বাধা যখন এত নিবিড় যে মানুষ তাহাকে আপনার আশ্রয় বলিয়া অবলম্বন করিয়া ধরে, সেই সময়েই অভাবনীয়রূপে প্রতিকারের দূত কোথা হইতে দ্বারে আসিয়া দাঁড়ায় তাহা বুঝিতেই পারি না। তাহাকে কেহ প্রত্যাশা করে না, কেহ চিনে না, সকলেই তাহাকে শত্রু বলিয়া উদ্‌বিগ্ন হইয়া উঠে। এ দেশে একদিন যখন রাশীকৃত প্রাণহীন সংস্কারের বাধা অনন্তের বোধকে আচ্ছন্ন করিয়া ধরিয়াছিল, মানুষের জীবনযাত্রাকে তুচ্ছ ও সমাজকে শতখণ্ড করিয়া তুলিয়াছিল, মনুষ্যত্বকে যখন আমরা সংকীর্ণ গ্রাম্যতার মধ্যেই আবদ্ধ করিয়া দেখিতেছিলাম, বিশ্বব্যাপারের কোথাও যখন আমরা একের অমোঘ নিয়ম দেখি নাই, কেবল দশের উৎপাতই কল্পনা করিতেছিলাম, উন্মত্তের দুঃস্বপ্নের মতো যখন সমস্ত জগৎকে বিচিত্র বিভীষিকায় পরিপূর্ণ দেখিতেছিলাম এবং কেবলই মন্ত্রতন্ত্র তাগাতাবিজ শান্তিস্বস্ত্যয়ন মানত ও বলিদানের দ্বারা ভীষণ শত্রুকল্পিত সংসারে কোনোমতে আত্মরক্ষা করিয়া চলিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলাম—এইরূপে যখন চিন্তায় ভীরুতা, কর্মে দৌর্বল্য, ব্যবহারে সংকোচ এবং আচারে মূঢ়তা সমস্ত দেশের পৌরুষকে শতদীর্ণ করিয়া অপমানের রসাতলে আমাদিগকে আকর্ষণ করিতেছিল, সেই সময়ে বাহিরের বিশ্ব হইতে আমাদের জীর্ণ প্রাচীরের উপরে একটা প্রচণ্ড আঘাত লাগিল—সেই আঘাতে যাঁহারা জাগিয়া উঠিলেন তাঁহারা এক মুহূর্তেই নিদারুণ বেদনার সহিত বুঝিতে পারিলেন কিসের অভাব এখানে, কিসের এই অন্ধকার, কিসের এই জড়তা এই অপমান, কিসের এই জীবিত-মৃত্যুর আনন্দহীন সর্বব্যাপী অবসাদ। এখানে আকাশ খণ্ডিত, আলোক নিষিদ্ধ, অনন্তের প্রাণসমীরণ প্রতিহত; এখানে নিখিলের সহিত অবাধ যোগ সহস্র কৃত্রিমতার প্রাচীরে প্রতিরুদ্ধ। তাঁহাদের সমস্ত প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল, 'ভূমাকে চাই, ভূমাকে চাই।'

এই কান্নাই সমস্ত মানুষের কান্না। পৃথিবীর সর্বত্রই মানুষ কোথাও বা আপনার বহু প্রাচীন অভ্যাসের আবরণের দ্বারা আপনার মঙ্গলকে আড়াল করিয়া রাখিয়াছে; কোথাও বা সে আপনার নানা রচনার দ্বারা, সঞ্চয়ের দ্বারা কেবলই আপনাকে বড়ো করিতে গিয়া আপনার চেয়ে বড়োকে হারাইয়া ফেলিতেছে; কোথাও বা সে নিষ্ক্রিয়ভাবে জড়তার দ্বারা, কোথাও বা সে সক্রিয়ভাবে প্রয়াসের দ্বারাই, মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ সার্থকতাকে বিস্মৃত হইয়া বসিয়াছে।

এই বিস্মৃতির গভীর তলদেশ হইতে আপনাকে উদ্ধার করিবার চেষ্টা, ইহাই আমরা ব্রাহ্মধর্মের ইতিহাসের আরম্ভেই দেখিতে পাই। মানুষের সমস্ত বোধকেই অনন্তের বোধের মধ্যে উদ্‌বোধিত করিয়া তুলিবার প্রয়াসই ব্রাহ্মধর্মের সাধনা-রূপে প্রকাশ পাইয়াছে। সেইজন্যই আমরা দেখিতে পাইলাম, রামমোহন রায়ের জীবনের কর্মক্ষেত্র সমস্ত মনুষ্যত্ব। রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, ধর্মনীতি, সকল দিকেই তাঁহার চিত্ত পূর্ণবেগে ধাবিত হইয়াছে। কেবলমাত্র কর্মশক্তির স্বাভাবিক প্রাচুর্যই তাহার মূল প্রেরণা নহে—ব্রহ্মের বোধ তাঁহার সমস্ত শক্তিকে অধিকার করিয়াছিল। সেই বোধের মধ্য দিয়া তিনি মানুষকে দেখিয়াছিলেন বলিয়াই মানুষকে সকল দিকেই এমন বড়ো করিয়া, এমন সত্য করিয়া দেখিয়াছিলেন; সেইজন্যই তাঁহার দৃষ্টি সমস্ত সংস্কারের বেষ্টন ছাড়াইয়া গিয়াছিল; সেইজন্য কেবল যে তিনি স্বদেশের চিত্তশক্তির বন্ধনমোচন কামনা করিয়াছিলেন তাহা নহে, মানুষ যেখানেই কোনো

মহৎ অধিকার লাভ করিয়া আপনার মুক্তির ক্ষেত্রকে বড়ো করিতে পারিয়াছে সেইখানেই তিনি তৃপ্তিবোধ করিয়াছেন।

ব্রাহ্মসমাজে, আরম্ভে এবং আজ পর্যন্ত, এই সত্যকেই আমরা সকলের চেয়ে বড়ো করিয়া দেখিতেছি। কোনো বিশেষ শাস্ত্র, বিশেষ মন্দির, বিশেষ দর্শনতন্ত্র বা পূজাপদ্ধতি যদি এই মুক্ত সত্যের স্থান নিজে অধিকার করিয়া লইতে চেষ্টা করে তবে তাহা ব্রাহ্মধর্মের স্বভাববিরুদ্ধ হইবে। আমরা মানুষের জীবনের মধ্যেই এই সত্যকে নিশ্চিতরূপে প্রত্যক্ষ করিব যে, অনন্তবোধের আলোকে সমস্তকে দেখা এবং অনন্তবোধের প্রেরণায় সমস্ত কাজ করা ইহাই মনুষ্যত্বের সর্বোচ্চ সিদ্ধি, ইহাই মানুষের সত্যধর্ম।

ধর্মশিক্ষা কেমন করিয়া দেওয়া যাইবে তাহা আলোচনার পূর্বে, আমরা কাহাকে ধর্ম বলি তাহা পরিষ্কার করিয়া বুঝিয়া দেখা আবশ্যক বলিয়া এত কথা বলিতে হইল। এ কথা স্থির জানিতে হইবে যে, বাঁধা বচন মুখস্থ করা বা বাঁধা আচার অভ্যাস করা আমাদের ধর্মশিক্ষা নহে। অতএব, ইহার যে অসুবিধা আছে তাহা আমাদিগকে স্বীকার করিয়া লইতেই হইবে। অন্যান্য সাম্প্রদায়িক ধর্মে অন্য প্রণালীতে কতকগুলি সহজ সুযোগ আছে, এ কথা চিন্তা করিয়া আমাদিগকে বিচলিত হইলে চলিবে না। কারণ, সত্যের জায়গায় সহজকে বসাইয়া লাভ কী? সোনার চেয়ে যে ধুলা সহজ।

যাহা হউক, এ কথা নিশ্চিত সত্য যে, স্বাস্থ্য যেমন সমস্ত শরীরকে জুড়িয়া আছে ধর্ম তেমনি মানুষের সমগ্রপ্রকৃতিগত।

স্বাস্থ্যকে টাকা-পয়সার মতো হাতে তুলিয়া দেওয়া যায় না কিন্তু আনুকূল্যের দ্বারা ভিতরের দিক হইতে তাহাকে জাগাইয়া তোলা যায়। তেমনি মানুষের প্রকৃতিনিহিত এই অনন্তের বোধকে, তাহার এই ধর্মপ্রবৃত্তিকে ইতিহাস ভূগোল অঙ্কের মতো স্কুল-কমিটির শাসনাধীনে সমর্পণ করা যায় না, ইন্‌স্পেক্টরের তদন্তজালে তাহার উন্নতির পরিমাণ ধরা পড়ে না এবং পরীক্ষকের নীল পেন্সিলের মার্কা দ্বারা তাহার ফলাফল চিহ্নিত হওয়া অসম্ভব; কেবল সর্বপ্রকার অনুকূল অবস্থার মধ্যে রাখিয়া তাহার সর্বাঙ্গীণ পরিণতি সাধন করা যাইতে পারে, তাহাকে বাঁধা নিয়মে বিদ্যালয়ে দেওয়া-নেওয়ার ব্যবসায়ের জিনিস করা যাইতে পারে না।

সাধকেরা আপনারাই বলিয়াছেন, তাঁহাকে পাইবার পথ 'ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন'। অর্থাৎ, এটা কোনোমতেই পঠনপাঠনের ব্যাপার নহে। কিন্তু, কেমন করিয়া সাধকেরা এই পূর্ণতার উপলব্ধিতে গিয়া উপনীত হইয়াছেন তাহা আজ পর্যন্ত কোনো মহাপুরুষ আমাদিগকে বলিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহারা কেবল বলেন: বেদাহমেতং। আমি জানিয়াছি, আমি পাইয়াছি। তাঁহারা বলেন: য এতদ্‌বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি। যাঁহারা ইঁহাকে জানেন তাঁহারাই অমৃত হন। কেমন করিয়া যে তাঁহারা ইঁহাকে জানেন সে অভিজ্ঞতা এতই অন্তরতম যে তাহা তাঁহাদের নিজেদেরই গোচর নহে। সে রহস্য যদি তাঁহারা প্রকাশ করিয়া দিতে পারিতেন তবে ধর্মশিক্ষা লইয়া আজ কোনোরূপ তর্কই থাকিত না।

অথচ, ঈশ্বরের বোধ কেমন করিয়া পূর্ণভাবে উদ্‌বোধিত করা যাইতে পারে, এরূপ প্রশ্ন করিলে কোনো কোনো মহাত্মা অত্যন্ত বাঁধা প্রণালীর উপদেশ দিয়াছেন, তাহাও দেখা গিয়াছে। এক দিকে যেমন এক দল মহাপুরুষ বলিয়াছেন, চিত্তকে শুদ্ধ করো, পাপকে দমন করো, ঈশ্বরের বোধ অন্তরের সামগ্রী, অতএব অন্তরকেই আপন আন্তরিক চেষ্টায় উদ্‌বোধিত করিয়া তোলো, অপর দিকে তেমনি আর-এক

দল বিশেষ বিশেষ বাহ্য প্রক্রিয়ার কথাও বলিয়াছেন। কেহ বা বলেন, যজ্ঞ করো; কেহ বা বলেন, বিশেষ শব্দ উচ্চারণ করিয়া বিশেষ মূর্তিকে ধ্যান করো; এমন-কি কেহ বা বলেন, মাদক পদার্থের দ্বারা অথবা অন্য নানা উপায়ে শারীরিক উত্তেজনার সাহায্যে মনকে তাড়না করিয়া দ্রুত বেগে সিদ্ধিলাভের দিকে অগ্রসর হইতে থাকো।

এমনি করিয়া যখনই চেষ্টাকে বাহিরের দিকে বিক্ষিপ্ত করিবার উপদেশ দেওয়া হয় তখনি প্রমাদের পথ খুলিয়া দেওয়া হয়। তখনই মিথ্যাকে ঠেকাইয়া রাখা যায় না, কল্পনাকে সংযত করা অসাধ্য হয়; তখনই মানুষের বিশ্বাসমুগ্ধতা লুব্ধ হইয়া উঠিয়া কোথাও আপনার সীমা দেখিতে পায় না; মানুষ আপনাকে ভোলায়, অন্যকে ভোলায়, সম্ভব-অসম্ভবের ভেদ বিলুপ্ত হইয়া ধর্মসাধনার ব্যাপার বিচিত্র মূঢ়তায় একেবারে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠে।

অথচ, যাঁহারা এইরূপ উপদেশ দেন তাঁহারা অনেকেই সাধু ও সাধক। তাঁহারা যে ইচ্ছা করিয়া লোকের মনকে মোহের পথে লইয়া যান তাহা নহে, কিন্তু এ সম্বন্ধে তাঁহাদের ভুল করিবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। কারণ, পাওয়া এক জিনিস, আর সেই পাওয়া ব্যাপারটাকে বিশ্লেষণ করিয়া জানা আর-এক জিনিস।

মনে করো, আহার পরিপাক করিবার শক্তি আমার অসামান্য; আমাকে যদি কোনো বেচারা অজীর্ণপীড়িত রোগী আসিয়া প্রশ্ন করে 'তুমি কেমন করিয়া এতটা পরিমাণ খাদ্য ও অখাদ্য বিনা দুঃখে হজম করিতে পার' তবে আমি হয়তো সরল বিশ্বাসে তাহাকে বলিয়া দিতে পারি যে, 'আহারের পর আমি দুই খণ্ড কাঁচা সুপারি মুখে দিয়া বর্মাদেশজাত একটা করিয়া আস্ত চুরুট নিঃশেষে ছাই করিয়া থাকি, ইহাতেই আমার সমস্ত হজম হইয়া যায়।' আসলে আমি যে এতৎসত্ত্বেও হজম করিয়া থাকি তাহা আমি নিজেই জানি না; এমন-কি যে অভ্যাসকে আমি আমার পরিপাকের সহায় বলিয়া কল্পনা করিয়া লইয়াছি কোনোদিন যদি তাহার অভাব ঘটে তবে আমার নিজেরই মনে হইতে থাকে যে, 'আজ বুঝি পাকযন্ত্রটা তেমন বেশ উৎসাহের সহিত কাজ করিতেছে না।'

শুনা যায়, কবিতা লিখিবার সময় বিখ্যাত জর্মান কবি শিলার পচা আপেল তাঁহার ডেস্কের মধ্যে রাখিতেন। তাঁহার পক্ষে ইহার উগ্র গন্ধ হয়তো একটা উত্তেজনার কাজ করিত। তাঁহার শিষ্য যদি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিত 'আপনি কী করিয়া এমন ভালো কবিতা লেখেন' তবে তিনি আর-কোনো প্রকাশযোগ্য কারণ ঠাহর করিতে না পারিয়া ঐ পচা আপেলটাকেই হয়তো উপায় বলিয়া নির্দেশ করিতেও পারিতেন। এ স্থলে, তিনি যত বড়ো কবি হউন-না কেন, তাঁহার বাক্যকেই যে কবিত্বচর্চার উপায় সম্বন্ধে বেদবাক্য বলিয়া গণ্য করিতে হইবে, এমন কথা নাই। এরূপ স্থলে তাঁহাকে যদি মুখের সামনে বলি 'তুমি কবিতাই লিখিতে পার, তাই বলিয়া তাহার উপায় সম্বন্ধে কী জান' তবে তাঁহাকে কবি হিসাবে অশ্রদ্ধা করা হয় না। বস্তুত, স্বাভাবিক প্রতিভা-বশতই যাহারা কোনো-একটা জিনিস পায়, পাওয়ার প্রণালীটা তাহাদেরই কাছে সব চেয়ে বেশি বিলুপ্ত হইয়া থাকে।

যেমন ব্যক্তিগত অভ্যাসের কথা বলিলাম তেমনি এমন অনেক অভ্যাস আছে যাহা কৌলিক বা স্বাদেশিক। সেই-সকল অভ্যাসমাত্রেই যে শক্তির সঞ্চার করে তাহা নহে; এমন-কি তাহারা শক্তিকে বহিরাশ্রিত করিয়া চিরদুর্বল করিয়া রাখে। অনেক মহাপুরুষ এইরূপ দেশপ্রচলিত অভ্যাসকে অমঙ্গলের হেতু বলিয়া আঘাত

করিয়া থাকেন, আবার কেহ কেহ সংস্কারের প্রভাবে তাহার অবলম্বন ত্যাগ করেন নাই তাহাও দেখা যায়। শেষোক্ত সাধকেরা যে নিজের প্রতিভাগুণে এই-সকল অভ্যাসের বাধা অতিক্রম করিয়াও আসল জায়গায় গিয়া পৌঁছিয়াছেন তাহা সকল সময় নিজেরাও বুঝেন না এবং কখনো বা মনে করেন, 'এখন আমার পক্ষে এই-সকল বাহ্য প্রক্রিয়া বাহুল্য হইলেও গোড়ায় ইহার প্রয়োজন ছিল।' ইহার ফল হয় এই, যাহাদের স্বাভাবিক শক্তি নাই তাহারা কেবলমাত্র এই অভ্যাসগুলিকেই অবলম্বন করিয়া কল্পনা করে যে 'আমরা সার্থকতা লাভ করিয়াছি'; তাহারা অহংকৃত ও অসহিষ্ণু হইয়া উঠে এবং যেখানে তাহাদের অভ্যাসের সামগ্রী না দেখিতে পায় সেখানে যে সত্য আছে এ কথা মনে করিতেই পারে না— কারণ, তাহাদের কাছে এই-সকল বাহ্য অভ্যাস এবং সত্য এক হইয়া গেছে।

যে-সকল জিনিসের মূল কারণ বাহিরের অভ্যাস নহে, অন্তরের বিকাশ, তাহাদের সম্বন্ধে কোনো কৃত্রিম প্রণালী থাকিতে পারে না, কিন্তু স্বাভাবিক আনুকূল্য আছে। ধর্মবোধ জিনিসটাকে যদি আমরা কোনো-একটা সাম্প্রদায়িক ফ্যাশান বা ভদ্রতার আসবাব বলিয়া গণ্য না করি, যদি তাহাকে মানুষের সর্বাঙ্গীণ চরম সার্থকতা বলিয়াই জানি, তবে প্রথম হইতেই বালকবালিকাদের মনকে ধর্মবোধে উদ্‌বোধিত করিয়া তুলিবার উপযুক্ত স্থান এবং অবকাশ থাকা আবশ্যক, এ কথা আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে; অর্থাৎ চারি দিকে সেই রকমের হাওয়া আলো আকাশটা থাকা চাই যাহাতে নিশ্বাস লইতেই প্রাণসঞ্চার হয় এবং আপনা হইতেই চিত্ত বড়ো হইয়া উঠিতে থাকে।

নিজের বাড়িতে যদি সেই অনুকূল অবস্থা পাওয়া যায় তবে তো কথাই নাই। অর্থাৎ, সেখানে যদি বৈষয়িকতাই নিজের মূর্তিকে সকলের চেয়ে প্রবল করিয়া না বসিয়া থাকে, যদি অর্থই সেখানে পরমার্থ না হয়, যদি গৃহস্বামী নিজেকেই নিজের সংসারের স্বামী বলিয়া প্রতিষ্ঠিত না করিয়া থাকেন, যদি তিনি বিশ্বের মঙ্গলময় স্বামীকেই বাক্যে ও ব্যবহারে মানিয়া চলেন, যদি সকলপ্রকার সাময়িক ঘটনাকে নিজের রাগদ্বেষের নিক্তিতে তৌল না করিয়া ভূমার মধ্যে স্থাপিত করিয়া যথাসাধ্য তাহাদিগকে বিচার ও যথোচিতভাবে তাহাদিগকে গ্রহণ করিতে চেষ্টা করেন, তবে সেইখানেই ছেলেমেয়েদের শিক্ষার স্থান বটে।

এরূপ সুযোগ সকল ঘরে নাই, সে কথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু ঘরে নাই আর বাহিরে আছে এ কথা বলিলেই বা চলিবে কেন, এ-সব দুর্লভ জিনিস তো আবশ্যক বুঝিয়া ফর্মাশ দিয়া তৈরি করা যায় না। সে কথা সত্য। কিন্তু আবশ্যকতা যদি থাকে এবং তাহার বোধ যদি জাগে তবে আপনিই যে সে আপনার পথ করিতে থাকিবে। সেই পথ করার কাজ আরম্ভ হইয়াছে; আমরা ইচ্ছা করিতেছি, আমরা সন্ধান করিতেছি, আমরা চেষ্টা করিতেছি। আমরা যা চাই আমাদের মনের মধ্যে তাহার একটা আদর্শ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আমরা যখনি বলিতেছি, 'ব্রাহ্মসমাজের ছেলেরা ধর্মশিক্ষার একটা কেন্দ্র, একটা যথার্থ আশ্রয়, যথার্থভাবে পাইতেছে না' তখনি সে জিনিসটা যে কেমনতরো হইতে পারে তাহার একটা আভাস আমাদের মনে জাগিতেছে।

বস্তুত, ব্রাহ্মসমাজে আমরা দেবমন্দির চাই না, বাহ্য আচার অনুষ্ঠান চাই না, আমরা আশ্রম চাই। অর্থাৎ, যেখানে বিশ্বপ্রকৃতির নির্মল সৌন্দর্য এবং মানুষের চিত্তের পবিত্র সাধনা একত্র মিলিত হইয়া একটি যোগাসন রচনা করিতেছে এমন আশ্রম। বিশ্বপ্রকৃতি এবং মানবের আত্মা যুক্ত হইয়াই আমাদের দেবমন্দির স্থাপন

করে এবং স্বার্থবন্ধনহীন মঙ্গলকর্মই আমাদের পূজানুষ্ঠান। এমন কি কোনো-একটি স্থান আমরা পাইব না যেখানে ‘শান্তং শিবমদ্বৈতম্’ বিশ্বপ্রকৃতিকে এবং মানুষকে, সুন্দরকে এবং মঙ্গলকে এক করিয়া দিয়া প্রাত্যহিক জীবনের কাজে ও পরিবেষ্টনে মানুষের হৃদয়ে সহজে অবাধে প্রত্যক্ষ হইতেছেন? সেই জায়গাটি যদি পাওয়া যায় তবে সেইখানেই ধর্মশিক্ষা হইবে। কেননা পূর্বেই বলিয়াছি, ধর্মসাধনার হাওয়ার মধ্যে স্বভাবের গূঢ় নিয়মেই ধর্মশিক্ষা হইতে পারে, সকলপ্রকার কৃত্রিম উপায় তাহাকে বিকৃত করে ও বাধা দেয়।

আমি জানি, যাঁহারা সকল বিষয়কেই শ্রেণীবিভক্ত ও নামাঙ্কিত করিয়া সংক্ষেপে সরাসরি বিচার করিতে ভালোবাসেন তাঁহারা বলিবেন, ‘এটা তো এ কালের কথা হইল না। এ যে দেখি মধ্যযুগের monasticism অর্থাৎ মঠাশ্রয়ী ব্যবস্থা। ইহাতে সংসারের সঙ্গে সাধকজীবনকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলা হয়, ইহাতে মনুষ্যত্বকে পঙ্গু করা হয়, ইহা কোনোমতেই চলিবে না।’

অন্য কোনো-এক কালে যে জিনিসটা ছিল এবং যাহা তাহার চরমে আসিয়া মরিয়াছে তাহার নকল করিতে বলা যে পাগলামি, সে কথা আমি খুবই স্বীকার করি। বর্বরদের ধনুর্বাণ যতই মনোহর হউক তাহাতে এখনকার কালের যোদ্ধার কাজ চলে না।

কিন্তু অসভ্যযুগের যুদ্ধপ্রবৃত্তির উপকরণ সভ্যযুগে যদি বা অনাদৃত হয়, কিন্তু সেই যুদ্ধের প্রবৃত্তিটা তো আছে। তাহা যতক্ষণ লুপ্ত না হয় ততক্ষণ ভিন্ন ভিন্ন যুগের যুদ্ধব্যাপারের মধ্যে একটা প্রণালীগত সাদৃশ্য থাকিবেই। অতএব, যুদ্ধ করিতে হইলেই ব্যাপারটা তখনকার কাল হইতে একেবারে উল্টা রকমের কিছু হইতে পারিবে না। এখনো সেকালেরই মতো সৈন্য লইয়া দল বাঁধিতে এবং দুই পক্ষে হানাহানি করিতে হইবে।

মানুষের মনের যে ইচ্ছা পূর্বে একদিন ধর্মসাধন উপলক্ষে একটি বিশেষ আকার ধারণ করিয়াছিল সেই ইচ্ছা যদি আজও প্রবল হইয়া উঠে তবে তাহারও সাধনোপায়, নকল না করিয়াও, অনেকটা সেই পূর্ব-আকার লইবে। এখনকার কালের উপযোগী বলিয়া ইহার একটা স্বাতন্ত্র্যও থাকিবে এবং চিরকালীন সত্যের প্রকাশ বলিয়া ভিন্ন ভিন্ন কালের সহিত ইহার মিলও থাকিবে। অতএব, মৃত পিতার সঙ্গে সাদৃশ্য আছে বলিয়াই ছেলেকে যেমন শ্মশানে দাহ করাটা কর্তব্য নহে, তেমনি সত্যের নূতন প্রকাশচেষ্টা তাহার পুরাতন চেষ্টার সঙ্গে কোনো অংশে মেলে বলিয়াই তাহাকে তাড়াতাড়ি বিদায় করিতে ব্যস্ত হওয়াটাকে সংগত বলিতে পারি না।

অথচ, আমরা অনুকরণচ্ছলে অনেক জিনিস গ্রহণ করি যাহার সংগতি বিচার করি না। যদি বলা গেল এটা বর্তমানকালীন, তবেই যেন তাহার পক্ষে সব কথা বলা হইল। কিন্তু যাহা তোমার বর্তমান তাহা যে আমার বর্তমান নহে, সে কথা চিন্তা করিতে চাই না। এইজন্যই যদি বলা যায় ‘আমরা যথাসম্ভব গির্জার মতো একটা পদার্থ গড়িয়া তুলিব’ তবে আমাদের মনে মস্ত এই একটা সান্ত্বনা আসে যে, আমরা বর্তমানের সঙ্গে ঠিক তাল রাখিয়া চলিতেছি; অথচ গির্জার হাজার বছরের ইতিহাসের সঙ্গে আমাদের কোনো যোগই নাই। কিন্তু যে-সকল ব্যবস্থা আমাদের স্বদেশীয়, যাহা আমাদের জাতির প্রকৃতিগত, তাহাকে আমরা অন্য দেশের ইতিহাসের মধ্যে স্থাপন করিবার চেষ্টা করিয়া মাথা নাড়িয়া বলি, ‘না, ইহা চলিবে না। ইহা মডার্ন্ নহে।’ মনের এমন অবস্থা মানুষের যখন জন্মায় তখন সে

আধুনিকতা-নামক অপরূপ পদার্থকে গুরু করিয়া তাহার নিকট হইতে কতকগুলো বাঁধা মন্ত্রকে কানে লয় এবং সত্যকে পরিত্যাগ করে।

আমি এখানে কেবল একটা কাল্পনিক প্রসঙ্গ লইয়া তর্ক করিতেছি না। আপনারা সকলেই জানেন, আমার পূজনীয় পিতৃদেব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বোলপুরের উন্মুক্ত প্রান্তরের মধ্যে যুগল সপ্তপর্ণচ্ছায়াতলে যেখানে একদিন তাঁহার নিভৃত সাধনার বেদী নির্মাণ করিয়াছিলেন সেইখানে তিনি একটি আশ্রম স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। এই আশ্রমের প্রতি কেবল যে তাঁহার একটি গভীর প্রীতি ছিল তাহা নহে, ইহার প্রতি তাঁহার একটি সুদৃঢ় শ্রদ্ধা ছিল। যদিও সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত এই স্থান প্রায় শূন্যই পড়িয়া ছিল তথাপি তাঁহার মনে লেশমাত্র সংশয় ছিল না যে, ইহার মধ্যে একটি গভীর সার্থকতা আছে। সেই সার্থকতা তিনি চক্ষে না দেখিলেও তাহার প্রতি তাঁহার পূর্ণ নির্ভর ছিল। তিনি জানিতেন, ঈশ্বরের ইচ্ছার মধ্যে ব্যস্ততা নাই কিন্তু অমোঘতা আছে।

একদিন এই আশ্রমে বিদ্যালয়স্থাপনের প্রস্তাব যখন তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল তখন পরমোৎসাহে তিনি সম্মতি দিলেন। এতদিন আশ্রম এই বিদ্যালয়ের জন্যই যে অপেক্ষা করিতেছিল তাহা তিনি অনুভব করিলেন। ছেলেদের মনকে মানুষ করিয়া তুলিবার ভারই এই আশ্রমের উপর। কারণ, মা যখন সন্তানকে অন্ন দেন তখন এক দিকে তাহা অন্ন, আর-এক দিকে তাহা তাঁহার হৃদয়। এই অন্নের সঙ্গে তাঁহার হৃদয় সম্মিলিত হইয়াই তাহা অমৃত হইয়া উঠে। আশ্রমও বালকদিগকে যে বিদ্যা-অন্ন দিবে তাহা হোটেলের অন্ন ইস্কুলের বিদ্যা নহে; তাহার সঙ্গে সঙ্গে আশ্রমের একটি প্রাণরস, একটি অমৃতরস, অলক্ষ্যে মিলিত হইয়া তাহাদের চিত্তকে আপনি পরিপুষ্ট করিয়া তুলিতে থাকিবে।

ইহা কেবল আশামাত্র নহে, বস্তুত ইহাই আমরা ঘটিতে দেখিয়াছি। শিক্ষকদের উপদেশ-অনুশাসন নিতান্ত স্থূলভাবে কাজ করে এবং তাহার অধিকাংশই উগ্র ঔষধের মতো কেবল যে ব্যর্থ হয় তাহা নহে, অনিষ্টই করিতে থাকে। কিন্তু এই আশ্রমের অলক্ষ্য ক্রিয়া অত্যন্ত গভীর এবং স্বাভাবিক। কেহ মনে করিবেন না, আমি এখানে কোনো অলৌকিক শক্তির উল্লেখ করিতেছি। এখানে যে একজন সাধক সাধনা করিয়াছেন এবং সেই সাধনার আনন্দই যে এই আশ্রমকে মানুষের চিরদিনের সামগ্রী করিয়া তুলিবার জন্য এখনো নিযুক্ত আছে, তাহা এখানকার সর্বত্রই নানা আকারে প্রকাশমান। বর্তমান আশ্রমবাসী আমরা সেই প্রকাশকে অহরহ নানা প্রকারে বাধা দিয়াও তাহাকে আচ্ছন্ন করিতে পারি নাই। সেই প্রকাশটি কেবল বালকদের নহে, শিক্ষকদের মনেও প্রতিনিয়ত অগোচরে কাজ করিয়া চলিয়াছে। এই স্থানটি যে নিতান্ত একটি বিদ্যালয়মাত্র নহে, ইহা যে আশ্রম, কেবলমাত্র এই ভাবটিরই প্রবলতা বড়ো সামান্য নহে।

ইহা দেখা গিয়াছে, যতদিন পর্যন্ত মনে করিয়াছিলাম 'আমরাই বালকদিগকে শিক্ষা দিব' 'আমরাই তাহাদের উপকার করিব' ততদিন আমরা নিতান্তই সামান্য কাজ করিয়াছি। ততদিন যত যন্ত্রই গড়িয়া তুলিয়াছি তত যন্ত্রই ভাঙিয়া ফেলিতে হইয়াছে। এখনো যন্ত্র গড়িবার উৎসাহ আমাদের একেবারে যায় নাই, কেননা এখনো ভিতরের জিনিসটি বেশ করিয়া ভরিয়া উঠে নাই। কিন্তু, তবুও যখন হইতে এই ভাবনাটা আমাদের মনে ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিল যে আপনারই শূন্যতাকে পূর্ণ করিতে হইবে, আমরাই এখানে পাইতে আসিয়াছি, এখানে বালকদের সাধনার এবং আমাদের সাধনার একই সমতল আসন, এখানে গুরু শিষ্য

সকলেই একই ইস্কুলে সেই মহাগুরুর ক্লাসে ভর্তি হইয়াছি, তখন হইতে ফল যেন আপনি ফলিয়া উঠিল, কাজের শৃঙ্খলা আপনি ঘটিতে লাগিল। এখনো আমাদের যাহা-কিছু নিষ্ফলতা সে এখানেই। যেখানেই আমরা মনে করি 'আমরা দিব অন্যে নিবে' 'সাধনা কেবল ছাত্রদের এবং আমরা তাহার চালক ও নিয়ন্তা' সেখানেই আমরা কোনো সত্য পদার্থ দিতে পারি না; সেইখানেই আমরা নিজের অপরাধ অন্যের স্কন্ধে চাপাই এবং প্রাণের অভাব কলের দ্বারা পূরণ করিতে চেষ্টা করি।

নিজেদের এই অভিজ্ঞতার প্রতি লক্ষ্য করিয়া এ কথা আমাকে বিশেষভাবে বলিতে হইবে যে, আমরা অন্যকে ধর্মশিক্ষা দিব এই বাক্যই যেখানে প্রবল সেখানে ধর্মশিক্ষা কখনোই সহজ হইবে না। যেমন, 'অন্যকে দৃষ্টিশক্তি দিব' বলিয়া দীপশিখা ব্যস্ত হইয়া বেড়ায় না, নিজে সে যে পরিমাণে উজ্জ্বল হইয়া উঠে সেই পরিমাণে স্বভাবতই অন্যের দৃষ্টিকে সাহায্য করে। ধর্মও সেই প্রকারের জিনিস, তাহা আলোর মতো। তাহার পাওয়া এবং দেওয়া একই কথা, তাহা একেবারে একসঙ্গেই ঘটে। এইজন্যই ধর্মশিক্ষার ইস্কুল নাই, তাহার আশ্রম আছে; যেখানে মানুষের ধর্মসাধনা অহোরাত্র প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিতেছে, যেখানে সকল কর্মই ধর্মকর্মের অঙ্গ-রূপে অনুষ্ঠিত হইতেছে, সেইখানেই স্বভাবের নিয়মে ধর্মবোধের উদ্‌বোধন হয়। এইজন্য সকল শাস্ত্রেই সঙ্গকেই ধর্মলাভের সর্বপ্রধান উপায় বলা হইয়াছে। এই সঙ্গ জিনিসটিকে, এই সাধকদের জীবনের সাধনাকে, যদি আমরা কোনো-একটি বিশেষ অনুকূল স্থানে আকর্ষণ করিয়া আনিতে পারি, তাহা যদি স্থানে স্থানে বিক্ষিপ্ত হইয়া ছড়াইয়া না থাকে, তবে এই পুঞ্জীভূত শক্তিকে আমরা মানবসমাজের উচ্চতম ব্যবহারে লাগাইতে পারি।

এ দেশে একদিন তপোবনের এইরূপ ব্যবহারই ছিল; সেখানে সাধনা ও শিক্ষা একত্র মিলিত হইয়াছিল বলিয়া, সেখানে পাওয়া এবং দেওয়ার কাজ অতি সহজে নিয়ত অনুষ্ঠিত হইতেছিল বলিয়াই, তপোবন হৃৎপিণ্ডের মতো সমস্ত সমাজের মর্মস্থান অধিকার করিয়া তাহার প্রাণকে শোধন পরিচালন এবং রক্ষা করিয়াছে। বৌদ্ধ বিহারেরও সেই কাজ ছিল। সেখানে পাওয়া এবং দেওয়া অবিচ্ছিন্ন হইয়া বিরাজ করিতেছিল।

এইখানে স্বভাবতই শ্রোতাদের মনে এই প্রশ্ন উঠিবে যে, তবে পূর্বে যে আশ্রমটির কথা বলা হইয়াছে সেখানে কি সাধকদের সমাগমে একটি পরিপূর্ণ ধর্মজীবনের শতদল পদ্ম বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে?

না, তাহা হয় নাই। আমরা যাহারা সেখানে সমবেত হইয়াছি আমাদের লক্ষ্য এক নহে এবং তাহা যে নির্বিশেষে উচ্চ এমন কথাও বলিতে পারি না। আমাদের সকলেরই শ্রদ্ধা যে গভীর এবং ধ্রুব তাহা নহে এবং তাহা আশাও করি না। আমরা যাহাকে উচ্চাকাঙ্ক্ষা নাম দিয়া থাকি, অর্থাৎ সাংসারিক উন্নতি ও খ্যাতিপ্রতিপত্তির ইচ্ছা, তাহা আমাদের মনে খুবই উচ্চ হইয়া আছে; সকলের-চেয়ে-উচ্চ আকাঙ্ক্ষাকে উচ্চে স্থাপন করিতে পারি নাই। কিন্তু তৎসত্ত্বেও এ কথা আমি দৃঢ় করিয়া বলিব, সেই আশ্রমের যে আহ্বান তাহা সেই শান্তম্‌ শিবমদ্বৈতম্‌ যিনি তাঁহারই আহ্বান। আমরা যে যাহা মনে করিয়া আসি-না কেন, তিনিই ডাকিতেছেন এবং সে ডাক এক মুহূর্তের জন্য থামিয়া নাই। আমরা কোনো কলরবে সেই অনবচ্ছিন্ন মঙ্গলশঙ্খ-ধ্বনিকে ঢাকিয়া ফেলিতে পারিতেছি না; তাহা সকলের উচ্চে বাজিতেছে, তাহার সুগম্ভীর স্বরতরঙ্গ সেখানকার তরুশ্রেণীর পল্লবে পল্লবে স্পন্দিত হইতেছে এবং

সেখানকার নির্মল আকাশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করিয়া তাহার আলোককে পুলকিত ও অন্ধকারকে নিস্তব্ধ পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতেছে।

সাধকদের জন্য অপেক্ষা করিতে হয়; তাঁহারা যখন আসিবেন তখন আসিবেন; তাঁহারা সকলেই কিছু গেরুয়া পরিয়া মাথায় তিলক কাটিয়া আসিবেন না, তাঁহারা এমন দীনবেশে নিঃশব্দে আসিবেন যে তাঁহাদের আগমনবার্তা জানিতেও পারিব না। কিন্তু ইতিমধ্যে ঐ-যে সাধনার আহ্বানটি ইহাই আমাদের সকলের চেয়ে বড়ো সম্পদ: এই ভূমার আহ্বানের একেবারে মাঝখানেই আশ্রমবাসীদিগকে বাস করিতে হইতেছে; সেই একাগ্র ধ্বনি যে তাহাদের বিমুখ কর্ণের বধিরতাকে দিনে দিনে ভেদ করিতেছে; সে যে তাহাদের শুষ্ক হৃদয়ের কঠিনতম স্তরের মধ্যেও অগোচরে প্রবেশ করিয়া ধীরে ধীরে রসসঞ্চার করিতেছে।

এমন কথা আমি একদিন কোনো বন্ধুর কাছে শুনিয়াছিলাম যে, জনতা হইতে দূরে একটা নিভৃত বেষ্টনের মধ্যে যে জীবনযাত্রা তাহার মধ্যে একটা শৌখিনতা আছে, তাহার মধ্যে পুরাপুরি সত্য নাই, সুতরাং এখানকার যে শিক্ষা তাহা সম্পূর্ণ কাজের শিক্ষা নহে। কোনো কাল্পনিক আশ্রম সম্বন্ধে এ কথা খাটিতে পারে, কিন্তু আমাদের এই আধুনিক আশ্রমটি সম্বন্ধে এ কথা আমরা স্বীকার করিতে পারি না।

সত্য বটে শহরে জনতার অভাব নাই, কিন্তু সেই জনতার সঙ্গে সত্যকার যোগ আছে কয়জন মানুষের? সে জনতা এক হিসাবে ছায়াবাজির ছায়ার মতো। নগরে গৃহস্থ তরঙ্গিত জনতাসমুদ্রের মধ্যে বেষ্টিত হইয়া এক-একটি রবিন্‌সন্‌ ক্রুসোর মতো আপনার প্রাইভেটিকে লইয়া নিরালায় দিন কাটাইতে থাকেন। এত বড়ো জনময় নির্জনতা কোথায় পাওয়া যাইবে?

কিন্তু একশো-দুশো মানুষকে এক আশ্রয়ে লইয়া দিনযাপন করাকে কোনো-মতেই নির্জনবাস বলা চলে না। এই-যে একশো-দুশো মানুষ ইহারা দূরের মানুষ নহে, ইহারা পথের পথিক নহে; ইচ্ছা করিলাম ইহাদের সঙ্গ লইলাম, আর ইচ্ছা না হইল তো আপনার ঘরের কোণে আসিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলাম, এমনটি হইবার জো নাই; এই একশো-দুশো মানুষের দিনরাত্রির সমস্ত প্রয়োজনের প্রত্যেক তুচ্ছ অংশটির সম্বন্ধেও চিন্তা করিতে হইবে; ইহাদের সমস্ত সুখদুঃখ সুবিধা-অসুবিধাকে আপনার করিয়া লইতে হইবে—ইহাকেই কি বলে মানুষের সঙ্গ এড়াইয়া দায়িত্ব কাটাইয়া শৌখিন শান্তির মধ্যে একটা বেড়া-দেওয়া পারমার্থিকতার দুর্বল সাধনা?

আমার সেই বন্ধু হয়তো বলিবেন, নির্জনতার কথা ছাড়িয়া দাও, কিন্তু সংসারে যেখানে চারি দিকেই ভালো-মন্দর তরঙ্গ কেবলই উঠাপড়া করিতেছে সেইখানেই ঠিক সত্যভাবে ভালোকে চিনাইয়া দিবার সুযোগ পাওয়া যায়। কাঁটার পরিচয় যেখানে নাই সেখানে কাঁটা বাঁচাইয়া চলিবার শিক্ষা হইবে কেমন করিয়া? কাঁটা-বনের গোলাপটাই সত্যকার গোলাপ, আর বারবার অতি যত্নে চোলাই করিয়া লওয়া সাধুতার গোলাপি আতর একটা নবাবি জিনিস।

হায়, সাধুতার এই নিষ্কণ্টক আতরটি কোন্‌ দোকানে মেলে তাহা নিশ্চয় জানি না, কিন্তু আমাদের আশ্রমে যে তাহার কারবার নাই তাহা নিজের দিকে তাকাইলেই বুঝিতে পারি। কাব্যে পুরাণে সর্বত্রই তপোবনের আদর্শটি অত্যুজ্জ্বল বর্ণনায় বিরাজ করে, কিন্তু তবু সেই বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে বহুতরো 'মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ' ঘন ঘন উঁকি মারিতেছে। মানুষের আদর্শও যেমন সত্য সেই আদর্শের

ব্যাঘাতও তেমনি সত্য; যাহারা সেই ব্যাঘাতের ভিতর দিয়াই চোখ মেলিয়া আদর্শকে দেখিতে না পারে চোখ বুজিয়া স্বপ্ন দেখা ছাড়া তাহাদের আর গতি নাই।

আমরা যে আশ্রমের কথা বলিতেছি সেখানে লোকালয়ের অন্য বিভাগেরই মতো মন্দের জন্য সিংহদ্বার খোলাই আছে। শয়তানকে সেখানে সকল সময়ে সাপের মতো ছদ্মবেশে প্রবেশ করিতে হয় না, সে দিব্য ভদ্রলোকেরই মতো মাথা তুলিয়া যাতায়াত করে। সেখানে সংসারের নানা দাবি, বৈষয়িকতার নানা আড়ম্বর, প্রবৃত্তির নানা চাঞ্চল্য এবং অহংপুরুষের নানা উদ্ধত মূর্তি সর্বদাই দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণ লোকালয়ে বরঞ্চ তাহারা তেমন করিয়া চোখেই পড়ে না, কারণ ভালোমন্দ সেখানে একপ্রকার আপস করিয়া মিলিয়া মিশিয়াই থাকে; এখানে তাহাদের মাঝখানে একটা বিচ্ছেদ আছে বলিয়াই মন্দটা এখানে খুব করিয়া দেখা দেয়।

তাই যদি হইল তবে আর হইল কী? বন্ধুরা বলিবেন, যদি সেখানে জনতার চাপ লোকালয়ের চেয়ে কম না হইয়া বরঞ্চ বেশিই হয়, এবং মন্দকেই যদি সেখান হইতে নিঃশেষে ছাঁকিয়া ফেলিবার আশা না করিতে পার, এবং যদি সেখানকার আশ্রমবাসীরা সংসারের সাধারণ লোকেরই মতো মাঝারি রকমেরই মানুষ হন, তবে সেইপ্রকার স্থানই যে বালকবালিকাদের ধর্মশিক্ষার অনুকূল স্থান তাহা কেমন করিয়া বলিবে?

এ সম্বন্ধে আমার যাহা বক্তব্য তাহা এই—কবিকল্পনার দ্বারা আগাগোড়া মনোরম করিয়া যে একটা আকাশকুসুমখচিত আশ্রম গড়া যায় না, এ কথাটা আমাকে খুব স্পষ্ট করিয়াই বলিতে হইতেছে; কারণ, আমার মতো লোকের মুখে কোনো প্রস্তাব শুনিলেই সেটাকে নিরতিশয় ভাবুকতা বলিয়া শ্রোতারা সন্দেহ করিতে পারেন। আশ্রম বলিতে আমি যে কোনো-একটা অদ্ভুত অসম্ভব স্বপ্নসুলভ পদার্থের কল্পনা করিতেছি তাহা নহে। সকল স্থূলদেহধারীর সঙ্গেই তাহার স্থূল দেহের ঐক্য আছে, এ কথা আমি বারম্বার স্বীকার করিব। কেবল যেখানে তাহার সূক্ষ্ম জায়গাটি সেইখানেই তাহার স্বাতন্ত্র্য। সে স্বাতন্ত্র্য সেইখানেই যেখানে তাহার মাঝখানে একটি আদর্শ বিরাজ করিতেছে। সে আদর্শটি সাধারণ সংসারের আদর্শ নহে, সে আদর্শ আশ্রমের আদর্শ; তাহা বাসনার দিকে নয়, সাধনার দিকেই নিয়ত লক্ষ্য নির্দেশ করিতেছে। এই আশ্রম যদি-বা পাঁকের মধ্যেও ফুটিয়া থাকে তবু ভূমার দিকে তাহার মুখ তুলিয়াছে; সে আপনাকে যদি-বা ছাড়িতে না পারিয়া থাকে তবু আপনাকে কেবলই ছাড়াইতে চাহিতেছে; সে যেখানে দাঁড়াইয়া আছে সেখানেই তাহার পরিচয় নয়, সে যেখানে দৃষ্টি রাখিয়াছে সেইখানেই তাহার প্রকাশ। তাহার সকলের ঊর্ধ্বে যে সাধনার শিখাটি জ্বলিতেছে তাহাই তাহার সর্বোচ্চ সত্য।

কিন্তু, কেনই-বা বড়ো কথাটাকে গোপন করিব? কেনই-বা কেবল কেজো লোকদের মন জোগাইবার জন্য ভিতরকার আসল রসটিকে আড়াল করিয়া রাখিব? এই প্রবন্ধ শেষ করিবার পূর্বে আমি অসংকোচে বলিব, আশ্রম বলিতেই আমাদের মনের সামনে যে ছবিটি জাগে, যে ভাবটি ভরিয়া উঠে, তাহা আমাদের সমস্ত হৃদয়কে হরণ করে। তাহার কারণ শুদ্ধমাত্র এ নহে যে, তাহা আমাদের জাতির অনেক যুগের ধ্যানের ধন, সাধনার সৃষ্টি; তাহার গভীর কারণ এই, আমাদের সমস্তের সঙ্গে তাহার ভারী একটি সংগতি দেখিতে পাই, এইজন্যই তাহাকে এমন সত্য,

এমন সুন্দর বলিয়া ঠেকে। বিধাতার কাছে আমরা যে দান পাইয়াছি তাহাকে অস্বীকার করিব কেমন করিয়া? আমরা তো ঘন মেঘের কালিমা-লিপ্ত আকাশের নিচে জন্মগ্রহণ করি নাই; শীতের নিষ্ঠুর পীড়ন আমাদিগকে তো রুদ্ধ ঘরের মধ্যে তাড়না করিয়া বদ্ধ করে নাই; আকাশ যে আমাদের কাছে তাহার বিরাট বক্ষপট উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে; আলোক যে কোনোখানে কিছুমাত্র কার্পণ্য রাখিল না; সূর্যোদয় যে ভক্তির পূজাঞ্জলির মতো আকাশে উঠে এবং সূর্যাস্ত যে ভক্তের প্রণামের মতো দিগন্তে নীরবে অবনমিত হয়; কী উদার নদীর ধারা, কী নির্জন গম্ভীর তাহার প্রসারিত তট; অবারিত মাঠ রুদ্রের যোগাসনের মতো স্থির হইয়া পড়িয়া আছে, কিন্তু তবু সে যেন বিষ্ণুর বাহন মহাবিহঙ্গমের মতো তাহার দিগন্তজোড়া পাখা মেলিয়া দিয়া কোন্ অনন্তের অভিমুখে উড়িয়া চলিয়াছে সেখানে তাহার গতিকে আর লক্ষ্য করা যাইতেছে না; এখানে তরুতল আমাদিগকে আতিথ্য করে, ভূমিশয্যা আমাদিগকে আহ্বান করে, আতপ্ত বায়ু আমাদিগকে বসন পরাইয়া রাখিয়াছে। আমাদের দেশে এ-সমস্তই যে সত্য, চিরকালের সত্য। পৃথিবীতে নানা জাতির মধ্যে যখন সৌভাগ্য ভাগ করা হইতেছিল তখন এই-সমস্ত যে আমাদের ভাগে পড়িয়াছিল, তবু আমাদের জীবনের সাধনায় ইহাদের কোনো ব্যবহারই করিব না? এত বড়ো সম্পদ আমাদের চেতনার বহির্দ্বারে অনাদৃত হইয়া পড়িয়া থাকিবে? আমরাই তো জগৎপ্রকৃতির সঙ্গে মানবপ্রকৃতির মিলন ঘটাইয়া চিত্তের বোধকে সর্বানুভূ, ধর্মের সাধনাকে বিশ্বব্যাপী করিয়া তুলিব, সেইজন্যই এই ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। সেইজন্যই আমাদের দুই চক্ষুর মধ্যে এমন একটি সুগভীর দৃষ্টি আছে যাহা রূপের মধ্যে অরূপকে প্রত্যক্ষ করিবার জন্য স্নিগ্ধ শান্ত অচঞ্চল হইয়া রহিয়াছে; সেইজন্যই অনন্তের বাঁশির সুর এমনি করিয়া আমাদের প্রাণের মধ্যে পৌঁছে যে সেই অনন্তকে আমাদের সমস্ত হৃদয় দিয়া ছুঁইবার জন্য, তাহাকে ঘরে বাহিরে চিন্তায় কল্পনায় সেবায় রসভোগে স্নানে আহারে কর্মে ও বিশ্রামে বিচিত্র প্রকারে ব্যবহার করিবার জন্য আমরা কত কাল ধরিয়া কত দিক দিয়া কত কত পথে কত কত চেষ্টা করিতেছি তাহার অন্ত নাই। সেইজন্য ভারতবর্ষের আশ্রম ভারতবর্ষের জীবনকে এমন করিয়া অধিকার করিয়াছে, আমাদের কাব্যপুরাণকে এমন করিয়া আবিষ্ট করিয়া ধরিয়াছে; সেইজন্যই ভারতবর্ষের যে দান আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে অক্ষয় হইয়া আছে এই আশ্রমেই তাহার উদ্ভব। নাহয় আজ যে কালে আমরা জন্মিয়াছি তাহাকে আধুনিক কাল বলা হয় এবং যে শতাব্দী ছুটিয়া চলিয়াছে তাহা বিংশ শতাব্দী বলিয়া আদর পাইতেছে, কিন্তু তাই বলিয়া বিধাতার অতি পুরাতন দান আজ নূতন কালের ভারতবর্ষে কি একেবারে নিঃশেষ হইয়া গেল, তিনি কি আমাদের নির্মল আকাশের উন্মুক্ততায় একেবারে কুলুপ লাগাইয়া দিলেন? নাহয় আমরা কয়জন এই শহরের পোষ্যপুত্র হইয়া তাহার পাথরের প্রাঙ্গণটাকে খুব বড়ো মনে করিতেছি, কিন্তু যে মাতার আমরা সন্তান সেই প্রকৃতি কি ভারতবর্ষ হইতে তাহার দিগন্তবিস্তীর্ণ শ্যামাঞ্চলটি তুলিয়া লইয়া বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন? তাহা যদি সত্য না হয় তবে আমাদের দেশের বাহিরের ও অন্তরের প্রকৃতিকে নির্বাসিত করিয়া সকল বিষয়ে সর্বতোভাবে অন্য দেশের ইতিহাসকে অনুসরণ করিয়া চলাকেই মঙ্গলের পথ বলিয়া মানিয়া লইতে পারিব না।

শান্তিনিকেতন আশ্রমের বিদ্যালয়টির সহিত আমার জীবনের একাদশবর্ষ জড়িত হইয়াছে, অতএব তাহার সফলতার কথা প্রকাশ করাতে সেটাকে আপনারা

আমার নিরবচ্ছিন্ন অহমিকা বলিয়া মনে করিতে পারেন। সেই আশঙ্কা-সত্ত্বেও আমি আপনাদের কাছে শিক্ষা সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা বিবৃত করিলাম; কারণ, আনুমানিক কথার কোনো মূল্য নাই এবং সকল অপবাদ স্বীকার করিয়াও সত্যের পক্ষে সাক্ষ্য দিতে হইবে। অতএব আমি সবিনয়ে অথচ অসংশয় বিশ্বাসের দৃঢ়তার সঙ্গেই বলিতেছি যে, যে ধর্ম কোনোপ্রকার রূপকল্পনা বা বাহ্য প্রক্রিয়াকে সাধনার বাধা ও মানুষের বুদ্ধি ও চরিত্রের পক্ষে বিপজ্জনক বলিয়াই মনে করে সাময়িক বক্তৃতা বা উপদেশের দ্বারা সে ধর্ম মানুষের চিত্তকে সম্পূর্ণ অধিকার করিতে পারিবে না। সে ধর্মের পক্ষে এমন-সকল আশ্রমের প্রয়োজন যেখানে বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মানবজীবনের যোগ ব্যবধানবিহীন ও যেখানে তরুলতা-পশুপক্ষীর সঙ্গে মানুষের আত্মীয়সম্বন্ধ স্বাভাবিক, যেখানে ভোগের আকর্ষণ ও উপকরণবাহুল্য নিত্যই মানুষের মনকে ক্ষুব্ধ করিতেছে না, সাধনা যেখানে কেবলমাত্র ধ্যানের মধ্যেই বিলীন না হইয়া ত্যাগে ও মঙ্গলকর্মে নিয়তই প্রকাশ পাইতেছে, কোনো সংকীর্ণ দেশকালপাত্রের দ্বারা কর্তব্যবুদ্ধিকে খণ্ডিত না করিয়া যেখানে বিশ্বজনীন মঙ্গলের শ্রেষ্ঠতম আদর্শকেই মনের মধ্যে গ্রহণ করিবার অনুশাসন গভীরভাবে বিরাজ করিতেছে, যেখানে পরস্পরের প্রতি ব্যবহারে শ্রদ্ধার চর্চা হইতেছে, জ্ঞানের আলোচনায় উদারতার ব্যাপ্তি হইতেছে এবং সকল দেশের মহাপুরুষদের চরিত স্মরণ করিয়া ভক্তির সাধনায় মন রসাভিষিক্ত হইয়া উঠিতেছে, যেখানে সংকীর্ণ বৈরাগ্যের কঠোরতার দ্বারা মানুষের সরল আনন্দকে বাধাগ্রস্ত করা হইতেছে না ও সংযমকে আশ্রয় করিয়া স্বাধীনতার উল্লাসই সর্বদা প্রকাশমান হইয়া উঠিতেছে, যেখানে সূর্যোদয় সূর্যাস্ত ও নৈশ আকাশে জ্যোতিষ্কসভার নীরব মহিমা প্রতিদিন ব্যর্থ হইতেছে না এবং প্রকৃতির ঋতু-উৎসবের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের আনন্দসংগীত একসুরে বাজিয়া উঠিতেছে, যেখানে বালকগণের অধিকার কেবলমাত্র খেলা ও শিক্ষার মধ্যে বদ্ধ নহে—তাহারা নানাপ্রকার কল্যাণভার লইয়া কর্তৃত্বগৌরবের সহিত প্রতি দিনের জীবনচেষ্টার দ্বারা আশ্রমকে সৃষ্টি করিয়া তুলিতেছে, এবং যেখানে ছোটো-বড়ো বালকবৃদ্ধ সকলেই একাসনে বসিয়া নতশিরে বিশ্বজননীর প্রসন্ন হস্ত হইতে জীবনের প্রতিদিনের এবং চিরদিনের অন্ন গ্রহণ করিতেছে।

মাঘ ১৩১৮

শিক্ষাবিধি

এখানে আসিবার সময় আমার একটা সংকল্প ছিল, এখানকার বিদ্যালয়গুলিকে ভালো করিয়া দেখিয়া শুনিয়া বুঝিয়া লইব, শিক্ষা সম্বন্ধে এখানকার কোনো ব্যবস্থা আমাদের দেশে খাটে কি না তাহা দেখিয়া যাইব। সামান্য কিছু দেখিয়াছি, কাগজে পত্রে এখানকার শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনাও পড়িয়াছি। পরীক্ষা নানা প্রকারের চলিতেছে, প্রণালী নানা রকমের উদ্ভাবিত হইতেছে। এক দল বলিতেছে, ছেলেদের শিক্ষা যথাসম্ভব সুখকর হওয়া উচিত; আর-এক দল বলিতেছে, ছেলেদের শিক্ষার মধ্যে দুঃখের ভাগ যথেষ্ট পরিমাণে না থাকিলে তাহাদিগকে সংসারের জন্য পাকা করিয়া মানুষ করা যায় না। এক দল বলিতেছে, চোখে-কানে ভাবে-আভাসে শিক্ষার বিষয়গুলিকে প্রকৃতির মধ্যে শোষণ করিয়া

লইবার ব্যবস্থাই উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা; আর-এক দল বলিতেছে, সচেষ্টভাবে নিজের শক্তিকে প্রয়োগ করিয়া সাধনার দ্বারা বিষয়গুলিকে আয়ত্ত করিয়া লওয়াই যথার্থ ফলদায়ক। বস্তুত, এ দ্বন্দ্ব কোনোদিনই মিটিবে না, কেননা মানুষের প্রকৃতির মধ্যেই এ দ্বন্দ্ব সত্য—সুখও তাহাকে শিক্ষা দেয়, দুঃখও তাহাকে শিক্ষা দেয়: শাসন নহিলেও তাহার চলে না, স্বাধীনতা নহিলেও তাহার রক্ষা নাই; এক দিকে তাহার পড়িয়া-পাওয়া জিনিসের প্রবেশদ্বার খোলা, আর-এক দিকে তাহার খাটিয়া-আনা জিনিসের আনাগোনার পথ উন্মুক্ত। এ কথা বলা সহজ যে, দুইয়ের মাঝখানের পথটিকে পাকা করিয়া চিহ্নিত করিয়া লও, কিন্তু কার্যত তাহা অসাধ্য। কারণ, জীবনের গতি কোনোদিনই একেবারে সোজা রেখায় চলে না—অন্তর-বাহিরের নানা বাধায় ও নানা তাগিদে সে নদীর মতো আঁকিয়া-বাঁকিয়া চলে, কাটা খালের মতো সিধা পড়িয়া থাকে না; অতএব তাহার মাঝখানের রেখাটি সোজা রেখা নহে, তাহাকেও কেবলই স্থান-পরিবর্তন করিতে হয়। এখন তাহার পক্ষে যাহা মধ্যরেখা আর-এক সময়ে তাহাই তাহার পক্ষে চরম প্রান্তরেখা; এক জাতির পক্ষে যাহা প্রান্তপথ, আর-এক জাতির পক্ষে তাহাই মধ্যপথ। নানা অনিবার্য কারণে মানুষের ইতিহাসে কখনো যুদ্ধ আসে, কখনো শান্তি আসে; কখনো ধন-সম্পদের জোয়ার আসে, কখনো তাহার ভাঁটার দিন উপস্থিত হয়; কখনো নিজের শক্তিতে সে উন্মত্ত হইয়া উঠে, কখনো নিজের অক্ষমতাবোধে সে অভিভূত হইয়া পড়ে। এমন অবস্থায় মানুষ যখন এক দিকে হেলিয়া পড়িতেছে তখন আর-এক দিকে প্রবল টান দেওয়াই তাহার পক্ষে সংশিক্ষা। মানুষের প্রকৃতি যখন সবলভাবে সজীব থাকে তখন আপনার ভিতর হইতেই একটা সহজ শক্তিতে আপনার ভারসামঞ্জস্যের পথ সে বাছিয়া লয়। যে মানুষের নিজের শরীরের উপর দখল আছে সে যখন এক দিক হইতে ধাক্কা খায় তখন সে স্বভাবতই অন্য দিকে ভর দিয়া আপনাকে সামলাইয়া লয়, কিন্তু মাতাল একটু ঠেলা খাইলেই কাৎ হইয়া পড়ে এবং সেই অবস্থাতেই পড়িয়া থাকে। য়ুরোপে ছেলেদের মানুষ করিবার পন্থা আপনা-আপনি পরিবর্তিত হইতেছে। ইহাদের চিত্ত যতই নানা ভাবের জ্ঞানের অভিজ্ঞতার সংস্রবে সচেতন হইয়া উঠিতেছে ততই ইহাদের পথের পরিবর্তন দ্রুত হইতেছে।

অতএব, চিত্তের গতি-অনুসারেই শিক্ষার পথ নির্দেশ করিতে হয়। কিন্তু যেহেতু গতি বিচিত্র এবং তাহাকে সকলে স্পষ্ট করিয়া চোখে দেখিতে পায় না, এইজন্যই কোনোদিনই কোনো এক জন বা এক দল লোক এই পথ দৃঢ় করিয়া নির্দিষ্ট করিয়া দিতে পারে না। নানা লোকের নানা চেষ্টার সমবায়ে আপনিই সহজ পথটি অঙ্কিত হইতে থাকে। এইজন্য সকল জাতির পক্ষেই আপন পরীক্ষার পথ খোলা রাখাই সত্যপথ-আবিষ্কারের একমাত্র পন্থা।

কিন্তু, যে দেশে সামাজিক শিক্ষাশালায় বাঁধা প্রথা হইতে এক চুল সরিয়া গেলে জাত হারাইতে হয় সে দেশে মানুষ হইবার পক্ষে গোড়াতেই একটা প্রকাণ্ড বাধা। সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটিতেছেই এবং ঘটিবেই, কেহ তাহাকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারিবে না, অথচ ব্যবস্থাকে সনাতন রেখায় পাকা করিয়া রাখিলে মানুষের পক্ষে তেমন দুর্গতির কারণ আর-কিছুই হইতে পারে না। এ কেমনতরো? যেমন, নদী সরিয়া যাইতেছে, কিন্তু বাঁধা ঘাট একই জায়গায় পড়িয়া আছে; খেয়া-নৌকার পথ একই জায়গায় নির্দিষ্ট; সে ঘাট ছাড়া অন্য ঘাটে নামিলে ধোবা নাপিত বন্ধ। সুতরাং, ঘাট আছে কিন্তু জল পাই না, নৌকা আছে কিন্তু তাহার চলা বন্ধ।

এমন অবস্থায় আমাদের সমাজ আমাদের কালের উপযোগী শিক্ষা আমাদিগকে দিতেছে না, আমাদিগকে দুই-চারি হাজার বৎসর পূর্ব-কালের শিক্ষা দিতেছে। অতএব, মানুষ করিয়া তুলিবার পক্ষে সকলের চেয়ে যে বড়ো বিদ্যালয় সেটা আমাদের বন্ধ। আমাদের বর্তমান কালের দিকে তাকাইয়া আমাদের জীবনযাত্রার প্রতি তাহার কোনো দাবি নাই। একদিন আমাদের ইতিহাসের একটা বিশেষ অবস্থায় আমাদের সমাজ মানুষের কাহাকেও ব্রাহ্মণ, কাহাকেও ক্ষত্রিয়, কাহাকেও বৈশ্য বা শূদ্র হইতে বলিয়াছিল। আমাদের প্রতি তাহার এই একটা কালোপযোগী দাবি ছিল, সুতরাং এই দাবির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া শিক্ষার ব্যবস্থা বিচিত্র আকারে আপনিই আপনাকে সৃষ্টি করিয়া তুলিতেছিল। কারণ, সৃষ্টির নিয়মই তাই: একটা মূল ভাবের বীজ জীবনের তাগিদে স্বতই আপন শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া বাড়িয়া ওঠে, বাহির হইতে কেহ ডালপালা সংগ্রহ করিয়া আনিয়া জুড়িয়া দেয় না। আমাদের বর্তমান সমাজের কোনো সজীব দাবি নাই; এখনো সে মানুষকে বলিতেছে, 'ব্রাহ্মণ হও, শূদ্র হও।' যাহা বলিতেছে তাহা সত্যভাবে পালন করা কোনোমতেই সম্ভবপর নহে, সুতরাং মানুষ তাহাকে কেবলমাত্র বাহিরের দিক হইতে মানিয়া লইতেছে। ব্রাহ্মণ হইবার কালে ব্রহ্মচর্য নাই, মাথা মুড়াইয়া তিন দিনের প্রহসন অভিনয়ের পর গলায় সূত্রধারণ আছে। তপস্যার দ্বারা পবিত্র জীবনের শিক্ষা ব্রাহ্মণ এখন আর দান করিতে পারে না, কিন্তু পদধূলিদানের বেলায় সে অসংকোচে মুক্তপদ। এ দিকে জাতিভেদের মূল প্রতিষ্ঠা বৃত্তিভেদ একেবারেই ঘুচিয়া গেছে এবং তাহাকে রক্ষা করাও সম্পূর্ণ অসম্ভব হইয়াছে, অথচ বর্ণভেদের বাহ্য বিধিনিষেধ সমস্তই অচল হইয়া বসিয়া আছে। খাঁচাটাকে তাহার সমস্ত লোহার শিক ও শিকল-সমেত মানিতেই হইবে, অথচ পাখিটা মরিয়া গেছে। দানাপানি নিয়ত জোগাইতেছি, অথচ তাহা কোনো প্রাণীর খোরাকে লাগিতেছে না। এমনি করিয়া আমাদের সামাজিক জীবনের সঙ্গে সামাজিক বিধির বিচ্ছেদ ঘটিয়া যাওয়াতে আমরা কেবল যে অনাবশ্যক কালবিরোধী ব্যবস্থার দ্বারা বাধাগ্রস্ত হইয়া আছি তাহা নহে, আমরা সামাজিক সত্যরক্ষা করিতে পারিতেছি না। আমরা মূল্য দিতেছি ও লইতেছি, অথচ তাহার পরিবর্তে কোনো সত্যবস্তু নাই। শিষ্য গুরুকে প্রণাম করিয়া দক্ষিণা চুকাইয়া দিতেছে, কিন্তু গুরু শিষ্যকে গুরুর দেনা শোধ করিবার চেষ্টামাত্র করিতেছে না এবং গুরু পুরাকালের বিস্মৃত ভাষায় শিষ্যকে উপদেশ দিতেছে— শিষ্যের তাহা গ্রহণ করিবার মতো শ্রদ্ধাও নাই, সাধ্যও নাই, ইচ্ছাও নাই। ইহার ফল হইতেছে এই, সত্যবস্তুর যে কোনো প্রয়োজন আছে এই বিশ্বাসটাই আমরা ক্রমশ হারাইতেছি। এ কথা স্বীকার করিতে আমরা লেশমাত্র লজ্জাও বোধ করি না যে, বাহিরের ঠাট বজায় রাখিয়া গেলেই যথেষ্ট। এমন-কি, এ কথা বলিতেও আমাদের বাধে না যে 'ব্যবহারত যথেচ্ছাচার করো কিন্তু প্রকাশ্যত তাহা কবুল না করিলে কোনো ক্ষতি নাই'। এমনতরো মিথ্যাচার মানুষকে দায়ে পড়িয়া অবলম্বন করিতে হয়। কারণ, যখন তোমার শ্রদ্ধা অন্য পথে গিয়াছে তখনো সমাজ যদি কঠোর শাসনে আচারকে একই জায়গায় বাঁধিয়া রাখে তাহা হইলে সমাজের পনেরো আনা লোক মিথ্যাচারকে অবলম্বন করিতে লজ্জাবোধ করে না। কারণ, মানুষের মধ্যে বীরপুরুষের সংখ্যা অল্প; অতএব সত্যকে প্রকাশ্যে স্বীকার করিবার দণ্ড যেখানে অসহ্যরূপে অতিমাত্র সেখানে কপটতাকে অপরাধ বলিয়া গণ্য করা আর চলে না। এইজন্য আমাদের দেশে এই একটা অদ্ভুত ব্যাপার প্রত্যহই দেখা যায়— মানুষ একটা জিনিসকে ভালো বলিয়া

স্বীকার করিতে অনায়াসে পারে, অথচ সেই মুহূর্তেই অম্লানবদনে বলিতে পারে যে 'সামাজিক ব্যবহারে ইহা আমি পালন করিতে পারিব না'। আমরাও এই মিথ্যাচারকে ক্ষমা করি যখন চিন্তা করিয়া দেখি, এ সমাজে নিজের সত্যবিশ্বাসকে কাজে খাটাইবার মাশুল কত অসাধ্যরূপে অতিরিক্ত।

অতএব, সমাজ যেখানে জীবনপ্রবাহের সহিত আপন স্বাস্থ্যকর সামঞ্জস্যের পথ একেবারেই খোলা রাখে নাই, সুতরাং পুরাতন কালের ব্যবস্থা যেখানে পদে পদে বাধাস্বরূপ হইয়া তাহাকে বদ্ধ করিয়া তুলিতেছে, সেখানে মানুষের যে শিক্ষাশালা সকলের চেয়ে স্বাভাবিক ও প্রশস্ত সেটা যে আমাদের পক্ষে নাই তাহা নহে—তাহা তদপেক্ষা ভয়ংকর, তাহা আছে অথচ নাই, তাহা সত্যকে পথ ছাড়িয়া দেয় না এবং মিথ্যাকে জমাইয়া রাখে। এ সমাজ গতিকে একেবারেই স্বীকার করিতে চায় না বলিয়া স্থিতিকে কলুষিত করিয়া তোলে।

সামাজিক বিদ্যালয়ের তো এই বদ্ধ দশা, তাহার পরে রাজকীয় বিদ্যালয়। সেও একটা প্রকাণ্ড ছাঁচে-ঢালা ব্যাপার। দেশের সমস্ত শিক্ষাবিধিকে সে এক ছাঁচে শক্ত করিয়া জমাইয়া দিবে, ইহাই তাহার একমাত্র চেষ্টা। পাছে দেশ আপনার স্বতন্ত্র প্রণালী আপনি উদ্ভাবিত করিতে চায়, ইহাই তাহার সব চেয়ে ভয়ের বিষয়। দেশের মনঃপ্রকৃতিতে একাধিপত্য বিস্তার করিয়া সে আপনার আইন খাটাইবে, ইহাই তাহার মতলব। সুতরাং এই বৃহৎ বিদ্যার কল কেরানিগিরির কল হইয়া উঠিতেছে। মানুষ এখানে নোটের নুড়ি কুড়াইয়া ডিগ্রির বস্তা বোঝাই করিয়া তুলিতেছে, কিন্তু তাহা জীবনের খাদ্য নহে। তাহার গৌরব কেবল বোঝাইয়ের গৌরব, তাহা প্রাণের গৌরব নহে।

সামাজিক বিদ্যালয়ের পুরাতন শিকল এবং রাজকীয় বিদ্যালয়ের নূতন শিকল দুইই আমাদের মনকে যে পরিমাণে বাঁধিতেছে সে পরিমাণে মুক্তি দিতেছে না, ইহাই আমাদের একমাত্র সমস্যা। নতুবা নূতন প্রণালীতে কেমন করিয়া ইতিহাস মুখস্থ সহজ হইয়াছে বা অঙ্ক কষা মনোরম হইয়াছে, সেটাকে আমি বিশেষ খাতির করিতে চাই না। কেননা আমি জানি, আমরা যখন প্রণালীকে খুঁজি তখন একটা অসাধ্য সস্তা পথ খুঁজি। মনে করি, উপযুক্ত মানুষকে যখন নিয়মিত ভাবে পাওয়া শক্ত তখন বাঁধা প্রণালীর দ্বারা সেই অভাব পূরণ করা যায় কি না। মানুষ বারবার সেই চেষ্টা করিয়া বারবারই অকৃতকার্য হইয়াছে এবং বিপদে পড়িয়াছে। ঘুরিয়া ফিরিয়া যেমন করিয়াই চলি-না কেন শেষকালে এই অলঙ্ঘ্য সত্যে আসিয়া ঠেকিতেই হয় যে, শিক্ষকের দ্বারাই শিক্ষাবিধান হয়, প্রণালীর দ্বারা হয় না। মানুষের মন চলনশীল এবং চলনশীল মনই তাহাকে বুঝিতে পারে। এ দেশেও পুরাকাল হইতে আজ পর্যন্ত এক-একজন বিখ্যাত শিক্ষক জন্মিয়াছেন, তাঁহারাই ভগীরথের মতো শিক্ষার পুণ্য স্রোতকে আকর্ষণ করিয়া সংসারের পাপের বোঝা হ্রাস করিয়াছেন ও মৃত্যুর জড়তা দূর করিয়াছেন। তাঁহারাই শিক্ষাসম্বন্ধীয় সমস্ত বাঁধা বিধানের বাধার ভিতর দিয়াও ছাত্রদের মনে প্রাণপ্রবাহ সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছেন। আমাদের দেশেও ইংরেজি শিক্ষার আরম্ভদিনের কথা স্মরণ করিয়া দেখো। ডিরোজিয়ো, কাপ্তেন রিচার্ড্‌সন, ডেভিড হেয়ার, ইঁহারা শিক্ষক ছিলেন; শিক্ষার ছাঁচ ছিলেন না, নোটের বোঝার বাহন ছিলেন না। তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যূহ এমন ভয়ংকর পাকা ছিল না, তখন তাহার মধ্যে আলো এবং হাওয়া-প্রবেশের উপায় ছিল; তখন নিয়মের ফাঁকে শিক্ষক আপন আসন পাতিবার স্থান করিয়া লইতে পারিতেন।

যেমন করিয়া হউক, আমাদের দেশে বিদ্যার ক্ষেত্রকে প্রাচীরমুক্ত করিতেই হইবে। রাজনৈতিক আন্দোলন প্রভৃতি বাহ্য পন্থায় আমরা আমাদের চেষ্টাকে বিক্ষিপ্ত করিয়া ফেলিয়া বিশেষ কোনো ফল পাইতেছি না। সেই শক্তিকে ও উদ্যমকে সফলতার পথে প্রবাহিত করিয়া স্বাধীনভাবে দেশকে শিক্ষাদানের ভার আমাদের নিজেকে লইতে হইবে। দেশের কাজে যাঁহারা আত্মসমর্পণ করিতে চান এইটেই তাঁহাদের সব চেয়ে প্রধান কাজ। নানা শিক্ষকের নানা পরীক্ষার ভিতর দিয়া আমাদের দেশের শিক্ষার স্রোতকে সচল করিয়া তুলিতে পারিলে তবেই তাহা আমাদের দেশের স্বাভাবিক সামগ্রী হইয়া উঠিবে। তবেই আমরা স্থানে স্থানে ও ক্ষণে ক্ষণে যথার্থ শিক্ষকের দেখা পাইব। তবেই স্বভাবের নিয়মে শিক্ষকপরম্পরা আপনি জাগিয়া উঠিতে থাকিবে। 'জাতীয়' নামের দ্বারা চিহ্নিত করিয়া আমরা কোনো-একটা বিশেষ শিক্ষাবিধিকে উদ্ভাবিত করিয়া তুলিতে পারি না। যে শিক্ষা স্বজাতির নানা লোকের নানা চেষ্টার দ্বারা নানা ভাবে চালিত হইতেছে তাহাকেই 'জাতীয়' বলিতে পারি। স্বজাতীয়ের শাসনেই হউক আর বিজাতীয়ের শাসনে হউক, যখন কোনো-একটা বিশেষ শিক্ষাবিধি সমস্ত দেশকে একটা কোনো ধ্রুব আদর্শে বাঁধিয়া ফেলিতে চায় তখন তাহাকে 'জাতীয়' বলিতে পারিব না; তাহা সাম্প্রদায়িক, অতএব জাতির পক্ষে তাহা সাংঘাতিক।

শিক্ষা সম্বন্ধে একটা মহৎ সত্য আমরা শিখিয়াছিলাম। আমরা জানিয়াছিলাম, মানুষ মানুষের কাছ হইতেই শিখিতে পারে; যেমন জলের দ্বারাই জলাশয় পূর্ণ হয়, শিখার দ্বারাই শিখা জ্বলিয়া উঠে, প্রাণের দ্বারাই প্রাণ সঞ্চারিত হইয়া থাকে। মানুষকে ছাঁটিয়া ফেলিলেই সে তখন আর মানুষ থাকে না, সে তখন আপিস-আদালতের বা কল-কারখানার প্রয়োজনীয় সামগ্রী হইয়া উঠে; তখনি সে মানুষ না হইয়া মাস্টার-মশায় হইতে চায়; তখনি সে আর প্রাণ দিতে পারে না, কেবল পাঠ দিয়া যায়। গুরু-শিষ্যের পরিপূর্ণ আত্মীয়তার সম্বন্ধের ভিতর দিয়াই শিক্ষাকার্য সজীব দেহের শোণিতস্রোতের মতো চলাচল করিতে পারে। কারণ, শিশুদের পালন ও শিক্ষণের যথার্থ ভার পিতামাতার উপর। কিন্তু পিতামাতার সে যোগ্যতা অথবা সুবিধা না থাকাতেই অন্য উপযুক্ত লোকের সহায়তা অত্যাবশ্যাক হইয়া ওঠে। এমন অবস্থায় গুরুকে পিতামাতা না হইলে চলে না। আমরা জীবনের শ্রেষ্ঠ জিনিসকে টাকা দিয়া কিনিয়া বা আংশিকভাবে গ্রহণ করিতে পারি না, তাহা স্নেহ-প্রেম-ভক্তির দ্বারাই আমরা আত্মসাৎ করিতে পারি; তাহাই মনুষ্যত্বের পাকযন্ত্রের জারকরস, তাহাই জৈব সামগ্রীকে জীবনের সঙ্গে সম্মিলিত করিতে পারে। বর্তমান কালে আমাদের দেশের শিক্ষায় সেই গুরুর জীবনই সকলের চেয়ে অত্যাবশ্যাক হইয়াছে। শিশুবয়সে নির্জীব শিক্ষার মতো ভয়ংকর ভার আর কিছুই নাই, তাহা মনকে যতটা দেয় তাহার চেয়ে পিষিয়া বাহির করে অনেক বেশি। আমাদের সমাজব্যবস্থায় আমরা সেই গুরুকে খুঁজিতেছি যিনি আমাদের জীবনকে গতিদান করিবেন; আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় আমরা সেই গুরুকে খুঁজিতেছি যিনি আমাদের চিত্তের গতিপথকে বাধামুক্ত করিবেন। যেমন করিয়া হউক, সকল দিকেই আমরা মানুষকে চাই; তাহার পরিবর্তে প্রণালীর বটিকা গিলাইয়া কোনো কবিরাজ আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবেন না।

চ্যাল্‌ফোর্ড্‌। ৩১ শ্রাবণ ১৩১৯

আশ্বিন ১৩১৯

লক্ষ্য ও শিক্ষা

আমার কোনো-এক বন্ধু ফলিত জ্যোতিষ লইয়া আলোচনা করেন। তিনি একবার আমাকে বলিয়াছিলেন, যে-সব মানুষ বিশেষ কিছুই নহে, যাহাদের জীবনে হাঁ এবং না জিনিসটা খুব স্পষ্ট করিয়া দাগা নাই, জ্যোতিষের গণনা তাহাদের সম্বন্ধে ঠিক দিশা পায় না। তাহাদের সম্বন্ধে শুভগ্রহ ও অশুভগ্রহের ফল কী তাহা হিসাবের মধ্যে আনা কঠিন। বাতাস যখন জোরে বহে তখন পালের জাহাজ হুহু করিয়া দুই দিনের রাস্তা এক দিনে চলিয়া যাইবে এ কথা বলিতে সময় লাগে না, কিন্তু কাগজের নৌকাটা এলোমেলো ঘুরিতে থাকিবে কি ডুবিয়া যাইবে, কি কী হইবে তাহা বলা যায় না। যাহার বিশেষ কোনো একটা বন্দর নাই তাহার অতীতই বা কী আর ভবিষ্যৎই বা কী? সে কিসের জন্য প্রতীক্ষা করিবে, কিসের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করিবে? তাহার আশা-তাপমানযন্ত্রে দুরাশার উচ্চতম রেখা অন্য দেশের নৈরাশ্যরেখার কাছাকাছি।

আমাদের দেশের বর্তমান সমাজে এই অবস্থাটাই সব চেয়ে সাংঘাতিক অবস্থা—আমাদের জীবনে সুস্পষ্টতা নাই। আমরা যে কী হইতে পারি, কতদূর আশা করিতে পারি, তাহা বেশ মোটা লাইনে বড়ো রেখায় দেশের কোথাও আঁকা নাই। আশা করিবার অধিকারই মানুষের শক্তিকে প্রবল করিয়া তোলে। প্রকৃতির গৃহিণীপনায় শক্তির অপব্যয় ঘটিতে পারে না, এইজন্য আশা যেখানে নাই শক্তি সেখান হইতে বিদায় গ্রহণ করে। বিজ্ঞানশাস্ত্রে বলে চক্ষুষ্মান প্রাণীরা যখন দীর্ঘকাল গৃহবাসী হইয়া থাকে তখন তাহারা দৃষ্টিশক্তি হারায়। আলোক থাকিবে না অথচ দৃষ্টি থাকিবে এই অসংগতি যেমন প্রকৃতি সহিতে পারে না তেমনি আশা নাই অথচ শক্তি আছে ইহাও প্রকৃতির পক্ষে অসহ্য। এইজন্য বিপদের মুখে পলায়নের যখন উপায় নাই পলায়নের শক্তিও তখন আড়ষ্ট হইয়া পড়ে।

এই কারণে দেখা যায়, আশা করিবার ক্ষেত্র বড়ো হইলেই মানুষের শক্তিও বড়ো হইয়া বাড়িয়া ওঠে। শক্তি তখন স্পষ্ট করিয়া পথ দেখিতে পায় এবং জোর করিয়া পা ফেলিয়া চলে। কোনো সমাজ সকলের চেয়ে বড়ো জিনিস যাহা মানুষকে দিতে পারে তাহা সকলের চেয়ে বড়ো আশা। সেই আশার পূর্ণ সফলতা সমাজের প্রত্যেক লোকেই যে পায় তাহা নহে; কিন্তু নিজের গোচরে এবং অগোচরে সেই আশার অভিমুখে সর্বদাই একটা তাগিদ থাকে বলিয়াই প্রত্যেকের শক্তি তাহার নিজের সাধ্যের শেষ পর্যন্ত অগ্রসর হইতে পারে। একটা জাতির পক্ষে সেইটেই সকলের চেয়ে মস্ত কথা। লোকসংখ্যার কোনো মূল্য নাই; কিন্তু সমাজে যতগুলি লোক আছে তাহাদের অধিকাংশের যথাসম্ভব শক্তি-সম্পদ কাজে খাটিতেছে, মাটিতে পোঁতা নাই, ইহাই সমৃদ্ধি। শক্তি যেখানে গতিশীল হইয়া আছে সেইখানেই মঙ্গল, ধন যেখানে সজীব হইয়া খাটিতেছে সেইখানেই ঐশ্বর্য।

এই পাশ্চাত্য দেশে লক্ষ্যবেধের আহ্বান সকলেই শুনিতে পাইয়াছে; মোটের উপর সকলেই জানে সে কী চায়; এইজন্য সকলেই আপনার ধনুকবাণ লইয়া প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছে। যজ্ঞসম্ভবা যাজ্ঞসেনীকে পাইবে এই আশায় যে লক্ষ্য বহু উচ্চে ঝুলিতেছে তাহাকে বিদ্ধ করিতে সকলেই পণ করিয়াছে। এই লক্ষ্যবেধের নিমন্ত্রণ আমরা পাই নাই। এইজন্য কী পাইতে হইবে সে বিষয়ে অধিক চিন্তা

করা আমাদের পক্ষে অনাবশ্যক এবং কোথায় যাইতে হইবে তাহাও আমাদের সম্মুখে স্পষ্ট করিয়া নির্দিষ্ট নাই।

এইজন্য যখন এমনতরো প্রশ্ন শুনি 'আমরা কী শিখিব, কেমন করিয়া শিখিব, শিক্ষার কোন্ প্রণালী কোথায় কী ভাবে কাজ করিতেছে' তখন আমার এই কথাই মনে হয়, শিক্ষা জিনিসটা তো জীবনের সঙ্গে সংগতি-হীন একটা কৃত্রিম জিনিস নহে। আমরা কী হইব এবং আমরা কী শিখিব এই দুটা কথা একেবারে গায়ে গায়ে সংলগ্ন। পাত্র যত বড়ো জল তাহার চেয়ে বেশি ধরে না।

চাহিবার জিনিস আমাদের বেশি কিছু নাই। সমাজ আমাদিগকে কোনো বড়ো ডাক ডাকিতেছে না, কোনো বড়ো ত্যাগে টানিতেছে না; ওঠা-বসা খাওয়া-ছোঁয়ার কতকগুলো কৃত্রিম নিরর্থক নিয়ম-পালন ছাড়া আমাদের কাছ হইতে সে আর-কোনো বিষয়ে কোনো কৈফিয়ত চায় না। রাজশক্তিও আমাদের জীবনের সম্মুখে কোনো বৃহৎ সঞ্চরণের ক্ষেত্র অবারিত করিয়া দেয় নাই; সেখানকার কাঁটার বেড়াটুকুর মধ্যে আমরা যেটুকু আশা করিতে পারি তাহা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর; এবং সেই বেড়ার ছিদ্র দিয়া আমরা যেটুকু দেখিতে পাই তাহাও অতি যৎসামান্য।

জীবনের ক্ষেত্রকে বড়ো করিয়া দেখিতে পাই না বলিয়াই জীবনকে বড়ো করিয়া তোলা এবং বড়ো করিয়া উৎসর্গ করিবার কথা আমাদের স্বভাবত মনেই আসে না। সে সম্বন্ধে যেটুকু চিন্তা করিতে যাই তাহা পুঁথিগত চিন্তা, যেটুকু কাজ করিতে যাই সেটুকু অন্যের অনুকরণ। আমাদের আরও বিপদ এই যে, যাহারা আমাদের খাঁচার দরজা এক মুহূর্তের জন্য খুলিয়া দেয় না তাহারাই রাত্রিদিন বলে 'তোমাদের উড়িবার শক্তি নাই'। পাখির ছানা তো বি. এ. পাস করিয়া উড়িতে শেখে না; উড়িতে পায় বলিয়াই উড়িতে শেখে। সে তাহার স্বজনসমাজের সকলকেই উড়িতে দেখে; সে নিশ্চয় জানে তাহাকে উড়িতেই হইবে। উড়িতে পারা যে সম্ভব এ সম্বন্ধে কোনোদিন তাহার মনে সন্দেহ আসিয়া তাহাকে দুর্বল করিয়া দেয় না। আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে, অপরে আমাদের শক্তি সম্বন্ধে সর্বদা সন্দেহ প্রকাশ করে বলিয়াই এবং সেই সন্দেহকে মিথ্যা প্রমাণ করিবার কোনো ক্ষেত্র পাই না বলিয়াই অন্তরে অন্তরে নিজের সম্বন্ধেও একটা সন্দেহ বদ্ধমূল হইয়া যায়। এমনি করিয়া আপনার প্রতি যে লোক বিশ্বাস হারায় সে কোনো বড়ো নদী পাড়ি দিবার চেষ্টা পর্যন্তও করিতে পারে না; অতি ক্ষুদ্র সীমানার মধ্যে ডাঙার কাছে কাছে সে ঘুরিয়া বেড়ায় এবং তাহাতেই সে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট থাকে এবং যেদিন সে কোনো গতিকে বাগবাজার হইতে বরানগর পর্যন্ত উজান ঠেলিয়া যাইতে পারে সেদিন সে মনে করে, 'আমি অবিকল কলম্বসের সমতুল্য কীর্তি করিয়াছি।'

'তুমি কেরানির চেয়ে বড়ো, ডেপুটি মুনসেফের চেয়ে বড়ো, তুমি যাহা শিক্ষা করিতেছ তাহা হাউইয়ের মতো কোনোক্রমে ইস্কুলমাস্টারি পর্যন্ত উড়িয়া তাহার পর পেন্সনভোগী জরাজীর্ণতার মধ্যে ছাই হইয়া মাটিতে আসিয়া পড়িবার জন্য নহে' এই মন্ত্রটি জপ করিতে দেওয়ার শিক্ষাই আমাদের দেশে সকলের চেয়ে প্রয়োজনীয় শিক্ষা এই কথাটা আমাদের নিশিদিন মনে রাখিতে হইবে। এইটে বুঝিতে না পারার মূঢ়তাই আমাদের সকলের চেয়ে বড়ো মূঢ়তা। আমাদের সমাজে এ কথা আমাদিগকে বোঝায় না, আমাদের ইস্কুলেও এ শিক্ষা নাই।

কিন্তু যদি কেহ মনে করেন তবে বুঝি দেশের সম্বন্ধে আমি হতাশ হইয়া পড়িয়াছি, তবে তিনি ভুল বুঝিবেন। আমরা কোথায় আছি, কোন্ দিকে চলিতেছি তাহা সুস্পষ্ট করিয়া জানা চাই। সে জানাটা যতই অপ্রিয় হউক তবু

সেটা সর্বাগ্রে আবশ্যক। আমরা এপর্যন্ত বারবার নিজের দুর্গতি সম্বন্ধে নিজেকে কোনোমতে ভুলাইয়া আরাম পাইবার চেষ্টা করিয়াছি। এ কথা বলিয়া কোনো লাভ নাই, মানুষকে মানুষ করিয়া তুলিবার পক্ষে আমাদের সনাতন সমাজ বিশ্বসংসারের সকল সমাজের সেরা; এত বড়ো একটা অদ্ভুত অত্যুক্তি যাহা মানবের ইতিহাসে প্রত্যক্ষতই প্রত্যহ আপনাকে অপ্রমাণ করিয়া দিয়াছে তাহাকে আড়ম্বরসহকারে ঘোষণা করা নিশ্চেষ্টতার গায়েরজোরি কৈফিয়ত; যে লোক কোনোমতেই কিছু করিবে না এবং নড়িবে না সে এমনি করিয়াই আপনার কাছে ও অন্যের কাছে আপনার লজ্জা রক্ষা করিতে চায়। গোড়াতেই নিজের এই মোহটাকে কঠিন আঘাতে ছিন্ন করিয়া ফেলা চাই। বিষফোড়ায় চিকিৎসক যখন অস্ত্রাঘাত করে তখন সেই ক্ষত আপনার আঘাতের মুখকে কেবলই ঢাকিয়া ফেলিতে চায়; কিন্তু সুচিকিৎসক ফোড়ার সেই চেষ্টাকে আমল দেয় না, যতদিন না আরোগ্যের লক্ষণ দেখা দেয় ততদিন প্রত্যহই ক্ষতমুখ খুলিয়া রাখে। আমাদের দেশের প্রকাণ্ড বিষফোড়া বিধাতার কাছ হইতে মস্ত একটা অস্ত্রাঘাত পাইয়াছে; এই বেদনা তাহার প্রাপ্য; কিন্তু প্রতিদিন ইহাকে সে ফাঁকি দিয়া ঢাকিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে। সে আপনার অপমানকে মিথ্যা করিয়া লুকাইতে গিয়া সেই অপমানের ফোড়াকে চিরস্থায়ী করিয়া পুষিয়া রাখিবার উদ্যোগ করিতেছে। কিন্তু যতবার সে ঢাকিবে চিকিৎসকের অস্ত্রাঘাত ততবারই তাহার সেই মিথ্যা অভিমানকে বিদীর্ণ করিয়া দিবে। এ কথা তাহাকে একদিন সুস্পষ্ট করিয়া স্বীকার করিতেই হইবে, ফোড়াটা তাহার বাহিরের জোড়াদেওয়া আকস্মিক জিনিস নহে। ইহা তাহার ভিতরকারই ব্যাধি। দোষ বাহিরের নহে, তাহার রক্ত দূষিত হইয়াছে; নহিলে এমন সাংঘাতিক দুর্বলতা, এমন মোহাবিষ্ট জড়তা মানুষকে এত দীর্ঘকাল এমন করিয়া সকল বিষয়ে পরাভূত করিয়া রাখিতে পারে না। আমাদের নিজের সমাজই আমাদের নিজের মনুষ্যত্বকে পীড়িত করিয়াছে, ইহার বুদ্ধিকে ও শক্তিকে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছে; সেইজন্যই সে সংসারে কোনোমতেই পারিয়া উঠিতেছে না। এই আপনার সম্বন্ধে আপনার মোহকে জোরের সঙ্গে স্পষ্ট করিয়া ভাঙিতে দেওয়া নৈরাশ্য ও নিশ্চেষ্টতার লক্ষণ নহে। ইহাই চেষ্টার পথকে মুক্তি দিবার উপায় এবং মিথ্যা আশার বাসা ভাঙিয়া দেওয়াই নৈরাশ্যকে যথার্থভাবে নির্বংশ করিবার পন্থা।

আমার বলিবার কথা এই, শিক্ষা কোনো দেশেই সম্পূর্ণত ইস্কুল হইতে হয় না এবং আমাদের দেশেও হইতেছে না। পরিপাকশক্তি ময়রার দোকানে তৈরি হয় না, খাদ্যই তৈরি হয়। মানুষের শক্তি যেখানে বৃহৎভাবে উদ্যমশীল সেইখানেই তাহার বিদ্যা তাহার প্রকৃতির সঙ্গে মেশে। আমাদের জীবনের চালনা হইতেছে না বলিয়াই আমাদের পুঁথির বিদ্যাকে আমাদের প্রাণের মধ্যে আয়ত্ত করিতে পারিতেছি না।

এ কথা মনে উদয় হইতে পারে, তবে আর আমাদের আশা কোথায়? কারণ, জীবনের চালনাক্ষেত্র তো সম্পূর্ণ আমাদের হাতে নাই; পরাধীন জাতির কাছে তো শক্তির দ্বার খোলা থাকিতে পারে না।

এ কথা সত্য হইলেও সম্পূর্ণ সত্য নহে। বস্তুত, শক্তির ক্ষেত্র সকল জাতির পক্ষেই কোনো না কোনো দিকে সীমাবদ্ধ। সর্বত্রই অন্তরপ্রকৃতি এবং বাহিরের অবস্থা উভয়ে মিলিয়া আপসে আপনার ক্ষেত্রকে নির্দিষ্ট করিয়া লয়। এই সীমানির্দিষ্ট ক্ষেত্রই সকলের পক্ষে দরকারি; কারণ, শক্তিকে বিক্ষিপ্ত করা শক্তিকে

ব্যবহার করা নহে। কোনো দেশেই অনুকূল অবস্থা মানুষকে অবারিত স্বাধীনতা দেয় না, কারণ তাহা ব্যর্থতা। ভাগ্য আমাদিগকে যাহা দেয় তাহা ভাগ করিয়াই দেয়; এক দিকে যাহার ভাগে বেশি পড়ে অন্য দিকে তাহার কিছু না কিছু কম পড়িবেই।

অতএব, কী পাইলাম সেটা মানুষের পক্ষে তত বড়ো কথা নয়, সেটাকে কেমন ভাবে গ্রহণ ও ব্যবহার করিব সেইটে যত বড়ো। সামাজিক বা মানসিক যে-কোনো ব্যবস্থায় সেই গ্রহণের শক্তিকে বাধা দেয়, সেই ব্যবহারের শক্তিকে পক্ষাঘাতগ্রস্ত করে, তাহাই সর্বনাশের মূল। মানুষ যেখানে কোনো জিনিসকেই পরখ করিয়া লইতে দেয় না, ছোটো বড়ো সকল জিনিসকেই বাঁধা বিশ্বাসের সহিত গ্রহণ করিতে ও বাঁধা নিয়মের দ্বারা ব্যবহার করিতে বলে, সেখানে অবস্থা যতই অনুকূল হউক-না কেন মনুষ্যত্বকে শীর্ণ হইতেই হইবে। আমাদের অবস্থার সংকীর্ণতা লইয়া আমরা আক্ষেপ করিয়া থাকি, কিন্তু আমাদের অবস্থা যে যথার্থত কী তাহা আমরা জানিই না; তাহাকে আমরা সকল দিকে পরখ করিয়া দেখি নাই। সেই পরখ করিয়া দেখিবার প্রবৃত্তিকেই আমরা অপরাধ বলিয়া সর্বাগ্রে দড়িদড়া দিয়া বাঁধিয়াছি। মানবপ্রকৃতির উপর ভরসা নাই বলিয়া এ কথা একেবারে ভুলিয়া বসিয়াছি যে, মানুষকে ভুল করিতে না দিলে মানুষকে শিক্ষা করিতে দেওয়া হয় না। মানুষকে সাহস করিয়া ভালো হইয়া উঠিবার প্রশস্ত অধিকার দিব না, তাহাকে সনাতন নিয়মে সকল দিকেই খর্ব করিয়া ভালো-মানুষির জেলখানায় চিরজীবন কারাদণ্ড বিধান করিয়া রাখিব, এমনতরো যাহাদের ব্যবস্থা তাহারা যতক্ষণ নিজের বেড়ি নিজে খুলিয়া না ফেলিবে এবং বেড়িটাকেই নিজের হাত-পায়ের চেয়ে পবিত্র ও পরমধন বলিয়া পূজা করা পরিত্যাগ না করিবে ততক্ষণ ভাগ্যবিধাতার কোনো বদান্যতায় তাহাদের কোনো স্থায়ী উপকার হইতে পারিবে না।

নিজের অবস্থাকে নিজের শক্তির চেয়ে প্রবল বলিয়া গণ্য করিবার মতো দীনতা আর কিছু নাই। মানুষের আকাঙ্ক্ষার বেগকে তাহার ব্যক্তিগত স্বার্থ, ব্যক্তিগত ভোগ, ব্যক্তিগত মুক্তির ক্ষুদ্র প্রলুব্ধতা হইতে উপরের দিকে জাগাইয়া তুলিতে পারিলেই তাহার এমন কোনো বাহ্য অবস্থাই নাই যাহার মধ্য হইতে সে বাড়িয়া উঠিতে পারে না; এমন-কি, সে অবস্থায় বাহিরের দারিদ্র্যই তাহাকে বড়ো হইয়া উঠিবার দিকে সাহায্য করে। কাঁঠাল গাছকে দ্রুত বেগে বাড়াইয়া তুলিবার জন্য আমাদের দেশে তাহার চারাকে বাঁশের চোঙের মধ্যে ঘিরিয়া বাঁধিয়া রাখে। সে চারা আশেপাশে ডালপালা ছড়াইতে পারে না, এইজন্য কোনোমতে চোঙের বেড়াকে ছাড়াইয়া আলোকে উঠিবার জন্য সে আপনার শক্তিকে একাগ্রভাবে চালনা করে এবং সিধা হইয়া আপন বন্ধনকে লঙ্ঘন করে। কিন্তু সেই চারাটির মজ্জার মধ্যে এই দুর্নিবার বেগটি সজীব থাকা চাই যে, 'আমাকে উঠিতেই হইবে, বাড়িতেই হইবে; আলোককে যদি পাশেই না পাই তবে তাহাকে উপরে খুঁজিতে বাহির হইব; মুক্তিকে যদি এক দিকে না পাই তবে তাহাকে অন্য দিকে লাভ করিবার জন্য চেষ্টা ছাড়িব না।' 'চেষ্টা করাই অপরাধ, যেমন আছি তেমনিই থাকিব' কোনো প্রাণবান জিনিস এমন কথা যখন বলে তখন তাহার পক্ষে বাঁশের চোঙও যেমন অনন্ত আকাশও তেমনি।

মানুষের সকলের চেয়ে যাহা পরম আশার সামগ্রী তাহা কখনো অসাধ্য হইতে পারে না, এ বিশ্বাস আমার মনে দৃঢ় আছে। আমাদের জাতির মুক্তি যদি পার্শ্বের

দিকে না থাকে তবে উপরের দিকে আছেই, এ কথা এক মুহূর্ত ভুলিলে চলিবে না। ডালপালা ছড়াইয়া পাশের দিকের বাড়টাকেই আমরা চারি দিকে দেখিতেছি, এইজন্য সেইটেকেই একমাত্র পরমার্থ বলিয়া ধরিয়া রাখিয়াছি, কিন্তু উচ্চের দিকের গতিও জীবনের গতি; সেখানেও সার্থকতার ফল সম্পূর্ণ হইয়াই ফলে। আসল কথা, এক দিকে হউক বা আর-এক দিকে হউক ভূমার আকর্ষণকে স্বীকার করিতেই হইবে; আমাদিগকে বড়ো হইতে হইবে, আরও বড়ো হইতে হইবে। সেই বাণী আমাদিগকে কান পাতিয়া শুনিতে হইবে যাহা আমাদিগকে কোণের বাহির করে, যাহা আমাদিগকে অনায়াসে আত্মত্যাগ করিতে শক্তি দেয়, যাহা কেবলমাত্র আপিসের দেয়াল ও চাকরির খাঁচাটুকুর মধ্যে আমাদের আকাঙ্ক্ষাকে বদ্ধ করিয়া রাখে না। আমাদের জাতীয় জীবনে সেই বেগ যখন সঞ্চারিত হইবে, সেই শক্তি যখন প্রবল হইয়া উঠিবে, তখন প্রতি মুহূর্তেই আমাদের অবস্থাকে আমরা অতিক্রম করিতে থাকিব; তখন আমাদের বাহ্য অবস্থার কোনো সংকোচ আমাদিগকে কিছুমাত্র লজ্জা দিতে পারিবে না।

বর্তমানের ইতিহাসকে সুনির্দিষ্ট করিয়া দেখা যায় না; এইজন্য যখন আলোক আসন্ন তখনও অন্ধকারকে চিরন্তন বলিয়া ভয় হয়। কিন্তু আমি তো স্পষ্টই মনে করি, আমাদের চিত্তের মধ্যে একটা চেতনার অভিঘাত আসিয়া পৌঁছিয়াছে। ইহার বেগ ক্রমশই আপনার কাজ করিতে থাকিবে, কখনোই আমাদিগকে নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে দিবে না। আমাদের প্রাণশক্তি কোনোমতেই মরিবে না, যে দিক দিয়া হউক তাহাকে বাঁচিতেই হইবে; সেই আমাদের দুর্জয় প্রাণচেষ্টা যেখানে একটু ছিদ্র পাইতেছে সেইখান দিয়াই এখনই আমাদিগকে আলোকের অভিমুখে ঠেলিয়া তুলিতেছে। মানুষের সম্মুখে যে পথ সর্বাপেক্ষা উন্মুক্ত বলিয়াই মানুষ যে পথ ভুলিয়া থাকে, রাজা যে পথে বাধা দিতে পারে না এবং দারিদ্র্য যে পথের পাথেয় হরণ করিতে অক্ষম, স্পষ্ট দেখিতেছি, সেই ধর্মের পথ আমাদের এই সর্বত্রপ্রতিহত চিত্তকে মুক্তির দিকে টানিতেছে। আমাদের দেশে এই পথযাত্রার আহ্বান বারম্বার নানা দিক হইতে নানা কণ্ঠে জাগিয়া উঠিতেছে। এই ধর্মবোধের জাগরণের মতো এত বড়ো জাগরণ জগতে আর কিছু নাই; ইহাই মূককে কথা বলায়, পঙ্গুকে পর্বত লঙ্ঘন করায়। ইহা আমাদের সমস্ত চিত্তকে চেতাইবে, সমস্ত চেষ্টাকে চালাইবে; ইহা আশার আলোকে এবং আনন্দের সংগীতে আমাদের বহুদিনের বঞ্চিত জীবনকে গৌরবান্বিত করিয়া তুলিবে। মানবজীবনের সেই পরম লক্ষ্য যতই আমাদের সম্মুখে স্পষ্ট হইয়া উঠিতে থাকিবে ততই আপনাকে অকৃপণভাবে আমরা দান করিতে পারিব এবং সমস্ত ক্ষুদ্র আকাঙ্ক্ষার জাল ছিন্ন হইয়া পড়িবে। আমাদের দেশের এই লক্ষ্যকে যদি আমরা সম্পূর্ণ সচেতনভাবে মনে রাখি তবেই আমাদের দেশের শিক্ষাকে আমরা সত্য আকার দান করিতে পারিব। জীবনের কোনো লক্ষ্য নাই অথচ শিক্ষা আছে, ইহার কোনো অর্থই নাই। আমাদের ভারতভূমি তপোভূমি হইবে, সাধকের সাধনক্ষেত্র হইবে, সাধুর কর্মস্থান হইবে, এইখানেই ত্যাগীর সর্বোচ্চ আত্মোৎসর্গের হোমাগ্নি জ্বলিবে— এই গৌরবের আশাকে যদি মনে রাখি তবে পথ আপনি প্রস্তুত হইবে এবং অকৃত্রিম শিক্ষাবিধি আপনি আপনাকে অঙ্কুরিত পল্লবিত ও ফলবান করিয়া তুলিবে। চ্যাল্‌ফোর্ড্‌। গ্লস্টরশিয়র। ১৯ অগস্ট ১৯১২

অগ্রহায়ণ ১৩১৯

স্ত্রীশিক্ষা

আমরা শ্রীমতী লীলা মিত্রের কাছ হইতে স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে একখানি চিঠি পাইয়াছি, তাহা আলোচনা করিয়া দেখিবার যোগ্য। চিঠিখানি এই—

এক দল লোক বলেন, স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজন নাই, কারণ স্ত্রীলোক শিক্ষিতা হইলে পুরুষের নানা বিষয়ে নানা অসুবিধা। শিক্ষিতা স্ত্রী স্বামীকে দেবতা বলিয়া মনে করে না, স্বামীসেবায় তার তেমন মন থাকে না, পড়াশুনা লইয়াই সে ব্যস্ত ইত্যাদি।

আবার আর-এক দল বলেন, স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজন খুবই আছে, কেননা আমরা পুরুষরা শিক্ষিত, আমরা যাহাদের লইয়া ঘরসংসার করিব তাহারা যদি আমাদের ভাব চিন্তা আশা আকাঙ্ক্ষা বুঝিতেই না পারে তবে আমাদের পারিবারিক সুখের ব্যাঘাত হইবে ইত্যাদি।

দুই দলই নিজেদের দিক হইতে স্ত্রীশিক্ষার বিচার করিতেছেন। নারীর যে পুরুষের মতো ব্যক্তিত্ব আছে, সে যে অন্যের জন্য সৃষ্ট নয়, তাহার নিজের জীবনের যে সার্থকতা আছে, তাহা স্ত্রীশিক্ষার স্বপক্ষের বা বিপক্ষের কোনো উকিল স্বীকার করেন না। উকিলরা যে পক্ষ লইয়াছেন বস্তুত তাহা তাঁহাদের নিজেরই পক্ষ। মামলার নিষ্পত্তিতে যাঁহাদের প্রকৃত স্বার্থ তাঁহাদের কথা কাহারও মনে উদয় হয় না, এইটেই আশ্চর্য।

বিদ্যা যদি মনুষ্যত্বলাভের উপায় হয় এবং বিদ্যালাভে যদি মানবমাত্রেরই সহজাত অধিকার থাকে তবে নারীকে কোন্ নীতির দোহাই দিয়া সে অধিকার হইতে বঞ্চিত করা যাইতে পারে বুঝিতে পারি না।

আবার, যাঁরা স্ত্রীলোককে তাঁহাদের নিজের জন্যই সৃষ্ট বলিয়া স্থির করিয়া বসিয়াছেন তাঁরা যেটুকু বিদ্যা স্ত্রীর জন্য উচ্ছিষ্ট রাখিতে চান তাহা হইতে স্ত্রীলোকের মনুষ্যত্বের যথোচিত পুষ্টি আশা করা বাতুলতা।

যাঁহারা শিক্ষাদানে স্ত্রী-পুরুষ উভয়কেই সমভাবে সাহায্য করিতে প্রবৃত্ত তাঁহারা সাধারণ পুরুষের পঙ্‌ক্তিতে পড়েন না; তাঁহাদের আসন অনেক উচ্চে, সুতরাং তাঁহাদের কথা ছাড়িয়া দেওয়াই উচিত।

অতএব, গরজ যাঁহাদের তাঁহাদিগকেই কার্যক্ষেত্রে নামিতে হইবে। নিজের উদ্যমে ও শক্তিতে নিজেকে মুক্ত না করিলে অন্যে মুক্তি দিতে পারে না। অন্যে যেটাকে মুক্তি বলিয়া উপস্থিত করে সেটা বন্ধনেরই অন্য মূর্তি। পুরুষ যে স্ত্রীশিক্ষার ছাঁচ গড়িয়াছে সেটা পুরুষের খেলার যোগ্য পুতুল গড়িবার ছাঁচ।

কিন্তু যিনি এ কার্যে অবতীর্ণা হইবেন তাঁহাকে সাধারণ স্ত্রীলোকের মতো গতানুগতিক হইলে চলিবে না। সংসারের লোকে যাহাকে সুখ বলে সেটাকে তিনি আদর্শ করিবেন না। এ কথা তাঁহাকে মনে রাখিতে হইবে, সন্তান গর্ভে ধারণ করাই তাঁহার চরম সার্থকতা নয়। তিনি পুরুষের আশ্রিতা, লজ্জাভয়ে লীলাঙ্গিনী, সামান্য ললনা নহেন; তিনি তাহার সংকটে সহায়, দুরূহ চিন্তায় অংশী এবং সুখে দুঃখে সহচরী হইয়া সংসারপথে প্রকৃত সহযাত্রী হইবেন।—

এই চিঠির মূল কথাটা আমি মানি। যাহা-কিছু জানিবার যোগ্য তাহাই বিদ্যা, তাহা পুরুষকেও জানিতে হইবে, মেয়েকেও জানিতে হইবে— শুধু কাজে খাটাইবার জন্য যে তাহা নয়, জানিবার জনাই।

মানুষ জানিতে চায়, সেটা তার ধর্ম; এইজন্য জগতের আবশ্যক অনাবশ্যক সকল তত্ত্বই তার কাছে বিদ্যা হইয়া উঠিয়াছে। সেই তার জানিতে চাওয়াকে যদি খোরাক না জোগাই কিম্বা তাকে কুপথ্য দিয়া ভুলাইয়া রাখি তবে তার মানবপ্রকৃতিকেই দুর্বল করি, এ কথা বলাই বাহুল্য।

কিন্তু, মানুষকে পুরা পরিমাণে মানুষ করিব এ কথা আমাদের সকলের অন্তরের কথা নয়। যখন সর্বসাধারণকে শিক্ষা দেওয়ার প্রস্তাব হয় তখন এক দল শিক্ষিত লোক বলিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমরা চাকর পাইব কোথা হইতে? বোধ হয় শীঘ্রই এ সম্বন্ধে রসিক লোকে প্রহসন লিখিবেন যাহাতে দেখা যাইবে—বাবুর চাকর কবিতা লিখিতেছে কিম্বা নক্ষত্রলোকের নাড়িনক্ষত্র গণনা করিবার জন্য বড়ো বড়ো অঙ্ক ফাঁদিয়া বসিয়াছে, বাবু তাহাকে ধুতি কোঁচাইবার জন্য ডাকিতে সাহস করিতেছেন না পাছে তার ধ্যানের ব্যাঘাত হয়। মেয়েদের সম্বন্ধেও সেই এক কথা যে, তারা যদি লেখাপড়া শেখে তবে যে ঝাঁটা বঁটি ও শিলনোড়া বাবুদের ভাগে পড়ে।

অথচ ইঁহাদের তর্কের যুক্তিটা এই যে, মেয়েদের প্রকৃতিই স্বতন্ত্র। কিন্তু তাই যদি হয় তবে তাঁহাদের ভয়টা কিসের? পৃথিবীকে আমরা চ্যাপ্‌টা ভাবি কিন্তু তাহা গোল, এ কথা জানিলে পুরুষের পৌরুষ কমে না। তেমনি, বাসুকির মাথার উপর পৃথিবী নাই এ খবরটা পাইলে মেয়েদের মেয়েলিভাব নষ্ট হইবে এ কথা যদি বলি তবে বুঝিতে হইবে, মেয়েরা মেয়েই নয়, আমরা তাহাদিগকে অজ্ঞানের ছাঁচে ঢালিয়া মেয়ে করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছি।

বিধাতা একদিন পুরুষকে পুরুষ এবং মেয়েকে মেয়ে করিয়া সৃষ্টি করিলেন, এটা তাঁর একটা আশ্চর্য উদ্ভাবন, সে কথা কবি হইতে আরম্ভ করিয়া জীবতত্ত্ববিৎ সকলেই স্বীকার করেন। জীবলোকে এই-যে একটা ভেদ ঘটিয়াছে এই ভেদের মুখ দিয়া একটা প্রবল শক্তি এবং পরম আনন্দের উৎস উৎসারিত হইয়া উঠিয়াছে। ইস্কুল-মাস্টার কিম্বা টেক্‌স্‌ট্‌বুক-কমিটি তাঁহাদের এক্সেসাইজের খাতা কিম্বা পাঠ্য ও অপাঠ্য বইয়ের বোঝা দিয়া এই শক্তি এবং সৌন্দর্য-প্রবাহের মুখে বাঁধ বাঁধিয়া দিতে পারেন, এমন কথা আমি মানি না। মোটের উপর, বিধাতা এবং ইস্কুল-মাস্টার এই দুইয়ের মধ্যে আমি বিধাতাকে বেশি বিশ্বাস করি। সেইজন্য আমার ধারণা এই যে, মেয়েরা যদি বা কাণ্ট্‌-হেগেল্‌ও পড়ে তবু শিশুদের স্নেহ করিবে এবং পুরুষদের নিতান্ত দূর-ছাই করিবে না।

কিন্তু তাই বলিয়া শিক্ষাপ্রণালীতে মেয়ে-পুরুষে কোথাও কোনো ভেদ থাকিবে না, এ কথা বলিলে বিধাতাকে অমান্য করা হয়। বিদ্যার দুটো বিভাগ আছে। একটা বিশুদ্ধ জ্ঞানের, একটা ব্যবহারের। যেখানে বিশুদ্ধ জ্ঞান সেখানে মেয়ে-পুরুষের পার্থক্য নাই, কিন্তু যেখানে ব্যবহার সেখানে পার্থক্য আছেই। মেয়েদের মানুষ হইতে শিখাইবার জন্য বিশুদ্ধ জ্ঞানের শিক্ষা চাই, কিন্তু তার উপরে মেয়েদের মেয়ে হইতে শিখাইবার জন্য যে ব্যবহারিক শিক্ষা তার একটা বিশেষত্ব আছে, এ কথা মানিতে দোষ কী?

মেয়েদের শরীরের এবং মনের প্রকৃতি পুরুষের হইতে স্বতন্ত্র বলিয়াই তাহাদের ব্যবহারের ক্ষেত্র স্বভাবতই স্বতন্ত্র হইয়াছে। আজকাল বিদ্রোহের ঝোঁকে এক দল মেয়ে এই গোড়াকার কথাটাকেই অস্বীকার করিতেছেন। তাঁরা বলেন, মেয়েদের ব্যবহারের ক্ষেত্র পুরুষের সঙ্গে একেবারে সমান।

এটা তাঁদের নিতান্তই ক্ষোভের কথা। ক্ষোভের কারণ এই যে, পুরুষ আপন

কর্মের পথ ধরিয়া জগতে নানা বিচিত্র ক্ষেত্রে কর্তৃত্ব লাভ করিয়াছে; কিন্তু মেয়েদের কর্ম যেখানে সেখানে অধিকাংশ বিষয়েই তাহাদিগকে দায়ে পড়িয়া পুরুষের অনুগত হইতে হইয়াছে। এই আনুগত্যকে তাঁরা অনিবার্য বলিয়া মনে করেন না।

তাঁরা বলেন, পুরুষ এতদিন কেবলমাত্র গায়ের জোরেই মেয়েদের কাঁধের উপর এই আনুগত্যটা চাপাইয়া দিয়াছে। জগতের সর্বত্রই এই কথাটা যদি এতদিন ধরিয়া সত্য হইয়া থাকে, যদি মেয়েদের প্রকৃতির বিরুদ্ধে পুরুষের শক্তি তাহাদিগকে সংসারের তলায় ফেলিয়া রাখিয়া থাকে তবে বলিতেই হইবে, দাসত্বই মেয়েদের পক্ষে স্বাভাবিক। দাসত্ব বলিতে এই বোঝায়, দায়ে পড়িয়া অনিচ্ছাসত্ত্বে পরের দায় বহন করা। যাদের পক্ষে এটা প্রকৃতিসিদ্ধ নয়, তারা বরঞ্চ মরে তবু এমন উৎপাত সহ্য করে না।

এতদিনের মানবের ইতিহাসে যদি এই কথাটাই সর্বদেশে সপ্রমাণ হইয়া থাকে যে দাসীত্ব মেয়েদের স্বাভাবিক, তবে পৃথিবীর সেই অর্ধেক মানুষের লজ্জায় সমস্ত পৃথিবী আজ মুখ তুলিতে পারিত না। কিন্তু আমি বলি, বিদ্রোহী মেয়েরা স্বজাতির বিরুদ্ধে এই-যে অপবাদ ঘোষণা করিয়া বেড়াইতেছেন এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা।

আসল কথা এই, স্ত্রী হওয়া, মা হওয়া, মেয়েদের স্বভাব; দাসী হওয়া নয়। ভালোবাসার অংশ মেয়েদের স্বভাবে বেশি আছে—এ নহিলে সন্তান মানুষ হইত না, সংসার টিঁকিত না। স্নেহ আছে বলিয়াই মা সন্তানের সেবা করে, তার মধ্যে দায় নাই; প্রেম আছে বলিয়াই স্ত্রী স্বামীর সেবা করে, তার মধ্যে দায় নাই।

কিন্তু দায় আসিয়া পড়ে যখন স্নেহপ্রেমের সম্বন্ধ স্বাভাবিক সম্বন্ধ না হয়। সকল স্বামীকেই সকল স্ত্রী যদি স্বভাবতই ভালোবাসিতে পারিত তাহা হইলে কথাই ছিল না, তাহা সম্ভবপর নহে। অথচ যতদিন সমাজ বলিয়া একটা পদার্থ আছে ততদিন মানুষকে অনেক বিষয়ে এবং অনেক পরিমাণে একটা নিয়ম মানিয়া চলিতেই হইবে।

কিন্তু, সেই নিয়ম সৃষ্টি করিবার সময় সমাজ ভিতরে ভিতরে স্বভাবেরই অনুসরণ করিতে থাকে। মেয়েদের সম্বন্ধে সমাজ আপনিই এটা ধরিয়া লইয়াছে যে, মেয়েদের পক্ষে ভালোবাসাটাই সহজ। তাই মেয়েদের সম্বন্ধে নিয়ম ভালোবাসার নিয়ম। সমাজ তাই মেয়েদের কাছে এই দাবি করে যে, তারা এমন করিয়া কাজ করিবে যেন তারা সংসারকে ভালোবাসিতেছে। বাপ মা ভাই বোন স্বামী ও ছেলেমেয়ের সেবা তারা করিবে। তাদের কাজ ভালোবাসার কাজ, এইটেই তাদের আদর্শ।

এইজন্য মেয়েদের সংসারে কোনো কারণে যেখানে তাদের ভালোবাসা নাই সেখানেও তাহাদিগকে সমাজ ভালোবাসার আদর্শেই বিচার করিয়া থাকে। যে স্বামীকে স্ত্রী ভালোবাসিতে পারে নাই তার সম্বন্ধেও তার ব্যবহারকে ভালোবাসার মাপকাঠিতেই মাপিতে হয়। সংসারকে সে ভালোবাসুক আর না-বাসুক তার আচরণকে কষিয়া দেখিবার ঐ একটিমাত্র কষ্টিপাথর আছে, সেটা ভালোবাসার কষ্টিপাথর।

ভালোবাসার ধর্মই আত্মসমর্পণে, সুতরাং তার গৌরবও তাহাতেই। যেটাকে আনুগত্য বলিয়া লজ্জা করা হইতেছে সেটা লজ্জার বিষয় হয় যদি তাহাতে প্রীতি না থাকে, কেবলমাত্র দায় থাকে। মেয়েরা আপনার স্বভাবের দ্বারাই সমাজে এমন একটা জায়গা পাইয়াছে যেখানে সংসারের কাছে তারা আত্মসমর্পণ করিতেছে।

যদি কোনো কারণে সমাজের এমন অবস্থা ঘটে যাতে এই আত্মসমর্পণ ভালোবাসার আদর্শ হইতে বহুল পরিমাণে ভ্রষ্ট হইয়া থাকে, তবে তাহা মেয়েদের পক্ষে পীড়া ও অবমাননা।

মেয়েরা স্বভাবতই ভালোবাসে এবং একনিষ্ঠ আত্মসমর্পণের আদর্শকেই সামাজিক শিক্ষায় তাদের মনে বদ্ধমূল করিয়া দিয়াছে, এই সুবিধাটুকু ধরিয়া অনেক স্বার্থপর পুরুষ তাদের প্রতি অত্যাচার করে। যেখানে পুরুষ যথার্থ পৌরুষের আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট সেখানে মেয়েরা আপন উচ্চ আদর্শের দ্বারাই পীড়িত ও বঞ্চিত হইতে থাকে, ইহার দৃষ্টান্ত আমাদের দেশে যত বেশি এমন আর-কোনো দেশে আছে কিনা আমি সন্দেহ করি। কিন্তু তাই বলিয়া এ কথাটাকে উড়াইয়া দেওয়া যায় না যে, সমাজে মেয়েরা যে ব্যবহারের ক্ষেত্রটি অধিকার করিয়াছে সেখানে স্বভাববশতই তারা আপনিই আসিয়া পৌঁছিয়াছে, বাহিরের কোনো অত্যাচার তাহাদিগকে বাধ্য করে নাই।

এ কথা মনে রাখিতে হইবে, সমাজে পুরুষের দাসত্ব মেয়েদের চেয়ে অল্প নহে, বরঞ্চ বেশি। এতকালের সভ্যতার সাধনার পরেও মানুষের সমাজ আজও দাসের হাতের খাটুনিতে চলিতেছে। এ সমাজে যথার্থ স্বাধীনতা অতি অল্প লোকেই ভোগ করে। রাজ্যতন্ত্রে বাণিজ্যতন্ত্রে এবং সমাজের সর্ববিভাগেই দাসের দল প্রাণপাত করিয়া সমাজ-জগন্নাথের প্রকাণ্ড রথ টানিয়া চলিতেছে। কোথায় লইয়া চলিতেছে তাহাও জানে না, কাহার রথ টানিতেছে তাহাও দেখিতে পায় না। সমস্ত জীবন দিনের পর দিন এমন দায় বহন করিতেছে যাহার মধ্যে প্রীতি নাই, সৌন্দর্য নাই। এই দাসত্বের বারো-আনা ভাগ পুরুষের কাঁধে চাপিয়াছে। মেয়েদের ভালোবাসার উপরই সমাজ ঝোঁক দিয়াছে, এইজন্য মেয়েদের দায় ভালোবাসার দায়। পুরুষের শক্তির উপরই সমাজ ঝোঁক দিয়াছে, এইজন্য পুরুষের দায় শক্তির দায়। অবস্থাগতিকে সেই দায় এত অতিরিক্ত হইতে পারে যাহাতে ভালোবাসা উৎপীড়িত হয় ও শক্তি দুর্বল হইয়া পড়ে। তখন সমাজের সংস্কার আবশ্যক হয়। সেই সংস্কারের জন্য আজ সমস্ত মানবসমাজে বেদনা জাগিয়াছে। কিন্তু সংস্কার যতদূর পর্যন্তই যাক্ সৃষ্টির গোড়া পর্যন্ত গিয়া পৌঁছিবে না এবং শেষ পর্যন্ত কবির দল এই বলিয়া আনন্দ করিতে পারিবেন যে, পুরুষ পুরুষই থাকিবে, মেয়েরা মেয়ে থাকিয়া যাইবে বলিয়াই তার 'সংকটে সহায়, দুরূহ চিন্তায় অংশী এবং সুখে দুঃখে সহচরী হইয়া সংসারে তাহার প্রকৃত সহযাত্রী হইবেন'।

ভাদ্র-আশ্বিন ১৩২২

শিক্ষার বাহন

প্রয়োজনের দিক হইতে দেখিলে বিদ্যায় মানুষের কত প্রয়োজন সে কথা বলা বাহুল্য। অথচ সে দিক দিয়া আলোচনা করিতে গেলে তর্ক ওঠে। চাষিকে বিদ্যা শিখাইলে তার চাষ করিবার শক্তি কমে কি না, স্ত্রীলোককে বিদ্যা শিখাইলে তার হরিভক্তি ও পতিভক্তির ব্যাঘাত হয় কি না, এ-সব সন্দেহের কথা প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায়। অর্থাৎ, যে বেহারা বসিয়া বসিয়া পাখা টানিবে তার পক্ষে আলোর চেয়ে অন্ধকার বেশি কাজের, যে গোরু ঘানি ঠেলিবে তার পক্ষে খোলা

আকাশের চেয়ে চোখের ঠুলিই বড়ো সহায়, এ কথা সহজেই মনে আসে। যে দেশে একই চক্রে ঘানি ঠেলাটা সব চেয়ে বড়ো কাজ সে দেশের বিজ্ঞ লোকেরা আলোটাকে শত্রু মনে করিতে পারেন।

কিন্তু, দিনের আলোককে আমরা কাজের প্রয়োজনের চেয়ে আরো বড়ো করিয়া দেখিতে পারি, সে হইতেছে জাগার প্রয়োজন। এবং তার চেয়ে আরো বড়ো কথা, এই আলোতে মানুষ মেলে, অন্ধকারে মানুষ বিচ্ছিন্ন হয়।

জ্ঞান মানুষের মধ্যে সকলের চেয়ে বড়ো ঐক্য। বাংলাদেশের এক কোণে যে ছেলে পড়াশুনা করিয়াছে তার সঙ্গে য়ুরোপের প্রান্তের শিক্ষিত মানুষের মিল অনেক বেশি সত্য, তার দুয়ারের পাশের মূর্খ প্রতিবেশীর চেয়ে।

জ্ঞানে মানুষের সঙ্গে মানুষের এই-যে জগৎজোড়া মিল বাহির হইয়া পড়ে, যে মিল দেশভেদ ও কালভেদকে ছাড়াইয়া যায়, সেই মিলের পরম প্রয়োজনের কথা ছাড়িয়া দেওয়া যাক; কিন্তু সেই মিলের যে পরম আনন্দ তাহা হইতে কোনো মানুষকেই কোনো কারণেই বঞ্চিত করিবার কথা মনেই করা যায় না।

সেই জ্ঞানের প্রদীপ এই ভারতবর্ষে কত বহু দূরে দূরে এবং কত মিট্‌মিট্‌ করিয়া জ্বলিতেছে সে কথা ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারি, ভারতবাসীর পক্ষে সেই পরম যোগের পথ কত সংকীর্ণ—যে যোগ জ্ঞানের যোগ, যে যোগে সমস্ত পৃথিবীর লোক আজ মিলিত হইবার সাধনা করিতেছে।

যাহা হউক, বিদ্যাশিক্ষার উপায় ভারতবর্ষে কিছু কিছু হইয়াছে, কিন্তু বিদ্যাবিস্তারের বাধা এখানে মস্ত বেশি। নদী দেশের এক ধার দিয়া চলে, বৃষ্টি আকাশ জুড়িয়া হয়। তাই ফসলের সব চেয়ে বড়ো বন্ধু বৃষ্টি, নদী তার অনেক নিচে; শুধু তাই নয়, এই বৃষ্টিধারার উপরেই নদীজলের গভীরতা বেগ এবং স্থায়িত্ব নির্ভর করে।

আমাদের দেশে যাঁরা বজ্র হাতে ইন্দ্রপদে বসিয়া আছেন তাঁদের সহস্রচক্ষু, কিন্তু বিদ্যার এই বর্ষণের বেলায় অন্তত তার ৯৯০টা চক্ষু নিদ্রা দেয়। গর্জনের বেলায় অট্টহাস্যের বিদ্যুৎ বিকাশ করিয়া বলেন, বাবুগুলার বিদ্যা একটা অদ্ভুত জিনিস; তার খোসার কাছে তল্‌তল্‌ করে, তার আঁঠির কাছে পাক ধরে না। যেন এটা বাবুসম্প্রদায়ের প্রকৃতিগত। কিন্তু বাবুদের বিদ্যাটাকে যে প্রণালীতে জাগ্‌ দেওয়া হয় সেই প্রণালীতেই আমাদের উপরওয়ালাদের বিদ্যাটাকেও যদি পাকানোর চেষ্টা করা যাইত তবে বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রমাণ হইত যে, যে বিদ্যার উপরে ব্যাপক শিক্ষার সূর্যালোকের তাপ লাগে না তার এমনি দশাই হয়।

জবাবে কেহ কেহ বলেন, ‘পশ্চিম যখন পশ্চিমেই ছিল, পূর্বদেশের ঘাড়ে আসিয়া পড়ে নাই, তখন তোমাদের টোলে চতুষ্পাঠীতে যে তর্কশাস্ত্রের প্যাঁচ কষা এবং ব্যাকরণসূত্রের জাল বোনা চলিত সেও তো অত্যন্ত কুনোরকমের বিদ্যা।’ এ কথা মানি, কিন্তু বিদ্যার যে অংশটা নির্জলা পাণ্ডিত্য সে অংশ সকল দেশেই পণ্ড এবং কুনো, পশ্চিমেও পেডান্‌ট্রি মরিতে চায় না। তবে কিনা, যে দেশ দুর্গতিগ্রস্ত সেখানে বিদ্যার বল কমিয়া গিয়া বিদ্যার কায়দাটাই বড়ো হইয়া ওঠে। তবু এ কথা মানিতে হইবে, তখনকার দিনের পাণ্ডিত্যটাই তর্কচঞ্চু ও ন্যায়পঞ্চাননদের মগজের কোণে কোণে বদ্ধ ছিল বটে, কিন্তু তখনকার কালের বিদ্যাটা সমাজের নাড়ীতে নাড়ীতে সজীব ও সবল হইয়া বহিত। কি গ্রামের নিরক্ষর চাষি কি অন্তঃপুরের স্ত্রীলোক, সকলেরই মন নানা উপায়ে এই বিদ্যার সেঁচ পাইত।

সুতরাং, এ জিনিসের মধ্যে অন্য অভাব অসম্পূর্ণতা যাই থাক্‌, ইহা নিজের মধ্যে সুসংগত ছিল।

কিন্তু, আমাদের বিলাতি বিদ্যাটা কেমন ইস্কুলের জিনিস হইয়া সাইন্‌বোর্ডে টাঙানো থাকে, আমাদের জীবনের ভিতরের সামগ্রী হইয়া যায় না। তাই পশ্চিমের শিক্ষায় যে ভালো জিনিস আছে তার অনেকখানি আমাদের নোট্‌বুকেই আছে; সে কি চিন্তায় কি কাজে ফলিয়া উঠিতে চায় না।

আমাদের দেশের আধুনিক পণ্ডিত বলেন, ইহার একমাত্র কারণ জিনিসটা বিদেশী। এ কথা মানি না। যা সত্য তার জিয়োগ্রাফি নাই। ভারতবর্ষও একদিন যে সত্যের দীপ জ্বালিয়াছে তা পশ্চিম মহাদেশকেও উজ্জ্বল করিবে, এ যদি না হয় তবে ওটা আলোই নয়। বস্তুত, যদি এমন কোনো ভালো থাকে যা একমাত্র ভারতবর্ষেরই ভালো তবে তা ভালোই নয়, এ কথা জোর করিয়া বলিব। যদি ভারতের দেবতা ভারতেরই হন তবে তিনি আমাদের স্বর্গের পথ বন্ধ করিবেন, কারণ স্বর্গ বিশ্বদেবতার।

আসল কথা, আধুনিক শিক্ষা তার বাহন পায় নাই, তার চলা-ফেরার পথ খোলসা হইতেছে না। এখনকার দিনে সর্বজনীন শিক্ষা সকল সভ্য দেশেই মানিয়া লওয়া হইয়াছে। যে কারণেই হউক আমাদের দেশে এটা চলিল না। মহাত্মা গোখ্‌লে এই লইয়া লড়িয়াছিলেন। শুনিয়াছি, দেশের মধ্যে বাংলাদেশের কাছ হইতেই তিনি সব চেয়ে বাধা পাইয়াছেন। বাংলাদেশে শুভবুদ্ধির ক্ষেত্রে আজকাল হঠাৎ সকল দিক হইতেই একটা অদ্ভুত মহামারীর হাওয়া বহিয়াছে। ভূতের পা পিছন দিকে, বাংলাদেশে সামাজিক সকল চেষ্টারই পা পিছনে ফিরিয়াছে। আমরা ঠিক করিয়াছি, সংসারে চলিবার পথে আমরা পিছন মুখে চলিব, কেবল রাষ্ট্রীয় সাধনার আকাশে উড়িবার পথে আমরা সামনের দিকে উড়িব; আমাদের পা যে দিকে আমাদের ডানা ঠিক তার উল্টা দিকে গজাইবে।

যে সর্বজনীন শিক্ষা দেশের উচ্চশিক্ষার শিকড়ে রস জোগাইবে কোথাও তার সাড়া পাওয়া গেল না, তার উপরে আবার আর-এক উপসর্গ জুটিয়াছে। এক দিকে আসবাব বাড়াইয়া অন্য দিকে স্থান কমাইয়া আমাদের সংকীর্ণ উচ্চশিক্ষার আয়তনকে আরো সংকীর্ণ করা হইতেছে। ছাত্রের অভাব ঘটুক, কিন্তু সরঞ্জামের অভাব না ঘটে সে দিকে কড়া দৃষ্টি।

কাগজে দেখিলাম, সেদিন বেহার-বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত গাড়িতে গিয়া ছোটোলাট বলিয়াছেন যে, যারা বলে ইমারতের বাহুল্যে আমরা শিক্ষার সম্বল খর্ব করি তারা অবুঝ, কেননা শিক্ষা তো কেবল জ্ঞানলাভ নয়, ভালো ঘরে বসিয়া পড়াশুনা করাও একটা শিক্ষা; ক্লাসে বড়ো অধ্যাপকের চেয়ে বড়ো দেয়ালটা বেশি বই কম দরকারি নয়।

মানুষের পক্ষে অন্নেরও দরকার থালারও দরকার এ কথা মানি, কিন্তু গরিবের ভাগ্যে অন্ন যেখানে যথেষ্ট মিলিতেছে না সেখানে থালা সম্বন্ধে একটু কষাকষি করাই দরকার। যখন দেখিব ভারত জুড়িয়া বিদ্যার অন্নসত্র খোলা হইয়াছে তখন অন্নপূর্ণার কাছে সোনার থালা দাবি করিবার দিন আসিবে। আমাদের জীবনযাত্রা গরিবের অথচ আমাদের শিক্ষার বাহ্যাড়ম্বরটা যদি ধনীর চালে হয় তবে টাকা ফুঁকিয়া দিয়া টাকার থলি তৈরি করার মতো হইবে।

আঙিনায় মাদুর বিছাইয়া আমরা আসর জমাইতে পারি, কলাপাতায় আমাদের ধনীর যজ্ঞের ভোজও চলে। আমাদের দেশের নমস্য যাঁরা তাঁদের অধিকাংশই

খোড়ো ঘরে মানুষ; এ দেশে লক্ষ্মীর কাছ হইতে ধার না লইলে সরস্বতীর আসনের দাম কমিবে, এ কথা আমাদের কাছে চলিবে না।

পূর্বদেশে জীবনসমস্যার সমাধান আমাদের নিজের প্রণালীতেই করিতে হইয়াছে। আমরা অশনে বসনে যতদূর পারি বস্তুভার কমাইয়াছি। এ বিষয়ে এখানকার জল হাওয়া হাতে ধরিয়া আমাদের হাতে-খড়ি দিয়াছে। ঘরের দেয়াল আমাদের পক্ষে তত আবশ্যক নয় যতটা আবশ্যক দেয়ালের ফাঁক; আমাদের গায়ের কাপড়ের অনেকটা অংশই তাঁতির তাঁতের চেয়ে আকাশের সূর্যকিরণেই বোনা হইতেছে; আহারের যে অংশটা দেহের উত্তাপ-সঞ্চারের জন্য তার অনেকটার বরাত পাকশালার ও পাকযন্ত্রের 'পরে নয়, দেবতার 'পরে। দেশের প্রাকৃতিক এই সুযোগ জীবনযাত্রায় খাটাইয়া আমাদের স্বভাবটা এক রকম দাঁড়াইয়া গেছে; শিক্ষাব্যবস্থায় সেই স্বভাবকে অমান্য করিলে বিশেষ লাভ আছে এমন তো আমার মনে হয় না।

গাছতলায় মাঠের মধ্যে আমার এক বিদ্যালয় আছে। সে বিদ্যালয়টি তপোবনের শকুন্তলারই মতো 'অনাঘ্রাতং পুষ্পং কিশলয়মলূনং কররুহৈঃ'; অবশ্য, ইন্‌স্পেক্টরের কররুহ। মৈত্রেয়ী যেমন যাজ্ঞবল্ক্যকে বলিয়াছিলেন তিনি উপকরণ চান না, অমৃতকে চান, এই বিদ্যালয়ের হইয়া আমার সেই কামনা ছিল। এইখানে ছোটোলাটের সঙ্গে একটা খুব গোড়ার কথায় আমাদের হয়তো অমিল আছে, এবং এইখানটায় আমরাও তাঁকে উপদেশ দিবার অধিকার রাখি। সত্যকে গভীর করিয়া দেখিলে দেখা যায়, উপকরণের একটা সীমা আছে যেখানে অমৃতের সঙ্গে তার বিরোধ বাধে। মেদ যেখানে প্রচুর, মজ্জা সেখানে দুর্বল।

দৈন্য জিনিসটাকে আমি বড়ো বলি না, সেটা তামসিক। কিন্তু অনাড়ম্বর, বিলাসীর ভোগসামগ্রীর চেয়ে দামে বেশি— তাহা সাত্ত্বিক। আমি সেই অনাড়ম্বরের কথা বলিতেছি যাহা পূর্ণতারই একটি ভাব, যাহা আড়ম্বরের অভাবমাত্র নহে। সেই ভাবের যেদিন আবির্ভাব হইবে সেদিন সভ্যতার আকাশ হইতে বস্তুকুয়াশার বিস্তর কলুষ দেখিতে দেখিতে কাটিয়া যাইবে। সেই ভাবের অভাব আছে বলিয়া যে-সব জিনিস প্রত্যেক মানুষের পক্ষে একান্ত আবশ্যক তাহা দুর্মূল্য ও দুর্ভর হইতেছে; গান-বাজনা আহার-বিহার আমোদ-আহ্লাদ শিক্ষা-দীক্ষা রাজ্যশাসন আইন-আদালত সভ্য দেশে সমস্তই অতি জটিল, সমস্তই মানুষের বাহিরের ও ভিতরের প্রভূত জায়গা জুড়িয়া বসে। এই বোঝার অধিকাংশই অনাবশ্যক; এই বিপুল ভার-বহনে মানুষের জোর প্রকাশ পায় বটে, ক্ষমতা প্রকাশ পায় না। এইজন্য বর্তমান সভ্যতাকে যে দেবতা বাহির হইতে দেখিতেছেন তিনি দেখিতেছেন, ইহা অপটু দৈত্যের সাঁতার দেওয়ার মতো; তার হাত-পা ছোঁড়ায় জল ঘুলাইয়া ফেনাইয়া উঠিতেছে, সে জানেও না এত বেশি হাঁস্‌ফাঁস্‌ করার যথার্থ প্রয়োজন নাই। মুশকিল এই যে, দৈত্যটার দৃঢ় বিশ্বাস যে প্রচণ্ড জোরে হাত-পা ছোঁড়াটারই একটা বিশেষ মূল্য আছে। যেদিন পূর্ণতার সরল সত্য সভ্যতার অন্তরের মধ্যে আবির্ভূত হইবে সেদিন পাশ্চাত্য বৈঠকখানার দেয়াল হইতে জাপানি পাখা, চীনা বাসন, হরিণের শিঙ, বাঘের চামড়া— তার এ-কোণ ও-কোণ হইতে বিচিত্র নিরর্থকতা— দুঃস্বপ্নের মতো ছুটিয়া যাইবে; মেয়েদের মাথার টুপিগুলো হইতে মরা পাখি, পাখির পালক, নকল ফুল পাতা এবং রাশিরাশি অদ্ভুত জঞ্জাল খসিয়া পড়িবে; তাদের সাজসজ্জার অমিতাচার বর্বরতার পুরাতত্ত্বে স্থান পাইবে; যে-সব পাঁচতলা দশতলা বাড়ি আকাশের আলোর দিকে ঘুষি তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে তারা লজ্জায় মাথা হেঁট করিবে; শিক্ষা বলো, কর্ম বলো, ভোগ বলো, সহজ হইয়া

ওঠাকেই আপনার শক্তির সত্য পরিচয় বলিয়া গণ্য করিবে; এবং মানুষের অন্তরপ্রকৃতি বাহিরের দাসরাজাদের রাজত্ব কাড়িয়া লইয়া তাহাদিগকে পায়ের তলায় বসাইয়া রাখিবে। একদিন পশ্চিমের মৈত্রেয়ীকেও বলিতে হইবে : যেনাহং নামৃতা স্যাম্‌ কিমহং তেন কুর্যাম্‌।

সে কবে হইবে ঠিক জানি না। ততদিন ঘাড় হেঁট করিয়া আমাদিগকে উপদেশ শুনিতে হইবে যে, প্রভূত আসবাবের মধ্যে বড়ো বাড়ির উচ্চতলায় বসিয়া শিক্ষাই উচ্চশিক্ষা। কারণ, মাটির তলাটাই মানুষের প্রাইমারি, ঐটেই প্রাথমিক; ইঁটের কোঠা যত বড়ো হাঁ করিয়া হাই তুলিবে বিদ্যা ততই উপরে উঠিতে থাকিবে।

একদা বন্ধুরা আমার সেই মেঠো বিদ্যালয়ের সঙ্গে একটা কলেজ জুড়িবার পরামর্শ দিয়াছিলেন। কিন্তু, একদিন আমাদের দেশের যে উচ্চশিক্ষা তরুতলকে অশ্রদ্ধা করে নাই আজ তাকে তৃণাসন দেখাইলে সে কি সহিতে পারিবে? সে যে ধনী পশ্চিমের পোষ্যপুত্র, বিলিতি বাপের কায়দায় সে বাপকেও ছাড়াইয়া চলিতে চায়। যতই বলি-না কেন 'শিক্ষাটাকে যতদূর পারি উচ্চেই রাখিব, কায়দাটাকে আমাদের মতো করিতে দাও' সে কথায় কেহ কান দেয় না। বলে কিনা. 'ঐ কায়দাটাই তো শিক্ষা, তাই তোমাদের ভালোর জন্যই ঐ কায়দাটাকে যথাসাধ্য দুঃসাধ্য করিয়া তুলিব।' কাজেই আমাকে বলিতে হইল, অন্তঃকরণকেই আমি বড়ো বলিয়া মানি, উপকরণকে তার চেয়েও বড়ো বলিয়া মানিব না।

উপকরণ যে অংশে অন্তঃকরণের অনুচর সে অংশে তাকে অমান্য করা দীনতা, এ কথা জানি। কিন্তু, সেই সামঞ্জস্যটাকে য়ুরোপ এখনো বাহির করিতে পারে নাই; বাহির করিবার চেষ্টা করিতেছে। আমাদের নিজের মতে আমাদিগকে সেই চেষ্টা করিতে কেন পাকা নিয়ম করিয়া বাধা দেওয়া হইবে? প্রয়োজনকে খর্ব না করিয়াও সমস্তটাকে সাদাসিধা করিয়া তুলিব, সে আমাদের নিজের স্বভাব ও নিজের গরজ অনুসারে। শিক্ষার বিষয়কে আমরা অন্য জায়গা হইতে লইতে পারি, কিন্তু মেজাজটাকে-সুদ্ধ লইতে হইবে সে যে বিষম জুলুম।

পূর্বেই বলিয়াছি, পশ্চিমের পোষ্যপুত্র তার বিলিতি বাপকেও ছাড়াইয়া চলে। আমেরিকায় দেখিলাম. স্টেটের সাহায্যে কত বড়ো বড়ো বিদ্যালয় চলিতেছে যেখানে ছাত্রদের বেতন নাই বলিলেই হয়। য়ুরোপেও দরিদ্র ছাত্রদের জন্য সুলভ শিক্ষার উপায় অনেক আছে। কেবল গরিব বলিয়াই, আমাদের দেশের শিক্ষা আমাদের সামর্থ্যের তুলনায় পশ্চিমের চেয়ে এত বেশি দুর্মূল্য হইল? অথচ, এই ভারতবর্ষেই একদিন বিদ্যা টাকা লইয়া বেচাকেনা হইত না।

দেশকে শিক্ষা দেওয়া স্টেটের গরজ, ইহা তো অন্যত্র দেখিয়াছি। এইজন্য য়ুরোপে জাপানে আমেরিকায় শিক্ষায় কৃপণতা নাই। কেবলমাত্র আমাদের গরিব দেশেই শিক্ষাকে দুর্মূল্য ও দুর্লভ করিয়া তোলাতেই দেশের বিশেষ মঙ্গল, এ কথা উচ্চাসনে বসিয়া যত উচ্চস্বরে বলা হইবে বেসুর ততই উচ্চ সপ্তকে উঠিবে। মাতার স্তন্যকে দুর্মূল্য করিয়া তোলাই উচিত, এমন কথা যদি স্বয়ং লর্ড কার্জনও শপথ করিয়া বলিতেন তবু আমরা বিশ্বাস করিতাম না যে শিশুর প্রতি করুণায় রাত্রে তাঁর ঘুম হয় না।

বয়স বাড়িতে বাড়িতে শিশুর ওজন বাড়িবে, এই তো স্বাস্থ্যের লক্ষণ। সমান থাকিলেও ভালো নয়, কমিতে থাকিলে ভাবনার কথা। তেমনি, আমাদের দেশে যেখানে শিক্ষার অধিকাংশ জমিই পতিত আছে সেখানে বছরে বছরে ছাত্রসংখ্যা বাড়িবে, হিতৈষীরা এই প্রত্যাশা করে। সমান থাকিলে সেটা দোষের আর সংখ্যা

যদি কমে তো বুঝিব, পাল্লাটা মরণের দিকে ঝুঁকিয়াছে। বাংলাদেশে ছাত্রসংখ্যা কমিল। সেজন্য শিক্ষাবিভাগে উদ্‌বেগ নাই। এই উপলক্ষে একটি ইংরেজি কাগজে লিখিয়াছে : এই তো দেখি লেখাপড়ায় বাঙালির শখ আপনিই কমিয়াছে, যদি গোখ্‌লের অবশ্যশিক্ষা এখানে চলিত তবে তো অনিচ্ছুকের 'পরে জুলুম করাই হইত।

এ-সব কথা নির্মমের কথা। নিজের জাতের সম্বন্ধে এমন কথা কেহ এমন অনায়াসে বলিতে পারে না। আজ ইংলন্‌ডে যদি দেখা যাইত লোকের মনে শিক্ষার শখ আপনিই কমিয়া আসিতেছে তবে নিশ্চয়ই এই-সব লোকই উৎকণ্ঠিত হইয়া লিখিত যে, কৃত্রিম উপায়েও শিক্ষার উত্তেজনা বাড়াইয়া তোলা উচিত।

নিজের জাতির 'পরে যে দরদ বাঙালির 'পরেও ইংরেজের সেই দরদ হইবে, এমন আশা করিতেও লজ্জা বোধ করি। কিন্তু, জাতিপ্রেমের সমস্ত দাবি মিটাইয়াও মনুষ্যপ্রেমের হিসাবে কিছু প্রাপ্য বাকি থাকে। ধর্মবুদ্ধির বর্তমান অবস্থায় স্বজাতির জন্য প্রতাপ ঐশ্বর্য প্রভৃতি অনেক দুর্লভ জিনিস অন্যকে বঞ্চিত করিয়াও লোকে কামনা করে, কিন্তু এখনো এমন-কিছু আছে যা খুব কম করিয়াও সকল মানুষেরই জন্য কামনা করা যায়। আমরা কোনো দেশের সম্বন্ধেই এমন কথা বলিতে পারি না যে, সেখানকার স্বাস্থ্য যখন আপনিই কমিয়া আসিতেছে তখন সে দেশের জন্য ডাক্তার-খরচটা বাদ দিয়া অন্ত্যেষ্টিসৎকারেরই আয়োজনটা পাকা করা উচিত।

তবে কিনা, এ কথাও কবুল করিতে হইবে, স্বজাতি সম্বন্ধে আমাদের নিজের মনে শুভবুদ্ধি যথেষ্ট সজাগ নয় বলিয়াই বাহিরের লোক আমাদের অন্নবস্ত্র-বিদ্যাবুদ্ধির মূল্য খুব কম করিয়া দেখে। দেশের অন্ন, দেশের বিদ্যা, দেশের স্বাস্থ্য আমরা তেমন করিয়া চাই নাই। পরের কাছে চাহিয়াছি, নিজের কাছে নহে। ওজর করিয়া বলি, আমাদের সাধ্য কম; কিন্তু আমাদের সাধনা তার চেয়েও অনেক কম।

দেশের দাম আমাদের নিজের কাছে যত অন্যের কাছে তার চেয়ে বেশি দাবি করিলে সে এক রকম ঠকানো হয়। ইহাতে বড়ো কেহ ঠকেও না। কেবল চিনা-বাজারের দোকানদারের মতো করিয়া পরের কাছে দর চড়াইয়া সময় নষ্ট করিয়া থাকি। তাতে যে পরিমাণে সময় যায় সে পরিমাণে লাভ হয় না। এতকাল রাষ্ট্রীয় হাটে সেই দোকানদারি করিয়া আসিয়াছি, যে জিনিসের জন্য নিজে যত দাম দিয়াছি বা দিতে রাজি তার চেয়ে অনেক বড়ো দাম হাঁকিয়া খুব একটা হট্টগোল করিয়া কাটাইলাম।

শিক্ষার জন্য আমরা আব্দার করিয়াছি, গরজ করি নাই। শিক্ষাবিস্তারে আমাদের গা নাই। তার মানে, শিক্ষার ভোজে নিজেরা বসিয়া যাইব, পাতের প্রসাদটুকু পর্যন্ত আর-কোনো ক্ষুধিত পায় বা না পায় সে দিকে খেয়ালই নাই। এমন কথা যারা বলে 'নিম্নসাধারণের জন্য যথেষ্ট শিক্ষার দরকার নাই, তাতে তাদের ক্ষতিই করিবে' তারা কর্তৃপক্ষদের কাছ হইতে এ কথা শুনিবার অধিকারী যে, বাঙালির পক্ষে বেশি শিক্ষা অনাবশ্যক, এমন-কি অনিষ্টকর। 'জনসাধারণকে লেখাপড়া শিখাইলে আমাদের চাকর জুটিবে না' এ কথা যদি সত্য হয় তবে আমরা লেখাপড়া শিখিলে আমাদেরও দাস্যভাবের ব্যাঘাত হইবে এ আশঙ্কাও মিথ্যা নহে।

এ সম্বন্ধে নিজের মনের ভাবটা ঠিকমত যাচাই করিতে হইলে দুটো-একটা দৃষ্টান্ত দেখা দরকার। আমরা বেঙ্গল প্রোভিন্‌শ্যাল কন্‌ফারেন্স্‌ নামে একটা রাষ্ট্রসভার সৃষ্টি করিয়াছি। সেটা প্রাদেশিক, তার প্রধান উদ্দেশ্য বাংলার অভাব

ও অভিযোগ সম্বন্ধে সকলে মিলিয়া আলোচনা করিয়া বাঙালির চোখ ফুটাইয়া দেওয়া। বহুকাল পর্যন্ত এই নিতান্ত সাদা কথাটা কিছুতেই আমাদের মনে আসে নাই যে, তা করিতে হইলে বাংলাভাষায় আলোচনা করা চাই। তার কারণ, দেশের লোককে দেশের লোক বলিয়া সমস্ত চৈতন্য দিয়া আমরা বুঝি না। এইজন্যই দেশের পুরা দাম দেওয়া আমাদের পক্ষে অসম্ভব। যা চাহিতেছি তা পেট ভরিয়া পাই না তার কারণ এ নয় যে দাতা প্রসন্নমনে দিতেছে না, তার কারণ এই যে আমরা সত্যমনে চাহিতেছি না।

বিদ্যাবিস্তারের কথাটাকে যখন ঠিকমত মন দিয়া দেখি তখন তার সর্বপ্রধান বাধাটা এই দেখিতে পাই যে তার বাহনটা ইংরেজি। বিদেশী মাল জাহাজে করিয়া শহরের ঘাট পর্যন্ত আসিয়া পৌঁছিতে পারে, কিন্তু সেই জাহাজটাতে করিয়াই দেশের হাটে হাটে আমদানি রফ্‌তানি করাইবার দুরাশা মিথ্যা। যদি বিলিতি জাহাজটাকেই কায়মনে আঁকড়াইয়া ধরিতে চাই তবে ব্যাবসা শহরেই আট্‌কা পড়িয়া থাকিবে।

এ পর্যন্ত এ অসুবিধাটাতে আমাদের অসুখ বোধ হয় নাই। কেননা মুখে যাই বলি, মনের মধ্যে এই শহরটাকেই দেশ বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলাম। দাক্ষিণ্য যখন খুব বেশি হয় তখন এই পর্যন্ত বলি : আচ্ছা বেশ, খুব গোড়ার দিকের মোটা শিক্ষাটা বাংলাভাষায় দেওয়া চলিবে, কিন্তু সে যদি উচ্চশিক্ষার দিকে হাত বাড়ায় তবে 'গমিষ্যত্যুপহাস্যতাম্'।

আমাদের এই ভীরুতা কি চিরদিনই থাকিয়া যাইবে? ভরসা করিয়া এটুকু কোনোদিন বলিতে পারিব না যে উচ্চশিক্ষাকে আমাদের দেশের ভাষায় দেশের জিনিস করিয়া লইতে হইবে? পশ্চিম হইতে যা-কিছু শিখিবার আছে জাপান তা দেখিতে দেখিতে সমস্ত দেশে ছড়াইয়া দিল তার প্রধান কারণ, সেই শিক্ষাকে তারা দেশী ভাষার আধারে বাঁধাই করিতে পারিয়াছে।

অথচ, জাপানি ভাষার ধারণাশক্তি আমাদের ভাষার চেয়ে বেশি নয়। নূতন কথা সৃষ্টি করিবার শক্তি আমাদের ভাষায় অপরিসীম। তা ছাড়া য়ুরোপের বুদ্ধিবৃত্তির আকার প্রকার যতটা আমাদের সঙ্গে মেলে এমন জাপানির সঙ্গে নয়। কিন্তু উদ্যোগী পুরুষসিংহ কেবলমাত্র লক্ষ্মীকে পায় না, সরস্বতীকেও পায়। জাপান জোর করিয়া বলিল, 'য়ুরোপের বিদ্যাকে নিজের বাণীমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিব।' যেমন বলা তেমনি করা, তেমনি তার ফললাভ। আমরা ভরসা করিয়া এ পর্যন্ত বলিতেই পারিলাম না যে, বাংলাভাষাতেই আমরা উচ্চশিক্ষা দিব এবং দেওয়া যায় এবং দিলে তবেই বিদ্যার ফসল দেশ জুড়িয়া ফলিবে।

আমাদের ভরসা এতই কম যে, স্কুল-কলেজের বাহিরে আমরা যে-সব লোকশিক্ষার আয়োজন করিয়াছি সেখানেও বাংলাভাষার প্রবেশ-নিষেধ। বিজ্ঞানশিক্ষাবিস্তারের জন্য দেশের লোকের চাঁদায় বহুকাল হইতে শহরে এক বিজ্ঞানসভা খাড়া দাঁড়াইয়া আছে। প্রাচ্যদেশের কোনো কোনো রাজার মতো গৌরবনাশের ভয়ে জনসাধারণের কাছে সে বাহির হইতেই চায় না। বরং অচল হইয়া থাকিবে তবু কিছুতে সে বাংলা বলিবে না। ও যেন বাঙালির চাঁদা দিয়া বাঁধানো পাকা ভিতের উপর বাঙালির অক্ষমতা ও ঔদাসীন্যের স্মরণ-স্তম্ভের মতো স্থাণু হইয়া আছে। কথাও বলে না, নড়েও না। উহাকে ভুলিতেও পারি না, উহাকে মনে রাখাও শক্ত। ওজর এই যে, বাংলাভাষায় বিজ্ঞানশিক্ষা অসম্ভব। ওটা অক্ষমের, ভীরুর ওজর। কঠিন বৈকি। সেইজন্যই কঠোর সংকল্প চাই। একবার

ভাবিয়া দেখুন, একে ইংরেজি তাতে সায়ান্স্‌, তার উপরে দেশে যে-সকল বিজ্ঞান-বিশারদ আছেন তাঁরা জগদ্‌বিখ্যাত হইতে পারেন কিন্তু দেশের কোণে এই-যে একটুখানি বিজ্ঞানের নীড় দেশের লোক বাঁধিয়া দিয়াছে এখানে তাঁদের ফলাও জায়গা নাই, এমন অবস্থায় এই পদার্থটা বঙ্গসাগরের তলায় যদি ডুব মারিয়া বসে তবে ইহার সাহায্যে সেখানকার মৎস্যশাবকের বৈজ্ঞানিক উন্নতি আমাদের বাঙালির ছেলের চেয়ে যে কিছুমাত্র কম হইতে পারে এমন অপবাদ দিতে পারিব না।

মাতৃভাষা বাংলা বলিয়াই কি বাঙালিকে দণ্ড দিতেই হইবে? এই অজ্ঞানকৃত অপরাধের জন্য সে চিরকাল অজ্ঞান হইয়াই থাক, সমস্ত বাঙালির প্রতি কয়জন শিক্ষিত বাঙালির এই রায়ই কি বহাল রহিল? যে বেচারা বাংলা বলে সেই কি আধুনিক মনুসংহিতার শূদ্র? তার কানে উচ্চশিক্ষার মন্ত্র চলিবে না? মাতৃভাষা হইতে ইংরেজি ভাষার মধ্যে জন্ম লইয়া তবেই আমরা দ্বিজ হই?

বলা বাহুল্য, ইংরেজি আমাদের শেখা চাইই, শুধু পেটের জন্য নয়। কেবল ইংরেজি কেন, ফরাসি জর্মন শিখিলে আরো ভালো। সেই সঙ্গে এ কথা বলাও বাহুল্য, অধিকাংশ বাঙালি ইংরেজি শিখিবে না। সেই লক্ষ লক্ষ বাংলাভাষীদের জন্য বিদ্যার অনশন কিংবা অর্ধাশনই ব্যবস্থা, এ কথা কোন্‌ মুখে বলা যায়?

দেশে বিদ্যাশিক্ষার যে বড়ো কারখানা আছে তার কলের চাকার অল্পমাত্র বদল করিতে গেলেই বিস্তর হাতুড়ি-পেটাপেটি করিতে হয়, সে খুব শক্ত হাতের কর্ম। আশু মুখুজ্জে মশায় ওরই মধ্যে এক জায়গায় একটুখানি বাংলা হাতল জুড়িয়া দিয়াছেন।

তিনি যেটুকু করিয়াছেন তার ভিতরকার কথা এই, বাঙালির ছেলে ইংরেজি বিদ্যায় যতই পাকা হোক্‌ বাংলা না শিখিলে তার শিক্ষা পুরা হইবে না। কিন্তু এ তো গেল যারা ইংরেজি জানে তাদেরই বিদ্যাকে চোকস করিবার ব্যবস্থা। আর, যারা বাংলা জানে, ইংরেজি জানে না, বাংলার বিশ্ববিদ্যালয় কি তাদের মুখে তাকাইবে না? এত বড়ো অস্বাভাবিক নির্মমতা ভারতবর্ষের বাহিরে আর কোথাও আছে?

আমাকে লোকে বলিবে, 'শুধু কবিত্ব করিলে চলিবে না, একটা প্র্যাক্‌টিক্যাল পরামর্শ দাও; অত্যন্ত বেশি আশা করাটা কিছু নয়।' অত্যন্ত বেশি আশা চুলায় যাক্‌, লেশমাত্র আশা না করিয়াই অধিকাংশ পরামর্শ দিতে হয়। কিছু করিবার এবং হইবার আগে ক্ষেত্রটাতে দৃষ্টি তো পড়ুক। কোনোমতে মনটা যদি একটু উস্‌খুস্‌ করিয়া ওঠে তা হলেই আপাতত যথেষ্ট। এমন-কি লোকে যদি গালি দেয় এবং মারিতে আসে তা হলেও বুঝি যে, একটা বেশ উত্তম-মধ্যম ফল পাওয়া গেল।

অতএব পরামর্শে নামা যাক্‌।

আজকাল আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা প্রশস্ত পরিমণ্ডল তৈরি হইয়া উঠিতেছে। একদিন মোটের উপর ইহা এক্‌জামিন পাসের কুস্তির আখড়া ছিল। এখন আখড়ার বাহিরেও ল্যাঙোটটার উপর ভদ্রবেশ ঢাকা দিয়া একটু হাঁফ ছাড়িবার জায়গা করা হইয়াছে। কিছুদিন হইতে দেখিতেছি বিদেশ হইতে বড়ো বড়ো অধ্যাপকেরা আসিয়া উপদেশ দিতেছেন, এবং আমাদের দেশের মনীষীদেরও এখানে আসন পড়িতেছে। শুনিয়াছি, বিশ্ববিদ্যালয়ের এইটুকু ভদ্রতাও আশু মুখুজ্জে মশায়ের কল্যাণে ঘটিয়াছে।

আমি এই বলি, বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতন বাড়িটার ভিতরের আঙিনায় যেমন

চলিতেছে চলুক, কেবল তার এই বাহিরের প্রাঙ্গণটাতে যেখানে আম-দরবারের নূতন বৈঠক বসিল সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাটাকে যদি সমস্ত বাঙালির জিনিস করিয়া তোলা যায় তাতে বাধাটা কী? আহূত যারা তারা ভিতর-বাড়িতেই বসুক, আর রবাহূত যারা তারা বাহিরে পাত পাড়িয়া বসিয়া যাক্-না। তাদের জন্য বিলিতি টেবিল নাহয় না রহিল, দিশি কলাপাত মন্দ কী? তাদের একেবারে দরোয়ান দিয়া ধাক্কা মারিয়া বিদায় করিয়া দিলে কি এ যজ্ঞে কল্যাণ হইবে? অভিশাপ লাগিবে না কি?

এমনি করিয়া, বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি এবং বাংলা ভাষার ধারা যদি গঙ্গাযমুনার মতো মিলিয়া যায় তবে বাঙালি শিক্ষার্থীর পক্ষে এটা একটা তীর্থস্থান হইবে। দুই স্রোতের সাদা এবং কালো রেখার বিভাগ থাকিবে বটে, কিন্তু তারা একসঙ্গে বহিয়া চলিবে। ইহাতেই দেশের শিক্ষা যথার্থ বিস্তীর্ণ হইবে, গভীর হইবে, সত্য হইয়া উঠিবে।

শহরে যদি একটিমাত্র বড়ো রাস্তা থাকে তবে সে পথে বিষম ঠেলাঠেলি পড়ে। শহর-সংস্কারের প্রস্তাবের সময় রাস্তা বাড়াইয়া ভিড়কে ভাগ করিয়া দিবার চেষ্টা হয়। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঝখানে আর-একটি সদর রাস্তা খুলিয়া দিলে ঠেলাঠেলি নিশ্চয় কমিবে।

বিদ্যালয়ের কাজে আমার যেটুকু অভিজ্ঞতা তাতে দেখিয়াছি, এক দল ছেলে স্বভাবতই ভাষাশিক্ষায় অপটু। ইংরেজি ভাষা কায়দা করিতে না পারিয়া যদি-বা তারা কোনোমতে এন্‌ট্রেন্‌সের দেউড়িটা তরিয়া যায়, উপরের সিঁড়ি ভাঙিবার বেলাতেই চিত হইয়া পড়ে।

এমনতরো দুর্গতির অনেকগুলা কারণ আছে। এক তো যে ছেলের মাতৃভাষা বাংলা তার পক্ষে ইংরেজি ভাষার মতো বালাই আর নাই; ও যেন বিলিতি তলোয়ারের খাপের মধ্যে দিশি খাঁড়া ভরিবার ব্যায়াম। তার পরে, গোড়ার দিকে ভালো শিক্ষকের কাছে ভালো নিয়মে ইংরেজি শিখিবার সুযোগ অল্প ছেলেরই হয়, গরিবের ছেলের তো হয়ই না। তাই অনেক স্থলেই বিশল্যকরণীর পরিচয় ঘটে না বলিয়া আস্ত গন্ধমাদন বহিতে হয়; ভাষা আয়ত্ত হয় না বলিয়া গোটা ইংরেজি বই মুখস্থ করা ছাড়া উপায় থাকে না। অসামান্য স্মৃতিশক্তির জোরে যে ভাগ্যবানরা এমনতরো কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড করিতে পারে তারা শেষ পর্যন্ত উদ্ধার পাইয়া যায়, কিন্তু যাদের মেধা সাধারণ মানুষের মাপে প্রমাণসই তাদের কাছে এতটা আশা করাই যায় না। তারা এই রুদ্ধ ভাষার ফাঁকের মধ্য দিয়া গলিয়া পার হইতেও পারে না, ডিঙাইয়া পার হওয়াও তাদের পক্ষে অসাধ্য।

এখন কথাটা এই, এই যে-সব বাঙালির ছেলে স্বাভাবিক বা আকস্মিক কারণে ইংরেজি ভাষা দখল করিতে পারিল না তারা কি এমন কিছু মারাত্মক অপরাধ করিয়াছে যেজন্য তারা বিদ্যামন্দির হইতে যাবজ্জীবন আণ্ডামানে চালান হইবার যোগ্য? ইংলন্‌ডে একদিন ছিল যখন সামান্য কলাটা মূলাটা চুরি করিলেও মানুষের ফাঁসি হইতে পারিত, কিন্তু এ যে তার চেয়েও কড়া আইন। এ যে চুরি করিতে পারে না বলিয়াই ফাঁসি। কেননা মুখস্থ করিয়া পাস করাই তো চৌর্যবৃত্তি। যে ছেলে পরীক্ষাশালায় গোপনে বই লইয়া যায় তাকে খেদাইয়া দেওয়া হয়; আর যে ছেলে তার চেয়েও লুকাইয়া লয়, অর্থাৎ চাদরের মধ্যে না লইয়া মগজের মধ্যে লইয়া যায়, সেই-বা কম কী করিল? সভ্যতার নিয়ম অনুসারে মানুষের স্মরণ-শক্তির মহলটা ছাপাখানায় অধিকার করিয়াছে। অতএব, যারা বই মুখস্থ করিয়া

পাস করে তারা অসভ্যরকমে চুরি করে, অথচ সভ্যতার যুগে পুরস্কার পাইবে তারাই?

যাই হোক, ভাগ্যক্রমে যারা পার হইল তাদের বিরুদ্ধে নালিশ করিতে চাই না। কিন্তু যারা পার হইল না তাদের পক্ষে হাবড়ার পুলটাই নাহয় দুফাঁক হইল, কিন্তু কোনো রকমের সরকারি খেয়াও কি তাদের কপালে জুটিবে না? স্টীমার না হয় তো পান্‌সি?

ভালোমত ইংরেজি শিখিতে পারিল না এমন ঢের ঢের ভালো ছেলে বাংলাদেশে আছে। তাদের শিখিবার আকাঙ্ক্ষা ও উদ্যমকে একেবারে গোড়ার দিকেই আটক করিয়া দিয়া দেশের শক্তির কি প্রভূত অপব্যয় করা হইতেছে না?

আমার প্রশ্ন এই, প্রেপারেটরি ক্লাস পর্যন্ত এক রকম পড়াইয়া তার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের মোড়টার কাছে যদি ইংরেজি বাংলা দুটো বড়ো রাস্তা খুলিয়া দেওয়া যায়, তা হইলে কি নানা প্রকারে সুবিধা হয় না? এক তো ভিড়ের চাপ কিছু কমেই, দ্বিতীয়ত শিক্ষার বিস্তার অনেক বাড়ে।

ইংরেজি রাস্তাটার দিকেই বেশি লোক ঝুঁকিবে তা জানি এবং দুটো রাস্তার চলাচল ঠিক সহজ অবস্থায় পৌঁছিতে কিছু সময়ও লাগিবে। রাজভাষার দর বেশি সুতরাং আদরও বেশি। কেবল চাকরির বাজারে নয়, বিবাহের বাজারেও বরের মূল্যবৃদ্ধি ঐ রাস্তাটাতেই। তাই হোক, বাংলাভাষা অনাদর সহিতে রাজি, কিন্তু অকৃতার্থতা সহ্য করা কঠিন। ভাগ্যমন্তের ছেলে ধাত্রীস্তন্যে মোটাসোটা হইয়া উঠুক-না, কিন্তু গরিবের ছেলেকে তার মাতৃস্তন্য হইতে বঞ্চিত করা কেন?

অনেক দিন হইতে অনেক মার খাইয়াছি বলিয়া সাবধানে কথা বলিবার চেষ্টা করিয়া থাকি। তবু অভ্যাসদোষে বেফাঁস কথা আপনি বাহির হইয়া পড়ে। আমার তো মনে হয়, গোড়ায় কথাটা আমি বেশ কৌশলেই পাড়িয়াছিলাম। নিজেকে বুঝাইয়াছিলাম, গোপাল অতি সুবোধ ছেলে, তাকে কম খাইতে দিলেও সে চেঁচামেচি করে না। তাই মৃদুস্বরে শুরু করিয়াছিলাম, আজকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের বহিরঙ্গনে যে একটা বক্তৃতার বৈঠক বসিয়াছে তারই এক কোণে বাংলার একটা আসন পাতিলে জায়গায় কুলাইয়া যাইবে। এ কথাটা গোপালের মতোই কথা হইয়াছিল; ইহাতে অভিভাবকেরা যদি-বা নারাজ হন তবু বিরক্ত হইবেন না।

কিন্তু, গোপালের সুবুদ্ধির চেয়ে যখন তার ক্ষুধা বাড়িয়া ওঠে তখন তার সুর আপনি চড়িতে থাকে; আমার প্রস্তাবটা অনেকখানি বড়ো হইয়া উঠিয়াছে। তার ফল প্রস্তাবের পক্ষেও সাংঘাতিক হইতে পারে, প্রস্তাবকের পক্ষেও। সেটা নূতন নয়। শুনিয়াছি, আমাদের দেশে শিশুমৃত্যুসংখ্যা খুব বেশি। এ দেশে শতকরা একশো-পঁচিশটা প্রস্তাব আঁতুরঘরেই মরে। আর, সাংঘাতিক মার এ বয়সে এত খাইয়াছি যে, ও জিনিসটাকে সাংঘাতিক বলিয়া একেবারেই বিশ্বাস করি না।

আমি জানি তর্ক এই উঠিবে, 'তুমি বাংলাভাষার যোগে উচ্চশিক্ষা দিতে চাও কিন্তু বাংলাভাষায় উঁচুদরের শিক্ষাগ্রন্থ কই?' নাই সে কথা মানি, কিন্তু শিক্ষা না চলিলে শিক্ষাগ্রন্থ হয় কী উপায়ে? শিক্ষাগ্রন্থ বাগানের গাছ নয় যে শৌখিন লোকে শখ করিয়া তার কেয়ারি করিবে, কিংবা সে আগাছাও নয় যে মাঠে বাটে নিজের পুলকে নিজেই কণ্টকিত হইয়া উঠিবে। শিক্ষাকে যদি শিক্ষাগ্রন্থের জন্য বসিয়া থাকিতে হয় তবে পাতার জোগাড় আগে হওয়া চাই তার পরে গাছের পালা, এবং কূলের পথ চাহিয়া নদীকে মাথায় হাত দিয়া পড়িতে হইবে।

বাংলায় উচ্চ অঙ্গের শিক্ষাগ্রন্থ বাহির হইতেছে না এটা যদি আক্ষেপের বিষয় হয় তবে তার প্রতিকারের একমাত্র উপায়, বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলায় উচ্চ-অঙ্গের শিক্ষা প্রচলন করা। বঙ্গসাহিত্যপরিষৎ কিছুকাল হইতে এই কাজের গোড়াপত্তনের চেষ্টা করিতেছেন। পরিভাষা-রচনা ও সংকলনের ভার পরিষৎ লইয়াছেন, কিছু কিছু করিয়াওছেন। তাঁদের কাজ ঢিমা চালে চলিতেছে বা অচল হইয়া আছে বলিয়া নালিশ করি। কিন্তু দু পা'ও যে চলিয়াছে এইটেই আশ্চর্য। দেশে এই পরিভাষা-তৈরির তাগিদ কোথায়? ইহার ব্যবহারের প্রয়োজন বা সুযোগ কৈ? দেশে টাকা চলিবে না অথচ টাঁকশাল চলিতেই থাকিবে, এমন আব্দার করি কোন্ লজ্জায়?

যদি বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনোদিন বাংলাশিক্ষার রাস্তা খুলিয়া যায় তবে তখন এই বঙ্গসাহিত্যপরিষদের দিন আসিবে। এখন রাস্তা নাই তাই সে হুঁচট খাইতে খাইতে চলে; তখন চার ঘোড়ার গাড়ি বাহির করিবে। আজ আক্ষেপের কথা এই যে, আমাদের উপায় আছে, উপকরণ আছে, ক্ষেত্র নাই। বাংলার যজ্ঞে আমরা অন্নসত্র খুলিতে পারি। এই তো সব আছেন আমাদের জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র, ব্রজেন্দ্রনাথ, মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী এবং আরো অনেক এই শ্রেণীর নামজাদা ও প্রচ্ছন্ননাম্ন বাঙালি। অথচ যে-সব বাঙালি কেবল বাংলা জানে তাদের উপবাস কোনোদিন ঘুচিবে না? তারা এঁদের লইয়া গৌরব করিবে, কিন্তু লইয়া ব্যবহার করিতে পারিবে না? বাংলাবিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসাদে বরঞ্চ সাত সমুদ্র পার হইয়া বিদেশী ছেলে এঁদের কাছে শিক্ষা লইয়া যাইতে পারে, কেবল বাংলাদেশের যে ছাত্র বাংলা জানে এঁদের কাছে বসিয়া শিক্ষা লইবার অধিকার তাদেরই নাই!

জার্মানিতে ফ্রান্সে আমেরিকায় জাপানে যে-সকল আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয় জাগিয়া উঠিয়াছে তাদের মূল উদ্দেশ্য সমস্ত দেশের চিত্তকে মানুষ করা। দেশকে তারা সৃষ্টি করিয়া চলিতেছে। বীজ হইতে অঙ্কুরকে, অঙ্কুর হইতে বৃক্ষকে তারা মুক্তিদান করিতেছে। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিকে, চিত্তশক্তিকে উদ্ঘাটিত করিতেছে।

দেশের এই মনকে মানুষ করা কোনোমতেই পরের ভাষায় সম্ভবপর নহে। আমরা লাভ করিব, কিন্তু সে লাভ আমাদের ভাষাকে পূর্ণ করিবে না; আমরা চিন্তা করিব, কিন্তু সে চিন্তার বাহিরে আমাদের ভাষা পড়িয়া থাকিবে; আমাদের মন বাড়িয়া চলিবে, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ভাষা বাড়িতে থাকিবে না—সমস্ত শিক্ষাকে অকৃতার্থ করিবার এমন উপায় আর কী হইতে পারে!

তার ফল হইয়াছে, উচ্চ-অঙ্গের শিক্ষা যদি-বা আমরা পাই উচ্চ-অঙ্গের চিন্তা আমরা করি না। কারণ, চিন্তার স্বাভাবিক বাহন আমাদের ভাষা। বিদ্যালয়ের বাহিরে আসিয়া পোশাকি ভাষাটা আমরা ছাড়িয়া ফেলি, সেই সঙ্গে তার পকেটে যা-কিছু সঞ্চয় থাকে তা আলনায় ঝোলানো থাকে; তার পরে আমাদের চিরদিনের আটপৌরে ভাষায় আমরা গল্প করি, গুজব করি, রাজা-উজির মারি, তর্জমা করি, চুরি করি এবং খবরের কাগজে অশ্রাব্য কাপুরুষতার বিস্তার করিয়া থাকি। এসত্ত্বেও আমাদের দেশে বাংলায় সাহিত্যের উন্নতি হইতেছে না এমন কথা বলি না, কিন্তু এ সাহিত্যে উপবাসের লক্ষণ যথেষ্ট দেখিতে পাই। যেমন, এমন রোগী দেখা যায় যে খায় প্রচুর অথচ তার হাড় বাহির হইয়া পড়িয়াছে, তেমনি দেখি আমরা যতটা শিক্ষা করিতেছি তার সমস্তটা আমাদের সাহিত্যের সর্বাঙ্গে পোষণ সঞ্চার করিতেছে না। খাদ্যের সঙ্গে আমাদের প্রাণের সঙ্গে সম্পূর্ণ যোগ হইতেছে না

তার প্রধান কারণ, আমরা নিজের ভাষার রসনা দিয়া খাই না; আমাদের কলে করিয়া খাওয়ানো হয়, তাতে আমাদের পেট ভর্তি করে, দেহপূর্তি করে না।

সকলেই জানেন, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাঁচে তৈরি। ঐ বিদ্যালয়টি পরীক্ষায় পাস করা ডিগ্রীধারীদের নামের উপর মার্কা মারিবার একটা বড়োগোছের শিলমোহর। মানুষকে তৈরি করা নয়, মানুষকে চিহ্নিত করা তার কাজ। মানুষকে হাটের মাল করিয়া তার বাজার-দর দাগিয়া দিয়া ব্যাবসাদারির সহায়তা সে করিয়াছে।

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় হইতেও আমরা সেই ডিগ্রীর টাঁকশালার ছাপ লওয়াকেই বিদ্যালাভ বলিয়া গণ্য করিয়াছি। ইহা আমাদের অভ্যাস হইয়া গেছে। আমরা বিদ্যা পাই বা না পাই বিদ্যালয়ের একটা ছাঁচ পাইয়াছি। আমাদের মুশকিল এই যে, আমরা চিরদিন ছাঁচের উপাসক। ছাঁচে-ঢালাই-করা রীতিনীতি চালচলনকেই নানা আকারে পূজার অর্ঘ্য দিয়া এই ছাঁচদেবীর প্রতি অচলা ভক্তি আমাদের মজ্জাগত। সেইজন্য ছাঁচে-ঢালা বিদ্যাটাকে আমরা দেবীর বরদান বলিয়া মাথায় করিয়া লই; ইহার চেয়ে বড়ো কিছু আছে এ কথা মনে করাও আমাদের পক্ষে শক্ত।

তাই বলিতেছি, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের যদি একটা বাংলা অঙ্গের সৃষ্টি হয় তার প্রতি বাঙালি অভিভাবকদের প্রসন্ন দৃষ্টি পড়িবে কি না সন্দেহ। তবে কিনা, ইংরেজি চালুনির ফাঁক দিয়া যারা গলিয়া পড়িতেছে এমন ছেলে এখানে পাওয়া যাইবে। কিন্তু আমার মনে হয়, তার চেয়ে একটা বড়ো সুবিধার কথা আছে।

সে সুবিধাটি এই যে, এই অংশেই বিশ্ববিদ্যালয় স্বাধীনভাবে ও স্বাভাবিকরূপে নিজেকে সৃষ্টি করিয়া তুলিতে পারিবে। তার একটা কারণ, এই অংশের শিক্ষা অনেকটা পরিমাণে বাজার-দরের দাসত্ব হইতে মুক্ত হইবে। আমাদের অনেককেই ব্যাবসার খাতিরে জীবিকার দায়ে ডিগ্রী লইতেই হয়, কিন্তু সে পথ যাদের অগত্যা বন্ধ কিংবা যারা শিক্ষার জন্যই শিখিতে চাহিবে তারাই এই বাংলা-বিভাগে আকৃষ্ট হইবে। শুধু তাই নয়, যারা দায়ে পড়িয়া ডিগ্রী লইতেছে তারাও অবকাশমত বাংলাভাষার টানে এই বিভাগে আনাগোনা করিতে ছাড়িবে না। কারণ, দু দিন না যাইতেই দেখা যাইবে, এই বিভাগেই আমাদের দেশের অধ্যাপকদের প্রতিভার বিকাশ হইবে। এখন যাঁরা কেবল ইংরেজি শব্দের প্রতিশব্দ ও নোটের ধুলা উড়াইয়া আঁধি লাগাইয়া দেন তাঁরাই সেদিন ধারাবর্ষণে বাংলার তৃষিত চিত্ত জুড়াইয়া দিবেন।

এমনি করিয়া যাহা সজীব তাহা ক্রমে কলকে আচ্ছন্ন করিয়া নিজের স্বাভাবিক সফলতাকে প্রমাণ করিয়া তুলিবে। একদিন ইংরেজিশিক্ষিত বাঙালি নিজের ইংরেজি লেখার অভিমানে বাংলাভাষাকে অবজ্ঞা করিয়াছিল, কিন্তু কোথা হইতে নব বাংলাসাহিত্যের ছোটো একটি অঙ্কুর বাংলার হৃদয়ের ভিতর হইতে গজাইয়া উঠিল— তখন তার ক্ষুদ্রতাকে তার দুর্বলতাকে পরিহাস করা সহজ ছিল— কিন্তু সে যে সজীব, ছোটো হইলেও উপেক্ষার সামগ্রী নয়; আজ সে মাথা তুলিয়া বাঙালির ইংরেজি রচনাকে অবজ্ঞা করিবার সামর্থ্য লাভ করিয়াছে। অথচ, বাংলাসাহিত্যের কোনো পরিচয় কোনো আদর রাজদ্বারে ছিল না— আমাদের মতো অধীন জাতির পক্ষে সেই প্রলোভনের অভাব কম অভাব নয়— বাহিরের সেই-সমস্ত অনাদরকে গণ্য না করিয়া বিলাতি বাজারের যাচনদারের দৃষ্টির বাহিরে কেবলমাত্র নিজের প্রাণের আনন্দেই সে আজ পৃথিবীতে চিরপ্রতিষ্ঠা লাভের যোগ্য হইতেছে।

এতদিন ধরিয়া আমাদের সাহিত্যিকেরা যদি ইংরেজি কপিবুক নকল করিয়া আসিতেন তাহা হইলে জগতে যে প্রভূত আবর্জনার সৃষ্টি হইত তাহা কল্পনা করিলেও গায়ে কাঁটা দিয়া উঠে।

এতদিন ধরিয়া ইংরেজি বিদ্যার যে কলটা চলিতেছে সেটাকে মিস্ত্রিখানার যোগে বদল করা আমাদের সাধ্যায়ত্ত নহে। তার দুটো কারণ আছে। এক, কলটা একটা বিশেষ ছাঁচে গড়া, একেবারে গোড়া হইতে সে ছাঁচ বদল করা সোজা কথা নয়। দ্বিতীয়ত, এই ছাঁচের প্রতি ছাঁচ-উপাসকদের ভক্তি এত সুদৃঢ় যে, আমরা ন্যাশনাল কলেজই করি আর হিন্দু য়ুনিভার্সিটিই করি আমাদের মন কিছুতেই ঐ ছাঁচের মুঠা হইতে মুক্তি পায় না। ইহার সংস্কারের একটিমাত্র উপায় আছে, এই ছাঁচের পাশে একটা সজীব জিনিসকে অল্প একটু স্থান দেওয়া। তাহা হইলে সে তর্ক না করিয়া, বিরোধ না করিয়া, কলকে আচ্ছন্ন করিয়া একদিন মাথা তুলিয়া উঠিবে এবং কল যখন আকাশে ধোঁওয়া উড়াইয়া ঘর্ঘর শব্দে হাটের জন্য মালের বস্তা উদ্গার করিতে থাকিবে তখন এই বনস্পতি নিঃশব্দে দেশকে ফল দিবে, ছায়া দিবে এবং দেশের সমস্ত কলভাষী বিহঙ্গদলকে নিজের শাখায় শাখায় আশ্রয় দান করিবে।

কিন্তু ঐ কলটার সঙ্গে রফা করিবার কথাই বা কেন বলা? ওটা দেশের আপিস-আদালত, পুলিসের থানা, জেলখানা, পাগ্‌লাগারদ, জাহাজের জেটি, পাটের কল প্রভৃতি আধুনিক সভ্যতার আসবাবের সামিল হইয়া থাক্‌-না। আমাদের দেশ যেখানে ফল চাহিতেছে, ছায়া চাহিতেছে, সেখানে কোঠাবাড়িগুলা ছাড়িয়া একবার মাটির দিকেই নামিয়া আসি-না কেন? গুরুর চারি দিকে শিষ্য আসিয়া যেমন স্বভাবের নিয়মে বিশ্ববিদ্যালয় সৃষ্টি করিয়া তোলে, বৈদিককালে যেমন ছিল তপোবন, বৌদ্ধকালে যেমন ছিল নালন্দা-তক্ষশিলা, ভারতের দুর্গতির দিনেও যেমন করিয়া টোল-চতুষ্পাঠী দেশের প্রাণ হইতে প্রাণ লইয়া দেশকে প্রাণ দিয়া রাখিয়াছিল, তেমনি করিয়াই বিশ্ববিদ্যালয়কে জীবনের দ্বারা জীবলোকে সৃষ্টি করিয়া তুলিবার কথাই সাহস করিয়া বলা যাক্‌-না কেন?

সৃষ্টির প্রথম মন্ত্র 'আমরা চাই'। এই মন্ত্র কি দেশের চিত্তকুহর হইতে একেবারেই শুনা যাইতেছে না? দেশে যাঁরা আচার্য, যাঁরা সন্ধান করিতেছেন, সাধনা করিতেছেন, ধ্যান করিতেছেন, তাঁরা কি এই মন্ত্রে শিষ্যদের কাছে আসিয়া মিলিবেন না? বাষ্প যেমন মেঘে মেলে, মেঘ যেমন ধারাবর্ষণে ধরণীকে অভিষিক্ত করে, তেমনি করিয়া কবে তাঁরা একত্র মিলিবেন, কবে তাঁদের সাধনা মাতৃভাষায় গলিয়া পড়িয়া মাতৃভূমিকে তৃষ্ণার জলে ও ক্ষুধার অন্নে পূর্ণ করিয়া তুলিবে?

আমার এই শেষ কথাটি কেজো কথা নহে, ইহা কল্পনা। কিন্তু আজ পর্যন্ত কেজো কথায় কেবল জোড়াতাড়া চলিয়াছে, সৃষ্টি হইয়াছে কল্পনায়।

পৌষ ১৩২২

ছাত্রশাসনতন্ত্র

প্রেসিডেন্সি কলেজে ছাত্রদের সহিত কোনো কোনো য়ুরোপীয় অধ্যাপকের যে বিরোধ ঘটিয়াছে তাহা লইয়া কোনো কথা বলিতে সংকোচ বোধ করি। তার একটা কারণ, ব্যাপারটা দেখিতেও ভালো হয় নাই, শুনিতেও ভালো নয়। আর-একটা

কারণ, ইংরেজ ও ভারতবাসীর সম্পর্কটার মধ্যে যেখানে কিছু ব্যথা আছে সেখানে নাড়া দিতে ইচ্ছা করে না।

কিন্তু কথাটাকে চাপা দিলে চলিবে না। চাপা থাকেও নাই, বাহির হইয়া পড়িয়াছে। মনে মনে বা কানে কানে বা মুখে মুখে সকলেই এর বিচার করিতেছে।

বিকৃতি ভিতরে জমিতে থাকিলে একদিন সে আর আপনাকে ধরিয়া রাখিতে পারে না। লাল হইয়া শেষকালে ফাটিয়া পড়ে। তখনকার মতো সেটা সুদৃশ্য নয়।

বাহিরে ফুটিয়া পড়াটাকেই দোষ দেওয়া বিশ্ববিধানকে দোষ দেওয়া; এমনতরো অপবাদে বিশ্ববিধাতা কান দেন না। ভিতরে ভিতরে জমিতে দেওয়া লইয়াই আমাদের নালিশ চলে।

যাক, বাহির যখন হইয়াছেই তখন বিচার করিয়া কোনো-একটা জায়গায় শান্তি না দিলে নয়। এইটেই সংকটের সময়। জিনিসটা ভদ্র রকমের নহে, এটা ঠিক। ইহার আক্রোশটা প্রকাশ করিব কার উপরে? প্রায় দেখা যায় সহজে যার উপরে জোর খাটে শাসনের ধাক্কাটা তারই উপরে পড়ে। ঘরের গৃহিণী যেখানে বউকে মারিতে ভয় পায় সেখানে ঝিকে মারিয়া কর্তব্য পালন করে।

বিচারসভা বসিয়াছে। ইতিমধ্যেই ছাত্রদের সম্বন্ধে শাসন কড়া করিবার জন্য কোনো মিশনরি কলেজের কর্তা কর্তৃপক্ষের নিকট আব্দার প্রকাশ করিয়াছেন। কথাটা শুনিতেও হঠাৎ সংগত বোধ হয়। কারণ, ছাত্রেরা অধ্যাপকদের অসম্মান করিলে সেটা যে কেবল অপরাধ হয় তাহা নহে, সেটা অস্বাভাবিক হইয়া উঠে। যেখান হইতে আমরা জ্ঞান পাই সেখানে আমাদের শ্রদ্ধা যাইবে, এটা মানবপ্রকৃতির ধর্ম। তাহার উল্টা দেখিলে বাহিরের শাসনে এই বিকৃতির প্রতিকার করিতে হইবে, সে কথা সকলেই স্বীকার করিবেন।

কিন্তু, প্রতিকারের প্রণালী স্থির করিবার পূর্বে ভাবিয়া দেখা চাই, স্বভাব ওল্টায় কিসে।

কাগজে দেখিতে পাই, অনেকে এই বলিয়া আক্ষেপ করিতেছেন যে, যে ভারতবর্ষে গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ ধর্মসম্বন্ধ সেখানে এমনতরো ঘটনা বিশেষভাবে গর্হিত। শুধু গর্হিত এ কথা বলিয়া পার পাইব না, চিরকালীন এই সংস্কার অস্থিমজ্জার মধ্যে থাকা সত্ত্বেও ব্যবহারে তাহার ব্যতিক্রম ঘটিতেছে কেন এর একটা সত্য উত্তর বাহির করিতে হইবে।

বাংলাদেশের ছাত্রদের মনস্তত্ত্ব যে বিধাতার একটি খাপছাড়া খেয়াল এ কথা মানি না। ছেলেরা যে বয়সে কলেজে পড়ে সেটা একটা বয়ঃসন্ধির কাল। তখন শাসনের সীমানা হইতে স্বাধীনতার এলাকায় সে প্রথম পা বাড়াইয়াছে। এই স্বাধীনতা কেবল বাহিরের ব্যবহারগত নহে; মনোরাজ্যেও সে ভাষার খাঁচা ছাড়িয়া ভাবের আকাশে ডানা মেলিতে শুরু করিয়াছে। তার মন প্রশ্ন করিবার, তর্ক করিবার, বিচার করিবার অধিকার প্রথম লাভ করিয়াছে। শরীর-মনের এই বয়ঃসন্ধিকালটিই বেদনাকাতরতায় ভরা। এই সময়েই অল্পমাত্র অপমান মর্মে গিয়া বিঁধিয়া থাকে এবং আভাসমাত্র প্রীতি জীবনকে সুধাময় করিয়া তোলে। এই সময়েই মানবসংস্রবের জোর তার 'পরে যতটা খাটে এমন আর-কোনো সময়েই নয়।

এই বয়সটাই মানুষের জীবন মানুষের সঙ্গপ্রভাবেই গড়িয়া উঠিবার পক্ষে সকলের চেয়ে অনুকূল, স্বভাবের এই সত্যটিকে সকল দেশের লোকেই মানিয়া লইয়াছে। এইজন্যই আমাদের দেশে বলে: প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে পুত্রং

মিত্রবদাচরেৎ। তার মানে এই বয়সেই ছেলে যেন বাপকে পুরাপুরি মানুষ বলিয়া বুঝিতে পারে, শাসনের কল বলিয়া নহে; কেননা, মানুষ হইবার পক্ষে মানুষের সংস্রব এই বয়সেই দরকার। এইজন্যই সকল দেশেই য়ুনিভার্সিটিতে ছাত্ররা এমন একটুখানি সম্মানের পদ পাইয়া থাকে যাহাতে অধ্যাপকদের বিশেষ কাছে তারা আসিতে পারে এবং সেই সুযোগে তাদের জীবনের 'পরে মানবসংস্রবের হাত পড়িতে পায়। এই বয়সে ছাত্রগণ শিক্ষার উদ্যোগপর্ব শেষ করিয়া মনুষ্যত্বের সার জিনিসগুলিকে আত্মসাৎ করিবার পালা আরম্ভ করে; এই কাজটি স্বাধীনতা ও আত্মসম্মান ছাড়া হইবার জো নাই। সেইজন্যই এই বয়সে আত্মসম্মানের সম্বন্ধে দরদ বড়ো বেশি হয়। চিবাইয়া খাইবার বয়স আসিলে বেশ একটু জানান দিয়া দাঁত ওঠে, তেমনি মনুষ্যত্বলাভের যখন বয়স আসে তখন আত্মসম্মানবোধটা একটু ঘটা করিয়াই দেখা দেয়।

এই বয়ঃসন্ধির কালে ছাত্ররা মাঝে মাঝে এক-একটা হাঙ্গাম বাধাইয়া বসে। যেখানে ছাত্রদের সঙ্গে অধ্যাপকের সম্বন্ধ স্বাভাবিক সেখানে এই-সকল উৎপাতকে জোয়ারের জলের জঞ্জালের মতো ভাসিয়া যাইতে দেওয়া হয়; কেননা, তাকে টানিয়া তুলিতে গেলেই সেটা বিশ্রী হইয়া উঠে।

বিধাতার নিয়ম অনুসারে বাঙালি ছাত্রদেরও এই বয়ঃসন্ধির কাল আসে, তখন তাহাদের মনোবৃত্তি যেমন এক দিকে আত্মশক্তির অভিমুখে মাটি ফুঁড়িয়া উঠিতে চায় তেমনি আর-এক দিকে যেখানে তারা কোনো মহত্ত্ব দেখে, যেখান হইতে তারা শ্রদ্ধা পায়, জ্ঞান পায়, দরদ পায়, প্রাণের প্রেরণা পায়, সেখানে নিজেকে উৎসর্গ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠে। মিশনরি কলেজের বিধাতাপুরুষের বিধানে ঠিক এই বয়সেই তাহাদিগকে শাসনে পেষণে দলনে দমনে নির্জীব জড়পিণ্ড করিয়া তুলিবার জাঁতাকল বানাইয়া তোলা জগদ্‌বিধাতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ; ইহাই প্রকৃত নাস্তিকতা।

জেলখানার কয়েদি নিয়মের নড়চড় করিলে তাকে কড়া শাসন করিতে কারও বাধে না; কেননা তাকে অপরাধী বলিয়াই দেখা হয়, মানুষ বলিয়া নয়। অপমানের কঠোরতায় মানুষের মনে কড়া পড়িয়া তাকে কেবলই অমানুষ করিতে থাকে, সে হিসাবটা কেহ করিতে চায় না; কেননা, মানুষের দিক দিয়া তাকে হিসাব করাই হয় না। এইজন্য জেলখানার সর্দারি যে করে সে মানুষকে নয়, অপরাধীকেই সকলের চেয়ে বড়ো করিয়া দেখে।

সৈন্যদলকে তৈরি করিয়া তুলিবার ভার যে লইয়াছে সে মানুষকে একটিমাত্র সংকীর্ণ প্রয়োজনের দিক হইতেই দেখিতে বাধ্য। লড়াইয়ের নিখুঁত কল বানাইবার ফর্মাশ তার উপরে। সুতরাং, সেই কলের হিসাবে যে কিছু ত্রুটি সেইটে সে একান্ত করিয়া দেখে এবং নির্মমভাবে সংশোধন করে।

কিন্তু, ছাত্রকে জেলের কয়েদি বা ফৌজের সিপাই বলিয়া আমরা তো মনে ভাবিতে পারি না। আমরা জানি, তাহাদিগকে মানুষ করিয়া তুলিতে হইবে। মানুষের প্রকৃতি সূক্ষ্ম এবং সজীব তন্তুজালে বড়ো বিচিত্র করিয়া গড়া। এইজন্যই মানুষের মাথা ধরিলে মাথায় মুগুর মারিয়া সেটা সারানো যায় না; অনেক দিক বাঁচাইয়া প্রকৃতির সাধ্যসাধনা করিয়া তার চিকিৎসা করিতে হয়। এমন লোকও আছে এ সম্বন্ধে যারা বিজ্ঞানকে খুবই সহজ করিয়া আনিয়াছে; তারা সকল ব্যাধিরই একটিমাত্র কারণ ঠিক করিয়া রাখিয়াছে, সে ভূতে পাওয়া। এবং তারা মিশনরি কলেজের ওঝাটির মতো ব্যাধির ভূতকে মারিয়া ঝাড়িয়া, গরম লোহার

ছ্যাঁকা দিয়া, চীৎকার করিয়া, তাড়াইতে চায়। তাহাতে ব্যাধি যায়। এবং প্রাণপদার্থের প্রায় পনেরো আনা তার অনুসরণ করে।

এ হইল আনাড়ির চিকিৎসা। যারা বিচক্ষণ তারা ব্যাধিটাকেই স্বতন্ত্র করিয়া দেখে না; চিকিৎসার সময় তারা মানুষের সমস্ত ধাতটাকে অখণ্ড করিয়া দেখে; মানবপ্রকৃতির জটিলতা ও সূক্ষ্মতাকে তারা মানিয়া লয় এবং বিশেষ কোনো ব্যাধিকে শাসন করিতে গিয়া সমস্ত মানুষকে নিকাশ করিয়া বসে না।

অতএব যাদের উচিত ছিল জেলের দারোগা বা ড্রিল সার্জেণ্ট্ বা ভূতের ওঝা হওয়া তাদের কোনোমতেই উচিত হয় না ছাত্রদিগকে মানুষ করিবার ভার লওয়া। ছাত্রদের ভার তাঁরাই লইবার অধিকারী যাঁরা নিজের চেয়ে বয়সে অল্প, জ্ঞানে অপ্রবীণ ও ক্ষমতায় দুর্বলকেও সহজেই শ্রদ্ধা করিতে পারেন; যাঁরা জানেন, শক্তস্য ভূষণং ক্ষমা; যাঁরা ছাত্রকেও মিত্র বলিয়া গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হন না।

যিশুখৃস্ট বলিয়াছেন, 'শিশুদিগকে আমার কাছে আসিতে দাও।' তিনি শিশুদিগকে বিশেষ করিয়া শ্রদ্ধা করিয়াছেন। কেননা, শিশুদের মধ্যেই পরিপূর্ণতার ব্যঞ্জনা আছে। যে মানুষ বয়সে পাকা হইয়া অভ্যাসে সংস্কারে ও অহমিকায় কঠিন হইয়া গেছে সে মানুষ সেই পূর্ণতার ব্যঞ্জনা হারাইয়াছে; বিশ্বগুরুর কাছে আসা তার পক্ষেই বড়ো কঠিন।

ছাত্রেরা গড়িয়া উঠিতেছে; ভাবের আলোকে, রসের বর্ষণে তাদের প্রাণকোরকের গোপন মর্মস্থলে বিকাশবেদনা কাজ করিতেছে। প্রকাশ তাদের মধ্যে থামিয়া যায় নাই; তাদের মধ্যে পরিপূর্ণতার ব্যঞ্জনা। সেইজন্যই সৎগুরু ইহাদিগকে শ্রদ্ধা করেন, প্রেমের সহিত কাছে আহ্বান করেন, ক্ষমার সহিত ইহাদের অপরাধ মার্জনা করেন এবং ধৈর্যের সহিত ইহাদের চিত্তবৃত্তিকে ঊর্ধ্বের দিকে উদ্‌ঘাটন করিতে থাকেন। ইহাদের মধ্যে পূর্ণমনুষ্যত্বের মহিমা প্রভাতের অরুণরেখার মতো অসীম সম্ভাব্যতার গৌরবে উজ্জ্বল; সেই গৌরবের দীপ্তি যাদের চোখে পড়ে না, যারা নিজের বিদ্যা পদ বা জাতির অভিমানে ইহাদিগকে পদে পদে অবজ্ঞা করিতে উদ্যত, তারা গুরুপদের অযোগ্য। ছাত্রদিগকে যারা স্বভাবতই শ্রদ্ধা করিতে না পারে ছাত্রদের নিকট হইতে ভক্তি তারা সহজে পাইতে পারিবে না। কাজেই ভক্তি জোর করিয়া আদায় করিবার জন্য তারাই রাজদরবারে কড়া আইন ও চাপরাশওয়ালা পেয়াদার দরবার করিয়া থাকে।

ছাত্রদিগকে কড়া শাসনের জালে যাঁরা মাথা হইতে পা পর্যন্ত বাঁধিয়া ফেলিতে চান তাঁরা অধ্যাপকদের যে কত বড়ো ক্ষতি করিতেছেন সেটা যেন ভাবিয়া দেখেন। পৃথিবীতে অল্প লোকই আছে নিজের অন্তরের মহৎ আদর্শ যাহাদিগকে সত্য পথে আহ্বান করিয়া লইয়া যায়। বাহিরের সঙ্গে ঘাতপ্রতিঘাতের ঠেলাতেই তারা কর্তব্য সম্বন্ধে সতর্ক হইয়া থাকে। বাহিরের সঙ্গে বোঝাপড়া আছে বলিয়াই তারা আত্মবিস্মৃত হইতে পারে না।

এইজন্যই চারি দিকে যেখানে দাসত্ব মনিবের সেখানে দুর্গতি, শূদ্র যেখানে শূদ্র ব্রাহ্মণের সেখানে অধঃপতন। কঠোর শাসনের চাপে ছাত্রেরা যদি মানবস্বভাব হইতে ভ্রষ্ট হয়, সকলপ্রকার অপমান দুর্ব্যবহার ও অযোগ্যতা যদি তারা নির্জীবভাবে নিঃশব্দে সহিয়া যায়, তবে অধিকাংশ অধ্যাপকদিগকেই তাহা অধোগতির দিকে টানিয়া লইবে। ছাত্রদের মধ্যে অবজ্ঞার কারণ তাঁরা নিজে ঘটাইয়া তুলিয়া তাহাদের অবমাননার দ্বারা নিজেকে অহরহ অবমানিত করিতে থাকিবেন। অবজ্ঞার ক্ষেত্রে নিজের কর্তব্য কখনোই কেহ সাধন করিতে পারে না।

অপর পক্ষ বলিবেন, তবে কি ছেলেরা যা খুশি তাই করিবে আর সমস্তই সহিয়া লইতে হইবে? আমার কথা এই, ছেলেরা যা খুশি তাই কখনোই করিবে না। তারা ঠিক পথেই চলিবে, যদি তাহাদের সঙ্গে ঠিকমত ব্যবহার করা হয়। যদি তাহাদিগকে অপমান কর, তাহাদের জাতি বা ধর্ম বা আচারকে গালি দাও, যদি দেখে তাহাদের পক্ষে সুবিচার পাইবার আশা নাই, যদি অনুভব করে যোগ্যতা-সত্ত্বেও তাহাদের স্বদেশীয় অধ্যাপকেরা অযোগ্যের কাছে মাথা হেঁট করিতে বাধ্য, তবে ক্ষণে ক্ষণে তারা অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করিবেই; যদি না করে তবে আমরা সেটাকে লজ্জা এবং দুঃখের বিষয় বলিয়া মনে করিব।

অপর পক্ষে একটি সংগত কথা বলিবার আছে। য়ুরোপীয়ের পক্ষে ভারতবর্ষ বিদেশ, এখানকার আবহাওয়া ক্লান্তিকর, তাঁহাদের পানাহার উত্তেজক, আমরা তাঁহাদের অধীনস্থ জাতি, আমাদের বর্ণ ধর্ম ভাষা আচার সমস্তই স্বতন্ত্র। তার উপরে, এ দেশে প্রত্যেক ইংরেজই রাজশক্তি বহন করেন, সুতরাং রাজাসন তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই চলিতে থাকে; এইজন্য ছাত্রকে কেবলমাত্র ছাত্র বলিয়া দেখা তাঁর পক্ষে শক্ত, তাকে প্রজা বলিয়াও দেখেন। অতএব, অতি সামান্য কারণেই অসহিষ্ণু হওয়া তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক। বাঙালি ছাত্রদের মানুষ করিবার ভার কেবল তাঁর নয়, ইংরেজ-রাজের প্রতিষ্ঠা রক্ষার ভারও তাঁর। অতএব, একে তিনি ইংরেজ, তার উপর তিনি ইম্পীরিএল সার্ভিসের অধ্যাপক, তার উপরে তিনি রাজার অংশ, তার উপরে তাঁর বিশ্বাস তিনি পতিত-উদ্ধার করিবার জন্য আমাদের প্রতি কৃপা করিয়াই এ দেশে আসিয়াছেন—এমন অবস্থায় সকল সময়ে তাঁর মেজাজ ঠিক না থাকিতেও পারে। অতএব, তিনি কিরূপ ব্যবহার করিবেন সে বিচার না করিয়া ছাত্রদেরই ব্যবহারকে আষ্টেপৃষ্ঠে কঠিন করিয়া বাঁধিয়া দিতে হইবে। সমুদ্রকে বলিলে চলিবে না যে, ‘তুমি এ পর্যন্ত আসিবে তার ঊর্ধ্বে নয়’, তীরে যারা আছে তাহাদিগকেই বলিতে হইবে, ‘তোমরা হঠো, হঠো, আরো হঠো।’

তাই বলিতেছি, এ কথা সত্য বলিয়া মানিতেই হইবে যে, নানা অনিবার্য কারণে ইংরেজ অধ্যাপক বাঙালি ছাত্রের সহিত বিশুদ্ধ অধ্যাপকের মতো ব্যবহার করিয়া উঠিতে পারেন না। কেম্‌ব্রিজে অক্‌স্‌ফোর্ডে ছাত্রদের সহিত অধ্যাপকদের সম্বন্ধ কিরূপ তর্কস্থলে আমরা সে নজির উত্থাপন করিয়া থাকি, কিন্তু তাহাতে লাভ কী! সেখানে যে সম্বন্ধ স্বাভাবিক এখানে যে তাহা নহে, সে কথা স্বীকার করিতেই হইবে। অতএব, স্বাভাবিকতায় যেখানে গর্ত আছে সেখানে শাসনের ইঁটপাটকেল দিয়া ভরাট করিবার কথাটাই সর্বাগ্রে মনে আসে।

সমস্যাটা আমাদের পক্ষে শক্ত হইয়াছে এই কারণেই। এইজন্যই আমাদের স্বদেশীয় বিজ্ঞেরাও ছাত্রদিগকে পরামর্শ দিয়া থাকেন যে, ‘বাপু, তোমরা কোনোমতে এগ্‌জামিন পাস করিয়াই সন্তুষ্ট থাকো, মানুষ হইবার দুরাশা মনে রাখিয়ো না।’

এ বেশ ভালো কথা। কিন্তু সুবুদ্ধির কথা চিরদিন খাটে না; মানবপ্রকৃতি সুবুদ্ধির পাকা ভিতের উপরে পাথরে গাঁথিয়া তৈরি হয় নাই। তাকে বাড়িতে হইবে, এইজন্যই সে কাঁচা। এইজন্যই কৃত্রিম ঘেরটাকে সে খানিকটা দূর পর্যন্ত সহ্য করে; তার পরে প্রাণের বাড় আর আপনাকে ধরিয়া রাখিতে পারে না, একদিন হঠাৎ বেড়া ফাটিয়া ভাঙিয়া পড়ে। যে প্রাণ কাঁচা তারই জয় হয়, যে বাঁধন পাকা সে টেকে না।

অতএব, স্বভাবকে যদি কেবল এক পক্ষেই মানি এবং অপর পক্ষে একেবারেই

অগ্রাহ্য করি তবে কিছুদিন মনে হয়, সেই এক-তরফা নিষ্পত্তিতে বেশ কাজ চলিতেছে। তার পরে একদিন হঠাৎ দেখিতে পাই, কাজ একেবারেই চলিতেছে না। তখন দ্বিগুণ রাগ হয়; যা এতদিন ঠাণ্ডা ছিল তার অকস্মাৎ চঞ্চলতা গুরুতর অপরাধ বলিয়াই গণ্য হইতে থাকে এবং সেই কারণেই শাস্তির মাত্রা দণ্ডবিধির সহজ বিধানকে ছাড়াইয়া যায়। তার পর হইতে সমস্ত ব্যাপারটা এমনি জটিল হইয়া উঠে যে কমিশনের পঞ্চায়েত তার মধ্যে পথ খুঁজিয়া পায় না; তখন বলিতে বাধ্য হয় যে, 'কুড়াল দিয়া কাটিয়া, আগুন দিয়া পোড়াইয়া, স্টীম্‌রোলার দিয়া পিষিয়া রাস্তা তৈরি করো।'

কথাটা বেশ। কর্ণধার কানে ধরিয়া ঝিঁকা মারিতে মারিতে স্কুলের খেয়া পার করিয়া দিল, তার পরে লোহশাসনের কলের গাড়িতে প্রাণরসকে অন্তররুদ্ধ তপ্তবাষ্পে পরিণত করিয়া য়ুনিভার্সিটির শেষ ইস্‌টেশনে গিয়া নামিলাম, সেখানে চাকরির বালুমরুতে দীর্ঘ মধ্যাহ্ন জীবিকামরীচিকার পিছনে ধুঁকিতে ধুঁকিতে চলিলাম, তার পরে সূর্য যখন অস্ত যায় তখন যমরাজের সদর গেটের কাছে গিয়া মাথার বোঝা নামাইয়া দিয়া মনে করিলাম 'জীবন সার্থক হইল'। জীবনযাত্রার এমন নিরাপদ এবং শান্তিময় আদর্শ অন্য কোথাও নাই। এই আদর্শ আমাদের দেশে যদি চিরদিন টেকা সম্ভবপর হইত তাহা হইলে কোনো কথা বলিতাম না।

কিন্তু, টিকিল না। তার কারণ, আমরা তো কেবলমাত্র খৃস্টানকলেজের প্রধান অধ্যক্ষ এবং পতিত-উদ্ধারের দুঃসাধ্যব্রতধারীদের কাছ হইতেই শিক্ষা পাই নাই। আমরা যে ইংলন্‌ডের কাছ হইতে শিখিতেছি। সেও আজ একশো বছরের উপর হইয়া গেল। সে শিক্ষা তো বন্ধ্যা নহে, নূতন প্রাণকে সে জন্ম দিবেই। তার পরে সেই প্রাণের ক্ষুধাতৃষ্ণা যে অন্নপানীয়ের দাবি করিবে তাকে একেবারে প্রত্যাখ্যান করিতে কেহ পারিবে না।

মনে আছে, ছেলেবেলা যখন ইংরেজি মাস্টারের কাছে ইংরেজি শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ মুখস্থ করিতে হইত তখন I শব্দের একটা প্রতিশব্দ বহু কষ্টে কণ্ঠস্থ করিয়াছিলাম, সে হইতেছে : Myself—I, by Myself I। ইংরেজি এই I শব্দের প্রতিশব্দটি আয়ত্ত করিতে কিছুদিন সময় লাগিয়াছে; ক্রমে ক্রমে অল্প অল্প করিয়া ওটা একরকম সড়গড় হইয়া আসিল। এখন মাস্টারমশায় I হইতে ঐ myself-টাকে কালীর দাগে লাঞ্ছিত করিয়া রবারের ঘর্ষণে একেবারে মুছিয়া ফেলিতে ইচ্ছা করিতেছেন। আমাদের খৃস্টান হেড্‌মাস্টার বলিতেছেন, 'আমাদের দেশে I শব্দের যে অর্থ তোমাদের দেশে সে অর্থ হইতেই পারে না।' কিন্তু, ওটাকে কণ্ঠস্থ করিতে যদি আমাদের দুইশো বছর লাগিয়া থাকে ওটাকে সম্পূর্ণ বহিষ্কৃত করিতে তার ডবল সময়েও কুলায় কি না সন্দেহ করি। কেননা, ঐ I শব্দের ইংরেজি মন্ত্রটা ভয়ংকর কড়া, গুরু যদি গোড়া হইতেই ওটা সম্পূর্ণ চাপিয়া যাইতে পারিতেন তো কোনো বালাই থাকিত না; এখন ওটা কান হইতে প্রাণের মধ্যে পৌঁছিয়াছে, এখন প্রাণটাকে মারিয়া ওটাকে উপড়ানো যায়। কিন্তু প্রাণ বড়ো শক্ত জিনিস।

ইংলন্‌ড্‌ যতক্ষণ পর্যন্ত ভারতবর্ষের সঙ্গে আপন সম্পর্ক রাখিয়াছে ততক্ষণ পর্যন্ত আপনাকে আপনি লঙ্ঘন করিতে পারিবে না। যাহা তার সর্বোচ্চ সম্পদ তাহা ইচ্ছা করিয়াই হউক, ইচ্ছার বিরুদ্ধেই হউক, আমাদিগকে দিতেই হইবে। ইহাই বিধাতার অভিপ্রায়, তার সঙ্গে প্রিন্‌সিপাল সাহেবের অভিপ্রায় মিলুক আর নাই মিলুক। তাই আজ আমাদের ছাত্রেরা কেবলমাত্র ইংরেজি কেতাবের ইংরেজি

নোট কুড়ানোর উঞ্ছবৃত্তিতেই নিজেকে কৃতার্থ মনে করিবে না, আজ তারা আত্মসম্মানকে বজায় রাখিতে চাহিবেই; আজ তারা নিজেকে কলের পুতুল বলিয়া ভুল করিতে পারিবে না; আজ তারা জেলের দারোগাকে নিজের গুরু বলিয়া মানিয়া শাসনের চোটে তাকে গুরুভক্তি দেখাইতে রাজি হইবে না। আজ যাহা সত্য হইয়া উঠিয়াছে তাকে গালি দিলেও তাহা মিথ্যা হইবে না এবং তার গালে চড় মারিলেও সে যে সত্য ইহাই আরো বেশি করিয়া প্রমাণ হইতে থাকিবে।

যে কথা লইয়া আজ আলোচনা চলিতেছে এ যদি একটা সামান্য ও সাময়িক আন্দোলন মাত্র হইত তাহা হইলে আমি কোনো কথাই বলিতাম না। কিন্তু ইহার মূলে খুব একটা বড়ো কথা আছে, সেইজন্যই এই প্রসঙ্গে চুপ করিয়া থাকা অন্যায় মনে করি।

মানুষের ইতিহাস ভিন্ন দেশে ভিন্ন মূর্তি ধরে। ভারতবর্ষের ইতিহাসেরও বিশেষত্ব আছে। সেই ইতিহাসের গোড়া হইতেই আমরা দেখিয়া আসিতেছি, এ দেশ কোনো বিশেষ একটি জাতির বা বিশেষ একটি সভ্যতার দেশ নয়। এ দেশে আর্যসভ্যতাও যেমন সত্য, দ্রাবিড়সভ্যতাও তেমনি সত্য, এ দেশে হিন্দুও যত বড়ো, মুসলমানও তার চেয়ে নিতান্ত কম নয়। এইজন্যই এখানকার ইতিহাস নানা বিরোধের বাষ্পসংঘাতে প্রকাণ্ড নীহারিকার মতো ঝাপসা হইয়া আছে। এই ইতিহাসে আমরা নানা শক্তির আলোড়ন দেখিয়া আসিতেছি, কিন্তু একটা অখণ্ড ঐতিহাসিক মূর্তির উদ্ভাবন এখনো দেখি নাই। এই পরিব্যাপ্ত বিপুলতার মধ্য হইতে একটি নিরবচ্ছিন্ন 'আমি'র সুস্পষ্ট ক্রন্দন জাগিল না।

স্ফটিক যখন দ্রব অবস্থায় থাকে তখন তাহা মূর্তিহীন; আমরা সেই অবস্থায় অনেক দিন কাটাইলাম। এমন সময় সমুদ্রপার হইতে একটি আঘাত এই তরল পদার্থের উপর হইতে নিচে, এক প্রান্ত হইতে আর-এক প্রান্তে সঞ্চারিত হইয়াছে; তাই অনুভব করিতেছি দানা বাঁধিবার মতো একটা সর্বব্যাপী আবেগ ইহার কণায় কণায় যেন নড়িয়া উঠিল। মূর্তি ধরিয়া উঠিবার একটা বেদনা ইহার সর্বত্র যেন চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে।

তাই দেখিতেছি, ভারতবর্ষের ইতিহাসে যেমন আর্য আছে দ্রাবিড় আছে, যেমন মুসলমান আছে, তেমনি ইংরেজও আসিয়া পড়িয়াছে। তাই, ভারতবর্ষের প্রকৃত ইতিহাস কেবল আমাদের ইতিহাস নহে, তাহা ইংরেজেরও ইতিহাস। এখন আমাদিগকে দেখিতে হইবে, ইতিহাসের এই-সমস্ত অংশগুলি ঠিকমত করিয়া মেলে, সমস্তটাই এক সজীব শরীরের অঙ্গ হইয়া উঠে। ইহার মধ্যে কোনো-একটা অংশকে বাদ দিব সে আমাদের সাধ্য নাই। মুসলমানকে বাদ দিতে পারি নাই, ইংরেজকেও বাদ দিতে পারিব না। এ কেবল বাহুবলের অভাব-বশত নহে, আমাদের ইতিহাসটার প্রকৃতিই এই; তাহা কোনো-এক জাতির ইতিহাস নয়, তাহা একটা মানব-রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ইতিহাস।

এই-যে নানা যুগ, নানা জাতি ও নানা সভ্যতা ভারতবর্ষের ইতিহাসকে গড়িয়া তুলিতেছে, আজ সেই ঐতিহাসিক অভিপ্রায়ের অনুগত করিয়া আমাদের অভিপ্রায়কে সজাগ করিতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে, আমাদের দেশ ইংলন্ড্ নয়, ইটালি নয়, আমেরিকা নয়; সেখানকার মাপে কোনোমতেই আমাদের ইতিহাসকে ছাঁটা চলিবে না। এখানে একেবারে মূলে তফাত। ও-সকল দেশ মোটের উপরে একটা ঐক্যকে লইয়াই নিজেরা ইতিহাস ফাঁদিয়াছে, আমরা অনৈক্য

লইয়াই প্রথম হইতে শুরু করিয়াছি এবং আজ পর্যন্ত কেবল তাহা বাড়িয়াই চলিয়াছে।

আমাদিগকে ভাবিতে হইবে, এই লইয়াই আমরা কী করিতে পারি। বাহিরকে কেমন করিয়া বাহির করিয়া দিব, স্বভাবতই অন্য ইতিহাসের এই ভাবনা; বাহিরকে কেমন করিয়া আপন করিয়া লইব, স্বভাবতই আমাদের ইতিহাসের এই ভাবনা।

ইংরেজকে আমাদের দেশের পক্ষে আপন করিয়া না লইতে পারিলে আমাদের স্বাস্থ্য নাই, কল্যাণ নাই। ইংরেজের শাসন যতক্ষণ আমাদের পক্ষে কলের শাসন থাকিবে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সম্বন্ধ মানবসম্বন্ধ না হইবে, ততক্ষণ Pax Britannica আমাদিগকে 'শান্তি' দিবে, জীবন দিবে না। আমাদের অন্নের হাঁড়িতে জল চড়াইবে মাত্র, চুলাতে আগুন ধরাইবে না। অর্থাৎ, ততক্ষণ ইংরেজ ভারতবর্ষের সৃজনকার্যে বিশ্বকর্মার ঘনিষ্ঠ সহযোগী হইবে না, বাহির হইতে মজুরি করিয়া কেবল ইঁট কাঠ ফেলিয়া দিয়া চলিয়া যাইবে। ইহাকেই একজন ইংরেজ কবি বলিয়াছেন the white man's burden। কিন্তু, 'বার্ডেন' কেন হইতে যাইবে? এ কেন সৃজনকার্যের আনন্দ না হইবে? সৃষ্টিকর্তার ডাকে ইংরেজ এখানে আসিয়াছে, তাকে সৃষ্টিকার্যে যোগ দিতেই হইবে। যদি আনন্দের সঙ্গে যোগ দিতে পারে তবেই সব দিকে ভালো, যদি না পারে তবে এই land of regrets-এর তপ্ত বালুকাপথ তাহাদের কঙ্কালে খচিত হইয়া যাইবে, তবু ভার বহিতেই হইবে। ভারত-ইতিহাসের গঠনকাজে যদি তাহাদের প্রাণের যোগ না ঘটে, কেবলমাত্র কাজের যোগ ঘটে, তাহা হইলে ভারতবর্ষের বিধাতা বেদনা পাইবেন, ইংরেজও সুখ পাইবে না।

তাই ভারত-ইতিহাসের প্রধান সমস্যা এই, ইংরেজকে পরিহার করা নয়, ইংরেজের সঙ্গে ভারতবর্ষের সম্বন্ধকে সজীব ও স্বাভাবিক করিয়া তোলা। এত দিন পর্যন্ত হিন্দু মুসলমান ও ভারতবর্ষের নানা বিচিত্র জাতিতে মিলিয়া এ দেশের ইতিহাস আপনা-আপনি যেমন-তেমন করিয়া গড়িয়া উঠিতেছিল। আজ ইংরেজ আসার পর এই কাজে আমাদের চেতনা জাগিয়াছে; ইতিহাস-রচনায় আজ আমাদের ইচ্ছা কাজ করিতে উদ্যত হইয়াছে।

এইজন্যই ইচ্ছায় ইচ্ছায় মাঝে মাঝে দ্বন্দ্ব বাধিবার আশঙ্কা আছে। কিন্তু যাঁরা এ দেশের সঞ্জীবনমন্ত্রের তপস্বী রাগদ্বেষে ক্ষুব্ধ হইলে তাঁদের চলিবে না। তাঁহাদিগকে এ কথা মনে রাখিতে হইবে যে, ইচ্ছায় ইচ্ছায় মিল করাই চাই। কারণ, ইংরেজ ভারতের ইতিহাস-ধারাকে বাধা দিতে আসে নাই, তাহাতে যোগ দিতে আসিয়াছে। ইংরেজকে নহিলে ভারত-ইতিহাস পূর্ণ হইতেই পারে না। সেইজন্যই আমরা কেবলমাত্র ইংরেজের আপিস চাই না, ইংরেজের হৃদয় চাই।

ইংরেজ যদি আমাদিগকে অবাধে অনায়াসে অবজ্ঞা করিতে পায় তাহা হইলেই আমরা তার হৃদয় হারাইব। শ্রদ্ধা আমাদিগকে দাবি করিতেই হইবে; আমরা খৃস্টান প্রিন্সিপালের নিকট হইতেও এক গালে চড় খাইয়া অন্য গাল ফিরাইয়া দিতে পারিব না।

ইংরেজের সঙ্গে ভারতবাসীর জীবনের সম্বন্ধ কোথায় সহজে ঘটিতে পারে? বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নয়, রাজকীয় ক্ষেত্রেও নয়। তার সর্বোৎকৃষ্ট স্থান বিদ্যাদানের ক্ষেত্র। জ্ঞানের আদানপ্রদানের ব্যাপারটি সাত্ত্বিক। তাহা প্রাণকে উদ্‌বোধিত করে। সেইজন্য এইখানেই প্রাণের নাগাল পাওয়া সহজ। এইখানেই গুরুর সঙ্গে

শিষ্যের সম্বন্ধ যদি সত্য হয় তবে ইহজীবনে তার বিচ্ছেদ নাই। তাহা পিতার সঙ্গে পুত্রের সম্বন্ধের চেয়েও গভীরতর।

আমাদের য়ুনিভার্সিটিতে এই সুযোগ ঘটিয়াছিল। এইখানে ইংরেজ এমন একটি স্থান পাইতে পারিত যাহা সে রাজসিংহাসনে বসিয়াও পায় না। এই সুযোগ যখন ব্যর্থ হইতে দেখা যায় তখন আক্ষেপের সীমা থাকে না।

ব্যর্থতার কারণ আমাদের ছাত্ররাই, এ কথা আমি কিছুতেই মানিতে পারি না। আমাদের দেশের ছাত্রদের আমি ভালো করিয়াই জানি। ইংরেজ ছেলের সঙ্গে একটা বিষয়ে ইহাদের প্রভেদ আছে। ইহারা ভক্তি করিতে পাইলে আর কিছু চায় না। অধ্যাপকের কাছ হইতে একটুমাত্রও যদি ইহারা খাঁটি স্নেহ পায় তবে তাঁর কাছে হৃদয় উৎসর্গ করিয়া দিয়া যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচে। আমাদের ছেলেদের হৃদয় নিতান্তই সস্তা দামে পাওয়া যায়।

এইজন্যই আমার যে-একটি বিদ্যালয় আছে সেখানে ইংরেজ অধ্যাপক আনিবার জন্য অনেক দিন হইতে উদ্যোগ করিয়াছি। বহুকাল পূর্বে একজনকে আনিয়াছিলাম। তিনি সুদীর্ঘকাল ভারতবর্ষের আবহাওয়ায় পাকিয়াছিলেন। তাহাতে তাঁর অন্তঃকরণে পিত্তাধিক্য ঘটিয়াছিল। তিনি তাঁর ক্লাসে ছেলেদের জাতি তুলিয়া গালি দিতেন; তারা বাঙালির ঘরে জন্মিয়াছে এই অপরাধ তিনি সহিতে পারিতেন না। সেই ছেলেরা যদিচ প্রেসিডেন্‌সি কলেজের ছাত্র নয়, তাদের বয়স নয়-দশ বৎসর হইবে, তবু তারা তাঁর ক্লাসে যাওয়া ছাড়িল। হেড্‌মাস্টারের তাড়নাতেও কোনো ফল হইল না। দেখিলাম হিতে বিপরীত ঘটিল। এই মাস্টারটিকে white man's burden হইতে সে যাত্রায় নিষ্কৃতি দিলাম।

কিন্তু, আশা ছাড়ি নাই এবং আমার কামনাও সফল হইয়াছে। আজ ইংরেজ গুরুর সঙ্গে বাঙালি ছাত্রের জীবনের গভীর মিলন ঘটিয়া আশ্রম পবিত্র হইয়াছে। এই পুণ্য মিলনটি সমস্ত ভারতক্ষেত্রে দেখিবার জন্য বিধাতা অপেক্ষা করিতেছেন। যে-দুটি ইংরেজ তাপস সেখানে আছেন তাঁরা নিজের ধর্ম প্রচার করিতে যান নাই, তাঁরা পতিত-উদ্ধারের দুঃসহ কর্তব্যভার গ্রহণ করেন নাই; তাঁরা গ্রীকদের মতো বর্বর জাতিকে সভ্যতায় দীক্ষিত করিবার জন্য ধরাধামে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এমন অভিমান মনে রাখেন না। তাঁরা তাঁদের পরমগুরুর মতো করিয়াই দুই হাত বাড়াইয়া বলিয়াছেন, 'ছেলেদের আসিতে দাও আমার কাছে, হোক-না তারা বাঙালির ছেলে।' ছেলেরা তাঁদের অত্যন্ত কাছে আসিতে লেশমাত্র বিলম্ব করে নাই, হোন-না তাঁরা ইংরেজ। আজ এই কথা বলিতে পারি, এই দুটি ইংরেজের সঙ্গে আমার ছেলেদের যে সম্বন্ধ ঘটিয়াছে তাহা তাহাদের জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ থাকিবে। এই ছেলেরা ইংরেজ-বিদ্বেষের বিষে জীবন পূর্ণ করিয়া সংসারে প্রবেশ করিবে না।

প্রথমে যে শিক্ষকটি আসিয়াছিলেন তিনি শিক্ষকতায় পাকা ছিলেন। তাঁর কাছে পড়িতে পাইলে ছেলেদের ইংরেজি উচ্চারণ ও ব্যাকরণ দুরস্ত হইয়া যাইত। সেই লোভে আমি কঠোর শাসনে ছাত্রগুলিকে তাঁর ক্লাসে পাঠাইতে পারিতাম। মনে করিতে পারিতাম, শিক্ষক যেমনই দুর্ব্যবহার করুন ছাত্রদের কর্তব্য সমস্ত সহিয়া তাঁকে মানিয়া চলা। কিছুদিন তাদের মনে বাজিত, হয়তো কিছুদিন পরে তাদের মনে বাজিতও না, কিন্তু তাদের অ্যাক্‌সেন্ট্‌ বিশুদ্ধ হইত। তা হউক, কিন্তু এই মানবের ছেলেদের কি ভগবান নাই? আমরাই কি চুল পাকিয়াছে বলিয়া

তাদের বিধাতাপুরুষ? ইংরেজি ভাষায় বিশুদ্ধ অ্যাক্‌সেণ্টের জোরে সেই ভগবানের বিচারে আমি কি খালাস পাইতাম?

ইংরেজ অধ্যাপকের সহিত বাঙালি ছাত্রদের সম্বন্ধ সরল ও স্বাভাবিক হওয়া বর্তমানে বিশেষ কঠিন হইয়াছে। তার কারণ কী, একদিন ইংলন্‌ডে থাকিতে তাহা খুব স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলাম। রেলগাড়িতে একজন ইংরেজ আমার পাশে বসিয়াছিলেন; প্রথমটা আমাকে দেখিয়া তাঁর ভালোই লাগিল। এমন-কি তাঁর মনে হইল ইংলন্‌ডে আমি ধর্মপ্রচার করিতে আসিয়াছি। য়ুরোপের লোককে সাধু উপদেশ দিবার অধিকার আমাদেরও আছে, এ মত তিনি বিশেষ উৎসাহের সহিত প্রকাশ করিলেন। এমন সময় হঠাৎ তাঁর কৌতূহল হইল আমি ভারতবর্ষের কোন্‌ প্রদেশ হইতে আসিয়াছি তাহা জানিবার জন্য। আমি বলিলাম, আমি বাংলাদেশের লোক। শুনিয়া তিনি লাফাইয়া উঠিলেন। কোনো দুষ্কর্মই যে বাংলাদেশের লোকের অসাধ্য নহে, তাহা তিনি তীব্র উত্তেজনার সঙ্গে বলিতে লাগিলেন।

কোনো জাতির উপর যখন রাগ করি তখন সে জাতির প্রত্যেক মানুষ আমাদের কাছে একটা অ্যাব্‌স্‌ট্র্যাক্‌ট্‌ সত্তা হইয়া উঠে। তখন সে আর বিশেষ্য থাকে না, বিশেষণ হয়। আমার সহযাত্রী যতক্ষণ না জানিয়াছিলেন আমি বাঙালি ততক্ষণ তিনি আমার সঙ্গে ব্যক্তিবিশেষের মতো ব্যবহার করিতেছিলেন, সুতরাং আদব-কায়দার ত্রুটি হয় নাই। কিন্তু, যেই তিনি শুনিলেন আমি বাঙালি অমনি আমার ব্যক্তিবিশেষত্ব বাষ্প হইয়া গিয়া একটা বিকট বিশেষণে আসিয়া দাঁড়াইল, সেই বিশেষণটি অভিধানে যাকে বলে 'নিদারুণ'। বিশেষণ-পদার্থের সঙ্গে সাধারণ ভদ্রতা রক্ষার কথা মনেই হয় না। কেননা, ওটা অপদার্থ বলিলেই হয়।

রাশিয়ানের উপর ইংরেজের যখন রাগ ছিল তখন রাশিয়ান-মাত্রেই তার কাছে একটা বিশেষণ হইয়া উঠিয়াছিল। আজ ইংরেজি কাগজে প্রায়ই দেখিতে পাই, রাশিয়ানের ধর্মপরতা সহৃদয়তার সীমা নাই। মানুষকে বিশেষণ হইতে বিশেষ্যের কোঠায় ফেলিবামাত্র তার মানবধর্ম প্রকাশ হইয়া পড়ে; তখন তার সঙ্গে সহজ ব্যবহার করিতে আর বাধে না।

বাঙালি আজ ইংরেজের কাছে বিশেষণ হইয়া উঠিয়াছে। এইজন্য বাঙালির বাস্তব সত্তা ইংরেজের চোখে পড়া আজ বড়ো কঠিন। এইজন্যই ইচ্ছা করিয়াছিলাম, বর্তমান য়ুরোপীয় যুদ্ধে বাঙালি যুবকদিগকে ভলন্‌টিয়ার রূপে লড়িতে দেওয়া হয়। ইংরেজের সঙ্গে এক যুদ্ধে মরিতে পারিলে বাঙালিও ইংরেজের চোখে বাস্তব হইয়া উঠিত, ঝাপ্‌সা থাকিত না; সুতরাং তার পর হইতে তাকে বিচার করা সহজ হইত।

সে সুযোগ তো চলিয়া গেল। এখনো আমরা অস্পষ্টতার আড়ালেই রহিয়া গেলাম। অস্পষ্টতাকে মানুষ সন্দেহ করে। আজ বাংলাদেশে একজন মানুষও আছে কি যে এই সন্দেহ হইতে মুক্ত?

যাহা হউক, আমাদের মধ্যে এই অস্পষ্টতার গোধূলি ঘনাইয়া আসিয়াছে; এইটেই ছায়াকে বস্তু ও বস্তুকে ছায়া ভ্রম করিবার সময়। এখন পরে পরে কেবলই ভুল-বোঝাবুঝির সময় বাড়িয়া চলিল।

কিন্তু, এই অন্ধকারটাকে কি কড়া শাসনের ধুলো উড়াইয়াই পরিষ্কার করা যায়? এখনই কি আলোকের প্রয়োজন সব চেয়ে অধিক নয়? সে আলোক প্রীতির আলোক, সে আলোক সমবেদনার প্রদীপে পরস্পর মুখ-চেনাচিনি করিবার

আলোক। এই দুর্যোগের সময়েই কি খৃস্টান কলেজের কর্তৃপক্ষেরা তাঁহাদের গুরুর চরিত ও উপদেশ স্মরণ করিবেন না? এখনই কি 'চ্যারিটি'র প্রয়োজন সব চেয়ে অধিক নয়? এই-যে দেশব্যাপী সংশয় ঘনাইয়া উঠিয়া সত্যকে আচ্ছন্ন ও বিকৃত করিয়া তুলিতেছে, ইহাকে সম্পূর্ণ কাটাইয়া তুলিবার শক্তি তাঁদেরই হাতে যাঁরা উপরে আছেন। পৃথিবীর কুয়াশা কাটাইয়া দিবার ভার আকাশের সূর্যের। যখন বারিবর্ষণের প্রয়োজন একান্ত তখন যাঁরা বজ্রবর্ষণের পরামর্শ দিতেছেন তাঁরা যে কেবলমাত্র সহৃদয়তা ও ঔদার্যের অভাব দেখাইতেছেন তাহা নহে, তাঁরা ভীরুতার পরিচয় দিতেছেন। পৃথিবীর অধিকাংশ অন্যায় উপদ্রব ভয় হইতে, সাহস হইতে নয়।

উপসংহারে আমি এই কথা কর্তৃপক্ষকে বিশেষভাবে স্মরণ করিতে অনুনয় করি। যে বিদ্যালয়ে ইংরেজ অধ্যাপকের কাছে বাঙালি ছাত্রেরা শিক্ষালাভ করিতেছে সেই বিদ্যালয় হইতে নবযুগের বাঙালি যুবক ইংরেজজাতির 'পরে শ্রদ্ধা ভক্তি প্রীতি বহন করিয়া সংসারে প্রবেশ করিবে, ইহাই আশা করিতে পারিতাম। যে বয়সে যে ক্ষেত্রে নূতন নূতন জ্ঞানের আলোকে ও ভাবের বর্ষণে ছাত্রদের মধ্যে নবজীবনের প্রথম বিকাশ ঘটিতেছে সেই বয়সে ও সেই ক্ষেত্রেই ইংরেজ গুরু যদি তাহাদের হৃদয়কে প্রীতির দ্বারা আকর্ষণ করিতে পারেন তবেই এই যুবকেরা ইংরেজের সঙ্গে ভারতবাসীর সম্বন্ধকে সজীব ও সুদৃঢ় করিয়া তুলিতে পারিবে। এই শুভক্ষণে এবং এই পুণ্যক্ষেত্রে ইংরেজ অধ্যাপকের সঙ্গে বাঙালি ছাত্রের সম্বন্ধ যদি সন্দেহের বিদ্বেষের ও কঠিন শাসনের সম্বন্ধ হয় তবে আমাদের পরস্পরের ভিতরকার এই বিরোধের বিষ ক্রমশই দেশের নাড়ীর মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিবে; ইংরেজের প্রতি অবিশ্বাস পুরুষানুক্রমে আমাদের মজ্জাগত হইয়া অন্ধ সংস্কারে পরিণত হইতে থাকিবে। সে অবস্থায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রশাসন-ব্যাপারে জঞ্জাল কেবলই বাড়িতে থাকিবে বলিয়া যে আশঙ্কা তাহাকেও আমি তেমন গুরুতর বলিয়া মনে করি না; আমার ভয় এই যে, ইংরেজের কাছ হইতে আমরা যে দান দিনে দিনে আনন্দে গ্রহণ করিতে পারিতাম সে দান প্রত্যহ আমাদের হৃদয়ের দ্বার হইতে ফিরিয়া যাইতে থাকিবে। শ্রদ্ধার সঙ্গে দান করিলেই শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করা সম্ভব হয়। যেখানে সেই শ্রদ্ধার সম্পর্ক নাই সেখানে আদানপ্রদানের সম্বন্ধ কলুষিত হইয়া উঠে। জেলখানার কয়েদিরা হাতে বেড়ি পরিয়া যে অন্ন খাইতে বসে তাকে যজ্ঞের ভোজ বলা বিদ্রূপ করা। জ্ঞানের ভোজ আনন্দের ভোজ। সেখানেও যে-সকল কর্তারা ভোক্তার জন্য আজ লোহার হাতকড়ি ফর্মাশ দিতেছেন তাঁরা কাল নিতান্ত ভালোমানুষটির মতো আশ্চর্য হইয়া বলিবেন 'এত করিয়াও বাঙালির ছেলের মন পাওয়া গেল না—কৃতজ্ঞতাবৃত্তি ইহাদের একেবারেই নাই' এবং তাঁরা রাত্রে শুইতে যাইবার সময় এবং প্রাতঃকালে জাগিয়া উঠিয়া প্রার্থনা করিবেন: Father, do not forgive them!

চৈত্র ১৩২২

অসন্তোষের কারণ

ভারতবর্ষের নানা স্থানেই নূতন নূতন বিশ্ববিদ্যালয়-স্থাপনের চেষ্টা চলিতেছে। ইহাতে বুঝা যায়, শিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের মনে একটা অসন্তোষ জন্মিয়াছে। কেন সেই অসন্তোষ? দুইটি কারণ আছে; একটা বাহিরের, একটা ভিতরের।

সকলেই জানেন, আমাদের দেশে ইংরেজি শিক্ষার যখন প্রথম পত্তন হইয়াছিল তখন তাহার লক্ষ্য ছিল এই যে, ব্রিটিশ ভারতের রাজ্যশাসন ও বাণিজ্যচালনের জন্য ইংরেজি-জানা দেশি কর্মচারী গড়িয়া তোলা। অনেক দিন হইতেই সেই গড়নের কাজ চলিতেছে। যতকাল ছাত্রসংখ্যা অল্প ছিল ততকাল প্রয়োজনের সঙ্গে আয়োজনের সামঞ্জস্য ছিল; কাজেই সে দিক হইতে কোনো পক্ষে অসন্তোষের কোনো কারণ ঘটে নাই। যখন হইতে ছাত্রের পরিমাণ অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছে তখন হইতেই এই শিক্ষাব্যবস্থার একটা প্রধান উদ্দেশ্য অধিকাংশ ছাত্রেরই পক্ষে ব্যর্থ হইতেছে। যদি আমাদের দেশের শিক্ষায় ছাত্রদিগকে চাকরি ছাড়া অন্যান্য জীবিকার সংস্থানে পটু করিয়া তুলিত তাহা হইলে এই সম্বন্ধে নালিশের কথা থাকিত না। কিন্তু পটু না করিয়া সর্বপ্রকারে অপটুই করিতেছে, এ কথা আমরা নিজের প্রতি তাকাইলে বুঝিতে পারি।

এই তো গেল বাহিরের দিকে নালিশ। ভিতরের দিকের নালিশ এই যে, এত কাল ধরিয়া ইংরেজের স্কুলে পড়িতেছি, কিন্তু ছাত্রদশা তো কোনোমতেই ঘুচিল না। বিদ্যা বাহির হইতেই কেবল জমা করিলাম, ভিতর হইতে কিছু তো দিলাম না। কলসে কেবলই জল ভরিতে থাকিব, অথচ সে জল কোনোদিনই যথেষ্ট পরিমাণে দান-পানের উপযোগী ভরা হইবে না, এ যে বিষম বিপত্তি। ভয়ে ভয়ে ইংরেজের ডাক্তার ছাত্র পুঁথি মিলাইয়া ডাক্তারি করিয়া চলিল, কিন্তু শারীরবিদ্যায় বা চিকিৎসাশাস্ত্রে একটা-কোনো নূতন তত্ত্ব বা তথ্য যোগ করিল না। ইংরেজের এঞ্জিনিয়ার ছাত্র সতর্কতার সহিত পুঁথি মিলাইয়া এঞ্জিনিয়ারি করিয়া পেন্সন লইতেছে, কিন্তু যন্ত্রতত্ত্বে বা যন্ত্র-উদ্ভাবনায় মনে রাখিবার মতো কিছুই করিতেছে না। শিক্ষার এই শক্তিহীনতা আমরা স্পষ্টই বুঝিতেছি। আমাদের শিক্ষাকে আমাদের বাহন করিলাম না, শিক্ষাকে আমরা বহন করিয়াই চলিলাম, ইহারই পরম দুঃখ গোচরে অগোচরে আমাদের মনের মধ্যে জমিয়া উঠিতেছে।

অথচ, বুদ্ধির এই কৃশতা নির্জীবতা যে আমাদের প্রকৃতিগত নয় তার বর্তমান প্রমাণ : জগদীশ বসু, প্রফুল্ল রায়, ব্রজেন্দ্র শীল। আমাদের শিক্ষার একান্ত দীনতা ও পরবশতা-সত্ত্বেও ইঁহাদের বুদ্ধি ও বিদ্যা বিশ্বজ্ঞানের মহাকাশে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। আর, অতীত কালের একটা মস্ত প্রমাণ এই যে, আমাদের প্রাচীন চিকিৎসাশাস্ত্র নানা শাখায় প্রশাখায়, নানা পরীক্ষায় ও উদ্ভাবনায় বিচিত্র বৃহৎ ও প্রাণবান হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু পরের ইস্কুলে-শেখা চিকিৎসাবিদ্যায় আজ আমাদের এত ক্ষীণতা ও ভীরুতা কেন!

ইহার প্রধান কারণ, ভাণ্ডারঘর যেমন করিয়া আহার্য দ্রব্য সঞ্চয় করে আমরা তেমনি করিয়াই শিক্ষা সঞ্চয় করিতেছি, দেহ যেমন করিয়া আহার্য গ্রহণ করে তেমন করিয়া নহে। ভাণ্ডারঘর যাহা-কিছু পায় হিসাব মিলাইয়া সাবধানে তাহার প্রত্যেক কণাটিকে রাখিবার চেষ্টা করে। দেহ যাহা পায় তাহা রাখিবার জন্য নহে, তাহাকে অঙ্গীকৃত করিবার জন্য। তাহা গোরুর গাড়ির মতো ভাড়া খাটিয়া বাহিরে

বহন করিবার জন্য নহে, তাহাকে অন্তরে রূপান্তরিত করিয়া রক্তে মাংসে স্বাস্থ্যে শক্তিতে পরিণত করিবার জন্য। আজ আমাদের মুশকিল হইয়াছে এই যে, এই এত বছরের নোটবুকের বস্তা-ভরা শিক্ষার মাল লইয়া আজ আমাদের গোরুর গাড়িও বাহিরে তেমন করিয়া ভাড়া খাটিতেছে না, অথচ সেটাকে মনের আনন্দে দিব্য পাক করিয়া ও পরিপাক করিয়া পেট ভরাই সে ব্যবস্থাও কোথাও নাই। তাই আমাদের বাহিরের থলিটাও রহিল ফাঁকা, অন্তরের পাকযন্ত্রটাও রহিল উপবাসী। গাড়োয়ান তাহার লাইসেন্সের পদক গলায় ঝুলাইয়া মালখানার দ্বারে চোখের জল মুছিতেছে, তাহার একমাত্র আশাভরসা কন্যার পিতার কাছে। এমন অবস্থাতেও এখনো যে যথেষ্ট পরিমাণে অসন্তোষ জন্মে নাই তাহার কারণ, বৃথা আশা মরিতে মরিতেও মরে না এবং নিষ্ফল অভ্যাস আপন বেড়ার বাহিরে ফললাভের কোনো ক্ষেত্র চোখেই দেখিতে পায় না। উপবাসকৃশ অক্ষম আপন ব্যর্থতার মধ্যেই চিত হইয়া পড়িয়া মনে করিতে থাকে, এইখানেই এক পাশ হইতে আর-এক পাশে ফিরিয়া কাঁদিয়া-কাটিয়া দৈবকৃপায় যেমন-তেমন একটা সদুপায় হইবেই। জামা কিনিতে গেলাম, পাইলাম একপাটি মোজা; এখন ভাবিতেছি, ঐটেকেই কাটিয়া ছাঁটিয়া কোনোমতে জামা করিয়া পরিব। ভাগ্য আমাদের সেই চেষ্টা দেখিয়া অট্টহাস্য করিতেছে।

বর্তমান শিক্ষাপ্রণালীটাই যে আমাদের ব্যর্থতার কারণ, অভ্যাসগত অন্ধ মমতার মোহে সেটা আমরা কিছুতেই মনে ভাবিতে পারি না। ঘুরিয়া ফিরিয়া নূতন বিশ্ববিদ্যালয় গড়িবার বেলাতেও প্রণালী বদল করিবার কথা মনেই আসে না; তাই, নূতনের ঢালাই করিতেছি সেই পুরাতনের ছাঁচে। নূতনের জন্য ইচ্ছা খুবই হইতেছে অথচ ভরসা কিছুই হইতেছে না। কেননা ঐটেই যে রোগ, এত দিনের শিক্ষা-বোঝার চাপে সেই ভরসাটাই যে সমূলে মরিয়াছে।

অনেক কাল এমনি করিয়া কাটিল, আর সময় নষ্ট করা চলিবে না। এখন মনুষ্যত্বের দিকে তাকাইয়া লক্ষ্যেরও পরিবর্তন করিতে হইবে। সাহস করিয়া বলিতে হইবে, যে শিক্ষা বাহিরের উপকরণ তাহা বোঝাই করিয়া আমরা বাঁচিব না, যে শিক্ষা অন্তরের অমৃত তাহার সাহায্যেই আমরা মৃত্যুর হাত এড়াইব।

শিক্ষাকে কেমন করিয়া সত্য এবং প্রাণের জিনিস করা যায়, সেই কথার আলোচনা যথাসাধ্য ক্রমে ক্রমে করা যাইবে।

জ্যৈষ্ঠ ১০২৬

বিদ্যার যাচাই

আমার মনে আছে, বালককালে একজনকে জানিতাম তিনি ইংরেজিতে পরম পণ্ডিত ছিলেন, বাংলাদেশে তিনি ইংরেজি শিক্ষার প্রথম যুগের শেষভাগের ছাত্র। ডিরোজিয়ো প্রভৃতি শিক্ষকদের কাছে তিনি পাঠ লইয়াছিলেন। তিনি জানি না কী মনে করিয়া কিছুদিন আমাদিগকে ইংরেজি সাহিত্য সম্বন্ধে উপদেশ দিতে ইচ্ছা করিলেন। ইংরেজি কবিদের সম্বন্ধে তিনি মনে একটা শ্রেণী-বিভাগ-করা ফর্দ লট্‌কাইয়া রাখিয়াছিলেন। তার মধ্যে পয়লা দোসরা এবং তেসরা নম্বর পর্যন্ত সমস্ত পাকাপাকি ঠিক করা ছিল। সেই ফর্দ তিনি আমাদিগকে লিখিয়া দিয়া

মুখস্থ করিতে বলিলেন। তখন আমাদের যেটুকু ইংরেজি জানা ছিল তাহাতে পয়লা নম্বর দূরে থাক্‌ তেসরা নম্বরেরও কাছ ঘেঁষিতে পারি এমন শক্তি আমাদের ছিল না। তথাপি ইংরেজি কবিদের সম্বন্ধে বাঁধা বিচারটা আগে হইতেই আমাদের আয়ত্ত করিয়া দেওয়াতে দোষ ছিল না। কেননা, রুচিরসনা দিয়া রসবিচার ইংরেজি কাব্য সম্বন্ধে আমাদের পক্ষে প্রশস্ত নহে। যেহেতু আমাদিগকে চাখিয়া নহে কিন্তু গিলিয়া খাইতে হইবে, কাজেই কোন্‌টা মিষ্ট কোন্‌টা অম্ল সেটা নোটবুকে লেখা না থাকিলে ভুল করার আশঙ্কা আছে। ইহার ফল কী হইয়াছে বলি। আমাদের শিশু বয়সে দেখিতাম, কবি বায়্‌রন সম্বন্ধে আমাদের দেশের ইংরেজি-পোড়োদের মনে অসীম ভক্তি ছিল। আধুনিক পোড়োদের মনে সে ভক্তি আদবেই নাই। অল্প কিছু দিন আগেই আমাদের যুবকেরা টেনিসনের নাম শুনিলেই যেরূপ রোমাঞ্চিত হইতেন এখন আর সেরূপ হন না। উক্ত কবিদের সম্বন্ধে ইংলন্‌ডে কাব্য-বিচারকদের রায় অল্পবিস্তর বদল হইয়া গিয়াছে, ইহা জানা কথা। সেই বদল হইবার স্বাভাবিক কারণ সেখানকার মনের গতি ও সামাজিক গতির মধ্যেই আছে। কিন্তু, সে কারণ তো আমাদের মধ্যে নাই। অথচ তাহার ফলটা ঠিক ঠিক মিলিতেছে। আদালতটাই আমাদের এখানে নাই, কাজেই বিদেশের বিচারের নকল আনাইয়া আমাদিগকে বড়ো সাবধানে কাজ চালাইতে হয়। যে কবির যে দর আধুনিক বাজারে প্রচলিত পাছে তাহার উল্টা বলিলেই আহাম্মক বলিয়া দাগা পড়ে, এইজন্য বিদেশের সাহিত্যের বাজার-দরটা সর্বদা মনে রাখিতে হয়। নহিলে আমাদের ইস্কুল-মাস্টারি চলে না, নহিলে মাসিকপত্রে ইব্‌সেন মেটার্লিঙ্ক্‌ ও রাশিয়ান ঔপন্যাসিকদের কথা পাড়িবার বেলা লজ্জা পাইতে হয়। শুধু সাহিত্য নহে, অর্থনীতি সমাজনীতি প্রভৃতি সম্বন্ধেও বিদেশের পরিবর্তনশীল বিচার-বুদ্ধির সঙ্গে অবিকল তাল মিলাইয়া যদি না চলি, যদি জনস্টুয়ার্ট্‌ মিলের মন্ত্র কার্লাইল-রাস্কিনের আমলে আওড়াই, বিলাতে যে সময়ে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের হাওয়া বদল হইয়াছে সেই সময় বুঝিয়া আমরাও যদি সংঘবাদের সুরে কণ্ঠ না মিলাই, তবে আমাদের দেশের হাই ইংরেজি স্কুলের মাস্টার ও ছাত্রদের কাছে মুখ দেখাইবার জো থাকিবে না।

ইংরেজি ইস্কুলে এত দীর্ঘ কাল দাগা বুলাইয়াও কেন আমরা কোনো বিষয়ে জোরের সঙ্গে মৌলিন্য প্রকাশ করিতে পারিলাম না, এই প্রশ্ন আমাদের মনে উঠিয়াছে। ইহার কারণ, বিদ্যাটাও যেখান হইতে ধার করিয়া লইতেছি বুদ্ধিটাও সেখান হইতে ধার-করা। কাজেই নিজের বিচার খাটাইয়া এ বিদ্যা তেজের সঙ্গে ব্যবহার করিতে ভরসা পাই না। বিদ্যা এবং বুদ্ধির ক্ষেত্রে ইংরেজের ছেলে পরবশ নহে, তাহার চারি দিকেই স্বাধীন সৃষ্টি ও স্বাধীন বিচারের হাওয়া বহিতেছে। একজন ফরাসি বিদ্বান নির্ভয়ে ইংরেজি বিদ্যার বিচার করিতে পারে; তার কারণ, যে ফরাসি বিদ্যা তাহার নিজের সেই বিদ্যার মধ্যেই বিচারের শক্তি ও বিধি রহিয়াছে। এইজন্য মাল যেখান হইতেই আসে যাচাই করিবার ভার তাহার নিজেরই হাতে, এইজন্য নিজের হিসাবমত সে মূল্য দেয় এবং কোন্‌টা লইবে কোন্‌টা ছাড়িবে সে সম্বন্ধে নিজের রুচি ও মতই তাহার পক্ষে প্রামাণ্য। কাজেই, জ্ঞানের ও ভাবের কারবারে নিজের 'পরেই ইহাদের ভরসা। এই ভরসা না থাকিলে মৌলিন্য কিছুতেই থাকিতে পারে না।

আমাদের মুশকিল এই যে, আগাগোড়া সমস্ত বিদ্যাটাই আমরা পরের কাছ হইতে পাই। সে বিদ্যা মিলাইব কিসের সঙ্গে, বিচার করিব কী দিয়া? নিজের

যে বাটখারা দিয়া পরিমাপ করিতে হয় সেই বাটখারাই নাই। কাজেই আমদানি মালের উপরে ওজনের ও দামের যে টিকিট মারা থাকে সেই টিকিটটাকেই ষোলো আনা মানিয়া লইতে হয়। এইজন্যই ইস্কুলমাস্টার এবং মাসিকপত্র-লেখকদের মধ্যে এই টিকিটে লিখিত মালের পরিচয় ও অঙ্ক যে যতটা ঠিকমত মুখস্থ রাখিতে ও আওড়াইতে পারে তাহার ততই পসার বাড়ে। এত কাল ধরিয়া কেবল এমনি করিয়াই কাটিল, কিন্তু চিরকাল ধরিয়াই কি এমনি করিয়া কাটিবে?

আষাঢ় ১৩২৬

বিদ্যাসমবায়

এলাহাবাদ ইংরেজি-বাংলা স্কুলের কোনো ছাত্রকে একদা এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে 'রিভার্‌' শব্দের সংজ্ঞা কী। মেধাবী বালক তাহার নির্ভুল উত্তর দিয়াছিল। তাহার পরে যখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল কোনোদিন সে কোনো রিভার্‌ দেখিয়াছে কি না, তখন গঙ্গাযমুনার তীরে বসিয়া এই বালক বলিল যে, 'না, আমি দেখি নাই।' অর্থাৎ, এই বালকের ধারণা হইয়াছিল, যাহা চেষ্টা করিয়া, কষ্ট করিয়া, বানান করিয়া, অভিধান ধরিয়া, পরের ভাষায় শেখা যায় তাহা আপন জিনিস নয়; তাহা বহুদূরবর্তী, অথবা তাহা কেবল পুঁথিলোক-ভুক্ত। এই ছেলে তাই নিজের জানা দেশটাকে মনে মনে জিয়োগ্রাফি-বিদ্যা হইতে বাদ দিয়াছিল। অবশ্য, পরে এক সময়ে এ শিখিয়াছিল যে, যে দেশে তাহার জন্ম ও বাস সেও ভূগোলবিদ্যার সামগ্রী, সেও একটা দেশ, সেখানকার রিভার্‌ও রিভার্‌। কিন্তু মনে করা যাক, তার বিদ্যাচর্চার শেষ পর্যন্ত এই খবরটি সে পায় নাই— শেষ পর্যন্তই সে জানিয়াছে যে আর-সকল জাতিরই দেশ আছে, কেবল তারই দেশ নাই— তবে কেবল যে তার পক্ষে সমস্ত পৃথিবীর জিয়োগ্রাফি অস্পষ্ট ও অসমাপ্ত থাকিয়া যাইবে তাহা নহে, তাহার মনটা অন্তরে অন্তরে গৃহহীন গৌরবহীন হইয়া রহিবে। অবশেষে বহুকাল পরে যখন কোনো বিদেশী জিয়োগ্রাফি-পণ্ডিত আসিয়া কথাচ্ছলে তাহাকে বলে যে 'তোমাদের একটা প্রকাণ্ড বড়ো দেশ আছে, তার হিমালয় প্রকাণ্ড বড়ো পাহাড়, তার সিন্ধু ব্রহ্মপুত্র প্রকাণ্ড বড়ো নদী', তখন হঠাৎ এই-সমস্ত খবরটায় তাহার মাথা ঘুরিয়া যায়; নূতন জ্ঞানটাকে সে সংযতভাবে বহন করিতে পারে না; অনেক কালের অগৌরবটাকে এক দিনে শোধ দিবার জন্য সে চীৎকারশব্দে চার দিকে বলিয়া বেড়ায়, 'আর-সকলের দেশ দেশমাত্র, আমাদের দেশ স্বর্গ।' একদিন যখন সে মাথা হেঁট করিয়া আওড়াইয়াছে যে 'পৃথিবীতে আর-সকলেরই দেশ আছে, কেবল আমাদেরই নাই' তখনো বিশ্বসত্যের সঙ্গে তার অজ্ঞান-কৃত বিচ্ছেদ ঘটিয়াছিল; আর আজ যখন সে মাথা তুলিয়া অসংগত তারস্বরে হাঁকিয়া বেড়ায় যে 'আর-সকলের দেশ আছে, আর আমাদের আছে স্বর্গ' তখনো বিশ্বসত্যের সঙ্গে তার বিচ্ছেদ। পূর্বের বিচ্ছেদ ছিল অজ্ঞানের, সুতরাং তাহা মার্জনীয়; এখনকার বিচ্ছেদ শিক্ষিত মূঢ়তার, সুতরাং তাহা হাস্যকর এবং ততোধিক অনিষ্টকর।

সাধারণত, ভারতীয় বিদ্যা সম্বন্ধে আমাদের যে ধারণা সেও এই শ্রেণীর। শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে আমাদের নিজ দেশের বিদ্যার স্থান নাই, অথবা তার স্থান সব-

পিছনে; সেইজন্য আমাদের সমস্ত শিক্ষার মধ্যে এই কথাটি প্রচ্ছন্ন থাকে যে, আমাদের নিজ দেশের বিদ্যা বলিয়া পদার্থই নাই, যদি থাকে সেটা অপদার্থ বলিলেই হয়। এমন সময় হঠাৎ বিদেশী পণ্ডিতের মুখে আমাদের বিদ্যার সম্বন্ধে একটু যদি বাহবা শুনিতে পাই অমনি উন্মত্ত হইয়া বলিতে থাকি, পৃথিবীতে আর-সকলের বিদ্যা মানবী, আমাদের বিদ্যা দৈবী। অর্থাৎ, আর-সকল দেশের বিদ্যা মানবের স্বাভাবিক বুদ্ধিবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ ভ্রম কাটাইয়া বাড়িয়া উঠিতেছে, কেবল আমাদের দেশেই বিদ্যা ব্রহ্মা বা শিবের প্রসাদে এক মুহূর্তে ঋষিদের ব্রহ্মরন্ধ্র দিয়া ভ্রমলেশবিবর্জিত হইয়া অনন্ত কালের উপযোগী আকারে বাহির হইয়া আসিয়াছে। ইংরেজিতে যাকে বলে স্পেশাল ক্রিয়েশন ইহা তাই, ইহাতে ক্রমবিকাশের প্রাকৃতিক নিয়ম খাটে না, ইহা ইতিহাসের ধারাবাহিক পথের অতীত, সুতরাং ইহাকে ঐতিহাসিক বিচারের অধীন করা চলে না; ইহাকে কেবলমাত্র বিশ্বাসের দ্বারা বহন করিতে হইবে, বুদ্ধি-দ্বারা গ্রহণ করিতে হইবে না। অহংকারের আঁধি লাগিয়া এ কথা আমরা একেবারে ভুলিয়া যাই যে, কোনো-একটি বিশেষ জাতির জন্যই বিধাতা সর্বাপেক্ষা অনুকূল ব্যবস্থা স্বহস্তে করিয়া দিয়াছেন, এ-সব কথা বর্বরকালের কথা। স্পেশাল ক্রিয়েশনের কথা আজিকার দিনে আর ঠাঁই পায় না। আজ আমরা এই বুঝি যে, সত্যের সহিত সত্যের সম্বন্ধ, সকল বিদ্যার উদ্ভব যে নিয়মে বিশেষ বিদ্যার উদ্ভব সেই নিয়মেই। পৃথিবীতে কেবলমাত্র কয়েদিই অপর সাধারণের সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া সলিটারি সেলে থাকে। সত্যের অধিকার সম্বন্ধে বিধাতা কেবলমাত্র ভারতবর্ষকেই সেই সলিটারি সেলে অন্তরায়িত করিয়া রাখিয়াছেন, এ কথা ভারতের গৌরবের কথা নয়।

দীর্ঘকাল আমাদের বিদ্যাকে আমরা একঘরে করিয়া রাখিয়াছিলাম। দুই রকম করিয়া একঘরে করা যায়— এক অবজ্ঞার দ্বারা, আর-এক অতিসম্মানের দ্বারা। দুইয়েরই ফল এক। দুইয়েতেই তেজ নষ্ট করে। এক কালে জাপানের মিকাডো তাঁর দুর্ভেদ্য রাজকীয় সম্মানের বেড়ার মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকিতেন, প্রজাদের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ ছিল না বলিলেই হয়। তার ফলে, শোগুন ছিল সত্যকার রাজা আর মিকাডো ছিলেন নামমাত্র রাজা। যখন মিকাডোকে যথার্থই আধিপত্য দিবার সংকল্প হইল তখন তাঁর অতিসম্মানের দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর ভাঙিয়া তাঁহাকে সর্বসাধারণের গোচর করিয়া দেওয়া হইল। আমাদের ভারতীয় বিদ্যার প্রাচীরও তেমনি দুর্লঙ্ঘ্য ছিল। নিজেকে তাহা সকল দেশের বিদ্যা হইতে একান্ত স্বতন্ত্র করিয়া রাখিয়াছিল, পাছে বিপুল বিশ্বসাধারণের সম্পর্কে তার মধ্যে বিকার আসে। তার ফলে আমাদের দেশে সে হইল বিদ্যারাজ্যের মিকাডো, আর যে বিদেশী বিদ্যা বিশ্ববিদ্যার সঙ্গে অবিরত যোগ রক্ষা করিয়া নিয়তই আপন প্রাণশক্তিকে পরিপুষ্ট করিয়া তুলিতেছে সেই শোগুন হইয়া আমাদিগকে প্রবল প্রতাপে শাসন করিতেছে। আমরা অন্যটিকে উদ্দেশে নমস্কার করিয়া ইহাকেই প্রত্যক্ষ সেলাম করিলাম, ইহাকেই খাজনা দিলাম এবং ইহারই কানমলা খাইলাম। ঘরে আসিয়া ইহাকে ম্লেচ্ছ বলিয়া গাল দিলাম; ইহার শাসনে আমাদের মতিগতি বিকৃত হইতেছে বলিয়া আক্ষেপ করিলাম; এ দিকে স্ত্রীর গহনা বেচিয়া, নিজের বাস্তুবাড়ি বন্ধক রাখিয়া, ইহার খাজনার শেষ কড়িটি শোধ করিবার জন্য ছেলেটাকে নিত্য ইহার কাছারিতে হাঁটাহাঁটি করাইতে লাগিলাম।

শিশু যে সেই ধাত্রীর কোলে থাকে। সাধারণের ভিড় হইতে তাহাকে রক্ষা করিয়াই মানুষ করিতে হয়। তাহার ঘরটি নিভৃত, তাহার দোলাটি নিরাপদ।

কিন্তু, তাহাকে যদি চিরদিনই ঢাকাঢুকি দিয়া ঘরের কোণে অঞ্চলের আড়াল করিয়া রাখি তাহা হইলে উলটা ফল হয়। অর্থাৎ, যে শিশু একদা অত্যন্ত স্বতন্ত্র ও সুরক্ষিত ছিল বলিয়াই পরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল সেই শিশুই বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া তাহার নিভৃত বেষ্টনের মধ্যে অকর্মণ্য, কাণ্ডজ্ঞানবিবর্জিত হইয়া উঠে। শুঁটির মধ্যে যে বীজ লালিত হইয়াছে ক্ষেতের মধ্যে সেই বীজের বর্ধিত হওয়া চাই।

একদিন চৈন পারসিক মৈশর গ্রীক রোমীয় প্রভৃতি প্রত্যেক বড়ো জাতিই ভারতীয়ের মতোই ন্যূনাধিক পরিমাণে নিজের সুরক্ষিত স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে নিজ সভ্যতাকে বড়ো করিয়া তুলিয়াছিল। পৃথিবীর এখন বয়স হইয়াছে; জাতিগত বিদ্যাস্বাতন্ত্র্যকে একান্তভাবে লালন করিবার দিন আজ আর নাই। আজ বিদ্যা-সমবায়ের যুগ আসিয়াছে। সেই সমবায়ে যে বিদ্যা যোগ দিবে না, যে বিদ্যা কৌলীন্যের অভিমানে অনূঢ়া হইয়া থাকিবে, সে নিষ্ফল হইয়া মরিবে।

অতএব, আমাদের দেশে বিদ্যাসমবায়ের একটি বড়ো ক্ষেত্র চাই, যেখানে বিদ্যার আদান প্রদান ও তুলনা হইবে, যেখানে ভারতীয় বিদ্যাকে মানবের সকল বিদ্যার ক্রমবিকাশের মধ্যে রাখিয়া বিচার করিতে হইবে।

তাহা করিতে গেলে ভারতীয় বিদ্যাকে তাহার সমস্ত শাখা-উপশাখার যোগে সমগ্র করিয়া জানা চাই। ভারতীয় বিদ্যার সমগ্রতার জ্ঞানটিকে মনের মধ্যে পাইলে তাহার সঙ্গে বিশ্বের সমস্ত বিদ্যার সম্বন্ধনির্ণয় স্বাভাবিক প্রণালীতে হইতে পারে। কাছের জিনিসের বোধ দূরের জিনিসের বোধের সহজ ভিত্তি।

বিদ্যার নদী আমাদের দেশে বৈদিক, পৌরাণিক, বৌদ্ধ, জৈন, প্রধানত এই চারি শাখায় প্রবাহিত। ভারতচিত্তগঙ্গোত্রীতে ইহার উদ্ভব। কিন্তু যে দেশে নদী চলিতেছে কেবল সেই দেশের জলেই সেই নদী পুষ্ট না হইতেও পারে। ভারতের গঙ্গার সঙ্গে তিব্বতের ব্রহ্মপুত্র মিলিয়াছে। ভারতের বিদ্যার স্রোতেও সেইরূপ মিলন ঘটিয়াছে। বাহির হইতে মুসলমান যে জ্ঞান ও ভাবের ধারা এখানে বহন করিয়া আনিয়াছে সেই ধারা ভারতের চিত্তকে স্তরে স্তরে অভিষিক্ত করিয়াছে, তাহা আমাদের ভাষায় আচারে শিল্পে সাহিত্যে সংগীতে নানা আকারে প্রকাশমান। অবশেষে সম্প্রতি য়ুরোপীয় বিদ্যার বন্যা সকল বাঁধ ভাঙিয়া দেশকে প্লাবিত করিয়াছে; তাহাকে হাসিয়া উড়াইতেও পারি না, কাঁদিয়া ঠেকানোও সম্ভবপর নহে।

অতএব, আমাদের বিদ্যায়তনে বৈদিক, পৌরাণিক, বৌদ্ধ, জৈন, মুসলমান ও পার্সি বিদ্যার সমবেত চর্চায় আনুষঙ্গিকভাবে য়ুরোপীয় বিদ্যাকে স্থান দিতে হইবে।

সমস্ত পৃথিবীকে বাদ দিয়া যাহারা ভারতকে একান্ত করিয়া দেখে তাহারা ভারতকে সত্য করিয়া দেখে না। তেমনি যাহারা ভারতের কেবল এক অংশকেই ভারতের সমগ্রতা হইতে খণ্ডিত করিয়া দেখে তাহারাও ভারতচিত্তকে নিজের চিত্তের মধ্যে উপলব্ধি করিতে পারে না। এই কারণ-বশতই পোলিটিক্যাল ঐক্যের অপেক্ষা গভীরতর উচ্চতর মহত্তর যে ঐক্য আছে তার কথা আমরা শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিতে পারি না। পৃথিবীর সকল ঐক্যের যাহা শাশ্বত ভিত্তি তাহাই সত্য ঐক্য। সে ঐক্য চিত্তের ঐক্য, আত্মার ঐক্য। ভারতে সেই চিত্তের ঐক্যকে পোলিটিক্যাল ঐক্যের চেয়ে বড়ো বলিয়া জানিতে হইবে; কারণ, এই ঐক্যে সমস্ত পৃথিবীকে ভারতবর্ষ আপন অঙ্গনে আহ্বান করিতে পারে। অথচ, দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের বর্তমান শিক্ষা এমন যে, সেই শিক্ষার গুণেই ভারতীয় চিত্তকে আমরা তাহার স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিতেছি না। ভারতের হিন্দু বৌদ্ধ জৈন

মুসলমান শিখ পার্সি খৃস্টানকে এক বিরাট চিত্তক্ষেত্রে সত্যসাধনার যজ্ঞে সমবেত করাই ভারতীয় বিদ্যায়তনের প্রধান কাজ—ছাত্রদিগকে কেবল ইংরেজি মুখস্থ করানো, অঙ্ক কষানো, সায়ান্স্ শেখানো নহে। লইবার জন্য অঞ্জলিকে বাঁধিতে হয়, দিবার জন্যও; দশ আঙুল ফাঁক করিয়া দেওয়াও যায় না, লওয়াও যায় না। ভারতের চিত্তকে একত্র সন্নিবিষ্ট করিলে তবে আমরা সত্যভাবে লইতেও পারিব, দিতেও পারিব।

আশ্বিন-কার্তিক ১৩২৬

শিক্ষার মিলন

এ কথা মানতেই হবে যে, আজকের দিনে পৃথিবীতে পশ্চিমের লোক জয়ী হয়েছে। পৃথিবীকে তারা কামধেনুর মতো দোহন করছে, তাদের পাত্র ছাপিয়ে গেল। আমরা বাইরে দাঁড়িয়ে হাঁ করে তাকিয়ে আছি, দিন দিন দেখছি আমাদের ভোগে অন্নের ভাগ কম পড়ে যাচ্ছে। ক্ষুধার তাপ বাড়তে থাকলে ক্রোধের তাপও বেড়ে ওঠে; মনে মনে ভাবি, যে মানুষটা খাচ্ছে ওটাকে একবার সুযোগমত পেলে হয়। কিন্তু ওটাকে পাব কি, ওইই আমাদের পেয়ে বসেছে; সুযোগ এপর্যন্ত ওরই হাতে আছে, আমাদের হাতে এসে পৌঁছয় নি।

কিন্তু কেন এসে পৌঁছয় নি? বিশ্বকে ভোগ করবার অধিকার ওরা কেন পেয়েছে? নিশ্চয় সে কোনো-একটা সত্যের জোরে। আমরা কোনো উপায়ে দল বেঁধে বাইরে থেকে ওদের খোরাক বন্ধ করে নিজের খোরাক বরাদ্দ করব, কথাটা এতই সোজা নয়। ড্রাইভারটার মাথায় বাড়ি দিলেই যে এঞ্জিনটা তখনই আমার বশে চলবে, এ কথা মনে করা ভুল। বস্তুত, ড্রাইভারের মূর্তি ধরে ওখানে একটা বিদ্যা এঞ্জিন চালাচ্ছে। অতএব, শুধু আমার রাগের আগুনে এঞ্জিন চলবে না, বিদ্যাটা দখল করা চাই— তা হলেই সত্যের বর পাব।

মনে করো, এক বাপের দুই ছেলে। বাপ স্বয়ং মোটর হাঁকিয়ে চলেন। তাঁর ভাবখানা এই, ছেলেদের মধ্যে মোটর চালাতে যে শিখবে মোটর তারই হবে। ওর মধ্যে একটি চালাক ছেলে আছে, তার কৌতূহলের অন্ত নেই। সে তন্ন তন্ন করে দেখে গাড়ি চলে কী করে। অন্য ছেলেটি ভালোমানুষ, সে ভক্তিভরে বাপের পায়ের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে; তাঁর দুই হাত মোটরের হাল যে কোন্ দিকে কেমন করে ঘোরাচ্ছে তার দিকেও খেয়াল নেই। চালাক ছেলেটি মোটরের কলকারখানা পুরোপুরি শিখে নিলে এবং একদিন গাড়িখানা নিজের হাতে বাগিয়ে নিয়ে ঊর্ধ্বস্বরে বাঁশি বাজিয়ে দৌড় মারলে। গাড়ি চালাবার শখ দিন রাত এমনি তাকে পেয়ে বসল যে, বাপ আছেন কি নেই সে হুঁশই তার রইল না। তাই বলেই তার বাপ যে তাকে তলব করে গালে চড় মেরে তার গাড়িটা কেড়ে নিলেন তা নয়; তিনি স্বয়ং যে রথের রথী তাঁর ছেলেও যে সেই রথেরই রথী, এতে তিনি প্রসন্ন হলেন। ভালোমানুষ ছেলে দেখলে, ভায়াটি তার পাকা ফসলের ক্ষেত লণ্ডভণ্ড করে তার মধ্যে দিয়ে দিনে দুপুরে হাওয়াগাড়ি চালিয়ে বেড়াচ্ছে; তাকে রোখে কার সাধ্য, তার সামনে দাঁড়িয়ে বাপের দোহাই পাড়লে মরণং ধ্রুবং— তখনো সে বাপের পায়ের দিকে তাকিয়ে রইল আর বললে, 'আমার আর-কিছুতে দরকার নেই।'

কিন্তু দরকার নেই বলে কোনো সত্যকার দরকারকে যে মানুষ খাটো করেছে তাকে দুঃখ পেতেই হবে। প্রত্যেক দরকারেরই একটা মর্যাদা আছে, সেইটুকুর মধ্যে তাকে মানলে তবেই ছাড়পত্র পাওয়া যায়। দরকারকে অবজ্ঞা করলে তার কাছে চিরঋণী হয়ে সুদ দিতে দিতে জীবন কেটে যায়। তাকে ঠিক পরিমাণে মেনে তবে আমরা মুক্তি পাই। পরীক্ষকের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার সব চেয়ে প্রশস্ত রাস্তা হচ্ছে পরীক্ষায় পাস করা।

বিশ্বের একটা বাইরের দিক আছে, সেই দিকে সে মস্ত একটা কল। সে দিকে তার বাঁধা নিয়মে এক চুল এদিক-ওদিক হবার জো নেই। এই বিরাট বস্তুবিশ্ব আমাদের নানা রকমে বাধা দেয়; কুঁড়েমি করে বা মূর্খতা করে যে তাকে এড়াতে গেছে বাধাকে সে ফাঁকি দিতে পারে নি, নিজেকেই ফাঁকি দিয়েছে। অপর পক্ষে বস্তুর নিয়ম যে শিখেছে শুধু যে বস্তুর বাধা তার কেটেছে তা নয়, বস্তু স্বয়ং তার সহায় হয়েছে— বস্তুবিশ্বের দুর্গম পথে ছুটে চলবার বিদ্যা তার হাতে, সকল জায়গায় সকলের আগে গিয়ে সে পৌঁছতে পারে বলে বিশ্বভোজের প্রথম ভাগটা পড়ে তারই পাতে; আর, পথ হাঁটতে হাঁটতে যাদের বেলা বয়ে যায় তারা গিয়ে দেখে যে, তাদের ভাগ্যে হয় অতি সামান্যই বাকি, নয় সমস্তই ফাঁকি।

এমন অবস্থায়, পশ্চিমের লোকে যে বিদ্যার জোরে বিশ্ব জয় করেছে সেই বিদ্যাকে গাল পাড়তে থাকলে দুঃখ কমবে না, কেবল অপরাধ বাড়বে। কেননা, বিদ্যা যে সত্য। কিন্তু এ কথা যদি বল 'শুধু তো বিদ্যা নয় বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে শয়তানিও আছে' তা হলে বলতে হবে, ঐ শয়তানির যোগেই ওদের মরণ। কেননা, শয়তানি সত্য নয়।

জন্তুরা আহার পায় বাঁচে, আঘাত পায় মরে, যেটাকে পায় সেটাকেই বিনা তর্কে মেনে নেয়। কিন্তু মানুষের সব চেয়ে বড়ো স্বভাব হচ্ছে মেনে না নেওয়া। জন্তুরা বিদ্রোহী নয়, মানুষ বিদ্রোহী। বাইরে থেকে যা ঘটে, যাতে তার নিজের কোনো হাত নেই, কোনো সায় নেই, সেই ঘটনাকে মানুষ একেবারে চূড়ান্ত বলে স্বীকার করে নি বলেই জীবের ইতিহাসে সে আজ এত বড়ো গৌরবের পদ দখল করে বসেছে। আসল কথা, মানুষ একেবারেই ভালোমানুষ নয়। ইতিহাসের আদিকাল থেকে মানুষ বলেছে, বিশ্বঘটনার উপরে সে কর্তৃত্ব করবে। কেমন করে করবে? না, ঘটনার পিছনে যে প্রেরণা আছে, যার থেকে ঘটনাগুলো বেরিয়ে এসেছে, তারই সঙ্গে কোনোমতে যদি রফা করতে বা তাকে বাধ্য করতে পারে তা হলেই সে আর ঘটনার দলে থাকবে না, ঘটয়িতার দলে গিয়ে ভর্তি হবে। সাধনা আরম্ভ করলে মন্ত্রতন্ত্র নিয়ে। গোড়ায় তার বিশ্বাস ছিল, জগতে যা-কিছু ঘটছে এ-সমস্তই একটা অদ্ভুত জাদুশক্তির জোরে, অতএব তারও যদি জাদুশক্তি থাকে তবেই শক্তির সঙ্গে শক্তির যোগে সে কর্তৃত্ব লাভ করতে পারে।

সেই জাদুমন্ত্রের সাধনায় মানুষ যে চেষ্টা শুরু করেছিল আজ বিজ্ঞানের সাধনায় তার সেই চেষ্টার পরিণতি। এই চেষ্টার মূল কথাটা হচ্ছে : মানব না, মানাব। অতএব, যারা এই চেষ্টায় সিদ্ধি লাভ করেছে তারাই বাহিরের বিশ্বে প্রভু হয়েছে, দাস নেই। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে নিয়মের কোথাও একটুও ত্রুটি থাকতে পারে না, এই বিশ্বাসটাই বৈজ্ঞানিক বিশ্বাস। এই বিশ্বাসের জোরেই জিত হয়। পশ্চিমের লোকে এই বৈজ্ঞানিক বিশ্বাসে ভর করে নিয়মকে চেপে ধরেছে, আর তারা বাহিরের জগতের সকল সংকট তরে যাচ্ছে। এখনো যারা বিশ্বব্যাপারে জাদুকে অস্বীকার করতে ভয় পায় এবং দায়ে ঠেকলে জাদুর শরণাপন্ন হবার জন্যে যাদের মন

ঝোঁকে বাহিরের বিশ্বে তারা সকল দিকেই মার খেয়ে মরছে; তারা আর কর্তৃত্ব পেল না।

পূর্বদেশে আমরা যে সময়ে রোগ হলে ভূতের ওঝাকে ডাকছি, দৈন্য হলে গ্রহশান্তির জন্যে দৈবজ্ঞের দ্বারে দৌড়চ্ছি, বসন্তমারীকে ঠেকিয়ে রাখবার ভার দিচ্ছি শীতলাদেবীর 'পরে, আর শত্রুকে মারবার জন্যে মারণ-উচাটন মন্ত্র আওড়াতে বসেছি, ঠিক সেই সময়ে পশ্চিম মহাদেশে ভল্‌টেয়ার্‌কে একজন মেয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'শুনেছি নাকি মন্ত্রগুণে পালকে পাল ভেড়া মেরে ফেলা যায়, সে কি সত্য?' ভল্‌টেয়ার জবাব দিয়েছিলেন, 'নিশ্চয়ই মেরে ফেলা যায়, কিন্তু তার সঙ্গে যথোচিত পরিমাণে সেঁকো বিষ থাকা চাই।' য়ুরোপের কোনো কোণে-কানাচে জাদুমন্ত্রের 'পরে বিশ্বাস কিছুমাত্র নেই এমন কথা বলা যায় না, কিন্তু এ সম্বন্ধে সেঁকো বিষটার প্রতি বিশ্বাস সেখানে প্রায় সর্ববাদিসম্মত। এইজন্যেই ওরা ইচ্ছা করলেই মারতে পারে, আর আমরা ইচ্ছে না করলেও মরতে পারি।

আজ এ কথা বলা বাহুল্য যে, বিশ্বশক্তি হচ্ছে ত্রুটিবিহীন বিশ্বনিয়মেরই রূপ; আমাদের নিয়ন্ত্রিত বুদ্ধি এই নিয়ন্ত্রিত শক্তিকে উপলব্ধি করে। বুদ্ধির নিয়মের সঙ্গে এই বিশ্বের নিয়মের সামঞ্জস্য আছে; এইজন্যে, এই নিয়মের 'পরে অধিকার আমাদের প্রত্যেকের নিজের মধ্যেই নিহিত এই কথা জেনে তবেই আমরা আত্মশক্তির উপর নিঃশেষে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পেরেছি। বিশ্বব্যাপারে যে মানুষ আকস্মিকতাকে মানে সে নিজেকে মানতে সাহস করে না, সে যখন-তখন যাকে-তাকে মেনে বসে; শরণাগত হবার জন্যে সে একেবারে ব্যাকুল। মানুষ যখন ভাবে বিশ্বব্যাপারে তার নিজের বুদ্ধি খাটে না তখন সে আর সন্ধান করতে চায় না, প্রশ্ন করতে চায় না; তখন সে বাইরের দিকে কর্তাকে খুঁজে বেড়ায়। এইজন্যে বাইরের দিকে সকলেরই কাছে সে ঠকছে, পুলিসের দারোগা থেকে ম্যালেরিয়ার মশা পর্যন্ত। বুদ্ধির ভীরুতাই হচ্ছে শক্তিহীনতার প্রধান আড্ডা।

পশ্চিমদেশে পোলিটিক্যাল স্বাতন্ত্র্যের যথার্থ বিকাশ হতে আরম্ভ হয়েছে কখন থেকে? অর্থাৎ, কখন থেকে দেশের সকল লোক এই কথা বুঝেছে যে, রাষ্ট্রনিয়ম ব্যক্তিবিশেষের বা সম্প্রদায়বিশেষের খেয়ালের জিনিস নয়, সেই নিয়মের সঙ্গে তাদের প্রত্যেকের সম্মতির সম্বন্ধ আছে? যখন থেকে বিজ্ঞানের আলোচনায় তাদের মনকে ভয়মুক্ত করেছে। যখন থেকে তারা জেনেছে, সেই নিয়মই সত্য যে নিয়ম ব্যক্তিবিশেষের কল্পনার দ্বারা বিকৃত হয় না, খেয়ালের দ্বারা বিচলিত হয় না। বিপুলকায় রাশিয়া সুদীর্ঘকাল রাজার গোলামি করে এসেছে, তার দুঃখের আর অন্ত ছিল না। তার প্রধান কারণ, সেখানকার অধিকাংশ প্রজাই সকল বিষয়েই দৈবকে মেনেছে, নিজের বুদ্ধিকে মানে নি। আজ যদি-বা তার রাজা গেল, কাঁধের উপরে তখনই আর-এক উৎপাত চড়ে বসে তাকে রক্তসমুদ্র সাঁতরিয়ে নিয়ে দুর্ভিক্ষের মরুডাঙায় আধমরা করে পৌঁছিয়ে দিলে। এর কারণ, স্বরাজের প্রতিষ্ঠা বাইরে নয়, যে আত্মবুদ্ধির প্রতি আস্থা আত্মশক্তির প্রধান অবলম্বন সেই আস্থার উপরে।

আমি একদিন একটি গ্রামের উন্নতি করতে গিয়েছিলুম। গ্রামের লোকদের জিজ্ঞাসা করলুম, 'সেদিন তোদের পাড়ায় আগুন লাগল, একখানা চালাও বাঁচাতে পারলি নে কেন?' তারা বললে, 'কপাল!' আমি বললেম, 'কপাল নয় রে, কুয়োর অভাব। পাড়ায় একখানা কুয়ো দিস নে কেন?' তারা তখনই বললে, 'আজ্ঞে, কর্তার ইচ্ছে হলেই হয়।' যাদের ঘরে আগুন লাগাবার বেলায় থাকে দৈব তাদেরই জল দান করবার ভার কোনো-একটি কর্তার। সুতরাং, যে করে হোক এরা একটা

কর্তা পেলে বেঁচে যায়। তাই এদের কপালে আর-সকল অভাবই থাকে, কিন্তু কোনো কালেই কর্তার অভাব হয় না।

বিশ্বরাজ্যে দেবতা আমাদের স্বরাজ দিয়ে বসে আছেন। অর্থাৎ, বিশ্বের নিয়মকে তিনি সাধারণের নিয়ম করে দিয়েছেন। এই নিয়মকে নিজের হাতে গ্রহণ করার দ্বারা আমরা প্রত্যেকে যে কর্তৃত্ব পেতে পারি তার থেকে কেবলমাত্র আমাদের মোহ আমাদের বঞ্চিত করতে পারে, আর-কেউ না, আর-কিছুতে না। এইজন্যেই আমাদের উপনিষৎ এই দেবতা সম্বন্ধে বলেছেন: যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাৎ শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ। অর্থাৎ, অর্থের বিধান তিনি যা করেছেন সে বিধান যথাতথ, তাতে খামখেয়ালি এতটুকুও নেই, এবং সে বিধান শাশ্বত কালের, আজ একরকম কাল একরকম নয়। এর মানে হচ্ছে, অর্থরাজ্যে তাঁর বিধান তিনি চিরকালের জন্যে পাকা করে দিয়েছেন। এ না হলে মানুষকে চিরকাল তাঁর আঁচল-ধরা হয়ে দুর্বল হয়ে থাকতে হত; কেবলই এ ভয়ে, ও ভয়ে, সে ভয়ে, পেয়াদার ঘুষ জুগিয়ে ফতুর হতে হত। কিন্তু, তাঁর পেয়াদার ছদ্মবেশধারী মিথ্যা বিভীষিকার হাত থেকে আমাদের বাঁচিয়েছে যে দলিল সে হচ্ছে তাঁর বিশ্বরাজ্যে আমাদের স্বরাজের দলিল; তারই মহা আশ্বাসবাণী হচ্ছে: যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাৎ শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ। তিনি অনন্তকাল থেকে অনন্তকালের জন্য অর্থের যে বিধান করেছেন তা যথাতথ। তিনি তাঁর সূর্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্রে এই কথা লিখে দিয়েছেন, 'বস্তুরাজ্যে আমাকে না হলেও তোমার চলবে, ওখান থেকে আমি আড়ালে দাঁড়ালুম। এক দিকে রইল আমার বিশ্বের নিয়ম, আর-এক দিকে রইল তোমার বুদ্ধির নিয়ম, এই দুয়ের যোগে তুমি বড়ো হও। জয় হোক তোমার, এ রাজ্য তোমারই হোক; এর ধন তোমার, অস্ত্র তোমারই।' এই বিধিদত্ত স্বরাজ যে গ্রহণ করেছে অন্য সকল রকম স্বরাজ সে পাবে, আর পেয়ে রক্ষা করতে পারবে।

কিন্তু নিজের বুদ্ধিবিভাগে যে লোক কর্তাভজা পোলিটিক্যাল বিভাগেও কর্তাভজা হওয়া ছাড়া তাদের আর গতি নেই। বিধাতা স্বয়ং যেখানে কর্তৃত্ব দাবি করেন না সেখানেও যারা কর্তা জুটিয়ে বসে, যেখানে সম্মান দেন সেখানেও যারা আত্মাবমাননা করে, তাদের স্বরাজে রাজার পর রাজার আমদানি হবে; কেবল ছোট্টো ঐ স্ব'টুকুকে বাঁচানোই দায় হবে।

মানুষের বুদ্ধিকে ভূতের উপদ্রব এবং অদ্ভুতের শাসন থেকে মুক্তি দেবার ভার যে পেয়েছে তার বাসাটা পূর্বেই হোক আর পশ্চিমেই হোক তাকে ওস্তাদ বলে কবুল করতে হবে। দেবতার অধিকার আধ্যাত্মিক মহলে, আর দৈত্যের অধিকার বিশ্বের আধিভৌতিক মহলে। দৈত্য বলছি আমি বিশ্বের সেই শক্তিরূপকে যা সূর্যনক্ষত্র নিয়ে আকাশে আকাশে তালে তালে চক্রে চক্রে লাটিম ঘুরিয়ে বেড়ায়। সেই আধিভৌতিক রাজ্যের প্রধান বিদ্যাটা আজ শুক্রাচার্যের হাতে। সেই বিদ্যাটার নাম সঞ্জীবনী বিদ্যা। সেই বিদ্যার জোরে সম্যক্‌রূপে জীবনরক্ষা হয়, জীবনপোষণ হয়, জীবনের সকলপ্রকার দুর্গতি দূর হতে থাকে; অন্নের অভাব, বস্ত্রের অভাব, স্বাস্থ্যের অভাব মোচন হয়; জড়ের অত্যাচার, জন্তুর অত্যাচার, মানুষের অত্যাচার থেকে এই বিদ্যাই রক্ষা করে। এই বিদ্যা যথাতথ বিধির বিদ্যা; এ যখন আমাদের বুদ্ধির সঙ্গে মিলবে তখনই স্বাতন্ত্র্যলাভের গোড়াপত্তন হবে, অন্য উপায় নেই।

এই শিক্ষা থেকে ভ্রষ্টতার একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। হিন্দুর কুয়ো থেকে মুসলমানে জল তুললে তাতে জল অপবিত্র করে। এটা বিষম মুশকিলের কথা। কেননা, পবিত্রতা হল আধ্যাত্মিক রাজ্যের আর কুয়োর জলটা হল বস্তুরাজ্যের। যদি

বলা যেত, মুসলমানকে ঘৃণা করলে মন অপবিত্র হয় তা হলে সে কথা বোঝা যেত; কেননা, সেটা আধ্যাত্মিক মহলের কথা। কিন্তু মুসলমানের ঘড়ার মধ্যে অপবিত্রতা আছে বললে তর্কের সীমানাগত জিনিসকে তর্কের সীমানার বাইরে নিয়ে গিয়ে বুদ্ধিকে ফাঁকি দেওয়া হয়। পশ্চিম-ইস্কুল-মাস্টারের আধুনিক হিন্দু ছাত্র বলবে, আসলে ওটা স্বাস্থ্যতত্ত্বের কথা। কিন্তু স্বাস্থ্যতত্ত্বের কোনো অধ্যায়ে তো পবিত্রতার বিচার নেই। ইংরেজের ছাত্র বলবে, আধিভৌতিকে যাদের শ্রদ্ধা নেই, আধ্যাত্মিকের দোহাই দিয়ে তাদের ভুলিয়ে কাজ করাতে হয়। এ জবাবটা একেবারেই ভালো নয়। কারণ, যাদের বাইরে থেকে ভুলিয়ে কাজ আদায় করতে হয় চিরদিনই বাইরে থেকে তাদের কাজ করাতে হয়; নিজের থেকে কাজ করার শক্তি তাদের থাকে না, সুতরাং কর্তা না হলে তাদের চলেই না। আর-একটি কথা, এই ভুল যখন সত্যের সহায়তা করতে যায় তখনো সে সত্যকে চাপা দেয়। 'মুসলমানের ঘড়া হিন্দুর কুয়োর জল অপরিষ্কার করে' না বলে যেই বলা হয় 'অপবিত্র করে', তখনই সত্যনির্ণয়ের সমস্ত পথ বন্ধ করা হয়। কেননা, কোনো জিনিস অপরিষ্কার করে কি না-করে সেটা প্রমাণসাপেক্ষ। সে স্থলে হিন্দুর ঘড়া, মুসলমানের ঘড়া— হিন্দুর কুয়োর জল, মুসলমানের কুয়োর জল— হিন্দুপাড়ার স্বাস্থ্য, মুসলমানপাড়ার স্বাস্থ্য—যথানিয়মে ও যথেষ্ট পরিমাণে তুলনা করে পরীক্ষা করে দেখা চাই। পবিত্রতাঘটিত দোষ অন্তরের; কিন্তু স্বাস্থ্যঘটিত দোষ বাইরের, অতএব বাইরে থেকে তার প্রতিকার চলে। স্বাস্থ্যতত্ত্ব হিসাবে ঘড়া পরিষ্কার রাখার নিয়ম বৈজ্ঞানিক নিয়ম; তা মুসলমানের পক্ষেও যেমন হিন্দুর পক্ষেও তেমনি: সেটা যাতে উভয় পক্ষে সমান গ্রহণ করে উভয়ের কুয়ো উভয়েই ব্যবহার করতে পারে সেইটেই চেষ্টার বিষয়। কিন্তু বাহ্য বস্তুকে অপরিষ্কার না বলে অপবিত্র বলার দ্বারা চিরকালের জন্যেই এ সমস্যাকে সাধারণের বুদ্ধি ও চেষ্টার বাইরে নির্বাসিত করে রাখা হয়। এটা কি কাজ সারার পক্ষেও ভালো রাস্তা? এক দিকে বুদ্ধিকে মুগ্ধ রেখে আর-এক দিকে সেই মূঢ়তার সাহায্য নিয়েই ফাঁকি দিয়ে কাজ চালানো, এটা কি কোনো উচ্চ অধিকারের পথ? চালিত যে তার দিকে অবুদ্ধি, আর চালক যে তার দিকে অসত্য, এই দুইয়ের সম্মিলনে কি কোনো কল্যাণ হতে পারে? এইরকম বুদ্ধিগত কাপুরুষতা থেকে দেশকে বাঁচাবার জন্যে আমাদের যেতে হবে শুক্রাচার্যের ঘরে। সে ঘর পশ্চিম-দুয়ারি বলে যদি খামকা বলে বসি 'ও ঘরটা অপবিত্র' তা হলে যে বিদ্যা বাহিরের নিয়মের কথা শেখায় তার থেকে বঞ্চিত হব, আর যে বিদ্যা অন্তরের পবিত্রতার কথা বলে তাকেও ছোটো করা হবে।

এই প্রসঙ্গে একটা তর্ক ওঠবার আশঙ্কা আছে। এ কথা অনেকে বলবেন, পশ্চিমদেশ যখন বুনো ছিল, পশুচর্ম পরে মৃগয়া করত, তখন কি আমরা নিজের দেশকে অন্ন জোগাই নি, বস্ত্র জোগাই নি? ওরা যখন দলে দলে সমুদ্রের এ পারে, ও পারে, দস্যুবৃত্তি করে বেড়াত, আমরা কি তখন স্বরাজশাসনবিধি আবিষ্কার করি নি? নিশ্চয় করেছি, কিন্তু কারণটা কী? আর তো কিছুই নয়, বস্তুবিদ্যা ও নিয়মতত্ত্ব ওরা যতটা শিখেছিল আমরা তার চেয়ে বেশি শিখেছিলেম। পশুচর্ম পরতে যে বিদ্যা লাগে তাঁত বুনতে তার চেয়ে অনেক বেশি বিদ্যার দরকার, পশু মেরে খেতে যে বিদ্যা খাটাতে হয় চাষ করে খেতে তার চেয়ে অনেক বেশি বিদ্যা লাগে। দস্যুবৃত্তিতে যে বিদ্যা রাজ্যচালনে ও পালনে তার চেয়ে অনেক বেশি। আজ আমাদের পরস্পরের অবস্থাটা যদি একেবারে উল্‌টে গিয়ে থাকে তার মধ্যে দৈবের কোনো ফাঁকি নেই। কলিঙ্গের রাজাকে পথে ভাসিয়ে দিয়ে বনের ব্যাধকে

আজ সিংহাসনে যে চড়িয়ে দিয়েছে সে তো কোনো দৈব নয়, সে ঐ বিদ্যা। অতএব, আমাদের সঙ্গে ওদের প্রতিযোগিতার জোর কোনো বাহ্য ক্রিয়াকলাপে কমবে না; ওদের বিদ্যাকে আমাদের বিদ্যা করতে পারলে তবেই ওদের সামলানো যাবে। এ কথার একমাত্র অর্থ, আমাদের সর্বপ্রধান সমস্যা শিক্ষাসমস্যা। অতএব শুক্রাচার্যের আশ্রমে আমাদের যেতে হচ্ছে।

এই পর্যন্ত এগিয়ে একটা কথায় এসে মন ঠেকে যায়। সামনে এই প্রশ্নটা দেখা দেয়, 'সব মানলেম, কিন্তু পশ্চিমের যে শক্তিরূপ দেখে এলে তাতে কি তৃপ্তি পেয়েছ?' না, পাই নি। সেখানে ভোগের চেহারা দেখেছি, আনন্দের না। অনবচ্ছিন্ন সাত মাস আমেরিকায় ঐশ্বর্যের দানবপুরীতে ছিলেম। দানব মন্দ অর্থে বলছি নে, ইংরেজিতে বলতে হলে হয়তো বলতেম, টাইট্যানিক ওয়েল্‌থ্‌। অর্থাৎ, যে ঐশ্বর্যের শক্তি প্রবল, আয়তন বিপুল। হোটেলের জানলার কাছে রোজ ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ-তলা বাড়ির ভ্রূকুটির সামনে বসে থাকতেম আর মনে মনে বলতেম, লক্ষ্মী হলেন এক, আর কুবের হল আর—অনেক তফাত। লক্ষ্মীর অন্তরের কথাটি হচ্ছে কল্যাণ, সেই কল্যাণের দ্বারা ধন শ্রীলাভ করে। কুবেরের অন্তরের কথাটি হচ্ছে সংগ্রহ, সেই সংগ্রহের দ্বারা ধন বহুলত্ব লাভ করে। বহুলত্বের কোনো চরম অর্থ নেই। দুই দুগুণে চার, চার দুগুণে আট, আট দুগুণে ষোলো, অঙ্কগুলো ব্যাঙের মতো লাফিয়ে চলে; সেই লাফের পাল্লা কেবলই লম্বা হতে থাকে। এই নিরন্তর উল্লম্ফনের ঝোঁকের মাঝখানে যে পড়ে গেছে তার রোখ চেপে যায়, রক্ত গরম হয়ে ওঠে, বাহাদুরির মত্ততায় সে ভোঁ হয়ে যায়। আর, যে লোক বাইরে বসে আছে তার যে কত বড়ো পীড়া এইখানে তার একটা উপমা দিই।

একদিন আশ্বিনের ভরা নদীতে আমি বজরার জানলায় বসে ছিলেম, সেদিন পূর্ণিমার সন্ধ্যা। অদূরে ডাঙার উপরে এক গহনার নৌকোর ভোজপুরি মাল্লার দল উৎকট উৎসাহে আত্মবিনোদনের কাজে লেগে গিয়েছিল। তাদের কারও হাতে ছিল মাদল, কারও হাতে করতাল। তাদের কণ্ঠে সুরের আভাসমাত্র ছিল না, কিন্তু বাহুতে শক্তি ছিল সে কথা কার সাধ্য অস্বীকার করে। খচমচ শব্দে তালের নাচন ক্রমেই দুন চৌদুন লয়ে চড়তে লাগল। রাত এগারোটা হয়, দুপুর বাজে, ওরা থামতেই চায় না। কেননা, থামবার কোনোই সংগত কারণ নেই। সঙ্গে যদি গান থাকত তা হলে সমও থাকত; কিন্তু অরাজক তালের গতি আছে শান্তি নেই, উত্তেজনা আছে পরিতৃপ্তি নেই। সেই তালমাতালের দল প্রতিক্ষণেই ভাবছিল ভরপুর মজা হচ্ছে। আমি ছিলেম তাণ্ডবের বাইরে, আমিই বুঝছিলেম গানহীন তালের দৌরাত্ম্য বড়ো অসহ্য।

তেমনি করেই আট্‌লান্‌টিকের ও পারে ইঁটপাথরের জঙ্গলে বসে আমার মন প্রতিদিনই পীড়িত হয়ে বলেছে, তালের খচমচ'র অন্ত নেই, কিন্তু সুর কোথায়! আরো চাই, আরো চাই, আরো চাই—এ বাণীতে তো সৃষ্টির সুর লাগে না। তাই সেদিন সেই ভ্রূকুটিকুটিল অভ্রভেদী ঐশ্বর্যের সামনে দাঁড়িয়ে ধনমানহীন ভারতের একটি সন্তান প্রতিদিন ধিক্কারের সঙ্গে বলেছে : ততঃ কিম্‌!

এ কথা বারবার বলেছি, আবার বলি, আমি বৈরাগ্যের নাম করে শূন্য ঝুলির সমর্থন করি নে। আমি এই বলি, অন্তরে গান বলে সত্যটি যদি ভরপুর থাকে তবে তার সাধনায় সুর-তাল রসের সংযমরক্ষা করে; বাহিরের বৈরাগ্য অন্তরের পূর্ণতার সাক্ষ্য দেয়। কোলাহলের উচ্ছৃঙ্খল নেশায় সংযমের কোনো বালাই নেই। অন্তরে প্রেম বলে সত্যটি যদি থাকে তবে তার সাধনায় ভোগকে হতে হয় সংযত,

সেবাকে হতে হয় খাঁটি। এই সাধনার সতীত্ব থাকা চাই। এই সতীত্বের যে বৈরাগ্য অর্থাৎ সংযম সেই হল প্রকৃত বৈরাগ্য। অন্নপূর্ণার সঙ্গে বৈরাগীর যে মিলন সেই হল প্রকৃত মিলন।

যখন জাপানে ছিলেম তখন প্রাচীন জাপানের যে রূপ সেখানে দেখেছি সে আমাকে গভীর তৃপ্তি দিয়েছে। কেননা, অর্থহীন বহুলতা তার বাহন নয়। প্রাচীন জাপান আপন হৃৎপদ্মের মাঝখানে সুন্দরকে পেয়েছিল। তার সমস্ত বেশভূষা, কর্ম খেলা, তার বাসা আসবাব, তার শিষ্টাচার ধর্মানুষ্ঠান, সমস্তই একটি মূল ভাবের দ্বারা অধিকৃত হয়ে সেই এককে সেই সুন্দরকে বৈচিত্র্যের মধ্যে প্রকাশ করেছে। একান্ত রিক্ততাও নিরর্থক, একান্ত বহুলতাও তেমনি। প্রাচীন জাপানের যে জিনিসটি আমার চোখে পড়েছিল তা রিক্ততাও নয়, বহুলতাও নয়, তা পূর্ণতা। এই পূর্ণতাই মানুষের হৃদয়কে আতিথ্য দান করে; সে ডেকে আনে, সে তাড়িয়ে দেয় না। আধুনিক জাপানকেও এর পাশাপাশি দেখেছি। সেখানে ভোজপুরি মাল্লার দল আড্ডা করেছে; তাদের যে প্রচণ্ড খচমচ উঠেছে সুন্দরের সঙ্গে তার মিল হল না, পূর্ণিমাকে তা ব্যঙ্গ করতে লাগল।

পূর্বে যা বলেছি তার থেকে এ কথা সবাই বুঝবেন যে, আমি বলি নে রেলওয়ে টেলিগ্রাফ কল কারখানার কোনোই প্রয়োজন নেই। আমি বলি, প্রয়োজন আছে কিন্তু তার বাণী নেই; বিশ্বের কোনো সুরে সে সায় দেয় না, হৃদয়ের কোনো ডাকে সে সাড়া দেয় না। মানুষের যেখানে অভাব সেইখানে তৈরি হয় তার উপকরণ, মানুষের যেখানে পূর্ণতা সেইখানে প্রকাশ হয় তার অমৃতরূপ। এই অভাবের দিকে উপকরণের মহলে মানুষের ঈর্ষা বিদ্বেষ; এইখানে তার প্রাচীর, তার পাহারা; এইখানে সে আপনাকে বাড়ায়, পরকে তাড়ায়। সুতরাং এইখানেই তার লড়াই। যেখানে তার অমৃত, যেখানে মানুষ—বস্তুকে নয়—আত্মাকে প্রকাশ করে, সেখানে সকলকে সে ডেকে আনে; সেখানে ভাগের দ্বারা ভোজের ক্ষয় হয় না। সুতরাং সেইখানেই শান্তি।

য়ুরোপ যখন বিজ্ঞানের চাবি দিয়ে বিশ্বের রহস্যনিকেতনের দরজা খুলতে লাগল তখন যে দিকে চায় সেই দিকেই দেখে বাঁধা নিয়ম। নিয়ত এই দেখার অভ্যাসে তার এই বিশ্বাসটা ঢিলে হয়ে এসেছে যে, নিয়মেরও পশ্চাতে এমন কিছু আছে যার সঙ্গে আমাদের মানবত্বের অন্তরঙ্গ মিল আছে। নিয়মকে কাজে খাটিয়ে আমরা ফল পাই, কিন্তু ফল পাওয়ার চেয়েও মানুষের একটা বড়ো লাভ আছে। চা-বাগানের ম্যানেজার কুলিদের 'পরে যে নিয়ম চালনা করে সে নিয়ম যদি পাকা হয় তা হলে চায়ের ফলনের পক্ষে কাজে লাগে। কিন্তু, বন্ধু সম্বন্ধে ম্যানেজারের তো পাকা নিয়ম নেই। তার বেলায় নিয়মের কথাই ওঠে না। ঐ জায়গাটাতে চায়ের আয় নেই, ব্যয় আছে। কুলির নিয়মটা আধিভৌতিক বিশ্বনিয়মের দলে, সেইজন্যে সেটা চা-বাগানেও খাটে। কিন্তু, যদি এমন ধারণা হয় যে, ঐ বন্ধুতার সত্য কোনো বিরাট সত্যের অঙ্গ নয়, তা হলে সেই ধারণায় মানবত্বকে শুকিয়ে ফেলে। কলকে তো আমরা আত্মীয় বলে বরণ করতে পারি নে; তা হলে কলের বাইরে কিছু যদি না থাকে তবে আমাদের যে আত্মা আত্মীয়কে খোঁজে সে দাঁড়ায় কোথায়? এক রোখে বিজ্ঞানের চর্চা করতে করতে পশ্চিমদেশে এই আত্মাকে কেবলই সরিয়ে সরিয়ে ওর জন্যে আর জায়গা রাখলে না। এক-ঝোঁকা আধ্যাত্মিক বুদ্ধিতে আমরা দারিদ্র্যে দুর্বলতায় কাত হয়ে পড়েছি, আর ওরাই কি এক-ঝোঁকা আধিভৌতিক চালে এক পায়ে লাফিয়ে মনুষ্যত্বের সার্থকতার মধ্যে গিয়ে পৌঁচচ্ছে?

বিশ্বের সঙ্গে যাদের এমনিতরো চা-বাগানের ম্যানেজারির সম্বন্ধ তাদের সঙ্গে যে-সে লোকের পেরে ওঠা শক্ত। সুদক্ষতার বিদ্যাটা এরা আয়ত্ত করে নিয়েছে। ভালোমানুষ লোক তাদের সন্ধানপর আড়কাঠির হাতে ঠকে যায়, ধরা দিলে ফেরবার পথ পায় না। কেননা, ভালোমানুষ লোকের নিয়মবোধ নেই, যেখানে বিশ্বাস করবার নয় ঠিক সেইখানেই আগে-ভাগে সে বিশ্বাস করে বসে আছে—তা সে বৃহস্পতিবারের বারবেলা হোক, রক্ষামন্ত্রের তাবিজ হোক, উকিলের দালাল হোক, আর চা-বাগানের আড়কাঠি হোক। কিন্তু এই নেহাত ভালোমানুষেরও একটা জায়গা আছে যেটা নিয়মের উপরকার; সেখানে দাঁড়িয়ে সে বলতে পারে, 'সাত জন্মে আমি যেন চা-বাগানের ম্যানেজার না হই, ভগবান, আমার 'পরে এই দয়া করো।' অথচ, এই অনবচ্ছিন্ন চা-বাগানের ম্যানেজারসম্প্রদায় নিখুঁত করে উপকার করতে জানে; জানে তাদের কুলির বস্তি কেমন করে ঠিক যেন কাঁচিছাঁটা সোজা লাইনে পরিপাটি করে বানিয়ে দিতে হয়; দাওয়াইখানা ডাক্তারখানা হাট-বাজারের যে ব্যবস্থা করে সে খুব পরিপাটি। এদের এই নির্মানুষিক সুব্যবস্থায় নিজেদের মুনাফা হয়, অন্যদের উপকারও হতে পারে, কিন্তু নাস্তি ততঃ সুখলেশঃ সত্যং।

কেউ না মনে করেন, আমি কেবলমাত্র পশ্চিমের সঙ্গে পূর্বের সম্বন্ধ নিয়েই এই কথাটা বলছি। যান্ত্রিকতাকে অন্তরে বাহিরে বড়ো করে তুলে পশ্চিমসমাজে মানবসম্বন্ধের বিশ্লিষ্টতা ঘটেছে। কেননা, স্ক্রু দিয়ে আঁটা, আঠা দিয়ে জোড়ার বন্ধনকেই ভাবনায় এবং চেষ্টায় প্রধান করে তুললে, অন্তরতম যে আত্মিক বন্ধনে মানুষ স্বতঃপ্রসারিত আকর্ষণে পরস্পর গভীরভাবে মিলে যায়, সেই সৃষ্টিশক্তি-সম্পন্ন বন্ধন শিথিল হতে থাকে। অথচ, মানুষকে কলের নিয়মে বাঁধার আশ্চর্য সফলতা আছে; তাতে পণ্যদ্রব্য রাশীকৃত হয়, বিশ্ব জুড়ে হাট বসে, মেঘ ভেদ করে কোঠাবাড়ি ওঠে। এ দিকে সমাজব্যাপারে শিক্ষা বলো, আরোগ্য বলো, জীবিকার সুযোগসাধন বলো, নানাপ্রকার হিতকর্মেও মানুষের যোলো আনা জিত হয়। কেননা পূর্বেই বলেছি, বিশ্বের বাহিরের দিকে এই কল জিনিসটা সত্য। সেইজন্যে এই যান্ত্রিকতায় যাদের মন পেকে যায় ফললাভের দিকে তাদের লোভের অন্ত থাকে না। লোভ যতই বাড়তে থাকে মানুষকে মানুষ খাটো করতে ততই আর দ্বিধা করে না।

কিন্তু লোভ তো একটা তত্ত্ব নয়, লোভ হচ্ছে রিপু। রিপুর কর্ম নয় সৃষ্টি করা। তাই, ফললাভের লোভ যখন কোনো সভ্যতার অন্তরে প্রধান আসন গ্রহণ করে তখন সেই সভ্যতায় মানুষের আত্মিক যোগ বিশ্লিষ্ট হতে থাকে। সেই সভ্যতা যতই ধন লাভ করে, বল লাভ করে, সুবিধাসুযোগের যতই বিস্তার করতে থাকে, মানুষের আত্মিক সত্যকে ততই সে দুর্বল করে।

একা মানুষ ভয়ংকর নিরর্থক; কেননা, একার মধ্যে ঐক্য নেই। বহুকে নিয়ে যে এক সেই হল সত্য এক। বহু থেকে বিচ্ছিন্ন যে সেই লক্ষ্মীছাড়া এক ঐক্য থেকে বিচ্ছিন্ন এক। ছবি এক লাইনে হয় না, সে হয় নানা লাইনের ঐক্যে। ছবির মধ্যে প্রত্যেক লাইনটি ছোটো বড়ো সমস্ত লাইনের আত্মীয়। এই আত্মীয়তার সামঞ্জস্যে ছবি হল সৃষ্টি। এঞ্জিনিয়র সাহেব নীলরঙের মোমজামার উপর বাড়ির প্ল্যান আঁকেন, তাকে ছবি বলি নে; কেননা, সেখানে লাইনের সঙ্গে লাইনের অন্তরের আত্মিক সম্বন্ধ নয়, বাহির-মহলের ব্যবহারিক সম্বন্ধ। তাই ছবি হল সৃজন, প্ল্যান হল নির্মাণ।

তেমনি ফললাভের লোভে ব্যবসায়িকতাই যদি মানুষের মধ্যে প্রবল হয়ে ওঠে তবে মানবসমাজ প্রকাণ্ড প্ল্যান হয়ে উঠতে থাকে, ছবির আর কিছু বাকি থাকে না। তখন মানুষের মধ্যে আত্মিক সম্বন্ধ খাটো হতে থাকে। তখন ধন হয় সমাজের রথ, ধনী হয় সমাজের রথী, আর শক্ত বাঁধনে বাঁধা মানুষগুলো হয় রথের বাহন। গড় গড় শব্দে এই রথটা এগিয়ে চলাকেই মানুষ বলে সভ্যতার উন্নতি। তা হোক, কিন্তু এই কুবেরের রথযাত্রায় মানুষের আনন্দ নেই। কেননা কুবেরের 'পরে মানুষের অন্তরের ভক্তি নেই। ভক্তি নেই বলেই মানুষের বাঁধন দড়ির বাঁধন হয়, নাড়ীর বাঁধন হয় না। দড়ির বাঁধনের ঐক্যকে মানুষ সইতে পারে না, বিদ্রোহী হয়। পশ্চিমদেশে আজ সামাজিক বিদ্রোহ কালো হয়ে ঘনিয়ে এসেছে এ কথা সুস্পষ্ট। ভারতে আচারের বন্ধনে যেখানে মানুষকে এক করতে চেয়েছে সেখানে সেই ঐক্যে সমাজকে নির্জীব করেছে, য়ুরোপে ব্যবহারের বন্ধনে যেখানে মানুষকে এক করতে চেয়েছে সেখানে সেই ঐক্যে সমাজকে সে বিশ্লিষ্ট করেছে। কেননা আচারই হোক আর ব্যবহারই হোক, তারা তো তত্ত্ব নয়; তাই তারা মানুষের আত্মাকে বাদ দিয়ে সকল ব্যবস্থা করে।

তত্ত্ব কাকে বলে? যিশু বলেছেন: আমি আর আমার পিতা এক। এ হল তত্ত্ব। পিতার সঙ্গে আমার যে ঐক্য সেই হল সত্য ঐক্য, ম্যানেজারের সঙ্গে কুলির যে ঐক্য সে সত্য ঐক্য নয়।

চরম তত্ত্ব আছে উপনিষদে—

ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্‌ধনম্‌।

পশ্চিমসভ্যতার অন্তরাসনে লোভ রাজা হয়ে বসেছে, পূর্বেই তার নিন্দা করেছি। কিন্তু, নিন্দাটা কিসের? ঈশোপনিষদে তত্ত্বস্বরূপে এরই উত্তরটি দেওয়া হয়েছে। ঋষি বলেছেন: মা গৃধঃ। লোভ কোরো না। কেন করব না? যেহেতু লোভে সত্যকে মেলে না। নাই-বা মিলল, আমি ভোগ করতে চাই। ভোগ কোরো না, এ কথা তো বলা হচ্ছে না। ভুঞ্জীথাঃ, ভোগই করবে; কিন্তু সত্যকে ছেড়ে আনন্দকে ভোগ করবার পন্থা নেই। তা হলে সত্যটা কী? সত্য হচ্ছে এই: ঈশাবাস্যমিদং সর্বম্‌। সংসারে যা-কিছু চলছে সমস্ত ঈশ্বরের দ্বারা আচ্ছন্ন। যা-কিছু চলছে সেইটেই যদি চরম সত্য হত, তার বাইরে আর-কিছুই না থাকত, তা হলে চলমান বস্তুকে যথাসাধ্য সংগ্রহ করাই মানুষের সব চেয়ে বড়ো সাধনা হত। তা হলে লোভই মানুষকে সব চেয়ে বড়ো চরিতার্থতা দিত। কিন্তু ঈশ সমস্ত পূর্ণ করে রয়েছেন এইটেই যখন শেষ কথা তখন আত্মার দ্বারা এই সত্যকে ভোগ করাই হবে পরম সাধনা। আর, তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ। ত্যাগের দ্বারাই এই ভোগের সাধন হবে, লোভের দ্বারা নয়। সাত মাস ধরে আমেরিকায় আকাশের বক্ষোবিদারী ঐশ্বর্যপুরীতে বসে এই সাধনার উল্‌টোপথে চলা দেখে এলেম। সেখানে 'যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ' সেটাই মস্ত হয়ে প্রকাশ পাচ্ছে, আর 'ঈশাবাস্যমিদং সর্বম্‌' সেইটেই ডলারের ঘন ধুলায় আচ্ছন্ন। এইজন্যেই সেখানে 'ভুঞ্জীথাঃ' এই বিধানের পালন সত্যকে নিয়ে নয়, ধনকে নিয়ে; ত্যাগকে নিয়ে নয়, লোভকে নিয়ে।

ঐক্য দান করে সত্য। ভেদবুদ্ধি ঘটায় ধন। তা ছাড়া সে অন্তরাত্মাকে শূন্য রাখে; সেইজন্যে পূর্ণতাকে বাইরের দিক থেকে ছিনিয়ে নিতে ইচ্ছা করে। সুতরাং কেবল সংখ্যাবৃদ্ধির দিকে দিনরাত ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়তে হয়; 'আরো' 'আরো' হাঁকতে-হাঁকতে হাঁপাতে-হাঁপাতে নামতার কোঠায় কোঠায় আকাঙ্ক্ষার

ঘোড়দৌড় করাতে-করাতে ঘূর্ণি লাগে; ভুলেই যেতে হয় অন্য যা-কিছু পাই আনন্দ পাচ্ছি নে।

তা হলে চরিতার্থতা কোথায়? তার উত্তর একদিন ভারতবর্ষের ঋষিরা দিয়েছেন। তাঁরা বলেন, চরিতার্থতা পরম একের মধ্যে। গাছ থেকে আপেল পড়ে একটা, দুটো, তিনটে, চারটে। আপেল পড়ার অন্তবিহীন সংখ্যাগণনার মধ্যেই আপেল পড়ার সত্যকে পাওয়া যায় এ কথা যে বলে প্রত্যেক সংখ্যার কাছে এসে তাকে তার মন ধাক্কা দিয়ে বলবে ‘ততঃ কিম্’। তার দৌড়ও থামবে না, তার প্রশ্নের উত্তরও মিলবে না। কিন্তু অসংখ্য আপেল পড়া যেমনি একটি আকর্ষণতত্ত্বে এসে ঠেকে অমনি বুদ্ধি খুশি হয়ে বলে ওঠে, ‘বাস্! হয়েছে।’

এই তো গেল আপেল পড়ার সত্য। মানুষের সত্যটা কোথায়? সেন্সস্ রিপোর্টে? এক দুই তিন চার পাঁচে? মানুষের স্বরূপপ্রকাশ কি অন্তহীন সংখ্যায়? এই প্রকাশের তত্ত্বটি উপনিষৎ বলেছেন—

যস্তু সর্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি
সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে।

যিনি সর্বভূতকে আপনারই মতো দেখেন এবং আত্মাকে সর্বভূতের মধ্যে দেখেন তিনি প্রচ্ছন্ন থাকেন না। আপনাকে আপনাতেই যে বদ্ধ করে সে থাকে লুপ্ত: আপনাকে সকলের মধ্যে যে উপলব্ধি করে সেই হয় প্রকাশিত। মনুষ্যত্বের এই প্রকাশ ও প্রচ্ছন্নতার একটা মস্ত দৃষ্টান্ত ইতিহাসে আছে। বুদ্ধদেব মৈত্রী-বুদ্ধিতে সকল মানুষকে এক দেখেছিলেন, তাঁর সেই ঐক্যতত্ত্ব চীনকে অমৃত দান করেছিল। আর, যে বণিক লোভের প্রেরণায় চীনে এল এই ঐক্যতত্ত্বকে সে মানলে না; সে অকুণ্ঠিতচিত্তে চীনকে মৃত্যুদান করেছে, কামান দিয়ে ঠেসে ঠেসে তাকে আফিম গিলিয়েছে। মানুষ কিসে প্রকাশ পেয়েছে আর কিসে প্রচ্ছন্ন হয়েছে, এর চেয়ে স্পষ্ট করে ইতিহাসে আর-কখনো দেখা যায় নি।

আমি জানি, আজকের দিনে আমাদের দেশে অনেকেই বলে উঠবেন, ‘ওই কথাটাই তো আমরা বারবার বলে আসছি। ভেদবুদ্ধিটা যাদের এত উগ্র, বিশ্বটাকে তাল পাকিয়ে পাকিয়ে এক-এক গ্রাসে গেলবার জন্যে যাদের লোভ এত বড়ো হাঁ করেছে, তাদের সঙ্গে আমাদের কোনো কারবার চলতে পারে না। কেননা ওরা আধ্যাত্মিক নয়, আমরা আধ্যাত্মিক। ওরা অবিদ্যাকেই মানে, আমরা বিদ্যাকে। এমন অবস্থায় ওদের সমস্ত শিক্ষাদীক্ষা বিষের মতো পরিহার করা চাই।’ এক দিকে এটাও ভেদবুদ্ধির কথা, অপর দিকে এটা সাধারণ বিষয়বুদ্ধির কথাও নয়। ভারতবর্ষ এই মোহকে সমর্থন করেন নি। তাই মনু বলেছেন—

ন তথৈতানি শক্যন্তে সংনিয়ন্তুমসেবয়া
বিষয়েষু প্রজুষ্টানি যথা জ্ঞানেন নিত্যশঃ।

বিষয়ের সেবা -ত্যাগের দ্বারা তেমন করে সংযমন হয় না, বিষয়ে নিযুক্ত থেকে জ্ঞানের দ্বারা নিত্য-নিত্য যেমন করে হয়। এর কারণ, বিষয়ের দায় আধিভৌতিক বিশ্বের দায়, সে দায়কে ফাঁকি দিয়ে আধ্যাত্মিকের কোঠায় ওঠা যায় না: তাকে বিশুদ্ধরূপে পূর্ণ করে তবে উঠতে হয়। তাই উপনিষৎ বলেছেন: অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে। অবিদ্যার পথ দিয়ে মৃত্যু থেকে বাঁচতে হবে, তার পরে বিদ্যার তীর্থে অমৃত লাভ হবে। শুক্রাচার্য এই মৃত্যু থেকে বাঁচাবার বিদ্যা নিয়ে আছেন, তাই অমৃতলোকের ছাত্র কচকেও এই বিদ্যা শেখবার জন্যে দৈত্যপাঠশালার খাতায় নাম লেখাতে হয়েছিল।

আত্মিক সাধনার একটা অঙ্গ হচ্ছে জড়বিশ্বের অত্যাচার থেকে আত্মাকে মুক্ত করা। পশ্চিমমহাদেশের লোকেরা সাধনার সেই দিকটার ভার নিয়েছে। এইটে হচ্ছে সাধনার সব-নিচেকার ভিত, কিন্তু এটা পাকা করতে না পারলে অধিকাংশ মানুষের অধিকাংশ শক্তিই পেটের দায়ে জড়ের গোলামি করতে ব্যস্ত থাকবে। পশ্চিম তাই হাতের আস্তিন গুটিয়ে খন্তা কোদাল নিয়ে এমনি করে মাটির দিকে ঝুঁকে পড়েছে যে উপর-পানে মাথা তোলবার ফুরসত তার নেই বললেই হয়। এই পাকা ভিতের উপর উপর-তলা যখন উঠবে তখনই হাওয়া-আলোর যারা ভক্ত তাদের বাসাটি হবে বাধাহীন। তত্ত্বজ্ঞানের ক্ষেত্রে আমাদের জ্ঞানীরা বলেছেন, না-জানাই বন্ধনের কারণ, জানাতেই মুক্তি। বস্তুবিশ্বেও সেই একই কথা। এখানকার নিয়মতত্ত্বকে যে না জানে সেই বদ্ধ হয়, যে জানে সেই মুক্তিলাভ করে। তাই বিষয়রাজ্যে আমরা যে বাহ্য বন্ধন কল্পনা করি সেও মায়া; এই মায়া থেকে নিষ্কৃতি দেয় বিজ্ঞানে। পশ্চিমমহাদেশ বাহ্য বিশ্বে মায়ামুক্তির সাধনা করছে; সেই সাধনা ক্ষুধা তৃষ্ণা শীত গ্রীষ্ম রোগ দৈন্যের মূল খুঁজে বের করে সেইখানে লাগাচ্ছে ঘা; এই হচ্ছে মৃত্যুর মার থেকে মানুষকে রক্ষা করবার চেষ্টা আর পূর্বমহাদেশ অন্তরাত্মার যে সাধনা করেছে সেই হচ্ছে অমৃতের অধিকার লাভ করবার উপায়। অতএব, পূর্বপশ্চিমের চিত্ত যদি বিচ্ছিন্ন হয় তা হলে উভয়েই ব্যর্থ হবে; তাই পূর্বপশ্চিমের মিলনমন্ত্র উপনিষৎ দিয়ে গেছেন। বলেছেন—

বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্‌বেদোভয়ং সহ
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে।

যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ, এইখানে বিজ্ঞানকে চাই। ঈশাবাস্যামিদং সর্বম্‌, এইখানে তত্ত্বজ্ঞানকে চাই। এই উভয়কে মেলাবার কথা যখন ঋষি বলেছেন তখন পূর্বপশ্চিমকে মিলতে হবে। এই মিলনের অভাবে পূর্বদেশ দৈন্যপীড়িত, সে নির্জীব; আর পশ্চিম অশান্তির দ্বারা ক্ষুব্ধ, সে নিরানন্দ।

এই ঐক্যতত্ত্ব সম্বন্ধে আমার কথা ভুল বোঝবার আশঙ্কা আছে। তাই যে কথাটা একবার আভাসে বলেছি সেইটে আর-একবার স্পষ্ট বলা ভালো। একাকার হওয়া এক হওয়া নয়। যারা স্বতন্ত্র তারাই এক হতে পারে। পৃথিবীতে যারা পরজাতির স্বাতন্ত্র্য লোপ করে তারাই সর্বজাতির ঐক্য লোপ করে। ইম্পীরিয়ালিজ্‌ম্‌ হচ্ছে অজগর সাপের ঐক্যনীতি; গিলে খাওয়াকেই সে এক করা বলে প্রচার করে। পূর্বে আমি বলেছি, আধিভৌতিককে আধ্যাত্মিক যদি আত্মসাৎ করে বসে তা হলে সেটাকে সমন্বয় বলা চলে না; পরস্পরের স্ব-ক্ষেত্রে উভয়ে স্বতন্ত্র থাকলে তবেই সমন্বয় সত্য হয়। তেমনি মানুষ যেখানে স্বতন্ত্র সেখানে তার স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করলে তবেই মানুষ যেখানে এক সেখানে তার সত্য ঐক্য পাওয়া যায়। সেদিনকার মহাযুদ্ধের পর য়ুরোপ যখন শান্তির জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠল তখন থেকে সেখানে কেবলই ছোটো ছোটো জাতির স্বাতন্ত্র্যের দাবি প্রবল হয়ে উঠছে। যদি আজ নবযুগের আরম্ভ হয়ে থাকে তা হলে এই যুগে অতিকায় ঐশ্বর্য, অতিকায় সাম্রাজ্য, সংঘবন্ধনের সমস্ত অতিশয়তা টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে যাবে। সত্যকার স্বাতন্ত্র্যের উপর সত্যকার ঐক্যের প্রতিষ্ঠা হবে। যারা নবযুগের সাধক ঐক্যের সাধনার জন্যেই তাদের স্বাতন্ত্র্যের সাধনা করতে হবে আর তাদের মনে রাখতে হবে, এই সাধনায় জাতিবিশেষের মুক্তি নয়, নিখিল মানবের মুক্তি।

যারা অন্যকে আপনার মতো জেনেছে 'ন ততো বিজুগুপ্‌সতে', তারাই প্রকাশ

পেয়েছে, এই তত্ত্বটি কি মানুষের পুঁথিতেই লেখা আছে? মানুষের সমস্ত ইতিহাসই কি এই তত্ত্বের নিরন্তর অভিব্যক্তি নয়? ইতিহাসের গোড়াতেই দেখি, মানুষের দল পর্বতসমুদ্রের এক-একটি বেড়ার মধ্যে একত্র হয়েছে। মানুষ যখন একত্র হয় তখন যদি এক হতে না পারে তা হলেই সে সত্য হতে বঞ্চিত হয়। একত্রিত মনুষ্যদলের মধ্যে যারা যদুবংশের মাতাল বীরদের মতো কেবলই হানাহানি করেছে, কেউ কাউকে বিশ্বাস করে নি, পরস্পরকে বঞ্চিত করতে গিয়েছে, তারা কোন্ কালে লোপ পেয়েছে। আর, যারা এক আত্মাকে আপনাদের সকলের মধ্যে দেখতে চেয়েছিল তারাই মহাজাতিরূপে প্রকাশ পেয়েছে।

বিজ্ঞানের কল্যাণে জলে স্থলে আকাশে আজ এত পথ খুলেছে, এত রথ ছুটেছে যে, ভূগোলের বেড়া আজ আর বেড়া নেই। আজ, কেবল নানা ব্যক্তি নয়, নানা জাতি কাছাকাছি এসে জুটল; অমনি মানুষের সত্যের সমস্যা বড়ো হয়ে দেখা দিল। বৈজ্ঞানিক শক্তি যাদের একত্র করেছে তাদের এক করবে কে? মানুষের যোগ যদি সংযোগ হল তো ভালোই, নইলে সে দুর্যোগ। সেই মহাদুর্যোগ আজ ঘটেছে। একত্র হবার বাহ্যশক্তি হু হু করে এগোল, এক করবার আন্তর শক্তি পিছিয়ে পড়ে রইল। ঠিক যেন গাড়িটা ছুটেছে এঞ্জিনের জোরে, বেচারা ড্রাইভার্‌টা 'আরে আরে! হাঁ হাঁ' করতে করতে তার পিছন পিছন দৌড়েছে— কিছুতে নাগাল পাচ্ছে না। অথচ, এক দল লোক এঞ্জিনের প্রচণ্ড বেগ দেখে আনন্দ করে বললে, 'শাবাশ! একেই তো বলে উন্নতি।' এ দিকে, আমরা পূর্বদেশের ভালোমানুষ যারা ধীরমন্দগমনে পায়ে হেঁটে চলি ওদের ঐ উন্নতির ধাক্কা আজও সামলে উঠতে পারছি নে। কেননা যারা কাছেও আসে, তফাতেও থাকে, তারা যদি চঞ্চল পদার্থ হয় তা হলে পদে পদে ঠকাঠক ধাক্কা দিতে থাকে। এই ধাক্কার মিলন সুখকর নয়, অবস্থাবিশেষে কল্যাণকর হতেও পারে।

যাই হোক, এর চেয়ে স্পষ্ট আজ আর কিছুই নয় যে, জাতিতে জাতিতে একত্র হচ্ছে অথচ মিলছে না। এরই বিষম বেদনায় সমস্ত পৃথিবী পীড়িত। এত দুঃখেও দুঃখের প্রতিকার হয় না কেন? তার কারণ এই যে, গণ্ডির ভিতরে যারা এক হতে শিখেছিল গণ্ডির বাইরে তারা এক হতে শেখে নি।

মানুষ সাময়িক ও স্থানিক কারণে গণ্ডির মধ্যে সত্যকে পায় বলেই সত্যের পূজা ছেড়ে গণ্ডির পূজা ধরে; দেবতার চেয়ে পাণ্ডাকে মানে; রাজাকে ভোলে, দারোগাকে কিছুতে ভুলতে পারে না। পৃথিবীতে নেশন গড়ে উঠল সত্যের জোরে; কিন্তু ন্যাশন্যালিজ্‌ম্ সত্য নয়, অথচ সেই জাতীয় গণ্ডি-দেবতার পূজার অনুষ্ঠানে চারি দিক থেকে নরবলির জোগান চলতে লাগল। যতদিন বিদেশী বলি জুটত ততদিন কোনো কথা ছিল না; হঠাৎ ১৯১৪ খৃস্টাব্দে পরস্পরকে বলি দেবার জন্যে স্বয়ং যজমানদের মধ্যে টানাটানি পড়ে গেল। তখন থেকে ওদের মনে সন্দেহ জাগতে আরম্ভ হল, একেই কি বলে ইষ্টদেবতা! এ যে ঘর পর কিছুই বিচার করে না! এ যখন একদিন পূর্বদেশের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কোমল অংশ বেছে তাতে দাঁত বসিয়েছিল এবং 'ভিক্ষু যথা ইক্ষু খায় ধরি ধরি চিবায় সমস্ত'— তখন মহাপ্রসাদের ভোজ খুব জমেছিল, সঙ্গে সঙ্গে মদমত্ততারও অবধি ছিল না। আজ মাথায় হাত দিয়ে ওদের কেউ কেউ ভাবছে, 'এর পুজো আমাদের বংশে সইবে না।' যুদ্ধ যখন পুরোদমে চলছিল তখন সকলেই ভাবছিল, যুদ্ধ মিটলেই অকল্যাণ

মিটবে। যখন মিটল তখন দেখা গেল ঘুরে ফিরে সেই যুদ্ধটাই এসেছে সন্ধিপত্রের মুখোশ পরে। কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে যার প্রকাণ্ড লেজটা দেখে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আঁতকে উঠেছিল, আজ লঙ্কাকাণ্ডের গোড়ায় দেখি সেই লেজটার উপর মোড়কে মোড়কে সন্ধিপত্রের স্নেহসিক্ত কাগজ জড়ানো চলেছে; বোঝা যাচ্ছে, ঐটাতে আগুন যখন ধরবে তখন কারোর ঘরের চাল আর বাকি থাকবে না। পশ্চিমের মনীষী লোকেরা ভীত হয়ে বলছেন যে, যে দুর্বুদ্ধি থেকে দুর্ঘটনার উৎপত্তি এত মারের পরেও তার নাড়ী বেশ তাজা আছে। এই দুর্বুদ্ধিরই নাম ন্যাশন্যালিজ্‌ম্‌, দেশের সর্বজনীন আত্মম্ভরিতা। এ হল রিপু, ঐক্যতত্ত্বের উল্টা দিকে অর্থাৎ আপনার দিকটাতেই এর টান। কিন্তু জাতিতে জাতিতে আজ একত্র হয়েছে এই কথাটা যখন অস্বীকার করবার জো নেই, এত বড়ো সত্যের উপর যখন কোনো একটামাত্র প্রবল জাতি আপন সাম্রাজ্যরথ চালিয়ে দিয়ে চাকার তলায় একে ধুলো করে দিতে পারে না, তখন এর সঙ্গে সত্য ব্যবহার করতেই হবে। তখন ঐ রিপুটাকে এর মাঝখানে আনলে শকুনির মতো কপট দ্যূতের ডিপ্লমাসিতে বারে বারে সে কুরুক্ষেত্র বাধিয়ে দেবে।

বর্তমান যুগের সাধনার সঙ্গেই বর্তমান যুগের শিক্ষার সংগতি হওয়া চাই। রাষ্ট্রীয় গণ্ডি-দেবতার যারা পূজারি তারা শিক্ষার ভিতর দিয়ে নানা ছুতোয় জাতীয় আত্মম্ভরিতার চর্চা করাকে কর্তব্য মনে করে। জর্মানি একদা শিক্ষা-ব্যবস্থাকে তার রাষ্ট্রনৈতিক ভেদবুদ্ধির ক্রীতদাসী করেছিল বলে পশ্চিমের অন্যান্য নেশন তার নিন্দা করেছে। পশ্চিমের কোন্‌ বড়ো নেশন এ কাজ করে নি? আসল কথা, জর্মানি সকল বিভাগেই বৈজ্ঞানিক রীতিকে অন্যান্য সকল জাতির চেয়ে বেশি আয়ত্ত করেছে, সেইজন্যে পাকা নিয়মের জোরে শিক্ষাবিধিকে নিয়ে স্বাজাত্যের ডিমে তা দেবার ইনক্যুবেটার যন্ত্র সে বানিয়েছিল। তার থেকে যে বাচ্চা জন্মেছিল দেখা গেছে অন্যদেশী বাচ্চার চেয়ে তার দম অনেক বেশি। কিন্তু তার প্রতিপক্ষ পক্ষীদের ডিমেতেও তা দিয়েছিল সেদিককার শিক্ষাবিধি। আর, আজ ওদের অধিকাংশ খবরের কাগজের প্রধান কাজটা কী? জাতীয় আত্মম্ভরিতার কুশল কামনা করে প্রতিদিন অসত্যপীরের সিন্নি মানা।

স্বাজাত্যের অহমিকা থেকে মুক্তিদান করার শিক্ষাই আজকের দিনের প্রধান শিক্ষা। কেননা কালকের দিনের ইতিহাস সার্বজাতিক সহযোগিতার অধ্যায় আরম্ভ করবে। যে-সকল রিপু যে-সকল চিন্তার অভ্যাস ও আচারপদ্ধতি এর প্রতিকূল তা আগামী কালের জন্যে আমাদের অযোগ্য করে তুলবে। স্বদেশের গৌরববুদ্ধি আমার মনে আছে, কিন্তু আমি একান্ত আগ্রহে ইচ্ছা করি যে, সেই বুদ্ধি যেন কখনো আমাকে এ কথা না ভোলায় যে একদিন আমার দেশে সাধকেরা যে মন্ত্র প্রচার করেছিলেন সে হচ্ছে ভেদবুদ্ধি দূর করবার মন্ত্র। শুনতে পাচ্ছি সমুদ্রের ও পারের মানুষ আজ আপনাকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছে, 'আমাদের কোন্‌ শিক্ষা, কোন্‌ চিন্তা, কোন্‌ কর্মের মধ্যে মোহ প্রচ্ছন্ন হয়ে ছিল যার জন্যে আমাদের আজ এমন নিদারুণ শোক?' তার উত্তর আমাদের দেশ থেকেই দেশে দেশান্তরে পৌঁছুক যে, 'মানুষের একত্বকে তোমরা সাধনা থেকে দূরে রেখেছিলে, সেইটেই মোহ, এবং তার থেকেই শোক।'—

যস্মিন্‌ সর্বাণি ভূতানি আত্মৈবাভূদ্‌ বিজানতঃ
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ।

আমরা শুনতে পাচ্ছি সমুদ্রের ও পারে মানুষ ব্যাকুল হয়ে বলছে, 'শান্তি চাই।'

এই কথা তাদের জানাতে হবে, শান্তি সেখানেই যেখানে মঙ্গল, মঙ্গল সেখানেই যেখানে ঐক্য। এইজন্য পিতামহেরা বলেছেন : শান্তং শিবমদ্বৈতম্। অদ্বৈতই শান্ত, কেননা অদ্বৈতই শিব। স্বদেশের গৌরববুদ্ধি আমার মনে আছে, সেইজন্যে এই সম্ভাবনার কল্পনাতেও আমার লজ্জা হয় যে, অতীত যুগের যে আবর্জনাভার সরিয়ে ফেলবার জন্যে আজ রুদ্রদেবতার হুকুম এসে পৌঁচেছে এবং পশ্চিমদেশ সেই হুকুমে জাগতে শুরু করেছে আমরা পাছে স্বদেশে সেই আবর্জনার পীঠ স্থাপন করে আজ যুগান্তরের প্রত্যুষেও তামসী পূজাবিধি দ্বারা তা অর্চনা করবার আয়োজন করতে থাকি। যিনি শান্ত, যিনি শিব, যিনি সার্বজাতিক মানবের পরমাশ্রয় অদ্বৈত, তাঁরই ধ্যানমন্ত্র কি আমাদের ঘরে নেই? সেই ধ্যানমন্ত্রের সহযোগেই কি নবযুগের প্রথম প্রভাতরশ্মি মানুষের মনে সনাতন সত্যের উদ্‌বোধন এনে দেবে না?

এইজন্যেই আমাদের দেশের বিদ্যানিকেতনকে পূর্বপশ্চিমের মিলননিকেতন করে তুলতে হবে, এই আমার অন্তরের কামনা। বিষয়লাভের ক্ষেত্রে মানুষের বিরোধ মেটে নি, সহজে মিটতেও চায় না। সত্যলাভের ক্ষেত্রে মিলনের বাধা নেই। যে গৃহস্থ কেবলমাত্র আপন পরিবারকে নিয়েই থাকে, আতিথ্য করতে যার কৃপণতা, সে দীনাত্মা। শুধু গৃহস্থের কেন, প্রত্যেক দেশেরই কেবল নিজের ভোজনশালা নিয়ে চলবে না, তার অতিথিশালা চাই যেখানে বিশ্বকে অভ্যর্থনা করে সে ধন্য হবে। শিক্ষাক্ষেত্রেই তার প্রধান অতিথিশালা। দুর্ভাগা ভারতবর্ষে বর্তমান কালে শিক্ষার যত-কিছু সরকারি ব্যবস্থা আছে তার পনেরো-আনা অংশই পরের কাছে বিদ্যাভিক্ষার ব্যবস্থা। ভিক্ষা যার বৃত্তি আতিথ্য করে না বলে লজ্জা করাও তার ঘুচে যায়। সেইজন্যই বিশ্বের আতিথ্য করে না বলে ভারতীয় আধুনিক শিক্ষালয়ের লজ্জা নেই। সে বলে, 'আমি ভিখারি, আমার কাছে আতিথ্যের প্রত্যাশা কারো নেই।' কে বলে নেই? আমি তো শুনেছি পশ্চিমদেশ বারম্বার জিজ্ঞাসা করছে, 'ভারতের বাণী কই?' তার পর সে যখন আধুনিক ভারতের দ্বারে এসে কান পাতে তখন বলে, 'এ তো সব আমারই বাণীর ক্ষীণ প্রতিধ্বনি, যেন ব্যঙ্গের মতো শোনাচ্ছে।' তাই তো দেখি, আধুনিক ভারত যখন ম্যাক্‌স্‌-ম্যুলরের পাঠশালা থেকে বাহির হয়েই আর্যসভ্যতার দম্ভ করতে থাকে তখন তার মধ্যে পশ্চিম গড়ের বাদ্যের কড়িমধ্যম লাগে, আর পশ্চিমকে যখন সে প্রবল ধিক্কারের সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করে তখনো তার মধ্যে সেই পশ্চিম রাগেরই তারসপ্তকের নিখাদ তীব্র হয়ে বাজে।

আমার প্রার্থনা এই যে, ভারত আজ সমস্ত পূর্বভূভাগের হয়ে সত্যসাধনার অতিথিশালা প্রতিষ্ঠা করুক। তার ধনসম্পদ নেই জানি, কিন্তু তার সাধনসম্পদ আছে। সেই সম্পদের জোরে সে বিশ্বকে নিমন্ত্রণ করবে এবং তার পরিবর্তে সে বিশ্বের সর্বত্র নিমন্ত্রণের অধিকার পাবে। দেউড়িতে নয়, বিশ্বের ভিতর-মহলে তার আসন পড়বে। কিন্তু আমি বলি, এই মানসম্মানের কথা এও বাহিরের, একেও উপেক্ষা করা চলে। এই কথাই বলবার কথা যে, সত্যকে চাই অন্তরে উপলব্ধি করতে এবং সত্যকে চাই বাহিরে প্রকাশ করতে; কোনো সুবিধার জন্যে নয়, সম্মানের জন্যে নয়, মানুষের আত্মাকে তার প্রচ্ছন্নতা থেকে মুক্তি দেবার জন্যে। মানুষের সেই প্রকাশতত্ত্বটি আমাদের শিক্ষার মধ্যে প্রচার করতে হবে, কর্মের মধ্যে প্রচলিত করতে হবে, তা হলেই সকল মানুষের সম্মান করে আমরা সম্মানিত হব; নবযুগের উদ্‌বোধন করে আমরা জয়যুক্ত হব। আমাদের শিক্ষালয়ের সেই

শিক্ষামন্ত্রটি এই—

> যস্তু সর্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি
> সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে।

আশ্বিন ১৩২৮

বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ

অপরিচিত আসনে অনভ্যস্ত কর্তব্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে আহ্বান করেছেন। তার প্রত্যুত্তরে আমি আমার সাদর অভিবাদন জানাই।

এই উপলক্ষে নিজের ন্যূনতা-প্রকাশ হয়তো শোভন রীতি। কিন্তু প্রথার এই অলংকারগুলি বস্তুত শোভন নয়, এবং তা নিষ্ফল। কর্তব্যক্ষেত্রে প্রবেশ করার উপক্রমেই আগে থাকতে ক্ষমা প্রার্থনা করে রাখলে সাধারণের মন অনুকূল হতে পারে, এই ব্যর্থ আশার ছলনায় মনকে ভোলাতে চাই নে। ক্ষমা প্রার্থনা করলেই অযোগ্যতার ত্রুটি সংশোধন হয় না, তাতে কেবল ত্রুটি স্বীকার করাই হয়। যাঁরা অকরুণ তাঁরা সেটাকে বিনয় বলে গ্রহণ করেন না, আত্মগ্লানি বলেই গণ্য করেন।

যে কর্মে আমাকে আমন্ত্রণ করা হয়েছে সে সম্বন্ধে আমার সম্বল কী আছে তা কারো অগোচর নেই। অতএব ধরে নিতে পারি, কর্মটি আমার যে উপযুক্ত সে বিচার কর্তৃপক্ষদের দ্বারা পূর্বেই হয়ে গেছে।

এই ব্যবস্থার মধ্যে কিছু নূতনত্ব আছে—তার থেকে অনুমান করা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সম্প্রতি কোনো-একটি নূতন সংকল্পের সূচনা হয়েছে। হয়তো মহৎ তার গুরুত্ব। এইজন্য সুস্পষ্টরূপে তাকে উপলব্ধি করা চাই।

বহুকাল থেকে কোনো-একটি বিশেষ পরিচয়ে আমি সাধারণের দৃষ্টির সম্মুখে দিন কাটিয়েছি। আমি সাহিত্যিক; অতএব, সাহিত্যিকরূপেই আমাকে এখানে আহ্বান করা হয়েছে এ কথা স্বীকার করতেই হবে। সাহিত্যিকের পদবী আমার পক্ষে নিরুদ্‌বেগের বিষয় নয়, বহু দিনের কঠোর অভিজ্ঞতায় সে আমি নিশ্চিত জানি। সাহিত্যিকের সমাদর রুচির উপরে নির্ভর করে, যুক্তিপ্রমাণের উপর নয়। এ ভিত্তি কোথাও কাঁচা, কোথাও পাকা, কোথাও কুটিল; সর্বত্র এ সমান ভার সয় না। তাই বলি কবির কীর্তি কীর্তিস্তম্ভ নয়, সে কীর্তিতরণী। আবর্ত-সংকুল বহুদীর্ঘ কালস্রোতের সকল পরীক্ষা সকল সংকট উত্তীর্ণ হয়েও যদি তার এগিয়ে চলা বন্ধ না হয়, অন্তত নোঙর করে থাকবার একটা ভদ্র ঘাট যদি সে পায়, তবেই সাহিত্যের পাকা খাতায় কোনো-একটা বর্গে তার নাম চিহ্নিত হতে পারে। ইতিমধ্যে লোকের মুখে মুখে নানা অনুকূল প্রতিকূল বাতাসের আঘাত খেতে খেতে তাকে ঢেউ কাটিয়ে চলতে হবে। মহাকালের বিচারদরবারে চূড়ান্ত শুনানির দিন ঘণ্টায় ঘণ্টায় ঘটে না, বৈতরণীর পরপারে তাঁর বিচারসভা।

বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্বানের আসন চিরপ্রসিদ্ধ। সেই পাণ্ডিত্যের গৌরবগম্ভীর পদে সহসা সাহিত্যিককে বসানো হল। সুতরাং এই রীতিবিপর্যয় অত্যন্ত বেশি করে চোখে পড়বার বিষয় হয়েছে। এরকম বহুতীক্ষ্ণদৃষ্টিসংকুল কুশাঙ্কুরিত পথে সহজে চলাফেরা করা আমার চেয়ে অনেক শক্ত মানুষের পক্ষেও দুঃসাধ্য। আমি যদি পণ্ডিত হতুম তবে নানা লোকের সম্মতি-অসম্মতির দ্বন্দ্ব সত্ত্বেও পথের বাধা

কঠোর হত না। কিন্তু স্বভাবতই এবং অভ্যাসবশতই আমার চলন অব্যবসায়ীর চালে। বাহির থেকে আমি এসেছি আগন্তুক, এইজন্য প্রশ্রয় প্রত্যাশা করতে আমার ভরসা হয় না।

অথচ আমাকে নির্বাচন করার মধ্যেই আমার সম্বন্ধে একটি অভয়পত্রী প্রচ্ছন্ন আছে, সেই আশ্বাসের আভাস পূর্বেই দিয়েছি। নিঃসন্দেহ আমি এখানে চলে এসেছি কোনো-একটি ঋতুপরিবর্তনের মুখে। পুরাতনের সঙ্গে আমার অসংগতি থাকতে পারে, কিন্তু নূতন বিধানের নবোদ্যম হয়তো আমাকে তার আনুচর্যে গ্রহণ করতে অপ্রসন্ন হবে না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মক্ষেত্রে প্রথম-পদার্পণ-কালে এই কথাটির আলোচনা করে অন্যের কাছে না হোক, অন্তত নিজের কাছে বিষয়টিকে স্পষ্ট করে তোলার প্রয়োজন আছে। অতএব, আমাকে জড়িত করে যে ব্রতটির উপক্রম হল তার ভূমিকা এখানে স্থির করে নিই।

বিশ্ববিদ্যালয় একটি বিশেষ সাধনার ক্ষেত্র। সাধারণভাবে বলা চলে, সে সাধনা বিদ্যার সাধনা। কিন্তু তা বললে কথাটা সুনির্দিষ্ট হয় না; কেননা বিদ্যা শব্দের অর্থ ব্যাপক এবং তার সাধনা বহুবিচিত্র।

এ দেশে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বিশেষ আকার প্রকার ক্রমশ পরিণত হয়ে উঠেছে। ভারতবর্ষের আধুনিক ইতিহাসেই তার মূল নিহিত। এই উপলক্ষে তার বিস্তারিত বিচার অসংগত হবে না। বাল্যকাল হতে যাঁরা এই বিদ্যালয়ের নিকট-সংস্রবে আছেন তাঁরা আপন অভ্যাস ও মমত্বের বেষ্টনী থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে একে বৃহৎ কালের পরিপ্রেক্ষণিকায় দেখতে হয়তো কিছু বাধা পেতে পারেন। সামীপ্যের এবং অভ্যাসের সম্বন্ধ না থাকাতে আমার পক্ষে সেই ব্যক্তিগত বাধা নেই; অতএব আমার অসংসক্ত মনে এর স্বরূপ কিরকম প্রতিভাত হচ্ছে সেটা সকলের পক্ষে স্বীকার করবার যোগ্য না হলেও বিচার করবার যোগ্য।

বলা বাহুল্য, য়ুরোপীয় ভাষায় যাকে য়ুনিভার্সিটি বলে প্রধানত তার উদ্ভব য়ুরোপে। অর্থাৎ য়ুনিভার্সিটির যে চেহারার সঙ্গে আমাদের আধুনিক পরিচয় এবং যার সঙ্গে আধুনিক শিক্ষিতসমাজের ব্যবহার সেটা সমূলে ও শাখা-প্রশাখায় বিলিতি। আমাদের দেশের অনেক ফলের গাছকে আমরা বিলিতি বিশেষণ দিয়ে থাকি, কিন্তু দিশি গাছের সঙ্গে তাদের কুলগত প্রভেদ থাকলেও প্রকৃতিগত ভেদ নেই। আজ পর্যন্ত আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে সে কথা সম্পূর্ণ বলা চলবে না। তার নামকরণ, তার রূপকরণ, এ দেশের সঙ্গে সংগত নয়; এ দেশের আবহাওয়ায় তার স্বভাবীকরণও ঘটে নি।

অথচ এই য়ুনিভার্সিটির প্রথম প্রতিরূপ একদিন ভারতবর্ষেই দেখা দিয়েছিল। নালন্দা বিক্রমশিলা তক্ষশিলার বিদ্যায়তন কবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার নিশ্চিত কালনির্ণয় এখনো হয় নি, কিন্তু ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, য়ুরোপীয় য়ুনিভার্সিটির পূর্বেই তাদের আবির্ভাব। তাদের উদ্ভব ভারতীয় চিত্তের আন্তরিক প্রেরণায়, স্বভাবের অনিবার্য আবেগে। তার পূর্ববর্তী কালে বিদ্যার সাধনা ও শিক্ষা বিচিত্র আকারে ও বিবিধ প্রণালীতে দেশে নানা স্থানে ব্যাপ্ত হয়েছিল, এ কথা সুনিশ্চিত। সমাজের সেই সর্বত্র-পরিকীর্ণ সাধনাই পুঞ্জীভূত কেন্দ্রীভূত রূপে এক সময়ে স্থানে স্থানে দেখা দিল।

এর থেকে মনে পড়ে ভারতবর্ষে বেদব্যাসের যুগ, মহাভারতের কাল। দেশে যে বিদ্যা, যে মননধারা, যে ইতিহাসকথা দূরে দূরে বিক্ষিপ্ত ছিল, এমন-কি দিগন্তের

কাছে বিলীনপ্রায় হয়ে এসেছে, এক সময়ে তাকে সংগ্রহ করা তাকে সংহত করার নিরতিশয় আগ্রহ জেগেছিল সমস্ত দেশের মনে। নিজের চিৎপ্রকর্ষের যুগব্যাপী ঐশ্বর্যকে সুস্পষ্টরূপে নিজের গোচর করতে না পারলে তা ক্রমশ অনাদরে অপরিচয়ে জীর্ণ হয়ে বিলুপ্ত হয়। কোনো-এক কালে এই আশঙ্কায় দেশ সচেতন হয়ে উঠেছিল; দেশ একান্ত ইচ্ছা করেছিল, আপন সূত্রচ্ছিন্ন রত্নগুলিকে উদ্ধার করতে, সংগ্রহ করতে, তাকে সূত্রবদ্ধ করে সমগ্র করতে এবং তাকে সর্বলোকের ও সর্বকালের ব্যবহারে উৎসর্গ করতে। দেশ আপন বিরাট চিন্ময়ী প্রকৃতিকে প্রত্যক্ষরূপে সমাজে স্থিরপ্রতিষ্ঠ করতে উৎসুক হয়ে উঠল। যা আবদ্ধ ছিল বিশেষ বিশেষ পণ্ডিতের অধিকারে তাকেই অনবচ্ছিন্নরূপে সর্বসাধারণের আয়ত্তগোচর করবার এই এক আশ্চর্য অধ্যবসায়। এর মধ্যে একটি প্রবল চেষ্টা, অক্লান্ত সাধনা, একটি সমগ্রদৃষ্টি ছিল। এই উদ্যোগের মহিমাকে শক্তিমতী প্রতিভা আপন লক্ষ্যীভূত করেছিল, তার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় মহাভারত নামটিতেই। মহাভারতের মহৎ সমুজ্জ্বল রূপ যাঁরা ধ্যানে দেখেছিলেন 'মহাভারত' নামকরণ তাঁদেরই কৃত। সেই রূপটি একই কালে ভৌমণ্ডলিক রূপ এবং মানস রূপ। ভারতবর্ষের মনকে দেখেছিলেন তাঁরা মনে। সেই বিশ্বদৃষ্টির প্রবল আনন্দে তাঁরা ভারতবর্ষে চিরকালের শিক্ষার প্রশস্ত ভূমি পত্তন করে দিলেন। সে শিক্ষা ধর্মে কর্মে রাজনীতিতে সমাজনীতিতে তত্ত্বজ্ঞানে বহুব্যাপক। তার পর থেকে ভারতবর্ষ আপন নিষ্ঠুর ইতিহাসের হাতে আঘাতের পর আঘাত পেয়েছে, তার মর্মগ্রন্থি বারবার বিশ্লিষ্ট হয়ে গেছে, দৈন্য এবং অপমানে সে জর্জর, কিন্তু ইতিহাসবিস্মৃত সেই যুগের সেই কীর্তি এতকাল লোকশিক্ষার অবাধ জলসেক-প্রণালীকে নানা ধারায় পূর্ণ ও সচল করে রেখেছে। গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে তার প্রভাব আজও বিরাজমান। সেই মূল প্রস্রবণ থেকে এই শিক্ষার ধারা যদি নিরন্তর প্রবাহিত না হত তা হলে দুঃখে দারিদ্র্যে অসম্মানে দেশ বর্বরতার অন্ধকূপে মনুষ্যত্ব বিসর্জন করত। সেইদিন ভারতবর্ষে যথার্থ আপন সজীব বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টি। তার মধ্যে জীবনীশক্তির বেগ যে কত প্রবল তা স্পষ্টই বুঝতে পারি যখন দেখতে পাই সমুদ্রপারে জাভাদ্বীপে সর্বসাধারণের সমস্ত জীবন ব্যাপ্ত করে কী-একটি কল্পলোকের সৃষ্টি সে করেছে; এই আর্যেতর জাতির চরিত্রে, তার কল্পনায়, তার রূপরচনায় কিরকম সে নিরন্তর সক্রিয়।

জ্ঞানের একটা দিক আছে, তা বৈষয়িক। সে রয়েছে জ্ঞানের বিষয় সংগ্রহ করবার লোভকে অধিকার করে, সে উত্তেজিত করে পাণ্ডিত্যের অভিমানকে। এই কৃপণের ভাণ্ডারের অভিমুখে কোনো মহৎ প্রেরণা উৎসাহ পায় না। ভারতে এই-যে মহাভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়-যুগের উল্লেখ করলেম সেই যুগের মধ্যে তপস্যা ছিল; তার কারণ, ভাণ্ডারপূরণ তার লক্ষ্য ছিল না; তার উদ্দেশ্য ছিল সর্বজনীন চিত্তের উদ্দীপন, উদ্‌বোধন, চারিত্রসৃষ্টি। পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের যে আদর্শ জ্ঞানে কর্মে হৃদয়ভাবে ভারতের মনে উদ্ভাসিত হয়েছিল এই উদ্যোগ তাকেই সঞ্চারিত করতে চেয়েছিল চিরদিনের জন্য সর্বসাধারণের জীবনের মধ্যে, তার আর্থিক ও পারমার্থিক সদ্গতির দিকে, কেবলমাত্র তার বুদ্ধিতে নয়।

নালন্দা বিক্রমশিলার বিদ্যায়তন সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। সে যুগে সে বিদ্যার মহৎমূল্য দেশের লোক গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিল; তাকে সমগ্র সম্পূর্ণতায় কেন্দ্রীভূত করে সর্বজনীন জ্ঞানসত্র রচনা করবার ইচ্ছা স্বতই ভারতবর্ষের মনে সমুদ্যত হয়েছিল সন্দেহ নেই। ভগবান বুদ্ধ একদিন যে ধর্ম প্রচার

করেছিলেন সে ধর্ম তার নানা তত্ত্ব, নানা অনুশাসন, তার সাধনার নানা প্রণালী নিয়ে সাধারণচিত্তের আন্তর্ভৌম স্তরে প্রবেশ করে ব্যাপ্ত হয়েছিল। তখন দেশ প্রবলভাবে কামনা করেছিল এই বহুশাখায়িত পরিব্যাপ্ত ধারাকে কোনো কোনো সুনির্দিষ্ট কেন্দ্রস্থলে উৎসরূপে উৎসারিত করে দিতে সর্বসাধারণের স্নানের জন্য, পানের জন্য, কল্যাণের জন্য।

এই ইচ্ছাটি যে কিরকম সত্য ছিল, কিরকম উদার, কিরকম বেগবান ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায় এই অনুষ্ঠানের মধ্যেই, এর অকৃপণ ঐশ্বর্যে। বিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ বিস্ময়োচ্ছ্বাসিত ভাষায় এই বিদ্যানিকেতনের বর্ণনা করেছেন। তাঁর লেখনীচিত্রে দেখতে পাই এর অলংকরণরেখাঙ্কিত শুক্তিরক্ত স্তম্ভশ্রেণী, এর অভ্রভেদী হর্ম্যশিখর, ধূপসুগন্ধি মন্দির, ছায়ানিবিড় আম্রবন, নীলপদ্মে-প্রফুল্ল গভীর সরোবর। তিনটি বড়ো বড়ো বাড়িতে এখানকার গ্রন্থাগার ছিল; তাদের নাম রত্নসাগর, রত্নোদধি, রত্নরঞ্জক। রত্নোদধি নয়-তলা; সেইখানে প্রজ্ঞাপারমিতাসূত্র এবং অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থ রক্ষিত ছিল। বহু রাজা পরে পরে এই সংঘের বিস্তারসাধন করেছেন; চারি দিকে উন্নত চৈত্য উঠেছে, সেই চৈত্যগুলির মধ্যে মধ্যে শিক্ষাভবন, তর্কসভাগৃহ, প্রত্যেক সরোবরের চারি দিকে বেদী ও মন্দির; স্থানে স্থানে শিক্ষক ও প্রচারকদের জন্যে চারতলা বাসস্থান। এখানকার গৃহনির্মাণে কিরকম সযত্ন সতর্কতা সেই প্রসঙ্গে ডাক্তার স্পুনার বলেন, আধুনিক কালে যে রকমের ইঁট ও গাঁথুনি প্রচলিত এখানকার গৃহনির্মাণের উপকরণ ও যোজনাপদ্ধতি তার চেয়ে অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ। ইৎসিঙ বলেন, এই বিদ্যালয়ের প্রয়োজন-নির্বাহের জন্য দুই শতের অধিক গ্রাম উৎসর্গ করা হয়েছে; বহুসহস্র ছাত্র ও অধ্যাপকের জীবিকার উপযুক্ত ভোজ্য প্রত্যহ প্রচুর পরিমাণে গ্রামের অধিবাসীরা নিয়মিত জুগিয়ে থাকে।

এই বিদ্যায়তনগুলির মধ্যে, শুধু বিদ্যার সঞ্চয় মাত্র নয়, বিদ্যার গৌরব ছিল প্রতিষ্ঠিত। যে-সকল আচার্য অধ্যাপক ছিলেন, হিউয়েন সাঙ বলেন, তাঁদের যশ বহুদূরব্যাপী; তাঁদের চরিত্র পবিত্র, অনিন্দনীয়। তাঁরা সদ্ধর্মের অনুশাসন অকৃত্রিম শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করেন। অর্থাৎ যে বিদ্যা প্রচারের ভার ছিল তাঁদের 'পরে সমস্ত দেশ এবং দূরদেশের ছাত্রেরা তাকে সম্মান করত; সেই সম্মানকে উজ্জ্বল করে রক্ষা করার দায়িত্ব ছিল তাঁদের 'পরে—কেবল মেধা দ্বারা নয়, বহু-শ্রুতের দ্বারা নয়, চরিত্রের দ্বারা, অস্খলিত কঠোর তপস্যার দ্বারা। এটা সম্ভব হতে পেরেছিল, কেননা সমস্ত দেশের শ্রদ্ধা এই সাত্ত্বিক আদর্শ তাঁদের কাছে প্রত্যাশা করেছে। আচার্যেরা জানতেন, দূর দূর দেশকে জ্ঞানবিতরণের মহৎ ভার তাঁদের 'পরে; সমুদ্র পর্বত পার হয়ে, প্রাণপণ কঠিন দুঃখ স্বীকার করে, বিদেশের ছাত্রেরা আসছে তাঁদের কাছে জ্ঞানপিপাসায়। এইভাবে বিদ্যার 'পরে সর্বজনীন শ্রদ্ধা থাকলে যাঁরা বিদ্যা বিতরণ করেন আপন যোগ্যতা সম্বন্ধে শৈথিল্য তাঁদের পক্ষে সহজ হয় না। সমস্ত দেশের কলাপ্রতিভাও আপন শ্রদ্ধার অর্ঘ্য এখানে পূর্ণ শক্তিতে নিবেদন করেছিল। সেই উপলক্ষে দেশ আপন শিল্পরচনার উৎকর্ষ এই বিদ্যামন্দিরের ভিত্তিতে ভিত্তিতে মিলিত করেছে, ঘোষণা করেছে; ভারতের কলা-বিদ্যা ভারতের বিশ্ববিদ্যাকে প্রণাম করেছে।

একটি কথা এই প্রসঙ্গে মনে রাখা চাই, তখনকার রাজাদের প্রাসাদভবন বা ভোগের স্থান কোনো বিশেষ সমারোহে ইতিহাসের স্মৃতিকে অধিকারচেষ্টা করেছিল, তার প্রমাণ পাই নে। এই চেষ্টা যে নিন্দনীয় তা বলি নে; কেননা

সাধারণত দেশ আপন ঐশ্বর্যগৌরব প্রকাশ করবার উপলক্ষ রচনা করে আপন নৃপতিকে বেষ্টন করে, সমস্ত প্রজার আত্মসম্মান সেইখানে কলানৈপুণ্যে শোভাপ্রাচুর্যে সমুজ্জ্বল হয়ে ওঠে। যে কারণেই হোক, অতীত ভারতবর্ষের সেই চেষ্টাকে আমরা আজ দেখতে পাই নে। হয়তো রাজাসনের ধ্রুবত্ব ছিল না বলেই সেখানে ক্রমাগতই ধ্বংসধূমকেতুর সম্মার্জনী কাজ করেছে। কিন্তু নালন্দা বিক্রমশিলা প্রভৃতি স্থানে স্মৃতিরক্ষাচেষ্টার বিরাম ছিল না। তার প্রতি দেশের ভক্তি, দেশের বেদনা যে কত প্রবল ছিল এই তার একটি প্রমাণ।

আপন সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যার প্রতি সর্বজনের যে উদার শ্রদ্ধা প্রভূতত্যাগস্বীকারে অকুণ্ঠিত সেই অকৃত্রিম শ্রদ্ধাই ছিল স্বদেশীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের যথার্থ প্রাণ-উৎস।

এ কথা সহজেই কল্পনা করা যায় যে, জ্ঞানসাধনার এই-সকল বিরাট যজ্ঞভূমিতে মানুষের মনের সঙ্গে মনের কিরকম অতি বৃহৎ ও নিবিড় সংঘর্ষ চলেছিল, তাতে ধীশক্তির বহ্নিশিখা কিরকম নিরন্তর প্রোজ্জ্বল হয়ে থাকত। ছাপানো টেক্‌স্‌ট্‌বুক্‌ থেকে নোট দেওয়া নয়, অন্তর থেকে অন্তরে অবিশ্রাম উদ্যম সঞ্চার করা। বিদ্যায় বুদ্ধিতে জ্ঞানে দেশের যাঁরা সুধীশ্রেষ্ঠ দূর দূরান্তর থেকে এখানে তাঁরা সম্মিলিত। ছাত্রেরাও তীক্ষ্ণবুদ্ধি, শ্রদ্ধাবান্‌, সুযোগ্য; দ্বারপণ্ডিতের কাছে কঠিন পরীক্ষা দিয়ে তবে তারা পেয়েছে প্রবেশের অধিকার। হিউয়েন সাঙ লিখেছেন, এই পরীক্ষায় দশ জনের মধ্যে অন্তত সাত-আট জন বর্জিত হত। অর্থাৎ তৎকালীন ম্যাট্রিকুলেশনের যে ছাঁকনি ছিল তাতে মোটা মোটা ফাঁক ছিল না। তার কারণ, সমস্ত পৃথিবীর হয়ে আদর্শকে বিশুদ্ধ ও উন্নত রাখবার দায়িত্ব ছিল জাগরূক। লোকের মনে উদ্‌বেগ ছিল, পাছে অযথা প্রশ্রয়ের দ্বারা বিদ্যার অধঃপতনে দেশের পক্ষে মানসিক আত্মঘাত ঘটে। নানা প্রকৃতির মন এখানে এক জায়গায় সমবেত হত; তারা একজাতীয় নয়, একদেশীয় নয়। এক লক্ষ্য দৃঢ় রেখে এক জীবিকাব্যবস্থায় তারা পরস্পরের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ঐক্য লাভ করেছিল। বিদ্যার সম্মিলনক্ষেত্রে এই ঐক্যের মূল্য যে কতখানি তাও মনে রাখা চাই। তখন পৃথিবীর আরো নানা স্থানে বড়ো বড়ো সভ্যতার উদ্ভব হয়েছিল; কিন্তু, জ্ঞানের তপস্যা-উপলক্ষে মানবমনের এমন বিশাল সমবায় আর কোথাও শোনা যায় নি। এর মূল কারণ, বিশ্বজনীন মনুষ্যত্বের প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধা, বিদ্যার প্রতি গৌরববোধ, চিত্তসম্পদ যাঁরা নিজে পেয়েছেন বা সৃষ্টি করেছেন সেই পাওয়ার ও সৃষ্টির পরম আনন্দে সেই সম্পদ দেশবিদেশের সকলকে দান করবার একাগ্র দায়িত্বজ্ঞান। আজ নিজের প্রতি, মানুষের প্রতি, নিজের সাধনার প্রতি, আলস্যবিজড়িত অশ্রদ্ধার দিনে বিশেষ করে আমাদের মনে করবার সময় এসেছে যে, মানব-ইতিহাসে সর্বাগ্রে ভারতবর্ষেই জ্ঞানের বিশ্বদানযজ্ঞ উদার দাক্ষিণ্যের সঙ্গে প্রবর্তিত হয়েছিল। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে আরো-একটি কথা আমাদের মনে রাখবার যোগ্য, নালন্দায় হিউয়েন সাঙের যিনি গুরু ছিলেন তিনি ছিলেন বাঙালি, তাঁর নাম শীলভদ্র। তিনি বাংলাদেশের কোনো-এক স্থানের রাজা ছিলেন, রাজ্য ত্যাগ করে বেরিয়ে আসেন। এই সংঘে যাঁরা শিক্ষাদান করতেন তাঁদের সকলের মধ্যে একলা কেবল ইনিই সমস্ত শাস্ত্র, সমস্ত সূত্র ব্যাখ্যা করতে পারতেন।

সেকালে বৌদ্ধভারতে সংঘ ছিল নানা স্থানে। সেই-সকল সংঘে সাধকেরা শাস্ত্রজ্ঞেরা তত্ত্বজ্ঞানীরা শিষ্যেরা সমবেত হয়ে জ্ঞানের আলোক জ্বালিয়ে রাখতেন, বিদ্যার পুষ্টিসাধন করতেন। নালন্দা বিক্রমশিলা তাদেরই বিশ্বরূপ, তাদেরই স্বাভাবিক পরিণতি।

উপনিষদের কালেও ভারতবর্ষে এইরকম বিদ্যাকেন্দ্রের সৃষ্টি হয়েছিল, তার কিছু কিছু প্রমাণ পাওয়া যায়। শতপথব্রাহ্মণের অন্তর্গত বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে, আরুণির পুত্র শ্বেতকেতু পাঞ্চালদেশের 'পরিষদ্'এ জৈবালি প্রবাহণের কাছে এসেছিলেন। এই স্থানটি আলোচনা করলে বোঝা যায়, ঐ পরিষদ ঐ দেশের বড়ো বড়ো জ্ঞানীদের সমবায়ে। এই পরিষদ জয় করতে পারলে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ হত। অনুমান করা যায় যে, সমস্ত পাঞ্চালদেশের মধ্যে উচ্চতম শিক্ষার উদ্দেশে সম্মিলিতভাবে একটা প্রতিষ্ঠান ছিল, বিদ্যার পরীক্ষা দেবার জন্যে সেখানে অন্যত্র থেকে লোক আসত। উপনিষদ্-কালের বিদ্যা যে স্বভাবতই স্থানে স্থানে শিক্ষা-আলোচনা তর্কবিতর্ক ও জ্ঞানসংগ্রহের জন্য আপন আশ্রয়রূপে পরিষদ্ রচনা করেছিল, তা নিশ্চিত অনুমান করা যেতে পারে।

য়ুরোপের ইতিহাসেও সেইরকম ঘটেছে। সেখানে খৃস্টধর্মের আরম্ভকালে পুরাতন ধর্মের সঙ্গে নূতন ধর্মের দ্বন্দ্ব এবং নিষ্ঠুর উৎপীড়নের দ্বারা নবদীক্ষিতদের ভক্তির পরীক্ষা চলেছিল। অবশেষে ক্রমে যখন এই ধর্ম সাধারণ্যে স্বীকৃত হল তখন স্বভাবতই পূজার ধারার পাশেপাশেই তত্ত্বের ধারা প্রবাহিত হল। বাঁধ যদি বেঁধে না দেওয়া যায় তবে ব্যক্তিবিশেষের বিশেষ প্রকৃতির প্ররোচনায় ভক্তির বিষয় বিচিত্র রূপ ও বিকৃত রূপ নিতে থাকে। তখন তর্ক অবলম্বন করে বিচারের প্রয়োজন হয়। বিশ্বাস তখন বুদ্ধির সাহায্যে, জ্ঞানের সাহায্যে আপন স্থায়ী ও বিশুদ্ধ ভিত্তির সন্ধান করে। তখন তার প্রশ্ন ওঠে : কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম। ভক্তি তখন কেবলমাত্র পূজার বিষয় না হয়ে বিদ্যার বিষয় হয়ে ওঠে। এইরকম অবস্থায় য়ুরোপের নানা স্থানে আচার্য ও ছাত্রদের সংঘ সৃষ্টি হচ্ছিল। তার মধ্যে থেকে নির্বাচনের দরকার হল। কোথায় শিক্ষা শ্রদ্ধেয়, কোথায় তা প্রামাণিক, তা স্থির করবার ভার নিলে রোমের প্রধান ধর্মসংঘ, তারই সঙ্গে রাজার শাসন ও উৎসাহ।

সকলেই জানেন, সে সময়কার আলোচ্য বিদ্যায় প্রধান স্থান ছিল তর্কশাস্ত্রের। তখনকার পণ্ডিতেরা জানতেন, ডায়েলেক্‌টিক সকল বিজ্ঞানের মূলবিজ্ঞান। এর কারণ স্পষ্টই বোঝা যায়। শাস্ত্রের উপদেশগুলি বাক্যের দ্বারা বদ্ধ। সেই-সকল আপ্তবাক্যের অবিসম্বাদিত অর্থে পৌঁছতে গেলে শাব্দিক তর্কের প্রয়োজন হয়। য়ুরোপের মধ্যযুগে সেই তর্কের যুক্তিজাল যে কিরকম সূক্ষ্ম ও জটিল হয়ে উঠেছিল তা সকলেরই জানা আছে। শাস্ত্রজ্ঞানের বিশুদ্ধতার জন্য এই ন্যায়শাস্ত্র। সমাজরক্ষার জন্য আর দুটি বিদ্যার বিশেষ প্রয়োজন, আইন এবং চিকিৎসা। তখনকার য়ুরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয় এই কয়টি বিদ্যাকেই প্রধানত গ্রহণ করেছিল। নালন্দাতে বিশেষভাবে শিক্ষার বিষয় ছিল হেতুবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, শব্দবিদ্যা। তার সঙ্গে ছিল তন্ত্র।

ইতিমধ্যে য়ুরোপে মানুষের অন্তর ও বাহিরের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেখানকার য়ুনিভার্সিটিতে মস্ত দুটি মূলগত পরিবর্তন ঘটেছে। ধর্মশাস্ত্রের প্রতি সেখানকার মনুষ্যত্বের ঐকান্তিক যে নির্ভর ছিল সেটা ক্রমে ক্রমে শিথিল হয়ে এল। একদিন সেখানে মানুষের জ্ঞানের ক্ষেত্রের প্রায় সমস্তটা ধর্মশাস্ত্রের সম্পূর্ণ অন্তর্গত না হোক, অন্তত শাসনগত ছিল। লড়াই করতে করতে অবশেষে সেই অধিকারের কর্তৃত্বভার তার হাত থেকে স্খলিত হয়েছে। বিজ্ঞানের সঙ্গে যেখানে শাস্ত্রবাক্যের বিরোধ সেখানে শাস্ত্র আজ পরাভূত, বিজ্ঞান আজ আপন স্বতন্ত্র বেদিতে একেশ্বররূপে প্রতিষ্ঠিত। ভূগোল ইতিহাস প্রভৃতি মানুষের অন্যান্য শিক্ষণীয় বিষয়

বৈজ্ঞানিক যুক্তিপদ্ধতির অনুগত হয়ে ধর্মশাস্ত্রের বন্ধন থেকে মুক্তি পেয়েছে। বিশ্বের সমস্ত জ্ঞাতব্য ও মন্তব্য বিষয় সম্বন্ধে মানুষের জিজ্ঞাসার প্রবণতা আজ বৈজ্ঞানিক। আপ্তবাক্যের মোহ তার কেটে গেছে।

এইসঙ্গে আর-একটা বড়ো পরিবর্তন ঘটেছে ভাষা নিয়ে। একদিন ল্যাটিন ভাষাই ছিল সমস্ত য়ুরোপের শিক্ষার ভাষা, বিদ্যার আধার। তার সুবিধা এই ছিল, সকল দেশের ছাত্রই এক পরিবর্তনহীন সাধারণভাষার যোগে শিক্ষালাভ করতে পারত। কিন্তু তার প্রধান ক্ষতি ছিল এই যে, বিদ্যার আলোক পাণ্ডিত্যের ভিত্তিসীমা এড়িয়ে বাইরে অতি অল্পই পৌঁছত। যখন থেকে য়ুরোপের প্রত্যেক জাতিই আপন আপন ভাষাকে শিক্ষার বাহনরূপে স্বীকার করলে তখন শিক্ষা ব্যাপ্ত হল সর্বসাধারণের মধ্যে। তখন বিশ্ববিদ্যালয় সমস্ত দেশের চিত্তের সঙ্গে অন্তরঙ্গরূপে যুক্ত হল। শুনতে কথাটা স্বতোবিরুদ্ধ, কিন্তু সেই ভাষাস্বাতন্ত্র্যের সময় থেকেই সমস্ত য়ুরোপে বিদ্যার যথার্থ সমবায়সাধন হয়েছে। এই স্বাতন্ত্র্য য়ুরোপের চিৎপ্রকর্ষকে খণ্ডিত না করে আশ্চর্যরূপে সম্মিলিত করেছে। য়ুরোপে এই স্বদেশী ভাষায় বিদ্যার মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে তার জ্ঞানের ঐশ্বর্য বেড়ে উঠল, ব্যাপ্ত হল সমস্ত প্রজার মধ্যে, যুক্ত হল প্রতিবেশী ও দূরবাসীদের জ্ঞানসাধনার সঙ্গে, স্বতন্ত্র ক্ষেত্রের সমস্ত শস্য সংগৃহীত হল য়ুরোপের সাধারণ ভাণ্ডারে। এখন সেখানে য়ুনিভার্সিটি যেমন উদারভাবে সকল দেশের তেমনি একান্তভাবে আপন দেশের। এইটিই হচ্ছে মানুষের প্রকৃতির অনুগত। কারণ, মানুষ যদি সত্যভাবে নিজেকে উপলব্ধি না করে তা হলে সত্যভাবে নিজেকে উৎসর্গ করতে পারে না। বিশ্বজনীনতার দাক্ষিণ্য বাস্তব হতে পারে না সেইসঙ্গে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উৎকর্ষ যদি বাস্তব না হয়। এসিয়ার মধ্যযুগে বৌদ্ধধর্মকে তিব্বত চীন মঙ্গোলিয়া গ্রহণ করেছিল, কিন্তু গ্রহণ করেছিল নিজের ভাষাতেই। এইজন্যেই সে-সকল দেশে সে ধর্ম সর্বজনের অন্তরের সামগ্রী হতে পেরেছে, এক-একটি সমগ্র জাতিকে মানুষ করেছে, তাকে মোহান্ধকার থেকে উদ্ধার করেছে।

য়ুনিভার্সিটির উৎপত্তি সম্বন্ধে বিস্তারিত বর্ণনার প্রয়োজন নেই। আমার বলবার মোট কথাটি এই যে, বিশেষ দেশ, বিশেষ জাতি যে বিদ্যার সম্বন্ধে বিশেষ প্রীতি গৌরব ও দায়িত্ব অনুভব করেছে তাকেই রক্ষা ও প্রচারের জন্যে স্বভাবতই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সৃষ্টি। যে ইচ্ছা সকল সৃষ্টির মূলে, সমস্ত দেশের সেই ইচ্ছাশক্তির থেকেই তার উদ্ভব। এই ইচ্ছার মূলে থাকে শক্তির ঐশ্বর্য। সেই ঐশ্বর্য দাক্ষিণ্য দ্বারা নিজেকে স্বতই প্রকাশ করতে চায়; তাকে নিবারণ করা যায় না।

সমস্ত সভ্যদেশ আপন বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে জ্ঞানের অবারিত আতিথ্য করে থাকে। যার সম্পদে উদ্‌বৃত্ত আছে সেই ডাকে অতিথিকে। গৃহস্থ আপন অতিথিশালায় বিশ্বকে স্বীকার করে। নালন্দায় ভারত আপন জ্ঞানের অন্নসত্র খুলেছিল স্বদেশবিদেশের সকল অভ্যাগতের জন্য। ভারত সেদিন অনুভব করেছিল, তার এমন সম্পদ পর্যাপ্ত পরিমাণে আছে সকল মানুষকে দিতে পারলে তবেই যার চরম সার্থকতা। পাশ্চাত্য মহাদেশের অধিকাংশ দেশেই বিদ্যার এই অতিথিশালা বর্তমান। সেখানে স্বদেশী-বিদেশীর ভেদ নেই। সেখানে জ্ঞানের বিশ্বক্ষেত্রে সব মানুষই পরস্পর আপন। সমাজের আর-আর প্রায় সকল অংশেই ভেদের প্রাচীর প্রতিদিন দুর্লঙ্ঘ্য হয়ে উঠছে; কেবল মানুষের আমন্ত্রণ রইল জ্ঞানের এই মহাতীর্থে। কেননা এইখানে দৈন্যস্বীকার, এইখানে কৃপণতা, ভদ্র-

জাতির পক্ষে সকলের চেয়ে আত্মলাঘব। সৌভাগ্যবান দেশের প্রাঙ্গণ এইখানে বিশ্বের দিকে উন্মুক্ত।

আমাদের দেশে য়ুনিভার্সিটির পত্তন হল বাহিরের দানের থেকে। সে দানে দাক্ষিণ্য অধিক নেই। তার রাজানুচিত কৃপণতা থেকে আজ পর্যন্ত দুঃখ পাচ্ছি। ইংরেজের দেশে রাজদ্বারে যে অতিথিশালা খোলা আছে লন্ডন য়ুনিভার্সিটিতে, এ দেশের দরিদ্রপাড়ায় তারই একটা ছোটো শাখা স্থাপন হল। ভারতীয় বিদ্যা বলে কোনো-একটা পদার্থ যে কোথাও আছে এই বিদ্যালয়ে গোড়াতেই তাকে অস্বীকার করা হয়েছে। এর স্বভাবটা পৃথিবীর সকল য়ুনিভার্সিটির একেবারে বিপরীত। এর দানের বিভাগ অবরুদ্ধ, কেবল গ্রহণের বিভাগ আপন ক্ষুধিত কবল উদ্‌ঘাটিত করে আছে। তাতে গ্রহণের কাজও ঠিকমত ঘটে না। কেননা, যেখানে দেওয়া-নেওয়ার চলাচল নেই সেখানে পাওয়াটাই থাকে অসম্পূর্ণ।

আধুনিক কালে জীবনযাত্রা সকল দিকেই জটিল। নূতন নূতন নানা সমস্যার আলোড়নে মানুষের মন সর্বদাই উৎক্ষুব্ধ। নিয়ত তার নানা প্রশ্নের নানা উত্তর, তার নানা বেদনার নানা প্রকাশ সমাজে তরঙ্গিত, সাহিত্যে বিচিত্র ভঙ্গিতে আবর্তিত। বিশ্ববিদ্যালয়ে নানা যুগের ধ্রুব আদর্শগুলি যেমন মনের সামনে বিধৃত, সঞ্চিত, তেমনি প্রচলিত সাহিত্যে প্রকাশ পাচ্ছে প্রবহমান চিত্তের লীলাচাঞ্চল্য। পাশ্চাত্ত্য বিশ্ববিদ্যালয়ে বাহিরের এই চিত্তমথনের সঙ্গে যোগ বিচ্ছিন্ন নয়। মানুষের শিক্ষার এই দুই ধারা সেখানে গঙ্গাযমুনার মতো মেলে। কেননা সেখানে সমস্ত দেশের একই চিত্ত তার বিদ্যাকে নিরবচ্ছিন্নভাবে সৃষ্টি করে তুলছে, পৃথিবীর সৃষ্টিকার্য যেমন জলে স্থলে উভয়তই সক্রিয়।

এ সংবাদ বোধ হয় সকলেই জানেন যে, বর্তমান কালের সঙ্গে পদক্ষেপ মিলিয়ে চলবার জন্যে ইংলন্ডের য়ুনিভার্সিটিগুলিতে সম্প্রতি বিশেষভাবে আধুনিক শিক্ষাবিস্তারের চেষ্টা প্রবৃত্ত। গত য়ুরোপীয় যুদ্ধের পরে অক্‌স্‌ফোর্ডে দর্শন রাষ্ট্রতত্ত্ব অর্থনীতির আধুনিক ধারার চর্চা স্বীকার করা হয়েছে। চারি দিকে কী ঘটছে, সমাজ কোন্‌ দিকে চলেছে, সেইটে যারা ভালো করে জানতে চায় তাদের সাহায্য করবার জন্যে য়ুনিভার্সিটির এই উদ্যোগ। ম্যাঞ্চেস্টর য়ুনিভার্সিটি আধুনিক অর্থতত্ত্ব এবং আধুনিক ইতিহাসের প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগ করছে। বর্তমান কালের চিন্তাদ্বন্দ্ব ও কর্মসংঘাতের দিনে এইরূপ শিক্ষার ফলে ছাত্র ও ছাত্রীরা উপযুক্তভাবে আপন কর্তব্য ও জীবনযাত্রার জন্য প্রস্তুত হতে পারে।

আমাদের দেশে বিদেশ-থেকে-পাওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে দেশের মনের এরকম সম্মিলন ঘটতে পারে নি। তা ছাড়া য়ুরোপীয় বিদ্যাও এখানে বদ্ধজলের মতো, তার চলৎ রূপ আমরা দেখতে পাই নে। যে-সকল প্রবীণ মত আসন্ন পরিবর্তনের মুখে, আমাদের সম্মুখে তারা স্থির থাকে ধ্রুবসিদ্ধান্তরূপে। সনাতনত্বমুগ্ধ আমাদের মন তাদের ফুলচন্দন দিয়ে পূজা করে থাকে। য়ুরোপীয় বিদ্যাকে আমরা স্থাবরভাবে পাই এবং তার থেকে বাক্য চয়ন করে আবৃত্তি করাকেই আধুনিক রীতির বৈদগ্ধ্য বলে জানি, এই কারণে তার সম্বন্ধে নূতন চিন্তার সাহস আমাদের থাকে না। দেশের জনসাধারণের সমস্ত দুরূহ প্রশ্ন, গুরুতর প্রয়োজন, কঠোর বেদনা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিচ্ছিন্ন। এখানে দূরের বিদ্যাকে আমরা আয়ত্ত করি জড় পদার্থের মতো বিশ্লেষণের দ্বারা, সমগ্র উপলব্ধির দ্বারা নয়। আমরা ছিঁড়ে ছিঁড়ে বাক্য মুখস্থ করি এবং সেই টুকরো-করা মুখস্থবিদ্যার পরীক্ষা দিয়ে নিষ্কৃতি পাই। টেক্‌স্‌ট্‌-বুক-সংলগ্ন আমাদের মন পরাশ্রিত

প্রাণীর মতো নিজের খাদ্য নিজে সংগ্রহ করবার, নিজে উদ্ভাবন করবার শক্তি হারিয়েছে।

ইংরেজি ভাষা আমাদের প্রয়োজনের ভাষা, এইজন্যে সমস্ত শিক্ষার কেন্দ্রস্থলে এই বিদেশী ভাষার প্রতি আমাদের লোভ; সে প্রেমিকের প্রীতি নয়, কৃপণের আসক্তি। ইংরেজি সাহিত্য পড়ি, প্রধান লক্ষ্য থাকে ইংরেজি ভাষা আয়ত্ত করা। অর্থাৎ ফুলের কীটের মতো আমাদের মন, মধুকরের মতো নয়। মুষ্টিভিক্ষায় যে দান সংগ্রহ করি ফর্দ ধরে তার পরীক্ষা দিয়ে থাকি। সে পরীক্ষায় পরিমাণের হিসাব দেওয়া; সেই পরিমাণগত পরীক্ষার তাগিদে শিক্ষা করতে হয় ওজন-দরে। বিদ্যাকে চিত্তের সম্পদ বলে গ্রহণ করা অনাবশ্যক হয় যদি তাকে বাহ্যবস্তুরূপে বহন করি। এরকম বিদ্যার দানেও গৌরব নেই, গ্রহণেও না। এমন দৈন্যের অবস্থাতেও কখনো কখনো এমন শিক্ষক মেলে শিক্ষাদান যাঁর স্বভাবসিদ্ধ। তিনি নিজগুণেই জ্ঞান দান করেন, নিজের অন্তর থেকে শিক্ষাকে অন্তরের সামগ্রী করেন, তাঁর অনুপ্রেরণায় ছাত্রদের মনে মননশক্তির সঞ্চার হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে বিশ্বক্ষেত্রে আপন বিদ্যাকে ফলবান করে কৃতী ছাত্রেরা তার সত্যতার প্রমাণ দেয়।

যে বিশ্ববিদ্যালয় সত্য সে এইরকম শিক্ষককে আকর্ষণ করে; শিক্ষার সাহায্যে সেখানে মনোলোকে সৃষ্টিকার্য চলে, এই সৃষ্টিই সকল সভ্যতার মূলে। কিন্তু আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে এমনতরো যথার্থ শিক্ষক না হলেও চলে। হয়তো-বা ভালোই চলে। কেননা এখানকার পরীক্ষাপদ্ধতিতে যে ফলের প্রতি দৃষ্টি সে আহরণ-করা ফল, ফলন-করা ফল নয়। দৈন্যের নিষ্ঠুর তাগিদে এমনতরো শিক্ষার প্রতি দেশের লোভ আছে, কিন্তু ভক্তি নেই। তাই শিক্ষক ও ছাত্রদের উদ্যমকে পরিপূর্ণমাত্রায় সতর্ক করে রাখবার প্রয়োজন হয় না। কেননা, দেশের প্রত্যাশা উচ্চ নয়; বাজার-দরের হিসাব করে যে পরীক্ষার মার্কা সে চায় সত্যের নিকষে তার মূল্য অতি সামান্য। এইজন্য দুর্মূল্য বিদ্যাকে সম্পূর্ণ সত্য করে তোলবার মতো শ্রদ্ধা রক্ষা করা এত কঠিন; তাই শৈথিল্য তার মজ্জায় প্রবেশ করেছে।

অভাব থেকে বিশ্ববিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠার দৃষ্টান্ত অন্যত্র আছে। যেমন জাপানে। জাপান যখন স্পষ্ট বুঝলে যে, আধুনিক য়ুরোপ আজ যে বিদ্যার প্রভাবে বিশ্ববিজয়ী তাকে আয়ত্ত করতে না পারলে সকল দিকেই পরাভব সুনিশ্চিত, তখন জাপান প্রাণপণ আকাঙ্ক্ষার বেগে আপন সদ্যপ্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ে সেই য়ুরোপীয় বিদ্যার পীঠস্থান রচনা করলে। বিদ্যাসাধনায় আধুনিক মানবসমাজে তার লেশমাত্র অগৌরব না ঘটে এই তার একান্ত স্পর্ধা। সুতরাং সমস্ত জাতির শিক্ষাদানকার্যে সিদ্ধির আদর্শকে খাটো করে নিজেকে বঞ্চনা করার কথা তার মনেও আসতে পারে না। আমাদের দেশে বিদ্যায় সফলতার কৃত্রিম আদর্শ অনেকটা পরিমাণে পরের হাতে। বিদেশী মনিবেরা ন্যূন পরিমাণে কতটুকু হলে তাঁদের আশু প্রয়োজনের হিসাবে সন্তুষ্ট হন তার একটা ওজন বুঝে নিয়েছিলুম। প্রথম থেকেই প্রধানত এইজন্যই বিদ্যার আন্তরিক আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা আমাদের হ্রাস হয়ে এসেছে।

জাপানে বিদ্যাকে সত্য করে তোলবার ইচ্ছার প্রমাণ পাওয়া গেল যখন স্বদেশী ভাষাকে সে আপন শিক্ষার ভাষা করতে বিলম্ব করলে না। সর্বজনের ভাষার ভিতর দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়কে সর্বজনের করে তুললে; শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মধ্যে চিত্তপ্রসারের পথ অবাধ প্রশস্ত হয়ে উঠল। তাই আজ সেখানে সমস্ত দেশে বুদ্ধির জ্যোতি অবারিতভাবে দীপ্যমান।

আমাদের দেশে মাতৃভাষায় একদা যখন শিক্ষার আসন প্রতিষ্ঠার প্রথম প্রস্তাব ওঠে তখন অধিকাংশ ইংরেজি-জানা বিদ্বান আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন। সমস্ত দেশের সামান্য যে-কয়জন লোক ইংরেজি ভাষাটাকে কোনোমতে ব্যবহার করবার সুযোগ পাচ্ছে তাদের ভাগে উক্ত ভাষার অধিকারে পাছে লেশমাত্র কমতি ঘটে এই ছিল তাঁদের ভয়। হায় রে, দরিদ্রের আকাঙ্ক্ষাও দরিদ্র!

এ কথা মানতে হবে, জাপান স্বাধীন দেশ; সেখানকার লোক বিদ্যার যে মূল্য স্থির করেছে সে মূল্য পুরো পরিমাণে মিটিয়ে দিতে কৃপণতা করে নি। আর, হতভাগা আমরা পুলিস ও ফৌজ-বিভাগের ভূরিভোজনের ভুক্তশেষ রাজস্বের উচ্ছিষ্টকণা খুঁটে তারই দামে বিদ্যার ঠাট কোনোমতে বজায় রাখছি ফাঁকা মাল-মশলায়। আমাদের কাঁথার ছিদ্র ঢাকতে হয় ছেঁড়া কাপড়ের তালি দিয়ে। তাতে গৌরব নেই; কেবল কিছু পরিমাণে লজ্জা-নিবারণ ঘটে, লোক-দেখানো মান রক্ষা হয়, জীর্ণতা সত্ত্বেও আবরণটা থাকে।

এটা সত্য কথা। কিন্তু আক্ষেপ করে যখন কোনোই ফল নেই তখন এর দোহাই দিয়ে নিজের চেষ্টাকে খর্ব করলে চলবে না; তুফান উঠেছে বলেই হাল আরো শক্ত করেই ধরতে হবে। যে বিদ্যাকে এতদিন আমরা বিদেশের নিলামে সস্তায়-কেনা ভাঙা বেঞ্চিতে বসিয়ে রেখেছি তাকে স্বদেশের চিত্তবেদিতে সমাদরে বসাতেই হবে। বিশ্ববিদ্যালয়কে যখন যথার্থভাবে স্বদেশের সম্পদ করে তুলতে পারব তখন সমস্ত দেশের অন্তরের এই দাবি তার কাছে সার্থক হবে: শ্রদ্ধয়া দেয়ম্। দান করা চাই শ্রদ্ধার সঙ্গে। সেই শ্রদ্ধার অন্ন প্রাণের সঙ্গে মেলে, প্রাণশক্তিকে জাগিয়ে তোলে।

অনেক দিন থেকে ইংরেজি বিদ্যার খাঁচা স্থাবরভাবে আমাদের দেশে রাজবাড়ির দেউড়িতে রক্ষিত ছিল। এর দরজা খুলে দিয়ে দেশের চিত্তশক্তির জন্য যে নীড় নির্মাণ করতে হবে সব-প্রথমে আশুতোষ সে কথা বুঝেছিলেন। প্রবল বলে এই জড়ত্বকে বিচলিত করবার সাহস তাঁর ছিল। সনাতনপন্থীদের দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের চিরাচরিত প্রথার মধ্যে বাংলাকে স্থান দেবার প্রস্তাব প্রথমে তাঁর মনে উঠেছিল ভীরু এবং লোভীদের নানা তর্কের বিরুদ্ধে। বাংলাভাষা আজও সম্পূর্ণরূপে শিক্ষার ভাষা হবার মতো পাকা হয়ে ওঠে নি সে কথা সত্য। কিন্তু আশুতোষ জানতেন যে না হবার কারণ তার নিজের শক্তিদৈন্যের মধ্যে নেই, সে আছে তার অবস্থাদৈন্যের মধ্যে। তাকে শ্রদ্ধা করে, সাহস করে, শিক্ষার আসন দিলে তবেই সে আপন আসনের উপযুক্ত হয়ে উঠবে। আর, তা যদি একান্তই অসম্ভব বলে গণ্য করি তবে বিশ্ববিদ্যালয় চিরদিনই বিলেতের-আমদানি টবের গাছ হয়ে থাকবে; সে টব মূল্যবান হতে পারে, অলংকৃত হতে পারে, কিন্তু গাছকে সে চিরদিন পৃথক করে রাখবে ভারতবর্ষের মাটি থেকে; বিশ্ববিদ্যালয় দেশের শখের জিনিস হবে, প্রাণের জিনিস হবে না।

তা ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অগৌরব ঘোচাবার জন্যে পরীক্ষার শেষ দেউড়ি পার করে দিয়ে আশুতোষ এখানে গবেষণাবিভাগ স্থাপন করেছিলেন—বিদ্যার ফসল শুধু জমানো নয়, বিদ্যার ফসল ফলানোর বিভাগ। লোকের অভাব, অর্থের অভাব, স্বজন-পরজনের প্রতিকূলতা, কিছুই তিনি গ্রাহ্য করেন নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের আত্মশ্রদ্ধার প্রবর্তন হয়েছে এইখানেই। তার প্রধান কারণ, বিশ্ববিদ্যালয়কে আশুতোষ আপন করে দেখতে পেরেছিলেন, সেই অভিমানেই এই বিদ্যালয়কে তিনি সমস্ত দেশের আপন করে তোলবার ভরসা করতে পারলেন।

দেশের দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে মোটা বেড়াটা উঁচু করে তোলা ছিল তার

মধ্যে অবকাশ রচনা করতে তিনি প্রবৃত্ত ছিলেন। সেই প্রবেশপথ দিয়েই আমার মতো লোকের আজ এইখানে অকুণ্ঠিত মনে উপস্থিত হওয়া সম্ভবপর হয়েছে। আমার মহৎ সৌভাগ্য এই যে, বিশ্ববিদ্যালয়কে স্বদেশী ভাষায় দীক্ষিত করে নেবার পুণ্য অনুষ্ঠানে আমারও কিছু হাত রইল, অন্তত নামটা রয়ে গেল। আমি মনে করি যে, স্বদেশের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের মিলনসেতুরূপেই আমাকে আহ্বান করা হয়েছে। স্বদেশী ভাষায় চিরজীবন আমি যে সাধনা করে এসেছি সেই সাধনাকে সম্মান দেবার জন্যেই বিশ্ববিদ্যালয় আজ তাঁর সভায় আমাকে আসন দিলেন। দুই কালের সন্ধিস্থলে আমাকে রাখলেন একটি চিহ্নের মতো। দেখলেম যথারীতি আমাকে পদবী দেওয়া হয়েছে, অধ্যাপক। এ পদবীতে যথেষ্ট সম্মান আছে, কিন্তু আমার পক্ষে এটা অসংগত। এর দায়িত্ব আছে, সেও আমার পক্ষে গ্রহণ করা অসম্ভব। সাহিত্যের প্রত্নতত্ত্ব, তার শব্দের উৎপত্তি ও বিশ্লিষ্ট উপাদান, অর্থাৎ সাহিত্যের নাড়িনক্ষত্র আমার অভিজ্ঞতার বহির্ভূত। আমি অনুশীলন করেছি তার অখণ্ড রূপ, তার গতি, তার ভঙ্গি, তার ইঙ্গিত।

তখন আমার বয়স সতেরো, ইংরেজিভাষার জটিল গহনে আলো-আঁধারে কোনোমতে হাতড়ে চলতে পারি মাত্র। সেই সময়ে লন্‌ডন য়ুনিভার্সিটিতে মাস-তিনেকের জন্যে সাহিত্যের ক্লাসে ছাত্র ছিলেম। আমাদের অধ্যাপক ছিলেন শুভ্রকেশ সৌম্যমূর্তি হেন্‌রি মর্লি। সাহিত্য তিনি পড়াতেন তার অন্তরতর রসটুকু দেবার জন্যে। শেক্‌স্‌পিয়রের কোরায়োলেনস, টমাস ব্রাউনের বেরিয়ল আর্‌ন্‌ এবং মিল্‌টনের প্যারাডাইস রিগেন্‌ড্‌ আমাদের পাঠ্য ছিল। নোট প্রভৃতির সাহায্যে বইগুলি নিজে পড়ে আসতুম তার অর্থ গ্রহণের জন্যে। অধ্যাপক ক্লাসে বসে মূর্তিমান নোট-বইয়ের কাজ করতেন না। যে কাব্য পড়াতেন তার ছবিটি পাওয়া যেত তাঁর মুখে মুখে, আবৃত্তি করে যেতেন তিনি অতি সরসভাবে, যেটি শব্দার্থের চেয়ে অনেক বেশি, অনেক গভীর, সেটি পাওয়া যেত তাঁর কণ্ঠ থেকে। মাঝে মাঝে দুরূহ জায়গায় দ্রুত বুঝিয়ে যেতেন, পঠনধারার ব্যাঘাত করতেন না। রচনাশক্তির উৎকর্ষসাধন সাহিত্যশিক্ষার আর-একটি আনুষঙ্গিক লক্ষ্য। এই দায়িত্বও তাঁর ছিল। ভাষাশিক্ষা সাহিত্যশিক্ষার কাজ মুখ্যত ভাষাতত্ত্ব দিয়ে নয়, সাহিত্যের প্রত্নতত্ত্ব দিয়ে নয়, রসের পরিচয় দিয়ে ও রচনায় ভাষার ব্যবহার দিয়ে। যেমন আর্ট্‌শিক্ষার কাজ আর্কিয়লজি আইকনোগ্রাফি দিয়ে নয়, আর্টেরই আন্তরিক রসস্বরূপের ব্যাখ্যা দিয়ে। সপ্তাহে একদিন তিনি সমগ্রভাবে ছাত্রদের প্রদত্ত রচনার ব্যাখ্যা করতেন; তার পদচ্ছেদ, প্যারাগ্রাফবিভাগ, শব্দপ্রয়োগের সূক্ষ্ম ত্রুটি বা শোভনতা, সমস্তই তাঁর আলোচ্য ছিল। সাহিত্য ও ভাষার স্বরূপবোধ, তার আঙ্গিকের অর্থাৎ টেক্‌নিকের পরিচয় ও চর্চাই সাহিত্যশিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য, এই কথাটিই তাঁর ক্লাস থেকে জেনেছিলেম।

বয়স যদি পর্যবসিতপ্রায় না হত আর যদি আমার কর্তব্য হত ক্লাসে সাহিত্য-শিক্ষকতা করা, তবে এই আদর্শ-অনুসারেই কাজ করবার চেষ্টা করতুম। সম্ভবত আমার পক্ষে তার পরিণাম শোকাবহ হত। কর্তৃপক্ষ এবং ছাত্রেরা কেউ দীর্ঘকাল আমাকে সহ্য করতেন না। সেই সম্ভবপর সংকট কাটিয়ে এসেছি।

আজ আমার শেষ বয়সে আমার কাছ থেকে কোনো রীতিমত কর্মপদ্ধতির প্রত্যাশা করা ধর্মবিরুদ্ধ, তাতে প্রত্যবায় আছে। আমার ক্লান্ত জীবনের সায়াহ্নকালে আমাকে বাংলা-অধ্যাপকের সুলভ সংস্করণরূপে চালাতে গেলে তাতে কাজেরও ক্ষতি হবে, আমার পক্ষেও সেটা স্বাস্থ্যকর হবে না। আমি এই জানি যে, আজ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে বঙ্গবাণী-বীণাপাণির মন্দিরদ্বারে বরণ করে নেবার ভার আমার 'পরে। সেই কথা মনে রেখে আমি তাকে অভিনন্দিত করি। এই কামনা করি যে, যখন ধূমমলিন নিশীথপ্রদীপের নির্বাপণের ক্ষণ এল তখন বঙ্গদেশের চিত্তাকাশে নবসূর্যোদয়ের প্রত্যূষকে যথার্থ স্বদেশীয় বিশ্ববিদ্যালয় যেন ভৈরবরাগে ঘোষণা করে, এবং বাংলার প্রতিভাকে নব নব সৃষ্টির পথ দিয়ে অক্ষয় কীর্তিলোকে উত্তীর্ণ করে দেয়।

ভাষণ : ডিসেম্বর ১৯৩২

শিক্ষার বিকিরণ

ভোজ্য জিনিসে ভাণ্ডার উঠল ভরে, রান্নাঘরে হাঁড়ি চড়েছে, তবু ভোজ বলে না তাকে। আঙিনায় পাত পড়ল কত, ডাকা হয়েছে কত জনকে, সেই হিসাবেই ভোজের মর্যাদা। আমরা যে এডুকেশন শব্দটা আবৃত্তি করে মনে মনে খুশি থাকি সেটাতে ভাঁড়ার-ঘরের চেহারা আছে, কিন্তু বাইরে তাকিয়ে দেখি ধু ধু করছে আঙিনা। শিক্ষার আলোর জন্যে উঁচু লন্‌ঠন ঝোলানো হয়েছে ইস্কুলে কলেজে, কিন্তু সেটা যদি রুদ্ধ দেয়ালে বন্দী আলোক হয় তা হলে বলব আমাদের অদৃষ্ট মন্দ। সমস্ত পট-জোড়া ভূমিকার মধ্যেই ছবির প্রকাশ, তেমনি পরিস্ফুটতা পাবার জন্যে শিক্ষা চায় দেশজোড়া ভূমিকা। ব্যাপক-ভূমিকা-ভ্রষ্ট শিক্ষা কতই অস্পষ্ট, অসম্পূর্ণ, কেবল অভ্যাসবশতই তার দৈন্যের বেদনা আমাদের মন থেকে মরে গিয়েছে। এডুকেশন নিয়ে অন্য দেশের সঙ্গে স্বদেশের যখন তুলনা করি তখন দৃশ্য অংশটাই লক্ষ্য করি, অদৃশ্য অংশের হিসাব রাখি নে। মিলিয়ে দেখি য়ুনিভার্সিটি সেখানেও আছে, আমাদের দেশেও তার প্রতিরূপ দুটো-একটা দেখা দিচ্ছে। ভুলে যাই এমন কোনো ভাগ্যবান দেশ নেই যেখানে বাঁধা শিক্ষালয়ের বাইরে সমস্ত সমাজ জুড়ে আবাঁধা শিক্ষার একটা দিগন্তবিকীর্ণ বৃহত্তর পরিধি না আছে।

এককালে আমাদের দেশেও ছিল। য়ুরোপের মধ্যযুগের মতো আমাদের দেশে শাস্ত্রিক শিক্ষাই ছিল প্রধান। এই শিক্ষার বিশেষ চর্চা টোলে, চতুষ্পাঠীতে, কিন্তু সমস্ত দেশেই বিস্তীর্ণ ছিল বিদ্যার ভূমিকা। বিশিষ্ট জ্ঞানের সঙ্গে সাধারণ জ্ঞানের নিত্যই ছিল চলাচল। ওয়েসিসের সঙ্গে মরুভূমির যে বৈপরীত্যের সম্বন্ধ, তেমন ছিল না পণ্ডিতমণ্ডলীর সঙ্গে অপণ্ডিত লোকালয়ের। দেশে এমন অনাদৃত অংশ ছিল না যেখানে রামায়ণ মহাভারত পুরাণকথা ধর্মব্যাখ্যা নানা প্রণালী বেয়ে প্রতিনিয়ত ছড়িয়ে না পড়ত। এমন-কি যে-সকল তত্ত্বজ্ঞান দর্শনশাস্ত্রে কঠোর অধ্যবসায়ে আলোচিত তারও সেচন চলেছিল সর্বক্ষণ জনসাধারণের চিত্তভূমিতে। গাছের খাদ্য যথেষ্ট-পরিমাণ জল দিয়ে তরল হলে তবেই গাছ তাকে শাখায় প্রশাখায় গ্রহণ করতে পারে, তেমনি করেই সেদিন কঠিন বিদ্যাকে রসে বিগলিত করে সর্বজনের মনে সঞ্চারিত করা হয়েছে। যে সময়ে আমাদের দেশে পূর্তকর্ম ধর্মের অঙ্গ ছিল তখন গ্রামে গ্রামে জলাশয়ের আয়োজন স্বতই ছিল বিস্তৃত, সর্বজনে মিলে আপনিই আপনার তৃষ্ণার জল জুগিয়েছে; রাজপরিষদের কোনো ব্যয়কুণ্ঠ আমলা-সেরেস্তায় জলের জন্যে মাথা খুঁড়তে হয়নি। তেমনি করেই সমাজ দেশের

বিদ্যা আপনিই দেশময় বিতরণ করেছে। না যদি করত তবে সমস্ত দেশ আজ বর্বরতায় কালো কর্কশ হয়ে উঠত। বিদ্যা তখন বিদ্বানের সম্পত্তি ছিল না, সে ছিল সমস্ত সমাজের সম্পদ।

যেখানে খবরের কাগজেরও পত্রমর্মর শোনা যায় না এমন একটি সামান্য গ্রামে চাষিরা একদিন আমাকে নিমন্ত্রণ করেছিল। সেখানে প্রায় সকলেই মুসলমান। আমার অভ্যর্থনা উপলক্ষে চলছিল একটা গানের পালা। চাঁদোয়ার তলায় কেরোসিন-লন্ঠন জ্বলছে, মাটির উপর ছেলে বুড়ো সকলেই বসে আছে স্তব্ধ হয়ে। যাত্রাগানের প্রধান বিষয়টা গুরুশিষ্যের মধ্যে তত্ত্বালোচনা—দেহতত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব, মুক্তিতত্ত্ব। থেকে থেকে তারই সঙ্গে নাচ গান কৌতুকের দ্রুতমুখরিত ঝংকার। এই পালার একটি বিশেষ অংশ আজও আমার মনে আছে। কথাটা এই, যাত্রী প্রবেশ করতে চলেছে বৃন্দাবনে, পাহারাওয়ালা আটক করলে তার পথ; বললে, ‘তুমি চোর, ভিতরে তোমাকে যেতে দেওয়া হবে না।’ যাত্রী বললে, ‘সে কী কথা, কোথায় দেখলে আমার চোরাই মাল?’ দ্বারী বললে, ‘ঐ-যে তোমার কাপড়ের নিচে লুকোনো, ঐ-যে তোমার আপনি, ওটা ষোলো আনা আমার রাজার পাওনা, ফাঁকি দিয়ে রেখেছ নিজেরই জিম্মায়।’ এই বলতে বলতে মহা ঢাক ঢোল বেজে উঠল, চলল পরচুলো ঝাঁকানি দিয়ে ঘন ঘন নাচ। যেন ঐখানটা পাঠের প্রধান অংশ, অধ্যাপকমশায় পেন্সিলের মোটা দাগ ডবল করে টেনে দিলেন। রাত এগোতে লাগল, দুপুর পেরিয়ে একটা বাজে, শ্রোতারা স্থির হয়ে বসে শুনছে। সব কথা স্পষ্ট বুঝুক বা না বুঝুক, এমন একটা-কিছুর স্বাদ পাচ্ছে যেটা প্রতিদিনের নীরস তুচ্ছতা ভেদ করে পথ খুলে দিলে চিরন্তনের দিকে।

এমনি কতকাল চলেছে দেশে; বারবার বিচিত্র রসের যোগে লোকে শুনেছে ধ্রুবপ্রহ্লাদের কথা, সীতার বনবাস, কর্ণের কবচদান, হরিশ্চন্দ্রের সর্বস্বত্যাগ। তখন দুঃখ ছিল অনেক, অবিচার ছিল, জীবনযাত্রার অনিশ্চয়তা ছিল পদে পদে, কিন্তু সেইসঙ্গে এমন একটি শিক্ষার প্রবাহ ছিল যাতে করে ভাগ্যের বিমুখতার মধ্যে মানুষকে তার আন্তরিক সম্পদের অবারিত পথ দেখিয়েছে, মানুষের যে শ্রেষ্ঠতাকে অবস্থার হীনতায় হেয় করতে পারে না তার পরিচয়কে উজ্জ্বল করেছে। আর যাই হোক, আমেরিকান টাঁকির দ্বারা এ কাজটা হয় না।

অন্য সকল দেশে আবশ্যিক শিক্ষার প্রবর্তন হয়েছে অল্পদিন হল। আমাদের দেশে যে জনশিক্ষা তাকে আবশ্যিক বলব না, তাকে বলব স্বৈচ্ছিক। সে অনেক কালের। তার পশ্চাতে কোনো আইন ছিল না, তাগিদ ছিল না; তার স্বতঃসঞ্চার ছিল ঘরে ঘরে, যেমন রক্তচলাচল হয় সর্বদেহে।

তার পরে সময়ের পরিবর্তন হল। ইতিমধ্যে শিক্ষিতসমাজ যখন রাজদ্বারের দিকে মুখ ফিরিয়ে মন্ত্রিসভায় প্রবেশাধিকারের আবেদন কখনো-বা করুণকণ্ঠে কখনো-বা কৃত্রিম আক্রোশে পেশ করছিলেন তখন তাঁদের পিছনের দিকে গ্রামে গ্রামে পিপাসার জল এল পাঁকের কাছে নেমে, এ দিকে শহরে শহরে দ্বারে দ্বারে ঝরতে লাগল কলের জল। আমরা বিস্মিত হয়ে বললেম, একেই বলে উন্নতি। দেশের যেটা বৃহৎ রূপ সেটা লুকোল আমাদের অগোচরে, যে প্রাণ যে আলো দেশের সর্বত্র বিকীর্ণ ছিল সেটা প্রতিসংহৃত হল ছোটো ছোটো কেন্দ্রে।

এ কালে যাকে আমরা এডুকেশন বলি তার আরম্ভ শহরে। তার পিছনে ব্যাবসা ও চাকরি চলেছে আনুষঙ্গিক হয়ে। এই বিদেশী শিক্ষাবিধি রেলকামরার দীপের মতো। কামরাটা উজ্জ্বল, কিন্তু যে যোজন যোজন পথ গাড়ি চলেছে ছুটে

সেটা অন্ধকারে লুপ্ত। কারখানার গাড়িটাই যেন সত্য, আর প্রাণবেদনায় পূর্ণ সমস্ত দেশটাই যেন অবাস্তব।

শহরবাসী একদল মানুষ এই সুযোগে শিক্ষা পেলে, মান পেলে, অর্থ পেলে; তারাই হল এন্‌লাইটেন্‌ড্‌, আলোকিত। সেই আলোর পিছনে বাকি দেশটাতে লাগল পূর্ণ গ্রহণ। ইস্কুলের বেঞ্চিতে বসে যাঁরা ইংরেজি পড়া মুখস্থ করলেন শিক্ষাদীপ্ত দৃষ্টির অন্ধতায় তাঁরা দেশ বলতে বুঝলেন শিক্ষিতসমাজ, ময়ূর বলতে বুঝলেন তার পেখমটা, হাতি বলতে তার গজদন্ত। সেই দিন থেকে জলকষ্ট বলো, পথকষ্ট বলো, রোগ বলো, অজ্ঞান বলো, জমে উঠল কাংস্যবাদ্যমন্দ্রিত নাট্যমঞ্চের নেপথ্যে নিরানন্দ নিরালোক গ্রামে গ্রামে। নগরী হল সুজলা; সুফলা, টানাপাখা-শীতলা; সেইখানেই মাথা তুললে আরোগ্যনিকেতন, শিক্ষার প্রাসাদ। দেশের বুকে এক প্রান্ত থেকে আর-এক প্রান্তে এত বড়ো বিচ্ছেদের ছুরি আর-কোনোদিন চালানো হয় নি, সে কথা মনে রাখতে হবে। একে আধুনিকের লক্ষণ বলে নিন্দা করলে চলবে না। কেননা, কোনো সভ্য দেশেরই অবস্থা এরকম নয়। আধুনিকতা সেখানে সপ্তমীর চাঁদের মতো অর্ধেক আলোয় অর্ধেক অন্ধকারে খণ্ডিত হয়ে নেই। জাপানে পাশ্চাত্ত্য বিদ্যার সংস্রব ভারতবর্ষের চেয়ে অল্প কালের, কিন্তু সেখানে সেটা তালি-দেওয়া ছেঁড়া কাঁথা নয়। সেখানে পরিব্যাপ্ত বিদ্যার প্রভাবে সমস্ত দেশের মনে চিন্তা করবার শক্তি অবিচ্ছিন্ন সঞ্চারিত। এই চিন্তা এক ছাঁচে ঢালা নয়। আধুনিক কালেরই লক্ষণ অনুসারে এই চিন্তায় বৈচিত্র্য আছে অথচ ঐক্যও আছে, সেই ঐক্য যুক্তির ঐক্য।

কেউ কেউ তথ্য গণনা করে দেখিয়েছেন, পূর্বকালে এ দেশে গ্রাম্য পাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষার যে উদ্যোগ ছিল ব্রিটিশ শাসনে ক্রমেই তা কমেছে। কিন্তু, তার চেয়ে সর্বনেশে ক্ষতি হয়েছে, জনশিক্ষাবিধির সহজ পথগুলি লোপ পেয়ে আসাতে। শোনা যায়, একদিন বাংলাদেশ জুড়ে নানা শাখায় খাল কাটা হয়েছিল অতি আশ্চর্য নৈপুণ্যে; হাল আমলের অনাদরে এবং নির্বুদ্ধিতায় সে-সমস্তই বন্ধ হয়ে গেছে বলেই তাদের কূলে কূলে এত চিতা আজ জ্বলছে। তেমনি এ দেশে শিক্ষার খালগুলোও গেল বন্ধ হয়ে, আর অন্তর-বাহিরের সমস্ত দীনতা বল পেয়ে উঠছে। শিক্ষার একটা বড়ো সমস্যার সমাধান হয়েছিল আমাদের দেশে। শাসনের শিক্ষা আনন্দের শিক্ষা হয়ে দেশের হৃদয়ে প্রবেশ করেছিল, মিলেছিল সমস্ত সমাজের প্রাণক্রিয়ার সঙ্গে। দেশব্যাপী সেই প্রাণের খাদ্যে আজ দুর্ভিক্ষ। পূর্বসঞ্চয় কিছু বাকি আছে, তাই এখনো দেখতে পাচ্ছি নে এর মারমূর্তি।

মধ্য-এসিয়ার মরুভূমিতে যে-সব পর্যটক প্রাচীন যুগের চিহ্ন সন্ধান করেছেন তাঁরা দেখেছেন, সেখানে কত সমৃদ্ধ জনপদ আজ বালিচাপা পড়ে হারিয়ে গেছে। এক কালে সে-সব জায়গায় জলের সঞ্চয় ছিল, নদীর রেখাও পাওয়া যায়। কখন রস এল শুকিয়ে, এক-পা এক-পা করে এগিয়ে এল মরু, শুষ্ক রসনা মেলে লেহন করে নিল প্রাণ, লোকালয়ের শেষ স্বাক্ষর মিলিয়ে গেল অসীম পাণ্ডুরতার মধ্যে। বিপুলসংখ্যক গ্রাম নিয়ে আমাদের যে দেশ সেই দেশের মনোভূমিতেও রসের জোগান আজ অবসিত। যে রস অনেক কাল থেকে নিম্ন স্তরে ব্যাপ্ত হয়ে আছে তাও দিনে দিনে শুষ্ক বাতাসের উষ্ণ নিশ্বাসে উবে যাবে, অবশেষে প্রাণনাশা মরু অগ্রসর হয়ে তৃষ্ণার অজগর সাপের মতো পাকে পাকে গ্রাস করতে থাকবে আমাদের এই গ্রামে-গাঁথা দেশকে। এই মরুর আক্রমণটা আমাদের চোখে পড়ছে না, কেননা, বিশেষ শিক্ষার গতিকেই দেশ-দেখা চোখ আমরা হারিয়েছি;

গবাক্ষলন্ঠনের আলোর মতো আমাদের সমস্ত দৃষ্টির লক্ষ্য কেন্দ্রীভূত শিক্ষিত-সমাজের দিকে।

আমি একদিন দীর্ঘকাল ছিলুম বাংলাদেশের গ্রামের নিকটসংস্রবে। গরমের সময়ে একটা দুঃখের দৃশ্য পড়ত চোখে। নদীর জল গিয়েছে নেমে, তীরের মাটি গিয়েছে ফেটে, বেরিয়ে পড়েছে পাড়ার পুকুরের পঙ্কস্তর, ধু ধু করছে তপ্ত বালু। মেয়েরা বহুদূর পথ থেকে ঘড়ায় করে নদীর জল বয়ে আনছে, সেই জল বাংলাদেশের অশ্রুজলমিশ্রিত। গ্রামে আগুন লাগলে নিবোবার উপায় পাওয়া যায় না; ওলাউঠো দেখা দিলে নিবারণ করা দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে।

এই গেল এক, আর-এক দুঃখের বেদনা আমার মনে বেজেছিল। সন্ধে হয়ে এসেছে, সমস্ত দিনের কাজ শেষ করে চাষিরা ফিরেছে ঘরে। এক দিকে বিস্তৃত মাঠের উপর নিস্তব্ধ অন্ধকার, আর-এক দিকে বাঁশঝাড়ের মধ্যে এক-একটি গ্রাম যেন রাত্রির বন্যার মধ্যে জেগে আছে ঘনতর অন্ধকারের দ্বীপের মতো। সেই দিক থেকে শোনা যায় খোলের শব্দ, আর তারই সঙ্গে একটানা সুরে কীর্তনের কোনো-একটা পদের হাজারবার তারস্বরে আবৃত্তি। শুনে মনে হত, এখানেও চিত্ত-জলাশয়ের জল তলায় এসে পড়েছে। তাপ বাড়ছে, কিন্তু ঠাণ্ডা করবার উপায় কতটুকুই বা! বছরের পর বছর যে অবস্থাদৈন্যের মধ্যে দিন কাটে তাতে কী করে প্রাণ বাঁচবে যদি মাঝে মাঝে এটা অনুভব না করা যায় যে, হাড়ভাঙা মজুরির উপরেও মন বলে মানুষের একটা-কিছু আছে যেখানে তার অপমানের উপশম, দুর্ভাগ্যের দাসত্ব এড়িয়ে যেখানে হাঁফ ছাড়বার জায়গা পাওয়া যায়! তাকে সেই তৃপ্তি দেবার জন্যে একদিন সমস্ত সমাজ প্রভূত আয়োজন করেছিল। তার কারণ, সমাজ এই বিপুল জনসাধারণকে স্বীকার করে নিয়েছিল আপন লোক বলে। জানত এরা নেমে গেলে সমস্ত দেশ যায় নেমে। আজ মনের উপবাস ঘোচাবার জন্যে কেউ তাদের কিছুমাত্র সাহায্য করে না। তাদের আত্মীয় নেই, তারা নিজে-নিজেই আগেকার দিনের তলানি নিয়ে কোনোমতে একটু সান্ত্বনা পাবার চেষ্টা করে। আর-কিছুদিন পরে এটুকুও যাবে শেষ হয়ে; সমস্ত দিনের দুঃখধন্দার রিক্ত প্রান্তে নিরানন্দ ঘরে আলো জ্বলবে না, সেখানে গান উঠবে না আকাশে। ঝিল্লি ডাকবে বাঁশবনে, ঝোপঝাড়ের মধ্য থেকে শেয়ালের ডাক উঠবে প্রহরে প্রহরে; আর সেই সময়ে শহরে শিক্ষাভিমানীর দল বৈদ্যুত আলোয় সিনেমা দেখতে ভিড় করবে।

এক দিকে আমাদের দেশে সনাতন শিক্ষার ব্যাপ্তি রুদ্ধ হয়ে জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞানের অনাবৃষ্টি চিরকালীন হয়ে দাঁড়ালো, অন্য দিকে আধুনিক কালের নতুন বিদ্যার যে আবির্ভাব হল তার প্রবাহ বইল না সর্বজনীন দেশের অভিমুখে। পাথরে-গাঁথা কুণ্ডের মতো স্থানে স্থানে সে আবদ্ধ হয়ে রইল; তীর্থের পাণ্ডাকে দর্শনী দিয়ে দূর থেকে এসে গণ্ডূষ ভর্তি করতে হয়, নানা নিয়মে তার আটঘাট বাঁধা। মন্দাকিনী থাকেন শিবের ঘোরালো জটাজূটের মধ্যে বিশেষভাবে; তবুও দেবললাট থেকে তিনি তাঁর ধারা নামিয়ে দেন, বহে যান সাধারণভাবে ঘাটে ঘাটে মর্ত্যজনের দ্বারের সম্মুখ দিয়ে, ঘটে ঘটে ভরে দেন আপন প্রসাদ। কিন্তু আমাদের দেশে প্রবাসিনী আধুনিকী বিদ্যা তেমন নয়। তার আছে বিশিষ্ট রূপ, সাধারণ রূপ নেই। সেইজন্যে ইংরেজি শিখে যাঁরা বিশিষ্টতা পেয়েছেন তাঁদের মনের মিল হয় না সর্বসাধারণের সঙ্গে। দেশে সকলের চেয়ে বড়ো জাতিভেদ এইখানেই, শ্রেণীতে শ্রেণীতে অস্পৃশ্যতা।

ইংরেজি ভাষায় অবগুণ্ঠিত বিদ্যা স্বভাবতই আমাদের মনের সহবর্তিনী হয়ে

চলতে পারে না। সেইজন্যেই আমরা অনেকেই যে পরিমাণে শিক্ষা পাই সে পরিমাণে বিদ্যা পাই নে। চার দিকের আবহাওয়ার থেকে এ বিদ্যা বিচ্ছিন্ন; আমাদের ঘর আর ইস্কুলের মধ্যে ট্রাম চলে, মন চলে না। ইস্কুলের বাইরে পড়ে আছে আমাদের দেশ; সেই দেশে ইস্কুলের প্রতিবাদ রয়েছে বিস্তর, সহযোগিতা নেই বললেই হয়। সেই বিচ্ছেদে আমাদের ভাষা ও চিন্তা অধিকাংশ স্থলেই ইস্কুলের ছেলের মতোই। ঘুচল না আমাদের নোট্‌বইয়ের শাসন, আমাদের বিচারবুদ্ধিতে নেই সাহস; আছে নজির মিলিয়ে অতি সাবধানে পা ফেলে চলা। শিক্ষার সঙ্গে দেশের মনের সহজ মিলন ঘটাবার আয়োজন আজ পর্যন্ত হল না। যেন কনে রইল বাপের বাড়ির অন্তঃপুরে; শ্বশুরবাড়ি নদীর ও পারে বালির চর পেরিয়ে। খেয়া-নৌকাটা গেল কোথায়?

পারাপারের একখানা ডোঙা দেখিয়ে দেওয়া হয়, তাকে বলে সাহিত্য। এ কথা মানতেই হবে, আধুনিক বঙ্গসাহিত্য বর্তমান যুগের অস্ত্রে বস্ত্রে মানুষ। এই সাহিত্য আমাদের মনে লাগিয়েছে এ কালের ছোঁওয়া; কিন্তু খাদ্য তো ও পার থেকে পুরোপুরি বহন করে আনছে না। যে বিদ্যা বর্তমান যুগের চিত্তশক্তিকে বিচিত্র আকারে প্রকাশ করছে, উদ্ঘাটন করছে বিশ্বরহস্যের নব নব প্রবেশদ্বার, বাংলাসাহিত্যের পাড়ায় তার যাওয়া-আসা নেই বললেই হয়। চিন্তা করে যে মন, যে মন বিচার করে, বুদ্ধির সঙ্গে ব্যবহারের যোগসাধন করে যে, সে পড়ে আছে পূর্বযুগান্তরে; আর যে মন রসসম্ভোগ করে সে যাতায়াত শুরু করেছে আধুনিক ভোজের নিমন্ত্রণশালার আঙিনায়। স্বভাবতই তার ঝোঁক পড়েছে সেই দিকটাতে যে দিকে চলেছে মদের পরিবেষণ, যেখানে ঝাঁঝালো গন্ধে বাতাস হয়েছে মাতাল।

গল্প কবিতা নাটক নিয়ে বাংলাসাহিত্যের পনেরো-আনা আয়োজন। অর্থাৎ ভোজের আয়োজন, শক্তির আয়োজন নয়। পাশ্চাত্ত্য দেশের চিত্তোৎকর্ষ বিচিত্র চিত্তশক্তির প্রবল সমবায় নিয়ে। মনুষ্যত্ব সেখানে দেহ মন প্রাণের সকল দিকেই ব্যাপৃত। তাই সেখানে যদি ত্রুটি থাকে তো পূর্তিও আছে। বটগাছের কোনো ডাল বা ঝড়ে ভাঙল, কোনোখানে বা পোকায় ছিদ্র করেছে, কোনো বৎসর বা বৃষ্টির কার্পণ্য, কিন্তু সবসুদ্ধ জড়িয়ে বনস্পতি জমিয়ে রেখেছে আপন স্বাস্থ্য, আপন বলিষ্ঠতা। তেমনি পাশ্চাত্ত্য দেশের মনকে ক্রিয়াবান্ করে রেখেছে তার বিদ্যা, তার শিক্ষা, তার সাহিত্য, সমস্ত মিলে; তার কর্মশক্তির অক্লান্ত উৎকর্ষ ঘটিয়েছে এই-সমস্তের উৎকর্ষ।

আমাদের সাহিত্যে রসেরই প্রাধান্য। সেইজন্যে যখন কোনো অসংযম কোনো চিত্তবিকার অনুকরণের নালা বেয়ে এই সাহিত্যে প্রবেশ করে তখন সেটাই একান্ত হয়ে ওঠে, কল্পনাকে রুগ্ন বিলাসিতার দিকে গাঁজিয়ে তোলে। প্রবল প্রাণশক্তি জাগ্রত না থাকলে দেহের ক্ষুদ্র বিকার কথায় কথায় বিষফোড়া হয়ে রাঙিয়ে ওঠে। আমাদের দেশে সেই আশঙ্কা। এ নিয়ে দোষ দিলে আমরা নজির দেখাই পাশ্চাত্ত্য সমাজের; বলি, এটাই তো সভ্যতার আধুনিকতম পরিণতি। কিন্তু সেইসঙ্গে সকল দিকে আধুনিক সভ্যতার যে সচিন্ত সচল প্রবল বৃহৎ সমগ্রতা আছে সেটার কথা চাপা রাখি।

একদা পাড়াগাঁয়ে যখন বাস করতুম তখন সাধু সাধকের বেশ-ধারী কেউ কেউ আমার কাছে আসত; তারা সাধনার নামে উচ্ছৃঙ্খল ইন্দ্রিয়চর্চার সংবাদ আমাকে জানিয়েছে। তাতে ধর্মের প্রশ্রয় ছিল। তাদেরই কাছে শুনেছি, এই প্রশ্রয় সুরঙ্গপথে শহর পর্যন্ত গোপনে শিষ্যে প্রশিষ্যে শাখায়িত। এই পৌরুষনাশী

ধর্মনামধারী লালসার লোলতা ব্যাপ্ত হবার প্রধান কারণ এই যে, আমাদের সাহিত্যে সমাজে সেই-সমস্ত উপাদানের অভাব যাতে বড়ো বড়ো চিন্তাকে, বুদ্ধির সাধনাকে আশ্রয় করে কঠিন গবেষণার দিকে মনের ঔৎসুক্য জাগিয়ে রাখতে পারে।

এজন্যে অন্তত বাঙালি সাহিত্যিকদের দোষ দেওয়া যায় না। আমাদের সাহিত্য সারগর্ভ নয় বলে একে নিন্দা করা সহজ, কিন্তু কী করলে একে সারালো করা যায় তার পন্থা নির্ণয় করা তত সহজ নয়। রুচির সম্বন্ধে লোকে বেপরোয়া, কেননা ও দিকে কোনো শাসন নেই। অশিক্ষিত রুচিও রসের সামগ্রী থেকে যা-হোক-কোনো-একটা আস্বাদন পায়। আর, যদি সে মনে করে তারই বোধ রসবোধের চরম আদর্শ তবে তা নিয়ে তর্ক তুললে ফৌজদারি পর্যন্ত পৌঁছতে পারে। কবিতা গল্প নাটকের বাজারের দিকে যারা সমঝদারের রাজপথটা পায় নি অন্তত তারা আনাড়িপাড়ার মাঠ দিয়েও চলতে পারে, কোনো মাশুল দিতে হয় না কোথাও। কিন্তু যে বিদ্যা মননের সেখানে কড়া পাহারার সিংহদ্বার পেরিয়ে যেতে হয়, মাঠ পেরিয়ে নয়। যে-সব দেশের 'পরে লক্ষ্মী প্রসন্ন, এবং সরস্বতীও, তারা সেই বিদ্যার দিকে নতুন নতুন পথ পাকা করছে প্রত্যহ: পণ্যের আদানপ্রদান চলছে দূরে নিকটে, ঘরে বাইরে। আমাদের দেশেও তো বিলম্ব করলে চলবে না।

বাংলার আকাশে দুর্দিন এসেছে চার দিক থেকে ঘনঘোর করে। একদা রাজদরবারে বাঙালির প্রতিপত্তি ছিল যথেষ্ট। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে বাঙালি কর্মে পেয়েছে খ্যাতি, শিক্ষাপ্রসারণে হয়েছে অগ্রণী। সেদিন সেখানকার লোকের কাছে সে শ্রদ্ধা পেয়েছে, পেয়েছে অকুণ্ঠিত কৃতজ্ঞতা। আজ রাজপুরুষ তার প্রতি অপ্রসন্ন; অন্যান্য প্রদেশে তার সম্বন্ধে আতিথ্য সংকুচিত, দ্বার অবরুদ্ধ। এ দিকে বাংলার আর্থিক দুর্গতিও চরমে এল।

অবস্থার দৈন্যে অশিক্ষার আত্মগ্লানিতে যেন বাঙালি নিচে তলিয়ে না যায়, যেন তার মন মাথা তুলতে পারে দুর্ভাগ্যের ঊর্ধ্বে, এই দিকে আমাদের সমস্ত চেষ্টা জাগাতে হবে তো। মানুষের মন যখন ছোটো হয়ে যায় তখন ক্ষুদ্রতার নখচঞ্চুর আঘাতে সকল উদ্যোগকেই সে ক্ষুণ্ণ করে। বাংলাদেশে এই ভাঙন-ধরানো ঈর্ষা নিন্দা দলাদলি এবং দুয়ো-দেবার উত্তেজনা তো বরাবরই আছে, তার উপরে চিত্তের আলো যতই ম্লান হয়ে আসবে ততই নিজের 'পরে অশ্রদ্ধাবশতই অন্য-সকলকে খর্ব করবার অহৈতুক প্রয়াস আরো উঠবে বিষাক্ত হয়ে। আজ হিন্দু-মুসলমানে যে-একটা লজ্জাজনক আড়াআড়ি দেশকে আত্মঘাতে প্রবৃত্ত করছে তার মূলেও আছে সর্বদেশব্যাপী অবুদ্ধি। অলক্ষ্মী সেই অশিক্ষিত অবুদ্ধির সাহায্যেই আমাদের ভাগ্যের ভিত্তি ভাঙবার কাজে চর লাগিয়েছে; আত্মীয়কে তুলছে শত্রু করে, বিধাতাকে করছে আমাদের বিপক্ষ। শেষকালে নিজের সর্বনাশ করবার জেদ এতদূর পর্যন্ত আজ এগোল যে, বাঙালি হয়ে বাংলাভাষার মধ্যেও ফাটল ধরাবার চেষ্টা আজ সম্ভবপর হয়েছে; শিক্ষার ও সাহিত্যের যে উদার ক্ষেত্রে সকল মতভেদ সত্ত্বেও একরাষ্ট্রীয় মানুষের মেলবার জায়গা সেখানেও স্বহস্তে কাঁটাগাছ রোপণ করবার উৎসাহ ব্যথা পেল না, লজ্জা পেল না। দুঃখ পাই তাতে ধিক্কার নেই, কিন্তু দেশজোড়া অশিক্ষাগ্রস্ত হেয়তা আমাদের মাথা হেঁট করে দিল, ব্যর্থ করে দিল আমাদের সকল মহৎ উদ্যম। রাষ্ট্রিক হাটে রাষ্ট্রাধিকার নিয়ে দর-দস্তুর করে হট্টগোল যতই পাকানো যাক, সেখানে গোল টেবিলের চক্রবাত্যায় প্রতিকারের চরম উপায় মিলবে না। তরীর তলায় যেখানে বাঁধন আলগা সেইখানে অবিলম্বে হাত লাগাতে হবে।

সকলের গোড়ায় চাই শিক্ষিত মন। ইস্কুল কলেজের বাইরে শিক্ষা বিছিয়ে দেবার উপায় সাহিত্য। কিন্তু সেই সাহিত্যকে সর্বাঙ্গীণরূপে শিক্ষার আধার করতে হবে; দেখতে হবে তাকে গ্রহণ করবার পথ সর্বত্র সুগম হয়েছে। এজন্যে কোন্ বন্ধুকে ডাকব? বন্ধু যে আজ দুর্লভ হল। তাই বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারেই আবেদন উপস্থিত করছি।

মস্তিষ্কের সঙ্গে স্নায়ুজালের অবিচ্ছিন্ন যোগ সমস্ত দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে। বিশ্ববিদ্যালয়কে সেই মস্তিষ্কের স্থান নিয়ে স্নায়ুতন্ত্র প্রেরণ করতে হবে দেশের সর্বদেহে। প্রশ্ন এই, কেমন করে করা যেতে পারে? তার উত্তরে আমার প্রস্তাব এই যে, একটা পরীক্ষার বেড়াজাল দেশ জুড়ে পাতা হোক। এমন সহজ ও ব্যাপক ভাবে তার ব্যবস্থা করতে হবে যাতে ইস্কুল-কলেজের বাইরে থেকেও দেশে পরীক্ষাপাঠ্য বইগুলি স্বেচ্ছায় আয়ত্ত করবার উৎসাহ জন্মে। অন্তঃপুরের মেয়েরা কিংবা পুরুষদের যারা নানা বাধায় বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারে না তারা অবকাশকালে নিজের চেষ্টায় অশিক্ষার লজ্জা নিবারণ করছে, এইটি দেখবার উদ্দেশে বিশ্ববিদ্যালয় জেলায় জেলায় পরীক্ষার কেন্দ্র স্থাপন করতে পারে। বহু বিষয় একত্র জড়িত করে বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিগ্রি দেওয়া হয়, এ ক্ষেত্রে উপাধি দেবার উপলক্ষে সেরকম বহুলতার প্রয়োজন নেই। প্রায়ই ব্যক্তিবিশেষের মনের প্রবণতা থাকে বিষয়বিশেষে। সেই বিষয়েই আপন বিশেষ অধিকারের পরিচয় দিতে পারলে সমাজে সে আপন বিশেষ স্থান পাবার অধিকারী হয়। সেটুকু অধিকার থেকে তাকে বঞ্চিত করবার কোনো কারণ দেখি নে।

বিশ্ববিদ্যালয় আপন পীঠস্থানের বাহিরেও যদি ব্যাপক উপায়ে আপন সত্তা প্রসারণ করে তবেই বাংলাভাষায় যথোচিত পরিমাণে শিক্ষাপাঠ্য গ্রন্থ-রচনা সম্ভবপর হবে। নইলে কোনো কালেই বাংলাসাহিত্যে বিষয়ের দৈন্য ঘুচতেই পারে না। যে-সব শিক্ষণীয় বিষয় জানা থাকলে আত্মসম্মান রক্ষা হয় তার জন্যে অগত্যা যদি ইংরেজি ভাষারই দ্বারস্থ হতে হয় তবে সেই অকিঞ্চনতায় মাতৃভাষাকে চিরদিন অপমানিত করে রাখা হবে। বাঙালি যারা বাংলাভাষাই জানে শিক্ষিতসমাজে তারা কি চিরদিন অন্ত্যজ শ্রেণীতেই গণ্য হয়ে থাকবে? এমনও এক সময় ছিল যখন ইংরেজি ইস্কুলের পয়লা শ্রেণীর ছাত্রেরা ‘বাংলা জানি নে’ বলতে অগৌরব বোধ করত না, এবং দেশের লোকেরাও সসম্ভ্রমে তাদের চৌকি এগিয়ে দিয়েছে। সেদিন আজ আর নেই বটে, কিন্তু বাঙালির ছেলেকে মাথা হেঁট করতে হয়, ‘শুধু কেবল বাংলা ভাষা জানি’ বলতে। এ দিকে রাষ্ট্রক্ষেত্রে স্বরাজ পাবার জন্যে প্রাণপণ দুঃখ স্বীকার করি, কিন্তু শিক্ষার ক্ষেত্রে স্বরাজ পাবার উৎসাহ আমাদের জাগে নি বললে কম বলা হয়। এমন মানুষ আজও দেশে আছে যারা তার বিরুদ্ধতা করতে প্রস্তুত, যারা মনে করে শিক্ষাকে বাংলাভাষার আসনে বসালে তার মূল্য যাবে কমে। বিলেতে যাতায়াতের প্রথম যুগে ইঙ্গবঙ্গী নেশা যখন উৎকট ছিল তখন সেই মহলে স্ত্রীকে শাড়ি পরালে প্রেস্‌টিজ-হানি হত। শিক্ষাসরস্বতীকে শাড়ি পরালে আজও অনেক বাঙালি বিদ্যার মানহানি কল্পনা করে। অথচ এটা জানা কথা যে, শাড়ি-পরা বেশে দেবী আমাদের ঘরের মধ্যে চলাফেরা করতে আরাম পাবেন, খুরওয়ালা বুটজুতোয় পায়ে পায়ে বাধা পাবার কথা।

একদিন অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সে যখন আমার শক্তি ছিল তখন কখনো কখনো ইংরেজি সাহিত্য মুখে মুখে বাংলা করে শুনিয়েছি। আমার শ্রোতারা ইংরেজি জানতেন সবাই। তবু তাঁরা স্বীকার করেছেন, ইংরেজি সাহিত্যের বাণী বাংলা-

ভাষায় তাঁদের মনে সহজে সাড়া পেয়েছে। বস্তুত আধুনিক শিক্ষা ইংরেজিভাষা-বাহিনী বলেই আমাদের মনের প্রবেশ-পথে তার অনেকখানি মারা যায়। ইংরেজি খানার টেবিলে আহারের জটিল পদ্ধতি যার অভ্যস্ত নয় এমন বাঙালির ছেলে বিলেতে পাড়ি দেবার পথে পি. এন্ড. ও. কোম্পানির ডিনার-কামরায় যখন খেতে বসে তখন ভোজ্য ও রসনার মধ্যপথে কাঁটাছুরির দৌত্য তার পক্ষে বাধাগ্রস্ত বলেই ভরপুর ভোজের মাঝখানেও ক্ষুধিত জঠরের দাবি সম্পূর্ণ মিটতে চায় না। আমাদের শিক্ষার ভোজেও সেই দশা; আছে সবই, অথচ মাঝপথে অনেকখানি অপচয় হয়ে যায়। এ যা বলছি এ কলেজি যজ্ঞের কথা, আমার আজকের আলোচ্য বিষয় এ নিয়ে নয়। আমার বিষয়টা সর্বসাধারণের শিক্ষা নিয়ে। শিক্ষার জলের কল চালানোর কথা নয়, পাইপ যেখানে পৌঁছয় না সেখানে পানীয়ের ব্যবস্থার কথা। মাতৃভাষায় সেই ব্যবস্থা যদি গোষ্পদের চেয়ে প্রশস্ত না হয় তবে এই বিদ্যাহারা দেশের মরুবাসী মনের উপায় হবে কী?

বাংলা যার ভাষা সেই আমার তৃষিত মাতৃভূমির হয়ে বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে চাতকের মতো উৎকণ্ঠিত বেদনায় আবেদন জানাচ্ছি: তোমার অভ্রভেদী শিখরচূড়া বেষ্টন করে পুঞ্জ পুঞ্জ শ্যামল মেঘের প্রসাদ আজ বর্ষিত হোক ফলে শস্যে, সুন্দর হোক পুষ্পে পল্লবে, মাতৃভাষার অপমান দূর হোক, যুগশিক্ষার উদ্‌বেল ধারা বাঙালিচিত্তের শুষ্ক নদীর রিক্ত পথে বান ডাকিয়ে বয়ে যাক, দুই কূল জাগুক পূর্ণ চেতনায়, ঘাটে ঘাটে উঠুক আনন্দধ্বনি।

ভাষণ : ফেব্রুয়ারি ১৯৩৩

শিক্ষা ও সংস্কৃতি

শিক্ষাবিধি সম্বন্ধে...আলোচনা করব স্থির করেছিলুম, ইতিমধ্যে কোনো-একটি আমেরিকান কাগজে এই বিষয়ে একটি প্রবন্ধ পড়লুম; পড়ে খুশি হয়েছি। আমার মতটি এই লেখায় ঠিকমত ব্যক্ত হয়েছে। হবার প্রধান কারণ এই, আমেরিকা দীর্ঘকাল থেকে বৈষয়িক সিদ্ধির নেশায় মেতে ছিল। সেই সিদ্ধির আয়তন ছিল অতি স্থূল, তার লোভ ছিল প্রকাণ্ড মাপের। এর ব্যাপ্তি ক্রমশ বেড়েই চলেছিল। তার ফলে সামাজিক মানুষের যে পূর্ণতা সেটা চাপা পড়ে গিয়ে বৈষয়িক মানুষের কৃতিত্ব সব ছাড়িয়ে উঠেছিল। আজ হঠাৎ সেই অতিকায় বৈষয়িক মানুষটি আপন সিদ্ধিপথের মাঝখানে অনেক দামের জটিল যানবাহনের চাকা ভেঙে, কল বিগ্‌ড়িয়ে, ধুলোয় কাত হয়ে পড়েছে। এখন তার ভাবনার কথা এই যে, সব ভাঙাচোরা বাদ দিয়ে মানুষটার বাকি রইল কী? এত কাল ধরে যা-কিছু সে গড়ে তুলছিল, যা-কিছুকে সে সর্বোচ্চ মূল্য দিয়েছিল, তার প্রায় সমস্তই বাইরের। বাইরে যখন ভাঙন ধরে তখন ভিতরটাতে যদি দেখে সমস্ত ফাঁক তা হলে সান্ত্বনা পাবে কী নিয়ে? আসবাবগুলো গেল, কিন্তু মানুষটা কোথায়? সে এই বলে শোক করছে যে, সে আজ ভিক্ষুক; বলতে পারছে না 'আমার অন্তরে সম্পদ আছে'। আজ তার মূল্য নেই; কেননা সে আপনাকে হাটের মানুষ করে তুলেছিল, সেই হাট গেছে ভেঙে।

একদিন ভারতবর্ষে যখন তার নিজের সংস্কৃতি ছিল পরিপূর্ণ তখন ধন-

লাঘবকে সে ভয় করত না, লজ্জা করত না; কেননা তার প্রধান লক্ষ্য ছিল অন্তরের দিকে। সেই লক্ষ্য নির্ণয় করা, অভ্যাস করা, তার শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করা শিক্ষার সর্বপ্রধান অঙ্গ। অবশ্য, তারই এক সীমানায় বৈষয়িক শিক্ষাকে স্থান দেওয়া চাই, কেননা মানুষের সত্তা ব্যবহারিক-পারমার্থিককে মিলিয়ে। সংস্কৃতির অভাব আছে অথচ দক্ষতা পুরোমাত্রায়, এমন খোঁড়া মানুষ চলেছিল বাইসিক্‌ল্‌ চড়ে। ভাবে নি কোনো চিন্তার কারণ আছে, এমন সময় বাইসিক্‌ল্‌ পড়ল ভেঙে। তখন বুঝল, বহুমূল্য যন্ত্রটার চেয়ে বিনা মূল্যের পায়ের দাম বেশি। যে মানুষ উপকরণ নিয়ে বড়াই করে সে জানে না আসলে সে কতই গরিব। বাইসিক্‌লের আদর কমাতে চাই নে, কিন্তু দুটো সজীব পায়ের আদর তার চেয়ে বেশি। যে শিক্ষায় এই সজীব পায়ের জীবনীশক্তিকে বাড়িয়ে তোলে তাকেই ধন্য বলি, যে শিক্ষায় প্রধানত আসবাবের প্রতিই মানুষকে নির্ভরশীল করে তোলে তাকে মূঢ়তার বাহন বলব।

যখন শান্তিনিকেতনে প্রথম বিদ্যালয় স্থাপন করি তখন এই লক্ষ্যটাই আমার মনে প্রবল ছিল। আসবাব জুটে গেলে তাকে ব্যবহার করার জন্যে সাধনার দরকার নেই, কিন্তু আসবাব-নিরপেক্ষ হয়ে কী করে বাহিরে কর্মকুশলতা ও অন্তরে আপন সম্মানবোধ রক্ষা করা যায় এইটেই শিক্ষাসাধ্য। তখন আশ্রমে গরিবের মতোই ছিল জীবনযাত্রা, সেই গরিবিয়ানাকে লজ্জা করাই লজ্জাকর এ কথাটা তখন মনে ছিল। উপকরণবানের জীবনকে ঈর্ষা করা বা বিশেষভাবে সম্মান করাই যে কুশিক্ষা, এ কথাটা আমি তখনকার শিক্ষকদের স্মরণ করিয়ে রেখেছিলুম।

বলা বাহুল্য, যে দারিদ্র্য শক্তিহীনতা থেকে উদ্ভূত সে কুৎসিত। কথা আছে : শক্তস্য ভূষণং ক্ষমা। তেমনি বলা যায়, সামর্থ্যবানেরই ভূষণ অকিঞ্চনতা। অতএব সামর্থ্য শিক্ষা করাই চাই ভোগের অভ্যাস বর্জন করে। সামর্থ্যহীন দারিদ্র্যেই ভারতবর্ষের মাথা হেঁট হয়ে গেছে, অকিঞ্চনতায় নয়। অক্ষমকে দেবতা ক্ষমা করেন না।

'আমি সব পারি, সব পারব' এই আত্মবিশ্বাসের বাণী আমাদের শরীর মন যেন তৎপরতার সঙ্গে বলতে পারে। 'আমি সব জানি' এই কথা বলবার জন্যে আমাদের ইন্দ্রিয় মন উৎসুক হয় তো হোক, কিন্তু তার পরেও চরমের কথা 'আমি সব পারি'। আজ এই বাণী সমস্ত য়ুরোপের। সে বলে, 'আমি সব পারি, সব পারব।' তার আপন ক্ষমতাকে শ্রদ্ধা করার অন্ত নেই। এই শ্রদ্ধার দ্বারা সে নির্ভীক হয়েছে, জলে স্থলে আকাশে সে জয়ী হয়েছে। আমরা দৈবের দিকে তাকিয়ে আছি, সেইজন্যে বহু শতাব্দী ধরে আমরা দৈবকর্তৃক প্রবঞ্চিত।

সুইডেনের বিখ্যাত ভূপর্যটক স্বেন হেডিনের ভ্রমণবৃত্তান্ত অনেক দিন পরে আবার আমি পড়েছিলুম। এসিয়ার দুর্গম মরুপ্রদেশে আবহতত্ত্ব পর্যবেক্ষণের উপায় করবার জন্যে তিনি দুঃসাধ্য অধ্যবসায়ে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। এই অধ্যবসায়ের মূলমন্ত্র হচ্ছে, 'আমি সব জানব, সব পারব।' এই পারবার শক্তি বলতে কী বোঝায় সে তাঁর বই পড়লে বোঝা যায়। আমরা কথায় কথায় ওদের বলে থাকি বস্তুতান্ত্রিক। আত্মার শক্তি যার এত প্রবল যে জ্ঞান-অর্জনের জন্যে সে প্রাণকে তুচ্ছ করে, যার কিছুতে ভয় নেই, সাংঘাতিক বাধাকে যে স্বীকার করে না, দুঃসহ কৃচ্ছ্রসাধনে যাকে পরাহত করতে পারে না— প্রাণপণ সাধনা এমন-কিছুর জন্যে যা আর্থিক নয়, জীবিকার পক্ষে যা অত্যাবশ্যক নয়, বরঞ্চ বিপরীত— তাকে বলব বস্তুতান্ত্রিক! আর, সে কথা বলবে আমাদের মতো দুর্বল-আত্মা!

'আমরা সব-কিছু পারব' এই কথা সত্য করে বলবার শিক্ষাই আত্মাবমাননা থেকে আমাদের দেশকে পরিত্রাণ করতে পারে, এ কথা ভুললে চলবে না। আমাদের বিদ্যালয়ে সকল কর্মে সকল ইন্দ্রিয়মনের তৎপরতা প্রথম হতেই অনুশীলিত হোক, এইটেই শিক্ষাসাধনার গুরুতর কর্তব্য বলে মনে করতে হবে। জানি এর প্রধান অন্তরায় অভিভাবক; পড়া মুখস্থ করতে করতে জীবনীশক্তি মননশক্তি কর্মশক্তি সমস্ত যতই কৃশ হতে থাকে তাতে বাধা দিতে গেলে তাঁরা উদ্‌বিগ্ন হয়ে ওঠেন। কিন্তু মুখস্থ বিদ্যার চাপে এই-সব চিরপঙ্গু মানুষের অকর্মণ্যতার বোঝা দেশ বহন করবে কী করে? উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ। আমাদের শিক্ষালয়ে নবীন প্রাণের মধ্যে অক্লান্ত উদ্যোগিতার হাওয়া বয়েছে যদি দেখতে পাই তা হলেই বুঝব, দেশে লক্ষ্মীর আমন্ত্রণ সফল হতে চলল। এই আমন্ত্রণ ইকনমিক্‌সে ডিগ্রি নেওয়ায় নয়; চরিত্রকে বলিষ্ঠ কর্মিষ্ঠ করায়, সকল অবস্থার জন্যে নিজেকে নিপুণভাবে প্রস্তুত করায়, নিরলস আত্মশক্তির উপর নির্ভর করে কর্মানুষ্ঠানের দায়িত্ব সাধনা করায়। অর্থাৎ কেবল পাণ্ডিত্যচর্চায় নয়, পৌরুষচর্চায়। সাধারণ ইস্কুলে এই সাধনার সুযোগ নেই, আমাদের আশ্রমে আছে। এখানে নানা বিভাগে নানা কর্ম চলছে, তার মধ্যে শক্তি প্রয়োগ করাতে পারে এমন ব্যবস্থা থাকা চাই।

এই কৃতিত্বশিক্ষা অত্যাবশ্যক হলেও এই-যে যথেষ্ট নয় সে কথা মানতে হবে। আমেরিকান লেখক এই কথাটারই আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন, আধুনিক শিক্ষা থেকে একটা জিনিস কেমন করে স্খলিত হয়ে পড়েছে, সে হচ্ছে সংস্কৃতি। চিত্তের ঐশ্বর্যকে অবজ্ঞা করে আমরা জীবনযাত্রার সিদ্ধিলাভকেই একমাত্র প্রাধান্য দিয়েছি। কিন্তু সংস্কৃতিকে বাদ দিয়ে এই সিদ্ধিলাভ কি কখনো যথার্থভাবে সম্পূর্ণ হতে পারে?

সংস্কৃতি সমগ্র মানুষের চিত্তবৃত্তিকে গভীরতর স্তর থেকে সফল করতে থাকে। তার প্রভাবে মানুষ অন্তর থেকে স্বতই সর্বাঙ্গীণ সার্থকতা লাভ করে। তার প্রভাবে নিষ্কাম জ্ঞানার্জনের অনুরাগ এবং নিঃস্বার্থ কর্মানুষ্ঠানের উৎসাহ স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। যথার্থ সংস্কৃতি জড়ভাবে প্রথাপালনের চেয়ে অকৃত্রিম সৌজন্যকে বড়ো মূল্য দিয়ে থাকে। মানুষের সঙ্গে ব্যবহারে কাজ উদ্ধার করবার উপযোগী বিনয়কৌশল তার অনুশাসন নয়; সংস্কৃতিবান্‌ মানুষ নিজের ক্ষতি করতে পারে, কিন্তু নিজেকে হেয় করতে পারে না। সে আড়ম্বরপূর্বক নিজেকে প্রচার করতে বা স্বার্থপরভাবে সবাইকে ঠেলে নিজেকে অগ্রসর করতে লজ্জা বোধ করে। যা-কিছু ইতর বা কপট তার গ্লানি তাকে বেদনা দেয়। শিল্পে সাহিত্যে মানুষের ইতিহাসে যা-কিছু শ্রেষ্ঠ তার সঙ্গে আন্তরিক পরিচয় থাকাতে সকল-প্রকার শ্রেষ্ঠতাকে সম্মান করতে সে আনন্দ পায়। সে বিচার করতে পারে, ক্ষমা করতে পারে, মতবিরোধের বাধা ভেদ করেও যেখানে যেটুকু ভালো আছে সে তা দেখতে পায়, অন্যের সফলতাকে ঈর্ষা করাকে সে নিজের লাঘব বলেই জানে।

সমগ্র মনুষ্যত্বের স্বকীয় আদর্শ প্রত্যেক বড়ো সমাজেই আছে। সেই আদর্শ কেবল পাঠাগারে নয়, পরিবারের মধ্যেও। আমাদের দেশে বর্তমান দুর্গতির দিনে সেই আদর্শ দুর্বল হয়ে গেছে, তার শোচনীয় দৃষ্টান্ত প্রতিদিন দেখতে পাই। তাই বীভৎস কুৎসা আমাদের দেশে আয়জনক পণ্যদ্রব্য হয়ে উঠেছে। তারস্বরে নিন্দা বিস্তার করে বাতাসকে বিষাক্ত করার অপরাধকে আমরা গ্রাহ্যই করি নে: একটু উপলক্ষ ঘটবা-মাত্র এই বীভৎসতাকে উদ্ভাবিত করার ও প্রশ্রয় দেবার লোক দলে দলে ভিড় করে আসে, ইতর হিংস্রতায় সমস্ত দেশ মারীগ্রস্ত হয়ে ওঠে। তীক্ষ্ণ

মেধার গুণে আমরা পড়া মুখস্থ করি; বিএ এমএ পাস করি: কিন্তু আত্মলাঘবকারী পরস্পরের সৌভাগ্যবিদ্বেষী নিন্দালোলুপ যে চরিত্রদৈন্য শুভকর্মে পরস্পর মিলিত হবার পথে পথে সচেষ্টভাবে কাঁটার বীজ বপন করে চলেছে, সকল প্রকার সদনুষ্ঠানকে জীর্ণ বিদীর্ণ করে দেবার জন্যে মহোল্লাসে উঠে পড়ে লেগেছে, সে কেবল সংস্কৃতির অভাবে মনুষ্যত্বের আদর্শ ক্ষুণ্ন হয়েছে বলেই সম্ভব হল। সকল কর্মানুষ্ঠানে উৎসাহপূর্বক নিজেদেরকে অকৃতার্থ করে আজ বাঙালি সমস্ত পৃথিবীর কাছে অশ্রদ্ধেয় হয়ে উঠল। শিশুকাল থেকে এই ইতরতার বিষবীজ শিক্ষার ভিতর দিয়ে উন্মূলিত করা আমাদের বিদ্যালয়ের সর্বপ্রধান লক্ষ্য হোক, এই আমি একান্ত মনে কামনা করি। এর একমাত্র উপায় হচ্ছে পরীক্ষা-পাসের জন্যে পড়া মুখস্থ করা নয়, মানুষের ইতিহাসে যা-কিছু ভালো তার সঙ্গে আনন্দময় পরিচয়সাধন করিয়ে তার প্রতি শ্রদ্ধা অনুভব করবার সুযোগ সর্বদা ঘটিয়ে দেওয়া। একদা আশ্রমে আমার কবিসহযোগী সতীশ রায় এই কাজ করতেন এবং আর-একজন সহযোগী ছিলেন অজিত চক্রবর্তী। তেমন শিক্ষক নিঃসন্দেহ এখনো আমাদের মধ্যে আছেন, কিন্তু রক্তপিপাসু পরীক্ষাদানবের কাছে শিশুদের মন বলি দিতে তাঁদের এত অত্যন্ত ব্যস্ত থাকতে হয় যে শিক্ষার উপরের তলায় ওঠবার সময় থাকে না।

আমেরিকান লেখক সংস্কৃতির এই ফলশ্রুতি বর্ণনা করেছেন; তিনি বলেন, সংস্কৃতির প্রভাবে চিত্তের সেই ঔদার্য ঘটে যাতে করে অন্তঃকরণে শান্তি আসে, আপনার প্রতি শ্রদ্ধা আসে, আত্মসংযম আসে এবং মনে মৈত্রীভাবের সঞ্চার হয়ে জীবনের প্রত্যেক অবস্থাকেই কল্যাণময় করে।

একদিন দেখেছিলেম, শান্তিনিকেতনের পথে গোরুর গাড়ির চাকা কাদায় বসে গিয়েছিল; আমাদের ছাত্ররা সকলে মিলে ঠেলে গাড়ি উদ্ধার করে দিলে। সেদিন কোনো অভ্যাগত আশ্রমে যখন উপস্থিত হলেন তাঁর মোট বয়ে আনবার কুলি ছিল না; আমাদের কোনো তরুণ ছাত্র অসংকোচে তাঁর বোঝা পিঠে করে নিয়ে যথাস্থানে এনে পৌঁছিয়ে দিয়েছিল। অপরিচিত অতিথিমাত্রের সেবা ও আনুকূল্য তারা কর্তব্য বলে জ্ঞান করত। সেদিন তারা আশ্রমের পথ নির্মাণ করেছে, গর্ত বুজিয়ে দিয়েছে। এ-সমস্তই তাদের সতর্ক ও বলিষ্ঠ সৌজন্যের অঙ্গ ছিল, বইয়ের পাতা অতিক্রম করে তাদের শিক্ষার মধ্যে সংস্কৃতি প্রবেশ করেছিল। সেই-সব ছেলেদের প্রত্যেককে তখন আমি জানতেম; তার পরে অনেক দিন তাদের অনেককে দেখি নি। আশা করি, তারা নিন্দাবিলাসী নয়, পরশ্রীকাতর নয়; অক্ষমকে সাহায্য করতে তারা তৎপর এবং ভালোকে তারা ঠিকমত যাচাই করতে জানে। ১৫ জুলাই ১৯৩৫

শ্রাবণ ১৩৪২

শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ

আমাদের দেশের আর্থিক দারিদ্র্য দুঃখের বিষয়, লজ্জার বিষয় আমাদের দেশের শিক্ষার অকিঞ্চিৎকরত্ব। এই অকিঞ্চিৎকরত্বের মূলে আছে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার অস্বাভাবিকতা, দেশের মাটির সঙ্গে এই ব্যবস্থার বিচ্ছেদ। চিত্ত-বিকাশের যে আয়োজনটা স্বভাবতই সকলের চেয়ে আপন হওয়া উচিত ছিল সেইটেই রয়েছে সব

চেয়ে পর হয়ে—তার সঙ্গে আমাদের দাড়ির যোগ হয়েছে, নাড়ীর যোগ হয় নি; এর ব্যর্থতা আমাদের স্বজাতিক ইতিহাসের শিকড়কে জীর্ণ করছে, খর্ব করে দিচ্ছে সমস্ত জাতির মানসিক পরিবৃদ্ধিকে। দেশের বহুবিধ অতিপ্রয়োজনীয় বিধিব্যবস্থায় অনাত্মীয়তার দুঃসহ ভার অগত্যাই চেপে রয়েছে; আইন আদালত, সকলপ্রকার সরকারি কার্যবিধি, যা বহুকোটি ভারতবাসীর ভাগ্য চালনা করে, তা সেই বহুকোটি ভারতবাসীর পক্ষে সম্পূর্ণ দুর্বোধ, দুর্গম। আমাদের ভাষা, আমাদের আর্থিক অবস্থা, আমাদের অনিবার্য অশিক্ষার সঙ্গে রাষ্ট্রশাসনবিধির বিপুল ব্যবধান-বশত পদে পদে যে দুঃখ ও অপব্যয় ঘটে তার পরিমাণ প্রভূত। তবু বলতে পারি 'এহ বাহ্য'। কিন্তু শিক্ষাব্যাপার দেশের প্রাণগত আপন জিনিস না হওয়া তার চেয়ে মর্মান্তিক। ল্যাবরেটরিতে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় উদ্ভাবিত কৃত্রিম অন্নে দেশের পেট ভরাবার মতো সেই চেষ্টা; অতি অল্পসংখ্যক পেটেই সেটা পৌঁছয়, এবং সেটাকে সম্পূর্ণ রক্তে পরিণত করবার শক্তি অতি অল্প পাকযন্ত্রেরই থাকে। দেশের চিত্তের সঙ্গে দেশের শিক্ষার এই দূরত্ব এবং সেই শিক্ষার অপমানজনক স্বল্পতা দীর্ঘকাল আমাকে বেদনা দিয়েছে; কেননা নিশ্চিত জানি সকল পরাশ্রয়তার চেয়ে ভয়াবহ—শিক্ষায় পরধর্ম। এ সম্বন্ধে বরাবর আমি আলোচনা করেছি, আবার তার পুনরুক্তি করতে প্রবৃত্ত হলেম; যেখানে ব্যথা সেখানে বারবার হাত পড়ে। আমার এই প্রসঙ্গে পুনরুক্তি অনেকেই হয়তো ধরতে পারবেন না; কেননা অনেকেরই কানে আমার সেই পুরোনো কথা পৌঁছয় নি। যাঁদের কাছে পুনরুক্তি ধরা পড়বে তাঁরা যেন ক্ষমা করেন। কেননা আজ আমি দুঃখের কথা বলতে এসেছি, নূতন কথা বলতে আসি নি। আমাদের দেশে ম্যালেরিয়া যেমন নিত্যই আপনার পুনরাবৃত্তি করতে থাকে, আমাদের দেশের সকল সাংঘাতিক দুঃখগুলির সেই দশা। ম্যালেরিয়া অপ্রতিহার্য নয় এ কথায় যাদের নিশ্চিত বিশ্বাস তাদেরই অজেয় ইচ্ছা ও প্রবল অধ্যবসায়ের কাছে ম্যালেরিয়া দৈববিহিত দুর্যোগের ছদ্মবেশ ঘুচিয়ে দিয়ে বিদায় গ্রহণ করে। অন্যশ্রেণীয় দুঃখও নিজের পৌরুষের দ্বারা প্রতিহত হতে পারে এই বিশ্বাসের দোহাই পাড়বার কর্তব্যতা স্মরণ করে অপটু দেহ নিয়ে আজ এসেছি।

একদা একজন অব্যবসায়ী ভদ্রসন্তান তার চেয়ে আনাড়ি এক ব্যক্তির বাড়ি তৈরি করবার ভার নিয়েছিলেন। মাল-মশলার জোগাড় হয়েছিল সেরা দরের; ইমারতের গাঁথুনি হয়েছিল মজবুত; কিন্তু কাজ হয়ে গেলে প্রকাশ পেল, সিঁড়ির কথাটা কেউ ভাবেই নি। শনির চক্রান্তে এমনতরো পৌরব্যবস্থা যদি কোনো রাজ্যে থাকে যেখানে এক-তলার লোকের নিত্যবাস এক-তলাতেই আর দোতলার লোকের দোতলায়, তবে সেখানে সিঁড়ির কথাটা ভাবা নিতান্তই বাহুল্য। কিন্তু আলোচিত পূর্বোক্ত বাড়িটাতে সিঁড়িযোগে ঊর্ধ্বপথযাত্রায় একতলার প্রয়োজন ছিল; এই ছিল তার উন্নতিলাভের একমাত্র উপায়।

এ দেশে শিক্ষা-ইমারতে সিঁড়ির সংকল্প গোড়া থেকেই আমাদের রাজমিস্ত্রির প্ল্যানে ওঠে নি। নিচের তলাটা উপরের তলাকে নিঃস্বার্থ ধৈর্যে শিরোধার্য করে নিয়েছে: তার ভার বহন করেছে, কিন্তু সুযোগ গ্রহণ করে নি; দাম জুগিয়েছে, মাল আদায় করে নি।

আমার পূর্বকার লেখায় এ দেশের সিঁড়িহারা শিক্ষাবিধানে এই মস্ত ফাঁকটার উল্লেখ করেছিলুম। তা নিয়ে কোনো পাঠকের মনে কোনো-যে উদ্‌বেগ ঘটেছে তার প্রমাণ পাওয়া যায় না। তার কারণ, অভ্রভেদী বাড়িটাই আমাদের অভ্যস্ত,

তার গৌরবে আমরা অভিভূত, তার বুকের কাছটাতে উপর-নিচে সম্বন্ধস্থাপনের যে সিঁড়ির নিয়মটা ভদ্র নিয়ম সেটাতে আমাদের অভ্যাস হয় নি। সেইজন্যেই ইতিপূর্বে আমার আলোচ্য বিষয়টা হয়তো সেলাম পেয়ে থাকবে, কিন্তু আসন পায় নি। তবু আর-একবার চেষ্টা দেখতে দোষ নেই, কেননা ভিতরে ভিতরে কখন যে দেশের মনে হাওয়া বদল হয় পরীক্ষা না করে তা বলা যায় না।

শিক্ষা সম্বন্ধে সব চেয়ে স্বীকৃত এবং সব চেয়ে উপেক্ষিত কথাটা এই যে, শিক্ষা জিনিসটি জৈব, ওটা যান্ত্রিক নয়। এর সম্বন্ধে কার্যপ্রণালীর প্রসঙ্গ পরে আসতে পারে, কিন্তু প্রাণক্রিয়ার প্রসঙ্গ সর্বাগ্রে। ইন্‌ক্যুবেটর যন্ত্রটা সহজ নয় বলেই কৌশল এবং অর্থব্যয়ের দিক থেকে তার বিবরণ শুনতে খুব মস্ত; কিন্তু মুর্গির জীবধর্মানুগত ডিম-পাড়াটা সহজ বলেই বেশি কথা জোড়ে না, তবু সেটাই অগ্রগণ্য।

বেঁচে থাকার নিয়ত ইচ্ছা ও সাধনাই হচ্ছে বেঁচে থাকার প্রকৃতিগত লক্ষণ। যে সমাজে প্রাণের জোর আছে সে সমাজ টিকে থাকবার স্বাভাবিক গরজেই আত্মরক্ষাঘটিত দুটি সর্বপ্রধান প্রয়োজনের দিকে অক্লান্তভাবে সজাগ থাকে, অন্ন আর শিক্ষা, জীবিকা আর বিদ্যা। সমাজের উপরের থাকের লোক খেয়ে-পরে পরিপুষ্ট থাকবে আর নিচের থাকের লোক অর্ধাশনে বা অনশনে বাঁচে কি মরে সে সম্বন্ধে সমাজ থাকবে অচেতন, এটাকে বলা যায় অর্ধাঙ্গের পক্ষাঘাত। এই অসাড়তার ব্যামোটা বর্বরতার ব্যামো।

পশ্চিম-মহাদেশে আজ সর্বব্যাপী অর্থসংকটের সঙ্গে সঙ্গে অন্নসংকট প্রবল হয়েছে। এই অভাব-নিবারণের জন্যে সেখানকার বিদ্বানের দল এবং গবর্মেণ্ট যেরকম অসামান্য দাক্ষিণ্য প্রকাশ করছেন সেরকম উদ্‌বেগ এবং চেষ্টা আমাদের বহুসহিষ্ণু বুভুক্ষার অভিজ্ঞতায় সম্পূর্ণ অপরিচিত। এ নিয়ে বড়ো বড়ো অঙ্কের ঋণ স্বীকার করতেও তাঁদের সংকোচ দেখি নে। আমাদের দেশে দু বেলা দু মুঠো খেতে পায় অতি অল্প লোক, বাকি বারো-আনা লোক আধপেটা খেয়ে ভাগ্যকে দায়ী করে এবং জীবিকার কৃপণ পথ থেকে মৃত্যুর উদার পথে সরে পড়তে বেশি দেরি করে না। এর থেকে যে নির্জীবতার সৃষ্টি হয়েছে তার পরিমাণ কেবল মৃত্যুসংখ্যার তালিকা দিয়ে নিরূপিত হতে পারে না। নিরুৎসাহ অবসাদ অকর্মণ্যতা রোগপ্রবণতা মেপে দেখবার প্রত্যক্ষ মানদণ্ড যদি থাকত তা হলে দেখতে পেতুম এ দেশের এক প্রান্ত থেকে আর-এক প্রান্ত জুড়ে প্রাণকে ব্যঙ্গ করছে মৃত্যু: সে অতি কুৎসিত দৃশ্য, অত্যন্ত শোচনীয়। কোনো স্বাধীন সভ্য দেশ মৃত্যুর এরকম সর্বনেশে নাট্যলীলা নিশ্চেষ্টভাবে স্বীকার করতেই পারে না, আজ তার প্রমাণ ভারতের বাইরে নানা দিক থেকেই পাচ্ছি।

শিক্ষা সম্বন্ধেও সেই একই কথা। শিক্ষার অভিসেচনক্রিয়া সমাজের উপরের স্তরকেই দুই-এক ইঞ্চি মাত্র ভিজিয়ে দেবে আর নিচের স্তরপরম্পরা নিত্যনীরস কাঠিন্যে সুদূরপ্রসারিত মরুময়তাকে ক্ষীণ আবরণে ঢাকা দিয়ে রাখবে, এমন চিত্তঘাতী সুগভীর মূর্খতাকে কোনো সভ্য সমাজ অলসভাবে মেনে নেয় নি। ভারতবর্ষকে মানতে বাধ্য করেছে আমাদের যে নির্মম ভাগ্য তাকে শতবার ধিক্কার দিই।

এমন কোনো কোনো গ্রহ উপগ্রহ আছে যার এক অর্ধেকের সঙ্গে অন্য অর্ধেকের চিরস্থায়ী বিচ্ছেদ; সেই বিচ্ছেদ আলোক-অন্ধকারের বিচ্ছেদ। তাদের একটা পিঠ সূর্যের অভিমুখে, অন্য পিঠ সূর্যবিমুখ। তেমনি করে যে সমাজের

এক অংশে শিক্ষার আলোক পড়ে, অন্য বৃহত্তর অংশ শিক্ষাবিহীন, সে সমাজ আত্মবিচ্ছেদের অভিশাপে অভিশপ্ত। সেখানে শিক্ষিত-অশিক্ষিতের মাঝখানে অসূর্যম্পশ্য অন্ধকারের ব্যবধান। দুই ভিন্নজাতীয় মানুষের চেয়েও এদের চিত্তের ভিন্নতা আরও বেশি প্রবল। একই নদীর এক পারের স্রোত ভিতরে ভিতরে অন্য পারের স্রোতের বিরুদ্ধ দিকে চলছে; সেই উভয় বিরুদ্ধের পার্শ্ববর্তিতাই এদের দূরত্বকে আরও প্রবলভাবে প্রমাণিত করে।

শিক্ষার ঐক্য-যোগে চিত্তের ঐক্য-রক্ষাকে সভ্য সমাজ মাত্রই একান্ত অপরিহার্য বলে জানে। ভারতের বাইরে নানা স্থানে ভ্রমণ করেছি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য মহাদেশে। দেখে এসেছি, এসিয়ায় নবজাগরণের যুগে সর্বত্রই জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাপ্রচারের দায়িত্ব একান্ত আগ্রহের সঙ্গে স্বীকৃত। বর্তমান যুগের সঙ্গে যে-সব দেশ চিত্তের ও বিত্তের আদানপ্রদান বুদ্ধিবিচারের সঙ্গে চালনা করতে না পারবে তারা কেবলই হঠে যাবে, কোণ-ঠেসা হয়ে থাকবে, এই শঙ্কার কারণ দূর করতে কোনো ভদ্র দেশ অর্থাভাবের কৈফিয়ত মানে নি। আমি যখন রাশিয়ায় গিয়েছিলুম তখন সেখানে আট বছর মাত্র নূতন স্বরাজতন্ত্রের প্রবর্তন হয়েছে; তার প্রথম ভাগে অনেক কাল বিদ্রোহে বিপ্লবে দেশ ছিল শান্তিহীন, অর্থসচ্ছলতা ছিলই না। তবু এই স্বল্পকালেই রাশিয়ার বিরাট রাজ্যে প্রজাসাধারণের মধ্যে যে অদ্ভুত দ্রুতগতিতে শিক্ষাবিস্তার হয়েছে সেটা ভাগ্যবঞ্চিত ভারতবাসীর কাছে অসাধ্য ইন্দ্রজাল বলেই মনে হল।

শিক্ষার ঐক্য-সাধন ন্যাশনাল ঐক্য-সাধনের মূলে, এই সহজ কথা সুস্পষ্ট করে বুঝতে আমাদের দেরি হয়েছে তারও কারণ আমাদের অভ্যাসের বিকার। একদা মহাত্মা গোখ্‌লে যখন সার্বজনিক অবশ্যশিক্ষা প্রবর্তনে উদ্যোগী হয়েছিলেন তখন সব চেয়ে বাধা পেয়েছিলেন বাংলাপ্রদেশের কোনো কোনো গণ্যমান্য লোকের কাছ থেকেই। অথচ, রাষ্ট্রীয় ঐক্যের আকাঙ্ক্ষা এই বাংলাদেশেই সব চেয়ে মুখর ছিল। শিক্ষার অনৈক্যে বিজড়িত থেকেও রাষ্ট্রিক উন্নতির পথে এগিয়ে চলা সম্ভবপর এই কল্পনা এ প্রদেশের মনে বাধা পায় নি, এই অনৈক্যের অভ্যাস এমনিই ছিল মজ্জাগত। অভ্যাসে চিন্তার যে জড়ত্ব আনে আমাদের দেশে তার আর-একটা দৃষ্টান্ত ঘরে ঘরেই আছে। আহারে কুপথ্য বাঙালির প্রাত্যহিক, বাঙালির মুখরোচক; সেটা আমাদের কাছে এতই সহজ হয়ে গেছে যে, যখন দেহটার আধমরা দশা বিচার করি তখন ডাক্তারের কথা ভাবি, ওষুধের কথা ভাবি, হাওয়া-বদলের কথা ভাবি, তুকতাক-মন্ত্রতন্ত্রের কথা ভাবি, এমন-কি বিদেশী শাসনকেও সন্দেহ করি, কিন্তু পথ্যসংস্কারের কথা মনেও আসে না। নৌকোটার নোঙর থাকে মাটি আঁকড়িয়ে, সেটা চোখে পড়ে না; মনে করি পালটা ছেঁড়া বলেই পারঘাটে পৌঁছনো হচ্ছে না।

আমার কথার জবাবে এমন তর্ক হয়তো উঠবে, আমাদের দেশে সমাজ পূর্বেও তো সজীব ছিল, আজও একেবারে মরে নি— তখনো কি আমাদের দেশ শিক্ষায় অশিক্ষায় যেন জলে স্থলে বিভক্ত ছিল না? তখনকার টোলে চতুষ্পাঠীতে তর্কশাস্ত্র ব্যাকরণশাস্ত্রের যে প্যাঁচ-কষাকষি চলত সে তো ছিল পণ্ডিত পালোয়ানদের ওস্তাদি-আখড়াতেই বদ্ধ; তার বাইরে যে বৃহৎ দেশটা ছিল সেও কি সর্বত্র ঐরকম পালোয়ানি কায়দায় তাল ঠুকে পাঁয়তারা করে বেড়াত? যা ছিল বিদ্যানামধারী পরিণত গজের বপ্রক্রীড়া সেই দিগ্‌গজ পাণ্ডিতি তো তার শুঁড় আস্ফালন করে নি দেশের ঘরে ঘরে। কথাটা মেনে নিলুম। বিদ্যার যে আড়ম্বর, নিরবচ্ছিন্ন

পাণ্ডিত্য, সকল দেশেই সেটা প্রাণের ক্ষেত্র থেকে দূরবর্তী। পাশ্চাত্য দেশেও স্থূলপদাবিক্ষেপে তার চলন আছে, তাকে বলে পেডান্ট্রি। আমার বক্তব্য এই যে, এ দেশে একদা বিদ্যার যে ধারা সাধনার দুর্গম তুঙ্গ শৃঙ্গ থেকে নির্ঝরিত হত সেই একই ধারা সংস্কৃতিরূপে দেশকে সকল স্তরেই অভিষিক্ত করেছে। এজন্যে যান্ত্রিক নিয়মে এডুকেশন ডিপার্ট্‌মেন্‌টে কারখানাঘর বানাতে হয় নি; দেহে যেমন প্রাণশক্তির প্রেরণায় মোটা ধমনীর রক্তধারা নানা আয়তনের বহুসংখ্যক শিরা-উপশিরা-যোগে সমস্ত দেহে অঙ্গপ্রত্যঙ্গে প্রবাহিত হতে থাকে তেমনি করেই আমাদের দেশের সমস্ত সমাজদেহে একই শিক্ষা স্বাভাবিক প্রাণপ্রক্রিয়ায় নিরন্তর সঞ্চারিত হয়েছে— নাড়ীর বাহনগুলি কোনোটা-বা স্থূল, কোনোটা-বা অতি সূক্ষ্ম, কিন্তু তবু তারা এক কলেবর-ভুক্ত নাড়ী, এবং রক্তও একই প্রাণ-ভরা রক্ত।

অরণ্য যে মাটি থেকে প্রাণরস শোষণ করে বেঁচে আছে সেই মাটিকে আপনিই প্রতিনিয়ত প্রাণের উপাদান অজস্র জুগিয়ে থাকে। তাকে কেবলই প্রাণময় করে তোলে। উপরের ডালে যে ফল সে ফলায় নিচের মাটিতে তার আয়োজন তার নিজকৃত। অরণ্যের মাটি তাই হয়ে ওঠে আরণ্যিক, নইলে সে হত বিজাতীয় মরু। যেখানে মাটিতে সেই উদ্‌ভিদসার পরিব্যাপ্ত নয় সেখানে গাছপালা বিরল হয়ে জন্মায়, উপবাসে বেঁকেচুরে শীর্ণ হয়ে থাকে। আমাদের সমাজের বনভূমিতে একদিন উচ্চশীর্ষ বনস্পতির দান নিচের ভূমিতে নিত্যই বর্ষিত হত। আজ দেশে যে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তিত হয়েছে মাটিকে সে দান করেছে অতি সামান্য; ভূমিকে সে আপন উপাদানে উর্বরা করে তুলছে না। জাপান প্রভৃতি দেশের সঙ্গে আমাদের এই প্রভেদটাই লজ্জাজনক এবং শোকাবহ। আমাদের দেশ আপন শিক্ষার ভূমিকাসৃষ্টি সম্বন্ধে উদাসীন। এখানে দেশের শিক্ষা এবং দেশের বৃহৎ মন পরস্পরবিচ্ছিন্ন। সেকালে আমাদের দেশের মস্ত মস্ত শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের সঙ্গে নিরক্ষর গ্রামবাসীর মনঃপ্রকৃতির বৈপরীত্য ছিল না। সেই শাস্ত্রজ্ঞানের প্রতি তাদের মনের অভিমুখিতা তৈরি হয়ে গিয়েছিল; সেই ভোজে অর্ধভোজন তাদের ছিল নিত্য, কেবল ঘ্রাণে নয়, উদ্‌বৃত্ত-উপভোগে।

কিন্তু সায়ান্সে-গড়া পাশ্চাত্যবিদ্যার সঙ্গে আমাদের দেশের মনের যোগ হয় নি; জাপানে সেটা হয়েছে পঞ্চাশ বছরের মধ্যে, তাই পাশ্চাত্যশিক্ষার ক্ষেত্রে জাপান স্বরাজের অধিকারী। এটা তার পাস-করা বিদ্যা নয়, আপনকরা বিদ্যা। সাধারণের কথা ছেড়ে দেওয়া যাক্‌, সায়ান্সে ডিগ্রি-ধারী পণ্ডিত এ দেশে বিস্তর আছে যাদের মনের মধ্যে সায়ান্সের জমিনটা তল্‌তলে; তাড়াতাড়ি যা-তা বিশ্বাস করতে তাদের অসাধারণ আগ্রহ, মেকি সায়ান্সের মন্ত্র পড়িয়ে অন্ধ সংস্কারকে তারা সায়ান্সের জাতে তুলতে কুণ্ঠিত হয় না। অর্থাৎ, শিক্ষার নৌকোতে বিলিতি দাঁড় বসিয়েছি, হাল লাগিয়েছি, দেখতে হয়েছে ভালো, কিন্তু সমস্ত নদীটার স্রোত উল্টো দিকে— নৌকো পিছিয়ে পড়ে আপনিই। আধুনিক কালে বর্বর দেশের সীমানার বাইরে ভারতবর্ষই একমাত্র দেশ যেখানে শতকরা আট-দশ জনের মাত্র অক্ষরপরিচয় আছে। এমন দেশে ঘটা করে বিদ্যাশিক্ষার আলোচনা করতে লজ্জা বোধ করি। দশ জন মাত্র যার প্রজা তার রাজত্বের কথাটা চাপা দেওয়াই ভালো। বিশ্ববিদ্যালয় অক্‌স্‌ফোর্ডে আছে, কেম্‌ব্রিজে আছে, লন্‌ডনে আছে। আমাদের দেশেও স্থানে স্থানে আছে, পূর্বোক্তের সঙ্গে এদের ভাবভঙ্গী ও বিশেষণের মিল দেখে আমরা মনে করে বসি, এরা পরস্পরের সবর্ণ; যেন ওটিন ক্রিম ও পাউডার মাখলেই মেমসাহেবের সঙ্গে সত্যসত্যই বর্ণভেদ ঘুচে যায়। বিশ্ববিদ্যালয় যেন তার ইমারতের

দেওয়াল এবং নিয়মাবলীর পাকা প্রাচীরের মধ্যেই পর্যাপ্ত। অক্‌স্‌ফোর্ড কেম্‌ব্রিজ বলতে শুধু ঐটুকুই বোঝায় না, তার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত শিক্ষিত ইংলন্‌ড্‌কেই বোঝায়। সেইখানেই তারা সত্য, তারা মরীচিকা নয়। আর আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় হঠাৎ থেমে গেছে তার আপন পাকা প্রাচীরের তলাটাতেই। থেমে যে গেছে সে কেবল বর্তমানের অসমাপ্তি-বশত নয়। এখনো বয়স হয় নি বলে যে মানুষটি মাথায় খাটো তার জন্যে আক্ষেপ করবার দরকার নেই, কিন্তু যার ধাতের মধ্যেই সম্পূর্ণ বাড়বার জৈবধর্ম নেই তাকে যেন গ্রেনেডিয়ারের স্বজাতীয় বলে কল্পনা না করি।

গোড়ায় যাঁরা এ দেশে তাঁদের রাজতন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাব্যবস্থার পত্তন করেছিলেন, দেখতে পাই, তাঁদেরও উত্তরাধিকারীরা বাইরের আসবাব এবং ইঁট-কাঠ-চুন-সুরকির প্যাটার্ন্‌ দেখিয়ে আমাদের এবং নিজেদেরকে ভোলাতে আনন্দ বোধ করেন। কিছুকাল পূর্বে একদিন কাগজে পড়েছিলুম, অন্য-এক প্রদেশের রাজ্যসচিব বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত-পত্তনের সময় বলেছিলেন যে, যারা বলে ইমারতের বাহুল্যে আমরা শিক্ষার সম্বল খর্ব করি তারা অবুঝ, কেননা শিক্ষা তো কেবল জ্ঞানলাভ নয়, ভালো দালানে বসে পড়াশুনো করা সেও একটা শিক্ষা। অর্থাৎ ক্লাসে বড়ো অধ্যাপকের চেয়ে বড়ো দেওয়ালটা বেশি বৈ কম নয়। আমাদের নালিশ এই যে, তলোয়ারটা যেখানে তালপাতার চেয়ে বেশি দামি করা অর্থাভাববশত অসম্ভব বলে সংবাদ পাই সেখানে তার খাপটাকে ইস্পাত দিয়ে বাঁধিয়ে দিলে আসল কাজ এগোয় না। তার চেয়ে ঐ ইস্পাতটাকে গলিয়ে একটা চলনসই গোছের ছুরি বানিয়ে দিলেও কতকটা সান্ত্বনার আশা থাকে।

আসল কথা, প্রাচ্য দেশে মূল্যবিচারের যে আদর্শ তাতে আমরা উপকরণকে অমৃতের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার দরকার বোধ করি নে। বিদ্যা জিনিসটি অমৃত, ইঁটকাঠের দ্বারা তার পরিমাপের কথা আমাদের মনেই হয় না। আন্তরিক সত্যের দিকে যা বড়ো বাহ্য রূপের দিকে তার আয়োজন আমাদের বিচারে না হলেও চলে। অন্তত, এতকাল সেইরকমই আমাদের মনের ভাব ছিল। বস্তুত, আমাদের দেশের প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় আজও আছে বারাণসীতে। অত্যন্ত সত্য, নিতান্ত স্বাভাবিক, অথচ মস্ত করে চোখে পড়ে না। এ দেশের সনাতন সংস্কৃতির মূল উৎস সেইখানেই, কিন্তু তার সঙ্গে না আছে ইমারত, না আছে অতিজটিল ব্যয়সাধ্য ব্যবস্থাপ্রণালী। সেখানে বিদ্যাদানের চিরন্তন ব্রত দেশের অন্তরের মধ্যে অলিখিত অনুশাসনে লেখা। বিদ্যাদানের পদ্ধতি, তার নিঃস্বার্থ নিষ্ঠা, তার সৌজন্য, তার সরলতা, গুরুশিষ্যের মধ্যে অকৃত্রিম হৃদ্যতার সম্বন্ধ, সর্বপ্রকার আড়ম্বরকে উপেক্ষা করে এসেছে— কেননা, সত্যেই তার পরিচয়। প্রাচ্য দেশের কারিগররা যেরকম অতি সামান্য হাতিয়ার দিয়ে অতি অসামান্য শিল্পদ্রব্য তৈরি করে থাকে পাশ্চাত্ত্য বুদ্ধি তা কল্পনা করতে পারে না। যে নৈপুণ্যটি ভিতরের জিনিস তার বাহন প্রাণে এবং মনে। বাইরের স্থূল উপাদানটি অত্যন্ত হয়ে উঠলে আসল জিনিসটি চাপা পড়ে।

দুর্ভাগ্যক্রমে এই সহজ কথাটা আমরাই আজকাল পাশ্চাত্ত্যের চেয়েও কম বুঝি। গরিব যখন ধনীকে মনে মনে ঈর্ষা করে তখন এইরকমই বুদ্ধিবিকার ঘটে। কোনো অনুষ্ঠানে যখন আমরা পাশ্চাত্ত্যের অনুকরণ করি তখন ইঁটকাঠের বাহুল্যে এবং যন্ত্রের চক্রে উপচক্রে নিজেকে ও অন্যকে ভুলিয়ে গৌরব করা সহজ। আসল জিনিসের কার্পণ্যে এইটেরই দরকার হয় বেশি। আসলের চেয়ে নকলের সাজসজ্জা স্বভাবতই যায় বাহুল্যের দিকে। প্রত্যহই দেখতে পাই, পূর্বদেশে জীবনসমস্যার

আমরা যে সহজ সমাধান করেছিলুম তার থেকে কেবলই আমরা স্খলিত হচ্ছি। তার ফলে হল এই যে, আমাদের অবস্থাটা রয়ে গেল পূর্ববৎ, এমন-কি তার চেয়ে কয়েক ডিগ্রি নিচের দিকে, অথচ আমাদের মেজাজটা ধার করে এনেছি অন্য দেশ থেকে যেখানে সমারোহের সঙ্গে তহবিলের বিশেষ আড়াআড়ি নেই।

মনে করে দেখো-না—এ দেশে বহুরোগজর্জর জনসাধারণের আরোগ্য বিধানের জন্যে রিক্ত রাজকোষের দোহাই দিয়ে ব্যয়সংকোচ করতে হয়, দেশজোড়া অতিবিরাট মূর্খতার কালিমা যথোচিত পরিমার্জন করতে অর্থে কুলোয় না, অর্থাৎ যে-সব অভাবে দেশ অন্তরে-বাহিরে মৃত্যুর তলায় তলাচ্ছে তার প্রতিকারের অতি ক্ষীণ উপায় দেউলে দেশের মতোই; অথচ এ দেশে শাসনব্যবস্থায় ব্যয়ের অজস্র প্রাচুর্য একেবারেই দরিদ্র দেশের মতো নয়। তার ব্যয়ের পরিমাণ স্বয়ং পাশ্চাত্ত্য ধনী দেশকেও অনেক দূরে এগিয়ে গেছে। এমন-কি বিদ্যাবিভাগের সমস্ত বাহ্য ঠাট বজায় রাখবার ব্যয় বিদ্যা-পরিবেষণের চেয়ে বেশি। অর্থাৎ গাছের পাতাকে দর্শনধারী আকারে ঝাঁকড়া করে তোলবার খাতিরে ফল ফলাবার রস-জোগানে টানাটানি চলেছে। তা হোক, এর এই বাইরের দিকের অভাবের চেয়ে এর মর্মগত গুরুতর অভাবটাই সব চেয়ে দুশ্চিন্তার বিষয়। সেই কথাটাই বলতে চাই। সেই অভাবটা শিক্ষার যথাযোগ্য আধারের অভাব।

আজকালকার অস্ত্রচিকিৎসায় অঙ্গপ্রত্যঙ্গে বাইরে থেকে জোড়া লাগাবার কৌশল ক্রমশই উৎকর্ষ লাভ করছে। কিন্তু বাইরে-থেকে-জোড়-লাগা জিনিসটা সমস্ত কলেবরের সঙ্গে প্রাণের মিলে মিলিত না হলে সেটাকে সুচিকিৎসা বলে না। তার ব্যান্ডেজ-বন্ধনের উত্তরোত্তর প্রভূত পরিস্ফীতি দেখে স্বয়ং রোগীর মনেও গর্ব এবং তৃপ্তি হতে পারে, কিন্তু মুমূর্ষু প্রাণপুরুষের এতে সান্ত্বনা নেই। শিক্ষা সম্বন্ধে এই কথাটা পূর্বেই বলেছি। বলেছি, বাইরের থেকে আহরিত শিক্ষাকে সমস্ত দেশ যতক্ষণ আপন করতে না পারবে ততক্ষণ তার বাহ্য উপকরণের দৈর্ঘ্য-প্রস্থের পরিমাপটাকে হিসাবের খাতায় লাভের কোঠায় ফেললে হুন্ডি-কাটা ধারের টাকাটাকে মূলধন-হারা ব্যবসায়ে মুনাফা বলে আনন্দ করার মতো হয়। সেই আপন করবার সর্বপ্রধান সহায় আপন ভাষা। শিক্ষার সকল খাদ্য ঐ ভাষার রসায়নে আমাদের আপন খাদ্য হয়। পক্ষীশাবক গোড়া থেকেই পোকা খেয়ে মানুষ; কোনো মানবসমাজে হঠাৎ যদি কোনো পক্ষীমহারাজের একাধিপত্য ঘটে তা হলেই কি এমন কথা বলা চলবে যে, সেই রাজখাদ্যটা খেলেই মানুষ-প্রজাদেরও পাখা গজিয়ে উঠবে।

শিক্ষায় মাতৃভাষাই মাতৃদুগ্ধ, জগতে এই সর্বজনস্বীকৃত নিরতিশয় সহজ কথাটা বহুকাল পূর্বে একদিন বলেছিলেম; আজও তার পুনরাবৃত্তি করব। সেদিন যা ইংরেজি-শিক্ষার-মন্ত্র-মুগ্ধ কর্ণকুহরে অশ্রাব্য হয়েছিল আজও যদি তা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় তবে আশা করি, পুনরাবৃত্তি করবার মানুষ বারে বারে পাওয়া যাবে।

আপন ভাষায় ব্যাপকভাবে শিক্ষার গোড়াপত্তন করবার আগ্রহ স্বভাবতই সমাজের মনে কাজ করে, এটা তার সুস্থ চিত্তের লক্ষণ। রামমোহন রায়ের বন্ধু পাদ্রি এডাম সাহেব বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার যে রিপোর্ট প্রকাশ করেন তাতে দেখা যায় বাংলা-বিহারে এক লক্ষের উপর পাঠশালা ছিল, দেখা যায় প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই ছিল জনসাধারণকে অন্তত ন্যূনতম শিক্ষাদানের ব্যবস্থা। এ ছাড়া প্রায় তখনকার ধনী মাত্রেই আপন চণ্ডীমণ্ডপে সামাজিক কর্তব্যের অঙ্গরূপে পাঠশালা রাখতেন,

গুরুমশায় বৃত্তি ও বাসা পেতেন তাঁরই কাছ থেকে। আমার প্রথম অক্ষরপরিচয় আমাদেরই বাড়ির দালানে, প্রতিবেশী পোড়োদের সঙ্গে। মনে আছে এই দালানের নিভৃত খ্যাতিহীনতা ছেড়ে আমার সতীর্থ আত্মীয় দুজন যখন অশ্বরথযোগে সরকারি বিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার পেলেন তখন মানহানির দুঃসহ দুঃখে অশ্রুপাত করেছি এবং গুরুমশায় আশ্চর্য ভবিষ্যদ্দৃষ্টির প্রভাবে বলেছিলেন, ঐখান থেকে ফিরে আসবার ব্যর্থ প্রয়াসে আরো অনেক বেশি অশ্রু আমাকে ফেলতে হবে। তখনকার প্রথম শিক্ষার জন্য শিশুশিক্ষা প্রভৃতি যে-সকল পাঠ্যপুস্তক ছিল, মনে আছে, অবকাশকালেও বারবার তার পাতা উল্‌টিয়েছি। এখনকার ছেলেদের কাছে তার প্রত্যক্ষ পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হব, কিন্তু সমস্ত দেশের শিক্ষা-পরিবেষণের স্বাভাবিক ইচ্ছা ঐ অত্যন্ত গরিব-ভাবে-ছাপানো বইগুলির পত্রপুটে রক্ষিত ছিল —এই মহৎ গৌরব এখনকার কোনো শিশুপাঠ্য বইয়ে পাওয়া যাবে না। দেশের খাল-বিল-নদী-নালায় আজ জল শুকিয়ে এল, তেমনি রাজার অনাদরে আধমরা হয়ে এল সর্বসাধারণের নিরক্ষরতা দূর করবার স্বাদেশিক ব্যবস্থা।

দেশে বিদ্যাশিক্ষার যে সরকারি কারখানা আছে তার চাকায় সামান্য কিছু বদল করতে হলে অনেক হাতুড়ি-পেটাপিটির দরকার হয়। সে খুব শক্ত হাতের কর্ম। সেই শক্ত হাতই ছিল আশু মুখুজ্জেমশায়ের। বাঙালির ছেলে ইংরেজি-বিদ্যায় যতই পাকা হোক, তবু শিক্ষা পুরো করবার জন্যে তাকে বাংলা শিখতেই হবে, ঠেলা দিয়ে মুখুজ্জেমশায় বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়কে এতটা দূর পর্যন্ত বিচলিত করেছিলেন। হয়তো ঐ পথটায় তার চলৎশক্তির সূত্রপাত করে দিয়েছেন, হয়তো তিনি বেঁচে থাকলে চাকা আরও এগোত। হয়তো সেই চালনার সংকেত মন্ত্রণা-সভার দফ্‌তরে এখনও পরিণতির দিকে উন্মুখ আছে।

তবু আমি যে আজ উদ্‌বেগ প্রকাশ করছি তার কারণ, বিশ্ববিদ্যালয়ের যান-বাহনটা অত্যন্ত ভারী এবং বাংলাভাষার পথ এখনো কাঁচা পথ। এই সমস্যা-সমাধান দুরূহ বলে পাছে হতে-করতে এমন একটা অতি অস্পষ্ট ভাবী কালে তাকে ঠেলে দেওয়া হয় যা অসম্ভাবিতের নামান্তর, এই আমাদের ভয়। আমাদের গতি মন্দাক্রান্তা, কিন্তু আমাদের অবস্থাটা সবুর করবার মতো নয়। তাই আমি বলি পরিপূর্ণ সুযোগের জন্যে সুদীর্ঘ কাল অপেক্ষা না করে অল্প বহরে কাজটা আরম্ভ করে দেওয়া ভালো, যেমন করে চারাগাছ রোপণ করে সেই সহজ ভাবে। অর্থাৎ তার মধ্যে সমগ্র গাছেরই আদর্শ আছে; বাড়তে বাড়তে দিনে দিনে সেই আদর্শ সম্পূর্ণ হয়। বয়স্ক ব্যক্তির পাশে শিশু যখন দাঁড়ায় সে আপন সমগ্রতার সম্পূর্ণ ইঙ্গিত নিয়েই দাঁড়ায়। এমন নয়, একটা ঘরে বছর-দুয়েক ধরে ছেলেটার কেবল পা'খানা তয়ের হচ্ছে, আর-একটা ঘরে এগিয়েছে হাতের কনুইটা পর্যন্ত। এতদূরে অত্যন্ত সতর্কতা সৃষ্টিকর্তার নেই। সৃষ্টির ভূমিকাতেও অপরিণতি সত্ত্বেও সমগ্রতা থাকে।

তেমনি বাংলা-বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সজীব সমগ্র শিশুমূর্তি দেখতে চাই, সে মূর্তি কারখানাঘরে-তৈরি খণ্ড খণ্ড বিভাগের ক্রমশ যোজনা নয়। বয়স্ক বিদ্যালয়ের পাশে এসেই সে দাঁড়াক বালক বিদ্যালয় হয়ে। তার বালকমূর্তির মধ্যেই দেখি তার বিজয়ী মূর্তি, দেখি ললাটে তার রাজাসন-অধিকারের প্রথম টিকা।

বিদ্যালয়ের কাজে যাঁরা অভিজ্ঞ তাঁরা জানেন, এক দল ছাত্র স্বভাবতই ভাষা-শিক্ষায় অপটু। ইংরেজি ভাষায় অনধিকার সত্ত্বেও যদি তারা কোনোমতে ম্যাট্রিকের

দেউড়িটা পেরিয়ে যায় উপরের সিঁড়ি ভাঙবার বেলায় বসে পড়ে, আর ঠেলে তোলা যায় না।

এই দুর্গতির অনেকগুলো কারণ আছে। একে তো যে ছেলের মাতৃভাষা বাংলা, ইংরেজি ভাষার মতো বালাই তার আর নেই। ও যেন বিলিতি তলোয়ারের খাপে দিশি খাঁড়া ভরবার কসরত। তার পরে, গোড়ার দিকে ভালো শিক্ষকের কাছে ভালো নিয়মে ইংরেজি শেখার সুযোগ অল্প ছেলেরই হয়, গরিবের ছেলের তো হয়ই না। তাই অনেক স্থলেই বিশল্যকরণীর পরিচয় ঘটে না বলেই গোটা ইংরেজি বই মুখস্থ করা ছাড়া উপায় থাকে না। সেরকম ত্রেতাযুগীয় বীরত্ব কজন ছেলের কাছে আশা করা যায়?

শুধু এই কারণেই কি তারা বিদ্যামন্দির থেকে আণ্ডামানে চালান যাবার উপযুক্ত? ইংলন্ডে একদিন চুরির দণ্ড ছিল ফাঁসি, এ যে তার চেয়েও কড়া আইন, এ যে চুরি করতে পারে না বলেই ফাঁসি। না বুঝে বই মুখস্থ করে পাস করা কি চুরি করে পাস করা নয়? পরীক্ষাগারে বইখানা চাদরের মধ্যে নিয়ে গেলেই চুরি, আর মগজের মধ্যে করে নিয়ে গেলে তাকে কী বলব? আস্ত-বই-ভাঙা উত্তর বসিয়ে যারা পাস করে তারাই তো চোরাই কড়ি দিয়ে পারানি জোগায়।

তা হোক, যে উপায়েই তারা পার হোক, নালিশ করতে চাই নে। তবু এ প্রশ্নটা থেকে যায় যে, বহুসংখ্যক যে-সব হতভাগা পার হতে পারল না তাদের পক্ষে হাওড়ার পুলটাই নাহয় দু-ফাঁক হয়েছে, কিন্তু কোনো রকমেরই সরকারি খেয়াও কি তাদের কপালে জুটবে না—একটা লাইসেন্স্‌-দেওয়া পান্সি, মোটর-চালিত নাই-বা হল, নাহয় হল দিশি হাতে-দাঁড়-টানা?

অন্য স্বাধীন দেশের সঙ্গে আমাদের একটা মস্ত প্রভেদ আছে। সেখানে শিক্ষার পূর্ণতার জন্যে যারা দরকার বোঝে তারা বিদেশী ভাষা শেখে। কিন্তু, বিদ্যার জন্যে যেটুকু আবশ্যক তার বেশি তাদের না শিখলেও চলে। কেননা, তাদের দেশের সমস্ত কাজই নিজের ভাষায়। আমাদের দেশের অধিকাংশ কাজই ইংরেজি ভাষায়। যাঁরা শাসন করেন তাঁরা আমাদের ভাষা শিখতে, অন্তত যথেষ্ট পরিমাণে শিখতে, বাধ্য নন। পর্বত নড়েন না, কাজেই সচল মানুষকেই প্রয়োজনের গরজে পর্বতের দিকে নড়তে হয়। ইংরেজি ভাষা কেবল যে আমাদের জানতে হবে তা নয়, তাকে ব্যবহার করতে হবে। সেই ব্যবহার বিদেশী আদর্শে যতই নিখুঁত হবে সেই পরিমাণেই স্বদেশীদের এবং কর্তাদের কাছে আমাদের সমাদর। আমি একজন ইংরেজ ম্যাজিস্‌ট্রেটকে জানতুম; তিনি বাংলা সহজেই পড়তে পারতেন। বাংলাসাহিত্যে তাঁর রুচির আমি প্রশংসা করবই; কারণ, রবীন্দ্রনাথের রচনা তিনি পড়তেন এবং পড়ে আনন্দ পেতেন। একবার গ্রামবাসীদের এক সভায় তিনি উপস্থিত ছিলেন। গ্রামহিতৈষী বাঙালি বক্তাদের মধ্যে যার যা বক্তব্য ছিল বলা হলে পর ম্যাজিস্‌ট্রেটের মনে হল, গ্রামের লোককে বাংলায় কিছু বলা তাঁরও কর্তব্য। কোনো প্রকারে দশ মিনিট কর্তব্য পালন করেছিলেন। গ্রামের লোকেরা বাড়ি ফিরে আত্মীয়দের জানালো যে, সাহেবের ইংরেজি বক্তৃতা এইমাত্র তারা শুনে এসেছে। পরভাষা ব্যবহার সম্বন্ধে বিদেশীর কাছে খুব বেশি আশা না করলেও তাকে অসম্মান করা হয় না। ম্যাজিস্‌ট্রেট নিজেই জানতেন তাঁর বাংলাকথনের ভাষা এমন নয় যে, গৌড়জন আনন্দে যার অর্থবোধ করতে পারে সম্যক্‌। তাই নিয়ে তিনি হেসেওছিলেন। আমরা হলে কিছুতেই হাসতে পারতুম না, ধরণীকে অনুনয় করতুম দ্বিধা হতে। ইংরেজি সম্বন্ধে আমাদের বিদেশিত্বের কৈফিয়ত আত্মীয় বা

অনাত্মীয় -সমাজে গ্রাহ্য হয় না। একদা বিশ্ববিখ্যাত জর্মান তত্ত্বজ্ঞানী অয়্‌কেনের ইংরেজি বক্তৃতা শুনেছিলেম। আশা করি এ কথাটা অত্যুক্তি বলে মনে করবেন না যে, ইংরেজি শুনলে আমি বুঝতে পারি সেটা ইংরেজি। কিন্তু অয়্‌কেনের ইংরেজি শুনে আমার ধাঁধা লেগেছিল। এ নিয়ে অয়্‌কেনকে অবজ্ঞা করতে কেউ পারে নি। কিন্তু এই দশা আমার হলে কী হত সে কথা কল্পনা করলেও কর্ণমূল রক্তবর্ণ হয়ে ওঠে। বাবু-ইংলিশ নামে নিরতিশয় অবজ্ঞা-সূচক একটা শব্দ ইংরেজিতে আছে; কিন্তু ইংরেজি-বাংলা তার চেয়ে বহুগুণে বিকৃত হলেও ওটাকে অনিবার্য বলে মেনে নিই, অবজ্ঞা করতে পারি নে। আমাদের কারও ইংরেজিতে ত্রুটি হলে দেশের লোকের কাছে সেটা যেমন হসনীয় হয় এমন কোনো প্রহসন হয় না। সেই হাসির মধ্য থেকে পরাধীনতারই কলঙ্ক দেখা দেয় কালো হয়ে। যতদিন আমাদের এই দশা বহাল থাকবে ততদিন আমাদের শিক্ষাভিমানীকে কেবল যথেষ্ট ইংরেজি নয়, অতিরিক্ত ইংরেজি শিখতে হবে। তাতে যে অতিরিক্ত সময় লাগে সেই সময়টা যথোচিত শিক্ষার হিসাব থেকে কাটা যায়। তা হোক, অত্যাবশ্যকের চেয়ে অতিরিক্তকে যতদিন আমাদের মেনে চলতেই হবে ততদিন ইংরেজি-ভাষায়-পেটাই-করা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজাতীয় ভার আমাদের আগাগোড়াই বহন করা অনিবার্য। কেননা, ভালো করে বাংলা শেখার দ্বারাতেই ভালো করে ইংরেজি শেখার সহায়তা হতে পারে, এ কথা মনে করতে সাহস হবে না। গরজটা অতিশয় জরুরি, তাই মন বলতে থাকে, কী জানি! আমার সেই শিক্ষানেতা গুরুজনের মতো অভিভাবক বাংলাদেশে বেশি পাওয়া যাবে না, তাই বেশি দাবি করে লাভ নেই। বাংলা-বিশ্ববিদ্যালয়ের একেশ্বরত্বের অধিকার আজ সহ্য হবে না। নূতন স্বাধীনতার দাবিকে পুরাতন অধীনতার সেফ্‌গার্ড্‌স্‌এর দ্বারা বেড়া তুলে দেবার আশ্বাস না দিতে পারলে সবটাই ফেঁসে যেতে পারে, এই আমার ভয়। তাই বলছি, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরের দালানে বিদ্যার ভোজের যে আয়োজন চলছে তার রান্নাটা বিলিতি মশলায় বিলিতি ডেক্‌চিতে, তার আহারটা বিলিতি আসনে বিলিতি পাত্রেই চলুক; তার জন্যে প্রাণপণে আমরা যে মূল্য দিতে পারি তাতে ভূরিভোজের আশা করা চলবে না। যারা কার্ড পেয়েছে তারা ভিতর-মহলেই বসুক, আর যারা রবাহূত বাইরের আঙিনায় তাদের জন্যে পাত পেড়ে দেওয়া যাক-না। টেবিল পাতা নাই হল, কলাপাত পড়ুক।

বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষাকে চিরকাল অথবা অতি দীর্ঘকাল পরান্নভোজী পরাবসথশায়ী হয়ে থাকতেই হবে, কেননা এ ভাষায় পাঠ্যপুস্তক নেই, এই কঠিন তর্ক তুললে একদা সেটা কথা-কাটাকাটির ঘূর্ণি হাওয়াতেই আবর্তিত হতে পারত; দূর দেশ ছাড়া কাছের পাড়া থেকে দৃষ্টান্ত আহরণ করে ঐ উৎপাতটাকে শান্ত করা যেতে পারত না। আজ হাতের কাছেই সুযোগ মিলেছে।

ভারতের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় দক্ষিণ হায়দ্রাবাদ বয়সে অল্প; সেইজন্যই বোধ করি তার সাহস বেশি, তা ছাড়া এ কথাও বোধ করি সেখানে স্বীকৃত হওয়া সহজ হয়েছে যে, শিক্ষাবিধানে কৃপণতা করার মতো নিজেকে ফাঁকি দেওয়া আর-কিছুই হতে পারে না। ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে অবিচলিত নিষ্ঠার সহায়তায় আদ্যন্তমধ্যে উর্দু ভাষার প্রবর্তন হয়েছে। তারই প্রবল তাড়নায় ঐ ভাষায় পাঠ্যপুস্তক-রচনা প্রায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। ইমারতও হল, সিঁড়িও হল, নিচে থেকে উপরে লোক-যাতায়াত চলছে। হতে পারে, সেখানে যথেষ্ট সুযোগ ও স্বাধীনতা ছিল। কিন্তু তবুও চারি দিকের প্রচলিত মত ও অভ্যাসের দস্তুর

বাধা অতিক্রম করে যিনি এমন মহৎ সংকল্পকে মনে এবং কাজের ক্ষেত্রে স্থান দিতে পেরেছেন সেই স্যর আকবর হয়্দারির সাহসকে ধন্য বলি। বিনা দ্বিধায় জ্ঞানসাধনার দুর্গমতাকে তাঁদের মাতৃভাষার ক্ষেত্রে সমভূম করে দিয়ে উর্দুভাষীদের তিনি যে মহৎ উপকার করেছেন তার দৃষ্টান্ত যদি আমাদের মন থেকে সংশয় দূর এবং শিক্ষাসংস্কৃতির বিলম্বিত গতিকে ত্বরান্বিত করতে পারে তবে একদা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় অন্য সকল সভ্য দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের সমপর্যায়ে দাঁড়িয়ে গৌরব করতে পারবে। নইলে প্রতিধ্বনি ধ্বনির সঙ্গে একই মূল্য দাবি করবে কোন্ স্পর্ধায়? বনস্পতির শাখায় যে পরগাছা ঝুলছে সে বনস্পতির সমতুল্য নয়।

বিদেশ থেকে যেখানে আমরা যন্ত্র কিনে এনে ব্যবহার করি সেখানে তার ব্যবহারে ভয়ে ভয়ে অক্ষরে অক্ষরে পুঁথি মিলিয়ে চলতে হয়, কিন্তু সজীব গাছের চারার মধ্যে তার আত্মচালনা-আত্মপরিবর্ধনার তত্ত্ব অনেক পরিমাণে ভিতরে ভিতরে কাজ করতে থাকে। যন্ত্র আমাদের স্বায়ত্ত হতে পারে, কিন্তু তাতে আমাদের স্বানুবর্তিতা থাকে না। স্বাধীন পরিচালনার ক্ষেত্রে যেখানে ন্যাশনাল কলেজ গড়া হয়েছে, হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়-স্থাপনায় যেখানে দেখা গেল অর্থব্যয় অজস্র হয়েছে, সেখানেও ছাঁচ-উপাসক আমরা ছাঁচের মুঠো থেকে আমাদের স্বাতন্ত্র্যকে কিছুতে ছাড়িয়ে নিতে পারছি নে। সেখানেও শুধু যে ইংরেজি য়ুনিভার্সিটির গায়ের মাপে ছেঁটেছুঁটে কুর্তি বানাচ্ছি তা নয়, ইংরেজের জমি থেকে তার ভাবাসুদ্ধ উপড়ে এনে দেশের চিত্তক্ষেত্রকে কোদালে কুড়ুলে ক্ষত বিক্ষত করে বিরুদ্ধ ভূমিতে তাকে রোপণের গলদ্ঘর্ম চেষ্টা করছি; তাতে শিকড় না ছড়াচ্ছে চারি দিকে, না পোঁচচ্ছে গভীরে।

বাংলাভাষার দোহাই দিয়ে যে শিক্ষার আলোচনা বারম্বার দেশের সামনে এনেছি তার মূলে আছে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। যখন বালক ছিলেম, আশ্চর্য এই যে, তখন অবিমিশ্র বাংলাভাষায় শিক্ষা দেবার একটা সরকারি ব্যবস্থা ছিল। তখনো যে-সব স্কুলের রাস্তা ছিল কলকাতা য়ুনিভার্সিটির প্রবেশদ্বারের দিকে জৃম্ভিত, যারা ছাত্রদের আবৃত্তি করাচ্ছিল 'he is up তিনি হন উপরে', যারা ইংরেজি I সর্বনাম শব্দের ব্যাখ্যা মুখস্থ করাচ্ছিল 'I, by myself I', তাদের আহ্বানে সাড়া দিচ্ছিল সেই-সব পরিবারের ছাত্র যারা ভদ্রসমাজে উচ্চ পদবীর অভিমান করতে পারত। এদেরই দূর পার্শ্বে সংকুচিতভাবে ছিল প্রথমোক্ত শিক্ষাবিভাগ, ছাত্রবৃত্তির পোড়োদের জন্য। তারা কনিষ্ঠ অধিকারী, তাদের শেষ সদ্গতি ছিল 'নর্মাল স্কুল' -নামধারী মাথা-হেঁট-করা বিদ্যালয়ে। তাদের জীবিকার শেষ লক্ষ্য ছিল বাংলা-বিদ্যালয়ে স্বল্পসন্তুষ্ট বাংলা-পণ্ডিতি ব্যবসায়ে। আমার অভিভাবক সেই নর্মাল স্কুলের দেউড়ি-বিভাগে আমাকে ভর্তি করেছিলেন। আমি সম্পূর্ণ বাংলাভাষার পথ দিয়েই শিখেছিলেম ভূগোল, ইতিহাস, গণিত, কিছু-পরিমাণ প্রাকৃত বিজ্ঞান, আর সেই ব্যাকরণ যার অনুশাসনে বাংলাভাষা সংস্কৃতভাষার আভিজাত্যের অনুকরণে আপন সাধু ভাষার কৌলীন্য ঘোষণা করত। এই শিক্ষার আদর্শ ও পরিমাণ বিদ্যা হিসাবে তখনকার ম্যাট্রিকের চেয়ে কম দরের ছিল না। আমার বারো বৎসর বয়স পর্যন্ত ইংরেজি-বর্জিত এই শিক্ষাই চলেছিল। তার পরে ইংরেজি-বিদ্যালয়ে প্রবেশের অনতিকাল পরেই আমি ইস্কুল-মাস্টারের শাসন হতে ঊর্ধ্বশ্বাসে পলাতক।

এর ফলে শিশুকালেই বাংলাভাষার ভাণ্ডারে আমার প্রবেশ ছিল অবারিত।

সে ভাণ্ডারে উপকরণ যতই সামান্য থাক্‌, শিশুমনের পোষণ ও তোষণের পক্ষে যথেষ্ট ছিল। উপবাসী মনকে দীর্ঘকাল বিদেশী ভাষার চড়াই পথে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে দম হারিয়ে চলতে হয় নি, শেখার সঙ্গে বোঝার প্রত্যহ সাংঘাতিক মাথা-ঠোকাঠুকি না হওয়াতে আমাকে বিদ্যালয়ের হাসপাতালে মানুষ হতে হয় নি। এমন-কি সেই কাঁচা বয়সে যখন আমাকে মেঘনাদবধ পড়তে হয়েছে তখন একদিন মাত্র আমার বাঁ গালে একটা বড়ো চড় খেয়েছিলুম, এইটেই একমাত্র অবিস্মরণীয় অপঘাত; যতদূর মনে পড়ে মহাকাব্যের শেষ সর্গ পর্যন্তই আমার কানের উপরেও শিক্ষকের হস্তক্ষেপ ঘটে নি, অথবা সেটা অত্যন্তই বিরল ছিল।

কৃতজ্ঞতার কারণ আরো আছে। মনের চিন্তা এবং ভাব কথায় প্রকাশ করবার সাধনা শিক্ষার একটি প্রধান অঙ্গ। অন্তরে বাহিরে দেওয়া-নেওয়ার এই প্রক্রিয়ার সামঞ্জস্যসাধনই সুস্থ প্রাণের লক্ষণ। বিদেশী ভাষাই প্রকাশচর্চার প্রধান অবলম্বন হলে সেটাতে যেন মুখোশের ভিতর দিয়ে ভাবপ্রকাশের অভ্যাস দাঁড়ায়। মুখোশ-পরা অভিনয় দেখেছি; তাতে ছাঁচে-গড়া ভাবকে অবিচল করে দেখানো যায় একটা বাঁধা সীমানার মধ্যে, তার বাইরে স্বাধীনতা পাওয়া যায় না। বিদেশী ভাষার আবরণের আড়ালে প্রকাশের চর্চা সেই জাতের। একদা মধুসূদনের মতো ইংরেজি-বিদ্যায় অসামান্য পণ্ডিত এবং বঙ্কিমচন্দ্রের মতো বিজাতীয় বিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র এই মুখোশের ভিতর দিয়ে ভাব বাৎলাতে চেষ্টা করেছিলেন; শেষকালে হতাশ হয়ে সেটা টেনে ফেলে দিতে হল।

রচনার সাধনা অমনিতেই সহজ নয়। সেই সাধনাকে পরভাষার দ্বারা ভারাক্রান্ত করলে চিরকালের মতো তাকে পঙ্গু করার আশঙ্কা থাকে। বিদেশী ভাষার চাপে বামন হওয়া মন আমাদের দেশে নিশ্চয়ই বিস্তর আছে। প্রথম থেকেই মাতৃভাষার স্বাভাবিক সুযোগে মানুষ হলে সেই মন কী হতে পারত আন্দাজ করতে পারি নে বলে, তুলনা করতে পারি নে।

যাই হোক, ভাগ্যবলে অখ্যাত নর্মাল স্কুলে ভর্তি হয়েছিলুম, তাই কাঁচ বয়সে রচনা করা ও কুস্তি করাকে এক করে তুলতে হয় নি; চলা এবং রাস্তা খোঁড়া ছিল না একসঙ্গে। নিজের ভাষায় চিন্তাকে ফুটিয়ে তোলা, সাজিয়ে তোলার আনন্দ গোড়া থেকেই পেয়েছি। তাই বুঝেছি মাতৃভাষায় রচনার অভ্যাস সহজ হয়ে গেলে তার পরে যথাসময়ে অন্য ভাষা আয়ত্ত করে সেটাকে সাহসপূর্বক ব্যবহার করতে কলমে বাধে না; ইংরেজির অতিপ্রচলিত জীর্ণ বাক্যাবলী সাবধানে সেলাই করে করে কাঁথা বুনতে হয় না। ইস্কুল-পালানে অবকাশে যেটুকু ইংরেজি আমি পথে-পথে সংগ্রহ করেছি সেটুকু নিজের খুশিতে ব্যবহার করে থাকি; তার প্রধান কারণ, শিশুকাল থেকে বাংলাভাষায় রচনা করতে আমি অভ্যস্ত। অন্তত, আমার এগারো বছর বয়স পর্যন্ত আমার কাছে বাংলাভাষার কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। রাজসম্মানগর্বিত কোনো সুয়োরানী তাকে গোয়ালঘরের কোণে মুখ চাপা দিয়ে রাখে নি। আমার ইংরেজিশিক্ষায় সেই আদিম দৈন্য সত্ত্বেও পরিমিত উপকরণ নিয়ে আমার চিত্তবৃত্তি কেবল গৃহিণীপনার জোরে ইংরেজি-জানা ভদ্র সমাজে আমার মান বাঁচিয়ে আসছে; যা-কিছু ছেঁড়া-ফাটা, যা-কিছু মাপে খাটো, তাকে কোনোরকমে ঢেকে বেড়াতে পেরেছে। নিশ্চিত জানি তার কারণ, শিশুকাল থেকে আমার মনের পরিণতি ঘটেছে কোনো-ভেজাল-না-দেওয়া মাতৃভাষায়; সেই খাদ্যে খাদ্যবস্তুর সঙ্গে যথেষ্ট খাদ্যপ্রাণ ছিল, যে খাদ্যপ্রাণে সৃষ্টিকর্তা তাঁর জাদুমন্ত্র দিয়েছেন।

অবশেষে আমার নিবেদন এই যে, আজ কোনো ভগীরথ বাংলাভাষায় শিক্ষাস্রোতকে বিশ্ববিদ্যার সমুদ্র পর্যন্ত নিয়ে চলুন; দেশের সহস্র সহস্র মন মূর্খতার অভিশাপে প্রাণহীন হয়ে পড়ে আছে, এই সঞ্জীবনী ধারার স্পর্শে বেঁচে উঠুক; পৃথিবীর কাছে আমাদের উপেক্ষিত মাতৃভাষার লজ্জা দূর হোক; বিদ্যাবিতরণের অন্নসত্র স্বদেশের নিত্যসম্পদ হয়ে আমাদের আতিথ্যের গৌরব রক্ষা করুক।

জানি নে হয়তো অভিজ্ঞ ব্যক্তি বলবেন, এ কথাটা কাজের কথা নয়, এ কবিকল্পনা। তা হোক, আমি বলব, আজ পর্যন্ত কেজো কথায় কেবল জোড়াতাড়ার কাজ চলেছে, সৃষ্টি হয়েছে কল্পনার বলে।

ভাষণ : ফেব্রুয়ারি ১৯৩৬

আশ্রমের শিক্ষা

প্রাচীন ভারতের তপোবন জিনিসটার ঠিক বাস্তব রূপ কী তার ঐতিহাসিক ধারণা আজ সহজ নয়। তপোবনের যে প্রতিরূপ স্থায়ীভাবে আঁকা পড়েছে ভারতের চিত্তে ও সাহিত্যে সে হচ্ছে একটি কল্যাণময় কল্পমূর্তি, বিলাসমোহমুক্ত প্রাণবান আনন্দের মূর্তি।

আধুনিক কালে জন্মেছি। কিন্তু, এই ছবি রয়ে গেছে আমারও মনে। বর্তমান যুগের বিদ্যায়তনে ভাবলোকের সেই তপোবনকে রূপলোকে প্রকাশ করবার জন্যে একদা কিছুকাল ধরে আমার মনে আগ্রহ জেগেছিল।

দেখেছি মনে মনে তপোবনের কেন্দ্রস্থলে গুরুকে। তিনি যন্ত্র নন, তিনি মানুষ—নিষ্ক্রিয়ভাবে মানুষ নন, সক্রিয়ভাবে; কেননা মনুষ্যত্বের লক্ষ্য-সাধনেই তিনি প্রবৃত্ত। এই তপস্যার গতিমান ধারায় শিষ্যের চিত্তকে গতিশীল করে তোলা তাঁর আপন সাধনারই অঙ্গ। শিষ্যের জীবন প্রেরণা পায় তাঁর অব্যবহিত সঙ্গ থেকে। নিত্যজাগরূক মানবচিত্তের এই সঙ্গ জিনিসটি আশ্রমের শিক্ষার সব চেয়ে মূল্যবান উপাদান। তার সেই মূল্য অধ্যাপনার বিষয়ে নয়, উপকরণে নয়, পদ্ধতিতে নয়। গুরুর মন প্রতি মুহূর্তে আপনাকে পাচ্ছে বলেই আপনাকে দিচ্ছে। পাওয়ার আনন্দ সপ্রমাণ করছে নিজের সত্যতা দেওয়ার আনন্দেই।

একদা একজন জাপানি ভদ্রলোকের বাড়িতে ছিলাম, বাগানের কাজে ছিল তাঁর বিশেষ শখ। তিনি বৌদ্ধ, মৈত্রীর সাধক। তিনি বলতেন, 'আমি ভালোবাসি গাছপালা। তরুলতায় সেই ভালোবাসার শক্তি প্রবেশ করে, ওদের ফুলে ফলে জাগে সেই ভালোবাসারই প্রতিক্রিয়া।' বলা বাহুল্য, মানবচিত্তের মালীর সম্বন্ধে এ কথা সম্পূর্ণ সত্য। মনের সঙ্গে মন যথার্থভাবে মিলতে থাকলে আপনি জাগে খুশি। সেই খুশি সৃজনশক্তিশীল। আশ্রমের শিক্ষাদান এই খুশির দান। যাদের মনে কর্তব্যবোধ আছে কিন্তু সেই খুশি নেই, তাদের দোসরা পথ। গুরু-শিষ্যের মধ্যে পরস্পরসাপেক্ষ সহজ সম্বন্ধকেই আমি বিদ্যাদানের প্রধান মাধ্যম বলে জেনেছি।

আরো একটি কথা মনে ছিল। যে গুরুর অন্তরে ছেলেমানুষটি একেবারে শুকিয়ে কাঠ হয়েছে তিনি ছেলেদের ভার নেবার অযোগ্য। উভয়ের মধ্যে শুধু সামীপ্য নয়, আন্তরিক সাযুজ্য ও সাদৃশ্য থাকা চাই, নইলে দেনা-পাওনায় নাড়ীর

যোগ থাকে না। নদীর সঙ্গে যদি প্রকৃত শিক্ষকের তুলনা করি তবে বলব, কেবল ডাইনে বাঁয়ে কতকগুলো বুড়ো বুড়ো উপনদীর যোগেই নদী পূর্ণ নয়। তার আদি ঝর্নার ধারাটি মোটা মোটা পাথরগুলোর মধ্যে হারিয়ে যায় নি। যিনি জাত-শিক্ষক ছেলেদের ডাক শুনলেই তাঁর ভিতরকার আদিম ছেলেটা আপনি বেরিয়ে আসে। মোটা গলার ভিতর থেকে উচ্ছ্বসিত হয় প্রাণে-ভরা কাঁচা হাসি। ছেলেরা যদি কোনো দিক থেকেই তাঁকে স্বশ্রেণীয় জীব বলে চিনতে না পারে, যদি মনে করে 'লোকটা যেন একটা প্রাগৈতিহাসিক মহাকায় প্রাণী', তবে নির্ভয়ে তাঁর কাছে হাত বাড়াতেই পারবে না। সাধারণত আমাদের গুরুরা সর্বদা নিজের প্রবীণতা অর্থাৎ নবীনের কাছ থেকে দূরবর্তিতা সপ্রমাণ করতে ব্যগ্র; প্রায়ই ওটা সস্তায় কর্তৃত্ব করবার প্রলোভনে। ছেলেদের পাড়ায় চোপদার না নিয়ে এগোলে পাছে সম্ভ্রম নষ্ট হয় এই ভয়ে তাঁরা সতর্ক। তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে ধ্বনি উঠছে 'চুপ চুপ'; তাই পাকা শাখায় কচি শাখায় ফুল ফোটাবার ফল ফলাবার মর্মগত সহযোগ রুদ্ধ হয়ে থাকে; চুপ করে যায় ছেলেদের চিত্তে প্রাণের ক্রিয়া।

আর-একটা কথা আছে। ছেলেরা বিশ্বপ্রকৃতির অত্যন্ত কাছের। আরাম-কেদারায় তারা আরাম চায় না, সুযোগ পেলেই গাছের ডালে তারা চায় ছুটি। বিরাট প্রকৃতির নাড়ীতে নাড়ীতে প্রথম প্রাণের বেগ নিগূঢ়ভাবে চঞ্চল। শিশুর প্রাণে সেই বেগ গতিসঞ্চার করে। বয়স্কদের শাসনে অভ্যাসের দ্বারা যে-পর্যন্ত তারা অভিভূত না হয়েছে সে-পর্যন্ত কৃত্রিমতার জাল থেকে মুক্তি পাবার জন্যে তারা ছট্‌ফট্‌ করে। আরণ্য ঋষিদের মনের মধ্যে ছিল চিরকালের অমর ছেলে। তাই কোনো বৈজ্ঞানিক প্রমাণের অপেক্ষা না রেখে তাঁরা বলেছিলেন, এই যা-কিছু সমস্তই প্রাণ হতে নিঃসৃত হয়ে প্রাণেই কম্পিত হচ্ছে। এ কি বের্গ্‌সঁ'এর বচন! এ মহান্‌ শিশুর বাণী। বিশ্বপ্রাণের স্পন্দন লাগতে দাও ছেলেদের দেহে মনে, শহরের বোবা কালা মরা দেয়ালগুলোর বাইরে।

তার পরে আশ্রমে প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার কথা। মনে পড়ছে কাদম্বরীতে একটি বর্ণনা: তপোবনে আসছে সন্ধ্যা, গোষ্ঠে-ফিরে-আসা পাটল হোমধেনুটির মতো। শুনে মনে জাগে, সেখানে গোরু-চরানো, গোদোহন, সমিধ-কুশ-আহরণ, অতিথিপরিচর্যা, যজ্ঞবেদীরচনা আশ্রম-বালকবালিকাদের দিনকৃত্য। এই-সব কর্ম-পর্যায়ের দ্বারা তপোবনের সঙ্গে নিরন্তর মিলে যায় তাদের নিত্যপ্রবাহিত জীবনের ধারা। সহকারিতার সখ্য-বিস্তারে আশ্রমে হতে থাকে প্রতি ক্ষণে আশ্রমবাসীদের নিজ হাতের রচনা। আমাদের আশ্রমে সতত-উদ্যমশীল এই কর্মসহযোগিতা কামনা করছি।

মানুষের প্রকৃতিতে যেখানে জড়তা আছে সেখানে প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা কুশ্রী ও মলিন। স্বভাবের বর্বরতা সেখানে প্রকাশে বাধা পায় না। ধনীসমাজে আন্তরিক শক্তির অভাব থাকলেও বাহ্যিক উপকরণপ্রাচুর্যে কৃত্রিম উপায়ে এই দীনতাকে চাপা দিয়ে রাখা যায়। আমাদের দেশে প্রায় সর্বত্রই ধনীগৃহে সদর-অন্দরের প্রভেদ দেখলে এই প্রকৃতিগত তামসিকতা ধরা পড়ে।

নিজের চার দিককে নিজের চেষ্টায় সুন্দর সুশৃঙ্খল ও স্বাস্থ্যকর করে তোলার দ্বারা একত্র বাসের সতর্ক দায়িত্বের অভ্যাস বাল্যকাল থেকেই সহজ করা চাই। একজনের শৈথিল্য অন্যের অসুবিধা অস্বাস্থ্য ও ক্ষতির কারণ হতে পারে, এই বোধটি সভ্য জীবনযাত্রার ভিত্তিগত। সাধারণত আমাদের দেশের গার্হস্থ্যে এই বোধের ত্রুটি সর্বদাই দেখা যায়।

সহযোগিতার সভ্য নীতিকে প্রত্যহ সচেতন করে তোলা আশ্রমের শিক্ষার প্রধান সুযোগ। সুযোগটিকে সফল করবার জন্যে শিক্ষার প্রথম পর্বে উপকরণ-লাঘব অত্যাবশ্যক। একান্ত বস্তুপরায়ণ স্বভাবে প্রকাশ পায় চিত্তবৃত্তির স্থূলতা। সৌন্দর্য এবং সুব্যবস্থা মনের জিনিস। সেই মনকে মুক্ত করা চাই কেবল আলস্য এবং অনৈপুণ্য থেকে নয়, বস্তুলুব্ধতা থেকেও। রচনাশক্তির আনন্দ ততই সত্য হয় যতই তা জড়বাহুল্যের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে। বাল্যকাল থেকেই ব্যবহারসামগ্রী সুনিয়ন্ত্রিত করবার আত্মশক্তিমূলক শিক্ষা আমাদের দেশে অত্যন্ত উপেক্ষিত হয়। সেই বয়সেই প্রতিদিন অল্প-কিছু উপকরণ, যা সহজে হাতের কাছে পাওয়া যায়, তাই দিয়েই সৃষ্টির আনন্দকে উদ্ভাসিত করবার চেষ্টা যেন নিরলস হতে পারে এবং সেইসঙ্গেই সাধারণের সুখ স্বাস্থ্য সুবিধা-বিধানের কর্তব্যে ছাত্রেরা যেন আনন্দ পেতে শেখে, এই আমার কামনা।

আপন পরিবেশের প্রতি ছেলেদের আত্মকর্তৃত্বচর্চাকে আমাদের দেশে অসুবিধাজনক আপদজনক ও ঔদ্ধত্য মনে করে সর্বদা আমরা দমন করি। এতে করে পরনির্ভরতার লজ্জা তাদের চলে যায়, পরের প্রতি আব্দার বেড়ে ওঠে, এমন-কি ভিক্ষুকতার ক্ষেত্রেও তাদের অভিমান প্রবল হতে থাকে; তারা আত্মপ্রসাদ পায় পরের ত্রুটি নিয়ে কলহ করে। এই লজ্জাকর দীনতা চার দিকে সর্বদাই দেখা যাচ্ছে। এর থেকে মুক্তি পাওয়াই চাই।

মনে আছে ছাত্রদের প্রাত্যহিক কাজে যখন আমার যোগ ছিল তখন এক দল বয়স্ক ছাত্রদের পক্ষ থেকে আমার কাছে নালিশ এল যে, অন্নভরা বড়ো বড়ো ধাতুপাত্র পরিবেষণের সময় মেজের উপর দিয়ে টানতে টানতে তার তলা ক্ষয়ে গিয়ে ঘরময় নোংরামি ছড়িয়ে পড়ে। আমি বললেম, 'তোমরা পাচ্ছ দুঃখ, অথচ তাকিয়ে আছ আমি এর প্রতিবিধান করব। এই সামান্য কথাটা তোমাদের বুদ্ধিতে আসছে না যে, ঐ পাত্রটার নিচে একটা বিড়ে বেঁধে দিলেই ঐ ঘর্ষণ থামে। চিন্তা করতে পার না তার একমাত্র কারণ, তোমরা এইটাই স্থির করে রেখেছ যে, নিষ্ক্রিয়ভাবে ভোক্তৃত্বের অধিকারই তোমাদের, আর কর্তৃত্বের অধিকার অন্যের। এতে আত্মসম্মান থাকে না।'

শিক্ষার অবস্থায় উপকরণের কিছু বিরলতা, আয়োজনের কিছু অভাব থাকাই ভালো; অভ্যস্ত হওয়া চাই স্বল্পতায়। অনায়াসে-প্রয়োজন-জোগানোর দ্বারা ছেলেদের মনটাকে আদুরে করে তোলা তাদের নষ্ট করা। সহজেই তারা যে এত-কিছু চায় তা নয়। আমরাই বয়স্ক লোকের চাওয়াটা কেবলই তাদের উপর চাপিয়ে তাদেরকে বস্তুর নেশায় দীক্ষিত করে তুলি। শরীরমনের শক্তির সম্যক্‌ চর্চা সেখানেই ভালো করে সম্ভব যেখানে বাইরের সহায়তা অনতিশয়। সেখানে মানুষের আপনার সৃষ্টি-উদ্যম আপনি জাগে। যাদের না জাগে প্রকৃতি তাদেরকে আবর্জনার মতো ঝেঁটিয়ে ফেলে দেয়। আত্মকর্তৃত্বের প্রধান লক্ষণ সৃষ্টিকর্তৃত্ব। সেই মানুষই যথার্থ স্বরাট আপনার রাজ্য যে আপনি সৃষ্টি করে। আমাদের দেশে অতিলালিত ছেলেরা সেই স্বচেষ্টতার চর্চা থেকে প্রথম হতেই বঞ্চিত। তাই আমরা অন্যদের শক্ত হাতের চাপে পরের নির্দিষ্ট নমুনামত রূপ নেবার জন্যে কর্দমাক্ত ভাবে প্রস্তুত।

এই উপলক্ষে আর-একটা কথা বলবার আছে। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে শরীরতন্ত্রের শৈথিল্য বা অন্য যে কারণেই হোক, আমাদের মানস প্রকৃতিতে ঔৎসুক্যের অত্যন্ত অভাব। একবার আমেরিকা থেকে জল-তোলা বায়ুচক্র আনিয়েছিলুম।

আশা ছিল, প্রকাণ্ড এই যন্ত্রটার ঘূর্ণিপাখার চালনা দেখতে ছেলেদের আগ্রহ হবে। কিন্তু দেখলুম অতি অল্প ছেলেই ভালো করে ওটার দিকে তাকালে। ওরা নিতান্তই আলগা ভাবে ধরে নিলে, ওটা যা-হোক একটা জিনিস, জিজ্ঞাসার অযোগ্য।

নিরোৎসুক্যই আন্তরিক নির্জীবতা। আজকের দিনে যে-সব জাতি পৃথিবীর উপর প্রভাব বিস্তার করেছে, সমস্ত পৃথিবীর সব-কিছুরই 'পরে তাদের অপ্রতিহত ঔৎসুক্য। এমন দেশ নেই, এমন কাল নেই, এমন বিষয় নেই, যার প্রতি তাদের মন ধাবিত না হচ্ছে। তাদের এই সজীব চিত্তশক্তি জয়ী হল সর্বজগতে।

পূর্বেই আভাস দিয়েছি, আশ্রমের শিক্ষা পরিপূর্ণভাবে বেঁচে থাকবার শিক্ষা। মরা মন নিয়েও পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীর উর্ধ্বশিখরে ওঠা যায়, আমাদের দেশে প্রত্যহ তার পরিচয় পাই। দেখা যায় অতি ভালো কলেজি ছেলেরা পদবী অধিকার করে, বিশ্ব অধিকার করে না। প্রথম থেকেই আমার সংকল্প ছিল আশ্রমের ছেলেরা চার দিকের অব্যবহিত-সম্পর্ক-লাভে উৎসুক হয়ে থাকবে; সন্ধান করবে, পরীক্ষা করবে, সংগ্রহ করবে। এখানে এমন-সকল শিক্ষক সমবেত হবেন যাঁদের দৃষ্টি বইয়ের সীমানা পেরিয়ে; যাঁরা চক্ষুষ্মান্, যাঁরা সন্ধানী, যাঁরা বিশ্বকুতূহলী, যাঁদের আনন্দ প্রত্যক্ষ জ্ঞানে।

সব-শেষে বলব যেটাকে সব-চেয়ে বড়ো মনে করি এবং যেটা সব-চেয়ে দুর্লভ। তাঁরাই শিক্ষক হবার উপযুক্ত যাঁরা ধৈর্যবান। ছেলেদের প্রতি স্বভাবতই যাঁদের স্নেহ আছে এই ধৈর্য তাঁদেরই স্বাভাবিক। শিক্ষকদের নিজের চরিত্র সম্বন্ধে গুরুতর বিপদের কথা এই যে, যাঁদের সঙ্গে তাঁদের ব্যবহার তারা ক্ষমতায় তাঁদের সমকক্ষ নয়। তাদের প্রতি সামান্য কারণে বা কাল্পনিক কারণে অসহিষ্ণু হওয়া, তাদের বিদ্রূপ করা, অপমান করা, শাস্তি দেওয়া অনায়াসেই সম্ভব। দুর্বল পরজাতিকে শাসন করাই যাদের কাজ তারা যেমন নিজের অগোচরেও সহজেই অন্যায়প্রবণ হয়ে ওঠে, এও তেমনি। ক্ষমতা-ব্যবহারের স্বাভাবিক যোগ্যতা যাদের নেই অক্ষমের প্রতি অবিচার করতে কেবল যে তাদের বাধা থাকে না তা নয়, তাতে তাদের আনন্দ। ছেলেরা অবোধ হয়ে দুর্বল হয়েই মায়ের কোলে আসে, এইজন্যে তাদের রক্ষার প্রধান উপায়— মায়ের মনে অপর্যাপ্ত স্নেহ। তৎসত্ত্বেও অসহিষ্ণুতা ও শক্তির অভিমান স্নেহকে অতিক্রম করেও ছেলেদের 'পরে অন্যায় অত্যাচারে প্রবৃত্ত করে, ঘরে ঘরে তার প্রমাণ পাই। ছেলেদের কঠিন দণ্ড ও চরম দণ্ড দেবার দৃষ্টান্ত যেখানে দেখা যায় প্রায়ই সেখানে মূলত শিক্ষকেরাই দায়ী। তাঁরা দুর্বলমনা বলেই কঠোরতা দ্বারা নিজের কর্তব্যকে সহজ করতে চান।

রাষ্ট্রতন্ত্রেই হোক আর শিক্ষাতন্ত্রেই হোক, কঠোর শাসননীতি শাসয়িতারই অযোগ্যতার প্রমাণ। শক্তস্য ভূষণং ক্ষমা। ক্ষমা যেখানে ক্ষীণ সেখানে শক্তিরই ক্ষীণতা।

আষাঢ় ১৩৪০

ছাত্রসম্ভাষণ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদবি-সম্মান-বিতরণের বার্ষিক অনুষ্ঠানে আজ আমি আহূত। আমার জীর্ণ শরীরের অপটুতা এই দায়িত্বভার গ্রহণের প্রতিকূল ছিল। কিন্তু অদ্যকার একটি বিশেষ গৌরবের উপলক্ষ আমাকে সমস্ত বাধার উপর দিয়ে আকর্ষণ করে এনেছে। আজ বাংলাদেশের প্রথমতম বিশ্ববিদ্যালয় আপন ছাত্রদের মাঙ্গল্যবিধানের শুভকর্মে বাংলার বাণীকে বিদ্যামন্দিরের উচ্চ বেদীতে বরণ করেছেন। বহুদিনের শূন্য আসনের অকল্যাণ আজ দূর হল।

দুর্ভাগ্যদিনের সকলের চেয়ে দুঃসহ লক্ষণ এই যে, সেই দিনে স্বতঃস্বীকার্য সত্যকেও বিরোধের কণ্ঠে জানাতে হয়। এ দেশে অনেক কাল জানিয়ে আসতে হয়েছে যে, পরভাষার মধ্য দিয়ে পরিস্রুত শিক্ষায় বিদ্যার প্রাণীন পদার্থ নষ্ট হয়ে যায়।

ভারতবর্ষ ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোনো দেশেই শিক্ষার ভাষা এবং শিক্ষার্থীর ভাষার মধ্যে আত্মীয়তা-বিচ্ছেদের অস্বাভাবিকতা দেখা যায় না। য়ুরোপীয় বিদ্যায় জাপানের দীক্ষা এক শতাব্দীও পার হয় নি। তার বিদ্যারম্ভের প্রথম সূচনায় শিক্ষণীয় বিষয়গুলি অগত্যা বিদেশী ভাষাকে আশ্রয় করতে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু প্রথম থেকেই শিক্ষাবিধির একান্ত লক্ষ্য ছিল, স্বদেশী ভাষার অধিকারে স্বাধীন সঞ্চরণ লাভ করা। কেননা, যে বিদ্যাকে আধুনিক জাপান অভ্যর্থনা করেছিল সে কেবলমাত্র বিশেষ-সুযোগ-প্রাপ্ত সংকীর্ণ শ্রেণীবিশেষের অলংকারপ্রসাধনের সামগ্রী বলেই আদরণীয় হয় নি; নির্বিশেষে সমগ্র মহাজাতিকেই শক্তি দেবে, শ্রী দেবে বলেই ছিল তার আমন্ত্রণ। এইজন্যই এই শিক্ষার সর্বজনগম্যতা ছিল অত্যাবশ্যক। যে শিক্ষা ঈর্ষাপরায়ণ শক্তিশালী জাতিদের দস্যুবৃত্তি থেকে জাপানকে আত্মরক্ষায় সামর্থ্য দেবে, যে শিক্ষা নগণ্যতা থেকে উদ্ধার করে মানবের মহাসভায় তাকে সম্মানের অধিকারী করবে, সেই শিক্ষার প্রসারসাধনচেষ্টায় অর্থে বা অধ্যবসায়ে সে লেশমাত্র কৃপণতা করে নি। সকলের চেয়ে অনর্থকর কৃপণতা, বিদ্যাকে বিদেশী ভাষার অন্তরালে দূরত্ব দান করা, ফসলের বড়ো মাঠকে বাইরে শুকিয়ে রেখে টবের গাছকে আঙিনায় এনে জলসেচন করা। দীর্ঘকাল ধরে আমাদের প্রতি ভাগ্যের এই অবজ্ঞা আমরা সহজেই স্বীকার করে এসেছি। নিজের সম্বন্ধে অশ্রদ্ধা শিরোধার্য করতে অভ্যস্ত হয়েছি; জেনেছি যে, সম্মুখবর্তী কয়েকটি মাত্র জনবিরল পঙ্‌ক্তিতে ছোটো হাতার মাপে ব্যয়কুণ্ঠ পরিবেষণকেই বলে দেশের এডুকেশন। বিদ্যাদানের এই অকিঞ্চিৎকরত্বকে পেরিয়ে যেতে পারে শিক্ষার এমন ঔদার্যের কথা ভাবতেই আমাদের সাহস হয় নি, যেমন সাহারামরুবাসী বেদুয়িনরা ভাবতেই সাহস পায় না যে, দূরবিক্ষিপ্ত কয়েকটি ক্ষুদ্র ওয়েসিসের বাইরে ব্যাপক সফলতায় তাদের ভাগ্যের সম্মতি থাকতে পারে। আমাদের দেশে শিক্ষা ও অশিক্ষার মধ্যে যে প্রভেদ সে ঐ সাহারা ও ওয়েসিসেরই মতো, অর্থাৎ পরিমাণগত ভেদ এবং জাতিগত ভেদ। আমাদের দেশের রাষ্ট্রশাসন এক, কিন্তু শিক্ষার সংকোচ-বশত চিত্তশাসন এক হতে পারে নি। বর্তমান কালে চীন জাপান পারস্য আরব তুরস্কে প্রাচ্যজাতীয়দের মধ্যে সর্বত্র এই ব্যর্থতাজনক আত্মবিচ্ছিন্নতার প্রতিকার হয়েছে, হয় নি কেবলমাত্র আমাদেরই দেশে।

প্রাণীবিবরণে দেখা যায়, একজাতীয় জীব আছে যারা পরাসক্ত হয়ে জন্মায়, পরাসক্ত হয়েই মরে। পরের অঙ্গীভূত হয়ে কেবল প্রাণধারণমাত্রে তাদের বাধা

ঘটে না, কিন্তু নিজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পরিণতি ও ব্যবহারে তারা চিরদিনই থাকে পঙ্গু হয়ে। আমাদের বিদ্যালয়ের শিক্ষা সেইজাতীয়। আরম্ভ থেকেই এই শিক্ষা বিদেশী ভাষার আশ্রয়ে পরজীবী। একেবারেই যে তার পোষণ হয় না তা নয়, কিন্তু তার পূর্ণতা হওয়া অসাধ্য। আত্মশক্তিব্যবহারে সে যে পঙ্গু হয়ে আছে সে কথা সে আপনি অনুভব করতেও অক্ষম হয়ে পড়েছে, কেননা ঋণ করে তার দিন চলে যায়। গৌরব বোধ করে এই ঋণলাভের পরিমাণ হিসাব করে। মহাজন-মহলে সে দাসখত লিখিয়ে দিয়েছে। যারা এই শিক্ষার পার হল তারা যা ভোগ করে তা উৎপন্ন করে না। পরের ভাষায় পরের বুদ্ধি দ্বারা চিন্তিত বিষয়ের প্রশ্রয় পেয়ে স্বাভাবিক প্রণালীতে নিজে চিন্তা করবার, বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ করবার আন্তরিক প্রেরণা ও সাহস তাদের দুর্বল হয়ে আসে। পরের কথিত বাণীর আবৃত্তি যতই যন্ত্রের মতো অবিকল হয় ততই তারা পরীক্ষায় কৃতার্থ হবার অধিকারী বলে গণ্য হতে থাকে। বলা বাহুল্য যে, পরাসক্ত মনকে এই চিরদৈন্য থেকে মুক্ত করবার একটা প্রধান উপায়, শিক্ষণীয় বিষয়কে শিশুকাল থেকে নিজের ভাষার ভিতর দিয়ে গ্রহণ করা ও প্রয়োগ করার চর্চা। কে না জানে, আহার্যকে আপন প্রাণের সামগ্রী করে নেবার উপায় হচ্ছে ভোজ্যকে নিজের দাঁত দিয়ে চিবিয়ে নিজের রসনার রসে জারিয়ে নেওয়া?

এ প্রসঙ্গে এ কথা স্বীকার করা চাই যে, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি ভাষার সম্মানের আসন বিচলিত হতে পারবে না। তার কারণ এ নয় যে, বর্তমান অবস্থায় আমাদের জীবনযাত্রায় তার প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। আজকের দিনে য়ুরোপের জ্ঞানবিজ্ঞান সমস্ত মানবলোকের শ্রদ্ধা অধিকার করেছে, স্বাজাত্যের অভিমানে এ কথা অস্বীকার করলে অকল্যাণ। আর্থিক ও রাষ্ট্রিক ক্ষেত্রে আত্মরক্ষার পক্ষে এই শিক্ষার যেমন প্রয়োজন তেমনি মনকে ও ব্যবহারকে মূঢ়তামুক্ত করবার জন্য তার প্রভাব মূল্যবান। যে চিত্ত এই প্রভাবকে প্রতিরোধ করে, একে অঙ্গীকার করে নিতে অক্ষম হয়, সে আপন সংকীর্ণ সীমাবদ্ধ নিরালোক জীবযাত্রায় ক্ষীণজীবী হয়ে থাকে। যে জ্ঞানের জ্যোতি চিরন্তন তা যে-কোনো দিগন্ত থেকেই বিকীর্ণ হোক, অপরিচিত বলে তাকে বাধা দেয় বর্বরতার অস্বচ্ছ মন। সত্যের প্রকাশমাত্রই জাতিবর্ণনির্বিশেষে সকল মানুষের অধিকারগম্য; এই অধিকার মনুষ্যত্বের সহজাত অধিকারেরই অঙ্গ। রাষ্ট্রগত বা ব্যক্তিগত বিষয়সম্পদে মানুষের পার্থক্য অনিবার্য, কিন্তু চিত্তসম্পদের দানসত্রে সর্বদেশে সর্বকালে মানুষ এক। সেখানে দান করবার দাক্ষিণ্যেই দাতা ধন্য ও গ্রহণ করবার শক্তি দ্বারাই গ্রহীতার আত্মসম্মান। সকল দেশেই অর্থভাণ্ডারের দ্বারে কড়া পাহারা, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্ঞানভাণ্ডারে সর্বমানবের ঐক্যের দ্বার অর্গলবিহীন। লক্ষ্মী কৃপণ; কারণ লক্ষ্মীর সঞ্চয় সংখ্যাগণিতের সীমায় আবদ্ধ, ব্যয়ের দ্বারা তার ক্ষয় হতে থাকে। সরস্বতী অকৃপণ; কেননা, সংখ্যার পরিমাপে তাঁর ঐশ্বর্যের পরিমাপ নয়, দানের দ্বারা তার বৃদ্ধিই ঘটে। বোধ করি, বিশেষভাবে বাংলাদেশের এই গৌরব করবার কারণ আছে যে, য়ুরোপীয় সংস্কৃতির কাছ থেকে সে আপন প্রাপ্য গ্রহণ করতে বিলম্ব করে নি। এই সংস্কৃতির বাধাহীন সংস্পর্শে অতি অল্পকালের মধ্যে তার সাহিত্য প্রচুর শক্তি ও সম্পদ লাভ করেছে, এ কথা সকলের স্বীকৃত। এই প্রভাবের প্রধান সার্থকতা এই দেখেছি যে, অনুকরণের দুর্বল প্রবৃত্তিকে কাটিয়ে ওঠবার উৎসাহ সে প্রথম থেকে দিয়েছে। আমাদের দেশে ইংরেজি শিক্ষার প্রথম যুগে যাঁরা বিদ্বান বলে গণ্য ছিলেন তাঁরা যদিচ পড়াশুনোয় চিঠিপত্রে কথাবার্তায় একান্তভাবেই ইংরেজি

ভাষা ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়েছিলেন, যদিচ তখনকার ইংরেজিশিক্ষিত চিত্তে চিন্তার ঐশ্বর্য ভাবরসের আয়োজন মুখ্যত ইংরেজি প্রেরণা থেকেই উদ্ভাবিত, তবু সেদিনকার বাঙালি লেখকেরা এই কথাটি অচিরে অনুভব করেছিলেন যে দূরদেশী ভাষার থেকে আমরা বাতির আলো সংগ্রহ করতে পারি মাত্র, কিন্তু আত্মপ্রকাশের জন্য প্রভাত-আলো বিকীর্ণ হয় আপন ভাষায়। পরভাষার মদগর্বে আত্ম-বিস্মৃতির দিনে এই সহজ কথার নূতন আবিষ্কৃতির দুটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখেছি আমাদের নবসাহিত্যসৃষ্টির উপক্রমেই। ইংরেজি ভাষায় ও সাহিত্যে মাইকেলের অধিকার ছিল প্রশস্ত, অনুরাগ ছিল সুগভীর। সেইসঙ্গে গ্রীক ল্যাটিন আয়ত্ত করে য়ুরোপীয় সাহিত্যের অমরাবতীতে তিনি আমন্ত্রিত হয়েছেন ও তৃপ্ত হয়েছেন সেখানকার অমৃতরসভোগে। স্বভাবতই প্রথমে তাঁর মন গিয়েছিল ইংরেজি ভাষায় কাব্য রচনা করতে। কিন্তু, এ কথা বুঝতে তাঁর বিলম্ব হয় নি যে ধার-করা ভাষায় সুদ দিতে হয় অত্যধিক, তার উদ্‌বৃত্ত থাকে অতি সামান্য। তিনি প্রথমেই মাতৃভাষায় এমন একটি কাব্যের আবাহন করলেন যে কাব্যে স্খলিতগতি প্রথম-পদচারণার ভীরু সতর্কতা নেই। এই কাব্যে বাহিরের গঠনে আছে বিদেশী আদর্শ, অন্তরে আছে কৃত্তিবাসি বাঙালি কল্পনার সাহায্যে মিল্‌টন-হোমর-প্রতিভার আতিথিসৎকার। এই আতিথ্যে অগৌরব নেই, এতে নিজের ঐশ্বর্যের প্রমাণ হয় এবং তার বৃদ্ধি হতে থাকে।

এই যেমন কাব্যসাহিত্যে মধুসূদন তেমনি আধুনিক বাংলা গদ্য-সাহিত্যের পথমুক্তির আদিতে আছেন বঙ্কিমচন্দ্র। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বপ্রথম ছাত্রদের মধ্যে তিনি ছিলেন একজন বরণীয় ব্যক্তি। বলা বাহুল্য, তাঁর চিত্ত অনুপ্রাণিত হয়েছিল প্রধানভাবে ইংরেজি শিক্ষায়। ইংরেজি কথাসাহিত্য থেকে তিনি যে প্ররোচনা পেয়েছিলেন তাকে প্রথমেই ইংরেজি ভাষায় রূপ দিতে চেষ্টা করেছেন। সেই চেষ্টার অকৃতার্থতা বুঝতে তাঁর বিলম্ব হয় নি। কিন্তু, যেহেতু বিদেশী শিক্ষা থেকে তিনি যথার্থ সংস্কৃতি লাভ করেছিলেন তাই সেই সংস্কৃতিই তাঁকে আপন সার্থকতার সন্ধানে স্বদেশী ভাষায় টেনে এনেছিল। যেমন দূর গিরি-শিখরের জলপ্রপাত যখন শৈলবক্ষ ছেড়ে প্রবাহিত হয় জনস্থানের মধ্য দিয়ে তখন দুই-তীরবর্তী ক্ষেত্রগুলিকে ফলবান করে তোলে তাদের নিজেরই ভূমি-উদ্ভিন্ন ফলশস্যে, তেমনি নূতন শিক্ষাকে বঙ্কিমচন্দ্র ফলবান করে তুলেছেন নিজেরই ভাষাপ্রকৃতির স্বকীয় দানের দ্বারা। তার আগে বাংলাভাষায় গদ্যপ্রবন্ধ ছিল ইস্কুলে-পোড়োদের উপদেশের বাহন। বঙ্কিমের আগে বাঙালি শিক্ষিতসমাজ নিশ্চিত স্থির করেছিলেন যে, তাঁদের ভাবরস-ভোগের ও সত্যসন্ধানের উপকরণ একান্তভাবে য়ুরোপীয় সাহিত্য হতেই সংগ্রহ করা সম্ভব, কেবল অল্পশিক্ষিতদের ধাত্রীবৃত্তি করবার জন্যেই দরিদ্র বাংলাভাষার যোগ্যতা। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজি শিক্ষার পরিণত শক্তিকেই রূপ দিতে প্রবৃত্ত হলেন বাংলাভাষায় বঙ্গদর্শন মাসিক পত্রে। বস্তুত নবযুগপ্রবর্তক প্রতিভাবানের সাধনায় ভারতবর্ষে সর্বপ্রথমে বাংলা-দেশেই য়ুরোপীয় সংস্কৃতির ফসল ভাবী কালের প্রত্যাশা নিয়ে দেখা দিয়েছিল, বিদেশ থেকে আনীত পণ্য-আকারে নয়, স্বদেশের ভূমিতে উৎপন্ন শস্যসম্পদের মতো। সেই শস্যের বীজ যদি-বা বিদেশ থেকে উড়ে এসে আমাদের ক্ষেত্রে পড়ে থাকে তবু তার অঙ্কুরিত প্রাণ এখানকার মাটিরই। মাটি যাকে গ্রহণ করতে পারে সে ফসল বিদেশী হলেও আর বিদেশী থাকে না। আমাদের দেশের বহু ফলে ফুলে তার পরিচয় আছে।

ইংরেজি শিক্ষার সার্থকতা আমাদের সাহিত্যে বঙ্গীয় দেহ নিয়ে বিচরণ করছে বাংলার ঘরে ঘরে, এই প্রদেশের শিক্ষানিকেতনেও সে তেমনি আমাদের অন্তরঙ্গ হয়ে দেখা দেবে, এজন্য অনেক দিন আমাদের মাতৃভূমি অপেক্ষা করেছে।

বাংলার বিশ্ববিদ্যালয় আপন স্বাভাবিক ভাষায় স্বদেশে সর্বজনের আত্মীয়তা-লাভে গৌরবান্বিত হবে, সেই আশার সংকেত আজকের দিনের অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করার সুযোগ আমি পেয়েছি। তাই সমস্ত বাংলাদেশের গর্ব ও আনন্দ বহন করে এই সভায় আজ আমার উপস্থিতি। নতুবা এখানে স্থান পাবার মতো প্রবেশিকার মূল্য দেওয়া আমার দ্বারা সাধ্য হয় নি। আমার জীবনে প্রথম বয়সে স্বল্পক্ষণস্থায়ী ছাত্রদশা কেটেছে অভ্রভেদী শিক্ষাসৌধের অধস্তন তলায়। তার পর কিশোরবয়সে অভিভাবকদের নির্দেশমত একদিন সসংকোচে আমি প্রবেশ করেছিলুম বাহিরঙ্গছাত্ররূপে প্রেসিডেন্‌সি কলেজের প্রথমবার্ষিক শ্রেণীতে। সেই এক দিন আর দ্বিতীয় দিনে পৌঁছল না। আকারে প্রকারে সমস্ত ক্লাসের সঙ্গে আমার এমন-কিছু ছন্দের ব্যত্যয় ছিল যাতে আমাকে দেখবামাত্র পরিহাস উঠল উচ্ছ্বসিত হয়ে। বুঝলুম মণ্ডলীর বাহির থেকে অসামঞ্জস্য নিয়ে এসেছি। পরের দিন থেকেই অনধিকার প্রবেশের দুঃসাহসিকতা থেকে বিরত হয়েছিলেম এবং আর যে কোনো দিন বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌকাঠ পার হয়ে অধিকারীবর্গের এক পাশে স্থান পাব এমন দুরাশা আমার মনে ছিল না। অবশেষে একদিন মাতৃভাষার সাধনা-পুণ্যেই আজ সেই দুর্লভ অধিকার আমার মিলবে, সেদিন তা স্বপ্নের অতীত ছিল।

বর্তমান যুগ য়ুরোপীয় সভ্যতা-কর্তৃক সম্পূর্ণ অধিকৃত এ কথা মানতেই হবে। এই যুগ একটি বিশেষ উদ্যমশীল চিত্তপ্রকৃতির ভূমিকা সমস্ত জগতে প্রবর্তিত করছে। মানুষের বুদ্ধিগত জ্ঞানগত বিচিত্র চিন্তা ও কর্ম নব নব আকার নিচ্ছে এই ভূমিকার 'পরেই। বুদ্ধিপরিশীলনার বিশেষ গতি ও বিস্তৃতি সভ্য পৃথিবী জুড়ে সমস্ত মানুষের মধ্যেই একটা ঐক্যলাভে প্রবৃত্ত হয়েছে। বিজ্ঞান সাহিত্য ইতিহাস অর্থনীতি রাষ্ট্রনীতি প্রভৃতি সকল বিষয়েই এবং চিন্তা করবার পদ্ধতি, সন্ধান করবার প্রণালী, সত্য যাচাই করবার আদর্শ, য়ুরোপীয় চিত্তের ভূমিকার উপরে উদ্ভাবিত ও আলোচিত হচ্ছে। এটা সম্ভবপর হতই না, যদি এর উপযোগিতা সর্বত্র নিয়ত পরীক্ষার দ্বারা স্বীকৃত না হত, যদি-না এই চিত্ত জয়যুক্ত হত তার সর্বপ্রকার অধ্যবসায়ে। সংসারযাত্রার কৃতার্থতালাভের জন্য আজ পৃথিবীতে সকল নবজাগ্রত দেশই য়ুরোপের এই চিত্তস্রোতকে জনসাধারণের মধ্যে প্রবাহিত করে দেবার চেষ্টায় অবিরাম প্রবৃত্ত। সর্বত্রই বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলি প্রজাদের মনঃক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে নববিদ্যাসেচনের প্রণালী। এমন দেশও প্রত্যক্ষ দেখেছি নবযুগের প্রভাবে যে আজ বহু দীর্ঘ শতাব্দীর উপেক্ষা-সঞ্চিত স্তূপাকার নিরক্ষরতার বাধা অল্প কালের মধ্যে আশ্চর্য শক্তিতে উত্তীর্ণ হয়েছে: সেখানে যে জনমন একদা ছিল অখ্যাত আকারে আত্মপ্রকাশহীন অকৃতিত্বে লুপ্তপ্রায় সে আজ অবারিত শক্তি নিয়ে মানবসমাজের পুরোভাগে সসম্মানে অগ্রসর। এ দিকে যথোচিত অর্থ-অভাবে শ্রদ্ধা-অভাবে উৎসাহ-অভাবে দীনসম্বল আমাদের দেশের বিদ্যানিকেতনগুলি স্বল্পপরিমিত ছাত্রদেরকে স্বল্পমাত্র বিদ্যায় পরীক্ষা পার করবার স্বল্পায়তন খেয়ানৌকোর কাজ করে চলেছে। দেশের আত্মচেতনাহারা বিরাট মনকে স্পর্শ করছে তার প্রান্ততম সীমায়; সে স্পর্শও ক্ষীণ, যেহেতু তা প্রাণবান নয়, যেহেতু সে স্পর্শ আসছে বহিঃস্থিত আবরণের বাধায়

ভিতর দিয়ে। এই কারণে প্রাচ্যমহাদেশের যে-যে অংশে নবদিনের উদ্‌বোধন দেখা দিয়েছে, জ্ঞানজ্যোতির্বিকীর্ণ আত্মপরিচয়ের সম্মান-লাভে তাদের সকলের থেকে বহুদূর পশ্চাতে আছে ভারতবর্ষ।

আমার এবং বাংলাদেশের লেখকবর্গের হয়ে আমি এ কথা বলব যে, আমরা নবযুগের সংস্কৃতিকে দেশের মর্মস্থানে প্রতিষ্ঠিত করবার কাজ করে আসছি। বর্তমান যুগের নূতন বিদ্যাকে দেশের প্রাণনিকেতনে চিরন্তন করবার এই স্বতঃসক্রিয় উদ্‌যোগকে অনেক দিন পর্যন্ত আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় আপন আমন্ত্রণ-ক্ষেত্র থেকে পৃথক করে রেখেছেন, তাকে ভিন্নজাতীয় বলে গণ্য করেছেন। আশুতোষ সর্বপ্রথমে এই বিচ্ছেদের মধ্যে সেতু বেঁধেছিলেন যখন তিনি আমার মতো বাংলাভাষাচর লেখককে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাক্তার উপাধি দিতে সাহস করলেন। সেদিন যথেষ্ট সাহসের প্রয়োজন ছিল। কারণ, ইংরেজি ভাষা সম্পর্কে কৃত্রিম কৌলীন্যগর্ব আদিকাল থেকেই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তরে অন্তরে সংস্কারগত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরভাষাশ্রিত আভিজাত্য-বোধকে অকস্মাৎ আঘাত করতে কুণ্ঠিত হলেন না, বিশ্ববিদ্যালয়ের তুঙ্গ মঞ্চচূড়া থেকে তিনিই প্রথম নমস্কার প্রেরণ করলেন তাঁর মাতৃভাষার দিকে। তার পরে তিনিই বাংলা-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাক্ষেত্রে বাংলাভাষার ধারাকে অবতারণ করলেন, সাবধানে তার স্রোতঃপথ খনন করে দিলেন। পিতৃনির্দিষ্ট সেই পথকে আজ প্রশস্ত করে দিচ্ছেন তাঁরই সুযোগ্য পুত্র বাংলাদেশের আশীর্ভাজন শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ। বিশ্ববিদ্যালয়ের দীক্ষামন্ত্র থেকে বঞ্চিত আমার মতো ব্রাত্য বাংলালেখককে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাধি দিয়ে আশুতোষ প্রথম রীতিলঙ্ঘন করেছেন; আজ তাঁরই পুত্র সেই ব্রাত্যকেই আজকের দিনের অনুষ্ঠানে বাংলাভাষায় অভিভাষণ পাঠ করতে নিমন্ত্রণ করে পুনশ্চ সেই রীতিরই দুটো গ্রন্থি একসঙ্গে মুক্ত করেছেন। এতে বোঝা গেল বাংলাদেশে শিক্ষাজগতে ঋতুপরিবর্তন হয়েছে, পাশ্চাত্ত্য-আবহাওয়ার শীতে-আড়ষ্ট শাখায় আজ এল নবপল্লবের উৎসব।

অন্যত্র ভারতবর্ষে সম্প্রতি এমন বিশ্ববিদ্যালয় দেখা দিয়েছে যেখানে স্থানীয় প্রজাসাধারণের ভাষা না হোক, শ্রেণীবিশেষের ব্যবহৃত ভাষা শিক্ষার বাহনরূপে আদ্যোপান্ত গণ্য হয়েছে এবং সেখানকার প্রধানবর্গ এই দুঃসাধ্য চেষ্টাকে আশ্চর্য সফলতা দিয়ে প্রশংসাভাজন হয়েছেন। এই অচিন্তিতপূর্ব সংকল্প এবং আশাতীত সিদ্ধিও কম গৌরবের বিষয় নয়। কিন্তু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যে সাধনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন সমস্ত প্রদেশের প্রজাসাধারণ তার লক্ষ্য। বাংলাভাষার অধিকৃত এই প্রদেশের কোনো কোনো অঙ্গ যদিও শাসনকর্তাদের কাটারি দ্বারা কৃত্রিম বিভাগে বিক্ষত হয়ে বহিষ্কৃত হয়েছে তবু অন্তত পাঁচ কোটি লোকের মাতৃভাষাকে এই শিক্ষার কেন্দ্র আপন ভাষারূপে স্বীকার করবার ইচ্ছা ঘোষণা করেছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্বদেশের প্রতি এই-যে সম্মান নিবেদন করলেন এর দ্বারা তিনি আজ সম্মাননীয়। যে শৌর্যবান পুরুষ স্বদেশের এই সৌভাগ্যের সূচনা করে গেছেন আজকের দিনে সেই আশুতোষের প্রতিও আমাদের সম্মান নিবেদন করি।

আমি জানি, য়ুরোপীয় শিক্ষা ও সভ্যতার মহত্ত্ব সম্বন্ধে সুতীব্র প্রতিবাদ জাগবার দিন আজ এসেছে। এই সভ্যতা বস্তুগত ধন-সঞ্চয়ে ও শক্তি-আবিষ্কারে অদ্ভুত দ্রুত গতিতে অগ্রসর হচ্ছে। কিন্তু সমগ্র মনুষ্যত্বের মহিমা তো তার বাহ্য রূপ এবং বাহ্য উপকরণ নিয়ে নয়। হিংস্রতা, লুব্ধতা, রাষ্ট্রিক কূটনীতির কুটিলতা পাশ্চাত্ত্য মহাদেশ থেকে যেরকম প্রচণ্ড মূর্তি ধরে মানুষের স্বাধিকারকে নির্মম-

তাদের দলন করতে উদ্যত হয়েছে ইতিহাসে এমন আর কোনো দিন হয় নি। মানুষের দুরাকাঙ্ক্ষাকে এমন বৃহৎ আয়তনে, এমন প্রভূত পরিমাণে, এমন সর্ববাধাজয়ী নৈপুণ্যের সঙ্গে জয়যুক্ত করতে কোনো দিন মানুষ সক্ষম হয় নি। আজ তা হতে পেরেছে বিশ্বপরাভবকারী বিজ্ঞানের জোরে। উনিশ শতকের আরম্ভে ও মাঝামাঝি কালে যখন য়ুরোপীয় সভ্যতার সঙ্গে আমাদের প্রথম পরিচয় হয়েছিল তখন ভক্তির সঙ্গে, আনন্দের সঙ্গে আমাদের মনে প্রবল ধারণা জন্মেছিল যে, এই সভ্যতা সর্বমানবের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা নিয়ে জগতে আবির্ভূত; নিশ্চিত স্থির করেছিলুম যে, সত্যনিষ্ঠা ন্যায়পরতা ও মানুষের সম্বন্ধে সুগভীর শ্রেয়োবুদ্ধি এর চারিত্রগত লক্ষণ; ভেবেছিলুম মানুষকে অন্তরে বাহিরে সর্বপ্রকার বন্ধন থেকে মুক্তি দেবার ব্রত এই সভ্যতা গ্রহণ করেছে। দেখতে দেখতে আমাদের জীবিত কালের মধ্যেই তার ন্যায়বুদ্ধি, তার মানবমৈত্রী এমনি ক্ষুণ্ণ হল, ক্ষীণ হল যে, বলদর্পিতের পেষণযন্ত্রে পীড়িত মানুষ এই সভ্যতার বিচারসভায় ধর্মের দোহাই দেবে এমন ভরসা আজ কোথাও রইল না। পাশ্চাত্ত্য ভূখণ্ডে যে-সকল বিশ্ববিশ্রুত দেশ এই সভ্যতার প্রধান বাহন তারা পরস্পরকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করবার উদ্দেশ্যে পাশব নখদন্তের অদ্ভুত উৎকর্ষসাধনে সমস্ত বুদ্ধি ও ঐশ্বর্যকে নিযুক্ত করেছে। মানুষের প্রতি মানুষের এমন অপরিসীম ভীতি, এমন দৃঢ়বদ্ধমূল অবিশ্বাস অন্য কোনো যুগেই দেখা যায় নি। মানবজগতের যে ঊর্ধ্বলোক থেকে আলোক আসে, মুক্তির মন্ত্র যেখানকার বাতাসে সঞ্চারিত হয়, মানবচিত্তের সেই দ্যুলোক রিপুপদদলিত পৃথিবীর উৎক্ষিপ্ত ধূলিতে আবিল, সাংঘাতিক মারীবীজে নিবিড়ভাবে পরিপূর্ণ। ইতিপূর্বে পৃথিবীতে আমরা যে-সকল মহা মহা সভ্যতার পরিচয় পেয়েছি তাদের প্রধান সাধনা ছিল মানবজগতের ঊর্ধ্বলোককে নির্মল রাখা, সেখানে পুণ্যজ্যোতির বিকিরণকে অবরোধমুক্ত করা। ধর্মের শাশ্বত নীতির প্রতি বিশ্বাসহীন আজকের দিনে এই সাধনা অশ্রদ্ধাভাজন; সমস্ত পৃথিবীকে নিষ্ঠুর শক্তিতে অভিভূত করবার স্বাভাবিক দায়িত্ব নিয়ে এসেছে বলে যারা গর্ব করে এই সাধনা তাদের মতো শাসক ও শোষক জাতির পক্ষে অনুপযুক্ত বলে গণ্য। উগ্র লোভের তীব্র মাদকরস-পানে উন্মত্ত সভ্যতার পদভারে কম্পান্বিত সমস্ত পাশ্চাত্ত্য মহাদেশ। যে শিক্ষায় কর্মবুদ্ধির সঙ্গে শুভবুদ্ধির এমন বিচ্ছেদ, যে সভ্যতা অসংযত মোহাবেশে আত্মহননোদ্যত, তার গৌরব ঘোষণা করব কোন্ মুখে!

কিন্তু একদিন মনুষ্যত্বের প্রতি সম্মান দেখেছি এই পাশ্চাত্ত্যের সাহিত্যে ও ইতিহাসে। নিজেকে নিজেই সে আজ ব্যঙ্গ করলেও তার চিত্তের সেই উদার অভ্যুদয়কে মরীচিকা বলে অস্বীকার করতে পারি নে। তার উজ্জ্বল সত্তাই মিথ্যা এবং তার ম্লান বিকৃতিই সত্য, এ কথা বলব না।

সভ্যতার পদস্খলন ও আত্মখণ্ডন ঘটেছে বারবার, নিজের শ্রেষ্ঠ দানকে সে বারবার নিজে প্রত্যাখ্যান করেছে। এই দুর্ঘটনা দেখেছি আমাদের স্বদেশেও এবং অন্য দেশেও। দেখা গেছে, মানবমহিমার শোচনীয় পতন ইতিহাসের পর্বে পর্বে। কিন্তু এই-সকল সভ্যতা যেখানে মহামূল্য সত্যকে কোনো দিন কোনো আকারে প্রকাশ করেছে সেইখান থেকেই সে চিরদিনের মতো জয় করেছে মানুষের মনকে; জয় করেছে আপন বাহ্য প্রতাপের ধূলিশায়ী ভগ্নস্তূপের উপরে দাঁড়িয়েও। য়ুরোপ মহৎ শিক্ষার উপাদান উপহার দিয়েছে মানুষকে। দেবার শক্তি যদি না থাকত তা হলে কোনো কালেই তার বিশ্বজয়ের যুগ আসত না এ কথা বলা বাহুল্য। সে দিয়েছে আপন অদম্য শৌর্যের, অসংকুচিত আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত; দেখিয়েছে

প্রাণান্তকর প্রয়াস জ্ঞানবিতরণের কাজে, আরোগ্যসাধনের উদ্‌যোগে। আজও এই সাংঘাতিক অধঃপতনের দিনে য়ুরোপের শ্রেষ্ঠ যাঁরা নিঃসন্দেহই ন্যায়ের পক্ষে, দুর্বলের পক্ষে, দুঃশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জাগিয়ে তাঁরা বলদৃপ্তের শাস্তিকে স্বীকার করছেন, দুঃখীর দুঃখকে আপন করে নিচ্ছেন। বারে বারে অকৃতার্থ হলেও তাঁরাই আশু পরাভবের মধ্য দিয়েও এই সভ্যতার প্রতিভূ। যে প্রেরণায় চারি দিকের কঠোর অত্যাচার ও চরিত্রবিকৃতির মধ্যে তাঁদের লক্ষ্যকে অবিচলিত রেখেছে সে প্রেরণাই এই সভ্যতার মর্মগত সত্য, তার থেকেই পৃথিবী শিক্ষা গ্রহণ করবে, পাশ্চাত্ত্য জাতির লজ্জাজনক অমানুষিক আত্মাবমাননা থেকে নয়।

তোমরা যে-সকল তরুণ ছাত্র আজ এই সভায় উপস্থিত, যারা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিংহদ্বার দিয়ে জীবনের জয়যাত্রার পথে অগ্রসর হতে প্রস্তুত, তোমাদের প্রতি আমার অভিনন্দন জানাই। তোমরাই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন গৌরবদিনের প্রভূত সফলতার প্রত্যাশা আগামী কালের পথে বহন করতে যাত্রা করছ।

আজ প্রচণ্ড আলোড়ন উঠেছে পৃথিবীব্যাপী জনসমুদ্রে। যেন সমস্ত সভ্য জগৎকে এক কল্প থেকে আর-এক কল্পের তটে উৎক্ষিপ্ত করবার জন্যে দেবদৈত্যে মিলে মন্থন শুরু হয়েছে। এবারকারও মন্থনরজ্জু বিষধর সর্প, বহুফণাধারী লোভের সর্প। সে বিষ উদ্গার করছে। আপনার মধ্যে সমস্ত বিষটাকে জীর্ণ করে নেবেন এমন মৃত্যুঞ্জয় শিব পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার মর্মস্থানে আসীন আছেন কি না এখনো তার প্রমাণ পাই নি। ভারতবর্ষে আমরা আছি কালের রুদ্রলীলাসমুদ্রের তটসীমায়। বর্তমান মানবসমাজের এই দুঃখের আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে যোগ দেবার উপলক্ষ আমাদের ঘটে নি। কিন্তু, ঘূর্ণির টান বাহির থেকে আসছে আমাদের উপরে এবং ভিতরের থেকেও দুর্গতির ঢেউ আছাড় খেয়ে পড়ছে আমাদের দক্ষিণে বামে। সমস্যার পর দুঃসাধ্য সমস্যা এসে অভিভূত করছে দেশকে। সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে পরস্পর-বিচ্ছেদ ও বিরোধ নানা কদর্য মূর্তিতে প্রকাশিত হয়ে উঠল; বিকৃতি আনলে আমাদের আত্মকল্যাণবোধে। এই সমস্যার সমাধান সহজে হবার নয়, সমাধান না হলেও নিরবচ্ছিন্ন দুর্গতি।

সমস্ত দেশের সংস্কৃতি সৌভ্রাত্র সচ্ছলতা একদা বিকীর্ণ ছিল আমাদের গ্রামে। আজ সেখানে প্রবেশ করলে দেখতে পাবে, মরণদশা তার বুকে খর নখর বিদ্ধ করেছে একটা রক্তশোষী শ্বাপদের মতো। অনশন ও দুঃখদারিদ্র্যের সহচর মজ্জাগত মারী সমস্ত জাতির জীবনীশক্তিকে জীর্ণজর্জর করে দিয়েছে। এর প্রতিকার কোথায় সে কথা ভাবতে হবে আমাদের নিজেকে—অশিক্ষিত কল্পনার দ্বারা নয়, ভাববিহ্বল দৃষ্টির বাষ্পাকুলতা দিয়ে নয়। এই পণ করে চলতে হবে যে, পরাস্ত যদি হতেও হয় তবে সে যেন প্রতিকূল অবস্থার কাছে ভীরুর মতো হাল ছেড়ে দিয়ে নয়; যেন নির্বোধের মতো নির্বিচারে আত্মহত্যার মাঝদরিয়ায় ঝাঁপ দিয়ে পড়াকেই গর্বের বিষয় না মনে করি।

ভাবপ্রবণতা আছে আমাদের দেশে অতিপরিমাণে। কর্মোদ্‌যোগে নিজেকে অপ্রমত্তভাবে প্রবৃত্ত করতে আমাদের মন যায় না। অবাস্তবের মোহাবেশ কাটিয়ে পুরুষের মতো উজ্জ্বল বুদ্ধির আলোকে দেশের সমস্ত অসম্পূর্ণতা মূঢ়তা কদর্যতা সব-কিছুকে অত্যুক্তিবর্জিত করে জেনে দৃঢ় সংকল্পের সঙ্গে দেশের দায়িত্ব গ্রহণ করো। যেখানে বাস্তবের ক্ষেত্রে ভাগ্য আমাদের প্রতিদিন বঞ্চিত করে, অবমানিত করে, সেখানে ঘর-গড়া অহংকারে নিজেকে ভোলাবার চেষ্টা দুর্বল চিত্তের দুর্লক্ষণ। সত্যকার কাজ আরম্ভ করার মুখে এ কথা মানাই চাই যে, আমাদের সমাজে, আমাদের

স্বভাবে, আমাদের অভ্যাসে, আমাদের বুদ্ধি-বিকারে গভীরভাবে নিহিত হয়ে আছে আমাদের সর্বনাশ। যখনই আমাদের দুর্গতির সকল দায়িত্ব একমাত্র বাহিরের অবস্থার অথবা অপর কোনো পক্ষের প্রতিকূলতার উপর আরোপ করে বধির শূন্যের অভিমুখে তারস্বরে অভিযোগ ঘোষণা করি তখনই হতাশ্বাস ধৃতরাষ্ট্রের মতো মন বলে ওঠে : তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়।

আজ আমাদের অভিযান নিজের অন্তর্নিহিত আত্মশত্রুতার বিরুদ্ধে; প্রাণপণ আঘাত হানতে হবে বহুশতাব্দীনির্মিত মূঢ়তার দুর্গভিত্তি-মূলে। আগে নিজের শক্তিকে তামসিকতার জড়িমা থেকে উদ্ধার করে নিয়ে তার পরে পরের শক্তির সঙ্গে আমাদের সম্মানিত সন্ধি হতে পারবে। নইলে আমাদের সন্ধি হবে ঋণের জালে, ভিক্ষুকতার জালে আষ্টেপৃষ্ঠে আড়ষ্টকর পাকে জড়িত। নিজের শ্রেষ্ঠতার দ্বারাই অন্যের শ্রেষ্ঠতাকে আমরা জাগাতে পারি, তাতেই মঙ্গল আমাদের ও অন্যের। দুর্বলের প্রার্থনা যে কুণ্ঠাগ্রস্ত দান সঞ্চয় করে সে দান শতছিদ্র ঘটের জল, যে আশ্রয় পায় চোরাবালিতে সে আশ্রয়ের ভিত্ত।

হে বিধাতা,
দাও দাও মোদের গৌরব দাও
দুঃসাধ্যের নিমন্ত্রণে
দুঃসহ দুঃখের গর্বে।
টেনে তোলো রসাক্ত ভাবের মোহ হতে।
সবলে ধিক্‌কৃত করো দীনতার ধূলায় লুণ্ঠন।
দূর করো চিত্তের দাসত্ববন্ধ,
ভাগ্যের নিয়ত অক্ষমতা,
দূর করো মূঢ়তায় অযোগ্যের পদে
মানবমর্যাদাবিসর্জন,
চূর্ণ করো যুগে যুগে স্তূপীকৃত লজ্জারাশি
নিষ্ঠুর আঘাতে।
নিঃসংকোচে
মস্তক তুলিতে দাও
অনন্ত আকাশে
উদাত্ত আলোকে
মুক্তির বাতাসে।

৫ ফাল্গুন ১৩৪০

আশ্রমের রূপ ও বিকাশ

প্রাচীন ভারতের তপোবন জিনিসটির ঠিক বাস্তব রূপ কী তার স্পষ্ট ধারণা আজ অসম্ভব। মোটের উপর এই বুঝি যে আমরা যাঁদের ঋষিমুনি বলে থাকি অরণ্যে ছিল তাঁদের সাধনার স্থান। সেই সঙ্গেই ছিল স্ত্রী পরিজন নিয়ে তাঁদের গার্হস্থ্য। এই সকল আশ্রমে কাম ক্রোধ রাগ দ্বেষের আলোড়ন যথেষ্ট ছিল, পুরাণের আখ্যায়িকায় তার বিবরণ মেলে।

কিন্তু তপোবনের যে চিত্রটি স্থায়ীভাবে রয়ে গেছে পরবর্তী ভারতের চিত্তে ও সাহিত্যে, সেটি হচ্ছে কল্যাণের নির্মল সুন্দর মানসমূর্তি, বিলাসমোহমুক্ত বলবান আনন্দের মূর্তি। অব্যবহিত পারিপার্শ্বিকের জটিলতা আবিলতা অসম্পূর্ণতা থেকে পরিত্রাণের আকাঙ্ক্ষা এই কাম্যলোক সৃষ্টি করে তুলেছিল ইতিহাসের অস্পষ্ট স্মৃতির উপকরণ নিয়ে। পরবর্তীকালে কবিদের বেদনার মধ্যে যেন দেশব্যাপী একটি নির্বাসন-দুঃখের আভাস পাওয়া যায়, কালিদাসের রঘুবংশে তার সুস্পষ্ট নিদর্শন আছে। সেই নির্বাসন তপোবনের উপকরণবিরল শান্ত সুন্দর যুগের থেকে ভোগৈশ্বর্যজালে বিজড়িত তামসিক যুগে।

কালিদাসের বহুকাল পরে জন্মেছি, কিন্তু এই ছবি রয়ে গেছে আমারও মনে। যৌবনে নিভৃতে ছিলুম পদ্মাবক্ষে সাহিত্যসাধনায়। কাব্যচর্চার মাঝখানে কখন এক সময়ে সেই তপোবনের আহ্বান আমার মনে এসে পৌঁচেছিল। ভাববিলীন তপোবন আমার কাছ থেকে রূপ নিতে চেয়েছিল আধুনিককালের কোনো একটি অনুকূল ক্ষেত্রে। যে প্রেরণা কাব্যরূপ-রচনায় প্রবৃত্ত করে, এর মধ্যে সেই প্রেরণাই ছিল—কেবলমাত্র বাণীরূপ নয়, প্রত্যক্ষরূপ।

অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে আমার মনে এই কথাটি জেগে উঠেছিল, ছেলেদের মানুষ করে তোলবার জন্যে যে-একটা যন্ত্র তৈরি হয়েছে, যার নাম ইস্কুল, সেটার ভিতর দিয়ে মানবশিশুর শিক্ষার সম্পূর্ণতা হতেই পারে না। এই শিক্ষার জন্যে আশ্রমের দরকার, যেখানে আছে সমগ্রজীবনের সজীব ভূমিকা।

তপোবনের কেন্দ্রস্থলে আছেন গুরু। তিনি যন্ত্র নন, তিনি মানুষ। নিষ্ক্রিয়ভাবে মানুষ নন, সক্রিয়ভাবে; কেননা মনুষ্যত্বের লক্ষ্য-সাধনে তিনি প্রবৃত্ত। এই তপস্যার গতিমান ধারায় শিষ্যদের চিত্তকে গতিশীল করে তোলা তাঁর আপন সাধনারই অঙ্গ। শিষ্যদের জীবন এই যে প্রেরণা পাচ্ছে সে তাঁর অব্যবহিত সঙ্গ থেকে। নিত্যজাগরূক মানবচিত্তের এই সঙ্গ জিনিসটিই আশ্রমের শিক্ষায় সব চেয়ে মূল্যবান উপাদান—অধ্যাপনার বিষয় নয়, পদ্ধতি নয়, উপকরণ নয়। গুরুর মন প্রতি মুহূর্তে আপনাকে পাচ্ছে বলেই আপনাকে দিচ্ছে। পাওয়ার আনন্দ দেওয়ার আনন্দেই নিজের সত্যতা সপ্রমাণ করে, যেমন যথার্থ ঐশ্বর্যের পরিচয় ত্যাগের স্বাভাবিকতায়।

পণ্য উৎপাদন ব্যাপারটাকে বিপুল ও দ্রুত করবার জন্যেই আধুনিককালে যন্ত্রযোগে ভূরি উৎপাদনের প্রবর্তন। পণ্যবস্তু প্রাণবান নয়, হাইড্রলিক জাঁতার চাপে তাদের কোনো কষ্ট নেই। কিন্তু শিক্ষা ব্যাপারটা ভূরি উৎপাদনের যান্ত্রিক চেষ্টায় নীরস নৈর্ব্যক্তিক প্রণালীতে মানুষের মনকে পীড়িত করবেই। ধরে নিতে হবে আশ্রমের শিক্ষা সেই শিক্ষার কারখানাঘর হবে না। এখানে প্রত্যেক ছাত্রের মনের উপর শিক্ষকের প্রাণগত স্পর্শ থাকবে, তাতে উভয় পক্ষেরই আনন্দ।

একদা একজন জাপানী ভদ্রলোকের বাড়িতে ছিলাম, বাগানের কাজে তাঁর ছিল বিশেষ শখ। তিনি বলেছিলেন, আমি বৌদ্ধ, মৈত্রীর সাধক। আমি ভালোবাসি গাছপালা, ওদের মধ্যে এই ভালোবাসার অনুভূতি প্রবেশ করে, ওদের কাছ থেকে সেই ভালোবাসারই পাই প্রতিদান। কেবলমাত্র নিপুণ মালীর সঙ্গে প্রকৃতির এই স্বতঃ-আনন্দের যোগ থাকে না। বলা বাহুল্য মানুষ-মালীর সম্বন্ধে এ কথা যে সম্পূর্ণ সত্য তাতে কোনো সন্দেহ নেই। মনের সঙ্গে মন মিলতে থাকলে আপনি জাগে খুশি। সেই খুশি সৃজনশক্তিশীল। আশ্রমের শিক্ষাদান এই খুশির দান। যাঁদের মনে কর্তব্যবোধ আছে কিন্তু খুশি নেই তাঁদের দোসরা পথ।

পুরাকালে আমাদের দেশের গৃহস্থ ধনের দায়িত্ব স্বীকার করতেন। যথাকালে যথাস্থানে যথাপাত্রে দান করার দ্বারা তিনি নিজেকেই জানতেন সার্থক। তেমনি যিনি জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন, জ্ঞান বিতরণের দায়িত্ব তিনি স্বতই গ্রহণ করতেন। তিনি জানতেন, যা পেয়েছেন তা দেবার সুযোগ না পেলে পাওয়াই থাকে অসম্পূর্ণ। গুরুশিষ্যের মধ্যে এই পরস্পরসাপেক্ষ সহজ সম্বন্ধকেই আমি বিদ্যাদানের প্রধান মাধ্যস্থ্য বলে জেনেছি।

আরো একটি কথা আমার মনে ছিল। গুরুর অন্তরে ছেলেমানুষটি যদি একেবারে শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায় তা হলে তিনি ছেলেদের ভার নেবার অযোগ্য হন। শুধু সামীপ্য নয়, উভয়ের মধ্যে প্রকৃতিগত সাযুজ্য ও সাদৃশ্য থাকা চাই। নইলে দেনা-পাওনায় নাড়ীর যোগ থাকে না। নদীর সঙ্গে যদি প্রকৃত শিক্ষকের তুলনা করি তবে বলব, কেবল ডাইনে বাঁয়ে কতকগুলো বুড়ো বুড়ো উপনদী-যোগেই তিনি পূর্ণ নন। তাঁর প্রথম আরম্ভের লীলাচঞ্চল কলহাস্যমুখর ঝরনার প্রবাহ পাথরগুলোর মধ্যে হারিয়ে যায় নি। যিনি জাত-শিক্ষক ছেলেদের ডাক পেলেই তাঁর আপন ভিতরকার আদিম ছেলেটা আপনি ছুটে আসে। মোটা গলার ভিতর থেকে উচ্ছ্বসিত হয় প্রাণে-ভরা কাঁচা হাসি। ছেলেরা যদি কোনো দিক থেকেই তাঁকে স্বশ্রেণীর জীব বলে চিনতে না পারে, যদি মনে করে লোকটা যেন প্রাগৈতিহাসিক মহাকায় প্রাণী, তবে থাবার আড়ম্বর দেখে নির্ভয়ে সে তাঁর কাছে হাত বাড়াতেই পারবে না। সাধারণত আমাদের গুরুরা প্রবীণতা সপ্রমাণ করতেই চান, প্রায়ই ওটা সস্তায় কর্তৃত্ব করবার প্রলোভনে, ছেলেদের আঙিনায় চোপদার না নিয়ে এগোলে সম্ভ্রম নষ্ট হবার ভয়ে তাঁরা সতর্ক। তাই পাকা শাখায় কচি শাখায় ফুল ফোটাবার ফল ফলাবার মর্মগত সহযোগ রুদ্ধ হয়ে থাকে।

আর-একটা গুরুতর কথা আমার মনে ছিল। ছেলেরা বিশ্বপ্রকৃতির অত্যন্ত কাছের সামগ্রী। আরামকেদারায় তারা আরাম চায় না, গাছের ডালে তারা চায় ছুটি। বিরাট প্রকৃতির অন্তরে আদিম প্রাণের বেগ নিগূঢ়ভাবে চঞ্চল, শিশুর প্রাণে সেই বেগ গতিসঞ্চার করে। জীবনের আরম্ভে অভ্যাসের দ্বারা অভিভূত হবার আগে কৃত্রিমতার জাল থেকে ছুটি পাবার জন্যে ছেলেরা ছট্‌ফট্‌ করতে থাকে, সহজ প্রাণলীলার অধিকার তারা দাবি করে বয়স্কদের শাসন এড়িয়ে। আরণ্যক ঋষিদের মনের মধ্যে ছিল চিরকালের ছেলে, তাই কোনো বৈজ্ঞানিক প্রমাণের অপেক্ষা না রেখে তাঁরা বলেছিলেন, যদিদং কিঞ্চ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্‌— এই যা-কিছু সমস্তই প্রাণ হতে নিঃসৃত হয়ে প্রাণেই কম্পিত হচ্ছে। এ কি বর্গ্‌সঁ-এর বচন। এ মহান শিশুর বাণী। বিশ্বপ্রাণের এই স্পন্দন লাগতে দাও ছেলেদের দেহে মনে, শহরের বোবা কালা মরা দেওয়ালগুলোর বাইরে। আমাদের আশ্রমের ছেলেরা এই প্রাণময়ী প্রকৃতিকে কেবল যে খেলায় ধুলায় নানা রকম করে কাছে পেয়েছে তা নয়,

আমি গানের রাস্তা দিয়ে নিয়ে গেছি তাদের মনকে প্রকৃতির রঙমহলে।

তার পরে আশ্রমের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার কথা। মনে পড়ছে, কাদম্বরীতে একটি বর্ণনা আছে— তপোবনে আসছে সন্ধ্যা, যেন গোষ্ঠে-ফিরে-আসা পাটলী হোমধেনুটির মতো। শুনে মনে পড়ে যায় সেখানে গোরু চরানো, গো দোহন, সমিধ্ আহরণ, অতিথি-পরিচর্যা, আশ্রম-বালকবালিকাদের দিনকৃত্য। এই সব কর্মপর্যায়ের দ্বারা তপোবনের সঙ্গে তাদের নিত্য-প্রবাহিত জীবনের যোগধারা। প্রাণায়ামের ফাঁকে ফাঁকে কেবলি যে সামমন্ত্র আবৃত্তি তা নয়, সহকারিতার সখ্য বিস্তারে সকলে মিলে আশ্রমের সৃষ্টিকার্য পরিচালন; তাতে করে আশ্রম হত আশ্রমবাসীদের নিজ হাতের সম্মিলিত রচনা, কর্মসমবায়ে। আমাদের আশ্রমে এই সতত-উদ্যমশীল কর্মসহযোগিতা কামনা করেছি। মাস্টারমশায় গোরু চরাবার কাজে ছেলেদের লাগালে তারা খুশি হত সন্দেহ নেই, দুর্ভাগ্যক্রমে এ যুগে তা সম্ভব হবে না। তবু শরীর মন খাটাবার কাজ বিস্তর আছে যা এ যুগে মানাত। কিন্তু হায় রে, পড়া মুখস্থ সর্বদাই থাকে বাকি, পাতা ভরে রয়েছে কন্‌জুগেশন্ অফ ইংরেজি ভর্ব্‌স্। তা হোক, আমি যে বিদ্যানিকেতনের কল্পনা করেছি পড়া-মুখস্থর কড়া পাহারা ঠেলেঠুলে তার মধ্যে পরস্পরের সেবা এবং পরিবেশ-রচনার কাজকে প্রধান স্থান দিয়েছি।

আশ্রমের শিক্ষাকে যথার্থভাবে সফল করতে হলে জীবনযাত্রাকে যথাসম্ভব উপকরণবিরল করে তোলা অত্যাবশ্যক হয়ে ওঠে। মানুষের প্রকৃতিতে যেখানে জড়তা আছে সেখানে প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা কুশ্রী উচ্ছৃঙ্খল এবং মলিন হতে থাকে, সেখানে তার স্বাভাবিক বর্বরতা প্রকাশে বাধা পায় না। ধনীসমাজে আন্তরিক শক্তির অভাব থাকলেও বাহ্যিক উপকরণ-প্রাচুর্যে কৃত্রিম উপায়ে এই দীনতাকে চাপা দিয়ে রাখা যায়। আমাদের দেশে প্রায় সর্বত্রই ধনীগৃহে সদর-অন্দরের প্রভেদ দেখলে এই প্রকৃতিগত তামসিকতা ধরা পড়ে।

আপনার চার দিককে নিজের চেষ্টায় সুন্দর সুশৃঙ্খল ও স্বাস্থ্যকর করে তুলে একত্র বাসের সতর্ক দায়িত্বের অভ্যাস বাল্যকাল থেকেই সহজ করে তোলা চাই। একজনের শৈথিল্য অন্যের অসুবিধা অস্বাস্থ্য ও ক্ষতির কারণ হতে পারে এই বোধটি সভ্য জীবনযাত্রার ভিত্তিগত। সাধারণত আমাদের দেশের গার্হস্থ্যের মধ্যে এই বোধের ত্রুটি সর্বদাই দেখা যায়।

সহযোগিতার সভ্যনীতিকে সচেতন করে তোলা আশ্রমের শিক্ষার প্রধান সুযোগ। এই সুযোগটিকে সফল করবার জন্যে শিক্ষার প্রথম বর্গে উপকরণলাঘব অত্যাবশ্যক। একান্ত বস্তুপরায়ণ স্বভাবে প্রকাশ পায় চিত্তবৃত্তির স্থূলতা। সৌন্দর্য এবং সুব্যবস্থা মনের জিনিস। সেই মনকে মুক্ত করা চাই কেবল আলস্য এবং অনৈপুণ্য থেকে নয়, বস্তুলুব্ধতা থেকে। রচনাশক্তির আনন্দ ততই সত্য হয় যতই তা জড় বাহুল্যের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে। বিচিত্র উপকরণকে সুবিহিতভাবে ব্যবহার করবার সুযোগ উপযুক্ত বয়সে ও অবস্থায় লাভ করবার সুযোগ অনেকের ঘটতে পারে, কিন্তু বাল্যকাল থেকেই ব্যবহার্য বস্তুগুলিকে সুনিয়ন্ত্রিত করবার আত্মশক্তিমূলক শিক্ষাটা আমাদের দেশে অত্যন্ত উপেক্ষিত হয়ে থাকে। সেই বয়সেই প্রতিদিন অল্প কিছু সামগ্রী যা হাতের কাছে পাওয়া যায় তাই দিয়েই সৃষ্টির আনন্দকে সুন্দর করে উদ্ভাবিত করবার চেষ্টা যেন নিরলস হতে পারে এবং সেই সঙ্গেই সাধারণের সুখ স্বাস্থ্য সুবিধা-বিধানের কর্তব্যে ছাত্রেরা যেন আনন্দ পেতে শেখে এই আমার কামনা।

আমাদের দেশে ছেলেদের আত্মকর্তৃত্বের বোধকে অসুবিধাজনক আপদজনক ও ঔদ্ধত্য মনে করে সর্বদা দমন করা হয়। এতে করে পরনির্ভরতার লজ্জা তাদের চলে যায়, পরের প্রতি দাবির আবদার তাদের বেড়ে যায়, ভিক্ষুকতার ক্ষেত্রেও তাদের অভিমান প্রবল হতে থাকে, আর পরের ত্রুটি নিয়ে কলহ করেই তারা আত্মপ্রসাদ লাভ করে। এই লজ্জাকর দীনতা চার দিকে সর্বদাই দেখা যাচ্ছে। এর থেকে মুক্তি পাওয়াই চাই। ছাত্রদের স্পষ্ট বোঝা উচিত, যেখানে নালিশ কথায় কথায় মুখর হয়ে ওঠে সেখানে সঞ্চিত আছে নিজেরই লজ্জার কারণ, আত্মসম্মানের বাধা। ত্রুটি সংশোধনের দায় নিজে গ্রহণ করার উদ্যম যাদের আছে, খুঁতখুঁত করার কাপুরুষতায় তারা ধিক্কার বোধ করে। আমার মনে আছে ছাত্রদের প্রাত্যহিক কাজে যখন আমার যোগ ছিল তখন একদল বয়স্ক ছাত্র আমার কাছে নালিশ করেছিল যে, অন্নভরা বড়ো বড়ো ধাতুপাত্র পরিবেশনের সময় মেজের উপর দিয়ে টানতে টানতে তার তলা ক্ষয়ে গিয়ে ঘর-ময় নোংরামির সৃষ্টি হয়। আমি বললুম, তোমরা পাচ্ছ দুঃখ, অথচ স্বয়ং এর সংশোধনের চিন্তামাত্র তোমাদের মনে আসে না, তাকিয়ে আছ আমি এর প্রতিবিধান করব। এই সামান্য কথাটা তোমাদের বুদ্ধিতে আসছে না যে, ঐ পাত্রটার নিচে একটা বিড়ে বেঁধে দিলেই ঘর্ষণ নিবারণ হয়। তার একমাত্র কারণ, তোমরা জান নিষ্ক্রিয়ভাবে ভোক্তৃত্বের অধিকারই তোমাদের আর কর্তৃত্বের অধিকার অন্যের। এইরকম ছেলেই বড়ো হয়ে সকল কর্মেই কেবল খুঁতখুঁতের বিস্তার করে নিজের মজ্জাগত অকর্মণ্যতার লজ্জাকে দশ দিকে গুঞ্জরিত করে তোলে।

এই বিদ্যালয়ের প্রথম থেকেই আমার মনে ছিল আশ্রমের নানা ব্যবস্থার মধ্যে যথাসম্ভব পরিমাণে ছাত্রদের কর্তৃত্বের অবকাশ দিয়ে অক্ষম কলহপ্রিয়তার ঘৃণ্যতা থেকে তাদের চরিত্রকে রক্ষা করব।

উপকরণের বিরলতা নিয়ে অসংগত ক্ষোভের সঙ্গে অসন্তোষ-প্রকাশের মধ্যেও চরিত্রদৌর্বল্য প্রকাশ পায়। আয়োজনের কিছু অভাব থাকাই ভালো, অভ্যস্ত হওয়া চাই স্বল্পে, অনায়াসে প্রয়োজনের জোগান দেওয়ার দ্বারা ছেলেদের মনটাকে আদুরে করে তোলা তাদের ক্ষতি করা। সহজেই তারা যে এত কিছু চায় তা নয়, তারা আত্মতৃপ্ত; আমরাই বয়স্কলোকের চাওয়াটা কেবলি তাদের উপর চাপিয়ে তাদেরকে বস্তুর নেশা-গ্রস্ত করে তুলি। গোড়া থেকেই শিক্ষার প্রয়োজন এই কথা ভেবে যে, কত অল্প নিয়ে চলতে পারে। শরীর মনের শক্তির সম্যক্‌রূপে চর্চা সেইখানেই ভালো করে সম্ভব যেখানে বাইরের সহায়তা অনতিশয়। সেখানে মানুষের আপনার সৃষ্টি-উদ্যম আপনি জাগে। যাদের না জাগে প্রকৃতি তাদেরকে আবর্জনার মতো ঝেঁটিয়ে ফেলে দেয়। আত্মকর্তৃত্বের প্রধান লক্ষণ সৃষ্টিকর্তৃত্ব। সেই মানুষই যথার্থ স্বরাট্‌ যে আপনার রাজ্য আপনি সৃষ্টি করে। আমাদের দেশে মেয়েদের হাতে অতিলালিত ছেলেরা মনুষ্যোচিত সেই আত্মপ্রবর্তনার চর্চা থেকে প্রথম হতেই বঞ্চিত। তাই আমরা অন্যদের শক্ত হাতের চাপে অন্যদের ইচ্ছার নমুনায় রূপ নেবার জন্যে অত্যন্ত কাদামাখাভাবে প্রস্তুত। তাই আপিসের নিম্নতম বিভাগে আমরা আদর্শ কর্মচারী।

এই উপলক্ষে আর একটা কথা আমার বলবার আছে। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে শরীর-তন্তুর শৈথিল্য বা অন্য যে কারণবশতই হোক আমাদের মানসপ্রকৃতিতে ঔৎসুক্যের অত্যন্ত অভাব। একবার আমেরিকা থেকে জল-তোলা বায়ুচক্র আনিয়েছিলুম। প্রত্যাশা করেছিলুম প্রকাণ্ড এই যন্ত্রটার ঘূর্ণিপাখার চালনা দেখতে ছেলেদের আগ্রহ হবে। কিন্তু দেখলুম অতি অল্প ছেলেই ওটার দিকে

ভালো করে তাকালে। ওরা নিতান্তই আলগাভাবে ধরে নিলে ও একটা জিনিস মাত্র। কেবল একজন নেপালী ছেলে ওটাকে মন দিয়ে দেখেছে। টিনের বাক্স কেটে সে ওর একটা নকলও বানিয়েছে। মানুষের প্রতি আমাদের ছেলেদের ঔৎসুক্য দুর্বল, গাছপালা পশুপাখির প্রতিও। স্রোতের শ্যাওলার মতো ওদের মন ভেসে বেড়ায়, চার দিকের জগতে কোনো কিছুকেই আঁকড়ে ধরে না।

নিরৌৎসুক্যই আন্তরিক নির্জীবতা। আজকের দিনে যে সব জাতি সমস্ত পৃথিবীর উপর প্রভাব বিস্তার করেছে সমস্ত পৃথিবীর সব কিছুরই উপরে তাদের ঔৎসুক্যের অন্ত নেই। কেবলমাত্র নিজের দেশের মানুষ ও বস্তু সম্বন্ধে নয়, এমন দেশ নেই এমন কাল নেই এমন বিষয় নেই যার প্রতি তাদের মন ধাবিত না হচ্ছে। মন তাদের সর্বতোভাবে বেঁচে আছে—তাদের এই সজীব চিত্তশক্তি জয়ী হল সর্বজগতে।

পূর্বেই আভাস দিয়েছি আশ্রমের শিক্ষা পরিপূর্ণভাবে বেঁচে থাকবার শিক্ষা। মরা মন নিয়েও পড়া মুখস্থ করে পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীর ঊর্ধ্বশিখরে ওঠা যায়; আমাদের দেশে প্রত্যহ তার পরিচয় পাই। তারাই আমাদের দেশের ভালো ছেলে যাদের মন গ্রন্থের পত্রচর, ছাপার অক্ষরে একান্ত আসক্ত, বাইরের প্রত্যক্ষ জগতের প্রতি যাদের চিত্তবিক্ষেপের কোনো আশঙ্কা নেই। এরা পদবী অধিকার করে, জগৎ অধিকার করে না। প্রথম থেকে আমার সংকল্প এই ছিল, আমার আশ্রমের ছেলেরা চারি দিকের জগতের অব্যবহিত সম্পর্কে উৎসুক হয়ে থাকবে—সন্ধান করবে, পরীক্ষা করবে, সংগ্রহ করবে। অর্থাৎ এখানে এমন-সকল শিক্ষক সমবেত হবেন যাঁদের দৃষ্টি বইয়ের সীমানা পেরিয়ে গেছে, যাঁরা চক্ষুষ্মান, যাঁরা সন্ধানী, যাঁরা বিশ্বকুতূহলী, যাঁদের আনন্দ প্রত্যক্ষ জ্ঞানে এবং সেই জ্ঞানের বিষয়বিস্তারে, যাঁদের প্রেরণাশক্তি সহযোগীমণ্ডল সৃষ্টি করে তুলতে পারে।

সব শেষে বলব আমি যেটাকে সব চেয়ে বড়ো মনে করি এবং যেটা সব চেয়ে দুর্লভ। তাঁরাই শিক্ষক হবার উপযুক্ত যাঁরা ধৈর্যবান, ছেলেদের প্রতি স্নেহ যাঁদের স্বাভাবিক। শিক্ষকদের নিজের চরিত্র সম্বন্ধে যথার্থ বিপদের কথা এই যে, যাদের সঙ্গে তাঁদের ব্যবহার, ক্ষমতায় তারা তাঁদের সমকক্ষ নয়। তাদের প্রতি সামান্য কারণে অসহিষ্ণু হওয়া এবং বিদ্রূপ করা অপমান করা শাস্তি দেওয়া অনায়াসেই সম্ভব। যাকে বিচার করা যায় তার যদি কোনোই শক্তি না থাকে তবে অবিচার করাই সহজ হয়ে ওঠে। ক্ষমতা ব্যবহার করবার স্বাভাবিক যোগ্যতা যাদের নেই অক্ষমের প্রতি অবিচার করতে কেবল যে তাদের বাধা থাকে না তা নয়, তাদের আনন্দ থাকে। ছেলেরা অবোধ হয়ে দুর্বল হয়ে মায়ের কোলে আসে, এইজন্যে তাদের রক্ষার প্রধান উপায় মায়ের মনে অপর্যাপ্ত স্নেহ। তৎসত্ত্বেও স্বাভাবিক অসহিষ্ণুতা ও শক্তির অভিমান স্নেহকে অতিক্রম করেও ছেলেদের 'পরে অন্যায় অত্যাচারে প্রবৃত্ত করে, ঘরে ঘরে তার প্রমাণ দেখা যায়। ছেলেদের মানুষ হবার পক্ষে এমন বাধা অল্পই আছে। ছেলেদের কঠিন দণ্ড ও চরম দণ্ড দেবার দৃষ্টান্ত দেখলে আমি শিক্ষকদেরই দায়ী করে থাকি। পাঠশালায় মূর্খতার জন্যে ছাত্রদের 'পরে যে নির্যাতন ঘটে তার বারো আনা অংশ গুরুমশায়ের নিজেরই প্রাপ্য। বিদ্যালয়ের কাজে আমি যখন নিজে ছিলুম তখন শিক্ষকের কঠোর বিচার থেকে ছাত্রকে রক্ষা করা আমার দুঃসাধ্য সমস্যা ছিল। অপ্রিয়তা স্বীকার করে আমাকে এ কথা বোঝাতে হয়েছে, শিক্ষার কাজটাকে বলের দ্বারা সহজ করবার জন্যেই যে শিক্ষক আছেন তা নয়। আজ পর্যন্ত মনে আছে চরম শাসন থেকে এমন অনেক

ছাত্রকে রক্ষা করেছি যার জন্যে অনুতাপ করতে হয় নি। রাষ্ট্রতন্ত্রেই কী আর শিক্ষাতন্ত্রেই কী, কঠোর শাসননীতি শাসয়িতারই অযোগ্যতার প্রমাণ।

৫ আষাঢ় ১৩৪৩

২

শিলাইদহে পদ্মাতীরে সাহিত্যচর্চা নিয়ে নিভৃতে বাস করতুম। একটা সৃষ্টির সংকল্প নিয়ে সেখান থেকে এলেম শান্তিনিকেতনের প্রান্তরে।

তখন আশ্রমের পরিধি ছিল ছোটো। তার দক্ষিণ সীমানায় দীর্ঘ সার-বাঁধা শালগাছ। মাধবী-লতা-বিতানে প্রবেশের দ্বার। পিছনে পূব দিকে আমবাগান, পশ্চিম দিকে কোথাও-বা তাল, কোথাও-বা জাম, কোথাও-বা ঝাউ, ইতস্তত গুটিকয়েক নারকেল। উত্তরপশ্চিম প্রান্তে প্রাচীন দুটি ছাতিমের তলায় মার্বেল পাথরে বাঁধানো একটি নিরলংকৃত বেদী। তার সামনে গাছের আড়াল নেই, দিগন্ত পর্যন্ত অবারিত মাঠ, সে মাঠে তখনো চাষ পড়ে নি। উত্তর দিকে আমলকী-বনের মধ্যে অতিথিদের জন্যে দোতলা কোঠা আর তারি সংলগ্ন রান্নাবাড়ি প্রাচীন কদমগাছের ছায়ায়। আর একটি মাত্র পাকা বাড়ি ছিল একতলা, তারি মধ্যে ছিল পুরানো আমলের বাঁধানো তত্ত্ববোধিনী এবং আরো কিছু বইয়ের সংগ্রহ। এই বাড়িটিকেই পরে প্রশস্ত করে এবং এর উপরে আর একতলা চড়িয়ে বর্তমান গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছে। আশ্রমের বাইরে দক্ষিণের দিকে বাঁধ তখন ছিল বিস্তৃত এবং জলে ভরা। তার উত্তরের উঁচু পাড়িতে বহুকালের দীর্ঘ তালশ্রেণী। আশ্রম থেকে দেখা যেত বিনা বাধায়। আশ্রমের পূর্ব সীমানায় বোলপুরের দিকে ছায়াশূন্য রাঙামাটির রাস্তা গেছে চলে। সে রাস্তায় লোকচলাচল ছিল সামান্য। কেননা শহরে তখনো ভিড় জমে নি, বাড়ি ঘর সেখানে অল্পই। ধানের কল তখনো আকাশে মলিনতা ও আহার্যে রোগ বিস্তার করতে আরম্ভ করে নি। চারিদিকে বিরাজ করত বিপুল অবকাশ নীরব নিস্তব্ধ।

আশ্রমের রক্ষী ছিল বৃদ্ধ দ্বারী সর্দার, ঋজু দীর্ঘ প্রাণসার তার দেহ। হাতে তার লম্বা পাকা-বাঁশের লাঠি, প্রথম বয়সের দস্যুবৃত্তির শেষ নিদর্শন। মালী ছিল হরিশ, দ্বারীর ছেলে। অতিথিভবনের একতলায় থাকতেন দ্বিপেন্দ্রনাথ তাঁর কয়েকজন অনুচর-পরিচর নিয়ে। আমি সস্ত্রীক আশ্রয় নিয়েছিলুম দোতলার ঘরে।

এই শান্ত জনবিরল শালবাগানে অল্প কয়েকটি ছেলে নিয়ে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের সহায়তায় বিদ্যালয়ের কাজ আরম্ভ করেছিলুম। আমার পড়াবার জায়গা ছিল প্রাচীন জামগাছের তলায়।

ছেলেদের কাছে বেতন নেওয়া হত না, তাদের যা কিছু প্রয়োজন সমস্ত আমিই জুগিয়েছি। একটা কথা ভুলেছিলুম যে সেকালে রাজস্বের ষষ্ঠ ভাগের বরাদ্দ ছিল তপোবনে, আর আধুনিক চতুষ্পাঠীর অবলম্বন সামাজিক ক্রিয়াকর্ম উপলক্ষে নিত্যপ্রবাহিত দানদক্ষিণা। অর্থাৎ এগুলি সমাজেরই অঙ্গ, এদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে কোনো ব্যক্তিগত স্বতন্ত্র চেষ্টার প্রয়োজন ছিল না। অথচ আমার আশ্রম ছিল একমাত্র আমারি ক্ষীণ শক্তির উপরে নির্ভর করে। গুরুশিষ্যের মধ্যে আর্থিক

দেনাপাওনার সম্বন্ধ থাকা উচিত নয় এই মত একদা সত্য হয়েছিল যে সহজ উপায়ে, বর্তমান সমাজে সেটা প্রচলিত না থাকা সত্ত্বেও মতটাকে রক্ষা করবার চেষ্টা করতে গেলে কর্মকর্তার আত্মরক্ষা অসাধ্য হয়ে ওঠে, এই কথাটা অনেকদিন পর্যন্ত বহু দুঃখে আমার দ্বারা পরীক্ষিত হয়েছে। আমার সুযোগ হয়েছিল এই যে, ব্রহ্মবান্ধব এবং তাঁর খৃস্টান শিষ্য রেবাচাঁদ ছিলেন সন্ন্যাসী। এই কারণে অধ্যাপনার আর্থিক ও কর্ম-ভার লঘু হয়েছিল তাঁদের দ্বারা। এই প্রসঙ্গে আর একজনের কথা সর্বাপেক্ষা আমার মনে জাগছে, তাঁর কথা কোনোদিন ভুলতে পারি নে। গোড়া থেকে বলা যাক।

এই সময়ে দুটি তরুণ যুবক, তাঁদের বালক বললেই হয়, এসে পড়লেন আমার কাছে। অজিতকুমার চক্রবর্তী তাঁর বন্ধু কবি সতীশচন্দ্র রায়কে নিয়ে এলেন আমাদের জোড়াসাঁকো বাড়িতে, আমার একতলার বসবার ঘরে। সতীশের বয়স তখন উনিশ, বি. এ. পরীক্ষা তাঁর আসন্ন। তাঁর পূর্বে তাঁর একটি কবিতার খাতা অজিত আমাকে পড়বার জন্যে দিয়েছিলেন। পাতায় পাতায় খোলসা করেই জানাতে হয়েছে আমার মত। সব কথা অনুকূল ছিল না। আর কেউ হলে এমন বিস্তারিত বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হতুম না। সতীশের লেখা পড়ে বুঝেছিলুম তাঁর অল্প বয়সের রচনায় অসামান্যতা অনুজ্জ্বলভাবে প্রচ্ছন্ন। যাঁর ক্ষমতা নিঃসন্দিগ্ধ, দুটো একটা মিষ্ট কথায় তাঁকে বিদায় করা তাঁর অসম্মাননা। আমার মতের যে অংশ ছিল অপ্রিয় অজিত তাতে অসহিষ্ণু হয়েছিলেন, কিন্তু সৌম্যমূর্তি সতীশ স্বীকার করে নিয়েছিলেন প্রসন্নভাবে।

আমার মনের মধ্যে তখন আশ্রমের সংকল্পটা সব সময়েই ছিল মুখর হয়ে। কথাপ্রসঙ্গে তার একটা ভবিষ্যৎ ছবি আমি এঁদের সামনে উৎসাহের সঙ্গে উজ্জ্বল করে ধরেছিলুম। দীপ্তি দেখা দিল সতীশের মুখে। আমি তাঁকে আহ্বান করি নি আমার কাজে। আমি জানতুম তাঁর সামনে তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপরের দুই বড়ো ধাপ বাকি। তার শেষভাগে ছিল জীবিকার আশ্বাসবাণী আইন পরীক্ষায়।

একদিন সতীশ এসে বললেন, যদি আমাকে গ্রহণ করেন আমি যোগ দিতে চাই আপনার কাজে। আমি বললুম, পরীক্ষা দিয়ে পরে চিন্তা কোরো। সতীশ বললেন, দেব না পরীক্ষা। কারণ, পরীক্ষা দিলেই আত্মীয়স্বজনের ধাক্কায় সংসারযাত্রার ঢালু পথে আমাকে গড়িয়ে নিয়ে চলবে।

কিছুতে তাঁকে নিরস্ত করতে পারলে না। দারিদ্র্যের ভার অবহেলায় মাথায় করে নিয়ে যোগ দিলেন আশ্রমের কাজে। বেতন অস্বীকার করলেন। আমি তাঁর অগোচরে তাঁর পিতার কাছে যথাসাধ্য মাসিক বৃত্তি পাঠিয়ে দিতুম। তাঁর পরনে ছিল না জামা, একটা চাদর ছিল গায়ে, তার পরিধেয়তা জীর্ণ। যে ভাবরাজ্যে তিনি সঞ্চরণ করতেন সেখানে তাঁর জীবন পূর্ণ হত প্রতিক্ষণে প্রকৃতির রসভাণ্ডার থেকে। আত্মভোলা মানুষ, যখন তখন ঘুরে বেড়াতেন যেখানে সেখানে। প্রায় তার সঙ্গে থাকত ছেলেরা, চলতে চলতে তাঁর সাহিত্যসম্ভোগের আস্বাদন পেত তারাও। সেই অল্প বয়সে ইংরেজি সাহিত্যে সুগভীর অভিনিবেশ তাঁর মতো আর কারও মধ্যে পাই নি। যে সব ছাত্রকে পড়াবার ভার ছিল তাঁর 'পরে তারা ছিল নিতান্তই অর্বাচীন। ইংরেজি ভাষার সোপানশ্রেণীর সব নিচেকার পইঠা পার করে দেওয়াই ছিল তাঁর কাজ, কিন্তু কেজো সীমার মধ্যে বদ্ধ সংকীর্ণ নৈপুণ্য ছিল না তাঁর মাস্টারিতে। সাহিত্যের তিনি রসজ্ঞ সাধক ছিলেন, সেইজন্যে তিনি

যা পাঠ দিতেন তা জমা করবার নয়, তা হজম করবার, তা হয়ে উঠত ছেলেদের মনের খাদ্য। তিনি দিতেন তাদের মনকে অবগাহন-স্নান, তার গভীরতা অত্যাবশ্যকের চেয়ে অনেক বেশি। ভাষাশিক্ষার মধ্যে একটা অনিবার্য শাসন থাকে, সেই শাসনকে অতিক্রম করে দিতে পারতেন সাহিত্যের উদার মুক্তি। এক বৎসরের মধ্যে হল তাঁর মৃত্যু। তার বেদনা আজও রয়ে গেছে আমার মনে। আশ্রমে যারা শিক্ষক হবে তারা মুখ্যত হবে সাধক, আমার এই কল্পনাটি সম্পূর্ণ সত্য করেছিলেন সতীশ।

তার পরের পর্বে এসেছিলেন জগদানন্দ। তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল সাধনা পত্রে তাঁর প্রেরিত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ পড়ে। এই সকল প্রবন্ধের প্রাঞ্জল ভাষা ও সহজ বক্তব্যপ্রণালী দেখে তাঁর প্রতি আমার বিশেষ শ্রদ্ধা আকৃষ্ট হয়েছিল। তাঁর সাংসারিক অভাব মোচনের জন্য আমি তাঁকে প্রথমে আমাদের জমিদারির কাজে নিযুক্ত করেছিলেম। তার প্রধান কারণ জমিদারি দপ্তরে বেতনের কৃপণতা ছিল না। কিন্তু তাঁকে এই অযোগ্য আসনে বন্দী করে রাখতে আমার মনে বেদনা দিতে লাগল। আমি তাঁকে শান্তিনিকেতনে অধ্যাপনার কাজে আমন্ত্রণ করলুম। যদিও এই কার্যে আয়ের পরিমাণ অল্প ছিল তবুও আনন্দের পরিমাণ তাঁর পক্ষে ছিল প্রচুর। তার কারণ শিক্ষাদানে তাঁর স্বভাবের ছিল অকৃত্রিম তৃপ্তি। ছাত্রদের কাছে সর্বতোভাবে আত্মদানে তাঁর একটুও কৃপণতা ছিল না। সুগভীর করুণা ছিল বালকদের প্রতি। শাস্তি উপলক্ষেও তাদের প্রতি লেশমাত্র নির্মমতা তিনি সহ্য করতে পারতেন না। একজন ছাত্রকে কোনো শিক্ষক তার একবেলার আহার বন্ধ করে দণ্ডবিধান করেছিলেন। এই শাসনবিধির নিষ্ঠুরতায় তাঁকে অশ্রু বর্ষণ করতে দেখেছি। তাঁর বিজ্ঞানের ভাণ্ডার খোলা ছিল ছাত্রদের সম্মুখে যদিও তা তাদের পাঠ্য বিষয়ের অন্তর্গত ছিল না। এই আত্মদানের অকার্পণ্য যথার্থ শিক্ষকের যথার্থ পরিচয়। তিনি আপনার আসনকে কখনো ছাত্রদের কাছ থেকে দূরে রাখেন নি। আত্মমর্যাদার স্বাতন্ত্র্য রক্ষার চেষ্টায় তিনি ছাত্রদের সেবায় কখনো লাইন টেনে চলতেন না। তাঁর অধ্যাপকের উচ্চ অধিকার তাঁর সদয় ব্যবহারের আবরণে কখনো অতিপ্রত্যক্ষ ছিল না। বস্তুত সকল বিষয়েই তিনি ছেলেদের সখা ছিলেন। তাঁর ক্লাসে গণিতশিক্ষায় কোনো ছাত্র কিছুমাত্র পিছিয়ে পড়ে পরীক্ষায় যদি অকৃতার্থ হত সে তাঁকে অত্যন্ত আঘাত করত। শিক্ষার উচ্চ আদর্শ রক্ষার জন্য তাঁর অক্লান্ত চেষ্টা ছিল। অমনোযোগী বালকদের প্রতি তাঁর তর্জন গর্জন শুনতে অতিশয় ভয়জনক ছিল কিন্তু তাঁর স্নেহ তাঁর ভর্ৎসনাকে ভিতরে ভিতরে প্রতিবাদ করে চলত, ছাত্ররা তা প্রত্যহ অনুভব করেছে। যে শিক্ষকেরা আশ্রমের সৃষ্টিকার্যে আপনাকে সর্বতোভাবে উৎসর্গ করেছিলেন, জগদানন্দ তার মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন। তাঁর অভাব ও বেদনা আশ্রম কদাচ ভুলতে পারবে না।

সতীশের বন্ধু অজিতকুমার যথার্থ শিক্ষকের পদে উচ্চ স্থান অধিকার করেছিলেন। তাঁর বিদ্যা ছিল ইংরেজি সাহিত্যে ও দর্শনে বহুব্যাপ্ত। এই জ্ঞানের রাজ্যে তিনি ছিলেন ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের ছাত্র। তিনিও নির্বিচারে ছাত্রদের কাছে তাঁর জ্ঞানের সঞ্চয় উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন। তাঁর ছাত্রেরা সর্বদাই তাঁর শিক্ষকতা থেকে উচ্চ অঙ্গের সাহিত্যরস আস্বাদনের অবকাশ পেয়েছিল। যদিও তাদের বয়স অল্প ও যোগ্যতার সীমা সংকীর্ণ তবুও তিনি কখনো তাদের কাছ থেকে নিজের পদের অভিমানে নির্লিপ্ত ছিলেন না। সতীশের মতো দারিদ্র্যে তাঁর

ঔদাসীন্য ছিল না তবুও তিনি তা স্বীকার করে নিয়েছিলেন। আমাদের আশ্রম-নির্মাণ-কার্যে ইনি একজন নিপুণ স্থপতি ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই।

মাঝখানে অতি অল্প সময়ের জন্য এসেছিলেন আমার এক আত্মোৎসর্গপরায়ণ বন্ধু মোহিতচন্দ্র সেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ বিভাগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। সেখানকার খ্যাতি প্রতিপত্তি সমস্ত ত্যাগ করে যোগ দিয়েছিলেন শিক্ষার এমন নিম্ন স্তরে লোকখ্যাতির দিক থেকে যা তাঁর যোগ্য ছিল না। কিন্তু তাতেই তিনি প্রভূত আনন্দ পেয়েছিলেন। কারণ শিক্ষকতা ছিল তাঁর স্বভাবসংগত। অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হয়ে শিক্ষাব্রত অকালে সমাপ্ত হয়ে গেল। তাঁর অকৃপণতা ছিল আর্থিক দিকে এবং পারমার্থিক দিকে। প্রথম যেদিন আমার সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল সেদিন তিনি আশ্রমের আদর্শের সম্বন্ধে যে সম্মান প্রকাশ করেছিলেন আমার আনন্দের পক্ষে তাই যথেষ্ট ছিল। অবশেষে বিদায় নেবার সময়ে তিনি বললেন, যদি আমি আপনার এখানকার কাজে যোগদান করতে পারতুম তবে নিজেকে কৃতার্থ বোধ করতুম। কিন্তু সম্প্রতি তা সম্ভব না হওয়াতে কিঞ্চিৎ শ্রদ্ধার অঞ্জলি দান করে গেলুম। এই বলে আমার হাতে একটি কাগজের মোড়ক দিয়ে গেলেন। পরে খুলে দেখলেম হাজার টাকার একখানি নোট। পরীক্ষকরূপে যা পেয়েছিলেন সমস্তই তিনি তাঁর শ্রদ্ধার নিদর্শনরূপে দান করে গেলেন। কিন্তু কেবল সেই একদিনের দান নয়, তার পর থেকে প্রতিদিন তিনি নিবেদন করেছেন তাঁর শ্রদ্ধার অর্ঘ্য একান্ত অনুপযুক্ত বেতন রূপে।

এঁদের অনেক পরে আশ্রমের সাধনাক্ষেত্রে দেখা দিলেন নন্দলাল। ছোটো বড়ো সমস্ত ছাত্রের সঙ্গে এই প্রতিভাসম্পন্ন আর্টিস্টের একাত্মকতা অতি আশ্চর্য। তাঁর আত্মদান কেবলমাত্র শিক্ষকতায় নয়, সর্বপ্রকার বদান্যতায়। ছাত্রদের রোগে, শোকে, অভাবে তিনি তাদের অকৃত্রিম বন্ধু। তাঁকে যারা শিল্পশিক্ষা উপলক্ষে কাছে পেয়েছে তারা ধন্য হয়েছে।

তার পর থেকে নানা কর্মী, নানা বন্ধু আশ্রমের সাধনাক্ষেত্রে সমবেত হয়েছেন এবং আপন আপন শক্তি ও স্বভাবের বিশিষ্টতা অনুসারে আশ্রমের গঠনকার্যে ক্রমশ বিচিত্র উপকরণ জুগিয়ে এসেছেন। সৃষ্টিকার্যে এই বৈচিত্র্যের প্রয়োজন আছে। নূতন নূতন কালের প্রেরণায় নতুন নতুন রূপ আপনাকে ব্যক্ত করতে থাকে এবং এই উপায়েই কালের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে তবে সে আপনার শক্তিকে অক্ষুণ্ণ রাখতে সমর্থ হয়। সেই পরিবর্তমান আদর্শের অনুবৃত্তির দ্বারা পুরাতন কালের ভিত্তির উপরেই নতুন কালের সৃষ্টি সম্পূর্ণতা লাভ করে। এই নিয়ে কোনো আক্ষেপ করা বৃথা। বস্তুত প্রাচীনকালের ছন্দে নতুনকাল তাল ভঙ্গ করলে সৃষ্টির সংগতি রক্ষা হয় না।

৩

'জীবনস্মৃতি'তে লিখেছি, আমার বয়স যখন অল্প ছিল তখনকার স্কুলের রীতি-প্রকৃতি এবং শিক্ষক ও ছাত্রদের আচরণ আমার পক্ষে নিতান্ত দুঃসহ হয়ে উঠেছিল। তখনকার শিক্ষাবিধির মধ্যে কোনো রস ছিল না. কিন্তু সেইটেই আমার অসহিষ্ণুতার একমাত্র কারণ নয়। কলকাতা শহরে আমি প্রায় বন্দী অবস্থায় ছিলেম। কিন্তু বাড়িতে তবুও বন্ধনের ফাঁকে ফাঁকে বাইরের প্রকৃতির সঙ্গে আমার একটা আনন্দের

সম্বন্ধ জন্মে গিয়েছিল। বাড়ির দক্ষিণ দিকের পুকুরের জলে সকাল-সন্ধ্যার ছায়া এপার-ওপার করত—হাঁসগুলো দিত সাঁতার, গুগলি তুলত জলে ডুব দিয়ে, আষাঢ়ের জলে-ভরা নীলবর্ণ পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ সারবাঁধা নারকেলগাছের মাথার উপরে ঘনিয়ে আনত বর্ষার গম্ভীর সমারোহ। দক্ষিণের দিকে যে বাগানটা ছিল ঐখানেই নানা রঙে ঋতুর পরে ঋতুর আমন্ত্রণ আসত উৎসুক দৃষ্টির পথে আমার হৃদয়ের মধ্যে।

শিশুর জীবনের সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির এই যে আদিম কালের যোগ, প্রাণমনের বিকাশের পক্ষে এর যে কত বড়ো মূল্য তা আশা করি ঘোরতর শাহরিক লোককেও বোঝাবার দরকার নেই। ইস্কুল যখন নীরস পাঠ্য, কঠোর শাসনবিধি ও প্রভুত্বপ্রিয় শিক্ষকদের নির্বিচার অন্যায় নির্মমতায় বিশ্বের সঙ্গে বালকের সেই মিলনের বৈচিত্র্যকে চাপা দিয়ে তার দিনগুলিকে নির্জীব নিরালোক নিষ্ঠুর করে তুলেছিল তখন প্রতিকারহীন বেদনায় মনের মধ্যে ব্যর্থ বিদ্রোহ উঠেছিল একান্ত চঞ্চল হয়ে। যখন আমার বয়স তেরো তখন এডুকেশন-বিভাগীয় দাঁড়ের শিকল ছিন্ন করে বেরিয়ে পড়েছিলেম। তার পর থেকে যে বিদ্যালয়ে হলেম ভর্তি তাকে যথার্থই বলা যায় বিশ্ববিদ্যালয়। সেখানে আমার ছুটি ছিল না, কেননা অবিশ্রাম কাজের মধ্যেই পেয়েছি ছুটি। কোনো কোনো দিন পড়েছি রাত দুটো পর্যন্ত। তখনকার অপ্রখর আলোকের যুগে রাত্রে সমস্ত পাড়া নিস্তব্ধ, মাঝে মাঝে শোনা যেত ‘হরিবোল’ শ্মশানযাত্রীদের কণ্ঠ থেকে। ভেরেণ্ডা তেলের সেজের প্রদীপে দুটো সলতের মধ্যে একটা সলতে নিবিয়ে দিতুম, তাতে শিখার তেজ হ্রাস হত কিন্তু হত আয়ুবৃদ্ধি। মাঝে মাঝে অন্তঃপুর থেকে বড়দিদি এসে জোর করে আমার বই কেড়ে নিয়ে আমাকে পাঠিয়ে দিতেন বিছানায়। তখন আমি যে সব বই পড়বার চেষ্টা করেছি কোনো কোনো গুরুজন তা আমার হাতে দেখে মনে করেছেন স্পর্ধা। শিক্ষার কারাগার থেকে বেরিয়ে এসে যখন শিক্ষার স্বাধীনতা পেলুম তখন কাজ বেড়ে গেল অনেক বেশি অথচ ভার গেল কমে।

তার পরে সংসারে প্রবেশ করলেম; রথীন্দ্রনাথকে পড়াবার সমস্যা এল সামনে। তখন প্রচলিত প্রথায় তাকে ইস্কুলে পাঠালে আমার দায় হত লঘু এবং আত্মীয়-বান্ধবেরা সেইটেই প্রত্যাশা করেছিলেন। কিন্তু বিশ্বক্ষেত্র থেকে যে শিক্ষালয় বিচ্ছিন্ন সেখানে তাকে পাঠানো আমার পক্ষে ছিল অসম্ভব। আমার ধারণা ছিল, অন্তত জীবনের আরম্ভকালে নগরবাস প্রাণের পুষ্টি ও মনের প্রথম বিকাশের পক্ষে অনুকূল নয়। বিশ্বপ্রকৃতির অনুপ্রেরণা থেকে বিচ্ছেদ তার একমাত্র কারণ নয়। শহরে যানবাহন ও প্রাণযাত্রার অন্যান্য নানাবিধ সুযোগ থাকে, তাতে সম্পূর্ণ দেহ-চালনা ও চারিদিকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভে শিশুরা বঞ্চিত হয়; বাহ্য বিষয়ে আত্মনির্ভর চিরদিনের মতো তাদের শিথিল হয়ে যায়। প্রশ্রয়প্রাপ্ত যে সব বাগানের গাছ উপর থেকেই জলসেচনের সুযোগ পায় তারা উপরে উপরেই মাটির সঙ্গে সংলগ্ন থাকে, গভীর ভূমিতে শিকড় চালিয়ে দিয়ে স্বাধীনজীবী হবার শিক্ষা তাদের হয় না; মানুষের পক্ষেও সেইরকম। দেহটাকে সম্যক্‌রূপে ব্যবহার করবার যে শিক্ষা প্রকৃতি আমাদের কাছে দাবি করে এবং নাগরিক ‘ভদ্দর’ শ্রেণীর রীতির কাছে যেটা উপেক্ষিত অবজ্ঞাভাজন তার অভাব-দুঃখ আমার জীবনে আজ পর্যন্ত আমি অনুভব করি। তাই সে সময়ে আমি কলকাতা শহর প্রায় বর্জন করেছিলেম। তখন সপরিজনে থাকতেম শিলাইদহে। সেখানে আমাদের জীবনযাপনের পদ্ধতি ছিল নিতান্তই সাদাসিধে। সেটা সম্ভব হয়েছিল তার কারণ, যে সমাজে আমরা

মানুষ সে সমাজে প্রচলিত প্রাণযাত্রার রীতি ও আদর্শ এখানে পৌঁছতে পারত না, এমনকি তখনকার দিনে নগরবাসী মধ্যবিত্ত লোকেরাও যে সকল আরামে ও আড়ম্বরে অভ্যস্ত তাও ছিল আমাদের থেকে বহু দূরে। বড়ো শহরে পরস্পরের অনুকরণে ও প্রতিযোগিতায় যে অভ্যাসগুলি অপরিহার্যরূপে গড়ে ওঠে সেখানে তার সম্ভাবনা মাত্র ছিল না।

শিলাইদহে বিশ্বপ্রকৃতির নিকটসান্নিধ্যে রথীন্দ্রনাথ যেরকম ছাড়া পেয়েছিল সেরকম মুক্তি তখনকার কালের সম্পন্ন অবস্থার গৃহস্থেরা আপন ঘরের ছেলেদের পক্ষে অনুপযোগী বলেই জানত এবং তার মধ্যে যে বিপদের আশঙ্কা আছে তারা ভয় করত তা স্বীকার করতে। রথী সেই বয়সে ডিঙি বেয়েছে নদীতে। সেই ডিঙিতে করে চলতি স্টীমার থেকে সে প্রতিদিন রুটি নামিয়ে আনত, তাই নিয়ে স্টীমারের সারঙ আপত্তি করেছে বার বার। চরে বনঝাউয়ের জঙ্গলে সে বেরোত শিকার করতে—কোনোদিন বা ফিরে এসেছে সমস্ত দিন পরে অপরাহ্ণে। তা নিয়ে ঘরে উদ্‌বেগ ছিল না তা বলতে পারি নে, কিন্তু সে উদ্‌বেগ থেকে নিজেদের বাঁচাবার জন্যে বালকের স্বাধীন সঞ্চরণ খর্ব করা হয় নি। যখন রথীর বয়স ছিল ষোলোর নিচে তখন আমি তাকে কয়েক জন তীর্থযাত্রীর সঙ্গে পদব্রজে কেদারনাথ-ভ্রমণে পাঠিয়েছি, তা নিয়ে ভর্ৎসনা স্বীকার করেছি আত্মীয়দের কাছ থেকে, কিন্তু একদিকে প্রকৃতির ক্ষেত্রে অন্যদিকে সাধারণ দেশবাসীদের সম্বন্ধে যে কষ্টসহিষ্ণু অভিজ্ঞতা আমি তার শিক্ষার অত্যাবশ্যক অঙ্গ বলে জানতুম তার থেকে তাকে স্নেহের ভীরুতাবশত বঞ্চিত করি নি।

শিলাইদহে কুঠিবাড়ির চারদিকে যে জমি ছিল প্রজাদের মধ্যে নতুন ফসল প্রচারের উদ্দেশ্যে সেখানে নানা পরীক্ষায় লেগেছিলেম। এই পরীক্ষাব্যাপারে সরকারি কৃষিবিভাগের বিশেষজ্ঞদের সহায়তা অত্যধিক পরিমাণেই মিলেছিল। তাঁদের আদিষ্ট উপাদানের তালিকা দেখে চিচেস্‌টরে যারা এগ্রিকালচারাল্‌ কলেজে পাস করে নি এমন-সব চাষিরা হেসেছিল; তাদেরই হাসিটা টিকেছিল শেষ পর্যন্ত। মরার লক্ষণ আসন্ন হলেও শ্রদ্ধাবান রোগীরা যেমন করে চিকিৎসকের সমস্ত উপদেশ অক্ষুণ্ণ রেখে পালন করে, পঞ্চাশ বিঘে জমিতে আলু চাষের পরীক্ষায় সরকারি কৃষিতত্ত্বপ্রবীণদের নির্দেশ সেইরকম একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গেই পালন করেছি। তাঁরাও আমার ভরসা জাগিয়ে রাখবার জন্যে পরিদর্শনকার্যে সর্বদাই যাতায়াত করেছেন। তারই বহুব্যয়সাধ্য ব্যর্থতার প্রহসন নিয়ে বন্ধুবর জগদীশচন্দ্র আজও প্রায় মাঝে মাঝে হেসে থাকেন। কিন্তু তাঁরও চেয়ে প্রবল অট্টহাস্য নীরবে ধ্বনিত হয়েছিল চামরু-নাম-ধারী এক-হাত-কাটা সেই রাজবংশী চাষির ঘরে, যে ব্যক্তি পাঁচ কাঠা জমির উপযুক্ত বীজ নিয়ে কৃষিতত্ত্ববিদের সকল উপদেশই অগ্রাহ্য করে আমার চেয়ে প্রচুরতর ফল লাভ করেছিল। চাষবাস-সম্বন্ধীয় যে সব পরীক্ষা-ব্যাপারের মধ্যে বালক বেড়ে উঠেছিল তারই একটা নমুনা দেবার জন্যে এই গল্পটা বলা গেল; পাঠকেরা হাসতে চান হাসুন, কিন্তু এ কথা যেন মানেন যে শিক্ষার অঙ্গরূপে এই ব্যর্থতাও ব্যর্থ নয়। এত বড়ো অদ্ভুত অপব্যয়ে আমি যে প্রবৃত্ত হয়েছিলুম তার কুইক্‌সটিত্বের মূল্য চামরুকে বোঝাবার সুযোগ হয় নি, সে এখন পরলোকে।

এরই সঙ্গে সঙ্গে পুঁথিগত বিদ্যার আয়োজন ছিল সে কথা বলা বাহুল্য। এক পাগলা মেজাজের চালচুলোহীন ইংরেজ শিক্ষক হঠাৎ গেল জুটে। তার পড়াবার কায়দা খুবই ভালো, আরো ভালো এই যে কাজে ফাঁকি দেওয়া তার ধাতে ছিল না। মাঝে মাঝে মদ খাবার দুর্নিবার উত্তেজনায় সে পালিয়ে গেছে কলকাতায়, তার পর

মাথা হেঁট করে ফিরে এসেছে লজ্জিত অনুতপ্ত চিত্তে। কিন্তু কোনোদিন শিলাইদহে মত্ততায় আত্মবিস্মৃত হয়ে ছাত্রদের কাছে শ্রদ্ধা হারাবার কোনো কারণ ঘটায় নি। ভৃত্যদের ভাষা বুঝতে পারত না, সেটাকে অনেক সময়ে সে মনে করেছে ভৃত্যদেরই অসৌজন্য। তা ছাড়া সে আমার প্রাচীন মুসলমান চাকরকে তার পিতৃদত্ত ফটিক নামে কোনোমতেই ডাকত না। তাকে অকারণে সম্বোধন করত সুলেমান। এর মনস্তত্ত্বরহস্য কী জানি নে। এতে বার বার অসুবিধা ঘটত। কারণ চাষিঘরের সেই চাকরটি বরাবরই ভুলত তার অপরিচিত নামের মর্যাদা।

আরো কিছু বলবার কথা আছে। লরেন্সকে পেয়ে বসল রেশমের চাষের নেশায়। শিলাইদহের নিকটবর্তী কুমারখালি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলে রেশম-ব্যবসায়ের একটা প্রধান আড্ডা ছিল। সেখানকার রেশমের বিশিষ্টতা খ্যাতিলাভ করেছিল বিদেশী হাটে। সেখানে ছিল রেশমের মস্ত বড়ো কুঠি। একদা রেশমের তাঁত বন্ধ হল সমস্ত বাংলা দেশে, পূর্বস্মৃতির স্বপ্নাবিষ্ট হয়ে কুঠি রইল শূন্য পড়ে। যখন পিতৃঋণের প্রকাণ্ড বোঝা আমার পিতার সংসার চেপে ধরল বোধ করি তারই কোনো এক সময়ে তিনি রেলওয়ে কোম্পানিকে এই কুঠি বিক্রি করেন। সে সময়ে গোরাই নদীর উপরে ব্রিজ তৈরি হচ্ছে। এই সেকেলে প্রাসাদের প্রভূত ইঁট পাথর ভেঙে নিয়ে সেই কোম্পানি নদীর বেগ ঠেকাবার কাজে সেগুলো জলাঞ্জলি দিলে। কিন্তু যেমন বাংলার তাঁতির দুর্দিনকে কেউ ঠেকাতে পারলে না, যেমন সাংসারিক দুর্যোগে পিতামহের বিপুল ঐশ্বর্যের ধ্বংস কিছুতে ঠেকানো গেল না—তেমনি কুঠিবাড়ির ভগ্নাবশেষ নিয়ে নদীর ভাঙন রোধ মানলে না; সমস্তই গেল ভেসে; সুসময়ের চিহ্নগুলোকে কালস্রোত যেটুকু রেখেছিল নদীর স্রোতে তাকে দিলে ভাসিয়ে।

লরেন্সের কানে গেল রেশমের সেই ইতিবৃত্ত। ওর মনে লাগল, আর একবার সেই চেষ্টার প্রবর্তন করলে ফল পাওয়া যেতে পারে; দুর্গতি যদি খুব বেশি হয় অন্তত আলুর চাষকে ছাড়িয়ে যাবে না। চিঠি লিখে যথারীতি বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে সে খবর আনালে। কীটদের আহার জোগাবার জন্যে প্রয়োজন ভেরেণ্ডা গাছের। তাড়াতাড়ি জন্মানো গেল কিছু গাছ কিন্তু লরেন্সের সবুর সইল না। রাজশাহি থেকে গুটি আনিয়ে পালনে প্রবৃত্ত হল অচিরাৎ। প্রথমত বিশেষজ্ঞদের কথাকে বেদবাক্য বলে মানলে না, নিজের মতে নতুন পরীক্ষা করতে করতে চলল। কীটগুলোর ক্ষুদে ক্ষুদে মুখ, ক্ষুদে ক্ষুদে গ্রাস, কিন্তু ক্ষুধার অবসান নেই। তাদের বংশবৃদ্ধি হতে লাগল খাদ্যের পরিমিত আয়োজনকে লঙ্ঘন করে। গাড়ি করে দূর দূর থেকে অনবরত পাতার জোগান চলল। লরেন্সের বিছানাপত্র, তার চৌকি টেবিল, খাতা বই, তার টুপি পকেট কোর্তা—সর্বত্রই হল গুটির জনতা। তার ঘর দুর্গম হয়ে উঠল দুর্গন্ধের ঘন আবেষ্টনে। প্রচুর ব্যয় ও অক্লান্ত অধ্যবসায়ের পর মাল জমল বিস্তর, বিশেষজ্ঞেরা বললেন অতি উৎকৃষ্ট, এ জাতের রেশমের এমন সাদা রঙ হয় না। প্রত্যক্ষ দেখতে পাওয়া গেল সফলতার রূপ—কেবল একটুখানি ত্রুটি রয়ে গেল। লরেন্স বাজার যাচাই করে জানলে তখনকার দিনে এ মালের কাটতি অল্প, তার দাম সামান্য। বন্ধ হল ভেরেণ্ডা পাতার অনবরত গাড়ি-চলাচল, অনেকদিন পড়ে রইল ছালাভরা গুটিগুলো; তার পরে তাদের কী ঘটল তার কোনো হিসেব আজ কোথাও নেই। সেদিন বাংলাদেশে এই গুটিগুলোর উৎপত্তি হল অসময়ে। কিন্তু যে শিক্ষালয় খুলেছিলেম তার সময় পালন তারা করেছিল।

আমাদের পণ্ডিত ছিলেন শিবধন বিদ্যার্ণব। বাংলা আর সংস্কৃত শেখানো ছিল তাঁর কাজ, আর তিনি ব্রাহ্মধর্মগ্রন্থ থেকে উপনিষদের শ্লোক ব্যাখ্যা করে আবৃত্তি করাতেন। তাঁর বিশুদ্ধ সংস্কৃত উচ্চারণে পিতৃদেব তাঁর প্রতি বিশেষ প্রসন্ন ছিলেন। বাল্যকাল থেকে প্রাচীন ভারতবর্ষের তপোবনের যে আদর্শ আমার মনে ছিল তার কাজ এমনি করে শুরু হয়েছিল কিন্তু তার মূর্তি সম্যক্ উপাদানে গড়ে ওঠে নি।

দীর্ঘকাল ধরে শিক্ষা সম্বন্ধে আমার মনের মধ্যে যে মতটি সক্রিয় ছিল মোটের উপর সেটি হচ্ছে এই যে, শিক্ষা হবে প্রতিদিনের জীবনযাত্রার নিকট অঙ্গ, চলবে তার সঙ্গে এক তালে এক সুরে, সেটা ক্লাসনামধারী খাঁচার জিনিস হবে না। আর যে বিশ্বপ্রকৃতি প্রতিনিয়ত প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ ভাবে আমাদের দেহে মনে শিক্ষাবিস্তার করে সেও এর সঙ্গে হবে মিলিত। প্রকৃতির এই শিক্ষালয়ের একটা অঙ্গ পর্যবেক্ষণ আর একটা পরীক্ষা, এবং সকলের চেয়ে বড়ো তার কাজ প্রাণের মধ্যে আনন্দসঞ্চার। এই গেল বাহ্য প্রকৃতি। আর আছে দেশের অন্তঃপ্রকৃতি, তারও বিশেষ রস আছে, রঙ আছে, ধ্বনি আছে। ভারতবর্ষের চিরকালের যে চিত্ত সেটার আশ্রয় সংস্কৃতভাষায়। এই ভাষার তীর্থপথ দিয়ে আমরা দেশের চিন্ময় প্রকৃতির স্পর্শ পাব, তাকে অন্তরে গ্রহণ করব, শিক্ষার এই লক্ষ্য মনে আমার দৃঢ় ছিল। ইংরেজি ভাষার ভিতর দিয়ে নানা জ্ঞাতব্য বিষয় আমরা জানতে পারি, সেগুলি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় । কিন্তু সংস্কৃত ভাষার একটা আনন্দ আছে, সে রঞ্জিত করে আমাদের মনের আকাশকে; তার মধ্যে আছে একটি গভীর বাণী, বিশ্বপ্রকৃতির মতোই সে আমাদের শান্তি দেয় এবং চিন্তাকে মর্যাদা দিয়ে থাকে।

যে শিক্ষাতত্ত্বকে আমি শ্রদ্ধা করি তার ভূমিকা হল এইখানে। এতে যথেষ্ট সাহসের প্রয়োজন ছিল, কেননা এর পথ অনভ্যস্ত এবং চরম ফল অপরীক্ষিত। এই শিক্ষাকে শেষ পর্যন্ত চালনা করবার শক্তি আমার ছিল না, কিন্তু এর 'পরে নিষ্ঠা আমার অবিচলিত। এর সমর্থন ছিল না দেশের কোথাও। তার একটা প্রমাণ বলি। একদিকে অরণ্যবাসে দেশের উন্মুক্ত বিশ্বপ্রকৃতি আর-এক দিকে গুরুগৃহবাসে দেশের শুদ্ধতম উচ্চতম সংস্কৃতি—এই উভয়ের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে তপোবনে একদা যে নিয়মে শিক্ষা চলত আমি কোনো-এক বক্তৃতায় তার প্রতি আমার শ্রদ্ধা ব্যাখ্যা করেছিলেম। বলেছিলেম, আধুনিক কালে শিক্ষার উপাদান অনেক বাড়াতে হবে সন্দেহ নেই, কিন্তু তার রূপটি তার রসটি তৈরি হয়ে উঠবে প্রকৃতির সহযোগে, এবং যিনি শিক্ষা দান করবেন তাঁর অন্তরঙ্গ আধ্যাত্মিক সংসর্গে। শুনে সেদিন গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেছিলেন, এ কথাটি কবিজনোচিত, কবি এর অত্যাবশ্যকতা যতটা কল্পনা করেছেন আধুনিক কালে ততটা স্বীকার করা যায় না। আমি প্রত্যুত্তরে তাঁকে বলেছিলেম, বিশ্বপ্রকৃতি ক্লাসে ডেস্কের সামনে বসে মাস্টারি করেন না, কিন্তু জলে স্থলে আকাশে তাঁর ক্লাস খুলে আমাদের মনকে তিনি যে প্রবল শক্তিতে গড়ে তোলেন কোনো মাস্টার কি তা পারে। আরবের মানুষকে কি আরবের মরুভূমিই গড়ে তোলে নি—সেই মানুষই বিচিত্র ফলশস্যশালিনী নীলনদীতীরবর্তী ভূমিতে যদি জন্ম নিত তা হলে কি তার প্রকৃতি অন্যরকম হত না। যে প্রকৃতি সজীব বিচিত্র, আর যে শহর নির্জীব পাথরে-বাঁধানো, চিত্তগঠন সম্বন্ধে তাদের প্রভাবের প্রবল প্রভেদ নিঃসংশয়।

এ কথা নিশ্চিত জানি, যদি আমি বাল্যকাল থেকে অধিকাংশ সময়ই শহরে আবদ্ধ থাকতেম তবে তার প্রভাবটা প্রচুর পরিমাণেই প্রকাশ পেত আমার চিন্তায়

আমার রচনায়। বিদ্যায় বুদ্ধিতে সেটা বিশেষভাবে অনুভব করা যেত কি না জানি নে, কিন্তু ধাত হত অন্যপ্রকারের। বিশ্বের অযাচিত দান থেকে যে পরিমাণে নিয়ত বঞ্চিত হতেম সেই পরিমাণে বিশ্বকে প্রতিদানের সম্পদে আমার স্বভাবে দারিদ্র্য থেকে যেত। এইরকম আন্তরিক জিনিসটার বাজারদর নেই বলেই এর অভাব সম্বন্ধে যে মানুষ স্বচ্ছন্দে নিশ্চেতন থাকে সেরকম বেদনাহীন হতভাগ্য যে কৃপাপাত্র তা অন্তর্যামী জানেন। সংসারযাত্রায় সে যেমনি কৃতকৃত্য হোক, মানবজন্মের পূর্ণতায় সে চিরদিন থেকে যায় অকৃতার্থ।

সেইদিনই আমি প্রথম মনে করলেম, শুধু মুখের কথায় ফল হবে না; কেননা এ সব কথা এখনকার কালের অভ্যাসবিরুদ্ধ। এই চিন্তাটা কেবলই মনের মধ্যে আন্দোলিত হতে লাগল যে এই আদর্শকে যতটা পারি কর্মক্ষেত্রে রচনা করে তুলতে হবে। তপোবনের বাহ্য অনুকরণ যাকে বলা যেতে পারে তা অগ্রাহ্য, কেননা এখনকার দিনে তা অসংগত, তা মিথ্যে। তার ভিতরকার সত্যটিকে আধুনিক জীবনযাত্রার আধারে প্রতিষ্ঠিত করা চাই।

তার কিছুকাল পূর্বে শান্তিনিকেতন আশ্রম পিতৃদেব জনসাধারণকে উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। বিশেষ নিয়ম পালন করে অতিথিরা যাতে দুই তিন দিন আধ্যাত্মিক শান্তির সাধনা করতে পারেন এই ছিল তাঁর সংকল্প। এজন্য উপাসনামন্দির লাইব্রেরি ও অন্যান্য ব্যবস্থা ছিল যথোচিত। কদাচিৎ সেই উদ্দেশ্যে কেউ কেউ এখানে আসতেন, কিন্তু অধিকাংশ লোক আসতেন ছুটি যাপন করবার সুযোগে এবং বায়ুপরিবর্তনের সাহায্যে শারীরিক আরোগ্যসাধনায়।

আমার বয়স যখন অল্প পিতৃদেবের সঙ্গে ভ্রমণে বের হয়েছিলেম। ঘর ছেড়ে সেই আমার প্রথম বাহিরে যাত্রা। ইঁটকাঠের অরণ্য থেকে অবারিত আকাশের মধ্যে বৃহৎ মুক্তি এই প্রথম আমি ভোগ করেছি। প্রথম বললে সম্পূর্ণ ঠিক বলা হয় না। এর পূর্বে কলকাতায় একবার যখন ডেঙ্গুজ্বর সংক্রামক হয়ে উঠেছিল তখন আমার গুরুজনদের সঙ্গে আশ্রয় নিয়েছিলেম গঙ্গার ধারে লালাবাবুদের বাগানে। বসুন্ধরার উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে সুদূরব্যাপ্ত আস্তরণের একটি প্রান্তে সেদিন আমার বসবার আসন জুটেছিল। সমস্ত দিন বিরাটের মধ্যে মনকে ছাড়া দিয়ে আমার বিস্ময়ের এবং আনন্দের ক্লান্তি ছিল না। কিন্তু তখনো আমি আমাদের পূর্বনিয়মে ছিলেম বন্দী, অবাধে বেড়ানো ছিল নিষিদ্ধ। অর্থাৎ কলকাতায় ছিলেম ঢাকা খাঁচার পাখি, কেবল চলার স্বাধীনতা নয় চোখের স্বাধীনতাও ছিল সংকীর্ণ; এখানে রইলুম দাঁড়ের পাখি, আকাশ খোলা চারি দিকে কিন্তু পায়ে শিকল। শান্তিনিকেতনে এসেই আমার জীবনে প্রথম সম্পূর্ণ ছাড়া পেয়েছি বিশ্ব-প্রকৃতির মধ্যে। উপনয়নের পরেই আমি এখানে এসেছি। উপনয়ন-অনুষ্ঠানে ভূর্ভুবঃস্বর্লোকের মধ্যে চেতনাকে পরিব্যাপ্ত করবার যে দীক্ষা পেয়েছিলেম পিতৃদেবের কাছ থেকে, এখানে বিশ্বদেবতার কাছ থেকে পেয়েছিলেম সেই দীক্ষাই। আমার জীবন নিতান্তই অসম্পূর্ণ থাকত প্রথম বয়সে এই সুযোগ যদি আমার না ঘটত। পিতৃদেব কোনো নিষেধ বা শাসন দিয়ে আমাকে বেষ্টন করেন নি। সকালবেলায় অল্প কিছুক্ষণ তাঁর কাছে ইংরেজি ও সংস্কৃত পড়তেম, তার পরে আমার অবাধ ছুটি। বোলপুর শহর তখন স্ফীত হয়ে ওঠে নি। চালের কলের ধোঁয়া আকাশকে কলুষিত আর তার দুর্গন্ধ সমল করে নি মলয় বাতাসকে। মাঠের মাঝখান দিয়ে যে লাল মাটির পথ চলে গেছে তাতে লোক-চলাচল ছিল অল্পই। বাঁধের জল ছিল পরিপূর্ণ প্রসারিত, চার দিক থেকে পলি-পড়া চাষের জমি তাকে কোণ-ঠেসা

করে আনে নি। তার পশ্চিমের উঁচু পাড়ির উপর অক্ষুণ্ণ ছিল ঘন তালগাছের শ্রেণী। যাকে আমরা খোয়াই বলি, অর্থাৎ কাঁকুরে জমির মধ্যে দিয়ে বর্ষার জলধারায় আঁকাবাঁকা উঁচুনিচু খোদাই পথ, সে ছিল নানা জাতের নানা আকৃতির পাথরে পরিকীর্ণ; কোনোটাতে শির-কাটা পাতার ছাপ, কোনোটা লম্বা আঁশওয়ালা কাঠের টুকরোর মতো, কোনোটা স্ফটিকের দানা সাজানো, কোনোটা অগ্নিগলিত মসৃণ। মনে আছে ১৮৭০ খৃস্টাব্দের ফরাসি-প্রুশীয় যুদ্ধের পরে একজন ফরাসি সৈনিক আমাদের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল; সে ফরাসি রান্না রেঁধে খাওয়াত আমার দাদাদের আর তাঁদের ফরাসি ভাষা শেখাত। তখন আমার দাদারা একবার বোলপুরে এসেছিলেন, সে ছিল সঙ্গে। একটা ছোটো হাতুড়ি নিয়ে আর একটা থলি কোমরে ঝুলিয়ে সে এই খোয়াইয়ে দুর্লভ পাথর সন্ধান করে বেড়াত। একদিন একটা বড়োগোছের স্ফটিক সে পেয়েছিল, সেটাকে আংটির মতো বাঁধিয়ে কলকাতার কোন্ ধনীর কাছে বেচেছিল আশি টাকায়। আমিও সমস্ত দুপুরবেলা খোয়াইয়ে প্রবেশ করে নানারকম পাথর সংগ্রহ করেছি, ধন উপার্জনের লোভে নয় পাথর উপার্জন করতেই। মাঠের জল চুঁইয়ে সেই খোয়াইয়ের এক জায়গায় উপরের ডাঙা থেকে ছোটো ঝরনা ঝরে পড়ত। সেখানে জমেছিল একটি ছোটো জলাশয়, তার সাদাটে ঘোলা জল আমার পক্ষে ডুব দিয়ে স্নান করবার মতো যথেষ্ট গভীর। সেই ডোবাটা উপচিয়ে ক্ষীণ স্বচ্ছ জলের স্রোত ঝির্ ঝির্ করে বয়ে যেত নানা শাখাপ্রশাখায়, ছোটো ছোটো মাছ সেই স্রোতে উজানমুখে সাঁতার কাটত। আমি জলের ধার বেয়ে বেয়ে আবিষ্কার করতে বেরতুম সেই শিশুভূবিভাগের নতুন নতুন বালখিল্য গিরিনদী। মাঝে মাঝে পাওয়া যেত পাড়ির গায়ে গহ্বর। তার মধ্যে নিজেকে প্রচ্ছন্ন করে অচেনা জিওগ্রাফির মধ্যে ভ্রমণকারীর গৌরব অনুভব করতুম। খোয়াইয়ের স্থানে স্থানে যেখানে মাটি জমা সেখানে বেঁটে বেঁটে বুনো জাম বুনো খেজুর, কোথাও-বা ঘন কাশ লম্বা হয়ে উঠেছে। উপরে দূরমাঠে গোরু চরছে, সাঁওতালরা কোথাও করছে চাষ, কোথাও চলেছে পথহীন প্রান্তরে আর্তস্বরে গোরুর গাড়ি, কিন্তু এই খোয়াইয়ের গহ্বরে জনপ্রাণী নেই। ছায়ায় রৌদ্রে বিচিত্র লাল কাঁকরের এই নিভৃত জগৎ, না দেয় ফল, না দেয় ফুল, না উৎপন্ন করে ফসল; এখানে না আছে কোনো জীবজন্তুর বাসা; এখানে কেবল দেখি কোনো আর্টিস্ট-বিধাতার বিনা কারণে একখানা যেমন-তেমন ছবি আঁকবার শখ; উপরে মেঘহীন নীল আকাশ রৌদ্রে পাণ্ডুর, আর নিচে লাল কাঁকরের রঙ পড়েছে মোটা তুলিতে নানারকমের বাঁকাচোরা বন্ধুর রেখায়, সৃষ্টিকর্তার ছেলেমানুষি ছাড়া এর মধ্যে আর কিছুই দেখা যায় না। বালকের খেলার সঙ্গেই এর রচনার ছন্দের মিল; এর পাহাড়, এর নদী, এর জলাশয়, এর গুহাগহ্বর সবই বালকের মনেরই পরিমাপে। এইখানে একলা আপন মনে আমার বেলা কেটেছে অনেকদিন, কেউ আমার কাজের হিসাব চায় নি, কারও কাছে আমার সময়ের জবাবদিহি ছিল না। এখন এ খোয়াইয়ের সে চেহারা নেই। বৎসরে বৎসরে রাস্তা-মেরামতের মশলা এর উপর থেকে চেঁচে নিয়ে একে নগ্ন দরিদ্র করে দিয়েছে, চলে গেছে এর বৈচিত্র্য, এর স্বাভাবিক লাবণ্য। তখন শান্তিনিকেতনে আর একটি রোমান্টিক অর্থাৎ কাহিনীরসের জিনিস ছিল। যে সর্দার ছিল এই বাগানের প্রহরী এককালে সেই ছিল ডাকাতের দলের নায়ক। তখন সে বৃদ্ধ, দীর্ঘ তার দেহ, মাংসের বাহুল্য মাত্র নেই, শ্যামবর্ণ, তীক্ষ্ণ চোখের দৃষ্টি, লম্বা বাঁশের লাঠি হাতে, কণ্ঠস্বরটা ভাঙা ভাঙা গোছের। বোধ হয় সকলে জানেন, আজ শান্তিনিকেতনে যে অতিপ্রাচীন যুগল

ছাতিম গাছ মালতীলতায় আচ্ছন্ন, এককালে মস্ত মাঠের মধ্যে ঐ দুটি ছাড়া আর গাছ ছিল না। ঐ গাছতলা ছিল ডাকাতের আড্ডা। ছায়াপ্রত্যাশী অনেক ক্লান্ত পথিক এই ছাতিমতলায় হয় ধন নয় প্রাণ নয় দুইই হারিয়েছে সেই শিথিল রাষ্ট্রশাসনের কালে। এই সর্দার সেই ডাকাতি কাহিনীর শেষ পরিচ্ছেদের শেষ পরিশিষ্ট বলেই খ্যাত। বামাচারী তান্ত্রিক শাক্তের এই দেশে মা-কালীর খর্পরে এ যে নররক্ত জোগায় নি তা আমি বিশ্বাস করি নে। আশ্রমের সম্পর্কে কোনো রক্তচক্ষু রক্ততিলকলাঞ্ছিত ভদ্র বংশের শাক্তকে জানতুম যিনি মহামাংসপ্রসাদ ভোগ করেছেন বলে জনশ্রুতি কানে এসেছে।

[একদা এই দুটিমাত্র ছাতিমগাছের ছায়া লক্ষ্য করে দূরপথযাত্রী পথিকেরা বিশ্রামের আশায় এখানে আসত। আমার পিতৃদেবও রায়পুরের ভুবন সিংহের বাড়িতে নিমন্ত্রণ সেরে পালকি করে যখন একদিন ফিরছিলেন তখন মাঠের মাঝখানে এই দুটি গাছের আহ্বান তাঁর মনে এসে পৌঁচেছিল। এইখানে শান্তির প্রত্যাশায় রায়পুরের সিংহদের কাছ থেকে এই জমি তিনি দান গ্রহণ করেছিলেন। একখানি একতলা বাড়ি পত্তন করে এবং রুক্ষ রিক্ত ভূমিতে অনেকগুলি গাছ রোপণ করে সাধনার জন্য এখানে তিনি মাঝে মাঝে আশ্রয় গ্রহণ করতেন। সেই সময়ে প্রায়ই তাঁর ছিল হিমালয়ে নির্জনবাস। যখন রেললাইন স্থাপিত হল তখন বোলপুর স্টেশন ছিল পশ্চিমে যাবার পথে, অন্য লাইন তখন ছিল না। তাই হিমালয়ে যাবার মুখে বোলপুরে পিতা তাঁর প্রথম যাত্রা-ভঙ্গ করতেন। আমি যে বারে তাঁর সঙ্গে এলুম সে বারেও ড্যালহৌসি পাহাড়ে যাবার পথে তিনি বোলপুরে অবতরণ করেন। আমার মনে পড়ে সকালবেলায় সূর্য ওঠবার পূর্বে তিনি ধ্যানে বসতেন অসমাপ্ত জলশূন্য পুষ্করিণীর দক্ষিণ পাড়ির উপরে। সূর্যাস্তকালে তাঁর ধ্যানের আসন ছিল ছাতিমতলায়। এখন ছাতিম গাছ বেষ্টন করে অনেক গাছপালা হয়েছে, তখন তার কিছুই ছিল না, সামনে অবারিত মাঠ পশ্চিম দিগন্ত পর্যন্ত ছিল একটানা। আমার 'পরে কটি বিশেষ কাজের ভার ছিল। ভগবদ্‌গীতা-গ্রন্থে কতকগুলি শ্লোক তিনি চিহ্নিত করে দিয়েছিলেন, আমি প্রতিদিন কিছু কিছু তাই কপি করে দিতুম তাঁকে। তার পরে সন্ধ্যাবেলা খোলা আকাশের নিচে বসে সৌরজগতের গ্রহমণ্ডলের বিবরণ বলতেন আমাকে, আমি শুনতুম একান্ত ঔৎসুক্যের সঙ্গে। মনে পড়ে আমি তাঁর মুখের সেই জ্যোতিষের ব্যাখ্যা লিখে তাঁকে শুনিয়েছিলুম। এই বর্ণনা থেকে বোঝা যাবে শান্তিনিকেতনের কোন্‌ ছবি আমার মনের মধ্যে কোন্‌ রসে ছাপা হয়ে গেছে। প্রথমত সেই বালকবয়সে এখানকার প্রকৃতির কাছ থেকে যে আমন্ত্রণ পেয়েছিলেম—এখানকার অনবরুদ্ধ আকাশ ও মাঠ, দূর হতে প্রতিভাত নীলাভ শাল ও তাল-শ্রেণীর সমুচ্চ শাখাপুঞ্জে শ্যামলা শান্তি, স্মৃতির সম্পদরূপে চিরকাল আমার স্বভাবের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। তার পরে এই আকাশে এই আলোকে দেখেছি সকালে বিকালে পিতৃদেবের পূজার নিঃশব্দ নিবেদন, তার গভীর গাম্ভীর্য। তখন এখানে আর কিছুই ছিল না, না ছিল এত গাছপালা, না ছিল মানুষের এবং কাজের এত ভিড়, কেবল দূরব্যাপী নিস্তব্ধতার মধ্যে ছিল একটি নির্মল মহিমা।]

তার পরে সেদিনকার বালক যখন যৌবনের প্রৌঢ়বিভাগে তখন বালকদের শিক্ষার তপোবন তাকে দূরে খুঁজতে হবে কেন। আমি পিতাকে গিয়ে জানালেম. শান্তিনিকেতন এখন প্রায় শূন্য অবস্থায়, সেখানে যদি একটি আদর্শ বিদ্যালয় স্থাপন করতে পারি তা হলে তাকে সার্থকতা দেওয়া হয়। তিনি তখনই উৎসাহের সঙ্গে

সম্মতি দিলেন। বাধা ছিল আমার আত্মীয়দের দিক থেকে। পাছে শান্তিনিকেতনের প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটে যায় এই ছিল তাঁদের আশঙ্কা। এখনকার কালের জোয়ারজলে নানা দিক থেকে ভাবের পরিবর্তন আবর্ত রচনা করে আসবে না এ আশা করা যায় না—যদি তার থেকে এড়াবার ইচ্ছা করি তা হলে আদর্শকে বিশুদ্ধ রাখতে গিয়ে তাকে নির্জীব করে রাখতে হয়। গাছপালা জীবজন্তু প্রভৃতি প্রাণবান বস্তু মাত্রেরই মধ্যে একই সময়ে বিকৃতি ও সংস্কৃতি চলতেই থাকে, এই বৈপরীত্যের ক্রিয়াকে অত্যন্ত ভয় করতে গেলে প্রাণের সঙ্গে ব্যবহার বন্ধ রাখতে হয়। এই তর্ক নিয়ে আমার সংকল্পসাধনে কিছুদিন প্রবলভাবেই ব্যাঘাত চলেছিল।

এই তো বাইরের বাধা। অপর দিকে আমার আর্থিক সংগতি নিতান্ত সামান্য ছিল, আর বিদ্যালয়ের বিধিব্যবস্থা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা ছিলই না। সাধ্যমতো কিছু কিছু আয়োজন করছি আর এই কথা নিয়ে আমার আলাপ এগোচ্ছে নানা লোকের সঙ্গে, এমনি অগোচরভাবে ভিৎপত্তন চলছিল। কিন্তু বিদ্যালয়ের কাজে শান্তিনিকেতন আশ্রমকে তখন আমার অধিকারে পেয়েছিলেম। এই সময়ে একটি তরুণ যুবকের সঙ্গে আমার আলাপ হল, তাকে বালক বললেই হয়। বোধ করি আঠারো পেরিয়ে সে উনিশে পড়েছে। তার নাম সতীশচন্দ্র রায়, কলেজে পড়ে, বি. এ. ক্লাসে। তার বন্ধু অজিতকুমার চক্রবর্তী সতীশের লেখা কবিতার খাতা কিছুদিন পূর্বে আমার হাতে দিয়ে গিয়েছিল। পড়ে দেখে আমার সন্দেহমাত্র ছিল না যে, এই ছেলেটির প্রতিভা আছে, কেবলমাত্র লেখবার ক্ষমতা নয়। কিছুদিন পরে বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে সতীশ এলেন আমার কাছে। শান্ত নম্র স্বল্পভাষী সৌম্যমূর্তি, দেখে মন স্বতই আকৃষ্ট হয়। সতীশকে আমি শক্তিশালী বলে জেনেছিলেম বলেই তার রচনায় যেখানে শৈথিল্য দেখেছি স্পষ্ট করে নির্দেশ করতে সংকোচ বোধ করি নি। বিশেষভাবে ছন্দ নিয়ে তার লেখার প্রত্যেক লাইন ধরে আমি আলোচনা করেছি। অজিত আমার কঠোর বিচারে বিচলিত হয়েছিল কিন্তু সতীশ সহজেই শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করে নিতে পারলে। অল্প দিনেই সতীশের যে পরিচয় পাওয়া গেল আমাকে তা বিস্মিত করেছিল। যেমন গভীর তেমনি বিস্তৃত ছিল তার সাহিত্যরসের অভিজ্ঞতা। ব্রাউনিঙের কবিতা সে যেরকম করে আত্মগত করেছিল এমন দেখা যায় না। শেক্সপীয়রের রচনায় যেমন ছিল তার অধিকার তেমনি আনন্দ। আমার এই বিশ্বাস দৃঢ় ছিল যে, সতীশের কাব্যরচনায় একটা বলিষ্ঠ নাট্যপ্রকৃতির বিকাশ দেখা দেবে, এবং সেই দিক থেকে সে একটা সম্পূর্ণ নতুন পথের প্রবর্তন করবে বাংলাসাহিত্যে। তার স্বভাবে একটি দুর্লভ লক্ষণ দেখেছি, যদিও তার বয়স কাঁচা তবু নিজের রচনার 'পরে তার অন্ধ আসক্তি ছিল না। সেগুলিকে আপনার থেকে বাইরে রেখে সে দেখতে পারত, এবং নির্মমভাবে সেগুলিকে বাইরে ফেলে দেওয়া তার পক্ষে ছিল সহজ। তাই তার সেদিনকার লেখার কোনো চিহ্ন অনতিকাল পরেও আমি দেখি নি। এর থেকে স্পষ্ট বোঝা যেত, তার কবিস্বভাবের যে বৈশিষ্ট্য ছিল তাকে বলা যেতে পারে বহিরাশ্রয়িতা বা অব্‌জেক্‌টিভিটি। বিশ্লেষণ ও ধারণা শক্তি তার যথেষ্ট ছিল, কিন্তু স্বভাবের যে পরিচয় আমাকে তার দিকে অত্যন্ত আকর্ষণ করেছিল সে তার মনের স্পর্শচেতনা। যে জগতে সে জন্মেছিল তার কোথাও ছিল না তার ঔদাসীন্য। একই কালে ভোগের দ্বারা এবং ত্যাগের দ্বারা সর্বত্র আপন অধিকার প্রসারিত করবার শক্তি নিয়েই সে এসেছিল। তার অনুরাগ ছিল আনন্দ ছিল নানা দিকে ব্যাপক কিন্তু তার আসক্তি ছিল না। মনে

আছে আমি তাকে একদিন বলেছিলেম, তুমি কবি ভর্তৃহরি, এই পৃথিবীতে তুমি রাজা এবং তুমি সন্ন্যাসী।

সে সময়ে আমার মনের মধ্যে নিয়ত ছিল শান্তিনিকেতন আশ্রমের সংকল্পনা। আমার নতুন-পাওয়া বালক-বন্ধুর সঙ্গে আমার সেই আলাপ চলত। তার স্বাভাবিক ধ্যানদৃষ্টিতে সমস্তটাকে সে দেখতে পেত প্রত্যক্ষ। উতঙ্কের যে উপাখ্যানটি সে লিখেছিল তাতে সেই ছবিটিকে সে আঁকতে চেষ্টা করেছে।

অবশেষে আনন্দের উৎসাহ সে আর সম্বরণ করতে পারলে না। সে বললে, আমাকে আপনার কাজে নিন। খুব খুশি হলেম কিন্তু কিছুতে তখন রাজি হলেম না। অবস্থা তাদের ভালো নয় জানতেম। বি. এ. পাস করে এবং পরে আইনের পরীক্ষা দিয়ে সে সংসার চালাতে পারবে, তার অভিভাবকদের এই ইচ্ছা ছিল সন্দেহ নেই। তখনকার মতো আমি তাকে ঠেকিয়ে রেখে দিলেম।

এমন সময় ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার পরিচয় ক্রমশ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল। আমার নৈবেদ্যের কবিতাগুলি প্রকাশ হচ্ছিল তার কিছুকাল পূর্বে। এই কবিতাগুলি তাঁর অত্যন্ত প্রিয় ছিল। তাঁর সম্পাদিত Twentieth Century পত্রিকায় এই রচনাগুলির যে প্রশংসা তিনি ব্যক্ত করেছিলেন সেকালে সেরকম উদার প্রশংসা আমি আর কোথাও পাই নি। বস্তুত এর অনেক কাল পরে এই সকল কবিতার কিছু অংশ এবং খেয়া ও গীতাঞ্জলি থেকে এই জাতীয় কবিতার ইংরেজি অনুবাদের যোগে যে সম্মান পেয়েছিলেম তিনি আমাকে সেইরকম অকুণ্ঠিত সম্মান দিয়েছিলেন সেই সময়েই। এই পরিচয় উপলক্ষেই তিনি জানতে পেরেছিলেন আমার সংকল্প, এবং খবর পেয়েছিলেন যে, শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয়-স্থাপনের প্রস্তাবে আমি পিতার সম্মতি পেয়েছি। তিনি আমাকে বললেন, এই সংকল্পকে কার্যে প্রতিষ্ঠিত করতে বিলম্ব করবার কোনো প্রয়োজন নেই। তিনি তাঁর কয়েকটি অনুগত শিষ্য ও ছাত্র নিয়ে আশ্রমের কাজে প্রবেশ করলেন। তখনই আমার তরফে ছাত্র ছিল রথীন্দ্রনাথ ও তার কনিষ্ঠ শমীন্দ্রনাথ। আর অল্প কয়েক জনকে তিনি যোগ করে দিলেন। সংখ্যা অল্প না হলে বিদ্যালয়ের সম্পূর্ণতা অসম্ভব হত। তার কারণ, প্রাচীন আদর্শ অনুসারে আমার এই ছিল মত যে, শিক্ষাদানব্যাপারে গুরু ও শিষ্যের সম্বন্ধ হওয়া উচিত আধ্যাত্মিক। অর্থাৎ শিক্ষা দেওয়াটা গুরুর আপন সাধনারই প্রধান অঙ্গ। বিদ্যার সম্পদ যে পেয়েছে তার নিজেরই নিঃস্বার্থ দায়িত্ব সেই সম্পদ দান করা। আমাদের সমাজে এই মহৎ দায়িত্ব আধুনিক কাল পর্যন্ত স্বীকৃত হয়েছে। এখন তার লোপ হচ্ছে ক্রমশই।

তখন যে কয়টি ছাত্র নিয়ে বিদ্যালয়ের আরম্ভ হল তাদের কাছ থেকে বেতন বা আহার্য-ব্যয় নেওয়া হত না, তাদের জীবনযাত্রার প্রায় সমস্ত দায় নিজের স্বল্প সম্বল থেকেই স্বীকার করেছি। অধ্যাপনার অধিকাংশ ভার যদি উপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত রেবাচাঁদ— তাঁর এখনকার উপাধি অণিমানন্দ— বহন না করতেন তা হলে কাজ চালানো একেবারে অসাধ্য হত। তখনকার আয়োজন ছিল দরিদ্রের মতো, আহারব্যবহার ছিল দরিদ্রের আদর্শে। তখন উপাধ্যায় আমাকে যে গুরুদেব উপাধি দিয়েছিলেন আজ পর্যন্ত আশ্রমবাসীদের কাছে আমাকে সেই উপাধি বহন করতে হচ্ছে। আশ্রমের আরম্ভ থেকে বহুকাল পর্যন্ত তার আর্থিক ভার আমার পক্ষে যেমন দুর্বহ হয়েছে, এই উপাধিটিও তেমনি। অর্থকৃচ্ছ্র এবং এই উপাধি কোনোটাকেই আরামে বহন করতে পারি নে কিন্তু দুটো বোঝাই যে ভাগ্য আমার

স্কন্ধে চাপিয়েছেন তাঁর হাতের দানস্বরূপ এই দুঃখ এবং লাঞ্ছনা থেকে শেষ পর্যন্তই নিষ্কৃতি পাবার আশা রাখি নে।

শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের সূচনার মূল কথাটা বিস্তারিত করে জানালুম। এইসঙ্গে উপাধ্যায়ের কাছে আমার অপরিশোধনীয় কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি।* তার পরে সেই কবিবালক সতীশের কথাটাও শেষ করে দিই।

বি. এ. পরীক্ষা তার আসন্ন হয়ে এল। অধ্যাপকেরা তার কাছে আশা করেছিল খুব বড়ো রকমেরই কৃতিত্ব। ঠিক সেই সময়েই সে পরীক্ষা দিল না। তার ভয় হল সে পাস করবে। পাস করলেই তার উপরে সংসারের যে সমস্ত দাবি চেপে বসবে তার পীড়ন ও প্রলোভন থেকে মুক্তি পাওয়া পাছে তার পক্ষে অসাধ্য হয় এইজন্যেই সে পিছিয়ে গেল শেষ মুহূর্তে। সংসারের দিক থেকে জীবনে সে একটা মস্ত ট্র্যাজিডির পত্তন করলে। আমি তার আর্থিক অভাব কিছু পরিমাণে পূরণ করবার যতই চেষ্টা করেছি কিছুতেই তাকে রাজি করতে পারি নি। মাঝে মাঝে গোপনে তাদের বাড়িতে পাঠিয়েছি টাকা। কিন্তু সে সামান্য। তখন আমার বিক্রি করবার যোগ্য যা-কিছু ছিল প্রায় সব শেষ হয়ে গেছে— অন্তঃপুরের সম্বল এবং বাইরের সম্বল। কয়েকটা আয়জনক বইয়ের বিক্রয়স্বত্ব কয়েক বৎসরের মেয়াদে দিয়েছি পরের হাতে। হিসাবের দুর্বোধ জটিলতায় সে মেয়াদ অতিক্রম করতে অতি দীর্ঘকাল লেগেছে। সমুদ্রতীরবাসের লোভে পুরীতে একটা বাড়ি করেছিলুম। সে বাড়ি একদিনও ভোগ করবার পূর্বে আশ্রমের ক্ষুধার দাবিতে বিক্রি হয়ে গেল। তার পরে যে সম্বল বাকি রইল তাকে বলে উচ্চহারের সুদে দেনা করবার ক্রেডিট। সতীশ জেনেশুনেই এখানকার সেই অগাধ দারিদ্র্যের মধ্যে ঝাঁপ দিয়েছিল প্রসন্ন মনে। কিন্তু তার আনন্দের অবধি ছিল না— এখানকার প্রকৃতির সংসর্গের আনন্দ, সাহিত্যসম্ভোগের আনন্দ, প্রতি মুহূর্তে আত্মনিবেদনের আনন্দ।

এই অপর্যাপ্ত আনন্দ সে সঞ্চার করত তার ছাত্রদের মনে। মনে পড়ে কতদিন তাকে পাশে নিয়ে শালবীথিকায় পায়চারি করেছি নানা তত্ত্বের আলোচনা করতে করতে— রাত্রি এগারোটা দুপুর হয়ে যেত— সমস্ত আশ্রম হত নিস্তব্ধ নিদ্রামগ্ন। তারই কথা মনে করে আমি লিখেছি—

কতদিন এই পাতা-ঝরা
বীথিকায়, পুষ্পগন্ধে বসন্তের আগমনী-ভরা
সায়াহ্নে দুজনে মোরা ছায়াতে অঙ্কিত চন্দ্রালোকে
ফিরেছি গুঞ্জিত আলাপনে। তার সেই মুগ্ধ চোখে
বিশ্ব দেখা দিয়েছিল নন্দনমন্দার রঙে রাঙা।
যৌবনতুফান-লাগা সেদিনের কত নিদ্রাভাঙা
জ্যোৎস্না-মুগ্ধ রজনীর সৌহার্দ্যের সুধারসধারা
তোমার ছায়ার মাঝে দেখা দিল, হয়ে গেল সারা।

---

* কেহ কেহ এমন কথা লিখেছেন যে, উপাধ্যায় ও রেবাচাঁদ খৃস্টান ছিলেন, তাই নিয়ে পিতৃদেব আপত্তি করেছিলেন। এ কথা সত্য নয়। আমি নিজে জানি এই কথা তুলে আমাদের কোনো আত্মীয় তাঁর কাছে অভিযোগ করেছিলেন। তিনি কেবল এই কথাটি বলেছিলেন, তোমরা কিছু ভেবো না। ওখানকার জন্যে কোনো ভয় নেই। আমি ওখানে শান্তং শিবমদ্বৈতমের প্রতিষ্ঠা করে এসেছি।

গভীর আনন্দক্ষণ কতদিন তব মঞ্জরীতে
একান্ত মিশিয়াছিল একখানি অখণ্ড সংগীতে
আলোকে আলাপে হাস্যে, বনের চঞ্চল আন্দোলনে,
বাতাসের উদাস নিশ্বাসে।—

এমন অবিমিশ্র শ্রদ্ধা, অবিচলিত অকৃত্রিম প্রীতি, এমন সর্বভারবাহী সর্বত্যাগী সৌহার্দ্য জীবনে কত যে দুর্লভ তা এই সত্তর বৎসরের অভিজ্ঞতায় জেনেছি। তাই সেই আমার কিশোর বন্ধুর অকাল তিরোভাবের বেদনা আজ পর্যন্ত কিছুতেই ভুলতে পারি নি।

এই আশ্রমবিদ্যালয়ের সুদূর আরম্ভ-কালের প্রথম সংকল্পন, তার দুঃখ তার আনন্দ, তার অভাব তার পূর্ণতা, তার প্রিয় সঙ্গ, প্রিয় বিচ্ছেদ, নিষ্ঠুর বিরুদ্ধতা ও অযাচিত আনুকূল্যের অল্পই কিছু আভাস দিলেম এই লেখায়। তার পরে শুধু আমাদের ইচ্ছা নয়, কালের ধর্ম কাজ করছে; এনেছে কত পরিবর্তন, কত নতুন আশা ও ব্যর্থতা, কত সুহৃদের অভাবনীয় আত্মনিবেদন, কত অজানা লোকের অহৈতুক শত্রুতা, কত মিথ্যা নিন্দা ও প্রশংসা, কত দুঃসাধ্য সমস্যা—আর্থিক ও পারমার্থিক। পারিতোষিক পাই বা না পাই, নিজের ক্ষতি করেছি সাধ্যের শেষ সীমা পর্যন্ত—অবশেষে ক্লান্ত দেহ ও জীর্ণ স্বাস্থ্য নিয়ে আমারও বিদায় নেবার দিন এল—প্রণাম করে যাই তাঁকে যিনি সুদীর্ঘ কঠোর দুর্গম পথে আমাকে এতকাল চালনা করে নিয়ে এসেছেন। এই এতকালের সাধনার বিফলতা প্রকাশ পায় বাইরে, এর সার্থকতার সম্পূর্ণ প্রমাণ থেকে যায় অলিখিত ইতিহাসের অদৃশ্য অক্ষরে।

প্র আশ্বিন ১৩৪০

বিশ্বভারতী

বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা

১

মানব-সংসারে জ্ঞানালোকের দিয়ালি-উৎসব চলিতেছে। প্রত্যেক জাতি আপনার আলোটিকে বড়ো করিয়া জ্বালাইলে তবে সকলে মিলিয়া এই উৎসব সমাধা হইবে। কোনো জাতির নিজের বিশেষ প্রদীপখানি যদি ভাঙিয়া দেওয়া যায়, অথবা তাহার অস্তিত্ব ভুলাইয়া দেওয়া যায় তবে তাহাতে সমস্ত জগতের ক্ষতি করা হয়।

এ কথা প্রমাণ হইয়া গেছে যে, ভারতবর্ষ নিজেরই মানসশক্তি দিয়া বিশ্বসমস্যা গভীরভাবে চিন্তা করিয়াছে এবং আপন বুদ্ধিতে তাহার সমাধানের চেষ্টা পাইয়াছে। সেই শিক্ষাই আমাদের দেশের পক্ষে সত্য শিক্ষা যাহাতে করিয়া আমাদের দেশের নিজের মনটিকে সত্য আহরণ করিতে এবং সত্যকে নিজের শক্তির দ্বারা প্রকাশ করিতে সক্ষম করে। পুনরাবৃত্তি করিবার শিক্ষা মনের শিক্ষা নহে, তাহা কলের দ্বারাও ঘটিতে পারে।

ভারতবর্ষ যখন নিজের শক্তিতে মনন করিয়াছে তখন তাহার মনের ঐক্য ছিল —এখন সেই মন বিচ্ছিন্ন হইয়া গেছে। এখন তাহার মনের বড়ো বড়ো শাখাগুলি একটি কাণ্ডের মধ্যে নিজেদের বৃহৎ যোগ অনুভব করিতে ভুলিয়া গেছে। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে এক-চেতনাসূত্রের বিচ্ছেদই সমস্ত দেহের পক্ষে সাংঘাতিক। সেইরূপ, ভারতবর্ষের যে মন আজ হিন্দু বৌদ্ধ জৈন শিখ মুসলমান খৃস্টানের মধ্যে বিভক্ত ও বিশ্লিষ্ট হইয়া আছে সে মন আপনার করিয়া কিছু গ্রহণ করিতে বা আপনার করিয়া কিছু দান করিতে পারিতেছে না। দশ আঙুলকে যুক্ত করিয়া অঞ্জলি বাঁধিতে হয়—নেবার বেলাও তাহার প্রয়োজন, দেবার বেলাও। অতএব ভারতবর্ষের শিক্ষাব্যবস্থায় বৈদিক পৌরাণিক বৌদ্ধ জৈন মুসলমান প্রভৃতি সমস্ত চিত্তকে সম্মিলিত ও চিত্তসম্পদকে সংগৃহীত করিতে হইবে; এই নানা ধারা দিয়া ভারতবর্ষের মন কেমন করিয়া প্রবাহিত হইয়াছে তাহা জানিতে হইবে। এইরূপ উপায়েই ভারতবর্ষ আপনার নানা বিভাগের মধ্য দিয়া আপনার সমগ্রতা উপলব্ধি করিতে পারিবে। তেমনি করিয়া আপনাকে বিস্তীর্ণ এবং সংশ্লিষ্ট করিয়া না জানিলে, যে শিক্ষা সে গ্রহণ করিবে তাহা ভিক্ষার মতো গ্রহণ করিবে। সেরূপ ভিক্ষাজীবিতায় কখনও কোনো জাতি সম্পদশালী হইতে পারে না।

দ্বিতীয় কথা এই যে, শিক্ষার প্রকৃত ক্ষেত্র সেইখানেই যেখানে বিদ্যার উদ্ভাবনা চলিতেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখ্য কাজ বিদ্যার উৎপাদন, তাহার গৌণ কাজ সেই বিদ্যাকে দান করা। বিদ্যার ক্ষেত্রে সেইসকল মনীষীদিগকে আহ্বান করিতে হইবে যাঁহারা নিজের শক্তি ও সাধনা দ্বারা অনুসন্ধান আবিষ্কার ও সৃষ্টির কার্যে নিবিষ্ট আছেন। তাঁহারা যেখানেই নিজের কাজে একত্র মিলিত হইবেন সেইখানে স্বভাবতই জ্ঞানের উৎস উৎসারিত হইবে, সেই উৎসধারার নির্ঝরিণীতটেই দেশের সত্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হইবে। বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের নকল করিয়া হইবে না।

তৃতীয় কথা এই যে, সকল দেশেই শিক্ষার সঙ্গে দেশের সর্বাঙ্গীণ জীবনযাত্রার যোগ আছে। আমাদের দেশে কেবলমাত্র কেরানিগিরি ওকালতি ডাক্তারি ডেপুটিগিরি দারোগাগিরি মুন্সেফি প্রভৃতি ভদ্রসমাজে প্রচলিত কয়েকটি ব্যবসায়ের

সঙ্গেই আমাদের আধুনিক শিক্ষার প্রত্যক্ষ যোগ। যেখানে চাষ হইতেছে, কলুর ঘানি ও কুমারের চাক ঘুরিতেছে, সেখানে এ শিক্ষার কোনো স্পর্শও পেঁছায় নাই। অন্য কোনো শিক্ষিত দেশে এমন দুর্যোগ ঘটিতে দেখা যায় না। তাহার কারণ, আমাদের নূতন বিশ্ববিদ্যালয়গুলি দেশের মাটির উপরে নাই, তাহা পরগাছার মতো পরদেশীয় বনস্পতির শাখায় ঝুলিতেছে। ভারতবর্ষে যদি সত্য বিদ্যালয় স্থাপিত হয় তবে গোড়া হইতেই সে বিদ্যালয় তাহার অর্থশাস্ত্র, তাহার কৃষিতত্ত্ব, তাহার স্বাস্থ্যবিদ্যা, তাহার সমস্ত ব্যবহারিক বিজ্ঞানকে আপন প্রতিষ্ঠাস্থানের চতুর্দিকবর্তী পল্লীর মধ্যে প্রয়োগ করিয়া দেশের জীবনযাত্রার কেন্দ্রস্থান অধিকার করিবে। এই বিদ্যালয় উৎকৃষ্ট আদর্শে চাষ করিবে, গো-পালন করিবে, কাপড় বুনিবে এবং নিজের আর্থিক সম্বল-লাভের জন্য সমবায়-প্রণালী অবলম্বন করিয়া ছাত্র শিক্ষক ও চারি দিকের অধিবাসীদের সঙ্গে জীবিকার যোগে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হইবে।

এইরূপ আদর্শ বিদ্যালয়কে আমি 'বিশ্বভারতী' নাম দিবার প্রস্তাব করিয়াছি।

প্র বৈশাখ ১৩২৬

২

বর্তমান কালে আমাদের দেশের উপরে যে শক্তি, যে শাসন, যে ইচ্ছা কাজ করছে, সমস্তই বাইরের দিক থেকে। সে এত প্রবল যে তাকে সম্পূর্ণ অতিক্রম করে আমরা কোনো ভাবনাও ভাবতে পারি নে। এতে করে আমাদের মনের মনীষা প্রতিদিন ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছে। আমরা অন্যের ইচ্ছাকে বহন করি, অন্যের শিক্ষাকে গ্রহণ করি, অন্যের বাণীকে আবৃত্তি করি, তাতে করে প্রকৃতিস্থ হতে আমাদের বাধা দেয়। এইজন্যে মাঝে মাঝে যে চিত্তক্ষোভ উপস্থিত হয় তাতে কল্যাণের পথ থেকে আমাদের ভ্রষ্ট করে। এই অবস্থায় একদল লোক গর্হিত উপায়ে বিদ্বেষবুদ্ধিকে তৃপ্তিদান করাকেই কর্তব্য বলে মনে করে, আর-এক দল লোক চাটুকারবৃত্তি বা চরবৃত্তির দ্বারা যেমন করে হোক অপমানের অন্ন খুটে খাবার জন্যে রাষ্ট্রীয় আবর্জনাকুণ্ডের আশেপাশে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। এমন অবস্থায় বড়ো করে দৃষ্টি করা বা বড়ো করে সৃষ্টি করা সম্ভবপর হয় না; মানুষ অন্তরে বাহিরে অত্যন্ত ছোটো হয়ে যায়, নিজের প্রতি শ্রদ্ধা হারায়।

যে ফলের চারাগাছকে বাইরে থেকে ছাগলে মুড়িয়ে খাবার আশঙ্কা আছে সেই চারাকে বেড়ার মধ্যে রাখার দরকার হয়। সেই নিভৃত আশ্রয়ে থেকে গাছ যখন বড়ো হয়ে ওঠে তখন সে ছাগলের নাগালের উপর উঠে যায়। প্রথম যখন আশ্রমে বিদ্যালয়-স্থাপনের সংকল্প আমার মনে আসে তখন আমি মনে করেছিলুম, ভারতবর্ষের মধ্যে এইখানে একটি বেড়া-দেওয়া স্থানে আশ্রয় নেব। সেখানে বাহ্য শক্তির দ্বারা অভিভূতির থেকে রক্ষা করে আমাদের মনকে একটু স্বাতন্ত্র্য দেবার চেষ্টা করা যাবে। সেখানে চাঞ্চল্য থেকে, রিপুর আক্রমণ থেকে মনকে মুক্ত রেখে বড়ো করে শ্রেয়ের কথা চিন্তা করব এবং সত্য করে শ্রেয়ের সাধনা করতে থাকব।

আজকাল আমরা রাষ্ট্রনৈতিক তপস্যাকেই মুক্তির তপস্যা বলে ধরে নিয়েছি। দল বেঁধে কান্নাকেই সেই তপস্যার সাধনা বলে মনে করেছিলুম। সেই বিরাট

কান্নার আয়োজনে অন্যসকল কাজকর্ম বন্ধই হয়ে গিয়েছিল। এইটেতে আমি অত্যন্ত পীড়াবোধ করেছিলুম।

আমাদের দেশে চিরকাল জানি, আত্মার মুক্তি এমন একটা মুক্তি যেটা লাভ করলে সমস্ত বন্ধন তুচ্ছ হয়ে যায়। সেই মুক্তিটাই, সেই স্বার্থের বন্ধন রিপুর বন্ধন থেকে মুক্তিটাই আমাদের লক্ষ্য; সেই কথাটাকে কান দিয়ে শোনা এবং সত্য বলে জানার একটা জায়গা আমাদের থাকা চাই। এই মুক্তিটা যে কর্মহীনতা শক্তিহীনতার রূপান্তর তা নয়। এতে যে নিরাসক্তি আনে তা তামসিক নয়; তাতে মনকে অভয় করে, কর্মকে বিশুদ্ধ করে, লোভ মোহকে দূর করে দেয়।

তাই বলে এ কথা বলি নে যে, বাইরের বন্ধনে কিছুমাত্র শ্রেয় আছে; বলি নে যে, তাকে অলংকার করে গলায় জড়িয়ে রেখে দিতে হবে। সেও মন্দ, কিন্তু অন্তরে যে মুক্তি তাকে এই বন্ধন পরাভূত ও অপমানিত করতে পারে না। সেই মুক্তির তিলক ললাটে যদি পরি তা হলে রাজসিংহাসনের উপরে মাথা তুলতে পারি এবং বণিকের ভূরি-সঞ্চয়কে তুচ্ছ করার অধিকার আমাদের জন্মে।

যাই হোক, আমার মনে এই কথাটি ছিল যে, পাশ্চাত্ত্য দেশে মানুষের জীবনের একটা লক্ষ্য আছে; সেখানকার শিক্ষা দীক্ষা সেই লক্ষ্যের দিকে মানুষকে নানা রকমে বল দিচ্ছে ও পথ নির্দেশ করছে। তারই সঙ্গে সঙ্গে অবান্তরভাবে এই শিক্ষাদীক্ষায় অন্য দশ রকম প্রয়োজনও সিদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু বর্তমানে আমাদের দেশে জীবনের বড়ো লক্ষ্য আমাদের কাছে জাগ্রত হয়ে ওঠে নি, কেবলমাত্র জীবিকার লক্ষ্যই বড়ো হয়ে উঠল।

জীবিকার লক্ষ্য শুধু কেবল অভাবকে নিয়ে, প্রয়োজনকে নিয়ে; কিন্তু জীবনের লক্ষ্য পরিপূর্ণতাকে নিয়ে—সকল প্রয়োজনের উপরে সে। এই পরিপূর্ণতার আদর্শ সম্বন্ধে য়ুরোপের সঙ্গে আমাদের মতভেদ থাকতে পারে, কিন্তু কোনো একটা আদর্শ আছে যা কেবল পেট ভরাবার না, টাকা করবার না, এ কথা যদি না মানি, তা হলে নিতান্ত ছোটো হয়ে যাই।

এই কথাটা মানব, মানতে শেখাব, এই মনে করেই এখানে প্রথমে বিদ্যালয়ের পত্তন করেছিলুম। তার প্রথম সোপান হচ্ছে বাইরে নানাপ্রকার চিত্তবিক্ষেপ থেকে সরিয়ে এনে মনকে শান্তির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করা। সেইজন্যে এই শান্তির ক্ষেত্রে এসে আমরা আসন গ্রহণ করলুম।

আজ এখানে যাঁরা উপস্থিত আছেন তাঁদের অনেকেই এর আরম্ভ-কালের অবস্থাটা দেখেন নি। তখন আর যাই হোক, এর মধ্যে ইস্কুলের গন্ধ ছিল না বললেই হয়। এখানে যে আহ্বানটি সবচেয়ে বড়ো ছিল সে হচ্ছে বিশ্বপ্রকৃতির আহ্বান, ইস্কুলমাস্টারের আহ্বান নয়। ছাত্রদের সঙ্গে তখন বেতনের কোনো সম্বন্ধ ছিল না, এমনকি বিছানা তৈজসপত্র প্রভৃতি সমস্ত আমাকেই জোগাতে হত।

কিন্তু আধুনিক কালে এত উজান-পথে চলা সম্ভবপর নয়। কোনো একটা ব্যবস্থা যদি এক জায়গায় থাকে এবং সমাজের অন্য জায়গায় তার কোনো সামঞ্জস্যই না থাকে তা হলে তাতে ক্ষতি হয় এবং সেটা টিকতে পারে না। সেইজন্যে এই বিদ্যালয়ের আকৃতিপ্রকৃতি তখনকার চেয়ে এখন অনেক বদল হয়ে এসেছে। কিন্তু হলেও, সেই মূল জিনিসটা আছে। এখানে বালকেরা যতদূর সম্ভব মুক্তির স্বাদ পায়। আমাদের বাহ্য মুক্তির লীলাক্ষেত্র হচ্ছে বিশ্বপ্রকৃতি, সেই ক্ষেত্র এখানে প্রশস্ত।

তার পরে ইচ্ছা ছিল, এখানে শিক্ষার ভিতর দিয়ে ছেলেদের মনের দাসত্ব মোচন

করব। কিন্তু শিক্ষাপ্রণালী যে জালে আমাদের দেশকে আপাদমস্তক বেঁধে ফেলেছে তার থেকে একেবারে বেরিয়ে আসা শক্ত। দেশে বিদেশে শিক্ষার যেসব সিংহদ্বার আছে আমাদের বিদ্যালয়ের পথ যদি সেই দিকে পৌঁছে না দেয় তা হলে কী জানি কী হয় এই ভয়টা মনের ভিতর ছিল। পুরোপুরি সাহস করে উঠতে পারি নি, বিশেষত আমার শক্তিও যৎসামান্য, অভিজ্ঞতাও তদ্রূপ। সেইজন্যে এখানকার বিদ্যালয়টি ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে হয়েছিল। সেই গণ্ডিটুকুর মধ্যে যতটা পারি স্বাতন্ত্র্য রাখতে চেষ্টা করেছি। এই কারণেই আমাদের বিদ্যালয়কে বিশ্ববিদ্যালয়ের শাসনাধীনে আনতে পারি নি।

পূর্বেই বলেছি, সকল বড়ো দেশেই বিদ্যাশিক্ষার নিম্নতর লক্ষ্য ব্যবহারিক সুযোগ-লাভ, উচ্চতর লক্ষ্য মানবজীবনের পূর্ণতা-সাধন। এই লক্ষ্য হতেই বিদ্যালয়ের স্বাভাবিক উৎপত্তি। আমাদের দেশের আধুনিক বিদ্যালয়গুলির সেই স্বাভাবিক উৎপত্তি নেই। বিদেশী বণিক ও রাজা তাঁদের সংকীর্ণ প্রয়োজন-সাধনের জন্য বাইরে থেকে এই বিদ্যালয়গুলি এখানে স্থাপন করেছিলেন। এমনকি তখনকার কোনো কোনো পুরনো দপ্তরে দেখা যায়, প্রয়োজনের পরিমাণ ছাপিয়ে শিক্ষাদানের জন্যে শিক্ষককে কর্তৃপক্ষ তিরস্কার করেছেন।

তার পরে যদিচ অনেক বদল হয়ে এসেছে তবু কৃপণ প্রয়োজনের দাসত্বের দাগা আমাদের দেশের সরকারি শিক্ষার কপালে-পিঠে এখনও অঙ্কিত আছে। আমাদের অভাবের সঙ্গে, অন্নচিন্তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে বলেই এই বিদ্যাশিক্ষাকে যেমন করে হোক বহন করে চলেছি। এই ভয়ংকর জবরদস্তি আছে বলেই শিক্ষাপ্রণালীতে আমরা স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ করতে পারছি নে।

এই শিক্ষাপ্রণালীর সকলের চেয়ে সাংঘাতিক দোষ এই যে, এতে গোড়া থেকে ধরে নেওয়া হয়েছে যে আমরা নিঃস্ব। যা-কিছু সমস্তই আমাদের বাইরে থেকে নিতে হবে—আমাদের নিজের ঘরে শিক্ষার পৈতৃক মূলধন যেন কানাকড়ি নেই। এতে কেবল যে শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকে তা নয়, আমাদের মনে একটা নিঃস্ব-ভাব জন্মায়। আত্মাভিমানের তাড়নায় যদি-বা মাঝে মাঝে সেই ভাবটাকে ঝেড়ে ফেলতে চেষ্টা করি তা হলেও সেটাও কেমনতরো বেসুরো রকম আস্ফালনে আত্মপ্রকাশ করে। আজকালকার দিনে এই আস্ফালনে আমাদের আন্তরিক দীনতা কিছুই ঘোচে নি, কেবল সেই দীনতাটাকে হাস্যকর ও বিরক্তিকর করে তুলেছি।

যাই হোক, মনের দাসত্ব যদি ঘোচাতে চাই তা হলে আমাদের শিক্ষার এই দাসভাবটাকে ঘোচাতে হবে। আমাদের আশ্রমে শিক্ষার যদি সেই মুক্তি দিতে না পারি তা হলে এখানকার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যাবে।

কিছুকাল পূর্বে শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়ের মনে একটি সংকল্পের উদয় হয়েছিল। আমাদের টোলের চতুষ্পাঠীতে কেবলমাত্র সংস্কৃত শিক্ষাই দেওয়া হয় এবং অন্যসকল শিক্ষাকে একেবারে অবজ্ঞা করা হয়। তার ফলে সেখানকার ছাত্রদের শিক্ষা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। আমাদের দেশের শিক্ষাকে মূল-আশ্রয়-স্বরূপ অবলম্বন করে তার উপর অন্যসকল শিক্ষার পত্তন করলে তবেই শিক্ষা সত্য ও সম্পূর্ণ হয়। জ্ঞানের আধারটিকে নিজের করে তার উপকরণ পৃথিবীর সর্বত্র হতে সংগ্রহ ও সঞ্চয় করতে হবে। শাস্ত্রীমহাশয় তাঁর এই সংকল্পটিকে কাজে পরিণত করতে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। কিন্তু নানা বাধায় তখন তিনি তা পারেন নি। এই অধ্যবসায়ের টানে কিছুদিন তিনি আশ্রম ত্যাগ করে গিয়েছিলেন।

তার পর তাঁকে পুনরায় আশ্রমে আহ্বান করে আনা গেল। এবার তাঁকে ক্লাস পড়ানো থেকে নিষ্কৃতি দিলুম। তিনি ভাষাতত্ত্বের চর্চায় প্রবৃত্ত রইলেন। আমার মনে হল, এইরকম কাজই হচ্ছে শিক্ষার যজ্ঞক্ষেত্রে যথার্থ যোগ্য। যাঁরা যথার্থ শিক্ষার্থী তাঁরা যদি এইরকম বিদ্যার সাধকদের চারি দিকে সমবেত হন তা হলে তো ভালোই; আর যদি আমাদের দেশের কপাল-দোষে সমবেত না হন তা হলেও এই যজ্ঞ ব্যর্থ হবে না। কথার মানে এবং বিদেশের বাঁধা বুলি মুখস্থ করিয়ে ছেলেদের তোতাপাখি করে তোলার চেয়ে এ অনেক ভালো।

এমনি করে কাজ আরম্ভ হল। এই আমাদের বিশ্বভারতীর প্রথম বীজবপন।

বিশ-পঞ্চাশ লক্ষ টাকা কুড়িয়ে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় পত্তন করবার সাধ্য আমাদের নেই। কিন্তু সেজন্যে হতাশ হতেও চাই নে। বীজের যদি প্রাণ থাকে তা হলে ধীরে ধীরে অঙ্কুরিত হয়ে আপনি বেড়ে উঠবে। সাধনার মধ্যে যদি সত্য থাকে তা হলে উপকরণের অভাবে ক্ষতি হবে না।

আমাদের আসনগুলি ভরে উঠেছে। সংস্কৃত পালি প্রাকৃতভাষা ও শাস্ত্র-অধ্যাপনার জন্য বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় একটিতে বসেছেন, আর-একটিতে আছেন সিংহলের মহাস্থবির; ক্ষিতিমোহনবাবু সমাগত; আর আছেন ভীমশাস্ত্রী মহাশয়। ওদিকে এন্ড্রুজের চারি দিকে ইংরেজি-সাহিত্য-পিপাসুরা সমবেত। ভীমশাস্ত্রী এবং দিনেন্দ্রনাথ সংগীতের অধ্যাপনার ভার নিয়েছেন, আর বিষ্ণুপুরের নকুলেশ্বর গোস্বামী তাঁর সুরবাহার নিয়ে এঁদের সঙ্গে যোগ দিতে আসছেন। শ্রীমান নন্দলাল বসু ও সুরেন্দ্রনাথ কর চিত্রবিদ্যা শিক্ষা দিতে প্রস্তুত হয়েছেন। দূর দেশ হতেও তাঁদের ছাত্র এসে জুটছে। তা ছাড়া আমাদের যার যতটুকু সাধ্য আছে কিছু কিছু কাজ করতে প্রবৃত্ত হব। আমাদের একজন বিহারী বন্ধু সত্বর আসছেন। তিনি পারসি ও উর্দু শিক্ষা দেবেন, ও ক্ষিতিমোহনবাবুর সহায়তায় প্রাচীন হিন্দিসাহিত্যের চর্চা করবেন। মাঝে মাঝে অন্যত্র হতে অধ্যাপক এসে আমাদের উপদেশ দিয়ে যাবেন এমনও আশা আছে।

শিশু দুর্বল হয়েই পৃথিবীতে দেখা দেয়। সত্য যখন সেইরকম শিশুর বেশে আসে তখনই তার উপরে আস্থা স্থাপন করা যায়। একেবারে দাড়িগোঁফ-সুদ্ধ যদি কেউ জন্মগ্রহণ করে তা হলে জানা যায় সে একটা বিকৃতি। বিশ্বভারতী একটা মস্ত ভাব, কিন্তু সে অতি ছোটো দেহ নিয়ে আমাদের আশ্রমে উপস্থিত হয়েছে। কিন্তু ছোটোর ছদ্মবেশে বড়োর আগমন পৃথিবীতে প্রতিদিনই ঘটে, অতএব আনন্দ করা যাক, মঙ্গলশঙ্খ বেজে উঠুক। একান্তমনে এই আশা করা যাক যে, এই শিশু বিধাতার অমৃতভাণ্ডার থেকে অমৃত বহন করে এনেছে; সেই অমৃতই একে ভিতর থেকে বাঁচাবে বাড়াবে, এবং আমাদেরও বাঁচাবে ও বাড়িয়ে তুলবে।

শান্তিনিকেতন
১৮ আষাঢ় ১৩২৬

৩

আজ বিশ্বভারতী-পরিষদের প্রথম অধিবেশন। কিছুদিন থেকে বিশ্বভারতীর এই বিদ্যালয়ের কাজ আরম্ভ হয়েছে। আজ সর্বসাধারণের হাতে তাকে সমর্পণ করে দেব। বিশ্বভারতীর যাঁরা হিতৈষীবৃন্দ ভারতের সর্বত্র ও ভারতের বাইরে আছেন, এর ভাবের সঙ্গে যাঁদের মনের মিল আছে, যাঁরা একে গ্রহণ করতে দ্বিধা করবেন না, তাঁদেরই হাতে আজ একে সমর্পণ করে দেব।

আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, হঠাৎ আজ আমাদের মধ্যে কয়েকজন হিতৈষী বন্ধু সমাগত হয়েছেন, যাঁরা দেশে ও দেশের বাইরে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। সকলে জানেন, আজ এখানে ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, ডাক্তার নীলরতন সরকার এবং ডাক্তার শিশিরকুমার মৈত্র উপস্থিত আছেন। আমাদের আরও সৌভাগ্য যে, সমুদ্রপার থেকে এখানে একজন মনীষী এসেছেন, যাঁর খ্যাতি সর্বত্র বিস্তৃত। আজ আমাদের কর্মে যোগদান করতে পরমসুহৃদ আচার্য সিল্‌ভ্যাঁ লেভি মহাশয় এসেছেন। আমাদের সৌভাগ্য যে, আমাদের এই প্রথম অধিবেশনে, যখন আমরা বিশ্বের সঙ্গে বিশ্বভারতীর যোগসাধন করতে প্রবৃত্ত হয়েছি সেই সভাতে, আমরা এঁকে পাশ্চাত্ত্য দেশের প্রতিনিধি রূপে পেয়েছি। ভারতবর্ষের চিত্তের সঙ্গে এঁর চিত্তের সম্বন্ধবন্ধন অনেক দিন থেকে স্থাপিত হয়েছে। ভারতবর্ষের আতিথ্য তিনি আশ্রমে আমাদের মধ্যে লাভ করুন। যেসকল সুহৃদ আজ এখানে উপস্থিত আছেন তাঁরা আমাদের হাত থেকে এর ভার গ্রহণ করুন। এই বিশ্বভারতীকে আমরা কিছুদিন লালনপালন করলুম, একে বিশ্বের হাতে সমর্পণ করবার এই সময় এসেছে। একে এঁরা প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করুন, এর সঙ্গে আপনার চিত্তের সম্বন্ধ স্থাপন করুন। এই কামনা নিয়ে আমি আচার্য শীল মহাশয়কে সকলের সম্মতি-ক্রমে বরণ করেছি; তিনি সভাপতির আসন গ্রহণ করে কর্ম সম্পন্ন করুন, বিশ্বের প্রতিনিধি রূপে আমাদের হাত থেকে একে গ্রহণ করে বিশ্বের সম্মুখে স্থাপন করুন। তিনি এ বিষয়ে যেমন করে বুঝবেন তেমন আর কেউ পারবেন না। তিনি উদার দৃষ্টিতে জ্ঞানরাজ্যকে দেখেছেন। কেবল অসাধারণ পাণ্ডিত্য থাকলেই তা হতে পারে না, কারণ অনেক সময়ে পাণ্ডিত্যের দ্বারা ভেদবুদ্ধি ঘটে। কিন্তু তিনি আত্মিক দৃষ্টিতে জ্ঞানরাজ্যের ভিতরের ঐক্যকে গ্রহণ করেছেন। আজকের দিনে তাঁর চেয়ে বিশ্বভারতীকে গ্রহণ করবার যোগ্য আর কেউ নেই। আনন্দের সহিত তাঁর হাতে একে সমর্পণ করছি। তিনি আমাদের হয়ে সকলের সামনে একে উপস্থিত করুন এবং তাঁর চিত্তে যদি বাধা না থাকে তবে নিজে এতে স্থান গ্রহণ করুন, একে আপনার করে বিশ্বের সঙ্গে যোগযুক্ত করুন।*

বিশ্বভারতীর মর্মের কথাটি আগে বলি, কারণ অনেকে হয়তো ভালো করে তা জানেন না। কয়েক বৎসর পূর্বে আমাদের পরমসুহৃদ বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়ের মনে সংকল্প হয়েছিল যে, আমাদের দেশে সংস্কৃতশিক্ষা যাকে বলা হয় তার অনুষ্ঠান ও প্রণালীর বিস্তারসাধন করা দরকার। তাঁর খুব ইচ্ছা হয়েছিল যে, আমাদের দেশে টোল ও চতুষ্পাঠী রূপে যেসকল বিদ্যায়তন আছে তার অধিকারকে প্রসারিত করতে হবে। তাঁর মনে হয়েছিল যে, যে কালকে আশ্রয় করে এদের প্রতিষ্ঠা সে কালে এদের উপযোগিতার কোনো অভাব ছিল না। কিন্তু কালের

---

* আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের বক্তৃতা পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

পরিবর্তন হয়েছে। বর্তমানে গবর্মেণ্টের দ্বারা যেসব বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেগুলি এই দেশের নিজের সৃষ্টি নয়। কিন্তু আমাদের দেশের প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের পুরাকালের এই বিদ্যালয়গুলির মিল আছে; এরা আমাদের নিজের সৃষ্টি। এখন কেবল দরকার এদের ভিতর দিয়ে নূতন যুগের স্পন্দন, তার আহ্বান, প্রকাশ পাওয়া; না যদি পায় তো বুঝতে হবে তারা সাড়া দিচ্ছে না, মরে গেছে। এই সংকল্প মনে রেখে তিনি নিজের গ্রামে যান; সে সূত্রে তাঁর সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ তখনকার মতো বিযুক্ত হওয়াতে দুঃখিত হয়েছিলুম, যদিও আমি জানতুম যে ভিতরকার দিক দিয়ে সে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হতে পারে না। তার পর নানা বাধায় তিনি গ্রামে চতুষ্পাঠী স্থাপন করতে পারেন নি। তখন আমি তাঁকে আশ্বাস দিলাম, তাঁর ইচ্ছাসাধন এখানেই হবে, এই স্থানই তাঁর প্রকৃষ্ট ক্ষেত্র। এমনিভাবে বিশ্বভারতীর আরম্ভ হল।

গাছের বীজ ক্রমে ক্রমে প্রাণের নিয়মে বিস্তৃতি লাভ করে। সে বিস্তার এমন করে ঘটে যে, সেই বীজের সীমার মধ্যে তাকে আর ধরেই না। তেমনি প্রথমে যে শিক্ষার আয়তনকে মনে করেছিলাম দেশের প্রয়োজনের মধ্যেই অবরুদ্ধ থাকবে, ক্রমে তা বৃহৎ আকাশে মুক্তিলাভের চেষ্টা করতে লাগল। যে অনুষ্ঠান সত্য তার উপরে দাবি সমস্ত বিশ্বের; তাকে বিশেষ প্রয়োজনে খর্ব করতে চাইলে তার সত্যতাকেই খর্ব করা হয়। এবার পশ্চিমে গিয়ে দেখেছি যে, পূর্ব-মহাদেশ কী সম্পদ দিতে পারে তা সকলে জানতে চাচ্ছে। আজ মানুষকে বেদনা পেতে হয়েছে। সে পুরাকালে যে আশ্রয়কে নির্মাণ করেছিল তার ভিত্তি বিদীর্ণ হয়ে গেছে। তাতে করে মানুষের মনে হয়েছে, এ আশ্রয় তার অভাবকে পূর্ণ করবার উপযোগী নয়। পশ্চিমের মনীষীরাও এ কথা বুঝতে পেরেছেন, এবং মানুষের সাধনা কোন্ পথে গেলে সে অভাব পূর্ণ হবে তাঁদের তা উপলব্ধি করবার ইচ্ছা হয়েছে।

কোনো জাতি যদি স্বাজাত্যের ঔদ্ধত্য-বশত আপন ধর্ম ও সম্পদকে একান্ত আপন বলে মনে করে তবে সেই অহংকারের প্রাচীর দিয়ে সে তার সত্য সম্পদকে বেষ্টন করে রাখতে পারবে না। যদি সে তার অহংকারের দ্বারা সত্যকে কেবলমাত্র স্বকীয় করতে যায় তবে তার সে সত্য বিনষ্ট হয়ে যাবে। আজ পৃথিবীর সর্বত্র এই বিশ্ববোধ উদ্‌বুদ্ধ হতে যাচ্ছে। ভারতবর্ষে কি এই যুগের সাধনা স্থান পাবে না? আমরা কি এ কথাই বলব যে, মানবের বড়ো অভিপ্রায়কে দূরে রেখে ক্ষুদ্র অভিপ্রায় নিয়ে আমরা থাকতে চাই? তবে কি আমরা মানুষের যে গৌরব তার থেকে বঞ্চিত হব না? স্বজাতির অচল সীমানার মধ্যে আপনাকে সংকীর্ণভাবে উপলব্ধি করাই কি সবচেয়ে বড়ো গৌরব?

এই বিশ্বভারতী ভারতবর্ষের জিনিস হলেও একে সমস্ত মানবের তপস্যার ক্ষেত্র করতে হবে। কিন্তু আমাদের দেবার কী আছে। কল্যাণরূপী শিব তাঁর ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে বেরিয়েছেন। সে ঝুলিতে কে কী দান করবে? শিব সমস্ত মানুষের কাছে সেই ঝুলি নিয়ে এসেছেন। আমাদের কি তাঁকে কিছু দেবার নেই? হাঁ, আমাদের দেবার আছে, এই কথা ভেবেই কাজ করতে হবে। এইজন্যই ভারতের ক্ষেত্রে বিশ্বভারতীকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই।

শান্তিনিকেতন
৮ পৌষ ১৩২৮

৪

কোনো জিনিসের আরম্ভ কী করে হয় তা বলা যায় না। সেই আরম্ভকালটি রহস্যে আবৃত থাকে। আমি চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত পদ্মার বোটে কাটিয়েছি, আমার প্রতিবেশী ছিল বালিচরের চক্রবাকের দল। তাদের মধ্যে বসে বসে আমি বই লিখেছি। হয়তো চিরকাল এইভাবেই কাটাতুম। কিন্তু মন হঠাৎ কেন বিদ্রোহী হল, কেন ভাবজগৎ থেকে কর্মজগতে প্রবেশ করলাম?

আমি বাল্যকালের শিক্ষাব্যবস্থায় মনে বড়ো পীড়া অনুভব করেছি। সেই ব্যবস্থায় আমাকে এত ক্লেশ দিত আঘাত করত যে বড়ো হয়েও সে অন্যায় ভুলতে পারি নি। কারণ প্রকৃতির বক্ষ থেকে, মানবজীবনের সংস্পর্শ থেকে স্বতন্ত্র করে নিয়ে শিশুকে বিদ্যালয়ের কলের মধ্যে ফেলা হয়। তার অস্বাভাবিক পরিবেষ্টনের নিষ্পেষণে শিশুচিত্ত প্রতিদিন পীড়িত হতে থাকে। আমরা নর্মাল ইস্কুলে পড়তাম। সেটা ছিল মল্লিকদের বাড়ি। সেখানে গাছপালা নেই, মার্বেলের উঠান আর ইঁটের উঁচু দেওয়াল যেন আমার দিকে কটমট করে তাকিয়ে থাকত। আমরা, যাদের শিশুপ্রকৃতির মধ্যে প্রাণের উদ্যম সতেজ ছিল, এতে বড়োই দুঃখ পেতাম। প্রকৃতির সাহচর্য থেকে দূরে থেকে আর মাস্টারদের সঙ্গে প্রাণগত যোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে আমাদের আত্মা যেন শুকিয়ে যেত। মাস্টাররা সব আমাদের মনে বিভীষিকার সৃষ্টি করত।

প্রাণের সম্বন্ধ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এই-যে বিদ্যা লাভ করা যায় এটা কখনও জীবনের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হয়ে উঠতে পারে না।

আমি এ বিষয়ে কখনও কখনও বক্তৃতাও দিয়েছিলেম। কিন্তু যখন দেখলাম যে আমার কথাগুলি শ্রুতিমধুর কবিত্ব হিসাবেই সকলে নিলেন এবং যাঁরা কথাটাকে মানলেন তাঁরা এটাকে কাজে খাটাবার কোনো উদ্যোগ করলেন না, তখন আমার ভাবকে কর্মের মধ্যে আকার দান করবার জন্য আমি নিজেই কৃতসংকল্প হলাম। আমার আকাঙ্ক্ষা হল, আমি ছেলেদের খুশি করব, প্রকৃতির গাছপালাই তাদের অন্যতম শিক্ষক হবে, জীবনের সহচর হবে— এমনি করে বিদ্যার একটি প্রাণনিকেতন নীড় তৈরি করে তুলব।

তখন আমার ঘাড়ে মস্ত একটা দেনা ছিল; সে দেনা আমার সম্পূর্ণ স্বকৃত নয়, কিন্তু তার দায় আমারই একলার। দেনার পরিমাণ লক্ষ টাকারও অধিক ছিল। আমার এক পয়সার সম্পত্তি ছিল না, মাসিক বরাদ্দ অতি সামান্য। আমার বইয়ের কপিরাইট প্রভৃতি আমার সাধ্যায়ত্ত সামগ্রীর কিছু কিছু সওদা করে অসাধ্যসাধনে লেগে গেলাম। আমার ডাক দেশের কোথাও পৌঁছয় নি। কেবল ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়কে পাওয়া গিয়েছিল, তিনি তখনও রাজনীতিক্ষেত্রে নামেন নি। তাঁর কাছে আমার এই সংকল্প খুব ভালো লাগল, তিনি এখানে এলেন। কিন্তু তিনি জমবার আগেই কাজ আরম্ভ করে দিয়েছিলাম। আমি পাঁচ-ছয়টি ছেলে নিয়ে জামগাছতলায় তাদের পড়াতাম। আমার নিজের বেশি বিদ্যে ছিল না। কিন্তু আমি যা পারি তা করেছি। সেই ছেলে-কয়টিকে নিয়ে রস দিয়ে ভাব দিয়ে রামায়ণ মহাভারত পড়িয়েছি— তাদের কাঁদিয়েছি হাসিয়েছি, ঘনিষ্ঠভাবে তাদের সঙ্গে যুক্ত থেকে তাদের মানুষ করেছি।

এক সময়ে নিজের অনভিজ্ঞতার খেদে আমার হঠাৎ মনে হল যে, একজন হেডমাস্টারের নেহাত দরকার। কে যেন একজন লোকের নাম করে বললে, ‘অমুক

লোকটি একজন ওস্তাদ শিক্ষক, যাকে তাঁর পাসের সোনার কাঠি ছুঁইয়েছেন সেই পাস হয়ে গেছে।'—তিনি তো এলেন, কিন্তু কয়েক দিন সব দেখেশুনে বললেন, 'ছেলেরা গাছে চড়ে, চেঁচিয়ে কথা কয়, দৌড়য়, এ তো ভালো না।' আমি বললাম, 'দেখুন, আপনার বয়সে তো কখনও তারা গাছে চড়বে না। এখন একটু চড়তেই দিন-না। গাছ যখন ডালপালা মেলেছে তখন সে মানুষকে ডাক দিচ্ছে। ওরা ওতে চড়ে পা ঝুলিয়ে থাকলই-বা।' তিনি আমার মতিগতি দেখে বিরক্ত হলেন। মনে আছে, তিনি কিন্ডারগার্টেন-প্রণালীতে পড়াবার চেষ্টা করতেন। তাল গোল, বেল গোল, মানুষের মাথা গোল—ইত্যাদি সব পাঠ শেখাতেন। তিনি ছিলেন পাসের ধুরন্ধর পণ্ডিত, ম্যাট্রিকের কর্ণধার। কিন্তু এখানে তাঁর বনল না, তিনি বিদায় নিলেন। তার পর থেকে আর হেডমাস্টার রাখি নি।

এ সামান্য ব্যাপার নয়, পৃথিবীতে অল্প বিদ্যালয়েই ছেলেরা এত বেশি ছাড়া পেয়েছে। আমি এ নিয়ে মাস্টারদের সঙ্গে লড়াই করেছি। আমি ছেলেদের বললাম, 'তোমরা আশ্রম-সম্মিলনী করো, তোমাদের ভার তোমরা নাও।' আমি কিছুতে আমার সংকল্প ত্যাগ করি নি—আমি ছেলেদের উপর জবরদস্তি হতে দিই নি। তারা গান গায়, গাছে চড়ে, ছবি আঁকে, পরস্পরের সঙ্গে অন্তরঙ্গ ও বাধামুক্ত সম্বন্ধে যুক্ত হয়ে আছে।

এখানকার শিশুশিক্ষার আর-একটা দিক আছে। সেটা হচ্ছে—জীবনের গভীর ও মহৎ তাৎপর্য ছোটো ছেলেদের বুঝতে দেওয়া। আমাদের দেশের সাধনার মন্ত্র হচ্ছে, যা মহৎ তাতেই সুখ, অল্পে সুখ নেই। কিন্তু একা রাজনীতিই এখন সেই বড়ো মহতের স্থান সমস্তটাই জুড়ে বসে আছে। আমার কথা এই যে, সবচেয়ে বড়ো যে আদর্শ মানুষের আছে তা ছেলেদের জানতে দিতে হবে। তাই আমরা এখানে সকালে সন্ধ্যায় আমাদের প্রাচীন তপোবনের মহৎ কোনো বাণী উচ্চারণ করি, স্থির হয়ে কিছুক্ষণ বসি। এতে আর-কিছু না হোক, একটা স্বীকারোক্তি আছে। এই অনুষ্ঠানের দ্বারা ছোটো ছেলেরা একটা বড়ো জিনিসের ইশারা পায়। হয়তো তারা উপাসনায় বসে হাত-পা নাড়ছে, চঞ্চল হয়ে উঠছে, কিন্তু এই আসনে বসবার একটা গভীর তাৎপর্য দিনে দিনে তাদের মনের মধ্যে গিয়ে পৌঁছয়।

এখানে ছেলেরা জীবনের আরম্ভকালকে বিচিত্র রসে পূর্ণ করে নেবে, এই আমার অভিপ্রায় ছিল। প্রকৃতির সঙ্গে নিত্যযোগে গানে অভিনয়ে ছবিতে আনন্দরস আস্বাদনের নিত্যচর্চায় শিশুদের মগ্ন চৈতন্যে আনন্দের স্মৃতি সঞ্চিত হয়ে উঠবে, এইটেকেই লক্ষ্য করে কাজ আরম্ভ করা গেল।

কিন্তু শুধু এটাকেই চরম লক্ষ্য বলে এই বিদ্যালয় স্বীকার করে নেয় নি। এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করবার আমার প্রথম উদ্দেশ্য ছিল, বাঙালির ছেলেরা এখানে মানুষ হবে, রূপে রসে গন্ধে বর্ণে চিত্রে সংগীতে তাদের হৃদয় শতদলপদ্মের মতো আনন্দে বিকশিত হয়ে উঠবে। কিন্তু আমার মনের পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে এর উদ্দেশ্যও গভীরতর হল। এখানকার এই বাঙালির ছেলেরা তাদের কলহাস্যের দ্বারা আমার মনে একটি ব্যাকুল চঞ্চলতার সৃষ্টি করল। আমি স্তব্ধ হয়ে বসে এদের আনন্দপূর্ণ কণ্ঠস্বর শুনেছি। দূর থেকে তাদের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমার মনে হয়েছে যে, এই আনন্দ, এ যে নিখিল মানবচিত্ত থেকে বিনিঃসৃত অমৃত-উৎসের একটি ধারা। আমি এই শিশুদের মধ্যে সেই স্পর্শ পেয়েছি। বিশ্বচিত্তের বসুন্ধরার সমস্ত মানবসন্তান যেখানে আনন্দিত হচ্ছে সেই বিরাট ক্ষেত্রে আমি হৃদয়কে বিস্তৃত করে দিয়েছি। যেখানে মানুষের বৃহৎ প্রাণময়

তীর্থ আছে, যেখানে প্রতিদিন মানুষের ইতিহাস গড়ে উঠছে, সেখানে আমার মন যাত্রা করেছে। পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত ইংরেজি লিখি নি, ইংরেজি যে ভালো করে জানি তা ধারণা ছিল না। মাতৃভাষাই তখন আমার সম্বল ছিল। যখন ইংরেজি চিঠি লিখতাম তখন অজিত বা আর-কাউকে দিয়ে লিখিয়েছি। আমি তেরো বছর পর্যন্ত ইস্কুলে পড়েছি, তার পর থেকে পলাতক ছাত্র। পঞ্চাশ বছর বয়সের সময় যখন আমি আমার লেখার অনুবাদ করতে প্রবৃত্ত হলাম তখন গীতাঞ্জলির গানে আমার মনে ভাবের একটা উদ্‌বোধন হয়েছিল বলে সেই গানগুলিই অনুবাদ করলাম। সেই তর্জমার বই আমার পশ্চিম-মহাদেশ-যাত্রার যথার্থ পাথেয়স্বরূপ হল। দৈবক্রমে আমার দেশের বাইরেকার পৃথিবীতে আমার স্থান হল, ইচ্ছা করে নয়। এই সম্মানের সঙ্গে সঙ্গে আমার দায়িত্ব বেড়ে গেল।

যতক্ষণ বীজ বীজই থাকে ততক্ষণ সে নিজের মধ্যেই থাকে। তার পরে যখন অঙ্কুরিত হয়ে বৃক্ষরূপে আকাশে বিস্তৃতি লাভ করে তখন সে বিশ্বের জিনিস হয়। এই বিদ্যালয় বাংলার এক প্রান্তে কয়েকটি বাঙালির ছেলে নিয়ে তার ক্ষুদ্র সামর্থ্যের মধ্যে কোণ আঁকড়ে পড়ে ছিল। কিন্তু সব সজীব পদার্থের মতো তার অন্তরে পরিণতির একটা সময় এল। তখন সে আর একান্ত সীমাবদ্ধ মাটির জিনিস রইল না, তখন সে উপরের আকাশে মাথা তুলল, বড়ো পৃথিবীর সঙ্গে তার অন্তরের যোগসাধন হল; বিশ্ব তাকে আপন বলে দাবি করল।

আধুনিক কালের পৃথিবীর ভৌগোলিক সীমা ভেঙে গেছে, মানুষ পরস্পরের নিকটতর হয়েছে, এই সত্যকে আমাদের গ্রহণ করতে হবে। মানুষের এই মিলনের ভিত্তি হবে প্রেম, বিদ্বেষ নয়। মানুষ বিষয়ব্যবহারে আজ পরস্পরকে পীড়ন করছে, বঞ্চিত করছে, এ কথা আমি অস্বীকার করছি না। কিন্তু সত্যসাধনায় পূর্ব-পশ্চিম নেই। বুদ্ধদেবের শিক্ষা ভারতবর্ষের মাটিতে উদ্ভূত হয়ে চীনদেশে গিয়ে মানবচিত্তকে আঘাত করল এবং ক্রমে সমস্ত এসিয়াকে অধিকার করল। চিরন্তন সত্যের মধ্যে পূর্ব-পশ্চিমের ভেদ নেই। এই বিশ্বভারতীতে সেই সত্যসাধনার ক্ষেত্রকে আমার গড়ে তুলতে হবে। পৃথিবীর সঙ্গে আমাদের দেওয়া-নেওয়ার সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়া দরকার। আমরা এতদিন পর্যন্ত ইংরেজি বিশ্ববিদ্যালয়ের 'স্কুলবয়' ছিলাম, কেবলই পশ্চিমের কাছে হাত পেতে পাঠ শিখে নিয়েছি। কিন্তু পশ্চিমের সঙ্গে আমাদের আদানপ্রদানের সম্বন্ধ হয় নি। সাহসপূর্বক য়ুরোপকে আমি আমাদের শিক্ষাকেন্দ্রে আমন্ত্রণ করে এসেছি। এখানে এইরূপে সত্যসম্মিলন হবে, জ্ঞানের তীর্থক্ষেত্র গড়ে উঠবে। আমরা রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে খুব মৌখিক বড়াই করে থাকি, কিন্তু অন্তরে আমাদের আত্মবিশ্বাস নেই, যথেষ্ট দীনতা আছে। যেখানে মনের ঐশ্বর্যের প্রকৃত প্রাচুর্য আছে সেখানে কার্পণ্য সম্ভবপর হয় না। আপন সম্পদের প্রতি যে জাতির যথার্থ আশা ও বিশ্বাস আছে অন্যকে বিতরণ করতে তার সংকোচ হয় না, সে পরকে ডেকে বিলোতে চায়। আমাদের দেশে তাই গুরুর কণ্ঠে এই আহ্বানবাণী এক সময় ঘোষিত হয়েছিল—আয়ন্তু সর্বতঃ স্বাহা।

আমরা সকলের থেকে দূরে বিচ্ছিন্ন হয়ে বিদ্যার নির্জন কারাবাসে রুদ্ধ হয়ে থাকতে চাই। কারারক্ষী যা দয়া করে খেতে দেবে তাই নিয়ে টিকে থাকবার মতলব করেছি। এই বিচ্ছিন্নতার থেকে ভারতবর্ষকে মুক্তিদান করা সহজ ব্যাপার নয়। সেবা করবার ও সেবা আদায় করবার, দান করবার ও দান গ্রহণ করবার সম্বন্ধকে আমাদের তৈরি করে তুলতে হবে। বিশ্বের জ্ঞানজগৎ থেকে ভারতবর্ষ একঘরে হয়ে আছে, তাকে শিক্ষার ছিটেফোঁটা দিয়ে চিরকেলে পাঠশালার পোড়ো করে রাখা

হয়েছে। আমরা পৃথিবীর জ্ঞানধারার সঙ্গে যুক্ত হয়ে এই আধ্যাত্মিক ও বুদ্ধিগত অবমাননা থেকে মুক্তি পেতে চাই।

ভারতবর্ষ তার আপন মনকে জানুক এবং আধুনিক সকল লাঞ্ছনা থেকে উদ্ধার লাভ করুক। রামানুজ শংকরাচার্য বুদ্ধদেব প্রভৃতি বড়ো বড়ো মনীষীরা ভারতবর্ষে বিশ্বসমস্যার যে সমাধান করবার চেষ্টা করেছিলেন তা আমাদের জানতে হবে। জোরাস্ত্রেরীয় ইসলাম প্রভৃতি এসিয়ার বড়ো বড়ো শিক্ষাসাধনার সঙ্গে পরিচিত হতে হবে। ভারতবর্ষের কেবল হিন্দুচিত্তকে স্বীকার করলে চলবে না। ভারতবর্ষের সাহিত্য শিল্পকলা স্থপতিবিজ্ঞান প্রভৃতিতেও হিন্দুমুসলমানের সংমিশ্রণে বিচিত্র সৃষ্টি জেগে উঠেছে। তারই পরিচয়ে ভারতবর্ষীয়ের পূর্ণ পরিচয়। সেই পরিচয় পাবার উপযুক্ত কোনো শিক্ষাস্থানের প্রতিষ্ঠা হয় নি বলেই তো আমাদের শিক্ষা অসম্পূর্ণ ও দুর্বল।

ভারতের বিরাট সত্তা বিচিত্রকে আপনার মধ্যে একত্র সম্মিলিত করবার চেষ্টা করছে। তার সেই তপস্যাকে উপলব্ধি করবার একটা সাধনক্ষেত্র আমাদের চাই তো। বিশ্বভারতীতে সেই কাজটি হতে পারে। বিশ্বের হাটে যদি আমাদের বিদ্যার যাচাই না হয় তবে আমাদের জ্ঞান সম্পূর্ণ হল না। ঘরের কোণে বসে আত্মীয়স্বজনে বৈঠকে যে অহংকার নিবিড় হতে থাকে সেটা সত্য পদার্থ নয়। মানুষের জ্ঞানচর্চার বৃহৎ ক্ষেত্রের সঙ্গে যোগ হলেই তবে আমাদের বিদ্যার সার্থকতা হবে। বিশ্বভারতীর এই লক্ষ্য সার্থক হোক।

শান্তিনিকেতন
২০ ফাল্গুন ১৩২৮

৫

আপনারা যাঁরা আজ এখানে সমবেত হয়েছেন, আপনাদের সকলের সঙ্গে ক্রমশ আমাদের যোগ ঘনিষ্ঠ হবে, সাক্ষাৎসম্বন্ধ স্থাপিত হবে। বিশ্বভারতীর ভিতরকার আদর্শ ক্রমে দিনে দিনে আপনাদের কাছে পরিস্ফুট হবে। বিশ্বভারতীর সব প্রতিষ্ঠানগুলি যেমন যেমন জেগে উঠতে থাকবে তেমন তেমন তার মধ্য দিয়ে এর ভিতরকার রূপটি আপনাদের কাছে জাগতে থাকবে। বাইরে থেকে এ সম্বন্ধে কথা বলতে কুণ্ঠা বোধ হয়, কারণ ভিতরের বড়ো আইডিয়ালকে বাইরে আকার দান করতে গেলে দুইয়ের মধ্যে অসামঞ্জস্য থেকে যাবেই। বাইরের অসম্পূর্ণতার সঙ্গে কোনো আইডিয়ালের ভিতরের মহত্ত্বের মধ্যেকার ব্যবধান যখন চোখে পড়ে তখন গোড়াকার বাক্যাড়ম্বরের পরে তা অনেকের কাছে হতাশার ও লজ্জার কারণ হয়। আইডিয়ালকে প্রকাশ করে তোলা কারও একলার সাধ্য নয়, কারণ তা দু-একজনের বিশেষ সময়কার কর্ম নয়। প্রথমে যে অনুধাবনায় আরম্ভ হয় সেই প্রথম ধাক্কাই তার যথার্থ পরিচয় নয়। হৃদয় কর্ম ও জীবন দিয়ে নানা কর্মীর সহায়তায় তা ফুটে উঠতে থাকে। তার প্রথমকার চেহারা ভিতরকার সেই সত্যটিকে যথার্থ ব্যক্ত করতে পারে না। এইজন্যই এই প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে কিছু বলতে আমি কুণ্ঠিত হই।

বিশ্বভারতী যে ভাব ও আদর্শকে পোষণ করছে, যে পূর্ণসত্যটিকে অন্তরে ধারণ করে রয়েছে, তা বাইরে থেকে সমাগত অতিথিরা এবং এর কর্মভারপ্রাপ্ত

ব্যক্তিরা অনেকে নানা অসম্পূর্ণতার মধ্য দিয়েও গ্রহণ করেছেন ও শ্রদ্ধা করেছেন। এতে আমাদের উৎসাহের সঞ্চার হয়েছে। স্বদেশের সকলের সঙ্গে এর যথার্থ আন্তরিক সম্বন্ধ স্থাপিত হয় নি। এমনকি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যাঁরা যুক্ত হয়ে রয়েছেন তাঁরাও অনেকে ভিতরের সত্যমূর্তিটিকে না দেখে এর পদ্ধতি অনুষ্ঠান উপকরণ-সংগ্রহ প্রভৃতি বাহ্যরূপটিকে দেখছেন, সেখানে আপনার অধিকার নিয়ে আক্ষেপ করছেন। এর কারণ হচ্ছে যে, আমি যে ভাবটিকে প্রকাশ করতে চাই বর্তমান কালে সকলের চিত্ত সে দিকে নেই। তাঁরা কতকগুলি আকস্মিক ও আধুনিক চেষ্টায় নিযুক্ত আছেন, বড়ো প্রয়োজনের সমাদর করতে তাঁদের মন চাচ্ছে না। কিম্বা হয়তো আমার নিজের অক্ষমতা ও দুর্ভাগ্য এর কারণ হতে পারে। হয়তো আমার নিজের জীবনের যা লক্ষ্য অন্যদের কাছ থেকে তার স্বীকৃতি পাবার আমার শক্তি নেই। যার ডাক পড়ে, যার আপনার থেকে আদেশ আসে তারই তাতে গরজ আর দায়িত্ব আছে। যদি সে তার জীবনের উদ্দেশ্য সকলের কাছে এমন করে না ধরতে পারে যাতে করে তা অপরের গ্রহণযোগ্য হয় তবে তারই নিজের অক্ষমতা প্রকাশ পায়। হয়তো আমারই চরিত্রের এমন অসম্পূর্ণতা আছে যাতে আমার আপনার কর্ম দেশের কর্ম হয়ে উঠতে পারছে না। কিন্তু আমার আশা আছে যে, সমস্তই নিষ্ফল হয় নি। কারণ প্রতিষ্ঠানটিকে তো শুধু আমার একলার জিনিস বলতে পারি না। সেখানে যারা মিলিত হয়েছে তাদের দ্বারা সৃজনকার্য নিরন্তর চলেছে। সেখানে দিনে দিনে যে আবহাওয়া তৈরি হয়ে উঠছে, প্রতি শিশুটি পর্যন্ত তাদের অবকাশমুখরিত সংগীত অভিনয় কলহাস্যের দ্বারাও তার সহায়তা করছে। প্রত্যেকটি শিশু প্রত্যেকটি ছাত্র ও অধ্যাপক না বুঝেও অগোচরে সত্যসাধনায় সহযোগিতা করছেন। তাঁদের দ্বারা যেটুকু কর্ম পরিব্যক্ত হচ্ছে তার উপর আমার বিশ্বাস আছে; আশা আছে যে, একদিন এর বীজ নিঃসন্দেহ পরিপূর্ণ বৃক্ষ-রূপে উপরের আকাশে মাথা তুলবে।

আমার মনে হয়েছে যে, আমাদের এই প্রদেশবাসীদের মধ্যে যেসব ছাত্রের উৎসাহ ও কৌতূহল আছে তারা কেন এই বৃক্ষের ফল ভোগ করবে না। বিশ্বভারতীতে আমরা যে চিন্তা করছি, যে সত্য সন্ধান করছি, সেখানে স্বদেশী ও বিদেশী পণ্ডিতেরা যে তত্ত্বালোচনায় ব্যাপৃত আছেন, তাঁরা যা-কিছু দিচ্ছেন, ছোটো জায়গায় সেই উৎপন্ন পদার্থের নিঃশেষ হয়ে গেলে তার অপব্যয় হবে। তা অল্প পরিধিতে বদ্ধ থাকলে তাতে সকলের গ্রহণ করবার সুযোগ হয় না। যদিচ শান্তিনিকেতনই আমার কেন্দ্রস্থল তবুও সেখানে যারা সমাগত হবে, যাদের হাতে-কলমে কাজ করাতে হবে তারাই যে শুধু আইডিয়াল গ্রহণ করবার যথার্থ যোগ্য তা তো নয়। তাই আমার মনে হয়েছে এবং অনেক ছাত্র ও ছাত্রবন্ধুরা আমাকে বলেছেন যে, বিশ্বভারতীতে যে সৃষ্টি হচ্ছে, যে সত্য আবিষ্কৃত হচ্ছে, তা যাতে কলকাতার ছাত্রমণ্ডলীও জানতে পারে, যাতে তারাও উপলব্ধি করতে পারে যে, সেখানে জীবনের সাধনা হচ্ছে, শুধু পুঁথিগত বিদ্যার চর্চা হচ্ছে না, সেজন্য সংগীত শিল্প সাহিত্যের নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তার পরিচয়ের ব্যবস্থা করা উচিত। আমি এই প্রস্তাবে সম্মত হয়েছিলুম, কিন্তু অতি সসংকোচে; কারণ দেশের ছাত্রদের সঙ্গে আমার তেমন পরিচয় নেই। ভয় হয়েছিল যে, যে লোকেরা এত কাল এত ভুল বুঝে এসেছে হয়তো তারা বিদ্রূপ করবে। বড়ো আইডিয়ালকে নিয়ে বিদ্রূপ করার মতো এত সহজ জিনিস আর নেই। যে খুব ছোটো সেও কোনো বড়ো জিনিসে ধুলো দিতে পারে, তাকে বিকৃত করতে পারে।

এই আইডিয়ালের সঙ্গে এখনকার কালের যোগ নেই, এই কথা অনুভব করেছিলাম বলেই আমি বিশ বছর পর্যন্ত নিভৃত কোণে ছিলুম। এত গোপনে আমার কাজ করে গেছি যে, আমার পরমাত্মীয়েরাও জানেন নি, বোঝেন নি। আমি কী লক্ষ্য নিয়ে কেন অন্যসব কাজ ছেড়ে দিয়ে অবকাশ ত্যাগ করে কোন্‌ ডাকে কোন্‌ আনন্দে এই কাজে লিপ্ত হয়েছি আমার সহকর্মীরাও অনেকে তা পুরোপুরি জানে না। তৎসত্ত্বে আমি আমার বিদ্যালয়ের ছেলেদের মধ্যে যে আনন্দের ছবি, যে স্বাধীন বিকাশের প্রমাণ পেয়েছি তাতে নিশ্চিত জেনেছি যে, এরা এখান থেকে কিছু পেয়েছে। এইসকল কারণেই আমি এতদিন বাহিরে বেরিয়ে আসি নি।

বিশ্বভারতীকে দুইভাবে দেখা যেতে পারে—প্রথম হচ্ছে শান্তিনিকেতনে তার যে কাজ হচ্ছে সেই কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করা; দ্বিতীয়ত শান্তিনিকেতনের কর্মানুষ্ঠানের ফল বাইরে থেকে ভোগ করা, তার সঙ্গে বাইরে থেকে যুক্ত হওয়া। বিশ্বভারতীর আইডিয়ালের সঙ্গে যাঁর সহানুভূতি আছে তিনি সেই প্রতিষ্ঠানের সভ্য হয়ে তার আদর্শপোষণের ভার নিতে পারেন। তিনি তার জন্য চিন্তা করবেন, চেষ্টা করে গড়ে তুলবেন, তাকে আঘাত থেকে রক্ষা করবেন। এটা হল এর দায়িত্বের দিক এবং আত্মীয়সমাজের লোকেদের কাজ। এর জন্য বিশ্বভারতীর দ্বার উদ্‌ঘাটিত রয়েছে। কিন্তু লোকে তো এ কথা বলতে পারে যে, আমাদের এসব ভালো লাগে না, বিদেশ থেকে কেন এসব অধ্যাপকদের আনানো; ভারতবর্ষ তো আপনার পরিধির মধ্যেই বেশ ছিল। যাঁরা এ কথা বলেন তাঁদের সঙ্গেও আমাদের কোনো বাদপ্রতিবাদ নেই। তাঁরা এই প্রতিকূলতা সত্ত্বেও কলকাতার এই 'বিশ্বভারতী সম্মিলনী'র সভ্য হতে পারেন, তাতে কারও আপত্তি নেই। যদি আমরা কিছু গান সংগ্রহ করে আনি তবে তাঁরা যে তা শুনবেন না এমন কোনো কথা নেই, কিম্বা আমাদের যদি কিছু বলবার থাকে তবে তাও তাঁরা শুনতে আসতে পারেন—এই যেমন ক্ষিতিমোহনবাবু সেদিন কবীর সম্বন্ধে বললেন, বা আজ যে আচার্য লেভির বিদায়ের পূর্বে তাঁকে সম্বর্ধনা করা হল। এই পণ্ডিত বিদেশী হলেও তো এঁকে বিশেষ কোনো দেশের লোক বলা চলে না—ইনি আমাদের আপনার লোক হয়ে গেছেন, আমাদের দেশকে গভীরভাবে হৃদয়ে গ্রহণ করেছেন। এঁর সঙ্গে যে পরিচয়সাধন হল এতে করে তো কেউ কোনো আঘাত পান নি।

বর্তমান যুগে ইতিহাস হঠাৎ যেন নতুন দিকে বাঁক নেবার চেষ্টা করছে। কেন। আপনার জাতির একান্ত উৎকর্ষের জন্য যারা নিয়ত চেষ্টা করছে হঠাৎ তাদের মধ্যে মুষলপর্ব কেন দেখা দিলে। পূর্বে বলেছি, মানুষের সত্য হচ্ছে, আপনাকে অনেকের মধ্যে লাভ করলে তবেই সে আপনাকে লাভ করে। এতদিন ছোটো সীমার মধ্যে এই সত্য কাজ করছিল। ভৌগোলিক বেষ্টন যতদিন পর্যন্ত সত্য ছিল ততদিন সেই বেষ্টনের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তি আপনার জাতির সকলের সঙ্গে মিলনে নিজেকে সত্য বলে অনুভব করার দ্বারা বড়ো হয়েছে। কিন্তু বর্তমান যুগে সে বেড়া ভেঙে গেছে; জলে স্থলে দেশে দেশে যেসকল বাধা মানুষকে বাহির থেকে বিভক্ত করেছিল সেসব ক্রমশ অপসারিত হচ্ছে। আজ আকাশপথে পর্যন্ত মানুষ চলাচল করছে। আকাশযানের উৎকর্ষ ক্রমে ঘটবে, তখন পৃথিবীর সমস্ত স্থূল বাধা মানুষ ডিঙিয়ে চলে যাবে, দেশগত সীমানার কোনো অর্থই থাকবে না।

ভূগোলের সীমা ক্ষীণ হয়ে মানুষ পরস্পরের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু এতবড়ো সত্যটা আজও বাহিরের সত্য হয়েই রইল, মনের ভিতরে এ সত্য স্থান পেলে না। পুরাতন যুগের অভ্যাস আজও তাকে জড়িয়ে আছে, সে যে সাধনার

পাথেয় নিয়ে পথে চলতে চায় তা অতীত যুগের জিনিস; সুতরাং তা বর্তমান যুগের সামনের পথে চলবার প্রতিকূলতা করতে থাকবে।

বর্তমান যুগে যে সত্যের আবির্ভাব হয়েছে তার কাছে সত্যভাবে না গেলে মার খেতে হবে। তাই আজ মারামারি বেধেছে—নানা জাতির মিলনের ক্ষেত্রেও আনন্দ নেই, শান্তি নেই। কাটাকাটি মারামারি সন্দেহ হিংসা যে পুঞ্জীভূত হয়ে উঠছে তাতেই বুঝছি যে, সত্যের সাধনা হচ্ছে না। যে সত্য আজ মানবসমাজদ্বারে অতিথি তাঁর অভ্যর্থনার সাধনা বিশ্বভারতী গ্রহণ করেছে।

দারিদ্র্য যতই হোক, বাইরে থেকে দুর্গতি তার যতই হোক, এই ভার নেবার অধিকার ভারতবর্ষের আছে। এ কথা আজ বোলো না, 'তুমি দরিদ্র পরাধীন, তোমার মুখে এসব কথা কেন।' আমাদেরই তো এই কথা। ধনের গৌরব তো এ সত্যকে স্বীকার করতে চায় না। ধনসম্পদ তো ভেদ সৃষ্টি করে, সত্যসম্পদই ভেদকে অতিক্রম করবার শক্তি রাখে। ধনকে যে মানুষ চরম আশ্রয় বলে বিশ্বাস করে না, যে মৈত্রেয়ীর মতো বলতে পেরেছে, যেনাহং নামৃতাস্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্, সেই তো ধনঞ্জয়, সেই তো ধনের বেড়া ভেঙে মানবাত্মার অধিকারকে সর্বত্র উদ্‌ঘাটিত করতে পারে। সেই অধিকারকে বিশ্বভারতী স্বীকার করুক। দেশ-বিদেশের তাপস এই বিশ্বভারতীতে আসন গ্রহণ করুন। আয়ন্তু সর্বতঃ স্বাহা, এই কথা আমরা আশ্রমে বসে বলব। ভারতবর্ষ আধ্যাত্মিক ঐক্যসাধনার যে তপস্যা করেছেন সেই তপস্যাকে এই আধুনিক যুগের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলে তবেই আমাদের সমস্ত অগৌরব দূর হবে—বাণিজ্য করে নয়, লড়াই করে নয়, সত্যকে স্বীকার করার দ্বারাই তা হবে। মনুষ্যত্বের সেই পূর্ণগৌরবসাধনের আয়োজনে বিশ্বভারতী আজ হতে নিযুক্ত হোক, এই আমাদের সংকল্প।

কলিকাতা
১ ভাদ্র, ১৩২৯

৬

বিশ্বভারতী সম্বন্ধে একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, আমার মনে এর ভাবটি সংকল্পটি কোনো একটি বিশেষ সময়ে যে ভেবেচিন্তে উদিত হয়েছে এমন নয়। এই সংকল্পের বীজ আমার মগ্ন চৈতন্যের মধ্যে নিহিত ছিল, তা ক্রমে অগোচরে অঙ্কুরিত হয়ে জেগে উঠেছে। এর কারণ আমার নিজের জীবনের মধ্যেই রয়েছে। বাল্যকাল থেকে আমি যে জীবন অতিবাহিত করে এসেছি তার ভিতর থেকে এই প্রতিষ্ঠানের আদর্শটি জাগ্রত হয়ে উঠেছে।

আপনারা জানেন যে, আমি যথোচিতভাবে বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থার সঙ্গে যোগ রক্ষা করে চলি নি। আমার পরিবারে আমি যে ভাবে মানুষ হয়েছি তাতে করে আমাকে সংসার থেকে দূরে নিয়ে গিয়েছিল, আমি একান্তবাসী ছিলাম। মানবসমাজের সঙ্গে আমার বাল্যকাল থেকে ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল না, আমি তার প্রান্তে মানুষ হয়েছি। 'জীবনস্মৃতি'তে এর বিবরণ পড়ে থাকবেন। আমি সমাজের থেকে দূরে বাস করতুম বলে তার দিকে বাতায়নের পথ দিয়ে দৃষ্টিপাত করেছি। তাই আমার কাছে দূরের দুর্লভ জিনিসের প্রতি আকর্ষণ খুব গভীর ছিল।

কলকাতা শহরে আমার বাস ছিল, কাজেই ইঁটকাঠপাথরের মধ্যে আমার গতিবিধি সংকীর্ণ সীমায় আবদ্ধ ছিল। আমাদের চারি দিকেই বাড়িগুলি মাথা তুলে থাকত, আর তাদের মাঝখানে অল্প পরিধির মধ্যে সামান্য কয়েকটি গাছপালা আর একটি পুষ্করিণী ছিল। কিন্তু দূরে আমাদের পাড়ার বাইরে বেশি বড়ো বাড়ি ছিল না, একটু পাড়াগাঁ গোছের ভাব ছিল।

সে সময় আমাকে বাইরের প্রকৃতি ডাক দিয়েছিল। মনে আছে মধ্যাহ্নে লুকিয়ে একলা ছাদের কোণটি গ্রহণ করতুম। উন্মুক্ত নীলাকাশ, চিলের ডাক, আর পাড়ার গলির জনতার বিচিত্র ছোটো ছোটো কলধ্বনির মধ্য দিয়ে বাড়ির ছাদের উপর থেকে যে জীবনযাত্রার খণ্ড খণ্ড ছবি পেতুম তা আমার হৃদয়কে আলোড়িত করেছিল। এর মধ্যে মানবপ্রকৃতিরও একটা ডাক ছিল। দূর থেকে কখনও-বা লোকালয়ের উপর রাত্রের ঘুম-পাড়ানো সুর, কখনও-বা প্রভাতের ঘুম-জাগানো গান, আর উৎসব-কোলাহলের নানারকম ধ্বনি আমার হৃদয়কে উতলা করে দিয়েছিল। বর্ষার নবমেঘাগমে আকাশের লীলাবৈচিত্র্য আর শরতের শিশিরে ছোটো বাগানটিতে ঘাস ও নারিকেলরাজির ঝলমলানি আমার কাছে অপূর্ব হয়ে দেখা দিত। মনে আছে অতি প্রত্যুষে সূর্যোদয়ের আবির্ভাবের সঙ্গে তাল রাখবার জন্য তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে তার অপেক্ষা করেছি। সকালের সেই শিশিরের উপর সোনার আলো আমার হৃদয়ে নিবিড় গভীর আনন্দবেদনার সঞ্চার করেছে। বিশ্বজগৎ যেন আমাকে বার বার করে আহ্বান করে বলেছে, 'তুমি আমার আপনার। আমার মধ্যে যে সত্য আছে তা সকলের সঙ্গে যোগের প্রতীক্ষা রাখে, কিন্তু তবুও তোমায়-আমায় এই বিরহের মধ্যেও মাধুর্য রয়েছে।' তখনও এই বহির্বিশ্বের উপলব্ধি আমার মনের ভিতরে অস্পষ্টভাবে ঘনিয়ে উঠেছে। ছোটো ঘরের ভিতরকার মানুষটিকে বাইরের ডাক গভীরভাবে মুগ্ধ করেছিল।

তার পর আমার মনে আছে যে, প্রথম যখন আমাদের শহরে ডেঙ্গুজ্বর দেখা দিল, এই ব্যাধি আমার কাছে বেরিয়ে পড়ার মস্ত সুযোগের মতো এল। গঙ্গার ধারে পেনেটির বাগানে আমরা বাস করতে লাগলুম। এই প্রথম অপেক্ষাকৃত নিকটভাবে প্রকৃতির স্পর্শ পেলাম। এ যে কত মনোহর তা ব্যক্ত করতে পারি না। আপনারা অনেকে পল্লীগ্রাম থেকে আসছেন, অনেকেরই পল্লীর সঙ্গে অতিনিকট সম্বন্ধ। আপনারা তার শ্যামল শস্যক্ষেত্র ও বনরাজি দেখে থাকবেন, কিন্তু আমার মনোভাব ঠিক উপলব্ধি করতে পারবেন না। ইঁটকাঠের কারাগার থেকে বহিরাকাশে মুক্তি পেয়ে প্রকৃতির সঙ্গে সেই প্রথম পরিচয় লাভ করা যে কত মূল্যবান তা আমার জীবনে যেমন বুঝেছিলুম অল্প লোকের ভাগ্যেই তা ঘটে। সকালে কুঠির পানশি দক্ষিণ দিকে যেত, সন্ধ্যায় তা উত্তরগামী হত। নদীর দু ধারে এই জনতার ধারা, জলের সঙ্গে মানুষের এই জীবনযাত্রার যোগ, গ্রামবাসীদের এই স্নান পান তর্পণ, এইসকল দৃশ্য আমার অন্তরকে স্পর্শ করেছিল। গ্রামগুলি যেন গঙ্গার দুই পারকে আঁকড়ে রয়েছে, পিপাসার জলকে স্তন্যরসের মতো গ্রহণ করে নিয়েছে। আমার গঙ্গার ধারে এই প্রথম যাওয়া। আর সে সময়ে সেখানকার সূর্যের উদয়াস্ত যে আমার কাছে কী অপরূপ লেগেছিল তা কী বলব। এই-যে বিশ্বজগতে প্রতি মুহূর্তে অনির্বচনীয় মহিমা উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে আমরা তার সঙ্গে যুক্ত থাকলেও অতিপরিচয়ের জন্য তা আমাদের কাছে ম্লান হয়ে যায়। ওঅর্ড্‌স্‌ওঅর্থের কবিতায় আপনারা তার উল্লেখ দেখেছেন। কেজো মানুষের কাছে বিশ্বপ্রকৃতির অপূর্বতা একেবারে 'না' হয়ে গেছে, নেই বললেই হয়। তার রহস্য মাধুর্য তার

মনে তেমন সাড়া দেয় না। আকাশে দিনের পর দিন যেন আশ্চর্য একটি কাব্যগ্রন্থের পাতার পর পাতা উদ্‌ঘাটন করে বিশ্বকবির মর্মকথাটি বার বার প্রকাশ করতে থাকে। আমরা মাঝখান থেকে অতিপরিচয়ের অন্তরালে তার রস থেকে বঞ্চিত হই। তাই প্রকৃতির রসধারার স্পর্শে আমার মন সে সময়ে যেরকম উৎসুক হয়ে উঠেছিল আজও তার প্রবলতা ক্ষীণ হয়ে যায় নি, এ কথাটা বলার দরকার আছে। এতটা আমি ভূমিকাস্বরূপ বললুম। যে যে ঘটনা আমার জীবনকে নানা সম্পর্কের মধ্য দিয়ে একটা বিশেষ দিকে চালনা করছিল এই সময়কার জীবনযাত্রা তার মধ্যে সর্বপ্রধান ব্যাপার।

এমনি আর-একটি অনুকূল ঘটনা ঘটল যখন আমি পদ্মানদীর তীরে গিয়ে বাস করতে লাগলুম। পদ্মাতটের সেই আম জাম ঝাউ বেত আর সর্ষের খেত, ফাল্গুনের মৃদু সৌগন্ধে ভারাক্রান্ত বাতাস, নির্জন চরে কলধ্বনিমুখরিত বুনো হাঁসের বসতি, সন্ধ্যাতারায়-জ্বলজ্বল-করা নদীর স্বচ্ছ গভীরতা, এসব আমার সঙ্গে নিবিড় আত্মীয়তা স্থাপন করেছিল। তখন পল্লীগ্রামে মানুষের জীবন ও প্রকৃতির সৌন্দর্যে সম্মিলিত জগতের সঙ্গে পরিচয় লাভ করে আমার গভীর আনন্দ পাবার উপলক্ষ হয়েছিল।

অল্প বয়সে আমি আর-একটি জিনিস পেয়েছি। মানুষের থেকে দূরে বাস করলেও এবং উন্মুক্ত প্রকৃতির কোল থেকে বিচ্ছিন্নভাবে কাটিয়ে থাকলেও আমি বাড়িতে আত্মীয়বন্ধুদের সংগীত সাহিত্য শিল্পকলার চর্চার আবহাওয়ার মধ্যে মানুষ হয়েছি। এটি আমার জীবনের খুব বড়ো কথা। আমি শিশুকাল থেকে পলাতক ছাত্র। মাস্টারকে বরাবর ভয় করে এড়িয়ে চলেছি। কিন্তু বিশ্বসংসারের যেসকল অদৃশ্য মাস্টার অলক্ষ্যে থেকে পাঠ শিখিয়ে দেন তাঁদের কাছে কোনোরকমে আমি পড়া শিখে নিয়েছি। আমাদের বাড়িতে নিয়ত ইংরেজি ও বাংলা সাহিত্যের ও সংগীতের আলোচনা হত, আমি এসবের মধ্যে বেড়ে উঠেছি। এইসকল বিদ্যা যথার্থভাবে শিক্ষালাভ না করলেও এ থেকে ভিতরে ভিতরে আশপাশ হতে নানা উপায়ে মনে মনে আনন্দরস সঞ্চয় করতে পেরেছি। আমার বড়দাদা তখন 'স্বপ্নপ্রয়াণ' লিখতে নিরত ছিলেন। বনস্পতি যেমন স্বচ্ছন্দে প্রচুর ফুল ফুটিয়ে ফল ধরিয়ে ইতস্তত বিস্তর খসিয়ে ঝরিয়ে ফেলে দেয়, তাতে তার কোনো অনুশোচনা নেই; তেমনি তিনি খাতায় যতটি লেখা রক্ষা করতেন তার চেয়ে ছেঁড়া কাগজে বাতাসে ছড়াছড়ি যেত অনেক বেশি। আমাদের চলাফেরার রাস্তা সেইসব বিক্ষিপ্ত ছিন্নপত্রে আকীর্ণ হয়ে গেছে। সেইসকল অবারিত সাহিত্যরচনার ছিন্নপত্রের স্তূপ আমার চিত্তধারায় পলিমাটির সঞ্চয় রেখে দিয়ে গিয়েছিল।

তার পর আপনারা জানেন, আমি খুব অল্পবয়স থেকেই সাহিত্যচর্চায় মন দিয়েছি, আর তাতে করে নিন্দা খ্যাতি যা পেয়েছি তারই মধ্য দিয়ে লেখনী চালিয়ে গিয়েছি। তখন একটি বড়ো সুবিধা ছিল যে, সাহিত্যক্ষেত্রে এত প্রকাশ্যতা ছিল না, সাহিত্যের এত বড়ো বাজার বসে নি, ছোটো হাটেই পসরা দেওয়া-নেওয়া চলত। তাই আমার বাল্যরচনা আপন কোণটুকুতে কোনো লজ্জা পায় নি। আত্মীয়বন্ধুদের যা একটু-আধটু প্রশংসা ও উৎসাহ লাভ করেছি তাই যথেষ্ট মনে করেছি। তার পর ক্রমে বঙ্গসাহিত্যের প্রসার হল, তার চর্চা ব্যাপকতা লাভ করল। সাহিত্যক্ষেত্র জনতায় আক্রান্ত হল। দেখতে দেখতে রাত্রির আকাশে তারার আবির্ভাবের মতো সাহিত্যাকাশ অসংখ্য লেখকের দ্বারা খচিত হয়ে দেখা দিল। কিন্তু তৎসত্ত্বেও আমার সাহিত্যচর্চার মধ্যে বরাবর সেই নির্জনতাই ছিল। এই বিরলবাসই আমার

একান্ত আপনার জিনিস ছিল। অতিরিক্ত প্রকাশ্যতার আঘাতে আমি কখনও সুস্থ বোধ করি নি। আমি চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছর পর্যন্ত পদ্মাতীরের নিরালা আবাসটিতে আপন খেয়ালে সাহিত্যরচনা করেছি। আমার কাব্য-সৃষ্টির যা-কিছু ভালো-মন্দ তা সে সময়েই লেখা হয়েছে।

যখন এমনি সাহিত্যের মধ্যে নিবিষ্ট হয়ে কাল কাটাচ্ছি তখন আমার অন্তরে একটি আহ্বান একটি প্রেরণা এল যার জন্য বাইরে বেরিয়ে আসতে আমার মন ব্যাকুল হল। যে কর্ম করবার জন্য আমার আকাঙ্ক্ষা হল তা হচ্ছে শিক্ষাদানকার্য। এটা খুব বিস্ময়কর ব্যাপার, কারণ শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে যে আমার যোগ ছিল না তা তো আগেই বলেছি। কিন্তু এই ভারই যে আমাকে গ্রহণ করতে হল তার কারণ হচ্ছে, আমার মনে এই বিশ্বাস দৃঢ় ছিল যে, আমাদের শিক্ষাপ্রণালীতে গুরুতর অভাব রয়েছে, তা দূর না হলে শিক্ষা আমাদের জীবন থেকে স্বতন্ত্র হয়ে সম্পূর্ণ বাইরের জিনিস হয়ে থাকবে। আমি এ কথা বলছি না যে, এই গুরুতর অভাব শুধু আমাদের দেশেই আছে— সকল দেশেই ন্যূনাধিক পরিমাণে শিক্ষা সর্বাঙ্গীণ হতে পারছে না— সর্বত্রই বিদ্যাশিক্ষাকে জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে অ্যাব্‌স্ট্রাক্ট ব্যাপার করে ফেলা হয়।

তখন আমার মনে একটি দূরকালের ছবি জেগে উঠল। যে তপোবনের কথা পুরাণকথায় পড়া যায় ইতিহাস তাকে কতখানি বাস্তব সত্য বলে গণ্য করবে জানি না, কিন্তু সে বিচার ছেড়ে দিলেও একটা কথা আমার নিজের মনে হয়েছে যে, তপোবনের শিক্ষাপ্রণালীতে খুব একটি বড়ো সত্য আছে। যে বিরাট বিশ্বপ্রকৃতির কোলে আমাদের জন্ম তার শিক্ষকতা থেকে বঞ্চিত বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকলে মানুষ সম্পূর্ণ শিক্ষা পেতে পারে না। বনস্থলীতে যেমন এই প্রকৃতির সাহচর্য আছে তেমনি অপর দিকে তপস্বী মানুষের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাসম্পদ সেই প্রকৃতির মাঝখানে বসে যখন লাভ করা যায় তখনই যথার্থ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের মধ্যে বাস করে বিদ্যাকে গুরুর কাছ থেকে পাওয়া যায়। শিক্ষা তখন মানবজীবন থেকে বঞ্চিত হয়ে একান্ত ব্যাপার হয় না। বনের ভিতর থেকে তপোবনের হোমধেনু দোহন করে অগ্নি প্রজ্বলিত করে নানা ভাবে প্রকৃতির সঙ্গে নিত্যযুক্ত হয়ে যে জীবনযাপনের ব্যবস্থা প্রাচীন কালে ছিল তার মধ্যে ঘনিষ্ঠতা ছিল। যাদের গুরুরূপে বরণ করা হয় তাদের সঙ্গে এইরূপ জীবনযাত্রার মধ্য দিয়ে একত্র মানুষ হয়ে ওঠার মধ্যে খুব একটা বড়ো শিক্ষা আছে। এতে করে শিক্ষা ও জীবনের মধ্যে যথার্থ যোগ স্থাপিত হয়, গুরুশিষ্যের সঙ্গে সম্বন্ধ সত্য ও পূর্ণ হয়, বিশ্বপ্রকৃতি ও মানবপ্রকৃতির সঙ্গে মিলন মধুর ও স্বাস্থ্যকর হয়ে ওঠে। তাই আমার মনে হয়েছিল যে, তখনকার দিনে তপোবনের মধ্যে মানবজীবনের বিকাশ একটি সহজ ব্যাপার ছিল বটে, কিন্তু তার সময়টি এখনও উত্তীর্ণ হয়ে যায় নি; তার মধ্যে যে সত্য ও সৌন্দর্য আছে তা সকল কালের। বর্তমান কালেও তপোবনের জীবন আমাদের আয়ত্তের অগম্য হওয়া উচিত নয়।

এই চিন্তা যখন আমার মনে উদিত হয়েছিল তখন আমি শান্তিনিকেতনে অধ্যাপনার ভার নিলুম। সৌভাগ্যক্রমে তখন শান্তিনিকেতন আমার পক্ষে তপোবনের ভাবে পূর্ণ ছিল। আমি বাল্যকালে আমার পিতৃদেবের সঙ্গে এখানে কালযাপন করেছি। আমি প্রত্যক্ষভাবে জানি যে, তিনি কী পূর্ণ আনন্দে বিশ্বের সঙ্গে পরমাত্মার সঙ্গে চিত্তের যোগসাধনের দ্বারা সত্যকে জীবনে একান্তভাবে উপলব্ধি করেছেন। আমি দেখেছি যে, এই অনুভূতি তাঁর কাছে বাহিরের জিনিস

ছিল না। তিনি রাত্রি দুটোর সময় উন্মুক্ত ছাদে বসে তারাখচিত রাত্রিতে নিমগ্ন হয়ে অন্তরে অমৃতরস গ্রহণ করেছেন, আর প্রতিদিন বেদীতলে বসে প্রাণের পাত্রটি পূর্ণ করে সুধাধারা পান করেছেন। যিনি সমস্ত বিশ্বকে পূর্ণ করে রয়েছেন তাঁকে বিশ্বছবির মধ্যে উপলব্ধি করা, এটি মহর্ষির জীবনে প্রত্যক্ষ সত্য হয়ে দেখা দিয়েছে। আমার মনে হল যে, যদি ছাত্রদের মহর্ষির সাধনস্থল এই শান্তিনিকেতনে এনে বসিয়ে দিতে পারি তবে তাদের সঙ্গে থেকে নিজের যেটুকু দেবার আছে তা দিতে পারলে বাকিটুকুর জন্য আমাকে ভাবতে হবে না, প্রকৃতিই তাদের হৃদয়কে পূর্ণ করে সকল অভাব মোচন করে দিতে পারবে। প্রকৃতির সঙ্গে এই যোগের জন্য সকলের চিত্তেই যে ন্যূনাধিক ক্ষুধার অংশ আছে তার নিবৃত্তি করবার চেষ্টা করতে হবে, যে স্পর্শ থেকে মানুষ বঞ্চিত হয়েছে তাকে জোগাতে হবে।

তখন আমার সঙ্গী-সহায় খুবই অল্প। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় মহাশয় আমায় ভালোবাসতেন আর আমার সংকল্পে শ্রদ্ধা করতেন। তিনি আমার কাজে এসে যোগ দিলেন। তিনি বললেন, ‘আপনি মাস্টারি করতে না জানেন, আমি সে ভার নিচ্ছি।’ আমার উপর ভার রইল ছেলেদের সঙ্গ দেওয়া। আমি সন্ধ্যাবেলায় তাদের নিয়ে রামায়ণ মহাভারত পড়িয়েছি, হাস্য করুণ রসের উদ্রেক করে তাদের হাসিয়েছি কাঁদিয়েছি। তা ছাড়া নানা গল্প বানিয়ে বলতাম, দিনের পর দিন একটি ছোটো গল্পকে টেনে টেনে লম্বা করে পাঁচ-সাত দিন ধরে একটি ধারা অবলম্বন করে চলে যেতাম। তখন মুখে মুখে গল্প তৈরি করবার আমার শক্তি ছিল। এইসব বানানো গল্পের অনেকগুলি আমার ‘গল্পগুচ্ছে’ স্থান পেয়েছে। এমনি ভাবে ছেলেদের মন যাতে অভিনয়ে গল্পে গানে, রামায়ণ-মহাভারত-পাঠে সরস হয়ে ওঠে তার চেষ্টা করেছি।

আমি জানি, ছেলেদের এমনি ভাবে মনের ধারা ঠিক করে দেওয়া, একটা অ্যাটিচুড তৈরি করে তোলা খুব বড়ো কথা। মানুষের যে এতবড়ো বিশ্বের মধ্যে এতবড়ো মানবসমাজে জন্ম হয়েছে, সে যে এতবড়ো উত্তরাধিকার লাভ করেছে, এইটার প্রতি তার মনের অভিমুখিতাকে খাঁটি করে তোলা দরকার। আমাদের দেশের এই দুর্গতির দিনে আমাদের অনেকের পক্ষেই শিক্ষার শেষ লক্ষ্য হয়েছে চাকরি, বিশ্বের সঙ্গে যে আনন্দের সম্বন্ধের দ্বারা বিশ্বসম্পদকে আত্মগত করা যায় তা থেকে আমরা বঞ্চিত হচ্ছি। কিন্তু মানুষকে আপন অধিকারটি চিনে নিতে হবে। সে যেমন প্রকৃতির সঙ্গে চিত্তের সামঞ্জস্য সাধন করবে তেমন তাকে বিরাট মানববিশ্বের সঙ্গে সম্মিলিত হতে হবে।

আমাদের দেশবাসীরা ‘ভূমৈব সুখম্’ এই ঋষিবাক্য ভুলে গেছে। ভূমৈব সুখং— তাই জ্ঞানতপস্বী মানব দুঃসহ ক্লেশ স্বীকার করেও উত্তর-মেরুর দিকে অভিযানে বার হচ্ছে, আফ্রিকার অভ্যন্তরপ্রদেশে দুর্গম পথে যাত্রা করছে, প্রাণ হাতে করে সত্যের সন্ধানে ধাবিত হচ্ছে। তাই কর্ম জ্ঞান ও ভাবের সাধনপথের পথিকেরা দুঃখের পথ অতিবাহন করতে নিষ্ক্রান্ত হয়েছে; তাঁরা জেনেছেন যে, ভূমৈব সুখং—দুঃখের পথেই মানুষের সুখ। আজ আমরা সে কথা ভুলেছি, তাই অত্যন্ত ক্ষুদ্র লক্ষ্য ও অকিঞ্চিৎকর জীবনযাত্রার মধ্যে আত্মাকে প্রচ্ছন্ন করে দিয়ে দেশের প্রায় সকল লোকেরই কাল কাটছে।

তাই শিক্ষালয় স্থাপন করবার সময়ে প্রথমেই আমার এ কথা মনে হল যে, আমাদের ছাত্রদের জীবনকে মানসিক ক্ষীণতা থেকে ভীরুতা থেকে উদ্ধার করতে হবে। যে গঙ্গার ধারা গিরিশিখর থেকে উত্থিত হয়ে দেশদেশান্তরে বহমান হয়ে

চলেছে মানুষ তার জলকে সংসারের ছোটো বড়ো সকল কাজেই লাগাতে পারে। তেমনি যে পাবনী বিদ্যাধারা কোনো উত্তুঙ্গ মানবচিত্তের উৎস থেকে উদ্ভূত হয়ে অসীমের দিকে প্রবাহিত হয়ে চলছে, যা পূর্ব-পশ্চিম-বাহিনী হয়ে দিকে দিকে নিরন্তর স্বতঃ-উৎসারিত হচ্ছে, তাকে আমরা ক্ষুদ্র স্বার্থসিদ্ধির পরিধির মধ্যে বাঁধ বেঁধে ধরে রেখে দেখব না; কিন্তু যেখানে তা পূর্ণ মানবজীবনকে সার্থক করে তুলেছে, তার সেই বিরাট বিশ্বরূপটি যেখানে পরিস্ফুট হয়েছে সেখানে আমরা অবগাহন করে শুদ্ধ নির্মল হব।

'স তপোঽতপ্যত স তপস্তপ্ত্বা ইদং সর্বমসৃজত যদিদং কিঞ্চ।' সৃষ্টিকর্তা তপস্যা করছেন, তপস্যা করে সমস্ত সৃজন করছেন। প্রতি অণুপরমাণুতে তাঁর সেই তপস্যা নিহিত। সেজন্য তাদের মধ্যে নিরন্তর সংঘাত, অগ্নিবেগ, চক্রপথের আবর্তন। সৃষ্টিকর্তার এই তপঃসাধনার সঙ্গে সঙ্গে মানুষেরও তপস্যার ধারা চলেছে, সেও চুপ করে বসে নেই। কেননা মানুষও সৃষ্টিকর্তা, তার আসল হচ্ছে সৃষ্টির কাজ। সে যে সংগ্রহ করে সঞ্চয় করে এই তার বড়ো পরিচয় নয়, সে ত্যাগের দ্বারা প্রকাশ করে এই তার সত্য পরিচয়। তাই বিধাতার এই বিশ্বতপঃক্ষেত্রে তারও তপঃসাধনা। মানুষ হচ্ছে তপস্বী, এই কথাটি উপলব্ধি করতে হবে। উপলব্ধি করতে হলে সকল কালের সকল দেশের তপস্যার প্রয়াসকে মানবের সত্য ধর্ম বলে বড়ো করে জানতে হবে।

আজকার দিনে যে তপঃক্ষেত্রে বিশ্বের সর্ব জাতির ও সর্ব দেশের মানবের তপস্যার আসন পাতা হয়েছে আমাদেরও সকল ভেদবুদ্ধি ভুলে গিয়ে সেখানে পৌঁছতে হবে। আমি যখন বিশ্বভারতী স্থাপিত করলুম তখন এই সংকল্পই আমার মনে কাজ করছিল। আমি বাঙালি বলে আমাদের সাহিত্যরসের চর্চা কেবল বাংলাসাহিত্যের মধ্যেই পরিসমাপ্ত হবে? আমি কি বিশ্বসংসারে জন্মাই নি। আমারই জন্য জগতের যত দার্শনিক যত কবি যত বৈজ্ঞানিক তপস্যা করছেন, এর যথার্থোপলব্ধির মধ্যে কি কম গৌরব আছে?

আমার মুখে এই কথা অহমিকার মতো শোনাতে পারে। আজকের কথাপ্রসঙ্গে তবু আমার বলা দরকার যে, য়ুরোপে আমি যে সম্মান পেয়েছি তা রাজামহারাজারা কোনো কালে পায় নি। এর দ্বারা একটা কথার প্রমাণ হচ্ছে যে, মানুষের অন্তর-প্রদেশের বেদনা-নিকেতনে জাতি-বিচার নেই। আমি এমন-সব লোকের কাছে গিয়েছি যাঁরা মানুষের গুরু, কিন্তু তাঁরা স্বচ্ছন্দে নিঃসংকোচে এই পূর্বদেশবাসীর সঙ্গে শ্রদ্ধার আদানপ্রদান করেছেন। আমি কোথায় যে মানুষের মনে সোনার কাঠি ছোঁয়াতে পেরেছি, কেন যে য়ুরোপের মহাদেশ-বিভাগে এরা আমাকে আত্মীয়রূপে সমাদর করেছে, সে কথা ভেবে আমি নিজেই বিস্মিত হই। এমনি ভাবেই স্যর জগদীশ বসুও যেখানে নিজের মধ্যে সত্যের উৎসধারার সন্ধান পেয়েছেন এবং তা মানুষকে দিতে পেরেছেন সেখানে সকল দেশের জ্ঞানীরা তাঁকে আপনার বলেই অভ্যর্থনা করে নিয়েছেন।

পাশ্চাত্ত্য ভূখণ্ডে নিরন্তর বিদ্যার সমাদর হচ্ছে। ফরাসি ও জর্মনদের মধ্যে বাইরের ঘোর রাষ্ট্রনৈতিক যুদ্ধ বাধলেও উভয়ের মধ্যে বিদ্যার সহযোগিতার বাধা কখনও ঘটে নি। আমরাই কেন শুধু চিরকেলে 'স্কুলবয়' হয়ে একটু একটু করে মুখস্থ করে পাঠ শিখে নিয়ে পরীক্ষার আসরে নামব, তার পর পরীক্ষাপাস করেই সব বিস্মৃতির গর্ভে ডুবিয়ে বসে থাকব। কেন সকল দেশের তাপসদের সঙ্গে আমাদের তপস্যার বিনিময় হবে না। এই কথা মনে রেখেই আমি বিশ্বভারতীতে

আমাদের সাধনার ক্ষেত্রে য়ুরোপের অনেক মনস্বী ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ করেছিলুম। তাঁরা একজনও সেই আমন্ত্রণের অবজ্ঞা করেন নি। তাঁদের মধ্যে একজনের সঙ্গে অন্তত আমাদের চাক্ষুষ পরিচয়ও হয়েছে। তিনি হচ্ছেন প্রাচ্যতত্ত্ববিদ ফরাসি পণ্ডিত সিল্‌ভ্যাঁ লেভি। তাঁর সঙ্গে যদি আপনাদের নিকটসম্বন্ধ ঘটত তা হলে দেখতেন যে, তাঁর পাণ্ডিত্য যেমন অগাধ তাঁর হৃদয় তেমনি বিশাল। আমি প্রথমে সংকোচের সঙ্গে অধ্যাপক লেভির কাছে গিয়ে আমার প্রস্তাব জানালুম। তাঁকে বললুম যে আমার ইচ্ছা যে, ভারতবর্ষে আমি এমন বিদ্যাক্ষেত্র স্থাপন করি যেখানে সকল পণ্ডিতের সমাগম হবে, যেখানে ভারতীয় সম্পদের একত্র-সমাবেশের চেষ্টা হবে। সে সময় তাঁর হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বক্তৃতা দেবার নিমন্ত্রণ এসেছিল। হার্ভার্ড পৃথিবীর বড়ো বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে অন্যতম। কিন্তু আমাদের বিশ্বভারতীর নামধাম কেউ জানে না; অথচ এই অখ্যাতনামা আশ্রমের আতিথ্য লেভি-সাহেব অতি শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করলেন।

আপনারা মনে করবেন না যে তিনি এখানে এসে শ্রদ্ধা হারিয়েছেন। তিনি বার বার বলেছেন, 'এ যেন আমার পক্ষে স্বর্গে বাস।' তিনি যেমন বড়ো পণ্ডিত ছিলেন, তাঁর তদনুরূপ যোগ্য ছাত্র যে অনেক পাওয়া গিয়েছিল তাও বলা যায় না, কিন্তু তিনি অবজ্ঞা করেন নি, তিনি ভাবের গৌরবেই কর্মগৌরব অনুভব করেছেন; তাই এখানে এসে তৃপ্ত হতে পেরেছেন। এই প্রসঙ্গে আপনাদের এই সংবাদ জানা দরকার যে, ফ্রান্স জর্মানি সুইজারল্যাণ্ড অস্ট্রিয়া বোহিমিয়া প্রভৃতি য়ুরোপীয় দেশ থেকে অজস্র পরিমাণ বই দানরূপে শান্তিনিকেতন লাভ করেছে।

বিশ্বকে সহযোগীরূপে পাবার জন্য শান্তিনিকেতনে আমরা সাধ্যমতো আসন পেতেছি, কিন্তু এক হাতে যেমন তালি বাজে না তেমনি এক পক্ষের দ্বারা এই চিত্তসমবায় সম্ভবপর হয় না। যেখানে ভারতবর্ষ এক জায়গায় নিজেকে কোণঠেসা করে রেখেছে সেখানে কি সে তার রুদ্ধ দ্বার খুলবে না? ক্ষুদ্র বুদ্ধির দ্বারা বিশ্বকে একঘরে করে রাখার স্পর্ধাকে নিজের গৌরব বলে জ্ঞান করবে?

আমার ইচ্ছা বিশ্বভারতীতে সেই ক্ষেত্রটি তৈরি হয় যেখানে বিশ্বের সঙ্গে ভারতের সম্বন্ধ স্বাভাবিক কল্যাণজনক ও আত্মীয়জনোচিত হয়। ভারতবর্ষকে অনুভব করতে হবে যে, এমন একটি জায়গা আছে যেখানে মানুষকে আত্মীয় বলে গ্রহণ করাতে অগৌরব বা দুঃখের কারণ নেই, যেখানে মানুষের পরস্পরের সম্পর্কটি পীড়াজনক নয়। আমার পাশ্চাত্ত্য বন্ধুরা আমাকে কখনও কখনও জিজ্ঞাসা করেছেন, 'তোমাদের দেশের লোকে কি আমাদের গ্রহণ করবে।' আমি তার উত্তরে জোরের সঙ্গে বলেছি, 'হ্যাঁ নিশ্চয়ই, ভারতীয়েরা আপনাদের কখনও প্রত্যাখ্যান করবে না।' আমি জানি যে, বাঙালির মনে বিদ্যার গৌরববোধ আছে, বাঙালি পাশ্চাত্ত্যবিদ্যাকে অস্বীকার করবে না। রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে নানা ভেদ ও মতবাদ সত্ত্বেও ভারতবর্ষের মধ্যে বাংলাদেশেই সর্বদেশীয় বিদ্যার প্রতি শ্রদ্ধা বাঙালির রক্তের জিনিস হয়ে গেছে। যারা অতি দরিদ্র, যাদের কষ্টের সীমা নেই, তারাও বিদ্যাশিক্ষার দ্বারা ভদ্র পদবী লাভ করবে বলে আকাঙ্ক্ষা বাংলাদেশেই করে। বাঙালি যদি শিক্ষিত না হতে পারে তবে সে ভদ্রসমাজেই উঠতে পারল না। তাই তো বাঙালির বিধবা মা ধান ভেনে সুতো কেটে প্রাণপাত করে ছেলেকে শিক্ষা দিতে ব্যগ্র হয়। তাই আমি মনে করেছিলুম যে, বাঙালি বিদ্যা ও বিজ্ঞানকে অবজ্ঞা করবে না; তাই আমি পাশ্চাত্ত্য জ্ঞানীদের বলে এসেছিলাম যে, 'তোমরা নিঃসংকোচে নির্ভয়ে আমাদের দেশে আসতে পার, তোমাদের অভ্যর্থনায় ত্রুটি হবে না।'

আমার এই আশ্বাসবাক্যের সত্য পরীক্ষা বিশ্বভারতীতেই হবে। আশা করি এইখানে আমরা প্রমাণ করতে পারব যে, বৃহৎ মানবসমাজে যেখানে জ্ঞানের যজ্ঞ চলছে সেখানে সত্যহোমানলে আহুতি দেবার অধিকার আমাদেরও আছে; সমস্ত দেশ ও কালের জ্ঞানসম্পদ আমরা আপনার বলে দাবি করতে পারি এই গৌরব আমাদের। মানুষের হাত থেকে বর ও অর্ঘ্য গ্রহণের যে স্বাভাবিক অধিকার প্রত্যেক মানুষেরই আছে কোনো মোহবশত আমরা তার থেকে লেশমাত্র বঞ্চিত নই। আমাদের মধ্যে সেই বর্বরতা নেই যা দেশকালপাত্রনিরপেক্ষ জ্ঞানের আলোককে আত্মীয়রূপে স্বীকার করে না, তাকে অবজ্ঞা করে লজ্জা পায় না, প্রত্যাখ্যান করে নিজের দৈন্য অনুভব করতে পারে না।

কলিকাতা
৪ ভাদ্র ১৩২৯

৭

প্রত্যেক মুহূর্তেই আমাদের মধ্যে একটি প্রেরণা আছে নিজেকে বিকশিত করবার। বিকাশই হচ্ছে বিশ্বজগতের গোড়াকার কথা। সৃষ্টির যে লীলা, তার এক দিকে আবরণ আর-এক দিকে প্রকাশ। প্রকাশের যে আনন্দ, দেশকালের মধ্যে দিয়ে সে আপন আবরণ মোচনের দ্বারা আপনাকে উপলব্ধি করছে। উপনিষদ বলছেন— 'হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্', হিরণ্ময় পাত্রের দ্বারা সত্যের মুখ আবৃত হয়ে আছে। কিন্তু একান্তই যদি আবৃত হয়ে থাকত তা হলে পাত্রকেই জানতুম, সত্যকে জানতুম না। সত্য যে প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে এ কথা বলবারও জোর থাকত না। কিন্তু যেহেতু সৃষ্টির প্রক্রিয়াই হচ্ছে সত্যের প্রকাশের প্রক্রিয়া সেইজন্যে উপনিষদের ঋষি মানুষের আকাঙ্ক্ষাকে এমন করে বলতে পেরেছেন, 'হে সূর্য, তোমার আলোকের আবরণ খোলো, আমি সত্যকে দেখি।'

মানুষ যে এমন কথা বলতে পেরেছে তার কারণ এই, মানুষ নিজের মধ্যেই দেখছে যে, প্রত্যক্ষ যে অবস্থার মধ্যে সে বিরাজমান সেইটেই তার চরম নয়। তার লোভ আছে এবং লোভ চরিতার্থ করবার প্রবল বাসনা আছে; কিন্তু তার অন্তরাত্মা বলছে, লোভের আবরণ থেকে মনুষ্যত্বকে মুক্তি দিতে চাই। অর্থাৎ যে পদার্থটা তার মধ্যে অতিরিক্তমাত্রায় প্রবল হয়ে আছে সেটাকে সে আপন মনুষ্যত্বের প্রকাশ বলে স্বীকার করে না, বাধা বলেই স্বীকার করে। যা আছে তাই সত্য, যা প্রতীয়মান তাই প্রতীতির যোগ্য, মানুষ এ কথা বলে নি। পশুবৎ বর্বর মানুষের মধ্যে বাহ্যশক্তি যতই প্রবল থাক্, তার সত্য যে ক্ষীণ অর্থাৎ তার প্রকাশ যে বাধাগ্রস্ত এ কথা মানুষ প্রথম থেকেই কোনোরকম করে উপলব্ধি করেছিল বলেই সে যাকে সভ্যতা বলে সে পদার্থটা তার কাছে নিরর্থক হয় নি।

সভ্যতা-শব্দটার আসল মানে হচ্ছে, সভার মধ্যে আপনাকে পাওয়া, সকলের মধ্যে নিজেকে উপলব্ধি করা। সভা-শব্দের ধাতুগত অর্থ এই যে, যেখানে আভা যেখানে আলোক আছে। অর্থাৎ মানুষের প্রকাশের আলো একলা নিজের মধ্যে নয়, সকলের সঙ্গে মিলনে। যেখানে এই মিলনতত্ত্বের যতটুকু খর্বতা সেইখানেই মানুষের সত্য সেই পরিমাণেই আচ্ছন্ন। এইজন্যেই মানুষ কেবলই আপনাকে

আপনি বলছে—'অপাবৃণু', খুলে ফেলো, তোমার একলা-আপনের ঢাকা খুলে ফেলো, তোমার সকল-আপনের সত্যে প্রকাশিত হও; সেইখানেই তোমার দীপ্তি, সেইখানেই তোমার মুক্তি।

বীজ যখন অঙ্কুররূপে প্রকাশিত হয় তখন ত্যাগের দ্বারা হয়। সে ত্যাগ নিজেকেই ত্যাগ। সে আপনাকে বিদীর্ণ করে তবে আপনার সত্যকে মুক্তি দিতে পারে। তেমনি, যে আপন সকলের তাকে পাবার জন্যে মানুষেরও ত্যাগ করতে হয় যে আপন তার একলার, তাকে। এইজন্যে ঈশোপনিষদ বলেছেন, যে মানুষ আপনাকে সকলের মধ্যে ও সকলকে আপনার মধ্যে পায় 'ন ততো বিজুগুপ্সতে' —সে আর গোপন থাকে না। অসত্যে গোপন করে, সত্যে প্রকাশ করে। তাই আমাদের প্রার্থনা, 'অসতো মা সদ্‌গময়'—অসত্য থেকে আমাকে সত্যে নিয়ে যাও; 'আবিরাবীর্ম এধি'—হে প্রকাশস্বরূপ, আমার মধ্যে তোমার আবির্ভাব হোক।

তা হলে দেখা যাচ্ছে, প্রকাশ হচ্ছে আপনাকে দান। আপনাকে দিতে গিয়ে তবে আপনাকে প্রকাশ করি, আপনাকে জানতে পাই। আপনাকে দেওয়া এবং আপনাকে জানা একসঙ্গেই ঘটে। নির্বাপিত প্রদীপ আপনাকে দেয় না, তাই আপনাকে পায় না। যে মানুষ নিজেকে সঞ্চয় করে সকলের চেয়ে বড়ো হয় সেই প্রচ্ছন্ন, সেই অবরুদ্ধ; যে মানুষ নিজেকে দান করে সকলের সঙ্গে এক হতে চায় সেই প্রকাশিত, সেই মুক্ত।

সওগাদ, তার উপরে নানা রঙের চিত্র-করা রুমাল ঢাকা। যতক্ষণ রুমাল আছে ততক্ষণ দেওয়া হয় নি, ততক্ষণ সমস্ত জিনিসটা আমার নিজের দিকেই টানা। ততক্ষণ মনে হয়েছে, ঐ রুমালটাই মহামূল্য। ততক্ষণ আসল জিনিসের মানে পাওয়া গেল না, তার দাম বোঝা গেল না। যখন দান করবার সময় এল, রুমাল যখন খোলা গেল, তখনই আসলের সঙ্গে বিশ্বের পরিচয় হল, সব সার্থক হল।

আমাদের আত্মনিবেদন যখন পূর্ণ হয় তখনই নিজেকে সম্পূর্ণ পাই। নইলে আমার আপন-নামক যে বিচিত্র ঢাকাখানা আছে সেইটেই চরম বলে বোধ হয়, সেইটেকেই কোনোরকমে বাঁচাবার প্রাণপণ চেষ্টা মনে জাগতে থাকে। সেইটে নিয়েই যত ঈর্ষা, যত ঝগড়া, যত দুঃখ। যারা মূঢ় তারা সেইটেরই রঙ দেখে ভুলে যায়। নিজের যেটা সত্য রূপ সেইটেই হচ্ছে বিশ্বের সঙ্গে মিলনের রূপ।

আজ নববর্ষের দিন আমাদের আশ্রমের ভিতরকার সত্যকে প্রত্যক্ষ করবার দিন। যে তপস্যা এখানে স্থান পেয়েছে তার সৃষ্টিশক্তিটি কী তা আমাদের জানতে হবে। এর বাইরের একটা ব্যবস্থা আছে, এর ঘরবাড়ি তৈরি হচ্ছে, এর আইন-কানুন চলছে, সে আমরা সকলে মিলে গড়ছি। কিন্তু এর নিজের ভিতরকার একটি তত্ত্ব আছে যা নিজেকে নিজে ক্রমশ উদ্‌ঘাটিত করছে, এবং সেই নিয়ত উদ্‌ঘাটিত করার প্রক্রিয়াই হচ্ছে তার সৃষ্টি। তাকে যদি আমরা স্পষ্ট করে দেখতে পাই তা হলেই আমাদের আত্মনিবেদনের উৎসাহ সম্পূর্ণ হতে পারে। সত্য যখন আমাদের কাছে অস্পষ্ট থাকে তখন আমাদের ত্যাগের ইচ্ছা বল পায় না।

সত্য আমাদের ত্যাগ করতে আহ্বান করে। কেননা ত্যাগের দ্বারাই আমাদের আত্মপ্রকাশ হয়। আমাদের আশ্রমের মধ্যেও সেই আহ্বান পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। সেই আহ্বানকে আমরা 'বিশ্বভারতী' নাম দিয়েছি।

স্বজাতির নামে মানুষ আত্মত্যাগ করবে এমন একটি আহ্বান কয়েক শতাব্দী ধরে পৃথিবীতে খুব প্রবল হয়ে উঠেছিল। অর্থাৎ স্বজাতিই মানুষের কাছে এতদিন মনুষ্যত্বের সবচেয়ে বড়ো সত্য বলে প্রতীয়মান হয়েছিল। তার ফল

হয়েছিল এই যে, এক জাতি অন্য জাতিকে শোষণ করে নিজে বড়ো হয়ে ওঠবার জন্যে পৃথিবী জুড়ে একটা দস্যুবৃত্তি চলছিল। এমনকি যেসব মানুষ স্বজাতির নামে জাল জালিয়াতি অত্যাচার নিষ্ঠুরতা করতে কুণ্ঠিত হয় নি, মানুষ নির্লজ্জভাবে তাদের নামকে নিজের ইতিহাসে সমুজ্জ্বল করে রেখেছে। অর্থাৎ যে ধর্মবিধি সর্বজনীন তাকেও স্বজাতির বেদীর কাছে অপমানিত করা মানুষ ধর্মেরই অঙ্গ বলে মনে করেছে। স্বজাতির গণ্ডিসীমার মধ্যে এই ত্যাগের চর্চা; এর আশুফল খুব লোভনীয় বলেই ইতিহাসে দেখা দিয়েছে। তার কারণ ত্যাগই সৃষ্টিশক্তি; সেই ত্যাগ যতটুকু পরিধির পরিমাণেই সত্য হয় ততটুকু পরিমাণেই সে সার্থকতা বিস্তার করে। এইজন্যে নেশনের ইতিহাসে ত্যাগের দৃষ্টান্ত মহদ্দৃষ্টান্ত বলেই সপ্রমাণ হয়েছে।

কিন্তু সত্যকে সংকীর্ণ করে কখনোই মানুষ চিরকাল সমৃদ্ধি লাভ করতে পারে না। এক জায়গায় এসে তাকে ঠেকতেই হবে। যদি কেবল উপরিতলের মাটি উর্বরা হয় তবে বনস্পতি দ্রুত বেড়ে ওঠে; কিন্তু অবশেষে তার শিকড় নীরস তলায় গিয়ে ঠেকে, তখন হঠাৎ একদিন তার ডালপালা মুষড়ে যেতে আরম্ভ করে। মানুষের কর্তব্যবুদ্ধি স্বজাতির সীমার মধ্যে আপন পূর্ণখাদ্য পায় না, তাই হঠাৎ একদিন সে আপনার প্রচুর ঐশ্বর্যের মাঝখানেই দারিদ্র্যে এসে উত্তীর্ণ হয়। তাই যে য়ুরোপ নেশনসৃষ্টির প্রধান ক্ষেত্র সেই য়ুরোপ আজ নেশনের বিভীষিকায় আর্ত হয়ে উঠেছে।

যুদ্ধ এবং সন্ধির ভিতর দিয়ে যে নিদারুণ দুঃখ য়ুরোপকে আলোড়িত করে তুলেছে তার অর্থ হচ্ছে এই যে, নেশনরূপের মধ্যে মানুষ আপন সত্যকে আবৃত করে ফেলেছে; মানুষের আত্মা বলছে, 'অপাবৃণু'—আবরণ উদ্‌ঘাটন করো। মনুষ্যত্বের প্রকাশ আচ্ছন্ন হয়েছে বলে স্বজাতির নামে পাপাচরণ সম্বন্ধে মানুষ এতদিন এমন স্পষ্ট ঔদ্ধত্য করতে পেরেছে, এবং মনে করতে পেরেছে যে, তাতে তার কোনো ক্ষতি হয় নি, লাভই হয়েছে। অবশেষে আজ নেশন যখন আপনার মুষল আপনি প্রসব করতে আরম্ভ করেছে তখন য়ুরোপে নেশন আপনার মূর্তি দেখে আপনি আতঙ্কিত হয়ে উঠেছে।

নূতন যুগের বাণী এই যে, আবরণ খোলো, হে মানব, আপন উদার রূপ প্রকাশ করো। আজ নববর্ষের প্রথম দিনে আমাদের আশ্রমের মধ্যে আমরা সেই নবযুগের বাণীকে অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করব। আমাদের আশ্রমকে আজ আমরা সর্বপ্রকার ভেদবুদ্ধির আবরণ-মুক্ত করে দেখি, তা হলেই তার সত্যরূপ দেখতে পাব।

আমাদের এখানে নানা দেশ থেকে নানা জাতির অতিথি এসেছে। তারা যদি অন্তরের মধ্যে কোনো বাধা না পায় তবে তাদের এই আসার দ্বারাতেই আপনিই এখানে নবযুগের একটি মিলনতীর্থ তৈরি হয়ে উঠবে। বাংলাদেশে নানা নদী এসে সমুদ্রে পড়েছে, সেই বহু নদীর সমুদ্রসংগম থেকেই বাংলাদেশ আপনি একটি বিশেষ প্রকৃতি লাভ করে তৈরি হয়ে উঠেছে। আমাদের আশ্রম যদি তেমনি আপন হৃদয়কে প্রসারিত করে দেয় এবং যদি এখানে আগন্তুকেরা সহজেই আপনার স্থানটি পায় তা হলে এই আশ্রম সকলের সেই সম্মিলনের দ্বারা আপনিই আপনার সত্যরূপকে লাভ করবে। তীর্থযাত্রীরা যে ভক্তি নিয়ে আসে, যে সত্যদৃষ্টি নিয়ে আসে, তার দ্বারাই তারা তীর্থস্থানকে সত্য করে তোলে। আমরা যারা এই আশ্রমে এসেছি, আমরা এখানে যে সত্যকে উপলব্ধি করব বলে শ্রদ্ধাপূর্বক প্রত্যাশা করি

সেই শ্রদ্ধার দ্বারা সেই প্রত্যাশা দ্বারাই সেই সত্য এখানে সমুজ্জ্বল হয়ে প্রকাশ পাবে। আমরা এখানে কোন্ মন্ত্রের রূপ দেখব বলে নিয়ত প্রত্যাশা করব। সে মন্ত্র হচ্ছে এই যে—‘যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্’। দেশে দেশে আমরা মানুষকে তার বিশেষ স্বাজাতিক পরিবেষ্টনের মধ্যে খণ্ডিত করে দেখেছি, সেখানে মানুষকে আপন বলে উপলব্ধি করতে পারি নে। পৃথিবীর মধ্যে আমাদের এই আশ্রম এমন-একটি জায়গা হয়ে উঠুক যেখানে ধর্ম ভাষা এবং জাতিগত সকলপ্রকার পার্থক্য সত্ত্বেও আমরা মানুষকে তার বাহ্যভেদমুক্তরূপে মানুষ বলে দেখতে পাই। সেই দেখতে পাওয়াই নূতন যুগকে দেখতে পাওয়া। সন্ন্যাসী পূর্বাকাশে প্রথম অরুণোদয় দেখবে বলে জেগে আছে। যখনই অন্ধকারের প্রান্তে আলোকের আরক্ত রেখাটি দেখতে পায় তখনই সে জানে যে, প্রভাতের জয়ধ্বজা তিমিররাত্রির প্রাকারের উপর আপন কেতন উড়িয়েছে। আমরা তেমনি করে ভারতের এই পূর্বপ্রান্তে এই প্রান্তরশেষে যেন আজ নববর্ষের প্রভাতে ভেদবাধার তিমির-মুক্ত মানুষের রূপ আমাদের এখানে সমাগত অতিথি বন্ধু সকলের মধ্যে উজ্জ্বল করে দেখতে পাই। সেই দেখতে পাওয়া থেকেই যেন মনের মধ্যে শ্রদ্ধা করতে পারি যে, মানবের ইতিহাসে নবযুগের অরুণোদয় আরম্ভ হয়েছে।

শান্তিনিকেতন
১ বৈশাখ ১৩৩০

৮

অল্প কিছুকাল হল কালিঘাটে গিয়েছিলুম। সেখানে গিয়ে আমাদের পুরোনো আদিগঙ্গাকে দেখলাম। তার মস্ত দুর্গতি হয়েছে। সমুদ্রে আনাগোনার পথ তার চিরদিনের মতো বন্ধ হয়ে গেছে। যখন এই নদীটির ধারা সজীব ছিল তখন কত বণিক আমাদের ভারত ছাড়িয়ে সিংহল গুজরাট ইত্যাদি দেশে নিজেদের বাণিজ্যের সম্বন্ধ বিস্তার করেছিল। এ যেন মৈত্রীর ধারার মতো মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনের বাধাকে দূর করেছিল। তাই এই নদী পুণ্যনদী বলে গণ্য হয়েছিল। তেমনি ভারতের সিন্ধু ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি যত বড়ো বড়ো নদনদী আছে সবগুলি সেকালে পবিত্র বলে গণ্য হয়েছিল। কেন। কেননা এই নদীগুলি মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ-স্থাপনের উপায়স্বরূপ ছিল। ছোটো ছোটো নদী তো ঢের আছে—তাদের ধারার তীব্রতা থাকতে পারে; কিন্তু না আছে গভীরতা, না আছে স্থায়িত্ব। তারা তাদের জলধারায় এই বিশ্বমৈত্রীর রূপকে ফুটিয়ে তুলতে পারে নি। মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনে তারা সাহায্য করে নি। সেইজন্য তাদের জল মানুষের কাছে তীর্থোদক হল না। যেখান দিয়ে বড়ো বড়ো নদী বয়ে গিয়েছে সেখানে কত বড়ো বড়ো নগর হয়েছে—সেসব দেশ সভ্যতার কেন্দ্রভূমি হয়ে উঠেছে। এইসব নদী বয়ে মানুষের জ্ঞানের সাধনার সম্পদ নানা জায়গায় গিয়েছে। আমাদের দেশের চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপকেরা যখন জ্ঞান বিতরণ করেন, অধ্যাপকপত্নী তাদের অন্নপানের ব্যবস্থা করে থাকেন; এই গঙ্গাও তেমনি একসময়ে যেমন ভারতের সাধনার ক্ষেত্র ধীরে ধীরে বিস্তারিত করেছিল তেমনি আর-এক দিক দিয়ে সে তার ক্ষুধাতৃষ্ণা দূর করেছিল। সেইজন্য গঙ্গার প্রতি মানুষের এত শ্রদ্ধা।

তা হলে আমরা দেখলাম, এই পবিত্রতা কোথায়? না, কল্যাণময় আহ্বানে ও সুযোগে মানুষ বড়ো ক্ষেত্রে মানুষের সঙ্গে মিলেছে— আপনার স্বার্থবুদ্ধির গণ্ডির মধ্যে একা একা বদ্ধ হয়ে থাকে নি। এ ছাড়া নদীর জলের মধ্যে এমন কোনো ধর্ম নেই যাতে করে তা পবিত্র হতে পারে।

কিন্তু যখনই তার ধারা লক্ষ্যভ্রষ্ট হল, সমুদ্রের সঙ্গে তার অবাধ সম্বন্ধ নষ্ট হল, তখনই তার গভীরতাও কমে গেল। গঙ্গা দেখলাম, কিন্তু চিত্ত খুশি হল না। যদিও এখনও লোকে তাকে শ্রদ্ধা করে, সেটা তাদের অভ্যাসমাত্র। জলে তার আর সেই পুণ্যরূপ নেই। আমাদের ভারতের জীবনেও ঠিক এই দশাই ঘটেছে। এক সময় পৃথিবীর সমস্ত দেশকে ভারত তার পুণ্যসাধনার পথে আহ্বান করেছিল, ভারতে সব দেশ থেকে লোক বড়ো সত্যকে লাভ করার জন্যে এসে মিলেছিল। ভারতও তখন নিজের শ্রেষ্ঠ যা তা সমস্ত বিশ্বে বিলিয়ে দিয়েছিল। সমস্ত বিশ্বের সঙ্গে নিজের যোগ স্থাপন করেছিল বলে ভারত পুণ্যক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল। গয়া আমাদের কাছে পুণ্যক্ষেত্র কেন হল। না, তার কারণ বুদ্ধদেব এখানে তপস্যা করেছিলেন, আর সেই তাঁর তপস্যার ফল ভারত সমস্ত বিশ্বে বণ্টন করে দিয়েছে। যদি তার পরিবর্তন হয়ে থাকে, আজ যদি সে আর অমৃত-অন্ন পরিবেশনের ভার না নেয়, তবে গয়াতে আর কিছুমাত্র পুণ্য অবশিষ্ট নেই। কিছু আছে যদি মনে করি তো বুঝতে হবে, তা আমাদের আগেকার অভ্যাস। গয়ার পাণ্ডারা কি গয়াকে বড়ো করতে পারে, না তার মন্দির পারে?

আমাদের এ কথা মনে রাখতে হবে, পুণ্যধর্ম মাটিতে বা হাওয়ায় নেই। চিন্তার দ্বারা, সাধনার দ্বারা পুণ্যকে সমর্থন করতে হবে। আমাদের আশ্রমে সে বাধা অনেক দূর হয়েছে। আপনা-আপনি বিদেশের অতিথিরা এখানে এসে তাঁদের আসন পাতছেন। তাঁরা বলছেন যে, তাঁরা এখানে এসে তৃপ্তি পেয়েছেন। এমনি করেই ভারতের গঙ্গা আমাদের আশ্রমের মধ্যে বইল। দেশবিদেশের অতিথিদের চলাচল হতে লাগল। তাঁরা আমাদের জীবনে জীবন মেলাচ্ছেন। এই আশ্রমকে অবলম্বন করে তাঁদের চিত্ত প্রসারিত হচ্ছে। এর চেয়ে আর সফলতা কিছু নেই। তীর্থে মানুষ উত্তীর্ণ হয় বলেই তার নাম তীর্থ। এমন অনেক জায়গা আছে যেখানে এসে সকলে উত্তীর্ণ হয় না; সমস্ত পথিক যেখানে আসে চলে যাবার জন্যে, থাকবার জন্যে নয়। যেমন কলকাতার বড়োবাজার— সেখানে এসে প্রীতি মেলে না, বিরাম মেলে না, সেখানে এসে যাত্রা শেষ হয় না; সেখানে লাভলোকসানের কথা ছাড়া আর কথা নেই। আমি কলকাতায় জন্মেছি— সেখানে আশ্রয় খুঁজে পাচ্ছি না। সেখানে আমার বাড়ি আছে, তবু সেখানে কিছু নিজের আছে বলে মনে করতে পারছি না। মানুষ যদি নিজের সেই আশ্রয়টি খুঁজে না পেলে তো মনুমেণ্ট দেখে, বড়ো বড়ো বাড়িঘর দেখে তার কী হবে। ওখানে কার আহ্বান আছে। বণিকরাই কেবল সেখানে থাকতে পারে। ও তীর্থক্ষেত্র নয়। এ ছাড়া আমাদের যেগুলো তীর্থক্ষেত্র আছে সেখানে কী হয়। সেখানে যারা পুণ্যপিপাসু তারা পাণ্ডাদের পায়ে টাকা দিয়ে আসে। সেখানে তো সব দেশের মানুষ মেলবার জন্যে ভিতরকার আহ্বান পায় না।

কাল একটি পত্র পেলাম। আমাদের সুরুলের পল্লীবিভাগের যিনি অধ্যক্ষ তিনি জাহাজ থেকে আমাকে চিঠি লিখেছেন। তিনি লিখেছেন যে, জাহাজের লোকেরা তাসখেলা ও অন্যান্য এত ছোটোখাটো আমোদপ্রমোদ নিয়ে দিন কাটায় যে তিনি বিস্মিত হয়ে আমাকে লিখেছেন যে, কেমন করে তারা এর মধ্যে থাকে।

যে জীবনে কোনো বড়ো প্রকাশ নেই, ক্ষুদ্র কথায় যে জীবন ভরে উঠেছে, বিশ্বের দিকে যে জীবনের কোনো প্রবাহ নেই, তারা কেমন করে তার মধ্যে থাকে, কী করে তারা মনে তৃপ্তি পায়।

শ্রীযুক্ত এল্‌ম্‌হার্‌স্ট্‌ এই-যে বেদনা অনুভব করেছেন তার কারণ কী। কারণ এই যে, তিনি আশ্রমে যে কার্যের ভার নিয়েছেন তাতে করে তাঁকে বৃহতের ক্ষেত্রে এসে দাঁড়াতে হয়েছে। তিনি তাঁর কর্মকে অবলম্বন করে সমস্ত গ্রামবাসীদের কল্যাণক্ষেত্রে এসে দাঁড়িয়েছেন। এ কাজ তাঁর আপনার স্বার্থের জন্যে নয়। তিনি সমস্ত গ্রামবাসীদের মানুষ বলে শ্রদ্ধা করে সকলের সঙ্গে মেলবার সুযোগ পেয়েছিলেন বলে এ জায়গা তাঁর কাছে তীর্থ হয়ে উঠেছে। এই-যে আশেপাশের গরিব অজ্ঞ, এদের মধ্যে যাবার তিনি পথ পেয়েছিলেন। সেইজন্যে তাঁর সঙ্গে যেসমস্ত বড়ো বড়ো ধনী ছিলেন— তাঁদের কেউ-বা জজ, কেউ-বা ম্যাজিস্ট্রেট— তাঁদের তিনি মনে মনে অত্যন্ত অকৃতার্থ বলে বুঝতে পেরেছিলেন। তাঁরা এখানে প্রভূত ক্ষমতা পেলেও, সমস্ত দেশবাসীর সহিত অব্যাহত মিলনের পথটি খুঁজে পান নি। তাঁরা ভারতে কোনো তীর্থে এসে পোঁছলেন না। তাঁদের কেউ-বা রাজতক্তায় এসে ঠেকলেন, কেউ-বা লোহার সিন্দুকে এসে ঠেকলেন, তাঁরা পুণ্যতীর্থে এসে ঠেকলেন না। আমাদের সাহেব সুরুলে এসে এর তীর্থের রূপটি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। আমরা এখানে থেকেও যদি সেটি উপলব্ধি করতে না পারি তবে আমাদের মতো অকৃতার্থ আর কেউ নেই। তাই বলছি, আমাদের এখানে কর্মের মধ্যে, এর জ্ঞানের সাধনার মধ্যে যেন কল্যাণকে উপলব্ধি করতে পারি। এ জায়গা শুধু পাঠশালা নয়, এই জায়গা তীর্থ। দেশবিদেশ থেকে লোকেরা এখানে এসে যেন বলতে পারে— আ বাঁচলাম, আমরা ক্ষুদ্র সংসারের বাইরে এসে বিশ্বের ও বিশ্বদেবতার দর্শন লাভ করলাম।

শান্তিনিকেতন
৫ বৈশাখ ১৩৩০

২

আমাদের অভাব বিস্তর, আমাদের নালিশের কথাও অনেক আছে। সেই অভাবের বোধ জাগাবার ও দূর করবার জন্যে, নালিশের বৃত্তান্ত বোঝাবার ও তার নিষ্পত্তি করবার জন্যে যাঁরা অকৃত্রিম উৎসাহ ও প্রাজ্ঞতার সঙ্গে চেষ্টা করছেন তাঁরা দেশের হিতকারী; তাঁদের ’পরে আমাদের শ্রদ্ধা অক্ষুণ্ণ থাক্‌।

কিন্তু কেবলমাত্র অপমান ও দারিদ্র্যের দ্বারা দেশের আত্মপরিচয় হয় না, তাতে আমাদের প্রচ্ছন্ন করে। যে নক্ষত্রের আলোক নিবে গেছে অন্ধকারই তার পক্ষে একমাত্র অভিশাপ নয়, নিখিল জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর মধ্যে তার অপ্রকাশই হচ্ছে তার সবচেয়ে বড়ো অবমাননা। অন্ধকার তাকে কেবল আপনার মধ্যেই বদ্ধ করে, আলোক তাকে সকলের সঙ্গে যোগযুক্ত করে রাখে।

ভারতের যেখানে অভাব যেখানে অপমান সেখানে সে বিশ্বের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন। এই অভাবই যদি তার একান্ত হত, ভারত যদি মধ্য-আফ্রিকা-খণ্ডের মতো সত্যই

দৈন্যপ্রধান হত, তা হলে নিজের নিরবচ্ছিন্ন কালিমার মধ্যেই অব্যক্ত হয়ে থাকা ছাড়া তার আর গতি ছিল না।

কিন্তু কৃষ্ণপক্ষই ভারতের একমাত্র পক্ষ নয়, শুক্লপক্ষের আলোক থেকে বিধাতা তাকে বঞ্চিত করেন নি। সেই আলোকের যোগেই সে আপন পূর্ণিমার গৌরব নিখিলের কাছে উদ্‌ঘাটিত করবার অধিকারী।

বিশ্বভারতী ভারতের সেই আলোকসম্পদের বার্তা বহন ও ঘোষণ করবার ভার নিয়েছে। যেখানে ভারতের অমাবস্যা সেখানে তার কার্পণ্য। কিন্তু একমাত্র সেই কার্পণ্যকে স্বীকার করেই কি সে বিশ্বের কাছে লজ্জিত হয়ে থাকবে। যেখানে তার পূর্ণিমা সেখানে তার দাক্ষিণ্য থাকা চাই তো। এই দাক্ষিণ্যেই তার পরিচয়, সেইখানেই নিখিল বিশ্ব তার নিমন্ত্রণ স্বীকার করে নেবেই।

যার ঘরে নিমন্ত্রণ চলে না সেই তো একঘরে, সমাজে সেই চিরলাঞ্ছিত। আমরা বিশ্বভারতীর পক্ষ থেকে বলতে চাই, ভারতে বিশ্বের সেই নিমন্ত্রণ বন্ধ হবার কারণ নেই। যারা অবিশ্বাসী, যারা একমাত্র তার অভাবের দিকেই সমস্ত দৃষ্টি রেখেছে, তারা বলে, যতক্ষণ না রাজ্যে স্বাতন্ত্র্য, বাণিজ্যে সমৃদ্ধি লাভ করব ততক্ষণ অবজ্ঞা করে ধনীরা আমাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করবেই না। কিন্তু এমন কথা বলায় শুধু স্বদেশের অপমান তা নয়, এতে সর্বমানবের অপমান। বুদ্ধদেব যখন অকিঞ্চনতা গ্রহণ করেই সত্যপ্রচারের ভার নিয়েছিলেন তখন তিনি এই কথাই সপ্রমাণ করেছিলেন যে, সত্য আত্মমহিমাতেই গৌরবান্বিত। সূর্য আপন আলোকেই স্বপ্রকাশ; স্যাকরার দোকানে সোনার গিল্টি না করালে তার মূল্য হবে না, ঘোরতর বেনের মুখেও এ কথা শোভা পায় না।

যে স্বদেশাভিমান আমরা পশ্চিমের কাছ থেকে ধার করে নিয়েছি তারই মধ্যে রাজ্যবাণিজ্যগত সম্পদের প্রতি একান্ত বিশ্বাসপরতার অশুচিতা রয়ে গেছে। সেইজন্যেই আজকের দিনে ভারতবাসীও এমন কথাও বলতে লজ্জা বোধ করে না যে, রাষ্ট্রীয় গৌরব সর্বাগ্রে, তার পরে সত্যের গৌরব। কোনো কোনো পাশ্চাত্ত্য মহাদেশে দেখে এসেছি, ধনের অভিমানেই সেখানকার সমস্ত শিক্ষা দীক্ষা সাধনাকে রাহুগ্রস্ত করে রেখেছে। সেখানে বিপুল ধনের ভারাকর্ষণে মানুষের মাথা মাটির দিকে ঝুঁকে পড়েছে। পশ্চিমকে খোঁটা দিয়ে স্বজাতিদম্ভ প্রকাশ করবার বেলায় আমরা যে মুখে সর্বদাই পশ্চিমের এই বস্তুলুব্ধতার নিন্দা করে থাকি সেই মুখেই যখন সত্যসম্পদকে শক্তিসম্পদের পশ্চাদ্‌বর্তী করে রাখবার প্রস্তাব করে থাকি তখন নিশ্চয়ই আমাদের অশুভগ্রহ কুটিল হাস্য করে। যেমন কোনো কোনো শুচিতাভিমানী ব্রাহ্মণ অপাঙ্‌ক্তেয়ের বাড়িতে যে মুখে আহার করে আসে বাইরে এসে সেই মুখেই তার নিন্দা করে, এও ঠিক সেইমতো।

বিশ্বভারতীর কণ্ঠ দিয়ে এই কথাই আমরা বলতে চাই যে, ভারতবর্ষে সত্যসম্পদ বিনষ্ট হয় নি। না যদি হয়ে থাকে তা হলে সত্যের দায়িত্ব মানতেই হবে। ধনবানের ধন ধনীর একমাত্র নিজের হতে পারে, কিন্তু সত্যবানের সত্য বিশ্বের। সত্যলাভের সঙ্গে সঙ্গেই তার নিমন্ত্রণ-প্রচার আছেই। ঋষি যখনই বুঝলেন 'বেদাহমেতম্‌'—আমি একে জেনেছি, তখনই তাঁকে বলতে হল, 'শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ'—তোমরা অমৃতের পুত্র, তোমরা সকলে শুনে যাও।

তোমরা সকলে শুনে যাও, পিতামহদের এই নিমন্ত্রণবাণী যদি আজ ভারতবর্ষে নীরব হয়ে থাকে তবে সাম্রাজ্যে স্বাধীনতা, বাণিজ্যে সমৃদ্ধি, কিছুতেই আমাদের আর গৌরব দিতে পারে না। ভারতে সত্যধন যদি লুপ্ত হয়ে থাকে তবেই বিশ্বের

প্রতি তার নিমন্ত্রণের অধিকারও লুপ্ত হয়ে গেছে। আজকের দিনে যারা ভারতের নিমন্ত্রণে বিশ্বাস করে না তারা ভারতের সত্যেও বিশ্বাস করে না। আমরা বিশ্বাস করি। বিশ্বভারতী সেই বিশ্বাসকে আমাদের স্বদেশবাসীর কাছে প্রকাশ করুক ও সর্বদেশবাসীর কাছে প্রচার করুক। বিশ্বভারতীতে ভারতের নিমন্ত্রণবাণী বিশ্বের কাছে ঘোষিত হোক। বিশ্বভারতীতে ভারত আপনার সেই সম্পদকে উপলব্ধি করুক, যে সম্পদকে সর্বজনের কাছে দান করার দ্বারাই লাভ করা যায়।

প্র. পৌষ ১৩৩০

১০

আমি যখন এই শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয় স্থাপন করে এখানে ছেলেদের আনলুম তখন আমার নিজের বিশেষ কিছু দেবার বা বলবার মতো ছিল না। কিন্তু আমার একান্ত ইচ্ছা ছিল যে, এখানকার এই প্রভাতের আলো, শ্যামল প্রান্তর, গাছপালা যেন শিশুদের চিত্তকে স্পর্শ করতে পারে। কারণ প্রকৃতির সাহচর্যে তরুণ চিত্তে আনন্দসঞ্চারের দরকার আছে; বিশ্বের চারি দিককার রসাস্বাদ করা ও সকালের আলো সন্ধ্যার সূর্যাস্তের সৌন্দর্য উপভোগ করার মধ্য দিয়ে শিশুদের জীবনের উন্মেষ আপনার থেকেই হতে থাকে। আমি চেয়েছিলুম যে তারা অনুভব করুক যে, বসুন্ধরা তাদের ধাত্রীর মতো কোলে করে মানুষ করছে। তারা শহরের যে ইঁটকাঠপাথরের মধ্যে বর্ধিত হয় সেই জড়তার কারাগার থেকে তাদের মুক্তি দিতে হবে। এই উদ্দেশ্যে আমি আকাশ-আলোর অংকশায়ী উদার প্রান্তরে এই শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করেছিলুম। আমার আকাঙ্ক্ষা ছিল যে, শান্তিনিকেতনের গাছপালা-পাখিই এদের শিক্ষার ভার নেবে। আর সেইসঙ্গে কিছু কিছু মানুষের কাছ থেকেও এরা শিক্ষা লাভ করবে। কারণ, বিশ্বপ্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে যে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা আছে তাতে করে শিশুচিত্তের বিষম ক্ষতি হয়েছে। এই যোগ-বিচ্ছেদের দ্বারা যে স্বাতন্ত্র্যের সৃষ্টি হয় তাতে করে মানুষের অকল্যাণ হয়েছে। পৃথিবীতে এই দুর্ভাগ্য অনেক দিন থেকে চলে এসেছে। তাই আমার মনে হয়েছিল যে, বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে যোগস্থাপন করবার একটি অনুকূল ক্ষেত্র তৈরি করতে হবে। এমনি করে এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়।

তখন আমার নিজের সহায় সম্বল কিছু ছিল না, কারণ আমি নিজে বরাবর ইস্কুলমাস্টারকে এড়িয়ে চলেছি। বই-পড়া বিদ্যা ছেলেদের শেখাব এমন দুঃসাহস ছিল না। কিন্তু আমাকে বাল্যকাল থেকে বিশ্বপ্রকৃতির বাণী মুগ্ধ করেছিল, আমি তার সঙ্গে একান্ত আত্মীয়তার যোগ অনুভব করেছি। বই পড়ার চেয়ে যে তার কত বেশি মূল্য তা যে কতখানি শক্তি ও প্রেরণা দান করে, তা আমি নিজে জানি। আমি কতদিন একা মাসের পর মাস বুনো হাঁসের পাড়ায় জীবন যাপন করেছি। এই বালুচরদের সঙ্গে জীবনযাপনকালে প্রকৃতির যা-কিছু দান তা আমি যতই অঞ্জলি ভরে গ্রহণ করেছি ততই আমি পেয়েছি, আমার চিত্ত ভরপুর হয়ে গেছে। তাই শিশুরা যে এখানে আনন্দে দৌড়চ্ছে, গাছে চড়ছে, কলহাস্যে আকাশ মুখর করে তুলছে—আমার মনে হয়েছে যে, এরা এমন-কিছু লাভ করেছে যা দুর্লভ। তাদের বিদ্যার কী মার্কা মারা হল এটাই সবচেয়ে বড়ো কথা নয়; কিন্তু তাদের

চিত্তের পেয়ালা বিশ্বের অমৃতরসে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে, আনন্দে উপচে উঠেছে, এই ব্যাপারটি বহুমূল্য। এই হাসিগান-আনন্দে গল্পে ভিতরে ভিতরে তাদের মনের পরিপুষ্টি হয়েছে। অভিভাবকেরা হয়তো তা বুঝবেন না, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষকেরা হয়তো তার জন্য পাসের নম্বর দিতে রাজি হবেন না, কিন্তু আমি জানি এ অতি আদরণীয়। প্রকৃতির কোলে থেকে সরস্বতীকে মাতৃরূপে লাভ করা, এ পরম সৌভাগ্যের কথা। এমনি করে আমার বিদ্যালয়ের সূত্রপাত হল।

তার পর একটি দ্বার খুলে যাওয়াতে ভিতরের কপাটগুলি উদ্‌ঘাটিত হতে লাগল। আসলে খোলবার জিনিস একটি, কিন্তু পাবার জিনিস বহু। কিন্তু প্রথম দ্বারটি বন্ধ থাকলে ভিতরে প্রবেশ করবার উপায় থাকে না। প্রকৃতির আশ্রয় থেকে বঞ্চিত হবার মধ্যে যে কৃত্রিম শিক্ষা সেটাই হল গোড়াকার সেই বন্ধনদশা যা ছিন্ন না করলে রসভাণ্ডারে প্রবেশ করা দুঃসাধ্য। তাই মানুষের মুক্তির উপায় হচ্ছে, প্রকৃতিকে ধাত্রী বলে স্বীকার করে নিয়ে তাঁরই আশ্রয়ে শিক্ষকতা লাভ করা। এই মুক্তির আদর্শ নিয়েই এই শিক্ষাকেন্দ্রের পত্তন হল।

এখানকার এই মুক্ত বায়ুতে আমরা যে মুক্তি পেয়ে গেলুম আজ তা গর্ব করে বলবার আছে। এতে করে আমাদের যে কত বন্ধনদশা ঘুচল, কত যে সংকীর্ণ সংস্কার দূর হল, তা বলে শেষ করা যায় না। এখানে আমরা সব মানুষকে আপনার বলে স্বীকার করতে শিখেছি, এখানে মানুষের পরস্পরের সম্বন্ধ ক্রমশ সহজ ও স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছে।

এটি যে পরম সৌভাগ্যের কথা তা আমাদের জানতে হবে। কারণ এ কথা আগেই বলেছি যে, মানুষের মধ্যে একটি মস্ত পীড়া হচ্ছে, তার লোকালয়ে একান্তভাবে অবরোধ। বিশ্বপ্রকৃতির থেকে বিচ্ছেদ তার চিত্তশক্তিকে খর্ব করে দিচ্ছে। কিন্তু তার চেয়েও মানুষের মধ্যে আর-একটি অস্বাভাবিকতা আছে, তা হচ্ছে এই যে, মানুষই মানুষের পরম শত্রু। এটি খুব সাংঘাতিক কথা। এর মধ্যে যে তার কতখানি চিত্তসংকোচ আছে তা আমরা অভ্যাসবশত জানতে পারি না। স্বাজাত্যের দম্ভে আমরা কোণঠেসা হয়ে গেছি, বিশ্বের বিস্তীর্ণ অধিকারে আপনাদের বঞ্চিত করেছি। এই ভীষণ বাধাকে অপসারিত করতে হবে; আমাদের জানতে হবে যে, যেখানে মানুষের চিত্তসম্পদ আছে সেখানে দেশবিদেশের ভেদ নেই, ভৌগোলিক ভাগবিভাগ নেই। পর্বত অরণ্য মরু, এরা মানুষের আত্মাকে কারারুদ্ধ করতে পারে না।

বাংলার যে মাটির ফসলে ধান হচ্ছে, যে মাটিতে গাছ বেড়ে উঠছে, সেই উপরিতলের মাটি হল বাংলাদেশের; কিন্তু একথা জানতে হবে যে, নিচেকার ভূমি পৃথিবীর সর্বত্র পরিব্যাপ্ত আছে, সুতরাং এ জায়গায় সমস্ত বিশ্বের সঙ্গে তার গভীরতম নাড়ির যোগ। এই তার ধাত্রীভূমিটি যদি সার্বভৌমিক না হত তবে এমন করে বাংলার শ্যামলতা দেখা দিত না। মাটি তুলে নিয়ে টবের ছোটো জায়গাতেও তো গাছ লাগানো যায়, কিন্তু তাতে করে যথেষ্ট ফল লাভ হয় না। বড়ো জায়গার যে মাটি তাতেই যথার্থ ফসল উৎপন্ন হয়। ঠিক তেমনি অন্তরের ক্ষেত্রে আমরা যেখানে বিশ্বকে অস্বীকার করছি, বলছি যে তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েও বড়ো হওয়া যায়, সেখানেই আমরা মস্ত ভুল করছি।

পৃথিবীতে যেখানে সভ্যতার নানা ধারা এসে মিলিত হয়েছে সেখানেই জ্ঞানের তীর্থভূমি বিরচিত হয়েছে। সেখানে নানা দিক থেকে নানা জাতির সমাবেশ হওয়াতে একটি মহামিলন ঘটেছে। গ্রীস রোম প্রভৃতি বড়ো সভ্যতার মধ্যে নানা

জ্ঞানধারার সম্মিলন ছিল, তাই তা একঘরে হয়ে ইতিহাসে প্রচ্ছন্ন হয়ে থাকে নি। ভারতবর্ষের সভ্যতাতেও তেমনি আর্য দ্রাবিড় পারসিক প্রভৃতি নানা বিচিত্র জাতির মিলন হয়েছিল। আমাদের এই সমন্বয়কে মানতে হবে। পৃথিবীর ইতিহাসে যারা বর্বর তারাই সবচেয়ে স্বতন্ত্র; তারা নূতন লোকদের স্বদেশে প্রবেশ করতে দেয় নি, বর্ণ ভাষা প্রভৃতির বৈষম্য যখনই দেখেছে তখনই তা দোষের বলে বিষবাণ প্রয়োগ করে মারতে গিয়েছে।

আজকের দিনে বিশ্বমানবকে আপনার বলে স্বীকার করবার সময় এসেছে। আমাদের অন্তরের অপরিমেয় প্রেম ও জ্ঞানের দ্বারা এই কথা জানতে হবে যে, মানুষ শুধু কোনো বিশেষ জাতির অন্তর্গত নয়; মানুষের সবচেয়ে বড়ো পরিচয় হচ্ছে, সে মানুষ। আজকার দিনে এই কথা বলবার সময় এসেছে যে, মানুষ সর্বদেশের সর্বকালের। তার মধ্যে কোনো জাতীয়তা বা বর্ণভেদ নেই। সেই পরিচয়সাধন হয় নি বলেই মানুষ আজ অপরের বিত্ত আহরণ করে বড়ো হতে চায়। সে আপনাকে মারছে, অন্যকে মারতে তার হাত কম্পিত হচ্ছে না—সে এতবড়ো অপকর্ম করতে সাহস পাচ্ছে।

ভারতবর্ষ তার জাতরক্ষা করবার স্বপক্ষে কি পাশ্চাত্ত্য দেশের নজির টেনে আনবে। আমরা কি এ কথা ভুলে গেছি যে, য়ুরোপ ও আমেরিকা আপন আপন ন্যাশনালিজ্‌মের ভিত্তিপত্তন করে যে বিরাট প্রাচীর নির্মাণ করেছে আমাদের দেশে তেমন ভিত্তিপত্তন কখনও হয় নি। ভারতবর্ষ এই কথা বলেছিল যে, যিনি বিশ্বকে আপনার বলে উপলব্ধি করতে পেরেছেন তিনিই যথার্থ সত্যকে লাভ করেছেন। তিনি অপ্রকাশ থাকেন না; ‘ন ততো বিজুগুপ্সতে’, তিনি সর্বলোকে সর্বকালে প্রকাশিত হন। কিন্তু যারা অপ্রকাশ, যারা অন্যকে স্বীকার করল না, তারা কখনও বড়ো হতে পারল না, ইতিহাসে তারা কোনো বড়ো সত্যকে রেখে যেতে পারল না। তাই কার্থেজ ইতিহাসে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। কার্থেজ বিশ্বের সমস্ত ধনরত্ন দোহন করতে চেয়েছিল। সুতরাং সে এমন-কিছু সম্পদ রেখে যায় নি যার দ্বারা ভবিষ্যৎ যুগের মানুষের পাথেয় রচনা হয়। তাই ভেনিসও কোনো বাণী রেখে যেতে পারল না। সে কেবলই বেনের মতো নিয়েছে, জমিয়েছে, কিছুই দিয়ে যেতে পারল না। কিন্তু মানুষ যখনই বিশ্বে আপনার জ্ঞানের ও প্রেমের অধিকার বিস্তৃত করতে পেরেছে তখনই সে আপন সত্যকে লাভ করেছে, বড়ো হয়েছে।

✓ প্রথমে আমি শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয় স্থাপন করে এই উদ্দেশ্যে ছেলেদের এখানে এনেছিলুম যে, বিশ্বপ্রকৃতির উদার ক্ষেত্রে আমি এদের মুক্তি দেব। কিন্তু ক্রমশ আমার মনে হল যে, মানুষে মানুষে যে ভীষণ ব্যবধান আছে তাকে অপসারিত করে মানুষকে সর্বমানবের বিরাট লোকে মুক্তি দিতে হবে। আমার বিদ্যালয়ের পরিণতির ইতিহাসের সঙ্গে সেই আন্তরিক আকাঙ্ক্ষাটি অভিব্যক্ত হয়েছিল। কারণ বিশ্বভারতী নামে যে প্রতিষ্ঠান তা এই আহ্বান নিয়ে স্থাপিত হয়েছিল যে, মানুষকে শুধু প্রকৃতির ক্ষেত্রে নয়, ~~কিন্তু~~ মানুষের মধ্যে মুক্তি দিতে হবে। নিজের ঘরের নিজের দেশের মধ্যে যে মুক্তি তা হল ছোটো কথা: তাতে করে সত্য খণ্ডিত হয়, আর সেজন্যই জগতে অশান্তির সৃষ্টি হয়। ইতিহাসে বারে বারে পদে পদে এই সত্যের বিচ্যুতি হয়েছে বলে মানুষ পীড়িত হয়েছে, বিদ্রোহানল জ্বালিয়েছে। মানুষে মানুষে যে সত্য, ‘আত্মবৎ সর্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স পশ্যতি’, এই কথার মধ্যে যে বিশ্বজনীন সত্য আছে তা মানুষ মানে নি, স্বদেশের

গণ্ডিতে আপনাদের আবদ্ধ করেছে। মানুষ যে পরিমাণে এই ঐক্যকে স্বীকার করেছে সে পরিমাণে সে যথার্থ সত্যকে পেয়েছে, আপনার পূর্ণপরিচয় লাভ করেছে।

এ কথা আজকার দিনে যদি আমরা না উপলব্ধি করি তবে কি তার দণ্ড নেই। মানুষের এই বড়ো সত্যের অপলাপ হলে যে বিষম ক্ষতি, তা কি আমাদের জানতে হবে না। মানুষ মানুষকে পীড়া দেয় এত বড়ো অন্যায় আচরণ আমাদের নিবারণ করতে হবে, বিশ্বভারতীতে আমরা সেই সত্য স্বীকার করব বলে এসেছি। অন্যেরা যে কাজেরই ভার নিন-না— বণিক বাণিজ্যবিস্তার করুন, ধনী ধনসঞ্চয় করুন, কিন্তু এখানে সর্বমানবের যোগসাধনের সেতু রচিত হবে। অতিথিশালার দ্বার খুলবে, যার চৌমাথায় দাঁড়িয়ে আমরা সকলকে আহ্বান করতে কুণ্ঠিত হব না। এই মিলনক্ষেত্রে আমাদের ভারতীয় সম্পদকে ভুললে চলবে না, সেই ঐশ্বর্যের প্রতি একান্ত আস্থা স্থাপন করে তাকে শ্রদ্ধায় গ্রহণ করতে হবে। বিক্রমাদিত্য উজ্জয়িনীতে যে প্রাসাদসৌধ নির্মাণ করেছিলেন আজ তো তার কোনো চিহ্ন নেই; ঐতিহাসিকেরা তাঁর গোষ্ঠীগোত্রের আজ পর্যন্ত মীমাংসা করতে পারল না। কিন্তু কালিদাস যে কাব্য রচনা করে গেছেন তার মধ্যে কোনো স্থানবিচার নেই; তা তো শুধু ভারতীয় নয়, তা যে চিরন্তন সর্বদেশের সর্বকালের সম্পদ হয়ে রইল। যখন সবাই বলবে যে, এটা আমার, আমি পেলুম, তখনই তা যথার্থ দেওয়া হল। এই-যে দেবার অধিকার লাভ করা, এর জন্য উৎসাহ চাই, সাধনার উদ্যম চাই। আমাদের কৃপণতা করলে চলবে না। কোনো বড়ো সম্পদকে গ্রহণ ও প্রচার করতে হলে বিপুল আনন্দে সমস্ত আঘাত অপমান সহ্য করে অকাতরে সব ত্যাগ করতে হবে। পৃথিবীর দেয়ালি-উৎসবে ভারতের যে প্রদীপ জ্বলবে সেই প্রদীপশিখার যেন অস্বীকৃতি না ঘটে, বিদ্রূপের দ্বারা যেন তাকে আচ্ছন্ন না করি। আত্মপ্রকাশের পথ অবারিত হোক, ত্যাগের দ্বারা আনন্দিত হও।

আজকার উৎসবের দিনে আমাদের এই প্রার্থনা যে, সকল অন্ধকার ও অসত্য থেকে আমাদের জ্যোতিতে নিয়ে যাও— সোনা-হীরা-মাণিক্যের জ্যোতি নয়, কিন্তু অধ্যাত্মলোকের জ্যোতিতে নিয়ে যাও। ভারতবর্ষ আজ এই প্রার্থনা জানাচ্ছে যে, তাকে মৃত্যু থেকে অমৃতলোকে নিয়ে যাও। আমরা অকিঞ্চন হলেও তবু আমাদের কণ্ঠ থেকে সকল মানুষের জন্য এই প্রার্থনা ধ্বনিত হোক। আনন্দস্বরূপ, তোমার প্রকাশ পূর্ণ হোক। রুদ্র, তোমার রুদ্রতার মধ্যে অনেক দুঃখদারিদ্র্য আছে— আমরা যেন বলতে পারি যে, সেই ঘন মেঘের আবরণ ভেদ করেও তোমার দক্ষিণ মুখ দেখেছি। 'বেদাহম্'— জেনেছি। 'আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ'— অন্ধকারেরই ওপার থেকে দেখেছি জ্যোতির রূপ। তাই অন্ধকারকে আর ভয় করি নে। যে অন্ধকার নিজেদের ছোটো গণ্ডির মধ্যেই আমাদের ছোটো পরিচয়ে আবদ্ধ করে তাকে স্বীকার করি নে। যে আলো সকলের কাছে আমাদের প্রকাশ করে এবং সকলকে আমাদের কাছে প্রকাশ করে আমরা তারই অভিনন্দন করি।

শান্তিনিকেতন
৭ পৌষ ১৩৩০

১১

আজ আমার আর একবার আশ্রম থেকে দূরে যাবার সময় উপস্থিত হয়েছে, হয়তো কিছু দীর্ঘকালের জন্যে এবার বিদেশে আমাকে কাটাতে হবে। যাবার পূর্বে আর একবার এই আশ্রম সম্বন্ধে, এই কর্ম সম্বন্ধে আমাদের যা কথা আছে তা সুস্পষ্ট করে বলে যেতে চাই।

আজ আমার চোখের সামনে আমাদের আশ্রমের এই বর্তমান ছবি—এই ছাত্রনিবাস কলাভবন গ্রন্থাগার অতিথিশালা, সব স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে। ভাবছি, কী করে এর আরম্ভ, এর পরিণাম কোথায়। সকলের চেয়ে এইটেই আশ্চর্য যে, যে লোক একেবারে অযোগ্য—মনে করবেন না এ কোনোরকম কৃত্রিম বিনয়ের কথা —তাকে দিয়ে এই কাজ সাধন করে নেবার বিধান। ছাত্রদের যেদিন এখানে আহ্বান করলুম সেদিন আমার হাতে কেবল যে অর্থ ছিল না তা নয়, একটা বড়ো ঋণভারে তখন আমি একান্ত বিপন্ন। তা শোধ করবার কোনো উপায় আমার ছিল না। তার পরে বিদ্যাশিক্ষা দেওয়া সম্বন্ধে আমার যে কত অক্ষমতা ছিল তা সকলেই জানেন। আমি ভালো করে পড়ি নি, আমাদের দেশে যে শিক্ষাপ্রণালী প্রচলিত ছিল তার সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল না। সব রকমের অযোগ্যতা এবং দৈন্য নিয়ে কাজে নেমেছিলুম। এর আরম্ভ অতি ক্ষীণ এবং দুর্বল ছিল. গুটি-পাঁচেক ছাত্র ছিল। ছাত্রদের কাছ থেকে বেতন নিতুম না; ছেলেদের অন্নবস্ত্র. প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী যেমন করে হোক আমাকেই জোগাতে হত, অধ্যাপকদের সাংসারিক অভাব মোচন করতে হত। বৎসরের পর বৎসর যায়, অর্থাভাব সমানই রইল, বিদ্যালয় বাড়তে লাগল। দেখা গেল, বেতন না নিলে বিদ্যালয় রক্ষা করা যায় না। বেতনের প্রবর্তন হল; কিন্তু অভাব দূর হল না। আমার গ্রন্থের স্বত্ব কিছু কিছু করে বিক্রয় করতে হল। এদিকে ওদিকে দু-একটা যা সম্পত্তি ছিল তা গেল, অলংকার বিক্রয় করলুম—নিজের সংসারকে রিক্ত করে কাজ চালাতে হল। কী দুঃসাহসে তখন প্রবৃত্ত হয়েছিলুম জানি নে। স্বপ্নের ঘোরে যে মানুষ দুর্গম পথে ঘুরে বেড়িয়েছে সে যেমন জেগে উঠে কেঁপে ওঠে, আজ পিছন দিকে যখন তাকিয়ে দেখি তখন আমারও সেই রকমের হৃৎকম্প হয়।

অথচ এটি সামান্যই একটি বিদ্যালয় ছিল। কিন্তু এই সামান্য ব্যাপারটি নিয়েই আবাল্য-কালের সাহিত্যসাধনাও আমাকে অনেক পরিমাণে বর্জন করতে হল। এর কারণ কী, এত আকর্ষণ কিসের। এই প্রশ্নের যে উত্তর আমার মনে আসছে সেটা আপনাদের কাছে বলি। অতি গভীরভাবে নিবিড়ভাবে এই বিশ্ব-প্রকৃতিকে শিশুকাল থেকে আমি ভালোবেসেছি। আমি খুব প্রবলভাবেই অনুভব করেছি যে, শহরের জীবনযাত্রা আমাদের চার দিকে যন্ত্রের প্রাচীর তুলে দিয়ে বিশ্বের সঙ্গে আমাদের বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিয়েছে। এখানকার আশ্রমে, প্রকৃতির প্রাণনিকেতনের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে, বসন্ত-শরতের পুষ্পোৎসবে ছেলেদের যে স্থান করে দিয়েছি তারই আনন্দে দুঃসাধ্য ত্যাগের মধ্যে আমাকে ধরে রেখেছিল। প্রকৃতি-মাতা যে অমৃত পরিবেশন করেন সেই অমৃত গানের সঙ্গে মিলিয়ে নানা আনন্দ-অনুষ্ঠানের মধ্যে ফলিয়ে এদের সকলকে বিতরণ করেছি। এরই সফলতা প্রতিদিন আমাকে উৎসাহ দিয়েছে। আর যে একটি কথা অনেক দিন থেকে আমার মনে জেগে ছিল সে হচ্ছে এই যে, ছাত্র ও শিক্ষকের সম্বন্ধ অত্যন্ত সত্য হওয়া দরকার। মানুষের পরস্পরের মধ্যে সকল প্রকার ব্যাপারেই দেনাপাওনার সম্বন্ধ।

কখনও বেতন দিয়ে, কখনও ত্যাগের বিনিময়ে, কখনও-বা জবরদস্তির দ্বারা মানুষ এই দেওয়া-নেওয়ার প্রবাহকে দিনরাত চালিয়ে রাখছে। বিদ্যা যে দেবে এবং বিদ্যা যে নেবে তাদের উভয়ের মাঝখানে যে সেতু সেই সেতুটি হচ্ছে ভক্তিস্নেহের সম্বন্ধ। সেই আত্মীয়তার সম্বন্ধ না থেকে যদি কেবল শুষ্ক কর্তব্য বা ব্যবসায়ের সম্বন্ধই থাকে তা হলে যারা পায় তারা হতভাগ্য, যারা দেয় তারাও হতভাগ্য। সাংসারিক অভাব মোচনের জন্য বাহিরের দিক থেকে শিক্ষককে বেতন নিতে হয়, কিন্তু তাঁর অন্তরের সম্বন্ধ সত্য হওয়া চাই। এ আদর্শ আমাদের বিদ্যালয়ে সেদিন অনেক দূর পর্যন্ত চালাতে পেরেছিলুম। তখন শিক্ষকেরা ছাত্রদের সঙ্গে একসঙ্গে বেড়িয়েছেন, খেলা করেছেন, তাদের সঙ্গে তাঁদের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ ছিল। ভাষা কি ইতিহাস কি ভূগোল নূতন উৎকৃষ্ট প্রণালীতে কী শিখিয়েছি না-শিখিয়েছি জানি নে, কিন্তু যে জিনিসটাকে কোনো বিদ্যালয়ে কেউ অত্যাবশ্যক বলে মনে করে না, অথচ যা সবচেয়ে বড়ো জিনিস, আমাদের বিদ্যালয়ে তার স্থান হয়েছে মনে করে আনন্দে অন্যসকল অভাব ভুলে ছিলুম।

ক্রমে আমাদের সেই অতি ছোটো বিদ্যালয় বড়ো হয়েছে। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ থেকে আপনারা অনেকে সমাগত হয়েছেন, ছাত্ররাও বিভিন্ন প্রদেশ থেকে এসেছে। ক্রমে এর সীমা আরও দূরে প্রসারিত হল, বিদেশ থেকে বন্ধুরা এসে এই কাজে যোগ দিলেন। যা প্রচ্ছন্ন ছিল তা কোনোদিন যে এমন ব্যাপকভাবে প্রকাশমান হবে তা কখনও ভাবি নি।

আমরা চেষ্টা করি নি, আমরা প্রত্যাশা করি নি। চিরদিন অল্প আয়োজন এবং অল্প শক্তিতেই আমরা একান্তে কাজ করেছি। তবু আমাদের এই প্রতিষ্ঠান যেন নিজেরই অন্তর্গূঢ় স্বভাব অনুসরণ করে বিশ্বের ক্ষেত্রে নিজেকে ব্যক্ত করেছে। পাশ্চাত্ত্য দেশের যেসব মনীষী এখানে এসেছিলেন— লেভি, উইণ্টারনিট্জ, লেস্নি, তাঁরা যে এমন কিছু এখানে পেয়েছিলেন যা বাংলাদেশের কোণের মধ্যে বদ্ধ নয়, তা থেকে বুঝতে পারি এখানে কোনো একটি সত্যের প্রকাশ হয়েছে। তাঁরা যে আনন্দ যে শ্রদ্ধা যে উৎসাহ অনুভব করে গেছেন তা যে এখানে আমাদের সকলের মধ্যে স্ফূর্তি পাচ্ছে তা নয়, তৎসত্ত্বেও এখানকার বাতাসের মধ্যে এমন কোনো একটা সার্থকতা আছে যার স্পর্শে দূরাগত অতিথিরা অন্তরঙ্গ সুহৃদ হয়ে উঠেছেন, যাঁরা কিছুদিনের জন্যে এসেছিলেন তাঁদের সঙ্গে চিরকালের যোগ ঘটেছে।

আজ ভেদবুদ্ধি ও বিদ্বেষবুদ্ধি সমস্ত পৃথিবীতে আগুন লাগিয়েছে, মানুষে মানুষে এমন জগদ্ব্যাপী পরম-শত্রুতার সংঘাত প্রাচীন ইতিহাসে নেই। দেশে-দেশান্তরে এই আগুন ছড়িয়ে গেল। প্রাচ্য মহাদেশে আমরা বহু শতাব্দী ঘুমিয়ে ছিলুম, আমরা যে জাগলুম সে এরই আঘাতে। জাপান মার খেয়ে জেগেছে। ভারতবর্ষ থেকে প্রেমের দৌত্য একদিন তাকে জাগিয়েছিল, আজ লোভ এসে ঘা দিয়ে ভয়ে তাকে জাগিয়েছে। লোভের দন্তের ঘা খেয়ে যে জাগে সে অন্যকেও ভয় দেখায়। জাপান কোরিয়াকে মারলে, চীনকে মারতে গিয়েছিল।

মানুষের আজ কী অসহ্য বেদনা। দাসত্বে ব্রতী হয়ে কত কলে সে ক্লিষ্ট হচ্ছে— মানুষের পূর্ণতা সর্বত্র পীড়িত। মনুষ্যত্বের এই-যে খর্বতা, সমস্ত পৃথিবী জুড়ে যন্ত্রদেবতার এই-যে পূজা, এই-যে আত্মহত্যা, পৃথিবীর কোথাও একে নিরস্ত করবার প্রয়াস কি থাকবে না। আমরা দরিদ্র, অন্য জাতির অধীন, তাই বলেই কি মানুষ তার সত্য সম্পদ আমাদের কাছ থেকে নেবে না। যদি

সাধনা সত্য হয়, অন্তরে আমাদের বাণী থাকে, তবে মাথা হেঁট করে সকলকে নিতেই হবে।

একদিন বুদ্ধ বললেন, 'আমি সমস্ত মানুষের দুঃখ দূর করব।' দুঃখ তিনি সত্যই দূর করতে পেরেছিলেন কি না সেটি বড়ো কথা নয়; বড়ো কথা হচ্ছে, তিনি এটি ইচ্ছা করেছিলেন, সমস্ত জীবের জন্য নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন। ভারতবর্ষ ধনী হোক প্রবল হোক, এ তাঁর তপস্যা ছিল না; সমস্ত মানুষের জন্য তিনি সাধনা করেছিলেন। আজ ভারতের মাটিতে আবার সেই সাধনা জেগে উঠুক সেই ইচ্ছাকে ভারতবর্ষ থেকে কি দূর করে দেওয়া চলে। আমি যে বিশ্বভারতীকে এই ভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত করতে পারি নি সে আমার নিজেরই দৈন্য— আমি যদি সাধক হতুম, সে একাগ্রতার শক্তি যদি আমার থাকত, তবে সব আপনিই হত। আজ অত্যন্ত নম্রভাবে সানুনয়ে আপনাদের জানাচ্ছি, আমি অযোগ্য, তাই এ কাজ আমার একলার নয়, এ সাধনা আপনাদের সকলের। এ আপনাদের গ্রহণ করতে হবে।

বিদেশে যখন যাই তখন সর্বমানুষের সম্বন্ধে আমাদের দেশে চৈতন্যের যে ক্ষীণতা আছে তা ভুলে যাই, ভারতের যজ্ঞক্ষেত্রে সকলকে আহ্বান করি। ফিরে এসে দেখি, এখানে সে বৃহৎ ভূমিকা কোথায়, বৃহৎ জগতের মাঝখানে যে আমরা আছি সে দৃষ্টি কোথায়। আমার শক্তি নেই, কিন্তু মনে ভরসা ছিল, বিশ্বের মর্মস্থান থেকে যে ডাক এসেছে তা অনেকেই শুনতে পাবে, অনেকে একত্র মিলিত হবে। সেই বোধের বাধা আমাদের আশ্রম থেকে যেন সর্বপ্রযত্নে দূর করি, রিপুর প্রভাব-জনিত যে দুঃখ তা থেকে যেন বাঁচি। হয়তো আমাদের সাধনা সিদ্ধ হবে, হয়তো হবে না। আমি গীতার কথা অন্তরের সঙ্গে মানি— ফলে লোভ করলে আপনাকে ভোলাব, অন্যকে ভোলাব। আমাদের কাজ বাইরে থেকে খুবই সামান্য— কটিই বা আমাদের ছাত্র, কটিই বা বিভাগ, কিন্তু অন্তরের দিক থেকে এর অধিকারের সীমা নেই। আমাদের সকলের সম্মিলিত চিত্ত সেই অধিকারকে দৃঢ় করুক, সেই অধিকারকে অবলম্বন করে বিচিত্র কল্যাণের সৃষ্টি করুক— সেই সৃষ্টির আনন্দ এবং তপোদুঃখ আমাদের হোক। ছোটো ছোটো মতের অনৈক্য, স্বার্থের সংঘাত ভুলে গিয়ে সাধনাকে আমরা বিশুদ্ধ রাখব, সেই উৎসাহ আমাদের আসুক। আমার নিজের চিত্তের তেজ যদি বিশুদ্ধ ও উজ্জ্বল থাকত তা হলে আমি গুরুর আসন থেকে এই দাবি করতুম। কিন্তু আমি আপনাদের সঙ্গে এক পথেরই পথিক মাত্র; আমি চালনা করতে পারি নে, চাই নে। আপনারা জানেন, আমার যা দেবার তা দিয়েছি, কৃপণতা করি নি। তাই আপনাদের কাছ থেকে ভিক্ষা করবার অধিকার আমার আজ হয়েছে।

শান্তিনিকেতন
১৭ ভাদ্র ১৩৩১

১২

একদিন আমাদের এখানে যে উদ্যোগ আরম্ভ হয়েছিল সে অনেক দিনের কথা। আমাদের একটি পূর্বতন ছাত্র সেদিনকার ইতিহাসের একটি খণ্ডকালকে কয়েকটি চিঠিপত্র ও মুদ্রিত বিবরণীর ভিতর দিয়ে আমার সামনে এনে দিয়েছিল। সেই ছাত্রটি এই বিদ্যায়তনের প্রতিষ্ঠা থেকেই এর সঙ্গে যুক্ত ছিল। কাল রাত্রে সেদিনকার ইতিকথার ছিন্নলিপি যখন পড়ে দেখছিলুম তখন মনে পড়ল, কী ক্ষীণ আরম্ভ, কত তুচ্ছ আয়োজন। সেদিন যে মূর্তি এই আশ্রমের শালবীথিচ্ছায়ায় দেখা দিয়েছিল, আজকের দিনের বিশ্বভারতীর রূপ তার মধ্যে এতই প্রচ্ছন্ন ছিল যে, সে কারও কল্পনাতেও আসতে পারত না। এই অনুষ্ঠানের প্রথম সূচনা-দিনে আমরা আমাদের পুরাতন আচার্যদের আহ্বানমন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেম— যে মন্ত্রে তাঁরা সকলকে ডেকে বলেছিলেন, 'আয়ন্তু সর্বতঃ স্বাহা'; বলেছিলেন, 'জলধারাসকল যেমন সমুদ্রের মধ্যে এসে মিলিত হয় তেমনি করে সকলে এখানে মিলিত হোক।' তাঁদেরই আহ্বান আমাদের কণ্ঠে ধ্বনিত হল, কিন্তু ক্ষীণকণ্ঠে। সেদিন সেই বেদমন্ত্র-আবৃত্তির ভিতরে আমাদের আশা ছিল, ইচ্ছা ছিল। কিন্তু আজ যে প্রাণের বিকাশ আমরা অনুভব করছি, সুস্পষ্টভাবে সেটা আমাদের গোচর ছিল না। এই বিদ্যালয়ের প্রচ্ছন্ন অন্তঃস্তর থেকে সত্যের বীজ আমার জীবিতকালের মধ্যেই অঙ্কুরিত হয়ে বিশ্বভারতী রূপে বিস্তার লাভ করবে, ভরসা করে এই কল্পনাকে সেদিন মনে স্থান দিতে পারি নি। কোনো একদিন বিরাট ভারতবর্ষ এই আশ্রমের মধ্যে আসন পাতবে, এই ভারতবর্ষ—যেখানে নানা জাতি নানা বিদ্যা নানা সম্প্রদায়ের সমাবেশ, সেই ভারতবর্ষের সকলের জন্যই এখানে স্থান প্রশস্ত হবে, সকলেই এখানে আতিথ্যের অধিকার পাবে, এখানে পরস্পরের সম্মিলনের মধ্যে কোনো বাধা কোনো আঘাত থাকবে না, এই সংকল্প আমার মনে ছিল। তখন একান্ত মনে এই ইচ্ছা করেছিলেম যে, ভারতবর্ষের আর সর্বত্রই আমরা বন্ধনের রূপ দেখতে পাই, কিন্তু এখানে আমরা মুক্তির রূপকেই যেন স্পষ্ট দেখি। যে বন্ধন ভারতবর্ষকে জর্জরিত করেছে সে তো বাইরে নয়, সে আমাদেরই ভিতরে। যাতেই বিচ্ছিন্ন করে তাই যে বন্ধন। যে কারারুদ্ধ সে বিচ্ছিন্ন বলেই বন্দী। ভেদবিভেদের প্রকাণ্ড শৃঙ্খলের অসংখ্য চক্র সমস্ত ভারতবর্ষকে ছিন্নবিচ্ছিন্নতায় পীড়িত ক্লিষ্ট করে রেখেছে, আত্মীয়তার মধ্যে মানুষের যে মুক্তি সেই মুক্তিকে প্রত্যেক পদে বাধা দিচ্ছে, পরস্পর-বিভিন্নতাই ক্রমে পরস্পর-বিরোধিতার দিকে আমাদের আকর্ষণ করে নিয়ে যাচ্ছে। এক প্রদেশের সঙ্গে অন্য প্রদেশের অনৈক্যকে আমরা রাষ্ট্রনৈতিক বক্তৃতা-মঞ্চে বাক্যকুহেলিকার মধ্যে ঢাকা দিয়ে রাখতে চাই, কিন্তু জীবনের ক্ষেত্রে পরস্পর সম্বন্ধে ঈর্ষা অবজ্ঞা আত্মপর-ভেদবুদ্ধি কেবলই যখন কণ্টকিত হয়ে ওঠে তখন সেটার সম্বন্ধে আমাদের লজ্জাবোধ পর্যন্ত থাকে না। এমনি করে পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতার আশা দূরে থাক্, পরস্পরের মধ্যে পরিচয়ের পথও সুগভীর ঔদাসীন্যের দ্বারা বাধাগ্রস্ত।

যে অন্ধকারে ভারতবর্ষে আমরা পরস্পরকে ভালো করে দেখতে পাই নে সেইটেই আমাদের সকলের চেয়ে দুর্বলতার কারণ। রাতের বেলায় আমাদের ভয়ের প্রবৃত্তি প্রবল হয়ে ওঠে, অথচ সকালের আলোতে সেটা দূর হয়ে যায়। তার প্রধান কারণ, সকালে আমরা সকলকে দেখতে পাই, রাত্রে আমরা নিজেকে স্বতন্ত্র করে

দেখি। ভারতবর্ষে সেই রাত্রি চিরন্তন হয়ে রয়েছে। মুসলমান বলতে কী বোঝায় তা সম্পূর্ণ করে আপনার করে, অর্থাৎ রামমোহন রায় যেমন করে জানতেন, তা খুব অল্প হিন্দুই জানেন। হিন্দু বলতে কী বোঝায় তাও বড়ো করে আপনার করে, অর্থাৎ দারাশিকো একদিন যেমন করে বুঝেছিলেন, তাও অল্প মুসলমানই জানেন। অথচ এইরকম গভীর ভাবে জানার ভিতরেই পরস্পরের ভেদ ঘোচে।

কিছুকাল থেকে আমরা কাগজে পড়ে আসছি, পঞ্জাবে অকালি শিখ সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি প্রবল ধর্ম-আন্দোলন জেগে উঠেছে, যার প্রবর্তনায় তারা দলে দলে নির্ভয়ে বধবন্ধনকে স্বীকার করেছে। কিন্তু অন্য শিখদের সঙ্গে তাদের পার্থক্য কোথায়, কোন্‌খানে তারা এত প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছে, ও কোন্‌ সত্যের প্রতি শ্রদ্ধাবশত তারা সেই আঘাতের সঙ্গে প্রাণান্তকর সংগ্রাম করে জয়ী হয়েছে সে সম্বন্ধে আমাদের দরদের কথা দূরে থাক্‌, আমাদের জিজ্ঞাসাবৃত্তি পর্যন্ত জাগে নি। অথচ কেবলমাত্র কথার জোরে এদের নিয়ে রাষ্ট্রীয় ঐক্যতন্ত্র সৃষ্টি করব বলে কল্পনা করতে কোথাও আমাদের বাধে না। দাক্ষিণাত্যে যখন মোপ্‌লা-দৌরাত্ম্য নিষ্ঠুর হয়ে দেখা দিল তখন সে সম্বন্ধে বাংলাদেশে আমরা সে পরিমাণেও বিচলিত হই নি যতটা হলে তাদের ধর্ম সমাজ ও আর্থিক কারণ-ঘটিত তথ্য জানবার জন্য আমাদের জ্ঞানগত উত্তেজনা জন্মাতে পারে। অথচ এই মালাবারের হিন্দু ও মোপ্‌লাদের নিয়ে মহাজাতিক ঐক্য স্থাপন করা সম্বন্ধে অন্তত বাক্যগত সংকল্প আমরা সর্বদাই প্রকাশ করে থাকি।

আমাদের শাস্ত্রে বলে, অবিদ্যা অর্থাৎ অজ্ঞানের বন্ধনই বন্ধন। এ কথা সকল দিকেই খাটে। যাকে জানি নে তার সম্বন্ধেই আমরা যথার্থ বিচ্ছিন্ন। কোনো বিশেষ দিনে তাকে গলা জড়িয়ে আলিঙ্গন করতে পারি, কেননা সেটা বাহ্য: তাকে বন্ধু সম্ভাষণ করে অশ্রুপাত করতে পারি, কেননা সেটাও বাহ্য; কিন্তু ‘উৎসবে ব্যসনে চৈব দুর্ভিক্ষে রাষ্ট্রবিপ্লবে রাজদ্বারে শ্মশানে চ’ আমরা সহজ প্রীতির অনিবার্য আকর্ষণে তাদের সঙ্গে সাযুজ্য রক্ষা করতে পারি নে। কারণ যাদের আমরা নিবিড়ভাবে জানি তারাই আমাদের জ্ঞাতি। ভারতবর্ষের লোক পরস্পরের সম্বন্ধে যখন মহাজ্ঞাতি হবে তখনই তারা মহাজাতি হতে পারবে।

সেই জানবার সোপান তৈরি করার দ্বারা মেলবার শিখরে পৌঁছবার সাধনা আমরা গ্রহণ করেছি। একদা যেদিন সুহৃদ্‌বর বিধুশেখর শাস্ত্রী ভারতের সর্ব সম্প্রদায়ের বিদ্যাগুলিকে ভারতের বিদ্যাক্ষেত্রে একত্র করবার জন্য উদ্যোগী হয়েছিলেন তখন আমি অত্যন্ত আনন্দ ও উৎসাহ বোধ করেছিলেম। তার কারণ, শাস্ত্রীমশায় প্রাচীন ব্রাহ্মণপণ্ডিতদের শিক্ষাধারার পথেই বিদ্যালাভ করেছিলেন। হিন্দুদের সনাতন শাস্ত্রীয় বিদ্যার বাহিরে যেসকল বিদ্যা আছে তাকেও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করতে পারলে তবেই যে আমাদের শিক্ষা উদারভাবে সার্থক হতে পারে, তাঁর মুখে এ কথার সত্য বিশেষভাবে বল পেয়ে আমার কাছে প্রকাশ পেয়েছিল। আমি অনুভব করেছিলেম, এই ঔদার্য, বিদ্যার ক্ষেত্রে সকল জাতির প্রতি এই সসম্মান আতিথ্য, এইটিই হচ্ছে যথার্থ ভারতীয়। সেই কারণেই ভারতবর্ষ পুরাকালে যখন গ্রীক-রোমকদের কাছ থেকে জ্যোতির্বিদ্যার বিশেষ পন্থা গ্রহণ করেছিলেন তখন ম্লেচ্ছগুরুদের ঋষিকল্প বলে স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হন নি। আজ যদি এ সম্বন্ধে আমাদের কিছুমাত্র কৃপণতা ঘটে থাকে তবে জানতে হবে, আমাদের মধ্যে সেই বিশুদ্ধ ভারতীয় ভাবের বিকৃতি ঘটেছে।

এ দেশের নানা জাতির পরিচয়ের উপর ভারতের যে আত্মপরিচয় নির্ভর করে,

এখানে কোনো-এক জায়গায় তার তো সাধনা থাকা দরকার। শান্তিনিকেতনে সেই সাধনার প্রতিষ্ঠা ধ্রুব হোক, এই ভাবনাটি এই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আমাদের লক্ষ্যে ও অলক্ষ্যে বিরাজ করছে। কিন্তু আমার সাধ্য কী। সাধ্য থাকলেও এ যদি আমার একলারই সৃষ্টি হয় তা হলে এর সার্থকতা কী। যে দীপ পথিকের প্রত্যাশায় বাতায়নে অপেক্ষা করে থাকে সেই দীপটুকু জ্বেলে রেখে দিয়ে আমি বিদায় নেব, এইটুকুমাত্রই আমার ভরসা ছিল।

তার পরে অসংখ্য অভাব দৈন্য বিরোধ ও ব্যাঘাতের ভিতর দিয়ে দুর্গম পথে একে বহন করে এসেছি। এর অন্তর্নিহিত সত্য ক্রমে আপনার আবরণ মোচন করতে করতে আজ আমাদের সামনে অনেকটা পরিমাণে সুস্পষ্ট রূপ ধারণ করেছে। আমাদের আনন্দের দিন এল। আজ আপনারা এই-যে সমবেত হয়েছেন, এ আমাদের কত বড়ো সৌভাগ্য। এর সদস্য, যাঁরা নানা কর্মে ব্যাপৃত, এর সঙ্গে তাঁদের যোগ ক্রমে ক্রমে যে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে, এ আমাদের কত বড়ো সৌভাগ্য।

এই কর্মানুষ্ঠানটিকে বহুকাল একলা বহন করার পর যেদিন সকলের হাতে সমর্পণ করলুম সেদিন মনে এই দ্বিধা এসেছিল যে, সকলে একে শ্রদ্ধা করে গ্রহণ করবেন কি না। অন্তরায় অনেক ছিল, এখনও আছে। তবুও সংশয় ও সংকোচ থাকা সত্ত্বেও একে সম্পূর্ণভাবেই সকলের কাছে নিবেদন করে দিয়েছি। কেউ যেন না মনে করেন, এটা একজন লোকের কীর্তি, এবং তিনি এটাকে নিজের সঙ্গেই একান্ত করে জড়িয়ে রেখেছেন। যাকে এত দীর্ঘকাল এত করে পালন করে এসেছি তাকে যদি সাধারণের কাছে শ্রদ্ধেয় করে থাকি সে আমার সবচেয়ে বড়ো সৌভাগ্য। সেদিন আজ এসেছে বলি নে, কিন্তু সে দিনের সূচনাও কি হয় নি? যেমন সেই প্রথম দিনে আজকের দিনের সম্ভাবনা কল্পনা করতে সাহস পাই নি, অথচ এই ভবিষ্যৎকে গোপনে সে বহন করেছিল, তেমনি ভারতবর্ষের দূর ইতিহাসে এই বিশ্বভারতীর যে পূর্ণ অভিব্যক্তি হবে তা প্রত্যয় করব না কেন। সেই প্রত্যয়ের দ্বারাই এর প্রকাশ বল পেয়ে ধ্রুব হয়ে ওঠে, এ কথা আমাদের মনে রাখতে হবে। এর প্রমাণ আরম্ভ হয়েছে যখন দেখতে পাচ্ছি আপনারা এর ভার গ্রহণ করেছেন। এই প্রতিষ্ঠানের দিক থেকে এটা বড়ো কথা, আবার আমার দিক থেকেও এ তো কম কথা নয়। কোনো একজন মানুষের পক্ষে এর ভার দুঃসহ। এই ভারকে বহন করবার অনুকূলে আমার আন্তরিক প্রত্যয় ও প্রত্যাশার আনন্দ যদিও আমাকে বল দিয়েছে, তবু আমার শক্তির দৈন্য কোনোদিনই ভুলতে অবকাশ পাই নি। কত অভাব কত অসামর্থ্যের দ্বারা এত কাল প্রত্যহ পীড়িত হয়ে এসেছি, বাইরের অকারণ প্রতিকূলতা একে কত দিক থেকে ক্ষুণ্ণ করেছে। তবু এর সমস্ত ত্রুটি অসম্পূর্ণতা, এর সমস্ত দারিদ্র্য সত্ত্বেও আপনারা একে শ্রদ্ধা করে পালন করবার ভার নিয়েছেন, এতে আমাকে যে কত দয়া করেছেন তা আমিই জানি। সেজন্য ব্যক্তিগতভাবে আজ আপনাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞতা নিবেদন করছি।

এই প্রতিষ্ঠানের বাহ্যায়তনটিকে সুচিন্তিত বিধি-বিধান দ্বারা সুসম্বদ্ধ করবার ভার আপনারা নিয়েছেন। এই নিয়ম-সংঘটনের কাজ আমি যে সম্পূর্ণ বুঝি তা বলতে পারি নে, শরীরের দুর্বলতা-বশত সব সময়ে এতে আমি যথেষ্ট মন দিতেও অক্ষম হয়েছি। কিন্তু নিশ্চিত জানি, এই অঙ্গবন্ধনের প্রয়োজন আছে। জলের পক্ষে জলাশয়ের উপযোগিতা কে অস্বীকার করবে। সেইসঙ্গে এ কথাও মনে রাখা চাই যে, চিত্ত দেহে বাস করে বটে কিন্তু দেহকে অতিক্রম করে। দেহ বিশেষ সীমায় বদ্ধ, কিন্তু চিত্তের বিচরণক্ষেত্র সমস্ত বিশ্বে। দেহব্যবস্থা অতিজটিলতার দ্বারা

চিত্তব্যাপ্তির বাধা যাতে না ঘটায় এ কথা আমাদের মনে রাখতে হবে। এই প্রতিষ্ঠানের কায়ারূপটির পরিচয় সম্প্রতি আমার কাছে সুস্পষ্ট ও সম্পূর্ণ নয়, কিন্তু এর চিত্তরূপটির প্রসার আমি বিশেষ করেই দেখেছি। তার কারণ, আমি আশ্রমের বাইরে দূরে দূরে বারবার ভ্রমণ করে থাকি। কতবার মনে হয়েছে, যাঁরা এই বিশ্বভারতীর যজ্ঞকর্তা তাঁরা যদি আমার সঙ্গে এসে বাইরের জগতে এর পরিচয় পেতেন তা হলে জানতে পারতেন কোন্ বৃহৎ ভূমির উপরে এর আশ্রয়। তা হলে বিশেষ দেশকাল ও বিধি-বিধানের অতীত এর মুক্তরূপটি দেখতে পেতেন। বিদেশের লোকের কাছে ভারতের সেই প্রকাশ সেই পরিচয়ের প্রতি প্রভূত শ্রদ্ধা দেখেছি যা ভারতের ভূ-সীমানার মধ্যে বদ্ধ হয়ে থাকতে পারে না, যা আলোর মতো দীপকে ছাড়িয়ে যায়। এর থেকে এই বুঝেছি, ভারতের এমন কিছু সম্পদ আছে যার প্রতি দাবি সমস্ত বিশ্বের। জাত্যভিমানের প্রবল উগ্রতা মন থেকে নিরস্ত করে নম্রভাবে সেই দাবি পূরণ করবার দায়িত্ব আমাদের। যে ভারত সকল কালের সকল লোকের, সেই ভারতে সকল কাল ও সকল লোককে নিমন্ত্রণ করবার ভার বিশ্বভারতীর।

কিছুদিন হল যখন দক্ষিণ-আমেরিকায় গিয়ে রুগ্নকক্ষে বদ্ধ ছিলাম তখন প্রায় প্রত্যহ আগন্তুকের দল প্রশ্ন নিয়ে আমার কাছে এসেছিলেন। তাঁদের সকল প্রশ্নের ভিতরকার কথাটা এই যে, পৃথিবীকে দেবার মতো কোন্ ঐশ্বর্য ভারতবর্ষের আছে। ভারতের ঐশ্বর্য বলতে এই বুঝি, যা-কিছু তার নিজের লোকের বিশেষ ব্যবহারে নিঃশেষ করবার নয়। যা নিয়ে ভারত দানের অধিকার আতিথ্যের অধিকার পায়: যার জোরে সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে সে নিজের আসন গ্রহণ করতে পারে; অর্থাৎ যাতে তার অভাবের পরিচয় নয়, তার পূর্ণতারই পরিচয়—তাই তার সম্পদ। প্রত্যেক বড়ো জাতির নিজের বৈষয়িক ব্যাপার একটা আছে, সেটাতে বিশেষভাবে তার আপন প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। তার সৈন্যসামন্ত-অর্থসামর্থ্যে আর কারও ভাগ চলে না। সেখানে দানের দ্বারা তার ক্ষতি হয়। ইতিহাসে ফিনিসীয় প্রভৃতি এমনসকল ধনী জাতির কথা শোনা যায় যারা অর্থ-অর্জনেই নিরন্তর নিযুক্ত ছিল। তারা কিছুই দিয়ে যায় নি, রেখে যায় নি; তাদের অর্থ যতই থাক্, তাদের ঐশ্বর্য ছিল না। ইতিহাসের জীর্ণ পাতার মধ্যে তারা আছে, মানুষের চিত্তের মধ্যে নেই। ইজিপ্ট গ্রীস রোম প্যালেস্টাইন চীন প্রভৃতি দেশ শুধু নিজের ভোজ্য নয় সমস্ত পৃথিবীর ভোগ্য সামগ্রী উৎপন্ন করেছে। বিশ্বের তৃপ্তিতে তারা গৌরবান্বিত। সেই কারণে সমস্ত পৃথিবীর প্রশ্ন এই, ভারতবর্ষ শুধু নিজেকে নয়, পৃথিবীকে কী দিয়েছে। আমি আমার সাধ্যমতো কিছু বলবার চেষ্টা করেছি এবং দেখেছি, তাতে তাদের আকাঙ্ক্ষা বেড়ে গেছে। তাই আমার মনে এই বিশ্বাস দৃঢ় হয়েছে যে, আজ ভারতবর্ষের কেবল যে ভিক্ষার ঝুলিই সম্বল তা নয়, তার প্রাঙ্গণে এমন একটি বিশ্বযজ্ঞের স্থান আছে যেখানে অক্ষয় আত্মদানের জন্য সকলকে সে আহ্বান করতে পারে।

সকলের জন্য ভারতের যে বাণী তাকেই আমরা বলি বিশ্বভারতী। সেই বাণীর প্রকাশ আমাদের বিদ্যালয়টুকুর মধ্যে নয়। শিব আসেন দরিদ্র ভিক্ষুকের মূর্তি ধরে, কিন্তু একদিন প্রকাশ হয়ে পড়ে সকল ঐশ্বর্য তাঁর মধ্যে। বিশ্বভারতী এই আশ্রমে দীন ছদ্মবেশে এসেছিল ছোটো বিদ্যালয়-রূপে। সেই তার লীলার আরম্ভ, কিন্তু সেখানেই তার চরম সত্য নয়। সেখানে সে ছিল ভিক্ষুক, মুষ্টিভিক্ষা আহরণ করছিল। আজ সে দানের ভাণ্ডার খুলতে উদ্যত। সেই ভাণ্ডার ভারতের।

বিশ্বপৃথিবী আজ অঙ্গনে দাঁড়িয়ে বলছে, 'আমি এসেছি।' তাকে যদি বলি, 'আমাদের নিজের দায়ে ব্যস্ত আছি, তোমাকে দেবার কথা ভাবতে পারি নে'—তার মতো লজ্জা কিছুই নেই। কেননা দিতে না পারলেই হারাতে হয়।

এ কথা অস্বীকার করবার জো নেই যে, বর্তমান যুগে সমস্ত পৃথিবীর উপরে য়ুরোপ আপন প্রভাব বিস্তার করেছে। তার কারণ আকস্মিক নয়, বাহ্যিক নয়। তার কারণ, যে বর্বরতা আপন প্রয়োজনটুকুর উপরেই সমস্ত মন দেয়, সমস্ত শক্তি নিঃশেষ করে, য়ুরোপ তাকে অনেক দূরে ছাড়িয়ে গেছে। সে এমন কোনো সত্যের নাগাল পেয়েছে যা সর্বকালীন সর্বজনীন, যা তার সমস্ত প্রয়োজনকে পরিপূর্ণ করে অক্ষয়ভাবে উদ্‌বৃত্ত থাকে। এই হচ্ছে তার বিজ্ঞান। এই বিজ্ঞানকে প্রকাশের দ্বারাই পৃথিবীতে সে আপনার অধিকার পেয়েছে। যদি কোনো কারণে য়ুরোপের দৈহিক বিনাশও ঘটে তবু এই সত্যের মূল্যে মানুষের ইতিহাসে তার স্থান কোনোদিন বিলুপ্ত হতে পারবে না। মানুষকে চিরদিনের মতো সে সম্পদশালী করে দিয়েছে, এই তার সকলের চেয়ে বড়ো গৌরব, এই তার অমরতা। অথচ এই য়ুরোপ যেখানে আপনার লোভকে সমস্ত মানুষের কল্যাণের চেয়ে বড়ো করেছে সেখানেই তার অভাব প্রকাশ পায়, সেখানেই তার খর্বতা, তার বর্বরতা। তার একমাত্র কারণ এই যে, বিচ্ছিন্নভাবে কেবল আপনটুকুর মধ্যে মানুষের সত্য নেই—পশুধর্মেই সেই বিচ্ছিন্নতা; বিনাশশীল দৈহিক প্রাণ ছাড়া যে পশুর আর কোনো প্রাণ নেই। যাঁরা মহাপুরুষ তাঁরা আপনার জীবনে সেই অনির্বাণ আলোককেই জ্বালেন, যার দ্বারা মানুষ নিজেকে সকলের মধ্যে উপলব্ধি করতে পারে।

পশ্চিম-মহাদেশ তার পলিটিক্সের দ্বারা বৃহৎ পৃথিবীকে পর করে দিয়েছে, তার বিজ্ঞানের দ্বারা বৃহৎ পৃথিবীকে নিমন্ত্রণ করেছে। বৃহৎকালের মধ্যে ইতিহাসের উদার রূপ যদি আমরা দেখতে পাই তা হলে দেখব, আত্মম্ভরি পলিটিক্সের দিকে য়ুরোপের আত্মাবমাননা, সেখানে তার অন্ধকার; বিজ্ঞানের দিকেই তার আলোক জ্বলেছে, সেখানেই তার যথার্থ আত্মপ্রকাশ; কেননা বিজ্ঞান সত্য, আর সত্যই অমরতা দান করে। বর্তমান যুগে বিজ্ঞানেই য়ুরোপকে সার্থকতা দিয়েছে, কেননা বিজ্ঞান বিশ্বকে প্রকাশ করে; আর তার সর্বভুক্‌ ক্ষুধিত পলিটিক্স তার বিনাশকেই সৃষ্টি করছে, কেননা পলিটিক্সের শোণিতরক্ত-উত্তেজনায় সে নিজেকে ছাড়া আর সমস্তকেই অস্পষ্ট ও ছোটো করে দেখে; সুতরাং সত্যকে খণ্ডিত করার দ্বারা অশান্তির চক্রবাত্যায় আত্মহত্যাকে আবর্তিত করে তোলে।

আমরা অত্যন্ত ভুল করব যদি মনে করি, সীমাবিহীন অহমিকা দ্বারা, জাত্যভিমানে আবিল ভেদবুদ্ধি দ্বারাই য়ুরোপ বড়ো হয়েছে। এমন অসম্ভব কথা আর হতে পারে না। বস্তুত সত্যের জোরেই তার জয়যাত্রা, রিপুর আকর্ষণেই তার অধঃপতন—যে রিপুর প্রবর্তনায় আমরা আপনাকে সব দিতে চাই, বাহিরকে বঞ্চিত করি।

এখন নিজের প্রতি আমাদের সকলের চেয়ে বড়ো প্রশ্ন এই যে, আমাদের কি দেবার জিনিস কিছু নেই? আমরা কি আকিঞ্চন্যের সেই চরম বর্বরতায় এসে ঠেকেছি যার কেবল অভাবই আছে ঐশ্বর্য নেই? বিশ্বসংসার আমাদের দ্বারে এসে অভুক্ত হয়ে ফিরলে কি আমাদের কোনো কল্যাণ হতে পারে? দুর্ভিক্ষের অন্ন আমাদের উৎপাদন করতে হবে না, এমন কথা আমি কখনোই বলি নে, কিন্তু ভাণ্ডারে যদি আমাদের অমৃত থাকে তার দায়িত্ব সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে আমরা বাঁচতে পারব?

এই প্রশ্নের উত্তর যিনিই যেমন দিন না, আমাদের মনে যে উত্তর এসেছে বিশ্বভারতীর কাজের ভিতর তারই পূর্ণ অভিব্যক্তি হতে থাক্‌, এই আমাদের সাধনা। বিশ্বভারতী এই বেদমন্ত্রের দ্বারাই আপন পরিচয় দিতে চায়—'যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্‌।' যে আত্মীয়তা বিশ্বে বিস্তৃত হবার যোগ্য সেই আত্মীয়তার আসন এখানে আমরা পাতব। সেই আসনে জীর্ণতা নেই, মলিনতা নেই, সংকীর্ণতা নেই।

এই আসনে আমরা সবাইকে বসাতে চেয়েছি; সে কাজ কি এখন আরম্ভ হয় নি? অন্য দেশ থেকে যেসকল মনীষী এখানে এসে পৌঁচেছেন, আমরা নিশ্চয় জানি, তাঁরা হৃদয়ের ভিতরে আহ্বান অনুভব করেছেন। আমার সুহৃদ্‌বর্গ, যাঁরা এই আশ্রমের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত, তাঁরা সকলেই জানেন, আমাদের দূরদেশের অতিথিরা এখানে ভারতবর্ষেরই আতিথ্য পেয়েছেন, পেয়ে গভীর তৃপ্তিলাভ করেছেন। এখান থেকে আমরা যে-কিছু পরিবেশন করছি তার প্রমাণ সেই অতিথিদের কাছেই। তাঁরা আমাদের অভিনন্দন করেছেন। আমাদের দেশের পক্ষ থেকে তাঁরা আত্মীয়তা পেয়েছেন, তাঁদের পক্ষ থেকেও আত্মীয়তার সম্বন্ধ সত্য হয়েছে।

আমি তাই বলছি, কাজ আরম্ভ হয়েছে। বিশ্বভারতীর যে সত্য তা ক্রমশ উজ্জ্বলতর হয়ে উঠছে। এখানে আমরা ছাত্রদের কোন্‌ বিষয় পড়াচ্ছি, পড়ানো সকলের মনের মতো হচ্ছে কি না, সাধারণ কলেজের আদর্শে উচ্চশিক্ষা-বিভাগ খোলা হয়েছে বা জ্ঞানানুসন্ধান-বিভাগে কিছু কাজ হচ্ছে, এ সমস্তকেই যেন আমরা আমাদের ধ্রুব পরিচয়ের জিনিস বলে না মনে করি। এসমস্ত আজ আছে কাল না থাকতেও পারে। আশঙ্কা হয় পাছে যা ছোটো তাই বড়ো হয়ে ওঠে, পাছে একদিন আগাছাই ধানের খেতকে চাপা দেয়। বনস্পতির শাখায় কোনো বিশেষ পাখি বাসা বাঁধতে পারে, কিন্তু সেই বিশেষ পাখির বাসাই বনস্পতির একান্ত বিশেষণ নয়। নিজের মধ্যে বনস্পতি সমস্ত অরণ্যপ্রকৃতির যে সত্যপরিচয় দেয় সেইটেই তার বড়ো লক্ষণ।

পূর্বেই বলেছি, ভারতের যে প্রকাশ বিশ্বের শ্রদ্ধেয় সেই প্রকাশের দ্বারা বিশ্বকে অভ্যর্থনা করব, এই হচ্ছে আমাদের সাধনা। বিশ্বভারতীর এই কাজে পশ্চিম-মহাদেশে আমি কী অভিজ্ঞতা লাভ করেছি সে কথা বলতে আমি কুণ্ঠিত হই। দেশের লোকে অনেকে হয়তো সেটা শ্রদ্ধাপূর্বক গ্রহণ করবেন না, এমনকি পরিহাস-রসিকেরা বিদ্রূপও করতে পারেন। কিন্তু সেটাও কঠিন কথা নয়। আসলে ভাবনার কথাটা হচ্ছে এই যে, বিদেশে আমাদের দেশ যে শ্রদ্ধা লাভ করে, পাছে সেটাকে কেবলমাত্র অহংকারের সমগ্রী করে তোলা হয়। সেটা আনন্দের বিষয়, সেটা অহংকারের বিষয় নয়। যখন অহংকার করি তখন বাইরের লোকদের আরও বাইরে ফেলি, যখন আনন্দ করি তখনই তাদের নিকটের বলে জানি। বারম্বার এটা দেখেছি, বিদেশের যেসব মহদাশয় লোক আমাদের ভালোবেসেছেন, আমাদের অনেকে তাঁদের বিষয়সম্পত্তির মতো গণ্য করেছেন। তাঁরা আমাদের জাতিকে যে আদর করতে পেরেছেন সেটুকু আমরা ষোলো আনা গ্রহণ করেছি, কিন্তু আমাদের তরফে তার দায়িত্ব স্বীকার করি নি। তাঁদের ব্যবহারে তাঁদের জাতির যে গৌরব প্রকাশ হয় সেটা স্বীকার করতে অক্ষম হয়ে আমরা নিজের গভীর দৈন্যের প্রমাণ দিয়েছি। তাঁদের প্রশংসাবাক্যে আমরা নিজেদের মহৎ বলে স্পর্ধিত হয়ে উঠি; এই শিক্ষাটুকু একেবারেই ভুলে যাই যে, পরের মধ্যে যেখানে শ্রেষ্ঠতা আছে সেটাকে

অকুণ্ঠিত আনন্দে স্বীকার করা ও প্রকাশ করার মধ্যে মহত্ত্ব আছে। আমাকে এইটেতেই সকলের চেয়ে নম্র করেছে যে, ভারতের যে পরিচয় অন্য দেশে আমি বহন করে নিয়ে গেছি কোথাও তা অবমানিত হয় নি। আমাকে যাঁরা সম্মান করেছেন তাঁরা আমাকে উপলক্ষ করে ভারতবর্ষকেই শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। যখন আমি পৃথিবীতে না থাকব তখনও যেন তার ক্ষয় না ঘটে, কেননা এ সম্মান ব্যক্তিগতভাবে আমার সঙ্গে যুক্ত নয়। বিশ্বভারতীকে গ্রহণ করে ভারতের অমৃতরূপকে প্রকাশের ভার আপনারা গ্রহণ করেছেন। আপনাদের চেষ্টা সার্থক হোক, অতিথিশালা দিনে দিনে পূর্ণ হয়ে উঠুক, অভ্যাগতরা সম্মান পান, আনন্দ পান, হৃদয় দান করুন, হৃদয় গ্রহণ করুন, সত্যের ও প্রীতির আদানপ্রদানের দ্বারা পৃথিবীর সঙ্গে ভারতের যোগ গভীর ও দূরপ্রসারিত হোক, এই আমার কামনা।

শান্তিনিকেতন
৯ পৌষ ১৩৩২

১৩

বাংলাদেশের পল্লীগ্রামে যখন ছিলাম, সেখানে এক সন্ন্যাসিনী আমাকে শ্রদ্ধা করতেন। তিনি কুটিরনির্মাণের জন্য আমার কাছে ভূমি ভিক্ষা নিয়েছিলেন— সেই ভূমি থেকে যে ফসল উৎপন্ন হত তাই দিয়ে তাঁর আহার চলত, এবং দুই-চারিটি অনাথ শিশুদের পালন করতেন। তাঁর মাতা ছিলেন সংসারে— তাঁর মাতার অবস্থাও ছিল সচ্ছল— কন্যাকে ঘরে ফিরিয়ে নেবার জন্যে তিনি অনেক চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু কন্যা সম্মত হন নি। তিনি আমাকে বলেছিলেন, নিজের ঘরের অন্নে আত্মাভিমান জন্মে— মন থেকে এই ভ্রম কিছুতে ঘুচতে চায় না যে, এই অন্নের মালেক আমিই, আমাকে আমিই খাওয়াচ্ছি। কিন্তু দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে যে অন্ন পাই সে অন্ন ভগবানের— তিনি সকল মানুষের হাত দিয়ে সেই অন্ন আমাকে দেন, তার উপরে আমার নিজের দাবি নেই, তাঁর দয়ার উপর ভরসা।

বাংলাদেশকে বাংলা ভাষার ভিতর চিরজীবন আমি সেবা করেছি, আমার পঁয়ষট্টি বৎসর বয়সের মধ্যে অন্তত পঞ্চান্ন বৎসর আমি সাহিত্যের সাধনা করে সরস্বতীর কাছ থেকে যা-কিছু বর লাভ করেছি সমস্তই বাংলাদেশের ভাণ্ডারে জমা করে দিয়েছি। এইজন্য বাংলাদেশের কাছ থেকে আমি যতটুকু স্নেহ ও সম্মান লাভ করেছি তার উপরে আমার নিজের দাবি আছে— বাংলাদেশ যদি কৃপণতা করে, যদি আমাকে আমার প্রাপ্য না দেয়, তা হলে অভিমান করে আমি বলতে পারি যে, আমার কাছে বাংলাদেশ ঋণী রয়ে গেল।

কিন্তু বাংলার বাইরে বা বিদেশে যে সমাদর, যে প্রীতি লাভ করি তার উপরে আমার আত্মাভিমানের দাবি নেই। এইজন্য এই দানকেই ভগবানের দান বলে আমি গ্রহণ করি। তিনি আমাকে দয়া করেন, নতুবা অপরেরা আমাকে দয়া করেন এমন কোনো হেতু নেই।

ভগবানের এই দানে মন নম্র হয়, এতে অহংকার জন্মে না। আমরা নিজের পকেটের চার-আনার পয়সা নিয়েও গর্ব করতে পারি, কিন্তু ভগবান আকাশ ভরে যে সোনার আলো ঢেলে দিয়েছেন, কোনো কালেই যার মূল্য শোধ করতে পারব

না, সেই আলোর অধিকার নিয়ে কেবল আনন্দই করতে পারি, কিন্তু গর্ব করতে পারি নে। পরের দত্ত সমাদরও সেইরকম অমূল্য— সেই দান আমি নম্রশিরেই গ্রহণ করি, উদ্ধতশিরে নয়। এই সমাদরে আমি বাংলাদেশের সন্তান বলে উপলব্ধি করবার সুযোগ লাভ করি নি। বাংলাদেশের ছোটো ঘরে আমার গর্ব করবার স্থান ছিল, কিন্তু ভারতের বড়ো ঘরে আমার আনন্দ করবার স্থান।

আমার প্রভু আমাকে তাঁর দেউড়িতে কেবলমাত্র বাঁশি বাজাবার ভার দেন নি— শুধু কবিতার মালা গাঁথিয়ে তিনি আমাকে ছুটি দিলেন না। আমার যৌবন যখন পার হয়ে গেল, আমার চুল যখন পাকল, তখন তাঁর অঙ্গনে আমার তলব পড়ল। সেখানে তিনি শিশুদের মা হয়ে বসে আছেন। তিনি আমাকে হেসে বললেন, 'ওরে পুত্র, এতদিন তুই তো কোনো কাজেই লাগলি নে, কেবল কথাই গেঁথে বেড়ালি। বয়স গেল, এখন যে কয়টা দিন বাকি আছে, এই শিশুদের সেবা কর্‌।'

কাজ শুরু করে দিলুম— সেই আমার শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ের কাজ। কয়েক জন বাঙালির ছেলেকে নিয়ে মাস্টারি শুরু করে দিলুম। মনে অহংকার হল, এ আমার কাজ, এ আমার সৃষ্টি। মনে হল, আমি বাংলাদেশের হিতসাধন করছি, এ আমারই শক্তি।

কিন্তু এ যে প্রভুরই আদেশ— যে প্রভু কেবল বাংলাদেশের নন— সেই কথা যাঁর কাজ তিনিই স্মরণ করিয়ে দিলেন। সমুদ্রপার হতে এলেন বন্ধু এন্ড্রুজ, এলেন বন্ধু পিয়ার্সন। আপন লোকের বন্ধুত্বের উপর দাবি আছে, সে বন্ধুত্ব আপন লোকেরই সেবায় লাগে। কিন্তু যাঁদের সঙ্গে নাড়ীর সম্বন্ধ নেই, যাঁদের ভাষা স্বতন্ত্র, ব্যবহার স্বতন্ত্র, তাঁরা যখন অনাহূত আমার পাশে এসে দাঁড়ালেন তখনই আমার অহংকার ঘুচে গেল, আমার আনন্দ জন্মাল। যখন ভগবান পরকে আপন করে দেন, তখন সেই আত্মীয়তার মধ্যে তাঁকেই আত্মীয় বলে জানতে পারি।

আমার মনে গর্ব জন্মেছিল যে, আমি স্বদেশের জন্য অনেক করছি— আমার অর্থ, আমার সামর্থ্য আমি স্বদেশকে উৎসর্গ করছি। আমার সেই গর্ব চূর্ণ হয়ে গেল যখন বিদেশী এলেন এই কাজে। তখনই বুঝলুম, এও আমার কাজ নয়, এ তাঁরই কাজ, যিনি সকল মানুষের ভগবান। এই-যে বিদেশী বন্ধুদের অযাচিত পাঠিয়ে দিলেন, এঁরা আত্মীয়স্বজনদের হতে বহু দূরে পৃথিবীর প্রান্তে ভারতের প্রান্তে এক খ্যাতিহীন প্রান্তরের মাঝখানে নিজেদের সমস্ত জীবন ঢেলে দিলেন; একদিনের জন্যও ভাবলেন না, যাদের জন্য তাঁদের আত্মোৎসর্গ তারা বিদেশী, তারা পূর্বদেশী, তারা শিশু, তাঁদের ঋণ শোধ করবার মতো অর্থ তাদের নেই, শক্তি তাদের নেই, মান তাদের নেই। তাঁরা নিজে পরম পণ্ডিত, কত সম্মানের পদ তাঁদের জন্য পথ চেয়ে আছে, কত ঊর্ধ্ব বেতন তাঁদের আহ্বান করছে, সমস্ত তাঁরা প্রত্যাখ্যান করেছেন— অকিঞ্চনভাবে, স্বদেশীর সম্মান ও স্নেহ হতে বঞ্চিত হয়ে, রাজপুরুষদের সন্দেহ দ্বারা অনুধাবিত হয়ে, গ্রীষ্ম এবং রোগের তাপে তাপিত হয়ে তাঁরা কাজে প্রবৃত্ত হলেন। এ কাজের বেতন তাঁরা নিলেন না, দুঃখই নিলেন। তাঁরা আপনাকে বড়ো করলেন না, প্রভুর আদেশকে বড়ো করলেন, প্রেমকে বড়ো করলেন, কাজকে বড়ো করে তুললেন।

এই তো আমার 'পরে ভগবানের দয়া— তিনি আমার গর্বকে ছোটো করে দিতেই আমার সাধনা বড়ো করে দিলেন। এখন এই সাধনা কি ছোটো বাংলাদেশের সীমার মধ্যে আর ধরে। বাংলার বাহির থেকে ছেলেরা আসতে লাগল। আমি তাদের ডাক দিই নি, ডাকলেও আমার ডাক এত দূরে পৌঁছত না। যিনি

সমুদ্রপার থেকে নিজের কণ্ঠে তাঁর সেবকদের ডেকেছেন তিনিই স্বহস্তে তাঁর সেবাক্ষেত্রের সীমানা মিটিয়ে দিতে লাগলেন।

আজ আমাদের আশ্রমে প্রায় ত্রিশ জন গুজরাটের ছেলে এসে বসেছে। সেই ছেলেদের অভিভাবকেরা আমার আশ্রমের পরম হিতৈষী। তাঁরা আমাদের সর্বপ্রকারে যত আনুকূল্য করেছেন, এমন আনুকূল্য ভারতের আর কোথাও পাই নি। অনেক দিন আমি বাঙালির ছেলেকে এই আশ্রমে মানুষ করেছি— কিন্তু বাংলাদেশে আমার সহায় নেই। সেও আমার বিধাতার দয়া। যেখানে দাবি বেশি সেখান থেকে যা পাওয়া যায় সে তো খাজনা পাওয়া। যে খাজনা পায় সে যদি-বা রাজাও হয় তবু সে হতভাগ্য, কেননা সে তার নিচের লোকের কাছ থেকেই ভিক্ষা পায়; যে দান পায় সে উপর থেকে পায়, সে প্রেমের দান, জবরদস্তির আদায়-ওয়াশিল নয়। বাংলাদেশের বাহির থেকে আমার আশ্রম যে আনুকূল্য পেয়েছে, সেই তো আশীর্বাদ—সে পবিত্র। সেই আনুকূল্যে এই আশ্রম সমস্ত বিশ্বের সামগ্রী হয়েছে।

আজ তাই আত্মাভিমান বিসর্জন করে বাংলাদেশাভিমান বর্জন করে বাইরে আশ্রমজননীর জন্য ভিক্ষা করতে বাহির হয়েছি। শ্রদ্ধয়া দেয়ম্‌। সেই শ্রদ্ধার দানের দ্বারা আশ্রমকে সকলে গ্রহণ করবেন, সকলের সামগ্রী করবেন, তাকে বিশ্বলোকে উত্তীর্ণ করবেন। এই বিশ্বলোকেই অমৃতলোক। যা-কিছু আমাদের অভিমানের গণ্ডির, আমাদের স্বার্থের গণ্ডির মধ্যে থাকে তাই মৃত্যুর অধিকারবর্তী। যা সকল মানুষের তাই সকল কালের। সকলের ভিক্ষার মধ্য দিয়ে আমাদের আশ্রমের উপরে বিধাতার অমৃত বর্ষিত হোক, সেই অমৃত-অভিষেকে আমরা, তাঁর সেবকেরা, পবিত্র হই, আমাদের অহংকার ধৌত হোক, আমাদের শক্তি প্রবল ও নির্মল হোক—এই কামনা মনে নিয়ে সকলের কাছে এসেছি; সকলের মধ্য দিয়ে বিধাতা আমাদের উপর প্রসন্ন হোন, আমাদের বাক্য মন ও চেষ্টাকে তাঁর কল্যাণসৃষ্টির মধ্যে দক্ষিণ হস্তে গ্রহণ করুন।

প্র জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩

১৪

বহুকাল আগে নদীতীরের সাহিত্যচর্চা থেকে জানি নে কী আহ্বানে এই প্রান্তরে এসেছিলেম। তার পর ত্রিশ বৎসর অতীত হয়ে গেল। আয়ুর প্রতি আর অধিক দাবি আছে বলে মনে করি নে। হয়তো আগামী কালে আর কিছু বলবার অবকাশ পাব না। অন্তরের কথা আজ তাই বলবার ইচ্ছা করি।

উদ্যোগের যখন আরম্ভ হয়, কেন হয় তা বলা যায় না। বীজ থেকে গাছ কেন হয় কে জানে। দুয়ের মধ্যে কোনো সাদৃশ্য নেই। প্রাণের ভিতর যখন আহ্বান আসে তখন তার চরম অর্থ কেউ জানে না। দুঃসময়ে এখানে এসেছি, দুঃখের মধ্যে দৈন্যের মধ্যে দিয়ে মৃত্যুশোক বহন করে দীর্ঘকাল চলেছি—কেন তা ভেবে পাই নে। ভালো করে বলতে পারি নে কিসের টানে এই শূন্য প্রান্তরের মধ্যে এসেছিলেম।

মানুষ আপনাকে বিশুদ্ধভাবে আবিষ্কার করে এমন কর্মের যোগে যার সঙ্গে

সাংসারিক দেনাপাওনার হিসাব নেই। নিজেকে নিজের বাইরে উৎসর্গ করে দিয়ে তবে আমরা আপনাকে পাই। বোধ করি সেই ইচ্ছেই ছিল, তাই সেদিন সহসা আমার প্রকৃতিগত চিরাভ্যস্ত রচনাকার্য থেকে অনেক পরিমাণে ছুটি নিয়েছিলুম।

সেদিন আমার সংকল্প ছিল, বালকদের এমন শিক্ষা দেব যা শুধু পুঁথির শিক্ষা নয়; প্রান্তরযুক্ত অবারিত আকাশের মধ্যে যে মুক্তির আনন্দ তারই সঙ্গে মিলিয়ে যতটা পারি তাদের মানুষ করে তুলব। শিক্ষা দেবার উপকরণ যে আমি সঞ্চয় করেছিলেম তা নয়। সাধারণ শিক্ষা আমি পাই নি, তাতে আমি অভিজ্ঞ ছিলুম না। আমার আনন্দ ছিল প্রকৃতির অন্তরলোকে, গাছপালা আকাশ আলোর সহযোগে। শিশু বয়স থেকে এই আমার সত্যপরিচয়। এই আনন্দ আমি পেয়েছিলুম বলে দিতেও ইচ্ছে ছিল। ইস্কুলে আমরা ছেলেদের এই আনন্দ-উৎস থেকে নির্বাসিত করেছি। বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে যে শিক্ষক বহুধাশক্তিযোগাৎ রূপরসগন্ধবর্ণের প্রবাহে মানুষের জীবনকে সরস ফলবান করে তুলছেন তার থেকে ছিন্ন করে ইস্কুলমাস্টার বেতের ডগায় বিরস শিক্ষা শিশুদের গিলিয়ে দিতে চায়। আমি স্থির করলেম, শিশুদের শিক্ষার মধ্যে প্রাণরস বহানো চাই; কেবল আমাদের স্নেহ থেকে নয়, প্রকৃতির সৌন্দর্যভাণ্ডার থেকে প্রাণের ঐশ্বর্য তারা লাভ করবে। এই ইচ্ছাটুকু নিয়েই অতি ক্ষুদ্র আকারে আশ্রমবিদ্যালয়ের শুরু হল. এইটুকুকে সত্য করে তুলে আমি নিজেকে সত্য করে তুলতে চেয়েছিলুম।

আনন্দের ত্যাগে স্নেহের যোগে বালকদের সেবা করে হয়তো তাদের কিছু দিতে পেরেছিলুম, কিন্তু তার চেয়ে নিজেই বেশি পেয়েছি। সেদিনও প্রতিকূলতার অন্ত ছিল না। এইভাবে কাজ আরম্ভ করে ক্রমশ এই কাজের মধ্যে আমার মন অগ্রসর হয়েছে। সেই ক্ষীণ প্রারম্ভ আজ বহু দূর পর্যন্ত এগোল। আমার সংকল্প আজ একটা রূপ লাভ করেছে। প্রতিদিন আমাকে দুঃখের যে প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে চলতে হয়েছে তার হিসাব নেব না। বারম্বার মনে ভেবেছি, আমার সত্যসংকল্পের সাধনায় কেন সবাইকে পাব না, কেন একলা আমাকে চলতে হবে। আজ সে ক্ষোভ থেকে কিছু মুক্ত হয়েছি, তাই বলতে পারছি, এ দুর্বল চিত্তের আক্ষেপ। যার বাইরের সমারোহ নেই, উত্তেজনা নেই, জনসমাজে যার প্রতিপত্তির আশা করা যায় না, যার একমাত্র মূল্য অন্তরের বিকাশে, অন্তর্যামীর সমর্থনে, তার সম্বন্ধে এ কথা জোর করে বলা চলে না, অপর লোকে কেন এর সম্বন্ধে উদাসীন। উপলব্ধি যার, দায় শুধু তারই। অন্যে অংশগ্রহণ না করলে নালিশ চলবে না। যার উপরে ভার পড়েছে তাকেই হিসেব চুকিয়ে দিয়ে চলে যেতে হবে; অংশী যদি জোটে তো ভালো, আর না যদি জোটে তো জোর খাটবে না। সমস্তই দিয়ে ফেলবার দাবি যদি অন্তর থেকে আসে তবে বলা চলবে না, এর বদলে পেলুম কী। আদেশ কানে পৌঁছলেই তা মানতে হবে।

আমাদের কাজ সত্যকে রূপ দেওয়া। অন্তরে সত্যকে স্বীকার করলে বাহিরেও তাকে প্রকাশ করা চাই। সম্পূর্ণরূপে সংকল্পকে সার্থক করেছি এ কথা কোনো কালেই বলা চলবে না—কঠিন বাধার ভিতর দিয়ে তাকে দেহ দিয়েছি। এ ভাবনা যেন না করি, আমি যখন যাব তখন কে একে দেখবে, এর ভবিষ্যতে কী আছে কী নেই। এইটুকু সান্ত্বনা বহন করে যেতে চাই, যতটুকু পেরেছি তা করেছি, মনে যা পেয়েছি দুর্ভর হলেও কর্মে তাকে গ্রহণ করা হল। তার পরে সংসারের লীলায় এই প্রতিষ্ঠান নানা অবস্থার মধ্য দিয়ে কী ভাবে বিকাশ পাবে তা কল্পনাও করতে পারি নে। লোভ হতে পারে, আমি যে ভাবে এর প্রবর্তন করেছি অবিকল সেই

ভাবে এর পরিণতি হতে থাকবে। কিন্তু সেই অহংকৃত লোভ ত্যাগ করাই চাই। সমাজের সঙ্গে কালের সঙ্গে যোগে কোন্ রূপরূপান্তরের মধ্য দিয়ে আপন প্রাণ-বেগে ভাবী কালের পথে এই প্রতিষ্ঠানের যাত্রা, আজ কে তা নির্দিষ্ট করে দিতে পারে। এর মধ্যে আমার ব্যক্তিগত যা আছে ইতিহাস তাকে চিরদিন স্বীকার করবে, এমন কখনও হতেই পারে না। এর মধ্যে যা সত্য আছে তারই জয়যাত্রা অপ্রতিহত হোক। সত্যের সেই সঞ্জীবন-মন্ত্র এর মধ্যে যদি থাকে তবে বাইরের অভিব্যক্তির দিকে যে রূপ এ গ্রহণ করবে আজকের দিনের ছবির সঙ্গে তার মিল হবে না বলেই ধরে নিতে পারি। কিন্তু 'মা গৃধঃ'—নিজের হাতে গড়া আকারের প্রতি লোভ কোরো না। যা-কিছু ক্ষুদ্র, যা আমার অহমিকার সৃষ্টি, আজ আছে কাল নেই, তাকে যেন আমরা পরমাশ্রয় বলে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে পাকা করে গড়বার আয়োজন না করি। প্রতি মুহূর্তের সত্য চেষ্টা সত্য কর্মের মধ্য দিয়েই আমাদের প্রতিষ্ঠান আপন সজীব পরিচয় দেবে, সেইখানেই তার চিরন্তন জীবন। জনসুলভ স্থূল সমৃদ্ধির পরিচয় দিতে প্রয়াস করে ব্যবসায়ীর মন সে না কিনুক; আন্তরিক গরিমায় তার যথার্থ শ্রী প্রকাশ পাবে। আদর্শের গভীরতা যেন নিরন্ত সার্থকতায় তাকে আত্মসৃষ্টির পথে চালিত করে। এই সার্থকতার পরিমাপ কালের উপর নির্ভর করে না, কেননা সত্যের অনন্ত পরিচয় আপন বিশুদ্ধ প্রকাশক্ষণে।

৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৭

১৫

আমার মধ্য বয়সে আমি এই শান্তিনিকেতনে বালকদের নিয়ে এক বিদ্যালয় স্থাপন করতে ইচ্ছা করি। মনে তখন আশঙ্কা ও উদ্‌বেগ ছিল, কারণ কর্মে অভিজ্ঞতা ছিল না। জীবনের অভ্যাস ও তদুপযোগী শিক্ষার অভাব, অধ্যাপনাকর্মে নিপুণতার অভাব সত্ত্বেও আমার সংকল্প দৃঢ় হয়ে উঠল। কারণ চিন্তা করে দেখলেম যে, আমাদের দেশে এক সময়ে যে শিক্ষাদান-প্রথা বর্তমান ছিল, তার পুনঃপ্রবর্তন বিশেষ প্রয়োজন। সেই প্রথাই যে পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এমন অন্ধ পক্ষপাত আমার মনে ছিল না, কিন্তু এই কথা আমার মনকে অধিকার করে যে, মানুষ বিশ্বপ্রকৃতি ও মানবসংসার এই দুইয়ের মধ্যেই জন্মগ্রহণ করেছে, অতএব এই দুইকে একত্র সমাবেশ করে বালকদের শিক্ষায়তন গড়লে তবেই শিক্ষার পূর্ণতা ও মানবজীবনের সমগ্রতা হয়। বিশ্বপ্রকৃতির যে আহ্বান, তার থেকে বিচ্ছিন্ন করে পুঁথিগত বিদ্যা দিয়ে জোর করে শিক্ষার আয়োজন করলে শুধু শিক্ষাবস্তুকেই জমানো হয়, যে মন তাকে গ্রহণ করবে তার অবস্থা হয় ভারবাহী জন্তুর মতো। শিক্ষার উদ্দেশ্য তাতে ব্যর্থ হয়।

আমার বাল্যকালের অভিজ্ঞতা ভুলি নি। আমার বালক-মনে প্রকৃতির প্রতি সহজ অনুরাগ ছিল, তার থেকে নির্বাসিত করে বিদ্যালয়ের নীরস শিক্ষাবিধিতে যখন আমার মনকে যন্ত্রের মতো পেষণ করা হয় তখন কঠিন যন্ত্রণা পেয়েছি। এভাবে মনকে ক্লিষ্ট করলে, এই কঠিনতায় বালক-মনকে অভ্যস্ত করলে, তা মানসিক স্বাস্থ্যের অনুকূল হতে পারে না। শিক্ষার আদর্শকেই আমরা ভুলে গেছি। শিক্ষা তো শুধু সংবাদ-বিতরণ নয়; মানুষ সংবাদ বহন করতে জন্মায় নি,

জীবনের মূলে যে লক্ষ্য আছে তাকেই গ্রহণ করা চাই। মানবজীবনের সমগ্র আদর্শকে জ্ঞানে ও কর্মে পূর্ণ করে উপলব্ধি করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য।

আমার মনে হয়েছিল, জীবনের কী লক্ষ্য এই প্রশ্নের মীমাংসা যেন শিক্ষার মধ্যে পেতে পারি। আমাদের দেশের পুরাতন শিক্ষাপ্রণালীতে তার আভাস পাওয়া যায়। তপোবনের নিভৃত তপস্যা ও অধ্যাপনার মধ্যে যে শিক্ষাসাধনা আছে তাকে আশ্রয় করে শিক্ষক ও ছাত্র জীবনের পূর্ণতা লাভ করেছিলেন। শুধু পরা বিদ্যা নয়, শিক্ষা কল্প ব্যাকরণ নিরুক্ত ছন্দ জ্যোতিষ প্রভৃতি অপরা বিদ্যার অনুশীলনেও যেমন প্রাচীন কালে গুরুশিষ্য একই সাধনক্ষেত্রে মিলিত হয়েছিলেন, তেমনি সহযোগিতার সাধনা যদি এখানে হয় তবেই শিক্ষার পূর্ণতা হবে।

বর্তমানে সেই সাধনা আমরা কতদূর গ্রহণ করতে পারি তা বলা কঠিন। আজ আমাদের চিত্তবিক্ষেপের অভাব নেই। কিন্তু এই-যে প্রাচীন কালের শিক্ষাসমবায়, এ কোনো বিশেষ কাল ও সম্প্রদায়ের অভিমত নয়। মানবচিত্তবৃত্তির মূলে সেই এক কথা আছে—মানুষ বিচ্ছিন্ন প্রাণী নয়, সব মানুষের সঙ্গে যোগে সে যুক্ত, তাতেই তার জীবনের পূর্ণতা, মানুষের এই ধর্ম। তাই যে দেশেই যে কালেই মানুষ যে বিদ্যা ও কর্ম উৎপন্ন করবে সে সব-কিছুতে সর্বমানবের অধিকার আছে। বিদ্যায় কোনো জাতিবর্ণের ভেদ নেই। মানুষ সর্বমানবের সৃষ্ট ও উদ্ভূত সম্পদের অধিকারী, তার জীবনের মূলে এই সত্য আছে। মানুষ জন্মগ্রহণ-সূত্রে যে শিক্ষার মধ্যে এসেছে তা এক জাতির দান নয়। কালে কালে নিখিলমানবের কর্মশিক্ষার ধারা প্রবাহিত হয়ে একই চিত্তসমুদ্রে মিলিত হয়েছে। সেই চিত্তসাগরতীরে মানুষ জন্মলাভ করে, তারই আহ্বানমন্ত্র দিকে দিকে ঘোষিত।

আদিকালের মানুষ একদিন আগুনের রহস্য ভেদ করল, তাকে ব্যবহারে লাগাল। আগুনের সত্য কোনো বিশেষ কালে আবদ্ধ রইল না, সর্বমানব এই আশ্চর্য রহস্যের অধিকারী হল। তেমনি পরিধেয় বস্ত্র, ভূ-কর্ষণ প্রভৃতি প্রথম যুগের আবিষ্কার থেকে শুরু করে মানুষের সর্বত্র চেষ্টা ও সাধনার মধ্য দিয়ে যে জ্ঞানসম্পদ আমরা পেলেম তা কোনো বিশেষ জাতির বা কালের নয়। এই কথা আমরা সম্যক্‌ উপলব্ধি করি না। আমাদের তেমনি দান চাই যা সর্বমানব গ্রহণ করতে পারে।

সর্বমানবের ত্যাগের ক্ষেত্রে আমরা জন্মেছি। ব্রহ্ম যিনি, সৃষ্টির মধ্যেই আপনাকে উৎসর্গ করে তাঁর আনন্দ, তাঁর সেই ত্যাগের ক্ষেত্রে জীবসকল জীবিত থাকে, এবং তাঁরই মধ্যে প্রবেশ করে ও বিলীন হয়—এ যেমন অধ্যাত্মলোকের কথা, তেমনি চিত্তলোকেও মানুষ মহামানবের ত্যাগের লোকে জন্মলাভ করেছে ও সঞ্চরণ করছে, এই কথা উপলব্ধি করতে হবে; তবেই আনুষঙ্গিক শিক্ষাকে আমরা পূর্ণতা ও সর্বাঙ্গীণতা দান করতে পারব।

আমার তাই সংকল্প ছিল যে, চিত্তকে বিশেষ জাতি ও ব্যক্তির মধ্যে আবদ্ধ না করে শিক্ষার ব্যবস্থা করব; দেশের কঠিন বাধা ও অন্ধ সংস্কার সত্ত্বেও এখানে সর্বদেশের মানবচিত্তের সহযোগিতায় সর্বকর্মযোগে শিক্ষাসত্র স্থাপন করব; শুধু ইতিহাস ভূগোল সাহিত্য-পাঠে নয়, কিন্তু সর্বশিক্ষার মিলনের দ্বারা এই সত্যসাধনা করব। এ অত্যন্ত কঠিন সাধনা, কারণ চারি দিকে দেশে এর প্রতিকূলতা আছে। দেশবাসীর যে আত্মাভিমান ও জাতি-অভিমানের সংকীর্ণতা তার সঙ্গে সংগ্রাম করতে হবে।

আমরা যে এখানে পূর্ণ সফলতা লাভ করেছি তা বলতে পারি না, কিন্তু এই

প্রতিষ্ঠানের অন্তর্নিহিত সেই সংকল্পটি আছে, তা স্মরণ করতে হবে। শুধু কেবল আনুষঙ্গিক কর্মপদ্ধতি নিয়ে ব্যস্ত থাকলে তার জটিল জাল বিস্তৃত করে বাহ্যিক শৃঙ্খলা-পারিপাট্যের সাধন সম্ভব হতে পারে, কিন্তু আদর্শের খর্বতা হবে।

প্রথম যখন অল্প বালক নিয়ে এখানে শিক্ষায়তন খুলি তখনও ফললাভের প্রতি প্রলোভন ছিল না। তখন সহায়ক হিসাবে কয়েকজন কর্মীকে পাই— যেমন, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, কবি সতীশচন্দ্র, জগদানন্দ। এঁরা তখন একটি ভাবের ঐক্যে মিলিত ছিলেন। তখনকার হাওয়া ছিল অন্যরূপ। কেবলমাত্র বিধিনিষেধের জালে জড়িত হয়ে থাকতেম না, অল্প ছাত্র নিয়ে তাদের সকলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগে আমাদের প্রাত্যহিক জীবন সত্য হয়ে উঠত। তাদের সেবার মধ্যে আমরা একটি গভীর আনন্দ, একটি চরম সার্থকতা উপলব্ধি করতেম। তখন অধ্যাপকদের মধ্যে অসীম ধৈর্য দেখেছি। মনে পড়ে, যেসব বালক দুরন্তপনায় দুঃখ দিয়েছে তাদের বিদায় দিই নি, বা অন্যভাবে পীড়া দিই নি। যতদিন আমার নিজের হাতে এর ভার ছিল ততদিন বার বার তাদের ক্ষমা করেছি; অধ্যাপকদের ক্ষমা করেছি। সেইসকল ছাত্র পরে কৃতিত্বলাভ করেছে।

তখন বাহ্যিক ফললাভের চিন্তা ছিল না, পরীক্ষার মার্কা-মারা করে দেবার ব্যস্ততা ছিল না, সকল ছাত্রকে আপন করবার চেষ্টা করেছি। তখন বিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্কিত ছিল না, তার থেকে নির্লিপ্ত ছিল। তখনকার ছাত্রদের মনে এই অনুষ্ঠানের প্রতি সুগভীর নিষ্ঠা লক্ষ্য করেছি।

এইভাবে বিদ্যালয় অনেকদিন চলেছিল। এর অনেক পরে এর পরিধির বিস্তার হয়। সৌভাগ্যক্রমে তখন স্বদেশবাসীর সহায়তা পাই নি; তাদের অহৈতুক বিরুদ্ধতা ও অকারণ বিদ্বেষ একে আঘাত করেছে, কিন্তু তার প্রতি দৃক্‌পাত করি নি, এবং এই-যে কাজ শুরু করলেম তার প্রচারেরও চেষ্টা করি নি। মনে আছে, আমার বন্ধুবর মোহিত সেন এই বিদ্যালয়ের বিবরণ পেয়ে আকৃষ্ট হন, আমাদের আদর্শ তাঁর মনকে গভীরভাবে নাড়া দেয়। তিনি বলেন, 'আমি কিছু করতে পারলেম না, বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকুরি আমার জীবিকা— এখানে এসে কাজ করতে পারলে ধন্য হতাম। তা হল না। এবার পরীক্ষায় কিছু অর্জন করেছি, তার থেকে কিছু দেব এই ইচ্ছা।' এই বলে তিনি এক হাজার টাকার একটি নোট আমাকে দেন। বোধ হয় আমার প্রদেশবাসীর এই প্রথম ও শেষ সহানুভূতি। এইসঙ্গেই উল্লেখ করতে হবে আমার প্রতি প্রীতিপরায়ণ ত্রিপুরাধিপতির আনুকূল্য। আজও তাঁর বংশে তা প্রবাহিত হয়ে আসছে।

মোহিতবাবু অনেকদিন এই অনুষ্ঠানের সঙ্গে আন্তরিকভাবে যুক্ত ছিলেন এবং আমার কী প্রয়োজন তার সন্ধান নিতেন। তিনি অনুমতি চাইলেন, এই বিদ্যালয়ের বিষয়ে কিছু কাগজে লেখেন। আমি তাতে আপত্তি জানাই। বললেম, 'গুটিকতক ছেলে নিয়ে গাছপালার মধ্যে বসেছি, কোনো বড়ো ঘরবাড়ি নেই, বাইরের দৃশ্য দীন, সর্বসাধারণ একে ভুল বুঝবে।'

এই অল্প অধ্যাপক ও ছাত্র নিয়ে আমি বহুকষ্টে আর্থিক দুরবস্থা ও দুর্গতির চরম সীমায় উপস্থিত হয়ে যেভাবে এই বিদ্যালয় চালিয়েছি তার ইতিহাস রক্ষিত হয় নি। কঠিন চেষ্টার দ্বারা ঋণ করে প্রতিদিনের প্রয়োজন জোগাতে সর্বস্বান্ত হয়ে দিন কাটিয়েছি, কিন্তু পরিতাপ ছিল না। কারণ গভীর সত্য ছিল এই দৈন্যদশার অন্তরালে। যাক, এ আলোচনা বৃথা। কর্মের যে ফল তা বাইরের বিধানে

দেখানো যায় না, প্রাণশক্তির যে রসসঞ্চার তা গোপন গূঢ়, তা ডেকে দেখাবার জিনিস নয়। সেই গভীর কাজ সকলপ্রকার বিরুদ্ধতার মধ্যেও এখানে চলেছিল।

এই নির্মম বিরুদ্ধতার উপকারিতা আছে— যেমন জমির অনুর্বরতা কঠিন প্রযত্নের দ্বারা দূর করে তবে ফসল ফলাতে হয়, তবেই তার উৎপাদনী শক্তি হয়, তার রসসঞ্চার হয়। দুঃখের বিষয়, বাংলার চিত্তক্ষেত্র অনুর্বর, কোনো প্রতিষ্ঠানকে স্থায়ী করবার পক্ষে তা অনুকূল নয়। বিনা কারণে বিদ্বেষের দ্বারা পীড়া দেয় যে দুর্বুদ্ধি তা গড়া জিনিসকে ভাঙে, সংকল্পকে আঘাত করে, শ্রদ্ধার সঙ্গে কিছুকে গ্রহণ করে না। এখানকার এই-যে প্রচেষ্টা রক্ষিত হয়েছে, তা কঠিনতাকে প্রতিহত করেই বেঁচেছে। অর্থবর্ষণের প্রশ্রয় পেলে হয়তো এর আত্মসত্য রক্ষা করা দুরূহ হত, অনেক জিনিস আসত খ্যাতির দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে যা বাঞ্ছনীয় নয়। তাই এই অখ্যাতির মধ্য দিয়ে এই বিদ্যালয় বেঁচে উঠেছে।

এক সময় এল, যখন এর পরিধি বাড়বার দিকে গেল। বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় বললেন, দেশের যে টোল চতুষ্পাঠী আছে তা সংকীর্ণ, তা একালের উপযোগী নয়, তাকে বিস্তৃত করে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত করে দেশের শিক্ষাপ্রণালীকে কালোপযোগী করতে হবে। আমারও এই কথাটা মনে লেগেছিল। আমার তখনকার বিদ্যালয় শুধু বালকদের শিক্ষায়তন ছিল, এতবড়ো বৃহৎ অনুষ্ঠানের কথা মনে হয় নি এবং তাতে সফলকাম হব বলেও ভাবি নি। শাস্ত্রীমশায় তখন কাশীতে সংস্কৃত মাসিকপত্রের সম্পাদন, ও সাহিত্যচর্চা করছিলেন। তিনি এখানে এসে জুটলেন। তখন পালিভাষা ও শাস্ত্রে তিনি প্রবীণ ছিলেন না, প্রথম আমার অনুরোধেই তিনি এই শাস্ত্রে জ্ঞানলাভ করতে ব্রতী হলেন।

ধীরে ধীরে এখানকার কাজ আরম্ভ হল। আমার মনে হল যে, দেশের শিক্ষাপ্রণালীর ব্যাপকতাসাধন করতে হবে। তখন এমন কোনো বিশ্ববিদ্যালয় ছিল না যেখানে সর্বদেশের বিদ্যাকে গৌরবের স্থান দেওয়া হয়েছে। সব য়ুনিভার্সিটিতে শুধু পরীক্ষাপাসের জন্যই পাঠ্যবিধি হয়েছে, সেই শিক্ষাব্যবস্থা স্বার্থসাধনের দীনতায় পীড়িত, বিদ্যাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণের কোনো চেষ্টা নেই। তাই মনে হল, এখানে মুক্তভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের শাসনের বাইরে এমন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলব যেখানে সর্ববিদ্যার মিলনক্ষেত্র হবে। সেই সাধনার ভার যাঁরা গ্রহণ করলেন, ধীরে ধীরে তাঁরা এসে জুটলেন।

আমার শিশু-বিদ্যালয়ের বিস্তৃতি সাধন হল— সভা-সমিতি মন্ত্রণাসভা ডেকে নয়, অল্পপরিসর প্রারম্ভ থেকে ধীরে ধীরে এর বৃদ্ধি হল। তার পর কালক্রমে কী করে এর কর্মপরিধি ব্যাপ্ত হল তা সকলে জানেন।

আমাদের কাজ যে কিছু সফল হয়েছে আমাদের কর্মীদের চোখে তার স্পষ্ট প্রতিরূপ ধরা পড়ে না, তারা সন্দিগ্ধ হয়, বাহ্যিক ফলে অসন্তোষ প্রকাশ করে। তাই এক-একবার আমাদের কর্মে সার্থকতা কোথায় তা দেখতে ইচ্ছা হয়, নইলে পরিতৃপ্তি হয় না। এবার কলকাতা থেকে আসবার পর নিকটবর্তী গ্রামের লোকেরা আমায় নিয়ে গেল— তাদের মধ্যে গিয়ে বড়ো আনন্দ হল, মনে হল এই তো ফললাভ হয়েছে; এই জায়গায় শক্তি প্রসারিত হল, হৃদয়ে হৃদয়ে তা বিস্তৃত হল। পরীক্ষার ফল ছোটো কথা— এই তো ফললাভ, আমরা মানুষের মনকে জাগাতে পেরেছি। মানুষ বুঝেছে, আমরা তাদের আপন। গ্রামবাসীদের সরল হৃদয়ে এখানকার প্রভাব সঞ্চারিত হল, তাদের আত্মশক্তির উদ্‌বোধন হল।

আমার মরবার আগে এই ব্যাপার দেখে খুশি হয়েছি। এই-যে এরা ভালোবেসে

ডাকল, এরা আমাদের কাছে থেকে শ্রদ্ধা ও শক্তি পেয়েছে। এ জনতা ডেকে 'মহতী সভা' করা নয়, খবরের কাগজের লক্ষ্যগোচর কিছু ব্যাপার নয়। কিন্তু এই গ্রামবাসীর ডাক, এ আমার হৃদয়ে স্পর্শ করল। মনে হল, দীপ জ্বলেছে, হৃদয়ে হৃদয়ে তার শিখা প্রদীপ্ত হল, মানুষের শক্তির আলোক হৃদয়ে হৃদয়ে উদ্‌ভাসিত হল।

এই-যে হল, এ কোনো একজনের কৃতিত্ব নয়। সকল কর্মীর চেষ্টা চিন্তা ও ত্যাগের দ্বারা, সকলের মিলিত কর্ম এই সমগ্রকে পুষ্ট করেছে। তাই ভরসার কথা, এ কৃত্রিম উপায়ে হয় নি। কোনো ব্যক্তিবিশেষকে আশ্রয় করে এ কাজ হয় নি। ভয় নেই, প্রাণশক্তির সঞ্চার হয়েছে, আমাদের অবর্তমানে এই অনুষ্ঠান জীর্ণ ও লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে না।

আমরা জনসাধারণকে আপন সংকল্পের অন্তর্গত করতে পেরেছি— এই প্রতিষ্ঠান তার অভিমুখে চলেছে। অল্প পরিমাণে এক জায়গাতেই আমরা ভারতের সমস্যার সমাধান করব। রাজনীতির ঔদ্ধত্যে নয়, সহজভাবে দেশবাসীদের আত্মীয়রূপে বরণ করে তাদের নিয়ে এখানে কাজ করব। তাদের ভোটাধিকার নিয়ে বিশ্ববিজয়ী হতে না পারি, তাদের সঙ্গে চিত্তের আদানপ্রদান হবে, তাদের সেবায় নিযুক্ত হব। তারাও দেবে, আমাদের কাছ থেকে নেবে, এই সর্বভারতের কাজ এখানে হবে।

এক সময়ে আমার কাছে প্রশ্ন আসে, তৎকালীন স্বদেশী আন্দোলনে কেন যোগ দিচ্ছি না। আমি বলি, সকলের মধ্যে যে উত্তেজনা আমার কাজকে তা অগ্রসর করবে না। শুধু একটি বিশেষ প্রণালীর দ্বারাই যে সত্যসাধনা হয় আমি তা মনে করি না। তাই আমি বলি যে, এই প্রশ্নের উত্তর যখন এখানে পূর্ণ হয়ে উঠবে তখন একদিন তা সকলের গোচর হবে। যা আমি সত্য বলে মনে করেছি সে উত্তরের জোগান হয়তো এখান থেকেই হবে।

সেই অপেক্ষায় ছিলুম। সত্যের মধ্যে সংকীর্ণতা নেই— সকল বিভাগে মনুষ্যত্বের সাধনা প্রসারিত। দল বাড়াবার সংকীর্ণ চেষ্টার মধ্যে সেই সত্যের খর্বতা হয়।

আধুনিক কালের মানুষের ধারণা যে, বিজ্ঞাপনের দ্বারা সংকল্পের ঘোষণা করতে হয়। দেখি যে আজকাল কখনও কখনও বিশ্বভারতীর কর্ম নিয়ে পত্রলেখকেরা সংবাদপত্রে লিখে থাকেন। এতে ভয় পাই, এ দিকে লক্ষ্য হলে সত্যের চেয়ে খ্যাতিকে বড়ো করা হয়। সত্য স্বল্পকে অবজ্ঞা করে না, অবাস্তবকে ভয় করে, তাই খ্যাতির কোলাহলকে আশ্রয় করতে সে কুণ্ঠিত। কিন্তু আধুনিক কালের ধর্ম, ব্যাপ্তির দ্বারা কাজকে বিচার করা, গভীরতার দ্বারা নয়। তার পরিণাম হয় গাছের ডালপালার পরিব্যাপ্তির মতো, তাতে ফল হয় কম।

আমি এক সময়ে নিভৃতে দুঃখ পেয়েছি অনেক, কিন্তু তাতে শান্তি ছিল। আমি খ্যাতি চাই নি, পাই নি; বরং অখ্যাতিই ছিল। মনু বলেছেন— সম্মানকে বিষের মতো জানবে। অনেক কাল কর্মের পুরস্কার-স্বরূপে সম্মানের দাবি করি নি। একলা আপনার কাজ করেছি, সহযোগিতার আশা ছেড়েই দিয়েছি। আশা করলে পাবার সম্ভাবনা ছিল না। তেমন স্থলে বাহ্যিকভাবে না পাওয়াই স্বাস্থ্যজনক।

বিশ্বভারতীর এই প্রতিষ্ঠান যে যুগে যুগে সার্থক হতেই থাকবে, তা বলে নিজেকে ভুলিয়ে কী হবে। মোহমুক্ত মনে নিরাশী হয়েই যথাসাধ্য কাজ করে

যেতে পারি যেন। বিধাতা আমাদের কাছে কাজ দাবি করেন কিন্তু আমরা তাঁর কাছে ফল দাবি করলে তিনি তার হিসাব গোপনে রাখেন, নগদ মজুরি চুকিয়ে দিয়ে আমাদের প্রয়াসের অবমাননা করেন না। তা ছাড়া আজ আমরা যে সংকল্প করেছি আগামী কালেও যে অবিকল তারই পুনরাবৃত্তি চলবে, কালের সে ধর্ম নয়। ভাবী কালের দিকে আমরা পথ তৈরি করে দিতে পারি, কিন্তু গম্য স্থানকে আমার আজকের দিনের রুচি ও বুদ্ধি দিয়ে একেবারে পাকা করে দেব, এ হতেই পারে না। যদি অন্ধ মমতায় তাই করে দিই তা হলে সে আমাদের মৃত সংকল্পের সমাধিস্থান হবে। আমাদের যে চেষ্টা বর্তমানে জন্মগ্রহণ করে, সময় উপস্থিত হলে তার অন্ত্যেষ্টি-সংকার হবে, তার দ্বারা সত্যের দেহ-মুক্তি হবে, কিন্তু তার পরে নবজন্মে তার নবদেহ-ধারণের আহ্বান আসবে এই কথা মনে রেখে—

নাভিনন্দেত মরণং নাভিনন্দেত জীবিতম্।
কালমেব প্রতীক্ষেত নির্দেশং ভৃতকো যথা॥

শান্তিনিকেতন
৯ পৌষ ১৩৩৯

১৬

প্রৌঢ় বয়সে একদা যখন এই বিদ্যায়তনের প্রতিষ্ঠা করেছিলেম তখন আমার সম্মুখে ভাসছিল ভবিষ্যৎ, পথ তখন লক্ষ্যের অভিমুখে, অনাগতের আহ্বান তখন ধ্বনিত—তার ভাবরূপ তখনও অস্পষ্ট, অথচ এক দিক দিয়ে তা এখনকার চেয়ে অধিকতর পরিস্ফুট ছিল। কারণ তখন যে আদর্শ মনে ছিল তা বাস্তবের অভিমুখে আপন অখণ্ড আনন্দ নিয়ে অগ্রসর হয়েছিল। আজ আমার আয়ুষ্কাল শেষপ্রায়, পথের অন্য প্রান্তে পৌঁছিয়ে পথের আরম্ভসীমা দেখবার সুযোগ হয়েছে, আমি সেই দিকে গিয়েছি—যেমনতর সূর্য যখন পশ্চিম-অভিমুখে অস্তাচলের তটদেশে তখন তার সামনে থাকে উদয়দিগন্ত, যেখানে তার প্রথম যাত্রারম্ভ।

অতীত কাল সম্বন্ধে আমরা যখন বলি তখন আমাদের হৃদয়ের পূর্বরাগ অত্যুক্তি করে, এমন বিশ্বাস লোকের আছে। এর মধ্যে কিছু সত্য আছে, কিন্তু সম্পূর্ণ সত্য নেই। যে দূরবর্তী কালের কথা আমরা স্মরণ করি তার থেকে যা-কিছু অবান্তর তা তখন স্বতই মন থেকে ঝরে পড়েছে। বর্তমান কালের সঙ্গে যত-কিছু আকস্মিক, যা-কিছু অসংগত সংযুক্ত থাকে তা তখন স্খলিত হয়ে ধূলিবিলীন; পূর্বে নানা কারণে যার রূপ ছিল বাধাগ্রস্ত তার সেই বাধার কঠোরতা আজ আর পীড়া দেয় না। এইজন্য গতকালের যে চিত্র মনের মধ্যে প্রকাশ পায় তা সুসম্পূর্ণ, যাত্রারম্ভের সমস্ত উৎসাহ স্মৃতিপটে তখন ঘনীভূত। তার মধ্যে এমন অংশ থাকে না যা প্রতিবাদরূপে অন্য অংশকে খণ্ডিত করতে থাকে। এইজন্যই অতীত স্মৃতিকে আমরা নিবিড়ভাবে মনে অনুভব করে থাকি। কালের দূরত্বে, যা যথার্থ সত্য তার বাহ্যরূপের অসম্পূর্ণতা ঘুচে যায়, সাধনার কল্পমূর্তি অক্ষুণ্ন হয়ে দেখা দেয়।

প্রথম যখন এই বিদ্যালয় আরম্ভ হয়েছিল তখন এর আয়োজন কত সামান্য ছিল, সেকালে এখানে যারা ছাত্র ছিল তারা তা জানে। আজকের তুলনায় তার

উপকরণবিরলতা, সকল বিভাগেই তার অকিঞ্চনতা, অত্যন্ত বেশি ছিল। কটি বালক ও দুই-এক জন অধ্যাপক নিয়ে বড়ো জামগাছতলায় আমাদের কাজের সূচনা করেছি। একান্তই সহজ ছিল তাদের জীবনযাত্রা—এখনকার সঙ্গে তার প্রভেদ গুরুতর। এ কথা বলা অবশ্যই ঠিক নয় যে, এই প্রকাশের ক্ষীণতাতেই সত্যের পূর্ণতর পরিচয়। শিশুর মধ্যে আমরা যে রূপ দেখি তার সৌন্দর্যে আমাদের মনে আনন্দ জাগায়, কিন্তু তার মধ্যে প্রাণরূপের বৈচিত্র্য ও বহুধাশক্তি নেই। তার পূর্ণ মূল্য ভাবী কালের প্রত্যাশার মধ্যে। তেমনি আশ্রমের জীবনযাত্রার যে প্রথম উপক্রম, বর্তমানে সে ছিল ছোটো, ভবিষ্যতেই সে ছিল বড়ো। তখন যা ইচ্ছা করেছিলাম তার মধ্যে কোনো সংশয় ছিল না। তখন আশা ছিল অমৃতের অভিমুখে, যে সংসার উপকরণ-বহুলতায় প্রতিষ্ঠিত তা পিছনে রেখেই সকলে এসেছিলেন। যাঁরা এখানে আমার কর্মসঙ্গী ছিলেন, অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন তাঁরা। আজ মনে পড়ে, কী কষ্টই না তাঁরা এখানে পেয়েছেন, দৈহিক সাংসারিক কত দীনতাই না তাঁরা বহন করেছেন। প্রলোভনের বিষয় এখানে কিছুই ছিল না, জীবনযাত্রার সুবিধা তো নয়ই, এমন কি খ্যাতিরও না—অবস্থার ভাবী উন্নতির আশা মরীচিকারূপেও তখন দূরদিগন্তে ইন্দ্রজাল বিস্তার করে নি। কেউ তখন আমাদের কথা জানত না, জানাতে ইচ্ছাও করি নি। এখন যেমন সংবাদপত্রের নানা ছোটোবড়ো জয়ঢাক আছে যা সামান্য ঘটনাকে শব্দায়িত করে রটনা করে, তার আয়োজনও তখন এমন ব্যাপক ছিল না। এই বিদ্যালয়ের কথা ঘোষণা করতে অনেক বন্ধু ইচ্ছাও করেছেন, কিন্তু আমরা তা চাই নি। লোকচক্ষুর অগোচরে, বহু দুঃখের ভিতর দিয়ে সে ছিল আমাদের যথার্থ তপস্যা। অর্থের এত অভাব ছিল যে, আজ জগদ্ব্যাপী দুঃসময়েও তা কল্পনা করা যায় না। আর সে কথা কোনোকালে কেউ জানবেও না, কোনো ইতিহাসে তা লিখিত হবে না। আশ্রমের কোনো সম্পত্তি ছিল না, সহায়তা ছিল না—চাইও নি। এইজন্যই, যাঁরা তখন এখানে কাজ করেছেন তাঁরা অন্তরে দান করেছেন, বাইরে কিছু নেন নি। যে আদর্শে আকৃষ্ট হয়ে এখানে এসেছি তার বোধ সকলেরই মনে যে স্পষ্ট বা প্রবল ছিল তা নয়, কিন্তু অল্প পরিসরের মধ্যে তা নিবিড় হতে পেরেছিল। ছাত্রেরা তখন আমাদের অত্যন্ত নিকটে ছিল, অধ্যাপকেরাও পরস্পর অত্যন্ত নিকটে ছিলেন—পরস্পরের সুহৃৎ ছিলেন তাঁরা। আমাদের দেশের তপোবনের আদর্শ আমি নিয়েছিলাম। কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সে আদর্শের রূপের পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু তার মূল সত্যটি ঠিক আছে—সেটি হচ্ছে, জীবিকার আদর্শকে স্বীকার করে তাকে সাধনার আদর্শের অনুগত করা। এক সময়ে এটা অনেকটা সুসাধ্য হয়েছিল, যখন জীবনযাত্রার পরিধি ছিল অনতিবৃহৎ। তাই বলেই সেই স্বল্পায়তনের মধ্যে সহজ জীবনযাত্রাই শ্রেষ্ঠ আদর্শ, এ কথা সম্পূর্ণ সত্য নয়। উচ্চতর সংগীতে নানা ত্রুটি ঘটতে পারে; একতারার ভুলচুকের সম্ভাবনা কম, তাই বলে একতারাই শ্রেষ্ঠ এমন নয়। বরঞ্চ কর্ম যখন বহুবিস্তৃত হয়ে বন্ধুর পথে চলতে থাকে তখন তার সকল ভ্রমপ্রমাদ সত্ত্বেও যদি তার মধ্যে প্রাণ থাকে তবে তাকেই শ্রদ্ধা করতে হবে। শিশু অবস্থার সহজতাকে চিরকাল বেঁধে রাখবার ইচ্ছা ও চেষ্টার মতো বিড়ম্বনা আর কী আছে। আমাদের কর্মের মধ্যেও সেই কথা। যখন একলা ছোটো কার্যক্ষেত্রের মধ্যে ছিলুম তখন সব কর্মীদের মনে এক অভিপ্রায়ের প্রেরণা সহজেই কাজ করত। ক্রমে ক্রমে যখন এ আশ্রম বড়ো হয়ে উঠল তখন একজনের অভিপ্রায় এর মধ্যে সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ পাবে এ সম্ভব হতে

পারে না। অনেকে এখানে এসেছেন, বিচিত্র তাঁদের শিক্ষাদীক্ষা—সকলকে নিয়েই আমি কাজ করি, কাউকে বাছাই করি নে, বাদ দিই নে; নানা ভুলত্রুটি ঘটে নানা বিদ্রোহ-বিরোধ ঘটে—এ সব নিয়েই জটিল সংসারে জীবনের যে প্রকাশ ঘাতাভিঘাতে সর্বদা আন্দোলিত তাকে আমি সম্মান করি। আমার প্রেরিত আদর্শ নিয়ে সকলে মিলে একতারা-যন্ত্রে গুঞ্জরিত করবেন এমন অতি সরল ব্যবস্থাকে আমি নিজেই শ্রদ্ধা করি নে। আমি যাকে বড়ো বলে জানি, শ্রেষ্ঠ বলে যা বরণ করেছি, অনেকের মধ্যে তার প্রতি নিষ্ঠার অভাব আছে জানি, কিন্তু তা নিয়ে নালিশ করতে চাই নে। আজ আমি বর্তমান থাকা সত্ত্বেও এখানকার যা কর্ম তা নানা বিরোধ ও অসংগতির মধ্য দিয়ে প্রাণের নিয়মে আপনি তৈরি হয়ে উঠছে; আমি যখন থাকব না, তখনও অনেক চিত্তের সমবেত উদ্যোগে যা উদ্ভাবিত হতে থাকবে তাই হবে সহজ সত্য। কৃত্রিম হবে যদি কোনো এক ব্যক্তি নিজের আদেশ-নির্দেশে একে বাধ্য করে চালায়—প্রাণধর্মের মধ্যে স্বতোবিরোধিতাকেও স্বীকার করে নিতে হয়।

অনেক দিন পরে আজ এ আশ্রমকে সমগ্র করে দেখতে পাচ্ছি; দেখছি, আপন নিয়মে এ আপনি গড়ে উঠেছে। গঙ্গা যখন গঙ্গোত্রীর মুখে তখন একটিমাত্র তার ধারা। তার পর ক্রমে বহু নদনদীর সহিত যতই সে সংগত হল, সমুদ্রের যত নিকটবর্তী হল, কত তার রূপান্তর ঘটেছে। সেই আদিম স্বচ্ছতা আর তার নেই, কত আবিলতা প্রবেশ করেছে তার মধ্যে, তবু কেউ বলে না গঙ্গার উচিত ফিরে যাওয়া, যেহেতু অনেক মলিনতা ঢুকেছে তার মধ্যে, সে সরল গতি আর তার নেই। সব নিয়ে যে সমগ্রতা সেইটেই বড়ো—আশ্রমও স্বতোধাবিত হয়ে সেই পথেই চলেছে, অনেক মানুষের চিত্তসম্মিলনে আপনি গড়ে উঠছে। অবশ্য এর মধ্যে একটা ঐক্য এনে দেয় মূলগত একটা আদিম বেগ; তারও প্রয়োজন আছে, অথচ এর গতি প্রবল হয় সকলের সম্মিলনে। নিত্যকালের মতো কিছুই কল্পনা করা চলে না—তবে এর মূলগত একটি গভীর তত্ত্ব বরাবর থাকবে এ কথা আমি আশা করি—সে কথা এই যে, এটা বিদ্যাশিক্ষার একটা খাঁচা হবে না, এখানে সকলে মিলে একটি প্রাণলোক সৃষ্টি করবে। এমনতরো স্বর্গলোক কেউ রচনা করতে পারে না যার মধ্যে কোনো কলুষ নেই, দুঃখজনক কিছু নেই; কিন্তু বন্ধুরা জানবেন যে, এর মধ্যে যা নিন্দনীয় সেইটাই বড়ো নয়। চোখের পাতা ওঠে, চোখের পাতা পড়ে; কিন্তু পড়াটাই বড়ো নয়, সেটাকে বড়ো বললে অন্ধতাকে বড়ো বলতে হয়। যাঁরা প্রতিকূল, নিন্দার বিষয় তাঁরা পাবেন না এমন নয়—নিন্দনীয়তার হাত থেকে কেউই রক্ষা পেতে পারে না। কিন্তু তাকে পরাস্ত করে উত্তীর্ণ হয়েও টিকে থাকাতেই প্রাণের প্রমাণ। আমাদের দেহের মধ্যে নানা শত্রু নানা রোগের বীজাণু—তাকে আলাদা করে যদি দেখি তো দেখব প্রত্যেক মানুষ বিকৃতির আলয়। কিন্তু আসলে রোগকে পরাস্ত করে যে স্বাস্থ্যকে দেখা যাচ্ছে সেইটেই সত্য। দেহের মধ্যে যেমন লড়াই চলছে, প্রত্যেক অনুষ্ঠানের মধ্যেই তেমনি ভালোমন্দের একটা দ্বন্দ্ব আছে—কিন্তু সেটা পিছন দিকের কথা। এর মধ্যে স্বাস্থ্যের তত্ত্বটাই বড়ো।

আমি এমন কথা কখনও বলি নি, আজও বলি নে যে, আমি যে কথা বলব তাই বেদবাক্য—সেরকম অধিনেতা আমি নই। অসাধারণ তত্ত্ব তো আমি কিছু উদ্ভাবন করি নি; সাধকেরা যে অখণ্ড পরিপূর্ণ জীবনের কথা বলেন সে কথা যেন সকলে স্বীকার করে নেন। এই একটি কথা ধ্রুব হয়ে থাক। তার পরে পরিবর্তমান পরিবর্ধমান সৃষ্টির কাজ সকলে মিলেই হবে। মানুষের দেহে যেমন অস্থি, এই অনুষ্ঠানের মধ্যেও তেমনি একটি যান্ত্রিক দিক আছে। এই অনুষ্ঠান

যেন প্রাণবান হয়, কিন্তু যন্ত্রই যেন মুখ্য না হয়ে ওঠে; হৃদয়-প্রাণ-কল্পনার সঞ্চরণের পথ যেন থাকে। আমি কল্পনা করি, এখানকার বিদ্যালয়ের আস্বাদন এক সময়ে যাঁরা পেয়েছেন, এখানকার প্রাণের সঙ্গে প্রাণকে মিলিয়েছেন অনেক সময় হয়তো তাঁরা এখানে অনেক বাধা পেয়েছেন, দুঃখ পেয়েছেন, কিন্তু দূরে গেলেই পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে পান এখানে যা বড়ো যা সত্য। আমার বিশ্বাস, সেই দৃষ্টিমান্ অনেক ছাত্র ও কর্মী নিশ্চয়ই আছেন, নইলে অস্বাভাবিক হত। এক সময়ে তাঁরা এখানে নানা আনন্দ পেয়েছেন, সখ্যবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন—এর প্রতি তাঁদের মমতা থাকবে না এ হতেই পারে না। আমি আশা করি, কেবল নিষ্ক্রিয় মমতা দ্বারা নয়, এই অনুষ্ঠানের অন্তর্বর্তী হয়ে যদি তাঁরা এর শুভ ইচ্ছা করেন, তবে এর প্রাণের ধারা অব্যাহত থাকতে পারবে, যন্ত্রের কঠিনতা বড়ো হয়ে উঠতে পারবে না। এক সময়ে এখানে যাঁরা ছাত্র ছিলেন, যাঁরা এখানে কিছু পেয়েছেন কিছু দিয়েছেন, তাঁরা যদি অন্তরের সঙ্গে একে গ্রহণ করেন তবেই এ প্রাণবান হবে। এইজন্য আজ আমার এই ইচ্ছা প্রকাশ করি যে, যাঁরা জীবনের অর্ঘ্য এখানে দিতে চান, যাঁরা মমতা দ্বারা একে গ্রহণ করতে চান, তাঁদের অন্তর্বর্তী করে নেওয়া যাতে সহজ হয় সেই প্রণালী যেন আমরা অবলম্বন করি। যাঁরা একদা এখানে ছিলেন তাঁরা সম্মিলিত হয়ে এই বিদ্যালয়কে পূর্ণ করে রাখুন এই আমার অনুরোধ। অন্যসব বিদ্যালয়ের মতো এ আশ্রম যেন কলের জিনিস না হয়—তা করব না বলেই এখানে এসেছিলাম। যন্ত্রের অংশ এসে পড়েছে, কিন্তু সবার উপরে প্রাণ যেন সত্য হয়। সেইজন্যই আহ্বান করি তাঁদের যাঁরা এক সময়ে এখানে ছিলেন, যাঁদের মনে এখনও সেই স্মৃতি উজ্জ্বল হয়ে আছে। ভবিষ্যতে যদি আদর্শের প্রবলতা ক্ষীণ হয়ে আসে তবে সেই পূর্বতনেরা যেন একে প্রাণধারায় সঞ্জীবিত করে রাখেন, নিষ্ঠা দ্বারা শ্রদ্ধা দ্বারা এর কর্মকে সফল করেন—এই আশ্বাস পেলেই আমি নিশ্চিন্ত হয়ে যেতে পারি।

শান্তিনিকেতন
৮ পৌষ ১৩৪১

১৭

এই আশ্রম-বিদ্যালয়ের কোথা থেকে আরম্ভ, কোন্ সংকল্প নিয়ে কিসের অভিমুখে এ চলেছে, সে কথা প্রতি বর্ষে একবার করে ভাববার সময় আসে—বিশেষ করে আমার—কেননা অনুভব করি, আমার বলবার সময় আর বেশি নেই। এর ইতিহাস বিশেষ নেই; যে কাজের ভার নিয়েছিলাম তা নিজের প্রকৃতিসংগত নয়। পূর্বে সমাজ থেকে দূরে কোণে মানুষ হয়েছি, আমি যে পরিবারে মানুষ হয়েছিলাম, লোকসমাজের সঙ্গে সংযোগ ছিল তার অল্প। যখন সাহিত্যে প্রবৃত্ত হলাম সে সময়ও নিভৃতে নদীতীরে কাটিয়েছি। এমন সময় এই বিদ্যালয়ের আহ্বান এল। এই কথাটা অনুভব করেছিলাম, শহরের খাঁচায় আবদ্ধ হয়ে মানবশিশু নির্বাসনদণ্ড ভোগ করে, তার শিক্ষাও বিদ্যালয়ে সংকীর্ণ পরিধিতে সীমাবদ্ধ। গুরুর শাসনে তারা অনেক দুঃখ পায়, এ সম্বন্ধে আমার নিজেরও অভিজ্ঞতা আছে। কখনও ভাবি নি আমার দ্বারা এর কোনো উপায় হবে। তবু একদিন নদীতীর ছেড়ে

এখানে এসে আহ্বান করলুম ছেলেদের। এখানকার কাজে প্রথমে যে উৎসাহ এসেছিল সেটা সৃষ্টির আনন্দ; শিক্ষাকে লোকহিতের দিক থেকে জনসেবার অঙ্গ করে দেখা যায়—সেদিক থেকে আমি এখানে কাজ আরম্ভ করি নি। প্রকৃতির সৌন্দর্যের মধ্যে মানুষ হয়ে এখানকার ছেলেদের মন বিকশিত হবে, আবরণ ঘুচে যাবে, কল্পনার এই রূপ দেখতে পেতাম। যখন জানলুম, এ কাজের ভার নেবার আর কেউ নেই, তখন অনভিজ্ঞতা সত্ত্বেও এ ভার আমি নিয়েছিলাম। আমি মনে করেছিলাম, আমার ছেলেরা প্রাণবান হবে, তাদের মধ্যে ঔৎসুক্য জাগরিত হবে। তারা বেশি পাসমার্কা পেয়ে ভালো করে পাস করবে এ লোভ ছিল না—তারা আনন্দিত হবে, প্রকৃতির শুশ্রূষায় শিক্ষকের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তায় পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হবে এই ইচ্ছাই মনে ছিল। অল্প কয়েকটি ছেলে নিয়ে গাছের তলায় এই লক্ষ্য নিয়েই কাজ আরম্ভ করেছিলাম। প্রকৃতির অবাধ সঙ্গ লাভ করবার উন্মুক্ত ক্ষেত্র এখানেই ছিল; শিক্ষায় যাতে তারা আনন্দ পায়, উৎসাহ বোধ করে, সেজন্য সর্বদা চেষ্টা করেছি, ছেলেদের রামায়ণ মহাভারত পড়ে শুনিয়েছি; অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় তখন এখানে আসতেন, তিনি তা শুনতে ছাত্র হয়ে আসতে পারবেন না বলে আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন। ছেলেদের জন্য নানারকম খেলা মনে মনে আবিষ্কার করেছি, একত্র হয়ে তাদের সঙ্গে অভিনয় করেছি, তাদের জন্য নাটক রচনা করেছি। সন্ধ্যার অন্ধকারে যাতে তারা দুঃখ না পায় এজন্য তাদের চিত্তবিনোদনের নূতন নূতন উপায় সৃষ্টি করেছি—তাদের সমস্ত সময়ই পূর্ণ করে রাখবার চেষ্টা করেছি। আমার নাটক গান তাদের জন্যই আমার রচনা। তাদের খেলাধুলোয়ও তখন আমি যোগ দিয়েছি। এইসব ব্যবস্থা অন্যত্র শিক্ষাবিধির অন্তর্গত নয়। অন্য বিদ্যালয়ে ক্রিয়াপদ শব্দরূপ হয়তো বিশুদ্ধভাবে মুখস্থ করানো হচ্ছে—অভিভাবকের দৃষ্টিও সেই দিকেই। আমাদের হয়তো সে দিকে কিছু ত্রুটি হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু এ কথা বলতেই হবে যে, এখানে ছাত্রদের সহজ মুক্তির আনন্দ দিয়েছি। সর্বদা তাদের সঙ্গী হয়ে ছিলাম—মাত্র দশটা-পাঁচটা নয়, শুধু তাদের নির্দিষ্ট পাঠের মধ্যে নয়—তাদের আপন অন্তরের মধ্যে তাদের জাগিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছি। কোনো নিয়ম দ্বারা তারা পিষ্ট না হয়, এই আমার মনে অভিপ্রায় ছিল। এই চেষ্টায় সঙ্গী পেয়েছিলুম কিশোর কবি সতীশচন্দ্রকে—শিক্ষাকে তিনি আনন্দে সরস করে তুলতে পেরেছিলেন, সেক্সপীয়রের মতো কঠিন বিষয়কেও তিনি অধ্যাপনার গুণে শিশুদের মনে মুদ্রিত করে দিতে পেরেছিলেন। তার পরে ক্রমশ নানা ঋতু-উৎসবের প্রচলন হয়েছে; আপনার অজ্ঞাতসারে প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের আনন্দের যোগ এই উৎসবের সহযোগে গড়ে উঠবে এই আমার লক্ষ্য ছিল।

ছাত্রসংখ্যা তখন অল্প ছিল, এও একটা সুযোগ ছিল, নইলে আমার পক্ষে একলা এর ভার গ্রহণ করা অসম্ভব হত। সকল ছাত্র-শিক্ষকে মিলে তখন এক হয়ে উঠেছিলেন, কাজেই সকলকে এক অভিপ্রায়ে চালিত করা সহজ হয়েছিল।

ক্রমে বিদ্যালয় বড়ো হয়ে উঠেছে। আমি যখন এর জন্য দায়ী ছিলুম তখন অনেক সংকট এসেছে, সবই সহ্য করেছি; অনেক সময় বহুসংখ্যক ছাত্রকে বিদায় করতে হয়েছে, তার যা আর্থিক ক্ষতি যেমন করে পারি বহন করেছি। কেবল এইটুকু লক্ষ্য রেখেছি, যেন ছাত্র শিক্ষক এক আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে চলেন। ক্রমে যেটা সহজ পন্থা বিদ্যালয় সেই দিকেই চলেছে বলে মনে হয়—শিক্ষার যেসব প্রণালী সাধারণত প্রচলিত, বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবি, সেইগুলিই

বলবান হয়ে ওঠে, তার নিজের ধারা বদলে গিয়ে হাই-ইস্কুলের চলতি ছাঁচের প্রভাব প্রবল হয়ে ওঠে, কেননা সেই দিকেই ঝোঁক দেওয়া সহজ; সফলতার আদর্শ প্রচলিত আদর্শের দিকে ঝুঁকে পড়ে। মাঝখানে এল কনস্টিট্যুশন, ঠিক হল বিদ্যালয় ব্যক্তির অধীনে থাকবে না, সর্বসাধারণের রুচিই একে পরিচালিত করবে। আমার কবিপ্রকৃতি বলেই হয়তো, কনস্টিট্যুশন, নিয়মের কাঠামো—যাতে প্রাণধর্মের চেয়ে কৃত্রিম উপায়ের উপর বেশি জোর, তা আমি বুঝতে পারি নে; সৃষ্টির কার্যে এটা বাধা দেয় বলেই আমার মনে হয়। যাই হোক, কনস্টিট্যুশনে নির্ভর রেখে আমি এর মধ্য থেকে অবকাশ নিয়েছি, কিন্তু এ কথা তো ভুলতে পারি নে যে, এ বিদ্যালয়ের কোনো বিশেষত্ব যদি অবশিষ্ট না থাকে তবে নিজেকে বঞ্চিত করা হয়। সাধ্যের বেশি অনেক আমাকে এর জন্য দিতে হয়েছে, কেউ সে কথা জানে না—কত দুঃসহ কষ্ট আমাকে স্বীকার করতে হয়েছে। অত্যন্ত দুঃখে যাকে গড়ে তুলতে হয়েছে সে যদি এমন হয় যা আরও ঢের আছে, অর্থাৎ তার সার্থকতার মানদণ্ড যদি সাধারণের অনুগত হয়, তবে কী দরকার ছিল এমন সমূহ ক্ষতি স্বীকার করবার? বিদ্যালয় যদি একটা হাই-ইস্কুলে মাত্র পর্যবসিত হয় তবে বলতে হবে ঠকলুম। আমার সঙ্গে যাঁরা এখানে শিক্ষকতা আরম্ভ করেছিলেন, এখানকার আদর্শের মধ্যে যাঁরা ধীরে ধীরে বেড়ে উঠছিলেন, তাঁদের অনেকেই আজ পরলোকে। পরবর্তী যাঁরা এখন এসেছেন তাঁদের শিক্ষকতার আদর্শ, দূর থেকে ছাত্রদের পরিচালনা করা, এটা আমার সময় ছিল না। এরকম করে দূরত্ব রেখে অন্তঃকরণকে জাগিয়ে তোলা সম্ভব হয় না। এতে হয়তো খুব দক্ষ পরিচালনা হতে পারে কিন্তু তার চেয়ে বড়ো জিনিসের অভাব ঘটতে থাকে। এখন অনেক ছাত্র অনেক বিভাগ হয়েছে, সকলই বিচ্ছিন্ন অবস্থায় চলছে। কর্মী সমগ্র অনুষ্ঠানটিকে চিন্তার ক্ষেত্রে সেবার ক্ষেত্রে এক করে দেখতে পাচ্ছেন না—বিচ্ছেদ জন্মাচ্ছে।

আমার বক্তব্য এই যে, সকল বিভাগই যদি এক প্রাণক্রিয়ার অন্তর্গত না হয় তবে এ ভার বহন করা কঠিন। আমি যতদিন আছি ততদিন হয়তো এ বিচ্ছেদ ঠেকাতে পারি, কিন্তু আমার অবর্তমানে কার আদর্শে চলবে? আমি এই বিদ্যালয়ের জন্য অনেক দুঃখ স্বীকার করে নিয়েছি—আশা করি আমার এই উদ্‌বেগ প্রকাশ করবার অধিকার আছে। এমন প্রতিষ্ঠান নেই যার মধ্যে কিছু নিন্দনীয় নেই, কিন্তু দরদী তা বুক দিয়ে চাপা দেয়; এমন অনুষ্ঠান নেই যার দুঃখ নেই, বন্ধু তা আনন্দের সঙ্গে বহন করে। দৃঢ় নিষ্ঠার সঙ্গে সকলে একত্র হয়ে যেন আমরা আদর্শের বিশুদ্ধি রক্ষা করি, বিদ্যালয়ের মূল উদ্দেশ্য বিস্মৃত না হই।

ক্রমে বিদ্যালয়ের মধ্যে আর একটা আইডিয়া প্রবেশ করেছিল— সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিশ্বের সঙ্গে ভারতবর্ষের যোগ। এতে নানা লাভক্ষতি হয়েছে, কিন্তু পেয়েছি আমি কয়েকজন বন্ধু যাঁরা এখানে ত্যাগের অর্ঘ্য এনেছেন, আমার কর্মকে, আমাকে ভালোবেসেছেন। নানা নিন্দা তাঁরা শুনেছেন। বাইরে আমরা অতি দরিদ্র, কী দেখাতে পারি—তবুও বন্ধুরূপে সাহায্য করেছেন। শ্রীনিকেতনকে যিনি রক্ষা করছেন তিনি একজন বিদেশী—কী না তিনি দিয়েছেন। এণ্ড্রুজ দরিদ্র, তবু তিনি যা পেরেছেন দিয়েছেন—আমরা তাঁকে কত আঘাত দিয়েছি, কিন্তু কখনও তাতে ক্ষুণ্ন হয়ে তিনি আমাদের ক্ষতি করেন নি। লেস্‌নি-সাহেব আমাদের পরম বন্ধু, পরম হিতৈষী। কেউ কেউ আজ পরলোকে। এই অকৃত্রিম সৌহার্দ্য সকল

ক্ষতির দুঃখে সান্ত্বনা। একান্তমনে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি এই বিদেশী বন্ধুদের কাছে।

শান্তিনিকেতন
৮ পৌষ ১৩৪২

১৮

য়ুরোপে সর্বত্রই আছে বিজ্ঞানসাধনার প্রতিষ্ঠান—ব্যাপক তার আয়োজন, বিচিত্র তার প্রয়াস। আধুনিক য়ুরোপের শক্তিকেন্দ্র বিজ্ঞানে, এইজন্যে তার অনুশীলনের উদ্যোগ সহজেই সর্বজনের সমর্থন পেয়েছে। কিন্তু য়ুরোপীয় সংস্কৃতি কেবলমাত্র বিজ্ঞান নিয়ে নয়—সাহিত্য আছে, সংগীত আছে, নানাবিধ কলাবিদ্যা আছে, জনহিতকর প্রচেষ্টা আছে। এদের কেন্দ্র নানা জায়গাতেই রূপ নিয়েছে জাতির স্বাভাবিক প্রবর্তনায়।

এইসকল কেন্দ্রের প্রধান সার্থকতা কেবল তার কর্মফল নিয়ে নয়। তার চেয়ে বড়ো সিদ্ধি সাধকদের আত্মার বিকাশে। নানা প্রকারে সেই বিকাশের প্রবর্তনা ও আনুকূল্য যদি দেশের মধ্যে থাকে তবেই দেশের অন্তরাত্মা জেগে উঠতে পারে। মানুষের প্রকৃতিতে ঊর্ধ্বদেশে আছে তার নিষ্কাম কর্মের আদেশ, সেইখানে প্রতিষ্ঠিত আছে সেই বেদী যেখানে অন্য কোনো আশা না রেখে সে সত্যের কাছে বিশুদ্ধভাবে আত্মসমর্পণ করতে পারে— আর কোনো কারণে নয়, তাতে তার আত্মারই পূর্ণতা হয় বলে।

আমাদের দেশে এখানে সেখানে দূরে দূরে গুটিকয়েক বিশ্ববিদ্যালয় আছে, সেখানে বাঁধা নিয়মে যান্ত্রিক প্রণালীতে ডিগ্রি বানাবার কারখানাঘর বসেছে। এই শিক্ষার সুযোগ নিয়ে ডাক্তার এঞ্জিনিয়র উকিল প্রভৃতি ব্যবসায়ীদের সংখ্যাও বেড়ে চলেছে। কিন্তু সমাজে সত্যের জন্য কর্মের জন্য নিষ্কাম আত্মনিয়োগের ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা হয় নি। প্রাচীন কালে ছিল তপোবন; সেখানে সত্যের অনুশীলন এবং আত্মার পূর্ণতা-বিকাশের জন্য সাধকেরা একত্র হয়েছেন, রাজস্বের ষষ্ঠ অংশ দিয়ে এইসকল আশ্রমকে রক্ষা করা রাজাদের কর্তব্য ছিল। সকল সভ্য দেশেই জ্ঞানের তাপস কর্মের ব্রতীদের জন্যে তপোভূমি রচিত হয়েছে।

আমাদের দেশে সাধনা বলতে সাধারণত মানুষ আধ্যাত্মিক মুক্তির সাধনা, সন্ন্যাসের সাধনা ধরে নিয়ে থাকে। আমি যে সংকল্প নিয়ে শান্তিনিকেতনে আশ্রম-স্থাপনায় উদ্যোগ করেছিলুম, সাধারণ মানুষের চিত্তোৎকর্ষের সুদূর বাইরে তার লক্ষ্য ছিল না। যাকে সংস্কৃতি বলে তা বিচিত্র; তাতে মনের সংস্কার সাধন করে, আদিম খনিজ অবস্থার অনুজ্জ্বলতা থেকে তার পূর্ণ মূল্য উদ্ভাবন করে নেয়। এই সংস্কৃতির নানা শাখাপ্রশাখা; মন যেখানে সুস্থ সবল, মন সেখানে সংস্কৃতির এই নানাবিধ প্রেরণাকে আপনিই চায়।

ব্যাপকভাবে এই সংস্কৃতি-অনুশীলনের ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা করে দেব, শান্তিনিকেতন-আশ্রমে এই আমার অভিপ্রায় ছিল। আমাদের দেশের বিদ্যালয়ে পাঠ্যপুস্তকের পরিধির মধ্যে জ্ঞানচর্চার যে সংকীর্ণ সীমা নির্দিষ্ট আছে কেবলমাত্র তাই নয়, সকলরকম কারুকার্য শিল্পকলা নৃত্যগীতবাদ্য নাট্যাভিনয় এবং

পল্লীহিতসাধনের জন্যে যেসকল শিক্ষা ও চর্চার প্রয়োজন সমস্তই এই সংস্কৃতির অন্তর্গত বলে স্বীকার করব। চিত্তের পূর্ণবিকাশের পক্ষে এই সমস্তেরই প্রয়োজন আছে বলে আমি জানি। খাদ্যে নানা প্রকারের প্রাণীন পদার্থ আমাদের শরীরে মিলিত হয়ে আমাদের দেয় স্বাস্থ্য, দেয় বল; তেমনি যেসকল শিক্ষণীয় বিষয়ে মনের প্রাণীন পদার্থ আছে তার সবগুলিরই সমবায় হবে আমাদের আশ্রমের সাধনায়—এই কথাই আমি অনেক কাল চিন্তা করেছি।

পদ্মার বোটে ছিল আমার নিভৃত নিবাস। সেখান থেকে আশ্রমে চলে এসে আমার আসন নিলুম গুটি-পাঁচছয় ছেলের মাঝখানে। কেউ না মনে করেন, তাদের উপকার করাই ছিল আমার লক্ষ্য। ক্লাস-পড়ানো কাজে উপকার করার সম্বল আমার ছিল না। বস্তুত সাধনা করার আগ্রহ আমাকে পেয়ে বসেছিল, আমার নিজেরই জন্যে। নিজেকে দিয়ে-ফেলার দ্বারা নিজেকে পাওয়ার লোভ আমাকে দখল করেছিল। ছোটো ছেলেদের পড়াবার কাজে দিনের পরে দিন আমার কেটেছে, তার মধ্যে খ্যাতির প্রত্যাশা বা খ্যাতির স্বাদ পাবার উপায় ছিল না। সবচেয়ে নিম্নশ্রেণীর ইস্কুলমাস্টারি। ঐ কটি ছোটো ছেলে আমার সমস্ত সময় নিলে, অর্থ নিলে, সামর্থ্য নিলে—এইটেই আমার সার্থকতা। এই-যে আমার সাধনার সুযোগ ঘটল, এতে করে আমি আপনাকেই পেতে লাগলুম। এই আত্মবিকাশ, এ কেবল সাধনার ফলে, বৃহৎ মানবজীবনের সংগমক্ষেত্রে। আপনাকে সরিয়ে ফেলতে পারলেই বৃহৎ মানুষের সংসর্গ পাওয়া যায়, এই সামান্য ছেলে-পড়ানোর মধ্যেও। এতে খ্যাতি নেই, স্বার্থ নেই, সেইজন্যেই এতে বৃহৎ মানুষের স্পর্শ আছে।

সকলে জানেন, আমি মানুষের কোনো চিত্তবৃত্তিকে অস্বীকার করি নি। বাল্যকাল থেকে আমার কাব্যসাধনার মধ্যে যে আত্মপ্রকাশের প্রবল ইচ্ছা জাগ্রত ছিল মানুষের সকল চিত্তবৃত্তির 'পরেই তার ছিল অভিমুখিতা। মানুষের কোনো চিৎশক্তির অনুশীলনকেই আমি চপলতা বা গাম্ভীর্যহানির দাগা দিই নি।

বহু বৎসর আমি নদীতীরে নৌকাবাসে সাহিত্যসাধনা করেছি, তাতে আমার নিরতিশয় শান্তি ও আনন্দ ছিল। কিন্তু মানুষ শুধু কবি নয়। বিশ্বলোকে চিত্তবৃত্তির যে বিচিত্র প্রবর্তনা আছে তাতে সাড়া দিতে হবে সকল দিক থেকে; বলতে হবে ওঁ—আমি জেগে আছি।

এখানে এলুম যখন তখন আমার কর্মচেষ্টায় বাইরের প্রকাশ অতি দীন ছিল। সে সম্বন্ধে এইটুকুমাত্রই বলতে পারি, সেই উপকরণবিরল অতি ছোটো ক্ষেত্রের মধ্যে আপনাকে দেওয়ার দ্বারা ও আপনাকে পাওয়ার দ্বারা যে আনন্দ তারই মধ্য দিয়ে এই আশ্রমের কাজ শুরু হয়েছে।

দিনে দিনে এই কাজের ক্ষেত্র প্রসারিত হয়েছে। আজ সে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে সর্বসাধারণের দৃষ্টির সামনে। আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে জেনেছি, আমাদের দেশের দৃষ্টি প্রায়ই অনুকূল নয়। কিন্তু তাতে ক্ষতি হয় নি, তাতে কর্মের মূল্যই বেড়েছে।

যাঁরা সংকীর্ণ কর্তব্যসীমার মধ্যেও এই বিদ্যায়তনে কাজ করছেন তাঁদেরও সহযোগিতা শ্রদ্ধার সঙ্গে সকৃতজ্ঞ চিত্তে আমার স্বীকার্য।

এখানে যাঁরা এসেছেন তাঁরা একে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করেছেন কি না জানি না। কিন্তু তাঁদের উদ্দেশে এই প্রতিষ্ঠানকে আমি সমর্পণ করেছি।

বহুদিন এই আশ্রমে আমরা প্রচ্ছন্ন ছিলাম। মাটির ভিতরে বীজের যে অজ্ঞাতবাস, প্রাণের স্ফুরণের জন্য তার প্রয়োজন আছে। এই অজ্ঞাতবাসের পর্ব

দীর্ঘকাল চলেছিল। আজ যদি এই প্রতিষ্ঠান লোকচক্ষুর গোচর হয়ে থাকে তবে সেই প্রকাণ্ড দৃষ্টিপাতের ঘাতসংঘাত ভালোমন্দ লাভক্ষতি সমস্ত স্বীকার করে নিতে হবে— কখনও পীড়িত মনে, কখনও উৎসাহের সঙ্গে।

যাঁরা উপদেষ্টা পরামর্শদাতা বা অতিথি ভাবে এখানে আসেন তাঁদের জানিয়ে রাখি, আমাদের এই বিদ্যায়তনে ব্যবসায়বুদ্ধি নেই। এখানে ক্ষণে ক্ষণে উত্তেজিত জনমতের অনুবর্তন করে জনতার মন রক্ষা করি নি, এবং সেই কারণে যদি আনুকূল্য থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকি তবে সে আমাদের সৌভাগ্য। আমরা কর্মপ্রচেষ্টার মধ্যে শ্রেয়কে বরণ করবার প্রয়াস রাখি। কর্মের সাধনাকে মনুষ্যত্বসাধনার সঙ্গে এক বলে জানি। আমাদের এখানে সাধনার আসন পাতা রয়েছে। সকল স্থলেই যে সেই আসন সাধকেরা অধিকার করেছেন এমন গর্ব করি নে। কিন্তু এখানকার আবহাওয়ার মধ্যে একটি আহ্বান আছে— আয়ন্তু সর্বতঃ স্বাহা।

আমাদের মনে বিশ্বাস হয়েছে, আমাদের চেষ্টা ব্যর্থ হয় নি, যদিও ফসলের পূর্ণপরিণত রূপ আমরা দেখতে পাচ্ছি না। যাঁরা আমাদের সুদীর্ঘ এবং দুরূহ প্রয়াসের মধ্যে এমন-কিছু দেখতে পেয়েছেন যার সর্বকালীন মূল্য আছে, তাঁদের সেই অনুকূল দৃষ্টি থেকে আমরা বর লাভ করেছি। তাঁদের দৃষ্টির সেই আবিষ্কার শক্তি জাগিয়েছে আমাদের কর্মে। দূরের থেকে এসেছেন মনীষীরা অতিথিরা, ফিরেছেন বন্ধুরূপে, তাঁদের আশ্বাস ও আনন্দ সঞ্চিত হয়েছে আশ্রমের সম্পদভাণ্ডারে।

বহুদিনের ত্যাগের দ্বারা, চেষ্টার দ্বারা এই আশ্রমকে দেশের বেদীমূলে স্থাপন করবার জন্য নৈবেদ্যসংরচনকার্য আমার আয়ুর সঙ্গে সঙ্গেই একরকম শেষ করে এনেছি। দূরের অতিথি-অভ্যাগতদের অনুমোদনের দ্বারা আমাদের কাছে এই কথা স্পষ্ট হয়েছে যে, এখানে প্রাণশক্তি রয়েছে। ফুলে ফলে বাইরের ফসলের কিছু-একটা প্রকাশ এঁরা দেখেছেন, তা ছাড়া তাঁরা এর অন্তরের ক্রিয়াকেও দেখেছেন। দূরের সেই অতিথিরা মনীষীরা আমাদের পরম বন্ধু, কারণ তাঁদের আশ্বাস আমরা পেয়েছি। আমাদের এই আশ্রমের কর্মেতে আমি যে আপনাকে সমর্পণ করেছি তা সার্থক হবে যদি আমার এই সৃষ্টি আমি যাবার পূর্বে দেশকে সঁপে দিতে পারি। শ্রদ্ধয়া দেয়ম্ যেমন, তেমনি শ্রদ্ধয়া আদেয়ম্। যেমন শ্রদ্ধায় দিতে চাই, তেমনি শ্রদ্ধায় একে গ্রহণ করতে হবে। এই দেওয়া-নেওয়া যেদিন পূর্ণ হবে সেদিন আমার সারা জীবনের কর্মসাধনার এই ক্ষেত্র পূর্ণতার রূপ লাভ করবে।

শান্তিনিকেতন
৮ পৌষ ১৩৪৫

১৯

অনেক দিন পরে আজ আমি তোমাদের সম্মুখে এই মন্দিরে উপস্থিত হয়েছি। অত্যন্ত সংকোচের সঙ্গেই আজ এসেছি। এ কথা জানি যে, দীর্ঘকালের অনুপস্থিতির ব্যবধানে আমার বহুকালের অনেক সংকল্পের গ্রন্থি শিথিল হয়ে এসেছে। যে কারণেই হোক, তোমাদের মন এখন আর প্রস্তুত নেই আশ্রমের সকল

অনুষ্ঠানের সকল কর্তব্যকর্মের অন্তরের উদ্দেশ্যটি গ্রহণ করতে, এ কথা অস্বীকার করে লাভ নেই। এর জন্যে শুধু তোমরা নও, আমরা সকলেই দায়ী।

আজ মনে পড়ছে চল্লিশ বৎসর পূর্বের একটি দিনের কথা। বাংলার নিভৃত এক প্রান্তে আমি তখন ছিলাম পদ্মানদীর নির্জন তীরে। মন যখন সে দিকে তাকায়, দেখতে পায় যেন এক দূর যুগের প্রত্যুষের আভা। কখন এক উদ্‌বোধনের মন্ত্র হঠাৎ এল আমার প্রাণে। তখন কেবলমাত্র কবিতা লিখে দিন কাটিয়েছি; অধ্যয়ন ও সাহিত্যালোচনার মধ্যে ডুবেছিলাম, তারই সঙ্গে ছিল বিষয়কর্মের বিপুল বোঝা।

কেন সেই শান্তিময় পল্লীশ্রীর স্নিগ্ধ আবেষ্টন থেকে টেনে নিয়ে এল আমাকে এই রৌদ্রদগ্ধ মরুপ্রান্তরে তা বলতে পারি না।

এখানে তখন বাইরে ছিল সব দিকেই বিরলতা ও বিজনতা, কিন্তু সব সময়েই মনের মধ্যে ছিল একটি পরিপূর্ণতার আশ্বাস। একাগ্রচিত্তে সর্বদা আকাঙ্ক্ষা করেছি, বর্তমান কালের তুচ্ছতা ইতরতা প্রগল্‌ভতা সমস্ত দূর করতে হবে। যাদের শিক্ষাদানের ভার গ্রহণ করেছি, ভারতের যুগান্তরব্যাপী সাধনার অমৃত-উৎসে তাদের পৌঁছে দিতে পারব, এই আশাই ছিল অন্তরের গভীরে।

কতদিন এই মন্দিরের সামনের চাতালে দুটি-একটি মাত্র উপাসক নিয়ে সমবেত হয়েছি—অবিরত চেষ্টা ছিল সুপ্ত প্রাণকে জাগাবার। তারই সঙ্গে আরও চেষ্টা ছিল ছেলেদের মনে তাদের স্বাধীন কর্মশক্তি ও মননশক্তিকে উদ্‌বুদ্ধ করতে। কোনোদিনই খণ্ডভাবে আমি শিক্ষা দিতে চাই নি। ক্লাসের বিচ্ছিন্ন ব্যবস্থায় তাদের শিক্ষার সমগ্রতাকে আমি কখনও বিপর্যস্ত করি নি।

সেদিনের সে আয়োজন অন্ধ-অনুষ্ঠানের দ্বারা ম্লান ছিল না, অপমানিত ছিল না অভ্যাসের ক্লান্তিতে। এমন কোনো কাজ ছিল না যার সঙ্গে নিবিড় যোগ ছিল না আশ্রমের কেন্দ্রস্থলবর্তী শ্রদ্ধার একটি মূল উৎসের সঙ্গে। স্নানপান-আহারে সেদিনের সমগ্র জীবনকে অভিষিক্ত করেছিল এই উৎস। শান্তিনিকেতনের আকাশ-বাতাস পূর্ণ ছিল এরই চেতনায়। সেদিন কেউ একে অবজ্ঞা করে অন্যমনস্ক হতে পারত না।

আজ বার্ধক্যের ভাঁটার টানে তোমাদের জীবন থেকে দূরে পড়ে গেছি। প্রথম যে আদর্শ বহন করে এখানে এসেছিলুম, আমার জীর্ণ শক্তির অপটুতা থেকে তাকে উদ্ধার করে নিয়ে দৃঢ় সংকল্পের সঙ্গে নিজের হাতে বহন করবার আনন্দিত উদ্যম কোথাও দেখতে পাচ্ছি নে। মনে হয়, এ যেন বর্তমান কালেরই বৈশিষ্ট্য। সব-কিছুকে সন্দেহ করা, অপমান করা, এতেই যেন তার স্পর্ধা। তারই তো বীভৎস লক্ষণ মারীবিস্তার করে ফুটে উঠেছে দেশে বিদেশে আজকের দিনের রাষ্ট্রে সমাজে, বিদ্রূপ করছে তাকে যা মানব-সভ্যতার চিরদিনের সাধনার সামগ্রী।

চল্লিশ বৎসর পূর্বে যখন এখানে প্রথম আসি তখন আশ্রমের আকাশ ছিল নির্মল। কেবল তাই নয়, তখন বিষবাষ্প ব্যাপ্ত হয় নি মানবসমাজের দিগ্‌দিগন্তে।

আজ আবার আসছি তোমাদের সামনে যেন বহুদূরের থেকে। আর-একবার মনে পড়ছে এই আশ্রমে প্রথম প্রবেশ করবার দীর্ঘ বন্ধুর পথ। বিরুদ্ধ ভাগ্যের নির্মমতা ভেদ করে সেই-যে পথযাত্রা চলেছিল সম্মুখের দিকে তার দুঃসহ দুঃখের ইতিহাস কেউ জানবে না। আজ এসেছি সেই দুঃখস্মৃতির ভিতর দিয়ে। উৎকণ্ঠিত মনে তোমাদের মধ্যে খুঁজতে এলাম তার সার্থকতা। আধুনিক যুগের

শ্রদ্ধাহীন স্পর্ধা দ্বারা এই তপস্যাকে মন থেকে প্রত্যাখ্যান কোরো না— একে স্বীকার করে নাও।

ইতিহাসে বিপর্যয় বহু ঘটেছে, সভ্যতার বহু কীর্তিমন্দির যুগে যুগে বিধ্বস্ত হয়েছে, তবু মানুষের শক্তি আজও সম্পূর্ণ লোপ পায় নি। সেই ভরসার 'পরে ভর করে মজ্জমান তরী উদ্ধার-চেষ্টা করতে হবে, নতুন হাওয়ার পালে সে আবার যাত্রা শুরু করবে। কালের স্রোত বর্তমান যুগের নবীন কর্ণধারদেরকেও ভিতরে ভিতরে যে এগিয়ে নিয়ে চলেছে তা সব সময় তাঁদের অনুভূতিতে পৌঁছয় না। একদিন যখন প্রগল্‌ভ তর্কের এবং বিদ্রূপমুখর অট্টহাস্যের ভিতর দিয়ে তাঁদেরও বয়সের অঙ্ক বেড়ে যাবে তখন সংশয়শুষ্ক বন্ধ্যা বুদ্ধির অভিমান প্রাণে শান্তি দেবে না। অমৃত-উৎসের অন্বেষণ তখন আরম্ভ হবে জীবনে।

সেই আশা-পথের পথিক আমরা, নূতন প্রভাতের উদ্‌বোধনমন্ত্র শ্রদ্ধার সঙ্গে গান করবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছি, যে শ্রদ্ধায় আছে অপরাজেয় বীর্য, নাস্তিবাদের অন্ধকারে যার দৃষ্টি পরাহত হবে না, যে ঘোষণা করবে—

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।

শান্তিনিকেতন
৮ শ্রাবণ ১৩৪৭

পরিশিষ্ট

এই আশ্রমের গুরুর অনুজ্ঞায় ও আপনাদের অনুমতিতে আমাকে যে সভাপতির ভার দেওয়া হল তাহা আমি শিরোধার্য করে নিচ্ছি। আমি এ ভারের সম্পূর্ণ অযোগ্য। কিন্তু আজকের এই প্রতিষ্ঠান বিপুল ও বহুযুগব্যাপী। তাই ব্যক্তিগত বিনয় পরিহার করে আমি এই অনুষ্ঠানে ব্রতী হলাম। বহু বৎসর ধরে এই আশ্রমে একটা শিক্ষার কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। এই ধরনের এডুকেশনাল এক্স্‌পেরিমেন্ট দেশে খুব বিরল। এই দেশ তো আশ্রম-সংঘ-বিহারের দেশ। কোথাও কোথাও ‘গুরুকুল’এর মতো দু-একটা এমনি বিদ্যালয় থাকলেও, এটি এক নূতন ভাবে অনুপ্রাণিত। এর স্থান আর কিছুতে পূর্ণ হতে পারে না। এখানে খোলা আকাশের নিচে প্রকৃতির ক্রোড়ে মেঘরৌদ্রবৃষ্টিবাতাসে বালকবালিকারা লালিত-পালিত হচ্ছে। এখানে শুধু বহিরঙ্গ-প্রকৃতির আবির্ভাব নয়, কলাসৃষ্টির দ্বারা অন্তরঙ্গ-প্রকৃতিও পারিপার্শ্বিক অবস্থায় জেগে উঠেছে। এখানকার বালকবালিকারা এক-পরিবারভুক্ত হয়ে আচার্যদের মধ্যে রয়েছে। একজন বিশ্বপ্রাণ পার্সনালিটি এখানে সর্বদাই এর মধ্যে জাগ্রত রয়েছেন। এমনিভাবে এই বিদ্যালয় গড়ে উঠেছে। আজ সেই ভিত্তির প্রসার ও পূর্ণাঙ্গতা সাধন হতে চলল। আজ এখানে বিশ্বভারতীর অভ্যুদয়ের দিন। ‘বিশ্বভারতী’র কোষানুযায়িক অর্থের দ্বারা আমরা বুঝি যে, যে ‘ভারতী’ এতদিন অলক্ষিত হয়ে কাজ করছিলেন আজ তিনি প্রকট হলেন। কিন্তু এর মধ্যে আর-একটি ধ্বনিগত অর্থও আছে— বিশ্ব ভারতের কাছে এসে পৌঁছবে, সেই বিশ্বকে ভারতীয় করে নিয়ে আমাদের রক্তরাগে অনুরঞ্জিত করে, ভারতের মহাপ্রাণে অনুপ্রাণিত করে আবার সেই প্রাণকে বিশ্বের কাছে উপস্থিত করব। সেই ভাবেই বিশ্বভারতীর নামের সার্থকতা আছে।

একটা কথা আমাদের স্মরণ রাখতে হবে। ভারতের মহাপ্রাণ কোন্‌টা। যে মহাপ্রাণ লুপ্তপ্রায় হয়ে এসেছে তাকে ধরতে গিয়ে আমরা যদি বিশ্বের সঙ্গে কারবার স্থাপন ও আদানপ্রদান না করি তবে আমাদের আত্মপরিচয় হবে না। Each can realize himself only by helping others as a whole to realize themselves এ যেমন সত্য, এর converse অর্থাৎ others can realize themselves by helping each individual to realize himselfও তেমনি সত্য। অপরে আমার লক্ষ্যের পথে, যাবার পথে যেমন মধ্যবর্তী তেমনি আমিও তার মধ্যবর্তী; কারণ আমাদের উভয়কে যেখানে ব্রহ্ম বেষ্টন করে আছেন সেখানে আমরা এক, একটি মহা ঐক্যে অন্তরঙ্গ হয়ে আছি। এ ভাবে দেখতে গেলে, বিশ্বভারতীতে ভারতের প্রাণ কী তার পরিচয় পেতে হবে, তাতে করে জগতের যে পরিচয় ঘটবে তার রূপে আত্মাকে প্রতিফলিত দেখতে পাব।

আমি আজ ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই। আজ জগৎ জুড়ে একটি সমস্যা রয়েছে। সর্বত্রই একটা বিদ্রোহের ভাব দেখা যাচ্ছে— সে বিদ্রোহ প্রাচীন সভ্যতা, সমাজতন্ত্র, বিদ্যাবুদ্ধি, অনুষ্ঠান, সকলের বিরুদ্ধে। আমাদের আশ্রম দেবালয় প্রভৃতি যা-কিছু হয়েছিল তা যেন সব ধূলিসাৎ হয়ে যাচ্ছে। বিদ্রোহের অনল জ্বলছে, তা অর্ডার-প্রগ্রেসকে মানে না, রিফর্ম চায় না, কিছুই চায় না। যে মহাযুদ্ধ হয়ে গেল এই বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে তার চেয়ে বড়ো যুদ্ধ চলে আসছে,

গত মহাযুদ্ধ তারই একটা প্রকাশ মাত্র। এই সমস্যার পূরণ কেমন করে হবে, শান্তি কোথায় পাওয়া যাবে। সকল জাতিই এর উত্তর দেবার অধিকারী। এই সমস্যায় ভারতের কী বলবার আছে, দেবার আছে?

আমরা এত কালের ধ্যানধারণা থেকে যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছি তার দ্বারা এই সমস্যা পূরণ করবার কিছু আছে কি না। য়ুরোপে এ সম্বন্ধে যে চেষ্টা হচ্ছে সেটা পোলিটিকাল অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশনের দিক দিয়ে হয়েছে। সেখানে রাজনৈতিক ভিত্তির উপর ট্রীটি, কন্‌ভেন্‌শন, প্যাক্ট্‌-এর ভিতর দিয়ে শান্তিস্থাপনের চেষ্টা হচ্ছে। এ হবে এবং হবার দরকারও আছে। দেখছি সেখানে মাল্‌টিপল্‌ অ্যালায়েন্স্‌ হয়েও হল না, বিরোধ ঘটল। আর্‌বিট্রেশন কোর্ট এবং হেগ-কন্‌ফারেন্সে হল না; শেষে লীগ অব নেশন্‌স্‌-এ গিয়ে দাঁড়াচ্ছে। তার অবলম্বন হচ্ছে limitation of armaments। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি যে, এ ছাড়া আরও অন্য দিকে চেষ্টা করতে হবে; কেবল রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে নয়, সামাজিক দিকে এর চেষ্টা হওয়া দরকার। Universal simultaneous disarmament of all nations-এর জন্য নূতন হিউম্যানিজ্‌মের রিলিজ্যাস মুভ্‌মেণ্ট্‌ হওয়া উচিত। তার ফলস্বরূপ যে মেশিনারি হবে তা পার্লামেণ্ট বা ক্যাবিনেটের ডিপ্লোম্যাসির অধীনে থাকবে না। পার্লামেণ্টসমূহের জয়েণ্ট্‌ সিটিং তো হবেই, সেইসঙ্গে বিভিন্ন people-এরও কন্‌ফারেন্স্‌ হলে তবেই শান্তির প্রতিষ্ঠা হতে পারে। কিন্তু একটা জিনিস আবশ্যক হবে— mass-এর life, mass-এর religion। বর্তমান কালে কেবলমাত্র inidividual salvation-এ চলবে না; সর্বমুক্তিতেই এখন মুক্তি, না হলে মুক্তি নেই। ধর্মের এই mass life-এর দিকটা সমাজে স্থাপন করতে হবে।

ভারতের এ সম্বন্ধে কী বাণী হবে। ভারতও শান্তির অনুধাবন করেছে, চীনদেশও করেছে। চীনে সামাজিক দিক দিয়ে তার চেষ্টা হয়েছে। যদি social fellowship of man with man হয় তবেই international peace হবে, নয় তো হবে না। কন্‌ফ্যুসিয়সের গোড়ার কথাই এই যে, সমাজ একটা পরিবার, শান্তি সামাজিক ফেলোশিপ-এর উপর স্থাপিত; সমাজে যদি শান্তি হয় তবেই বাইরে শান্তি হতে পারে। ভারতবর্ষে এর আর-একটা ভিত্তি দেওয়া হয়েছে, তা হচ্ছে অহিংসা মৈত্রী শান্তি। প্রত্যেক inidividual-এ বিশ্বরূপদর্শন এবং তারই ভিতর ব্রহ্মের ঐক্যকে অনুভব করা; এই ভাবের মধ্যে যে peace আছে ভারতবর্ষ তাকেই চেয়েছে। ব্রহ্মের ভিত্তিতে আত্মাকে স্থাপন করে যে peace compact হবে তাতেই শান্তি আনবে। এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টায় চীনদেশের সোশ্যাল ফেলোশিপ এবং ভারতের আত্মার শান্তি এই দুইই চাই, নতুবা লীগ অব নেশন্‌স্‌-এ কিছু হবে না। গ্রেট ওঅর-এর থেকেও বিশালতর যে দ্বন্দ্ব জগৎ জুড়ে চলছে তার জন্য ভারতবর্ষের পক্ষ থেকে বিশ্বভারতীকে বাণী দিতে হবে।

ভারতবর্ষ দেখেছে যে, রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে যে State আছে তা কিছু নয়। সে বলেছে যে, নেশনের বাইরেও মহা সত্য আছে, সনাতন ধর্মেই তার স্বাজাত্য রয়েছে। যেখানে আত্মার বিকাশ ও ব্রহ্মের আবির্ভাব সেখানেই তাহার দেশ। ভারতবর্ষ ধর্মের বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে এই extra-territorial nationality-তে বিশ্বাস করেছে। এই ভাবের অনুসরণ করে লীগ অব নেশন্‌স্‌-এর ন্যাশনালিটির ধারণাকে সংশোধিত করতে হবে। তেমনি আত্মার দিক দিয়ে extra-territorial sovereigntyর ভাবকে স্থান দিতে হবে। এমনিভাবে Federation of the World স্থাপিত হতে পারে, এখনকার সময়ের উপযোগী করে লীগ অব

নেশন্স্-এ এই extra-territorial nationalityর কথা উত্থাপন করা যেতে পারে। ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় দিক দিয়ে এই বাণী দেবার আছে। আমরা দেখতে পাই যে, বৌদ্ধ প্রচারকগণ এই ভাবটি প্রচার করেছিলেন যে, প্রত্যেক রাজার code এমন হওয়া উচিত যা শুধু নিজের জাতির নয়, অপর সব জাতির সমানভাবে হিত-সাধন করতে পারবে। ভারতের ইতিহাসে এই বিধিটি সর্বদা রক্ষিত হয়েছে, তার রাজারা জয়ে পরাজয়ে, রাজচক্রবর্তী হয়েও, এমনি করে আন্তর্জাতিক সম্বন্ধকে স্বীকার করেছেন।

সামাজিক জীবন সম্বন্ধে ভারতবর্ষের মেসেজ্ কী। আমাদের এখানে গ্রুপ ও কম্যুনিটির স্থান খুব বেশি। এরা intermediary body between state and individual। রোম প্রভৃতি দেশে রাষ্ট্রব্যবস্থার ফলে স্টেট ও ইন্ডিভিজুয়ালে বিরোধ বেধেছিল; শেষে ইন্ডিভিজুয়ালিজ্মের পরিণতি হল অ্যানার্কিতে, এবং স্টেট, মিলিটারি সোশ্যালিজ্মে গিয়ে দাঁড়াল। আমাদের দেশের ইতিহাসে গ্রামে বর্ণাশ্রমে এবং ধর্মসংঘের ভিতরে কম্যুনিটির জীবনকেই দেখতে পাই। বর্ণাশ্রমে যেমন প্রতি ব্যক্তির কিছু প্রাপ্য ছিল, তেমনি তার কিছু দেয়ও ছিল, তাকে কতকগুলি নির্ধারিত কর্তব্য পালন করতে হত। Community in the Individual যেমন আছে তেমনি the Individual in the Communityও আছে। প্রত্যেকের ব্যক্তিজীবনে গ্রুপ পার্সনালিটি এবং ইন্ডিভিজুয়াল পার্সনালিটি জাগ্রত আছে, এই উভয়েরই সমান প্রয়োজন আছে। গ্রুপ পার্সনালিটির ভিতর ইন্ডিভিজুয়ালের স্বাধিকারকে স্থান দেওয়া দরকার। আমাদের দেশে ত্রুটি রয়ে গেছে যে, আমাদের ইন্ডিভিজুয়াল পার্সনালিটির বিকাশ হয় নি, co-ordination of power in the stateও হয় নি। আমরা ইন্ডিভিজুয়াল পার্সনালিটির দিক দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি, ব্যূহবদ্ধ শত্রুর হাতে আমাদের লাঞ্ছিত হতে হয়েছে।

আজকাল য়ুরোপে group principle-এর দরকার হচ্ছে। সেখানে political organization, economic organization, এসবই group গঠন করার দিকে যাচ্ছে। আমাদেরও এই পথে সমস্যাপূরণ করবার আছে। আমাদের যেমন য়ুরোপের কাছ থেকে স্টেটের centralization ও organization নেবার আছে তেমনি য়ুরোপকেও group principle দেবার আছে। আমরা সে দেশ থেকে economic organization-কে গ্রহণ করে আমাদের village community-কে গড়ে তুলব। কৃষিই আমাদের জীবনযাত্রার প্রধান অবলম্বন, সুতরাং ruralization-এর দিকে আমাদের চেষ্টাকে নিয়োগ করতে হবে। অবশ্য আমি সেজন্য বলছি না যে, town life-কে develop করতে হবে না; তারও প্রয়োজন আছে। কিন্তু আমাদের ভূমির সঙ্গে প্রাণের যোগ-সাধন করতে হবে। ভূমির সঙ্গে ownership-এর সম্বন্ধ হলে তবে স্বাধীনতা থাকতে পারে। কারখানার জীবনও দরকার আছে, কিন্তু ভূমি ও বাস্তুর সঙ্গে individual ownership-এর যোগকে ছেড়ে না দিয়ে large-scale production আনতে হবে। বড়ো আকারে energyকে আনতে হবে, কিন্তু দেখতে হবে, কলের energy মানুষের আত্মাকে পীড়িত অভিভূত না করে, যেন জড় না করে দেয়। সমবায়প্রণালীর দ্বারা হাতের কলকেও দেশে স্থান দিতে হবে। এমনিভাবে economic organization-এ ভারতকে আত্মপরিচয় দিতে হবে। আমাদের স্ট্যান্ডার্ড অব লাইফ এত নিম্নস্তরে আছে যে, আমরা decadent হয়ে মরতে বসেছি। যে প্রণালীতে efficient organization-

এর নির্দেশ করলাম তাকে না ছেড়ে বিজ্ঞানকে আমাদের প্রয়োজনসাধনে লাগাতে হবে। আমাদের বিশ্বভারতীতে তাই, রাষ্ট্রনীতি সমাজধর্ম ও অর্থনীতির যে যে ইন্‌স্টিট্যুশন পৃথিবীতে আছে, সে সবকেই স্টাডি করতে হবে, এবং আমাদের দৈন্য কেন ও কোথায় তা বুঝে নিয়ে আমাদের অভাব পূরণ করতে হবে। কিন্তু এতে করে নিজের প্রাণকে ও সৃজনীশক্তিকে যেন বাইরের চাপে নষ্ট না করি। যা-কিছু গ্রহণ করব তাকে ভারতের ছাঁচে ঢেলে নিতে হবে। আমাদের সৃজনীশক্তির দ্বারা তারা coined into our flesh and blood হয়ে যাওয়া চাই।

ভিন্ন ভিন্ন জাতির স্কীম অব লাইফ আছে কিন্তু তাদের ইতিহাস ও ভূপরিচয়ের মধ্যেও একটি বৃহৎ ঐক্য আছে, এই বিভিন্নতার মধ্যেও এক জায়গায় unity of human race আছে। তাদের সেই ইতিহাস ও ভূগোলের বিভিন্ন environment-এর জন্য যে life values সৃষ্ট হয়েছে, পরস্পরের যোগাযোগের দ্বারা তাদের বিস্তৃতি হওয়া প্রয়োজন। এই লাইফ-স্কীমগুলির আদান-প্রদানে বিশ্বে তাদের বৃহৎ লীলাক্ষেত্র তৈরি হবে।

আমাদের জাতীয় চরিত্রে কী কী অভাব আছে, কী কী আমাদের বাইরে থেকে আহরণ করতে হবে। আমাদের মূল ত্রুটি হচ্ছে, আমরা বড়ো একপেশে— ইমোশনাল। আমাদের ভিতরে will ও intellect-এর মধ্যে, সব্‌জেক্‌টিভিটি ও অব্‌জেক্‌টিভিটির মধ্যে চিরবিচ্ছেদ ঘটেছে। আমরা হয় খুব সব্‌জেক্‌টিভ্‌, নয়তো খুব য়ুনিভার্সাল। অনেক সময়েই আমরা য়ুনিভার্সালিজ্‌মের বা সাম্যের চরম সীমায় চলে যাই, কিন্তু differentiation-এ যাই না। আমাদের অব্‌জেক্‌টিভিটির পূর্ণ বিকাশ হওয়া দরকার। প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ ও অব্‌জার্‌ভেশনের ভিতর দিয়ে মনের সত্যানুবর্তিতাকে ও শৃঙ্খলাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। আমাদের intellect-এর character-এর অভাব আছে, সুতরাং আমাদের intellectual honesty-র প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে। তা হলেই দেখব যে, কর্তব্যবোধ জাগ্রত হয়েছে। অন্য দিকে আমাদের moral ও personal responsibilityর বোধকে জাগাতে হবে, Law, Justice ও Equality-র যা লুপ্ত হয়ে গেছে তাকে ফিরিয়ে আনতে হবে—এসকল বিষয়ে আমাদের শিক্ষা আহরণ করতে হবে। আমাদের মধ্যে বিশ্বকে না পেলে আমরা নিজেকে পাব না। তাই বিশ্বরূপকে প্রতিষ্ঠিত করে আমরা আত্মপরিচয় লাভ করব এবং আমাদের বাণী বিশ্বকে দেব।

এ দেশে অনেক বিশ্ববিদ্যালয় অনেক প্রতিষ্ঠান আছে, কিন্তু সেখান থেকে cast iron ও rigid standardized product তৈরি হচ্ছে। শান্তিনিকেতনে naturalness-এর স্থান হয়েছে, আশা করি বিশ্বভারতীতে সেই spontaneityর বিকাশের দিকে দৃষ্টি থাকবে। য়ুনিভার্সিটিকে জাতীয় প্রতিষ্ঠান বলা যেতে পারে। এশিয়ার genius য়ুনিভার্সাল হিউম্যানিজ্‌ম্‌-এর দিকে, অতএব ভারতের এবং এশিয়ার interestএ এরূপ একটি য়ুনিভার্সিটির প্রয়োজন আছে। পূর্বে যে সংঘ ও বিহারের দ্বারা ভারতের সার্থকতা-সাধন হয়েছিল, তাদেরই এ যুগের উপযোগী করে, সেই পুরাতন আরণ্যককে বিশ্বভারতী রূপে এখানে পত্তন করা হয়েছে।

৮ পৌষ ১৩২৮। শান্তিনিকেতন
বিশ্বভারতী পরিষদ্‌-সভার
প্রতিষ্ঠা-উৎসবে
সভাপতির অভিভাষণ

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ শীল

শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম

ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ের ছাত্র ও অধ্যাপকগণসহ রবীন্দ্রনাথ

প্রতিষ্ঠাদিবসের উপদেশ

হে সৌম্য মানবকগণ, অনেককাল পূর্বে আমাদের এই দেশ, এই ভারতবর্ষ, সকল বিষয়ে যথার্থ বড়ো ছিল— তখন এখানকার লোকেরা বীর ছিলেন; তাঁরাই আমাদের পূর্বপুরুষ।

যথার্থ বড়ো কাকে বলে। আমাদের পূর্বপুরুষেরা কী হলে আপনাদের বড়ো মনে করতেন? আজকাল আমাদের মনে তাঁদের সেই বড়ো ভাবটি নেই বলেই ধনকেই আমরা বড়ো হবার উপায় মনে করি, ধনীকেই আমরা বলি বড়োমানুষ। তাঁরা তা বলতেন না। তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে যাঁরা বড়ো ছিলেন সেই ব্রাহ্মণরা ধনকে তুচ্ছ করতেন। তাঁদের বেশভূষা বিলাসিতা কিছুই ছিল না। অথচ বড়ো বড়ো রাজারা এসে তাঁদের কাছে মাথা নত করতেন।

যে মানুষ কাপড়চোপড় জুতোছাতা নিয়ে নিজেকে বড়ো মনে করে, ভেবে দেখো দেখি সে কত ছোটো। জুতো কি মানুষকে বড়ো করতে পারে। দামি জুতো দামি কাপড় কি আমাদের কোনো গুণের পরিচয় দেয়। আমাদের প্রাচীনকালে যেসব ঋষিদের পায়ে জুতো ছিল না, গায়ে পোশাক ছিল না, তাঁরা কি সাহেবের বাড়ির জুতো এবং বিলাতি দোকানের কাপড় পরা আমাদের চেয়ে অনেক বড়ো ছিলেন না। আজ যদি আমাদের সেই যাজ্ঞবল্ক্য, সেই বশিষ্ঠ ঋষি খালি গায়ে খালি পায়ে তাঁদের সেই জ্যোতির্ময় দৃষ্টি, তাঁদের সেই পিঙ্গল জটাভার নিয়ে আমাদের মাঝখানে এসে দাঁড়ান, তাহলে সমস্ত দেশের মধ্যে এমন কোন্ রাজা এমন কত বড়ো সাহেব আছেন যিনি তাঁর জুতো ফেলে দিয়ে মাথার তাজ নামিয়ে, সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণের পায়ের ধুলা নিয়ে নিজেকে কৃতার্থ না মনে করেন। আজ এমন কে আছে যে তার গাড়ি জুড়ি অট্টালিকা এবং সোনার চেন নিয়ে তাঁদের সামনে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে।

তাঁরাই আমাদের পিতামহ ছিলেন, সেই পূজ্য ব্রাহ্মণদের আমরা নমস্কার করি। কেবল মাথা নত করে নমস্কার করা নয়— তাঁরা যে শিক্ষা দিয়েছেন তাই গ্রহণ করি, তাঁরা যে দৃষ্টান্ত দিয়েছেন তার অনুসরণ করি। তাঁদের মতো হবার চেষ্টা করাই হচ্ছে তাঁদের প্রতি ভক্তি করা।

তাঁরা বড়ো হয়েছিলেন কী গুণে। তাঁরা সত্যকে সকলের চেয়ে বড়ো বলে জানতেন— মিথ্যার কাছে তাঁরা মাথা নিচু করেন নি। সত্য কী তাই জানবার জন্যে সমস্ত জীবন তাঁরা কঠিন তপস্যা করতেন— কেবল আমোদ-প্রমোদ করেই জীবনটা কাটিয়ে দেওয়া তাঁদের লক্ষ্য ছিল না। যাতে সত্য জানবার কিছুমাত্র ব্যাঘাত করত তাকে তাঁরা অনায়াসে পরিত্যাগ করতেন। মনে সত্য জানবার অবিশ্রাম চেষ্টা করতেন, মুখে সত্য বলতেন, এবং সত্য বলে যা জানতেন কাজেও তাই পালন করতেন, সেজন্যে কাউকে ভয় করতেন না। আমরা টাকাকড়ি জুতোছাতা পাবার জন্যে যেরকম প্রাণপণ খেটে মরি, তাঁরা সত্যকে পাবার জন্যে তার চেয়ে অনেক বেশি কষ্ট স্বীকার করতেন। সেইজন্যে তাঁরা আমাদের চেয়ে অনেক বেশি বড়ো ছিলেন।

তাঁরা অভয় ছিলেন, ধর্ম ছাড়া আর-কিছুকেই ভয় করতেন না। তাঁদের মনের মধ্যে এমন একটি তেজ ছিল, সর্বদাই এমন একটি আনন্দ ছিল যে, তাঁরা কোনো রাজা-মহারাজার অন্যায় শাসনকে গ্রাহ্য করতেন না, এমনকি, মৃত্যুকেও তাঁরা ভয় করতেন না। তাঁরা এটা বেশ জানতেন যে, তাঁদের কাছ থেকে কেড়ে নেবার তো কিছু নেই—বেশভূষা ধনসম্পদ গেলে তো তাঁদের কোনো ক্ষতিই হয় না। তাঁদের যা-কিছু আছে সব মনের মধ্যে। তাঁরা যে সত্য জানতেন তা তো দস্যু কিম্বা রাজা হরণ করতে পারত না। তাঁরা নিশ্চয় জানতেন মৃত্যু ভয়ের বিষয় নয়। মৃত্যুতে এই শরীরটা মাত্র যায়, কিন্তু অন্তরের জিনিস যায় না।

তাঁরা সকলের মঙ্গলের জন্যে ভালোর জন্যে চিন্তা করতেন, কিসে সকলের ভালো হবে সেইটে তাঁরা ধ্যান করতেন এবং যাতে ভালো হয় সেইটে তাঁরা ব্যবস্থা করতেন। কার কী করা উচিত সেইটে সকলে তাঁদের কাছে জানতে আসত। কিসে ঘরের লোকের মঙ্গল হয় তাই জানবার জন্য গৃহস্থ লোকেরা তাঁদের কাছে আসত—কিসে প্রজাদের ভালো হয় তাই পরামর্শ নেবার জন্যে রাজারা তাঁদের কাছে আসত। পৃথিবীর সকলের ভালোর জন্য তাঁরা সমস্ত আমোদপ্রমোদ সমস্ত বিলাসিতা ত্যাগ করে চিন্তা করতেন।

কিন্তু তখন কি কেবল ব্রাহ্মণ-ঋষিরাই ছিলেন। তা নয়। রাজারাও ছিলেন, রাজার সৈন্যসামন্ত ছিল। রাজ্যের প্রয়োজনে তাঁদের যুদ্ধবিগ্রহ করতে হত। কিন্তু যুদ্ধের সময়েও তাঁরা ধর্ম ভুলতেন না। যে-লোকের হাতে অস্ত্র নেই তাকে মারতেন না, শরণাপন্নকে বধ করতেন না, রথের উপর চড়ে নিচের লোকদের উপর অস্ত্র চালাতেন না। সৈন্যে-সৈন্যেই যুদ্ধ চলত, কিন্তু শত্রুপক্ষের দেশের নিরীহ প্রজাদের ঘরদুয়োর জ্বালিয়ে দিতেন না। রাজার ছেলের যখন বড়ো বয়স হত তখন রাজা আপনার সমস্ত টাকাকড়ি রাজত্ব ছেলের হাতে দিয়ে সত্য জানবার জন্য, ঈশ্বরের প্রতি সমস্ত মন দেবার জন্যে বনে চলে যেতেন। তখন আর তাঁদের হীরা-মুক্তো ছাতাজুতো লোকজন কিছুই থাকত না। রাজ্যেশ্বর রাজা ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে দীনহীনের মতো সমস্ত ছেড়ে যেতেন। তাঁরা জানতেন রাজ্য টাকাকড়ি বাইরের জিনিস, তাতেই যে মানুষ বড়ো হয় তা নয়, বড়ো হবার জিনিস ভিতরে। তবে ধর্মনিয়মমতে রাজত্ব করা রাজার কর্তব্য, সুতরাং সেজন্যে প্রাণ দেওয়া দরকার হলে তাও দিতেন—কিন্তু যুবরাজ বড়ো হয়ে উঠলে যখন সে কর্তব্যের শেষ হয় তখন আর তাঁরা রাজত্ব আঁকড়ে ধরে পড়ে থাকতেন না।

গৃহস্থদেরও ঐরকম নিয়ম ছিল। যখন জ্যেষ্ঠ পুত্র বড়ো হয়ে উঠত তখন তারই হাতে সমস্ত সংসার দিয়ে তাঁরা দরিদ্র বেশে তপস্যা করতে চলে যেতেন। যতদিন সংসারে থাকতে হত ততদিন প্রাণপণে তাঁরা সংসারের কাজ করতেন। আত্মীয় স্বজন প্রতিবেশী অতিথি অভ্যাগত দরিদ্র অনাথ কাউকেই ভুলতেন না—প্রাণপণে নিজের সুখ নিজের স্বার্থ দূরে রেখে তাদেরই সেবা করতেন—তার পরে সময় উত্তীর্ণ হলেই আর ধনসম্পদ ঘরদুয়ারের প্রতি তাকাতেন না।

তখন যাঁরা বাণিজ্য করতেন তাঁদেরও ধর্মপথে সত্যপথে চলতে হত। কাউকে ঠকানো, অন্যায় সুদ নেওয়া, কৃপণের মতো সমস্ত ধন কেবল নিজের জন্যেই জড়ো করে রাখা, এ তাঁদের দ্বারা হত না।

যাঁরা রাজত্ব করতেন, যাঁরা বাণিজ্য করতেন, যাঁরা কর্ম করতেন, তাঁদের সকলের জন্যই ব্রাহ্মণেরা চিন্তা করতেন। যাতে সমাজে ধর্ম থাকে, সত্য থাকে, শৃঙ্খলা থাকে, যাতে ভালো হয়, এই তাঁদের একান্ত লক্ষ্য ছিল। সেইজন্য তাঁদের আদর্শে

তাঁদের উপদেশে তখনকার সকল লোকেই ভালো হয়ে চলতে পারত। সমস্ত সমাজের মধ্যে সেইজন্যে এত উন্নতি এত শ্রী ছিল।

সেই তখনকার ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যেরা যে-শিক্ষা যে-ব্রত অবলম্বন করে বড়ো হয়ে উঠেছিলেন, বীর হয়ে উঠেছিলেন, সেই শিক্ষা সেই ব্রত গ্রহণ করবার জন্যেই তোমাদের এই নির্জন আশ্রমের মধ্যে আমি আহ্বান করেছি। তোমরা আমার কাছে এসেছ— আমি সেই প্রাচীন ঋষিদের সত্যবাক্য তাঁদের উজ্জ্বল চরিত মনের মধ্যে সর্বদা ধারণ করে রেখে তোমাদের সেই মহাপুরুষদের পথে চালনা করতে চেষ্টা করব— আমাদের ব্রতপতি ঈশ্বর আমাকে সেই বল সেই ক্ষমতা দান করুন। যদি আমাদের চেষ্টা সফল হয় তবে তোমরা প্রত্যেকে বীরপুরুষ হয়ে উঠবে— তোমরা ভয়ে কাতর হবে না, দুঃখে বিচলিত হবে না, ক্ষতিতে ম্রিয়মাণ হবে না, ধনের গর্বে স্ফীত হবে না; মৃত্যুকে গ্রাহ্য করবে না, সত্যকে জানতে চাইবে, মিথ্যাকে মন থেকে কথা থেকে কাজ থেকে দূর করে দেবে, সর্বদা জগতের সকল স্থানেই মনে এবং বাইরে এক ঈশ্বর আছেন এইটে নিশ্চয় জেনে আনন্দমনে সকল দুষ্কর্ম থেকে নিবৃত্ত থাকবে। কর্তব্যকর্ম প্রাণপণে করবে, সংসারের উন্নতি ধর্মপথে থেকে করবে, অথচ যখন কর্তব্যবোধে ধনসম্পদ ও সংসার ত্যাগ করতে হবে তখন কিছুমাত্র ব্যাকুল হবে না। তাহলে তোমাদের দ্বারা ভারতবর্ষ আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠবে— তোমরা যেখানে থাকবে সেইখানেই মঙ্গল হবে, তোমরা সকলের ভালো করবে এবং তোমাদের দেখে সকলে ভালো হবে।

আমাদের পূর্বপুরুষেরা কিরূপ শিক্ষা ও ব্রত অবলম্বন করতেন? তাঁরা বাল্যকালে গৃহ ছেড়ে নির্জনে গুরুর বাড়িতে যেতেন। সেখানে খুব কঠিন নিয়মে নিজেকে সংযত করে থাকতে হত। গুরুকে একান্তমনে ভক্তি করতেন, গুরুর সমস্ত কাজ করে দিতেন। গুরুর জন্যে কাঠ কাটা, জল তুলে আনা, তাঁর গোরু চরানো, তাঁর জন্যে গ্রাম থেকে ভিক্ষে করে আনা, এইসমস্ত তাঁদের কাজ ছিল, তা তাঁরা যত বড়ো ধনীর পুত্র হোন-না। শরীর-মনকে একেবারে পবিত্র রাখতে হবে— তাঁদের শরীরে ও মনে কোনো-রকম দোষ একেবারে স্পর্শ করত না। গেরুয়া বস্ত্র পরতেন, কঠিন বিছানায় শুতেন, পায়ে জুতো নেই, মাথায় ছাতা নেই— সাজসজ্জা বড়োমানুষি কিছুমাত্র নেই। সমস্ত মনের সমস্ত চেষ্টা কেবল শিক্ষালাভে, কেবল সত্যের সন্ধানে, কেবল নিজের দুষ্প্রবৃত্তি-দমনে, নিজের ভালো গুণকে ফুটিয়ে তুলতে নিযুক্ত থাকত।

তোমাদের সেইরকম কষ্ট স্বীকার করে সেই কঠিন নিয়মে, সকলপ্রকার বড়োমানুষিকে তুচ্ছ করে দিয়ে এখানে গুরুগৃহে বাস করতে হবে। গুরুকে সর্বতোভাবে শ্রদ্ধা করবে, মনে বাক্যে কাজে তাঁকে লেশমাত্র অবজ্ঞা করবে না। শরীরকে পবিত্র করে রাখবে— কোনো দোষ যেন স্পর্শ না করে। মনকে গুরু-উপদেশের সম্পূর্ণ অধীন করে রাখবে।

আজ থেকে তোমরা সত্যব্রত গ্রহণ করলে। মিথ্যাকে কায়মনোবাক্যে দূরে রাখবে। প্রথমত সত্য জানবার জন্য সবিনয়ে সমস্ত মন বুদ্ধি ও চেষ্টা দান করবে, তার পরে যা সত্য বলে জানবে তা নির্ভয়ে সতেজে পালন ও ঘোষণ করবে।

আজ থেকে তোমাদের অভয়ব্রত। ধর্মকে ছাড়া জগতে তোমাদের ভয় করবার আর কিছুই নেই। বিপদ না, মৃত্যু না, কষ্ট না— কিছুই তোমাদের ভয়ের বিষয় নয়। সর্বদা দিবারাত্রি প্রফুল্লচিত্তে প্রসন্নমুখে শ্রদ্ধার সঙ্গে সত্য-লাভে ধর্ম-লাভে নিযুক্ত থাকবে।

আজ থেকে তোমাদের পুণ্যব্রত। যা-কিছু অপবিত্র কলুষিত, যা-কিছু প্রকাশ করতে লজ্জা বোধ হয়, তা সর্বপ্রযত্নে প্রাণপণে শরীর-মন থেকে দূর করে প্রভাতের শিশিরসিক্ত ফুলের মতো পুণ্যে ধর্মে বিকশিত হয়ে থাকবে।

আজ থেকে তোমাদের মঙ্গলব্রত। যাতে পরস্পরের ভালো হয় তাই তোমাদের কর্তব্য। সেজন্যে নিজের সুখ নিজের স্বার্থ বিসর্জন।

এক কথায় আজ থেকে তোমাদের ব্রহ্মব্রত। এক ব্রহ্ম তোমাদের অন্তরে বাহিরে সর্বদা সকল স্থানেই আছেন। তাঁর কাছ থেকে কিছুই লুকোবার জো নেই। তিনি তোমাদের মনের মধ্যে স্তব্ধ হয়ে দেখছেন। যখন যেখানে থাক, শয়ন কর, উপবেশন কর, তাঁর মধ্যেই আছ, তাঁর মধ্যেই সঞ্চরণ করছ। তোমার সর্বাঙ্গে তাঁর স্পর্শ রয়েছে—তোমার সমস্ত ভাবনা তাঁরই গোচরে রয়েছে। তিনিই তোমাদের একমাত্র ভয়, তিনিই তোমাদের একমাত্র অভয়।

প্রত্যহ অন্তত একবার তাঁকে চিন্তা করবে। তাঁকে চিন্তা করবার মন্ত্র আমাদের বেদে আছে। এই মন্ত্র আমাদের ঋষিরা দ্বিজেরা প্রত্যহ উচ্চারণ করে জগদীশ্বরের সম্মুখে দণ্ডায়মান হতেন। সেই মন্ত্র, হে সৌম্য, তুমিও আমার সঙ্গেসঙ্গে একবার উচ্চারণ করো :

ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি
ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ।

৭ পৌষ ১৩০৮
প্রথম প্রকাশ:
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা
মাঘ ১৮২৩ শক

প্রথম কার্যপ্রণালী

বিনয়সম্ভাষণমেতৎ—

আপনার প্রতি আমি যে ভার অর্পণ করিয়াছি আপনি তাহা ব্রতস্বরূপে গ্রহণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, ইহাতে আমি বড়ো আনন্দলাভ করিয়াছি। একান্তমনে কামনা করি, ঈশ্বর আপনাকে এই ব্রতপালনের বল ও নিষ্ঠা দান করুন।

আমি আপনাকে পূর্বেই বলিয়াছি, বালকদিগের অধ্যয়নের কাল একটি ব্রতযাপনের কাল। মনুষ্যত্বলাভ স্বার্থ নহে পরমার্থ—ইহা আমাদের পিতামহেরা জানিতেন। এই মনুষ্যত্বলাভের ভিত্তি যে শিক্ষা তাহাকে তাঁহারা ব্রহ্মচর্যব্রত বলিতেন। এ কেবল পড়া মুখস্থ করা এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া নহে—সংযমের দ্বারা, ভক্তিশ্রদ্ধার দ্বারা, শুচিতা দ্বারা, একাগ্র নিষ্ঠা দ্বারা সংসারাশ্রমের জন্য এবং সংসারাশ্রমের অতীত ব্রহ্মের সহিত অনন্ত যোগ সাধনের জন্য প্রস্তুত হইবার সাধনাই ব্রহ্মচর্যব্রত।

ইহা ধর্মব্রত। পৃথিবীতে অনেক জিনিসই কেনাবেচার সামগ্রী বটে, কিন্তু ধর্ম পণ্যদ্রব্য নহে। ইহা এক পক্ষে মঙ্গল ইচ্ছার সহিত দান ও অপর পক্ষে বিনীত ভক্তির সহিত গ্রহণ করিতে হয়। এইজন্য প্রাচীন ভারতে শিক্ষা পণ্যদ্রব্য ছিল না। এখন যাঁহারা শিক্ষা দেন তাঁহারা শিক্ষক, তখন যাঁহারা শিক্ষা দিতেন তাঁহারা গুরু ছিলেন। তাঁহারা শিক্ষার সঙ্গে এমন একটি জিনিস দিতেন যাহা গুরুশিষ্যের আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ ব্যতীত দানপ্রতিগ্রহ হইতেই পারে না।

ছাত্রদিগের সহিত এইরূপ পারমার্থিক সম্বন্ধ স্থাপনই শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয়ের মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু এ কথা মনে রাখা আবশ্যক যে, উদ্দেশ্য যত উচ্চ হইবে তাহার উপায়ও তত দুরূহ ও দুর্লভ হইবে। এসব কার্য ফরমাশমতো চলে না। শিক্ষক পাওয়া যায়, গুরু সহজে পাওয়া যায় না। এইজন্য যথাসম্ভব লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ধৈর্যের সহিত সুযোগের প্রতীক্ষা করিতে হয়। সমস্ত অবস্থা বিবেচনায় যতটা মঙ্গলসাধন সম্ভবপর তাহাই শিরোধার্য করিয়া লইতে হইবে এবং নিজের অযোগ্যতা স্মরণ করিয়া নিজেকে প্রত্যহ সাধনার পথে অগ্রসর করিতে হইবে।

মঙ্গলব্রত গ্রহণ করিলে বাধাবিরোধ-অশান্তির জন্য মনকে প্রস্তুত করিতে হয়—অনেক অন্যায় আঘাতও ধৈর্যের সহিত সহ্য করিতে হইবে। সহিষ্ণুতা ক্ষমা ও কল্যাণভাবের দ্বারা সমস্ত বিরোধ-বিপ্লবকে জয় করিতে হইবে।

ব্রহ্মবিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে স্বদেশের প্রতি বিশেষরূপে ভক্তিশ্রদ্ধাবান্‌ করিতে চাই। পিতামাতায় যেরূপ দেবতার বিশেষ আবির্ভাব আছে—তেমনি আমাদের পক্ষে আমাদের স্বদেশে, আমাদের পিতৃপিতামহদিগের জন্ম ও শিক্ষা-স্থানে দেবতার বিশেষ সত্তা আছে। পিতামাতা যেমন দেবতা তেমনি স্বদেশও দেবতা। স্বদেশকে লঘুচিত্ত অবজ্ঞা, উপহাস, ঘৃণা—এমনকি, অন্যান্য দেশের তুলনায় ছাত্ররা যাহাতে খর্ব করিতে না শেখে সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে চাই। আমাদের স্বদেশীয় প্রকৃতির বিরুদ্ধে চলিয়া আমরা কখনও সার্থকতা লাভ করিতে পারিব না। আমাদের দেশের যে বিশেষ মহত্ত্ব ছিল সেই মহত্ত্বের মধ্যে নিজের প্রকৃতিকে

পূর্ণতা দান করিতে পারিলেই আমরা যথার্থভাবে বিশ্বজনীনতার মধ্যে উত্তীর্ণ হইতে পারিব— নিজেকে ধ্বংস করিয়া অন্যের সহিত মিলাইয়া দিয়া কিছুই হইতে পারিব না—অতএব, বরঞ্চ অতিরিক্তমাত্রায় স্বদেশাচারের অনুগত হওয়া ভালো তথাপি মুগ্ধভাবে বিদেশীর অনুকরণ করিয়া নিজেকে কৃতার্থ মনে করা কিছু নহে।

ব্রহ্মচর্য-ব্রতে ছাত্রদিগকে কাঠিন্য অভ্যাস করিতে হইবে। বিলাস ও ধনাভিমান পরিত্যাগ করিতে হইবে। ছাত্রদের মন হইতে ধনের গৌরব একেবারে বিলুপ্ত করিতে চাই। যেখানে তাহার কোনো লক্ষণ দেখা যাইবে সেখানে তাহা একেবারে নষ্ট করা কর্তব্য হইবে। আমার মনে হইয়াছে ... র পুত্র ... র শৌখিন দ্রব্যের প্রতি কিঞ্চিৎ আসক্তি আছে—সেটা দমন করিতে হইবে। বেশভূষা সম্বন্ধে বিলাসিতা পরিত্যাগ করিতে হইবে। কেহ দারিদ্র্যকে যেন লজ্জাজনক ঘৃণাজনক না মনে করে। অশনে বসনেও শৌখিনতা দূর করা চাই।

দ্বিতীয়ত নিষ্ঠা। উঠা বসা পড়া লেখা স্নান আহার ও সর্বপ্রকার পরিচ্ছন্নতা ও শুচিতা সম্বন্ধে সমস্ত নিয়ম একান্ত দৃঢ়তার সহিত পালনীয়। ঘরে বাহিরে শয্যায় বসনে ও শরীরে কোনোপ্রকার মলিনতা প্রশ্রয় দেওয়া না হয়। যেখানে কোনো ছাত্রের কাপড় কম আছে সেখানে সে যেন কাপড়-কাচা সাবান দিয়া স্বহস্তে প্রত্যহ নিজের কাপড় কাচে—ও ব্যবহার্য গাড়ু মাজিয়া পরিষ্কার রাখে। এবং ঘরের যে অংশে তাহার বিছানা কাপড়চোপড় ও বই প্রভৃতি থাকে সে অংশ যেন প্রত্যহ যথাসময়ে যথানিয়মে পরিষ্কার তক্‌তকে করিয়া রাখে। ছেলেরা প্রত্যহ পর্যায়ক্রমে তাহাদের অধ্যাপকদের ঘরও পরিষ্কার করিয়া গুছাইয়া রাখিলে ভালো হয়। অধ্যাপকদের সেবা করা ছাত্রদের অবশ্যকর্তব্যের মধ্যে নির্ধারিত করা চাই।

তৃতীয়ত ভক্তি। অধ্যাপকদের প্রতি ছাত্রদের নির্বিচারে ভক্তি থাকা চাই। তাঁহারা অন্যায় করিলেও তাহা বিনা বিদ্রোহে নম্রভাবে সহ্য করিতে হইবে। কোনো মতে তাঁহাদের সমালোচনা বা নিন্দায় যোগ দিতে পারিবে না। অধ্যাপকেরা যদি কখনো পরস্পরের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হন তবে সে সময়ে কোনো ছাত্র সেখানে উপস্থিত না থাকে তৎপ্রতি যত্নবান হইতে হইবে। কোনো অধ্যাপক ছাত্রদের সমক্ষে অন্য অধ্যাপকদের প্রতি অবজ্ঞাজনক ব্যবহার, অসহিষ্ণুতা বা রোষ প্রকাশ না করেন সে দিকে সকলের মনোযোগ থাকা কর্তব্য। ছাত্রগণ অধ্যাপকদিগকে প্রত্যহ প্রণাম করিবে। অধ্যাপকগণ পরস্পরকে নমস্কার করিবেন। পরস্পরের প্রতি শিষ্টাচার ছাত্রদের নিকট যেন আদর্শস্বরূপ বিদ্যমান থাকে।

বিলাসত্যাগ, আত্মসংযম, নিয়মনিষ্ঠা, গুরুজনে ভক্তি সম্বন্ধে আমাদের দেশের প্রাচীন আদর্শের প্রতি ছাত্রদের মনোযোগ অনুকূল অবসরে আকর্ষণ করিতে হইবে।

যাঁহারা (ছাত্র বা অধ্যাপক) হিন্দুসমাজের সমস্ত আচার যথাযথ পালন করিতে চান তাঁহাদিগকে কোনোপ্রকারে বাধা দেওয়া বা বিদ্রূপ করা এ বিদ্যালয়ের নিয়ম-বিরুদ্ধ। রন্ধনশালায় বা আহারস্থানে হিন্দু-আচারবিরুদ্ধ কোনো অনিয়মের দ্বারা কাহাকেও ক্লেশ দেওয়া হইবে না।

আহ্নিক। ছাত্রদিগকে গায়ত্রীমন্ত্র মুখস্থ করাইয়া বুঝাইয়া দেওয়া হইয়া থাকে। আমি যে ভাবে গায়ত্রী ব্যাখ্যা করি তাহা সংক্ষেপে নিম্নে লিখিলাম :

ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ—

এই অংশ গায়ত্রীর ব্যাহৃতি নামে খ্যাত। চারি দিক হইতে আহরণ করিয়া আনার নাম ব্যাহৃতি। প্রথম ধ্যানকালে ভূলোক ভুবর্লোক ও স্বর্লোক অর্থাৎ সমস্ত বিশ্ব-

জগৎকে মনের মধ্যে আহরণ করিয়া আনিতে হইবে—তখনকার মতো মনে করিতে হইবে আমি সমস্ত বিশ্বজগতের মধ্যে দাঁড়াইয়াছি—আমি এখন কেবলমাত্র কোনো বিশেষ দেশবাসী নহি। বিশ্বজগতের মধ্যে দাঁড়াইয়া বিশ্বজগতের যিনি সবিতা যিনি সৃষ্টিকর্তা তাঁহারই বরণীয় জ্ঞান ও শক্তি ধ্যান করিতে হইবে। মনে করিতে হইবে এই ধারণাতীত বিপুল বিশ্বজগৎ এই মুহূর্তে এবং প্রতি মুহূর্তেই তাঁহা হইতে বিকীর্ণ হইতেছে। তাঁহার এই-যে অসীম শক্তি যাহার দ্বারা ভূর্ভুবঃস্বর্লোক অবিশ্রাম প্রকাশিত হইতেছে, আমার সহিত তাঁহার অব্যবহিত সম্পর্ক কী সূত্রে? কোন্ সূত্র অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে ধ্যান করিব। ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ—যিনি আমাদিগকে বুদ্ধিবৃত্তিসকল প্রেরণ করিতেছেন, সেই ধীসূত্রেই তাঁহাকে ধ্যান করিব। সূর্যের প্রকাশ আমরা প্রত্যক্ষভাবে কিসের দ্বারা জানি? সূর্য আমাদিগকে যে কিরণ প্রেরণ করিতেছে সেই কিরণের দ্বারা। সেইরূপ বিশ্বজগতের সবিতা আমাদের মধ্যে অহরহ যে ধীশক্তি প্রেরণ করিতেছেন, যে শক্তি থাকার দরুন আমি নিজেকে ও বাহিরের সমস্ত বিশ্বব্যাপারকে উপলব্ধি করিতেছি—সেই ধীশক্তি তাঁহারই শক্তি এবং সেই ধীশক্তি দ্বারাই তাঁহারই শক্তি প্রত্যক্ষভাবে অন্তরের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অন্তরতম রূপে অনুভব করিতে পারি। বাহিরে যেমন ভূর্ভুবঃস্বর্লোকের সবিতারূপে তাঁহাকে জগৎচরাচরের মধ্যে উপলব্ধি করি, অন্তরের মধ্যেও সেইরূপ আমার ধীশক্তির অবিশ্রাম প্রেরয়িতা বলিয়া তাঁহাকে অব্যবহিতভাবে উপলব্ধি করিতে পারি। বাহিরে জগৎ এবং আমার অন্তরে ধী, এ দুইই একই শক্তির বিকাশ—ইহা জানিলে জগতের সহিত আমার চেতনার এবং আমার চেতনার সহিত সেই সচ্চিদানন্দের ঘনিষ্ঠ যোগ অনুভব করিয়া সংকীর্ণতা হইতে স্বার্থ হইতে ভয় হইতে বিষাদ হইতে মুক্তি লাভ করি। গায়ত্রীমন্ত্রে বাহিরের সহিত অন্তরের ও অন্তরের সহিত অন্তরতমের যোগসাধন করে—এইজন্যই আর্যসমাজে এই মন্ত্রের এত গৌরব:

যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।
য ওষধিষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ॥

ব্রহ্মধারণার পক্ষে এই মন্ত্রই আমি বালকদের পক্ষে সর্বাপেক্ষা সরল বলিয়া মনে করি। ঈশ্বর জলে স্থলে অগ্নিতে ওষধি-বনস্পতিতে সর্বত্র আছেন, এই কথা মনে করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করা শান্তিনিকেতনের দিগন্তপ্রসারিত মাঠের মধ্যে অত্যন্ত সহজ। সেখানকার নির্মল আলোক আকাশ এবং প্রান্তর বিশ্বেশ্বরের দ্বারা পরিপূর্ণ, এ কথা মনে করিয়া ভক্তি করা ছেলেদের পক্ষেও কঠিন নহে। এইজন্য গায়ত্রীর সঙ্গেসঙ্গে এই মন্ত্রটিও ছেলেরা শিক্ষা করে। গায়ত্রী সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিবার পূর্বেও এই মন্ত্রটি তাহারা ব্যবহার করিতে পারে।

ছাত্রগণ পাঠ আরম্ভ করিবার পূর্বে সকলে সমস্বরে 'ওঁ পিতানোঽসি' উচ্চারণপূর্বক প্রণাম করে। ঈশ্বর যে আমাদের পিতা, এবং তিনিই যে আমাদিগকে পিতার ন্যায় জ্ঞান শিক্ষা দিতেছেন, ছাত্রদিগকে তাহা প্রত্যহ স্মরণ করা চাই। অধ্যাপকেরা উপলক্ষ্যমাত্র, কিন্তু যথার্থ যে জ্ঞানশিক্ষা তাহা আমাদের বিশ্বপিতার নিকট হইতে পাই। তাহা পাইতে হইলে চিত্তকে সর্বপ্রকার পাপ মলিনতা হইতে মুক্ত করিতে হয়, সে জ্ঞান পাইতে হইলে ভক্তিসহকারে ঈশ্বরের কাছে প্রত্যহ প্রার্থনা করিতে হয়—সেইজন্যই ঐ মন্ত্রে আছে

বিশ্বানি দেব সবিতর্দুরিতানি পরাসুব—
যদ্ ভদ্রং তন্ন আসুব।

'হে দেব, হে পিত, আমাদের সমস্ত পাপ দূর কর, যাহা ভদ্র তাহাই আমাদিগকে প্রেরণ কর।'

ব্রহ্মচারীদের পক্ষে জীবনের প্রতিদিনকে সকলপ্রকার শারীরিক মানসিক পাপ হইতে নির্মল করিবার জন্য মনুষ্যত্বলাভের জন্য প্রস্তুত হইবার ইহাই প্রকৃষ্ট মন্ত্র—

যদ্‌ভদ্রং তন্ন আসুব।

বক্তৃতা দিতে অনেক সময়েই চিত্তবিক্ষেপ ঘটায়। অধ্যাত্মসাধনায় ভাবান্দোলনের মূল্য যে অধিক তাহা আমি মনে করি না। ভাবাবেশের অভ্যাস মাদকসেবনের ন্যায় চিত্তদৌর্বল্যজনক। গভীর তত্ত্বগর্ভ সংক্ষিপ্ত প্রাচীন মন্ত্রের ন্যায় ধ্যানের সহায় কিছুই নাই। সাধনার পথে যত অগ্রসর হওয়া যায় এইসকল মন্ত্রের অন্তরের মধ্যে ততই গভীরতর রূপে প্রবেশ করা যায়—ইহারা কোথাও যেন বাধা দেয় না। এইজন্য আমি ছাত্রদিগকে উপনিষদের মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া থাকি। মন্ত্র যাহাতে মুখস্থ কথার মতো না হইয়া যায় সেজন্য তাহাদিগকে মাঝে মাঝে ব্যাখ্যা করিয়া স্মরণ করাইয়া দিয়া থাকি। কিছুকাল আমার অনুপস্থিতিবশত নূতন ছাত্রদিগকে মন্ত্র বুঝাইয়া দিবার অবকাশ পাই নাই। আপনার সঙ্গে যে ছাত্রদিগকে লইয়া যাইবেন তাহাদিগকে যদি আহ্নিকের জন্য উপনিষদের কোনো মন্ত্র বুঝাইয়া বলিয়া দেন তো ভালোই হয়।

এক্ষণে, আপনার কার্যপ্রণালীর কথা বিবৃত করিয়া বলা যাক।

মনোরঞ্জনবাবু, জগদানন্দবাবু ও সুবোধবাবুকে[১] লইয়া একটি সমিতি স্থাপিত হইবে। মনোরঞ্জনবাবু তাহার সভাপতি হইবেন। আপনি উক্ত সমিতির নির্দেশমতে বিদ্যালয়ের কার্যসম্পাদন করিতে থাকিবেন।

বিদ্যালয়ের ছাত্রদের শয্যা হইতে গাত্রোত্থান স্নান আহ্নিক আহার পড়া খেলা ও শয়ন সম্বন্ধে কাল নির্ধারণ তাঁহারা করিয়া দিবেন—যাহাতে সেই নিয়ম পালিত হয় আপনি তাহাই করিবেন।

বিদ্যালয়ের ভৃত্যনিয়োগ, তাহাদের বেতননির্ধারণ বা তাহাদিগকে অবসর দান, তাঁহাদের পরামর্শমতো আপনি করিবেন।

মাস শেষে আগামী মাসের একটি আনুমানিক বাজেট সমিতির নিকট হইতে পাস করাইয়া লইবেন। বাজেটের অতিরিক্ত খরচ করিতে হইলে তাঁহাদের লিখিত সম্মতি লইবেন।

খাতায় প্রত্যহ তাঁহাদের সহি লইবেন। সপ্তাহ অন্তর সপ্তাহের হিসাব ও মাসান্তে মাসকাবার তাঁহাদের স্বাক্ষরসহ আমাকে দিতে হইবে।

সমিতির প্রস্তাবিত কোনো নিয়মের পরিবর্তন খাতায় লিখিয়া লইয়া আমাকে জানাইবেন।

সায়াহ্নে ছেলেদের খেলা শেষ হইয়া গেলে সমিতির নিকট আপনার সমস্ত মন্তব্য জানাইবেন ও খাতায় সহি লইবেন।

ভাণ্ডারের ভার আপনার উপর। জিনিসপত্র ও গ্রন্থ প্রভৃতি সমস্ত আপনার জিম্মায় থাকিবে। জিনিসপত্রের তালিকায় আপনি সমিতির স্বাক্ষর লইবেন। কোনো জিনিস নষ্ট হইলে হারাইলে বা বাড়িলে তাঁহাদের স্বাক্ষরসহ তাহা জমা-খরচ করিয়া লইবেন।

আহারের সময় উপস্থিত থাকিয়া ছাত্রদের ভোজন পর্যবেক্ষণ করিবেন।

---

[১] সুবোধচন্দ্র মজুমদার

ছাত্রদের স্বাস্থ্যের প্রতি সর্বদা দৃষ্টি রাখিবেন।

তাহাদের জিনিসপত্রের পারিপাট্য, তাহাদের ঘর শরীর ও বেশভূষার নির্মলতা ও পরিচ্ছন্নতার প্রতি মনোযোগী হইবেন।

ছাত্রদের চরিত্র সম্বন্ধে সন্দেহজনক কিছু লক্ষ্য করিলেই সমিতিকে জানাইয়া তাহা আরম্ভেই সংশোধন করিয়া লইবেন।

বিদ্যালয়ের ভিতরে বাহিরে রান্নাঘরে ও তাহার চতুর্দিকে, পায়খানার কাছে কোনোরূপ অপরিষ্কার না থাকে আপনি তাহার তত্ত্বাবধান করিবেন।

গোশালায় গোরু মহিষ ও তাহাদের খাদ্যের ও ভৃত্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

বিদ্যালয়ের সংলগ্ন ফুল ও তরকারির বাগান আপনার হাতে। সেজন্য বীজ ক্রয়, সার সংগ্রহ ও মধ্যে মধ্যে ঠিকা লোক নিয়োগ সমিতিকে জানাইয়া করিতে পারিবেন।

শান্তিনিকেতনের আশ্রমের সহিত বিদ্যালয়ের সংস্রব প্রার্থনীয় নহে।[২] জিনিসপত্র ক্রয়, বাজার করা ও বাগান তৈরির সহায়তায় মাঝে মাঝে আশ্রমের মালীদের প্রয়োজন হইতে পারে—কিন্তু অন্যান্য ভৃত্যদের সহিত যোগরক্ষা না করাই শ্রেয়।

ঠিকা লোক প্রভৃতির প্রয়োজন হইলে সর্দারকে বা মালীদিগকে, রবীন্দ্রসিংহকে বা তাহার সহকারীকে জানাইয়া সংগ্রহ করিবেন।

শান্তিনিকেতনে ঔষধ লইতে রোগী আসিলে তাহাদিগকে হোমিওপ্যাথি ঔষধ দিবেন। যে যে ঔষধের যখন প্রয়োজন হইবে আমাকে তালিকা করিয়া দিলে আমি আনাইয়া দিব।

শান্তিনিকেতন-আশ্রমসম্পর্কীয় কেহ বিদ্যালয়ের প্রতি কোনোপ্রকার হস্তক্ষেপ করিলে—বা সেখানকার ভৃত্যদের কোনো দুর্ব্যবহারে বিরক্ত হইলে আমাকে জানাইবেন।

জাপানী ছাত্র হোরির আহারাদি ও সর্বপ্রকার স্বচ্ছন্দতার জন্য আপনি বিশেষরূপ মনোযোগী হইবেন।

মনোরঞ্জনবাবু ও শিক্ষকদের বিনা অনুমতিতে শান্তিনিকেতনের অতিথি-অভ্যাগতগণ স্কুল পরিদর্শন বা অধ্যাপনের সময় উপস্থিত থাকিতে পারিবেন না। আপনি যথাসম্ভব বিনয়ের সহিত তাঁহাদিগকে এই নিয়ম জ্ঞাপন করিবেন।

অভিভাবকদের অনুমতি ব্যতীত কোনো ছাত্রকে বিদ্যালয়ের বাহিরে কোথাও যাইতে দিবেন না।

বাহিরের লোককে ছাত্রদের সহিত মিশিতে দিবেন না।

অধ্যাপকগণ ভৃত্যদের ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইলে আপনাকে জানাইবেন—আপনি সমিতিতে জানাইয়া তাহার প্রতিকার করিবেন।

---

[২] বাংলা ১২৬৯ সালে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনের জমির পাট্টা লইয়াছিলেন; ১২৯৪ সালে 'নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনার জন্য একটি আশ্রম সংস্থাপনের অভিপ্রায়ে' ও তাহার অনুকূল কার্যসম্পাদনার্থে মহর্ষি এই সম্পত্তি ট্রস্টীদিগের হাতে অর্পণ করেন ও এই আশ্রমের ব্যয়নির্বাহার্থে আর্থিক ব্যবস্থা করিয়া দেন। 'এই ট্রস্টের উদ্দিষ্ট আশ্রমধর্মের উন্নতির জন্য ট্রস্টীগণ শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মবিদ্যালয় ও পুস্তকালয় সংস্থাপন করিতে পারিবেন।' পরে ১৩০৮ সালে মহর্ষির অনুমতিক্রমে তাঁহার ধর্মদীক্ষাবার্ষিকীতে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রতিষ্ঠা করেন; এ ক্ষেত্রে 'আশ্রম' বলিতে উক্ত ট্রস্ট অনুযায়ী পূর্বাগত ব্যবস্থা, ও 'বিদ্যালয়' বলিতে নবপ্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মচর্যাশ্রম বুঝিতে হইবে। পরে আশ্রম ও বিদ্যালয় সাধারণত সমার্থক হইয়াছে।—প্রকাশক

আহারাদির ব্যবস্থায় অসন্তুষ্ট হইলে অধ্যাপকগণ ছাত্রদের সমক্ষে বা ভৃত্যদের নিকটে তাহার কোনো আলোচনা না করিয়া আপনাকে জানাইবেন, আপনি সমিতির নিকট তাঁহাদের নালিশ উত্থাপন করিবেন।

বিশেষ নির্দিষ্টদিনে ছাত্রগণ যাহাতে অভিভাবকগণের নিকট পোস্টকার্ড লেখে তাহার ব্যবস্থা করিবেন। বন্ধ-চিঠি লেখা নিম্নশ্রেণীর ছাত্রদের পক্ষে নিষিদ্ধ জানিবেন।

পোস্টকার্ড কাগজ কলম বহি প্রভৃতি কেনার হিসাব রাখিয়া অভিভাবকদের নিকট হইতে পত্র লিখিয়া মূল্য আদায় করিবার চেষ্টা করিতে হইবে।

সমিতি, বিদ্যালয়ের সম্বন্ধে অভিভাবকদের নিকট জ্ঞাপনীয় বিষয় যাহা স্থির করিবেন আপনি তাহা তাঁহাদিগকে পত্রের দ্বারা জানাইবেন।

কোনো বিশেষ ছাত্র সম্বন্ধে আহারাদির বিশেষ বিধি আবশ্যক হইলে সমিতিকে জানাইয়া আপনি তাহা প্রবর্তন করিবেন।

কোনো ছাত্রের অভিভাবক কোনো বিশেষ খাদ্যসামগ্রী পাঠাইলে অন্য ছাত্রদিগকে না দিয়া তাহা একজনকে খাইতে দেওয়া হইতে পারিবে না।

গোশালায় গোরু-মহিষ যে দুধ দিবে তাহা ছাত্রদের কুলাইয়া অবশিষ্ট থাকিলে অধ্যাপকগণ পাইবেন, এ নিয়ম আপনার অবগতির জন্য লিখিলাম।

শান্তিনিকেতন-আশ্রমের অতিথি প্রভৃতি কেহ কোনো বই পড়িতে লইলে তাহা যথাসময়ে তাঁহার নিকট হইতে উদ্ধার করিয়া লইতে হইবে।

কাহাকেও কলিকাতায় বই লইয়া যাইতে দেওয়া হইবে না। বিশেষ প্রয়োজন হইলে আমার বিশেষ অনুমতি লইতে হইবে।

মাসের মধ্যে একদিন থালা ঘটিবাটি প্রভৃতি জিনিসপত্র গণনা করিয়া লইবেন।

ছাত্রদের অভিভাবক উপস্থিত হইলে মনোরঞ্জনবাবুর অনুমতি লইয়া নির্দিষ্ট সময়ে ছাত্রদের সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া লইবেন।

উপস্থিতমতো এই নিয়মগুলি লিখিয়া দিলাম। ক্রমশ আবশ্যকমতো ইহার অনেক পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হইবে।

কিন্তু প্রধানত নিয়মের সাহায্যেই বিদ্যালয়-চালনার প্রতি আমার বিশেষ আস্থা নাই। কারণ, শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়টি পড়া গিলাইবার কলমাত্র নহে। স্বত-উৎসারিত মঙ্গল ইচ্ছার সহায়তা ব্যতীত ইহার উদ্দেশ্য সফল হইবে না।

এই বিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণকে আমি আমার অধীনস্থ বলিয়া মনে করি না। তাঁহারা স্বাধীন শুভবুদ্ধির দ্বারা কর্তব্য সম্পন্ন করিয়া যাইবেন ইহাই আমি আশা করি এবং ইহার জন্যই আমি সর্বদা প্রতীক্ষা করিয়া থাকি। কোনো অনুশাসনের কৃত্রিম শক্তির দ্বারা আমি তাঁহাদিগকে পুণ্যকর্মে বাহ্যিকভাবে প্রবৃত্ত করিতে ইচ্ছা করি না। তাঁহাদিগকে আমার বন্ধু বলিয়া এবং সহযোগী বলিয়াই জানি। বিদ্যালয়ের কর্ম যেমন আমার, তেমনি তাঁহাদেরও কর্ম—এ যদি না হয় তবে এ বিদ্যালয়ের বৃথা প্রতিষ্ঠা।

আমি যে ভাবোৎসাহের প্রেরণায় সাহিত্যিক ও আর্থিক ক্ষতি এবং শারীরিক মানসিক নানা কষ্ট স্বীকার করিয়া এই বিদ্যালয়ের কর্মে আত্মোৎসর্গ করিয়াছি সেই ভাবাবেগ আমি সকলের কাছে আশা করি না। অনতিকালপূর্বে এমন সময় ছিল যখন আমি নিজের কাছ হইতেও ইহা আশা করিতে পারিতাম না। কিন্তু

আমি অনেক চিন্তা করিয়া সুস্পষ্ট বুঝিয়াছি যে, বাল্যকালে ব্রহ্মচর্য-ব্রত, অর্থাৎ আত্মসংযম, শারীরিক ও মানসিক নির্মলতা, একাগ্রতা, গুরুভক্তি এবং বিদ্যাকে মনুষ্যত্ব লাভের উপায় বলিয়া জানিয়া শান্ত সমাহিত ভাবে শ্রদ্ধার সহিত গুরুর নিকট হইতে সাধনা-সহকারে তাহা দুর্লভ ধনের ন্যায় গ্রহণ করা—ইহাই ভারতবর্ষের পথ এবং ভারতবর্ষের একমাত্র রক্ষার উপায়।

কিন্তু এই মত ও এই আগ্রহ আমি যদি অন্যের মনে সঞ্চার করিয়া না দিতে পারি তবে সে আমার অক্ষমতা ও দুর্ভাগ্য—অন্যকে সেজন্য আমি দোষ দিতে পারি না। নিজের ভাব জোর করিয়া কাহারও উপর চাপানো যায় না—এবং এসকল ব্যাপারে কপটতা ও ভান সর্বাপেক্ষা হেয়।

আমার মনের মধ্যে একটি ভাবের সম্পূর্ণতা জাগিতেছে বলিয়া অনুষ্ঠিত ব্যাপারের সমস্ত ত্রুটি দৈন্য অপূর্ণতা অতিক্রম করিয়াও আমি সমগ্রভাবে আমার আদর্শকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই—বর্তমানের মধ্যে ভবিষ্যৎকে, বীজের মধ্যে বৃক্ষকে উপলব্ধি করিতে পারি—সেইজন্য সমস্ত খণ্ডতা দীনতা সত্ত্বেও, ভাবের তুলনায় কর্মের যথেষ্ট অসংগতি থাকিলেও আমার উৎসাহ ও আশা ম্রিয়মাণ হইয়া পড়ে না। যিনি আমার কাজকে খণ্ড খণ্ড ভাবে প্রতিদিনের মধ্যে বর্তমানের মধ্যে দেখিবেন, নানা বাধাবিরোধ ও অভাবের মধ্যে দেখিবেন, তাঁহার উৎসাহ আশা সর্বদা সজাগ না থাকিতে পারে। সেইজন্য আমি কাহারও কাছে বেশি কিছু দাবি করি না, সর্বদা আমার উদ্দেশ্য লইয়া অন্যকে বলপূর্বক উৎসাহিত করিবার চেষ্টা করি না—কালের উপর, সত্যের উপরে, বিধাতার উপরে সম্পূর্ণ ধৈর্যের সহিত নির্ভর করিয়া থাকি। ধীরে ধীরে স্বাভাবিক নিয়মে অন্তরের ভিতর হইতে অলক্ষ্য শক্তিতে যাহার বিকাশ হয় তাহাই যথার্থ এবং তাহার উপরেই নির্ভর করা যায়। ক্রমাগত বাহিরের উত্তেজনায়, কতক লজ্জায়, কতক ভাবাবেগে, কতক অনুকরণে যাহার উৎপত্তি হয় তাহার উপরে সম্পূর্ণ নির্ভর করা যায় না এবং অনেক সময়ে তাহা হইতে কুফল উৎপন্ন হয়।

আমি আশা করিয়া আছি যে, অধ্যাপকগণ, আমার অনুশাসনে নহে, অন্তরস্থ কল্যাণবীজের সহজ বিকাশে ক্রমশই আগ্রহের সহিত আনন্দের সহিত ব্রহ্মচর্যাশ্রমের সঙ্গে নিজের জীবনকে একীভূত করিতে পারিবেন। তাঁহারা প্রত্যহ যেমন ছাত্রদের সেবা ও প্রণাম গ্রহণ করিবেন তেমনি আত্মত্যাগ ও আত্মসংযমের দ্বারা ছাত্রদের নিকটে আপনাদিগকে প্রকৃত ভক্তির পাত্র করিয়া তুলিবেন। পক্ষপাত অবিচার অধৈর্য, অল্প কারণে অকস্মাৎ রোষ, অভিমান, অপ্রসন্নতা, ছাত্র বা ভৃত্যদের সম্বন্ধে চপলতা, লঘুচিত্ততা, ছোটোখাটো অভ্যাসদোষ, এসমস্ত প্রতিদিনের প্রাণপণ যত্নে পরিহার করিতে থাকিবেন। নিজেরা ত্যাগ ও সংযম অভ্যাস না করিলে ছাত্রদের নিকট তাঁহাদের সমস্ত উপদেশ নিষ্ফল হইবে—এবং ব্রহ্মচর্যাশ্রমের উজ্জ্বলতা ম্লান হইয়া যাইতে থাকিবে। ছাত্রেরা বাহিরে ভক্তি ও মনে মনে উপেক্ষা করিতে যেন না শেখে।

আমার ইচ্ছা, গুরুদের সেবা ও অতিথিদের প্রতি আতিথ্য প্রভৃতি কার্যে রথীর দ্বারা বিদ্যালয়ে আদর্শ স্থাপন করা হয়। এসমস্ত কার্যে যথার্থ গৌরব আছে, অবমান নাই—এই কথা যেন ছাত্রদের মনে মুদ্রিত হয়। সকলেই যেন আগ্রহের সহিত অগ্রসর হইয়া এইসমস্ত সেবাকার্যে প্রবৃত্ত হয়। অভ্যাগতদের অভিবাদন, তাঁহাদের সহিত শিষ্টালাপ ও তাঁহাদের প্রতি সযত্ন ব্যবহার যেন সকল ছাত্রকে বিশেষরূপে অভ্যাস করানো হয়। বিদ্যালয়ের নিকট কোনো আগন্তুক উপস্থিত

হইলে তাহাকে যেন বিনয়ের সহিত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে শেখে—ছাত্রগণ ভৃত্যদের প্রতি যেন অবজ্ঞা প্রকাশ না করে এবং তাহারা পীড়াগ্রস্ত হইলে যেন তাহাদের সংবাদ লয়। ছাত্রদের মধ্যে কাহারো পীড়া হইলে তাহাকে যথাসময়ে ঔষধ ও পথ্য সেবন করানো ও তাহার অন্যান্য শুশ্রূষার ভার যেন ছাত্রদের প্রতি অর্পিত হয়। ভৃত্যদের দ্বারা যত অল্প কাজ করানো যাইতে পারে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। আপনি যদি সংগত ও সুবিধাজনক মনে করেন তবে গোশালায় গাভীগুলির তত্ত্বাবধানের ভার ছাত্রদের প্রতি কিয়ৎপরিমাণে অর্পণ করিতে পারেন। দুইটি হরিণ আছে, ছাত্রগণ যদি তাহাদিগকে স্বহস্তে আহারাদি দিয়া পোষ মানাইতে পারে তবে ভালো হয়। আমার ইচ্ছা কয়েকটি পাখি মাছ ও ছোটো জন্তু আশ্রমে রাখিয়া ছাত্রদের প্রতি তাহাদের পালনের ভার দেওয়া হয়। পাখি খাঁচায় না রাখিয়া প্রত্যহ আহারাদি দিয়া ধৈর্যের সহিত মুক্ত পাখিদিগকে বশ করানোই ভালো। শান্তিনিকেতনে কতকগুলি পায়রা আশ্রয় লইয়াছে, চেষ্টা করিলে ছাত্ররা তাহাদিগকে ও কাঠবিড়ালিদিগকে বশ করাইতে পারে। লাইব্রেরি গোছানো, ঘর পরিপাটি রাখা, বাগানের যত্ন করা, এ সমস্ত কাজের ভার যথাসম্ভব ছাত্রদের প্রতিই অর্পণ করা উচিত জানিবেন।

জাপানী ছাত্র হোরির সেবাভার রথী প্রভৃতি কোনো বিশেষ ছাত্রের উপর দিবেন। এন্‌ট্রেন্স পরীক্ষার ব্যস্ততায় আপাতত তাহার যদি একান্ত সময়াভাব ঘটে তবে আর কোনো ছাত্রের উপর অথবা পালা করিয়া বয়স্ক ছাত্রদের উপর দিবেন। তাহারা যেন যথাসময়ে স্বহস্তে হোরিকে পরিবেশন করে। প্রাতঃকালে তাহার বিছানা ঠিক করিয়া দেয়—যথাসময়ে তাহার তত্ত্ব লইতে থাকে—নাবার ঘরে ভৃত্যেরা তাহার আবশ্যকমতো জল দিয়াছে কি না পর্যবেক্ষণ করে। প্রথম দুই-একদিন রথীর দ্বারা এই কাজ করাইলে অন্য ছাত্রেরা কোনোপ্রকার সংকোচ অনুভব করিবে না।

ছাত্ররা যখন খাইতে বসিবে তখন পালা করিয়া একজন ছাত্র পরিবেশন করিলে ভালো হয়। ব্রাহ্মণ পরিবেশক না হইলে আপত্তিজনক হইতে পারে। অতএব সে সম্বন্ধে বিহিত ব্যবস্থাই কর্তব্য হইবে।

রবিবারে মাঝে মাঝে চড়িভাতি করিয়া ছেলেরা স্বহস্তে রন্ধনাদি করিলে ভালো হয়।

সম্প্রতি নানা উদ্‌বেগের মধ্যে আছি, এজন্য সকল কথা ভালোরূপ চিন্তা করিয়া লিখিতে পারিলাম না। আপনি সেখানকার কাজে যোগদান করিলে একে একে অনেক কথা আপনার মনে উদয় হইবে, তখন অধ্যাপকগণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া আপনার মন্তব্য আমাকে জানাইবেন।

আপনার প্রতি আমার কোনো আদেশ নির্দেশ নাই; আপনি সমবেদনার দ্বারা, শ্রদ্ধা ও প্রীতির দ্বারা আমার হৃদয়ের ভাব অনুভব করিবেন এবং স্বতঃপ্রবৃত্ত কল্যাণ-কামনার দ্বারা কর্তব্যের শাসনে স্বাধীনভাবে ধরা দিবেন এবং

যদ্‌যৎ কর্ম প্রকুর্বীত তদ্‌ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ।

ইতি ২৭শে কার্তিক ১৩০৯

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পত্রখানি কুঞ্জলাল ঘোষকে লিখিত।

বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে
গ্রন্থসম্পাদনে সহায়তা করেছেন

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন (বিশ্বভারতী)
শ্রীপ্রমথনাথ বিশী (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)
শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)
শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত (বিশ্বভারতী)
ও
শ্রীঅমিয়কুমার সেন (শিক্ষাবিভাগ)

রবীন্দ্র রচনাবলী

দ্বাদশ খণ্ড

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্র-রচনাবলী

দ্বাদশ খণ্ড

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী

২ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট। কলিকাতা

প্রকাশ আশ্বিন ১৩৪৯
পুনর্মুদ্রণ পৌষ ১৩৫৮
পুনর্মুদ্রণ পৌষ ১৩৬৭ : ১৮৮২ শকাব্দ

মূল্য : ৯৲, ১২৲

© বিশ্বভারতী ১৯৬০

প্রকাশক শ্রীকানাই সামন্ত
বিশ্বভারতী। ৬/৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭

মুদ্রাকর শ্রীসূর্যনারায়ণ ভট্টাচার্য
তাপসী প্রেস। ৩০ কর্নওআলিস স্ট্রীট। কলিকাতা ৬

৩·১

সূচী

কবিতা ও গান

বলাকা ১

নাটক ও প্রহসন

ফাল্গুনী ৮১

উপন্যাস ও গল্প

মালঞ্চ ১৪৯

প্রবন্ধ

সমাজ ২০৩
শিক্ষা ২৭৫
শব্দতত্ত্ব ৩৩৫

পরিশিষ্ট

সমাজ ৪১৩
শিক্ষা ৫০১
শব্দতত্ত্ব ৫২৯

গ্রন্থপরিচয় ৫৯১
বর্ণানুক্রমিক সূচী ৬৪১

চিত্রসূচী

রবীন্দ্রনাথ ১

'বলাকা'র পাণ্ডুলিপির একটি পৃষ্ঠা ৪০

রবীন্দ্রনাথ ও পিয়র্‌সন্‌ ৭৪

দ্বিজেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ ৫৫১

কবিতা ও গান

বলাকা

উৎসর্গ

উইলি পিয়র্‌সন্ বন্ধুবরেষু

আপনারে তুমি সহজে ভুলিয়া থাক,
আমরা তোমারে ভুলিতে পারি না তাই।
সবার পিছনে নিজেরে গোপনে রাখ,
আমরা তোমারে প্রকাশ করিতে চাই।
ছোটোরে কখনো ছোটো নাহি কর মনে,
আদর করিতে জান অনাদৃত জনে,
প্রীতি তব কিছু না চাহে নিজের জন্য,
তোমারে আদরি' আপনারে করি ধন্য।

৭ মে ১৯১৬
তোসা-মারু জাহাজ
বঙ্গসাগর

স্নেহাসক্ত
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বলাকা

১

ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা,
ওরে সবুজ, ওরে অবুঝ,
আধমরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা।
রক্ত আলোর মদে মাতাল ভোরে
আজকে যে যা বলে বলুক তোরে,
সকল তর্ক হেলায় তুচ্ছ ক'রে
পুচ্ছটি তোর উচ্চে তুলে নাচা।
আয় দুরন্ত, আয় রে আমার কাঁচা।

খাঁচাখানা দুলছে মৃদু হাওয়ায়;
আর তো কিছুই নড়ে না রে
ওদের ঘরে, ওদের ঘরের দাওয়ায়।
ঐ যে প্রবীণ, ঐ যে পরম পাকা,
চক্ষু-কর্ণ দুইটি ডানায় ঢাকা,
ঝিমায় যেন চিত্রপটে আঁকা
অন্ধকারে বন্ধ-করা খাঁচায়।
আয় জীবন্ত, আয় রে আমার কাঁচা।

বাহিরপানে তাকায় না যে কেউ,
দেখে না যে বান ডেকেছে
জোয়ার-জলে উঠছে প্রবল ঢেউ।
চলতে ওরা চায় না মাটির ছেলে
মাটির 'পরে চরণ ফেলে ফেলে,
আছে অচল আসনখানা মেলে
যে যার আপন উচ্চ বাঁশের মাচায়,
আয় অশান্ত, আয় রে আমার কাঁচা।

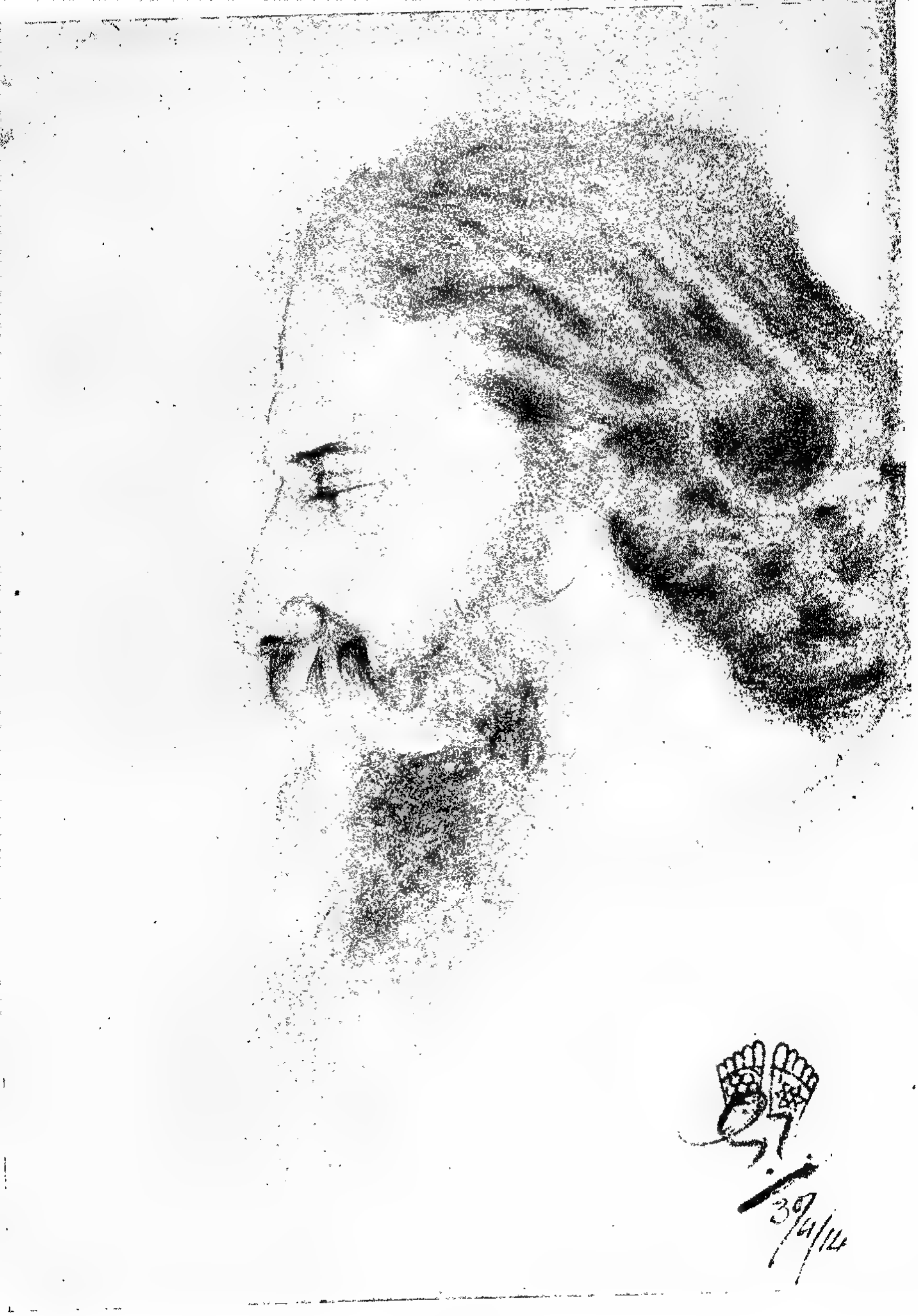

৩০/৫/১৪

রবীন্দ্রনাথ

গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক অঙ্কিত

তোরে হেথায় করবে সবাই মানা।
হঠাৎ আলো দেখবে যখন
ভাববে এ কী বিষম কাণ্ডখানা।
সংঘাতে তোর উঠবে ওরা রেগে,
শয়ন ছেড়ে আসবে ছুটে বেগে,
সেই সুযোগে ঘুমের থেকে জেগে
লাগবে লড়াই মিথ্যা এবং সাঁচায়।
আয় প্রচণ্ড, আয় রে আমার কাঁচা।

শিকল-দেবীর ঐ যে পূজাবেদী
চিরকাল কি রইবে খাড়া।
পাগলামি তুই আয় রে দুয়ার ভেদি।
ঝড়ের মাতন, বিজয়-কেতন নেড়ে
অট্টহাস্যে আকাশখানা ফেড়ে,
ভোলানাথের ঝোলাঝুলি ঝেড়ে
ভুলগুলো সব আন্ রে বাছা-বাছা।
আয় প্রমত্ত, আয় রে আমার কাঁচা।

আন্ রে টেনে বাঁধা-পথের শেষে।
বিবাগী কর্ অবাধপানে,
পথ কেটে যাই অজানাদের দেশে।
আপদ আছে, জানি আঘাত আছে,
তাই জেনে তো বক্ষে পরান নাচে,
ঘুচিয়ে দে ভাই পুঁথি-পোড়োর কাছে
পথে চলার বিধিবিধান যাচা।
আয় প্রমুক্ত, আয় রে আমার কাঁচা।

চিরযুবা তুই যে চিরজীবী,
জীর্ণ জরা ঝরিয়ে দিয়ে
প্রাণ অফুরান ছড়িয়ে দেদার দিবি।

সবুজ নেশায় ভোর করেছিস ধরা,
ঝড়ের মেঘে তোরি তড়িৎ ভরা,
বসন্তেরে পরাস আকুল-করা
আপন গলার বকুল-মাল্যগাছা,
আয় রে অমর, আয় রে আমার কাঁচা।

১৫ বৈশাখ ১৩২১
শান্তিনিকেতন

২

এবার যে ঐ এল সর্বনেশে গো।
বেদনায় যে বান ডেকেছে
রোদনে যায় ভেসে গো।
রক্ত-মেঘে ঝিলিক মারে,
বজ্র বাজে গহন-পারে,
কোন্ পাগল ঐ বারে বারে
উঠছে অট্টহেসে গো।
এবার যে ঐ এল সর্বনেশে গো।

জীবন এবার মাতল মরণ-বিহারে।
এইবেলা নে বরণ ক'রে
সব দিয়ে তোর ইহারে।
চাহিস নে আর আগুপিছু,
রাখিস নে তুই লুকিয়ে কিছু,
চরণে কর্ মাথা নিচু
সিক্ত আকুল কেশে গো।
এবার যে ঐ এল সর্বনেশে গো।

পথটাকে আজ আপন করে নিয়ো রে।
গৃহ আঁধার হল, প্রদীপ
নিবল শয়ন-শিয়রে।
ঝড় এসে তোর ঘর ভরেছে,
এবার যে তোর ভিত নড়েছে,
শুনিস নি কি ডাক পড়েছে
নিরুদ্দেশের দেশে গো।
এবার যে ঐ এল সর্বনেশে গো।

ছি ছি রে ঐ চোখের জল আর ফেলিস নে।
ঢাকিস নে মুখ ভয়ে ভয়ে
কোণে আঁচল মেলিস নে।
কিসের তরে চিত্ত বিকল,
ভাঙুক না তোর দ্বারের শিকল,
বাহিরপানে ছোট্ না, সকল
দুঃখসুখের শেষে গো।
এবার যে ঐ এল সর্বনেশে গো।

কণ্ঠে কি তোর জয়ধ্বনি ফুটবে না।
চরণে তোর রুদ্র তালে
নূপুর বেজে উঠবে না ?
এই লীলা তোর কপালে যে
লেখা ছিল,— সকল ত্যেজে
রক্তবাসে আয় রে সেজে
আয় না বধূর বেশে গো।
ঐ বুঝি তোর এল সর্বনেশে গো।

৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩২১
রামগড়

৩

আমরা চলি সমুখপানে,
কে আমাদের বাঁধবে।
রইল যারা পিছুর টানে
কাঁদবে তারা কাঁদবে।
ছিঁড়ব বাধা রক্ত-পায়ে,
চলব ছুটে রৌদ্রে ছায়ে,
জড়িয়ে ওরা আপন গায়ে
কেবলি ফাঁদ ফাঁদবে।
কাঁদবে ওরা কাঁদবে।

রুদ্র মোদের হাঁক দিয়েছে
বাজিয়ে আপন তূর্য।
মাথার 'পরে ডাক দিয়েছে
মধ্যদিনের সূর্য।
মন ছড়াল আকাশ ব্যেপে,
আলোর নেশায় গেছি খেপে,
ওরা আছে দুয়ার ঝেঁপে,
চক্ষু ওদের ধাঁধবে।
কাঁদবে ওরা কাঁদবে।

সাগর-গিরি করব রে জয়,
যাব তাদের লঙ্ঘি।
একলা পথে করি নে ভয়,
সঙ্গে ফেরেন সঙ্গী।
আপন ঘোরে আপনি মেতে
আছে ওরা গণ্ডী পেতে,
ঘর ছেড়ে আঙিনায় যেতে

বাধবে ওদের বাধবে।
কাঁদবে ওরা কাঁদবে।

জাগবে ঈশান, বাজবে বিষাণ,
পুড়বে সকল বন্ধ।
উড়বে হাওয়ায় বিজয়-নিশান
ঘুচবে দ্বিধাদ্বন্দ্ব।
মৃত্যুসাগর মথন করে
অমৃতরস আনব হরে,
ওরা জীবন আঁকড়ে ধরে
মরণ-সাধন সাধবে।
কাঁদবে ওরা কাঁদবে।

৬ জ্যৈষ্ঠ ১৩২১
রামগড়

৪

তোমার শঙ্খ ধুলায় প'ড়ে,
কেমন করে সইব।
বাতাস আলো গেল মরে
এ কী রে দুর্দৈব।
লড়বি কে আয় ধ্বজা বেয়ে,
গান আছে যার ওঠ্-না গেয়ে,
চলবি যারা চল্ রে ধেয়ে,
আয়-না রে নিঃশঙ্ক।
ধুলায় পড়ে রইল চেয়ে
ওই যে অভয় শঙ্খ।

চলেছিলেম পূজার ঘরে
সাজিয়ে ফুলের অর্ঘ্য।

খুঁজি সারাদিনের পরে
কোথায় শান্তি-স্বর্গ।
এবার আমার হৃদয়-ক্ষত
ভেবেছিলেম হবে গত,
ধুয়ে মলিন চিহ্ন যত
হব নিষ্কলঙ্ক।
পথে দেখি ধুলায় নত
তোমার মহাশঙ্খ।

আরতি-দীপ এই কি জ্বালা।
এই কি আমার সন্ধ্যা।
গাঁথব রক্তজবার মালা ?
হায় রজনীগন্ধা।
ভেবেছিলেম যোঝাযুঝি
মিটিয়ে পাব বিরাম খুঁজি,
চুকিয়ে দিয়ে ঋণের পুঁজি
লব তোমার অঙ্ক।
হেনকালে ডাকল বুঝি
নীরব তব শঙ্খ।

যৌবনেরি পরশমণি
করাও তবে স্পর্শ।
দীপক-তানে উঠুক ধ্বনি'
দীপ্ত প্রাণের হর্ষ।
নিশার বক্ষ বিদার করে
উদ্বোধনে গগন ভরে
অন্ধ দিকে দিগন্তরে
জাগাও-না আতঙ্ক।
দুই হাতে আজ তুলব ধরে
তোমার জয়শঙ্খ।

জানি জানি তন্দ্রা মম
রইবে না আর চক্ষে।
জানি শ্রাবণধারা-সম
বাণ বাজিবে বক্ষে।
কেউ বা ছুটে আসবে পাশে,
কাঁদবে বা কেউ দীর্ঘশ্বাসে,
দুঃস্বপনে কাঁপবে ত্রাসে
সুপ্তির পর্যঙ্ক।
বাজবে যে আজ মহোল্লাসে
তোমার মহাশঙ্খ।

তোমার কাছে আরাম চেয়ে
পেলেম শুধু লজ্জা।
এবার সকল অঙ্গ ছেয়ে
পরাও রণসজ্জা।
ব্যাঘাত আসুক নব নব,
আঘাত খেয়ে অটল রব,
বক্ষে আমার দুঃখে তব
বাজবে জয়ডঙ্ক।
দেব সকল শক্তি, লব
অভয় তব শঙ্খ।

১২ জ্যৈষ্ঠ ১৩২১
রামগড়

৫

মত্ত সাগর দিল পাড়ি গহন রাত্রিকালে
ঐ যে আমার নেয়ে।
ঝড় বয়েছে, ঝড়ের হাওয়া লাগিয়ে দিয়ে পালে
আসছে তরী বেয়ে।

কালো রাতের কালি-ঢালা ভয়ের বিষম বিষে
আকাশ যেন মূর্ছি পড়ে সাগরসাথে মিশে,
উতল ঢেউয়ের দল খেপেছে, না পায় তারা দিশে,
উধাও চলে ধেয়ে।
হেনকালে এ-দুর্দিনে ভাবল মনে কী সে
কূলছাড়া মোর নেয়ে।

এমন রাতে উদাস হয়ে কেমন অভিসারে
আসে আমার নেয়ে।
সাদা পালের চমক দিয়ে নিবিড় অন্ধকারে
আসছে তরী বেয়ে।
কোন্ ঘাটে যে ঠেকবে এসে কে জানে তার পাতি,
পথহারা কোন্ পথ দিয়ে সে আসবে রাতারাতি,
কোন্ অচেনা আঙিনাতে তারি পূজার বাতি
রয়েছে পথ চেয়ে।
অগৌরবার বাড়িয়ে গরব করবে আপন সাথি
বিরহী মোর নেয়ে।

এই তুফানে এই তিমিরে খোঁজে কেমন খোঁজা
বিবাগী মোর নেয়ে।
নাহি জানি পূর্ণ ক'রে কোন্ রতনের বোঝা
আসছে তরী বেয়ে।
নহে নহে, নাইকো মানিক, নাই রতনের ভার,
একটি ফুলের গুচ্ছ আছে রজনীগন্ধার,
সেইটি হাতে আঁধার রাতে সাগর হবে পার
আনমনে গান গেয়ে।
কার গলাতে নবীন প্রাতে পরিয়ে দেবে হার
নবীন আমার নেয়ে।

সে থাকে এক পথের পাশে, অদিনে যার তরে
বাহির হল নেয়ে।
তারি লাগি পাড়ি দিয়ে সবার অগোচরে
আসছে তরী বেয়ে।
রুক্ষ অলক উড়ে পড়ে, সিক্ত-পলক আঁখি,
ভাঙা ভিতের ফাঁক দিয়ে তার বাতাস চলে হাঁকি,
দীপের আলো বাদল-বায়ে কাঁপছে থাকি থাকি
ছায়াতে ঘর ছেয়ে।
তোমরা যাহার নাম জান না তাহারি নাম ডাকি
ঐ যে আসে নেয়ে।

অনেক দেরি হয়ে গেছে বাহির হল কবে
উন্মনা মোর নেয়ে।
এখনো রাত হয় নি প্রভাত, অনেক দেরি হবে
আসতে তরী বেয়ে।
বাজবে নাকো তূরী ভেরী, জানবে নাকো কেহ,
কেবল যাবে আঁধার কেটে, আলোয় ভরবে গেহ,
দৈন্য যে তার ধন্য হবে, পুণ্য হবে দেব
পুলক-পরশ পেয়ে
নীরবে তার চিরদিনের ঘুচিবে সন্দেহ
কূলে আসবে নেয়ে।

৫ ভাদ্র ১৩২১
কলিকাতা

৬

তুমি কি কেবল ছবি শুধু পটে লিখা।
ওই যে সুদূর নীহারিকা
যারা করে আছে ভিড়
আকাশের নীড়;

ওই যারা দিনরাত্রি
আলো-হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী
গ্রহ তারা রবি
তুমি কি তাদেরি মতো সত্য নও।
হায় ছবি, তুমি শুধু ছবি।

চিরচঞ্চলের মাঝে তুমি কেন শান্ত হয়ে রও।
পথিকের সঙ্গ লও
ওগো পথহীন।
কেন রাত্রিদিন
সকলের মাঝে থেকে সবা হতে আছ এত দূরে
স্থিরতার চির অন্তঃপুরে।
এই ধূলি
ধূসর অঞ্চল তুলি
বায়ুভরে ধায় দিকে দিকে ;
বৈশাখে সে বিধবার আভরণ খুলি
তপস্বিনী ধরণীরে সাজায় গৈরিকে ;
অঙ্গে তার পত্রলিখা দেয় লিখে
বসন্তের মিলন-উষায়,
এই ধূলি এও সত্য হায় ;
এই তৃণ
বিশ্বের চরণতলে লীন
এরা যে অস্থির, তাই এরা সত্য সবি—
তুমি স্থির, তুমি ছবি,
তুমি শুধু ছবি।

একদিন এই পথে চলেছিলে আমাদের পাশে।
বক্ষ তব দুলিত নিশ্বাসে ;
অঙ্গে অঙ্গে প্রাণ তব

কত গানে কত নাচে
রচিয়াছে
আপনার ছন্দ নব নব
বিশ্বতালে রেখে তাল ;
সে যে আজ হল কত কাল।
এ জীবনে
আমার ভুবনে
কত সত্য ছিলে।'
মোর চক্ষে এ নিখিলে
দিকে দিকে তুমিই লিখিলে
রূপের তুলিকা ধরি রসের মুরতি।
সে-প্রভাতে তুমিই তো ছিলে
এ-বিশ্বের বাণী মূর্তিমতী।

একসাথে পথে যেতে যেতে
রজনীর আড়ালেতে
তুমি গেলে থামি।
তার পরে আমি
কত দুঃখে সুখে
রাত্রিদিন চলেছি সম্মুখে।
চলেছে জোয়ার-ভাঁটা আলোকে আঁধারে
আকাশ-পাথারে ;
পথের দুধারে
চলেছে ফুলের দল নীরব চরণে
বরনে বরনে ;
সহস্রধারায় ছোটে দুরন্ত জীবন-নির্ঝরিণী
মরণের বাজায়ে কিঙ্কিণী।
অজানার সুরে
চলিয়াছি দূর হতে দূরে—
মেতেছি পথের প্রেমে।

তুমি পথ হতে নেমে
যেখানে দাঁড়ালে
সেখানেই আছ থেমে।
এই তৃণ, এই ধূলি— ওই তারা, ওই শশী-রবি
সবার আড়ালে
তুমি ছবি, তুমি শুধু ছবি।

কী প্রলাপ কহে কবি।
তুমি ছবি?
নহে, নহে, নও শুধু ছবি।
কে বলে রয়েছ স্থির রেখার বন্ধনে
নিস্তব্ধ ক্রন্দনে।
মরি মরি, সে আনন্দ থেমে যেত যদি
এই নদী
হারাত তরঙ্গবেগ,
এই মেঘ
মুছিয়া ফেলিত তার সোনার লিখন।
তোমার চিকন
চিকুরের ছায়াখানি বিশ্ব হতে যদি মিলাইত
তবে
একদিন কবে
চঞ্চল পবনে লীলায়িত
মর্মর-মুখর ছায়া মাধবী-বনের
হত স্বপনের।
তোমায় কি গিয়েছিনু ভুলে!
তুমি যে নিয়েছ বাসা জীবনের মূলে
তাই ভুল।
অন্যমনে চলি পথে, ভুলি নে কি ফুল।
ভুলি নে কি তারা।

তবুও তাহারা
প্রাণের নিশ্বাসবায়ু করে সুমধুর,
ভুলের শূন্যতা-মাঝে ভরি দেয় সুর।
ভুলে থাকা নয় সে তো ভোলা ;
বিস্মৃতির মর্মে বসি রক্তে মোর দিয়েছ যে দোলা।
নয়নসম্মুখে তুমি নাই,
নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই ;
আজি তাই
শ্যামলে শ্যামল তুমি, নীলিমায় নীল।
আমার নিখিল
তোমাতে পেয়েছে তার অন্তরের মিল।
নাহি জানি, কেহ নাহি জানে
তব সুর বাজে মোর গানে ;
কবির অন্তরে তুমি কবি,
নও ছবি, নও ছবি, নও শুধু ছবি।
তোমারে পেয়েছি কোন্ প্রাতে,
তার পরে হারায়েছি রাতে।
তার পরে অন্ধকারে অগোচরে তোমারেই লভি
নও ছবি, নও তুমি ছবি।

৩ কার্তিক ১৩২১
রাত্রি
এলাহাবাদ

৭

এ কথা জানিতে তুমি, ভারত-ঈশ্বর শা-জাহান,
কালস্রোতে ভেসে যায় জীবন যৌবন ধন মান ,
শুধু তব অন্তরবেদনা
চিরন্তন হয়ে থাক্ সম্রাটের ছিল এ সাধনা।
রাজশক্তি বজ্র সুকঠিন

সন্ধ্যারক্তরাগসম তন্দ্রাতলে হয় হোক লীন,
কেবল একটি দীর্ঘশ্বাস
নিত্য-উচ্ছ্বসিত হয়ে সকরুণ করুক আকাশ
এই তব মনে ছিল আশ।
হীরামুক্তামাণিক্যের ঘটা
যেন শূন্য দিগন্তের ইন্দ্রজাল ইন্দ্রধনুচ্ছটা
যায় যদি লুপ্ত হয়ে যাক,
শুধু থাক্
একবিন্দু নয়নের জল
কালের কপোলতলে শুভ্র সমুজ্জ্বল
এ তাজমহল।

হায় ওরে মানবহৃদয়,
বার বার
কারো পানে ফিরে চাহিবার
নাই যে সময়,
নাই নাই।
জীবনের খরস্রোতে ভাসিছ সদাই
ভুবনের ঘাটে ঘাটে ;—
এক হাটে লও বোঝা, শূন্য করে দাও অন্য হাটে।
দক্ষিণের মন্ত্রগুঞ্জরণে
তব কুঞ্জবনে
বসন্তের মাধবীমঞ্জরী
যেই ক্ষণে দেয় ভরি
মালঞ্চের চঞ্চল অঞ্চল,
বিদায়-গোধূলি আসে ধুলায় ছড়ায়ে ছিন্নদল।
সময় যে নাই ;
আবার শিশিররাত্রে তাই
নিকুঞ্জে ফুটায়ে তোল নব কুন্দরাজি,
সাজাইতে হেমন্তের অশ্রুভরা আনন্দের সাজি।

হায় রে হৃদয়,
তোমার সঞ্চয়
দিনান্তে নিশান্তে শুধু পথপ্রান্তে ফেলে যেতে হয়
নাই নাই, নাই যে সময়।
হে সম্রাট, তাই তব শঙ্কিত হৃদয়
চেয়েছিল করিবারে সময়ের হৃদয় হরণ
সৌন্দর্যে ভুলায়ে।
কণ্ঠে তার কী মালা দুলায়ে
করিলে বরণ
রূপহীন মরণেরে মৃত্যুহীন অপরূপ সাজে।
রহে না যে
বিলাপের অবকাশ
বারো মাস,
তাই তব অশান্ত ক্রন্দনে
চিরমৌন জাল দিয়ে বেঁধে দিলে কঠিন বন্ধনে।
জ্যোৎস্নারাতে নিভৃত মন্দিরে
প্রেয়সীরে
যে-নামে ডাকিতে ধীরে ধীরে
সেই কানে-কানে ডাকা রেখে গেলে এইখানে
অনন্তের কানে।
প্রেমের করুণ কোমলতা
ফুটিল তা
সৌন্দর্যের পুষ্পপুঞ্জে প্রশান্ত পাষাণে।
হে সম্রাট কবি,
এই তব হৃদয়ের ছবি,
এই তব নব মেঘদূত,
অপূর্ব অদ্ভুত
ছন্দে গানে
উঠিয়াছে অলক্ষ্যের পানে

যেথা তব বিরহিণী প্রিয়া
রয়েছে মিশিয়া
প্রভাতের অরুণ-আভাসে,
ক্লান্তসন্ধ্যা দিগন্তের করুণ নিশ্বাসে,
পূর্ণিমায় দেহহীন চামেলির লাবণ্যবিলাসে,
ভাষার অতীত তীরে
কাঙাল নয়ন যেথা দ্বার হতে আসে ফিরে ফিরে।
তোমার সৌন্দর্যদূত যুগ যুগ ধরি
এড়াইয়া কালের প্রহরী
চলিয়াছে বাক্যহারা এই বার্তা নিয়া
“ভুলি নাই, ভুলি নাই, ভুলি নাই প্রিয়া

চলে গেছ তুমি আজ,
মহারাজ ;
রাজ্য তব স্বপ্নসম গেছে ছুটে,
সিংহাসন গেছে টুটে ;
তব সৈন্যদল
যাদের চরণভরে ধরণী করিত টলমল
তাহাদের স্মৃতি আজ বায়ুভরে
উড়ে যায় দিল্লীর পথের ধূলি-’পরে।
বন্দীরা গাহে না গান ;
যমুনা-কল্লোলসাথে নহবত মিলায় না তান ;
তব পুরসুন্দরীর নূপুরনিক্বণ
ভগ্ন প্রাসাদের কোণে
ম’রে গিয়ে ঝিল্লীস্বনে
কাঁদায় রে নিশার গগন।
তবুও তোমার দূত অমলিন,
শ্রান্তিক্লান্তিহীন,
তুচ্ছ করি রাজ্য-ভাঙাগড়া,

তুচ্ছ করি জীবনমৃত্যুর ওঠাপড়া,
যুগে যুগান্তরে
কহিতেছে একস্বরে
চিরবিরহীর বাণী নিয়া
"ভুলি নাই, ভুলি নাই, ভুলি নাই প্রিয়া।"

মিথ্যা কথা— কে বলে যে ভোল নাই।
কে বলে রে খোল নাই
স্মৃতির পিঞ্জরদ্বার।
অতীতের চির অস্ত-অন্ধকার
আজিও হৃদয় তব রেখেছে বাঁধিয়া ?
বিস্মৃতির মুক্তিপথ দিয়া
আজিও সে হয় নি বাহির ?
সমাধিমন্দির
এক ঠাঁই রহে চিরস্থির ;
ধরার ধুলায় থাকি
স্মরণের আবরণে মরণেরে যত্নে রাখে ঢাকি।
জীবনেরে কে রাখিতে পারে।
আকাশের প্রতি তারা ডাকিছে তাহারে।
তার নিমন্ত্রণ লোকে লোকে
নব নব পূর্বাচলে আলোকে আলোকে।
স্মরণের গ্রন্থি টুটে
সে যে যায় ছুটে
বিশ্বপথে বন্ধনবিহীন।
মহারাজ, কোনো মহারাজ্য কোনোদিন
পারে নাই তোমারে ধরিতে ;
সমুদ্রস্তনিত পৃথ্বী, হে বিরাট, তোমারে ভরিতে
নাহি পারে—
তাই এ-ধরারে

জীবন-উৎসব-শেষে দুই পায়ে ঠেলে
মৃৎপাত্রের মতো যাও ফেলে।
তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ,
তাই তব জীবনের রথ
পশ্চাতে ফেলিয়া যায় কীর্তিরে তোমার
বারম্বার।
তাই
চিহ্ন তব পড়ে আছে, তুমি হেথা নাই।
যে প্রেম সম্মুখপানে
চলিতে চালাতে নাহি জানে,
যে প্রেম পথের মধ্যে পেতেছিল নিজ সিংহাসন,
তার বিলাসের সম্ভাষণ
পথের ধুলার মতো জড়ায়ে ধরেছে তব পায়ে,
দিয়েছ তা ধূলিরে ফিরায়ে।
সেই তব পশ্চাতের পদধূলি 'পরে
তব চিত্ত হতে বায়ুভরে
কখন সহসা
উড়ে পড়েছিল বীজ জীবনের মাল্য হতে খসা।
তুমি চলে গেছ দূরে
সেই বীজ অমর অঙ্কুরে
উঠেছে অম্বরপানে,
কহিছে গম্ভীর গানে—
'যত দূর চাই
নাই নাই সে পথিক নাই।
প্রিয়া তারে রাখিল না, রাজ্য তারে ছেড়ে দিল পথ
রুধিল না সমুদ্র পর্বত।
আজি তার রথ
চলিয়াছে রাত্রির আহ্বানে
নক্ষত্রের গানে
প্রভাতের সিংহদ্বারপানে।

তাই
স্মৃতিভারে আমি পড়ে আছি,
ভারমুক্ত সে এখানে নাই।'

১৪ কার্তিক ১৩২১
রাত্রি
এলাহাবাদ

৮

হে বিরাট নদী,
অদৃশ্য নিঃশব্দ তব জল
অবিচ্ছিন্ন অবিরল
চলে নিরবধি।
স্পন্দনে শিহরে শূন্য তব রুদ্র কায়াহীন বেগে;
বস্তুহীন প্রবাহের প্রচণ্ড আঘাত লেগে
পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তুফেনা উঠে জেগে;
ক্রন্দসী কাঁদিয়া ওঠে বহ্নিভরা মেঘে।
আলোকের তীব্রচ্ছটা বিচ্ছুরিয়া উঠে বর্ণস্রোতে
ধাবমান অন্ধকার হতে;
ঘূর্ণাচক্রে ঘুরে ঘুরে মরে
স্তরে স্তরে
সূর্যচন্দ্রতারা যত
বুদ্‌বুদের মতো।

হে ভৈরবী, ওগো বৈরাগিণী,
চলেছ যে নিরুদ্দেশ সেই চলা তোমার রাগিণী,
শব্দহীন সুর।
অন্তহীন দূর
তোমারে কি নিরন্তর দেয় সাড়া।
সর্বনাশা প্রেমে তার নিত্য তাই তুমি ঘরছাড়া।
উন্মত্ত সে-অভিসারে

তব বক্ষোহারে
ঘন ঘন লাগে দোলা— ছড়ায় অমনি
নক্ষত্রের মণি ;
আঁধারিয়া ওড়ে শূন্যে ঝোড়ো এলোচুল ;
দুলে উঠে বিদ্যুতের দুল ;
অঞ্চল আকুল
গড়ায় কম্পিত তৃণে,
চঞ্চল পল্লবপুঞ্জে বিপিনে বিপিনে ;
বারম্বার ঝরে ঝরে পড়ে ফুল
জুঁই চাঁপা বকুল পারুল
পথে পথে
তোমার ঋতুর থালি হতে।
শুধু ধাও, শুধু ধাও, শুধু বেগে ধাও
উদ্দাম উধাও ;
ফিরে নাহি চাও,
যা কিছু তোমার সব দুই হাতে ফেলে ফেলে যাও
কুড়ায়ে লও না কিছু, কর না সঞ্চয় ;
নাই শোক, নাই ভয়,
পথের আনন্দবেগে অবাধে পাথেয় করো ক্ষয়।

যে মুহূর্তে পূর্ণ তুমি সে মুহূর্তে কিছু তব নাই,
তুমি তাই
পবিত্র সদাই।
তোমার চরণস্পর্শে বিশ্বধূলি
মলিনতা যায় ভুলি
পলকে পলকে—
মৃত্যু ওঠে প্রাণ হয়ে ঝলকে ঝলকে।
যদি তুমি মুহূর্তের তরে
ক্লান্তিভরে
দাঁড়াও থমকি,

তখনি চমকি
উচ্ছ্রিয়া উঠিবে বিশ্ব পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তুর পর্বতে ;
পঙ্গু মূক কবন্ধ বধির আঁধা
স্থূলতনু ভয়ংকরী বাধা
সবারে ঠেকায়ে দিয়ে দাঁড়াইবে পথে ;
অণুতম পরমাণু আপনার ভারে
সঞ্চয়ের অচল বিকারে
বিদ্ধ হবে আকাশের মর্মমূলে
কলুষের বেদনার শূলে।
ওগো নটী, চঞ্চল অপ্সরী,
অলক্ষ্য সুন্দরী
তব নৃত্যমন্দাকিনী নিত্য ঝরি ঝরি
তুলিতেছে শুচি করি
মৃত্যুস্নানে বিশ্বের জীবন।
নিঃশেষে নির্মল নীলে বিকাশিছে নিখিল গগন

ওরে কবি, তোরে আজ করেছে উতলা
ঝংকারমুখরা এই ভুবনমেখলা,
অলক্ষিত চরণের অকারণ অবারণ চলা।
নাড়ীতে নাড়ীতে তোর চঞ্চলের শুনি পদধ্বনি,
বক্ষ তোর উঠে রনরনি।
নাহি জানে কেউ
রক্তে তোর নাচে আজি সমুদ্রের ঢেউ,
কাঁপে আজি অরণ্যের ব্যাকুলতা ;
মনে আজি পড়ে সেই কথা—
যুগে যুগে এসেছি চলিয়া
স্খলিয়া স্খলিয়া
চুপে চুপে
রূপ হতে রূপে

প্রাণ হতে প্রাণে।
নিশীথে প্রভাতে
যা কিছু পেয়েছি হাতে
এসেছি করিয়া ক্ষয় দান হতে দানে,
গান হতে গানে।

ওরে দেখ্‌ সেই স্রোত হয়েছে মুখর,
তরণী কাঁপিছে থরথর।
তীরের সঞ্চয় তোর পড়ে থাক্‌ তীরে,
তাকাস নে ফিরে।
সম্মুখের বাণী
নিক তোরে টানি
মহাস্রোতে
পশ্চাতের কোলাহল হতে
অতল আঁধারে— অকূল আলোতে।

৩ পৌষ ১৩২১
রাত্রি
এলাহাবাদ

৯

কে তোমারে দিল প্রাণ
রে পাষাণ।
কে তোমারে জোগাইছে এ অমৃতরস
বরষ বরষ।
তাই দেবলোকপানে নিত্য তুমি রাখিয়াছ ধরি
ধরণীর আনন্দমঞ্জরী ;
তাই তো তোমারে ঘিরি বহে বারোমাস
অবসন্ন বসন্তের বিদায়ের বিষণ্ণ নিশ্বাস ;
মিলনরজনীপ্রান্তে ক্লান্ত চোখে
ম্লান দীপালোকে

ফুরায়ে গিয়েছে যত অশ্রু-গলা গান
তোমার অন্তরে তারা আজিও জাগিছে অফুরান,
হে পাষাণ, অমর পাষাণ।

বিদীর্ণ হৃদয় হতে বাহিরে আনিল বহি
সে-রাজবিরহী
বিরহের রত্নখানি ;
দিল আনি
বিশ্বলোক-হাতে
সবার সাক্ষাতে।
নাই সেথা সম্রাটের প্রহরী সৈনিক,
ঘিরিয়া ধরেছে তারে দশদিক।
আকাশ তাহার 'পরে
যত্নভরে
রেখে দেয় নীরব চুম্বন
চিরন্তন ;
প্রথম মিলনপ্রভা
রক্তশোভা
দেয় তারে প্রভাত-অরুণ,
বিরহের ম্লানহাসে
পাণ্ডুভাসে
জ্যোৎস্না তারে করিছে করুণ।

সম্রাটমহিষী,
তোমার প্রেমের স্মৃতি সৌন্দর্যে হয়েছে মহীয়সী।
সে-স্মৃতি তোমারে ছেড়ে
গেছে বেড়ে
সর্বলোকে
জীবনের অক্ষয় আলোকে।

অঙ্গ ধরি সে-অনঙ্গস্মৃতি
বিশ্বের প্রীতির মাঝে মিলাইছে সম্রাটের প্রীতি
রাজ্-অন্তঃপুর হতে আনিল বাহিরে
গৌরবমুকুট তব, পরাইল সকলের শিরে
যেথা যার রয়েছে প্রেয়সী
রাজার প্রাসাদ হতে দীনের কুটিরে—
তোমার প্রেমের স্মৃতি সবারে করিল মহীয়সী।

সম্রাটের মন,
সম্রাটের ধনজন
এই রাজকীর্তি হতে করিয়াছে বিদায়গ্রহণ।
আজ সর্বমানবের অনন্ত বেদনা
এ পাষাণ-সুন্দরীরে
আলিঙ্গনে ঘিরে
রাত্রিদিন করিছে সাধনা।

৫ পৌষ ১৩২১
প্রভাতে
এলাহাবাদ

১০

হে প্রিয়, আজি এ প্রাতে
নিজ হাতে
কী তোমারে দিব দান।
প্রভাতের গান ?
প্রভাত যে ক্লান্ত হয় তপ্ত রবিকরে
আপনার বৃন্তটির 'পরে ;
অবসন্ন গান
হয় অবসান।

হে বন্ধু, কী চাও তুমি দিবসের শেষে
মোর দ্বারে এসে।
কী তোমারে দিব আনি।
সন্ধ্যাদীপখানি ?
এ-দীপের আলো এ যে নিরালা কোণের,
স্তব্ধ ভবনের।
তোমার চলার পথে এরে নিতে চাও জনতায় ?
এ যে হায়
পথের বাতাসে নিবে যায়।

কী মোর শকতি আছে তোমারে যে দিব উপহার।
হোক ফুল, হোক-না গলার হার,
তার ভার
কেনই বা সবে,
একদিন যবে
নিশ্চিত শুকাবে তারা ম্লান ছিন্ন হবে।
নিজ হতে তব হাতে যাহা দিব তুলি
তারে তব শিথিল অঙ্গুলি
যাবে ভুলি—
ধূলিতে খসিয়া শেষে হয়ে যাবে ধূলি।

তার চেয়ে যবে
ক্ষণকাল অবকাশ হবে,
বসন্তে আমার পুষ্পবনে
চলিতে চলিতে অন্যমনে
অজানা গোপন গন্ধে পুলকে চমকি
দাঁড়াবে থমকি,
পথহারা সেই উপহার
হবে সে তোমার।
যেতে যেতে বীথিকায় মোর
চোখেতে লাগিবে ঘোর,

দেখিবে সহসা—
সন্ধ্যার কবরী হতে খসা
একটি রঙিন আলো কাঁপি' থরথরে
ছোঁয়ায় পরশমণি স্বপনের 'পরে,
সেই আলো, অজানা সে উপহার
সেই তো তোমার।

আমার যা শ্রেষ্ঠধন সে তো শুধু চমকে ঝলকে,
দেখা দেয়, মিলায় পলকে।
বলে না আপন নাম, পথেরে শিহরি দিয়া সুরে
চলে যায় চকিত নূপুরে।
সেথা পথ নাহি জানি,
সেথা নাহি যায় হাত, নাহি যায় বাণী।
বন্ধু, তুমি সেথা হতে আপনি যা পাবে
আপনার ভাবে,
না-চাহিতে না-জানিতে সেই উপহার
সেই তো তোমার।
আমি যাহা দিতে পারি সামান্য সে দান—
হোক ফুল, হোক তাহা গান।

১০ পৌষ ১৩২১
শান্তিনিকেতন

১১

হে মোর সুন্দর,
যেতে যেতে
পথের প্রমোদে মেতে
যখন তোমার গায়
কারা সবে ধুলা দিয়ে যায়,
আমার অন্তর
করে হায় হায়।

কেঁদে বলি, হে মোর সুন্দর,
আজ তুমি হও দণ্ডধর,
করহ বিচার।
তার পরে দেখি,
এ কী,
খোলা তব বিচারঘরের দ্বার,
নিত্য চলে তোমার বিচার।
নীরবে প্রভাত-আলো পড়ে
তাদের কলুষরক্ত নয়নের 'পরে ;
শুভ্র বনমল্লিকার বাস
স্পর্শ করে লালসার উদ্দীপ্ত নিশ্বাস ;
সন্ধ্যাতাপসীর হাতে জ্বালা
সপ্তর্ষির পূজাদীপমালা
তাদের মত্ততাপানে সারারাত্রি চায়—
হে সুন্দর, তব গায়
ধুলা দিয়ে যারা চলে যায়।
হে সুন্দর,
তোমার বিচারঘর
পুষ্পবনে,
পুণ্যসমীরণে,
তৃণপুঞ্জে পতঙ্গগুঞ্জনে,
বসন্তের বিহঙ্গকূজনে,
তরঙ্গচুম্বিত তীরে মর্মরিত পল্লববীজনে।

প্রেমিক আমার,
তারা যে নির্দয় ঘোর, তাদের যে আবেগ দুর্বার।
লুকায়ে ফেরে যে তারা করিতে হরণ
তব আভরণ,
সাজাবারে
আপনার নগ্ন বাসনারে।

তাদের আঘাত যবে প্রেমের সর্বাঙ্গে বাজে,
সহিতে সে পারি না যে ;
অশ্রু-আঁখি
তোমারে কাঁদিয়া ডাকি,—
খড়্গ ধরো, প্রেমিক আমার,
করো গো বিচার।
তার পরে দেখি
এ কী,
কোথা তব বিচার-আগার।
জননীর স্নেহ-অশ্রু ঝরে
তাদের উগ্রতা-'পরে ;
প্রণয়ীর অসীম বিশ্বাস
তাদের বিদ্রোহশেল ক্ষতবক্ষে করি লয় গ্রাস।
প্রেমিক আমার,
তোমার সে বিচার-আগার
বিনিদ্র স্নেহের স্তব্ধ নিঃশব্দ বেদনামাঝে,
সতীর পবিত্র লাজে,
সখার হৃদয়রক্তপাতে,
পথ-চাওয়া প্রণয়ের বিচ্ছেদের রাতে,
অশ্রুপ্লুত করুণার পরিপূর্ণ ক্ষমার প্রভাতে।

হে রুদ্র আমার,
লুব্ধ তারা, মুগ্ধ তারা, হয়ে পার
তব সিংহদ্বার,
সংগোপনে
বিনা নিমন্ত্রণে
সিঁধ কেটে চুরি করে তোমার ভাণ্ডার।
চোরা ধন দুর্বহ সে ভার
পলে পলে
তাহাদের মর্ম দলে,
সাধ্য নাহি রহে নামাবার।

তোমারে কাঁদিয়া তবে কহি বারম্বার—
এদের মার্জনা করো, হে রুদ্র আমার।
চেয়ে দেখি মার্জনা যে নামে এসে
প্রচণ্ড ঝঞ্ঝার বেশে;
সেই ঝড়ে
ধুলায় তাহারা পড়ে;
চুরির প্রকাণ্ড বোঝা খণ্ড খণ্ড হয়ে
সে-বাতাসে কোথা যায় বয়ে
হে রুদ্র আমার,
মার্জনা তোমার
গর্জমান বজ্রাগ্নিশিখায়,
সূর্যাস্তের প্রলয়লিখায়,
রক্তের বর্ষণে,
অকস্মাৎ সংঘাতের ঘর্ষণে ঘর্ষণে।

১২ পৌষ ১৩২১
শান্তিনিকেতন

১২

তুমি দেবে, তুমি মোরে দেবে,
গেল দিন এই কথা নিত্য ভেবে ভেবে।
সুখে দুঃখে উঠে নেবে
বাড়ায়েছি হাত
দিনরাত;
কেবল ভেবেছি, দেবে, দেবে,
আরো কিছু দেবে।

দিলে, তুমি দিলে, শুধু দিলে;
কভু পলে পলে তিলে তিলে,

কভু অকস্মাৎ বিপুল প্লাবনে
দানের শ্রাবণে।
নিয়েছি, ফেলেছি কত, দিয়েছি ছড়ায়ে,
হাতে পায়ে রেখেছি জড়ায়ে
জালের মতন ;
দানের রতন
লাগিয়েছি ধুলার খেলায়
অযত্নে হেলায়,
আলস্যের ভরে
ফেলে গেছি ভাঙা খেলাঘরে।
তবু তুমি দিলে, শুধু দিলে, শুধু দিলে,
তোমার দানের পাত্র নিত্য ভরে উঠিছে নিখিলে।

অজস্র তোমার
সে নিত্য দানের ভার
আজি আর
পারি না বহিতে।
পারি না সহিতে
এ ভিক্ষুক হৃদয়ের অক্ষয় প্রত্যাশা,
দ্বারে তব নিত্য যাওয়া-আসা।
যত পাই তত পেয়ে পেয়ে
তত চেয়ে চেয়ে
পাওয়া মোর চাওয়া মোর শুধু বেড়ে যায় ;
অনন্ত সে দায়
সহিতে না পারি হায়
জীবনে প্রভাত-সন্ধ্যা ভরিতে ভিক্ষায়।

লবে তুমি, মোরে তুমি লবে, তুমি লবে,
এ প্রার্থনা পুরাইবে কবে।
শূন্য পিপাসায় গড়া এ পেয়ালাখানি
ধুলায় ফেলিয়া টানি,

সারা রাত্রি পথ-চাওয়া কম্পিত আলোর
প্রতীক্ষার দীপ মোর
নিমেষে নিবায়ে
নিশীথের বায়ে,
আমার কণ্ঠের মালা তোমার গলায় প'রে
লবে মোরে লবে মোরে
তোমার দানের স্তূপ হতে
তব রিক্ত আকাশের অন্তহীন নির্মল আলোতে

১৩ পৌষ ১৩২১
শান্তিনিকেতন

১৩

পউষের পাতা-ঝরা তপোবনে
আজি কী কারণে
টলিয়া পড়িল আসি বসন্তের মাতাল বাতাস ;
নাই লজ্জা, নাই ত্রাস,
আকাশে ছড়ায় উচ্চহাস
চঞ্চলিয়া শীতের প্রহর
শিশির-মন্থর।

বহুদিনকার
ভুলে-যাওয়া যৌবন আমার
সহসা কী মনে ক'রে
পত্র তার পাঠায়েছে মোরে
উচ্ছৃঙ্খল বসন্তের হাতে
অকস্মাৎ সংগীতের ইঙ্গিতের সাথে।

লিখেছে সে—
আছি আমি অনন্তের দেশে

যৌবন তোমার
চিরদিনকার।
গলে মোর মন্দারের মালা,
পীত মোর উত্তরীয় দূর বনান্তের গন্ধ-ঢালা।
বিরহী তোমার লাগি
আছি জাগি
দক্ষিণ-বাতাসে
ফাল্গুনের নিশ্বাসে নিশ্বাসে।
আছি জাগি চক্ষে চক্ষে হাসিতে হাসিতে
কত মধু মধ্যাহ্নের বাঁশিতে বাঁশিতে।

লিখেছে সে—
এসো এসো চলে এসো বয়সের জীর্ণ পথশেষে,
মরণের সিংহদ্বার
হয়ে এসো পার;
ফেলে এসো ক্লান্ত পুষ্পহার।
ঝরে পড়ে ফোটা ফুল, খসে পড়ে জীর্ণ পত্রভার,
স্বপ্ন যায় টুটে,
ছিন্ন আশা ধূলিতলে পড়ে লুটে।
শুধু আমি যৌবন তোমার
চিরদিনকার,
ফিরে ফিরে মোর সাথে দেখা তব হবে বারম্বার
জীবনের এপার ওপার।

২৩ পৌষ ১৩২১
সুরুল

১৪

কত লক্ষ বরষের তপস্যার ফলে
ধরণীর তলে
ফুটিয়াছে আজি এ মাধবী।
এ আনন্দচ্ছবি
যুগে যুগে ঢাকা ছিল অলক্ষ্যের বক্ষের আঁচলে

সেইমতো আমার স্বপনে
কোনো দূর যুগান্তরে বসন্তকাননে
কোনো এক কোণে
একবেলাকার মুখে একটুকু হাসি
উঠিবে বিকাশি—
এই আশা গভীর গোপনে
আছে মোর মনে।

২৬ পৌষ ১৩২১
শান্তিনিকেতন

১৫

মোর গান এরা সব শৈবালের দল,
যেথায় জন্মেছে সেথা আপনারে করে নি অচল।
মূল নাই, ফুল আছে, শুধু পাতা আছে,
আলোর আনন্দ নিয়ে জলের তরঙ্গে এরা নাচে।
বাসা নাই, নাইকো সঞ্চয়,
অজানা অতিথি এরা কবে আসে নাইকো নিশ্চয়

যেদিন শ্রাবণ নামে দুর্নিবার মেঘে,
দুই কূল ডোবে স্রোতোবেগে,

আমার শৈবালদল
উদ্দাম চঞ্চল,
বন্যার ধারায়
পথ যে হারায়,
দেশে দেশে
দিকে দিকে যায় ভেসে ভেসে।

২৭ পৌষ ১৩২১
সুরুল

১৬

বিশ্বের বিপুল বস্তুরাশি
উঠে অট্টহাসি';
ধুলা বালি
দিয়ে করতালি
নিত্য নিত্য
করে নৃত্য
দিকে দিকে দলে দলে;
আকাশে শিশুর মতো অবিরত কোলাহলে।

মানুষের লক্ষ লক্ষ অলক্ষ্য ভাবনা,
অসংখ্য কামনা,
রূপে মত্ত বস্তুর আহ্বানে উঠে মাতি
তাদের খেলায় হতে সাথি।
স্বপ্ন যত অব্যক্ত আকুল
খুঁজে মরে কূল;
অস্পষ্টের অতল প্রবাহে পড়ি
চায় এরা প্রাণপণে ধরণীরে ধরিতে আঁকড়ি

কাষ্ঠ-লোষ্ট্র-সুদৃঢ় মুষ্টিতে,
ক্ষণকাল মাটিতে তিষ্ঠিতে।
চিত্তের কঠিন চেষ্টা বস্তুরূপে
স্তূপে স্তূপে
উঠিতেছে ভরি—
সেই তো নগরী।
এ তো শুধু নহে ঘর,
নহে শুধু ইষ্টক প্রস্তর।

অতীতের গৃহছাড়া কত যে অশ্রুত বাণী
শূন্যে শূন্যে করে কানাকানি;
খোঁজে তারা আমার বাণীরে
লোকালয়-তীরে-তীরে।
আলোকতীর্থের পথে আলোহীন সেই যাত্রীদল
চলিয়াছে অশ্রান্ত চঞ্চল।
তাদের নীরব কোলাহলে
অস্ফুট ভাবনা যত দলে দলে ছুটে চলে
মোর চিত্তগুহা ছাড়ি,
দেয় পাড়ি
অদৃষ্টের অন্ধ মরু ব্যগ্র ঊর্ধ্বশ্বাসে
আকারের অসহ্য পিয়াসে।

কী জানি কে তারা কবে
কোথা পার হবে
যুগান্তরে,
দূর সৃষ্টি-'পরে
পাবে আপনার রূপ অপূর্ব আলোতে।
আজ তারা কোথা হতে
মেলেছিল ডানা
সেদিন তা রহিবে অজানা।

অকস্মাৎ পাবে তারে কোন্ কবি,
বাঁধিবে তাহারে কোন্ ছবি,
গাঁথিবে তাহারে কোন্ হর্ম্যচূড়ে,
সেই রাজপুরে
আজি যার কোনো দেশে কোনো চিহ্ন নাই।
তার তরে কোথা রচে ঠাঁই
অরচিত দূর যজ্ঞভূমে।
কামানের ধূমে
কোন্ ভাবী ভীষণ সংগ্রাম
রণশৃঙ্গে আহ্বান করিছে তার নাম!

২৭ পৌষ ১৩২১
সুরুল

১৭

হে ভুবন
আমি যতক্ষণ
তোমারে না বেসেছিনু ভালো
ততক্ষণ তব আলো
খুঁজে খুঁজে পায় নাই তার সব ধন।
ততক্ষণ
নিখিল গগন
হাতে নিয়ে দীপ তার শূন্যে শূন্যে ছিল পথ চেয়ে

মোর প্রেম এল গান গেয়ে;
কী যে হল কানাকানি
দিল সে তোমার গলে আপন গলার মালাখানি

মুগ্ধচক্ষে হেসে
তোমারে সে
গোপনে দিয়েছে কিছু যা তোমার গোপন হৃদয়ে
তারার মালার মাঝে চিরদিন রবে গাঁথা হয়ে।

২৮ পৌষ ১৩২১
সুরুল

১৮

যতক্ষণ স্থির হয়ে থাকি
ততক্ষণ জমাইয়া রাখি
যতকিছু বস্তুভার।
ততক্ষণ নয়নে আমার
নিদ্রা নাই;
ততক্ষণ এ বিশ্বেরে কেটে কেটে খাই
কীটের মতন;
ততক্ষণ
চারিদিকে নেমে নেমে আসে আবরণ;
দুঃখের বোঝাই শুধু বেড়ে যায় নূতন নূতন;
এ জীবন
সতর্ক বুদ্ধির ভারে নিমেষে নিমেষে
বৃদ্ধ হয় সংশয়ের শীতে পক্ককেশে।

যখন চলিয়া যাই সে-চলার বেগে
বিশ্বের আঘাত লেগে
আবরণ আপনি যে ছিন্ন হয়,
বেদনার বিচিত্র সঞ্চয়
হতে থাকে ক্ষয়।
পুণ্য হই সে-চলার স্নানে,
চলার অমৃতপানে

নবীন যৌবন
বিকশিয়া ওঠে প্রতিক্ষণ।

ওগো আমি যাত্রী তাই—
চিরদিন সম্মুখের পানে চাই।
কেন মিছে
আমারে ডাকিস পিছে।
আমি তো মৃত্যুর গুপ্ত প্রেমে
রব না ঘরের কোণে থেমে।
আমি চিরযৌবনেরে পরাইব মালা,
হাতে মোর তারি তো বরণডালা।
ফেলে দিব আর সব ভার,
বার্ধক্যের স্তূপাকার
আয়োজন।

ওরে মন,
যাত্রার আনন্দগানে পূর্ণ আজি অনন্ত গগন।
তোর রথে গান গায় বিশ্বকবি,
গান গায় চন্দ্র তারা রবি।

২৯ পৌষ ১৩২১
প্রাতঃকাল
সুরুল

১৯

আমি যে বেসেছি ভালো এই জগতেরে ;
পাকে পাকে ফেরে ফেরে
আমার জীবন দিয়ে জড়ায়েছি এরে ;
প্রভাত-সন্ধ্যার
আলো-অন্ধকার

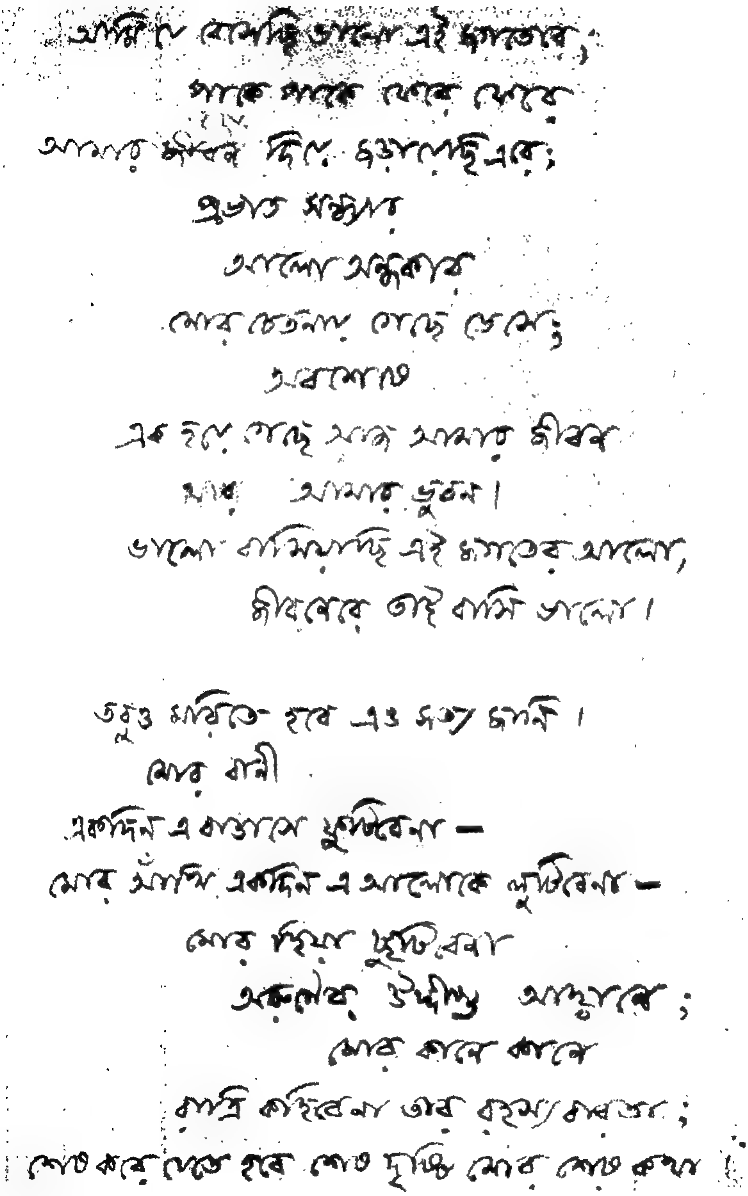

আমি যে বেসেছি ভালো এই জগতেরে;
পাকে পাকে ফেরে ফেরে
আমার জীবন দিয়ে জড়ায়েছি এরে;
প্রভাত সন্ধ্যার
আলো অন্ধকার
মোর চেতনায় গেছে ভেসে;
অবশেষে
এক হয়ে গেছে আজ আমার জীবন
আর আমার ভুবন।
ভালো বাসিয়াছি এই জগতের আলো,
জীবনেরে তাই বাসি ভালো।

তবুও মরিতে হবে এও সত্য জানি।
মোর বাণী
একদিন এ বাতাসে ফুটিবেনা —
মোর আঁখি একদিন এ আলোকে লুটিবেনা —
মোর হিয়া ছুটিবেনা
অরুণের উদ্দীপ্ত আহ্বানে;
মোর কানে কানে
রাত্রি কহিবেনা তার রহস্যবারতা;
শেষ করে যেতে হবে শেষ দৃষ্টি মোর শেষ কথা।

'বলাকা'র পাণ্ডুলিপির একটি পৃষ্ঠা

মোর চেতনায় গেছে ভেসে ;
অবশেষে
এক হয়ে গেছে আজ আমার জীবন
আর আমার ভুবন।
ভালোবাসিয়াছি এই জগতের আলো
জীবনেরে তাই বাসি ভালো।

তবুও মরিতে হবে এও সত্য জানি।
মোর বাণী
একদিন এ-বাতাসে ফুটিবে না,
মোর আঁখি এ-আলোকে লুটিবে না,
মোর হিয়া ছুটিবে না
অরুণের উদ্দীপ্ত আহ্বানে ;
মোর কানে কানে
রজনী কবে না তার রহস্যবারতা,
শেষ করে যেতে হবে শেষ দৃষ্টি, মোর শেষ কথা।

এমন একান্ত করে চাওয়া
এও সত্য যত
এমন একান্ত ছেড়ে যাওয়া
সেও সেই মতো।
এ দুয়ের মাঝে তবু কোনোখানে আছে কোনো মিল ;
নহিলে নিখিল
এতবড়ো নিদারুণ প্রবঞ্চনা
হাসিমুখে এতকাল কিছুতে বহিতে পারিত না।
সব তার আলো
কীটে-কাটা পুষ্পসম এতদিনে হয়ে যেত কালো।

২৯ পৌষ ১৩২১
প্রাতঃকাল
সুরুল

২০

আনন্দ-গান উঠুক তবে বাজি'
এবার আমার ব্যথার বাঁশিতে।
অশ্রুজলের ঢেউয়ের 'পরে আজি
পারের তরী থাকুক ভাসিতে।

যাবার হাওয়া ঐ যে উঠেছে— ওগো
ঐ যে উঠেছে,
সারারাত্রি চক্ষে আমার
ঘুম যে ছুটেছে।

হৃদয় আমার উঠছে দুলে দুলে
অকূল জলের অট্টহাসিতে,
কে গো তুমি দাও দেখি তান তুলে
এবার আমার ব্যথার বাঁশিতে।

হে অজানা, অজানা সুর নব
বাজাও আমার ব্যথার বাঁশিতে,
হঠাৎ এবার উজান হাওয়ায় তব
পারের তরী থাক্ না ভাসিতে।

কোনো কালে হয় নি যারে দেখা— ওগো
তারি বিরহে
এমন করে ডাক দিয়েছে,
ঘরে কে রহে।

বাসার আশা গিয়েছে মোর ঘুরে,
ঝাঁপ দিয়েছি আকাশরাশিতে;
পাগল, তোমার সৃষ্টিছাড়া সুরে
তান দিয়ো মোর ব্যথার বাঁশিতে।

২৯ পৌষ ১৩২১
রেলগাড়ি

২১

ওরে তোদের ত্বর সহে না আর ?
এখনো শীত হয় নি অবসান।
পথের ধারে আভাস পেয়ে কার
সবাই মিলে গেয়ে উঠিস গান ?
ওরে পাগল চাঁপা, ওরে উন্মত্ত বকুল,
কার তরে সব ছুটে এলি কৌতুকে আকুল।

মরণপথে তোরা প্রথম দল,
ভাবলি নে তো সময় অসময়।
শাখায় শাখায় তোদের কোলাহল
গন্ধে রঙে ছড়ায় বনময়।
সবার আগে উচ্চে হেসে ঠেলাঠেলি করে
উঠলি ফুটে, রাশি রাশি পড়লি ঝরে ঝরে।

বসন্ত সে আসবে যে ফাল্গুনে
দখিন হাওয়ার জোয়ার-জলে ভাসি'
তাহার লাগি রইলি নে দিন গুণে
আগে-ভাগেই বাজিয়ে দিলি বাঁশি।
রাত না হতে পথের শেষে পৌঁছবি কোন্ মতে।
যা ছিল তোর কেঁদে হেসে ছড়িয়ে দিলি পথে!

ওরে খ্যাপা, ওরে হিসাব-ভোলা,
দূর হতে তার পায়ের শব্দে মেতে
সেই অতিথির ঢাকতে পথের ধুলা
তোরা আপন মরণ দিলি পেতে।
না দেখে না শুনেই তোদের পড়ল বাঁধন খসে,
চোখের দেখার অপেক্ষাতে রইলি নে আর বসে।

৮ মাঘ ১৩২১
কলিকাতা

২২

যখন আমায় হাতে ধরে
আদর করে
ডাকলে তুমি আপন পাশে,
রাত্রিদিবস ছিলেম ত্রাসে
পাছে তোমার আদর হতে অসাবধানে কিছু হারাই,
চলতে গিয়ে নিজের পথে
যদি আপন ইচ্ছামতে
কোনোদিকে এক পা বাড়াই,
পাছে বিরাগ-কুশাঙ্কুরের একটি কাঁটা একটু মাড়াই।

মুক্তি, এবার মুক্তি আজি
উঠল বাজি
অনাদরের কঠিন ঘায়ে,
অপমানের ঢাকে ঢোলে সকল নগর সকল গাঁয়ে
ওরে ছুটি, এবার ছুটি, এই যে আমার হল ছুটি,
ভাঙল আমার মানের খুঁটি,
খসল বেড়ি হাতে পায়ে ;
এই যে এবার
দেবার নেবার
পথ খোলসা ডাইনে বাঁয়ে।

এতদিনে আবার মোরে
বিষম জোরে
ডাক দিয়েছে আকাশ পাতাল।
লাঞ্ছিতেরে কে রে থামায়।
ঘর-ছাড়ানো বাতাস আমায়
ক্তি-মদে করল মাতাল।

খসে-পড়া তারার সাথে
নিশীথরাতে
ঝাঁপ দিয়েছি অতলপানে
মরণ-টানে।

আমি-যে সেই বৈশাখী মেঘ বাঁধনছাড়া,
ঝড় তাহারে দিল তাড়া ;
সন্ধ্যারবির স্বর্ণকিরীট ফেলে দিল অস্তপারে,
বজ্রমানিক দুলিয়ে নিল গলার হারে ;
একলা আপন তেজে
ছুটল সে-যে
অনাদরের মুক্তিপথের ’পরে
তোমার চরণধুলায়-রঙিন চরম সমাদরে।

গর্ভ ছেড়ে মাটির ’পরে
যখন পড়ে
তখন ছেলে দেখে আপন মাকে।
তোমার আদর যখন ঢাকে,
জড়িয়ে থাকি তারি নাড়ীর পাকে,
তখন তোমায় নাহি জানি।
আঘাত হানি
তোমারি আচ্ছাদন হতে যেদিন দূরে ফেলাও টানি
সে-বিচ্ছেদে চেতনা দেয় আনি,
দেখি বদনখানি।

১৯ মাঘ ১৩২১
রাত্রি
শিলাইদা। কুঠিবাড়ি

২৩

কোন্ ক্ষণে
সৃজনের সমুদ্রমন্থনে
উঠেছিল দুই নারী
অতলের শয্যাতল ছাড়ি।
একজনা উর্বশী, সুন্দরী,
বিশ্বের কামনা-রাজ্যে রানী,
স্বর্গের অপ্সরী।
অন্যজনা লক্ষ্মী সে কল্যাণী,
বিশ্বের জননী তাঁরে জানি,
স্বর্গের ঈশ্বরী।

একজন তপোভঙ্গ করি
উচ্চহাস্য-অগ্নিরসে ফাল্গুনের সুরাপাত্র ভরি
নিয়ে যায় প্রাণমন হরি,
দু-হাতে ছড়ায় তারে বসন্তের পুষ্পিত প্রলাপে,
রাগরক্ত কিংশুকে গোলাপে,
নিদ্রাহীন যৌবনের গানে।

আরজন ফিরাইয়া আনে
অশ্রুর শিশির-স্নানে
স্নিগ্ধ বাসনায়;
হেমন্তের হেমকান্ত সফল শান্তির পূর্ণতায়;
ফিরাইয়া আনে
নিখিলের আশীর্বাদপানে
অচঞ্চল লাবণ্যের স্মিতহাস্যসুধায় মধুর।
ফিরাইয়া আনে ধীরে
জীবনমৃত্যুর
পবিত্র সংগমতীর্থতীরে
অনন্তের পূজার মন্দিরে।

২০ মাঘ ১৩২১
পদ্মাতীরে

২৪

স্বর্গ কোথায় জানিস কি তা ভাই।
তার ঠিক-ঠিকানা নাই।
তার আরম্ভ নাই, নাই রে তাহার শেষ,
ওরে নাই রে তাহার দেশ,
ওরে নাই রে তাহার দিশা,
ওরে নাই রে দিবস, নাই রে তাহার নিশা।

ফিরেছি সেই স্বর্গে শূন্যে শূন্যে
ফাঁকির ফাঁকা ফানুস
কত যে যুগ-যুগান্তরের পুণ্যে
জন্মেছি আজ মাটির 'পরে ধুলামাটির মানুষ।
স্বর্গ আজ কৃতার্থ তাই আমার দেহে,
আমার প্রেমে, আমার স্নেহে,
আমার ব্যাকুল বুকে,
আমার লজ্জা, আমার সজ্জা, আমার দুঃখে সুখে।
আমার জন্ম-মৃত্যুরি তরঙ্গে
নিত্যনবীন রঙের ছটায় খেলায় সে-যে রঙ্গে।

আমার গানে স্বর্গ আজি
ওঠে বাজি,
আমার প্রাণে ঠিকানা তার পায়,
আকাশভরা আনন্দে সে আমারে তাই চায়।
দিগঙ্গনার অঙ্গনে আজ বাজল যে তাই শঙ্খ,
সপ্ত সাগর বাজায় বিজয়-ডঙ্ক
তাই ফুটেছে ফুল,
বনের পাতায় ঝরনাধারায় তাই রে হুলুস্থুল।
স্বর্গ আমার জন্ম নিল মাটি-মায়ের কোলে
বাতাসে সেই খবর ছোটে আনন্দ-কল্লোলে।

২০ মাঘ ১৩২১
শিলাইদা। কুঠিবাড়ি

২৫

যে-বসন্ত একদিন করেছিল কত কোলাহল
লয়ে দলবল
আমার প্রাঙ্গণতলে কলহাস্য তুলে
দাড়িম্বে পলাশগুচ্ছে কাঞ্চনে পারুলে ;
নবীন পল্লবে বনে বনে
বিহ্বল করিয়াছিল নীলাম্বর রক্তিম চুম্বনে ;
সে আজ নিঃশব্দে আসে আমার নির্জনে ;
অনিমেষে
নিস্তব্ধ বসিয়া থাকে নিভৃত ঘরের প্রান্তদেশে
চাহি' সেই দিগন্তের পানে
শ্যামশ্রী মূর্ছিত হয়ে নীলিমায় মরিছে যেখানে ।

২০ মাঘ ১৩২১
পদ্মা

২৬

এবারে ফাল্গুনের দিনে সিন্ধুতীরের কুঞ্জবীথিকায়
এই যে আমার জীবন-লতিকায়
ফুটল কেবল শিউরে-ওঠা নতুন পাতা যত
রক্তবরন হৃদয়ব্যথার মতো ;
দখিন হাওয়া ক্ষণে ক্ষণে দিল কেবল দোল,
উঠল কেবল মর্মর কল্লোল ।
এবার শুধু গানের মৃদু গুঞ্জনে
বেলা আমার ফুরিয়ে গেল কুঞ্জবনের প্রাঙ্গণে ।

আবার যেদিন আসবে আমার রূপের আগুন ফাগুনদিনের কাল
দখিন-হাওয়ায় উড়িয়ে রঙিন পাল,

সেবারে এই সিন্ধুতীরের কুঞ্জবীথিকায়
যেন আমার জীবন-লতিকায়
ফোটে প্রেমের সোনার বরন ফুল ;
হয় যেন আকুল
নবীন রবির আলোকটি তাই বনের প্রাঙ্গণে ;
আনন্দ মোর জনম নিয়ে
তালি দিয়ে তালি দিয়ে
নাচে যেন গানের গুঞ্জনে।

২২ মাঘ ১৩২১
পদ্মা

২৭

আমার কাছে রাজা আমার রইল অজানা।
তাই সে যখন তলব করে খাজানা
মনে করি পালিয়ে গিয়ে দেব তারে ফাঁকি,
রাখব দেনা বাকি।
যেখানেতেই পালাই আমি গোপনে
দিনে কাজের আড়ালেতে, রাতে স্বপনে,
তলব তারি আসে
নিশ্বাসে নিশ্বাসে।

তাই জেনেছি, আমি তাহার নইকো অজানা।
তাই জেনেছি ঋণের দায়ে
ডাইনে বাঁয়ে
বিকিয়ে বাসা নাইকো আমার ঠিকানা।
তাই ভেবেছি জীবন-মরণে
যা আছে সব চুকিয়ে দেব চরণে।

তাহার পরে
নিজের জোরে
নিজেরি স্বত্বে
মিলবে আমার আপন বাসা তাঁহার রাজত্বে।

২২ মাঘ ১৩২১
পদ্মা

২৮

পাখিরে দিয়েছ গান, গায় সেই গান,
তার বেশি করে না সে দান।
আমারে দিয়েছ স্বর, আমি তার বেশি করি দান,
আমি গাই গান।

বাতাসেরে করেছ স্বাধীন,
সহজে সে ভৃত্য তব বন্ধনবিহীন।
আমারে দিয়েছ যত বোঝা,
তাই নিয়ে চলি পথে কভু বাঁকা কভু সোজা।
একে একে ফেলে ভার মরণে মরণে
নিয়ে যাই তোমার চরণে
একদিন রিক্তহস্ত সেবায় স্বাধীন;
বন্ধন যা দিলে মোরে করি তারে মুক্তিতে বিলীন।

পূর্ণিমারে দিলে হাসি;
সুখস্বপ্ন-রসরাশি
ঢালে তাই, ধরণীর করপুট সুধায় উচ্ছ্বাসি
দুঃখখানি দিলে মোর তপ্ত ভালে থুয়ে,
অশ্রুজলে তারে ধুয়ে ধুয়ে

আনন্দ করিয়া তারে ফিরায়ে আনিয়া দিই হাতে
দিনশেষে মিলনের রাতে।

তুমি তো গড়েছ শুধু এ মাটির ধরণী তোমার
মিলাইয়া আলোকে আঁধার।
শূন্যহাতে সেথা মোরে রেখে
হাসিছ আপনি সেই শূন্যের আড়ালে গুপ্ত থেকে।
দিয়েছ আমার 'পরে ভার
তোমার স্বর্গটি রচিবার।

আর সকলেরে তুমি দাও,
শুধু মোর কাছে তুমি চাও।
আমি যাহা দিতে পারি আপনার প্রেমে,
সিংহাসন হতে নেমে
হাসিমুখে বক্ষে তুলে নাও।
মোর হাতে যাহা দাও
তোমার আপন হাতে তার বেশি ফিরে তুমি পাও।

২৪ মাঘ ১৩২১
পদ্মাতীর

২৯

যেদিন তুমি আপনি ছিলে একা
আপনাকে তো হয় নি তোমার দেখা।
সেদিন কোথাও কারো লাগি ছিল না পথ-চাওয়া;
এপার হতে ওপার বেয়ে
বয় নি ধেয়ে
কাঁদন-ভরা বাঁধন-ছেঁড়া হাওয়া।

আমি এলেম, ভাঙল তোমার ঘুম,
শূন্যে শূন্যে ফুটল আলোর আনন্দ-কুসুম।

আমায় তুমি ফুলে ফুলে
ফুটিয়ে তুলে
দুলিয়ে দিলে নানা রূপের দোলে।
আমায় তুমি তারায় তারায় ছড়িয়ে দিয়ে কুড়িয়ে নিলে কোলে।
আমায় তুমি মরণমাঝে লুকিয়ে ফেলে
ফিরে ফিরে নূতন ক'রে পেলে।

আমি এলেম, কাঁপল তোমার বুক,
আমি এলেম, এল তোমার দুখ,
আমি এলেম, এল তোমার আগুনভরা আনন্দ,
জীবন-মরণ-তুফান-তোলা ব্যাকুল বসন্ত।
আমি এলেম, তাই তো তুমি এলে,
আমার মুখে চেয়ে
আমার পরশ পেয়ে
আপন পরশ পেলে।

আমার চোখে লজ্জা আছে, আমার বুকে ভয়,
আমার মুখে ঘোমটা পড়ে রয়;
দেখতে তোমায় বাধে ব'লে পড়ে চোখের জল।
ওগো আমার প্রভু,
জানি আমি তবু
আমায় দেখবে ব'লে তোমার অসীম কৌতূহল,
নইলে তো এই সূর্যতারা সকলি নিষ্ফল।

২৫ মাঘ ১৩২১
পদ্মাতীর

৩০

এই দেহটির ভেলা নিয়ে দিয়েছি সাঁতার গো,
এই দু-দিনের নদী হব পার গো।
তার পরে যেই ফুরিয়ে যাবে বেলা,
ভাসিয়ে দেব ভেলা,
তার পরে তার খবর কী যে ধারি নে তার ধার গো,
তার পরে সে কেমন আলো, কেমন অন্ধকার গো।

আমি যে অজানার যাত্রী সেই আমার আনন্দ।
সেই তো বাধায় সেই তো মেটায় দ্বন্দ্ব।
জানা আমায় যেমনি আপন ফাঁদে
শক্ত করে বাঁধে
অজানা সে সামনে এসে হঠাৎ লাগায় ধন্দ,
এক-নিমেষে যায় গো ফেঁসে অমনি সকল বন্ধ।

অজানা মোর হালের মাঝি, অজানাই তো মুক্তি,
তার সনে মোর চিরকালের চুক্তি।
ভয় দেখিয়ে ভাঙায় আমার ভয়
প্রেমিক সে নির্দয়।
মানে না সে বুদ্ধিশুদ্ধি বৃদ্ধজনার যুক্তি,
মুক্তারে সে মুক্ত করে ভেঙে তাহার শুক্তি।

ভাবিস বসে যেদিন গেছে সেদিন কি আর ফিরবে।
সেই কূলে কি এই তরী আর ভিড়বে।
ফিরবে না রে, ফিরবে না আর, ফিরবে না,
সেই কূলে আর ভিড়বে না।
সামনেকে তুই ভয় করেছিস, পিছন তোরে ঘিরবে
এমনি কি তুই ভাগ্যহারা। ছিঁড়বে বাঁধন ছিঁড়বে

ঘণ্টা যে ঐ বাজল কবি, হোক রে সভাভঙ্গ,
জোয়ার-জলে উঠেছে তরঙ্গ।
এখনো সে দেখায় নি তার মুখ,
তাই তো দোলে বুক।
কোন্ রূপে যে সেই অজানার কোথায় পাব সঙ্গ,
কোন্ সাগরের কোন্ কূলে গো কোন্ নবীনের রঙ্গ।

২৬ মাঘ ১৩২১
পদ্মাতীর

৩১

নিত্য তোমার পায়ের কাছে
তোমার বিশ্ব তোমার আছে
কোনোখানে অভাব কিছু নাই।
পূর্ণ তুমি, তাই
তোমার ধনে মানে তোমার আনন্দ না ঠেকে।
তাই তো একে একে
যা-কিছু ধন তোমার আছে আমার ক'রে লবে।
এমনি করেই হবে
এ ঐশ্বর্য তব
তোমার আপন কাছে, প্রভু, নিত্য নব নব।
এমনি করেই দিনে দিনে
আমার চোখে লও যে কিনে
তোমার সূর্যোদয়।
এমনি করেই দিনে দিনে
আপন প্রেমের পরশমণি আপনি যে লও চিনে
আমার পরান করি হিরণ্ময়।

২৭ মাঘ ১৩২১
পদ্মা

৩২

আজ এই দিনের শেষে
সন্ধ্যা যে ঐ মানিকখানি পরেছিল চিকন কালো কেশে
গেঁথে নিলেম তারে
এই তো আমার বিনিসুতার গোপন গলার হারে।
চক্রবাকের নিদ্রানীরব বিজন পদ্মাতীরে
এই যে সন্ধ্যা ছুঁইয়ে গেল আমার নতশিরে
নির্মাল্য তোমার
আকাশ হয়ে পার;
ঐ যে মরি মরি
তরঙ্গহীন স্রোতের 'পরে ভাসিয়ে দিল তারার ছায়াতরী;
ঐ যে সে তার সোনার চেলি
দিল মেলি
রাতের আঙিনায়
ঘুমে অলস কায়;
ঐ যে শেষে সপ্তঋষির ছায়াপথে
কালো ঘোড়ার রথে
উড়িয়ে দিয়ে আগুন-ধূলি নিল সে বিদায়;
একটি কেবল করুণ পরশ রেখে গেল একটি কবির ভালে;
তোমার ঐ অনন্ত মাঝে এমন সন্ধ্যা হয় নি কোনোকালে,
আর হবে না কভু।
এমনি করেই প্রভু
এক নিমেষের পত্রপুটে ভরি
চিরকালের ধনটি তোমার ক্ষণকালে লও যে নূতন করি।

২৭ মাঘ ১৩২১
পদ্মা

৩৩

জানি আমার পায়ের শব্দ রাত্রে দিনে শুনতে তুমি পাও,
খুশি হয়ে পথের পানে চাও।
খুশি তোমার ফুটে ওঠে শরৎ-আকাশে
অরুণ-আভাসে।
খুশি তোমার ফাগুনবনে আকুল হয়ে পড়ে
ফুলের ঝড়ে ঝড়ে।
আমি যতই চলি তোমার কাছে
পথটি চিনে চিনে
তোমার সাগর অধিক করে নাচে
দিনের পরে দিনে।

জীবন হতে জীবনে মোর পদ্মটি যে ঘোমটা খুলে খুলে
ফোটে তোমার মানস-সরোবরে—
সূর্যতারা ভিড় ক'রে তাই ঘুরে ঘুরে বেড়ায় কূলে কূলে
কৌতূহলের ভরে।
তোমার জগৎ আলোর মঞ্জরী
পূর্ণ করে তোমার অঞ্জলি।
তোমার লাজুক স্বর্গ আমার গোপন আকাশে
একটি করে পাপড়ি খোলে প্রেমের বিকাশে।

২৭ মাঘ ১৩২১
পদ্মা

৩৪

আমার মনের জানলাটি আজ হঠাৎ গেল খুলে
তোমার মনের দিকে।
সকালবেলার আলোয় আমি সকল কর্ম ভুলে
রৈনু অনিমিখে।

দেখতে পেলেম তুমি মোরে
সদাই ডাক যে-নাম ধ'রে
সে-নামটি এই চৈত্রমাসের পাতায় পাতায় ফুলে
আপনি দিলে লিখে।
সকালবেলার আলোতে তাই সকল কর্ম ভুলে
রৈনু অনিমিখে।

আমার সুরের পর্দাটি আজ হঠাৎ গেল উড়ে
তোমার গানের পানে।
সকালবেলার আলো দেখি তোমার সুরে সুরে
ভরা আমার গানে।
মনে হল আমারি প্রাণ
তোমার বিশ্বে তুলেছে তান,
আপন গানের সুরগুলি সেই তোমার চরণমূলে
নেব আমি শিখে।
সকালবেলার আলোতে তাই সকল কর্ম ভুলে
রৈনু অনিমিখে।

২১ চৈত্র ১৩২১
সুরুল

৩৫

আজ প্রভাতের আকাশটি এই
শিশির-ছলছল,
নদীর ধারের ঝাউগুলি ঐ
রৌদ্রে ঝলমল,
এমনি নিবিড় করে
এরা দাঁড়ায় হৃদয় ভরে

তাই তো আমি জানি
বিপুল বিশ্বভুবনখানি
অকূল মানস-সাগরজলে
কমল টলমল।
তাই তো আমি জানি
আমি বাণীর সাথে বাণী,
আমি গানের সাথে গান,
আমি প্রাণের সাথে প্রাণ,
আমি অন্ধকারের হৃদয়-ফাটা
আলোক জলজল

৭ কার্তিক ১৩২২
শ্রীনগর। কাশ্মীর

৩৬

সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলমের স্রোতখানি বাঁকা
আঁধারে মলিন হল— যেন খাপে-ঢাকা
বাঁকা তলোয়ার ;
দিনের ভাঁটার শেষে রাত্রির জোয়ার
এল তার ভেসে-আসা তারাফুল নিয়ে কালো জলে ;
অন্ধকার গিরিতটতলে
দেওদার তরু সারে সারে ;
মনে হল সৃষ্টি যেন স্বপ্নে চায় কথা কহিবারে,
বলিতে না পারে স্পষ্ট করি,
অব্যক্ত ধ্বনির পুঞ্জ অন্ধকারে উঠিছে গুমরি।

সহসা শুনিনু সেই ক্ষণে
সন্ধ্যার গগনে
শব্দের বিদ্যুৎছটা শূন্যের প্রান্তরে
মুহূর্তে ছুটিয়া গেল দূর হতে দূরে দূরান্তরে।

হে হংস-বলাকা,
ঝঞ্ঝা-মদরসে মত্ত তোমাদের পাখা
রাশি রাশি আনন্দের অট্টহাসে
বিস্ময়ের জাগরণ তরঙ্গিয়া চলিল আকাশে।
ঐ পক্ষধ্বনি,
শব্দময়ী অপ্সর-রমণী
গেল চলি স্তব্ধতার তপোভঙ্গ করি।
উঠিল শিহরি
গিরিশ্রেণী তিমির-মগন,
শিহরিল দেওদার-বন।

মনে হল এ পাখার বাণী
দিল আনি
শুধু পলকের তরে
পুলকিত নিশ্চলের অন্তরে অন্তরে
বেগের আবেগ।
পর্বত চাহিল হতে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ;
তরুশ্রেণী চাহে, পাখা মেলি
মাটির বন্ধন ফেলি
ওই শব্দরেখা ধরে চকিতে হইতে দিশাহারা,
আকাশের খুঁজিতে কিনারা।
এ সন্ধ্যার স্বপ্ন টুটে বেদনার ঢেউ উঠে জাগি
সুদূরের লাগি,
হে পাখা বিবাগী।
বাজিল ব্যাকুল বাণী নিখিলের প্রাণে—
"হেথা নয়, হেথা নয়, আর কোন্‌খানে।"

হে হংস-বলাকা,
আজ রাত্রে মোর কাছে খুলে দিলে স্তব্ধতার ঢাকা।

শুনিতেছি আমি এই নিঃশব্দের তলে
শূন্যে জলে স্থলে
অমনি পাখার শব্দ উদ্দাম চঞ্চল।
তৃণদল
মাটির আকাশ 'পরে ঝাপটিছে ডানা,
মাটির আঁধার-নীচে কে জানে ঠিকানা
মেলিতেছে অঙ্কুরের পাখা
লক্ষ লক্ষ বীজের বলাকা।
দেখিতেছি আমি আজি
এই গিরিরাজি,
এই বন, চলিয়াছে উন্মুক্ত ডানায়
দ্বীপ হতে দ্বীপান্তরে, অজানা হইতে অজানায়।
নক্ষত্রের পাখার স্পন্দনে
চমকিছে অন্ধকার আলোর ক্রন্দনে।

শুনিলাম মানবের কত বাণী দলে দলে
অলক্ষিত পথে উড়ে চলে
অস্পষ্ট অতীত হতে অস্ফুট সুদূর যুগান্তরে।
শুনিলাম আপন অন্তরে
অসংখ্য পাখির সাথে
দিনেরাতে
এই বাসাছাড়া পাখি ধায় আলো-অন্ধকারে
কোন্ পার হতে কোন্ পারে।
ধ্বনিয়া উঠিছে শূন্য নিখিলের পাখার এ গানে—
"হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোথা, অন্য কোন্‌খানে।"

কার্তিক ১৩২২
শ্রীনগর

৩৭

দূর হতে কি শুনিস মৃত্যুর গর্জন, ওরে দীন,
ওরে উদাসীন,
ওই ক্রন্দনের কলরোল,
লক্ষ বক্ষ হতে মুক্ত রক্তের কল্লোল।
বহ্নিবন্যা-তরঙ্গের বেগ,
বিষশ্বাস-ঝটিকার মেঘ,
ভূতল গগন
মূর্ছিত বিহ্বল-করা মরণে মরণে আলিঙ্গন ;
ওরি মাঝে পথ চিরে চিরে
নূতন সমুদ্রতীরে
তরী নিয়ে দিতে হবে পাড়ি,
ডাকিছে কাণ্ডারী
এসেছে আদেশ—
বন্দরে বন্ধনকাল এবারের মতো হল শেষ,
পুরানো সঞ্চয় নিয়ে ফিরে ফিরে শুধু বেচাকেনা
আর চলিবে না।
বঞ্চনা বাড়িয়া ওঠে, ফুরায় সত্যের যত পুঁজি,
কাণ্ডারী ডাকিছে তাই বুঝি—
"তুফানের মাঝখানে
নূতন সমুদ্রতীরপানে
দিতে হবে পাড়ি।"
তাড়াতাড়ি
তাই ঘর ছাড়ি
চারিদিক হতে ওই দাঁড়-হাতে ছুটে আসে দাঁড়ী।

"নূতন উষার স্বর্ণদ্বার
খুলিতে বিলম্ব কত আর।"

এ কথা শুধায় সবে
ভীত আর্তরবে
ঘুম হতে অকস্মাৎ জেগে।
ঝড়ের পুঞ্জিত মেঘে
কালোয় ঢেকেছে আলো— জানে না তো কেউ
রাত্রি আছে কি না আছে ; দিগন্তে ফেনায়ে উঠে ঢেউ—
তারি মাঝে ফুকারে কাণ্ডারী—
"নূতন সমুদ্রতীরে তরী নিয়ে দিতে হবে পাড়ি।"
বাহিরিয়া এল কা'রা। মা কাঁদিছে পিছে,
প্রেয়সী দাঁড়ায়ে দ্বারে নয়ন মুদিছে।
ঝড়ের গর্জনমাঝে
বিচ্ছেদের হাহাকার বাজে ;
ঘরে ঘরে শূন্য হল আরামের শয্যাতল ;
"যাত্রা করো, যাত্রা করো যাত্রীদল,"
উঠেছে আদেশ,
"বন্দরের কাল হল শেষ।"

মৃত্যু ভেদ করি'
দুলিয়া চলেছে তরী।
কোথায় পৌঁছিবে ঘাটে, কবে হবে পার,
সময় তো নাই শুধাবার।
এই শুধু জানিয়াছে সার
তরঙ্গের সাথে লড়ি
বাহিয়া চলিতে হবে তরী।
টানিয়া রাখিতে হবে পাল,
আঁকড়ি ধরিতে হবে হাল ;—
বাঁচি আর মরি
বাহিয়া চলিতে হবে তরী।
এসেছে আদেশ—
বন্দরের কাল হল শেষ।

অজানা সমুদ্রতীর, অজানা সে-দেশ—
সেথাকার লাগি
উঠিয়াছে জাগি
ঝটিকার কণ্ঠে কণ্ঠে শূন্যে শূন্যে প্রচণ্ড আহ্বান।
মরণের গান
উঠেছে ধ্বনিয়া পথে নবজীবনের অভিসারে
ঘোর অন্ধকারে।
যত দুঃখ পৃথিবীর, যত পাপ, যত অমঙ্গল,
যত অশ্রুজল,
যত হিংসা হলাহল,
সমস্ত উঠিছে তরঙ্গিয়া,
কূল উল্লঙ্ঘিয়া,
ঊর্ধ্ব আকাশেরে ব্যঙ্গ করি'।
তবু বেয়ে তরী
সব ঠেলে হতে হবে পার,
কানে নিয়ে নিখিলের হাহাকার,
শিরে লয়ে উন্মত্ত দুর্দিন,
চিত্তে নিয়ে আশা অন্তহীন,
হে নির্ভীক, দুঃখ-অভিহত।
ওরে ভাই, কার নিন্দা কর তুমি। মাথা করো নত।
এ আমার এ তোমার পাপ।
বিধাতার বক্ষে এই তাপ
বহু যুগ হতে জমি' বায়ুকোণে আজিকে ঘনায়—
ভীরুর ভীরুতাপুঞ্জ, প্রবলের উদ্ধত অন্যায়,
লোভীর নিষ্ঠুর লোভ,
বঞ্চিতের নিত্য চিত্তক্ষোভ,
জাতি-অভিমান,
মানবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার বহু অসম্মান,
বিধাতার বক্ষ আজি বিদীরিয়া
ঝটিকার দীর্ঘশ্বাসে জলে স্থলে বেড়ায় ফিরিয়া।

ভাঙিয়া পড়ুক ঝড়, জাগুক তুফান,
নিঃশেষ হইয়া যাক নিখিলের যত বজ্রবাণ।
রাখো নিন্দাবাণী, রাখো আপন সাধুত্ব অভিমান,
শুধু একমনে হও পার
এ প্রলয়-পারাবার
নূতন সৃষ্টির উপকূলে
নূতন বিজয়ধ্বজা তুলে।

দুঃখেরে দেখেছি নিত্য, পাপেরে দেখেছি নানা ছলে;
অশান্তির ঘূর্ণি দেখি জীবনের স্রোতে পলে পলে;
মৃত্যু করে লুকাচুরি
সমস্ত পৃথিবী জুড়ি।
ভেসে যায় তারা সরে যায়
জীবনেরে করে যায়
ক্ষণিক বিদ্রূপ।
আজ দেখো তাহাদের অভ্রভেদী বিরাট স্বরূপ।
তার পরে দাঁড়াও সম্মুখে,
বলো অকম্পিত বুকে—
"তোরে নাহি করি ভয়,
এ সংসারে প্রতিদিন তোরে করিয়াছি জয়।
তোর চেয়ে আমি সত্য এ বিশ্বাসে প্রাণ দিব, দেখ্।
শান্তি সত্য, শিব সত্য, সত্য সেই চিরন্তন এক।"

মৃত্যুর অন্তরে পশি' অমৃত না পাই যদি খুঁজে,
সত্য যদি নাহি মেলে দুঃখ সাথে যুঝে,
পাপ যদি নাহি মরে যায়
আপনার প্রকাশ-লজ্জায়,
অহংকার ভেঙে নাহি পড়ে আপনার অসহ্য সজ্জায়,
তবে ঘরছাড়া সবে
অন্তরের কী আশ্বাস-রবে

মরিতে ছুটিছে শত শত
প্রভাত-আলোর পানে লক্ষ লক্ষ নক্ষত্রের মতো।
বীরের এ রক্তস্রোত, মাতার এ অশ্রুধারা
এর যত মূল্য সে কি ধরার ধুলায় হবে হারা।
স্বর্গ কি হবে না কেনা।
বিশ্বের ভাণ্ডারী শুধিবে না
এত ঋণ?
রাত্রির তপস্যা সে কি আনিবে না দিন।
নিদারুণ দুঃখরাতে
মৃত্যুঘাতে
মানুষ চূর্ণিল যবে নিজ মর্তসীমা
তখন দিবে না দেখা দেবতার অমর মহিমা?

২৩ কার্তিক ১৩২২
কলিকাতা

৩৮

সর্বদেহের ব্যাকুলতা কী বলতে চায় বাণী,
তাই আমার এই নূতন বসনখানি।
নূতন সে মোর হিয়ার মধ্যে দেখতে কি পায় কেউ।
সেই নূতনের ঢেউ
অঙ্গ বেয়ে পড়ল ছেয়ে নূতন বসনখানি।
দেহ-গানের তান যেন এই নিলেম বুকে টানি।

আপনাকে তো দিলেম তারে, তবু হাজার বার
নূতন করে দিই যে উপহার।
চোখের কালোয় নূতন আলো ঝলক দিয়ে ওঠে,
নূতন হাসি ফোটে,
তারি সঙ্গে, যতনভরা নূতন বসনখানি
অঙ্গ আমার নূতন করে দেয়-যে তারে আনি।

চাঁদের আলো চাইবে রাতে বনছায়ার পানে
বেদনভরা শুধু চোখের গানে।
মিলব তখন বিশ্বমাঝে আমরা দোঁহে একা,
যেন নূতন দেখা।
তখন আমার অঙ্গ ভরি' নূতন বসনখানি
পাড়ে পাড়ে ভাঁজে ভাঁজে করবে কানাকানি।

ওগো, আমার হৃদয় যেন সন্ধ্যারি আকাশ,
রঙের নেশায় মেটে না তার আশ,
তাই তো বসন রাঙিয়ে পরি কখনো বা ধানী,
কখনো জাফরানী,
আজ তোরা দেখ চেয়ে আমার নূতন বসনখানি
বৃষ্টি-ধোওয়া আকাশ যেন নবীন আসমানী।

অকূলের এই বর্ণ, এ-যে দিশাহারার নীল,
অন্য পারের বনের সাথে মিল।
আজকে আমার সকল দেহে বইছে দূরের হাওয়া
সাগরপানে ধাওয়া।
আজকে আমার অঙ্গে আনে নূতন কাপড়খানি
বৃষ্টিভরা ঈশান কোণের নব মেঘের বাণী।

১২ অগ্রহায়ণ ১৩২২
পদ্মা

৩৯

যেদিন উদিলে তুমি, বিশ্বকবি, দূর সিন্ধুপারে,
ইংলণ্ডের দিকপ্রান্ত পেয়েছিল সেদিন তোমারে
আপন বক্ষের কাছে, ভেবেছিল বুঝি তারি তুমি
কেবল আপন ধন; উজ্জ্বল ললাট তব চুমি'

দেখেছিল কিছুকাল অরণ্যশাখার বাহুজালে,
ঢেকেছিল কিছুকাল কুয়াশা-অঞ্চল-অন্তরালে
বনপুষ্প-বিকশিত তৃণঘন শিশির-উজ্জ্বল
পরীদের খেলার প্রাঙ্গণে। দ্বীপের নিকুঞ্জতল
তখনো ওঠে নি জেগে কবিসূর্য-বন্দনাসংগীতে
তার পরে ধীরে ধীরে অনন্তের নিঃশব্দ ইঙ্গিতে
দিগন্তের কোল ছাড়ি' শতাব্দীর প্রহরে প্রহরে
উঠিয়াছ দীপ্তজ্যোতি মধ্যাহ্নের গগনের 'পরে;
নিয়েছ আসন তব সকল দিকের কেন্দ্রদেশে
বিশ্বচিত্ত উদ্ভাসিয়া; তাই হেরো যুগান্তর-শেষে
ভারতসমুদ্রতীরে কম্পমান শাখাপুঞ্জে আজি
নারিকেলকুঞ্জবনে জয়ধ্বনি উঠিতেছে বাজি'।

১৩ অগ্রহায়ণ ১৩২২
শিলাইদহ

৪০

এইক্ষণে

মোর হৃদয়ের প্রান্তে আমার নয়ন-বাতায়নে
যে-তুমি রয়েছ চেয়ে প্রভাত-আলোতে
সে-তোমার দৃষ্টি যেন নানা দিন নানা রাত্রি হতে
রহিয়া রহিয়া
চিত্তে মোর আনিছে বহিয়া
নীলিমার অপার সংগীত,
নিঃশব্দের উদার ইঙ্গিত।

আজি মনে হয় বারে বারে
যেন মোর স্মরণের দূর পরপারে
দেখিয়াছি কত দেখা
কত যুগে, কত লোকে, কত চোখে, কত জনতায়, কত একা।

সেই সব দেখা আজি শিহরিছে দিকে দিকে
ঘাসে ঘাসে নিমিখে নিমিখে,
বেণুবনে ঝিলিমিলি পাতার ঝলক-ঝিকিমিকে।
কত নব নব অবগুণ্ঠনের তলে
দেখিয়াছ কত ছলে
চুপে চুপে
এক প্রেয়সীর মুখ কত রূপে রূপে
জন্মে জন্মে, নামহারা নক্ষত্রের গোধূলি-লগনে।
তাই আজি নিখিল গগনে
অনাদি মিলন তব অনন্ত বিরহ
এক পূর্ণ বেদনায় ঝংকারি উঠিছে অহরহ।

তাই যা দেখিছ তারে ঘিরেছে নিবিড়
যাহা দেখিছ না তারি ভিড়।
তাই আজি দক্ষিণ পবনে
ফাল্গুনের ফুলগন্ধে ভরিয়া উঠিছে বনে বনে
ব্যাপ্ত ব্যাকুলতা,
বহুশত জনমের চোখে-চোখে কানে-কানে কথা।

৭ ফাল্গুন ১৩২২
শিলাইদা

৪১

যে-কথা বলিতে চাই,
বলা হয় নাই,
সে কেবল এই—
চিরদিবসের বিশ্ব আঁখিসম্মুখেই
দেখিনু সহস্রবার
দুয়ারে আমার।

অপরিচিতের এই চিরপরিচয়
এতই সহজে নিত্য ভরিয়াছে গভীর হৃদয়
সে-কথা বলিতে পারি এমন সরল বাণী
আমি নাহি জানি।

শূন্য প্রান্তরের গান বাজে ওই একা ছায়াবটে ;
নদীর এপারে ঢালু তটে
চাষি করিতেছে চাষ ;
উড়ে চলিয়াছে হাঁস
ওপারের জনশূন্য তৃণশূন্য বালুতীরতলে।
চলে কি না চলে
ক্লান্তস্রোত শীর্ণ নদী, নিমেষ-নিহত
আধো-জাগা নয়নের মতো।
পথখানি বাঁকা
বহুশত বরষের পদচিহ্ন-আঁকা
চলেছে মাঠের ধারে, ফসল-খেতের যেন মিতা,
নদীসাথে কুটিরের বহে কুটুম্বিতা।

ফাল্গুনের এ-আলোয় এই গ্রাম, ওই শূন্য মাঠ,
ওই খেয়াঘাট,
ওই নীল নদীরেখা, ওই দূর বালুকার কোলে
নিভৃত জলের ধারে চখাচখি কাকলি-কল্লোলে
যেখানে বসায় মেলা— এই সব ছবি
কতদিন দেখিয়াছে কবি।
শুধু এই চেয়ে দেখা, এই পথ বেয়ে চলে যাওয়া,
এই আলো, এই হাওয়া,
এইমতো অস্ফুটধ্বনির গুঞ্জরণ,
ভেসে-যাওয়া মেঘ হতে

অকস্মাৎ নদীস্রোতে
ছায়ার নিঃশব্দ সঞ্চরণ,
যে আনন্দ-বেদনায় এ জীবন বারেবারে করেছে উদাস
হৃদয় খুঁজিছে আজি তাহারি প্রকাশ।

৮ ফাল্গুন ১৩২২
পদ্মা

৪২

তোমারে কি বারবার করেছিনু অপমান।
এসেছিলে গেয়ে গান
ভোরবেলা;
ঘুম ভাঙাইলে ব'লে মেরেছিনু ঢেলা
বাতায়ন হতে,
পরক্ষণে কোথা তুমি লুকাইলে জনতার স্রোতে!
ক্ষুধিত দরিদ্রসম
মধ্যাহ্নে এসেছ দ্বারে মম।
ভেবেছিনু, 'এ কী দায়,
কাজের ব্যাঘাত এ-যে।' দূর হতে করেছি বিদায়।

সন্ধ্যাবেলা এসেছিলে যেন মৃত্যুদূত
জ্বালায়ে মশাল-আলো, অস্পষ্ট অদ্ভুত
দুঃস্বপ্নের মতো।
দস্যু ব'লে শত্রু ব'লে ঘরে দ্বার যত
দিনু রোধ করি।
গেলে চলি, অন্ধকার উঠিল শিহরি।
এরি লাগি এসেছিলে, হে বন্ধু অজানা—
তোমারে করিব মানা,
তোমারে ফিরায়ে দিব, তোমারে মারিব,
তোমা-কাছে যত ধার সকলি ধারিব,

না করিয়া শোধ
দুয়ার করিব রোধ।

তার পরে অর্ধরাতে
দীপ-নেবা অন্ধকারে বসিয়া ধুলাতে
মনে হবে আমি বড়ো একা
যাহারে ফিরায়ে দিনু বিনা তারি দেখা।
এ দীর্ঘ জীবন ধরি
বহুমানে যাহাদের নিয়েছিনু বরি
একাগ্র উৎসুক,
আঁধারে মিলায়ে যাবে তাহাদের মুখ।
যে আসিলে ছিনু অন্যমনে,
যাহারে দেখি নি চেয়ে নয়নের কোণে,
যারে নাহি চিনি,
যার ভাষা বুঝিতে পারি নি,
অর্ধরাতে দেখা দিবে বারেবারে তারি মুখ নিদ্রাহীন চোখে
রজনীগন্ধার গন্ধে তারার আলোকে।
বারেবারে-ফিরে-যাওয়া অন্ধকারে বাজিবে হৃদয়ে
বারেবারে-ফিরে-আসা হয়ে।

৮ ফাল্গুন ১৩২২
শিলাইদা

৪৩

ভাবনা নিয়ে মরিস কেন খেপে।
দুঃখ-সুখের লীলা
ভাবিস এ কি রইবে বক্ষে চেপে
জগদ্দল-শিলা।
চলেছিস রে চলাচলের পথে
কোন সারথির উধাও মনোরথে?

নিমেষতরে যুগে যুগান্তরে
দিবে না রাশ-ঢিলা।

শিশু হয়ে এলি মায়ের কোলে,
সেদিন গেল ভেসে।
যৌবনেরি বিষম দোলার দোলে
কাটল কেঁদে হেসে।
রাত্রে যখন হচ্ছিল দীপ জ্বালা
কোথায় ছিল আজকে দিনের পালা।
আবার কবে কী সুর বাঁধা হবে
আজকে পালার শেষে।

চলতে যাদের হবে চিরকালই
নাইকো তাদের ভার।
কোথা তাদের রৈবে থলি-থালি,
কোথা বা সংসার।
দেহযাত্রা মেঘের খেয়া বাওয়া,
মন তাহাদের ঘূর্ণা-পাকের হাওয়া ;
বেঁকে বেঁকে আকার এঁকে এঁকে
চলছে নিরাকার।

ওরে পথিক, ধর্ না চলার গান,
বাজা রে একতারা।
এই খুশিতেই মেতে উঠুক প্রাণ—
নাইকো কূল-কিনারা।
পায়ে পায়ে পথের ধারে ধারে
কান্না-হাসির ফুল ফুটিয়ে যা রে,
প্রাণ-বসন্তে তুই-যে দখিন হাওয়া
গৃহ-বাঁধন-হারা !

এই জনমের এই রূপের এই-খেলা
এবার করি শেষ ;
সন্ধ্যা হল, ফুরিয়ে এল বেলা,
বদল করি বেশ।
যাবার কালে মুখ ফিরিয়ে পিছু
কান্না আমার ছড়িয়ে যাব কিছু,
সামনে সে-ও প্রেমের কাঁদন ভরা
চির-নিরুদ্দেশ।

বঁধুর দিঠি মধুর হয়ে আছে
সেই অজানার দেশে।
প্রাণের ঢেউ সে এমনি করেই নাচে
এমনি ভালোবেসে।
সেখানেতে আবার সে কোন্ দূরে
আলোর বাঁশি বাজবে গো এই সুরে
কোন্ মুখেতে সেই অচেনা ফুল
ফুটবে আবার হেসে।

এইখানে এক শিশির-ভরা প্রাতে
মেলেছিলেম প্রাণ।
এইখানে এক বীণা নিয়ে হাতে
সেধেছিলেম তান।
এতকালের সে মোর বীণাখানি
এইখানেতেই ফেলে যাব জানি,
কিন্তু ওরে হিয়ার মধ্যে ভরি
নেব যে তার গান।

সে-গান আমি শোনাব যার কাছে
নূতন আলোর তীরে,
চিরদিন সে সাথে সাথে আছে
আমার ভুবন ঘিরে।

শরতে সে শিউলি-বনের তলে
ফুলের গন্ধে ঘোমটা টেনে চলে,
ফাল্গুনে তার বরণমালাখানি
পরাল মোর শিরে।

পথের বাঁকে হঠাৎ দেয় সে দেখা
শুধু নিমেষতরে।
সন্ধ্যা-আলোয় রয় সে বসে একা
উদাস প্রান্তরে।
এমনি করেই তার সে আসা-যাওয়া,
এমনি করেই বেদন-ভরা হাওয়া
হৃদয়-বনে বইয়ে সে যায় চলে
মর্মরে মর্মরে।

জোয়ার-ভাঁটার নিত্য চলাচলে
তার এই আনাগোনা।
আধেক হাসি আধেক চোখের জলে
মোদের চেনাশোনা।
তারে নিয়ে হল না ঘর-বাঁধা,
পথে পথেই নিত্য তারে সাধা,
এমনি করেই আসা-যাওয়ার ডোরে
প্রেমেরি জাল-বোনা।

২৯ ফাল্গুন ১৩২২
শান্তিনিকেতন

৪৪

যৌবন রে, তুই কি রবি সুখের খাঁচাতে।
তুই যে পারিস কাঁটাগাছের উচ্চ ডালের 'পরে
পুচ্ছ নাচাতে।
তুই পথহীন সাগরপারের পান্থ,
তোর ডানা যে অশান্ত অক্লান্ত,
অজানা তোর বাসার সন্ধানে রে
অবাধ যে তোর ধাওয়া;
ঝড়ের থেকে বজ্রকে নেয় কেড়ে
তোর যে দাবিদাওয়া।

যৌবন রে, তুই কি কাঙাল, আয়ুর ভিখারি।
মরণ-বনের অন্ধকারে গহন কাঁটাপথে
তুই যে শিকারি।
মৃত্যু যে তার পাত্রে বহন করে
অমৃতরস নিত্য তোমার তরে;
বসে আছে মানিনী তোর প্রিয়া
মরণ-ঘোমটা টানি।
সেই আবরণ দেখ্‌ রে উতারিয়া
মুগ্ধ সে মুখখানি।

যৌবন রে, রয়েছ কোন্‌ তানের সাধনে।
তোমার বাণী শুষ্ক পাতায় রয় কি কভু বাঁধা
পুঁথির বাঁধনে।
তোমার বাণী দখিন হাওয়ার বীণায়
অরণ্যেরে আপনাকে তার চিনায়,
তোমার বাণী জাগে প্রলয়মেঘে
ঝড়ের ঝংকারে;

রবীন্দ্রনাথ ও পিয়ার্সন

১৯১৬

ঢেউয়ের ’পরে বাজিয়ে চলে বেগে
বিজয়-ডঙ্কা রে।

যৌবন রে, বন্দী কি তুই আপন গণ্ডিতে।
বয়সের এই মায়াজালের বাঁধনখানা তোরে
হবে খণ্ডিতে।
খড়্‌গসম তোমার দীপ্ত শিখা
ছিন্ন করুক জরার কুজ্‌ঝটিকা,
জীর্ণতারি বক্ষ দু-ফাঁক ক’রে
অমর পুষ্প তব
আলোকপানে লোকে লোকান্তরে
ফুটুক নিত্য নব।

যৌবন রে, তুই কি হবি ধুলায় লুণ্ঠিত।
আবর্জনার বোঝা মাথায় আপন গ্লানিভারে
রইবি কুণ্ঠিত?
প্রভাত যে তার সোনার মুকুটখানি
তোমার তরে প্রত্যূষে দেয় আনি,
আগুন আছে ঊর্ধ্ব শিখা জ্বেলে
তোমার সে যে কবি।
সূর্য তোমার মুখে নয়ন মেলে
দেখে আপন ছবি।

৪ চৈত্র ১৩২২
শান্তিনিকেতন

৪৫

পুরাতন বৎসরের জীর্ণক্লান্ত রাত্রি
ওই কেটে গেল, ওরে যাত্রী।
তোমার পথের 'পরে তপ্ত রৌদ্র এনেছে আহ্বান
রুদ্রের ভৈরব গান।
দূর হতে দূরে
বাজে পথ শীর্ণ তীব্র দীর্ঘতান সুরে,
যেন পথহারা
কোন্ বৈরাগীর একতারা।

ওরে যাত্রী,
ধূসর পথের ধুলা সেই তোর ধাত্রী;
চলার অঞ্চলে তোরে ঘূর্ণাপাকে বক্ষেতে আবরি
ধরার বন্ধন হতে নিয়ে যাক হরি'
দিগন্তের পারে দিগন্তরে।
ঘরের মঙ্গলশঙ্খ নহে তোর তরে,
নহে রে সন্ধ্যার দীপালোক,
নহে প্রেয়সীর অশ্রু-চোখ।
পথে পথে অপেক্ষিছে কালবৈশাখীর আশীর্বাদ,
শ্রাবণরাত্রির বজ্রনাদ।
পথে পথে কণ্টকের অভ্যর্থনা,
পথে পথে গুপ্তসর্প গূঢ়ফণা।
নিন্দা দিবে জয়শঙ্খনাদ
এই তোর রুদ্রের প্রসাদ।

ক্ষতি এনে দিবে পদে অমূল্য অদৃশ্য উপহার
চেয়েছিলি অমৃতের অধিকার—
সে তো নহে সুখ, ওরে, সে নহে বিশ্রাম,
নহে শান্তি, নহে সে আরাম।

মৃত্যু তোরে দিবে হানা,
দ্বারে দ্বারে পাবি মানা,
এই তোর নব বৎসরের আশীর্বাদ,
এই তোর রুদ্রের প্রসাদ
ভয় নাই, ভয় নাই, যাত্রী,
ঘরছাড়া দিকহারা অলক্ষ্মী তোমার বরদাত্রী।

পুরাতন বৎসরের জীর্ণক্লান্ত রাত্রি
ওই কেটে গেল, ওরে যাত্রী।
এসেছে নিষ্ঠুর,
হোক রে দ্বারের বন্ধ দূর,
হোক রে মদের পাত্র চুর।
নাই বুঝি, নাই চিনি, নাই তারে জানি,
ধরো তার পাণি;
ধ্বনিয়া উঠুক তব হৃৎকম্পনে তার দীপ্ত বাণী
ওরে যাত্রী
গেছে কেটে, যাক কেটে পুরাতন রাত্রি।

৯ বৈশাখ ১৩২৩
কলিকাতা

নাটক ও প্রহসন

ফাল্গুনী

উৎসর্গ

যাহারা ফাল্গুনীর ফল্গুনদীটিকে বৃদ্ধকবির চিত্তমরুর
তলদেশ হইতে উপরে টানিয়া আনিয়াছে তাহাদের
এবং সেই সঙ্গে
সেই বালকদলের সকল নাটের কাণ্ডারী
আমার সকল গানের ভাণ্ডারী
শ্রীমান দিনেন্দ্রনাথের হস্তে
এই নাট্যকাব্যটিকে কবি-বাউলের একতারার মতো
সমর্পণ করিলাম।

১৫ ফাল্গুন
১৩২২

পাত্রগণ

রাজা
মন্ত্রী
শ্রুতিভূষণ
কবিশেখর
নববসন্তের দূতগণ

নবযৌবনের দল
চন্দ্রহাস ... ... উক্ত দলের প্রিয়সখা
দাদা ... ... উক্ত দলের প্রবীণ যুবক
জীবন সর্দার ... ... উক্ত দলের নেতা
অন্ধ বাউল
মাঝি
কোটাল
অনাথ কলু ইত্যাদি।

এই নাট্যকাব্যে নবযৌবনের দল যেখানে কথাবার্তা কহিতেছে সেখানে চন্দ্রহাস, দাদা ও সর্দার ছাড়া আর কাহারও নাম নির্দিষ্ট নাই। দলের অন্য সকলে যে যেটা খুশি বলিতে পারে এবং তাহাদের লোকসংখ্যারও সীমা করিয়া দেওয়া হয় নাই।

সূচনা

রাজোদ্যান

চুপ, চুপ, চুপ কর্ তোরা।

কেন, কী হয়েছে।

মহারাজের মন খারাপ হয়েছে।

সর্বনাশ!

কে রে। কে বাজায় বাঁশি।

কেন ভাই, কী হয়েছে।

মহারাজের মন খারাপ হয়েছে।

সর্বনাশ!

ছেলেগুলো দাপাদাপি করছে কার।

আমাদের মণ্ডলদের।

মণ্ডলকে সাবধান করে দে। ছেলেগুলোকে ঠেকাক

মন্ত্রী কোথায় গেলেন।

এই যে এখানেই আছি।

খবর পেয়েছেন কি।

কী বলো দেখি।

মহারাজের মন খারাপ হয়েছে।

কিন্তু প্রত্যন্তবিভাগ থেকে যুদ্ধের সংবাদ এসেছে যে।

যুদ্ধ চলুক কিন্তু তার সংবাদটা এখন চলবে না।

চীন-সম্রাটের দূত অপেক্ষা করছেন।

অপেক্ষা করতে দোষ নেই কিন্তু সাক্ষাৎ পাবেন না।

ওই-যে মহারাজ আসছেন।

জয় হোক মহারাজের!

মহারাজ, সভায় যাবার সময় হল।

যাবার সময় হল বই কি, কিন্তু সভায় যাবার নয়।

সে কী কথা মহারাজ!

সভা ভাঙবার ঘণ্টা বেজেছে শুনতে পেয়েছি।

কই, আমরা তো কেউ—

তোমরা শুনবে কী করে। ঘণ্টা একেবারে আমারই কানের কাছে বাজিয়েছে।

এতবড়ো স্পর্ধা কার হতে পারে।

মন্ত্রী, এখনও বাজাচ্ছে।

মহারাজ, দাসের স্থূলবুদ্ধি মাপ করবেন, বুঝতে পারলুম না।

এই চেয়ে দেখো—

মহারাজের চুল—

ওখানে একজন ঘণ্টা-বাজিয়েকে দেখতে পাচ্ছ না?

দাসের সঙ্গে পরিহাস?

পরিহাস আমার নয় মন্ত্রী, যিনি পৃথিবীসুদ্ধ জীবের কানে ধরে পরিহাস করেন এ তাঁরই। গত রজনীতে আমার গলায় মল্লিকার মালা পরাবার সময় মহিষী চমকে উঠে বললেন, এ কী মহারাজ, আপনার কানের কাছে দুটো পাকাচুল দেখছি যে!

মহারাজ, এজন্য খেদ করবেন না— রাজবৈদ্য আছেন, তিনি—

এ বংশের প্রথম রাজা ইক্ষ্বাকুরও রাজবৈদ্য ছিলেন, তিনি কী করতে পেরেছিলেন। —মন্ত্রী, যমরাজ আমার কানের কাছে তাঁর নিমন্ত্রণপত্র ঝুলিয়ে রেখে দিয়েছেন। মহিষী এ দুটো চুল তুলে ফেলতে চেয়েছিলেন, আমি বললুম, কী হবে রানী। যমের পত্রই যেন সরালুম কিন্তু যমের পত্রলিখককে তো সরানো যায় না। অতএব এ পত্র শিরোধার্য করাই গেল। এখন তা হলে—

যে আজ্ঞা, এখন তা হলে রাজকার্যের আয়োজন—

কিসের রাজকার্য। রাজকার্যের সময় নেই— শ্রুতিভূষণকে ডেকে আনো।

সেনাপতি বিজয়বর্মা—

না, বিজয়বর্মা না শ্রুতিভূষণ।

মহারাজ, এ দিকে চীন-সম্রাটের দূত—

তাঁর চেয়ে বড়ো সম্রাটের দূত অপেক্ষা করছেন— ডাকো শ্রুতিভূষণকে।

মহারাজ, প্রত্যন্তসীমার সংবাদ—

মন্ত্রী, প্রত্যন্ততম সীমার সংবাদ এসেছে, ডাকো শ্রুতিভূষণকে।

মহারাজের শ্বশুর—

আমি যাঁর কথা বলছি তিনি আমার শ্বশুর নন। ডাকো শ্রুতিভূষণকে।

আমাদের কবিশেখর তাঁর কল্পমঞ্জরী কাব্য নিয়ে—

নিয়ে তিনি তাঁর কল্পদ্রুমের শাখায় প্রশাখায় আনন্দে সঞ্চরণ করুন, ডাকো শ্রুতিভূষণকে।

যে আদেশ, তাঁকে ডাকতে পাঠাচ্ছি।

বোলো, সঙ্গে যেন তাঁর বৈরাগ্যবারিধি পুঁথিটা আনেন।

প্রতিহারী, বাইরে ওই কান্না গোল করছে, বারণ করো, আমি একটু শান্তি চাই।

নাগপত্তনে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে, প্রজারা সাক্ষাৎ প্রার্থনা করে।

আমার তো সময় নেই মন্ত্রী, আমি শান্তি চাই।

তারা বলছে তাদের সময় আরও অনেক অল্প— তারা মৃত্যুর দ্বার প্রায় লঙ্ঘন করেছে— তারা ক্ষুধাশান্তি চায়।

ক্ষুধাশান্তি! এ সংসারে কি ক্ষুধার শান্তি আছে। ক্ষুধানলের শান্তি চিতানলে।

তা হলে মহারাজ ওই হতভাগ্যদের—

ওই হতভাগ্যদের প্রতি এই হতভাগ্যের উপদেশ এই যে, কাল-ধীবরের জাল ছিন্ন করবার জন্যে ছটফট করা বৃথা, আজই হোক কালই হোক সে টেনে তুলবেই।

অতএব—

অতএব শ্রুতিভূষণকে প্রয়োজন এবং তাঁর বৈরাগ্যবারিধি পুঁথি।

প্রজারা তা হলে দুর্ভিক্ষ—

দেখো মন্ত্রী, ভিক্ষা তো অন্নের নয়, ভিক্ষা আয়ুর। সেই ভিক্ষায় জগৎ জুড়ে দুর্ভিক্ষ— কী রাজার কী প্রজার— কে কাকে রক্ষা করবে।

অতএব—

অতএব শ্মশানেশ্বর শিব যেখানে ডমরুধ্বনি করছেন সেইখানেই সকলের সব প্রার্থনা ছাইচাপা পড়বে— তবে কেন মিছে গলা ভাঙা। এই যে শ্রুতিভূষণ, প্রণাম।

শুভমস্তু।

শ্রুতিভূষণমশায়, মহারাজকে একটু বুঝিয়ে বলবেন যে অবসাদগ্রস্ত নিরুৎসাহকে লক্ষ্মী পরিহার করেন।

শ্রুতিভূষণ, মন্ত্রী আপনাকে কী বলছেন।

উনি বলছেন লক্ষ্মীর স্বভাবসম্বন্ধে মহারাজকে কিছু উপদেশ দিতে।

আপনার উপদেশ কী।

বৈরাগ্যবারিধিতে একটি চৌপদী আছে—

যে পদ্মে লক্ষ্মীর বাস, দিন-অবসানে
সেই পদ্ম মুদে দল সকলেই জানে।

গৃহ যার ফুটে আর মুদে পুনঃপুনঃ
সে লক্ষ্মীরে ত্যাগ করো, শুন মূঢ় শুন।

অহো, আপনার উপদেশের এক ফুৎকারেই আশা-প্রদীপের জ্বলন্ত শিখা নির্বাপিত হয়ে যায়। আমাদের আচার্য বলেছেন না—

দন্তং গলিতং পলিতং মুণ্ডং
তদপি ন মুঞ্চতি আশাভাণ্ডং।

মহারাজ,আশার কথা যদি তুললেন তবে বারিধি থেকে আর-একটি চৌপদী শোনাই—

শৃঙ্খল বাঁধিয়া রাখে এই জানি সবে,
আশার শৃঙ্খল কিন্তু অদ্ভুত এ ভবে।
সে যাহারে বাঁধে সেই ঘুরে মরে পাকে,
সে-বন্ধন ছাড়ে যারে স্থির হয়ে থাকে।

হায় হায় অমূল্য আপনার বাণী! শ্রুতিভূষণকে এক সহস্র স্বর্ণমুদ্রা এখনই— ও কী মন্ত্রী, আবার কারা গোল করছে।

সেই দুর্ভিক্ষগ্রস্ত প্রজারা।

ওদের এখনই শান্ত হতে বলো।

তা হলে মহারাজ, শ্রুতিভূষণকে ওদের কাছে পাঠিয়ে দিন না— আমরা ততক্ষণ যুদ্ধের পরামর্শটা—

না না যুদ্ধ পরে হবে, শ্রুতিভূষণকে ছাড়তে পারছি নে।

মহারাজ, স্বর্ণমুদ্রা দেবার কথা বলছিলেন কিন্তু সে দান যে ক্ষয় হয়ে যাবে। বৈরাগ্যবারিধি লিখছেন—

স্বর্ণদান করে যেই করে দুঃখ দান
যত স্বর্ণ ক্ষয় হয় ব্যথা পায় প্রাণ।
শত দাও, লক্ষ দাও, হয়ে যায় শেষ,
শূন্য ভাণ্ড ভরি' শুধু থাকে মনঃক্লেশ।

আহা শরীর রোমাঞ্চিত হল। প্রভু কি তা হলে—

না, আমি সহস্র মুদ্রা চাই নে।

দিন দিন, একটু পদধূলি দিন। সহস্র মুদ্রা চান না! এতবড়ো কথা!

মহারাজ, এই সহস্র মুদ্রা অক্ষয় হয়ে যাতে মহারাজের পুণ্যফলকে অসীম করে আমি এমন-কিছু চাই। গোধনসমেত আপনার ওই কাঞ্চনপুর জনপদটি যদি ব্রহ্মত্র দান করেন কেবলমাত্র ওইটুকুতেই আমি সন্তুষ্ট থাকব; কারণ বৈরাগ্যবারিধি বলছেন—

বুঝেছি শ্রুতিভূষণ, এর জন্যে আর বৈরাগ্যবারিধির প্রমাণ দরকার নেই। মন্ত্রী, কাঞ্চনপুর জনপদটি যাতে শ্রুতিভূষণের বংশে চিরন্তন— আবার কী, বারবার কেন চীৎকার করছে।

চীৎকারটা বারবার করছে বটে কিন্তু কারণটা একই রয়ে গেছে। ওরা সেই মহারাজের দুর্ভিক্ষকাতর প্রজা।

মহারাজ, ব্রাহ্মণী মহারাজকে বলতে বলেছেন তিনি তাঁর সর্বাঙ্গে মহারাজের যশোঝংকার ধ্বনিত করতে চান কিন্তু আভরণের অভাববশত শব্দ বড়োই ক্ষীণ হয়ে বাজছে।

মন্ত্রী!

মহারাজ!

ব্রাহ্মণীর আভরণের অভাবমোচন করতে যেন বিলম্ব না হয়।

আর মন্ত্রীমশায়কে বলে দিন, আমরা সর্বদাই পরমার্থচিন্তায় রত, বৎসরে বৎসরে গৃহসংস্কারের চিন্তায় মন দিতে হলে চিত্তবিক্ষেপ হয়। অতএব রাজশিল্পী যদি আমার গৃহটি সুদৃঢ় করে নির্মাণ করে দেয় তা হলে তার তলদেশে শান্তমনে বৈরাগ্যসাধন করতে পারি।

মন্ত্রী, রাজশিল্পীকে যথাবিধি আদেশ করে দাও।

মহারাজ, এ বৎসর রাজকোষে ধনাভাব।

সে তো প্রতি বৎসরেই শুনে আসছি। মন্ত্রী, তোমাদের উপর ভার ধন বৃদ্ধি করবার, আর আমার উপর ভার অভাব বৃদ্ধি করবার। এই দুইয়ের মিলে সন্ধি করে হয় ধনাভাব।

মহারাজ, মন্ত্রীকে দোষ দিতে পারি নে। উনি দেখছেন আপনার অর্থ, আর আমরা দেখছি আপনার পরমার্থ, সুতরাং উনি যেখানে দেখতে পাচ্ছেন অভাব আমরা সেইখানে দেখতে পাচ্ছি ধন। বৈরাগ্যবারিধিতে লিখছেন—

রাজকোষ পূর্ণ হয়ে তবু শূন্যমাত্র,
যোগ্য হাতে যাহা পড়ে লভে সৎপাত্র।
পাত্র নাই ধন আছে, থেকেও না থাকা,
পাত্র হাতে ধন, সেই রাজকোষ পাকা।

আহা হা! আপনাদের সঙ্গ অমূল্য।

কিন্তু মহারাজের সঙ্গ কত মূল্যবান, শ্রুতিভূষণমশায় তা বেশ জানেন। তা হলে আসুন শ্রুতিভূষণ, বৈরাগ্যসাধনের ফর্দ যা দিলেন সেটা সংগ্রহ করা যাক।

চলুন তবে চলুন, বিলম্বে কাজ নেই। মন্ত্রী এই সামান্য বিষয় নিয়ে যখন এত অধীর হয়েছেন তখন ওঁকে শান্ত করে এখনই আবার ফিরে আসছি।

আমার সর্বদা ভয় হয় পাছে আপনি রাজাশ্রয় ছেড়ে অরণ্যে চলে যান।

মহারাজ, মনটা মুক্ত থাকলে কিছুই ত্যাগ করতে হয় না— এই রাজগৃহে যতক্ষণ আমার সন্তোষ আছে ততক্ষণ এই আমার অরণ্য। এক্ষণে তবে আসি। মন্ত্রী, চলো চলো।

ওই যে কবিশেখর আসছে— আমার তপস্যা ভাঙলে বুঝি! ওকে ভয় করি। ওরে পাকাচুল, কান ঢেকে থাক্‌ রে, কবির বাণী যেন প্রবেশপথ না পায়।

মহারাজ, আপনার এই কবিকে নাকি বিদায় করতে চান।

কবিত্ব যে বিদায়-সংবাদ পাঠালে, এখন কবিকে রেখে হবে কী।

সংবাদটা কোথায় পৌঁছল।

ঠিক আমার কানের উপর। চেয়ে দেখো।

পাকাচুল? ওটাকে আপনি ভাবছেন কী।

যৌবনের শ্যামকে মুছে ফেলে সাদা করার চেষ্টা।

কারিকরের মতলব বোঝেন নি। ওই সাদা ভূমিকার উপরে আবার নূতন রং লাগবে।

কই রঙের আভাস তো দেখি নে।

সেটা গোপনে আছে। সাদার প্রাণের মধ্যে সব রঙেরই বাসা।

চুপ চুপ, চুপ করো, কবি চুপ করো।

মহারাজ, এ যৌবন ম্লান যদি হল তো হোক না। আরেক যৌবনলক্ষ্মী আসছেন, মহারাজের কেশে তিনি তাঁর শুভ্র মল্লিকার মালা পাঠিয়ে দিয়েছেন— নেপথ্যে সেই মিলনের আয়োজন চলছে।

আরে, আরে, তুমি দেখছি বিপদ বাধাবে কবি। যাও যাও তুমি যাও— ওরে, শ্রুতিভূষণকে দৌড়ে ডেকে নিয়ে আয়।

তাঁকে কেন মহারাজ!

বৈরাগ্য সাধন করব।

সেই খবর শুনেই তো ছুটে এসেছি, এ সাধনায় আমিই তো আপনার সহচর।

তুমি!

হাঁ মহারাজ, আমরাই তো পৃথিবীতে আছি মানুষের আসক্তি মোচন করবার জন্য।

বুঝতে পারলুম না।

এতদিন কাব্য শুনিয়ে এলুম তবু বুঝতে পারলেন না? আমাদের কথার মধ্যে বৈরাগ্য, সুরের মধ্যে বৈরাগ্য, ছন্দের মধ্যে বৈরাগ্য। সেইজন্যেই তো লক্ষ্মী আমাদের ছাড়েন, আমরাও লক্ষ্মীকে ছাড়বার জন্যে যৌবনের কানে মন্ত্র দিয়ে বেড়াই।

তোমাদের মন্ত্রটা কী।

আমাদের মন্ত্র এই যে, ওরে ভাই ঘরের কোণে তোদের থলি-থালি আঁকড়ে বসে থাকিস নে— বেরিয়ে পড়্ প্রাণের সদর রাস্তায় ওরে যৌবনের বৈরাগীর দল।

সংসারের পথটাই বুঝি তোমার বৈরাগ্যের পথ হল?

তা নয়তো কী মহারাজ! সংসারে যে কেবলি সরা, কেবলি চলা; তারই সঙ্গে সঙ্গে যে-লোক একতারা বাজিয়ে নৃত্য করতে করতে কেবলই সরে, কেবলই চলে, সে-ই তো বৈরাগী, সে-ই তো পথিক, সে-ই তো কবি-বাউলের চেলা।

তা হলে শান্তি পাব কী করে।

শান্তির উপরে তো আমাদের একটুও আসক্তি নেই, আমরা যে বৈরাগী।

কিন্তু ধ্রুব সম্পদটি তো পাওয়া চাই।

ধ্রুব সম্পদে আমাদের একটুও লোভ নেই, আমরা যে বৈরাগী।

সে কী কথা।— বিপদ বাধাবে দেখছি। ওরে শ্রুতিভূষণকে ডাক্।

আমরা অধ্রুব মন্ত্রের বৈরাগী। আমরা কেবলই ছাড়তে ছাড়তে পাই, তাই ধ্রুবটাকে মানি নে।

এ তোমার কিরকম কথা।

পাহাড়ের গুহা ছেড়ে যে-নদী বেরিয়ে পড়েছে তার বৈরাগ্য কি দেখেন নি মহারাজ। সে অনায়াসে আপনাকে ঢেলে দিতে দিতেই আপনাকে পায়। নদীর পক্ষে ধ্রুব হচ্ছে বালির মরুভূমি— তার মধ্যে সেঁধলেই বেচারা গেল। তার দেওয়া যেমনি ঘোচে অমনি তার পাওয়াও ঘোচে।

ওই শোনো কবিশেখর, কান্না শোনো। ওই তো তোমার সংসার!

ওরা মহারাজের দুর্ভিক্ষকাতর প্রজা।

আমার প্রজা? বল কী কবি। সংসারের প্রজা ওরা। এ দুঃখ কি আমি সৃষ্টি করেছি। তোমার কবিত্বমন্ত্রের বৈরাগীরা এ দুঃখের কী প্রতিকার করতে পারে বলো তো।

মহারাজ, এ দুঃখকে তো আমরাই বহন করতে পারি। আমরা যে নিজেকে

ঢেলে দিয়ে বয়ে চলেছি। নদী কেমন ক'রে ভার বহন করে দেখেছেন তো? মাটির পাকা রাস্তাই হল যাকে বলেন ধ্রুব, তাই তো ভারকে কেবলই সে ভারী করে তোলে; বোঝা তার উপর দিয়ে আর্তনাদ করতে করতে চলে, আর তারও বুক ক্ষত বিক্ষত হয়ে যায়। নদী আনন্দে বয়ে চলে, তাই তো সে আপনার ভার লাঘব করেছে ব'লেই বিশ্বের ভার লাঘব করে। আমরা ডাক দিয়েছি সকলের সব সুখ-দুঃখকে চলার লীলায় বয়ে নিয়ে যাবার জন্যে। আমাদের বৈরাগীর ডাক। আমাদের বৈরাগীর সর্দার যিনি, তিনি এই সংসারের পথ দিয়ে নেচে চলেছেন, তাই তো বসে থাকতে পারি নে—

পথ দিয়ে কে যায় গো চলে
ডাক দিয়ে সে যায়।
আমার ঘরে থাকাই দায়।

পথের হাওয়ায় কী সুর বাজে,
বাজে আমার বুকের মাঝে,
বাজে বেদনায়।
আমার ঘরে থাকাই দায়।

পূর্ণিমাতে সাগর হতে
ছুটে এল বান,
আমার লাগল প্রাণে টান।

আপন মনে মেলে আঁখি
আর কেন বা পড়ে থাকি
কিসের ভাবনায়।
আমার ঘরে থাকাই দায়॥

যাক গে শ্রুতিভূষণ। ওহে কবিশেখর, আমার কী মুশকিল হয়েছে জানো। তোমার কথা আমি এক বিন্দুবিসর্গও বুঝতে পারি নে অথচ তোমার সুরটা আমার বুকে গিয়ে বাজে। আর শ্রুতিভূষণের ঠিক তার উলটো; তার কথাগুলো খুবই স্পষ্ট বোঝা যায় হে— ব্যাকরণের সঙ্গেও মেলে— কিন্তু সুরটা— সে কী আর বলব।

মহারাজ, আমাদের কথা তো বোঝাবার জন্যে হয় নি, বাজবার জন্যে হয়েছে।

এখন তোমার কাজটা কী বলো তো কবি।

মহারাজ, ওই-যে তোমার দরজার বাইরে কান্না উঠেছে ওই কান্নার মাঝখান দিয়ে এখন ছুটতে হবে।

ওহে কবি, বল কী তুমি। এ-সমস্ত কেজো লোকের কাজ, দুর্ভিক্ষের মধ্যে তোমরা কী করবে।

কেজো লোকেরা কাজ বেসুরো করে ফেলে, তাই সুর বাঁধবার জন্যে আমাদের ছুটে আসতে হয়।

ওহে কবি, আর-একটু স্পষ্ট ভাষায় কথা কও।

মহারাজ, ওরা কর্তব্যকে ভালোবাসে ব'লে কাজ করে, আমরা প্রাণকে ভালোবাসি ব'লে কাজ করি— এইজন্যে ওরা আমাদের গাল দেয়, বলে নিষ্কর্মা, আমরা ওদের গাল দিই, বলি নির্জীব।

কিন্তু জিতটা হল কার।

আমাদের, মহারাজ, আমাদের।

তার প্রমাণ?

পৃথিবীতে যা-কিছু সকলের বড়ো তার প্রমাণ নেই। পৃথিবীতে যত কবি যত কবিত্ব সমস্ত যদি ধুয়ে-মুছে ফেলতে পার তা হলেই প্রমাণ হবে এতদিন কেজো লোকেরা তাদের কাজের জোরটা কোথা থেকে পাচ্ছিল, তাদের ফসলখেতের মূলের রস জুগিয়ে এসেছে কারা। মহারাজ, আপনার দরজার বাইরে ওই-যে কান্না উঠেছে সে কান্না থামায় কারা। যারা বৈরাগ্যবারিধির তলায় ডুব মেরেছে তারা নয়, যারা বিষয়কে আঁকড়ে ধরে রয়েছে তারা নয়, যারা কাজের কৌশলে হাত পাকিয়েছে তারাও নয়, যারা কর্তব্যের শুষ্ক রুদ্রাক্ষের মালা জপছে তারাও নয়, যারা অপর্যাপ্ত প্রাণকে বুকের মধ্যে পেয়েছে ব'লেই জগতের কিছুতে যাদের উপেক্ষা নেই, জয় করে তারা, ত্যাগ করেও তারাই, বাঁচতে জানে তারা, মরতেও জানে তারা, তারা জোরের সঙ্গে দুঃখ পায়, তারা জোরের সঙ্গে দুঃখ দূর করে— সৃষ্টি করে তারাই, কেন-না তাদের মন্ত্র আনন্দের মন্ত্র, সব-চেয়ে বড়ো বৈরাগ্যের মন্ত্র।

ওহে কবি, তা হলে তুমি আমাকে কী করতে বল।

উঠতে বলি মহারাজ, চলতে বলি। ওই-যে কান্না, ও-যে প্রাণের কাছে প্রাণের আহ্বান। কিছু করতে পারব কি না সে পরের কথা— কিন্তু ডাক শুনে যদি ভিতরে সাড়া না দেয়, প্রাণ যদি না দুলে ওঠে তবে অকর্তব্য হল ব'লে ভাবনা নয়, তবে ভাবনা মরেছি ব'লে।

কিন্তু মরবই যে কবিশেখর, আজ হোক আর কাল হোক।

কে বললে মহারাজ, মিথ্যা কথা। যখন দেখছি বেঁচে আছি তখন জানছি যে বাঁচবই ; যে আপনার সেই বাঁচাটাকে সব দিক থেকে যাচাই করে দেখলে না সে-ই বলে মরব—সে-ই বলে "নলিনীদলগত জলমতি তরলং তদ্বৎ জীবনমতিশয় চপলং।"

কী বল হে কবি, জীবন চপল নয় ?

চপল বই-কি, কিন্তু অনিত্য নয়। চপল জীবনটা চিরদিন চপলতা করতে করতেই চলবে। মহারাজ, আজ তুমি তার চপলতা বন্ধ ক'রে মরবার পালা অভিনয় আরম্ভ করতে বসেছ।

ঠিক বলছ কবি ? আমরা বাঁচবই ?

বাঁচবই।

যদি বাঁচবই তবে বাঁচার মতো করেই বাঁচতে হবে— কী বল।

হাঁ মহারাজ।

প্রতিহারী !

কী মহারাজ।

ডাকো, ডাকো, মন্ত্রীকে এখনই ডাকো।

কী মহারাজ।

মন্ত্রী, আমাকে এতক্ষণ বসিয়ে রেখেছ কেন।

ব্যস্ত ছিলুম।

কিসে।

বিজয়বর্মাকে বিদায় করে দিতে।

কী মুশকিল। বিদায় করবে কেন। যুদ্ধের পরামর্শ আছে যে।

চীনের সম্রাটের দূতের জন্যে বাহনের ব্যবস্থা—

কেন, বাহন কিসের।

মহারাজের তো দর্শন হবে না, তাই তাঁকে ফিরিয়ে দেবার—

মন্ত্রী, আশ্চর্য করলে দেখছি— রাজকার্য কি এমনি করেই চলবে। হঠাৎ তোমার হল কী।

তার পরে আমাদের কবিশেখরের বাসা ভাঙবার জন্যে লোকের সন্ধান করছিলুম— আর তো কেউ রাজি হয় না, কেবল দিঙনাগের বংশে যাঁরা অলংকারের আর ব্যাকরণ-শাস্ত্রের টোল খুলেছেন তাঁরা দলে দলে শাবল হাতে ছুটে আসছেন।

সর্বনাশ ! মন্ত্রী, পাগল হলে নাকি। কবিশেখরের বাসা ভেঙে দেবে ?

ভয় নেই মহারাজ, বাসাটা একেবারে ভাঙতে হবে না। শ্রুতিভূষণ খবর পেয়েই স্থির করেছেন কবিশেখরের ওই বাসাটা আজ থেকে তিনিই দখল করবেন।

কী বিপদ। সরস্বতী যে তা হলে তাঁর বীণাখানা আমার মাথার উপর আছড়ে ভেঙে ফেলবেন। না, না, সে হবে না।

আর-একটা কাজ ছিল— শ্রুতিভূষণকে কাঞ্চনপুরের সেই বৃহৎ জনপদটা—

ওহো, সেই জনপদটার দানপত্র তৈরি হয়েছে বুঝি? সেটা কিন্তু আমাদের এই কবিশেখরকে—

সে কী কথা মহারাজ। আমার পুরস্কার তো জনপদ নয়— আমরা জনপদের সেবা তো কখনও করি নি— তাই ওই পদপ্রাপ্তিটা আশাও করি নে।

আচ্ছা, তবে ওটা শ্রুতিভূষণের জন্যই থাক্।

আর, মহারাজ, দুর্ভিক্ষপীড়িত প্রজাদের বিদায় করবার জন্যে সৈন্যদলকে আহ্বান করেছি।

মন্ত্রী, আজ দেখছি পদে পদে তোমার বুদ্ধির বিভ্রাট ঘটছে। দুর্ভিক্ষকাতর প্রজাদের বিদায় করবার ভালো উপায় অন্ন দিয়ে, সৈন্য দিয়ে নয়।

মহারাজ!

কী প্রতিহারী।

বৈরাগ্যবারিধি নিয়ে শ্রুতিভূষণ এসেছেন।

সর্বনাশ করলে! ফেরাও তাকে ফেরাও। মন্ত্রী, দেখো হঠাৎ যেন শ্রুতিভূষণ না এসে পড়ে। আমার দুর্বল মন, হয়তো সামলাতে পারব না, হয়তো অন্যমনস্ক হয়ে বৈরাগ্যবারিধির ডুব-জলে গিয়ে পড়ব। ওহে কবিশেখর, আমাকে কিছুমাত্র সময় দিয়ো না— প্রাণটাকে জাগিয়ে রাখো— একটা যা-হয়-কিছু করো— যেমন এই ফাল্গুনের হাওয়াটা যা-খুশি-তাই করছে তেমনিতরো। হাতে কিছু তৈরি আছে হে? একটা নাটক, কিম্বা প্রকরণ, কিম্বা রূপক, কিম্বা ভাণ, কিম্বা—

তৈরি আছে— কিন্তু সেটা নাটক, কি প্রকরণ, কি রূপক, কি ভাণ তা ঠিক বলতে পারব না।

যা রচনা করেছ তার অর্থ কি কিছু গ্রহণ করতে পারব।

না মহারাজ। রচনা তো অর্থগ্রহণ করবার জন্যে নয়।

তবে?

সেই রচনাকেই গ্রহণ করবার জন্যে। আমি তো বলেছি আমার এ-সব জিনিস বাঁশির মতো, বোঝবার জন্যে নয়, বাজবার জন্যে।

বল কী হে কবি, এর মধ্যে তত্ত্বকথা কিছুই নেই ?

কিচ্ছু না।

তবে তোমার ও-রচনাটা বলছে কী।

ও বলছে, আমি আছি। শিশু জন্মাবামাত্র চেঁচিয়ে ওঠে, সেই কান্নার মানে জানেন মহারাজ ? শিশু হঠাৎ শুনতে পায় জলস্থল-আকাশ তাকে চারদিক থেকে ব'লে উঠেছে—"আমি আছি।"—তারই উত্তরে ওই প্রাণটুকু সাড়া পেয়ে ব'লে ওঠে—"আমি আছি।" আমার রচনা সেই সদ্যোজাত শিশুর কান্না, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ডাকের উত্তরে প্রাণের সাড়া।

তার বেশি আর কিচ্ছু না ?

কিচ্ছু না। আমার রচনার মধ্যে প্রাণ ব'লে উঠেছে, সুখে দুঃখে, কাজে বিশ্রামে, জন্মে মৃত্যুতে, জয়ে পরাজয়ে, লোকে লোকান্তরে জয়— এই আমি-আছির জয়, জয়— এই আনন্দময় আমি-আছির জয়।

ওহে কবি, তত্ত্ব না থাকলে আজকের দিনে তোমার এ জিনিস চলবে না।

সে কথা সত্য মহারাজ। আজকের দিনের আধুনিকেরা উপার্জন করতে চায়, উপলব্ধি করতে চায় না। ওরা বুদ্ধিমান !

তা হলে শ্রোতা কাদের ডাকা যায়। আমার রাজবিদ্যালয়ের নবীন ছাত্রদের ডাকব কি।

না মহারাজ, তারা কাব্য শুনেও তর্ক করে। নতুন-শিং-ওঠা হরিণশিশুর মতো ফুলের গাছকেও গুঁতো মেরে মেরে বেড়ায়।

তবে ?

ডাক দেবেন যাদের চুলে পাক ধরেছে।

সে কী কথা কবি।

হাঁ মহারাজ, সেই প্রৌঢ়দেরই যৌবনটি নিরাসক্ত যৌবন। তারা ভোগবতী পার হয়ে আনন্দলোকের ডাঙা দেখতে পেয়েছে। তারা আর ফল চায় না, ফলতে চায়।

ওহে কবি, তবে তো এতদিন পরে ঠিক আমার কাব্য শোনবার বয়েস হয়েছে। বিজয়বর্মাকেও ডাকা যাক।

ডাকুন।

চীন-সম্রাটের দূতকে ?

ডাকুন।

আমার শ্বশুর এসেছেন শুনছি—

তাঁকে ডাকতে পারেন— কিন্তু শ্বশুরের ছেলেগুলির সম্বন্ধে সন্দেহ আছে।

তাই ব'লে শ্বশুরের মেয়ের কথাটা ভুলো না কবি।

আমি ভুললেও তাঁর সম্বন্ধে ভুল হবার আশঙ্কা নেই।

আর শ্রুতিভূষণকে ?

না মহারাজ, তাঁর প্রতি তো আমার কিছুমাত্র বিদ্বেষ নেই, তাঁকে কেন দুঃখ দিতে যাব।

কবি, তা হলে প্রস্তুত হও গে।

না মহারাজ, আমি অপ্রস্তুত হয়েই কাজ করতে চাই। বেশি বানাতে গেলেই সত্য ছাই-চাপা পড়ে।

চিত্রপট—

চিত্রপটে প্রয়োজন নেই— আমার দরকার চিত্তপট— সেইখানে শুধু সুরের তুলি বুলিয়ে ছবি জাগাব।

এ নাটকে গান আছে নাকি।

হাঁ মহারাজ, গানের চাবি দিয়েই এর এক-একটি অঙ্কের দরজা খোলা হবে।

গানের বিষয়টা কী।

শীতের বস্ত্রহরণ।

এ তো কোনো পুরাণে পড়া যায় নি।

বিশ্বপুরাণে এই গীতের পালা আছে। ঋতুর নাট্যে বৎসরে বৎসরে শীত-বুড়োটার ছদ্মবেশ খসিয়ে তার বসন্ত-রূপ প্রকাশ করা হয়, দেখি পুরাতনটাই নূতন।

এ তো গেল গানের কথা, বাকিটা ?

বাকিটা প্রাণের কথা।

সে কী রকম।

যৌবনের দল একটা বুড়োর পিছনে ছুটে চলেছে। তাকে ধরবে ব'লে পণ। গুহার মধ্যে ঢুকে যখন ধরলে তখন—

তখন কী দেখলে।

কী দেখলে সেটা যথাসময়ে প্রকাশ হবে।

কিন্তু একটা কথা বুঝতে পারলুম না। তোমার গানের বিষয় আর তোমার নাট্যের বিষয়টা আলাদা নাকি।

না মহারাজ, বিশ্বের মধ্যে বসন্তের যে লীলা চলছে আমাদের প্রাণের মধ্যে যৌবনের সেই একই লীলা। বিশ্বকবির সেই গীতিকাব্য থেকেই তো ভাব চুরি করেছি।

তোমার নাটকের প্রধান পাত্র কে কে।

এক হচ্ছে সর্দার।

সে কে।

যে আমাদের কেবলই চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আর-একজন হচ্ছে চন্দ্রহাস।

সে কে।

যাকে আমরা ভালোবাসি— আমাদের প্রাণকে সে-ই প্রিয় করেছে।

আর কে আছে।

দাদা— প্রাণের আনন্দটাকে যে অনাবশ্যক বোধ করে, কাজটাকেই যে সার মনে করেছে।

আর কেউ আছে?

আর আছে এক অন্ধ বাউল।

অন্ধ?

হাঁ মহারাজ, চোখ দিয়ে দেখে না ব'লেই সে তার দেহ মন প্রাণ সমস্ত দিয়ে দেখে।

তোমার নাটকের প্রধান পাত্রদের মধ্যে আর কে আছে।

আপনি আছেন।

আমি!

হাঁ মহারাজ, আপনি যদি এর ভিতরে না থেকে বাইরেই থাকেন তা হলে কবিকে গাল দিয়ে বিদায় ক'রে ফের শ্রুতিভূষণকে নিয়ে বৈরাগ্যবারিধির চৌপদী ব্যাখ্যায় মন দেবেন। তা হলে মহারাজের আর মুক্তির আশা নেই। স্বয়ং বিশ্বকবি হার মানবেন— ফাল্গুনের দক্ষিণ হাওয়া দক্ষিণা না পেয়েই বিদায় হবে।

ফাল্গুনী

প্রথম দৃশ্যের গীতি-ভূমিকা

নবীনের আবির্ভাব

বেণুবনের গান

ওগো দখিন হাওয়া, পথিক হাওয়া,
দোদুল দোলায় দাও দুলিয়ে
নূতন পাতার পুলক-ছাওয়া
পরশখানি দাও বুলিয়ে।
আমি পথের ধারের ব্যাকুল বেণু
হঠাৎ তোমার সাড়া পেনু,
আহা, এস আমার শাখায় শাখায়
প্রাণের গানের ঢেউ তুলিয়ে।

ওগো দখিন হাওয়া, পথিক হাওয়া,
পথের ধারে আমার বাসা।
জানি তোমার আসাযাওয়া,
শুনি তোমার পায়ের ভাষা।
আমায় তোমার ছোঁওয়া লাগলে পরে
একটুকুতেই কাঁপন ধরে,
আহা, কানে-কানে একটি কথায়
সকল কথা নেয় ভুলিয়ে॥

২

পাখির নীড়ের গান

আকাশ আমায় ভরল আলোয়,
আকাশ আমি ভরব গানে।
সুরের আবীর হানব হাওয়ায়,
নাচের আবীর হাওয়ায় হানে।
ওরে পলাশ, ওরে পলাশ,
রাঙা রঙের শিখায় শিখায়
দিকে দিকে আগুন জলাস,
আমার মনের রাগরাগিণী
রাঙা হল রঙিন তানে।
দখিন হাওয়ায় কুসুমবনের
বুকের কাঁপন থামে না যে।
নীল আকাশে সোনার আলোয়
কচি পাতার নূপুর বাজে।
ওরে শিরীষ, ওরে শিরীষ,
মৃদু হাসির অন্তরালে
গন্ধজালে শূন্য ঘিরিস।
তোমার গন্ধ আমার কণ্ঠে
আমার হৃদয় টেনে আনে॥

৩

ফুলন্ত গাছের গান

ওগো নদী, আপন বেগে
পাগল-পারা,
আমি স্তব্ধ চাঁপার তরু
গন্ধভরে তন্দ্রাহারা।

আমি সদা অচল থাকি,
গভীর চলা গোপন রাখি,
আমার চলা নবীন পাতায়,
আমার চলা ফুলের ধারা।

ওগো নদী, চলার বেগে
পাগল-পারা,
পথে পথে বাহির হয়ে
আপন-হারা।
আমার চলা যায় না বলা,
আলোর পানে প্রাণের চলা,
আকাশ বোঝে আনন্দ তার,
বোঝে নিশার নীরব তারা॥

প্রথম দৃশ্য

সূত্রপাত

পথ

যুবকদলের প্রবেশ

গান

ওরে ভাই ফাগুন লেগেছে বনে বনে—
ডালে ডালে ফুলে ফলে পাতায় পাতায় রে,
আড়ালে আড়ালে কোণে কোণে।
রঙে রঙে রঙিল আকাশ,
গানে গানে নিখিল উদাস,
যেন চল-চঞ্চল নব পল্লবদল
মর্মরে মোর মনে মনে।
ফাগুন লেগেছে বনে বনে।

হেরো হেরো অবনীর রঙ্গ
গগনের করে তপোভঙ্গ।
হাসির আঘাতে তার   মৌন রহে না আর
কেঁপে কেঁপে ওঠে ক্ষণে ক্ষণে।
বাতাস ছুটিছে বনময় রে,
ফুলের না জানে পরিচয় রে।
তাই বুঝি বারে বারে   কুঞ্জের দ্বারে দ্বারে
শুধায়ে ফিরিছে জনে জনে।
ফাগুন লেগেছে বনে বনে॥

ফাগুনের গুণ আছে রে ভাই, গুণ আছে।

বুঝলি কী করে।

নইলে আমাদের এই দাদাকে বাইরে টেনে আনে কিসের জোরে।

তাই তো— দাদা আমাদের চৌপদীছন্দের বোঝাই নৌকো— ফাগুনের গুণে বাঁধা পড়ে কাগজ-কলমের উলটো মুখে উজিয়ে চলেছে।

চন্দ্রহাস। ওরে ফাগুনের গুণ নয় রে। আমি চন্দ্রহাস, দাদার তুলট কাগজের হলদে পাতাগুলো পিয়াল বনের সবুজ পাতার মধ্যে লুকিয়ে রেখেছি ; দাদা খুঁজতে বের হয়েছে।

তুলট কাগজগুলো গেছে আপদ গেছে কিন্তু দাদার সাদা চাদরটা তো কেড়ে নিতে হচ্ছে।

চন্দ্রহাস। তাই তো, আজ পৃথিবীর ধুলোমাটি পর্যন্ত শিউরে উঠেছে আর এ পর্যন্ত দাদার গায়ে বসন্তর আমেজ লাগল না!

দাদা। আহা কী মুশকিল। বয়েস হয়েছে যে।

পৃথিবীর বয়েস অন্তত তোমার চেয়ে কম নয়, কিন্তু নবীন হতে ওর লজ্জা নেই।

চন্দ্রহাস। দাদা, তুমি বসে বসে চৌপদী লিখছ, আর এই চেয়ে দেখো সমস্ত জল স্থল কেবল নবীন হবার তপস্যা করছে।

দাদা, তুমি কোটরে বসে কবিতা লেখ কী করে।

দাদা। আমার কবিতা তো তোদের কবিশেখরের কল্পমঞ্জরীর মতো শৌখিন কাব্যের ফুলের চাষ নয় যে কেবল বাইরের হাওয়ায় দোল খাবে। এতে সার আছে রে, ভার আছে।

যেমন কচু। মাটির দখল ছাড়ে না।

দাদা। শোন্ তবে বলি—

ওই রে দাদা এবার চৌপদী বের করবে।

এল রে এল চৌপদী এল। আর ঠেকানো গেল না।

ভো ভো পথিকবৃন্দ, সাবধান, দাদার মত্ত চৌপদী চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

চন্দ্রহাস। না দাদা, তুমি ওদের কথায় কান দিয়ো না। শোনাও তোমার চৌপদী। কেউ না টিঁকতে পারে আমি শেষ পর্যন্ত টিঁকে থাকব। আমি ওদের মতো কাপুরুষ নই।

আচ্ছা বেশ, আমরাও শুনব।

যেমন করে পারি শুনবই।

খাড়া দাঁড়িয়ে শুনব। পালাব না।

চৌপদীর চোট যদি লাগে তো বুকে লাগবে, পিঠে লাগবে না।

কিন্তু দোহাই দাদা, একটা। তার বেশি নয়।

দাদা। আচ্ছা, তবে তোরা শোন্—

বংশে শুধু বংশী যদি বাজে
বংশ তবে ধ্বংস হবে লাজে।
বংশ নিঃস্ব নহে বিশ্বমাঝে।
যেহেতু সে লাগে বিশ্বকাজে।

আর-একটু ধৈর্য ধরো ভাই, এর মানেটা—

আবার মানে!

একে চৌপদী— তার উপর আবার মানে।

দাদা। একটু বুঝিয়ে দিই—অর্থাৎ বাঁশে যদি কেবলমাত্র বাঁশিই বাজত তা হলে—

না, আমরা বুঝব না।

কোনোমতেই বুঝব না।

কার সাধ্য আমাদের বোঝায়।

আমরা কিচ্ছু বুঝব না ব'লেই আজ বেরিয়ে পড়েছি।

আজ কেউ যদি আমাদের জোর ক'রে বোঝাতে চায় তা হলে আমরা জোর ক'রে ভুল বুঝব।

দাদা। ও শ্লোকটার অর্থ হচ্ছে এই যে, বিশ্বের হিত যদি না করি তবে—

তবে? তবে বিশ্ব হাঁপ ছেড়ে বাঁচে।

দাদা। ওই কথাটাকেই আর-একটু স্পষ্ট করে বলেছি—

অসংখ্য নক্ষত্র জ্বলে সশঙ্ক নিশীথে।
অম্বরে লম্বিত তারা লাগে কার হিতে।
শূন্যে কোন্ পুণ্য আছে আলোক বাঁটিতে।
মর্তে এলে কর্মে লাগে মাটিতে হাঁটিতে।

ওহে, তবে আমাদের কথাটাকেও আর-একটু পষ্ট ক'রে বলতে হল দেখছি। ধরো, দাদাকে ধরো— ওকে আড়কোলা ক'রে নিয়ে চলো ওর কোটরে।

দাদা। তোরা অত ব্যস্ত হচ্ছিস কেন বল্ তো। বিশেষ কাজ আছে?

বিশেষ কাজ।

অত্যন্ত জরুরি।

দাদা। কাজটা কী শুনি।

বসন্তের ছুটিতে আমাদের খেলাটা কী হবে তাই খুঁজে বের করতে বেরিয়েছি।

দাদা। খেলা? দিনরাতই খেলা?

গান

সকলে। মোদের যেমন খেলা তেমনি যে কাজ
জানিস নে কি ভাই।
তাই কাজকে কভু আমরা না ডরাই।
খেলা মোদের লড়াই করা,
খেলা মোদের বাঁচা মরা,
খেলা ছাড়া কিছুই কোথাও নাই।

ওই যে আমাদের সর্দার আসছে ভাই।

আমাদের সর্দার!

সর্দার। কী রে, ভারি গোল বাধিয়েছিস যে।

চন্দ্রহাস। তাই বুঝি থাকতে পারলে না?

সর্দার। বেরিয়ে আসতে হল।

ওই জন্যেই গোল করি।

সর্দার। ঘরে বুঝি টিঁকতে দিবি নে?

তুমি ঘরে টিঁকলে আমরা বাইরে টিঁকি কী করে।

চন্দ্রহাস। এতবড়ো বাইরেটা পত্তন করতে তো চন্দ্র সূর্য তারা কম খরচ হয় নি, এটাকে আমরা যদি কাজে লাগাই তবে বিধাতার মুখরক্ষা হবে।

সর্দার। তোদের কথাটা কী হচ্ছে বল্ তো।

কথাটা হচ্ছে এই—

মোদের যেমন খেলা তেমনি যে কাজ
জানিস নে কি ভাই।

সর্দার।
খেলতে খেলতে ফুটেছে ফুল,
খেলতে খেলতে ফল যে ফলে,
খেলারই ঢেউ জলে স্থলে।
ভয়ের ভীষণ রক্তরাগে
খেলার আগুন যখন লাগে
ভাঙাচোরা জ্ব'লে যে হয় ছাই।

সকলে।
মোদের যেমন খেলা তেমনি যে কাজ
জানিস নে কি ভাই॥

আমাদের এই খেলাটাতেই দাদার আপত্তি।

দাদা। কেন আপত্তি করি বলব? শুনবি?

বলতে পার দাদা, কিন্তু শুনব কি না তা বলতে পারি নে।

দাদা।
সময় কাজেরই বিত্ত, খেলা তাহে চুরি।
সিঁধ কেটে দণ্ডপল লহ ভূরি ভূরি।
কিন্তু চোরাধন নিয়ে নাহি হয় কাজ।
তাই তো খেলারে বিজ্ঞ দেয় এত লাজ।

চন্দ্রহাস। বল কী তুমি দাদা। সময় জিনিসটাই যে খেলা, কেবল চলে যাওয়াই তার লক্ষ্য।

দাদা। তা হলে কাজটা?

চন্দ্রহাস। চলার বেগে যে ধুলো ওড়ে কাজটা তাই, ওটা উপলক্ষ্য।

দাদা। আচ্ছা সর্দার, তুমি এর নিষ্পত্তি করে দাও।

সর্দার। আমি কিছুরই নিষ্পত্তি করি নে। সংকট থেকে সংকটে নিয়ে চলি— ওই আমার সর্দারি।

দাদা। সব জিনিসের সীমা আছে কিন্তু তোদের যে কেবলই ছেলেমান্‌ষি!

তার কারণ, আমরা যে কেবলই ছেলেমানুষ! সব জিনিসের সীমা আছে কেবল ছেলেমান্‌ষির সীমা নেই।

(দাদাকে ঘেরিয়া নৃত্য)

দাদা। তোদের কি কোনোকালেই বয়েস হবে না।

না, হবে না বয়েস, হবে না।

বুড়ো হয়ে মরব তবু বয়েস হবে না।

বয়েস হলেই সেটাকে মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে নদী পার করে দেব।

মাথা মুড়োবার খরচ লাগবে না ভাই— তার মাথাভরা টাক!

গান

আমাদের পাকবে না চুল গো— মোদের
পাকবে না চুল।
আমাদের ঝরবে না ফুল গো— মোদের
ঝরবে না ফুল।
আমরা ঠেকব না তো কোনো শেষে,
ফুরয় না পথ কোনো দেশে রে।
আমাদের ঘুচবে না ভুল গো— মোদের
ঘুচবে না ভুল।

সর্দার। আমরা নয়ন মুদে করব না ধ্যান
করব না ধ্যান।
নিজের মনের কোণে খুঁজব না জ্ঞান
খুঁজব না জ্ঞান।
আমরা ভেসে চলি স্রোতে স্রোতে
সাগরপানে শিখর হতে রে,
আমাদের মিলবে না কূল গো— মোদের
মিলবে না কূল॥

এই উঠতি বয়সেই দাদার যে-রকম মতিগতি, তাতে কোন্ দিন উনি সেই বুড়োর কাছে মন্তর নিতে যাবেন— আর দেরি নেই।

সর্দার। কোন্ বুড়ো রে!

চন্দ্রহাস। সেই যে মান্ধাতার আমলের বুড়ো। কোন্ গুহার মধ্যে তলিয়ে থাকে, মরবার নাম করে না।

সর্দার। তার খবর তোরা পেলি কোথা থেকে।

যার সঙ্গে দেখা হয় সবাই তার কথা বলে।

পুঁথিতে তার কথা লেখা আছে।

সর্দার। তার চেহারাটা কী রকম।

কেউ বলে, সে সাদা, মড়ার মাথার খুলির মতো; কেউ বলে, সে কালো, মড়ার চোখের কোটরের মতো।

কেন, তুমি কি তার খবর রাখ না সর্দার।

সর্দার। আমি তাকে বিশ্বাস করি নে।

বাঃ, তুমি যে উলটো কথা বললে। সেই বুড়োই তো সবচেয়ে বেশি করে আছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পাঁজরের ভিতরে তার বাসা।

পণ্ডিতজি বলে, বিশ্বাস যদি কাউকে না করতে হয় সে কেবল আমাদের। আমরা আছি কি নেই তার কোনো ঠিকানাই নেই।

চন্দ্রহাস। আমরা যে ভারি কাঁচা, আমরা যে একেবারে নতুন, ভবের রাজ্যে আমাদের পাকা দলিল কোথায়।

সর্দার। সর্বনাশ করলে দেখছি। তোরা পণ্ডিতের কাছে আনাগোনা শুরু করেছিস নাকি।

তাতে ক্ষতি কী সর্দার।

সর্দার। পুঁথির বুলির দেশে ঢুকলে যে একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে যাবি। কার্তিকমাসের সাদা কুয়াশার মতো। তোদের মনের মধ্যে একটুও রক্তের রং থাকবে না। আচ্ছা এক কাজ কর্। তোরা খেলার কথা ভাবছিলি?

হাঁ সর্দার, ভাবনায় আমাদের চোখে ঘুম ছিল না।

আমাদের ভাবনার চোটে পাড়ার লোক রাজদরবারে নালিশ করতে ছুটেছিল।

সর্দার। একটা নতুন খেলা বলতে পারি।

বলো, বলো, বলো।

সর্দার। তোরা সবাই মিলে বুড়োটাকে ধরে নিয়ে আয়।

নতুন বটে, কিন্তু এটা ঠিক খেলা কি না জানি নে।

সর্দার। আমি বলছি এ তোরা পারবি নে।

পারব না ? বলো কী। নিশ্চয়ই পারব।

সর্দার। কখনও পারবি নে।

আচ্ছা যদি পারি ?

সর্দার। তা হলে গুরু ব'লে আমি তোদের মানব।

গুরু! সর্বনাশ! আমাদের সুদ্ধ বুড়ো বানিয়ে দেবে ?

সর্দার। তবে কী চাস বল্।

তোমার সর্দারি আমরা কেড়ে নেব।

সর্দার। তা হলে তো বাঁচি রে! তোদের সর্দারি কি সোজা কাজ। এমনই অস্থির করে রেখেছিস যে হাড়গুলো-সুদ্ধ উলটো-পালটা হয়ে গেছে।— তা হলে রইল কথা ?

চন্দ্রহাস। হাঁ রইল কথা। দোলপূর্ণিমার দিনে তাকে ঝোলার উপর দোলাতে দোলাতে তোমার কাছে হাজির করে দেব।

কিন্তু তাকে নিয়ে কী করবে সর্দার।

সর্দার। বসন্ত উৎসব করব।

বল কী। তা হলে যে আমের বোলগুলো ধরতে ধরতেই আঁটি হয়ে যাবে।

আর কোকিলগুলো পেঁচা হয়ে সব লক্ষ্মীর খোঁজে বেরবে।

চন্দ্রহাস। আর ভ্রমরগুলো অনুস্বার বিসর্গের চোটে বাতাসটাকে ঘুলিয়ে দিয়ে মন্তর জপতে থাকবে।

সর্দার। আর তোদের খুলিটা সুবুদ্ধিতে এমনই বোঝাই হবে যে এক পা নড়তে পারবি নে।

সর্বনাশ!

সর্দার। আর ওই ঝুমকো-লতায় যেমন গাঁঠে গাঁঠে ফুল ধরেছে তেমনই তোদের গাঁঠে গাঁঠে বাতে ধরবে।

সর্বনাশ!

সর্দার। আর তোরা সবাই নিজের দাদা হয়ে নিজের কান মলতে থাকবি।

সর্বনাশ!

সর্দার। আর—

আর কাজ কী সর্দার। থাক্ বুড়োধরা খেলা। ওটা বরঞ্চ শীতের দিনেই হবে। এবার তোমাকে নিয়েই—

সর্দার। তোদের দেখছি আগে থাকতেই বুড়োর ছোঁয়াচ লেগেছে।

কেন, কী লক্ষণটা দেখলে।

সর্দার। উৎসাহ নেই? গোড়াতেই পেছিয়ে গেলি? দেখ্‌ই না কী হয়।

আচ্ছা বেশ। রাজি।

চল্ রে, সব চল্।

বুড়োর খোঁজে চল্।

যেখানে পাই তাকে পাকা চুলটার মতো পট্ করে উপড়ে আনব।

শুনেছি উপড়ে আনার কাজে তারই হাত পাকা। নিড়ুনি তার প্রধান অস্ত্র।

ভয়ের কথা রাখ্। খেলতেই যখন বেরলুম তখন ভয়, চৌপদী, পণ্ডিত, পুঁথি, এ-সব ফেলে যেতে হবে।

গান

আমাদের ভয় কাহারে।
বুড়ো বুড়ো চোর ডাকাতে
কী আমাদের করতে পারে।
আমাদের রাস্তা সোজা, নাইকো গলি,
নাইকো ঝুলি, নাইকো থলি,
ওরা আর যা কাড়ে কাড়ুক, মোদের
পাগ্‌লামি কেউ কাড়বে না রে।
আমরা চাই নে আরাম, চাই নে বিরাম,
চাই নে যে ফল, চাই নে রে নাম,
মোরা ওঠায় পড়ায় সমান নাচি,
সমান খেলি জিতে হারে—
আমাদের ভয় কাহারে॥

দ্বিতীয় দৃশ্যের গীতি-ভূমিকা

প্রবীণের দ্বিধা

১

দুরন্ত প্রাণের গান

আমরা খুঁজি খেলার সাথি।
ভোর না হতে জাগাই তাদের
ঘুমায় যারা সারা রাতি।
আমরা ডাকি পাখির গলায়,
আমরা নাচি বকুলতলায়,
মন ভোলাবার মন্ত্র জানি,
হাওয়াতে ফাঁদ আমরা পাতি

মরণকে তো মানি নে রে,
কালের ফাঁসি ফাঁসিয়ে দিয়ে
লুঠ-করা ধন নিই যে কেড়ে।
আমরা তোমার মনোচোরা,
ছাড়ব না গো তোমায় মোরা,
চলেছ কোন্ আঁধারপানে
সেথাও জ্বলে মোদের বাতি॥

২

শীতের বিদায় গান

ছাড়্ গো তোরা ছাড়্ গো,
আমি চলব সাগর-পার গো।
বিদায়-বেলায় এ কী হাসি,
ধরলি আগমনীর বাঁশি।

যাবার সুরে আসার সুরে
করলি একাকার গো।

সবাই আপনপানে
আমায় আবার কেন টানে।
পুরানো শীত পাতা-ঝরা,
তারে এমন নূতন-করা ?
মাঘ মরিল ফাগুন হয়ে
খেয়ে ফুলের মার গো॥

৩

নবযৌবনের গান

আমরা নূতন প্রাণের চর।
আমরা থাকি পথে ঘাটে
নাই আমাদের ঘর।
নিয়ে পক্ক পাতার পুঁজি
পালাবে শীত ভাবছ বুঝি।
ও-সব কেড়ে নেব, উড়িয়ে দেব
দখিন হাওয়ার 'পর।

তোমায় বাঁধব নূতন ফুলের মালায়
বসন্তের এই বন্দীশালায়।
জীর্ণ জরার ছদ্মরূপে
এড়িয়ে যাবে চুপে চুপে ?
তোমার সকল ভূষণ ঢাকা আছে
নাই যে অগোচর গো॥

৪

উদ্‌ভ্রান্ত শীতের গান

ছাড়্ গো আমায় ছাড়্ গো—
আমি চলব সাগর-পার গো।
রঙের খেলার, ভাই রে,
আমার সময় হাতে নাই রে।
তোমাদের ঐ সবুজ ফাগে
চক্ষে আমার ধাঁদা লাগে,
আমায় তোদের প্রাণের দাগে
দাগিস নে ভাই আর গো॥

দ্বিতীয় দৃশ্য

সন্ধান

ঘাট

ওগো ঘাটের মাঝি, ঘাটের মাঝি, দরজা খোলো।

মাঝি। কেন গো, তোমরা কাকে চাও।

আমরা বুড়োকে খুঁজতে বেরিয়েছি।

মাঝি। কোন্ বুড়োকে।

চন্দ্রহাস। কোন্-বুড়োকে না। বুড়োকে।

মাঝি। তিনি কে।

চন্দ্রহাস। আহা, আদ্যিকালের বুড়ো।

মাঝি। ওঃ বুঝেছি। তাকে নিয়ে করবে কী।

বসন্ত-উৎসব করব।

মাঝি। বুড়োকে নিয়ে বসন্ত-উৎসব! পাগল হয়েছ?

পাগল হঠাৎ হই নি। গোড়া থেকেই এই দশা।

আর অন্তিম পর্যন্তই এই ভাব।

গান

আমাদের খেপিয়ে বেড়ায় যে
কোথায় লুকিয়ে থাকে রে।
ছুটল বেগে ফাগুন হাওয়া
কোন্ খেপামির নেশায় পাওয়া।
ঘূর্ণা হাওয়ায় ঘুরিয়ে দিল সূর্যতারাকে।

মাঝি। ওহে তোমাদের হাওয়ার জোর আছে— দরজায় ধাক্কা লাগিয়েছে।

এখন সেই বুড়োটার খবর দাও।

মাঝি। সেই যে বুড়িটা রাস্তার মোড়ে ব'সে চরকা কাটে তাকে জিজ্ঞাসা করলে হয় না?

জিজ্ঞাসা করেছিলুম— সে বলে. সামনে দিয়ে কত ছায়া যায়, কত ছায়া আসে, কাকেই বা চিনি।

ও যে একই জায়গায় ব'সে থাকে, ও কারও ঠিকানা জানে না।

মাঝি, তুমি ঘাটে ঘাটে অনেক ঘুরেছ, তুমি নিশ্চয় বলতে পার কোথায় সেই—

মাঝি। ভাই, আমার ব্যাবসা হচ্ছে পথ ঠিক করা— কাদের পথ, কিসের পথ সে আমার জানবার দরকার হয় না। আমার দৌড় ঘাট পর্যন্ত, ঘর পর্যন্ত না।

আচ্ছা চলো তো, পথগুলো পরখ করে দেখা যাক।

গান

কোন্ খেপামির তালে নাচে
পাগল সাগরনীর।
সেই তালে যে পা ফেলে যাই,
রইতে নারি স্থির।
চল্ রে সোজা, ফেল্ রে বোঝা,
রেখে দে তোর রাস্তা খোঁজা,
চলার বেগে পায়ের তলায়
রাস্তা জেগেছে॥

মাঝি। ওই যে কোটাল আসছে, ওকে জিজ্ঞাসা করলে হয়— আমি পথের খবর জানি, ও পথিকদের খবর জানে।

ওহে কোটাল হে, কোটাল হে।

কোটাল। কে গো, তোমরা কে।

আমাদের যা দেখছ তাই, পরিচয় দেবার কিছুই নেই।

কোটাল। কী চাই।

চন্দ্রহাস। বুড়োকে খুঁজতে বেরিয়েছি।

কোটাল। কোন্ বুড়োকে।

সেই চিরকালের বুড়োকে।

কোটাল। এ তোমাদের কেমন খেয়াল। তোমরা খোঁজ তাকে ? সে-ই তো তোমাদের খোঁজ করছে।

চন্দ্রহাস। কেন বলো তো।

কোটাল। সে নিজের হিমরক্তটা গরম করে নিতে চায়, তপ্ত যৌবনের 'পরে তার বড়ো লোভ।

চন্দ্রহাস। আমরা তাকে কষে গরম করে দেব, সে-ভাবনা নেই। এখন দেখা পেলে হয়। তুমি তাকে দেখেছ ?

কোটাল। আমার রাতের বেলার পাহারা— দেখি ঢের লোক, চেহারা বুঝি নে। কিন্তু বাপু, তাকেই সকলে বলে ছেলেধরা, উলটে তোমরা তাকে ধরতে চাও— এটা যে পুরো পাগলামি !

দেখেছ ? ধরা পড়েছি। পাগলামিই তো। চিনতে দেরি হয় না।

কোটাল। আমি কোটাল, পথ-চলতি যাদের দেখি সবাই এক ছাঁদের। তাই অদ্ভুত কিছু দেখলেই চোখে ঠেকে।

ওই শোনো ! পাড়ার ভদ্রলোকমাত্রই ওই কথা বলে— আমরা অদ্ভুত।

আমরা অদ্ভুত বই-কি, কোনো ভুল নেই।

কোটাল। কিন্তু তোমরা ছেলেমানুষি করছ।

ওই রে, আবার ধরা পড়েছি। দাদাও ঠিক ওই কথাই বলে।

অতি প্রাচীন কাল থেকে আমরা ছেলেমানুষিই করছি।

ওতে আমরা একেবারে পাকা হয়ে গেছি।

চন্দ্রহাস। আমাদের এক সর্দার আছে, সে ছেলেমানুষিতে প্রবীণ। সে নিজের খেয়ালে এমনি হুহু করে চলেছে যে তার বয়েসটা কোন্ পিছনে খসে পড়ে গেছে, হুঁশ নেই।

কোটাল। আর তোমরা ?

আমরা সব বয়েসের গুটি-কাটা প্রজাপতি।

কোটাল। (জনান্তিকে মাঝির প্রতি) পাগল রে, একেবারে উন্মাদ পাগল!

মাঝি। বাপু, এখন তোমরা কী করবে।

চন্দ্রহাস। আমরা যাব।

কোটাল। কোথায়।

চন্দ্রহাস। সেটা আমরা ঠিক করি নি।

কোটাল। যাওয়াটাই ঠিক করেছ কিন্তু কোথায় যাবে সেটা ঠিক কর নি?

চন্দ্রহাস। সেটা চলতে চলতে আপনি ঠিক হয়ে যাবে।

কোটাল। তার মানে কী হল।

তার মানে হচ্ছে—

গান

চলি গো, চলি গো, যাই গো চলে।
পথের প্রদীপ জলে গো
গগন-তলে।
বাজিয়ে চলি পথের বাঁশি,
ছড়িয়ে চলি চলার হাসি,
রঙিন বসন উড়িয়ে চলি
জলে স্থলে।

কোটাল। তোমরা বুঝি কথার জবাব দিতে হলে গান গাও?

হাঁ। নইলে ঠিক জবাবটা বেরয় না। সাদা কথায় বলতে গেলে ভারি অস্পষ্ট হয়, বোঝা যায় না।

কোটাল। তোমাদের বিশ্বাস, তোমাদের গানগুলো খুব পষ্ট?

চন্দ্রহাস। হাঁ, ওতে সুর আছে কিনা।

গান

পথিক ভুবন ভালোবাসে
পথিকজনে রে।
এমন সুরে তাই সে ডাকে
ক্ষণে ক্ষণে রে।

চলার পথের আগে আগে
ঋতুর ঋতুর সোহাগ জাগে,
চরণঘায়ে মরণ মরে
পলে পলে ॥

কোটাল। কোনো সহজ মানুষকে তো কথা বলতে বলতে গান গাইতে শুনি নি।

আবার ধরা পড়ে গেছি রে, আমরা সহজ মানুষ না।

কোটাল। তোমাদের কোনো কাজকর্ম নেই বুঝি ?

না। আমাদের ছুটি।

কোটাল। কেন বলো তো।

চন্দ্রহাস। পাছে সময় নষ্ট হয়।

কোটাল। এটা তো বোঝা গেল না।

ওই দেখো— তা হলে আবার গান ধরতে হল।

কোটাল। না তার দরকার নেই। আর বেশি বোঝবার আশা রাখি নে।

সবাই আমাদের বোঝবার আশা ছেড়ে দিয়েছে।

কোটাল। এমন হলে তোমাদের চলবে কী করে।

চন্দ্রহাস। আর তো কিছুই চলবার দরকার নেই— শুধু আমরাই চলি।

কোটাল। (মাঝির প্রতি) পাগল রে! উন্মাদ পাগল!

চন্দ্রহাস। এই যে এতক্ষণ পরে দাদা আসছে।

কী দাদা, পিছিয়ে পড়েছিলে কেন।

চন্দ্রহাস। ওরে আমরা চলি উনপঞ্চাশ বায়ুর মতো, আমাদের ভিতরে পদার্থ কিছুই নেই ; আর দাদা চলে শ্রাবণের মেঘ— মাঝে মাঝে থমকে দাঁড়িয়ে ভারমোচন করতে হয়। পথের মধ্যে ওকে শ্লোকরচনায় পেয়েছিল।

দাদা। চন্দ্রহাস, দৈবাৎ তোমার মুখে এই উপমাটি উপাদেয় হয়েছে। ওর মধ্যে একটু সার কথা আছে। আমি ওটি চৌপদীতে গেঁথে নিচ্ছি।

চন্দ্রহাস। না, না, এখন থাক্‌ দাদা। আমরা কাজে বেরিয়েছি। তোমার চৌপদীর চার পা, কিন্তু চলবার বেলা এতবড়ো খোঁড়া জন্তু জগতে দেখতে পাওয়া যায় না।

দাদা। আপনি কে।

মাঝি। আমি ঘাটের মাঝি।

দাদা। আর আপনি ?

কোটাল। আমি পাড়ার কোটাল।

দাদা। তা উত্তম হল— আপনাদের কিছু শোনাতে ইচ্ছা করি। বাজে জিনিস না— কাজের কথা।

মাঝি। বেশ, বেশ। আহা, বলেন, বলেন।

কোটাল। আমাদের গুরু বলেছিলেন, ভালো কথা বলবার লোক অনেক মেলে কিন্তু ভালো কথা যে-মরদ খাড়া দাঁড়িয়ে শুনতে পারে তাকেই সাবাস। ওটা ভাগ্যের কথা কিনা। তা, বলো ঠাকুর বলো।

দাদা। আজ পথে যেতে যেতে দেখলুম, রাজপুরুষ একজন বন্দীকে নিয়ে চলেছে। শুনলুম, সে কোনো শ্রেষ্ঠী, তার টাকার লোভেই রাজা মিথ্যা ছুতো করে তাকে ধরেছে। শুনে আমি নিকটেই মুদির দোকানে বসে এই শ্লোকটি রচনা করেছি। দেখো বাপু, আমি বানিয়ে একটি কথাও লিখি নে। আমি যা লিখব রাস্তায় ঘাটে তা মিলিয়ে নিতে পারবে।

ঠাকুর, কী লিখেছ শুনি।

দাদা।

আত্মরস লক্ষ্য ছিল ব'লে
ইক্ষু মরে ভিক্ষুর কবলে।
ওরে মূর্খ, ইহা দেখি শিক্ষ—
ফল দিয়ে রক্ষা পায় বৃক্ষ।

বুঝেছ? রস জমায় বলেই ইক্ষু বেটা মরে, যে গাছ ফল দেয় তাকে তো কেউ মারে না।

কোটাল। ওহে মাঝি, খাসা লিখেছে হে!

মাঝি। ভাই কোটাল, কথাটির মধ্যে সার আছে।

কোটাল। শুনলে মানুষের চৈতন্য হয়। আমাদের কায়েতের পো এখানে থাকলে ওটা লিখে নিতুম রে। পাড়ায় খবর পাঠিয়ে দে।

সর্বনাশ করলে রে!

চন্দ্রহাস। ও ভাই মাঝি, তুমি যে বললে আমাদের সঙ্গে বেরবে, দাদার চৌপদী জমলে তো আর—

মাঝি। আরে রসুন মশায়, পাগলামি রেখে দিন। ঠাকুরকে পেয়েছি, দুটো ভালো কথা শুনে নিই— বয়েস হয়ে এল, কোন্ দিন মরব।

ভাই, সেইজন্যেই তো বলছি, আমাদের সঙ্গ পেয়েছ, ছেড়ো না।

চন্দ্রহাস। দাদাকে চিরদিনই পাবে কিন্তু আমরা একবার ম'লে বিধাতা দ্বিতীয়বার আর এমন ভুল করবেন না।

(বাহির হইতে) ওগো কোটাল, কোটাল, কোটাল!

কে রে! অনাথ কলু দেখছি। কী হয়েছে।

কলু। সেই যে ছেলেটাকে পুষেছিলুম, তাকে বুঝি কাল রাত্রে ভুলিয়ে নিয়ে গেছে সেই ছেলেধরা।

কোন্ ছেলেধরা।

কলু। সেই বুড়ো।

চন্দ্রহাস। বুড়ো? বলিস কী রে।

কলু। আপনারা অত খুশি হন কেন।

ওটা আমাদের একটা বিশ্রী স্বভাব। আমরা থামকা খুশি হয়ে উঠি।

কোটাল। পাগল! একেবারে উন্মাদ পাগল!

চন্দ্রহাস। তাকে তুমি দেখেছ হে?

কলু। বোধ হয় কাল রাত্রে তাকেই দূর থেকে দেখেছিলুম।

কী রকম চেহারাটা।

কলু। কালো, আমাদের এই কোটাল দাদার চেয়েও। একেবারে রাত্রের সঙ্গে মিশিয়ে গেছে। আর বুকে দুটো চক্ষু জোনাক পোকার মতো জ্বলছে।

ওহে বসন্ত-উৎসবে তো মানাবে না।

চন্দ্রহাস। ভাবনা কী। তেমন যদি দেখি তবে এবার নাহয় পূর্ণিমায় উৎসব না করে অমাবস্যায় করা যাবে। অমাবস্যার বুকে তো চোখের অভাব নেই।

কোটাল। ওহে বাপু, তোমরা ভালো কাজ করছ না।

না, আমরা ভালো কাজ করছি নে।

আবার ধরা পড়েছি রে, আমরা ভালো কাজ করছি নে।

কী করব অভ্যাস নেই।

যেহেতু আমরা ভালোমানুষ নই।

কোটাল। এ কি ঠাট্টা পেয়েছ। এতে বিপদ আছে।

বিপদ? সেইটেই তো ঠাট্টা।

গান

ভালোমানুষ নই রে মোরা
ভালোমানুষ নই।
গুণের মধ্যে ঐ আমাদের
গুণের মধ্যে ঐ।

দেশে দেশে নিন্দে রটে,
পদে পদে বিপদ ঘটে,
পুঁথির কথা কই নে মোরা
উলটো কথা কই।

কোটাল। ওহে বাপু, তোমরা যে কোন্ সর্দারের কথা বলছিলে, সে গেল কোথায়। সে সঙ্গে থাকলে যে তোমাদের সামলাতে পারত।

সে সঙ্গে থাকে না পাছে সামলাতে হয়।

সে আমাদের পথে বের করে দিয়ে নিজে সরে দাঁড়ায়।

কোটাল। এ তার কেমনতরো সর্দারি।

চন্দ্রহাস। সর্দারি করে না বলেই তাকে সর্দার করেছি।

কোটাল। দিব্যি সহজ কাজটি তো সে পেয়েছে।

চন্দ্রহাস। না ভাই, সর্দারি করা সহজ, সর্দার হওয়া সহজ নয়।

গান

জন্ম মোদের ত্র্যহস্পর্শে,
সকল অনাসৃষ্টি।
ছুটি নিলেন বৃহস্পতি,
রইল শনির দৃষ্টি।
অযাত্রাতে নৌকো ভাসা,
রাখি নে ভাই ফলের আশা,
আমাদের আর নাই যে গতি
ভেসেই চলা বই॥

দাদা, চলো তবে, বেরিয়ে পড়ি।

কোটাল। না না ঠাকুর, ওদের সঙ্গে কোথায় মরতে যাবে।

মাঝি। তুমি আমাদের শোলোক শোনাও, পাড়ার মানুষ সব এল বলে। এ-সব কথা শোনা ভালো।

দাদা। না ভাই, এখান থেকে আমি নড়ছি নে।

তা হলে আমরা নড়ি। পাড়ার মানুষ আমাদের সইতে পারে না।

পাড়াকে আমরা নাড়া দিই, পাড়া আমাদের তাড়া দেয়।

ওই যে চৌপদীর গন্ধ পেয়েছে, মউমাছির গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে।

পাড়ার লোক। ওরে মাঝির এখানে পাঠ হবে।

কে গো। তোমরাই পাঠ করবে নাকি।

আমরা অন্য অনেক অসহ্য উৎপাত করি কিন্তু পাঠ করি নে।

ওই পুণ্যের জোরেই আমরা রক্ষা পাব।

পাড়ার লোক। এরা বলে কী রে। হেঁয়ালি নাকি।

চন্দ্রহাস। আমরা যা নিজে বুঝি তাই বলি ; হঠাৎ হেঁয়ালি বলে ভ্রম হয়। আর তোমরা যা খুবই বোঝ দাদা তাই তোমাদের বুঝিয়ে বলবে, হঠাৎ গভীর জ্ঞানের কথা বলে মনে হবে।

একজন বালকের প্রবেশ

বালক। আমি পারলুম না। কিছুতে তাকে ধরতে পারলুম না।

কাকে ভাই।

বালক। ওই তোমরা যে-বুড়োর খোঁজ করছিলে তাকে।

তাকে দেখেছ নাকি।

বালক। সে বোধ হয় রথে চড়ে গেল।

কোন্ দিকে।

বালক। কিছুই ঠাওরাতে পারলুম না। কিন্তু তার চাকার ঘূর্ণিহাওয়ায় এখনও ধুলো উড়ছে।

চল্ তবে চল্।

শুকনো পাতায় আকাশ ছেয়ে দিয়ে গেছে।

[প্রস্থান

কোটাল। পাগল ! উন্মাদ পাগল !

তৃতীয় দৃশ্যের গীতি-ভূমিকা

প্রবীণের পরাভব

১

বসন্তের হাসির গান

ওর ভাব দেখে যে পায় হাসি। হায় হায় রে।
মরণ-আয়োজনের মাঝে
বসে আছেন কিসের কাজে
প্রবীণ প্রাচীন প্রবাসী। হায় হায় রে।
এবার দেশে যাবার দিনে
আপনাকে ও নিক্ না চিনে,
সবাই মিলে সাজাও ওকে
নবীন রূপের সন্ন্যাসী। হায় হায় রে।
এবার ওকে মজিয়ে দে রে
হিসাব-ভুলের বিষম ফেরে।
কেড়ে নে ওর থলি-থালি,
আয় রে নিয়ে ফুলের ডালি,
গোপন প্রাণের পাগলাকে ওর
বাইরে দে আজ প্রকাশি'। হায় হায় রে॥

২

আসন্ন মিলনের গান

আর নাই যে দেরি নাই যে দেরি।
সামনে সবার পড়ল ধরা
তুমি যে ভাই আমাদেরি।
হিমের বাহু-বাঁধন টুটি
পাগলা ঝোরা পাবে ছুটি,

উত্তরে এই হাওয়া তোমার
বইবে উজান কুঞ্জ ঘেরি'

আর নাই যে দেরি, নাই যে দেরি।
শুনছ না কি জলে স্থলে
জাদুকরের বাজল ভেরি।
দেখছ না কি এই আলোকে
খেলছে হাসি রবির চোখে,
সাদা তোমার শ্যামল হবে
ফিরব মোরা তাই যে হেরি'॥

তৃতীয় দৃশ্য

সন্দেহ

মাঠ

সবাই বলে ওই, ওই, ওই— তার পরে চেয়ে দেখলেই দেখা যায় শুধু ধুলো আর শুকনো পাতা।

তার রথের ধ্বজাটা মেঘের মধ্যে যেন একবার দেখা দিয়েছিল।

কিন্তু দিক ভুল হয়ে যায়। এই ভাবি পুবে, এই ভাবি পশ্চিমে।

এমনি করে সমস্ত দিন ধুলো আর ছায়ার পিছনে ঘুরে ঘুরেই হয়রান হয়ে গেলুম। বেলা যে গেল রে ভাই, বেলা যে গেল!

সত্যি কথা বলি, যতই বেলা যাচ্ছে ততই মনে ভয় ঢুকছে।

মনে হচ্ছে, ভুল করেছি।

সকালবেলাকার আলো কানে কানে বললে, সাবাস, এগিয়ে চলো,— বিকেলবেলাকার আলো তাই নিয়ে ভারি ঠাট্টা করছে।

ঠকলুম বুঝি রে!

দাদার চৌপদীগুলোর উপরে ক্রমে শ্রদ্ধা বাড়ছে।

ভয় হচ্ছে আমরাও চৌপদী লিখতে বসে যাব— বড়ো দেরি নেই।

আর পাড়ার লোক আমাদের ঘিরে বসবে।

আর এমনি তাদের ভয়ানক উপকার হতে থাকবে যে, তারা এক পা নড়বে না।

আমরা রাত্রি বেলাকার পাথরের মতো ঠাণ্ডা হয়ে বসে থাকব।

আর তারা আমাদের চারদিকে কুয়াশার মতো ঘন হয়ে জমবে।

ও ভাই, আমাদের সর্দার এ-সব কথা শুনলে বলবে কী।

ওরে আমার ক্রমে বিশ্বাস হচ্ছে সর্দারই আমাদের ঠকিয়েছে। সে আমাদের মিথ্যে ফাঁকি দিয়ে খাটিয়ে নেয়, নিজে সে কুঁড়ের সর্দার।

ফিরে চল্ রে। এবার সর্দারের সঙ্গে লড়ব।

বলব, আমরা চলব না— দুই পা কাঁধের উপর মুড়ে বসব। পাদুটো লক্ষীছাড়া, পথে পথেই ঘুরে মরল।

হাত দুটোকে পিছনের দিকে বেঁধে রাখব।

পিছনের কোনো বালাই নেই রে, যত মুশকিল এই সামনেটাকে নিয়ে।

শরীরে যতগুলো অঙ্গ আছে তার মধ্যে পিঠটাই সত্যি কথা বলে। সে বলে চিত হয়ে পড়্, চিত হয়ে পড়্।

কাঁচা বয়সে বুকটা বুক ফুলিয়ে চলে কিন্তু পরিণামে সেই পিঠের উপরেই ভর— পড়তেই হয় চিত হয়ে।

গোড়াতেই যদি চিতপাত দিয়ে শুরু করা যেত তা হলে মাঝখানে উৎপাত থাকত না রে।

আমাদের গ্রামের ছায়ার নীচে দিয়ে সেই যে ইরা নদী বয়ে চলেছে তার কথা মনে পড়ছে ভাই।

সেদিন মনে হয়েছিল, সে বলছে, চল্, চল্, চল্,— আজ মনে হচ্ছে ভুল শুনেছিলুম, সে বলছে, ছল, ছল, ছল। সংসারটা সবই ছল রে!

সে কথা আমাদের পণ্ডিত গোড়াতেই বলেছিল।

এবারে ফিরে গিয়েই একেবারে সোজা সেই পণ্ডিতের চণ্ডীমণ্ডপে।

পুঁথি ছাড়া আর এক পা চলা নয়।

কী ভুলটাই করেছিলুম। ভেবেছিলুম চলাটাই বাহাদুরি। কিন্তু না-চলাই যে গ্রহ নক্ষত্র জল হাওয়া সমস্তর উলটো। সেটাই তো তেজের কথা হল।

ওরে বীর, কোমর বাঁধ্ রে— আমরা চলব না।

ওরে পালোয়ান, তাল ঠুকে বসে পড়্, আমরা চলব না।

চলচ্চিত্তং চলদ্বিত্তং— আমাদের চিত্তেও কাজ নেই, বিত্তেও কাজ নেই; আমরা চলব না।

চলজ্জীবনযৌবনং— আমাদের জীবনও থাক্ যৌবনও থাক্, আমরা চলব না।

যেখান থেকে যাত্রা শুরু করেছি ফিরে চল্।

না রে সেখানে ফিরতে হলেও চলতে হবে।

তবে ?

তবে আর কী। যেখানে এসে পড়েছি এইখানেই বসে পড়ি।

মনে করি এইখানেই বরাবর বসে আছি।

জন্মাবার ঢের আগে থেকে।

মরার ঢের পরে পর্যন্ত।

ঠিক বলেছিস্, তা হলে মনটা স্থির থাকবে। আর-কোথাও থেকে এসেছি জানলেই আর-কোথাও যাবার জন্যে মন ছটফট করে।

আর-কোথাওটা বড়ো সর্বনেশে দেশ রে !

সেখানে দেশটা সুদ্ধ চলে। তার পথগুলো চলে।

কিন্তু আমরা—

গান

মোরা চলব না।
মুকুল ঝরে ঝরুক, মোরা ফলব না।
সূর্য তারা আগুন ভুগে
জ্বলে মরুক যুগে যুগে,
আমরা যতই পাই না জ্বালা
জ্বলব না।
বনের শাখা কথা বলে,
কথা জাগে সাগর-জলে,
এই ভুবনে আমরা কিছুই
বলব না।
কোথা হতে লাগে রে টান,
জীবনজলে ডাকে রে বান,
আমরা তো এই প্রাণের টলায়
টলব না॥

ওরে হাসি রে হাসি!

ওই হাসি শোনা যাচ্ছে।

বাঁচা গেল, এতক্ষণে একটা হাসি শোনা গেল।

যেন গুমোটের ঘোমটা খুলে গেল।

এ যেন বৈশাখের এক পশলা বৃষ্টি।

কার হাসি ভাই।

শুনেই বুঝতে পারছিস নে, আমাদের চন্দ্রহাসের হাসি?

কী আশ্চর্য হাসি ওর।

যেন ঝরনার মতো, কালো পাথরটাকে ঠেলে নিয়ে চলে।

যেন সূর্যের আলো, কুয়াশার তাড়কা রাক্ষসীকে তলোয়ার দিয়ে টুকরো টুকরো করে কাটে।

যাক আমাদের চৌপদীর ফাঁড়া কাটল। এবার উঠে পড়্।

এবার কাজ ছাড়া কথা নেই— চরাচরমিদং সর্বং কীর্তির্যস্য স জীবতি।

ও আবার কী রকম কথা হল। ঈশানকে এখনও চৌপদীর ভূত ছাড়ে নি।

কীর্তি? নদী কি নিজের ফেনাকে গ্রাহ্য করে। কীর্তি তো আমাদের ফেনা— ছড়াতে ছড়াতে চলে যাব। ফিরে তাকাব না।

এসো ভাই চন্দ্রহাস এসো, তোমার হাসিমুখ যে!

চন্দ্রহাস। বুড়োর রাস্তার সন্ধান পেয়েছি।

কার কাছ থেকে।

চন্দ্রহাস। এই বাউলের কাছ থেকে।

ও কী। ও যে অন্ধ!

চন্দ্রহাস। সেইজন্যে ওকে রাস্তা খুঁজতে হয় না, ও ভিতর থেকে দেখতে পায়।

কী হে ভাই, ঠিক নিয়ে যেতে পারবে তো?

বাউল। ঠিক নিয়ে যাব।

কেমন ক'রে।

বাউল। আমি যে পায়ের শব্দ শুনতে পাই।

কান তো আমাদেরও আছে, কিন্তু—

বাউল। আমি যে সব-দিয়ে শুনি— শুধু কান-দিয়ে না।

চন্দ্রহাস। রাস্তায় যাকে জিজ্ঞাসা করি বুড়োর কথা শুনলেই আঁতকে ওঠে, কেবল দেখি এরই ভয় নেই।

ও বোধ হয় চোখে দেখতে পায় না বলেই ভয় করে না।

বাউল। না গো, আমি কেন ভয় করি নে বলি। একদিন আমার দৃষ্টি ছিল। যখন অন্ধ হলুম ভয় হল দৃষ্টি বুঝি হারালুম। কিন্তু চোখওয়ালার দৃষ্টি অস্ত যেতেই অন্ধের দৃষ্টির উদয় হল। সূর্য যখন গেল তখন দেখি অন্ধকারের বুকের মধ্যে আলো। সেই অবধি অন্ধকারকে আমার আর ভয় নেই।

তা হলে এখন চলো। ওই তো সন্ধ্যাতারা উঠেছে।

বাউল। আমি গান গাইতে গাইতে যাই, তোমরা আমার পিছনে পিছনে এসো। গান না গাইলে আমি রাস্তা পাই নে।

সে কী কথা হে।

বাউল। আমার গান আমাকে ছাড়িয়ে যায়— সে এগিয়ে চলে, আমি পিছনে চলি।

গান

ধীরে বন্ধু ধীরে ধীরে
চলো তোমার বিজন মন্দিরে।
জানি নে পথ, নাই যে আলো,
ভিতর বাহির কালোয় কালো,
তোমার চরণশব্দ বরণ করেছি
আজ এই অরণ্যগভীরে।

ধীরে বন্ধু ধীরে ধীরে।
চলো অন্ধকারের তীরে তীরে।
চলব আমি নিশীথরাতে
তোমার হাওয়ার ইশারাতে,
তোমার বসনগন্ধ বরণ করেছি
আজ এই বসন্তসমীরে॥

চতুর্থ দৃশ্যের গীতি-ভূমিকা

নবীনের জয়

১

প্রত্যাগত যৌবনের গান

বিদায় নিয়ে গিয়েছিলেম
বারে বারে।
ভেবেছিলেম ফিরব না রে।
এই তো আবার নবীন বেশে
এলেম তোমার হৃদয়-দ্বারে।
কে গো তুমি।— আমি বকুল;
কে গো তুমি।— আমি পারুল;
তোমরা কে বা।— আমরা আমের মুকুল গো
এলেম আবার আলোর পারে।

এবার যখন ঝরব মোরা
ধরার বুকে
ঝরব তখন হাসিমুখে।
অফুরানের আঁচল ভ'রে
মরব মোরা প্রাণের সুখে।
তুমি কে গো।— আমি শিমুল;
তুমি কে গো।— কামিনী ফুল;
তোমরা কে বা— আমরা নবীন পাতা গো
শালের বনে ভারে ভারে॥

২

নূতন আশার গান

এই কথাটাই ছিলেম ভুলে—
মিলব আবার সবার সাথে
ফাল্গুনের এই ফুলে ফুলে।

অশোক বনে আমার হিয়া
নূতন পাতায় উঠবে জিয়া,
বুকের মাতন টুটবে বাঁধন
যৌবনেরি কূলে কূলে
ফাল্গুনের এই ফুলে ফুলে।

বাঁশিতে গান উঠবে পূরে
নবীন রবির বাণী-ভরা
আকাশবীণার সোনার সুরে।
আমার মনের সকল কোণে
ভরবে গগন আলোক-ধনে,
কান্নাহাসির বন্যারি নীর
উঠবে আবার দুলে দুলে
ফাল্গুনের এই ফুলে ফুলে॥

৩

বোঝাপড়ার গান

এবার তো যৌবনের কাছে
মেনেছ, হার মেনেছ ?
মেনেছি।
আপন মাঝে নূতনকে আজ জেনেছ ?
জেনেছি।
আবরণকে বরণ করে
ছিলে কাহার জীর্ণ ঘরে।
আপনাকে আজ বাহির করে এনেছ ?
এনেছি।
এবার আপন প্রাণের কাছে
মেনেছ, হার মেনেছ ?
মেনেছি।

মরণ মাঝে অমৃতকে জেনেছ ?

লুকিয়ে তোমার অমরপুরী
ধুলা-অসুর করে চুরি,
তাহারে আজ মরণ আঘাত হেনেছ ?
হেনেছি ॥

৪

নবীন রূপের গান

এতদিন যে বসেছিলেম
পথ চেয়ে আর কাল গুনে,
দেখা পেলেম ফাল্গুনে।
বালক বীরের বেশে তুমি করলে বিশ্বজয়—
এ কী গো বিস্ময়।
অবাক আমি তরুণ গলার
গান শুনে।
গন্ধে উদাস হাওয়ার মতো
উড়ে তোমার উত্তরী,
কর্ণে তোমার কৃষ্ণচূড়ার মঞ্জরী।
তরুণ হাসির আড়ালে কোন্
আগুন ঢাকা রয়—
এ কী গো বিস্ময়।
অস্ত্র তোমার গোপন রাখ
কোন্ তূণে ॥

চতুর্থ দৃশ্য

প্রকাশ

গুহাদ্বার

দেখ্ দেখি ভাই, আবার আমাদের ফেলে রেখে চন্দ্রহাস কোথায় গেল।

ওকে কি ধরে রাখবার জো আছে।

বসে বিশ্রাম করি আমরা, ও চ'লে বিশ্রাম করে।

অন্ধ বাউলকে নিয়ে সে নদীর ওপারে চলে গেছে।

আর কিছু নয়, ওই অন্ধের অন্ধতার মধ্যে সেঁধিয়ে গিয়ে তবে ও ছাড়বে।

তাই আমাদের সর্দার ওকে ডুবুরি বলে।

চন্দ্রহাস একটু সরে গেলেই আর আমাদের খেলার রস থাকে না।

ও কাছে থাকলে মনে হয় কিছু হোক বা না হোক তবু মজা আছে। এমন-কি বিপদের আশঙ্কা থাকলে মনে হয় সে আরও বেশি মজা।

আজ এই রাত্রে ওর জন্যে মনটা কেমন করছে।

দেখছিস এখানকার হাওয়াটা কেমনতরো?

এখানে আকাশটা যেন যাবার বেলাকার বন্ধুর মতো মুখের দিকে তাকিয়ে আছে।

যারা সেখানে বলছিল চল্ চল্, তারা এখানে বলছে যাই যাই।

কথাটা একই, সুরটা আলাদা।

মনটার ভিতরে কেমন ব্যথা দিচ্ছে, তবু লাগছে ভালো।

ঝাউগাছের বীথিকার ভিতর দিয়ে কোথা থেকে এই একটা নদীর স্রোত চলে আসছে, এ যেন কোন্ দুপুররাতের চোখের জল।

পৃথিবীর দিকে এমন করে কখনও আমরা দেখি নি।

ঊর্ধ্বশ্বাসে যখন সামনে ছুটি তখন সামনের দিকেই চোখ থাকে, চারপাশের দিকে নয়।

বিদায়ের বাঁশিতে যখন কোমল ধৈবত লাগে তখনই সকলের দিকে চোখ মেলি।

আর দেখি বড়ো মধুর। যদি সবাই চলে চলে না যেত তা হলে কি কোনো মাধুরী চোখে পড়ত।

চলার মধ্যে যদি কেবলই তেজ থাকত তা হলে যৌবন শুকিয়ে যেত। তার মধ্যে কান্না আছে তাই যৌবনকে সবুজ দেখি।

এই জায়গাটাতে এসে শুনতে পাচ্ছি জগৎটা কেবল পাব পাব বলছে না— সঙ্গে সঙ্গেই বলছে, ছাড়ব, ছাড়ব।

সৃষ্টির গোধূলিলগ্নে 'পাব'র সঙ্গে 'ছাড়ব'র বিয়ে হয়ে গেছে যে— তাদের মিল ভাঙলেই সব ভেঙে যাবে।

অন্ধ বাউল আমাদের এ কোন্ দেশে আনলে ভাই।

ওই তারাগুলোর দিকে তাকাচ্ছি আর মনে হচ্ছে, যুগে যুগে যাদের ফেলে এসেছি তাদের অনিমেষ দৃষ্টিতে সমস্ত রাত একেবারে ছেয়ে রয়েছে।

ফুলগুলোর মধ্যে কারা বলছে মনে রেখো, মনে রেখো, তাদের নাম তো মনে নেই কিন্তু মন যে উদাস হয়ে ওঠে।

একটা গান না গাইলে বুক ফেটে যাবে।

গান

তুই ফেলে এসেছিস কারে। (মন, মন রে আমার)
তাই জনম গেল, শান্তি পেলি না রে। (মন, মন রে আমার)
যে পথ দিয়ে চলে এলি
সে পথ এখন ভুলে গেলি,
কেমন করে ফিরবি তাহার দ্বারে। (মন, মন রে আমার)
নদীর জলে থাকি রে কান পেতে,
কাঁপে যে প্রাণ পাতার মর্মরেতে।
মনে হয় রে পাব খুঁজি
ফুলের ভাষা যদি বুঝি,
যে-পথ গেছে সন্ধ্যাতারার পারে॥ (মন, মন রে আমার)

এবার আমাদের বসন্ত-উৎসবে এ কী রকম সুর লাগছে।

এ যেন ঝরা পাতার সুর।

এতদিন বসন্ত তার চোখের জলটা আমাদের কাছে লুকিয়ে ছিল।

ভেবেছিল আমরা বুঝতে পারব না, আমরা যে যৌবনে দুরন্ত।

আমাদের কেবল হাসি দিয়ে ভুলোতে চেয়েছিল।

কিন্তু আজ আমরা আমাদের মনকে মজিয়ে নেব এই সমুদ্রপারের দীর্ঘনিশ্বাসে।

প্রিয়া এই পৃথিবী আমাদের প্রিয়া। এই সুন্দরী পৃথিবী। সে চাচ্ছে আমাদের যা আছে সমস্তই— আমাদের হাতের স্পর্শ, আমাদের হৃদয়ের গান—

চাচ্ছে যা আমাদের আপনার মধ্যে আপনার কাছ থেকেও লুকিয়ে আছে।

ও যে কিছু পায় কিছু পায় না, এইজন্যেই ওর কান্না। পেতে পেতেই সব হারিয়ে যায়।

ওগো পৃথিবী, তোমাকে আমরা ফাঁকি দেব না।

গান

আমি যাব না গো অমনি চলে।
মালা তোমার দেব গলে।
অনেক সুখে অনেক দুখে
তোমার বাণী নিলেম বুকে,
ফাগুন শেষে যাবার বেলা
আমার বাণী যাব বলে।
কিছু হল, অনেক বাকি ;
ক্ষমা আমায় করবে না কি।
গান এসেছে সুর আসে নাই
হল না যে শোনানো তাই,
সে-সুর আমার রইল ঢাকা
নয়নজলে নয়নজলে॥

ও ভাই, কে যেন গেল বোধ হচ্ছে।

আরে, গেল গেল গেল, এ ছাড়া আর তো কিছুই বোধ হচ্ছে না।

আমার গায়ের উপর কোন্ পথিকের কাপড় ঠেকে গেল।

নিয়ে চলো পথিক, নিয়ে চলো তোমার সঙ্গে, হাওয়া যেমন ফুলের গন্ধ নিয়ে যায়।

কাকে ধরে আনবার জন্যে বেরিয়েছিলুম কিন্তু ধরা দেবার জন্যেই মন আকুল হল।

বাউলের প্রবেশ

এই যে আমাদের বাউল। আমাদের এ কোথায় এনেছ, এখানে সমস্ত পথিক-জগতের নিশ্বাস আমাদের গায়ে লাগছে— সমস্ত তারাগুলোর।

আমরা খেলাচ্ছলে বেরিয়েছিলুম কিন্তু খেলাটা যে কী তা ভুলেই গেছি।

আমরা তাকেই ধরতে বেরিয়েছিলুম পৃথিবীর মধ্যে যে বুড়ো।

রাস্তায় সবাই বললে সে ভয়ংকর। সে কেবলমাত্র একটা মুণ্ড, একটা হাঁ যৌবনের চাঁদকে গিলে খাবার জন্যেই তার একমাত্র লোভ।

কিন্তু ভয় ভেঙে গেছে। মনের ভিতর বলছে সে যদি আমাকে চায় তবে আমিও বসে থাকব না। ফুল যাচ্ছে, পাতা যাচ্ছে, নদীর জল যাচ্ছে - তার পিছন পিছন আমিও যাব।

ও ভাই বাউল, তোমার একতারাতে একটা সুর লাগাও। রাত কত হল কে জানে। হয়তো বা ভোর হয়ে এল।

বাউলের গান

সবাই যারে সব দিতেছে
তার কাছে সব দিয়ে ফেলি।
কবার আগে চাবার আগে
আপনি আমায় দেব মেলি।
নেবার বেলা হলেম ঋণী,
ভিড় করেছি, ভয় করি নি,
এখনো ভয় করব না রে,
দেবার খেলা এবার খেলি।
প্রভাত তারি সোনা নিয়ে
বেরিয়ে পড়ে নেচে-কুঁদে।
সন্ধ্যা তারে প্রণাম করে
সব সোনা তার দেয় রে শুধে।
ফোটা ফুলের আনন্দ রে
ঝরা ফুলেই ফলে ধরে,
আপনাকে ভাই ফুরিয়ে দেওয়া
চুকিয়ে দে তুই বেলাবেলি॥

ওহে বাউল, চন্দ্রহাস এখনও এল না কেন।

বাউল। সে যে গেছে, তা জানো না?

গেছে? কোথায় গেছে।

বাউল। সে বললে, আমি তাকে জয় করে আনব।

কাকে।

বাউল। যাকে সবাই ভয় করে। সে বললে, নইলে আমার কিসের যৌবন।

বাঃ এ তো বেশ কথা! দাদা গেল পাড়ার লোককে চৌপদী শোনাতে, আর চন্দ্রহাস কোথায় গেল ঠিকানাই নেই!

বাউল। সে বললে, যুগে যুগে মানুষ লড়াই করেছে, আজ বসন্তের হাওয়ায় তারি ঢেউ।

তারি ঢেউ?

বাউল। হাঁ। খবর এসেছে মানুষের লড়াই শেষ হয় নি।

বসন্তের এই কি খবর।

বাউল। যারা ম'রে অমর, বসন্তের কচি পাতায় তারাই পত্র পাঠিয়েছে। দিগ্‌দিগন্তে তারা রটাচ্ছে— "আমরা পথের বিচার করি নি— আমরা পাথেয়ের হিসাব রাখি নি— আমরা ছুটে এসেছি, আমরা ফুটে বেরিয়েছি। আমরা যদি ভাবতে বসতুম তা হলে বসন্তের দশা কী হত।"

চন্দ্রহাস তাই বুঝি খেপে উঠেছে?

বাউল। সে বললে—

গান

বসন্তে ফুল গাঁথল আমার
জয়ের মালা।
বইল প্রাণে দখিন হাওয়া
আগুন-জ্বালা।
পিছের বাঁশি কোণের ঘরে
মিছে রে ঐ কেঁদে মরে,
মরণ এবার আনল আমার
বরণ-ডালা।
যৌবনেরি ঝড় উঠেছে
আকাশ পাতালে।
নাচের তালের ঝংকারে তা'র
আমায় মাতালে।
কুড়িয়ে নেবার ঘুচল পেশা,
উড়িয়ে দেবার লাগল নেশা,
আরাম বলে, "এল আমার
যাবার পালা।"

কিন্তু সে গেল কোথায়।

বাউল। সে বললে, আমি পথ চেয়ে চুপ করে বসে থাকতে পারব না। আমি এগিয়ে গিয়ে ধরব। আমি জয় করে আনব।

কিন্তু গেল কোন্ দিকে।

বাউল। সেই গুহার মধ্যে চলে গেছে।

সে কী কথা। সে যে ঘোর অন্ধকার।

কোনো খবর না নিয়েই একেবারে—

বাউল। সে নিজেই খবর নিতে গেছে।

ফিরবে কখন।

তুইও যেমন! সে কি আর ফিরবে।

কিন্তু চন্দ্রহাস গেলে আমাদের জীবনের রইল কী।

আমাদের সর্দারের কাছে কী জবাব দেব।

এবার সর্দারও আমাদের ছাড়বে।

যাবার সময় আমাদের কী বলে গেল সে।

বাউল। বললে, আমার জন্যে অপেক্ষা ক'রো, আমি আবার ফিরে আসব।

ফিরে আসবে? কেমন করে জানব।

বাউল। সে তো বললে, আমি জয়ী হয়ে ফিরে আসব।

তা হলে আমরা সমস্ত রাত অপেক্ষা করে থাকব।

বাউল, কোথায় আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।

বাউল। এই-যে গুহার ভিতর থেকে নদীর জল বেরিয়ে আসছে এরই মুখের কাছে।

ওই গুহায় কোন্ রাস্তা দিয়ে গেল। ওখানে যে কালো থাঁড়ার মতো অন্ধকার।

বাউল। রাত্রের পাখিগুলোর ডানার শব্দ ধ'রে গেছে।

তুমি সঙ্গে গেলে না কেন।

বাউল। আমাকে তোমাদের আশ্বাস দেবার জন্যে রেখে গেল।

কখন গেছে বলো তো।

বাউল। অনেকক্ষণ— রাতের প্রথম প্রহরেই।

এখন বোধ হয় তিন প্রহর পেরিয়ে গেছে। কেমন একটা ঠাণ্ডা হাওয়া দিয়েছে— গা সির্ সির্ করছে।

দেখ্ ভাই, স্বপ্ন দেখেছি যেন তিন জন মেয়েমানুষ চুল এলিয়ে দিয়ে—

তোর স্বপ্নের কথা রেখে দে। ভালো লাগছে না।

সব লক্ষণগুলো কেমন খারাপ ঠেকছে।

পেঁচাটা ডাকছিল, এতক্ষণ কিছু মনে হয় নি— কিন্তু—

মাঠের ওপারে কুকুরটা কী রকম বিশ্রী সুরে চেঁচাচ্ছে শুনছিস!

ঠিক যেন তার পিঠের উপর ডাইনি সওয়ার হয়ে তাকে চাবকাচ্ছে।

যদি ফেরবার হত চন্দ্রহাস এতক্ষণে ফিরত।

রাতটা কেটে গেলে বাঁচা যায়।

শোন্ রে ভাই, ওই মেয়েমানুষের কান্না!

ওরা তো কাঁদছেই – কেবল কাঁদছেই, অথচ কাউকে ধরে রাখতে পারছে না।

নাঃ আর পারা যায় না— চুপ করে বসে থাকলেই যত কুলক্ষণ দেখা যায়।

চল্ আমরাও যাই— পথ চললেই ভয় থাকে না।

পথ দেখাবে কে।

ওই যে বাউল আছে।

কী হে, তুমি পথ দেখাতে পারো?

বাউল। পারি।

বিশ্বাস করতে সাহস হয় না। তুমি চোখে না দেখে পথ বের কর শুধু গান গেয়ে?

তুমি চন্দ্রহাসকে কী রাস্তা দেখিয়ে দিলে। যদি সে ফিরে আসে তবে তোমাকে বিশ্বাস করব।

ফিরে যদি না আসে তা হলে কিন্তু—

চন্দ্রহাসকে যে আমরা এত ভালোবাসতুম তা জানতুম না।

এতদিন ওকে নিয়ে আমরা যা-খুশি তাই করেছি।

যখন খেলি তখন খেলাটাই হয় বড়ো, যার সঙ্গে খেলি তাকে নজর করি নে।

এবার যদি সে ফেরে, তাকে মুহূর্তের জন্যে অনাদর করব না।

আমার মনে হচ্ছে আমরা কেবলই তাকে দুঃখ দিয়েছি।

তার ভালোবাসা সব দুঃখকে ছাড়িয়ে উঠেছিল।

সে যে কী সুন্দর ছিল যখন তাকে চোখে দেখলুম তখন সেটা চোখে পড়ে নি।

গান

চোখের আলোয় দেখেছিলেম
চোখের বাহিরে।
অন্তরে আজ দেখব, যখন
আলোক নাহি রে।

ধরায় যখন দাও না ধরা
হৃদয় তখন তোমায় ভরা,
এখন তোমার আপন আলোয়
তোমায় চাহি রে।
তোমায় নিয়ে খেলেছিলেম
খেলার ঘরেতে।
খেলার পুতুল ভেঙে গেছে
প্রলয় ঝড়েতে।
থাক্ তবে সেই কেবল খেলা,
হোক না এখন প্রাণের মেলা—
তারের বীণা ভাঙল, হৃদয়-
বীণায় গাহি রে॥

ওই বাউলটা চুপ করে বসে থাকে, কথা কয় না, ভালো লাগছে না।

ও কেমন যেন একটা অলক্ষণ।

যেন কালবৈশাখীর প্রথম মেঘ।

দাও ভাই দাও, ওকে বিদায় করে দাও।

না, না, ও বসে আছে তবু একটা ভরসা আছে।

দেখছ না ওর মুখে কিচ্ছু ভয় নেই।

মনে হচ্ছে ওর কপালে যেন কী সব খবর আসছে।

ওর সমস্ত গা যেন অনেক দূরের কাকে দেখতে পাচ্ছে। ওর আঙুলের আগায় চোখ ছড়িয়ে আছে।

ওকে দেখলেই বুঝতে পারি কে আসছে অন্ধকারের ভিতর দিয়ে পথ করে।

ওই দেখো জোড়হাত করে উঠে দাঁড়িয়েছে।

পুবের দিকে মুখ করে কাকে প্রণাম করছে।

ওখানে তো কিচ্ছুই নেই— একটু আলোর রেখাও না।

একবার জিজ্ঞাসাই করো না, ও কী দেখছে— কাকে দেখছে।

না, না, এখন ওকে কিছু বোলো না।

আমার কী মনে হচ্ছে জান? যেন ওর মধ্যে সকাল হয়েছে।

যেন ওর ভুরুর মাঝখানে অরুণের আলো খেয়া-নৌকোটির মতো এসে ঠেকেছে।

ওর মনটা ভোরবেলাকার আকাশের মতো চুপ।

এখনই যেন পাখির গানের ঝড় উঠবে— তার আগে সমস্ত থম্‌থমে।

ওই-যে একটু একটু একতারাতে ঝংকার দিচ্ছে, ওর মন গান গাচ্ছে

চুপ করো চুপ করো, ওই গান ধরেছে।

বাউলের গান

হবে জয়, হবে জয়, হবে জয় রে
ওহে বীর, হে নির্ভয়।
জয়ী প্রাণ, চিরপ্রাণ,
জয়ী রে আনন্দগান,
জয়ী প্রেম, জয়ী ক্ষেম,
জয়ী জ্যোতির্ময় রে।
এ আঁধার হবে ক্ষয়, হবে ক্ষয় রে,
ওহে বীর, হে নির্ভয়।
ছাড়ো ঘুম, মেলো চোখ,
অবসাদ দূর হোক,
আশার অরুণালোক
হোক অভ্যুদয় রে॥

ওই যে!

চন্দ্রহাস, চন্দ্রহাস!

রোস্ রোস্ ব্যস্ত হোস্ নে— এখনও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না।

না, ও চন্দ্রহাস ছাড়া আর কেউ হতে পারে না।

বাঁচলুম, বাঁচলুম।

এসো এসো চন্দ্রহাস।

এতক্ষণ আমাদের ছেড়ে কী করলে ভাই বলো।

যাকে ধরতে গিয়েছিলে তাকে ধরতে পেরেছ?

চন্দ্রহাস। ধরেছি, তাকে ধরেছি।

কই তাকে তো দেখছি নে।

চন্দ্রহাস। সে আসছে— এখনই আসছে।

কী তুমি দেখলে আমাকে বলো ভাই।

চন্দ্রহাস। সে তো আমি বলতে পারব না।

কেন।

চন্দ্রহাস। সে তো আমি চোখ দিয়ে দেখি নি।

তবে?

চন্দ্রহাস। আমার সব দিয়ে দেখেছিলুম।

তা হোক না, বলো না ভাই।

চন্দ্রহাস। আমার সমস্ত দেহ মন যদি কণ্ঠ হত বলতে পারত।

কাকে তুমি ধরেছ তাও কি বুঝতে পারলে না।

জগতের সেই বিরাট বুড়োটাকে?

যে-বুড়োটা অগস্ত্যের মতো পৃথিবীর যৌবনসমুদ্র শুষে খেতে চায়?

সেই যে ভয়ংকর? যে অন্ধকারের মতো? যার বুকে চোখ?

যার পা উলটো দিকে? যে পিছনে হেঁটে চলে?

নরমুণ্ড যার গলায়? শ্মশানে যার বাস?

চন্দ্রহাস। আমি তো বলতে পারি নে। সে আসছে এখনই তাকে দেখতে পাব।

ভাই বাউল, তুমি দেখেছ তাকে?

বাউল। হাঁ, এই তো দেখছি।

কই।

বাউল। এই যে।

ওই যে বেরিয়ে এল, এল।

ওই-যে কে গুহা থেকে বেরিয়ে এল।

আশ্চর্য! আশ্চর্য!

চন্দ্রহাস। এ কী, এ যে তুমি!

তুমি! সেই আমাদের সর্দার!

আমাদের সর্দার রে!

বুড়ো কোথায়।

সর্দার। কোথাও তো নেই।

কোথাও না?

সর্দার। না।

তবে সে কী।

সর্দার। সে স্বপ্ন।

চন্দ্রহাস। তবে তুমিই চিরকালের ?

সর্দার। হাঁ।

চন্দ্রহাস। আর আমরাই চিরকালের ?

সর্দার। হাঁ।

পিছন থেকে যারা তোমাকে দেখলে তারা যে তোমাকে কত লোকে কত রকম মনে করলে তার ঠিক নেই।

সেই ধুলোর ভিতর থেকে আমরা তো তোমাকে চিনতে পারি নি।

তখন তোমাকে হঠাৎ বুড়ো বলে মনে হল।

তার পর গুহার মধ্যে থেকে বেরিয়ে এলে। এখন মনে হচ্ছে যেন তুমি বালক।

যেন তোমাকে এই প্রথম দেখলুম।

চন্দ্রহাস। এ তো বড়ো আশ্চর্য! তুমি বারে বারেই প্রথম, তুমি ফিরে ফিরেই প্রথম!

ভাই চন্দ্রহাস, তোমারই হার হল। বুড়োকে ধরতে পারলে না।

চন্দ্রহাস। আর দেরি না— এবার উৎসব শুরু হোক। সূর্য উঠেছে।

ভাই বাউল, তুমি যদি অমন চুপ করে থাক তা হলে মূর্ছিত হয়ে পড়বে। একটা গান ধরো।

বাউলের গান

তোমায় নতুন করেই পাব বলে
হারাই ক্ষণে ক্ষণ
ও মোর ভালোবাসার ধন।
দেখা দেবে বলে তুমি
হও যে অদর্শন
ও মোর ভালোবাসার ধন।

ও গো তুমি আমার নও আড়ালের,
তুমি আমার চিরকালের,
ক্ষণকালের লীলার স্রোতে
হও যে নিমগন
ও মোর ভালোবাসার ধন।

আমি তোমায় যখন খুঁজে ফিরি
ভয়ে কাঁপে মন
প্রেমে আমার ঢেউ লাগে তখন।

তোমার শেষ নাহি, তাই শূন্য সেজে
শেষ করে দাও আপনাকে যে,
ঐ হাসি রে দেয় ধুয়ে মোর
বিরহের রোদন
ও মোর ভালোবাসার ধন॥

ওই যে গুন গুন শব্দ শোনা যাচ্ছে।

শুনছি বটে।

ও তো মধুকরের দল নয়, পাড়ার লোক।

তা হলে দাদা আসছে চৌপদী নিয়ে।

দাদা। সর্দার নাকি।

সর্দার। কী দাদা।

দাদা। ভালোই হয়েছে। চৌপদীগুলো শুনিয়ে দিই।

না, না, গুলো নয়, গুলো নয়। একটা।

দাদা। আচ্ছা ভাই, ভয় নেই, একটাই হবে।

সূর্য এল পূর্বদ্বারে তূর্য বাজে তার।
রাত্রি বলে, ব্যর্থ নহে এ মৃত্যু আমার,
এত বলি' পদপ্রান্তে করে নমস্কার।
ভিক্ষাঝুলি স্বর্ণে ভরি গেল অন্ধকার॥

অর্থাৎ—

আবার অর্থাৎ!

না, এখানে অর্থাৎ চলবে না।

দাদা। এর মানে—

না, মানে না। মানে বুঝব না এই আমাদের প্রতিজ্ঞা।

দাদা। এমন মরিয়া হয়ে উঠলে কেন।

আজ আমাদের উৎসব।

দাদা। উৎসব নাকি। তা হলে আমি পাড়ায়—

চন্দ্রহাস। না, তোমাকে পাড়ায় যেতে দিচ্ছি নে।

দাদা। আমাকে দরকার আছে না কি।

আছে।

দাদা। আমার চৌপদী—

চন্দ্রহাস। তোমার চৌপদীকে আমরা এমনি রাঙিয়ে দেব যে তার অর্থ আছে কি না আছে বোঝা দায় হবে।

সুতরাং অর্থ না থাকলে মানুষের যে দশা হয় তোমার তাই হবে।

অর্থাৎ পাড়ার লোকে তোমাকে ত্যাগ করবে।

কোটাল তোমাকে বলবে অবোধ।

পণ্ডিত বলবে অর্বাচীন।

ঘরের লোক বলবে অনাবশ্যক।

বাইরের লোক বলবে অদ্ভুত।

চন্দ্রহাস। আমরা তোমার মাথায় পরাব নব পল্লবের মুকুট।

তোমার গলায় পরাব নব মল্লিকার মালা।

পৃথিবীতে এই আমরা ছাড়া আর কেউ তোমার আদর বুঝবে না।

সকলে মিলিয়া

উৎসবের গান

আয় রে তবে মাত্ রে সবে আনন্দে
আজ নবীন প্রাণের বসন্তে।
পিছনপানের বাঁধন হতে
চল্ ছুটে আজ বন্যাস্রোতে,
আপনাকে আজ দখিন হাওয়ায়
ছড়িয়ে দে রে দিগন্তে,
আজ নবীন প্রাণের বসন্তে।

বাঁধন যত ছিন্ন করো আনন্দে
আজ নবীন প্রাণের বসন্তে।

অকূল প্রাণের সাগর-তীরে
ভয় কী রে তোর ক্ষয়-ক্ষতিরে
যা আছে রে সব নিয়ে তোর
ঝাঁপ দিয়ে পড়্ অনন্তে
আজ নবীন প্রাণের বসন্তে ॥

২০ ফাল্গুন, ১৩২১

উপন্যাস ও গল্প

মালঞ্চ

মালঞ্চ

১

পিঠের দিকে বালিশগুলো উঁচু-করা। নীরজা আধ-শোওয়া পড়ে আছে রোগশয্যায়। পায়ের উপরে সাদা রেশমের চাদর টানা, যেন তৃতীয়ার ফিকে জ্যোৎস্না হালকা মেঘের তলায়। ফ্যাকাশে তার শাঁখের মতো রং, ঢিলে হয়ে পড়েছে চুড়ি, রোগা হাতে নীল শিরার রেখা, ঘনপক্ষ্ম চোখের পল্লবে লেগেছে রোগের কালিমা।

মেঝে সাদা মারবেলে বাঁধানো, দেয়ালে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ছবি, ঘরে পালঙ্ক, একটি টিপাই, দুটি বেতের মোড়া আর এক কোণে কাপড় ঝোলাবার আলনা ছাড়া অন্য কোনো আসবাব নেই ; এক কোণে পিতলের কলসিতে রজনীগন্ধার গুচ্ছ, তারই মৃদু গন্ধ বাঁধা পড়েছে ঘরের বন্ধ হাওয়ায়।

পুবদিকে জানলা খোলা। দেখা যায় নিচের বাগানে অরকিডের ঘর, ছিটে বেড়ায় তৈরি ; বেড়ার গায়ে গায়ে অপরাজিতার লতা। অদূরে ঝিলের ধারে পাম্প চলছে, জল কুলকুল করে বয়ে যায় নালায় নালায়, ফুলগাছের কেয়ারির ধারে ধারে। গন্ধনিবিড় আমবাগানে কোকিল ডাকছে যেন মরিয়া হয়ে।

বাগানের দেউড়িতে ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজল বেলা দুপুরের। ঝাঁ ঝাঁ রৌদ্রের সঙ্গে তার সুরের মিল। তিনটে পর্যন্ত মালীদের ছুটি। ওই ঘণ্টার শব্দে নীরজার বুকের ভিতরটা ব্যথিয়ে উঠল, উদাস হয়ে গেল তার মন। আয়া এল দরজা বন্ধ করতে। নীরু বললে, না না থাক্। চেয়ে রইল যেখানে ছড়াছড়ি যাচ্ছে রৌদ্র-ছায়া গাছগুলোর তলায় তলায়।

ফুলের ব্যবসায়ে নাম করেছে তার স্বামী আদিত্য। বিবাহের পরদিন থেকে নীরজার ভালোবাসা আর তার স্বামীর ভালোবাসা নানা ধারায় এসে মিলেছে এই বাগানের নানা সেবায় নানা কাজে। এখানকার ফুলে পল্লবে দুজনের সম্মিলিত আনন্দ নব নব রূপ নিয়েছে নব নব সৌন্দর্যে। বিশেষ বিশেষ ডাক আসবার দিনে বন্ধুদের কাছ থেকে প্রবাসী যেমন অপেক্ষা করে চিঠির, ঋতুতে ঋতুতে তেমনই ওরা অপেক্ষা করেছে ভিন্ন ভিন্ন গাছের পুঞ্জিত অভ্যর্থনার জন্যে।

আজ কেবল নীরজার মনে পড়ছে সেইদিনকার ছবি। বেশি দিনের কথা নয়, তবু মনে হয় যেন একটা তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে যুগান্তরের ইতিহাস। বাগানের

পশ্চিমধারে প্রাচীন মহানিম গাছ। তারই জুড়ি আরও একটা নিমগাছ ছিল; সেটা কবে জীর্ণ হয়ে পড়ে গেছে; তারই গুঁড়িটাকে সমান করে কেটে নিয়ে বানিয়েছে একটা ছোটো টেবিল। সেইখানেই ভোরবেলায় চা খেয়ে নিত দুজনে, গাছের ফাঁকে ফাঁকে সবুজডালে-ছাঁকা রৌদ্র এসে পড়ত পায়ের কাছে; শালিখ কাঠবিড়ালি হাজির হত প্রসাদপ্রার্থী। তার পরে দোঁহে মিলে চলত বাগানের নানা কাজ। নীরজার মাথার উপরে একটা ফুলকাটা রেশমের ছাতি, আর আদিত্যর মাথায় সোলার টুপি, কোমরে ডাল-ছাঁটা কাঁচি। বন্ধুবান্ধবরা দেখা করতে এলে বাগানের কাজের সঙ্গে মিলিত হত লৌকিকতা। বন্ধুদের মুখে প্রায় শোনা যেত,— "সত্যি বলছি ভাই, তোমার ডালিয়া দেখে হিংসে হয়।" কেউ বা আনাড়ির মতো জিজ্ঞাসা করেছে, "ওগুলো কি সূর্যমুখী।" নীরজা ভারি খুশি হয়ে হেসে উত্তর করেছে, "না না, ও তো গাঁদা।" একজন বিষয়বুদ্ধিপ্রবীণ একদা বলেছিল— "এতবড়ো মোতিয়া বেল কেমন করে জন্মালেন, নীরজা দেবী। আপনার হাতে জাদু আছে। এ যেন টগর!" সমজদারের পুরস্কার মিলল; হলা মালীর ভ্রূকুটি উৎপাদন করে পাঁচটা টবসুদ্ধ সে নিয়ে গেছে বেলফুলের গাছ। কতদিন মুগ্ধ বন্ধুদের নিয়ে চলত কুঞ্জপরিক্রম, ফুলের বাগান, ফলের বাগান, সবজির বাগানে। বিদায়কালে নীরজা ঝুড়িতে ভরে দিত গোলাপ, ম্যাগনোলিয়া, কারনেশন,— তার সঙ্গে পেঁপে, কাগজিলেবু, কয়েতবেল,— ওদের বাগানের ডাকসাইটে কয়েতবেল। যথাঋতুতে সব-শেষে আসত ডাবের জল। তৃষিতেরা বলত, "কী মিষ্টি জল।" উত্তরে শুনত, "আমার বাগানের গাছের ডাব।" সবাই বলত, "ওঃ, তাই তো বলি।"

সেই ভোরবেলাকার গাছতলায় দার্জিলিং চায়ের বাষ্পে-মেশা নানা ঋতুর গন্ধস্মৃতি দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে মিলে হায় হায় করে ওর মনে। সেই সোনার রঙে রঙিন দিনগুলোকে ছিঁড়ে ফিরিয়ে আনতে চায় কোন্ দস্যুর কাছ থেকে। বিদ্রোহী মন কাউকে সামনে পায় না কেন। ভালোমানুষের মতো মাথা হেঁট ক'রে ভাগ্যকে মেনে নেবার মেয়ে নয় ও তো। এর জন্যে কে দায়ী। কোন্ বিশ্বব্যাপী ছেলেমানুষ। কোন্ বিরাট পাগল। এমন সম্পূর্ণ সৃষ্টিটাকে এতবড়ো নিরর্থকভাবে উলটপালট করে দিতে পারলে কে।

বিবাহের পর দশটা বছর একটানা চলে গেল অবিমিশ্র সুখে। মনে মনে ঈর্ষা করেছে সখীরা; মনে করেছে ওর যা বাজারদর তার চেয়ে ও অনেক বেশি পেয়েছে। পুরুষ বন্ধুরা আদিত্যকে বলেছে, 'লাকি ডগ।'

নীরজার সংসার-সুখের পালের নৌকো প্রথম যে-ব্যাপার নিয়ে ধস্ করে একদিন তলায় ঠেকল সে ওদের 'ডলি' কুকুর-ঘটিত। গৃহিণী এ সংসারে আসবার পূর্বেই ডলিই

ছিল স্বামীর একলা ঘরের সঙ্গিনী। অবশেষে তার নিষ্ঠা বিভক্ত হল দম্পতির মধ্যে। ভাগে বেশি পড়েছিল নীরজার দিকেই। দরজার কাছে গাড়ি আসতে দেখলেই কুকুরটার মন যেত বিগড়িয়ে। ঘন ঘন লেজ আন্দোলনে আসন্ন রথযাত্রার বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করত। অনিমন্ত্রণে গাড়ির মধ্যে লাফিয়ে ওঠবার দুঃসাহস নিরস্ত হত স্বামিনীর তর্জনী সংকেতে। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে লেজের কুণ্ডলীর মধ্যে নৈরাশ্যকে বেষ্টিত করে দ্বারের কাছে পড়ে থাকত। ওদের ফেরবার দেরি হলে মুখ তুলে বাতাস ঘ্রাণ করে করে ঘুরে বেড়াত, কুকুরের অব্যক্ত ভাষায় আকাশে উচ্ছ্বসিত করত করুণ প্রশ্ন। অবশেষে এই কুকুরকে হঠাৎ কী রোগে ধরলে, শেষ পর্যন্ত ওদের মুখের দিকে কাতর দৃষ্টি স্তব্ধ রেখে নীরজার কোলে মাথা দিয়ে মারা গেল।

নীরজার ভালোবাসার ছিল প্রচণ্ড জেদ। সেই ভালোবাসার বিরুদ্ধে বিধাতারও হস্তক্ষেপ তার কল্পনার অতীত। এতদিন অনুকূল সংসারকে সে নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করেছে। আজ পর্যন্ত বিশ্বাস নড়বার কারণ ঘটে নি। কিন্তু আজ ডলির পক্ষেও যখন মরা অভাবনীয়রূপে সম্ভবপর হল তখন ওর দুর্গের প্রাচীরে প্রথম ছিদ্র দেখা দিল। মনে হল এটা অলক্ষণের প্রথম প্রবেশদ্বার। মনে হল বিশ্বসংসারের কর্মকর্তা অব্যবস্থিতচিত্ত— তাঁর আপাতপ্রত্যক্ষ প্রসাদের উপরেও আর আস্থা রাখা চলে না।

নীরজার সন্তান হবার আশা সবাই ছেড়ে দিয়েছিল। ওদের আশ্রিত গণেশের ছেলেটাকে নিয়ে যখন নীরজার প্রতিহত স্নেহবৃত্তির প্রবল আলোড়ন চলেছে, আর ছেলেটা যখন তার অশান্ত অভিঘাত আর সইতে পারছে না এমন সময় ঘটল সন্তান-সম্ভাবনা। ভিতরে ভিতরে মাতৃহৃদয় উঠল ভরে, ভাবীকালের দিগন্ত উঠল নব-জীবনের প্রভাত-আভায় রক্তিম হয়ে, গাছের তলায় বসে বসে আগন্তুকের জন্যে নানা অলংকরণে নীরজা লাগল সেলাইয়ের কাজে।

অবশেষে এল প্রসবের সময়। ধাত্রী বুঝতে পারলে আসন্ন সংকট। আদিত্য এত বেশি অস্থির হয়ে পড়ল যে ডাক্তার ভর্ৎসনা করে তাকে দূরে ঠেকিয়ে রাখলে। অস্ত্রাঘাত করতে হল, শিশুকে মেরে জননীকে বাঁচালে। তার পর থেকে নীরজা আর উঠতে পারলে না। বালুশয্যাশায়িনী বৈশাখের নদীর মতো তার স্বল্পরক্ত দেহ ক্লান্ত হয়ে রইল পড়ে। প্রাণশক্তির অজস্রতা একেবারেই হল নিঃস্ব। বিছানার সামনে জানলা খোলা, তপ্ত হাওয়ায় আসছে মুচকুন্দ ফুলের গন্ধ, কখনো বাতাবি ফুলের নিঃশ্বাস, যেন তার সেই পূর্বকালের দূরবর্তী বসন্তের দিন মৃদুকণ্ঠে তাকে জিজ্ঞাসা করছে, "কেমন আছ।"

সকলের চেয়ে তাকে বাজল যখন দেখলে বাগানের কাজে সহযোগিতার জন্যে

আদিত্যের দূরসম্পর্কীয় বোন সরলাকে আনাতে হয়েছে। খোলা জানলা থেকে যখনই সে দেখে অভ্র ও রেশমের কাজ-করা একটা টোকা মাথায় সরলা বাগানের মালীদের খাটিয়ে বেড়াচ্ছে তখন নিজের অকর্মণ্য হাতপাগুলোকে সহ্য করতে পারত না। অথচ সুস্থ অবস্থায় এই সরলাকেই প্রত্যেক ঋতুতে নিমন্ত্রণ করে পাঠিয়েছে নতুন চারা রোপণের উৎসবে। ভোরবেলা থেকে কাজ চলত। তার পরে ঝিলে সাঁতার কেটে স্নান, তার পরে গাছের তলায় কলাপাতায় খাওয়া, একটা গ্রামোফোনে বাজত দিশি-বিদিশি সংগীত। মালীদের জুটত দই চিঁড়ে সন্দেশ। তেঁতুলতলা থেকে তাদের কলরব শোনা যেত। ক্রমে বেলা আসত নেমে, ঝিলের জল উঠত অপরাহ্ণের বাতাসে শিউরিয়ে, পাখি ডাকত বকুলের ডালে, আনন্দময় ক্লান্তিতে হত দিনের অবসান।

ওর মনের মধ্যে যে রস ছিল নিছক মিষ্ট, আজ কেন সে হয়ে গেল কটু; যেমন আজকালকার দুর্বল শরীরটা ওর অপরিচিত, তেমনই এখনকার তীব্র নীরস স্বভাবটাও ওর চেনা স্বভাব নয়। সে স্বভাবে কোনো দাক্ষিণ্য নেই। এক-একবার এই দারিদ্র্য ওর কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে, লজ্জা জাগে মনে, তবু কোনোমতে সামলাতে পারে না। ভয় হয়, আদিত্যের কাছে এই হীনতা ধরা পড়ছে বুঝি, কোন্‌দিন হয়তো সে প্রত্যক্ষ দেখবে নীরজার আজকালকার মনখানা বাদুড়ের চঞ্চুক্ষত ফলের মতো, ভদ্র-প্রয়োজনের অযোগ্য।

বাজল দুপুরের ঘণ্টা। মালীরা গেল চলে। সমস্ত বাগানটা নির্জন। নীরজা দূরের দিকে তাকিয়ে রইল, যেখানে দুরাশার মরীচিকাও আভাস দেয় না, যেখানে ছায়াহীন রৌদ্রে শূন্যতার পরে শূন্যতার অনুবৃত্তি।

২

নীরজা ডাকল, "রোশনি!"

আয়া এল ঘরে। প্রৌঢ়া, কাঁচা-পাকা চুল, শক্ত হাতে মোটা পিতলের কঙ্কণ, ঘাঘরার উপরে ওড়না। মাংসবিরল দেহের ভঙ্গিতে ও শুষ্ক মুখের ভাবে একটা চিরস্থায়ী কঠিনতা। যেন ওর আদালতে এদের সংসারের প্রতিকূলে ও রায় দিতে বসেছে। মানুষ করেছে নীরজাকে, সমস্ত দরদ তার 'পরেই। তার কাছাকাছি যারা যায় আসে, এমন-কি নীরজার স্বামী পর্যন্ত, তাদের সকলেরই সম্বন্ধে ওর একটা সতর্ক বিরুদ্ধতা।

ঘরে এসে জিজ্ঞাসা করলে, "জল এনে দেব খোঁখী ?"

"না, বোস্।" মেঝের উপর হাঁটু উঁচু করে বসল আয়া।

নীরজার দরকার কথা কওয়া, তাই আয়াকে চাই। আয়া ওর স্বগত উক্তির বাহন।

নীরজা বললে, "আজ ভোরবেলায় দরজা খোলার শব্দ শুনলুম।"

আয়া কিছু বললে না; কিন্তু তার বিরক্ত মুখভাবের অর্থ এই যে, "কবে না শোনা যায়।"

নীরজা অনাবশ্যক প্রশ্ন করল, "সরলাকে নিয়ে বুঝি বাগানে গিয়েছিলেন ?"

কথাটা নিশ্চিত জানা, তবু রোজই একই প্রশ্ন। একবার হাত উলটিয়ে মুখ বাঁকিয়ে আয়া চুপ করে বসে রইল।

নীরজা বাইরের দিকে চেয়ে আপন মনে বলতে লাগল, "আমাকেও ভোরে জাগাতেন, আমিও যেতুম বাগানের কাজে, ঠিক ওই সময়েই। সে তো বেশিদিনের কথা নয়।"

এই আলোচনায় যোগ দেওয়া কেউ তার কাছে আশা করে না, তবু আয়া থাকতে পারলে না। বললে, "ওঁকে না নিলে বাগান বুঝি যেত শুকিয়ে ?"

নীরজা আপন মনে বলে চলল, "নিয়ু মার্কেটে ভোরবেলাকার ফুলের চালান না পাঠিয়ে আমার একদিনও কাটত না। সেইরকম ফুলের চালান আজও গিয়েছিল, গাড়ির শব্দ শুনেছি। আজকাল চালান কে দেখে দেয় রোশনি।"

এই জানা কথার কোনো উত্তর করল না আয়া, ঠোঁট চেপে রইল বসে।

নীরজা আয়াকে বললে, "আর যাই হোক, আমি যতদিন ছিলুম মালীরা ফাঁকি দিতে পারে নি।"

আয়া উঠল গুমরিয়ে, বললে, "সেদিন নেই, এখন লুঠ চলছে দু হাতে।"

"সত্যি নাকি।"

"আমি কি মিথ্যা বলছি। কলকাতার নতুনবাজারে ক'টা ফুলই বা পৌঁছয়। জামাইবাবু বেরিয়ে গেলেই খিড়কির দরজায় মালীদের ফুলের বাজার বসে যায়।"

"এরা কেউ দেখে না ?"

"দেখবার গরজ এত কার।"

"জামাইবাবুকে বলিস নে কেন।"

"আমি বলবার কে। মান বাঁচিয়ে চলতে হবে তো ? তুমি বল না কেন। তোমারই তো সব।"

"হোক না, হোক না, বেশ তো। চলুক না এমনই কিছুদিন, তার পরে যখন ছারখার হয়ে আসবে আপনি পড়বে ধরা। একদিন বোঝবার সময় আসবে, মায়ের চেয়ে সৎমায়ের ভালোবাসা বড়ো নয়। চুপ করে থাক না।"

"কিন্তু তাও বলি খোখী, তোমার ওই হলা মালীটাকে দিয়ে কোনো কাজ পাওয়া যায় না।"

হলার কাজে ঔদাসীন্যই যে আয়ার একমাত্র বিরক্তির কারণ তা নয়, ওর উপরে নীরজার স্নেহ অসংগতরূপে বেড়ে উঠছে, এই কারণটাই সবচেয়ে গুরুতর।

নীরজা বললে, "মালীকে দোষ দিই নে। নতুন মনিবকে সইতে পারবে কেন। ওদের হল সাতপুরুষে মালীগিরি, আর তোমার দিদিমণির বইপড়া বিদ্যে, হুকুম করতে এলে সে কি মানায়। হলা ছিষ্টিছাড়া আইন মানতে চায় না, আমার কাছে এসে নালিশ করে। আমি বলি কানে আনিস নে কথা, চুপ করে থাক্।"

"সেদিন জামাইবাবু ওকে ছাড়িয়ে দিতে গিয়েছিল।"

"কেন, কী জন্যে।"

"ও বসে বসে বিড়ি টানছে, আর ওর সামনে বাইরের গোরু এসে গাছ খাচ্ছে। জামাইবাবু বললে, 'গোরু তাড়াস নে কেন।' ও মুখের উপর জবাব করলে, 'আমি তাড়াব গোরু! গোরুই তো তাড়া করে আমাকে। আমার প্রাণের ভয় নেই!'"

শুনে হাসলে নীরজা, বললে, "ওর ওইরকম কথা। তা যাই হোক, ও আমার আপন হাতে তৈরি।"

"জামাইবাবু তোমার খাতিরেই তো ওকে সয়ে যায়, তা গোরুই ঢুকুক আর গণ্ডারই তাড়া করুক। এতটা আবদার ভালো নয়, তাও বলি।"

"চুপ কর্ রোশনি। কী দুঃখে ও গোরু তাড়ায় নি সে কি আমি বুঝি নে। ওর আগুন জ্বলছে বুকে। ওই যে হলা মাথায় গামছা দিয়ে কোথায় চলেছে। ডাক্ তো ওকে।"

আয়ার ডাকে হলধর মালী এল ঘরে। নীরজা জিজ্ঞাসা করলে, "কী রে, আজকাল নতুন ফরমাশ কিছু আছে?"

হলা বললে, "আছে বই-কি। শুনে হাসিও পায়, চোখে জলও আসে।"

"কী রকম, শুনি।"

"ওই-যে সামনে মল্লিকদের পুরোনো বাড়ি ভাঙা হচ্ছে, ওইখান থেকে ইটপাটকেল নিয়ে এসে গাছের তলায় বিছিয়ে দিতে হবে। এই হল ওঁর হুকুম।

আমি বললুম, রোদের বেলায় গরম লাগবে গাছের। কান দেয় না আমার কথায়।"

"বাবুকে বলিস নে কেন।"

"বাবুকে বলেছিলেম। বাবু ধমক দিয়ে বলে, চুপ করে থাক্। বউদিদি, ছুটি দাও আমাকে, সহ্য হয় না আমার।"

"তাই দেখেছি বটে, ঝুড়ি করে রাবিশ বয়ে আনছিলি।"

"বউদিদি, তুমি আমার চিরকালের মনিব। তোমারই চোখের সামনে আমার মাথা হেঁট করে দিলে। দেশের লোকের কাছে আমার জাত যাবে। আমি কি কুলিমজুর।"

"আচ্ছা, এখন যা। তোদের দিদিমণি যখন তোকে ইঁটসুরকি বইতে বলবে আমার নাম করে বলিস আমি বারণ করেছি। দাঁড়িয়ে রইলি যে ?"

"দেশ থেকে চিঠি এসেছে বড়ো হালের গোরুটা মারা গেছে।" ব'লে মাথা চুলকতে লাগল।

নীরজা বললে, "না, মারা যায় নি, দিব্যি বেঁচে আছে। নে দুটো টাকা, আর বেশি বকিস নে।" এই বলে টিপাইয়ের উপরকার পিতলের বাক্স থেকে টাকা বের করে দিলে।

"আবার কী।"

"বউয়ের জন্যে একখানা পুরোনো কাপড়। জয়জয়কার হবে তোমার।" এই বলে পানের ছোপে কালো-বর্ণ মুখ প্রসারিত করে হাসলে।

নীরজা বললে, "রোশনি, দে তো ওকে আলনার ওই কাপড়খানা।"

রোশনি সবলে মাথা নেড়ে বললে, "সে কী কথা, ও যে তোমার ঢাকাই শাড়ি !"

"হোক না ঢাকাই শাড়ি। আমার কাছে আজ সব শাড়িই সমান। কবেই বা আর পরব।"

রোশনি দৃঢ়মুখ করে বললে, "না, সে হবে না। ওকে তোমার সেই লালপেড়ে কলের কাপড়টা দেব। দেখ্, হলা, খোঁখীকে যদি এমনি জালাতন করিস বাবুকে বলে তোকে দূর করে তাড়িয়ে দেব।"

হলা নীরজার পা ধরে কান্নার সুরে বললে, "আমার কপাল ভেঙেছে বউদিদি।"

"কেন রে, কী হয়েছে তোর।"

"আয়াজিকে মাসি বলি আমি। আমার মা নেই, এতদিন জানতেম হতভাগা হলাকে আয়াজি ভালোবাসেন। আজ বউদিদি, তোমার যদি দয়া হল উনি কেন

দেন বাগড়া। কারও দোষ নয় আমারই কপালের দোষ। নইলে তোমার হলাকে পরের হাতে দিয়ে তুমি আজ বিছানায় প'ড়ে।"

"ভয় নেই রে, তোর মাসি তোকে ভালোই বাসে। তুই আসবার আগেই তোর গুণগান করছিল। রোশনি, দে ওকে ওই কাপড়টা, নইলে ও ধন্না দিয়ে পড়ে থাকবে।"

অত্যন্ত বিরস মুখে আয়া কাপড়টা এনে ফেলে দিলে ওর সামনে। হলা সেটা তুলে নিয়ে গড় হয়ে প্রণাম করলে। তার পরে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "এই গামছাটা দিয়ে মুড়ে নিই বউদিদি। আমার ময়লা হাত, দাগ লাগবে।" সম্মতির অপেক্ষা না রেখেই আলনা থেকে তোয়ালেটা নিয়েই কাপড় মুড়ে দ্রুতপদে হলা প্রস্থান করলে।

নীরজা আয়াকে জিজ্ঞাসা করলে, "আচ্ছা আয়া, তুই ঠিক জানিস বাবু বেরিয়ে গেছেন ?"

"নিজের চক্ষে দেখলুম। কী তাড়া। টুপিটা নিতে ভুলে গেলেন।"

"আজ এই প্রথম হল। আমার সকালবেলাকার পাওনা ফুলে ফাঁকি পড়ল। দিনে দিনে এই ফাঁকি বাড়তে থাকবে। শেষকালে আমি গিয়ে পড়ব আমার সংসারের আঁস্তাকুড়ে, যেখানে নিবে-যাওয়া পোড়া কয়লার জায়গা।"

সরলাকে আসতে দেখে আয়া মুখ বাঁকিয়ে চলে গেল।

সরলা ঢুকল ঘরে। তার হাতে একটি অরকিড। ফুলটি শুভ্র, পাপড়ির আগায় বেগনির রেখা। যেন ডানা-মেলা মস্ত প্রজাপতি। সরলা ছিপছিপে লম্বা, শামলা রং, প্রথমেই লক্ষ্য হয় তার বড়ো বড়ো চোখ, উজ্জ্বল এবং করুণ। মোটা খদ্দরের শাড়ি, চুল অযত্নে বাঁধা, শ্লথবন্ধনে নেমে পড়েছে কাঁধের দিকে। অসজ্জিত দেহ যৌবনের সমাগমকে অনাদৃত করে রেখেছে।

নীরজা তার মুখের দিকে তাকালে না, সরলা ধীরে ধীরে ফুলটি বিছানায় তার সামনে রেখে দিলে।

নীরজা বিরক্তির ভাব গোপন না করেই বললে, "কে আনতে বলেছে।"

"আদিতদা।"

"নিজে এলেন না যে ?"

"নিয়ু মার্কেটের দোকানে তাড়াতাড়ি যেতে হল চা খাওয়া সেরেই।"

"এত তাড়া কিসের।"

"কাল রাত্রে আপিসের তালা ভেঙে টাকা-চুরির খবর এসেছে।"

"টানাটানি করে কি পাঁচ মিনিটও সময় দিতে পারতেন না।"

“কাল রাত্রে তোমার ব্যথা বেড়েছিল। ভোরবেলায় ঘুমিয়ে পড়েছিলে। দরজার কাছ পর্যন্ত এসে ফিরে গেলেন। আমাকে বলে গেলেন দুপুরের মধ্যে যদি নিজে না আসতে পারেন এই ফুলটি যেন দিই তোমাকে।”

দিনের কাজ আরম্ভের পূর্বেই রোজ আদিত্য বিশেষ বাছাই-করা একটি করে ফুল স্ত্রীর বিছানায় রেখে যেত। নীরজা প্রতিদিন তারই অপেক্ষা করেছে। আজকের দিনের বিশেষ ফুলটি আদিত্য সরলার হাতে দিয়ে গেল। এ কথা তার মনে আসে নি যে, ফুল দেওয়ার প্রধান মূল্য নিজের হাতে দেওয়া। গঙ্গার জল হলেও নলের ভিতর থেকে তার সার্থকতা থাকে না।

নীরজা ফুলটা অবজ্ঞার সঙ্গে ঠেলে দিয়ে বললে, “জান মার্কেটে এ ফুলের দাম কত? পাঠিয়ে দাও সেখানে, মিছে নষ্ট করবার দরকার কী।” বলতে বলতে গলা ভার হয়ে এল।

সরলা বুঝলে ব্যাপারখানা। বুঝলে জবাব দিতে গেলে আক্ষেপের বেগ বাড়বে বই কমবে না। চুপ করে রইল দাঁড়িয়ে। একটু পরে খামখা নীরজা প্রশ্ন করলে, “জান এ ফুলের নাম?”

বললেই হত, জানি নে, কিন্তু বোধ করি অভিমানে ঘা লাগল, বললে,“এমারিলিস।”

নীরজা অন্যায় উষ্মার সঙ্গে ধমক দিলে, “ভারি তো জান তুমি; ওর নাম গ্র্যাণ্ডিফ্লোরা।”

সরলা মৃদুস্বরে বললে, “তা হবে।”

“তা হবে মানে কী। নিশ্চয়ই তাই। বলতে চাও, আমি জানি নে?”

সরলা জানত নীরজা জেনেশুনেই ভুল নামটা দিয়ে প্রতিবাদ করলে। অন্যকে জ্বালিয়ে নিজের জ্বালা উপশম করবার জন্যে। নীরবে হার মেনে ধীরে ধীরে বেরিয়ে চলে যাচ্ছিল, নীরজা ফিরে ডাকল, “শুনে যাও। কী করছিলে সমস্ত সকাল, কোথায় ছিলে।”

“অরকিডের ঘরে।”

নীরজা উত্তেজিত হয়ে বললে, “অরকিডের ঘরে তোমার ঘন ঘন যাবার এত কী দরকার।”

“পুরোনো অরকিড চিরে ভাগ করে নতুন অরকিড করবার জন্যে আদিতদা আমাকে বলে গিয়েছিলেন।”

নীরজা বলে উঠল ধমক দেওয়ার সুরে, “আনাড়ির মতো সব নষ্ট করবে তুমি। আমি নিজের হাতে হলা মালীকে তৈরি করে শিখিয়েছি, তাকে হুকুম করলে সে কি পারত না।”

এর উপর জবাব চলে না। এর অকপট উত্তরটা ছিল এই যে, নীরজার হাতে হলা মালীর কাজ চলত ভালোই, কিন্তু সরলার হাতে একেবারেই চলে না। এমন-কি, ওকে সে অপমান করে ঔদাসীন্য দেখিয়ে।

মালী এটা বুঝে নিয়েছিল যে, এ আমলে ঠিকমত কাজ না করলেই ও-আমলের মনিব হবেন খুশি। এ যেন কলেজ বয়কট করে পাস না করার দামটাই ডিগ্রি পাওয়ার চেয়ে বড়ো হয়েছে।

সরলা রাগ করতে পারত কিন্তু রাগ করলে না। সে বোঝে বউদিদির বুকের ভিতরটা টনটন করছে। নিঃসন্তান মায়ের সমস্ত হৃদয় জুড়েছে যে বাগান, দশ বছর পরে আজ এত কাছে আছে, তবু এই বাগানের থেকে নির্বাসন। চোখের সামনেই নিষ্ঠুর বিচ্ছেদ। নীরজা বললে, “দাও, বন্ধ করে দাও ওই জানলা। সরলা বন্ধ করে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, “এইবার কমলালেবুর রস নিয়ে আসি?”

“না, কিছু আনতে হবে না, এখন যেতে পারো।”

সরলা ভয়ে ভয়ে বললে, “মকরধ্বজ খাবার সময় হয়েছে।”

“না দরকার নেই মকরধ্বজ। তোমার উপর বাগানের আর কোনো কাজের ফরমাশ আছে নাকি।”

“গোলাপের ডাল পুঁততে হবে।”

নীরজা একটু খোঁটা দিয়ে বললে, “তার সময় এই বুঝি! এ বুদ্ধি তাঁকে দিলে কে শুনি।”

সরলা মৃদুস্বরে বললে, “মফস্বল থেকে হঠাৎ অনেকগুলো অর্ডার এসেছে দেখে কোনোমতে আসছে বর্ষার আগেই বেশি করে গাছ বানাতে পণ করেছেন। আমি বারণ করেছিলুম।”

“বারণ করেছিলে বুঝি! আচ্ছা, আচ্ছা, ডেকে দাও হলা মালীকে।”

এল হলা মালী। নীরজা বললে, “বাবু হয়ে উঠেছ? গোলাপের ডাল পুঁততে হাতে খিল ধরে! দিদিমণি তোমার অ্যাসিস্টেন্ট মালী নাকি। বাবু শহর থেকে ফেরবার আগেই যতগুলো পারিস ডাল পুঁতবি, আজ তোদের ছুটি নেই বলে দিচ্ছি। পোড়া ঘাসপাতার সঙ্গে বালি মিশিয়ে জমি তৈরি করে নিস ঝিলের ডান পাড়িতে।” মনে মনে স্থির করলে এইখানে শুয়ে-শুয়েই গোলাপের গাছ সে তৈরি করে তুলবেই। হলা মালীর আর নিষ্কৃতি নেই।

হঠাৎ হলা প্রশ্রয়ের হাসিতে মুখ ভরে বললে, “বউদিদি, এই একটা পিতলের ঘটি। কটকের হরসুন্দর মাইতির তৈরি। এ জিনিসের দরদ তুমিই বুঝবে। তোমার ফুলদানি মানাবে ভালো।”

নীরজা জিজ্ঞাসা করলে, “এর দাম কত।”

জিভ কেটে হলা বললে, “এমন কথা বোলো না। এ ঘটির আবার দাম নেব! গরিব আমি, তা বলে তো ছোটোলোক নই। তোমারই খেয়ে-পরে যে মানুষ।”

ঘটি টিপাইয়ের উপর রেখে অন্য ফুলদানি থেকে ফুল নিয়ে সাজাতে লাগল। অবশেষে যাবার-মুখো হয়ে ফিরে দাঁড়িয়ে বললে, “তোমাকে জানিয়েছি আমার ভাগ্নীর বিয়ে। বাজুবন্ধর কথা ভুলো না বউদিদি। পিতলের গয়না যদি দিই তোমারই নিন্দে হবে। এতবড়ো ঘরের মালী, তারই ঘরে বিয়ে, দেশসুদ্ধ লোক তাকিয়ে আছে।”

নীরজা বললে, “আচ্ছা তোর ভয় নেই, তুই এখন যা।” হলা চলে গেল। নীরজা হঠাৎ পাশ ফিরে বালিশে মাথা রেখে গুমরে উঠে বলে উঠল, “রোশনি, রোশনি, আমি ছোটো হয়ে গেছি, ওই হলা মালীর মতোই হয়েছে আমার মন।”

আয়া বললে, “ও কী বলছ খোঁখী, ছি ছি!”

নীরজা আপনিই বলতে লাগল, “আমার পোড়া কপাল আমাকে বাইরে থেকে নামিয়ে দিয়েছে, আবার ভিতর থেকে নামিয়ে দিলে কেন। আমি কি জানি নে আমাকে হলা আজ কী চোখে দেখছে। আমার কাছে লাগালাগি করে হাসতে হাসতে বকশিশ নিয়ে চলে গেল। ওকে ডেকে দে। খুব করে ওকে ধমকে দেব, ওর শয়তানি ঘোচাতে হবে।”

আয়া যখন হলাকে ডাকবার জন্যে উঠল, নীরজা বললে, “থাক্ থাক্ আজ থাক্।”

৩

কিছুক্ষণ পরে ওর খুড়তুতো দেওর রমেন এসে বললে, “বউদি, দাদা পাঠিয়ে দিলেন। আজ আপিসে কাজের ভিড়, হোটেলে খাবেন, দেরি হবে ফিরতে।”

নীরজা হেসে বললে, “খবর দেবার ছুতো করে একদৌড়ে ছুটে এসেছ ঠাকুরপো! কেন, আপিসের বেহারাটা মরেছে বুঝি?”

“তোমার কাছে আসতে তুমি ছাড়া অন্য ছুতোর দরকার কিসের বউদি। বেহারা বেটা কী বুঝবে এই দূত-পদের দরদ।”

“ওগো মিষ্টি ছড়াচ্ছ অস্থানে। এ ঘরে এসেছ কোন্ ভুলে। তোমার মালিনী আছেন আজ একাকিনী নেবুকুঞ্জবনে, দেখো গে যাও।”

"কুঞ্জবনের বনলক্ষ্মীকে দর্শনী দিই আগে, তার পরে যাব মালিনীর সন্ধানে।" এই বলে বুকের পকেট থেকে একখানা গল্পের বই বের করে নীরজার হাতে দিল।

নীরজা খুশি হয়ে বললে, "'অশ্রু-শিকল', এই বইটাই চাচ্ছিলুম। আশীর্বাদ করি, তোমার মালঞ্চের মালিনী চিরদিন বুকের কাছে বাঁধা থাক্ হাসির শিকলে। ওই যাকে তুমি বল তোমার কল্পনার দোসর, তোমার স্বপ্নসাঙ্গনী! কী সোহাগ গো।"

রমেন হঠাৎ বললে, "আচ্ছা বউদি, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, ঠিক উত্তর দিয়ো।"

"কী কথা।"

"সরলার সঙ্গে আজ কি তোমার ঝগড়া হয়ে গেছে।"

"কেন বলো তো।"

"দেখলুম ঝিলের ধারে ঘাটে চুপ করে সে বসে আছে। মেয়েদের তো পুরুষদের মতো কাজ-পালানো উড়ো মন নয়। এমন বেকার দশা আমি সরলার কোনোদিন দেখি নি। জিজ্ঞাসা করলুম, 'মন কোন্‌দিকে।' ও বললে, 'যে দিকে তপ্ত হাওয়া শুকনো পাতা ওড়ায় সেই দিকে।' আমি বললুম, 'ওটা হল হেঁয়ালি। স্পষ্ট ভাষায় কথা কও।' সে বললে, 'সব কথারই ভাষা আছে?' আবার দেখি হেঁয়ালি। তখন গানের বুলিটা মনে পড়ল 'কাহার বচন দিয়েছে বেদন'।"

"হয়তো তোমার দাদার বচন।"

"হতেই পারে না। দাদা যে পুরুষমানুষ। সে তোমার ওই মালীগুলোকে হুংকার দিতে পারে। কিন্তু 'পুষ্পরাশাবিবাগ্নিঃ' এও কি সম্ভব হয়।"

"আচ্ছা, বাজে কথা বকতে হবে না। একটা কাজের কথা বলি, আমার অনুরোধ রাখতেই হবে। দোহাই তোমার, সরলাকে তুমি বিয়ে করো। আইবড়ো মেয়েকে উদ্ধার করলে মহাপুণ্য।"

"পুণ্যের লোভ রাখি নে কিন্তু ওই কন্যার লোভ রাখি, এ কথা বলছি তোমার কাছে হলফ করে।"

"তা হলে বাধাটা কোথায়। ওর কি মন নেই।"

"সে কথা জিজ্ঞাসাও করি নি। বলেইছি তো ও আমার কল্পনার দোসরই থাকবে, সংসারের দোসর হবে না।"

হঠাৎ তীব্র আগ্রহের সঙ্গে নীরজা রমেনের হাত চেপে ধরে বললে, "কেন হবে না, হতেই হবে। মরবার আগে তোমাদের বিয়ে দেখবই, নইলে ভূত হয়ে তোমাদের জ্বালাতন করব বলে রাখছি।"

নীরজার ব্যগ্রতা দেখে রমেন বিস্মিত হয়ে কিছুক্ষণ তার মুখের দিকে রইল চেয়ে।

শেষকালে মাথা নেড়ে বললে, “বউদি, আমি সম্পর্কে ছোটো, কিন্তু বয়সে বড়ো। উড়ো বাতাসে আগাছার বীজ আসে ভেসে, প্রশ্রয় পেলে শিকড় ছড়ায়, তার পরে আর ওপড়ায় কার সাধ্যি।”

“আমাকে উপদেশ দিতে হবে না। আমি তোমার গুরুজন, তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি, বিয়ে করো। দেরি কোরো না। এই ফাল্গুন মাসে ভালো দিন আছে।”

“আমার পাঁজিতে তিন শো পঁয়ষট্টি দিনই ভালো দিন। কিন্তু দিন যদি বা থাকে, রাস্তা নেই। আমি একবার গেছি জেলে, এখনও আছি পিছল পথে জেলের কবলটার দিকে। ও পথে প্রজাপতির পেয়াদার চল নেই।”

“এখনকার মেয়েরাই বুঝি জেলখানাকে ভয় করে?”

“না করতে পারে কিন্তু সপ্তপদী গমনের রাস্তা ওটা নয়। ও রাস্তায় বধূকে পাশে না রেখে মনের মধ্যে রাখলে জোর পাওয়া যায়। রইল চিরদিন আমার মনে।”

হরলিকস দুধের পাত্র টিপাইয়ের উপর রেখে সরলা চলে যাচ্ছিল। নীরজা বললে, “যেয়ো না, শোনো সরলা, এই ফোটোগ্রাফটা কার। চিনতে পার?”

সরলা বললে, “ও তো আমার।”

“তোমার সেই আগেকার দিনের ছবি। যখন তোমার জেঠামশায়ের ওখানে তোমরা দুজনে বাগানের কাজ করতে। দেখে মনে হচ্ছে, বয়সে পনেরো হবে। মরাঠী মেয়ের মতো মালকোঁচা দিয়ে শাড়ি পরেছ।”

“এ তুমি কোথা থেকে পেলে।”

“দেখেছিলুম ওর একটা ডেস্কের মধ্যে, তখন ভালো করে লক্ষ্য করি নি। আজ সেখান থেকে আনিয়ে নিয়েছি। ঠাকুরপো, তখনকার চেয়ে সরলাকে এখন আরও অনেক ভালো দেখতে হয়েছে। তোমার কী মনে হয়।”

রমেন বললে, “তখন কি কোনো সরলা কোথাও ছিল। অন্তত আমি তাকে জানতুম না। আমার কাছে এখনকার সরলাই একমাত্র সত্য। তুলনা করব কিসের সঙ্গে।”

নীরজা বললে, “ওর এখনকার চেহারা হৃদয়ের কোনো একটা রহস্যে ঘন হয়ে ভরে উঠেছে— যেন যে মেঘ ছিল সাদা তার ভিতর থেকে শ্রাবণের জল আজ ঝরি-ঝরি করছে— একেই তোমরা রোম্যান্টিক বল, না ঠাকুরপো?”

সরলা চলে যেতে উদ্যত হল, নীরজা তাকে বললে, “সরলা, একটু বোসো। ঠাকুরপো, একবার পুরুষমানুষের চোখ দিয়ে সরলাকে দেখে নিই। ওর কী সকলের আগে চোখে পড়ে বলো দেখি।”

রমেন বললে, "সমস্তটাই একসঙ্গে।"

"নিশ্চয়ই ওর চোখ দুটো; কেমন একরকম গভীর করে চাইতে জানে। না, উঠো না সরলা। আর-একটু বোসো। ওর দেহটাও কেমন নিরেট নিটোল।"

"তুমি কি ওকে নিলেম করতে বসেছ নাকি বউদি। জানই তো অমনিতেই আমার উৎসাহের কিছু কমতি নেই।"

নীরজা দালালির উৎসাহে বলে উঠল, "ঠাকুরপো, দেখো সরলার হাত দুখানি, যেমন জোরালো তেমনই সুডোল, কোমল, তেমনই তার শ্রী। এমনটি আর দেখেছ ?"

রমেন হেসে বললে, "আর কোথাও দেখেছি কি না তার উত্তরটা তোমার মুখের সামনে রূঢ় শোনাবে।"

"অমন-দুটি হাতের 'পরে দাবি করবে না ?"

"চিরদিনের দাবি নাই করলেম, ক্ষণে ক্ষণে দাবি করে থাকি। তোমাদের ঘরে যখন চা খেতে আসি তখন চায়ের চেয়ে বেশি কিছু পাই ওই হাতের গুণে। সেই রসগ্রহণে পাণিগ্রহণের যেটুকু সম্পর্ক থাকে অভাগার পক্ষে সে-ই যথেষ্ট।"

সরলা মোড়া ছেড়ে উঠে পড়ল। ঘর থেকে বেরবার উপক্রম করতেই রমেন দ্বার আগলে বললে, "একটা কথা দাও তবে পথ ছাড়ব।"

"কী, বলো।"

"আজ শুক্লাচতুর্দশী। আমি মুসাফির আসব তোমার বাগিচায়, কথা যদি থাকে তবু কইবার দরকারই হবে না। আকাল পড়েছে, পেট ভরে দেখাই জোটে না। হঠাৎ এই ঘরে মুষ্টিভিক্ষার দেখা,— এ মঞ্জুর নয়। আজ তোমাদের গাছতলায় বেশ একটু রয়ে-সয়ে মনটা ভরিয়ে নিতে চাই।"

সরলা সহজ স্বরেই বললে, "আচ্ছা, এসো তুমি।"

রমেন খাটের কাছে ফিরে এসে বললে, "তবে আসি বউদি।"

"আর থাকবার দরকার কী। বউদির যে কাজটুকু ছিল, সে তো সারা হল।"

রমেন চলে গেল।

৪

রমেন চলে গেলে নীরজা হাতের মধ্যে মুখ লুকিয়ে বিছানায় পড়ে রইল। ভাবতে লাগল, এমন মন-মাতানো দিন তারও ছিল। কত বসন্তের রাতকে সে উতলা করেছে। সংসারের বারো-আনা মেয়ের মতো সে কি ছিল স্বামীর ঘরকন্নার আসবাব। বিছানায় শুয়ে শুয়ে কেবলই মনে পড়ে, কতদিন তার স্বামী তার অলক

ধরে টেনে আর্দ্রকণ্ঠে বলেছে, "আমার রংমহলের সাকী।" দশ বছরে রং একটু ম্লান হয় নি, পেয়ালা ছিল ভরা। তার স্বামী তাকে বলত, "সেকালে মেয়েদের পায়ের ছোঁয়া লেগে ফুল ধরত অশোকে, মুখমদের ছিটে পেলে বকুল উঠত ফুটে, আমার বাগানে সেই কালিদাসের কাল দিয়েছে ধরা। যে-পথে রোজ তোমার পা পড়ে, তারি দু ধারে ফুল ফুটেছে রঙে রঙে, বসন্তের হাওয়ায় দিয়েছ মদ ছড়িয়ে, গোলাপবনে লেগেছে তার নেশা।" কথায় কথায় সে বলত, "তুমি না থাকলে এই ফুলের স্বর্গে বেনের দোকান বৃত্রাসুর হয়ে দখল জমাত। আমার ভাগ্যগুণে তুমি আছ নন্দনবনের ইন্দ্রাণী।" হায় রে, যৌবন তো আজও ফুরোয় নি কিন্তু চলে গেল তার মহিমা। তাই তো ইন্দ্রাণী আপন আসন আজ ভরাতে পারছে না। সেদিন ওর মনে কোথাও কি ছিল লেশমাত্র ভয়। সে যেখানে ছিল সেখানে আর কেউই ছিল না, ওর আকাশে ও ছিল সকালবেলার অরুণোদয়ের মতো পরিপূর্ণ একা। আজ কোনোখানে একটু ছায়া দেখলেই বুক দুরদুর করে উঠছে, নিজের উপর আর ভরসা নেই। নইলে কে ওই সরলা, কিসের ওর গুমর। আজ তাকে নিয়েও সন্দেহে মন দুলে উঠছে। কে জানত বেলা না ফুরোতেই এত দৈন্য ঘটবে কপালে। এতদিন ধরে এত সুখ এত গৌরব অজস্র দিয়ে অবশেষে বিধাতা এমন করে চোরের মতো সিঁধ কেটে দত্তাপহরণ করলেন!

"রোশনি, শুনে যা।"

"কী খোঁখী।"

"তোদের জামাইবাবু একদিন আমাকে ডাকত 'রংমহলের রঙ্গিনী'। দশ বছর আমাদের বিয়ে হয়েছে সেই রং তো এখনও ফিকে হয় নি, কিন্তু সেই রংমহল?"

"যাবে কোথায়, আছে তোমার মহল। কাল তুমি সারারাত ঘুমোও নি, একটু ঘুমোও তো, পায়ে হাত বুলিয়ে দিই।"

"রোশনি, আজ তো পূর্ণিমার কাছাকাছি। এমন কত জ্যোৎস্নারাত্রে ঘুমোই নি। দুজনে বেড়িয়েছি বাগানে। সেই জাগা আর এই জাগা। আজ তো ঘুমোতে পারলে বাঁচি, কিন্তু পোড়া ঘুম আসতে চায় না যে।"

"একটু চুপ করে থাকো দেখি, ঘুম আপনি আসবে।"

"আচ্ছা, ওরা কি বাগানে বেড়ায় জ্যোৎস্নারাত্রে।"

"ভোরবেলাকার চালানের জন্য ফুল কাটতে দেখেছি। বেড়াবে কখন, সময় কোথায়।"

"মালীগুলো আজকাল খুব ঘুমোচ্ছে। তা হলে মালীদের বুঝি জাগায় না ইচ্ছে করেই?"

"তুমি নেই এখন ওদের গায়ে হাত দেয় কার সাধ্যি।"

"ওই না শুনলেম গাড়ির শব্দ ?"

"হাঁ, বাবুর গাড়ি এল।"

"হাত-আয়নাটা এগিয়ে দে। বড়ো গোলাপটা নিয়ে আয় ফুলদানি থেকে। সেফটিপিনের বাক্সটা কোথায় দেখি। আজ আমার মুখ বড়ো ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। যা তুই ঘর থেকে।"

"যাচ্ছি, কিন্তু দুধ বার্লি পড়ে আছে, খেয়ে নাও লক্ষ্মীটি।"

"থাক্ পড়ে, খাব না।"

"দু দাগ ওষুধ তোমার আজ খাওয়া হয় নি।"

"তোর বকতে হবে না, তুই যা বলছি, ওই জানলাটা খুলে দিয়ে যা।"

আয়া চলে গেল।

ঢং ঢং করে তিনটে বাজল। আরক্ত হয়ে এসেছে রোদ্দুরের রং, ছায়া হেলে পড়েছে পুবদিকে, বাতাস এল দক্ষিণ থেকে, ঝিলের জল উঠল টল টল করে। মালীরা লেগেছে কাজে, নীরজা দূর থেকে যতটা পারে তাই দেখে।

দ্রুতপদে আদিত্য ছুটে এল ঘরে। হাত জোড়া বাসন্তী রংএর দেশী ল্যাবার্ণাম ফুলের মঞ্জরীতে। তাই দিয়ে ঢেকে দিল নীরজার পায়ের কাছটা। বিছানায় বসেই তার হাত চেপে ধরে বললে, "আজ কতক্ষণ তোমাকে দেখি নি নীরু।" শুনে নীরজা আর থাকতে পারলে না, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। আদিত্য খাটের থেকে নেমে মেজের উপর হাঁটু গেড়ে নীরজার গলা জড়িয়ে ধরলে, তার ভিজে গালে চুমো খেয়ে বললে, "মনে মনে তুমি নিশ্চয় জান আমার দোষ ছিল না।"

"অত নিশ্চয় করে কী করে জানব বলো। আমার কি আর সেদিন আছে।"

"দিনের কথা হিসেব করে কী হবে। তুমি তো আমার সেই তুমিই আছ।"

"আজ যে আমার সকলতাতেই ভয় করে। জোর পাই নে যে মনে।"

"অল্প একটু ভয় করতে ভালো লাগে। না ? খোঁটা দিয়ে আমাকে একটুখানি উসকিয়ে দিতে চাও। এ চাতুরী মেয়েদের স্বভাবসিদ্ধ।"

"আর ভুলে-যাওয়া বুঝি পুরুষদের স্বভাবসিদ্ধ নয় ?"

"ভুলতে ফুরসৎ দাও কই।"

"বোলো না বোলো না, পোড়া বিধাতার শাপে লম্বা ফুরসৎ দিয়েছি যে।"

"উলটো বললে। সুখের দিনে ভোলা যায়, ব্যথার দিনে নয়।"

"সত্যি বলো, আজ সকালে তুমি ভুলে চলে যাও নি ?"

"কী কথা বল তুমি। চলে যেতে হয়েছিল কিন্তু যতক্ষণ না ফিরেছি মনে স্বস্তি ছিল না।"

"কেমন করে বসেছ তুমি। তোমার পাদুটো বিছানায় তোলো।"

"বেড়ি দিতে চাও পাছে পালাই!"

"হাঁ বেড়ি দিতে চাই। জনমে মরণে তোমার পা দুখানি নিঃসন্দেহে রইল আমার কাছে বাঁধা।"

"মাঝে মাঝে একটু একটু সন্দেহ কোরো, তাতে আদরের স্বাদ বাড়ায়।"

"না, একটুও সন্দেহ না। এতটুকুও না। তোমার মতো এমন স্বামী কোন্ মেয়ে পেয়েছে। তোমাকেও সন্দেহ, তাতে যে আমাকেই ধিক্কার!"

"আমিই তা হলে তোমাকে সন্দেহ করব, নইলে জমবে না নাটক।"

"তা কোরো, কোনো ভয় নেই। সেটা হবে প্রহসন।"

"যাই বল আজ কিন্তু রাগ করেছিলে আমার 'পরে।"

"কেন আবার সে কথা। শাস্তি তোমার দিতে হবে না— নিজের মধ্যেই তার দণ্ডবিধান।"

"দণ্ড কিসের জন্য। রাগের তাপ যদি মাঝে মাঝে দেখা না দেয় তা হলে বুঝব ভালোবাসার নাড়ি ছেড়ে গেছে।"

"যদি কোনো দিন ভুলে তোমার উপরে রাগ করি, নিশ্চয় জেনো সে আমি নয়, কোনো অপদেবতা আমার উপরে ভর করেছে।"

"অপদেবতা আমাদের সকলেরই একটা করে থাকে, মাঝে মাঝে অকারণে জানান দেয়। সুবুদ্ধি যদি আসে, রাম নাম করি, দেয় সে দৌড়।"

আয়া ঘরে এল। বললে, "জামাইবাবু, আজ সকাল থেকে খোঁখী দুধ খায় নি, ওষুধ খায় নি, মালিশ করে নি। এমন করলে আমরা ওর সঙ্গে পারব না।" বলেই হন হন করে হাত দুলিয়ে চলে গেল।

শুনেই আদিত্য দাঁড়িয়ে উঠল, বললে, "এবার তবে আমি রাগ করি?"

"হাঁ করো, খুব রাগ করো, যত পার রাগ করো, অন্যায় করেছি, কিন্তু মাপ কোরো তার পরে।" আদিত্য দরজার কাছে এসে ডাক দিতে লাগল, "সরলা, সরলা।"

শুনেই নীরজার শিরায় শিরায় যেন ঝন ঝন করে উঠল। বুঝলে বেঁধানো কাঁটায় হাত পড়েছে। সরলা এল ঘরে। আদিত্য বিরক্ত হয়ে প্রশ্ন করলে, "নীরুকে ওষুধ দাও নি আজ, সারাদিন কিছু খেতেও দেওয়া হয় নি?" নীরজা বলে উঠল, "ওকে বকছ কেন। ওর দোষ কী। আমিই দুষ্টুমি করে খাই নি, আমাকে বকো না। সরলা তুমি যাও; মিছে কেন দাঁড়িয়ে বকুনি খাবে।"

"যাবে কী, ওষুধ বের করে দিক। হরলিকস মিল্ক তৈরি করে আনুক।"

"আহা সমস্ত দিন ওকে মালীর কাজে খাটিয়ে মার তার উপরে আবার নার্সের কাজ কেন। একটু দয়া হয় না তোমার মনে? আয়াকে ডাকো না।"

"আয়া কি ঠিকমত পারবে এ-সব কাজ।"

"ভারি তো কাজ, খুব পারবে। আরো ভালোই পারবে।"

"কিন্তু—"

"কিন্তু আবার কিসের। আয়া আয়া।"

"অত উত্তেজিত হোয়ো না। একটা বিপদ ঘটাবে দেখছি।"

"আমি আয়াকে ডেকে দিচ্ছি" বলে সরলা চলে গেল। নীরজার কথার যে একটা প্রতিবাদ করবে, সেও তার মুখে এল না। আদিত্যও মনে মনে আশ্চর্য হল, ভাবলে সরলাকে কি সত্যিই অন্যায় খাটানো হচ্ছে।

ওষুধপথ্য হয়ে গেলে আদিত্য আয়াকে বললে, সরলাদিদিকে ডেকে দাও।

"কথায় কথায় কেবলই সরলাদিদি, বেচারাকে তুমি অস্থির করে তুলবে দেখছি।"

"কাজের কথা আছে।"

"থাক্ না এখন কাজের কথা।"

"বেশিক্ষণ লাগবে না।"

"সরলা মেয়েমানুষ ওর সঙ্গে এত কাজের কথা কিসের, তার চেয়ে হলা মালীকে ডাকো না।"

"তোমাকে বিয়ে করবার পর থেকে একটা কথা আবিষ্কার করেছি যে, মেয়েরাই কাজের, পুরুষেরা হাড়ে অকেজো। আমরা কাজ করি দায়ে পড়ে, তোমরা কাজ কর প্রাণের উৎসাহে। এই সম্বন্ধে একটা থীসিস লিখব মনে করেছি। আমার ডায়রি থেকে বিস্তর উদাহরণ পাওয়া যাবে।"

"সেই মেয়েকেই আজ তার প্রাণের কাজ থেকে বঞ্চিত করেছে যে-বিধাতা, তাকে কী ব'লে নিন্দে করব। ভূমিকম্পে হুড়মুড় করে আমার কাজের চূড়া পড়েছে ভেঙে তাই তো পোড়ো বাড়িতে ভূতের বাসা হল।"

সরলা এল। আদিত্য জিজ্ঞাসা করলে, "অরকিড-ঘরের কাজ হয়ে গেছে?"

"হাঁ হয়ে গেছে।"

"সবগুলো?"

"সবগুলোই।"

"আর গোলাপের কাটিং?"

"মালী তার জমি তৈরি করছে।"

"জমি! সে তো আমি আগেই তৈরি করে রেখেছি। হলা মালীর উপর ভার দিয়েছ, তা হলেই দাঁতন-কাঠির চাষ হবে আর কী।"

কথাটাতে তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে নীরজা বললে, "সরলা, যাও তো কমলালেবুর রস করে নিয়ে এসো গে, তাতে একটু আদার রস দিয়ো, আর মধু।"

সরলা মাথা হেঁট করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

নীরজা জিজ্ঞাসা করলে, "আজ তুমি ভোরে উঠেছিলে যেমন আমরা রোজ উঠতুম?"

"হাঁ উঠেছিলুম।"

"ঘড়িতে তেমনি এলার্মের দম দেওয়া ছিল?"

"ছিল বই-কি।"

"সেই নিমগাছতলায় সেই কাটা গাছের গুঁড়ি। তার উপরে চায়ের সরঞ্জাম। সব ঠিক রেখেছিল বাসু?"

"রেখেছিল। নইলে খেসারতের দাবিতে নালিশ রুজু করতুম তোমার আদালতে।"

"দুটো চৌকিই পাতা ছিল?"

"পাতা ছিল সেই আগেকার মতোই। আর ছিল সেই নীল-পাড়-দেওয়া বাসন্তী রংএর চায়ের সরঞ্জাম; দুধের জ্যাগ রুপোর, ছোটো সাদা পাথরের বাটিতে চিনি, আর ড্রাগন-আঁকা জাপানী ট্রে।"

"অন্য চৌকিটা খালি রাখলে কেন।"

"ইচ্ছে করে রাখি নি। আকাশে তারাগুলো গোনাগুনতি ঠিকই ছিল, কেবল শুক্লপঞ্চমীর চাঁদ রইল দিগন্তের বাইরে। সুযোগ থাকলে তাকে আনতেম ধরে।"

"সরলাকে কেন ডাক না তোমার চায়ের টেবিলে।"

এর উত্তরে বললেই হত, তোমার আসনে আর কাউকে ডাকতে মন যায় না। সত্যবাদী তা না বলে বললে, "সকালবেলায় বোধ হয় সে জপতপ কিছু করে, আমার মতো ভজনপূজনহীন ম্লেচ্ছ তো নয়।"

"চা খাওয়ার পরে আজ বুঝি অরকিড-ঘরে তাকে নিয়ে গিয়েছিলে?"

"হাঁ, কিছু কাজ ছিল, ওকে বুঝিয়ে দিয়েই ছুটতে হল দোকানে।"

"আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, সরলার সঙ্গে রমেনের বিয়ে দাও না কেন।"

"ঘটকালি কি আমার ব্যাবসা।"

"না, ঠাট্টা নয়। বিয়ে তো করতেই হবে, রমেনের মতো পাত্র পাবে কোথায়।"

"পাত্র আছে এক দিকে, পাত্রীও আছে আর-এক দিকে, মাঝখানটাতে মন আছে কি না সে-খবর নেবার ফুরসৎ পাই নি। দূরের থেকে মনে হয় যেন ওইখানটাতেই খটকা।"

একটু ঝাঁজের সঙ্গে বললে নীরজা, কোনো খটকা থাকত না যদি তোমার সত্যিকার আগ্রহ থাকত।"

"বিয়ে করবে অন্য পক্ষ, সত্যিকার আগ্রহটা থাকবে একা আমার, এটাতে কি কাজ চলে। তুমি চেষ্টা দেখো না।"

"কিছুদিন গাছপালা থেকে ওই মেয়েটার দৃষ্টিটাকে ছুটি দাও দেখি, ঠিক জায়গায় আপনি চোখ পড়বে।"

"শুভদৃষ্টির আলোতে গাছপালা পাহাড়পর্বত সমস্তই স্বচ্ছ হয়ে যায়। ও একজাতের একস্‌রেজ আর কি।"

"মিছে বকছ। আসল কথা, তোমার ইচ্ছে নয় বিয়েটা ঘটে।"

"এতক্ষণে ধরেছ ঠিক। সরলা গেলে আমার বাগানের দশা কী হবে বলো। লাভ লোকসানের কথাটাও ভাবতে হয়। ও কী ও, হঠাৎ তোমার বেদনাটা বেড়ে উঠল নাকি।"

উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল আদিত্য। নীরজা রুক্ষ গলায় বললে, "কিছু হয় নি। আমার জন্যে তোমাকে অত ব্যস্ত হতে হবে না।"

স্বামী যখন উঠি-উঠি করছে, সে বলে উঠল, "আমাদের বিয়ের পরেই ওই অরকিড-ঘরের প্রথম পত্তন, ভুলে যাও নি তো সে কথা? তার পরে দিনে দিনে আমরা দুজনে মিলে ওই ঘরটাকে সাজিয়ে তুলেছি। ওটাকে নষ্ট করতে দিতে তোমার মনে একটুও লাগে না!"

আদিত্য বিস্মিত হয়ে বললে, "সে কেমন কথা। নষ্ট হতে দেবার শখ আমার দেখলে কোথায়।"

উত্তেজিত হয়ে নীরজা বললে, "সরলা কী জানে ফুলের বাগানের।"

"বল কী। সরলা জানে না? যে-মেসোমশায়ের ঘরে আমি মানুষ, তিনি যে সরলার জেঠামশায়। তুমি তো জান তাঁরি বাগানে আমার হাতেখড়ি। জেঠামশায় বলতেন, ফুলের বাগানের কাজ মেয়েদেরই, আর গোরু দোওয়ানো। তাঁর সব কাজে ও ছিল তাঁর সঙ্গিনী।"

"আর তুমি ছিলে সঙ্গী।"

"ছিলেম বই-কি। কিন্তু আমাকে করতে হত কলেজের পড়া, ওর মতো অত সময় দিতে পারি নি। ওকে মেসোমশায় নিজে পড়াতেন।"

"সেই বাগান নিয়ে তোমার মেসোমশায়ের সর্বনাশ হয়ে গেল। এমনই ও-মেয়ের পয়। আমার তো তাই ভয় করে। অলক্ষুণে মেয়ে। দেখ না মাঠের মতো কপাল, ঘোড়ার মতন লাফিয়ে চলন! মেয়েমানুষের পুরুষালী বুদ্ধিটা ভালো নয়। ওতে অকল্যাণ ঘটায়।"

"তোমার আজ কী হয়েছে বলো তো নীরু। কী কথা বলছ। মেসোমশায় বাগান করতেই জানতেন, ব্যাবসা করতে জানতেন না। ফুলের চাষ করতে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়. নিজের লোকসান করতেও তাঁর সমকক্ষ কেউ ছিল না। সকলের কাছে তিনি নাম পেতেন, দাম পেতেন না। বাগান করবার জন্যে আমাকে যখন মূলধনের টাকা দিয়েছিলেন আমি কি জানতুম তখনই তাঁর তহবিল ডুবোডুবো। আমার একমাত্র সান্ত্বনা এই যে, তাঁর মরবার আগেই সমস্ত দিয়েছি শোধ করে।"

সরলা কমলালেবুর রস নিয়ে এল। নীরজা বললে, "ওইখানে রেখে যাও।" রেখে সরলা চলে গেল। পাত্রটা পড়ে রইল, ও ছুঁলই না।

"সরলাকে তুমি বিয়ে করলে না কেন।"

"শোনো একবার কথা! বিয়ের কথা কোনোদিন মনেও আসে নি।"

"মনেও আসে নি! এই বুঝি তোমার কবিত্ব!"

"জীবনে কবিত্বের বালাই প্রথম দেখা দিল যেদিন তোমাকে দেখলুম। তার আগে আমরা দুই বুনোয় মিলে দিন কাটিয়েছি বনের ছায়ায়। নিজেদের ছিলুম ভুলে। হাল আমলের সভ্যতায় যদি মানুষ হতুম তা হলে কী হত বলা যায় না।"

"কেন সভ্যতার অপরাধটা কী।"

"এখনকার সভ্যতাটা দুঃশাসনের মতো হৃদয়ের বস্ত্রহরণ করতে চায়। অনুভব করবার পূর্বেই সেয়ানা করে তোলে চোখে আঙুল দিয়ে। গন্ধের ইশারা ওর পক্ষে বেশি সূক্ষ্ম, খবর নেয় পাপড়ি ছিঁড়ে।"

"সরলাকে তো দেখতে মন্দ নয়।"

"সরলাকে জানতুম সরলা বলেই। ও দেখতে ভালো কি মন্দ সে-তত্ত্বটা সম্পূর্ণ বাহুল্য ছিল।"

"আচ্ছা, সত্যি বলো, ওকে তুমি ভালোবাসতে না?"

"নিশ্চয় ভালোবাসতুম। আমি কি জড় পদার্থ যে, ওকে ভালোবাসব না। মেসোমশায়ের ছেলে রেঙ্গুনে ব্যারিস্টারি করে, তার জন্যে কোনো ভাবনা নেই। তাঁর

বাগানটি নিয়ে সরলা থাকবে এই ছিল তাঁর জীবনের সাধ। এমন-কি, তাঁর বিশ্বাস ছিল এই বাগানই ওর সমস্ত মনপ্রাণ অধিকার করবে। ওর বিয়ে করবার গরজ থাকবে না। তার পরে তিনি চলে গেলেন, অনাথা হল সরলা, পাওনাদারের হাতে বাগানটি গেল বিকিয়ে। সেদিন আমার বুক ভেঙে গিয়েছিল, দেখ নি কি তুমি। ও যে ভালোবাসবার জিনিস, ভালোবাসব না ওকে? মনে তো আছে একদিন সরলার মুখে হাসিখুশি ছিল উচ্ছ্বসিত। মনে হত যেন পাখির ওড়া ছিল ওর পায়ের চলার মধ্যে। আজ ও চলেছে বুকভরা বোঝা বয়ে বয়ে, তবু ভেঙে পড়ে নি। একদিনের জন্যে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে নি আমারও কাছে, নিজেকে তার অবকাশও দিলে না।"

আদিত্যের কথা চাপা দিয়ে নীরজা বললে, "থামো গো থামো, অনেক শুনেছি ওর কথা তোমার কাছে, আর বলতে হবে না। অসামান্য মেয়ে। সেইজন্যে বলেছি ওকে সেই বারাসতের মেয়ে-স্কুলের হেড্‌মিসট্রেস করে দাও। তারা তো কতবার ধরাধরি করেছে।"

"বারাসতের মেয়ে ইস্কুল? কেন আণ্ডামানও তো আছে।"

"না, ঠাট্টা নয়। সরলাকে তোমার বাগানের আর যে-কোনো কাজ দিতে হয় দিয়ো কিন্তু ওই অরকিড-ঘরের কাজ দিতে পারবে না।"

"কেন হয়েছে কী।"

"আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি, সরলা অরকিড ভালো বোঝে না।"

"আমিও তোমাকে বলছি, আমার চেয়ে সরলা ভালো বোঝে। মেসোমশায়ের প্রধান শখ ছিল অরকিডে। তিনি নিজের লোক পাঠিয়ে সেলিবিস থেকে, জাভা থেকে, এমন-কি চীন থেকে অরকিড আনিয়েছেন, তার দরদ বোঝে এমন লোক তখন ছিল না।"

কথাটা নীরজা জানে, সেইজন্যে কথাটা তার অসহ্য।

"আচ্ছা আচ্ছা, বেশ বেশ, ও নাহয় আমার চেয়ে ঢের ভালো বোঝে এমন-কি তোমার চেয়েও। তা হোক, তবু বলছি ওই অরকিডের ঘর শুধু তোমার আমার, ওখানে সরলার কোনো অধিকার নেই। তোমার সমস্ত বাগানটা ওকেই দিয়ে দাও না যদি তোমার নিতান্ত ইচ্ছে হয়; কেবল খুব অল্প একটু কিছু রেখো যেটুকু কেবল আমাকেই উৎসর্গ-করা। এতকাল পরে অন্তত এইটুকু দাবি করতে পারি। কপালদোষে নাহয় আজ আছি বিছানায় প'ড়ে, তাই বলে"— কথা শেষ করতে পারলে না, বালিশে মুখ গুঁজে অশান্ত হয়ে কাঁদতে লাগল।

স্তম্ভিত হয়ে গেল আদিত্য। ঠিক যেন এতদিন স্বপ্নে চলছিল, ঠোকর খেয়ে

উঠল চমকে। এ কী ব্যাপার। বুঝতে পারল এই কান্না অনেকদিনকার। বেদনার ঘূর্ণিবাতাস নীরজার অন্তরে অন্তরে বেগ পেয়ে উঠছিল দিনে দিনে, আদিত্য জানতে পারে নি মুহূর্তের জন্যেও। এমন নির্বোধ যে, মনে করেছিল, সরলা বাগানের যত্ন করতে পারে এতে নীরজা খুশি। বিশেষত ঋতুর হিসাব ক'রে বাছাই-করা ফুলে কেয়ারি সাজাতে ও অদ্বিতীয়। আজ হঠাৎ মনে পড়ল, একদিন যখন কোনো উপলক্ষে সরলার প্রশংসা করে ও বলেছিল, "কামিনীর বেড়া এমন মানানসই ক'রে আমি তো লাগাতে পারতুম না", তখন তীব্র হেসে বলেছে নীরজা, "ওগো মশায়, উচিত পাওনার চেয়ে বেশি দিলে আখেরে মানুষের লোকসান করাই হয়।" আদিত্যের আজ মনে পড়ল, গাছপালা সম্বন্ধে কোনোমতে সরলার একটা ভুল যদি ধরতে পারত নীরজা উচ্চহাস্যে কথাটাকে ফিরে ফিরে মুখরিত করে তুলত। স্পষ্ট মনে পড়ল, ইংরেজি বই খুঁজে খুঁজে নীরজা মুখস্থ করে রাখত অল্পপরিচিত ফুলের উদ্ভট নাম; ভালোমানুষের মতো জিজ্ঞাসা করত সরলাকে, যখন সে ভুল করত, তখন থামতে চাইত না ওর হাসির হিল্লোল; "ভারি পণ্ডিত, কে না জানে ওর নাম ক্যাসিয়া জাভানিকা। আমার হলা মালীও বলতে পারত।"

আদিত্য অনেকক্ষণ ধরে বসে ভাবলে। তার পরে হাত ধরে বললে, "কেঁদো না নীরু, বলো কী করব। তুমি কি চাও সরলাকে বাগানের কাজে না রাখি।"

নীরজা হাত ছিনিয়ে নিয়ে বললে, "কিছু চাই নে, কিচ্ছু না, ও তো তোমারই বাগান। তুমি যাকে খুশি রাখতে পারো আমার তাতে কী।"

"নীরু, এমন কথা তুমি বলতে পারলে, আমারই বাগান? তোমার নয়? আমাদের মধ্যে এই ভাগ হয়ে গেল কবে থেকে।"

"যবে থেকে তোমার রইল বিশ্বের আর সমস্ত-কিছু আর আমার রইল কেবল এই ঘরের কোণ। আমার এই ভাঙা প্রাণ নিয়ে দাঁড়াব কিসের জোরে তোমার ওই আশ্চর্য সরলার সামনে। আমার সে শক্তি আজ কোথায় যে তোমার সেবা করি, তোমার বাগানের কাজ করি।"

"নীরু, তুমি তো কতদিন এর আগে আপনি সরলাকে ডেকে পাঠিয়েছ, নিয়েছ ওর পরামর্শ। মনে নেই কি এই কয়েক বছর আগে বাতাবিলেবুর সঙ্গে কলম্বালেবুর কলম বেঁধেছ দুইজনে, আমাকে আশ্চর্য করে দেবার জন্যে।"

"তখন তো ওর এত গুমর ছিল না। বিধাতা যে আমারই দিকে আজ অন্ধকার করে দিলে, তাই তো তোমার কাছে হঠাৎ ধরা পড়ছে, ও এত জানে ও তত জানে, অর্কিড চিনতে আমি ওর কাছে লাগি নে। সেদিন তো এ-সব কথা

কোনোদিন শুনি নি। তবে আজ আমার এই দুর্ভাগ্যের দিনে কেন দুজনের তুলনা করতে এলে। আজ আমি ওর সঙ্গে পারব কেন। মাপে সমান হব কী নিয়ে।"

"নীরু, আজ তোমার কাছে এই যা-সব শুনছি তার জন্য একটুও প্রস্তুত ছিলুম না। মনে হচ্ছে এ যেন আমার নীরুর কথা নয়, এ যেন আর কেউ।"

"না গো না, সেই নীরুই বটে। তার কথা এত দিনেও তুমি বুঝলে না। এই আমার সবচেয়ে শাস্তি। বিয়ের পর যেদিন আমি জেনেছিলেম তোমার বাগান তোমার প্রাণের মতো প্রিয়, সেদিন থেকে ওই বাগান আর আমার মধ্যে ভেদ রাখি নি একটুকুও। নইলে তোমার বাগানের সঙ্গে আমার ভীষণ ঝগড়া বাধত, ওকে সইতে পারতুম না। ও হত আমার সতিন। তুমি তো জান, আমার দিনরাতের সাধনা। জান কেমন করে ওকে মিলিয়ে নিয়েছি আমার মধ্যে। একেবারে এক হয়ে গেছি ওর সঙ্গে।"

"জানি বই-কি। আমার সব কিছুকে নিয়েই যে তুমি।"

"ও-সব কথা রাখো। আজ দেখলুম ওই বাগানের মধ্যে অনায়াসে প্রবেশ করলে আর-একজন। কোথাও একটুও ব্যথা লাগল না। আমার দেহখানাকে চিরে ফেলবার কথা কি মনে করতেও পারতে, আর কারু প্রাণ তার মধ্যে চালিয়ে দেবার জন্যে। আমার ওই বাগান কি আমার দেহ নয়। আমি হলে কি এমন করতে পারতুম।"

"কী করতে তুমি।"

"বলব কী করতুম? বাগান ছারখার হয়ে যেত হয়তো। ব্যাবসা হত দেউলে। একটার জায়গায় দশটা মালী রাখতুম কিন্তু আসতে দিতুম না আর কোনো মেয়েকে, বিশেষত এমন কাউকে যার মনে গুমর আছে— সে আমার চেয়েও বাগানের কাজ ভালো জানে। ওর এই অহংকার দিয়ে তুমি আমাকে অপমান করবে প্রতিদিন, যখন আমি আজ মরতে বসেছি, যখন উপায় নেই নিজের শক্তি প্রমাণ করবার? এমনটা কেন হতে পারল, বলব?"

"বলো।"

"তুমি আমার চেয়ে ওকে ভালোবাস বলে। এতদিন সে কথা লুকিয়ে রেখেছিলে।"

আদিত্য কিছুক্ষণ মাথার চুলের মধ্যে হাত গুঁজে বসে রইল। তার পরে বিহ্বলকণ্ঠে বললে, "নীরু, দশ বৎসর তুমি আমাকে জেনেছ, সুখে দুঃখে নানা অবস্থায় নানা কাজে,

তার পরেও তুমি যদি এমন কথা আজ বলতে পার তবে আমি কোনো জবাব করব না। চললুম। কাছে থাকলে তোমার শরীর খারাপ হবে। ফর্নারির পাশে যে জাপানী ঘর আছে সেইখানে থাকব। যখন আমাকে দরকার হবে ডেকে পাঠিয়ো।"

৫

দিঘির ওপারের পাড়িতে চালতা গাছের আড়ালে চাঁদ উঠছে, জলে পড়েছে ঘন কালো ছায়া। এ পারে বাসন্তী গাছে কচি পাতা শিশুর ঘুমভাঙা চোখের মতো রাঙা, তার কাঁচাসোনার বরন ফুল, ঘন গন্ধ ভারী হয়ে জমে উঠেছে, গন্ধের কুয়াশা যেন। জোনাকির দল ঝলমল করছে জারুল গাছের ডালে। শান-বাঁধানো ঘাটের বেদির উপর স্তব্ধ হয়ে বসে আছে সরলা। বাতাস নেই কোথাও, পাতায় নেই কাঁপন, জল যেন কালো ছায়ার ফ্রেমে বাঁধানো পালিশ-করা রুপোর আয়না।

পিছনের দিক থেকে প্রশ্ন এল, "আসতে পারি কি।"

সরলা স্নিগ্ধ কণ্ঠে উত্তর দিলে, "এসো।" রমেন বসল ঘাটের সিঁড়ির উপর, পায়ের কাছে। সরলা ব্যস্ত হয়ে বললে, "কোথায় বসলে রমেনদাদা, উপরে এসো।"

রমেন বললে, "জান দেবীদের বর্ণনা আরম্ভ পদপল্লব থেকে? পাশে জায়গা থাকে তো পরে বসব। দাও তোমার হাতখানি, অভ্যর্থনা শুরু করি বিলিতি মতে।"

সরলার হাত নিয়ে চুম্বন করলে। বললে, "সম্রাজ্ঞীর অভিবাদন গ্রহণ করো।"

তার পরে উঠে দাঁড়িয়ে অল্প একটুখানি আবির নিয়ে দিলে ওর কপালে মাখিয়ে।

"এ আবার কী।"

"জান না আজ দোলপূর্ণিমা? তোমাদের গাছে গাছে ডালে ডালে রঙের ছড়াছড়ি। বসন্তে মানুষের গায়ে তো রং লাগে না, লাগে তার মনে। সেই রংটাকে বাইরে প্রকাশ করতে হবে, নইলে, বনলক্ষ্মী, অশোকবনে তুমি নির্বাসিত হয়ে থাকবে।"

"তোমার সঙ্গে কথার খেলা করি এমন ওস্তাদি নেই আমার।"

"কথার দরকার কিসের। পুরুষ পাখিই গান করে, তোমরা মেয়ে পাখি চুপ করে শুনলেই উত্তর দেওয়া হল। এইবার বসতে দাও পাশে।"

পাশে এসে বসল। অনেকক্ষণ চুপ করে রইল দুজনেই। হঠাৎ সরলা প্রশ্ন করলে, "রমেনদা, জেলে যাওয়া যায় কী করে, পরামর্শ দাও আমাকে।"

"জেলে যাবার রাস্তা এত অসংখ্য এবং আজকাল এত সহজ যে কী করে জেলে না যাওয়া যায় সেই পরামর্শই কঠিন হয়ে উঠল। এ যুগে গোয়ার বাঁশি ঘরে টিঁকতে দিল না।"

"না, আমি ঠাট্টা করছি নে, অনেক ভেবে দেখলুম আমার মুক্তি ওইখানেই।"

"ভালো করে খুলে বলো তোমার মনের কথাটা।"

"বলছি সব কথা। সম্পূর্ণ বুঝতে পারতে, যদি আদিতদার মুখখানা দেখতে পেতে।"

"আভাসে কিছু দেখেছি।"

"আজ বিকেলবেলায় একলা ছিলেম বারান্দায়। আমেরিকা থেকে ফুলগাছের ছবি-দেওয়া কেটালগ এসেছে, দেখছিলেম পাতা উলটিয়ে; রোজ বিকেলে সাড়ে চারটার মধ্যে চা খাওয়া সেরে আদিতদা আমাকে ডেকে নেন বাগানের কাজে। আজ দেখি অন্যমনে বেড়াচ্ছেন ঘুরে ঘুরে; মালীরা কাজ করে যাচ্ছে তাকিয়েও দেখছেন না। মনে হল আমার বারান্দার দিকে আসবেন বুঝি, দ্বিধা করে গেলেন ফিরে। অমন শক্ত লম্বা মানুষ, জোরে চলা, জোরে কাজ, সবদিকেই সজাগ দৃষ্টি, কড়া মনিব অথচ মুখে ক্ষমার হাসি; আজ সেই মানুষের সেই চলন নেই, দৃষ্টি নেই বাইরে, কোথায় তলিয়ে আছেন মনের ভিতরে। অনেকক্ষণ পরে ধীরে ধীরে এলেন কাছে। অন্যদিন হলে তখনই হাতের ঘড়িটা দেখিয়ে বলতেন, সময় হয়েছে, আমিও উঠে পড়তুম। আজ তা না বলে আস্তে আস্তে পাশে চৌকি টেনে নিয়ে বসলেন। বললেন, 'কেটালগ দেখছ বুঝি ?' আমার হাত থেকে কেটালগ নিয়ে পাতা ওলটাতে লাগলেন। কিছু যে দেখলেন তা মনে হল না। হঠাৎ একবার আমার মুখের দিকে চাইলেন, যেন পণ করলেন আর দেরি না করে এখনই কী একটা বলাই চাই। আবার তখনই পাতার দিকে চোখ নামিয়ে বললেন, 'দেখেছ সরি, কতবড়ো ন্যাসটার্শিয়াম।' কণ্ঠে গভীর ক্লান্তি। তার পর অনেকক্ষণ কথা নেই, চলল পাতা ওলটানো। আর-একবার হঠাৎ আমার মুখের দিকে চাইলেন, চেয়েই ধাঁ করে বই বন্ধ করে আমার কোলের উপর ফেলে দিয়ে উঠে পড়লেন। আমি বললেম, 'যাবে না বাগানে ?' আদিতদা বললেন, 'না ভাই বাইরে বেরতে হবে, কাজ আছে' বলেই তাড়াতাড়ি নিজেকে যেন ছিঁড়ে নিয়ে চলে গেলেন।"

"আদিতদা তোমাকে কী বলতে এসেছিলেন,; কী আন্দাজ কর তুমি।"

"বলতে এসেছিলেন, আগেই ভেঙেছে তোমার এক বাগান, এবার হুকুম এল, তোমার কপালে আর-এক বাগান ভাঙবে।"

"তাই যদি ঘটে সরি, তা হলে জেলে যাবার স্বাধীনতা যে আমার থাকবে না।"

সরলা ম্লান হেসে বললে, "তোমার সে রাস্তা কি আমি বন্ধ করতে পারি। সম্রাটবাহাদুর স্বয়ং খোলসা রাখবেন।"

"তুমি বৃন্তচ্যুত হয়ে পড়ে থাকবে রাস্তায়, আর আমি শিকলে ঝংকার দিতে দিতে চমক লাগিয়ে চলব জেলখানায়, এ কি কখনও হতে পারে। এখন থেকে তা হলে যে আমাকে এই বয়সে ভালোমানুষ হতে শিখতে হবে!"

"কী করবে তুমি।"

"তোমার অশুভগ্রহের সঙ্গে লড়াই ঘোষণা করে দেব। কুষ্টি থেকে তাকে তাড়াব। তার পরে লম্বা ছুটি পাব, এমন-কি কালাপানির পার পর্যন্ত।"

"তোমার কাছে কোনো কিছুই লুকোতে পারি নে। একটা কথা আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠছে কিছুদিন থেকে। আজ সেটা তোমাকে বলব, কিছু মনে কোরো না।"

"না বললে মনে করব।"

"ছেলেবেলা থেকে আদিতদার সঙ্গে একত্রে মানুষ হয়েছি। ভাই বোনের মতো নয়, দুই ভাই-এর মতো। নিজের হাতে দুজনে পাশাপাশি মাটি কুপিয়েছি, গাছ কেটেছি। জেঠাইমা আর মা দু তিন দিন পরে পরে মারা যান টাইফয়েডে, আমার বয়স তখন ছয়। বাবার মৃত্যু তার দু বছর পরে। জেঠামশাইয়ের মস্ত সাধ ছিল আমিই তাঁর বাগানটিকে বাঁচিয়ে রাখব আমার প্রাণ দিয়ে। তেমনি করেই আমাকে তৈরি করেছিলেন। কাউকে তিনি অবিশ্বাস করতে জানতেন না। যে-বন্ধুদের টাকা ধার দিয়েছিলেন তারা শোধ ক'রে বাগানকে দায়মুক্ত করবে এতে তাঁর সন্দেহ ছিল না। শোধ করেছেন কেবল আদিতদা, আর কেউ না। এই ইতিহাস হয়তো তুমি কিছু কিছু জান কিন্তু তবু আজ সব কথা গোড়া থেকে বলতে ইচ্ছে করছে।"

"সমস্ত আবার নূতন লাগছে আমার।"

"তার পরে জান হঠাৎ সবই ডুবল। যখন ডাঙায় টেনে তুলল বন্যা থেকে, তখন আর-একবার আদিতদার পাশে এসে ঠেকল আমার ভাগ্য। মিললুম তেমনি করেই— আমরা দুই ভাই, আমরা দুই বন্ধু। তার পর থেকে আদিতদার আশ্রয়ে আছি এও যেমন সত্যি, তাঁকে আশ্রয় দিয়েছি সেও তেমনি সত্যি। পরিমাণে আমার দিক থেকে কিছু কম হয় নি এ আমি জোর করে বলব। তাই আমার পক্ষে একটুও কারণ ঘটে নি সংকোচ করবার। এর আগে একত্রে ছিলেম যখন, তখন আমাদের যে-বয়স ছিল সেই

বয়সটা নিয়েই যেন ফিরলুম, সেই সম্বন্ধ নিয়ে। এমনি করেই চিরদিন চলে যেতে পারত। আর বলে কী হবে।"

"কথাটা শেষ করে ফেলো।"

"হঠাৎ আমাকে ধাক্কা মেরে কেন জানিয়ে দিলে যে আমার বয়স হয়েছে। যেদিনকার আড়ালে একসঙ্গে কাজ করেছি সেদিনকার আবরণ উড়ে গেছে এক-মুহূর্তে। তুমি নিশ্চয় সব জান রমেনদা, আমার কিছুই ঢাকা থাকে না তোমার চোখে। আমার উপরে বউদির রাগ দেখে প্রথম প্রথম ভারি আশ্চর্য লেগেছিল, কিছুতেই বুঝতে পারি নি। এতদিন দৃষ্টি পড়ে নি নিজের উপর, বউদিদির বিরাগের আগুনের আভায় দেখতে পেলেম নিজেকে, ধরা পড়লুম নিজের কাছে। আমার কথা বুঝতে পারছ কি।"

"তোমার ছেলেবেলাকার তলিয়ে-থাকা ভালোবাসা নাড়া খেয়ে ভেসে উঠছে উপরের তলায়।"

"আমি কী করব বলো। নিজের কাছ থেকে নিজে পালাই কী করে।" বলতে বলতে রমেনের হাত চেপে ধরলে।

রমেন চুপ করে রইল। আবার সে বললে, "যতক্ষণ এখানে আছি ততক্ষণ বেড়ে চলেছে আমার অন্যায়।"

"অন্যায় কার উপরে।"

"বউদির উপরে।"

"দেখো সরলা, আমি মানি নে ও-সব পুঁথির কথা। দাবির হিসেব বিচার করবে কোন্ সত্য দিয়ে। তোমাদের মিলন কতকালের; তখন কোথায় ছিল বউদি।"

"কী বলছ রমেনদা! আপন ইচ্ছের দোহাই দিয়ে এ কী আবদারের কথা। আদিতদার কথাও তো ভাবতে হবে।"

"হবে বই-কি। তুমি কি ভাবছ, যে-আঘাতে চমকিয়ে দিয়েছে তোমাকে, সেই আঘাতটাই তাঁকে লাগে নি।"

"রমেন নাকি।" পিছন থেকে শোনা গেল।

"হাঁ দাদা।" রমেন উঠে পড়ল।

"তোমার বউদি তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন, আয়া এসে এইমাত্র জানিয়ে গেল।"

রমেন চলে গেল, সরলাও তখনি উঠে যাবার উপক্রম করলে।

আদিত্য বললে, "যেয়ো না সরি, একটু বোসো।" আদিত্যের মুখ দেখে সরলার

বুক ফেটে যেতে চায়। ওই অবিশ্রাম কর্মরত আপনা-ভোলা মস্ত মানুষটা এতক্ষণ যেন কেবল পাক খেয়ে বেড়াচ্ছিল হালভাঙা ঢেউখাওয়া নৌকার মতো।

আদিত্য বললে, "আমরা দুজনে এ সংসারে জীবন আরম্ভ করেছিলেম একেবারে এক হয়ে। এত সহজ আমাদের মিল যে এর মধ্যে কোনো ভেদ কোনো কারণে ঘটতে পারে সে কথা মনে করাই অসম্ভব। তাই কি নয় সরি।"

"অঙ্কুরে যা এক থাকে, বেড়ে উঠে তা ভাগ হয়ে যায় এ কথা না মেনে তো থাকবার জো নেই আদিতদা।"

"সে-ভাগ তো বাইরে, কেবল চোখে দেখার ভাগ। অন্তরে তো প্রাণের মধ্যে ভাগ হয় না। আজ তোমাকে আমার কাছ থেকে সরিয়ে নেবার ধাক্কা এসেছে। আমাকে যে এত বেশি বাজবে এ আমি কোনোদিন ভাবতেই পারতুম না। সরি, তুমি কি জান কী ধাক্কাটা এল হঠাৎ আমাদের 'পরে।"

"জানি ভাই, তুমি জানবার আগে থাকতেই।"

"সইতে পারবে সরি?"

"সইতেই হবে।"

"মেয়েদের সহ্য করবার শক্তি কি আমাদের চেয়ে বেশি, তাই ভাবি।"

"তোমরা পুরুষমানুষ দুঃখের সঙ্গে লড়াই কর, মেয়েরা যুগে যুগে দুঃখ কেবল সহ্যই করে। চোখের জল আর ধৈর্য, এ ছাড়া আর তো কিছুই সম্বল নেই তাদের।"

"তোমাকে আমার কাছ থেকে ছিঁড়ে নিয়ে যাবে এ আমি ঘটতে দেব না, দেব না। এ অন্যায়, এ নিষ্ঠুর অন্যায়।"— ব'লে মুঠো শক্ত করে আকাশে কোন্ অদৃশ্য শত্রুর সঙ্গে লড়াই করতে প্রস্তুত হল।

সরলা কোলের উপর আদিত্যের হাতখানা নিয়ে তার উপরে ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। বলে গেল যেন আপন মনে ধীরে ধীরে, "ন্যায় অন্যায়ের কথা নয় ভাই, সম্বন্ধের বন্ধন যখন ফাঁস হয়ে ওঠে তার ব্যথা বাজে নানা লোকের মধ্যে, টানাটানি পড়ে নানা দিক থেকে, কাকেই বা দোষ দেব।"

"তুমি সহ্য করতে পারবে তা জানি। একদিনের কথা মনে পড়ছে। কী চুল ছিল তোমার, এখনও আছে। সে চুলের গর্ব ছিল তোমার মনে। সবাই সেই গর্বে প্রশ্রয় দিত। একদিন ঝগড়া হল তোমার সঙ্গে। দুপুরবেলা বালিশের 'পরে চুল মেলে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলে, আমি কাঁচি হাতে অন্তত আধহাতখানেক কেটে দিলাম। তখনই জেগে তুমি দাঁড়িয়ে উঠলে, তোমার ওই কালো চোখ আরও কালো হয়ে উঠল। শুধু বললে, 'মনে করেছ আমাকে জব্দ করবে?' ব'লে আমার হাত

থেকে কাঁচি টেনে নিয়ে ঘাড় পর্যন্ত চুল কেটে ফেললে কচ কচ করে। মেসোমশায় তোমাকে দেখে আশ্চর্য। বললেন, 'এ কী কাণ্ড।' তুমি শান্তমুখে অনায়াসে বললে, 'বড়ো গরম লাগে।' তিনিও একটু হেসে সহজেই মেনে নিলেন। প্রশ্ন করলেন না, ভর্ৎসনা করলেন না, কেবল্ কাঁচি নিয়ে সমান করে দিলেন তোমার চুল। তোমারই তো জেঠামশায়!"

সরলা হেসে বললে, "তোমার যেমন বুদ্ধি! তুমি ভাবছ এটা আমার ক্ষমার পরিচয়? একটুকুও নয়। সেদিন তুমি আমাকে যতটা জব্দ করেছিলে তার চেয়ে অনেক বেশি জব্দ করেছিলুম আমি তোমাকে। ঠিক কি না বলো।"

"খুব ঠিক। সেই কাটা চুল দেখে আমি কেবল কাঁদতে বাকি রেখেছিলুম। তার পরদিন তোমাকে মুখ দেখাতে পারি নি লজ্জায়। পড়বার ঘরে চুপ করে ছিলেম বসে। তুমি ঘরে ঢুকেই হাত ধ'রে আমাকে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গেলে বাগানের কাজে, যেন কিছুই হয় নি। আর-একদিনের কথা মনে পড়ে, সেই যেদিন ফাল্গুন মাসে অকালে ঝড় উঠে আমার বিছন লাগাবার ঘরের চাল উড়িয়ে নিয়েছিল তখন তুমি এসে—"

"থাক্ আর বলতে হবে না আদিতদা" ব'লে দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে, "সে-সব দিন আর আসবে না" বলেই তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল।

আদিত্য ব্যাকুল হয়ে সরলার হাত চেপে ধরে বললে, "না যেয়ো না, এখনই যেয়ো না, কখন একসময়ে যাবার দিন আসবে তখন—"

বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে বলে উঠল, "কোনোদিন কেন যেতে হবে। কী অপরাধ ঘটেছে। ঈর্ষা! আজ দশ বৎসর সংসারযাত্রায় আমার পরীক্ষা হল তারই এই পরিণাম? কী নিয়ে ঈর্ষা। তা হলে তো তেইশ বছরের ইতিহাস মুছে ফেলতে হয়, যখন থেকে তোমার সঙ্গে আমার দেখা।"

"তেইশ বছরের কথা বলতে পারি নে ভাই, কিন্তু তেইশ বছরের এই শেষ বেলাতে ঈর্ষার কি কোনো কারণই ঘটে নি। সত্যি কথা তো বলতে হবে। নিজেকে ভুলিয়ে লাভ কী। তোমার আমার মধ্যে কোনো কথা যেন অস্পষ্ট না থাকে।"

আদিত্য কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইল, বলে উঠল, "অস্পষ্ট আর রইল না। অন্তরে অন্তরে বুঝেছি তুমি নইলে আমার জগৎ হবে ব্যর্থ। যাঁর কাছ থেকে পেয়েছি তোমাকে জীবনের প্রথম বেলায়, তিনি ছাড়া আর কেউ তোমাকে কেড়ে নিতে পারবে না।

"কথা বোলো না আদিতদা, দুঃখ আর বাড়িয়ো না। একটু স্থির হয়ে দাও ভাবতে।"

"ভাবনা নিয়ে তো পিছনের দিকে যাওয়া যায় না। দুজনে যখন জীবন আরম্ভ করেছিলেম মেসোমশায়ের কোলের কাছে, সে তো না ভেবে চিন্তে। আজ কোনো রকমের নিড়ুনি দিয়ে কি উপড়ে ফেলতে পারবে সেই আমাদের দিনগুলিকে। তোমার কথা বলতে পারি নে সরি, আমার তো সাধ্য নেই।"

"পায়ে পড়ি, দুর্বল কোরো না আমাকে। দুর্গম কোরো না উদ্ধারের পথ।"

আদিত্য সরলার দুই হাত চেপে ধরে বললে, "উদ্ধারের পথ নেই, সে পথ আমি রাখব না। ভালোবাসি তোমাকে, এ কথা আজ এত সহজ করে সত্য করে বলতে পারছি এতে আমার বুক ভরে উঠেছে। তেইশ বছর যা ছিল কুঁড়িতে, আজ দৈবের কৃপায় তা ফুটে উঠেছে। আমি বলছি, তাকে চাপা দিতে গেলে সে হবে ভীরুতা, সে হবে অধর্ম।"

"চুপ চুপ, আর বোলো না। আজকের রাত্তিরের মতো মাপ করো, মাপ করো আমাকে।"

"সরি, আমিই কৃপাপাত্র, জীবনের শেষদিন পর্যন্ত আমিই তোমার ক্ষমার যোগ্য। কেন আমি ছিলুম অন্ধ। কেন আমি তোমাকে চিনলুম না, কেন বিয়ে করতে গেলুম ভুল করে। তুমি তো কর নি, কত পাত্র এসেছিল তোমাকে কামনা করে, সে তো আমি জানি।"

"জেঠামশায় যে আমাকে উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন তাঁর বাগানের কাজে, নইলে হয়তো—"

"না না— তোমার মনের গভীরে ছিল তোমার সত্য উজ্জ্বল। না জেনেও তার কাছে তুমি বাঁধা রেখেছিলে নিজেকে। আমাকে কেন তুমি চেতন করে দাও নি। আমাদের পথ কেন হল আলাদা।"

"থাক্ থাক্, যাকে মেনে নিতেই হবে তাকে না মানবার জন্য ঝগড়া করছ কার সঙ্গে। কী হবে মিথ্যে ছটফট করে। কাল দিনের বেলায় যা হয় একটা উপায় স্থির করা যাবে।"

"আচ্ছা, চুপ করলুম। কিন্তু এমন জ্যোৎস্নারাত্রে আমার হয়ে কথা কইবে এমন কিছু রেখে যাব তোমার কাছে।"

বাগানে কাজ করবার জন্য আদিত্যের কোমরে একটা ঝুলি থাকে বাঁধা, কিছু না কিছু সংগ্রহ করবার দরকার হয়। সেই ঝুলি থেকে বের করলে ছোটো তোড়ায় বাঁধা পাঁচটি নাগকেশরের ফুল। বললে, "আমি জানি নাগকেশর তুমি ভালোবাস। তোমার কাঁধের ওই আঁচলের উপর পরিয়ে দেব? এই এনেছি সেফটিপিন।"

সরলা আপত্তি করলে না। আদিত্য বেশ একটু সময় নিয়ে ধীরে ধীরে পরিয়ে দিলে। সরলা উঠে দাঁড়াল, আদিত্য সামনে দাঁড়িয়ে, দুই হাত ধরে, তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল, যেমন তাকিয়ে আছে আকাশের চাঁদ। বললে, "কী আশ্চর্য তুমি সরি, কী আশ্চর্য।"

সরলা হাত ছিনিয়ে নিয়ে দৌড়ে চলে গেল। আদিত্য অনুসরণ করলে না, যতক্ষণ দেখা যায় চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখলে। তার পরে বসে পড়ল সেই ঘাটের বেদির 'পরে। চাকর এসে খবর দিল "খাবার এসেছে"। আদিত্য বলল, "আজ আমি খাব না।"

৬

রমেন দরজার কাছ থেকে জিজ্ঞাসা করলে, "বউদি, ডেকেছ কি।" নীরজা রুদ্ধ গলা পরিষ্কার করে নিয়ে উত্তর দিলে, "এসো।"

ঘরের সব আলো নেবানো। জানলা খোলা, জ্যোৎস্না পড়েছে বিছানায়, পড়েছে নীরজার মুখে, আর শিয়রের কাছে আদিত্যের দেওয়া সেই ল্যাবার্নম গুচ্ছের উপর, বাকি সমস্ত অস্পষ্ট। বালিশে হেলান দিয়ে নীরজা অর্ধেক উঠে বসে আছে, চেয়ে আছে জানলার বাইরে। সেদিকে অরকিডের ঘর পেরিয়ে দেখা যাচ্ছে সুপুরি গাছের সার। এইমাত্র হাওয়া জেগেছে, দুলে উঠছে পাতাগুলো, গন্ধ আসছে আমের বোলের। অনেক দূর থেকে শব্দ শোনা যায় মাদলের আর গানের, গোরুর গাড়ির গাড়োয়ানদের বস্তিতে হোলি জমেছে। মেঝের উপর পড়ে আছে থালায় বরফি আর কিছু আবির। দারোয়ান দিয়ে গেছে উপহার। রোগীর বিশ্রামভঙ্গের ভয়ে সমস্ত বাড়ি আজ নিস্তব্ধ। এক গাছ থেকে আর-এক গাছে 'পিয়ুকাঁহা' পাখির চলেছে উত্তর প্রত্যুত্তর, কেউ হার মানতে চায় না। রমেন মোড়া টেনে এনে বসল বিছানার পাশে। পাছে কান্না ভেঙে পড়ে এই ভয়ে অনেকক্ষণ নীরজা কোনো কথা বললে না। তার ঠোঁট কাঁপতে লাগল, গলার কাছটাতে যেন বেদনার ঝড় পাক খেয়ে উঠছে। কিছু পরে সামলে নিলে, ল্যাবার্নম গুচ্ছের দুটো খসে-পড়া ফুল দলিত হয়ে গেল তার মুঠোর মধ্যে। তার পরে কোনো কথা না বলে একখানা চিঠি দিলে রমেনের হাতে। চিঠিখানা আদিত্যের লেখা। তাতে আছে—

"এতদিনের পরিচয়ের পরে আজ হঠাৎ দেখা গেল আমার নিষ্ঠায় সন্দেহ করা সম্ভবপর হল তোমার পক্ষে। এ নিয়ে যুক্তি তর্ক করতে লজ্জা বোধ করি।

তোমার মনের বর্তমান অবস্থায় আমার সকল কথা সকল কাজই বিপরীত হবে তোমার অনুভবে। সেই অকারণ পীড়ন তোমার দুর্বল শরীরকে আঘাত করবে প্রতিমুহূর্তে। আমার পক্ষে দূরে থাকাই ভালো, যে পর্যন্ত না তোমার মন সুস্থ হয়। এও বুঝলুম, সরলাকে এখানকার কাজ থেকে বিদায় করে দিই, এই তোমার ইচ্ছা। হয়তো দিতে হবে। ভেবে দেখলুম তা ছাড়া অন্য পথ নেই। তবু বলে রাখি, আমার শিক্ষা দীক্ষা উন্নতি সমস্তই সরলার জেঠামশায়ের প্রসাদে ; আমার জীবনে সার্থকতার পথ দেখিয়ে দিয়েছেন তিনিই। তাঁরই স্নেহের ধন সরলা সর্বস্বান্ত নিঃসহায়। আজ ওকে যদি ভাসিয়ে দিই তো অধর্ম হবে। তোমার প্রতি ভালোবাসার খাতিরেও পারব না।

অনেক ভেবে স্থির করেছি, আমাদের ব্যবসায়ে নতুন বিভাগ একটা খুলব, ফুল সবজির বীজ তৈরির বিভাগ। মানিকতলায় বাড়িসুদ্ধ জমি পাওয়া যেতে পারবে। সেইখানেই সরলাকে বসিয়ে দেব কাজে। এই কাজ আরম্ভ করবার মতো নগদ টাকা হাতে নেই আমার। আমাদের এই বাগানবাড়ি বন্ধক রেখে টাকা তুলতে হবে। এ প্রস্তাবে রাগ কোরো না এই আমার একান্ত অনুরোধ। মনে রেখো, সরলার জেঠামশায় আমার এই বাগানের জন্যে আমাকে মূলধন বিনাসুদে ধার দিয়েছিলেন, শুনেছি তারও কিছু অংশ তাঁকে ধার করতে হয়েছিল। শুধু তাই নয়, কাজ শুরু করে দেবার মতো বীজ, কলমের গাছ, দুর্লভ ফুলগাছের চারা, অরকিড, ঘাসকাটা কল ও অন্যান্য অনেক যন্ত্র দান করেছেন বিনামূল্যে। এতবড়ো সুযোগ যদি আমাকে না দিতেন, আজ ত্রিশটাকা বাসাভাড়ায় কেরানীগিরি করতে হত, তোমার সঙ্গে বিবাহও ঘটত না কপালে। তোমার সঙ্গে কথা হবার পর এই প্রশ্নই বার বার মনে আমার উঠেছে, আমিই ওকে আশ্রয় দিয়েছি, না আমাকেই আশ্রয় দিয়েছে সরলা? এই সহজ কথাটাই ভুলে ছিলেম, তুমিই আমাকে দিলে মনে করিয়ে। এখন তোমাকেও মনে রাখতে হবে। কখনও ভেবো না সরলা আমার গলগ্রহ। ওদের ঋণ শোধ করতে পারব না কোনোদিন, ওর দাবিরও অন্ত থাকবে না আমার ’পরে। তোমার সঙ্গে কখনও যাতে ওর দেখা না হয় সে চেষ্টা রইল মনে। কিন্তু আমার সঙ্গে ওর সম্বন্ধ যে বিচ্ছিন্ন হবার নয় সে কথা আজ যেমন বুঝেছি এমন এর আগে কখনও বুঝি নি। সব কথা বলতে পারলুম না, আমার দুঃখ আজ কথায় অতীত হয়ে গেছে। যদি অনুমানে বুঝতে পার তো পারলে, নইলে জীবনে এই প্রথম আমার বেদনা, যা রইল তোমার কাছে অব্যক্ত।”

রমেন চিঠিখানা পড়লে দুইবার। পড়ে চুপ করে রইল।

নীরজা ব্যাকুলস্বরে বললে, "কিছু একটা বলো ঠাকুরপো।"

রমেন তবু কিছু উত্তর দিলে না।

নীরজা তখন বিছানার উপর লুটিয়ে প'ড়ে বালিশে মাথা ঠুকতে লাগল, বললে, "অন্যায় করেছি, আমি অন্যায় করেছি। কিন্তু কেউ কি তোমরা বুঝতে পার না কিসে আমার মাথা দিল খারাপ ক'রে।"

"কী করছ বউদি। শান্ত হও, তোমার শরীর যে যাবে ভেঙে।"

"এই ভাঙা শরীরই তো আমার কপাল ভেঙেছে, ওর জন্যে মমতা কিসের। তার 'পরে আমার অবিশ্বাস এ দেখা দিল কোথা থেকে। এ যে অক্ষম জীবন নিয়ে আমার নিজেরই উপরে অবিশ্বাস! সেই তাঁর নীরু আজ আছে কোথায়, যাকে তিনি কখনো বলতেন 'মালিনী', কখনো বলতেন 'বনলক্ষ্মী'! আজ কে নিলে কেড়ে তার উপবন। আমার কি একটাই নাম ছিল। কাজ সেরে আসতে যেদিন তাঁর দেরি হত আমি বসে থাকতুম তাঁর খাবার আগলে, তখন আমাকে ডেকেছেন 'অন্নপূর্ণা'। সন্ধ্যাবেলায় তিনি বসতেন দিঘির ঘাটে, ছোটো রুপোর থালায় বেলফুল রাশ করে তার উপরে পান সাজিয়ে দিতেম তাঁকে, হেসে আমাকে বলতেন, 'তাম্বূলকরঙ্কবাহিনী'। সেদিন সংসারের সব পরামর্শ ই আমার কাছ থেকে নিয়েছেন তিনি। আমাকে নাম দিয়েছিলেন 'গৃহসচিব', কখনো-বা 'হোম সেক্রেটারি'। আমি যেন সমুদ্রে এসেছিলেম ভরা নদী, ছড়িয়েছিলেম নানা শাখা নানা দিকে, সব শাখাতেই আজ একদণ্ডে জল গেল শুকিয়ে, বেরিয়ে পড়ল পাথর।"

"বউদি, আবার তুমি সেরে উঠবে, তোমার আসন আবার অধিকার করবে পূর্ণশক্তি দিয়ে।"

"মিছে আশা দিয়ো না ঠাকুরপো। ডাক্তার কী বলে সে আমার কানে আসে। সেইজন্যেই এতদিনের সুখের সংসারকে এত করে আঁকড়ে ধরতে আমার এই নৈরাশ্যের কাঙালপনা।"

"দরকার কী বউদি। আপনাকে এতদিন তো ঢেলে দিয়েছ তোমার সংসারে। তার চেয়ে বড়ো কথা আর কিছু আছে কি। যেমন দিয়েছ তেমনই পেয়েছ, এত পাওয়াই বা কোন্ মেয়ে পায়। যদি ডাক্তারের কথা সত্যি হয়, যদি যাবার দিন এসেই থাকে, তা হলে যাকে বড়ো করে পেয়েছ, তাকে বড়ো করে ছেড়ে যাও। এতদিন যে-গৌরবে কাটিয়েছ সে-গৌরবকে খাটো করে দিয়ে যাবে কেন। এ বাড়িতে তোমার শেষ স্মৃতিকে যাবার সময় নূতন মহিমা দিয়ো।"

"বুক ফেটে যায় ঠাকুরপো, বুক ফেটে যায়। আমার এতদিনের আনন্দকে ফেলে রেখে হাসিমুখেই চলে যেতে পারতুম। কিন্তু কোনোখানে কি এতটুকু ফাঁক থাকবে না যেখানে আমার জন্যে একটা বিরহের দীপ টিমটিম করেও জ্বলবে। এ কথা ভাবতে গেলে যে মরতেও ইচ্ছে করে না। ওই সরলা সমস্তটাই দখল করবে একেবারে পুরোপুরি, বিধাতার এই কি বিচার।"

"সত্যি কথা বলব বউদি, রাগ কোরো না। তোমার কথা ভালো বুঝতেই পারি নে। যা নিজে ভোগ করতে পারবে না, তাও প্রসন্ন মনে দান করতে পার না যাকে এতদিন এত দিয়েছ? তোমার ভালোবাসার উপর এত বড়ো খোঁটা থেকে যাবে? তোমার সংসারে তোমারই শ্রদ্ধার প্রদীপ তুমি আপনিই আজ চুরমার করতে বসেছ। তার ব্যথা তুমি চলে যাবে এড়িয়ে, কিন্তু চিরদিন সে আমাদের বাজবে যে। মিনতি করে বলছি, তোমার সারাজীবনের দাক্ষিণ্যকে শেষমুহূর্তে কৃপণ করে যেয়ো না।"

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল নীরজা। চুপ করে বসে রইল রমেন, সান্ত্বনা দেবার চেষ্টামাত্র করলে না, কান্নার বেগ থেমে গেলে নীরজা বিছানায় উঠে বসল। বললে, "আমার একটি ভিক্ষা আছে ঠাকুরপো।"

"হুকুম করো বউদি।"

"বলি শোনো। যখন চোখের জলে ভিতরে ভিতরে বুক ভেসে যায় তখন ওই পরমহংসদেবের ছবির দিকে তাকিয়ে থাকি। কিন্তু ওঁর বাণী তো হৃদয়ে পৌঁছয় না। আমার মন বিশ্রী ছোটো। যেমন করে পার আমাকে গুরুর সন্ধান দাও। না হলে কাটবে না বন্ধন। আসক্তিতে জড়িয়ে পড়ব। যে সংসারে সুখের জীবন কাটিয়েছি, মরার পরে সেইখানেই দুঃখের হাওয়ায় যুগযুগান্তর কেঁদে কেঁদে বেড়াতে হবে; তার থেকে উদ্ধার করো আমাকে, উদ্ধার করো।"

"তুমি তো জান বউদি শাস্ত্রে যাকে বলে পাষণ্ড, আমি তাই। কিছু মানি নে। প্রভাস মিত্তির অনেক টানাটানি করে একবার আমাকে তার গুরুর কাছে নিয়ে গিয়েছিল। বাঁধা পড়বার আগেই দিলেম দৌড়। জেলখানার মেয়াদ আছে, এ বাঁধন বেমেয়াদি।"

"ঠাকুরপো, তোমার মন জোরালো, তুমি কিছুতে বুঝবে না আমার বিপদ। বেশ জানি যতই আঁকুবাঁকু করছি ততই ডুবছি অগাধ জলে, সামলাতে পারছি নে।"

"বউদি, একটা কথা বলি শোনো। যতক্ষণ মনে করবে তোমার ধন কেউ কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে ততক্ষণ বুকের পাঁজর জ্বলবে আগুনে। পাবে না শান্তি।

কিন্তু স্থির হয়ে বসে বলো দেখি একবার,— 'দিলেম আমি। সকলের চেয়ে যা দুর্মূল্য তাই দিলেম তাঁকে যাঁকে সকলের চেয়ে ভালোবাসি'— সব ভার যাবে একমুহূর্তে নেমে। মন ভরে উঠবে আনন্দে। গুরুকে দরকার নেই; এখনই বলো,— 'দিলেম, দিলেম, কিছুই হাতে রাখলেম না, আমার সব কিছু দিলেম, নির্মুক্ত হয়ে নির্মল হয়ে যাবার জন্যে প্রস্তুত হলেম, কোনো দুঃখের গ্রন্থি জড়িয়ে রেখে গেলেম না সংসারে'।"

"আহা, বলো, বলো ঠাকুরপো, বার বার করে শোনাও আমাকে। তাঁকে এ পর্যন্ত যা-কিছু দিতে পেরেছি তাতেই পেয়েছি আনন্দ, আজ যা দিতে পারছি নে, তাতেই এত করে মারছে। দেব, দেব, দেব, সব দেব আমার— আর দেরি নয়, এখনই। তুমি তাঁকে ডেকে নিয়ে এসো।"

"আজ নয় বউদি, কিছুদিন ধরে মনটাকে বেঁধে নাও, সহজ হোক তোমার সংকল্প।"

"না, না, আর সইতে পারছি নে। যখন থেকে বলে গেছেন এ বাড়ি ছেড়ে জাপানী ঘরে গিয়ে থাকবেন তখন থেকে এ শয্যা আমার কাছে চিতাশয্যা হয়ে উঠেছে। যদি ফিরে না আসেন এ রাত্তির কাটবে না, বুক ফেটে মরে যাব। অমনি ডেকে এনো সরলাকে, আমি শেল উপড়ে ফেলব বুকের থেকে, ভয় পাব না— এই তোমাকে বলছি নিশ্চয় করে।"

"সময় হয় নি বউদি, আজ থাক।"

"সময় যায় পাছে এই ভয়। এক্ষণি ডেকে আনো।" পরমহংসদেবের ছবির দিকে তাকিয়ে দু হাত জোড় করে বললে, "বল দাও ঠাকুর, বল দাও, মুক্তি দাও মতিহীন অধম নারীকে। আমার দুঃখ আমার ভগবানকে ঠেকিয়ে রেখেছে, পূজা অর্চনা সব গেল আমার। ঠাকুরপো, একটা কথা বলি আপত্তি কোরো না।"

"কী বলো।"

"একবার আমাকে ঠাকুরঘরে যেতে দাও দশ মিনিটের জন্যে, তা হলে আমি বল পাব, কোনো ভয় থাকবে না।"

"আচ্ছা, যাও, আপত্তি করব না।"

"আয়া।"

"কী খোঁখী।"

"ঠাকুরঘরে নিয়ে চল্ আমাকে।"

"সে কী কথা। ডাক্তারবাবু—"

"ডাক্তারবাবু যমকে ঠেকাতে পারবে না আর আমার ঠাকুরকে ঠেকাবে?"

"আয়া, তুমি ওঁকে নিয়ে যাও, ভয় নেই, ভালোই হবে।"

আয়াকে অবলম্বন করে নীরজা যখন চলে গেল এমন সময়ে আদিত্য ঘরে এল।

আদিত্য জিজ্ঞাসা করলে, "এ কী, নীরু ঘরে নেই কেন।"

"এখনই আসবেন, তিনি ঠাকুরঘরে গেছেন।"

"ঠাকুরঘরে! ঘর তো কাছে নয়। ডাক্তারের নিষেধ আছে যে।"

"শুনো না দাদা। ডাক্তারের ওষুধের চেয়ে কাজে লাগবে। একবার কেবল ফুলের অঞ্জলি দিয়ে প্রণাম করেই চলে আসবেন।

নীরজাকে চিঠি লিখে যখন পাঠিয়ে দিয়েছিল তখন আদিত্য স্পষ্ট জানত না যে, অদৃষ্ট তার জীবনের পটে প্রথম যে-লিপিখানি অদৃশ্য কালিতে লিখে রেখেছে, বাইরের তাপ লেগে সেটা হঠাৎ এতখানি উঠবে উজ্জ্বল হয়ে। প্রথমে ও সরলাকে বলতে এসেছিল— আর উপায় নেই, ছাড়াছাড়ি করতে হবে। সেই কথা বলবার বেলাতেই ওর মুখ দিয়ে বেরল উলটো কথা। তার পরে জ্যোৎস্নারাত্রে ঘাটে বসে বসে বারবার করে বলেছে— জীবনের সত্যকে আবিষ্কার করেছে বিলম্বে, তাই বলেই তাকে অস্বীকার করতে পারে না। ওর তো অপরাধ নেই, লজ্জা করবার নেই কিছু। অন্যায় তবেই হবে, যদি সত্যকে গোপন করতে যায়। করবে না গোপন, নিশ্চয় স্থির; ফলাফল যা হয় তা হোক। এ কথা আদিত্য বেশ বুঝেছে যে, যদি তার জীবনের কেন্দ্র থেকে কর্মের ক্ষেত্র থেকে সরলাকে আজ সরিয়ে দেয়, তবে সেই একাকিতায়, সেই নীরসতায় ওর সমস্ত নষ্ট হয়ে যাবে, ওর কাজ পর্যন্ত যাবে বন্ধ হয়ে।

"রমেন, তুমি আমাদের সব কথা জান আমি জানি।"

"হাঁ জানি।"

"আজ চুকিয়ে দেব সব, আজ পরদা ফেলব উঠিয়ে।"

"তুমি তো একলা নও দাদা। বোঝা ঘাড় থেকে ঝেড়ে ফেললেই তো হল না। বউদি রয়েছেন ওদিকে। সংসারের গ্রন্থি জটিল।"

"তোমার বউদি আর আমার মধ্যে মিথ্যাকে খাড়া করে রাখতে পারব না। বাল্যকাল থেকে সরলার সঙ্গে আমার যে সম্বন্ধ তার মধ্যে কোনো অপরাধ নেই সে কথা মান তো?"

"মানি বই-কি।"

"সেই সহজ সম্বন্ধের তলায় গভীর ভালোবাসা ঢাকা ছিল, জানতে পারি নি, সে কি আমাদের দোষ।"

"কে বলে দোষ।"

"আজ সেই কথাটাই যদি গোপন করি তা হলেই মিথ্যাচরণের অপরাধ হবে। আমি মুখ তুলেই বলব।"

"গোপনই বা করতে যাবে কী জন্যে, আর সমারোহ করে প্রকাশই বা করবে কেন। বউদিদি যা জানবার তা তিনি আপনিই জেনেছেন। আর ক'টা দিন পরেই তো এই পরম দুঃখের জটা আপনিই এলিয়ে যাবে। তুমি তা নিয়ে মিথ্যে টানাটানি কোরো না। বউদি যা বলতে চান শোনো, তার উত্তরে তোমারও যা বলা উচিত আপনিই সহজ হয়ে যাবে।"

নীরজাকে ঘরে আসতে দেখে রমেন বেরিয়ে গেল।

নীরজা ঘরে ঢুকেই আদিত্যকে দেখেই মেঝের উপরে লুটিয়ে পড়ে পায়ে মাথা রেখে অশ্রুগদগদ কণ্ঠে বললে, "মাপ করো, মাপ করো আমাকে, অপরাধ করেছি। এতদিন পরে ত্যাগ কোরো না আমাকে, দূরে ফেলো না আমাকে।" আদিত্য দুই হাতে তাকে তুলে ধরে বুকে করে নিয়ে আস্তে আস্তে বিছানায় শুইয়ে দিলে। বললে, "নীরু, তোমার ব্যথা কি আমি বুঝি নে।" নীরজার কান্না থামতে চায় না। আদিত্য আস্তে আস্তে ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। নীরজা আদিত্যের হাত টেনে নিয়ে বুকে চেপে ধরলে, বললে, "সত্যি বলো আমাকে মাপ করেছ। তুমি প্রসন্ন না হলে মরার পরেও আমার সুখ থাকবে না।"

"তুমি তো জান নীরু, মাঝে মাঝে মনান্তর হয়েছে আমাদের মধ্যে, কিন্তু মনের মিল কি ভেঙেছে তা নিয়ে।"

"এর আগে তো কোনোদিন বাড়ি ছেড়ে চলে যাও নি তুমি। এবারে গেলে কেন। এত নিষ্ঠুর তোমাকে করেছে কিসে।"

"অন্যায় করেছি নীরু, মাপ করতে হবে।"

"কী বল তার ঠিক নেই। তোমার কাছ থেকেই আমার সব শান্তি, সব পুরস্কার। অভিমানে তোমার বিচার করতে গিয়েই তো আমার এমন দশা ঘটেছিল। —ঠাকুরপোকে বলেছিলুম, সরলাকে ডেকে আনতে, এখনও আনলেন না কেন।"

সরলাকে ডেকে আনবার কথায় ধক্ করে ঘা লাগল আদিত্যের মনে। সমস্যাকে অন্তত আজকের মতো কোনোক্রমে পাশে সরিয়ে রাখতে পারলে সে নিশ্চিন্ত হয়। বললে, "রাত হয়েছে, এখন থাক্।" এমন সময় নীরজা বলে উঠল, "ওই শোনো, আমার মনে হচ্ছে ওরা অপেক্ষা করছে দরজার বাইরে। ঠাকুরপো, ঘরে এসো তোমরা।"

সরলাকে নিয়ে রমেন ঘরে ঢুকল। নীরজা বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। সরলা

প্রণাম করলে নীরজার পা ছুঁয়ে। নীরজা বললে, "এসো বোন, আমার কাছে এসো।"

সুরলার হাত ধরে বিছানায় বসাল। বালিশের নীচে থেকে গয়নার কেস টেনে নিয়ে একটি মুক্তোর মালা বের করে সরলাকে পরিয়ে দিলে। বললে, "একদিন ইচ্ছে করেছিলুম, যখন চিতায় আমার দাহ হবে এই মালাটি যেন আমার গলায় থাকে। কিন্তু তার চেয়ে এই ভালো। আমার হয়ে মালা তুমিই গলায় প'রে থেকো শেষদিন পর্যন্ত। বিশেষ বিশেষ দিনে এ মালা কতবার পরেছি সে তোমার দাদা জানেন। তোমার গলায় থাকলে সেই দিনগুলি ওঁর মনে পড়বে।"

"অযোগ্য আমি দিদি, অযোগ্য, কেন আমাকে লজ্জা দিচ্ছ।"

নীরজা মনে করেছিল, আজ তার সর্বদানযজ্ঞের এও একটা অঙ্গ। কিন্তু তার অন্তরতর মনের জ্বালা যে এই দানের মধ্যে দীপ্ত হয়ে প্রকাশ পেল সে কথা সে নিজেও স্পষ্ট বুঝতে পারে নি। ব্যাপারটা সরলাকে যে কতখানি বাজল তা অনুভব করলে আদিত্য। বললে, "ওই মালাটা আমাকে দাও-না সরলা। ওর মূল্য আমার কাছে যতখানি, এমন আর কারও কাছে নয়। ও আমি আর কাউকে দিতে পারব না।"

নীরজা বললে, "আমার কপাল। এত করেও বোঝাতে পারলুম না বুঝি। সরলা, শুনেছিলেম এই বাগান থেকে তোমার চলে যাবার কথা হয়েছিল। সে আমি কোনোমতেই ঘটতে দেব না। তোমাকে আমি আমার সংসারের যা-কিছু সমস্তর সঙ্গে রাখব বেঁধে, এই হারটি তারই চিহ্ন। এই আমার বাঁধন তোমার হাতে দিয়েছিলুম যাতে নিশ্চিন্ত হয়ে মরতে পারি।"

"ভুল করছ দিদি, আমাকে বাঁধতে চেয়ো না, ভালো হবে না তাতে।"

"সে কী কথা।"

"আমি সত্যি কথাই বলব। এতদিন আমাকে বিশ্বাস করতে পারতে। কিন্তু আজ আমাকে বিশ্বাস কোরো না, এই আমি তোমাদের সকলের সামনেই বলছি। ভাগ্য যে-দান থেকে আমাকে বঞ্চনা করেছে, কাউকে বঞ্চনা ক'রে সে আমি নেব না। এই রইল তোমার পায়ে আমার প্রণাম, আমি চললেম। অপরাধ আমার নয়, অপরাধ সেই আমার ঠাকুরের যাঁকে সরল বিশ্বাসে রোজ দু বেলা পূজা করেছি। সেও আজ আমার শেষ হল।"

এই বলে সরলা দ্রুতপদে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আদিত্য নিজেকে ধরে রাখতে পারলে না, সেও গেল চলে।

"ঠাকুরপো, এ কী হল ঠাকুরপো। বলো ঠাকুরপো, একটা কথা কও!"

"এইজন্যেই বলেছিলেম আজ রাত্রে ডেকো না।"

"কেন, মন খুলে আমি তো সবই দিয়ে দিয়েছি। ও কি তাও বুঝল না।"

"বুঝেছে বই-কি। বুঝেছে যে, মন তোমার খোলে নি। সুর বাজল না।"

"কিছুতে বিশুদ্ধ হল না আমার মন! এত মার খেয়েও! কে বিশুদ্ধ করে দেবে। ওগো সন্ন্যাসী, আমাকে বাঁচাও না। ঠাকুরপো, কে আমার আছে, কার কাছে যাব আমি।"

"আমি আছি বউদি। তোমার দায় আমি নেব। তুমি এখন ঘুমোও।"

"ঘুমোব কেমন করে। এ বাড়ি থেকে আবার যদি উনি চলে যান তা হলে মরণ নইলে আমার ঘুম হবে না।"

"চলে উনি যেতে পারবেন না; সে ওঁর ইচ্ছায় নেই, শক্তিতে নেই। এই নাও ঘুমের ওষুধ, তোমাকে ঘুম পাড়িয়ে তবে আমি যাব।"

"যাও ঠাকুরপো, তুমি যাও, ওরা দুজনে কোথায় গেল দেখে এসো, নইলে আমি নিজেই যাব, তাতে আমার শরীর ভাঙে ভাঙ্‌ক।"

"আচ্ছা, আচ্ছা, আমি যাচ্ছি।"

৭

আদিত্য ওর সঙ্গে এল দেখে সরলা বললে, "কেন এলে। ভালো করো নি। ফিরে যাও। আমার সঙ্গে তোমাকে এমন করে দেব না জড়াতে।"

"তুমি দেবে কি না সে তো কথা নয়, জড়িয়ে যে গেছেই। সেটা ভালো হোক বা মন্দ হোক তাতে আমাদের হাত নেই।"

"সে-সব কথা পরে হবে, ফিরে যাও, রোগীকে শান্ত করো গে।"

"আমাদের এই বাগানের আর-একটা শাখা বাড়াব সেই কথাটা—"

"আজ থাক্। আমাকে দু-চার দিন ভাববার সময় দাও, এখন আমার ভাববার শক্তি নেই।"

রমেন এসে বললে, "যাও দাদা, বউদিকে ওষুধ খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দাও গে, দেরি কোরো না। কিছুতেই কোনো কথা কইতে দিয়ো না ওঁকে। রাত হয়ে গেছে।"

আদিত্য চলে গেলে পর সরলা বললে, "শ্রদ্ধানন্দ পার্কে কাল তোমাদের একটা সভা আছে না?"

"আছে।"

"তুমি যাবে না?"

"যাবার কথা ছিল। কিন্তু এবার আর যাওয়া হল না।"

"কেন।"

"সে কথা তোমাকে বলে কী হবে।"

"তোমাকে ভিতু বলে সবাই নিন্দে করবে।"

"যারা আমায় পছন্দ করে না তারা আমায় নিন্দে করবে বই-কি।"

"তা হলে শোনো আমার কথা, আমি তোমাকে মুক্তি দেব। সভায় তোমাকে যেতেই হবে।"

"আর-একটু স্পষ্ট করে বলো।"

"আমিও যাব সভায় নিশেন হাতে নিয়ে।"

"বুঝেছি।"

"পুলিসে বাধা দেয় সেটা মানতে রাজি আছি কিন্তু তুমি বাধা দিলে মানব না।"

"আচ্ছা বাধা দেব না।"

"এই রইল কথা?"

"রইল।"

"আমরা দুজন একসঙ্গে যাব কাল বিকেল পাঁচটার সময়।"

"হাঁ যাব, কিন্তু ওই দুর্জনরা তার পরে আমাদের আর একসঙ্গে থাকতে দেবে না।"

এমন সময় আদিত্য এসে পড়ল। সরলা জিজ্ঞাসা করলে, "ও কী, এখনই এলে যে বড়ো!"

"দুই একটা কথা বলতে বলতেই নীরজা ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল, আমি আস্তে আস্তে চলে এলুম।"

রমেন বললে, "আমার কাজ আছে চললুম।"

সরলা হেসে বললে, "বাসা ঠিক করে রেখো, ভুলো না।"

"কোনো ভয় নেই। চেনা জায়গা।" এই বলে সে চলে গেল।

৮

সরলা বসে ছিল, সে উঠে দাঁড়াল, বললে, "যে-সব কথা বলবার নয় সে আমাকে বোলো না আজ, পায়ে পড়ি।"

"কিচ্ছু বলব না, ভয় নেই।"

"আচ্ছা, তা হলে আমিই কিছু বলতে চাই তুমি শোনো। বলো, কথা রাখবে।"

"অরক্ষণীয়া না হলে কথা নিশ্চয় রাখব তুমি তা জান।"

"বুঝতে বাকি নেই আমি কাছে থাকলে একেবারেই চলবে না। এই সময়ে দিদির সেবা করতে পারলে খুশি হতুম, কিন্তু সে আমার ভাগ্যে সইবে না। আমাকে অনুপস্থিত থাকতেই হবে। একটু থামো, কথাটা শেষ করতে দাও। শুনেইছ ডাক্তার বলেছেন বেশিদিন ওঁর সময় নেই। এইটুকুর মধ্যে ওঁর মনের কাঁটা তোমাকে উপড়ে দিতেই হবে। এই কয়দিনের মধ্যে আমার ছায়া কিছুতেই পড়তে দিয়ো না ওঁর জীবনে।"

"আমার মন থেকে আপনিই ছায়া যদি পড়ে, তবে কী করতে পারি।"

"না না, নিজের সম্বন্ধে অমন অশ্রদ্ধার কথা বোলো না। সাধারণ বাঙালি ছেলের মতো ভিজে মাটির তলতলে মন কি তোমার। কক্ষনো না, আমি তোমাকে জানি।"

আদিত্যের হাত ধরে বললে, "আমার হয়ে এই ব্রতটি তুমি নাও। দিদির জীবনান্তকালের শেষ ক'টা দিন দাও তোমার দাক্ষিণ্যে পূর্ণ ক'রে। একেবারে ভুলিয়ে দাও যে, আমি এসেছিলেম ওঁর সৌভাগ্যের ভরা ঘট ভেঙে দেবার জন্যে।"

আদিত্য চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

"কথা দাও ভাই।"

"দেব, কিন্তু তোমাকেও একটা কথা দিতে হবে। বলো, রাখবে।"

"তোমার সঙ্গে আমার তফাত এই যে, আমি যদি তোমাকে কিছু প্রতিজ্ঞা করাই সেটা সাধ্য, কিন্তু তুমি যদি করাও সেটা হয়তো অসম্ভব হবে।"

"না, হবে না।"

"আচ্ছা, বলো।"

"যে কথা মনে মনে বলি সে কথা তোমার কাছে মুখে বলতে অপরাধ নেই। তুমি যা বলছ তা শুনব এবং সেটা বিনা ত্রুটিতে পালন করা সম্ভব হবে যদি নিশ্চিত জানি একদিন তুমি পূর্ণ করবে আমার সমস্ত শূন্যতা। কেন চুপ করে রইলে।"

"জানি নে যে ভাই, প্রতিজ্ঞা পালনে কী বিঘ্ন একদিন ঘটতে পারে।"

"বিঘ্ন তোমার অন্তরে আছে কি। সেই কথাটা বলো আগে।"

"কেন আমাকে দুঃখ দাও। তুমি কি জান না এমন কথা আছে ভাষায় বললে যার আলো যায় নিভে।"

"আচ্ছা, এই শুনলুম, এই শুনেই চললুম কাজে।"

"আর ফিরে তাকাবে না এখন?"

"না, কিন্তু অব্যক্ত প্রতিজ্ঞার শিলমোহর করে নিতে ইচ্ছা করছে তোমার মুখটিতে।"

"যা সহজ তাকে নিয়ে জোর কোরো না। থাক্ এখন।"

"আচ্ছা, তবে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, এখন কী করবে, থাকবে কোথায়।"

"সে ভার নিয়েছেন রমেনদা।"

"রমেন তোমাকে আশ্রয় দেবে! সে-লক্ষ্মীছাড়ার চালচুলো আছে কি।"

"ভয় নেই তোমার। পাকা আশ্রয়। নিজের সম্পত্তি নয়, কিন্তু বাধা ঘটবে না।"

"আমি জানতে পারব তো?"

"নিশ্চয় জানতে পারবে কথা দিয়ে যাচ্ছি; কিন্তু ইতিমধ্যে আমাকে দেখবার জন্যে একটুও ব্যস্ত হতে পারবে না এই সত্য করো।"

"তোমারও মন ব্যস্ত হবে না?"

"যদি হয় অন্তর্যামী ছাড়া আর কেউ তা জানতে পারবে না।"

"আচ্ছা, কিন্তু যাবার সময় ভিক্ষার পাত্র একেবারে শূন্য রেখেই বিদায় দেবে?"

পুরুষের চোখ ছল ছল করে উঠল।

সরলা কাছে এসে নীরবে মুখ তুলে ধরলে।

৯

"রোশনি!"

"কী খোঁখী।"

"কাল থেকে সরলাকে দেখছি নে কেন।"

"সে কী কথা, জান না, সরকার বাহাদুর যে তাকে পুলিপোলাও চালান দিয়েছে?"

"কেন, কী করেছিল।"

"দারোয়ানের সঙ্গে ষড় করে বড়োলাটের মেমসাহেবের ঘরে ঢুকেছিল।"

"কী করতে।"

"মহারানীর শিলমোহর থাকে যে-বাক্সয় সেইটে চুরি করতে, আচ্ছা বুকের পাটা!"

"লাভ কী।"

"ওই শোনো! সেটা পেলেই তো সব হল। লাটসাহেবের ফাঁসি দিতে পারত। সেই মোহরের ছাপেই তো রাজ্যিখানা চলছে।"

"আর ঠাকুরপো?"

"সিঁধকাঠি বেরিয়েছে তাঁর পাগড়ির ভিতর থেকে, দিয়েছে তাঁকে হরিনবাড়িতে, পাথর ভাঙাবে পঁচাশ বছর। আচ্ছা খোঁখী, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, বাড়ি থেকে

যাবার সময় সরলাদিদি তার জাফরানী রঙের দামী শাড়িখানা আমাকে দিয়ে গেল। বললে, 'তোমার ছেলের বউকে দিয়ো।' চোখে আমার জল এল। কম দুঃখ তো দিই নি ওকে। এই শাড়িটা যদি রেখে দিই কোম্পানি বাহাদুর ধরবে না তো?"

"ভয় নেই তোর। কিন্তু শিগগির যা। বাইরের ঘরে খবরের কাগজ পড়ে আছে, নিয়ে আয়।"

পড়ল কাগজ। আশ্চর্য হল, আদিত্য তাকে এতবড়ো খবরটাও দেয় নি। এ কি অশ্রদ্ধা ক'রে। জেলে গিয়ে জিতল ওই মেয়েটা। আমি কি পারতুম না যেতে যদি শরীর থাকত। হাসতে হাসতে ফাঁসি যেতে পারতুম।

"রোশনি, তোদের সরলা দিদিমণির কাণ্ডটা দেখলি? হাটের লোকের সামনে ভদ্রঘরের মেয়ে—"

আয়া বললে, "মনে পড়লে গায়ে কাঁটা দেয়, চোরডাকাতের বাড়া। ছি ছি!"

"ওর সব তাতেই গায়ে-পড়া বাহাদুরি। বেহায়াগিরির একশেষ, বাগান থেকে আরম্ভ করে জেলখানা পর্যন্ত। মরতে মরতেও দেমাক ঘোচে না।"

আয়ার মনে পড়ল জাফরানী রঙের শাড়ির কথা। বললে, "কিন্তু খোঁখী, দিদিমণির মনখানা দরাজ।"

কথাটা নীরজাকে মস্ত একটা ধাক্কা দিলে। সে যেন হঠাৎ জেগে উঠে বললে, "ঠিক বলেছিস রোশনি, ঠিক বলেছিস। ভুলে গিয়েছিলুম। শরীর খারাপ থাকলেই মন খারাপ হয়। আগের থেকে কত যেন নিচু হয়ে গেছি। ছি ছি নিজেকে মারতে ইচ্ছে করে। সরলা খাঁটি মেয়ে, মিথ্যে জানে না। অমন মেয়ে দেখা যায় না। আমার চেয়ে অনেক ভালো। শিগগির আমাদের গণেশ সরকারকে ডেকে দে।"

আয়া চলে গেলে ও পেনসিল নিয়ে একটা চিঠি লিখতে বসল। গণেশ এল। তাকে বললে, "চিঠি পৌঁছিয়ে দিতে পারবে জেলখানায় সরলাদিদিকে?"

গণেশ গাঙ্গুলির কৃতিত্বের অভিমান ছিল। বললে, "পারব। কিছু খরচ লাগবে। কিন্তু কী লিখলে মা শুনি, কেননা পুলিসের হাত হয়ে যাবে চিঠিখানা।"

নীরজা পড়ে শোনালে, "ধন্য তোমার মহত্ত্ব। এবার জেলখানা থেকে বেরিয়ে যখন আসবে, তখন দেখবে তোমার পথের সঙ্গে আমার পথ মিলে গেছে।"

গণেশ বললে, "ওই যে পথটার কথা লিখেছ ভালো শোনাচ্ছে না। আমাদের উকিলবাবুকে দেখিয়ে ঠিক করা যাবে।"

গণেশ চলে গেল। নীরজা মনে মনে রমেনকে প্রণাম করে বললে, "ঠাকুরপো, তুমি আমার গুরু।"

১০

আদিত্য একটা পেয়ালায় ওষুধ নিয়ে ঘরে এসে প্রবেশ করলে।

নীরজা বললে, "এ আবার কী।"

আদিত্য বললে, "ডাক্তার বলে গেছে ঘণ্টায় ঘণ্টায় ওষুধ খাওয়াতে হবে।"

ওষুধ খাওয়াবার জন্যে বুঝি আর পাড়ায় লোক জুটল না! নাহয় দিনের বেলাকার জন্যে একজন নার্স রেখে দাও-না, যদি মনে এতই উদ্বেগ থাকে।"

"সেবার ছলে কাছে আসবার সুযোগ যদি পাই ছাড়ব কেন।"

"তার চেয়ে কোনো সুযোগে তোমার বাগানের কাজে যদি যাও তো ঢের বেশি খুশি হব। আমি পড়ে আছি, আর দিনে দিনে বাগান যে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।"

"হোক না নষ্ট। সেরে ওঠ আগে, তার পরে সেদিনকার মতো দুজনে মিলে কাজ করব।"

"সরলা চলে গেছে, তুমি একলা পড়েছ, কাজে মন যাচ্ছে না। কিন্তু উপায় কী তাই বলে লোকসান করতে দিয়ো না।"

"লোকসানের কথা আমি ভাবছি নে নীরু। বাগান করাটা যে আমার ব্যাবসা সে কথা এতদিন তুমিই ভুলিয়ে রেখেছিলে, কাজে তাই সুখ ছিল। এখন মন যায় না।"

"অমন করে আক্ষেপ করছ কেন। বেশ তো কাজ করছিলে এই সেদিন পর্যন্ত। কিছুদিনের জন্যে যদি বাধা পড়ে তাই নিয়ে এত ব্যাকুল হ'য়ো না।"

"পাখাটা কি চালিয়ে দেব।"

"বাড়াবাড়ি কোরো না তুমি, এ-সব কাজ তোমাদের নয়। এতে আমাকে আরও ব্যস্ত করে তোলে। যদি কোনোরকম ক'রে দিন কাটাতে চাও তোমাদের তো হর্টিকালচরিস্ট্‌ ক্লাব আছে।"

"তুমি যে রঙিন লিলি ভালোবাস, বাগানে অনেক খুঁজেছিলুম, একটাও পাই নি। এব্যরে ভালো বৃষ্টি হয় নি বলে গাছগুলোর তেজ নেই।"

"কী তুমি মিছিমিছি বকছ। তার চেয়ে হলাকে ডেকে দাও, আমি শুয়ে শুয়েই বাগানের কাজ করব। তুমি কি বলতে চাও আমি শয্যাগত বলেই আমার বাগানও হবে শয্যাগত। শোনো আমার কথা। শুকনো সীজন ফুলের গাছগুলো উপড়িয়ে ফেলে সেখানে জমি তৈরি করিয়ে নাও। আমার সিঁড়ির নিচের ঘরে সরষের খোলের বস্তা আছে। হলার কাছে আছে তার চাবি।"

"তাই নাকি, হলা তো এতদিন কিছুই বলে নি।"

"বলতে ওর রুচবে কেন। ওকে কি তোমরা কম হেনস্তা করেছ। কাঁচা সাহেব এসে প্রবীণ কেরানীকে যে-রকম গ্রাহ্য করে না সেইরকম আর কি।"

"হলা মালীর সম্বন্ধে সত্য কথা বলতে যদি চাই তবে সেটা অপ্রিয় হয়ে উঠবে।"

"আচ্ছা, আমি এই বিছানায় পড়ে থেকেই ওকে দিয়ে কাজ করাব, দেখবে দু দিনেই বাগানের চেহারা ফেরে কি না। বাগানের ম্যাপটা আমার কাছে দিয়ো। আর আমার বাগানের ডায়রিটা। আমি ম্যাপে পেনসিলের দাগ দিয়ে সমস্ত ব্যবস্থা করে দেব।"

"আমার তাতে কোনো হাত থাকবে না?"

"না। যাবার আগে এ বাগানে সম্পূর্ণ আমারই ছাপ মেরে দেব। বলে রাখছি রাস্তার ধারের ওই বট্‌ল-পাম্‌গুলো আমি একটাও রাখব না। ওখানে ঝাউগাছের সার লাগিয়ে দেব। অমন করে মাথা নেড়ো না। হয়ে গেলে তখন দেখো। তোমাদের ওই লন্‌টা আমি রাখব না, ওখানে মারবেলের একটা বেদি বাঁধিয়ে দেব।"

"বেদিটা কি ও জায়গায় মানাবে। একটু যেন— যাকে বলে সস্তা নবাবি।"

"চুপ করো। খুব মানাবে। তুমি কোনো কথা বলতে পারবে না। কিছুদিনের জন্যে এ বাগানটা হবে একলা আমার, সম্পূর্ণ আমার। তার পরে সেই আমার বাগানটা আমি তোমাকে দিয়ে যাব। ভেবেছিলে আমার শক্তি গেছে। দেখিয়ে দেব কী করতে পারি। আরও তিনজন মালী আমার চাই, আর মজুর লাগবে জন ছয়েক। মনে আছে একদিন তুমি বলেছিলে, বাগান সাজিয়ে তোলার শিক্ষা আমার হয় নি। হয়েছে কি না তার পরীক্ষা দিয়ে যাব। তোমাকে মনে রাখতেই হবে যে এ আমার বাগান, আমারই বাগান, আমার স্বত্ব কিছুতে যাবে না।"

"আচ্ছা সেই ভালো, তা হলে আমি কী করব।"

"তুমি তোমার দোকান নিয়ে থাকো; সেখানে তোমার আপিসের কাজ তো কম নয়।"

"তোমাকে নিয়ে থাকাও তা হলে নিষিদ্ধ?"

"হাঁ, সর্বদা কাছে থাকবার মতো সে আমি আর নেই, এখন আমি কেবল আর-একজনকে মনে করিয়েই দিতে পারি, তাতে লাভ কী।"

"আচ্ছা বেশ। যখন তুমি আমাকে সহ্য করতে পারবে তখনই আসব। ডেকে পাঠিয়ো আমাকে। আজ সাজিতে তোমার জন্যে গন্ধরাজ এনেছি, রেখে যাই তোমার বিছানায়, কিছু মনে কোরো না।" ব'লে আদিত্য উঠে পড়ল।

নীরজা হাত ধরে বললে, “না, যেয়ো না, একটু বোসো।” ফুলদানিতে একটা ফুল দেখিয়ে বললে, “জান এ ফুলের নাম ?”

আদিত্য জানে কী জবাব দিলে ও খুশি হবে, তাই মিথ্যে করে বললে, “না, জানি নে।”

“আমি জানি। বলব ? পেটুানিয়া। তুমি মনে কর আমি কিচ্ছু জানি নে, মুখ্যু আমি।”

আদিত্য হেসে বললে, “সহধর্মিণী তুমি, যদি মূর্খ হও অন্তত আমার সমান মূর্খ। আমাদের জীবনে মূর্খতার কারবার আধাআধি ভাগে চলছে।”

“সে কারবার আমার ভাগ্যে এইবারে শেষ হয়ে এল। ওই-যে দারোয়ানটা ওইখানে বসে তামাক কুটছে, ও থাকবে দেউড়িতে, কিছুদিন পরেই আমি থাকব না। ওই-যে গোরুর গাড়িটা পাথুরে কয়লা আজাড় করে দিয়ে খালি ফিরে যাচ্ছে ওর যাতায়াত চলবে রোজ রোজ, কিন্তু চলবে না আমার এই হৃদয়যন্ত্রটা।” আদিত্যের হাত হঠাৎ জোর করে চেপে ধরলে, বললে, “একেবারেই থাকব না, কিচ্ছুই থাকব না ? বলো আমাকে, তুমি তো অনেক বই পড়েছ, বলো-না আমাকে সত্যি করে।”

“যাদের বই পড়েছি তাদের বিদ্যে যতদূর আমারও ততদূর। যমের দরজার কাছটাতে এসে থেমেছি আর এগোই নি।”

“বলো-না, তুমি কী মনে কর। একটুও থাকব না ? এতটুকুও না ?”

“এখন আছি এটাই যদি সম্ভব হয়, তখন থাকব সেও সম্ভব।”

“নিশ্চয়ই সম্ভব, ওই বাগানটা সম্ভব আর আমিই হব অসম্ভব, এ হতেই পারে না, কিছুতেই না। সন্ধেবেলায় অমনি করেই অস্পষ্ট আলোয় কাকেরা ফিরবে বাসায়, এমনি করেই দুলবে সুপুরিগাছের ডাল ঠিক আমারই চোখের সামনে। সেদিন তুমি মনে রেখো আমি আছি, আমি আছি, সমস্ত বাগানময় আমি আছি। মনে কোরো বাতাস যখন তোমার চুল ওড়াচ্ছে আমার আঙুলের ছোঁয়া আছে তাতে। বলো, মনে করবে ?”

আদিত্যকে বলতে হল, “হাঁ, মনে করব।” কিন্তু এমন সুরে বলতে পারলে না যাতে তার বিশ্বাসের প্রমাণ হয়।

নীরজা অস্থির হয়ে বলে উঠল, “তোমাদের বই যারা লেখে ভারি তো পণ্ডিত তারা, কিচ্ছু জানে না। আমি নিশ্চয় জানি, আমার কথা বিশ্বাস করো। আমি থাকব, আমি এইখানেই থাকব, আমি তোমারই কাছে থাকব, একেবারে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। এই তোমাকে বলে যাচ্ছি, কথা দিয়ে যাচ্ছি, তোমার বাগানের গাছপালা

সমস্তই আমি দেখব, যেমন আগে দেখতুম তার চেয়ে অনেক ভালো করে দেখব। কাউকে দরকার হবে না। কাউকে না।”

বিছানায় শুয়েছিল নীরজা ; উঠে বালিশে ঠেসান দিয়ে বসল, বললে, “আমাকে দয়া কোরো, দয়া কোরো। তোমাকে এত ভালোবাসি সেই কথা মনে ক’রে আমাকে দয়া কোরো। এতদিন তুমি আমাকে যেমন আদরে স্থান দিয়েছ তোমার ঘরে, সেদিনও তেমনই করেই স্থান দিয়ো। ঋতুতে ঋতুতে তোমার যে-সব ফুল ফুটবে তেমনই করেই মনে মনে তুলে দিয়ো আমার হাতে। যদি নিষ্ঠুর হও তুমি, তা হলে তো এখানে আমি থাকতে পারব না। আমার বাগান যদি কেড়ে নাও তা হলে হাওয়ায় হাওয়ায় কোন্ শূন্যে আমি ভেসে বেড়াব?” নীরজার দুই চক্ষু দিয়ে জল ঝরে পড়তে লাগল।

আদিত্য মোড়া ছেড়ে বিছানার উপর উঠে বসল। নীরজার মুখ বুকে টেনে নিয়ে আস্তে আস্তে হাত বুলোতে লাগল তার মাথায়। বললে, “নীরু, শরীর নষ্ট কোরো না।”

“যাক গে আমার শরীর। আমি আর কিচ্ছু চাই নে, আমি কেবল তোমাকে চাই এই সমস্ত কিছু নিয়ে। শোনো একটা কথা বলি, রাগ কোরো না আমার উপর, রাগ কোরো না,” বলতে বলতে স্বর রুদ্ধ হয়ে এল। একটু শান্ত হলে পর বললে, “সরলার উপর অন্যায় করেছি। তোমার পায়ে ধরে বলছি আর অন্যায় করব না। যা হয়েছে, তার জন্যে আমাকে মাপ কোরো। কিন্তু আমাকে ভালোবেসো, ভালোবেসো তুমি, যা চাও আমি সব করব।”

আদিত্য বললে, “শরীরের সঙ্গে সঙ্গে মন ছিল অসুস্থ নীরু, তাই নিজেকে মিথ্যা পীড়ন করেছ।”

“শোনো বলি। কাল রাত্রি থেকে বারবার পণ করেছি, এবার দেখা হলে নির্মল মনে ওকে বুকে টেনে নেব আপন বোনের মতো। তুমি আমাকে এই শেষ প্রতিজ্ঞা-রক্ষায় সাহায্য করো। বলো, আমি তোমার ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হব না, তা হলে সবাইকে আমার ভালোবাসা দিয়ে যেতে পারব।”

এ কথার কোনো উত্তর না করে আদিত্য বারবার চুম্বন করলে ওর মুখ, ওর কপাল। মুদে এল নীরজার চোখ। খানিক বাদে নীরজা জিজ্ঞাসা করলে, “সরলা কবে খালাস পাবে সেই দিন গুণছি। ভয় হয় পাছে তার আগে মরে যাই। পাছে বলে যেতে না পারি যে আমার মন একেবারে সাদা হয়ে গেছে। এইবার আলো জ্বালাও। আমাকে পড়ে শোনাও অক্ষয় বড়ালের ‘এষা’।” বালিশের নীচে থেকে বই বের করে দিলে। আদিত্য পড়ে শোনাতে লাগল।

শুনতে শুনতে যেই একটু ঘুম এসেছে আয়া ঘরে এসে বলল, "চিঠি", ঘোর ভেঙে নীরজা চমকে উঠল। ধড় ধড় করতে লাগল তার বুক। কোনো বন্ধু আদিত্যকে খবর দিয়েছে, জেলে স্থানাভাব, তাই যে-কয়টি কয়েদীকে মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার আগেই ছেড়ে দেওয়া হবে সরলা তার মধ্যে একজন। আদিত্যের মনটা লাফিয়ে উঠল। প্রাণপণ বলে চেপে রাখলে মনের উল্লাস। নীরজা জিজ্ঞাসা করলে, "কার চিঠি, কী খবর।"

পাছে পড়তে গেলে গলার আওয়াজ যায় কেঁপে, চিঠিখানা দিলে নীরজার হাতেই। নীরজা আদিত্যের মুখের দিকে চাইলে। মুখে কথা নেই বটে কিন্তু কথার প্রয়োজন ছিল না। নীরজার মুখেও কথা বেরল না কিছুক্ষণ। তার পরে খুব জোর করে বললে, "তা হলে তো আর দেরি নেই। আজই আসবে। নিশ্চয়ই ওকে আনবে আমার কাছে।"

"ও কী। কী হল। নীরু! নার্স, ডাক্তার আছেন?"

"আছেন বাইরের ঘরে।"

"এখনই নিয়ে এসো, এই যে ডাক্তার! এইমাত্র বেশ সহজ শরীরে কথা বলছিল, বলতে বলতে অজ্ঞান হয়ে গেল।"

ডাক্তার নাড়ি দেখে চুপ করে রইল।

কিছুক্ষণ পরে রোগী চোখ মেলেই বললে, "ডাক্তার, আমাকে বাঁচাতেই হবে। সরলাকে না দেখে যেতে পারব না, ভালো হবে না তাতে। আশীর্বাদ করব তাকে— শেষ আশীর্বাদ।"

আবার এল চোখ বুজে। হাতের মুঠো শক্ত হল, বলে উঠল, "ঠাকুরপো, কথা রাখব, কৃপণের মতো মরব না।"

এক-একবার চেতনা ক্ষীণ হয়ে জগৎ ঝাপসা হয়ে আসছে আবার নিবু-নিবু প্রদীপের মতো জীবন-শিখা উঠছে জ্বলে। স্বামীকে থেকে থেকে জিজ্ঞাসা করছে, "কখন আসবে সরলা।"

থেকে থেকে সে ডেকে ওঠে, "রোশনি!"

আয়া বলে, "কী খোঁখী।"

"ঠাকুরপোকে ডেকে দে এক্ষুনি।" একবার আপনি বলে উঠল, "কী হবে আমার ঠাকুরপো! দেব দেব দেব, সব দেব।"

রাত্রি তখন ন'টা। নীরজার ঘরের কোণে ক্ষীণ আলোতে জ্বলছে একটা মোমের বাতি। বাতাসে দোলনচাঁপার গন্ধ। খোলা জানলার থেকে দেখা যায় বাগানের

গাছগুলোর পুঞ্জীভূত কালিমা, আর তার উপরের আকাশে কালপুরুষের নক্ষত্রশ্রেণী। রোগী ঘুমোচ্ছে আশঙ্কা ক'রে সরলাকে দরজার কাছে রেখে আদিত্য ধীরে ধীরে এল নীরজার বিছানার কাছে।

আদিত্য দেখলে ঠোঁট নড়ছে। যেন নিঃশব্দে কী জপ করছে। জ্ঞানে অজ্ঞানে জড়িত বিহ্বল মুখ। কানের কাছে মাথা নামিয়ে আদিত্য বললে, "সরলা এসেছে।" চোখ ঈষৎ মেলে নীরজা বললে, "তুমি যাও"— একবার ডেকে উঠল, "ঠাকুরপো!" কোথাও সাড়া নেই।

সরলা এসে প্রণাম করবার জন্য পায়ে হাত দিতেই যেন বিদ্যুতের আঘাতে ওর সমস্ত শরীর আক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। পা দ্রুত আপনি গেল সরে।

ভাঙা গলায় বলে উঠল, "পারলুম না, পারলুম না, দিতে পারব না, পারব না।"

বলতে বলতে অস্বাভাবিক জোর এল দেহে— চোখের তারা প্রসারিত হয়ে জ্বলতে লাগল। চেপে ধরলে সরলার হাত, কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ হল, বললে, "জায়গা হবে না তোর রাক্ষসী, জায়গা হবে না। আমি থাকব, থাকব, থাকব।"

হঠাৎ ঢিলে-শেমিজ-পরা পাণ্ডুবর্ণ শীর্ণমূর্তি বিছানা ছেড়ে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে উঠল। অদ্ভুত গলায় বললে, "পালা পালা পালা এখনই, নইলে দিনে দিনে শেল বিঁধব তোর বুকে, শুকিয়ে ফেলব তোর রক্ত।" বলেই পড়ে গেল মেঝের উপর।

গলার শব্দ শুনে আদিত্য ছুটে এল ঘরে, প্রাণের সমস্ত শক্তি ফুরিয়ে ফেলে দিয়ে নীরজার শেষ কথা তখন স্তব্ধ হয়ে গেছে।

প্রবন্ধ

সমাজ

সমাজ

আচারের অত্যাচার

> “ইংরেজিতে পাউণ্ড আছে, শিলিং আছে, পেনি আছে, ফার্দিং আছে— আমাদের টাকা আছে, আনা আছে, কড়া আছে, ক্রান্তি আছে, দন্তি আছে, কাক আছে, তিল আছে।… ইংরেজ এবং অন্যান্য জাতি ক্ষুদ্রতম অংশ ধরে না, ছাড়িয়া দেয়; আমরা ক্ষুদ্রতম অংশ ধরি, ছাড়ি না… হিন্দু বলেন যে, ধর্মজগতেও কড়াক্রান্তিটি বাদ যায় না, স্বয়ং ভগবান কড়াক্রান্তিটিও ছাড়েন না। তাই বুঝি হিন্দু সামাজিক অনুষ্ঠানেও কড়াক্রান্তিটি পর্যন্ত ছাড়েন নাই, কড়াক্রান্তিটির ভাবনাও ভাবিয়া গিয়াছেন, ব্যবস্থাও করিয়া গিয়াছেন।”
>
> —সাহিত্য, ৩য় ভাগ, ৭ম সংখ্যা

সকল দিক সমানভাবে রক্ষা করা মানুষের পক্ষে দুঃসাধ্য। এইজন্য মানুষকে কোনো-না-কোনো বিষয়ে রফা করিয়া চলিতেই হয়।

কেবলমাত্র যদি থিয়োরি লইয়া থাকিতে হয়, তাহা হইলে তুমি কড়া, ক্রান্তি, দন্তি, কাক, সূক্ষ্ম, অতিসূক্ষ্ম এবং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভগ্নাংশ লইয়া, ঘরে বসিয়া, পাটিগণিতের বিচিত্র সমস্যা পূরণ করিতে পার। কিন্তু কাজে নামিলেই অতিসূক্ষ্ম অংশগুলি ছাঁটিয়া চলিতে হয়, নতুবা হিসাব মিলাইতে মিলাইতে কাজ করিবার সময় পাওয়া যায় না।

কারণ, সীমা তো এক জায়গায় টানিতেই হইবে। তুমি সূক্ষ্মহিসাবী, দন্তি কাক পর্যন্ত হিসাব চালাইতে চাও, তোমার চেয়ে সূক্ষ্মতর হিসাবী বলিতে পারেন, কাকে গিয়াই বা থামিব কেন। বিধাতার দৃষ্টি যখন অনন্ত সূক্ষ্ম, তখন আমাদের জীবনের হিসাবও অনন্ত সূক্ষ্মের দিকে টানিতে হইবে। নহিলে তাঁহার সম্পূর্ণ সন্তোষ হইবে না— তিনি ক্ষমা করিবেন না।

বিশুদ্ধ তর্কের হিসাবে ইহার বিরুদ্ধে কাহারও কথা কহিবার জো নাই— কিন্তু কাজের হিসাবে দেখিতে গেলে, জোড়হস্তে বিনীতস্বরে আমরা বলি, “প্রভু, আমাদের অনন্ত ক্ষমতা নাই, সে তুমি জান। আমাদিগকে কাজও করিতে হয় এবং তোমার কাছে হিসাবও দিতে হয়। আমাদের জীবনের সময়ও অল্প এবং সংসারের পথও কঠিন। তুমি আমাদিগকে দেহ দিয়াছ, মন দিয়াছ, আত্মা দিয়াছ; ক্ষুধা দিয়াছ, বুদ্ধি দিয়াছ, প্রেম দিয়াছ; এবং এই-সমস্ত বোঝা লইয়া আমাদিগকে সংসারের সহস্র লোকের সহস্র বিষয়ের আবর্তের মধ্যে ফেলিয়া দিয়াছ। ইহার উপরেও

পণ্ডিতেরা ভয় দেখাইতেছেন, তুমি হিন্দুর দেবতা অতি কঠিন, তুমি কড়াক্রান্তি-দন্তিকাকের হিসাবও ছাড় না। তা যদি হয়, তবে তো হিন্দুকে সংসারের কোনো প্রকৃত কাজে, মানবের কোনো বৃহৎ অনুষ্ঠানে যোগ দিবার অবসর দেওয়া হয় না। তবে তো তোমার বৃহৎ কাজ ফাঁকি দিয়া, কেবল তোমার ক্ষুদ্র হিসাব কষিতে হয়। তুমি যে শোভাসৌন্দর্যবৈচিত্র্যময় সাগরাম্বরা পৃথিবীতে আমাদিগকে প্রেরণ করিয়াছ, সে-পৃথিবী তো পর্যটন করিয়া দেখা হয় না, তুমি যে উন্নত মানববংশে আমাদিগকে জন্মদান করিয়াছ, সেই মানবদের সহিত সম্যক্ পরিচয় এবং তাহাদের দুঃখমোচন, তাহাদের উন্নতিসাধনের জন্য বিচিত্র কর্মানুষ্ঠান, সে তো অসাধ্য হয়। কেবল ক্ষুদ্র পরিবারে ক্ষুদ্র গ্রামে বদ্ধ হইয়া, গৃহকোণে বসিয়া, গতিশীল বিপুল মানব-প্রবাহ ও জগৎসংসারের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া আপনার ক্ষুদ্র দৈনিক জীবনের কড়াক্রান্তি গনিতে হয়। ইহাকে স্পর্শ করিব না, তাহার ছায়া মাড়াইব না, অমুকের অন্ন খাইব না, অমুকের কন্যা গ্রহণ করিব না, এমন করিয়া উঠিব, অমন করিয়া বসিব, তেমন করিয়া চলিব, তিথি নক্ষত্র দিন ক্ষণ লগ্ন বিচার করিয়া হাত পা নাড়িব, এমন করিয়া কর্মহীন ক্ষুদ্র জীবনটাকে টুকরা টুকরা করিয়া, কাহনকে কড়া-কড়িতে ভাঙিয়া স্তূপাকার করিয়া তুলিব, এই কি আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য। হিন্দুর দেবতা, এই কি তোমার বিধান যে, আমরা কেবলমাত্র 'হিঁদু' হইব, মানুষ হইব না।"

ইংরেজিতে একটা কথা আছে, "পেনি ওয়াইজ পাউণ্ড ফুলিশ"— বাংলায় তাহার তর্জমা করা যাইতে পারে, "কড়ায় কড়া কাহনে কানা।" অর্থাৎ কড়ার প্রতি অতিরিক্ত দৃষ্টি রাখিতে গিয়া কাহনের প্রতি ঢিল দেওয়া। তাহার ফল হয়, "বজ্র আঁটন ফসকা গিরো"— প্রাণপণ আঁটুনির ত্রুটি নাই কিন্তু গ্রন্থিটি শিথিল।

আমাদের দেশেও হইয়াছে তাই। বিধিব্যবস্থা-আচারবিচারের প্রতি অত্যধিক মনোযোগ করিতে গিয়া, মনুষ্যত্বের স্বাধীন উচ্চ অঙ্গের প্রতি অবহেলা করা হইয়াছে।

সামাজিক আচার হইতে আরম্ভ করিয়া ধর্মনীতির ধ্রুব অনুশাসনগুলি পর্যন্ত সকলেরই প্রতি সমান কড়াকড় করাতে ফল হইয়াছে, আমাদের দেশে সমাজনীতি ক্রমে সুদৃঢ় কঠিন হইয়াছে কিন্তু ধর্মনীতি শিথিল হইয়া আসিয়াছে। একজন লোক গোরু মারিলে সমাজের নিকট নির্যাতন সহ্য করিবে এবং তাহার প্রায়শ্চিত্ত স্বীকার করিবে, কিন্তু মানুষ খুন করিয়া সমাজের মধ্যে বিনা প্রায়শ্চিত্তে স্থান পাইয়াছে এমন দৃষ্টান্তের অভাব নাই। পাছে হিন্দুর বিধাতার হিসাবে কড়াক্রান্তির গরমিল হয়,

এইজন্য পিতা অষ্টমবর্ষের মধ্যেই কন্যার বিবাহ দেন এবং অধিক বয়সে বিবাহ দিলে জাতিচ্যুত হন ; বিধাতার হিসাব মিলাইবার জন্য সমাজের যদি এতই সূক্ষ্মদৃষ্টি থাকে তবে উক্ত পিতা নিজের উচ্ছৃঙ্খল চরিত্রের শত শত পরিচয় দিলেও কেন সমাজের মধ্যে আত্মগৌরব রক্ষা করিয়া চলিতে পারে। ইহাকে কি কাকদন্তির হিসাব বলে। আমি যদি অস্পৃশ্য নীচজাতিকে স্পর্শ করি, তবে সমাজ তৎক্ষণাৎ সেই দন্তি-হিসাব সম্বন্ধে আমাকে সতর্ক করিয়া দেন, কিন্তু আমি যদি উৎপীড়ন করিয়া সেই নীচজাতির ভিটামাটি উচ্ছিন্ন করিয়া দিই, তবে সমাজ কি আমার নিকট হইতে সেই কাহনের হিসাব তলব করেন। প্রতিদিন রাগদ্বেষ লোভমোহ মিথ্যাচরণে ধর্মনীতির ভিত্তিমূল জীর্ণ করিতেছি, অথচ স্নান তপ বিধিব্যবস্থার তিলমাত্র ত্রুটি হইতেছে না। এমন কি দেখা যায় না।

আমি বলি না যে, হিন্দুশাস্ত্রে ধর্মনীতিমূলক পাপকে পাপ বলে না। কিন্তু মনুষ্যকৃত সামান্য সামাজিক নিষেধগুলিকেও তাহার সমশ্রেণীতে ভুক্ত করাতে যথার্থ পাপের ঘৃণ্যতা স্বভাবতই হ্রাস হইয়া আসে। অত্যন্ত বৃহৎ ভিড়ের ভিতর শ্রেণীবিচার দুরূহ হইয়া উঠে। অস্পৃশ্যকে স্পর্শ করা এবং সমুদ্রযাত্রা হইতে নরহত্যা পর্যন্ত সকল পাপই আমাদের দেশে গোলে হরিবোল দিয়া মিশিয়া পড়ে।

পাপখণ্ডনেরও তেমনই শত শত সহজ পথ আছে। আমাদের পাপের বোঝা যেমন দেখিতে দেখিতে বাড়িয়া উঠে, তেমনই যেখানে-সেখানে তাহা ফেলিয়া দিবারও স্থান আছে। গঙ্গায় স্নান করিয়া আসিলাম, অমনি গাত্রের ধুলা এবং ছোটোবড়ো সমস্ত পাপ ধৌত হইয়া গেল। যেমন রাজ্যে বৃহৎ মড়ক হইলে প্রত্যেক মৃতদেহের জন্য ভিন্ন ভিন্ন গোর দেওয়া অসাধ্য হয়, এবং আমীর হইতে ফকির পর্যন্ত সকলকে রাশীকৃত করিয়া এক বৃহৎ গর্তের মধ্যে ফেলিয়া সংক্ষেপে অন্ত্যেষ্টিসৎকার সারিতে হয়, আমাদের দেশে তেমনই খাইতে শুইতে উঠিতে বসিতে এত পাপ যে, প্রত্যেক পাপের স্বতন্ত্র খণ্ডন করিতে গেলে সময়ে কুলায় না ; তাই মাঝে মাঝে একেবারে ছোটোবড়ো সকলগুলাকে কুড়াইয়া অতি সংক্ষেপে এক সমাধির মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া আসিতে হয়। যেমন বজ্র আঁটন তেমন ফসকা গিরো।

এইরূপে পাপপুণ্য যে মনের ধর্ম, মানুষ ক্রমে সেটা ভুলিয়া যায়। মন্ত্র পড়িলে, ডুব মারিলে, গোময় খাইলে যে পাপ নষ্ট হইতে পারে এ বিশ্বাস মনে আনিতে হয়। কারণ, মানুষকে যদি মানুষের হিসাবে না দেখিয়া যন্ত্রের হিসাবে দেখ, তবে তাহারও নিজেকে যন্ত্র বলিয়া ভ্রম হইবে। যদি সামান্য লাভলোকসান ব্যাবসাবাণিজ্য ছাড়া আর কোনো বিষয়েই তাহার স্বাধীন বুদ্ধিচালনার অবসর না দেওয়া হয়, যদি

ওঠাবসা মেলামেশা ছোঁওয়াখাওয়াও তাহার জন্য দৃঢ়নির্দিষ্ট হইয়া থাকে, তবে মানুষের মধ্যে যে একটা স্বাধীন মানসিক ধর্ম আছে সেটা ক্রমে ভুলিয়া যাইতে হয়। পাপপুণ্য সকলই যন্ত্রের ধর্ম মনে করা অসম্ভব হয় না এবং তাহার প্রায়শ্চিত্তও যন্ত্রসাধ্য বলিয়া মনে হয়।

কিন্তু অতিসূক্ষ্ম যুক্তি বলে, যদি মানুষের স্বাধীন বুদ্ধির প্রতি কিঞ্চিন্মাত্র নির্ভর করা যায় তবে দৈবাৎ কাকদন্তির হিসাব না মিলিতে পারে। কারণ, মানুষ ঠেকিয়া শেখে— কিন্তু তিলমাত্র ঠেকিলেই যখন পাপ, তখন তাহাকে শিখিতে অবসর না দিয়া নাকে দড়ি দিয়া চালানোই যুক্তিসংগত। ছেলেকে হাঁটিতে শিখাইতে গেলে পড়িতে দিতে হয়, তাহা অপেক্ষা তাহাকে বুড়াবয়স পর্যন্ত কোলে করিয়া লইয়া বেড়ানোই ভালো। তাহা হইলে তাহার পড়া হইল না, অথচ গতিবিধিও বন্ধ হইল না। ধূলির লেশমাত্র লাগিলে হিন্দুর দেবতার নিকট হিসাব দিতে হইবে, অতএব মনুষ্যজীবনকে তেলের মধ্যে ফেলিয়া শিশির মধ্যে নীতি-মিউজিয়ামের প্রদর্শনদ্রব্যের স্বরূপ রাখিয়া দেওয়াই সুপরামর্শ।

ইহাকেই বলে কড়ায় কড়া, কাহনে কানা। কী রাখিলাম আর কী হারাইলাম সে কেহ বিচার করিয়া দেখে না। কবিকঙ্কণে বাণিজ্যবিনিময়ে আছে—

শুকুতার বদলে মুকুতা দিবে
ভেড়ার বদলে ঘোড়া।

আমরা পণ্ডিতেরা মিলিয়া অনেক যুক্তি করিয়া শুক্তার বদলে মুক্তা দিতে প্রস্তুত হইয়াছি। মানসিক যে-স্বাধীনতা না থাকিলে পাপপুণ্যের কোনো অর্থই থাকে না, সেই স্বাধীনতাকে বলি দিয়া নামমাত্র পুণ্যকে তহবিলে জমা করিয়াছি।

পাপপুণ্য-উত্থানপতনের মধ্য দিয়া আমাদের মনুষ্যত্ব উত্তরোত্তর পরিস্ফুট হইয়া উঠিতে থাকে। স্বাধীনভাবে আমরা যাহা লাভ করি সে-ই আমাদের যথার্থ লাভ; অবিচারে অন্যের নিকট হইতে যাহা গ্রহণ করি তাহা আমরা পাই না। ধূলিকর্দমের উপর দিয়া, আঘাতসংঘাতের মধ্য দিয়া, পতনপরাভব অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইতে হইতে যে-বল সঞ্চয় করি, সেই বলই আমাদের চিরজীবনের সঙ্গী। মাটিতে পদার্পণমাত্র না করিয়া, দুগ্ধফেনশুভ্র পুণ্যশয্যায় শয়ান থাকিয়া হিন্দুর দেবতার নিকটে জীবনের একটি অতিনিষ্কলঙ্ক হিসাব প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যায়— কিন্তু সে-হিসাব কী। একটি শূন্য শুভ্র খাতা। তাহাতে কলঙ্ক নাই এবং অঙ্কপাত নাই। পাছে কড়াক্রান্তি-কাকদন্তির গোল হয় এইজন্য আয় ব্যয় স্থিতিমাত্র নাই।

নিখুঁত সম্পূর্ণতা মনুষ্যের জন্য নহে। কারণ, সম্পূর্ণতার মধ্যে একটা সমাপ্তি

আছে। মানুষ ইহজীবনের মধ্যেই সমাপ্ত নহে। যাঁহারা পরলোক মানেন না, তাঁহারাও স্বীকার করিবেন, একটি জীবনের মধ্যেই মানুষের উন্নতিসম্ভাবনার শেষ নাই।

নিম্নশ্রেণীর জন্তুরা ভূমিষ্ঠকাল অবধি মানবশিশুর অপেক্ষা অধিকতর পরিণত। মানবশিশু একান্ত অসহায়। ছাগশিশুকে চলিবার আগে পড়িতে হয় না। যদি বিধাতার নিকট চলার হিসাব দিতে হয়, তবে ছাগশাবক কাকদন্তির হিসাব পর্যন্ত মিলাইয়া দিতে পারে। কিন্তু মনুষ্যের পতন কে গণনা করিবে।

জন্তুদের জীবনের পরিসর সংকীর্ণ, তাহারা অল্পদূর গিয়াই উন্নতি শেষ করে—এইজন্য আরম্ভকাল হইতেই তাহারা শক্তসমর্থ। মানুষের জীবনের পরিধি বহুবিস্তীর্ণ, এইজন্য বহুকাল পর্যন্ত সে অপরিণত দুর্বল।

জন্তুরা যে-স্বাভাবিক নৈপুণ্য লইয়া জন্মগ্রহণ করে ইংরেজিতে তাহাকে বলে ইন্‌স্‌টিংক্‌ট্‌, বাংলায় তাহার নাম দেওয়া যাইতে পারে সহজ-সংস্কার। সহজ-সংস্কার, অশিক্ষিতপটুত্ব একেবারেই ঠিক পথ দিয়া চলিতে পারে, কিন্তু বুদ্ধি ইতস্তত করিতে করিতে ভ্রমের মধ্য দিয়া আপনার পথ সন্ধান করিয়া বাহির করে। সহজ-সংস্কার পশুদের, বুদ্ধি মানুষের। সহজ-সংস্কারের গম্যস্থান সামান্য সীমার মধ্যে, বুদ্ধির শেষ লক্ষ্য এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই।

আবশ্যকের আকর্ষণ চতুষ্পার্শ্ব বাঁচাইয়া, পথঘাট দেখিয়া, ক্ষেত্র নিষ্কণ্টক করিয়া, সুবিধার পথ দিয়া আমাদিগকে স্বার্থপরতার সীমা পর্যন্ত লইয়া যায়; প্রেমের আকর্ষণ আমাদিগকে সমস্ত গণ্ডীর বাহিরে লইয়া, আত্মবিসর্জন করাইয়া, কখনো ভূতলশায়ী কখনো অশ্রুসাগরে নিমগ্ন করে। আবশ্যকের সীমা আপনার মধ্যে, প্রেমের সীমা কোথায় কেহ জানে না। তেমনই, পূর্ব হইতে সমস্ত নির্দিষ্ট করিয়া, সমস্ত পতন সমস্ত গ্লানি হইতে রক্ষা করিয়া একটি নিরতিশয় সমতল সমাজের মধ্যে নিরাপদে জীবন চালনা করিলে, সে-জীবনের পরিসর নিতান্ত সামান্য হয়।

আমরা মানবসন্তান বলিয়াই বহুকাল আমাদের শারীরিক মানসিক দুর্বলতা; বহুকাল আমরা পড়ি, বহুকাল আমরা ভুলি, বহুকাল আমাদিগের শিক্ষা করিতে যায়—আমরা অনন্তের সন্তান বলিয়া বহুকাল ধরিয়া আমাদের আধ্যাত্মিক দুর্বলতা, পদে পদে আমাদের দুঃখ কষ্ট পতন। কিন্তু সে-ই আমাদের সৌভাগ্য, সে-ই আমাদের চিরজীবনের লক্ষণ, তাহাতেই আমাদিগকে বলিয়া দিতেছে, এখনও আমাদের বুদ্ধি ও বিকাশের শেষ হইয়া যায় নাই।

শৈশবেই যদি মানুষের উপসংহার হইত, তাহা হইলে মানুষের মতো অপরিস্ফুটতা

সমস্ত প্রাণীসংসারে কোথাও পাওয়া যাইত না; অপরিণত পদস্খলিত ইহজীবনেই যদি আমাদের পরিসমাপ্তি হয়, তবে আমরা একান্ত দুর্বল ও হীন তাহার আর সন্দেহ নাই। কিন্তু আমাদের বিলম্ববিকাশ, আমাদের ত্রুটি, আমাদের পাপ আমাদের সম্মুখবর্তী সুদূর ভবিষ্যতের সূচনা করিতেছে। বলিয়া দিতেছে, কড়াক্রান্তি কাক-দন্তি চোখবাঁধা ঘানির বলদের জন্য; সে তাহার পূর্ববর্তীদের পদচিহ্নিত একটি ক্ষুদ্র সুগোলচক্রের মধ্যে প্রতিদিন পাক খাইয়া সর্ষপ হইতে তৈলনিষ্পেষণ নামক একটি বিশেষনির্দিষ্ট কাজ করিয়া জীবননির্বাহ করিতেছে, তাহার প্রতি মুহূর্ত এবং প্রতি তৈলবিন্দু হিসাবের মধ্যে আনা যায়— কিন্তু যাহাকে আপনার সমস্ত মনুষ্যত্ব অপরিমেয় বিকাশের দিকে লইয়া যাইতে হইবে, তাহাকে বিস্তর খুচরা হিসাব ছাঁটিয়া ফেলিতে হইবে।

উপসংহারে একটি কথা বলিয়া রাখি, একিলিস এবং কচ্ছপ নামক একটি ন্যায়ের কুতর্ক আছে। তদ্দ্বারা প্রমাণ হয় যে, একিলিস যতই দ্রুতগামী হউক, মন্দগতি কচ্ছপ যদি একত্রে চলিবার সময় কিঞ্চিন্মাত্র অগ্রসর থাকে, তবে একিলিস তাহাকে ধরিতে পারিবে না। এই কুতর্কে তার্কিক অসীম ভগ্নাংশের হিসাব ধরিয়াছেন— কড়াক্রান্তি-দন্তিকাকের দ্বারা তিনি ঘরে বসিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে, কচ্ছপ চিরদিন অগ্রবর্তী থাকিবে। কিন্তু এ দিকে প্রকৃত কর্মভূমিতে একিলিস এক পদক্ষেপে সমস্ত কড়াক্রান্তি-দন্তিকাক লঙ্ঘন করিয়া কচ্ছপকে ছাড়াইয়া চলিয়া যায়। তেমনই আমাদের পণ্ডিতেরা সূক্ষ্মযুক্তি দ্বারা প্রমাণ করিতে পারেন যে, কড়াক্রান্তি-দন্তিকাক লইয়া আমাদের কচ্ছপসমাজ অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে অগ্রসর হইয়া আছে; কিন্তু দ্রুতগামী মানবপথিকেরা এক-এক দীর্ঘ পদক্ষেপে আমাদের সমস্ত সূক্ষ্ম প্রমাণ লঙ্ঘন করিয়া চলিয়া যাইতেছে; তাহাদিগকে যদি ধরিতে চাই তবে চুল-চেরা হিসাব ফেলিয়া দিয়া রীতিমত চলিতে আরম্ভ করা যাক। আর তা যদি না চাই, তবে অন্ধ আত্মাভিমান বৃদ্ধি করিবার জন্য চোখ বুজিয়া পাণ্ডিত্য করা অলস সময়যাপনের একটা উপায় বটে। তাহাতে আমাদের পুণ্য প্রমাণ হয় কি না জানি না, কিন্তু নৈপুণ্য প্রমাণ হয়।

১২৯৯

সমুদ্রযাত্রা

বাংলাদেশে সমুদ্রযাত্রার আন্দোলন প্রায় সমুদ্র-আন্দোলনের তুল্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সংবাদপত্র এবং চটি পুঁথি বাক্যোচ্ছ্বাসে ফেনিল ও স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে, পরস্পর আঘাত প্রতিঘাতেরও শেষ নাই।

তর্কটা এই লইয়া যে, সমুদ্রযাত্রা শাস্ত্রসিদ্ধ না শাস্ত্রবিরুদ্ধ। সমুদ্রযাত্রা ভালো কি মন্দ তাহা লইয়া কোনো কথা নহে। কারণ, যাহা অন্য হিসাবে ভালো অথবা যাহাতে কোনো মন্দর সংস্রব দেখা যায় না, তাহা যে শাস্ত্রমতে ভালো না হইতে পারে, এ কথা স্বীকার করিতে আমাদের কোনো লজ্জা নাই।

যাহাতে আমাদের মঙ্গল, আমাদের শাস্ত্রের বিধানও তাহাই, এ কথা আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি না। তাহা যদি পারিতাম, তবে সেই মঙ্গলের দিক হইতে যুক্তি আকর্ষণ করিয়া শাস্ত্রের সহিত মিলাইয়া দিতাম। আগে দেখাইতাম, অমুক কার্য আমাদের পক্ষে ভালো এবং অবশেষে দেখাইতাম তাহাতে আমাদের শাস্ত্রের সম্মতি আছে।

সমুদ্রযাত্রার উপকারিতার পক্ষে ভূরি ভূরি প্রমাণ থাক্ না কেন, যদি শাস্ত্রে তাহার বিরুদ্ধে একটিমাত্র বচন থাকে, তবে সমস্ত প্রমাণ ব্যর্থ হইবে। তাহার অর্থ এই, আমাদের কাছে সত্যের অপেক্ষা বচন বড়ো, মানবের শাস্ত্রের নিকট জগদীশ্বরের শাস্ত্র ব্যর্থ।

শাস্ত্রই যে সকল সময়ে বলবান তাহাও নহে। অনেকে বলেন বটে, ঋষিদের এমন অমানুষিক বুদ্ধি ছিল যে, তাঁহারা যে-সকল বিধান দিয়াছেন, সমস্ত প্রমাণ তুচ্ছ করিয়া আমরা অন্ধবিশ্বাসের সহিত নির্ভয়ে তাহা পালন করিয়া যাইতে পারি। কিন্তু সমাজে অনেক সময়েই শাস্ত্রবিধি ও ঋষিবাক্য তাঁহারা লঙ্ঘন করেন এবং তখন লোকাচার ও দেশাচারের দোহাই দিয়া থাকেন।

তাহাতে এই প্রমাণ হয় যে, শাস্ত্রবিধি ও ঋষিবাক্য অভ্রান্ত নহে। যদি অভ্রান্ত হইত, তবে লোকাচার তাহার কোনোরূপ অন্যথা করিলে লোকাচারকে দোষী করা উচিত হইত। কিন্তু দেশাচার ও লোকাচারের প্রতি যদি শাস্ত্রবিধি সংশোধনের ভার দেওয়া যায়, তবে শাস্ত্রের অমোঘতা আর থাকে না ; তবে স্পষ্ট মানিতে হয়, শাস্ত্রশাসন সকল কালে সকল স্থানে খাটে না।

তাহা যদি না খাটিল, তবে আমাদের কর্তব্যের নিয়ামক কে। শুভবুদ্ধিও নহে, শাস্ত্রবাক্যও নহে। লোকাচার। কিন্তু লোকাচারকে কে পথ দেখাইবে। লোকাচার যে অভ্রান্ত নহে, ইতিহাসে তাহার শতসহস্র প্রমাণ আছে। লোকাচার যদি অভ্রান্ত হইত, তবে পৃথিবীতে এত বিপ্লব ঘটিত না, এত সংস্কারকের অভ্যুদয় হইত না।

বিশেষত যে-লোকসমাজের মধ্যে জীবনপ্রবাহ নাই, সেখানকার জড় লোকাচার আপনাকে আপনি সংশোধন করিতে পারে না। স্রোতের জল অবিশ্রান্ত গতিবেগে নিজের দূষিত অংশ ক্রমাগত পরিহার করিতে থাকে। কিন্তু বদ্ধ জলে দোষ প্রবেশ করিলে তাহা সংশোধিত হইতে পারে না, উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

আমাদের সমাজ বদ্ধ সমাজ। একে তো আভ্যন্তরিক সহস্র আইনে বদ্ধ, তাহার পরে আবার ইংরেজের আইনেও বাহির হইতে আষ্টেপৃষ্ঠে বন্ধন পড়িয়া গেছে। সমাজসংশোধনে স্বদেশীয় রাজার স্বাভাবিক অধিকার ছিল এবং পূর্বকালে তাঁহারা সে-কাজ করিতেন। কিন্তু অনধিকারী ইংরেজ আমাদের সমাজকে যে-অবস্থায় হাতে পাইয়াছে, ঠিক সেই অবস্থায় দৃঢ়ভাবে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। সে নিজেও কোনো নূতন নিয়ম প্রচলিত করিতে সাহস করে না, বাহির হইতেও কোনো নূতন নিয়মকে প্রবেশ করিতে দেয় না। কোন্‌টা বৈধ কোন্‌টা অবৈধ তাহা সে অন্ধভাবে নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছে। এখন সমাজের কোনো সচেতন স্বাভাবিক শক্তি সহজে কোনোরূপ পরিবর্তন সাধন করিতে পারে না।

এমন বাঁধা-সমাজের মধ্যে যদি লোকাচার মানিতে হয়, তবে একটা মৃত দেবতার পূজা করিতে হয়। সে কেবল একটা নিশ্চল নিশ্চেষ্ট জড় কঙ্কাল। সে চিন্তা করে না, অনুভব করে না, সময়ের পরিবর্তন উপলব্ধি করিতে পারে না। তাহার দক্ষিণে বামে নড়িবার শক্তি নাই। সমস্ত হতভাগ্য জাতি, তাহার সমস্ত ভক্ত উপাসক, যদি তাহার সম্মুখে পড়িয়া পলে পলে আপনার মরণব্রত উদ্‌যাপন করে, তথাপি সে কল্যাণপথে তিলার্ধমাত্র অঙ্গুলিনির্দেশ করিতে পারে না।

যাঁহারা শাস্ত্র হইতে বিধি সংগ্রহ করিয়া লোকাচারকে আঘাত করিতে চেষ্টা করেন, তাঁহারা কী করেন। তাঁহারা মৃতকে মারিতে চাহেন। যাহার বেদনাবোধ নাই তাহার প্রতি অস্ত্র প্রয়োগ করেন, যে অন্ধ তাহার নিকট দীপশিখা আনয়ন করেন। অস্ত্র প্রতিহত হয়, দীপশিখা বৃথা আলোকদান করে।

তাঁহাদের আর-একটা কথা জানা উচিত। শাস্ত্রও এক সময়ের লোকাচার। তাঁহারা অন্য সময়ের লোকাচারকে স্বপক্ষভুক্ত করিয়া বর্তমানকালের লোকাচারকে আক্রমণ করিতে চাহেন। তাঁহারা বলিতে চাহেন, বহুপ্রাচীনকালে সমুদ্রযাত্রার

কোনো বাধা ছিল না। বর্তমান লোকাচার বলে, তখন ছিল না এখন আছে ; ইহার কোনো উত্তর নাই।

এ যেন এক শত্রুকে তাড়াইবার উদ্দেশ্যে আর-এক শত্রুকে ডাকা। মোগলের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য পাঠানের হাতে আত্মসমর্পণ করা। যাহার নিজের কিছুমাত্র শক্তি আছে, সে এমন বিপদের খেলা খেলিতে চাহে না।

আমাদের কি নিজের কোনো শক্তি নাই। আমাদের সমাজে যদি কোনো দোষের সঞ্চার হয়, যদি তাহার কোনো ব্যবস্থা আমাদের সমস্ত জাতির উন্নতিপথের ব্যাঘাতস্বরূপ আপন পাষাণমস্তক উত্তোলন করিয়া থাকে, তবে তাহা দূর করিতে গেলে কি আমাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে, বহু প্রাচীনকালে তাহার কোনো নিষেধবিধি ছিল কি না। যদি দৈবাৎ পাওয়া গেল, তবে দিনকতক পণ্ডিতে পণ্ডিতে শাস্ত্রে শাস্ত্রে দেশব্যাপী একটা লাঠালাঠি পড়িয়া গেল ; আর যদি দৈবাৎ অনুস্বারবিসর্গবিশিষ্ট একটা বচনার্ধ না পাওয়া গেল, তবে আমরা কি এমনি নিরুপায় যে, সমাজের সমস্ত অসম্পূর্ণতা সমস্ত দোষ শিরোধার্য করিয়া বহন করিব, এমন-কি তাহাকে পবিত্র বলিয়া পূজা করিব। দোষও কি প্রাচীন হইলে পূজ্য হয়।

আমরা কি নিজের কর্তব্যবুদ্ধির বলে মাথা তুলিয়া বলিতে পারি না— পূর্বে কী ছিল এবং এখন কী আছে তাহা জানিতে চাহি না, সমাজের যাহা দোষ তাহা দূর করিব, যাহা মঙ্গল তাহা আবাহন করিয়া আনিব। আমাদের শুভাশুভ-জ্ঞানকে হস্তপদ ছেদন করিয়া পঙ্গু করিয়া রাখিয়া দিব, আর একটা গুরুতর আবশ্যক পড়িলে, দেশের একটা মহৎ অনিষ্ট একটা বৃদ্ধ অকল্যাণ দূর করিতে হইলে, সমস্ত পুরাণসংহিতা আগমনিগম হইতে বচনখণ্ড খুঁজিয়া খুঁজিয়া উদ্‌ভ্রান্ত হইতে হইবে— সমাজের হিতাহিত লইয়া বয়স্ক লোকের মধ্যে এরূপ বাল্যখেলা আর কোনো দেশে প্রচলিত আছে কি।

আমাদের ধর্মবুদ্ধিকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া যে-লোকাচারকে তাহার স্থলে অভিষিক্ত করিয়াছি, সে আবার এমনি মূঢ় অন্ধ যে, সে নিজের নিয়মেরও সংগতি রক্ষা করিতে জানে না। কত হিন্দু যবনের জাহাজে চড়িয়া উড়িষ্যা মাদ্রাজ সিংহল ভ্রমণ করিয়া আসিতেছে, তাহাদের জাতি লইয়া কোনো কথা উঠিতেছে না, এ দিকে সমুদ্রযাত্রা বিধিসংগত নহে বলিয়া লোকসমাজ চীৎকার করিয়া মরিতেছে। দেশে শত শত লোক অখাদ্য ও যবনান্ন খাইয়া মানুষ হইয়া উঠিল, প্রকাশ্যে যবনের প্রস্তুত মদ্য পান করিতেছে, কেহ সে দিকে একবার তাকায়ও না, কিন্তু বিলাতে গিয়া পাছে অনাচার ঘটে এজন্য বড়ো শঙ্কিত। কিন্তু যুক্তি নিষ্ফল। যাহার চক্ষু আছে তাহার নিকট এ-সকল কথা চোখে আঙুল দিয়া

দেখাইবারও আবশ্যক ছিল না। কিন্তু লোকাচার নামক প্রকাণ্ড জড়পুত্তলিকার মস্তকের অভ্যন্তরে তো মস্তিষ্ক নাই, সে একটা নিশ্চল পাষাণমাত্র। কাককে ভয় দেখাইবার নিমিত্ত গৃহস্থ হাঁড়ি চিত্রিত করিয়া শস্যক্ষেত্রে খাড়া করিয়া রাখে, লোকাচার সেইরূপ চিত্রিত বিভীষিকা। যে তাহার জড়ত্ব জানে সে তাহাকে ঘৃণা করে, যে তাহাকে ভয় করে তাহার কর্তব্যবুদ্ধি লোপ পায়।

আজকাল অনেক পুস্তক ও পত্রে আমাদের বর্তমান লোকাচারের অসংগতি-দোষ দেখানো হয়। বলা হয়, এক দিকে আমরা বাধ্য হইয়া অথবা অন্ধ হইয়া কত অনাচার করি, অন্য দিকে সামান্য আচার বিচার লইয়া কত কড়াকড়। কিন্তু হাসি পায় যখন ভাবিয়া দেখি, কাহাকে সে-কথাগুলা বলা হইতেছে। শিশুরা পুত্তলিকার সঙ্গেও এমনি করিয়া কথা কয়। কে বলে লোকাচার যুক্তি অথবা শাস্ত্র মানিয়া চলে। সে নিজেও এমন মহা অপরাধ স্বীকার করে না। তবে তাহাকে যুক্তির কথা কেন বলি।

সমাজের মধ্যে যে-কোনো পরিবর্তন ঘটিয়াছে, তাহা বিনা যুক্তিতেই সাধিত হইয়াছে। গুরুগোবিন্দ, চৈতন্য যখন এই জাতিনিগড়বদ্ধ দেশে জাতিভেদ কথঞ্চিৎ শিথিল করেন, তখন তাহা যুক্তিবলে করেন নাই, চরিত্রবলে করিয়াছিলেন।

আমাদের যদি এরূপ মত হয় যে, সমুদ্রযাত্রায় উপকার আছে; মনুর যে-নিষেধ বিনা কারণে ভারতবর্ষীয়দিগকে চিরকালের জন্য কেবল পৃথিবীর একাংশেই বদ্ধ করিয়া রাখিতে চাহে, সেই কারাদণ্ডবিধান নিতান্ত অন্যায় ও অনিষ্টজনক; দেশে-বিদেশে গিয়া জ্ঞান-অর্জন ও উন্নতিসাধন হইতে কোনো প্রাচীন বিধি আমাদিগকে বঞ্চিত করিতে পারে না; যিনি আমাদিগকে এই সমুদ্রবেষ্টিত পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছেন, তিনি আমাদিগকে সমস্ত পৃথিবী ভ্রমণের অধিকার দিয়াছেন— তবে আমরা আর কিছু শুনিতে চাহি না— তবে কোনো শ্লোকখণ্ড আমাদিগকে ভয় দেখাইতে, কোনো লোকাচার আমাদিগকে নিষেধ করিতে পারে না।

বাঁধও ভাঙিয়াছে। কেহ শাস্ত্র ও লোকাচারের মুখ চাহিয়া বসিয়া নাই। বঙ্গগৃহ হইতে সন্তানগণ দলে দলে সমুদ্রপার হইতেছে, এবং ক্ষীণবল সমাজ তাহার কোনো প্রতিবিধান করিতে পারিতেছে না। সমাজের প্রধান বল নীতিবল যখন চলিয়া গিয়াছে, তখন তাহাকে বেশিদিন কেহ ভয় করিবে না। যে-সমাজ মিথ্যাকে কপটতাকে মার্জনা করে, অর্ধগুপ্ত অনাচারের প্রতি জানিয়া-শুনিয়া চক্ষু নিমীলন করে, যাহার নিয়মের মধ্যে কোনো নৈতিক কারণ কোনো যৌক্তিক সংগতি নাই, সে যে

নিতান্ত দুর্বল। সমাজের সমস্ত বিশ্বাস যদি দৃঢ় হইত, যদি সেই অখণ্ড বিশ্বাস অনুসারে সে নিজের সমস্ত ক্রিয়াকলাপ নিয়মিত করিত, তবে তাহাকে লঙ্ঘন করা বড়ো দুরূহ হইত।

যাঁহারা শুভবুদ্ধির প্রতি নির্ভর না করিয়া শাস্ত্রের দোহাই দিয়া সমুদ্র যাত্রা করিতে চান, তাঁহারা দুর্বল। কারণ, তাঁহাদের পক্ষে কোনো যুক্তি নাই; সমাজ শাস্ত্রমতে চলে না।

দ্বিতীয় কথা এই, লোকাচার যে সমুদ্রযাত্রা নিষেধ করে তাহার একটা অর্থ আছে। হিন্দুসমাজের অনেকগুলি নিয়ম পরস্পর দৃঢ়সম্বদ্ধ। একটা ভাঙিতে গেলে আর-একটা ভাঙিয়া পড়ে। রীতিমত স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত করিতে গেলে বাল্যবিবাহ তুলিয়া দিতে হয়। বাল্যবিবাহ গেলে ক্রমশই স্বাধীনবিবাহ আসিয়া পড়ে। স্বাধীনবিবাহ প্রচলিত করিতে গেলে সমাজের বিস্তর রূপান্তর অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে এবং জাতিভেদের মূল ক্রমে জীর্ণ হইয়া আসে। কিন্তু তাই বলিয়া এখন স্ত্রীশিক্ষা কে বন্ধ করিতে পারে।

সমুদ্র পার হইয়া বিদেশযাত্রাও আমাদের বর্তমান সমাজ রক্ষার পক্ষে সম্পূর্ণ অনুকূল নহে। আমাদের সমাজে কোনো প্রকার স্বাধীনতার কোনো অবসর নাই। আমরা নিশ্চেষ্ট নিশ্চল অন্ধভাবে সমাজের অন্ধকূপে এক অবস্থায় পড়িয়া থাকিব, লোকাচারের এই বিধান। মৃত্যুর ন্যায় শান্ত অবস্থা আর নাই, সেই অগাধ শান্তি লাভ করিবার জন্য যতদূর সম্ভব আমাদের জীবনীশক্তি লোপ করা হইয়াছে। একটি সমগ্র বৃহৎ জাতিকে সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট ও নির্জীব করিয়া ফেলিতে অল্প আয়োজন করিতে হয় নাই। কারণ, মনুষ্যত্বের অভ্যন্তরে একটি অমর জীবনের বীজ নিহিত আছে যে, সে যদি কোনো ছিদ্র দিয়া একটুখানি স্বাধীন সূর্যালোক ও বৃষ্টিধারা প্রাপ্ত হয়, অমনি অঙ্কুরিত পল্লবিত বিকশিত হইয়া উঠিতে চেষ্টা করে। সেই ভয়ে আমাদের হিন্দুসমাজ কোথাও কোনো ছিদ্র রাখিতে চাহে না। আমাদের জীবন্ত মনুষ্যত্বের উপরে নিয়মের পর নিয়ম পাষাণ ইষ্টকের ন্যায় স্তরে স্তরে গাঁথিয়া তুলিয়া একটি দেশব্যাপী অপূর্ব প্রকাণ্ড কারাপুরী নির্মাণ করা হইয়াছে। যেখানেই কালক্রমে একটি ইষ্টক খসিয়া পড়িতেছে, একটি ছিদ্র আবিষ্কৃত হইতেছে, সেইখানেই পুনর্বার নূতন মৃত্তিকালেপ ও নূতন ইষ্টকপাত করিতে হইতেছে। আমাদের সমাজ জীবন্ত নহে, তাহার হ্রাসবৃদ্ধি পরিবর্তন নাই, তাহা সুসম্বদ্ধ, পরিপাটি প্রকাণ্ড জড় অট্টালিকা। তাহার প্রত্যেক কক্ষ পরিমিত, তাহার প্রত্যেক ইষ্টক যথাস্থানে বিন্যস্ত।

স্বাধীনতাই এ সমাজের সর্বপ্রধান শত্রু। যে রৌদ্র বৃষ্টি বায়ুতে জীবিত পদার্থের জীবনধারণ হয়, সেই রৌদ্র বৃষ্টি বায়ুতেই ইহার ইষ্টক জীর্ণ করে, এইজন্য সমাজশিল্পী

অদ্ভুত নৈপুণ্যসহকারে এই কারাগারের মধ্যে সমস্ত স্বাধীন স্বাভাবিক শক্তির প্রবেশ প্রতিরোধ করিয়াছে।

যে যেখানে আছে, সে ঠিক সেইখানেই থাকিলে তবে এই জড়সমাজ রক্ষিত হয়। তিলমাত্র নড়িলে-চড়িলে সমস্তটাই সশব্দে পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা, এইজন্য যেখানেই জীবনচাঞ্চল্য লক্ষিত হয়, সেখানেই তৎক্ষণাৎ চাপ দিতে হয়।

সমুদ্র পার হইয়া নূতন দেশে নূতন সভ্যতার নূতন নূতন আদর্শ লাভ করিয়া আমাদের মনের মধ্যে চিন্তার বন্ধনমুক্তি হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। যে-সমস্ত নিয়ম আমরা বিনা সংশয়ে আজন্মকাল পালন করিয়া আসিয়াছি, কখনও কারণ জিজ্ঞাসাও মনে উদয় হয় নাই, সে-সম্বন্ধে নানা যুক্তি তর্ক ও সন্দেহের উদ্ভব হইবে। সেই মানসিক আন্দোলনই হিন্দুসমাজের পক্ষে সর্বাপেক্ষা আশঙ্কার কারণ। বাহ্যত ম্লেচ্ছসংসর্গ ও সমুদ্র পার হওয়া কিছুই নহে, কিন্তু সেই অন্তরের মধ্যে স্বাধীন মনুষ্যত্বের সঞ্চার হওয়াই যথার্থ লোকাচারবিরুদ্ধ।

কিন্তু হায়, আমরা সমুদ্র পার না হইলেও মনুর সংহিতা অন্য জাতিকে সমুদ্র পার হইতে নিষেধ করিতে পারে নাই। নূতন জ্ঞান, নূতন আদর্শ, নূতন সন্দেহ, নূতন বিশ্বাস জাহাজ-বোঝাই হইয়া এ দেশে আসিয়া পৌঁছিতেছে। আমাদের যে গোড়াতেই ভ্রম। সমাজরক্ষার জন্য যদি আমাদের এত ভয়, এত ভাবনা, তবে গোড়ায় ইংরেজি-শিক্ষা হইতে আপনাকে সযত্নে রক্ষা করা উচিত ছিল। পর্বতকে যদি মহম্মদের নিকট যাইতে নিষেধ কর, মহম্মদ যে পর্বতের কাছে আসে, তাহার উপায় কী। আমরা যেন ইংলণ্ডে না গেলাম, কিন্তু ইংরেজি শিক্ষা যে আমাদের গৃহে গৃহে আসিয়া প্রবেশ করিতেছে। বাঁধটা সে-ই তো ভাঙিয়াছে। আজ যে এত বাকচাতুরী, এত শাস্ত্রসন্ধানের ধূম পড়িয়াছে, মূলে আঘাত না পড়িলে তো তাহার কোনো আবশ্যক ছিল না।

কিন্তু মূঢ় লোকাচার এমনি অন্ধ অথবা এমনি কপটাচারী যে, সে দিকে কোনো দৃক্‌পাত নাই। অতি-বড়ো পবিত্র হিন্দুও শৈশব হইতে আপন পুত্রকে ইংরেজি শিখাইতেছে; এমন-কি মাতৃভাষা শিখাইতেছে না; এবং শিক্ষাসমিতি-সভায় যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে মাতৃভাষাশিক্ষার প্রস্তাব উঠিতেছে, তখন স্বদেশের লোকেই তো তাহাতে প্রধান আপত্তি করিতেছে।

কেরানীগিরি না করিলে যে উদরপূর্ণ হয় না। পাস করিতেই হইবে। পাস না করিলে চাকরি চুলায় যাক, বিবাহ করা দুঃসাধ্য হইয়াছে। ইংরেজি-শিক্ষার মর্যাদা দেশের আপামর সাধারণের মধ্যে এমনি বদ্ধমূল হইয়াছে।

কিন্তু এ কী ভ্রম, এ কী দুরাশা। ইংরেজি-শিক্ষাতে কেবলমাত্র যতটুকু কেরানীগিরির সহায়তা করিবে ততটুকু আমরা গ্রহণ করিব, বাকিটুকু আমাদের অন্তরে প্রবেশলাভ করিবে না। এ কি কখনও সম্ভব হয়। দীপশিখা কেবল যে আলো দেয় তাহা নহে; পলিতাটুকুও পোড়ায়, তেলটুকুও শেষ করে। ইংরেজি-শিক্ষা কেবল যে মোটামোটা চাকরি দেয় তাহা নহে, আমাদের লোকাচারের আবহমান সূত্রগুলিকেও পলে পলে দগ্ধ করিয়া ফেলে।

এখন যতদিন এই শিক্ষা চলিবে এবং ইহার উপর আমাদের জীবিকানির্বাহ নির্ভর করিবে, ততদিন যিনি যেমন তর্ক করুন, শাস্ত্র মৃতভাষায় যতই নিষেধ ও বিভীষিকা প্রচার করুক, বাঙালি সমুদ্র পার হইবে, পৃথিবীর সমস্ত উন্নতিপথের যাত্রীদের সঙ্গ ধরিয়া একত্রে যাত্রা করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিবে।

১২৯৯

বিলাসের ফাঁস

ইংরেজ আত্মপরিতৃপ্তির জন্য পূর্বের চেয়ে অনেক বেশি খরচ করিতেছে, ইহা লইয়া ইংরেজি কাগজে আলোচনা দেখা যাইতেছে। এ কথা তাহাদের অনেকেই বলিতেছে যে, বেতনের ও মজুরির হার আজকাল উচ্চতর হইলেও তাহাদের জীবনযাত্রা এখনকার দিনে পূর্বের চেয়ে অনেক বেশি দুরূহ হইয়াছে। কেবল যে তাহাদের ভোগস্পৃহা বাড়িয়াছে তাহা নহে, আড়ম্বরপ্রিয়তাও অতিরিক্ত হইয়া উঠিয়াছে। কেবলমাত্র ইংলণ্ড এবং ওয়েল্‌সে বৎসরে সাড়ে তিন লক্ষের অধিক লোক দেনা শোধ করিতে না পারায় আদালতে হাজির হয়। এই সকল দেনার অধিকাংশই আড়ম্বরের ফল। পূর্বে অল্প আয়ের লোকে সাজে সজ্জায় যত বেশি খরচ করিত, এখন তাহার চেয়ে অনেক বেশি করে। বিশেষত মেয়েদের পোশাকের দেনা শোধ করিতে গৃহস্থ ফতুর হইতেছে। যে-স্ত্রীলোক মুদির দোকানে কাজ করে, ছুটির দিনে তাহার কাপড় দেখিয়া তাহাকে আমীর-ঘরের মেয়ে বলিয়া ভ্রম হইয়াছে, এমন ঘটনা দুর্লভ নহে। বৃহৎ ভূসম্পত্তি হইতে যে-সকল ড্যুকের বিপুল আয় আছে, বহুব্যয়সাধ্য নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণে তাহাদেরও টানাটানি পড়িয়াছে, যাহাদের অল্প আয় তাহাদের তো কথাই নাই। ইহাতে লোকের বিবাহে অপ্রবৃত্তি হইয়া তাহার বহুবিধ কুফল ফলিতেছে।

এই ভোগ এবং আড়ম্বরের ঢেউ আমাদের দেশেও যে উত্তাল হইয়া উঠিয়াছে, সে কথা কাহারো অগোচর নহে। অথচ আমাদের দেশে আয়ের পথ বিলাতের

অপেক্ষা সংকীর্ণ। শুধু তাই নয়। দেশের উন্নতির উদ্দেশ্যে যে-সকল আয়োজন আবশ্যক, অর্থাভাবে আমাদের দেশে তাহা সমস্তই অসম্পূর্ণ।

আড়ম্বরের একটা উদ্দেশ্য লোকের কাছে বাহবা পাওয়া। এই বাহবা পাইবার প্রবৃত্তি এখনকার চেয়ে পূর্বকালে অল্প ছিল, সে কথা মানিতে পারি না। তখনও লোকসমাজে খ্যাত হইবার ইচ্ছা নিঃসন্দেহ এখনকার মতোই প্রবল ছিল। তবে প্রভেদ এই, তখন খ্যাতির পথ এক দিকে ছিল, এখন খ্যাতির পথ অন্য দিকে হইয়াছে।

তখনকার দিনে দানধ্যান, ক্রিয়াকর্ম, পূজাপার্বণ ও পূর্তকার্যে ধনী ব্যক্তিরা খ্যাতিলাভ করিতেন। এই খ্যাতির প্রলোভনে নিজের সাধ্যাতিরিক্ত কর্মানুষ্ঠানে অনেক সম্পন্ন গৃহস্থ নিঃস্ব হইয়াছেন, এমন ঘটনা শুনা গেছে।

কিন্তু, এ কথা স্বীকার করিতে হইবে যে, যে-আড়ম্বরের গতি নিজের ভোগলালসা তৃপ্তির দিকে নহে, তাহা সাধারণত নিতান্ত অসংযত হইয়া উঠে না, এবং তাহাতে জনসাধারণের মধ্যে ভোগের আদর্শকে বাড়াইয়া তুলিয়া চতুর্দিকে বিলাসের মহামারী সৃষ্টি করে না। মনে করো, যে-ধনীর গৃহে নিত্য অতিথিসেবা ছিল, তাঁহার এই সেবার ব্যয় যতই বেশি হউক না অতিথিরা যে-আহার পাইতেন তাহাতে বিলাসিতার চর্চা হইত না। বিবাহাদি কর্মে রবাহূত অনাহূতদের নিষেধ ছিল না বটে, কিন্তু তাহার ফলে যজ্ঞের আয়োজন বৃহৎ হইলেও যথেষ্ট সরল হইত। ইহাতে সাধারণ লোকের চালচলন বাড়িয়া যাইত না।

এখনকার দিনে ব্যক্তিগত ভোগের আদর্শ বাড়িয়া উঠিয়াছে, এইজন্য বাহবার স্রোত সেই মুখেই ফিরিয়াছে। এখন আহার পরিচ্ছদ, বাড়ি গাড়ি জুড়ি, আসবাবপত্র দ্বারা লোকে আপন মাহাত্ম্য ঘোষণা করিতেছে। ধনীতে ধনীতে এখন এই লইয়া প্রতিযোগিতা। ইহাতে যে কেবল তাহাদেরই চাল বাড়িয়া যাইতেছে তাহা নহে, যাহারা অশক্ত তাহাদেরও বাড়িতেছে। আমাদের দেশে ইহাতে যে কতদূর পর্যন্ত দুঃখ সৃষ্টি করিতেছে, তাহা আলোচনা করিলেই বুঝা যাইবে। কারণ, আমাদের সমাজের গঠন এখনও বদলায় নাই। এ সমাজ বহুসম্বন্ধবিশিষ্ট। দূর নিকট, স্বজন পরিজন, অনুচর পরিচর, কাহাকেও এ সমাজ অস্বীকার করে না। অতএব এ সমাজের ক্রিয়াকর্ম বৃহৎ হইতে গেলেই সরল হওয়া অত্যাবশ্যক। না হইলে মানুষের পক্ষে অসাধ্য হইয়া পড়ে। পূর্বেই বলিয়াছি এ পর্যন্ত আমাদের সামাজিক কর্মে এই সরলতা ও বিপুলতার সামঞ্জস্য ছিল; এখন সাধারণের চালচলন বাড়িয়া গেছে অথচ এখন আমাদের সমাজের পরিধি সে পরিমাণে সংকুচিত হয় নাই, এইজন্য সাধারণ লোকের সমাজকৃত্য দুঃসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে।

আমি জানি, এক ব্যক্তি ত্রিশ টাকা বেতনে কর্ম করে। তাহার পিতার মৃত্যু হইলে পর পিতৃবিয়োগের অপেক্ষা শ্রাদ্ধের ভাবনা তাহাকে অধিক পীড়িত করিতে লাগিল। আমি তাহাকে বলিলাম, "তোমার আয়ের অনুপাতে তোমার সাধ্য অনুসারে কর্ম নির্বাহ করো-না কেন।" সে বলিল, তাহার কোনো উপায় নাই, গ্রামের লোক ও আত্মীয়কুটুম্বমণ্ডলীকে না খাওয়াইলে তাহার বিপদ ঘটিবে। এই দরিদ্রের প্রতি সমাজের দাবি সম্পূর্ণই রহিয়াছে অথচ সমাজের ক্ষুধা বাড়িয়া গেছে। পূর্বে যেরূপ আয়োজনে সাধারণের তৃপ্তি হইত এখন আর তাহা হয় না। যাঁহারা ক্ষমতাশালী ধনী লোক, তাঁহারা সমাজকে উপেক্ষা করিতে পারেন। তাঁহারা শহরে আসিয়া কেবলমাত্র বন্ধুমণ্ডলীকে লইয়া সামাজিক ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে পারেন, কিন্তু যাঁহারা সংগতিপন্ন নহেন, তাঁহাদের পলাইবার পথ নাই।

আমরা বীরভূম জেলায় একজন কৃষিজীবী গৃহস্থের বাড়ি বেড়াইতে গিয়াছিলাম। গৃহস্বামী তাহার ছেলেকে চাকরি দিবার জন্য আমাকে অনুরোধ করাতে আমি বলিলাম, "কেন রে, ছেলেকে চাষবাস ছাড়াইয়া পরের অধীন করিবার চেষ্টা করিস কেন।" সে কহিল, "বাবু, একদিন ছিল যখন জমিজমা লইয়া আমরা সুখেই ছিলাম। এখন শুধু জমিজমা হইতে আর দিন চলিবার উপায় নাই।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন বল্‌ তো।" সে উত্তর করিল, "আমাদের চাল বাড়িয়া গেছে। পূর্বে বাড়িতে কুটুম্ব আসিলে চিঁড়াগুড়েই সন্তুষ্ট হইত, এখন সন্দেশ না পাইলে নিন্দা করে। আমরা শীতের দিনে দোলাই গায়ে দিয়া কাটাইয়াছি, এখন ছেলেরা বিলাতি র‍্যাপার না পাইলে মুখ ভারী করে। আমরা জুতা পায়ে না দিয়াই শ্বশুরবাড়ি গেছি, ছেলেরা বিলাতি জুতা না পরিলে লজ্জায় মাথা হেঁট করে। তাই চাষ করিয়া আর চাষার চলে না।"

কেহ কেহ বলিবেন, এ-সমস্ত ভালো লক্ষণ; অভাবের তাড়নায় মানুষকে সচেষ্ট করিয়া তোলে। ইহাতে তাহার সম্পূর্ণ ক্ষমতা বিকাশের উত্তেজনা জন্মে। কেহ কেহ এমনও বলিবেন, বহুসম্বন্ধবিশিষ্ট সমাজ ব্যক্তিত্বকে চাপিয়া নষ্ট করে। অভাবের দায়ে এই সমাজের বহুবন্ধনপাশ শিথিল হইয়া গেলে মানুষ স্বাধীন হইবে। ইহাতে দেশের মঙ্গল।

এ-সমস্ত তর্কের মীমাংসা সংক্ষেপে হইবার নহে। য়ুরোপে ভোগের তাগিদ দিয়া অনেকগুলি লোককে মারিয়া কতকগুলি লোককে ক্ষমতাশালী করিয়া তোলে। হিন্দুসমাজতন্ত্রে কতকগুলি লোককে অনেকগুলি লোকের জন্য ত্যাগ করিতে বাধ্য করিয়া সমাজকে ক্ষমতাশালী করিয়া রাখে, এই উভয় পন্থাতেই ভালো মন্দ দুইই আছে।

য়ুরোপীয় পন্থাই যদি একমাত্র শ্রেয় বলিয়া সপ্রমাণ হইত, তাহা হইলে এ বিষয়ে কোনো কথাই ছিল না। য়ুরোপের মনীষিগণের কথায় অবধান করিলে জানা যায় যে, এ সম্বন্ধে তাঁহাদের মধ্যেও মতভেদ আছে।

যেমন করিয়া হউক, আমাদের হিন্দুসমাজের সমস্ত গ্রন্থি যদি শিথিল হইয়া যায়, তবে ইহা নিশ্চয় যে বহু সহস্র বৎসরে হিন্দুজাতি যে-অটল আশ্রয়ে বহু ঝড়-ঝঞ্ঝা কাটাইয়া আসিয়াছে, তাহা নষ্ট হইয়া যাইবে। ইহার স্থানে নূতন আর-কিছু গড়িয়া উঠিবে কি না, উঠিলেও তাহা আমাদিগকে কিরূপ নির্ভর দিতে পারিবে, তাহা আমরা জানি না। এমন স্থলে, আমাদের যাহা আছে, নিশ্চিন্তমনে তাহার বিনাশদশা দেখিতে পারিব না।

মুসলমানের আমলে হিন্দুসমাজের যে কোনো ক্ষতি হয় নাই তাহার কারণ, সে-আমলে ভারতবর্ষের আর্থিক পরিবর্তন হয় নাই। ভারতবর্ষের টাকা ভারতবর্ষেই থাকিত, বাহিরের দিকে তাহার টান না পড়াতে আমাদের অন্নের স্বচ্ছলতা ছিল। এই কারণে আমাদের সমাজব্যবহার সহজেই বহুব্যাপক ছিল। তখন ধনোপার্জন আমাদের প্রত্যেক ব্যক্তির চিন্তাকে এমন করিয়া আকর্ষণ করে নাই। তখন সমাজে ধনের মর্যাদা অধিক ছিল না এবং ধনই সর্বোচ্চ ক্ষমতা বলিয়া গণ্য ছিল না। ধনশালী বৈশ্যগণ যে সমাজে উচ্চস্থান অধিকার করিয়া ছিলেন তাহাও নহে। এই কারণে, ধনকে শ্রেষ্ঠ আসন দিলে জনসাধারণের মনে যে হীনতা আসে, আমাদের দেশে তাহা ছিল না।

এখন টাকা সম্বন্ধে সমাজস্থ সকলেই অত্যন্ত বেশি সচেতন হইয়া উঠিয়াছে। সেই-জন্য আমাদের সমাজেও এমন-একটা দীনতা আসিয়াছে যে, টাকা নাই ইহাই স্বীকার করা আমাদের পক্ষে সকলের চেয়ে লজ্জাকর হইয়া উঠিতেছে। ইহাতে ধনাড়ম্বরের প্রবৃত্তি বাড়িয়া উঠে, লোকে ক্ষমতার অতিরিক্ত ব্যয় করে, সকলেই প্রমাণ করিতে বসে যে আমি ধনী। বণিকজাতি রাজসিংহাসনে বসিয়া আমাদিগকে এই ধনদাসত্বের দারিদ্র্যে দীক্ষিত করিয়াছে।

মুসলমানসমাজে বিলাসিতা যথেষ্ট ছিল এবং তাহা হিন্দুসমাজকে যে একেবারে স্পর্শ করে নাই তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু বিলাসিতা সাধারণের মধ্যে ব্যাপ্ত হয় নাই। তখনকার দিনে বিলাসিতাকে নবাবী বলিত। অল্প লোকেরই সেই নবাবী চাল ছিল। এখনকার দিনে বিলাসিতাকে বাবুগিরি বলে, দেশে বাবুর অভাব নাই।

এই বাবুয়ানার প্রতিযোগিতা উত্তরোত্তর বাড়িয়া উঠায় আমরা যে কতদিক হইতে কত দুঃখ পাইতেছি, তাহার সীমা নাই। ইহার একটা দৃষ্টান্ত দেখো। এক দিকে

আমাদের সমাজবিধানে কন্যাকে একটা বিশেষ বয়সে বিবাহ দিতে সকলে বাধ্য, অন্য দিকে পূর্বের ন্যায় নিশ্চিন্তচিত্তে বিবাহ করা চলে না। গৃহস্থজীবনের ভার বহন করিতে যুবকগণ সহজেই শঙ্কা বোধ করে। এমন অবস্থায় কন্যার বিবাহ দিতে হইলে পাত্রকে যে পণ দিয়া ভুলাইতে হইবে, ইহাতে আশ্চর্য কী আছে। পণের পরিমাণও জীবনযাত্রার বর্তমান আদর্শ অনুসারে যে বাড়িয়া যাইবে, ইহাতেও আশ্চর্য নাই। এই পণ-লওয়া প্রথার বিরুদ্ধে আজকাল অনেক আলোচনা চলিতেছে; বস্তুত ইহাতে বাঙালি গৃহস্থের দুঃখ যে অত্যন্ত বাড়িয়াছে তাহাতেও সন্দেহমাত্র নাই, কন্যার বিবাহ লইয়া উদ্বিগ্ন হইয়া নাই এমন কন্যার পিতা আজ বাংলাদেশে অল্পই আছে। অথচ, এজন্য আমাদের বর্তমান সাধারণ অবস্থা ছাড়া ব্যক্তিবিশেষকে দোষ দেওয়া যায় না। এক দিকে ভোগের আদর্শ উচ্চ হইয়া সংসারযাত্রা বহুব্যয়সাধ্য ও অপর দিকে কন্যামাত্রকেই নির্দিষ্ট বয়সের মধ্যে বিবাহ দিতে বাধ্য হইলে পাত্রের আর্থিক মূল্য না বাড়িয়া গিয়া থাকিতে পারে না। অথচ এমন লজ্জাকর ও অপমানকর প্রথা আর নাই। জীবনের সর্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দোকানদারি দিয়া আরম্ভ করা, যাহারা আজ বাদে কাল আমার আত্মীয়শ্রেণীতে গণ্য হইবে আত্মীয়তার অধিকার স্থাপন লইয়া তাহাদের সঙ্গে নির্লজ্জভাবে নির্মমভাবে দরদাম করিতে থাকা— এমন দুঃসহ নীচতা যে-সমাজে প্রবেশ করিয়াছে, সে-সমাজের কল্যাণ নাই, সে-সমাজ নিশ্চয়ই নষ্ট হইতে আরম্ভ করিয়াছে। যাঁহারা এই অমঙ্গল দূর করিতে চান তাঁহারা ইহার মূলে কুঠারাঘাত না করিয়া যদি ডাল ছাঁটিবার চেষ্টা করেন তবে লাভ কী। প্রত্যেকে জীবনযাত্রাকে সরল করুন, সংসারভারকে লঘু করুন, ভোগের আড়ম্বরকে খর্ব করুন, তবেই লোকের পক্ষে গৃহী হওয়া সহজ হইবে, টাকার অভাব ও টাকার আকাঙ্ক্ষাই সর্বোচ্চ হইয়া উঠিয়া মানুষকে এতদূর পর্যন্ত নির্লজ্জ করিবে না। গৃহই আমাদের দেশের সমাজের ভিত্তি, সেই গৃহকে যদি আমরা সহজ না করি, মঙ্গল না করি, তাহাকে ত্যাগের দ্বারা নির্মল না করি, তবে অর্থোপার্জনের সহস্র নূতন পথ আবিষ্কৃত হইলেও দুর্গতি হইতে আমাদের নিষ্কৃতি নাই।

একবার ভাবিয়া দেখো, আজ চাকরি সমস্ত বাঙালি ভদ্রসমাজের গলায় কী ফাঁসই টানিয়া দিয়াছে। এই চাকরি যতই দুর্লভ হইতে থাক্‌, ইহার প্রাপ্য যতই স্বল্প হইতে থাক্‌, ইহার অপমান যতই দুঃসহ হইতে থাক্‌, আমরা ইহারই কাছে মাথা পাতিয়া দিয়াছি। এই দেশব্যাপী চাকরির তাড়নায় আজ সমস্ত বাঙালিজাতি দুর্বল, লাঞ্ছিত, আনন্দহীন। এই চাকরির মায়ায় বাংলার বহুতর সুযোগ্য শিক্ষিত লোক কেবল যে অপমানকেই সম্মান বলিয়া গ্রহণ করিতেছে তাহা নহে, তাহারা দেশের সহিত

ধর্মসম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিতে বাধ্য হইতেছে। আজ তাহার দৃষ্টান্ত দেখো। বিধাতার লীলাসমুদ্র হইতে জোয়ার আসিয়া আজ যখন সমস্ত দেশের হৃদয়স্রোত আত্মশক্তির পথে মুখ ফিরাইয়াছে তখন বিমুখ কারা। তখন গোয়েন্দাগিরি করিয়া সত্যকে মিথ্যা করিয়া তুলিতেছে কারা। তখন ধর্মাধিকরণে বসিয়া অন্যায়ের দণ্ডে দেশপীড়নের সাহায্য করিতেছে কারা। তখন বালকদের অতি পবিত্র গুরুসম্বন্ধ গ্রহণ করিয়াও তাহাদিগকে অপমান ও নির্যাতনের হস্তে অনায়াসে সমর্পণ করিতে উদ্যত হইতেছে কারা। যারা চাকরির ফাঁস গলায় পড়িয়াছে। তারা যে কেবল অন্যায় করিতে বাধ্য হইতেছে তাহা নয়, তারা নিজেকে ভুলাইতেছে, তারা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিতেছে যে দেশের লোক ভুল করিতেছে। বলো দেখি, দেশের যোগ্যতম শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের কণ্ঠে এই-যে চাকরি-শিকলের টান, ইহা কী প্রাণান্তকর টান। এই টানকে আমরা প্রত্যহই বাড়াইয়া তুলিতেছি কী করিয়া। নবাবিয়ানা, সাহেবিয়ানা, বাবুয়ানাকে প্রত্যহই উগ্রতর করিয়া মনকে বিলাসের অধীন করিয়া আপন দাসখতের মেয়াদ এবং কড়ার বাড়াইয়া চলিয়াছি।

জীবনযাত্রাকে লঘু করিবা মাত্র দেশব্যাপী এই চাকরির ফাঁসি এক মুহূর্তে আলগা হইয়া যাইবে। তখন চাষবাস বা সামান্য ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইতে ভয় হইবে না। তখন এত অকাতরে অপমান সহ্য করিয়া পড়িয়া থাকা সহজ হইবে না।

আমাদের মধ্যে বিলাসিতা বাড়িয়াছে বলিয়া অনেকে কল্পনা করেন যে ইহা আমাদের ধনবৃদ্ধির লক্ষণ। কিন্তু এ কথা বিচার করিয়া দেখিতে হইবে যে, পূর্বে যে-অর্থ সাধারণের কার্যে ব্যয়িত হইত, এখন তাহা ব্যক্তিগত ভোগে ব্যয়িত হইতেছে। ইহাতে ফল হইতেছে দেশের ভোগবিলাসের স্থানগুলি সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিতেছে, শহরগুলি ফাঁপিয়া উঠিতেছে, কিন্তু পল্লীগুলিতে দারিদ্র্যের অবধি নাই। সমস্ত বাংলাদেশে পল্লীতে দেবমন্দির ভাঙিয়া পড়িতেছে, পুষ্করিণীর জল স্নান-পানের অযোগ্য হইতেছে, গ্রামগুলি জঙ্গলে ভরিয়া উঠিয়াছে, এবং যে-দেশ বারো মাসে তেরো পার্বণে মুখরিত হইয়া থাকিত সে-দেশ নিরানন্দ নিস্তব্ধ হইয়া গেছে। দেশের অধিকাংশ অর্থ শহরে আকৃষ্ট হইয়া কোঠাবাড়ি গাড়িঘোড়া সাজসরঞ্জাম আহারবিহারেই উড়িয়া যাইতেছে। অথচ যাঁহারা এইরূপ ভোগবিলাসে ও আড়ম্বরে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, তাঁহারা প্রায় কেহই সুখে স্বচ্ছন্দে নাই ; তাঁহাদের অনেকেরই টানাটানি, অনেকেরই ঋণ, অনেকেরই পৈতৃক সম্পত্তিকে মহাজনের দায়মুক্ত করিবার জন্য চিরজীবন নষ্ট হইতেছে— কন্যার বিবাহ দেওয়া, পুত্রকে মানুষ করিয়া তোলা, পৈতৃক কীর্তি রক্ষা করিয়া চলা, অনেকেরই পক্ষে বিশেষ কষ্টসাধ্য হইয়াছে। যে-ধন সমস্তদেশের বিচিত্র

অভাবমোচনের জন্য চারি দিকে ব্যাপ্ত হইত, সেই ধন সংকীর্ণ স্থানে আবদ্ধ হইয়া যে ঐশ্বর্যের মায়া সৃজন করিতেছে তাহা বিশ্বাসযোগ্য নহে। সমস্ত শরীরকে প্রতারণা করিয়া কেবল মুখেই যদি রক্ত সঞ্চার হয়, তবে তাহাকে স্বাস্থ্য বলা যায় না। দেশের ধর্মস্থানকে বন্ধুস্থানকে জন্মস্থানকে কৃশ করিয়া, কেবল ভোগস্থানকে স্ফীত করিয়া তুলিলে, বাহির হইতে মনে হয় যেন দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইতে চলিল। সেইজন্য এই ছদ্মবেশী সর্বনাশই আমাদের পক্ষে অতিশয় ভয়াবহ। মঙ্গল করিবার শক্তিই ধন, বিলাস ধন নহে।

১৩১২

কোট বা চাপকান

আজকাল একটি অদ্ভুত দৃশ্য আমাদের দেশে দেখা যায়। আমাদের মধ্যে যাঁহারা বিলাতি পোশাক পরেন, স্ত্রীগণকে তাঁহারা শাড়ি পরাইয়া বাহির করিতে কুণ্ঠিত হন না। একাসনে গাড়ির দক্ষিণভাগে হ্যাট কোট, বামভাগে বোম্বাই শাড়ি। নব্য বাংলার আদর্শে হরগৌরীরূপ যদি কোনো চিত্রকর চিত্রিত করেন, তবে তাহা যদিবা "সারাইম" না হয়, অন্তত সারাইমের অদূরবর্তী আর-একটা কিছু হইয়া দাঁড়াইবে।

পশুপক্ষীর রাজ্যে প্রকৃতি অনেক সময় স্ত্রীপুরুষের সাজের এত প্রভেদ করেন যে, দম্পতীকে একজাতীয় বলিয়া চেনা বিশেষ অভিজ্ঞতাসাধ্য হইয়া পড়ে। কেশরের অভাবে সিংহীকে সিংহের পত্নী বলিয়া চেনা কঠিন এবং কলাপের অভাবে ময়ূরের সহিত ময়ূরীর কুটুম্বিতানির্ণয় দুরূহ।

বাংলাতেও যদি প্রকৃতি তেমন একটা বিধান করিয়া দিতেন, স্বামী যদি তাঁহার নিজের পেখম বিস্তার করিয়া সহধর্মিণীর উপরে টেক্কা দিতে পারিতেন, তাহা হইলে কোনো কথাই উঠিত না। কিন্তু গৃহকর্তা যদি পরের পেখম পুচ্ছে গুঁজিয়া ঘরের মধ্যে অনৈক্য বিস্তার করেন, তাহা হইলে সেটা যে কেবল ঘরের পক্ষে আপসোসের বিষয় হয় তাহা নহে, পরের চক্ষে হাস্যেরও বিষয় হইয়া ওঠে।

যাহা হউক, ব্যাপারটা যতই অসংগত হউক, যখন ঘটিয়াছে তখন ইহার মধ্যে সংগত কারণ একটুকু আছেই।

আমরা যে-কারণটি নির্ণয় করিয়াছি তাহার মধ্যে আমাদের মনের কতকটা সান্ত্বনা

আছে। অন্তত সেইজন্যই আশা করি এইটেই যথার্থ কারণ। সে কারণ নির্দেশ করিবার পূর্বে বিষয়টা একটু বিস্তারিতভাবে সমালোচনা করা যাক।

ইংরেজি কাপড়ের একটা মস্ত অসুবিধা এই যে, তাহার ফ্যাশানের উৎস ইংলণ্ডে। সেখানে কী কারণবশত কিরূপ পরিবর্তন চলিতেছে আমরা তাহা জানি না, তাহার সহিত আমাদের কোনো প্রত্যক্ষ সংস্রবমাত্র নাই। আমাদিগকে চেষ্টা করিয়া খবর লইতে এবং সাবধানে অনুকরণ করিতে হয়। যাঁহারা নূতন বিলাত হইতে আসেন তাঁহারা সাবেক দলের কলার এবং প্যাণ্টলুনের ছাঁট দেখিয়া মনে মনে হাস্য করেন, এবং সাবেকদলেরা নব্যদলের সাজসজ্জার নব্যতা দেখিয়া তাঁহাদিগকে "ফ্যাশানেব্ল" বলিয়া হাস্য করিতে ত্রুটি করেন না।

ফ্যাশানের কথা ছাড়িয়া দেও। সকল দেশেরই বেশভূষার একটা ভদ্রতার আদর্শ আছে। যে-দেশে কাপড় না পরিয়া উলকি পরে সেখানেও উলকির ইতরবিশেষে ভদ্র অভদ্র চিহ্নিত হয়। ইংরেজি ভদ্রকাপড়ের সেই আদর্শ আমরা কোথা হইতে সংগ্রহ করিব। তাহা আমাদের ঘরের মধ্যে আমাদের সমাজের মধ্যে নাই। সে-আদর্শ আমরা নিজের ভদ্রতাগৌরবে আমাদের নিজের সুরুচি ও সুবিচারের দ্বারা, আমাদের আপনাদের ভদ্রমণ্ডলীর সাহায্যে স্বাধীনভাবে গঠিত করিতে পারি না। আমাদিগকে ভদ্র সাজিতে হয় পরের ভদ্রতা-আদর্শ অনুসন্ধান করিয়া লইয়া।

যাহাদের নিকট হইতে অনুসন্ধান এবং ধার করিয়া লইতে হইবে, তাহাদের সমাজে আমাদের গতিবিধি নাই। তাহাদের দোকান হইতে আমরা ঈভনিং কোর্তা কিনি, কিন্তু তাহাদের নিমন্ত্রণে সেটা ব্যবহার করিবার সুযোগ পাই না।

এমন অবস্থায় ক্রমে দোকানে-কেনা আদর্শ হইতেও ভ্রষ্ট হইতে হয়। ক্রমে কলারের শুভ্রতায় টাইয়ের বন্ধনে প্যাণ্টলুনের পরিধিতে শৈথিল্য আসিয়া পড়ে। শুনিতে পাই ইংরেজিবেশী বাঙালির মধ্যে এমন দৃষ্টান্ত আজকাল প্রায় দেখা যায়।

একে বিলাতি সাজ স্বভাবতই বাঙালিদেহে অসংগত, তাহার উপরে যদি তাহাতে ভদ্রোচিত পারিপাট্য না থাকে, তবে তাহাতে হাসিও আসে অবজ্ঞাও আনে। এ কথা সহজেই মুখে আসে যে, যদি পরিতে না জান এবং শক্তি না থাকে, তবে পরের কাপড়ে সাজিয়া বেড়াইবার দরকার কী ছিল।

ইংরেজি কাপড়ে 'খেলো' হইলে যত খেলো এবং যত দীন দেখিতে হয়, এমন দেশী কাপড়ে নয়। তাহার একটা কারণ ইংরেজি সাজে সারল্য নাই, তাহার মধ্যে আয়োজন এবং চেষ্টার বাহুল্য আছে। ইংরেজি কাপড় যদি গায়ে ফিট না হইল, যদি তাহাতে টানাটানি প্রকাশ পাইল, তবে তাহা ভদ্রতার পক্ষে অত্যন্ত বেআবরু হইয়া

পড়ে ; কারণ, ইংরেজি কাপড়ের আগাগোড়ায় গায়ে ফিট করিবার চরম উদ্দেশ্য, দেহটাকে খোসার মতো মুড়িয়া ফেলিবার সযত্ন চেষ্টা সর্বদা বর্তমান। সুতরাং প্যাণ্টলুন যদি একটু খাটো হয়, কোট যদি একটু উঠিয়া পড়ে, তবে নিজেকেই ছোটো বলিয়া মনে হয়, সেইটুকুতেই আত্মসম্মানের লাঘব হইতে থাকে ;— যে-ব্যক্তি এ সম্বন্ধে অজ্ঞতাসুখে অচেতন, অন্যলোকে তাহার হইয়া লজ্জা বোধ করে।

যাঁহারা আজকাল ইংরেজি বস্ত্র ধরিয়াছেন লক্ষ্মী তাঁহাদের প্রতি সুপ্রসন্ন থাকুন, তাঁহাদিগকে কখনও যেন চাঁদনিতে ঢুকিতে না হয়। কিন্তু তাঁহাদের পুত্রপৌত্রেরা সকলেই যে র‍্যানকিনের বাড়ি গতিবিধি রক্ষা করিয়া চলিতে পারিবে, এমন আশা কিছুতেই করা যায় না। অথচ পৈতৃক বেশের সহিত পৈতৃক দুর্বলতাটুকুও যদি তাহারা পায়, সাহেবিয়ানা পরিহার করিবার শক্তি যদি তাহাদের না থাকে, তবে তাহাদের সম্মুখে দারুণ চুনাগলি ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পাই না।

যাঁহারা বিলাতে গিয়াছেন তাঁহারা বিলাতি বসনভূষণের অন্ধিসন্ধি কতকটা বুঝিয়া চলিতে পারেন ; যাঁহারা যান নাই তাঁহারা অনেক সময় অদ্ভুত কাণ্ড করেন। তাঁহারা দার্জিলিঙের প্রকাশ্যপথে ড্রেসিংগাউন পরিয়া বেড়ান, এবং ছোটো কন্যাকে মলিন সাদা ফুলমোজার উপরে বিলাতি ফ্রক এবং টুপি উলটা করিয়া পরাইয়া সভায় লইয়া আসেন।

এ সম্বন্ধে দুটো কথা আছে। প্রথমে ঠিক দস্তুর-মতো ফ্যাশান-মতো কাপড় পরিতেই হইবে, এমন কী মাথার দিব্য আছে। এ কথাটা খুব বড়োলোকের, খুব স্বাধীনচেতার মতো কথা বটে। দশের দাসত্ব, প্রথার গোলামি, এ সমস্ত ক্ষুদ্রতাকে ধিক্। কিন্তু এ স্বাধীনতার কথা তাহাকে শোভা পায় না যে-লোক গোড়াতেই বিলাতি সাজ পরিয়া অনুকরণের দাসখত আপাদমস্তকে লিখিয়া রাখিয়াছে। পাঁঠা যদি নিজের হয়, তবে তাহাকে কাটা সম্বন্ধেও স্বাধীনতা থাকে ; নিজেদের ফ্যাশানে যদি চলি, তবে তাহাকে লঙ্ঘন করিয়াও মহত্ত্ব দেখাইতে পারি। পরের পথেও চলিব, আবার সে-পথ কলুষিতও করিব, এমন বীরত্বের মহত্ত্ব বোঝা যায় না।

আর-একটা কথা এই যে, যেমন ব্রাহ্মণের পইতা তেমনই বিলাতফেরতের বিলাতি কাপড়, ওটা সাম্প্রদায়িক লক্ষণরূপে স্বতন্ত্র করা কর্তব্য। কিন্তু সে বিধান চলিবে না। গোড়ায় সেই-মতোই ছিল বটে, কিন্তু আজকাল সমুদ্র পার না হইয়াও অনেকে চিহ্ন-ধারণ করিতে শুরু করিয়াছেন। আমাদের উর্বর দেশে ম্যালেরিয়া ওলাউঠা প্রভৃতি যে-কোনো ব্যাধি আসিয়াছে, ব্যাপ্ত না হইয়া ছাড়ে নাই ; বিলাতি কাপড়েরও দিন আসিয়াছে ; ইহাকে দেশের কোনো অংশবিশেষে পৃথক্‌করণ কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে।

দীন ভারতবর্ষ যেদিন ইংলণ্ডের পরিত্যক্ত ছিন্নবস্ত্রে ভূষিত হইয়া দাঁড়াইবে, তখন তাহার দৈন্য কী বীভৎস বিজাতীয় মূর্তি ধারণ করিবে। আজ যাহা কেবলমাত্র শোকাবহ আছে সেদিন তাহা কী নিষ্ঠুর হাস্যজনক হইয়া উঠিবে। আজ যাহা বিরল-বসনের সরল নম্রতার দ্বারা সংবৃত সেদিন তাহা জীর্ণ কোর্তার ছিদ্রপথে অধাবরণের ইতরতায় কী নির্লজ্জভাবে দৃশ্যমান হইয়া উঠিবে। চুনাগলি যেদিন বিস্তীর্ণ হইয়া সমস্ত ভারতবর্ষকে গ্রাস করিতে আসিবে, সেদিন যেন ভারতবর্ষ একটি পা মাত্র অগ্রসর হইয়া তাঁহারই সমুদ্রের ঘাটে তাঁহার মলিন প্যাণ্টলুনের ছিন্ন প্রান্ত হইতে ভাঙা টুপির মাথাটা পর্যন্ত নীলাম্বুরাশির মধ্যে নিলীন করিয়া নারায়ণের অনন্তশয়নের অংশ লাভ করেন।

কিন্তু এ হল সেন্টিমেণ্ট, ভাবুকতা,— প্রকৃতিস্থ কাজের লোকের মতো কথা ইহাকে বলা যায় না। ইহা সেন্টিমেণ্ট বটে। মরিব তবু অপমান সহিব না, ইহাও সেন্টিমেণ্ট। যাহারা আমাদিগকে ক্রিয়াকর্মে আমোদপ্রমোদ-সামাজিকতায় সর্বতোভাবে বাহিরে ঠেলিয়া রাখে, আমরা তাহাদিগকে পূজার উৎসবে ছেলের বিবাহে বাপের অন্ত্যেষ্টিসংকারে ডাকিয়া আনিব না, ইহাও সেন্টিমেণ্ট। বিলাতি কাপড় ইংরেজের জাতীয় গৌরবচিহ্ন বলিয়া সেই ছদ্মবেশে স্বদেশকে অপমানিত করিব না, ইহাও সেন্টিমেণ্ট। এই সমস্ত সেন্টিমেণ্টেই দেশের যথার্থ বল, দেশের যথার্থ গৌরব; অর্থে নহে, রাজপদে নহে, ডাক্তারির নৈপুণ্য অথবা আইন-ব্যবসায়ের উন্নতিসাধনে নহে।

আশা করিতেছি এই সেন্টিমেণ্টের কিঞ্চিৎ আভাস আছে বলিয়াই বিলাতি বেশধারীগণ অত্যন্ত অসংগত হইলেও তাঁহাদের অর্ধাঙ্গিনীদের শাড়ি রক্ষা করিয়াছেন।

পুরুষেরা কর্মক্ষেত্রে কাজের সুবিধার জন্য ভাবগৌরবকে বলিদান দিতে অনেকে কুণ্ঠিত হন না। কিন্তু স্ত্রীগণ যেখানে আছেন সেখানে সৌন্দর্য এবং ভাবুকতার রাহুরূপী কর্ম আজিও আসিয়া প্রবেশ করে নাই। সেইখানে একটু ভাবরক্ষার জায়গা রহিয়াছে, সেখানে আর স্ফীতোদর গাউন আসিয়া আমাদের দেশীয় ভাবের শেষ লক্ষণটুকু গ্রাস করিয়া যায় নাই।

সাহেবিয়ানাকেই যদি চরম গৌরবের বিষয় বলিয়া জ্ঞান করি, তাহা হইলে স্ত্রীকে বিবি না সাজাইয়া সে-গৌরব অর্ধেক অসম্পূর্ণ থাকে। তাহা যখন সাজাই নাই, তখন শাড়িপরা স্ত্রীকে বামে বসাইয়া এ কথা প্রকাশ্যে কবুল করিতেছি যে, আমি যাহা করিয়াছি তাহা সুবিধার খাতিরে;— দেখো, ভাবের খাতির রক্ষা করিয়াছি আমার ঘরের মধ্যে, আমার স্ত্রীগণের পবিত্র দেহে।

কিন্তু আমরা আশঙ্কা করিতেছি, ইহাদের অনেকেই এই প্রসঙ্গে একটা অত্যন্ত নিষ্ঠুর কথা বলিবেন। বলিবেন, পুরুষের উপযোগী জাতীয় পরিচ্ছদ তোমাদের আছে কোথায় যে আমরা পরিব? ইহাকেই বলে আঘাতের উপরে অবমাননা। একে তো পরিবার বেলা ইচ্ছাসুখেই বিলাতি কাপড় পরিলেন, তাহার পর বলিবার বেলা সুর ধরিলেন যে, তোমাদের কোনো কাপড় ছিল না বলিয়াই আমাদিগকে এই বেশ ধরিতে হইয়াছে। আমরা পরের কাপড় পরিয়াছি বটে, কিন্তু তোমাদের কোনো কাপড়ই নাই— সে আরও খারাপ।

বাঙালি সাহেবেরা ব্যঙ্গস্বরে অবজ্ঞা করিয়া বলেন, তোমাদের জাতীয় পরিচ্ছদ পরিতে গেলে পায়ে চটি, হাঁটুর উপরে ধুতি এবং কাঁধের উপরে একখানা চাদর পরিতে হয়; সে আমরা কিছুতেই পারিব না। শুনিয়া ক্ষোভে নিরুত্তর হইয়া থাকি।

যদিও কাপড়ের উপর মানুষ নির্ভর করে না, মানুষের উপর কাপড় নির্ভর করে; এবং সে-হিসাবে মোটা ধুতি চাদর লেশমাত্র লজ্জাকর নহে। বিদ্যাসাগর, একা বিদ্যাসাগর নহেন, আমাদের দেশে বহুসংখ্যক মোটা চাদরধারী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের সহিত গৌরবে গাম্ভীর্যে কোর্তাগ্রস্ত কোনো বিলাতফেরতই তুলনীয় হইতে পারেন না। যে-ব্রাহ্মণেরা এককালে ভারতবর্ষকে সভ্যতার উচ্চ শিখরে উত্তীর্ণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের বসনের একান্ত বিরলতা জগদ্বিখ্যাত। কিন্তু সে-সকল তর্ক তুলিতে চাহি না। কারণ সময়ের পরিবর্তন হইয়াছে, এবং সেই পরিবর্তনের একেবারে বিপরীতমুখে চলিতে গেলে আত্মরক্ষা করা অসম্ভব হইয়া উঠে।

অতএব এ কথা স্বীকার করিতে হইবে যে, বাংলাদেশে যে-ভাবে ধুতি চাদর পরা হয়, তাহা আধুনিক কাজকর্ম এবং আপিস-আদালতের উপযোগী নয়। কিন্তু আচকান-চাপকানের প্রতি সে-দোষারোপ করা যায় না।

সাহেবী বেশধারীরা বলেন, ওটাও তো বিদেশী সাজ। বলেন বটে, কিন্তু সে একটা জেদের তর্ক মাত্র। অর্থাৎ বিদেশী বলিয়া চাপকান তাঁহারা পরিত্যাগ করেন নাই, সাহেব সাজিবার একটা কোনো বিশেষ প্রলোভন আছে বলিয়াই ত্যাগ করিয়াছেন।

কারণ যদি চাপকান এবং কোট দুটোই তাঁহার নিকট সমান নূতন হইত, যদি তাঁহাকে আপিসে প্রবেশ ও রেলগাড়িতে পদার্পণ করিবার দিন দুটোর মধ্যে একটা প্রথম বাছিয়া লইতে হইত, তাহা হইলে এ-সকল তর্কের উত্থাপন হইতে পারিত। চাপকান তাঁহার গায়েই ছিল, তিনি সেটা তাঁহার পিতার নিকট হইতে পাইয়াছিলেন। তাহা ত্যাগ করিয়া যেদিন কালো কুর্তির মধ্যে প্রবেশপূর্বক গলায় টাই

বাঁধিলেন, সেদিন আনন্দে এবং গৌরবে এ তর্ক তোলেন নাই যে, পিতা ও-চাপকানটা কোথা হইতে পাইয়াছিলেন।

তোলাও সহজ নহে, কারণ চাপকানের ইতিবৃত্ত ঠিক তিনিও জানেন না, আমিও জানি না। কেননা মুসলমানদের সহিত বসনভূষণ শিল্পসাহিত্যে আমাদের এমন ঘনিষ্ঠ আদানপ্রদান হইয়া গেছে যে, উহার মধ্যে কতটা কার, তাহার সীমা নির্ণয় করা কঠিন। চাপকান হিন্দুমুসলমানের মিলিত বস্ত্র। উহা যে-সকল পরিবর্তনের মধ্য দিয়া বর্তমান আকারে পরিণত হইয়াছে, তাহাতে হিন্দুমুসলমান উভয়েই সহায়তা করিয়াছে। এখনও পশ্চিমে ভিন্ন ভিন্ন রাজাধিকারে চাপকানের অনেক বৈচিত্র্য দেখা যায়; সে-বৈচিত্র্যে যে একমাত্র মুসলমানের কর্তৃত্ব তাহা নহে, তাহার মধ্যে হিন্দুরও স্বাধীনতা আছে।

যেমন আমাদের ভারতবর্ষীয় সংগীত মুসলমানেরও বটে হিন্দুরও বটে, তাহাতে উভয়জাতীয় গুণীরই হাত আছে; যেমন মুসলমান রাজ্যপ্রণালীতে হিন্দু মুসলমান উভয়েরই স্বাধীন ঐক্য ছিল।

তাহা না হইয়া যায় না। কারণ মুসলমানগণ ভারতবর্ষের অধিবাসী ছিল। তাহাদের শিল্পবিলাস ও নীতিপদ্ধতির আদর্শ ভারতবর্ষ হইতে সুদূরে থাকিয়া আপন আদিমতা রক্ষা করে নাই; এবং মুসলমান যেমন বলের দ্বারা ভারতবর্ষকে আপনার করিয়া লইয়াছিল, ভারতবর্ষও তেমনই স্বভাবের অমোঘ নিয়মে কেবল আপন বিপুলতা আপন নিগূঢ় প্রাণশক্তি দ্বারা মুসলমানকে আপনার করিয়া লইয়াছিল। চিত্র, স্থাপত্য, বস্ত্রবয়ন, সূচিশিল্প, ধাতুদ্রব্য-নির্মাণ, দন্তকার্য, নৃত্য, গীত, এবং রাজকার্য, মুসলমানের আমলে ইহার কোনোটাই একমাত্র মুসলমান বা হিন্দুর দ্বারা হয় নাই; উভয়ে পাশাপাশি বসিয়া হইয়াছে। তখন ভারতবর্ষের যে একটি বাহ্যাবরণ নির্মিত হইতেছিল, তাহাতে হিন্দু ও মুসলমান ভারতবর্ষের ডান হাত ও বাম হাত হইয়া টানা ও পোড়েন বুনিতেছিল।

অতএব এই মিশ্রণের মধ্যে চাপকানের খাঁটি মুসলমানত্ব যিনি গায়ের জোরে প্রমাণ করিতে চান, তাঁহাকে এই কথা বলিতে হয় যে, তোমার যখন গায়ের এতই জোর, তখন কিছুমাত্র প্রমাণ না করিয়া ওই গায়ের জোরেই হ্যাটকোট অবলম্বন করো; আমরা মনের আক্ষেপ নীরবে মনের মধ্যে পরিপাক করি।

এক্ষণে যদি ভারতবর্ষীয় জাতি বলিয়া একটা জাতি দাঁড়াইয়া যায়, তবে তাহা কোনোমতেই মুসলমানকে বাদ দিয়া হইবে না। যদি বিধাতার কৃপায় কোনোদিন সহস্র অনৈক্যের দ্বারা খণ্ডিত হিন্দুরা এক হইতে পারে, তবে হিন্দুর সহিত মুসলমানের

এক হওয়াও বিচিত্র হইবে না। হিন্দু মুসলমানে ধর্মে না-ও মিলিতে পারে, কিন্তু জনবন্ধনে মিলিবে,— আমাদের শিক্ষা আমাদের চেষ্টা আমাদের মহৎ স্বার্থ সেইদিকে অনবরত কাজ করিতেছে। অতএব যে-বেশ আমাদের জাতীয় বেশ হইবে তাহা হিন্দুমুসলমানের বেশ।

যদি সত্য হয়, চাপকান পায়জামা একমাত্র মুসলমানদেরই উদ্ভাবিত সজ্জা, তথাপি এ কথা যখন স্মরণ করি, রাজপুতবীরগণ শিখসর্দারবর্গ এই বেশ পরিধান করিয়াছেন, রাণাপ্রতাপ রণজিৎসিংহ এই চাপকান পায়জামা ব্যবহার করিয়া ইহাকে ধন্য করিয়া গিয়াছেন, তখন মিস্টার ঘোষ-বোস-মিত্র, চাটুয্যে-বাঁড়ুয্যে-মুখুয্যের এ বেশ পরিতে লজ্জার কারণ কিছুই দেখি না।

কিন্তু সর্বাপেক্ষা সাংঘাতিক কথা এই যে, চাপকান পায়জামা দেখিতে অতি কুশ্রী। তর্ক যখন এইখানে আসিয়া ঠেকে তখন মানে মানে চুপ করিয়া যাওয়া শ্রেয়। কারণ রুচির তর্কের, শেষকালে প্রায় বাহুবলে আসিয়াই মীমাংসা হয়।

১৩০৫

নকলের নাকাল

ইংরেজিতে একটি বচন আছে, সাব্‌লাইম হইতে হাস্যকর অধিক দূর নহে। সংস্কৃত অলংকারে অদ্ভুতরস ইংরেজি সাব্‌লিমিটির প্রতিশব্দ। কিন্তু অদ্ভুত দুই রকমেরই আছে— হাস্যকর অদ্ভুত এবং বিস্ময়কর অদ্ভুত।

দুইদিনের জন্য দার্জিলিঙে ভ্রমণ করিতে আসিয়া, এই দুই জাতের অদ্ভুত একত্র দেখা গেল। একদিকে দেবতাত্মা নগাধিরাজ, আর-একদিকে বিলাতি-কাপড়-পরা বাঙালি। সাব্‌লাইম এবং হাস্যকর একেবারে গায়ে-গায়ে সংলগ্ন।

ইংরেজি কাপড়টাই যে হাস্যকর, সে কথা আমি বলি না— বাঙালির ইংরেজি কাপড় পরাটাই যে হাস্যকর, সে-প্রসঙ্গও আমি তুলিতে চাহি না। কিন্তু বাঙালির গায়ে বিসদৃশ রকমের বিলাতি কাপড় যদি করুণরসাত্মক না হয়, তবে নিঃসন্দেহই হাস্যকর। আশা করি, এ সম্বন্ধে কাহারও সহিত মতের অনৈক্য হইবে না।

হয়তো কাপড় একরকমের, টুপি একরকমের, হয়তো কলার আছে টাই নাই, হয়তো যে-রংটা ইংরেজের চক্ষে বিভীষিকা সেই রঙের কুর্তি; হয়তো যে-অঙ্গাবরণকে

ঘরের বাহিরে ইংরেজ বিবসন বলিয়া গণ্য করে, সেই অসংগত অঙ্গচ্ছদ। এমনতরো অজ্ঞানকৃত সং-সজ্জা কেন।

যদি সম্মুখে কাছা ও পশ্চাতে কোঁচা দিয়া কোনো ইংরেজ বাঙালিটোলায় ঘুরিয়া বেড়ায়, তবে সে-ব্যক্তি সম্মানলাভের আশা করিতে পারে না। আমাদের যে বাঙালি ভ্রাতারা অদ্ভুত বিলাতি সাজ পরিয়া গিরিরাজের রাজসভায় ভাঁড় সাজিয়া ফিরেন, তাঁহারা ঘরের কড়ি খরচ করিয়া ইংরেজ দর্শকের কৌতুকবিধান করিয়া থাকেন।

বেচারা কী আর করিবে। ইংরেজ-দস্তুর সে জানিবে কী করিয়া। যে বিলাত-ফেরত বাঙালি দস্তুর জানেন, তাঁহার স্বদেশীয়ের এই বেশবিভ্রমে তিনিই সবচেয়ে লজ্জাবোধ করেন। তিনিই সবচেয়ে তীব্রস্বরে বলিয়া থাকেন, যদি না জানে তবে পরে কেন। আমাদের সুদ্ধ ইংরেজের কাছে অপদস্থ করে।

না পরিবে কেন। তুমি যদি পর, এবং পরিয়া দেশীপরিচ্ছদধারীর চেয়ে নিজেকে বড়ো মনে কর, তবে সে-গর্ব হইতে সেই-বা বঞ্চিত হইবে কেন। তোমার যদি মত হয় যে, আমাদের স্বদেশীয় সজ্জা ত্যাজ্য এবং বিদেশী পোশাকই গ্রাহ্য, তবে দলপুষ্টিতে আপত্তি করিলে চলিবে না।

তুমি বলিবে, বিলাতি সাজ পরিতে চাও পরো, কিন্তু কোন্‌টা ভদ্র কোন্‌টা অভদ্র কোন্‌টা সংগত কোনটা অদ্ভুত, সে-খবরটা লও।

কিন্তু সে কখনই সম্ভব হইতে পারে না। যাহারা ইংরেজিসমাজে নাই, যাহাদের আত্মীয়স্বজন বাঙালি, তাহারা ইংরেজিদস্তুরের আদর্শ কোথায় পাইবে।

যাহাদের টাকা আছে, তাহারা র‍্যাঙ্কিন-হার্মাণের হস্তে চক্ষু বুজিয়া আত্মসমর্পণ করে, এবং বড়ো বড়ো চেকে সই করিয়া দেয়, মনে মনে সান্ত্বনা লাভ করে, নিশ্চয়ই আর কিছু না হউক আমাকে দেখিয়া অন্তত ভদ্র ফিরিঙ্গি বলিয়া লোকে আন্দাজ করিবে— ইংরেজি কায়দা জানে না, এমন মূর্ছাকর অপবাদ কেহ দিতে পারিবে না।

কিন্তু পনেরো-আনা বাঙালিরই অর্থাভাব, এবং চাঁদনিই তাহাদের বাঙালি সজ্জায় চরম মোক্ষস্থান। অতএব উলটা-পালটা ভুলচুক হইতেই হইবে। এমন স্থলে পরের সাজ পরিতে গেলে, অধিকাংশ লোকেরই সংসাজা বই গতি নাই।

স্বজাতিকে কেন এমন করিয়া অপদস্থ করা। এমন কাজ কেন কর, যাহার দৃষ্টান্তে দেশের লোক হাস্যকর হইয়া উঠে। দুই-চারিটা কাক অবস্থাবিশেষে ময়ূরের পুচ্ছ মানান-সই করিয়া পরিতেও পারে, কিন্তু বাকি কাকেরা তাহা কোনোমতেই পারিবে না, কারণ ময়ূরসমাজে তাহাদের গতিবিধি নাই, এমন অবস্থায় সমস্ত কাকসম্প্রদায়কে বিদ্রূপ হইতে রক্ষা করিবার জন্য উক্ত কয়েকটি ছদ্মবেশীকে ময়ূরপুচ্ছের লোভ সংবরণ

করিতেই হইবে। না যদি করেন, তবে পরপুচ্ছ বিকৃতভাবে আস্ফালনের প্রহসন সর্বত্রই ব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে।

এই লজ্জা হইতে, ইংরেজিয়ানার এই বিকার হইতে, স্বদেশকে রক্ষা করিবার জন্য আমরা কি সক্ষম নকলকারীকে সানুনয়ে অনুরোধ করিতে পারি না, কারণ, তাঁহারা সক্ষম, আর-সকলে অক্ষম। এমন-কি, অবস্থাবিশেষে তাঁহাদের পুত্রপৌত্রেরাও অক্ষম হইয়া পড়িবে। তাহারা যখন ফিরিঙ্গিলীলার অধস্তন রসাতলের গলিতে গলিতে সমাজচ্যুত আবর্জনার মতো পড়িয়া থাকিবে, তখন কি র‍্যাঙ্কিনবিলাসীর প্রেতাত্মা শান্তিলাভ করিবে।

দরিদ্র কোনোমতেই পরের নকল ভদ্ররকমে করিতে পারে না। নকল করিবার কাঠখড় বেশি। বাহির হইতে তাহার আয়োজন করিতে হয়। যাহাকে নকল করিতে হইবে, সর্বদা তাহার সংসর্গে থাকিতে হয়, দরিদ্রের পক্ষে সেইটেই সর্বাপেক্ষা কঠিন। সুতরাং সে-অবস্থায় নকল করিতে হইলে, আদর্শভ্রষ্ট হইয়া কিম্ভূতকিমাকার একটা ব্যাপার হইয়া পড়ে। বাঙালির পক্ষে খাটো ধুতি পরা লজ্জাকর নহে, কিন্তু খাটো প্যাণ্টলুন পরা লজ্জাজনক। কারণ, খাটো প্যাণ্টলুনে কেবল অসামর্থ্য বুঝায় না, তাহাতে পর সাজিবার যে-চেষ্টা যে-স্পর্ধা প্রকাশ পায়, তাহা দারিদ্র্যের সহিত কিছুতেই সুসংগত নহে।

আজকাল ইংরেজি সাজ কিরূপ চলতি হইয়া আসিতেছে, এবং যতই চলতি হইতেছে ততই তাহা কিরূপ বিকৃত হইয়া উঠিতেছে, দার্জিলিঙের মতো জায়গায় আসিলে অল্পকালের মধ্যেই তাহা অনুভব করা যায়। বাঙালির দুরদৃষ্ট বাঙালিকে অনেক দুঃখ দিয়াছে,— পেটে প্লীহা, হাড়ের মধ্যে ম্যালেরিয়া, দেহে কৃশতা, চর্মে কালিমা, ভাণ্ডারে দৈন্য ; অবশেষে তাহাকে কি অদ্ভুত সাজে সাজাইয়া ব্যঙ্গ করিতে আরম্ভ করিবে। চিত্তদৌর্বল্যে যখন হাস্যকর করিয়া তোলে, তখন ধরণী দ্বিধা হওয়া ছাড়া লজ্জানিবারণের আর উপায় থাকে না।

আচারব্যবহার সাজসজ্জা উদ্ভিদের মতো, তাহাকে উপড়াইয়া আনিলে শুকাইয়া পচিয়া নষ্ট হইয়া যায়। বিলাতি বেশভূষা-আদবকায়দার মাটি এখানে কোথায়। সে কোথা হইতে তাহার অভ্যস্ত রস আকর্ষণ করিয়া সজীব থাকিবে। ব্যক্তিবিশেষ খরচপত্র করিয়া কৃত্রিম উপায়ে মাটি আমদানি করিতে পারেন এবং দিনরাত সযত্ন-সচেতন থাকিয়া তাহাকে কোনোমতে খাড়া রাখিতে পারেন। কিন্তু সে কেবল দুই-চারিজন শৌখিনের দ্বারাই সাধ্য।

যাহাকে পালন করিতে, সজীব রাখিতে পারিবে না, তাহাকে ঘরের মধ্যে আনিয়া

পচাইয়া হাওয়া খারাপ করিবার দরকার? ইহাতে পরেরটাও নষ্ট হয়, নিজেরটাও মাটি হইয়া যায়। সমস্ত মাটি করিবার সেই আয়োজন বাংলাদেশেই দেখিতেছি।

তবে কি পরিবর্তন হইবে না। যেখানে যাহা আছে, চিরকাল কি সেখানে তাহা একই ভাবে চলে।

প্রয়োজনের নিয়মে পরিবর্তন হইবে, অনুকরণের নিয়মে নহে। কারণ, অনুকরণ অনেক সময়ই প্রয়োজনবিরুদ্ধ। তাহা সুখশান্তিস্বাস্থ্যের অনুকূল নহে। চতুর্দিকের অবস্থার সহিত তাহার সামঞ্জস্য নাই। তাহাকে চেষ্টা করিয়া আনিতে হয়, কষ্ট করিয়া রক্ষা করিতে হয়।

অতএব রেলওয়ে-ভ্রমণের জন্য, আপিসে বাহির হইবার জন্য, নূতন প্রয়োজনের জন্য ছাঁটা-কাটা কাপড় বানাইয়া লও। সে তুমি নিজের দেশ, নিজের পরিবেশ, নিজের পূর্বাপরের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া প্রস্তুত করো। সম্পূর্ণ ইতিহাসবিরুদ্ধ ভাববিরুদ্ধ সংগতিবিরুদ্ধ অনুকরণের প্রতি হতবুদ্ধির ন্যায় ধাবিত হইয়ো না।

পুরাতনের পরিবর্তন ও নূতনের নির্মাণে দোষ নাই। আবশ্যকের অনুরোধে তাহা সকল জাতিকেই সর্বদা করিতে হয়। কিন্তু এরূপ স্থলে সম্পূর্ণ অনুকরণ প্রয়োজনের দোহাই দিয়া চলে না। সে প্রয়োজনের দোহাই একটা ছুতামাত্র। কারণ সম্পূর্ণ অনুকরণ কখনই সম্পূর্ণ উপযোগী হইতে পারে না। তাহার হয়তো একাংশ কাজের হইতে পারে, অপরাংশ বাহুল্য। তাহার ছাঁটা কোর্তা হয়তো দৌড়ধাপের পক্ষে প্রয়োজনীয় হইতে পারে, কিন্তু তাহার ওয়েস্টকোট হয়তো অনাবশ্যক এবং উত্তাপজনক। তাহার টুপিটা হয়তো খপ্‌ করিয়া মাথায় পরা সহজ হইতে পারে, কিন্তু তাহার টাই-কলার বাঁধিতে অনর্থক সময় দিতে হয়।

যেখানে পরিবর্তন ও নূতন নির্মাণ অসম্ভব ও সাধ্যাতীত, সেইখানেই অনুকরণ মার্জনীয় হইতে পারে। বেশভূষায় সে-কথা কোনোক্রমেই খাটে না।

বিশেষত বেশভূষায় কেবলমাত্র অঙ্গাবরণের প্রয়োজন সাধন করে না, তাহাতে ভদ্রাভদ্র, দেশী-বিদেশী, স্বজাতি-বিজাতির পরিচয় দেওয়া হয়। ইংরেজি কাপড়ের ভদ্রতা ইংরেজ জানে। আমাদের ভদ্রলোকদের অধিকাংশের তাহা জানিবার সম্ভাবনা নাই। জানিতে গেলেও সর্বদাই ভয়ে ভয়ে পরের মুখ তাকাইতে হয়।

তার পরে স্বজাতি-বিজাতির কথা। কেহ কেহ বলেন, স্বজাতির পরিচয় লুকাইবার জন্যই বিলাতি কাপড়ের প্রয়োজন হয়।

এ কথা বলিতে যাহার লজ্জাবোধ না হয়, তাহাকে লজ্জা দেওয়া কাহারও সাধ্য নহে, পরের বাড়িতে ছদ্মবেশে সম্বন্ধী সাজিয়া গেলে আদর পাওয়া যাইতে পারে, তবু যাহার

কিছুমাত্র তেজ ও ভদ্রতাজ্ঞান আছে, সেই আদরকে সে উপেক্ষা করিয়া থাকে। রেলওয়ের ফিরিঙ্গি গার্ড ফিরিঙ্গিভ্রাতা মনে করিয়া যে-আদর করে তাহার প্রলোভন সংবরণ করাই ভালো। কোনো কোনো রেল-লাইনে দেশী-বিলাতির স্বতন্ত্র গাড়ি আছে, কোনো কোনো হোটেলে দেশী লোককে প্রবেশ করিতে দেয় না, সেজন্য রাগিয়া কষ্ট পাইবার অবসর যদি হাতে থাকে তবে সে-কষ্ট স্বীকার করো, কিন্তু জন্ম ভাঁড়াইয়া সেই গাড়িতে বা সেই হোটেলে প্রবেশ করিলে সম্মানের যে কী বৃদ্ধি হয়, তাহা বুঝা কঠিন।

পরিবর্তন কোন্ পর্যন্ত গেলে অনুকরণের সীমার মধ্যে আসিয়া পড়ে, তাহা নির্দিষ্ট করিয়া বলা শক্ত। তবে সাধারণ নিয়মের স্বরূপ একটা কথা বলা যাইতে পারে।

যেটুকু লইলে বাকিটুকুর সহিত বেখাপ হয় না, তাহাকে বলে গ্রহণ করা ; যেটুকু লইলে বাকিটুকুর সহিত অসামঞ্জস্য হয় তাহাকে বলে অনুকরণ করা।

মোজা পরিলে কোট পরা অনিবার্য হয় না, ধুতির সঙ্গে মোজা বিকল্পে চলিয়া যায়। কিন্তু কোটের সঙ্গে ধুতি, অথবা হ্যাটের সঙ্গে চাপকান চলে না। সাধু ইংরেজিভাষার মধ্যেও মাঝে মাঝে ফরাসি মিশাল চলে, তাহা ইংরেজি-পাঠকেরা জানেন। কিন্তু কী-পর্যন্ত চলিতে পারে, নিশ্চয়ই তাহার একটা অলিখিত নিয়ম আছে, সে-নিয়ম বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে শেখানো বাহুল্য। তথাপি তার্কিক বলিতে পারে, তুমি যদি অতটা দূরে গেলে, আমি না হয় আরও কিছুদূর গেলাম, কে আমাকে নিবারণ করিবে। সে তো ঠিক কথা। তোমার রুচি যদি তোমাকে নিবারণ না করে, তবে কাহার পিতৃপুরুষের সাধ্য তোমাকে নিবারণ করিয়া রাখে।

বেশভূষাতেও সেই তর্ক চলে। যিনি আগাগোড়া বিলাতি ধরিয়াছেন তিনি সমালোচককে বলেন, তুমি কেন চাপকানের সঙ্গে প্যান্টলুন পরিয়াছ। অবশেষে তর্কটা ঝগড়ায় গিয়া দাঁড়ায়।

সে স্থলে আমার বক্তব্য এই যে, যদি অন্যায় হইয়া থাকে, নিন্দা করো, সংশোধন করো, প্যান্টলুনের পরিবর্তে অন্য কোনোপ্রকার পায়জামা যদি কার্যকর ও সুসংগত হয় তবে তাহার প্রবর্তন করো— তাই বলিয়া তুমি আগাগোড়া দেশীবস্ত্র পরিহার করিবে কেন। একজন এক কান কাটিয়াছে বলিয়া দ্বিতীয় ব্যক্তি খামকা দুই কান কাটিয়া বসিবে, ইহার বাহাদুরিটা কোথায় বুঝিতে পারি না।

নূতন প্রয়োজনের সঙ্গে যখন প্রথম পরিবর্তনের আরম্ভ হয়, তখন একটা অনিশ্চয়তার প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। তখন কে কতদূরে যাইবে তাহার সীমা নির্দিষ্ট থাকে না। কিছুদিনের ঠেলাঠেলির পরে পরস্পর আপসে সীমানা পাকা হইয়া আসে।

সেই অনিবার্য অনিশ্চয়তার প্রতি দোষারোপ করিয়া যিনি পুরা নকলের দিকে যান, তিনি অত্যন্ত কুদৃষ্টান্ত দেখান।

কারণ, আলস্য সংক্রামক। পরের তৈরি জিনিসের লোভে নিজের সমস্ত চেষ্টা বিসর্জন দিবার নজির পাইলে, লোকে তাহাতে আকৃষ্ট হয়। ভুলিয়া যায়, পরের জিনিস কখনই আপনার করা যায় না। ভুলিয়া যায়, পরের কাপড় পরিতে হইলে, চিরকালই পরের দিকে তাকাইয়া থাকিতে হইবে।

জড়ত্ব যাহার আরম্ভ, বিকার তাহার পরিণাম। আজ যদি বলি, কে অত ভাবে, তার চেয়ে বিলিতি দোকানে গিয়া একস্যুট অর্ডার দিয়া আসি— তবে কাল বলিব, প্যাণ্টলুনটা খাটো হইয়া গেছে, কে এত হাঙ্গাম করে, ইহাতেই কাজ চলিয়া যাইবে।

কাজ চলিয়া যায়। কারণ, বাঙালি-সমাজে বিলাতি কাপড়ের অসংগতির দিকে কেহ দৃষ্টিপাত করে না। সেইজন্য বিলাতফেরতদের মধ্যেও বিলাতি সাজ সম্বন্ধে ঢিলাভাব দেখা যায়; সস্তার চেষ্টায় বা আলস্যের গতিকে তাঁহারা অনেকে এমন ভাবে বেশবিন্যাস করেন, যাহা বিধিমতো অভদ্র।

কেবল তাহাই নহে। বাঙালি বন্ধুর বাড়িতে বিবাহ প্রভৃতি শুভকর্মে বাঙালি-ভদ্রলোক সাজিয়া আসিতে তাঁহারা অবজ্ঞা করেন, আবার বিলাতি ভদ্রতার নিয়মে নিমন্ত্রণ সাজ পরিয়া আসিতেও আলস্য করেন। পরসজ্জা সম্বন্ধে কোন্‌টা বিহিত, কোন্‌টা অবিহিত, সেটা আমাদের মধ্যে প্রচলিত নাই বলিয়া তাঁহারা শিষ্টসমাজের বিধিবিধানের অতীত হইয়া যাইতেছেন। ইংরেজি সমাজে তাঁহারা সামাজিকভাবে চলিতে ফিরিতে পান না। দেশী সমাজকে তাঁহারা সামাজিকভাবে উপেক্ষা করিয়া থাকেন— সুতরাং তাঁহাদের সমস্ত বিধান নিজের বিধান, সুবিধার বিধান; সে বিধানে আলস্য-ঔদাসীন্যকে বাধা দিবার কিছুই নাই। বিলাতের এই-সকল ছাড়া-কাপড় ইহাদের পরপুরুষের গাত্রে কিরূপ বীভৎস হইয়া উঠিবে, তাহা কল্পনা করিলে লোমহর্ষণ উপস্থিত হয়।

কেবল সাজসজ্জা নহে, আচারব্যবহারে এ-সকল কথা আরও অধিক খাটে। বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেশী প্রথা হইতে যাঁহারা নিজেকে একেবারেই বিচ্ছিন্ন করিয়াছেন, তাঁহাদের আচারব্যবহারকে সদাচার-সদ্‌ব্যবহারের সীমামধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিবে কিসে। যে-ইংরেজের আচার তাঁহারা অবলম্বন করিয়াছেন তাঁহাদের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রাখিতে পারেন না, দেশী সমাজের ঘনিষ্ঠতা তাঁহারা বলপূর্বক ছেদন করিয়াছেন।

এঞ্জিন কাটিয়া লইলেও গাড়ি খানিকক্ষণ চলিতে পারে, বেগ একেবারে বন্ধ হয়

না। বিলাতের ধাক্কা বিলাতফেরতের উপর কিছুদিন থাকিতে পারে, তাহার পরে চলিবে কিসে।

সমাজের হিতার্থে সকল সমাজের মধ্যেই কতকগুলি কঠোর শাসন আপনি অভিব্যক্ত হইয়া উঠে। যাঁহারা স্বেচ্ছাক্রমে আত্মসমাজের ত্যাজ্যপুত্র, এবং চেষ্টাসত্ত্বেও পরসমাজের পোষ্যপুত্র নহেন, তাঁহারা স্বভাবতই দুই সমাজের শাসন পরিত্যাগ করিয়া সুখটুকু লইবার চেষ্টা করিবেন। তাহাতে কি মঙ্গল হইবে।

ইঁহাদের একরকম চলিয়া যাইবে, কিন্তু ইঁহাদের পুত্রপৌত্রেরা কী করিবে, এবং যাহারা নকলের নকল করে, তাহাদের কী দুরবস্থা হইবে।

দেশী দরিদ্রেরও সমাজ আছে। দরিদ্র হইলেও সে ভদ্র বলিয়া গণ্য হইতে পারে। কিন্তু বিলাতি-সাজা দরিদ্রের কোথাও স্থান নাই। বাঙালি-সাহেব কেবলমাত্র ধনসম্পদ ও ক্ষমতার দ্বারা আপনাকে দুর্গতির উর্ধ্বে খাড়া রাখিতে পারে। ঐশ্বর্য হইতে ভ্রষ্ট হইবামাত্র সেই সাহেবের পুত্রটি সর্বপ্রকার আশ্রয়হীন অবমাননার মধ্যে বিলুপ্ত হইয়া যায়। তখন তাহার ক্ষমতাও নাই, সমাজও নাই। তাহার নূতনলব্ধ পৈতৃক গৌরবেরও চিহ্ন নাই, চিরাগত পৈতামহিক সমাজেরও অবলম্বন নাই। তখন সে কে।

কেবলমাত্র অনুকরণ এবং সুবিধার আকর্ষণে আত্মসমাজ হইতে যাঁহারা নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিতেছেন, তাঁহাদের পুত্রপৌত্রেরা তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ হইবে না, ইহা নিশ্চয়, এবং যে-দুর্বলচিত্তগণ ইঁহাদের অনুকরণে ধাবিত হইবে, তাহারা সর্বপ্রকারে হাস্যজনক হইয়া উঠিবে, ইহাতেও সন্দেহ নাই।

যেটা লজ্জার বিষয়, সেইটে লইয়াই বিশেষরূপে গৌরব অনুভব করিতে বসিলে বন্ধুর কর্তব্য তাহাকে সচেতন করিয়া দেওয়া। যিনি সাহেবের অনুকরণ করিয়াছি মনে করিয়া গর্ববোধ করেন তিনি বস্তুত সাহেবির অনুকরণ করিতেছেন। সাহেবির অনুকরণ সহজ, কারণ তাহা বাহ্যিক জড় অংশ; সাহেবের অনুকরণ শক্ত, কারণ তাহা আন্তরিক মনুষ্যত্ব। যদি সাহেবের অনুকরণ করিবার শক্তি তাঁহার থাকিত, তবে সাহেবির অনুকরণ কখনই করিতেন না। অতএব কেহ যদি শিব গড়িতে গিয়া মাটির গুণে অন্য কিছু গড়িয়া বসেন, তবে সেটা লইয়া লম্ফঝম্ফ না করাই শ্রেয়।

১৩০৮

প্রাচ্য ও প্রতীচ্য

আমি যখন য়ুরোপে গেলুম তখন কেবল দেখলুম, জাহাজ চলছে, গাড়ি চলছে, লোক চলছে, দোকান চলছে, থিয়েটার চলছে, পার্লামেণ্ট চলছে,— সকলেই চলছে। ক্ষুদ্র থেকে বৃহৎ সকল বিষয়েই একটা বিপর্যয় চেষ্টা অহর্নিশি নিরতিশয় ব্যস্ত হয়ে রয়েছে; মানুষের ক্ষমতার চূড়ান্ত সীমা পাবার জন্যে সকলে মিলে অশ্রান্তভাবে ধাবিত হচ্ছে।

দেখে আমার ভারতবর্ষীয় প্রকৃতি ক্লিষ্ট হয়ে ওঠে, এবং সেই সঙ্গে বিস্ময়-সহকারে বলে— হাঁ, এরাই রাজার জাত বটে। আমাদের পক্ষে যা যথেষ্টের চেয়ে ঢের বেশি এদের কাছে তা অকিঞ্চন দারিদ্র্য। এদের অতি সামান্য সুবিধাটুকুর জন্যেও, এদের অতি ক্ষণিক আমোদের উদ্দেশেও মানুষের শক্তি আপন পেশী ও স্নায়ু চরম সীমায় আকর্ষণ করে খেটে মরছে।

জাহাজে বসে ভাবতুম এই যে জাহাজটি অহর্নিশি লৌহবক্ষ বিস্ফারিত করে চলেছে, ছাদের উপরে নরনারীগণ কেউ-বা বিশ্রামসুখে, কেউ-বা ক্রীড়াকৌতুকে নিযুক্ত; কিন্তু এর গোপন জঠরের মধ্যে যেখানে অনন্ত অগ্নিকুণ্ড জ্বলছে, যেখানে অঙ্গারকৃষ্ণ নিরপরাধ নারকীরা প্রতিনিয়তই জীবনকে দগ্ধ করে সংক্ষিপ্ত করছে সেখানে কী অসহ্য চেষ্টা, কী দুঃসাধ্য পরিশ্রম, মানবজীবনের কী নির্দয় অপব্যয় অশ্রান্তভাবে চলেছে। কিন্তু কী করা যাবে। আমাদের মানব-রাজা চলেছেন; কোথাও তিনি থামতে চান না; অনর্থক কাল নষ্ট কিংবা পথকষ্ট সহ্য করতে তিনি অসম্মত।

তাঁর জন্যে অবিশ্রাম যন্ত্রচালনা করে কেবলমাত্র দীর্ঘ পথকে হ্রাস করাই যথেষ্ট নয়; তিনি প্রাসাদে যেমন আরামে, যেমন ঐশ্বর্যে থাকেন পথেও তার তিলমাত্র ত্রুটি চান না। সেবার জন্যে শত শত ভৃত্য অবিরত নিযুক্ত, ভোজনশালা সংগীতমণ্ডপ সুসজ্জিত স্বর্ণচিত্রিত শ্বেতপ্রস্তরমণ্ডিত শত বিদ্যুদ্দীপে সমুজ্জ্বল। আহারকালে চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয়ের সীমা নেই। জাহাজ পরিষ্কার রাখবার জন্যে কত নিয়ম কত বন্দোবস্ত; জাহাজের প্রত্যেক দড়িটুকু যথাস্থানে সুশোভনভাবে গুছিয়ে রাখবার জন্য কত দৃষ্টি।

যেমন জাহাজে, তেমনি পথে ঘাটে দোকানে নাট্যশালায় গৃহে সর্বত্রই আয়োজনের আর অবধি নেই। দশদিকেই মহামহিম মানুষের প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের ষোড়শোপচারে পূজা হচ্ছে। তিনি মুহূর্তকালের জন্যে যাতে সন্তোষ লাভ করবেন তার জন্যে সংবৎসরকাল চেষ্টা চলছে।

এ-রকম চরমচেষ্টাচালিত সভ্যতাযন্ত্রকে আমাদের অন্তর্মনস্ক দেশীয় স্বভাবে যন্ত্রণা জ্ঞান করত। দেশে যদি একমাত্র যথেচ্ছাচারী বিলাসী রাজা থাকে তবে তার শৌখিনতার আয়োজন করবার জন্যে অনেক অধমকে জীবনপাত করতে হয়, কিন্তু যখন শতসহস্র রাজা তখন মনুষ্যকে নিতান্ত দুর্বহ ভারাক্রান্ত হয়ে পড়তে হয়। কবিবর Hood-রচিত Song of the Shirt সেই ক্লিষ্ট মানবের বিলাপসংগীত।

খুব সম্ভব দুর্দান্ত রাজার শাসনকালে ইজিপ্টের পিরামিড অনেকগুলি প্রস্তর এবং অনেকগুলি হতভাগ্য মানবজীবন দিয়ে রচিত হয়। এখনকার এই পরম সুন্দর অভ্রভেদী সভ্যতা দেখে মনে হয়, এও উপরে পাষাণ নীচে পাষাণ এবং মাঝখানে মানবজীবন দিয়ে গঠিত হচ্ছে। ব্যাপারটা অসম্ভব প্রকাণ্ড এবং কারুকার্যও অপূর্ব চমৎকার, তেমনি ব্যয়ও নিতান্ত অপরিমিত। সেটা বাহিরে কারও চোখে পড়ে না, কিন্তু প্রকৃতির খাতায় উত্তরোত্তর তার হিসাব জমা হচ্ছে। প্রকৃতির আইন অনুসারে উপেক্ষিত ক্রমে আপনার প্রতিশোধ নেবেই। যদি টাকার প্রতি বহু যত্ন করে পয়সার প্রতি নিতান্ত অনাদর করা যায়, তা হলে সেই অনাদৃত তাম্রখণ্ড বহু যত্নের ধন গৌরাঙ্গ টাকাকে ধ্বংস করে ফেলে।

স্মরণ হচ্ছে য়ুরোপের কোনো এক বড়োলোক ভবিষ্যদ্বাণী প্রচার করেছেন যে, এক সময়ে কাফ্রিরা য়ুরোপ জয় করবে। আফ্রিকা থেকে কৃষ্ণ অমাবস্যা এসে য়ুরোপের শুভ্র দিবালোক গ্রাস করবে। প্রার্থনা করি তা না ঘটুক, কিন্তু আশ্চর্য কী। কারণ আলোকের মধ্যে নির্ভয়, তার উপরে সহস্র চক্ষু পড়ে রয়েছে, কিন্তু যেখানে অন্ধকার জড়ো হচ্ছে বিপদ সেইখানে বসে গোপনে বলসঞ্চয় করে, সেইখানেই প্রলয়ের তিমিরাবৃত জন্মভূমি। মানব-নবাবের নবাবি যখন উত্তরোত্তর অসহ্য হয়ে উঠবে, তখন দারিদ্র্যের অপরিচিত অন্ধকার ঈশান কোণ থেকেই ঝড় ওঠবার সম্ভাবনা।

এইসঙ্গে আর একটা কথা মনে হয়; যদিও বিদেশীয় সমাজ সম্বন্ধে কোনো কথা নিঃসংশয়ে বলা ধৃষ্টতা, কিন্তু বাহির হতে যতটা বোঝা যায় তাতে মনে হয়, য়ুরোপে সভ্যতা যত অগ্রসর হচ্ছে স্ত্রীলোক ততই অসুখী হচ্ছে।

স্ত্রীলোক সমাজের কেন্দ্রানুগ (centripetal) শক্তি; সভ্যতার কেন্দ্রাতিগ শক্তি সমাজকে বহির্মুখে যে-পরিমাণে বিক্ষিপ্ত করে দিচ্ছে, কেন্দ্রানুগ শক্তি অন্তরের দিকে সে-পরিমাণে আকর্ষণ করে আনতে পারছে না। পুরুষেরা দেশে বিদেশে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে, অভাববৃদ্ধির সঙ্গে নিয়ত জীবিকাসংগ্রামে নিযুক্ত হয়ে রয়েছে। সৈনিক অধিক ভার নিয়ে লড়তে পারে না, পথিক অধিক ভার বহন করে চলতে পারে না, য়ুরোপে পুরুষ পারিবারিক ভার গ্রহণে সহজে সম্মত হয় না।

স্ত্রীলোকের রাজত্ব ক্রমশ উজাড় হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে। পাত্রের অপেক্ষায় কুমারী দীর্ঘকাল বসে থাকে, স্বামী কার্যোপলক্ষে চলে যায়, পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হলে পর হয়ে পড়ে। প্রখর জীবিকাসংগ্রামে স্ত্রীলোকদেরও একাকিনী যোগ দেওয়া আবশ্যক হয়েছে। অথচ তাদের চিরকালের শিক্ষা স্বভাব এবং সমাজনিয়ম তার প্রতিকূলতা করছে।

য়ুরোপে স্ত্রীলোক পুরুষের সঙ্গে সমান অধিকারপ্রাপ্তির যে-চেষ্টা করছে সমাজের এই সামঞ্জস্যনাশই তার কারণ ব'লে বোধ হয়। নরোয়েদেশীয় প্রসিদ্ধ নাট্যকার ইবসেন-রচিত কতকগুলি সামাজিক নাটকে দেখা যায়, নাট্যোক্ত অনেক স্ত্রীলোক প্রচলিত সমাজবন্ধনের প্রতি একান্ত অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করছে, অথচ পুরুষেরা সমাজ-প্রথার অনুকূলে। এইরকম বিপরীত ব্যাপার পড়ে আমার মনে হল, বাস্তবিক, বর্তমান য়ুরোপীয় সমাজে স্ত্রীলোকের অবস্থাই নিতান্ত অসংগত। পুরুষেরা না তাদের গৃহপ্রতিষ্ঠা করে দেবে, না তাদের কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের পূর্ণাধিকার দেবে। রাশিয়ার নাইহিলিস্ট সম্প্রদায়ের মধ্যে এত স্ত্রীলোকের সংখ্যা দেখে আপাতত আশ্চর্য বোধ হয়। কিন্তু ভেবে দেখলে য়ুরোপে স্ত্রীলোকের প্রলয়মূর্তি ধরবার অনেকটা সময় এসেছে।

অতএব সবসুদ্ধ দেখা যাচ্ছে, য়ুরোপীয় সভ্যতায় সর্ব বিষয়েই প্রবলতা এমনই অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে যে, অসমর্থ পুরুষই বল আর অবলা রমণীই বল, দুর্বলদের আশ্রয়স্থান এ সমাজে যেন ক্রমশই লোপ হয়ে যাচ্ছে। এখন কেবলই কার্য চাই, কেবলই শক্তি চাই, কেবলই গতি চাই ; দয়া দেবার এবং দয়া নেবার, ভালোবাসবার এবং ভালোবাসা পাবার যারা যোগ্য তাদের এখানে যেন সম্পূর্ণ অধিকার নেই। এই জন্যে স্ত্রীলোকেরা যেন তাদের স্ত্রীস্বভাবের জন্যে লজ্জিত। তারা বিধিমতে প্রমাণ করতে চেষ্টা করছে যে,আমাদের কেবল যে হৃদয় আছে তা নয়, আমাদের বলও আছে। অতএব "আমি কি ডরাই সখি ভিখারী রাঘবে।" হায়, আমরা ইংরেজ-শাসিত বাঙালিরাও সেইভাবেই বলছি, "নাহি কি বল এ ভুজমৃণালে।"

এই তো অবস্থা। কিন্তু ইতিমধ্যে যখন ইংলণ্ডে আমাদের স্ত্রীলোকদের দুরবস্থার উল্লেখ করে মুষলধারায় অশ্রুবর্ষণ হয়, তখন এতটা অজস্র করুণা বৃথা নষ্ট হচ্ছে বলে মনে অত্যন্ত আক্ষেপ উপস্থিত হয়। ইংরেজের মুল্লুকে আমরা অনেক আইন এবং অনেক আদালত পেয়েছি। দেশে যত চোর আছে পাহারাওয়ালার সংখ্যা তার চেয়ে ঢের বেশি। সুনিয়ম সুশৃঙ্খল সম্বন্ধে কথাটি কবার জো নেই। ইংরেজ আমাদের সমস্ত দেশটিকে ঝেড়ে ঝুড়ে ধুয়ে নিংড়ে ভাঁজ করে পাট করে ইস্ত্রি করে নিজের

বাক্সর মধ্যে পুরে তার উপর জগদ্দল হয়ে চেপে বসে আছে। আমরা ইংরেজের সতর্কতা, সচেষ্টতা, প্রখর বুদ্ধি, সুশৃঙ্খল কর্মপটুতার অনেক পরিচয় পেয়ে থাকি ; যদি কোনো কিছুর অভাব অনুভব করি তবে সে এই স্বর্গীয় করুণার, নিরুপায়ের প্রতি ক্ষমতাশালীর অবজ্ঞাবিহীন অনুকূল প্রসন্নভাবের। আমরা উপকার অনেক পাই, কিন্তু দয়া কিছুই পাই নে। অতএব যখন এই দুর্লভ করুণার অস্থানে অপব্যয় দেখি, তখন ক্ষোভের আর সীমা থাকে না।

আমরা তো দেখতে পাই আমাদের দেশের মেয়েরা তাঁদের সুগোল কোমল দুটি বাহুতে দু-গাছি বালা প'রে সিঁথের মাঝখানটিতে সিঁদুরের রেখা কেটে সদাপ্রসন্নমুখে স্নেহ প্রেম কল্যাণে আমাদের গৃহ মধুর করে রেখেছেন। কখনো কখনো অভিমানের অশ্রুজলে তাঁদের নয়নপল্লব আর্দ্র হয়ে আসে, কখনো-বা ভালোবাসার গুরুতর অত্যাচারে তাঁদের সরল সুন্দর মুখশ্রী ধৈর্যগম্ভীর সকরুণ বিষাদে ম্লানকান্তি ধারণ করে ; কিন্তু রমণীর অদৃষ্টক্রমে দুর্বৃত্ত স্বামী এবং অকৃতজ্ঞ সন্তান পৃথিবীর সর্বত্রই আছে ; বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হওয়া যায় ইংলণ্ডেও তার অভাব নেই। যা হোক, আমাদের গৃহলক্ষ্মীদের নিয়ে আমরা তো বেশ সুখে আছি এবং তাঁরা যে বড়ো অসুখী আছেন এমনতরো আমাদের কাছে তো কখনও প্রকাশ করেন নি, মাঝের থেকে সহস্র ক্রোশ দূরে লোকের অনর্থক হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যায় কেন।

পরস্পরের সুখদুঃখ সম্বন্ধে লোকে স্বভাবতই অত্যন্ত ভুল করে থাকেন। মৎস্য যদি উত্তরোত্তর সভ্যতার বিকাশে সহসা মানবহিতৈষী হয়ে ওঠে, তা হলে সমস্ত মানবজাতিকে একটা শৈবালবহুল গভীর সরোবরের মধ্যে নিমগ্ন না করে কিছুতে কি তার করুণ হৃদয়ের উৎকণ্ঠা দূর হয়। তোমরা বাহিরে সুখী, আমরা গৃহে সুখী, এখন আমাদের সুখ তোমাদের বোঝাই কী করে।

একজন লেডি-ডফারিন্‌-স্ত্রী-ডাক্তার আমাদের অন্তঃপুরে প্রবেশ করে যখন দেখে, অপরিচ্ছন্ন ছোটো কুঠরি— ছোটো ছোটো জানলা, বিছানাটা নিতান্ত দুগ্ধফেননিভ নয়, মাটির প্রদীপ, দড়িবাঁধা মশারি, আর্টস্টুডিয়োর রং-লেপা ছবি, দেয়ালের গাত্রে দীপশিখার কলঙ্ক এবং বহুজনের বহুদিনের মলিন করতলের চিহ্ন— তখন সে মনে করে কী সর্বনাশ, কী ভয়ানক কষ্টের জীবন, এদের পুরুষেরা কী স্বার্থপর, স্ত্রীলোকদের জন্তুর মতো করে রেখেছে। জানে না আমাদের দশাই এই। আমরা মিল পড়ি, স্পেন্সর পড়ি, রস্কিন পড়ি, আপিসে কাজ করি, খবরের কাগজে লিখি, বই ছাপাই, ওই মাটির প্রদীপ জ্বালি, ওই মাদুরে বসি, অবস্থা কিঞ্চিৎ সচ্ছল হলে অভিমানিনী সহধর্মিণীর গহনা গড়িয়ে দিই, এবং ওই দড়িবাঁধা মোটা মশারির মধ্যে আমি,

আমার স্ত্রী এবং মাঝখানে একটি কচি খোকা নিয়ে তালপাতার হাতপাখা খেয়ে রাত্রিযাপন করি।

কিন্তু আশ্চর্য এই, তবু আমরা নিতান্ত অধম নই। আমাদের কৌচ কার্পেট কেদারা নেই বললেই হয়, কিন্তু তবুও তো আমাদের দয়ামায়া ভালোবাসা আছে। তক্তপোশের উপর অর্ধশয়ান অবস্থায় এক হাতে তাকিয়া আঁকড়ে ধরে তোমাদের সাহিত্য পড়ি, তবুও তো অনেকটা বুঝতে পারি এবং সুখ পাই; ভাঙা প্রদীপে খোলা গায়ে তোমাদের ফিলজফি অধ্যয়ন করে থাকি, তবু তার থেকে এত বেশি আলো পাই যে আমাদের ছেলেরাও অনেকটা তোমাদেরই মতো বিশ্বাসবিহীন হয়ে আসছে।

আমরাও আবার তোমাদের ভাব বুঝতে পারি নে। কৌচ-কেদারা খেলাধুলা তোমরা এত ভালোবাস যে স্ত্রীপুত্র না হলেও তোমাদের বেশ চলে যায়। আরামটি তোমাদের আগে, তার পরে ভালোবাসা; আমাদের ভালোবাসা নিতান্তই আবশ্যক, তার পরে প্রাণপণ চেষ্টায় ইহজীবনে কিছুতেই আর আরামের জোগাড় হয়ে ওঠে না।

অতএব আমরা যখন বলি, আমরা যে বিবাহ করে থাকি সেটা কেবলমাত্র আধ্যাত্মিকতার প্রতি লক্ষ রেখে পারত্রিক মুক্তিসাধনের জন্য, কথাটা খুব জাঁকালো শুনতে হয় কিন্তু তবু সেটা মুখের কথা মাত্র, এবং তার প্রমাণ সংগ্রহ করবার জন্য আমাদের বর্তমান সমাজ পরিত্যাগ করে প্রাচীন পুঁথির পাতার মধ্যে প্রবেশপূর্বক ব্যস্তভাবে গবেষণা করে বেড়াতে হয়। প্রকৃত সত্য কথাটা হচ্ছে, ও না হলে আমাদের চলে না, আমরা থাকতে পারি নে। আমরা শুশুকের মতো কর্মতরঙ্গের মধ্যে দিগ্‌বাজি খেলে বেড়াই বটে, কিন্তু চট্‌ ক'রে অমনি যখন-তখন অন্তঃপুরের মধ্যে হুস করে হাঁফ ছেড়ে না এলে আমরা বাঁচি নে। যিনি যা-ই বলুন, সেটা পারলৌকিক সদ্গতির জন্যে নয়।

এমন অবস্থায় আমাদের সমাজের ভালো হচ্ছে, কি মন্দ হচ্ছে, সে কথা এখানে বিচার্য নয়, সে কথা নিয়ে অনেক বাদ-প্রতিবাদ হয়ে গেছে। এখানে কথা হচ্ছিল, আমাদের স্ত্রীলোকেরা সুখী কি অসুখী। আমার মনে হয় আমাদের সমাজের যেরকম গঠন, তাতে সমাজের ভালোমন্দ যা-ই হোক আমাদের স্ত্রীলোকেরা বেশ একরকম সুখে আছে। ইংরেজেরা মনে করতে পারেন লনটেনিস না খেললে এবং 'বলে' না নাচলে স্ত্রীলোক সুখী হয় না, কিন্তু আমাদের দেশের লোকের বিশ্বাস, ভালোবেসে এবং ভালোবাসা পেয়েই স্ত্রীলোকের প্রকৃত সুখ। তবে সেটা একটা কুসংস্কার হতেও পারে।

আমাদের পরিবারে নারীহৃদয় যেমন বিচিত্রভাবে চরিতার্থতা লাভ করে এমন

ইংরেজ-পরিবারে অসম্ভব। এইজন্যে একজন ইংরেজ-মেয়ের পক্ষে চিরকুমারী হওয়া দারুণ দুরদৃষ্টতা। তাদের শূন্যহৃদয় ক্রমশ নীরস হয়ে আসে, কেবল কুকুরশাবক পালন ক'রে এবং সাধারণ-হিতার্থে সভা পোষণ ক'রে আপনাকে ব্যাপৃত রাখতে চেষ্টা করে। যেমন মৃতবৎসা প্রসূতির সঞ্চিত স্তন্য কৃত্রিম উপায়ে নিষ্ক্রান্ত করে দেওয়া তার স্বাস্থ্যের পক্ষে আবশ্যক, তেমনি য়ুরোপীয় চিরকুমারীর নারীহৃদয়সঞ্চিত স্নেহরস নানা কৌশলে নিষ্ফল ব্যয় করতে হয়, কিন্তু তাতে তাদের আত্মার প্রকৃত পরিতৃপ্তি হতে পারে না।

ইংরেজ old maid-এর সঙ্গে আমাদের বালবিধবার তুলনা বোধ হয় অন্যায় হয় না। সংখ্যায় বোধ করি ইংরেজ কুমারী এবং আমাদের বালবিধবা সমান হবে কিংবা কিছু যদি কমবেশ হয়। বাহ্য সাদৃশ্যে আমাদের বিধবা য়ুরোপীয় চিরকুমারীর সমান হলেও প্রধান একটা বিষয়ে প্রভেদ আছে। আমাদের বিধবা নারীপ্রকৃতি কখনও শুষ্ক শূন্য পতিত থেকে অনুর্বরতা লাভের অবসর পায় না। তাঁর কোল কখনও শূন্য থাকে না, বাহু দুটি কখনও অকর্মণ্য থাকে না, হৃদয় কখনও উদাসীন থাকে না। তিনি কখনও জননী, কখনও দুহিতা, কখনও সখী। এইজন্যে চিরজীবনই তিনি কোমল সরস স্নেহশীল সেবাতৎপর হয়ে থাকেন। বাড়ির শিশুরা তাঁরই চোখের সামনে জন্মগ্রহণ করে এবং তাঁরই কোলে কোলে বেড়ে ওঠে। বাড়ির অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে তাঁর বহুকালের সুখদুঃখময় প্রীতির সখিত্ববন্ধন, বাড়ির পুরুষদের সঙ্গে স্নেহভক্তিপরিহাসের বিচিত্র সম্বন্ধ ; গৃহকার্যের ভার যা স্বভাবতই মেয়েরা ভালোবাসে তাও তাঁর অভাব নেই। এবং ওরই মধ্যে রামায়ণ মহাভারত দুটো-একটা পুরাণ পড়বার কিংবা শোনবার সময় থাকে, এবং সন্ধ্যাবেলায় ছোটো ছোটো ছেলেদের কোলের কাছে টেনে নিয়ে উপকথা বলাও একটা স্নেহের কাজ বটে। বরং একজন বিবাহিত রমণীর বিড়ালশাবক এবং ময়না পোষবার প্রবৃত্তি এবং অবসর থাকে, কিন্তু বিধবাদের হাতে হৃদয়ের সেই অতিরিক্ত কোণটুকুও উদ্বৃত্ত থাকতে প্রায় দেখা যায় না।

এই-সকল কারণে, তোমাদের যে-সকল মেয়ে প্রমোদের আবর্তে অহর্নিশি ঘূর্ণ্যমান কিংবা পুরুষের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় প্রবৃত্ত, কিংবা দুটো একটা কুকুরশাবক এবং চারটে পাঁচটা সভা কোলে ক'রে একাকিনী কৌমার্য কিংবা বৈধব্য যাপনে নিরত, তাঁদের চেয়ে যে আমাদের অন্তঃপুরচারিণীরা অসুখী, এ কথা আমার মনে লয় না। ভালোবাসাহীন বন্ধনহীন শূন্য স্বাধীনতা নারীর পক্ষে অতি ভয়ানক, মরুভূমির মধ্যে অপর্যাপ্ত স্বাধীনতা গৃহীলোকের পক্ষে যেমন ভীষণ শূন্য।

আমরা আর যা-ই হই, আমরা গৃহস্থ জাতি। অতএব বিচার করে দেখতে গেলে, আমরা আমাদের রমণীদের দ্বারেই অতিথি ; তাঁরাই আমাদের সর্বদা বহু যত্ন আদর করে রেখে দিয়েছেন। এমনই আমাদের সম্পূর্ণ আয়ত্ত করে নিয়েছেন যে, আমরা ঘর ছেড়ে দেশ ছেড়ে দু'দিন টিঁকতে পারি নে ; তাতে আমাদের অনেক ক্ষতি হয় সন্দেহ নেই, কিন্তু তাতে ক'রে নারীরা অসুখী হয় না।

আমাদের সমাজে স্ত্রীলোকদের সম্বন্ধে যে কিছুই করবার নেই, আমাদের সমাজ যে সর্বশ্রেষ্ঠ সর্বসম্পূর্ণ এবং আমাদের স্ত্রীলোকদের অবস্থা তার একটা প্রমাণ, এ কথা বলা আমার অভিপ্রায় নয়। আমাদের রমণীদের শিক্ষার অঙ্গহীনতা আছে এবং অনেক বিষয়ে তাঁদের শরীরমনের সুখসাধন করাকে আমরা উপেক্ষা এবং উপহাসযোগ্য জ্ঞান করি। এমন-কি, রমণীদের গাড়িতে চড়িয়ে স্বাস্থ্যকর বায়ুসেবন করানোকে আমাদের দেশের পরিহাসরসিকেরা একটা পরম হাস্যরসের বিষয় বলে স্থির করেন ; কিন্তু তবুও মোটের উপর বলা যায়, আমাদের স্ত্রীকন্যারা সর্বদাই বিভীষিকারাজ্যে বাস করছেন না এবং তাঁরা সুখী।

তাঁদের মানসিক শিক্ষা সম্বন্ধে কথা বলতে গেলে এই প্রশ্ন ওঠে, আমরা পুরুষেরাই কি খুব বেশি শিক্ষিত। আমরা কি একরকম কাঁচা-পাকা জোড়া-তাড়া অদ্ভুত ব্যাপার নই। আমাদের কি পর্যবেক্ষণশক্তির, বিচারশক্তি এবং ধারণাশক্তির বেশ সুস্থ সহজ এবং উদার পরিণতি লাভ হয়েছে। আমরা কি সর্বদাই পর্যবেক্ষণের সঙ্গে অপ্রকৃত কল্পনাকে মিশ্রিত করে ফেলি নে, এবং অন্ধসংস্কার কি আমাদের যুক্তিরাজ্যসিংহাসনের অর্ধেক অধিকার ক'রে সর্বদাই অটল এবং দাম্ভিকভাবে বসে থাকে না। আমাদের এইরকম দুর্বল শিক্ষা এবং দুর্বল চরিত্রের জন্য সর্বদাই কি আমাদের বিশ্বাস এবং কার্যের মধ্যে একটা অদ্ভুত অসংগতি দেখা যায় না। আমাদের বাঙালিদের চিন্তা এবং মত এবং অনুষ্ঠানের মধ্যে কি একপ্রকার শৃঙ্খলাসংযমহীন বিষম বিজড়িত ভাব লক্ষিত হয় না।

আমরা সুশিক্ষিতভাবে দেখতে শিখি নি, ভাবতে শিখি নি, কাজ করতে শিখি নি, সেইজন্যে আমাদের কিছুর মধ্যেই স্থিরত্ব নেই— আমরা যা বলি যা করি সমস্ত খেলার মতো মনে হয়, সমস্ত অকাল মুকুলের মতো ঝরে গিয়ে মাটি হয়ে যায়। সেইজন্যে আমাদের রচনা ডিবেটিং ক্লাবের 'এসে'র মতো, আমাদের মতামত সূক্ষ্ম তর্কচাতুরী প্রকাশের জন্যে, জীবনের ব্যবহারের জন্যে নয়, আমাদের বুদ্ধি কুশাঙ্কুরের মতো তীক্ষ্ণ কিন্তু তাতে অস্ত্রের বল নেই। আমাদেরই যদি এই দশা তো আমাদের স্ত্রীলোকদের কতই-বা শিক্ষা হবে। স্ত্রীলোকেরা স্বভাবতই সমাজের

যে-অন্তরের স্থান অধিকার করে থাকেন সেখানে পাক ধরতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হয়। য়ুরোপের স্ত্রীলোকদের অবস্থা আলোচনা করলেও তাই দেখা যায়। অতএব আমাদের পুরুষদের শিক্ষার বিকাশলাভের পূর্বেই যদি আমাদের অধিকাংশ নারীদের শিক্ষার সম্পূর্ণতা প্রত্যাশা করি তা হলে ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়ার প্রয়াস প্রকাশ পায়।

তবে এ কথা বলতেই হয় ইংরেজ স্ত্রীলোক অশিক্ষিত থাকলে যতটা অসম্পূর্ণ-স্বভাব থাকে আমাদের পরিপূর্ণ গৃহের প্রসাদে আমাদের রমণীর জীবনের শিক্ষা সহজেই তার চেয়ে অধিকতর সম্পূর্ণতা লাভ করে।

কিন্তু এই বিপুল গৃহের ভারে আমাদের জাতির আর বৃদ্ধি হতেই পেলে না। গার্হস্থ্য উত্তরোত্তর এমনই অসম্ভব প্রকাণ্ড হয়ে পড়েছে যে, নিজ গৃহের বাহিরের জন্যে আর কারও কোনো শক্তি অবশিষ্ট থাকে না। অনেকগুলায় একত্রে জড়ীভূত হয়ে সকলকেই সমান খর্ব করে রেখে দেয়। সমাজটা অত্যন্ত ঘনসন্নিবিষ্ট একটা জঙ্গলের মতো হয়ে যায়, তার সহস্র বাধাবন্ধনের মধ্যে কোনো-একজনের মাথা ঝাড়া দিয়ে ওঠা বিষম শক্ত হয়ে পড়ে।

এই ঘনিষ্ঠ পরিবারের বন্ধনপাশে পড়ে এ দেশে জাতি হয় না, দেশ হয় না, বিশ্ববিজয়ী মনুষ্যত্ব বৃদ্ধি পায় না। পিতামাতা হয়েছে, পুত্র হয়েছে, ভাই হয়েছে, স্ত্রী হয়েছে, এবং এই নিবিড় সমাজশক্তির প্রতিক্রিয়াবশে অনেক বৈরাগী সন্ন্যাসীও হয়েছে কিন্তু বৃহৎ সংসারের জন্যে কেউ জন্মে নি ;— পরিবারকেই আমরা সংসার বলে থাকি।

কিন্তু য়ুরোপে আবার আর-এক কাণ্ড দেখা যাচ্ছে। য়ুরোপীয়ের গৃহবন্ধন অপেক্ষাকৃত শিথিল ব'লে তাঁদের মধ্যে অনেকে যেমন সমস্ত ক্ষমতা স্বজাতি কিংবা মানবহিতব্রতে প্রয়োগ করতে সক্ষম হয়েছেন তেমনি আর একদিকে অনেকেই সংসারের মধ্যে কেবলমাত্র নিজেকেই লালন পালন পোষণ করবার সুদীর্ঘ অবসর এবং সুযোগ পাচ্ছেন ; একদিকে যেমন বন্ধনহীন পরহিতৈষা আর-একদিকেও তেমনি বাধাবিহীন স্বার্থপরতা। আমাদের যেমন প্রতিবৎসর পারবার বাড়ছে, ওদের তেমনি প্রতিবৎসর আরাম বাড়ছে। আমরা বলি যাবৎ দারপরিগ্রহ না হয় তাবৎ পুরুষ অর্ধেক, ইংরেজ বলে যতদিন একটি ক্লাব না জোটে ততদিন পুরুষ অর্ধাঙ্গ ; আমরা বলি সন্তানে গৃহ পবিবৃত না হলে গৃহ শ্মশানসমান, ইংরেজ বলেন আসবাব অভাবে গৃহ শ্মশানতুল্য।

সমাজে একবার যদি এই বাহ্যসম্পদকে অতিরিক্ত প্রশ্রয় দেওয়া হয় তবে সে

এমনই প্রভু হয়ে বসে যে, তার হাত আর সহজে এড়াবার জো থাকে না। তবে ক্রমে সে গুণের প্রতি অবজ্ঞা এবং মহত্ত্বের প্রতি কৃপাকটাক্ষপাত করতে আরম্ভ করে। সম্প্রতি এ দেশেও তার অনেকগুলি দৃষ্টান্ত দেখা যায়। ডাক্তারিতে যদি কেহ পসার করতে ইচ্ছা করেন, তবে তাঁর সর্বাগ্রেই জুড়ি গাড়ি এবং বড়ো বাড়ির আবশ্যক: এইজন্যে অনেক সময়ে রোগীকে মারতে আরম্ভ করবার পূর্বে নবীন ডাক্তার নিজে মরতে আরম্ভ করেন। কিন্তু আমাদের কবিরাজ মহাশয় যদি চটি এবং চাদর প'রে পালকি অবলম্বনপূর্বক যাতায়াত করেন তাতে তাঁর পসারের ব্যাঘাত করে না। কিন্তু একবার যদি গাড়ি ঘোড়া ঘড়ি ঘড়ির-চেনকে আমল দেওয়া হয় তবে সমস্ত চরক-সুশ্রুত-ধন্বন্তরীর সাধ্য নেই যে, আর তার হাত থেকে পরিত্রাণ করে। ইন্দ্রিয়সূত্রে জড়ের সঙ্গে মানুষের একটা ঘনিষ্ঠ কুটুম্বিতা আছে, সেই সুযোগে সে সর্বদাই আমাদের কর্তা হয়ে উঠে। এইজন্যে প্রতিমা প্রথমে ছল করে মন্দিরে প্রবেশ করে তার পরে দেবতাকে অতিষ্ঠ করে তোলে। গুণের বাহ্য নিদর্শনস্বরূপ হয়ে ঐশ্বর্য দেখা দেয় অবশেষে বাহ্যাড়ম্বরের অনুবর্তী হয়ে না এলে গুণের আর সম্মান থাকে না।

বেগবতী মহানদী নিজে বালুকা সংগ্রহ করে এনে অবশেষে নিজের পথরোধ করে বসে। য়ুরোপীয় সভ্যতাকে সেই রকম প্রবল নদী বলে এক-একবার মনে হয়। তার বেগের বলে, মানুষের পক্ষে যা সামান্য আবশ্যক এমন-সকল বস্তুও চতুর্দিক থেকে আনীত হয়ে রাশীকৃত হয়ে দাঁড়াচ্ছে। সভ্যতার প্রতি বর্ষের আবর্জনা পর্বতাকার হয়ে উঠছে। আর আমাদের সংকীর্ণ নদীটি নিতান্ত ক্ষীণস্রোত ধারণ ক'রে অবশেষে মধ্যপথে পারিবারিক ঘনশৈবালজালের মধ্যে জড়ীভূত হয়ে আচ্ছন্নপ্রায় হয়ে গেছে। কিন্তু তারও একটি শোভা সরসতা শ্যামলতা আছে। তার মধ্যে বেগ নেই, বল নেই, ব্যাপ্তি নেই, কিন্তু মৃদুতা স্নিগ্ধতা সহিষ্ণুতা আছে।

আর, যদি আমার আশঙ্কা সত্য হয়, তবে য়ুরোপীয় সভ্যতা হয়তো-বা তলে তলে জড়ত্বের এক প্রকাণ্ড মরুভূমি সৃজন করছে ; গৃহ, যা মানুষের স্নেহপ্রেমের নিভৃত নিকেতন, কল্যাণের চিরউৎসভূমি, পৃথিবীর আর সমস্তই লুপ্ত হয়ে গেলেও যেখানে একটুখানি স্থান থাকা মানুষের পক্ষে চরম আবশ্যক, স্তূপাকার বাহ্যবস্তুর দ্বারা সেইখানটা উত্তরোত্তর ভরাট করে ফেলছে, হৃদয়ের জন্মভূমি জড় আবরণে কঠিন হয়ে উঠছে।

নতুবা যে-সভ্যতা পরিবারবন্ধনের অনুকূল, সে-সভ্যতার মধ্যে কি নাইহিলিজ্‌ম্ নামক অতবড়ো একটা সর্বসংহারক হিংস্র প্রবৃত্তির জন্মলাভ সম্ভব হয়। সোশ্যালিজম

কি কখনও পিতামাতা ভ্রাতাভগ্নী পুত্রকলত্রের মধ্যে এসে পড়ে নখদন্ত বিকাশ করতে পারে। যখন কেবল আপনার সম্পদের বোঝাটি আপনার মাথায় তুলে নিয়ে গৃহত্যাগী সার্থবাহী সংসারপথ দিয়ে একলা চলে তখনই সন্ধ্যাবেলায় এই শ্বাপদগুলো এক লম্ফে স্কন্ধে এসে পড়বার সুযোগ অন্বেষণ করে।

যা হোক, আমার মতো অভাজন লোকের পক্ষে য়ুরোপীয় সভ্যতার পরিণাম অন্বেষণের চেষ্টা অনেকটা আদার ব্যাপারীর জাহাজের তত্ত্ব নেওয়ার মতো হয়। তবে একটা নির্ভয়ের কথা এই যে, আমি যে-কোনো অনুমানই ব্যক্ত করি না কেন, তার সত্য মিথ্যা পরীক্ষার এত বিলম্ব আছে যে, ততদিনে আমি এখানকার দণ্ড-পুরস্কারের হাত এড়িয়ে বিস্মৃতিরাজ্যে অজ্ঞাতবাস গ্রহণ করব। অতএব এ-সকল কথা যিনি যে-ভাবেই নিন আমি তার জবাবদিহি করতে চাই না। কিন্তু য়ুরোপের স্ত্রীলোক সম্বন্ধে যে-কথাটা বলছিলুম সেটা নিতান্ত অবজ্ঞার যোগ্য বলে আমার বোধ হয় না।

যে-দেশে গৃহ নষ্ট হয়ে ক্রমে হোটেল বৃদ্ধি হচ্ছে ; যে-যার নিজে নিজে উপার্জন করছে এবং আপনার ঘরটি, easy chair-টি, কুকুরটি, ঘোড়াটি, বন্দুকটি, চুরটের পাইপটি, এবং জুয়াখেলার ক্লাবটি নিয়ে নির্বিঘ্নে আরামের চেষ্টায় প্রবৃত্ত আছে সেখানে নিশ্চয়ই মেয়েদের মৌচাক ভেঙে গেছে। পূর্বে সেবক-মক্ষিকারা মধু অন্বেষণ ক'রে চাকে সঞ্চয় করত এবং রাজ্ঞী-মক্ষিকারা কর্তৃত্ব করতেন, এখন স্বার্থপরগণ যে-যার নিজের নিজের চাক ভাড়া ক'রে সকালে মধু উপার্জনপূর্বক সন্ধ্যা পর্যন্ত একাকী নিঃশেষে উপভোগ করছে। সুতরাং রানী-মক্ষিকাদের এখন বেরোতে হচ্ছে, কেবলমাত্র মধুদান এবং মধুপান করবার আর সময় নেই। বর্তমান অবস্থা এখনও তাঁদের স্বাভাবিক হয়ে যায় নি ; এইজন্যে অনেকটা পরিমাণে অসহায়ভাবে তাঁরা ইতস্তত ভন্ ভন্ করে বেড়াচ্ছেন। আমরা আমাদের মহারানীদের রাজত্বে বেশ আছি এবং তাঁরাও আমাদের অন্তঃপুর অর্থাৎ আমাদের পারিবারিক সমাজের মর্মস্থানটি অধিকার করে সকল কটিকে নিয়ে বেশ সুখে আছেন।

কিন্তু সম্প্রতি সমাজের নানা বিষয়ে অবস্থান্তর ঘটছে। দেশের আর্থিক অবস্থার এমন পরিবর্তন হয়েছে যে, জীবনযাত্রার প্রণালী স্বতই ভিন্ন আকার ধারণ করছে এবং সেই সূত্রে আমাদের একান্নবর্তী পরিবার কালক্রমে কথঞ্চিৎ বিশ্লিষ্ট হবার মতো বোধ হচ্ছে। সেইসঙ্গে ক্রমশ আমাদের স্ত্রীলোকদের অবস্থাপরিবর্তন আবশ্যক এবং অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়বে। কেবলমাত্র গৃহলুণ্ঠিত কোমল হৃদয়রাশি হয়ে থাকলে চলবে না, মেরুদণ্ডের উপর ভর করে উন্নত উৎসাহী ভাবে স্বামীর পার্শ্বচারিণী হতে হবে।

অতএব স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত না হলে বর্তমান শিক্ষিতসমাজে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে

সামঞ্জস্য নষ্ট হয়। আমাদের দেশে বিদেশী শিক্ষা প্রচলিত হওয়াতে, ইংরেজি যে জানে এবং ইংরেজি যে জানে না তাদের মধ্যে একটা জাতিভেদের মতো দাঁড়াচ্ছে, অতএব অধিকাংশ স্থলেই আমাদের বরকন্যার মধ্যে যথার্থ অসবর্ণ বিবাহ হচ্ছে। একজনের চিন্তা, চিন্তার ভাষা, বিশ্বাস এবং কাজ আর-একজনের সঙ্গে বিস্তর বিভিন্ন। এইজন্যে আমাদের আধুনিক দাম্পত্যে অনেক প্রহসন এবং সম্ভবত অনেক ট্র্যাজেডিও ঘটে থাকে। স্বামী যেখানে ঝাঁঝালো সোডাওআটার চায়, স্ত্রী সেখানে সুশীতল ডাবের জল এনে উপস্থিত করে।

এইজন্যে সমাজে স্ত্রীশিক্ষা ক্রমশই প্রচলিত হচ্ছে; কারও বক্তৃতায় নয়, কর্তব্যজ্ঞানে নয়, আবশ্যকের বশে।

এখন, অন্তরে বাহিরে এই ইংরেজি শিক্ষা প্রবেশ করে সমাজের অনেক ভাবান্তর উপস্থিত করবেই সন্দেহ নেই। কিন্তু যাঁরা আশঙ্কা করেন আমরা এই শিক্ষার প্রভাবে য়ুরোপীয় সভ্যতার মধ্যে প্রাচ্যলীলা সংবরণ করে পরম পাশ্চাত্যলোক লাভ করব, আমার আশা এবং আমার বিশ্বাস তাঁদের সে আশঙ্কা ব্যর্থ হবে।

কারণ, যেমন শিক্ষাই পাই না কেন, আমাদের একেবারে রূপান্তর হওয়া অসম্ভব। ইংরেজি শিক্ষা আমাদের কেবল কতকগুলি ভাব এনে দিতে পারে কিন্তু তার সমস্ত অনুকূল অবস্থা এনে দিতে পারে না। ইংরেজি সাহিত্য পেতে পারি কিন্তু ইংলণ্ড পাব কোথা থেকে। বীজ পাওয়া যায় কিন্তু মাটি পাওয়াই কঠিন।

দৃষ্টান্তস্বরূপে দেখানো যেতে পারে, বাইবল যদিও বহুকাল হতে য়ুরোপের প্রধান শিক্ষার গ্রন্থ, তথাপি য়ুরোপ আপন অসহিষ্ণু দুর্দান্ত ভাব রক্ষা করে এসেছে, বাইবেলের ক্ষমা এবং নম্রতা এখনও তাদের অন্তরকে গলাতে পারে নি।

আমার তো বোধ হয় য়ুরোপের পরম সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, য়ুরোপ বাল্যকাল হতে এমন-একটি শিক্ষা পাচ্ছে যা তার প্রকৃতির সম্পূর্ণ অনুযায়ী নয়, যা তার সহজ স্বভাবের কাছে নূতন অধিকার এনে দিচ্ছে, এবং সর্বদা সংঘাতের দ্বারা তাকে মহত্বের পথে জাগ্রত করে রাখছে।

য়ুরোপ কেবল যদি নিজের প্রকৃতি-অনুসারিণী শিক্ষা লাভ করত তা হলে য়ুরোপের আজ এমন উন্নতি হত না। তা হলে য়ুরোপের সভ্যতার মধ্যে এমন ব্যাপ্তি থাকত না, তাহলে একই উদারক্ষেত্রে এত ধর্মবীর এবং কর্মবীরের অভ্যুদয় হত না। খৃষ্টধর্ম সর্বদাই য়ুরোপের স্বর্গ এবং মর্ত, মন এবং আত্মার মধ্যে সামঞ্জস্য সাধন করে রেখেছে।

খৃষ্টীয় শিক্ষা কেবল যে তলে তলে য়ুরোপীয় সভ্যতার মধ্যে আধ্যাত্মিক রসের সঞ্চার করছে তা নয়, তার মানসিক বিকাশের কত সহায়তা করেছে বলা যায় না।

য়ুরোপের সাহিত্যে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। বাইবলসহযোগে প্রাচ্যভাব প্রাচ্যকল্পনা য়ুরোপের হৃদয়ে স্থান লাভ ক'রে সেখানে কত কবিত্ব কত সৌন্দর্য বিকাশ করেছে; উপদেশের দ্বারায় নয় কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্নজাতীয় ভাবের সহিত ঘনিষ্ঠ সংস্রবের দ্বারায় তার হৃদয়ের সার্বজনীন অধিকার যে কত বিস্তৃত করেছে তা আজ কে বিশ্লেষ করে দেখাতে পারে।

সৌভাগ্যক্রমে আমরা যে-শিক্ষা প্রাপ্ত হচ্ছি তাও আমাদের প্রকৃতির সম্পূর্ণ অনুগত নয়। এইজন্যে আশা করছি এই নূতন শক্তির সমাগমে আমাদের বহুকালের এক-ভাবাপন্ন জড়ত্ব পরিহার করতে পারব, নব জীবনহিল্লোলের স্পর্শে সজীবতা লাভ করে পুনরায় নবপত্রপুষ্পে বিকশিত হয়ে উঠব, আমাদের মানসিক রাজ্য সুদূরবিস্তৃতি লাভ করতে পারবে।

কেহ কেহ বলেন, য়ুরোপের ভালো য়ুরোপের পক্ষেই ভালো, আমাদের ভালো আমাদেরই ভালো। কিন্তু কোনো প্রকার ভালো কখনই পরস্পরের প্রতিযোগী নয় তাহা সহযোগী। অবস্থাবশত আমরা কেহ একটাকে কেহ আর-একটাকে প্রাধান্য দিই, কিন্তু মানবের সর্বাঙ্গীণ হিতের প্রতি দৃষ্টি করলে কাউকেই দূর করে দেওয়া যায় না। এমন-কি, সকল ভালোর মধ্যেই এমন-একটি পারিবারিক বন্ধন আছে যে, একজনকে দূর করলেই আর-একজন দুর্বল হয় এবং অঙ্গহীন মনুষ্যত্ব ক্রমশ আপনার গতি বন্ধ ক'রে সংসারপথপার্শ্বে একস্থানে স্থিতি অবলম্বন করতে বাধ্য হয় এবং এই নিরুপায় স্থিতিকেই উন্নতির চূড়ান্ত পরিণাম বলে আপনাকে ভোলাতে চেষ্টা করে।

গাছ যদি সহসা বুদ্ধিমান কিংবা অত্যন্ত সহৃদয় হয়ে ওঠে তা হলে সে মনে মনে এমন তর্ক করতে পারে যে, মাটিই আমার জন্মস্থান অতএব কেবল মাটির রস আকর্ষণ করেই আমি বাঁচব। আকাশের রৌদ্রবৃষ্টি আমাকে ভুলিয়ে আমার মাতৃভূমি থেকে আমাকে ক্রমশই আকাশের দিকেই নিয়ে যাচ্ছে, অতএব আমরা নব্যতরুসম্প্রদায়েরা একটা সভা করে এই সততচঞ্চল পরিবর্তনশীল রৌদ্রবৃষ্টিবায়ুর সংস্পর্শ বহুপ্রযত্নে পরিহার-পূর্বক আমাদের ধ্রুব অটল সনাতন ভূমির একান্ত আশ্রয় গ্রহণ করব।

কিংবা সে এমন তর্কও করতে পারে যে, ভূমিটা অত্যন্ত স্থূল, হেয় এবং নিম্নবর্তী, অতএব তার সঙ্গে কোনো আত্মীয়তা না রেখে আমি চাতক পক্ষীর মতো কেবল মেঘের মুখ চেয়ে থাকব— দুয়েতেই প্রকাশ পায় বৃক্ষের পক্ষে যতটা আবশ্যক তার চেয়ে তার অনেক অধিক বুদ্ধির সঞ্চার হয়েছে।

তেমনই বর্তমান কালে যাঁরা বলেন, আমরা প্রাচীন শাস্ত্রের মধ্যে বদ্ধমূল হয়ে বাহিরের শিক্ষা হতে আপনাকে রক্ষা করবার জন্যে আপাদমস্তক আচ্ছন্ন করে বসে

থাকব, কিংবা যাঁরা বলেন, হঠাৎ-শিক্ষার বলে আমরা আতশবাজির মতো এক মুহূর্তে ভারতভূতল পরিত্যাগ করে সুদূর উন্নতির জ্যোতিষ্কলোকে গিয়ে হাজির হব তাঁরা উভয়েই অনাবশ্যক কল্পনা নিয়ে অতিরিক্ত বুদ্ধিকৌশল প্রয়োগ করছেন।

কিন্তু সহজ-বুদ্ধিতে স্বভাবতই মনে হয় যে, ভারতবর্ষ থেকে শিকড় উৎপাটন করেও আমরা বাঁচব না এবং যে-ইংরেজিশিক্ষা আমাদের চতুর্দিকে নানা আকারে বর্ষিত ও প্রবাহিত হচ্ছে তাও আমাদের শিরোধার্য করে নিতে হবে। মধ্যে মধ্যে দুটো একটা বজ্রও পড়তে পারে এবং কেবলই যে বৃষ্টি হবে তা নয়, কখনো কখনো শিলাবৃষ্টিরও সম্ভাবনা আছে, কিন্তু বিমুখ হয়ে যাব কোথায়। তা ছাড়া এটাও স্মরণ রাখা কর্তব্য, এই যে নূতন বর্ষার বারিধারা এতে আমাদের সেই প্রাচীন ভূমির মধ্যেই নবজীবন সঞ্চার করছে।

অতএব ইংরেজি শিক্ষায় আমাদের কী হবে। আমরা ইংরেজ হব না, কিন্তু আমরা সবল হব উন্নত হব জীবন্ত হব। মোটের উপরে আমরা এই গৃহপ্রিয় শান্তিপ্রিয় জাতিই থাকব, তবে এখন যেমন "ঘর হইতে আঙিনা বিদেশ" তেমনটা থাকবে না। আমাদের বাহিরেও বিশ্ব আছে সে বিষয়ে আমাদের চেতনা হবে। আপনার সঙ্গে পরের তুলনা ক'রে নিজের যদি কোনো বিষয়ে অনভিজ্ঞ গ্রাম্যতা কিংবা অতিমাত্র বাড়াবাড়ি থাকে তবে সেটা অদ্ভুত হাস্যকর অথবা দূষণীয় ব'লে ত্যাগ করতে পারব। আমাদের বহুকালের রুদ্ধ বাতায়নগুলো খুলে দিয়ে বাহিরের বাতাস এবং পূর্ব পশ্চিমের দিবালোক ঘরের মধ্যে আনয়ন করতে পারব। যে-সকল নির্জীব সংস্কার আমাদের গৃহের বায়ু দূষিত করছে কিংবা গতিবিধির বাধারূপে পদে পদে স্থানাবরোধ করে পড়ে আছে, তাদের মধ্যে আমাদের চিন্তার বিদ্যুৎশিখা প্রবেশ করে কতকগুলিকে দগ্ধ এবং কতকগুলিকে পুনর্জীবিত করে দেবে। আমরা প্রধানত সৈনিক, বণিক অথবা পথিক-জাতি না হতেও পারি কিন্তু আমরা সুশিক্ষিত পরিণতবুদ্ধি সহৃদয় উদারস্বভাব মানবহিতৈষী ধর্মপরায়ণ গৃহস্থ হয়ে উঠতে পারি এবং বিস্তর অর্থ-সামর্থ্য না থাকলেও সদাসচেষ্ট জ্ঞান প্রেমের দ্বারা সাধারণ মানবের যথেষ্ট সাহায্য করতেও পারি।

অনেকের কাছে এ-আইডিয়ালটা আশানুরূপ উচ্চ না মনে হতেও পারে কিন্তু আমার কাছে এটা বেশ সংগত বোধ হয়। এমন-কি, আমার মনে হয় পালোয়ান হওয়া আইডিয়াল নয়, সুস্থ হওয়াই আইডিয়াল। অভ্রভেদী মন্যুমেণ্ট কিংবা পিরামিড আইডিয়াল নয়, বায়ু ও আলোকগম্য বাসযোগ্য সুদৃঢ় গৃহই আইডিয়াল।

একটা জ্যামিতির রেখা যতই দীর্ঘ এবং উন্নত করে তোলা যায় তাকে আকৃতির

উচ্চ আদর্শ বলা যায় না। তেমনই মানবের বিচিত্র বৃত্তির সহিত সামঞ্জস্যরহিত একটা হঠাৎ গগনস্পর্শী বিশেষত্বকে মনুষ্যত্বের আইডিয়াল বলা যায় না। আমাদের অন্তর এবং বাহিরের সম্যক স্ফূর্তি সাধন ক'রে আমাদের বিশেষ ক্ষমতাকে সুস্থ সুন্দরভাবে সাধারণ প্রকৃতির অঙ্গীভূত করে দেওয়াই আমাদের যথার্থ সুপরিণতি।

আমরা গৃহকোণে বসে রুদ্র আর্যতেজে সমস্ত সংসারকে আপন মনে নিঃশেষে ভস্মসাৎ করে দিয়ে, মানবজাতির পনেরো আনা উনিশগণ্ডা দুই পাইকে একঘরে করে কল্পনা করি পৃথিবীর মধ্যে আমরা আধ্যাত্মিক; পৃথিবীতে আমাদের পদধূলি এবং চরণামৃত বিক্রয় করে চিরকাল আমরা অপরিমিত স্ফীতিভাব রক্ষা করতে পারব। অথচ সেটা আছে কি না আছে ঠিক জানি নে; এবং যদি থাকে তো কোন্ সবল ভিত্তি অধিকার করে আছে তাও বলতে পারি নে; আমাদের সুশিক্ষিত উদার মহৎ হৃদয়ের উপরে প্রতিষ্ঠিত আছে, না শাস্ত্রের শ্লোকরাশির মধ্যে নিহিত হয়ে আছে তাও বিবেচনা করে দেখি নে, সকলে মিলে চোখ বুজে নিশ্চিন্ত মনে স্থির করে রেখে দিই কোথাও না কোথাও আছে, নিজের অন্তরের মধ্যেই হোক আর তুলটের পুঁথির মধ্যেই হোক, বর্তমানের মধ্যেই হোক আর অতীতের মধ্যেই হোক, অর্থাৎ আছেই হোক আর ছিলই হোক, ও একই কথা।

ধনীর ছেলে যেমন মনে করে আমি ধনী অতএব আমার বিদ্বান হবার কোনো আবশ্যক নেই, এমন-কি চাকরি-পিপাসুদের মতো কলেজে পাস দেওয়া আমার বংশ-মর্যাদার হানিজনক তেমনই আমাদের শ্রেষ্ঠতাভিমানীরা মনে করেন পৃথিবীর মধ্যে আমরা বিশেষ কারণে বিশেষ বড়ো, অতএব আমাদের আর-কিছু না করলেও চলে এমন-কি কিছু না করাই কর্তব্য।

এ দিকে হয়তো আমার পৈতৃক ধন সমস্ত উড়িয়ে বসে আছি। ব্যাঙ্কে আমার যা ছিল হয়তো তার কানাকড়ি অবশিষ্ট নেই কেবল এই কীটদষ্ট চেকবইটা মাত্র অবশিষ্ট আছে। যখন কেহ দরিদ্র অপবাদ দেয় তখন প্রাচীন লোহার সিন্দুক থেকে ওই বইটা টেনে নিয়ে তাতে বড়ো বড়ো অঙ্কপাতপূর্বক খুব সতেজে নাম সই করতে থাকি। শত সহস্র লক্ষ কোটি কলমে কিছুই বাধে না। কিন্তু যথার্থ তেজস্বী লোকে এ ছেলেখেলার চেয়ে মজুরি করে সামান্য উপার্জনও শ্রেয়স্কর জ্ঞান করে।

অতএব আপাতত আমাদের কোনো বিশেষ মহত্ত্বে কাজ নেই। আমরা যে-ইংরেজি শিক্ষা পাচ্ছি সেই শিক্ষা-দ্বারা আমাদের ভারতবর্ষীয় প্রকৃতির অসম্পূর্ণতা দূর করে আমরা যদি পুরা প্রমাণসই একটা মানুষের মতো হতে পারি তা হলেই যথেষ্ট। তার পরে যদি সৈন্য হয়ে রাঙা কুর্তি প'রে চতুর্দিকে লড়াই করে করে বেড়াই কিংবা

আধ্যাত্মিক হয়ে ঠিক ভ্রূর মধ্যবিন্দুতে কিংবা নাসিকার অগ্রভাগে অহর্নিশি আপনাকে নিবিষ্ট করে রেখে দিই সে পরের কথা।

আশা করি আমরা নানা ভ্রম এবং নানা আঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে সেই পূর্ণ মনুষ্যত্বের দিকেই যাচ্ছি। এখনও আমরা দুই বিপরীত শক্তির মধ্যে দোদুল্যমান; তাই উভয় পক্ষের সত্যকেই অনিশ্চিত ছায়ার মতো অস্পষ্ট দেখাচ্ছে; কেবল মাঝে মাঝে ক্ষণেকের জন্য মধ্য আশ্রয়টি উপলব্ধি করে ভবিষ্যতের পক্ষে একটা স্থির আশা-ভরসা জন্মে। আমার এই অসংলগ্ন অসম্পূর্ণ রচনায় পর্যায়ক্রমে সেই আশা ও আশঙ্কার কথা ব্যক্ত হয়েছে।

১২৯৮

অযোগ্য ভক্তি

ইষ্ট আর পুরোহিত
যাহা হতে সর্বস্থিত
    তারা যদি আসে বাড়ি পরে,
শুধু হাতে প্রণামেতে
ভার হয়ে যান তাতে
    মুখে হাসি অন্তরে বেজার।
তিন টাকা নগদে দিলে
চরণ তুলি মাথা পরে
    প্রসন্ন বদনে দেন বর।

উল্লিখিত শ্লোক তিনটি টাকা সম্বন্ধীয় একটি ছড়া হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। ইহার ছন্দ মিল এবং কবিত্ব সম্বন্ধে আমি কোনো জবাবদিহি স্বীকার করিতে প্রস্তুত নই।

কেবল দেখিবার বিষয় এই যে, ইহার মধ্যে যে-সত্যটুকু বর্ণিত হইয়াছে তাহা আমাদের দেশে সাধারণের মধ্যে প্রচলিত, তাহা সর্ববাদিসম্মত।

টাকার যে কী আশ্চর্য ক্ষমতা তাহারই অনেকগুলি দৃষ্টান্তের মধ্যে আমাদের অখ্যাতনামা কবি উপরের দৃষ্টান্তটিও নিবিষ্ট করিয়াছেন। কিন্তু এ দৃষ্টান্তে টাকার

ক্ষমতা অপেক্ষা মানুষের মনের সেই অত্যাশ্চর্য ক্ষমতা প্রকাশ করিতেছে যাহার প্রভাবে সে একই সময়ে একই লোককে যুগপৎ ভক্তি এবং অশ্রদ্ধা করিতে পারে।

সাধারণত গুরুপুরোহিত যে সাধুপুরুষ নহেন, সামান্য বৈষয়িকদের মতো পয়সার প্রতি তাঁহার যে বিলক্ষণ লোভ আছে সে সম্বন্ধে আমাদের কিছুমাত্র অন্ধতা নাই, তথাপি তাঁহার পায়ের ধুলা মাথায় লইয়া আমরা কৃতার্থ হইয়া থাকি কেননা গুরু ব্রহ্ম। এরূপ ভক্তি দ্বারা আমরা যে নিজেকে অপমানিত করি, এবং উপযুক্ত ব্যক্তিকে সম্মান করাই যে আত্মসম্মান এ কথা আমরা মনেই করি না।

কিন্তু অন্ধ ভক্তি অন্ধ মানুষের মতো অভ্যাসের পথ দিয়া অনায়াসে চলিয়া যায়। সকল দেশেই ইহার নজির আছে। বিলাতে একজন লর্ডের ছেলে সর্বতোভাবে অপদার্থ হইলেও অতি সহজেই যোগ্য লোকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়া থাকে।

যাহাকে অনেকদিন অনেকে পূজা করিয়া আসিতেছে তাহাকে ভক্তি করিবার জন্য কোনো ভক্তিজনক গুণ বা ক্ষমতাবিচারের প্রয়োজনই হয় না। এমন-কি সে-স্থলে অভক্তির প্রত্যক্ষ কারণ থাকিলেও তাহার পদমূলে অর্ঘ্য আপনি আসিয়া আকৃষ্ট হয়।

এইরূপ আমাদের মনের মধ্যে স্বভাবতই অনেকটা পরিমাণে জড়ধর্ম আছে। সেই কারণে আমাদের মন অভ্যাসের গড়ানো পথে মোহের আকর্ষণে আপনিই পাথরের মতো গড়াইয়া পড়ে, যুক্তি তাহার মাঝখানে বাধা দিতে আসিলে যুক্তি চূর্ণ হইয়া যায়।

সভ্যতার মধ্যে সেই জাগ্রত শক্তি আছে যাহা আমাদের মনের স্বাভাবিক জড়ত্বের বিরুদ্ধে প্রতিনিয়ত যুদ্ধ করিবার জন্য আমাদিগকে উৎসাহিত করে; যাহা আমাদিগকে কঠিন প্রমাণের পর বিশ্বাস করিতে বলে, যাহা আমাদিগকে শিক্ষিত রুচির দ্বারা উপভোগ করিতে প্রবৃত্ত করে, যাহা আমাদিগকে পরীক্ষিত যোগ্যতার নিকট ভক্তিনম্র হইতে উপদেশ দেয়, যাহা এইরূপে ক্রমশই আমাদের সচেষ্ট মনকে নিশ্চেষ্ট জড়বন্ধনের জাল হইতে উদ্ধার করিতে থাকে।

এই অশ্রান্ত সভ্যতাশক্তির উত্তেজনাতেই য়ুরোপখণ্ডে ভক্তিবৃত্তির জড়ত্বকে সম্পূর্ণ প্রতিরোধ করিতে না পারিলেও তাহাকে নিন্দা করিয়া থাকে। ইংরেজ একজন লর্ডকে শুদ্ধমাত্র লর্ড বলিয়াই বিশেষ ভক্তি না করিয়া থাকিতে পারে না এবং সেইসঙ্গে এইরূপ অযোগ্য ভক্তিকে "স্নবিসনেস" বলিয়া লাঞ্ছিত করে। ক্রমশ ইহার ফল দুই দিকেই ফলে,— অর্থাৎ আভিজাত্যের প্রতি সাধারণ লোকের অসংগত ভক্তি শিথিল হয় এবং অভিজাতগণও এই বরাদ্দ ভক্তির প্রতি নির্ভর করিয়া কোনো নিন্দনীয় কাজ করিতে সাহস করেন না।

এই শক্তির বলে অন্ধ রাজভক্তির মোহপাশ ছেদন করিয়া য়ুরোপ কেমন করিয়া আপনি রাজা হইয়া উঠিতেছে তাহা কাহারও অগোচর নাই। পুরোহিতের প্রতি অন্ধভক্তির বিরুদ্ধেও য়ুরোপীয় সভ্যতার মধ্যে একটা বিদ্রোহী শক্তি কাজ করিতেছে।

জনসমাজের স্বাধীন ক্ষমতাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সম্প্রতি য়ুরোপে টাকার থলি একটা পূজার বেদি অধিকার করিবার উপক্রম করিতেছে সন্দেহ নাই। কিন্তু সাহিত্যে তাহা সর্বদা উপহসিত। কার্লাইল প্রভৃতি মনস্বীগণ ইহার বিরুদ্ধে রক্তধ্বজা আন্দোলন করিতেছেন।

যে ক্ষমতার কাছে মস্তক নত করিলে মস্তকের অপমান হয়, যেমন টাকা, পদবি, গায়ের জোর এবং অমূলক প্রথা,— যাহাকে ভক্তি করিলে ভক্তি নিষ্ফলা হয়, অর্থাৎ চিত্তবৃত্তির প্রসার না ঘটিয়া কেবল সংকোচ ঘটে তাহার দুর্দান্ত শাসন হইতে মনকে স্বাধীন ও ভক্তিকে মুক্ত করা মনুষ্যত্ব রক্ষার প্রধান সাধনা।

ভক্তির দ্বারা যে-বিনতি আনয়ন করে সে-বিনতি সকল ক্ষেত্রেই শোভন নহে। এই বিনতি, কেবল গ্রহণ করিবার শিক্ষা করিবার, মাহাত্ম্যপ্রভাবের নিকট আপনার প্রকৃতিকে সাষ্টাঙ্গে অনুকূল করিবার জন্য। কিন্তু অমূলক বিনতি, অস্থানে বিনতি সেই কারণেই দুর্গতি আনয়ন করে। তাহা হীনকে ভক্তি করিয়া হীনতা লাভ করে, তাহা অযোগ্যের নিকট নত হইয়া অযোগ্যতার জন্য আপনাকে অনুকূল করিয়া রাখে।

ভক্তি আমাদিগকে ভক্তিভাজনের আদর্শের প্রতি স্বতঃ আকর্ষণ করে বলিয়াই সজীব সভ্যসমাজে কতকগুলি কঠিন বিচার প্রচলিত আছে। সেখানে যে-লোকের এমন কোনো ক্ষমতা আছে যাহা সাধারণের দৃষ্টি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে তাহাকে সমাজ সকল বিষয়েই নিষ্কলঙ্ক হইতে প্রত্যাশা করে। যে লোক রাজনীতিতে শ্রদ্ধেয় সে লোক ধর্মনীতিতে হেয় হইলে সাধারণ দুর্নীতিপর লোক অপেক্ষা তাহাকে অনেক বেশি নিন্দনীয় হইতে হয়।

এক হিসাবে ইহার মধ্যে কিঞ্চিৎ অন্যায় আছে। কারণ, ক্ষমতা সর্বতোব্যাপী হয় না, রাষ্ট্রনীতিতে যাহার বিচক্ষণতা, তাহার ক্ষমতা এবং চরিত্রের অপর অংশ সাধারণ লোকের অপেক্ষা যে উন্নত হইবেই এমন কোনো প্রাকৃতিক নিয়ম নাই, অতএব সাধারণ লোককে যে-আদর্শে বিচার করি, রাষ্ট্রনীতিতে বিচক্ষণ ব্যক্তিকে রাষ্ট্রনীতি ব্যতীত অন্য অংশে সেই আদর্শে বিচার করাই উচিত। কিন্তু সমাজ কেবলমাত্র আত্মরক্ষার জন্য এ সম্বন্ধে কিয়ৎ পরিমাণে অবিচার করিতে বাধ্য।

কারণ, পূর্বেই বলিয়াছি ভক্তির দ্বারা মন গ্রহণ করিবার অনুকূল অবস্থায় উপনীত

হয়। এক অংশ লইব এবং অপর অংশ লইব না এমন বিচারশক্তি তখন তাহার থাকে না। কোনো সূত্রে যে-লোক আমার ভক্তি আকর্ষণ করে, অলক্ষ্যে, নিজের অজ্ঞাতসারে আমি তাহার অনুকরণ করিতে থাকি। ভক্তির ধর্মই এই।

কিন্তু যে-বিষয়ে কোনো লোক অসাধারণ, ঠিক সেই বিষয়েই সাধারণ লোকের পক্ষে তাহার অনুকরণ দুঃসাধ্য। সুতরাং যে-অংশে সে সাধারণ লোকের অপেক্ষা উচ্চ নহে, এমন-কি, যে-অংশে তাহার দুর্বলতা, সেই অংশেরই অনুকরণ দেখিতে দেখিতে ব্যাপ্ত এবং সফল হইয়া উঠে। এইজন্য যে-লোক এক বিষয়ে মহৎ সে-লোক অন্য বিষয়ে হীন হইলে সমাজ প্রথমত তাহার এক বিষয়ের মহত্ত্বও অস্বীকার করিতে চেষ্টা করে, তাহাতে যদি কৃতকার্য না হয় তবে তাহার হীনতার প্রতি সাধারণ হীনতা অপেক্ষা গাঢ়তর কলঙ্ক আরোপ করে। আত্মরক্ষার জন্য সভ্যসমাজের এইরূপ চেষ্টা। যে লোক অসাধারণ, তাহাকে সংশোধন করিবার জন্য ততটা নহে, কিন্তু যাহারা সাধারণ লোক তাহাদিগকে ভক্তির কুফল হইতে রক্ষা করিবার জন্য।

অহংকারের কুফল সম্বন্ধে নীতিশাস্ত্রমাত্রেই আমাদিগকে সতর্ক করিয়া রাখে। অহংকারে লোকের পতন হয় কেন। প্রথম কারণ, নিজের বড়োত্ব সম্বন্ধে অতিবিশ্বাস থাকাতে সে পরকে ঠিকমত জানিতে পারে না; যে-সংসারে পাঁচজনের সহিত বাস করিতে ও কাজ করিতে হয় সেখানে নিজের তুলনায় অন্যকে যথার্থরূপে জানিতে পারিলে তবেই সকল বিষয়ে সফলতা লাভ করা সম্ভব। চীনদেশ আত্মাভিমানের প্রবলতায় জাপানকে চিনিতে পারে নাই, তাই তাহার এমন অকস্মাৎ দুর্গতি ঘটিল। জার্মানির সহিত যুদ্ধের পূর্বে ফ্রান্সেরও সেই দশা ঘটিয়াছিল। আর অতিদর্পে হতা লঙ্কা, এ কথা আমাদের দেশে প্রসিদ্ধ। ইংরেজিতে একটা প্রবাদ আছে, জ্ঞানই বল। কী গৃহে কী কর্মক্ষেত্রে পরের সম্বন্ধে ঠিকমত জ্ঞানই আমাদের প্রধান বল। অহংকার সেই সম্বন্ধে অজ্ঞতা আনয়ন করিয়া আমাদের দুর্বলতার প্রধান কারণ হইয়া থাকে।

অহংকারের আর-এক বিপদ, তাহা সংসারকে আমাদের প্রতিকূলে দাঁড় করায়। যিনি যত বড়ো লোকই হোন না কেন, সংসারের কাছে নানা বিষয়ে ঋণী; যে-লোক সবিনয়ে সেই ঋণ স্বীকার করিতে না চাহে তাহার পক্ষে ঋণ পাওয়া কঠিন হয়।

কিন্তু সর্বাপেক্ষা বিপদ আর-একটি আছে। বড়োকে বড়ো বলিয়া জানায় একটি আধ্যাত্মিক আনন্দ আছে। আত্মার বিস্তার হয় বলিয়া সে-আনন্দ। অহংকার আমাদিগকে নিজের সংকীর্ণতার মধ্যে বদ্ধ করিয়া রাখে; যাহার ভক্তি নাই, সে জানে না অহংকারের অধিকার কত সংকীর্ণ; যাহার ভক্তি আছে সেই জানে আপনার বাহিরে যে-বৃহত্ত্ব যে-মহত্ত্ব তাহাই অনুভব করাতেই আত্মার মুক্তি।

এইজন্য বৈষয়িক এবং আধ্যাত্মিক উভয় হিসাবেই অহংকারের এত নিন্দা।

কিন্তু অযথা ভক্তিও যে অহংকারের মতো সর্বতোভাবে দূষ্য, নীতিশাস্ত্রে সে কথার উল্লেখ থাকা উচিত। অন্ধ ভক্তিও পরের সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতার কারণ হয়। এবং অযোগ্য ভক্তিতে আমাদিগকে যদি আপনার সমকক্ষ অথবা আপনার অপেক্ষা হীনের নিকট নত করে, তবে তাহাতে যে দীনতা উপস্থিত করে তাহা অহংকারের সংকীর্ণতা অপেক্ষা অল্প হেয় নহে।

এইজন্য ইংরেজসমাজে অভিমানকে অহংকারের মতো নিন্দনীয় বলে না। অভিমান না থাকিলে মনুষ্যত্বের হানি হয়, এ কথা তাহারা স্বীকার করে।

যাহার মনুষ্যত্বের অভিমান আছে, সে কখনই অযোগ্য স্থানে আপনাকে নত করিতে পারে না। তাহার ভক্তিবৃত্তি যদি চরিতার্থতা চায় তবে সে যেখানে-সেখানে লুটাইয়া পড়ে না— সে যথোচিত সন্ধান ও প্রমাণের দ্বারা যথার্থ ভক্তিভাজনকে বাহির করে।

কিন্তু আমরা ভক্তিপ্রবণ জাতি। ভক্তি করাকেই আমরা ধর্মাচরণ বলিয়া থাকি ; কাহাকে ভক্তি করি তাহা বিচার করা আমাদের পক্ষে বাহুল্য।

আমাদের সৎপ্রবৃত্তিরও পথ যদি অত্যন্ত অবাধ হয়, তাহাতে ভালো ফল হয় না। তাহার বল, তাহার সচেষ্টতা, তাহার আধ্যাত্মিক উজ্জ্বলতা রক্ষার জন্য, তাহাকে অমোঘ হইবার জন্য, বাধার সহিত তাহার সংগ্রাম আবশ্যক।

যেমন বৈজ্ঞানিক সত্য নির্ণয় করিতে হইলে তাহাকে পদে পদে সংশয়ের দ্বারা বাধা দিতে হয়, আপাতদৃষ্টিতে বিশ্বসাধারণের কাছে যাহা অসন্দিগ্ধ সত্য বলিয়া খ্যাত, তাহাকেও কঠিন প্রমাণের দ্বারা বারংবার বিচিত্রভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হয়। যে-লোক অতিব্যগ্রতার সহিত তাড়াতাড়ি আপনার প্রশ্নের উত্তর পাইতে চায় তাহার উত্তর জানিবার ব্যাকুলতা সহজে পরিতৃপ্ত হইতে পারে, কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই সে ভুল উত্তর পায়। বৈজ্ঞানিকের ব্যাকুলতা সহজে নিবৃত্ত হইতে পায় না, কিন্তু বহু কষ্টে বহু বাধা অতিক্রম করিয়া সে যে-উত্তরটুকু পায় তাহা খাঁটি। এখানে যে-কোনো প্রকারে হউক জিজ্ঞাসাবৃত্তির নিবৃত্তিই মুখ্য লক্ষ্য হওয়া উচিত নহে, সত্যনির্ণয়ই জিজ্ঞাসার প্রকৃত পরিণাম।

তেমনই, তাড়াতাড়ি কোনো প্রকারে ভক্তিবৃত্তির পরিতৃপ্তি সাধনই ভক্তির সার্থকতা নহে। বরঞ্চ কোনোমতে আপনাকে পরিতৃপ্ত করিবার অতিমাত্র আগ্রহে সে আপনাকে ভ্রান্ত পথে লইয়া যায়। এইরূপে সে মিথ্যা দেবতা, আত্মাবমান ও সহজ সাধনার সৃষ্টি করিতে থাকে। মহত্ত্বের ধারণাই ভক্তির লক্ষ্য তা সে যতই কঠিন হউক ; আত্ম-পরিতৃপ্তি নহে, তা সে যতই সহজ ও সুখকর হউক।

জিজ্ঞাসাবৃত্তির পথে বুদ্ধিবিচারই প্রধান আবশ্যক বাধা। সেইসঙ্গে একটা অভিমানও আছে। অভিমান বলে, আমাকে ফাঁকি দিতে পারবে না। আমি এমন অপদার্থ নহি। যাহা-তাহাকে আমি সত্য বলিয়া মানিতে পারি না। আগে আমার সমস্ত সংশয়কে পরাস্ত করো, তবেই আমি সত্যকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি।

ভক্তিপথেও সেই বুদ্ধিবিচার ও অভিমানই অত্যাবশ্যক বাধা। সেই বাধা থাকিলে তবেই যথার্থ ভক্তিভাজনকে আশ্রয় করিয়া ভক্তি আপনাকে চরিতার্থ করে। অভিমান সহজে মাথা নত হইতে দেয় না। যখন সে আত্মসমর্পণ করে তখন ভক্তিভাজনের পরীক্ষা হইয়া গেছে, রামচন্দ্র তখন ধনুক ভাঙিয়া তবে তাঁহার বলের প্রমাণ দিয়াছেন। সেই বাধা না থাকিলে ভক্তি অলস হইয়া যায়, অন্ধ হইয়া যায়, কলের পুতুলের মতো নির্বিচারে ক্ষণে ক্ষণে মাথা নত করিয়া সে আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করে। এইরূপে ভক্তি অধ্যাত্মশক্তি হইতে মোহে পরিণত হয়।

অনেক সময় আমরা ভুল বুঝিয়া ভক্তি করি। যাহাকে মহৎ মনে করি সে হয়তো মহৎ নয়। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত আমার কল্পনায় সে মহৎ, ততক্ষণ তাহাকে ভক্তি করিলে ক্ষতির কারণ অল্পই আছে।

ক্ষতির কারণ কিছু নাই তাহা নয়। পূর্বেই বলিয়াছি যাহাকে মহৎ বলিয়া ভক্তি করি, জ্ঞাত এবং অজ্ঞাতসারে তাহার অনুকরণে প্রবৃত্ত হই। যে-লোক প্রকৃত মহৎ নহে, কেবল আমাদের কল্পনায় ও বিশ্বাসে মহৎ, অন্ধভাবে তাহার আচরণের অনুকরণ আমাদের পক্ষে উন্নতিকর নহে।

কিন্তু আমাদের দেশে, আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আমরা ভুল বুঝিয়াও ভক্তি করি। আমরা যাহাকে হীন বলিয়া জানি, তাহার পদধূলি অকৃত্রিম ভক্তিভরে মস্তকে ধারণ করিতে ব্যগ্র হই। ইহা অপেক্ষা আত্মাবমাননা কল্পনা করা যায় না।

সৈন্যগণকে যেমন মরিবার মুখে লইয়া যাইতে হইলে বহুদিনের কঠিন চর্চায় যন্ত্রবৎ বশ্যতা অভ্যাস করাইয়া লইতে হয় তেমনই পদে পদে আমাদের জাতিকে বিনাশের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত করা হইয়াছে। আমাদের শাস্ত্র আমাদের আচার আমাদিগকে বিশ্ব-জগতের কাছে নত এবং বশীভূত করিয়া রাখিয়াছে।

আমাদের দেশে মোহান্তের মহৎ, পুরোহিতের পবিত্র এবং দেবচরিত্রের উন্নত হওয়ার প্রয়োজন হয় না, কারণ আমরা ভক্তি লইয়া প্রস্তুত রহিয়াছি। যে-মোহান্ত জেলে যাইবার যোগ্য তাহার চরণামৃত পান করিয়া আমরা আপনাকে অপমানিত জ্ঞান করি না, যে-পুরোহিতের চরিত্র বিশুদ্ধ নহে এবং যে-লোক পূজানুষ্ঠানের মন্ত্রগুলির অর্থ পর্যন্তও জানে না তাহাকে ইষ্ট গুরুদেব বলিয়া স্বীকার করিতে আমাদের মুহূর্তের

জন্যও কুণ্ঠাবোধ হয় না, এবং আমাদেরই দেশে দেখা যায়, যে-সকল দেবতার পুরাণবর্ণিত আচরণ লক্ষ্য করিয়া আলাপে ও প্রচলিত কাব্যে ও গানে অনেকস্থলে নিন্দা ও পরিহাস করি, সেই দেবতাকেই আমরা পূর্ণ ভক্তিতে পূজা করিয়া থাকি।

সুতরাং এ স্থলে সহজেই মনে প্রশ্ন উঠে, কেন পূজা করি। তাহার এক উত্তর এই যে, অভ্যাসবশত অর্থাৎ মনের জড়ত্ববশত; দ্বিতীয় উত্তর এই যে, ভক্তিজনক গুণের জন্য নহে, পরন্তু শক্তি কল্পনা করিয়া এবং সেই শক্তি হইতে ফল কামনা করিয়া।

আমাদের উদ্ধৃত শ্লোকের প্রথমেই আছে, "ইষ্ট আর পুরোহিত যাহা হতে সর্বস্থিত।" ইহাতেই বুঝা যাইতেছে গুরু ও পুরোহিতের মধ্যে আমরা একটা গূঢ় শক্তি কল্পনা করিয়া থাকি; তাঁহাদের শিক্ষা, চরিত্র ও আচরণ যেমনই হউক তাঁহারা আমাদের সাংসারিক মঙ্গলের প্রধান কারণ এবং তাঁহাদের প্রতি ভক্তিতে লাভ ও অভক্তিতে লোকসান আছে, এই বিশ্বাস আমাদের মাথাকে তাঁহাদের পায়ের কাছে নত করিয়া রাখিয়াছে। কোনো কোনো সম্প্রদায়ের মধ্যে এ বিশ্বাস এতদূর পর্যন্ত গিয়াছে যে, তাঁহারা গৃহধর্মনীতির সুস্পষ্ট ব্যভিচার দ্বারাও গুরুভক্তিকে অন্যায় প্রশ্রয় দিয়া থাকেন।

দেবতা সম্বন্ধেও সে কথা খাটে। দেবচরিত্র আমাদের আদর্শ চরিত্র হইবে, এমন আবশ্যক নাই। দেবভক্তিতে ফল আছে, কারণ দেবতা শক্তিমান।

ব্রাহ্মণ সম্বন্ধেও তাহাই। ব্রাহ্মণ দুশ্চরিত্র নরাধম হইলেও ব্রাহ্মণ বলিয়াই পূজ্য। ব্রাহ্মণের কতকগুলি নিগূঢ় শক্তি আছে। তাঁহাদের প্রসাদে ও বিরাগে আমাদের ভালো মন্দ ঘটিয়া থাকে। এরূপ ভক্তিতে ভক্ত ও ভক্তিপাত্রের মধ্যে আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ থাকে না, দেনা-পাওনার সম্বন্ধই দাঁড়াইয়া যায়। সেই সম্বন্ধে ভক্তিপাত্রকেও উচ্চ হইতে হয় না এবং ভক্তও নীচতা লাভ করে।

কিন্তু আমাদের দেবভক্তি সম্বন্ধে আধুনিক শিক্ষিত অনেকে অত্যন্ত সূক্ষ্ম তর্ক করেন। তাঁহারা বলেন, ঈশ্বর যখন সর্বজ্ঞ সর্বব্যাপী তখন ঈশ্বর বলিয়া আমরা যাঁহাকেই পূজা করি, ঈশ্বরই সে-পূজা গ্রহণ করেন। অতএব এরূপ ভক্তি নিষ্ফল নহে।

পূজা যেন খাজনা দেওয়ার মতো; স্বয়ং রাজার হস্তেই দিই আর তাঁহার তহসিলদারের হস্তেই দিই, একই রাজভাণ্ডারে গিয়া জমা হয়।

দেবতার সহিত দেনা-পাওনার সম্বন্ধ আমাদের মনে এমনই বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে যে, পূজার দ্বারা ঈশ্বরের যেন একটা বিশেষ উপকার করিলাম এবং তাহার পরিবর্তে

একটা প্রত্যুপকার আমার পাওনা রহিল, ইহাই ভুলিতে না পারিয়া আমরা দেবভক্তি সম্বন্ধে এমন দোকানদারির কথা বলিয়া থাকি। পূজাটা দেবতার হস্তগত হওয়াই যখন বিষয়, এবং সেটা ঠিকমত তাঁহার ঠিকানায় পৌঁছিলেই যখন আমার কিঞ্চিৎ লাভ আছে, তখন যত অল্প ব্যয়ে অল্প চেষ্টায় সেটা চালান করা যায় ধর্ম-ব্যবসায়ে ততই আমার জিৎ। দরকার কী ঈশ্বরের স্বরূপ ধারণার চেষ্টায়, দরকার কী কঠোর সত্যানুসন্ধানে; সম্মুখে কাষ্ঠ প্রস্তর যাহা উপস্থিত থাকে তাহাকে ঈশ্বর বলিয়া পূজা নিবেদন করিয়া দিলে যাঁহার পূজা তিনি আপনি ব্যগ্র হইয়া আসিয়া হাত বাড়াইয়া লইবেন।

আমাদের পুরাণে ও প্রচলিত কাব্যে যেরূপ বর্ণনা আছে, তাহাতে মনে হয় যেন দেবতারা আপনাদের পূজা গ্রহণের জন্য মৃতদেহের উপর শকুনি-গৃধিনীর ন্যায় কাড়াকাড়ি ছেঁড়াছিঁড়ি করিতেছেন। অতএব আমাদের নিকট হইতে ভক্তিগ্রহণের লোলুপতা যে ঈশ্বরেরই, এ কথা আমাদের শিক্ষিতসম্প্রদায়ের মনেও অলক্ষ্যে বিরাজ করিতেছে।

কিন্তু কী মনুষ্যপূজায় এবং কী দেবপূজায়, ভক্তি ভক্তেরই লাভ। যাঁহাকে ভক্তি করি তিনি না জানিলেও ক্ষতি নাই। কিন্তু তাঁহাকেই আমার জানা চাই, তবেই আমার ভক্তির সার্থকতা। পূজ্য ব্যক্তির আদর্শকে আমাদের প্রকৃতির সহিত সম্পূর্ণ মিশাইয়া লইতে চাহিলে ভক্তি ছাড়া আর কোনো উপায়ই নাই। আমরা যাঁহাকে পূজা করি তাঁহাকেই যদি বস্তুত চাই তবে তাঁহার প্রকৃতির আদর্শ তাঁহার সত্যস্বরূপ একান্ত ভক্তিযোগে হৃদয়ে স্থাপনা করিতে হয়। সেরূপ অবস্থায় ফাঁকি দিতে স্বতই প্রবৃত্তি হয় না; তাঁহার সহিত বৈসাদৃশ্য ও দূরত্ব যতই দীনত্বের সহিত অনুভব করি, ততই ভক্তি বাড়িয়া উঠিয়া ক্ষুদ্র আপনাকে তাঁহার সহিত লীন করিবার চেষ্টা করে।

ইহাই ভক্তির গৌরব। ভক্তিরস সেই আধ্যাত্মিক রসায়নশক্তি যাহা ক্ষুদ্রকে বিগলিত করিয়া মহতের সহিত মিশ্রিত করিতে পারে।

অতএব ঈশ্বরকে যখন ভক্তি করি তখন তদ্দ্বারা তাঁহার ঐশ্বর্য বাড়ে না, আমরাই সেই রসস্বরূপের রাসায়নিক মিলন লাভ করি। আমাদের ঈশ্বরের আদর্শ যত মহৎ মিলনের আনন্দ ততই প্রগাঢ়, এবং তদ্দ্বারা আত্মার প্রসার ততই বিপুল হইবে।

ভক্তি আমরা যাঁহাকে করি, তাঁহাকে ছাড়া আর কাহাকেও পাই না। যদি গুরুকে ব্রহ্ম বলিয়া ভক্তি করি, তবে সে গুরুর আদর্শই আমাদের মনে অঙ্কিত

হয়। ভক্তির প্রবলতায় সেই গুরুর মানস আদর্শ তাঁহার স্বাভাবিক আদর্শ অপেক্ষা কতকটা পরিমাণে আপনি বাড়িয়া যায় সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা হইতে স্বতন্ত্র হইতে পারে না।

অস্থানে ভক্তি করিবার একটা মহৎ পাপ এই যে, যিনি যথার্থ পূজ্য, অযোগ্য পাত্রদের সহিত তাঁহাকে একাসনভুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। দেবতায় উপদেবতায় প্রভেদ থাকে না।

আমাদের দেশে এই অন্যায় মিশ্রণ সকল দিকেই ঘটিয়াছে। আমাদের দেশে অনাচার এবং পাপ এক কোঠায় পড়িয়া গেছে। ইতর জাতিকে স্পর্শ করাও পাপ, ইতরজাতিকে হত্যা করাও পাপ। নরহত্যা করিয়া সমাজে নিষ্কৃতি আছে কিন্তু গোহত্যা করিয়া নিষ্কৃতি নাই। অন্যায় করিয়া যবনের অন্ন মারিলে ক্ষমা আছে কিন্তু তাহার অন্ন গ্রহণ করিলে পাতক।

প্রায়শ্চিত্ত-বিধিও তেমনই। তিলক রাজদ্রোহ অভিযোগে জেলে গিয়াছেন— সেখানে অনিবার্য রাজদণ্ডের বিধানে তাঁহাকে দূষিত অন্ন গ্রহণ করিতে হইয়াছে; মাথা মুড়াইয়া গোঁফ কামাইয়া কঠিন প্রায়শ্চিত্ত বিধানের জন্য সমাজ তাঁহাকে আহ্বান করিতেছে। তিলক যে সত্য রাজদ্রোহী এ কথা কেহ বিশ্বাস করে না এবং যদি-বা করিত সেজন্য তাঁহাকে দণ্ডনীয় করিত না,— কিন্তু যে অনিচ্ছাকৃত অনাচারে তাঁহার সাধু চরিত্রকে কিছুমাত্র স্পর্শ করে নাই তাহাই তাঁহার পক্ষে পাপ, এবং সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত মস্তকমুণ্ডন।

যে সমস্ত পাপ অনাচারমাত্র নহে— যাহা মিথ্যাচরণ, চৌর্য, নিষ্ঠুরতা প্রভৃতি চরিত্রের মূলগত পাপ তাহারও খণ্ডন তিথিবিশেষে গঙ্গাস্নানে তীর্থযাত্রায়।

অনাচার আচারের ত্রুটি এবং ধর্মনিয়মের লঙ্ঘনকে একত্র মিশ্রিত করিয়া আমরা এমনই একটি ঘোরতর জড়বাদ, এমনই নিগূঢ় নাস্তিকতায় উপনীত হইয়াছি।

ভক্তিরাজ্যেও সেইরূপ মিশ্রণ ঘটাইয়া আমরা ভক্তির আধ্যাত্মিকতা নষ্ট করিয়াছি। সেইজন্যই আমরা বরঞ্চ সাধু শূদ্রকে ভক্তি করি না, কিন্তু অসাধু ব্রাহ্মণকে ভক্তি করি। আমরা প্রভাতসূর্যালোকিত হিমাদ্রিশিখরের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া চলিয়া যাইতে পারি কিন্তু সিন্দূরলিপ্ত উপলখণ্ডকে উপেক্ষা করিতে পারি না।

সত্য এবং শাস্ত্রের মধ্যেও আমরা এইরূপ একটা জটা পাকাইয়াছি। সমুদ্রযাত্রা উচিত কি না তাহা নির্ণয় করিতে ইহাই দেখা কর্তব্য যে, নূতন দেশ ও নূতন আচার ব্যবহার দেখিয়া আমাদের জ্ঞানের বিস্তার হয় কি না, আমাদের সংকীর্ণতা দূর হয় কি না, ভূখণ্ডের একটি ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে কোনো জ্ঞানপিপাসু উন্নতি-ইচ্ছুক ব্যক্তিকে

বলপূর্বক বদ্ধ করিয়া রাখিবার ন্যায্য অধিকার কাহারও আছে কি না। কিন্তু তাহা না দেখিয়া আমরা দেখিব, পরাশর সমুদ্র পার হইতে বলিয়াছেন কি না এবং অত্রি কী বলিয়া তাহার সমর্থন করিয়াছেন।

বালবিধবাকে চিরকুমারী করিয়া রাখা ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে নিদারুণ ও সমাজের পক্ষে বিপজ্জনক কি না ইহা আমাদের দ্রষ্টব্য বিষয় নহে কিন্তু বহু প্রাচীনকালে সমাজের শিক্ষা আচার ও অবস্থার একান্ত পার্থক্যের সময় কোন্ বিধানকর্তা কী বলিয়াছেন তাহাই আলোচ্য।

এমন বিপরীত বিকৃতি কেন ঘটিল। ইহার প্রধান কারণ এই যে, স্বাধীনতাতেই যে-সমস্ত প্রবৃত্তির প্রধান গৌরব তাহাদিগকেই বন্ধনে বদ্ধ করা হইয়াছে।

অভ্যাস বা পরের নির্দেশবশত নহে, পরন্তু স্বাধীন বোধশক্তি যোগে ভক্তিবলে আমরা মহত্ত্বের নিকট আত্মসমর্পণ করি, তাহাই সার্থক ভক্তি।

কিন্তু আশঙ্কা এই যে, যদি বোধশক্তি তোমার না থাকে। অতএব নিয়ম বাঁধিয়া দেওয়া গেল, অমুক সম্প্রদায়কে এই প্রণালীতে ভক্তি করিতেই হইবে। না করিলে সাংসারিক ক্ষতি ও পুরুষানুক্রমে নরকবাস।

যে-ভক্তি স্বাধীন হৃদয়ের তাহাকে মৃত শাস্ত্রে রাখা হইল; যে-ভক্তির প্রকৃত লাভ-ক্ষতি আমাদের অন্তঃকরণে আমাদের অন্তরাত্মায় তাহা সংসারের খাতায় ও চিত্রগুপ্তের কাল্পনিক খতিয়ানে লিখিত হইল।

গাছ মাটিতে রোপণ করিলে তাহাকে গোরুতে খাইতে পারে, তাহাকে পথিকে দলন করিতে পারে, এই ভয়ে তাহাকে লোহার সিন্দুকে বদ্ধ রাখা হইল। সেখানে সে নিরাপদে রহিল, কিন্তু তাহাতে ফল ধরিল না; সজীব গাছ মৃত কাষ্ঠ হইয়া গেল।

মানুষের বুদ্ধিকে যতক্ষণ স্বাধীনতা না দেওয়া যায় ততক্ষণ সে ব্যর্থ কিন্তু যদি সে ভুল করে, অতএব তাহাকে বাঁধো; আমি বুদ্ধিমান যে-ঘানিগাছ রোপণ করিলাম চোখে ঠুলি দিয়া সেইটেকে সে নিত্যকাল প্রদক্ষিণ করিতে থাক্। স্বাস্থ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে তাহাকে কোনোদিন মাথা ঘুরাইতে হইবে না— আমি ঠিক করিয়া দিলাম কোন্ তিথিতে মুলা খাইলে তাহার নরক এবং চিঁড়া খাইলে তাহার অক্ষয় ফল। তোমার মুলা ছাড়িয়া চিঁড়া খাইয়া তাহার কী উপকার হইল তাহার কোনো প্রমাণ নাই, কিন্তু যাহা অপকার হইল ইতিহাসে তাহা উত্তরোত্তর পুঞ্জীকৃত হইয়া উঠিতেছে।

একটি সামান্য উদাহরণ এখানে উল্লেখযোগ্য। আমাদের দেশে যাহারা রেশম-

কীটের চাষ করে তাহাদের মধ্যে একটা প্রবাদ আছে যে, নিরামিষ আহার, নিয়ম পালন ও গঙ্গাজল প্রভৃতি দ্বারা নিজেকে সর্বদা পবিত্র না রাখিলে রেশমব্যবসায়ীর সাংসারিক অমঙ্গল ঘটে।

শিক্ষিত ব্যক্তিরা বলিয়া উঠিবেন, পাছে মলিনতা দ্বারা রেশমকীটের মধ্যে সংক্রামক রোগবীজ প্রবেশ করিয়া ফসল নষ্ট হয় এইজন্য বুদ্ধিমান কর্তৃক এইরূপ প্রবাদ প্রচারিত হইয়াছে। কিন্তু চাষাকে প্রকৃত তত্ত্ব না বুঝাইয়া দিয়া তাহার বুদ্ধিকে চিরকালের মতো অন্ধ করিয়া পরিণামে বিষময় ফল হয়। চাষা অনির্দিষ্ট অমঙ্গল আশঙ্কায় নিজে নিয়ম পালন করে কিন্তু কীটদের সম্বন্ধে নিয়ম রক্ষা করে না,—স্নান-পানাদির দ্বারা নিজে পবিত্র থাকে কিন্তু কীটের ঘরে এক পাতায় তিন দিন চলিতেছে, মলিনতা সঞ্চিত হইতেছে তাহাতে দৃষ্টি নাই।

শোয়া বসা চলা ফিরা কোনো ক্ষুদ্র বিষয়েই যাহাকে স্বাধীন বুদ্ধি চালনা ও নিজের শুভাশুভ বিচার করিতে হয় না তাহার কাছে অন্য বৈজ্ঞানিক সত্য বুঝাইতে গিয়া মাথায় করাঘাত করিয়া ফিরিয়া আসিতে হয়।

এইরূপে নীতি, ভক্তি ও বুদ্ধি— স্বাধীনতাতেই যাহার বল, যাহার জীবন, স্বাধীনতাতেই যাহার যথার্থ স্বরূপ রক্ষিত ও বিকশিত হয়, তাহাদিগকে সর্বপ্রকার স্বাভাবিক আপদ হইতে রক্ষা করিবার জন্য সযত্নে মৃত্যু ও বিকৃতির মধ্যে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। ইহাতে আমাদের মানসিক প্রকৃতির এমনই নিদারুণ জড়ত্ব জন্মিয়াছে যে, যাহাকে আমরা জ্ঞানে জানি ভক্তির অযোগ্য তাহাকেও প্রথার অভ্যাসে ভক্তি করিতে সংকোচমাত্র অনুভব করি না।

১৩০৫

পূর্ব ও পশ্চিম

ভারতবর্ষের ইতিহাস কাহাদের ইতিহাস।

একদিন যে শ্বেতকায় আর্যগণ প্রকৃতির এবং মানুষের সমস্ত দুরূহ বাধা ভেদ করিয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিলেন, যে অন্ধকারময় সুবিস্তীর্ণ অরণ্য এই বৃহৎ দেশকে আচ্ছন্ন করিয়া পূর্বে পশ্চিমে প্রসারিত ছিল তাহাকে একটা নিবিড় যবনিকার মতো সরাইয়া দিয়া ফলশস্যে-বিচিত্র আলোকময় উন্মুক্ত রঙ্গভূমি উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিলেন, তাঁহাদের বুদ্ধি শক্তি ও সাধনা একদিন এই ইতিহাসের ভিত্তিরচনা করিয়াছিল। কিন্তু, এ কথা তাঁহারা বলিতে পারেন নাই যে, ভারতবর্ষ আমাদেরই ভারতবর্ষ।

আর্যরা অনার্যদের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছিলেন। প্রথম যুগে আর্যদের প্রভাব যখন অক্ষুন্ন ছিল, তখনও অনার্য শূদ্রদের সহিত তাঁহাদের প্রতিলোম বিবাহ চলিতেছিল। তার পর বৌদ্ধযুগে এই মিশ্রণ আরও অবাধ হইয়া উঠিয়াছিল। এই যুগের অবসানে যখন হিন্দুসমাজ আপনার বেড়াগুলি পুনঃসংস্কার করিতে প্রবৃত্ত হইল এবং খুব শক্ত পাথর দিয়া আপন প্রাচীর পাকা করিয়া গাঁথিতে চাহিল, তখন দেশের অনেকস্থলে এমন অবস্থা ঘটিয়াছিল যে, ক্রিয়াকর্ম পালন করিবার জন্য বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন হইয়াছিল; অনেক স্থলে ভিন্নদেশ হইতে ব্রাহ্মণ আমন্ত্রণ করিয়া আনিতে হইয়াছে, এবং অনেক স্থলে রাজাজ্ঞায় উপবীত পরাইয়া ব্রাহ্মণ রচনা করিতে হইয়াছে, এ কথা প্রসিদ্ধ। বর্ণের যে-শুভ্রতা লইয়া একদিন আর্যরা গৌরব বোধ করিয়াছিলেন সে-শুভ্রতা মলিন হইয়াছে; এবং আর্যগণ শূদ্রদের সহিত মিশ্রিত হইয়া তাহাদের বিবিধ আচার ও ধর্ম, দেবতা ও পূজাপ্রণালী গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে সমাজের অন্তর্গত করিয়া লইয়া হিন্দুসমাজ বলিয়া এক সমাজ রচিত হইয়াছে; বৈদিক সমাজের সহিত কেবল যে তাহার ঐক্য নাই তাহা নহে অনেক বিরোধও আছে।

অতীতের সেই পর্বেই কি ভারতবর্ষের ইতিহাস দাঁড়ি টানিতে পারিয়াছে। বিধাতা কি তাহাকে এ কথা বলিতে দিয়াছেন যে, ভারতবর্ষের ইতিহাস হিন্দুর ইতিহাস। হিন্দুর ভারতবর্ষে যখন রাজপুত রাজারা পরস্পর মারামারি কাটাকাটি করিয়া বীরত্বের আত্মঘাতী অভিমান প্রচার করিতেছিলেন, সেই সময়ে ভারতবর্ষের সেই বিচ্ছিন্নতার ফাঁক দিয়া মুসলমান এ দেশে প্রবেশ করিল, চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িল এবং পুরুষানুক্রমে জন্মিয়া ও মরিয়া এ দেশের মাটিকে আপন করিয়া লইল।

যদি এইখানেই ছেদ দিয়া বলি, বাস্, আর নয়— ভারতবর্ষের ইতিহাসকে আমরা হিন্দুমুসলমানেরই ইতিহাস করিয়া তুলিব, তবে, যে-বিশ্বকর্মা মানবসমাজকে সংকীর্ণ কেন্দ্র হইতে ক্রমশই বৃহৎ পরিধির দিকে গড়িয়া তুলিতেছেন, তিনি কি তাঁহার প্ল্যান বদলাইয়া আমাদেরই অহংকারকে সার্থক করিয়া তুলিবেন।

ভারতবর্ষ আমার হইবে কি তোমার হইবে, হিন্দুর হইবে কি মুসলমানের হইবে, কি আর কোনো জাত আসিয়া এখানে আধিপত্য করিবে, বিধাতার দরবারে যে সেই কথাটাই সবচেয়ে বড়ো করিয়া আলোচিত হইতেছে, তাহা নহে। তাঁহার আদালতে নানা পক্ষের উকিল নানা পক্ষের দরখাস্ত লইয়া লড়াই করিতেছে, অবশেষে একদিন মকদ্দমা শেষ হইলে পর হয় হিন্দু নয় মুসলমান নয় ইংরেজ নয় আর-কোনো জাতি চূড়ান্ত ডিক্রি পাইয়া নিশান-গাড়ি করিয়া বসিবে, এ কথা সত্য নহে। আমরা মনে করি জগতে স্বত্বের লড়াই চলিতেছে, সেটা আমাদের অহংকার; লড়াই যা সে সত্যের লড়াই।

যাহা সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, যাহা সকলের চেয়ে পূর্ণ, যাহা চরম সত্য, তাহা সকলকে লইয়া; এবং তাহাই নানা আঘাত-সংঘাতের মধ্য দিয়া হইয়া উঠিবার দিকে চলিয়াছে,— আমাদের সমস্ত ইচ্ছা দিয়া তাহাকেই আমরা যে-পরিমাণে অগ্রসর করিতে চেষ্টা করিব, সেই পরিমাণেই আমাদের চেষ্টা সার্থক হইবে; নিজেকেই— ব্যক্তি হিসাবেই হউক আর জাতি হিসাবেই হউক— জয়ী করিবার যে চেষ্টা, বিশ্ববিধানের মধ্যে তাহার গুরুত্ব কিছুই নাই। গ্রীসের জয়পতাকা আলেকজাণ্ডারকে আশ্রয় করিয়া সমস্ত পৃথিবীকে যে একচ্ছত্র করিতে পারে নাই, তাহাতে গ্রীসের দম্ভই অকৃতার্থ হইয়াছে; পৃথিবীতে আজ সে-দম্ভের মূল্য কী। রোমের বিশ্বসাম্রাজ্যের আয়োজন বর্বরের সংঘাতে ফাটিয়া খান্‌খান্ হইয়া সমস্ত য়ুরোপময় যে বিকীর্ণ হইল, তাহাতে রোমকের অহংকার অসম্পূর্ণ হইয়াছে; কিন্তু সেই ক্ষতি লইয়া জগতে আজ কে বিলাপ করিবে। গ্রীস এবং রোম মহাকালের সোনার তরীতে নিজের পাকা ফসল সমস্তই বোঝাই করিয়া দিয়াছে; কিন্তু তাহারা নিজেরাও সেই তরণীর স্থান আশ্রয় করিয়া আজ পর্যন্ত যে বসিয়া নাই, তাহাতে কালের অনাবশ্যক ভার লাঘব করিয়াছে মাত্র, কোনো ক্ষতি করে নাই।

ভারতবর্ষেও যে-ইতিহাস গঠিত হইয়া উঠিতেছে এ-ইতিহাসের শেষ তাৎপর্য এ নয় যে, এ দেশে হিন্দুই বড়ো হইবে বা আর কেহ বড়ো হইবে। ভারতবর্ষে মানবের ইতিহাস একটি বিশেষ সার্থকতার মূর্তি পরিগ্রহ করিবে, পরিপূর্ণতাকে একটি অপূর্ব আকার দান করিয়া তাহাকে সমস্ত মানবের সামগ্রী করিয়া তুলিবে;— ইহা অপেক্ষা

কোনো ক্ষুদ্র অভিপ্রায় ভারতবর্ষের ইতিহাসে নাই। এই পরিপূর্ণতার প্রতিমা গঠনে হিন্দু মুসলমান বা ইংরেজ যদি নিজের বর্তমান বিশেষ আকারটিকে একেবারে বিলুপ্ত করিয়া দেয়, তাহাতে স্বাজাতিক অভিমানের অপমৃত্যু ঘটিতে পারে, কিন্তু সত্যের বা মঙ্গলের অপচয় হয় না।

আমরা বৃহৎ ভারতবর্ষকে গড়িয়া তুলিবার জন্য আছি। আমরা তাহার একটা উপকরণ। কিন্তু উপকরণ যদি এই বলিয়া বিদ্রোহ প্রকাশ করিতে থাকে যে, আমরাই চরম, আমরা সমগ্রের সহিত মিলিব না, আমরা স্বতন্ত্র থাকিব, তবে সকল হিসাবেই ব্যর্থ হয়। বিরাট রচনার সহিত যে-খণ্ড সামগ্রী কোনোমতেই মিশ খাইবে না, যে বলিবে আমিই টিঁকিতে চাই, সে একদিন বাদ পড়িয়া যাইবে। যে বলিবে আমি স্বয়ং কিছুই নই, যে-সমগ্র রচিত হইতেছে তাহারই উদ্দেশে আমি সম্পূর্ণভাবে উৎসৃষ্ট, ক্ষুদ্রকে সে-ই ত্যাগ করিয়া বৃহতের মধ্যে রক্ষিত হইবে। ভারতবর্ষেরও যে-অংশ সমস্তের সহিত মিলিতে চাহিবে না, যাহা কোনো-একটা বিশেষ অতীত কালের অন্তরালের মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া অন্য-সকল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিতে চাহিবে, যে আপনার চারি দিকে কেবল বাধা রচনা করিয়া তুলিবে, ভারত-ইতিহাসের বিধাতা তাহাকে আঘাতের পর আঘাতে হয় পরম দুঃখে সকলের সঙ্গে সমান করিয়া দিবেন, নয় তাহাকে অনাবশ্যক ব্যাঘাত বলিয়া একেবারে বর্জন করিবেন। কারণ ভারতবর্ষের ইতিহাস আমাদেরই ইতিহাস নহে, আমরাই ভারতবর্ষের ইতিহাসের জন্য সমাহৃত; আমরা নিজেকে যদি তাহার যোগ্য না করি, তবে আমরাই নষ্ট হইব। আমরা সর্বপ্রকারের সকলের সংস্রব বাঁচাইয়া অতি বিশুদ্ধভাবে স্বতন্ত্র থাকিব, এই বলিয়া যদি গৌরব করি এবং যদি মনে করি এই গৌরবকেই আমাদের বংশপরম্পরায় চিরন্তন করিয়া রাখিবার ভার আমাদের ইতিহাস গ্রহণ করিয়াছে, যদি মনে করি আমাদের ধর্ম কেবলমাত্র আমাদেরই, আমাদের আচার বিশেষভাবে আমাদেরই, আমাদের পূজাক্ষেত্রে আর-কেহ পদার্পণ করিবে না, আমাদের জ্ঞান কেবল আমাদেরই লৌহপেটকে আবদ্ধ থাকিবে, তবে না জানিয়া আমরা এই কথাই বলি যে, বিশ্বসমাজে আমাদের মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হইয়া আছে,— এক্ষণে তাহারই জন্য আত্মরচিত কারাগারে অপেক্ষা করিতেছি।

সম্প্রতি পশ্চিম হইতে ইংরেজ আসিয়া ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটি প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে। এই ঘটনা অনাহূত আকস্মিক নহে। পশ্চিমের সংস্রব হইতে বঞ্চিত হইলে ভারতবর্ষ সম্পূর্ণতা হইতে বঞ্চিত হইত। য়ুরোপের প্রদীপের মুখে শিখা এখন জ্বলিতেছে। সেই শিখা হইতে আমাদের প্রদীপ জ্বালাইয়া লইয়া আমাদিগকে

কালের পথে আর-একবার যাত্রা করিয়া বাহির হইতে হইবে। বিশ্বজগতে আমরা যাহা পাইতে পারি, তিন হাজার বৎসর পূর্বেই আমাদের পিতামহেরা তাহা সমস্তই সঞ্চয় করিয়া চুকাইয়া দিয়াছেন, আমরা এমন হতভাগ্য নহি এবং জগৎ এত দরিদ্র নহে ; আমরা যাহা করিতে পারি, তাহা আমাদের পূর্বেই করা হইয়া গেছে, এ কথা যদি সত্য হয়, তবে জগতের কর্মক্ষেত্রে আমাদের প্রকাণ্ড অনাবশ্যকতা লইয়া আমরা তো পৃথিবীর ভার হইয়া থাকিতে পারিব না। যাহারা প্রপিতামহদের মধ্যেই নিজেকে সর্বপ্রকারে সমাপ্ত বলিয়া জানে, এবং সমস্ত বিশ্বাস এবং আচারের দ্বারা আধুনিকের সংস্পর্শ হইতে নিজেকে বাঁচাইয়া চলিতে চেষ্টা করে, তাহারা নিজেকে বাঁচাইয়া রাখিবে কোন্ বর্তমানের তাড়নায়, কোন্ ভবিষ্যতের আশ্বাসে। পৃথিবীতে আমাদেরও যে প্রয়োজন আছে, সে-প্রয়োজন আমাদের নিজের ক্ষুদ্রতার মধ্যেই বদ্ধ নহে, তাহা নিখিল মানুষের সঙ্গে জ্ঞান প্রেম কর্মের নানা পরিবর্ধমান সম্বন্ধে, নানা উদ্ভাবনে, নানা প্রবর্তনায় জাগ্রত থাকিবে ও জাগরিত করিবে ; আমাদের মধ্যে সেই উদ্যম সঞ্চার করিবার জন্য ইংরেজ জগতের যজ্ঞেশ্বরের দূতের মতো জীর্ণদ্বার ভাঙিয়া আমাদের ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। তাহাদের আগমন যে-পর্যন্ত না সফল হইবে, জগতযজ্ঞের নিমন্ত্রণে তাহাদের সঙ্গে যে-পর্যন্ত না যাত্রা করিতে পারিব, সে-পর্যন্ত তাহারা আমাদিগকে পীড়া দিবে, তাহারা আমাদিগকে আরামে নিদ্রা যাইতে দিবে না।

ইংরেজের আহ্বান যে-পর্যন্ত আমরা গ্রহণ না করিব, তাহাদের সঙ্গে মিলন যে-পর্যন্ত না সার্থক হইবে, সে-পর্যন্ত তাহাদিগকে বলপূর্বক বিদায় করিব, এমন শক্তি আমাদের নাই। যে-ভারতবর্ষ অতীতে অঙ্কুরিত হইয়া ভবিষ্যতের অভিমুখে উদ্ভিন্ন হইয়া উঠিতেছে, ইংরেজ সেই ভারতের জন্য প্রেরিত হইয়া আসিয়াছে। সেই ভারতবর্ষ সমস্ত মানুষের ভারতবর্ষ — আমরা সেই ভারতবর্ষ হইতে অসময়ে ইংরেজকে দূর করিব, আমাদের এমন কী অধিকার আছে। বৃহৎ ভারতবর্ষের আমরা কে। এ কি আমাদেরই ভারতবর্ষ। সেই আমরা কাহারা। সে কি বাঙালি, না মারাঠি, না পাঞ্জাবি, হিন্দু না মুসলমান ? একদিন যাহারা সম্পূর্ণ সত্যের সহিত বলিতে পারিবে, আমরাই ভারতবর্ষ, আমরাই ভারতবাসী— সেই অখণ্ড প্রকাণ্ড আমরা'র মধ্যে যে-কেহই মিলিত হউক, তাহার মধ্যে হিন্দু মুসলমান ইংরেজ অথবা আরও যে-কেহ আসিয়াই এক হউক না, তাহারাই হুকুম করিবার অধিকার পাইবে এখানে কে থাকিবে আর কে না থাকিবে।

ইংরেজের সঙ্গে আমাদের মিলন সার্থক করিতে হইবে। মহাভারতবর্ষ গঠন ব্যাপারে এই ভার আজ আমাদের উপরে পড়িয়াছে। বিমুখ হইব, বিচ্ছিন্ন হইব,

কিছুই গ্রহণ করিব না, এ কথা বলিয়া আমরা কালের বিধানকে ঠেকাইতে পারিব না, ভারতের ইতিহাসকে দরিদ্র ও বঞ্চিত করিতে পারিব না।

অধুনাতন কালে দেশের মধ্যে যাঁহারা সকলের চেয়ে বড়ো মনীষী, তাঁহারা পশ্চিমের সঙ্গে পূর্বকে মিলাইয়া লইবার কাজেই জীবনযাপন করিয়াছেন। তাহার দৃষ্টান্ত রামমোহন রায়। তিনি মনুষ্যত্বের ভিত্তির উপরে ভারতবর্ষকে সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে মিলিত করিবার জন্য একদিন একাকী দাঁড়াইয়াছিলেন। কোনো প্রথা কোনো সংস্কার তাঁহার দৃষ্টিকে অবরুদ্ধ করিতে পারে নাই। আশ্চর্য উদার হৃদয় ও উদার বুদ্ধির দ্বারা তিনি পূর্বকে পরিত্যাগ না করিয়া পশ্চিমকে গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন। তিনিই একলা সকল দিকেই নব্যবঙ্গের পত্তন করিয়া গিয়াছিলেন। এইরূপে তিনিই স্বদেশের লোকের সকল বিরোধ স্বীকার করিয়া আমাদের জ্ঞানের ও কর্মের ক্ষেত্রকে পূর্ব হইতে পশ্চিমের দিকে প্রশস্ত করিয়া দিয়াছেন; আমাদিগকে মানবের চিরন্তন অধিকার, সত্যের অবাধ অধিকার দান করিয়াছেন; আমাদিগকে জানিতে দিয়াছেন আমরা সমস্ত পৃথিবীর; আমাদেরই জন্য বুদ্ধ খৃষ্ট মহম্মদ জীবন গ্রহণ ও জীবন দান করিয়াছেন। ভারতবর্ষের ঋষিদের সাধনার ফল আমাদের প্রত্যেকের জন্যই সঞ্চিত হইয়াছে; পৃথিবীর যে-দেশেই যে-কেহ জ্ঞানের বাধা দূর করিয়াছেন, জড়ত্বের শৃঙ্খল মোচন করিয়া মানুষের আবদ্ধ শক্তিকে মুক্তি দিয়াছেন, তিনি আমাদেরই আপন, তাঁহাকে লইয়া আমরা প্রত্যেকে ধন্য। রামমোহন রায় ভারতবর্ষের চিত্তকে সংকুচিত ও প্রাচীরবদ্ধ করেন নাই, তাহাকে দেশে ও কালে প্রসারিত করিয়াছেন, ভারতবর্ষ ও য়ুরোপের মধ্যে তিনি সেতু স্থাপন করিয়াছেন; এই কারণেই ভারতবর্ষের সৃষ্টিকার্যে আজও তিনি শক্তিরূপে বিরাজ করিতেছেন। কোনো অন্ধ অভ্যাস কোনো ক্ষুদ্র অহংকারবশত মহাকালের অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে মূঢ়ের মতো তিনি বিদ্রোহ করেন নাই; যে-অভিপ্রায় কেবল অতীতের মধ্যে নিঃশেষিত নহে, যাহা ভবিষ্যতের দিকে উদ্যত, তাহারই জয়পতাকা সমস্ত বিঘ্নের বিরুদ্ধে বীরের মতো বহন করিয়াছেন।

দক্ষিণ ভারতে রানাডে পূর্ব পশ্চিমের সেতুবন্ধনকার্যে জীবন যাপন করিয়াছেন। যাহা মানুষকে বাঁধে, সমাজকে গড়ে, অসামঞ্জস্যকে দূর করে, জ্ঞান প্রেম ও ইচ্ছাশক্তির বাধাগুলিকে নিরস্ত করে, সেই সৃজনশক্তি সেই মিলনতত্ত্ব রানাডের প্রকৃতির মধ্যে ছিল; সেইজন্য ভারতবাসী ও ইংরেজের মধ্যে নানাপ্রকার ব্যবহারবিরোধ ও স্বার্থ-সংঘাত সত্ত্বেও তিনি সমস্ত সাময়িক ক্ষোভ ক্ষুদ্রতার ঊর্ধ্বে উঠিতে পারিয়াছিলেন। ভারত-ইতিহাসের যে-উপকরণ ইংরেজের মধ্যে আছে, তাহা গ্রহণের পথ যাহাতে বিস্তৃত হয়, যাহাতে ভারতবর্ষের সম্পূর্ণতাসাধনের কোনো ব্যাঘাত না ঘটে, তাঁহার প্রশস্ত হৃদয় ও উদার বুদ্ধি সেই চেষ্টায় চিরদিন প্রবৃত্ত ছিল।

অল্পদিন পূর্বে বাংলাদেশে যে-মহাত্মার মৃত্যু হইয়াছে, সেই বিবেকানন্দও পূর্ব ও পশ্চিমকে দক্ষিণে ও বামে রাখিয়া মাঝখানে দাঁড়াইতে পারিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসের মধ্যে পাশ্চাত্যকে অস্বীকার করিয়া ভারতবর্ষকে সংকীর্ণ সংস্কারের মধ্যে চিরকালের জন্য সংকুচিত করা তাঁহার জীবনের উপদেশ নহে। গ্রহণ করিবার, মিলন করিবার, সৃজন করিবার প্রতিভাই তাঁহার ছিল। তিনি ভারতবর্ষের সাধনাকে পশ্চিমে ও পশ্চিমের সাধনাকে ভারতবর্ষে দিবার ও লইবার পথ রচনার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

একদিন বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনে যে দিন অকস্মাৎ পূর্বপশ্চিমের মিলনযজ্ঞ আহ্বান করিলেন, সেইদিন হইতে বঙ্গসাহিত্যে অমরতার আবাহন হইল; সেইদিন হইতে বঙ্গসাহিত্য মহাকালের অভিপ্রায়ে যোগদান করিয়া সার্থকতার পথে দাঁড়াইল। বঙ্গসাহিত্য যে দেখিতে দেখিতে এমন বৃদ্ধিলাভ করিয়া উঠিতেছে, তাহার কারণ এ-সাহিত্য সেই-সকল কৃত্রিম বন্ধন ছেদন করিয়াছে যাহাতে বিশ্বসাহিত্যের সহিত ইহার ঐক্যের পথ বাধাগ্রস্ত হয়। ইহা ক্রমশই এমন করিয়া রচিত হইয়া উঠিয়াছে, যাহাতে পশ্চিমের জ্ঞান ও ভাব ইহা সহজে আপনারই করিয়া গ্রহণ করিতে পারে। বঙ্কিম যাহা রচনা করিয়াছেন কেবল তাহার জন্যই যে তিনি বড়ো তাহা নহে, তিনিই বাংলা-সাহিত্যে পূর্ব-পশ্চিমের আদানপ্রদানের রাজপথকে প্রতিভাবলে ভালো করিয়া মিলাইয়া দিতে পারিয়াছেন। এই মিলনতত্ত্ব বাংলাসাহিত্যের মাঝখানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ইহার সৃষ্টিশক্তিকে জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছে।

এমনি করিয়া আমরা যে দিক হইতে দেখিব, দেখিতে পাইব আধুনিক ভারতবর্ষে যাঁহাদের মধ্যে মানবের মহত্ত্ব প্রকাশ পাইবে, যাঁহারা নবযুগ প্রবর্তন করিবেন, তাঁহাদের প্রকৃতিতে এমন একটি স্বাভাবিক ঔদার্য থাকিবে যাহাতে পূর্ব ও পশ্চিম তাঁহাদের জীবনে বিরুদ্ধ ও পীড়িত হইবে না, পূর্ব ও পশ্চিম তাঁহাদের মধ্যে একত্রে সফলতা লাভ করিবে।

শিক্ষিতসম্প্রদায়ের মধ্যে আজ আমরা অনেকেই মনে করি যে, ভারতবর্ষে আমরা নানাজাতি যে একত্রে মিলিত হইবার চেষ্টা করিতেছি, ইহার উদ্দেশ্য পোলিটিকাল বল লাভ করা। এমন করিয়া যে-জিনিসটা বড়ো তাহাকে আমরা ছোটোর দাস করিয়া দেখিতেছি। ভারতবর্ষে আমরা সকল মানুষে মিলিব, ইহা অন্য সকল উদ্দেশ্যের চেয়ে বড়ো, কারণ ইহা মনুষ্যত্ব। মিলিতে যে পারিতেছি না ইহাতে আমাদের মনুষ্যত্বের মূলনীতি ক্ষুণ্ণ হইতেছে, সুতরাং সর্বপ্রকার শক্তিই ক্ষীণ হইয়া সর্বত্রই বাধা পাইতেছে; ইহা আমাদের পাপ, ইহাতে আমাদের ধর্ম নষ্ট হইতেছে বলিয়া সকলই নষ্ট হইতেছে।

সেই ধর্মবুদ্ধি হইতে এই মিলনচেষ্টাকে দেখিলে তবেই এই চেষ্টা সার্থক হইবে। কিন্তু ধর্মবুদ্ধি তো কোনো ক্ষুদ্র অহংকার বা প্রয়োজনের মধ্যে বদ্ধ নহে। সেই বুদ্ধির অনুগত হইলে আমাদের মিলনচেষ্টা কেবল যে ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন ক্ষুদ্রজাতির মধ্যেই বদ্ধ হইবে তাহা নহে, এই চেষ্টা ইংরেজকেও ভারতবর্ষের করিয়া লইবার জন্য নিয়ত নিযুক্ত হইবে।

সম্প্রতি ইংরেজের সঙ্গে ভারতবর্ষের শিক্ষিত, এমন-কি অশিক্ষিত সাধারণের মধ্যেও যে বিরোধ জন্মিয়াছে, তাহাকে আমরা কী ভাবে গ্রহণ করিব। তাহার মধ্যে কি কোনো সত্য নাই। কেবল তাহা কয়েকজন চক্রান্তকারীর ইন্দ্রজাল মাত্র? ভারতবর্ষের মহাক্ষেত্রে যে নানা জাতি ও নানা শক্তির সমাগম হইয়াছে, ইহাদের সংঘাতে সম্মিলনে যে-ইতিহাস গঠিত হইয়া উঠিতেছে বর্তমান বিরোধের আবর্ত কি একেবারেই তাহার প্রতিকূল। এই বিরোধের তাৎপর্য কী তাহা আমাদিগকে বুঝিতে হইবে।

আমাদের দেশে ভক্তিতত্ত্বে বিরোধকেও মিলনসাধনার একটা অঙ্গ বলা হয়। লোকে প্রসিদ্ধি আছে যে, রাবণ ভগবানের শত্রুতা করিয়া মুক্তিলাভ করিয়াছিল। ইহার অর্থ এই যে, সত্যের নিকট পরাস্ত হইলে নিবিড়ভাবে সত্যের উপলব্ধি হইয়া থাকে। সত্যকে অবিরোধে অসংশয়ে সহজে গ্রহণ করিলে তাহাকে সম্পূর্ণ গ্রহণ করা হয় না। এইজন্য সন্দেহ এবং প্রতিবাদের সঙ্গে অত্যন্ত কঠোরভাবে লড়াই করিয়া তবেই বৈজ্ঞানিকতত্ত্ব প্রতিষ্ঠালাভ করে।

আমরা একদিন মুগ্ধভাবে জড়ভাবে য়ুরোপের কাছে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলাম; আমাদের বিচারবুদ্ধি একেবারে অভিভূত হইয়া গিয়াছিল; এমন করিয়া যথার্থভাবে লাভ করা যায় না। জ্ঞানই বলো আর রাষ্ট্রীয় অধিকারই বলো, তাহা উপার্জনের অপেক্ষা রাখে, অর্থাৎ বিরোধ ও ব্যাঘাতের ভিতর দিয়া আত্মশক্তির দ্বারা লাভ করিলেই তবে তাহার উপলব্ধি ঘটে; কেহ তাহা আমাদের হাতে তুলিয়া দিলে তাহা আমাদের হস্তগত হয় না। যে-ভাবে গ্রহণে আমাদের অবমাননা হয়, সে-ভাবে গ্রহণ করিলে ক্ষতিই হইতে থাকে।

এইজন্যই কিছুদিন হইতে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও ভাবের বিরুদ্ধে আমাদের মনে একটা বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে। একটা আত্মাভিমান জন্মিয়া আমাদিগকে ধাক্কা দিয়া নিজের দিকে ঠেলিয়া দিতেছে।

যে-মহাকালের অভিপ্রায়ের কথা বলিয়াছি, সেই অভিপ্রায়ের অনুগত হইয়াই এই আত্মাভিমানের প্রয়োজন ঘটিয়াছিল। আমরা নির্বিচারে নির্বিরোধে দুর্বলভাবে

দীনভাবে যাহা লইতেছিলাম, তাহা যাচাই করিয়া তাহার মূল্য বুঝিয়া তাহাকে আপন করিতে পারিতেছিলাম না, তাহা বাহিরের জিনিস পোশাকী জিনিস হইয়া উঠিতেছিল বলিয়াই আমাদের মধ্যে একটা পশ্চাদ্বর্তনের তাড়না আসিয়াছে।

রামমোহন রায় যে পশ্চিমের ভাবকে আত্মসাৎ করিতে পারিয়াছিলেন, তাহার প্রধান কারণ পশ্চিম তাঁহাকে অভিভূত করে নাই; তাঁহার আপনার দিকে দুর্বলতা ছিল না। তিনি নিজের প্রতিষ্ঠাভূমির উপরে দাঁড়াইয়া বাহিরের সামগ্রী আহরণ করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের ঐশ্বর্য কোথায় তাহা তাঁহার অগোচর ছিল না, এবং তাহাকে তিনি নিজস্ব করিয়া লইয়াছিলেন; এইজন্যই যেখান হইতে যাহা পাইয়াছেন, তাহা বিচার করিবার নিক্তি ও মানদণ্ড তাঁহার হাতে ছিল; কোনো মূল্য না বুঝিয়া তিনি মুগ্ধের মতো আপনাকে বিকাইয়া দিয়া অঞ্জলিপূরণ করেন নাই।

যে-শক্তি নব্যভারতের আদি-অধিনায়কের প্রকৃতির মধ্যে সহজেই ছিল, আমাদের মধ্যে তাহা নানা ঘাতপ্রতিঘাতে ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়া অভিব্যক্ত হইবার চেষ্টা করিতেছে। এই কারণে সেই চেষ্টা পর্যায়ক্রমে বিপরীত সীমার চূড়ান্তে গিয়া ঠেকিতেছে। একান্ত অভিমুখতা এবং একান্ত বিমুখতায় আমাদের গতিকে আঘাত করিতে করিতে আমাদিগকে লক্ষ্যপথে লইয়া চলিয়াছে।

বর্তমানে ইংরেজ ভারতবাসীর যে-বিরোধ জাগিয়া উঠিয়াছে তাহার একটা কারণ এই প্রতিক্রিয়ার প্রভাব; ইংরেজের জ্ঞান ও শক্তিকে ক্রমাগত নিশ্চেষ্টভাবে মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিতে করিতে আমাদের অন্তরাত্মা পীড়িত হইয়া উঠিতেছিল। সেই পীড়ার মাত্রা অলক্ষিতভাবে জমিতে জমিতে আজ হঠাৎ দেশের অন্তঃকরণ প্রবলবেগে বাঁকিয়া দাঁড়াইয়াছে।

কিন্তু কারণ শুধু এই একটিমাত্র নহে। ভারতবর্ষের গৃহের মধ্যে পশ্চিম আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে; তাহাকে কোনোমতেই ব্যর্থ ফিরাইয়া দিতে পারিব না, তাহাকে আপনার শক্তিতে আপনার করিয়া লইতে হইবে। আমাদের তরফে সেই আপন করিয়া লইবার আত্মশক্তির যদি অভাব ঘটে, তবে তাহাতে কালের অভিপ্রায়বেগ ব্যাঘাত পাইয়া বিপ্লব উপস্থিত করিবে। আবার অন্যপক্ষেও পশ্চিম যদি নিজেকে সত্যভাবে প্রকাশ করিতে কৃপণতা করে, তবে তাহাতেও বিক্ষোভ উপস্থিত হইবে।

ইংরেজের যাহা শ্রেষ্ঠ যাহা সত্য তাহার সহিত আমাদের যদি সংস্রব না ঘটে, ইংরেজের মধ্যে যদি প্রধানত আমরা সৈনিকের বা বণিকের পরিচয় পাই, অথবা যদি কেবল শাসনতন্ত্রচালকরূপে তাহাকে আপিসের মধ্যে যন্ত্রারূঢ় দেখিতে থাকি, যে-ক্ষেত্রে

মানুষের সঙ্গে মানুষ আত্মীয়ভাবে মিশিয়া পরস্পরকে অন্তরে গ্রহণ করিতে পারে, সে-ক্ষেত্রে যদি তাহার সঙ্গে আমাদের সংস্পর্শ না থাকে, যদি পরস্পর ব্যবহিত হইয়া পৃথক হইয়া থাকি, তবে আমরা পরস্পরের পক্ষে পরম নিরানন্দের বিষয় হইয়া উঠিবই। এরূপ স্থলে প্রবল পক্ষ সিডিশনের আইন করিয়া দুর্বল পক্ষের অসন্তোষকে লোহার শৃঙ্খল দিয়া বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতে পারে, কিন্তু তাহাতে অসন্তোষকে বাঁধিয়াই রাখা হইবে, তাহাকে দূর করা হইবে না। অথচ এই অসন্তোষ কেবল এক পক্ষের নহে। ভারতবাসীর মধ্যে ইংরেজের কোনোই আনন্দ নাই। ভারতবাসীর অস্তিত্বকে ইংরেজ ক্লেশকর বলিয়া সর্বতোভাবে পরিহার করিবারই চেষ্টা করে। একদা ডেভিড হেয়ারের মতো মহাত্মা অত্যন্ত নিকটে আসিয়া ইংরেজচরিত্রের মহত্ত্ব আমাদের হৃদয়ের সম্মুখে আনিয়া ধরিতে পারিয়াছিলেন; তখনকার ছাত্রগণ সত্যই ইংরেজজাতির নিকট হৃদয় সমর্পণ করিয়াছিল। এখন ইংরেজ অধ্যাপক স্বজাতির যাহা শ্রেষ্ঠ তাহা কেবল যে আমাদের নিকটে আনিয়া দিতে পারেন না তাহা নহে, তাঁহারা ইংরেজের আদর্শকে আমাদের কাছে খর্ব করিয়া ইংরেজের দিক হইতে বাল্যকাল হইতে আমাদের মনকে বিমুখ করিয়া দেন। তাহার ফল এই হইয়াছে, পূর্বকালের ছাত্রগণ ইংরেজের সাহিত্য ইংরেজের শিক্ষা যেমন সমস্ত মন দিয়া গ্রহণ করিত, এখনকার ছাত্ররা তাহা করে না। তাহারা গ্রাস করে, তাহারা ভোগ করে না। সেকালের ছাত্রগণ যেরূপ আন্তরিক অনুরাগের সহিত শেক্‌স্পীয়র বায়রনের কাব্যরসে চিত্তকে অভিষিক্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন, এখন তাহা দেখিতে পাই না। সাহিত্যের ভিতর দিয়া ইংরেজ জাতির সঙ্গে যে প্রেমের সম্বন্ধ সহজে ঘটিতে পারে, তাহা এখন বাধা পাইয়াছে। অধ্যাপক বলো, ম্যাজিস্ট্রেট বলো, সদাগর বলো, পুলিসের কর্তা বলো, সকল প্রকার সম্পর্কেই ইংরেজ তাহার ইংরেজি সভ্যতার চরম অভিব্যক্তির পরিচয় অবাধে আমাদের নিকট স্থাপিত করিতেছে না,— সুতরাং ভারতবর্ষে ইংরেজ-আগমনের যে-সর্বশ্রেষ্ঠ লাভ, তাহা হইতে ইংরেজ আমাদিগকে বঞ্চিত করিতেছে; আমাদের আত্মশক্তিকে বাধাগ্রস্ত এবং আত্মসম্মানকে খর্ব করিতেছে। সুশাসন এবং ভালো আইনই যে মানুষের পক্ষে সকলের চেয়ে বড়ো লাভ তাহা নহে। আপিস আদালত আইন এবং শাসন তো মানুষ নয়। মানুষ যে মানুষকে চায়,— তাহাকে যদি পায় তবে অনেক দুঃখ অনেক অভাব সহিতেও সে রাজী আছে। মানুষের পরিবর্তে বিচার এবং আইন, রুটির পরিবর্তে পাথরেরই মতো। সে-পাথর দুর্লভ এবং মূল্যবান হইতে পারে কিন্তু তাহাতে ক্ষুধা দূর হয় না।'

এইরূপে পূর্ব ও পশ্চিমের সম্যক মিলনের বাধা ঘটিতেছে বলিয়াই আজ যত কিছু

উৎপাত জাগিয়া উঠিতেছে। কাছে থাকিব অথচ মিলিব না, এ অবস্থা মানুষের পক্ষে অসহ্য এবং অনিষ্টকর। সুতরাং একদিন না একদিন ইহার প্রতিকারের চেষ্টা দুর্দম হইয়া উঠিবেই। এ বিদ্রোহ নাকি হৃদয়ের বিদ্রোহ, সেইজন্য ইহা ফলাফলের হিসাব বিচার করে না, ইহা আত্মহত্যা স্বীকার করিতেও প্রস্তুত হয়।

তৎসত্ত্বেও ইহা সত্য যে, এ-সকল বিদ্রোহ ক্ষণিক। কারণ পশ্চিমের সঙ্গে আমাদিগকে সত্যভাবেই মিলিতে হইবে, এবং তাহার যাহা-কিছু গ্রহণ করিবার তাহা গ্রহণ না করিয়া ভারতবর্ষের অব্যাহতি নাই। যতক্ষণ পর্যন্ত ফল পরিণত হইয়া না উঠিবে, ততক্ষণ তাহাকে বোঁটায় বাঁধা থাকিতে হইবেই, এবং বোঁটায় বাঁধা না থাকিলেও তাহার পরিণতি হইবে না।

এইবার একটি কথা বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব। ইংরেজের যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ, ইংরেজ তাহা যে সম্পূর্ণভাবে ভারতবর্ষে প্রকাশ করিতে পারিতেছে না, সেজন্য আমরা দায়ী আছি। আমাদের দৈন্য ঘুচাইলে তবেই তাহাদেরও কৃপণতা ঘুচিবে। বাইবেলে লিখিত আছে, যাহার আছে, তাহাকেই দেওয়া হইবে।

সকল দিকেই আমাদিগকে শক্তিশালী হইতে হইবে ; তবেই ভারতবর্ষকে ইংরেজ যাহা দিতে আসিয়াছে, তাহা দিতে পারিবে। যতদিন তাহারা আমাদিগকে অবজ্ঞা করিবে, ততদিন ইংরেজের সঙ্গে আমাদের মিলন হইতে পারিবে না। আমরা রিক্ত-হস্তে তাহাদের দ্বারে দাঁড়াইলে বার বার ফিরিয়া আসিতে হইবে।

ইংরেজের মধ্যে যাহা সকলের চেয়ে বড়ো এবং সকলের চেয়ে ভালো তাহা আরামে গ্রহণ করিবার নহে, তাহা আমাদিগকে জয় করিয়া লইতে হইবে। ইংরেজ যদি দয়া করিয়া আমাদের প্রতি ভালো হয়, তবে তাহা আমাদের পক্ষে ভালো হইবে না। আমরা মনুষ্যত্ব দ্বারা তাহার মনুষ্যত্বকে উদ্বোধিত করিয়া লইব। ইহা ছাড়া সত্যকে গ্রহণ করিবার আর কোনো সহজ পন্থা নাই। এ কথা মনে রাখিতে হইবে যে, ইংরেজের যাহা শ্রেষ্ঠ তাহা ইংরেজের কাছেও কঠিন দুঃখেই উপলব্ধ হইয়াছে, তাহা দারুণ মন্থনে মথিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহার যথার্থ সাক্ষাৎলাভ যদি করিতে চাই তবে আমাদের মধ্যেও শক্তির আবশ্যক। আমাদের মধ্যে যাহারা উপাধি বা সম্মান বা চাকরির লোভে হাত জোড় করিয়া মাথা হেঁট করিয়া ইংরেজের দরবারে উপস্থিত হয়, তাহারা ইংরেজের ক্ষুদ্রতাকেই আকর্ষণ করে, তাহারা ভারতবর্ষের নিকট ইংরেজের প্রকাশকে বিকৃত করিয়া দেয়। অন্যপক্ষে যাহারা কাণ্ডজ্ঞানবিহীন অসংযত ক্রোধের দ্বারা ইংরেজকে উন্মত্তভাবে আঘাত করিতে চায়, তাহারা ইংরেজের পাপপ্রকৃতিকেই জাগরিত করিয়া তোলে। ভারতবর্ষ অত্যন্ত অধিক পরিমাণে ইংরেজের লোভকে, ঔদ্ধত্যকে, ইংরেজের

কাপুরুষতা ও নিষ্ঠুরতাকেই উদ্বোধিত করিয়া তুলিতেছে, এ যদি সত্য হয় তবে এজন্য ইংরেজকে দোষ দিলে চলিবে না, এ অপরাধের প্রধান অংশ আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে।

স্বদেশে ইংরেজের সমাজ ইংরেজের নীচতাকে দমন করিয়া তাহার মহত্ত্বকেই উদ্দীপিত রাখিবার জন্য চারি দিক হইতে নানা চেষ্টা নিয়ত প্রয়োগ করিতে থাকে, সমস্ত সমাজের শক্তি প্রত্যেককে একটা উচ্চ ভূমিতে ধারণ করিয়া রাখিবার জন্য অশ্রান্তভাবে কাজ করে; এমনই করিয়া মোটের উপর নিজের নিকট হইতে যত দূর পর্যন্ত পূর্ণফল পাওয়া সম্ভব, ইংরেজ-সমাজ তাহা জাগিয়া থাকিয়া বলের সহিত আদায় করিয়া লইতেছে।

এ দেশে ইংরেজের প্রতি ইংরেজ-সমাজের সেই শক্তি সম্পূর্ণ বলে কাজ করিতে পারে না। এখানে ইংরেজ সমগ্র মানুষের ভাবে কোনো সমাজের সহিত যুক্ত নাই। এখানকার ইংরেজ-সমাজ হয় সিভিলিয়ান-সমাজ, নয় বণিক-সমাজ, নয় সৈনিক-সমাজ। তাঁহারা তাহাদের বিশেষ কার্যক্ষেত্রে সংকীর্ণতার দ্বারা আবদ্ধ। এই-সকল ক্ষেত্রের সংস্কারসকল সর্বদাই তাহাদের চারি দিকে কঠিন আবরণ রচনা করিতেছে, বৃহৎ মনুষ্যত্বের সংস্পর্শে সেই আবরণ ক্ষয় করিয়া ফেলিবার জন্য কোনো শক্তি তাহাদের চারি দিকে প্রবলভাবে কাজ করিতেছে না। তাহারা এ দেশের হাওয়ায় কেবল কড়া সিভিলিয়ান, পুরা সদাগর এবং ষোলো-আনা সৈনিক হইয়া পাকিয়া উঠিতে থাকে; এই কারণেই ইহাদের সংস্রবকে আমরা মানুষের সংস্রব বলিয়া অনুভব করিতে পারি না। এইজন্যই যখন কোনো সিভিলিয়ান হাইকোর্টের জজের আসনে বসে তখন আমরা হতাশ হই; কারণ তখন আমরা জানি এ লোকটির কাছ হইতে যথার্থ বিচারকের বিচার পাইব না, সিভিলিয়ানের বিচারই পাইব; সে-বিচারের ন্যায়ধর্মের সঙ্গে যেখানে সিভিলিয়ানের ধর্মের বিরোধ ঘটিবে, সেখানে সিভিলিয়ানের ধর্মই জয়ী হইবে। এই ধর্ম ইংরেজের শ্রেষ্ঠ প্রকৃতিরও বিরুদ্ধ, ভারতবর্ষেরও প্রতিকূল।

আবার যে-ভারতবর্ষের সঙ্গে ইংরেজের কারবার, সেই ভারতবর্ষের সমাজও নিজের দুর্গতি-দুর্বলতাবশতই ইংরেজের ইংরেজত্বকে উদ্বোধিত করিয়া রাখিতে পারিতেছে না; সেইজন্য যথার্থ ইংরেজ এ দেশে আসিলে ভারতবর্ষ যে-ফল পাইত সেই ফল হইতে সে বঞ্চিত হইতেছে। সেইজন্যই পশ্চিমের বণিক সৈনিক এবং আপিস আদালতের বড়ো সাহেবদের সঙ্গেই আমাদের সাক্ষাৎ ঘটে, পশ্চিমের মানুষের সঙ্গে পূর্বের মানুষের মিলন ঘটিল না। পশ্চিমের সেই মানুষ প্রকাশ পাইতেছে না বলিয়াই এ দেশে যাহা কিছু বিপ্লব বিরোধ, আমাদের যাহা কিছু দুঃখ অপমান; এবং

এই যে প্রকাশ পাইতেছে না, এমন-কি প্রকাশ বিকৃত হইয়া যাইতেছে, সেজন্য আমাদের পক্ষেও যে পাপ আছে, তাহা আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে। "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"— পরমাত্মা বলহীনের কাছে প্রকাশ পান না ; কোনো মহৎ সত্যই বলহীনের দ্বারা লভ্য নহে ; যে-ব্যক্তি দেবতাকে চায়, তাহার প্রকৃতিতে দেবতার গুণ থাকা আবশ্যক।

শক্ত কথা বলিয়া বা অকস্মাৎ দুঃসাহসিক কাজ করিয়া বল প্রকাশ হয় না। ত্যাগের দ্বারাই বলের পরিচয় ঘটে। ভারতবাসী যতক্ষণ পর্যন্ত ত্যাগশীলতার দ্বারা শ্রেয়কে বরণ করিয়া না লইবে, ভয়কে স্বার্থকে আরামকে সমগ্র দেশের হিতের জন্য ত্যাগ করিতে না পারিবে, ততক্ষণ ইংরেজের কাছে যাহা চাহিব তাহাতে ভিক্ষা চাওয়াই হইবে, এবং যাহা পাইব তাহাতে লজ্জা এবং অক্ষমতা বাড়িয়া উঠিবে। নিজের দেশকে যখন আমরা নিজের চেষ্টা নিজের ত্যাগের দ্বারা নিজের করিয়া লইব, যখন দেশের শিক্ষার জন্য স্বাস্থ্যের জন্য আমাদের সমস্ত সামর্থ্যপ্রয়োগ করিয়া দেশের সর্বপ্রকার অভাবমোচন ও উন্নতিসাধনের দ্বারা আমরা দেশের উপর আমাদের সত্য অধিকার স্থাপন করিয়া লইব, তখন দীনভাবে ইংরেজের কাছে দাঁড়াইব না। তখন ভারতবর্ষে আমরা ইংরেজরাজের সহযোগী হইব, তখন আমাদের সঙ্গে ইংরেজকে আপস করিয়া চলিতেই হইবে, তখন আমাদের পক্ষে দীনতা না থাকিলে ইংরেজের পক্ষেও হীনতা প্রকাশ হইবে না। আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত ব্যক্তিগত বা সামাজিক মূঢ়তাবশত নিজের দেশের লোকের প্রতি মনুষ্যোচিত ব্যবহার না করিতে পারিব, যতক্ষণ আমাদের দেশের জমিদার প্রজাদিগকে নিজের সম্পত্তির অঙ্গমাত্র বলিয়াই গণ্য করিবে, আমাদের দেশের প্রবল পক্ষ দুর্বলকে পদানত করিয়া রাখাই সনাতন রীতি বলিয়া জানিবে, উচ্চবর্ণ নিম্নবর্ণকে পশুর অপেক্ষা ঘৃণা করিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা ইংরেজের নিকট হইতে সদ্ব্যবহারকে প্রাপ্য বলিয়া দাবি করিতে পারিব না ; ততক্ষণ পর্যন্ত ইংরেজের প্রকৃতিকে আমরা সত্যভাবে উদ্বোধিত করিতে পারিব না, এবং ভারতবর্ষ কেবলই বঞ্চিত অপমানিত হইতে থাকিবে। ভারতবর্ষ আজ সকল দিক হইতে শাস্ত্রে ধর্মে সমাজে নিজেকেই নিজে বঞ্চনা ও অপমান করিতেছে ; নিজের আত্মাকেই সত্যের দ্বারা ত্যাগের দ্বারা উদ্বোধিত করিতেছে না, এইজন্যই অন্যের নিকট হইতে যাহা পাইবার তাহা পাইতেছে না। এইজন্যই পশ্চিমের সঙ্গে মিলন ভারতবর্ষে সম্পূর্ণ হইতেছে না, সে-মিলনে পূর্ণ ফল জন্মিতেছে না, সে-মিলনে আমরা অপমান এবং পীড়াই ভোগ করিতেছি। ইংরেজকে ছলে বলে ঠেলিয়া ফেলিয়া আমরা এই দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি পাইব না ; ইংরেজের সঙ্গে ভারতবর্ষের সংযোগ

পরিপূর্ণ হইলে, এই সংঘাতের সমস্ত প্রয়োজন সমাপ্ত হইয়া যাইবে। তখন ভারতবর্ষে দেশের সঙ্গে দেশের, জাতির সঙ্গে জাতির, জ্ঞানের সঙ্গে জ্ঞানের, চেষ্টার সঙ্গে চেষ্টার যোগসাধন হইবে; তখন বর্তমানে ভারত-ইতিহাসের যে-পর্বটা চলিতেছে, সেটা শেষ হইয়া যাইবে, এবং পৃথিবীর মহত্তর ইতিহাসের মধ্যে সে উত্তীর্ণ হইবে।

১৩১৫

শিক্ষা

শিক্ষা

শিক্ষার হেরফের

রাজসাহী অ্যাসোসিয়েশনে পঠিত

[আমাদের বঙ্গসাহিত্যে নানা অভাব আছে সন্দেহ নাই ; দর্শন বিজ্ঞান এবং বিবিধ শিক্ষণীয় বিষয় এ পর্যন্ত বঙ্গভাষায় যথেষ্ট পরিমাণে প্রকাশিত হয় নাই ; এবং সেই কারণে রীতিমত শিক্ষালাভ করিতে হইলে বিদেশীয় ভাষার সাহায্য গ্রহণ করা ব্যতীত উপায়ান্তর দেখা যায় না। কিন্তু আমার অনেক সময় মনে হয় সেজন্য আক্ষেপ পরে করিলেও চলে, আপাতত শিশুদের পাঠ্যপুস্তক দুই চারিখানি না পাইলে নিতান্ত অচল হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

বর্ণবোধ, শিশুশিক্ষা এবং নীতিপুস্তকের অভাব নাই, কিন্তু তাহাকে আমি শিশুদিগের পাঠ্যপুস্তক বলি না।

পৃথিবীর পুস্তকসাধারণকে পাঠ্যপুস্তক এবং অপাঠ্যপুস্তক, প্রধানত এই দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। টেক্‌স্‌ট বুক কমিটি হইতে যে-সকল গ্রন্থ নির্বাচিত হয় তাহাকে শেষোক্ত শ্রেণীতে গণ্য করিলে অন্যায় বিচার করা হয় না।

কেহ-বা মনে করেন আমি শুদ্ধমাত্র পরিহাস করিতেছি। কমিটি দ্বারা দেশের অনেক ভালো হইতে পারে ; তেলের কল, সুরকির কল, রাজনীতি এবং বারোয়ারি-পূজা কমিটির দ্বারা চালিত হইতে দেখা গিয়াছে, কিন্তু এ পর্যন্ত এ দেশে সাহিত্য-সম্পর্কীয় কোনো কাজ কমিটির দ্বারা সুসম্পন্ন হইতে দেখা যায় নাই। মা সরস্বতী যখন ভাগের মা হইয়া দাঁড়ান তখন তাঁহার সদ্গতি হয় না। অতএব কমিটি-নির্বাচিত গ্রন্থগুলি যখন সর্বপ্রকার সাহিত্যরসবর্জিত হইয়া দেখা দেয় তখন কাহার দোষ দিব। আখমাড়া কলের মধ্য দিয়া যে-সকল ইক্ষুদণ্ড বাহির হইয়া আসে তাহাতে কেহ রসের প্রত্যাশা করে না ; 'সুকুমারমতি' হীনবুদ্ধি শিশুরাও নহে।

অতএব, কমিটিকে একটি অবশ্যম্ভাবী অদৃষ্টবিড়ম্বনাস্বরূপ জ্ঞান করিয়া তৎসম্বন্ধে কোনো প্রসঙ্গ উত্থাপন না করিলেও সাধারণত বিদ্যালয়ে ব্যবহার্য পুস্তকগুলিকে পাঠ্যপুস্তক-শ্রেণী হইতে বহির্ভূত করা যাইতে পারে। ব্যাকরণ, অভিধান, ভূগোল-বিবরণ এবং নীতিপাঠ পৃথিবীর পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে গণ্য হইতে পারে না, তাহারা কেবলমাত্র শিক্ষাপুস্তক।]

যতটুকু অত্যাবশ্যক কেবল তাহারই মধ্যে কারারুদ্ধ হইয়া থাকা মানবজীবনের ধর্ম নহে। আমরা কিয়ৎপরিমাণে আবশ্যকশৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া থাকি এবং কিয়ৎপরিমাণ স্বাধীন। আমাদের দেহ সাড়ে তিন হাতের মধ্যে বদ্ধ, কিন্তু তাই বলিয়া ঠিক সেই সাড়ে তিন হাত পরিমাণ গৃহ নির্মাণ করিলে চলে না। স্বাধীন চলাফেরার জন্য অনেকখানি স্থান রাখা আবশ্যক, নতুবা আমাদের স্বাস্থ্য এবং আনন্দের ব্যাঘাত হয়। শিক্ষা সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। যতটুকু কেবলমাত্র শিক্ষা অর্থাৎ অত্যাবশ্যক তাহারই মধ্যে শিশুদিগকে একান্ত নিবদ্ধ রাখিলে কখনই তাহাদের মন যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িতে পারে না। অত্যাবশ্যক শিক্ষার সহিত স্বাধীন পাঠ না মিশাইলে ছেলে ভালো করিয়া মানুষ হইতে পারে না— বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেও বুদ্ধিবৃত্তি সম্বন্ধে সে অনেকটা পরিমাণে বালক থাকিয়াই যায়।

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের হাতে কিছুমাত্র সময় নাই। যত শীঘ্র পারি বিদেশীয় ভাষা শিক্ষা করিয়া পাস দিয়া কাজে প্রবিষ্ট হইতে হইবে। কাজেই শিশুকাল হইতে ঊর্ধ্বশ্বাসে দ্রুতবেগে, দক্ষিণে বামে দৃকপাত না করিয়া পড়া মুখস্থ করিয়া যাওয়া ছাড়া আর কোনো কিছুর সময় পাওয়া যায় না। সুতরাং ছেলেদের হাতে কোনো শখের বই দেখিলেই সেটা তৎক্ষণাৎ ছিনাইয়া লইতে হয়।

শখের বই জুটিবেই বা কোথা হইতে। বাংলায় সেরূপ গ্রন্থ নাই। এক রামায়ণ. মহাভারত আছে, কিন্তু ছেলেদের এমন করিয়া বাংলা শেখানো হয় না যাহাতে তাহারা আপন ইচ্ছায় ঘরে বসিয়া কোনো বাংলা কাব্যের যথার্থ স্বাদ গ্রহণ করিতে পারে। আবার দুর্ভাগারা ইংরেজিও এতটা জানে না যাহাতে ইংরেজি বাল্যগ্রন্থের মধ্যে প্রবেশ লাভ করে। বিশেষত শিশুপাঠ্য ইংরেজি গ্রন্থ এরূপ খাস ইংরেজি, তাহাতে এত ঘরের গল্প ঘরের কথা যে, বড়ো বড়ো বি. এ. এম. এ-দের পক্ষেও তাহা সকল সময় সম্পূর্ণরূপ আয়ত্তগম্য হয় না।

কাজেই বিধির বিপাকে বাঙালির ছেলের ভাগ্যে ব্যাকরণ অভিধান এবং ভূগোলবিবরণ ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। বাঙালির ছেলের মতো এমন হতভাগ্য আর কেহ নাই। অন্য দেশের ছেলেরা যে-বয়সে নবোদ্গত দন্তে আনন্দমনে ইক্ষু চর্বণ করিতেছে, বাঙালির ছেলে তখন ইস্কুলের বেঞ্চির উপর কোঁচাসমেত দুইখানি শীর্ণ খর্ব চরণ দোদুল্যমান করিয়া শুদ্ধমাত্র বেত হজম করিতেছে, মাস্টারের কটু গালি ছাড়া তাহাতে আর কোনোরূপ মসলা মিশানো নাই।

তাহার ফল হয় এই, হজমের শক্তিটা সকল দিক হইতেই হ্রাস হইয়া আসে। যথেষ্ট খেলাধুলা এবং উপযুক্ত আহারাভাবে বঙ্গসন্তানের শরীরটা যেমন অপুষ্ট থাকিয়া

যায়, মানসিক পাকযন্ত্রটাও তেমনি পরিণতি লাভ করিতে পারে না। আমরা যতই বি. এ, এম. এ পাস করিতেছি, রাশি রাশি বই গিলিতেছি, বুদ্ধিবৃত্তিটা তেমন বেশ বলিষ্ঠ এবং পরিপক্ক হইতেছে না। তেমন মুঠা করিয়া কিছু ধরিতে পারিতেছি না, তেমন আদ্যোপান্ত কিছু গড়িতে পারিতেছি না, তেমন জোরের সহিত কিছু দাঁড় করাইতে পারিতেছি না। আমাদের মতামত কথাবার্তা এবং আচার-অনুষ্ঠান ঠিক সাবালকের মতো নহে। সেইজন্য আমরা অত্যুক্তি আড়ম্বর এবং আস্ফালনের দ্বারা আমাদের মানসিক দৈন্য ঢাকিবার চেষ্টা করি।

ইহার প্রধান কারণ, বাল্যকাল হইতে আমাদের শিক্ষার সহিত আনন্দ নাই। কেবল যাহা-কিছু নিতান্ত আবশ্যক তাহাই কণ্ঠস্থ করিতেছি। তেমন করিয়া কোনোমতে কাজ চলে মাত্র, কিন্তু বিকাশলাভ হয় না। হাওয়া খাইলে পেট ভরে না, আহার করিলে পেট ভরে, কিন্তু আহারটি রীতিমত হজম করিবার জন্য হাওয়া খাওয়ার দরকার। তেমনই একটা শিক্ষাপুস্তককে রীতিমত হজম করিতে অনেকগুলি পাঠ্যপুস্তকের সাহায্য আবশ্যক। আনন্দের সহিত পড়িতে পড়িতে পড়িবার শক্তি অলক্ষিতভাবে বৃদ্ধি পাইতে থাকে; গ্রহণশক্তি ধারণাশক্তি চিন্তাশক্তি বেশ সহজে এবং স্বাভাবিক নিয়মে বললাভ করে।

কিন্তু এই মানসিকশক্তি-হ্রাসকারী নিরানন্দ শিক্ষার হাত বাঙালি কী করিয়া এড়াইবে, কিছুতেই ভাবিয়া পাওয়া যায় না।

এক তো, ইংরেজি ভাষাটা অতিমাত্রায় বিজাতীয় ভাষা। শব্দবিন্যাস পদবিন্যাস সম্বন্ধে আমাদের ভাষার সহিত তাহার কোনোপ্রকার মিল নাই। তাহার পরে আবার ভাববিন্যাস এবং বিষয়-প্রসঙ্গও বিদেশী। আগাগোড়া কিছুই পরিচিত নহে, সুতরাং ধারণা জন্মিবার পূর্বেই মুখস্থ আরম্ভ করিতে হয়। তাহাতে না চিবাইয়া গিলিয়া খাইবার ফল হয়। হয়তো কোনো-একটা শিশুপাঠ্য রীডারে hay-making সম্বন্ধে একটা আখ্যান আছে, ইংরেজ ছেলের নিকট সে-ব্যাপারটা অত্যন্ত পরিচিত, এইজন্য বিশেষ আনন্দদায়ক; অথবা snowball খেলায় Charlie এবং Katieর মধ্যে যে কিরূপ বিবাদ ঘটিয়াছিল তাহার ইতিহাস ইংরেজ-সন্তানের নিকট অতিশয় কৌতুকজনক, কিন্তু আমাদের ছেলেরা যখন বিদেশী ভাষায় সেগুলা পড়িয়া যায় তখন তাহাদের মনে কোনোরূপ স্মৃতির উদ্রেক হয় না, মনের সম্মুখে ছবির মতো করিয়া কিছু দেখিতে পায় না, আগাগোড়া অন্ধভাবে হাতড়াইয়া চলিতে হয়।

আবার নিচের ক্লাসে যে-সকল মাস্টার পড়ায় তাহারা কেহ এণ্ট্রেন্স পাস, কেহ-বা এণ্ট্রেন্স ফেল, ইংরেজি ভাষা ভাব আচার ব্যবহার এবং সাহিত্য তাহাদের নিকট

কখনই সুপরিচিত নহে। তাহারাই ইংরেজির সহিত আমাদের প্রথম পরিচয় সংঘটন করাইয়া থাকে। তাহারা না জানে ভালো বাংলা, না জানে ভালো ইংরেজি ; কেবল তাহাদের একটা সুবিধা এই যে, শিশুদিগকে শিখানো অপেক্ষা ভুলানো ঢের সহজ কাজ, এবং তাহাতে তাহারা সম্পূর্ণ কৃতকার্যতা লাভ করে।

বেচারাদের দোষ দেওয়া যায় না। Horse is a noble animal— বাংলায় তর্জমা করিতে গেলে বাংলারও ঠিক থাকে না, ইংরেজিও ঘোলাইয়া যায়। কথাটা কেমন করিয়া প্রকাশ করা যায়। ঘোড়া একটি মহৎ জন্তু, ঘোড়া অতি উঁচুদরের জানোয়ার, ঘোড়া জন্তুটা খুব ভালো— কথাটা কিছুতেই তেমন মনঃপূতরকম হয় না, এমন স্থলে গোঁজামিলন দেওয়াই সুবিধা। আমাদের প্রথম ইংরেজি শিক্ষায় এইরূপ কত গোঁজামিলন চলে তাহার আর সীমা নাই। ফলত অল্পবয়সে আমরা যে ইংরেজিটুকু শিখি তাহা এত যৎসামান্য এবং এত ভুল যে, তাহার ভিতর হইতে কোনোপ্রকারের রস আকর্ষণ করিয়া লওয়া বালকদের পক্ষে অসম্ভব হয়— কেহ তাহা প্রত্যাশাও করে না। মাস্টারও বলে ছাত্রও বলে, আমার রসে কাজ নাই, টানিয়া-বুনিয়া কোনোমতে একটা অর্থ বাহির করিতে পারিলে এ যাত্রা বাঁচিয়া যাই, পরীক্ষায় পাস হই ; আপিসে চাকরি জোটে। সচরাচর যে-অর্থটা বাহির হয় তৎসম্বন্ধে শঙ্করাচার্যের এই বচনটি খাটে :

অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যং
নাস্তি ততঃ সুখলেশঃ সত্যম্।

অর্থকে অনর্থ বলিয়া জানিয়ো, তাহাতে সুখও নাই এবং সত্যও নাই।

তবে ছেলেদের ভাগ্যে বাকি রহিল কী। যদি কেবল বাংলা শিখিত তবে রামায়ণ মহাভারত পড়িতে পাইত ; যদি কিছুই না শিখিত তবে খেলা করিবার অবসর থাকিত, গাছে চড়িয়া, জলে ঝাঁপাইয়া, ফুল ছিঁড়িয়া, প্রকৃতিজননীর উপর সহস্র দৌরাত্ম্য করিয়া শরীরের পুষ্টি, মনের উল্লাস এবং বাল্যপ্রকৃতির পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারিত। আর ইংরেজি শিখিতে গিয়া না হইল শেখা না হইল খেলা, প্রকৃতির সত্যরাজ্যে প্রবেশ করিবারও অবকাশ থাকিল না, সাহিত্যের কল্পনারাজ্যে প্রবেশ করিবারও দ্বার রুদ্ধ রহিল। অন্তরে এবং বাহিরে যে-দুইটি উদার এবং উন্মুক্ত বিহারক্ষেত্র আছে, মনুষ্য যেখান হইতে জীবন বল এবং স্বাস্থ্য সঞ্চয় করে, যেখানে নানা বর্ণ নানা রূপ নানা গন্ধ, বিচিত্র গতি এবং গীতি, প্রীতি ও প্রফুল্লতা সর্বদা হিল্লোলিত হইয়া আমাদিগকে সর্বাঙ্গসচেতন এবং সম্পূর্ণ বিকশিত করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছে সেই দুই মাতৃভূমি হইতে নির্বাসিত করিয়া হতভাগ্য শিশুদিগকে কোন্ বিদেশী কারাগারে শৃঙ্খলাবদ্ধ

করিয়া রাখা হয়। ঈশ্বর যাহাদের জন্য পিতামাতার হৃদয়ে স্নেহ সঞ্চার করিয়াছেন, জননীর কোল কোমল করিয়া দিয়াছেন, যাহারা আকারে ক্ষুদ্র তবু সমস্ত গৃহের সমস্ত শূন্য অধিকার করিয়াও তাহাদের খেলার জন্য যথেষ্ট স্থান পায় না তাহাদিগকে কোথায় বাল্য যাপন করিতে হয় ;— বিদেশী ভাষার ব্যাকরণ এবং অভিধানের মধ্যে। যাহার মধ্যে জীবন নাই, আনন্দ নাই, অবকাশ নাই, নবীনতা নাই, নড়িয়া বসিবার এক তিল স্থান নাই, তাহারই অতি শুষ্ক কঠিন সংকীর্ণতার মধ্যে। ইহাতে কি সে-ছেলের কখনও মানসিক পুষ্টি, চিত্তের প্রসার, চরিত্রের বলিষ্ঠতা লাভ হইতে পারে। সে কি একপ্রকার পাণ্ডুবর্ণ রক্তহীন শীর্ণ অসম্পূর্ণ হইয়া থাকে না। সে কি বয়ঃপ্রাপ্তিকালে নিজের বুদ্ধি খাটাইয়া কিছু বাহির করিতে পারে, নিজের বল খাটাইয়া বাধা অতিক্রম করিতে পারে, নিজের স্বাভাবিক তেজে মস্তক উন্নত করিয়া রাখিতে পারে। সে কি কেবল মুখস্থ করিতে, নকল করিতে এবং গোলামি করিতে শেখে না।

এক বয়স হইতে আর-এক বয়স পর্যন্ত একটা যোগ আছে। যৌবন যে বাল্যকাল হইতে ক্রমশ পরিণত হইয়া উঠে এ কথা নূতন করিয়া বলাই বাহুল্য। যৌবনে সহসা কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াই যখন যাহা আবশ্যক অমনি যে হাতের কাছে পাওয়া যায় তাহা নহে— জীবনের যথার্থ নির্ভরযোগ্য এবং একান্ত আবশ্যক জিনিস হস্তপদের মতো আমাদের জীবনের সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়া উঠিতে থাকে। তাহারা কোনো প্রস্তুত সামগ্রীর মতো নহে যে, প্রয়োজনের সময়ে অখণ্ড আকারে বাজার হইতে কিনিতে পারা যাইবে।

চিন্তাশক্তি এবং কল্পনাশক্তি জীবনযাত্রা নির্বাহের পক্ষে দুইটি অত্যাবশ্যক শক্তি তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অর্থাৎ যদি মানুষের মতো মানুষ হইতে হয় তবে ওই দুটা পদার্থ জীবন হইতে বাদ দিলে চলে না। অতএব বাল্যকাল হইতে চিন্তা ও কল্পনার চর্চা না করিলে কাজের সময় যে তাহাকে হাতের কাছে পাওয়া যাইবে না এ কথা অতি পুরাতন।

কিন্তু আমাদের বর্তমান শিক্ষায় সে পথ একপ্রকার রুদ্ধ। আমাদিগকে বহুকাল পর্যন্ত শুদ্ধমাত্র ভাষাশিক্ষায় ব্যাপৃত থাকিতে হয়। পূর্বেই বলিয়াছি ইংরেজি এতই বিদেশীয় ভাষা এবং আমাদের শিক্ষকেরা সাধারণত এত অল্পশিক্ষিত যে, ভাষার সঙ্গে সঙ্গে ভাব আমাদের মনে সহজে প্রবেশ করিতে পারে না। এইজন্য ইংরেজি ভাবের সহিত কিয়ৎপরিমাণে পরিচয় লাভ করিতে আমাদিগকে দীর্ঘকাল অপেক্ষা করিতে হয় এবং ততক্ষণ আমাদের চিন্তাশক্তি নিজের উপযুক্ত কোনো কাজ না পাইয়া নিতান্ত নিশ্চেষ্টভাবে থাকে। এণ্ট্রেন্স এবং ফার্স্ট-আর্টস পর্যন্ত কেবল চলনসই রকমের ইংরেজি

শিখিতেই যায় ; তার পরেই সহসা বি. এ. ক্লাসে বড়ো বড়ো পুঁথি এবং গুরুতর চিন্তাসাধ্য প্রসঙ্গ আমাদের সম্মুখে ধরিয়া দেওয়া হয়— তখন সেগুলা ভালো করিয়া আয়ত্ত করিবার সময়ও নাই শক্তিও নাই— সবগুলা মিলাইয়া এক-একটা বড়ো বড়ো তাল পাকাইয়া একেবারে এক-এক গ্রাসে গিলিয়া ফেলিতে হয়।

যেমন যেমন পড়িতেছি অমনি সঙ্গে সঙ্গে ভাবিতেছি না, ইহার অর্থ এই যে, স্তূপ উঁচা করিতেছি কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নির্মাণ করিতেছি না। ইঁটসুরকি, কড়িবরগা, বালিচুন, যখন পর্বতপ্রমাণ উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে এমন সময় বিশ্ববিদ্যালয় হইতে হুকুম আসিল একটা তেতালার ছাদ প্রস্তুত করো। অমনি আমরা সেই উপকরণস্তূপের শিখরে চড়িয়া দুই বৎসর ধরিয়া পিটাইয়া তাহার উপরিভাগ কোনোমতে সমতল করিয়া দিলাম, কতকটা ছাদের মতো দেখিতে হইল। কিন্তু ইহাকে কি অট্টালিকা বলে। ইহার মধ্যে বায়ু এবং আলোক প্রবেশ করিবার কি কোনো পথ আছে, ইহার মধ্যে মনুষ্যের চিরজীবনের বাসযোগ্য কি কোনো আশ্রয় আছে, ইহা কি আমাদিগকে বহিঃসংসারের প্রখর উত্তাপ এবং অনাবরণ হইতে রীতিমত রক্ষা করিতে পারে, ইহার মধ্যে কি কোনো একটা শৃঙ্খলা সৌন্দর্য এবং সুষমা দেখিতে পাওয়া যায়।

মালমসলা যাহা জড়ো হইতেছে তাহা প্রচুর তাহার আর সন্দেহ নাই ; মানসিক অট্টালিকা নির্মাণের উপযুক্ত এত ইঁট পাটকেল পূর্বে আমাদের আয়ত্তের মধ্যে ছিল না। কিন্তু সংগ্রহ করিতে শিখিলেই যে নির্মাণ করিতে শেখা হইল ধরিয়া লওয়া হয়, সেইটেই একটা মস্ত ভুল। সংগ্রহ এবং নির্মাণ যখন একই সঙ্গে অল্পে অল্পে অগ্রসর হইতে থাকে তখনই কাজটা পাকা রকমের হয়।

অর্থাৎ সংগ্রহযোগ্য জিনিসটা যখনই হাতে আসে তখনই তাহার ব্যবহারটি জানা, তাহার প্রকৃত পরিচয়টি পাওয়া, জীবনের সঙ্গে সঙ্গে জীবনের আশ্রয়স্থলটি গড়িয়া তোলাই রীতিমত শিক্ষা। মানুষ একদিকে বাড়িতেছে আর তাহার বিদ্যা আর-একদিকে জমা হইতেছে, খাদ্য একদিকে ভাণ্ডারকে ভারাক্রান্ত করিতেছে, পাকযন্ত্র আর-একদিকে আপনার জারকরসে আপনাকে জীর্ণ করিয়া ফেলিতেছে— আমাদের দেশে এই একপ্রকার অভূতপূর্ব কাণ্ড চলিতেছে।

অতএব ছেলে যদি মানুষ করিতে চাই, তবে ছেলেবেলা হইতেই তাহাকে মানুষ করিতে আরম্ভ করিতে হইবে, নতুবা সে ছেলেই থাকিবে, মানুষ হইবে না। শিশুকাল হইতেই কেবল স্মরণশক্তির উপর সমস্ত ভর না দিয়া সঙ্গে সঙ্গে যথাপরিমাণে চিন্তাশক্তি ও কল্পনাশক্তির স্বাধীন পরিচালনার অবসর দিতে হইবে। সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত

কেবলই লাঙল দিয়া চাষ এবং মই দিয়া ঢেলাভাঙা, কেবলই ঠেঙা লাঠি, মুখস্থ এবং একজামিন— আমাদের এই 'মানব-জনম' আবাদের পক্ষে আমাদের এই দুর্লভ ক্ষেত্রে সোনা ফলাইবার পক্ষে, যথেষ্ট নহে। এই শুষ্ক ধূলির সঙ্গে এই অবিশ্রাম কর্ষণ-পীড়নের সঙ্গে রস থাকা চাই। কারণ মাটি যত সরস থাকে ধান তত ভালো হয়। তাহার উপর আবার এক-একটা বিশেষ সময় আসে যখন ধান্যক্ষেত্রের পক্ষে বৃষ্টি বিশেষরূপে আবশ্যক। সে-সময়টি অতিক্রম হইয়া গেলে হাজার বৃষ্টি হইলেও আর তেমন সুফল ফলে না, বয়োবিকাশেরও তেমনই একটা বিশেষ সময় আছে যখন জীবন্ত ভাব এবং নবীন কল্পনাসকল জীবনের পরিণতি এবং সরসতা সাধনের পক্ষে অত্যাবশ্যক। ঠিক সেই সময়টিতে যদি সাহিত্যের আকাশ হইতে খুব এক পশলা বর্ষণ হইয়া যায় তবে 'ধন্য রাজা পুণ্য দেশ'। নবোদ্ভিন্ন হৃদয়াঙ্কুরগুলি যখন অন্ধকার মাতৃভূমি হইতে বিপুল পৃথিবী এবং অনন্ত নীলাম্বরের দিকে প্রথম মাথা তুলিয়া দেখিতেছে, প্রচ্ছন্ন জন্মান্তঃপুরের দ্বারদেশে আসিয়া বহিঃসংসারের সহিত তাহার নূতন পরিচয় হইতেছে, যখন নবীন বিস্ময়, নবীন প্রীতি, নবীন কৌতূহল চারিদিকে আপন শীর্ষ প্রসারণ করিতেছে, তখন যদি ভাবের সমীরণ এবং চিরানন্দলোক হইতে আলোক এবং আশীর্বাদধারা নিপতিত হয়, তবেই তাহার সমস্ত জীবন যথাকালে সফল সরস এবং পরিণত হইতে পারে; কিন্তু সেই সময় যদি কেবল শুষ্ক ধূলি এবং তপ্ত বালুকা, কেবল নীরস ব্যাকরণ এবং বিদেশী অভিধান তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, তবে পরে মুষলধারায় বর্ষণ হইলেও য়ুরোপীয় সাহিত্যের নব নব জীবন্ত সত্য, বিচিত্র কল্পনা এবং উন্নত ভাবসকল লইয়া দক্ষিণে বামে ফেলাছড়া করিলেও সে আর তেমন সফলতা লাভ করিতে পারে না, সাহিত্যের অন্তর্নিহিত জীবনীশক্তি আর তাহার জীবনের মধ্যে তেমন সহজভাবে প্রকাশ করিতে পারে না।

আমাদের নীরস শিক্ষায় জীবনের সেই মাহেন্দ্রক্ষণ অতীত হইয়া যায়। আমরা বাল্য হইতে কৈশোর এবং কৈশোর হইতে যৌবনে প্রবেশ করি কেবল কতকগুলা কথার বোঝা টানিয়া। সরস্বতীর সাম্রাজ্যে কেবলমাত্র মজুরি করিয়া মরি, পৃষ্ঠের মেরুদণ্ড বাঁকিয়া যায় এবং মনুষ্যত্বের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ হয় না। যখন ইংরেজি ভাবরাজ্যের মধ্যে প্রবেশ করি তখন আর সেখানে তেমন যথার্থ অন্তরঙ্গের মতো বিহার করিতে পারি না। যদি বা ভাবগুলা একরূপ বুঝিতে পারি কিন্তু সেগুলাকে মর্মস্থলে আকর্ষণ করিয়া লইতে পারি না; বক্তৃতায় এবং লেখায় ব্যবহার করি, কিন্তু জীবনের কার্যে পরিণত করিতে পারি না।

এইরূপে বিশ-বাইশ বৎসর ধরিয়া আমরা যে-সকল ভাব শিক্ষা করি আমাদের

জীবনের সহিত তাহার একটা রাসায়নিক মিশ্রণ হয় না বলিয়া আমাদের মনের ভারি-একটা অদ্ভুত চেহারা বাহির হয়। শিক্ষিত ভাবগুলি কতক আটা দিয়া জোড়া থাকে, কতক কালক্রমে ঝরিয়া পড়ে। অসভ্যেরা যেমন গায়ে রঙ মাখিয়া উলকি পরিয়া পরম গর্ব অনুভব করে, স্বাভাবিক স্বাস্থ্যের উজ্জ্বলতা এবং লাবণ্য আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, আমাদের বিলাতি বিদ্যা আমরা সেইরূপ গায়ের উপর লেপিয়া দম্ভভরে পা ফেলিয়া বেড়াই, আমাদের যথার্থ আন্তরিক জীবনের সহিত তাহার অল্পই যোগ থাকে। অসভ্য রাজারা যেমন কতকগুলা সস্তা বিলাতি কাচখণ্ড পুঁতি প্রভৃতি লইয়া শরীরের যেখানে সেখানে ঝুলাইয়া রাখে এবং বিলাতি সাজসজ্জা অযথাস্থানে বিন্যাস করে, বুঝিতেও পারে না কাজটা কিরূপ অদ্ভুত এবং হাস্যজনক হইতেছে, আমরাও সেইরূপ কতকগুলা সস্তা চকচকে বিলাতি কথা লইয়া ঝলমল করিয়া বেড়াই এবং বিলাতি বড়ো বড়ো ভাবগুলি লইয়া হয়তো সম্পূর্ণ অযথা স্থানে অসংগত প্রয়োগ করি, আমরা নিজেও বুঝিতে পারি না অজ্ঞাতসারে কী একটা অপূর্ব প্রহসন অভিনয় করিতেছি এবং কাহাকেও হাসিতে দেখিলে তৎক্ষণাৎ য়ুরোপীয় ইতিহাস হইতে বড়ো বড়ো নজির প্রয়োগ করিয়া থাকি।

বাল্যকাল হইতে যদি ভাষাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ভাবশিক্ষা হয় এবং ভাবের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত জীবনযাত্রা নিয়মিত হইতে থাকে তবেই আমাদের সমস্ত জীবনের মধ্যে একটা যথার্থ সামঞ্জস্য স্থাপিত হইতে পারে, আমরা বেশ সহজ মানুষের মতো হইতে পারি এবং সকল বিষয়ের একটা যথাযথ পরিমাণ ধরিতে পারি।

যখন আমরা একবার ভালো করিয়া ভাবিয়া দেখি যে, আমরা যে-ভাবে জীবন-নির্বাহ করিব আমাদের শিক্ষা তাহার আনুপাতিক নহে; আমরা যে-গৃহে আমৃত্যুকাল বাস করিব সে-গৃহের উন্নতচিত্র আমাদের পাঠ্যপুস্তকে নাই; যে-সমাজের মধ্যে আমাদিগকে জন্ম যাপন করিতে হইবে সেই সমাজের কোনো উচ্চ আদর্শ আমাদের নূতন শিক্ষিত সাহিত্যের মধ্যে লাভ করি না; আমাদের পিতা মাতা, আমাদের সুহৃৎ বন্ধু, আমাদের ভ্রাতা ভগ্নীকে তাহার মধ্যে প্রত্যক্ষ দেখি না; আমাদের দৈনিক জীবনের কার্যকলাপ তাহার বর্ণনার মধ্যে কোনো স্থান পায় না; আমাদের আকাশ এবং পৃথিবী, আমাদের নির্মল প্রভাত এবং সুন্দর সন্ধ্যা, আমাদের পরিপূর্ণ শস্যক্ষেত্র এবং দেশলক্ষ্মী স্রোতস্বিনীর কোনো সংগীত তাহার মধ্যে ধ্বনিত হয় না; তখন বুঝিতে পারি আমাদের শিক্ষার সহিত আমাদের জীবনের তেমন নিবিড় মিলন হইবার কোনো স্বাভাবিক সম্ভাবনা নাই; উভয়ের মাঝখানে একটা ব্যবধান থাকিবেই থাকিবে; আমাদের শিক্ষা হইতে আমাদের

জীবনের সমস্ত আবশ্যক অভাবের পূরণ হইতে পারিবেই না। আমাদের সমস্ত জীবনের শিকড় যেখানে, সেখান হইতে শত হস্ত দূরে আমাদের শিক্ষার বৃষ্টিধারা বর্ষিত হইতেছে, বাধা ভেদ করিয়া যেটুকু রস নিকটে আসিয়া পৌঁছিতেছে সেটুকু আমাদের জীবনের শুষ্কতা দূর করিবার পক্ষে যথেষ্ট নহে। আমরা যে-শিক্ষায় আজন্মকাল যাপন করি, সে-শিক্ষা কেবল যে আমাদিগকে কেরানীগিরি অথবা কোনো একটা ব্যবসায়ের উপযোগী করে মাত্র, যে-সিন্দুকের মধ্যে আমাদের আপিসের শামলা এবং চাদর ভাঁজ করিয়া রাখি সেই সিন্দুকের মধ্যেই যে আমাদের সমস্ত বিদ্যাকে তুলিয়া রাখিয়া দিই, আটপৌরে দৈনিক জীবনে তাহার যে কোনো ব্যবহার নাই, ইহা বর্তমান শিক্ষাপ্রণালীগুণে অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিয়াছে। এজন্য আমাদের ছাত্রদিগকে দোষ দেওয়া অন্যায়। তাহাদের গ্রন্থজগৎ এক প্রান্তে আর তাহাদের বসতি-জগৎ অন্যপ্রান্তে, মাঝখানে কেবল ব্যাকরণ-অভিধানের সেতু। এইজন্য যখন দেখা যায় একই লোক একদিকে য়ুরোপীয় দর্শন বিজ্ঞান এবং ন্যায়শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, অন্যদিকে চিরকুসংস্কারগুলিকে সযত্নে পোষণ করিতেছেন, একদিকে স্বাধীনতার উজ্জ্বল আদর্শ মুখে প্রচার করিতেছেন, অন্যদিকে অধীনতার শত সহস্র লূতাতন্তুপাশে আপনাকে এবং অন্যকে প্রতি মুহূর্তে আচ্ছন্ন ও দুর্বল করিয়া ফেলিতেছেন, একদিকে বিচিত্রভাবপূর্ণ সাহিত্য স্বতন্ত্রভাবে সম্ভোগ করিতেছেন, অন্যদিকে জীবনকে ভাবের উচ্চশিখরে অধিরূঢ় করিয়া রাখিতেছেন না, কেবল ধনোপার্জন এবং বৈষয়িক উন্নতি সাধনেই ব্যস্ত, তখন আর আশ্চর্য বোধ হয় না। কারণ, তাঁহাদের বিদ্যা এবং ব্যবহারের মধ্যে একটা সত্যকার দুর্ভেদ্য ব্যবধান আছে, উভয়ে কখনও সুসংলগ্নভাবে মিলিত হইতে পায় না।

তাহার ফল হয় এই, উভয়ে উভয়ের প্রতি উত্তরোত্তর বাম হইতে থাকে। যেটা আমাদের শিক্ষিত বিদ্যা, আমাদের জীবন ক্রমাগতই তাহার প্রতিবাদ করিয়া চলাতে সেই বিদ্যাটার প্রতিই আগাগোড়া অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধা জন্মিতে থাকে। মনে হয়, ও জিনিসটা কেবল ভুয়া এবং সমস্ত য়ুরোপীয় সভ্যতা ঐ ভুয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত। আমাদের যাহা আছে তাহা সমস্তই সত্য এবং আমাদের শিক্ষা যেদিকে পথ নির্দেশ করিয়া দিতেছে সেদিকে সভ্যতা নামক একটি মায়াবিনী মহামিথ্যার সাম্রাজ্য। আমাদের অদৃষ্টক্রমে বিশেষ কারণবশতই যে আমাদের শিক্ষা আমাদের নিকট নিষ্ফল হইয়া উঠিয়াছে তাহা না মনে করিয়া আমরা স্থির করি, উহার নিজের মধ্যে স্বভাবতই একটা বৃহৎ নিষ্ফলতার কারণ বর্তমান রহিয়াছে। এইরূপে আমাদের শিক্ষাকে আমরা যতই অশ্রদ্ধা করিতে থাকি আমাদের শিক্ষাও আমাদের জীবনের প্রতি ততই বিমুখ

হইতে থাকে, আমাদের চরিত্রের উপর তাহার সম্পূর্ণ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না।—এইরূপে আমাদের শিক্ষার সহিত জীবনের গৃহবিচ্ছেদ ক্রমশ বাড়িয়া উঠে, প্রতি-মুহূর্তে পরস্পর পরস্পরকে সুতীব্র পরিহাস করিতে থাকে এবং অসম্পূর্ণ জীবন ও অসম্পূর্ণ শিক্ষা লইয়া বাঙালির সংসারযাত্রা দুই-ই সঙের প্রহসন হইয়া দাঁড়ায়।

এইরূপে জীবনের এক-তৃতীয়াংশকাল যে-শিক্ষায় যাপন করিলাম তাহা যদি চিরকাল আমাদের জীবনের সহিত অসংলগ্ন হইয়া রহিল এবং অন্য শিক্ষালাভের অবসর হইতেও বঞ্চিত হইলাম, তবে আর আমরা কিসের জোরে একটা যাথার্থ্য লাভ করিতে পারিব।

আমাদের এই শিক্ষার সহিত জীবনের সামঞ্জস্য সাধনই এখনকার দিনের সর্বপ্রধান মনোযোগের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

কিন্তু এ মিলন কে সাধন করিতে পারে। বাংলাভাষা, বাংলাসাহিত্য। যখন প্রথম বঙ্কিমবাবুর বঙ্গদর্শন একটি নূতন প্রভাতের মতো আমাদের বঙ্গদেশে উদিত হইয়াছিল তখন দেশের সমস্ত শিক্ষিত অন্তর্জগৎ কেন এমন একটি অপূর্ব আনন্দে জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছিল। য়ুরোপের দর্শনে বিজ্ঞানে ইতিহাসে যাহা পাওয়া যায় না এমন কোনো নূতন তত্ত্ব নূতন আবিষ্কার বঙ্গদর্শন কি প্রকাশ করিয়াছিল। তাহা নহে। বঙ্গদর্শনকে অবলম্বন করিয়া একটি প্রবল প্রতিভা আমাদের ইংরেজি শিক্ষা ও আমাদের অন্তঃকরণের মধ্যবর্তী ব্যবধান ভাঙিয়া দিয়াছিল— বহুকাল পরে প্রাণের সহিত ভাবের একটি আনন্দ সম্মিলন সংঘটন করিয়াছিল, প্রবাসীকে গৃহের মধ্যে আনিয়া আমাদের গৃহকে উৎসবে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছিল। এতদিন মথুরায় কৃষ্ণ রাজত্ব করিতেছিলেন, বিশ পঁচিশ বৎসর কাল দ্বারীর সাধ্যসাধন করিয়া তাঁহার সুদূর সাক্ষাৎলাভ হইত, বঙ্গদর্শন দৌত্য করিয়া তাঁহাকে আমাদের বৃন্দাবনধামে আনিয়া দিল। এখন আমাদের গৃহে, আমাদের সমাজে, আমাদের অন্তরে একটা নূতন জ্যোতি বিকীর্ণ হইল। আমরা আমাদের ঘরের মেয়েকে সূর্যমুখী কমলমণিরূপে দেখিলাম, চন্দ্রশেখর এবং প্রতাপ বাঙালি পুরুষকে একটা উচ্চতর ভাবলোকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিল, আমাদের প্রতিদিনের ক্ষুদ্র জীবনের উপরে একটি মহিমরশ্মি নিপতিত হইল।

বঙ্গদর্শন সেই যে এক অনুপম নূতন আনন্দের আস্বাদ দিয়া গেছে তাহার ফল হইয়াছে এই যে, আজকালকার শিক্ষিত লোকে বাংলা ভাষায় ভাব প্রকাশ করিবার জন্য উৎসাহী হইয়া উঠিয়াছে। এটুকু বুঝিয়াছে যে, ইংরেজি আমাদের পক্ষে কাজের ভাষা কিন্তু ভাবের ভাষা নহে। প্রত্যক্ষ দেখিয়াছে যে, যদিও আমরা শৈশবাবধি এত একান্ত যত্নে একমাত্র ইংরেজি ভাষা শিক্ষা করি, তথাপি আমাদের দেশীয় বর্তমান স্থায়ী সাহিত্য যাহা-কিছু তাহা বাংলা ভাষাতেই প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার প্রধান

কারণ, বাঙালি কখনই ইংরেজি ভাষার সহিত তেমন ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ভাবে পরিচিত হইতে পারে না যাহাতে সাহিত্যের স্বাধীন ভাবোচ্ছ্বাস তাহার মধ্যে সহজে প্রকাশ করিতে পারে। যদি বা ভাষার সহিত তাহার তেমন পরিচয় হয় তথাপি বাঙালির ভাব ইংরেজের ভাষায় তেমন জীবন্তরূপে প্রকাশিত হয় না। যে-সকল বিশেষ মাধুর্য, বিশেষ স্মৃতি আমাদিগকে প্রকাশচেষ্টায় উত্তেজিত করে, যে-সকল সংস্কার পুরুষানুক্রমে আমাদের সমস্ত মনকে একটা বিশেষ গঠন দান করিয়াছে, তাহা কখনই বিদেশী ভাষার মধ্যে যথার্থ মুক্তি লাভ করিতে পারে না।

অতএব আমাদের শিক্ষিত লোকেরা যখনই ভাব প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করেন তখনই বাংলা ভাষা অবলম্বন করিতে তাঁহাদের একটা কাতরতা জন্মে। কিন্তু হায় অভিমানিনী ভাষা, সে কোথায়। সে কি এত দীর্ঘকাল অবহেলার পর মুহূর্তের আহ্বানে অমনি তৎক্ষণাৎ তাহার সমস্ত সৌন্দর্য, তাহার সমস্ত গৌরব লইয়া একজন শিক্ষাভিমানী গর্বোদ্ধত পুরুষের নিকট আত্মসমর্পণ করিবে। হে সুশিক্ষিত, হে আর্য, তুমি কি আমাদের এই সুকুমারী সুকোমলা তরুণী ভাষার যথার্থ মর্যাদা জানো। ইহার কটাক্ষে যে উজ্জ্বল হাস্য, যে অশ্রুম্লান করুণা, যে প্রখর তেজস্ফুলিঙ্গ, যে স্নেহ প্রীতি ভক্তি স্ফুরিত হয় তাহার গভীর মর্ম কি কখনও বুঝিয়াছ, হৃদয়ে গ্রহণ করিয়াছ। তুমি মনে করো, আমি যখন মিল স্পেন্সার পড়িয়াছি, সব কটা পাস করিয়াছি, আমি যখন এমন একজন স্বাধীন চিন্তাশীল মেধাবী যুবাপুরুষ, যখন হতভাগ্য কন্যাদায়গ্রস্ত পিতাগণ আপন কুমারী কন্যা এবং যথাসর্বস্ব লইয়া আমার দ্বারে আসিয়া সাধ্যসাধনা করিতেছে, তখন ওই অশিক্ষিত সামান্য গ্রাম্য লোকদিগের ঘরের তুচ্ছ ভাষাটার উচিত ছিল আমার ইঙ্গিতমাত্রে আমার শরণাপন্ন হইয়া কৃতকৃতার্থ হওয়া। আমি যে ইংরেজি পড়িয়া বাংলা লিখি ইহা অপেক্ষা বাংলার সৌভাগ্য কী হইতে পারে। আমি যখন ইংরেজি ভাষায় আমার অনায়াসপ্রাপ্য যশ পরিহার করিয়া আমার এত বড়ো বড়ো ভাব এই দরিদ্র দেশে হেলায় বিসর্জন দিতেছি, তখন জীর্ণবস্ত্র দীন পান্থগণ রাজাকে দেখিলে যেমন সসম্ভ্রমে পথ ছাড়িয়া দেয়, তেমনই আমার সম্মুখ হইতে সমস্ত তুচ্ছ বাধাবিপত্তির শশব্যস্ত হইয়া সরিয়া যাওয়া উচিত ছিল। একবার ভাবিয়া দেখো আমি তোমাদের কত উপকার করিতে আসিয়াছি, আমি তোমাদিগকে পোলিটিক্যাল ইকনমি সম্বন্ধে দুইচারি কথা বলিতে পারিব, জীবরাজ্য হইতে আরম্ভ করিয়া সমাজ এবং আধ্যাত্মিক জগৎ পর্যন্ত এভোল্যুশনের নিয়ম কিরূপে কার্য করিতেছে তৎসম্বন্ধে আমি যাহা শিখিয়াছি তাহা তোমাদের নিকট হইতে সম্পূর্ণ গোপন করিব না, আমার ঐতিহাসিক এবং দার্শনিক প্রবন্ধের ফুটনোটে নানা ভাষার দুরূহ গ্রন্থ হইতে নানা বচন

ও দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিয়া দেখাইতে পারিব, এবং বিলাতি সাহিত্যের কোন্ পুস্তক সম্বন্ধে কোন্ সমালোচক কী কথা বলেন তাহাও বাঙালির অগোচর থাকিবে না। কিন্তু যদি তোমাদের এই জীর্ণচীর অসম্পূর্ণ ভাষা আদেশমাত্র অগ্রসর হইয়া আমাকে সমাদর করিয়া না লয় তবে আমি বাংলায় লিখিব না, আমি, ওকালতি করিব, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হইব, ইংরেজি খবরের কাগজে লীডার লিখিব, তোমাদের যে কত ক্ষতি হইবে তাহার আর ইয়ত্তা নাই।

বঙ্গদেশের পরম দুর্ভাগ্যক্রমে তাহার এই লজ্জাশীলা অথচ তেজস্বিনী নন্দিনী বঙ্গভাষা অগ্রবর্তিনী হইয়া এমন-সকল ভালো ভালো ছেলের সমাদর করে না এবং ভালো ছেলেরাও রাগ করিয়া বাংলাভাষার সহিত কোনো সম্পর্ক রাখে না। এমন-কি বাংলায় চিঠিও লেখে না, বন্ধুদের সহিত সাক্ষাৎ হইলে যতটা পারে বাংলা হাতে রাখিয়া ব্যবহার করে এবং বাংলাগ্রন্থ অবজ্ঞাভরে অন্তঃপুরে নির্বাসিত করিয়া দেয়। ইহাকে বলে লঘু পাপে গুরু দণ্ড।

পূর্বে বলিয়াছি, আমাদের বাল্যকালের শিক্ষায় আমরা ভাষার সহিত ভাব পাই না, আবার বয়স হইলে ঠিক তাহার বিপরীত ঘটে, যখন ভাব জুটিতে থাকে তখন ভাষা পাওয়া যায় না। এ কথাও পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, ভাষাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ভাবশিক্ষা একত্র অবিচ্ছেদ্যভাবে বৃদ্ধি পায় না বলিয়াই য়ুরোপীয় ভাবের যথার্থ নিকট সংসর্গ আমরা লাভ করি না এবং সেইজন্যই আজকাল আমাদের অনেক শিক্ষিত লোকে য়ুরোপীয় ভাবসকলের প্রতি অনাদর প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। অন্যদিকেও তেমনই ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই আপনার মাতৃভাষাকে দৃঢ়-সম্বন্ধরূপে পান নাই বলিয়া মাতৃভাষা হইতে তাঁহারা দূরে পড়িয়া গেছেন এবং মাতৃভাষার প্রতি তাঁহাদের একটি অবজ্ঞা জন্মিয়া গেছে। বাংলা তাঁহারা জানেন না সে কথা স্পষ্টরূপে স্বীকার না করিয়া তাঁহারা বলেন, "বাংলায় কি কোনো ভাব প্রকাশ করা যায়। এ ভাষা আমাদের মতো শিক্ষিত মনের উপযোগী নহে।" প্রকৃত কথা, আঙুর আয়ত্তের অতীত হইলে তাহাকে টক বলিয়া উপেক্ষা, আমরা অনেক সময় অজ্ঞাতসারে করিয়া থাকি।

যে দিক হইতে যেমন করিয়াই দেখা যায়, আমাদের ভাব ভাষা এবং জীবনের মধ্যকার সামঞ্জস্য দূর হইয়া গেছে। মানুষ বিচ্ছিন্ন হইয়া নিষ্ফল হইতেছে, আপনার মধ্যে একটি অখণ্ড ঐক্যলাভ করিয়া বলিষ্ঠ হইয়া দাঁড়াইতে পারিতেছে না, যখন যেটি আবশ্যক তখন সেটি হাতের কাছে পাইতেছে না। একটি গল্প আছে, একজন দরিদ্র সমস্ত শীতকালে অল্প অল্প ভিক্ষা সঞ্চয় করিয়া যখন শীতবস্ত্র কিনিতে সক্ষম হইত তখন

গ্রীষ্ম আসিয়া পড়িত, আবার সমস্ত গ্রীষ্মকাল চেষ্টা করিয়া যখন লঘুবস্ত্র লাভ করিত তখন অগ্রহায়ণ মাসের মাঝামাঝি ; দেবতা যখন তাহার দৈন্য দেখিয়া দয়ার্দ্র হইয়া বর দিতে চাহিলেন তখন সে কহিল, "আমি আর কিছু চাহি না, আমার এই হেরফের ঘুচাইয়া দাও। আমি যে সমস্ত জীবন ধরিয়া গ্রীষ্মের সময় শীতবস্ত্র এবং শীতের সময় গ্রীষ্মবস্ত্র লাভ করি এইটে যদি একটু সংশোধন করিয়া দাও তাহা হইলেই আমার জীবন সার্থক হয়।"

আমাদেরও সেই প্রার্থনা। আমাদের হেরফের ঘুচিলেই আমরা চরিতার্থ হই। শীতের সহিত শীতবস্ত্র, গ্রীষ্মের সহিত গ্রীষ্মবস্ত্র কেবল একত্র করিতে পারিতেছি না বলিয়াই আমাদের এত দৈন্য, নহিলে আছে সকলই ; এখন আমরা বিধাতার নিকট এই বর চাহি, আমাদের ক্ষুধার সহিত অন্ন, শীতের সহিত বস্ত্র, ভাবের সহিত ভাষা, শিক্ষার সহিত জীবন কেবল একত্র করিয়া দাও। আমরা আছি যেন :

পানীমে মীন পিয়াসি
শুনত শুনত লাগে হাসি।

আমাদের পানীও আছে পিয়াসও আছে, দেখিয়া পৃথিবীর লোক হাসিতেছে, এবং আমাদের চক্ষে অশ্রু আসিতেছে, কেবল আমরা পান করিতে পারিতেছি না।

১২৯৯

শিক্ষা-সংস্কার

যাহারা খবরের কাগজ পড়েন তাঁহারা জানেন, ইংলণ্ডে ফ্রান্সে শিক্ষা সম্বন্ধে খুব একটা গোলমাল চলিতেছে। শিক্ষা লইয়া আমরাও নিশ্চিন্ত নাই, তাহাও কাহারও অবিদিত নাই।

এমন সময়ে 'স্পীকার' নামক বিখ্যাত ইংরেজি সাপ্তাহিক-পত্রে আইরিশ শিক্ষা-সংস্কার সম্বন্ধে যে প্রস্তাব আলোচিত হইয়াছে, তাহা আমাদের মনোযোগপূর্বক চিন্তা করিয়া দেখিবার বিষয়।

য়ুরোপের যে-যুগকে অন্ধকার যুগ বলে, যখন বর্বর আক্রমণের ঝড়ে রোমের বাতি নিবিয়া গেল, সেই সময়ে য়ুরোপের সকল দেশের মধ্যে কেবলমাত্র আয়রলণ্ডেই বিদ্যার চর্চা জাগিয়াছিল। তখন য়ুরোপের ছাত্রগণ আয়রলণ্ডের বিদ্যালয়ে আসিয়া পড়াশুনা করিত। সপ্তম শতাব্দীতে যখন বহুতর বিদ্যার্থী এখানে আসিয়া জুটিয়াছিল, তখন

তাহারা আহার বাসা পুঁথি এবং শিক্ষা বিনামূল্যেই পাইত। কতকটা আমাদের দেশের টোলের মতো আর কি।

. য়ুরোপের অধিকাংশ দেশেই আইরিশ বৈরাগিগণ বিদ্যা এবং খৃষ্টধর্মের নির্বাণপ্রায় শিখা আবার উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছেন। ফ্রান্সের রাজা শার্লমান অষ্টম শতাব্দীতে পারিস-য়ুনিভরসিটির প্রতিষ্ঠাভার বিখ্যাত আইরিশ পণ্ডিত ক্লেমেন্সের হাতে দিয়াছিলেন। এরূপ আরও অনেক দৃষ্টান্ত আছে।

প্রাচীন আইরিশ বিদ্যালয়ে যদিচ লাটিন, গ্রীক এবং হিব্রু শেখানো হইত, তবু সেখানে শিখাইবার ভাষা ছিল আইরিশ। গণিতজ্যোতিষ, ফলিতজ্যোতিষ এবং তখনকার কালে যে-সকল বিজ্ঞান প্রচলিত ছিল তাহা আইরিশ ভাষাদ্বারাই শেখানো হইত, সুতরাং এ ভাষায় পারিভাষিক শব্দের দৈন্য ছিল না।

যখন দিনেমার এবং ইংরেজরা আয়রলণ্ড আক্রমণ করে, তখন এই-সকল বিদ্যালয়ে আগুন লাগাইয়া বিপুলসঞ্চিত পুঁথিপত্র জ্বালাইয়া দেওয়া হয় এবং অধ্যাপক ও ছাত্রগণ হত ও বিক্ষিপ্ত হইতে থাকে। কিন্তু আয়রলণ্ডের যে যে স্থান এই-সকল উৎপাত হইতে দূরে থাকিয়া ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত দেশীয় রাজাদের অধীন ছিল, সে-সকল স্থানের বড়ো বড়ো বিদ্যাগারে শিক্ষাকার্য সম্পূর্ণ আইরিশ প্রণালীতেই নির্বাহিত হইত। অবশেষে এলিজাবেথের কালে লড়াই হইয়া যখন সমস্ত সম্পত্তি অপহৃত হইল, তখন আয়রলণ্ডের স্বায়ত্তবিদ্যা ও বিদ্যালয় একেবারে নষ্ট করিয়া দেওয়া হইল।

এইরূপে আয়রলণ্ডবাসীরা জ্ঞানচর্চা হইতে বঞ্চিত হইয়া রহিল, তাহাদের ভাষা নিকৃষ্টসমাজের ভাষা বলিয়া অবজ্ঞা প্রাপ্ত হইতে থাকিল। অবশেষে ঊনবিংশ শতাব্দীতে 'ন্যাশনাল ইস্কুল' প্রণালীর সূত্রপাত হইল। জ্ঞানপিপাসু আইরিশগণ এই প্রণালীর দোষগুলি বিচারমাত্র না করিয়া ব্যগ্রভাবে ইহাকে অভ্যর্থনা করিয়া লইল। কেবল একজন বড়োলোক— টুয়ামের আর্চবিশপ জন ম্যকহেল— এই প্রণালীর বিরুদ্ধে আপত্তি প্রকাশ করেন এবং ইহার দ্বারা ভবিষ্যতে যে অমঙ্গল হইবে তাহা ব্যক্ত করেন।

আইরিশদিগকে জোর করিয়া স্যাকসনের ছাঁচে ঢালা এবং ইংরেজ করিয়া তোলাই ন্যাশনাল ইস্কুল-প্রণালীর মতলব ছিল। ফলে এই চেষ্টার ব্যর্থতা প্রমাণ হইল। ভালোই বলো আর মন্দই বলো, প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন জাতিকে এমন ভিন্ন রকম করিয়া গড়িয়াছেন যে, এক জাতকে ভিন্ন জাতের কাঠামোর মধ্যে পুরিতে গেলে সমস্ত খাপছাড়া হইয়া যায়।

যে-সময়ে এই শিক্ষাপ্রণালীর প্রবর্তন করা হয়, তখন আয়রলণ্ডের শতকরা

আশিজন লোক আইরিশ ভাষায় কথা কহিত। যদি শিক্ষা দেওয়াই ন্যাশনাল বোর্ডের উদ্দেশ্য হইত, তবে আইরিশ ছাত্রদিগকে আগে নিজের ভাষায় পড়িতে শুনিতে শিখাইয়া তাহার পরে সেই মাতৃভাষার সাহায্যে তাহাদিগকে বিদেশী ভাষা শিক্ষা দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তাহা না করিয়া নানাপ্রকার কঠিন শাস্তিদ্বারা বালকদিগকে তাহাদের মাতৃভাষা ব্যবহার করিতে একেবারে নিরস্ত করিয়া দেওয়া হইল।

শুধু ভাষা নয়, আইরিশ ইতিহাস পড়ানো বন্ধ হইল; আইরিশ ভূবৃত্তান্তও ভালো করিয়া শেখানো হইত না। ছেলেরা বিদেশের ইতিহাস ও ভূবৃত্তান্ত শিখিয়া নিজের দেশের সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকিত।

ইহার ফল যেমন হওয়া উচিত, তাহাই হইল। মানসিক জড়তা সমস্ত দেশে ব্যাপ্ত হইয়া গেল। আইরিশ-ভাষী ছেলেরা বুদ্ধি এবং জিজ্ঞাসা লইয়া বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিল আর বাহির হইল পঙ্গু মন এবং জ্ঞানের প্রতি বিতৃষ্ণা লইয়া।

ইহার কারণ, এ শিক্ষাপ্রণালী কলের প্রণালী, ইহাতে মন খাটে না, ছেলেরা তোতাপাখি বনিয়া যায়।

এই প্রাথমিক শিক্ষার পর মাধ্যমিক শিক্ষা (Intermediate Education)। আটাশ বৎসর ধরিয়া আয়র্লণ্ডে সেই মাধ্যমিক শিক্ষার পরখ করা হইয়াছে। তাহার ফলস্বরূপ বিদ্যাশিক্ষা সেখানে একেবারে দলিত হইয়া গেল। পরীক্ষাফলের প্রতি অতিমাত্র লোভ করিয়া করিয়া কলেজে শেখাইবার চেষ্টা হয় না, কেবল গেলাইবার আয়োজন হয়। ইহাতে হাজার হাজার আইরিশ ছাত্রের স্বাস্থ্য নষ্ট এবং বুদ্ধি বন্ধ্যা হইয়া যাইতেছে। অতিশ্রমের দ্বারা অকালে তাহাদের মন জীর্ণ হইয়া যায় এবং বিদ্যার প্রতি তাহাদের অনুরাগ থাকে না।

এই বিদ্যাবিভ্রাটের প্রতিকারস্বরূপ আইরিশ জাতি কী প্রার্থনা করিতেছে। তাহারা বিপ্লব বাধাইতে চায় না, দেশের বিদ্যাশিক্ষার ভার তাহারা নিজের হাতে চালাইতে চায়। ব্যয়ের জন্যও কর্তৃপক্ষকে বেশি ভাবিতে হইবে না। শিক্ষাব্যয়ের জন্য আয়র্লণ্ডের যে বরাদ্দ নির্দিষ্ট হইতেছে, তাহা অতি যৎসামান্য। ইংলণ্ডে পুলিস এবং আদালতে যে খরচ হয় তাহার প্রত্যেক পাউণ্ডের হারে বিদ্যাশিক্ষায় আট পাউণ্ড খরচ হইয়া থাকে। আর আয়র্লণ্ডে যেখানে অপরাধের সংখ্যা তুলনায় অত্যন্ত কম, সেখানে প্রত্যেক পুলিস ও আদালতের বরাদ্দের প্রত্যেক পাউণ্ডের অনুপাতে বিদ্যাশিক্ষায় তেরো শিলিং চার পেন্স মাত্র ব্যয় ধরা হইয়াছে।

ঠিক একটা দেশের সঙ্গে অন্য দেশের সকল অংশে তুলনা হইতেই পারে না। আয়র্লণ্ডের শিক্ষানীতি যে-ভাবে চলিয়াছিল, ভারতবর্ষেও যে ঠিক সেই ভাবেই

চলিয়াছে তাহা বলা যায় না, কিন্তু আয়র্লণ্ডের শিক্ষাসংকটের কথা আলোচনা করিয়া দেখিলে একটা গভীর জায়গায় আমাদের সঙ্গে মিল পাওয়া যায়।

বিদ্যাশিক্ষায় আমাদেরও মন খাটিতেছে না— আমাদেরও শিক্ষাপ্রণালীতে কলের অংশ বেশি। যে-ভাষায় আমাদের শিক্ষা সমাধা হয়, সে-ভাষায় প্রবেশ করিতে আমাদের অনেক দিন লাগে। ততদিন পর্যন্ত কেবল দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া হাতুড়ি-পেটা এবং কুলুপ-খোলার তত্ত্ব অভ্যাস করিতেই প্রাণান্ত হইতে হয়। আমাদের মন তেরো চোদ্দো বছর বয়স হইতেই জ্ঞানের আলোক এবং ভাবের রস গ্রহণ করিবার জন্য ফুটিবার উপক্রম করিতে থাকে, সেই সময়েই অহরহ যদি তাহার উপর বিদেশী ভাষার ব্যাকরণ এবং মুখস্থবিদ্যার শিলাবৃষ্টিবর্ষণ হইতে থাকে, তবে তাহা পুষ্টিলাভ করিবে কী করিয়া। প্রায় বছর কুড়ি বয়স পর্যন্ত মারামারির পর ইংরেজি ভাষায় আমাদের স্বাধীন অধিকার জন্মে, কিন্তু ততদিন আমাদের মন কী খোরাকে বাঁচিয়াছে। আমরা কী ভাবিতে পাইয়াছি, আমাদের হৃদয় কী রস আকর্ষণ করিয়াছে, আমাদের কল্পনাবৃত্তি সৃষ্টিকার্য চর্চার জন্য কী উপকরণ লাভ করিয়াছে। যাহা গ্রহণ করি, তাহা সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ করিতে থাকিলে তবেই ধারণাটা পাকা হয়। পরের ভাষায় গ্রহণ করাও শক্ত প্রকাশ করাও কঠিন। এইরূপে রচনা করিবার চর্চা না থাকাতে যাহা শিখি তাহাতে আমাদের অধিকার দৃঢ় হইতেই পারে না। Key মুখস্থ করিয়া শেখা এবং লেখা, দুয়ের কাজ চালাইয়া দিতে হয়। যে-বয়সে মন অনেকটা পরিমাণে পাকিয়া যায়, সে-বয়সের লাভ পুরালাভ নহে। যে-কাঁচাবয়সে মন অজ্ঞাতসারে আপনার খাদ্য শোষণ করিতে পারে, তখনই সে জ্ঞান ও ভাবকে আপনার রক্তমাংসের সহিত পূর্ণভাবে মিশাইয়া নিজেকে সজীব সবল সক্ষম করিয়া তোলে। সেই সময়টাই আমাদের মাঠে মারা যায়। সে-মাঠ শস্যশূন্য অনুর্বর নীরস মাঠ। সেই মাঠে আমাদের বুদ্ধি ও স্বাস্থ্য কত যে মরিয়াছে তাহার হিসাব কে রাখে।

এইরূপ শিক্ষাপ্রণালীতে আমাদের মন যে অপরিণত থাকিয়া যায়, বুদ্ধি যে সম্পূর্ণ স্ফূর্তি পায় না, সে কথা আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে। আমাদের পাণ্ডিত্য অল্প কিছু দূর পর্যন্ত অগ্রসর হয়, আমাদের উদ্ভাবনাশক্তি শেষ পর্যন্ত পৌঁছে না, আমাদের ধারণাশক্তির বলিষ্ঠতা নাই। আমাদের ভাবাচিন্তা আমাদের লেখাপড়ার মধ্যে সেই ছাত্র-অবস্থার ক্ষীণতাই বরাবর থাকিয়া যায়; আমরা নকল করি, নজির খুঁজি, এবং স্বাধীন মত বলিয়া যাহা প্রচার করি, তাহা হয় কোনো না কোনো মুখস্থ বিদ্যার প্রতিধ্বনি, নয় একটা ছেলেমানুষি ব্যাপার। হয় মানসিক ভীরুতাবশত আমরা পদচিহ্ন মিলাইয়া চলি, নয় অজ্ঞতার স্পর্ধাবশত বেড়া ডিঙাইয়া চলিতে থাকি।

কিন্তু আমাদের বুদ্ধির যে স্বাভাবিক খর্বতা আছে, এ কথা কোনো মতেই স্বীকার্য নহে। আমাদের শিক্ষাপ্রণালীর ত্রুটি সত্ত্বেও আমরা অল্প সময়ের মধ্যে যতটা মাথা তুলিতে পারিয়াছি, সে আমাদের নিজের গুণে।

আর একটি কথা। শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গে যদি আর-কোনো অবান্তর উদ্দেশ্য ভিতরে ভিতরে থাকিয়া যায় তবে তাহাতে বিকার জন্মায়। আইরিশকে স্যাকসন করিবার চেষ্টায় তাহার শিক্ষাকেই মাটি করা হইয়াছে। কর্তৃপক্ষ আজকাল আমাদের শিক্ষার মধ্যে পোলিটিক্যাল মতলবকে সাঁধ করাইবার চেষ্টা করিতেছেন, তাহা বুঝা কঠিন নহে। সেইজন্য তাঁহারা শিক্ষাব্যাপারে দেশীয় লোকের স্বাধীনতা নানাদিক হইতে খর্ব করিতে উদ্যত হইয়াছেন। শিক্ষাকে তাঁহারা শাসনবিভাগের আপিসভুক্ত করিয়া লইতে চান। এখন হইতে অনভিজ্ঞ ডাইরেক্টরের পরীক্ষিত, অনভিজ্ঞ ম্যাকমিলান কোম্পানীর রচিত, অতি সংকীর্ণ, অতি দরিদ্র এবং বিকৃত বাংলার পাঠ্যগ্রন্থ পড়িয়া বাঙালির ছেলেকে মানুষ হইতে হইবে এবং বিদ্যালয়ের বইগুলি এমন ভাবে প্রস্তুত ও নির্বাচিত হইবে যাহাতে নিরপেক্ষ উদার জ্ঞানচর্চা পোলিটিক্যাল প্রয়োজনসিদ্ধির কাছে খণ্ডিত হইয়া যায়।

শুধু তাই নয়। ডিসিপ্লিনের যন্ত্রটাতে যে-পরিমাণ পাক দিলে ছেলেরা সংযত হয়, তাহার চেয়ে পাক বাড়াইবার চেষ্টা দেখা যাইতেছে, ইহাতে তাহাদিগকে নিঃসত্ত্ব করা হইবে। ছেলেদের মধ্যে ছেলেমানুষের চাঞ্চল্য যে স্বাভাবিক ও স্বাস্থ্যকর তাহা স্বদেশের সম্বন্ধে ইংরেজ ভালোই বোঝে। তাহারা জানে, এই চাঞ্চল্যকে দমন না করিয়া যদি নিয়মিত করিয়া পুষ্ট করা যায়, তবে ইহাই একদিন চরিত্র এবং বুদ্ধির শক্তিরূপে সঞ্চিত হইবে। এই চাঞ্চল্যকে একেবারে দলিত করাই কাপুরুষতাসৃষ্টির প্রধান উপায়। ছেলেদের যাহারা যথার্থ হিতৈষী, তাহারা এই চাঞ্চল্যের মধ্যে প্রকৃতির শুভ উদ্দেশ্য স্বীকার করে, তাহারা ইহাকে উপদ্রব বলিয়া গণ্য করে না। এইজন্য বালোচিত চাপল্যের নানাবিধ উৎপাতকে বিজ্ঞলোকেরা সস্নেহে রক্ষা করেন। ইংলণ্ডে এই ক্ষমাগুণের চর্চা যথেষ্ট দেখা যায়— এমন-কি, আমাদের কাছে তাহা অতিরিক্ত বলিয়া মনে হয়।

নিজে চিন্তা করিবে, নিজে সন্ধান করিবে, নিজে কাজ করিবে, এমনতরো মানুষ তৈরি করিবার প্রণালী এক, আর পরের হুকুম মানিয়া চলিবে, পরের মতের প্রতিবাদ করিবে না, ও পরের কাজের জোগানদার হইয়া থাকিবে মাত্র, এমন মানুষ তৈরির বিধান অন্যরূপ। আমরা স্বভাবত স্বজাতিকে স্বাতন্ত্র্যের জন্য প্রস্তুত করিতে ইচ্ছা করিব, সে কথা বলাই বাহুল্য। ইংলণ্ডের যখন সুদিন ছিল, তখন ইংলণ্ডও কোনো

জাতিসম্বন্ধেই এই আদর্শে বাধা দিত না— ভারতবর্ষে শিক্ষানীতি সম্বন্ধে মেকলের মন্তব্য তাহার প্রমাণ। এখন কালের পরিবর্তন হইয়াছে ; এইজন্যই শিক্ষার আদর্শ লইয়া কর্তৃপক্ষদের সঙ্গে স্বদেশভক্তদের বিরোধ অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িয়াছে। আমরা বিদ্যালয়ের সাহায্যে এ দেশে তাঁবেদারির চিরস্থায়ী ভিত্তি পত্তন করিতে কিছুতেই রাজি হইতে পারি না। কাজেই, সময় উপস্থিত হইয়াছে, এখন বিদ্যাশিক্ষাকে যেমন করিয়া হউক নিজের হাতে গ্রহণ করিতেই হইবে।

গবর্মেণ্ট-প্রতিষ্ঠিত সেনেটে সিণ্ডিকেটে বাঙালি থাকিলেই যে বিদ্যাশিক্ষার ভার আমাদের নিজের হাতে রহিল, তাহা আমি মনে করি না। গবর্মেণ্টের আমাদের কাছে জবাবদিহি না থাকিয়া দেশের লোকের কাছে জবাবদিহি থাকা চাই। আমরা গবর্মেণ্টের সম্মতির অধীনে যখন বাহ্যস্বাতন্ত্র্যের একটা বিড়ম্বনা লাভ করি, তখনই আমাদের বিপদ সব চেয়ে বেশি। তখন প্রসাদলব্ধ সেই মিথ্যা স্বাতন্ত্র্যের মূল্য যাহা দিতে হয়, তাহাতে মাথা বিকাইয়া যায়। বিশেষত দেশীলোককে দিয়াই দেশের মঙ্গল দলন করা গবর্মেণ্টের পক্ষে কিছুমাত্র কঠিন নহে, নইলে এ দেশের দুর্গতি কিসের। অতএব, চাকরির অধিকার নহে, মনুষ্যত্বের অধিকারের যোগ্য হইবার প্রতি যদি লক্ষ্য রাখি, তবে শিক্ষা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য-চেষ্টার দিন আসিয়াছে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। দেশের লোককে শিশুকাল হইতে মানুষ করিবার সদুপায় যদি নিজে উদ্ভাবন এবং তাহার উদ্যোগ যদি নিজে না করি, তবে আমরা সর্বপ্রকারে বিনাশপ্রাপ্ত হইব— অন্নে মরিব, স্বাস্থ্যে মরিব, বুদ্ধিতে মরিব, চরিত্রে মরিব— ইহা নিশ্চয়। বস্তুত আমরা প্রত্যহই মরিতেছি অথচ তাহার প্রতিকারের উপযুক্ত চেষ্টামাত্র করিতেছি না, তাহার চিন্তামাত্র যথার্থরূপে আমাদের মনেও উদয় হইতেছে না, এই-যে নিবিড় মোহাবৃত নিরুদ্যম ও চরিত্রবিকার— বাল্যকাল হইতে প্রকৃত শিক্ষা ব্যতীত কোনো অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের দ্বারা ইহা নিবারণের কোনো উপায় নাই।

বর্তমানকালে যে একটিমাত্র সাধক য়ুরোপে গুরুর আসনে বসিয়া নিরন্তর অরণ্যে রোদন করিয়া মরিতেছেন সেই টলস্টয় রুশিয়ার শিক্ষানীতি সম্বন্ধে যে-কথা বলিয়াছেন তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করি।

It seems to me that it is now specially important to do what is right quietly and persistently, not only without asking permission from Government, but consciously avoiding its participation. The strength of the Government lies in the people's ignorance, and the Government knows this, and will therefore always oppose true enlightenment. It is time we realized that fact. And it is most undesirable to let the Government, while it is spreading darkness, pretend to be busy with the enlightenment of the people. It is doing this now by means of all sorts of pseudo educational establishment which it controls : schools, high schools, universities, academies, and all kinds of committees and congresses. But good is good and enlightenment is enlightenment, only when it is quite good and quite enlightened and not when it is toned down to meet the requirements of Delyanof's or Dournovo's circulars. And I am extremely sorry when I see valuable, disinterested, and self-sacrificing efforts spent unprofitably. It is strange to see good, wise people spending their strength in a struggle against the Government, but carrying on this struggle on the basis of whatever laws the Government itself likes to make.

১৩১৩

শিক্ষাসমস্যা

জাতীয় শিক্ষাপরিষদের সভ্য আমার কয়েকজন শ্রদ্ধেয় সুহৃদ এই পরিষদের ইস্কুল-বিভাগের একটি গঠন-পত্রিকা তৈরি করিবার জন্য আমার উপরে ভার দিয়াছিলেন।

তাঁহাদের অনুরোধ রক্ষা করিতে বসিয়া দেখিলাম কাজটি সহজ নহে। কেননা, গোড়ায় জানা উচিত এই সংকল্পিত বিদ্যালয়ের কারণবীজটি কী, ইহার মূলে কোন্ ভাব আছে। আমার তাহা জানা নাই।

আমাদের শাস্ত্রে বলে, বাসনাই জন্মপ্রবাহের কারণ— বস্তুপুঞ্জের আকস্মিক সংঘটনই জন্মের হেতু নহে। যদি বাসনার ছেদ হয় তবে গোড়া কাটা পড়িয়া জন্মমৃত্যুর অবসান হইয়া যায়।

তেমনি বলা যাইতে পারে ভাব জিনিসটাই সকল অনুষ্ঠানের গোড়ায়। যদি ভাব না থাকে তবে নিয়ম থাকিতে পারে, টাকা থাকিতে পারে, কমিটি থাকিতে পারে কিন্তু কর্মের শিকড় কাটা পড়িয়া তাহা শুকাইয়া যায়।

তাই গোড়াতেই মনে প্রশ্ন উদয় হয় যে, জাতীয় শিক্ষাপরিষৎটি কোন্‌ ভাবের প্রেরণায় জন্মগ্রহণ করিতেছে। দেশে সম্প্রতি যে-সকল বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা আছে তাহার মধ্যে কোন্‌ ভাবের অভাব ছিল যাহাতে সেই শিক্ষা সম্পূর্ণ হইতেছিল না এবং প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ে সেই ভাবটিকে কোথায় স্থান-দেওয়া হইতেছে।

জাতীয় শিক্ষাপরিষৎ শুধু যদি কারুবিদ্যালয়-স্থাপনের জন্য প্রতিষ্ঠিত হইত তাহা হইলে বুঝিতাম যে, একটা বিশেষ সংকীর্ণ প্রয়োজন সাধন করাই ইহার উদ্দেশ্য। কিন্তু যখন দেখা যাইতেছে সাধারণত দেশের সমস্ত শিক্ষার প্রতি পরিষৎ দৃষ্টি রাখিতে চান তখন এই জিজ্ঞাসা মনে উঠে যে, কোন্‌ ভাবে এই শিক্ষাকার্য চলিবে। কোন্‌ নিয়মে চলিবে এবং কী কী বই পড়ানো হইবে সে-সমস্ত বাহিরের কথা।

ইহার উত্তরে যদি কেহ বলেন "জাতীয়" ভাবে শিক্ষা দেওয়া হইবে, তবে প্রশ্ন উঠিবে শিক্ষা সম্বন্ধে জাতীয় ভাব বলিতে কী বুঝায়। "জাতীয়" শব্দটার কোনো সীমা নির্দেশ হয় নাই, হওয়াও শক্ত। কোন্‌টা জাতীয় এবং কোন্‌টা জাতীয় নহে, শিক্ষা সুবিধা ও সংস্কার অনুসারে ভিন্ন লোকে তাহা ভিন্ন রকমে স্থির করেন।

অতএব শিক্ষাপরিষদের মূল ভাবটি সম্বন্ধে গোড়াতেই দেশের লোকে সকলে মিলিয়া একটা বোঝাপড়া হওয়া দরকার। ইংরেজ সরকারের প্রতি রাগ করিয়া আমরা এই কাজে প্রবৃত্ত হইয়াছি এ কথা এক মুহূর্তের জন্য মনে স্থান দিতে পারি না। দেশের অন্তঃকরণ একটা-কিছু অভাব বোধ করিয়াছিল, একটা-কিছু চায়, সেইজন্যই আমরা দেশের সেই ক্ষুধা নিবৃত্তি করিতে একত্র হইয়াছি এই কথাই সত্য।

আমরা চাই— কিন্তু কী চাই তাহা বাহির করা যে সহজ তাহা মনে করি না। এই সম্বন্ধে সত্য আবিষ্কারের পরেই আমাদের উদ্ধার নির্ভর করে। যদি ভুল করি, যেটা হাতের কাছেই আছে, আমরা যেটাতে অভ্যস্ত, জড়ত্ববশত যদি সেইটেকেই সত্য মনে করি তবে বড়ো বড়ো নাম আমাদিগকে বিফলতা হইতে রক্ষা করিতে পারিবে না।

এইজন্য শিক্ষাপরিষদের প্রতিষ্ঠাতাগণ যখন উদ্‌যোগে প্রবৃত্ত আছেন তখন দেশের সর্বসাধারণের তরফ হইতে নিজের চিত্ত নিজের অভাব বুঝিবার জন্য একটা আলোচনা হওয়া উচিত।

সেই আলোচনাকে জাগাইয়া তোলাই আমার এই রচনার প্রধান উদ্দেশ্য। এই উপলক্ষে, যে-ভাবটি আমার মনের সম্মুখে জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে তাহাকে দেশের দরবারে উপস্থিত করা আমার কর্তব্য। যদি শিক্ষিত সমাজের প্রচলিত সংস্কারের সঙ্গে ইহার বিরোধ বাধে তবে ইহা গ্রাহ্য হইবে না, জানি। যদি গ্রাহ্য না হয় তবে

আপনাদের একটা সুবিধা আছে— আপনারা সমস্তটাকে কবিকল্পনার আকাশকুসুম বলিয়া অতি সংক্ষেপেই বর্জন করিতে পারিবেন এবং আমিও ব্যর্থ কবিদের সান্ত্বনাস্থল "পস্টারিটি" অর্থাৎ কোনো একটা অনির্দিষ্ট উত্তরকালের মধ্যে আমার অনাদৃত প্রস্তাবটির ভাবী সদ্‌গতি কল্পনা করিয়া আশ্বাস-লাভের চেষ্টা করিব। কিন্তু তৎপূর্বে আজ আপনাদের নিকট বহুল পরিমাণে ধৈর্য ও ক্ষমা সানুনয়ে প্রার্থনা করি।

ইস্কুল বলিতে আমরা যাহা বুঝি সে একটা শিক্ষা দিবার কল। মাস্টার এই কারখানার একটা অংশ। সাড়ে দশটার সময় ঘণ্টা বাজাইয়া কারখানা খোলে। কল চলিতে আরম্ভ হয়, মাস্টারেরও মুখ চলিতে থাকে। চারটের সময় কারখানা বন্ধ হয়, মাস্টার-কলও তখন মুখ বন্ধ করেন, ছাত্ররা দুই-চার পাত কলে-ছাঁটা বিদ্যা লইয়া বাড়ি ফেরে। তার পর পরীক্ষার সময় এই বিদ্যার যাচাই হইয়া তাহার উপরে মার্কা পড়িয়া যায়।

কলের একটা সুবিধা, ঠিক মাপে ঠিক ফরমাশ-দেওয়া জিনিসটা পাওয়া যায়— এক কলের সঙ্গে আর-এক কলের উৎপন্ন সামগ্রীর বড়ো-একটা তফাত থাকে না, মার্কা দিবার সুবিধা হয়।

কিন্তু এক মানুষের সঙ্গে আর-এক মানুষের অনেক তফাত। এমন-কি, একই মানুষের একদিনের সঙ্গে আর-একদিনের ইতর-বিশেষ ঘটে।

তবু মানুষের কাছ হইতে মানুষ যাহা পায় কলের কাছ হইতে তাহা পাইতে পারে না। কল সম্মুখে উপস্থিত করে কিন্তু দান করে না— তাহা তেল দিতে পারে কিন্তু আলো জ্বালাইবার সাধ্য তাহার নাই।

য়ুরোপে মানুষ সমাজের ভিতরে থাকিয়া মানুষ হইতেছে, ইস্কুল তাহার কথঞ্চিৎ সাহায্য করিতেছে। লোকে যে-বিদ্যা লাভ করে সে-বিদ্যাটা সেখানকার মানুষ হইতে বিচ্ছিন্ন নহে — সেইখানেই তাহার চর্চা হইতেছে, সেইখানেই তাহার বিকাশ হইতেছে— সমাজের মধ্যে নানা আকারে নানা ভাবে তাহার সঞ্চার হইতেছে, লেখাপড়ায় কথাবার্তায় কাজেকর্মে তাহা অহরহ প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিতেছে। সেখানে জনসমাজ যাহা কালে কালে নানা ঘটনায় নানা লোকের দ্বারায় লাভ করিয়াছে, সঞ্চয় করিয়াছে এবং ভোগ করিতেছে তাহাই বিদ্যালয়ের ভিতর দিয়া বালকদিগকে পরিবেশনের একটা উপায় করিয়াছে মাত্র।

এইজন্য সেখানকার বিদ্যালয় সমাজের সঙ্গে মিশিয়া আছে, তাহা সমাজের মাটি হইতেই রস টানিতেছে এবং সমাজকেই ফলদান করিতেছে।

কিন্তু বিদ্যালয় যেখানে চারিদিকের সমাজের সঙ্গে এমন এক হইয়া মিশিতে পারে

নাই, যাহা বাহির হইতে সমাজের উপরে চাপাইয়া দেওয়া, তাহা শুষ্ক তাহা নির্জীব। তাহার কাছ হইতে যাহা পাই তাহা কষ্টে পাই, এবং সে-বিদ্যা প্রয়োগ করিবার বেলা কোনো সুবিধা করিয়া উঠিতে পারি না। দশটা হইতে চারটে পর্যন্ত যাহা মুখস্থ করি, জীবনের সঙ্গে, চারিদিকের মানুষের সঙ্গে, ঘরের সঙ্গে তাহার মিল দেখিতে পাই না। বাড়িতে বাপমা-ভাইবন্ধুরা যাহা আলোচনা করেন বিদ্যালয়ের শিক্ষার সঙ্গে তাহার যোগ নাই, বরঞ্চ অনেক সময়ে বিরোধ আছে। এমন অবস্থায় বিদ্যালয় একটা এঞ্জিন মাত্র হইয়া থাকে— তাহা বস্তু জোগায়, প্রাণ জোগায় না।

এইজন্য বলিতেছি, য়ুরোপের বিদ্যালয়ের অবিকল বাহ্য নকল করিলেই আমরা যে সেই একই জিনিস পাইব এমন নহে। এই নকলে সেই বেঞ্চি, সেই টেবিল, সেইপ্রকার কার্যপ্রণালী সমস্তই ঠিক মিলাইয়া পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা আমাদের পক্ষে বোঝা হইয়া উঠে।

পূর্বে যখন আমরা গুরুর কাছে বিদ্যা পাইতাম শিক্ষকের কাছে নহে, মানুষের কাছে জ্ঞান চাহিতাম কলের কাছে নয়, তখন আমাদের শিক্ষার বিষয় এত বিচিত্র ও বিস্তৃত ছিল না এবং তখন আমাদের সমাজে প্রচলিত ভাব ও মতের সঙ্গে পুঁথির শিক্ষার কোনো বিরোধ ছিল না। ঠিক সেদিনকে আজ ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিলে সে-ও একটা নকল হইবে মাত্র, তাহার বাহ্য আয়োজন বোঝা হইয়া উঠিবে, কোনো কাজেই লাগিবে না।

অতএব আমাদের এখনকার প্রয়োজন যদি আমরা ঠিক বুঝি তবে এমন ব্যবস্থা করিতে হইবে যাহাতে বিদ্যালয় ঘরের কাজ করিতে পারে; যাহাতে পাঠ্যবিষয়ের বিচিত্রতার সঙ্গে অধ্যাপনার সজীবতা মিশিতে পারে; যাহাতে পুঁথির শিক্ষাদান এবং হৃদয়-মনকে গড়িয়া তোলা দুই ভারই বিদ্যালয় গ্রহণ করে। দেখিতে হইবে আমাদের দেশে বিদ্যালয়ের সঙ্গে বিদ্যালয়ের চতুর্দিকের যে বিচ্ছেদ, এমন-কি, বিরোধ আছে তাহার দ্বারা যেন ছাত্রদের মন বিক্ষিপ্ত হইয়া না যায় ও এইরূপে বিদ্যাশিক্ষাটা যেন কেবল দিনের মধ্যে কয়েকঘণ্টা মাত্র সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হইয়া উঠিয়া বাস্তবিকতাসম্পর্কশূন্য একটা অত্যন্ত গুরুপাক অ্যাব্‌স্ট্রাক্ট ব্যাপার হইয়া না দাঁড়ায়।

বিদ্যালয়ে ঘর বানাইলে তাহা বোর্ডিংইস্কুল আকার ধারণ করে। এই বোর্ডিংইস্কুল বলিতে যে-ছবি মনে জাগিয়া উঠে তাহা মনোহর নয়— তাহা বারিক, পাগলাগারদ, হাসপাতাল বা জেলেরই একগোষ্ঠীভুক্ত।

অতএব বিলাতের নজির একেবারে ছাড়িতে হইবে, কারণ, বিলাতের ইতিহাস, বিলাতের সমাজ আমাদের নহে। আমাদের দেশের লোকের মনকে কোন্‌ আদর্শ

বহুদিন মুগ্ধ করিয়াছে, আমাদের দেশের হৃদয়ে রসসঞ্চার হয় কিসে তাহা ভালো করিয়া বুঝিতে হইবে।

বুঝিবার বাধা যথেষ্ট আছে। আমরা ইংরেজি ইস্কুলে পড়িয়াছি, যে দিকে তাকাই ইংরেজের দৃষ্টান্ত আমাদের চোখের সামনে প্রত্যক্ষ। ইহার আড়ালে, আমাদের দেশের ইতিহাস, আমাদের স্বজাতির হৃদয়, অস্পষ্ট হইয়া আছে। আমরা ন্যাশনাল পতাকাটাকে উচ্চে তুলিয়া যখন স্বাধীন চেষ্টায় কাজ করিব বলিয়া কোমর বাঁধিয়া বসি তখনও বিলাতের বেড়ি কোমরবন্ধ হইয়া আমাদিগকে বাঁধিয়া ফেলে, আমাদিগকে নজিরের বাহিরে নড়িতে দেয় না।

আমাদের একটা মুশকিল এই যে, আমরা ইংরেজি বিদ্যা ও বিদ্যালয়ের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজি সমাজকে অর্থাৎ সেই বিদ্যা ও বিদ্যালয়কে তাহার যথাস্থানে দেখিতে পাই না। আমরা ইহাকে সজীব লোকালয়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া জানি না। এইজন্য সেই বিদ্যালয়ের এ দেশী প্রতিরূপটিকে কেমন করিয়া আমাদের জীবনের সঙ্গে মিলাইয়া লইতে হইবে তাহাই জানি না অথচ ইহাই জানা সবচেয়ে প্রয়োজনীয়। বিলাতের কোন্ কলেজে কোন্ বই পড়ানো হয় এবং তাহার নিয়ম কী ইহা লইয়া তর্কবিতর্কে কালক্ষেপ করা সময়ের সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার নহে।

এ সম্বন্ধে আমাদের হাড়ের মধ্যে একটা অন্ধ সংস্কার প্রবেশ করিয়াছে। যেমন তিব্বতি মনে করে যে, লোক ভাড়া করিয়া তাহাকে দিয়া একটা মন্ত্রলেখা চাকা চালাইলেই পুণ্যলাভ হয় তেমনি আমরাও মনে করি, কোনোমতে একটা সভা স্থাপন করিয়া কমিটির দ্বারা যদি সেটা চালাইয়া যাই তবেই আমরা ফললাভ করিব। বস্তুত সেই স্থাপন করাটাই যেন লাভ। আমরা অনেকদিন হইল একটা বিজ্ঞানসভা স্থাপন করিয়াছি, তাহার পরে বৎসরে বৎসরে বিলাপ করিয়া আসিয়াছি— দেশের লোকে বিজ্ঞানশিক্ষায় উদাসীন। কিন্তু একটা বিজ্ঞানসভা স্থাপন করা এক, আর দেশের লোকের চিত্তকে বিজ্ঞানশিক্ষায় নিবিষ্ট করা আর। সভা ফাঁদিলেই তাহার পরে দেশের লোক বিজ্ঞানী হইয়া উঠিবে এরূপ মনে করা ঘোর কলিযুগের কল-নিষ্ঠার পরিচয়।

আসল কথা, মানুষের মন পাইতে হইবে, তাহা হইলে যেটুকু আয়োজন করা যায় সেইটুকুই পুরা ফল দেয়। ভারতবর্ষ যখন শিক্ষা দিত তখন মন পাইয়াছিল কী করিয়া সে কথাটা ভাবিয়া দেখা চাই— বিদেশী য়ুনিভার্সিটির ক্যালেণ্ডার খুলিয়া তাহার রস বাহির করিবার জন্য তাহাতে পেনসিলের দাগ দিতে নিষেধ করিব না কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই বিচারটাও উপেক্ষার বিষয় নহে। কী শিখাইব তাহা ভাবিবার বটে কিন্তু যাহাকে

শিখাইব তাহার সমস্ত মনটা কী করিয়া পাওয়া যাইতে পারে সে-ও কম কথা নয়।

একদিন তপোবনে ভারতবর্ষের গুরুগৃহ ছিল এইরূপ একটা পুরাণকথা আমাদের দেশে প্রচলিত আছে। অবশ্য তপোবনের যে একটা পরিষ্কার ছবি আমাদের মনে আছে তাহা নহে এবং তাহা অনেক অলৌকিকতার কুহেলিকায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে।

যে কালে এই-সকল আশ্রম সত্য ছিল সে কালে তাহারা ঠিক কিরূপ ছিল তাহা লইয়া তর্ক করিব না, করিতে পারিব না। কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে, এই-সকল আশ্রমে যাঁহারা বাস করিতেন তাঁহারা গৃহী ছিলেন এবং শিষ্যগণ সন্তানের মতো তাঁহাদের সেবা করিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে বিদ্যা গ্রহণ করিতেন। এই ভাবটাই আমাদের দেশের টোলেও আজ কতকটা পরিমাণে চলিয়া আসিয়াছে।

এই টোলের প্রতি লক্ষ্য করিলেও দেখা যাইবে, চতুষ্পাঠীতে কেবলমাত্র পুঁথির পড়াটাই সবচেয়ে বড়ো জিনিস নয়, সেখানে চারিদিকেই অধ্যয়ন-অধ্যাপনার হাওয়া বহিতেছে। গুরু নিজেও ওই পড়া লইয়াই আছেন ; শুধু তাই নয়, সেখানে জীবনযাত্রা নিতান্ত সাধাসিধা ; বৈষয়িকতা বিলাসিতা মনকে টানাছেঁড়া করিতে পারে না, সুতরাং শিক্ষাটা একেবারে স্বভাবের সঙ্গে মিশ খাইবার সময় ও সুবিধা পায়। য়ুরোপের বড়ো বড়ো শিক্ষাগারেও যে এই ভাবটি নাই সে কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নহে।

প্রাচীন ভারতবর্ষের মতে, যতদিন অধ্যয়নের কাল ততদিন ব্রহ্মচর্যপালন এবং গুরুগৃহে বাস আবশ্যক।

ব্রহ্মচর্যপালন বলিতে যে কৃচ্ছ্রসাধন বুঝায় তাহা নহে। সংসারের মাঝখানে যাহারা থাকে তাহারা ঠিক স্বভাবের পথে চলিতে পারে না। নানা লোকের সংঘাতে নানাদিক হইতে নানা ঢেউ আসিয়া অনেক সময়ে অনাবশ্যকরূপে তাহাদিগকে চঞ্চল করিতে থাকে— যে সময়ে যে-সকল হৃদয়বৃত্তি ভ্রূণ অবস্থায় থাকিবার কথা তাহারা কৃত্রিম আঘাতে অকালে জন্মগ্রহণ করে ; ইহাতে কেবলই শক্তির অপব্যয় হয় এবং মন দুর্বল এবং লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া পড়ে।

অথচ জীবনের আরম্ভকালে বিকৃতির সমস্ত কৃত্রিম কারণ হইতে স্বভাবকে প্রকৃতিস্থ রাখা নিতান্তই আবশ্যক। প্রবৃত্তির অকালবোধন এবং বিলাসিতার উগ্র উত্তেজনা হইতে মনুষ্যত্বের নবোদ্‌গমের অবস্থাকে স্নিগ্ধ করিয়া রক্ষা করাই ব্রহ্মচর্য পালনের উদ্দেশ্য।

বস্তুত এই স্বভাবের নিয়মের মধ্যে থাকা বালকদের পক্ষে সুখের অবস্থা। ইহাতে তাহাদের পূর্ণ বিকাশের সহায়তা করে, ইহাতেই তাহারা যথার্থভাবে স্বাধীনতার আনন্দ লাভ করিতে পায়। ইহাতে তাহাদের নবাঙ্কুরিত নির্মল সতেজ মন সমস্ত শরীরের মধ্যে দীপ্তির সঞ্চার করে।

ব্রহ্মচর্যপালনের পরিবর্তে আজকাল নীতিপাঠের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। যে-কোনো উপলক্ষে ছাত্রদিগকে নীতি-উপদেশ দিতে হইবে, দেশের অভিভাবকদের এইরূপ অভিপ্রায়।

ইহাও ওই কলের ব্যাপার। নিয়মিত প্রত্যহ খানিকটা করিয়া সালসা খাওয়ানোর মতো খানিকটা নীতি-উপদেশ— ইহা একটা বরাদ্দ; শিশুকে ভালো করিয়া তুলিবার এই একটা বাঁধা উপায়।

নীতি-উপদেশ জিনিসটা একটা বিরোধ। ইহা কোনোমতেই মনোরম হইতে পারে না। যাহাকে উপদেশ দেওয়া হয় তাহাকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়। উপদেশ হয় তাহার মাথা ডিঙাইয়া চলিয়া যায়, নয় তাহাকে আঘাত করে। ইহাতে যে কেবল চেষ্টা ব্যর্থ হয় তাহা নয়, অনেক সময় অনিষ্ট করে। সৎকথাকে বিরস ও বিফল করিয়া তোলা মনুষ্যসমাজের যেমন ক্ষতিকর এমন আর কিছুই নয়— অথচ অনেক ভালো লোক এই কাজে উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছেন, ইহা দেখিয়া মনে আশঙ্কা হয়।

সংসারে কৃত্রিম জীবনযাত্রায় হাজার রকমের অসত্য ও বিকৃতি যেখানে প্রতিমুহূর্তে রুচি নষ্ট করিয়া দিতেছে সেখানে ইস্কুলে দশটা-চারটের মধ্যে গোটাকতক পুঁথির বচনে সমস্ত সংশোধন করিয়া দিবে ইহা আশাই করা যায় না। ইহাতে কেবল ভূরি ভূরি ভাণের সৃষ্টি হয়, এবং নৈতিক জ্যাঠামি যাহা সকল জ্যাঠামির অধম, তাহা সুবুদ্ধির স্বাভাবিকতা ও সৌকুমার্য নষ্ট করিয়া দেয়।

ব্রহ্মচর্যপালনের দ্বারা ধর্মসম্বন্ধে সুরুচিকে স্বাভাবিক করিয়া দেওয়া হয়— উপদেশ দেওয়া নহে, শক্তি দেওয়া হয়। নীতিকথাকে বাহ্যভূষণের মতো জীবনের উপরে চাপাইয়া দেওয়া নহে, জীবনকেই ধর্মের সঙ্গে গড়িয়া তোলা এবং এইরূপে ধর্মকে বিরুদ্ধপক্ষে দাঁড় না করাইয়া তাহাকে অন্তরঙ্গ করিয়া দেওয়া হয়। অতএব জীবনের আরম্ভে মনকে চরিত্রকে গড়িয়া তুলিবার সময় উপদেশ নহে, অনুকূল অবস্থা এবং অনুকূল নিয়মই সকলের চেয়ে বেশি আবশ্যক।

শুধু এই ব্রহ্মচর্যপালন নয়, তাহার সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির আনুকূল্য থাকা চাই। শহর ব্যাপারটা মানুষের কাজের প্রয়োজনেই তৈরি হইয়াছে; তাহা আমাদের স্বাভাবিক আবাস নয়। ইটকাঠপাথরের কোলে ভূমিষ্ঠ হইয়া আমরা মানুষ হইব, বিধাতার এমন

বিধান ছিল না। আপিসের কাছে এবং এই আপিসের শহরের কাছে পুষ্পপল্লব-চন্দ্রসূর্যের কোনো দাবি নাই, তাহা সজীব সরস বিশ্বপ্রকৃতির বক্ষ হইতে ছিনাইয়া লইয়া আমাদিগকে তাহার উত্তপ্ত জঠরের মধ্যে গিলিয়া পরিপাক করিয়া ফেলে। যাহারা ইহাতেই অভ্যস্ত এবং যাহারা কাজের নেশায় বিহ্বল তাহারা এ সম্বন্ধে কোনো অভাবই অনুভব করে না— তাহারা স্বভাব হইতে ভ্রষ্ট হইয়া বৃহৎ জগতের সংস্রব হইতে প্রতিদিনই দূরে চলিয়া যায়।

কিন্তু কাজের ঘূর্ণির মধ্যে ঘাড়মুড় ভাঙিয়া পড়িবার পূর্বে, শিখিবার কালে বাড়িয়া উঠিবার সময়ে, প্রকৃতির সহায়তা নিতান্তই চাই। গাছপালা, স্বচ্ছ আকাশ, মুক্তবায়ু, নির্মল জলাশয়, উদার দৃশ্য, ইহারা বেঞ্চি এবং বোর্ড, পুঁথি এবং পরীক্ষার চেয়ে কম আবশ্যক নয়।

চিরদিন উদার বিশ্বপ্রকৃতির ঘনিষ্ঠসংস্রবে থাকিয়াই ভারতবর্ষের মন গড়িয়া উঠিয়াছে। জগতের জড়-উদ্ভিদ-চেতনের সঙ্গে নিজকে একান্তভাবে ব্যাপ্ত করিয়া দেওয়া ভারতবর্ষের স্বভাবসিদ্ধ হইয়াছে। ভারতবর্ষের তপোবনে দ্বিজবটুগণ এই মন্ত্র আবৃত্তি করিয়াছেন—

যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।
য ওষধিষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ॥

যে দেবতা অগ্নিতে, যিনি জলে, যিনি বিশ্বভুবনে আবিষ্ট হইয়া আছেন, যিনি ওষধিতে যিনি বনস্পতিতে সেই দেবতাকে নমস্কার করি, নমস্কার করি।

অগ্নি বায়ু জলস্থল বিশ্বকে বিশ্বাত্মা দ্বারা সহজে পরিপূর্ণ করিয়া দেখিতে শেখাই যথার্থ শেখা। এই শিক্ষা শহরের ইস্কুলে ঠিকমতো সম্ভবে না; সেখানে বিদ্যাশিক্ষার কারখানাঘরে জগৎকে আমরা একটা যন্ত্র বলিয়াই শিখিতে পারি।

কিন্তু এখনকার দিনের কাজের লোকেরা এ-সকল কথা মিস্টিসিজম বা ভাবকুহেলিকা বলিয়া উড়াইয়া দিবেন, অতএব ইহা লইয়া সমস্ত আলোচনাটাকে অশ্রদ্ধাভাজন করিবার প্রয়োজন নাই।

তথাপি, খোলা আকাশ খোলা বাতাস এবং গাছপালা মানবসন্তানের শরীরমনের সুপরিণতির জন্য যে অত্যন্ত দরকার এ কথা বোধ হয় কেজো লোকেরাও একেবারেই উড়াইয়া দিতে পারিবেন না। বয়স যখন বাড়িবে, আপিস যখন টানিবে, লোকের ভিড় যখন ঠেলিয়া লইয়া বেড়াইবে, মন যখন নানা মতলবে নানা দিকে ফিরিবে তখন বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ হৃদয়ের যোগ অনেকটা বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে। তাহার পূর্বে যে জলস্থল-আকাশবায়ুর চিরন্তন ধাত্রীক্রোড়ের মধ্যে জন্মিয়াছি, তাহার সঙ্গে

যথার্থভাবে পরিচয় হইয়া যাক, মাতৃস্তন্যের মতো তাহার অমৃতরস আকর্ষণ করিয়া লই, তাহার উদার মন্ত্র গ্রহণ করি, তবেই সম্পূর্ণরূপে মানুষ হইতে পারিব। বালকদের হৃদয় যখন নবীন আছে, কৌতূহল যখন সজীব এবং সমুদয় ইন্দ্রিয়শক্তি যখন সতেজ তখনই তাহাদিগকে মেঘ ও রৌদ্রের লীলাভূমি অবারিত আকাশের তলে খেলা করিতে দাও— তাহাদিগকে এই ভূমার আলিঙ্গন হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিও না। স্নিগ্ধনির্মল প্রাতঃকালে সূর্যোদয় তাহাদের প্রত্যেক দিনকে জ্যোতির্ময় অঙ্গুলির দ্বারা উদ্‌ঘাটিত করুক এবং সূর্যাস্তদীপ্ত সৌম্যগম্ভীর সায়াহ্ন তাহাদের দিবাবসানকে নক্ষত্রখচিত অন্ধকারের মধ্যে নিঃশব্দে নিমীলিত করিয়া দিক। তরুলতার শাখাপল্লবিত নাট্যশালায় ছয় অঙ্কে ছয় ঋতুর নানারসবিচিত্র গীতিনাট্যাভিনয় তাহাদের সম্মুখে ঘটিতে দাও। তাহারা গাছের তলায় দাঁড়াইয়া দেখুক, নববর্ষা প্রথমযৌবরাজ্যে অভিষিক্ত রাজপুত্রের মতো তাহার পুঞ্জ পুঞ্জ সজলনিবিড় মেঘ লইয়া আনন্দগর্জনে চিরপ্রত্যাশী বনভূমির উপরে আসন্নবর্ষণের ছায়া ঘনাইয়া তুলিতেছে; এবং শরতে অন্নপূর্ণা ধরিত্রীর বক্ষে শিশিরে সিঞ্চিত, বাতাসে চঞ্চল, নানাবর্ণে বিচিত্র, দিগন্তব্যাপ্ত শ্যামল সফলতার অপর্যাপ্ত বিস্তার স্বচক্ষে দেখিয়া তাহাদিগকে ধন্য হইতে দাও। হে প্রবীণ অভিভাবক, হে বিষয়ী, তুমি কল্পনাবৃত্তিকে যতই নির্জীব, হৃদয়কে যতই কঠিন করিয়া থাক, দোহাই তোমার, এ কথা অন্তত লজ্জাতেও বলিয়ো না যে, ইহার কোনো আবশ্যক নাই; তোমার বালকদিগকে বিশাল বিশ্বের মধ্য দিয়া বিশ্বজননীর প্রত্যক্ষলীলাস্পর্শ অনুভব করিতে দাও— তাহা তোমার ইনস্পেক্টরের তদন্ত এবং পরীক্ষকের প্রশ্নপত্রিকার চেয়ে যে কত বেশি কাজ করে তাহা অন্তরে অনুভব কর না বলিয়াই তাহাকে নিতান্ত উপেক্ষা করিয়ো না।

মন যখন বাড়িতে থাকে তখন তাহার চারিদিকে একটা বৃহৎ অবকাশ থাকা চাই। বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে সেই অবকাশ বিশালভাবে বিচিত্রভাবে সুন্দর ভাবে বিরাজমান। কোনোমতে সাড়েনয়টা-দশটার মধ্যে তাড়াতাড়ি অন্ন গিলিয়া বিদ্যাশিক্ষার হরিণবাড়ির মধ্যে হাজিরা দিয়া কখনই ছেলেদের প্রকৃতি সুস্থভাবে বিকাশ লাভ করিতে পারে না। শিক্ষাকে দেয়াল দিয়া ঘিরিয়া, গেট দিয়া রুদ্ধ করিয়া, দরোয়ান দিয়া পাহারা বসাইয়া, শাস্তি দ্বারা কণ্টকিত করিয়া, ঘণ্টা দ্বারা তাড়া দিয়া মানবজীবনের আরম্ভে এ কী নিরানন্দের সৃষ্টি করা হইয়াছে। শিশু যে অ্যাল্‌জেব্রা না কষিয়াই, ইতিহাসের তারিখ না মুখস্থ করিয়াই মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াছে সে জন্য সে কি অপরাধী। তাই সে হতভাগ্যদের নিকট হইতে তাহাদের আকাশ বাতাস তাহাদের আনন্দ অবকাশ সমস্ত কাড়িয়া লইয়া শিক্ষাকে সর্বপ্রকারেই তাহাদের পক্ষে শাস্তি করিয়া তুলিতে

হইবে ? না জানা হইতে ক্রমে ক্রমে জানিবার আনন্দ পাইবে বলিয়াই কি শিশুরা অশিক্ষিত হইয়া জন্মগ্রহণ করে না। আমাদের অক্ষমতা ও বর্বরতাবশত জ্ঞানশিক্ষাকে যদি আমরা আনন্দজনক করিয়া না তুলিতে পারি তবু চেষ্টা করিয়া, ইচ্ছা করিয়া, নিতান্ত নিষ্ঠুরতাপূর্বক নিরপরাধ শিশুদের বিদ্যাগারকে কেন আমরা কারাগারের আকৃতি দিই। শিশুদের জ্ঞানশিক্ষাকে বিশ্বপ্রকৃতির উদার রমণীয় অবকাশের মধ্য দিয়া উন্মেষিত করিয়া তোলাই বিধাতার অভিপ্রায় ছিল— সেই অভিপ্রায় আমরা যে পরিমাণে ব্যর্থ করিতেছি সেই পরিমাণেই ব্যর্থ হইতেছি। হরিণবাড়ির প্রাচীর ভাঙিয়া ফেলো— মাতৃগর্ভের দশমাসে পণ্ডিত হইয়া উঠে নাই বলিয়া শিশুদের প্রতি সশ্রম কারাদণ্ডের বিধান করিয়ো না, তাহাদিগকে দয়া করো।

তাই আমি বলিতেছি, শিক্ষার জন্য এখনও আমাদের বনের প্রয়োজন আছে এবং গুরুগৃহও চাই। বন আমাদের সজীব বাসস্থান এবং গুরু আমাদের সহৃদয় শিক্ষক। এই বনে, এই গুরুগৃহে আজও বালকদিগকে ব্রহ্মচর্যপালন করিয়া শিক্ষা সমাধা করিতে হইবে। কালে আমাদের অবস্থার যতই পরিবর্তন হইয়া থাক্‌, এই শিক্ষানিয়মের উপযোগিতার কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই, কারণ এ নিয়ম মানবচরিত্রের নিত্যসত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত।

অতএব, আদর্শ বিদ্যালয় যদি স্থাপন করিতে হয় তবে লোকালয় হইতে দূরে নির্জনে মুক্ত আকাশ ও উদার প্রান্তরে গাছপালার মধ্যে তাহার ব্যবস্থা করা চাই। সেখানে অধ্যাপকগণ নিভৃতে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় নিযুক্ত থাকিবেন এবং ছাত্রগণ সেই জ্ঞানচর্চার যজ্ঞক্ষেত্রের মধ্যেই বাড়িয়া উঠিতে থাকিবে।

যদি সম্ভব হয় তবে এই বিদ্যালয়ের সঙ্গে খানিকটা ফসলের জমি থাকা আবশ্যক ; এই জমি হইতে বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয় আহার্য সংগ্রহ হইবে, ছাত্ররা চাষের কাজে সহায়তা করিবে। দুধ-ঘি প্রভৃতির জন্য গোরু থাকিবে এবং গোপালনে ছাত্রদিগকে যোগ দিতে হইবে। পাঠের বিশ্রামকালে তাহারা স্বহস্তে বাগান করিবে, গাছের গোড়া খুঁড়িবে, গাছে জল দিবে, বেড়া বাঁধিবে। এইরূপে তাহারা প্রকৃতির সঙ্গে কেবল ভাবের নহে, কাজের সম্বন্ধও পাতাইতে থাকিবে।

অনুকূল ঋতুতে বড়ো বড়ো ছায়াময় গাছের তলায় ছাত্রদের ক্লাস বসিবে। তাহাদের শিক্ষার কতক অংশ অধ্যাপকের সহিত তরুশ্রেণীর মধ্যে বেড়াইতে বেড়াইতে সমাধা হইবে। সন্ধ্যার অবকাশ তাহারা নক্ষত্রপরিচয়ে, সংগীতচর্চায়, পুরাণকথা ও ইতিহাসের গল্প শুনিয়া যাপন করিবে।

অপরাধ করিলে ছাত্রগণ আমাদের প্রাচীন প্রথা অনুসারে প্রায়শ্চিত্ত পালন

করিবে। শাস্তি পরের নিকট হইতে অপরাধের প্রতিফল, প্রায়শ্চিত্ত নিজের দ্বারা অপরাধের সংশোধন। দণ্ডস্বীকার করা যে নিজেরই কর্তব্য এবং না করিলে যে গ্লানিমোচন হয় না এই শিক্ষা বাল্যকাল হইতেই হওয়া চাই— পরের নিকটে নিজেকে দণ্ডনীয় করিবার হীনতা মনুষ্যোচিত নহে।

যদি অভয় পাই তবে এই প্রসঙ্গে সাহসে ভর করিয়া আর-একটা কথা বলিয়া রাখি। এই বিদ্যালয়ে বেঞ্চি টেবিল চৌকির প্রয়োজন নাই। আমি ইংরেজি সামগ্রীর বিরুদ্ধে গোঁড়ামি করিয়া এই কথা বলিতেছি এমন কেহ যেন না মনে করেন। আমার বক্তব্য এই যে, আমাদের বিদ্যালয়ে অনাবশ্যককে খর্ব করিবার একটা আদর্শ সর্বপ্রকারে স্পষ্ট করিয়া তুলিতে হইবে। চৌকি টেবিল ডেস্ক সকল মানুষের সকল সময়ে জোটা সহজ নহে, কিন্তু ভূমিতল কেহ কাড়িয়া লইবে না। চৌকি টেবিলে সত্যসত্যই ভূমিতলকে কাড়িয়া লয়। এমন দশা ঘটে যে, ভূমিতল ব্যবহার করিতে বাধ্য হইলে সুখ পাই না, সুবিধা হয় না। ইহা একটা প্রকাণ্ড ক্ষতি। আমাদের দেশ শীতের দেশ নহে, আমাদের বেশভূষা এমন নয় যে আমরা নীচে বসিতে পারি না, অথচ পরদেশের অভ্যাসে আমরা আসবাবের বাহুল্য সৃষ্টি করিয়া কষ্ট বাড়াইতেছি। অনাবশ্যককে যে-পরিমাণে অত্যাবশ্যক করিয়া তুলিব সেই পরিমাণে আমাদের শক্তির অপব্যয় ঘটিবে। অথচ ধনী য়ুরোপের মতো আমাদের সম্বল নাই; তাহার পক্ষে যাহা সহজ আমাদের পক্ষে তাহা ভার। কোনো-একটা সৎকর্মের অনুষ্ঠান করিতে গেলেই গোড়াতে ঘরবাড়ি ও আসবাবপত্রের হিসাব খতাইয়া চক্ষে অন্ধকার দেখিতে হয়। এই হিসাবের মধ্যে অনাবশ্যকের দৌরাত্ম্য বারো আনা। আমরা কেহ সাহস করিয়া বলিতে পারি না, আমরা মাটির ঘরে কাজ আরম্ভ করিব, আমরা নীচে আসন পাতিয়া সভা করিব। এ কথা বলিতে পারিলে আমাদের অর্ধেক ভার লাঘব হইয়া যায় অথচ কাজের বিশেষ তারতম্য হয় না। কিন্তু যে দেশে শক্তির সীমা নাই, যে দেশে ধন কানায় কানায় ভরিয়া উপচিয়া পড়িতেছে সেই দেশের আদর্শে সমস্ত কাজের পত্তন না করিলে আমাদের লজ্জা দূর হয় না, আমাদের কল্পনা তৃপ্ত হয় না। ইহাতে আমাদের ক্ষুদ্র শক্তির অধিকাংশই আয়োজনে নিঃশেষিত হইয়া যায়, আসল জিনিসকে খোরাক জোগাইতে পারি না। যতদিন মেঝেতে খড়ি পাতিয়া হাত পাকাইয়াছি ততদিন পাঠশালা স্থাপন করিতে আমাদের ভাবনা ছিল না, এখন বাজারে স্লেট পেনসিলের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে কিন্তু পাঠশালা হওয়াই মুশকিল। সকল দিকেই ইহা দেখা যাইতেছে। পূর্বে আয়োজন যখন অল্প ছিল, সামাজিকতা অধিক ছিল; এখন আয়োজন বাড়িয়া চলিয়াছে এবং সামাজিকতায় ভাঁটা পড়িতেছে। আমাদের দেশে

একদিন ছিল যখন আসবাবকে আমরা ঐশ্বর্য বলিতাম কিন্তু সভ্যতা বলিতাম না; কারণ তখন দেশে যাঁহারা সভ্যতার ভাণ্ডারী ছিলেন তাঁহাদের ভাণ্ডারে আসবাবের প্রাচুর্য ছিল না। তাঁহারা দারিদ্র্যকে সুভদ্র করিয়া সমস্ত দেশকে সুস্থ-স্নিগ্ধ রাখিয়াছিলেন। অন্তত শিক্ষার দিনে যদি আমরা এই আদর্শে মানুষ হইতে পারি তবে আর কিছু না হউক হাতে আমরা কতকগুলি ক্ষমতা লাভ করি— মাটিতে বসিবার ক্ষমতা, মোটা পরিবার মোটা খাইবার ক্ষমতা, যথাসম্ভব অল্প আয়োজনে যথাসম্ভব বেশি কাজ চালাইবার ক্ষমতা— এগুলি কম ক্ষমতা নহে, এবং ইহা সাধনার অপেক্ষা রাখে। সুগমতা, সরলতা, সহজতাই যথার্থ সভ্যতা— বহু আয়োজনের জটিলতা বর্বরতা; বস্তুত তাহা গলদ্‌ঘর্ম অক্ষমতার স্তূপাকার জঞ্জাল। কতকগুলা জড়বস্তুর অভাবে মনুষ্যত্বের সম্ভ্রম যে নষ্ট হয় না বরঞ্চ অধিকাংশ স্থলেই স্বাভাবিক দীপ্তিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠে এ শিক্ষা শিশুকাল হইতে বিদ্যালয়ে লাভ করিতে হইবে— নিষ্ফল উপদেশের দ্বারা নহে, প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দ্বারা; এই নিতান্ত সহজ কথাকে সকল প্রকারে সাক্ষাৎভাবে ছেলেদের কাছে স্বাভাবিক করিয়া দিতে হইবে। এ শিক্ষা নহিলে শুধু যে আমরা নিজের হাতকে, পা-কে, ঘরের মেঝেকে, মাটিকে অবজ্ঞা করিতে অভ্যস্ত হইব তাহা নহে, আমাদের পিতা-পিতামহকে ঘৃণা করিব এবং প্রাচীন ভারতবর্ষের সাধনার মাহাত্ম্য যথার্থভাবে অনুভব করিতেই পারিব না।

এইখানে কথা উঠিবে, বাহিরের চিকনচাকনকে যদি তুমি খাতির করিতে না চাও তবে ভিতরের জিনিসটাকে বিশেষভাবে মূল্যবান করিয়া তুলিতে হইবে— সে-মূল্য দিবার সাধ্য কি আমাদের আছে। প্রথমেই জ্ঞানশিক্ষার আশ্রম স্থাপন করিতে হইলে গুরুর প্রয়োজন। শিক্ষক কাগজে বিজ্ঞাপন দিলেই জোটে কিন্তু গুরু তো ফরমাশ দিলেই পাওয়া যায় না।

এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, আমাদের সংগতি যাহা আছে তাহার চেয়ে বেশি আমরা দাবি করিতে পারি না এ কথা সত্য। অত্যন্ত প্রয়োজন হইলেও সহসা আমাদের পাঠশালায় গুরুমহাশয়ের আসনে যাজ্ঞবল্ক্য ঋষির আমদানি করা কাহারও আয়ত্তাধীন নহে। কিন্তু এ কথাও বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে, আমাদের যে সংগতি আছে অবস্থাদোষে তাহার পুরাটা দাবি না করিয়া আমরা সম্পূর্ণ মূলধন খাটাইতে পারি না এমন ঘটনাও ঘটে। ডাকের টিকিট লেফাফায় আঁটিবার জন্যই যদি জলের ঘড়া ব্যবহার করি তবে তাহার অধিকাংশ জলই অনাবশ্যক হয়; আবার, স্নান করিতে হইলে সেই ঘড়ার জলই সম্পূর্ণ নিঃশেষ করা যায়; একই ঘড়ার উপযোগিতা ব্যবহারের গুণে কমে বাড়ে। আমরা যাঁহাকে ইস্কুলের শিক্ষক করি

তাঁহাকে এমন করিয়া ব্যবহার করি যাহাতে তাঁহার হৃদয়মনের অতি অল্প অংশই কাজে খাটে— ফোনোগ্রাফ যন্ত্রের সঙ্গে একখানা বেত এবং কতকটা পরিমাণ মগজ জুড়িয়া দিলেই ইস্কুলের শিক্ষক তৈরি করা যাইতে পারে। কিন্তু এই শিক্ষককেই যদি গুরুর আসনে বসাইয়া দাও তবে স্বভাবতই তাঁহার হৃদয়মনের শক্তি সমগ্রভাবে শিষ্যের প্রতি ধাবিত হইবে। অবশ্য, তাঁহার যাহা সাধ্য তাহার চেয়ে বেশি তিনি দিতে পারিবেন না, কিন্তু তাহার চেয়ে কম দেওয়াও তাঁহার পক্ষে লজ্জাকর হইবে। একপক্ষ হইতে যথার্থভাবে দাবি না উত্থাপিত হইলে অন্যপক্ষে সম্পূর্ণ শক্তির উদ্বোধন হয় না। আজ ইস্কুলের শিক্ষকরূপে দেশের যেটুকু শক্তি কাজ করিতেছে, দেশ যদি অন্তরের সঙ্গে প্রার্থনা করে তবে গুরুরূপে তাহার চেয়ে অনেক বেশি শক্তি খাটিতে থাকিবে।

আজকাল প্রয়োজনের নিয়মে শিক্ষকের গরজ ছাত্রের কাছে আসা, কিন্তু স্বভাবের নিয়মে শিষ্যের গরজ গুরুকে লাভ করা। শিক্ষক দোকানদার, বিদ্যাদান তাঁহার ব্যবসায়। তিনি খরিদ্দারের সন্ধানে ফেরেন। ব্যাবসাদারের কাছে লোকে বস্তু কিনিতে পারে কিন্তু তাহার পণ্যতালিকার মধ্যে স্নেহ শ্রদ্ধা নিষ্ঠা প্রভৃতি হৃদয়ের সামগ্রী থাকিবে এমন কেহ প্রত্যাশা করিতে পারে না। এই প্রত্যাশা অনুসারেই শিক্ষক বেতন গ্রহণ করেন ও বিদ্যাবস্তু বিক্রয় করেন— এইখানে ছাত্রের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক শেষ। এইরূপ প্রতিকূল অবস্থাতেও অনেক শিক্ষক দেনাপাওনার সম্বন্ধ ছাড়াইয়া উঠেন— সে তাঁহাদের বিশেষ মাহাত্ম্য গুণে। এই শিক্ষকই যদি জানেন যে তিনি গুরুর আসনে বসিয়াছেন— যদি তাঁহার জীবনের দ্বারা ছাত্রের মধ্যে জীবনসঞ্চার করিতে হয়, তাঁহার জ্ঞানের দ্বারা তাহার জ্ঞানের বাতি জ্বালিতে হয়, তাঁহার স্নেহের দ্বারা তাহার কল্যাণসাধন করিতে হয়, তবেই তিনি গৌরবলাভ করিতে পারেন— তবে তিনি এমন জিনিস দান করিতে বসেন যাহা পণ্যদ্রব্য নহে, যাহা মূল্যের অতীত; সুতরাং ছাত্রের নিকট হইতে শাসনের দ্বারা নহে, ধর্মের বিধানে স্বভাবের নিয়মে তিনি ভক্তিগ্রহণের যোগ্য হইতে পারেন। তিনি জীবিকার অনুরোধে বেতন লইলেও তাহার চেয়ে অনেক বেশি দিয়া আপন কর্তব্যকে মহিমান্বিত করেন। এবারে বাংলাদেশের বিদ্যালয়গুলির 'পরে রাজচক্রের শনির দৃষ্টি পড়িবামাত্র কত প্রবীণ এবং নবীন শিক্ষক জীবিকালুব্ধ শিক্ষকবৃত্তির কলঙ্ককালিমা নির্লজ্জভাবে সমস্ত দেশের সম্মুখে প্রকাশ করিয়াছেন তাহা কাহারও অগোচর নাই। তাঁহারা যদি গুরুর আসনে থাকিতেন তবে পদগৌরবের খাতিরে এবং হৃদয়ের অভ্যাসবশতই ছোটো ছোটো ছেলেদের উপরে কন্‌স্টেবলি করিয়া নিজের ব্যবসায়কে এরূপ ঘৃণ্য

করিয়া তুলিতে পারিতেন না। এই শিক্ষা-দোকানদারির নীচতা হইতে দেশের শিক্ষককে ও ছাত্রগণকে কি আমরা রক্ষা করিব না।

কিন্তু এ-সকল বিস্তারিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া বোধ করি বৃথা হইতেছে। বোধ হয় গোড়ার কথাতেই অনেকের আপত্তি আছে। আমি জানি অনেকের মত এই যে, লেখাপড়া শিখাইবার জন্য ঘর হইতে ছাত্রদিগকে দূরে পাঠানো তাহাদের পক্ষে হিতকর নহে।

এ সম্বন্ধে প্রথম বক্তব্য কথা এই যে, লেখাপড়া শেখানো বলিতে আমরা আজকাল যাহা বুঝি তাহার জন্য বাড়ির গলির কাছে যে-কোনো-একটা সুবিধামতো ইস্কুল এবং তাহার সঙ্গে বড়ো-জোর একটা প্রাইভেট টিউটার রাখিলেই যথেষ্ট। কিন্তু এইরূপ 'লেখাপড়া করে যেই গাড়িঘোড়া চড়ে সেই' শিক্ষার দীনতা ও কার্পণ্য মানবসন্তানের পক্ষে যে অযোগ্য তাহা আমি একপ্রকার ব্যক্ত করিয়াছি।

দ্বিতীয় কথা এই, শিক্ষার জন্য বালকদিগকে ঘর হইতে দূরে পাঠানো উচিত নহে এ কথা মানিতে পারি যদি ঘর তেমনি হয়। কামার কুমার তাঁতী প্রভৃতি শিল্পীগণ ছেলেদিগকে নিজের কাছে রাখিয়াই মানুষ করে, তাহার কারণ তাহারা যেটুকু শিক্ষা দিতে চায় তাহা ঘরে রাখিয়াই ভালোরূপে চলিতে পারে। শিক্ষার আদর্শ আর-একটু উন্নত হইলে ইস্কুলে পাঠাইতে হয়, তখন এ কথা কেহ বলে না যে, বাপ-মায়ের কাছে শেখানোই সর্বাপেক্ষা শ্রেয়; কেননা, নানা কারণে তাহা সম্ভবপর হয় না। শিক্ষার আদর্শকে আরও যদি উচ্চে তুলিতে পারি, যদি কেবল পরীক্ষাফললোলুপ পুঁথির শিক্ষার দিকেই না তাকাইয়া থাকি, যদি সর্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্বের ভিত্তি স্থাপনকেই শিক্ষার লক্ষ্য বলিয়া স্থির করি, তবে তাহার ব্যবস্থা ঘরে এবং স্কুলে করা সম্ভবই হয় না।

সংসারে কেহ বা বণিক, কেহ বা উকিল, কেহ বা ধনী জমিদার, কেহ বা আর-কিছু। ইহাদের প্রত্যেকের ঘরের রকমসকম আবহাওয়া স্বতন্ত্র। ইহাদের ঘরে ছেলেরা শিশুকাল হইতে বিশেষ একটা ছাপ পাইতে থাকে।

জীবনযাত্রার বৈচিত্র্যে মানুষের আপনি যে একটা বিশেষত্ব ঘটে তাহা অনিবার্য এবং এইরূপে এক একটা ব্যবসায়ের বিশেষ আকারপ্রকার লইয়া মানুষ এক-একটা কোঠায় বিভক্ত হইয়া যায়, কিন্তু বালকেরা সংসারক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার পূর্বে অজ্ঞাতসারে তাহাদের অভিভাবকদের ছাঁচে তৈরি হইতে থাকা তাহাদের পক্ষে কল্যাণকর নহে।

উদাহরণস্বরূপ দেখা যাক ধনীর ছেলে। ধনীর ঘরে ছেলে জন্মগ্রহণ করে বটে কিন্তু ধনীর ছেলে বলিয়া বিশেষ একটা-কিছু লইয়া কেহ জন্মায় না। ধনীর ছেলে এবং

দরিদ্রের ছেলে কোনো প্রভেদ লইয়া আসে না। জন্মের পরদিন হইতে মানুষ সেই প্রভেদ নিজের হাতে তৈরি করিয়া তুলিতে থাকে।

এমন অবস্থায় বাপ-মায়ের উচিত ছিল, গোড়ায় সাধারণ মনুষ্যত্বে পাকা করিয়া তাহার পরে আবশ্যকমতে ছেলেকে ধনীর সন্তান করিয়া তোলা। কিন্তু তাহা ঘটে না, সে সম্পূর্ণরূপে মানবসন্তান হইতে শিখিবার পূর্বেই ধনীর সন্তান হইয়া উঠে, ইহাতে দুর্লভ মানবজন্মের অনেকটাই তাহার অদৃষ্টে বাদ পড়িয়া যায়, জীবনধারণের অনেক রসাস্বাদের ক্ষমতাই তাহার বিলুপ্ত হয়। প্রথমেই তো বদ্ধডানা খাঁচার পাখির মতো বাপ-মা ধনীর ছেলেকে হাত-পা সত্ত্বেও একেবারে পঙ্গু করিয়া ফেলেন। তাহার চলিবার জো নাই, গাড়ি চাই; সামান্য বোঝাটুকু বহিবার জো নাই, মুটে চাই; নিজের কাজ চালাইবার জো নাই, চাকর চাই। শুধু যে শারীরিক ক্ষমতার অভাবে এরূপ ঘটে তাহা নহে, লোকলজ্জায় সে-হতভাগ্য সুস্থ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সত্ত্বেও পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়া থাকে। যাহা সহজ তাহা তাহার পক্ষে কষ্টকর, যাহা স্বাভাবিক তাহা তাহার পক্ষে লজ্জাকর হইয়া উঠে। দলের লোকের মুখ চাহিয়া তাহাকে যে-সকল অনাবশ্যক শাসনে বদ্ধ হইতে হয় তাহাতে সে সহজ মনুষ্যের বহুতর অধিকার হইতে বঞ্চিত হয়। পাছে তাহাকে কেহ ধনী না মনে করে এইটুকু লজ্জা সে সহিতে পারে না, ইহার জন্য পর্বতপ্রমাণ ভার তাহাকে বহন করিতে হয় এবং এই ভারে পৃথিবীতে সে পদে পদে আবদ্ধ হইয়া থাকে। তাহাকে কর্তব্য করিতে হইলেও এই-সকল ভার বহিয়া করিতে হয়, আরাম করিতে হইলেও এই-সকল ভার লইয়া করিতে হয়, ভ্রমণ করিতে হইলে সঙ্গে সঙ্গে এই-সকল ভার টানিয়া বেড়াইতে হয়। সুখ যে মনে, আয়োজনে নহে, এই সরল সত্যটুকু তাহাকে সর্বপ্রকার চেষ্টার দ্বারা ভুলিতে দিয়া তাহাকে সহস্রবিধ জড়পদার্থের দাসানুদাস করিয়া তোলা হয়। নিজের সামান্য প্রয়োজনগুলিকে সে এত বাড়াইয়া তোলে যে, তাহার পক্ষে ত্যাগস্বীকার অসাধ্য হয়, কষ্টস্বীকার করা অসম্ভব হইয়া উঠে। জগতে এতবড়ো বন্দী এতবড়ো পঙ্গু আর কেহ নাই। তবু কি বলিতে হইবে, এই-সকল অভিভাবক, যাহারা কৃত্রিম অক্ষমতাকে গর্বের সামগ্রী করিয়া দাঁড় করাইয়া পৃথিবীর শস্যক্ষেত্রগুলিকে কাঁটার গাছে ছাইয়া ফেলিল তাহারাই সন্তানদের হিতৈষী। যাহারা বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া স্বেচ্ছাপূর্বক বিলাসিতাকে বরণ করিয়া লয় তাহাদিগকে বাধা দেওয়া কাহারও সাধ্য নয়— কিন্তু শিশুরা, যাহারা ধুলামাটিকে ঘৃণা করে না, যাহারা রৌদ্রবৃষ্টিবায়ুকে প্রার্থনা করে, যাহারা সাজসজ্জা করাইতে গেলে পীড়া বোধ করে, নিজের সমস্ত ইন্দ্রিয় চালনা করিয়া জগৎকে প্রত্যক্ষভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখাতেই যাহাদের সুখ, নিজের স্বভাবে স্থিতি

করিয়া যাহাদের লজ্জা নাই, সংকোচ নাই, অভিমান নাই, তাহাদিগকে চেষ্টার দ্বারা বিকৃত করিয়া দিয়া চিরদিনের মতো অকর্মণ্য করিয়া দেওয়া কেবল পিতামাতার দ্বারাই সম্ভব— সেই পিতামাতার হাত হইতে এই নিরপরাধগণকে রক্ষা করো।

আমরা জানি, অনেকের ঘরে বালকবালিকা সাহেবিয়ানায় অভ্যস্ত হইতেছে। তাহারা আয়ার হাতে মানুষ হয়, বিকৃত হিন্দুস্থানি শেখে, বাংলা ভুলিয়া যায় এবং বাঙালির ছেলে বাংলাসমাজ হইতে যে শত সহস্র ভাবসূত্রে আজন্মকাল বিচিত্র রস আকর্ষণ করিয়া পরিপুষ্ট হয় সেই-সকল সজাতীয় নাড়ির যোগ হইতে তাহারা বিচ্ছিন্ন হয় — অথচ ইংরেজি সমাজের সঙ্গে তাহাদের সম্বন্ধ থাকে না। তাহারা অরণ্য হইতে উৎপাটিত হইয়া বিলাতি টিনের টবের মধ্যে বড়ো হইতেছে। আমি স্বকর্ণে শুনিয়াছি এই শ্রেণীর একটি ছেলে দূর হইতে কয়েকজন দেশীভাবাপন্ন আত্মীয়কে দেখিয়া তাহার মাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছে— Mamma Mamma, look, lots of Babus are coming। বাঙালির ছেলের এমন দুর্গতি আর কী হইতে পারে। বড়ো হইয়া স্বাধীন রুচি ও প্রবৃত্তি -বশত যাহারা সাহেবি চাল অবলম্বন করে তাহারা করুক, কিন্তু তাহাদের শিশু-অবস্থায় যে-সকল বাপ-মা বহু অপব্যয়ে ও বহু অপচেষ্টায় সন্তানদিগকে সকল সমাজের বাহির করিয়া দিয়া স্বদেশে অযোগ্য এবং বিদেশে অগ্রাহ্য করিয়া তুলিতেছে, সন্তানদিগকে কেবলমাত্র কিছুকাল নিজের উপার্জনের নিতান্ত অনিশ্চিত আশ্রয়ের মধ্যে বেষ্টন করিয়া রাখিয়া ভবিষ্যৎ দুর্গতির জন্য বিধিমতে প্রস্তুত করিতেছে, এই-সকল অভিভাবকদের নিকট হইতে বালকগণ দূরে থাকিলেই কি অত্যন্ত দুশ্চিন্তার কারণ ঘটিবে।

আমি শেষোক্ত দৃষ্টান্তটি যে দিলাম তাহার একটু কারণ আছে। সাহেবিয়ানায় যাঁহারা অভ্যস্ত নন, এই দৃষ্টান্ত তাঁহাদিগকে প্রবলভাবে আঘাত করিবে। তাঁহারা নিশ্চয়ই মনে মনে ভাবিবেন, লোকে কেন এটুকু বুঝিতে পারে না— কেন সমস্ত ভবিষ্যৎ ভুলিয়া কেবল নিজের কতকগুলা বিকৃত অভ্যাসের অন্ধতায় ছেলেদের এমন সর্বনাশ করিতে বসে।

কিন্তু মনে রাখিবেন, যাঁহারা সাহেবিয়ানায় অভ্যস্ত তাঁহারা এই কাণ্ড অতি সহজেই করিয়া থাকেন, তাঁহারা সন্তানদের যে কোনোপ্রকার অভ্যাসদোষ ঘটাইতেছেন তাহা মনেও করিতে পারেন না। ইহাতে এইটুকু বোঝা উচিত, আমাদের নিজেদের মধ্যে যে-সকল বিশেষ বিকৃতি আছে তাহার সম্বন্ধে আমরা অনেকটা অচেতন; তাহা আমাদিগকে এত বেশি পাইয়া বসিয়াছে যে, তাহাতে করিয়া আর-কাহারও অনিষ্ট অসুবিধা হইলেও আমরা উদাসীন থাকি। আমরা মনে করি, পরিবারের মধ্যে

নানাপ্রকার রোষ দ্বেষ অন্যায় পক্ষপাত বিবাদ বিরোধ নিন্দা গ্লানি কুঅভ্যাস কুসংস্কারের প্রাদুর্ভাব থাকিলেও পরিবার হইতে দূরে থাকাই ছেলেদের পক্ষে সর্বাপেক্ষা বিপদ। আমরা যাহার মধ্যে মানুষ হইয়াছি তাহারই মধ্যে আর কেহ মানুষ হইলে ক্ষতি আছে, এ কথা আমাদের মনেও আসে না। কিন্তু মানুষ করিবার আদর্শ যদি খাঁটি হয়, যদি ছেলেকে আমাদের মতোই চলনসই কাজের লোক করাকেই আমরা যথেষ্ট না মনে করি, তবে এ কথা আমাদের মনে উদয় হইবেই যে, ছেলেদিগকে শিক্ষাকালে এমন জায়গায় রাখা কর্তব্য যেখানে তাহারা স্বভাবের নিয়মে বিশ্বপ্রকৃতির সহিত ঘনিষ্ঠ হইয়া ব্রহ্মচর্যপালনপূর্বক গুরুর সহবাসে জ্ঞানলাভ করিয়া মানুষ হইয়া উঠিতে পারে।

ভ্রূণকে গর্ভের মধ্যে এবং বীজকে মাটির মধ্যে নিজের উপযুক্ত খাদ্যের দ্বারা পরিবৃত হইয়া গোপনে থাকিতে হয়। তখন দিনরাত্রি তাহার একমাত্র কাজ— খাদ্যশোষণ করিয়া নিজেকে আকাশের জন্য, আলোকের জন্য প্রস্তুত করা। তখন সে আহরণ করে না, চারদিক হইতে শোষণ করে। প্রকৃতি তাহাকে অনুকূল অন্তরালের মধ্যে আহার দিয়া বেষ্টন করিয়া রাখে— বাহিরের নানা আঘাত অপঘাত তাহার নাগাল পায় না, এবং নানা আকর্ষণে তাহার শক্তি বিভক্ত হইয়া পড়ে না।

ছাত্রদের শিক্ষাকালও তাহাদের পক্ষে এইরূপ মানসিক ভ্রূণ অবস্থা। এই সময়ে তাহারা জ্ঞানের একটি সজীব বেষ্টনের মধ্যে দিনরাত্রি মনের খোরাকের মধ্যেই বাস করিয়া বাহিরের সমস্ত বিভ্রান্তি হইতে দূরে গোপনে যাপন করিবে, ইহাই স্বাভাবিক বিধান। এই সময়ে চতুর্দিকে সমস্তই তাহাদের অনুকূল হওয়া চাই, যাহাতে তাহাদের মনের একমাত্র কাজ হয়, জানিয়া এবং না জানিয়া খাদ্যশোষণ, শক্তিসঞ্চয় এবং নিজের পুষ্টিসাধন করা।

সংসার কাজের জায়গা এবং নানা প্রবৃত্তির লীলাভূমি— সেখানে এমন অনুকূল অবস্থার সংঘটন হওয়া বড়ো কঠিন যাহাতে শিক্ষাকালে অক্ষুব্ধভাবে ছেলেরা শক্তিলাভ এবং পরিপূর্ণ জীবনের মূলপত্তন করিতে পারে। শিক্ষা সমাধা হইলে গৃহী হইবার যথার্থ ক্ষমতা তাহাদের জন্মিবে— কিন্তু সংসারের সমস্ত প্রবৃত্তিসংঘাতের মধ্যে যথেচ্ছ মানুষ হইলে গৃহস্থ হইবার উপযুক্ত মনুষ্যত্ব লাভ করা যায় না— বিষয়ী হওয়া যায়, ব্যবসায়ী হওয়া যায়, কিন্তু মানুষ হওয়া কঠিন হয়। একদিন গৃহধর্মের আদর্শ আমাদের দেশে অত্যন্ত উচ্চ ছিল বলিয়াই সমাজে তিন বর্ণকে সংসারপ্রবেশের পূর্বে ব্রহ্মচর্য-পালনের দ্বারা নিজেকে প্রস্তুত করিবার উপদেশ ও ব্যবস্থা ছিল। অনেকদিন হইতেই সে-আদর্শ হীন হইয়াছে এবং তাহার স্থলে কোনো মহৎ আদর্শই

গ্রহণ করি নাই বলিয়া আজ আমরা কেরানী সেরেস্তাদার দারোগা ডেপুটিম্যাজিস্ট্রেট হইয়াই সন্তুষ্ট থাকি— তাহার বেশি হওয়াকে মন্দ বলি না, তবে বাহুল্য বলি।

কিন্তু তাহার অনেক বেশিও বাহুল্য নয়। আমি কেবল হিন্দুর তরফে বলিতেছি না— কোনো দেশেই কোনো সমাজেই বাহুল্য নয়। অন্য দেশে ঠিক এইরূপ শিক্ষাপ্রণালী অবলম্বিত হয় নাই, অথচ তাহারা লড়াই করিতেছে, বাণিজ্য করিতেছে, টেলিগ্রাফের তার খাটাইতেছে, রেলগাড়ির এঞ্জিন চালাইতেছে— এ দেখিয়া আমরা ভুলিয়াছি ; এ ভুল যে সভাস্থলে কোনো একটা প্রবন্ধের আলোচনা করিয়াই ভাঙিবে এমন আশা করিতে পারি না। অতএব আশঙ্কা হয় আজ আমরা 'জাতীয়' শিক্ষাপরিষৎ রচনা করিবার সময় নিজের দেশ নিজের ইতিহাস ছাড়া সর্বত্রই নজির খুঁজিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া আরও একটা ছাঁচেঢালা কলের ইস্কুল তৈরি করিয়া বসিব। আমরা প্রকৃতিকে বিশ্বাস করি না, মানুষের প্রতি ভরসা রাখি না, কল বৈ আমাদের গতি নাই। আমরা মনে বুঝিয়াছি নীতিপাঠের কল পাতিলেই মানুষ সাধু হইয়া উঠিবে এবং পুঁথি পড়াইবার বড়ো ফাঁদ পাতিলেই মানুষের তৃতীয় চক্ষু যে জ্ঞাননেত্র তাহা আপনি উদ্‌ঘাটিত হইয়া যাইবে।

দস্তুরমতো একটা ইস্কুল ফাঁদার চেয়ে জ্ঞানদানের উপযুক্ত আশ্রম স্থাপন কঠিন তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই কঠিনকে সহজ করাই ভারতবর্ষের কাজ হইবে। কারণ, এই আশ্রমের আদর্শ আমাদের কল্পনা হইতে এখনও যায় নাই এবং য়ুরোপের নানাপ্রকার বিদ্যাও আমাদের গোচর হইয়াছে। বিদ্যালাভ ও জ্ঞানলাভের প্রণালীর মধ্যে আমাদিগকে সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে হইবে। ইহাই যদি না পারিলাম তবে কেবলই নকলের দিকে মন রাখিয়া আমরা সর্বপ্রকারে ব্যর্থ হইব। অধিকার লাভ করিতে গেলেই আমরা পরের কাছে হাত পাতি এবং গড়িয়া তুলিতে গেলেই আমরা নকল করিতে বসিয়া যাই— নিজের শক্তি এবং নিজের মনের দিকে, দেশের প্রকৃতি ও দেশের যথার্থ প্রয়োজনের দিকে তাকাই না, তাকাইতে সাহসই হয় না। যে-শিক্ষার ফলে আমাদের এই দশা হইতেছে সেই শিক্ষাকেই নূতন একটা নাম দিয়া স্থাপন করিলেই যে তাহা নূতন ফল প্রসব করিতে থাকিবে এইরূপ আশা করিয়া নূতন আর-একটা নৈরাশ্যের মুখে অগ্রসর হইতে প্রবৃত্তি হয় না। এ কথা আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে, যেখানে মুষলধারায় চাঁদার টাকা আসিয়া পড়ে সেইখানেই যে শিক্ষা বেশি করিয়া জমা হইতে থাকে তাহা নহে, মনুষ্যত্ব টাকায় কেনা যায় না ; যেখানে কমিটির নিয়মধারা অহরহ বর্ষিত হয়, সেইখানেই যে শিক্ষাকল্পলতা তাড়াতাড়ি বাড়িয়া উঠে তাহাও নহে, শুদ্ধমাত্র নিয়মাবলী অতি উত্তম হইলেও তাহা মানুষের মনকে খাদ্য

দান করে না; বহুবিধ বিষয়-পাঠনার ব্যবস্থা করিলেই যে শিক্ষায় লাভের অঙ্ক অগ্রসর হয় তাহা নহে, মানুষ যে বাড়ে সে "ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন"। যেখানে নিভৃতে তপস্যা হয় সেইখানেই আমরা শিখিতে পারি; যেখানে গোপনে ত্যাগ, যেখানে একান্তে সাধনা সেইখানেই আমরা শক্তিলাভ করি, যেখানে সম্পূর্ণভাবে দান সেইখানেই সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ সম্ভবপর; যেখানে অধ্যাপকগণ জ্ঞানের চর্চায় স্বয়ং প্রবৃত্ত সেইখানেই ছাত্রগণ বিদ্যাকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পায়; বাহিরে বিশ্বপ্রকৃতির আবির্ভাব যেখানে বাধাহীন, অন্তরে সেইখানেই মন সম্পূর্ণ বিকশিত; ব্রহ্মচর্যের সাধনায় চরিত্র যেখানে সুস্থ এবং আত্মবশ, ধর্মশিক্ষা সেইখানেই সরল ও স্বাভাবিক; আর যেখানে কেবল পুঁথি ও মাস্টার, সেনেট ও সিণ্ডিকেট, ইঁটের কোঠা ও কাঠের আসবাব, সেখানে আজও আমরা যত বড়ো হইয়া উঠিয়াছি কালও আমরা তত বড়োটা হইয়াই বাহির হইব।

১৩১৩

জাতীয় বিদ্যালয়

জাতীয়বিদ্যালয় তো বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল, এখন এই বিদ্যালয়ের উপযোগিতা যে কী সে কি যুক্তি দিয়া বুঝাইবার আর কোনো প্রয়োজন আছে।

যুক্তির অভাবে পৃথিবীতে খুব অল্প জিনিসই ঠেকিয়াছে। প্রয়োজন আছে এ কথা বুঝাইয়া দিলেই যে প্রয়োজনসিদ্ধি হয়, অন্তত আমাদের দেশে তাহার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। আমাদের অভাব তো অনেক আছে, অভাব আছে এ কথা বুঝাইবার লোকও অনেক আছে এবং এ কথা মানিবার লোকেরও অভাব নাই, তবু ইহাতে ইতর-বিশেষ কিছুই ঘটে না।

আসল কথা, যুক্তি কোনো বড়ো জিনিসের সৃষ্টি করিতে পারে না। স্ট্যাটিস্‌টিক্সের তালিকাযোগে লাভ, সুবিধা, প্রয়োজনের কথা বুঝাপড়া করিতে করিতে কেবল গলা ভাঙে, তাহাতে কিছু গড়ে না। শ্রোতারা গবেষণার প্রশংসা করে, আর-কিছু করা আবশ্যক বোধ করে না।

আমাদের দেশের একটা মুশকিল এই হইয়াছে, শিক্ষা বল, স্বাস্থ্য বল, সম্পদ বল, আমাদের উপরে যে কিছু নির্ভর করিতেছে, এ কথা আমরা একরকম

ভুলিয়াছিলাম। অতএব এ-সকল বিষয়ে আমাদের বোঝা না-বোঝা দুই-ই প্রায় সমান ছিল। আমরা জানি, দেশের সমস্ত মঙ্গলসাধনের দায়িত্ব গবর্মেন্টের ; অতএব আমাদের অভাব কী আছে না আছে তাহা বোঝার দরুন কোনো কাজ অগ্রসর হইবার কোনো সম্ভাবনা নাই। এমনতরো দায়িত্ববিহীন আলোচনায় পৌরুষের ক্ষতি করে। ইহাতে পরের উপর নির্ভর আরও বাড়াইয়া তোলে।

স্বদেশ যে আমাদেরই কর্মক্ষেত্র এবং আমরাই যে তাহার সর্বপ্রধান কর্মী, এমন-কি, অন্যে অনুগ্রহপূর্বক যতই আমাদের কর্মভার লাঘব করিবে, আমাদের স্বচেষ্টার কঠোরতাকে যতই খর্ব করিবে, ততই আমাদিগকে বঞ্চিত করিয়া কাপুরুষ করিয়া তুলিবে— এ কথা যখন নিঃসংশয়ে বুঝিব তখনই আর-আর কথা বুঝিবার সময় হইবে।

ইংরেজিতে একটা প্রবাদ শুনিতে পাই, ইচ্ছা যেখানে পথ সেখানেই আছে। এ কথা কেহ বলে না, যুক্তি যেখানে আছে পথ সেইখানেই। কিন্তু আমাদের ইচ্ছা যে আমাদের পথ রচনা করিতে পারে, পুরুষোচিত এই কথার প্রতি আমাদের বিশ্বাস ছিল না। আমরা জানিতাম, ইচ্ছা আমরা করিব, কিন্তু পথ করা না করা সে অন্যের হাত— তাহাতে আমাদের হাত কেবল দরখাস্তে সই করিবার বেলায়।

এইজন্য উপযোগিতা বিচার করিয়া, অভাব বুঝিয়া, এতদিন আমরা কিছুই করি নাই। পরিণামবিহীন আন্দোলন-আলোচনার দ্বারা আমাদের প্রকৃতি যথার্থ বললাভ করে নাই। এইজন্যই ইচ্ছাশক্তির প্রভাব যে কিরূপ অব্যর্থ, আমাদের নিজের মধ্যে তাহার পরিচয় পাইবার বড়োই প্রয়োজন ছিল। রাজা যে আমাদের পক্ষে কত-বড়ো অনুকূল, তাহা নহে কিন্তু ইচ্ছা যে আমাদের মধ্যে কত-বড়ো শক্তি ইহাই নিশ্চয় বুঝিবার জন্য আমাদের একান্ত অপেক্ষা ছিল।

বিধাতার প্রসাদে আজ কেমন করিয়া সেই পরিচয় পাইয়াছি। আজ আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম, ইচ্ছাই ঈশ্বরের ঐশ্বর্য, সমস্ত সৃষ্টির গোড়াকার কথাটা ইচ্ছা। যুক্তি নহে, তর্ক নহে, সুবিধা-অসুবিধার হিসাব নহে, আজ বাঙালির মনে কোথা হইতে একটা ইচ্ছার বেগ উপস্থিত হইল এবং পরক্ষণেই সমস্ত বাধাবিপত্তি, সমস্ত দ্বিধাসংশয় বিদীর্ণ করিয়া অখণ্ড পুণ্যফলের ন্যায় আমাদের জাতীয়বিদ্যাব্যবস্থা আকার গ্রহণ করিয়া দেখা দিল। বাঙালির হৃদয়ের মধ্যে ইচ্ছার যজ্ঞহুতাশন জ্বলিয়া উঠিয়াছিল এবং সেই অগ্নিশিখা হইতে চরু হাতে করিয়া আজ দিব্যপুরুষ উঠিয়াছেন— আমাদের বহুদিনের শূন্য আলোচনার বন্ধ্যাত্ব এইবার বুঝি ঘুচিবে। যাহা চেষ্টা করিয়া, কষ্ট করিয়া, তর্ক করিয়া দীর্ঘকালেও হইবার নহে— পূর্বতন সমস্ত হিসাবের খাতা খতাইয়া দেখিলে বিজ্ঞ

ব্যক্তিমাত্রেই যাহাকে অসাময়িক অসম্ভব অসংগত বলিয়া সবলে পরুশীর্ষ চালনা করিতেন, তাহা কত সহজে, কত অল্পসময়ে আজ সত্যরূপে আবির্ভূত হইল।

অনেকদিন পরে আজ বাঙালি যথার্থভাবে একটা-কিছু পাইল। এই পাওয়ার মধ্যে কেবল যে একটা উপস্থিত-লাভ আছে, তাহা নহে, ইহা আমাদের একটা শক্তি। আমাদের যে পাইবার ক্ষমতা আছে, সে-ক্ষমতাটা যে কী এবং কোথায়, আমরা তাহাই বুঝিলাম। এই পাওয়ার আরম্ভ হইতে আমাদের পাইবার পথ প্রশস্ত হইল। আমরা বিদ্যালয়কে পাইলাম যে তাহা নহে, আমরা নিজের সত্যকে পাইলাম, নিজের শক্তিকে পাইলাম।

আমি আপনাদের কাছে আজ সেই আনন্দের জয়ধ্বনি তুলিতে চাই। আজ বাংলাদেশে যাহার আবির্ভাব হইল তাহাকে কিভাবে গ্রহণ করিতে হইবে তাহা যেন আমরা না ভুলি। আমরা পাঁচজনে যুক্তি করিয়া কাঠখড় দিয়া কোনোমতে কোনো-একটা সুবিধার খেলনা গড়িয়া তুলি নাই; আমাদের বঙ্গমাতার সূতিকাগৃহে আজ সজীব মঙ্গল জন্মগ্রহণ করিয়াছে; সমস্ত দেশের প্রাঙ্গণে আজ যেন আনন্দশঙ্খ বাজিয়া উঠে, আজ যেন উপঢৌকন প্রস্তুত থাকে, আজ আমরা যেন কৃপণতা না করি।

সুযোগ-সুবিধার কথা কালক্রমে চিন্তা করিবার অবসর আসিবে, আজ আমাদিগকে গৌরব অনুভব করিয়া উৎসব আরম্ভ করিতে হইবে। আমি ছাত্রদিগকে বলিতেছি, আজ তোমরা গৌরবে সমুদয় হৃদয় পরিপূর্ণ করিয়া স্বদেশের বিদ্যামন্দিরে প্রবেশ করো —তোমরা অনুভব করো, বাঙালিজাতির শক্তির একটি সফলমূর্তি তাঁহার সিংহাসনের সম্মুখে তোমাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন; তাঁহাকে যে পরিমাণে যথার্থরূপে তোমরা মানিবে, তিনি সেই পরিমাণে তেজ লাভ করিবেন এবং সেই তেজে আমরা সকলে তেজস্বী হইব। এই-যে জাতীয়শক্তির তেজ, ইহার কাছে ব্যক্তিগত সামান্য ক্ষতিবৃদ্ধি সমস্তই তুচ্ছ। তোমরা যদি এই বিদ্যাভবনের জন্য গৌরব অনুভব কর তবেই ইহার গৌরববৃদ্ধি হইবে। বড়ো বাড়ি, মস্ত জমি বা বৃহৎ আয়োজন ইহার গৌরব নহে; তোমাদের শ্রদ্ধা, তোমাদের নিষ্ঠা, বাঙালির আত্মসমর্পণে ইহার গৌরব। বাঙালির ইচ্ছায় ইহার সৃষ্টি, বাঙালির নিষ্ঠায় ইহার রক্ষা— ইহাই ইহার গৌরব এবং এই গৌরবই আমাদের গৌরব।

আমাদের অন্তঃকরণে যতক্ষণ পর্যন্ত গৌরববোধ না জন্মে ততক্ষণ কেবলই অন্যের সঙ্গে আমাদের অনুষ্ঠানের তুলনা করিয়া আমরা পদে পদে লজ্জিত ও হতাশ হইতে থাকি। ততক্ষণ আমাদের বিদ্যালয়ের সঙ্গে অন্য দেশের বিদ্যালয় মিলাইয়া দেখিবার প্রবৃত্তি হয়— যেটুকু মেলে সেইটুকুতেই গর্ববোধ করি, যেটুকু না মেলে সেইটুকুতেই খাটো হইয়া যাই।

কিন্তু এরূপ তুলনা কেবল নির্জীব পদার্থ সম্বন্ধেই খাটে। গজকাঠিতে বা ওজনের বাটখারায় জীবিতবস্তুর পরিমাপ হয় না। আজ আমাদের দেশে এই-যে জাতীয়-বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, আমি বলিতেছি, ইহা নির্জীব ব্যাপার নহে— আমরা প্রাণ দিয়া প্রাণ সৃষ্টি করিয়াছি। সুতরাং যেখানে ইহাকে দাঁড় করানো হইল সেইখানেই ইহার শেষ নহে— ইহা বাড়িবে, ইহা চলিবে, ইহার মধ্যে বিপুল ভবিষ্যৎ রহিয়াছে, তাহার ওজন কে করিতে পারে। যে-কোনো বাঙালি নিজের প্রাণের মধ্যে এই বিদ্যালয়ের প্রাণ অনুভব করিবে সে কোনোমতেই ইঁটকাঠের দরে ইহার মূল্যনিরূপণ করিবে না— সে ইহার প্রথম আরম্ভের মধ্যে চরম পরিণামের মহতী সম্পূর্ণতা অনুভব করিবে, সেই ইহার ব্যক্ত ও অব্যক্ত সমস্তটাকে এক করিয়া সজীবসত্যের সেই সমগ্রমূর্তির নিকট আনন্দের সহিত আত্মসমর্পণ করিবে।

তাই আজ আমি ছাত্রদিগকে অনুরোধ করিতেছি, এই বিদ্যালয়ের প্রাণকে অনুভব করো— সমস্ত বাঙালিজাতির প্রাণের সঙ্গে এই বিদ্যালয়ের যে প্রাণের যোগ হইয়াছে তাহা নিজের অন্তঃকরণের মধ্যে উপলব্ধি করো— ইহাকে কোনোদিন একটা ইস্কুলমাত্র বলিয়া ভ্রম করিয়ো না। তোমাদের উপরে এই একটি মহৎ দায়িত্ব রহিল। স্বদেশের একটি পরমধনের রক্ষণভার আজ তোমাদের উপরে যতটা পরিমাণে ন্যস্ত হইল, তোমাদিগকে একান্ত ভক্তির সহিত, নম্রতার সহিত তাহা বুঝিয়া লইতে হইবে। ইহাতে তপস্যার প্রয়োজন হইবে। ইতিপূর্বে অন্য কোনো বিদ্যালয় তোমাদের কাছে এত কঠোরতা দাবি করিতে পারে নাই। এই বিদ্যালয় হইতে কোনো সহজ সুবিধা আশা করিয়া ইহাকে ছোটো হইতে দিয়ো না। বিপুল চেষ্টার দ্বারা ইহাকে তোমাদের মস্তকের ঊর্ধ্বে তুলিয়া ধরো ; ইহার ক্লেশসাধ্য আদর্শকে মহত্তম করিয়া রাখো ; ইহাকে কেহ যেন লজ্জা না দেয়, উপহাস করিতে না পারে, সকলেই যেন স্বীকার করে যে, আমরা শৈথিল্যকে প্রশ্রয় দিবার জন্য, জড়ত্বকে সম্মানিত করিবার জন্য বড়ো নাম দিয়া একটা কৌশল অবলম্বন করি নাই। তোমাদিগকে পূর্বাপেক্ষা যে দুরূহতর প্রয়াস, যে কঠিনতর সংযম আশ্রয় করিতে হইবে, তাহা ব্রতস্বরূপ ধর্মস্বরূপ গ্রহণ করিয়ো। কারণ, এ বিদ্যালয় তোমাদিগকে বাহিরের কোনো শাসনের দ্বারা, কোনো প্রলোভনের দ্বারা আবদ্ধ করিতে পারিবে না— ইহার বিধানকে অগ্রাহ্য করিলে তোমরা কোনো পদ বা পদবির ভরসা হইতে ভ্রষ্ট হইবে না— কেবল তোমাদের স্বদেশকে তোমাদের ধর্মকে শিরোধার্য করিয়া, স্বজাতির গৌরব এবং নিজের চরিত্রের সম্মানকে নিয়ত স্মরণ রাখিয়া, তোমাদিগকে এই বিদ্যালয়ের সমস্ত কঠিন ব্যবস্থা স্বেচ্ছাপূর্বক অনুদ্ধত আত্মোৎসর্গের সহিত নতশিরে বহন করিতে হইবে।

আমাদের এই বিদ্যালয় সম্বন্ধে যখন চিন্তা করিবে, তখন এই কথা ভাবিয়া দেখিয়ো যে, যে-দেশে জলাশয় নাই সে-দেশে আকাশের বৃষ্টিপাত ব্যর্থ হইয়া যায়। জল ধরিবার স্থান না থাকিলে বৃষ্টিধারার অধিকাংশ ব্যবহার নষ্ট হইতে থাকে। আমাদের দেশে যে জ্ঞানী গুণী ক্ষমতাসম্পন্ন লোক জন্মগ্রহণ করেন না তাহা নহে,—কিন্তু তাঁহাদের জ্ঞান গুণ ও ক্ষমতা ধরিয়া রাখিবার কোনো ব্যবস্থা আমাদের দেশে নাই। তাঁহারা চাকরি করেন, ব্যাবসা করেন, রোজগার করেন, পরের হুকুম মানিয়া চলেন, তাহার পরে পেনশন লইয়া ভাবিয়া পান না কেমন করিয়া দিন কাটিবে। এমন প্রত্যহ কত রাশি রাশি সামর্থ্য দেশের উপর দিয়া গড়াইয়া বহিয়া উবিয়া চলিয়া যাইতেছে। ইহা আমরা নিশ্চয় জানি, বিধাতার অভিশাপে আমাদের দেশে যে শক্তির চিরন্তন অনাবৃষ্টি ঘটিয়াছে তাহা নহে, দেশের শক্তিকে দেশের কাজে ব্যবহারে লাগাইবার, তাহাকে কোথাও একত্রে সংগ্রহ করিবার কোনো বিধান আমরা করি নাই। এইজন্য, যে-শক্তি আছে সে-শক্তিকে প্রত্যক্ষ করিবার, অনুভব করিবার কোনো উপায় আমাদের হাতে নাই। যদি আমাদের প্রতি কেহ শক্তিহীনতার অপবাদ দেয়, তবে রাজসরকারের চাকরির ইতিবৃত্ত হইতে রায়বাহাদুরের তালিকা খুঁজিয়া বেড়াইতে হয়, নিতান্ত তুচ্ছ সাময়িক প্রতিপত্তির উঞ্ছ খুঁটিয়া নিজেদের সামর্থ্য সপ্রমাণ করিবার জন্য চেষ্টা করিতে হয়; কিন্তু তাহাতে আমরা সান্ত্বনা পাই না এবং নিজেদের প্রতি বিশ্বাস আন্তরিক হইয়া উঠে না।

এমন দুর্দশার দিনে এই জাতীয়বিদ্যালয় আমাদের বিধিদত্ত শক্তিসঞ্চয়ের একটি উপায়স্বরূপে আবির্ভূত হইয়াছে। দেশের মহত্ত্ব এইখানে স্বভাবতই আকৃষ্ট হইয়া বাঙালিজাতির চিরদিনের সম্বলের মতো এই ভাণ্ডে এই ভাণ্ডারে রক্ষিত ও বর্ধিত হইতে থাকিবে। অতি অল্পকালের মধ্যেই কি তাহার প্রমাণ আমরা পাই নাই। এই বিদ্যালয়ে দেখিতে দেখিতে দেশের যে-সকল প্রভাবসম্পন্ন পূজ্য ব্যক্তিগণকে আমরা একত্রে লাভ করিয়াছি তাঁহাদের প্রচুর সামর্থ্য কি কেবলমাত্র আহ্বানেরই অভাবে, কেবলমাত্র যজ্ঞক্ষেত্রেরই অবর্তমানে ক্ষীণভাবে বিক্ষিপ্ত হইয়া যাইত না। এ কি আমাদের কম সৌভাগ্য। দেশের গুরুজনেরা যেখানে স্বেচ্ছাপূর্বক উৎসাহের সহিত সমবেত হইতেছেন সেইখানেই দেশের ছাত্রগণের শিক্ষালাভের ব্যবস্থা হইয়াছে, এ কি আমাদের সামান্য কল্যাণ। উপযুক্ত দাতাসকলে শ্রদ্ধার সহিত দান করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিতেছেন, উপযুক্ত গ্রহীতারাও শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিবার জন্য করজোড়ে দাঁড়াইয়াছেন, এমন শুভযোগ যেখানে সেখানে দাতাও ধন্য, গ্রহীতাও ধন্য এবং সেই যজ্ঞভূমিও পুণ্যস্থান।

আমরা আক্ষেপ করিয়া থাকি যে, আমাদের দেশের লোক দেশহিতকর কাজে ত্যাগস্বীকার করিতে পারে না। কেন পারে না। তাহার কারণ, হিতকর কার্য তাহাদের সম্মুখে সত্য হইয়া দেখা দেয় না। কতকগুলি কাজের মতো কাজ আমাদের নিকটে বর্তমান থাকে, ইহা আমাদের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়। না থাকিলে প্রতিদিনের তুচ্ছ স্বার্থ আমাদের কাছে অত্যন্ত বেশি সত্য হইয়া বড়ো হইয়া উঠে। স্বীকার করি, আমরা এ পর্যন্ত দেশের মঙ্গলের জন্য তেমন করিয়া ত্যাগ করিতে পারি নাই। কিন্তু মঙ্গল যদি মূর্তি ধরিয়া আমাদের প্রাঙ্গণে দাঁড়াইত তবে তাহাকে না চিনিয়া এবং না দিয়া কি থাকিতে পারিতাম। ত্যাগস্বীকার মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক, কিন্তু সেই ত্যাগে প্রবৃত্ত করাইবার উপলক্ষ্য কেবল কথার কথা হইলে চলে না; চাঁদার খাতা এবং অনুষ্ঠানপত্র আমাদের মন এবং অর্থে টান দিতে পারে না।

যে-জাতি আপনার ঘরের কাছে সত্যভাবে প্রত্যক্ষভাবে আত্মত্যাগের উপলক্ষ্য রচনা করিতে পারে নাই তাহার প্রাণ ক্ষুদ্র, তাহার লাভ সামান্য। সে কোম্পানির কাগজ, ব্যাঙ্কের ডিপজিট ও চাকরির সুযোগকেই সকলের চেয়ে বড়ো করিয়া দেখিতে বাধ্য। সে কোনো মহৎ ভাবকে মনের সহিত বিশ্বাস করে না, কারণ ভাব যেখানে কেবলই ভাবমাত্র কর্মের মধ্যে যাহার আকার নাই, সে সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য নহে; সম্পূর্ণ সত্যের প্রবল দাবি সে করিতে পারে না। সুতরাং তাহার প্রতি আমরা অনুগ্রহের ভাব প্রকাশ করি, তাহাকে ভিক্ষুকের মতো দেখি; কখনও বা কৃপা করিয়া তাহাকে কিঞ্চিৎ দিই, কখনও বা অবজ্ঞা ও অবিশ্বাস করিয়া তাহাকে প্রত্যাখ্যান করি। যে-দেশে মহৎ ভাব ও বৃহৎ কর্তব্যগুলি এমন কৃপাপাত্ররূপে দ্বারে দ্বারে হাত পাতিয়া বেড়ায় সে দেশের কল্যাণ নাই।

আজ জাতীয়বিদ্যালয় মঙ্গলের মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া আমাদের কাছে দেখা দিয়াছে। ইহার মধ্যে মন বাক্য এবং কর্মের পূর্ণসম্বন্ধ প্রকাশ পাইয়াছে। ইহাকে আমরা কখনই অস্বীকার করিতে পারিব না। ইহার নিকটে আমাদিগকে পূজা আহরণ করিতেই হইবে। এইরূপ পূজার বিষয় প্রতিষ্ঠার দ্বারাই জাতি বড়ো হইয়া উঠে। অতএব জাতীয়-বিদ্যালয় যে কেবল আমাদের ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিয়া কল্যাণসাধন করিবে তাহা নহে, কিন্তু দেশের মাঝখানে একটি পূজার যোগ্য প্রকৃত মহৎ ব্যাপারের উপস্থিতিই লক্ষ্যে অলক্ষ্যে আমাদিগকে মহত্ত্বের দিকে লইয়া যাইবে।

এই কথা মনে রাখিয়া আজ আমরা ইহাকে আবাহন ও অভিবাদন করিব। এই কথা মনে রাখিয়া আমরা ইহাকে রক্ষা করিব ও মান্য করিব। ইহাকে রক্ষা করা আত্মরক্ষা, ইহাকে মান্য করাই আত্মসম্মান।

কিন্তু যদি এই কথাই সত্য হয় যে, আমরা আমাদের অস্থিমজ্জার মধ্যে দাসখত বহন করিয়া জন্মগ্রহণ করিয়া থাকি, যদি সত্য হয় যে, পরের দ্বারা তাড়িত না হইলে আমরা চলিতেই পারিব না— তবেই আমরা স্বেচ্ছাপূর্বক স্বদেশের মান্য ব্যক্তিদের শাসনে অসহিষ্ণু হইব, তবেই আমরা তাঁহাদের নিয়মের মধ্যে আপনাকে আবদ্ধ করিতে গৌরববোধ করিব না, তবেই অন্যত্র সামান্য সুযোগের জন্য আমাদের মন প্রলুব্ধ হইতে থাকিবে এবং সংযম ও শিক্ষার কঠোরতার জন্য আমাদের চিত্ত বিদ্রোহী হইয়া উঠিবে।

কিন্তু এ-সকল অশুভ কল্পনাকে আজ মনে স্থান দিতে চাই না। সম্মুখে পথ সুদীর্ঘ এবং পথও দুর্গম; আশার পাথেয় দ্বারা হৃদয়কে পরিপূর্ণ করিয়া আজ যাত্রা আরম্ভ করিতে হইবে। উদয়াচলের অরুণচ্ছটার ন্যায় এই আশা এবং বিশ্বাসই পৃথিবীর সমস্ত সৌভাগ্যবান জাতির মহদ্দিনের প্রথম সূচনা করিয়াছে। এই আশাকে, এই বিশ্বাসকে আমরা আজ কোথাও লেশমাত্র ক্ষুণ্ণ হইতে দিব না। এই আশার মধ্যে কোথাও যেন দুর্বলতা, বিশ্বাসের মধ্যে কোথাও যেন সাহসের অভাব না থাকে। নিজের মধ্যে নিজেকে যেন আজ দীন বলিয়া অনুভব না করি। ইহা যেন পূর্ণভাবে বুঝিতে পারি, আমাদের দেশের মধ্যে, আমাদের দেশবাসী প্রত্যেকের মধ্যে, বিধাতার একটি অপূর্ব অভিপ্রায় নিহিত আছে। সে-অভিপ্রায় আর-কোনো দেশের আর-কোনো জাতির দ্বারা সিদ্ধ হইতেই পারে না। আমরা পৃথিবীকে যাহা দিব, তাহা আমাদের নিজের দান হইবে, তাহা অন্যের উচ্ছিষ্ট হইবে না। আমাদের পিতামহগণ তপোবনের মধ্যে সেই দানের সামগ্রী প্রস্তুত করিতেছিলেন; আমরাও নানা দুঃখের দাহে, নানা দুঃসহ আঘাতের তাড়নায় সেই সামগ্রীর বিচিত্র উপকরণকে একত্রে বিগলিত করিয়া তাহাকে গঠনের উপযোগী করিয়া তুলিতেছি; তাঁহাদের সেই তপস্যা, আমাদের এই দুর্বহ দুঃখ কখনই ব্যর্থ হইবে না।

জগতের মধ্যে ভারতবাসীর যে-একটি বিশেষ অধিকার আছে, সেই অধিকারের জন্য আমাদের জাতীয়বিদ্যালয় আমাদিগকে প্রস্তুত করিবে, আজ এই মহতী আশা হৃদয়ে লইয়া আমরা এই নূতন বিদ্যাভবনের মঙ্গলাচরণে প্রবৃত্ত হইলাম। সুশিক্ষার লক্ষণ এই যে তাহা মানুষকে অভিভূত করে না, তাহা মানুষকে মুক্তিদান করে। এতদিন আমরা ইস্কুলকলেজে যে শিক্ষালাভ করিতেছিলাম, তাহাতে আমাদিগকে পরাস্ত করিয়াছে। আমরা তাহা মুখস্থ করিয়াছি, আবৃত্তি করিয়াছি, শিক্ষালব্ধ বাঁধিবচনগুলিকে নিঃসংশয়ে চূড়ান্তসত্য বলিয়া প্রচার করিতেছি। যে-ইতিহাস ইংরেজি কেতাবে পড়িয়াছি তাহাই আমাদের একমাত্র ইতিহাসের বিদ্যা;

যে-পোলিটিকাল ইকনমি মুখস্থ করিয়াছি, তাহাই আমাদের একমাত্র পোলিটিকাল ইকনমি। যাহা-কিছু পড়িয়াছি, তাহা আমাদিগকে ভূতের মতো পাইয়া বসিয়াছে; সেই পড়া-বিদ্যা আমাদের মুখ দিয়া কথা বলাইতেছে, বাহির হইতে মনে হইতেছে যেন আমরাই কথা বলিতেছি। আমরা মনে করিতেছি, পোলিটিকাল সভ্যতা ছাড়া সভ্যতার আর-কোনো আকার হইতেই পারে না। আমরা স্থির করিয়াছি, য়ুরোপীয় ইতিহাসের মধ্য দিয়া যে পরিণাম প্রকাশ পাইয়াছে, জাতিমাত্রেরই সেই একমাত্র সদ্‌গতি। যাহা অন্যদেশের শাস্ত্রসম্মত তাহাকেই আমরা হিত বলিয়া জানি এবং আগাগোড়া অন্যদেশের প্রণালী অনুসরণ করিয়া আমরা স্বদেশের হিতসাধন করিতে ব্যগ্র।

মানুষ যদি এমন করিয়া শিক্ষার নীচে চাপা পড়িয়া যায়, সেটাকে কোনোমতেই মঙ্গল বলিতে পারি না। আমাদের যে শক্তি আছে তাহারই চরম বিকাশ হইবে, আমরা যাহা হইতে পারি তাহাই সম্পূর্ণভাবে হইব— ইহাই শিক্ষার ফল। আমরা চলন্ত পুঁথি হইব, অধ্যাপকের সজীব নোটবুক হইয়া বুক ফুলাইয়া বেড়াইব, ইহা গর্বের বিষয় নহে। আমরা জগতের ইতিহাসকে নিজের স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে দেখিতে সাহস করিলাম কই, আমরা পোলিটিকাল ইকনমিকে নিজের স্বাধীন গবেষণার দ্বারা যাচাই করিলাম কোথায়। আমরা কী, আমাদের সার্থকতা কিসে, ভারতবর্ষকে বিধাতা যে-ক্ষেত্রে দাঁড় করাইয়াছেন সে-ক্ষেত্র হইতে মহাসত্যের কোন্ মূর্তি কী ভাবে দেখা যায়, শিক্ষার দ্বারা বলপ্রাপ্ত হইয়া তাহা আমরা আবিষ্কার করিলাম কই। আমরা কেবল :

ভয়ে ভয়ে যাই, ভয়ে ভয়ে চাই,
ভয়ে ভয়ে শুধু পুঁথি আওড়াই।

হায়, শিক্ষা আমাদিগকে পরাভূত করিয়া ফেলিয়াছে।

আজ আমি আশা করিতেছি, এবারে আমরা শিক্ষার নাগপাশ কাটিয়া ফেলিয়া শিক্ষার মুক্ত অবস্থায় উত্তীর্ণ হইব। আমরা এতকাল যেখানে নিভৃতে ছিলাম, আজ সেখানে সমস্ত জগৎ আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, নানা জাতির ইতিহাস তাহার বিচিত্র অধ্যায় উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে, দেশদেশান্তর হইতে যুগযুগান্তরের আলোকতরঙ্গ আমাদের চিন্তাকে নানাদিকে আঘাত করিতেছে— জ্ঞানসামগ্রীর সীমা নাই, ভাবের পণ্য বোঝাই হইয়া উঠিল— এখন সময় আসিয়াছে, আমাদের দ্বারের সম্মুখবর্তী এই মেলায় আমরা বালকের মতো হতবুদ্ধি হইয়া কেবল পথ হারাইয়া ঘুরিয়া বেড়াইব না;— সময় আসিয়াছে যখন ভারতবর্ষের মন লইয়া এই-সকল নানা স্থানের বিক্ষিপ্ত বিচিত্র উপকরণের উপর সাহসের সহিত গিয়া পড়িব, তাহাদিগকে সম্পূর্ণ আপনার করিয়া

লইব, আমাদের চিত্ত তাহাদিগকে একটি অপূর্ব ঐক্য দান করিবে, আমাদের চিন্তাক্ষেত্রে তাহারা যথাযথস্থানে বিভক্ত হইয়া একটি অপরূপ ব্যবস্থায় পরিণত হইবে ; সেই ব্যবস্থার মধ্যে সত্য নূতন দীপ্তি, নূতন ব্যাপ্তি লাভ করিবে এবং মানবের জ্ঞানভাণ্ডারে তাহা নূতন সম্পত্তির মধ্যে গণ্য হইয়া উঠিবে। ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ী জানিয়াছিলেন, উপকরণের মধ্যে অমৃত নাই ; বিদ্যারই কী আর বিষয়েরই কী, উপকরণ আমাদিগকে আবদ্ধ করে, আচ্ছন্ন করে ; চিত্ত যখন সমস্ত উপকরণকে জয় করিয়া অবশেষে আপনাকেই লাভ করে তখনই সে অমৃত লাভ করে। ভারতবর্ষকেও আজ সেই সাধনা করিতে হইবে— নানা তথ্য, নানা বিদ্যার ভিতর দিয়া পূর্ণতররূপে নিজেকে উপলব্ধি করিতে হইবে ; পাণ্ডিত্যের বিদেশী বেড়ি ভাঙিয়া ফেলিয়া পরিণতজ্ঞানে জ্ঞানী হইতে হইবে। আজ হইতে "ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবাঃ"— হে দেবগণ, আমরা কান দিয়া যেন ভালো করিয়া শুনি, বই দিয়া না শুনি ; "ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ"— হে পূজ্যগণ, আমরা চোখ দিয়া যেন ভালো করিয়া দেখি, পরের বচন দিয়া না দেখি। জাতীয়বিদ্যালয় আবৃত্তিগত ভীরুবিদ্যার গণ্ডি হইতে বাহির করিয়া আমাদের বন্ধনজর্জর বুদ্ধির মধ্যে উদার সাহস ও স্বাতন্ত্র্যের সঞ্চার করিয়া যেন দেয়। পাঠ্যপুস্তকটির সঙ্গে আমাদের যে কথাটি না মিলিবে তাহার জন্য আমরা যেন লজ্জিত না হই। এমন-কি, আমরা ভুল করিতেও সংকোচ বোধ করিব না। কারণ, ভুল করিবার অধিকার যাহার নাই, সত্যকে আবিষ্কার করিবার অধিকারও সে পায় নাই। পরের শত শত ভুল জড়ভাবে মুখস্থ করিয়া রাখার চেয়ে সচেষ্টভাবে নিজে ভুল করা অনেক ভালো। কারণ, যে চেষ্টা ভুল করায় সেই চেষ্টাই ভুলকে লঙ্ঘন করাইয়া লইয়া যায়। যাহাই হউক, যেমন করিয়াই হউক, শিক্ষার দ্বারা আমরা যে পূর্ণপরিণত আমরাই হইব— আমরা যে ইংরেজি লেকচারের ফেনোগ্রাফ, বিলিতি অধ্যাপকের শিকলবাঁধা দাঁড়ের পাখি হইব না, এই একান্ত আশ্বাস হৃদয়ে লইয়া আমি আমাদের নূতন প্রতিষ্ঠিত জাতীয়বিদ্যামন্দিরকে আজ প্রণাম করি। এখানে আমাদের ছাত্রগণ যেন শুদ্ধমাত্র বিদ্যা নহে, তাহারা যেন শ্রদ্ধা, যেন নিষ্ঠা, যেন শক্তি লাভ করে ;— তাহারা যেন অভয় প্রাপ্ত হয়, দ্বিধাবর্জিত হইয়া তাহারা যেন নিজেকে নিজে লাভ করিতে পারে, তাহারা যেন অস্থিমজ্জার মধ্যে উপলব্ধি করে :

সর্বং পরবশং দুঃখং সর্বমাত্মবশং সুখম্।

তাহাদের অন্তরে যেন এই মহামন্ত্র সর্বদাই ধ্বনিত হইতে থাকে :

ভূমৈব সুখম্ নাল্পে সুখমস্তি।

যাহা ভূমা যাহা মহান তাহাই সুখ, অল্পে সুখ নাই।

ভারতবর্ষের প্রাচীন তপোবনে ব্রহ্মবিদ্যাপরায়ণ গুরু মুক্তিকাম ছাত্রগণকে যে-মন্ত্রে আহ্বান করিয়াছিলেন সে-মন্ত্র বহুদিন এ দেশে ধ্বনিত হয় নাই। আজ আমাদের বিদ্যালয় সেই গুরুর স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া ব্রহ্মপুত্র এবং ভাগীরথীর তীরে তীরে এই বাণী প্রেরণ করিতেছেন :

যথাপঃ প্রবতা যন্তি যথা মাসা অহর্জরম্, এবং মাং ব্রহ্মচারিণো ধাতরায়ন্তু সর্বতঃ স্বাহা।

জলসকল যেমন নিম্নদেশে গমন করে, মাসসকল যেমন সংবৎসরের দিকে ধাবিত হয়, তেমনি সকল দিক হইতে ব্রহ্মচারিগণ আমার নিকটে আসুন— স্বাহা।

সহ বীর্যং করবাবহৈ।

আমরা উভয়ে মিলিত হইয়া যেন বীর্য প্রকাশ করি।

তেজস্বি নাবধীতমস্তু।

তেজস্বিভাবে আমাদের অধ্যয়ন-অধ্যাপনা হউক।

মা বিদ্বিষাবহৈ।

আমরা পরস্পরের প্রতি যেন বিদ্বেষ না করি।

ভদ্রন্নো অপি বাতয় মনঃ।

হে দেব, আমাদের মনকে মঙ্গলের প্রতি সবেগে প্রেরণ করো।

১৩১৩

আবরণ

পায়ের তেলোটি এমন করিয়া তৈরি হইয়াছিল যে, খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়া পৃথিবীতে চলিবার পক্ষে এমন ব্যবস্থা আর হইতে পারে না। যেদিন হইতে জুতা পরিতে শুরু করিলাম, সেই দিন হইতে তেলোকে মাটির সংস্রব হইতে বাঁচাইয়া তাহার প্রয়োজনকেই মাটি করিয়া দেওয়া গেল। পদতল এতদিন অতি সহজেই আমাদের ভার বহন করিতেছিল, এখন হইতে পদতলের ভার আমাদিগকে লইতে হইল। এখন খালিপায়ে পথে চলিতে হইলে পদতল আমাদের সহায় না হইয়া পদে পদে দুঃখের কারণ হইয়া উঠে। শুধু তাই নয়, ওটাকে লইয়া সর্বদাই সতর্ক থাকিতে হয়; মনকে নিজের পদতলের সেবায় নিযুক্ত না রাখিলে বিপদ ঘটে। ওখানে ঠাণ্ডা লাগিলেই হাঁচি, জল লাগিলেই জ্বর— অবশেষে মোজা, চটি, গোড়তলা জুতা, বুট প্রভৃতি বিবিধ উপচারে এই প্রত্যঙ্গটির পূজা করিয়া ইহাকে সকল কর্মের বাহির করিয়া দেওয়া হয়। ঈশ্বর আমাদিগকে খুর দেন নাই বলিয়া ইহা তাঁহার প্রতি একপ্রকার অনুযোগ।

এইরূপে বিশ্বজগৎ এবং আমাদের স্বাধীনশক্তির মাঝখানে আমরা সুবিধার প্রলোভনে অনেকগুলা বেড়া তুলিয়া দিয়াছি। এইরূপে সংস্কার ও অভ্যাসক্রমে সেই কৃত্রিম আশ্রয়গুলাকেই আমরা সুবিধা এবং নিজের স্বাভাবিক শক্তিগুলাকেই অসুবিধা বলিয়া জানিয়াছি। কাপড় পরিয়া পরিয়া এমনি করিয়া তুলিয়াছি যে, কাপড়টাকে নিজের চামড়ার চেয়ে বড়ো করা হইয়াছে। এখন আমরা বিধাতার সৃষ্ট আমাদের এই আশ্চর্য সুন্দর অনাবৃত শরীরকে অবজ্ঞা করি।

কিন্তু কাপড়জুতাকে একটা অন্ধসংস্কারের মতো জড়াইয়া ধরা আমাদের এই গরম দেশে ছিল না। এক তো সহজেই আমাদের কাপড় বিরল ছিল; তাহার পরে, বালককালে ছেলেমেয়েরা অনেকদিন পর্যন্ত কাপড়জুতা না পরিয়া উলঙ্গ শরীরের সঙ্গে উলঙ্গ জগতের যোগ অসংকোচে অতি সুন্দরভাবে রক্ষা করিয়াছে। এখন আমরা ইংরেজের নকল করিয়া শিশুদেহের জন্যও লজ্জাবোধ করিতে আরম্ভ করিয়াছি। শুধু বিলাতফেরত নহে, শহরবাসী সাধারণ বাঙালি গৃহস্থও আজকাল বাড়ির বালককে অতিথির সামনে অনাবৃত দেখিলে সংকোচবোধ করেন এবং এইরূপে ছেলেটাকেও নিজের দেহসম্বন্ধে সংকুচিত করিয়া তোলেন।

এমনি করিয়া আমাদের দেশের শিক্ষিতলোকদের মধ্যে একটা কৃত্রিম লজ্জার সৃষ্টি হইতেছে। যে-বয়স পর্যন্ত শরীরসম্বন্ধে আমাদের কোনো কুণ্ঠা থাকা উচিত নয়, সে-বয়স আর পার হইতে দিতে পারিতেছি না— এখন আজন্মকাল মানুষ আমাদের পক্ষে লজ্জার বিষয় হইয়া উঠিতেছে। শেষকালে কোন্ এক দিন দেখিব, চৌকিটেবিলের পায়া ঢাকা না দেখিলেও আমাদের কর্ণমূল আরক্ত হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

শুধু লজ্জার উপর দিয়াই যদি যাইত, আক্ষেপ করিতাম না। কিন্তু ইহা পৃথিবীতে দুঃখ আনিতেছে। আমাদের লজ্জার দায়ে শিশুরা মিথ্যা কষ্ট পায়। এখনও তাহারা প্রকৃতির খাতক, সভ্যতার ঋণ তাহারা গ্রহণ করিতেই চাহে না। কিন্তু বেচারাদের জোর নাই; এক কান্না সম্বল। অভিভাবকদের লজ্জানিবারণ ও গৌরববৃদ্ধি করিবার জন্য লেস ও সিল্কের আবরণে বাতাসের সোহাগ ও আলোকের চুম্বন হইতে বঞ্চিত হইয়া তাহারা চীৎকারশব্দে বধির বিচারকের কর্ণে শিশুজীবনের অভিযোগ উত্থাপিত করিতে থাকে। জানে না, বাপমায়ে একজিক্যুটীভ ও জুডিশ্যাল একত্র হওয়াতে তাহার সমস্ত আন্দোলন ও আবেদন বৃথা হইয়া যায়।

আর দুঃখ অভিভাবকের। অকাললজ্জার সৃষ্টি করিয়া অনাবশ্যক উপসর্গ বাড়ানো হইল। যাহারা ভদ্রলোক নহে, সরল শিশুমাত্র, তাহাদিগকেও একেবারে শুরু হইতেই অর্থহীন ভদ্রতা ধরাইয়া অর্থের অপব্যয় করা আরম্ভ হইল। উলঙ্গতার একটা সুবিধা

তাহার মধ্যে প্রতিযোগিতা নাই। কিন্তু কাপড় ধরাইলেই শখের মাত্রা, আড়ম্বরের আয়োজন রেষারেষি করিয়া বাড়িয়া চলিতে থাকে। শিশুর নবনীতকোমল সুন্দর দেহ ধনাভিমান-প্রকাশের উপলক্ষ হইয়া উঠে; ভদ্রতার বোঝা অকারণে অপরিমিত হইতে থাকে।

এ-সমস্ত ডাক্তারির বা অর্থনীতির তর্ক তুলিব না। আমি শিক্ষার দিক হইতে বলিতেছি। মাটি-জল-বাতাস-আলোর সঙ্গে সম্পূর্ণ যোগ না থাকিলে শরীরের শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। শীতে গ্রীষ্মে কোনোকালে আমাদের মুখটা ঢাকা থাকে না, তাই আমাদের মুখের চামড়া দেহের চামড়ার চেয়ে বেশি শিক্ষিত— অর্থাৎ বাহিরের সঙ্গে কী করিয়া আপনার সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিতে হয়, তাহা সে ঠিক জানে। সে আপনাতেই আপনি সম্পূর্ণ; তাহাকে কৃত্রিম আশ্রয় প্রায় লইতে হয় না।

এ কথা বলা বাহুল্য, আমি ম্যাঞ্চেস্টারকে ফতুর করিবার জন্য ইংরেজের রাজ্যে উলঙ্গতা প্রচার করিতে বসি নাই। আমার কথা এই যে, শিক্ষা করিবার একটা বয়স আছে, সেটা বাল্যকাল। সেই সময়টাতে আমাদের শরীরমনের পরিণতিসাধনের জন্য প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের বাধাবিহীন যোগ থাকা চাই। সে-সময়টা ঢাকাঢাকির সময় নয়, তখন সভ্যতা একেবারেই অনাবশ্যক। কিন্তু সেই বয়স হইতেই শিশুর সঙ্গে সভ্যতার সঙ্গে লড়াই আরম্ভ হইতেছে দেখিয়া বেদনাবোধ করি। শিশু আচ্ছাদন ফেলিয়া দিতে চায়, আমরা তাহাকে আচ্ছন্ন করিতে চাই। বস্তুত এ ঝগড়া তো শিশুর সঙ্গে নয়, এ ঝগড়া প্রকৃতির সঙ্গে। প্রকৃতির মধ্যে যে পুরাতন জ্ঞান আছে, তাহাই কাপড় পরাইবার সময় শিশুর ক্রন্দনের মধ্য হইতে প্রতিবাদ করিতে থাকে; আমরাই তো তাহার কাছে শিশু।

যেমন করিয়া হউক, সভ্যতার সঙ্গে একটা রফা দরকার। অন্তত একটা বয়স পর্যন্ত সভ্যতার এলেকাকে সীমাবদ্ধ করা চাই। আমি খুব কম করিয়া বলিতেছি, সাত বছর। সে-পর্যন্ত শিশুর সজ্জায় কাজ নাই, লজ্জায় কাজ নাই। সে-পর্যন্ত বর্বরতার যে অত্যাবশ্যক শিক্ষা, তাহা প্রকৃতির হাতে সম্পন্ন হইতে দিতে হইবে। বালক তখন যদি পৃথিবীমায়ের কোলে গড়াইয়া ধুলামাটি না মাখিয়া লইতে পারে, তবে কবে তাহার সে-সৌভাগ্য হইবে। সে তখন যদি গাছে চড়িয়া ফল পাড়িতে না পায়, তবে হতভাগা ভদ্রতার লোকলজ্জায় চিরজীবনের মতো গাছপালার সঙ্গে অন্তরঙ্গ সখ্য-সাধনে বঞ্চিত হইবে। এই সময়টায় বাতাস আকাশ মাঠ গাছপালার দিকে তাহার শরীরমনের যে-একটা স্বাভাবিক টান আছে— সব জায়গা হইতেই তার যে-একটা নিমন্ত্রণ আসে, সেটাতে যদি কাপড়-চোপড় দরজা-দেয়ালের ব্যাঘাতস্থাপন করা যায়,

তবে ছেলেটার সমস্ত উদ্যম অবরুদ্ধ হইয়া তাহাকে ইঁচড়ে পাকায়। খোলা পাইলে যে উৎসাহ স্বাস্থ্যকর হইত, বদ্ধ হইয়া তাহাই দূষিত হইতে থাকে।

ছেলেকে কাপড় পরাইলেই কাপড়ের জন্য তাহাকে সাবধানে রাখিতে হয়। ছেলেটার দাম আছে কি না সে কথা সব সময়ে মনে থাকে না, কিন্তু দরজির হিসাব ভোলা শক্ত। এই কাপড় ছিঁড়িল, এই কাপড় ময়লা হইল, আহা সেদিন এত টাকা দিয়া এমন সুন্দর জামা করাইয়া দিলাম, লক্ষ্মীছাড়া ছেলে কোথা হইতে তাহাতে কালি মাথাইয়া আনিল, এই বলিয়া যথোচিত চপেটাঘাত ও কানমলার যোগে শিশুজীবনের সকল খেলা সকল আনন্দের চেয়ে কাপড়কে যে কী প্রকারে খাতির করিয়া চলিতে হয়, শিশুকে তাহা শিখানো হইয়া থাকে। যে-কাপড়ে তাহার কোনো প্রয়োজন নাই সে-কাপড়ের জন্য বেচারাকে এ বয়সে এমন করিয়া দায়ী করা কেন ; বেচারাদের জন্য ঈশ্বর বাহিরে যে কয়টা অবাধ সুখের আয়োজন, এবং মনের মধ্যে অব্যাহত সুখ-সম্ভোগের ক্ষমতা দিয়াছিলেন, অতি অকিঞ্চিৎকর পোশাকের মমতায় তাহার জীবনারম্ভের সেই সরল আনন্দের লীলাক্ষেত্রকে অকারণে এমন বিঘ্নসংকুল করিয়া তুলিবার কী প্রয়োজন ছিল। মানুষ কি সকল জায়গাতেই নিজের ক্ষুদ্রবুদ্ধি ও তুচ্ছ প্রবৃত্তির শাসন বিস্তার করিয়া কোথাও স্বাভাবিক সুখশান্তির স্থান রাখিবে না। আমার ভালো লাগে, অতএব যেমন করিয়া হউক উহারও ভালো লাগা উচিত, এই জবরদস্তির যুক্তিতে কি জগতের চারিদিকে কেবলই দুঃখ বিস্তার করিতে হইবে।

যাই হউক, প্রকৃতির দ্বারা যেটুকু করিবার, তাহা আমাদের দ্বারা কোনোমতেই হয় না, অতএব মানুষের সমস্ত ভালো কেবল আমরা বুদ্ধিমানেরাই করিব এমন পণ না করিয়া প্রকৃতিকেও খানিকটা পথ ছাড়িয়া দেওয়া চাই। সেইটে গোড়ায় হইলেই ভদ্রতার সঙ্গে কোনো বিরোধ বাধে না এবং ভিত্তি পাকা হয়। এই প্রাকৃতিক শিক্ষা যে কেবল ছেলেদের তাহা নহে, ইহাতে আমাদেরও উপকার আছে। আমরা নিজের হাতের কাজে সমস্ত আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়া সেইটেতেই আমাদের অভ্যাসকে এমন বিকৃত করি যে, স্বাভাবিককে আর কোনোমতেই সহজদৃষ্টিতে দেখিতে পারি না। আমরা যদি মানুষের সুন্দর শরীরকে নির্মল বাল্য অবস্থাতেও উলঙ্গ দেখিতে সর্বদাই অভ্যস্ত না থাকি তবে বিলাতের লোকের মতো শরীরসম্বন্ধে যে একটা বিকৃত সংস্কার মনের মধ্যে বদ্ধমূল হয় তাহা যথার্থই বর্বর এবং লজ্জার যোগ্য।

অবশ্য, ভদ্রসমাজে কাপড়চোপড় জুতামোজার একটা প্রয়োজন আছে বলিয়াই ইহাদের সৃষ্টি হইয়াছে ; কিন্তু এই-সকল কৃত্রিম সহায়কে প্রভু করিয়া তুলিয়া তাহার কাছে নিজেকে কুণ্ঠিত করিয়া রাখা সংগত নয়। এই বিপরীত ব্যাপারে কখনোই

ভালো ফল হইতে পারে না। অন্তত ভারতবর্ষের জলবায়ু এরূপ যে, আমাদের এই সকল উপকরণের চিরদাস হওয়ার কোনো প্রয়োজনই নাই ; কোনোকালে আমরা ছিলামও না। আমরা প্রয়োজনমতো কখনো বা বেশভূষা ব্যবহার করিয়াছি, কখনো বা তাহা খুলিয়াও রাখিয়াছি। বেশভূষা জিনিসটা যে নৈমিত্তিক,— ইহা আমাদের প্রয়োজন সাধন করে মাত্র, এই প্রভুত্বটুকু আমাদের বরাবর ছিল। এইজন্য খোলা গায়ে আমরা লজ্জিত হইতাম না এবং অন্যকে দেখিলেও আমাদের রাগ হইত না। এ সম্বন্ধে বিধাতার প্রসাদে য়ুরোপীয়দের চেয়ে আমাদের বিশেষ সুবিধা ছিল। আমরা আবশ্যকমতো লজ্জারক্ষাও করিয়াছি, অথচ অনাবশ্যক অতিলজ্জার দ্বারা নিজেকে ভারগ্রস্ত করি নাই।

এ কথা মনে রাখিতে হইবে, অতিলজ্জা লজ্জাকে নষ্ট করে। কারণ, অতিলজ্জাই বস্তুত লজ্জাজনক। তা ছাড়া, অতি-র বন্ধন মানুষ যখন একবার ছিঁড়িয়া ফেলে, তখন তাহার আর বিচার থাকে না। আমাদের মেয়েরা গায়ে বেশি কাপড় দেয় না মানি, কিন্তু তাহারা কোনোক্রমেই ইচ্ছা করিয়া সচেষ্টভাবে বুকপিঠের আবরণের বারো-আনা বাদ দিয়া পুরুষসমাজের বাহির হইতে পারে না। আমরা লজ্জা করি না, কিন্তু লজ্জাকে এমন করিয়া আঘাতও করি না।

কিন্তু লজ্জাতত্ত্ব সম্বন্ধে আমি আলোচনা করিতে বসি নাই, অতএব ও কথা থাক্। আমার কথা এই, মানুষের সভ্যতা কৃত্রিমের সহায়তা লইতে বাধ্য, সেইজন্যই এই কৃত্রিম যাহাতে অভ্যাসদোষে আমাদের কর্তা হইয়া না উঠে, যাহাতে আমরা নিজের গড়া সামগ্রীর চেয়ে সর্বদাই উপরে মাথা তুলিয়া থাকিতে পারি, এ দিকে আমাদের দৃষ্টি রাখা দরকার। আমাদের টাকা যখন আমাদিগকেই কিনিয়া বসে, আমাদের ভাষা যখন আমাদের ভাবের নাকে দড়ি দিয়া ঘুরাইয়া মারে, আমাদের সাজ যখন আমাদের অঙ্গকে অনাবশ্যক করিবার জো করে, আমাদের নিত্য যখন নৈমিত্তিকের কাছে অপরাধীর মতো কুণ্ঠিত হইয়া থাকে, তখন সভ্যতার সমস্ত বুলিকে অগ্রাহ্য করিয়া এ কথা বলিতেই হইবে, এটা ঠিক হইতেছে না। ভারতবাসীর খালি-গা কিছুমাত্র লজ্জার নহে ; যে সভ্যব্যক্তির চোখে ইহা অসহ্য, সে আপনার চোখের মাথা খাইয়া বসিয়াছে।

শরীর সম্বন্ধে কাপড়-জুতা-মোজা যেমন, আমাদের মন সম্বন্ধে বই জিনিসটা ঠিক তেমনি হইয়া উঠিয়াছে। বইপড়াটা যে শিক্ষার একটা সুবিধাজনক সহায়মাত্র, তাহা আর আমাদের মনে হয় না ; আমরা বইপড়াটাকেই শিক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়া ঠিক করিয়া বসিয়া আছি। এ সম্বন্ধে আমাদের সংস্কারকে নড়ানো বড়োই কঠিন হইয়া উঠিয়াছে।

মাস্টার বই হাতে করিয়া শিশুকাল হইতেই আমাদিগকে বই মুখস্থ করাইতে থাকেন। কিন্তু বইয়ের ভিতর হইতে জ্ঞানসঞ্চয় করা আমাদের মনের স্বাভাবিক ধর্ম নহে। প্রত্যক্ষ জিনসকে দেখিয়া-শুনিয়া নাড়িয়া-চাড়িয়া সঙ্গে সঙ্গেই অতি সহজেই আমাদের মননশক্তির চর্চা হওয়া স্বভাবের বিধান ছিল। অন্যের অভিজ্ঞাত ও পরীক্ষিত জ্ঞান, তাও লোকের মুখ হইতে শুনিলে তবে আমাদের সমস্ত মন সহজে সাড়া দেয়। কারণ, মুখের কথা তো শুধু কথা নহে, তাহা মুখের কথা। তাহার সঙ্গে প্রাণ আছে; চোখমুখের ভঙ্গী, কণ্ঠের স্বরলীলা, হাতের ইঙ্গিত— ইহার দ্বারা কানে শুনিবার ভাষা, সংগীত ও আকার লাভ করিয়া চোখ কান দুয়েরই সামগ্রী হইয়া উঠে। শুধু তাই নয়, আমরা যদি জানি, মানুষ তাহার মনের সামগ্রী সদ্য মন হইতে আমাদিগকে দিতেছে, সে একটা বই পড়িয়া মাত্র যাইতেছে না, তাহা হইলে মনের সঙ্গে মনের প্রত্যক্ষ সম্মিলনে জ্ঞানের মধ্যে রসের সঞ্চার হয়।

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের মাস্টাররা বই পড়াইবার একটা উপলক্ষমাত্র; আমরাও বই পড়িবার একটা উপসর্গ। ইহাতে ফল হইয়াছে এই, আমাদের শরীর যেমন কৃত্রিম জিনিসের আড়ালে পড়িয়া পৃথিবীর সঙ্গে গায়ে-গায়ে যোগটা হারাইয়াছে এবং হারাইয়া এমন অভ্যস্ত হইয়াছে যে, সে-যোগটাকে আজ ক্লেশকর লজ্জাকর বলিয়া মনে করে— তেমনি আমাদের মন এবং বাহিরের মাঝখানে বই আসিয়া পড়াতে আমাদের মন জগতের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগের স্বাদ-শক্তি অনেকটা হারাইয়া ফেলিয়াছে। সব জিনিসকে বইয়ের ভিতর দিয়া জানিবার একটা অস্বাভাবিক অভ্যাস আমাদের মধ্যে বদ্ধমূল হইয়া গেছে। পাশেই যে-জিনিসটা আছে, সেইটেকেই জানিবার জন্য বইয়ের মুখ তাকাইয়া থাকিতে হয়। নবাবের গল্প শুনিয়াছি, জুতাটা ফিরাইয়া দিবার জন্য চাকরের অপেক্ষা করিয়া শত্রুহস্তে বন্দী হইয়াছিল। বইপড়া বিদ্যার গতিকে আমাদেরও মানসিক নবাবি তেমনি অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছে। তুচ্ছ বিষয়টুকুর জন্যও বই নহিলে মন আশ্রয় পায় না। বিকৃত সংস্কারের দোষে এইরূপ নবাবিয়ানা আমাদের কাছে লজ্জাকর না হইয়া গৌরবজনক হইয়া উঠে, এবং বইয়ের ভিতর দিয়া জানাকেই আমরা পাণ্ডিত্য বলিয়া গর্ব করি। জগতকে আমরা মন দিয়া ছুঁই না, বই দিয়া ছুঁই।

মানুষের জ্ঞান ও ভাবকে বইয়ের মধ্যে সঞ্চিত করিবার যে একটা প্রচুর সুবিধা আছে, সে-কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। কিন্তু সেই সুবিধার দ্বারা মনের স্বাভাবিক শক্তিকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলে বুদ্ধিকে বাবু করিয়া তোলা হয়। বাবুনামক জীব চাকর-বাকর জিনিসপত্রের সুবিধার অধীন। নিজের চেষ্টাপ্রয়োগে

যেটুকু কষ্ট, যেটুকু কাঠিন্য আছে, সেইটুকুতেই যে আমাদের সুখ সত্য হয়, আমাদের লাভ মূল্যবান হইয়া উঠে, বাবু তাহা বোঝে না। বইপড়া-বাবুয়ানাতেও জ্ঞানকে নিজে পাওয়ার যে একটা আনন্দ, সত্যকে তাহার যথাস্থানে কঠিন প্রেমাভিসারের দ্বারায় লাভ করার যে একটা সার্থকতা, তাহা থাকে না। ক্রমে মনের সেই স্বাভাবিক স্বাধীনশক্তিটাই মরিয়া যায়, সুতরাং সেই শক্তিচালনার সুখটাও থাকে না, বরঞ্চ চালনা করিতে বাধ্য হইলে তাহা কষ্টের কারণ হইয়া উঠে।

এইরূপে বইপড়ার আবরণে মন শিশুকাল হইতে আপাদমস্তক আবৃত হওয়াতে আমরা মানুষের সঙ্গে সহজভাবে মেলামেশা করিবার শক্তি হারাইতেছি। আমাদের কাপড়পরা শরীরের যেমন একটা সংকোচ জন্মিয়াছে, আমাদের মনেরও তেমনই ঘটিয়াছে— সে বাহিরে আসতেই চায় না। লোকজনদের সহজে আদর-অভ্যর্থনা করা, তাহাদের সঙ্গে আপনভাবে মিলিয়া কথাবার্তা কওয়া আমাদের শিক্ষিতলোকদের পক্ষে ক্রমশই কঠিন হইয়া উঠিতেছে, তাহা আমারা লক্ষ করিয়া দেখিয়াছি। আমরা বইয়ের লোককে চিনি, পৃথিবীর লোককে চিনি না; বইয়ের লোক আমাদের পক্ষে মনোহর, পৃথিবীর লোক শ্রান্তিকর। আমরা বিরাট সভায় বক্তৃতা করিতে পারি, কিন্তু জনসাধারণের সঙ্গে কথাবার্তা কহিতে পারি না। যখন আমরা বড়ো কথা, বইয়ের কথা লইয়া আলোচনা করিতে পারি, কিন্তু সহজ আলাপ, সামান্য কথা আমাদের মুখ দিয়া ঠিকমতো বাহির হইতে চায় না, তখন বুঝিতে হইবে দৈবদুর্যোগে আমরা পণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছি, কিন্তু আমাদের মানুষটি মারা গেছে। মানুষের সঙ্গে মানুষভাবে আমাদের অবারিত গতিবিধি থাকিলে ঘরের বার্তা, সুখদুঃখের কথা, ছেলেপুলের খবর, প্রতিদিনের আলোচনা আমাদের পক্ষে সহজ ও সুখকর হয়। বইয়ের মানুষ তৈরি-করা কথা বলে, তাহারা যে-সকল কথায় হাসে তাহা প্রকৃত পক্ষেই হাস্যরসাত্মক, তাহারা যাহাতে কাঁদে তাহা করুণরসের সার; কিন্তু সত্যকার মানুষ যে রক্তমাংসের প্রত্যক্ষগোচর মানুষ, সে ইখানেই যে তাহার মস্ত জিত— এইজন্য তাহার কথা, তাহার হাসিকান্না অত্যন্ত পয়লা নম্বরের না হইলেও চলে। বস্তুত সে স্বভাবত যাহা তাহার চেয়ে বেশি হইবার আয়োজন না করিলেই সুখের বিষয় হয়। মানুষ বই হইয়া উঠিবার চেষ্টা করিলে তাহাতে মানুষের স্বাদ নষ্ট হইয়া যায়।

চাণক্য বুঝি বলিয়া গেছেন, বিদ্যা যাহাদের নাই, তাহারা 'সভামধ্যে ন শোভন্তে'। কিন্তু সভা তো চিরকাল চলে না। এক সময়ে তো সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়া আলো নিবাইয়া দিতেই হয়। মুশকিল এই যে, আমাদের দেশের এখনকার বিদ্বানরা সভার

বাহিরে 'ন শোভন্তে'; তাঁহারা বইপড়ার মধ্যে মানুষ, তাই মানুষের মধ্যে তাঁহাদের কোনো সোয়াস্তি নাই।

এরূপ অবস্থার স্বাভাবিক পরিণাম নিরানন্দ। একটা সৃষ্টিছাড়া মানসিক ব্যাধি য়ুরোপের সাহিত্যে সমাজে সর্বত্র প্রকাশ পাইতেছে, তাহাকে সে-দেশের লোকে বলে world-weariness। লোকের স্নায়ু বিকল হইয়া গেছে; জীবনের স্বাদ চলিয়া গেছে; নব নব উত্তেজনা সৃষ্টি করিয়া নিজেকে ভুলাইবার চেষ্টা চলিতেছে। এই অসুখ, এই বিকলতা যে কিসের জন্য, কিছুই বুঝিবার জো নাই। এই অবসাদ মেয়ে-পুরুষ উভয়কেই পাইয়া বসিয়াছে।

স্বভাব হইতে ক্রমশই অনেক দূরে চলিয়া যাওয়া ইহার কারণ। কৃত্রিম সুবিধা উত্তরোত্তর আকাশপ্রমাণ হইয়া জগতের জীবকে জগৎছাড়া করিয়া দিয়াছে। পুঁথির মধ্যে মন, আসবাবের মধ্যে শরীর প্রচ্ছন্ন হইয়া আত্মার সমস্ত দরজা-জানলাগুলাকে অবরুদ্ধ করিয়াছে। যাহা সহজ, যাহা নিত্য, যাহা মূল্যহীন বলিয়াই সর্বাপেক্ষা মূল্যবান, তাহার সঙ্গে আনাগোনা বন্ধ হওয়াতে তাহা গ্রহণ করিবার ক্ষমতা চলিয়া গেছে। যে-সকল জিনিস উত্তেজনার নব নব তাড়নায় উদ্ভাবিত হইয়া দুইচারিদিন ফ্যাশনের আবর্তে আবিল হইয়া উঠে এবং তাহার পরেই অনাদরে আবর্জনার মধ্যে জমা হইয়া সমাজের বাতাসকে দূষিত করে, তাহাই কেবল পুনঃপুনঃ লক্ষ লক্ষ গুণী ও মজুরের চেষ্টাকে সমস্ত সমাজ জুড়িয়া ঘানির বলদের মতো ঘুরাইয়া মারিতেছে।

এক বই হইতে আর-এক বই উৎপন্ন হইতেছে, এক কাব্যগ্রন্থ হইতে আর-এক কাব্যগ্রন্থের জন্ম, একজনের মত মুখে-মুখে সহস্রলোকের মত হইয়া দাঁড়াইতেছে; অনুকরণ হইতে অনুকরণের প্রবাহ চলিয়াছে; এমনি করিয়া পুঁথি ও কথার অরণ্য মানুষের চারদিকে নিবিড় হইয়া উঠিতেছে, প্রাকৃতিক জগতের সঙ্গে ইহার সম্বন্ধ ক্রমশই দূরে চলিয়া যাইতেছে। মানুষের অনেকগুলি মনের ভাব উৎপন্ন হইতেছে যাহা কেবল পুঁথির সৃষ্টি। এই-সকল বাস্তবতাবর্জিত ভাবগুলা ভূতের মতো মানুষকে পাইয়া বসে; তাহার মনের স্বাস্থ্য নষ্ট করে; তাহাকে অত্যুক্তি এবং আতিশয্যের দিকে লইয়া যায়; সকলে মিলিয়া ক্রমাগতই একই ধুয়া ধরিয়া কৃত্রিম উৎসাহের দ্বারা সত্যের পরিমাণ নষ্ট করিয়া তাহাকে মিথ্যা করিয়া তোলে। দৃষ্টান্তস্বরূপে বলিতে পারি, প্যাট্রিয়টিজম-নামক পদার্থ। ইহার মধ্যে যেটুকু সত্য ছিল, প্রতিদিন সকলে পড়িয়া সেটাকে তুলা ধুনিয়া একটা প্রকাণ্ড মিথ্যা করিয়া তুলিয়াছে; এখন এই তৈরি বুলিটাকে প্রাণপণ চেষ্টায় সত্য করিয়া তুলিবার জন্য কত কৃত্রিম উপায়, কত অলীক উদ্দীপনা, কত

অন্যায় শিক্ষা, কত গড়িয়া-তোলা বিদ্বেষ, কত কূট যুক্তি, কত ধর্মের ভাণ সৃষ্ট হইতেছে তাহার সীমা সংখ্যা নাই। এই-সকল স্বভাবভ্রষ্ট কুহেলিকার মধ্যে মানুষ বিভ্রান্ত হয়— সরল ও উদার, প্রশান্ত ও সুন্দর হইতে সে কেবল দূরে চলিয়া যাইতে থাকে। কিন্তু বুলির মোহ ভাঙানো বড়ো শক্ত। বস্তুকে আক্রমণ করিয়া ভূমিসাৎ করা যায়, বুলির গায়ে ছুরি বসে না। এইজন্য বুলি লইয়া মানুষে মানুষে যত ঝগড়া, যত রক্তপাত হইয়াছে, এমন তো বিষয় লইয়া হয় নাই।

সমাজে সরল অবস্থায় দেখিতে পাই, লোকে যেটুকু জানে তাহা মানে। সেটুকুর প্রতি তাহাদের নিষ্ঠা অটল; তাহার জন্য ত্যাগস্বীকার, কষ্টস্বীকার তাহাদের পক্ষে সহজ। ইহার কতকগুলি কারণ আছে; কিন্তু একটি প্রধান কারণ, তাহাদের হৃদয় মন মতের দ্বারা আবৃত হইয়া যায় নাই; যতটুকু সত্য বলিয়া গ্রহণ করিবার অধিকার ও শক্তি তাহাদের আছে ততটুকুই তাহারা গ্রহণ করিয়াছে। মন যাহা সত্যরূপে গ্রহণ করে, হৃদয় তাহার জন্য অনেক ক্লেশ অনায়াসেই সহিতে পারে; সেটাকে সে বাহাদুরি বলিয়া মনেই করে না।

সভ্যতার জটিল অবস্থায় দেখা যায়, মতের বহুতর স্তর জমিয়া গেছে। কোনোটা চার্চের মত, চর্চার মত নহে; কোনোটা সভার মত, ঘরের মত নহে; কোনোটা দলের মত, অন্তরের মত নহে; কোনো মতে চোখ দিয়া জল বাহির হয়, পকেট হইতে টাকা বাহির হয় না; কোনো মতে টাকাও বাহির হয়, কাজও চলে— কিন্তু হৃদয়ে তাহার স্থান নাই, ফ্যাশানে তাহার প্রতিষ্ঠা। এই-সকল অবিশ্রাম-উৎপন্ন ভূরি ভূরি সত্যবিকারের মাঝখানে পড়িয়া মানুষের মন সত্য-মতকেও অবিচলিত-সত্যরূপে গ্রহণ করিতে পারে না। এইজন্য তাহার আচারণ সর্বত্র সর্বতোভাবে সত্য হইতে পারে না। সে সরলভাবে আপন শক্তি ও প্রকৃতি অনুযায়ী কোনো পন্থা নির্বাচন করিবার অবকাশ না পাইয়া বিভ্রান্তভাবে দশের কথার পুনরাবৃত্তি করিতে থাকে, অবশেষে কাজের বেলায় তাহার প্রকৃতির মধ্যে বিরোধ বাধিয়া যায়। সে যদি নিজের স্বভাবকে নিজে পাইত, তবে সেই স্বভাবের ভিতর দিয়া যাহা-কিছু পাইত, তাহা ছোটো হউক বড়ো হউক খাঁটি জিনিস হইত। তাহা তাহাকে সম্পূর্ণ বল দিত, সম্পূর্ণ আশ্রয় দিত; সে তাহাকে সর্বতোভাবে কাজে না খাটাইয়া থাকিতে পারিত না। এখন তাহাকে গোলেমালে পড়িয়া পুঁথির মত, মুখের মত, সভার মত, দলের মত লইয়া ধ্রুবলক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া কেবল বিস্তর কথা আওড়াইয়া বেড়াইতে হয়। সেই কথা আওড়াইয়া বেড়ানোকে সে হিতকর্ম বলিয়া মনে করে; সেজন্য সে বেতন পায়; তাহা বেচিয়া

সে লাভ করে ; এই-সকল কথার একটুখানি এদিক-ওদিক লইয়া সে অন্য সম্প্রদায়, অন্য জাতিকে হেয় এবং নিজের জাতি ও দলকে শ্রদ্ধেয় বলিয়া প্রচার করে।

মানুষের মনের চারিদিকে এই-যে অতিনিবিড় পুঁথির অরণ্যে বুলির বোল ধরিয়াছে, ইহার মোদোগন্ধে আমাদিগকে মাতাল করিতেছে, শাখা হইতে শাখান্তরে কেবলই চঞ্চল করিয়া মারিতেছে ; কিন্তু যথার্থ আনন্দ, গভীর তৃপ্তি দিতেছে না। নানাপ্রকার বিদ্রোহ ও মনোবিকার উৎপন্ন করিতেছে।

সহজ জিনিসের গুণ এই যে, তাহার স্বাদ কখনোই পুরাতন হয় না, তাহার সরলতা তাহাকে চিরদিন নবীন করিয়া রাখে। যাহা যথার্থ স্বভাবের কথা, তাহা মানুষ যতবার বলিয়াছে ততবারই নূতন লাগিয়াছে। পৃথিবীতে গুটিদুইতিন মহাকাব্য আছে যাহা সহস্রবৎসরেও ম্লান হয় নাই ; নির্মল জলের মতো তাহা আমাদের পিপাসা হরণ করিয়া তৃপ্তি দেয়, মদের মতো তাহা আমাদিগকে উত্তেজনার ডগার উপরে তুলিয়া শুষ্ক অবসাদের মধ্যে আছাড় মারিয়া ফেলে না। সহজ হইতে দূরে আসিলেই একবার উত্তেজনা ও একবার অবসাদের মধ্যে কেবলই ঢেঁকি-কোটা হইতে হয়। উপকরণবহুল অতিসভ্যতার ইহাই ব্যাধি।

এই জঙ্গলের ভিতর দিয়া পথ বাহির করিয়া, এই রাশীকৃত পুঁথি ও বচনের আবরণ ভেদ করিয়া, সমাজের মধ্যে, মানুষের মনের মধ্যে স্বভাবের বাতাস ও আলোক আনিবার জন্য মহাপুরুষ এবং হয়তো মহাবিপ্লবের প্রয়োজন হইবে। অত্যন্ত সহজ কথা, অত্যন্ত সরল সত্যকে হয়তো রক্তসমুদ্র পাড়ি দিয়া আসিতে হইবে। যাহা আকাশের মতো ব্যাপক, যাহা বাতাসের মতো মূল্যহীন, তাহাকে কিনিয়া উপার্জন করিয়া লইতে হয়তো প্রাণ দিতে হইবে। য়ুরোপের মনোরাজ্যে ভূমিকম্প ও অগ্ন্যুৎপাতের অশান্তি মাঝে মাঝে প্রায়ই দেখা দিতেছে ; স্বভাবের সঙ্গে জীবনের, বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে অন্তঃপ্রকৃতির প্রকাণ্ড অসামঞ্জস্যই ইহার কারণ।

কিন্তু য়ুরোপের এই বিকৃতি কেবল অনুকরণের দ্বারা, কেবল ছোঁয়াচ লাগিয়া আমরা পাইতেছি। ইহা আমাদের দেশজ নহে। আমরা শিশুকাল হইতে বিলাতি বই মুখস্থ করিতে লাগিয়া গেছি ; যাহা আবর্জনা তাহাও লাভ মনে করিয়া লইতেছি। আমরা যে-সকল বিদেশী বুলি সর্বদাই অসন্দিগ্ধমনে পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে ব্যবহার করিয়া চলিতেছি, জানি না, তাহার প্রত্যেকটিকে অবিশ্বাসের সহিত আদিসত্যের নিকষপাথরে ঘষিয়া যাচাই করিয়া লওয়া চাই— তাহার বারো-আনা কেবল পুঁথির সৃষ্টি, কেবল তাহারা মুখেমুখেই বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে, দশজনে পরস্পরের অনুকরণ করিয়া বলিতেছে বলিয়া আর-দশজনে তাহাকে ধ্রুবসত্য বলিয়া গণ্য করিতেছে। আমরাও সেই-সকল

বাঁধিগৎ এমন করিয়া ব্যবহার করিতেছি, যেন তাহার সত্য আমরা আবিষ্কার করিয়াছি— যেন তাহা বিদেশী ইস্কুলমাস্টারের আবৃত্তির জড় প্রতিধ্বনিমাত্র নহে।

আবার, যাহারা নূতন পড়া আওড়াইতেছে, তাহাদের উৎসাহ কিছু বেশি হইয়া থাকে। সুশিক্ষিত টিয়াপাখি যত উচ্চস্বরে কানে তালা ধরায়, তাহার শিক্ষকের গলা তত চড়া নয়। শুনা যায়, যে-সব জাতির মধ্যে বিলাতি সভ্যতা নূতন প্রবেশ করে, তাহারা বিলাতের মদ ধরিয়া একেবারে মারা পড়িবার জো হয়, অথচ যাহাদের অনুকরণে তাহারা মদ ধরে তাহারা মদে এত বেশি অভিভূত হয় না। তেমনি দেখা যায়, যে-সকল কথার মোহে কথার সৃষ্টিকর্তারা অনেকটা পরিমাণে অবিচলিত থাকে, আমরা তাহাতে একেবারে ধরাশায়ী হইয়া যাই। সেদিন কাগজে দেখিলাম, বিলাতের কোন্ এক সভায় আমাদের দেশী লোকেরা একজনের পর আর-একজন উঠিয়া ভারতবর্ষে স্ত্রী-শিক্ষার অভাব ও সেই অভাবপূরণ সম্বন্ধে অতি পুরাতন বিলাতি বুলি দাঁড়ের পাখির মতো আওড়াইয়া গেলেন ; শেষকালে একজন ইংরেজ উঠিয়া ভারতবর্ষের মেয়েদের ইংরেজি কায়দায় শেখানোই যে একমাত্র শিক্ষানামের যোগ্য, এবং সেই শিক্ষাই আমাদের স্ত্রীলোকের পক্ষে যে একমাত্র শ্রেয়, সে-সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিলেন। আমি দুই পক্ষের তর্কের সত্যামথ্যা সম্বন্ধে কোনো কথা তুলিতেছি না। কিন্তু বিলাতে প্রচলিত দস্তুর ও মত যে গন্ধমাদনের মতো আদ্যোপান্ত উৎপাটন করিয়া আনিবার যোগ্য, এ সম্বন্ধে আমাদের মনে বিচার মাত্র উপস্থিত হয় না তাহার কারণ, ছেলেবেলা হইতে এ-সব কথা আমরা পুঁথি হইতেই শিখিয়াছি এবং আমাদের যাহা কিছু শিক্ষা সমস্তই পুঁথির শিক্ষা।

বুলি ও পুঁথির বিবরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আমাদের দেশেও শিক্ষিত লোকের মধ্যে নিরানন্দ দেখা দিয়াছে। কোথায় হৃদ্যতা, কোথায় মেলামেশা, কোথায় সহজ হাস্যকৌতুক। জীবনযাত্রার ভার বাড়িয়া গেছে বলিয়াই যে এতটা অবসন্নতা, তাহা নহে। সে একটা কারণ বটে, সন্দেহ নাই ; আমাদের সহিত সর্বপ্রকার-সামাজিক-যোগবিহীন আত্মীয়তাশূন্য রাজশক্তির অহরহ অলক্ষ্য চাপও আর-একটা কারণ ; কিন্তু সেই সঙ্গে আমাদের অত্যন্ত কৃত্রিম লেখাপড়ার তাড়নাও কম কারণ নহে। নিতান্ত শিশুকাল হইতে তাহার পেষণ আরম্ভ হয় ; এই জ্ঞানলাভের সঙ্গে মনের সঙ্গে যোগ অতি অল্প। এ জ্ঞান আনন্দের জন্যও নহে, এ কেবল প্রাণের দায়ে এবং কতকটা মানের দায়েও বটে।

আমরা মন খাটাইয়া সজীবভাবে যে-জ্ঞান উপার্জন করি, তাহা আমাদের মজ্জার সঙ্গে মিশিয়া যায় ; বই মুখস্থ করিয়া যাহা পাই তাহা বাহিরে জড়ো হইয়া সকলের

সঙ্গে আমাদের বিচ্ছেদ ঘটায়। তাহাকে আমরা কিছুতেই ভুলিতে পারি না বলিয়া অহংকার বাড়িয়া উঠে ; সেই অহংকারের যেটুকু সুখ সেই আমাদের একমাত্র সম্বল। নহিলে জ্ঞানের স্বাভাবিক আনন্দ আমরা যদি লাভ করিতাম তবে এতগুলি শিক্ষিতলোকের মধ্যে অন্তত গুটিকয়েককেও দেখিতে পাইতাম যাঁহারা জ্ঞানচর্চার জন্য নিজের সমস্ত স্বার্থকে খর্ব করিয়াছেন। কিন্তু দেখিতে পাই, সায়েন্সের পরীক্ষায় প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া ডেপুটিম্যাজিস্ট্রেট হইয়া সমস্ত বিদ্যা আইন-আদালতের অতলস্পর্শ নিরর্থকতার মধ্যে চিরদিনের মতো বিসর্জন করিতে সকলে ব্যগ্র এবং কতকগুলা পাস করিয়া কেবল হতভাগা কন্যার পিতাকে ঋণের পঙ্কে ডুবাইয়া মারাই তাঁহাদের একমাত্র স্থায়ী কীর্তি হইয়া থাকে। দেশে বড়ো বড়ো শিক্ষিত উকিল-জজ-কেরানীর অভাব নাই, কিন্তু জ্ঞানতপস্বী কোথায়।

কথায়-কথায় কথা অনেক বাড়িয়া গেল। উপস্থিতমতো আমার যেটুকু বক্তব্য সে এই— বইপড়াটাই যে শেখা, ছেলেদের মনে এই অন্ধসংস্কার যেন জন্মিতে দেওয়া না হয়। প্রকৃতির অক্ষয়ভাণ্ডার হইতেই যে বইয়ের সঞ্চয় আহরিত হইয়াছে, অন্তত হওয়া উচিত, এবং সেখানে যে আমাদেরও অধিকার আছে, এ কথা পদে পদে জানানো চাই। বইয়ের দৌরাত্ম্য অত্যন্ত বেশি হইয়াছে বলিয়াই বেশি করিয়া জানানো চাই। এ দেশে অতি পুরাকালে যখন লিপি প্রচলিত ছিল তখনও তপোবনে পুঁথিব্যবহার হয় নাই। তখনও গুরু শিষ্যকে মুখে-মুখেই শিক্ষা দিতেন, এবং ছাত্র তাহা খাতায় নহে, মনের মধ্যেই লিখিয়া লইত। এমনি করিয়া এক দীপশিখা হইতে আর-এক দীপশিখা জ্বলিত। এখন ঠিক এমনটি হইতে পারে না। কিন্তু যথাসম্ভব ছাত্রদিগকে পুঁথির আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে হইবে। পারতপক্ষে ছাত্রদিগকে পরের রচনা পড়িতে দেওয়া নহে— তাহারা গুরুর কাছে যাহা শিখিবে, তাহাদের নিজেকে দিয়া তাহাই রচনা করিয়া লইতে হইবে ; এই স্বরচিত গ্রন্থই তাহাদের গ্রন্থ। এমন হইলে তাহারা মনেও করিবে না, গ্রন্থগুলা আকাশ হইতে পড়া বেদবাক্য। 'আর্যরা মধ্য-এশিয়া হইতে ভারতে আসিয়াছেন', 'খৃষ্টজন্মের দুই হাজার বৎসর পূর্বে বেদরচনা হইয়াছে', এই-সকল কথা আমরা বই হইতে পড়িয়াছি— বইয়ের অক্ষরগুলো কাটকুটহীন নির্বিকার ; তাহারা শিশুবয়সে আমাদের উপরে সম্মোহন প্রয়োগ করে— তাই আমাদের কাছে আজ এ-সমস্ত কথা একেবারে দৈববাণীর মতো। ছেলেদের প্রথম হইতেই জানাইতে হইবে, এই-সকল আনুমানিক কথা কতকগুলা যুক্তির উপর নির্ভর করিতেছে। সেই-সকল যুক্তির মূল উপকরণগুলি যথাসম্ভব তাহাদের সম্মুখে ধরিয়া তাহাদের নিজেদের অনুমানশক্তির উদ্রেক করিতে হইবে। বইগুলা যে কী

করিয়া তৈরি হইতে থাকে তাহা প্রথম হইতেই অল্পে-অল্পে ক্রমে-ক্রমে তাহারা নিজেদের মনের মধ্যে অনুভব করিতে থাকুক ; তাহা হইলেই বইয়ের যথার্থ ফল তাহারা পাইবে, অথচ তাহার অন্ধশাসন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে, এবং নিজের স্বাধীন উদ্যমের দ্বারা জ্ঞানলাভ করিবার যে স্বাভাবিক মানসিক শক্তি, তাহা ঘাড়ের-উপরে-বাহির-হইতে-বোঝা-চাপানো বিদ্যার দ্বারায় আচ্ছন্ন ও অভিভূত হইবে না— বইগুলোর উপরে মনের কর্তৃত্ব অক্ষুণ্ন থাকিবে। বালক অল্পমাত্রও যেটুকু শিখিবে, তখনই তাহা প্রয়োগ করিতে শিখিবে ; তাহা হইলে শিক্ষা তাহার উপরে চাপিয়া বসিবে না, শিক্ষার উপর সে-ই চাপিয়া বসিবে। এ কথায় সায় দিয়া যাইতে অনেকে দ্বিধা করেন না, কিন্তু কাজে লাগাইবার বেলা আপত্তি করেন। তাঁহারা মনে করেন, বালকদিগকে এমন করিয়া শিক্ষা দেওয়া অসম্ভব। তাঁহারা যাহাকে শিক্ষা বলেন, তাহা এমন করিয়া দেওয়া অসম্ভব বটে। তাঁহারা কতকগুলা বই ও কতকগুলা বিষয় বাঁধিয়া দেন— নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট প্রণালীতে তাহার পরীক্ষা লওয়া হয়— ইহাকেই তাঁহারা বিদ্যাশিক্ষা-দেওয়া বলেন এবং যেখানে সেইরূপ শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহাকেই বিদ্যালয় বলা হয়। বিদ্যা জিনিসটা যেন একটা স্বতন্ত্র পদার্থ ; শিশুর মন হইতে সেটাকে যেন তফাত করিয়া দেখিতে হয় ; সেটা যেন বইয়ের পাতা এবং অক্ষরের সংখ্যা তাহাতে ছাত্রের মন যদি পিষিয়া যায়, সে যদি পুঁথির গোলাম হয়, তাহার স্বাভাবিক বুদ্ধি যদি অভিভূত হইয়া পড়ে, সে যদি নিজের প্রাকৃতিক ক্ষমতাগুলি চালনা করিয়া জ্ঞান অধিকার করিবার শক্তি অনভ্যাস ও উৎপীড়ন -বশত চিরকালের মতো হারায়, তবু ইহা বিদ্যা— কারণ ইহা এতটুকু ইতিহাসের অংশ, এতগুলি ভূগোলের পাতা, এত ক'টা অঙ্ক, এবং এতটা পরিমাণ বি. এল. এ. ক্লে, সি. এল. এ. ক্লে। শিশুর মন যতটুকু শিক্ষার উপরে সম্পূর্ণ কর্তৃত্বলাভ করিতে পারে, অল্প হইলেও সেইটুকু শিক্ষাই শিক্ষা ; আর যাহা শিক্ষানাম ধরিয়া তাহার মনকে আচ্ছন্ন করিয়া দেয় তাহাকে পড়ানো বলিতে পার, কিন্তু তাহা শেখানো নহে। মানুষের 'পরে মানুষ অনেক অত্যাচার করিবে জানিয়াই বিধাতা তাহাকে শক্ত করিয়া গড়িয়াছেন ; সেইজন্য গুরুপাক অখাদ্য খাইয়া অজীর্ণে ভুগিয়াও মানুষ বাঁচিয়া থাকে, এবং শিশুকাল হইতে শিক্ষার দুর্বিষহ উৎপীড়ন সহ্য করিয়াও সে খানিকটাপরিমাণে বিদ্যালাভও করে ও তাহা লইয়া গর্বও করিতে পারে। এই তাড়নায় ও পীড়নে তাহাকে যে কতটা লোকসান দিতে হয়, কী বিপুল মূল্য দিয়া সে যে কত অল্পই ঘরে আনিতে পায় তাহা কেহ বা বুঝেন না, কেহ বা বুঝেন স্বীকার করেন না, কেহ বা বুঝেন ও স্বীকার করেন কিন্তু কাজের বেলায় যেমন চলিয়া আসিতেছে তাহাই চালাইতে থাকেন।

১৩১৩

শব্দতত্ত্ব

শব্দতত্ত্ব

বাংলা উচ্চারণ

ইংরেজি শিখিতে আরম্ভ করিয়া ইংরেজি শব্দের উচ্চারণ মুখস্থ করিতে গিয়াই বাঙালির ছেলের প্রাণ বাহির হইয়া যায়। প্রথমত ইংরেজি অক্ষরের নাম একরকম, তাহার কাজ আর-এক রকম। অক্ষর দুটি যখন আলাদা হইয়া থাকে তখন তাহারা এ বি, কিন্তু একত্র হইলেই তাহারা অ্যাব্ হইয়া যাইবে, ইহা কিছুতেই নিবারণ করা যায় না। এদিকে u-কে মুখে বলিব ইউ, কিন্তু up-এর মুখে যখন থাকেন তখন তিনি কোনো পুরুষে ইউ নন। ও পিসি এ দিকে এসো, এই শব্দগুলো ইংরেজিতে লিখিতে হইলে উচিতমতো লেখা উচিত— O pc adk so। পিসি যদি বলেন এসেচি, তবে লেখো— She ; আর পিসি যদি বলেন এইচি, তবে আরও সংক্ষেপ— he। কিন্তু কোনো ইংরেজের পিসির সাধ্য নাই এরূপ বানান বুঝিয়া উঠে। আমাদের কখগঘ-র কোনো বালাই নাই ; তাহাদের কথার নড়চড় হয় না।

এই তো গেল প্রথম নম্বর। তারপরে আবার এক অক্ষরের পাঁচ রকম উচ্চারণ। অনেক কষ্টে যখন বি এ=বে, সি এ=কে মুখস্থ হইয়াছে, তখন শুনা গেল, বি এ বি=ব্যাব্, সি এ বি=ক্যাব্। তাও যখন মুখস্থ হইল তখন শুনি বি এ আর=বার্, সি এ আর=কার্। তাও যদি বা আয়ত্ত হইল তখন শুনি, বি এ ডব্ল্-এল্=বল্, সি এ ডব্ল্-এল্=কল্। এই অকূল বানান-পাথারের মধ্যে গুরুমহাশয় যে আমাদের কর্ণ ধরিয়া চালনা করেন, তাঁহার কম্পাসই বা কোথায়, তাঁহার ধ্রুবতারাই বা কোথায়।

আবার এক-এক জায়গায় অক্ষর আছে অথচ তাহার উচ্চারণ নাই ; একটা কেন, এমন পাঁচটা অক্ষর সারি সারি বেকার দাঁড়াইয়া আছে, বাঙালির ছেলের মাথার পীড়া ও অম্লরোগ জন্মাইয়া দেওয়া ছাড়া তাহাদের আর-কোনো সাধু উদ্দেশ্যই দেখা যায় না। মাস্টারমশায় psalm শব্দের বানান জিজ্ঞাসা করিলে কিরূপ হৃৎকম্প উপস্থিত হইত, তাহা আজও কি ভুলিতে পারিয়াছি। পেয়ারার মধ্যে যেমন অনেকগুলো বীজ কেবলমাত্র খাদকের পেটকামড়ানির প্রতি লক্ষ করিয়া বিরাজ করে, তেমনি ইংরেজি শব্দের উদর পরিপূর্ণ করিয়া অনেকগুলি অক্ষর কেবল রোগের বীজস্বরূপে থাকে মাত্র।

বাংলায় এ উপদ্রব নাই। কেবল একটিমাত্র শব্দের মধ্যে একটা দুষ্ট অক্ষর নিঃশব্দ পদসঞ্চারে প্রবেশ করিয়াছে, তীক্ষ্ম সঙিন ঘাড়ে করিয়া শিশুদিগকে ভয় দেখাইতেছে, সেটা আর কেহ নয় — গবর্ণমেণ্ট শব্দের মূর্ধন্য ণ। ওটা বিদেশের আমদানি নতুন আসিয়াছে, বেলা থাকিতে ওটাকে বিদায় করা ভালো।

ইংরেজের কামান আছে, বন্দুক আছে, কিন্তু ছাব্বিশটা অক্ষরই কী কম। ইহারা আমাদের ছেলেদের পাকযন্ত্রের মধ্যে গিয়া আক্রমণ করিতেছে। ইংরেজের প্রজা বশীভূত করিবার এমন উপায় অতি অল্পই আছে। বাল্যকাল হইতেই একে একে আমাদের অস্ত্র কাড়িয়া লওয়া হয়; আমাদের বাহুর বল, চোখের দৃষ্টি, উদরের পরিপাকশক্তি বিদায়গ্রহণ করে; তার পরে ম্যালেরিয়াকম্পিত হাত হইতে অস্ত্র ছিনাইয়া লওয়াই বাহুল্য। আইন ইংরেজ-রাজ্যের সর্বত্র আছে (রক্ষা হউক আর না-ই হউক), কিন্তু ইংরেজের ফাস্টবুক-এ নাই। যখন বর্গির উপদ্রব ছিল তখন বর্গির ভয় দেখাইয়া ছেলেদের ঘুম পাড়াইত— কিন্তু ছেলেদের পক্ষে বর্গির অপেক্ষা ইংরেজি ছাব্বিশটা অক্ষর যে বেশি ভয়ানক, সে বিষয়ে কাহারও দ্বিমত হইতে পারে না। ঘুমপাড়ানী গান নিম্নলিখিত মতে বদল করিলে সংগত হয়; ইহাতে আজকালকার বাঙালির ছেলেও ঘুমাইবে, বর্গির ছেলেও ঘুমাইবে :

ছেলে ঘুমোল পাড়া জুড়োল
ফাস্টবুক এল দেশে—
বানান-ভুলে মাথা খেয়েছে
একজামিন দেবো কিসে।

পূর্বে আমার বিশ্বাস ছিল আমাদের বাংলা-অক্ষর উচ্চারণে কোনো গোলোযোগ নাই। কেবল তিনটে স, দুটো ন ও দুটো জ শিশুদিগকে বিপাকে ফেলিয়া থাকে। এই তিনটে স-এর হাত এড়াইবার জন্যই পরীক্ষার পূর্বে পণ্ডিতমশায় ছাত্রদিগকে পরামর্শ দিয়াছিলেন যে, "দেখো বাপু, 'সুশীতল সমীরণ' লিখতে যদি ভাবনা উপস্থিত হয় তো লিখে দিয়ো 'ঠাণ্ডা হাওয়া'।" এ ছাড়া দুটো ব-এর মধ্যে একটা ব কোনো কাজে লাগে না। ঋঙঞ-গুলো কেবল সং সাজিয়া আছে। চেহারা দেখিলে হাসি আসে, কিন্তু মুখস্থ করিবার সময় শিশুদের বিপরীত ভাবোদয় হয়। সকলের চেয়ে কষ্ট দেয় দীর্ঘহ্রস্ব স্বর। কিন্তু বর্ণমালার মধ্যে যতই গোলযোগ থাক্ না কেন, আমাদের উচ্চারণের মধ্যে কোনো অনিয়ম নাই, এইরূপ আমার ধারণা ছিল।

ইংলণ্ডে থাকিতে আমার একজন ইংরেজ বন্ধুকে বাংলা পড়াইবার সময় আমার চৈতন্য হইল, এ বিশ্বাস সম্পূর্ণ সমূলক নয়।

এ বিষয়ে আলোচনা করিবার পূর্বে একটা কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক। বাংলা দেশের নানাস্থানে নানাপ্রকার উচ্চারণের ভঙ্গী আছে। কলিকাতা-অঞ্চলের উচ্চারণকেই আদর্শ ধরিয়া লইতে হইবে। কারণ, কলিকাতা রাজধানী। কলিকাতা সমস্ত বঙ্গভূমির সংক্ষিপ্তসার।

হরি শব্দে আমরা হ যেরূপ উচ্চারণ করি, হর শব্দে হ সেরূপ উচ্চারণ করি না। দেখা শব্দের একার একরূপ এবং দেখি শব্দের একার আর-একরূপ। পবন শব্দে প অকারান্ত, ব ওকারান্ত, ন হসন্ত শব্দ। শ্বাস শব্দের শ্ব-র উচ্চারণ বিশুদ্ধ শ-এর মতো, কিন্তু বিশ্বাস শব্দের শ্ব-এর উচ্চারণ শ্‌শ-এর ন্যায়। 'ব্যয়' লিখি কিন্তু পড়ি—ব্যায়। অথচ অব্যয় শব্দে ব্য-এর উচ্চারণ ব্ব-এর মতো। আমরা লিখি গর্দভ, পড়ি— গর্ধোব। লিখি 'সহ্য', পড়ি— সোজ্‌ঝো। এমন কত লিখিব।

আমরা বলি আমাদের তিনটে স-এর উচ্চারণের কোনো তফাত নাই, বাংলায় সকল স-ই তালব্য শ-এর ন্যায় উচ্চারিত হয়; কিন্তু আমাদের যুক্ত-অক্ষর উচ্চারণে এ কথা খাটে না। তার সাক্ষ্য দেখো কষ্ট শব্দ এবং ব্যস্ত শব্দের দুই শ-এর উচ্চারণের প্রভেদ আছে। প্রথমটি তালব্য শ, দ্বিতীয়টি দন্ত্য স। 'আসতে হবে' এবং 'আশ্চর্য' এই উভয় পদে দন্ত্য স ও তালব্য শ-এর প্রভেদ রাখা হইয়াছে। জ-এর উচ্চারণ কোথাও বা ইংরেজি z-এর মতো হয়, যেমন লুচি ভাজতে হবে, এ স্থলে ভাজতে শব্দের জ ইংরেজি z-র মতো।

সচরাচর আমাদের ভাষায় অন্তঃস্থ ব-এর আবশ্যক হয় না বটে, কিন্তু জিহ্বা অথবা আহ্বান শব্দে অন্তঃস্থ ব ব্যবহৃত হয়।

আমরা লিখি 'তাঁহারা' কিন্তু উচ্চারণ করি - তাঁহারা অথবা তাঁহাঁরা। এমন আরো অনেক দৃষ্টান্ত আছে।

বাংলাভাষায় এইরূপ উচ্চারণের বিশৃঙ্খলা যখন নজরে পড়িল, তখন আমার জানিতে কৌতূহল হইল, এই বিশৃঙ্খলার মধ্যে একটা নিয়ম আছে কি না। আমার কাছে তখন খানদুই বাংলা অভিধান ছিল। মনোযোগ দিয়া তাহা হইতে উদাহরণ সংগ্রহ করিতে লাগিলাম। যখন আমার খাতায় অনেকগুলি উদাহরণ সঞ্চিত হইল, তখন তাহা হইতে একটা নিয়ম বাহির করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। এই-সকল উদাহরণ এবং তাহার টীকায় রাশি রাশি কাগজ পুরিয়া গিয়াছিল। যখন দেশে আসিলাম তখন এই কাগজগুলি আমার সঙ্গে ছিল। একটি চামড়ার বাক্সে সেগুলি রাখিয়া আমি অত্যন্ত নিশ্চিন্ত ছিলাম। দুই বৎসর হইল, একদিন সকালবেলায় ধুলা ঝাড়িয়া বাক্সটি খুলিলাম, ভিতরে চাহিয়া দেখি— গোটাদশেক হলদে রং-করা মস্ত-

খোঁপাবিশিষ্ট মাটির পুতুল তাহাদের হস্তদ্বয়ের অসম্পূর্ণতা ও পদদ্বয়ের সম্পূর্ণ অভাব লইয়া অম্লান বদনে আমার বাক্সর মধ্যে অন্তঃপুর রচনা করিয়া বসিয়া আছে। আমার কাগজপত্র কোথায়। কোথাও নাই। একটি বালিকা আমার হিজিবিজি কাগজগুলি বিষম ঘৃণাভরে ফেলিয়া দিয়া বাক্সটির মধ্যে পরম সমাদরে তাহার পুতুলের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। তাহাদের বিছানাপত্র, তাহাদের কাপড়চোপড়, তাহাদের ঘটিবাটি, তাহাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের সামান্যতম উপকরণটুকু পর্যন্ত কিছুরই ত্রুটি দেখিলাম না, কেবল আমার কাগজগুলিই নাই। বুড়ার খেলা বুড়ার পুতুলের জায়গা ছেলের খেলা ছেলের পুতুল অধিকার করিয়া বসিল। প্রত্যেক বৈয়াকরণের ঘরে এমনই একটি করিয়া মেয়ে থাকে যদি, পৃথিবী হইতে সে যদি তদ্ধিত প্রত্যয় ঘুচাইয়া তাহার স্থানে এইরূপ ঘোরতর পৌত্তলিকতা প্রচার করিতে পারে, তবে শিশুদের পক্ষে পৃথিবী অনেকটা নিষ্কণ্টক হইয়া যায়।

কিছু কিছু মনে আছে, তাহা লিখিতেছি। অ কিংবা অকারান্ত বর্ণ উচ্চারণকালে মাঝে মাঝে ও কিংবা ওকারান্ত হইয়া যায়। যেমন :

অতি কলু ঘড়ি কল্য মরু দক্ষ ইত্যাদি। এরূপ স্থানে অ যে ও হইয়া যায়, তাহাকে হ্রস্ব-ও বলিলেও হয়।

দেখা গিয়াছে অ কেবল স্থানবিশেষেই ও হইয়া যায়, সুতরাং ইহার একটা নিয়ম পাওয়া যায়।

১ম নিয়ম। ই (হ্রস্ব অথবা দীর্ঘ) অথবা উ (হ্রস্ব অথবা দীর্ঘ) কিংবা ইকারান্ত উকারান্ত ব্যঞ্জনবর্ণ পরে থাকিলে তাহার পূর্ববর্তী অকারের উচ্চারণ 'ও' হইবে ; যথা, অগ্নি অগ্রিম কপি তরু অঙ্গুলি অধুনা হনু ইত্যাদি।

২য়। যফলা-বিশিষ্ট ব্যঞ্জনবর্ণ পরে থাকিলে 'অ' 'ও' হইয়া যাইবে। এ নিয়ম প্রথম নিয়মের অন্তর্গত বলিলেও হয়, কারণ যফলা ই এবং অ-এর যোগমাত্র। উদাহরণ, গণ্য দন্ত্য লভ্য ইত্যাদি। 'দন্ত' এবং 'দন্ত্য ন' এই দুই শব্দের উচ্চারণের প্রভেদ লক্ষ্য করিয়া দেখো।

৩য়। ক্ষ পরে থাকিলে তৎপূর্ববর্তী 'অ' 'ও' হইয়া যায় ; যথা, অক্ষর কক্ষ লক্ষ পক্ষ ইত্যাদি। ক্ষ-র উচ্চারণ বোধ করি এককালে কতকটা ইকার-ঘেঁষা ছিল, তাই এই অক্ষরের নাম হইয়াছে ক্ষিয়। পূর্ববঙ্গের লোকেরা এই ক্ষ-র সঙ্গে যফলা যোগ করিয়া উচ্চারণ করেন, এমন-কি, ক্ষ-র পূর্বেও ঈষৎ ইকারের আভাস দেন। কলিকাতা অঞ্চলে 'লক্ষ টাকা' বলে, তাঁহারা বলেন 'লৈক্ষ্য টাকা'।

৪র্থ। ক্রিয়াপদে স্থলবিশেষে অকারের উচ্চারণ 'ও' হইয়া যায় ; যেমন, হ'লে ক'রলে

প’ল ম’ল ইত্যাদি। অর্থাৎ যদি কোনো স্থলে অ-এর পরবর্তী ই অপভ্রংশে লোপ হইয়া থাকে, তথাপিও পূর্ববর্তী অ-এর উচ্চারণ ও হইবে। হইলে-র অপভ্রংশ হ’লে, করিলে-র অপভ্রংশ ক’র্‌লে, পড়িল— প’ল, মরিল— ম’ল। করিয়া-র অপভ্রংশ ক’রে, এইজন্য ক-এ ওকার যোগ হয়, কিন্তু সমাপিকা ক্রিয়া ‘করে’ অবিকৃত থাকে। কারণ করে শব্দের মধ্যে ই নাই এবং ছিল না।

৫ম। ঋফলা-বিশিষ্ট বর্ণ পরে আসিলে তৎপূর্বের অকার ‘ও’ হয়; যথা, কর্তৃক ভর্তৃ মসৃণ যকৃত বক্তৃতা ইত্যাদি। ইহার কারণ স্পষ্ট পড়িয়া রহিয়াছে, বঙ্গভাষায় ঋফলার উচ্চারণের সহিত ইকারের যোগ আছে।

৬ষ্ঠ। এবারে যে-নিয়মের উল্লেখ করিতেছি তাহা নিয়ম কি নিয়মের ব্যতিক্রম বুঝা যায় না। দ্ব্যক্ষর-বিশিষ্ট শব্দে দন্ত্য ন অথবা মূর্ধন্য ণ পরে থাকিলে পূর্ববর্তী অকার ‘ও’ হইয়া যায়; যথা, বন ধন জন মন মণ পণ ক্ষণ। ঘন শব্দের উচ্চারণের স্থিরতা নাই। কেহ বলেন ‘ঘনো দুধ’, কেহ বলেন ‘ঘোনো দুধ’। কেবল গণ এবং রণ শব্দ এই নিয়মের মধ্যে পড়ে না। তিন অথবা তাহার বেশি অক্ষরের শব্দে এই নিয়ম খাটে না; যেমন, কনক গণক সন্‌সন্‌ কন্‌কন্‌। তিন অক্ষরের অপভ্রংশে যেখানে দুই অক্ষর হইয়াছে, সেখানেও এ নিয়ম খাটে না; যেমন, কহেন শব্দের অপভ্রংশ ক’ন, হয়েন শব্দের অপভ্রংশ হ’ন ইত্যাদি। যাহা হউক ষষ্ঠ নিয়মটা তেমন পাকা নহে।

৭ম। ৪র্থ নিয়মে বলিয়াছি অপভ্রংশে ইকারের লোপ হইলেও পূর্ববর্তী ‘অ’ ‘ও’ হইয়াছে। অপভ্রংশে উকারের লোপ হইলেও পূর্ববর্তী অ উচ্চারণস্থলে ও হইবে; যথা, হউন— হ’ন, রহুন— র’ন, কহুন— ক’ন ইত্যাদি।

৮ম। রফলা-বিশিষ্ট বর্ণের সহিত অ লিপ্ত থাকিলে তাহা ‘ও’ হইয়া যায়; যথা, শ্রবণ ভ্রম ভ্রমণ ব্রজ গ্রহ ত্রস্ত প্রমাণ প্রতাপ ইত্যাদি। কিন্তু য় পরে থাকিলে অ-এর বিকার হয় না; যথা, ক্রয় ত্রয় শ্রয়।

দুয়েকটি ছাড়া যতগুলি নিয়ম উপরে দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে বুঝাইতেছে ই কিংবা উ-এর পূর্বে অ-এর উচ্চারণ ‘ও’ হইয়া যায়। এমন-কি, ইকার উকার অপভ্রংশে লোপ হইলেও এ নিয়ম খাটে। এমন-কি, যফলা ও ঋফলায় ইকারের সংস্রব আছে বলিয়া তাহার পূর্বেও অ-এর বিকার হয়। ইকারের পক্ষে যেমন যফলা, উকারের পক্ষে তেমনই বফলা— উ-এ অ-এ মিলিয়া বফলা হয়; অতএব আমাদের নিয়মানুসারে বফলার পূর্বেও অকারের বিকার হওয়া উচিত। কিন্তু বফলার উদাহরণ অধিক সংগ্রহ করিতে পারি নাই বলিয়া এ কথা জোর করিয়া বলিতে পারিতেছি না। কিন্তু যে দুই তিনটি মনে আসিতেছে তাহাতে আমাদের কথা খাটে; যথা, অন্বেষণ ধন্বন্তরী মন্বন্তর।

এইখানে গুটিকতক ব্যতিক্রমের কথা বলা আবশ্যক। ই উ যফলা ঋফলা ক্ষ পরে থাকিলেও অভাবার্থসূচক অ-এর বিকার হয় না ; যথা, অকিঞ্চন অকুতোভয় অখ্যাতি অনৃত অক্ষয়।

নিম্নলিখিত শব্দগুলি নিয়ম মানে না, অর্থাৎ ই উ যফলা ঋফলা ইত্যাদি পরে না থাকা সত্ত্বেও ইহাদের আদ্যক্ষরবর্তী অ 'ও' হইয়া যায় ; মন্দ মন্ত্র মন্ত্রণা নখ মঙ্গল ব্রহ্ম।

আমি এই প্রবন্ধে কেবল আদ্যক্ষরবর্তী অকার উচ্চারণের নিয়ম লিখিলাম। মধ্যাক্ষর বা শেষাক্ষরের নিয়ম অবধারণের অবসর পাই নাই। মধ্যাক্ষরে যে প্রথম অক্ষরের নিয়ম খাটে না, তাহা একটা উদাহরণ দিলেই বুঝা যাইবে। বল শব্দে ব-এর সহিত সংযুক্ত অকারের কোনো পরিবর্তন হয় না, কিন্তু কেবল শব্দের ব-এ হ্রস্ব ওকার লাগে। ব্যঞ্জনবর্ণ উচ্চারণের নিয়মও সময়াভাবে বাহির করিতে পারি নাই। সাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া দেওয়াই আমার এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। যদি কোনো অধ্যবসায়ী পাঠক রীতিমতো অন্বেষণ করিয়া এই-সকল নিয়ম নির্ধারণ করিতে পারেন, তবে আমাদের বাংলাব্যাকরণের একটি অভাব দূর হইয়া যায়।

এখানে ইহাও বলা আবশ্যক যে, প্রকৃত বাংলাব্যাকরণ একখানিও প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃতব্যাকরণের একটু ইতস্তত করিয়া তাহাকে বাংলাব্যাকরণ নাম দেওয়া হয়।

বাংলাব্যাকরণের অভাব আছে, ইহা পূরণ করিবার জন্য ভাষাতত্ত্বানুরাগী লোকের যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত।

১২৯২

স্বরবর্ণ অ

বাংলাশব্দ উচ্চারণের কতকগুলি বিশেষ নিয়ম পাওয়া যায়, পূর্বে তাহার আলোচনা করিয়াছি। তাহারই অনুবৃত্তিক্রমে আরও কিছু বালবার আছে, তাহা এই প্রবন্ধে অবতারণা করিতে ইচ্ছা করি। কিয়ৎপরিমাণে পুনরুক্তি পাঠকদিগকে মার্জনা করিতে হইবে।

বাংলায় প্রধানত ই এবং উ এই দুই স্বরবর্ণের প্রভাবেই অন্য স্বরবর্ণের উচ্চারণ-বিকার ঘটিয়া থাকে।

গত এবং গতি এই দুই শব্দের উচ্চারণভেদ বিচার করিলে দেখা যাইবে, গত শব্দের গ-এ কোনো পরিবর্তন ঘটে নাই, কিন্তু ইকার পরে থাকাতে গতি শব্দের গ-এ ওকার সংযোগ হইয়াছে। কণা এবং কণিকা, ফণা এবং ফণী, স্থল এবং স্থলী তুলনা করিয়া দেখো।

উকার পরে থাকিলেও প্রথম অক্ষরবর্তী স্বরবর্ণের এইরূপ বিকার ঘটে। কল এবং কলু, সর এবং সরু, বট এবং বটু তুলনা করিয়া দেখিলেই আমার কথার প্রমাণ হইবে।

পরবর্তী বর্ণে যফলা থাকিলে পূর্ববর্তী প্রথম অক্ষরের অকার পরিবর্তিত হয়। গণ এবং গণ্য, কল এবং কল্য, পথ এবং পথ্য তুলনা করিলে ইহার দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইবে। ফলত যফলা— ইকার এবং অকারের সংযোগমাত্র, অতএব ইহাকেও পূর্ব নিয়মের অন্তর্গত করা যাইতে পারে।[1]

ঋফলা-বিশিষ্ট বর্ণ পরে আসিলে তৎপূর্বের অকার 'ও' হয়। এ সম্বন্ধে কর্তা এবং কর্তৃ, ভর্তা এবং ভর্তৃ, বক্তা এবং বক্তৃতা তুলনাস্থলে আনা যায়। কিন্তু বাংলায় ঋফলা উচ্চারণে ই-কার যোগ করা হয়, অতএব ইহাকেও পূর্বনিয়মের শাখাস্বরূপে গণ্য করিলে দোষ হয় না।[2]

[1] যফলা যেমন ই এবং অ-র সংযোগ, বফলা তেমনই উ এবং অ-র সংযোগ, অতএব তৎসম্বন্ধেও বোধ করি পূর্বনিয়ম খাটে। কিন্তু বফলার উদাহরণ অধিক পাওয়া যায় না, যে দুয়েকটি মনে পড়িতেছে তাহাতে আমাদের কথা সপ্রমাণ হইতেছে; যথা, অন্বেষণ ধন্বন্তরী মন্বন্তর। কজ্জল সত্ত্ব প্রভৃতি শব্দে প্রথম অক্ষর এবং বফলার মধ্যে দুই অক্ষর পড়াতে ইহাকে ব্যতিক্রমের দৃষ্টান্তস্বরূপে উল্লেখ করা যায় না।

[2] মহারাষ্ট্রীয়েরা ঋ উচ্চারণে উকারের আভাস দিয়া থাকেন। আমরা প্রকৃতি-কে কতকটা প্রক্রিতি বলি, তাঁহারা লঘু উকার যোগ করিয়া বলেন প্রক্রুতি।

অপভ্রংশে পরবর্তী ই অথবা উ লোপ হইলেও উক্ত নিয়ম বলবান থাকে; যেমন হইল শব্দের অপভ্রংশে হ'ল, হউন শব্দের অপভ্রংশে হন [কিন্তু, হয়েন শব্দের অপভ্রংশ বিশুদ্ধ 'হন' উচ্চারণ হয়]। থলিয়া শব্দের অপভ্রংশে থলে, টকুয়া শব্দের অপভ্রংশে ট'কো (অম্ল)।

ক্ষ-র পূর্বেও অ ও হইয়া যায়; যেমন, কক্ষ পক্ষ লক্ষ। ক্ষ-শব্দের উচ্চারণ বোধ করি এককালে ইকার-ঘেঁষা ছিল, তাই এই অক্ষরের নাম হইয়াছে ক্ষিয়। এখনও পূর্ববঙ্গের লোকেরা ক্ষ-র সঙ্গে যফলা যোগ করেন; এবং তাঁহাদের দেশের যফলা উচ্চারণের প্রচলিত প্রথানুসারে পূর্ববর্তী বর্ণে ঐকার যোগ করিয়া দেন; যেমন, তাঁহারা লক্ষটাকা-কে বলেন— লৈক্ষ্য টাকা।

যাহা হউক, মোটের উপর এই নিয়মটিকে পাকা নিয়ম বলিয়া ধরা যাইতে পারে। যে দুই-একটা ব্যতিক্রম আছে, পূর্বে অন্যত্র তাহা প্রকাশিত হওয়াতে এ স্থলে তাহার উল্লেখ করিলাম না।

দেখা যাইতেছে ও-স্বরবর্ণের প্রতি বাংলা উচ্চারণের কিছু বিশেষ ঝোঁক আছে। প্রথমত, আমরা সংস্কৃত অ-র বিশুদ্ধ উচ্চারণ রক্ষা করি নাই। আমাদের অ, সংস্কৃত অ এবং ও-র মধ্যবর্তী। তাহার পরে আবার সামান্য ছুতা পাইলেই আমাদের অ সম্পূর্ণ ও হইয়া দাঁড়ায়। কতকগুলি স্বরবর্ণ আছে যাহাকে সন্ধিস্বর বলা যাইতে পারে; যেমন, অ এবং উ-র মধ্যপথে— ও, অ এবং ই-র সেতুস্বরূপ— এ; যখন এক পক্ষে ই অথবা এ এবং অপর পক্ষে আ, তখন অ্যা তাহাদের মধ্যে বিরোধভঞ্জন করে। বোধ হয় ভালো করিয়া সন্ধান করিলে দেখা যাইবে, বাঙালিরা উচ্চারণ কালে এই সহজ সন্ধিস্বরগুলির প্রতিই বিশেষ মমত্ব প্রকাশ করিয়া থাকে।

১২৯৯

স্বরবর্ণ এ

বাংলায় 'এ' স্বরবর্ণ আদ্যক্ষরস্বরূপে ব্যবহৃত হইলে তাহার দুইপ্রকার উচ্চারণ দেখা যায়। একটি বিশুদ্ধ এ, আর-একটি অ্যা। এক এবং একুশ শব্দে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

একারের বিকৃত উচ্চারণ বাংলায় অধিকাংশ স্থলেই দেখা যায়; কেবল এ সম্বন্ধে একটি পাকা নিয়ম খুব দৃঢ় করিয়া বলা যায়।— পরে ইকার অথবা উকার থাকিলে তৎপূর্ববর্তী একারের কখনোই বিকৃতি হয় না। জেঠা এবং জেঠী, বেটা এবং বেটী, একা এবং একটু— তুলনা করিয়া দেখিলে ইহার প্রমাণ হইবে। এ নিয়মের একটিও ব্যতিক্রম আছে বলিয়া জানা যায় নাই।

কিন্তু একারের বিকার কোথায় হইবে তাহার একটা নিশ্চিত নিয়ম বাহির করা এমন সহজ নহে; অনেকস্থলে দেখা যায় অবিকল একইরূপ প্রয়োগে 'এ' কোথাও বা বিকৃত কোথাও বা অবিকৃত ভাবে আছে; যথা, তেলা (তৈলাক্ত) এবং বেলা (সময়)।

প্রথমে দেখা যাক, পরে অকারান্ত অথবা বিসর্গ শব্দ থাকিলে পূর্ববর্তী এ কারের কিরূপ অবস্থা হয়।

অধিকাংশ স্থলেই কোনো পরিবর্তন হয় না; যথা, কেশ বেশ পেট হেঁট বেল তেল তেজ শেজ খেদ বেদ প্রেম হেম ইত্যাদি।

কিন্তু দন্ত্য ন-এর পূর্বে ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায়; যথা, ফেন (ভাতের) সেন (পদবী) কেন যেন হেন। মূর্ধন্য ণ-এর পূর্বেও সম্ভবত এই নিয়ম খাটে, কিন্তু প্রচলিত বাংলায় তাহার কোনো উদাহরণ পাওয়া যায় না। একটা কেবল উল্লেখ করি, কেহ কেহ দিনক্ষণ-কে দিনখ্যান বলিয়া থাকেন। এইখানে পাঠকদিগকে বলিয়া রাখি, ন অক্ষর যে কেবল একারকে আক্রমণ করে তাহা নহে, অকারের প্রতিও তাহার বক্রদৃষ্টি আছে— বন মন ধন জন প্রভৃতি শব্দের প্রচলিত উচ্চারণ প্রণিধান করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে, উক্ত শব্দগুলিতে আদ্যক্ষরযুক্ত অকারের বিকৃতি ঘটিয়াছে। বট মঠ জল প্রভৃতি শব্দের প্রথমাক্ষরের সহিত তুলনা করিলে আমার কথা স্পষ্ট হইবে।

আমার বিশ্বাস, পরবর্তী চ অক্ষরও এইরূপ বিকারজনক। কিন্তু কথা বড়ো বেশি পাওয়া যায় না। একটা কথা আছে— প্যাঁচ। কিন্তু সেটা যে পেঁচ-শব্দ হইতে রূপান্তরিত হইয়াছে, এমন অনুমান করিবার কোনো কারণ নাই। আর-একটা বলা

যায়— 'ট্যাঁচ'। 'ট্যাঁচ' করিয়া দেওয়া। এ শব্দ সম্বন্ধেও পূর্বকথা খাটে। অতএব এটাকে নিয়ম বলিয়া মানিতে পারি না। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গবাসী পাঠকেরা কাল্পনিক শব্দবিন্যাস দ্বারা চেষ্টা করিয়া দেখিবেন, চ-এর পূর্বে বিশুদ্ধ এ-কার উচ্চারণ জিহ্বার পক্ষে কেমন সহজ বোধ হয় না। এখানে বলা আবশ্যক, আমি দুই অক্ষরের কথা লইয়া আলোচনা করিতেছি।

পূর্বনিয়মের দুটো-একটা ব্যতিক্রম আছে। কোনো পাঠক যদি তাহার কারণ বাহির করিতে পারেন তো সুখী হইব। এ দিকে 'ভেক' উচ্চারণে কোনো গোলযোগ নাই, অথচ 'এক' শব্দ উচ্চারণে 'এ' স্বর বিকৃত হইয়াছে। আর-একটা ব্যতিক্রম— লেজ (লাঙ্গুল)। তেজ শব্দের একার বিশুদ্ধ, লেজ শব্দের একার বিকৃত।

বাংলায় দুই শ্রেণীর শব্দদ্বিগুণীকরণ প্রথা প্রচলিত আছে :

১। বিশেষণ ও অসমাপিকা ক্রিয়াপদ ; যথা, বড়ো-বড়ো ছোটো-ছোটো বাঁকা-বাঁকা নেচে-নেচে গেয়ে-গেয়ে হেসে-হেসে ইত্যাদি।

২। শব্দানুকরণমূলক বর্ণনাসূচক ক্রিয়ার বিশেষণ। যথা প্যাটপ্যাট টাঁটাঁ খিটখিট ইত্যাদি।

এই দ্বিতীয় শ্রেণীর দ্বিগুণীকরণের স্থলে পাঠক কুত্রাপিও আদ্যক্ষরে একার সংযোগ দেখিতে পাইবেন না। গাঁগাঁ গোঁগোঁ চীঁচীঁ চ্যাঁচ্যাঁ টুকটুক পাইবেন, কিন্তু গেঁগেঁ চেঁচেঁ কোথাও নাই। কেবল নিতান্ত যেখানে শব্দের অবিকল অনুকরণ সেইখানেই দৈবাৎ একারের সংস্রব পাওয়া যায়, যথা ঘেউঘেউ। এইরূপ স্থলে অ্যাকারের প্রাদুর্ভাবটাই কিছু বেশি ; যথা, ফ্যাসফ্যাস খ্যাকখ্যাক স্যাঁৎস্যাঁৎ ম্যাড়ম্যাড়।

এই শব্দগুলিকে বিশেষণে পরিণত করিলে দ্বিতীয়ার্ধের প্রথমে অ্যাকারের পরিবর্তে একার সংযুক্ত হয় ; যথা, স্যাঁৎসেঁতে ম্যাড়মেড়ে। তাহার কারণ পূর্বেই আভাস দিয়াছি। স্যাঁৎসেঁতিয়া হইতে স্যাঁৎসেঁতে হইয়াছে। বলা হইয়াছে ইকারের পূর্বে 'এ' উচ্চারণ বলবান থাকে।

ক্রিয়াপদজাত বিশেষ্য শব্দের একারের উচ্চারণ সম্বন্ধে একটি বিশেষ নিয়ম সন্ধান করা আবশ্যক। দৃষ্টান্তস্বরূপে দেখো, খেলা এবং গেলা (গলাধঃকরণ), ইহাদের প্রথমাক্ষরবর্তী একারের উচ্চারণভেদ দেখা যায়। প্রথমটি খ্যালা, দ্বিতীয়টি গেলা।

আমি স্থির করিলাম,— সংস্কৃত মূলশব্দের ইকারের অপভ্রংশ বাংলায় যেখানে 'এ' হয় সেখানে বিশুদ্ধ 'এ' উচ্চারণ থাকে। খেলন হইতে খেলা, কিন্তু গিলন হইতে গেলা, —এইজন্য শেষোক্ত এ অবিকৃত আছে। ইহার পোষক আরও অনেকগুলি প্রমাণ পাওয়া গেল ; যেমন, মিলন হইতে মেলা (মিলিত হওয়া), মিশ্রণ হইতে মেশা, চিহ্ন হইতে চেনা ইত্যাদি।

ইহার প্রথম ব্যতিক্রম দেখিলাম, বিক্রয় হইতে বেচা (ব্যাচা) সিঞ্চন হইতে সেঁচা (স্যাঁচা) চীৎকার হইতে চেঁচানো (চ্যাঁচানো)।

তখন আমার পূর্বসন্দেহ দৃঢ় হইল যে, চ অক্ষরের পূর্বে একার উচ্চারণের বিকার ঘটে। এইজন্যই চ-এর পূর্বে আমার এই শেষ নিয়মটি খাটিল না।

যাহা হউক, যদি এই শ্রেণীর শব্দ সম্বন্ধে একটা সর্বব্যাপী নিয়ম করিতে হয় তবে এরূপ বলা যাইতে পারে,— যে-সকল অসমাপিকা ক্রিয়ার আদ্যক্ষরে ই সংযুক্ত থাকে, বিশেষ্যরূপ ধারণকালে তাহাদের সেই ইকার একারে বিকৃত হইবে, এবং অসমাপিকারূপে যে-সকল ক্রিয়ার আদ্যক্ষরে 'এ' সংযুক্ত থাকে, বিশেষ্যরূপে তাহাদের সেই একার অ্যাকারে পরিণত হইবে। যথা :

অসমাপিকা ক্রিয়ারূপে	বিশেষ্যরূপে
কিনিয়া	কেনা
বেচিয়া	ব্যাচা
মিলিয়া	মেলা
ঠেলিয়া	ঠ্যালা
লিখিয়া	লেখা
দেখিয়া	দ্যাখা
হেলিয়া	হ্যালা
গিলিয়া	গেলা

এ নিয়মের কোথাও ব্যতিক্রম পাওয়া যাইবে না।

মোটের উপর ইহা বলা যায় যে, এ হইতে একেবারে আ উচ্চারণে যাওয়া রসনার পক্ষে কিঞ্চিৎ আয়াসসাধ্য, আ হইতে এ উচ্চারণে গড়াইয়া পড়া সহজ। এইজন্য আমাদের অঞ্চলে আ কারের পূর্ববর্তী একার প্রায়ই অ্যা নামক সন্ধিস্বরকে আপন আসন ছাড়িয়া দিয়া রসনার শ্রমলাঘব করে।

১২৯৯

টা টো টে

একটা, দুটো, তিনটে। টা, টো, টে। একই বিভক্তির এরূপ তিন প্রকার ভেদ কেন হয়, এই প্রশ্ন সহজেই মনে উদয় হইয়া থাকে।

আমাদের বাংলাশব্দে যে-সকল উচ্চারণবৈষম্য আছে, মনোনিবেশ করিলে তাহার একটা-না-একটা নিয়ম পাওয়া যায়, এ কথা আমি পূর্বেই নির্দেশ করিয়াছি। আমি দেখাইয়াছি বাংলায় আদ্যক্ষরবর্তী অ স্বরবর্ণ কখনো কখনো বিকৃত হইয়া 'ও' হইয়া যায়; যেমন, কলু (কোলু) কলি (কোলি) ইত্যাদি; স্বরবর্ণ এ বিকৃত হইয়া অ্যা হইয়া যায়; যেমন, খেলা (খ্যালা) দেখা (দ্যাখা) ইত্যাদি। কিন্তু এইরূপ পরিবর্তন গুটিকতক নিয়মের অনুবর্তী।

আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি ই এবং উ স্বরবর্ণ বাংলার বহুসংখ্যক উচ্চারণবিকারের মূলীভূত কারণ; উপস্থিত প্রসঙ্গেও তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

উদাহরণ। 'সে' অথবা 'এ' শব্দের পরে টা বিভক্তি অবিকৃত থাকে; যেমন, সেটা এটা। কিন্তু 'সেই' অথবা 'এই' শব্দের পরে টা বিভক্তির বিকার জন্মে; যেমন, এইটে সেইটে।

অতএব দেখা গেল ইকারের পর টা টে হইয়া যায়। কিন্তু কেবলমাত্র টা বিভক্তির মধ্যে এই নিয়মকে সীমাবদ্ধ করিলে সংগত হয় না। ইকারের পরবর্তী আকারমাত্রের প্রতিই এই নিয়ম প্রয়োগ করিয়া দেখা কর্তব্য।

হইয়া— হয়ে
লইয়া— লয়ে
পিঠা— পিঠে
চিঁড়া— চিঁড়ে
শিকা— শিকে
বিলাত— বিলেত

হিসাব— হিসেব
মাহিনা— মাইনে
ভিক্ষা— ভিক্ষে
শিক্ষা— শিক্ষে
নিন্দা— নিন্দে
বিনা— বিনে

এমন-কি, যেখানে অপভ্রংশে মূল শব্দের ইকার লুপ্ত হইয়া যায়, সেখানেও এ নিয়ম খাটে। যেমন :

করিয়া— ক'রে
মরিচা— মর্চে
সরিষা— সর্ষে

আ এবং ই মিলিত হইয়া যুক্তস্বর 'ঐ' হয়। এজন্য 'ঐ' স্বরের পরেও আ স্বরবর্ণ এ হইয়া যায়; যেমন:

কৈলাস— কৈলেস
তৈয়ার— তোয়ের

কেবল ইহাই নহে। যফলার সহিত সংযুক্ত আকারও একারে পরিণত হয়। কারণ, যফলা ই এবং অ-এর যুক্তস্বর; যথা:

অভ্যাস— অভ্যেস
কন্যা— কন্যে
বন্যা— বন্যে
হত্যা— হত্যে

আমরা অ স্বরবর্ণের সমালোচনাস্থলে লিখিয়াছিলাম ক্ষ-র পূর্ববর্তী অকার ও হইয়া যায়; যেমন, লক্ষ (লোক্ষ) পক্ষ (পোক্ষ) ইত্যাদি। যে-কারণবশত ক্ষ-র পূর্ববর্তী অ-ওকারে পরিণত হয়, সেই কারণেই ক্ষ-সংযুক্ত আকার এ হইয়া যায়; যথা, রক্ষা —রক্ষে। বাংলায় ক্ষা-অন্ত শব্দের উদাহরণ অধিক না থাকাতে এই একটি দৃষ্টান্ত দিয়াই নিরস্ত হইলাম।

যফলা এবং ক্ষ সম্বন্ধে একটি কথা বলিয়া রাখি। যফলা ও ক্ষ-সংযুক্ত আকার একারে পরিণত হয় বটে কিন্তু আদ্যক্ষরে এ নিয়ম খাটে না; যেমন, ত্যাগ ন্যায় ক্ষার ক্ষালন ইত্যাদি।

বাংলার অনেকগুলি আকারান্ত ক্রিয়াপদ কালক্রমে একারান্ত হইয়া আসিয়াছে। পূর্বে ছিল, করিলা খাইলা করিতা খাইতা করিবা খাইবা; এখন হইয়াছে, করিলে খাইলে করিতে খাইতে করিবে খাইবে। পূর্ববর্তী ইকারের প্রভাবেই যে আ স্বরবর্ণের ক্রমশ এইরূপ দুর্গতি হইয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য।

পূর্বে ই থাকিলে যেমন পরবর্তী আ 'এ' হইয়া যায় তেমনই পূর্বে উ থাকিলে পরবর্তী আ 'ও' হইয়া যায়, এইরূপ উদাহরণ বিস্তর আছে; যথা:

ফুটা— ফুটো
মুঠা— মুঠো
কুলা— কুলো
চুলা— চুলো
কুয়া— কুয়ো
চুমা— চুমো

ঔকারের পরেও এ নিয়ম খাটে। কারণ ঔ— অ এবং উ-মিশ্রিত যুক্তস্বর; যথা:

নৌকা— নৌকো

কৌটা— কৌটো

সর্বশেষে বক্তব্য এই যে, বাংলার দুই-একটা উচ্চারণবিকার এমনই দৃঢ়মূল হইয়া গেছে যে, যেখানেই হউক তাহার অন্যথা দেখা যায় না; যেমন ইকার এবং উকারের পূর্ববর্তী অ-কে আমরা সর্বত্রই 'ও' উচ্চারণ করি। সাধুভাষায় লিখিত কোনো গ্রন্থ পাঠকালেও আমরা কটি এবং কটু শব্দকে কোটি এবং কোটু উচ্চারণ করিয়া থাকি। কিন্তু অদ্যকার প্রবন্ধে যে-সকল দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল তৎসম্বন্ধে এ কথা খাটে না। আমরা প্রচলিত ভাষায় যদিও মুঠা-কে মুঠো বলি, তথাপি গ্রন্থে পড়িবার সময় মুঠা পড়িয়া থাকি; চলিত ভাষায় বলি নিন্দে, সাধু ভাষায় বলি নিন্দা। অতএব এই দুই প্রকারের উচ্চারণের মধ্যে একটা শ্রেণীভেদ আছে। পাঠকদিগকে তাহার কারণ আলোচনা করিতে সবিনয় অনুরোধ করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করি।

১২৯৯

বীম্‌সের বাংলা ব্যাকরণ

ইংরেজিতে একটা প্রবাদ আছে ভুল করা মানবধর্ম, বিশেষত বাঙালির পক্ষে ইংরেজি ভাষায় ভুল করা। সেই প্রবাদের বাকি অংশে বলে, মার্জনা করা দেবধর্ম। কিন্তু বাঙালির ইংরেজি-ভুলে ইংরেজরা সাধারণত দেবত্ব প্রকাশ করেন না।

আমাদের ইস্কুলে-শেখা ইংরেজিতে ভুল হইবার প্রধান কারণ এই যে, সে-বিদ্যা পুঁথিগত। আমাদের মধ্যে যাঁহারা দীর্ঘকাল বিলাতে বাস করিয়াছেন, তাঁহারা ইংরেজিভাষার ঠিক মর্মগ্রহ করিতে পারিয়াছেন। এইজন্য অনেক খাঁটি ইংরেজের ন্যায় তাঁহারা হয়তো ব্যাকরণে ভুল করিতেও পারেন, কিন্তু ভাষার প্রাণগত মর্মগত ভুল করা তাঁহাদের পক্ষে বিরল। এ দেশে থাকিয়া যাঁহারা ইংরেজি শেখেন, তাঁহারা কেহ কেহ ব্যাকরণকে বাঁচাইয়াও ভাষাকে বধ করিতে ছাড়েন না। ইংরেজগণ তাহাতে অত্যন্ত কৌতুক বোধ করেন।

সেইজন্য আমাদেরও বড়ো ইচ্ছা করে, যে-সকল ইংরেজ এ দেশে সুদীর্ঘকাল বাস করিয়া, দেশীভাষা শিক্ষার বিশেষ চেষ্টা করিয়া ও সুযোগ পাইয়াও সে-ভাষা সম্বন্ধে ভুল করেন তাঁহাদের প্রতি হাস্যরস বর্ষণ করিয়া পালটা জবাবে গায়ের ঝাল মিটাই।

সন্ধান করিলে এ সম্বন্ধে দুই একটা বড়ো বড়ো দৃষ্টান্তও পাওয়া যায়। বাবু-ইংরেজির

আদর্শ প্রায় অশিক্ষিত দরিদ্র উমেদারদিগের দরখাস্ত হইতে সংগ্রহ করা হইয়া থাকে। কিন্তু তাহাদের সহিত বাংলার ভূতপূর্ব সিবিলিয়ান জন্ বীম্স্ সাহেবের তুলনা হয় না। বীম্স্ সাহেব চেষ্টা করিয়া বাংলা শিখিয়াছেন ; বাংলাদেশেই তাঁহার যৌবন ও প্রৌঢ়বয়স যাপন করিয়াছেন ; বহু বৎসর ধরিয়া বাঙালি সাক্ষীর জবানবন্দী ও বাঙালি মোক্তারের আবেদন শুনিয়াছেন এবং বাঙালি সাহিত্যেরও রীতিমতো চর্চা করিয়াছেন, এরূপ শুনা যায়।

কেবল তাহাই নয়, বীম্স্ সাহেব বাংলাভাষার এক ব্যাকরণও রচনা করিয়াছেন। বিদেশী ভাষার ব্যাকরণ রচনা স্পর্ধার বিষয় ; পেটের দায়ে দরখাস্ত রচনার সহিত ইহার তুলনা হইতে পারে না। অতএব সেই ব্যাকরণে যদি পদে পদে এমন-সকল ভুল দেখা যায়, যাহা বাঙালি মাত্রেরই কাছে অত্যন্ত অসংগত ঠেকে, তবে সেই সাহেবি অজ্ঞতাকে পরিহাস করিবার প্রলোভন সংবরণ করা কঠিন হইয়া উঠে।

কিন্তু যখন দেখি আজ পর্যন্ত কোনো বাঙালি প্রকৃত বাংলাব্যাকরণ রচনায় হস্তক্ষেপ করেন নাই, তখন প্রলোভন সংবরণ করিয়া লইতে হয়। আমরা কেন বাংলা-ব্যাকরণ লিখিতে গিয়া সংস্কৃতব্যাকরণ লিখি, আমাদের কোনো শিক্ষিত লোককেও বাংলাভাষার ব্যাকরণের নিয়ম জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহার চক্ষুস্থির হইয়া যায় কেন, এ-সব কথা ভাবিয়া দেখিলে নিজের উপর ধিক্কার এবং সাহেবের উপর শ্রদ্ধা জন্মে।

এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে, এই ভ্রমসংকুল ব্যাকরণটি লিখিতে গিয়াও বিদেশীকে প্রচুর পরিশ্রম ও অধ্যবসায় অবলম্বন করিতে হইয়াছে। শুদ্ধমাত্র জ্ঞানানুরাগ দ্বারা চালিত হইয়া তিনি এ কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। জ্ঞানানুরাগ ও দেশানুরাগ এই দুটোতে মিলিয়াও আমাদের দেশের কোনো লোককে এ কাজে প্রবৃত্ত করিতে পারে নাই। অথচ আমাদের পক্ষে এই অনুষ্ঠানের পথ বিদেশীর অপেক্ষা অনেক সুগম।

বীম্স্ সাহেব তাঁহার ব্যাকরণে যে-সমস্ত ভুল করিয়াছেন, সেইগুলি আলোচনা ও বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলেও মাতৃভাষা সম্বন্ধে আমাদের অনেক শিক্ষালাভ হইতে পারে। অতিপরিচয়-বশত ভাষার যে-সমস্ত রহস্য সম্বন্ধে আমাদের মনে প্রশ্নমাত্র উত্থাপিত হয় না, সেইগুলি জাগ্রত হইয়া উঠে এবং বিদেশীর মধ্যস্থতায় স্বভাষার সহিত যেন নবতর এবং দৃঢ়তর পরিচয় স্থাপিত হয়।

এই ব্যাকরণের প্রথম অধ্যায়ে বাংলাভাষার উচ্চারণ সম্বন্ধে আলোচনা আছে। ইংরেজি মুদ্রিত সাহিত্যে অনেক স্থলে বানানের সহিত উচ্চারণের সংগতি নাই। ইংরেজ লেখে একরূপ, পড়ে অন্যরূপ। বাংলাতেও অপেক্ষাকৃত অল্পপরিমাণে বানানের সহিত উচ্চারণের পার্থক্য আছে, তাহা সহসা আমাদের মনে উদয় হয় না।

ব্যয় শব্দের ব্য, অব্যয় শব্দের ব্য এবং ব্যতীত শব্দের ব্য উচ্চারণে প্রভেদ আছে ; লেখা এবং খেলা শব্দের এ কারের উচ্চারণ ভিন্নরূপ। সস্তা শব্দের দুই দন্ত্য স-এর উচ্চারণ এক নহে। শব্দ শব্দের শ-অক্ষরবর্তী অকার এবং দ-অক্ষরবর্তী অকারে প্রভেদ আছে। এমন বিস্তর উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে।

এই উচ্চারণবিকারগুলি অনেকস্থলেই নিয়মবদ্ধ, তাহা আমরা অন্যত্র আলোচনা করিয়াছি।

বীম্স্ বলিতেছেন, বাংলা স্বরবর্ণ অ কোথাও বা ইংরেজি not rock প্রভৃতি শব্দের স্বরের মতো, কোথাও বা bone শব্দের স্বরের ন্যায় উচ্চারিত হয়।

স্থানভেদে অ স্বরের এইরূপ বিভিন্নতা বীম্স্ সাহেবের স্বদেশীয়গণ ধরিতে না পারিয়া বাংলা উচ্চারণকে অদ্ভুত করিয়া তোলেন। বাঙালি গরু-কে গোরু উচ্চারণ করেন, ইংরেজ তাহাকে যথাপঠিত উচ্চারণ করিয়া থাকেন। কিন্তু যদি কোনো বাংলা-ব্যাকরণে এই সাধারণ নিয়ম লিখিত থাকিত যে, ইকার, উকার, ক্ষ এবং ণ ও ন-র পূর্বে প্রায় সর্বত্রই অকারের উচ্চারণ ওকারবৎ হইয়া যায়, তাহা হইলে পশ্চিমবঙ্গ-প্রচলিত উচ্চারণের আদর্শ তাঁহাদের পক্ষে সুগম হইতে পারিত।

কিন্তু এই-সকল নিয়মের মধ্যে অনেক সূক্ষ্মতা আছে। আমরা বন মন ক্ষণ প্রভৃতি শব্দকে বোন মোন খোন রূপে উচ্চারণ করি, কিন্তু তিন অক্ষরের শব্দের বেলায় তাহার বিপর্যয় দেখা যায় ; তনয় জনম ক্ষণেক প্রভৃতি তাহার দৃষ্টান্ত।

আশা করি, বাংলার এই-সকল উচ্চারণের বৈচিত্র্য ও তাহার নিয়মনির্ণয়কে আমাদের শিক্ষিত ব্যক্তিগণ তুচ্ছজ্ঞান করিবেন না।

বীম্স্ সাহেব লিখিতেছেন, সিলেব্লের (syllable) শেষে অ স্বরের লোপ হইয়া হসন্ত হয়। কলসী ও ঘটকী শব্দ তিনি তাহার উদাহরণস্বরূপ প্রয়োগ করিয়াছেন।

লিখিত এবং কথিত বাংলার ব্যাকরণে প্রভেদ আছে। বীম্সের ব্যাকরণে কোথাও-বা লিখিত বাংলার কোথাও-বা কথিত বাংলার নিয়ম নির্দিষ্ট হওয়ায় অনেকস্থলে বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে। সাধুভাষায় লিখিত সাহিত্যে আমরা ঘটকী শব্দের ট হইতে অকার লোপ করি না। অপর পক্ষে বীম্স্ সাহেব যে-নিয়ম নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা কী কথিত কী লিখিত কোনো বাংলাতেই সর্বত্র খাটে না ; জনরব বনবাস বলবান্ পরচর্চা প্রভৃতি শব্দ তাহার উদাহরণ। এ স্থলে প্রথম সিলেব্ল্-এ সংযুক্ত অকারের লোপ হয় নাই ; অথচ বিচ্ছিন্ন করিয়া লইলে, জন বন বল এবং পর শব্দের শেষ অকার লুপ্ত হইয়া থাকে। কলস দুই সিলেব্লে গঠিত, কল্+অস্, কিন্তু প্রথম সিলেব্লের পরবর্তী অকারের লোপ হয় নাই। ঘটক শব্দের দুই সিলেব্ল্, ঘট্+অক্, এখানেও অকার উচ্চারিত হয়।

কিন্তু এই প্রসঙ্গে চিন্তা করিয়া দেখা যায়, বীম্‌স্‌ সাহেবের নিয়মকে আর-একটু সংকীর্ণ করিয়া আনিলেই তাহার সার্থকতা পাওয়া যাইতে পারে।

আঁচল এবং আঁচ্‌লা, আপন এবং আপ্‌নি, চামচ এবং চাম্‌চে, আঁচড় এবং আঁচ্‌ড়ানো, ঢোলক এবং ঢল্‌কো, পরশ এবং পর্‌শু, দৃষ্টান্তগুলি আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, পরবর্তী সিলেব্‌ল্‌ স্বরান্ত হইলে পূর্ব সিলেব্‌লের অকার লোপ পায়, পরন্তু হসন্তের পূর্ববর্তী অকার কিছুতেই লোপ পায় না।

কিন্তু পূর্বোক্ত বনবাস জনরব বলবান প্রভৃতি শব্দে এ নিয়ম খাটে নাই। তাহাতে অকার ও আকারের পূর্ববর্তী অ লোপ পায় নাই।

অথচ, পর্‌কলা আল্‌পনা অব্‌সর (লিখিত ভাষায় নহে) প্রভৃতি প্রচলিত কথায় বীম্‌সের নিয়ম খাটে। ইহা হইতে বুঝা যায়, যে-সকল সংস্কৃত শব্দ ভাষায় নূতন প্রবেশ করিয়াছে এবং জনসাধারণের দ্বারা সর্বদা ব্যবহৃত হয় না, তাহাতে সংস্কৃত উচ্চারণের নিয়ম এখনও রক্ষিত হয়। কিন্তু 'পাঠ্‌শালা' প্রভৃতি সংস্কৃত কথা যাহা চাষাভুষারাও নিয়ত ব্যবহার করে, তাহাতে বাংলাভাষার নিয়ম সংস্কৃত নিয়মকে পরাস্ত করিয়াছে।

বীম্‌স্‌ লিখিয়াছেন, বিশেষণ শব্দে সিলেব্‌লের অন্তর্বর্তী অকারের লোপ হয় না ; যথা, ভাল ছোট বড়।

রামমোহন রায় ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে যে গৌড়ীয় ব্যাকরণ রচনা করেন, তাহাতে তিনিও লেখেন :

> গৌড়ীয় ভাষায় অকারান্ত বিশেষণ শব্দ অকারান্ত উচ্চারণ হয়, যেমন ছোট খাট ; এতদ্‌ভিন্ন তাবং অকারান্ত শব্দ হলন্ত উচ্চারিত হয়, যেমন ঘট্‌ পট্‌ রাম্‌ রাম্‌দাস্‌ উত্তম্‌ সুন্দর্‌ ইত্যাদি।

রামমোহন রায়ের উদ্ধৃত দৃষ্টান্ত তাঁহার নিয়মকে অপ্রমাণ করিতেছে তাহা তিনি লক্ষ্য করেন নাই। উত্তম ও সুন্দর শব্দ বিশেষণ শব্দ। যদি কেহ বলেন উহা সংস্কৃত শব্দ, তথাপি খাঁটি বাংলা শব্দেও ব্যতিক্রম মিলিবে ; যথা, নরম গরম।

এ কথা স্বীকার করিতে হইবে, খাঁটি বাংলায় দুই অক্ষরের অধিকাংশ বিশেষণ শব্দ হলন্ত নহে।

প্রথমেই মনে হয়, বিশেষণ শব্দ বিশেষরূপে অকারান্ত উচ্চারিত হইবে, এ নিয়মের কোনো সার্থকতা নাই। অতএব, ছোট বড় ভাল প্রভৃতি বিশেষণ শব্দ যে সাধারণ বাংলা শব্দের ন্যায় হসন্ত হয় নাই, তাহার কারণটা ওই শব্দগুলির মূল সংস্কৃত শব্দে পাওয়া যাইবে। 'ভালো' শব্দ ভদ্র শব্দজ, 'বড়ো' বৃদ্ধ হইতে উৎপন্ন, 'ছোটো' ক্ষুদ্র শব্দের অপভ্রংশ। মূল শব্দগুলির শেষবর্ণ যুক্ত,— যুক্তবর্ণের অপভ্রংশে হসন্ত বর্ণ না হওয়ারই সম্ভাবনা।

কিন্তু এ নিয়ম খাটে না। নৃত্য-র অপভ্রংশ নাচ, পঙ্ক— পাঁক, অঙ্ক— আঁক, রঙ্গ— রাং, ভট্ট— ভাট, হস্ত— হাত, পঞ্চ— পাঁচ ইত্যাদি।

অতএব নিশ্চয়ই বিশেষণের কিছু বিশেষত্ব আছে। সে বিশেষত্ব আরও চোখে পড়ে যখন দেখা যায়, বাংলার অধিকাংশ তুই অক্ষরের বিশেষণ, যাহা সংস্কৃত মূল শব্দ অনুসারে অকারান্ত হওয়া উচিত ছিল, তাহা আকারান্ত হইয়াছে।

যথা : সহজ—সোজা, মহৎ—মোটা, রুগ্ন—রোগা, ভগ্ন—ভাঙা, শ্বেত—শাদা, অভিষিক্ত—ভিজা, খঞ্জ—খোঁড়া, কাণ—কাণা, লম্ব—লম্বা, সুগন্ধ—সোঁধা, বক্র—বাঁকা, তিক্ত—তিতা, মিষ্ট—মিঠা, নগ্ন—নাগা, তির্যক্—টেড়া, কঠিন—কড়া।

দ্রষ্টব্য এই যে, 'কর্ণ' হইতে বিশেষ্য শব্দ কান হইয়াছে, অথচ কান শব্দ হইতে বিশেষণ শব্দ কানা হইল। বিশেষ্য শব্দ হইল ফাঁক, বিশেষণ হইল ফাঁকা; বাঁক শব্দ বিশেষ্য, বাঁকা শব্দ বিশেষণ।

সংস্কৃত ভাষায় ক্ত প্রত্যয়যোগে যে-সকল বিশেষণ পদ নিষ্পন্ন হয়, বাংলায় তাহা প্রায়ই আকারান্ত বিশেষণ পদে পরিণত হয়; ছিন্নবস্ত্র বাংলায়— ছেঁড়া বস্ত্র, ধূলিলিপ্ত শব্দ বাংলায়— ধুলোলেপা, কর্ণকর্তিত— কানকাটা ইত্যাদি।

বিশেষ্য শব্দ চন্দ্র হইতে চাঁদ, বন্ধ হইতে বাঁধ, কিন্তু বিশেষণ শব্দ মন্দ হইতে হইল —মাদা। এক শব্দকে বিশেষরূপে বিশেষণে পরিণত করিলে 'একা' হয়।

এইরূপ বাংলা তুই-অক্ষরের বিশেষণ অধিকাংশই আকারান্ত। যেগুলি অকারান্ত, হিন্দিতে সেগুলিও আকারান্ত; যথা, ছোটা বড়া ভালা।

ইহার একটা কারণ আমরা এখানে আলোচনা করিতেছি। স্বর্গগত উমেশচন্দ্র বটব্যালের রচনা হইতে দীনেশবাবু তাঁহার 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থে নিম্নলিখিত ছত্রকয়টি উদ্ধৃত করিয়াছেন :

> তাম্রশাসনের ভাষার প্রতি লক্ষ করিলে দেখা যাইবে যে, ইহাতে স্বার্থে ক-এর ব্যবহার কিছু বেশি। দূত স্থানে দূতক, হট্ট স্থানে হট্টিকা, বাট স্থানে বাটক, লিখিত স্থানে লিখিতক, এরূপ শব্দপ্রয়োগ কেবল উদ্ধৃত অংশমধ্যেই দেখা যায়। সমুদায় শাসনে আরো অনেক দেখা যাইবে।

দীনেশবাবু লিখিয়াছেন :

> এই ক (যথা, বৃক্ষক চারুদত্তক পুত্রক) প্রাকৃতে অনেকস্থলে ব্যবহৃত দেখা যায়। গাথা ভাষায় এই ক-এর প্রয়োগ সর্বাপেক্ষা অধিক; যথা ললিতবিস্তর, একবিংশাধ্যায়ে :
>
> সুবসন্তকে ঋতুবরে আগতকে
> রতিমো প্রিয়া ফুল্লিতপাদপকে।
> তবরূপ সুরূপ সুশোভনকো
> বসবর্ত্তী সুলক্ষণবিচিত্রিতকো।১।

বয়ং জাত সুজাত সুসংস্থিতিকাঃ
সুখকারণ দেব নরাণবসন্ততিকাঃ।
উত্থি লঘু পরিভুঞ্জ সুযৌবনকং
দুর্লভ বোধি নিবর্তয় মানসকম্ ।২।

দীনেশবাবু প্রাচীন বাংলায় এই ক প্রত্যয়ের বাহুল্য প্রমাণ করিয়াছেন।

এই ক-এর অপভ্রংশে আকার হয়; যেমন ঘোটক হইতে ঘোড়া, ক্ষুদ্রক হইতে ছোঁড়া, তিলক হইতে টিকা, মধুক হইতে মহুয়া, নাবিক হইতে নাইয়া, মস্তক হইতে মাথা, পিষ্টক হইতে পিঠা, শীষক হইতে শীষা, একক হইতে একা, চতুষ্ক হইতে চৌকা, ফলক হইতে ফলা, হীরক হইতে হীরা। ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন, লোহক হইতে লোহা, স্বর্ণক হইতে সোনা, কাংস্যক হইতে কাঁসা, তাম্রক হইতে তামা হইয়াছে।

আমরা কিঞ্চিৎ অবজ্ঞাসূচকভাবে রাম-কে রামা, শ্যাম-কে শ্যামা, মধু-কে মোধো (অর্থাৎ মধুয়া), হরি-কে হরে (অর্থাৎ হরিয়া) বলিয়া থাকি; তাহারও উৎপত্তি এইরূপে। অর্থাৎ, রামক শ্যামক মধুক হরিক শব্দ ইহার মূল। সংস্কৃতে যে হ্রস্ব-অর্থে ক প্রত্যয় হয়, বাংলায় উক্ত দৃষ্টান্তগুলি তাহার নিদর্শন।

দুই-একস্থলে মূল শব্দের ক প্রায় অবিকৃত আছে; যথা, হালকা, ইহা লঘুক শব্দজ। লহুক হইতে হলুক ও হলুক হইতে হালকা।

এই ক প্রত্যয় বিশেষণেই অধিক, এবং দুই-অক্ষরের ছোটো ছোটো কথাতেই ইহার প্রয়োগসম্ভাবনা বেশি। কারণ, বড়ো কথাকে ক সংযোগে বৃহত্তর করিলে তাহা ব্যবহারের পক্ষে কঠিন হয়। এইজন্যই বাংলা দুই-অক্ষরের বিশেষণ যাহা অকারান্ত হওয়া উচিত ছিল তাহা অধিকাংশই আকারান্ত। যে-সকল বিশেষণ শব্দ দুই-অক্ষরকে অতিক্রম করিয়াছে তাহাদের ঈষৎ ভিন্নরূপ বিকৃতি হইয়াছে; যথা, পাঠকক হইতে পড়ুয়া ও তাহা হইতে পোড়ো, পতিতক হইতে পড়ুয়া ও পোড়ো, মধ্যমক— মেঝুয়া মেঝো, উচ্ছিষ্টক— এঁঠুয়া এঁঠো, জলীয়ক— জলুয়া জোলো, কাষ্ঠিয়ক—কাঠুয়া কেঠো ইত্যাদি। অনুরূপ দুই-একটি বিশেষ্য পদ যাহা মনে পড়িল তাহা লিখি। কিঞ্চিলিক শব্দ হইতে কেঁচুয়া ও কেঁচো হইয়াছে। স্বল্পাক্ষরক পেচক শব্দ হইতে পেঁচা ও বহ্বক্ষরক কিঞ্চিলিক হইতে কেঁচো শব্দের উৎপত্তি তুলনা করা যাইতে পারে। দীপরক্ষক শব্দ হইতে দেরখুয়া ও দেরখো আর-একটি দৃষ্টান্ত।

বাংলাবিশেষণ সম্বন্ধে আলোচ্য বিষয় অনেক আছে, এ স্থলে তাহার বিস্তারিত অবতারণা অপ্রাসঙ্গিক হইবে।

বীম্‌স্ সাহেব বাংলা উচ্চারণের একটি নিয়ম উল্লেখ করিয়াছেন; তিনি বলেন,

চলিত কথায় আ স্বরের পর ঈ স্বর থাকিলে সাধারণত উভয়ে সংকুচিত হইয়া এ হইয়া যায়। উদাহরণস্বরূপে দিয়াছেন, খাইতে— খেতে, পাইতে— পেতে। এইসঙ্গে বলিয়াছেন, in less common words অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত অপ্রচলিত শব্দে এইরূপ সংকোচ ঘটে না; যথা, গাইতে হইতে গেতে হয় না।

গাইতে শব্দ খাইতে ও পাইতে শব্দ হইতে অপেক্ষাকৃত অপ্রচলিত বলিয়া কেন গণ্য হইবে বুঝা যায় না। তাহার অপরাধের মধ্যে সে একটি নিয়মবিশেষের মধ্যে ধরা দেয় না। কিন্তু তাহার সমান অপরাধী আরও মিলিবে। বাংলায় এই-জাতীয় ক্রিয়াপদ যে-কয়টি আছে, সবগুলি একত্র করা যাক; খাইতে গাইতে চাইতে ছাইতে ধাইতে নাইতে পাইতে বাইতে ও যাইতে। এই নয়টির মধ্যে কেবল খাইতে পাইতে ও যাইতে, এই তিনটি শব্দ বীম্‌স্‌ সাহেবের নিয়ম পালন করে, বাকি ছয়টি অন্য নিয়মে চলে।

এই ছয়টির মধ্যে চারিটি শব্দের মাঝখানে একটা হ্‌ লুপ্ত হইয়াছে দেখা যায়; যথা, গাহিতে চাহিতে নাহিতে ও বাহিতে (বহন করিতে)।

হ্‌ আশ্রয় করিয়া যে ইকারগুলি আছে তাহার বল অধিক দেখা যাইতেছে। ইহার অনুকূল অপর দৃষ্টান্ত আছে। করিতে চলিতে প্রভৃতি শব্দে ইকার লোপ হইয়া করতে চলতে হয়; হইতে শব্দের ইকার লোপ হইয়া 'হতে' এবং লইতে শব্দের ইকার স্থানভ্রষ্ট হইয়া 'নিতে' হয়। কিন্তু, বহিতে সহিতে কহিতে শব্দের ইকার বইতে সইতে কইতে শব্দের মধ্যে টিঁকিয়া যায়। অথচ সমস্ত বর্ণমালায় হ্‌ ব্যতীত আর-কোনো অক্ষরের এরূপ ক্ষমতা নাই।

লইতে শব্দ লভিতে শব্দ হইতে উৎপন্ন; ভ হ্‌-এ পরিণত হইয়া 'লহিতে' হয়। তদুৎপন্ন নিতে শব্দে ইকার যদিচ স্থানচ্যুত হইয়াছে তথাপি হ্‌-এর জোরে টিকিয়া গেছে।

বীম্‌স্‌ তাঁহার উল্লিখিত নিয়মে একটা কথা বলেন নাই। তাঁহার নিয়ম দুই-অক্ষরের কথায় খাটে না। হাতি শব্দে কোনো পরিবর্তন হয় না, কিন্তু হাতিয়ার শব্দের বিকারে হেতের হয়। আসি শব্দ ঠিক থাকে; 'আসিয়া' হয়— আস্যা, পরে হয়— এসে। খাই শব্দে পরিবর্তন হয় না; খাইয়া হয়— খায়্যা, পরে হয়— খেয়ে। এইরূপে হাঁড়িশাল হইতে হয়— হেঁশেল।

এ স্থলে এই নিয়মের চূড়ান্ত পর্যালোচনা হইল না; আমরা কেবল পাঠকদের মনোযোগ আকর্ষণ করিলাম।

'এ' স্বরবর্ণ কোথাও বা ইংরেজি came শব্দস্থিত a স্বরের মতো, কোথাও বা lack শব্দের a-র মতো উচ্চারিত হয়, বীম্‌স্‌ তাহাও নির্দেশ করিয়াছেন। 'এ' স্বরের

উচ্চারণবৈচিত্র্য সম্বন্ধে আমরা সাধনা পত্রিকায় আলোচনা করিয়াছি। বীম্‌স্‌ সাহেব লিখিয়াছেন, যাওয়া-সম্বন্ধীয় ক্রিয়াপদ গেল শব্দের উচ্চারণ গ্যাল হইয়াছে, গিলিবার সম্বন্ধীয় ক্রিয়াপদ গেল শব্দের উচ্চারণে বিশুদ্ধ একার রক্ষিত হইয়াছে। তিনি বলেন, অভ্যাস ব্যতীত ইহার নির্ণয়ের অন্য উপায় নাই। কিন্তু এই ক্রিয়াপদগুলি সম্বন্ধে একটি সহজ নিয়ম আছে।

যে-সকল ক্রিয়াপদের আরম্ভ-শব্দে ইকার আছে, যথা, গিল মিল ইত্যাদি, তাহারা ইকারের পরিবর্তে একার গ্রহণ করিলে একারের উচ্চারণ বিশুদ্ধ থাকে; যথা, গিলন হইতে গেলা, মিলন হইতে মেলা (মেলন শব্দ হইতে যে মেলা-র উৎপত্তি তাহার উচ্চারণ ম্যালা), লিখন হইতে লেখা, শিক্ষণ হইতে শেখা ইত্যাদি। অন্য সর্বত্রই একারের উচ্চারণ অ্যা হইয়া যায়; যথা, খেলন— খেলা, ঠেলন— ঠেলা, দেখন— দেখা ইত্যাদি। অর্থাৎ গোড়ায় যেখানে ই থাকে সেটা হয় এ, গোড়ায় যেখানে এ থাকে সেটা হয় অ্যা। গোড়ায় কোথায় এ আছে এবং কোথায় ই আছে, তাহা ইতে প্রত্যয়ের দ্বারা ধরা পড়ে; যথা, গিলিতে মিলিতে লিখিতে শিখিতে মিটিতে পিটিতে; অন্যত্র, খেলিতে ঠেলিতে দেখিতে ঠেকিতে বেঁকিতে মেলিতে হেলিতে ইত্যাদি।

বীম্‌স্‌ লিখিয়াছেন, ও এবং য় পরে পরে আসিলে তাহার উচ্চারণ প্রায় ইংরেজি w-র মতো হয়; যথা, ওয়াশিল তল্‌ওয়ার ওয়ার্ড রেলওয়ে ইত্যাদি। একটা জায়গায় ইহার ব্যতিক্রম আছে, তাহা লক্ষ না করিয়া সাহেব একটি অদ্ভুত বানান করিয়াছেন; তিনি ইংরেজি will শব্দকে উয়িল অথবা উইল না লিখিয়া ওয়িল লিখিয়াছেন। ওয় সর্বত্রই ইংরেজি w-র পরিবর্তে ব্যবহৃত হইতে পারে, কেবল এই 'ও' ইকারের পূর্বে উ না হইয়া যায় না। ব-এর সহিত যফলা যোগে দুই তিন রকম উচ্চারণ হয় তাহা বীম্‌স্‌ সাহেব ধরিয়াছেন, কিন্তু দৃষ্টান্তে অদ্ভুত ভুল করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন ব্যবহার-এর উচ্চারণ বেভার, ব্যক্তি-র উচ্চারণ বিক্তি, এবং ব্যতীত শব্দের উচ্চারণ বিতীত।

তাহা ছাড়া, কেবল ব-এর সঙ্গে যফলা যোগেই যে উচ্চারণবৈচিত্র্য ঘটে তাহা নহে, সকল বর্ণ সম্বন্ধেই এইরূপ। ব্যবহার শব্দের ব্য এবং ত্যক্ত শব্দের ত্য উভয়েই যফলার স্থলে যফলা-আকার উচ্চারণ হয়। ইকারের পূর্বে যফলার উচ্চারণ এ হইয়া যায়, ব্যক্তি এবং ব্যতীত তাহার দৃষ্টান্ত। নব্য ভব্য প্রভৃতি মধ্য বা শেষাক্ষরবর্তী যফলা আশ্রয়বর্ণকে দ্বিগুণিত করে মাত্র। ইকারের পূর্বে যফলা যেমন একার হইয়া যায়, তেমনই ক্ষ-ও একার গ্রহণ করে; যেমন ক্ষতি শব্দকে কথিত ভাষায় খেতি উচ্চারণ করে। ইহার প্রধান কারণ, ক্ষ অক্ষরের উচ্চারণে আমরা সাধারণত যফলা যোগ করিয়া লই। এইজন্য ক্ষমা শব্দের ইতর উচ্চারণ খ্যামা।

আমরা বীম্‌স্‌ সাহেবের ব্যাকরণধৃত উচ্চারণ-পর্যায় অনুসরণ করিয়া প্রসঙ্গক্রমে দুইচারিটা কথা সংক্ষেপে বলিলাম। এ কথা নিশ্চিত যে, বাংলার উচ্চারণতত্ত্ব ও বর্ণবিকারের নিয়ম বাঙালির দ্বারা যথোচিত আলোচিত হয় নাই।

১৩০৫

বাংলা বহুবচন

সংস্কৃত ভাষার সাত বিভক্তি প্রাকৃতে অনেকটা সংক্ষিপ্ত হইয়া আসিয়াছে। প্রাকৃতে চতুর্থী বিভক্তি নাই বলিলেই হয় এবং ষষ্ঠীর দ্বারাই প্রথমা ব্যতীত অন্য সকল বিভক্তির কার্য সারিয়া লওয়া যাইতে পারে।

আধুনিক ভারতবর্ষীয় আর্যভাষাগুলিতে প্রাকৃতের এই নিয়মের প্রভাব দেখা যায়।[১]

সংস্কৃত ষষ্ঠীর স্য বিভক্তির স্থানে প্রাকৃতে শ্‌শ হ হো হে হি বিভক্তি পাওয়া যায়। আধুনিক ভাষাগুলিতে এই বিভক্তির অনুসরণ করা যাক।

চহুবানহ পাস	—চাঁদ :	চহুবানের নিকট।
সংসারহি পারা	—কবীর :	সংসারের পার।
মুনিহিঁ দিখাঈ	—তুলসীদাস :	মুনিকে দেখাইলেন।
যুবরাজপদ রামহি দেহু	—তুলসীদাস :	যুবরাজপদ রামকে দেও।
কহ্যো সম খান্‌ততারহ	—চাঁদ :	তিনি খান্‌তাতারকে কহিলেন।
তত্তারহ উপরহ	—চাঁদ :	তাতারের উপরে
আদিহিতে সব কথা সুনাঈ	— তুলসীদাস :	আদি হইতে তিনি সকল কথা শুনাইলেন।

উক্ত উদাহরণ হইতে দেখা যাইতেছে ষষ্ঠী বিভক্তির চিহ্ন প্রায় সকল বিভক্তির কাজ সারিতেছে।

বাংলায় কী হয় দেখা যাক। বাংলায় যে-সকল বিভক্তিতে 'এ' যোগ হয় তাহার ইতিহাস প্রাকৃত হি-র মধ্যে পাওয়া যায়। সংস্কৃত— গৃহস্য, অপভ্রংশ প্রাকৃত— ঘরহে, বাংলা— ঘরে। সংস্কৃত— তাম্রকস্য, অপভ্রংশ প্রাকৃত— তম্বঅহে, বাংলায়— তাঁবায় (তাঁবাএ)।

পরবর্তী হি যে অপভ্রংশে একার হইয়া যায় বাংলায় তাহার অন্য প্রমাণ আছে।

---

[১] প্রাকৃতের পরবর্তী সমুদয় সংস্কৃতমূলক ভারতবর্ষীয় ভাষার উল্লেখস্থলে হর্ন্‌লে 'গৌড়ীয় ভাষা' নাম ব্যবহার করিয়াছেন; আমরাও তাঁহার অনুসরণ করিব।

বারবার শব্দটিকে জোর দিবার সময় আমরা ‘বারে বারে’ বলি ; সংস্কৃত নিশ্চয়ার্থসূচক হি-যোগে ইহা নিষ্পন্ন ; বারহি বারহি— বারই বারই— বারে বারে। একেবারে শব্দটিরও ওইরূপ ব্যুৎপত্তি। প্রাচীন বাংলায় কর্মকারকে ‘এ’ বিভক্তি যোগ ছিল, তাহা বাংলা কাব্যপ্রয়োগ দেখিলেই বুঝা যায় :

লাজ কেন কর বধূজনে : কবিকঙ্কণ।

করণ কারকেও ‘এ’ বিভক্তি চলে। যথা,

পুজিলেন ভূষণে চন্দনে।
ধনে ধান্যে পরিপূর্ণ।
তিলকে ললাট শোভিত।

বাংলায় সম্প্রদান কর্মের অনুরূপ। যথা,

দীনে কর দান।
গুরুজনে করো নতি।

অধিকরণের তো কথাই নাই।

যাহা হউক, সম্বন্ধের চিহ্ন লইয়া প্রায় সকল কারকের কাজ চলিয়া গেল কিন্তু স্বয়ং সম্বন্ধের বেলা কিছু গোল দেখা যায়।

বাংলায় সম্বন্ধে ‘র’ আসিল কোথা হইতে। পাঠকগণ বাংলা প্রাচীনকাব্যে দেখিয়া থাকিবেন, তাহার যাহার প্রভৃতি শব্দের স্থলে তাকর যাকর প্রভৃতি প্রয়োগ কোথাও দেখা যায়। এই কর শব্দের ক লোপ পাইয়া র অবশিষ্ট রহিয়াছে, এমন অনুমান সহজেই মনে উদয় হয়।

পশ্চিমি হিন্দির অধিকাংশ শাখায় ষষ্ঠীতে কো কা কে প্রভৃতি বিভক্তি যোগ হয় ; যথা, ঘোড়েকা ঘোড়েকো ঘোড়েকৌ ঘোড়াকো।

বাংলার সহিত যাহাদের সাদৃশ্য আছে নিম্নে বিবৃত হইল ; মৈথিলী— ঘোড়াকর ঘোড়াকের ; মাগধী— ঘোড়াকের ঘোড়রাকর ; মাড়োয়ারি— ঘোড়ারো ; বাংলা— ঘোড়ার।

এই তালিকা আলোচনা করিলে প্রতীতি হয় কর শব্দ কোনো ভাষা সমগ্র রাখিয়াছে, এবং কোনো ভাষায় উহার ক অংশ এবং কোনো ভাষায় উহার র অংশ রক্ষিত হইয়াছে।

প্রাকৃতে অনেক স্থলে ষষ্ঠী বিভক্তির পর এক অনাবশ্যক কেরক শব্দের যোগ দেখা যায় ; যথা, কস্‌স কেরকং এদং পবহণং— কাহার এই গাড়ি, তুহ্মহং কেরউং ধন— তোমার ধন, জস্থকেরে হুংকারউয়েঁ মুহহুঁ পড়ংতি তনাইঁ— যাহার হুংকারে মুখ হইতে তৃণ পড়িয়া যায়। ইহার সহিত চাঁদ কবির : ভীমহকরি সেন— ভীমের

সৈন্য, তুলসীদাসের : জীবন্থকের কলেসা— জীবগণের ক্লেশ, তুলনা করিলে উভয়ের সাদৃশ্য সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিবে না।

এই কেরক শব্দের সংস্কৃত— কৃতক, কৃত। তস্যকৃত শব্দের অর্থ তাঁহার দ্বারা কৃত। এই কৃতবাচক সম্বন্ধ ক্রমে সর্বপ্রকার সম্বন্ধেই ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা পূর্বোক্ত উদাহরণেই প্রমাণ হইবে।

এই স্থলে বাংলা ষষ্ঠীর বহুবচন দের দিগের শব্দের উৎপত্তি আলোচনা করা যাইতে পারে। দীনেশবাবু যে মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত আলোচ্য। এ স্থলে উদ্ধৃত করি :

> বহুবচন বুঝাইতে পূর্বে শব্দের সঙ্গে শুধু সব সকল প্রভৃতি সংযুক্ত হইত ; যথা,
>
> তুমি সব জন্ম জন্ম বান্ধব আমার
> কৃষ্ণের কৃপায় শাস্ত্র স্ফুরুক সবার।—চৈ. ভা
>
> ক্রমে আদি সংযোগে বহুবচনের পদ সৃষ্টি হইতে লাগিল ; যথা নরোত্তম বিলাসে,
>
> শ্রীচৈতন্যদাস আদি যথা উত্তরিলা।
> শ্রীনৃসিংহ কবিরাজে তথা নিয়োজিলা॥
> শ্রীপতি শ্রীনিধি পণ্ডিতাদি বাসাঘরে।
> করিলেন নিযুক্ত শ্রীবাস আচার্যেরে॥
> আকাই হাটের কৃষ্ণদাসাদি বাসায়।
> হইলা নিযুক্ত শ্রীবল্লভীকান্ত তায়॥
>
> এইরূপে, রামাদি জীবাদি হইতে ষষ্ঠীর র সংযোগে— রামদের জীবদের হইয়াছে, স্পষ্টই দেখা যায়।
>
> আদি শব্দের উত্তরে স্বার্থে ক যুক্ত হইয়া বৃক্ষাদিক জীবাদিক শব্দের সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক।
>
> ফলত উদাহরণেও তাহাই পাওয়া যায় ; যথা নরোত্তম বিলাসে,
>
> "রামচন্দ্রাদিক যৈছে গেলা বৃন্দাবনে।
> কবিরাজ খ্যাতি তার হইল যেমনে॥"
>
> এই ক-এর গ-এ পরিণতিও সহজেই প্রতিপন্ন হইতে পারে। সুতরাং বৃক্ষাদিগ (বৃক্ষদিগ), জীবাদিগ (জীবদিগ) শব্দ পাওয়া যাইতেছে। এখন ষষ্ঠীর র সংযোগে দিগের এবং কর্মের ও সম্প্রদানের চিহ্নে পরিণত কে-র সংযোগে দিগকে পদ উৎপন্ন হইয়াছে নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে।

সম্পূর্ণ নিঃসংশয়ের কথা নহে। কারণ, দীনেশবাবু কেবল অকারান্ত পদের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। ইকার-উকারান্ত পদের সহিত আদি শব্দের যোগ তিনি প্রাচীন বাংলা গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করিতে পারেন কি না সন্দেহ। এবং রামাদিগ হইতে রামদিগ হওয়া যত সহজ, কপ্যাদিগ হইতে কপিদিগ এবং ধেন্বাদিগ হইতে ধেনুদিগ হওয়া তত সহজ নহে।

হিন্দিভাষার সহিত তুলনা করিয়া দেখা আবশ্যক। সাধু হিন্দি— ঘোড়োঁকা,

কনৌজি—ঘোড়নকো, ব্রজভাষা—ঘোড়োঁকৌ অথবা ঘোড়নিকৌ, মাড়োয়ারি—ঘোড়াঁরো, মেবারি—ঘোড়াঁকো, গঢ়বালি—ঘোড়োঁকো, অবধি—ঘোড়বনকর, বিরাই—ঘ্ঁাড়নকর, ভোজপুরি—ঘোড়নকি, মাগধী—ঘোড়নকের, মৈথিলী—ঘোড়নিক ঘোড়নিকর।

উদ্ধৃত দৃষ্টান্তগুলিতে দেখা যাইতেছে, কা কো কের কর প্রভৃতি ষষ্ঠী বিভক্তি চিহ্নের বহুবচন নাই। বহুবচনের চিহ্ন মূল শব্দের সহিত সানুনাসিকরূপে যুক্ত।

অপভ্রংশ প্রাকৃতে ষষ্ঠীর বহুবচনে হং হুং হিং বিভক্তি হয়। সংস্কৃত নরাণাং কৃতকঃ শব্দ অপভ্রংশ প্রাকৃতে নরহং কেরও এবং হিন্দিতে নরোঁকো হয়। সংস্কৃত ষষ্ঠী বহুবচনের আনাং হিন্দিতে বিচিত্র সানুনাসিকে পরিণত হইয়াছে।

বাংলায় এ নিয়মের ব্যত্যয় হইবার কারণ পাওয়া যায় না। আমাদের মতে সম্পূর্ণ ব্যত্যয় হয় নাই। নিম্নে তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া গেল। হিন্দিতে কর্তৃকারকে একবচন বহুবচনের ভেদচিহ্ন লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। বিশেষরূপে বহুবচন বুঝাইতে হইলে লোগ্ গণ প্রভৃতি শব্দ অনুযোজন করা হয়।

প্রাচীন বাংলারও এই দশা ছিল, পুরাতন কাব্যে তাহার প্রমাণ আছে; দেখা গিয়াছে, সব সকল প্রভৃতি শব্দের অনুযোজনাদ্বারা বহুবচন নিষ্পন্ন হইত।

কিন্তু হিন্দিতে দ্বিতীয়া তৃতীয়া প্রভৃতি বিভক্তির চিহ্ন যোগের সময় শব্দের একবচন ও বহুবচন রূপ লক্ষিত হয়; যথা, ঘোড়েকো— একটি ঘোড়াকে, ঘোড়োঁকো—অনেক ঘোড়াকে। ঘোড়ে একবচনরূপ এবং ঘোড়োঁ বহুবচনরূপ।

পূর্বে এক স্থলে উল্লেখ করিয়াছি যে, প্রাকৃত একবচন ষষ্ঠীবিভক্তিচিহ্ন হে হি স্থলে বাংলায় একার দেখা যায়; যথা অপভ্রংশ প্রাকৃত— ঘরহে, বাংলায় ঘরে।

হিন্দিতেও এইরূপ ঘটে। ঘোড়ে শব্দ তাহার দৃষ্টান্ত।

প্রাকৃতের প্রথা অনুসারে প্রথমে গৌড়ীয় ভাষায় বিভক্তির মধ্যে ষষ্ঠীবিভক্তিচিহ্নই একমাত্র অবশিষ্ট ছিল; অবশেষে ভাবপরিস্ফুটনের জন্য সেই ষষ্ঠীবিভক্তির সহিত সংলগ্ন করিয়া ভিন্ন ভিন্ন কারকজ্ঞাপক শব্দযোজনা প্রবর্তিত হইল।

বাংলায় এই নিয়মের লক্ষণ একেবারে নাই তাহা নহে। 'হাতর' না বলিয়া বাংলায় হাতের বলে, 'ভাইর' না বলিয়া ভাইয়ের বলে, 'মুখতে' না বলিয়া মুখেতে এবং বিকল্পে পাতে এবং পায়েতে বলা হইয়া থাকে।

প্রথমে, হাতে ভাইয়ে মুখে পায়ে রূপ করিয়া তাহাতে র তে প্রভৃতি বিশেষ বিভক্তি যোগ হইয়াছে। পূর্বেই বলা হইয়াছে এই একার প্রাকৃত একবচন ষষ্ঠীবাচক হি হে-র অপভ্রংশ।

আমাদের বিশ্বাস বহুবচনেও বাংলা একসময়ে হিন্দির অনুযায়ী ছিল এবং সংস্কৃত ষষ্ঠী বহুবচনের আনাং বিভক্তি যেখানে হিন্দিতে সংক্ষিপ্ত সানুনাসিকে পরিবর্তিত হইয়াছে, বাংলায় তাহা দ আকার ধারণ করিয়াছে এবং কৃত শব্দের অপভ্রংশ কের তাহার সহিত বাহুল্য প্রয়োগরূপে যুক্ত হইয়াছে।

তুলসীদাসে আছে, জীবন্হকের কলেসা, এই জীবন্হকের শব্দের রূপান্তর 'জীবদিগের' হওয়া কিছুই অসম্ভব নহে।

ন হইতে দ হওয়ার একটি দৃষ্টান্ত সকলেই অবগত আছেন, বানর হইতে বান্দর ও বাঁদর।

কর্মকারকে জীবন্হকে হইতে জীবদিগে শব্দের উদ্ভব হওয়া স্বাভাবিক। আমাদের নূতন সৃষ্ট বাংলায় আমরা কর্মকারকে দিগকে লিখিয়া থাকি, কিন্তু কথিত ভাষায় মনোযোগ দিলে কর্মকারকে দিগে শব্দের প্রয়োগ অনেক স্থলেই শুনা যায়।

বোধ হয় সকলেই লক্ষ করিয়া থাকিবেন, সাধারণ লোকদের মধ্যে— আমাগের তোমাগের শব্দ প্রচলিত আছে। এরূপ প্রয়োগ বাংলার কোনো বিশেষ প্রদেশে বদ্ধ কি না বলিতে পারি না, কিন্তু নিম্নশ্রেণীর লোকদের মুখে বারংবার শুনা গিয়াছে, ইহা নিশ্চয়। আমাগের তোমাগের শব্দের মধ্যস্থলে দ আসিবার প্রয়োজন হয় নাই; কারণ, ম সানুনাসিক বর্ণ হওয়াতে পার্শ্ববর্তী সানুনাসিককে সহজে আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছে। যাগের তাগের শব্দ ব্যবহার করিতে শুনা যায় নাই।

এই মতের বিরুদ্ধে সন্দেহের একটি কারণ বর্তমান আছে। আমরা সাধারণত, নিজদের লোকদের গাছদের না বলিয়া, নিজেদের লোকেদের গাছেদের বলিয়া থাকি। জবন্হকের— জীবন্হের— জীবন্দের— জীবদের, এরূপ রূপান্তরপর্যায়ে উক্ত একারের স্থান কোথাও দেখি না।

মেওয়ারি কাব্যে ষষ্ঠী বিভক্তির একটি প্রাচীন রূপ দেখা যায় হংদো। কাশ্মীরিতে ষষ্ঠী বিভক্তির বহুবচন হিংদ; জনহিংদ বলিতে লোকদিগের বুঝায়। বীম্‌স্‌ সাহেবের মতে এই হংদো ভূ ধাতুর ভবন্ত হইতে উৎপন্ন। যেমন কৃত একপ্রকারের সম্বন্ধ তেমনই ভূত আর-একপ্রকারে সম্বন্ধ।

যদি ধরিয়া লওয়া যায়, জনহিন্দকের জনহিঁন্দের শব্দের একপর্যায়গত শব্দ জনদিগের জনেদের, তাহা হইলে নিয়মে বাধে না। ঘরহিঁ স্থলে যদি 'ঘরে' হয় তবে জনহি স্থলে 'জনে' হওয়া অসংগত নহে। বাংলার প্রতিবেশী আসামি ভাষায় হঁত শব্দ বহুবচনবাচক। মানুহহঁত অর্থে মানুষগণ বুঝায়। হঁত এবং হংদ শব্দের সাদৃশ্য আছে। কিন্তু হংদ সম্বন্ধবাচক বহুবচন, হঁত বহুবচন কিন্তু সম্বন্ধবাচক নহে।

পরন্তু সম্বন্ধ ও বহুবচনের মধ্যে নৈকট্য আছে। একের সহিত সম্বন্ধীয়গণই বহু। বাংলায় রামের শব্দ সম্বন্ধসূচক, রামেরা বহুবচনসূচক ; রামেরা বলিতে রামের গণ, অর্থাৎ রাম-সম্বন্ধীয়গণ বুঝায়। নরা গজা প্রভৃতি শব্দে প্রাচীন বাংলায় বহুবচনে আকার প্রয়োগ দেখা যায়, রামের শব্দকে সেইরূপ আকারযোগে বহুবচন করিয়া লওয়া হইয়াছে এইরূপ আমাদের বিশ্বাস।

নেপালি ভাষায় ইহার পোষক প্রমাণ পাওয়া যায়। আমরা যে স্থলে দেবেরা বলি তাহারা দেবহেরু বলে। হে এবং রু উভয় শব্দই সম্বন্ধবাচক এবং সম্বন্ধের বিভক্তি দিয়াই বহুবচনরূপ নিষ্পন্ন হইয়াছে।

আসামি ভাষায় ইঁহতর শব্দের অর্থ ইঁহাদের, তঁহতর তোমাদের। ইঁহত-কের ইঁহাদিগের, তঁহত-কের তোমাদিগের, কানে বিসদৃশ বলিয়া ঠেকে না। কর্মকারকেও আসামি ইঁহতক বাংলা ইঁহাদিগের সহিত সাদৃশ্যবান।

এই হঁত শব্দ রাজপুত হংদো শব্দের ন্যায় ভবন্ত বা সন্ত শব্দানুসারী, তাহা মনে করিবার একটা কারণ আছে। আসামিতে হঁওতা শব্দের অর্থ হওয়া।

এ স্থলে এ কথাও স্মরণ রাখা যাইতে পারে যে, পশ্চিমি হিন্দির মধ্যে রাজপুত ভাষাতেই সাধারণপ্রচলিত সম্বন্ধকারক বাংলার অনুরূপ ; ঘোড়ার শব্দের মাড়োয়ারি ও মেরারি ঘোড়ারো, বহুবচনে ঘোড়াঁরো।

পাঞ্জাবি ভাষায় ষষ্ঠী বিভক্তি চিহ্ন দা, স্ত্রীলিঙ্গে দী। ঘোড়াদা— ঘোড়ার, যন্ত্রদীবাণী— যন্ত্রের বাণী। প্রাচীন পাঞ্জাবিতে ছিল ডা। আমাদের দিগের শব্দের দ-কে এই পাঞ্জাবি দ-এর সহিত এক করিয়া দেখা যাইতে পারে। ঘোড়াদা-কের— ঘোড়াদিগের।

বীম্‌স্‌ সাহেবের মতে পাঞ্জাবি এই দা শব্দ সংস্কৃত তন শব্দের অপভ্রংশ। তন শব্দের যোগে সংস্কৃত পুরাতন সনাতন প্রভৃতি শব্দের সৃষ্টি। প্রাকৃতেও ষষ্ঠীবিভক্তির পরে কের এবং তণ উভয়ের ব্যবহার আছে ; হেমচন্দ্রে আছে, সম্বন্ধিনঃ কেরতণৌ। মেরারি তণো তণুঁ এবং বহুবচনে তণাঁ ব্যবহার হইয়া থাকে। তণাঁ-র উত্তর কের শব্দ যোগ করিলে 'তণাকের' রূপে দিগের শব্দের মিল পাওয়া যায়।

প্রাচীনকাব্যে অধিকাংশ স্থলে সব শব্দ যোগ করিয়া বহুবচন নিষ্পন্ন হইত।

এখনও বাংলায় সব শব্দের যোগ চলিত আছে। কাব্যে তাহার দৃষ্টান্ত :

পাখিসব করে রব রাতি পোহাইল।

কিন্তু কথিত ভাষায় উক্তপ্রকার কাব্যপ্রয়োগের সহিত নিয়মের প্রভেদ দেখা যায়। কাব্যে আমাসব, তোমাসব, পাখিসব প্রভৃতি কথায় দেখা যাইতেছে সব শব্দই

বহুবচনের একমাত্র চিহ্ন, কিন্তু কথিত ভাষায় অন্য বহুবচনবিভক্তির পরে উহা বাহুল্যরূপে ব্যবহৃত হয়— আমরা সব, তোমরা সব, পাখিরা সব ; যেন, আমরা তোমরা পাখিরা 'সব' শব্দের বিশেষণ।

ইহা হইতে আমাদের পূর্বের কথা প্রমাণ হয়, রা বিভক্তি বহুবচনবাচক বটে কিন্তু উহা মূলে সম্বন্ধবাচক। 'পাখিরা সব' অর্থ পাখিসম্বন্ধীয় সমষ্টি।

ইহা হইতে আর-একটা দেখা যায়, বিভক্তির বাহুল্যপ্রয়োগ আমাদের ভাষার প্রকৃতিবিরুদ্ধ নহে। লোকেদের শব্দকে বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাই, প্রথমত লোকে শব্দের এ প্রাচীন ষষ্ঠীবাচক, তাহার পর দা শব্দ অপেক্ষাকৃত আধুনিক ষষ্ঠীবিভক্তি, তাহার পর কের শব্দ সম্বন্ধবাচক বাহুল্যপ্রয়োগ।

মৈথিলীভাষায় সব শব্দ যোগে বহুবচন নিষ্পন্ন হয়। কিন্তু তাহার প্রয়োগ আমাদের প্রাচীন কাব্যের ন্যায়। নেনাসভ অর্থে বালকেরা সব, নেনিসভ— বালিকারা সব ; কিন্তু এ সম্বন্ধে মৈথিলীর সহিত বাংলার তুলনা হয় না। কারণ, মৈথিলীতে অন্য কোনো প্রকার বহুবচনবাচক বিভক্তি নাই। বাংলায় রা বিভক্তিযোগে বহুবচন সমস্ত গৌড়ীয় ভাষা হইতে স্বতন্ত্র, কেবল নেপালি হেরু বিভক্তির সহিত তাহার সাদৃশ্য আছে।

কিন্তু রা বিভক্তিযোগে বহুবচন কেবল সচেতন পদার্থ সম্বন্ধেই খাটে। আমরা বাংলায় ফলেরা পাতারা বলি না। এই কারণেই ফলেরা সব, পাতারা সব, এমন প্রয়োগ সম্ভবপর নহে।

মৈথিলী ভাষায় ফলসভ, কথাসভ, এরূপ ব্যবহারের বাধা নাই। বাংলায় আমরা এরূপ স্থলে ফলগুলা সব, পাতাগুলা সব, বলিয়া থাকি।

সচেতন পদার্থ বুঝাইতে লোকগুলা সব, বানরগুলা সব বলিতেও দোষ নাই।

অতএব দেখা যাইতেছে গুলা যোগে বাংলায় সচেতন অচেতন সর্বপ্রকার বহুবচনই সিদ্ধ হয়। এক্ষণে এই গুলা শব্দের উৎপত্তি অনুসন্ধান করা আবশ্যক।

নেপালি বহুবচনবিভক্তি হেরু শব্দের উৎপত্তি প্রাকৃতভাষার কেরউ হইতে। অম্হহং কেরউ— আমাদিগের। কেরউ— কেরু— হেরু।

বাংলা রা যেমন সম্বন্ধবাচক হইতে বহুবচনবাচকে পরিণত হইয়াছে, নেপালি হেরু শব্দেরও সেই গতি।

নেপালিতে কেরু শব্দের কে হে হইয়াছে, বাংলায় তাহা গে হইয়াছে, দিগের শব্দে তাহার প্রমাণ আছে।

কেরু হইতে গেরু, গেরু হইতে গেলু, গেলু হইতে গুলু, গুলু হইতে গুলো ও গুলা

হওয়া অসম্ভব নহে। এরূপ স্বরবর্ণবিপর্যয়ের উদাহরণ অনেক আছে ; বিন্দু হইতে বুঁদ তাহার একটি, মুদ্রিকা হইতে মাদুলি অন্যপ্রকারের (এই বুঁদ শব্দ হইতে বিন্দু-আকার মিষ্টান্ন বোঁদে শব্দের উদ্ভব)।

ঘোড়াকেরু নেপালিতে হইল ঘোড়াহেরু, বাংলায় হইল ঘোড়াগুলো।

গুলি ও গুলিন্ শব্দ গুলা-র স্ত্রীলিঙ্গ। ক্ষুদ্র জিনিস বুঝাইতে একসময়ে বঙ্গভাষায় স্ত্রীলিঙ্গ ব্যবহার হইত তাহার অনেক দৃষ্টান্ত আছে ; যথা, বড়া বড়ি, গোলা গুলি, খোঁটা খুঁটি, দড়া দড়ি, ঘড়া ঘটি, ছোরা ছুরি, জাঁতা জাঁতি, আংটা আংটি, শিকল শিক্‌লি ইত্যাদি।

প্রাচীন কাব্যে দেখা যায়, সব অপেক্ষা গণ শব্দের প্রচলন অনেক বেশি। মুকুন্দরামের কবিকঙ্কণচণ্ডী দেখিলে তাহার প্রমাণ হইবে ; অন্য বাংলা প্রাচীন কাব্য এক্ষণে লেখকের হস্তে বর্তমান নাই, এইজন্য তুলনা করিবার সুযোগ হইল না।

এই গণ শব্দ হইতে গুলা হওয়াও অসম্ভব নহে। কারণ, গণ শব্দের অপভ্রংশ প্রাকৃত গণ্। জানি না ধ্বনিবিকারের নিয়মে গণ্ হইতে গল্ ও গুলো হওয়া সুসাধ্য কি না।

কিন্তু কেরু হইতেই যে গুলো হইয়াছে লেখকের বিশ্বাসের ঝোঁকটা সেইদিকে। তাহার কারণ আছে ; প্রথমত রা বিভক্তির সহিত তাহার যোগ পাওয়া যায়, দ্বিতীয়ত নেপালি হেরু শব্দের সহিত তাহার সাদৃশ্য আছে, তৃতীয়ত যাহার যুক্তিপরম্পরা অপেক্ষাকৃত দুরূহ এবং যাহা প্রথম শ্রুতিমাত্রই প্রত্যয় আকর্ষণ করে না উদ্ভাবকের কল্পনা তাহার প্রতিই বেশি আকৃষ্ট হয়।

এইখানে বলা আবশ্যক, উড়িয়া ও আসামির সহিত যদিচ বাংলা ভাষার ঘনিষ্ঠ নৈকট্য আছে তথাপি বহুবচন সম্বন্ধে বাংলার সহিত তাহার মিল পাওয়া যায় না।

উড়িয়া ভাষায় মানে শব্দ যোগে বহুবচন হয়। ঘর একবচন, ঘরমানে বহুবচন। বীম্‌স্ বলেন, এই মানে শব্দ পরিমাণ হইতে উদ্ভূত ; হর্ন্‌লে বলেন মানব হইতে। প্রাচ্য হিন্দিতে মনুষ্যগণকে মনই বলে, মানে শব্দ তাহারই অনুরূপ।

হিন্দিতে কর্তৃকারক বহুবচন লোগ্ (লোক) শব্দযোগে সিদ্ধ হয় ; ঘোড়ালোগ— ঘোড়াসকল। বাংলাতেও শ্রেণীবাচক বহুবচনে লোক শব্দ ব্যবহৃত হয় ; যথা, পণ্ডিতলোক মূর্খলোক গরিবলোক ইত্যাদি।

আসামি ভাষায় বিলাক হঁত এবং বোর শব্দযোগে বহুবচন নিষ্পন্ন হয়। তন্মধ্যে হঁত শব্দ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। বিলাক এবং বোর শব্দের উৎপত্তি নির্ণয় সুকঠিন।

যাহাই হউক বিস্ময়ের বিষয় এই যে, কর্তৃকারক এবং সম্বন্ধের বহুবচনে বাংলা প্রায় সমুদয় গৌড়ীয় ভাষা হইতে স্বতন্ত্র। কেবল রাজপুতানি এবং নেপালি হিন্দির সহিত তাহার কথঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে। কিন্তু মনোযোগপূর্বক অনুধাবন করিলে অন্যান্য গৌড়ীয় ভাষার সহিত বাংলার এই-সকল বহুবচন রূপের যোগ পাওয়া যায়, এই প্রবন্ধে তাহারই অনুশীলন করা গেল।

সম্বন্ধের একবচনেও অপর গৌড়ীয় ভাষার সহিত বাংলার প্রভেদ আছে তাহা পূর্বে বলা হইয়াছে, কেবল মাড়োয়ারি ও মেরারি রো বিভক্তি বাংলার র বিভক্তির সহিত সাদৃশ্যবান। এ কথাও বলা আবশ্যক উড়িয়া ও আসামি ভাষার সহিতও এ সম্বন্ধে বাংলার প্রভেদ নাই। অপরাপর গৌড়ীয় ভাষায় কা প্রভৃতি যোগে ষষ্ঠীবিভক্তি হয়।

কিন্তু একটি বিষয় বিশেষরূপে লক্ষ করিবার আছে।

উত্তম পুরুষ এবং মধ্যম পুরুষ সর্বনাম শব্দে কী একবচনে কী বহুবচনে প্রায় কোথাও ষষ্ঠীতে ককারের প্রয়োগ নাই, প্রায় সর্বত্রই রকার ব্যবহৃত হইয়াছে ; যথা, সাধুহিন্দি— একবচনে মেরা, বহুবচনে হমারা। কনৌজি— মেরো, হমারো। ব্রজভাষা —মেরৌ, হমারৌ। মাড়োয়ারি— মারো, ম্হারো। মেরারি— ম্হারো, হ্‌াঁরহ্‌াঁরো। অরধি— মোর, হমার। রিরাই—ম্‌রার, হম্‌হার।

মধ্যম পুরুষেও— তেরা তুম্‌হরা তোর তুমার, ত্‌রার তুম্‌হার প্রভৃতি প্রচলিত।

কোনো কোনো ভাষায় বহুবচনে কিঞ্চিৎ প্রভেদ দেখা যায় ; যথা, নেপালি— হামেরুকো, ভোজপুরি— হমরণকে, মাগধী— হমরণীকে, মৈথিলী – হমরাসভকে।

অন্য গৌড়ীয় ভাষায় কেবল সর্বনামের ষষ্ঠী বিভক্তিতে যে রকার বর্তমান, বাংলায় তাহা সর্বনাম ও বিশেষ্যে সর্বত্রই বর্তমান। ইহা হইতে অনুমান করি, ককার অপেক্ষা রকার ষষ্ঠীবিভক্তির প্রাচীনতর রূপ।

এখানে আর-একটি লক্ষ করিবার বিষয় আছে। একবচনে যেখানে তেরা বহুবচনে সেখানে তুম্‌হরা, একবচনে ম্‌রার বহুবচনে হম্‌হার। নেপালিভাষায় কর্তৃকারক বহুবচনে হেরু বিভক্তি পাওয়া যায় ; এই হেরু হার এবং হরা সাদৃশ্যবান।

কিন্তু নেপালিতে হেরু নাকি কর্তৃকারক বহুবচনে ব্যবহার হয়, এইজন্য সম্বন্ধে রকারের পরে পুনশ্চ রকার-যোগ সম্ভব হয় নাই, কো শব্দযোগে ষষ্ঠী করিতে হইয়াছে। অথচ নেপালি একবচনে মেরো হইয়া থাকে।

মৈথিলী ষষ্ঠীর বহুবচনে হমরাসভকে সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে।

পূর্বে বলিয়াছি বাংলায় কর্তৃকারক বহুবচনে সব শব্দের পূর্বে বহুবচনবাচক রা বিভক্তি বসে, যথা ছেলেরা সব ; কিন্তু মৈথিলীতে শুদ্ধ নেনাসভ বলিতেই বালকেরা

সব বুঝায়। পূর্বে এ কথাও বলিয়াছি এ সম্বন্ধে মৈথিলীর সহিত বাংলার তুলনা হয় না, কারণ, মৈথিলীতে বাংলার ন্যায় কর্তৃকারক বহুবচনের কোনো বিশেষ বিভক্তি নাই।

কিন্তু দেখা যাইতেছে সর্বনাম উত্তম ও মধ্যম পুরুষে মৈথিলী কর্তৃকারক বহুবচনে হমরাসভ তোহরাসভ ব্যবহার হয়, এবং অন্যান্য কারকেও হম্‌রাসভকে তোহরাসভকে প্রভৃতি প্রচলিত।

মৈথিলী সর্বনামশব্দে যে ব্যবহার, বাংলায় সর্বনাম ও বিশেষ্যে সর্বত্রই সেই ব্যবহার।

ইহা হইতে দুই প্রকার অনুমান সংগত হয়। হয়, এই হমরা এককালে বাংলা ও মৈথিলী উভয় ভাষায় বহুবচনরূপ ছিল, নয় এককালে যাহা কেবল সম্বন্ধের বিভক্তি ছিল বাংলায় তাহা ঈষৎ রূপান্তরিত হইয়া কর্তৃকারক বহুবচন ও মৈথিলী ভাষায় তাহা কেবল সর্বনাম শব্দের ষষ্ঠীবিভক্তিতে দাঁড়াইয়াছে।

বলা বাহুল্য আমাদের এই আলোচনাগুলি সংশয়পরিশূন্য নহে। পাঠকগণ ইহাকে অনুসন্ধানের সোপানস্বরূপে গণ্য করিলে আমরা চরিতার্থ হইব।

দীনেশবাবুর বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, হর্ন্‌লে-সাহেবের গৌড়ীয় ভাষার ব্যাকরণ, কেলগ্‌-সাহেবের হিন্দিব্যাকরণ, গ্রিয়র্সন-সাহেবের মৈথিলী ব্যাকরণ, এবং ডাক্তার ব্রাউনের আসামি ব্যাকরণ অবলম্বনে এই প্রবন্ধ লিখিত হইল।

১৩০৫

সম্বন্ধে কার

সংস্কৃত কৃত এবং তাহার প্রাকৃত অপভ্রংশ কের শব্দ হইতে বাংলাভাষায় সম্বন্ধে র বিভক্তির সৃষ্টি হইয়াছে, পূর্বে আমরা তাহার বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি। প্রাচীন বৈষ্ণব পদাবলীতে— তাহার যাহার অর্থে তাকর যাকর শব্দের প্রয়োগ দৃষ্টান্ত-স্বরূপে দেখানো হইয়াছে।

এ সম্বন্ধে বর্তমানে অপ্রচলিত পুরাতন দৃষ্টান্তের বিশেষ প্রয়োজন নাই। কারণ এখনও সম্বন্ধে বাংলায় কার শব্দপ্রয়োগ ব্যবহৃত হয়; যথা, এখনকার তখনকার ইত্যাদি।

কিন্তু এই কার শব্দের প্রয়োগ কেবল স্থলবিশেষেই বদ্ধ। কৃত শব্দের অপভ্রংশ কার কেনই বা কোনো কোনো স্থলে অবিকৃত রহিয়াছে এবং কেনই বা অন্যত্র কেবলমাত্র তাহার র অক্ষর অবশিষ্ট রহিয়াছে, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। ভাষা ইচ্ছাশক্তি-বিশিষ্ট জীবের মতো কেন যে কী করে, তাহার সম্পূর্ণ কিনারা করা যায় না।

উচ্চারণের বিশেষ নিয়মঘটিত কারণে অনেক সময়ে বিভক্তির পরিবর্তন হইয়া থাকে; যথা, অধিকরণে মাটির বেলায় আমরা বলি মাটিতে, ঘোড়ার বেলায় বলি ঘোড়ায়। কিন্তু এ স্থলে সে কথা খাটে না। লিখন শব্দের বেলায় আমরা সম্বন্ধে বলি— লিখনের, কিন্তু এখন শব্দের বেলায় এখনের বলি না, বলি— এখনকার। অথচ লিখন এবং এখন শব্দে উচ্চারণনিয়মের কোনো প্রভেদ হইবার কথা নাই।

বাংলায় কোন্ কোন্ স্থলে সম্বন্ধে কার শব্দের প্রয়োগ হয় তাহার একটি তালিকা প্রকাশিত হইল।

এখনকার তখনকার যখনকার কখনকার।

এখানকার সেখানকার যেখানকার কোন্‌খানকার।

এ-বেলাকার ও-বেলাকার সে-বেলাকার।

এ-সময়কার ও-সময়কার সে-সময়কার।

সে-বছরকার ও-বছরকার এ-বছরকার।

যে-দিনকার সে-দিনকার ও-দিনকার এ-দিনকার।

এ-দিককার ও-দিককার সে-দিককার,— দক্ষিণ দিককার, উত্তর দিককার, সম্মুখ দিককার, পশ্চাৎ দিককার।

আজকেকার কালকেকার পরশুকার।

এপারকার ওপারকার উপরকার নিচেকার তলাকার কোথাকার।

দিনকার রাত্রিকার।

এ-ধারকার ও-ধারকার সামনেকার পিছনকার।

এ-হপ্তাকার ও-হপ্তাকার।

আগেকার পরেকার কবেকার।

একালকার সেকালকার।

প্রথমকার শেষেকার মাঝেকার।

ভিতরকার বাহিরকার।

আগাকার গোড়াকার।

সকালকার বিকালকার।

এই তালিকা হইতে দেখা যায় সময় এবং অবস্থান (position)-সূচক বিশেষ্য ও বিশেষণের সহিত কার বিভক্তির যোগ।

• কিন্তু ইহাও দেখা যাইতেছে, তাহারও একটা নির্দিষ্ট সীমা আছে। আমরা বলি— দিনের বেলা, দিনকার বেলা বলি না। অথচ সেদিনকার শব্দ প্রচলিত আছে। সময় শব্দের সম্বন্ধে সময়ের বলি, অথচ তৎপূর্বে এ সে প্রভৃতি সর্বনাম যোগ করিলে সম্বন্ধে কার বিভক্তি বিকল্পে প্রয়োগ হইয়া থাকে।

ইহাতে প্রমাণ হয়, সময় ও দেশ সম্বন্ধে যেখানে বিশেষ সীমা নির্দিষ্ট হয়, সেইখানেই কার শব্দ প্রয়োগ হইতে পারে। সেদিনের কথা এবং সেদিনকার কথা— এ দুটা শব্দের একটি সূক্ষ্ম অর্থভেদ আছে। সেদিনের অর্থ অপেক্ষাকৃত অনির্দিষ্ট, সেদিনের কথা বলিতে অতীতকালের অনেক দিনের কথা বুঝাইতে পারে, কিন্তু সেদিনকার কথা বলিতে বিশেষ একটি দিনের কথা বুঝায়। যেখানে সেই বিশেষত্বের উপর বেশি জোর দিবার প্রয়োজন, কোনোমতে দেশ বা কালের একটি বিশেষ নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করিবার জো নাই, সেখানে শুদ্ধমাত্র এর বিভক্তি না দিয়া কার বিভক্তি হয়।

অতএব বিশেষার্থবোধক, সময় এবং অবস্থানসূচক বিশেষ্য ও বিশেষণের উত্তরে সম্বন্ধে কার প্রত্যয় হয়।

ইহার দুটি অথবা তিনটি ব্যতিক্রম চোখে পড়িতেছে। একজনকার দুইজনকার ইত্যাদি, ইহা মনুষ্যসংখ্যাবাচক, দেশকালবাচক নহে। মনুষ্যসমষ্টিবাচক— সকলকার। এবং সত্যকার। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সকলকার হয় কিন্তু সমস্তকার হয় না। (প্রাচীন বাংলায় সভাকার), সত্যকার হয় কিন্তু মিথ্যাকার হয় না। এবং মনুষ্য

সংখ্যাবাচক একজন দুইজন ব্যতীত পশু বা জড়সংখ্যাবাচক একটা দুইটা-র সহিত কার শব্দের সম্পর্ক নাই।

অবস্থানবাচক যে-সকল শব্দে কার প্রত্যয় হয় তাহার অধিকাংশই বিশেষণ; যথা, উপর নীচ সমুখ পিছন আগা গোড়া মধ্য ধার তল দক্ষিণ উত্তর ভিতর বাহির ইত্যাদি। বিশেষ্যের মধ্যে কেবল খান (স্থান) পার ও ধার শব্দ। এই তিনটি বিশেষ্যের বিশেষ ধর্ম এই যে, ইহাদের পূর্বে এ সে প্রভৃতি বিশেষার্থবোধক সর্বনাম-বিশেষণ যুক্ত না হইলে ইহাদের উত্তরে কার প্রত্যয় হয় না; যথা সেখানকার এপারকার ওধারকার। কিন্তু, ভিতরকার বাহিরকার প্রভৃতি শব্দে সে কথা খাটে না।

সময়বাচক যে-সকল শব্দের উত্তর কার প্রত্যয় হয়, তাহার অধিকাংশই বিশেষ্য; যথা, দিন রাত্রি ক্ষণ বেলা বার বছর হপ্তা ইত্যাদি। এইরূপ সময়বাচক বিশেষ্য শব্দের পূর্বে এ সে প্রভৃতি সর্বনাম-বিশেষণ না থাকিলে তদুত্তরে কার প্রয়োগ হয় না। শুদ্ধমাত্র — বারকার বেলাকার ক্ষণকার হয় না, এবেলাকার এখানকার এক্ষণকার এবারকার হয়। বিশেষণ শব্দে অন্যরূপ।

সময়বাচক বিশেষ্য শব্দ সম্বন্ধে অনেকগুলি ব্যতিক্রম দেখা যায়। মাস মুহূর্ত দণ্ড ঘণ্টা প্রভৃতি শব্দের সহিত কার শব্দের যোগ হয় না। ইহার কারণ নির্ধারণ সুকঠিন।

যাহা হউক দেশ সম্বন্ধে একটা মোটা নিয়ম পাওয়া যায়। দেশবাচক যে-সকল শব্দে সংস্কৃতে বর্তী শব্দ হইতে পারে, বাংলায় তাহার স্থানে কার ব্যবহার হয়। ঊর্ধ্ববর্তী নিম্নবর্তী সম্মুখবর্তী পশ্চাদ্বর্তী অগ্রবর্তী প্রভৃতি শব্দের স্থলে বাংলায় উপরকার নিচেকার সামনেকার পিছনকার আগাকার ইত্যাদি প্রচলিত। ঋজুবর্তী বক্রবর্তী লম্ববর্তী ইত্যাদি কথা সংস্কৃতে নাই, বাংলাতেও সোজাকার বাঁকাকার লম্বাকার হইতে পারে না।

১৩০৫

বাংলা শব্দদ্বৈত

ব্রুগ্‌মান তাঁহার ইণ্ডোজর্মানীয় ভাষার তুলনামূলক ব্যাকরণে লিখিতেছেন, একই শব্দকে দুই বা ততোধিকবার বহুলীকরণ দ্বারা, পুনর্বৃত্তি (repetition), দীর্ঘকাল-বর্তিতা, ব্যাপকতা অথবা প্রগাঢ়তা ব্যক্ত করা হইয়া থাকে। ইণ্ডোজর্মানীয় ভাষার অভিব্যক্তিদশায় পদে পদে এইরূপ শব্দদ্বৈতের প্রমাণ পাওয়া যায়।

ইণ্ডোজর্মান ভাষায় অনেক দ্বিগুণিত শব্দ কালক্রমে সংযুক্ত হইয়া এক হইয়া গেছে ; সংস্কৃত ভাষায় তাহার দৃষ্টান্ত, মর্মর গর্গর, (ঘড়া, জলশব্দের অনুকরণে), গদ্‌গদ বর্বর (অস্পষ্টভাষী) কঙ্কণ। দ্বিগুণিত শব্দের এক অংশ ক্রমে বিকৃত হইয়াছে এমন দৃষ্টান্তও অনেক আছে ; যথা কর্কশ কঙ্কর ঝঞ্ঝা বম্ভর (ভ্রমর) চঞ্চল।

অসংযুক্ত ভাবে দ্বিগুণীকরণের দৃষ্টান্ত সংস্কৃতে যথেষ্ট আছে ; যথা, কালে কালে, জন্মজন্মনি, নব নব, উত্তরোত্তর, পুনঃ পুনঃ, পীত্বা পীত্বা, যথা যথা, যদ্‌যৎ, অহরহঃ, প্রিয়ঃ প্রিয়ঃ, সুখসুখেন, পুঞ্জপুঞ্জেন।

এই দৃষ্টান্তগুলিতে হয় পুনরাবৃত্তি, নয় প্রগাঢ়তার ভাব ব্যক্ত হইতেছে।

যতদূর দেখিয়াছি তাহাতে বাংলায় শব্দদ্বৈতের প্রাদুর্ভাব যত বেশি, অন্য আর্য-ভাষায় তত নহে। বাংলা শব্দদ্বৈতের বিধিও বিচিত্র ; অধিকাংশ স্থলেই সংস্কৃত ভাষায় তাহার তুলনা পাওয়া যায় না।

দৃষ্টান্তগুলি একত্র করা যাক। মধ্যে মধ্যে, বারে বারে, পরে পরে, পায় পায়, পথে পথে, ঘরে ঘরে, হাড়ে হাড়ে, কথায় কথায়, ঘণ্টায় ঘণ্টায়— এগুলি পুনরাবৃত্তিবাচক।

বুকে বুকে, মুখে মুখে, চোখে চোখে, কাঠে কাঠে, পাথরে পাথরে, মানুষে মানুষে— এগুলি পরস্পর-সংযোগবাচক।

সঙ্গে সঙ্গে, আগে আগে, পাশে পাশে, পিছনে পিছনে, মনে মনে, তলে তলে, পেটে পেটে, ভিতরে ভিতরে, বাইরে বাইরে, উপরে উপরে— এগুলি নিয়তবর্তিতা-বাচক, অর্থাৎ এগুলিতে সর্বদা লাগিয়া থাকার ভাব ব্যক্ত করে।

চলিতে চলিতে, হাসিতে হাসিতে, চলিয়া চলিয়া, হাসিয়া হাসিয়া— এগুলি দীর্ঘ-কালীনতাবাচক।

অন্য অন্য, অনেক অনেক, নূতন নূতন, ঘন ঘন, টুকরা টুকরা— এগুলি বিভক্ত বহুলতাবাচক। নূতন নূতন কাপড়, বলিলে প্রত্যেক নূতন কাপড়কে পৃথক করিয়া

দেখা হয়। অনেক অনেক লোক, বলিলে লোকগুলিকে অংশে অংশে ভাগ করা হয়, কিন্তু শুদ্ধ 'অনেক লোক' বলিলে নিরবচ্ছিন্ন বহু লোক বোঝায়।

লাল লাল, কালো কালো, লম্বা লম্বা, মোটা মোটা, রকম রকম— এগুলিও পূর্বোক্ত শ্রেণীর। লাল লাল ফুল, বলিলে ভিন্ন ভিন্ন অনেকগুলি লাল ফুল বোঝায়।

যাকে যাকে, যেমন যেমন, যেখানে যেখানে, যখন যখন, যত যত, যে যে, যারা যারা— এগুলিও পূর্বোক্তরূপ।

আশায় আশায়, ভয়ে ভয়ে— এ দুইটিও ওই প্রকার। আশায় আশায় আছি, অর্থাৎ প্রত্যেক বার আশা হইতেছে; ভয়ে ভয়ে আছি, অর্থাৎ বারংবার ভয় হইতেছে। অর্থাৎ ক্ষণে ক্ষণে পৃথক পৃথক রূপে আশা বা ভয় উদ্রেক করিতেছে।

মুঠো মুঠো, ঝুড়ি ঝুড়ি, বস্তা বস্তা— এগুলিও পূর্বানুরূপ।

টাটকা টাটকা, গরম গরম, ঠিক ঠিক— এগুলি প্রকর্ষবাচক।

টাটকা টাটকা বলিলে টাটকা শব্দকে বিশেষ করিয়া নিশ্চয় করিয়া বলা যায়।

চার চার, তিন তিন— এগুলিও পূর্ববৎ। চার চার পেয়াদা আসিয়া হাজির, অর্থাৎ নিতান্তই চারটে পেয়াদা বটে।

গলায় গলায় (আহার) কানে কানে (কথা)— ইহাও পূর্বশ্রেণীর; অর্থাৎ অত্যন্তই গলা পর্যন্ত পূর্ণ, নিতান্তই কানের নিকটে গিয়া কথা। হাতে হাতে (ফল, বা ধরা পড়া), বোধ করি স্বতন্ত্রজাতীয়। বোধ করি তাহার অর্থ এই যে, যেমনি হাত দিয়া কাজ করা অমনি সেই হাতেই ফল প্রাপ্ত হওয়া, যে-হাতে চুরি করা সেই হাতেই ধৃত হওয়া।

নিজে নিজে, আপনি আপনি, তখনই তখনই— পূর্বানুরূপ। অর্থাৎ বিশেষরূপে নিজেই, আপনিই আর কেহই নহে, বিলম্বমাত্র না করিয়া তৎক্ষণাৎ। সকাল সকাল শব্দও বোধ করি এই-জাতীয়, অর্থাৎ নিশ্চয়রূপে দ্রুতরূপে সকাল।

জল্ জল্, চুর্ চুর্, ঘুর্ ঘুর্, টল্ টল্, নড়্ নড়্— এগুলি জ্বলন চূর্ণন ঘূর্ণন টলন নর্তন শব্দজাত; এগুলিতেও প্রকর্ষভাব ব্যক্ত হইতেছে।

বাংলা অনেকগুলি শব্দদ্বৈতে দ্বিধা, ঈষদূনতা, মৃদুতা, অসম্পূর্ণতার ভাব ব্যক্ত করে; যথা, যাব যাব, উঠি উঠি; মেঘ মেঘ, জ্বর জ্বর, শীত শীত, মর্ মর্, পড়ো পড়ো, ভরা ভরা, ফাঁকা ফাঁকা, ভিজে ভিজে, ভাসা ভাসা, কাঁদো কাঁদো, হাসি হাসি।

মানে মানে, ভাগ্যে ভাগ্যে শব্দের মধ্যেও এই ঈষদূনতার ভাব আছে। মানে মানে পলায়ন, অর্থে— মান প্রায় যায় যায় করিয়া পলায়ন। ভাগ্যে ভাগ্যে রক্ষা পাওয়া অর্থাৎ যেটুকু ভাগ্যসূত্রে রক্ষা পাওয়া গেছে তাহা অতি ক্ষীণ।

ঘোড়া ঘোড়া (খেলা), চোর চোর (খেলা) এই-জাতীয়; অর্থাৎ সত্যকার ঘোড়া নহে, তাহারি নকল করিয়া খেলা।

এইরূপ ঈষদূনত্বসূচক অসম্পূর্ণতাবাচক শব্দদ্বৈত বোধ করি অন্য আর্যভাষায় দেখা যায় না। ফরাসি ভাষায় একপ্রকার শব্দব্যবহার আছে যাহার সহিত ইহার কথঞ্চিৎ তুলনা হইতে পারে।

ফরাসি চলিত ভাষায় কোনো জিনিসকে আদরের ভাবে বা কাহাকেও খর্ব করিয়া লইতে হইলে কিঞ্চিৎ পরিমাণে শব্দদ্বৈত ঘটিয়া থাকে; যথা, me-mere মে-মেয়ার্, অর্থাৎ ক্ষুদ্র মাতা; মেয়ার্ অর্থে মা, মে-মেয়ার্ অর্থে ছোট্ট মা, আদরের মা, যেন অসম্পূর্ণ মা। bete বেট্ শব্দের অর্থ জন্তু, be-bete বে-বেট্ শব্দের অর্থ ছোট্ট পশু, আদরের পশুটি; অর্থাৎ দেখা যাইতেছে এই দ্বিগুণীকরণে প্রকর্ষ না বুঝাইয়া খর্বতা বুঝাইতেছে।

আর-একপ্রকার বিকৃত শব্দদ্বৈত বাংলায় এবং বোধ করি ভারতীয় অন্য অনেক আর্যভাষায় চলিত আছে, তাহা অনির্দিষ্ট-প্রভৃতি-বাচক; যেমন, জল-টল পয়সা-টয়সা। জল-টল বলিলে জলের সঙ্গে সঙ্গে আরও যে ক'টা আনুষঙ্গিক জিনিস শ্রোতার মনে উদয় হইতে পারে তাহা সংক্ষেপে সারিয়া লওয়া যায়।

বোঁচকা-বুঁচকি দড়া-দড়ি গোলা-গুলি কাটি-কুটি গুঁড়া-গাঁড়া কাপড়-চোপড়—এগুলিও প্রভৃতিবাচক বটে, কিন্তু পূর্বোক্ত শ্রেণীর অপেক্ষা নির্দিষ্টতর। বোঁচকা-বুঁচকি বলিলে ছোটো বড়ো মাঝারি একজাতীয় নানা প্রকার বোঁচকা বোঝায়, অন্য-জাতীয় কিছু বোঝায় না।

মহারাষ্ট্রি হিন্দি প্রভৃতি ভারতবর্ষীয় অন্যান্য আর্যভাষাবিৎ পণ্ডিতগণ বাংলাভাষার সহিত তৎতৎ ভাষার শব্দদ্বৈতবিধির তুলনা করিলে একান্ত বাধিত হইব।

১৩০৭

ধ্বন্যাত্মক শব্দ

বাংলাভাষায় বর্ণনাসূচক বিশেষ একশ্রেণীর শব্দ বিশেষণ ও ক্রিয়ার বিশেষণ রূপে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহারা অভিধানের মধ্যে স্থান পায় নাই। অথচ সে-সকল শব্দ ভাষা হইতে বাদ দিলে বঙ্গভাষার বর্ণনাশক্তি নিতান্তই পঙ্গু হইয়া পড়ে। প্রথমে তাহার একটি তালিকা দিতেছি; পরে তৎসম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য প্রকাশ করিব। তালিকাটি যে সম্পূর্ণ হইয়াছে এরূপ আশা করিতে পারি না।

আইঢাই আঁকুবাঁকু আনচান আমতা-আমতা।

ইলিবিলি।

উসখুস।

কচ কচাৎ কচকচ কচাকচ কচর-কচর কচমচ কচর-মচর কট কটাৎ কটাস কটকট কটাকট কটমট কটর-মটর কড়কড় কড়াৎ কড়মড় কড়র-মড়র কন্‌কন কপ কপাৎ কপকপ কপাকপ করকর কলকল কসকস কিচকিচ কিচমিচ কিচির-মিচির কিটকিট কিড়মিড় কিরকির কিলকিল কিলবিল কুচ কুচকুচ কুট কুটকুট কুটুর-কুটুর কুটুস কুপ কুপকুপ কুপকাপ কুলকুল কুরকুর কুঁইকুঁই কেঁইমেই কেঁউমেউ ক্যাঁ ক্যাঁক্যাঁ কোঁকোঁ কোঁৎকোঁৎ ক্যাঁচ ক্যাঁচক্যাঁচ ক্যাঁচর-ক্যাঁচর ক্যাঁটক্যাঁট। কচকচে কটমটে কড়কড়ে কন্‌কনে করকরে কিটকিটে (তেল কিটকিটে) কিরকিরে কিলবিলে কুচকুচে কুটকুটে ক্যাঁটকেঁটে॥

খক খকখক খচখচ খচাখচ খচমচ খট খটখট খটাখট খটাস খটাৎ খটর-খটর খটমট খটর-মটর খড়খড় খড়মড় খন খনখন খপ খপাৎ খপাস খরখর খলখল খসখস খাঁ-খাঁ খিক খিকখিক খিটখিট খিটমিট খিটিমিটি খিলখিল খিসখিস খুক খুকখুক খুটখুট খুটুর-খুটুর খুটুস-খুটুস খুটখাট খুঁৎখুঁৎ খুঁৎমুৎ খুরখুর খুসখুস খেঁইখেঁই খ্যাঁক খ্যাঁকখ্যাঁক খ্যাঁচখ্যাঁচ খ্যাঁচাখেঁচি খ্যাঁৎখ্যাঁৎ খ্যানখ্যান। খটখটে খড়খড়ে খরখরে খসখসে খিটমিটে খিটখিটে খুঁৎখুঁতে খুঁৎমুতে খুসখুসে (কাশি) খ্যানখেনে॥

গজগজ গজর-গজর গট গটগট গড়গড় গদগদ গনগন গপগপ গবগব গবাগব গমগম গরগর গলগল গসগস গাঁগাঁ গাঁইগুঁই গাঁকগাঁক গিজগিজ গিসগিস গুটগুট গুড়গুড় গুনগুন গুপগুপ গুবগাব গুম গুমগুম গুরগুর গেঁইগেঁই গোঁগোঁ গোঁৎগোঁৎ। গনগনে (আগুন) গমগমে গুড়গুড়ে॥

ঘটঘট ঘটর-ঘটর ঘড়ঘড় ঘসঘস ঘিনঘিন ঘিসাঘস ঘুটঘুট ঘুটমুট ঘুরঘুর ঘুসঘুস ঘেউঘেউ ঘোঁৎঘোঁৎ ঘেঁচ ঘেঁচঘেঁচ ঘ্যাঁচর-ঘ্যাঁচর ঘ্যানঘ্যান ঘ্যানর-ঘ্যানর। ঘুরঘুরে ঘুসঘুসে (জ্বর) ঘ্যানঘেনে ॥

চকচক চকর-চকর (পশুর জলপান-শব্দ) চকমক চট চটাস চটচট চটাচট চটপট চটাপট চচ্চড় চড়াৎ চড়াস চড়াচ্চড় চন চনচন চপচপ চপাচপ চিঁচিঁ চিকচিক চিকমিক চিটচিট চিচ্চিড় চিড়িক চিড়িক-চিড়িক চিড়বিড় চিন চিনচিন চুকচুক চুকুর-চুকুর চুচ্চুর চেঁইভেঁই চেঁইমেই চোঁ চোঁচোঁ চোঁভোঁ চোঁচাঁ চ্যাঁচ্যাঁ চ্যাঁভ্যাঁ। চকচকে চটচটে চটপটে চনচনে চিকচিকে চিটচিটে চিনচিনে চুকচুকে চুচ্চুরে ॥

ছটফট ছপছপ ছপাছপ ছপাৎ ছপাস ছমছম ছলছল ছোঁ ছোঁছোঁ ছ্যাঁক ছ্যাঁকছ্যাঁক। ছটফটে ছলছলে ছলোছলো ছ্যাঁকছেঁকে ছিপছিপে ॥

জরজর জ্যাবজ্যাব জ্যালজ্যাল। জবজবে জিরজিরে জ্যালজেলে জিলজিলে ॥

ঝকঝক ঝকমক ঝটপট ঝড়াৎ ঝন ঝনঝন ঝপ ঝপঝপ ঝপাঝপ ঝমঝম ঝমাৎ ঝমাস ঝমর-ঝমর ঝমাজ্‌ঝম ঝরঝর ঝাঁ ঝাঁ-ঝাঁ ঝিকঝিক ঝিকমিক ঝিকিমিকি ঝিনঝিন ঝিরঝির ঝুনঝুন ঝুপঝুপ ঝুমঝুম। ঝকঝকে ঝরঝরে ঝিকঝিকে ॥

টক টকটক টকাটক টংটং টন টনটন টপ টপটপ টপাটপ টলটল টলমল টসটস টিকটিক টিকিস-টিকিস টিংটিং টিপটিপ টিমটিম টুকটুক টুকুস-টুকুস টুংটুং টুংটাং টুনটুন টুপ টুপটুপ টুপুস-টুপুস টুপটাপ টুসটুস টোটো ট্যাঁটাঁ ট্যাঁসট্যাঁস ট্যাঁঙস-ট্যাঁঙস। টকটকে টনটনে টলটলে টসটসে টিংটিঙে টিপটিপে টিমটিমে টুকটুকে টুপটুপে টুসটুসে ট্যাসটেসে ॥

ঠক ঠকঠক ঠকর-ঠকর ঠংঠং ঠনঠন ঠুক ঠুকঠুক ঠুকুর-ঠুকুর ঠকাঠক ঠকাৎ ঠকাস ঠুকুস-ঠুকুস ঠুকঠাক ঠুংঠুং ঠুনঠুন ঠ্যাংঠ্যাং ঠ্যাসঠ্যাস। ঠনঠনে ঠ্যাংঠেঙে ॥

ডগডগে (লাল) ডিগডিগে।

ঢক ঢকঢক ঢকাঢক ঢকাস ঢকাৎ ঢবঢব ঢলঢল ঢুকঢুক ঢুলঢুল ঢ্যাবঢ্যাব। ঢকঢকে ঢলঢলে ঢুলঢুলে ঢুলুঢুলু ঢ্যাবঢেবে ॥

তকতক তড়তড় তড়াত্তড় তড়াক তড়াক-তড়াক তরতর তলতল তুলতুল তিড়িং তিড়িং-তিড়িং তড়াং তড়াং-তড়াং। তকতকে তলতলে তুলতুলে ॥

থকথক থপ থপাৎ থপাস থপথপ থমথম থরথর থলথল থসথস থৈ-থৈ ; থকথকে থপথপে থমথমে থলথলে থসথসে থুড়থুড়ে থ্যাসথেসে ॥

দগদগ দপদপ দবদব দমদম দমাদ্দম দরদর দড়াদ্দড় দড়াম দাউদাউ দুদ্দূড় দুদ্দাড় দুপদুপ দুপদাপ দুমদুম দুমদাম। দগদগে (রক্তবর্ণ বা অগ্নি) ॥

ধক্ ধকধক ধড়ধড় ধড়াস ধড়াস-ধড়াস ধড়াদ্ধড়, ধড়ফড় ধড়মড় ধপ ধপধপ ধপাধপ ধমাস ধবধব ধম ধমধম ধমাদ্ধম ধস ধসধস ধাঁ ধাঁ-ধাঁ ধিকি ধিকিধিকি ধিনধিন ধুকধুক ধুম ধুমধুম ধুমধাম ধুমাধুম ধুপধাপ ধূ-ধূ ধেইধেই। ধড়ফড়ে ধপধপে ধবধবে ধসধসে ॥

নড়নড় নড়বড় নড়র-বড়র নিশপিশ নিড়বিড়। নম্নড়ে নড়বড়ে নিশপিশে নিড়বিড়ে ॥

পট পটপট পটাপট পটাৎ পটাস পটাস-পটাস পচপচ পড়পড় (ছেঁড়া) প্‌ড়াস প্‌ড়াৎ প্‌ড়াং প্‌ড়াংপ্‌ড়াং প্‌ড়িংপ্‌ড়িং পিটপিট পিলপিল পিঁপিঁ পুট পুটপুট পোঁপোঁ প্যাঁকপ্যাঁক প্যাঁচপ্যাঁচ প্যানপ্যান প্যাঁটপ্যাঁট পটাং পটাংপটাং। পিটপিটে পুসপুসে প্যাঁচপেঁচে প্যানপেনে ॥

ফটফট ফটাফট ফড়ফড় ফড়র-ফড়র ফটাৎ ফটাস ফড়াৎ ফড়াস ফনফন ফরফর ফস ফসফস ফসাফস ফিক ফিকফিক ফিটফাট ফিনফিন ফুটফুট ফুটফাট ফুরফুর ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ-ফুড়ুৎ ফুস ফুসফুস ফুসফাস ফোঁফাঁ ফোঁফোঁ ফোঁৎফোঁৎ ফোঁচফোঁচ ফোঁস ফোঁসফোঁস ফ্যাফ্যা ফ্যাকফ্যাক ফ্যাঁচ ফ্যাঁচফ্যাঁচ ফ্যাঁচর-ফ্যাঁচর ফ্যাটফ্যাট ফ্যালফ্যাল। ফুরফুরে ফিনফিনে ফুটফুটে ফ্যাটফেটে ফ্যালফেলে ॥

বকবক বকর-বকর বজর-বজর বনবন বড়বড় বড়র-বড়র বিজবিজ বিজির-বিজির বিড়বিড় বিড়ির-বিড়ির বুগবুগ বোঁ বোঁ-বোঁ ব্যাজব্যাজ।

ভকভক ভড়ভড় ভনভন ভুকভুক ভুটভাট ভুরভুর ভুড়ুক-ভুড়ুক ভোঁ ভোঁ-ভোঁ ভ্যাঁ ভ্যাঁ-ভ্যাঁ, ভ্যানভ্যান। ভ্যানভেনে ॥

মচ মচমচ মট মটমট মড়মড় মড়াৎ মসমস মিটমিট মিটিমিটি মিনমিন মুচ মুচমুচ ম্যাড়ম্যাড় ম্যাজম্যাজ। মড়মড়ে মিটমিটে মিনমিনে মিসমিসে মুচমুচে ম্যাড়মেড়ে ম্যাজমেজে ॥

রী-রী রিমঝিম রিনিঝিনি রুনুঝুনু রৈরৈ রগরগে ॥

লকলক লটপট লিকলিক। লকলকে লিকলিকে লিংলিঙে ॥

সট সটসট সনসন সড়সড় সপসপ সপাসপ সরসর সিরসির সাঁ সাঁ-সাঁ সাঁইসাঁই সুট সুটসুট সুড়সুড় সুড়ুৎ সোঁ-সোঁ স্যাঁৎস্যাঁৎ। স্যাঁৎসেঁতে ॥

হট হটহট হটর-হটর হড়হড় হড়াৎ হড়বড় হড়র-হড়র হনহন হলহল হড়র-বড়র হাউমাউ হা-হা হাউহাউ হাঁ-হাঁ হাঁসফাঁস হিহি হিড়হিড় হু-হু হুটহাট হুড়হুড় হুড়মুড় হুড়ুৎ হুপহাপ হুস হুসহুস হুসহাস হো হো, হোহো হ্যাঁহ্যাঁ (কুকুর) হ্যাটহ্যাট হ্যাৎহ্যাৎ হাপুস-হুপুস হাপুড়-হুপুড় হুড়োমুড়ি।

ধ্বনির অনুকরণে ধ্বনির বর্ণনা ইংরেজি ভাষাতেও আছে ; যথা, bang thud ding-dong hiss ইত্যাদি। কিন্তু বাংলাভাষার সহিত তুলনায় তাহা যৎসামান্য। পূর্বোদ্ধৃত তালিকা দেখিলে তাহা প্রমাণ হইবে।

কিন্তু বাংলাভাষার একটি অদ্ভুত বিশেষত্ব আছে, তৎপ্রতি পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে ইচ্ছা করি।

যে-সকল অনুভূতি শ্রুতিগ্রাহ্য নহে, আমরা তাহাকেও ধ্বনিরূপে বর্ণনা করিয়া থাকি।

এরূপ ভিন্নজাতীয় অনুভূতি সম্বন্ধে ভাষাবিপর্যয়ের উদাহরণ কেবল বাংলায় নহে, সর্বত্রই পাওয়া যায়। 'মিষ্ট' বিশেষণ শব্দ গোড়ায় স্বাদ সম্বন্ধে ব্যবহৃত হইয়া ক্রমে মিষ্ট মুখ, মিষ্ট কথা, মিষ্ট গন্ধ প্রভৃতি নানা স্বতন্ত্র-জাতীয় ইন্দ্রিয়বোধ সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে। ইংরেজিতে loud শব্দ ধ্বনির বিশেষণ হইলেও বর্ণের বিশেষণরূপে প্রয়োগ হইয়া থাকে, যথা loud colour। কিন্তু এরূপ উদাহরণ বিশ্লেষণ করিলে অধিকাংশ স্থলেই দেখা যাইবে, এই শব্দগুলির আদিম ব্যবহার যতই সংকীর্ণ থাক্, ক্রমেই তাহার অর্থের ব্যাপ্তি হইয়াছে। মিষ্ট শব্দ মুখ্যত স্বাদকে বুঝাইলেও এক্ষণে তাহার গৌণ অর্থ মনোহর দাঁড়াইয়াছে।

কিন্তু আমাদের তালিকাধৃত শব্দগুলি সে শ্রেণীর নহে। তাহাদিগকে অর্থবদ্ধ শব্দ বলা অপেক্ষা ধ্বনি বলাই উচিত। সৈন্যদলের পশ্চাতে যেমন একদল আনুযাত্রিক থাকে, তাহারা রীতিমতো সৈন্য নহে অথচ সৈন্যদের নানাবিধ প্রয়োজন সরবরাহ করে, ইহারাও বাংলাভাষার পশ্চাতে সেইরূপ ঝাঁকে ঝাঁকে ফিরিয়া সহস্র কর্ম করিয়া থাকে, অথচ রীতিমতো শব্দশ্রেণীতে ভরতি হইয়া অভিধানকারের নিকট সম্মান প্রাপ্ত হয় নাই। ইহারা অত্যন্ত কাজের অথচ অখ্যাত অবজ্ঞাত। ইহারা না থাকিলে বাংলাভাষায় বর্ণনার পাঠ একেবারে উঠাইয়া দিতে হয়।

পূর্বেই আভাস দিয়াছি, বাংলাভাষায় সকল প্রকার ইন্দ্রিয়বোধই অধিকাংশস্থলে শ্রুতিগম্য ধ্বনির আকারে ব্যক্ত হইয়া থাকে।

গতির দ্রুততা প্রধানত চক্ষুরিন্দ্রিয়ের বিষয় ; কিন্তু আমরা বলি ধাঁ করিয়া, সাঁ করিয়া, বোঁ করিয়া অথবা ভোঁ করিয়া চলিয়া গেল। তীর প্রভৃতি দ্রুতগামী পদার্থ বাতাসে উক্তরূপ ধ্বনি করে, সেই ধ্বনি আশ্রয় করিয়া বাংলাভাষা চকিতের মধ্যে তীরের উপমা মনে আনয়ন করে। তীরবেগে চলিয়া গেল, বলিলে প্রথমে অর্থবোধ ও পরে কল্পনা উদ্রেক হইতে সময় লাগে ; সাঁ শব্দের অর্থের বালাই নাই, সেইজন্য কল্পনাকে সে অব্যবহিত ভাবে ঠেলা দিয়া চেতাইয়া তোলে।

ইহার আর-এক সুবিধা এই যে, ধ্বনিবৈচিত্র্য এত সহজে এত বর্ণনাবৈচিত্র্যের অবতারণা করিতে পারে যে, তাহা অর্থবদ্ধ শব্দদ্বারা প্রকাশ করা দুঃসাধ্য। সাঁ করিয়া গেল, এবং গটগট করিয়া গেল, উভয়েই দ্রুতগতি প্রকাশ করিতেছে; অথচ উভয়ের মধ্যে যে-পার্থক্য আছে, তাহা অন্য উপায়ে প্রকাশ করিতে গেলে হতাশ হইতে হয়।

এক কাটা সম্বন্ধে কত বিচিত্র বর্ণনা আছে। কচ করিয়া, কচাৎ করিয়া, কচকচ করিয়া কাটা; কচাকচ কাটিয়া যাওয়া; কুচ করিয়া, কট করিয়া, কটাৎ করিয়া, কটাস করিয়া, ক্যাঁচ করিয়া, ঘ্যাঁচ ঘ্যাঁচ করিয়া, ঝড়াৎ করিয়া, এই-সকল ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োগে কাটা সম্বন্ধে যত প্রকার বিচিত্র ভাবের উদ্রেক করে, তাহার সূক্ষ্ম প্রভেদ ভাষান্তরে বিদেশীর নিকট ব্যক্ত করা অসম্ভব।

ইংরেজিতে গমনক্রিয়া ভিন্ন ভিন্ন ছবির জন্য বিচিত্র শব্দ আছে— creep crawl sweep totter waddle ইত্যাদি। বাংলায় আভিধানিক শব্দে চলার বিচিত্র ছবি পাওয়া যায় না; ছবি খুঁজিতে হইলে আমাদের অভিধানতিরস্কৃত শব্দগুলি ঘাঁটিয়া দেখিতে হয়। খটখট করিয়া, ঘটঘট করিয়া, খুটখুট করিয়া, খুরখুর করিয়া, খুটুস খুটুস করিয়া, গুটগুট করিয়া, ঘটর ঘটর করিয়া, ট্যাঙস ট্যাঙস করিয়া, থপ থপ করিয়া, থপাস থপাস করিয়া, ধক্কড় করিয়া, ধাঁ ধাঁ করিয়া, সন সন করিয়া, সুড় সুড় করিয়া, সুট সুট করিয়া, সুড়ুৎ করিয়া, হন হন করিয়া, হুড়মুড় করিয়া— চলার এত বিচিত্র অথচ সুস্পষ্ট ছবি কোথায় পাওয়া যাইবে।

চলা কাটা প্রভৃতি ক্রিয়ার সহিত ধ্বনির সম্বন্ধ থাকা আশ্চর্য নহে; কারণ গতি হইতে শব্দ উৎপন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু যে-সকল ছবি ধ্বনির সহিত দূরসম্পর্কবিশিষ্ট, তাহাও বাংলাভাষায় ধ্বন্যাত্মক শব্দে ব্যক্ত হয়; যেমন পাতলা জিনিসকে ফিনফিন ফুরফুর ধ্বনির দ্বারা ব্যক্ত করা হয়। পাতলা ফিনফিন করছে, বলিলে এ কথা কেহ বোঝে না যে, পাতলা বস্তু বাস্তবিক কোনো শব্দ করিতেছে, অথচ তদ্দ্বারা তনু পদার্থের তনুত্ব সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। ছিপছিপে কথাটাও ওইরূপ; সরু বেতই বাতাসে আহত হইয়া ছিপছিপ শব্দ করে, মোটা লাঠি করে না, এইজন্য ছিপছিপে লোক বস্তুত কোনো শব্দ না করিলেও ছিপছিপে শব্দ দ্বারা তাহার দেহের বিরলতা সহজেই মনে আসে। লকলকে লিকলিকে লিংলিঙে শব্দও এই শ্রেণীর।

কিন্তু ধ্বনির সহিত যে-সকল ভাবের দূর সম্বন্ধও নাই, তাহাও বাংলায় ধ্বনির দ্বারা ব্যক্ত হয়। যেমন কনকনে শীত; কনকন ধ্বনির সহিত শীতের কোনো সম্বন্ধ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। শীতে শরীরে যে বেদনা বোধ হয়, আমাদের কল্পনার কোনো

অদ্ভুত বিশেষত্ববশত আমরা তাহাকে কনকন ধ্বনির সহিত তুলনা করি; অর্থাৎ আমরা মনে করি, সেই বেদনা যদি শ্রুতিগম্য হইত তবে তাহা কনকন শব্দরূপে প্রকাশ পাইত।

আমরা শরীরের প্রায় সর্বপ্রকার বেদনাকেই বিশেষ বিশেষ ধ্বনির ভাষায় ব্যক্ত করি; যথা, কটকট কনকন করকর (চোখের বালি) কুটকুট গা ঘ্যানঘ্যান (বা গা-ঘিনঘিন) গা-চচ্চড় চিনচিন গা-ছমছম ঝিনঝিন দবদব ধকধক বুক-ঢুদ্দুড় ম্যাজম্যাজ সুড়সুড় সড়সড় রীরী। ইংরেজিতে এইরূপ শারীরিক বেদনাসকলকে— throbbing gnawing boring crawling cutting tearing bursting প্রভৃতি বিশেষণে অভিহিত করা হয়। আমরাও ছিঁড়ে পড়া, ফেটে যাওয়া, কামড়ানো প্রভৃতি বিশেষণ আবশ্যকমতো ব্যবহার করি, কিন্তু উল্লিখিত ধ্বন্যাত্মক শব্দে তাহা যে ভাবে ব্যক্ত হয়, তাহা আর কিছুতে হইবার জো নাই। ওই-সকল ধ্বনির সহিত ওই-সকল বেদনার সম্বন্ধ যে কাল্পনিক, এক্ষণে আমাদের পক্ষে তাহা মনে করাই কঠিন। বাস্তবিক অনুভূতি সম্বন্ধে কিরূপ বিসদৃশ উপমা আমাদের মনে উদিত হয়, গা মাটি মাটি করা, বাক্যটি তাহার উদাহরণস্থল। মাটির সহিত শারীরিক অবস্থাবিশেষের যে কী তুলনা হইতে পারে তাহা বুঝা যায় না, অথচ, গা মাটিমাটি করা, কথাটা আমাদের কাছে সুস্পষ্ট ভাববহ।

সর্বপ্রকার শূন্যতা, স্তব্ধতা, এমন-কি নিঃশব্দতাকেও আমরা ধ্বনির দ্বারা ব্যক্ত করি। আমাদের ভাষায় শূন্য ঘর খাঁ খাঁ করে, মধ্যাহ্ন রৌদ্রের স্তব্ধতা ঝাঁ ঝাঁ করে, শূন্য মাঠ ধূ ধূ করে, বৃহৎ জলাশয় থৈ থৈ করে, পোড়োবাড়ি হাঁ হাঁ করে, শূন্য হৃদয় হু হু করে, কোথাও কেহ না থাকিলে ভোঁ ভোঁ করিতে থাকে— এই-সকল নিঃশব্দতার ধ্বনি অন্যভাষীদের নিকট কিরূপ জানি না, আমাদের কাছে নিরতিশয় স্পষ্ট ভাববহ; ইংরেজি ভাষার desolate প্রভৃতি অর্থাত্মক শব্দ, অন্তত আমাদের নিকট এত সুস্পষ্ট নহে।

বর্ণকে ধ্বনিরূপে বর্ণনা করা, সেও আশ্চর্য। টকটকে টুকটুকে ডগডগে দগদগে রগরগে লাল; ফুটফুটে ফ্যাটফেটে ফ্যাকফেকে ধবধবে শাদা; মিসমিসে কুচকুচে কালো।

টকটক শব্দ কাঠের ন্যায় কঠিন পদার্থের শব্দ। যে-লাল অত্যন্ত কড়া লাল সে যখন চক্ষুতে আঘাত করে, তখন সেই আঘাতক্রিয়ার সহিত টকটক শব্দ আমাদের মনে উহ্য থাকিয়া যায়। কবির কর্ণে যেমন 'silent spheres' অর্থাৎ নিঃশব্দ জ্যোতিষ্কলোকের একটি সংগীত উহ্যভাবে ধ্বনিত হইতে থাকে, এও সেইরূপ। ঘোর

লাল আমাদের ইন্দ্রিয়দ্বারে যে-আঘাত করে, তাহার যদি কোনো শব্দ থাকিত, তবে তাহা আমাদের মতে টকটক শব্দ। আবার সেই রক্তবর্ণ যখন মৃদুতর হইয়া আঘাত করে, তখন তাহার টকটক শব্দ টুকটুক শব্দে পরিণত হয়।

কিন্তু ধবধব শব্দ সম্ভবত গোড়ায় ধবল শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এবং সংসর্গবশত নিজের অর্থসম্পত্তি হারাইয়া ধ্বনির দলে ভিড়িয়া গিয়াছে। জ্বলজ্বল শব্দ তাহার অন্যতর উদাহরণ ; জ্বলন শব্দ তাহার পিতৃপুরুষ হইতে পারে, কিন্তু বর্তমান অবস্থায় সে কুলত্যাগী, সেই কারণে আমরা কোনো জিনিসকে 'জ্বলজ্বল হইতেছে' বলি না— 'জ্বলজ্বল করিতেছে' বলি— এই করিতেছে ক্রিয়ার পূর্বে ধ্বনি শব্দ উহ্য। বাংলাভাষায় এইরূপ প্রয়োগই প্রসিদ্ধ। নদী কুলকুল করে, জুতা মচমচ করে, মাছি ভনভন করে, এরূপ স্থলে শব্দ করে বলা বাহুল্য ; সাদা ধবধব করে বলিলেও বুঝায়, শ্বেতপদার্থ আমাদের কল্পনাকর্ণে এক প্রকার অশব্দিত শব্দ করে। কোনো বর্ণ যখন তাহার উজ্জ্বলতা পরিত্যাগ করে, তখন বলি ম্যাড়ম্যাড় করিতেছে। কেন বলি তাহার কৈফিয়ত দেওয়া আমার কর্ম নহে, কিন্তু যেখানে ম্যাড়মেড়ে বলা আবশ্যক— সেখানে মলিন ম্লান প্রভৃতি আর-কিছু বলিয়া কুলায় না।

চিকচিক গোড়ায় চিক্কণ শব্দ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে কি না, সে প্রসঙ্গ এ স্থলে আমি অনাবশ্যক বোধ করি। চকচক চিকচিক ঝিকঝিক এক্ষণে বিশুদ্ধ ধ্বনিমাত্র। চিকচিকে পদার্থের চঞ্চল জ্যোতি আমাদের চক্ষে একপ্রকার অশব্দ ধ্বনি করিতে থাকে, তাহাকে আমরা চিকচিক বলি ; আবার সেই চিক্কণতা যদি তৈলাভিষিক্ত হয় তবে তাহা নীরবে চুকচুক শব্দ করে, আমরা বলি তেল-চুকচুকে। চিক্কণ পদার্থ যদি চঞ্চল হয়, যদি গতিবশত তাহার জ্যোতি একবার একদিক হইতে একবার অন্যদিক হইতে আঘাত করে, তখন সেই জ্যোতি চিকচিক ঝিকঝিক বা ঝলঝল না করিয়া চিকমিক ঝিকমিক ঝলমল করিতে থাকে, অর্থাৎ তখন সে একটা শব্দ না করিয়া দুইটা শব্দ করে। কটমট করিয়া চাহিলে সেই দৃষ্টি যেন একদিক হইতে কট এবং আর-একদিক হইতে মট করিয়া আসিয়া মারিতে থাকে, এবং ধ্বনির বৈচিত্র্য দ্বারা কাঠিন্যের ঐক্য যেন আরও পরিস্ফুট হয়।

অবস্থাবিশেষে শব্দের হ্রস্বদীর্ঘতা আছে ; ধপ করিয়া যে লোক পড়ে, তাহা অপেক্ষা স্থূলকায় লোক ধপাস করিয়া পড়ে। পাতলা জিনিস কচ করিয়া কাটা যায়, কিন্তু মোটা জিনিস কচাৎ করিয়া কাটে।

আলোচ্য বিষয় আরও অনেক আছে। দেখা আবশ্যক এই ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলির সীমা কোথায়, অর্থাৎ কোন্ কোন্ বিশেষজাতীয় ছবি ও ভাব প্রকাশের জন্য ইহারা

নিযুক্ত। প্রথমত ইহাদিগকে স্থাবর এবং জঙ্গমে একটা মোটা বিভাগ করা যায়, অর্থাৎ স্থিতিবাচক এবং গতিবাচক শব্দগুলিকে স্বতন্ত্র করা যাইতে পারে। তাহা হইলে দেখা যাইবে স্থিতিবাচক শব্দ অতি অল্প। কেবল শূন্যতাপ্রকাশক শব্দগুলিকে ওই দলে ধরা যাইতে পারে; যথা, মাঠ ধূ ধূ করিতেছে, অথবা রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে। এই ধূ ধূ এবং ঝাঁ ঝাঁ ভাবের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম স্পন্দনের ভাব আছে বলিয়াই তাহারা এই ধ্বন্যাত্মক শব্দের দলে মিশিতে পারিয়াছে। আমাদের এই শব্দগুলি সচলধর্মী। চকচকে জিনিস স্থির থাকিতে পারে, কিন্তু তাহার জ্যোতি চঞ্চল। যাহা পরিষ্কার তকতক করে, তাহার আভাও স্থির নহে। বর্ণ জলজলে হউক বা ম্যাড়মেড়ে হউক, তাহার আভা আছে।

বাংলাভাষায় স্থিরত্ব বর্ণনার উপাদান কী, তাহা আলোচনা করিলেই আমার কথা স্পষ্ট হইবে।

গট হইয়া বসা, গুম হইয়া থাকা, ভোঁ হইয়া থাকা, বুঁদ হইয়া যাওয়া। গট গুম এবং ভোঁ ধ্বন্যাত্মক বটে, কিন্তু আর পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। ইহার মধ্যেও গুম-ভাবে একটি আবদ্ধ আবেগ আছে; যেন গতি স্তব্ধ হইয়া আছে, এবং ভোঁ-ভাবের মধ্যেও একটি আবেগের বিহ্বলতা প্রকাশ পায়। ইহারা একান্ত স্থিতিবোধক নহে, স্থিতির মধ্যে গতির আভাসবোধক। যাহাই হউক এরূপ উদাহরণ আরও যদি পাওয়া যায়, তবে তাহা অত্যল্প।

স্থিতিবাচক শব্দ অধিকাংশই অর্থাত্মক। স্থিতি বুঝিতে মনের সত্বরতা আবশ্যক হয় না। স্থিতির গুরুত্ব বিস্তার এবং স্থায়িত্ব, সময় লইয়া ওজন করিয়া পরিমাপ করিয়া বুঝিলে ক্ষতি নাই। অর্থাত্মক শব্দে সেই পরিমাপ কার্যের সাহায্য করে। কিন্তু গতিবোধ এবং বেদনাবোধ স্থিতিবোধ অপেক্ষা অধিকতর অনির্বচনীয়। তাহা বুঝিতে হইলে বর্ণনা ছাড়িয়া সংকেতের সাহায্য লইতে হয়। ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলি সংকেত।

গদ্য ও পদ্যের প্রভেদও এই কারণমূলক। গদ্য জ্ঞান লইয়া এবং পদ্য অনুভাব লইয়া। বিশুদ্ধ জ্ঞান অর্থের সাহায্যে পরিস্ফুট হয়; কিন্তু অনুভাব কেবলমাত্র অর্থের দ্বারা ব্যক্ত হয় না, তাহার জন্য ছন্দের ধ্বনি চাই; সেই ধ্বনি অনির্বচনীয়কে সংকেতে প্রকাশ করে।

আমাদের বর্ণনায় যে-অংশ অপেক্ষাকৃত অনির্বচনীয়তর, সেইগুলিকে ব্যক্ত করিবার জন্য বাংলাভাষায় এই-সকল অভিধানের আশ্রয়চ্যুত অব্যক্ত ধ্বনি কাজ করে। যাহা চঞ্চল, যাহার বিশেষত্ব অতি সূক্ষ্ম, যাহার অনুভূতি সহজে সুস্পষ্ট হইবার নহে, তাহাদের জন্য এই ধ্বনিগুলি সংকেতের কাজ করিতেছে।

আমার তালিকা অকারাদি বর্ণানুক্রমে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। সময়াভাববশত সেই সহজ পথ লইয়াছি। উচিত ছিল চলন কর্তন পতন প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ে শব্দগুলিকে শ্রেণীবদ্ধ করা। তাহা হইলে সহজে বুঝা যাইত, কোন্ কোন্ শ্রেণীর বর্ণনায় এই শব্দগুলি ব্যবহার হয় এবং ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ের মধ্যে ধ্বনির ঐক্য আছে কি না। ঐক্য থাকাই সম্ভব। ছেদনবোধক শব্দগুলি চকারান্ত অথবা টকারান্ত; কচ এবং কট— তীক্ষ্ণ অস্ত্রে ছেদন কচ, এবং গুরু অস্ত্রে কট। এই পর্যায়ের সকল শব্দই ক-বর্গের মধ্যে সমাপ্ত; ক্যাঁচ খ্যাঁচ গ্যাঁচ ঘ্যাঁচ।

পাঠকগণ চেষ্টা করিয়া এইরূপ পর্যায়বিভাগে সহায়তা করিবেন এই আশা করি।

জ্যাবড়া ধ্যাবড়া অ্যাবড়া-খ্যাবড়া হিজিবিজি হাবজা-গোবজা হোমরা-চোমরা হেজিপেঁজি ঝাপসা ভাবসা ঝুপসি ড্যাপসা হোঁৎকা গোমসা ধুমসো ঘুপসি, মটকা মারা, গুঁড়ি মারা, উঁকি মারা, টেবো, ট্যাবলা, ভেবড়ে যাওয়া, মুষড়ে যাওয়া প্রভৃতি বর্ণনামূলক খাঁটি বাংলাশব্দের শ্রেণীবদ্ধ তালিকাসংকলনে পাঠকদিগকে অনুরোধ করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করি।

১৩০৭

বাংলা কৃৎ ও তদ্ধিত

প্রবন্ধ-আরম্ভে বলা আবশ্যক যে-সকল বাংলাশব্দ লইয়া আলোচনা করিব, তাহার বানান কলিকাতার উচ্চারণ অনুসারে লিখিত হইবে। বর্তমানকালে কলিকাতা ছাড়া বাংলাদেশের অপরাপর বিভাগের উচ্চারণকে প্রাদেশিক বলিয়া গণ্য করাই সংগত।

আজ পর্যন্ত বাংলা-অভিধান বাহির হয় নাই; সুতরাং বাংলাশব্দের দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিতে নিজের অসহায় স্মৃতিশক্তির আশ্রয় লইতে হয়। কিন্তু স্মৃতির উপর নির্ভর করিবার দোষ এই যে, স্মৃতি অনেক সময় অযাচিত অনুগ্রহ করে, কিন্তু প্রার্থীর প্রতি বিমুখ হইয়া দাঁড়ায়। সেই কারণে প্রবন্ধে পদে পদে অসম্পূর্ণতা থাকিবে। আমি কেবল বিষয়টার সূত্রপাত করিবার ভার লইলাম, তাহা সম্পূর্ণ করিবার ভার সুধী-সাধারণের উপর।

আমার পক্ষে সংকোচের আর-একটি গুরুতর কারণ আছে। আমি বৈয়াকরণ নহি। অনুরাগবশত বাংলাশব্দ লইয়া অনেক দিন ধরিয়া অনেক নাড়াচাড়া করিয়াছি; কখনো কখনো বাংলার দুটা-একটা ভাষাতত্ত্ব মাথায় আসিয়াছে; কিন্তু ব্যাকরণব্যবসায়ী নহি বলিয়া সেগুলিকে যথাযোগ্য পরিভাষার সাহায্যে সাজাইয়া লিপিবদ্ধ করিতে

সাহসী হই নাই। এ প্রবন্ধে পাঠকেরা আনাড়ির পরিচয় পাইবেন, কিন্তু চেষ্টা ও পরিশ্রমের ত্রুটি দেখিতে পাইবেন না। অতএব শ্রমের দ্বারা যাহা সংগ্রহ করিয়াছি, পণ্ডিতগণের বিদ্যাবুদ্ধির দ্বারা তাহা সংশোধিত হইবে আশা করিয়াই সাহিত্য-পরিষদে এই বাংলাভাষাতত্ত্বঘটিত প্রবন্ধের অবতারণা করিলাম।

সংস্কৃতব্যাকরণের পরিভাষা বাংলাব্যাকরণে প্রয়োগ করা কিরূপ বিপজ্জনক তাহা মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রীমহাশয় ইতিপূর্বে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।[১] সুতরাং জ্ঞাতসারে পাপ করিতে প্রবৃত্তি হয় না। নূতন পরিভাষা নির্মাণের ক্ষমতা নাই, অথচ না করিলেও লেখা অসম্ভব।

এইখানে একটা পরিভাষার কথা বলি। সংস্কৃতব্যাকরণে যাহাকে ণিজন্ত ধাতু বলে বাংলায় তাহাকে ণিজন্ত বলিতে গেলে অসংগত হয়; কারণ সংস্কৃতভাষায় ণিচ্ প্রত্যয় দ্বারা ণিজন্ত ধাতু সিদ্ধ হয়, বাংলায় ণিচ্ প্রত্যয়ের কোনো অর্থ নাই। অতএব অন্যভাষার আকারগত পরিভাষা অবলম্বন না করিয়া প্রকারগত পরিভাষা রচনা করিতে হয়।

ণিজন্তের প্রকৃতি কী। তাহাতে ব্যবহিত ও অব্যবহিত দুইটি কর্তা থাকে। ফল পাড়িলাম; পতন-ব্যাপারের অব্যবহিত কর্তা ফল, কিন্তু তাহার হেতু-কর্তা আমি: কারয়তি যঃ স হেতুঃ— যে করায় সে-ই হেতু, সে-ই ণিজন্ত ধাতুর প্রথম কর্তা, এবং যাহার উপর সেই কার্যের ফল হয় সে-ই ণিজন্তধাতুর দ্বিতীয় কর্তা। হেতু-র একটি প্রতিশব্দ নিমিত্ত, তাহাই অবলম্বন করিয়া আমি বর্তমান প্রবন্ধে ণিজন্ত ধাতুকে নৈমিত্তিক ধাতু নাম দিলাম।

বাংলা কৃৎ ও তদ্ধিত বর্তমান প্রবন্ধের বিষয়। তাহার মধ্যে কোন্‌গুলি প্রকৃত বাংলা ও কোন্‌গুলি সংস্কৃত, তাহা লইয়া তর্ক উঠিতে পারে। সংস্কৃত হইতে উদ্ভূত হইলেই যে তাহাদের সংস্কৃত বলিতে হইবে, এ কথা মানি না। সংস্কৃত ইন্ প্রত্যয় বাংলায় ই প্রত্যয় হইয়াছে, সেইজন্য তাহা সংস্কৃত পূর্বপুরুষের প্রথা রক্ষা করে না। দাগি (দাগযুক্ত) শব্দ কোনো অবস্থাতেই দাগিন্ হয় না। বাংলা অন্ত প্রত্যয় সংস্কৃত শতৃ প্রত্যয় হইতে উৎপন্ন, কিন্তু তাহা শতৃপ্রত্যয়ের অনুশাসন লঙ্ঘন করিয়া একবচনে জিয়ন্ত ফুটন্ত ইত্যাদিরূপ ধারণ করিতে লেশমাত্র লজ্জিত হয় না।

বাংলায় সংস্কৃতেতর শব্দেও যে-সকল প্রত্যয়ের ব্যবহার হয়, আমরা তাহাকে বাংলা-প্রত্যয় বলিয়া গণ্য করিব। ত প্রত্যয় যোগে সংস্কৃত রঞ্জিত শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে,

---

[১] বাংলা ব্যাকরণ— হরপ্রসাদ শাস্ত্রী : সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকা ১৩০৮, প্রথম সংখ্যা

কিন্তু বাংলায় ত প্রত্যয়ের ব্যবহার নাই, সেইজন্য আমরা রঙিত বলি না। সজ্জিত হয়, সাজিত হয় না; অতএব ত প্রত্যয় বাংলাপ্রত্যয় নহে।

হিন্দি পারসি প্রভৃতি হইতে বাংলায় যে-সকল প্রত্যয়ের আমদানি হইয়াছে, সে সম্বন্ধেও আমার ওই একই বক্তব্য। সই প্রত্যয় সম্ভবত হিন্দি বা পারসি; কিন্তু বাংলা শব্দের সহিত তাহা মিশ্রিত হইয়া ট্যাঁকসই প্রমাণসই মানানসই প্রভৃতি শব্দ সৃজন করিয়াছে। ওয়ান প্রত্যয় সেরূপ নহে। গাড়োয়ান দারোয়ান পালোয়ান শব্দ আমরা হিন্দি হইতে বাংলায় পাইয়াছি, প্রত্যয়টি পাই নাই।

অর্থাৎ যে-সকল প্রত্যয় সংস্কৃত অথবা বিদেশীয় শব্দসহযোগে বাংলায় আসিয়াছে, বাংলার সহিত কোনো প্রকার আদানপ্রদান করিতেছে না, তাহাকে আমরা বাংলা-ব্যাকরণে প্রত্যয়রূপে স্বীকার করিতে পারি না।

যে-সকল কৃৎতদ্ধিতের সাহায্যে বাংলা বিশেষ্য ও বিশেষণ পদের সৃষ্টি হয়, বর্তমান প্রবন্ধে কেবল তাহারই উল্লেখ থাকিবে। ক্রিয়াপদ সম্বন্ধে বারান্তরে আলোচনার ইচ্ছা রহিল।

এই প্রবন্ধে বিশেষ্য বিশেষণকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছি, ক্রিয়াবাচক ও পদার্থবাচক। ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য যথা, চলা বলা সাঁৎরানো বাঁচানো ইত্যাদি। পদার্থবাচক যথা, হাতি ঘোড়া জিনিসপত্র ঢেঁকি কুলা ইত্যাদি। গুণবাচক প্রভৃতি বিশেষ্য বিশেষণের প্রয়োজন হয় নাই।

অ প্রত্যয়

এই প্রত্যয়যোগে একশ্রেণীর বিশেষণ শব্দের সৃষ্টি হয়; যথা, কট্‌মট্ শব্দের উত্তর অ প্রত্যয় হইয়া কটমট (কটমট ভাষা, কটমট দৃষ্টি), টল্‌মল্ হইতে টলমল।[1]

আসন্নপ্রবণতা বুঝাইবার জন্য শব্দদ্বৈত যোগে যে-বিশেষণ হয় তাহাতে এই অ প্রত্যয়ের হাত আছে; যথা, পড়্ ধাতু হইতে পড়-পড়, পাক্ ধাতু হইতে পাক-পাক, মর্ ধাতু হইতে মর-মর, কাঁদ্ ধাতু হইতে কাঁদ-কাঁদ। অন্য অর্থে হয় না; যথা, কাটাকাটা (কথা), পাকাপাকা ছাড়াছাড়া ইত্যাদি।

এই প্রসঙ্গে একটি বিষয়ে পাঠকদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চাই। মনে পড়িতেছে, রামমোহন রায় তাঁহার বাংলাব্যাকরণে লিখিয়াছেন, বাংলায় বিশেষণপদ

---

[1] দ্রষ্টব্য এই যে, ধ্বন্যাত্মক শব্দদ্বৈতে সর্বত্র এ নিয়ম খাটে না: যথা, আমরা টকটক লাল বা খট খট রৌদ্র বা টনটন ব্যথা বলি না, সে স্থলে টক্‌টকে টন্‌টনে বলিয়া থাকি। কট্‌মট্ টল্‌মল্ জ্বলজ্বল্, শব্দ হইতে বিকল্পে— কটমট কট্‌মটে, টলমল টল্‌মলে, জ্বলজ্বল জ্বল্‌জ্বলে হইয়া থাকে।

হলন্ত হয় না। কথাটা সম্পূর্ণ প্রামাণিক নহে, কিন্তু মোটের উপর বলা যায়, খাস বাংলার অধিকাংশ দুই অক্ষরের বিশেষণ হলন্ত নহে। বাংলা-উচ্চারণের সাধারণ নিয়মমতে 'ভাল' শব্দ ভাল্‌ হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু আমরা অকারান্ত উচ্চারণ করি।[1] বস্তুত বাংলায় অকারান্ত বিশেষ্য শব্দ অতি অল্পই দেখা যায়, অধিকাংশই বিশেষণ; যথা; বড় ছোট মাঝ (মাঝো মেঝো) ভাল কাল খাট (ক্ষুদ্র) জড় (পুঞ্জীকৃত) ইত্যাদি।

বাকি অনেকগুলা বিশেষণই আকারান্ত; যথা, কাঁচা পাকা বাঁকা তেড়া সোজা সিধা সাদা মোটা নুলা বোবা কালা ন্যাড়া কানা তিতা মিঠা উঁচা বোকা ইত্যাদি।

আ প্রত্যয়

পূর্বোক্ত আকারান্ত বিশেষণগুলিকে আ প্রত্যয়যোগে নিষ্পন্ন বলিয়া অনুমান করিতেছি। সংস্কৃত শব্দ কাণ, বাংলায় বিশেষণ হইবার সময় কানা হইল, মৃত হইতে মড়া হইল, মহৎ হইতে মোটা হইল, সিত হইতে সাদা হইল। এই আকারগুলি উচ্চারণের নিয়মে আপনি আসে নাই। বিশেষণে হলন্ত প্রয়োগ বর্জন করিবার একটা চেষ্টা বাংলায় আছে বলিয়াই যেখানে সহজে অন্য কোনো স্বরবর্ণ জোটাইতে পারে নাই, সেই-সকল স্থলে আ প্রত্যয় যোগ করিয়াছে।

সংস্কৃত ভাষার 'স্বার্থে ক' বাংলায় আ প্রত্যয়ের আকার ধারণ করিয়াছে। ঘোটক ঘোড়া, মস্তক মাথা. পিষ্টক পিঠা, কণ্টক কাঁটা, চিপিটক চিঁড়া, গোপালক গোয়ালা, কুল্যক কুলা।

বাংলায় অনেক শব্দ আছে যাহা কখনো বা স্বার্থে আ প্রত্যয় গ্রহণ করিয়াছে, কখনো করে নাই; যেমন তক্ত তক্তা, বাঘ বাঘা, পাট পাটা, ল্যাজ ল্যাজা, চোঙ চোঙা, চাঁদ চাঁদা, পাত পাতা, ভাই ভাইয়া (ভায়া), বাপ বাপা, থাল থালা, কালো কালা, তল তলা, ছাগল ছাগ্‌লা, বাদল বাদ্‌লা, পাগল পাগ্‌লা, বামন বাম্‌না, বেল (ফুল) বেলা, ইলিশ ইল্‌শা (ইল্‌শে)।

এই আ প্রত্যয়যোগে অনেকস্থলে অবজ্ঞা বা অতিপরিচয় জ্ঞাপন করে, বিশেষত মানুষের নাম সম্বন্ধে; যথা, রাম রামা, শাম শামা, হরি হরে (হরিয়া), মধু মোধো (মধুয়া) ফটিক ফট্‌কে (ফট্‌কিয়া)।

দ্রষ্টব্য এই যে, সকল নামে আ প্রত্যয় হয় না; যাদবকে যাদ্‌বা, মাধবকে মাধ্‌বা

---

[1] বাংলা অ অনেকস্থলেই হ্রস্ব ওকারের ন্যায় উচ্চারিত হয়। আমরা লিখি যত, উচ্চারণ করি যতো লিখি বড়, উচ্চারণ করি বড়ো। উড়িয়ার বড় বাঙালির বড়-র সহিত তুলনা করিলে দুই অকারের প্রভেদ বুঝা যাইবে।

বলে না। শ্রীশ, প্রিয়, পরান প্রভৃতিও এইরূপ। বাংলা নামের বিকার সম্বন্ধে কোনো পাঠক আলোচনা সম্পূর্ণ করিয়া দিলে আনন্দিত হইব।

স্বার্থে আ প্রত্যয়ের উদাহরণ দেওয়া গেছে, তাহাতে অর্থের পরিবর্তন হয় না। আবার, আ প্রত্যয়ে অর্থের কিছু পরিবর্তন ঘটে এমন উদাহরণও আছে ; যেমন, হাত হইতে হাতা (রন্ধনের হাতা, জামার হাতা, অর্থাৎ হাতের মতো পদার্থ) ঠ্যাঙ হইতে ঠ্যাঙা (ঠ্যাঙের ন্যায় পদার্থ) ভাত হইতে ভাতা (খোরাকি), বাস হইতে বাসা, ধোব হইতে ধোবা, চাষ হইতে চাষা।

ধাতুর উত্তর আ প্রত্যয়যোগে ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য বিশেষণের সৃষ্টি হয় ; বাঁধ্ ধাতুর উত্তর আ প্রত্যয় করিয়া বাঁধা, ঝর্ ধাতুর উত্তর আ প্রত্যয় করিয়া ঝরা। ইহারা বিশেষ্য বিশেষণ উভয় ভাবেই ব্যবহৃত হয়। বিশেষণ যেমন, বাঁধা হাত ; বিশেষ্য যেমন, হাত বাঁধা।

দ্রষ্টব্য এই যে, কেবল একমাত্রিক অর্থাৎ monosyllabic ধাতুর উত্তর এইরূপ আ প্রত্যয় হইয়া দুই অক্ষরের বিশেষ্য বিশেষণ সৃষ্টি করে ; যেমন ধর্ মার্ চল্ বল হইতে ধরা মারা চলা বলা। বহুমাত্রিক ধাতু বা ক্রিয়াবাচক শব্দের উত্তর আ সংযোগ হয় না ; যেমন, আঁচড় হইতে আঁচ্ড়া আছাড় হইতে আছড়া হয় না।

কিন্তু শুদ্ধমাত্র বিশেষণরূপে হইতে পারে ; যেমন, থ্যাঁৎলা মাংস, কোঁক্ড়া চুল, বাঘ-আঁচ্ড়া গাছ, নেই-আঁক্ড়া লোক (ন্যায়-আঁক্ড়া অর্থাৎ নৈয়ায়িক তার্কিক)।

ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য বিশেষণের দৃষ্টান্ত উপরে দেওয়া গেল। আ প্রত্যয়যোগে নিষ্পন্ন পদার্থবাচক ও গুণবাচক বিশেষ্যের দৃষ্টান্ত দুই-একটি মনে পড়িতেছে ; তাওয়া (যাহাতে রুটিতে তা দেওয়া যায়), দাওয়া (দাবি, অর্থাৎ দাও বলিবার অধিকার), আছ্ড়া (আঁটি হইতে ধান আছড়াইয়া লইয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে)।

বিশিষ্ট অর্থে আ প্রত্যয় হইয়া থাকে ; যথা তেলবিশিষ্ট তেলা, বেতালবিশিষ্ট বেতালা, বেসুরবিশিষ্ট বেসুরা, জলময় জলা, নুনবিশিষ্ট নোনা (লবণাক্ত), আলোকিত আলা, রোগযুক্ত রোগা, মলযুক্ত ময়লা, চালযুক্ত চালা (ঘর), মাটিযুক্ত মাটিয়া (মেটে), বালিযুক্ত বালিয়া (বেলে), দাড়যুক্ত দাড়িয়া (দেড়ে)।

বৃহৎ অর্থে আ প্রত্যয় ; যথা, হাঁড়া (ক্ষুদ্র হাঁড়ি) ; নোড়া (লোষ্ট্র হইতে ; ক্ষুদ্র, নুড়)।

আন্ প্রত্যয়

আন্ প্রত্যয়ের দৃষ্টান্ত : যোগান্ চাপান্ চালান্ জানান্ হেলান্ ঠেসান্ মানান্। এগুলি ছাড়া একপ্রকার বিশেষ পদবিন্যাসে এই আন্ প্রত্যয়ের ব্যবহার দেখা যায়।

ঠকা হইতে ঠকান্ শব্দ বাংলায় সচরাচর দেখা যায় না, কিন্তু আমরা বলি, ভারি ঠকান্ ঠকেছি, অথবা, কী ঠকান্‌টাই ঠকিয়েছে। সেইরূপ, কী পিটান্‌টাই পিটিয়েছে, কী চলান্‌টাই চলিয়েছে, এরূপ বিস্ময়সূচক পদবিন্যাসের বাহিরে পিটান্ চলান্ ব্যবহার হয় না।

উপরের দৃষ্টান্তগুলি ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য। পদার্থবাচকের দৃষ্টান্তও আছে, যথা, বানান্ উঠান্ উনান্ উজান্ (ঊর্ধ্ব—উঝ+আন্) ঢালান্ (জলের) মাচান্ (মঞ্চ)।

আন্+অ প্রত্যয়

আন্ প্রত্যয়ের উত্তর পুনশ্চ অ প্রত্যয় করিয়া বাংলায় অনেকগুলি ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য বিশেষণের সৃষ্টি হয়।

পূর্বে দেখানো গিয়াছে, একমাত্রিক ধাতুর উত্তর আ প্রত্যয় করিয়া ক্রিয়াবাচক দুই-অক্ষরের বিশেষ্য বিশেষণ সিদ্ধ হয়; যেমন, ধরা মারা ইত্যাদি।

বহুমাত্রিকে আ প্রত্যয় না হইয়া আন্ ও তদুত্তরে অ প্রত্যয় হয়; যেমন, চুল্‌কান (উচ্চারণ চুল্‌কানো) কাম্‌ড়ান (কামড়ানো) ছটফটান (ছট্‌ফটানো) ইত্যাদি।

কিন্তু সাধারণত নৈমিত্তিক ক্রিয়াপদকেই ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য বিশেষণে পরিণত করিতে আন্+অ প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়; যেমন, করা শব্দ হইতে নৈমিত্তিক অর্থে করান, বলা হইতে বলান।

ইহাই সাধারণ নিয়ম, কিন্তু কয়েকটি ব্যতিক্রমও দেখা যায়; যেমন পড়া হইতে নৈমিত্তিক পাড়া, চলা হইতে চালা, গলা হইতে গালা, নড়া হইতে নাড়া, জ্বলা হইতে জ্বালা, মরা হইতে মারা, বহা হইতে বাহা, জ্বরা হইতে জ্বারা।

কিন্তু পড়া হইতে পড়ান, নড়া হইতে নড়ান, চলা হইতে চলান, ইহাও হয়। এমনকি, নৈমিত্তিক ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যশব্দ চালা নাড়া পাড়া প্রভৃতির উত্তর পুনশ্চ আন্+অ যোগ করিয়া, চালান পাড়ান নাড়ান হইয়া থাকে।

কিন্তু তাকান গড়ান (বিছানায়) আঁচান প্রভৃতি অনৈমিত্তিক শব্দ সম্বন্ধে কী বুঝিতে হইবে। তাকা গড়া আঁচা, হইল না কেন।

তাহার কারণ, এইগুলির মূল ধাতু একমাত্রিক নহে। দেখ্, একমাত্রিক ধাতু, তাহা হইতে 'দেখা' হইয়াছে; কিন্তু তাকান শব্দের মূল ধাতুটি তাক্ নহে, তাহা তাকা, সেইজন্যই উক্ত ধাতুকে বিশেষ্য করিতে আন্+অ প্রত্যয়ের প্রয়োজন হইয়াছে। নামধাতুগুলিও আন্+অ প্রত্যয়ের অপেক্ষা রাখে; যেমন, লাথ্ হইতে লাথান, পিঠ্ হইতে পিঠান (পিটোনো), হাত হইতে হাতান।

মূল ধাতু বহুমাত্রিক কি না, তাহার পরীক্ষার অন্য উপায় আছে। অনুজ্ঞায় আমরা দেখ্ ধাতুর উত্তর 'ও' প্রত্যয় করিয়া বলি, দেখো, কিন্তু তাকো বলি না; তাকা ধাতুর উত্তর ও প্রত্যয় করিয়া বলি তাকাও। গঠন করো, বলিতে হইলে গড়্ ধাতুর উত্তর ও প্রত্যয় করিয়া বলি গড়ো, কিন্তু, শয়ন করো, বুঝাইতে হইলে গড়া ধাতুর উত্তর ও প্রত্যয় করিয়া বলি গড়াও।

আমাদের বহুমাত্রিক ক্রিয়াবাচক শব্দগুলি আকারান্ত, সেইজন্য পুনশ্চ তাহার উত্তর আ প্রত্যয় না হইয়া আন্+অ প্রত্যয় হয়। মূল শব্দটি আট্কা বা চম্কা না হইলে অনুজ্ঞায় আট্কাও হইত না, চম্কাও হইত না। হিন্দিতে পাকড়্ শব্দের উত্তর ও প্রত্যয় হইয়া পাকড়ো হয়; সেই শব্দই বাংলায় পাক্ড়া রূপ ধরিয়া পাক্ড়াও হইয়া দাঁড়ায়।

অন্ প্রত্যয়

দৃষ্টান্ত: মাতন্ চলন্ কাঁদন্ গড়ন্ (গঠনক্রিয়া) ইত্যাদি। ইহারা ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য শব্দ।

অন্ প্রত্যয়সিদ্ধ পদার্থবাচক শব্দের উদাহরণও মনে পড়ে; যেমন, ঝাড়ন্ বেলুন্ (রুটি বেলিবার) মাজন্ গড়ন্ (শরীরের) ফোড়ন্ ঝোঁটন্ (ঝুঁটি হইতে) পাঁচন্।

অন্+আ প্রত্যয়

অন্ প্রত্যয়ের উত্তর পুনশ্চ আ প্রত্যয় করিয়া কতকগুলি ক্রিয়াবাচক বিশেষণের সৃষ্টি হইয়াছে; ইহারা বিকল্পে বিশেষ্যও হয়; যেমন, পাওন্ হইতে পাওনা, দেওন্ হইতে দেনা, ফেলন্ হইতে ফেল্না, মাগন্ হইতে মাগ্না, শুকন্ হইতে শুক্না।

পদার্থবাচক বিশেষ্যেরও দৃষ্টান্ত আছে; যেমন, বাট্না কুট্না ওড়্না ঝর্না খেলনা বিছানা বাজ্না ঢাক্না।

ই প্রত্যয়

ধর্ম ও ব্যবসায় অর্থে: গোলাপি বেগুনি চালাকি চাকরি চুরি ডাক্তারি মোক্তারি ব্যারিস্টারি মাস্টারি; খাড়াই (খাড়া পদার্থের ধর্ম) লম্বাই চৌড়াই ঠাণ্ডাই আড়ি (আড় অর্থাৎ বক্র হইবার ভাব)।

অনুকরণ অর্থে: সাহেবি নবাবি।

দক্ষ অর্থে: হিসাবদক্ষ হিসাবি, আলাপদক্ষ আলাপি, ধ্রুপদদক্ষ ধ্রুপদি।

বিশিষ্ট অর্থে: দামবিশিষ্ট দামি, দাগবিশিষ্ট দাগি, রাগবিশিষ্ট রাগি, ভারবিশিষ্ট ভারি।

ক্ষুদ্র অর্থে: হাঁড়ি পুঁটুলি কাঠি (ইহাদের বৃহৎ— হাঁড়া পোঁটলা কাঠ)।

দেশীয় অর্থে : মারাঠি গুজরাটি আসামি পাটনাই বস্‌রাই।

স্বার্থে : হাস হাসি, ফাঁস ফাঁসি, লাথ লাথি, পাড় (পুকুরের) পাড়ি, কড়া কড়াই (কটাহ)।

দিননির্দেশ অর্থে : পাঁচই ছউই সাতই আটই নওই দশই, এরূপে আঠারই পর্যন্ত।

আ+ই প্রত্যয়

ক্রিয়াবাচক : বাছাই যাচাই দলাই-মলাই (ঘোড়াকে) খোদাই ঢালাই ধোলাই ঢোলাই বাঁধাই পালটাই।

পদার্থবাচক : মরাই (ধানের) বালাই (বালকের অকল্যাণ) মিঠাই।

মনুষ্যের নাম : বলাই কানাই নিতাই জগাই মাধাই।

ধর্ম : বড়াই (বড়ত্ব) বামনাই পোষ্টাই (পুষ্টের ধর্ম)।

ই+আ প্রত্যয়

জাল শব্দ ই প্রত্যয়যোগে জালি, স্বার্থে আ— জালিয়া (জেলে)। এইরূপ, কোঁদলিয়া (কুঁদুলে) জঙ্গলিয়া (জঙ্গুলে) গোবরিয়া (গুবরে), স্যাঁৎস্যাঁতিয়া (স্যাঁৎসেঁতে) ইত্যাদি।

উ প্রত্যয়

চালু (চলনশীল) ঢালু (ঢাল-বিশিষ্ট) নিচু (নিম্নগামী) কলু (ঘানিকল-বিশিষ্ট), গাড়ু (গাগর শব্দ হইতে গাগরু) আগুপিছু (অগ্রবর্তী-পশ্চাদ্বর্তী)।

মানুষের নাম : যাদব হইতে যাদু, কালা হইতে কালু, শিব হইতে শিবু, পাঁচকড়ি হইতে পাঁচু।

উ+আ প্রত্যয়

বিশিষ্ট অর্থে, যথা : জলবিশিষ্ট জলুয়া (জোলো), পাঁকুয়া (পেঁকো) জাঁকুয়া (জেঁকো) বাতুয়া (বেতো) পড়ুয়া (পোড়ো)।

সম্বন্ধ অর্থে : মাছুয়া (মেছো) বুনুয়া (বুনো) ঘরুয়া (ঘোরো) মাঠুয়া (মেঠো)।

নির্মিত অর্থে : কাঠুয়া (কেঠো) ধানুয়া (ধেনো)।

আ+ও প্রত্যয়

ঘেরাও চড়াও উধাও ফেলাও (ফলাও)।

ও+আ প্রত্যয়

বাঁচোয়া ঘরোয়া চড়োয়া ধরোয়া আগোয়া।

অন্+ই প্রত্যয়

মনোযোগ করিলে দেখা যাইবে, অন্ প্রত্যয়ের উত্তর আ প্রত্যয় কেবল একমাত্রিক ধাতুতেই প্রয়োগ হইয়া থাকে ; যেমন, ধব্ হইতে ধব্না (ধন্না), কাঁদ্ হইতে কাঁদনা (কান্না)। কিন্তু বহুমাত্রিক শব্দের উত্তর এরূপ হয় না। আমরা কামড়ানা কটকটান্না বলি না, তাহার স্থলে কামড়ানি কটকটানি বলিয়া থাকি ; অর্থাৎ অন্ প্রত্যয়ের উত্তর আ প্রত্যয় না করিয়া ই প্রত্যয় করিয়া থাকি।

অন্ প্রত্যয়ের উত্তর ই প্রত্যয় একমাত্রিকেও হয় ; যথা মাতনি (মাতুনি) বাঁধনি (বাঁধুনি) জ্বলনি (জ্বলুনি) কাঁপনি (কাঁপুনি) দাপনি (দাপুনি) কাটনি (কাটুনি)।

মূল ধাতুটি হলন্ত কিংবা আকারান্ত, তাহা এই অন+ই প্রত্যয়ের সাহায্যে জানা যাইতে পারে। তাকনি না হইয়া তাকানি হইয়াছে, তখন বুঝিতে হইবে মূল ধাতুটি তাকা। এইরূপ, আছড়া চট্‌কা কাম্‌ড়া ইত্যাদি।

অন+ই প্রত্যয়সিদ্ধ অধিকাংশ ক্রিয়াবাচক শব্দই অপ্রিয়ভাব ব্যক্ত করে ; যথা, বকুনি ধমকানি চমকানি হাঁপানি শাসানি টাটানি নাকানি-চোবানি কাঁত্নি জ্বলুনি কাঁপুনি ফোঁস্‌লানি ফোঁপানি গোঙানি ঘ্যাঙানি খ্যাচ্‌কানি কোঁচ্‌কানি (ভুরু) বাঁকানি (মুখ) খিঁচুনি (দাঁত) খ্যাঁকানি ঘস্‌ড়ানি ঘুরুনি (চোখ) চাপুনি চেঁচানি ভ্যাঙানি (মুখ) রগড়ানি রাঙানি (চোখ) লাফানি ঝাঁপানি।

ব্যতিক্রম : বাঁধুনি (কথার) শুনানি ভুলুনি বুনুনি (কাপড় বা ধান) বাছনি (বাছাই)।

ধ্বন্যাত্মক শব্দের মধ্যে যেগুলি অসুখব্যঞ্জক তাহার উত্তরেই অন্+ই প্রত্যয় হয় ; যথা, দব্‌দবানি ঝন্‌ঝনানি কন্‌কনানি টন্‌টনানি ছট্‌ফটানি কুট্‌কুটুনি ইত্যাদি।

অন্+ই প্রত্যয়ের সাহায্যে বাংলার কয়েকটি পদার্থবাচক বিশেষ্যপদ সিদ্ধ হয় ; দৃষ্টান্ত, ছাঁকনি নিড়নি চালুনি বিনান (চুলের) চাট্‌নি ছাউনি নিছনি তলানি (তরলপদার্থের তলায় যাহা জমে)।

ব্যক্তি ও বস্তুর বিশেষণ : রাঁধুনি (ব্রাহ্মণ) ঘুম-পাড়ানি পাট-পচানি ইত্যাদি।

না প্রত্যয়

না প্রত্যয়যোগে বর্ণের বিশেষ পরিবর্তন হয় না ; পাখা পাখনা, জাব (গরুর) জাবনা, ফাতা (ছিপের) ফাৎনা, ছোট ছোটনা (ধান)।

আনা প্রত্যয়

বাবুয়ানা সাহেবিয়ানা নবাবিয়ানা মুন্সিয়ানা। ই প্রত্যয় করিয়া হিঁদুয়ানি।

ল্ প্রত্যয়

কাঁক্‌ড়োল (কাঁকুড় হইতে) হাবল খাবল পাগল পাকল (পাক অর্থাৎ ঘূর্ণাবশিষ্ট) হাতল মাতল (মত্ত হইতে মাতা)।

র্ প্রত্যয়

বাংলা ধ্বন্যাত্মক শব্দের উত্তর এই র্ প্রত্যয়ে অবিরামতা বুঝায় ; যথা, গজ্ গজ্ হইতে গজর্ গজর্, বক্‌বক্ হইতে বকর্ বকর্, নড়্‌বড়্ হইতে নড়র্ বড়র্, কট্‌মট্ হইতে কটর্ মটর্, ঘ্যান্‌ঘ্যান্ হইতে ঘ্যানর্ ঘ্যানর্, কুটকুট্ হইতে কুটুর্ কুটুর্।

আল্ প্রত্যয়

দয়াল্ কাঙাল্ (কাঙ্‌ক্ষালু) বাচাল্ আঁঠিয়াল্ আড়াল মিশাল।

ল্+আ

মেঘলা বাদলা পাতলা শামলা আধলা ছ্যাৎলা একলা দোকলা চাকলা।

ল্+ই+আ

দীঘলিয়া (দীঘ্‌লে) আগলিয়া (আগ্‌লে) পাছলিয়া (পাছ্‌লে) ছুটলিয়া (ছুট্‌লে)।

আড়্

জোগাড় লাগাড় (নাগাড়) সাবাড় লেজুড় খেলোয়াড় উজাড়।

আড়্+ই+আ

বাসাড়িয়া (বাসাড়ে) জোগাড়িয়া (জোগাড়ে) মজাড়িয়া (মজাড়ে) হাতাড়িয়া (হাতুড়ে, যে হাতড়াইয়া বেড়ায়) কাঠুরে হাটুরে ঘেসুড়ে ফাঁসুড়ে চাষাড়ে।

রা ও ড়া

টুকরা চাপড়া ঝাঁকড়া পেটরা চামড়া ছোকরা গাঁঠরা ফোঁপরা ছিবড়া থাবড়া বাগড়া খাগড়া।

বহু অর্থে : রাজারাজড়া গাছগাছড়া কাঠকাঠরা।

আরি

জুয়ারি কাঁসারি চুনারি পূজারি ভিখারি।

আরু

সজারু (শল্যবিশিষ্ট জন্তু) লাফারু (কোনো কোনো প্রদেশে খরগোশকে বলে) দাবাড়ু (দাবা খেলায় মত্ত)।

ক্

মড়ক চড়ক মোড়ক বৈঠক চটক ঝলক চমক আটক।

আক্ উক্ ইক্

এই-সকল প্রত্যয়যোগে যে ক্রিয়ার বিশেষণগুলি হয় তাহাতে দ্রুতবেগ বুঝায়; যথা, ফুড়ুক্ তিড়িক্ তড়াক্ চিড়িক্ ঝিলিক্ ইত্যাদি।

ক্+আ

মট্‌কা বোঁচ্‌কা হাল্‌কা বোঁট্‌কা হোঁৎকা উচক্কা। ক্ষুদ্রার্থে ই প্রত্যয় করিয়া মট্‌কি, বুঁচ্‌কি ইত্যাদি হয়।

ক্+ +আ

গুট্‌কিয়া (গুট্‌কে) পুঁটকিয়া (পুঁট্‌কে) পুঁচকিয়া (পুঁচ্‌কে) ফচ্‌কিয়া (ফচ্‌কে) ছোট্‌কিয়া (ছুট্‌কে)।

উক্

মিথ্যুক লাজুক মিশুক।

গির্+ই

গির্ প্রত্যয়টি বাংলায় চলে নাই। তাগাদ্‌গির প্রভৃতি শব্দগুলি বিদেশী। কিন্তু *এই গির্ প্রত্যয়ের সহিত ই প্রত্যয় মিশিয়া গিরি প্রত্যয় বাংলা ভাষায় স্থান লাভ করিয়াছে।*

ব্যবসায় অর্থে ই প্রত্যয় সর্বত্র হয় না। কামারের ব্যবসায়কে কেহ কামারি বলে না, বলে কামারগিরি। এই গির্+ই যোগে অধিকাংশ ব্যবসায় ব্যক্ত হয়; অ্যাটর্ণিগিরি স্যাকরাগিরি মুচিগিরি মুটেগিরি।

অনুকরণ অর্থে: বাবুগিরি নবাবগিরি।

দার্

দোকানদার চৌকিদার রংদার বুটিদার জেল্লাদার যাচনদার চড়নদার ইত্যাদি।

ইহার সহিত ই প্রত্যয় যুক্ত হইয়া দোকানদারি ইত্যাদি বৃত্তিবাচক বিশেষ্যের সৃষ্টি হয়।

দান্

বাতিদান পিকদান শামাদান আতরদান। স্বার্থে ই প্রত্যয় যোগে বাতিদানি পিকদানি আতরদানি হইয়া থাকে।

সই

হাতসই মাপসই প্রমাণসই মানানসই ট্যাঁকসই।

পনা

বুড়াপনা ন্যাকাপনা ছিব্‌লেপনা গিন্নিপনা।

ওলা বা ওয়ালা

কাপড়ওয়ালা ছাতাওয়ালা ইত্যাদি।

তর

এমনতর যেমনতর কেমনতর।

অৎ

মানৎ বসৎ ঘুরৎ ফেরৎ গলৎ (গলদ)।

ধ্বন্যাত্মক শব্দের উত্তর অৎ প্রত্যয়ে দ্রুতবেগ বুঝায় : সড়াৎ ফুড়ৎ পটাৎ থটাৎ।

অৎ+আ

ধর্‌তা ফের্‌তা পড়্‌তা জান্‌তা (সবজান্তা)।

তা

বিশিষ্ট অর্থে, যথা : পান্‌তা নোন্‌তা তল্‌তা (তরল্‌তা, তরল বাঁশ)। আওতা নাম্‌তা শব্দের ব্যুৎপত্তি বুঝা যায় না।

অৎ+ই

ফির্‌তি চল্‌তি উঠ্‌তি বাড়্‌তি পড়্‌তি চুক্‌তি ঘাঁট্‌তি গুন্‌তি।

অৎ+আ+ই

খোল্‌তাই ধর্‌তাই।

অন্ত

জিয়ন্ত ফুটন্ত চলন্ত।

মন্ত

লক্ষ্মীমন্ত বুদ্ধিমন্ত আক্কেলমন্ত।

অন্দা (?)

বাসন্দা (অধিবাসী) মাকন্দা (গুম্ফশ্মশ্রুবিহীন)। বলা উচিত এ-প্রত্যয়টির প্রতি আমার বিশেষ আস্থা নাই।

ট্

চাপট্ (চৌচাপট্) সাপট্ ঝাপট্ দাপট্।

ট্+ই

চিম্‌টি।

ট্ট

ভরট্ট (নদীভরট্ট, খালভরট্ট জমি)।

আ+ট্

জমাট্ ভরাট্ ঘেরাট্।

টা

চ্যাপটা ল্যাঙ্‌টা ঝাপ্‌টা ল্যাপ্‌টা চিম্‌টা শুক্‌টা।

আট্+ই+আ

রোগাটিয়া (রোগাটে) বোকাটিয়া (বোকাটে) তামাটিয়া (তামাটে) ঘোলাটিয়া (ঘোলাটে) ভাড়াটিয়া (ভাড়াটে) বামন্‌টিয়া (বেঁটে)।

অং আং ইং

ভড়ং ভুজং-ভাজাং চোং (নল) খোলাং (খোলাং কুচি) তিড়িং। বড়াং, কোনো কোনো জেলায় অহংকার অর্থে বড়াই না বলিয়া বড়াং বলে।

অঙ্গ আঙ্গ অঙ্গিয়া

সুড়ঙ্গ সুড়ঙ্গি সুড়ুঙ্গে কুলঙ্গি ধিঙ্গি ধেড়েঙ্গে বিরিঙ্গি (বৃহৎ পরিবারকে কোনো কোনো প্রদেশে 'বিরিঙ্গি গুষ্টি' বলে)।

চ চা চি

আল্‌গচ (আলগা ভাব) ল্যাংচা (খোঁড়ার ভাব) ভ্যাংচা (ব্যাঙের ভাব) ভাংচি থিম্‌চি ঘামাচি ত্যাড়্‌চা (তির্যক ভাব)। আধার অর্থে : ধুনচি ধুপচি খুঞ্চি চিলিম্‌চি খাতাঞ্চি মশাল্‌চি।

ক্ষুদ্র অর্থে : ব্যাঙাচি নলচি (হুঁকার) কঞ্চি কুচি ; মোচা (কলার মোচা, মুকুলচা হইতে মোচা) ; মোচার ক্ষুদ্র মুচি।

অস্

খোলস্ মুখস্ তাড়স্ ঢ্যাপস্।

ধ্বন্যাত্মক শব্দের উত্তর অস্ প্রত্যয়ে স্থূলতা ও ভার বুঝায়— ধপ্ হইতে ধপাস্ ; ব্যাপ্তি বুঝায়, যথা, ধড়াস্ করিয়া পড়া— অপেক্ষাকৃত বিস্তীর্ণ স্থান লইয়া পড়া ; খট্ এবং খটাস্, পট্ এবং পটাস্ শব্দের সূক্ষ্ম অর্থভেদ নির্দেশ করিতে গেলে পাঠকদের সহিত তুমুল তর্ক উপস্থিত হইবে আশঙ্কা করি।

সা

চোপ্‌সা গোম্‌সা ঝাপ্‌সা ভাপ্‌সা চিম্‌সা পান্‌সা ফেন্‌সা এক্‌সা খোলসা মাকড়্‌সা কাল্‌সা।

সা+ইয়া

ফ্যাকাসিয়া (ফ্যাকাসে), লাল্‌চে সম্ভবত লাল্‌সে কথার বিকার, কাল্‌সিটে— কাল+সা+ইয়া+টা=কাল্‌সিয়াটা কাল্‌সিটে।

আম

অনুকরণ অর্থে : বুড়ামো ছেলেমো পাগ্‌লামো জ্যাঠামো বাঁদরামো।

ভাব অর্থে : মাৎলামো ঢিলেমো আল্‌সেমো।

আম+ই

বুড়ামি মাৎলামি ইত্যাদি।

স্ত্রীলিঙ্গে ই

ছুঁড়ি ছুক্‌রি বেটি খুড়ি মাসি পিসি দিদি পাঁঠি ভেড়ি বুড়ি বাম্‌নি।

স্ত্রীলিঙ্গে নি

কলুনি তেলিনি গয়লানি বাঘিনি মালিনি ধোবানি নাপ্‌তিনি কামার্‌নি চামার্‌নি পুরুত্‌নি মেত্‌রানি তাঁতনি ঠাকুরানি চাক্‌রানি উড়েনি কায়েত্‌নি খোট্টানি মুসলমান্‌নি জেলেনি।

বাংলাকৃৎতদ্ধিত আমার যতগুলি মনে পড়িল লিখিলাম। নিঃসন্দেহই অনেকগুলি বাদ পড়িয়াছে ; সেগুলি পূরণের জন্য পাঠকদের অপেক্ষা করিয়া রহিলাম।

ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের অধিবাসীরা প্রাদেশিক প্রয়োগের দৃষ্টান্ত যত সংগ্রহ করিয়া পাঠাইবেন, ততই কাজে লাগিবে।

প্রত্যয়গুলির উৎপত্তি নির্ণয় করাও বাকি রহিল। এ সম্বন্ধে যাঁহারা আলোচনা করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ডাক্তার হ্যর্নলে রচিত Comparative Grammar of the Gaudian Languages পুস্তক হইতে যথেষ্ট সাহায্য পাইবেন।

প্রত্যেক প্রত্যয়জাত শব্দের তালিকা সম্পূর্ণ করা আবশ্যক। ইহা নিশ্চয়ই পাঠকেরা লক্ষ করিয়াছেন, প্রত্যয়গুলির মধ্যে পক্ষপাতের ভাব দেখা যায় ; তাহারা কেন যে কয়টিমাত্র শব্দকে বাছিয়া লয়, বাকি সমস্তকেই বর্জন করে, তাহা বুঝা কঠিন। তালিকা সম্পূর্ণ হইলে তাহার নিয়ম আবিষ্কারের আশা করা যাইতে পারে। মস্ত প্রত্যয় কেনই-বা আক্কেল শব্দকে আশ্রয় করিয়া আক্কেলমস্ত হইবে, অথচ চালাকি শব্দের সহযোগে চালাকিমস্ত হইতে পারিল না, তাহা কে বলিবে। নি যোগে বহুতর বাংলা স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে— কামারনি খোট্টানি ইত্যাদি। কিন্তু বদ্যিনি (বৈদ্য-স্ত্রী) কেহ তো বলে না ; উড়েনি বলে, কিন্তু পঞ্জাবিনি বা শিখিনি বা মগিনি বলে না। বাঘিনি হয়, কিন্তু উটিনি হয় না, কুকুরনি বেড়ালনি হয় না। প্রত্যয় যোগে স্ত্রীলিঙ্গ অনেক স্থলে হয়ই না, সেই কারণে মাদি কুকুর বলিতে হয়। পাঁঠার স্ত্রীলিঙ্গে পাঁঠি হয়, মোষের স্ত্রীলিঙ্গে মোষি হয় না। এ সমস্ত অনুধাবন করিবার যোগ্য।

কোন্ প্রত্যয় যোগে শব্দের কী প্রকার রূপান্তর হয় তাহাও নিয়মবদ্ধ করিয়া লেখা আবশ্যক। নিতান্তই সময়াভাববশত আমি সে কাজে হাত দিতে পারি নাই। নোড়া শব্দের উত্তর ই প্রত্যয় করিলে হয় নুড়ি; দাড়ি শব্দের উত্তর আ প্রত্যয় করিলে হয় দেড়ে; টোল শব্দের উত্তর আ প্রত্যয় করিলে টুলো; মধু শব্দের উত্তর আ প্রত্যয় করিলে হয় মোধো; লুন্ শব্দের উত্তর আ প্রত্যয় করিলে হয় লোনা; জল্ শব্দের উত্তর অন্+ই প্রত্যয় করিলে হয় জলুনি, কোঁদল শব্দের উত্তর ই+আ প্রত্যয় করিলে হয় কুঁদুলে।

কতকগুলি প্রত্যয় আমি আনুমানিক ভাবে দিয়াছি। সেগুলিকে প্রত্যয় বলিয়া বিশ্বাস করি, কিন্তু শব্দ হইতে তাহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহাদের প্রত্যয়রূপ প্রমাণ করিতে পারি নাই। যেমন,অং প্রত্যয়; ভুজং ভড়ং প্রভৃতি শব্দের অং বাদ দিলে যাহা বাকি থাকে তাহা বাংলায় চলিত নাই। ভড়্ শব্দ নাই বটে, কিন্তু ভড়্কা আছে, ভড়ং এবং ভড়কের অর্থসাদৃশ্য আছে। তাই মনে হয়, ভড়্ বলিয়া একটা আদিশব্দ ছিল, তাহার উত্তরে অক্ করিয়া ভড়ক্ ও অং করিয়া ভড়ং হইয়াছে। বড়াং শব্দে এই মত সমর্থন করিবে। আমার কাল্না-প্রদেশীয় বন্ধুগণ বলেন, তাঁহারা বড়াই শব্দের স্থলে বড়াং সর্বদাই ব্যবহার করেন; তাহাতে বুঝা যায় বড়ো শব্দের উত্তর যেমন আ+ই প্রত্যয় করিয়া বড়াই হইয়াছে, তেমনই আং প্রত্যয় করিয়া বড়াং হইয়াছে— মূল শব্দটি বড়ো, প্রত্যয় দুইটি আই ও আং।

প্রত্যয়গুলি কী ভাবে লিখিত হওয়া উচিত, তাহাও বিচারের দ্বারা ক্রমশ স্থির হইতে পারিবে। যাহাকে অস্ প্রত্যয় বলিয়াছি, তাহা অস্ অথবা অ-বর্জিত, সা প্রত্যয় স+আ অথবা সা, এ সমস্ত নির্ণয় করিবার ভার ব্যাকরণবিৎ পণ্ডিতদের উপর নিক্ষেপ করিয়া আমি বিদায় গ্রহণ করিলাম।

১৩০৮

ভাষার ইঙ্গিত

বাংলাব্যাকরণের কোনো কথা তুলিতে গেলে গোড়াতেই দুই-একটা বিষয়ে বোঝা-পড়া স্পষ্ট করিয়া লইতে হয়। বাংলাভাষা হইতে তাহার বিশুদ্ধ সংস্কৃত অংশকে কোনো মতেই ত্যাগ করা চলে না, এ কথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। মানুষকে তাহার বেশভূষা বাদ দিয়া আমরা ভদ্রসমাজে দেখিতে ইচ্ছা করি না। বেশভূষা না হইলে তাহার কাজই চলে না, সে নিষ্ফল হয়; কী আত্মীয়সভায় কী রাজসভায় কী পথে মানুষকে যথোপযুক্ত পরিচ্ছদ ধারণ করিতেই হয়।

কিন্তু এ কথাও স্বীকার করিতে হইবে যে, মানুষ বরঞ্চ দেহত্যাগ করিতে রাজী হইবে তবু বস্ত্র ত্যাগ করিতে রাজী হইবে না, তবু বস্ত্র তাহার অঙ্গ নহে এবং তাহার বস্ত্রতত্ত্ব ও অঙ্গতত্ত্ব একই তত্ত্বের অন্তর্গত নহে।

সংস্কৃত ভাষার যোগ ব্যতীত বাংলার ভদ্রতা রক্ষা হয় না এবং বাংলা তাহার অনেক শোভা ও সফলতা হইতে বঞ্চিত হয়, কিন্তু তবু সংস্কৃত বাংলার অঙ্গ নহে, তাহা তাহার আবরণ, তাহার লজ্জা রক্ষা, তাহার দৈন্য গোপন, তাহার বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনসাধনের বাহ্য উপায়।

অতএব, মানুষের বস্ত্রবিজ্ঞান ও শরীরবিজ্ঞান যেমন একই কথা নহে তেমনই বাংলার সংস্কৃত অংশের ব্যাকরণ এবং নিজ বাংলার ব্যাকরণ এক নহে। আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে, এই সামান্য কথাটাও প্রকাশ করিতে প্রচুর পরিমাণে বীররসের প্রয়োজন হয়।

বাংলার সংস্কৃত অংশের ব্যাকরণটি কিঞ্চিৎ পরিমাণে পরিবর্তিত সংস্কৃতব্যাকরণ। আমরা যেমন বিদ্যালয়ে ভারতবর্ষের ইতিহাস নাম দিয়া মহম্মদঘোরী বাবর হুমায়ুনের ইতিহাস পড়ি, তাহাতে অতি অল্প পরিমাণ ভারতবর্ষ মিশ্রিত থাকে; তেমনই আমরা বাংলা ব্যাকরণ নাম দিয়া সংস্কৃতব্যাকরণ পড়িয়া থাকি তাহাতে অতি অল্প পরিমাণ বাংলার গন্ধ মাত্র থাকে। এরূপ বেনামিতে বিদ্যালাভ ভালো কী মন্দ তাহা প্রচলিত মতের বিরুদ্ধে বলিতে সাহস করি না, কিন্তু ইহা যে বেনামি তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। কেবল দেখিয়াছি শ্রীযুক্ত নকুলেশ্বর ভট্টাচার্য মহাশয় তাঁহার রচিত বাংলা ব্যাকরণে বাংলাভাষার বাংলা ও সংস্কৃত দুই অংশকেই খাতির দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন; ইহাতে তিনি পণ্ডিতসমাজে সুস্থ শরীরে শান্তি রক্ষা করিয়া আছেন কি না সে সংবাদ পাই নাই।

এই যে-বাংলায় আমরা কথাবার্তা কহিয়া থাকি, ইহাকে বুঝিবার সুবিধার

জন্য প্রাকৃত বাংলা নাম দেওয়া যাইতে পারে। যে-বাংলা ঘরে ঘরে মুখে মুখে দিনে দিনে ব্যবহার করা হইয়া থাকে, বাংলার সমস্ত প্রদেশেই সেই ভাষার অনেকটা ঐক্য থাকিলেও সাম্য নাই। থাকিতেও পারে না। সকল দেশেরই কথিত ভাষায় প্রাদেশিক ব্যবহারের ভেদ আছে।

সেই ভেদগুলি ঠিক হইয়া গেলে ঐক্যগুলি কি বাহির করা সহজ হইয়া পড়ে। বাংলাদেশে প্রচলিত প্রাকৃত ভাষাগুলির একটি তুলনামূলক ব্যাকরণ যদি লিখিত হয়, তবে বাংলাভাষা বাঙালির কাছে ভালো করিয়া পরিচিত হইতে পারে। তাহা হইলে বাংলাভাষার কারক ক্রিয়া ও অব্যয় প্রভৃতির উৎপত্তি ও পরিণতির নিয়ম অনেকটা সহজে ধরা পড়ে।

কিন্তু তাহার পূর্বে উপকরণ সংগ্রহ করা চাই। নানা দিক হইতে সাহায্য পাইলে তবেই ক্রমে ভাবী ব্যাকরণকারের পথ সুগম হইয়া উঠিবে।

ভাষার অমুক ব্যবহার বাংলার পশ্চিমে আছে পূর্বে নাই বা পূর্বে আছে পশ্চিমে নাই, এরূপ একটা ঝগড়া যেন না ওঠে। এই সংগ্রহে বাংলার সকল প্রদেশকেই আহ্বান করা যাইতেছে। পূর্বেই আভাস দিয়াছি, ঐক্য নির্ণয় করিয়া বাংলাভাষার নিত্য প্রকৃতিটি বাহির করিতে হইলে প্রথমে তাহার ভিন্নতা লইয়া আলোচনা করিতে হইবে।

আমরা কেবলমাত্র ভাষার দ্বারা ভাব প্রকাশ করিয়া উঠিতে পারি না ; আমাদের কথার সঙ্গে সঙ্গে সুর থাকে, হাতমুখের ভঙ্গী থাকে, এমনই করিয়া কাজ চালাইতে হয়। কতকটা অর্থ এবং কতকটা ইঙ্গিতের উপরে আমরা নির্ভর করি।

আবার আমাদের ভাষারও মধ্যে সুর এবং ইশারা স্থানলাভ করিয়াছে। অর্থবিশিষ্ট শব্দের সাহায্যে যে-সকল কথা বুঝিতে দেরি হয় বা বুঝা যায় না, তাহাদের জন্য ভাষা বহুতর ইঙ্গিত-বাক্যের আশ্রয় লইয়াছে। এই ইঙ্গিত-বাক্যগুলি অভিধান-ব্যাকরণের বাহিরে বাস করে, কিন্তু কাজের বেলা ইহাদিগকে নহিলে চলে না।

বাংলাভাষায় এই ইঙ্গিত-বাক্যের ব্যবহার যত বেশি, এমন আর-কোনো ভাষায় আছে বলিয়া আমরা জানি না।

যে-সকল শব্দ ধ্বনিব্যঞ্জক, কোনো অর্থসূচক ধাতু হইতে যাহাদের উৎপত্তি নহে, তাহাদিগকে ধ্বন্যাত্মক নাম দেওয়া গেছে ; যেমন, ধাঁ শাঁ চট্ খট্ ইত্যাদি।

এইরূপ ধ্বনির অনুকরণমূলক শব্দ অন্য ভাষাতেও ব্যবহৃত হয়, কিন্তু বাংলার বিশেষত্ব এই যে, এগুলি সকল সময় বাস্তবধ্বনির অনুকরণ নহে, অনেক সময়ে ধ্বনির কল্পনামাত্র। মাথা দব্‌দব্ করিতেছে, টন্‌টন্ করিতেছে, কন্‌কন্ করিতেছে প্রভৃতি শব্দে

বেদনাবোধকে কাল্পনিক ধ্বনির ভাষায় তর্জমা করিয়া প্রকাশ করা হইতেছে। মাঠ ধূ ধূ করিতেছে, রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে, শূন্য ঘর গম্‌গম্‌ করিতেছে, ভয়ে গা ছম্‌ছম্‌ করিতেছে, এগুলিকে অন্য ভাষায় বলিতে গেলে বিস্তারিত করিয়া বলিতে হয় এবং বিস্তারিত করিয়া বলিলেও ইহার অনির্বচনীয়তাটুকু হৃদয়ের মধ্যে তেমন অনুভবগম্য হয় না; এরূপ স্থলে এই প্রকার অব্যক্ত অস্ফুট ভাষাই ভাবব্যক্ত করিবার পক্ষে বেশি উপযোগী। একটা জিনিসকে লাল বলিলে তাহার বস্তুগুণসম্বন্ধে কেবলমাত্র একটা খবর দেওয়া হয়, কিন্তু, লাল টুক্‌টুক্‌ করিতেছে বলিলে সেই লাল রং আমাদের অনুভূতির মধ্যে কেমন করিয়া উঠিয়াছে, তাহাই একটা অর্থহীন কাল্পনিক ধ্বনির সাহায্যে বুঝাইবার চেষ্টা করা যায়। ইহা ইঙ্গিত, ইহা বোবার ভাষা।

বাংলাভাষায় এইরূপ অনির্বচনীয়তাকে ব্যক্ত করিবার চেষ্টায় এই প্রকারের অব্যক্ত ধ্বনিমূলকশব্দ প্রচুররূপে ব্যবহার করা হয়।

ভালো করিয়া ছবি আঁকিতে গেলে শুধু গোটাকতক মোটা রং লইয়া বসিলে চলে না, নানা রকমের মিশ্র রং, সূক্ষ্ম রঙের দরকার হয়। বর্ণনার ভাষাতেও সেইরূপ বৈচিত্র্যের প্রয়োজন। শরীরের গতি সম্বন্ধে ইংরেজিভাষায় কত কথা আছে ভাবিয়া দেখিবেন, walk run hobble waggle wade creep crawl ইত্যাদি; বাংলা লিখিত ভাষায় কেবল দ্রুতগতি ও মন্দগতি দ্বারা এই সমস্ত অবস্থা ব্যক্ত করা যায় না। কিন্তু কথিত ভাষা লিখিত ভাষার মতো বাবু নহে, তাহাকে যেমন করিয়া হউক প্রতিদিনের নানান কাজ চালাইতে হয়; যতক্ষণ বোপদেব পাণিনি অমরকোষ ও শব্দকল্পদ্রুম আসিয়া তাহাকে পাশ ফিরাইয়া না দেন ততক্ষণ কাত হইয়া পড়িয়া থাকিলে তাহার চলে না; তাই সে নিজের বর্ণনার ভাষা নিজে বানাইয়া লইয়াছে, তাই তাহাকে কখনো সাঁ করিয়া, কখনো গট্‌গট্‌ করিয়া, কখনো খুটুস্‌ খুটুস্‌ করিয়া, কখনো নড়বড় করিতে করিতে, কখনো সুড়্‌সুড়্‌ করিয়া, কখনো থপ্‌ থপ্‌ এবং কখনো থপাস্‌ থপাস্‌ করিয়া চলিতে হয়। ইংরেজিভাষা laugh, smile, grin, simper, chukle করিয়া নানাবিধ আনন্দ কৌতুক ও বিদ্রূপ প্রকাশ করে; বাংলাভাষা খলখল করিয়া, খিলখিল করিয়া, হোহো করিয়া, হিহি করিয়া, ফিক্‌ ফিক্‌ করিয়া, ফিক্‌ করিয়া এবং মুচ্‌কিয়া হাসে। মুচকে হাসির জন্য বাংলা অমরকোষের কাছে ঋণী নহে। মচ্‌কান শব্দের অর্থ বাঁকান, বাঁকাইতে গেলে যে মচ্‌ করিয়া ধ্বনি হয় সেই ধ্বনি হইতে এই কথার উৎপত্তি। উহাতে হাসিকে ওষ্ঠাধরের মধ্যে চাপিয়া মচকাইয়া রাখিলে তাহা মুচকে হাসিরূপে একটু বাঁকাভাবে বিরাজ করে।

বাংলাভাষার এই শব্দগুলি প্রায়ই জোড়াশব্দ। এগুলি জোড়াশব্দ হইবার কারণ

আছে। জোড়াশব্দে একটা কালব্যাপকত্বের ভাব আছে। ধূধূ করিতেছে ধবধব করিতেছে, বলিতে অনেকক্ষণ ধরিয়া একটা ক্রিয়ার ব্যাপকত্ব বোঝায়। যেখানে ক্ষণিকতা বোঝায় সেখানে জোড়া কথার চল নাই; যেমন, ধাঁ করিয়া, সাঁ করিয়া ইত্যাদি।

যখন ধাঁ ধাঁ, সাঁ সাঁ, বলা যায় তখন ক্রিয়ার পুনরাবর্তন বুঝায়।

'এ' প্রত্যয় যোগ করিয়া এই-জাতীয় শব্দগুলি হইতে বিশেষণ তৈরি হইয়া থাকে; যেমন, ধব্ ধবে টক্‌টকে ইত্যাদি।

টকটক ঠকঠক প্রভৃতি কয়েকটি ধ্বন্যাত্মক শব্দের মাঝখানে আকার যোগ করিয়া উহারই মধ্যে একটুখানি অর্থের বিশেষত্ব ঘটানো হইয়া থাকে; যেমন, কচাকচ কটাকট কড়াকড় কপাকপ খচাখচ খটাখট খপাখপ গপাগপ ঝনাজ্‌ঝন টকাটক টপাটপ ঠকাঠক ধড়াধ্বড় ধপাধপ, ধমাধ্বম পটাপট ফসাফস।

কপকপ এবং কপাকপ, ফসফস এবং ফসাফস, টপটপ এবং টপাটপ শব্দের মধ্যে কেবলমাত্র আকারযোগে অর্থের যে সূক্ষ্ম বৈলক্ষণ্য হইয়াছে, তাহা কোনো বিদেশীকে অর্থবিশিষ্ট ভাষার সাহায্যে বোঝানো শক্ত। ঠকাঠক বলিলে এই বুঝায় যে, একবার ঠক করিয়া তাহার পরে বলসঞ্চয়পূর্বক পুনর্বার দ্বিতীয়বার ঠক করা; মাঝখানের সেই উদ্যত অবস্থার যতিটুকু আকার যোগে আপনাকে প্রকাশ করে। এইরূপে বাংলা ভাষা যেন অ আ ই উ স্বরবর্ণ কয়টাকে লইয়া সুরের মতো ব্যবহার করিয়াছে। সে-সুর যাহার কানে অভ্যস্ত হইয়াছে সে-ই তাহার সূক্ষ্মতম মর্মটুকু বুঝিতে পারে।

উল্লিখিত উদাহরণগুলিতে লক্ষ করিবার বিষয় আর-একটি আছে। আদ্যক্ষরে যেখানে অকার আছে সেইখানে পরবর্তী অক্ষরে আকার-যোজন চলে, অন্যত্র নহে।

যেমন টকটক হইতে টকাটক হইয়াছে, কিন্তু টিকটিক হইতে টিকাটিক বা ঠুকঠুক হইতে ঠুকাঠুক হয় না। এইরূপে মনোযোগ করিলে দেখা যাইবে, বাংলাভাষার উচ্চারণে স্বরবর্ণগুলির কতকগুলি কঠিন বিধি আছে।

স্বরবর্ণ আকারকে আবার আর-এক জায়গায় প্রয়োগ করিলে আর-এক রকমের সুর বাহির হয়; তাহার দৃষ্টান্ত, টুকটাক ঠুকঠাক খুটখাট ভুটভাট দুড়দাড় কুপকাপ গুপগাপ ঝুপঝাপ টুপটাপ ধুপধাপ হুপহাপ দুমদাম ধুমধাম ফুসফাস হুসহাস।

এই শব্দগুলি দুই প্রকারের ধ্বনিব্যঞ্জন করে, একটি অস্ফুট আর-একটি স্ফুট। যখন বলি, টুপটাপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে তখন এই বুঝায় যে, ছোটো ফোঁটাটি টুপ করিয়া এবং বড়ো ফোঁটাটি টাপ করিয়া পড়িতেছে, ঠুকঠাক শব্দের অর্থ একটা শব্দ ছোটো আর-একটা বড়ো। উকারে অব্যক্তপ্রায় প্রকাশ, আকারে পরিস্ফুট প্রকাশ।

আমরা এতক্ষণ যে-সকল জোড়াকথার দৃষ্টান্ত লইয়া আলোচনা করিলাম তাহারা বিশুদ্ধ ধ্বন্যাত্মক। আর-একরকমের জোড়াকথা আছে তাহার মূলশব্দটি অর্থসূচক এবং দোসর শব্দটি মূলশব্দেরই অর্থহীন বিকার; যেমন, চুপচাপ ঘুষঘাষ তুকতাক ইত্যাদি। চুপ ঘুষ এবং তুক এ-তিনটে শব্দ আভিধানিক, ইহারা অর্থহীন ধ্বনি নহে; ইহাদের সঙ্গে চাপ ঘাষ ও তাক, এই তিনটে অর্থহীন শব্দ শুদ্ধমাত্র ইঙ্গিতের কাজ করিতেছে।

জলের ধারেই যে-গাছটা দাঁড়াইয়া আছে সেই গাছটার সঙ্গে সঙ্গে তাহার সংলগ্ন বিকৃত ছায়াটাকে একত্র করিয়া দেখিলে যেমন হয়, বাংলাভাষার এই কথাগুলাও সেইরূপ; চুপ কথাটার সঙ্গে তাহার একটা বিকৃত ছায়া যোগ করিয়া দিয়া চুপচাপ হইয়া গেল। ইহাতে অর্থেরও একটু অনির্দিষ্টভাবের বিস্তৃতি হইল। যদি বলা যায় কেহ চুপ করিয়া আছে, তবে বুঝায় সে নিঃশব্দ হইয়া আছে; কিন্তু যদি বলি চুপচাপ আছে, তবে বুঝায় লোকটা কেবলমাত্র নিঃশব্দ নহে একপ্রকার নিশ্চেষ্ট হইয়াও আছে। একটা নির্দিষ্ট অর্থের পশ্চাতে একটা অনির্দিষ্ট আভাস জুড়িয়া দেওয়া এই শ্রেণীর জোড়াকথার কাজ।

ছায়াটা আসল জিনিসের চেয়ে বড়োই হইয়া থাকে। অনির্দিষ্টটা নির্দিষ্টের চেয়ে অনেক মস্ত। আকার স্বরটাই বাংলায় বড়োত্বের সুর লাগাইবার জন্য আছে। আকার স্বরবর্ণের যোগে ঘুষঘাষ-এর ঘাষ, তুকতাক-এর তাক, ঘুষ অর্থ ও তুক অর্থকে কল্পনাক্ষেত্রে অনেকখানি বাড়াইয়া দিল অথচ স্পষ্ট কিছুই বলিল না।

কিন্তু যেখানে মূলশব্দে আকার আছে সেখানে দোসর শব্দে এ নিয়ম খাটে না, পুনর্বার আকার যোগ করিলে কথাটা দ্বিগুণিত হইয়া পড়ে। কিন্তু দ্বিগুণিত করিলে তাহার অর্থ অন্য রকম হইয়া যায়। যদি বলি গোল-গোল, তাহাতে হয় একাধিক গোল পদার্থকে বুঝায় নয় প্রায়-গোল জিনিসকে বুঝায়। কিন্তু গোল-গাল বলিলে গোল আকৃতি বুঝায়, সেই সঙ্গেই পরিপুষ্টতা প্রভৃতি আরও কিছু অনির্দিষ্ট ভাব মনে আনিয়া দেয়।

এইজন্য এইপ্রকার অনির্দিষ্ট ব্যঞ্জনার স্থলে দ্বিগুণিত করা চলে না, বিকৃতির প্রয়োজন। তাই গোড়ায় যেখানে আকার আছে সেখানে দোসর শব্দে অন্য স্বরবর্ণের প্রয়োজন; তাহার দৃষ্টান্ত, দাগদোগ ডাকডোক বাছবোছ সাজসোজ ছাঁটছোঁট চালচোল ধারধোর সাফসোফ।

অন্যরকম: কাটাকোটা খাটাখোটা ডাকাডোকা ঢাকাঢোকা ঘাঁটাঘোঁটা ছাঁটাছোঁটা ঝাড়াঝোড়া চাপাচোপা ঠাসাঠোসা কালোকোলো।

এইগুলির রূপান্তর : কাটাকুটি ডাকাডুকি ঢাকাঢুকি ঘাঁটাঘুঁটি ছাঁটাছুঁটি কড়াকুড়ি ছাড়াছুড়ি ঝাড়াঝুড়ি ভাজাভুজি তাড়াতুড়ি টানাটুনি চাপাচুপি ঠাসাঠুসি। এইগুলি ক্রিয়াপদ হইতে উৎপন্ন। বিশেষ্যপদ হইতে উৎপন্ন শব্দ : কাঁটাকুঁটি ঠাট্টাঠুট্টি ধাক্কাধুক্কি।

শেষোক্ত দৃষ্টান্ত হইতে দেখা যায়, পূর্বে আকার ও পরে ইকার থাকিলে মাঝখানের ওকারটি উচ্চারণের সুবিধার জন্য উকাররূপ ধরে। শুদ্ধমাত্র 'কোটি' উচ্চারণ সহজ, কিন্তু 'কোটাকোটি' দ্রুত উচ্চারণের পক্ষে ব্যাঘাতজনক। চাপাচোপি ডাকাডোকি ঘাঁটাঘোঁটি, উচ্চারণের চেষ্টা করিলেই ইহা বুঝা যাইবে, অথচ, চুপি ডুকি ঘুঁটি উচ্চারণ কঠিন নহে।

তাহা হইলে মোটের উপরে দেখা যাইতেছে যে, জোড়া কথাগুলির প্রথমাংশের আদ্যক্ষরে যেখানে ই উ বা ও আছে সেখানে দ্বিতীয়াংশে আকার-স্বর যুক্ত হয়; যেমন ঠিকঠাক মিটমাট ফিটফাট ভিড়ভাড় ঢিলেঢালা টিপটাপ ইত্যাদি; কুচোকাচা গুঁড়োগাঁড়া গুঁতোগাঁতা কুটোকাটা ফুটোফাটা ভুজংভাজাং টুকরো-টাকরা হুকুম-হাকাম শুকনো-শাকনা; গোলগাল যোগযাগ সোরসার রোখরাথ খোঁচখাঁচ গোছগাছ মোটমাট খোপখাপ খোলাখালা জোগাড়-জাগাড়।

কিন্তু যেখানে প্রথমাংশের আদ্যক্ষরে আকার যুক্ত আছে সেখানে দ্বিতীয়াংশে ওকার জুড়িতে হয়। ইহার দৃষ্টান্ত পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে; জোগাড় শব্দের বেলায় হইল জোগাড়-জাগাড়, ডাগর শব্দের বেলায় হইল ডাগর-ডোগর। একদিকে দেখো টুকরো টাকরা হুকুম-হাকাম, অন্যদিকে হাপুস-হুপুস নাদুস-নুদুস। ইহাতে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, আকারে ওকারে একটা বোঝাপাড়া আছে। ফিরিঙ্গি যেমন ইংরেজের চালে চলে, আমাদের সংকরজাতীয় অ্যাকারও এখানে আকারের নিয়ম রক্ষা করেন; যথা, ঠ্যাকা-ঠোকা গ্যাটাগোটা অ্যালাগোলা।

উল্লিখিত নিয়মটি বিশেষ শ্রেণীর কথা সম্বন্ধেই খাটে, অর্থাৎ যে-সকল কথায় প্রথমার্ধের অর্থ নির্দিষ্ট ও দ্বিতীয়ার্ধের অর্থ অনির্দিষ্ট; যেমন ঘুষোঘাষা। কিন্তু ঘুষোঘুষি কথাটার ভাব অন্য রকম, তাহার অর্থ দুই পক্ষ হইতে সুস্পষ্ট ঘুষি-চালাচালি; ইহার মধ্যে আভাস ইঙ্গিত কিছুই নাই। এখানে দ্বিতীয়াংশের আদ্যক্ষরে সেইজন্য স্বরবিকার হয় নাই।

এইরূপ ঘুষোঘুষি-দলের কথাগুলি সাধারণত অন্যোন্যতা বুঝাইয়া থাকে; কানাকানি-র মানে, এর কানে ও বলিতেছে, ওর কানে এ বলিতেছে। গলাগলি বলিতে বুঝায়, এর গলা ও, ওর গলা এ ধরিয়াছে। এই শ্রেণীর শব্দের তালিকা এইখানেই দেওয়া যাক—

কষাকষি কচলা-কচলি গড়াগড়ি গলাগলি চটাচটি চটকা-চটকি ছড়াছড়ি জড়াজড়ি টক্করা-টক্করি ডলাডলি ঢলাঢলি দলাদলি ধরাধরি ধস্তাধস্তি বকাবকি বলাবলি।

আঁটাআঁটি আঁচাআঁচি আড়াআড়ি আধাআধি কাছাকাছি কাটাকাটি ঘাঁটাঘাঁটি চাটাচাটি চাপাচাপি চালাচালি চাওয়া-চাওয়ি ছাড়াছাড়ি জানাজানি জাপটা-জাপটি টানাটানি ডাকাডাকি ঢাকাঢাকি তাড়াতাড়ি দাপাদাপি ধাক্কাধাক্কি নাচানাচি নাড়ানাড়ি পালটা-পালটি পাকাপাকি পাড়াপাড়ি পাশাপাশি ফাটাফাটি মাথামাথি মাঝামাঝি মাতামাতি মারামারি বাছাবাছি বাঁধাবাঁধি বাড়াবাড়ি ভাগাভাগি রাগারাগি রাতারাতি লাগালাগি লাঠালাঠি লাথালাথি লাফালাফি সামনা-সামনি হাঁকাহাঁকি হাঁটাহাঁটি হাতাহাতি হানাহানি হারাহারি (হারাহারি ভাগ করা) খ্যাচাখেঁচি খ্যামচা-খেমচি ঘ্যাষাঘেঁষি ঠ্যাসাঠেসি ঠ্যালাঠেলি ঠ্যাকাঠেকি ঠ্যাঙাঠেঙি ত্যাখাদেখি ব্যাঁকাবেঁকি হ্যাঁচকা-হেঁচকি ল্যাপালেপি।

কিলোকিলি পিঠোপিঠি (ভাইবোন)।

খুনোখুনি গুঁতোগুঁতি ঘুষোঘুষি চুলোচুলি ছুটোছুটি ঝুলোঝুলি মুখোমুখি স্মুখো-স্মুখি।

টেপাটেপি পেটাপিটি লেখালিখি ছেঁড়াছিঁড়ি।

কোনাকুনি কোলাকুলি কোস্তাকুস্তি খোঁচাখুচি খোঁজাখুঁজি খোলাখুলি গোড়াগুড়ি ঘোরাঘুরি ছোঁড়াছুঁড়ি ছোঁওয়াছুঁয়ি ঠোকাঠোকি ঠোকরা-ঠুকরি দোলাদুলি যোকাযুকি রোখারুখি লোফালুফি শোঁকাশুঁকি দৌড়োদৌড়ি।

এই শ্রেণীর জোড়াকথা তৈরির নিয়মে দেখা যাইতেছে— প্রথমার্ধের শেষে আ ও দ্বিতীয়ার্ধের শেষে ই যোগ করিতে হয়; যেমন, ছড়্ ধাতুর উত্তরে একবার আ ও একবার ই যোগ করিয়া ছড়াছড়ি, বল্ ধাতুর উত্তরে আ এবং ই যোগ করিয়া বলাবলি ইত্যাদি।

কেবল ক্রিয়াপদের ধাতু নহে, বিশেষ্য শব্দের উত্তরেও এই নিয়ম খাটে; যেমন, রাতারাতি হাতাহাতি মাঝামাঝি ইত্যাদি।

কিন্তু যেখানে আদ্যক্ষরে ইকার উকার বা ঔকার আছে, সেখানে আ প্রত্যয়কে তাহার বন্ধু ওকারের শরণাপন্ন হইতে হয়; যেমন, কিলোকিলি খুনোখুনি দৌড়োদৌড়ি।

ইহাতে প্রমাণ হয়, ইকার ও উকারের পরে আকার অতিষ্ঠ হইয়া উঠে। অন্যত্র তাহার দৃষ্টান্ত আছে; যথা, যেখানে লিখিত ভাষায় লিখি— মিলাই মিশাই বিলাই, সেখানে কথিত ভাষায় উচ্চারণ করি— মিলোই মিশোই বিলোই; ডিবা-কে বলি

ডিবে, চিনাবাসন-কে বলি চিনেবাসন; ডুবাই লুকাই জুড়াই-কে বলি— ডুবোই লুকোই জুড়োই; কুলা-কে বলি কুলো, ধুলাকে বলি ধুলো ইত্যাদি। অতএব এখানে নিয়মের যে-ব্যতিক্রম দেখা যায় তাহা উচ্চারণবিধিবশত।

যেখানে আদ্যক্ষরে অ্যাকার একার বা ওকার আছে, সেখানে আবার আর-একদিকে স্বরব্যত্যয় ঘটে; নিয়মমতো, ঠ্যালাঠ্যালি না হইয়া ঠ্যালাঠেলি, টিপাটেপি না হইয়া টেপাটিপি, এবং কোনাকোনি না হইয়া কোনাকুনি হয়।

কিন্তু, শেষাশেষি দ্বেষাদ্বেষি রেষারেষি মেশামেশি প্রভৃতি শ-ওয়ালা কথায় একারের কোনো বৈলক্ষণ্য ঘটে না। বাংলা উচ্চারণবিধির এই-সকল রহস্য আলোচনার বিষয়।

আমরা শেষোক্ত তালিকাটিকে বাংলার ইঙ্গিতবাক্যের মধ্যে ভুক্ত করিলাম কেন তাহা বলা আবশ্যক। কানাকানি করিতেছে বা বলাবলি করিতেছে, বলিলে যে-সকল কথা উহ্য থাকে তাহা কেবল কথার ভঙ্গীতে ব্যক্ত হইতেছে। পরস্পর পরস্পরের কানে কথা বলিতেছে, বলিলে প্রকৃত ব্যাপারটাকে অর্থবিশিষ্ট কথায় ব্যক্ত করা হয়, কিন্তু কান কথাটাকে দুইবার বাঁকাইয়া বলিয়া একটা ইঙ্গিতে সমস্তটা সংক্ষেপে সারিয়া দেওয়া হইল।

এ পর্যন্ত আমরা তিন রকমের ইঙ্গিত বাক্য পাইলাম। একটা ধ্বনিমূলক যেমন, সোঁ সোঁ কন্‌কন্‌ ইত্যাদি। আর-একটা পদবিকারমূলক যেমন, খোলাখালা গোলগাল চুপচাপ ইত্যাদি। আর-একটা পদদ্বৈতমূলক যেমন, বলাবলি দলাদলি ইত্যাদি।

ধ্বনিমূলক শব্দগুলি দুই রকমের; একটা ধ্বনিদ্বৈত, আর-একটা ধ্বনিদ্বৈধ। ধ্বনিদ্বৈত যেমন, কলকল কটকট ইত্যাদি; ধ্বনিদ্বৈধ যেমন, ফুটফাট কুপকাপ ইত্যাদি। ধ্বনিমূলক এই শব্দগুলি আমাদের ইন্দ্রিয়বোধ বেদনাবোধ প্রভৃতি অনুভূতি প্রকাশ করে।

পদবিকারমূলক শব্দগুলি একটা নির্দিষ্ট অর্থকে কেন্দ্র করিয়া তাহার চারিদিকে অনির্দিষ্ট আভাসটুকু ফিকা করিয়া লেপিয়া দেয়। পদদ্বৈতমূলক শব্দগুলি সাধারণত অন্যোন্যতা প্রকাশ করে।

ধ্বনিদ্বৈধ ও পদবিকারমূলক শব্দগুলিতে আমরা এ পর্যন্ত কেবল স্বরবিকারেরই পরিচয় পাইয়াছি; যেমন, হুসহাস— হুসের সহিত যে বর্ণভেদ ঘটিয়াছে তাহা স্বরবর্ণভেদ; খোলাখালা প্রভৃতি শব্দ সম্বন্ধেও সেইরূপ। এবারে ব্যঞ্জনবর্ণ-বিকারের দৃষ্টান্ত লইয়া পড়িব।

প্রথমে অর্থহীন শব্দমূলক কথাগুলি দেখা যাক; যেমন, উসখুস উস্কোখুস্কো নজগজ

নিশপিশ আইঢাই কাঁচুমাচু আবল-তাবল হাঁসফাঁস খুঁটিনাটি আগড়ম-বাগড়ম এবড়ো-খেবড়ো ছটফট তড়বড় হিজিবিজি ফষ্টিনাষ্টি আঁকুবাঁকু হাবজা-গোবজা লটখটে তড়বড়ে ইত্যাদি।

এই কথাগুলির অধিকাংশই আগাগোড়া অনির্দিষ্টভাব প্রকাশ করে। হাতপা চোখমুখ কাপড়চোপড় লইয়া ছোটোখাটো কত কী করাকে যে উসখুস করা বলে তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিতে গেলে হতাশ হইতে হয়; কী কী বিশেষ কার্য করাকে যে আইঢাই করা বলে তাহা আমাদের মধ্যে কে ব্যাখ্যা করিয়া বলিতে পারেন। কাঁচুমাচু করা কাহাকে বলে তাহা আমরা বেশ জানি, কিন্তু কাঁচুমাচু করার প্রক্রিয়াটি যে কী তাহা সুস্পষ্ট ভাষায় বলিবার ভার লইতে পারি না।

এ তো গেল অর্থহীন কথা; কিন্তু যে-জোড়াকথার প্রথমাংশ অর্থবিশিষ্ট এবং দ্বিতীয়াংশ বিকৃতি, বাংলায় তাহার প্রধান কর্ণধার ট ব্যঞ্জনবর্ণটি। ইনি একেবারে সরকারীভাবে নিযুক্ত; জলটল কথাটথা গিয়েটিয়ে কালোটালো ইত্যাদি বিশেষ্য বিশেষণ ক্রিয়া কোথাও ইঁহার অনধিকার নাই। অভিধানে দেখা যায় ট অক্ষরের কথা বড়ো বেশি নাই, কিন্তু বেকার ব্যক্তিকে যেমন পৃথিবীসুদ্ধ লোকের বেগার ঠেলিয়া বেড়াইতে হয় তেমনই বাংলাভাষায় কুঁড়েমিচর্চার যেখানে প্রয়োজন সেইখানেই ট-টাকে হাজরে দিতে হয়।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, মূলশব্দের বিকৃতিটাকে মূলের পশ্চাতে জুড়িয়া দিয়া বাংলাভাষা একটা স্পষ্ট অর্থের সঙ্গে অনেকখানি ঝাপসা অর্থ ইশারায় সারিয়া দেয়; জলটল গানটান তাহার দৃষ্টান্ত। এই সরকারী ট-এর পরিবর্তে এক-এক সময় ফ একটিনি করিতে আসে, কিন্তু তাহাতে একটা অবজ্ঞার ভাব আনে; যদি বলি লুচিটুচি তবে লুচির সঙ্গে কচুরি নিমকি প্রভৃতি অনেক উপাদেয় পদার্থ বুঝাইবার আটক নাই, কিন্তু লুচিফুচি বলিলে লুচির সঙ্গে লোভনীয়তার সম্পর্কমাত্র থাকে না।

আর দুটি অক্ষর আছে, স এবং ম। বিশেষভাবে কেবল কয়েকটি শব্দেই ইহাদের প্রয়োগ হয়।

স-এর দৃষ্টান্ত: জো-সো জড়োসড়ো মোটাসোটা রকম-সকম ব্যামোস্যামো ব্যারাম-স্যারাম বোকাসোকা নরম-সরম বুড়োসুড়ো আঁটসাট গুটিয়ে-সুটিয়ে বুঝেসুঝে।

ম-এর দৃষ্টান্ত: চটেমটে রেগেমেগে হিঁচকে-মিচকে সিটকে-মিটকে চটকে-মটকে চমকে-মমকে চেঁচিয়ে-মেচিয়ে আঁৎকে-মাৎকে জড়িয়ে-মড়িয়ে আঁচড়ে-মাচড়ে শুকিয়ে-মুকিয়ে কুঁচকে-মুচকে তেড়েমেড়ে এলোমেলো খিটিমিটি হুড়মুড় ঝাঁকড়া-মাকড়া কটোমটো।

দেখা যাইতেছে ম-এর দৃষ্টান্তগুলি বেশ সাধু শান্ত ভাবের নহে, কিছু রুক্ষ রকমের। বোধ হয় চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে, সচরাচর কথাতেও আমরা ম অক্ষরটাকে ট-এর পরিবর্তে ব্যবহার করি, অন্তত ব্যবহার করিলে কানে লাগে না, কিন্তু সে-সকল জায়গায় ম আপনার মেজাজটুকু প্রকাশ করে। আমরা বিষ-মিষ বলিতে পারি কিন্তু সন্দেশ-মন্দেশ যদি বলি তবে সন্দেশের গৌরবটুকু একেবারে নষ্ট হইয়া যাইবে। দুটো ঘুষোমুষো লাগিয়ে দিলেই ঠিক হয়ে যাবে, এ কথা বলা চলে, কিন্তু বন্ধুকে যত্নমত্ন বা গরিবকে দানমান করা উচিত, একেবারে অচল। হিংসে-মিংসে করা যায়, কিন্তু ভক্তি-মক্তি করা যায় না ; তেমন তেমন স্থলে খোঁচা-মোচা দেওয়া যায় কিন্তু আদর-মাদর নিষিদ্ধ। অতএব ট-এর ন্যায় ফ ও ম প্রশান্ত নিরপেক্ষ স্বভাবের নহে, ইহা নিশ্চয়।

তার পরে, কতকগুলি বিশেষ কথার বিশেষ বিকৃতি প্রচলিত আছে। সেগুলি সেই কথারই সম্পত্তি ; যেমন পড়েহড়ে বেছেগুছে মিলেজুলে খেয়েদেয়ে মিশেগুশে সেজেগুজে মেখেচুখে জুটেপুটে লুটেপুটে চুকেবুকে বকেঝকে। এইগুলি বিশেষ প্রয়োগের দৃষ্টান্ত।

উল্লিখিত তালিকাটি ক্রিয়াপদের। এখানে বিশেষ্য পদেরও দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে : কাপড়-চোপড় আশপাশ বাসন-কোসন রসকস রাবদাব গিন্নিবান্নি তাড়াহুড়ো চোটপাট চাকর-বাকর হাঁড়িকুঁড়ি[১] ফাঁকিজুকি আঁকজোকা এলাগোলা এলোথেলো বেঁটেখেটে খাবার-দাবার ছুঁতোনাতা চাষাভুষো[২] অন্ধিসন্ধি অলিগলি হাবুডুবু নড়বড় হুলস্থূল।

এই দৃষ্টান্তগুলির গুটিকয়েক কথার একটা উলটাপালটা দেখা যায় ; বিকৃতিটা আগে এবং মূলশব্দটা পরে, যেমন : আশপাশ অন্ধিসন্ধি অলিগলি হাবুডুবু হুলস্থূল।

উল্লিখিত তালিকার প্রথমার্ধের শেষ অক্ষরের সহিত শেষার্ধের শেষ অক্ষরের মিল পাওয়া যায়। কতকগুলি কথা আছে যেখানে সে-মিলটুকুও নাই ; যেমন : দৌড়ধাপ পুঁজিপাটা কান্নাকাটি তিতিবিরক্ত।

এইবার আমরা ক্রমে ক্রমে একটা জায়গায় আসিয়া পৌঁছিতেছি যেখানে জোড়া-শব্দের দুইটি অংশই অর্থবিশিষ্ট। সে স্থলে সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মানুসারে তাহাকে সমাসের কোঠায় ফেলা উচিত ছিল। কিন্তু কেন যে তাহা সম্ভবপর নহে দৃষ্টান্তের

---

[১] সংস্কৃতভাষায় কুণ্ডি শব্দের অর্থ পাত্রবিশেষ, সম্ভবত ইহা হইতে হাঁড়িকুঁড়ি শব্দের কুঁড়ি উৎপন্ন ; এই-সকল তালিকার মধ্যে এমন আরও থাকিতে পারে যে-স্থলে এই দোসর শব্দগুলিকে অর্থহীনের কোঠায় ফেলা চলিবে না।

[২] ছুঁতোনাতা শব্দে ছুতা কী নিয়ম অনুসারে ছুঁতো হইয়াছে এবং চাষাভুষা শব্দের ভুষা কী কারণে ভুষো হইল পূর্বেই তাহা বলিয়াছি।

দ্বারা তাহা বোঝানো যাক। ছাইভস্ম কালিকিষ্টি লজ্জাশরম প্রভৃতি জোড়াকথার দুই অংশের একই অর্থ; এ কেবল জোর দিবার জন্য কথাগুলাকে গালভরা করিয়া তোলা হইয়াছে। এইরূপ সম্পূর্ণ সমার্থক বা প্রায়-সমার্থক জোড়াশব্দের তালিকা দেওয়া গেল:

চিঠিপত্র লোকজন ব্যাবসা-বাণিজ্য দুঃখধান্দা ছাইপাঁশ ছাইভস্ম মাথামুণ্ডু কাজকর্ম ক্রিয়াকর্ম ছোটোখাটো ছেলেপুলে ছেলে-ছোকরা খড়কুটো সাদাসিধে জাঁক-জমক বসবাস সাফ-সুৎরো ত্যাড়াবাঁকা পাহাড়-পর্বত মাপজোখ সাজসজ্জা লজ্জাশরম ভয়ডর পাকচক্র ঠাট্টা-তামাসা ইশারা-ইঙ্গিত পাখি-পাখালি জন্তু-জানোয়ার মামলা-মকদ্দমা গা-গতর খবর-বার্তা অসুখ-বিসুখ গোনা-গুনতি ভরা-ভরতি কাঙাল-গরিব গরিবদুঃখী গরিব-গুরবো রাজা-রাজড়া খাটপালং বাজনা-বাদ্য কালিকিষ্টি দয়ামায়া মায়া-মমতা ঠাকুর-দেবতা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য চালাক-চতুর শক্ত-সমর্থ গালি-গালাজ ভাবনা-চিন্তে ধর-পাকড় টানা-হ্যাঁচড়া বাঁধাছাঁদা নাচাকোঁদা বলা-কওয়া করাকর্ম।

এমন কতকগুলি কথা আছে যাহার দুই অংশের কোনো অর্থসামঞ্জস্য পাওয়া যায় না; যেমন: মেগেপেতে কেঁদেকেটে বেয়েছেয়ে জুড়েতেড়ে পুড়েঝুড়ে কুড়িয়ে-বাড়িয়ে আগেভাগে গালমন্দ পাকে-প্রকারে।

বাংলাভাষায় পত্র শব্দযোগে যে-কথাগুলির উৎপত্তি হইয়াছে সেগুলিকেও এই শ্রেণীভুক্ত করা যাইতে পারে; কারণ, গহনাপত্র শব্দে গহনা শব্দের সহিত পত্র শব্দের কোনো অর্থসামঞ্জস্য দেখা যায় না। ওইরূপ, তৈজসপত্র জিনিসপত্র খরচপত্র বিছানাপত্র ঔষধপত্র হিসাবপত্র দেনাপত্র আসবাবপত্র পুঁথিপত্র বিষয়পত্র চোতাপত্র দলিলপত্র এবং খাতাপত্র। ইহাদের মধ্যে কোনো কোনো কথায় পত্র শব্দের কিঞ্চিৎ সার্থকতা পাওয়া যায়, কিন্তু অনেক স্থলে নয়।

যে-সকল জোড়াশব্দের দুই অংশের এক অর্থ নহে কিন্তু অর্থটা কাছাকাছি, তাহাদের দৃষ্টান্ত: মাল-মসলা দোকান-হাট হাঁকডাক ধীরেসুস্থে ভাব-গতিক ভাবভঙ্গি লম্ফঝম্ফ চাল-চলন পাল-পার্বন কাণ্ড-কারখানা কালিঝুলি ঝড়ঝাপট বনজঙ্গল খানাখন্দ জোতজমা লোক-লশকর চুরি-চামারি উঁকিঝুঁকি পাঁজিপুঁথি লম্বা-চওড়া দলামলা বাছ-বিচার জ্বালা-যন্ত্রণা সাতপাঁচ নয়ছয় ছকড়া-নকড়া উনিশ-বিশ সাত-সতেরো আলাপ-পরিচয় কথাবার্তা বন-বাদাড় ঝোপঝাড় হাসিখুশি আমোদ-আহ্লাদ লোহা-লক্কড় শাক-সবজি বৃষ্টি-বাদল ঝড়তুফান লাথিঝাঁটা সেঁকতাপ আদর-অভ্যর্থনা চালচুলো চাষবাস মুটে-মজুর ছলবল।

ছাইভস্ম প্রভৃতি দুই সমানার্থক জোড়াশব্দ জোর দিবার জন্য প্রয়োগ করা হয়— মালমসলা দোকানহাট প্রভৃতি সমশ্রেণীর ভিন্নার্থক জোড়াশব্দে একটা ইত্যাদিসূচক

অনির্দিষ্টতা প্রকাশ করে। কাণ্ড-কারখানা চুরি-চামারি হাসিখুশি প্রভৃতি কথাগুলির মধ্যে ভাষাও আছে আভাসও আছে।

যে-সকল পদার্থ আমরা সচরাচর একসঙ্গে দেখি তাহাদের মধ্যে বাছিয়া দুটি পদার্থের নাম একত্রে জুড়িয়া বাকিগুলাকে ইত্যাদিভাবে বুঝাইয়া দিবার প্রথাও বাংলায় প্রচলিত আছে, যেমন, ঘটিবাটি। যদি বলা যায় ঘটিবাটি সামলাইয়ো, তাহার অর্থ এমন নহে যে, কেবল ঘটি ও বাটিই সামলাইতে হইবে, এই সঙ্গে থালা ঘড়া প্রভৃতি অনেক অস্থাবর জিনিস আসিয়া পড়ে। কাহারও সহিত মাঠে-ঘাটে দেখা হইয়া থাকে, বলিলে কেবল যে ওই দুটি মাত্র স্থানেই সাক্ষাৎ ঘটে তাহা বুঝায় না, উক্ত লোকটির সঙ্গে যেখানে-সেখানেই দেখা হয় এইরূপ বুঝিতে হয়। এইরূপ জোড়া-কথার দৃষ্টান্ত: পথঘাট ঘর-দুয়োর ঘটিবাটি কাছা-কোঁচা হাতিঘোড়া বাঘ-ভাল্লুক খেলাধুলা (খেলা-দেয়ালা) পড়াশুনা খালবিল লোক-লশকর গাড়ু-গামছা লেপকাঁথা গান-বাজনা খেতখোলা কানাখোঁড়া কালিয়া-পোলাও শাকভাত সেপাই-সান্ত্রী নাড়ি-নক্ষত্র কোলেপিঠে কাঠখড় দত্যিদানো ভূতপ্রেত।

বিপরীতার্থক শব্দ জুড়িয়া সমগ্রতা ও বৈপরীত্য বুঝাইবার দৃষ্টান্ত: আগাগোড়া ল্যাজামুড়ো আকাশ-পাতাল দেওয়া-থোওয়া নরম-গরম আনাগোনা উলটোপালটা তোলপাড় আগা-পাস্তাড়া।

এই যতপ্রকার জোড়াশব্দের তালিকা দেওয়া গেছে সংস্কৃত সমাসের সঙ্গে তাহাদের বিশেষত্ব এই যে, শব্দগুলির যে-অর্থ তাহাদের ভাবটা তাহার চেয়ে বেশি এবং এই কথার জুড়িগুলি যেন একেবারে চিরদাম্পত্যে বাঁধা। বাঘভাল্লুক না বলিয়া বাঘসিংহ বলিতে গেলে একটা অত্যাচার হইবে; বনজঙ্গল এবং ঝোপঝাড় শব্দকে বনঝাড় এবং ঝোপজঙ্গল বলিলে ভাষা নারাজ হয়, অথচ অর্থের অসংগতি হয় না।

এইখানে ইংরেজিতে যে-সকল ইঙ্গিতবাক্য প্রচলিত আছে তাহার যে-কয়েকটি দৃষ্টান্ত মনে পড়িতেছে উল্লেখ করিতে ইচ্ছা করি; বাংলার সহিত তুলনা করিলে পাঠকেরা সাদৃশ্য দেখিতে পাইবেন: nick-nack riff-raff wishy-washy dilly-dally shilly-shally pit-a-pat bric-abrac।

এই উদাহরণগুলিতে জোড়াশব্দের দ্বিতীয়ার্ধে আকারের প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতেছে। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, বাংলাতেও এইরূপস্থলে শেষার্ধে আকারটাই আসিয়া পড়ে; যেমন, হো-হা জো-জা জোর-জার। কিন্তু যেখানে প্রথমার্ধে আকার থাকে, দ্বিতীয়ার্ধে সেখানে ওকারের প্রচলনই বেশি; যেমন, ঘা-ঘো টান-টোন টায়-টোয় ঠারে-ঠোরে। সবশেষে যদি ইকার থাকে তবে মাঝের ওকার উ হইয়া যায়, যেমন জারি-জুরি।

দ্বিতীয়ার্ধে ব্যঞ্জনবর্ণবিকারের দৃষ্টান্ত : hotchpotch higgledy-piggledy harum-scarum helter-skelter hoity-toity hurly-burly roly-poly hugger-mugger namby-pamby wishy-washy.

আমাদের যেমন টুংটাং ইংরেজিতে তেমনই ding-dong, আমাদের যেমন ঠঙাঠঙ ইংরেজিতে তেমনই ding-a-dong।

প্রথমার্ধের সহিত দ্বিতীয়ার্ধের মিল নাই এমন দৃষ্টান্ত,— topsyturvy।

জোড়াশব্দের দুই অংশে মিল নাই, এমন কথা সকল ভাষাতেই দুর্লভ। মিলের দরকার আছে। মিলটা মনের উপর ঘা দেয়, তাহাকে বাজাইয়া তোলে ; একটা শব্দের পরে ঠিক তাহার অনুরূপ আর-একটা শব্দ পড়িলে সচকিত মনোযোগ ঝংকৃত হইয়া উঠে, জোড়া মিলের পরস্পর ঘাতপ্রতিঘাতে মনকে সচেষ্ট করিয়া তোলে, সে সুরের সাহায্যে অনেকখানি আন্দাজ করিয়া লয়। কবিতার মিলও এই সুবিধাটুকু ছাড়ে না, ছন্দের পর্বে পর্বে বারংবার আঘাতে মনের বোধশক্তিকে জাগ্রত করিয়া রাখে; কেবলমাত্র কথাদ্বারা মন যতটুকু বুঝিত, মিলের ঝংকারে অনির্দিষ্টভাবে তাহাকে আরও অনেকখানি বুঝাইয়া দেয়। অনির্বচনীয়কে প্রকাশ করিবার ভার যাহাকে লইতে হয় তাহাকে এইরূপ কৌশল অবলম্বন না করিলে চলে না।

এইখানে আমার প্রবন্ধের উপসংহার করিব। আমার আশঙ্কা হইতেছে, এই প্রবন্ধের বিষয়টি অনেকের কাছে অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর বলিয়া ঠেকিবে। আমার কৈফিয়ত এই যে, বিজ্ঞানের কাছে কিছুই অবজ্ঞেয় নাই এবং প্রেমের কাছেও তদ্রূপ। আমার মতো সাহিত্যওয়ালা বিপদে পড়িয়া বিজ্ঞানের দোহাই মানিলে লোকে হাসিবে, কিন্তু প্রেমের নিবেদন যদি জানাই, বলি মাতৃভাষার কিছুই আমার কাছে তুচ্ছ নহে— তবে আশা করি কেহ নাসা কুঞ্চিত করিবেন না। মাতাকে সংস্কৃতভাষার সমাসসন্ধি-তদ্ধিতপ্রত্যয়ে দেবীবেশে ঝলমল করিতে দেখিলে গর্ব বোধ হয় সন্দেহ নাই, কিন্তু ঘরের মধ্যে কাজকর্মের সংসারে আটপৌরে কাপড়ে তাঁহাকে গেহিণী বেশে দেখিতে যদি লজ্জা বোধ করি তবে সেই লজ্জার জন্য লজ্জিত হওয়া উচিত।

বৈয়াকরণের যে-সকল গুণ ও বিদ্যা থাকা উচিত তাহা আমার নাই, শিশুকাল হইতে স্বভাবতই আমি ব্যাকরণভীরু; কিন্তু বাংলাভাষাকে তাহার সকলপ্রকার মূর্তিতেই আমি হৃদয়ের সহিত শ্রদ্ধা করি, এইজন্য তাহার সহিত তন্ন তন্ন করিয়া পরিচয়সাধনে আমি ক্লান্তি বোধ করি না। এই চেষ্টার ফলস্বরূপে ভাষার ভাণ্ডার হইতে যাহাকিছু আহরণ করিয়া থাকি, মাঝে মাঝে তাহার এটা ওটা সকলকে দেখাইবার জন্য আনিয়া উপস্থিত করি ; ইহাতে ব্যাকরণকে চিরঋণে বদ্ধ করিতেছি

বলিয়া স্পর্ধা করিব না, ভুলচুক অসম্পূর্ণতাও যথেষ্ট থাকিবে। কিন্তু আমার এই চেষ্টায় কাহারও মনে যদি এরূপ ধারণা হয় যে, প্রাকৃত বাংলাভাষার নিজের একটি স্বতন্ত্র আকারপ্রকার আছে এবং এই আকৃতিপ্রকৃতির তত্ত্ব নির্ণয় করিয়া শ্রদ্ধার সহিত অধ্যবসায়ের সহিত বাংলাভাষার ব্যাকরণরচনায় যদি যোগ্য লোকের উৎসাহ বোধ হয়, তাহা হইলে আমার এই বিস্মরণযোগ্য ক্ষণস্থায়ী চেষ্টাসকল সার্থক হইবে।

১৩১১

পরিশিষ্ট

সমাজ। শিক্ষা। শব্দতত্ত্ব

হিন্দুবিবাহ

সায়ান্স্ অ্যাসোসিয়েশন হলে পঠিত

অধ্যাপক সীলি তাঁহার Natural Religion নামক গ্রন্থের একস্থলে লিখিয়াছেন :

Among the crowd of Voltairian abbes we can fancy some in whom the conflict between inherited and imbibed ways of thinking may have destroyed belief and energy alike. Those who live in the decay of Churches and systems of life are exposed to such a paralysis. They have been made all that they are by the system; their mode of thought and feeling, their very morality has grown out of it. But at a given moment the system is struck with decay. It falls out of the current of life and thought. Then the faith which had long been genuine, even if mistaken, which had actually inspired vigorous action and eloquent speech, begins to ebb. The vigour begins to be spasmodic, the eloquence to ring hollow, the loyalty to have an air of hopeless self-sacrifice. Faith gradually passes into conventionalism. A later stage comes when the depression, the uneasiness, the misgiving, have augmented tenfold. It is then that in an individual here and there the moral paralysis sets in. In the ardour of conflict they have pushed in to the foreground all the weakest parts of their creed, and have learnt the habit of asserting most vehemently just what they doubt most, because it is what is most denied. As their own belief ebbs away from them they are precluded from learning a new one, because they are too deeply pledged, have promised too much, asseverated too much, and involved too many others with themselves. Happy those in such a situation who either are not too clear-sighted or cling to a system not entirely corrupt! There is an extreme case when what is upheld as divine has really become a source of moral evil, while the champion is one who cannot help seeing clearly. As he becomes reluctantly enlightened, as his advocacy grows first a little forced, then by degrees consciously hypocritical, until in the end he secretly confesses himself to be on the wrong side,— what a moral dissolution!

ইহার মর্মার্থ :

> যাঁহারা কোনো পুরাতন ধর্মপ্রণালী অথবা সমাজতন্ত্রের জীর্ণদশায় জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই প্রাচীন সংস্কারের সহিত নূতন শিক্ষার বিরোধবশত বিশ্বাস ও বল হারাইয়া নৈতিক পঙ্গু-অবস্থা প্রাপ্ত হন। তাঁহারা সেই সমাজতন্ত্রের মধ্যেই গঠিত হইয়াছেন, তাঁহাদের মনোবৃত্তি ও চিন্তাপ্রণালী, এমন-কি ধর্মনীতি সেই সমাজ হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে। কিন্তু কখন এক সময়ে সেই সমাজে জরা প্রবেশ করিয়াছে; সে-সমাজ মানবের বুদ্ধি ও জীবনস্রোতের বাহিরে গিয়া পড়িয়াছে। যে অকপট বিশ্বাস পূর্বে সকলকে উদ্যমশীল কার্যে ও আবেগপূর্ণ বক্তৃতায় প্রবৃত্ত করিয়াছে এখন সে-বিশ্বাস ক্ষীণ হইয়া আসিতে থাকে। তাহার জীবন্ত উদ্যম কচিৎ ক্ষণস্থায়ী চকিত চেষ্টায় পর্যবসিত হয়, তাহার বক্তৃতাবেগ শূন্যগর্ভ বলিয়া বোধ হয়, এবং তাহার নিষ্ঠা অত্যন্ত আশাহীন আত্মবলিদানের ন্যায় প্রতিভাত হইতে থাকে। আন্তরিক বিশ্বাস ক্রমে বাহ্য প্রথায় পরিণত হয়। ক্রমে অবসাদ অশান্তি ও সংশয় বাড়িতে থাকে। এই মতবিরোধের সময় কতকগুলি লোক উঠেন, তাঁহারা বিবাদে উত্তেজিত হইয়া তাঁহাদের মতের জীর্ণতম অংশগুলিই সম্মুখে সাজাইয়া আস্ফালন করিতে থাকেন; যেগুলি মনে মনে সর্বাপেক্ষা অধিক সন্দেহ করেন সেইগুলিই তাঁহারা সর্বাপেক্ষা অধিক উৎসাহের সহিত ঘোষণা করেন, কারণ বিরোধী পক্ষ সেইগুলিকেই অধিকতর অবিশ্বাস করিয়া থাকে। ক্রমে এতদূর পর্যন্তও হইতে পারে যে, যাহা নৈতিক দুর্দশার কারণ তাহাকেই তাঁহারা স্বর্গীয় বলিয়া প্রচার করেন, অথচ ইহার অসংগতি নিজেই মনে মনে না বুঝিয়া থাকিতে পারেন না। প্রথমে অল্পে অল্পে চোখ ফুটিতে থাকে এবং জোর করিয়া নিজমত সমর্থন করেন, পরে ক্রমে আপন মত অন্যায় জানিয়াও স্পষ্ট কাপট্য অবলম্বন করেন।

অধ্যাপক সীলির এই বর্ণনার সহিত আমাদের সমাজের বর্তমান অবস্থার কী আশ্চর্য ঐক্য। নূতন শিক্ষাপ্রাপ্ত বঙ্গভূমির নূতন চিন্তাস্রোত ও জীবনস্রোতের সহিত প্রাচীন সমাজতন্ত্র মিশিতে পারিতেছে না। সুতরাং প্রাচীন সমাজের প্রচলিত বিশ্বাসবলে যে-সকল বৃহৎকার্য যেরূপ প্রবল বেগে সম্পন্ন হইতে পারিত, এখন আর সেরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই। তখনকার জীবন্ত বিশ্বাস এখন জীবনহীন প্রথায় পরিণত হইয়াছে। অবসাদ অশান্তি ও সংশয়ে আমাদের সমাজ ভারাক্রান্ত, এবং আমাদের মধ্যে একদল লোক উঠিয়াছেন, তাঁহারা পরমসূক্ষ্ম কূটযুক্তি দ্বারা প্রাচীন মতের পক্ষ সমর্থন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন; এবং বোধ করি একদল রূঢ়স্বভাব সংবাদপত্রব্যবসায়ীর মধ্যে এ সম্বন্ধে কাপট্যের লক্ষণও দেখা দিয়াছে।

সম্প্রতি আমাদের দেশে একদলের মধ্যে এই-যে প্রাচীনতার একান্ত পক্ষপাত দেখা যায়, তাহার কতকগুলি কারণ ঘটিয়াছে। প্রথমত, নূতন শিক্ষার প্রভাবে আমরা অনেকগুলি নূতন কর্তব্য প্রাপ্ত হইয়াছি; কিন্তু আমাদের অনভ্যাস, পূর্বরাগ, স্বাভাবিক জড়ত্ব ও ভীরুতাবশত আমরা তাহা সমস্ত পালন করিয়া উঠিতে পারি না। আলস্যের দায়ে ও সমাজের ভয়ে অনেক সময়ে আমরা তাহার বিপরীতাচরণ করিয়া থাকি।

কিন্তু অসম্পন্ন কর্তব্যের লাঞ্ছনা মানুষ চিরদিন সহিয়া থাকিতে পারে না। কেন বিশ্বাস করিতেছি একরূপ এবং কাজ করিতেছি অন্যরূপ, তাহার সন্তোষজনক কৈফিয়ত দিতে ইচ্ছা করে। সুতরাং কিছুদিন পরে নূতন বিশ্বাসের খুঁত ধরিতে আরম্ভ করা যায়। নূতন শিক্ষালব্ধ কর্তব্য যে অকর্তব্য, এবং আমরা যাহা করিয়া আসিতেছি ঠিক তাহাই করা যে উচিত, প্রাণপণ সূক্ষ্মযুক্তি দ্বারা ইহাই প্রমাণ করিতে প্রবৃত্ত হওয়া যায়। কিন্তু এরূপ স্থলে সাধারণত যুক্তিগুলি কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত সূক্ষ্ম হইয়া পড়ে; এত সূক্ষ্ম হয় যে সেই যুক্তিভেদ করিয়া যুক্তিকর্তার হৃদয়ের প্রচ্ছন্ন অবিশ্বাস কখনো কখনো কিছু কিছু দৃষ্টিগোচর হইতে থাকে।

দ্বিতীয়ত, পুরাতনের উপর যখন একবার আমাদের বিশ্বাস শিথিল হইয়া যায়, তখন আমরা অনেক সময় অবিচারে নূতনকে হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশাধিকার দিই। নূতনের উপর প্রকৃত বিশ্বাসবশতই যে তাহাকে সকল সময়ে আমরা হৃদয়ে স্থান দিই তাহা নহে, অনেক সময়ে পুরাতনের প্রতি আড়ি করিয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া আনি। আমরা গৃহশত্রুর প্রতি আড়ি করিয়া কখনো কখনো বহিঃশত্রুকে গৃহে আহ্বান করিয়া থাকি। অবশেষে উপদ্রব সহ্য করিয়া যখন চৈতন্য হয় তখন আগাগোড়া নূতনের উপরে বিরাগ জন্মে। যখন এ দেশে নূতন কালেজ হয় তখন শিক্ষিত যুবকেরা যে অনেকগুলি উৎপাত আপন গৃহচালের উপরে ডাকিয়া আনিয়াছিলেন, সে কেবল পুরাতনের উপরে আড়ি করিয়া বই তো নয়। এখনকার একদল লোক সেই-সকল উৎপাতমিশ্রিত নূতন মতকে সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য বলিয়া প্রমাণ করিবার জন্য কৃতসংকল্প হইয়াছেন।

তৃতীয়ত, আমরা পরাধীন জাতি। আমরা পরের কাছে অপমানিত, সুতরাং ঘরে সম্মানের প্রত্যাশী। এইজন্য আমরা ইংরেজকে বলিতে চাহি— ইংরেজ, তোমাদের শস্ত্র বড়ো, কিন্তু আমাদের শাস্ত্র বড়ো; তোমরা রাজা, আমরা আর্য। এককালে আমাদের যাহা ছিল এখনও যেন তাহাই আছে, এইরূপ ভাণ করিয়া অপমানদুঃখ ভুলিয়া থাকিতে চাই। দেহে বল ও হৃদয়ের সাহস নাই যে অপমান হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে পারি, সুতরাং পুরাণ ও সংহিতা, চটুল রসনা ও কূটযুক্তির দ্বারা আবৃত হইয়া আপনাকে বড়ো বলিয়া মনে করিতে ইচ্ছা হয়। যে-সকল আচারের অস্তিত্ব হয়তো আমাদের অপমানের অন্যতম কারণ সেগুলি দূর করিতে সাহস হয় না, এইজন্য তাহাদের প্রতি আর্য আধ্যাত্মিক পবিত্র প্রভৃতি বিশেষণ প্রয়োগ করিয়া আপনাদিগকে পরমসম্মানিত জ্ঞান করি। এইরূপে অনেকসময়ে অপমানজ্বালা বিস্মৃত হইবার অভিপ্রায়েই আমরা অপমানের কারণ স্বহস্তে স্বদেশে বদ্ধমূল করিয়া দিই।

চতুর্থত, ভাবেগতিকে বোধ হয়, কেহ কেহ মনে করেন প্রাচীনতাকে অবলম্বন করা আমাদের political উন্নতির পক্ষে আবশ্যক। তাহাকে বিশ্বাস করি বা না করি, তাহা সত্যই হউক আর মিথ্যাই হউক, তাহাকে সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া মনে করিলে আমাদের কতকগুলি বিষয়ে কতকগুলি লাভ আছে। কিন্তু সত্যমিথ্যার প্রতি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ হইয়া এরূপ লাভক্ষতি গণনা করিয়া যে দেশের কোনো স্থায়ী ও বৃহৎ কাজ করা যায় এরূপ আমার বিশ্বাস নহে।

আমাদের দেশে কিছুকাল হইল হিন্দুবিবাহ লইয়া আলোচনা পড়িয়াছে। যাঁহারা এই আলোচনা তুলিয়াছেন তাঁহারা অনেকেই সাধারণের শ্রদ্ধার পাত্র এবং আমাদের বঙ্গসাহিত্যের শীর্ষস্থানীয় বলিয়া গণ্য। কিন্তু তাঁহারা কেহই হিন্দুবিবাহের শাস্ত্রসম্মত ঐতিহাসিকতা বা বিজ্ঞানসম্মত উপযোগিতার বিষয় বড়ো-একটা-কিছু বলেন নাই, কেবল সূক্ষ্মযুক্তি ও কবিত্বময় ভাষা প্রয়োগ করিয়া হিন্দুবিবাহের পবিত্রতা ও আধ্যাত্মিকতা সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। হিন্দুসভ্যতার ইতিহাসে ক্রমে ক্রমে হিন্দুবিবাহের বিস্তর রূপান্তর ঘটিয়াছে— ইহার মধ্যে কোন্ সময়ের বিবাহকে যে তাঁহারা হিন্দুবিবাহ বলেন, তাহা ভালোরূপ নির্দেশ করেন নাই। যদি বঙ্গদেশের উচ্চবর্ণের মধ্যে প্রচলিত বর্তমান বিবাহকে হিন্দুবিবাহ বলেন, তবে প্রাচীন শাস্ত্র হইতে তাহার পবিত্রতা ও আধ্যাত্মিকতা প্রমাণ করিবার চেষ্টা কেন। প্রাচীন কালে স্ত্রীপুরুষের মধ্যে যেরূপ সম্বন্ধ ছিল, এখন সেরূপ আছে কি না সে বিষয়ে কিছুই বলা হয় না। অতএব সেকালের শাস্ত্রোক্তি এখন প্রয়োগ করিলে অনেক সময়ে চোখে ধুলা দেওয়া হয়। হিন্দুবিবাহের পবিত্রতা সম্বন্ধে যদি কেহ বৈদিক বচন উদ্ধৃত করেন তাঁহার জানা উচিত যে, বৈদিক কালে স্ত্রীপুরুষের সামাজিক ও গার্হস্থ্য অবস্থা আমাদের বর্তমান কালের ন্যায় ছিল না। যিনি হিন্দুবিবাহের পক্ষে পুরাণ ইতিহাস উদ্ধৃত করেন, তিনি এক মহাভারত সমস্ত পড়িয়া দেখিলে অকূল সমুদ্রে পড়িবেন। মহাভারতের নানা কাহিনীতে বিবাহ সম্বন্ধীয় নানা বিশৃঙ্খলা বর্ণিত হইয়াছে; ঐতিহাসিক পদ্ধতি-অনুসারে তাহার ভালোরূপ সমালোচনা ও কালাকাল নির্ণয় না করিয়া কোনো কথা বলা উচিত হয় না। যিনি মনুসংহিতার দোহাই দেন তাঁহার প্রতি আমার গুটিকতক বক্তব্য আছে। প্রথমত, মনুসংহিতা যে-সমাজের সংহিতা সে-সমাজের সহিত আমাদের বর্তমান সমাজের মূলগত প্রভেদ। শিক্ষার ঐক্য নাই অথচ সমাজের ঐক্য আছে, ইহা প্রমাণ করিতে বসা বিড়ম্বনা। মনুসংহিতায় ব্রাহ্মণের শিক্ষাপ্রণালী যেরূপ নির্দিষ্ট আছে তাহা যে বঙ্গদেশে কোন্‌কালে প্রচলিত ছিল নির্ণয় করা কঠিন। তিন দিনের মধ্যে নিতান্ত জো-সো

করিয়া ব্রহ্মচর্যব্রতের অভিনয় সমাপনপূর্বক আমাদের দেশে ব্রাহ্মণ বহুকাল হইতে দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছেন। কোথায় বা গুরুগৃহে বাস, কোথায় বা বেদাধ্যয়ন, কোথায় বা কঠিন ব্রতাচরণ। অতএব প্রথমেই দেখা যাইতেছে, মনুসংহিতার মতে যে-মানুষ গঠিত হইত, এখনকার মতে সে-মানুষ গঠিত হয় না। দ্বিতীয়ত, মনু পুরুষের পক্ষে বিবাহের যে-বয়স নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন, তাহাই বা কোথায় পালিত হইয়া থাকে। তৃতীয়ত, বিবাহের পরে মনু স্ত্রীপুরুষের পরস্পর সংসর্গের যে-সকল নিয়ম স্থির করিয়াছেন, তাহাই বা কয়জন লোক জানে ও পালন করে। তবে, আপন সুবিধামতো মনু হইতে দুই-একটা শ্লোক নির্বাচন করিয়া বর্তমান দেশাচারপ্রচলিত বিবাহপ্রথার পক্ষে প্রয়োগ করা সকল সময়ে সংগত বোধ হয় না। তবে যদি কেহ বলেন, আমাদের বর্তমান প্রথাসকল হিন্দুশাস্ত্রসম্মত বিশুদ্ধতা হারাইয়াছে, অতএব আমরা মনুকে আদর্শ করিয়াই আমাদের বিবাহাদিপ্রথার সংস্কার করিব, কারণ সেকালের বিবাহাদি পবিত্র ও আধ্যাত্মিক ছিল, তবে আমার জিজ্ঞাস্য এই— বিবাহাদি সম্বন্ধে মনুর সমস্ত নিয়ম নির্বিচারে গ্রহণ করিবে, না আপনাপন মতানুসারে স্থানে স্থানে বর্জন করিয়া সংহিতাকে আপন সুবিধা ও নূতন শিক্ষার অনুবর্তী করিয়া লইবে। মনুসংহিতা স্ত্রীপুরুষের যে সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া দিয়াছেন তাহার সমস্তটাই পবিত্র ও আধ্যাত্মিক, না তুমি তাহার মধ্য হইতে যেটুকু বাদসাদ দিয়া লইয়াছ সেইটুকু পবিত্র ও আধ্যাত্মিক?

আমরা যে শাস্ত্র হইতে বাদসাদ দিয়া কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দেশানুরাগে কথঞ্চিৎ অন্ধ হইয়া আপন ঘরগড়া মতকে প্রাচীন বলিয়া প্রতিপন্ন করি, এখানে তাহার দুই-একটি উদাহরণ দিতে চাই।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু পরম ভাবুক জ্ঞানবান ও সহৃদয়। তাঁহার শকুন্তলা-সমালোচন তাঁহার আশ্চর্য প্রতিভার পরিচয় দিয়াছে। আমি যতদূর জানি বাংলায় এরূপ গ্রন্থ আর নাই। বাংলার পাঠকসাধারণে চন্দ্রনাথবাবুকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিয়া থাকে। এইজন্য কিছুকাল হইল তিনি 'হিন্দুপত্নী' এবং 'হিন্দুবিবাহের বয়স ও উদ্দেশ্য' নামে যে-দুই প্রবন্ধ প্রচার করেন তাহা সাধারণ্যে অতিশয় আদৃত হইয়াছে। উক্ত প্রবন্ধে তিনি হিন্দুবিবাহের আধ্যাত্মিকতা ও হিন্দুদম্পতির একীকরণতা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা আজকাল গুটিকতক কাগজে অবিশ্রান্ত প্রতিধ্বনিত হইতেছে। ইনি উক্ত প্রবন্ধদ্বয়ে হিন্দুবিবাহ এবং তাহার আনুষঙ্গিকস্বরূপে বাল্যবিবাহ সম্বন্ধে যতটা বলিয়াছেন, তাঁহার পরবর্তী আর কেহ ততটা বলেন নাই। খ্যাতনামা গুণী ও গুণজ্ঞ লেখক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সরকার মহাশয় চন্দ্রনাথবাবুর বিবাহ প্রবন্ধের উল্লেখ করিয়া বলেন, "হিন্দুবিবাহের ওরূপ পরিষ্কার ব্যাখ্যা আর কোথাও নাই।"

অতএব উক্ত সর্বজনমান্য প্রবন্ধদ্বয়কে মুখ্যত অবলম্বন করিয়া আমি বর্তমান প্রবন্ধ রচনা করিয়াছি, এবং এই উপলক্ষে আমার মতামত যথাসাধ্য ব্যক্ত করিয়াছি।[১]

চন্দ্রনাথবাবু তাঁহার 'হিন্দুপত্নী' প্রবন্ধে বলিয়াছেন :

> খ্রীষ্টধর্মের আবির্ভাবের বহুপূর্বে ভারতে হিন্দুজাতি স্ত্রীজাতিকে অতি উৎকৃষ্ট ও মাননীয় বলিয়া বুঝিয়াছিল এবং অপর দেশে খ্রীষ্টধর্ম স্ত্রীজাতিকে যত উচ্চ করিয়া তুলিয়াছিল ভারতের হিন্দু ভারতের স্ত্রীকে তদপেক্ষা অনেক উচ্চ আসনে বসাইয়াছিল। খ্রীষ্টধর্ম স্ত্রীকে পুরুষের সমান করিয়াছিল; হিন্দুধর্ম স্ত্রীকে পুরুষের সমান করে নাই, পুরুষের দেবতা করিয়াছিল। 'যত্র নার্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।' যেখানে নারী পূজিতা হন সেখানে দেবতা সন্তুষ্ট হন।

প্রাচীন কালে স্ত্রীলোকের অবস্থা কিরূপ ছিল তাহা আমি বলিতে পারি না, কারণ আমি সংস্কৃতভাষায় ব্যুৎপন্ন নহি এবং আমার শাস্ত্রজ্ঞান যথেষ্ট পরিমাণে নাই। কিন্তু আজকাল মুখে ও লেখায় ও অনুবাদে শাস্ত্রচর্চা দেশে এতটুকু ব্যাপ্ত হইয়াছে যে, শাস্ত্রসম্বন্ধে কথঞ্চিৎ আলোচনা করিবার অধিকার অনেকেরই জন্মিয়াছে। চন্দ্রনাথবাবুর মত সত্য কি মিথ্যা তাহা সাহস করিয়া বলিতে পারি না, কিন্তু এটুকু বলিতে পারি যে, চন্দ্রনাথবাবু তাঁহার মত ভালোরূপ প্রমাণ করিতে পারেন নাই। তিনি যেমন দুই-একটি শ্লোক আপন মতের স্বাপক্ষ্যে উদ্ধৃত করিয়াছেন, আমিও তেমনই অনেকগুলি শ্লোক তাঁহার মতের বিপক্ষে উদ্ধৃত করিতে পারি। কিন্তু মনুসংহিতায় স্ত্রীনিন্দাবাচক যে-সকল শ্লোক আছে তাহা উদ্ধৃত করিতে লজ্জা ও কষ্ট বোধ হয়। যাঁহারা জানিতে চাহেন তাঁহারা মনুসংহিতার নবম অধ্যায়ে চতুর্দশ পঞ্চদশ ও ষোড়শ শ্লোক পাঠ করিবেন, আমি কেবল সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শ্লোক এইখানে পাঠ করি।

---

[১] এইখানে বলা আবশ্যক, চন্দ্রনাথবাবু যখন বিবাহ সম্বন্ধে তাঁহার প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন তখন এ বিষয়ে আন্দোলন কিছুই ছিল না। সুতরাং বিবাহের সমস্ত দিক আলোচনার তেমন আবশ্যক ছিল না। তখন সহৃদয় কল্পনার দ্বারা নীত হইয়া হিন্দুবিবাহের কোনো একরূপ বিশেষ ব্যাখ্যা করা আশ্চর্য নহে; ইহাতে সাহিত্যের অধিকার আছে। কিন্তু আজকাল বিষয়টি যেরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে ইহাকে কেবল সাহিত্যের হিসাবে দেখিলে আর চলে না। এইজন্য সাহিত্যের কল্পনাপূর্ণ ভাষা ও ভাবকে অনুসন্ধান ও যুক্তির দ্বারা নির্মমভাবে ভাঙিয়া দেখিতে হইতেছে। বর্তমান আন্দোলন যদি চন্দ্রনাথবাবু পূর্ব হইতে জানিতে পারিতেন তবে তাঁহার প্রবন্ধ আর-একরূপ হইত। তাহা হইলে তাঁহার প্রবন্ধে সাহিত্যরস অপেক্ষাকৃত অল্প থাকিত এবং তিনি তাঁহার বিষয়টিকে একমাত্র যুক্তির সাহায্যে দুর্গম পথের মধ্য দিয়া অতি সাবধানে লইয়া যাইতেন। তিনি যে বিবাহের কথা বলিয়াছেন তাহা সমাজের কোনো কাল্পনিক অবস্থায় ঘটিলেও ঘটিতে পারিত, কিন্তু আজকাল যে আন্দোলন উঠিয়াছে তাহা ভালোমন্দ পরিপূর্ণ সমাজের প্রাত্যহিক বিবাহ লইয়া কিন্তু তাঁহার উক্ত সাহিত্য-প্রবন্ধের ভাষা লইয়া আজকাল সকলেই কার্যস্থলে ব্যবহার করিতেছেন, সুতরাং কঠিন যুক্তির দ্বারা তাঁহার প্রবন্ধ সমালোচনা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। ইহাতে চন্দ্রনাথবাবুর দোষ নাই এবং আমারও দোষ নাই— ঘটনাক্রমেই এইরূপ হইয়া পড়িল।

শয্যাসনমলংকারং কামং ক্রোধমনার্জবং
দ্রোহভাবং কুচর্যাঞ্চ স্ত্রীভ্যো মনুরকল্পয়ৎ।

শয্যা, আসন, অলংকার, কাম, ক্রোধ, কুটিলতা, পরহিংসা ও কুৎসিত আচার স্ত্রীলোক হইতে হয় ইহা মনু কল্পনা করিয়াছেন।

নাস্তি স্ত্রীণাং ক্রিয়া মন্ত্রৈরিতি ধর্মোব্যবস্থিতঃ
নিরিন্দ্রিয়াহমন্ত্রাশ্চ স্ত্রিয়োহনৃতমিতি স্থিতিঃ।

যেহেতুক স্ত্রীলোকের মন্ত্রদ্বারা কোনো ক্রিয়া নাই ধর্মের এইরূপ ব্যবস্থা, অতএব ধর্মজ্ঞানহীন মন্ত্রহীন স্ত্রীগণ অনৃত, মিথ্যা পদার্থ।

এ-সকল শ্লোকের দ্বারা স্ত্রীলোকের সম্মান কিছুমাত্র প্রকাশ পায় না। চন্দ্রনাথবাবু তাঁহার প্রবন্ধের একস্থলে হিন্দুবিবাহের সহিত কোম্‌তের মতের তুলনা করিয়াছেন। হিন্দুশাস্ত্র সম্বন্ধে আমার জ্ঞান যতদূর কোম্‌ৎশাস্ত্র সম্বন্ধে তাহা অপেক্ষাও অনেক অল্প, কিন্তু চন্দ্রনাথবাবুই এককথায় স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে কোম্‌তের মত ব্যক্ত করিয়াছেন। সেই স্থানটি উদ্ধৃত করি :

বিবাহের উদ্দেশ্য ও আবশ্যকতা সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্রকারদিগের মত যে কতদূর পাকা তাহা এতদিনের পর য়ুরোপে কেবল কোম্‌তের শিষ্যেরা কিয়ৎপরিমাণে বুঝিতে সক্ষম হইয়াছেন। কোম্‌ৎ মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছেন যে, ধর্মপ্রবৃত্তি এবং হৃদয়ের গুণসম্বন্ধে স্ত্রী পুরুষ অপেক্ষা অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ এবং সেইজন্য স্ত্রীর সাহায্য ব্যতিরেকে পুরুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবন পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না।

বলা বাহুল্য কোম্‌ৎ মুক্তকণ্ঠে যাহা বলিয়াছেন মনু মুক্তকণ্ঠে ঠিক তাহা বলেন নাই। মহাভারতে ভীষ্ম ও যুধিষ্ঠিরও মুক্তকণ্ঠে কোম্‌তের মত সমর্থন করেন নাই। অনুশাসনপর্বে অষ্টত্রিংশত্তম অধ্যায়ে স্ত্রীচরিত্র সম্বন্ধে ভীষ্ম ও যুধিষ্ঠিরে যে-কথোপকথন হইয়াছে, বর্তমান সমাজে তাহার সমগ্র ব্যক্ত করিবার যোগ্য নহে। অতএব তাহার স্থানে স্থানে পাঠ করি। কালীসিংহ কর্তৃক অনুবাদিত মহাভারত আমার অবলম্বন।

কামিনীগণ সৎকুলসম্ভূত রূপসম্পন্ন ও সধবা হইলেও স্বধর্ম পরিত্যাগ করে। উহাদের অপেক্ষা পাপপরায়ণ আর কেহই নাই। উহারা সকল দোষের আকর।

উহাদের অন্তঃকরণে কিছুমাত্র ধর্মভয় নাই।

তুলাদণ্ডের একদিকে যম, বায়ু, মৃত্যু, পাতাল, বাড়বানল, ক্ষুরধার, বিষ, সর্প ও বহ্নি এবং অপরদিকে স্ত্রীজাতিরে সংস্থাপন করিলে স্ত্রীজাতি কখনই ভয়ানকত্বে উহাদের অপেক্ষা ন্যূন হইবে না। বিধাতা যে-সময় সৃষ্টিকার্যে প্রবৃত্ত হইয়া মহাভূতসমুদয় ও স্ত্রীপুরুষের সৃষ্টি করেন, সেই সময়েই স্ত্রীদিগের দোষের সৃষ্টি করিয়াছেন।

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির বলিতেছেন :

পুরুষে রোদন করিলে উহারা কপটে রোদন এবং হাস্য করিলে উহারা কপটে হাস্য করিয়া থাকে।

> কামিনীরা সত্যকে মিথ্যা ও মিথ্যারে সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে পারে। ইত্যাদি ইত্যাদি।

স্ত্রীলোকের চরিত্র সম্বন্ধে যাহাদের এরূপ বিশ্বাস তাহারা স্ত্রীলোককে যথার্থ সম্মান করিতে অক্ষম, বিশেষত স্ত্রীলোক সম্বন্ধে কোম্‌ৎ-শিষ্যগণের মতের সহিত তাহাদের মতের ঐক্য হইবার সম্ভাবনা নাই।

বিবাহ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে প্রথমত স্ত্রীলোকের ও পুরুষের অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হয়। চন্দ্রনাথবাবু শাস্ত্র উদ্ধৃত করিয়া বলিতেছেন— প্রাচীন সমাজে স্ত্রীলোকের সবিশেষ সম্মান ছিল, কিন্তু আমি দেখিতেছি, শাস্ত্রে স্ত্রীলোকের অসম্মানেরও প্রমাণ আছে। অতএব এ বিষয়ে এখনও নিঃসংশয়ে কিছু বলিবার সময় হয় নাই।

দ্বিতীয় দ্রষ্টব্য বিষয় এই যে, বিবাহিতা স্ত্রীলোকের অবস্থা সেকালে কিরূপ ছিল। চন্দ্রনাথবাবু রঘুনন্দনের এক বচন উদ্ধৃত করিয়া এবং তাহার অত্যন্ত সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে—

> হিন্দুভার্যা পুণ্য বল, পবিত্রতা বল, অলৌকিকতা বল, দেবতা বল, মুক্তি বল, সবই।

সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন আমাদের দেশে সর্বসাধারণের সংস্কার এই যে, স্বামীই স্ত্রীর দেবতা, কিন্তু স্ত্রী যে স্বামীর দেবতা ইহা ইতিপূর্বে শুনা যায় নাই। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির ধর্মপত্নী দ্রৌপদীকে দ্যূতক্রীড়ায় পণ স্বরূপে দান করিয়াছেন। কেহ কেহ বলিবেন, তৎপূর্বে তিনি আপনাকে দান করিয়াছিলেন। তাহার উত্তর এই যে, আপনাকে সম্মান করিতে কেহ বাধ্য নহে, কিন্তু মান্য ব্যক্তিকে সম্মান করিতে সকলে বাধ্য। দ্রৌপদী যদি সত্যই যুধিষ্ঠিরের মান্যা হইতেন, দেবতা হইতেন, তবে যুধিষ্ঠির কখনই তাঁহাকে দ্যূতের পণ্যস্বরূপ দান করিতে পারিতেন না। প্রকাশ্য সভায় যখন দ্রৌপদী যৎপরোনাস্তি অপমানিত হইয়াছিলেন তখন ভীষ্ম-দ্রোণ-ধৃতরাষ্ট্রপ্রমুখ সভাস্থগণ কে স্ত্রীসম্মান রক্ষা করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন! ওই দ্রৌপদীই যখন প্রকাশ্যভাবে বিরাটসভায় কীচকের পদাঘাত সহ্য করেন তখন সমস্ত সভাস্থলে কেহই স্ত্রীসম্মান রক্ষা করে নাই। মনুসংহিতার দণ্ডবিধির মধ্যে এক স্থলে আছে :

> ভার্যা পুত্রশ্চ দাসশ্চ শিষ্যোভ্রাতা চ সোদরঃ
> প্রাপ্তাপরাধাস্তাড্যাঃ স্যুরজ্জা-বেণুদলেন বা।

> স্ত্রী, পুত্র, দাস, শিষ্য ও সোদর কনিষ্ঠভ্রাতা যদি অপরাধ করে, সূক্ষ্ম রজ্জু অথবা বেণুদল দ্বারা শাসনার্থ তাড়ন করিবে।

দেবতার প্রতি এরূপ রজ্জু ও বেণুদলের তাড়নব্যবস্থা হইতে পারে না। স্বামীও স্ত্রীর দেবতা, কিন্তু স্বামীদেবতা স্ত্রীর হস্ত হইতে এরূপ অর্ঘ্য শাস্ত্রবিধি অনুসারে কখনও

গ্রহণ করেন নাই ; তবে শাস্ত্রের অনভিমতে সম্মার্জনীপ্রয়োগ প্রভৃতির উল্লেখ এখানে আমি করিতে চাহি না। যাহা হউক আমার এবং বোধ করি সাধারণের বিশ্বাস এই যে, হিন্দু স্ত্রী কোনোকালে হিন্দু স্বামীর দেবতা ছিলেন না।. অতএব এ স্থলে হিন্দুশাস্ত্রের সহিত কিঞ্চিৎ বলপূর্বক কোম্‌ৎশাস্ত্রের অসবর্ণ মিলন সংঘটন করা হইয়াছে।

বিবাহবিশেষ আলোচনায় তৃতীয় দ্রষ্টব্য এই যে, স্বামীস্ত্রীর দাম্পত্যবন্ধন কিরূপ ঘনিষ্ঠ। চন্দ্রনাথবাবু বলেন, হিন্দুবিবাহে যেরূপ একীকরণ দেখা যায় এরূপ অন্য কোনো জাতির বিবাহে দেখা যায় না। এ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। এক স্বামী ও এক স্ত্রীর একীকরণ বিবাহের উচ্চতম আদর্শ। সে-আদর্শ আমাদের দেশে যদি জাজ্বল্যমান থাকিত তবে এ দেশে বহু বিবাহ কিরূপে সম্ভব হইত। মহাভারত পাঠে জানা যায় শ্রীকৃষ্ণের যোড়শসহস্র মহিষী ছিল। তখনকার অন্যান্য রাজপরিবারেও বহুবিবাহদৃষ্টান্তের অসদ্ভাব ছিল না। ব্রাহ্মণ ঋষিদিগেরও একাধিক পত্নী দেখা যাইত। অন্য ঋষির কথা দূরে যাউক, বশিষ্ঠের দৃষ্টান্ত দেখো। অরুন্ধতীই যে তাঁহার একমাত্র স্ত্রী তাহা নহে, অক্ষমালা নামে এক অধম জাতীয়া নারী তাঁহার অপর স্ত্রী ছিলেন। এরূপ ব্যবস্থাকে ন্যায্যমতে একীকরণ বলা উচিত হয় না ; ইহাকে পঞ্চীকরণ, ষড়ীকরণ, সহস্রীকরণ বলিলেও দোষ নাই। কেহ কেহ বলিবেন, স্ত্রী যতগুলিই থাক্‌ না কেন, সকলগুলিই স্বামীর সহিত মিশিয়া একেবারে এক হইয়া যাইবে, ইহাই হিন্দুবিবাহের গৌরব। স্ত্রী যত অধিক হয় বিবাহের গৌরবও বোধ করি তত অধিক, কারণ একীকরণ ততই গুরুতর। কিন্তু একীকরণ বলিতে বোধ করি এই বুঝায় যে, প্রেমবিনিময়বশত স্বামীস্ত্রীর হৃদয়মনের সর্বাঙ্গীণ ঐক্য ; এবং এরূপ ঐক্য যে দাম্পত্যবন্ধনের পবিত্র আদর্শ তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। কিন্তু প্রেমপ্রভাবে হৃদয়ের ঐক্য যেখানে মুখ্য আদর্শ সেখানে বহুদারপরিগ্রহ সম্ভব হইতে পারে না। স্ত্রী ও পুরুষের পরিপূর্ণ মিলন যদি হিন্দুবিবাহের যথার্থ প্রাণ হইত তবে এ দেশে কৌলিন্য বিবাহ কোনোমতে স্থান পাইত না। বিবাহের যত কিছু আদর্শের উচ্চতা সে কেবলমাত্র পত্নীর বেলায়, পতিকে সে-আদর্শ স্পর্শ করিতেছে না। কিন্তু ইহা কে অস্বীকার করিতে পারেন যে, বিবাহ পতি পত্নী উভয়ে মিলিয়া হয়। এ সম্বন্ধে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার আশ্চর্য উত্তর দিয়াছেন। হিন্দু বিধবার ন্যায় বিপত্নীক পুরুষও যে কেন নিষ্কাম ধর্ম অবলম্বন করেন না, তৎসম্বন্ধে তিনি বলেন :

> হিন্দু সাম্যবাদ মানেন না ; হিন্দু মানেন অনুপাতবাদ। ক খ যখন সমান নহে তখন তাহারা সমান আসন পাইবেও না ; ক যেমন তেমনই ক পাইবে, খ যেমন তেমনই খ পাইবে। ক খ মধ্যে যেরূপ সম্বন্ধ, ক-র ও খ-র স্বত্বাধিকার মধ্যে সেইরূপ অনুপাত হইবে। হিন্দু এই অনুপাতবাদী। হিন্দু স্ত্রীপুরুষের সাম্য স্বীকার করে না ; কাজেই হিন্দু স্ত্রী পুরুষ মধ্যে অবস্থার সাম্য ব্যবস্থা করে না।

এ কথা যদি বল তবে কোথায় গিয়া দাঁড়াইতে হয় বলা যায় না। তুমি বলিতেছ নিষ্কামধর্মের পবিত্র মহত্ত্ব আছে; অতএব স্বামীর মৃত্যুর পর কামনা বিসর্জন দিয়া সংসারধর্ম পালন করিবার যে-অবসর পাওয়া যায়, তাহা অতি পবিত্র অবসর, সে-অবসর অবহেলা করা উচিত নহে। এখন তোমার সাম্য বৈষম্যের দোহাই দিয়া জিজ্ঞাসা করি, নিষ্কামধর্মও কি হিন্দুদের ন্যায় অনুপাতবাদ মানিয়া চলেন। পুরুষের পক্ষেও নিষ্কামধর্ম কি পবিত্র নহে, অতএব কষ্টসাধ্য হইলেও হিন্দুবিবাহের পরম একীকরণ এবং আধ্যাত্মিক মিলনের দ্বারা অনিবার্যবেগে চালিত হইয়া স্ত্রীবিয়োগে পুরুষেরও নিষ্কামধর্মব্রত গ্রহণ করা কেন অবশ্যকর্তব্য বলিয়া স্থির হয় নাই। তাহার বেলায় ক খ ও অনুপাতবাদের হেঁয়ালিধূম বিস্তার করিবার তাৎপর্য কী। পবিত্র একনিষ্ঠ অচল দাম্পত্যপ্রেম পুরুষেরও মহত্ত্বের লক্ষণ ও হৃদয়ের উন্নতির অন্যতম কারণ, তাহা কোন্ অনুপাতবাদী অস্বীকার করিতে পারেন।

তবে এমন যদি বল যে, আধ্যাত্মিকতা ও পবিত্রতার কথা ছাড়িয়া দাও, হিন্দুবিবাহ সাংসারিক সুবিধার জন্য, তবে সে এক স্বতন্ত্র কথা। তাহা হইলে অনুপাতবাদের হিসাব কাজে লাগিতে পারে। অক্ষয়বাবু বলেন:

> অপত্যোৎপাদনের জন্যই বিবাহের প্রয়োজন, এ সিদ্ধান্ত বিবাহের অতি নিকৃষ্ট ভাগ, অতি সামান্য ভাগ দেখিয়াই হইয়াছে। হিন্দুবিবাহের অতি উচ্চতর, অতি প্রশস্ততর, অতি পবিত্র, সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য আছে; সকল ব্যাপারেই হিন্দুর আধ্যাত্মিক দিকে দৃষ্টি প্রখরা। হিন্দুর বিবাহব্যাপারেও আধ্যাত্মিক ভাবটা উজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত।

অপত্যোৎপাদনের জন্যই বিবাহের প্রয়োজনীয়তা যে বিবাহের অতি নিকৃষ্টভাগ, অতি সামান্যভাগ এরূপ আমার বিশ্বাস নহে। এবং প্রাচীন হিন্দুরা যে ইহাকে নিকৃষ্ট ও সামান্য জ্ঞান করিতেন, আমার তাহা বোধ হয় না। শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য 'ভারতবর্ষের ধর্মপ্রণালী' নামক প্রবন্ধে বলিয়াছেন:

> মনু প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্রকারেরা যাহা কিছু উপদেশ করিয়াছেন, সমাজই সে সকলের কেন্দ্রস্থান; সমাজের কল্যাণ লক্ষ্য করিয়াই সেই-সকল ব্যবস্থার সৃষ্টি করা হইয়াছে।

অতএব সমাজের কল্যাণের প্রতি যদি দৃষ্টিপাত করা যায় তবে অপত্যোৎপাদন বিবাহের নিতান্ত সামান্য ও নিকৃষ্ট উদ্দেশ্য কেহই বলিবেন না। সুস্থকায় সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ প্রফুল্লচিত্ত সুচরিত্র সন্তান উৎপাদন অপেক্ষা সমাজের মঙ্গল আর কিসে সাধিত হইতে পারে। পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা, এ কথা আমাদের সাধারণের মধ্যে প্রচলিত। মনু কহিতেছেন:

> প্রজনার্থং মহাভাগাঃ পূজার্হাগৃহদীপ্তয়ঃ।

সন্তান উৎপাদনের জন্য স্ত্রীগণ বহুকল্যাণভাগিনী পূজনীয়া ও গৃহের শোভাজনক হয়েন।

উৎপাদনমপত্যস্য জাতস্য পরিপালনং
প্রত্যহং লোকযাত্রায়াঃ প্রত্যক্ষং স্ত্রীনিবন্ধনং।

স্ত্রীগণ অপত্যের উৎপাদন, অপত্যের পালন ও প্রত্যহ-লোকযাত্রার প্রত্যক্ষ নিদান হয়েন।

যেখানে মনু বলিয়াছেন:

যত্র নার্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।

সেইখানেই বলিয়াছেন:

যদিহি স্ত্রী ন রোচেত পুমাংসং ন প্রমোদয়েৎ।
অপ্রমোদাৎ পুনঃ পুংসঃ প্রজনং ন প্রবর্ততে।

নারী যদি দীপ্তি প্রাপ্ত না হন তাহা হইলে তিনি স্বামীর হর্ষোৎপাদন করিতে পারেন না। স্বামীর হর্ষোৎপাদন করিতে না পারিলে সন্তানোৎপাদন সম্পন্ন হয় না।

এই-সমস্ত দেখিয়া মনে হইতেছে সংসারযাত্রানির্বাহই হিন্দুবিবাহের মুখ্য উদ্দেশ্য। এবং কেবল সেই উদ্দেশ্যেই যতটা একীকরণ সাংসারিক হিসাবে আবশ্যক তাহার প্রতি হিন্দুধর্মের বিশেষ মনোযোগ। অনেক সময়ে সংসারযাত্রানির্বাহের সহায়তা-জন্যই পুরুষ দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করিতে বাধ্য। কারণ, অপত্য উৎপাদন যখন বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্য তখন বন্ধ্যা স্ত্রী সত্ত্বে দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ শাস্ত্রমতে অন্যায় হইতে পারে না। এমন-কি, প্রাচীনকালে অশক্ত স্বামীর নিয়োগানুসারে অথবা নিরপত্য স্বামীর মৃত্যুতে দেবরের দ্বারা সন্তানোৎপাদন স্ত্রীলোকের পক্ষে ধর্মহানিজনক ছিল না। মহাভারতে ইহার অনেক উদাহরণ আছে।

অতএব সন্তান-উৎপাদন, সন্তানপালন ও লোকযাত্রানির্বাহ যদি হিন্দুবিবাহের মুখ্য উদ্দেশ্য হয় তবে দেখা যাইতেছে, উক্ত কর্তব্যসাধনের পক্ষে স্ত্রীলোকের একপতিনিষ্ঠ হওয়ার যত আবশ্যক পুরুষের পক্ষে একপত্নীনিষ্ঠ হইবার তেমন আবশ্যক নাই। কারণ, বহুপতি থাকিলে সন্তানপালন ও লোকযাত্রার বিশেষ ব্যাঘাত ঘটে, কিন্তু বহুপত্নীতে সে-ব্যাঘাত না ঘটিতেও পারে। স্ত্রীর মৃত্যুর পরে দ্বিতীয়বার বিবাহ সংসারযাত্রার সুবিধাজনক হইতে পারে, কিন্তু বিধবার দ্বিতীয়বার বিবাহ অধিকাংশস্থলে সংসারে বিশৃঙ্খলা আনয়ন করে। কারণ, বিধবার যদি সন্তানাদি থাকে তবে সেই সন্তানদিগকে হয় এক কুল হইতে কুলান্তরে লইয়া যাইতে হয়, নচেৎ তাহাদিগকে মাতৃহীন হইয়া থাকিতে হয়। সন্তানাদি না থাকিলেও বিধবা রমণীকে পুরাতন ভর্তৃকুল হইতে নূতন ভর্তৃকুলে লইয়া যাওয়া নানাকারণে সমাজের অসুখ ও অসুবিধা-জনক; অতএব যখন সাংসারিক অসুবিধার কথা হইতেছে, কোনো প্রকার

আধ্যাত্মিকতার কথা হইতেছে না, তখন এ স্থলে অনুপাতবাদ গ্রাহ্য। এইজন্য মনু পুরুষের দ্বিতীয়বার বিবাহের স্পষ্ট বিধান দিয়াছেন :

ভার্যায়ৈ পূর্বমারিণ্যৈ দত্ত্বাগ্নীনন্ত্যকর্মণি
পুনর্দারক্রিয়াং কুর্যাৎ পুনরাধানমেবচ।

পূর্বমৃতা ভার্যার দাহকর্ম সমাধা করিয়া পুরুষ পুনর্বার স্ত্রী ও শ্রৌত অগ্নি গ্রহণ করিবেন।

এখানে সংসারধর্মের প্রতিই মনুর লক্ষ দেখা যাইতেছে। আধ্যাত্মিক মিলনের প্রতি অনুরাগ ততটা প্রকাশ পাইতেছে না। বিবাহের আধ্যাত্মিকতা কাহাকে বলে। সমস্ত বিরহবিচ্ছেদ-অবস্থান্তর, সমস্ত অভাবদুঃখক্লেশ, এমন-কি কদর্যতা ও অবমাননা অতিক্রম করিয়াও ব্যক্তিবিশেষ বা ভাববিশেষের প্রতি ঐকান্তিক নিষ্ঠার যে একটি পবিত্র উজ্জ্বল সৌন্দর্য আছে, তাহাকেই যদি আধ্যাত্মিকতা বল এবং যদি বল সেই আধ্যাত্মিকতাই হিন্দুবিবাহের মুখ্য অবলম্বন এবং সন্তানোৎপাদন প্রভৃতি সামাজিক কর্তব্য তাহার গৌণ উদ্দেশ্য, তাহার সামান্য ও নিকৃষ্ট অংশ তবে কোনো যুক্তি অনুসারেই বহুবিবাহ ও স্ত্রীবিয়োগান্তে দ্বিতীয় বিবাহ আমাদের সমাজে স্থান পাইতে পারিত না। কারণ পূর্বেই বলিয়াছি বিবাহ বলিতে স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়েরই পরস্পরের সম্মিলন বুঝায়—বিবাহ লইয়া সম্প্রতি এত আন্দোলন পড়িয়াছে এবং বুদ্ধির প্রভাবে অনেকে অনেক নূতন কথাও বলিয়াছেন, কিন্তু এ পর্যন্ত এ সম্বন্ধে কাহারও মতভেদ শুনা যায় নাই।

অনেকে হিন্দুবিবাহের পবিত্র একীকরণপ্রসঙ্গে ইংরেজি ডিভোর্স প্রথার উল্লেখ করিয়া থাকেন। ডিভোর্স প্রথার ভালোমন্দ বিচার করিতে চাহি না, কিন্তু সত্যের অনুরোধে ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, আমাদের দেশে ডিভোর্স প্রথা নাই বলিয়া যে আমাদের বিবাহের একীকরণতা বিশেষ সপ্রমাণ হইতেছে তাহা বলিতে পারি না। যে দেশে শাস্ত্র ও রাজনিয়মে একাধিক বিবাহ হইতেই পারে না সেখানে ডিভোর্স প্রথা দূষণীয় বলা যায় না। স্ত্রী অসতী হইলে আমরা ইচ্ছামতো তাহাকে ত্যাগ করিয়া যত ইচ্ছা বিবাহ করিতে পারি। স্বামী ব্যভিচারপরায়ণ হইলেও স্বামীকে ত্যাগ করা স্ত্রীর পক্ষে নিষিদ্ধ। স্বামী যখন প্রকাশ্যভাবে অন্যস্ত্রী অথবা বারস্ত্রীতে আসক্ত হইয়া পবিত্র একীকরণের মস্তকের উপর পঙ্কিল পাদুকাসমেত দুই চরণ উত্থাপন করেন তখন অরণ্যে রোদন ছাড়া স্ত্রীর আর কোনো অধিকার দেওয়া হয় নাই। যদি জানা যাইত অন্যদেশের তুলনায় আমাদের দেশে বিবাহিত পুরুষের অধিকাংশই বারস্ত্রীসক্ত নহে তবে হিন্দুবিবাহের পবিত্র প্রভাব সম্বন্ধে সন্দেহমোচন হইত। কিন্তু যখন পুরুষ যথেচ্ছ বিবাহ ও ব্যভিচার করিতে পারে এবং স্ত্রীলোকের স্বামীত্যাগের পথ কঠিন নিয়মের দ্বারা রুদ্ধ তখন এ প্রসঙ্গে কোনো তুলনাই উঠিতে পারে না।

আমাদের দেশে বিবাহিত পুরুষদের মধ্যে দাম্পত্যনীতি সম্বন্ধে যথেচ্ছাচার যে যথেষ্ট প্রচলিত আছে তাহা বোধ করি কাহাকেও বলিতে হইবে না। বৃদ্ধ লোকেরা অবগত আছেন, কিছুকাল পূর্বে অন্যান্য নানা আয়োজনের মধ্যে বেশ্যা রাখাও বড়োমানুষির এক অঙ্গ ছিল। এখনও দেখা যায় দেশের অনেক খ্যাতনামা লোক প্রকাশ্যে রাজপথে গাড়ি করিয়া বেশ্যা লইয়া যাইতে এবং ধুমধাম করিয়া বেশ্যা প্রতিপালন করিতে কিছুমাত্র সংকোচ বোধ করেন না এবং সমাজও সে-বিষয়ে তাঁহাদিগকে লাঞ্ছনা করে না। সমাজের অনেক তুচ্ছ নিয়মটুকু লঙ্ঘন করিলে যে-দায়ে পড়িতে হয় ইহাতে ততটুকু দায়ও নাই। অতএব ডিভোর্স প্রথা আমাদের মধ্যে প্রচলিত নাই বলিয়াই ইহা বলা যায় না যে, আমাদের দেশে বিবাহের পবিত্রতা ও আধ্যাত্মিক একীকরণতা রক্ষার প্রতি সমাজের বিশেষ মনোযোগ আছে।

যাহা হউক আমার বক্তব্য এই যে, হিন্দুবিবাহের যথার্থ যাহা মর্ম ইতিহাস হইতে তাহা প্রমাণ না করিয়া যদি ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবে আপন মনের মতো এক নূতন আদর্শ গড়িয়া তাহাকে পুরাতন বলিয়া প্রচার করিতে চেষ্টা করি, তবে সত্যপথ হইতে ভ্রষ্ট হইতে হয়। আমরা ইংরেজি শিক্ষা হইতে অনেক sentiment প্রাপ্ত হইয়াছি (sentiment শব্দের বাংলা আমার মনে আসিতেছে না) অনেক দেশানুরাগী ব্যক্তি সেইগুলিকে দেশীয় ও প্রাচীন বলিয়া প্রমাণ করিবার জন্য বিশেষ উৎসুক হইয়াছেন, এবং তাঁহারা বিরোধী পক্ষকে বিজাতীয় শিক্ষায় বিকৃতমস্তিক বলিয়া উপহাস করেন। কেবল sentiment নহে, অনেক Evolution, Natural Selection, Magnetism প্রভৃতি নব্য বিজ্ঞানতত্ত্বসকলও প্রাচীন ঋষিদের জটাজালের মধ্য হইতে সূক্ষ্মদৃষ্টিতে বাছিয়া বাহির করিতেছেন। কিন্তু সাপুড়ে অনেক সময়ে নিরীহ দর্শকের ক্ষুদ্র নাসাবিবর হইতে একটা বৃহৎ সাপ বাহির করে বলিয়াই যে উক্ত নাসাবিবর যথার্থ সেই সাপের আশ্রয়স্থল বলিয়া বিশ্বাস করিতে হইবে এমন নহে। সাপ তাহার বৃহৎ ঝুলিটার মধ্যেই ছিল। sentiment-সকলও আমাদের ঝুলিটার মধ্যেই আছে, আমরা নানা কৌশলে ও অনেক বাঁশি বাজাইয়া সেগুলি পুঁথির মধ্য হইতেই যেন বাহির করিলাম এইরূপ অন্যকে এবং আপনাকে বুঝাইতেছি। হিন্দুবিবাহের মধ্যে আমরা যতটা sentiment পুরিয়াছি তাহার কতটা Comte-র, কতটা ইংরেজি কাব্যসাহিত্যের, কতটা খৃষ্টধর্মের 'স্বর্গীয় পবিত্রতা' নামক শব্দ ও ভাব বিশেষের এবং কতটা প্রাচীন হিন্দুর এবং কতটা আধুনিক আচারের, তাহা বলা দুঃসাধ্য। সাংসারিকতাকে প্রাচীন হিন্দুরা হেয়জ্ঞান করিতেন না, কিন্তু খৃষ্টানেরা করেন। অতএব, পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা —এ কথা স্বীকার করা

হিন্দুর পক্ষে লজ্জার কারণ নহে, খৃষ্টানের পক্ষে বটে। হিন্দু স্ত্রীকে যে পতিপ্রাণা হইতে হইবে সেও সাংসারিক সুবিধার জন্য। পুত্রার্থেই বিবাহ কর বা যে কারণেই কর না কেন, স্ত্রী যদি পতিপ্রাণা না হয় তবে অশেষ সাংসারিক অসুখের কারণ হয়, এবং অনেক সময়ে বিবাহের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইয়া যায়, অতএব সাংসারিক শৃঙ্খলার জন্যই স্ত্রীর পতিপ্রাণা হওয়া আবশ্যক। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে স্বামীর পত্নীগতপ্রাণ হইবার এত আবশ্যক নাই যে তাহার জন্য ধরাবাঁধা করিতে হয়। এইজন্যই শাস্ত্রে বলে, সা ভার্যা যা পতিপ্রাণা, সা ভার্যা যা প্রজাবতী— সেই ভার্যা যে পতিপ্রাণা। কিন্তু ইহা বলিয়াই শেষ হয় নাই— তাহার উপরে বলা হইয়াছে, সেই ভার্যা যে সন্তানবতী। আধ্যাত্মিক পবিত্রতা যতই থাক্‌, সন্তান না হইলেই হিন্দুবিবাহ ব্যর্থ।

এইখানে আমার মনে একটি আশঙ্কা জন্মিতেছে। যে-শব্দের পরিষ্কার অর্থ নাই অথবা নির্দিষ্ট হয় নাই তাহা ইচ্ছামতো নানাস্থানে নানা অর্থে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। ইহাতে সে-শব্দের উপযোগিতা বাড়ে কি কমে তাহা বিচারের যোগ্য। সকলেই জানেন আমাদের বাংলাভাষায় 'ইয়ে' নামক সর্বভুক্‌ সর্বনাম শব্দ আছে ; শব্দ বা ভাবের অভাব হইলেই তৎক্ষণাৎ 'ইয়ে' আসিয়া ভাষার শূন্যতা পূর্ণ করিয়া দেয়। এই সুবিধা থাকাতে আমাদের মানসিক আলস্য ও ভাবপ্রকাশের অক্ষমতা সাহায্য-প্রাপ্ত হইতেছে। Magnetism-এর স্বরূপ সম্পূর্ণ অবগত না থাকাতে উক্ত শব্দকে আশ্রয় করিয়া অনেক বৈজ্ঞানিক উপকথা সমাজে প্রচলিত হয়। Magnetism-এর কুহেলিকাময় ছদ্মবেশে আবৃত হইয়া আমাদের আর্যশাস্ত্রের অনেক প্রমাণহীন উক্তি ও অর্থহীন আচার বিজ্ঞানের সহিত এক পংক্তিতে আসন পাইবার মন্ত্রণা করে। সম্প্রতি Psychic Force নামক আরেকটি অজ্ঞাতকুলশীল শব্দ Magnetism-এর পদ অধিকার করিবার চেষ্টা করিতেছে। যতদিন না স্বরূপ নির্দিষ্ট হইয়া তাহার মুক্তিলাভ হয় ততদিন সে প্রদোষের অন্ধকারে জীর্ণমতের ভগ্নভিত্তির মধ্যে ও দেবতাহীন প্রাচীন দেবমন্দিরের ভগ্নাবশেষে প্রেতের ন্যায় সঞ্চরণ করিয়া বেড়াইবে। অতএব মুক্তির উদ্দেশেই কথার অর্থ নির্দেশ করিয়া দেওয়া আবশ্যক। বিবাহ 'আধ্যাত্মিক' বলিতে কী বুঝায়। যদি কেহ বলেন যে, সাংসারিক কার্য সুশৃঙ্খলে নির্বাহ করিবার অভিপ্রায়ে বিবাহ করার নামই আধ্যাত্মিক বিবাহ, কেবলমাত্র নিজের সুখ নহে সংসারের সুখের প্রতি লক্ষ করিয়া বিবাহ করাই আধ্যাত্মিকতা, তবে বোধ হয় আধ্যাত্মিক শব্দের প্রতি অত্যাচার করা হয়। পার্ল্যামেণ্ট-সভায় সমস্ত ইংলণ্ড এবং তাহার অধীনস্থ দেশের সুখ সম্পদ সৌভাগ্য নিধারিত হয়, কিন্তু পার্ল্যামেণ্ট-সভা কি আধ্যাত্মিকতার আদর্শস্বরূপ গণ্য হইতে পারে। যদি বল পার্ল্যামেণ্ট-সভার সহিত

ধর্মের কোনো যোগ নাই তাহা ঠিক নহে। দেশের Church যাহাতে যথানিয়মে অব্যাহতরূপে বজায় থাকে পার্ল্যামেণ্টকে তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হয়। উক্ত সভার প্রত্যেক সভ্যকে ঈশ্বরে বিশ্বাস স্বীকার করিতে হয় এবং ঈশ্বরের নামে শপথ গ্রহণ করিতে হয়। যদি বল, পার্ল্যামেণ্টের কার্যকে ইংরেজরা ধর্মকার্য বলিয়া মনে করেন না, কিন্তু বিবাহকে আমরা ধর্মকার্য বলিয়া মনে করি, অতএব আমাদের বিবাহ আধ্যাত্মিক,— তবে তৎসম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, আমাদের কোন্ কাজটা ধর্মের সহিত জড়িত নহে। সম্মুখযুদ্ধে নিহত হওয়া ক্ষত্রিয়ের ধর্ম ও পুণ্যের কারণ বলিয়া উক্ত হইয়াছে, এমন-কি, ক্রুরকর্মা দুর্যোধনকে যুধিষ্ঠির স্বর্গস্থ দেখিয়া যখন বিস্ময় ও ক্ষোভ প্রকাশ করিলেন তখন দেবগণ তাঁহাকে এই বলিয়া সান্ত্বনা করেন যে, ক্ষত্রিয় সম্মুখ যুদ্ধে নিহত হইয়া যে-ধর্ম উপার্জন করেন তাহারই প্রভাবে স্বর্গ প্রাপ্ত হন। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই, ক্ষত্রিয় দুর্যোধন যে-যুদ্ধ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন তাহাকে আধ্যাত্মিক যুদ্ধ বলিবে কি না। শরীররক্ষার্থে আহারব্যবহার সম্বন্ধে ধর্মের নামে শাস্ত্রে সহস্র অনুশাসন প্রচলিত আছে, তাহার সকলগুলিকে আধ্যাত্মিক বলা যায় কি না। শূদ্রকে শাস্ত্রজ্ঞান দেওয়া আমাদের ধর্মে নিষিদ্ধ, কিন্তু যদি অন্য-একজন ব্রাহ্মণ মাঝখানে থাকেন ও তাঁহাকে উপলক্ষ রাখিয়া শূদ্র শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করে তাহাতে অধর্ম নাই। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই শূদ্র শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করিলে তাহার আধ্যাত্মিকতার ব্যাঘাত হয় কি না, এবং ব্রাহ্মণ মধ্যবর্তী থাকিলেই সে ব্যাঘাত দূর হয় কি না। ধর্মের অঙ্গস্বরূপ নির্দিষ্ট হইলেও এ-সকল লৌকিক নিয়ম না আধ্যাত্মিক নিয়ম? যখন আমাদের সকল কার্যই ধর্মকার্য তখন ধর্মানুষ্ঠানমাত্রকে যদি আধ্যাত্মিকতা বল, তবে আধ্যাত্মিক বিবাহের বিশেষ উল্লেখ করিবার আবশ্যকতা নাই, তবে আমরা যাহাই করি না কেন আধ্যাত্মিকতার হাত এড়াইবার জো নাই।

যদি বল হিন্দু স্বামীস্ত্রীর সম্বন্ধ অনন্ত সম্বন্ধ, দেহের অবসানে স্বামীস্ত্রীর বিচ্ছেদ নাই এইজন্য তাহা আধ্যাত্মিক, তবে সে কথাও বিচার্য। কারণ হিন্দুশাস্ত্রে কর্মফলানুসারে জন্মান্তরপরিগ্রহ কল্পিত হইয়াছে। স্ত্রীপুরুষের মধ্যে জন্মজন্মান্তরসঞ্চিত কর্মফলের প্রভেদ আছেই, অতএব পরজন্মে পুনরায় উভয়ের দাম্পত্যবন্ধন দৈবক্রমে হইতেও পারে কিন্তু তাহা অবশ্যম্ভাবী নহে। আমাদের শাস্ত্রে জন্মান্তরের ন্যায় স্বর্গনরককল্পনাও আছে, কিন্তু সকল সময়ে স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই যে একত্রে স্বর্গ বা নরকে গতি হইবে তাহা নহে। যদি পুণ্যবলে উভয়েই স্বর্গে যায় তবে পুণ্যের তারতম্য অনুসারে লোকভেদ আছে, এবং পাপভেদে নরকেও সেইরূপ ব্যবস্থা। আমাদের শাস্ত্রে পাপপুণ্যের নিরতিশয় সূক্ষ্ম বিচারের কল্পনা আছে, এ স্থলে বিবাহের অনন্তকালস্থায়িত্ব সম্ভব

হয় কিরূপে। অতএব হিন্দুশাস্ত্রমতে সাধারণত ইহজীবনেই দাম্পত্যবন্ধনের সীমা, অতএব তাহাকে ইহলৌকিক অর্থাৎ সাংসারিক বলিতে আপত্তি কিসের। দাম্পত্যবন্ধনের ঐহিক সীমাসম্বন্ধে সাধারণের বিশ্বাস বদ্ধমূল। কুমারী যখন স্বামী প্রার্থনা করে তখন সে বলে, যেন রামের মতো বা মহাদেবের মতো স্বামী পাই। পূর্বজন্মের স্বামী এ জন্মেও আধ্যাত্মিক মিলনে বদ্ধ হইয়া তাহার অনুসরণ করিবে এ বিশ্বাস যদি কুমারীর থাকিত, তবে এ প্রার্থনা সে করিত না। বাল্মীকির রামায়ণে কী আছে স্মরণ নাই, কিন্তু সাধারণে প্রচলিত গান এবং উপাখ্যানে শুনা যায় সীতা রামকে বলিতেছেন, পরজন্মে যেন তোমার মতো স্বামী পাই— কিন্তু তোমাকেই পাই এ কথা কেন বলা হয় নাই।

অনেকে বলেন, অন্য দেশের বিবাহ চুক্তিমূলক, আমাদের দেশে ধর্মমূলক, অতএব তাহা আধ্যাত্মিক। কিন্তু তাঁহাদের এ কথাটাই অমূলক। য়ুরোপের ক্যাথলিক ধর্মশাস্ত্র বলে :

> Our divine Redeemer sanctified this holy state of matrimony, and from a natural and civil contract raised it to the dignity of a Sacrament. And St. Paul declared it to be a representative of that sacred union which Jesus Christ had formed with his spouse the Church.

ইহার মর্ম এই :

> বিবাহ পূর্বে প্রাকৃতিক ও সামাজিক চুক্তিমাত্র ছিল, কিন্তু যিশুখৃষ্ট ইহাকে উদ্ধার করিয়া মন্ত্রপূত পবিত্র সংস্কারমধ্যে গণ্য করিয়াছেন। ধর্মমণ্ডলীর সহিত দেবতার যে-পুণ্য মিলন সংঘটিত হইয়াছে বিবাহ সেই পুণ্য মিলনের সামাজিক প্রতীকস্বরূপ।

বিবাহসময়ে ক্যাথলিক স্ত্রী ঈশ্বরের নিকট যে-প্রার্থনা করেন তাহাও পাঠ করিলে য়ুরোপীয় দাম্পত্যের একীকরণতা সম্বন্ধে সন্দেহ দূর হইবে। অতএব অন্যদেশের বিবাহের তুলনায় হিন্দুবিবাহকে বিশেষরূপে আধ্যাত্মিক আখ্যা দেওয়া হয় কেন। আধ্যাত্মিক শব্দের শাস্ত্রসংগত ঠিক অর্থটি কী তাহা আমি নিঃসংশয়ে বলিতে পারি না; শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট তাহার মীমাংসা প্রার্থনা করি। কিন্তু আধ্যাত্মিক শব্দের আভিধানিক অর্থ 'আত্মা সম্বন্ধীয়'। কোনো খণ্ডকালে বা খণ্ডদেশে যাহার অবসান নাই এমন যে এক অজর অমর সূক্ষ্ম সত্তা আমাদের অস্তিত্বের কেন্দ্রস্থলে বর্তমান, তাহা সহজবোধ্যই হউক বা দুর্বোধ্যই হউক, তৎসম্বন্ধীয় যে-ভাব তাহাকে আধ্যাত্মিক ভাব বলে। এ আত্মা সমাজ নহে, এবং এ সমাজে, এ সংসারে ও এ দেহে আত্মার নিত্য অবস্থিতি নহে— অতএব বিবাহ যদি শ্বশুরশ্বশ্রূ পরিবার প্রতিবেশী অতিথিব্রাহ্মণ

প্রভৃতির সমষ্টিভূত সমাজ রক্ষার জন্য হয় অথবা ক্ষণিক আত্মসুখের জন্য হয় তাহাকে কোন্ অর্থ অনুসারে আধ্যাত্মিক আখ্যা দেওয়া যায়। যে-উদ্দেশ্য জন্মমৃত্যুসংসারকে অতিক্রম করিয়া নিত্য বিরাজ করে তাহাকেই আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য কহে। কিন্তু হিন্দুমতে বিবাহ নিত্য নহে, আত্মার নিত্য আশ্রয় নহে। হিন্দুদের বানপ্রস্থকে আধ্যাত্মিক বলা যাইতে পারে। কারণ, তাহা প্রকৃত পক্ষে আত্মার মুক্তিসাধন উপলক্ষেই গ্রহণ করা হইয়া থাকে। তাহা সংসারের হিতসাধনের জন্য নহে।

যাহা হউক, আমি যতদূর আলোচনা করিয়াছি তাহাতে দেখিতেছি আমাদের বিবাহ সামাজিক বলিয়াই সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হইয়াছে। এমন-কি, এখন মনুর নিয়মও সমস্ত রক্ষিত হয় না। অতএব বর্তমান সমাজের সুবিধা ও আবশ্যক -অনুসারে হিন্দুবিবাহ সমালোচন করিবার অধিকার আছে। যদি দেখা যায় হিন্দুবিবাহে আমাদের বর্তমান সমাজে রোগ শোক দারিদ্র্য বাড়িতেছে, তবে বলা যাইতে পারে, মনু সমাজের কল্যাণ লক্ষ্য করিয়া বিবাহের নিয়ম নির্দেশ করিয়াছেন : অতএব সেই সমাজের কল্যাণের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বিবাহের নিয়মপরিবর্তন করা অন্যায় নহে। ইহাতে মনুর অবমাননা করা হয় না, প্রত্যুত তাঁহার সম্মাননা করাই হয়। কিন্তু প্রথমেই বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, রাজবিধির সহায়তা লইয়া সমাজসংস্কার আমার মত নহে। জীবনের সকল কাজই যে লাল-পাগড়ির ভয়ে করিতে হইবে, আমাদের জন্য সর্বদাই যে একটা বড়ো দেখিয়া বিজাতীয় জুজু পুষিয়া রাখিতে হইবে, আপন মঙ্গল অমঙ্গল কোনোকালেই আপনারা বুঝিয়া স্থির করিতে পারিব না, ইহা হইতেই পারে না ; জুজুর হস্তে সমাজ সমর্পণ করিলে সমাজের আর উদ্ধার হইবে কবে।

বিবাহের বয়সনির্ণয় লইয়া কিছুদিন হইতে ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। যদি এমন বিবেচনা করা যায় যে, সন্তানোৎপাদন বিবাহের মুখ্য উদ্দেশ্য এবং সুস্থ সবল সন্তান উৎপাদন সমাজের কল্যাণের প্রধান হেতু, তবে সুস্থ সন্তানোৎপাদনপক্ষে স্ত্রীপুরুষের কোন্ বয়স উপযোগী বিজ্ঞানের সাহায্যেই তাহা স্থির করা আবশ্যক। কিন্তু কিছুদিন হইতে আমাদের শিক্ষিত সমাজ এ সম্বন্ধে বিজ্ঞানের কোনো কথাই শুনিবেন না বলিয়া দৃঢ়সংকল্প হইয়াছেন। এ সম্বন্ধে তাঁহারা শরীরতত্ত্ববিৎ কোনো পণ্ডিতেরই মত শুনিতে চাহেন না, আপনারা মত দিতেছেন। তাঁহারা বলেন, বাল্যবিবাহে সন্তান দুর্বল হয় এ কথা শ্রবণযোগ্য নহে। তাঁহাদের মতে আমাদের দেশের মনুষ্যেরাই যে কেবল দুর্বল তাহা নহে পশুরাও দুর্বল, অথচ পশুরা বাল্যবিবাহ সম্বন্ধে মনুর বিধান মানিয়া চলে না ; অতএব বাল্যবিবাহের দোষ দেওয়া যায় না, দেশের জলবায়ুরই দোষ। এ বিষয়ে গুটিদুয়েক বক্তব্য আছে। সত্যই যে আমাদের

দেশের সকল জন্তুই অন্যদেশের তজ্জাতীয় জন্তুদের অপেক্ষা দুর্বল তাহা রীতিমতো কোনো বক্তা বা লেখক প্রমাণ করেন নাই। আমাদের বঙ্গদেশের ব্যাঘ্র ভুবনবিখ্যাত জন্তু। বাংলার হাতি বড়ো কম নহে, অন্যদেশের হাতির সহিত ভালোরূপ তুলনা না করিয়া তাহার বিরুদ্ধে কোনো মত ব্যক্ত করা অন্যায়। আমাদের দেশের বন্যপশুদের সহিত অন্য দেশের বন্যপশুর তুলনা কেহই করেন নাই। গৃহপালিত পশু অনেক সময়ে পালকের অজ্ঞতাবশত হীনদশা প্রাপ্ত হয়, অতএব তাহাদের বিষয়েও ভালোরূপ না জানিয়া কেবল চোখে দেখিয়া কিছুই বলা যায় না। দ্বিতীয় কথা এই যে, মনুষ্যের উপরে যে জলবায়ুর প্রভাব আছে এ কথা কেহই অস্বীকার করে না। কিন্তু তাই বলিয়া বাল্যবিবাহের কথা চাপা দেওয়া যায় না। শ্যালককে মন্দ বলিলেই যে ভগ্নীপতিকে ভালো বলা হয়, ন্যায়শাস্ত্রে এরূপ কোনো পদ্ধতি নাই। দেশের জলবায়ুর অনেক দোষ থাকিতে পারে, কিন্তু বাল্যবিবাহের দোষ তাহাতে কাটে না, বরং বাড়ে। বাল্যবিবাহে দুর্বল সন্তান জন্মিয়া থাকে, এ কথা শুনিলেই অমনি আমাদের দেশের অনেক লোক বলিয়া উঠেন এবং লিখিয়াও থাকেন যে, 'ম্যালেরিয়াতে দেশ উচ্ছন্ন গেল, তাহার বিষয় কিছুই বলিতেছ না, কেবল বাল্যবিবাহের কথাই চলিতেছে!' যখন একটা কথা বলিতেছি তখন কেন যে সে-কথাটা ছাড়িয়া দিয়া আরেকটা কথা বলিব তাহার কারণ খুঁজিয়া পাই না। যাহারা কোনো কর্তব্য সমাধা করিতে চাহে না তাহারা এক কর্তব্যের কথা উঠিলেই দ্বিতীয় কর্তব্যের কথা তুলিয়া মুখচাপা দিতে চায়। আমরা অত্যন্ত বিচক্ষণতা এবং অতিশয় দূরদৃষ্টি ও সম্পূর্ণ সাবধানতাসহকারে দেশের সমস্ত অভাব এবং বিঘ্ন সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে সমালোচনা করিয়া এমন একটা প্রচণ্ড পাকা চাল চালিতে চাহি, যাহাতে একই সময়ে সকল দিকে সকল প্রকার সুবিধা করিতে পারি এবং সজোরে 'কিস্তিমাত' উচ্চারণ করিয়া তাহার পর হইতে যাবজ্জীবন নির্বিঘ্নে তামাক এবং তাকিয়া সেবন করিবার অখণ্ড অবসর প্রাপ্ত হই। কিন্তু আমরা বুদ্ধিমান বাঙালি হইলেও ঠিক এমন সুযোগটি সংঘটন করিতে পারিব না। এমন-কি, আমাদিগকেও ধীরে ধীরে একটি একটি করিয়া কর্তব্য সাধন করিতে হইবে। অতএব দেশে ম্যালেরিয়া এবং অন্যান্য দুর্বলতার কারণ থাকা সত্ত্বেও আমাদিগকে বাল্যবিবাহের কুফল সমালোচন ও তৎপ্রতি মনোযোগ করিতে হইবে। একেবারে অনেক অধিক ভাবিতে পারিব না, কারণ অত্যন্ত অধিক চিন্তাশক্তি প্রয়োগ করিতে গেলে অনেক সময়ে চিন্তনীয় বিষয় সম্পূর্ণ অতিক্রম করিয়া চিন্তার অতীত স্থানে গিয়া পৌঁছিতে হয়। মহাবীর হনুমান যদি অতিরিক্তমাত্রায় লম্ফনশক্তি প্রয়োগ করিতেন তবে তিনি সমুদ্র ডিঙাইয়া লঙ্কায় না

পড়িয়া লম্বা ডিঙাইয়া সমুদ্রে পড়িতেও পারিতেন। ইহা হইতে এই প্রমাণ হইতেছে, অন্যান্য সকল শক্তির ন্যায় চিন্তাশক্তিরও সংযম আবশ্যক।

বৈজ্ঞানিক বিষয়ে বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতদের কথায় যদি কর্ণপাত না করি তবে সত্য সম্বন্ধে কিছু কিনারা করা দুর্ঘট। আমরা নিজে সকল বিষয়েই সকলের চেয়ে ভালো জানিতে পারিব না অতএব অগত্যা বিনীত ভাবে পারদর্শীদের মত লইতেই হয়। কিছুদিন হইল আমাদের মান্য সভাপতি[১] এবং অন্যান্য ডাক্তারেরা বিবাহের বয়স সম্বন্ধে যে বিধান দিয়াছেন তাহা কালক্রমে পুরাতন হইয়া গিয়াছে কিন্তু তাই বলিয়া মিথ্যা হইয়া যায় নাই। কিন্তু সে-সকল কথা পাড়িতে সাহস হয় না— সকলেই পরম অশ্রদ্ধার সহিত বলিয়া উঠিবেন, 'সেই এক পুরাতন কথা!' কিন্তু আমরা পুরাতন কথা যতই ছাড়িতে চাই সে আমাদিগকে কিছুতেই ছাড়িতে চায় না। পুরাতন কথা বারবার তুলিতেই হইবে— নাচার।

ডাক্তার কার্পেন্টারকে সকলেই মান্য করিয়া থাকেন, শরীরতত্ত্ব সম্বন্ধে তিনি যে মস্ত পণ্ডিত এ কথা কেহই অস্বীকার করিবেন না; অতএব এ সম্বন্ধে তিনি যাহা বলেন তাহা শুনিতে সকলেই বাধ্য। তিনি বলেন, ১৩ হইতে ১৬ বৎসরের মধ্যে স্ত্রীলোকদের যৌবনলক্ষণ প্রকাশ হইতে আরম্ভ করে। অনেকে বলেন, উষ্ণদেশে স্ত্রীলোকদের যৌবনারম্ভের বয়স শীতদেশ হইতে অপেক্ষাকৃত অনেক অল্প। কিন্তু কার্পেন্টার তাহা অস্বীকার করেন। তিনি বলেন যৌবনলক্ষণ প্রকাশ শারীরিক উত্তাপের উপর নির্ভর করে, বাহ্য উত্তাপের উপরে নহে। বাহ্য উত্তাপ সামান্য পরিমাণে শারীরিক উত্তাপ বৃদ্ধি করে মাত্র। অতএব যৌনবিকাশ সম্বন্ধে বাহ্য উত্তাপের প্রভাব অতি সামান্য। আমাদের মান্য সভাপতি মহাশয়ের মতের সহিতও এই মতের সম্পূর্ণ ঐক্য দেখা যায়। তবে আমাদের দেশে ১০।১১ বৎসর বয়সেও যে অনেক স্ত্রীলোকের যৌবনসঞ্চার হইবার উপক্রম দেখা যায় তাহা বাল্যবিবাহের অস্বাভাবিক ফল বলিতে হইবে। বাল্যকালে স্বামীসহবাস অথবা বিবাহিত রমণী, প্রগল্‌ভা দাসী ও পরিহাসকুশলা বৃদ্ধাদের সংসর্গে বালিকারা যথাসময়ের পূর্বেই যৌবনদশায় উপনীত হয়, ইহা সহজেই মনে করা যায়। যৌবনলক্ষণপ্রকাশ হইবামাত্রই যে স্ত্রীপুরুষ সন্তানোৎপাদনের যোগ্য হয় তাহাও নহে। কার্পেন্টার বলেন :

> যৌবনারম্ভে স্ত্রীপুরুষের জননেন্দ্রিয়সকলের বিকাশ লক্ষণ দেখা দিবামাত্র যে বুঝিতে হইবে যে, উক্ত ইন্দ্রিয় সকল সম্পূর্ণ ব্যবহারযোগ্য হইয়াছে তাহা নহে, তাহা কেবল পূর্ববর্তী আয়োজন মাত্র।

---

[১] শ্রীযুক্ত ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার।

> নরনারী যখন সর্বাঙ্গীণ পরিস্ফুটতা লাভ করে হিসাবমতে তখনই তাহারা জাতিরক্ষার জন্য জননশক্তি প্রয়োগ করিবার অধিকারী হয়।

আমাদের সভাপতি মহাশয় বলিয়াছেন— যেমন দাঁত উঠিলেই অমনি ছেলেদের খুব শক্ত জিনিস খাইতে দেওয়া উচিত হয় না, তেমনই যৌবন সঞ্চার হইবামাত্র স্ত্রীপুরুষ সন্তান-উৎপাদনের যোগ্য হয় না। এ বিষয়ে বড়ো বড়ো ডাক্তারদের মত এতবার সাধারণের সমক্ষে স্থাপিত হইয়াছে যে, এ স্থলে অন্য পণ্ডিতের মত উদ্ধৃত করা অনাবশ্যক। সুশ্রুতসংহিতার সহিত এ বিষয়ে পাশ্চাত্ত্য শাস্ত্রের সম্পূর্ণ ঐক্য আছে, তাহাও সকলে অবগত আছেন— অতএব শাস্ত্র-আস্ফালন করিয়া প্রবন্ধবাহুল্যের প্রয়োজন দেখিতেছি না।

যাহা হউক, কাহারও কাহারও মতের সহিত না মিলিলেও ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, অভিজ্ঞ বৈজ্ঞানিক মান্য ব্যক্তিগণ বৈজ্ঞানিক কারণ দর্শাইয়া বলিয়া থাকেন যে, যৌবনারম্ভ হইবামাত্রই অপত্যোৎপাদন স্ত্রী পুরুষ এবং সন্তানের শরীরের পক্ষে ক্ষতিজনক। অতএব বিজ্ঞানের পরামর্শ লইতে গেলে বাল্যবিবাহ টেকে না।

শিক্ষিত সমাজের মধ্যে যাঁহারা বাল্যবিবাহের পক্ষে তাঁহাদের মধ্যে দুই দল আছেন। একদল মনুর ব্যবস্থানুসারে পুরুষের ২৪ হইতে ৩০-এর মধ্যে এবং স্ত্রীলোকের ৮ হইতে ১২-র মধ্যে বিবাহ দিতে চান, আর-এক দল, স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই বাল্যাবস্থায় বিবাহে কোনো দোষ দেখেন না। 'পারিবারিক প্রবন্ধ' নামক একখানি পরমোৎকৃষ্ট গ্রন্থে মান্যবর লেখক 'বাল্যবিবাহ' নামক প্রবন্ধে প্রথমে মনুর নিয়মের প্রশংসা করিয়া তাহার পরেই লিখিতেছেন :

> ছেলেবেলা হইতে মা বাপ যে দুটিকে মিলাইয়া দেন, তাহারা একত্র থাকিতে থাকিতে ক্রমে ক্রমে দুইটি নবীন লতিকার ন্যায় পরস্পর গায়ে গায়ে জড়াইয়া এক হইয়া উঠে। তাহাদিগের মধ্যে যে-প্রকার চিরস্থায়ী প্রণয় জন্মিবার সম্ভাবনা, বয়োধিকদিগের বিবাহে সেরূপ চিরস্থায়ী প্রণয় কিরূপে জন্মিবে।

অতএব পুরুষের অধিক বয়সে বিবাহ লেখকের অভিমত কি না তাহা স্পষ্ট বুঝা গেল না। কিন্তু শ্রদ্ধাস্পদ চন্দ্রনাথ বসু বলেন, যখন স্ত্রীকে স্বামীর সহিত সম্পূর্ণ মিশিয়া যাইতে হইবে, তখন স্বামীর পরিণতবয়স্ক হওয়া আবশ্যক। কারণ :

> যাহাকে এই কঠিন এবং গুরুতর মিশ্রণকার্য সম্পন্ন করিতে হইবে তাহার জ্ঞানবান বিদ্যাবান এবং পরিণতবয়স্ক হওয়া চাই, এবং যাহাকে এই রকম হাড়েহাড়ে মিশিতে হইবে তাহার শিশু হওয়া একান্ত আবশ্যক। তাই হিন্দুশাস্ত্রকারদিগের মতে পুরুষের বিবাহের বয়স বেশি, স্ত্রীর বিবাহের বয়স কম।

চব্বিশে এবং আটে বিবাহ হইলে হাড়ে হাড়ে কঠিন এবং গুরুতর মিশ্রণ হইতেও

পারে কিন্তু সে-মিশ্রণ সত্বর বিশ্লিষ্ট হইতে আটক নাই। দম্পতির বয়সের এত ব্যবধান থাকিলে আমাদের দেশে বিধবাসংখ্যা অত্যন্ত বাড়িবে সন্দেহ নাই। যদিও বৈধব্য-ব্রতের মহত্ত্ব সম্বন্ধে চন্দ্রনাথবাবুর সন্দেহ নাই, কিন্তু পুরুষ ও রমণী উভয়েরই কল্যাণ কামনায় ইহা তাঁহাকে স্বীকার করিতেই হইবে যে, তাই বলিয়া বিবাহিতা রমণীর বৈধব্য প্রার্থনীয় নহে। শ্রদ্ধাস্পদ অক্ষয়বাবু এই মনে করিয়াই 'হিন্দুবিবাহ' প্রবন্ধে 'কিশোর বালকের সহিত অপোগণ্ড বালিকার বিবাহ' অন্যায় বলিয়াছিলেন। বাল্যবিবাহই বৈধব্যের মূল কারণ ইহাই স্থির করিয়া তিনি বলিয়াছেন :

> আসুন না, সকলে মিলিয়া আমরা বালকবিবাহের কার্যত প্রতিবাদ করি। করিলে বালবৈধব্যের প্রতিরোধ করা হইবে। যাহার বিবাহ হয় নাই সে বিধবা হইয়াছে এ বিড়ম্বনা আর দেখিতে হইবে না।

যদি ২৪ বৎসর এবং তদূর্ধ্ব বয়সে পুরুষের বিবাহ স্থির হয়, তবে যিনি যেরূপ শাস্ত্রব্যাখ্যা করুন কন্যার বয়সও বাড়াইতেই হইবে।

এইখানে চন্দ্রনাথবাবুর কথা ভালো করিয়া সমালোচনা করা যাক। কেন কন্যার বয়স অল্প হওয়া আবশ্যক তাহার কারণ দেখাইয়া চন্দ্রনাথবাবু বলেন :

> ইংরেজ আত্মপ্রিয় বলিয়া তাহার বিবাহের প্রকৃতপক্ষে মহৎ উদ্দেশ্য নাই। মহৎ উদ্দেশ্য নাই বলিয়াই তাহার বিবাহ বিবাহই নয়। মহৎ উদ্দেশ্য থাকিলেই মানুষের সহিত প্রকৃত বিবাহ হয়। যেমন হারমোদিয়াসের সহিত এরিস্টজিটনের বিবাহ; যিশুখৃষ্টের সহিত সেন্টপলের বিবাহ; চৈতন্যের সহিত নিত্যানন্দের বিবাহ; রামের সহিত লক্ষ্মণের বিবাহ।

এ কথা বলিবার তাৎপর্য এই যে, হিন্দুবিবাহ মহৎ উদ্দেশ্যমূলক বলিয়া হিন্দুদম্পতির সম্পূর্ণ এক হইয়া যাওয়া আবশ্যক, নতুবা উদ্দেশ্যসিদ্ধির ব্যাঘাত হয়। এবং এক হইতে গেলে স্ত্রীর বয়স নিতান্ত অল্প হওয়া চাই। মহৎ উদ্দেশ্য বলিতে এখানে স্ত্রীর পক্ষে এই বুঝাইতেছে যে, শ্বশুর শ্বশ্রূ ননন্দা দেবর প্রভৃতির সহিত মিলিয়া গৃহকার্যের সহায়তা, অতিথির জন্য রন্ধন ও সেবা, পরিবারে যে-সকল ধর্মানুষ্ঠান হয় তাহার আয়োজনে সহায়তা করা এবং স্বামীর সেবা করা। স্বামীর পক্ষে মহৎ উদ্দেশ্য এই যে, সাংসারিক নিত্যকার্যে স্ত্রীর সাহায্য গ্রহণ করা। সাংসারিক নিত্য-অনুষ্ঠেয় কার্যে স্ত্রীর সাহায্য-গ্রহণ-করা-রূপ মহৎ উদ্দেশ্য সকল দেশের সকল স্বামীরই আছে, এইরূপ শুনিতে পাওয়া যায়। তবে প্রভেদ এই, সকল দেশে গার্হস্থ্য অনুষ্ঠান সমান নহে। দেশভেদে এরূপ অনুষ্ঠানের প্রভেদ হওয়া কিছুই আশ্চর্য নহে, কিন্তু উদ্দেশ্যভেদ দেখিতেছি না। মুসলমান সংসারে নিত্যঅনুষ্ঠান কী কী তাহা জানি না, কিন্তু ইহা জানি মুসলমান পত্নী সে-সকল অনুষ্ঠানের প্রধান সহায়। ইংরেজপরিবারে নিত্যকার্য কী তাহা জানি না, কিন্তু ইহা

জানি ইংরেজ পত্নীর সহায়তায় তাহা সম্পন্ন হয়। কেবল তাহাই নহে, শুনিয়াছি সাংসারিক কার্য ছাড়া অন্যান্য মহৎ বা ক্ষুদ্র কার্যেও ইংরেজ স্ত্রী স্বামীর সহায়তা করিয়া থাকেন। লেখকের স্ত্রী স্বামীর কেরানীগিরি করেন, প্রুফ-সংশোধন করেন, এবং অনেক সময় তদপেক্ষা গুরুতর সাহায্য করিয়া থাকেন। পাদ্রির স্ত্রী পল্লীর দরিদ্র রুগ্‌ণ শোকাতুর ও দুষ্কর্মকারীদের সাহায্য সেবা সান্ত্বনা ও উপদেশ দান করিয়া স্বামীর পৌরোহিত্য কার্যের অনেক সাহায্য করিয়া থাকেন। যিনি দরিদ্রের দুঃখমোচন বা অসুস্থের স্বাস্থ্যবিধান প্রভৃতি কোনো লোকহিতকর ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহার স্ত্রীও তাঁহাকে কায়মনে সাহায্য করে। চন্দ্রনাথবাবু জিজ্ঞাসা করিবেন, যদি না করে? আমার উত্তর, হিন্দু স্ত্রী যদি সমস্ত গার্হস্থ্য ধর্ম না পালন করে? সে যদি দুষ্টস্বভাব বা আলস্যবশত শাশুড়ির সহিত ঝগড়া করে ও সঘনে হাত-নাড়া দিয়া কঠিন পণ করিয়া বসে, আমি অমুক গৃহকাজটা করিতে পারিব না, তবে কী হয়। তবে হয় তাহাকে বলপূর্বক সে-কাজে প্রবৃত্ত করানো হয়, নয় বধূর এই বিদ্রোহ পরিবারকে নীরবে সহ্য করিতে হয়। ইংলণ্ডেও সম্ভবত তাহাই ঘটে। যদি ইংরেজ স্ত্রী তাহার অসহায় স্বামীকে বলিয়া বসে তোমার নিমন্ত্রিত অতিথিদের জন্য পাকাদির ব্যবস্থা আমি করিতে পারিব না, তবে হয় স্বামী বলপ্রকাশ বা ভয়প্রদর্শন করে, নয় ভালোমানুষটির মতো আর কোনো বন্দোবস্ত করে। চন্দ্রনাথবাবু বলিবেন, হিন্দু স্ত্রী এমনভাবে শিক্ষিত ও পালিত হয় যে বিদ্রোহী হইবার সম্ভাবনা তাহার পক্ষে অল্প; অপর পক্ষে তেমনই বলা যায়, ইংরেজ স্ত্রী যেরূপ শিক্ষা ও স্বাধীনতায় পালিত, তাহাতে সাংসারিক কার্য ছাড়া মহৎ স্বামীর অন্য কোনো মহৎ উদ্দেশ্যে সহায়তা করিতে সে অধিকতর সক্ষম। কতকগুলি কাজ যন্ত্রের দ্বারা সাধিত হয়, এবং কতকগুলি কাজ স্বাধীন ইচ্ছার বল ব্যতীত সাধিত হইতে পারে না। রন্ধন ও শুশ্রূষাদি শাশুড়ি-ননদের নিত্য সেবা এবং গৃহ-কর্মের অনুষ্ঠানে সাহায্য করা, আশৈশব অভ্যাসে প্রায় সকলেরই দ্বারা সুচারুরূপে সাধিত হইতে পারে। কিন্তু জন স্টুয়ার্ট মিল যেরূপ স্ত্রীর সাহচর্য লাভ করিয়াছিলেন সেরূপ স্ত্রী জাঁতায় পিষিয়া প্রস্তুত হইতে পারে না। হার্মোদিয়াস এবং এরিস্টজিটন, যিশুখৃষ্ট এবং সেণ্ট পল, চৈতন্য এবং নিত্যানন্দ, রাম এবং লক্ষ্মণের যে মহৎ উদ্দেশ্যজাত বিবাহ তাহা জাঁতায়-পেষা বিবাহ নহে, তাহা স্বতসিদ্ধ বিবাহ। কেহ না মনে করেন আমি জাঁতায়-পেষা বিবাহের নিন্দা করিতেছি, অনেকের পক্ষে তাহার আবশ্যক আছে; তাই বলিয়া যিনি একমাত্র সেই বিবাহের মহিমা কীর্তন করিয়া অন্য সমস্ত বিবাহের নিন্দা করেন তাঁহার সহিত আমি একমত হইতে পারি না। সর্বত্রই পুরুষ বল্লিষ্ঠ, অনেক

কারণেই স্বামী স্ত্রীলোকের প্রভু ; এইজন্য সাধারণত প্রায় সর্বত্রই সংসারে স্ত্রী স্বামীর অধীন হইয়া কাজ করে। ইংরেজের অপেক্ষা আমাদের পরিবার বৃহৎ, এইজন্য পরিবারভারে অভিভূত হইয়া আমাদের দেশের স্ত্রীলোকের অধীন-অবস্থা অপেক্ষাকৃত গুরুতর হইয়া উঠে। ইংরেজ স্ত্রী স্বামীর অধীন বটে কিন্তু বৃহৎ সংসারভারে এত ভারাক্রান্ত নহে যে, কেবল পারিবারিক কর্তব্য ছাড়া আর-কোনো কর্তব্য সাধন করিতে সে অক্ষম হইয়া পড়ে। এইজন্য পরিবারের অবশ্যকর্তব্যকার্য তাহাকে সাধন করিতেই হয়, এবং তাহা ছাড়া জগতের স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত কর্তব্যগুলি পালন করিতেও তাহার অবসর হয়। যদি বল অনেক ইংরেজ স্ত্রী সে অবসর বৃথা নষ্ট করেন তবে এ পক্ষে বলা যায় যে, অনেক হিন্দু স্ত্রী জগতের অনেক স্থায়ী উপকার করিবার স্বাভাবিক ক্ষমতা কুটনা কুটিয়া, বাটনা বাঁটিয়া নিঃশেষ করিয়া ফেলিয়াছেন।

অতএব দাম্পত্যবলে বলীয়ান হইয়া কোনো মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য বিবাহ করিতে হইলেই যে শিশুস্ত্রীকে বিবাহ করাই আবশ্যক তাহা আমার বিশ্বাস নহে। শিক্ষা পাইলেই যে লোকে মহৎ উদ্দেশ্য গ্রহণ করে তাহা নহে, স্বাভাবিক বুদ্ধি প্রবৃত্তি ও ক্ষমতার উপরে অনেকটা নির্ভর করে। অতএব শিশুস্ত্রী বড়ো হইয়া মহৎ উদ্দেশ্যবিশেষ সাধনে স্বামীর সহযোগিনী হইতে পারিবে কি না কিছুই বলা যায় না। কতকগুলি নিত্য-অভ্যস্ত কার্য নির্বিচারে ও নিপুণতাসহকারে সম্পন্ন করা এক, আর শিক্ষামার্জিত স্বাভাবিক ধর্মপ্রবৃত্তি ও বিবেচনা -সহকারে জগতের উন্নতি-সাধনকার্যে স্বামীর সহযোগিতা করা আর-এক। ইহার জন্য নির্বাচন এবং দুই হৃদয়ের এক মহৎ উদ্দেশ্যগত স্বাভাবিক আকর্ষণ আবশ্যক। তবে নির্বাচন করিতে গেলে বিবাহের মহৎ উদ্দেশ্য ভুলিয়া পাছে রূপ যৌবন দেখিয়া লোকে মুগ্ধ হয় এই ভয়। কিন্তু যদি গোড়াতেই পুরুষকে পরিণতবয়স্ক বিদ্যাবান ধর্মবুদ্ধিবিশিষ্ট ও মহৎ উদ্দেশ্য-সম্পন্ন বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া যায় তবে ইহা কেন মনে করা হয়, উক্ত পুরুষ কেবলমাত্র কন্যার রূপ দেখিয়াই কন্যা নির্বাচন করিবেন। চন্দ্রনাথবাবু গোড়ায় তাহাই স্বীকার করিয়া লইয়াছেন ; তিনি বলেন মহৎ-উদ্দেশ্যবিশেষের জন্য স্ত্রীকে প্রস্তুত করিয়া লইবার ভার স্বামীর উপরে, অতএব হিন্দুবিবাহে স্বামীর পূর্বোক্ত লক্ষণাক্রান্ত হওয়া আবশ্যক। এমন স্বামী যদি অধিক থাকে, সমাজের এত উন্নতির অবস্থা যদি ধরিয়া লওয়া হয়, তবে অনেক গোলযোগ গোড়ায় মিটিয়া যায়। তবে সে-সমাজে মহৎ পিতা-মাতার মহৎ আদর্শ ও মহৎ শিক্ষায় কন্যারাও সহজে মহত্ত্ব লাভ করে এবং মহৎ পুরুষের পক্ষে মহৎ-উদ্দেশ্যসম্পন্ন স্ত্রী লাভ করাও দুরূহ হয় না। কিন্তু সর্বত্রই ভালো মন্দ দু-ই আছে, এবং মহৎ উদ্দেশ্য সকলের দেখা যায় না। শ্বশুর শাশুড়ি ননদ দেবর প্রভৃতির

যথাবিহিত সেবা, এবং পুরপ্রচলিত দেবকার্যের যথাবিধি সহায়তা করিয়া স্ত্রী মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করিলেই যে সকল স্বামীর সম্পূর্ণ পরিতৃপ্তি ঘটে তাহা নহে। স্বামী চায় মনের মতো স্ত্রী। তাহারই বিশেষ প্রীতিকর রূপগুণসম্পন্ন স্ত্রী নইলে কেবল অভ্যস্ত-গৃহকার্যনিষ্ঠা স্ত্রী লইয়া তাহার সম্পূর্ণ বাসনা তৃপ্ত হয় না। মনুষ্যের যে কেবল একমাত্র গার্হস্থ্য শৃঙ্খলার প্রতিই দৃষ্টি আছে তাহা নহে। তাহার সৌন্দর্যের প্রতি স্পৃহা, কলাবিদ্যার প্রতি অনুরাগ, এবং লোকবিশেষে কতকগুলি বিশেষ মানসিক ও নৈতিকগুণের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ আছে। এইজন্য রুচি-অনুসারে স্বভাবতই মানুষ সৌন্দর্য সংগীত প্রভৃতি কলাবিদ্যা এবং আপন মনের গতি-অনুযায়ী বিশেষ কতকগুলি মানসিক ও নৈতিক গুণ স্ত্রীর নিকট হইতে অনুসন্ধান করিয়া থাকে। স্ত্রীতে তাহার অভাব দেখিলে হৃদয় অপরিতৃপ্ত থাকিয়া যায়। সেরূপ স্থলে অনেক পুরুষ হতাশ হইয়া বারাঙ্গনাসক্ত হয় এবং অনেক পুরুষ দাম্পত্যসুখে বঞ্চিত হইয়া মনের অসুখে স্ত্রীর প্রতি ঠিক ন্যায্য ব্যবহার করিতে পারে না। ইহা তো অনেক স্থলেই দেখা যায় স্ত্রী অভ্যাসমতো গৃহকোণে আপনমনে নিত্যগৃহকার্য ম্লানমুখে সম্পন্ন করিতেছে, স্বামীর তাহার প্রতি লক্ষই নাই, আদর নাই, যত্ন নাই।

কেহ কেহ বলিবেন আধুনিক শিক্ষিতসমাজের মধ্যেই এরূপ ঘটিতেছে, পূর্বে এতটা ছিল না। এ কথা অসংগত নহে। পূর্বে আমাদের মনে সকল বিষয়েই যে একটি সন্তোষ ছিল, ইংরেজিশিক্ষায় তাহা দূর করিয়া দিয়াছে। ইংরেজের দৃষ্টান্তে ও শিক্ষায় বাঙালির মনে কিয়ৎপরিমাণে উদ্যমের সঞ্চার হইয়াছে। এখন আমরা সকল বিষয়েই অদৃষ্টের হাত দেখিয়া আপন হাত গুটাইয়া লইতে পারি না। এইজন্য কোনো অভাব বোধ করিলে সকল সময়ে অদৃষ্টকে ধিক্কার না দিয়া আপনাকেই ধিক্কার দিই ; ইহাই অসন্তোষ। আমাদের আকাঙ্ক্ষাবেগ পূর্বাপেক্ষা বাড়িয়াছে, এবং আগে অনেক কিছু যাহা অনুভব করিতাম না এখন তাহা অনুভব করিয়া থাকি। অতএব আকাঙ্ক্ষাও বাড়িয়াছে, এবং আকাঙ্ক্ষাতৃপ্তিসাধনের উদ্দেশ্যে উদ্যমও বাড়িয়াছে। অতএব এ কথা যদি সত্য হয় যে, আধুনিক কালে অনেক পুরুষ তাঁহার বাল্যবিবাহিতা পত্নীর প্রতি অনুরাগবিহীন হইয়া থাকেন, তবে তাহাতে স্বভাববিরুদ্ধ কিছু ঘটিয়াছে এমন বলিতে পারি না। অনেকে বলিবেন এরূপ যাহাতে না হয়, প্রাচীন সন্তোষ যাহাতে ফিরিয়া আসে, এমন শিক্ষা দেওয়া উচিত। কিন্তু ব্রহ্মচর্যাদি আশ্রম গ্রহণ করিয়া প্রাচীন কালে পুরুষের প্রতি যে-শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল, এখন সে-শিক্ষাপ্রণালী আর ফিরিয়া আসিতে পারে না। আমরা যে-শিক্ষার দায়ে পড়িয়াছি তাহা লইয়াই বিব্রত, কারণ তাহার সহিত পেটের দায় জড়িত। চারিদিকের অবস্থা আলোচনা করিয়া মনে করিয়া

লইতে হইবে এ শিক্ষা এখন অনেক কাল চলিবেই। অতএব এ শিক্ষার প্রত্যক্ষ এবং অলক্ষ্য প্রভাব উত্তরোত্তর বাড়িবে বৈ কমিবে না। সুতরাং সামাজিক কোনো অনুষ্ঠান সমালোচন করিবার সময় এ শিক্ষাকে একেবারেই আমল না দিলে চলিবে কেন। সমাজে যে-শিক্ষা প্রচলিত নাই তাহারই ফলাফল বিচার করিয়া, এবং যে-শিক্ষা প্রচলিত আছে তাহাকে দূরে রাখিয়া কোনো সমাজনিয়ম স্থাপন করা যায় না।

বিবাহ সম্বন্ধে ইংরেজিশিক্ষার কী প্রভাব তাহা আলোচনা আবশ্যক। পুরুষ শাস্ত্রচর্চাবান এবং স্ত্রী শাস্ত্রচর্চাহীন মন্ত্রহীন হয়, ইংরেজি মতে ইহা প্রার্থনীয় নহে। বিবাহে স্ত্রীপুরুষের একীকরণ ইংরেজি বিবাহের উচ্চ আদর্শ। কিন্তু সে-একীকরণ সর্বাঙ্গীণ একীকরণ— কেবল সাংসারিক একীকরণ নহে, মানসিক একীকরণ। স্বামী যদি বিদ্বান হয় এবং স্ত্রী যদি মূর্খ হয় তবে উভয়ের মধ্যে মানসিক একীকরণ সম্ভবে না, পরস্পরের মধ্যে সম্যক্‌ ভাবগ্রহ চলিতে পারে না। একটি প্রধান বিষয়ে স্ত্রী পুরুষ পরস্পরের মধ্যে অলঙ্ঘ্য ব্যবধান থাকে।

জীবনের সমুদয় কর্তব্যসাধনে স্ত্রীর সহযোগিতা, ইহাও ইংরেজি বিবাহের আদর্শ। এ সম্বন্ধে পূর্বেই বলিয়াছি; এবং ইহাও বলিয়াছি এরূপ মহৎ উদ্দেশ্যে মিলন ঘরে প্রস্তুত করিয়া লওয়া যায় না। চৈতন্যের সহিত নিত্যানন্দের, যিশুখৃষ্টের সহিত সেণ্টপলের, রামের সহিত লক্ষ্মণের যেরূপ অনিবার্য স্বাভাবিক মিলন ঘটিয়াছিল, ইহাতেও সেইরূপ হওয়া আবশ্যক। ইংরেজি সকল বিবাহে যে এরূপ ঘটিয়া থাকে তাহা নহে, কিন্তু এইরূপ বিবাহই তাহাদের আদর্শ।

যাঁহারা বলেন হিন্দুবিবাহের এইরূপ আদর্শ, তাঁহাদের কথা প্রমাণাভাবে এখনও মানিতে পারি না। হিন্দুবিবাহে মনে মনে, প্রাণে প্রাণে, আত্মায় আত্মায় মিলন ঘটিয়া থাকে কি না বিচার্য। আমরা স্ত্রীকে সহধর্মিণী নাম দিয়া থাকি বটে, কিন্তু মনু স্পষ্টই বলিয়াছেন, স্ত্রীদের মন্ত্র নাই, ব্রত নাই, উপবাস নাই; কেবল স্বামীকে শুশ্রূষা করিয়া তাঁহারা স্বর্গে মহিমান্বিতা হন। ইহাকে উচিতমতে স্বামীর সহিত সহধর্ম বলা যায় না। ইহাকে যদি সহধর্ম বলে তবে প্রাচীন কালের শূদ্রদিগকেও ব্রাহ্মণের সহধর্মী বলা যাইতে পারে। স্ত্রীপুরুষে শিক্ষার ঐক্য নাই, ধর্মব্রতপালনের ঐক্য নাই, কেবলমাত্র জাতিকুলের ঐক্য আছে।

অনেক শিক্ষিত লোকে ইংরেজিশিক্ষার গুণে এই ইংরেজি একীকরণের পক্ষপাতী হইয়াছেন। হৃদয়মনের স্বাভাবিক নিগূঢ় ঐক্য থাকা প্রযুক্ত দুই স্বাধীন ব্যক্তির স্বেচ্ছাপূর্বক এক হইয়া যাওয়াই ইংরেজি একীকরণ; আঠা দিয়া এবং চাপ দিয়া জোড়া, সে অন্য প্রকার একীকরণ। উক্ত ইংরেজি আদর্শের প্রতি যদি কোনো কোনো

শিক্ষিত লোকের পক্ষপাত দেখা যায়, তবে তাঁহাদের দোষ দেওয়া যায় না। উহা অবশ্যম্ভাবী। ইংরেজি শিখিয়া যে কেবলমাত্র অন্নটুকু উপার্জন করিব তাহা হইতেই পারে না, ইংরেজি ভাব উপার্জন না করিয়া থাকিবার জো নাই। জলে প্রবেশ করিয়া মাছ ধরিতে গেলে ভিজিতেও হইবে।

অতএব আধুনিক শিক্ষিত দলের মধ্যে অনেকেই যখন স্ত্রী গ্রহণ করেন তখন সে-স্ত্রী যে কেবলমাত্র গৃহকার্য নিপুণরূপে সম্পন্ন করিবে, ও তাঁহাকেই দেবতা জ্ঞান করিবে, ইহাই মনে করিয়া সন্তুষ্ট থাকেন না। সে-স্ত্রীর স্বাভাবিক গুণ ও শিক্ষা তাঁহারা দেখিতে চান, এবং যাঁহারা ভাবী সন্তানের স্বাস্থ্যের কথা ভাবেন, তাঁহারা স্ত্রীর কোনো স্থায়ী রোগপ্রবণতা বা অঙ্গহীনতা না থাকে তাহার প্রতিও দৃষ্টি রাখিতে চান। কিন্তু সকলেই যে এইরূপ বিচার করিয়া বিবাহ করিবেন তাহা বলি না। অনেকেই ধন রূপ বা যৌবন-মোহে মুগ্ধ হইয়া বিবাহ করিবেন। বর্তমান হিন্দুবিবাহেও সেরূপ হইয়া থাকে। অক্ষয়বাবু তাঁহার বক্তৃতায় কায়স্থবিবাহে দরদামের প্রাবল্য এবং কুলশীলের প্রতি উপেক্ষা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা কাহারও অগোচর নাই। প্রচলিত বিবাহে কন্যার রূপে মুগ্ধ হইয়াও যে কন্যা নির্বাচন হয় না, তাহাও ঠিক বলিতে পারি না। ইহার যা ফল তাহা এখনও হয় পরেও হইবে। পিতার ধনমদে মত্ত বধূ ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিয়া অনেক সময়ে দরিদ্র পতিকুলের অশান্তির কারণ হইয়া থাকে; এবং অক্ষমতাবশত দরিদ্র পিতা কন্যার বিবাহের পণ সম্বন্ধে কোনো ত্রুটি করিলে অভাগিনী কন্যাকে তজ্জন্য বিস্তর লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়। অতএব কেবলমাত্র ধনযৌবনের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কন্যানির্বাচন করিলে তাহার যা ফল তাহা ভোগ করিতে হইবে। কিন্তু যাঁহারা গুণ দেখিয়া কন্যা বিবাহ করিতে চান, বাল্যবিবাহে তাঁহাদের সম্পূর্ণ অসুবিধা। চরিত্রবিকাশ না হইলে কন্যার গুণাগুণ বিষয়ে কিছুই জানা যায় না। কন্যা বড়ো হইয়াই যে সত্যনিষ্ঠ সদ্বিবেচক প্রিয়বাদিনী ও হিতানুষ্ঠাননিরতা হইবে তাহা বলা যায় না। অনেক শিশুস্ত্রী বড়ো হইয়া নানাবিধ বৃথা অভিমানে ও উত্তরোত্তর-বিকাশমান হীন স্বভাব-বশত ঝগড়া-বিবাদ ও ঘরভাঙাভাঙি করিয়া থাকে। এবং অনেকে অগত্যা বধূদশা নিরুপদ্রবে যাপন করিয়া যথাসময়ে প্রচণ্ড শাশুড়িমূর্তি ধারণ করিয়া অকারণে নিজ বধূর প্রতি যৎপরোনাস্তি নিপীড়ন, অধীনাগণকে তাড়ন ও গৃহের শান্তিভঙ্গ করিয়া থাকেন। তর্কস্থলে কী করিবেন জানি না, কিন্তু আমাদের সমাজে এরূপ শাশুড়ির বহুল অস্তিত্ব কেহ অস্বীকার করেন না। অতএব বাল্যবিবাহেই যে সুগৃহিণী উৎপন্ন হইয়া থাকে, যৌবনবিবাহে হয় না, তাহা কেমন করিয়া বলিব।

উপহাসরসিক শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন, যদি এমন করিয়া বাছিয়াই বিবাহ প্রচলিত হয় তবে সমাজে অন্ধ খঞ্জ কুৎসিত অঙ্গহীনদের দশা কী হইবে। মনুর আমলে অঙ্গহীনতা প্রভৃতি দোষ জন্য যে-সকল কন্যার বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল, তাহাদের দশা কী হইত। পিতামাতার উপরে নির্বাচনের ভার রহিয়াছে বলিয়াই যদি সমাজে অন্ধ খঞ্জ অঙ্গহীনরা পার হইয়া যায়, তবে এমন হৃদয়হীন বিবেচনাশূন্য নির্বাচন-প্রণালী অতি ভয়ানক বলিতে হইবে। ছেলেমেয়ের বিবাহ দিবার সময় পিতামাতা তাহাদের মঙ্গল আগে খুঁজিবেন, না সমাজের যত অন্ধখঞ্জদের সুখ আগে দেখিবেন?

কিন্তু পছন্দ করিয়া বিবাহ করিলেই সকল সময়ে মনের মতো হইবে এমন কী কথা আছে— ইহাও অনেকে বলিয়া থাকেন। কিন্তু মনের মতো বিবাহ করাই যদি মত হয় তবে পছন্দ করিয়া লইতেই হইবে। আসল কথা, মনের মতো পাওয়া শক্ত, অতএব ঠকিবার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু তাই বলিয়া এমন কয়জন লোক বলিতে পারেন, তবে আমি মনের মতো চাই না— মনের অ-মতো হইলেও ক্ষতি নাই। যদি আমার সম্পূর্ণতা লাভের জন্য, আমার সমগ্র মানবপ্রকৃতির চরিতার্থতা-সাধনের জন্য আমি স্ত্রী চাই, তবে তাঁহাকে সন্ধান করিতে হইবে। সন্ধান করিলেই যে সকল সময়েই সম্পূর্ণ কৃতকার্য হওয়া যাইবে, এমন কোনো কথাই নাই। কিন্তু সন্ধানপূর্বক বিবেচনাপূর্বক সংযতচিত্তে স্ত্রী নির্বাচন করিয়া লওয়া ছাড়া ইহার অন্য পন্থা নাই। Catholic শাস্ত্র দাম্পত্যনির্বাচন সম্বন্ধে কী বলেন এইখানে উদ্ধৃত করিব:

> They ought to implore the divine assistance by fervent and devout prayer, to guide them in their choice of a proper person; for on the prudent choice which they make will very much depend their happiness both in this life and in the next. They should be guided by the good character and virtuous dispositions of person of their choice rather than by riches, beauty or any other worldly considerations, which ought to be but secondary motives.

এখনকার অনেক ছেলে যথাসম্ভব স্ত্রী নির্বাচন করিয়া লয়। এখন অনেক স্থলে শুভদৃষ্টিই যে প্রথম দৃষ্টি তাহা নয়। অতএব দেখিতেছি নির্বাচনপ্রথা অল্পে অল্পে শুরু হইয়াছে। পিতামাতারাও ইহাতে ক্ষুব্ধ নহেন।

তবে একান্নবর্তী পরিবারের কী দশা হইবে। বাল্যবিবাহের স্বপক্ষে এই এক প্রধান যুক্তি। স্ত্রীকে যে অনেকের সহিত এক হইতে হইবে। স্বামীর সহিত

সম্পূর্ণ একীকরণ সকল সময় হউক বা না হউক, বৃহৎ পরিবারের সহিত বধূর একীকরণ-সাধন করিতে হইবে। এ সম্বন্ধে চন্দ্রনাথ বাবু যাহা বলেন তাহা যথার্থ :

> ইংরেজপত্নীর যেমন একটিমাত্র সম্বন্ধ, হিন্দুপত্নীর তেমন নয়। হিন্দুপত্নীর বহুবিধ সম্বন্ধ। দেখা গেল যে, হিন্দুশাস্ত্রকার হিন্দুপত্নীকে সেই বহুবিধ সম্বন্ধের উপযোগী করিতে উৎসুক। অতএব একরকম নিশ্চয় করিয়া বলা যাইতে পারে যে, পতিকুলের জটিল এবং বহুবিধ সম্বন্ধ ভাবিয়া হিন্দুশাস্ত্রকার হিন্দুস্ত্রীর শৈশববিবাহের ব্যবস্থা করিয়াছেন ; যদি তাহাই হয় তবে কেমন করিয়া শৈশববিবাহের নিন্দা করি।

শৈশববিবাহের যে নিন্দাই করিতে হইবে, এমন তো কোনো কথা নাই। অবস্থাবিশেষে তাহার উপযোগিতা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবে না। যদি স্ত্রীশিক্ষা না থাকে এবং একান্নবর্তী পরিবার থাকে, তবে শিশুস্ত্রীবিবাহ সমাজরক্ষার জন্য আবশ্যক। কিন্তু তাহার জন্য আরও গুটিকতক আবশ্যক আছে ; তাহার প্রতি কেহ মনোযোগ করেন না। পুরাকালে যেরূপ শিক্ষা প্রচলিত ছিল সেইরূপ শিক্ষা আবশ্যক এবং তখন সাংসারিক অবস্থা যেরূপ ছিল সেইরূপ অবস্থা আবশ্যক। কারণ, কেবলমাত্র শিশুস্ত্রীবিবাহের উপর একান্নবর্তী পরিবারের স্থায়িত্ব নির্ভর করিতেছে না।

পূর্বকালে সমাজের যে-অবস্থা ছিল ও যে-শিক্ষা প্রচলিত ছিল, সেই-সমস্ত অবস্থা ও শিক্ষা একত্র মিলিয়া একান্নবর্তী-পরিবার-প্রথার স্থায়িত্ব বিধান করিত। ইহার মধ্যে কোনো একটিকে বাছিয়া লইলে চলিবে না। সন্তোষ একান্নবর্তী-প্রথার মূলভিত্তি। বর্তমান সমাজে সন্তোষ কোথায়। আমাদের কত কী চাই তাহার ঠিক নাই। প্রথমত, ছাতা জুতা টুপি অশন বসন ভূষণ এবং ভদ্রসমাজের বাহ্য উপকরণ বিস্তর বাড়িয়াছে, এবং তাহাদের দামও বাড়িয়াছে। দ্বিতীয়ত, বিদেশীয় শিক্ষার আবশ্যকতা ও মহার্ঘতা বাড়িয়াছে। কিছুকাল পূর্বে আমাদের দেশে লেখাপড়া অল্প ছিল এবং তাহার খরচও অল্প ছিল। সংস্কৃত সকলে শিখিতেন না, যাঁহারা শিখিতেন তাঁহাদের জন্য টোল ছিল। রাজভাষা ফার্সি কেহ কেহ শিখিতেন, কিন্তু তাহা আমাদের বর্তমান রাজভাষাশিক্ষার ন্যায় এমন গুরুতর ব্যাপার ছিল না। শুভংকর ও বাংলা বর্ণমালা শিখিতে অধিক সময়ও চাই না, অর্থও চাই না। কিন্তু এখন ছেলেকে ইংরেজি শিখাইতে হইবে, পিতামাতার মনে এ আকাঙ্ক্ষা সর্বদাই জাগ্রত থাকে। কেহ কেহ বা ছেলেকে বিলাতে পাঠাইবেন, এমন বাসনাও মনে মনে পোষণ করিয়া থাকেন। ইংরেজিবিদ্যাকে যে সকলে শুদ্ধমাত্র অর্থকরী বিদ্যা বলিয়া জ্ঞান করেন তাহা নহে ; অনেকেই মনে করেন, ইংরেজি শিক্ষা না হইলে মানসিক, এমন-কি, নৈতিক শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। এইজন্য ছেলেকে ইংরেজি শিক্ষা দেওয়া তাঁহারা পরম কর্তব্য জ্ঞান করেন।

অতএব সন্তানের স্থায়ী উন্নতিসাধন পিতামাতার সর্বপ্রধান ধর্ম, ইহা স্থির করিয়া তাঁহারা পুত্রের সামান্য শিক্ষায় সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন না। সবসুদ্ধ ধরিয়া অভাব আকাঙ্ক্ষা এবং তদনুসারে খরচপত্র বিস্তর বাড়িয়া গিয়াছে, ইহা সকলেই স্বীকার করেন। কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি, সমাজের সচ্ছল ও সন্তোষের অবস্থাতেই একান্নবর্তী পরিবার সম্ভব। যখন সকলেরই অভাব অল্প এবং সামান্য পরিশ্রমেই সে-অভাব মোচন হইতে পারে, তখন অনেকে একত্র থাকিয়া পরস্পরের অভাবমোচনচেষ্টা স্বাভাবিক, এবং তাহা দুরূহ নহে। বললাভের জন্য বৃহৎ জ্ঞাতিবন্ধন বা গোত্রবন্ধন (ইংরেজিতে যাহাকে **clan system** বলে) সাধারণের অল্প অভাব এবং এক উদ্দেশ্য থাকিলে সহজেই ঘটিয়া থাকে। কিন্তু প্রত্যেকেরই যদি বিপুল অভাব ও উদ্দেশ্যের পার্থক্য জন্মে তবে ঐক্যবন্ধন বলবৎ থাকিতে পারে না। অভাব আমাদের বাড়িয়াছে এবং বাড়িতেছে, একান্নবর্তী পরিবারও টলমল করিতেছে— অনেক পরিবার ভাঙিয়াছে এবং অনেক পরিবার ভাঙিতেছে।

ইংরেজি শাস্ত্রে স্বাধীন চিন্তা শিক্ষা দেয়। স্বাধীন চিন্তা যেখানে আছে সেখানে বুদ্ধির ভিন্নতা-অনুসারে উদ্দেশ্যের ভিন্নতা জন্মিয়াই থাকে। এখন কর্তব্য সম্বন্ধে ভিন্ন লোকের ভিন্ন মত। ভিন্ন মত না থাকিলে বর্তমান প্রবন্ধ লইয়া আজ আমাকে সভাস্থলে উপস্থিত হইতে হইত না। যখন শাস্ত্রের প্রবল অনুশাসনে সকলে গুটিকতক কর্তব্য শিরোধার্য করিয়া লইত তখন ভিন্ন লোকের মধ্যে জীবনযাত্রার ঐক্য ছিল, এবং এক শাস্ত্রের অধীনে অনেকে মিলিয়া বাস করা দুঃসাধ্য ছিল না। কিন্তু এখন যখন এমন অবস্থা হইয়াছে যে, শাস্ত্র বলিতেছে বলিয়াই কিছু মানি না, এমন-কি যাঁহারা শাস্ত্রকে সম্মান করেন তাঁহারা অনেকে আপন মতানুসারে শাস্ত্রের নানারূপ ব্যাখ্যা করেন, অথবা নিজের বুদ্ধি অনুসরণ করিয়া শাস্ত্রের কোনো কোনো অংশ বর্জন করিয়া কোনো কোনো অংশ নির্বাচন করিয়া লন, তখন নির্বিরোধে একত্র অবস্থান কিরূপে সম্ভব হয়। অতএব একত্র থাকিতে গেলে সকলের অভাব অল্প থাকা চাই, এবং যুক্তিবিচারনিরপেক্ষ কতকগুলি সরল কর্তব্য থাকা চাই, এবং তাহার কর্তব্যতার প্রতি সকলের সমান বিশ্বাস থাকা চাই।

ইহা ছাড়া পরিবারের একটি কর্তা থাকা চাই। কিন্তু এখন পূর্বের মতো কর্তার কর্তৃত্ব তেমন নাই বলিলেও হয়। বঙ্গদেশে পিতা ইচ্ছা করিলে সন্তানকে বিষয় হইতে বঞ্চিত করিতে পারেন, এই জন্য সচরাচর গুরুতর পিতৃদ্রোহ ততটা দেখা যায় না; কিন্তু বড়ো ভায়ের প্রতি ছোটো ভায়ের অসম্মান এবং ভায়ে ভায়ে বিরোধ, ইহা অনেক দেখা যায়। বড়ো ভাই যাহা বলিবেন তাহাই বেদবাক্য, এবং যাহা করিবেন তাহাই

সহিয়া থাকিতে হইবে, ইহা এখন সকলে মানে না। যে-কারণে শাস্ত্রের অনুশাসন শিথিল হইয়া আসিতেছে, জ্যেষ্ঠের প্রতি কনিষ্ঠের নির্বিচার ভক্তিবন্ধন সেই কারণেই শিথিল হইয়া আসিতেছে।

এ স্থলে আরেকটি বিষয় বিচার্য। তাহা শিক্ষার বৈষম্য। যে ভালোরূপ ইংরেজি শিখিয়াছে এবং যে শেখে নাই, তাহাদের মধ্যে গুরুতর ব্যবধান পড়িয়াছে। তাহাদের চিন্তাপ্রণালী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হইয়া গিয়াছে। পূর্বে বিদ্বান-মূর্খের মধ্যে এরূপ প্রভেদ ছিল না। তখন একজন বেশি জানিত আরেকজন কম জানিত, এইমাত্র প্রভেদ ছিল। এখন একজন একরূপ জানে, আরেকজন অন্যরূপ জানে। এই জন্য অনেক সময়ে দেখা যায়, উভয়ে উভয়কে জানে না। সামান্য বিষয়ে পরস্পর পরস্পকে ভুল বুঝে, এই জন্য উভয়ের তেমন ঘনিষ্ঠভাবে একত্র থাকা প্রায় অসম্ভব।

অতএব দেখা যাইতেছে, এক সময়ে একান্নবর্তী প্রথা থাকাতে অনেক সুবিধা ছিল এবং তাহাতে মানবপ্রকৃতির অনেক উন্নতি সাধন করিত। কিন্তু এখন অবস্থাভেদে তাহার সুবিধাগুলি চলিয়া যাইতেছে এবং তাহার মধ্যে যে উন্নতির কারণ ছিল তাহাও নষ্ট হইতেছে। পূর্বে জটিলতাবিহীন সমাজে যে-সকল সুখ সম্পদ ও শিক্ষা লভ্য ছিল, তাহা একান্নবর্তী পরিবারের মধ্যে থাকিয়াই সকলে পাইত। এখন একান্নবর্তী পরিবারে থাকে বলিয়াই অনেকে সে-সকল হইতে বঞ্চিত হইতেছে। আমি প্রাণপণে উপার্জন করিয়া যে-অর্থ সঞ্চয় করিতেছি, তাহাতে কোনোমতে আমার পুত্রের শিক্ষা দিয়া তাহার যাবজ্জীবন উন্নতির মূলপত্তন করিয়া দিতে পারি ; কিন্তু আমি আমার পুত্রের অহিতসাধন করিয়া আমার শ্যালকপুত্রের কথঞ্চিৎ উদরপূর্তি করিব,ইহাকে সকলের মহৎ উদ্দেশ্য মনে না হইতেও পারে। যদি ইচ্ছা কর তো সন্তানোৎপাদন বন্ধ করিয়া অপরের সন্তানের উন্নতিসাধনে প্রাণপণ করিতে পার, তাহাতে তোমার মহত্ত্ব প্রকাশ পাইবে ; কিন্তু যদি তোমার নিজের সন্তান জন্মে তবে সর্বাপেক্ষা প্রবল স্নেহ ও কর্তব্য-সূত্রে তোমার সহিত বদ্ধ যে-আত্মজ, তাহার সম্যক্ উন্নতিবিধানের জন্য তুমি প্রধানত দায়ী। পূর্বে শ্যালকপুত্রের সহিত নিজ পুত্রের প্রভেদ করিবার কোনো আবশ্যকতা ছিল না, কারণ তখন আমাদের অন্নপূর্ণা বঙ্গভূমি তাঁহার সকল সন্তানকে একত্রে কোলে লইয়া সকলের মুখে অন্ন তুলিয়া দিতে পারিতেন, তাঁহার ভাণ্ডার এমন পরিপূর্ণ ছিল ; এখন চারিদিকে অন্ন নাই অন্ন নাই রব উঠিয়াছে, এখন পিতা স্বয়ং আপন ক্ষুধিত সন্তানের মুখ না চাহিলে উপায় কী। দ্বিতীয় কথা, পূর্বকালে একান্নবর্তী পরিবারে প্রীতিভাবের অত্যন্ত চর্চা হইত। এ জন্য তাহা দেশের একটি মহৎ আশ্রম বলিয়া গণ্য হইত। কিন্তু এখন সাধারণের অবস্থাভেদে শিক্ষাভেদে শাস্ত্রভেদে মতভেদে ও

রুচিভেদে নিতান্ত একত্র অবস্থানে সর্বত্র সেরূপ সদ্ভাবের সম্ভাবনা নাই, বরঞ্চ বিরোধ বিদ্বেষ ঈর্ষা ও নিন্দাগ্লানির সম্ভাবনা ; এবং ইহাতে মনুষ্যপ্রকৃতির উন্নতি না হইয়া অবনতি হইবারই কথা। তৃতীয় কথা, যখন পরিবারের মধ্যে শাসন শিথিল হইয়া আসিয়াছে ইহা সকলেই প্রত্যক্ষ করিতেছেন তখন পরিবারের মধ্যে যথেচ্ছাচারের প্রাদুর্ভাব অবশ্যম্ভাবী, ইহাও স্বীকার করিতে হইবে। বহুবিস্তৃত পরিবারে এরূপ যথেচ্ছাচারের অপেক্ষা ক্ষতিজনক আর কী আছে। একজন এক ঘরে মদ্যপান করিতেছেন, আরেকজন অন্য ঘরে বন্ধুবান্ধবসমেত অট্টহাস্য ও ঊর্ধ্বকণ্ঠে কুৎসিত আলাপে নিরত, এ স্থলে আমার ছেলেপুলের শিক্ষা কীরূপ হয়। আমি আমার সন্তানকে এক ভাবে শিক্ষা দিতে চাই, আমার গুরুজন তাহাকে অন্য ভাবে শিক্ষা দেন, সে স্থলে ছেলেটার উপায় কী। পিতার শিক্ষাগুণে ভ্রাতুষ্পুত্রগণ বিগড়িয়া গেছে, তাহাদের সহিত আমি আমার ছেলেকে একত্র রাখি কী করিয়া। তাহা ছাড়া বৃহৎ পরিবারে সকলের প্রেমের বন্ধন সমান হইতেই পারে না ; সুতরাং পরস্পরের প্রতি কুৎসা দ্বেষ মিথ্যাচরণ অনেক সময় দূষিত রক্তস্রোতের ন্যায় পরিবারের মধ্যে সঞ্চরণ করিতে থাকে। অতএব দেখিতেছি, কালক্রমে একান্নবর্তী প্রথার সদ্‌গুণসকল বিনষ্ট এবং তাহার প্রতিষ্ঠাভূমি জীর্ণ হইয়া আসিতেছে। কেবলমাত্র কন্যার বাল্যবিবাহ-প্রবর্তন-রূপ ক্ষীণ দণ্ড আশ্রয় করিয়াই যে এই ঐতিহাসিক প্রকাণ্ড পতনোন্মুখ মন্দিরকে ধরিয়া রাখিতে পারিব তাহা মনে হয় না। প্রথমে শিখিতে হইবে শাস্ত্র অভ্রান্ত, গুরুবাক্য অলঙ্ঘনীয়, তার পর দেখিতে হইবে জীবনের অভাব সকল উত্তরোত্তর স্বল্প ও সরল হইয়া আসিতেছে ; তবে জানিব একান্নবর্তী প্রথা টিঁকিবে। কিন্তু দেখিতেছি, বর্তমান সমাজে দুটার মধ্যে কোনোটাই ঘটিতেছে না ; এবং ভবিষ্যতে যতটা দেখা যায়, শীঘ্র এ অবস্থার পরিবর্তন দেখি না, বরঞ্চ উত্তরোত্তর বৃদ্ধিরই সম্ভাবনা।

এই-সকল ভাবিয়া যাঁহারা বলেন বর্তমান সমাজে একান্নবর্তী প্রথার অনেক দোষ ঘটিয়াছে, অতএব উহা উঠিয়া গেলে কোনো হানি নাই, বরং উঠিয়া যাওয়াই উচিত, কিন্তু তাই বলিয়া বাল্যবিবাহ উঠাইবার কোনো প্রয়োজন দেখি না— তাঁহাদের প্রতি বক্তব্য এই যে, একান্নবর্তী প্রথা না রাখিলে বাল্যবিবাহ থাকিতে পারে না। যেখানে স্বতন্ত্র গৃহ করিতে হইবে সেখানে স্বামীস্ত্রীর বয়স অল্প হইলে চলিবে না। তখন শিশুস্ত্রী যদি অনেক দিন পর্যন্ত স্বামীর নিরুদ্যম ভারস্বরূপ হইয়া থাকে তবে স্বামীর পক্ষে সংকট। একক স্বামীগৃহে কেই-বা তাহাকে গৃহকার্য শিক্ষা দিবে। অতএব এরূপ অবস্থায় পিতৃভবন হইতে গৃহকার্য শিক্ষা করিয়া স্বামীগৃহে আসা আবশ্যক। অথবা পরিণত বয়সে বিবাহ হওয়াতে স্বল্প পরিবারের ভার গ্রহণে বিশেষ অসুবিধা হয় না।

অতএব একান্নবর্তীপ্রথা ভালো সুতরাং তাহা রক্ষার জন্যই বাল্যবিবাহ ভালো, এ কথা বলিলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে অনেক কথা উঠে ; সংক্ষেপে তাহার আলোচনা করা গেল। এখন আর-একটি কথা দেখিতে হইবে। যে-অসচ্ছল অবস্থার পীড়নে একান্নবর্তীপ্রথা প্রতিদিন অল্পে অল্পে ভাঙিয়া পড়িতেছে, সেই অবস্থার দায়েই বাল্যবিবাহ-প্রথাও দুর্বল হইয়া পড়িতেছে। দায়ে পড়িয়া শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘনপূর্বক কন্যাকে অনেক বয়স পর্যন্ত অবিবাহিত রাখা হইয়াছে, ইতিপূর্বে হিন্দুসমাজে এরূপ দৃষ্টান্ত দেখা গেছে। সমাজে সর্বাপেক্ষা অধিক মান্য কুলীনসম্প্রদায়ের মধ্যেই ইহা প্রচলিত ছিল এবং অনেক স্থলে এখনও আছে। অতএব তেমন দায়ে পড়িলে অল্পে অল্পে কুমারী কন্যার বয়োবৃদ্ধি এখনও অসম্ভব নহে। সমাজ দায়েও পড়িয়াছে এবং অল্পে অল্পে বয়োবৃদ্ধিও আরম্ভ হইয়াছে। যাঁহারা আচার মানিয়া চলেন তাঁহাদের মধ্যেও ১৩ বৎসর বয়সে কন্যাদান অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু কিছুকাল পূর্বে আটদশ বৎসর পার হইলেই কন্যাকে পিতৃগৃহে দেখা যাইত না। পূর্বে কন্যার ৩।৪।৫ বৎসর বয়সে যত বিবাহ দেখা যাইত এখন তত দেখা যায় না। পুরুষের বিবাহবয়স পূর্বাপেক্ষা অনেক বাড়িয়াছে ইহা প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে। শিক্ষিত হিন্দুসমাজে পুরুষের শিশুবিবাহ নাই বলিলেও হয়। এইরূপ অলক্ষিতভাবে বিবাহের বয়োবৃদ্ধি যে ইংরেজিশিক্ষার অব্যবহিত ফল, আমার তাহা বিশ্বাস নহে। অবস্থার অসচ্ছলতাই ইহার প্রধান কারণ। আমার বোধ হয় বড়োমানুষের ঘরে বাল্যবিবাহ যতটা আছে মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ঘরে ততটা নাই। অর্থক্লেশের সময় ছেলেমেয়েদের বিবাহ দেওয়া বিষম ব্যাপার। সুবিধা করিয়া বিবাহ দিতে অনেক সময় যায়। বিবাহের ব্যয়ভার বহন করিবার জন্য সাংসারিক খরচ বাদে অল্প অল্প করিয়া অর্থ সঞ্চয় করিতে হয়। গৃহস্থ লোকের পক্ষে তাহাতে অনেক সময় চাই। সমাজের সচ্ছল অবস্থায় কন্যাদায়গ্রস্তকে লোকে সাহায্য করিত। কিন্তু এখন একপক্ষে খরচ বাড়িয়াছে, অপরপক্ষে সাহায্য কমিয়াছে।

এ ছাড়া, ইংরেজিশিক্ষার প্রভাবে অনেক অবিবাহিত যুবক নানা বিবেচনায় চটপট বিবাহকার্য সারিয়া ফেলিতে চান না। ইহাদের মধ্যে অল্পসংখ্যক যুবক আছেন যাঁহারা যৌবনের স্বাভাবিক উৎসাহে সংকল্প করেন যে, বিবাহ না করিয়া জীবন দেশের কোনো মহৎ কার্যে উৎসর্গ করিব ; অবশেষে বয়োবৃদ্ধি-সহকারে মহৎ কার্যের প্রতি ঔদাসীন্য জন্মিলে হয়তো বিবাহের প্রতি মনোযোগ করেন। অনেকে বিদ্যাশিক্ষার ব্যাঘাত হইবে বলিয়া পাঠদ্দশায় বিবাহ করিতে অসম্মত। এবং অনেকে বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছেন, অল্পবয়সে বিবাহ করিয়া তাড়াতাড়ি পরিবারবৃদ্ধি করিলে ইহজীবন দারিদ্র্যের হাত এড়ানো দুষ্কর হইবে। তাঁহারা জানেন যে, অল্পবয়সে স্ত্রীপুত্রের ভারে

অভিভূত হইয়া তেজ বল সাহস সমস্তই হারাইতে হয়। সহস্র অপমান নীরবে সহ্য করিয়া যাইতে হয়, তাহার সমুচিত প্রতিশোধ দিতে ভরসা হয় না। যখন বিদেশীয় প্রভুর নিকট হইতে নিতান্ত হীনজনের ন্যায় অন্যায় লাঞ্ছনা সহ্য করা যায় তখন গৃহের ক্ষুধিত রুগ্‌ণ সন্তানের ম্লান মুখই মনে পড়ে এবং নীরবে নতশিরে ধৈর্য অবলম্বন করিতে হয়। কাগজে পত্রে শ্বেতাঙ্গদের বিরুদ্ধে অনেক লেখনী-আস্ফালন করি, কিন্তু গৃহে ক্রন্দনধ্বনি শুনিলে আর থাকা যায় না; সেই শ্বেতপুরুষের দ্বারস্থ হইয়া জোড়হস্তে ছলছলনয়নে দুই বেলা উমেদারি করিয়া মরিতে হয়। সংসার-ভার বহন করিয়া বাঙালিদের স্বাভাবিক সাবধানতাবৃত্তি চতুর্গুণ বাড়িয়া উঠে এবং সকল দিক বিবেচনা করিয়া কোনো কাজে অগ্রসর হইতে পা উঠে না। এইরূপ ভারাক্রান্ত ভীত এবং ব্যাকুল ভাব জাতির উন্নতির প্রতিকূল তাহার আর সন্দেহ নাই। এ কথা স্মরণ করিয়া অনেক দেশানুরাগী অপমান-অসহিষ্ণু উন্নতস্বভাব যুবক অসমর্থ অবস্থায় বিবাহ করিতে বিরত হইবেন। ইহা নিশ্চয়ই যে, দারিদ্র্যের প্রভাব যতই অনুভব করা যাইবে লোকে বিবাহবন্ধনে ধরা দিতে ততই সংকুচিত হইবে। যখন চারিদিকে দেখা যাইবে উদ্বাহবন্ধন উদ্বন্ধনের ন্যায় বিবাহিতের কণ্ঠদেশ আক্রমণ করিয়াছে, তখন মনু অথবা অন্য কোনো ঋষির বিধান সত্ত্বেও যুবক যখন-তখন উক্ত ফাঁসের মধ্যে গলা গলাইয়া দিতে সম্মত হইবে না। স্ত্রীর সহিত পবিত্র একত্ব সাধন করিতে গিয়া যদি পঞ্চত্ব নিকটবর্তী হয় তবে অনেক বিবেচক লোক উক্ত মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করিতে বিরত হইবেন সন্দেহ নাই। বাপ মায়ে ঠেকিয়া শিখিয়াছেন, তাহারাও যে তাড়াতাড়ি অবিবেচক বালকের গলদেশে বিষম গুরুভার বধূ বাঁধিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইবেন, ইহা সম্ভব নহে। ছেলে যখন আপনি উপার্জন করিবে তখন বিবাহ করিবে, আজকাল অনেক পিতার মুখে এ কথা শুনা যায়। এমন-কি, হিন্দুগৃহে প্রাচীন নিয়মে পালিতা সেকেলে একটি প্রাচীনার মুখে এইমত শুনিয়া আশ্চর্য হইয়াছি। অথবা আশ্চর্যের কারণ কিছুই নাই; জীব দিয়াছেন যিনি, আহার দিবেন তিনি— সমাজের অবস্থাগতিকে এ বিশ্বাস আর টিঁকে না।

অতএব ইংরেজিশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে অভাবের জটিলতা যতই বাড়িতে থাকিবে ততই পুরুষেরা শীঘ্র বিবাহ করিতে চাহিবে না, ইহা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন। আগে অনেক ছেলে 'বিয়েপাগলা' ছিল, এখন অনেকে বিয়েকে ডরায়। ক্রমে এ ভাব আরও অনেকের মধ্যে সংক্রামিত হইতে থাকিবে। পুরুষ যদি উপার্জনক্ষম হইয়া বড়ো বয়সে বিবাহ করে তবে মেয়ের বয়সও বাড়াইতে হইবে সন্দেহ নাই। মস্ত পুরুষের সঙ্গে কচি মেয়ের বিবাহ নিতান্ত অসংগত। দেখা যায় বরকন্যার

মধ্যে বয়সের নিতান্ত বৈসাদৃশ্য দেখিলে কন্যাপক্ষীয় মেয়েরা অত্যন্ত কাতর হন। বোধ করি মনের অমিল ও বৈধব্যের সম্ভাবনাই তাঁহাদের চিন্তার বিষয়। অতএব স্বাভাবিক নিয়মানুসারে বিবাহযোগ্য পুরুষের সঙ্গে বিবাহযোগ্য মেয়ের বয়সও বাড়িতে থাকিবে।

অতএব যিনি যতই বক্তৃতা দিন, দেশের যেরূপ অবস্থা হইয়াছে এবং আমরা যেরূপ শিক্ষা পাইতেছি তাহাতে অবিবাহিত ছেলেমেয়ের বয়সের সীমা বাড়িবেই, কেহ নিবারণ করিতে পারিবে না। কিছুদিন প্রাচীন নিয়ম ও নূতন অবস্থার বিরোধে সমাজে অনেক অসুখ অশান্তি বিশৃঙ্খলা ঘটিবে, এবং ক্রমশ এই মথিত সমাজের আলোড়নে নূতন জীবন নূতন নিয়ম জাগ্রত হইয়া উঠিবে। তাহার সমস্ত ফলাফল আমরা আগে হইতে সম্পূর্ণ বিচার করিয়া স্থির করিতে পারি না। এখন আমাদের সমাজে অনেক মন্দ আছে, কিন্তু অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে বলিয়া সেগুলিকে তত গুরুতর মন্দ বলিয়া মনে হয় না; তখনও হয়তো কতকগুলি অনিবার্য মন্দ উঠিবে যাহা আমরা আগে হইতে কল্পনা করিয়া যত ভীত হইতেছি তখনকার লোকের পক্ষে তত ভীতিজনক হইবে না। দূর হইতে ইংরেজেরা আমাদের কতকগুলি সামাজিক অনুষ্ঠানের নামমাত্র শুনিয়া ভয়ে বিস্ময়ে যতখানি চমক খাইয়া উঠেন, ভিতরে প্রবেশ করিলে ততখানি চমক খাইবার কিছুই নাই, সমাজের মধ্যে সন্ধান করিলে দেখা যায়, অনেক অনুষ্ঠানের ভালোমন্দ ভাগ লইয়া একপ্রকার সামঞ্জস্যবিধান হইয়াছে। তেমনই আমরাও দূর হইতে ইংরেজসমাজের অনেক আচারের নাম শুনিয়া যতটা ভয় পাই, ভিতরে গিয়া দেখিলে হয়তো জানিতে পারি ততটা আশঙ্কার কারণ নাই। তাহা ছাড়া অভ্যাসে অনেক ভালোমন্দ সৃজিত হয়। এখন যে-মেয়ে ঘোমটা দিয়া সূক্ষ্ম বসন পরে তাহাকে আমরা বেহায়া বলি না, কিছুকাল পরে যাহারা ঘোমটা না দিয়া মোটা কাপড় পরিবে তাহাদিগকে বেহায়া বলিব না। মনে করো, শ্যালীর সহিত ভগ্নিপতির অনেকস্থলে যেরূপ উপহাস চলে তাহাতে একজন বিদেশের লোক কত কী অনুমান করিয়া লইতে পারে, এবং অনুমান করিলেও তাহাকে দোষ দেওয়া যায় না, কিন্তু সত্য সত্যই ততটা ঘটে না। সমাজের এক নিয়ম অপর নিয়মের দোষসম্ভাবনা কথঞ্চিৎ সংশোধন করে। অতএব কোনো সমাজের একটিমাত্র নিয়ম স্বতন্ত্র তুলিয়া লইয়া তাহার ভালো মন্দ বিচার করিলে প্রতারিত হইতে হয়। এইজন্য আমাদের সমাজের পরিবর্তনে যে-সকল নূতন নিয়ম অল্পে অল্পে স্বভাবতই উদ্ভাবিত হইবে, আগে হইতে তাহার সম্পূর্ণ সূক্ষ্ম বিচার অসম্ভব। তাহারা অকাট্য নিয়মে পরস্পর পরস্পরকে জন্ম দিবে ও রক্ষা করিবে। সমাজে

আগে-ভাগে বুদ্ধি খাটাইয়া গায়ে পড়িয়া একটা নিয়মস্থাপন করিতে যাওয়া অনেক সময় মূঢ়তা। সে-নিয়ম নিজে ভালো হইতে পারে, কিন্তু অন্য নিয়মের সংসর্গে সে হয়তো মন্দ। অতএব বাল্যবিবাহ উঠিয়া গেলে আজ তাহার ফল যতটা ভয়ানক বলিয়া মনে হইবে, তাহা হইতে যত বিপদ ও অমঙ্গল আশঙ্কা করিব, তাহার অনেকটা আমাদের কাল্পনিক। কেবল, কতকটা দেখিতেছি এবং অনেকটা দেখিতেছি না বলিয়া এত ভয়।

বলা বাহুল্য, আমি সমাজের পরিবর্তন সম্বন্ধে যত কথা বলিয়াছি তাহা প্রধানত শিক্ষিত সমাজের পক্ষে খাটে। অতএব শীঘ্র বাল্যবিবাহ দূর হওয়া শিক্ষিত-সমাজেই সম্ভব। কিন্তু তাহা আপনি সহজ নিয়মে হইবে। যাঁহারা আইন করিয়া জবরদস্তি করিয়া এ প্রথা উঠাইতে চান তাঁহারা এ প্রথাকে নিতান্ত স্বতন্ত্র করিয়া লইয়া ইহার দুই একটি ফলাফলমাত্র বিচার করিয়াছেন, হিন্দুসমাজের বাল্যবিবাহের আনুষঙ্গিক অন্যান্য প্রথা তাঁহারা দেখেন নাই। সামাজিক অন্যান্য সহকারী নিয়মের মধ্য হইতে বাল্যবিবাহকে বলপূর্বক উৎপাটন করিলে সমাজে সমূহ দুর্নীতি ও বিশৃঙ্খলার প্রাদুর্ভাব হইবে। অল্পে অল্পে নূতন অবস্থার প্রভাবে সমাজের সমস্ত নিয়ম নূতন আকার ধারণ করিয়া সমাজের বর্তমান অবস্থার সহিত আপন উপযোগিতাসূত্র বন্ধন করিতেছে। অতএব যাঁহারা বাল্যবিবাহের বিরোধী তাঁহাদিগকে অকারণ ব্যস্ত হইতে হইবে না।

তেমনই, যাঁহারা একান্নবর্তী পরিবার হইতে বিচ্যুত হইয়া নূতন অবস্থা ও নূতন শিক্ষার আবর্তে পড়িয়া আচার ও উপদেশ হইতে বাল্যবিবাহ দূর করিয়া দিয়াছেন, তাঁহারা ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ব্রাহ্ম অথবা বিদেশগমন দ্বারা জাতিচ্যুত হইলেও বিবেচক হিন্দুমণ্ডলী তাঁহাদিগকে দুর্নীতির প্রশ্রয়দাতা মহাপাতকী জ্ঞান না করেন। তাঁহারা কিছুই অন্যায় করেন নাই। তাঁহারা বর্তমান শিক্ষা ও বর্তমান অবস্থার অনুগত হইয়া আপন কর্তব্যবুদ্ধির প্ররোচনায় যুক্তিসংগত কাজই করিয়াছেন। কারণ আমি পূর্বেই বলিয়াছি, অবস্থাবিশেষে বাল্যবিবাহ উপযোগী হইলেও অবস্থাবিপর্যয়ে তাহা অনিষ্টজনক।

এই দীর্ঘ প্রবন্ধে কী কী বলিয়াছি, এইখানে তাহার একটি সংক্ষেপ পুনরাবৃত্তি আবশ্যক।

প্রথম। হিন্দুবিবাহসম্বন্ধে অনেকে অনেক কথাই বলিয়া থাকেন, কিন্তু ঐতিহাসিক পদ্ধতি-অনুসারে হিন্দুবিবাহ সমালোচন না করাতে তাঁহাদের কথার সত্যমিথ্যা কিছুই স্থির করিয়া বলা যায় না। শাস্ত্রের ইতস্তত হইতে শ্লোকখণ্ড উদ্ধৃত করিয়া একই বিষয়ের পক্ষে এবং বিপক্ষে মত দেওয়া যাইতে পারে।

দ্বিতীয়। যাঁহারা বলেন, হিন্দুবিবাহের প্রধান লক্ষ্য দম্পতির একীকরণতার প্রতি, তাঁহাদিগকে এই উত্তর দেওয়া হইয়াছে যে, তাহা হইলে পুরুষের বহুবিবাহ এ দেশে কোনোক্রমে প্রচলিত হইতে পারিত না।

তৃতীয়। আজকাল অনেকেই বলেন হিন্দুবিবাহ আধ্যাত্মিক। তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে, আধ্যাত্মিক শব্দের অর্থ কী। উক্ত শব্দের প্রচলিত অর্থ হিন্দুবিবাহে নানা কারণে প্রয়োগ করা যাইতে পারে না; উক্ত কারণসকল একে একে দেখানো হইয়াছে।

চতুর্থ। তাহাই যদি হয় তবে দেখা যাইতেছে, হিন্দুবিবাহ সামাজিক মঙ্গল ও সাংসারিক সুবিধার জন্য। সংহিতা সম্বন্ধে পণ্ডিত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের উক্তি এবং মনুর কতকগুলি বিধান উক্ত মতের পক্ষ সমর্থন করিতেছে।

পঞ্চম। সমাজের মঙ্গল যদি বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্য হয়, পারত্রিক বা আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য যদি তাহার না থাকে বা গৌণভাবে থাকে, তবে বিবাহ সমালোচনা করিবার সময় সমাজের মঙ্গলের প্রতিই বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। এবং যেহেতু সমাজের পরিবর্তন হইতেছে এবং নানা বিষয়ে জ্ঞানের বৃদ্ধি হইতেছে, অতএব সমাজের মঙ্গলসাধক উপায়েরও তদনুসারে পরিবর্তন আবশ্যক হইতেছে। পুরাতন সমাজের নিয়ম সকল সময় নূতন সমাজের মঙ্গলজনক হয় না। অতএব আমাদের বর্তমান সমাজের বিবাহের সকল প্রাচীন নিয়ম হিতজনক হয় কি না তাহা সমালোচ্য।

ষষ্ঠ। তাহা হইলে দেখিতে হইবে বাল্যবিবাহের ফল কী। প্রথম, বাল্যবিবাহে সুস্থকায় সন্তান উৎপাদনের ব্যাঘাত হয় কি না। বিজ্ঞানের মতে ব্যাঘাত হয়।

সপ্তম। কেহ কেহ বলেন, পুরুষের অধিক বয়সে বিবাহ দিলেই আর কোনো ক্ষতি হইবে না। কিন্তু পুরুষের বিবাহবয়স বাড়াইলে স্বাভাবিক নিয়মেই হয় মেয়েদের বয়সও বাড়াইতে হইবে নয় পুরুষের বয়স আপনি অল্পে অল্পে কমিয়া আসিবে, যেমন মনুর সময় হইতে কমিয়া আসিয়াছে।

অষ্টম। কিন্তু কেহ কেহ বলেন, সুস্থ সন্তান উৎপাদনই সমাজের একমাত্র মঙ্গলের কারণ নহে, অতএব একমাত্র তৎপ্রতিই বিবাহের লক্ষ থাকিতে পারে না। মহৎ উদ্দেশ্যসাধনেই বিবাহের মহত্ত্ব। অতএব মহৎ উদ্দেশ্যসাধনের অভিপ্রায়ে বাল্যকাল হইতে স্ত্রীকে শিক্ষিত করিয়া লওয়া স্বামীর কর্তব্য। এইজন্য স্ত্রীর অল্প বয়স হওয়া চাই। আমি প্রথমে দেখাইয়াছি, যথার্থ মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে অধিক বয়সে বিবাহ উপযোগী। তাহার পরে দেখাইয়াছি, মহৎ উদ্দেশ্য সকল স্বামীরই থাকিতে পারে না; কিন্তু অধিকাংশ লোকেরই স্বভাবভেদে বিশেষ বিশেষ গুণের প্রতি বিশেষ

আকর্ষণ আছে, উক্ত গুণসকল তাহারা স্ত্রীর নিকট হইতে প্রত্যাশা করে; নিরাশ হইলে অনেক সময়ে সমাজে অশান্তি ও অমঙ্গল সৃষ্ট হয়। অতএব গুণ দেখিয়া স্ত্রী নির্বাচন করিতে হইলে বড়ো বয়সে বিবাহ আবশ্যক।

নবম। কিন্তু পরিণতবয়স্কা স্ত্রী বিবাহ করিলে একান্নবর্তী পরিবারে অসুখ ঘটিতে পারে। আমি দেখাইয়াছি, কালক্রমে নানা কারণে একান্নবর্তীপ্রথা শিথিল হইয়া আসিয়াছে এবং সমাজের অনিষ্টজনক হইয়া উঠিয়াছে; অতএব একমাত্র বাল্যবিবাহ-দ্বারা উহাকে রক্ষা করা যাইবে না এবং রক্ষা করা উচিত কি না তদ্বিষয়েও সন্দেহ।

দশম। সমাজে এ-সকল ছাড়া দারিদ্র্য প্রভৃতি এমন কতকগুলি কারণ ঘটিয়াছে যাহাতে স্বতই বাল্যবিবাহ অধিক কাল টিঁকিতে পারে না। সমাজে অল্পে অল্পে তাহার লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে।

অতএব যাঁহারা বাল্যবিবাহ দূষণীয় জ্ঞান করেন অথবা সুবিধার অনুরোধে ত্যাগ করেন, তাঁহাদিগকে দোষ দেওয়া যায় না। কিন্তু তাই বলিয়া বলপূর্বক বাল্যবিবাহ উঠাঁনো যায় না। কারণ, ভালোরূপ শিক্ষা-ব্যতিরেকে বাল্যবিবাহ উঠিয়া গেলে সমাজের সমূহ অনিষ্ট হইবে। যেখানে শিক্ষার প্রভাব হইতেছে সেখানে বাল্যবিবাহ আপনিই উঠিতেছে, যেখানে হয় নাই সেখানে এখনও বাল্যবিবাহ উপযোগী। আমাদের অন্তঃপুরের, আমাদের সমাজের, অনেক অনুষ্ঠান ও অভ্যাসে এবং আমাদের একান্নবর্তী পরিবারের ভিতরকার শিক্ষায় বাল্যবিবাহ নিতান্ত আবশ্যক হইয়া পড়ে; অতএব অগ্রে শিক্ষার প্রভাবে সে-সকলের পরিবর্তন না হইলে কেবল আইনের জোরে ও বক্তৃতার তোড়ে সর্বত্রই বাল্যবিবাহ দূর করা যাইতে পারে না।

১২৯৪

রমাবাইয়ের বক্তৃতা-উপলক্ষে

পত্র

কাল বিকেলে বিখ্যাত বিদুষী রমাবাইয়ের বক্তৃতার কথা ছিল, তাই শুনতে গিয়েছিলেম। অনেকগুলি মহারাষ্ট্রী ললনার মধ্যে গৌরী নিরাভরণা শ্বেতাম্বরী ক্ষীণতনুযষ্টি উজ্জ্বলমূর্তি রমাবাইয়ের প্রতি দৃষ্টি আপনি আকৃষ্ট হল। তিনি বললেন, মেয়েরা সকল বিষয়ে পুরুষদের সমকক্ষ কেবল মদ্যপানে নয়। তোমার কী মনে হয়। মেয়েরা সকল বিষয়েই যদি পুরুষের সমকক্ষ, তাহলে পুরুষের প্রতি বিধাতার নিতান্ত অন্যায় অবিচার বলতে হয়। কেননা কতক বিষয়ে মেয়েরা পুরুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, যেমন, রূপে এবং অনেকগুলি হৃদয়ের ভাবে; তার উপরে যদি পুরুষের সমস্ত গুণ তাদের সমান থাকে তাহলে মানবসমাজে আমরা আর প্রতিষ্ঠা পাই কোথায়। সকল বিষয়েই প্রকৃতিতে একটা Law of Compensation অর্থাৎ ক্ষতিপূরণের নিয়ম আছে। শারীরিক বিষয়ে আমরা যেমন বলে শ্রেষ্ঠ, মেয়েরা তেমনই রূপে শ্রেষ্ঠ; অন্তঃকরণের বিষয়ে আমরা যেমন বুদ্ধিতে শ্রেষ্ঠ, মেয়েরা তেমনই হৃদয়ে শ্রেষ্ঠ; তাই স্ত্রী পুরুষ দুই জাতি পরস্পর পরস্পরকে অবলম্বন করতে পারছে। স্ত্রীলোকের বুদ্ধি পুরুষের চেয়ে অপেক্ষাকৃত অল্প ব'লে অবশ্য এ কথা কেউ বলবে না যে, তবে তাদের লেখাপড়া শেখানো বন্ধ করে দেওয়া উচিত; যেমন, স্নেহ দয়া প্রভৃতি সম্বন্ধে পুরুষের সহৃদয়তা মেয়েদের চেয়ে অল্প বলে এ কথা কেউ বলতে পারে না যে, তবে পুরুষদের হৃদয়বৃত্তি চর্চা করা অকর্তব্য। অতএব স্ত্রীশিক্ষা অত্যাবশ্যক এটা প্রমাণ করবার সময় স্ত্রীলোকের বুদ্ধি পুরুষের ঠিক সমান এ কথা গায়ের জোরে তোলবার কোনো দরকার নেই।

আমার তো বোধ হয় না, কবি হতে ভূরিপরিমাণ শিক্ষার আবশ্যক। মেয়েরা এতদিন যেরকম শিক্ষা পেয়েছে তাই যথেষ্ট ছিল। Burns খুব যে সুশিক্ষিত ছিলেন তা নয়। অনেক বড়ো কবি অপেক্ষাকৃত অশিক্ষিত নিম্নশ্রেণী থেকে উদ্ভূত। স্ত্রীজাতির মধ্যে প্রথমশ্রেণীর কবির আবির্ভাব এখনও হয় নি। মনে করে দেখো, বহুদিন থেকে যত বেশি মেয়ে সংগীতবিদ্যা শিখছে এত পুরুষ শেখে নি। য়ুরোপে অনেক মেয়েই সকাল থেকে রাত্তির পর্যন্ত পিয়ানো ঠং ঠং এবং ডোরেমিফা চেঁচিয়ে মরছে, কিন্তু তাদের মধ্যে ক'টা Mozart কিংবা Beethoven জন্মাল! অথচ Mozart

শিশুকাল থেকেই musician। এমন তো ঢের দেখা যায়, বাপের গুণ মেয়েরা এবং মায়ের গুণ ছেলেরা পায়, তবে কেন এরকম প্রতিভা কোনো মেয়ে সচরাচর পায় না। আসল কথা প্রতিভা একটা শক্তি (Energy), তাতে অনেক বল আবশ্যক, তাতে শরীর ক্ষয় করে। তাই মেয়েদের একরকম গ্রহণশক্তি ধারণাশক্তি আছে, কিন্তু সৃজনশক্তির বল নেই। মস্তিষ্কের মধ্যে কেবল একটা বুদ্ধি থাকলে হবে না, আবার সেই সঙ্গে মস্তিষ্কের একটা বল চাই। মেয়েদের একরকম চটপটে বুদ্ধি আছে, কিন্তু সাধারণত পুরুষদের মতো বলিষ্ঠ বুদ্ধি নেই। আমার তো এইরকম বিশ্বাস। তুমি বলবে, এখন পর্যন্ত এইরকম চলে আসছে কিন্তু ভবিষ্যতে কী হবে কে বলতে পারে। সে সম্বন্ধে দুই-একটা কথা আছে।

আসলে শিক্ষা, যাতে সমস্ত বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ হয়, তা কেবল বই পড়ে হতে পারে না— তা কেবল কাজ করে হয়। বহিঃপ্রকৃতির ভিতরে পড়ে যখন সংগ্রাম করতে হয়, সহস্র বাধা বিঘ্ন যখন অতিক্রম করতে হয়, যখন বুদ্ধিতে বুদ্ধিতে এবং বুদ্ধিতে ও জড় বাধাতে সংঘাত উপস্থিত হয়, তখন আমাদের সমস্ত বুদ্ধি জেগে ওঠে। তখন আমাদের সমস্ত মনোবৃত্তির আবশ্যক হয় সুতরাং চর্চা হয়, এবং সেই অবিশ্রাম আঘাতে স্নেহ দয়া প্রভৃতি কতকগুলি কোমল বৃত্তি স্বভাবতই কঠিন হয়ে আসে। মেয়েরা হাজার পড়াশুনো করুক, এই কার্যক্ষেত্রে কখনোই পুরুষদের সঙ্গে সমানভাবে নাবতে পারবে না। তার একটা কারণ শারীরিক দুর্বলতা। আর-একটা কারণ অবস্থার প্রভেদ। যতদিন মানবজাতি থাকবে কিংবা তার থাকবার সম্ভাবনা থাকবে, ততদিন স্ত্রীলোকদের সন্তান গর্ভে ধারণ এবং সন্তান পালন করতেই হবে। এ কাজটা এমন কাজ যে, এতে অনেক দিন ও অনেক ক্ষণ গৃহে রুদ্ধ থাকতে হয়, নিতান্ত বলসাধ্য কাজ প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে।

যেমন করেই দেখ প্রকৃতি বলে দিচ্ছে যে, বাহিরের কাজ মেয়েরা করতে পারবে না। যদি প্রকৃতির সে-রকম অভিপ্রায় না হত তাহলে মেয়েরা বলিষ্ঠ হয়ে জন্মাত। যদি বল, পুরুষদের অত্যাচারে মেয়েদের এই দুর্বল অবস্থা হয়েছে, সে কোনো কাজেরই কথা নয়। কেননা, গোড়ায় যদি স্ত্রী পুরুষ সমান বল নিয়ে জন্মগ্রহণ করত তাহলে পুরুষদের বল স্ত্রীদের উপর খাটত কী করে।

যদি এ কথা ঠিক হয় যে, বহিঃপ্রকৃতির ভিতরে প্রবেশ করে তার সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে তবে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির পূর্ণ বিকাশ হয়, তবে এ কথা নিশ্চয় যে, মেয়েরা কখনোই পুরুষদের সঙ্গে (কেবল পরীক্ষা উত্তীর্ণ হয়ে) বুদ্ধিতে সমকক্ষ হবে না। য়ুরোপীয় ও ভারতবর্ষীয় সভ্যতার প্রভেদ কোথা থেকে হয়েছে তার কারণ অন্বেষণ

করতে গেলে দেখা যায়— আমাদের দেশের লোকেরা বহিঃপ্রকৃতির ভিতরে প্রবেশ করে নি, এইজন্যে তাদের বুদ্ধির দৃঢ়তা হয় নি। তাদের সমস্ত মনের পূর্ণ বিকাশ হয় নি। একরকম আধাআধি রকমের সভ্যতা হয়েছিল ; য়ুরোপের আজ যে এত প্রভাব তার প্রধান কারণ, কাজ করে তার বুদ্ধি হয়েছে ; প্রকৃতির রণক্ষেত্রে অবিশ্রাম সংগ্রাম করে তার সমস্ত বুদ্ধি বলিষ্ঠ হয়েছে। আমরা চিরকাল কেবল বসে বসে চিন্তা করেছি। জীবতত্ত্ববিদ বলেন, যখন থেকে প্রাণীরাজ্যে বুড়ো-আঙুলের আবির্ভাব হল, তখন থেকে মানবসভ্যতার একরকম গোড়াপত্তন হল। বুড়ো-আঙুলের পর থেকে সমস্ত জিনিস ধরে ছুঁয়ে ভেঙে নেড়েচেড়ে আঁকড়ে ভার অনুভব করে উৎকৃষ্টরূপে পরীক্ষা করে দেখবার উপায় হল। কৌতূহল থেকে পরীক্ষার আরম্ভ হয়, তার পরে পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে চিন্তাশক্তি বুদ্ধিবৃত্তি উত্তেজিত হতে থাকে। এই পরীক্ষায় বুড়ো-আঙল পুরুষদের অত্যন্ত বেশি ব্যবহার করতে হয়, মেয়েদের তেমন করতে হয় না। সুতরাং—।

যদি-বা এমন বিবেচনা করা যায়, একসময় আসবে যখন স্ত্রী পুরুষ উভয়েই আত্মরক্ষা উপার্জন প্রভৃতি কার্যে সমানরূপে ভিড়বে— সুতরাং তখন পরিবারসেবার অনুরোধে মেয়েদের অধিকাংশ সময় গৃহে বদ্ধ থাকবার আবশ্যক হবে না— বাহিরে গিয়ে এই বিপুল বিচিত্র সংসারের সঙ্গে তাদের চোখোচোখি মুখোমুখি হাতাহাতি পরিচয় হবে, তৎসম্বন্ধে পূর্বেই বলেছি আর সমস্ত সম্ভব হতে পারে, স্বামীকে ছাড়তে পার, বাপভাইয়ের আশ্রয় লঙ্ঘন করতে পার— কিন্তু সন্তানকে তো ছাড়বার জো নেই। সে যখন গর্ভে আশ্রয় নেবে এবং নিদেন পাঁচ ছয় বৎসর নিতান্ত অসহায় ভাবে জননীর কোল অধিকার করে বসবে, তখন সমকক্ষ ভাবে পুরুষের সঙ্গে প্রতিযোগিতা মেয়েদের পক্ষে কী রকমে সম্ভব হবে। এইরকম সন্তানকে উপলক্ষ করে ঘরের মধ্যে থেকে পরিবার-সেবা মেয়েদের স্বাভাবিক হয়ে পড়ে ; এ পুরুষদের অত্যাচার নয়, প্রকৃতির বিধান। যখন শারীরিক দুর্বলতা এবং অলঙ্ঘনীয় অবস্থাভেদে মেয়েদের সেই গৃহের মধ্যে থাকতেই হবে তখন কাজে-কাজেই প্রাণধারণের জন্যে পুরুষের প্রতি তাদের নির্ভর করতেই হবে। এক সন্তানধারণ থেকেই স্ত্রী পুরুষের প্রধান প্রভেদ হয়েছে ; তার থেকেই উত্তরোত্তর বলের অভাব, বলিষ্ঠ বুদ্ধির অভাব এবং হৃদয়ের প্রাবল্য জন্মেছে। আবার এ কারণটা এমন স্বাভাবিক কারণ যে, এর হাত এড়াবার জো নেই।

অতএব আজকাল পুরুষাশ্রয়ের বিরুদ্ধে যে একটা কোলাহল উঠেছে, সেটা আমার অসংগত এবং অমঙ্গলজনক মনে হয়। পূর্বকালে মেয়েরা পুরুষের অধীনতাগ্রহণকে

একটা ধর্ম মনে করত ; তাতে এই হত যে, চরিত্রের উপরে অধীনতার কুফল ফলতে পারত না, অর্থাৎ হীনতা জন্মাত না, এমন-কি, অধীনতাতেই চরিত্রের মহত্ত্বসম্পাদন করত। প্রভুভক্তিকে যদি ধর্ম মনে করে তাহলে ভৃত্যের মনে মনুষ্যত্বের হানি হয় না। রাজভক্তি সম্বন্ধেও তাই বলা যায়। কতকগুলি অবশ্যম্ভাবী অধীনতা মানুষকে সহ্য করতেই হয় ; সেগুলিকে যদি অধীনতা হীনতা বলে আমরা ক্রমাগত অনুভব করি তাহলেই আমরা বাস্তবিক হীন হয়ে যাই এবং সংসারে সহস্র অসুখের সৃষ্টি হয়। তাকে যদি ধর্ম মনে করি তাহলে অধীনতার মধ্যেই আমরা স্বাধীনতা লাভ করি। আমি দাসত্ব মনে করে যদি কারও অনুগামী হই তাহলেই আমি বাস্তবিক অধীন, আর আমি ধর্ম মনে করে যদি কারও অনুগামী হই তাহলে আমি স্বাধীন। সাধ্বী স্ত্রীর প্রতি যদি কোনো স্বামী পাশব ব্যবহার করে, তবে সে-ব্যবহারের দ্বারা স্ত্রীর অধোগতি হয় না, বরং মহত্ত্বই বাড়ে। কিন্তু যখন একজন ইংরেজ পাখাটানা কুলিকে লাথি মারে তখন তাতে করে সেই কুলির উজ্জ্বলতা বাড়ে না।

আজকাল একদল মেয়ে ক্রমাগতই নাকী সুরে বলছে, আমরা পুরুষের অধীন, আমরা পুরুষের আশ্রয়ে আছি, আমাদের অবস্থা অতি শোচনীয়। তাতে করে কেবল এই হচ্ছে যে, স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধবন্ধন হীনতা প্রাপ্ত হচ্ছে ; অথচ সে-বন্ধন ছেদন করবার কোনো উপায় নেই। যারা অগত্যা অধীনতা স্বীকার করে আছে তারা নিজেকে দাসী মনে করছে ; সুতরাং তারা আপনার কর্তব্য কাজ প্রসন্ন মনে এবং সম্পূর্ণভাবে করতে পারছে না। দিনরাত খিটিমিটি বাধছে, নানা সূত্রে পরস্পর পরস্পরকে লঙ্ঘন করবার চেষ্টা করছে। এ-রকম অস্বাভাবিক অবস্থা যদি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়, তাহলে স্ত্রীপুরুষের মধ্যে অনেকটা বিচ্ছেদ হবে ; কিন্তু তাতে স্ত্রীলোকের অবস্থার উন্নতি হওয়া দূরে থাক্‌, তাদের সম্পূর্ণ ক্ষতি হবে।

কেউ কেউ হয়তো বলবে, পুরুষের আশ্রয়-অবলম্বনই যে স্ত্রীলোকের ধর্ম এটা বিশ্বাস করা সকলের পক্ষে সম্ভব নয়, কেননা এটা একটা কুসংস্কার। সে সম্বন্ধে এই বক্তব্য, প্রকৃতির যা অবশ্যম্ভাবী মঙ্গল নিয়ম তা স্বাধীনভাবে গ্রহণ এবং পালন করা ধর্ম। ছোটো বালকের পক্ষে পিতামাতাকে লঙ্ঘন করে চলা অসম্ভব এবং প্রকৃতিবিরুদ্ধ, তার পক্ষে পিতামাতার বশ্যতা স্বীকার করাই ধর্ম, সুতরাং এই বশ্যতাকে ধর্ম বলে জানাই তার পক্ষে মঙ্গল। নানা দিক থেকে দেখা যাচ্ছে, সংসারের কল্যাণ অব্যাহত রেখে স্ত্রীলোক কখনও পুরুষের আশ্রয় ত্যাগ করতে পারে না। প্রকৃতি এই স্ত্রীলোকের অধীনতা কেবল তাদের ধর্মবুদ্ধির উপরে রেখে দিয়েছেন তা নয়, নানা উপায়ে এমনই আটঘাট বেঁধে দিয়েছেন যে, সহজে তার থেকে নিষ্কৃতি নেই। অবশ্য

পৃথিবীতে এমন অনেক মেয়ে আছে পুরুষের আশ্রয় যাদের আবশ্যক করে না, কিন্তু তাদের জন্যে সমস্ত মেয়ে-সাধারণের ক্ষতি করা যায় না। অনেক পুরুষ আছে যারা মেয়েদের মতো আশ্রিত হতে পারলেই ভালো থাকত, কিন্তু তাদের অনুরোধে পুরুষ-সাধারণের কর্তব্যনিয়ম উলটে দেওয়া যায় না। যাই হোক, পতিভক্তি বাস্তবিকই স্ত্রীলোকের পক্ষে ধর্ম। আজকাল একরকম নিষ্ফল ঔদ্ধত্য ও অগভীর ভ্রান্ত শিক্ষার ফলে সেটা চলে গিয়ে সংসারের সামঞ্জস্য নষ্ট করে দিচ্ছে এবং স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই আন্তরিক অসুখ জন্মিয়ে দিচ্ছে। কর্তব্যের অনুরোধে যে-স্ত্রী স্বামীর প্রতি একান্ত নির্ভর করে সে তো স্বামীর অধীন নয়, সে কর্তব্যের অধীন।

স্ত্রীপুরুষের অবস্থাপার্থক্য সম্বন্ধে আমার এই মত; কিন্তু এর সঙ্গে স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতার কোনো বিরোধ নেই। মনুষ্যত্ব লাভ করবার জন্যে স্ত্রীলোকের বুদ্ধির উন্নতি ও পুরুষের হৃদয়ের উন্নতি, পুরুষের যথেচ্ছাচার ও স্ত্রীলোকের জড়সংকোচভাব পরিহার একান্ত আবশ্যক। অবশ্য, শিক্ষা সত্ত্বেও পুরুষ সম্পূর্ণ স্ত্রী এবং স্ত্রী সম্পূর্ণ পুরুষ হতে পারবে না এবং না হলেই বাঁচা যায়। রমাবাই যখন বললেন, মেয়েরা সুবিধে পেলে পুরুষের কাজ করতে পারে, তখন পুরুষ উঠে বলতে পারত, পুরুষরা অভ্যেস করলে মেয়েদের কাজ করতে পারত; কিন্তু তাহলে এখন পুরুষদের যে-সব কাজ করতে হচ্ছে সেগুলো ছেড়ে দিতে হত। তেমনই মেয়েকে যদি ছেলে মানুষ না করতে হত তাহলে সে পুরুষের অনেক কাজ করতে পারত। কিন্তু এ 'যদি'কে ভূমিসাৎ করা রমাবাই কিংবা আর কোনো বিদ্রোহী রমণীর কর্ম নয়। অতএব এ কথার উল্লেখ করা প্রগল্‌ভতা।

রমাবাইয়ের বক্তৃতার চেয়ে আমার বক্তৃতা দীর্ঘ হয়ে পড়ল। রমাবাইয়ের বক্তৃতাও খুব দীর্ঘ হতে পারত, কিন্তু এখানকার বর্গির উৎপাতে তা আর হয়ে উঠল না। রমাবাই বলতে আরম্ভ করতেই তারা ভারি গোল করতে লাগল। শেষকালে বক্তৃতা অসম্পূর্ণ রেখে রমাবাইকে বসে পড়তে হল।

স্ত্রীলোকের পরাক্রম সম্বন্ধে রমণীকে বক্তৃতা করতে শুনে বীর পুরুষেরা আর থাকতে পারলেন না, তাঁরা পুরুষের পরাক্রম প্রকাশ করতে আরম্ভ করলেন; তর্জনগর্জনে অবলার ক্ষীণ কণ্ঠস্বরকে অভিভূত করে জয়গর্বে বাড়ি ফিরে গেলেন। আমি মনে মনে আশা করতে লাগলুম, আমাদের বঙ্গভূমিতে যদিও সম্প্রতি অনেক বীরপুরুষের অভ্যুদয় হয়েছে কিন্তু ভদ্ররমণীর প্রতি রূঢ় ব্যবহার করে এতটা প্রতাপ এখনও কারও জন্মায় নি। তবে বলা যায় না, নীচলোক সর্বত্রই আছে; এবং নীচশ্রেণীয়-হীনশিক্ষা ভীরুদের এই একটা মহৎ অধিকার আছে যে, পঙ্কের মধ্যে বাস করে তারা

অসংকোচে স্নাত দেহে পঙ্ক নিক্ষেপ করতে পারে ; মনে জানে, এরূপ স্থলে সহিষ্ণুতাই ভদ্রতার একমাত্র কৌলিক ধর্ম। মহারাষ্ট্রীয় শ্রোতৃবালকবর্গের প্রতি এতটা কথা বলা অসংগত হয়ে পড়ে— আমি কেবল প্রসঙ্গক্রমে এই কথাটা বলে রাখলুম। আক্ষেপের বিষয় এই, যাদের প্রতি এ কথা খাটে তারা এ ভাষা বোঝে না এবং তাদের যে-ভাষা তা ভদ্রসম্প্রদায়ের শ্রবণের ও ব্যবহারের অযোগ্য।

জ্যৈষ্ঠ ১২৯৬
পুণা

মুসলমান মহিলা

সারসংগ্রহ

কোনো তুরস্কবাসিনী ইংরেজরমণী মুসলমান নারীদিগের একান্ত দুরবস্থার যে বর্ণনা করিয়াছেন তাহা বিশেষ প্রমাণ না পাইলে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা উচিত জ্ঞান করি না। কিন্তু অসূর্যম্পশ্যা জেনানার সুখদুঃখ সত্যমিথ্যা কে প্রমাণ করিবে। তবে, আমাদের নিজের অন্তঃপুরের সহিত তুলনা করিয়া কতকটা বুঝা যায়।

লেখিকা গল্প করিতেছেন, তিনি দুইটি মুসলমান অন্তঃপুরচারিণীর সহিত গল্প করিতেছেন এমন সময়ে হঠাৎ দেখিলেন, তাহাদের মধ্যে একজন তক্তার নীচে আর-একজন সিন্দুকের তলায় তাড়াতাড়ি প্রবেশ করিয়া লুকাইয়া পড়িল। ব্যাপারটা আর-কিছুই নয়, তাহাদের দেবর দ্বারের নিকট উপস্থিত হইয়াছিল। আমাদের দেশে ভ্রাতৃবধূর দৃষ্টিপথে ভাসুরের অভ্যুদয় হইলে কতকটা এইমতোই বিপর্যয় ব্যাপার উপস্থিত হয়। নব্য মুসলমানেরা এইরূপ সতর্ক অবরোধ সম্বন্ধে বলিয়া থাকেন, "বহুমূল্য জহরৎ কি কেহ রাস্তার ধারে ফেলিয়া রাখে। তাহাকে এমন সাবধানে ঢাকিয়া রাখা আবশ্যক যে, সূর্যালোকেও তাহার জ্যোতিকে ম্লান না করিতে পারে।" আমাদের দেশেও যাঁহারা বাক্যবিন্যাসবিশারদ তাঁহারা এইরূপ বড়ো বড়ো কথা বলিয়া থাকেন। তাঁহারা শাস্ত্রের শ্লোক ও কবিত্বের ছটার দ্বারা প্রমাণ করেন যে, যাহাকে তোমরা মনুষ্যত্বের প্রতি অত্যাচার বল তাহা প্রকৃতপক্ষে দেবত্বের প্রতি সম্মান। কিন্তু কথায় চিঁড়ে ভিজে না। যে-হতভাগিনী মনুষ্যসুলভ ক্ষুধা লইয়া বসিয়া আছে, তাহাকে কেবলই শাস্ত্রীয় স্তুতি দিয়া মাঝে মাঝে পার্থিব দধি না দিলে তাহার বরাদ্দ একমুষ্টি শুষ্ক চিঁড়া গলা দিয়া নাবা নিতান্ত দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে।

লেখিকা একটি অতিশয় রোমহর্ষণ ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। জেনাবের যখন দশ বৎসর বয়স তখন তাহার বাপ তাহাকে হীরা-জহরতে জড়িত করিয়া পুত্তলিবেশে আপনার চেয়ে বয়সে ও ধনে সম্ভ্রমে বড়ো একটি বৃদ্ধ স্বামীর হস্তে সমর্পণ করিলেন। একবার স্বামীগৃহে পদার্পণ করিলে বাপমায়ের সহিত সাক্ষাৎ বহু সাধনায় ঘটে, বিশেষত যখন তাঁহারা কুলে মানে স্বামীর অপেক্ষা ছোটো। জেনাব দুই ছেলের মা হইল, তথাপি বাপের সহিত একবার দেখা হইল না। নানা উপদ্রবে পাগলের মতো হইয়া একদিন সে দাসীর ছদ্মবেশে পলাইয়া পিতার চরণে গিয়া উপস্থিত হইল। কাঁদিয়া বলিল, "বাবা আমাকে মারিয়া ফেলো, কিন্তু শ্বশুরবাড়ি পাঠাইয়ো না।" ইহার পর তাহার প্রাণসংশয় পীড়া উপস্থিত হইল। তাহার অবস্থা ও আকৃতি দেখিয়া বাপের মনে বড়ো আঘাত লাগিল। বাপ জামাতাকে বলিয়া পাঠাইলেন, "কন্যার প্রাপ্য হিসাবে এক পয়সাও চাহি না, বরঞ্চ তুমি যদি কিছু চাও তো দিতে প্রস্তুত আছি, তুমি তোমার স্ত্রীকে মুসলমান বিধি অনুসারে পরিত্যাগ করো।" সে কহিল, "এত বড়ো কথা! আমার অন্তঃপুরে হস্তক্ষেপ! মশাল্লা! এত সহজে যদি সে নিষ্কৃতি পায় তবে যে আমার দাড়িকে সকলে উপহাস করিবে।"

তাহার রকমসকম দেখিয়া দূতেরা বাপকে আসিয়া কহিল, "যে-রকম গতিক দেখিতেছি তোমার মেয়েকে একবার হাতে পাইলেই বিষম বিপদ ঘটাইবে।" বাপ বহুযত্নে কন্যাকে লুকাইয়া রাখিলেন।

বলিতে হৃৎকম্প হয়, পাষণ্ড স্বামী নিজের অপোগণ্ড বালক দুটিকে ঘাড় মটকাইয়া বধ করিয়া তাহাদের সদ্যমৃত দেহ স্ত্রীর নিকট উপহারস্বরূপ পাঠাইয়া দিল।

মা কেবল একবার আর্তস্বরে চীৎকার করিয়া আর মাথা তুলিল না, দুইচারি দিনেই দুঃখের জীবন শেষ করিল।

এরূপ অমানুষিক ঘটনা জাতীয় চরিত্রসূচক দৃষ্টান্তস্বরূপে উল্লেখ করা লেখিকার পক্ষে ন্যায়সংগত হইয়াছে বলিতে পারি না, কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে, একীকরণের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে যিনিই যত বড়ো বড়ো কথা বলুন, মানুষের প্রতি মানুষের অধিকারের একটা সীমা আছে; পৃথিবীর প্রাচ্য প্রদেশে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর অধিকার সেই সীমা এতদূর অতিক্রম করিয়াছে যে, আধ্যাত্মিকতার দোহাই দিয়া কতকগুলা আগড়ম-বাগড়ম বকিয়া আমাদিগকে কেবল কথার ছলে লজ্জা নিবারণ করিতে হইতেছে।

১২৯৮

প্রাচ্য সমাজ

কোনো ইংরেজ মহিলা মুসলমান স্ত্রীলোকদের দুরবস্থা বর্ণনা করিয়া নাইনটিন্থ-সেঞ্চুরিতে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, আমরা পূর্ব সংখ্যায় তাহার সারমর্ম প্রকাশ করিয়াছি।[১] গত সেপ্টেম্বরের পত্রিকায় অনারেবল জষ্টিস আমির আলি তাহার জবাব দিয়াছেন।

তিনি দেখাইতেছেন যে, খৃষ্টীয় ধর্মই যে য়ুরোপে স্ত্রীলোকদের অবস্থার উন্নতি সাধন করিয়াছে তাহা নহে, ক্রমে ক্রমে জ্ঞান ও সভ্যতার বিকাশেই তাহারা বর্তমান উচ্চপদবী প্রাপ্ত হইয়াছে। খৃষ্টীয় সমাজের প্রথম অবস্থায় স্ত্রীজাতি খৃষ্টধর্মমণ্ডলীর চক্ষে নিতান্ত নিন্দিতভাবে ছিলেন। স্ত্রীলোকদের স্বাভাবিক দূষ্ণীয়তা সম্বন্ধে চার্চের অধ্যক্ষগণ বিপরীত বিদ্বেষের সহিত মত প্রকাশ করিয়াছেন; খৃষ্টীয় সাধু টর্টলিয়ন স্ত্রীলোককে শয়তানের প্রবেশদ্বার, নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফলচোর, দিব্যধর্ম-পরিত্যাগিনী, মনুষ্যরূপী-ঈশ্বরপ্রতিমাবিনাশিনী আখ্যা দিয়াছেন। এবং সেণ্ট ক্রিসস্টম স্ত্রীলোককে প্রয়োজনীয় পাপ, প্রকৃতির মায়াপাশ, মনোহর বিপৎপাত, গার্হস্থ্য সংকট সাংঘাতিক আকর্ষণ এবং সুচিক্কণ অকল্যাণ শব্দে অভিহিত করিয়াছেন।

তখন কোনো উচ্চ অঙ্গের ধর্মানুষ্ঠানে স্ত্রীলোকদের অধিকার ছিল না। জনসমাজে মিশিতে, প্রকাশ্যে বাহির হইতে, কোনো ভোজে বা উৎসবে গমন করিতে তাহাদের কঠিন নিষেধ ছিল। অন্তরালে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া মৌনাবলম্বনপূর্বক স্বামীর আজ্ঞা পালন করা এবং তাঁত চরকা ও রন্ধন লইয়া থাকাই তাহাদের কর্তব্য বলিয়া নির্দিষ্ট ছিল।

তারপর মধ্যযুগে যখন চিভল্‌রি-ধর্মের অভ্যুদয়ে য়ুরোপে নারীভক্তির প্রচার হইল, স্ত্রীলোকদের প্রতি উৎপীড়ন এবং প্রতারণা তখনকার কালেরও একটি প্রধান লক্ষণ ছিল। বহুবিবাহ এবং গোপন বিবাহ কেবল কুলীন নহে সাধারণের মধ্যেই প্রচলিত ছিল। ধর্মযাজকেরাও তাহাদের চির কৌমার্যব্রত লঙ্ঘন করিয়া একাধিক বৈধ অথবা অবৈধ বিবাহ করিত। পুরাবৃত্তবিৎ হ্যালাম দেখাইয়াছেন যে, জর্মান ধর্মসংস্কারকগণ সন্তানাভাবে এককালীন দুই অথবা তিন বিবাহ বৈধ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। সকলেই জানেন মহারাজ শার্ল্‌মানের বহুপত্নী ছিল। খৃষ্টধর্ম-

---

[১] মুসলমান মহিলা : সাধনা, ১২৯৮ অগ্রহায়ণ
দ্রষ্টব্য : রচনাবলী, ১২শ খণ্ড, পূর্ববর্তী প্রবন্ধ

বৎসল জুষ্টিনিয়নের অধিকারকালে কন্স্টন্টিনোপ্‌লের রাজপথ স্ত্রীলোকের প্রতি কি নিদারুণ অত্যাচারের দৃশ্যস্থল ছিল। একটি স্ত্রীলোক সুন্দরী এবং বিদুষী ছিলেন, এইমাত্র অপরাধে কোনো খৃষ্টান সাধুর অনুচরগণ তাঁহাকে আলেক্‌জান্দ্রিয়ার রাজপথে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া বধ করিয়াছিল। লেখক বলিতেছেন, হিন্দু ধর্মশাস্ত্রকার মনুর অনুশাসন আছে যে, স্ত্রী স্বামীর অবাধ্য হইলে তাহাকে চতুষ্পথে ডালকুত্তার দ্বারা টুকরা টুকরা করিয়া ফেলাই বিধান ;— যদি সেণ্ট সীরিল্ স্ত্রীলোক সম্বন্ধে কোনো গ্রন্থ লিখিতেন তবে কি মনুর সহিত তাঁহার মতের সম্পূর্ণ ঐক্য হইত না। য়ুরোপের মধ্যযুগে স্ত্রীলোক সদাসর্বদাই উৎপীড়িত, বলপূর্বক অপহৃত, কারামধ্যে বন্দীকৃত, এবং পরমখৃষ্টান য়ুরোপের উপরাজগণের দ্বারা কশাহত হইত। খৃষ্টানগণ তাহাদিগকে দগ্ধ করিতে, জলমগ্ন করিতেও কুন্ঠিত হইত না।

এমন সময়ে মহম্মদের আবির্ভাব হইল। মর্তলোকে স্বর্গরাজ্যের আসন্ন আগমন প্রচার করিয়া লোকসমাজে একটা হুলস্থুল বাধাইয়া দেওয়া তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না। সে-সময়ে আরব সমাজে যে-উচ্ছৃঙ্খলতা ছিল তাহাই যথাসম্ভব সংযত করিতে তিনি মনোনিবেশ করিলেন। পূর্বে বহুবিবাহ, দাসীসংসর্গ ও যথেচ্ছ স্ত্রীপরিত্যাগের কোনো বাধা ছিল না ; তিনি তাহার সীমা নির্দিষ্ট করিয়া দিয়া স্ত্রীলোককে অপেক্ষাকৃত মান্য-পদবীতে আরোপণ করিলেন। তিনি বার বার বলিয়াছেন, স্ত্রীবর্জন ঈশ্বরের চক্ষে নিতান্ত অপ্রিয় কার্য। কিন্তু এ প্রথা সমূলে উৎপাটিত করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত ছিল না। এইজন্য তিনি স্ত্রীবর্জন একেবারে নিষেধ না করিয়া অনেকগুলি গুরুতর বাধার সৃষ্টি করিলেন।

লেখক বলেন, স্ত্রীলোকের অধিকার সম্বন্ধে খৃষ্টীয় আইন অপেক্ষা মুসলমান আইনে অনেক উদারতা প্রকাশ পায়। হিন্দুশাস্ত্রে যেমন বিশেষ বিশেষ কারণে স্বামীত্যাগের বিধি আছে কিন্তু হিন্দুসমাজে তাহার কোনো চিহ্ন নাই, সেইরূপ লেখক বলেন, মুসলমানশাস্ত্রেও অত্যাচার, ভরণপোষণের অক্ষমতা প্রভৃতি কারণে স্ত্রীর স্বামীত্যাগের অধিকার আছে।

আমরা যেরূপ লীলাবতী ও খনার দৃষ্টান্ত সর্বদা উল্লেখ করিয়া থাকি, লেখক সেইরূপ প্রাচীন কালের মুসলমান বিদুষীদের দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিয়া তৎকালীন আরব-রমণীদের উন্নত অবস্থা প্রমাণ করিয়াছেন।

যাহা হউক, মান্যবর আমির আলি মহাশয় প্রমাণ করিয়াছেন যে, কোনো কোনো বিষয়ে মুসলমানদের প্রাচীন সামাজিক আদর্শ উচ্চতর ছিল এবং মহম্মদ যে-সকল সংস্কারকার্যের সূত্রপাত করিয়াছিলেন, তাহাকেই তিনি চূড়ান্ত স্থির করেন নাই।

মধ্যস্থ হইয়া তখনকার প্রবল সমাজের সহিত উপস্থিতমতো রফা করিয়াছিলেন। কতকগুলি পরিবর্তন সাধন করিয়া সমাজকে পথ নির্দেশ করিয়াছিলেন। তবু সমাজ সেইখানেই থামিয়া রহিল। কিন্তু সে দোষ মুসলমান ধর্মের নহে, সে কেবল জ্ঞান বিদ্যা সভ্যতার অভাব।

আমির আলি মহাশয়ের এই রচনা পাঠ করিয়া মনের মধ্যে একটা বিষাদের উদয় হয়। এককালে আদর্শ উচ্চতর ছিল, ক্রমশ তাহা বিকৃত হইয়া আসিয়াছে; এবং এককালে কোনো মহাপুরুষ তৎসময়ের উপযোগী যে-সকল বিধান প্রচলিত করিয়া গিয়াছেন, বুদ্ধিচালনাপূর্বক সচেতনভাবে সমাজ তাহার অধিক আর এক পা অগ্রসর হয় নাই— এ কথা বর্তমান মুসলমানেরাও বলিতেছেন এবং বর্তমান হিন্দুরাও বলিতেছেন। গৌরব করিবার বেলাও এই কথা বলি, বিলাপ করিবার বেলাও এই কথা বলি। যেন আমাদের এসিয়ার মজ্জার মধ্যে সেই প্রাণক্রিয়ার শক্তি নাই যাহার দ্বারা সমাজ বাড়িয়া উঠে, যাহার অবিশ্রাম গতিতে সমাজ পুরাতন ত্যাগ ও নূতন গ্রহণ করিয়া প্রতিনিয়তই আপনাকে সংস্কৃত করিয়া অগ্রসর হইতে পারে।

য়ুরোপে এসিয়ায় প্রধান প্রভেদ এই যে, য়ুরোপে মনুষ্যের একটা গৌরব আছে, এসিয়াতে তাহা নাই। এই হেতু এসিয়ায় বড়ো লোককে মহৎ মনুষ্য বলে না, একেবারে দেবতা বলিয়া বসে; কিন্তু য়ুরোপের কর্মপ্রধান দেশে প্রতিদিনই মনুষ্য নানা আকারে আপনার ক্ষমতা প্রকাশ করিতেছে, সেইজন্য তাহারা আপনাকে নগণ্য, জীবনকে স্বপ্ন এবং জগৎকে মায়া মনে করিতে পারে না। প্রাচ্য খৃষ্টীয় ধর্মের প্রভাবে য়ুরোপীয়দের মনে মধ্যে মধ্যে বিপরীতভাব উপস্থিত হইলেও তাহা প্রবল কর্মের স্রোতে ভাসিয়া যায়। তাই সেখানে রাজার একাধিপত্য ভাঙিয়া আসে পুরোহিতের দেবত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ উপস্থিত হয় এবং গুরুবাক্যের অভ্রান্তিকতার উপরে স্বাধীনবুদ্ধি জয়লাভ করে।

আমাদের পূর্বাঞ্চলে প্রবলা প্রকৃতির পদতলে অভিভূতভাবে বাস করিয়া প্রত্যেক মানুষ নিজের অসারতা ও ক্ষুদ্রতা অনুভব করে; এইজন্য কোনো মহৎ লোকের অভ্যুদয় হইলে তাঁহাকে স্বশ্রেণী হইতে সম্পূর্ণ পৃথক করিয়া দেবতা-পদে স্থাপিত করে। তাহার পর হইতে তিনি যে-কয়টি কথা বলিয়া গিয়াছেন বসিয়া বসিয়া তাহার অক্ষর গণনা করিয়া জীবনযাপন করি; তিনি সাময়িক অবস্থার উপযোগী যে-বিধান করিয়া গিয়াছেন তাহার রেখামাত্র লঙ্ঘন করা মহাপাতক জ্ঞান করিয়া থাকি। পুনর্বার যুগান্তরে দ্বিতীয় মহৎলোক দেবতাভাবে আবির্ভূত হইয়া সময়োচিত দ্বিতীয় পরিবর্তন প্রচলিত না করিলে আমাদের আর গতি নাই। আমরা যেন ডিম্ব হইতে ডিম্বান্তরে

জন্ম গ্রহণ করি। একজন মহাপুরুষ প্রাচীন প্রথার খোলা ভাঙিয়া যে-নূতন সংস্কার আনয়ন করেন তাহাই আবার দেখিতে দেখিতে শক্ত হইয়া উঠিয়া আমাদিগকে রুদ্ধ করে। পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হইয়া নিজের যত্নে নিজের উপযোগী খাদ্যসংগ্রহ আমাদের দ্বারা আর হইয়া উঠে না। মহম্মদ প্রাচীন আরব কুপ্রথা কিয়ৎপরিমাণে দূর করিয়া তাহাদিগকে যেখানে দাঁড় করাইলেন তাহারা সেইখানেই দাঁড়াইল, আর নড়িল না। কোনো সংস্কারকার্য বীজের মতো ক্রমশ অঙ্কুরিত হইয়া যে পরিপুষ্টতা লাভ করিবে, আমাদের সমাজ সেরূপ জীবনপূর্ণ ক্ষেত্র নহে। মনুষ্যত্বের মধ্যে যেন প্রাণধর্মের অভাব। এইজন্য উত্তরোত্তর উৎকর্ষ লাভ না করিয়া বিশুদ্ধ আদর্শ ক্রমশই বিকৃতি লাভ করিতে থাকে। যেমন পাখি তা' না দিলে ডিম পচিয়া যায়, সেইরূপ কালক্রমে মহাপুরুষের জীবন্ত প্রভাবের উত্তাপ যতই দূরবর্তী হয় ততই আবরণবদ্ধ সমাজের মধ্যে বিকৃতি জন্মিতে থাকে।

আসল কথা, বিশুদ্ধ জিনিসও অবরোধের মধ্যে দূষিত হইয়া যায় এবং বিকৃত বস্তুও মুক্তক্ষেত্রে ক্রমে বিশুদ্ধি লাভ করে। যে-সকল বৃহৎ দোষ স্বাধীন সমাজে থাকে তাহা তেমন ভয়াবহ নহে, স্বাধীনবুদ্ধিহীন অবরুদ্ধ সমাজে তিলমাত্র দোষ তদপেক্ষা সাংঘাতিক। কারণ, তাহাতে বাতাস লাগে না, প্রকৃতির স্বাস্থ্যদায়িনী শক্তি তাহার উপর সম্পূর্ণ তেজে কাজ করিতে পায় না।

১২৯৮

আহার সম্বন্ধে চন্দ্রনাথবাবুর মত

অগ্রহায়ণ মাসের 'সাহিত্যে' শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় আহার নামক এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাঁহার মতে আহারের দুই উদ্দেশ্য, দেহের পুষ্টিসাধন ও আত্মার শক্তিবর্ধন। তিনি বলেন, আহারে দেহের পুষ্টি হয় এ কথা সকল দেশের লোকই জানে, কিন্তু আত্মার শক্তিবর্ধনও যে উহার একটা কার্যের মধ্যে— এ-রহস্য কেবল ভারতবর্ষেই বিদিত ; কেবল ইংরেজি শিখিয়া এই নিগূঢ় তথ্য ভুলিয়া ইংরেজি শিক্ষিতগণ লোভের তাড়নায় পাশব আহারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন এবং ধর্মশীলতা শ্রমশীলতা ব্যাধিহীনতা দীর্ঘজীবিতা, হৃদয়ের কমনীয়তা, চরিত্রের নির্মলতা, সাত্ত্বিকতা আধ্যাত্মিকতা সমস্ত হারাইতে বসিয়াছেন। তিনি বলেন, এই আহার-তথ্যের "শিক্ষা গুরুপুরোহিতেরা দিলেই ভালো হয়। কিন্তু তাঁহারা যদি এ শিক্ষা দিতে অক্ষম হন তবে শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রকেই এ শিক্ষা দিতে হইবে।" এই বলিয়া তিনি নিজে উক্ত কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন ; এবং ব্রাহ্মণ অধ্যাপকের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া প্রকাশ করিয়াছেন, "নিরামিষ আহারে দেহ মন উভয়েরই যেরূপ পুষ্টি হয়, আমিষযুক্ত আহারে সেরূপ হয় না।"

এই লেখা সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য নিম্নে প্রকাশ করিলাম। নিশ্চয়ই লেখকমহাশয়ের অগোচর নাই যে, ইংরেজিশিক্ষিত নব্যগণ যে কেবল আমিষ খান তাহা নয়, তাঁহারা গুরুবাক্য মানেন না। কতকগুলি কথা আছে যাহার উপরে তর্কবিতর্ক চলিতে পারে। আহার প্রসঙ্গটি সেই শ্রেণীভুক্ত। লেখকমহাশয় তাঁহার প্রবন্ধে কেবল একটিমাত্র যুক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন এবং তাহা উক্ত রচনার সর্বপ্রান্তে নিবিষ্ট করিয়াছেন ; সেটি তাঁহার স্বাক্ষর শ্রীচন্দ্রনাথ বসু। পূর্বকালের বাদশাহেরা যখন কাহারও মুণ্ড আনিতে বলিতেন তখন আদেশপত্রে এইরূপ অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত যুক্তি প্রয়োগ করিতেন ; এবং গুরুপুরোহিতেরাও সচরাচর নানা কারণে এইরূপ যুক্তিকেই সর্বপ্রাধান্য দিয়া থাকেন। কিন্তু ইংরেজ বাদশাহ কাহারও মুণ্ডপাত করিবার পূর্বে বিস্তারিত যুক্তিনির্দেশ বাহুল্য জ্ঞান করেন না, এবং ইংরেজ গুরু মত জাহির করিবার পূর্বে প্রমাণ প্রয়োগ করিতে না পারিলে গুরুপদ হইতে বিচ্যুত হন। আমরা অবস্থাগতিকে সেই ইংরেজরাজের প্রজা, সেই ইংরেজ গুরুর ছাত্র, অতএব চন্দ্রনাথবাবুর স্বাক্ষরের প্রতি আমাদের যথোচিত শ্রদ্ধা থাকিলেও তাহা ছাড়াও আমরা প্রমাণ প্রত্যাশা করিয়া থাকি। ইহাকে কুশিক্ষা বা সুশিক্ষা যাহাই বল, অবস্থাটা এইরূপ।

প্রাচীন ভারতবর্ষে আহার সম্বন্ধে কী নিগূঢ় তত্ত্ব প্রচলিত ছিল জানি না এবং

চন্দ্রনাথবাবুও নব্যশিক্ষিতদের নিকটে তাহা গোপন করিয়াই গেছেন, কিন্তু রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয় প্রমাণ করিয়াছেন প্রাচীন ভারতের আহার্যের মধ্যে মাংসের চলন না ছিল এমন নহে।

এক সময়ে ব্রাহ্মণেরা আমিষ ত্যাগ করিয়াছিলেন; কিন্তু একমাত্র ব্রাহ্মণের দ্বারা কোনো সমাজ রচিত হইতে পারে না। ভারতবর্ষে কেবল বিংশতি কোটি অধ্যাপক পুরোহিত এবং তপস্বীর প্রাদুর্ভাব হইলে অতি সত্বরই সেই সুপবিত্র জনসংখ্যার হ্রাস হইবার সম্ভাবনা। প্রাচীন ভারতবর্ষে ধ্যানশীল ব্রাহ্মণও ছিল এবং কর্মশীল ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রও ছিল, মগজও ছিল মাংসপেশিও ছিল, সুতরাং স্বাভাবিক আবশ্যক-অনুসারে আমিষও ছিল নিরামিষও ছিল, আচারের সংযমও ছিল আচারের অপেক্ষাকৃত স্বাধীনতাও ছিল। যখন সমাজে ক্ষত্রিয়তেজ ছিল তখনই ব্রাহ্মণের সাত্ত্বিকতা উজ্জ্বলভাবে শোভা পাইত— শক্তি থাকিলে যেমন ক্ষমা শোভা পায়, সেইরূপ। অবশেষে সমাজ যখন আপনার যৌবনতেজ হারাইয়া আগাগোড়া সকলে মিলিয়া সাত্ত্বিক সাজিতে বসিল, কর্মনিষ্ঠ সকল বর্ণ ব্রাহ্মণের সহিত লিপ্ত হইয়া লুপ্ত হইয়া গেল, এই বৃহৎ ভূভাগে কেবল ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণের পদানুবর্তী একটা ছায়ামাত্র অবশিষ্ট রহিল তখনই প্রাচীন ভারতবর্ষের বিনাশ হইল। তখন নিস্তেজতাই আধ্যাত্মিকতার অনুকরণ করিয়া অতি সহজে যন্ত্রাচারী এবং কর্মক্ষেত্রের সম্পূর্ণ অনুপযোগী হইয়া উঠিল। ভীরুর ধৈর্য আপনাকে মহতের ধৈর্য বলিয়া পরিচয় দিল, নিশ্চেষ্টতা বৈরাগ্যের ভেক ধারণ করিল এবং দুর্ভাগা অক্ষম ভারতবর্ষ ব্রাহ্মণ্যহীন ব্রাহ্মণের গোরুটি হইয়া তাঁহারই ঘানিগাছের চতুর্দিকে নিয়ত প্রদক্ষিণ করিয়া পবিত্র চরণতলের তৈল যোগাইতে লাগিল। এমন সংযম এমন বদ্ধ নিয়ম, এমন নিরামিষ সাত্ত্বিকতার দৃষ্টান্ত কোথায় পাওয়া যাইবে। আজকাল চোখের ঠুলি খুলিয়া অনেকে ঘানি-প্রদক্ষিণের পবিত্র নিগূঢ়তত্ত্ব ভুলিয়া যাইতেছে। কী আক্ষেপের বিষয়।

এক হিসাবে শঙ্করাচার্যের আধুনিক ভারতবর্ষকেই প্রাচীন ভারতবর্ষ বলা যাইতে পারে; কারণ, ভারতবর্ষ তখন এমনই জরাগ্রস্ত হইয়াছে যে, তাহার জীবনের লক্ষণ আর বড়ো নাই। সেই মৃতপ্রায় সমাজকে শুভ্র আধ্যাত্মিক বিশেষণে সজ্জিত করিয়া তাহাকেই আমাদের আদর্শস্থল বলিয়া প্রচার করিতেছি, তাহার কারণ, আমাদের সহিত তাহার তেমন অনৈক্য নাই। কিন্তু মহাভারতের মহাভারতবর্ষকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে যে-প্রচণ্ড বীর্য, বিপুল উদ্যমের আবশ্যক তাহা কেবলমাত্র নিরামিষ ও সাত্ত্বিক নহে, অর্থাৎ কেবলমাত্র ব্রাহ্মণ অধ্যাপকের আবাদ করিলে সে-ভারতবর্ষ উৎপন্ন হইবে না।

আহারের সহিত আত্মার যোগ আর-কোনো দেশ আবিষ্কার করিতে পারিয়াছিল কি না জানি না কিন্তু প্রাচীন য়ুরোপের যাজকসম্প্রদায়ের মধ্যেও আহারব্যবহার এবং জীবনযাত্রা কঠিন নিয়মের দ্বারা সংযত ছিল। কিন্তু সেই উপবাসকৃশ যাজকসম্প্রদায়ই কি প্রাচীন য়ুরোপ। তখনকার য়ুরোপীয় ক্ষত্রিয়মণ্ডলীও কি ছিল না। এইরূপ বিপরীত শক্তির ঐক্যই কি সমাজের প্রকৃত জীবন নহে।

কোনো বিশেষ আহারে আধ্যাত্মিকতা বৃদ্ধি পায় বলিতে কী বুঝায়।— মনুষ্যের মধ্যে যে-একটি কর্তৃশক্তি আছে, যে-শক্তি স্থায়ী সুখের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ক্ষণিক সুখ বিসর্জন করে, ভবিষ্যৎকে উপলব্ধি করিয়া বর্তমানকে চালিত করে, সংসারের কার্যনির্বাহার্থ আমাদের যে-সকল প্রবৃত্তি আছে প্রভুর ন্যায় তাহাদিগকে যথাপথে নিয়োগ করে, তাহাকেই যদি আধ্যাত্মিক শক্তি বলে তবে স্বল্পাহারে বা বিশেষ আহারে সেই শক্তি বৃদ্ধি হয় কী করিয়া আলোচনা করিয়া দেখা যাক।

খাদ্যরসের সহিত আত্মার যোগ কোথায়, এবং আহারের অন্তর্গত কোন্ কোন্ উপাদান বিশেষরূপে আধ্যাত্মিক, বিজ্ঞানে তাহা এ পর্যন্ত নির্দিষ্ট হয় নাই। যদি তৎসম্বন্ধে কোনো রহস্য শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদিগের গোচর হইয়া থাকে, তবে অক্ষম গুরুপুরোহিতের প্রতি ভারার্পণ না করিয়া চন্দ্রনাথবাবু নিজে তাহা প্রকাশ করিলে আজিকার এই নব্য পাশবাচারের দিনে বিশেষ উপকারে আসিত।

এ কথা সত্য বটে স্বল্পাহার এবং অনাহার প্রবৃত্তিনাশের একটি উপায়। সকল প্রকার নিবৃত্তির এমন সরল পথ আর নাই। কিন্তু প্রবৃত্তিকে বিনাশ করার নামই যে আধ্যাত্মিক শক্তির বৃদ্ধিসাধন তাহা নহে।

মনে করো, প্রভুর নিয়োগক্রমে লোকাকীর্ণ রাজপথে আমাকে চার ঘোড়ার গাড়ি হাঁকাইয়া চলিতে হয়। কাজটা খুব শক্ত হইতে পারে কিন্তু ঘোড়াগুলার দানা বন্ধ করিয়া তাহাদিগকে আধমরা করিয়া রাখিলে কেবল ঘোড়ার চলৎশক্তি কমিবে, কিন্তু তাহাতে যে আমার সারথ্যশক্তি বাড়িবে এমন কেহ বলিতে পারে না। ঘোড়াকে যদি তোমার শত্রুই স্থির করিয়া থাক তবে রথযাত্রাটা একেবারে বন্ধই রাখিতে হয়। প্রবৃত্তিকে যদি রিপু জ্ঞান করিয়া থাক তবে শত্রুহীন হইতে গেলে আত্মহত্যা করা আবশ্যক, কিন্তু তদ্দ্বারা আধ্যাত্মিক শক্তি বাড়ে কি না তাহার প্রমাণ দুষ্প্রাপ্য।

গীতায় “শ্রীকৃষ্ণ কর্মকে মনুষ্যের শ্রেষ্ঠপথ বলিয়া নির্দিষ্ট করিয়াছেন” তাহার কারণ কী। তাহার কারণ এই যে, কর্মেই মনুষ্যের কর্তৃশক্তি বা আধ্যাত্মিকতার বলবৃদ্ধি হয়। কর্মেই মনুষ্যের সমুদয় প্রবৃত্তি পরিচালনা করিতে হয় এবং সংযত

করিতেও হয়। কর্ম যতই বিচিত্র, বৃহৎ এবং প্রবল, আত্মনিয়োগ এবং আত্মসংযমের চর্চা ততই অধিক। এঞ্জিনের পক্ষে বাষ্প যেমন, কর্মানুষ্ঠানের পক্ষে প্রবৃত্তি সেইরূপ। এঞ্জিনে যেমন একদিকে ক্রমাগত কয়লার খোরাক দিয়া আগ্নেয় শক্তি উত্তেজিত করিয়া তোলা হইতেছে আর-একদিকে তেমনি দুর্ভেদ্য লৌহবল তাহাকে গ্রহণ ও ধারণ করিয়া স্বকার্যে নিয়োগ করিতেছে, মনুষ্যের জীবনযাত্রাও সেইরূপ। সমস্ত আগুন নিবাইয়া দিয়া সাত্ত্বিক ঠাণ্ডা জলের মধ্যে শীতকালের সরীসৃপের মতো নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকাকেই যদি মুক্তির উপায় বল তবে সে এক স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের সে উপদেশ নহে। প্রবৃত্তির সাহায্যে কর্মের সাধন এবং কর্মের দ্বারা প্রবৃত্তির দমনই সর্বোৎকৃষ্ট। অর্থাৎ মনোজ শক্তিকে নানা শক্তিতে রূপান্তরিত ও বিভক্ত করিয়া চালনা করার দ্বারাই কর্মসাধন এবং আত্মকর্তৃত্ব উভয়েরই চর্চা হয়— খোরাক বন্ধ করিয়া প্রবৃত্তির শ্বাসরোধ করা আধ্যাত্মিক আলস্যের একটা কৌশলমাত্র।

তবে এমন কথা উঠিতে পারে যে, প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে জীবমাত্রেরই আহারের প্রতি একটা আকর্ষণ আছে; যদি মধ্যে মধ্যে এক-একদিন আহার রহিত করিয়া অথবা প্রত্যহ আহার হ্রাস করিয়া সেই আকর্ষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা যায় তবে তদ্দ্বারা আত্মশক্তির চালনা হইয়া আধ্যাত্মিক বললাভ হয়। এ সম্বন্ধে কথা এই যে, মাঝিগিরিই যাহার নিয়ত ব্যবসায়, শখের দাঁড় টানিয়া শরীরচালনা তাহার পক্ষে নিতান্তই বাহুল্য। সংসারের নিত্যনৈমিত্তিক কাজে প্রতিদিনই এত সংযমচর্চার আবশ্যক এবং অবসর আছে যে শখের সংযম বাহুল্যমাত্র। এমন অনেক লোক দেখা যায় যাঁহারা জপ তপ উপবাস ব্রতচারণে নানাপ্রকার সংযম পালন করেন, কিন্তু সাংসারিক বৈষয়িক বিষয়ে তাহাদের কিছুমাত্র সংযম নাই। শখের সংযমের প্রধান আশঙ্কাই তাই। লোকে মনে করে যখন সংযমচর্চার স্বতন্ত্র ক্ষেত্র কঠিনরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে তখন কর্মক্ষেত্রে ঢিলা দিলেও চলে। অনেক সময় ইহার ফল হয়, খেলায় সংযম এবং কাজে স্বেচ্ছাচারিতা, মুখে জপ এবং অন্তরে কুচক্রান্ত, ব্রাহ্মণকে দান এবং ব্যবসায়ে প্রতারণা, গঙ্গাস্নানের নিষ্ঠা এবং চরিত্রের অপবিত্রতা।

যাহা হউক, কর্মানুষ্ঠানকেই যদি মনুষ্যের পক্ষে শ্রেষ্ঠ পথ বল, এবং কেবল ঘরসংসার করাকেই একমাত্র কর্ম না বল, যদি ঘরের বাহিরেও সুবৃহৎ সংসার থাকে এবং সংসারের বৃহৎ কার্যও যদি আমাদের মহৎ কর্তব্য হয় তবে শরীরকে নিকৃষ্ট ও অপবিত্র বলিয়া ঘৃণা করিলে চলিবে না; তবে শারীরিক বল ও শারীরিক উদ্যমকে আধ্যাত্মিকতার অঙ্গ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

তাহা হইলে বিচার্য এই যে, শরীরের বলসাধনের পক্ষে সামিষ এবং নিরামিষ আহারের কাহার কিরূপ ফল সে বিষয়ে আমার কিছু বলা শোভা পায় না এবং ডাক্তারের মধ্যেও নানা মত। কিন্তু চন্দ্রনাথবাবু নিজ মত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন :

> নিরামিষ আহারে দেহ মন উভয়েরই যেরূপ পুষ্টি হয়, আমিষযুক্ত আহারে সেরূপ হয় না।

আমরা এক শতাব্দীর ঊর্ধ্বকাল একটি প্রবল আমিষাশী জাতির দেহমনের সাতিশয় পুষ্টি অস্থিমজ্জায় অনুভব করিয়া আসিতেছি, মতপ্রচারের উৎসাহে চন্দ্রনাথবাবু সহসা তাহাদিগকে কী করিয়া ভুলিয়া গেলেন বুঝিতে পারি না। তাহারাই কি আমাদিগকে ভোলে, না আমরাই তাহাদিগকে ভুলিতে পারি? তাহাদের দেহের পুষ্টি মুষ্টির অগ্রভাগে আমাদের নাসার সম্মুখে সর্বদাই উদ্যত হইয়া আছে, এবং তাহাদের মনের পুষ্টি যদি অস্বীকার করি তবে তাহাতে আমাদেরই বোধশক্তির অক্ষমতা প্রকাশ পায়।

প্রমাণস্থলে লেখকমহাশয় হবিষ্যাশী অধ্যাপকপণ্ডিতের সহিত আমিষাশী নব্য বাঙালির তুলনা করিয়াছেন। এইরূপ তুলনা নানা কারণে অসংগত।

প্রথমত, মুখের এক কথাতেই তুলনা হয় না। অনির্দিষ্ট আনুমানিক তুলনার উপর নির্ভর করিয়া সর্বসাধারণের প্রতি অকাট্য মত জারি করা যাইতে পারে না।

দ্বিতীয়ত, যদি-বা স্বীকার করা যায় যে, অধ্যাপকপণ্ডিতেরা মাংসাশী যুবকের অপেক্ষা বলিষ্ঠ ও দীর্ঘজীবী ছিলেন, তথাপি আহারের পার্থক্যই যে সেই প্রভেদের কারণ তাহার কোনো প্রমাণ নাই। সকলেই জানেন অধ্যাপকপণ্ডিতের জীবন নিতান্তই নিরুদ্বেগ্ এবং আধুনিক যুবকদিগের পক্ষে জীবনযাত্রানির্বাহ বিষম উৎকণ্ঠার কারণ হইয়া পড়িয়াছে, এবং উদ্বেগ যেরূপ আয়ুক্ষয়কর এরূপ আর কিছুই নহে।

নিরামিষাশী শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় যতই বলিষ্ঠ ও নম্রপ্রকৃতি হউন না কেন, তাঁহাকে "সাত্ত্বিক আহারের উৎকৃষ্টতার" প্রমাণস্বরূপে উল্লেখ করা লেখকমহাশয়ের পক্ষে যুক্তিসংগত হয় নাই। আমিও এমন কোনো লোককে জানি যিনি দুইবেলা মাংস ভোজন করেন অথচ তাঁহার মতো মাটির মানুষ দেখা যায় না। আরও এমন ব্যক্তিগত দৃষ্টান্ত অনেক আছে, কিন্তু সেগুলিকে প্রমাণস্বরূপে উল্লেখ করিয়া ফল কী। চন্দ্রনাথবাবুর বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত এরূপ ব্যক্তিগত দৃষ্টান্ত প্রমাণস্বরূপে প্রয়োগ করিলে বুঝায় যে, তাঁহার মতে অন্ততপক্ষে একজনও বলিষ্ঠ এবং নির্মলপ্রকৃতির লোক নাই।

আধুনিক শিক্ষিত যুবকদের প্রতি চন্দ্রনাথবাবুর অভিযোগ এই যে :

> তাঁহারা অসংযতেন্দ্রিয়, তাঁহাদের সংযম শিক্ষা একেবারেই হয় না। এইজন্য তাঁহারা প্রায়ই সম্ভোগপ্রিয়, ভোগাসক্ত হইয়া থাকেন। শুধু আহারে নয়, ইন্দ্রিয়াধীন সকল কার্যেই তাঁহারা কিছু লুব্ধ, কিছু মুগ্ধ, কিছু মোহাচ্ছন্ন।

অসংযতেন্দ্রিয় এবং সংযমশিক্ষাহীন, সম্ভোগপ্রিয় এবং ভোগাসক্ত, মুগ্ধ এবং মোহাচ্ছন্ন, কথাগুলার প্রায় একই অর্থ। উপস্থিতক্ষেত্রে চন্দ্রনাথবাবুর বিশেষ বক্তব্য এই যে, নব্যদের লোভটা কিছু বেশি প্রবল।

প্রাচীন ব্রাহ্মণবটুদের ওই প্রবৃত্তিটা যে মোটেই ছিল না, এ কথা চন্দ্রনাথবাবু বলিলেও আমরা স্বীকার করিতে পারিব না। লেখকমহাশয় লুব্ধ পশুর সহিত নব্য পশুখাদকের কোনো প্রভেদ দেখিতে পান না। কিন্তু এ কথা জগদ্‌বিখ্যাত যে, ব্রাহ্মণপণ্ডিতকে বশ করিবার প্রধান উপায় আহার এবং দক্ষিণা। অধ্যাপকমহাশয় ঔদরিকতার দৃষ্টান্তস্থল। যিনি একদিন লুচিদধির গন্ধে উন্মনা হইয়া জাতিচ্যুত ধনীগৃহে ঊর্ধ্বশ্বাসে ধাবমান হইয়াছিলেন এবং আহারান্তে বাহিরে আসিয়া কৃত কার্য অম্লানমুখে অস্বীকার করিয়াছিলেন তাঁহারই পৌত্র আজ 'চপকট্‌লেটের সৌরভে বাবুর্চি বাহাদুরের খাপরেলখচিত মুর্গিমণ্ডপাভিমুখে ছোটেন' এবং অনেকে তাহা বাহিরে আসিয়া মিথ্যাচরণপূর্বক গোপনও করেন না। উভয়ের মধ্যে কেবল সময়ের ব্যবধান কিন্তু সংযম ও সাত্ত্বিকতার বড়ো ইতরবিশেষ দেখি না। তাহা ছাড়া নব্য ব্রাহ্মণদিগের প্রাচীন পিতৃপুরুষেরা যে ক্রোধবর্জিত ছিলেন তাঁহাদের তর্ক ও বিচারপ্রণালীদ্বারা তাহাও প্রমাণ হয় না।

যাহা হউক, প্রাচীন বঙ্গসমাজে ষড়্‌রিপু যে নিতান্ত নির্জীবভাবে ছিল এবং আধুনিক সমাজে আমিষের গন্ধ পাইবামাত্র তাহারা সব ক'টা উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছে, এটা অনেকটা লেখকমহাশয়ের কল্পনামাত্র। তাঁহার জানা উচিত, আমরা প্রাচীন কালের যুবকদিগকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই না; যাঁহাদিগকে দেখি তাঁহারা যৌবনলীলা বহুপূর্বে সমাধা করিয়া ভোগাসক্তির বিরুদ্ধে উপদেশ দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এইজন্য আমাদের সহজেই ধারণা হয়, তবে বুঝি সেকালে কেবলমাত্র হরিনাম এবং আত্মারই আমদানি ছিল। কিন্তু মাঝে মাঝে যে-সকল পীতবর্ণ জীর্ণ বৈষয়িক এবং রসনিমগ্ন পরিপক্ব ভোগী বৃদ্ধ দেখা যায়, তাহাতে বুঝা যায়, সত্যযুগ আমাদের অব্যবহিত পূর্বেই ছিল না।

সামিষ এবং নিরামিষ আহারের তুলনা করা আমার উদ্দেশ্য নহে। আমি কেবল এইটুকু বলিতে চাহি, আহার সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিতে গিয়া একটা ঘরগড়া দৈববাণী রচনা করা আজকালকার দিনে শোভা পায় না। এখনকার কালে যদি

কোনো দৈবদুর্যোগে কোনো লোকের মনে সহসা একটা অভ্রান্ত সত্যের আবির্ভাব হইয়া পড়ে অথচ সঙ্গে সঙ্গে কোনো প্রমাণ দেখা না দেয়, তবে তাঁহার একমাত্র কর্তব্য সেটাকে মনে মনে পরিপাক করা। গুরুর ভঙ্গিতে কথা বলার একটা নূতন উপদ্রব বঙ্গসাহিত্যে সম্প্রতি দেখা দিতেছে। এরূপ ভাবে সত্য কথা বলিলেও সত্যের অপমান করা হয়, কারণ সত্য কোনো লেখকের নামে বিকাইতে চাহে না, আপনার যুক্তি দ্বারা সে আপনাকে প্রমাণ করে, লেখক উপলক্ষ মাত্র।

অবশ্য, রুচিভেদে অভিজ্ঞতাভেদে আমাদের কোনো জিনিস ভালো লাগে কোনো জিনিস মন্দ লাগে, সকল সময়ে তাহার কারণ নির্দেশ করিতে পারি না। তাহার যেটুকু কারণ তাহা আমাদের সমস্ত জীবনের সহিত জড়িত, সেটাকে টানিয়া বাহির করা ভারি দুরূহ। মনের বিশেষ গতি অনুসারে অসম্পূর্ণ প্রমাণের উপরেও আমরা অনেক মত গঠিত করিয়া থাকি ; এইরূপ ভূরি ভূরি অপ্রমাণিত বিশ্বাস লইয়া আমরা সংসারযাত্রা নির্বাহ করিয়া যাই। সেইরূপ মত ও বিশ্বাস যদি ব্যক্ত করিবার ইচ্ছা হয় তবে তাহা বলিবার একটা বিশেষ ধরন আছে। একেবারে অভ্রান্ত অভ্রভেদী গুরুগৌরব ধারণ করিয়া বিশ্বসাধারণের মস্তকের উপর নিজের মতকে বেদবাক্য-স্বরূপে বর্ষণ করিতে আরম্ভ করা কখনো হাস্যকর, কখনো উৎপাতজনক।

১২৯৮

কর্মের উমেদার

প্রকাণ্ড পিয়ানো অথবা বৃহদাকার অর্গান যন্ত্র সঙ্গে না থাকিলে য়ুরোপীয় সংগীত সম্পূর্ণ হয় না— য়ুরোপীয় সংসারযাত্রাও তেমনই স্তূপাকার সামগ্রীর উপর নির্ভর করে। শোয়াবসা চলাফেরা, অশন বসন ভূষণ, সকল দিকেই তাহাদের এত সহস্র সরঞ্জামের সৃষ্টি হইয়াছে যে ভালো করিয়া ভাবিয়া দেখিতে গেলে অবাক হইতে হয়। একটা শামুকের পিঠে কতটুকুই বা খোলা, কিন্তু মানুষের আসবাবের খোলস প্রতিদিন পর্বতাকার হইয়া উঠিতেছে।

মানুষও সেই পরিমাণে সঙ্গে সঙ্গে বাড়িতেছে কি না সেই একটা জিজ্ঞাস্য আছে। একটা রোগ আছে তাহাতে মানুষের খাদ্যের অধিকাংশই চর্বিতে পরিণত করে। অস্থি মাংসপেশি স্নায়ু অনুরূপমাত্রায় খাদ্য পায় না, কেবল শরীরের পরিধি বিপুল হইয়া উঠিতে থাকে। সর্বাঙ্গীণ স্বাস্থ্যের পরিবর্তে এরূপ অতিরিক্ত আংশিক উদ্যমকে কেহ কল্যাণজনক মনে করিতে পারে না। ডাক্তাররা বলেন, এরূপ বিপরীত বসাগ্রস্ত

হইলে হৃৎপিণ্ডের বিকার (fatty degeneration of heart) ঘটিতে পারে এবং মস্তিষ্কের পক্ষেও এরূপ অবস্থা অনুকূল নহে।

য়ুরোপীয় সভ্যতাও কি সেইরূপ বেশি মাত্রায় বহরে বাড়িয়া উঠিতেছে, এবং জিনিসপত্রের প্রকাণ্ড চাপে তাহার হৃদয় এবং বুদ্ধিবৃত্তি অপেক্ষাকৃত অকর্মণ্য হইবার উপক্রম হইয়াছে, অথবা তাহা দৈত্যের মতো সর্বাংশেই বিপুলতা লাভ করিতেছে এবং অন্যের পক্ষে যাহা অত্যধিক তাহার পক্ষে তাহাই স্বাভাবিক পরিমাণ, ইহার মীমাংসা আমাদের সাধ্যায়ত্ত নহে, এবং সে চেষ্টাও বিদেশির পক্ষে ধৃষ্টতামাত্র।

কিন্তু সভ্যতার অসংখ্য আসবাব যোগাইয়া ওঠা দিন দিন অসামান্য চেষ্টাসাধ্য হইয়া উঠিতেছে। কল বাড়িতেছে এবং মানুষও কলের মতো খাটিতেছে। যত সস্তায় যত বেশি জিনিস উৎপন্ন করা যাইতে পারে, সকলের এই প্রাণপণ চেষ্টা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু ইহাই একান্ত চেষ্টা হইলে মানুষকে ক্রমে আর মানুষ জ্ঞান হয় না, কলেরই একটা অংশ মনে হয়, এবং তাহার নিকট হইতে যতদূর সম্ভব জিনিস আদায় করিয়া লইতে প্রবৃত্তি হয়। তাহার সুখদুঃখ শ্রান্তিবিশ্রামের প্রতি অধিক মনোযোগ করিলে অচল হইয়া উঠে।

য়ুরোপে এইরূপ অবস্থা উত্তরোত্তর গুরুতর হইয়া উঠিতেছে। লোহার কলের সঙ্গে সঙ্গে রক্তমাংসের মানুষকে সমান খাটিতে হইতেছে। কেবল বণিকসম্প্রদায় লাভ করিতেছেন এবং ধনীসম্প্রদায় আরামে আছেন।

কিন্তু য়ুরোপের মানুষকে যন্ত্রের তলায় পিষিয়া ফেলা সহজ ব্যাপার নহে। কোনো প্রবল শক্তি কিছুদিন আমাদের মাথার উপর চাপ দিলেই আমরা ধূলির মতো গুঁড়াইয়া সকলে মিলিয়া একাকার হইয়া যাই ; তা সে ব্রহ্মণ্যশক্তিই হউক আর রাজন্যশক্তিই হউক, শাস্ত্রই হউক আর শস্ত্রই হউক। য়ুরোপীয় প্রকৃতি কিছুদিন এইরূপ উপদ্রব সহ্য করিয়া অবশেষে বিদ্রোহ উপস্থিত করে। যেখানে যে কারণেই হউক, যখনই তাহার মনুষ্যত্বের উপর বন্ধন আঁট হইয়া আসে তখনই সে অধীর হইয়া উঠিয়া তাহা ছিন্ন করিবার চেষ্টা করে— সে ধর্মের বন্ধনই হউক আর কর্মের বন্ধনই হউক।

য়ুরোপের মনুষ্যত্ব এইরূপ জীবন্ত এবং প্রবল থাকাতেই সহজে কোনো বিকারের আশঙ্কা হয় না। কোনোরূপ বাড়াবাড়ি ঘটিলেই আপনিই তাহার সংশোধনের চেষ্টা জাগিয়া উঠে। রাজা প্রজার স্বাধীনতায় একান্ত হস্তক্ষেপ করিলে যথাসময়ে রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটিয়া উঠে— শাস্ত্র ও পুরোহিত ধর্মের ছদ্মবেশে মানবের স্বাধীন বুদ্ধিকে শৃঙ্খলিত করিবার চেষ্টা করিলে ধর্মবিপ্লব উপস্থিত হয়। এইরূপে, মানুষ যেখানে স্বাধীন এবং স্বাধীনতাপ্রিয় সেখানে সত্বরই হউক বিলম্বেই হউক, সংশোধনের পথ মুক্ত আছে।

সেখানে রোগ আরম্ভ হইলে একেবারে মৃত্যুতে গিয়া শেষ হয় না। যাহারা আপনার ধর্মবুদ্ধি এবং সংসারবুদ্ধি, দেহ এবং মনের প্রত্যেক স্বাধীনতাই বহুদিন হইতে পরের হাতে সমর্পণ করিয়া জড়বৎ বসিয়া আছে, গ্রন্থবৎ আচার পালন করিতেছে, তাহাদের মধ্যে কোনো-একটা নূতন বিপৎপাত হইলে স্বাধীন প্রতিকার-চেষ্টা প্রবল হইয়া উঠে না, উত্তরোত্তর তাহার চরম ফল ফলিতে থাকে— জ্বর আরম্ভ হইলে বিকারে গিয়া দাঁড়ায়।

অতএব, আমাদের দেশে যদি অতিরিক্ত যন্ত্রচালনার প্রাদুর্ভাব হইত তবে তাহার পরিণাম ফল কী হইত বলা শক্ত নহে। আমাদের বর্তমান অবস্থার সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে খুব বেশি পরিবর্তন হইত না। কারণ, আমাদের মানসিক রাজ্যে আমরা যন্ত্রের রাজত্বই বহন করিয়া আসিতেছি। কী খাইব, কী করিয়া খাইব, কোথায় বসিব, কাহাকে ছুঁইব, জীবনের প্রত্যেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে এবং দানধ্যান তপজপ প্রভৃতি ধর্মকার্যে আমরা এমনই বাঁধা নিয়মে চলিয়া আসিয়াছি যে, মন হইতে স্বাধীনতার অঙ্কুর পর্যন্ত লোপ পাইয়াছে— স্বাধীনভাবে চিন্তাও করিতে পারি না, স্বাধীনভাবে কার্যও করিতে পারি না। আকস্মিক ঘটনাকে দৈব ঘটনা বলিয়া ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাকাইয়া থাকি। প্রবল শক্তি মাত্রকেই অনিবার্য দৈবশক্তি জ্ঞান করিয়া বিনা বিরোধে তাহার পদতলে আত্মসমর্পণ করি। য়ুরোপে গুটিপোকার মড়ক হইলে, দ্রাক্ষা কীটগ্রস্ত হইলে তাহারও প্রতিবিধানের চেষ্টা হয়; আমাদের দেশে ওলাউঠা এবং বসন্তকে আমরা পূজা করিয়া মরি। স্বাধীন বুদ্ধির চোখ বাঁধিয়া, তুলা দিয়া তাহার নাসাকর্ণ রোধ করিয়া আমরাও সম্প্রতি এইরূপ পরম আধ্যাত্মিক অবস্থায় উত্তীর্ণ হইয়াছি। অন্তরে যখন এইরূপ পরিপূর্ণ অধীনতা বাহিরে তখন স্বাধীনতা কিছুতেই তিষ্ঠিতে পারে না।

অতএব, যদি মজুরের আবশ্যক হয় তো আমাদের মতো কলের মজুর আর নাই।

য়ুরোপের মজুররা প্রতিদিন বিদ্রোহী হইয়া উঠিতেছে। আমাদের কাছে যে কথা নূতন ঠেকিবে তাহারা সেই কথা উত্থাপিত করিয়াছে। তাহারা বলিতেছে, মজুর হই আর যা-ই হই, আমরা মানুষ। আমরা যন্ত্র নই। আমরা দরিদ্র বলিয়াই যে প্রভুরা আমাদের সহিত যথেচ্ছ ব্যবহার করিবেন তাহা হইতে পারে না, আমরা ইহার প্রতিকার করিব। আমাদের বেতন বৃদ্ধি করো, আমাদের পরিশ্রম হ্রাস করো, আমাদের প্রতি মানুষের ন্যায় আচরণ করো।

যন্ত্ররাজের বিরুদ্ধে যন্ত্রীগণ এইরূপে নিজের স্বাধীন ইচ্ছা প্রচার করিতেছে।

য়ুরোপে রাজা এবং ধর্মের যথেচ্ছ প্রভুত্ব শিথিল হইয়া ধনের প্রভুত্ব বলীয়ান হইয়া

উঠিতেছিল। সারসরাজা ধরিয়া খায়, কাষ্ঠরাজা চাপিয়া মারে। য়ুরোপ পূর্বেই সারসরাজার চঞ্চু বাঁধিয়া দিয়াছে; এবারে জড়রাজার সহিত লাঠালাঠি বাধাইবার উপক্রম করিয়াছে।

ধনের অধীনতার একটা সীমা ছিল, সেই পর্যন্ত মানুষ সহ্য করিয়াছিল। শিল্পীর একটা স্বাধীনতা আছে। শিল্পনৈপুণ্য তাহার নিজস্ব। তাহার মধ্যে নিজের প্রতিভা খেলাইতে পারে এমন স্থান আছে। শক্তি অনুসারে সে আপন কাজে গৌরব অর্জন করিতে সক্ষম। নিজের হাতের কাজ নিজে সম্পূর্ণ করিয়া সে একটি স্বাধীন সন্তোষ লাভ করিতে পারে।

কিন্তু যন্ত্র সকল মানুষকেই ন্যূনাধিক সমান করিয়া দেয়। তাহাতে স্বাধীন নৈপুণ্য খাটাইবার স্থান নাই। জড়ের মতো কেবল কাজ করিয়া যাইতে হয়।

এইরূপে সমাজে ধনী সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং নির্ধন একান্ত পরাধীন হইয়া পড়ে। এমনকি, সে যে-কাজ করে সে-কাজের মধ্যেও তাহার স্বাধীনতা নাই। পেটের দায়ে সে পৃথিবীর লোকসংখ্যার অন্তর্গত না হইয়া যন্ত্রসংখ্যার মধ্যে ভুক্ত হয়। পূর্বে যাহারা শিল্পী ছিল এখন তাহারা মজুর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পূর্বে যাহারা ওস্তাদ কারিগরের অধীনে কাজ করিত এখন তাহারা বৃহৎ যন্ত্রের অধীনে কাজ করে।

ইহাতেই নির্ধনের আন্তরিক অসন্তোষ প্রতিদিন বাড়িয়া উঠিতেছে, তাহার কাজের সুখ নাই। সে আপনার মনুষ্যত্ব খাটাইতে পারে না।

বিলাসী রোম একসময়ে অসভ্য বিদেশীকে আপনাদের সেনারূপে নিযুক্ত করিয়াছিল। য়ুরোপের শূদ্রদল যদি বিদ্রোহী হইয়া কখনও কর্মে জবাব দেয়, পূর্ব হইতে জানাইয়া রাখা ভালো, আমরা উমেদার আছি।

আমরা কলের কাজ করিবার জন্য একেবারে কলে তৈয়ারি হইয়াছি। মনু পরাশর ভৃগু নারদ সকলে মিলিয়া আমাদের আত্মকর্তৃত্ব চূর্ণ করিয়া দিয়াছেন; পশুর মতো নিজের স্বাভাবিক চক্ষুতে ঠুলি পরিয়া পরের রাশ মানিয়া কী করিয়া চলিতে হয় বহুকাল হইতে তাহা তাঁহারা শিখাইয়াছেন, এখন আমাদিগকে যন্ত্রে জুতিয়া দিলেই হইল। শরীর কাহিল বটে, যন্ত্রের তাড়নায় প্রাণান্ত হইতে পারে, কিন্তু কখনও বিদ্রোহী হইব না। কখনও এমন স্বপ্নেও মনে করিব না যে, স্বাধীন চেষ্টার দ্বারা আমাদের এ অবস্থার কোনো প্রতিকার হইতে পারে।

কর্মে আমাদের অনুরাগ নাই। বৈরাগ্যমন্ত্র কানে দিয়া সেটুকু জীবনলক্ষণও আমাদের রাখা হয় নাই। কিন্তু তাহাতে কলের কাজের কোনো ব্যাঘাত হইবে না, বরং সুবিধা হইবে। কেননা কর্মে যাহাদের প্রকৃত অনুরাগ আছে তাহারা সহিষ্ণুতা-

সহকারে কলের কাজ করিতে পারে না। কারণ, যাহারা কর্তৃত্ব অনুভব করিয়া সুখ পায় তাহারাই কর্মের অনুরাগী। উদ্দেশ্যসাধনের উপলক্ষে বাধা অতিক্রম করিয়া একটা কার্য সমাধাপূর্বক তাহারা আপনারই স্বাধীনতা উপলব্ধি করে, সে-ই তাহাদের আনন্দ। কিন্তু সেরূপ কর্মানুরাগী লোক কলের কাজ করিয়া সুখী হয় না, কারণ কলের কাজে কেবল কাজের দুঃখ আছে অথচ কাজের সুখটুকু নাই। তাহাতে স্বাধীনতা নাই। কোনো কর্মপ্রিয় লোক ঘানির গোরু কিংবা স্যাকরাগাড়ির ঘোড়া হইতে চাহে না। কিন্তু যাহার কর্মে অনুরাগ দূর হইয়া গেছে তাহাকে এরূপ কাজে লাগাইলে ললাটের লিখন স্মরণ করিয়া বিনা উপদ্রবে সে কাজ করিয়া যায়।

মাঝে ইংরেজি শিক্ষায় আমাদের মনে ঈষৎ চাঞ্চল্য আনয়ন করিয়াছিল। বহুদিবসের পিঞ্জরবদ্ধ বিহঙ্গের মনে মুক্ত আকাশ এবং স্বাধীন নীড়ের কথা উদয় হইয়াছিল। কিন্তু আমাদের জ্ঞানী লোকেরা সম্প্রতি বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন, এরূপ চাঞ্চল্য পবিত্র হিন্দুদিগকে শোভা পায় না। তাঁহারা উপদেশ দেন, অদৃষ্টবাদ অতি পবিত্র, কারণ তাহাতে স্বাধীন চেষ্টাকে যথাসম্ভব দূর করিয়া দেয়। সর্ববিষয়ে শাস্ত্রানুশাসন অতি পবিত্র, কারণ তাহাতে স্বাধীন বুদ্ধিকে অকর্মণ্য করিয়া রাখে। আমাদের যাহা আছে তাহাই সর্বাপেক্ষা পবিত্র, কারণ এ কথা স্মরণ রাখিলে স্বাধীন বুদ্ধি এবং স্বাধীন চেষ্টাকে একেবারেই জবাব দেওয়া যাইতে পারে। বোধ হয় এই-সকল জ্ঞানগর্ভ কথা সাধারণের খুব হৃদয়গ্রাহী হইবে, বহুকাল হইতে হৃদয় এইভাবেই প্রস্তুত হইয়া আছে।

যন্ত্রবিজ্ঞানের উন্নতি-সহকারে যন্ত্র যতই সম্পূর্ণ হইবে তাহা চালনা করিতে মানুষের বুদ্ধির আবশ্যক ততই হ্রাস হইয়া আসিবে, এবং স্বাধীনবুদ্ধিসম্পন্ন জীবের পক্ষে সে কাজ ততই অসহ্য হইয়া উঠিবে। আশা আছে, ভারতবর্ষীয়দের বিশেষ উপযোগিতা তখনই য়ুরোপ বুঝিতে পারিবে। যাহারা মান্ধাতার আমলের লাঙলে চাষ করিতেছে, যাহারা মনুর আমলের ঘানিতে তেল বাহির করিতেছে, যাহারা যেখানে পড়ে সেইখানে পড়িয়া থাকাকেই পৃথিবীর মধ্যে সর্বোচ্চ গৌরবের বিষয় বলিয়া গর্ব করে, আবশ্যক হইলে তাহারাই সহিষ্ণুভাবে নতশিরে সমস্ত য়ুরোপের কল টানিতে পারিবে। যদি বরাবর পবিত্র আর্যশিক্ষাই জয়ী হয় তবে আমাদের প্রপৌত্রদিগের চাকরির জন্য বোধ হয় আমাদের পৌত্রদিগকে অধিক ভাবিতে হইবে না।

১২৯৮

আদিম আর্য-নিবাস

লেখাপড়া শিখিয়া আমাদের অনেকেই মা-সরস্বতীর কাছে আবেদন করিয়া থাকেন ;

যে বিদ্যা দিয়েছ মা গো ফিরে তুমি লও,
কাগজ কলমের কড়ি আমায় ফিরে দাও।

মা-সরস্বতী অনেক সময়ে তাঁহাদের প্রার্থনানুসারে বিদ্যা ফিরাইয়া লন, কিন্তু কড়ি ফিরাইয়া দেন না।

অনেক বিদ্যা, যাহা মাথা খুঁড়িয়া মাথায় প্রবেশ করাইতে হইয়াছিল, হঠাৎ নোটিস পাওয়া যায়, সেগুলা মিথ্যা ; আবার মাথা খুঁড়িয়া তাহাদিগকে বাহির করা দায় হইয়া উঠে। শতদলবাসিনী যদি ইংরেজ-আইনের বাধ্য হইতেন তবে উকিলের পরামর্শ লইয়া তাঁহার নিকট হইতে খেসারতের দাবি করা যাইতে পারিত। জনসমাজে লক্ষ্মীরই চাঞ্চল্য-অপবাদ প্রচার হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার সপত্নীর যে নিতান্ত অটল স্বভাব এমন কোনো লক্ষণ দেখা যায় না।

বাল্যকালে শিক্ষা করিয়াছিলাম, মধ্য-এসিয়ার কোনো-এক-স্থানে আর্যদিগের আদিম বাসস্থান ছিল। সেখান হইতে একদল য়ুরোপে এবং একদল ভারতবর্ষে ও পারস্যে যাত্রা করে। কতকগুলি এসিয়াবাসী ও য়ুরোপীয় জাতির ভাষার সাদৃশ্য দ্বারা ইহার প্রমাণ হইয়াছে।

কথাটা মনে রাখিবার একটা সুবিধা ছিল। সূর্য পূর্ব দিক হইতে পশ্চিমে যাত্রা করে। শ্বেতাঙ্গ আর্যগণও সেই পথ অনুসরণ করিয়াছেন, এবং পূর্বাচলের কাছেও দুই একটি মলিন জ্যোতিরেখা রাখিয়া গিয়াছেন।

কিন্তু উপমা যতই সুন্দর হউক, তাহাকে যুক্তি বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। আজকাল ইংলণ্ড ফ্রান্স ও জর্মানিতে বিস্তর পুরাতত্ত্ববিৎ উঠিয়াছেন, তাঁহারা বলেন, য়ুরোপই আর্যদের আদিম বাসস্থান, কেবল একদল কোনো বিশেষ কারণে এসিয়ায় আসিয়া পড়িয়াছিল।

ইহাদের দল প্রতিদিন যেরূপ পুষ্টিলাভ করিতেছে তাহাতে বেশ মনে হইতেছে, আমাদের পুত্রপৌত্রগণ প্রাচীন আর্যদের সম্বন্ধে স্বতন্ত্র পাঠ মুখস্থ করিতে আরম্ভ করিবেন এবং আমাদের ধারণাকে একটা বহুকেলে ভ্রম বলিয়া অবজ্ঞা করিতে ছাড়িবেন না।

আর্যদিগের পশ্চিমযাত্রা সম্বন্ধে ইংলণ্ডে ল্যাথাম সাহেব সর্বপ্রথমে আপত্তি উত্থাপন করেন।

তিনি বলেন, শাখা হইতে গুঁড়ি হয় না, গুঁড়ি হইতেই শাখা হয়। য়ুরোপেই যখন অধিকাংশ আর্যজাতির বাসস্থান দেখা যাইতেছে তখন সহজেই মনে হয়, য়ুরোপেই মোট জাতটার উদ্ভব হইয়াছে এবং পারস্য ভারতবর্ষে তাহার একটা শাখা প্রসারিত হইয়াছে মাত্র।

মার্কিন ভাষাতত্ত্ববিৎ হুইটনি সাহেব বলেন, আর্যদিগের আদিম নিবাস সম্বন্ধে পৌরাণিক উপাখ্যান ইতিহাস অথবা ভাষা -আলোচনা দ্বারা কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার কোনো পথ নাই। অতএব মধ্য-এসিয়ায় আর্যদের বাসস্থান নিরূপণ করা নিতান্তই কপোলকল্পিত অনুমান।

জর্মান পণ্ডিত বেন্‌ফি সাহেব বলেন, এসিয়াই আর্যদিগের প্রথম জন্মভূমি বলিয়া স্থির করিবার একটি কারণ ছিল। বহুদিন হইতে একটা সংস্কার চলিয়া আসিতেছে যে, এসিয়াতেই মানবের প্রথম উৎপত্তি হয়; অতএব আর্যগণ যে সেইখান হইতেই অন্যত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে ইহার বিশেষ প্রমাণ লওয়া কেহ আবশ্যক মনে করিত না। কিন্তু ইতিমধ্যে য়ুরোপের ভূস্তরে বহুপ্রাচীন মানবের বাসচিহ্ন আবিষ্কৃত হইয়াছে, এইজন্য সেই পূর্ব সংস্কার এখন অমূলক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহা ছাড়া ভাষাতত্ত্ব হইতে তিনি একটা বিরোধী প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন। তাহার মর্ম এই— সংস্কৃত ও পারসিকের সহিত গ্রীক লাটিন জর্মান প্রভৃতি য়ুরোপীয় ভাষায় গার্হস্থ্য সম্পর্ক এবং অনেক পশু ও প্রাকৃতিক বস্তুর নামের ঐক্য আছে; সেই ভাষাগত ঐক্যের উপর নির্ভর করিয়াই এই ভিন্নভাষীদিগের একজাতিত্ব স্থির হইয়াছে। কেবল তাহাই নহে, নানা স্থানে বিভক্ত হইবার পূর্বে আর্যগণ যখন একত্রে বাস করিতেন, তখন তাঁহাদের কিরূপ অবস্থা ছিল ভাষা তুলনা করিয়া তাহার আভাস পাওয়া যায়। যেমন, যদি দেখা যায় সংস্কৃত ও য়ুরোপীয় ভাষায় লাঙলের নামের সাদৃশ্য আছে তবে স্থির করা যায় যে, আর্যগণ বিচ্ছিন্ন হইবার পূর্বেই চাষ আরম্ভ করিয়াছিলেন, তেমনই যদি দেখা যায় কোনো-একটা বস্তুর নাম উভয় ভাষায় পৃথক তবে অনুমান করা যাইতে পারে যে, ভিন্ন হইবার পরে তৎসম্বন্ধে তাঁহাদের পরিচয় ঘটিয়াছে। সেই যুক্তি অবলম্বন করিয়া বেন্‌ফি বলেন, সংস্কৃত ভাষায় সিংহ শব্দ যে-ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে সে-ধাতু য়ুরোপীয় কোনো ভাষায় নাই। অপর পক্ষে গ্রীকগণ সিংহের নাম হিব্রুভাষা হইতে ধার করিয়া লইয়াছেন— গ্রীক লিস্, হিব্রু লাইশ। অতএব এ কথা বলা যাইতে পারে যে, আর্যগণ একত্র থাকিবার সময় সিংহের পরিচয় পান নাই। সম্ভবত গ্রীক লিস্ ও

লিওন্ শব্দের ন্যায় সংস্কৃত সিংহ শব্দও তৎকালীন কোনো অনার্য ভাষা হইতে সংগৃহীত। অথবা পশুরাজের গর্জনের অনুকরণেও নূতন নামকরণ অসম্ভব নহে। যাহাই হউক, এসিয়াই যদি আর্যদিগের আদিম নিবাস হইত তবে সিংহ শব্দের ধাতু য়ুরোপীয় আর্যভাষাতেও পাওয়া যাইত। উষ্ট্র হস্তী এবং ব্যাঘ্র শব্দ সম্বন্ধেও এই কথা খাটে।

এ দিকে আবার মানবতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন, শ্বেতবর্ণ মানবেরা একটি বিশেষজাতীয় এবং এই-জাতীয় মানব য়ুরোপেই দেখা যায়, এসিয়ায় নহে। প্রাচীন বর্ণনা এবং বর্তমান দৃষ্টান্ত দ্বারা জানা যায় যে, আদিম আর্যগণ শ্বেতাঙ্গ ছিলেন এবং বর্তমান আর্যদের অধিকাংশই শ্বেতবর্ণ। অতএব য়ুরোপেই এই শ্বেতজাতীয় মনুষ্যের উৎপত্তি অধিকতর সংগত বলিয়া বিবেচনা হয়।

লিওেন্‌স্মিট বলেন, ভাষার ঐক্য ধরিয়া যে-সমস্ত জাতিকে আর্য-নামে অভিহিত করা হইতেছে মস্তকের গঠন ও শারীরিক পরিণতি -অনুসারে তাহাদের আদিম আদর্শ য়ুরোপেই দেখা যায়। য়ুরোপীয়দের শারীরিক প্রকৃতি, দীর্ঘ জীবন এবং দুর্ধর্ষ জীবনীশক্তি পর্যালোচনা করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে, আর্যজাতির প্রবলতম প্রাচীনতম এবং গভীরতম মূল কোথায় পাওয়া যাইতে পারে। তাঁহার মতে, ভারতবর্ষে ও এসিয়ার অন্যত্র আর্যগণ তত্রস্থ আদিম অধিবাসীদের সহিত অনেক পরিমাণে মিশ্রিত হইয়া সংকর জাতিতে পরিণত হইয়াছে।

য়ুরোপের উত্তরাঞ্চলবাসী ফিন্‌জাতি আর্যজাতি নহে। ভাষাতত্ত্ববিৎ কুনো সাহেব দেখাইয়াছেন, ফিন্‌ভাষার বহুতর সংখ্যাবাচক শব্দ, সর্বনাম শব্দ, এবং পারিবারিক সম্পর্কের নাম ইণ্ডোয়ুরোপীয় ধাতু হইতে উৎপন্ন। তাঁহার মতে এ-সকল শব্দ যে ধার করিয়া লওয়া তাহা নহে; কোনো-এক সময়ে অতি প্রাচীনকালে উক্ত দুই জাতির পরস্পরসামীপ্যবশত কতকগুলি শব্দ ও ধাতু উভয়েরই সরকারি দখলে ছিল। ইহা হইতেও প্রমাণ হয় য়ুরোপেই আর্যগণের আদিম বাসস্থান, সুতরাং ফিন্‌জাতি তাঁহাদের প্রতিবেশী ছিল।

ইতিমধ্যে আবার একটা নূতন কথা অল্পে অল্পে দেখা দিতেছে, সেটা যদি ক্রমে পাকিয়া দাঁড়ায় তবে আবার প্রাচীন মতই বহাল থাকিবার সম্ভাবনা।

সেমেটিক জাতি (আরব্য য়িহুদি প্রভৃতি জাতিরা যাহার অন্তর্গত) আর্যজাতির দলভুক্ত নয়, এতকাল এই কথা শুনিয়া আসিতেছিলাম। কিন্তু আজকাল দুই একজন করিয়া পুরাতত্ত্ববিৎ কোনো কোনো সেমেটিক শব্দের সহিত আর্যশব্দের সাদৃশ্য বাহির করিতেছেন। এবং কেহ কেহ এরূপ অনুমান করিতেছেন যে, সেমেটিকগণ হয়তো

এককালে আর্যজাতির অন্তর্ভুক্ত ছিল; সর্বাগ্রে তাহারাই বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল, এইজন্য তাহাদের সহিত অবশিষ্ট আর্যগণের সাদৃশ্য ক্রমশই ক্ষীণতর হইয়া আসিয়াছে। আর্যদিগের সহিত সেমেটিকদের সম্পর্ক স্থির হইয়া গেলে আদিমকালে উভয়ের একত্র এসিয়া-বাসই অপেক্ষাকৃত সংগত বলিয়া মনে হইতে পারে।

কিন্তু এ মত এখনও পরিস্ফুট হয় নাই, অনুমানের মধ্যেই আছে।

আমরা বলি, আদিম বাসস্থান যেখানেই থাক্, কুটুম্বিতা যতই বাড়ে ততই ভালো। এই এক আর্যসম্পর্কে পৃথিবীর অনেক বড়ো বড়ো জাতির সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ বাধিয়াছে। আরবিক ও য়িহুদিরা কম লোক নহে। তাহারা যদি জাতভাই হইয়া দাঁড়ায় সে তো সুখের বিষয়। বর্ণিত আছে যে, দ্রৌপদী কর্ণকে দেখিয়া মনে করিতেন— যখন আমার সে-ই পঞ্চস্বামীই হইল, তখন কর্ণকে সুদ্ধ ধরিয়া ছয় স্বামী হইলেই মনের খেদ মিটিত; তাহা হইলে পৃথিবীতে আমার স্বামীর তুলনা মিলিত না। আমাদেরও কতকটা সেই অবস্থা। ইংরেজ ফরাসী গ্রীক লাটিন ইহারা তো আমাদের খুড়তুতো ভাই, এখন ইহুদি মুসলমানেরাও যদি আমাদের আপনার হইয়া যায় তাহা হইলে পৃথিবীতে আমাদের আত্মীয়গৌরবের তুলনা মিলে না। তাহা হইলে আমাদের আর্য-মাতার প্রথম-জাত এই অজ্ঞাত পুত্র কর্ণও আমাদের চিরবৈরীশ্রেণী হইতে কুটুম্বশ্রেণীতে ভুক্ত হন।

১২৯৯

আদিম সম্বল

যে জাতি নূতন জীবন আরম্ভ করিতেছে তাহার বিশ্বাসের বল থাকা চাই। বিশ্বাস বলিতে কতকগুলা অমূলক বিশ্বাস কিংবা গোঁড়ামির কথা বলি না। কিন্তু কতকগুলি ধ্রুব সত্য আছে, যাহা সকল জাতিরই জীবনের মূলধন, যাহা চিরদিনের পৈতৃক সম্পত্তি; এবং যাহা অনেক জাতি সাবালক হইয়া উড়াইয়া দেয় অথবা কোনো কাজে না খাটাইয়া মাটির নীচে পুঁতিয়া যক্ষের জিম্মায় সমর্পণ করে।

যেমন একটা আছে স্বাধীনতার প্রতি বিশ্বাস; অর্থাৎ আর-একজন কেহ ঘাড় ধরিয়া আমার কোনো স্থায়ী উপকার করিতে পারে এ কথা কিছুতে মনে লয় না, আমার চোখে ঠুলি দিয়া আর-একজন যে আমাকে মহত্ত্বের পথে লইয়া যাইতে পারে এ কথা স্বভাবতই অসংগত এবং অসহ্য মনে হয়; কারণ, যাহাতে মনুষ্যত্বের অপমান হয় তাহা

কখনই উন্নতির পথ হইতে পারে না। আমার যেখানে স্বাভাবিক অধিকার সেখানে আর-একজনের কর্তৃত্ব যে সহ্য করিতে পারে সে আদিম মনুষ্যত্ব হারাইয়াছে।

স্বাধীনতাপ্রিয়তা যেমন উক্ত আদিম মনুষ্যত্বের একটি অঙ্গ তেমনই সত্যপ্রিয়তা আর-একটি। ছলনার প্রতি যে একটা ঘৃণা, সে ফলাফল বিচার করিয়া নহে, সে একটি সহজ উন্নত সরলতার গুণে। যেমন যুবাপুরুষ সহজে ঋজু হইয়া দাঁড়াইতে পারে তেমনই স্বভাবসুস্থ যুবক জাতি সহজেই সত্যাচরণ করে।

যদি-বা কোনো বয়স্ক বিজ্ঞলোক এমন মনে করেন, কথাটা সম্পূর্ণ সত্য নহে, আমার স্বাভাবিক অধিকার থাকিলেও আমার স্বাভাবিক যোগ্যতা না থাকিতেও পারে, অতএব সেইরূপ স্থলে অধীনতা স্বীকার করাই যুক্তিসংগত ; কথাটা যেমনই প্রামাণিক হউক তবু এ কথা বলিতেই হইবে, যে-জাতির মাথায় এমন যুক্তির উদয় হইয়াছে তাহার যাহা হইবার তাহা হইয়া গেছে।

আর যা-ই হউক, জীবনের আরম্ভে এরূপ ভাব কিছুতেই শোভা পায় না। আমার কার্য আমাকেই করিতে হইবে ; আর-একজন করিয়া দিলে কাজ হইতে পারে কিন্তু আমার ভালো হইবে না। কাজের চেয়ে মানুষ শ্রেষ্ঠ। কলে কাজ হয় কিন্তু কলে মানুষ হয় না। এইরূপ স্বাভাবিক বিশ্বাস লইয়া যে-জাতি কাজ করিতে আরম্ভ করে সে-ই কাজ করিতে পারে। সে অনেক ভুল করিবে কিন্তু তাহার মানুষ হইবার আশা আছে।

অন্যপক্ষে, যুক্তির চক্ষু উৎপাটন করিয়া, জীবনধর্মের গতিমুখে বাঁধ বাঁধিয়া দিয়া, মানুষের স্বাধীনতাসর্বস্ব সম্পূর্ণ বাজেয়াপ্ত করিয়া একটি সমাজকে কলের মতো বানাইয়া তাহা হইতে নির্বিরোধে নিয়মিত কাজ আদায় করিতে পার, কিন্তু মনুষ্যত্বের দফা নিকাশ। সেখানে চিন্তা যুক্তি আত্মকর্তৃত্ব এবং সেই সঙ্গে ভ্রম বিরোধ সংশয় প্রভৃতি মানবের ধর্ম লোপ পাইয়া যাইবে, কেবল কালের ধর্ম, কাজ করা, তাহাই চলিতে থাকিবে।

কিন্তু নির্ভুল কল এবং ভ্রান্ত মানুষের মধ্যে যদি পছন্দ করিয়া লইতে হয় তবে মানুষকেই বাছিতে হয়। ভ্রম হইতে অনেক সময় সত্যের জন্ম হয়, কিন্তু কল হইতে কিছুতেই মানুষ বাহির হয় না।

মনুষ্যের সকল প্রকার স্বাধীনতা অপহরণ করিয়া আমাদের সমাজের যে কী আশ্চর্য শৃঙ্খলা দাঁড়াইয়াছে এই কথা লইয়া যাঁহারা গৌরব করেন, তাঁহারা প্রকৃত মনুষ্যত্বের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করেন।

স্বাধীনতা সম্বন্ধে যেমন, সত্য সম্বন্ধেও তেমনই। অল্প বয়সে অমিশ্র সত্যের প্রতি

যেরূপ উজ্জ্বল শ্রদ্ধা থাকে কিঞ্চিৎ বয়স হইলে অনেকের তাহা ম্লান হইয়া যায়। যাঁহারা বলেন, সত্য সকলের উপযোগী নয় এবং অনেক সময় অসুবিধাজনক এবং তাহা অধিকারীভেদে ন্যূনাধিক মিথ্যার সহিত মিশাইয়া বাঁটোয়ারা করিয়া দেওয়া আবশ্যক, তাঁহারা খুব পাকা কথা বলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু এত পাকা কথা কোনো মানুষের মুখে শোভা পায় না।

যে খাঁটি লোক, যাহার মন সাদা, যাহার পৌরুষ আছে, সে বলে, ফলাফল-বিচার আমার হাতে নাই; আমি যাহা সত্য তাহা বলিব, লোকে বুঝুক আর না-ই বুঝুক, বিশ্বাস করুক আর না-ই করুক।

এখন কথা এই, আমরা নব্য বাঙালিরা আপনাদিগকে পুরাতন জাতি না নূতন জাতি, কী হিসাবে দেখিব। যেমন চলিয়া আসিতেছে তাই চলিতে দিব, না জীবনলীলা আর-একবার পালটাইয়া আরম্ভ করিব?

যদি এমন বিশ্বাস হয় যে, পূর্বে আমরা কখনও একজাতি ছিলাম না, নূতন শিক্ষার সঙ্গে এই জাতীয় ভাবের নূতন আস্বাদ পাইতেছি; ধীরে ধীরে মনের মধ্যে এক নূতন সংকল্পের অভ্যুদয় হইতেছে যে, আমাদের স্বদেশের এই-সমস্ত সমবেতহৃদয়কে অসীম কালক্ষেত্রের মাঝখানে পরিপূর্ণ আকারে উদ্‌ভিন্ন করিয়া তুলিতে হইবে; সমস্তের মধ্যে এক জীবনপ্রবাহ সঞ্চারিত করিয়া দিয়া এক অপূর্ব বলশালী বিরাট পুরুষকে জাগ্রত করিতে হইবে; আমাদের দেশ একটি বিশেষ স্বতন্ত্র দেহ ধারণ করিয়া বিপুল নরসমাজে আপনার স্বাধীন অধিকার লাভ করিবে; এই বিশ্বব্যাপী চলাচলের হাটে অসংকোচে অসীম জনতার মধ্যে নিরলস নির্ভীক হইয়া আদান-প্রদান করিতে থাকিবে; তাহার জ্ঞানের খনি, তাহার কর্মের ক্ষেত্র, তাহার প্রেমের পথ সর্বত্র উদ্‌ঘাটিত হইয়া যাইবে— তবে মনের মধ্যে বিশ্বাস দৃঢ় করিতে হইবে; তবে জাতির প্রথম সম্বল যে-স্বাধীনতা ও সত্যপ্রিয়তা, যাহাকে এক কথায় বীরত্ব বলে, বুড়ামানুষের মতো তর্ক করিয়া অভ্যাস আবশ্যক ও আশঙ্কার কথা তুলিয়া তাহাকে নির্বাসিত করিলে চলিবে না। যেখানে যুক্তির স্বাভাবিক অধিকার সেখানে শাস্ত্রকে রাজা করিয়া, যেখানে স্বভাবের পৈতৃক সিংহাসন সেখানে কৃত্রিমতাকে অভিষিক্ত করিয়া আমরা এতদিন সহস্রবাহু অধীনতা-রাক্ষসকে সমাজের দেবাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিয়াছি; স্বাধীন মনুষ্যত্বকে ধর্মে সমাজে দৈনিক ক্রিয়াকলাপে সূচ্যগ্র ভূমিমাত্র না ছাড়িয়া দেওয়াকেই আমরা উচ্চ মনুষ্যত্ব জ্ঞান করিয়া আসিতেছি। যতদিন বিচ্ছিন্নভাবে আমরা নিজ নিজ গৃহপ্রাচীরের মধ্যে বদ্ধ হইয়া বাস করিতাম ততদিন এমন করিয়া চলিত। কিন্তু যদি একটা জাতি বাঁধিতে চাই, তবে

যে-সকল প্রাচীন আরাধ্য প্রস্তর আমাদের মনুষ্যত্বের উপর চাপিয়া বসিয়া তাহার সমস্ত বল ও স্বাধীন পুরুষকার নিষ্পেষিত করিয়া দিতেছে, তাহাদিগকে যথাযোগ্য ভক্তি ও বিচ্ছেদবেদনা -সহকারে বিসর্জন দেওয়া আবশ্যক।

১২৯৯

কর্তব্যনীতি

অধ্যাপক হক্সলির মত [১]

জগতে দেখা যায়, সুখ দুঃখ প্রাণীদের মধ্যে ঠিক ন্যায়বিচার-মতে বণ্টন হয় না। প্রথমত, নিম্নশ্রেণীয় প্রাণীদের এতটুকু বিবেকবুদ্ধি নাই যাহাতে তাহারা দণ্ডপুরস্কারের স্বরূপ সুখদুঃখের অধিকারী হইতে পারে। তাহার পরে মানুষের মধ্যেও দেখিতে পাই পাপাচরণ করিয়াও কত লোকে উন্নতিলাভ করিতেছে এবং পুণ্যবান দ্বারে দ্বারে অন্নভিক্ষা করিয়া ফিরিতেছে; পিতার দোষে পুত্র কষ্টভোগ করিতেছে; অজ্ঞানকৃত কার্যের ফল ইচ্ছাকৃত অপরাধের সমান হইয়া দাঁড়াইতেছে; এবং একজন লোকের উৎপীড়ন বা অবিবেচনায় শত সহস্র লোককে দুঃখবহন করিতে হইতেছে।

অতএব জগতের নিয়মকে ধর্মনীতির আইন-অনুসারে বিচার করিতে হইলে তাহাকে অপরাধী সাব্যস্ত করিতে হয়। কিন্তু সাহস করিয়া কোনো বিচারক সে-রায় প্রকাশ করিতে চান না।

হিব্রুশাস্ত্র এ সম্বন্ধে চুপ করিয়া থাকেন। ভারতবর্ষ এবং গ্রীস আসামীর পক্ষ অবলম্বন করিয়া ওকালতি করিতে চেষ্টা করেন।

ভারতবর্ষ বলেন, সকলকেই অসংখ্য পূর্বজন্মপরম্পরার কর্মফল ভোগ করিতে হয়। বিশ্বনিয়মে কোথাও কার্যকারণশৃঙ্খলের ছেদ নাই; সুখদুঃখও সেই অনন্ত অমোঘ অবিচ্ছিন্ন নিয়মের বশবর্তী।

হিন্দুশাস্ত্রমতে পরিবর্তমান বস্তু এবং মনঃপদার্থের অভ্যন্তরে একটি নিত্যসত্তা আছে। জগতের মধ্যবর্তী সেই নিত্যপদার্থের নাম ব্রহ্ম এবং জীবের অন্তরস্থিত ধ্রুবসত্তাকে আত্মা কহে। জীবাত্মা কেবল ইন্দ্রিয়জ্ঞান বুদ্ধিবাসনা প্রভৃতি মায়া দ্বারা ব্রহ্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আছে। যাহারা অজ্ঞান তাহারা এই মায়াকেই সত্য বলিয়া

---

[১] **Evolution and Ethics by Thomas H. Huxley, F. R. S.**

জানে, এবং সেই ভ্রমবশতই বাসনাপাশে বদ্ধ হইয়া দুঃখের কষাঘাতে জর্জরিত হইতে থাকে।

এ মত গ্রহণ করিলে অস্তিত্ব হইতে মুক্তিলাভের চেষ্টাই একমাত্র উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়ায়। বিষয়বাসনা, সমাজবন্ধন, পারিবারিক স্নেহপ্রেম, এমন-কি, ক্ষুধাতৃষ্ণা ও ইন্দ্রিয়ানুভূতিও বিনাশ করিয়া একপ্রকার সংজ্ঞাহীন জড়ত্বকেই ব্রহ্মসম্মিলনের লক্ষণ বলিয়া বিশ্বাস করিতে হয়।

বৌদ্ধগণ ব্রাহ্মণদিগের এই মত গ্রহণ করিয়া সন্তুষ্ট ছিলেন না; তাঁহারা আত্মা এবং ব্রহ্মের সত্তাও লোপ করিয়া দিলেন। কারণ, কোথাও কোনো অস্তিত্বের লেশমাত্রও স্বীকার করিলে পুনরায় তাহা হইতে দুঃখের অভিব্যক্তি অবশ্যম্ভাবী বলিয়া মানিতে হয়। এমন-কি, হিন্দুশাস্ত্রের নির্গুণ ব্রহ্মের মতো এমন একটা নাস্তিবাচক অস্তিত্বকেও তাঁহারা কোথাও স্থান দিতে সাহস করিলেন না।

বুদ্ধ বলিলেন, বস্তুই বা কী আর মনই বা কী, কিছুর মধ্যেই নিত্যপদার্থ নাই; অনন্ত বিশ্বমরীচিকা কেবল স্বপ্নপ্রবাহমাত্র। স্বপ্ন দেখিবার বাসনা একবার ধ্বংস করিতে পারিলেই মানুষের মুক্তি হয়, এবং ব্রহ্ম ও আত্মা নামক কোনো নিত্যপদার্থ না থাকাতে একবার নির্বাণলাভ করিলে আর দ্বিতীয়বার অস্তিত্বলাভের সম্ভাবনামাত্র থাকে না।

প্রাচীন গ্রীসে স্টোয়িক সম্প্রদায় যখন জগৎকারণ ঈশ্বরে অসীম সদ্‌গুণের আরোপ করিলেন তখন তাঁহার সৃষ্ট বিশ্বজগতে অমঙ্গলের অস্তিত্ব কিরূপে সম্ভব হইল, ইহাই এক সমস্যা দাঁড়াইল।

তাঁহারা বলিলেন, প্রথমত জগতে অমঙ্গল নাই; দ্বিতীয়ত যদি-বা থাকে তাহা মঙ্গলেরই আনুষঙ্গিক; এবং যেটুকু আছে তাহা আমাদের নিজদোষে নয় আমাদের ভালোরই জন্য।

হক্সলি বলেন, অমঙ্গলের মধ্যেও যে মঙ্গলের অস্তিত্ব দেখা যায় তাহাতে সন্দেহ নাই এবং দুঃখ কষ্ট যে অনেক সময় আমাদের শিক্ষকের কার্য করে তাহাও সত্য; কিন্তু অসংখ্য মূঢ় প্রাণী, যাহারা এই শিক্ষায় কোনো উপকার পায় না এবং যাহাদিগকে কোনো কাজের জন্য দায়িক করা যাইতে পারে না, তাহারা যে কেন দুঃখভোগ করে এবং অনন্তশক্তিমান কেনই-বা সর্বতোভাবে দুঃখপাপহীন করিয়া জগৎসৃজন না করিলেন, স্টোয়িকগণ তাহার কোনো উত্তর দিলেন না। জগতে যাহা-কিছু আছে তাহাই সর্বাপেক্ষা উত্তম, এ কথা স্বীকার করিলে কোথাও কোনো সংশোধনের চেষ্টা না করিয়া সম্পূর্ণ উদাসীন হইয়া বসিয়া থাকাই কর্তব্য হইয়া দাঁড়ায়।

কিন্তু বাহ্যজগৎ যে মানুষের ধর্মশিক্ষাস্থল, সর্বমঙ্গলবাদী স্টোয়িকদের নিকটও তাহা

ক্রমশ অপ্রমাণ হইতে লাগিল। কারণ দেখিতে পাওয়া যায়, এক হিসাবে জগৎপ্রকৃতি আমাদের ধর্মপ্রকৃতির বিরোধী। এ সম্বন্ধে হক্সলির মত আর একটু বিবৃত করিয়া নিম্নে লিখা যাইতেছে।

মানুষ জীবনসংগ্রামে জয়ী হইয়া আজ সমস্ত জীবরাজ্যের সর্বশ্রেষ্ঠপদে অভিষিক্ত হইয়াছে। নিজেকে যেন তেন প্রকারেণ বজায় রাখা, যাহা পাওয়া যায় নির্বিচারে তাহাকে আত্মসাৎ করা এবং যাহা হাতে আসে তাহাকে একান্ত চেষ্টায় রক্ষা করা, ইহাই জীবনযুদ্ধের প্রধান অঙ্গ। যে-সকল গুণের প্রভাবে বানর এবং ব্যাঘ্র জীবনরক্ষা করিতেছে সেই-সকল গুণ লইয়াই মানুষ জীবনসংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। তাহার শারীর প্রকৃতির বিশেষত্ব, তাহার ধূর্ততা, তাহার সামাজিকতা, তাহার কৌতূহল তাহার অনুকরণনৈপুণ্য এবং তাহার ইচ্ছা বাধাপ্রাপ্ত হইলে প্রচণ্ড ক্রোধাবেগে নিষ্ঠুর হিংস্রতাই তাহাকে জীবনরঙ্গভূমিতে বিজয়ী করিয়াছে।

ক্রমে আদিম অরাজকতা দূর হইয়া যতই সামাজিক শৃঙ্খলা স্থাপিত হইল ততই মনুষ্যের পাশব গুণগুলি দোষের হইয়া দাঁড়াইতে লাগিল। সভ্য মানব যে-মই দিয়া উপরে উঠিয়াছে সে-মইটা আজ পদাঘাত করিয়া ফেলিয়া দিতে চাহে। ভিতরে ব্যাঘ্র এবং বানরের যে-অংশটা আছে সেটাকে দূর করিতে পারিলে বাঁচে। কিন্তু সেই ব্যাঘ্র-বানরটা সভ্য মানবের সুবিধা বুঝিয়া দূরে যাইতে চাহে না; সেই কৈশোরের চির-সহচরগুলি অনাদৃত হইয়াও মানবসমাজের মধ্যে অনাহূত আসিয়া পড়ে এবং আমাদের সংযত সামাজিক জীবনে শত সহস্র দুঃখকষ্ট এবং জটিল সমস্যার সৃষ্টি করে। সেই সনাতন ব্যাঘ্রবানর-প্রবৃত্তিগুলাকে মানুষ আজ পাপ বলিয়া দাগা দিয়াছে এবং যাহারা এককালে আমাদিগকে দুরূহ ভবসংগ্রামে উত্তীর্ণ করিয়াছে তাহাদিগকে বন্ধনে ছেদনে সবংশে বিনাশ করিবার চেষ্টা করিতেছে।

অতএব জগৎপ্রকৃতি আমাদের ধর্মপ্রবৃত্তির আনুকূল্য করিতেছে এ কথা স্বীকার করা যায় না; বরঞ্চ দেখা যায়, আমাদের ধর্মপ্রবৃত্তির সহিত তাহার অহর্নিশি সংগ্রাম চলিতেছে। স্টোয়িকগণও তাহা বুঝিলেন এবং অবশেষে বলিলেন, সংসার ত্যাগ করিয়া সমস্ত মায়ামমতা বিসর্জন দিয়া তবে কিয়ৎপরিমাণে পরিপূর্ণতার আদর্শ লাভ করা যাইতে পারে। Apatheia অর্থাৎ বৈরাগ্য মানবপ্রকৃতির পূর্ণতাসাধনের উপায়; সেই বৈরাগ্যের অবস্থায় মানবহৃদয়ের সমস্ত ইচ্ছা কেবল বিশুদ্ধ প্রজ্ঞার অনুশাসন পালন করিয়া চলে। সেই স্বল্পাবশিষ্ট চেষ্টাটুকুও কেবল অল্পদিনের জন্য; সে যেন বিশ্বব্যাপী পরমাত্মারই দেহপিঞ্জরাবদ্ধ একটি উচ্ছ্বাস, মৃত্যু-অন্তে সেই সর্বব্যাপী আত্মার সহিত পুনর্মিলনের প্রয়াস পাইতেছে।

দেখা যাইতেছে, ভারতবর্ষ এবং গ্রীস ভিন্ন দিক হইতে আরম্ভ করিয়া অবশেষে এক বৈরাগ্যে গিয়া মিলিত হইয়াছে।

বৈদিক এবং হোমেরিক কাব্যে আমাদের সম্মুখে যে-জীবনের চিত্র ধরিয়াছে তাহার মধ্যে কী একটা বলিষ্ঠ স্বাস্থ্য এবং আনন্দপূর্ণ সমরোৎসাহ দেখা যায়— তখন বীরগণ সুখ-দুঃখ, শুভদিনের সূর্যালোক এবং দুর্দিনের বজ্রপতন উভয়কেই খেলাচ্ছলে গ্রহণ করিতেন এবং যখন শোণিত উষ্ণ হইয়া উঠিত তখন দেবতাদের সহিত যুদ্ধ করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। তাহার পরে কয়েক শতাব্দী অতীত হইতেই পরিণত সভ্যতা-প্রভাবে চিন্তাজ্বরে জরাজীর্ণ হইয়া সেই বীরমণ্ডলীর উত্তরপুরুষগণ জগৎসংসারকে দুঃখময় দেখিতে লাগিল। যোদ্ধা হইল তপস্বী, কর্মী হইল বৈরাগী। গঙ্গাকূলে এবং টাইবর-তীরে নীতিজ্ঞ ব্যক্তি স্বীকার করিলেন বিশ্বসংসার প্রবল শত্রু এবং বিশ্ববন্ধনচ্ছেদনই মুক্তির প্রধান উপায়।

প্রাচীন হিন্দু ও গ্রীক -দর্শন যেখান হইতে আরম্ভ করিয়াছিল আধুনিক মানবমনও সেইখান হইতেই যাত্রার উপক্রম করিতেছে।

কিন্তু আধুনিক সমাজে যদিও দুঃখবাদী ও সুখবাদীর অভাব নাই তথাপি এ কথা স্বীকার করিতে হয়, আমাদের অধিকাংশ লোকই দুই মতের মাঝখান দিয়া চলিয়া থাকেন। মোটের উপর সাধারণের ধারণা, জগৎটা নিতান্ত সুখেরও নহে নিতান্ত দুঃখেরও নহে।

দ্বিতীয়ত, মানুষ যে নিজকৃত কর্মের দ্বারা জীবনের অনেকটা সুখদুঃখের হ্রাসবৃদ্ধি সাধন করিতে পারে এ সম্বন্ধেও অধিকাংশের মতের ঐক্য আছে।

তৃতীয়ত, কায়মনোবাক্যে সমাজের মঙ্গলসাধন যে আমাদের সর্বোচ্চ কর্তব্য এ সম্বন্ধেও লেখক কাহাকেও সন্দেহ প্রকাশ করিতে শোনেন নাই।

এক্ষণে বর্তমানকালে প্রাকৃতিক নিয়ম সম্বন্ধে আমাদের যে-সকল নূতন জ্ঞান লাভ হইয়াছে, তাহার সহিত আমাদের কর্তব্যনীতির কতটা যোগ তাহাই আলোচ্য।

একদল আছেন যাঁহারা অন্যান্য প্রাকৃতিক ঘটনার ন্যায় ধর্মনীতিরও ক্রমাভিব্যক্তি স্বীকার করেন। লেখকের সহিত তাঁহাদের মতের বিশেষ অনৈক্য নাই, কিন্তু হক্সলি বলেন, আমাদের ভালোমন্দ প্রবৃত্তিগুলি কিরূপে পরিব্যক্ত হইল, অভিব্যক্তিবাদ তাহা আমাদিগকে জানাইতে পারে, কিন্তু ভালো যে মন্দের অপেক্ষা কেন শ্রেয়, অভিব্যক্তিতত্ত্ব তাহার কোনো নূতন সদ্‌যুক্তি দেখাইতে পারে না। হয়তো কোনো একদিন আমাদের সৌন্দর্যবোধের অভিব্যক্তি সম্বন্ধে আমরা জ্ঞানলাভ করিতে পারিব, কিন্তু তাহাতে করিয়া এটা সুন্দর এবং ওটা কুৎসিত এই বোধশক্তির কোনো হ্রাসবৃদ্ধি সাধন করিতে পারিবে না।

ধর্মনীতির অভিব্যক্তিবাদ উপলক্ষে আর-একটা ভ্রম আজকাল প্রচলিত হইতে দেখা যায়। মোটের উপরে জীবজন্তু-উদ্ভিদগণ জীবনযুদ্ধে যোগ্যতমতা অনুসারেই টিঁকিয়া গিয়া উন্নতি লাভ করিয়াছে। অতএব সামাজিক মনুষ্য, নীতিপথবর্তী মনুষ্যও সেই এক উপায়েই উন্নতিসোপানে অগ্রসর হইতে পারে, এমন কথা কেহ কেহ বলিয়া থাকেন। যোগ্যতম এবং সাধুতম কথাটা এক নহে। প্রকৃতিতে যোগ্যতমতা অবস্থার উপরে নির্ভর করে। পৃথিবী যদি অধিকতর শীতল হইয়া আসে তবে ওক অপেক্ষা শৈবাল যোগ্যতর হইয়া দাঁড়াইবে ; সে স্থলে অন্য কোনোরূপ শ্রেষ্ঠতাকে যোগ্যতা বলা যাইবে না।

সামাজিক মনুষ্যও এই জাগতিক নিয়মের অধীন, তাহাতে সন্দেহ নাই। লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে এবং জীবিকার জন্য প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতেছে— যাহার জোর বেশি, আপনাকে বেশি জাহির করিতে পারে, সে অক্ষমকে দলিত করিয়া দিতেছে। কিন্তু তথাপি অভিব্যক্তির এই জাগতিক পদ্ধতি সভ্যতার নিম্নাবস্থাতেই অধিকতর প্রভাব বিস্তার করে। সামাজিক উন্নতির অর্থই, এই জাগতিক পদ্ধতিকে পদে পদে বাধা দিয়া তৎপরিবর্তে নূতন পদ্ধতির প্রতিষ্ঠা করা, যাহাকে বলে নৈতিক পদ্ধতি ; এবং যাহার শেষ উদ্দেশ্য, অবস্থানুযায়ী যোগ্যতাকে পরিহার করিয়া নৈতিক শ্রেষ্ঠতাকে রক্ষা করা।

জাগতিক পদ্ধতির স্থলে নৈতিক পদ্ধতিকে সমাজে স্থান দিতে হইলে নিষ্ঠুর স্বেচ্ছাচারিতার পরিবর্তে আত্মসংযম অবলম্বন করিতে হইবে— সমস্ত প্রতিদ্বন্দ্বীকে অপসারিত বিদলিত না করিয়া পরস্পরকে সাহায্য করিতে হইবে— যাহাতে করিয়া কেবল যোগ্যতম রক্ষা না পায়, পরন্তু সাধ্যমতো সম্ভবমতো অনেকেই রক্ষা পাইবার যোগ্য হয়। আইন এবং নীতিসূত্র সকল জাগতিক পদ্ধতিকে বাধা দিয়া সমাজের প্রতি প্রত্যেকের কর্তব্য স্মরণ করাইয়া দিতেছে ; তাহারই আশ্রয় ও প্রভাবে কেবল যে প্রত্যেকে জীবনরক্ষা করিতে সমর্থ হইতেছে তাহা নহে, পাশব বর্বরতার আকর্ষণ হইতে আপনাকে উদ্ধার করিয়াছে।

অতএব এ কথা বিশেষরূপে মনে ধারণা করা কর্তব্য যে, জাগতিক পদ্ধতির অনুসরণ করিয়া, অথবা তাহার নিকট হইতে সন্ত্রাসে পলায়ন করিয়া সমাজের নৈতিক উন্নতি হয় না, তাহার সহিত সংগ্রাম করাই প্রকৃষ্ট উপায়। আমরা ক্ষুদ্র পরমাণু হইয়া বিশ্বজগতের সহিত লড়াই করিতে বসিব এ কথা স্পর্ধার মতো শুনিতে হয়, কিন্তু আধুনিক জ্ঞানোন্নতি পর্যালোচনা করিলে ইহা নিতান্ত দুরাশা বলিয়া বোধ হয় না।

সভ্যতার ইতিহাসে দেখা যায়, মানুষ ক্রমে ক্রমে বিশ্বজগতের মধ্যে একটি কৃত্রিম জগৎ রচনা করিতেছে। প্রত্যেক পরিবারে, প্রত্যেক সমাজে শাস্ত্র ও লোকাচারের দ্বারা মানবাশ্রিত জাগতিক পদ্ধতি সংযত ও রূপান্তরিত হইয়াছে এবং বহিঃপ্রকৃতিতেও

পশুপাল কৃষী ও শিল্পীর দ্বারা তাহাকে পরিবর্তিত করিয়া লওয়া হইয়াছে। যতই সভ্যতা বৃদ্ধি হইয়াছে ততই প্রকৃতির কার্যে মানুষের হস্তক্ষেপ বাড়িয়া আসিয়াছে; অবশেষে শিল্প ও বিজ্ঞানের উন্নতি-সহকারে মানব-বহির্ভূত প্রকৃতির উপরে মানুষের প্রভাব এতই প্রবল হইয়াছে যে, পুরাকালে ইন্দ্রজালেরও এত ক্ষমতা লোকে বিশ্বাস করিত না।

কিন্তু অভিব্যক্তিবাদ মানিতে গেলে ধরাধামে ভূস্বর্গপ্রতিষ্ঠা সম্ভবপর বলিয়া আশা হয় না। কারণ, যদিচ বহুযুগ ধরিয়া আমাদের পৃথিবী উন্নতির দিকে অগ্রসর হইয়া চলিতেছে, তথাপি এক সময়ে তাহার শিখরচূড়ায় উত্তীর্ণ হইয়া পুনর্বার তাহাকে নিম্নদিকে যাত্রা আরম্ভ করিতে হইবে। এ কথা কল্পনা করিতে সাহস হয় না যে, মানুষের বুদ্ধি ও শক্তি কোনোকালে কালের গতিকে প্রতিহত করিতে পারিবে।

তাহা ছাড়া, জাগতিক প্রকৃতি আমাদের আজন্ম সঙ্গী, আমাদের জীবনরক্ষার সহায় এবং তাহা লক্ষ লক্ষ বৎসরে কঠিন সাধনায় সিদ্ধ; কেবল কয়েক শতাব্দীর চেষ্টাতেই যে তাহাকে নৈতিক নিগড়ে বদ্ধ করা যাইতে পারিবে, এ আশা মনে পোষণ করা মূঢ়তা। যতদিন জগৎ থাকিবে বোধ করি ততদিনই এই কঠিনপ্রাণ প্রবল শত্রুর সহিত নৈতিক প্রকৃতিকে যুদ্ধ করিতে হইবে।

অপরপক্ষে, মানুষের বুদ্ধি এবং ইচ্ছা একত্র সম্মিলিত ও বিশুদ্ধ বিচারপ্রণালীর দ্বারা চালিত হইয়া জাগতিক অবস্থাকে যে কতদূর অনুকূল করিয়া তুলিতে পারে তাহারও সীমা দেখা যায় না। এবং মানবপ্রকৃতিরও কতদূর পরিবর্তন হইতে পারে তাহা বলা কঠিন। যে-মানুষ নেকড়ে বাঘের জাতভাইকে মেষরক্ষক কুক্কুরে পরিণত করিয়াছে, সে-মানুষ সভ্য মানবের অন্তর্নিহিত বর্বর প্রবৃত্তিগুলিকেও যে বহুলপরিমাণে দমন করিয়া আনিতে পারিবে, এমন আশা করা যায়।

জগতে অমঙ্গল দমন করা সম্বন্ধে আমরা যে পুরাকালের নীতিজ্ঞদের অপেক্ষা অধিকতর আশান্বিত হইয়া উঠিয়াছি সে-আশা সফল করিতে হইলে, দুঃখের হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়াই যে জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য এ মতটা দূর করিতে হইবে।

আর্যজাতির শৈশবাবস্থায় যখন ভালো এবং মন্দ উভয়কেই ক্রীড়াসহচরের ন্যায় গ্রহণ করা যাইত সে-দিন গিয়াছে। তাহার পরে যখন মন্দর হাত হইতে এড়াইবার জন্য গ্রীক এবং হিন্দু রণক্ষেত্র ছাড়িয়া পলায়নোদ্যত হইল সে-দিনও গেল; এখন আমরা সেই বাল্যোচিত অতিশয় আশা এবং অতিশয় নৈরাশ্য পরিহার করিয়া বয়স্ক লোকের ন্যায় আচরণ করিব, কঠিন পণ ও বলিষ্ঠ হৃদয় লইয়া চেষ্টা করিব, সন্ধান করিব, উপার্জন করিব এবং কিছুতে হার মানিব না। ভালো যাহা পাইব তাহাকে একান্ত যত্নে পালন করিব এবং মন্দকে বহন করিয়া অপরাজিত হৃদয়ে তাহাকে বিনাশ করিবার

চেষ্টা করিব ; হয়তো সমুদ্র আমাদিগকে গ্রাস করিবে, হয়তো-বা সুখময় দ্বীপে উত্তীর্ণ হইতে পারিব, কিন্তু সেই অনিশ্চিত পরিণামের পূর্বে এমন অনেক নিশ্চিত কার্য সমাধা হইবে যাহাতে মহত্ত্বগৌরব আছে।

১৩০০

বিদেশীয় অতিথি এবং দেশীয় আতিথ্য

অল্পদিন হইল সুইডেনদেশীয় একটি যুবক বঙ্গদেশে আসিয়া আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি য়ুরোপীয় সঙ্গ দূরে পরিহার করিয়া বাঙালির বাড়িতে বাস করিতেন, বাঙালি ছাত্রদিগকে য়ুরোপীয় ভাষায় শিক্ষা দিতেন, যাহাকিছু পাইতেন তাহাতে বহি কিনিতেন ও সেই বহি ছাত্রদিগকে পড়িতে দিতেন, এবং পথের দরিদ্র বালকদিগকে পয়সা বিতরণ করিতেন।

কোনো য়ুরোপীয়কে অতিথি-আত্মীয়-ভাবে সন্নিকটে পাওয়া আমাদের পক্ষে অত্যন্ত দুর্লভ। ইংরেজ কিছুতেই আপনার রাজগর্ব ভুলিতে পারে না, আমাদের কাছে আসিতে তাহার ইচ্ছাও নাই, তাহার সাধ্যও নাই। সেইজন্য এই সুইডেনবাসীর সঙ্গ আমাদের নিকট সবিশেষ মূল্যবান ছিল।

যে-লোকটির কথা বলিতেছি তিনি আকারে প্রকারে ব্যবহারে নিতান্ত নিরীহের মতো ছিলেন। কোটপ্যান্ট্‌লুনের মধ্যে এত নম্রতা ও নিরীহতা দেখা আমাদের অভ্যাস নাই।

কিন্তু এই সাহেবটি আমাদেরই মতো বিনম্র মৃদুপ্রকৃতির লোক ছিলেন বটে, তথাপি তাঁহার অস্থিমজ্জার মধ্যে য়ুরোপের প্রাণশক্তি নিহিত ছিল। দেখিতে শুনিতে নিতান্ত সহজ লোকের মতো, অথচ লোকটি যে-সে লোক নহে এমন দৃষ্টান্ত আমরা সচরাচর পাই না। আমাদের দিশি ভালো মানুষ মাটির মানুষ, দেবপ্রতিমা, কিন্তু ভিতরে কোনো চরিত্র নাই, বহুল পরিমাণে খড় আছে। যথার্থ চরিত্র-অগ্নি থাকিলে সেই তৃণনির্মিত নির্জীব ভালোমানুষি দগ্ধ হইয়া যায়।

এই কৃশ খর্বকায় শান্তস্বভাব য়ুরোপীয় যুবকটির অন্তরের মধ্যে যে একটি দীপ্তিমান চরিত্র-অগ্নি ঊর্ধ্বশিখা হইয়া জ্বলিতেছিল তাহা তাঁহার প্রথম কার্যেই প্রকাশ পায়। তিনি যে স্বদেশ ছাড়িয়া সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া জন্মভূমি ও আত্মীয়স্বজন হইতে বহুদূরে এই সম্পূর্ণ অপরিচিত পরজাতির মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন এই দুঃসাধ্য কার্যে কে তাঁহাকে প্রবৃত্ত করাইল। কোথায় সেই মেরুতুষারচুম্বিত য়ুরোপের শীর্ষবিলম্বিত সুইডেন

আর কোথায় এই এসিয়ার প্রান্তবর্তী খররৌদ্রক্লান্ত বঙ্গভূমি। পরস্পরের মধ্যে কোনো সভ্যতার সাম্য, কোনো আত্মীয়তার সম্বন্ধ, কোনো ঐতিহাসিক সংযোগ নাই। ভাষা প্রথা অভ্যাস জীবনযাত্রার প্রণালী, সমস্তই স্বতন্ত্র। সমস্ত প্রিয়বন্ধন সমস্ত চিরাভ্যস্ত সংস্কার হইতে কোনো দেশের রাজশাসনও কোনো ব্যক্তিকে এমন সম্পূর্ণরূপে নির্বাসনদণ্ড বিধান করিতে পারে কি না সন্দেহ।

কলিকাতায় বাঙালির নিমন্ত্রণসভায় উৎসবক্ষেত্রে ধর্মসমাজে এই শুভ্রকোর্তাধারী সৌম্য প্রফুল্লমূর্তি শ্বেতাস্য বিদেশীকে একপ্রান্তভাগে অনেকবার দেখিয়াছি। আমাদের মধ্যে প্রবেশলাভ করিবার জন্য যেন তাঁহার একটি বিশেষ আগ্রহ ছিল। অনেক সভাস্থলে আমাদের বক্তৃতার ভাষা আমাদের সংগীতের সুর তাঁহার পক্ষে সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত থাকিলেও তিনি প্রতিনিবৃত্ত হইতেন না; ধৈর্যসহকারে হৃদয়ের অন্তরঙ্গতা-গুণে আমাদের ভাবের মধ্যে যেন স্থানলাভ করিতে চেষ্টা করিতেন। পরজাতির গূঢ় হৃদয়গুহায় প্রবেশ করিবার জন্য যে-নম্রতাগুণের আবশ্যক তাহা তাঁহার বিশেষরূপে ছিল।

ছাত্রশিক্ষার যে-কার্যভার তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা পালন করিতে গিয়া তাঁহাকে অসামান্য কষ্টস্বীকার করিতে হইত। মধ্যাহ্নের রৌদ্রে অনাহারে অনিয়মে কলিকাতার পথে পথে সমস্তদিন পরিভ্রমণ করিয়াছেন, কিছুতেই তাঁহার অশ্রান্ত উদ্যমকে পরাভূত করিতে পারে নাই। রৌদ্রতাপ এবং উপবাস তিনি কিরূপ সহ্য করিতে পারিতেন বর্তমান লেখক একদিন তাহার পরিচয় পাইয়াছিল। বোলপুরের শান্তিনিকেতন আশ্রমে উৎসব-উপলক্ষে গত বৎসর পৌষ মাসে তিনি উপস্থিত ছিলেন। সেখানে গিয়া প্রাতঃকালে এক পেয়ালা চা খাইয়া তিনি ভ্রমণে বাহির হন। বিনা ছাতায় বিনা আহারে সমস্তদিন মাঠে মাঠে ভূতত্ত্ব আলোচনা করিয়া অপরাহ্ণে উৎসবারম্ভকালে ফিরিয়া আসেন— তখন কিছুতেই আহার করিতে সম্মত না হইয়া উৎসবান্তে রাত্রি নয়টার সময় কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া পদব্রজে স্টেশনে গমনপূর্বক সেই রাত্রেই কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন।

একদিন তিনি পদব্রজে ভ্রমণ করিতে বাহির হইয়া একেবারে বারাকপুরে গিয়া উপস্থিত হন। সেখান হইতে পুনর্বার পদব্রজে ফিরিতে রাত্রি দশটা হইয়া যায়। পাছে ভৃত্যদের কষ্ট হয় এইজন্য সেই দীর্ঘ ভ্রমণ দীর্ঘ উপবাসের পর অনাহারেই রাত্রি যাপন করেন। কোনো কোনো দিন রাত্রে তিনি আহারে ঔদাসীন্য প্রকাশ করিলে গৃহস্বামিনী যখন খাইতে পীড়াপীড়ি করিতেন, তিনি বলিতেন, ভোজনে আজ আমার অধিকার ও অভিরুচি নাই— দিনের কার্য আজ আমি ভালো করিয়া সম্পন্ন করিতে

পারি নাই। প্রাতঃকালে আহার করিবার সময় তিনি রুটিখণ্ড গাছের শাখায় এবং ভূতলে রাখিয়া দিতেন, পাখিরা আসিয়া খাইলে পরে তবে তাঁহার আহার সম্পন্ন হইত।

তাঁহার একটি সাধ ছিল আমাদের দেশীয় শিক্ষিত যুবকদের জন্য ভালো লাইব্রেরি এবং আলোচনাসভা স্থাপন করা। এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য রৌদ্রবৃষ্টি অর্থব্যয় এবং শারীরিক কষ্ট তুচ্ছ করিয়া তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া ফিরিয়াছেন। যাঁহারা তাঁহার সহায়তাসাধনে প্রতিশ্রুত ছিলেন তাঁহাদের উৎসাহ অনবরত প্রজ্বলিত রাখিয়াছেন। অবশেষে আয়োজন সম্পূর্ণ হইতে না হইতেই তিনি সাংঘাতিক পীড়ায় আক্রান্ত হইলেন।

শুনা যায় এই লাইব্রেরি-স্থাপন-চেষ্টার জন্য গুরুতর অনিয়ম ও পরিশ্রমই তাঁহার পীড়ার অন্যতম কারণ। মৃত্যুর পূর্বদিনে তিনি আমাদের দেশীয় কোনো সম্ভ্রান্ত মহিলাকে বলিয়াছিলেন, দেশে আমার যে কোনো আত্মীয়স্বজন নাই তাহা নহে, খৃষ্টিয়ান ধর্মবিশ্বাস ত্যাগ করিয়া একেশ্বরবাদ গ্রহণ করাতেই আমি তাঁহাদের পর হইয়াছি। মৃত্যুকাল পর্যন্ত তাঁহার লাইব্রেরির কথা ভুলিতে পারেন নাই। তাঁহার কোনো-একটি ছাত্রের নিকট হইতে তিনি অগ্রিম বেতন লইয়াছিলেন, সেই টাকা তাহাকে ফেরত দিবার জন্য মৃত্যুশয্যায় তাহার বিদেশীয় নাম স্মরণ করিবার অনেক চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য হইয়াছিলেন, সেই তাঁহার শেষ চেষ্টা; এবং সেই ছাত্রকে সন্ধান করিয়া তাহার প্রাপ্য টাকা তাহাকে ফিরাইয়া দিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন, সেই তাঁহার শেষ অনুরোধ।

তিনি যদি এখানে আসিয়া তাঁহার স্বজাতীয়দের আতিথ্য লাভ করিতেন তবে আর কিছু না হউক হয়তো তাঁহার জীবনরক্ষা হইত, কারণ ভারতবর্ষে স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য য়ুরোপীয়ের পক্ষে কী কী নিয়ম পালন করা কর্তব্য সে-অভিজ্ঞতা তিনি স্বজাতীয়ের নিকট হইতে লাভ করিতে পারিতেন। যদি-বা জীবনরক্ষা না হইত তথাপি অন্তত যেরূপ চিকিৎসা যেরূপ আরাম যেরূপ সেবাশুশ্রূষা তাঁহাদের চিরাভ্যস্ত, বিদেশে মৃত্যুকালে সেটুকু হইতে তাঁহাকে বঞ্চিত হইতে হইত না; এবং য়ুরোপীয় ডাক্তারের দ্বারা চিকিৎসিত হইবার জন্য অন্তিমকাল পর্যন্ত তাঁহার যে-আকাঙ্ক্ষা অপরিতৃপ্ত ছিল তাহাও পূর্ণ হইতে পারিত।

সুইডেনবাসী হ্যামারগ্রেন সাহেবের বাংলায় আতিথ্যযাপনের সংক্ষেপ বিবরণ আমরা প্রকাশ করিলাম। তিনি এ দেশে অল্পকাল ছিলেন, এবং যদিও আমাদের প্রতি তাঁহার আন্তরিক প্রেম ও আমাদের হিতসাধনে তাঁহার একান্ত চেষ্টা ছিল

এবং যদিও তাঁহার অকৃত্রিম অমায়িক স্বভাবে তিনি ছাত্রবৃন্দ ও বন্ধুবর্গের হৃদয় আকর্ষণ করিতে পারিয়াছিলেন, তথাপি এমন-কিছু করিয়া যাইতে পারেন নাই যাহাতে সাধারণের নিকট সুপরিচিত হইতে পারেন, সুতরাং এই বিদেশীর বৃত্তান্ত সাধারণের আলোচ্য বিষয় না হইবার কথা। আমরাও সে প্রসঙ্গে বিরত থাকিতাম, কিন্তু আমাদের কোনো কোনো বাংলাসংবাদপত্র তাঁহার অন্ত্যেষ্টিসংকার সম্বন্ধে যেরূপ নিষ্ঠুর আলোচনা উত্থাপন করিয়াছেন তাহাতে ক্ষোভ প্রকাশ না করিয়া থাকা যায় না।

হ্যামারগ্রেন মৃত্যুর পূর্বে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার মৃতদেহ কবরস্থ না করিয়া যেন দাহ করা হয়। তাঁহার সেই অন্তিম ইচ্ছা অনুসারে নিমতলার ঘাটে তাঁহার মৃতদেহ দাহ হইয়াছিল। শাস্ত্রমতে অগ্নি যদিও পাবক এবং কাহাকেও ঘৃণা করেন না, তথাপি হিন্দুর পবিত্র নিমতলায় ম্লেচ্ছদেহ দগ্ধ হয় ইহাতে কোনো কোনো হিন্দুপত্রিকা গাত্রদাহ প্রকাশ করিতেছেন। বলিতেছেন এ পর্যন্ত মৃত্যুর পরে তাঁহারা 'হাড়িডোম' প্রভৃতি অনার্য অন্ত্যজ জাতির সহিত একস্থানে ভস্মীভূত হইতে আপত্তি করেন নাই, কিন্তু যে-শ্মশানে কোনো সুইডেনবাসীর চিতা জ্বলিয়াছে সেখানে যে তাঁহাদের পবিত্র মৃতদেহ পুড়িবে, ইহাতে তাঁহারা ধৈর্য রক্ষা করিতে পারিতেছেন না।

কিছুকাল পূর্বে একসময় ছিল যখন আমাদের স্বদেশপ্রেমিকগণ প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিতেন যে, হিন্দুধর্মে উদারতা বিশ্বপ্রেম নির্বিচার-আতিথ্য অন্য সকল ধর্ম অপেক্ষা অধিক। কিন্তু জানি না কী দুর্দৈবক্রমে সম্প্রতি এমন দুঃসময় পড়িয়াছে যে, আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকেরাও হিন্দুধর্মকে নিষ্ঠুর সংকীর্ণ এবং একান্ত পরবিদ্বেষী বলিয়া স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইতেছেন না।

শ্রুতিতে আছে, অতিথিদেবোভব। কিন্তু কালক্রমে আমাদের লোকাচার এমন অনুদার ও বিকৃত হইয়া আসিয়াছে যে, কোনো বিদেশীয় বিজাতীয় সাধুব্যক্তি যদি আমাদের দেশে উপস্থিত হইয়া প্রীতিপূর্বক আমাদের মধ্যে অবস্থান করিতে ইচ্ছা করেন, তবে কোনো হিন্দুগৃহ তাঁহাকে সমাদরের সহিত অসংকোচে স্থান দেয় না, তাঁহাকে দ্বারস্থ কুক্কুরের ন্যায় মনে মনে দূরস্থ করিতে ইচ্ছা করে; এই অমানুষিক মানবঘৃণাই কি আমাদের পক্ষে অক্ষয় কলঙ্কের কারণ নহে, অবশেষে আমাদের শ্মশানকেও কি আমাদের গৃহের ন্যায় বিদেশীর নিকটে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিব। জীবিত কালে আমাদের গৃহে পরদেশীর স্থান নাই, মৃত্যুর পরে আমাদের শ্মশানেও কি পরদেশীর দগ্ধ হইবার অধিকার থাকিবে না।

যদি আমাদের ধর্মশাস্ত্রে ইহার বিরুদ্ধে কোনো নিষেধ থাকিত তাহা হইলেও

আমাদের ধর্মশাস্ত্রের জন্য লজ্জা অনুভব করিয়া আমরা অগত্যা নীরব থাকিতাম। যখন সেরূপ নিষেধ কিছু নাই তখন ধর্মের নাম করিয়া অধর্মবুদ্ধিকে প্রশ্রয় দিয়া, অকারণে গায়ে পড়িয়া বিদ্বেষবহ্নিকে প্রধূমিত করিয়া হিন্দুসমাজের কী হিতসাধন হইবে বলিতে পারি না।

শ্মশান বৈরাগ্যের মহাক্ষেত্র। সেখানে মতভেদ ধর্মভেদ জাতিভেদ নাই ; সেখানে একদিন ছোটো-বড়ো ধনী-দরিদ্র দেশী-বিদেশী, সকলেই মুষ্টিকয়েক ভস্মাবশেষের মধ্যে সমান পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আমাদের হিন্দুসন্ন্যাসীরা শ্মশানে সমাজবন্ধনবিহীন মহাকালের নিরঞ্জন নির্বিকার অনন্তস্বরূপ উপলব্ধি করিবার জন্য গমন করিয়া থাকেন। সেখানে সেই দেশকালাতীত ধ্যাননিমগ্ন বৈরাগ্যের সমাধিভূমিতেও কি পরজাতিবিদ্বেষ আপন সংবাদপত্রের ক্ষুদ্র জয়ধ্বজা লইয়া ফর্ফর শব্দে আস্ফালন করিতে কুণ্ঠিত হইবে না।

আমাদের দেবতার মধ্যে যম কোনো জাতিকে ঘৃণা করেন না, মহাযোগী মহাদেবেরও সর্বজাতির প্রতি অপক্ষপাতের কথা শুনা যায়। কিন্তু আজ তাঁহাদের লীলাক্ষেত্র বিহারভূমি শ্মশানের প্রান্তদেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রহরীগণ মৃতদেহের জাতিবিচার করিতে বসিয়া গিয়াছেন— সে কি ধর্মের গৌরব বৃদ্ধি করিবার জন্য, না সংকীর্ণ হৃদয়ের ক্ষুদ্র বিদ্বেষবুদ্ধি চরিতার্থ করিবার জন্য।

এই সুইডেনদেশীয় নিরীহ প্রবাসী প্রীতিপূর্বক বিশ্বাসপূর্বক অতি দূরদেশে পরজাতীয়ের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন ; পাছে কোথাও অনধিকারপ্রবেশ হয়, পাছে কাহারও অন্তরে আঘাত লাগে, পাছে অজ্ঞাতসারে কাহারও পীড়ার কারণ হন, এইজন্য সর্বত্র সর্বদাই ত্রস্ত সতর্ক বিনম্রভাবে একপার্শ্বে অবস্থান করিতেন। সেই দয়ালু সহৃদয় মহাশয় ব্যক্তি কাহারও কোনো অপকার করেন নাই, কেবল পরজাতি পরধর্মীর হিতচেষ্টায় আপন জীবনপাত করিয়াছেন মাত্র। সেই অসম্পন্ন চেষ্টার জন্য তাঁহার প্রতি কাহাকেও কৃতজ্ঞ হইতে অনুরোধ করিতেছি না, কিন্তু এই অকালমৃত বিদেশী সাধুর প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ নিষ্ঠুর অবমাননা করিতে কি নিষেধ করাও উচিত নহে।

যদি দৈবক্রমে কোনো বিদেশী আপন আত্মীয়স্বজন হইতে বিচ্যুত হইয়া আমাদের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হয়, তবে হউক না সে পরের সন্তান, হউক না সে বিধর্মী, বঙ্গভূমি কি জননীবাৎসল্যে আপন স্নেহক্রোড়ের এক প্রান্তভাগে তাহাকে স্থান দিতে পারিবে না এবং তাহার অকালমৃত্যুর পরে সকল ঘৃণার অবসানক্ষেত্র শ্মশানভূমির মধ্যেও তাহার প্রতি সুকঠোর ঘৃণা প্রকাশ করিবে? এই নিষ্ঠুর বর্বরতা কি অতিথিবৎসল হিন্দুধর্মের প্রকৃতিগত, না এই পতিত জাতির বুদ্ধিবিকারমাত্র?

এই প্রবাসী যুবক মৃত্যুকালে পবিত্র আর্যভূমির নিকটে কোন্ অসম্ভব প্রার্থনা

করিয়াছিলেন। আমাদের সুপবিত্র সংস্পর্শ, না আমাদের সুদুর্লভ আত্মীয়তা? তিনি ব্রাহ্মণের ঘরের আসন, কুলীনের ঘরের কন্যা, যজমানের ঘরের দক্ষিণা চাহেন নাই; তিনি সুইডেনের উত্তর প্রদেশ হইতে আসিয়া কলিকাতার যে-শ্মশানে 'হাড়িডোম'[১] প্রভৃতি অন্ত্যজ জাতির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া নিষিদ্ধ নহে, সেই শ্মশানপ্রান্তে ভস্মসাৎ হইবার অধিকার চাহিয়াছিলেন মাত্র।

হায় বিদেশী, বঙ্গভূমির প্রতি তোমার কী অন্ধ বিশ্বাস, কী দুঃসহ স্পর্ধা। মনে যত অনুরাগ যত শ্রদ্ধাই থাক্ পুড়িয়া মরিবার এবং মরিয়া পুড়িবার এই মহাশ্মশানক্ষেত্রে জীবনে মরণে তোমাদের কোনো অধিকার নাই।

১৩০১

ব্যাধি ও প্রতিকার

ইংরেজিশিক্ষার প্রথম উচ্ছ্বাসে আমাদের বক্ষ যতটা স্ফীত হইয়া উঠিয়াছিল, এখন আর ততটা নাই, এমন-কি কিছুকাল হইতে নাড়ী স্বাভাবিক অবস্থার চেয়েও যেন দাবিয়া গেছে। জ্বরের মুখে যে-উত্তাপ দেখিতে দেখিতে একশো-চারপাঁচছয়ের দিকে উঠিতেছিল, এখন যেন তাহা আটানব্বইয়ের নীচে নামিয়া চলিয়াছে এবং সমস্তই যেন হিম হইয়া আসিতেছে। এমন অবস্থায় শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের মতো সুযোগ্য ভাবুক ব্যক্তি "সামাজিক ব্যাধি ও তাহার প্রতীকার" সম্বন্ধে যাহা আলোচনা করিবেন তাহা আমাদের ঔৎসুক্যজনক না হইয়া থাকিতে পারে না।

তথাপি আমরা লেখকমহাশয়ের এবং তাঁহার প্রবন্ধের নামের দ্বারা স্বভাবত আকৃষ্ট হইয়াও অতিশয় অধিক প্রত্যাশা করি নাই। কারণ, আমরা নিশ্চয় জানি, সামাজিক ব্যাধির কোনো অভূতপূর্ব পেটেণ্ট ঔষধ কবি বা কবিরাজের কল্পনার অতীত। আসল কথা, ঔষধ চিরপরিচিত, কিন্তু নিকটে তাহার ডাক্তারখানা কোথায় পাওয়া যায়, সেইটে ঠাহর করা শক্ত। কারণ, মানসিক ব্যাধির ঔষধও মানসিক এবং ব্যাধি থাকাতেই সে-ঔষধ দুষ্প্রাপ্য।

তবে এ সম্বন্ধে আলোচনার সময় আসিয়াছে; কেননা আমাদের মধ্যে একটা দ্বিধা জন্মিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রাচীন ভারতবর্ষ এবং আধুনিক সভ্যজগতের চৌমাথার মোড়ে আমরা মাথায় হাত দিয়া বসিয়া আছি।

[১] পাঠকগণ মনে করিবেন না আমরা ঘৃণা প্রকাশ পূর্বক হাড়িডোম প্রভৃতির নামোল্লেখ করিতেছি; আমরা সংবাদপত্রের ভাষা উদ্ধৃত করিতেছি।

কিছু পূর্বে এরূপ আন্তরিক দ্বিধা আমাদের শিক্ষিতসমাজে ছিল না। স্বদেশাভিমানীরা মুখে যিনি যাহাই বলিতেন, আধুনিক সভ্যতার উপর তাঁহাদের অটল বিশ্বাস ছিল। ফরাসীবিদ্রোহী, দাসত্ববারণচেষ্টা এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রত্যুষকালীন ইংরেজি কাব্যসাহিত্য বিলাতি সভ্যতাকে যে ভাবের ফেনায় ফেনিল করিয়া তুলিয়াছিল, তখনও তাহা মরে নাই— সে-সভ্যতা জাতিবর্ণনির্বিচারে সমস্ত মনুষ্যত্বকে বরণ করিতে প্রস্তুত আছে, এমনই একটা আশ্বাসবাণী ঘোষণা করিতেছিল।

আমাদের তাহাতে তাক লাগিয়া গিয়াছিল। আমরা সেই সভ্যতার ঔদার্যের সহিত ভারতবর্ষীয় সংকীর্ণতার তুলনা করিয়া য়ুরোপকে বাহবা দিতেছিলাম।

বিশেষত আমাদের মতো অসহায় পতিতজাতির পক্ষে এই ঔদার্য অত্যন্ত রমণীয়। সেই অতিবদান্য সভ্যতার আশ্রয়ে আমরা নানাবিধ সুলভ সুবিধা ও অনায়াসমহত্ত্বের স্বপ্ন দেখিতে লাগিলাম। মনে আশা হইতে লাগিল, কেবল স্বাধীনতার বুলি আওড়াইয়া আমরা বীরপুরুষ হইব, এবং কলেজ হইতে দলে দলে উপাধিগ্রহণ করিয়াই আমরা সাম্যসৌভ্রাত্রস্বাতন্ত্র্যমন্ত্রদীক্ষিত পাশ্চাত্য সভ্যতার নিকট হইতে স্বাধীনশাসনের দাবি করিব।

চৈতন্য যখন ভক্তিবন্যায় ব্রাহ্মণচণ্ডালের ভেদবাঁধ ভাঙিয়া দিবার কথা বলিলেন তখন যে-হীনবর্ণ সম্প্রদায় উৎফুল্ল হইয়া ছুটিল, তাহারা বৈষ্ণব হইল কিন্তু ব্রাহ্মণ হইল না।

আমরাও সভ্যতার প্রথম ডাক শুনিয়া যখন নাচিয়াছিলাম তখন মনে করিয়াছিলাম, এই পাশ্চাত্যমন্ত্র গ্রহণ করিলেই আর জেতাবিজেতার ভেদ থাকিবে না— কেবল মন্ত্রবলে গৌরে-শ্যামে একাঙ্গ হইয়া যাইবে।

এইজন্যই আমাদের এত বেশি উচ্ছ্বাস হইয়াছিল এবং বায়রণের সুরে সুর বাঁধিয়া এমন উচ্চ সপ্তকে তান লাগাইয়াছিলাম। এমন পতিতপাবন সভ্যতাকে পতিতজাতি যদি মাথায় করিয়া না লইবে, তবে কে লইবে।

কিন্তু আমরা বৈষ্ণব হইলাম, ব্রাহ্মণ হইলাম না। আমাদের যাহাকিছু ছিল ছাড়িতে প্রস্তুত হইলাম, কিন্তু ভেদ সমানই রহিয়া গেল। এখন মনে মনে ধিক্কার জন্মিতেছে; ভাবিতেছি, কিসের জন্য—

ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর,
পর কৈনু আপন, আপন কৈনু পর!

বাঁশি বাজিয়াছিল মধুর, কিন্তু এখন মনে হইতেছে—

যে ঝাড়ের তরল বাঁশি তারি লাগি পাও,
ডালে মূলে উপাড়িয়া সাগরে ভাসাও।

এখন বিলাতি শিক্ষাটাকে ডালেমূলে উপড়াইবার ইচ্ছা হইতেছে। কিন্তু কথা এই যে কেবলমাত্র বাঁশির আওয়াজে যিনি কুলত্যাগ করেন, তাঁহাকে অনুতাপ করিতেই হইবে। মহত্ত্ব ও মনুষ্যত্ব লাভ এত সহজ মনে করাই ভুল। আমরা কথঞ্চিৎ-পরিমাণে ইংরেজের ভাষা শিখিয়াছি বলিয়াই যে ইংরেজ জেতাবিজেতার সমস্ত প্রভেদ ভুলিয়া আমাদিগকে তাহার রাজতক্তায় তুলিয়া লইবে, এ কথা স্বপ্নেও মনে করা অসংগত। জাতীয় মহত্ত্বের দুর্গমশিখরে কণ্টকিত পথ দিয়া উঠিতে হয়; কেমন করিয়া উঠিতে হয়, সে তো আমরা ইংরেজের ইতিহাসেই পড়িয়াছি।

আমি এই কথা বলি যে, ইংরেজ যদি আমাদিগকে সমান বলিয়া একাসনে বসাইত, তাহা হইলে আমাদের অসমানতা আরও অধিক হইত। তাহা হইলে ইংরেজের মহত্ত্বের তুলনায় আমাদের গৌরব আরও কমিয়া যাইত। তাহারা পৌরুষের দ্বারা যে-আসন পাইয়াছে, আমরা প্রশ্রয়ের দ্বারা তাহা পাইয়া যদি সম্পূর্ণ পরিতৃপ্ত থাকিতাম, আমাদের আত্মাভিমান শান্ত হইত, তবে তদ্দ্বারা আমাদের জাতির গভীরতর দারুণতর দুর্গতি হইত।

কিছু আদায় করিতে হইবে এই মন্ত্র ছাড়িয়া, কিছু দিতে হইবে কিছু করিতে হইবে, এই মন্ত্র লইবার সময় হইয়াছে। যতক্ষণ আমরা কিছু না দিতে পারিব, ততক্ষণ আমরা কিছু পাইবার চেষ্টা করিলে এবং সে-চেষ্টায় কৃতকার্য হইলেও তাহা ভিক্ষাবৃত্তিমাত্র — তাহাতে সুখ নাই, সম্মান নাই।

সে-কথাটা আমাদের মনের মধ্যে আছে বলিয়াই আমরা ভিক্ষার সময় কর্ণ ভীষ্ম দ্রোণ গৌতম কপিলের কথা পাড়িয়া থাকি। বলি যে, আমাদের পিতামহ জগতের সভ্যতার অনেক খোরাক জোগাইয়াছিলেন; অতএব ভিক্ষা দে বাবা।

পিতামহদের মহিমা স্মরণ করার খুবই দরকার কিন্তু সে কেবল নিজেকে মহিমা-লাভে উত্তেজিত করিবার জন্য, ভিক্ষার দাবিকে উচ্চ সপ্তকে চড়াইবার জন্য নহে। কিন্তু যে-ব্যক্তি হতভাগা, তাহার সকলই বিপরীত।

যাহাই হোক, পৃথিবীতে আমাদের একটা-কিছু উপযোগিতা দেখাইতে হইবে। দরখাস্ত লিখিবার উপযোগিতা নহে, দরখাস্ত পাইবার। কিছু-একটার জন্য পৃথিবীকে আমাদের দেউড়িতে উমেদারি করিতে হইবে, তবে আমাদের মুখে আস্ফালন শোভা পাইবে।

রাষ্ট্রনীতিতে মহত্ত্বলাভ আমাদের পক্ষে সর্বপ্রকারে অসম্ভব। সেই পথেই আমাদের সমস্ত মনকে যদি রাখি, তবে পথের ভিক্ষুক হইয়াই আমাদের চিরটা-কাল কাটিবে। যে-শক্তির দ্বারা রাষ্ট্রীয় গৌরবের অধিকারী হওয়া যায় সে-শক্তি আমাদের নাই, লাভ

করিবার কোনো আশাও দেখি না। কেবল ইংরেজকে অনুরোধ করিতেছি, তিনি যে-শাখায় দাঁড়াইয়া আছেন, সেই শাখাটাকে অনুগ্রহপূর্বক ছেদন করিতে থাকুন। সেই অনুরোধ ইংরেজ যেদিন পালন করিবে, সেদিনের জন্য অপেক্ষা করিতে হইলে কাল-বিলম্ব হইবার আশঙ্কা আছে।

যেখানে আমাদের অধিকার নাই, সেখানে কখনো কপট করজোড়ে কখনো কপট সিংহনাদে ধাবমান হওয়া বিড়ম্বনা, সে-কথা আমরা ক্রমেই অনুভব করিতেছি। বুঝিতেছি, নিজের চেষ্টার দ্বারা নিজের ক্ষমতা-অনুযায়ী স্থায়ী যাহা-কিছু করিয়া তুলিতে পারিব, তাহাতেই আমাদের নিস্তার। যে-জিনিসটা এ বৎসর একজন কৃপা করিয়া দিবে, পাঁচ বৎসর বাদে আর-একজন গালে চড় মারিয়া কাড়িয়া লইবে, সেটা যতবড়ো জিনিস হোক, আমাদিগকে এক ইঞ্চিও বড়ো করিতে পারিবে না।

কোনো বিষয়ে একটা-কিছু করিয়া তুলিতে যদি চাই তবে উজান স্রোতে সাঁতার দিয়া তাহা পারিব না। কোথায় আমাদের বল, আমাদের প্রকৃতির স্বাভাবিক গতি কোন্‌দিকে, তাহা বাহির করিতে হইবে। তাহা বাহির করিতে হইলেই নিজেকে যথার্থরূপে চিনিয়া লইতে হইবে।

হতাশ ব্যক্তিরা বলেন, চিনিব কেমন করিয়া। বিদেশী শিক্ষায় আমাদের চোখে ধুলা দিতেছে।

ধুলা নহে, তাহা অঞ্জন। বিপরীত সংঘাত ব্যতীত মহত্ত্বশিখা জ্বলিয়া উঠে না। খৃষ্টধর্ম য়ুরোপীয় প্রকৃতির বিপরীত শক্তি। সেই শক্তির দ্বারা মথিত হইয়াই য়ুরোপীয় প্রকৃতির সারভাগ এমন করিয়া দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে।

তেমনই য়ুরোপীয় শিক্ষা ভারতবর্ষীয় প্রকৃতির পক্ষে বিপরীত শক্তি। এই শক্তির দ্বারাই আপনাকে যথার্থরূপে উপলব্ধি করিব এবং ফুটাইয়া তুলিব।

আমাদের শিক্ষিতমণ্ডলীর মধ্যে সেই লক্ষণ দেখা গিয়াছে। অন্তত নিজেকে আদ্যোপান্তভাবে জানিবার জন্য আমাদের একটা ব্যাকুলতা জন্মিয়াছে। প্রথম আবেগে অনেকটা হাতড়াইতে হয়, উদ্যমের অনেকটা বাজেখরচ হইয়া যায়। এখনও আমাদের সেই হাস্যকর অবস্থাটা কাটিয়া যায় নাই।

কিন্তু কাটিয়া যাইবে। পূর্বপশ্চিমের আলোড়ন হইতে আমরা কেবলই যে বিষ পাইব, তাহা নহে; যে-লক্ষ্মী ভারতবর্ষের হৃদয়সমুদ্রতলে অদৃশ্য হইয়া আছেন তিনি একদিন অপূর্বজ্যোতিতে বিশ্বভুবনের বিস্মিত দৃষ্টির সম্মুখে দৃশ্যমান হইয়া উঠিবেন।

নতুবা, যে ভারতে আর্যসভ্যতার সর্বপ্রথম উন্মেষ দেখা দিয়াছিল, সেই ভারতেই সুদীর্ঘকাল পরে আর্যসভ্যতার বর্তমান উত্তরাধিকারিগণ কী করিতে আসিয়াছে।

জাগাইতে আসিয়াছে। প্রাচীন ভারত তপোবনে বসিয়া একদিন এই জাগরণের মন্ত্র পাঠ করিয়াছিল :

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।
ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া
দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।

উঠ, জাগো, যাহা-কিছু শ্রেষ্ঠ তাহাই প্রাপ্ত হইয়া প্রবুদ্ধ হও। কবিরা বলিতেছেন, সেই পথ ক্ষুরধারা শাণিত দুর্গম।

য়ুরোপও আমাদের রুদ্ধহৃদয়ের দ্বারে আঘাত করিয়া সেই মন্ত্রের পুনরুচ্চারণ করিতেছে ; বলিতেছে, যাহা শ্রেষ্ঠ, তাহাই প্রাপ্ত হইয়া প্রবুদ্ধ হও। যাহা শ্রেষ্ঠ, তাহা আর-কেহ ভিক্ষাস্বরূপ দান করিতে পারে না ; আবেদনপত্রপুটে তাহা ধারণ করিতে পারে না, তাহা সন্ধান করিতে হইলে দুর্গম পথেই চলিতে হয়।

সে পথ কোথায়। অরণ্যে সে-পথ আচ্ছন্ন হইয়া গেছে, তবু পিতামহদের পদচিহ্ন এখনও সে-পথ হইতে লুপ্ত হয় নাই।

কিন্তু হায়, পথের চেয়ে সেই পথলোপকারী অরণ্যের প্রতিই আমাদের মমতা। আমাদের প্রাচীন মহত্ত্বের মূলধারাটি কোথায় এবং তাহাকে নষ্ট করিয়াছে কোন্ বিকারগুলিতে, ইহা আমরা বিচার করিয়া স্বতন্ত্র করিয়া দেখিতে পারি না। স্বজাতি-গর্ব মাঝে মাঝে আমাদের উপর ভর করে, তখন যেগুলি আমাদের স্বজাতির গর্বের বিষয় এবং যাহা লজ্জার বিষয়, যাহা সনাতন এবং যাহা অধুনাতন, যাহা স্বজাতির স্বরূপগত এবং যাহা আকস্মিক, ইহার মধ্যে আমরা কোনো ভেদ দেখিতে পাই না। যাহা আমাদের আছে তাহাকেই ভালো বলিয়া, যাহা আমাদের ছিল তাহাকে অবমানিত করি।

এ কথা ভুলিয়া যাই, ভালোর প্রমাণ, সে-ভালোকে যাহারা আশ্রয় করিয়া আছে, তাহারাই। সবই যদি ভালো হইবে তবে আমরা ভ্রষ্ট হইলাম কী করিয়া।

এ কথা মনে রাখিতে হইবে, যে-আদর্শ যথার্থ মহান তাহা কেবল কালবিশেষ বা অবস্থাবিশেষের উপযোগী নহে। তাহাতে মনুষ্যকে মনুষ্যত্ব দান করে, সে-মানুষ সকল কালে সকল অবস্থাতেই আপন শ্রেষ্ঠতা রাখিতে পারে।

আমার দৃঢ়বিশ্বাস, প্রাচীন ভারতে যে-আদর্শ ছিল তাহা ক্ষণভঙ্গুর নহে ; বিলাতে গেলে তাহা নষ্ট হয় না, বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইলে তাহা বিকৃত হয় না, বর্তমান-কালোপযোগী কর্মে নিযুক্ত হইতে গেলে তাহা অনাবশ্যক হইয়া উঠে না। যদি তাহা হইত, তবে সে-আদর্শকে মহান বলিতে পারিতাম না।

সকল সভ্যতারই মূল মহত্ত্বসূত্রটি চিরন্তন এবং তাহার বাহ্য আয়তনটি সাময়িক ; তাহা মূলসূত্রকে অবলম্বন করিয়া কালে কালে পরিবর্তিত হইয়া চলিয়াছে।

য়ুরোপীয় সভ্যতার বাহ্য অবয়বটি যদি আমরা অবলম্বন করি, তবে আমরা ভুল করিব। কারণ, যাহা ইংলণ্ডের ইতিহাসে বাড়িয়াছে, ভারতের ইতিহাসে তাহার স্থান নাই। এই কারণেই বিলাতে গিয়া আমরা ইংরেজের বাহ্য আচারের যে-অনুকরণ করি, এ দেশে তাহা অস্থানিক অসাময়িক বিদ্রূপমাত্র। কিন্তু সেই সভ্যতার চিরন্তন অংশটি যদি আমরা গ্রহণ করি, তবে তাহা সর্বদেশে সর্বকালেই কাজে লাগিবে।

তেমনই ভারতবর্ষীয় প্রাচীন আদর্শের মধ্যেও একটা চিরন্তন এবং একটা সাময়িক অংশ আছে। যেটা সাময়িক সেটা অন্যসময়ে শোভা পায় না। সেইটেকেই যদি প্রধান করিয়া দেখি, তবে বর্তমান কাল ও বর্তমান অবস্থা দ্বারা আমরা পদে পদে বিড়ম্বিত উপহসিত হইব। কিন্তু ভারতবর্ষের চিরন্তন আদর্শটিকে যদি আমরা বরণ করিয়া লই, তবে আমরা ভারতবর্ষীয় থাকিয়াও নিজেদের নানা কাল নানা অবস্থার উপযোগী করিতে পারিব।

এ কথা যিনি বলেন, ভারতবর্ষীয় আদর্শে লোককে কেবলই তপস্বী করে, কেবলই ব্রাহ্মণ করিয়া তুলে, তিনি ভুল বলেন এবং গর্বচ্ছলে মহান আদর্শকে নিন্দা করিয়া থাকেন। ভারতবর্ষ যখন মহান ছিল, তখন সে বিচিত্ররূপে বিচিত্রভাবেই মহান ছিল। তখন সে বীর্যে ঐশ্বর্যে জ্ঞানে এবং ধর্মে মহান ছিল, তখন সে কেবলই মালাজপ করিত না।

তবে ভিন্ন ভিন্ন সভ্যতায় আদর্শের বিভিন্নতা কোন্‌খানে। কে কোন্‌টাকে মুখ্য এবং কোন্‌টাকে গৌণ দেখে তাহা লইয়া। ভালোকে সব সভ্যদেশই ভালো বলে কিন্তু সেই ভালোকে কেমন করিয়া সাজাইতে হইবে, কোন্‌টা আগে বসিবে এবং কোন্‌টা পরে বসিবে সেই রচনার বিভিন্নতা লইয়াই প্রভেদ।

যেমন সকল জীবের কোষ-উপাদান একই-জাতীয় কিন্তু তাহার সংস্থান নানাবিধ, ইহাও সেইরূপ। কিন্তু এই সংস্থানের নিয়মকে অবজ্ঞা করিবার জো নাই। ইহা আমাদের প্রকৃতির বহুকালীন অভ্যাসের দ্বারা গঠিত। আমরা অন্য কাহারও নকল করিয়া এই মূল উপাদানগুলিকে যেমন খুশি তেমন করিয়া সাজাইতে পারি না ; চেষ্টা করিতে গেলে এমন একটা ব্যাপার হইয়া উঠে, যাহা কোনো কর্মের হয় না।

এইজন্য কোনো বিষয়ে সার্থকতালাভ করিতে হইলে আমাদের ভারতবর্ষীয় প্রকৃতিকে উড়াইয়া দিতে পারিব না। তাহাকে অবলম্বন করিয়া তাহারই আনুকূল্যে আমাদিগকে মহত্ত্ব লাভ করিতে হইবে।

কেহ বলিতে পারেন, তবে তো কথাটা সহজ হইল। নিজের প্রকৃতিরক্ষার জন্য চেষ্টার দরকার হয় না তো?

হয়। তাহারও সাধনা আছে। স্বাভাবিক হইবার জন্যও অভ্যাস করিতে হয়। কারণ, যে-লোক দুর্বল, তাহাকে নানাদিকে নানাশক্তি বিক্ষিপ্ত করিয়া তোলে। সে নিজেকে ব্যক্ত না করিয়া পাঁচজনেরই অনুকরণ করিতে থাকে। পাঁচজনের আকর্ষণ হইতে আপনাকে উদ্ধার করিতে হইলে নিজের প্রকৃতিকে সবল সক্ষম করিয়া তুলিতে হয়; সে একদিনের কাজ নহে, বিশেষত বাহিরের শক্তি যখন প্রবল।

কবি প্রথম বয়সে এর ওর নকল করিয়া মরে, অবশেষে প্রতিভার বিকাশে যখন সে নিজের সুরটি ঠিক ধরিতে পারে তখনই সে অমর হয়। তখনই সে স্বকীয় কাব্য-সম্পদে তার নিজেরও লাভ, অন্য সকলেরও লাভ। আমরা যতদিন ইংরেজের নকলে সব কাজ করিতে যাইব, ততদিন এমন-কিছু হইবে না যাহাতে আমাদের সুখ আছে বা ইংরেজের লাভ আছে। যখন নিজের মতো হইব, স্বাভাবিক হইব, তখন ইংরেজের কাছ হইতে যাহা লইব তাহা নূতন করিয়া ইংরেজকে ফিরাইয়া দিতে পারিব।

সে দিন নিঃসন্দেহই আসিবে। আসিবে যে তাহার শুভলক্ষণ এই দেখিতেছি, আমাদের পোলিটিক্যাল আন্দোলনের নেশা অনেকটা ছুটিয়া গেছে; এখন আমরা স্বাধীন চেষ্টায় স্বাধীন সন্ধানে আমাদের ইতিহাসবিজ্ঞানদর্শন আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। আমাদের ধর্ম, আমাদের সমাজের প্রতিও দৃষ্টি পড়িয়াছে।

ত্রিবেদী মহাশয় বলিয়াছেন, অস্বাভাবিকতাই আমাদের ব্যাধি। অর্থাৎ ইংরেজি-শিক্ষাকে আমরা প্রকৃতিগত করিতে পারি নাই, সেই শিক্ষাই আমাদের প্রকৃতিকে আচ্ছন্ন করিতেছে; সেইজন্যই বিলাতি সভ্যতার বাহ্যভাগ লইয়া আছি, তাহার মূল মহত্ত্বকে আয়ত্ত করিতে পারি নাই।

কিন্তু তিনি আর-একটা কথা বলেন নাই। কেবল ইংরেজ-সভ্যতা নহে, আমাদের দেশীয় সভ্যতা সম্বন্ধেও আমরা অস্বাভাবিক। আমরা তাহার বাহ্যিক ক্ষণিক অংশ লইয়া যে-আড়ম্বর করিতেছি তাহা আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক নহে, স্বাভাবিক হইতেই পারে না। কারণ, মনুর সময়ে যাহা সাময়িক আমাদের সময়ে তাহা অসাময়িক, মনুর সময়ে যাহা চিরন্তন, আমাদের সময়েও তাহা চিরন্তন।

এই-যে নিত্যানিত্য-কালাকাল-বিবেক, ইহাই আমাদের হয় নাই। কেবল সেইজন্যই ইংরেজের কাছ হইতে আমরা ভালোরূপ আদায় করিতে পারিতেছি না, ভারতবর্ষের কাছ হইতেও পারিতেছি না।

কিন্তু আমার এ কথার মধ্যে অত্যুক্তি আছে। কালের সমস্ত ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়া

চক্ষে পড়ে না। যে-শক্তি কাজ করিতেছে, তাহা অলক্ষ্যে সমাজ গড়িয়া তোলে বলিয়া তাহাকে প্রতিদিন দেখিতে পাওয়া যায় না। বিশ-পঞ্চাশ বৎসরে ভাগ করিয়া দেখিলে তবেই তাহার কাজের পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা যখন হতাশের আক্ষেপ গাহিতেছি, তখনও সে বিনা-জবাবদিহিতে কাজ করিয়া যাইতেছে। আমরা পর-শিক্ষাবলেই পর-শিক্ষাপাশ হইতে নিজেকে কিরূপে ধীরে ধীরে এক-এক পাক করিয়া মুক্ত করিতেছি তাহা পঞ্চাশ-বৎসর-পরবর্তী বঙ্গদর্শনের সম্পাদক অনেকটা পরিষ্কার করিয়া দেখিতে পাইবেন।

তখনও যে সমস্তটা সম্পাদকের সম্পূর্ণ মনোমতোই হইবে, তাহা নহে; কারণ, সংসারের হতাশের আক্ষেপ অমর,—কিন্তু ত্রিবেদীমহাশয়ের পুস্তিকার সহিত মিলাইয়া সুসময়ের আলোচনা করিলে তিনি অনেকটা পরিমাণে সান্ত্বনা পাইবেন, এ কথা তাঁহার পূর্ববর্তী সম্পাদক জোর করিয়া বলিতে পারেন।

১৩০৮

আলোচনা

'নকলের নাকাল' সম্বন্ধে

'নকলের নাকাল' প্রবন্ধে লেখক সাহেবিয়ানার নকল লইয়া ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছেন।

সমস্ত জাতি ও সমাজের মধ্যে চিরকাল অনুকরণশক্তি কাজ করিয়া আসিতেছে। খ্যাতনামা ইংরেজ লেখক ব্যাজট্ সাহেব তাঁহার 'ফিজিক্স্ এণ্ড পলিটিক্স' গ্রন্থে জাতিনির্মাণ কার্যে এই অনুকরণশক্তির ক্রিয়া বর্ণন করিয়াছেন।

গোড়ায় একটা জাতি কী করিয়া বিশেষ একটা প্রকৃতি লাভ করে, তাহা নির্ণয় করা শক্ত। কিন্তু তাহার পরে কালে কালে তাহার যে পরিবর্তনের ধারা চলিয়া আসে, প্রধানত অনুকরণই তাহার মূল। ইংলণ্ডে রাজ্ঞী অ্যানের রাজত্বকালে ইংরেজ সমাজ সাহিত্য আচার ব্যবহার যেরূপ ছিল, জর্জ-রাজগণের সময় তাহার অনেক পরিবর্তন হইয়াছিল। অথচ জ্ঞানবিজ্ঞানের নূতন প্রসার এমন-কিছু হয় নাই, যাহাতে অবস্থাপরিবর্তনের গুরুতর কারণ কিছু পাওয়া যায়।

ব্যাজট্ সাহেব বলেন, এই-সকল পরিবর্তন তুচ্ছ অনুকরণের দ্বারা সাধিত হয়। একজন কিছু-একটা বদল করে, হঠাৎ কী কারণে সেটা আর-পাঁচজনের লাগিয়া যায়,

অবশেষে সেটা ছড়াইয়া পড়ে। হয়তো সেই বদলটা কোনো কাজের নহে, হয়তো তাহাতে সৌন্দর্যও নাই ; কিন্তু যে-লোক বদল করিয়াছে, তাহার প্রতিপত্তিবশত বা কী কারণবশত সেটা অনুকরণবৃত্তিকে উত্তেজিত করিতে পারে। এইরূপে পরিবর্তনের বৃহৎ কারণ না থাকিলেও, ছোটোখাটো অনুকরণের বিস্তারে কালে কালে জাতির চেহারা বদল হইয়া যায়।

ব্যাজট্‌ সাহেবের এ কথা স্বীকার্য। কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও বলা আবশ্যক যে, যেমন সবল সুস্থ শরীর বহিঃপ্রকৃতির সমস্ত প্রভাব নিজের অনুকূল করিয়া লয়, অস্বাস্থ্যকর যাহা-কিছু অতি শীঘ্র পরিত্যাগ করিতে পারে, তেমনই সবলপ্রকৃতি জাতি স্বভাবতই এমন-কিছুই গ্রহণ করে না বা দীর্ঘকাল রক্ষা করে না, যাহা তাহার জাতীয় প্রকৃতিকে আঘাত করিতে পারে। দুর্বল জাতির পক্ষে ঠিক উলটা। ব্যাধি তাহাকে চট করিয়া চাপিয়া ধরে এবং তাহা সে শীঘ্র ঝাড়িয়া ফেলিতে পারে না। বাহিরের প্রভাব তাহাকে অনেক সময় বিকারের দিকে লইয়া যায়, এইজন্য তাহাকে অতিশয় সাবধানে থাকিতে হয়। সবল লোকের পক্ষে যাহা বলকারক, স্বাস্থ্যজনক, রোগা লোকের পক্ষে তাহাও অনিষ্টকর হইতে পারে।

মোগলরাজত্বের সময়েও কি মুসলমানের অনুকরণ আমাদের দেশে ব্যাপ্ত হয় নাই। নিশ্চয়ই তাহাতে ভালোমন্দ দুইই ঘটিয়াছিল। কিন্তু ইংরেজিয়ানার নকলের সহিত তাহার একটি গুরুতর প্রভেদ ছিল, তাহার আলোচনা আবশ্যক।

মুসলমানরাজত্ব ভারতবর্ষেই প্রতিষ্ঠিত ছিল। বাহিরে তাহার মূল ছিল না। এইজন্য মুসলমান ও হিন্দু সভ্যতা পরস্পর জড়িত হইয়াছিল। পরস্পরের মধ্যে স্বাভাবিক আদানপ্রদানের সহস্র পথ ছিল। এইজন্য মুসলমানের সংস্রবে আমাদের সংগীত সাহিত্য শিল্পকলা বেশভূষা আচারব্যবহার, দুই পক্ষের যোগে নির্মিত হইয়া উঠিতেছিল। উর্দুভাষার ব্যাকরণগত ভিত্তি ভারতবর্ষীয়, তাহার অভিধান বহুল-পরিমাণে পারসিক ও আরবি। আধুনিক হিন্দুসংগীতও এইরূপ। অন্য সমস্ত শিল্পকলা হিন্দু ও মুসলমান কারিকরের রুচি ও নৈপুণ্যে রচিত। চাপকান-জাতীয় সাজ যে মুসলমানের অনুকরণ তাহা নহে, তাহা উর্দুভাষার ন্যায় হিন্দুমুসলমানের মিশ্রিত সাজ ; তাহা ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন আকারে গঠিত হইয়া উঠিয়াছিল।

লেখক লিখিয়াছেন, বিলাতিয়ানার মূল আদর্শ বিলাতে, ভারতবর্ষ হইতে বহুদূরে। সুতরাং এই আদর্শ আমরা অবলম্বন করিলে বরাবর তাহাকে জীবিত রাখিতে পারিব না, মূলের সহিত প্রত্যক্ষ যোগ না থাকাতে, আজ না হউক কাল তাহা বিকৃত হইয়া যাইবে।

বিলাতের যাহা-কিছু সম্পূর্ণ আমাদের করিয়া লইতে পারি, অর্থাৎ যাহাতে করিয়া আমাদের মধ্যে অন্যায় আত্মবিরোধ না ঘটে, চারিদিকের সহিত সামঞ্জস্য নষ্ট না হয়, যাহা আমাদের সহিত মিশ্রিত হইয়া আমাদিগকে পোষণ করিতে পারে, ভারাক্রান্ত বা ব্যাধিগ্রস্ত না করে, তাহাতেই আমাদের বলবৃদ্ধি এবং তাহার বিপরীতে আমাদের আয়ুক্ষয়মাত্র।

সাহেবিয়ানা আমাদের পক্ষে বোঝা। তাহার কাঠখড় অধিকাংশ বিলাত হইতে আনাতেই হয়, তাহার খরচ অতিরিক্ত। তাহা আমাদের সর্বসাধারণের পক্ষে নিতান্ত দুঃসাধ্য। তাহাতে আমাদের নিজের আদর্শ, নিজের আশ্রয় নষ্ট করে, অথচ তৎপরিবর্তে যে-আদর্শ যে-আশ্রয় দেয়, তাহা আমরা সম্পূর্ণভাবে বিশুদ্ধভাবে রক্ষা করিতে পারি না। তীর ছাড়িয়া যে-নৌকায় পা দিই, সে-নৌকার হাল অন্যত্র। মাঝে হইতে স্বেচ্ছাচার-অনাচার প্রবল হইয়া উঠে।

সেইজন্য প্রতিদিন দেখিতেছি, আমাদের দেশী সাহেবিয়ানার মধ্যে কোনো ধ্রুব আদর্শ নাই; ভালোমন্দ শিষ্ট-অশিষ্টের স্থলে সুবিধা-অসুবিধা ইচ্ছা-অনিচ্ছা দখল করিয়া বসিয়াছে। কেহ-বা নিজের সুবিধামতে একরূপ আচরণ করে, কেহ-বা অন্যরূপ; কেহ-বা যেটাকে বিলাতি হিসাবে কর্তব্য বলিয়া জানে, দেশী সমাজের উত্তেজনার অভাবে আলস্যবশত তাহা পালন করে না; কেহ-বা যেটা সকল সমাজের মতেই গর্হিত বলিয়া জানে, স্বাধীন আচারের দোহাই দিয়া স্পর্ধার সহিত তাহা চালাইয়া দেয়। এক দিকে অবিকল অনুকরণ, এক দিকে উচ্ছৃঙ্খল স্বাধীনতা। এক দিকে মানসিক দাসত্ব, অন্য দিকে স্পর্ধিত ঔদ্ধত্য। সর্বপ্রকার আদর্শচ্যুতিই ইহার কারণ।

এই আদর্শচ্যুতি এখনও যদি তেমন কুদৃশ্য হইয়া না উঠে, কালক্রমে তাহা উত্তরোত্তর কদর্য হইতে থাকিবে, সন্দেহ নাই। যাঁহারা ইংরেজের টাটকা সংস্রব হইতে নকল করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যেও যদি ইংরেজি সামাজিক শিষ্টতার বিশুদ্ধ আদর্শ রক্ষিত না হয়, তবে তাঁহাদের উত্তরবংশীয়দের মধ্যে বিকার কিরূপ বিষম হইয়া উঠিবে, তাহা কল্পনা করিতেও লজ্জাবোধ হয়।

ব্যাজট্ বলেন, অনুকরণের প্রভাবে জাতি গঠিত হইতে থাকে, কিন্তু তাহা সংগত অনুকরণে— জাতীয় প্রকৃতির অনুকূল অনুকরণে।

যে-জাতি অসংগত অনুকরণ করে—

ধ্রুবাণি তস্য নশ্যন্তি অধ্রুবং নষ্টমেব চ।

১৩০৮

স্মৃতিরক্ষা

আজকাল আমাদের দেশে বড়োলোকের মৃত্যু হইলে, তাহার স্মৃতিরক্ষার চেষ্টায় সভা করা হইয়া থাকে।[১] এই-সকল সভা যে বারবার ব্যর্থ হইয়া যায়, তাহা আমরা দেখিয়াছি।

যে দেশে কোনো-একটা চেষ্টা ঠিক একটা বিশেষ জায়গায় আসিয়া ঠেকিয়া যায়, আর অগ্রসর হইতে চায় না, সে দেশে সেই চেষ্টাকে অন্য কোনো একটা সহজ পথ দিয়া চালনা করাই আমি সুযুক্তি বলিয়া মনে করি। যেখানে দরজা নাই কেবল দেয়াল আছে, সেখানে ঠেলাঠেলি করিয়া লাভ কী।

আমাদের দেশে মানুষের মূর্তিপূজা প্রচলিত নাই। এই পৌত্তলিকতা আমরা য়ুরোপ হইতে আমদানি করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছি। কিন্তু এখনও কৃতকার্য হইবার কোনো লক্ষণ দেখিতেছি না।

ইজিপ্‌ট্‌ মৃতদেহকে অবিনশ্বর করিবার চেষ্টা করিয়াছে। য়ুরোপ মৃতদেহকে কবরে রাখিয়া যেন তাহা রহিল এই বলিয়া মনকে ভুলাইয়া রাখে। যাহা থাকিবার নহে তাহার সম্বন্ধে মোহ একেবারে নিঃশেষ করিয়া ফেলা আমাদের দেশের অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার একটা লক্ষ্য।

অথচ য়ুরোপে বার্ষিক শ্রাদ্ধ নাই, আমাদের দেশে তাহা আছে। দেহ নাই বলিয়া যে যাঁহাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করিব তিনি নাই এ কথা আমরা স্বীকার করি না। মৃত্যুর পরে আমরা দেহকে সমস্ত ব্যবহার হইতে বর্জন করিয়া অনশ্বর পুরুষকে মানিয়া থাকি।

আমাদের এই প্রকারের স্বভাব ও অভ্যাস হওয়াতে মানুষের মূর্তিস্থাপনায় যথেষ্ট উৎসাহ অনুভব করি না। অথচ আমাদের দেশে মূর্তিরক্ষার পরিবর্তে কীর্তিরক্ষা বলিয়া একটা কথা প্রচলিত আছে। মানুষ মৃত্যুর পরে ইহলোকে মূর্তিরূপে নহে কীর্তিরূপে থাকে, এ কথা আমরা সকলেই বলি। "কীর্তির্যস্য স জীবতি" এ কথার অর্থ এই যে, যাঁহার কীর্তি আছে তাঁহাকে আর মূর্তিরূপে বাঁচিতে হয় না।

কিন্তু কীর্তি মহাপুরুষের নিজের ; পূজাটা তো আমাদের হওয়া উচিত। কেবল পাইব, কিছু দিব না সে তো হইতে পারে না।

তা ছাড়া মহাপুরুষকে স্মরণ করা কেবল যে কর্তব্য, তাহা তো নয়, সেটা যে

---

[১] তুলনীয় 'বারোয়ারি-মঙ্গল', 'ভারতবর্ষ'— রবীন্দ্র-রচনাবলী চতুর্থ খণ্ড, 'শোকসভা'— পরিশিষ্ট, রবীন্দ্র-রচনাবলী নবম খণ্ড।

আমাদের লাভ। স্মরণ যদি না করি, তবে তো তাঁহাকে হারাইব। যত দীর্ঘকাল আমরা মহাত্মাদিগকে পূজা করিব, ততই তাঁহাদের স্মৃতি আমাদের দেশের স্থায়ী ঐশ্বর্যরূপে বর্ধিত হইতে থাকিবে।

বড়োলোককে স্মরণীয় করিবার একটা দেশী উপায় আমাদের এখানে প্রচলিত আছে, শিক্ষিতলোকে সে দিকে বড়ো-একটা দৃষ্টিপাত করেন না। আমাদের দেশে জয়দেবের মূর্তি নাই, কিন্তু জয়দেবের মেলা আছে।

যদি মূর্তি থাকিত, তবে এতদিনে কোন্ জঙ্গলের মধ্যে অথবা কোন্ কালাপাহাড়ের হাতে তাহার কী গতি হইত বলা যায় না। বড়োজোর ভগ্নাবস্থায় ম্যুজিয়মে নীরবে দাঁড়াইয়া পণ্ডিতে পণ্ডিতে ভয়ংকর বিবাদ বাধাইয়া দিত।

মূর্তি মাঠের মধ্যে বা পথের প্রান্তে খাড়া হইয়া থাকে, পথিকের কৌতূহল-উদ্রেক যদি হয় তো সে ক্ষণকাল চাহিয়া দেখে, না হয় তো চলিয়া যায়। কলিকাতা শহরে যে মূর্তিগুলো রহিয়াছে, শহরের অধিকাংশ লোকই তাহার ইতিহাসও জানে না, তাহার দিকে চাহিয়াও দেখে না।

একবার সভা ডাকিয়া চাঁদা সংগ্রহ করিয়া বিলাতের শিল্পীকে দিয়া অনুরূপ হউক বা বিরূপ হউক একটা মূর্তি কোনো জায়গায় দাঁড় করাইয়া দেওয়া গেল, তার পরে ম্যুনিসিপ্যালিটির জিম্মায় সেটা রহিল; ইহা মৃত মহাত্মাকে অত্যন্ত সংক্ষেপে 'থ্যাঙ্কস্' দিয়া বিদায় দেওয়ার মতো কায়দা।

তাঁহার নামে একটা লাইব্রেরি বা একটা বিদ্যালয় গড়িয়া তুলিলেও কিছুদিন পরে নানা কারণে তাহা নষ্ট বা বিকৃত হইয়া যাইতে পারে।

কিন্তু মেলায় যে-স্মৃতি প্রচারিত হয়, তাহা চিরদিন নবীন, চিরদিন সজীব, এক কাল হইতে অন্য কাল পর্যন্ত ধনী-দরিদ্রে পণ্ডিতে-মূর্খে মিলিয়া তাহাকে বহন করিয়া লইয়া যায়। তাহাকে কেহ ভাঙিতে পারে না, ভুলিতে পারে না। তাহার জন্য কাহাকেও চাঁদার খাতা লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে হয় না, সে আপনাকে আপনি অতি সহজে রক্ষা করে।

দেশের শিক্ষিতসমাজ এই কথাটা একটু ভাবিয়া দেখিবেন কি। রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথের স্মৃতিকে বিদেশী উপায়ে খর্ব না করিয়া, ব্যর্থ না করিয়া, কেবল নগরের কয়েকজন শিক্ষিত লোকের মধ্যে বদ্ধ না করিয়া দেশপ্রচলিত সহজ উপায়ে সর্বকালে এবং সর্বসাধারণের মধ্যে ব্যাপ্ত করিবার চেষ্টা করিবেন কি।

১৩১২

শিক্ষার হেরফের প্রবন্ধের অনুবৃত্তি

'শিক্ষার হেরফের' নামক প্রবন্ধ যখন লিখিত হয় তখন মনে করি নাই যে, বর্তমান শিক্ষাপ্রণালী অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের ত্রুটি প্রদর্শনে কাহারও হৃদয়ে আঘাত লাগিবে। বিশেষত উক্ত প্রবন্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সম্মুখেই পঠিত হয়। সেখানে রাজসাহী কলেজের অধ্যক্ষ ও অধ্যাপক অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা কেহ কোনোরূপ ক্ষোভ প্রকাশ করেন নাই; বরং যতদূর জানা গিয়াছিল অনেকেই অনুকূলভাবে লেখকের মতের অনুমোদন করিয়াছিলেন।

অবশেষে উক্ত প্রবন্ধ সাধনায় প্রকাশিত হইলে অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী পাঠক উহা ইংরেজিতে অনুবাদ করিবার জন্য ঔৎসুক্য প্রকাশ করেন এবং কলেজের অনেক পুরাতন ছাত্রের নিকট উহার ঐকমত শুনা যায়। বঙ্কিমবাবু, গুরুদাসবাবু এবং আনন্দমোহন বসু মহাশয় তৎসম্বন্ধে যে-পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাও পাঠকগণ অবগত আছেন।[১]

বিশ্ববিদ্যালয়ের স্মৃতি যাঁহাদের হৃদয়নিকুঞ্জে প্রিয়স্থান অধিকার করিয়াছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বহির্ভুক্ত লোকের মুখে তাহার কোনোরূপ অমর্যাদার কথা শুনিলে তাঁহাদের মধ্যে কাহারও মনক্ষোভ উপস্থিত হইতে পারে সন্দেহ নাই, অতএব বর্তমান আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া আমি আমার পক্ষে দুর্ভাগ্য বিবেচনা করি। কেবল, বিশ্ববিদ্যালয়ের যাঁহারা গৌরবস্থল এমন অনেক মহোদয়ের উৎসাহবাক্যে আমি নিজের লজ্জা নিবারণে সক্ষম হইতেছি।

তর্কের আরম্ভেই যখন মূল কথা ছাড়িয়া আনুষঙ্গিক কথা লইয়া আন্দোলন উপস্থিত হয় এবং প্রতিপক্ষকে সমগ্রভাবে বুঝিবার চেষ্টা না করিয়া তাহার কথাগুলিকে খণ্ড খণ্ড ভাবে আক্রমণ করিবার আয়োজন হয়, তখন সেই নিষ্ফল বাক্‌যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করাই সুবুদ্ধিসংগত। সিঁদুরে মেঘ খুব রক্তবর্ণ হইয়া উঠে কিন্তু বারিবর্ষণ করে না, এরূপ তর্কও সেইমতো রুদ্রমূর্তি ধারণ করে কিন্তু শীতল শান্তিবারি বর্ষণ না করিয়াই বায়ুবেগে উড়িয়া যায়।

ভাষা একে অসম্পূর্ণ, তাহাতে তাহাকে স্বস্থানচ্যুত করিয়া স্বতন্ত্রভাবে দেখিলে তাহার প্রকৃত অর্থ উদ্ধার করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। পাঠকসাধারণেরও পূর্বাপর মিলাইয়া দেখিবার অবসর নাই, সেই কারণে প্রতিবাদমাত্রেই তাঁহাদের চিত্ত বিক্ষিপ্ত

---

[১] দ্রষ্টব্য— গ্রন্থপরিচয়, রবীন্দ্র-রচনাবলীর বর্তমান খণ্ড।

হইবার সম্ভাবনা আছে। সুতরাং 'শিক্ষাসঙ্কট'[১] প্রবন্ধে আমাদের যে-সকল কথার যথার্থ অর্থনির্ণয় হয় নাই তাহার পুনরবতারণ করিতে বাধ্য হইলাম।

উক্ত প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছে :

> আমাদের শিক্ষাপ্রণালী মনকে অত্যাবশ্যক বিষয়ে নিবদ্ধ রাখে এ কথা ভিত্তিহীন। সাধনায় প্রকাশিত প্রবন্ধে পূজনীয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে কেন বর্তমান শিক্ষার ঘাড়ে এই দোষ চাপাইয়াছেন বলিতে পারি না।

দোষ যে কে কাহার ঘাড়ে কেন চাপায় বোঝা শক্ত; অবশেষে অদৃষ্টকেই দোষী করিতে হয়। আমি যে ঠিক পূর্বোক্তভাবে কথা বলিয়াছি এ দোষ আমার ঘাড়েই বা কেন চাপানো হইল তাহা কে বলিতে পারে।

আমি কেবল বলিয়াছিলাম আমাদের দেশে শিশুদের স্বেচ্ছাপাঠ্য গ্রন্থ নাই। ইংরেজের ছেলে কেবল যে ভূগোল এবং জ্যামিতির সূত্র কণ্ঠস্থ করিয়া মরে তাহা নহে, বিবিধ আমোদজনক কৌতুকজনক গল্পের বই, ভ্রমণবৃত্তান্ত, বীরকাহিনী, সুখপাঠ্য বিজ্ঞান ইতিহাস পড়িতে পায়। বিশেষত তাহারা স্বভাষায় শিক্ষালাভ করে বলিয়া পাঠ্য পুস্তকের মধ্যে যতটুকু সাহিত্যরস থাকে তাহা অনায়াসে গ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু আমাদের ছেলেরা কায়ক্লেশে কেবলই শিক্ষণীয় বিষয়ের শুষ্ক অংশটুকু মুখস্থ করিয়া যায়।

এ স্থলে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সম্বন্ধে কোনো কথাই বলি নাই।

মনে আছে আমরা বাল্যকালে কেবলমাত্র বাংলাভাষায় শিক্ষা আরম্ভ করিয়াছিলাম, বিদেশী ভাষার পীড়নমাত্র ছিল না। আমরা পণ্ডিতমহাশয়ের নিকট পাঠ সমাপন করিয়া কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরামদাসের মহাভারত পড়িতে বসিতাম। রামচন্দ্র ও পাণ্ডবদিগের বিপদে কত অশ্রুপাত ও সৌভাগ্যে কী নিরতিশয় আনন্দলাভ করিয়াছি তাহা আজিও ভুলি নাই। কিন্তু আজকাল আমার জ্ঞানে আমি একটি ছেলেকেও ওই দুই গ্রন্থ পড়িতে দেখি নাই। অতি বাল্যকালেই ইংরেজির সহিত মিশাইয়া বাংলা তাহাদের তেমন সুচারুরূপে অভ্যস্ত হয় না এবং অনভ্যস্ত ভাষায় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া গ্রন্থ পাঠ করিতে স্বভাবতই তাহারা বিমুখ হয়, এবং ইংরেজিতেও শিশুবোধ্য বহি পড়া তাহাদের পক্ষে অসাধ্য, অতএব দায়ে পড়িয়া আমাদের ছেলেদের পড়াশুনা কেবলমাত্র কঠিন শুষ্ক অত্যাবশ্যক পাঠ্য পুস্তকেই নিবদ্ধ থাকে; এবং তাহাদের চিন্তাশক্তি ও কল্পনাশক্তি বহুকাল পর্যন্ত খাদ্যাভাবে অপুষ্ট অপরিণত থাকিয়া যায়।

---

[১] শিক্ষাসঙ্কট। শ্রীমোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়। ভারতী। জ্যৈষ্ঠ, ১৭শ ভাগ।

আমি বলিয়াছিলাম ভালো করিয়া ভাবিয়া দেখিলে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে সৌধবুদ্‌বুদ বলিয়া প্রতীয়মান হইবে; লোকপ্রবাহের গভীর তলদেশে তাহার মূল নাই। বলা বাহুল্য, এরূপ কথা তুলনাসাপেক্ষ। যে-সকল কথা কাব্যে পুরাণে প্রচলিত, যে-সকল কথা দেশের আবালবৃদ্ধবনিতার মুখে মুখে সর্বদা প্রবাহিত, যে-সকল কথা সহজে স্বাভাবিক নিয়মে অনুক্ষণ কার্যে পরিণত হইয়া উঠিতেছে, তাহাই জাতীয় জীবনের মূলে গিয়া সঞ্চিত হইতেছে, তাহাই চিরস্থায়ী। অতএব কোনো শিক্ষাকে স্থায়ী করিতে হইলে, গভীর করিতে হইলে, ব্যাপক করিতে হইলে তাহাকে চিরপরিচিত মাতৃভাষায় বিগলিত করিয়া দিতে হয়। যে-ভাষা দেশের সর্বত্র সমীরিত, অন্তঃপুরের অসূর্যম্পশ্য কক্ষেও যাহার নিষেধ নাই, যাহাতে সমস্ত জাতির মানসিক নিশ্বাসপ্রশ্বাস নিষ্পন্ন হইতেছে, শিক্ষাকে সেই ভাষার মধ্যে মিশ্রিত করিলে তবে সে সমস্ত জাতির রক্তকে বিশুদ্ধ করিতে পারে, সমস্ত জাতির জীবনক্রিয়ার সহিত তাহার যোগসাধন হয়। বুদ্ধ সেইজন্য পালিভাষায় ধর্মপ্রচার করিয়াছেন, চৈতন্য বঙ্গভাষায় তাঁহার প্রেমাবেগ সর্বসাধারণের অন্তরে সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছিলেন। অতএব আমি যখন বলিয়াছিলাম, ভাবিয়া দেখিলে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে সৌধবুদ্‌বুদ বলিয়া প্রতীত হইবে তাহার এমন অর্থ নহে যে, বিশ্ববিদ্যালয় কোনো কাজ বা অকাজ করিতেছে না এবং ইংরেজিশিক্ষায় শিক্ষিত লোকদের কোনো উপকার বা অপকার হয় নাই। আমার কথার অর্থ এই ছিল, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের জাতীয় জীবনের অন্তরে মূল প্রতিষ্ঠা করিতে পারে নাই। কাল যদি ইংরেজ দেশ হইতে চলিয়া যায় তবে ওই বড়ো বড়ো সৌধগুলি কোথাও দাঁড়াইবার স্থান পায় না।

ইংরেজিশিক্ষার সুফলের প্রতি সুদৃঢ় বিশ্বাস আছে বলিয়াই যাহাতে সেই শিক্ষা মাতৃভাষা অবলম্বন করিয়া গভীর ও স্থায়ী -রূপে দেশের অন্তরের মধ্যে ব্যাপ্ত হইতে পারে, এই ইচ্ছা যাঁহারা প্রকাশ করিয়াছেন তাঁহাদিগকে উদাহরণের দ্বারা বলা বাহুল্য যে, পূর্বে 'বাসুকির গাত্রকণ্ডু অপনোদনেচ্ছা ভূমিকম্পের হেতু' এইরূপ বিশ্বাস ছিল, এক্ষণে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভূমিকম্পের অন্য কারণ প্রচার করিতেছে। আমাদের অভিপ্রায় এই যে, ভূমিকম্পে কাল্পনিক হেতুনির্ণয়ের মূলচ্ছেদন করিতে হইলে ইংরেজিশিক্ষাকে সহজ স্বাভাবিক ও সাধারণের আয়ত্তগম্য করিতে হইবে, যাহাতে শিশুকাল হইতে তাহার সার গ্রহণ করিতে পারি, যাহাতে বহুব্যয়ে ও সাংঘাতিক চেষ্টায় তাহাকে ক্রয় করিতে না হয়, যাহাতে অন্তঃপুরেও তাহার প্রবেশ সুলভ হয়। নতুবা শিক্ষিত লোকদের মধ্যেও বাসুকির গাত্রকণ্ডু ভূমিকম্পের কারণরূপে ফিরিয়া দেখা দেয় এমন উদাহরণের অভাব নাই।

'ইংরাজিশিক্ষায় কৃতবিদ্য শ্রীযুক্ত লোকেন্দ্রনাথ পালিত' ইংরেজিশিক্ষার ফলাফল সম্বন্ধে যে-কথা[1] বলিয়াছেন 'শিক্ষাসঙ্কট' প্রবন্ধে তাহার উচিত অর্থ গ্রহণ হয় নাই, আমার এই বিশ্বাস। শিক্ষাটা কতদূর হয় বা না-হয়, ইহাই তাঁহার আলোচ্য বিষয় ছিল। তাঁহার সমস্ত প্রবন্ধে কোথাও তিনি বলেন নাই যে, পূর্বাপেক্ষা এক্ষণে লোক ঘুষ অধিক লইতেছে অথবা জাল করিতে অধিকতর পারদর্শিতা লাভ করিয়াছে। তিনি কেবল এই বলিয়াছেন যে, বর্তমান প্রণালীতে ছাত্রেরা কেবল যে ভালো শেখে না তাহা নহে পরন্তু ভুল শেখে। কিন্তু প্রতিবাদক সমস্ত প্রবন্ধের সহিত ভাব না মিলাইয়া একটিমাত্র বিচ্ছিন্ন পদ অবলম্বন করিয়া সবিস্তারে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, পুরাকালে লোকে ঘুষ লইত, জালিয়াতকে আশ্রয় দিত, এবং বাসুকির গাত্রকণ্ডু অপনোদনেচ্ছা ভূমিকম্পের হেতু বলিয়া বিশ্বাস করিত।

লেখক আমার সম্বন্ধে বলিয়াছেন :

> যাঁহার মত এক্ষণে আলোচিত হইল তিনি তো ইংরেজিশিক্ষা নিষ্ফল এইমাত্র বলিয়াই ক্ষান্ত।

—যদি সত্যই আমি এইমাত্র বলিতাম তবে কোথায় গিয়া ক্ষান্ত হইতাম বলা শক্ত; তবে এখনকার ছেলেরা আমাকে ঢিল ছুঁড়িয়া মারিত, এবং বঙ্কিমবাবু, গুরুদাসবাবু ও আনন্দমোহন বসু মহাশয় কখনোই আমার লেখার তিলমাত্র অনুমোদন করিতেন না।

লেখক সর্বশেষে বলিয়াছেন :

> আলোচ্য প্রবন্ধগুলি পড়িয়া আর-একটি ভাব মনে উদয় হয়— সন্দেহ উঠে যে, লেখকগণ হয়তো অনেক সময় ভুলিয়া যান যে, এ দেশে ধান জন্মে আর বিলাতে জন্মায় ওক— এটা ভারতবর্ষ, ইংলণ্ড নয়।

আমরা ঠিক সেই কথাটাই ভুলি না; আমরাই বারংবার বলিতেছি, এ দেশে ধান জন্মে আর বিলাতে জন্মায় ওক। এখানকার দেশী ভাষা বাংলা, ইংরেজি নহে। যদি কর্ষণ করিয়া সম্যক্ ফললাভ করিবার ইচ্ছা হয় তবে বাংলায় করিতে হইবে, নতুবা ঠিক 'কালচার' হইবে না।

আমরা এ কথা স্বপ্নেও ভুলি না যে, এ দেশে ধান জন্মে আর বিলাতে জন্মায় ওক। এইজন্যই আমরা বাংলায় যাহা পাই তাহাকেই বহুমান্য করি; ইংরেজির সহিত তুলনা করিয়া তাহাকে হতাদর করিবার চেষ্টা করি না। এইজন্যই আমরা বাঙালির

---

[1] শিক্ষাপ্রণালী। সাধনা, ১২৯৯ মাঘ।

শিক্ষাসাধনের ভার কতক পরিমাণে বাংলার প্রতিও অর্পণ করিতে ইচ্ছা করি। এইজন্যই আমরা মনে করি, ইংরেজিশিক্ষা বাংলাভাষার মধ্যে যে-পরিমাণে অঙ্কুরিত হইয়া উঠে সেই পরিমাণেই তাহার ফলবান হইবার সম্ভাবনা।

বাংলার শস্য, বাংলার ভাষা, বাংলার সাহিত্যের প্রতি আমাদের কৃপাদৃষ্টি নাই, তাহার প্রতি আমাদের অন্তরের প্রীতি এবং একান্ত বিশ্বাস আছে, এ কথায় যাঁহাদের 'সন্দেহ' হয় তাঁহারা পুনর্বার ধীরভাবে আলোচ্য প্রবন্ধগুলির যথার্থ মর্ম গ্রহণ করিয়া পড়িয়া দেখিবেন। এবং যদি কোথাও দৈবক্রমে কোনো একটি বা দুটি কথায় কোনো ত্রুটি বা কোনো অলংকারদোষ ঘটিয়া থাকে তবে তাহা অনুগ্রহপূর্বক মার্জনা করিবেন; কারণ, আমরা তর্কের ইন্ধন সংগ্রহ করিবার জন্য প্রবন্ধগুলি লিখি নাই, যথার্থই আবশ্যক এবং বেদনা অনুভব করিয়া লিখিয়াছি।

১৩০০

প্রসঙ্গকথা

১

অল্পকাল হইল বাংলাদেশের তৎসাময়িক শাসনকর্তা ম্যাকেঞ্জিসাহেবকে সভাপতির আসনে বসাইয়া মান্যবর শ্রীযুক্ত ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয় তাঁহার স্বপ্রতিষ্ঠিত সায়ান্স অ্যাসোসিয়েশনের দুরবস্থা উপলক্ষে নিজের সম্বন্ধে করুণা, স্বদেশ সম্বন্ধে আক্ষেপ, এবং স্বদেশীয়ের প্রতি আক্রোশ প্রকাশ করিয়াছেন। ব্যাপারটি সম্পূর্ণ শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল।

তাঁহার সমস্ত বক্তৃতার মধ্যে একটা নালিশের সুর ছিল। বাদী ছিলেন তিনি, প্রতিবাদী ছিল তাঁহার অবশিষ্ট স্বজাতিবর্গ এবং জজ ও জুরি ছিল ম্যাকেঞ্জিপ্রমুখ রাজপুরুষগণ। এ বিচারে আমাদের নিরপরাধে খালাস পাইবার আশামাত্র ছিল না।

কবুল করিতেই হইবে, আমাদের অপরাধ অনেক আছে এবং সেজন্য আমরা লজ্জিত— অথবা সুগভীর অজ্ঞতা ও ঔদাসীন্য-বশত লজ্জাবোধও আমাদের নাই। কিন্তু সেই অপরাধখণ্ডনের ভার আমাদের দেশের বড়োলোকদের উপর। মানবসমাজের বিচারালয়ে বাঙালির নাম আসামীশ্রেণী হইতে খারিজ করিয়া লইবার জন্যই তাঁহারা জন্মিয়াছেন, সেই তাঁহাদের জীবনের সার্থকতা। নালিশ করিবার লোক ঢের আছে এবং বাঙালির নামে নালিশ শুনিবার লোকও রাজপুরুষদের মধ্যে যথেষ্ট মিলিবে।

প্রাণীদের মধ্যে মনুষ্যজাতিটা খুব শ্রেষ্ঠজাতি বলিয়া প্রসিদ্ধ; তথাপি ইতিহাসের

আরম্ভভাগ হইতেই দেখা যায় মনুষ্যের উপকার করা সহজ কাজ নহে। যাঁহারা ইহাকে বিপুল চেষ্টা ও সুদীর্ঘ সময় -সাধ্য বলিয়া না জানেন তাঁহারা যেন সাধারণের উপকার করার কাজটায় হঠাৎ হস্তক্ষেপ না করেন। যদি করেন তবে অবশেষে পাঁচ-জনকে ডাকিয়া বিলাপ পরিতাপ ও সাধারণের প্রতি দোষারোপ করিয়া সান্ত্বনা পাইবার প্রয়াস পাইতে হইবে। তাহা দেখিতেও শোভন হয় না, তাহার ফলও নিরুৎসাহজনক, এবং তাহাতে গৌরবহানি ঘটে।

অবশ্য সায়ান্স অ্যাসোসিয়েশনের প্রতি মহেন্দ্রবাবুর অকৃত্রিম অনুরাগ আছে এবং সেই অনুরাগের টানে তিনি অনেক করিয়াছেন। কিন্তু অনেক করিয়াছেন বলিয়া বিলাপ না করিয়া তাঁহাকে যে আরও অনেক করিতে হয় নাই সেজন্য কৃতজ্ঞতা অনুভব করা উচিত ছিল। বিজ্ঞানপ্রচারের উৎসাহে কোনো মহাপুরুষ জেলে গিয়াছেন, কোনো মহাপুরুষকে অগ্নিতে দগ্ধ হইতে হইয়াছে। বড়োলোক হইয়া বড়ো কাজ করিতে গেলে এরূপ অসুবিধা ঘটিয়া থাকে।

মহেন্দ্রবাবুর অপেক্ষা অধিকতর চেষ্টা করিয়া তাঁহা অপেক্ষা অধিকতর নিষ্ফল অনেকে হইয়াছেন। ডাক্তার সরকারকে জিজ্ঞাসা করি, আজ পর্যন্ত সমস্ত বঙ্গদেশে এমন কয়টা অনুষ্ঠান আছে যে নিজের ঘর-দুয়ার ফাঁদিতে পারিয়াছে, বহুব্যয়সাধ্য আসবাব সংগ্রহ করিয়াছে, যাহার স্থায়ী অর্থের সংস্থান হইয়াছে, এবং যাহার সভাপতি দেশের ছোটোলাট বড়োলাট সাহেবকে সম্মুখে বসাইয়া নিজের মহৎ ত্যাগস্বীকার ঘোষণা-পূর্বক অশ্রুপাত করিবার দুর্লভ অবসর পাইয়াছে। যতটা হইয়াছে বাঙালি তাহার জন্য ডাক্তার সরকারের নিকট কৃতজ্ঞ, কিন্তু সেজন্য তিনিও বাঙালির নিকট কতকটা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতে পারিতেন।

বড়োলোকেরা বড়ো কাজ করিয়া থাকেন কিন্তু তাঁহারা আলাদিনের প্রদীপ লইয়া জন্মগ্রহণ করেন না। কাজেই তাঁহারা রাতারাতি অসাধ্য সাধন করিতে পারেন না। আমাদের দুর্ভাগ্য দেশে উচ্চপদস্থ রাজপুরুষদের নাম ছোটোখাটো আলাদিনের প্রদীপবিশেষ। সেই প্রদীপের সাহায্যে এবং ডাক্তার সরকারের নিজের নাম ও চেষ্টার জোরে এই বিজ্ঞানচর্চাবিহীন বঙ্গদেশে অকস্মাৎ পাকা ভিত এবং যন্ত্রতন্ত্রসহ এক সায়ান্স অ্যাসোসিয়েশন উঠিয়া পড়িল। ইহাকে একপ্রকার ভেলকি বলা যাইতে পারে।

কিন্তু বাস্তবজগতে আরব্য উপন্যাস অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারে না। ভেলকির জোরে জনসাধারণের মনে বিজ্ঞানের প্রতি অনুরাগ সঞ্চার করা সম্ভব নহে। আজ প্রায় সিকি শতাব্দীকাল বাংলাদেশে বিজ্ঞানের জন্য একখানা পাকাবাড়ি, কতকগুলি

আসবাব এবং কিঞ্চিৎ অর্থ আছে বলিয়াই যে বিজ্ঞান আপনা-আপনি গোকুলে বাড়িয়া উঠিতে থাকিবে এমন কোনো কথা নাই। আরও আসবাব এবং আরও টাকা থাকিলেই যে বিজ্ঞান আরও ফুলিয়া উঠিবে এমনও কোনো বৈজ্ঞানিক নিয়ম দেখা যায় না।

অবশ্য, দেশ কাল পাত্র সমস্তই ষোলো আনা অনুকূল যদি হয় তবে তাহার মতো সুখের বিষয় আর-কিছুই হইতে পারে না। কিন্তু সর্বত্রই প্রায় কোনো-না-কোনোটা সম্বন্ধে টানাটানি থাকেই; আমাদের এ দরিদ্র দেশে তো আগাগোড়াই টানাটানি। অন্তত বিজ্ঞান সম্বন্ধে আমাদের যেমন দেশ, তেমনই কাল, তেমনই পাত্র! এখানে সায়ান্স অ্যাসোসিয়েশন নামক একটা কল জুড়িয়া দিলেই যে বিজ্ঞান একদমে বাঁশি বাজাইয়া রেলগাড়ির মতো ছুটিতে থাকিবে, অত্যন্ত অন্ধ অনুরাগও এরূপ দুরাশা পোষণ করিতে পারে না। গাড়ি চলে না বলিয়া দেশাধিপতির নিকট দেশের নামে নালিশ রুজু না করিয়া আপাতত রাস্তা বানাইতে শুরু করা কর্তব্য।

রাস্তা বানাইতে গেলে নামিয়া আসিয়া একেবারে মাটিতে হাত লাগাইতে হয়। আমাদের দেশের বড়োলোকদের নিকটে সে-প্রস্তাব করিতে সংকোচ বোধ করি, কিন্তু অগত্যা না করিয়া থাকা যায় না। বিজ্ঞান যাহাতে দেশের সর্বসাধারণের নিকট সুগম হয় সে-উপায় অবলম্বন করিতে হইলে একেবারে মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চার গোড়াপত্তন করিয়া দিতে হয়। সায়ান্স অ্যাসোসিয়েশন যদি গত পঁচিশ বৎসর এই কার্যে যত্নশীল হইতেন তবে যে-ফললাভ করিতেন তাহা রাজপুরুষবর্গের সমুচ্চ প্রাসাদ-বাতায়ন হইতে দৃষ্টিগোচর না হইলেও আমাদের এই বিজ্ঞানদীন দেশের পক্ষে অত্যন্ত মহার্ঘ হইত।

নালিশ এই যে, বিজ্ঞানসভা দেশের জনসাধারণের নিকট হইতে উপযুক্তমতো খোরাকি এবং আদর পায় না। কেমন করিয়া পাইবে। যাহারা বিজ্ঞানের মর্যাদা বোঝে না তাহারা বিজ্ঞানের জন্য টাকা দিবে, এমন অলৌকিক সম্ভাবনার পথ চাহিয়া বসিয়া থাকা নিষ্ফল। আপাতত মাতৃভাষার সাহায্যে সমস্ত বাংলাদেশকে বিজ্ঞানচর্চায় দীক্ষিত করা আবশ্যক, তাহা হইলেই বিজ্ঞানসভা সার্থক হইবে এবং সফলতা মৃগতৃষ্ণিকার ন্যায় দিগন্তে বিলীন হইবে না।

পূর্বকালে ভারতবর্ষে কেবল ব্রাহ্মণদের জ্ঞানানুশীলনের অধিকার ছিল। ব্রহ্মণ্যের উচ্চ আদর্শ সেই কারণেই ক্রমে ম্লান এবং বিকৃত হইয়া যায়। ক্রমে কর্ম নিরর্থক, ধর্ম পুঁথিগত, এবং পুঁথিও মুখস্থবিদ্যায় পরিণত হইয়া আসিতেছিল। ইহার কারণ, নিম্নের মাধ্যাকর্ষণশক্তি অত্যন্ত প্রবল। যেখানে চতুর্দিক অনুন্নত সেখানে সংকীর্ণ উন্নতিকে দীর্ঘকাল রক্ষা করা দুঃসাধ্য। অদ্য ব্রাহ্মণ নামমাত্র ব্রাহ্মণ, তাহার তিন

দিনের উপনয়ন ব্রহ্মচর্যের বিদ্রূপমাত্র, তাহার মন্ত্রার্থজ্ঞানহীন সংস্কার বর্বরতা। তাহার কারণ, অশিক্ষিত বিপুলবিস্তৃত শূদ্রসম্প্রদায় আপন দূরব্যাপী প্রকাণ্ড মূঢ়তার গুরুভারে ধীরে ধীরে ক্রমে ক্রমে ব্রাহ্মণ্যের উচ্চশিরকে ধূলিসাৎ করিয়া জয়ী হইয়াছে।

অদ্য ইংরেজিশিক্ষিতগণ কিয়ৎপরিমাণে সেই ব্রাহ্মণদের স্থান অধিকার করিয়াছেন। সাধারণের কাছে ইংরেজিভাষা বেদের মন্ত্র অপেক্ষা সরল নহে। এবং অধিকাংশ জ্ঞানবিজ্ঞান ইংরেজিভাষার কড়া পাহারার মধ্যে আবদ্ধ।

তাহার ফল এই, বিদ্যালয়ে আমরা যাহা লাভ করি সমাজে তাহার কোনো চর্চা নাই। সুতরাং আমাদের বিদ্যা আমাদের প্রাণের সহিত রক্তের সহিত মিশ্রিত হয় না। বিদ্যার প্রধান গৌরব দাঁড়াইয়াছে অর্থোপার্জনের উপায়রূপে।

সায়ান্স অ্যাসোসিয়েশন সেই স্বল্পসংখ্যক আধুনিক ব্রাহ্মণস্থানীয়দের জন্য আপন শক্তি নিয়োগ করিয়াছে। যে-কয়জনা ইংরেজিতে বিজ্ঞান শেখে সভা তাহাদের নিকট ইংরেজিভাষায় বিজ্ঞান ব্যাখ্যা করে; বাকি সমস্ত বাঙালির সহিত তাহার কিছুমাত্র সংস্রব নাই। অথচ সায়ান্স অ্যাসোসিয়েশনের জন্য বাঙালি বিশেষ উদ্যোগী হইতেছে না, এ আক্ষেপ তাহার উত্তরোত্তর প্রবল হইয়া উঠিতেছে।

বিজ্ঞানচর্চার দ্বারা জিজ্ঞাসাবৃত্তির উদ্রেক, পরীক্ষণশক্তির সূক্ষ্মতা এবং চিন্তনক্রিয়ার যাথাতথ্য জন্মে এবং সেইসঙ্গে সর্বপ্রকার ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত ও অন্ধ সংস্কার সূর্যোদয়ে কুয়াশার মতো দেখিতে দেখিতে দূর হইয়া যায়। কিন্তু আমরা বারংবার দেখিয়াছি আমাদের দেশের ইংরেজিশিক্ষিত বিজ্ঞানঘেঁষা ছাত্রেরাও কালক্রমে তাঁহাদের সমস্ত বৈজ্ঞানিক কায়দা ঢিলা দিয়া অযৌক্তিক সংস্কারের হস্তে আত্মসমর্পণপূর্বক বিশ্রামলাভ করেন। যেমন পাথুরে জমির উপর আধহাতখানেক পুষ্করিণীর পাঁক তুলিয়া দিয়া তাহাতে বৃক্ষ রোপণ করিলে গাছটা প্রথম প্রথম খুব ঝাড়িয়া মাথা তুলিয়া ডালেপালায় গজাইয়া উঠে, অবশেষে শিকড় যেমনি নীচের কঠিন স্তরে গিয়া ঠেকে অমনি অকস্মাৎ মুষড়িয়া মরিয়া যায়— আমাদের দেশের বিজ্ঞানশিক্ষারও সেই অবস্থা।

ঘরে বাইরে চারিদিকে বিজ্ঞানের আলোককে সাধারণভাবে পরিব্যাপ্ত করিয়া দিলে তবেই বিশেষভাবে বিজ্ঞানের চর্চা এ দেশে স্থায়ীরূপে বর্ধিত হইতে পারিবে। নতুবা আপাতত দুইদিনের উন্নতি দেখিয়া অত্যন্ত উৎফুল্ল হইবার কারণ নাই— কেননা, চারিদিকের দিগন্তপ্রসারিত মূঢ়তা দিনে নিশীথে অলক্ষ্যভাবে আকর্ষণ করিয়া সংকীর্ণমূল উচ্চতাকে আপনার সহিত সমভূম করিয়া আনিবে। ভারতবর্ষীয় প্রাচীন জ্ঞানবিজ্ঞানের অধোগতির প্রধান কারণ এই ভিত্তির সংকীর্ণতা, ব্যাপ্তির অভাব, একাংশের সহিত অপরাংশের গুরুতর অসাম্য।

অথচ বাংলাভাষায় ইংরেজি-অনভিজ্ঞদের কাছে বিজ্ঞানপ্রচারের কোনো উপায় এ দেশে নাই। ইহা ব্যয়সাধ্য, চেষ্টাসাধ্য, ইহাতে আশু ফললাভের আশাও নাই— কোনো ব্যক্তিবিশেষের একান্ত উৎসাহ রক্ষার উপযোগী কোনো উত্তেজনা ইহাতে দেখা যায় না। ইহাতে অর্থনাশ ছাড়া অর্থাগমেরও সম্ভাবনা অল্প। বাংলাভাষায় বৈজ্ঞানিক পরিভাষা রচনা করাও অনেক চিন্তা ও চেষ্টার কাজ— বিজ্ঞানের যাথাতথ্য রক্ষাপূর্বক তাহাকে জনসাধারণের বুদ্ধিগম্য করিয়া সরলভাষায় প্রকাশ করাও শক্ত।

অতএব যেমন করিয়াই দেখি সায়ান্স অ্যাসোসিয়েশনের ন্যায় সামর্থ্যশালী বিশেষ সভার দ্বারাই এই কার্য সম্ভবপর বোধ হয়। ইংরেজিতে বিজ্ঞান শিখাইবার জন্য অনেক ইস্কুল কলেজ আছে, তাহার গ্রন্থ ও আচার্যের অভাব নাই। এমন-কি, যাঁহারা ইংরেজিতে বিজ্ঞানশিক্ষা সমাধা করিতে চান তাঁহারা বিলাতে গিয়াও কৃতিত্ব লাভ করিতে পারেন। ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বসু এবং প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। কিন্তু নানা কারণে ইংরেজিশিক্ষায় বঞ্চিত আমাদের অধিকাংশ, আমাদের সর্বসাধারণ, আমাদের প্রকৃত দেশ সায়ান্স অ্যাসোসিয়েশনের দ্বারাও উপেক্ষিত; অথচ এমনই দৈব বিড়ম্বনা, সায়ান্স অ্যাসোসিয়েশন সেই দেশের নামে অবহেলার অভিযোগ আনিয়াছেন।

বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ বাংলার বৈজ্ঞানিক পরিভাষাসংকলনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের উদ্দেশ্য নানা শাখায় বিভক্ত হওয়ায় কার্য যথোচিতরূপে অগ্রসর হইতেছে না। এই কার্যে সাহিত্যপরিষদের সহিত সায়ান্স অ্যাসোসিয়েশনের যোগ দেওয়া কর্তব্য। বাংলায় বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ প্রচার, সাময়িক পত্র প্রকাশ, স্থানে স্থানে যথানিয়মে বক্তৃতা দিবার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। নিজের উপযোগিতা উপকারিতা সর্বতোভাবে প্রমাণ করা আবশ্যক। তবেই দেশের সহিত সভার দান-প্রতিদানের সম্বন্ধ স্থাপিত হইবে, কেবলমাত্র বিলাপের দ্বারা তাহা হইতে পারে না। এমন-কি, রাজ-প্রতিনিধির মধ্যস্থতা দ্বারাও বেশিকিছু হইবে না। রাজা সায়ান্স অ্যাসোসিয়েশনের অর্থাগমের সুযোগ করিয়া দিতে পারেন, কিন্তু তাহাকে সফল করিতে পারেন না।

যাহাই হোক, সায়ান্স অ্যাসোসিয়েশন যদি যথার্থ পথে কাজ করিতে অগ্রসর হন তবে তাঁহার ভর্ৎসনা সহিতে আমরা প্রস্তুত আছি; কিন্তু কাজও করিবেন না, চোখও রাঙাইবেন, দেশকে দূরে রাখিবেন অথচ সাহেবকে ডাকিয়া দেশের নামে নালিশ করিবেন, ইহার অপরূপ সৌন্দর্যটুকু আমরা দেখিতে পাই না।[১]

১৩০৫

---

[১] তুলনীয় "বিজ্ঞান সভা"—পরিশিষ্ট, রবীন্দ্র-রচনাবলী, বর্তমান খণ্ড।

২

বর্তমানসংখ্যক 'ভারতী'তে 'ঐতিহাসিক যৎকিঞ্চিৎ' নামক ক্ষুদ্র প্রবন্ধটি যিনি লিখিয়াছেন, তিনি আধুনিক বাঙালি ইতিহাস-লেখকগণের শীর্ষস্থানীয়।[1] তাঁহার প্রস্তাবটির প্রতি পাঠকগণ মনোযোগ করিবেন।

ইতিহাসের সত্য মিথ্যা নির্ণয় করা বড়ো কঠিন। কথা সজীব পদার্থের মতো বাড়িয়া চলে; মুখে মুখে কালে কালে তাহার পরিবর্তন ঘটিতে থাকে। সৃজনশক্তি মানুষের মনের স্বাভাবিক শক্তি— যে-কোনো ঘটনা, যে-কোনো কথা তাহার হস্তগত হয় তাহাকে সে অবিকৃত রাখিতে পারে না, কতকটা নিজের ছাঁচে ঢালিয়া তাহাকে গড়িয়া লয়। এইজন্য আমরা প্রত্যহই একটি ঘটনার নানা পাঠান্তর নানা লোকের নিকট পাইয়া থাকি।

কেহ কেহ এইরূপ প্রাত্যহিক ঘটনার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া ইতিহাসের সত্যতা সম্বন্ধে আগাগোড়া সন্দেহ প্রকাশ করেন। কিন্তু একটি কথা তাঁহারা ভুলিয়া যান, ঐতিহাসিক ঘটনার জনশ্রুতি বহুতর লোকের মন হইতে প্রতিফলিত হইয়া আসে এবং সেই ঘটনার বিবরণে সাময়িক লোকের মনের ছাপ পড়িয়া যায়। তাহা হইতে ঘটনার বিশুদ্ধ সত্যতা আমরা না পাইতেও পারি কিন্তু তৎসাময়িক অনেক লোকের মনে তাহা কিরূপ প্রতিভাত হইয়াছিল সেটা পাওয়া যাইতে পারে।

অতীত সময়ের অবস্থা কেবল ঘটনার দ্বারা নির্ণয় হয় না, লোকের কাছে তাহা কিরূপ ঠেকিয়াছিল সেও একটা প্রধান দ্রষ্টব্য বিষয়। অতএব ঐতিহাসিক ঘটনার জনশ্রুতিতে বাস্তব ঘটনার সহিত মানবমন মিশ্রিত হইয়া যে-পদার্থ উদ্ভূত হয় তাহাই ঐতিহাসিক সত্য। সেই সত্যের বিবরণই মানবের নিকট চিরন্তন কৌতুকাবহ এবং শিক্ষার বিষয়।

এই বিচিত্র জনশ্রুতি এবং জীর্ণ-উপকরণমূলক ইতিহাসে এমন অনেকটা অংশই থাকে যাহার প্রমাণ অপ্রমাণ ঐতিহাসিকের ব্যক্তিগত প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। দুই সাক্ষীর মধ্যে কোন্ সাক্ষীকে বিশ্বাস করিব তাহা অনেক সময়ে কেবলমাত্র বিচারকের স্বভাব ও পূর্বসংস্কারের দ্বারা স্থিরীকৃত হয়। ইংরেজ মিথ্যা বলে না, ইংরেজ জজ ইহা কতকটা স্বভাবত এবং কতকটা টানিয়াও বিশ্বাস করেন; এই প্রবৃত্তি ও বিশ্বাস -বশত তাঁহারা অন্যদেশীয়দের প্রতি অনেক সময়ে অবিচার করিয়া থাকেন, তাহা ইংরেজ ব্যতীত আর-সকলেই অনুভব করিতে পারেন।

---

[1] অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়

ইতিহাসে এইপ্রকার ব্যক্তিগত সংস্কারের লীলা যখন অবশ্যম্ভাবী, তখন এই কথা সহজেই মনে উদয় হয়, আমরা ক্রমাগত বিদেশীয় ঐতিহাসিকের বিজাতীয় সংস্কারের দ্বারা গঠিত ইতিহাসপাঠের পীড়ন কেন সহ্য করিব। আমরা যে-ইতিহাস সংকলন করিব, তাহাও যে বিশুদ্ধ সত্য হইবে এ আশা করি না; কিন্তু ইতিহাসের যে-অংশ প্রমাণ অপেক্ষা ঐতিহাসিকের মানসিক প্রকৃতির উপর বেশি নির্ভর করে, সে-অংশে আমাদের স্বজাতীয় প্রকৃতির সৃজনকর্তৃত্ব আমরা দেখিতে চাই।

তাহা ছাড়া ইতিহাস একতরফা না হইয়া দুইতরফা হইলে সত্যনির্ণয় সহজ হয়। বিদেশী ঐতিহাসিক এক ভাবে সাক্ষী সাজাইবেন এবং স্বদেশী ঐতিহাসিক অন্য ভাবে সাক্ষী সাজাইবেন, তাহাতে নিরপেক্ষ তৃতীয় পক্ষের কাজের সুবিধা হয়।

যাহা হউক, বিদেশীলিখিত ভারতবর্ষের ইতিহাসকে বিনা প্রশ্নে বিনা বিচারে গ্রহণ ও মুখস্থ করিয়া, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ফার্স্ট প্রাইজ পাওয়া আমাদের গৌরবের বিষয় হইতেছে না। কোনো ইতিহাসই কোনোকালে প্রশ্ন ও বিচারের অতীত হইতে পারে না। য়ুরোপীয় ইতিহাসেও ভুরি ভুরি চিরপ্রচলিত দৃঢ়নিবদ্ধ বিশ্বাস নব নব সমালোচনার দ্বারা তিরস্কৃত হইতেছে। আমাদের দেশীয় ইতিহাস হইতে মিথ্যা বাছিতে গেলে তাহার উজাড় হইবার সম্ভাবনা আশঙ্কা করি।

লেখকমহাশয় আমাদের দেশীয় ইতিহাস সমালোচন ও সংকলনের জন্য একটি ঐতিহাসিক সভা স্থাপনের প্রস্তাব করিয়াছেন।

আমাদের দেশে সভাস্থাপনের প্রতি আমাদের বড়ো-একটা বিশ্বাস নাই। লেখকমহাশয় তাঁহার প্রবন্ধে আমাদের দেশের মাটিতে শিব গড়িতে গিয়া কিরূপ লজ্জা পাইতে হয়, তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। সভা নামক বড়ো শিব গড়িতে গিয়া আরও কি বড়ো প্রহসনের সম্ভাবনা নাই।

যে দেশে কোনো-একটি বিশেষ বিষয়ে অনেকগুলি লেখকের সুদৃঢ় উৎসাহ আছে, সেই দেশে উৎসাহী লোকেরা একত্র হইয়া বৃহৎ কার্য সম্পন্ন করিতে পারেন। যে দেশে উৎসাহী লোক স্বল্প সে দেশে সভা করিতে গেলে ঠিক বিপরীত ফল ফলিবার সম্ভাবনা। কারণ, সে সভায় অধিকাংশ বাজে লোক জুটিয়া উৎসাহী লোকের উদ্যম খর্ব করিয়া দেয় মাত্র।

আমরা লেখকমহাশয় ও তাঁহার দুই চারিজন সহযোগীর স্বতন্ত্র চেষ্টার প্রতিই লক্ষ করিয়া আছি। তাঁহারা নিজেদের উৎসাহের উদ্যমে ভুলিয়া যাইতেছেন যে, দেশের লোকের অধিকাংশের মনে এ-সকল বিষয়ে অকৃত্রিম অনুরাগ নাই। অতএব তাঁহারা প্রথমে নিজের রচনা ও দৃষ্টান্তদ্বারা দেশে ইতিহাসানুরাগ বিস্তার করিয়া দিলে যথাসময়ে সভাস্থাপনের সময় হইবে।

সমবেত চেষ্টার জন্য উৎসাহী অনুরাগী লোকমাত্রেরই মন কাঁদে। মানুষ কাজ করিবার যন্ত্র নহে— অন্য পাঁচজন মানুষের সহিত মিশিয়া পাঁচজনের সহানুভূতি, সমাদর, ও উৎসাহ -দ্বারা বললাভ প্রাণলাভ করিতে হয়; জনহীন শূন্য সভায় একা দাঁড়াইয়া কেবলমাত্র কর্তব্য করিয়া যাওয়া বড়ো কঠিন। কিন্তু বাংলাদেশে যাঁহারা কোনো মহৎ কার্যের ভার লইবেন, লোকসঙ্গ লোকসাহায্যের সুখ তাঁহাদের অদৃষ্টে নাই।

বিনা আড়ম্বরে বিনা ঘোষণায় 'ঐতিহাসিক চিত্রাবলী' নামক যে কয়েকটি মূল্যবান ইতিহাসগ্রন্থ বাংলায় বাহির হইতে আরম্ভ হইয়াছে তাহাই আমাদের বিপুল আশার কারণ। যাঁহারা "সিরাজদ্দৌলা" গ্রন্থখানি পাঠ করিয়াছেন তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন, সভার দ্বারা তেমন কাজ হয় না প্রতিভার দ্বারা যেমন হয়।

১৩০৫

প্রাইমারি শিক্ষা

বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যপুস্তকে বাংলার উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম বিভাগ-অনুসারে চার রকমের গ্রাম্য উপভাষা চালাইবার প্রস্তাব হইয়াছে এ কথা সকলেই জানেন।[১]

এ সম্বন্ধে যাহাকিছু বলিবার, কাগজে পত্রে তাহা নানা প্রকারে বলা হইয়া গেছে; কিন্তু দেশের উৎকণ্ঠা ঘুচিতেছে না। আমাদের পক্ষে যুক্তি আছে বলিয়া যে জয়ও আমাদের দিকে, তাহা আশা করা কঠিন।

আমরা দেখিয়াছি গবর্মেণ্টের কোনো প্রস্তাবে আমরা সকলে মিলিয়া অত্যন্ত বেশি আপত্তি করিলে প্রস্তাবটা প্রত্যাখ্যান করিতে গবর্মেণ্ট যেন আরও বেশি নারাজ হন।

ইহার অনেকগুলা কারণ আছে। প্রথমত আমরা যেটাকে অনিষ্ট বলিয়া মনে করি, সরকারের শাসননীতির পক্ষে যে-কোনো কারণে সেইটেই যদি ইষ্ট হয়, তবে আমাদের তরফের সমস্ত যুক্তিগুলা তাঁহাদের সংকল্পকেই সবল করিবে।

দ্বিতীয়ত, সরকারের ভয় হয়, পাছে আমাদের দোহাই শুনিয়া কোনো সংকল্প হইতে নিরস্ত হইলে প্রজার কাছে প্রতিপত্তি নষ্ট হয়।

তৃতীয়ত, প্রবল পক্ষকে তর্কে পরাস্ত করিবার চেষ্টা করিলে তাঁহাদের কতদূর পর্যন্ত যে আত্মবিস্মৃতি ঘটে, সম্প্রতি তাহার প্রমাণ পাইয়াছি।

---

[১] তুলনীয়— 'সফলতার সদুপায়' প্রসঙ্গ—গ্রন্থপরিচয়, রবীন্দ্র-রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড।

অতএব আমরা সকলে মিলিয়া আপত্তি তুলিয়াছি বলিয়া সেটা যে আমাদের পক্ষে আশাপ্রদ হইয়াছে, তাহা বলিতে পারি না।

না তুলিলেই যে বিশেষ আশার কারণ হইত, তাহাও বলিতে পারি না। হতভাগ্যের পক্ষে কোন্‌টা যে সৎপথ, তাহা নির্ণয় করা কঠিন।

তথাপি মোটের উপর, কমিটির প্রস্তাব কার্যে পরিণত হইলে যে ভয়ের কারণ আছে, আমার তাহা মনে হয় না। সেইটুকুই আমাদের সান্ত্বনা।

ভাবিয়া দেখো-না, চাষার ছেলে প্রাইমারি স্কুলে কেন যায়। ভালো করিয়া চাষার কাজ শিখিতে যে যায়, তাহা নহে। গুরুমশায় যে তাহার ছেলেকে কৃষিবিদ্যায় ওস্তাদ করিতে পারে, এ কথা শুনিলে সে হাসিয়া উড়াইয়া দিবে।

তার পরে, প্রাইমারি স্কুলে পড়িয়া তাহার ছেলে ডাক্তারও হইবে না, উকিলও হইবে না, কেরানিও হইবে না। প্রাইমারির পরে যদি তাহার ছাত্রবৃত্তি পড়ার শখ থাকে, তবে উপভাষা ছাড়িয়া আবার তাহাকে সাধুভাষা শিখিতে হইবে।

যাই হোক, যে-চাষা তাহার ছেলেকে প্রাইমারি স্কুলে পাঠায়, তাহার একটিমাত্র উদ্দেশ্য এই যে, তাহার ছেলে নিতান্ত চাষা না থাকিয়া কিঞ্চিৎপরিমাণে ভদ্রসমাজ-ঘেঁষা হইবার যোগ্য হয়; চিঠিটা পত্রটা লিখিতে পারে, পড়িতেও পারে, জমিদারের কাছারিতে দাঁড়াইয়া কতকটা ভদ্রছাঁদে মোক্তারি করিতে পারে, গ্রামের মোড়লি করিবার যোগ্য হয়, ভদ্রলোকের মুখে শুনিতে পায় যে, "তাইতো রে, তোর ছেলেটা তো বলিতে-কহিতে বেশ!"

চাষা একটু সম্পন্ন অবস্থার হইলেই ভদ্রসমাজের সীমানার দিকে অগ্রসর হইয়া বসিতে তাহার স্বভাবতই ইচ্ছা হয়। এমন-কি, তাহার ছেলে একদিন হাল-লাঙল ছাড়িয়া দিয়া বাবুর চালে চলিবে এ সাধও তাহার মনে উদয় হইতে থাকে। এইজন্য সময় নষ্ট করিয়াও, নিজের ক্ষতি করিয়াও ছেলেকে সে পাঠশালায় পাঠায় অথবা নিজের আঙিনায় পাঠশালার পত্তন করে।

কিন্তু চাষাকে যদি বলা হয়, তোর ছেলেকে তুই চাষার পাঠশালায় পাঠাইবি, ভদ্রের পাঠশালায় নয়, তবে তাহার উৎসাহের কারণ কিছুই থাকিবে না। এরূপ স্থলে ছেলেকে পাঠশালায় পাঠাইবার উদ্দেশ্যই তাহার পক্ষে ব্যর্থ হইবে।

শুধু তাই নয়। পল্লীর মধ্যে চাষার পাঠশালাটা চাষার পক্ষে একটা লজ্জার বিষয় হইয়া দাঁড়াইবে। কালক্রমে ভাগ্যক্রমে যে-চাষাত্ব হইতে তাহারা উপরে উঠিবার আশা রাখে, সেইটাকে বিধিমতো উপায়ে স্থায়ী করিবার আয়োজনে, আর যেই হউক, চাষা খুশি হইবে না।

ওষুধ বলিতে যেমন তিক্ত বা ঝাঁঝালো কিছু মনে আসে, তেমনই শিক্ষা বলিতে চাষা এমন একটা-কিছু বোঝে যাহা তাহার প্রতিদিনের ব্যাপার-সংক্রান্ত নহে। তাহার কাছে শিক্ষার গৌরবই তাই।

তাহার ছেলে যদি এত করিয়া পাঠশালে গিয়া তাহাদের অভ্যস্ত গ্রাম্যভাষা এবং তাহাদের নিজের ব্যবসায়ের সামান্য দুটো কথা শিখিতে বসে, তবে সে-শিক্ষার উপরে চাষার অশ্রদ্ধা হইবেই।

চাষা সাধুভাষা ব্যবহার করিতে পারে না সত্য, কিন্তু সাধুভাষা যে তাহার অপরিচিত তাহা নহে। যাত্রায়, গানে, গ্রন্থশ্রবণে নানারূপেই সাধুভাষা তাহার কানে পৌঁছিয়া থাকে, ভদ্রদের সঙ্গে কথা কহিবার সময় সেও যথাসাধ্য এই ভাষার মিশাল চালাইতে চেষ্টা করে।

তাহার ছেলেকে বিশেষ শিক্ষার দ্বারা যখন সেই ভদ্রভাষা ভুলাইবার চেষ্টা করা হইবে, তখন চাষা যে তাহা বুঝিবে না তাহা নহে, বুঝিয়া যে খুশি হইবে তাহাও বলিতে পারি না।

'observer, thinker and experimenter' কাহাকে বলে তাহা চাষা বুঝে না, কিন্তু ভদ্র এবং অভদ্র কাহাকে বলে তাহা সে বুঝে। অতএব যাহা কিছুই বুঝে না তাহার প্রলোভনে, যাহা বুঝে তাহার আশা প্রসন্ন মনে বিসর্জন দিবে, চাষা এতবড়ো চাষা নহে।

এই-সকল কারণে আশা করিতেছি, চাষার সদ্‌বুদ্ধি চাষাকে এবং দেশকে শিক্ষা-কমিটির গুপ্তবাণ হইতে রক্ষা করিবে।

১৩১২

পূর্বপ্রশ্নের অনুবৃত্তি

বৈশাখের ভাণ্ডারে যে-প্রশ্ন[1] তোলা হইয়াছিল অর্থাৎ আমাদের দেশের পব্লিক উদ্‌যোগগুলির সঙ্গে দেশের প্রাকৃতসাধারণের যোগ রক্ষার উপায় কী— দেশের নানা বিশিষ্ট লোকের[2] কাছ হইতে তাহার উত্তর পাওয়া গেছে।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যাঁহারা লিখিয়াছেন, তাঁহারা আমাদের দেশের আধুনিক উদ্‌যোগগুলির উপকারিতা সম্বন্ধে একমত নহেন, তবু মোটের উপর তাঁহাদের উত্তরগুলির মধ্যে কোনো অনৈক্য নাই।

তাঁহারা সকলেই এই কথা বলেন যে, প্রাকৃতসাধারণকে আমাদের পব্লিক উদ্‌যোগে আহ্বান করা এখন চলে না। আগে তাহাদের শিক্ষার ভালো বন্দোবস্ত করা চাই।

তাহার কারণ ইঁহারা বলিতেছেন, দেশ বলিতে কী বুঝায় তাহা দেশের সাধারণ লোকে বুঝে না, এবং দেশের হিত যে কেমন করিয়া করিতে হইবে তাহাও ইহাদের বুদ্ধিতে আসিবে না। অতএব, ইস্কুল করিয়া এবং অন্য পাঁচরকম উপায়ে ইহাদের শিক্ষার গোড়াপত্তন করিয়া দেওয়া চাই।

কথাটা একটা বড়ো কথা, প্রথমে এ বিষয়ে সমাজে একটা মতের স্থিরতা হওয়া চাই, তার পরে কাজে লাগিতে হইবে।

ভাণ্ডারের পরীক্ষায় এটা দাঁড়াইতেছে যে, মতের মিল হইয়াছে। কিন্তু কর্তব্যসম্বন্ধে মতের মিল হওয়া সহজ, উপায় সম্বন্ধে মিল হওয়াই কঠিন।

তবু কাজ আরম্ভ করিতে হইলে কাজের কথা পাড়িতেই হইবে, কোথায় কী বিঘ্ন আছে তাহা স্পষ্ট করিয়া ভাবিয়া না দেখিলে চলিবে না।

আমরা দেখিতেছি, গবর্মেণ্ট আমাদের দেশের প্রাকৃতসাধারণের শিক্ষার একটা বিশেষ বন্দোবস্ত করিতে উদ্‌যোগী হইয়াছেন। ইহাও দেখিতেছি, সেইসঙ্গে তাঁহারা ভারি একটা দ্বিধার মধ্যে পড়িয়া গেছেন। তাঁহারা দেখিয়াছেন, দেশের লোক রোগে এবং দুর্ভিক্ষে একেবারে অবাধে মারা পড়িতেছে। ইহাতে তাঁহাদের শাসনকার্যের একটা ভারি কঠিন সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে। প্রজার অন্নবস্ত্র এবং প্রাণটা বাঁচানো কেবল যে প্রজার হিত তাহা নহে, তাহা রাজারও স্বার্থ।

---

[1] প্রশ্নকর্তা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

[2] নগেন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, আশুতোষ চৌধুরী, শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, পৃথ্বীশচন্দ্র রায়, বিপিনচন্দ্র পাল— ভাণ্ডার, বৈশাখ, ১৩১২

কর্তারা মনে করিতেছেন, চাষারা যদি আর-একটু ভালো করিয়া চাষ করিতে শেখে এবং স্বাস্থ্য বাঁচাইয়া চলিবার উপদেশ পায়, যদি সাধারণ হিসাবপত্রটা লিখিয়া জমিদার ও মহাজনের অন্যায় প্রবঞ্চনার হাত এড়াইতে পারে, তবে তাহাতে দেশের যতটুকু শ্রীরক্ষা হইবে, তাহাতে প্রজার লাভ এবং রাজারও লাভ। অতএব গোড়ায় তাহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা চাই।

কিন্তু শিক্ষা-জিনিসটাকে একদিকে একবার শুরু করিয়া দিলে তার পরে তাহাকে গণ্ডি টানিয়া কমানো শক্ত। বিদেশী রাজার পক্ষে সেটা একটা বিষম ভাবনা। প্রজা বাঁচিয়া-বর্তিয়া থাকে, এটা তাঁহার একান্ত প্রয়োজন, কিন্তু বাঁচার চেয়েও যদি বেশি অগ্রসর হইয়া পড়ে, তবে সেটা তাঁহার প্রয়োজনের সঙ্গে ঠিক খাপ খায় না।

এইজন্য প্রাইমারি শিক্ষার প্রস্তাবে কর্তৃপক্ষের নানা রকম দুশ্চিন্তার লক্ষণ দেখা যাইতেছে। তাঁহারা ভাবিতেছেন খাল কাটিয়া বেনো জল ঢোকানো কাজটা ভালো নয়—শিক্ষার সুযোগে আমাদের দেশের ভদ্রলোকের ঢেউটা যদি চাষার মধ্যে প্রবেশ করে, তবে সে একটা বিষম ঝঞ্ঝাটের সৃষ্টি করা হইবে।

অতএব চাষাদের শিক্ষাকে এমন শিক্ষা করা চাই, যাহাতে মোটের উপর তাহারা চাষাই থাকিয়া যায়। তাহারা যেন কেবল গ্রামের ম্যাপটাই বোঝে; পৃথিবীর ম্যাপ চুলায় যাক, ভারতবর্ষের ম্যাপটাও তাহাদের বুঝিবার প্রয়োজন নাই। তা ছাড়া তাহাদের ভাষা শিক্ষাটা প্রাদেশিক উপভাষার বেড়া ডিঙাইয়া না যায়, সেটাও দেখা দরকার।

অতএব প্রথমেই দেখিতেছি, আমরা চাষাদের শিক্ষালাভ হইতে দেশের যে-সুবিধাটা আশা করিতেছি, কর্তৃপক্ষ স্বভাবতই সেটাকে আনন্দের বিষয় বলিয়া মনে করিতে পারেন না।

আমাদের দেশহিতৈষীরা যদি মনে করেন, সরকারের কর্তব্য দেশের সাধারণ লোকদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা এবং আমাদের কর্তব্য তৎসম্বন্ধে রেজোল্যুশন পাস করা, তবে এ কথাটা আমাদিগকে মনে রাখিতেই হইবে যে, সরকারের হাতে শিক্ষার ভার দিলে সে-শিক্ষার দ্বারা তাঁহারা তাঁহাদের উদ্দেশ্য সাধনেরই চেষ্টা করিবেন, আমাদের উদ্দেশ্য দেখিবেন না। তাঁহারা চাষাকে গ্রামের চাষা রাখিবার জন্যই ব্যবস্থা করিবেন, তাহাকে ভারতবর্ষের অধিবাসী করিয়া তুলিবার জন্য ব্যস্ত হইবেন না।

শিক্ষা যদি নিজের হাতে লই, তবেই নিজের মতলবমতো শিক্ষা দিতে পারিব—ভিক্ষাও করিব, ফরমায়েশও দিব, এ কখনও হয় না। ইংরেজিতে একটি চলতি কথা আছে, দানের ঘোড়ার দাঁত পরীক্ষা করিয়া লওয়াটা শোভা পায় না।

আমাদের নিজের শিক্ষার স্বতন্ত্র ব্যবস্থা নিজেরা করিব, এ কথা তুলিলেই আপত্তি এই উঠে যে, আমাদের পাঠশালার শিক্ষায় অন্নের সংস্থান কেমন করিয়া হইবে। সরকার যদি এমন কথা বলেন, সরকারী বিধানের ছাঁচে বিদ্যালয় না বানাইলে সেখানকার উত্তীর্ণ ছাত্রদিগকে আমরা উমেদারির বেলা আমল দিব না, তবে আমরা কী উপায় করিব।

এই প্রশ্নের সদুত্তর অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হইয়াছে। উত্তর দিবার পূর্বে প্রশ্নের বিষয়টাকে পরিষ্কার করিয়া সম্মুখে ধরা যাক।

প্রথম কথা— দেশের কাজে দেশকে যথার্থভাবে নিযুক্ত করিতে হইলে গোড়ায় সাধারণকে শিক্ষা দিতে হইবে।

দ্বিতীয় কথা— শিক্ষার যদি একটা প্রধান উদ্দেশ্য এই হয় যে, দেশের লোককে দেশের কাজে যোগ্য করা, তবে স্বভাবতই শিক্ষার প্রণালী সম্বন্ধে সরকারের সঙ্গে আমাদের মতের মিল হইবে না।

তৃতীয় কথা— যদি তাহা না হয় তবে পরের বাঁধা-চালে কতকগুলা বিদ্যালয় বানাইয়া বিদেশের শাসনে স্বদেশের সরস্বতীকে জিঞ্জির পরাইলে বিশেষ ফললাভ প্রত্যাশা করা চলিবে না। শিক্ষাপ্রণালীকে সকল প্রকারেই স্বদেশের মঙ্গলসাধনের উপযোগী করিবার জন্য দেশের বিদ্যালয়কে সরকারের শাসন হইতে মুক্তি দেওয়া দরকার।

শেষ কথা— তাহার বাধা এই যে, অন্নের দায়ে বিদ্যা সরকারের দ্বারে বাঁধা পড়িয়াছে। সে-বন্ধন না কাটিলে বিদ্যাকে স্বাধীন করিব কী উপায়ে।

সত্য কথা বলিতে গেলে, বাধা যে শুধু এইমাত্র, তাহা নহে। দেশের যে-কোনো একটা মঙ্গলসাধনের ভার নিজের হাতে লইতে গেলে যে-পরিমাণে ত্যাগস্বীকারের প্রয়োজন, আমরা যে ততদূর প্রস্তুত আছি, তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু যদি-বা প্রস্তুত হই, তবে গোড়াতেই যে বিঘ্নটা আছে, সেটা ভাবিয়া দেখা দরকার। এ সম্বন্ধে যাঁহারা চিন্তা করেন ও চিন্তা করা উচিত বোধ করেন, তাঁহাদের কাছ হইতে ইহার বিচার প্রার্থনা করি। আমার একান্ত অনুরোধ এই যে, দেশকে ভালো করিয়া শিক্ষা দেওয়া উচিত, এই কথা বলিয়া ক্ষান্ত না হইয়া শিক্ষার কিরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে, দেশের হিতৈষিগণ 'ভাণ্ডারে' তাহারই আলোচনা উপস্থিত করুন।

১৩১২

১২॥৩৪

বিজ্ঞানসভা

স্বর্গগত মহাত্মা মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয় গবর্মেন্টের উৎসাহে ও দেশের লোকের আনুকূল্যে একটি বিজ্ঞানসভা স্থাপন করিয়া গেছেন।

দেশে বিজ্ঞানপ্রচারই এই সভার উদ্দেশ্য।

আমাদের দেশের লোকহিতকরী সভাগুলির মতো এ সভাটি নিঃস্ব নয়। ইহার নিজের চালচুলা আছে।

এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই যে, দেশে বিজ্ঞানচর্চার তেমন ভালোরকম সুযোগ জুটিতেছে না। প্রেসিডেন্সি কলেজে সম্প্রতি কিছু বন্দোবস্ত হইয়াছে, কিন্তু সেখানে আমরা পরাধীন, তাহার 'পরে আমরা অধিক ভরসা রাখি না। আমাদের ছেলেদের যে বুদ্ধিশুদ্ধি কিছুই নাই, সেখান হইতে এমন খোঁটা খাইবার সম্ভাবনা আমাদের আছে।

বিজ্ঞানচর্চাসম্বন্ধে দেশের এমন দুরবস্থা অথচ এই বিদ্যাদুর্ভিক্ষের মাঝখানে বিজ্ঞানসভা তাঁহার পরিপুষ্ট ভাণ্ডারটি লইয়া দিব্য সুস্থভাবে বসিয়া আছেন।

সেখানকার হলে মাঝে মাঝে লেকচার হইয়া থাকে জানি— সেটা কলেজের লেকচারের মতো— তেমন লেকচারের জন্য কোনো বিশেষ বন্দোবস্তের বিশেষ প্রয়োজন নাই।

যাহা হউক, এটুকু নিঃসন্দেহ যে, বিজ্ঞানসভা নাম ধরিয়া একটা ব্যাপার এ দেশে বর্তমান এবং তাহার যন্ত্রতন্ত্র-অর্থসামর্থ্য কিঞ্চিৎ পরিমাণে আছে।

আমাদের যাহা নাই, তাহার জন্য আমরা রাজদ্বারে ধন্না দিয়া পড়ি এবং চাঁদার খাতা লইয়া গলদ্‌ঘর্ম হইয়া বেড়াই— কিন্তু যাহা আছে, তাহাকে কেমন করিয়া কাজে লাগাইতে হইবে, সেদিকে কি আমরা দৃষ্টিপাত করিব না। আমাদের অভাবের মাঝখানে এই যে বিজ্ঞানসভা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, ইহার কি ঘুম ভাঙাইবার সময় হয় নাই।

আমাদের দেশে অধ্যাপক জগদীশ, অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র দেশবিদেশে যশোলাভ করিয়াছেন, বিজ্ঞানসভা কি তাঁহাদিগকে কাজে লাগাইবার জন্য কিছুমাত্র চেষ্টা করিতেছেন। দেশের বিজ্ঞানসভা দেশের বিজ্ঞানবীরদের মুখের দিকে তাকাইবেন না? ইহাতে কি তাঁহার লেশমাত্র গৌরব বা সার্থকতা আছে।

যদি জগদীশ ও প্রফুল্লচন্দ্রের শিক্ষাধীনে দেশের কয়েকটি অধ্যবসায়ী ছাত্রকে মানুষ

করিয়া তুলিবার ভার বিজ্ঞানসভা গ্রহণ করেন, তবে সভা এবং দেশ উভয়েই ধন্য হইবেন।

স্বদেশে বিজ্ঞান প্রচার করিবার দ্বিতীয় সদুপায়, স্বদেশের ভাষায় বিজ্ঞান প্রচার করা। যতদিন পর্যন্ত না বাংলাভাষায় বিজ্ঞানের বই বাহির হইতে থাকিবে, ততদিন পর্যন্ত বাংলাদেশের মাটির মধ্যে বিজ্ঞানের শিকড় প্রবেশ করিতে পারিবে না।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় প্রভৃতি কয়েকজন বিজ্ঞানপণ্ডিত, দেশের ভাষায় দেশের লোকের কাছে বিজ্ঞানের পরিচয় দিতে উদ্যত হইয়াছেন। বাংলাসাহিত্যের ইতিহাসে সেজন্য তাঁহাদের নাম থাকিয়া যাইবে। কিন্তু বিজ্ঞানসভা কী করিলেন।

দেশের প্রতিভাবান্ ব্যক্তিদিগকে ও সুযোগ্য অনুসন্ধিৎসুদিগকে বিজ্ঞানচর্চার সুযোগ দান করা, ও দেশের ভাষায় সর্বসাধারণের পক্ষে বিজ্ঞানশিক্ষাকে সুগম করিয়া দেওয়া, বিজ্ঞান প্রচারের উদ্দেশে বিজ্ঞানসভার এই দুটি মস্ত কাজ আছে; ইহার মধ্যে কোনোটাই তিনি করিতেছেন না।

কেহ যেন না মনে করেন যে, আমি বিজ্ঞানসভার সম্পাদক প্রভৃতিকে এজন্য দায়ী করিতেছি। মন্দিরে প্রদীপ জ্বালাইয়া রাখিবার ভার তাঁহাদের উপরে আছে মাত্র। কিন্তু সভা যে আমাদের সকলের। ইহা যদি সমস্ত আয়োজন উপকরণ লইয়া নিষ্ফল হইয়া পড়িয়া থাকে, তবে সেজন্য আমরা প্রত্যেকেই দায়ী। ইহাকে কাজে লাগাইবার কর্তা আমরা সকলেই, কোনো ব্যক্তিবিশেষ নহে।

আমরা স্বকীয় শাসনের অধিকার লইবার জন্য রাজদ্বারে প্রার্থনা করিতেছি। কিন্তু বিজ্ঞানসভার মতো ব্যাপারগুলি দেশের জমি জুড়িয়া নিষ্ফল হইয়া পড়িয়া থাকিলে প্রতিদিন প্রমাণ হইতে থাকে যে, আমরা স্বকীয় শাসনের অধিকারী নহি। কারণ, যে-অধিকার আমাদের হস্তে আছে তাহাকে যদি ব্যর্থ করি, তবে যাহা নাই তাহাকে পাইলেই যে আমরা চতুর্ভুজ হইয়া উঠিব এ কথা স্বীকার করা যায় না।

এই কারণে বিজ্ঞানসভার মতো কর্মশূন্য সভা আমাদের জাতির পক্ষে লজ্জার বিষয়। ইহা আমাদের জাতির পক্ষে নিত্য কুদৃষ্টান্ত ও নিরুৎসাহের কারণ।

আমার প্রস্তাব এই যে, বিজ্ঞানসভা যখন আমাদের দেশের জিনিস, তখন ইহাকে হাতে লইয়া ইহার দ্বারা যতদূর পর্যন্ত সম্ভব দেশের কাজ করাইয়া, স্বজাতির অন্তত একটা জড়তা ও হীনতার প্রত্যক্ষ প্রমাণকে দূর করিয়া দিতে যেন কিছুমাত্র বিলম্ব না করি।[১]

১৩১২

---

[১] তুলনীয় প্রসঙ্গ-কথা (১)— রবীন্দ্র-রচনাবলী ; বর্তমান খণ্ড।

ইতিহাসকথা

আমাদের দেশে লোকশিক্ষা দিবার যে দুটি সহজ উপায় অনেকদিন হইতে প্রচলিত আছে, তাহা যাত্রা এবং কথকতা। এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে প্রকৃতির মধ্যে কোনো শিক্ষাকে বদ্ধমূল করিয়া দিবার পক্ষে এমন সুন্দর উপায় আর নাই।

আজকাল শিক্ষার বিষয় বৈচিত্র্যলাভ করিয়াছে— একমাত্র পুরাণকথার ভিতর দিয়া সকল প্রকার উপদেশ চালানো যায় না। অথচ শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত দলের মধ্যে ভেদ যদি যথাসম্ভব লোপ করিয়া দেওয়াই শ্রেয় হয়, তবে যাহারা শিক্ষা হইতে বঞ্চিত তাহাদের মধ্যে এমন অনেক জ্ঞান প্রচার করা আবশ্যক যাহা লাভ করিবার উপায় তাহাদের নাই।

একেবারে গোড়াগুড়ি ইস্কুলে পড়িয়া সেই-সকল জ্ঞানলাভের প্রত্যাশা করা দুরাশা। সাধারণ লোকের ভাগ্যে ইস্কুলে পড়ার সুযোগ তেমন করিয়া কখনোই ঘটিবে না। তা ছাড়া ইস্কুলে-পড়া জ্ঞান প্রকৃতির মধ্যে যথেষ্ট গভীরভাবে প্রবেশ করে না।

ভালো করিয়া ভাবিয়া দেখিলে আমাদের দেশে শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মধ্যে যে জ্ঞানের বৈষম্য সবচেয়ে বেশি করিয়া অনুভব করা যায়, তাহা ইতিহাসজ্ঞান। স্বদেশে ও বিদেশে মানুষ কী করিয়া বড়ো হইয়াছে, প্রবল হইয়াছে, দল বাঁধিয়াছে, যাহা শ্রেয় জ্ঞান করিয়াছে তাহা কী করিয়া পাইয়াছে, পাইয়া কী করিয়া রক্ষা করিয়াছে, সাধারণ লোকের এ-সমস্ত ধারণা না থাকাতে তাহারা শিক্ষিতলোকের অনেক ভাবনা-চিন্তার কোনো অর্থ খুঁজিয়া পাইতেছে না এবং তাহাদের কাজকর্মে যোগ দিতে পারিতেছে না। পৃথিবীতে মানুষ কী করিয়াছে ও কী করিতে পারে, তাহা না জানা মানুষের পক্ষে শোচনীয় অজ্ঞতা।

কথা এবং যাত্রার সাহায্যে জনসাধারণকে ইস্কুলে না পড়াইয়াও ইতিহাস শেখানো যাইতে পারে। এমন-কি, সামান্য ইস্কুলে যতটুকু শিক্ষা দেওয়া সম্ভব, তার চেয়ে অনেক ভালো করিয়াই শেখানো যাইতে পারে।

আজকাল য়ুরোপে ঐতিহাসিক উপন্যাস ও নাটক ইতিহাসশিক্ষার প্রকৃষ্ট উপকরণ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। ইতিহাসকে কেবল জ্ঞানে নহে, কল্পনার দ্বারা গ্রহণ করিলে তবেই তাহাকে যথার্থভাবে পাওয়া যায়— এ কথা সকলেই স্বীকার করেন।

সেই কল্পনার সাহায্যে সরলভাবে জ্ঞানদানের প্রণালী, জ্ঞানের বিষয়কে হৃদয়ের সামগ্রী করিয়া তুলিবার উপায় আমাদের দেশে অনেকদিন হইতেই চলিত আছে—

য়ুরোপ আজ সেইরূপ সরস উপায়ের দিকে ঝোঁক দিয়াছে, আর আমরাই কি আমাদের জ্ঞানপ্রচারের স্বাভাবিক পথগুলিকে পরিত্যাগ করিয়া কল্পনালোকবর্জিত ইস্কুল-শিক্ষার শরণ লইব।

আমার প্রস্তাব এই যে, ইতিহাসকে কথা ও যাত্রার আকারে স্থান ও কালের উজ্জ্বল বর্ণনার দ্বারা সজীব সরস করিয়া দেশের সর্বত্র প্রচার করিবার উপায় অবলম্বন করা হউক। আমরা আজকাল কেবল মাসিক কাগজে ও ছাপানো গ্রন্থে সাহিত্য-প্রচারের চেষ্টা করিয়া থাকি,— কিন্তু যদি কোনো কথা বা যাত্রার দল ইতিহাস ও সাহিত্য দেশের সর্বত্র প্রচার করিয়া দিবার ভার গ্রহণ করেন, তবে প্রচুর সার্থকতা লাভ করিবেন। আজকালকার দিনে কেবলমাত্র পৌরাণিক যাত্রা ও কথা আমাদের সম্পূর্ণ উপযোগী নহে। ইতিহাস, এমন-কি, কাল্পনিক আখ্যায়িকা অবলম্বন করিয়া আমাদিগকে লোকশিক্ষা বিধান করিতে হইবে।

যদি বিদ্যাসুন্দরের গল্প আমাদের দেশে যাত্রায় প্রচলিত হইতে পারে, তবে পৃথ্বীরাজ, গুরুগোবিন্দ, শিবাজি, আকবর প্রভৃতির কথাই বা লোকের মনোরঞ্জন না করিবে কেন। এমন-কি, আনন্দমঠ রাজসিংহ প্রভৃতির ন্যায় উপন্যাসই বা সুগায়ক কথকের মুখে পরম উপাদেয় না হইবে কেন।

১৩১২

স্বাধীন শিক্ষা

দেশের শিক্ষাকে বিদেশী রাজার অধীনতা হইতে মুক্তি দিবার জন্য কী উপায় করা যাইতে পারে, এই প্রশ্ন 'ভাণ্ডারে' উঠিয়াছে।

যতদিন বিদ্যালয়ের উপাধিলাভের উপরে অন্নলাভ নির্ভর করিবে, ততদিন মুক্তির আশা করা যায় না এই কথাই সকলে বলিতেছেন।

কিন্তু কথাটা কেবল উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধেই খাটে, তাহা আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে। পাড়াগাঁয়ে প্রাকৃতগণ যে শিক্ষালাভের জন্য ছেলেকে পাঠশালায় পাঠায়, সে-শিক্ষার দ্বারা গবর্মেণ্টের চাকরি কেহ প্রত্যাশা করে না।

আমাদের দেশে এই পাঠশালা চিরকাল স্বাধীন ছিল। আজও এই-সকল পাঠশালার অধিকাংশ ব্যয় দেশের লোক বহন করে ; কেবল তাহার উপর আর সামান্য দুই-চার আনার লোভে এই আমাদের নিতান্তই দেশীয় ব্যবস্থা পরের হাতে আপনাকে বিকাইয়াছে।

এই প্রাথমিক পাঠশালার চেয়ে উপর পর্যন্ত উঠে অথচ কলেজ পর্যন্ত পৌঁছে না এমন একদল ছাত্র আছে, সাধারণত ইহারাও সরকারি চাকরির দাবি করিতে পারে না। ইহারা অনেকেই সদাগরের আপিসে, জমিদারের সেরেস্তায়, ধনিগৃহের দপ্তরখানায়, গৃহস্থঘরের বাজার-সরকার প্রভৃতি কাজে নিযুক্ত হইবার জন্য চেষ্টা করে।

কিন্তু দেশে ইহাদের শিক্ষার তেমন ভালো ব্যবস্থা নাই। পূর্বে ছাত্রবৃত্তি স্কুল ইহাদের কতকটা উপযোগী ছিল। কিন্তু মাইনর স্কুল এখন ছাত্রবৃত্তিকে প্রায় চাপিয়া মারিল। ইংরেজি শিক্ষাই যে-সব স্কুলের প্রধান লক্ষ্য এবং কলেজই যাহার গম্য স্থান, সে-সকল স্কুলে কিছুদূর পর্যন্ত পড়িয়া পড়াশুনা ছাড়িয়া দিলে না বাংলা না ইংরেজি না কিছুই শেখা হয়।

অতএব যাহারা পাঠশালা পর্যন্ত পড়ে এবং যাহারা নানাপ্রকার অভাব ও অসুবিধাবশত তাহার চেয়ে আর-কিছুদূর মাত্র পড়িবার আশা করিতে পারে, দেশ তাহাদের শিক্ষার ভার নিজের হাতে লইলে বাধার কারণ তো কিছুই দেখা যায় না।

গুনতি করিয়া দেখিলে কলেজে পাস-করা ছাত্রদের চেয়ে ইহাদের সংখ্যা অনেক বেশি হইবে। এই বহুবিস্তৃত নিম্নতন শ্রেণীর শিক্ষা আমরা যদি উপযুক্তভাবে দিতে পারি, তবে দেশের শ্রী ফিরিয়া যায় সন্দেহ নাই।

ইহাদের শিক্ষা গোড়া হইতে এমনভাবে দিতে হইবে যাহাতে লোকহিত কাহাকে বলে তাহা ইহারা ভালো করিয়া জানিতে এবং জীবিকা উপার্জনের জন্য হাতে-কলমে সকল রকমে তৈরি হইয়া উঠিতে পারে। পাঠশালায় শিশুবয়সে যে-সকল ভাব, জ্ঞান ও অভ্যাস সঞ্চার করিয়া দেওয়া যায়, বড়োবয়সে বক্তৃতার দ্বারা তাহা কখনোই সম্ভবপর হয় না।

যাই হোক, উচ্চশিক্ষায় দেশের লোকের পক্ষে গবর্মেণ্টের প্রতিযোগিতা করিবার যে-সকল বাধা আছে নিম্নশিক্ষায় তাহা নাই।

কিন্তু এতবড়ো দেশব্যাপী কাজের ভার আমাদিগকে নিজের হাতে গ্রহণ করিতে হইবে, এ কথা বলিলেই বিজ্ঞ ব্যক্তিরা হতাশ হইয়া পড়েন। অথচ তাঁহারা ইহাও জানেন, এ কাজ সরকারের হাতে দিলে কিণ্টারগার্টেনের ধুয়া ধরিয়া নিতান্ত ছেলেখেলা হইতে থাকিবে এবং লাভের মধ্যে ম্যাক্‌মিলন কোম্পানির উদরপূরণ হইবে। কিছু না-হউক, এ শিক্ষা আমরা যেমন চাই তেমন হইবে না, বরঞ্চ কতক অংশে বিপরীত হইবে।

অন্যত্র ইহা তো দেখিয়াছি দয়ানন্দের দল আপন সম্প্রদায়ের জন্য স্বচেষ্টায় বিদ্যালয় স্থাপন করিতেছে। আমাদের দেশেও এইরূপ চেষ্টা কী করিলে সাধ্য হইতে পারে এবং এই-সকল নিম্নতন বিদ্যালয়গুলিতে কী কী বিষয় কী নিয়মে শিক্ষা দিতে হইবে, সুধীগণ 'ভাণ্ডার' পত্রে তাহার আলোচনা করিলে সম্পাদক কৃতার্থ হইবেন।

১৩১২

শিক্ষার আন্দোলনের ভূমিকা

সমাজকে বিদ্যা শিখাইবার জন্য আমাদের দেশ কোনোদিন স্বদেশী বা বিদেশী রাজার আইনের বাঁধনে ধরা দেয় নাই। নিজের শিক্ষার ব্যবস্থা সমাজের লোক নিজেরাই করিয়াছে। সেই শিক্ষার ব্যবস্থা বলিতে যে কেবল টোল এবং পাঠশালাই বুঝাইত তাহা নহে, পৃথিবীর সর্বপ্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় এই ভারতবর্ষেই স্থাপিত হইয়াছিল। প্রাচীন ভারতে নালন্দা এবং তক্ষশিলায় যে-বিদ্যায়তন ছিল, তেমন বৃহৎ ব্যাপার এখনও কোথাও আছে কি না সন্দেহ। মিথিলা কাশী নবদ্বীপে ভারতের প্রাচীন বিদ্যার বিশ্ববিদ্যালয় রাজসাহায্য ব্যতিরেকেই চিরদিন চলিয়াছে।

বর্তমানকালে নানা কারণে শিক্ষালাভের জন্য আমাদিগকে বহুল পরিমাণে রাজার অধীনতা স্বীকার করিতে হইয়াছে। ইহাতে আমাদের যথোচিত শিক্ষালাভের কী পরিমাণ ব্যাঘাত ঘটিতেছে, তাহা আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই; কিন্তু সমাজ আত্মহিতসাধনের শক্তি হইতে যে প্রত্যহ ভ্রষ্ট হইতেছে, ইহাই আমি সর্বাপেক্ষা আক্ষেপের বিষয় বলিয়া জ্ঞান করি। আমাদের যে-পাঠশালা যে-টোল অনায়াসে স্বদেশের মাটি হইতে রস আকর্ষণ করিয়া দেশকে চিরদিন ফলদান করিয়া আসিয়াছে, সেই আমাদের স্বকীয় পাঠশালা ও টোলগুলিও ক্রমশই রাজার গলগ্রহ হইয়া উঠিয়া আত্মপোষণের স্বাধীন শক্তি হারাইতেছে। মোগলসাম্রাজ্যসূর্য যখন অস্তমিত হইল, তখন সঙ্গে সঙ্গে দেশের বিদ্যার ব্যবস্থা বিলুপ্ত হয় নাই। স্বভাবের নিয়মে একদিন ইংরেজকেও নিশ্চয় এ দেশ হইতে বিদায় হইতে হইবে, তখন তাঁহাদের অন্নজীবী টোল-পাঠশালাগুলি ভিক্ষান্নের জন্য আবার কাহার দ্বারে হাত পাতিতে যাইবে।

শক্তিলাভই সকল লাভের শ্রেষ্ঠ; কারণ, তাহা কেবলমাত্র খাদ্যলাভ নহে, তাহাই মনুষ্যত্বলাভ। নিজের হিতসাধনের শক্তি যখন অভ্যাসের অভাবে, সুযোগের অভাবে, সামর্থ্যের অভাবে সমাজ হারাইতে বসে তখন সে-ক্ষতি কোনো প্রকার বাহ্য সমৃদ্ধির

দ্বারা পূরণ করা যায় না। দেশে কতখানি রেল পাতা হইয়াছে, টেলিগ্রাফের তার বসানো হইয়াছে, কলের চিমনি উঠিয়াছে, তাহা লইয়া দেশের গৌরব নহে। সেই রেল সেই তার সেই চিমনির সঙ্গে দেশের শক্তির কতটুকু সম্বন্ধ তাহাই বিচার্য। ইংরেজের আমলে ভারতবর্ষে আজ যতগুলি ব্যাপার চলিতেছে, তাহার ফল আমরা যেমনই ভোগ করি না কেন, সেই চালনায় আমাদের স্বকীয় অধিকার কতই যৎসামান্য। সুতরাং ইহার অধিকাংশই আমাদের পক্ষে স্বপ্নমাত্র; যখনই জাগ্রত হইব তখনই সমস্ত বিলুপ্ত হইবে।

কিন্তু আমাদের বর্তমান অবস্থায় দেশের সকল কর্ম করিবার স্বাধীনতা দেশের লোকের থাকিতে পারে না। বিদেশী রাজার কর্তৃত্ব স্বভাবতই কতকগুলি বিষয়ে আমাদের শক্তিকে সংকীর্ণ করিবেই। ইংরেজ আমাদের অস্ত্র হরণ করিয়াছে, সুতরাং অস্ত্রপ্রয়োগ করিবার অভ্যাস ও শক্তি ভারতবর্ষের লোককে হারাইতে হইতেছে। বিদেশী আক্রমণ হইতে দেশকে রক্ষা করিবার শক্তি ইংরেজ এ দেশের লোকের হাতে রাখিবে না। এমন আরও অনেকগুলি শক্তি আছে যাহার উৎকর্ষসাধনে ইংরেজ স্বভাবতই আমাদিগকে সাহায্য করিবে না, বরঞ্চ বাধা দিবে।

তথাপি, স্বদেশের মঙ্গলসাধন করিবার স্বাধীনতা আমাদের হাত হইতে সম্পূর্ণ হরণ করা কাহারও সাধ্য নাই। যে যে স্থানে আমাদের সেই স্বাধীনতার ক্ষেত্র আছে, সেই-সকল স্থানেও আমরা যদি জড়ত্ববশত বা ত্যাগ ও কষ্ট -স্বীকারের অনিচ্ছাবশত নিজের স্বাধীনশক্তিকে প্রতিষ্ঠিত না করি, এমন-কি, আমাদের বিধিদত্ত স্বাতন্ত্র্যকে গায়ে পড়িয়া পরের হাতে সমর্পণ করি, তবে দেবে-মানবে কোনোদিন কেহ আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবে না।

এই কথা লইয়া বাংলাদেশে কিছুদিন আলোচনা চলিতেছিল— এমন-কি, দেশের বিদ্যাশিক্ষাকে স্বাধীনতা দিবার চেষ্টা কেহ কেহ নিজের সাধ্যমতো সামান্যভাবে আরম্ভ করিয়াছিলেন। সেই আলোচনা এবং সেই চেষ্টা সম্বন্ধে সাধারণের মনের ভাব ও আনুকূল্য কিরূপ ছিল, তাহা কাহারও অগোচর নাই।

ইতিমধ্যে বঙ্গবিভাগ লইয়া একটা আন্দোলনের ঝড় উঠিল। রাগের মাথায় অনেকে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, যে-পর্যন্ত না পার্টিশন রহিত হইবে সে-পর্যন্ত তাঁহারা বিলাতি দ্রব্য কেনা রহিত করিবেন। সে সময়ে কেহ কেহ বলিয়াছিলেন, পরের উপরে রাগ করিয়া নিজের হিত করিবার চেষ্টা স্থায়ী হয় না, আমরা পরাধীনজাতির মজ্জাগত দুর্বলতাবশত মুগ্ধভাবে বিলাতি জিনিসের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছি, যদি মোহপাশ বিচ্ছিন্ন করিয়া স্বদেশীবস্তুর অভিমুখে ফিরিতে পারি তবে স্বদেশ একটি

নূতন শক্তি লাভ করিবে। যে-সকল দ্রব্য ত্যাগ করিব, তাহা অপেক্ষা যে-শক্তিলাভ করিব তাহার মূল্য অনেক বেশি। এক শক্তি আর-এক শক্তিকে আকর্ষণ করে— বলিষ্ঠভাবে ত্যাগ করিবার শক্তি বলিষ্ঠভাবে অর্জন করিবার শক্তিকে আকর্ষণ করিয়া আনে। এ-সকল কথা যদি সত্য হয়, তবে পার্টিশনের সঙ্গে বিদেশীবর্জনকে জড়িত করা শ্রেয় নহে। মনে আছে, এই আলোচনাও তখন অনেকের পক্ষে বিরক্তির কারণ হইয়াছিল।

তাহার পরে মফস্বল বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষদের প্রতি কর্তৃপক্ষ এক ন্যায়বিগর্হিত সুবুদ্ধিবিবর্জিত সার্কুলার জারি করিলেন। তখন ছাত্রমণ্ডলী হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া পণ করিতে বসিলেন যে, আমরা বর্তমান য়ুনিভর্সিটিকে 'বয়কট' করিব; আমরা এ বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিব না, আমাদের জন্য অন্য বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হউক।

অবশ্য এ কথা আমরা অনেকদিন হইতে বলিয়া আসিতেছি যে, দেশের বিদ্যালয় সম্পূর্ণ দেশীয়ের আয়ত্তাধীন হওয়া উচিত। গম্ভীরভাবে দৃঢ়ভাবে সেই ঔচিত্য বুঝিয়া দেশের শিক্ষাকে স্বাধীন করিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হওয়া দরকার। কিন্তু এই চেষ্টা যদি কোনো সাময়িক উত্তেজনা বা ক্ষণিক রাগারাগির দ্বারা প্রবর্তিত হয়, তবে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না।

অনেক সময় প্রবর্তক কারণ নিতান্ত তুচ্ছ এবং সাময়িক হইলেও তাহার ফল বৃহৎ ও স্থায়ী হইয়া থাকে। জগতের ইতিহাসে অনেক বিশাল ব্যাপারের প্রারম্ভ দীর্ঘ কাল ধরিয়া একটা আকস্মিক ক্ষণিক আঘাতের অপেক্ষা করিয়া থাকে ইহা দেখা গেছে। শিক্ষা সম্বন্ধে ও অন্যান্য নানা অভাবের প্রতিকার সম্বন্ধে এ দেশের স্বাধীন শক্তি ও স্বাধীন চেষ্টার উদ্বোধন সম্ভবত বর্তমান আন্দোলনের প্রতীক্ষায় ছিল, অতএব এই উপলক্ষকে অবজ্ঞা করিতে পারা যায় না।

তথাপি, স্থায়ী মঙ্গল যে-উদ্যোগের লক্ষ্য, আকস্মিক উৎপাতকে সে আপনার সহায় করিতে আশঙ্কা বোধ না করিয়া থাকিতে পারে না। যে-দেশ আপনার প্রাণগত অভাব অনুভব করিয়া কোনো ত্যাগসাধ্য ক্লেশসাধ্য মঙ্গল-অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতে পারে নাই, পরের প্রতি রাগ করিয়া আজ সেই দেশ যে স্থায়ীভাবে কোনো দুষ্কর তপশ্চরণে নিযুক্ত হইবে, এরূপ শ্রদ্ধা রক্ষা করা বড়োই কঠিন। রাগারাগির স্টীম চিরদিন জ্বালাইয়া রাখিবে কে এবং রাখিলেই বা মঙ্গল কী। গ্যাস ফুরাইলেই যদি বেলুন মাটিতে আছাড় খাইয়া পড়ে, তবে সেই বেলুনে বাস্তবাড়ি স্থাপনের আশা করা চলে না।

আজ যাঁহারা অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া বলিতেছেন, আমাদের এখনই আস্ত একটি

বিশ্ববিদ্যালয় চাই, কালই সেখানে পরীক্ষা দিতে যাইব, তাঁহাদিগকে দেশীয় বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠার স্থায়ী সহায় বলিয়া মনে করিতে সাহস হয় না। এমন-কি, তাঁহারা ইহার বিঘ্নস্বরূপ হইতেও পারেন।

কারণ, তাঁহারা স্বভাবতই অসহিষ্ণু অবস্থায় রহিয়াছেন। তাঁহারা কোনোমতেই ধৈর্য ধরিতে পারিতেছেন না। প্রবলক্ষমতাশালী পক্ষের প্রতি রাগ করিয়া যখন মনে জেদ জন্মে, তখন অতি সত্বর যে অসাধ্য সাধন করিবার ইচ্ছা হয় তাহা ইন্দ্রজালের দ্বারাই সম্ভব। সেই ইন্দ্রজাল ক্ষণকালের জন্য একটা বৃহৎ বিভ্রম বিস্তার করে মাত্র, তাহার উপর নির্ভর করা যায় না।

কিন্তু মায়ার ভরসা ছাড়িয়া দিয়া যদি যথার্থ কাজের প্রত্যাশা করা যায়, তবে ধৈর্য ধরিতেই হইবে। ভিত্তি হইতে আরম্ভ করিতে হইবে, ছোটো হইতে বড়ো করিতে হইবে। অনিবার্য বিলম্বকর হইলেও কাজের নিয়মকে স্বীকার করিতেই হইবে।

ছোটো আরম্ভের প্রতি ধৈর্য রক্ষা করা যথার্থ প্রীতির লক্ষণ। সেইজন্য শিশুকে মানুষ করিয়া তুলিতে পিতৃমাতৃস্নেহের প্রয়োজন হয়। যথার্থ স্বদেশপ্রীতির প্রবর্তনায় যখন আমরা কোনো কাজ আরম্ভ করি, তখন ক্ষুদ্র আরম্ভের প্রতিও আমরা অন্তরের সমস্ত স্নেহ ঢালিয়া দিতে পারি। তখন কেবলই এই ভয় হইতে থাকে, পাছে অতিরিক্ত প্রলোভনের তাগিদে তাড়াহুড়া করিয়া সমস্ত নষ্ট হইয়া যায়।

কিন্তু বিপক্ষপক্ষের প্রতি স্পর্ধা করিয়া যখন আমরা কোনো উদ্যোগে প্রবৃত্ত হই তখন আমাদের বিলম্ব সয় না। তখন আমরা এক মুহূর্তেই শেষকে দেখিতে চাই, আরম্ভকে দুই চক্ষে দেখিতে পারি না। সেইজন্য আরম্ভকে আমরা কেবলই বার বার আঘাত করিতে থাকি।

দেশীয় বিদ্যালয়প্রতিষ্ঠার উদ্‌যোগে প্রথম হইতেই আমাদের এই-যে আঘাতকর অধৈর্যের লক্ষণ দেখা যাইতেছে, ইহাই আমাদের আশঙ্কার বিষয়। কাজের সূত্রপাত হইতেই আমরা বিবাদ শুরু করিয়াছি। আমাদের যাঁহার যতটুকু মনের-মতো না হইতেছে, যাঁহার যে-পরিমাণ কল্পনাবৃত্তি অপরিতৃপ্ত থাকিতেছে, তিনি তাহার চতুর্গুণ আক্রোশের সহিত এই উদ্‌যোগকে আঘাত করিতেছেন। এ কথা বলিতেছেন না, "আচ্ছা, হউক, পাঁচজনে মিলিয়া কাজটা আরম্ভ হউক; কোনো জিনিস যে আরম্ভেই একেবারেই নিখুঁতসুন্দর এবং সর্ববাদিসম্মত হইয়া উঠিবে, এরূপ আশা করা যায় না; কিন্তু এমন কোনো ব্যাপারকে যদি খাড়া করিয়া তোলা যায় যাহা চিরদিনের মতো জাতীয় সম্বল হইয়া উঠে, তবে সমস্ত জাতির সুবুদ্ধি নিশ্চয়ই ক্রমে ক্রমে তাহাকে নিজের সম্পূর্ণ উপযোগী করিয়া তুলিবে।"

বাংলাদেশে স্বদেশী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য যে-সকল সভা-সমিতি বসিয়াছে, তাহার মধ্যে নানা মতের, নানা বয়সের, নানা দলের লোক সমবেত হইয়াছেন। ইহারা সকলে মিলিয়া যাহা-কিছু স্থির করিতেছেন, তাহা ইঁহাদের প্রত্যেকেরই সম্পূর্ণ মনঃপূত হইতে পারে না। এই-সকল সমিতির সঙ্গে বর্তমান লেখকেরও যোগ ছিল। প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ের যে শিক্ষাপ্রণালী ও নিয়ম নির্ধারিত হইয়াছে, লেখকের যদি সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকিত তবে ঠিক সেরূপ হইত না সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহা লইয়া লেখক বিবাদ করিতে প্রস্তুত নহেন। তিনি কাজ আরম্ভ হওয়াকেই সকলের চেয়ে বেশি মনে করেন। যদি তাঁহার মনোমতো প্রণালীই বাস্তবিক সর্বোৎকৃষ্ট হয়, তবে কাজ আরম্ভ হইলে পর সে-প্রণালীর প্রবর্তন যথাকালে সম্ভবপর হইবে, এ ধৈর্য তাঁহাকে রক্ষা করিতেই হইবে।

সাধারণের সম্মানভাজন শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ের আদর্শরচনাসমিতির সভাপতি ছিলেন। তিনি যেরূপ চিন্তা, শ্রম ও বিচক্ষণতা সহকারে আদর্শরচনা কার্যে সহায়তা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেই হইবে। সর্ববিষয়ে তাঁহার সহিত মতের মিল হউক বা না হউক, তাঁহার দ্বারা পরিচালিত হইতে অন্তত আমার তো কোনো আপত্তি নাই।

কারণ, কাজের বেলা একজনকে মানিতেই হইবে। পাঠশালায় ডিবেটিং ক্লাবকে সর্বত্র বিস্তার করা চলে না। সকলে মিলিয়া বাদবিতণ্ডা এবং পরস্পরের প্রত্যেক কথার অন্তহীন সমালোচনা, এ কেবল সেই প্রকার বৈঠকেই শোভা পায় যাহার পরিণাম কেবল তর্ক। আমাদের তর্কের দিন যদি গিয়া থাকে, আমাদের কাজের সময় উপস্থিত হইয়া থাকে, তবে প্রত্যেকেই প্রধান হইবার চেষ্টা না করিয়া বিনয়ের সহিত একজনের নায়কতা স্বীকার করিতেই হইবে।

শিক্ষাচালনার নায়কপদ দেশ কাহাকে দিবে তাহা এখনও স্থির হয় নাই, কিন্তু তাহা অনুমান করা দুঃসাধ্য নহে। বর্তমান লেখকের মনে সন্দেহ নাই যে, এই শিক্ষাব্যাপারের কাণ্ডারীপদ হইতে যদি কোনো কারণে গুরুদাসবাবু অবসর গ্রহণ করেন, তবে ইহার উপর হইতে দেশের শ্রদ্ধা চলিয়া যাইবে।

নূতন বিদ্যালয়ের প্রবর্তনব্যাপারে গুরুদাসবাবুকে প্রধান স্থান দিবার নানা কারণ আছে। তাহার মধ্যে একটি গুরুতর কারণ এই যে, দেশের বর্তমান আন্দোলনব্যাপারে তাঁহাকে একেবারে অভিভূত করিতে পারে নাই; তিনি এই আন্দোলনের সুবিধাটুকুর প্রতি লক্ষ রাখিয়া ইহার আঘাতের প্রতি অমনোযোগী হইবেন না। কোটালের জোয়ারে নৌকাকে কেবল অগ্রসর করে তাহা নহে, ডুবাইতেও পারে। প্রবল

জোয়ারের বেগ হইতে আত্মরক্ষার জন্য সবলে হাল বাগাইয়া ধরা চাই। ভাসিয়া যাওয়াই লক্ষ্য নহে, গম্যস্থানে পৌঁছানোই লক্ষ্য, আন্দোলনের উত্তেজনায় এ কথা আমরা বারংবার ভুলিয়া থাকি। আপাতত কর্তৃপক্ষের প্রতি স্পর্ধা প্রকাশ করিয়া আমাদের ক্ষুব্ধ হৃদয়ের তৃপ্তি হইতে পারে; কিন্তু কার্যসিদ্ধিতেই আমাদের চিরন্তন কল্যাণ এ কথা যাঁহারা এক মুহূর্ত ভোলেন না, দেশের সংকটের সময় তাঁহাদের হাতেই হাল ছাড়িয়া দিতে হয়। যখন রাগের মাথায় সর্বস্ব খোয়াইয়া মকদ্দমা জিতিবারই জেদ জন্মায়, তখনই শান্তচিত্ত প্রবীণ অভিভাবকের প্রয়োজন। সম্প্রতি আমরা সমস্ত স্বীকার করিয়া স্পর্ধা প্রকাশ করাকেই আমাদের চরম লক্ষ্য বলিয়া মনে করিতেছি, এমন অবস্থায় যদি দেশের কোনো স্থায়ী মঙ্গলকর কর্মকে সফলতার দিকে লইয়া যাইতে হয়, তবে গুরুদাসবাবুর মতো লোকের প্রয়োজন। স্পর্ধা প্রকাশের জন্য সভা উত্তম, সংবাদপত্রও উত্তম, কিন্তু জাতীয় বিদ্যালয় নৈব নৈব চ।

যাহাই হউক, আমাদের সংকল্পিত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবে অথবা তাহা ভাঙিয়া চুরিয়া যাইবে তাহা জানি না। যদি দেশ যথার্থভাবে এ কাজের জন্য প্রস্তুত না হইয়া থাকে, যদি আমরা এক উদ্দেশ্য করিয়া আর-একটা জিনিস গড়িবার আয়োজন করিয়া থাকি, তবে আমাদের জল্পনা-কল্পনা বৃথা হইয়া যাইবে। সেজন্য ক্ষোভ করা বৃথা। ইহা নিঃসন্দেহ, দেশ যদি বাঁচিতে চায়, তবে আজ না হউক কাল পুনরায় এই চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইবে। এখন যদি আমাদের আয়োজন পণ্ডও হয়, তবে যথাকালে ভবিষ্যৎ উদ্‌যোগের সময় এই প্রয়াসের ইতিহাস শিক্ষাপ্রদ হইবে।

১৩১২

একটি প্রশ্ন

ইংরেজিশব্দ বাংলা অক্ষরে লিখিবার সময় কতকগুলি জায়গায় ভাবনা উপস্থিত হয়। যথা—ইংরেজি sir। বাংলায় সার লেখা উচিত না সর্ লেখা উচিত? ইংরেজি v অক্ষরে বাংলার ব না ভ? vow শব্দ বাংলায় কি বৌ লিখিব, না ভৌ লিখিব, না বাউ অথবা ভাউ লিখিব। এ সম্বন্ধে অনেক পণ্ডিত যাহা বলেন তাহা অযৌক্তিক বলিয়া মনে হয়, তাই এ প্রশ্ন উত্থাপিত করিলাম।

সাধারণত পণ্ডিতেরা বলেন, perfect শব্দের e, sir শব্দের i আ নহে— উহা অ। stir শব্দের i এবং star শব্দের a কখনও এক হইতে পারে না— শেষোক্ত a আমাদের আ এবং প্রথমোক্ত i আমাদের অ। কিন্তু এ সম্বন্ধে আমার কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। শুনিবামাত্র অনুভব করা যায় যে, stir শব্দের i এবং star শব্দের a একই স্বর; কেবল উহাদের মধ্যে হ্রস্ব দীর্ঘ প্রভেদ মাত্র। সংস্কৃতবর্ণমালায় অ এবং আ-এ হ্রস্বদীর্ঘের প্রভেদ, কিন্তু বাংলাবর্ণমালায় তাহা নহে। বাংলা অ আকারের হ্রস্ব নহে, তাহা একটি স্বতন্ত্র স্বর, অতএব সংস্কৃত অ যেখানে খাটে বাংলা অ সেখানে খাটে না। হিন্দুস্থানিরা কলম শব্দ কিরূপে উচ্চারণ করে এবং আমরা কিরূপ করি তাহা মনোযোগ দিয়া শুনিলেই উভয় অকারের প্রভেদ বুঝা যায়। হিন্দুস্থানিরা যাহা বলে তাহা বাংলা অক্ষরে 'কালাম' বলিলেই ঠিক হয়। কারণ, আ স্বর আমরা প্রায় হ্রস্বই ব্যবহার করিয়া থাকি। বাংলায় কল লিখিলে ইংরেজি call কথাই মনে আসে, কখনও cull মনে হয় না; শেষোক্ত কথা বাংলায় কাল লিখিলেই প্রকৃত উচ্চারণের কাছাকাছি যায়। এইরূপ noun শব্দবর্তী ইংরেজি ou আমাদের ঔ নহে, তাহা আউ;— অথবা time শব্দবর্তী i আমাদের ঐ নহে তাহা আই। v শব্দের উচ্চারণ অনেকে বলিয়া থাকেন অন্ত্যস্থ ব। আমার তাহা ঠিক মনে হয় না। ইংরেজি w প্রকৃত অন্ত্যস্থ ব, ইংরেজি f অন্ত্যস্থ ফ, ইংরেজি v অন্ত্যস্থ ভ। কিন্তু অন্ত্যস্থ ফ অথবা অন্ত্যস্থ ভ আমাদের নাই। এইজন্য বাধ্য হইয়া f ও v-র জায়গায় আমাদিগকে ফ ও ভ ব্যবহার করিতে হয়; wise এবং voice শব্দ উচ্চারণ করিলে w এবং v-এর প্রভেদ বুঝা যায়। w-এর স্থানে ব দিলে বরঞ্চ সংস্কৃত-বর্ণমালার হিসাবে ঠিক হয়, কিন্তু v-র স্থানে ব দিলে কোন্ হিসাবে ঠিক হয় বুঝিতে পারি না। আমার মতে আমাদের বর্ণমালার ভ-ই v-এর সর্বাপেক্ষা কাছাকাছি আসে। যাহা হউক এই প্রশ্নের মীমাংসা প্রার্থনা করি।

১২৯২

সংজ্ঞাবিচার

পৌষমাসের বালকে উৎকৃষ্ট সংজ্ঞা বাহির করিবার জন্য ‘হুজুগ’, ‘ন্যাকামি’, এবং ‘আহ্লাদে’ এই তিনটি শব্দ নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলাম, পাঠকদের নিকট হইতে অনেকগুলি সংজ্ঞা আমাদের হাতে আসিয়াছে।[১]

কথাগুলি সম্পূর্ণ প্রচলিত। আমরা পরস্পর কথোপকথনে ওই কথাগুলি যখন ব্যবহার করি তখন কাহারও বুঝিবার ভুল হয় না, অথচ স্পষ্ট করিয়া অর্থ জিজ্ঞাসা করিলে ভিন্ন লোকে ভিন্ন অর্থ বলিয়া থাকেন। ইহা হইতে এমন বুঝাইতেছে না যে, বাস্তবিকই ওই কথাগুলি ভিন্ন লোকে ভিন্ন অর্থ বুঝিয়া থাকেন— কারণ, তাহা হইলে তো ও কথা লইয়া কোনো কাজই চলিত না। প্রকৃত কথা এই, আমরা অনেক জিনিস বুঝিয়া থাকি, কিন্তু কী বুঝিলাম সেটা ভালো করিয়া বুঝিতে অনেক চিন্তা আবশ্যক করে। যেমন আমরা অনেকে সহজেই সাঁতার দিতে পারি, কিন্তু কী উপায়ে সাঁতার দিতেছি তাহা বুঝাইয়া বলিতে পারি না। অথবা, একজন মানুষ রাগিলে তাহার মুখভঙ্গী দেখিলে আমরা সহজেই বলিতে পারি মানুষটা রাগিয়াছে; কিন্তু আমি যদি পাঁচজনকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করি, আচ্ছা বলো দেখি রাগিলে মানুষের মুখের কিরূপ পরিবর্তন হয়, মুখের কোন্ কোন্ মাংসপেশির কিরূপ বিকার হয়, মুখের কোন্ অংশের কিরূপ অবস্থান্তর হয়, তাহা হইলে পাঁচজনের বর্ণনায় প্রভেদ লক্ষিত হইবে। অথচ ক্রুদ্ধ মনুষ্যকে দেখিলেই পাঁচজনে বিনা মতভেদে সমস্বরে বলিয়া উঠিবে লোকটা ভারি চটিয়া উঠিয়াছে। পাঠকদের নিকট হইতে যে-সকল সংজ্ঞা পাইয়াছি তাহার কতকগুলি এই স্থানে পরে পরে আলোচনা করিয়া দেখিলেই পরস্পরের মধ্যে অনেক প্রভেদ দেখা যাইবে।

একজন বলিতেছেন, ‘হুজুক—জনসাধারণের হৃদয়োন্মাদক আন্দোলন।’ তা যদি হয় তো, বুদ্ধ চৈতন্য যিশু ক্রমোয়েল ওয়াশিংটন প্রভৃতি সকলেই হুজুক করিয়াছিলেন। কিন্তু লেখক কখনোই সচরাচর কথোপকথনে এরূপ অর্থে হুজুক ব্যবহার করেন না।

ইনিই বলিতেছেন, ‘ন্যাকামি— অভিমানবশত কিছুতে অনিচ্ছা প্রকাশ অথবা ইচ্ছাসত্ত্বে অভিমানীর অনিচ্ছা প্রকাশ।’

---

[১] পাঠকদের প্রতি: বালকের যে-কোনো গ্রাহক ‘হুজুগ’, ‘ন্যাকামি’ ও ‘আহ্লাদে’ শব্দের সর্বোৎকৃষ্ট সংক্ষেপ সংজ্ঞা (definition) লিখিয়া পৌষমাসের ২০শে তারিখের মধ্যে আমাদিগের নিকট পাঠাইবেন তাঁহাকে একটি ভালো গ্রন্থ পুরস্কার দেওয়া হইবে। একেকটি সংজ্ঞা পাঁচটি পদের অধিক না হয়। বালক, ১২৯২ পৌষ।

স্থলবিশেষে অভিমানচ্ছলে কোনো ব্যক্তি ন্যাকামি করিতেও পারে, কিন্তু তাই বলিয়া অভিমানবশত অনিচ্ছা প্রকাশ করাকেই যে ন্যাকামি বলে তাহা নহে।

আহ্লাদে শব্দের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া ইনি বলেন, 'দশজনের আহ্লাদ পাইয়া অহংকৃত।' প্রশ্রয়প্রাপ্ত, অহংকৃত এবং 'আহ্লাদের'-র মধ্যে যে অনেক প্রভেদ বলাই বাহুল্য।

হুজুগ শব্দের নিম্নলিখিত প্রাপ্ত সংজ্ঞাগুলি পরে পরে প্রকাশ করিলাম।

হুজুগ

১। বিস্ময়জনক সংবাদ যাহা সত্য কি মিথ্যা নির্ণয় করা কঠিন।

২। অকারণ বিষয়ে উদ্যোগ ও উৎসাহ (অকারণ শব্দের দুই অর্থ—১ অনির্দিষ্ট; ২ তুচ্ছ, সামান্য)।

৩। অল্পেতে নেচে ওঠার নাম।

৪। অতিরঞ্জিত জনরব।

*

৬। ফল অনিশ্চিত এরূপ বিষয়ে মাতা।

৭। কোনো-এক ঘটনা, লোকে যাহার হ্যাপায় প'ড়ে স্রোতে ভাসে। 'বাজারদরে নেচে বেড়ানো।' 'ঝড়ের আগে ধুলা উড়া।'

৮। ফস্ কথায় নেচে ওঠা।

৯। দেশব্যাপী কোনো নূতন (সত্য এবং মিথ্যা) আন্দোলন।

১০। বাহ্যাড়ম্বরের মত্ততা।

প্রথম সংজ্ঞাটি যে ঠিক হয় নাই তাহা ব্যক্ত করিয়া বলাই বাহুল্য।

দ্বিতীয় সংজ্ঞা সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, লেখক নিজেই অকারণ শব্দের যে-অর্থ নির্দেশ করিয়াছেন তাহা পরিষ্কার নহে। অনির্দিষ্ট অর্থাৎ যাহার লক্ষ্য স্থির হয় নাই এমন কোনো তুচ্ছ সামান্য বিষয়কেই বোধ করি তিনি অকারণ বিষয় বলিতেছেন—তাঁহার মতে এইরূপ বিষয়ে উদ্যোগ ও উৎসাহকেই হুজুক বলে। কেহ যদি বিশেষ উদ্যোগের সহিত একটা বালুকার স্তূপ নির্মাণ করিয়া সমস্ত দিন ধরিয়া পরমোৎসাহে তাহা আবার ভাঙিতে থাকে তবে তাহাকে হুজুকে বলিবে না পাগল বলিবে?

তৃতীয় সংজ্ঞা। রাম যদি ঘুড়ি উড়াইবার প্রস্তাব শুনিবামাত্র উৎসাহে নাচিয়া উঠে তবে রামকে কি হুজুকে বলিবে।

চতুর্থ সংজ্ঞা। অতিরঞ্জিত জনরবকে যে হুজুক বলে না তাহা আর কাহাকেও

---

* মূলে মুদ্রাকরপ্রমাদ।

বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। শ্যাম তাহার কন্যার বিবাহোপলক্ষে পাঁচ শ টাকা খরচ করিয়াছে ; লোকে যদি রটায় যে সে পাঁচ হাজার টাকা খরচ করিয়াছে, তবে সেই জনরবকেই কি হুজুক বলিবে।

পঞ্চম সংজ্ঞা। মাঝে মাঝে সংবাদপত্রে অসম্ভব সংবাদ রাষ্ট্র হইয়া থাকে, তাহাকে কেহ হুজুক বলে না।

ষষ্ঠ সংজ্ঞা। লাভ অনিশ্চিত এমনতরো ব্যবসায়ে অনেকে অর্থলোভে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন, সেরূপ ব্যবসায়কে কেহ হুজুক বলে না।

সপ্তম। এ সংজ্ঞাটি পরিষ্কার নহে। যে-ঘটনার স্রোতে লোকে ভাসিতে থাকে তাহাকে হুজুক বলা যায় না ; তবে লেখক হ্যাপা শব্দের যোগ করিয়া ইহার মধ্যে আর-একটি নূতন ভাব প্রবেশ করাইয়াছেন। কিন্তু হ্যাপা শব্দের ঠিক অর্থটি কী সে সম্বন্ধে তর্ক উঠিতে পারে, অতএব হুজুগ শব্দের ন্যায় হ্যাপা শব্দও সংজ্ঞানির্দেশযোগ্য। সুতরাং হ্যাপা শব্দের সাহায্যে হুজুগ শব্দ বোঝাইবার চেষ্টা সংগত হয় না। 'বাজার-দরে নেচে বেড়ানো', 'ঝড়ের আগে ধুলা উড়া'— দুটি ব্যাখ্যাও সুস্পষ্ট নহে।

অষ্টম। হরি যদি মাধবকে বলে, তুই ট্যাঁকশালের দাওয়ান হইবি,— অমনি যদি মাধব নাচিয়া উঠে— তবে মাধবের সেই উৎসাহ-উল্লাসকে হুজুগ বলা যায় না।

নবম। আন্দোলন নূতন হইলেই তাহাকে হুজুগ বলা যাইতে পারে না।

দশম। বাহ্যাড়ম্বরে মত্ততা মাত্রই হুজুগ বলিতে পারি না। কোনো রায়বাহাদুর যদি তাহার খেতাব ও গাড়িজুড়ি লইয়া মাতিয়া থাকে, তাহার সেই মত্ততাকে কি হুজুগ বলা যায়।

আমরা যে-লেখককে পুরস্কার দিয়াছি তিনি হুজুগ শব্দের নিম্নলিখিতমতো ব্যাখ্যা করেন :

> 'মাথা নাই মাথা ব্যথা' গোছের কতকগুলো নাচুনে জিনিস লইয়া যে-নাচন আরম্ভ হয় সেই নাচনের অবস্থাকেই হুজুগ বলে। বিশেষ কিছুই হয় নাই অথবা অতি সামান্য একটা-কিছু হইয়াছে আর সেইটাকে লইয়া সকলে নাচিয়া উঠিয়াছে, এই অবস্থার নাম হুজুগ।

আমরা দেখিতেছি হুজুগে প্রথমত এমন একটা বিষয় থাকা চাই যাহার প্রতিষ্ঠাভূমি নাই— যাহার ডালপালা খুব বিস্তৃত, কিন্তু শিকড়ের দিকের অভাব। মনে করো আমি 'সার্বজনীনতা' বা 'বিশ্বপ্রেম' প্রচারের জন্য এক সম্প্রদায় সৃষ্টি করিয়া বসিয়াছি ; তাহার কত মন্ত্রতন্ত্র কত অনুষ্ঠান তাহার ঠিক নাই, কিন্তু আমার ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের বহির্ভূত লোকদের প্রতি আমাদের জাত-বিদ্বেষ প্রকাশ পাইতেছে— মূলেই প্রেমের অভাব অথচ প্রেমের অনুষ্ঠানের ত্রুটি নাই। দ্বিতীয়ত,

ইহার সঙ্গে একটা নাচনের যোগ থাকা চাই, অর্থাৎ কাজের প্রতি ততটা নহে যতটা মত্ততার প্রতি লক্ষ। অর্থাৎ হো-হো করিয়া বেশ সময় কাটিয়া যাইতেছে, খুব একটা হাঙ্গামা হইতেছে এবং তাহাতেই একটা আনন্দ পাইতেছি। যদি স্থির হইয়া স্তব্ধভাবে কাজ করিতে বলো তবে তাহাতে মন লাগে না, কারণ নাচানো এবং নাচা, এ-দুটোই মুখ্য আবশ্যক। তৃতীয়ত, কেবল একজনকে লইয়া হুজুগ হয় না— সাধারণকে আবশ্যক— সাধারণকে লইয়া একটা হট্টগোল বাধাইবার চেষ্টা। চতুর্থত, হুজুগ কেবল একটা খবরমাত্র রটানো নহে ; কোনো অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবার জন্য সমারোহের সহিত উদ্যোগ করা, তার পরে সেটা হউক বা না-হউক।

আমাদের পুরস্কৃত সংজ্ঞালেখকের সংজ্ঞা যে সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ ও যথেষ্ট সংক্ষিপ্ত হইয়াছে তাহা বলিতে পারি না। তিনি তাঁহার সংজ্ঞার দুইটি পদকে সংক্ষেপ করিয়া অনায়াসেই একপদে পরিণত করিতে পারিতেন।

সংজ্ঞা রচনা করা যে দুরূহ তাহার প্রধান একটা কারণ এই দেখিতেছি যে, একটি কথার সহিত অনেকগুলি জটিল ভাব জড়িত হইয়া থাকে, লেখকেরা সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞার মধ্যে তাহার সকলগুলি গুছাইয়া লইতে পারেন না— অনবধানতাদোষে একটা-না-একটা বাদ পড়িয়া যায়। উদ্ধৃত সংজ্ঞাগুলির মধ্যে পাঠকেরা তাহার দৃষ্টান্ত পাইয়াছেন।

ন্যাকামি

১। জানিয়া না-জানার ভাণ।
২। জানিয়া না-জানার ভাব প্রকাশ করা।
৩। জেনেও জানি না, এই ভাব প্রকাশ করা।
৪। জানিয়াও না-জানার ভাণ।
৫। অবগত থাকিয়া অজ্ঞতা দেখানো।
৬। বিলক্ষণ জানিয়াও অজ্ঞানতার লক্ষণ প্রকাশ করা।
৭। বুঝেও নিজেকে অবুঝের ন্যায় প্রতিপন্ন করা।
৮। সেয়ানা হয়ে বোকা সাজা।
৯। জেনেশুনে ছেলেমি।
১০। বুঝে অবুঝ হওয়া। জেনেশুনে হাবা হওয়া।
১১। ইচ্ছাকৃত অজ্ঞতা এবং মিথ্যা সরলতা।

প্রথম হইতে সপ্তম সংজ্ঞা পর্যন্ত সকলগুলির ভাব প্রায় একই রকম। অর্থাৎ সকলগুলিতেই জানিয়াও না-জানার ভাণ, এই অর্থই প্রকাশ পাইতেছে ; কিন্তু এরূপ ভাবকে অসরলতা মিথ্যাচরণ বা কপটতা বলা যায়। কিন্তু কপটতা ও ন্যাকামি

ঠিক একরূপ জিনিস নহে। অষ্টম সংজ্ঞায় লেখক শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ রায় যে বলিয়াছেন, সেয়ানা হইয়া বোকা সাজা, ইহাই আমার ঠিক বোধ হয়। জানিয়া না-জানার ভাব প্রকাশ করিলেই হইবে না, সেই সঙ্গে প্রকাশ করিতে হইবে আমি যেন নির্বোধ, আমার যেন বুঝিবার শক্তিই নাই। ষষ্ঠ এবং সপ্তম সংজ্ঞাতেও কতকটা এই ভাব প্রকাশ পাইয়াছে, কিন্তু তেমন স্পষ্ট হয় নাই। নবম ও দশম সংজ্ঞা ঠিক হইয়াছে। কিন্তু অষ্টম হইতে দশম সংজ্ঞাতে বোকা, ছেলেমি, হাবা শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে; এই শব্দগুলি সংজ্ঞানির্দেশযোগ্য। অর্থাৎ হাবামি, বোকামি ও ছেলেমির বিশেষ লক্ষণ কী তাহা মনোযোগসহকারে আলোচনা করিয়া দেখিবার বিষয়। এইজন্য একাদশ সংজ্ঞার লেখক যে ইচ্ছাকৃত অজ্ঞতার ভাণের সঙ্গে 'মিথ্যা সরলতা' শব্দ যোগ করিয়া দিয়াছেন, তাহাতে ন্যাকামি শব্দের অর্থ পরিষ্কার হইয়াছে। অজ্ঞতা এবং সরলতা উভয়ের ভাণ থাকিলে তবে ন্যাকামি হইতে পারে। আমাদের পুরস্কৃত সংজ্ঞালেখক লিখিয়াছেন, "ন্যাকামি বলিতে সাধারণত জানিয়া শুনিয়া বোকা সাজার ভাব বুঝায়" পরে দ্বিতীয় পদে তাহার ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন, "যেন কিছু জানে না, যেন কিছু বুঝে না এই ভাবের নাম ন্যাকামি।" যেন কিছু জানে না, যেন কিছু বুঝে না বলিতে লোকটা যেন নেহাত হাবা, নিতান্ত খোকা এইরূপ বুঝায়, লোকটা যেন কিছু বুঝেই না, এবং তাহাকে বুঝাইবার উপায়ও নাই।

আহ্লাদে

১। স্বার্থের জন্য বিবেচনারহিত।
২। যাহারা পরিমাণাধিক আহ্লাদে সর্বদাই মত্ত।
৩। যে সকল-তা'তেই অন্যায়রূপে আমোদ চায়, অথবা যে হক্ না হক্ দাঁত বের করে।
৪। অযথা আনন্দ বা অভিমান -প্রকাশক।
৫। অন্যকে অসন্তুষ্ট করিয়া যে নিজে হাসে।
৬। যে সর্বদা আহ্লাদ করিয়া বেড়ায়।
৭। কী সময়ে কী অসময়ে যে আহ্লাদ প্রকাশ করে।
৮। যে অভিমানী অল্পে অধৈর্য হয়।
৯। যে অনুপযুক্ত সময়েও আবদারী।
১০। সাধের গোপাল নীলমণি।

আমার বোধ হয়, যে-ব্যক্তি নিজেকে জগতের আদুরে ছেলে মনে করে তাহাকে আহ্লাদে বলে; প্রশ্রয়দাত্রী মায়ের কাছে আদুরে ছেলেরা যেরূপ ব্যবহার করে যে-ব্যক্তি সকল জায়গাতেই কতকটা সেইরূপ ব্যবহার করিতে যায়। অর্থাৎ যে-ব্যক্তি সময়-অসময় পাত্রাপাত্র বিচার না করিয়া সর্বত্র আবদার করিতে যায়, সর্বত্রই দাঁত বাহির

করে, মনে করে সকলেই তাহার সকল বাড়াবাড়ি মাপ করিবে, সে-ই আহ্লাদে। তাহাকে কে চায় না-চায়, তাহাকে কে কী-ভাবে দেখে, সে-বিষয় বিবেচনা না করিয়া সে ঢুলিতে ঢুলিতে গায়ে পড়িয়া সকলের গা ঘেঁষিয়া বসে, সকলের আদর কাড়িতে চেষ্টা করে। সংজ্ঞালেখকগণ অনেকেই আহ্লাদে ব্যক্তির এক-একটি লক্ষণমাত্র নির্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু যাহা বলিলে তাহার সকল লক্ষণ ব্যক্ত হয় এমন কোনো কথা বলেন নাই। দশম সংজ্ঞাকে ঠিক সংজ্ঞা বলাই যায় না।

যাঁহাকে পুরস্কার দেওয়া গিয়াছে তাঁহার আহ্লাদে শব্দের সংজ্ঞা ঠিক হয় নাই। তিনি বলেন :

> ভাতের ফেনের মতো টগবগে। যাহাদিগের প্রায় সকল কার্যেই 'একের মরণ অন্যের আমোদ' কথার সত্যতা প্রমাণ হয়, অর্থাৎ তুমি বাঁচ আর মর আমার আমোদ হইলেই হইল, ইহাই যাহাদিগের মত ও কার্য, তাহাদিগকে 'আহ্লাদে' বলা যায়।

আমাদের পুরস্কৃত সংজ্ঞালেখক দুটি সংজ্ঞার উত্তর দিয়াছেন। তৃতীয়টিতে কৃতকার্য হন নাই। শ্রী বঃ— বলিয়া তিনি আত্মপরিচয় দিয়াছেন, বোধ করি নাম প্রকাশ করিতে অসম্মত। আমরা বলিয়াছিলাম সংজ্ঞা পাঁচ পদের অধিক না হয়, কেহ কেহ পদ বলিতে শব্দ বুঝিয়াছেন। আমরা ইংরেজি sentence অর্থে পদ ব্যবহার করিয়াছি।

১২৯২

'নিছনি'

১

তৃতীয়সংখ্যক 'সাধনা'য় কোনো পাঠক নিছনি শব্দের অর্থ জিজ্ঞাসা করিয়াছেন ; তাহার উত্তরে জগদানন্দবাবু নিছনি শব্দের অর্থ অনিচ্ছা লিখিয়াছেন।[১] কিন্তু প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে অনিচ্ছা অর্থে নিছনির ব্যবহার কোথাও দেখা যায় নাই। গোবিন্দদাসে আছে :

> গৌরাঙ্গের নিছনি লইয়া মরি।

স্পষ্টই অনুমান করা যায়, 'বালাই লইয়া মরি' বলিতে যে ভাব বুঝায় 'নিছনি লইয়া

---

[১] প্রশ্ন : প্রাচীন কাব্যে নিছনি শব্দের বহুল ব্যবহার দেখা যায়। তাহার প্রকৃত অর্থ কী এবং তাহা সংস্কৃত কোন্ শব্দ হইতে উৎপন্ন। শব্দতত্ত্বান্বেষী। সাধনা, ১২৯৮ মাঘ।

উত্তর : নিছনি শব্দের অর্থ অনিচ্ছা। শ্রীজগদানন্দ রায়. কৃষ্ণনগর। সাধনা, ১২৯৮ ফাল্গুন।

মরি' বলিতে তাহাই বুঝাইতেছে। কিন্তু সর্বত্র নিছনি শব্দের এরূপ অর্থ পাওয়া যায় না। বসন্ত রায়ের কোনো পদে আছে :

পরাণ কেমন করে মরম কহিনু তোরে,
জীবন নিছনি তুয়া পাশ।

এখানে নিছনি বলিতে কতকটা উপহারের ভাব বুঝায়।

বসন্ত রায়ের অন্যত্র আছে :

তোমার পিরীতে হাম হইনু বিকিনী,
মূলে বিকালাঙ আর কি দিব নিছনি।

এখানে নিছনি বলিতে কা বুঝাইতেছে ঠিক করিয়া বলা শক্ত। এরূপ স্থলে নিছনি শব্দের সংস্কৃত মূলটি বাহির করিতে পারিলে অর্থ নির্ণয়ের সাহায্য হইতে পারে।

গোবিন্দদাসের এক স্থলে আছে :

দোঁহে দোঁহে তনু নিরছাই।

এ স্থলে 'নিছিয়া' এবং 'নিরছাই' এক ধাতুমূলক বলিয়া সহজেই বোধ হয়।

অন্যত্র আছে :

বরু হাম জীবন তোহে নিরমঞ্ছব
তবহুঁ না সোঁপব অঙ্গ।

ইহার অর্থ, বরং আমার জীবন তোমার নিকট পরিত্যাগ করিব তথাপি অঙ্গ সমর্পণ করিব না।

আর-এক স্থলে দেখা যায় :

কুণ্ডল পিচ্ছে চরণ নিরমঞ্ছল
অব কিয়ে সাধসি মান।

অর্থাৎ তোমার চরণে মাথা লুটাইয়া কানের কুণ্ডল ও চূড়ার ময়ূরপুচ্ছ দিয়া তোমার পা মুছাইয়া দিয়াছে, তথাপি তোমার মান গেল না?

এই নির্মঞ্ছন শব্দই যে নিছনি শব্দের মূল রূপ, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

অভিধানে নির্মঞ্ছন শব্দের অর্থ দেখা যায়— 'নীরাজনা, আরুতি, সেবা, মোছা।' নীরাজনা অর্থ "আরাত্রিক, দীপমালা, সজলপদ্ম, ধৌতবস্ত্র, বিল্বপত্রাদি, সাষ্টাঙ্গ-প্রণাম— এই পঞ্চ দ্বারা আরাধনা, আরুতি।" উহার আর-এক অর্থ 'শান্তিকর্ম-বিশেষ।'

অতএব যেখানে 'নিছনি লইয়া মরি' বলা হয়, সেখানে বুঝায় তোমার সমস্ত অমঙ্গল লইয়া মরি— এখানে 'শান্তিকর্ম' অর্থের প্রয়োগ।

দোঁহে দোঁহে তনু নিরছাই

এ স্থলে নিরছাই অর্থে মোছা।

নিরমল কুলশীল বিদিত ভুবন,
নিছনি করিনু তোমার ছুঁইয়া চরণ।

এখানে নিছনি অর্থে স্পষ্টই আরাধনার অর্ঘ্যোপহার বুঝাইতেছে।

পরাণ নিছিয়া দিই পিরীতে তোমার

অর্থাৎ, তোমার প্রেমে প্রাণকে উপহারস্বরূপে অর্পণ করি।

তোমার পিরীতে হাম হইনু বিকিনী
মূলে বিকালাঙ, আর কি দিব নিছনি!

ইহার অর্থ বোধ করি নিম্নলিখিত মতো হইবে—

> তোমার প্রেমে যখন আমি সমূলে বিক্রীত হইয়াছি তখন বিশেষ করিয়া আরাধনাযোগ্য উপহার আর কী দিব।

বর্তমানপ্রচলিত ভাষায় এই নিছনি শব্দের ব্যবহার আছে কি না জানিতে উৎসুক আছি; যদি কোনো পাঠক অনুগ্রহ করিয়া জানান তো বাধিত হই। চণ্ডীদাসের পদাবলীতে নিছনি শব্দ কোথাও দেখি নাই।

১২৯৮

২

মনেতে করিয়ে সাধ যদি হয় পরিবাদ যৌবন সকল করি মানি
জ্ঞানদাসেতে কয় এমত যাহার হয় ত্রিভুবনে তাহার নিছনি।

এ স্থলে নিছনি অর্থে পূজা। আমার প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছি 'নির্মঞ্ছন' শব্দের একটি অর্থ আরাধনা।

সই এবে বলি কিরূপ দেখিনু
দেখিয়া মোহন রূপ আপনে নিছিনু।

নিছনি অর্থে যখন মোছা হয় তখন 'আপনে নিছিনু' অর্থে আপনাকে মুছিলাম অর্থাৎ আপনাকে ভুলিলাম অর্থ অসংগত হয় না।

পদ পঙ্কজপরি মণিময় নূপুর রুনুঝুনু খঞ্জন ভাষ
মদন মুকুর জনু নখমণি দরপণ নিছনি গোবিন্দদাস।

আমার মতে এ স্থলে নিছনি অর্থে পূজার উপহার। অর্থাৎ গোবিন্দদাস চরণপঙ্কজে আপনাকে অর্ঘ্যস্বরূপে সমর্পণ করিতেছেন।

যশোদা আকুল হইয়া ব্যাকুলি রাইএরে করল কোলে
ও মোর বাছনি জান মু নিছনি ভোজন করহ ব'লে।

'জান মু নিছনি' অর্থাৎ আমি তোমার নিছনি যাই। অর্থাৎ তোমার অশান্তি অমঙ্গল

আমি মুছিয়া লই ; যেরূপ ভাবে 'বালাই লইয়া মরি' ব্যবহার হয়, 'নিছনি যাই' বলিতেও সেইরূপ ভাব প্রকাশ হইতেছে।

নয়নে গলয়ে ধারা দেখি মুখখানি
কার ঘরের শিশু তোমার যাইতে নিছনি।

আমার বিবেচনায় এখানেও নিছনি অর্থে বালাই বুঝাইতেছে।

সবার অগ্রজ তুমি, তোরে কি শিখাব আমি
বাপ মোর যাইরে নিছনি।

এখানেও তাহাই।

নিছনি যাইয়ে পুত্র উঠহ এখন
কহয়ে মাধব উঠি বসিল তখন।

নিছনি যাইয়ে— অর্থাৎ সমস্ত অমঙ্গল দূর হইয়া।

১। অমিয়া নিছনি বাজিছে সঘনে মধুর মুরলী গীত
অবিচল কুল রমণী সকল শুনিয়া হরল চিত।

অমিয়া নিছনি— অর্থাৎ অমৃত মুছিয়া লইয়া।

২। নন্দের নন্দন গোকুল কানাই সবাই আপনা বোলে
মোপুনি ইছিয়া নিছিয়া লইনু অনাদি জনম ফলে।

নিছিয়া লইনু— আরাধনা করিয়া লইনু, অর্থাৎ বরণ করিয়া লইনু অর্থ হইতে পারে।

৩। তথা কনক বরণ কিরে দরপন নিছনি দিয়ে যে তার
কপালে ললিত চান্দ যে শোভিত সিন্দুর অরুণ আর।
৪। তনু ধন জন যৌবন নিছিনু কালার পিরিতে।

উদ্ধৃত [১, ২, ৩, ৪] অংশগুলি চণ্ডীদাসের পদের অন্তর্গত সন্দেহ নাই।

নিছনি শব্দ যদি নির্মঞ্ছন শব্দেরই অপভাষা হয় তবে নির্মঞ্ছন শব্দের যতগুলি অর্থ আছে নিছনি শব্দের তদতিরিক্ত অর্থ হওয়ার সম্ভাবনা বিরল। দীনেন্দ্রকুমার বাবু নিছনি শব্দের যতগুলি প্রয়োগ উদ্ধৃত করিয়াছেন[১] তাহার সকলগুলিতেই কোনো না কোনো অর্থে নির্মঞ্ছন শব্দ খাটে।

দীনেন্দ্রবাবু শ্রম স্বীকার করিয়া এই আলোচনায় যোগ দিয়াছেন সেজন্য আমি বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছি। আমাদের প্রাচীন কাব্যে যে-সকল দুর্বোধ শব্দপ্রয়োগ আছে সাধারণের মধ্যে আলোচিত হইয়া এইরূপে তাহার মীমাংসা হইতে পারিলে বড়োই সুখের বিষয় হইবে।

১২৯৯

---

[১] 'নিছনি'— শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়। সাধনা, ১২৯৯ বৈশাখ।

'পহুঁ'

বৈষ্ণব কবিদের গ্রন্থে সচরাচর পহুঁ শব্দের দুই অর্থ দেখা যায়, প্রভু এবং পুনঃ। শ্রদ্ধাস্পদ অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় তাঁহার প্রকাশিত প্রাচীন কাব্যসংগ্রহের টীকায় লিখিয়াছেন পহু অর্থে প্রভু এবং পঁহু অর্থে পুনঃ। কিন্তু উভয় অর্থেই পহুঁ শব্দের ব্যবহার এত দেখা গিয়াছে যে, নিশ্চয় বলা যায় এ নিয়ম এক্ষণে আর খাটে না।

দীনেন্দ্রবাবু যতগুলি ভণিতা উদ্ধৃত করিয়াছেন প্রায় তাহার সকলগুলিতেই পহু এবং পহুঁ শব্দের অর্থ প্রভু।[1]

গোবিন্দদাস পহু নটবর শেখর

অর্থাৎ গোবিন্দদাসের প্রভু নটবর শেখর।

রাধামোহন পহুঁ রসিক সুনাহ

অর্থাৎ রাধামোহনের প্রভু রসিক সু-নাথ।

নরোত্তমদাস পহুঁ নাগর কান,
রসিক কলাগুরু তুহু সব জান।

ইহার অর্থ এই, তুমি নরোত্তমদাসের প্রভু নাগর কান, তুমি রসিক কলাগুরু, তুমি সকলই জান। এরূপ ভণিতা হিন্দি গানেও দেখা যায়। যথা :

তানসেনপ্রভু আকবর।

বৈষ্ণব পদে স্থানে স্থানে সমাস ভাঙাও দেখা যায়। যথা :

গোবিন্দদাসের পহু
হাসিয়া হাসিয়া রহু।

কেবল একটা ভণিতায় এই অর্থ খাটে না।

রাধামোহন পহু দুহু অতি নিরুপম।

এ স্থলে পহুঁ-র ভণে অর্থ না হইলে আর-কোনো অর্থ পাওয়া যায় না।

আমি যতদূর আলোচনা করিয়াছি তাহাতে গোবিন্দদাস এবং তাহার অনুকরণকারী রাধামোহন ব্যতীত আর-কোনো বৈষ্ণব কবিতায় পহুঁ শব্দের এরূপ অর্থ নাই। রাধামোহনেও ভণে অর্থে পহুঁ-র ব্যবহার অত্যন্ত বিরল— দৈবাৎ দুই-একটি যদি পাওয়া যায়।

রাধামোহন পহু তুয়া পায়ে নিবেদয়ে।

---

[1] 'পহু' (১)— শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়। সাধনা ১২৯৯ জ্যৈষ্ঠ।

এ স্থলে পহুঁ অর্থে পুনঃ এবং অন্যত্র অধিকাংশ স্থলেই পহুঁ অর্থে প্রভু। কিন্তু গোবিন্দদাসের অনেক স্থলে পহুঁ-র 'ভণে' অর্থব্যবহার দেখা যায়।

গোবিন্দদাস পহু দীপ সায়াহ্ন, বেলি অবসান ভৈ গেলি।

অর্থাৎ গোবিন্দদাস কহিতেছেন বেলা অবসান হইয়াছে, সন্ধ্যাদীপের সময় হইল। ইহা ছাড়া এ স্থলে আর-কোনোরূপ অর্থ কল্পনা করা যায় না। আরও এমন অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে।

এক্ষণে কথা এই, কোন্ ধাতু অনুসারে পহুঁ-র ভণে অর্থ স্থির হইতে পারে। এক, ভণহুঁ[১] হইতে ভহুঁ এবং ক্রমে পহুঁ হওয়া নিতান্ত অসম্ভব নহে— কিন্তু ইহা একটা কাল্পনিক অনুমানমাত্র। বিশেষত, যখন গোবিন্দদাস ব্যতীত অন্য কোনো প্রাচীন পদকর্তার পদে পহুঁ-র এরূপ অর্থ দেখা যায় না তখন উক্ত অনুমানের সংগত ভিত্তি নাই বলিতে হইবে।

আমার বিবেচনায় পূর্বোক্তরূপ ভণিতা পহুঁ অর্থে পুনঃ-ই ধরিয়া লইতে হইবে, এবং স্থির করিতে হইবে এরূপ ক্রিয়াহীন অসম্পূর্ণ পদবিন্যাস গোবিন্দদাসের একটি বিশেষত্ব ছিল। 'গোবিন্দদাস পঁহু,' অর্থাৎ 'গোবিন্দদাস পুনশ্চ বলিতেছেন', এইরূপ অর্থ করিতে হইবে। গোবিন্দদাসের স্থানে স্থানে পহুঁ শব্দের পরে ক্রিয়ার যোগও দেখা যায়। যথা :

গোবিন্দদাস পহু এই রস গায়।

অর্থাৎ গোবিন্দদাস পুনশ্চ এই রস গান করেন।

পাঠকেরা আপত্তি করিতে পারেন এরূপ স্থলে পুনঃ অর্থের বিশেষ সার্থকতা দেখা যায় না। কিন্তু প্রাচীন কবিদের পদে একপ্রকার অনির্দিষ্ট অর্থে পুনঃ শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। যথা :

তুহারি চরিত নাহি জানি, বিদ্যাপতি পুন শিরে কর হানি।
রাধামোহন পুন তঁহি ভেল বঞ্চিত।
গোবিন্দদাস কহই পুন এতিখনে জানিয়ে কী ভেল গোরি।

যাহা হউক, গোবিন্দদাস কখনো বা ক্রিয়াপদের সহিত যোগ করিয়া কখনো বা ক্রিয়াপদকে উহ্য রাখিয়া পহুঁ শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু সেই সেই স্থলে পহুঁ অর্থে পুনঃ-ই বুঝিতে হইবে। অন্য কোনোরূপ আনুমানিক অমূলক অর্থ কল্পনা করিয়া লওয়া সংগত হয় না।

এই স্থলে প্রসঙ্গক্রমে বলিতেছি, আমার কোনো শ্রদ্ধেয় পূর্ববঙ্গবাসী বন্ধুর নিকট

---

[১] ভণহ বিদ্যাপতি, শুন বর যুবতী।

শুনিলাম যে, তাঁহাদের দেশে 'নিছেপুঁছে' শব্দের চলন আছে। এবং নববধূ ঘরে আসিলে তাহার মুখে গায়ে হাত বুলাইয়া তাহাকে 'নিছিয়া' লওয়া হয়। অতএব এরূপ চলিত প্রয়োগ থাকিলে নিছনি শব্দের অর্থ সম্বন্ধে সংশয় থাকে না।

১২৯৯

প্রত্যুত্তর

পঁহু প্রসঙ্গ

১

শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী[১]
মান্যবরেষু

আপনি বলিয়াছেন :

> অপভ্রংশের নিয়ম সকলজাতির মধ্যে সমান নহে, কারণ কণ্ঠের ব্যাবৃত্তি সকলের সমান নহে। দুঃখের বিষয় বাংলার শব্দশাস্ত্র এখনও রচিত হয় নাই।

এ কথা নিঃসন্দেহ সত্য। এবং এইজন্যই বাংলার কোন্ শব্দটা শব্দশাস্ত্রের কোন্ নিয়মানুসারে বিকার প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা নির্ণয় করা কঠিন।

আপনার মতে :

> শব্দশাস্ত্রের কোনো সূত্র অনুসারে প্রভু হইতে পঁহু শব্দের ব্যুৎপত্তি করা যায় না।

কিন্তু যে-হেতুক বাংলার শব্দশাস্ত্র এখনও রচিত হয় নাই, ইহার সূত্র নির্ধারণ করার কোনো উপায় নাই। অতএব বাংলার আরও দুইচারিটা শব্দের সহিত তুলনা করা ছাড়া অন্য পথ দেখিতেছি না।

বোধ করি আপনার তর্কটা এই যে, মূল শব্দে যেখানে অনুনাসিকের কোনো সংস্রব নাই, সেখানে অপভ্রংশে অনুনাসিকের প্রয়োগ শব্দশাস্ত্রের নিয়মবিরুদ্ধ। 'বন্ধু' হইতে পঁহু শব্দের উৎপত্তি স্থির করিলে এই সংকট হইতে উদ্ধার পাওয়া যায়।

কিন্তু শব্দতত্ত্বে সর্বত্র এ নিয়ম খাটে না, তাহার দৃষ্টান্ত দেখাই ; যথা, কঙ্ক হইতে কাঁকাল, বক্র হইতে বাঁকা, অক্ষি হইতে আঁখি, শস্য হইতে শাঁস, সত্য হইতে সাঁচ্চা। যদি বলেন, পরবর্তী যুক্ত-অক্ষরের পূর্বে চন্দ্রবিন্দু যোগ হইতে পারে কিন্তু অযুক্ত অক্ষরের পূর্বে হয় না, সে কথাও ঠিক নহে। শাবক হইতে ছাঁ, প্রাচীর হইতে পাঁচিল তাহার দৃষ্টান্তস্থল। সাধারণত অপ্রচলিত এবং বৈষ্ণব পদাবলীতেই

---

[১] প্রশ্নকর্তা। 'পঁহু'— সাধনা, ১২৯৯ শ্রাবণ।

বিশেষরূপে ব্যবহৃত দুই-একটি শব্দ উদাহরণস্বরূপে উল্লেখ করা যাইতে পারে ; যথা, শৈবাল হইতে শেঁয়লি, শ্রাবণ হইতে সাঙন।

ত বর্গের চতুর্থ বর্ণ ধ যেমন হ-এ পরিবর্তিত হইতে পারে তেমনই প বর্গের চতুর্থ বর্ণ ভ-ও অপভ্রংশে হ হইতে পারে, এ বিষয়ে বোধ করি আমার সহিত আপনার কোনো মতান্তর নাই। তথাপি দুই-একটা উদাহরণ দেওয়া কর্তব্য ; যথা, শোভন হইতে শোহন, গাভী হইতে গাই (গাভী হইতে গাহী, গাহী হইতে গাই), নাভি হইতে নাই (হি হইতে ই হওয়ার উদাহরণ বিস্তর আছে, যেমন আপনি দেখাইয়াছেন, রাধিকা হইতে রাহী এবং রাহী হইতে রাই)।

আমি যে-সকল দৃষ্টান্ত প্রয়োগ করিলাম তাহার মধ্যে যদি কোনো ভ্রম না থাকে তবে প্রভু হইতে পহু শব্দের উৎপত্তি অসম্ভব বোধ হইবে না।

বন্ধু হইতেও পঁহু-র উদ্ভব হইতে আটক নাই, আপনি তাহার প্রমাণ করিয়াছেন। কিন্তু একটি কথা জিজ্ঞাস্য আছে, আপনি চন্দ্রবিন্দুযুক্ত পঁহু শব্দ বিদ্যাপতির কোনো মৈথিলী পদে পাইয়াছেন কি। আমি তো গ্রিয়ার্সনের ছাপায় এবং বিদ্যাপতির মিথিলাপ্রচলিত পুঁথিতে কোথাও 'পহু' ছাড়া 'পঁহু' দেখি নাই। যদি বন্ধু হইতে বন্হু, বন্হু হইতে পন্হু এবং পন্হু হইতে পঁহুর অভিব্যক্তি হইয়া থাকে, তবে উক্ত শব্দ মৈথিলী বিদ্যাপতিতে প্রচলিত থাকাই সম্ভব। কিন্তু প্রভু শব্দের বিকারজাত পহু শব্দ যে বাঙালির মুখে একটি চন্দ্রবিন্দু লাভ করিয়াছে, ইহাই আমার নিকট অধিকতর সংগত বোধ হয়। বিশেষত বৈষ্ণব কবিদিগের আদিস্থান বীরভূম অঞ্চলে এই চন্দ্রবিন্দুর যে কিরূপ প্রাদুর্ভাব তাহা সকলেই জানেন।

আর-একটা কথা এই যে, বৈষ্ণব কবিরা অনেকেই ভণিতায় পঁহু শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। যথা :

গোবিন্দদাস পঁহু নটবর শেখর।
রাধামোহন পঁহু রসিক সুনাহ।
নরোত্তমদাস পঁহু নাগর কান। ইত্যাদি।

এ স্থলে কবিগণ কৃষ্ণকে বঁধু শব্দে অথবা প্রভু শব্দে সম্ভাষণ করিতেছেন দু-ই হইতে পারে, এখন যাঁহার মনে যেটা অধিকতর সংগত বোধ হয়।

পুনঃ শব্দ হইতেও পঁহু শব্দের উৎপত্তি শব্দশাস্ত্রসিদ্ধ নহে, এ কথা আপনি বলিয়াছেন। সে সম্বন্ধে আমার প্রথম বক্তব্য এই যে, পুনঃ অর্থে পহুঁ শব্দের ব্যবহার এতস্থানে দেখিয়াছি যে, ওটা বানানভুল বলিয়া ধরিতে মনে লয় না। দুর্ভাগ্যক্রমে আমার হাতের কাছে বহি নাই ; যদি আপনার সন্দেহ থাকে তো ভবিষ্যতে উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব।

দ্বিতীয়ত, পুনঃ শব্দ হইতে পহুঁ শব্দের উৎপত্তি শব্দতত্ত্ব অনুসারে আমার নিতান্ত অসম্ভব বোধ হয় না। বিশেষত, পুনঃ শব্দের পর বিসর্গ থাকাতে উক্ত বিসর্গ হ্‌-এ এবং ন চন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হওয়া এবং উকারের স্থানবিপর্যয় নিয়মবিরুদ্ধ হয় নাই। নিবেদক শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১২৯৯

২

পঁহু শব্দ বন্ধু শব্দ হইতে উৎপন্ন হয় নাই ইহা আপনি[১] স্বীকার করেন, তথাপি উক্ত শব্দ যে প্রভুশব্দমূলক তাহা আপনার সংগত বোধ হয় না। কিন্তু পঁহু যে তৎসম বা তদ্‌ভব সংস্কৃত শব্দ নহে পরন্তু দেশজ শব্দ, আপনার এরূপ অনুমানের পক্ষে কোনো উপযুক্ত কারণ দেখাইতে পারেন নাই। কেবল আপনি বলিয়াছেন, “মধুররসসর্বস্ব পরকীয়া প্রেমে দাস্যভাব অসংযুক্ত।” কিন্তু এই একমাত্র যুক্তি আমার নিকট যথেষ্ট প্রবল বোধ হয় না; কারণ, বৈষ্ণবপদাবলীতে অনেক স্থানেই রাধিকা আপনাকে কৃষ্ণের দাসী ও কৃষ্ণ আপনাকে রাধিকার দাস বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

দ্বিতীয় কথা এই যে, পদাবলীতে স্থানে স্থানে পঁহু শব্দ প্রভু অথবা বঁধু ছাড়াও অন্য অর্থে যে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা আমরা দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রমাণ করিতে পারি।

রাধামোহন দাস রাধিকার বিরহবর্ণনা করিতেছেন :

> প্রেমগজদলন সহই না পারই জীবইতে করই ধিকার।
> অন্তরগত তুহু নিরগত করইতে কত কত করত সঞ্চার।
> অথির নয়ন শরঘাতে বিষম জ্বর ছটফট জলজ শয়ান।
> রাধামোহন পঁহু কহই অপরূপ নহ যাহে লাগয়ে পাঁচবান।

অর্থাৎ শ্যামকে সম্বোধন করিয়া দূতী কহিতেছে :

> প্রেমগজের দলন সহিতে না পারিয়া রাধিকা বাঁচিয়া থাকা ধিক্কারযোগ্য জ্ঞান করিতেছেন এবং অন্তর্গত তোমাকে নির্গত করিবার জন্য বিবিধ চেষ্টা করিতেছেন। তোমার অস্থির নয়নশরঘাতে বিষম জ্বরাতুর হইয়া বিরহিণী পদ্মশয়ন অবলম্বন করিয়াছেন। রাধামোহন কহিতেছেন, যাহাকে পঞ্চবাণ লাগে তাহার এরূপ আচরণ কিছুই অপরূপ নহে।

এ স্থলে পহুঁ শব্দের কী অর্থ হইতেছে। ‘রাধামোহনের প্রভু বলিতেছেন’ এরূপ অর্থ

---

[১] ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী। ‘পঁহু’— সাধনা, ১২৯৯ চৈত্র।

অসংগত। কারণ, কৃষ্ণের মুখে এরূপ উত্তর নিতান্ত রসভঙ্গজনক। 'রাধামোহন কহিতেছেন হে প্রভু' এরূপ অর্থও এ স্থলে ঠিক খাটে না ; কারণ, সেরূপ অর্থ হইলে পঁহু শব্দ পরে বসিত— তাহা হইলে কবি সম্ভবত 'রাধামোহন কহে অপরূপ নহে পঁহু' এইরূপ শব্দবিন্যাস ব্যবহার করিতেন।

যুগলমূর্তি বর্ণনায় গোবিন্দদাস কহিতেছেন :

ও নব পদুমিনী সাজ,
ইহ মত্ত মধুকর রাজ।
ও মুখ চন্দ উজোর,
ইহ দিঠি লুবধ চকোর।
গোবিন্দদাস পহু ধন্দ,
অরুণ নিয়ড়ে পুন চন্দ।

এখানে ভণিতার অর্থ :

অরুণের নিকট চাঁদ দেখিয়া গোবিন্দদাসের ধাঁদা লাগিয়াছে।

গোবিন্দদাসের প্রভুর ধাঁদা লাগিয়াছে এ কথা বলা যায় না, কারণ তিনিই বর্ণনার বিষয়। এখানে পঁহু সম্বোধন পদ নহে তাহা পড়িলেই বুঝা যায়।

শ্যামের সেবাসমাপনান্তে রাধিকা সখীসহ গৃহে ফিরিতেছেন :

সখীগণ মেলি করল জয়কার,
শ্যামরু অঙ্গে দেয়ল ফুলহার।
নিজ মন্দিরে ধনী করল প্রয়াণ,
ঘন বনে রহল সুনাগর কান।
সখীগণ সঙ্গে রঙ্গে চলু গোরী,
মণিময় ভূষণে অঙ্গ উজোরি।
শঙ্খ শব্দ ঘন জয়জয় কার,
সুন্দর বদনে কবরী কেশভার।
হেরি মদন কত পরাভব পায়।
গোবিন্দদাস পহু এহ রস গায়।

এখানেও পঁহু অর্থে প্রভু অথবা বঁধু অসংগত।

সুন্দর অপরূপ শ্যামরু চন্দ,
দোহত ধেনু করত কত ছন্দ।
গোধন গরজত বড়ই গভীর
ঘন ঘন দোহন করত যদুবীর।

গোরস ধীর ধীর বিরাজিত অঙ্গ,
তমালে বিথারল মোহিত রঙ্গ।
মুটকি মুটকি ভরি রাখত চারি।
গোবিন্দদাস পঁহু করত নেহারি।

এখানে 'গোবিন্দদাসের প্রভু নিরীক্ষণ করিতেছেন' এরূপ অর্থ হয় না; কারণ, পূর্বেই উক্ত হইয়াছে তিনি দোহনে নিযুক্ত।

বনি বনমালা আজানুলম্বিত
পরিমলে অলিকুল মাতি রহু।
বিম্বাধর পর মোহন মুরলী
গায়ত গোবিন্দদাস পঁহু।

এখানে 'গোবিন্দদাসের প্রভু গান গাহিতেছেন' ঠিক হয় না: কারণ, তাঁহার মুখে মোহন মুরলী।

নিজ মন্দির যাই বৈঠল রসবতী
গুরুজন নিরখি আনন্দ।
শিরীষ কুসুম জিনি তনু অতি সুকোমল
চর চর ও মুখচন্দ।...
গৃহ নিজ কাজ সমাপল সখীজন
গুরুজন সেবন কেলি।
গোবিন্দদাস পঁহু দীপ সায়াহ্ন
বেলি অবসান ভৈ গেলি।

এই পদে কেবল রাধিকার গৃহের কথা হইতেছে; তিনি ক্রমে ক্রমে গৃহকার্য এবং ভোজনাদি সমাধা করিলেন এবং সন্ধ্যা হইল— কবি ইহাই দর্শন এবং বর্ণনা করিতেছেন। এখানে শ্যাম কোথায় যে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিবেন যে, 'হে গোবিন্দদাসের বঁধু, বেলা গেল সন্ধ্যা হল।'

আমি কেবল নির্দেশ করিতে চাহি যে, গোবিন্দদাসের এবং দুই এক স্থলে রাধামোহন দাসের পদাবলীতে পঁহু পহুঁ বা পহু— প্রভু ও বঁধু অর্থে ব্যবহৃত হয় না। কী অর্থে হয় তাহা নিঃসংশয়ে বলা কঠিন।

কিন্তু প্রাচীন কাব্যসংগ্রহে বিদ্যাপতির নোটে অক্ষয়বাবু এক স্থলে পহু অর্থে পুনঃ লিখিয়াছেন। তাঁহার সেই অর্থ নিতান্ত অনুমানমূলক না মনে করিয়া আমরা তাহাই গ্রহণ করিয়াছি এবং দেখিয়াছি স্থানে স্থানে পহুঁ শব্দের পুনঃ অর্থ সংগত হয়। কিন্তু তথাপি স্থানে স্থানে 'ভণে' অর্থ না করিয়া পুনঃ অর্থ করিলে ভাব অসম্পূর্ণ থাকে; যেমন, গোবিন্দদাস পঁহু দীপ সায়াহ্ন ইত্যাদি।

এই কারণে আমরা কিঞ্চিৎ দ্বিধায় পড়িয়া আছি। ভণহুঁ এবং পুনহুঁ এই দুই শব্দ হইতেই যদি পহুঁ-র উৎপত্তি হইয়া থাকে তবে স্থানভেদে এই দুই অর্থই স্বীকার করিয়া লওয়া যায়। কিন্তু স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, গোবিন্দদাস (এবং কদাচিৎ রাধামোহন) ছাড়া আর-কোনো বৈষ্ণব কবির পদাবলীতে পহুঁ শব্দ প্রয়োগের এরূপ গোলযোগ নাই। অতএব ইহার বিরুদ্ধে যদি অন্য কোনো দৃষ্টান্ত ও প্রমাণ না থাকে তবে অনুমান করা যাইতে পারে যে, এই শব্দ ব্যবহারে গোবিন্দদাসের বিশেষ একটু শৈথিল্য ছিল।

প্রসঙ্গক্রমে জিজ্ঞাসা করি ; আপনি মিথিলাপ্রচলিত বিদ্যাপতির পদ হইতে যে-সকল দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাতে পহু শব্দে চন্দ্রবিন্দু প্রয়োগ দেখা যাইতেছে ; এই চন্দ্রবিন্দু কি আপনি কোনো পুঁথিতে পাইয়াছেন। গ্রিয়ার্সন-প্রকাশিত গ্রন্থে কোথাও পঁহু দেখি নাই ; এবং কিছুকাল পূর্বে যে হস্তলিখিত পুঁথি দেখিয়াছিলাম তাহাতে পহু ব্যতীত কুত্রাপি পহুঁ দেখি নাই।

১২৯৯

ভাষাবিচ্ছেদ

ইংরেজের রাজচক্রবর্তীত্বে ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশগুলি পূর্বাপেক্ষা অনেকটা নিকটবর্তী হইয়াছে তাহার সন্দেহ নাই। প্রথমত, এক রাজার শাসনপ্রণালীর বন্ধন তো আছেই, তাহার পরে পথের সুগমতা এবং বাণিজ্য ব্যাবসা ও চাকরির টানে পরস্পরের সহিত নিয়ত সম্মিলন ঘটিতেছেই।

ইহার একটা অনিবার্য ফল এই ছিল যে, যে-সকল প্রতিবেশী জাতির মধ্যে প্রভেদ সামান্য তাহারা ক্রমশ এক হইয়া যাইতে পারিত। অন্তত ভাষা সম্বন্ধে তাহার উপক্রম দেখা গিয়াছিল।

উড়িষ্যা এবং আসামে বাংলাশিক্ষা যেরূপ সবেগে ব্যাপ্ত হইতেছিল, বাধা না পাইলে বাংলার এই দুই উপবিভাগ ভাষার সামান্য অন্তরালটুকু ভাঙিয়া দিয়া একদিন একগৃহবর্তী হইতে পারিত।

সামান্য অন্তরাল এইজন্য বলিতেছি যে, বাংলাভাষার সহিত আসামি ও উড়িয়ার যে-প্রভেদ সে-প্রভেদসূত্রে পরস্পর ভিন্ন হইবার কোনো কারণ দেখা যায় না। উক্ত দুই ভাষা চট্টগ্রামের ভাষা অপেক্ষা বাংলা হইতে স্বতন্ত্র নহে। বীরভূমের কথিত ভাষার সহিত ঢাকার কথিত ভাষার যে-প্রভেদ, বাংলার সহিত আসামির প্রভেদ তাহা অপেক্ষা খুব বেশি নহে।

অবশ্য, উপভাষা আপন জন্মস্থান হইতে একেবারে লুপ্ত হয় না। তাহা পূর্বপুরুষের রসনা হইতে উত্তরপুরুষের রসনায় সংক্রামিত হইয়া চলে। কিন্তু লিখনভাষা যত বৃহৎ পরিধির মধ্যে ব্যাপ্ত হয় ততই দেশের পক্ষে মঙ্গল।

বৃটিশ দ্বীপে স্কট্‌ল্যাণ্ড, অয়র্ল্যাণ্ড ও ওয়েল্‌সের স্থানীয় ভাষা ইংরেজি সাধুভাষা হইতে একেবারেই স্বতন্ত্র। তাহাদিগকে ইংরেজির উপভাষাও বলা যায় না। উক্ত ভাষাসকলের প্রাচীন সাহিত্যও স্বল্পবিস্তৃত নহে। কিন্তু ইংরেজের বল জয়ী হওয়ায় প্রবল ইংরেজিভাষাই বৃটিশ দ্বীপের সাধুভাষারূপে গণ্য হইয়াছে। এই ভাষার ঐক্যে বৃটিশজাতি যে উন্নতি ও বললাভ করিয়াছে, ভাষা পৃথক থাকিলে তাহা কদাচ সম্ভবপর হইত না।

ভারতবর্ষেও যে যে সমশ্রেণীয় ভাষার একীভবন স্বাভাবিক অথবা স্বল্পচেষ্টাসাধ্য, সে-গুলিকে এক হইতে দিলে আমাদের ব্যাপক ও স্থায়ী উন্নতির পথ প্রসর হইত।

কিন্তু, যদিচ একীকরণ ইংরেজরাজত্বের স্বাভাবিক গতি, তথাপি দুর্ভাগ্যক্রমে ভেদনীতি ইংরেজের রাজকৌশল। সেই নীতি অবলম্বন করিয়া তাঁহারা আমাদের ভাষার ব্যবধানকে পূর্বাপেক্ষা স্থায়ী ও দৃঢ় করিবার চেষ্টায় আছেন। তাঁহারা বাংলাকে আসাম ও উড়িষ্যা হইতে যথাসম্ভব নির্বাসিত করিয়া স্থানীয় ভাষাগুলিকে কৃত্রিম উত্তেজনায় পরিপুষ্ট করিয়া তুলিতে প্রবৃত্ত।

স্থানীয় চাকরি পাওয়া সম্বন্ধে রাজপুরুষেরা বাঙালির বিরুদ্ধে যে-গণ্ডি টানিয়া দিয়াছেন এবং সেই সূত্রে বেহারি প্রভৃতি বঙ্গশাখীদের সহিত বাঙালির যে-একটি ঈর্ষার সম্বন্ধ দাঁড় করাইয়াছেন, তাহা আমরা স্বল্প অশুভেরই কারণ মনে করি; কিন্তু ভাষার ঐক্য যাহা নিত্য, যাহা সুগভীর, যাহা আমাদের এই বিচ্ছিন্ন দেশের একমাত্র মুক্তির কারণ, তাহাকে আপন রাজশক্তির দ্বারা পরাহত করিয়া ইংরেজ আমাদের নিরুপায় দেশকে চিরদিনের মতো ভাঙিয়া রাখিতেছেন।

ইংরেজিভাষা কোনো উপায়েই আমাদের দেশের সাধারণ ভাষা হইতে পারে না। কারণ, তাহা অত্যন্ত উৎকট বিদেশী। এবং যে-সকল ভাষার ভিত্তি বহুসহস্র বৎসরের প্রাচীন ও মহৎ সংস্কৃত বাণীর মধ্যে নিহিত, এবং যে-সকল ভাষা বহুসহস্র বৎসরের পুরাতন কাব্য দর্শন সমাজরীতি ও ধর্মনীতি হইতে বিচিত্র রস আকর্ষণ করিয়া লইয়া নরনারীর হৃদয়কে বিবিধরূপে সজল সফল শস্যশ্যামল করিয়া রাখিয়াছে, তাহা কখনোই মরিবার নহে।

কিন্তু সেই সংস্কৃতমূলক ভাষা রাজনৈতিক ও অন্যান্য নানাপ্রকার বাধায় শতধা

বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বতন্ত্র স্থানে স্বতন্ত্ররূপে বাড়িয়া উঠিতেছিল। তাহাদের মধ্যে শক্তিপরীক্ষা ও যোগ্যতমের জয়চেষ্টার অবসর হয় নাই।

এক্ষণে সেই অবসরের সূত্রপাত হইয়াছিল। এবং আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি, ভাষা সম্বন্ধে ভারতবর্ষে যদি প্রাকৃতিক নির্বাচনের স্বাধীন হস্ত থাকে তবে বাংলা-ভাষার পরাভবের কোনো আশঙ্কা নাই।

প্রথমত, বাঙালিভাষীর জনসংখ্যা ভারতবর্ষের অপরভাষীর তুলনায় অধিক। প্রায় পাঁচ কোটি লোক বাংলা বলে।

কিন্তু আপন সাহিত্যের মধ্যে বাংলা যে-প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে তাহাতেই তাহার অমরতা সূচনা করে।

এক্ষণে ভারতবর্ষে বাংলা ছাড়া বোধ হয় এমন কোনো ভাষাই নাই, যে-ভাষার আধুনিক সাহিত্যে ইংরেজিশিক্ষিত এবং ইংরেজি-অনভিজ্ঞ উভয় সম্প্রদায়েরই সজাগ ঔৎসুক্য। অন্যত্র শিক্ষিত ব্যক্তিরা জনসাধারণকে শিক্ষাদানের জন্যই দেশীয় ভাষা প্রধানত অবলম্বনীয় জ্ঞান করেন,— কিন্তু তাঁহাদের মনের শ্রেষ্ঠভাব ও নূতন উদ্ভাবন-সকলকে তাঁহারা ইংরেজিভাষায় রক্ষা করিতে ব্যগ্র।

বাংলাদেশে ইংরেজিতে প্রবন্ধরচনার প্রয়াস প্রায় তিরোধান করিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ইংরেজি বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উত্তীর্ণ যে-সকল ছাত্রের রচনা করিবার স্বাভাবিক ক্ষমতা আছে, বাংলাসাহিত্য অনতিবিলম্বে তাঁহাদিগকে আকর্ষণ করিয়া লইতে পারে, আমাদের সাহিত্য এমন-একটি সবেগতা, এমন-একটি প্রবলতা লাভ করিয়াছে। চতুর্দিকে জীবনদান এবং জীবনগ্রহণ করিবার শক্তি ইহার জন্মিয়াছে। ইহার দেশপরিধি যত বাড়িবে ইহার জীবনীশক্তিও তত বিপুলতর হইয়া উঠিবে। এবং বেগবান বৃহৎ নদী যেমন যে-দেশ দিয়া যায় সে-দেশ স্বাস্থ্যে সৌন্দর্যে বাণিজ্যে ও ধনে-ধান্যে ধন্য হইয়া উঠে, তেমনই ভারতবর্ষে যতদূর পর্যন্ত বাংলাভাষার ব্যাপ্তি হইবে ততদূর পর্যন্ত একটা মানসিক জীবনের প্রবাহ প্রবাহিত হইয়া দুই উপকূলকে নিত্য নব নব ভাবসম্পদে ঐশ্বর্যশালী করিয়া তুলিবে।

সেইজন্য বলিতেছিলাম, আসাম ও উড়িষ্যায় বাংলা যদি লিখনপঠনের ভাষা হয় তবে তাহা যেমন বাংলাসাহিত্যের পক্ষে শুভজনক হইবে তেমনই সেই দেশের পক্ষেও।

কিন্তু ইংরেজের কৃত্রিম উৎসাহে বাংলার এই দুই উপকণ্ঠবিভাগের একদল শিক্ষিত যুবক বাংলাপ্রচলনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহধ্বজা তুলিয়া স্থানীয় ভাষার জয়কীর্তন করিতেছেন।

এ কথা আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, দেশীয় ভাষা আমাদের রাজভাষা নহে,

যে-ভাষার সাহায্যে বিদ্যালয়ের উপাধি বা মোটা বেতন লাভের আশা নাই। অতএব দেশীয় সাহিত্যের একমাত্র ভরসা তাহার প্রজাসংখ্যা, তাহার লেখক ও পাঠকসাধারণের ব্যাপ্তি। খণ্ড বিচ্ছিন্ন দেশে কখনোই মহৎ সাহিত্য জন্মিতে পারে না। তাহা সংকীর্ণ গ্রাম্য প্রাদেশিক আকার ধারণ করে। তাহা ঘোরো এবং আটপৌরে হইয়া উঠে, তাহা মানব-রাজদরবারের উপযুক্ত নয়।

আসামী এবং উড়িয়া যদি বাংলার সগোত্র ভাষা না হইত তবে আমাদের এত কথা বলিবার কোনো অধিকার থাকিত না। বিশেষত শব্দভাণ্ডারের দৈন্যবশত সাধুসাহিত্যে লেখকগণ প্রচুর পরিমাণে সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিতে বাধ্য, অতএব সাহিত্যগ্রাহ্য ভাষায় অনৈক্য আরও সামান্য। লেখক কটকে বাসকালে উড়িয়া বক্তৃতা শুনিয়াছিলেন, তাহার সহিত সাধুবাংলার প্রভেদ তর্জনীর সহিত মধ্যম অঙ্গুলির অপেক্ষা অধিক নহে।

একটি উড়িয়া ভাষায় লিখিত ক্ষুদ্র কাহিনী এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। কোনো বাঙালিকে ইহার অর্থ বলিয়া দিবার প্রয়োজন হইবে না।

> কেতে বেলে এক হরিণ পীড়িত হেবারু তাহার আত্মীয় ও পরিবারীয় পশুগণ তাকু দেখিবা নিমন্তে আসি চারিদিগরে শুষ্ক ও সরস যেতে তৃণ পল্লবিথিলা, তাহা সবু খায়ি পকাইলা। হরিণর পীড়ার শান্ত হেলা-উত্তারু সে কিচ্ছি আহার করিবা নিমন্তে ইচ্ছা কলা। মাত্র কিছিহি খাদ্য পাইলা নাহি, তহি রে ক্ষুধারে তাহার প্রাণ বিয়োগ হেলা। ইহার তাৎপর্য এহি— অবিবেচক বন্ধু থিবাঠারু বরং বন্ধু ন থিবা ভল।

ইংরেজ লেখকগণ বাংলার এই-সকল উপভাষাগুলিকে স্বতন্ত্র ভাষারূপে প্রমাণ করিবার জন্য যে-সকল যুক্তি প্রয়োগ করেন তাহা যে কতদূর অসংগত ডাক্তার ব্রাউন-প্রণীত আসামি ব্যাকরণ আলোচনা করিলে তাহা দেখা যায়।

তিনি উচ্চারণপ্রভেদের যে-যুক্তি দিয়াছেন তাহা অবলম্বন করিলে পশ্চিমবাংলা ও পূর্ববাংলাকে পৃথক ভাষায় ভাগ করিতে হয়। আসামিরা চ-কে দন্ত্য স (ইংরেজি s) জ-কে দন্ত্য জ (ইংরেজি z) রূপে উচ্চারণ করে, পূর্ববাংলাতেও সেই নিয়ম। তাহারা শ-কে হ বলে, পূর্ববঙ্গেও তাই। তাহারা বাক্য-কে 'বাইক্য', মান্য-কে 'মাইন্য' বলে, এ সম্বন্ধেও পূর্ববঙ্গের সহিত তাহার প্রভেদ দেখি না।

ব্রাউন বলিয়াছেন, উচ্চারণের প্রতি লক্ষ করিয়া দেখিলে আসামির সহিত হিন্দুস্থানির ঐক্য পাওয়া যায় এবং সংস্কৃতমূলক শব্দের আসামি উচ্চারণ হইতে স্পষ্ট প্রমাণ হয়, আসামি বাংলা হইতে জাত হয় নাই।

অথচ আশ্চর্য এই যে, মূর্ধন্য ষ আসামি ভাষায় খ-এর ন্যায় উচ্চারিত হয়, ইহা ছাড়া

আসামির সহিত হিন্দুস্থানির আর-কোনো সাদৃশ্য নাই এবং তাহার সমস্ত সাদৃশ্যই বাংলার সহিত।

অকারের বিশুদ্ধ উচ্চারণই হিন্দুস্থানির প্রধান বিশেষত্ব, হিন্দুস্থানিতে বট শব্দ ইংরেজি but শব্দের অনুরূপ, বাংলায় তাহা ইংরেজি bought শব্দের ন্যায়। পাশ্চাত্য ও দাক্ষিণাত্য গৌড়ীয় উচ্চারণের সহিত প্রাচ্য গৌড়ীয়ের এই সর্বপ্রধান প্রভেদ। আসামি ভাষা এ সম্বন্ধে বাংলার মতো। ঐকারের উচ্চারণেও তাহা দেখা যায়। বাংলা 'ঐ' ইংরেজি stoic শব্দের oi, হিন্দি 'ঐ' ইংরেজি style শব্দের y। ঔ শব্দও তদ্রূপ।

বাংলার অকার উচ্চারণ স্থানবিশেষে, যথা, ইকার উকারের পূর্বে হ্রস্ব ওকারে পরিণত হয়। কল, কলি ও কলু শব্দের উচ্চারণভেদ আলোচনা করিলেই তাহা বোধগম্য হইবে। আসামি ভাষার উচ্চারণে বাংলার এই বিশেষত্ব আছে।

আসামিতে ইকারের পূর্বে ওকার প্রায় উকারে পরিণত হয়, যথা 'বোলে' ক্রিয়া (বাংলা, বলে) বিভক্তিপরিবর্তনে 'বুলিছে' হয়। বাংলাতেও, খোলে খুলিছে, দোলে দুলিছে। বোল বুলি, খোল খুলি, ঝোলা ঝুলি, গোলা গুলি, ইত্যাদি।

যুক্ত অক্ষরের উচ্চারণেও প্রভেদ দেখি না, আসামিরাও স্মরণ-কে স্বরণ, স্বরূপ-কে সরূপ, পক্ষী-কে পক্‌খী বলে।

অন্তস্থ ৱ সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, বাংলাতেও এই উচ্চারণ আছে, কিন্তু বর্গীয় ব ও অন্ত্যস্থ ৱ-এ অক্ষরের ভেদ নাই, আসামিতে সেই ভেদচিহ্ন আছে। তাহা বলিয়া এ কথা কেহ মনে করিবেন না, মহারাষ্ট্রিদের ন্যায় আসামিরা সংস্কৃতশব্দে অন্ত্যস্থ ও বর্গীয় ব-এর প্রভেদ রক্ষা করিয়া থাকে। আমরা যেখানে 'পাওয়া' লিখি আসামিরা সেখানে 'পৱা' লেখে। আমাদের ওয়া এবং তাহাদের ৱা উচ্চারণে একই, লেখায় ভিন্ন।

যাহাই হউক, যে-ভাষা ভ্রাতাদের মধ্যে অবাধ ভাবপ্রবাহ সঞ্চারের জন্য হওয়া উচিত, তাহাকেই প্রাদেশিক অভিমান ও বৈদেশিক উত্তেজনায় পরস্পরের মধ্যে ব্যবধানের প্রাচীরস্বরূপে দৃঢ় ও উচ্চ করিয়া তুলিবার যে-চেষ্টা তাহাকে স্বদেশহিতৈষিতার লক্ষণ বলা যায় না এবং তাহা সর্বতোভাবে অশুভকর।

১৩০৫

দ্বিজেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ

উপসর্গ-সমালোচনা

মাছের ক্ষুদ্র পাখনাকে তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে তুচ্ছ বলিয়াই বোধ হয়, কিন্তু তাহাদেরই চালনা দ্বারা মাছ দক্ষিণে বামে সম্মুখে পশ্চাতে বিশেষ গতি লাভ করে। কেবল তাই নয়, প্রাণীতত্ত্ববিৎদের চোখে তাহা খর্বাকৃতি হাতপায়েরই সামিল। তেমনই য়ুরোপীয় আর্যভাষার **prefix** ও ভারতীয় আর্যভাষার উপসর্গগুলি সাধারণত আমাদের চোখ এড়াইয়া যায় বলিয়া শব্দ ও ধাতুর অঙ্গে তাহাদের প্রাধান্য সম্পূর্ণরূপে আমাদের হৃদয়ংগম হয় না। এবং তাহারা যে সম্ভবত আর্যভাষার প্রথম বয়সে স্বাধীন শব্দরূপে ছিল এবং কালক্রমে খর্বতা প্রাপ্ত হইয়া পরাশ্রিত হইয়া পড়িয়াছে, এরূপ সংশয় আমাদের মনে স্থান পায় না। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার চতুর্থ ভাগ চতুর্থ সংখ্যা ও পঞ্চম ভাগ দ্বিতীয় সংখ্যায় শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় 'উপসর্গের অর্থবিচার' নামক প্রবন্ধে উক্ত বিষয়ের প্রতি নূতন করিয়া আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন। সেই প্রবন্ধের সমালোচনায় হস্তক্ষেপ করা আমাদের পক্ষে ধৃষ্টতা। লেখক আমাদের মান্য গুরুজন সে একটা কারণ বটে, কিন্তু গুরুতর কারণ এই যে, তাঁহার প্রবন্ধে যে অসামান্য গবেষণা ও প্রতিভা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতে আমাদের মতো অধিকাংশ পাঠকের মনে সম্ভ্রম উদয় না হইয়া থাকিতে পারে না।

কিন্তু ইতিমধ্যে পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার পঞ্চম ভাগ চতুর্থ সংখ্যায় 'উপসর্গের অর্থ বিচার নামক প্রবন্ধের সমালোচনা' আখ্যা দিয়া এক রচনা বাহির করিয়াছেন। সেই রচনায় তিনি প্রবন্ধলেখকের মতের কেবলই প্রতিবাদ করিয়াছেন, সমালোচিত সুদীর্ঘ প্রবন্ধের কোথাও সমর্থনযোগ্য শ্রদ্ধেয় কোনো কথা আছে এমন আভাসমাত্র দেন নাই।

এ সম্বন্ধে পাঠকদিগকে একটিমাত্র পরামর্শ দিয়া আমরা সংক্ষেপে কর্তব্যসাধন করিতে পারি, সে আর কিছুই নহে, তাঁহারা একবার সমালোচিত প্রবন্ধ ও তাহার সমালোচনা একত্র করিয়া পাঠ করুন, তাহা হইলে উভয় প্রবন্ধের ওজনের প্রভূত প্রভেদ বুঝিতে তাঁহাদের ক্ষণমাত্র বিলম্ব হইবে না। কিন্তু নিশ্চয় জানি, অনেক পাঠকই শ্রমস্বীকারপূর্বক আমাদের এ পরামর্শ গ্রহণ করিবেন না, সুতরাং নানা কারণে সংকোচসত্ত্বেও উপসর্গঘটিত আলোচনা সম্বন্ধে আমাদের মত প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম।

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় স্পষ্টই স্বীকার করিয়াছেন, উপসর্গের অর্থবিচার

সম্বন্ধে তিনি একটি পথ নির্দেশ করিয়াছেন মাত্র। এবং সে-পথ তাঁহার নিজের আবিষ্কৃত কোনো গোপন পথ নহে, তাহা বিজ্ঞানসম্মত রাজপথ। তিনি দৃষ্টান্তপরম্পরা হইতে সিদ্ধান্তে নীত হইয়া উপসর্গগুলির অর্থ-উদ্ধারের চেষ্টা করিয়াছেন। সেই চেষ্টার ফল সর্বত্র না-ও যদি হয়, তথাপি সেই প্রণালী একমাত্র সমীচীন প্রণালী।

প্রাচীন শব্দশাস্ত্রে এই প্রকার প্রণালী অবলম্বনে উপসর্গের অর্থনির্ণয় হইয়াছিল বলিয়া জানি না। শাস্ত্রী মহাশয় লিখিতেছেন, "আমাদের দেশীয় প্রাচীনতম শব্দাচার্যদিগের মতে উপসর্গগুলি ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। একই উপসর্গের ধাতুভেদে প্রয়োগভেদে নানা অর্থ লক্ষিত হয়। ওই-সকল প্রয়োগের অর্থ অনুগত (generalize) করিয়া তাঁহারা এক-একটি উপসর্গের কতকগুলি করিয়া অর্থ স্থির করিয়াছেন।" কথা এই যে, তাঁহারা যাহা স্থির করিয়াছেন তাহা প্রত্যক্ষ না থাকায় তাঁহাদের কথা আমরা মানিয়া লইতে পারি, পরখ করিয়া লইতে পারি না। এ সম্বন্ধে দুই একটা দৃষ্টান্ত দিতে ইচ্ছা করি। মেদিনীকোষকার অপ উপসর্গের নিম্নলিখিত অর্থ নির্দেশ করিয়াছেন— অপকৃষ্টার্থঃ ; বর্জনার্থঃ, বিয়োগঃ, বিপর্যয়ঃ ; বিকৃতিঃ, চৌর্যং, নির্দেশঃ, হর্ষঃ। আমাদের মনে প্রথমে এই সংশয় উপস্থিত হয় যে, যে-অর্থ ক্রিয়ার বিশেষণ ভাবে ব্যবহৃত হইতে না পারে, তাহা উপসর্গ সম্বন্ধে প্রযুজ্য কিরূপে হয়। অপ উপসর্গের চৌর্য অর্থ সহজেই সংগত বলিয়া বোধ হয় না। অবশ্য অপচয় বা অপহরণ শব্দে চৌর্য অর্থ প্রকাশ করে, অপ উপসর্গের অপকৃষ্টার্থ ই তাহার কারণ। হরণ শব্দের অর্থ স্থানান্তর করণ, চয়ন শব্দে গ্রহণ বুঝায় ; অপ উপসর্গযোগে তাহাতে দূষিত ভাবের সংস্রব হইয়া চৌর্য অর্থ নিষ্পন্ন হয়। য়ুরোপীয় ভাষায় abduction শব্দের অর্থ অপহরণ— ducere ধাতুর অর্থ নয়ন, তাহার সহিত ab (অপ) উপসর্গ যুক্ত হইয়া নীচার্থে চৌর্য বুঝাইতেছে। অপ উপসর্গের হর্ষ অর্থ সম্বন্ধেও আমাদের ওইরূপ সন্দেহ আছে। কিন্তু প্রাচীন শব্দাচার্য কোন্ পথ অবলম্বন করিয়া এই-সকল অর্থে উপনীত হইয়াছেন, তাহা আমরা জানি না ; সুতরাং হয় তাঁহার কথা তর্কের অতীত বলিয়া মানিয়া লইতে হয়, নয়তো বিতর্কের মধ্যেই থাকিতে হয়। দুর্গাদাস সং উপসর্গের নানা অর্থের মধ্যে 'ঔচিত্য' অর্থ নিদর্শন করিয়াছেন। অবশ্য, সমুচিত শব্দের দ্বারা ঔচিত্য ব্যক্ত হয়, সে কথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু তাহাতে সং উপসর্গের ঔচিত্য অর্থ সূচনা করে না। সংগতি, সমীচীনতা, সমীক্ষকারিতা, সমঞ্জস প্রভৃতি শব্দের অভ্যন্তরে ইঙ্গিতে যে ঔচিত্যের ভাব আছে, সং উপসর্গ ই তাহার মুখ্য ও মূল কারণ নহে। এরূপ বিচার করিতে গেলে উপসর্গের অর্থের অন্ত পাওয়া যায় না ; তাহা হইলে বলা যাইতে পারে সং উপসর্গের অর্থ সম্মান এবং প্রমাণস্বরূপ

সম্মান, সমাদর, সম্ভ্রম, সমভ্যর্থন প্রভৃতি উদাহরণ উপস্থিত করা যাইতে পারে। দুর্গাদাস সং উপসর্গের অর্থ সম্বন্ধে বলিয়াছেন, সম্ প্রকর্ষাশ্লেষনৈরন্তর্যৌচিত্যাভিমুখ্যেষু ; এই আভিমুখ্য অর্থ স্পষ্টতই সং উপসর্গের বিশেষ অর্থ নহে— কারণ, সং উপসর্গের যে আশ্লেষ অর্থ দেওয়া হইয়াছে আভিমুখ্য তাহার একটি অংশ, বৈমুখ্যও তাহার মধ্যে আসিতে পারে। সমাবেশ, সমাগম, সংকুলতা বলিলে যে আশ্লেষ বা একত্র হওন বুঝায় তাহার মধ্যে— আভিমুখ্য, বৈমুখ্য, উন্মুখতা, অধোমুখতা, সমস্তই থাকিতে পারে ; এ স্থলে বিশেষভাবে আভিমুখ্যের উল্লেখ করাতে অন্যগুলিকে নিরাকৃত করা হইয়াছে। যে-জনতায় নানা লোক নানা দিকে মুখ করিয়া আছে, এমন-কি কেহ কাহারও অভিমুখে নাই তাহাকেও জনসমাগম বলা যায় ; কারণ, সং উপসর্গের মূল অর্থ আশ্লেষ, তাহার মধ্যে আভিমুখ্য থাকিলেও চলে না-থাকিলেও চলে। ইহাও দেখা যাইতেছে, উপসর্গ সম্বন্ধে প্রাচীন শব্দাচার্যদিগের অর্থতালিকায় পরস্পরের মধ্যে অনেক কমবেশি আছে। মেদিনীকোষকার সং উপসর্গের যে ‘শোভনার্থ’ উল্লেখ করিয়াছেন দুর্গাদাসের টীকায় তাহা নাই ; দুর্গাদাসের ঔচিত্য আভিমুখ্য অর্থ মেদিনীকোষে দেখা যায় না। এই-সকল শব্দাচার্যের অগাধ পাণ্ডিত্য ও কুশাগ্রবুদ্ধিতা সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ মাত্র নাই ; কিন্তু তাঁহাদের সিদ্ধান্ত আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীর দ্বারা পরীক্ষা করা কর্তব্য, এ সম্বন্ধেও সংশয় করা উচিত নহে।

প্রাচীন শব্দাচার্যগণ সম্বন্ধে সমালোচক মহাশয় বলিতেছেন, “তাঁহারা কিন্তু প্রবন্ধকারের ন্যায় এক-একটি উপসর্গের সর্বত্রই একরূপ অর্থ হইবে, ইহা স্বীকার করেন না।” প্রবন্ধকারও কোথাও তাহা স্বীকার করেন নাই। তিনি উপসর্গগুলির মূল অর্থ সন্ধান করিয়াছেন এবং সেই এক অর্থ হইতে নানা অর্থের পরিমাণ কিরূপে হইতে পারে, তাহাও আলোচনা করিয়াছেন। য়ুরোপীয় e (ই) উপসর্গের একটা অর্থ অভাব, আর-এক অর্থ বহির্গমতা ; educate শব্দের উৎপত্তিমূলক অর্থ বহির্নয়ন, edit শব্দের অর্থ বাহিরে দান, edentate শব্দের অর্থ দন্তহীন ; কেহ যদি দেখাইয়া দেন যে, e উপসর্গের মূল অর্থ বহির্গমতা এবং তাহা হইতেই অভাব অর্থের উৎপত্তি, অর্থাৎ যাহা বাহির হইয়া যায় তাহা থাকে না, তবে তিনি e উপসর্গের বহু অর্থ স্বীকার করেন না এ কথা বলা অসংগত। অন্তর শব্দের এক অর্থ ভিতর, আর-এক অর্থ ফাঁক ; যদি বলা যায় যে, ওই ভিতর অর্থ হইতেই ফাঁক অর্থের উৎপত্তি হইয়াছে, কারণ দুই সীমার ভিতরের স্থানকেই ফাঁক বলা যাইতে পারে, তবে তদ্দ্বারা অন্তর শব্দের দুই অর্থ অস্বীকার করা হয় না। পরন্তু তাহার মূল অর্থ যে দুই নহে, এক, এই কথাই বলা হইয়া থাকে ; এবং মূল অর্থের প্রতি সচেতন দৃষ্টি রাখিলে সাধারণত শব্দের প্রয়োগ এবং তাহার

রূপান্তরকরণ যথামতো হইতে পারে, এ কথাও অসংগত নহে। বস্তুত গুঁড়ি একটা হয় এবং ডাল অনেকগুলি হইয়া থাকে, ভাষাতত্ত্বের পদে পদে এ নিয়মের পরিচয় পাওয়া যায়। একই ধাতু হইতে ঘৃণা, ঘৃত, ঘর্ম প্রভৃতি স্বতন্ত্রার্থক শব্দের উৎপত্তি হইলেও মূল ধাতুর অর্থভেদ কল্পনা করা সংগত নহে। বরঞ্চ এক ধাতুমূলক নানা শব্দের মধ্যে যে-অংশে কোনো-একটা ঐক্য পাওয়া যায়, সেইখানেই ধাতুর মূল অর্থ প্রচ্ছন্ন আছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। তেমনই এক উপসর্গের নানা অর্থভেদের মধ্যে যদি কোনো ঐক্য আবিষ্কার করা যায়, তবে সেই ঐক্যের মধ্যে যে সেই উপসর্গের আদি অর্থ প্রচ্ছন্ন আছে, এ কথা স্বভাবত মনে উদয় হয়। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধে ব্যাপ্তিসাধন প্রণালী দ্বারা (Generalization) উপসর্গের বিচিত্র ভিন্ন অর্থের মধ্য হইতে আশ্চর্য নৈপুণ্যসহকারে এক মূল অর্থ উদ্ধারের চেষ্টা করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে এই প্রথম চেষ্টা। সুতরাং সে-চেষ্টার ফল নানাস্থানে অসম্পূর্ণ থাকাই সম্ভব এবং পরবর্তী আলোচকগণ নব নব দৃষ্টান্ত ও তুলনার সহায়তায় উক্ত প্রবন্ধের সংশোধন ও পরিপোষণ করিয়া চলিবেন আশা করা যায়। বস্তুত প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সমস্ত আর্য-ভাষার তুলনা করিয়া না দেখিলে উপসর্গের অর্থবিচার কখনোই সম্পূর্ণ হইতে পারে না এবং উহার মধ্যে অনেক অংশ কাল্পনিক থাকিয়া যাইতে পারে; সেইরূপ তুলনামূলক সমালোচনাই এরূপ প্রবন্ধের প্রকৃষ্ট সমালোচনা। প্রাচীন শব্দাচার্য এইরূপ মত দিয়াছেন, এ কথা বলিয়া সমালোচনা করা চলে না।

প্রবন্ধকার মহাশয় প্রশ্বাস নিশ্বাস, প্রবৃত্তি নিবৃত্তি, প্রবাস নিবাস, প্রবেশ নিবেশ, প্রক্ষেপ নিক্ষেপ, প্রকৃষ্ট নিকৃষ্ট প্রভৃতি দৃষ্টান্তযোগে প্র এবং নি উপসর্গের মূল অর্থ নির্ণয় করিয়াছেন। তিনি বলেন, প্র উপসর্গের লক্ষ সম্মুখের দিকে বাহিরের দিকে, নি উপসর্গের লক্ষ ভিতরের দিকে।

ইহাদের সমশ্রেণীয় য়ুরোপীয় উপসর্গও তাঁহার মত সমর্থন করিতেছে। Projection, injection; progress, ingress; induction, production; install, forestall; জর্মানভাষায় einfuhren— to introduce, vorfuhren— to produce। এরূপ দৃষ্টান্তের শেষ নাই।

প্র, নি ; pro, in এবং vor, ein এক পর্যায়ভুক্ত তাহাতে সন্দেহ নাই।

কিন্তু সমালোচকমহাশয় এক 'নিশ্বাস' শব্দ লইয়া প্রবন্ধকারের মত এক নিশ্বাসে উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলেন, নিশ্বাস শব্দ প্রশ্বাস শব্দের বৈপরীত্যবাচক নহে। তিনি প্রমাণ প্রয়োগের দ্বারা দেখাইয়াছেন যে, নিশ্বাস অর্থে অন্তর্গামী শ্বাস বুঝায় না, তাহা বহির্গামী শ্বাস। সেই সঙ্গে বলিয়াছেন, "নিশ্বাস এই

শব্দটি কোনো কোনো স্থলে 'নিঃশ্বাস' এইরূপ বিসর্গমধ্যও লিখিতে হয়, কিন্তু উভয় শব্দেরই অর্থ এক।

স যখন কোনো ব্যঞ্জনবর্ণের পূর্বে যুক্ত হইয়া থাকে তখন তৎপূর্বে বিসর্গ লিখিলেও চলে, না লিখিলেও চলে ; যথা, নিস্পন্দ নিস্পৃহ, প্রাতস্নান। কিন্তু তাই বলিয়া নি উপসর্গ ও নিঃ উপসর্গ এক নহে, এমন-কি, তাহাদের বিপরীত অর্থ। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় প্রমাণসহ তাহার বিচার করিয়াছেন। নি উপসর্গের গতি ভিতরের দিকে, নিঃ উপসর্গের গতি বাহিরের দিকে। নিবাস এবং নির্বাসন তাহার একটা দৃষ্টান্ত। নিঃ উপসর্গের না-অর্থ গৌণ, তাহার মুখ্যভাব বহির্গামিতা। নির্গত শব্দের অর্থ না-গত নহে, তাহার অর্থ বাহিরে গত। নিঃসৃত, বহিঃসৃত। নিষ্ক্রমণ, বহিষ্ক্রমণ। নির্ঘোষ, বহির্ব্যাপ্ত শব্দ। নির্ঝর, বহিরুদ্গত ঝরনা। নির্মোক, খোলস যাহা বাহিরে ত্যক্ত হয়। নিরতিশয় অর্থে, যে অতিশয় বাহিরে চলিয়া যাইতেছে অর্থাৎ আপনাকেও যেন অতিক্রম করিতেছে। য়ুরোপীয় e এবং ex উপসর্গে দেখা যায় তাহাদের মূল বহির্গমন অর্থ হইতে অভাব অর্থের উৎপত্তি হইয়াছে। নিঃ উপসর্গেও তাহাই দেখা যায়। শব্দকল্পদ্রুম, শব্দস্তোমমহানিধি প্রভৃতি সংস্কৃতঅভিধানে দেখা যায় অভাবার্থক নিঃ উপসর্গকে নির্গত শব্দের দ্বারা ব্যাখ্যা করা হইয়াছে ; যথা নিরর্গল —নির্গতমর্গলং যস্মাৎ, নিরর্থক— নির্গতোঽর্থো যস্মাৎ ইত্যাদি। অ এবং অন্ প্রয়োগের দ্বারা বিশুদ্ধ অভাব বুঝায়, কিন্তু নিঃ প্রয়োগে ভাব হইতে বহিশ্চ্যুতি বুঝায়। জর্মান ভাষায় ইহার স্বজাতীয় উপসর্গ— hin। নিঃ উপসর্গের বিসর্গ স্থানচ্যুতিবশত হি রূপে ন-এর পূর্বে বসিয়াছে, অথবা মূল আর্য ভাষায় যে-ধাতু ছিল তাহাতে হি পূর্বে ছিল, সংস্কৃতে তাহা বিসর্গরূপে পরে বসিয়াছে। Hin উপসর্গেরও বহির্গমতা এবং অভাব অর্থ দেখা যায়। জর্মান অভিধান hin উপসর্গের অর্থ সম্বন্ধে বলে, motion or direction from the speaker, gone, lost। সংস্কৃতে যেমন নি ভিতর এবং নিঃ বাহির বুঝায়, জর্মান-ভাষায় সেইরূপ ein ভিতর এবং hin বাহির বুঝায়। Einfahren অর্থ ভিতরে আনা, hinfahren শব্দের অর্থ বাহিরে লইয়া যাওয়া। লাটিন in উপসর্গে নি এবং নিঃ, ein এবং hin একত্রে সংগত হইয়াছে। innate অর্থ অন্তরে জাত, infinite অর্থ যাহা সীমার অতীত।

যাহাই হউক, প্র উপসর্গের মূল অর্থ বাহিরে, অগ্রভাগে ; নি উপসর্গের অর্থ ভিতরে এবং নিঃ উপসর্গের অর্থ ভিতর হইতে বাহিরে। অতএব নিঃ উপসর্গযোগে যে-শ্বাসের অর্থ বহির্গামী শ্বাস হইবে, নি উপসর্গযোগে তাহাই অন্তর্গমনশীল শ্বাস বুঝাইবে। অথচ ঘটনাক্রমে শ্বাস শব্দের পূর্বে নিঃ উপসর্গের বিসর্গ লোপপ্রবণ হইয়া

পড়ে। অতএব এ স্থলে বানানের উপর নির্ভর করা যায় না। ফলত সংস্কৃতভাষায় বাহ্যবায়ুগ্রহণ অর্থে সাধারণত উপসর্গহীন শ্বাস শব্দই ব্যবহৃত হইয়া থাকে এবং নিশ্বাস ও প্রশ্বাস উভয় শব্দই অন্তর্বায়ুর নিঃসারণ অর্থে প্রযুক্ত হয়।

দেখা গেল, 'উপসর্গের অর্থবিচার' প্রবন্ধে প্র এবং নি উপসর্গের যে-অর্থ নির্ণয় করা হইয়াছে, নিশ্বাস শব্দের আলোচনায় তাহার কোনো পরিবর্তন ঘটিতেছে না।

প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি শব্দ লইয়া সমালোচকমহাশয় বিস্তর সূক্ষ্ম তর্ক করিয়াছেন, এ স্থলে তাহার বিস্তারিত অবতারণ ও আলোচনা বিরক্তিজনক ও নিষ্ফল হইবে বলিয়া পরিত্যাগ করিলাম। পাণ্ডিত্য অনেক সময় দুর্গম পথ সৃষ্টি করে এবং সত্য সরল পথ অবলম্বন করিয়া চলে। এ কথা অত্যন্ত সহজ যে, প্রবৃত্তি প্রবর্তনের দিক, অর্থাৎ মনের চেষ্টা তদ্দ্বারা বাহিরের দিকে ধাবিত হয়; নিবৃত্তি নিবর্তনের দিক, অর্থাৎ মনের চেষ্টা তদ্দ্বারা ভিতরের দিকে ফিরিয়া আসে।

সমালোচকমহাশয় প্রবৃত্তিনিবৃত্তির এই সহজ উপপত্তি পরিত্যাগপূর্বক বিশেষ জেদ করিয়া কষ্টকল্পনার পথে গিয়াছেন। তিনি বলেন, "প্রবৃত্তি কি, না প্রকৃষ্টাবৃত্তি অর্থাৎ ভালো করিয়া থাকা, এবং ক্রিয়ার অবস্থা (কুর্বদবস্থা) (state of action) কোনো বস্তুর স্থিতির বা সত্তার প্রকৃষ্ট অবস্থা বলিয়া প্রকৃষ্ট বৃদ্ধি শব্দে ক্রিয়ারম্ভ বুঝাইতে পারে।" ক্রিয়ার অবস্থাই যে ভালোরূপ থাকার অবস্থা এ কথা স্বীকার করা কঠিন। নিবৃত্তি শব্দের যে ব্যুৎপত্তি করিয়াছেন তাহাও সংগত হয় নাই। তিনি বলেন, "নিতরাং বর্ততে ইতি নিবৃত্তি অর্থাৎ নিতরাং সম্পূর্ণভাবে বেষ্টাদিশূন্য হইয়া স্থিতি বা থাকা অর্থাৎ চেষ্টাবিরাম।"

সমালোচকমহাশয় প্রতিবাদ করিয়া উত্তেজনায় নিজেকে অত্যন্ত অধিক পরিমাণে প্রকৃষ্টাবৃত্তি অর্থাৎ কুর্বদবস্থায় লইয়া গেছেন,— এ সম্বন্ধে আর-একটু নিতরাং বর্তন করিতেও পারিতেন; কারণ প্রাচীন শব্দাচার্যগণও নি উপসর্গের অন্তর্ভাব স্বীকার করিয়াছেন, যথা, মেদিনীকোষে নি অর্থে "মোক্ষঃ, অন্তর্ভাবং বন্ধনম্" ইত্যাদি কথিত হইয়াছে। কিন্তু পাছে সেই অর্থ স্বীকার করিলে কোনো অংশে প্রবন্ধকারের সহিত ঐক্য সংঘটন হয়, এইজন্য যত্নপূর্বক তাহা পরিহার করিয়াছেন; ইহা নিশ্চয় একটা প্রবৃত্তি অর্থাৎ প্রকৃষ্টাবৃত্তির কার্য।

নি উপসর্গ অর্থে নিতরাং কেন হইল। বস্তুত নি, প্র, পরি, উৎ প্রভৃতি অনেক উপসর্গেরই আধিক্য অর্থ দেখা যায়। ইহার কারণ, আধিক্যের নানা দিক আছে। কোনোটা বা বাহিরে বহুদূর যায়, কোনোটা ভিতরে, কোনোটা পার্শ্বে, কোনোটা উপরে। অত্যন্ত পাণ্ডিত্যকে এমনভাবে দেখা যাইতে পারে যে, তাহা

পণ্ডিতমহাশয়ের মনের খুব ভিতরে তলাইয়া গিয়াছে, অথবা তাহা সকল পণ্ডিতের পাণ্ডিত্যের অগ্রে অর্থাৎ সম্মুখে চলিয়া গিয়াছে, অথবা তাহা রাশীকৃত হইয়া পর্বতের ন্যায় উপরে চড়িয়া গিয়াছে, অথবা তাহা নানা বিষয়কে অবলম্বন করিয়া চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। কালক্রমে এই-সকল সূক্ষ্ম প্রভেদ ঘুচিয়া গিয়া সর্বপ্রকার আধিক্যকেই উক্ত যে-কোনো উপসর্গ দ্বারা যদৃচ্ছাক্রমে ব্যক্ত করা প্রচলিত হইয়াছে। যদিচ উৎ উপসর্গের ঊর্ধ্বগামিতার ভাব সুস্পষ্ট, এবং উৎপত্তি অনুসারে 'উদার' শব্দে বিশেষরূপে উচ্চতা ও উন্নতভাবই প্রকাশ করে, তথাপি জয়দেব রাধিকার পদপল্লবে উদার বিশেষণ প্রয়োগ করিয়া তাহার একান্ত গৌরব সূচনা করিয়াছেন মাত্র। অতএব নানা উপসর্গে যে একই ভূশার্থ পাওয়া যায় তদ্দ্বারা সেই উপসর্গগুলির ভিন্ন ভিন্ন নানা মূল অর্থেরই সমর্থন করে। অনেক স্থলেই শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয়ের সময় উক্ত উপসর্গগুলির মূল অর্থ অথবা ভূশার্থ দু-ই ব্যবহার করা যাইতে পারে। যথা, নিগূঢ় অর্থে অত্যন্ত গূঢ় অথবা ভিতরের দিকে গূঢ় দু-ই বলা যায়, intense অত্যন্তরূপে টানা অথবা ভিতরের দিকে টানা, উন্মত্ত অত্যন্ত মত্ত অথবা ঊর্ধ্বদিকে মত্ত অর্থাৎ মত্ততা ছাপাইয়া উঠিতেছে, concentrate অত্যন্ত কেন্দ্রীভূত অথবা এরূপ স্থলে কেহ যদি বলেন, অত্যন্ত একত্রে কেন্দ্রীভূত। অর্থের বিকল্পে অন্য অর্থ আমি স্বীকার করিব না, তবে তাঁহার সহিত বৃথা বিতণ্ডা করিতে ক্ষান্ত থাকিব। সমালোচকমহাশয় ইহাও আলোচনা করিয়া দেখিবেন, প্রতি অনু আং প্রভৃতি উপসর্গে নিতরাং প্রকৃষ্ট সম্যক্ প্রভৃতি ভূশার্থ বুঝায় না, তাহার মুখ্য কারণ ওই-সকল উপসর্গে দূরত্ব বুঝাইতে পারে না।

যাহা হউক, সংস্কৃতভাষার উপসর্গের সহিত য়ুরোপীয় আর্যভাষার উপসর্গগুলির যে আশ্চর্য সাদৃশ্য আছে এবং উভয়ের উৎপত্তিস্থল যে একই, সমালোচকমহাশয় বোধ করি তাহা অস্বীকার করেন না। সংস্কৃত উপসর্গগুলির প্রচলিত নানা অর্থের মধ্যে যে-অর্থ ভারতীয় এবং য়ুরোপীয় উভয় ভাষাতেই বিদ্যমান, তাহাকেই মূল অর্থ বলিয়া অনুমান করা অন্যায় নহে।

এইরূপ আর্যভাষার নানা শাখার আলোচনা করিয়া উপসর্গের মূলে উপনীত হইতে যে-পাণ্ডিত্য অবকাশ এবং প্রামাণিক গ্রন্থাদির সহায়তা আবশ্যক, আমার তাহা কিছুই নাই। যাঁহাদের সেই ক্ষমতা ও সুযোগ আছে, এ সম্বন্ধে তাঁহাদের মনোযোগ আকর্ষণ ছাড়া আমার দ্বারা আর কিছুই সম্ভবে না। স্বল্প প্রমাণ ও বহুল অনুমান আশ্রয় করিয়া কয়েকটি কথা বলিব, তাহা অসম্পূর্ণ হইলেও তদ্দ্বারা যোগ্যতর লোকের মনে উদ্যম সঞ্চার করিয়া দিতে পারে, এই আশা করিয়া লিখিতে স্পর্ধিত হইতেছি।

প্র উপসর্গের অর্থ একটা কিছু হইতে বহির্ভাগে অগ্রগামিতা। য়ুরোপীয় উপসর্গ হইতেও ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। বাংলাভাষায় আইসা এবং পইসা নামক দুইটি ক্রিয়া আছে, তাহা আবিশ্‌ এবং প্রবিশ্‌ ধাতুমূলক,— তন্মধ্যে পইসা ধাতু পশিল প্রভৃতি শব্দে বাংলা প্রাচীন সাহিত্যে ও কাব্যে স্থান পাইয়াছে এবং আইসা ধাতু এখনও আপন অধিকার বজায় রাখিয়াছে। আইসা এবং পইসা এই দুটি ধাতুতে আ এবং প্র উপসর্গের অর্থভেদ স্পষ্টরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে। ইহা কেবল দিক্‌ভেদ, পইসা বক্তার দিক হইতে অগ্রভাগে এবং আইসা বক্তার দিকের সান্নিধ্যে আগমন সূচনা করে। য়ুরোপীয় আর্যভাষায় pro উপসর্গের মুখ্য অর্থ বহির্দিকে অগ্রগামিতা এ কথা সর্ববাদিসম্মত ; অতএব এই অর্থ যে মূল প্রাচীন অর্থ, তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই।

এ কথা স্বীকার্য যে, সূর্যের বর্ণরশ্মির ন্যায় প্র উপসর্গ য়ুরোপীয় ভাষায় নানা উপসর্গে বিভক্ত হইয়াছে। Pro, pre, per তাহার উদাহরণ। প্রো সম্মুখগামিতা, প্রি পূর্বগামিতা এবং পর্‌ পারগামিতা অর্থাৎ দূরগামিতা প্রকাশ করে। কাল হিসাবে অগ্রবর্তিতা বক্তার মনের গতি অনুসারে পশ্চাৎকালেও থাটে সম্মুখকালেও খাটে, এই কারণে 'প্রাচীন' শব্দে 'প্র' উপসর্গ অসংগত হয় না। পুরঃ এবং পুরা শব্দে ইহার অনুরূপ উদাহরণ পাওয়া যায়। উভয় শব্দের একই উৎপত্তি হইলেও পুরঃ শব্দ দেশ হিসাবে নিকটবর্তী সম্মুখস্থ দেশ এবং পুরা শব্দ কালহিসাবে দূরবর্তী অতীত কালকে বুঝায়। পূর্ব শব্দেরও প্রয়োগ এইরূপ। পূর্বস্থিত পদার্থ সম্মুখে বর্তমান, কিন্তু পূর্বকাল অতীতকাল। অতএব প্রাচীন শব্দাচার্যগণ যে প্র উপসর্গের 'প্রাথম্যং' এবং 'আরম্ভঃ' অর্থ নির্ণয় করিয়াছেন, তাহা অগ্রগামিতা অর্থেরই রূপভেদ মাত্র। লাটিন ভাষায় তাহাই প্রো এবং প্রি দুই উপসর্গে বিভক্ত হইয়াছে। গ্রীক প্রো উপসর্গে প্রাথম্য অর্থও সূচিত হয়, যথা prologue ; অপর পক্ষে সম্মুখগমতাও ব্যক্ত করে, যথা proboskis, শুণ্ড,— উহার উপপত্তিমূলক অর্থ প্রভক্ষক, যাহা সম্মুখ হইতে খায়। লাটিন পর্‌ উপসর্গের অর্থ through, অর্থাৎ একপ্রান্ত হইতে পরপ্রান্তের অভিমুখতা, পারগামিতা। তাহা হইতে স্বভাবতই 'সর্বতোভাব' অর্থও ব্যক্ত হয়। দুর্গাদাসধৃত পুরুষোত্তমের মতে প্র উপসর্গের সর্বতোভাব অর্থও স্বীকৃত হইয়াছে।

পরি এবং পরা উপসর্গও এই প্র উপসর্গের সহোদর। প্র উপসর্গ বিশেষরূপে বহির্ব্যঞ্জক। Fro, from, fore, forth প্রভৃতি ইংরেজি অব্যয় শব্দগুলি এই অর্থ সমর্থন করে। পরি এবং পরা উপসর্গেও সেই বাহিরের ভাব, পরভাব, অনাত্মভাব বুঝায়। গ্রীক উপসর্গ peri এবং para, পরি এবং পরা উপসর্গের স্বশ্রেণীয়।

গ্রীক ভাষায় পরি উপসর্গে নিকট এবং চতুর্দিক দু-ই বুঝায়। উক্ত উপসর্গ perigee perihelion শব্দে নৈকট্য অর্থে এবং periphery periphrasis শব্দে পরিবেষ্টন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। গ্রীক para উপসর্গেরও একাধিক অর্থ আছে। দূরার্থ, যথা paragoge (addition of a letter or syllable to the end of a word : form para, beyond and ago, to lead), paralogism (reasoning beside or from the point : from para, beyond and logismos, discourse)। Para উপসর্গের আর-একটি অর্থ পাশাপাশি, কিন্তু সে-পাশাপাশি নিকট অর্থে নহে, সংলগ্ন অর্থে নহে, তাহাতে মুখ্যরূপে বিচ্ছেদভাবই প্রকাশ করে। Parallel অর্থে যাহারা পাশাপাশি চলিয়াছে কিন্তু ঘেঁষাঘেঁষি নহে ; এমন-কি, মিলন হইলেই 'প্যারালাল'ত্ব ব্যর্থ হইয়া যায়। Paraphrase অর্থে বুঝায় মূল বাক্যের পাশাপাশি এমন বাক্যপ্রয়োগ যাহারা একভাবাত্মক অথচ এক নহে। Peri উপসর্গে যেমন অবিচ্ছেদ বহির্বেষ্টন বুঝায়, para উপসর্গেও সেইরূপে বাহিরে স্থিতি বুঝায় কিন্তু তাহাতে মধ্যে বিচ্ছেদের অপেক্ষা রাখে।

প্রতি উপসর্গও প্র উপসর্গের একটি শাখা। প্রতি উপসর্গ প্র উপসর্গের সাধারণ অর্থকে একটি বিশেষ অর্থে সংকীর্ণ করিয়া লইয়াছে। ইহাতেও প্র উপসর্গের বাহিরের দিকে অগ্রসর হওয়া বুঝায়, কিন্তু সম্মুখভাগে একটি বিশেষ বাধা লক্ষ্যের অপেক্ষা রাখে। গ্রীক pros এবং প্রাচীন গ্রীক proti উপসর্গ সংস্কৃত প্রতি উপসর্গের একজাতীয়। লাটিন উপসর্গ por (portend) এবং প্রাচীন লাটিন উপসর্গের port-ও এই শ্রেণীভুক্ত।

নি, in, ein এক পর্যায়গত উপসর্গ। নি এবং in উপসর্গে অন্তর্ভাব এবং কখনো কখনো অভাব বুঝায়। যাহা ভিতরে চলিয়া যায়, অন্তর্হিত হয়, তাহা আর দেখা যায় না। বস্তুত, নি অস্ত অন্তর, এগুলি একজাতীয়। নি নির্ অস্ত অন্তর, in en (গ্রীক) anti ante ein hin ent, নি ও নিঃ অব্যয় ও উপসর্গগুলিকে এক গণ্ডির মধ্যে ধরা যায়। ইহা দেখা গিয়াছে যে সংস্কৃত ভাষায় নি উপসর্গে যে ইকার পরে বসিয়াছে অধিকাংশ য়ুরোপীয় আর্যভাষাতেই তাহা পূর্বে বসিয়াছে। অ্যাংলো-স্যাক্সন ডাচ জর্মান গথ ওয়েলস আইরিশ ও লাটিন ভাষায় in, গ্রীক ভাষায় en, স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান ভাষায় ন-বর্জিত শুদ্ধমাত্র i দেখা যায়। মূল আর্যভাষার অ স্বরবর্ণ সংস্কৃত ভাষায় যেরূপ অধিকাংশস্থলে বিশুদ্ধভাবে রক্ষিত হইয়াছে, য়ুরোপীয় আর্যভাষায় তাহা হয় নাই, শব্দশাস্ত্রে এই কথা বলে। অধ্যাপক উইল্‌কিন্স 'গ্রীকভাষা' প্রবন্ধে লিখিতেছেন :

> **But while Graeco-Italic consonants are on the whole the same as those of the primitive tongue, there is a highly important and significant change in the vowel-system. The original a, retained for the most part in Sanskrit, and modified in Zend only under conditions which make it plain that this is not a phenomenon of very ancient date there, has in Europe undergone a change in two directions.**

সেই দ্বিবিধ পরিবর্তন এই যে, অ কোথাও e, i এবং কোথাও o, u আকার ধারণ করিয়াছে।

ইহা হইতে এ কথা অনুমান করা যাইতে পারে যে, মূল আর্যভাষায় যাহা অন্‌ ছিল, য়ুরোপীয় আর্যভাষায় তাহা ইন্‌ ও এন্‌ হইয়াছে। লাটিন ইন্‌ উপসর্গের উত্তর তর প্রত্যয় করিয়া inter intra intro প্রভৃতি শব্দের উদ্ভব হইয়াছে। সংস্কৃত অন্তর শব্দের সহিত তার সারূপ্য সহজেই হৃদয়ংগম হয়।

এইরূপে অন্‌ শব্দকেই অন্ত ও অন্তর শব্দের মূল বলিয়া ধরিলে, অভাবাত্মক অ অন ন নি, an (Greek) in un শব্দগুলির সহিত তাহার যোগ পাওয়া যায়। অন্ত অর্থে শেষ; যেখানে গিয়া কোনো জিনিস 'না' হইয়া যায় সেইখানেই তাহার অন্ত। অন্তর অর্থে যেখানে দূর সেখানে অন্তভাবেরই আধিক্য প্রকাশ করে। অন্তর অর্থে যেখানে ভিতর, সেখানেও একজাতীয় শেষ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গম্যতার অন্ত বুঝাইয়া থাকে। জর্মান-ভাষায় unter, ইংরেজিভাষায় under যদিও অন্তর শব্দের একজাতীয়, তথাপি তাহাতে ভিতর না বুঝাইয়া নিম্ন বুঝায়;— যাহা আর-কিছুর নীচে চাপা পড়ে তাহা প্রত্যক্ষগোচরতার অন্তে গমন করে। লাটিন উপসর্গ ante দেশ বা কালের পূর্বপ্রান্ত নির্দেশ করে: সংস্কৃতভাষায় অন্তর বলিতে ভিতর এবং অন্তর বলিতে বাহির (তদন্তর, অর্থে তাহার পরে অর্থাৎ তাহার বাহিরে), অন্তর বলিতে দূর বুঝায়— শেষের ভাব, প্রান্তের ভাব এই-সকল অর্থের মূল।

অতএব নি ও নির্‌ উপসর্গ এবং তাহার স্বজাতীয় য়ুরোপীয় উপসর্গগুলিতে অন্তের ভাব, অন্তর্ভাব, এবং অন্তর্ধানের ভাব কিরূপে ব্যক্ত হইতেছে তাহা বুঝা কঠিন নহে। এবং মূল অন্‌ শব্দ হইতে কিরূপে ন নি নিঃ, in hin en ein প্রভৃতি নানা রূপের উৎপত্তি হইতে পারে, তাহাও লক্ষ করিলে দেখা যায়।

সংস্কৃত অনু এবং গ্রীক ana, যাহার মুখ্য অর্থ কাহারও পশ্চাদ্বর্তিতা এবং গৌণ অর্থ তুল্যতা এবং পৌনঃপুন্য, পূর্বোক্ত অন্‌ ধাতুর সহিত তাহারও সম্বন্ধ আছে বলিয়া গণ্য করি।

লাটিন de dis এবং সংস্কৃত বি উপসর্গ সম্বন্ধে য়ুরোপীয় শব্দশাস্ত্রে যে-মত প্রচলিত আছে তাহা শ্রদ্ধেয়। দ্বি (অর্থাৎ দুই) শব্দ সংকুচিত হইয়া দি এবং ভারতে বি রূপে

অবশিষ্ট রহিয়াছে। তাহার ভাবই এই— খণ্ডিত হওয়া, বিচ্ছিন্ন হওয়া এবং সেই সঙ্গে নষ্ট হওয়া। Joint বা যোগ দুইখানা হইয়া গেলেই disjointed বা বিযুক্ত হইতে হয়। এই খণ্ডীভবনের ভাব হইতেই de এবং বি উপসর্গে deformity বিকৃতির ভাব আসিয়াছে এবং সাধারণ হইতে খণ্ডীকৃত হইবার ভাব হইতেই বি এবং de উপসর্গের 'বিশেষত্ব' অর্থ উদ্ভাবিত হইয়াছে।

আ অভি অপি অপ অব অধি এবং অতি উপসর্গগুলিকে এক পংক্তিতে স্থাপন করা যায়। আ উপসর্গের অর্থ নিকটলগ্নতা ; ইংরেজি উপসর্গ a (aback, asleep), জর্মান an (ankommen অর্থাৎ আগমন), লাটিন ad, ইংরেজি অব্যয় at সংস্কৃত আ উপসর্গের প্রতিরূপ। এই নৈকট্য অর্থ সংস্কৃতভাষায় স্থিতি এবং গতি অনুসারে আ এবং অভি এই দুই উপসর্গে বিভক্ত হইয়াছে। যাহা নৈকট্য প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা আ এবং যাহা নৈকট্যের চেষ্টা করিতেছে তাহা অভি উপসর্গের দ্বারা ব্যক্ত হয়। অভ্যাগতশব্দে এই দুই ভাব একত্রেই সূচিত হয় ; অভি উপসর্গের দ্বারা দূর হইতে নিকটে আসিবার চেষ্টা এবং আ উপসর্গের দ্বারা সেই চেষ্টার সফলতা, উভয়ই প্রকাশ পাইতেছে। যে-লোক বিশেষ লক্ষ করিয়া দূর হইতে নিকটে আসিয়াছে সে-ই অভ্যাগত। কিন্তু ইহার স্বজাতীয় য়ুরোপীয় উপসর্গগুলিতে স্থানভেদে এই দুই অর্থই ব্যক্ত হয়। A an ad, সংস্কৃত আ এবং অভি উভয় উপসর্গেরই স্থান অধিকার করিয়াছে। Adjacent adjective adjunct শব্দগুলিকে আসন্ন আক্ষিপ্ত আবদ্ধ শব্দ দ্বারা অনুবাদ করিলে মূল শব্দের তাৎপর্য যথাযথ ব্যক্ত করে। কিন্তু adduce address advent শব্দ অভিনয়ন অভিদেশ (অভিনির্দেশ) এবং অভিবর্তন শব্দ দ্বারা অনুবাদযোগ্য। সংস্কৃত অধি উপসর্গও এই ad উপসর্গের সহিত জড়িত।

অপ উপসর্গ আ এবং অভির বিপরীত। লাটিন ab, গ্রীক apo, জর্মান ab এবং ইংরেজি off ইহার স্বজাতীয়। ইহার অর্থ from, নিকট হইতে দূরে। এই দূরীকরণতা হইতে জুগুপ্সাভাব অর্থাৎ ঘৃণাব্যঞ্জকতাও অপ উপসর্গের একটি অর্থ বলিয়া গ্রাহ্য হইয়াছে। ইংরেজিভাষাতেও abject abduction aberration abhor শব্দ আলোচনা করিলে এই অর্থ পাওয়া যায়।

লাটিন sub, গ্রীক hupo যে উপ উপসর্গের স্বজাতীয় ইহা সকলেই জানেন। অব শব্দের নিম্নগতার উপ শব্দের নিম্নবর্তিতার কিঞ্চিৎ অর্থভেদ আছে। উপ উপসর্গে উচ্চ এবং নীচের মধ্যে একটি যোগ রাখিয়া দেয়, অব উপসর্গে সেই সম্বন্ধটি নাই। কূল ও শাখার তুলনায় উপকূল উপশাখা যদিচ নিম্নশ্রেণীয়, তথাপি উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগ

আছে। নিম্নে বসা মাত্রকেই উপাসনা বলে না, পরন্তু আর-কাহারও সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া তাহার নিম্নে নিজেকে আসীন করাই উপাসনা শব্দের উপপত্তিমূলক ভাবার্থ।

Hyper hupar up super উপসর্গগুলির সহিত সংস্কৃত উৎ উপসর্গের সম্পর্ক শ্রুতিমাত্র হৃদয়ংগম হয় না। কিন্তু উৎ হইতে উপ্, উধ হইতে উভ শব্দের উদ্ভব শব্দশাস্ত্র-মতে সংগত। প্রাচীন বাংলার উভমুখ, উভকর, উভরায় শব্দ তাহার প্রমাণ। পালিতেও উর্ধ্বম্ অব্যয়শব্দ উব্‌ভম হইয়াছে। উৎছলিত হওয়াকে বাংলায় উপছিয়া পড়া কহে। উৎপাটিত করাকে উপড়াইয়া ফেলা বলে।

সম উপসর্গ যে গ্রীক syn এবং লাটিন con উপসর্গের একজাতীয় এবং একত্রীভবনের ভাবই তাহার মূল অর্থ, এ সম্বন্ধেও আমরা প্রতিবাদের আশঙ্কা করি না। খণ্ডিত হওয়ার ভাব হইতে বি উপসর্গে যেরূপ বিকৃতি অর্থ আসিয়াছে, একত্রিত হওয়ার ভাব হইতে সং উপসর্গে ঠিক তাহার উল্টা অর্থ প্রকাশ করে। ফলত সং এবং বি পরস্পর বৈপরীত্যবাচক উপসর্গ। সং এক এবং বি দুই। চেম্বার্সের অভিধানে syn উপসর্গ সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে—The root originally signifying one is seen in L. simmul, together simple। শব্দের উৎপত্তিনির্ণয়ে লিখিত হইয়াছে—Simplus, sim once, plico to fold। বিখ্যাত ঋক্ মন্ত্রে সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং শ্লোকে স্পষ্টতই সং শব্দের একত্ব অর্থ প্রকাশ পায়; শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। অতএব প্রাচীন আর্যভাষায় সং শব্দের কোনো মূল ধাতুর অর্থ যে এক ছিল, সে-অনুমান অন্যায় নহে।

যাহা হউক অভিধানে উপসর্গগুলির যে-সকল অর্থ ধৃত হইয়াছে তাহারা মিথ্যা না হইলেও, তাহারা যে মূল অর্থ নহে এবং বিচিত্র আর্যভাষার তুলনা করিয়া যে মূল অর্থ নিষ্কাশনের চেষ্টা করা যাইতে পারে, ইহাই দেখাইবার জন্য আমরা এই প্রবন্ধে বহুল পরিমাণে তুলনামূলক আলোচনা উত্থাপন করিয়াছি। ফলত পণ্ডিত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় যেরূপ অবহেলাসহকারে 'উপসর্গের অর্থবিচার' প্রবন্ধের সমালোচনা করিয়াছেন তাহা সর্বপ্রকারে অনুপযুক্ত হইয়াছে।

১৩০৬

প্রাকৃত ও সংস্কৃত

শ্রীনাথবাবু তাঁহার 'ভাষাতত্ত্ব'-সমালোচনার প্রতিবাদে[1] প্রাচীন বাংলাসাহিত্য হইতে যে-সকল উদাহরণ[2] উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্টই প্রমাণ হইয়াছে, জনসাধারণ্যে প্রচলিত ভাষা 'প্রাকৃত' নামে অভিহিত হইত। মারাঠি ভাষায় এখনও প্রাকৃত শব্দের সেইরূপ ব্যবহার দেখা যায়।[2]

কিন্তু প্রাকৃত শব্দের এই প্রয়োগ আধুনিক বাংলায় চলে নাই, চলা প্রার্থনীয় কি না সন্দেহ।

পুরাকালে যখন গ্রন্থের ভাষা, পণ্ডিতদের ভাষা, সাধারণকথিত ভাষা হইতে ক্রমশ স্বতন্ত্র হইয়া উঠিল তখন সংস্কৃত ও প্রাকৃত এই দুই পৃথক নামের সৃষ্টি হইয়াছিল। তখন যাহা সংস্কৃত ছিল এবং তখন যাহা প্রাকৃত ছিল তাহাই বিশেষরূপে সংস্কৃত ও প্রাকৃত শব্দে বাচ্য।

এখনও বাংলায় লিখিত ভাষা কথিত ভাষা হইতে ক্রমশ স্বতন্ত্র ও সম্পূর্ণ আকার ধারণ করিতেছে। আমরা যদি ধাতুগত অর্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সাধারণকথিত বাংলাকে প্রাকৃত বলি, তাহা হইলে লিখিত গ্রন্থের বাংলাকে সংস্কৃত বলিতে হয়। বস্তুত এখনকার কালের প্রাকৃত ও সংস্কৃত ইহাই। কিন্তু এরূপ হইলে বিপাকে পড়িতে হইবে।

কালিদাস প্রভৃতি কবিদের নাটকে যে-প্রাকৃত ব্যবহার হইয়াছে, তাহা তাঁহাদের সময়ের চলিত ভাষা নহে। চলিত ভাষা প্রদেশভেদে ভিন্ন হয়, অথচ সাহিত্যের প্রাকৃত একই এবং সে-প্রাকৃতের এক ব্যাকরণ। ইহা হইতে অনুমান করা অন্যায় হয় না যে, বিশেষ সময়ের ও বিশেষ দেশের চলিত ভাষা অভিধানে প্রাকৃত শব্দে বিশেষরূপে নির্দিষ্ট হইয়া গেছে; অন্য দেশকালের প্রাকৃতকে 'প্রাকৃত' বলিতে গেলে কেঁচোকেও উদ্ভিদ বলা যাইতে পারে।

যদি প্রাকৃত ও সংস্কৃত শব্দ বাংলাশব্দের পূর্বে বিশেষণরূপে জুড়িয়া ব্যবহার করা হয়,

---

[1] শ্রীনাথ সেন প্রণীত ভাষাতত্ত্ব গ্রন্থের চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সমালোচনার (বঙ্গদর্শন, ১৩০৮ বৈশাখ) গ্রন্থকারকৃত প্রতিবাদ (আলোচনা গ : বঙ্গদর্শন, ১৩০৮ আষাঢ়)।

[2] দ্রষ্টব্য গ্রন্থপরিচয়, রবীন্দ্র-রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড।

যদি লিখিত বাংলাকে 'সংস্কৃত বাংলা' ও কথিত বাংলাকে 'প্রাকৃত বাংলা' বলা যায়, তাহা হইলে আমরা আপত্তি করিতে পারি না। কিন্তু সংস্কৃতভাষা ও প্রাকৃতভাষা অন্যরূপ। প্রাকৃতভাষা বাংলাভাষা নহে, বররুচি তাহার সাক্ষ্য দিবেন।

১৩০৮

বাংলা ব্যাকরণ

তর্কের বিষয়টা কী, অধিকাংশ সময়ে তাহা বুঝিবার পূর্বেই তর্ক বাধিয়া যায়। সেটা যতই কম বোঝা যায়, তর্কের বেগ ততই প্রবল হয়; অবশেষে খুনাখুনি রক্তপাতের পর হঠাৎ বাহির হইয়া পড়ে, দুই পক্ষের মধ্যে মতের বিশেষ অনৈক্য নাই। অতএব ঝগড়াটা কোন্‌খানে, সেইটে আবিষ্কার করা একটা মস্ত কাজ।

আমি কতকগুলা বাংলাপ্রত্যয় ও তাহার দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিয়া তাহা বিচারের জন্য 'পরিষৎ'-সভার হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলাম।[1] আমার সে-লেখাটা এখনও পরিষৎ-পত্রিকায় বাহির হয় নাই, সুতরাং আমার তরফের বক্তব্য পাঠকের সম্মুখে অনুপস্থিত। শুনিয়াছি, কোন্ সুযোগে তাহার প্রুফটি সংগ্রহ করিয়া লইয়া কোন্ কাগজে তাহার প্রতিবাদ বাহির হইয়া গেছে।[2] আমার সাক্ষী হাজির নাই, এই অবকাশে বাদের পূর্বেই প্রতিবাদকে পাঠকসভায় উপস্থিত করিয়া একতরফা মীমাংসার চেষ্টা করাকে ঠিক ধর্মযুদ্ধ বলে না।

এখন সে লইয়া আক্ষেপ করা বৃথা।

বাংলায় জল হইতে জোলো, মদ হইতে মোদো, পানি হইতে পানতা, নুন হইতে নোনতা, বাঁদর হইতে বাদ্‌রাম, জ্যাঠা হইতে জ্যাঠাম প্রভৃতি চলিত কথাগুলি হইতে উয়া, তা, আম প্রভৃতি প্রত্যয় সংকলন করিয়া ভাবী ব্যাকরণকারের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছিলাম। ব্যাকরণ তাঁহারাই করিবেন, আমার কেবল মজুরিই সার। সেই মজুরির জন্য যে অল্প একটুখানি বেতন আমার পাওনা আছে বলিয়া আমি সাধারণের কাছে মনে মনে দাবি করিয়াছিলাম, তাহা নামঞ্জুর হইয়া গেলেও বিশেষ ক্ষতিবোধ করিতাম না। সম্প্রতি দাঁড়াইয়াছে এই যে, ভিক্ষায় কাজ নাই, এখন কুত্তা বুলাইয়া লইলে বাঁচি।

[1] দ্রষ্টব্য "বাংলা কৃৎ ও তদ্ধিত", পৃ. ৩৮২।

[2] নূতন বাংলা ব্যাকরণ— শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী : ভারতী, ১৩০৮ অগ্রহায়ণ।

এখন আমার নামে উলটা অভিযোগ আসিয়াছে যে, আমি এই চলিত কথাগুলা ও তাহার প্রত্যয় সংগ্রহে সহায়তা করিয়া বাংলাভাষাটাকেই মাটি করিবার চেষ্টায় আছি।

যে-কথাগুলা লইয়া আমি আলোচনা করিয়াছিলাম, তাহাদিগকে বাংলায় রাখা বা বাংলা হইতে খারিজ করিয়া দেওয়া আমার বা আর-কাহারও সাধ্যই নহে। তাহারা আছে, এবং কাহারও কথায় তাহারা নিজের স্থান ছাড়িবে না। জগতে যে-কোনো জিনিসই আছে, তাহা ছোটো হউক আর বড়ো হউক, কুৎসিত হউক আর সুশ্রী হউক, প্রাদেশিক হউক আর নাগরিক হউক, তাহার তত্ত্বনির্ণয় বিজ্ঞানের কাজ। শরীরতত্ত্ব কেবল উত্তমাঙ্গেরই বিচার করে এমন নহে, পদাঙ্গুলিকেও অবজ্ঞা করে না। বিজ্ঞানের ঘৃণা নাই, পক্ষপাত নাই।

কিন্তু এই বাংলা চলিত কথাগুলি এবং সংস্কৃত-ব্যাকরণনিরপেক্ষ বিশেষ নিয়মগুলির উল্লেখমাত্র করিলেই বাংলাভাষা নষ্ট হইয়া যাইবে, এমন ধারণা কেন হয়। হিন্দুঘরে গ্রাম্য আত্মীয়ের, দরিদ্র আত্মীয়েরও তো প্রবেশনিষেধ নাই। যদি কেহ নিষেধ করিতে উদ্যত হয়, তবে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে হয়তো জবাব দেয়, উহারা আত্মীয় বটে কিন্তু কুলত্যাগ করিয়া জাতিভ্রষ্ট হইয়াছে।

বাংলায় যাহা-কিছু সংস্কৃতের নিয়ম মানে না, তাহাকে একদল লোক কুলত্যাগী বলিয়া ত্যাগ করিতে চান। এবং সংস্কৃতের নিয়মকে বাংলায় সর্বত্রই প্রতিষ্ঠিত করিতে তাঁহাদের চেষ্টা। তাঁহাদের বিশ্বাস, স্বরচিত ব্যাকরণে তাঁহারা সংস্কৃত-নিয়মকে জাহির করিলে এবং বাংলানিয়মের উল্লেখ না করিলেই, বাংলাভাষা সংস্কৃত হইয়া দাঁড়াইবে। তাঁহারা মনে করেন, 'পাগলাম' এবং 'সাহেবিয়ানা' কথা যে বাংলায় আছে, ও 'আম' এবং 'আনা' নামক সংস্কৃতের প্রত্যয় দ্বারা তাহারা সিদ্ধ, এ কথা না তুলিলেই আপদ চুকিয়া যায়— এবং যখন প্রয়োজন হয়, তখন 'উন্মত্ততা' ও 'ইংরাজানুকৃতিশীলত্ব' কথা ব্যবহার করিলেই গ্রাম্য কথা দুটার অস্তিত্বই ঢাকিয়া রাখা যাইবে।

বাংলাব্যাকরণ যে প্রায় সংস্কৃতব্যাকরণ, ইহাই প্রতিপন্ন করিবার জন্য তাঁহারা বাংলার কারক-বিভক্তিকে সংস্কৃত কারক-বিভক্তির সঙ্গে অন্তত সংখ্যাতেও সমান বলিতে চান।

সংস্কৃতভাষায় সম্প্রদানকারক বলিয়া একটা স্বতন্ত্র কারক আছে, বিভক্তিতেই তাহার প্রমাণ। বাংলায় সে কারক নাই, কর্মকারকের মধ্যে তাহা সম্পূর্ণ লুপ্ত। তবু সংস্কৃত ব্যাকরণের নজিরে যদি বাংলাব্যাকরণে সম্প্রদানকারক জবরদস্তি করিয়া

চালাইতে হয়, তবে এ কথাই বা কেন না বলা যায় যে, বাংলায় দ্বিবচন আছে। যদি 'ধোপাকে কাপড় দিলাম' কর্ম এবং 'গরিবকে কাপড় দিলাম' সম্প্রদান হয়, তবে একবচনে 'বালক', দ্বিবচনে 'বালকেরা' ও বহুবচনেও 'বালকেরা' না হইবে কেন। তবে বাংলাক্রিয়াপদেই বা একবচন, দ্বিবচন, বহুবচন, ছাড়া যায় কী জন্য। তবে ছেলেদের মুখস্থ করাইতে হয়— একবচন 'হইল', দ্বিবচন 'হইল', বহুবচন 'হইল'; একবচন 'দিয়াছে', দ্বিবচন 'দিয়াছে', বহুবচন 'দিয়াছে' ইত্যাদি। 'তাহাকে দিলাম' যদি সম্প্রদান-কারকের কোঠায় পড়ে, তবে 'তাহাকে মারিলাম' সন্তাড়ন-কারক; 'ছেলেকে কোলে লইলাম' সংলালন-কারক; 'সন্দেশ খাইলাম' সম্ভোজন-কারক; 'মাথা নাড়িলাম' সঞ্চালন-কারক এবং এক বাংলা কর্ম-কারকের গর্ভ হইতে এমন সহস্র সঙের সৃষ্টি হইতে পারে।

সংস্কৃত ও বাংলায় কেবল যে কারক-বিভক্তির সংখ্যায় মিল নাই, তাহা নহে। তাহার চেয়ে গুরুতর অনৈক্য আছে। সংস্কৃতভাষায় কর্তৃবাচ্যে ক্রিয়াপদের জটিলতা বিস্তর; এইজন্য আধুনিক গৌড়ীয় ভাষাগুলি সংস্কৃত কর্মবাচ্য অবলম্বন করিয়াই প্রধানত উদ্ভূত। 'করিল' ক্রিয়াপদ 'কৃত' হইতে, 'করিব করিবে' 'কর্তব্য' হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা এ প্রবন্ধে হওয়া সম্ভবপর নহে; হর্ন্‌লে-সাহেব তাঁহার তুলনামূলক গৌড়ীয় ব্যাকরণে ইহার প্রভূত প্রমাণ দিয়াছেন। এই কর্মবাচ্যের ক্রিয়া বাংলায় কর্তৃবাচ্যে ব্যবহার হইতে থাকায় সংস্কৃতব্যাকরণ আর তাহাকে বাগ মানাইতে পারে না। সংস্কৃত তৃতীয়া বিভক্তি 'এন' বাংলায় 'এ' হইয়াছে; যেমন, বাঁশে মাথা ফাটিয়াছে, চোখে দেখিতে পাই না ইত্যাদি। বাঘে খাইল, কথাটার ঠিক সংস্কৃত তর্জমা ব্যাঘ্রেণ খাদিতঃ। কিন্তু খাদিত শব্দ বাংলায় খাইল আকার ধারণ করিয়া কর্তৃবাচ্যের কাজ করিতে লাগিল; সুতরাং বাঘ যাহাকে খাইল, সে বেচারা আর কর্তৃকারকের রূপ ধরিতে পারে না। এইজন্য, ব্যাঘ্রেণ রামঃ খাদিতঃ, বাংলায় হইল বাঘে রামকে খাইল; বাঘে শব্দে করণকারকের এ-কার বিভক্তি থাকা সত্ত্বেও রাম শব্দে কর্মকারকের কে বিভক্তি লাগিল। এ খিচুড়ি সংস্কৃতব্যাকরণের কোনো পর্যায়েই পড়ে না। পণ্ডিতমশায় বলিতে পারেন, হর্ন্‌লে সাহেব-টাহেব আমি মানি না, বাংলায় একার বিভক্তি কর্তৃকারকের বিভক্তি। আচ্ছা দেখা যাক, তেমন করিয়া মেলানো যায় কি না। ধনে শ্যামকে বশ করা গেছে, ইহার সংস্কৃতঅনুবাদ ধনেন শ্যামো বশীকৃতঃ। কিন্তু বাংলাবাক্যটির কর্তা কে। 'ধনে' যদি কর্তা হইত, তবে 'করা গেছে' ক্রিয়া 'করিয়াছে' রূপ ধরিত। 'তাঁহাকে' শব্দ কর্তা নহে, 'কে' বিভক্তিই

তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। কর্তা উহ্য আছে বলা যায় না ; কারণ 'করা গেছে' ক্রিয়া কর্তা মানে না, আমরা করা গেছে, তাঁহারা করা গেছে, হয় না। অথচ ভাবার্থ দেখিতে গেলে, 'বশ করা গেছে' ক্রিয়ার কর্তা উহ্যভাবে 'আমরা'। করা গেছে, খাওয়া গেছে, হওয়া গেছে, সর্বত্রই উত্তম পুরুষ। কিন্তু এই 'আমরা' কথাটাকে স্পষ্টভাবে ব্যবহার করিবার জো নাই ; আমরা আয়োজন করা গেছে, বলিতেই পারি না। এইরূপ কর্তৃহীন কবন্ধবাক্য সংস্কৃতভাষায় হয় না বলিয়া কি পণ্ডিতমশায় বাংলা হইতে ইহাদিগকে নির্বাসিত করিয়া দিবেন। তাহা হইলে ঠগ বাছিতে গাঁ উজাড় হইবে। তাঁহাকে নাচিতে হইবে, কথাটার সংস্কৃত কী। তাং নর্তিতুং ভবিষ্যতি, নহে। যদি বলি, 'নাচিতে হইবে' এক কথা, তবু 'তাং নর্তব্যম্' হয় না। অতএব দেখা যাইতেছে, সংস্কৃতে যেখানে 'তয়া নর্তব্যম্' বাংলায় সেখানে 'তাহাকে নাচিতে হইবে।' ইহা বাংলাব্যাকরণ না সংস্কৃতব্যাকরণ ? আমার করা চাই— এই 'চাই' ক্রিয়াটা কী। ইহার আকার দেখিয়া ইহাকে উত্তমপুরুষ বোধ হয়, কিন্তু সংস্কৃতে ইহাকে 'মম করণং যাচে' বলা চলে না। বাংলাতেও 'আমি আমার করা চাই' এমন কখনও বলি না। বস্তুত 'আমার করা চাই' যখন বলি, তখন অধিকাংশ সময়েই সেটা আমি চাই না, পেয়াদায় চায়। অতএব এই 'চাই' ক্রিয়াটা সংস্কৃত-ব্যাকরণের কোন্ জিনিসটার কোন্ সম্বন্ধী। আমাকে তোমার পড়াতে হবে, এখানে 'তোমার' সর্বনামটি সংস্কৃত কোন্ নিয়মমতে সম্বন্ধপদ হয়। এই বাক্যের অনুবাদ ত্বং মাং পাঠয়িতুম্ অর্হসি ; এখানে ত্বং কর্তৃকারক ও প্রথমা এবং অর্হসি মধ্যম-পুরুষ— কিন্তু বাংলায় 'তোমার' সম্বন্ধপদ এবং 'হবে' প্রথমপুরুষ। সংস্কৃত-ব্যাকরণের নিয়মে এ-সকল বাক্য সাধা অসাধ্য, বাংলাভাষার নিয়মে এগুলিকে পরিত্যাগ করা ততোধিক অসাধ্য। পণ্ডিতমশায় কোন্ পথে যাইবেন। 'আমাকে তোমার পড়াতে হবে' বাক্যটির প্রত্যেক শব্দই সংস্কৃতমূলক, অথচ ইহার প্রত্যেক শব্দটিতেই সংস্কৃত-নিয়ম লঙ্ঘন হইয়াছে।

অপর পক্ষে বলিতে পারেন, যেখানে সংস্কৃতে বাংলায় যথার্থ প্রভেদ ঘটিয়াছে, সেখানে প্রভেদ মানিতে রাজি আছি, কিন্তু যেখানে প্রভেদ নাই, সেখানে তো ঐক্য স্বীকার করিতে হয়। যেমন সংস্কৃতভাষায় ইন প্রত্যয়যোগে 'বাস' হইতে 'বাসী' হয়, তেমনই সেই সংস্কৃত 'ইন' প্রত্যয়ের যোগেই বাংলা দাগ হইতে দাগী হয়— বাংলাপ্রত্যয়টাকে কেহ যদি ই প্রত্যয় নাম দেয় তবে সে অন্যায় করে।

আমরা বলিয়াছিলাম বটে যে, চাষি, দামি, দাগি, দোকানি প্রভৃতি শব্দ সংস্কৃত ইন্ প্রত্যয় যোগে নহে, বাংলা ই প্রত্যয় যোগে হইয়াছে। কেন বলিয়াছিলাম বলি।

জিজ্ঞাস্য এই যে, বাসী শব্দ যে প্রত্যয় যোগে ঈ গ্রহণ করিয়াছে, তাহাকে ঈ প্রত্যয় না বলিয়া ইন্ প্রত্যয় কেন বলা হইয়াছে। ইন্ প্রত্যয়ের ন্-টা মাঝে মাঝে ‘বাসিন্’ ‘বাসিনী’ রূপে বাহির হইয়া পড়ে বলিয়াই তো ? যদি কোথাও কোনো অবস্থাতেই সে ন্ না দেখা যায় তবু কি ইহাকে ইন্ প্রত্যয় বলি। ব্যাঙাচির লেজ ছিল বটে, কিন্তু সে লেজটা খসিয়া গেলেও কি ব্যাঙকে লেজবিশিষ্ট বলিতে হইবে। কিন্তু পণ্ডিতমশায় বলেন, সংস্কৃত মানী শব্দও তো বাংলায় ‘মানিন্’ হয় না। আমাদের বক্তব্য এই যে, কেহ যদি সেইভাবে কোথাও ব্যবহার করেন, তাঁহাকে কেহ একঘরে করিবে না ; অন্তত মানী শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে ‘মানিনী’ হইয়া থাকে। কিন্তু স্ত্রীবিদ্যালয়ের মসীচিহ্নিত বালিকাকে যদি ‘দাগিনী’ বলা যায়, তবে ছাত্রীও হাঁ করিয়া থাকিবে, তাহার পণ্ডিতও টাকে হাত বুলাইবেন।

তখন বৈয়াকরণ পণ্ডিতমশায় উলটিয়া বলিবেন, দাগ কথাটা যে বাংলাকথা, ওটা তো সংস্কৃত নয়, সেইজন্য স্ত্রীলিঙ্গে তাহার ব্যবহার হয় না। ঠিক কথা, যেমন বাংলায় বিশেষণশব্দ স্ত্রীলিঙ্গরূপ পরিত্যাগ করিয়াছে, তেমনই বাংলায় ইন্ প্রত্যয় তাহার ন্ বর্জন করিয়া ই প্রত্যয় হইয়াছে।

ভালো, একটি সংস্কৃত কথাই বাহির করা যাক। ভার শব্দ সংস্কৃত। তবু আমাদের মতে ‘ভারি কথায় বাংলা ই প্রত্যয় হইয়াছে, সংস্কৃত ইন্ প্রত্যয় হয় নাই। তাহার প্রমাণ এই যে, ‘ভারিণী নৌকা’ লিখিতে পণ্ডিতমশায়ের কলমও দ্বিধা করিবে। ইহার কারণ আর কিছুই নয়, মানী কথাটা প্রত্যয় সমেত সংস্কৃতভাষা হইতে পাইয়াছি, ভারি কথাটা পাই নাই ; আমাদের প্রয়োজনমতো আমরা উহাকে বাংলা প্রত্যয়ের ছাঁচে ঢালিয়া তৈরি করিয়া লইয়াছি। মাস্টার কথা আমরা ইংরেজি হইতে পাইয়াছি, কিন্তু মাস্টারি (মাস্টার-বৃত্তি) কথায় আমরা বাংলা ই প্রত্যয় যোগ করিয়াছি। এই ই ইংরেজি mastery শব্দের y নহে। সংস্কৃত ছাঁদে বাংলা লিখিবার সময় কেহ যদি ‘ভো স্বদেশিন্’ লেখেন, তাঁহাকে অনেক পণ্ডিত সমালোচক প্রশংসা করিবেন, কিন্তু কেহ যদি ‘ভো বিলাতিন্’ লিখিয়া রচনার গাম্ভীর্যসঞ্চার করিতে চান, তবে ঘরে-পরে সকলেই হাসিয়া উঠিবে। কেহ বলিতে পারেন ‘বিলাতি’ সংস্কৃত ই প্রত্যয়, ইন্ প্রত্যয় নহে। আচ্ছা, দোকান যাহার আছে সেই ‘দোকানি’কে সম্ভাষণকালে ‘দোকানিন’ এবং তাহার স্ত্রীকে ‘দোকানিনী’ বলা যায় কি।

আর একটা দৃষ্টান্ত দিই। বাংলায় ‘রাগ’ শব্দের অর্থ ক্রোধ ; সেই ‘রাগ’ শব্দের উত্তর ই প্রত্যয়ে ‘রাগি’ হয়। কিন্তু প্রাচীন বৈষ্ণব পদাবলীর কাল হইতে আজ পর্যন্ত পণ্ডিত অপণ্ডিত কেহই রুষ্টা স্ত্রীলোককে “রাগিণী” বলিয়া সম্ভাষণ করেন নাই।

গোবিন্দদাস রাধিকার বর্ণনাস্থলে লিখিয়াছেন :

নব অনুরাগিণী অখিল সোহাগিনী
পঞ্চম রাগিণী মোহিনী রে !

গোবিন্দদাস মহাশয়ের বলিবার অভিপ্রায় এরূপ নহে যে, রাধিকার রাগ সর্বদা পঞ্চমেই চড়িয়া আছে। ইহা হইতে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, সংগীতের 'রাগিণী' কথাটা সংস্কৃত প্রত্যয়ের দ্বারা তৈরি। 'অনুরাগী' কথাটাও সেইরূপ।

পণ্ডিতমশায় বলিবেন, সে যেমনই হউক, এ সমস্তই সংস্কৃতভাষার ব্যবহার হইতে উৎপন্ন ; আমিও সে কথা স্বীকার করি। প্রমাণ হইয়াছে, একই মূল হইতে 'হংস' এবং ইংরেজি 'গ্যাণ্ডার' শব্দ উৎপন্ন। কিন্তু তাই বলিয়া গ্যাণ্ডার সংস্কৃত হংস শব্দের ব্যাকরণগত নিয়ম মানে না, এবং তাহার স্ত্রীলিঙ্গে 'গ্যাণ্ডারী' না হইয়া 'গূস্' হয়। ইহাও প্রমাণ হইয়াছে, একই আর্যপিতামহ হইতে বপ্‌, বার্ণ্‌ফ্‌ প্রভৃতি য়ুরোপীয় শাব্দিক ও বাঙালি ব্যাকরণজ্ঞ পণ্ডিত জন্মিয়াছেন, কিন্তু য়ুরোপীয় পণ্ডিতরা ব্যাকরণকে যে-বিজ্ঞানসম্মত ব্যাপকভাবে দেখেন, আমাদের পণ্ডিতরা তাহা দেখেন না ; অতএব উৎপত্তি এক হইলেও ব্যুৎপত্তি ভিন্ন প্রকারের হওয়া অসম্ভব নহে। ইন্‌ প্রত্যয় হইতে বাংলা ই প্রত্যয় উৎপন্ন হইয়াছে বটে, তবু তাহা ইন্‌ প্রত্যয়ের সমস্ত নিয়ম মানিয়া চলে না ; এইজন্য এই দুটিকে ভিন্ন কোঠায় না ফেলিলে কাজ চালাইবার অসুবিধা হয়। লাঙলের ফলার লোহা হইতে ছুঁচ তৈরি হইতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া সেই ছুঁচ দিয়া মাটি চষিবার চেষ্টা করা পাণ্ডিত্য নহে।

বস্তুত প্রত্যেক ভাষার নিজের একটা ছাঁচ আছে। উপকরণ যেখান হইতেই সে সংগ্রহ করুক, নিজের ছাঁচে ঢালিয়া সে তাহাকে আপনার সুবিধামতো বানাইয়া লয়। সেই ছাঁচটাই তাহার প্রকৃতিগত, সেই ছাঁচেই তাহার পরিচয়। উর্দুভাষায় পারসি আরবি কথা ঢের আছে, কিন্তু সে কেবল আপনার ছাঁচেই চতুর ভাষাতত্ত্ববিদের কাছে হিন্দির বৈমাত্র সহোদর বলিয়া ধরা পড়িয়া গেছে। আমাদের বাঙালি কেহ যদি মাথায় হ্যাট, পায়ে বুট, গলায় কলার এবং সর্বাঙ্গে বিলাতি পোশাক পরেন, তবু তাঁহার রঙে এবং দেহের ছাঁচে কুললক্ষণ প্রকাশ হইয়া পড়ে। ভাষার সেই প্রকৃতিগত ছাঁচটা বাহির করাই ব্যাকরণকারের কাজ। বাংলায় সংস্কৃতশব্দ ক'টা আছে, তাহার তালিকা করিয়া বাংলাকে চেনা যায় না, কিন্তু কোন্‌ বিশেষ ছাঁচে পড়িয়া সে বিশেষ-রূপে বাংলা হইয়া উঠিয়াছে, তাহা সংস্কৃত ও অন্য ভাষার আমদানিকে কী ছাঁচে ঢালিয়া আপনার করিয়া লয়, তাহাই নির্ণয় করিবার জন্য বাংলাব্যাকরণ। সুতরাং ভাষার এই আসল ছাঁচটি বাহির করিতে গেলে, এখনকার ঘরগড়া কেতাবি ভাষার

বাহিরে গিয়া চলিত কথার মধ্যে প্রবেশ করিতে হয়। সে-সব কথা গ্রাম্য হইতে পারে, ছাপাখানায় কালির ছাপে বঞ্চিত হইতে পারে, সাধুভাষায় ব্যবহারের অযোগ্য হইতে পারে, তবু ব্যাকরণকারের ব্যাবসা রক্ষা করিতে হইলে তাহাদের মধ্যে গতিবিধি রাখিতে হয়।

ইন্ প্রত্যয় সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, স্ত্রীলিঙ্গে ইনি ও ঈ সম্বন্ধেও সেই একই কথা। বাংলায় স্ত্রীলিঙ্গে 'ইনি' 'ই' পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা সংস্কৃত-ব্যাকরণের ছাঁচ মানে না। সে বাঙালি হইয়া আর এক পদার্থ হইয়া গেছে। তাহার চেহারাও বদল হইয়াছে। রয়ের পরে সে আর মূর্ধন্য ণ গ্রহণ করে না (কলমের মুখে করিতে পারে কিন্তু জিহ্বাগ্রে করে না)— সংস্কৃত বিধানমতে সে কোথাও স্ত্রীলিঙ্গে আকার মানে না, এইজন্য সে অধীনাকে অধীনি বলে। সে যদি নিজেকে সংস্কৃত বলিয়া পরিচয় দিতে ব্যাকুল হইত, তবে 'পাঁঠা' হইতে 'পাঁঠি' হইত না, 'বাঘ' হইতে 'বাঘিনী' হইত না। কলু হইতে কলুনি, ঘোড়া হইতে ঘুড়ি, পুরুৎ হইতে পুরুৎনি নিষ্পন্ন করিতে হইলে মুগ্ধবোধের সূত্র টুকরা টুকরা এবং বিদ্যাবাগীশের টীকা আগুন হইয়া উঠিত।

পণ্ডিতমশায় বলিবেন, ছি ছি ও কথাগুলা অকিঞ্চিৎকর, উহাদের সম্বন্ধে কোনো বাক্যব্যয় না করাই উচিত। তাহার উত্তর এই যে, কমলি নেই ছোড়তা। পণ্ডিতমশায়ও ঘরের মধ্যে কলুর স্ত্রীকে 'কল্বী' অথবা 'তৈলযন্ত্রপরিচালিকা' বলেন না, সে স্থলে আমরা কোন্ ছার! মাকে মা বলিয়া স্বীকার না করিয়া প্রপিতামহীকেই মা বলিতে যাওয়া দোষের হয়। সেইরূপ বাংলাকে বাংলা না বলিয়া কেবলমাত্র সংস্কৃতকেই যদি বাংলা বলিয়া গণ্য করি, তবে তাহাতে পাণ্ডিত্যপ্রকাশ হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে কাণ্ডজ্ঞানের পরিচয় থাকে না।

পণ্ডিত বলেন, বাংলা স্ত্রীলিঙ্গ শব্দে তুমি ঈ ছাড়িয়া হ্রস্ব ই ধরিলে যে? আমি বলিব ছাড়িলাম আর কই। একতলাতেই যাহার বাস তাহাকে যদি জিজ্ঞাসা কর, নীচে নামিলে যে, সে বলিবে, নামিলাম আর কই— নীচেই তো আছি। ঘোটকীর দীর্ঘ ঈ-তে দাবি আছে; সে ব্যাকরণের প্রাচীন সনন্দ দেখাইতে পারে,— কিন্তু ঘুড়ির তাহা নাই। প্রাচীনভাষা তাহাকে এ অধিকার দেয় নাই। কারণ, তখন তাহার জন্ম হয় নাই; তাহার পরে জন্মাবধি সে তাহার ইকারের পৈতৃক দীর্ঘতা খোয়াইয়া বসিয়াছে। টিপুসুলতানের কোনো বংশধর যদি নিজেকে মৈশুরের রাজা বলেন, তবে তাঁহার পারিষদরা তাহাতে সায় দিতে পারে, কিন্তু রাজত্ব মিলিবে না। হ্রস্ব ই-কে জোর করিয়া দীর্ঘ লিখিতে পার, কিন্তু দীর্ঘত্ব মিলিবে না। যেখানে খাস্ বাংলা স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ সেখানে হ্রস্ব ইকারের অধিকার, সুতরাং দীর্ঘ ঈ-র সেখান হইতে ভাসুরের মতো দূরে চলিয়া যাওয়াই কর্তব্য।

পণ্ডিতমশায় বলিবেন, বানানের মধ্যে পূর্ব ইতিহাসের চিহ্ন বজায় রাখা উচিত। দেখা যাক, মেছনি কথাটার মধ্যে পূর্ব ইতিহাস কতটা বজায় আছে। ৎ, স, এবং যফলা কোথায় গেল। ম-এ একার কোন্ প্রাচীন ব্যবহারের চিহ্ন। ন-টা কোথাকার কে। ওটা কি মৎস্যজীবিনীর ন। তবে জীবিটা গেল কোথায়। এমন আরও অনেক প্রশ্ন হইতে পারে। সদুত্তর এই যে, ৎ এবং স বাংলায় ছ হইয়া গেছে— এই ছ-ই ৎ এবং স-এর ঐতিহাসিক চিহ্ন, এই চিহ্ন বাংলা 'বাছা' শব্দের মধ্যেও আছে। পরিবর্তনপরম্পরায় যফলা লোপ পাইয়া পূর্ববর্ণের অকারকে আকার করিয়াছে, যেমন লুপ্ত যফলা অদ্যকে আজ, কল্যকে কাল করিয়াছে— অতএব এই আকারই লুপ্ত যফলার ঐতিহাসিক চিহ্ন। ইহারা পূর্ব ইতিহাসেরও চিহ্ন, এখনকার ইতিহাসেরও চিহ্ন। মাছ শব্দের উত্তর বাংলাপ্রত্যয় উয়া যোগ হইয়া 'মাছুয়া' হয়, মাছুয়া শব্দের সংক্ষিপ্ত ব্যবহার 'মেছো'; মেছো শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে নি প্রত্যয় হইয়াছে। এই নি প্রত্যয়ের হ্রস্ব ই প্রাচীন দীর্ঘ ঈকারের ঐতিহাসিক অবশেষ। আমরা যদি বাংলার অনুরোধে মৎস্যকে কাটিয়া কুটিয়া মাছ করিয়া লইতে পারি এবং তাহাতে যদি ইতিহাসের জাতি নষ্ট না হইয়া থাকে, তবে বাংলাউচ্চারণের সত্যরক্ষা করিতে দীর্ঘ ঈ-র স্থলে হ্রস্ব ই বসাইলেও ইতিহাসের ব্যাঘাত হইবে না। মুখে যাহাই করি, লেখাতেই যদি প্রাচীন ইতিহাস রক্ষা করা বিধি হয়, তবে 'মৎস্য' লিখিয়া 'মাছ' পড়িলে ক্ষতি নাই। পণ্ডিত বলিবেন, আমরা সংস্কৃত শব্দেও তিন স, দুই ন, য ও হ্রস্ব-দীর্ঘ স্বরকে লিখি শুদ্ধ, কিন্তু পড়ি অশুদ্ধ, অতএব ঠিক সেই পরিমাণ উচ্চারণের সহিত বানানের অনৈক্য বাংলাতেও চালানো যাইতে পারে। তাহার উত্তর এই যে, অনেক বাঙালি ইংরাজি w বর্ণের উচ্চারণ করেন না— তাঁহারা লেখেন wood, কিন্তু উচ্চারণ করেন ood; কিন্তু তাই বলিয়া নিজের উচ্চারণদোষের অনুরূপ বানান করিবার অধিকার তাঁহার নাই; ইহা তাঁহার নিজস্ব নহে; ইহার বানানে হস্তক্ষেপ করিলে অর্থবোধই হইবে না। কিন্তু, আলমারি শব্দ 'আলমাইরা' হইতে উৎপন্ন হইলেও, উহা জন্মান্তরগ্রহণকালে বাঙালি হইয়া গেছে; সুতরাং বাংলা আলমারি-কে 'আলমাইরা' লিখিলে চলিবে না। সহস্র পারসি কথা বিকৃত হইয়া বাংলা হইয়া গেছে, এখন তাহাদের আর জাতে তোলা চলে না; আমরা লোকসান-কে 'নুকসান্' লিখিলে ভুল হইবে, এমন-কি, লুকসান-ও লিখিতে পারি না। কিন্তু যে পারসি শব্দ বাংলা হইয়া যায় নাই, অথচ আমাদের রসনার অভ্যাসবশত যাহার উচ্চারণের কিছু ব্যতিক্রম হয়, তাহার বানান বিশুদ্ধ আদর্শের অনুরূপ লেখা উচিত। অনেক হিন্দুস্থানি নাইয়ের নীচে ধুতি পরে;

আমরা তাহাদের প্রথা জানি, সুতরাং আশ্চর্য হই না ;— কিন্তু সে যদি নাইয়ের নীচে প্যাণ্টলুন্ পরে, তবে তাহাকে বন্ধুভাবে নিষেধ করিয়া দিতে হয়। নিজের জিনিস নিজের নিয়মেই ব্যবহার করিতে হয়, পরের জিনিসে নিজের নিয়ম খাটাইতে গেলেই গোল বাধিয়া যায়। যে-সংস্কৃতশব্দ বাংলা হইয়া যায় নাই, তাহা সংস্কৃতেই আছে, যাহা বাংলা হইয়া গেছে, তাহা বাংলাই হইয়াছে— এই সহজ কথাটা মনে রাখা শক্ত নহে।

কিন্তু কেতাবের বাংলায় প্রতিদিন ইহার ব্যতিক্রম হইতেছে। আমরা জড়-এর জ এবং যখন-এর য একই রকম উচ্চারণ করি, আলাদারকম লিখি। উপায় নাই। শিশু বাংলাগদ্যের ধাত্রী ছিলেন যাঁহারা, তাঁহারা এই কাণ্ড করিয়া রাখিয়াছেন। সাবেক কালে যখন শব্দটাকে বর্গ্য জ দিয়া লেখা চলিত— ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতরা সংস্কৃতের যৎ শব্দের অনুরোধে বর্গ্য জ-কে অন্তস্থ য করিয়া লইলেন, অথচ ক্ষণ শব্দের মূর্ধন্য ণ-কে বাংলায় দন্ত্য ন-ই রাখিয়া দিলেন। তাহাতে, এই যখন শব্দটা একাঙ্গীভূত হরগৌরীর মতো হইল ; তাহার—

আধভালে শুদ্ধ অন্তস্থ সাজে
আধভালে বঙ্গ বর্গীয় রাজে।

সৌভাগ্যক্রমে আধুনিক পণ্ডিতরা খাঁটি বাংলাশব্দকে অবজ্ঞা করিয়া তাঁহাদের রচনাপংক্তির মধ্যে পারতপক্ষে স্থান দেন নাই— কেবল যে-সকল ক্রিয়া ও অব্যয় পদ নহিলে নয়, সেইগুলাকে সংস্কৃত বানানের দ্বারা যথাসাধ্য শোধন করিয়া লইয়া তবে তাঁহাদের লেখার মধ্যে প্রবেশ করিতে দিয়াছেন। এইজন্য অধিকাংশ খাস বাংলাকথা সম্বন্ধে এখনও আমাদের অভ্যাস খারাপ হয় নাই ; সেগুলার খাঁটি বাংলাবানান চালাইবার সময় এখনও আছে।

আমরা এ কথা বলিয়া থাকি, সংস্কৃতব্যাকরণে যাহাকে ণিজন্ত বলে, বাংলায় তাহাকে ণিজন্ত বলা যায় না। ইহাতে যিনি, সংস্কৃতব্যাকরণের অপমান বোধ করেন, তিনি বলেন, কেন ণিজন্ত বলিব না, অবশ্য বলিব। কবিবর নবীন সেন মহাশয়ের দুইটি লাইন মনে পড়ে :

কেন গাহিব না অবশ্য গাহিব,
গাহে না কি কেহ সুস্বর বিহনে।

ণিজন্ত শব্দ সম্বন্ধেও পণ্ডিতমহাশয়ের সেইরূপ অটল জেদ, তিনি বলেন, ণিজন্ত—

কেন বলিব না অবশ্য বলিব
বলে না কি কেহ কারণ বিহনে

আমরা ব্যাকরণে পণ্ডিত নই, তবু আমরা যতটা বুঝিয়াছি, তাহাতে ণিচ্ একটা

সংকেত মাত্র— যেখানে সে-সংকেত খাটে না, সেখানে তাহার কোনোই অর্থ নাই। ণিচ্-এর সংকেত বাংলায় খাটে না, তবু পণ্ডিতমশায় যদি ওই কথাটাকে বাংলায় চালাইতে চান, তবে তাহার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, সংস্কৃত নৌকা দাঁড়ে চলে, অতএব বাংলা ফসলের খেতে লাঙল চলিবে কেন, নিশ্চয়ই দাঁড় চলিবে। কিন্তু দাঁড় জিনিস অত্যন্ত দামি উৎকৃষ্ট জিনিস হইলেও তবু চলিবে না। শ্রু ধাতু যে-নিয়মে 'শ্রাবি' হয়, সেই নিয়মে শুন্ ধাতুর 'শু' 'শৌ' হইয়া ও পরে ইকার যোগে 'শৌনিতেছে' হইত। হয়তো খুব ভালোই হইত, কিন্তু হয় না যে সে আমার বা মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের দোষ নহে। সংস্কৃত পঠ্ ধাতুর উত্তরে ণিচ্ প্রত্যয় করিয়া পাঠন হয়, বাংলায় সেই অর্থে পড়্ ধাতু হইতে 'পড়ান' হয় 'পাড়ন' হয় না। অতএব সেখানে তাহার সংকেতই কেহ মানিবে না, সেখানে অস্থানে অকারণে বৃদ্ধ ণিচ্‌সিগ্নালার তাহার প্রাচীন পতাকা তুলিয়া কেন বসিয়া থাকিবে, সে নাই-ও। তাহার স্থলে আর-একটি যে-সংকেত বসিয়া আছে, সে হয়তো তাহারই শ্রীমান পৌত্র, আমাদের ভক্তিভাজন ণিচ্ নহে ;— কৌলিক সাদৃশ্য তো কিছু থাকিবেই, কিন্তু ব্যবহারের ব্যতিক্রমেই তাহার স্বাতন্ত্র্য ধরা পড়ে। তবু যদি বাংলায় সেই ণিচ্ প্রত্যয়ই আছে বলিতে হয়, তবে ধ্রুপদের প্রতি সম্মান দেখাইবার জন্য কাওয়ালিকে চৌতাল নাম দিলেও দোষ হয় না। প্রতিবাদে লিখিত হইয়াছে ;

> যে সকল শব্দ লইয়া অভিনব ব্যাকরণ নির্মাণের চেষ্টা হইতেছে উহা একান্ত অকিঞ্চিৎকর। ঐ সকল শব্দের বহুল প্রয়োগে ভাষার গুরুত্ব ও মাধুর্য কতদূর রক্ষিত হইবে, তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে।

বাংলা বলিয়া একটা ভাষা আছে, তাহার গুরুত্ব মাধুর্য ওজন করা ব্যাকরণকারের কাজ নহে। সেই ভাষার নিয়ম বাহির করিয়া লিপিবদ্ধ করাই তাঁহার কাজ। সে-ভাষা যে ইচ্ছা ব্যবহার করুক বা না-করুক, তিনি উদাসীন। কাহারও প্রতি তাঁহার কোনো আদেশ নাই, অনুশাসন নাই। জীবতত্ত্ববিৎ কুকুরের বিষয়ও লেখেন, শেয়ালের বিষয়ও লেখেন। কোনো পণ্ডিত যদি তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিতে আসেন যে, তুমি যে শিয়ালের কথাটা এত আনুপূর্বিক লিখিতে বসিয়াছে, শেষকালে যদি লোকে শেয়াল পুষিতে আরম্ভ করে !— তবে জীবতত্ত্ববিদ্ তাহার কোনো উত্তর না দিয়া তাঁহার শেয়াল সম্বন্ধীয় পরিচ্ছেদটা শেষ করিতেই প্রবৃত্ত হন। বঙ্গদর্শন-সম্পাদক যদি তাঁহার কাগজে মাছের তেলের উপর বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লেখেন, তবে আশা করি কোনো পণ্ডিত তাঁহাকে এ অপবাদ দিবেন না যে, তিনি মাছের তেল মাথায় মাখিবার জন্য পাঠকদিগকে অন্যায় উত্তেজিত করিতেছেন।

প্রতিবাদ-লেখক মহাশয় হাস্যরসের অবতারণা করিয়া লিখিয়াছেন :

> যদি কেহ লেখেন, 'যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে বলিলেন— প্রিয়ে, তুমি যে-কথা বলিতেছ তাহার বিস্‌মোল্লায়ই গলদ' তাহা হইলে প্রয়োগটি কি অতিশোভন হইবে।

প্রয়োগের শোভনতাবিচার ব্যাকরণের কাজ নহে, অলংকার শাস্ত্রের কাজ— ইহা পণ্ডিতমহাশয় জানেন না, এ কথা বিশ্বাস করিতে আমাদের সাহস হয় না। উল্লিখিত প্রয়োগে ব্যাকরণের কোনো ভুলই নাই, অলংকারের দোষ আছে। 'বিস্‌মোল্লায় গলদ' কথাটা এমন জায়গাতেও বসিতে পারে যেখানে অলংকারের দোষ না হইয়া গুণ হইবে। অতএব পণ্ডিতমশায়ের রসিকতা এখানে বাজে খরচ হইল। যাঁহারা প্রাকৃত বাংলার ব্যাকরণ লিখিতেছেন, তাঁহারা এই হাস্যবাণে বাসায় গিয়া মরিয়া থাকিবেন না। শ্রীযুক্ত পণ্ডিতমহাশয় এ কথাও মনে রাখিবেন যে, চলিত ভাষা অস্থানে বসাইলেই যে কেবল ভাষার প্রয়োগদোষ হয়, তাহা নহে ; বিশুদ্ধ সংস্কৃতশব্দ বিশুদ্ধ সংস্কৃতনিয়মে বাংলায় বসাইলেও অলংকারদোষ ঘটিতে পারে। কেহ যদি বলেন, আপনার সুন্দরী বক্তৃতা শুনিয়া অদ্যকার সভা আপ্যায়িতা হইয়াছে, তবে তাহাতে স্বর্গীয় বোপদেবের কোনো আপত্তি থাকিবার কথা নাই, কিন্তু শ্রোতারা গাম্ভীর্য-রক্ষা না করিতেও পারেন।

খাঁটি বাংলাকথাগুলির নিয়ম অত্যন্ত পাকা ;— উট কথাটাকে কোনোমতেই স্ত্রীলিঙ্গে 'উটী' করা যাইবে না, অথবা দাগ শব্দের উত্তর কোনোমতেই ইত প্রত্যয় করিয়া 'দাগিত' হইবে না, ইহাতে সংস্কৃতব্যাকরণ যতই চক্ষু রক্তবর্ণ করুন। কিন্তু সংস্কৃতশব্দের বেলায় আমাদের স্বাধীনতা অনেকটা বেশি। আমরা ইচ্ছা করিলে 'এই মেয়েটি বড়ো সুন্দরী' বলিতে পারি, আবার 'এই মেয়েটি বড়ো সুন্দর' ইহাও বলা চলে। আমাদের পণ্ডিতমশায় একজায়গায় লিখিয়াছেন, 'বিদ্যা যশের হেতুরূপে প্রতীয়মান হয়।' প্রতীয়মান কথাটা তিনি বাংলাব্যাকরণের নিয়মে ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু যদি সংস্কৃতনিয়মে 'প্রতীয়মানা' লিখিতেন তাহাও চলিত। আর-এক জায়গায় লিখিয়াছেন, 'বিভীষিকাময়ী ছায়াটাকে বঙ্গভাষার অধিকার হইতে নিষ্কাশিত করিয়া দিতে পারেন,'— ছায়া শব্দের এক বিশেষণ 'বিভীষিকাময়ী' সংস্কৃত বিধানে হইল অন্য বিশেষণ 'নিষ্কাশিত' বাংলানিয়মেই হইল। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে, সংস্কৃতশব্দ বাংলাভাষায় সুবিধামতো কখনো নিজের নিয়মে চলে, কখনো বাংলানিয়মে চলে। কিন্তু খাঁটি বাংলাকথার সে-স্বাধীনতা নাই— 'কথাটা উপযুক্তা হইয়াছে' এমন প্রয়োগ চলিতেও পারে, কিন্তু 'কথাটা ঠিক হইয়াছে' না বলিয়া যদি 'ঠিকা হইয়াছে' বলি, তবে তাহা সহ্য করা অন্যায় হইবে। অতএব বাংলারচনায়

সংস্কৃতশব্দ কোথায় বাংলানিয়মে, কোথায় সংস্কৃতনিয়মে চলিবে তাহা ব্যাকরণকার বাঁধিয়া দিবেন না, তাহা অলংকার শাস্ত্রের আলোচ্য। কিন্তু বাংলাশব্দ ভাষার ভূষণ নহে, ভাষার অঙ্গ— সুতরাং তাহাকে বোপদেবের সূত্রে মোচড় দিলে চলিবে না, তাহাতে সমস্ত ভাষার গায়ে ব্যথা লাগিবে। এইজন্যই, 'ভ্রাতৃবধূ একাকী আছেন' অথবা 'একাকিনী আছেন' দু-ই বলিতে পারি— কিন্তু 'আমার ভাজ একলা আছেন' না বলিয়া 'এক্‌লানী আছেন' এমন প্রয়োগ প্রাণান্ত সংকটে পড়িলেও করা যায় না। অতএব, বাংলাভাষায় সংস্কৃতশব্দ কিরূপ নিয়মে ব্যবহার করা যাইবে, তাহা লইয়া পণ্ডিতে পণ্ডিতে যত ইচ্ছা লড়াই করুন, বাংলা-বৈয়াকরণের সে-যুদ্ধে রক্তপাত করিবার অবকাশ নাই।

আমার প্রবন্ধে আমি ইংরেজি monosyllabic অর্থে 'একমাত্রিক' কথা ব্যবহার করিয়াছিলাম, এবং 'দেখ্, মার্' প্রভৃতি ধাতুকে একমাত্রিক বলিয়াছিলাম, ইহাতে প্রতিবাদী মহাশয় অত্যন্ত রাগ করিয়াছেন। তিনি বলেন :

> ব্যাকরণশাস্ত্রানুসারে হ্রস্বস্বরের একমাত্রা, দীর্ঘ স্বরের দুইমাত্রা, প্ল‍ুতস্বরের তিনমাত্রা ও ব্যঞ্জনবর্ণের অর্ধমাত্রা গণনা করা হয়।

অতএব তাঁহার মতে দেখ্ ধাতু আড়াইমাত্রিক। এই যুক্তি অনুসারে 'একমাত্রিক' শব্দটাকে তিনি বিদেশী বলিয়া গণ্য করেন।

ইহাকেই বলে বিস্‌মোল্লায় গলদ। মাত্রা ইংরেজিই কী বাংলাই কী আর সংস্কৃতই কী। যদিচ প্রাচীন ভারতবর্ষ আধুনিক ভারতের চেয়ে অনেক বিষয়ে অনেক বড়ো ছিল, তবু 'এক' তখনও 'এক'ই ছিল এবং দুই ছিল 'দুই'। পণ্ডিতমশায় যদি যথেষ্ট পরিমাণে ভাবিয়া দেখেন, তবে হয়তো বুঝিতে পারিবেন, গণিত শাস্ত্রের এক ইংলণ্ডেও এক, বাংলাদেশেও এক এবং ভীষ্ম-দ্রোণ ভীমার্জুনের নিকটও তাহা একই ছিল। তবে আমরা যেখানে এক ব্যবহার করি অন্যত্র সেখানে দুই ব্যবহার করিতে পারে। যেমন, আমরা এক হাতে খাই, ইংরেজ দুই হাতে খায়, লঙ্কেশ্বর রাবণ হয়তো দশ হাতে খাইতেন ; আমরা কেবল আমাদেরই খাওয়ার নিয়মকে স্মরণ করিয়া ওই-সকল 'বাহুহাস্তিক' খাওয়াকে 'ঐকহাস্তিক' বলিয়া বর্ণনা করিতে পারি না। সংস্কৃতভাষায় যে-শব্দ আড়াইমাত্রা কাল ধরিয়া উচ্চারিত হইত, বাংলায় সেটা যদি একমাত্রা কাল লইয়া উচ্চারিত হয় তবুও তাহাকে আড়াইমাত্রিক বলিবই,— সংস্কৃতব্যাকরণের খাতিরে বুদ্ধির প্রতি এতটা জুলুম সহ্য হয় না। পণ্ডিতমহাশয়কে যদি নামতা পড়িতে হয়, তবে সাতসাত্তে উনপঞ্চাশ কথাটা তিনি কতক্ষণ ধরিয়া উচ্চারণ করেন ? বাংলা ব্যবহারে ইহার মাত্রা ছয়— সংস্কৃতমতে ষোলো। তিনি যদি পাণিনির প্রতি সম্মান

রাখিবার জন্য যোলো মাত্রায় সা-ত-সা-ত্তে-উ-ন-প-ঞ্চা-শ উচ্চারণ করিতেন, তবে তাঁহার অপেক্ষা নির্বোধ ছেলে দ্রুত আওড়াইয়া দিয়া ক্লাসে তাঁহার উপরে উঠিয়া যাইত। সংস্কৃতব্যাকরণকেই যদি মানিতে হয়, তবে কেবল মাত্রায় কেন উচ্চারণেও মানিতে হয়। পণ্ডিতমহাশয়ের যদি লক্ষ্মীনারান বলিয়া চাকর থাকে এবং তিনি অষ্টাধ্যায়ীর মতে দীর্ঘ-হ্রস্ব-প্লুত স্বরের মাত্রা ও কণ্ঠ-তালব্য-মূর্ধন্যের নিয়ম রাখিয়া 'লক্‌ষমীনারায়ড়ঁ' বলিয়া ডাক পাড়েন তবে একা লক্ষ্মীনারান কেন, রাস্তার লোক সুদ্ধ আসিয়া হাজির হয়। কাজেই বাংলা 'ক্ষ' সংস্কৃত ক্ষ নহে এবং বাংলার মাত্রা সংস্কৃতের মাত্রা নহে, এ কথা বাংলাব্যাকরণকার প্রচার করা কর্তব্য বোধ করেন। এইজন্য স্বয়ং মাতা সরস্বতীও যখন বাংলা বলেন, বাঙালির ছেলেরা তাহা নিজের মাতৃভাষা বলিয়া চিনিতে পারে— তবে তাঁহারই বরপুত্র হইয়া পণ্ডিতমহাশয় বাংলাভাষার বাংলানিয়মের প্রতি এত অসহিষ্ণু কেন। তিনি অত্যন্ত উদ্ধত হইয়া বলিয়াছেন যে, তিনি আর-কিছুরই প্রতি দৃক্‌পাতমাত্র করিবেন না, কেবল 'একমাত্রিক শব্দের দেশীয় ব্যাকরণ ও অভিধানানুযায়ী অর্থ গ্রহণ' করিবেন। তাই করুন, আমরা বাধা দিব না। কিন্তু ইহা দেখা যাইতেছে, অর্থ জিনিসটাকে গ্রহণ করিব বলিলেই করা যায় না। অভিধান-ব্যাকরণ অর্থের লোহার সিন্ধুক— তাহারা অর্থ দিতে পারে না, বহন করিতে পারে মাত্র। চাবি লাগাইয়া সেই অর্থ লইতে হয়।

প্রতিবাদী মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধের একস্থলে প্রশ্ন করিয়াছেন :

> রবীন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন 'থ্যাঁলো মাংস'— এই থ্যাঁলোটা কী।

অবশেষে শ্রান্ত, বিমর্ষ, হতাশ হইয়া লিখিতেছেন :

> অনেককে জিজ্ঞাসা করিলাম, কেহই বলিতে পারিলেন না। কলিকাতার অধিবাসী অথচ যাঁহাদের গৃহে সাহিত্যচর্চাও আছে এবং নির্বিশেষে মৎস্যমাংসের গতিবিধিও আছে এমন ব্যক্তির নিকট জিজ্ঞাসু হইয়াছি, তাহাতেও কোনো ফল হয় নাই।

পণ্ডিতমহাশয়ের যে এত প্রচুর শ্রম ও দুঃখের কারণ হইয়াছি, ইহাতে নিজেকে ধিক্কার দিতে ইচ্ছা হয়। আমার প্রবন্ধ বহন করিয়া আজ পর্যন্ত পরিষৎপত্রিকা বাহির হয় নাই, এবং পণ্ডিতমহাশয় আমার পাঠ শুনিয়াই প্রতিবাদ লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এ কথা স্বীকারই করিয়াছেন। অতএব, যখন আমি 'থ্যাঁৎলা' বলিয়াছিলাম, তখন যদি বক্তার দুরদৃষ্ট ক্রমে শ্রোতা থ্যাঁলো-ই শুনিয়া থাকেন, তবে সেজন্য বক্তা ক্ষমা প্রার্থনা করিতে প্রস্তুত আছেন। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে, দুষ্কৃতিকারীকে তৎক্ষণাৎ শাসন না করিয়া যে-সকল নিতান্ত নিরীহ নিরপরাধ লোক কলিকাতায় বাস করেন অথচ সাহিত্যচর্চা করেন এবং মৎস্য মাংস খাইয়া

থাকেন, তাঁহাদিগকে খামকা জবাবদিহিতে ফেলিলেন কেন। প্রতিবাদী মহাশয় যদি কোনো সুযোগে পরিষৎ পত্রিকার প্রুফ সংগ্রহ করিয়া তাহাতে এই ভুল দেখিয়া থাকেন তবে সেজন্যও আমাকে ক্ষমা করিবেন। ছাপার ভুলে যদি দণ্ডিত হইতে হয়, তবে দণ্ডশালায় পণ্ডিতমহাশয়েরও সঙ্গ লাভ হইতে বঞ্চিত হইব না।

এরূপ ছোটো ছোটো ভুল খুঁটিয়া মূল প্রবন্ধের বিচার সংগত নহে। থ্যাঁলো শব্দটা রাখিলে বা বাদ দিলে আসল কথাটার কিছুই আসে যায় না। বাংলা আল্ প্রত্যয়ের দৃষ্টান্তস্থলে ভ্রমক্রমে যদি, 'বাচাল' সংস্কৃত কথাটা বসিয়া থাকে তবে সেটাকে অনায়াসে উৎপাটন করিয়া ফেলা যায়, তাহাতে বিবেচ্য বিষয়ের মূলে আঘাত করে না। 'ছাগল' যদি সংস্কৃত শব্দ হয়, তবে তাহাকে বাংলা ল প্রত্যয়ের দৃষ্টান্তগুলি হইতে বিনা ক্লেশে মুক্ত করিয়া দেওয়া যাইতে পারে, খাঁটি বাংলা দৃষ্টান্ত অনেক পাওয়া যাইবে। ধানের খেতের মধ্যে যদি দুটো-একটা গত বৎসরের যবের শীষ উঠিয়া থাকে, তাহাকে রাখ বা ফেলিয়া দাও, বিশেষ আসে যায় না, তাই বলিয়াই ধানের খেতকে যবের খেত বলা চলে না।

মোট কথাটার এবং আসল কথাটার উপর দৃষ্টি না রাখিয়া অনুবীক্ষণ হাতে ছোটো ছোটো খুঁত ধরিবার চেষ্টায় বেড়াইলে খুঁত সর্বত্রই পাওয়া যায়। যে-গাছ হইতে ফল পাড়া যাইতে পারে, সে-গাছ হইতে কীটও পাওয়া সম্ভব, কিন্তু সেই কীটের দ্বারা গাছের বিচার করা যায় না।

একটি গল্প মনে পড়িল। কোনো রাজপুত গোঁফে চাড়া দিয়া রাস্তায় চলিয়াছিল। একজন পাঠান আসিয়া বলিল, লড়াই করো। রাজপুত বলিল, খামকা লড়াই করিতে আসিলে, ঘরে কি স্ত্রী পুত্র নাই। পাঠান বলিল, আছে বটে, আচ্ছা তাহাদের একটা বন্দোবস্ত করিয়া আসিগে। বলিয়া বাড়ি গিয়া সব কটাকে কাটিয়াকুটিয়া নিঃশেষ করিয়া আসিল। পাঠান দ্বিতীয়বার লড়াইয়ের প্রস্তাব করিতেই রাজপুত জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা ভাই, তুমি যে লড়াই করিতে বলিতেছ, আমার অপরাধটা কী। পাঠান বলিল, তুমি যে আমার সামনে গোঁফ তুলিয়া আছ, সেই অপরাধ। রাজপুত তৎক্ষণাৎ গোঁফ নামাইয়া দিয়া কহিল, আচ্ছা ভাই, গোঁফ নামাইয়া দিতেছি।

প্রতিবাদী মহাশয়ের কাছে আমারও প্রশ্ন এই যে, ওই 'ছাগল' 'বাচাল' 'থ্যাঁৎলা' এবং 'নৈমিত্তিক' শব্দ কয়েকটি লইয়াই কি আমার সঙ্গে তাঁহার বিবাদ। আচ্ছা আমি গোঁফ নামাইয়া লইতেছি— ও শব্দ কয়টা একেবারেই ত্যাগ করিলাম। তাহাতে মূল প্রবন্ধের কোনোই ক্ষতিবৃদ্ধি হইবে না। ইহাতে বিবাদ মিটিবে কি। প্রতিবাদী বলিবেন, অকিঞ্চিৎকর কথাগুলো বাংলায় ঢোকাইয়া তুমি ভাষাটাকে মাটি করিবার

চেষ্টায় আছ। আমার বিনীত উত্তর এই যে, ওই কথাগুলো আমার এবং তাঁহার বহুপূর্ব পিতামহ-পিতামহীরা প্রচলিত করিয়া গেছেন, আমি তাহাদের রাখিবারই বা কে, মারিবারই বা কে।

প্রতিবাদী মহাশয়ের হুকুম হইতে পারে, আচ্ছা বেশ, ভাষায় আছে থাক্, তুমি ওগুলার নিয়ম আলোচনা করিয়ো না। কিন্তু এ হুকুম চলিবে না। গোঁফের এই ডগাটুকু নামাইতে পারিব না।

যে-কথাগুলি লইয়া আজ এত তর্ক উঠিল তাহা এতই সোজা যে, পাঠক ও শ্রোতাদের এবং 'সাহিত্য-পরিষৎ-সভা'র সম্মানের প্রতি লক্ষ করিয়া চুপ করিয়া থাকাই উচিত ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, শেক্সপীয়ার যাহা বলিয়াছেন, তাহা সকলের পক্ষেই খাটে। তিনি বলেন, দুর্ভাগ্য একা আসে না, দলবল সঙ্গে করিয়াই আসে। প্রতিবাদী মহাশয়ও একা নহেন, তাঁহার দলবল আছে। তিনি শাসাইয়াছেন যে, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক বি. এ. এম. এ. উপাধিধারী' এবং 'বর্তমান সময়ে যে সকল লেখক ও লেখিকা গ্রন্থ প্রণয়ন করিতেছেন' তাঁহারা এবং 'ইংলণ্ডপ্রত্যাগত অনেক কৃতবিদ্য' তাঁহার দলে আছেন।— ইহাতে অকস্মাৎ বাংলাভাষার এত হিতৈষী অভিভাবকের ভিড় দেখিয়া এতকালের উপেক্ষিতা মাতৃভাষার জন্য আশাও জন্মে অথচ নিজের অসহায়তায় হৃৎকম্পও উপস্থিত হয়। সেই কারণে পণ্ডিতমহাশয়ের দল ভাঙাইয়া লইবার জন্যই আমার আজিকার এই চেষ্টা। তাঁহাদিগকে আমি আশ্বাস দিতেছি, এ দলে আসিয়াও তাঁহারা 'ভাষার বিশুদ্ধি ও মাধুর্য রক্ষায়' মনোযোগ করিলে আমরা কেহ বাধা দিব না, চাই কি, আমরাও শিক্ষা লাভ করিতে পারিব।

কেবল তাঁহাদিগকে এই অত্যন্ত সহজ কথাটুকু স্বীকার করিতে হইবে যে, বাংলা-ভাষা বাংলাব্যাকরণের নিয়মে চলে এবং সে-ব্যাকরণ সম্পূর্ণরূপে সংস্কৃতব্যাকরণের দ্বারা শাসিত নহে। ইহাতে তাঁহাদের কৃতবিদ্যতা ও ইংলণ্ডপ্রত্যাগমনের গৌরব ক্ষুণ্ণ হইবে না, অথচ আমিও যথেষ্ট সম্মানিত ও সহায়বান হইব।

১৩০৮

বিবিধ

সাময়িক সাহিত্য

পত্রিকায় চণ্ডীদাসের যে নূতন পদাবলী প্রকাশিত হইতেছে তাহা বহুমূল্যবান।·· ·· সম্পাদক মহাশয় আদর্শ পুঁথির বানান সংশোধন করিয়া দেন নাই সেজন্য তিনি আমাদের ধন্যবাদভাজন। প্রাচীন গ্রন্থসকলের যে-সমস্ত মুদ্রিত সংস্করণ আজকাল বাহির হয় তাহাতে বানান-সংশোধকগণ কালাপাহাড়ের বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহারা সংস্কৃতবানানকে বাংলাবানানের আদর্শ কল্পনা করিয়া যথার্থ বাংলাবানান নির্বিচারে নষ্ট করিয়াছেন। ইহাতে ভাষাতত্ত্বজিজ্ঞাসুদিগের বিশেষ অসুবিধা ঘটিয়াছে। বর্তমান সাহিত্যের বাংলা বহুলপরিমাণে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদিগের উদ্‌ভাবিত বলিয়া বাংলাবানান, এমন কি, বাংলাপদবিন্যাসপ্রণালী তাহার স্বাভাবিক পথভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে, এখন তাহাকে স্বপথে ফিরাইয়া লইয়া যাওয়া সম্ভবপর নহে। কিন্তু আধুনিক বাংলার আদর্শে যাঁহারা প্রাচীন পুঁথি সংশোধন করিতে থাকেন তাঁহারা পরম অনিষ্ট করেন।

শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র মহলানবিশ জীবতত্ত্ব সম্বন্ধে কয়েকটি কথা লিখিয়াছেন। প্রবন্ধে যে দু-একটি পারিভাষিক শব্দ আছে, তৎসম্বন্ধে আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। বাংলায় এভোল্যুশন্‌ থিওরি-র অনেকগুলি প্রতিশব্দ চলিয়াছে। লেখক মহাশয় তাহার মধ্যে হইতে ক্রমবিকাশতত্ত্ব বাছিয়া লইয়াছেন। পূজ্যপাদ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এরূপ স্থলে অভিব্যক্তিবাদ শব্দ ব্যবহার করেন। অভিব্যক্তি শব্দটি সংক্ষিপ্ত; ক্রমে ব্যক্ত হইবার দিকে অভিমুখভাব অভি উপসর্গযোগে সুস্পষ্ট; এবং শব্দটিকে অভিব্যক্ত বলিয়া বিশেষণে পরিণত করা সহজ। তা ছাড়া ব্যক্ত হওয়া শব্দটির মধ্যে ভালোমন্দ উন্নতি-অবনতির কোনো বিচার নাই; বিকাশ শব্দের মধ্যে একটি উৎকর্ষ অর্থের আভাস আছে। লেখক মহাশয় Natural Selection-কে বাংলায় নৈসর্গিক মনোনয়ন বলিয়াছেন। এই সিলেক্‌শন্‌ শব্দের চলিত বাংলা ‘বাছাই করা’। বাছাই কার্য যন্ত্রযোগেও হইতে পারে; বলিতে পারি চা-বাছাই করিবার যন্ত্র, কিন্তু চা মনোনীত করিবার যন্ত্র বলিতে পারি না। মন শব্দের সম্পর্কে মনোনয়ন কথাটার মধ্যে ইচ্ছা-অভিরুচির ভাব আসে। কিন্তু প্রাকৃতিক সিলেক্‌শন্‌ যন্ত্রবৎ নিয়মের কার্য, তাহার মধ্যে ইচ্ছার অভাবনীয় লীলা নাই। অতএব বাছাই শব্দ এখানে সংগত। বাংলায় বাছাই শব্দের সাধু প্রয়োগ নির্বাচন। ‘নৈসর্গিক নির্বাচন’ শব্দে কোনো আপত্তির কারণ আছে

কি না জানিতে ইচ্ছুক আছি। Fossil শব্দকে সংক্ষেপে ‘শিলাবিকার’ বলিলে কিরূপ হয়? Fossilized শব্দকে বাংলায় শিলাবিকৃত অথবা শিলীভূত বলা যাইতে পারে।

লেখক মহাশয় ইংরেজি ফসিল্‌ শব্দের বাংলা করিয়াছেন ‘প্রস্তরীভূত কঙ্কাল’। কিন্তু উদ্‌ভিদ পদার্থের ফসিল্‌ সম্বন্ধে কঙ্কাল শব্দের প্রয়োগ কেমন করিয়া হইবে। ‘পাতার কঙ্কাল’ ঠিক বাংলা হয় না। · ফসিলের প্রতিশব্দ শিলাবিকার হইতে পারে, এরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলাম। কিন্তু মহলানবিশ মহাশয়ের সহিত আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি, ‘শিলাবিকার’ metamorphosed rock-এর উপযুক্ত ভাষান্তর হয়, এবং জীবশিলা শব্দ ফসিলের প্রতিশব্দরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে।

‘চরিত্র নীতি’ প্রবন্ধটির লেখক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র। · ইংরেজি Ethics শব্দকে তিনি বাংলায় চরিত্রনীতি নাম দিয়াছেন। অনেকে ইহাকে নীতি ও নীতিশাস্ত্র বলেন— সেটাকে লেখক পরিত্যাগ করিয়া ভালোই করিয়াছেন; কারণ নীতি শব্দের অর্থ সকল সময়ে ধর্মানুকূল নহে।

প্রহরিষ্যন্‌ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ, প্রহৃত্যাপি প্রিয়োত্তরম্‌।
অপিচাস্য শিরশ্ছিত্ত্বা রুদ্যাৎ শোচেৎ তথাপি চ॥

মারিতে মারিতে কহিবে মিষ্ট,
মারিয়া কহিবে আরো।
মাথাটা কাটিয়া কাঁদিয়া উঠিবে
যতটা উচ্চে পারো।

ইহাও এক শ্রেণীর নীতি, কিন্তু এথিক্‌স্‌ নহে। সংস্কৃত ভাষায় ধর্ম বলিতে মুখ্যত এথিক্‌স্‌ বুঝায়, কিন্তু ধর্মের মধ্যে আরও অনেক গৌণ পদার্থ আছে। মৌনী হইয়া ভোজন করিবে, ইহা ব্রাহ্মণের ধর্ম হইতে পারে কিন্তু ইহা এথিক্‌স্‌ নহে। অতএব চরিত্রনীতি শব্দটি উপযুক্ত হইয়াছে, কিন্তু ইহাকে আর-একটু সংহত করিয়া ‘চারিত্র’ বলিলে ব্যবহার পক্ষে সুবিধাজনক হয়। চরিত্রনীতিশিক্ষা, চরিত্রনীতিবোধ, চরিত্রনৈতিক উন্নতি অপেক্ষা ‘চারিত্রশিক্ষা’, ‘চারিত্রবোধ’, ‘চারিত্রোন্নতি’ আমাদের কাছে সংগত বোধ হয়।··· আর-একটি কথা জিজ্ঞাস্য, metaphysics শব্দের বাংলা কি ‘তত্ত্ববিদ্যা’ নহে।

লেখক মহাশয় সেন্‌ট্রিপীটাল্‌ ও সেন্‌ট্রিফ্যুগাল ফোর্স্‌-কে কেন্দ্রাভিসারিনী ও কেন্দ্রাপগামিনী শক্তি বলিয়াছেন— কেন্দ্রানুগ এবং কেন্দ্রাতিগ শক্তি আমাদের মতে সংক্ষিপ্ত ও সংগত।

বাংলায় বৈজ্ঞানিক পরিভাষা স্থির হয় নাই, অতএব পরিভাষার প্রয়োগ লইয়া আলোচনা কর্তব্য, কিন্তু বিবাদ করা অসংগত। ইংরেজি মিটিয়রলজির বাংলাপ্রতিশব্দ এখনও প্রচলিত হয় নাই, সুতরাং জগদানন্দবাবু যদি আপ্তের সংস্কৃত অভিধানের দৃষ্টান্তে 'বায়ুনভোবিদ্যা' ব্যবহার করিয়া কাজ চালাইয়া থাকেন, তাঁহাকে দোষ দিতে পারি না। যোগেশবাবু 'আবহ' শব্দ কোনো প্রাচীন গ্রন্থ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, তাহার অর্থ ভূবায়ু। কিন্তু এই ভূবায়ু বলিতে প্রাচীনেরা কী বুঝিতেন, এবং তাহা আধুনিক অ্যাট্‌মস্‌ফিয়ার শব্দের প্রতিশব্দ কি না, তাহা বিশেষরূপ প্রমাণের অপেক্ষা রাখে— এক কথায় ইহার মীমাংসা হয় না। অগ্রে সেই প্রমাণ উপস্থিত না করিয়া জোর করিয়া কিছু বলা যায় না। শকুন্তলার সপ্তম অঙ্কে দুষ্মন্ত যখন স্বর্গলোক হইতে মর্তে অবতরণ করিতেছেন, তখন মাতলিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন আমরা কোন্‌ বায়ুর অধিকারে আসিয়াছি।" মাতলি উত্তর করিলেন, "গগনবর্তিনী মন্দাকিনী যেখানে বহমানা, চক্রবিভক্তরশ্মি জ্যোতিষ্কলোক যেখানে বর্তমান, বামনবেশধারী হরির দ্বিতীয় চরণপাতে পবিত্র এই স্থান ধূলিশূন্য প্রবহবায়ুর মার্গ!" দেখা যাইতেছে, প্রাচীনকালে 'প্রবহ' প্রভৃতি বায়ুর নাম তৎকালীন একটি কাল্পনিক বিশ্বতত্ত্বের মধ্যে প্রচলিত ছিল— সেগুলি একটি বিশেষ শাস্ত্রের পারিভাষিক প্রয়োগ। দেবীপুরাণে দেখা যায়:

প্রাবাহো নিবহশ্চৈব উদ্বহঃ সংবহস্তথা।
বিবহঃ প্রবহশ্চৈব পরিবাহস্তথৈব চ।
অন্তরীক্ষে চ বাহ্যে তে পৃথঙ্‌মার্গবিচারিণঃ॥

এই-সকল বায়ুর নাম কি আধুনিক মিটিয়রলজির পরিভাষার মধ্যে স্থান পাইতে পারে। বিশেষ শাস্ত্রের বিশেষ মত ও সংজ্ঞার দ্বারা তাহার পরিভাষাগুলির অর্থ সীমাবদ্ধ, তাহাদিগকে নির্বিচারে অন্যত্র প্রয়োগ করা যায় না। অপর পক্ষে নভঃ শব্দ পারিভাষিক নহে, তাহার অর্থ আকাশ, এবং সে-আকাশ বিশেষরূপে মেঘের সহিত সম্বন্ধযুক্ত; সেইজন্য নভঃ ও নভস্য শব্দে শ্রাবণ ও ভাদ্রমাস বুঝায়। কিন্তু নভঃ শব্দের সহিত পুনশ্চ বায়ুশব্দ যোগ করিবার প্রয়োজন নাই, এ কথা স্বীকার করি। আপ্তেও তাঁহার অভিধানে তাহা করেন নাই; তাঁহার আভিধানিক সংকেত অনুসারে নভোবায়ু-বিদ্যা বলিতে নভোবিদ্যা বা বায়ুবিদ্যা বুঝাইতেছে। 'নভোবিদ্যা' মিটিয়রলজির প্রতিশব্দরূপে ব্যবহৃত হইলে সাধারণের সহজে বোধগম্য হইতে পারে।

বানান লইয়া কয়েকটি কথা বলিতে ইচ্ছা করি। রাঙা ভাঙা ডাঙা আঙুল প্রভৃতি শব্দ ঙ্গ-অক্ষরযোগে লেখা নিতান্তই ধ্বনিসংগতিবিরুদ্ধ। গঙ্গা শব্দের সহিত রাঙা, তুঙ্গ শব্দের সহিত ঢ্যাঙা তুলনা করিলে এ কথা স্পষ্ট হইবে। মূল শব্দটিকে স্মরণ করাইবার জন্য ধ্বনির সহিত বানানের বিরোধ ঘটানো কর্তব্য নহে। সে-নিয়ম মানিতে হইলে চাঁদ-কে চান্দ, পাঁক-কে পঙ্ক, কুমার-কে কুম্ভার লিখিতে হয়। অনেকে মূলশব্দের সাদৃশ্যরক্ষার জন্য সোনা কে সোণা, কান-কে কাণ বানান করেন, অথচ শ্রবণশব্দজ শোনা-কে শোণা লেখেন না। যে-সকল সংস্কৃত শব্দ অপভ্রংশের নিয়মে পুরা বাংলা হইয়া গেছে সেগুলির ধ্বনি-অনুযায়িক বানান হওয়া উচিত। প্রাকৃতভাষার বানান ইহার উদাহরণস্থল। জোড়া, জোয়ান, জাঁতা, কাজ প্রভৃতি শব্দে আমরা স্বাভাবিক বানান গ্রহণ করিয়াছি, অথচ অন্য অনেক স্থলে করি নাই। পত্রিকাসম্পাদক মহাশয় বাংলা-বানানের নিয়ম সম্বন্ধে আলোচনা উত্থাপন করিলে আমরা কৃতজ্ঞ হইব।

টেক্‌স্‌ট্‌বুক্‌ কমিটি ক্ষকারকে বাংলা বর্ণমালা হইতে নির্বাসন দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ অনেক পুরাতন নজির দেখাইয়া ক্ষকারের পক্ষে ওকালতি করিয়াছেন। অসংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের দলে ক্ষ কেমন করিয়া প্রথমে প্রবেশ করিয়াছিল জানি না, কিন্তু সে-সময়ে দ্বাররক্ষক যে সতর্ক ছিল, তাহা বলিতে পারি না। আধুনিক ভারতবর্ষীয় আর্যভাষায় মূর্ধন্য ষ-এর উচ্চারণ খ হইয়া গিয়াছিল, সুতরাং ক্ষকারে মূর্ধন্য ষ-এর বিশুদ্ধ উচ্চারণ ছিল না। না থাকিলেও উহা যুক্ত অক্ষর এবং উহার উচ্চারণ ক্‌খ। শব্দের আরম্ভে অনেক যুক্ত অক্ষরের যুক্ত উচ্চারণ থাকে না, যেমন জ্ঞান শব্দের জ্ঞ; কিন্তু অজ্ঞ শব্দে উহার যুক্ত উচ্চারণ সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে না। ক্ষকারও সেই রূপ—ক্ষয় এবং অক্ষয় শব্দের উচ্চারণে তাহা প্রমাণ হইবে। অতএব অসংযুক্ত বর্ণমালায় ক্ষকার দলভ্রষ্ট একঘরে, তাহাতে সন্দেহ নাই। সেই ব্যঞ্জনপংক্তির মধ্যে উহার অনুরূপ সংকরবর্ণ আর একটিও নাই। দীর্ঘকালের দখল প্রমাণ হইলেও তাহাকে আরও দীর্ঘকাল অন্যায় অধিকার রক্ষা করিতে দেওয়া উচিত কি।

শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর পাঁড়ে ‘জাতীয় সাহিত্য’ প্রবন্ধে আধুনিক ভারতবর্ষীয় ভাষাগুলিকে সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মমতো চলিতে উত্তেজনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, নচেৎ আদর্শের ঐক্য থাকে না। তিনি বলেন, “কেন চট্টগ্রামবাসী নবদ্বীপবাসীর ব্যবহৃত অসংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিতে বাধ্য হইবে।” আমরা বলি, কেহ তো জবরদস্তি করিয়া বাধ্য করিতেছে না, স্বভাবের নিয়মে চট্টগ্রামবাসী আপনি বাধ্য হইতেছে। নবীনচন্দ্র

সেন মহাশয় তাঁহার কাব্যে চট্টগ্রামের প্রাদেশিক প্রয়োগ ব্যবহার না করিয়া নবদ্বীপের প্রাদেশিক প্রয়োগ ব্যবহার করিয়াছেন। তাহার বিপরীত করিবার স্বাধীনতা তাঁহার ছিল; কিন্তু নিশ্চয় কাব্যের ক্ষতি আশঙ্কা করিয়া সেই স্বাধীনতাসুখ ভোগ করিতে ইচ্ছা করেন নাই। সকল দেশেই প্রাদেশিক প্রয়োগের বৈচিত্র্য আছে, তথাপি এক-একটি বিশেষ প্রদেশ ভাষাসম্বন্ধে অন্যান্য প্রদেশের উপর কর্তৃত্ব করিয়া থাকে। ইংরেজিভাষা লাটিননিয়মে আপনার বিশুদ্ধি রক্ষা করে না। যদি করিত, তবে এ ভাষা এত প্রবল, এত বিচিত্র, এত মহৎ হইত না। ভাষা সোনারুপার মতো জড়পদার্থ নহে যে, তাহাকে ছাঁচে ঢালিব। তাহা সজীব,— তাহা নিজের অনির্বচনীয় জীবনীশক্তির নিয়মে গ্রহণ ও বর্জন করিতে থাকে। সমাজে শাস্ত্র অপেক্ষা লোকাচারকে প্রাধান্য দেয়। লোকাচারের অসুবিধা অনেক, তাহাতে এক দেশের আচারকে অন্য দেশের আচার হইতে তফাত করিয়া দেয়; তা হউক, তবু লোকাচারকে ঠেকাইবে কে। লোককে না মারিয়া ফেলিলে লোকাচারের নিত্য পরিবর্তন ও বৈচিত্র্য কেহ দূর করিতে পারে না। কৃত্রিম গাছের সব শাখাই এক মাপের করা যায়, সজীব গাছের করা যায় না। ভাষারও লোকাচার শাস্ত্রের অপেক্ষা বড়ো। সেইজন্যই আমরা 'ক্ষান্ত' দেওয়া বলিতে লজ্জা পাই না। সেইজন্যই ব্যাকরণ যেখানে 'আবশ্যকতা' ব্যবহার করিতে বলে, আমরা সেখানে 'আবশ্যক' ব্যবহার করি। ইহাতে সংস্কৃতব্যাকরণ যদি চোখ রাঙাইয়া আসে, লোকাচারের হুকুম দেখাইয়া আমরা তাহাকে উপেক্ষা করিতে পারি।

একটা ছোটো কথা বলিয়া লই। 'অনুবাদিত' কথাটা বাংলায় চলিয়া গেছে— আজকাল পণ্ডিতেরা অনূদিত লিখিতে শুরু করিয়াছেন। ভয় হয় পাছে তাঁহারা সৃজন কথার জায়গায় 'সর্জন' চালাইয়া বসেন।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় বঙ্গদর্শনসম্পাদক 'শব্দদ্বৈত' নামক এক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন।[১] ফাল্গুনমাসের প্রদীপে তাহার একটি সমালোচনা বাহির হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত বিহারীলাল গোস্বামী সেই সমালোচনা অবলম্বন করিয়া উক্ত বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন। মূল প্রবন্ধলেখকের নিকট এই আলোচনা অত্যন্ত হৃদ্য। এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য পরিস্ফুট করিয়া বলিতে গেলে সংক্ষিপ্ত সমালোচনার সীমা লঙ্ঘন করিবে। কেবল একটা উদাহরণ লইয়া আমাদের বক্তব্যের আভাসমাত্র দিব।— আমরা

[১] দ্রষ্টব্য রবীন্দ্র-রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, পৃ ৩৭১।

বলিয়াছিলাম, ‘চার চার’ ‘তিন তিন’ প্রকর্ষবাচক। অর্থাৎ যখন বলি ‘চার চার পেয়াদা আসিয়া হাজির’ তখন একেবারে চার পেয়াদা আসায় বাহুল্য জনিত বিস্ময় প্রকাশ করি। প্রদীপের সমালোচক মহাশয় বলেন, এই স্থলের দ্বিত্ব বিভক্ত-বহুলতা-জ্ঞাপক। অর্থাৎ যখন বলা হয়, ‘তাহাদিগকে ধরিবার জন্য চার চার জন পেয়াদা আসিয়া হাজির’ তখন, সমালোচক মহাশয়ের মতে, তাহাদের প্রত্যেকের জন্য চার চার পেয়াদা আসিয়া উপস্থিত ইহাই বুঝায়। আমরা এ কথায় সায় দিতে পারিলাম না। বিহারীবাবুও দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইয়াছেন, একজনের জন্যও ‘চার চার পেয়াদা’ বাংলাভাষা অনুসারে আসিতে পারে। বিহারীবাবু বলেন, দৃষ্টান্ত অনুসারে দুই অর্থই সংগত হয়। অর্থাৎ প্রকর্ষ এবং বিভক্ত-বহুলতা, দু-ই বুঝাইতে পারে। তাহা ঠিক নহে— প্রকর্ষই বুঝায়, সেই প্রকর্ষ একজনের সম্বন্ধেও বুঝাইতে পারে, ভিন্ন ভিন্ন লোকের সম্বন্ধেও বুঝাইতে পারে, সুতরাং উভয়বিধ প্রয়োগের মধ্যে প্রকর্ষ ভাবই সাধারণ।

প্রতিষ্ঠান কথাটা আমাকে বানাইতে হইল। ইংরেজি কথাটা institution। ইহার কোনো বাংলা প্রচলিত প্রতিশব্দ পাইলাম না। যে-প্রথা কোনো-একটা বিশেষ ব্যবস্থাকে অবলম্বন করিয়া দেশে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া যায়, তাহাকে প্রতিষ্ঠান বলিতে দোষ দেখি না। Ceremony শব্দের বাংলা অনুষ্ঠান এবং institution শব্দের বাংলা প্রতিষ্ঠান করা যাইতে পারে।

১৩০৫-১৩১২

বাংলা ক্রিয়াপদের তালিকা[১]

অ

অর্শে (যথা, দোষ অর্শে— দোষ বর্তে)।

আ

আউলানো (এলানো) আওড়ানো আওটানো আইসা আঁকা আঁকড়ানো আঁচানো (আচমন ; আঁচ দেওয়া) আঁচ্‌ড়ানো (আকর্ষণ) আগ্‌লানো আছ্‌ড়ানো আজ্ঞানো আঁটা আট্‌কানো আঁৎকানো (আতঙ্কন) আনা (আনয়ন) আওসানো (ভেজিয়ে দেওয়া) আম্‌লানো (টকে যাওয়া এবং নির্বীর্য ও মৃতপ্রায় হওয়া) আদ্‌রানো আঙ্‌লানো (অঙ্গুলিদ্বারা নাড়া) আব্‌জানো (ভেজিয়ে দেওয়া ।— নদীয়া কৃষ্ণনগর অঞ্চলে ব্যবহৃত) আজানো আজ্‌ড়ানো (কোনো পদার্থ পাত্র হইতে পাত্রান্তরে রাখা)।

ই

ইঁটোনো (ইঁটদ্বারা আঘাত করা)।

উ

উগ্‌রোনো (উদ্গীরণ) উঁচোনো (উচ্চারণ) উঠা (উত্থান) উৎরনো (উত্তরণ) উথ্‌লনো (উচ্ছলিত) উপ্‌ড়নো (উৎপাটন) উব্‌চোনো উল্‌সনো (উল্লসন) উল্‌টনো (উল্লুণ্ঠন) উস্‌কনো উট্‌কনো উঙ্গোনো (ভাজিবার সময় নাড়াচাড়া করা) উল্গোনো (নামিয়ে দেওয়া) উখ্‌ড়ানো (উলটে পালটে দেওয়া) উজ্‌ড়ানো (নিঃশেষ করা) উজানো (নদীর স্রোতের বিপরীতে যাওয়া) উনানো (গালানো, তরল করা) উবা (উবে যাওয়া)।

এ

এগোনো এড়ানো এলানো এলা (ধান এলে দেওয়া) এলে দেওয়া ।

ও

ওলা ওপ্‌ড়ানো ওড়া বা উড়া ওঠানো ওৎকানো ওল্‌টানো ওস্‌কানো ওট্‌কানো ওব্‌চানো ওথ্‌লানো ওঁচানো ওগ্‌রানো ওখ্‌ড়ানো ।

---

[১] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সংকলিত। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ হইতে ১৩০৮ বঙ্গাব্দে পুস্তিকাকারে প্রচারিত।

ক

ককানো (কেঁদে ককানো) কমা কসা করা কহা কচ্লানো কড়্কানো কটিয়ে-যাওয়া (যথা কটা, চুল কটিয়ে যাওয়া) কখ্চানো কব্লানো কাচা (কাপড় কাচা) কাটা কাড়া কাঁড়ানো (ধান কাঁড়ানো) কাঁদা (ক্রন্দন) কাঁপা (কম্পন) কাৎরানো কাম্ড়ানো কামানো (কর্ম) কাশা (কাশ) কিলোনো (কিল) কোঁচানো (কুঞ্চন) কোটা (কুট্টন) কুড়নো কুলনো কোপানো কোঁক্ড়ানো কোঁচ্কানো কোঁতানো (কুন্থন) কোঁদা কেনা কোড়ানো কেলানো কচানো (নূতন পত্রোদ্গম হওয়া) কলানো (অঙ্কুরিত হওয়া) কড়মড়ানো (কড়মড় শব্দ করা) কৎলানো (ধৌত করা) কন্কনানো (বেদনা করা) কোঁৎকানো (লাঠি ইত্যাদিদ্বারা আঘাত) কাব্রানো (কাবার অর্থাৎ শেষ করা) কুচোনো (কুচি কুচি করা) কাঁচানো (একবার পূর্ণতা বা পরিপক্কতা লাভ করিয়া পুনঃ অপক্ক অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া— পাশাখেলার ঘুঁটি কাঁচানো) কোদ্লানো (কোদাল দ্বারা কোপানো) কাছানো (কাছে আসা) কালানো (শীতে হাত পা কালিয়ে যাওয়া— অবশ হওয়া)।

খ

খতানো খসা খাটা খাওয়া খাম্চানো খাব্লানো খিঁচোনো (আক্ষেপ) খিচ্ড়ানো খেঁকানো খোঁচানো খোঁজা খোঁটা খোঁড়া (খনন) খোদা খোলা খেদানো খেপা (ক্ষিপ্ত) খেলা খেঁচ্কানো খাপানো (কার্যে ব্যবহৃত করা) খরানো (তাপসংযোগে ঝল্সে যাওয়া) খিলানো (খিলান arch নির্মাণ করা) খোঁড়ানো (খঞ্জ) খোঁসড়ানো বা খুঁসড়ানো বা খোঁসা।

গ

গগানো (মুমূর্ষু অবস্থায়) গছানো (গচ্ছিত) গড়া (গঠন) গড়ানো (গলিত ; শয়ন) গতানো (গমিত) গজানো গলা (গলন) গর্জানো (গর্জন) গাওয়া (গান গাওয়া) গাদানো (ঠেসে দেওয়া) গালানো গেলা (গিলন) গোঁগানো গোংরানো (গোঁ গোঁ শব্দ করা) গোঁয়ানো গোছানো গোঁজা বা গোঁজ্ড়ানো গোটানো গোঁতানো গোনা (গণন) গোনানো (গুনিয়ে দেওয়া) গোলা গুম্রোনো গুঁতোনো গুলোনো গুছোনো গুটোনো গাঁজানো বা গেঁজানো (fermented হওয়া) গাবানো (স্পর্ধা প্রচার করা ; পুষ্করিণীর জল নষ্ট করা) গুঁড়ানো (গুঁড়া বা চূর্ণ করা)।

ঘ

ঘটা (ঘটন) ঘনানো ঘব্ড়ানো ঘসা (ঘর্ষণ) ঘস্ড়ানো বা ঘস্টানো ঘাঁটা ঘেরা ঘেঁসা ঘোচা ঘোঁটা ঘোরা ঘোলানো ঘুমানো ঘুসানো ঘুস্টানো ঘুরোনো ঘাড়ানো (ঘাড়ে দায়িত্বগ্রহণ করা) ঘেঁঙানো (কাতরোক্তি করা) ঘেঁতানো।

চ

চর্চা চড়া চলা চরা চসা চট্‌কানো চড়ানো (চড় মারা ; উচ্চ করা বা উচ্চ স্থানে রাখা) চল্‌কানো চম্‌কানো চাখা চাগা (উত্তেজিত হওয়া) চাঁচা চাটা চাপা চারানো চালানো চাপ্‌ড়ানো চেতানো চেনা চিবোনো চেরা চিরোনো চোকানো চোখানো (তীক্ষ্ণ করা) চেঁচানো চোটানো চোবানো (নিমজ্জিত করা) চোরানো চোষা চোনা (চুনে লওয়া) চোপ্‌সানো চান্‌কানো (প্রতিমা ও পুত্তলিকা প্রভৃতির চক্ষু অঙ্কন করা কৃষ্ণনগর অঞ্চলে গ্রাম্য চিত্রকরের মধ্যে ব্যবহৃত) চিম্‌টানো (চিম্‌টি কাটা ; রসহীন হওয়া) চেপ্‌টানো (চেপ্টা করা) চিক্‌রানো (চেঁচানো) চোপানো (অস্ত্র দ্বারা থোড়া)।

ছ

ছকা (ছক্ কাটা) ছড়ানো ছাঁকা ছাঁটা ছাড়া ছাঁদা ছানা (ছেনে লওয়া) ছাওয়া ছেঁড়া ছেঁচা ছটানো ছোঁচানো (শৌচ) ছোটা ছোঁড়া ছোলা (ছুলে দেওয়া) ছোঁয়া ছোব্‌লানে ছিটোনো ছুটোনো ছোটানো ছিট্‌কানো বা ছট্‌কানো ছাপানো (ছাপ দেওয়া ; ছাপিয়ে উঠা) ছেঁচ্‌ড়ানো (ঘর্ষণ সহকারে টানিয়া লওয়া) ছোবানো বা ছোপানো (রঞ্জিত করা)।

জ

জড়ানো জপা জমা জম্‌কানো জ্বলা জ্বরা জাঁকা (জাঁকিয়ে উঠা) জারা (জারণ) জানা জ্বালা জেতা জোটা জোতা জোড়া জ্যাব্‌ড়ানো জিয়োনো জিরোনো জুতোনো জুটনো জুড়োনো জুয়োনো জল্‌শনো জবানো (জবাই করা) জাগা জাওরানো (রোমন্থন করা)।

ঝ

ঝরা ঝল্‌সানো ঝাঁকানো (অধ্যাকম্পন) ঝাঁক্‌রানো ঝাঁটানো ঝাড়া ঝাঁপা ঝাম্‌রানো (অধ্যামর্ষণ) ঝালানো (অধ্যালেপন) ঝোঁকা ঝোলা ঝিমনো ঝট্‌কানো (অস্ত্রের আঘাতে দ্বিধা করা) ঝাঁজানো (তীব্রতা উৎপাদন)।

ট

টকা (টকিয়া যাওয়া) টলা টপ্‌কানো টহলানো টস্‌কানো টানা টাঁকা টেপা টোকা টুটা টেঁকা টোয়ানো (টুইয়ে দেওয়া) টিঁকনো টোপানো (বিন্দু বিন্দু করিয়া পড়া) টাটানো (ব্যথা করা) টাউরানো (শীতে শরীর টাউরে যাওয়া, অবশ হওয়া) টোকা (note করা)।

ঠ

ঠকা ঠাসা ঠাওরানো ঠেকা ঠেলা ঠেসা ঠেঙানো ঠোকা ঠোক্‌রানো ঠোসা।

ড

ডলা ডয়ানো ডাকা ডোক্‌রানো ডোবা ডিঙনো ডালানো (গাছের ডাল কাটিয়া দেওয়া)।

ঢ

ঢাকা ঢালা ঢিলোনো ঢ্যালানো ঢিপোনো ঢিকোনো ঢোকা ঢোলা ঢোঁসানো ঢুকোনো ঢ্যাকানো (ধাক্কা দেওয়া) ঢল্‌কানো (কোনো তরল পদার্থ ঢালিয়া ফেলা এবং তাহাকে কোনো এক নির্দিষ্ট দিকে লইয়া যাওয়া)।

ত

তরা (তরে যাওয়া) তলানো তড়বড়ানো তাকানো তাড়ানো তাংড়ানো তামানো তোব্‌ড়ানো তোলা তোড়া (তুড়ে দেওয়া) তোত্‌লানো তাতানো (উত্তপ্ত করা)।

থ

থতা (থতিয়ে যাওয়া) থাকা থামা থম্‌কানো থাব্‌ড়ানো থোড়া (থুড়িয়ে দেওয়া) থিতোনো থোয়া থেঁত্‌লানো থাড়ানো (to make erect) থেব্‌ড়ানো (কোমল পদার্থে চাপ দিয়া চেপটা করা)।

দ

দমানো (বলপ্রয়োগে নত করা) দাঁড়ানো দাঁতানো (দাঁত বহির্গমন হওয়া) দাপানো (হস্তপদাদি আস্ফালন করা) দাব্‌ড়ানো দাবানো (দমানো) দোলানো দেওয়া দেখা দোষানো (দোষ প্রদর্শন) দৌড়োনো দড়বড়ানো দপ্‌দপানো দোয়ানো (দোহন করা) দোম্‌ড়ানো।

ধ

ধরা ধসা ধাওয়া ধোয়া ধোয়ানো ধোনা (তুলা ধোনা, অর্থাৎ তাহার আঁশগুলা পরস্পর বিচ্ছিন্ন করা)।

ন

নড়া নাচা নাড়া নাওয়া নাবা বা নামা নাদা নেতানো (নেতিয়ে পড়া) নেলানো নেংড়ানো নিড়োনো নিকোনো নোওয়া নিছোনো নিবোনো নেবা নেটানো (ছেঁচ্‌ড়ে লইয়া যাওয়া ; সংস্পর্শে আনা) নলানো (খেজুরগাছ হতে রস গ্রহণজন্য গাছে নল সংযুক্ত করা)।

প

পচা পটানো পড়া পঢ়া (পাঠ-কৃ) পরা পলানো পশা পাকা পাকানো পাওয়া পাঠানো পাড়া পানানো (গোরু পানিয়ে যাওয়া) পেঁচানো পোঁচানো পোঁছা পোড়া পোঁতা পোওয়ানো পোরা পোষা পেশা (পুজিয়ে বা পূরণ করিয়া পুজান দেওয়া)

পেটানো পিছনো পিটোনো পিল্‌কানো পাক্‌ড়ানো পট্‌কানো পারা পাশানো (পাশ দেওয়া তাস-খেলায়) পেঁজা বা পিঁজা (তুলা প্রভৃতির আঁশ পৃথক্ করা) পিচ্‌লানো পিট্‌পিটোনো (চক্ষু পিটাপট করা)।

ফ

ফলা ফস্‌কানো ফাটা ফাড়া ফাঁদা ফাঁসা ফিরোনো ফুক্‌রোনো ফুলোনো ফুরোনো ফুটোনো ফুঁপোনো ফেলা ফেটানো ফেরা ফেঁকা ফোলা ফোটা ফোঁসানো ফোক্‌রানো ফাঁপা ফের্‌কানো (হঠাৎ রাগাদি-প্রযুক্ত চলিয়া যাওয়া) ফেনানো (ফেনাযুক্ত করা) ফোঁড়া (বিদীর্ণ করা) ফুসানো : ফুস্‌লানো (কুপরামর্শ গোপনে দেওয়া)।

ব

বহা বকা বখানো (বখিয়ে দেওয়া) বধা বনা বওয়া বদ্‌লানো বলা বসা বাঁকানো বাগানো বাঁচা বাচানো (বাচিয়ে দেওয়া) বাছা বাজা বাঁধা বানানো (তৈয়ার করা) বাড়া বাওয়া বেছানো বেড়ানো বিওনো বিকোনো বিগ্‌ড়ানো বিননো বিলানো বিষানো (বিষাক্ত হওয়া) বেচা বেলা (রুটি বেলা) বুঁচোনো বুজোনো বুঝোনো বুড়োনো বুনোনো বুলোনো বোঁচানো বোজা বোঝা বোড়ানো বোনা বোলানো বেড়ানো বেতোনো (বেত দ্বারা মারা) বাত্‌লানো বিঁধোনো।

ভ

ভজা ভরা ভড়্‌কানো ভাগা ভাঙা ভাজা ভাঁড়ানো ভাঁটানো (ভাঁটিয়ে দেওয়া) ভানা ভাপানো ভাবা ভাসা ভিজোনো ভিড়োনা ভুগোনো ভুলোনো ভেঙানো বা ভেঙচানো ভেজানো (বন্ধ করা) ভেপ্‌সানো ভেজানো (আর্দ্র করা) ভোগানো ভোলানো ভিয়ানো (মিষ্টান্ন প্রস্তুত করা) ভাঁড়ানো (ভাঁড়ামি করা ; প্রতারণা করা) ভাব্‌ড়ানো (অকৃতকার্যতা-নিবন্ধন চিন্তা করা) ভ্যাকানো।

ম

মচ্‌কানো মজানো মওয়া (মন্থন করা) মরা মলা (মর্দন করা) মাখা মাঙা মাজা মাড়া মাতা মানা (মান্য করা) মাপা মারা মিটোনো মিওনো মিলোনো মিশোনো মুখোনো (মুখিয়ে থাকা) মুড়োনো মুতোনো মেটানো মেলানো মেশানো মোটানো মোড়ানো মোতা মোদা মোছা মোস্‌ড়ানো (হতাশ্বাস হওয়া) মস্‌টানো (ময়দা মস্‌টানো)।

য

যাচা যাওয়া যাঁতানো।

র

রগ্‌ড়ানো রঙানো রচা রটা রওয়া রসা রাখা রাগা রাঙানো রুচোনো রোখা রোচা রোপা রোওয়া।

ল

লড়া লতানো লওয়া লাফানো লুকোনো লুটোনো লেখা লেপা লোটা লোঠা লাঠানো (লাঠি দ্বারা প্রহার করা) লুফা বা লোফা (শূন্য হইতে পথে কোনো পদার্থকে ধরা)।

শ

শাসানো শিসনো শোষা শেখা শিখোনো শিউরোনো শোওয়া শুকোনো শোধ্‌রানো শোনা শাপানো (অভিসম্পাত করা) শিঙোনো (প্রথম শৃঙ্গোদ্গম হওয়া)।

স

সট্‌কানো সঁপা সওয়া সরা সাজা সাধা সাম্‌লানো সাঁৎরানো সাঁৎলানো সানানো সারানো সিট্‌কোনো সুধানো সেঁকা সেঁচা সেঁধানো (প্রবেশ করা) সোঁকা সোল্‌কানো সাঁটানো সাপাঁনো (সর্পকর্তৃক দংশিত হওয়া) সারানো।

হ

হটা হওয়া হাঁকা হাগা হাঁচা হাজা হাঁটা হাট্‌কানো হাতানো হাৎড়ানো হাঁপানো হারা হাসা হেদোনো হেলা হেরা হ্যাঁচ্‌কানো (হঠাৎ জোরে টানা)।

ক্ষ

ক্ষওয়া ক্ষরা ক্ষেপানো (ক্ষিপ্ত করা) ক্ষুরোনো (প্রসবকালীন গোবৎসের প্রথম ক্ষুর নির্গমন)।

১৩০৮

গ্রন্থপরিচয়

[রচনাবলীর বর্তমান খণ্ডে মুদ্রিত গ্রন্থগুলির প্রথম সংস্করণ, বর্তমানে স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রচলিত সংস্করণ, রচনাবলী-সংস্করণ, এই তিনটির পার্থক্য সংক্ষেপে ও সাধারণভাবে নির্দেশ করা গেল। এই খণ্ডে মুদ্রিত কোনো কোনো রচনা সম্বন্ধে কবির নিজের মন্তব্য, এবং অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্যও মুদ্রিত হইল। পূর্ণতর তথ্যসংগ্রহ সর্বশেষ খণ্ডে একটি পঞ্জীতে সংকলিত হইবে।]

বলাকা

বলাকা ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের (১৩২৩ সাল) মে মাসে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

বিশ্বভারতী রবীন্দ্র-ম্যুজিয়মে বলাকার প্রথমটি ব্যতীত অন্য কবিতাগুলির পাণ্ডুলিপি রক্ষিত আছে। ম্যুজিয়ম কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় সেই পাণ্ডুলিপির সাহায্যে বলাকার বর্তমান সংস্করণে কয়েকটি কবিতার রচনাস্থান এবং রচনাকাল ও পাঠ সংশোধিত হইল। প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণে কবিতাগুলি শিরোনামবর্জিত ছাপা হইয়াছিল। পরবর্তী মুদ্রণসমূহে প্রথম আটটি কবিতায় নাম থাকিলেও রচনাবলীতে আদ্যোপান্ত প্রথম মুদ্রণের অনুসরণ করা হইল।

'হে বিরাট নদী' (৮) কবিতাটির রচনাবলীতে গৃহীত পাঠে অষ্টম ছত্রটি নূতন, পাণ্ডুলিপি হইতে প্রাপ্ত। 'পাখিরে দিয়েছ গান' (২৮) কবিতাটির প্রথম শ্লোকের পরে পাণ্ডুলিপির পাঠে নিম্নোদ্ধৃত সম্পূর্ণ একটি নূতন শ্লোক আছে :

ফুলের পাতার পুটে রেখে দিলে তব নাম,
        করে সে প্রণাম—
তোমার নামের ভরে মাথা হয় নিচু
        তার বেশি আর নয় কিছু।
দিলে জনমের প্রাতে
        মোর হাতে
শুধু শূন্য সাজিখানি, রক্তে দিলে শান্তিহীন খোঁজা,
        শূন্য ভ'রে এনে দিই পূজা।

বলাকার সকল কবিতাই সাময়িক পত্রে কবিপ্রদত্ত নাম লইয়া প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহাদের প্রথম মুদ্রণের তালিকা পরে দেওয়া হইল।

সংখ্যা	নাম	পত্রিকা
১	সবুজের অভিযান	সবুজ পত্র, ১৩২১ বৈশাখ
২	সর্বনেশে	সবুজ পত্র, ১৩২১ শ্রাবণ
৩	আমরা চলি সমুখপানে (বলাকা : আহ্বান)	সবুজ পত্র, ১৩২১ জ্যৈষ্ঠ
৪	শঙ্খ	সবুজ পত্র, ১৩২১ আষাঢ়
৫	পাড়ি	সবুজ পত্র, ১৩২১ ভাদ্র
৬	ছবি	সবুজ পত্র, ১৩২১ অগ্রহায়ণ
৭	তাজমহল (বলাকা : শা-জাহান)	সবুজ পত্র, ১৩২১ অগ্রহায়ণ
৮	চঞ্চলা	সবুজ পত্র, ১৩২১ পৌষ
৯	তাজমহল	সবুজ পত্র, ১৩২১ পৌষ
১০	উপহার	সবুজ পত্র, ১৩২১ মাঘ
১১	বিচার	সবুজ পত্র, ১৩২১ মাঘ
১২	দেওয়া নেওয়া	প্রবাসী, ১৩২২ আশ্বিন
১৩	যৌবনের পত্র	সবুজ পত্র, ১৩২২ আষাঢ়
১৪	মাধবী	প্রবাসী, ১৩২২ চৈত্র
১৫	আমার গান	সবুজ পত্র, ১৩২২ বৈশাখ
১৬	রূপ	সবুজ পত্র, ১৩২২ ফাল্গুন
১৭	প্রেমের পরশ	মানসী, ১৩২২ আষাঢ়
১৮	যাত্রা	সবুজ পত্র, ১৩২২ শ্রাবণ
১৯	জীবন মরণ	ভারতী, ১৩২২ আশ্বিন
২০	যাত্রাগান	প্রবাসী, ১৩২২ বৈশাখ
২১	অগ্রণী	প্রবাসী, ১৩২২ বৈশাখ
২২	মুক্তি	প্রবাসী, ১৩২১ ফাল্গুন
২৩	দুই নারী	সবুজ পত্র, ১৩২১ ফাল্গুন
২৪	স্বর্গ	প্রবাসী, ১৩২১ ফাল্গুন
২৫	এবার	সবুজ পত্র, ১৩২১ ফাল্গুন
২৬	আবার	সবুজ পত্র, ১৩২১ ফাল্গুন
২৭	রাজা	ভারতী, ১৩২৩ আষাঢ়
২৮	দেনাপাওনা	ভারতী, ১৩২২ চৈত্র
২৯	তুমি আমি	সবুজ পত্র, ১৩২২ বৈশাখ
৩০	অজানা	সবুজ পত্র, ১৩২২ ভাদ্র ও আশ্বিন
৩১	পূর্ণের অভাব	ভারতী, ১৩২২ চৈত্র
৩২	সন্ধ্যায়	ভারতী, ১৩২২ শ্রাবণ
৩৩	প্রেমের বিকাশ	প্রবাসী, ১৩২১ চৈত্র

৩৪	খোলা জানালায়	প্রবাসী, ১৩২১ চৈত্র
৩৫	'মানসী'	মানসী, ১৩২২ মাঘ
৩৬	বলাকা	সবুজ পত্র, ১৩২২ কার্তিক
৩৭	ঝড়ের খেয়া	প্রবাসী, ১৩২২ পৌষ
৩৮	নূতন বসন	সবুজ পত্র, ১৩২২ অগ্রহায়ণ
৩৯	শেক্‌স্‌পিয়র	সবুজ পত্র, ১৩২২ পৌষ
৪০	চেয়ে দেখা	সবুজ পত্র, ১৩২২ ফাল্গুন
৪১	(যে কথা বলিতে চাই)	সবুজ পত্র, ১৩২২ চৈত্র
৪২	অপমানিত	মানসী, ১৩২৩ বৈশাখ
৪৩	পথের প্রেম	ভারতী, ১৩২৩ বৈশাখ
৪৪	যৌবন	প্রবাসী, ১৩২৩ বৈশাখ
৪৫	নববর্ষের আশীর্বাদ	সবুজ পত্র, ১৩২৩ বৈশাখ

৩৯ সংখ্যক কবিতাটি শেক্‌স্‌পিয়রের মৃত্যুর তিনশততম স্মৃতিবার্ষিক উপলক্ষে রচিত হয়, এবং নিম্নমুদ্রিত কবিকৃত ইংরেজি অনুবাদসুদ্ধ A Book of Homage to Shakespeare, 1916 গ্রন্থে (পৃ ৩২০-২১) প্রকাশিত হয়। কবির ইংরেজি কোনো কবিতাগ্রন্থে ইহা সংকলিত হয় নাই।

When by the far-away sea your fiery disk appeared from behind the unseen, O poet, O sun, England's horizon felt you near her breast and took you to be her own

She kissed your forehead, caught you in the arms of her forest branches, hid you behind her mist mantle and watched you in the green sward where fairies love to play among meadow flowers.

A few early birds sang your hymn of praise while the rest of the woodland choir were asleep.

Then at the silent beckoning of the Eternal you rose higher and higher till you reached the mid-sky, making all quarters of heaven your own.

Therefore at this moment, after the end of centuries the palm groves by the Indian sea raise their tremulous branches to the sky murmuring your praise.

বলাকার ৪ ও ৭ সংখ্যক কবিতা দুইটির নিম্নোদ্ধৃত ব্যাখ্যা রবীন্দ্রনাথ চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন :

৪— বলাকার শঙ্খ বিধাতার আহ্বানশঙ্খ, এতেই যুদ্ধের নিমন্ত্রণ ঘোষণা করতে হয়— অকল্যাণের সঙ্গে পাপের সঙ্গে অন্যায়ের সঙ্গে। উদাসীন ভাবে এ শঙ্খকে মাটিতে পড়ে থাকতে দিতে নেই। সময় এলেই দুঃখস্বীকারের হুকুম বহন করতে হবে, প্রচার করতে হবে।

৭— শাজাহানকে যদি মানবাত্মার বৃহৎ ভূমিকার মধ্যে দেখা যায় তাহলে দেখতে পাই সম্রাটের সিংহাসনটুকুতে তাঁর আত্মপ্রকাশের পরিধি নিঃশেষ হয় না— ওর মধ্যে তাঁকে কুলোয় না বলেই এত বড়ো সীমাকেও ভেঙে তাঁর চলে যেতে হয়— পৃথিবীতে এমন বিরাট কিছুই নেই যার মধ্যে চিরকালের মতো তাঁকে ধরে রাখলে তাঁকে খর্ব করা হয় না। আত্মাকে মৃত্যু নিয়ে চলে কেবলই সীমা ভেঙে ভেঙে। তাজমহলের সঙ্গে শাজাহানের যে-সম্বন্ধ সে কখনোই চিরকালের নয়— তাঁর সঙ্গে তাঁর সাম্রাজ্যের সম্বন্ধও সেইরকম। সে-সম্বন্ধ জীর্ণ পত্রের মতো খসে পড়েছে, তাতে চিরসত্যরূপী শাজাহানের লেশমাত্র ক্ষতি হয় নি।

তাজমহলের শেষ দুটি লাইনের সর্বনাম 'আমি' ও 'সে'— যে চলে যায় সে-ই হচ্ছে 'সে', তার স্মৃতিবন্ধন নেই,— আর যে-অহং কাঁদছে, সে-ই তো ভার-বওয়া পদার্থ। এখানে 'আমি' বলতে কবি নয়, 'আমি-আমার' ক'রে যেটা কান্নাকাটি করে সেই সাধারণ পদার্থটা। আমার বিরহ, আমার স্মৃতি, আমার তাজমহল, যে-মানুষটা বলে তারই প্রতীক ওই গোরস্থানে ; আর মুক্ত হয়েছে যে, সে লোকলোকান্তরের যাত্রী— তাকে কোনো একখানে ধরে না, না তাজমহলে, না ভারতসাম্রাজ্যে, না শাজাহান-নামরূপধারী বিশেষ ইতিহাসের ক্ষণকালীন অস্তিত্বে। (প্রবাসী, ১৩৪৮ কার্তিক)

৭ সংখ্যক কবিতাটির শেষাংশ সম্বন্ধে শ্রীপ্রমথনাথ বিশীকে একটি পত্রে (২১ শ্রাবণ, ১৩৪৪) রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন :

> যে-প্রেম সম্মুখপানে · ·
> উড়ে পড়েছিল বীজ জীবনের মাল্য হতে খসা। ইত্যাদি।

কবিতা লিখেছি বলেই যে তার মানে সম্পূর্ণ বুঝেছি এমন কথা মনে করবার কোনো হেতু নেই। মন থেকে কথাগুলো যখন সদ্য উৎসারিত হচ্ছিল, তখন নিশ্চয়ই এর মধ্যে একটা মানের ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন ছিল। সেই অন্তর্যামীর কাজ সারা হতেই সে দৌড় দিয়েছে—। এখন বাইরে থেকে আমাকে মানে ভেবে বের করতে হবে— সেই বাইরের দেউড়িতে যেমন আমি আছি, তেমনি তুমিও আছ এবং আরও দশজন আছে, তাদের মধ্যে মতান্তর নিয়ে সর্বদাই হট্টগোল বেধে যায়। সেই গোলমালের মধ্যে আমার ব্যাখ্যাটি যোগ করে দিচ্ছি, যদি সন্তোষজনক না মনে কর, তোমার বুদ্ধি খাটাও, আমার আপত্তি করবার অধিকার নেই।

বেগমমণ্ডলী পরিবৃত বাদশার যে প্রেম, কালিদাস হংসপদিকার মুখ থেকে তাকে লাঞ্ছিত করেছেন। সে প্রেম চলিত পথের। ধুলোর উপরে তার খেলাঘর। মমতাজ যথাসময়ে মারা গিয়েছিল বলেই বিরহের একটি সজীব বীজ সেই খেলাঘরের ধুলির উপরে প'ড়ে ধূলি হয়ে যায় নি, ক্লান্তিপ্রবণ বিলাসের ক্ষণভঙ্গুরতা অতিক্রম করে অঙ্কুরিত হয়েছিল। তার ভিতরকার অমরতা ক্ষণকালের পরমা স্মৃতিকে বহন করে রয়ে গেল। যে-বেদনাকে সেই স্মৃতি ঘোষণা করছে, তারই সঙ্গে সঙ্গে তার আর-একটি ঘোষণা আছে, তার বাণী হচ্ছে এই যে, সেই শাজাহানও নেই সেই মমতাজও নেই, কেবল তাদের যাত্রাপথের এক অংশের ধূলির উপরে জীবনের ক্রন্দনধ্বনি বহন করে রয়ে গেছে তাজমহল। দুষ্যন্ত-শকুন্তলার প্রেমের মধ্যে একটা মহিমা আছে, দুই তপোবনের

মাঝখান দিয়ে সে গেছে অমরাবতীর দিকে— তার সংকীর্ণ খেলাঘরের বেড়া ভেঙে গিয়েছিল, তাই প্রথম বিলাসবিভ্রমের বিস্মৃতিকে উত্তীর্ণ হয়ে সে তপঃপূত চিরস্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে বিরাজ করছে, সে-প্রেম দুঃখবন্ধুর পথে অন্তহীন সম্মুখের দিকে চলে গিয়েছে, সম্ভোগের মধ্যে তার সমাপ্তি নয়।

আমি জানি শাজাহানের এই অংশটি দুর্বোধ। তাই এক সময় এটাকে বর্জন করেছিলুম। তারপরে ভাবলুম, কে বোঝে কে না-বোঝে সে-কথার বিচার আমি করতে যাব কেন— তোমাদের মতো অধ্যাপকদের আক্কেলদাঁতের চর্বপদার্থ না রেখে গেলে ছাত্রমণ্ডলীদের ধাঁধা লাগবে কী উপায়ে।

'আমার ধর্ম' প্রবন্ধে (সবুজপত্র, ১৩২৪ আশ্বিন-কার্তিক) রবীন্দ্রনাথ বলাকার ২২ সংখ্যক কবিতাটি সম্বন্ধে প্রসঙ্গত লিখিয়াছেন :

"সত্যং জ্ঞানং অনন্তম্। শান্তং শিবং অদ্বৈতম্। য়িহুদি পুরাণে আছে— মানুষ একদিন অমৃতলোকে বাস করত। সে-লোক স্বর্গলোক। সেখানে দুঃখ নেই, মৃত্যু নেই। কিন্তু যে-স্বর্গকে দুঃখের ভিতর দিয়ে, মন্দের সংঘাত দিয়ে না জয় করতে পেরেছি, সে-স্বর্গ তো জ্ঞানের স্বর্গ নয়— তাকে স্বর্গ বলে জানিই নে। মায়ের গর্ভের মধ্যে মাকে পাওয়া যেমন মাকে পাওয়াই নয়— তাঁকে বিচ্ছেদের মধ্যে পাওয়াই পাওয়া।

গর্ভ ছেড়ে মাটির পরে
যখন পড়ে
তখন ছেলে দেখে আপন মাকে।
তোমার আদর যখন ঢাকে,
জড়িয়ে থাকি তারি নাড়ির পাকে,
তখন তোমায় নাহি জানি।
আঘাত হানি'
তোমারি আচ্ছাদন হতে যেদিন দূরে ফেলাও টানি—
সে-বিচ্ছেদে চেতনা দেয় আনি—
দেখি বদনখানি।

তাই সেই অচেতন স্বর্গলোকে জ্ঞান এল। সেই জ্ঞান আসতেই সত্যের মধ্যে আত্মবিচ্ছেদ ঘটল। সত্য মিথ্যা, ভালো মন্দ, জীবন মৃত্যুর দ্বন্দ্ব এসে স্বর্গ থেকে মানুষকে লজ্জা দুঃখ বেদনার মধ্যে নির্বাসিত করে দিলে। এই দ্বন্দ্ব অতিক্রম করে যে অখণ্ড সত্যে মানুষ আবার ফিরে আসে, তার থেকে তার আর বিচ্যুতি নেই। কিন্তু এই সমস্ত বিপরীতের বিরোধ মিটতে পারে কোথায়।— অনন্তের মধ্যে। তাই উপনিষদে আছে সত্যং জ্ঞানং অনন্তম্। প্রথমে সত্যের মধ্যে জড় জীব সকলেরই সঙ্গে এক হয়ে মানুষ বাস করে— জ্ঞান এসে বিরোধ ঘটিয়ে মানুষকে সেখান থেকে টেনে স্বতন্ত্র করে – অবশেষে সত্যের পরিপূর্ণ অনন্ত রূপের ক্ষেত্রে আবার তাকে সকলের সঙ্গে মিলিয়ে দেয়। ধর্মবোধের প্রথম অবস্থায় শান্তং— মানুষ তখন আপন প্রকৃতির অধীন— তখন সে সুখকেই চায়, সম্পদকেই চায়, তখন শিশুর মতো কেবল

তার রসভোগের তৃষ্ণা, তখন তার লক্ষ্য প্রেয়। তারপরে মনুষ্যত্বের উদ্বোধনের সঙ্গে তার দ্বিধা আসে ; তখন সুখ এবং দুঃখ, ভালো এবং মন্দ, এই দুই বিরোধের সমাধান সে খোঁজে,— তখন দুঃখকে সে এড়ায় না, মৃত্যুকে সে ডরায় না,— সেই অবস্থায় শিবং, তখন তার লক্ষ্য শ্রেয়। কিন্তু এইখানেই শেষ নয়— শেষ হচ্ছে প্রেম, আনন্দ। সেখানে সুখ ও দুঃখের, ভোগও ত্যাগের, জীবনও মৃত্যুর গঙ্গাযমুনা-সংগম। সেখানে অদ্বৈতং। সেখানে কেবল যে বিচ্ছেদের ও বিরোধের সাগর পার হওয়া তা নয়— সেখানে তরী থেকে তীরে ওঠা। সেখানে যে আনন্দ সে তো দুঃখের ঐকান্তিক নিবৃত্তিতে নয়, দুঃখের ঐকান্তিক চরিতার্থতায়। ধর্মবোধের এই যে যাত্রা— এর প্রথমে জীবন, তার পরে মৃত্যু, তার পরে অমৃত। মানুষ সেই অমৃতের অধিকার লাভ করেছে। কেননা জীবের মধ্যে মানুষই শ্রেয়ের ক্ষুরধারনিশিত দুর্গম পথে দুঃখকে মৃত্যুকে স্বীকার করেছে। সে সাবিত্রীর মতো যমের হাত থেকে আপন সত্যকে ফিরিয়ে এনেছে। সে স্বর্গ থেকে মর্তলোকে ভূমিষ্ঠ হয়েছে, তবেই অমৃত-লোককে আপনার করতে পেরেছে। ধর্মই মানুষকে এই দ্বন্দ্বের তুফান পার করিয়ে দিয়ে, এই অদ্বৈতে, অমৃতে, আনন্দে, প্রেমে উত্তীর্ণ করিয়ে দেয়। যারা মনে করে তুফানকে এড়িয়ে পালানোই মুক্তি— তারা পারে যাবে কী করে। সেইজন্যেই তো মানুষ প্রার্থনা করে,— অসতো মা সদ্‌গময়, তমসো মা জোতির্গময়, মৃত্যোর্মামৃতং গময়। 'গময়' এই কথার মানে এই যে, পথ পেরিয়ে যেতে হবে, পথ এড়িয়ে যাবার জো নেই।"

শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতীর ছাত্রদের অধ্যাপনার সময়ে (১৩২৮) রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং বলাকার অনেকগুলি কবিতার যে-আলোচনা করিয়াছিলেন শ্রীপ্রদ্যোতকুমার সেনগুপ্ত -কৃত তাহার অনুলেখন ১৩২৯-৩০ সালের 'শান্তিনিকেতন' পত্রিকায় নিম্নমুদ্রিত ক্রম-অনুসারে প্রকাশিত হইয়াছিল :

১৩২৯ : জ্যৈষ্ঠ—১, ২, ৩, ৪ ; আষাঢ়—৫ ; অগ্রহায়ণ—১৭, ১৮ ; পৌষ—৩১ ; মাঘ—২৪, ৩০ ; ফাল্গুন—১৪ ; চৈত্র—৬ ।

১৩৩০ : বৈশাখ—১৬ ; আষাঢ়—২২ ; ভাদ্র—২৩ ; আশ্বিন—৩২, ৩৩ ; কার্তিক—৩৪, ৩৫ ; অগ্রহায়ণ—২৮, ২৯ ; পৌষ—৩১, ৩৬, ৩৮; মাঘ—৪৫ ।

এই আলোচনায় স্থানে স্থানে বলাকার কবিতাগুলি সম্বন্ধে সাধারণভাবে কবি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার প্রাসঙ্গিক অংশগুলি সংক্ষেপে উদ্ধৃত হইল :

এই কবিতাগুলি প্রথমে সবুজপত্রের তাগিদে লিখতে আরম্ভ করি। পরে চারপাঁচটি কবিতা রামগড়ে থাকতে লিখেছিলাম। তখন আমার প্রাণের মধ্যে একটা ব্যথা চলছিল এবং সে-সময়ে পৃথিবীময় একটা ভাঙাচোরার আয়োজন হচ্ছিল। এণ্ড্রুজ সাহেব এই সময়ে আমার সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন তিনি আমার তখনকার মানসিক অবস্থার কথা জানেন। এই কবিতাগুলি ধারাবাহিকভাবে একটার পর একটা

আসছিল। হয়তো এদের পরস্পরের মধ্যে একটা অপ্রত্যক্ষ যোগ রয়েছে। এইজন্যই একে 'বলাকা' বলা হয়েছে। হংসশ্রেণীর মতনই তারা মানসলোক থেকে যাত্রা ক'রে একটি অনির্বচনীয় ব্যাকুলতা নিয়ে কোথায় উড়ে যাচ্ছে।

য়ুরোপীয় যুদ্ধের তড়িৎবার্তা এই কবিতা (২) লেখার অনেক পরে আসে। এণ্ড্রুজ সাহেব বলেন যে, 'তোমার কাছে এই সংবাদ যেন তারহীন টেলিগ্রাফে এসেছিল।' আমার এই অনুভূতি ঠিক যুদ্ধের অনুভূতি নয়। আমার মনে হয়েছিল যে, আমরা মানবের এক বৃহৎ যুগসন্ধিতে এসেছি, এক অতীত রাত্রি অবসানপ্রায়। মৃত্যু-দুঃখ-বেদনার মধ্য দিয়ে বৃহৎ নবযুগের রক্তাভ অরুণোদয় আসন্ন। সেজন্য মনের মধ্যে অকারণ উদ্বেগ ছিল…

এই কবিতা (৪) যে-সময়কার লেখা তখনও যুদ্ধ শুরু হতে দু মাস বাকি আছে। তারপর শঙ্খ বেজে উঠেছে; ঔদ্ধত্যে হোক, ভয়ে হোক, নির্ভয়ে হোক তাকে বাজানো হয়েছে। যে যুদ্ধ হয়ে গেল তা নূতন যুগে পৌঁছবার সিংহদ্বারস্বরূপ। এই লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে একটি সার্বজাতিক যজ্ঞে নিমন্ত্রণ রক্ষা করবার হুকুম এসেছে। তা শেষ হয়ে স্বর্গারোহণ পর্ব এখনও আরম্ভ হয় নি। আরও ভাঙবে, সংকীর্ণ বেড়া ভেঙে যাবে, ঘরছাড়ার দলকে এখনও পথে পথে ঘুরতে হবে। পাশ্চাত্ত্য দেশে দেখে এসেছি, সেই ঘরছাড়ার দল আজ বেরিয়ে পড়েছে। তারা এক ভাবী কালকে মানসলোকে দেখতে পাচ্ছে যে-কাল সর্বজাতির লোকের। চাকভাঙা মৌমাছির দল বেরিয়ে পড়েছে, আবার নূতন করে চাক বাঁধতে। শঙ্খের আহ্বান তাদের কানে পৌঁচেছে। রোমা রোঁলা, বাট্রাণ্ড রাসেল প্রভৃতি এই দলের লোক। এরা যুদ্ধের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল বলে অপমানিত হয়েছে, জেল খেটেছে, সার্বজাতিক কল্যাণের কথা বলতে গিয়ে তিরস্কৃত হয়েছে। এই দলের কত অখ্যাত লোক অজ্ঞাত পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে, বলছে; প্রভাত হতে আর বিলম্ব নেই। পাখির দল যেমন অরুণোদয়ের আভাস পায়, এরা তেমনি নূতন যুগকে অন্তর্দৃষ্টিতে দেখেছে।

বলাকা-রচনাকালে যে-ভাব আমাকে উৎকণ্ঠিত করেছিল এখনও সেই ভাব আমার মনে জেগে আছে। আমি আজ পর্যন্ত তাকে ফিরে ফিরে বলবার চেষ্টা করছি। বুকের মাঝে যে-আলোড়ন হল তার কী সার্বজাতিক অভিপ্রায় আছে তা আমি ধরতে চেষ্টা করেছি। পশ্চিম মহাদেশে ভ্রমণের সময়ে সে-চিন্তা আমার মনে বর্তমান ছিল। আমি মনে মনে একটা পক্ষ নিয়েছি; একটা আহ্বানকে স্বীকার করেছি; সে-ডাককে কেউ মেনেছে কেউ মানে নি। বলাকায় আমার সেই ভাবের সূত্রপাত হয়েছিল। আমি কিছুদিন থেকে অগোচরে এই ভাবের প্রেরণায় অস্পষ্ট আহ্বানের পথে অগ্রসর হয়েছিলাম। এই কবিতাগুলি আমার সেই যাত্রাপথের ধ্বজাস্বরূপ হয়েছিল। তখন ভাবের দিক দিয়ে যা অনুভব করেছিলুম, কবিতায় যা অস্পষ্ট ছিল, আজ তাকে সুস্পষ্ট আকারে বুঝতে পেরে আমি এক জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছি।

বলাকা বইটার নামকরণের মধ্যে এই কবিতার (৩৬) মর্মগত ভাবটা নিহিত আছে। সেদিন যে একদল বুনো হাঁসের পাখা সঞ্চালিত হয়ে সন্ধ্যার অন্ধকারের স্তব্ধতাকে ভেঙে দিয়েছিল, কেবল এই ব্যাপারই আমার কাছে একমাত্র উপলব্ধির বিষয় ছিল না, কিন্তু বলাকার পাখা যে নিখিলের বাণীকে জাগিয়ে দিয়েছিল সেইটাই এর আসল বলবার কথা এবং বলাকা বইটার কবিতাগুলির মধ্যে এই বাণীটিই নানা আকারে ব্যক্ত হয়েছে। 'বলাকা' নামের মধ্যে এই ভাবটা আছে যে, বুনো হাঁসের দল নীড় বেঁধেছে, ডিম পেড়েছে, তাদের ছানা হয়েছে, সংসার পাতা হয়েছে— এমন সময়ে তারা কিসের আবেগে অভিভূত হয়ে পরিচিত বাসা ছেড়ে পথহীন সমুদ্রের উপর দিয়ে কোন্ সিন্ধুতীরে আরেক বাসার দিকে উড়ে চলেছে।

সেদিন সন্ধ্যায় আকাশপথে যাত্রী হংস-বলাকা আমার মনে এই ভাব জাগিয়ে দিল— এই নদী, বন, পৃথিবী, বসুন্ধরা মানুষ সকলে এক জায়গায় চলেছে; তাদের কোথা থেকে শুরু কোথায় শেষ তা জানি নে। আকাশে

তারার প্রবাহের মতো, সৌর-জগতের গ্রহ-উপগ্রহের ছুটে চলার মতো এই বিশ্ব কোন্ নক্ষত্রকে কেন্দ্র করে প্রতি মুহূর্তে কত মাইল বেগে ছুটে চলেছে। কেন তাদের এই ছুটাছুটি তা জানি নে, কিন্তু ধাবমান নক্ষত্রের মতো তাদের একমাত্র এই বাণী— এখানে নয়, এখানে নয়।

বলাকার ৬ সংখ্যক কবিতার প্রথম শ্লোকের শেষ ছত্র, (পৃ. ১১)— "হায় ছবি, তুমি শুধু ছবি" স্থলে "হায় ছবি, তুমি শুধু ছবি ?" পড়িতে হইবে।

৩৮ সংখ্যক কবিতার শেষ শ্লোকের শেষ ছত্রে (পৃ. ৬৫)—"নব মেঘের বেণী" স্থলে "নব মেঘের বাণী" পড়িতে হইবে।

ফাল্গুনী

ফাল্গুনী ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে (১৩২২) গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

গীতিভূমিকার গানগুলি ও সর্বশেষের উৎসবের গানটি একত্রে 'বসন্তের পালা' নামে নাটকের প্রবেশকরূপে, এবং নাটক অংশটি 'ফাল্গুনী' নামে ১৩২১ সালের চৈত্র মাসের সবুজপত্রে সম্পূর্ণ পত্রিকাটি জুড়িয়া প্রকাশিত হয়। এই দুইটি অংশের রবীন্দ্রনাথ যে-দুইটি ভূমিকা লিখিয়াছিলেন তাহা সবুজপত্র হইতে নিম্নে যথাক্রমে মুদ্রিত হইল :

ভূমিকা : বসন্তের পালা

আর কয়েক পৃষ্ঠা পরে পাঠক ফাল্গুনী বলিয়া একটা নাটকের ধরনের ব্যাপার দেখিতে পাইবেন। এই বসন্তের পালার গানগুলি তম্বুরার মতো তাহারই মূল স্বর-কয়টি ধরাইয়া দিতেছে। অতএব এগুলি কানে করিয়া লইলে খেয়াল-নাটকের চেহারাটি ধরিবার সুবিধা হইতে পারে।

একদা এপ্রেলের পয়লা তারিখে কবি তাঁর কয়েকজন বন্ধুকে হোটেলে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। ভোজটা খুব রীতিমতো জমিয়াছিল ; তারপরে পরিণামে যখন বিল শোধের জন্য অর্থ বাহির করিবার দরকার হইল তখন কবির আর দেখা পাওয়া গেল না। সেদিনকার এই ছিল কৌতুক। এবারকার এপ্রেলেরও কৌতুকটা সেই একই, গোড়াতেই তাহা বলিয়া রাখা ভালো। সবুজ পাতার পাত পাড়িয়া যে-বাসন্তিক ভোজের উদ্যোগ হইল কবি শেষপর্যন্ত তাহাতে যোগ দিবেন কিন্তু যখন সেই ভয়ংকর পরিণামের সময়টা উপস্থিত হইবে, যখন সকলে চিৎকার শব্দে অর্থ দাবি করিতে থাকিবে তখন, হে কবি,—"অন্যে বাক্য ক'বে কিন্তু তুমি রবে নিরুত্তর !"

ভূমিকা : ফাল্গুনী

বসন্তে ঘরছাড়ার দল পাড়া ছাড়িয়াছে। পাড়া জুড়াইয়াছে। ইহাদেরই বসন্ত-যাপনের কাহিনী কবি লিখিতেছেন। লেখাটা নাট্য কি না তাহা স্থির হয় নাই, ইহা রূপক কি না তাহা লইয়া তর্ক উঠিবে এবং যিনি লিখিতেছেন তিনি কবি কি না

সে-সম্বন্ধে মতভেদ আছে। আর যা-ই হউক ইহা ইতিহাস নহে। ইহার সত্যমিথ্যার জন্য মূলে তিনিই দায়ী যিনি জগতে বসন্তের মতো এত বড়ো প্রলাপের অবতারণা করিয়াছেন।

এই ঘরছাড়া দলের মধ্যে বয়স নানা রকমের আছে। কারো কারো চুল পাকিয়াছে কিন্তু সে-খবরটা এখনও তাদের মনের মধ্যে পৌঁছায় নাই। ইহারা যাকে দাদা বলে তার বয়স সবচেয়ে কম। সে সবে চতুষ্পাঠী হইতে উপাধি লইয়া বাহির হইয়াছে। এখনও বাহিরের হাওয়া তাকে বেশ করিয়া লাগে নাই। এইজন্য সে সবচেয়ে প্রবীণ। আশা আছে বয়স যতই বাড়িবে সে অন্যদের মতোই কাঁচা হইয়া উঠিবে। বিশ ত্রিশ বছর সময় লাগিতে পারে।

ইহারা যাকে সর্দার বলিয়া ডাকে সর্দার ছাড়া তার অন্য কোনো পরিচয় খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। আমার ভয় হইতেছে তত্ত্বজ্ঞানীরা ইহাকে কোনো একটা তত্ত্বের দলে ফেলিয়া ইহার পঞ্চত্ব ঘটাইতে পারেন। কিন্তু আমার বিশ্বাস লোকটা তত্ত্বকথা নহে, সত্যকারই সর্দার। এই লোকটির কাজ চালাইয়া লওয়া— পথ হইতে পথে, লক্ষ্য হইতে লক্ষ্যে, খেলা হইতে খেলায়। কেহ যে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবে সেটা তার অভিপ্রায় নয়। কিন্তু যেহেতু সত্যকার সর্দার মাত্রেই বাহিরে হাঙ্গামা করে না ভিতরে কথা কয়, এই লোকটিকে রঙ্গমঞ্চে না দেখা গেলেই ইহার পরিচয় সুস্পষ্ট হইবে।

এই কাণ্ডটার দৃশ্য পথে ঘাটে বনে বাদাড়ে। বিশেষ করিয়া তাহার উল্লেখ করার দরকার নাই। যে দলের কথা বলিয়াছি কোনো তালিকায় তাহাদের জনসংখ্যা এ পর্যন্ত নির্দিষ্ট হয় নাই। এজন্য তাহাদের সংখ্যার কোনো পরিচয় দেওয়া গেল না। আর, দলের কে যে কোন্ কথাটা বলিতেছে তারও নিদর্শন রাখিলাম না। যে যেটা-খুশি বলিতে পারে। কেবল উহাদের মধ্যে যারা কোনো কারণে বিশেষ ব্যক্তি হইয়া উঠিয়াছে তাদেরই কথাগুলোর সঙ্গে তাদের নামের যোগ থাকিবে।

নক্ষত্রলোকের যে-কবি নীহারিকার কাব্য লেখেন তিনি আপন খেয়ালমতো অনেকখানি আলো ঝাপসা করিয়া আঁকিয়াছেন, তারই মাঝে মাঝে একটা-একটা তারা ফুটিয়া ওঠে। বেশ দেখা যাইতেছে, এই মর্তের লেখকটা তাঁরই নকল করিবার চেষ্টা করে। আলোর নকল কতটা করিতে পারে জানি না কিন্তু ঝাপসা নকল করিতে চমৎকার হাত পাকাইয়াছে। খুব বড়ো দূরবীন এবং খুব জোরালো অণুবীক্ষণ লাগাইয়াও ইহার মধ্যে বস্তু খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। আর অর্থ? অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যম্।

যত বড়ো লেখা তার চেয়ে ভূমিকা বড়ো হইলে লোকের সুবিধা হয়, এমন-কি, ভূমিকাটাই রাখিয়া লেখাটা বাদ দিতে পারিলেও কোনো উৎপাত থাকে না।— কিন্তু ফাল্গুন প্রায় শেষ হইয়া আসিল, সময় আর বেশি নাই।

ফাল্গুনীর সবুজপত্রে প্রকাশিত ভূমিকাসংবলিত পাঠের এবং গীতিভূমিকার গানগুলির পাণ্ডুলিপি রবীন্দ্র-ভবনে রক্ষিত আছে। বর্তমান সংস্করণের পাঠ তাহার

সাহায্যে স্থানে স্থানে সংশোধিত হইল। পাণ্ডুলিপি-অনুসারে ফাল্গুনী-রচনার তারিখ ও স্থান, ২০ ফাল্গুন ১৩২১, সুরুল।

যে-সকল গানের রচনার তারিখ ও স্থান পাণ্ডুলিপিতে পাওয়া গিয়াছে নিম্নে উদ্ধৃত হইল :

ওগো দখিন হাওয়া, পথিক হাওয়া	১২ ফাল্গুন রাত্রি ১৩২১ সুরুল
আকাশ আমায় ভরল আলোয়	১৩ ফাল্গুন রাত্রি [১৩২১] সুরুল
ওগো নদী, আপন বেগে	২৩ ফাল্গুন ১৩২১ রেলপথে
আমরা খুঁজি খেলার সাথি	১৩ ফাল্গুন [১৩২১] সুরুল
ছাড়্ গো তোরা ছাড়্ গো	১২ ফাল্গুন রাত্রি [১৩২১] সুরুল
আমরা নূতন প্রাণের চর	১৩ ফাল্গুন প্রভাত [১৩২১] সুরুল
চলি গো, চলি গো, যাই গো চ'লে	২৩ ফাল্গুন ১৩২১ রেলপথে
ওর ভাব দেখে যে পায় হাসি	১৩ ফাল্গুন [১৩২১] সুরুল
আর নাই যে দেরি	১৪ ফাল্গুন প্রভাত [১৩২১] সুরুল
বিদায় নিয়ে গিয়েছিলাম	১৩ ফাল্গুন রাত্রি [১৩২১] সুরুল
এই কথাটাই ছিলেম ভুলে	১৩ ফাল্গুন [১৩২১] সুরুল
এবার তো যৌবনের কাছে	১৩ ফাল্গুন [১৩২১] সুরুল
এতদিন যে বসেছিলেম	১৫ ফাল্গুন রাত্রি [১৩২১] সুরুল
চোখের আলোয় দেখেছিলেম	২১ ফাল্গুন প্রাতে [১৩২১] সুরুল
তোমায় নতুন করেই পাব ব'লে	২০ ফাল্গুন রাত্রি [১৩২১] সুরুল
আয় রে তবে মাত্ রে সবে আনন্দে	১৩ ফাল্গুন [১৩২১] সুরুল

চতুর্থ দৃশ্যের 'আমি যাব না গো অমনি চলে' গানটির একটি স্বতন্ত্র পাঠ পাণ্ডুলিপিতে পাওয়া গিয়াছে :

আমি বিদায় নিয়ে যাব না গো চ'লে
মালাখানি না পরায়ে গলে।
অনেক গভীর রাতে অনেক ভোরে
তোমার বাণী নিলেম বুকে ক'রে,
ফাগুনশেষে এবার যাবার বেলা
আমার বাণী তোমায় যাব ব'লে।
কিছু হল রইল অনেক বাকি।
ক্ষমা আমায় তুমি করবে না কি।
গান এসেছে সুর আসে নি প্রাণে,
শোনানো তাই হয় নি তোমার কানে,
বাকি যাহা রইল, যাব রাখি'
নয়নজলে আমার নয়নজলে॥

বাঁকুড়ার দুর্ভিক্ষ নিবারণের সাহায্যে ১৩২২ সালের মাঘ মাসে কলিকাতায় ফাল্গুনী নাটকের অভিনয় হয়। ফাল্গুনীর প্রচলিত সংস্করণের 'সূচনা' অংশ সেই উপলক্ষে রচিত হয় (মাঘ ১৩২২) এবং 'বৈরাগ্য সাধন' নামে ১৩২২ সালের মাঘ মাসের সবুজ পত্রে প্রকাশিত হয়। বর্তমান সংস্করণের সূচনা অংশে 'পথ দিয়ে কে যায় গো চলে' গানটি সবুজপত্রের পাঠ-অনুযায়ী সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হইয়াছে।

১৩২২ সালের এই অভিনয়ের অব্যবহিত পূর্বে শান্তিনিকেতন হইতে গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লেখা রবীন্দ্রনাথের কয়েকটিপত্রে এবং রবীন্দ্রনাথ-কৃত অভিনয়সূচীর একটি অসম্পূর্ণ খসড়া হইতে ফাল্গুনীর অভিনয় ও সূচনা-সংযোজন-সংক্রান্ত অনেক তথ্য জানা যায়। পত্র কয়খানি শ্রীপুলিনবিহারী সেনের সংগ্রহে আছে; প্রাসঙ্গিক অংশগুলি নিম্নে মুদ্রিত হইল।

১

গগন, ফাল্গুনীর সম্বন্ধে ভাবনার কথা এই যে, ও জিনিসটি অত্যন্ত delicate— ওর একটু সূত্র ছিন্ন হয়ে গেলেই ওর খেই খুঁজে পাওয়া শক্ত হয়। যারা অভিনয় আরম্ভ হবার কিছু পরে আসবে তারা একেবারেই আগাগোড়া এ-জিনিসটার মানে বুঝতে পারবে না। অভিনয় শুরু হবার পরে প্রোগ্রাম পড়বারও সময় থাকবে না, কেননা একবারও যবনিকা পড়বে না। তাই গোড়ায় খুব ছোট্ট একটা-কিছু যদি করা যায় তা হলেও চলে— তা হলে অন্তত লোকজনের আনাগোনাটাও তার উপর দিয়ে কেটে যায়। আর-একটা কথা— অভিনয় হবার দিনের আগে যদি প্রোগ্রাম বিক্রি হয় তা হলে সেটাতে করে বিজ্ঞাপনও হবে, শ্রোতাদের বোঝবারও সুবিধা হতে পারবে। এটা ভেবে দেখো। প্রোগ্রামের নাম দিয়ো নাট্যবিষয়সার। দাদার চৌপদীগুলো প্রোগ্রামে ছাপানো থাকলে মন্দ হয় না। যে যে দৃশ্যে তাঁর যে যে চৌপদী আছে সেই সেই দৃশ্যের গানগুলি যেমন ছাপা হবে অমনি তারই সঙ্গে 'দাদার চৌপদী' এই heading দিয়ে চৌপদীগুলোও ছাপিয়ে দিয়ো। তার কারণ, চৌপদীগুলো stage-এ প্রথমটা শোনবামাত্রই তার মানে বোঝা যায় না।

চেষ্টা করছি আমাদের শিশুগাইয়ের দল বাড়িয়ে তুলতে।…দু-একটি বড়ো মেয়ের গলাও পাবার চেষ্টা করছি— এখানে কিছুকাল এসে থেকে শিখে যেতে পারে এমন বেশ গলাওয়ালা মেয়ের সন্ধান আছে কি। ছেলের দলের মধ্যে দু-চারটি মেয়েকে সুন্দর করে সাজিয়ে দিলে বেশ দেখতে হবে। রাস্তা দিয়ে পথিক-চলাচলের by play-টা তোমরা করে নিতে পারবে? সমস্তক্ষণই আমাদের অভিনয়ের পিছন দিয়ে কেবল এইরকম যাতায়াত চালালে বেশ হয়।

…ফাল্গুনীর কথাটা মনের মধ্যে সর্বদাই জাগিয়ে রেখো— ভাবতে ভাবতে ক্রমে ক্রমে এক-একটা suggestion মনে এসে পড়বে। চোখ এবং কান এবং দুয়েরই একেবারে পেট ভরিয়ে তুলতে হবে। তার পরে মানে বুঝতে না পারে না-ই পারলে— বুঝিয়ে দেওয়ার চেয়ে মজিয়ে দেওয়াটাই দরকার।

২

প্রোগ্রাম নিশ্চয় পেয়েছ। তাতে 'বশীকরণ' নাম বদলে 'বহুবিবাহ' করে দিয়েছি। তোমাদের রিহার্সেল কী রকম চলছে। মেয়ে সাজাবার সমস্যা কী রকম সমাধান করলে।…

বহুবিবাহে মনোরমা এবং মাতাজি একই লোককে সাজানো যেতে পারে মনে রেখো। মনোরমাকে একটিও কথা বলতে হয় নি— সে audience-এর দিকে পিঠ করে ঘোমটা দিয়ে চুপ করে বসে থাকবে— গোঁফ দাড়ি থাকলেও ক্ষতি হবে না— নেপথ্য থেকে একজন কেউ ওর গানটা গেয়ে দেবে।

অবশ্য, মাতাজিকে স্পষ্ট করে দর্শন দিতে হবে। তাকে দিব্য করে ত্রিপুণ্ড্র প্রভৃতি এঁকে রুদ্রাক্ষের মালা জড়িয়ে হাতে এক ত্রিশূল দিয়ে ভৈরবী-গোছের চেহারা করে দিতে হবে।— অথচ দেখতে ভালো হওয়া চাই।

ফাল্গুনীর সর্দার যে সাজবে সে যখন গুহা থেকে বেরিয়ে আসবে তখন তার হাতে ধনুর্বাণ দিতে হবে। সেটা তৈরি রেখো। সর্দারকে একটু বেশ সাজানো চাই। অন্য যারা আছে তারা নানারঙবেরঙের চাদর উড়িয়ে পাগড়ি জড়িয়ে বেশ সরগরম করে তুলবে।

বাউলকে মাথা থেকে পা পর্যন্ত একেবারে ধবধবে সাদা করে দিয়ো।

৩

ফাল্গুনীটা এতই ছোটো যে যারা দশটাকা দিয়ে আসবে তারা দুঃখিত হবে। ওর সঙ্গে একটা ফাউ না দিলে কি চলবে। না-হয় বৈকুণ্ঠের খাতাটা জুড়ে দাও-না। বহুবিবাহটা ছোটো আছে, ধাঁ করে মুখস্থ হয়ে যাবে— চারু, দ্বিজেন বাগচী, সুরেশ, মণিলাল প্রভৃতিকে এতে লাগিয়ে দাও-না। নিতান্তই যদি না পার আমার addition[১]-ওয়ালা বইটা আমাকে পাঠিয়ে দিয়ো, দেখি যদি এখানে কোনোরকম করে করে-তুলতে পারি। আমাদের পক্ষে খুবই শক্ত, তবু তোমরা যখন আমাদের পরিত্যাগই করলে তখন একবার প্রাণপণে চেষ্টা করব আত্মশক্তিতে কী করতে পারি।…

বাংলা প্রোগ্রামটা তুমি মনোমোহন ঘোষকে দিয়ে ইংরেজি করিয়ে নাও— এখন আমার এত কম সময় যে ও-ভার আমি নিতে পারব না।

৪

কাল সন্ধেবেলায় তোমার টেলিগ্রাফের তাড়া পেয়ে কালই লিখে ফেলেছি। সংক্ষেপে হলে চলবে না— কাজেই একটু ফলিয়ে ছেলেদের গানগুলো তর্জমা করে একটু বেশ পড়বার যোগ্য করে তুলতে হল।…

---

[১] সংযোজনাংশ পরে দ্রষ্টব্য।

ভাবছিলুম উঠোনে স্টেজ না করে আটচালা বেঁধে তোমাদের দক্ষিণের আঙিনায় স্টেজ করলে কেমন হয়। এখন থেকেই সাজাতে পার— গাছপালা পোঁতা সহজ হয়, হয়তো seats বেশি ধরতে পারে, সামনের রোয়াকে এবং দোতলায় মেয়েদের জায়গা করা যায়, ইত্যাদি সুবিধা আছে। হোগলার চাল করলে একপশলা বৃষ্টিও কেটে যেতে পারে।

কাপড়ের কী করলে। আমার জন্যে যে সাদা ঝোলা করবে তার হাতের আস্তিনাটা খুব ঝোলানো করতে হবে— মসলিনের কাপড় হলে সাদাটা বেশ খুলবে ভালো। মেয়ে যারা থাকবে, তাদের পেশোয়াজ গোছের সাজেই বোধ হয় মানাবে। কী বল।···

ব্যস্ত আছি। বৈকুণ্ঠের খাতার তালিমটা যেন ভালোরকম দেওয়া হয়— প্রম্‌প্‌-টিঙের উপরেই কান পেতে থেকো না - ভালো মুখস্থ না হলে জমে না। মুশকিল, আমি ওখানে নেই— থাকলে জবরদস্তি করে খাড়া করে তুলতে পারতুম।

৫

আমিও সে-কথা ভাবছিলুম। বৈকুণ্ঠের খাতার সঙ্গে ফাল্গুনীকে জুড়ে দিলে বড্ড বড়ো হবে। তা ছাড়া দুটোর মধ্যে মিল থাকবে না। তাই ভাবছি, ফাল্গুনীরই একটা introduction গোছের scene জুড়ে দেব— সেটা ছোটো হবে, তাতে মেয়ে থাকবে না, আর যারা দেরিতে আসবে তাদের disturbance-টা ওইটের উপর দিয়েই যাবে। এটা রাজা ও রাজসভাসদ্‌দের ব্যাপার হবে। একটু কাপড়চোপড় হয়তো বেড়ে যাবে— কিন্তু এর অভিনয় তোমাদেরই ঘাড়ে ফেলব। কাল থেকে লিখতে শুরু করব।···

তোমরাই শুধু ব্যস্ত আছ তা নয়— আমরাও ভয়ানক ব্যস্ত। তোমাকে চিঠি লিখছি যেন স্বপ্নে লিখছি— মনটা কোথায় বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে বলতে পারি নে।

···একা ফাল্গুনীতেই যাতে আগুন জ্ব'লে ওঠে সেই চেষ্টা করা যাবে। তোমরা stage effect জমাবার ভারটা নিয়ো— আমরা গানে ও অভিনয়ে আছি।

ইংরেজি synopsis-টা পড়লে বুঝতে পারবে ছেলেদের কাকে কী রকম সাজাতে হবে। বেণুবন, পাখি, ফুটন্ত চাঁপা, বকুল, পারুল, আমের বোল, শালের কচি পাতা ইত্যাদি।

ফাল্গুনীর আরম্ভে বহুবিবাহ (বশীকরণ) প্রহসন সংযোজনের যে-প্রস্তাব এই পত্রগুলিতে উল্লিখিত আছে শ্রীসুহৃৎকুমার মুখোপাধ্যায়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত রবীন্দ্রনাথ-কৃত তাহার খসড়া 'অভিনয়সূচি' পরপৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইল।

অভিনয়সূচি

বহুবিবাহ প্রহসন

কেমন করিয়া একটিকে লইয়াই বহুবিবাহ ঘটিতে পারে এই প্রহসনে তাহাই প্রমাণিত হইয়াছে।

প্রথম দৃশ্য : আশুর বাড়ি

অন্নদা স্ত্রী-সত্ত্বেও দৈবদুর্যোগে স্ত্রীহারা। তিনি আশুর সহিত দ্বিতীয় স্ত্রী-সন্ধানের আলোচনায় রত। ৪৯ নম্বরের রামবৈরাগীর গলিতে পশ্চিম হইতে এক বিধবা তাঁহার বিবাহযোগ্যা কুমারী কন্যা মনোরমার যোগ্য পাত্র খুঁজিতেছেন। তাহাকে দেখিতে যাইবার পরামর্শ। কুমারব্রতধারী আশু যোগবিদ্যা চান, তিনি স্ত্রী চান না। তাঁহার অনুবর্তী রাধাচরণ সংবাদ দিল যে, মন্ত্রে তন্ত্রে সিদ্ধা মাতাজি ২২ নম্বর ভেড়াতলায় যোগবিদ্যা দান করিবার যোগ্য পাত্র খুঁজিতেছেন। অন্নদা কন্যার সন্ধানে চলিল ৪৯ নম্বরে, আশু যোগবিদ্যার সন্ধানে চলিল ২২ নম্বরে।

দ্বিতীয় দৃশ্য : ২২ নম্বর ভেড়াতলা

মাতাজি অনুভব করিয়াছেন, মন্ত্রসাধনার পক্ষে ২২ নম্বরটি অনুকূল নহে। বাড়ি বদল করিতে চান। বাড়িওয়ালার ৪৯ নম্বরের বাড়িতে পশ্চিম হইতে কন্যাসহ এক বিধবা মহিলা আসিয়াছেন। স্থির হইল তাঁহার ৪৯ নম্বরের সহিত মাতাজির ২২ নম্বরের বাসা বদল করা হইবে।

তৃতীয় দৃশ্য : ২২ নম্বর ভেড়াতলা

কন্যার মা আশঙ্কা করিতেছেন, যে-ছেলেটি মেয়ে দেখিতে আসিবে পাছে সে ৪৯ নম্বরে গিয়া খবর না পায়। এমন সময় যোগবিদ্যাপ্রার্থী আশু আসিয়া উপস্থিত। তাহার প্রার্থনার কিরূপ পূরণ হইল এই দৃশ্যে প্রকাশ পাইবে। গান। কী বলে করিব নিবেদন—

চতুর্থ দৃশ্য : ৪৯ নম্বর রামবৈরাগীর গলি

বিবাহযোগ্যা কন্যা দেখিতে আসিয়া ৪৯ নম্বরে অন্নদার কেমন করিয়া যোগবিদ্যার পরিচয় লাভ ঘটিল এই দৃশ্যে তাহাই বর্ণিত। গান। এবার বুঝি সোনার মৃগ—

সমাপ্ত

ফাল্গুনী : গীতিনাট্য

একেকেই কোন্ পথে হারাইয়া ফিরিয়া ফিরিয়া পাই, সেই রহস্য এই গীতিনাট্যে প্রকাশ হইয়াছে।

ভূমিকা

ফাল্গুনে বনে বনে নববসন্তের চর ও অনুচরগণের আবির্ভাব।

বেণুবনের গান

দখিন হাওয়া—

পাখির নীড়ের গান

আকাশ আমায়—

ফুলন্ত গাছের গান

ওগো নদী—

প্রথম দৃশ্য : বনপথ

নবযৌবনের দল প্রাণের বেগে বাহির হইয়া পড়িয়াছে। দলের মধ্যে প্রবীণ দাদা প্রাণের চাঞ্চল্য অশ্রদ্ধা করেন। তিনি উপদেশগর্ভ চৌপদী রচনা করিয়া তাহার অর্থ ব্যাখ্যা করিতে উৎসুক,— নবযৌবনের দল তাহাতে কর্ণপাত করিতে অনিচ্ছুক। নবযৌবনদলের নেতা জীবনসর্দারের প্রবেশ। কথাপ্রসঙ্গে স্থির হইল, জগতে চিরকালের যে-বুড়োটা যৌবন-উৎসবের আলোটাকে ফু দিয়া নিবাইয়া অন্ধকার করিয়া দেয় তাহাকে বন্দী করিয়া আনিয়া এবার বসন্ত-উৎসবের খেলা খেলিতে হইবে। গান। ওরে ভাই ফাগুন লেগেছে—

বহুবিবাহ (বশীকরণ) প্রহসনটিকে ফাল্গুনীর পূর্বে জুড়িবার উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ যাহা লিখিয়াছিলেন, নিম্নে মুদ্রিত হইল।[১]

[অন্নদা] বহুবিবাহ কাকে বলে এবার সেটা নতুন করে বুঝেছি।

আশু। কী রকম শুনি।

অন্নদা। একের সঙ্গেই আমাদের বহুবার করে মিলন হচ্ছে। একটি পুরাতনকেই আমরা বারে বারে নূতন করে পাচ্ছি।

আশু। আমি তো এই তত্ত্ব তোমাকে এর আগে বোঝাতে চেয়েছিলুম, তখন তুমি কান দাও নি।

অন্নদা। এখন ভালো গুরু পেয়েছি বলেই সব বোঝা এত সহজ হয়ে গেছে। তোমাকেও কতবার আমি বোঝাতে চেয়েছি, মন্ত্র জিনিসটা খুবই সত্য সন্দেহ নেই, কিন্তু সে তো পুঁথির মন্ত্র নয়— মন্ত্র আছে চোখে মুখে হাসিতে ইশারায়। আমার কথা বিশ্বাস কর নি— এখন মন্ত্রদাতা যেমনি পেয়েছ অমনি সব সন্দেহ ঘুচে গেছে।

আশু। চললেম। এক ঘণ্টার মধ্যেই যাবার কথা আছে। আর কুড়ি মিনিট বাকি।

অন্নদা। একটা কথা বলে নিই। তোমার তো অনেক কবিবন্ধু আছে— আমাদের এই বহুবিবাহের উৎসবে একটি নাটক ফরমাশ দিতে চাই।

আশু। বিষয়টা কী হবে বলো দেখি।

অন্নদা। হারাধনকে ফিরে পাওয়া।

আশু। যেমন মৃত্যুর ভিতর দিয়ে আমরা পুরোনো জীবনকে আবার নতুন করে পাই।

---

[১] অন্নদা। হতে পারে না কী বলছ। হয়েছে, আবার হতে পারে না কী। একবার হয়েছে, এই আবার দু-বার হল, তুমি বলছ হতে পারে না! ('বশীকরণ', পঞ্চম অঙ্ক রবীন্দ্র-রচনাবলী সপ্তম খণ্ড পৃ. ৩৮৩)— এই উক্তির অনুবৃত্তিরূপে সংযোজনাংশটি পড়িতে হইবে।

অন্নদা। আশু, তোমার ও-সব তত্ত্বকথা রাখো। এখন আমার কবিত্বে ভারি দরকার। এমনি হয়েছে যদি শিগগির একটা কাব্য জুটিয়ে না দিতে পার তা হলে আমিই লিখতে বসে যাব— সম্পাদক, পাঠক, মাস্টারমশায়, পুলিসম্যান, কাউকে মানব না। সেই বিপদ থেকে গৌড়জনকে রক্ষা করো।

আশু। আচ্ছা বেশ, বিষয়টা তা হলে এই রইল— শীতের ভিতর দিয়ে একই বসন্তের বারবার নতুন হয়ে ফিরে ফিরে আসা। যখন মনে হচ্ছে সবই ঝরে পড়ল তার পরেই দেখি সবই গজিয়ে উঠেছে, বনলক্ষ্মীর আঁচল যেই শূন্য হয় অমনিই তা দেখতে দেখতে ভরে ওঠে। এমনি করে একই ধনকে বারবার করে পাওয়া।

অন্নদা। বাহবা আশু! এ'কেই বলে কবিত্ব! কিন্তু বহুবিবাহ করলুম আমি, আর তোমার মাথায় তার কবিত্ব গজিয়ে উঠল কী করে।

আশু। বলব? বাইশ নম্বরে আমি যাঁর কাছে আজ মন্ত্র নিয়ে এসেছি, মনে হল এ-মন্ত্র তাঁরই চোখ মুখ হাসি থেকে যেন আমি বারে বারে নিয়েছি— নতুন নতুন নম্বরের গলিতে, নতুন নতুন ভাষায়। তোমার মহীমোহিনী যেমন তোমার একবারই মোহিনী নয়, আমার মনোরমাও তেমনি আমার লক্ষ যৌবনের লক্ষবারকার মনোরমা।

অন্নদা। হয়েছে, হয়েছে হে, আর বলতে হবে না। জীবনের লুকোচুরি খেলার রসটি আমরা দুই বন্ধুই ঠিক এই মুহূর্তে ধরতে পেরেছি।

আশু। (মহীমোহিনীর দিকে ফিরিয়া) দেবী, তোমাদের কল্যাণে আমরা অমৃতকে চক্ষে দেখেছি— আমরা চিরজীবনকে পাকড়াও করেছি। আমরা এখন থেকে পৃথিবীর সেই বুড়োটাকে আর বিশ্বাস করব না— তার মুখোশ খসে গেছে, সে চিরযৌবন, সে চিরপ্রাণ। তাকে যেমনি ধরতে যাই অমনি দেখি, সে নেই— তার জায়গায় তোমরা— হে চিরসুন্দর, হে চিরআনন্দ!

অন্নদা। আরে আরে আশু, কর কী, কর কী। তুমি আমার মুখের সব কথাই যে কেড়ে নিলে কিছু আর বাকি রাখলে না! ভুলে যাচ্ছ, তোমার কুড়ি মিনিটের আর বারো মিনিট মাত্র বাকি।

আশু। ঠিক বটে, চললুম।

অন্নদা। কাজ সারা হলে তোমার কবিকে একবার ঠেলে তুলো— ভুলো না। ফাল্গুন মাসে ত্রিশটা বই দিন নেই।

আশু। পাঁজির ফাল্গুনের সঙ্গে আমাদের ফাল্গুনের মিলবে না। আমাদের ফাল্গুনের দিন বেড়ে গেছে। —শনিবারের চিঠি, মাঘ ১৩৪৮

১৯২৫ খৃষ্টাব্দের বর্ষাকালে ঢাকায় একবার ফাল্গুনীর অভিনয় হয়। রবীন্দ্রনাথ সেই উপলক্ষে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিম্নমুদ্রিত কথোপকথনটুকু নাটকের সূচনার শেষে যোজনার জন্য পাঠান:

কবি, তুমি যে এই ভরা বাদলের মাঝখানে ফাল্গুনের তলব করে বসলে, এ তোমার কী রকম খ্যাপামি।

এ খ্যাপামি শিখেছি সেই খ্যাপার কাছ থেকে যিনি জ্যৈষ্ঠের হোমহুতাশনের ভরা দাহনের মধ্যে সজলজলদস্নিগ্ধকান্ত আষাঢ়ের অভিষেক-উৎসবের নিমন্ত্রণপত্র জারি করে বসেন কদম্বের নবকিশলয়ে। যিনি পাতাঝরা উত্তরে হাওয়ার সুর এক মুহূর্তে ফিরিয়ে দিয়ে বনসভায় দক্ষিণ হাওয়ার আসর জমিয়ে তোলেন। বর্ষার শিঙাখানা কেড়ে নিয়ে তাতেই যদি বসন্তের বাঁশি বাজিয়ে তুলতে না পারি তবে আমি কবি কিসের।

পুষ্পবনে পুষ্প নাহি
আছে অন্তরে।
পরানে বসন্ত এল
কার মন্তরে॥

শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে একটি পত্রে (শিলাইদহ, ২০ মাঘ ১৩২২) রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন :

ফাল্গুনীর ভিতরকার কথাটি এতই সহজ যে, ঘটা করে তার অর্থ বোঝাতে সংকোচ বোধ হয়।

জগৎটার দিকে চেয়ে দেখলে দেখা যায় যে, যদিচ তার উপর দিয়ে যুগ যুগ চলে যাচ্ছে তবু সে জীর্ণ নয়— আকাশের আলো উজ্জ্বল, তার নীলিমা নির্মল। ধরণীর মধ্যে রিক্ততা নেই, তার শ্যামলতা অম্লান— অথচ খণ্ড খণ্ড করে দেখতে গেলে দেখি ফুল ঝরছে, পাতা শুকচ্ছে, ডাল মরছে। জরামৃত্যুর আক্রমণ চারিদিকেই দিনরাত চলেছে, তবুও বিশ্বের চিরনবীনতা নিঃশেষ হল না। Facts-এর দিকে দেখি জরা মৃত্যু, Truth-এর দিকে দেখি অক্ষয় জীবন যৌবন। শীতের মধ্যে এসে যে-মুহূর্তে বনের সমস্ত ঐশ্বর্য দেউলে হল বলে মনে হল সেই মুহূর্তেই বসন্তের অসীম সমারোহ বনে বনে ব্যাপ্ত হয়ে পড়ল। জরাকে, মৃত্যুকে ধরে রাখতে গেলেই দেখি, সে আপন ছদ্মবেশ ঘুচিয়ে প্রাণের জয়পতাকা উড়িয়ে দাঁড়ায়। পিছনদিক থেকে যেটাকে জরা বলে মনে হয় সামনের দিক থেকে সেইটেকেই দেখি যৌবন। তা যদি না হত তা হলে অনাদি কালের এই জগৎটা আজ শতজীর্ণ হয়ে পড়ত— এর উপরে যেখানে পা দিতুম সেইখানেই ধসে যেত।

বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে প্রতি ফাল্গুনে চিরপুরাতন এই যে চিরনূতন হয়ে জন্মাচ্ছে, মানুষপ্রকৃতির মধ্যেও পুরাতনের সেই লীলা চলছে। প্রাণশক্তিই মৃত্যুর ভিতর দিয়ে আপনাকে বারে বারে নূতন করে উপলব্ধি করছে। যা চিরকালই আছে তাকে কালে কালে হারিয়ে হারিয়ে না যদি পাওয়া যায় তবে তার উপলব্ধিই থাকে না।

ফাল্গুনীর যুবকের দল প্রাণের উদ্দাম বেগে প্রাণকে নিঃশেষ করেই প্রাণকে অধিক করে পাচ্ছে। সর্দার বলছে, ভয় নেই, বুড়োকে আমি বিশ্বাসই করি নে— আচ্ছা দেখ্‌ যদি তাকে ধরতে পারিস তো ধর্‌। প্রাণের প্রতি গভীর বিশ্বাসের জোরে চন্দ্রহাস মৃত্যুর গুহার মধ্যে প্রবেশ করে সেই প্রাণকেই নূতন করে— চিরন্তন করে দেখতে পেলে। যুবকের দল বুঝতে পারলে জীবনকে যৌবনকে বারে বারে হারাতে হবে, নইলে ফিরে পাবার উৎসব হতে পারবে না। শীত না থাকলে ফাল্গুনের মহোৎসবের মহাসমারোহ তো মারা যেত।

'আমার ধর্ম' প্রবন্ধে প্রসঙ্গত রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন :

জীবনকে সত্য বলে জানতে গেলে মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে তার পরিচয় চাই। যে মানুষ ভয় পেয়ে মৃত্যুকে এড়িয়ে জীবনকে আঁকড়ে রয়েছে, জীবনের পরে তার যথার্থ শ্রদ্ধা নেই বলে জীবনকে সে পায় নি। তাই সে জীবনের মধ্যে বাস করেও মৃত্যুর বিভীষিকায় প্রতিদিন মরে। যে লোক নিজে এগিয়ে গিয়ে মৃত্যুকে বন্দী করতে ছুটেছে, সে দেখতে পায়, যাকে সে ধরেছে সে মৃত্যুই নয়,— সে জীবন। যখন সাহস করে তার সামনে দাঁড়াতে পারি নে, তখন পিছনদিকে তার ছায়াটা দেখি। সেইটে দেখে ডরিয়ে ডরিয়ে মরি। নির্ভয়ে যখন তার সামনে গিয়ে দাঁড়াই, তখন দেখি যে-সর্দার জীবনের পথে আমাদের এগিয়ে নিয়ে যায়, সেই সর্দারই মৃত্যুর তোরণদ্বারের মধ্যে আমাদের বহন করে নিয়ে যাচ্ছে। ফাল্গুনীর গোড়াকার কথাটা হচ্ছে এই যে, যুবকেরা বসন্ত উৎসব করতে বেরিয়েছে। কিন্তু এই উৎসব তো শুধু আমোদ করা নয়, এ তো অনায়াসে হবার জো নেই। জরার অবসাদ, মৃত্যুর ভয় লঙ্ঘন ক'রে তবে সেই নবজীবনের আনন্দে পৌঁছনো যায়। তাই যুবকেরা বললে,— আনব সেই জরাবুড়োকে বেঁধে, সেই মৃত্যুকে বন্দী করে। মানুষের ইতিহাসে তো এই লীলা, এই বসন্ত-উৎসব বারে বারে দেখতে পাই। জরা সমাজকে ঘনিয়ে ধরে, প্রথা অচল হয়ে বসে, পুরাতনের অত্যাচার নূতন প্রাণকে দলন ক'রে নির্জীব করতে চায়— তখন মানুষ মৃত্যুর মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে, বিপ্লবের ভিতর দিয়ে নববসন্তের উৎসবের আয়োজন করে। সেই আয়োজনই তো য়ুরোপে চলছে। সেখানে নূতন যুগের বসন্তের হোলি খেলা আরম্ভ হয়েছে। মানুষের ইতিহাস আপন চিরনবীন অমর মূর্তি প্রকাশ করবে বলে মৃত্যুকে তলব করেছে। মৃত্যুই তার প্রসাধনে নিযুক্ত হয়েছে। তাই ফাল্গুনীতে বাউল বলছে,— "যুগে যুগে মানুষ লড়াই করেছে, আজ বসন্তের হাওয়ায় তারই ঢেউ। যারা ম'রে অমর, বসন্তের কচি পাতায় তারা পত্র পাঠিয়েছে। দিগদিগন্তে তারা রটাচ্ছে,— আমরা পথের বিচার করি নি, আমরা পাথেয়ের হিসাব রাখি নি, আমরা ছুটে এসেছি, আমরা ফুটে বেরিয়েছি। আমরা যদি ভাবতে বসতুম তা হলে বসন্তের দশা কী হোত।"— বসন্তের কচি পাতায় এই যে পত্র, এ কাদের পত্র। যে-সব পাতা ঝরে গিয়েছে— তারাই মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে আপন বাণী পাঠিয়েছে। তারা যদি শাখা আঁকড়ে থাকতে পারত, তা হলে জরাই অমর হত— তা হলে পুরাতন পুঁথির তুলট কাগজে সমস্ত অরণ্য হলদে হয়ে যেত, সেই শুকনো পাতার সর্ সর্ শব্দে আকাশ শিউরে উঠত। কিন্তু পুরাতনই মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে আপন চিরনবীনতা প্রকাশ করে— এ-ই তো বসন্তের উৎসব। তাই বসন্ত বলে,— যারা মৃত্যুকে ভয় করে, তারা জীবনকে চেনে না; তারা জরাকে বরণ ক'রে জীবন্মৃত হয়ে থাকে— প্রাণবান বিশ্বের সঙ্গে তাদের বিচ্ছেদ ঘটে।—

চন্দ্রহাস। এ কী। এ যে তুমি! সেই আমাদের সর্দার? বুড়ো কোথায়।
সর্দার। কোথাও তো নেই।
চন্দ্রহাস। কোথাও না? তবে সে কী।
সর্দার। সে স্বপ্ন।

চন্দ্রহাস। তবে তুমিই চিরকালের?

সর্দার। হাঁ।

চন্দ্রহাস। আর আমরাই চিরকালের?

সর্দার। হাঁ।

চন্দ্রহাস। পিছন থেকে যারা তোমাকে দেখলে, তারা যে তোমাকে কতরকম মনে করলে তার ঠিক নেই। তখন তোমাকে হঠাৎ বুড়ো বলে মনে হল। তার পর গুহার মধ্যে থেকে বেরিয়ে এলে— এখন মনে হচ্ছে তুমি বালক,— যেন তোমাকে এই প্রথম দেখলুম। এ তো বড়ো আশ্চর্য, তুমি বারে বারেই প্রথম, তুমি ফিরে ফিরেই প্রথম। —সবুজপত্র, আশ্বিন-কার্তিক ১৩২৪

মালঞ্চ

মালঞ্চ ১৩৪০ সালের চৈত্র মাসে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। বিচিত্রা মাসিক-পত্রে (১৩৪০ আশ্বিন— অগ্রহায়ণ) উপন্যাসটি ধারাবাহিক প্রকাশিত হইয়াছিল।

উপন্যাসটির বর্তমান সংস্করণের পাঠ প্রস্তুতকালে রবীন্দ্র-ভবনে রক্ষিত পাণ্ডুলিপির সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে।

মালঞ্চ উপন্যাসটি রবীন্দ্রনাথ নাটকে রূপান্তরিত করিয়াছিলেন। সম্পূর্ণ নাটকটি পাণ্ডুলিপি-আকারে রবীন্দ্র-ভবনে রক্ষিত আছে।

সমাজ

সমাজ গদ্যগ্রন্থাবলীর ত্রয়োদশ ভাগ রূপে ১৩১৫ সালে প্রকাশিত হয়।

স্বতন্ত্র সংস্করণ সমাজ গ্রন্থের ‘চিঠিপত্র’ অংশ রবীন্দ্র-রচনাবলী দ্বিতীয় খণ্ডে মুদ্রিত হইয়াছে, বর্তমান খণ্ডে পুনর্মুদ্রিত হইল না। প্রথম সংস্করণ সমাজ গ্রন্থের ‘নকলের নাকাল’ প্রবন্ধ ‘কোট বা চাপকান’ এবং ‘নকলের নাকাল’ এই দুইটি পৃথক সময়ে প্রকাশিত পৃথক প্রবন্ধের সংস্কৃত ও সংযোজিত রূপ। পঞ্চম সংস্করণে প্রবন্ধটি বর্জিত হয়। বর্তমান সংস্করণে মূল প্রবন্ধ দুইটি স্বতন্ত্র আকারে প্রকাশিত হইল।

১৩১৫ সাল বা তাহার পূর্ববর্তীকালে লিখিত এবং সমাজ গ্রন্থে অসংকলিত রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ সমাজবিষয়ক রচনা বর্তমান খণ্ডে পরিশিষ্টের সমাজ অংশে সংকলিত হইল। মূল গ্রন্থে ও পরিশিষ্টে মুদ্রিত প্রবন্ধাবলীর সাময়িক পত্রে প্রথম প্রকাশের সূচী নিম্নে প্রদত্ত হইল :

সমাজ

আচারের অত্যাচার[1]	সাধনা, ১২৯৯ পৌষ
(আদি নাম—'কড়ায়-কড়া কাহন-কানা')	
সমুদ্রযাত্রা (প্রসঙ্গকথা)[1]	সাধনা, ১২৯৯ ফাল্গুন
বিলাসের ফাঁস	ভাণ্ডার, ১৩১২ মাঘ
কোট বা চাপকান	ভারতী, ১৩০৫ আশ্বিন
নকলের নাকাল	বঙ্গদর্শন, ১৩০৮ জ্যৈষ্ঠ
অযোগ্য ভক্তি[1]	ভারতী, ১৩০৫ অগ্রহায়ণ
(আদি নাম 'স্বাধীন ভক্তি')	
পূর্ব ও পশ্চিম	প্রবাসী, ১৩১৫ ভাদ্র

পরিশিষ্ট

হিন্দুবিবাহ	ভারতী ও বালক, ১২৯৪ আশ্বিন
রমাবাইয়ের বক্তৃতা-উপলক্ষে : পত্র[2]	ভারতী ও বালক, ১২৯৬ আষাঢ়
মুসলমান মহিলা	সাধনা, ১২৯৮ অগ্রহায়ণ
প্রাচ্য সমাজ	সাধনা, ১২৯৮ পৌষ
আহার সম্বন্ধে চন্দ্রনাথ বাবুর মত	সাধনা, ১২৯৮ পৌষ
কর্মের উমেদার	সাধনা, ১২৯৮ মাঘ
আদিম আর্যনিবাস	সাধনা, ১২৯৯ জ্যৈষ্ঠ
আদিম সম্বল	সাধনা, ১২৯৯ আষাঢ়
কর্তব্য নীতি	সাধনা, ১৩০০ পৌষ
বিদেশীয় অতিথি এবং দেশীয় আতিথ্য[3]	সাধনা, ১৩০১ শ্রাবণ
ব্যাধি ও প্রতিকার	বঙ্গদর্শন, ১৩০৮ বৈশাখ
আলোচনা : (নকলের নাকাল সম্বন্ধে)	বঙ্গদর্শন, ১৩০৮ আষাঢ়
স্মৃতিরক্ষা	ভাণ্ডার, ১৩১২ বৈশাখ

'প্রাচ্য ও প্রতীচ্য' প্রবন্ধটি য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারির প্রথম খণ্ডের (বৈশাখ, ১২৯৮) দ্বিতীয়াংশ।

'পূর্ব ও পশ্চিম' প্রবন্ধটির নিম্নমুদ্রিত সংক্ষিপ্ত পাঠটি 'প্রাচ্য ও প্রতীচ্য' নামে বঙ্গদর্শনে

---

[1] চিহ্নিত প্রবন্ধগুলির সাময়িক পত্রে প্রকাশিত পূর্ণতর পাঠ বর্তমান সংস্করণে মুদ্রিত হইল।

[2] এই পত্রের মতামত লইয়া ভারতী ও বালকে (১২৯৬ শ্রাবণ) সম্পাদিকা স্বর্ণকুমারী দেবী তাঁহার 'রমাবাই' প্রবন্ধে আলোচনা করেন এবং উপসংহারে পণ্ডিত রমাবাই-এর বোম্বাই-এ প্রতিষ্ঠিত "শারদা-সদন" বিদ্যালয়ের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় বামাবোধিনী পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত করেন।

[3] 'অনধিকার প্রবেশ' গল্পটি সাধনার একই সংখ্যায় এই প্রবন্ধটির অব্যবহিত পরেই মুদ্রিত হয়।

(১৩১৫ ভাদ্র) প্রকাশিত হয়— "পূজনীয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সম্প্রতি ছাত্র-সমাজে যে-বক্তৃতা করেন ইহা তাহারই সংক্ষিপ্ত মর্ম" ।

ভারতবর্ষের ইতিহাস কাহাদের ইতিহাস। প্রকৃতপক্ষে বলিতে গেলে ভারতের ইতিহাস কাহারও স্বতন্ত্র ইতিহাস নহে। যে-আর্যগণ একদিন তাঁহাদের বুদ্ধিশক্তি-প্রভাবে তমসাচ্ছন্ন ভারতকে মহিমালোক সমুদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়া ভারতেতিহাসের ভিত্তি স্থাপনা করিয়াছিলেন, যে-আর্যগণ অতঃপর অনার্যগণের সহিত মিশিয়া প্রতিলোম বিবাহে এবং অনার্যাচরিত বিবিধ আচারধর্ম দেবতা ও পূজাপ্রণালী গ্রহণে তাহাদিগকে সমাজান্তর্গত করিয়া লইয়া বৈদিক সমাজের সম্পূর্ণ বিরোধী আধুনিক সমাজকে গঠিত করিয়া তুলিয়াছিলেন, হিন্দুর আত্মঘাতী গৃহবিবাদের অবকাশে যে-মুসলমান এ দেশে আসিয়া বংশপরম্পরাক্রমে জন্মমৃত্যু দ্বারা এ দেশের মাটিকে আপনার করিয়া লইল— ভারতের ইতিহাস ইহাদের মধ্যে কাহার।— স্বতন্ত্র কাহারও নহে। তবে সে কি হিন্দুমুসলমানের। তাহাও নহে। সংকীর্ণতার গণ্ডি দিয়া ইহাকে বাঁধিতে যাওয়া শুধু আমাদের অহংকার প্রকাশ করা মাত্র।

ভারতবর্ষ কাহারও নিজস্ব সম্পত্তি নহে, এবং একদিন যে কোনো-এক বিশিষ্ট জাতি তাহার সর্বময় কর্তা হইয়া বসিবে তাহাও নহে। ভারতের ইতিহাস স্বত্বের ইতিহাস নহে, তাহা সত্যের ইতিহাস। যে মহান সত্য নানা আঘাত-সংঘাতের মধ্য দিয়া পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে, আমাদিগকে তাহারই সাহায্য করিতে হইবে। ব্যক্তিবিশেষ বা সমাজবিশেষের কর্তৃত্বলাভের চেষ্টায় মর্যাদা কিছু নাই। ভারতবর্ষকে একটি অপূর্ব পরিপূর্ণাকারে গড়িয়া তুলিতে হইবে। আমরা তাহার একটি উদাহরণ-মাত্র এ কথা যেন মনে রাখি। আমরা যদি দূরে দূরে থাকি বা নিজের স্বাতন্ত্র্যে খণ্ডাকারে প্রকাশিত হইতে চাই— সে নির্বুদ্ধিতার জন্য আমরাই দায়ী। আমরা যেটুকু মিলিতে পারিব সেইটুকুই সার্থক হইবে। যেটুকু গণ্ডিবদ্ধ সেটুকু নিরর্থক, এবং তাহার নাশ অবশ্যম্ভাবী।

আজ যে পশ্চিম হইতে ইংরেজ আসিয়া ভারতেতিহাসের একটা প্রধান অংশ জুড়িয়া বসিয়াছে ইহা কি সম্পূর্ণ আকস্মিক, অপ্রয়োজনীয়। ইংরেজের নিকট কি আজ আমাদের শিখিবার কিছুই নাই। তিন সহস্র বৎসর পূর্বে আমাদের পূর্বপুরুষগণ যাহা আমাদের দিয়া গিয়াছেন, বিশ্বমানব-ভাণ্ডারে তাহা অপেক্ষা নূতন জ্ঞান কি আর কিছুই থাকিতে পারে না। নিখিলমানবের সঙ্গে জ্ঞান প্রেম কর্মের নানা আদানপ্রদানে আমাদের অনেক প্রয়োজন আছে ; ইংরেজ বিধাতৃপ্রণোদিত হইয়া তাহারই উদ্যম আমাদের মধ্যে জাগাইতে আসিয়াছে,— সফল না হওয়া পর্যন্ত সে নিশ্চিন্ত হইবে না। সে সফলতা পূর্ব ও পশ্চিমের মিলনে, বিরোধে নহে। ভারতবর্ষ হইতে অসময়ে ইংরেজকে তাড়াইবার আমাদের অধিকার ? আমরাই বা কাহারা।— হিন্দু না মুসলমান ? বাঙালি না মারাঠি না পাঞ্জাবি ? যাহারা— যে সম্মিলিত সমষ্টি— একদিন সম্পূর্ণ সত্যের সহিত 'আমরাই ভারতবর্ষ' এ কথা বলিতে পারিবে, এ অহংকার তাহাদেরই মুখে শোভা পাইবে।

আজ মহাভারতবর্ষ গঠনের ভার আমাদের উপর। সমুদয় শ্রেষ্ঠ উপকরণ লইয়া আজ আমাদের এক মহাসম্পূর্ণতাকে গঠিত করিয়া তুলিতে হইবে। খণ্ডিবদ্ধ থাকিয়া ভারতের ইতিহাসকে যেন আমরা দরিদ্র করিয়া না তুলি।

ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ অধুনাতন মনীষিগণ এ কথা বুঝিয়াছিলেন, তাই তাঁহারা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যকে মিলাইয়া কার্য করিয়া গিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ রামমোহন রায়, রানাডে এবং বিবেকানন্দের নাম করিতে পারি। ইঁহারা প্রত্যেকেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের সাধনাকে একীভূত করিতে চাহিয়াছেন; ইঁহারা বুঝাইয়াছেন যে, জ্ঞান শুধু এক দেশ বা জাতির মধ্যে আবদ্ধ নহে; পৃথিবীর যে-দেশেই যে-কেহ জ্ঞানকে মুক্ত করিয়াছেন, জড়ত্বের শৃঙ্খল মোচন করিয়া মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তিকে উন্মুখ করিয়া দিয়াছেন তিনিই আমাদের আপন— তিনি ভারতের ঋষি হউন বা প্রতীচ্যের মনীষী হউন— তাঁহাকে লইয়া আমরা মানবমাত্রেই ধন্য।

বঙ্কিমচন্দ্রও অসীম প্রতিভাবলে বাংলাসাহিত্যে পশ্চিম এবং পূর্বের মিলন সাধন করিয়া বঙ্গসাহিত্যকে পূর্ণ পরিণতির পথে অগ্রসর করাইয়া, কম সার্থক করিয়া তোলেন নাই।

অতএব, আজ আমাদের এই মিলনের সাধনা করিতে হইবে; রাজনৈতিক বললাভের জন্য নহে, মনুষ্যত্বলাভের জন্য; স্বার্থবুদ্ধির পথ দিয়া নহে, ধর্মবুদ্ধির মধ্য দিয়া।

কিন্তু আজ এই মিলনের পথে যে-বিরোধ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, ইহা কি মিলনের পক্ষে সম্পূর্ণ প্রতিকূল। তাহা নহে। আমাদের ভক্তিতত্ত্বে বিরোধও মিলন-সাধনার একটা অঙ্গস্বরূপ। কারণ, অসত্যকে অবলম্বন করিয়া সত্যের নিকট যে-পরাজয়, তাহার মতো স্থায়ী লাভ আর নাই। অসংশয়ে বিনা বিচারে যাহা গ্রহণ করিলাম, তাহাতে আমার প্রতিষ্ঠা থাকে কোথায়। আজ আমরা আমাদের জীবনের মাঝে এক অবমাননার বেদনা অনুভব করিতেছি। এতদিন আমরা নিজের মর্যাদার প্রতি লক্ষ না রাখিয়া শুধুই অপরের দান গ্রহণ করিয়া আসিতোছলাম। আত্মমর্যাদার প্রস্তরে ঘসিয়া তাহার মূল্য যাচাই করিয়া তাহাকে আপনার করিয়া লইতে এত দিন পারি নাই। কাজে কাজেই সে দান আমাদের অন্তরে মিশিতে পায় নাই, তাহা শুধু বাহিরের পোষাকী জিনিস হইয়া উঠিতেছিল। সে যে দান নহে, সে যে শুধু অপমান, আজ তাহা আমরা আমাদের ক্ষুণ্ণ মর্যাদায় স্পষ্টই উপলব্ধি করিতেছি এবং এই স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ার প্রভাবেই আজ যত বিরোধ উপস্থিত হইতেছে।

আপনার মর্যাদায় দণ্ডায়মান হইয়া যেদিন অপরের দান লইতে পারিব সেইদিন সে-গ্রহণে সার্থকতা, কারণ তাহাতে নীচতা নাই— সে-দান তখন আমাদের অন্তরাত্মার সহিত যথার্থ মিশিয়া আমাদের এই অতৃপ্তি অশান্তি বিদূরিত করিতে সমর্থ হইবে। মহাত্মা রামমোহন দীনের ন্যায় পাশ্চাত্ত্যের চরণতলে উপস্থিত হন নাই, তিনি শুধু প্রতীচ্যের জ্ঞানে আপনার জ্ঞানের অসম্পূর্ণতাটুকুকে পূর্ণ করিতে চাহিয়াছিলেন মাত্র। এবং সেইজন্যই তিনি প্রাচ্যের জ্ঞানরত্নভাণ্ডার-দ্বারে দাঁড়াইয়া গর্বের সহিত প্রতীচ্যের মুক্তারাজি আহরণ করিয়া তাহাদিগকে যথার্থ আপনার করিয়া তুলিতে পারিয়াছিলেন।

আসল কথা এই, পশ্চিমের সহিত প্রাচ্যকে মিলিতেই হইবে। পশ্চিমকে আপনার শক্তিতে আপনার করিয়া লইতেই হইবে। আমাদের যদি আত্মশক্তির অভাব ঘটে বা পশ্চিম যদি আপনাকে সত্যভাবে প্রকাশ করিতে কৃপণতা করে— উভয়ই ক্ষোভের বিষয়। অধুনা ইংরেজ, ডেভিড হেয়ার প্রমুখ তাহার পূর্বতন মনীষীগণের ন্যায়, তাহার ইংরেজি সভ্যতার পূর্ণ অভিব্যক্তির পরিচয় আমাদিগকে দিতেছে না ; এবং সেইজন্যই পূর্বকালের ছাত্রসম্প্রদায়ের ন্যায় আধুনিক ছাত্রগণের সেক্সপীয়র বা বায়রনের কাব্যপাঠে সে আন্তরিক অনুরাগ আর নাই ;— সাহিত্যের মধ্য দিয়া ইংরেজের সহিত যে-মিলন তখন ফুটিয়া উঠিতেছিল, আজ তাহা প্রতিহত হইয়া পড়িয়াছে। তাহার যাহা শ্রেষ্ঠ, যাহা সত্য, তাহা হইতে ইংরেজ আজ আমাদিগকে স্বেচ্ছায় দূরে রাখিতেছে ; এমত অবস্থায় যদি স্বভাবতই মিলন না আসে তবে প্রবল সিডিশনের আইন করিয়া দুর্বল আমাদিগকে বাঁধিয়া রাখা, অসন্তোষ বৃদ্ধি করা মাত্র— দূর করা নহে। সুশাসন এবং ভালো আইন মানুষের চরম লাভ নহে ; মানুষ মানুষকে চায়, মানুষ হৃদয়কে চায় ; তাহা যদি সে না পায় সে কিছুতেই তৃপ্ত হইতে পারে না।

কিন্তু এ কথা আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, দীনতার নিকটেই হীনতা ধরা পড়ে— শক্তির নিকটেই যথার্থ মর্যাদা প্রকাশ পায় ; অতএব সকল দিকেই আমাদিগকে শক্তিশালী হইতে হইবে। আমাদিগের সকল দাবিই আমাদিগকে জয় করিয়া লইতে হইবে— হীনতার দ্বারা নহে, কিন্তু মহত্ত্বের দ্বারা, মনুষ্যত্বের দ্বারা। "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"— দুর্বল পরমাত্মাকে জানিতে পারে না ; দেবতাকে যে চাহে তাহাকে দেবগুণোচিত প্রকৃতিসম্পন্ন হইতে হইবে।

তীব্র উক্তির দ্বারা নহে, দুঃসাহসিক কার্যের দ্বারা নহে, কিন্তু ত্যাগের দ্বারা আজ আমাদিগকে শ্রেয়কে বরণ করিয়া লইতে হইবে। যখন আমরা নিজের চেষ্টা দ্বারা, নিজের ত্যাগের দ্বারা, দেশকে আপন করিয়া লইতে এবং দেশের উপর আমাদের সত্য অধিকার স্থাপন করিতে পারিব— তখন আর আমরা দীন নই, আমরা তখন ইংরেজের সহযোগী। আমাদের দীনতার অভাবে তখন ইংরেজেরও আর হীনতা প্রকাশ পাইবে না। ভারত আজ আপনার মূঢ়তায় শাস্ত্রে ধর্মসমাজে কেবলই আপনাকে বঞ্চনা ও অপমান করিতেছে। সত্যের দ্বারা ত্যাগের দ্বারা আজ তাহাকে নিজের আত্মাকে উপলব্ধি করিতে হইবে। তাহা হইলেই আমরা যাহা চাহিতেছি তাহা পাইব এবং পশ্চিমের সহিত প্রাচ্যের মিলন সম্পূর্ণ হইবে। সেইদিনই ভারত-ইতিহাসের এই বিরোধসংকুল বর্তমান পর্বের অবসান হইবে।

পরিশিষ্টের 'হিন্দুবিবাহ' প্রবন্ধটি যখন সমাজ গ্রন্থের প্রচলিত সংস্করণে (পরিবর্তিত পঞ্চম সংস্করণ) সংকলিত হয় তখন উহার অনেক অংশ বর্জিত হইয়াছিল। বর্তমান খণ্ডে প্রবন্ধটির সাময়িক পত্রে প্রকাশিত পাঠ সম্পূর্ণ মুদ্রিত হইল।

'আহার সম্বন্ধে চন্দ্রনাথবাবুর মত' প্রবন্ধটির অনুবৃত্তিস্বরূপ নিম্নের আলোচনাটি সাধনার (১২৯৮ চৈত্র) সাময়িক-সাহিত্য-সমালোচনা হইতে মুদ্রিত হইল।

ফাল্গুনের সাহিত্য পত্রিকার ‘আহার’ প্রবন্ধ সমালোচনা করিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন :

“শ্রদ্ধাস্পদ লেখক মহাশয় বলেন, ‘আমাদের মহাজ্ঞানী ও সূক্ষ্মদর্শী শাস্ত্রকারেরা আহারকে ধর্মের অন্তর্গত করিয়া গিয়াছেন।’ এই ভাবের কথা আমরা অনেক দিন হইতে শুনিয়া আসিতেছি, কিন্তু ইহার তাৎপর্য সম্পূর্ণ বুঝিতে পারি না। অনেকেই গৌরব করিয়া থাকেন আমাদের আহার ব্যবহার সমস্তই ধর্মের অন্তর্ভূত— কিন্তু এখানে ধর্ম বলিতে কী বুঝায়। যদি বল, ধর্মের অর্থ কর্তব্যজ্ঞান— মানুষের পক্ষে যাহা ভালো তাহাই তাহার কর্তব্য, ধর্ম এই কথা বলে, তবে জিজ্ঞাসা করি সে কথা কোন্ দেশে অবিদিত। শরীর সুস্থ রাখা যে মানুষের কর্তব্য, যাহাতে তাহার কল্যাণ হয় তাহাই তাহার অনুষ্ঠেয় এ কথা কে না বলে। যদি বল, এ স্থলে ধর্মের অর্থ পরলোকে দণ্ড-পুরস্কারের বিধান, অর্থাৎ বিশেষ দিনে বিশেষ ভাবে বিশেষ আহার করিলে শিবলোক প্রাপ্তি হইবে এবং না করিলে চতুর্দশ পুরুষ নরকস্থ হইবে, ধর্ম এই কথা বলে, তবে সেটাকে সত্যধর্ম বলিয়া স্বীকার করা যায় না। কোনো এক মহাজ্ঞানী সূক্ষ্মদর্শী শাস্ত্রকার লিখিয়া গিয়াছেন মধুকৃষ্ণা ত্রয়োদশীতে গঙ্গাস্নান করিলে “ত্রিকোটিকুলমুদ্ধরেৎ” মানিয়া লওয়া যাক উক্ত ত্রয়োদশীতে নদীর জলে স্নান করিলে শরীরে স্বাস্থ্যসাধন হয়, কিন্তু ইহার মধ্যে গৌরবের অংশ কোন্‌টুকু— ওই পুরস্কারের প্রলোভনটুকু ? কেবল ওই মিথ্যা প্রলোভনসূত্রে এই স্বাস্থ্যতত্ত্ব অথবা আধ্যাত্মিকতত্ত্বের নিয়মটুকুকে ধর্মের সহিত গাঁথা হইয়াছে। নহিলে স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম পালন করা ভালো এবং যাহা ভালো তাহাই কর্তব্য, এ কথা কোন্ দেশের লোক জানে না। আহারের সময় পূর্বমুখ করিয়া উপবেশন করিলে তাহাতে পরিপাকের সহায়তা ও তৎসঙ্গে মানসিক প্রসন্নতার বৃদ্ধিসাধন করে, অতএব পূর্বমুখে আহার করা ধর্মবিহিত, এ কথা বলিলে প্রমাণ লইয়া তর্ক উঠিতে পারে কিন্তু মূল কথাটা সম্বন্ধে কাহারও কোনো আপত্তি থাকিতে পারে না। কিন্তু যদি বলা হয় পূর্বমুখে আহার না করিলে অপবিত্র হইয়া ত্রিকোটিকুলসমেত নরকে পতিত হইতে হইবে, ইহা ধর্ম, অতএব ইহা পালন করিবে, তবে এ কথা লইয়া গৌরব করিতে পারি না। যাহার সত্য-মিথ্যা প্রমাণের উপর নির্ভর করে, যে-সকল বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞানোন্নতি সহকারে মতের পরিবর্তন কিছুই অসম্ভব নহে, তাহাকে কী বলিয়া ধর্মনিয়মভুক্ত করা যায়। স্বাস্থ্যরক্ষা করা মানুষের কর্তব্য অতএব তাহা ধর্ম, এ মূলনীতির কোনোকালে পরিবর্তন সম্ভব নহে ; কিন্তু কোনো একটা বিশেষ উপায়ে বিশেষ দ্রব্য আহার করা ধর্ম, না করা অধর্ম, এরূপ বিশ্বাসে গুরুতর অনিষ্টের কারণ ঘটে।

মানবনীতির দুই অংশ আছে, এক অংশ স্বতঃসিদ্ধ, এক অংশ যুক্তিসিদ্ধ।[১] আধুনিক সভ্য জাতিরা এই দুই অংশকে পৃথক করিয়া লইয়াছেন ; এক অংশকে

---

[১] এখানে আমরা তত্ত্ববিদ্যার তর্কে নামিতে চাহি না। বলা আবশ্যক, স্বতঃসিদ্ধ কিছু আছে বলিয়া অনেকে বিশ্বাস করেন না।

ধর্মনৈতিক ও অপর অংশকে সামাজিক এবং রাজনৈতিক শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। একদিকে এই ধ্রুব শক্তি এবং অপরদিকে চঞ্চল শক্তির স্বাতন্ত্র্যই সমাজজীবনের মূল নিয়ম। সকলেই জানেন, আকর্ষণশক্তি না থাকিলে জগৎ বাষ্প হইয়া অনন্তে মিশাইয়া যাইত এবং বিপ্রকর্ষণশক্তি না থাকিলেও বিশ্বজগৎ বিন্দুমাত্রে পরিণত হইত। তেমনই অটল ধর্মনীতির বন্ধন না থাকিলে সমাজ বিচ্ছিন্ন হইয়া সমাজ-আকার ত্যাগ করে, এবং চঞ্চল লোকনীতি না থাকিলে সমাজ জড় পাষাণবৎ সংহত হইয়া যায়। আধুনিক হিন্দুসমাজে খাওয়া শোওয়া কোনো বিষয়েই যুক্তির স্বাধীনতা নাই; সমস্তই এক অটল ধর্মনিয়মে বদ্ধ এ কথা যদি সত্য হয়, তবে ইহা আমাদের গৌরবের, আমাদের কল্যাণের বিষয় নহে। চন্দ্রনাথবাবুও অন্যত্র এ কথা একরূপ স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলেন, 'হিন্দুশাস্ত্রের নিষিদ্ধ দ্রব্যের মধ্যে কোনোটি ভক্ষণ করিয়া যদি মানসিক প্রকৃতির অনিষ্ট না হয় তবে সে দ্রব্যটি ভক্ষণ করিলে তোমার হিন্দুয়ানিও নষ্ট হইবে না, তোমার হিন্দুনামেও কলঙ্ক পড়িবে না।' অর্থাৎ এ-সকল বিষয় ধ্রুব ধর্মনিয়মের অন্তর্গত নহে। ইহার কর্তব্যতা প্রমাণ ও অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে।

কিন্তু এই একটিমাত্র কথায় চন্দ্রনাথবাবু বর্তমান হিন্দুসমাজের মূলে আঘাত করিতেছেন। আমি যদি বলি গোমাংস খাইলে আমার মানসিক প্রকৃতির অনিষ্ট হয় না, আমি যদি প্রমাণস্বরূপ দেখাই গোমাংসভুক্ যাজ্ঞবল্ক্য অনেক কুষ্মাণ্ডভুক্ স্মার্ত-বাগীশের অপেক্ষা উচ্চতর মানসিক প্রকৃতিসম্পন্ন, তবে কি হিন্দুসমাজ আমাকে মাপ করিবেন। যদি কোনো ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাস্পদ চন্দ্রনাথবাবুর সহিত একাসনে বসিয়া আহার করেন এবং প্রমাণ করেন তাহাতে তাঁহার আধ্যাত্মিক প্রকৃতির কিছুমাত্র বিকার জন্মে নাই, তবে কি তাঁহার হিন্দুনামে কলঙ্ক পড়িবে না। যদি না পড়ে, এই যদি হিন্দুধর্ম হয়, হিন্দুধর্মে যদি মূল ধর্মনীতিকে রক্ষা করিয়া আচার সম্বন্ধে স্বাধীনতা দেওয়া থাকে তবে এতক্ষণ আমরা বৃথা তর্ক করিতেছিলাম।"

শিক্ষা

শিক্ষা গদ্যগ্রন্থাবলীর চতুর্দশ ভাগ রূপে ১৩১৫ সালে প্রকাশিত হয়।

শিক্ষার অন্তর্গত 'ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ' ও 'সাহিত্যসম্মিলন' প্রবন্ধ দুইটি ইতি-পূর্বেই যথাক্রমে আত্মশক্তি (রবীন্দ্র-রচনাবলী, তৃতীয়খণ্ড) ও সাহিত্য, পরিশিষ্টের (রবীন্দ্র-রচনাবলী, অষ্টম খণ্ড) অন্তর্গত হইয়াছে; এইজন্য পুনর্মুদ্রিত হইল না।

১৩১৫ সালের পূর্বে লিখিত শিক্ষাবিষয়ক অধিকাংশ রচনা পরিশিষ্টে সংকলিত হইল।

প্রবন্ধগুলির সাময়িক পত্রে প্রথম প্রকাশের সূচী নিম্নে দেওয়া হইল :

শিক্ষা

শিক্ষার হেরফের[১]	সাধনা, ১২৯৯ পৌষ
শিক্ষা-সংস্কার .	ভাণ্ডার, ১৩১৩ আষাঢ়
শিক্ষাসমস্যা[২]	বঙ্গদর্শন, ১৩১৩ আষাঢ়
জাতীয় বিদ্যালয়[৩]	বঙ্গদর্শন, ১৩১৩ ভাদ্র
আবরণ	বঙ্গদর্শন, ১৩১৩ ভাদ্র

পরিশিষ্ট

শিক্ষার হেরফের প্রবন্ধের অনুবৃত্তি	সাধনা, ১৩০০ আষাঢ়
প্রসঙ্গ কথা : ১, ২	ভারতী, ১৩০৫ বৈশাখ
প্রাইমারি-শিক্ষা	ভাণ্ডার, ১৩১২ বৈশাখ
পূর্বপ্রশ্নের অনুবৃত্তি	ভাণ্ডার, ১৩১২ জ্যৈষ্ঠ
বিজ্ঞানসভা	ভাণ্ডার, ১৩১২ জ্যৈষ্ঠ
ইতিহাস কথা	ভাণ্ডার, ১৩১২ আষাঢ়
স্বাধীন শিক্ষা	ভাণ্ডার, ১৩১২ আষাঢ়
শিক্ষার আন্দোলনের ভূমিকা	ভাণ্ডার, ১৩১২ অগ্রহায়ণ

'শিক্ষার হেরফের প্রবন্ধের অনুবৃত্তি' নামক আলোচনাটিতে বঙ্কিমচন্দ্র, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আনন্দমোহন বসু মহাশয়ের যে পত্রের উল্লেখ আছে, সাধনার (১২৯৯ চৈত্র) নিম্নমুদ্রিত 'প্রসঙ্গকথায়' সেই তিনখানি পত্র উদ্ধৃত এবং আলোচিত হইয়াছে। সম্পাদকীয় মন্তব্যরূপে প্রকাশিত এই রচনাটিও 'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধের অনুবৃত্তিস্বরূপ :

শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রায়বাহাদুর, শ্রীযুক্ত অনারেবল জষ্টিস গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বসু মহাশয়ের নিকট হইতে পৌষ মাসের সাধনায় প্রকাশিত 'শিক্ষার হেরফের' নামক প্রবন্ধের লেখক উক্ত প্রবন্ধ সম্বন্ধে যে-পত্র পাইয়াছেন তাহা আমরা প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি ; প্রার্থনা করি তাঁহারা আমাদিগকে মার্জনা করিবেন।

বঙ্কিমবাবু লিখিয়াছেন :

> পৌষ মাসের সাধনায় প্রকাশিত শিক্ষাসম্বন্ধীয় প্রবন্ধটি আমি দুইবার পাঠ করিয়াছি। প্রতি ছত্রে আপনার সঙ্গে আমার মতের ঐক্য আছে। এ বিষয় আমি অনেকবার অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নিকট উত্থাপিত করিয়াছিলাম, এবং একদিন সেনেট হলে দাঁড়াইয়া কিছু বলিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম।

—কিন্তু কেন যে তাঁহার 'ক্ষীণস্বর' কাহারও কর্ণগোচর হয় নাই এবং সেনেট

---

[১] রাজসাহী অ্যাসোসিয়েশনে পঠিত, ১২৯৯। প্রবন্ধটির বর্তমান সংস্করণের পাঠে প্রথম পাঁচটি অনুচ্ছেদ সাধনায় প্রকাশিত পাঠ হইতে গৃহীত।

[২] ওভারটুন হলে আহূত সভায় পঠিত, ২৩ জ্যৈষ্ঠ বুধবার, ১৩১৩।

[৩] কলিকাতা টাউনহলে পঠিত, ২৯ শ্রাবণ, ১৩১৩।

হৌসের মহতী সভা ‘অসংখ্য বালক বলিদানরূপ মহাপুণ্যবলে’ কিরূপ চরম সদ্‌গতির অধিকারী হইয়াছে, সে-সম্বন্ধে বঙ্কিমবাবুর মত আমরা অপ্রকাশ রাখিলাম। কারণ, পাঠকগণ সকলেই অবগত আছেন, বঙ্কিমবাবুর ক্ষীণ স্বর যদি-বা কোনো কর্ণ ভেদ করিতে না পারে তাঁহার তীক্ষ্ণ বাক্য উক্ত কর্ণ ছেদ করিতে সম্পূর্ণ সক্ষম।

গুরুদাসবাবু লিখিয়াছেন :

> আপনার ‘শিক্ষার হেরফের’ নামক প্রবন্ধটি মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াছি, এবং যদিও তাহার আনুষঙ্গিক দুই-একটি কথা (যথা, য়ুরোপীয় সভ্যতার প্রতি অনাস্থার কারণ) আমার মতের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিলে না, তাহার প্রধান প্রধান কথাগুলি আমারও একান্ত মনের কথা, এবং সময়ে সময়ে তাহা ব্যক্তও করিয়াছি। আমার কথানুসারে বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্রদ্ধাস্পদ কয়েকজন সভ্য বাংলাভাষা শিক্ষার প্রতি উৎসাহ প্রদানার্থে একটি প্রস্তাব উপস্থিত করেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তাহা গৃহীত হয় নাই (Cal. University Minutes for 1891-92, pp. 56-58)…
>
> কী উপায়ে যে এই উপকার সাধন হইতে পারে তাহা বলা বড়ো সহজ নহে। ভাবিয়া চিন্তিয়া যতটুকু বুঝিয়াছি তাহাতে বোধ হয় দুই দিকে চেষ্টা করা আবশ্যক। প্রথমত, বঙ্গভাষায় এমন-সকল সাহিত্যের ও বিজ্ঞান দর্শনাদির গ্রন্থ যথেষ্ট পরিমাণে রচিত হওয়া আবশ্যক যাহাতে মনের আশা, জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা মিটে। দ্বিতীয়ত, সমাজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য শিক্ষাবিভাগের কর্তৃপক্ষ ও রাজপুরুষগণের নিকট হইতে বাংলাভাষা শিক্ষার যতদূর উৎসাহ পাওয়া যাইতে পারে তাহা পাইবার চেষ্টা করা উচিত। অনেক স্থলে সভাসমিতির কার্য ও বক্তৃতা ইংরেজিতে হওয়া আবশ্যক বটে, কিন্তু এমনও অনেক স্থল আছে যেখানে তাহা বঙ্গভাষায় হইতে পারে ও হইলে অধিক শোভা পায়; এবং সেই-সকল স্থলেই স্বদেশীয় ভাষায় মনের ভাব ব্যক্ত করার পদ্ধতি চলিলেও অনেকটা উপকার হইতে পারে।

আনন্দমোহনবাবু লিখিয়াছেন :

> পৌষ মাসের সাধনায় প্রকাশিত ‘শিক্ষার হেরফের’ নামক প্রবন্ধটি অত্যন্ত আহ্লাদের সহিত পড়িয়াছি। আপনি এ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, অনেক পূর্ব হইতে আমারও সেই মত; সুতরাং সেই মত এমন অতি সুন্দরভাবে এবং দক্ষতার সহিত সমর্থিত ও প্রচারিত হইতে দেখিয়া আনন্দিত হইব ইহাও স্বাভাবিকই। প্রবন্ধটি যেমন গুরুতর বিষয়সম্বন্ধীয়, ভাবগুণে এবং ভাষালালিত্যে আবার তেমনি মধুর ও উপাদেয় হইয়াছে।
>
> এখন আলোচ্য, প্রদর্শিত অনিষ্টের প্রতিকারের উপায় কী। বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষার ভাষা এবং নিয়মাদি সম্বন্ধে কতক কতক পরিবর্তন করিলে উপকার হইতে পারে কিন্তু এই বিষয়ের আমি যখনই অবতারণা করিয়াছি তখনই আমাদের স্বদেশীয়দের নিকট হইতেই আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে। এতৎ সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে পাব্‌লিক ওপিনিয়ান অনেকটা পরিবর্তন হওয়া আবশ্যক। আমি সময়ে সময়ে এ সম্বন্ধে প্রস্তাব বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মুখে আনিব মনে করিয়াছি, কিন্তু যে-পর্যন্ত এই পরিবর্তন সাধিত না হয় কিছুই করা যাইতে পারিবে না বলিয়া নিরস্ত হইয়াছি। আশা করি, এই পরিবর্তনসংসাধন পক্ষে আপনার সুন্দর প্রবন্ধটি বিশেষ সাহায্য করিবে এবং এই উদ্দেশ্যে প্রবন্ধের বহুলরূপে প্রচার প্রার্থনীয়।

উক্ত তিন পত্র হইতে এইরূপ অনুমান হয় যে, সিণ্ডিকেটের সভ্যগণ বাঙালির শিক্ষায় বাংলার কোনো উপযোগিতা স্বীকার করেন না, এবং আমাদের স্বদেশীয়দের নিকট হইতেই প্রধানত আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে।

অবশ্য, আমাদের স্বদেশীয়েরা যে এ সম্বন্ধে আপত্তি করিবেন তাহাতে আশ্চর্য কিছুই নাই। যদি না করিতেন তবে আমাদের দেশের এমন দুর্দশা হইবে কেন। কিন্তু কিছু আশ্চর্যও আছে। আমরা কখনও কিছুতে আপত্তি করি নাই বলিয়াই আমাদের এত দুর্গতি; দেশের উপর যখন যে-কোনো অমঙ্গল স্রোত আসিয়া

পড়িয়াছে আমরা বিনা আপত্তিতে তাহার নিকট মস্তক নত করিয়া দিয়াছি; স্বদেশের কথা, ভবিষ্যতের কথা এক মুহূর্তের জন্য ভাবিও নাই। আজ আমরা ইংরেজের কল্যাণে যদি-বা আপত্তি করিতে শিখিলাম, অভাগার অদৃষ্ট এমনই, অনেক সময় দেশের মঙ্গল প্রস্তাবে আপত্তি করিয়া বসি।

বোধ হয়, আপত্তি করিতেই একটা সুখ আছে। নতুবা, স্বদেশী ভাষার সাহায্য ব্যতীত কখনোই স্বদেশের স্থায়ী কল্যাণ সাধিত হইতে পারে না, এ কথা কে না বোঝে।

কিন্তু দুর্দৈবক্রমে সহজ কথা না বুঝিলে তাহার মতো কঠিন কথা আর নাই। কারণ, কঠিন কথা না বুঝিলে সহজ কথার সাহায্যে বুঝাইতে হয়, কিন্তু সহজ কথা না বুঝিলে আর উপায় দেখা যায় না।

দেশের অধিকাংশ লোকের শিক্ষার উপর যদি দেশের উন্নতি নির্ভর করে, এবং সেই শিক্ষার গভীরতা ও স্থায়িত্বের উপর যদি উন্নতির স্থায়িত্ব নির্ভর করে, তবে মাতৃভাষা ছাড়া যে আর কোনো গতি নাই, এ কথা কেহ না বুঝিলে হাল ছাড়িয়া দিতে হয়।

রাজা কত আসিতেছে কত যাইতেছে; পাঠান গেল, মোগল গেল, ইংরেজ আসিল আবার কালক্রমে ইংরেজও যাইবে, কিন্তু ভাষা সেই বাংলাই চলিয়া আসিতেছে এবং বাংলাই চলিবে; যাহা-কিছু বাংলায় থাকিবে তাহাই যথার্থ থাকিবে এবং চিরকাল থাকিবে। ইংরেজ যদি কাল চলিয়া যায় তবে পরশু ওই বড়ো বড়ো বিদ্যালয়গুলি বড়ো বড়ো সৌধবুদ্বুদের মতো প্রতীয়মান হইবে।

ভালোরূপ নজর করিয়া দেখিলে আজও ওগুলাকে বুদ্বুদ বলিয়া বোঝা যায়। উহারা আমাদের বৃহৎ লোকপ্রবাহের মধ্যে অত্যন্ত লঘুভাবে অতিশয় অল্প স্থান অধিকার করিয়া আছে। প্রবাহের গভীর তলদেশে উহাদের কোনো মূল নাই। তীরে বসিয়া ফেনের আধিক্য দেখিলে ভ্রম হয় তবে বুঝি আগাগোড়া এইরূপ ধবলাকার, একটু অন্তরে অবগাহন করিলেই দেখা যায় সেখানে সেই স্নিগ্ধ শীতল চিরকালের নীলাম্বুধারা।

শিক্ষা যদি সেই তলদেশে প্রবেশ না করে, জীবন্ত মাতৃভাষার মধ্যে বিগলিত হইয়া চিরস্থায়িত্ব লাভ না করে, তবে সমাজের উপরিভাগে যতই অবিশ্রাম নৃত্য করুক এবং ফেনাইয়া উঠুক তাহা ক্ষণিক শোভার কারণ হইতে পারে, চিরন্তন জীবনের উৎস হইতে পারে না।

এ-সব কথা ইতিহাসে অনেকবার আলোচিত হইয়া গেছে, এবং অনেক ইংরেজ লেখকও এ কথা লিখিয়াছেন। জর্মানিতে যতদিন না মাতৃভাষার আদর হইয়াছিল ততদিন তাহার যথার্থ আত্মাদর এবং আত্মোন্নতি হয় নাই। শিক্ষাসভার যে-সভ্যগণ মাতৃভাষার প্রতি আপত্তি প্রকাশ করেন তাঁহারা এ-সমস্ত উদাহরণ অবগত আছেন, সেইজন্যই কথাটা তাঁহাদের বুঝানো আরও কঠিন, কারণ, বুঝাইবার কিছু নাই।

আর-একটা যুক্তি আছে। এতদিনকার ইংরেজি শিক্ষাতেও শিক্ষিতগণের মধ্যে প্রকৃত মানসিক বিকাশ দেখা যায় না। তাঁহারা এমন-একটা কিছু করেন নাই যাহাকে পৃথিবীর একটা নূতন উপার্জন বলা যাইতে পারে, যাহাতে মনুষ্যজাতির একটা নূতন গৌরব প্রকাশ পাইয়াছে। কেহ কেহ ভালো ইংরেজি বলেন, কেহ কেহ বিশুদ্ধ উচ্চারণ রক্ষা করেন, কিন্তু ধাত্রীর অঞ্চল ছাড়িয়া কেহ এক পা হাঁটিতে পারেন না।

তাহার প্রধান কারণ, বিদেশী ভাষার ভার বড়ো গুরুতর। একজনের খোলস আর-একজনের স্কন্ধে চাপাইলে সে কখনোই তাহা লইয়া বেশ স্বাধীন সহজভাবে চলিতে পারে না। আমাদের ভাবকে বিদেশী ভাষার বোঝা কাঁধে লইয়া চলিতে হয়, প্রতি পদে পদস্খলনের ভয়ে তাহাকে বড়ো সাবধানে অগ্রসর হইতে হয়, কোনোমতে মান বাঁচাইয়া বাঁধা রাস্তা ধরিয়া চলিতে পারিলেই তাহার পক্ষে যথেষ্ট।

কিন্তু ততটুকু করাই এত কঠিন যে, সেইটুকু সুসম্পন্ন করিলেই পরম একটা গৌরব অনুভব করা যায়, সেটাকে খুব-একটা মহৎ ফললাভ বলিয়া ভ্রম হয়। অন্য দেশে একটা বড়ো কাজের যতটা মূল্য, আমাদের দেশে একটা অবিকল নকলের মূল্য তাহা অপেক্ষা অল্প নহে। এতটা করিয়া যাহা হইল তাহা যে কিছুই নহে, এ কথা লোককে বোঝানো বড়ো শক্ত। এইজন্য মুখুজ্যের ছেলেকে গড়গড় শব্দে ইংরেজি বক্তৃতা করিতে শুনিলে বাঁড়ুয্যের ছেলেকেও সেই চূড়ান্ত গৌরব হইতে বঞ্চিত করিতে তাহার বাপের প্রবৃত্তি হয় না। তখন যদি তাহাকে বুঝাইতে বসা যায় যে, বার্ক্‌ ব্রাইট্‌ গ্লাডস্টোনের ভাষার সহিত প্রচুর পরিমাণে পানাপুকুরের জল মিশাইয়া একটি বঙ্গশাবক যে বহুকষ্টে অথবা অনায়াসে গোটাকতক অকিঞ্চিৎকর কথা বলিয়া গেল, উহাতে কোনো কাজই হইল না, উহা না আমাদের দেশের অন্তঃকরণে স্থায়ী হইল, না বিলাতি সাহিত্যে প্রবেশ লাভ করিল— কেবল নিষ্ফল শিলাবৃষ্টির ন্যায় অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী চট্‌পট্‌ শব্দের করতালি আকর্ষণ করিয়া শস্যবীজহীন পথকর্দমের সহিত মিশাইয়া গেল; উহা অপেক্ষা বাংলাভাষায় ভাব প্রকাশ করিবার চেষ্টারও সহস্রগুণ সফলতা আছে।— তবে এ-সব কথা বাঁড়ুয্যের কর্ণে স্থান লাভ করে না, মুখুজ্যের ছেলের ইংরেজি ফাঁকা আওয়াজের কাছে স্বদেশের সমস্ত দাবি তাহার নিকট এতই ক্ষীণ বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

বুঝাইবার পক্ষে আর-একটা বড়ো বাধা আছে। অনেকে এমন কথা মনে করেন, আমরাও তো আধুনিক প্রণালীতে শিক্ষালাভ করিয়াছি; কই আমাদের মানসিক ঔৎকর্ষ সম্বন্ধে আমাদের মনে তো কখনও তিলমাত্র সংশয় উপস্থিত হয় না। বুঝিতে পড়িতে কহিতে বলিতে আমরা তো বড়ো কম নহি।

সে কথা অস্বীকার করিয়া কাজ নাই। তাঁহাদিগকে বলা যাক, আপনারা কিছুতেই ন্যূন নহেন। কিন্তু আরও ঢের বেশি হইতে পারিতেন। এখনই যদি আপিসের কাজ সুশৃঙ্খলমতো নির্বাহ করিয়া জগৎকে চমৎকৃত করিয়া দিতে পারিতেছেন, বিদেশী ভাষার বাধা অতিক্রম করিতে না হইলে না জানি কী হইতেন এবং কী করিতেন। তাঁহাদিগকে আরও বলা যাইতে পারে যে, আপনাদের কথা স্বতন্ত্র। আপনারা যে এমন প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও এত বড়ো হইয়া উঠিয়াছেন, তাহাতে আপনাদেরই বিশেষ মাহাত্ম্য প্রকাশ পাইতেছে, শিক্ষাপ্রণালীর নহে। কিন্তু দেশের সকলেই তো আপনাদের মতো হইতে পারে না।

শিক্ষায় স্বদেশী ভাষা অবলম্বন করিলে কেন যে মনের বিশেষ উন্নতি হয় সে কথা পূর্বে বলিয়াছি। যে-সৌভাগ্যবান সভ্যজাতিরা দেশীভাষায় শিক্ষালাভ করে তাহারা প্রথম হইতেই ধারণা করিবার, চিন্তা করিবার অবসর পায়। আরম্ভ হইতেই তাহাদের ভাব প্রকাশ করিবার সুযোগ ঘটে। কেবল যে কতকগুলা মুখস্থ জ্ঞান অর্জন হয় তাহা নহে, মানসিক শক্তির বিকাশ হইতে থাকে।

একজন এণ্ট্রেন্সক্লাসের ছোকরা কতটুকুই বা বুঝিতে পারে, কতটুকুই বা প্রকাশ করিতে পারে। সে দশ-বারো বৎসরকাল খেলাধুলো ভুলিয়া প্রাণপণ করিয়া অতি যৎসামান্য ইংরেজি শিখে, তাহাতে তাহার মানসিক দৈন্য কিছুই দূর হয় না। নিজে কিছু বুঝিয়া উঠা, কিছু ভাবিয়া বলা তাহার পক্ষে অসাধ্য। কারণ, সকলই অভ্যাসের উপর নির্ভর করে। কথার মানে দেখিতে দেখিতে, 'কী' মুখস্থ করিতে করিতে হতভাগ্য হায়রান হইয়া গিয়াছে, এ পর্যন্ত মনের মধ্যে একটি ভাব রীতিমতো ধারণা করিবার অবকাশ তাহার হয় নাই।

কেবল তাহাই নহে। যেমন আহার করিয়া বলসঞ্চয়পূর্বক পরিশ্রম করিয়া পুনশ্চ তাহা কিয়দংশ ব্যয় না করিলে ক্ষুধা হয় না, পরিপাক হয় না, সে-আহার সম্যক্‌রূপ কাজে লাগে না— তেমনই শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ করিতে, আলোচনা করিতে না পারিলে সে-শিক্ষা অপরিপক্ব অবস্থাতেই থাকিয়া যায়; তাহার অধিকাংশই মনের সহিত মেশে না। য়ুরোপে ছাত্রেরা যেটুকু যখন শেখে সেটুকু তখনই প্রকাশ করিতে পারে। লেখায় না হউক, কথায়। কিন্তু আমরা বহুকাল পর্যন্ত মূক। বলিবার কোনো বিষয়ও পাই না, বলিবার একটা ভাষাও নাই। কথার মানে বুঝিতে এতকাল লাগে যে ভাব বুঝিতে অনেক বিলম্ব হয়, কেবল ভাষা রচনা করিতে এতদিন কাটিয়া যায় যে ভাব প্রকাশ করিতে বহুকাল অপেক্ষা করিতে হয়।

কোনো কোনো ইংরেজ অধ্যাপক আক্ষেপ করিয়া থাকেন যে, বাঙালি ছাত্রের মধ্যে ওরিজিন্যালিটির কোনো লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় না। সে কথা সত্য। কিন্তু কচুর আবাদ করিয়া, কলার কাঁদি পাওয়া যাইতেছে না বলিয়া পরিতাপ করা শোভা পায় না। ঢেঁকির কাষ্ঠ নিয়মিত পদাঘাত দ্বারা চালিত হইয়া অবিশ্রাম মাথা খুঁড়িয়া সুচারুরূপে ধান ভানিতে পারে, কিন্তু তাহাতে পাতা গজায় না, ফল ফলে না। এ-জন্য অন্য যে-খুশি আক্ষেপ করুক, কিন্তু যে-ছুতার সজীব গাছ কাটিয়া এই নির্জীব ঢেঁকি বানাইয়াছে সে কেন বিস্মিত হয়। মানুষের মনকে যদি মনরূপে বাড়িতে দিতে তবেই তো মধ্যে মধ্যে ওরিজিন্যালিটি বিকাশ লাভ করিত, কিন্তু শিশুকাল হইতে তাহাকে যদি যন্ত্ররূপে পরিণত করিলে তবে সে নিরুপায় হইয়া কেবল শেখা-কথা আওড়াইতে এবং অভ্যস্ত কাজ সম্পন্ন করিতে পারিবে। জিজ্ঞাসা করি, জর্মানি যখন ফরাসি শিখিত, তখন কি সে ফরাসিভাষায় ওরিজিন্যালিটি দেখাইয়াছিল। জর্মন-রচিত কোন্ ফরাসি গ্রন্থ ফরাসি-সাহিত্যে স্থায়ী সমাদর প্রাপ্ত হইয়াছে। ফ্রেঞ্চ এবং জর্মনদের ভাষা, ভাব, দেশের প্রকৃতি, ইতিহাস ও ধর্মকর্মের যতটা ঐক্য আছে আমাদের সহিত ইংরেজের কি তাহার শতাংশ আছে। আমরা সেই ইংরেজি শিখিয়া সেই ইংরেজি ভাষায় ইংরেজ অধ্যাপকের নিকট ওরিজিন্যালিটি দেখাইব? নিজের পা খোয়াইয়া কাঠের পা পরিয়া চলিতে পারি এই পরম সৌভাগ্য, নৃত্য করিতে পারি না বলিয়া ধিক্কার দাও কেন।

সে যা-ই হোক, কথাটা সত্য যে আমাদের মধ্যে ওরিজিন্যালিটির স্ফূর্তি হয় না— এবং তাহার প্রধান কারণ সম্বন্ধেও সন্দেহ নাই।

অবশ্য, ওরিজিন্যালিটি না থাকিলেও কাজ চলিয়া যায়, কারণ উহা বাড়ার ভাগ মাত্র। কিন্তু একটা কাজ সমাধা করিতে ঠিক যতটা শক্তির আবশ্যক তদপেক্ষা

কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত হাতে রাখিতেই হয়। দুই-শ জনকে যজ্ঞে নিমন্ত্রণ করিলে ন্যূনপক্ষে আড়াই-শ জনের মতো আয়োজন করিতে হয়। সমাজের সকল বিভাগে যখন এই বাড়তি ভাগ, এই ওরিজিন্যালিটি, এই প্রতিভা প্রত্যক্ষগোচর হয়, তখন স্পষ্ট বুঝা যায়, সমাজের সমস্ত অবশ্যপ্রয়োজনীয় কার্য অনায়াসে সম্পন্ন হইতেছে। অতএব ওরিজিন্যালিটি সমাজের সচ্ছলতা ও জীবনীশক্তির একটা লক্ষণ।

পরন্তু, আমাদের শিক্ষায় আমাদের অত্যাবশ্যকটুকুই ভালো করিয়া চলে না, ওরিজিন্যালিটির অভাবই তাহার প্রধান প্রমাণ। যেখানে বড়োলোক আছে সেখানে ছোটো কাজ রীতিমতো চলিতেছে। যতক্ষণ অপর্যাপ্ত না হয় ততক্ষণ সমাজের পক্ষে পর্যাপ্ত হয় না।

দেশীভাষায় যদি আমরা শিক্ষালাভ করিতে পারিতাম, তবে সে-শিক্ষা আমাদের পক্ষে অপর্যাপ্ত হইত। আমরা তাহার মধ্যে যথেচ্ছ বিচরণ সঞ্চরণ করিতে পারিতাম, তাহার মধ্যে বাস করিতে পারিতাম এবং ক্রীড়া করিতেও পারিতাম। তাহার মধ্যে কাজও পাইতাম অবকাশও পাইতাম, সেও আমাকে গঠন করিত আমিও তাহাকে গঠন করিতাম। শিক্ষা এবং মনের মধ্যে খুব একটা স্বাভাবিক চলাচল থাকিত।

এখন, কথা হইতে পারে বাংলায় এত বই কোথায়। তবে সেই কথাই হউক। বাংলায় যাহাতে পাঠ্য বই হয় সেই চেষ্টা করা যাক। সিণ্ডিকেট-সভা যদি প্রসন্ন হন, যদি অনুমতি করেন, তবে দরিদ্র বাঙালি এ কাজে এখনই নিযুক্ত হয়। ম্যাক্‌মিলান সাহেবকে অনেককাল অন্ন জোগাইয়াছি, এখন ঘরের অন্ন ঘরের উপবাসী ছেলেদের মুখে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ উঠিলে দেখিয়াও চক্ষু সার্থক হইবে।

ওরিজিন্যাল কেতাব না পাওয়া যায় তো তর্জমা করিতে দোষ নাই। জ্ঞান বিজ্ঞান যেখানকারই হউক, ভাষা মাতার হওয়া চাই। শিক্ষাকে এমন আকারে পাওয়া চাই যাহাতে ইচ্ছা করিলে আমরা সকল ভ্রাতাভগিনীই তাহার সমান অধিকারী হইতে পারি। যাহাতে সেই শিক্ষা সুস্থ শরীরের পরিণত রক্তের মতো সহজে সমাজের আপামর সাধারণের মধ্যে সঞ্চারিত হইতে পারে, কেবল সংকীর্ণ স্থানবিশেষে বদ্ধ হইয়া একটা অত্যন্ত রক্তবর্ণ প্রদাহ উপস্থিত না করে।

কিন্তু বোধ করি প্রধান আপত্তি এই যে, শিশুকাল হইতে সমস্ত শিক্ষা ইংরেজি-ভাষায় নির্বাহ না হইলে বাঙালির ছেলে ভালো করিয়া ইংরেজি শিখিতে পারিবে না।

চোর মনে করে, যত অধিক পরিমাণে লইব তত শীঘ্র চুরি শেষ হইবে। থলির মুখ সংকীর্ণ, তাহার মধ্যে দুই হাত প্রবেশ করাইয়া দেয়; বহুলোভে দুই মুঠা ভরিয়া যখন হাত বাহির করিতে চায় তখন হাত বাহির হয় না, অবশেষে মুঠা হইতে চৌর্য সামগ্রী যখন পড়িয়া যায় তখন হাত বাহির হইয়া আসে।

আমাদের শিক্ষা-থলির প্রবেশপথও বড়ো সংকীর্ণ, কারণ, সে-থলি বিদেশী ভাষা। তাহার মধ্যে দুই মুঠা ভরিয়া আমরা লুণ্ঠন করিতে চেষ্টা করি, কিন্তু যখন হাত টানিয়া লই তাহাতে কতটুকু অবশিষ্ট থাকে! বোঝা ভারী করা সহজ, বহন করাই শক্ত।

সরল হইতে ক্রমে দুরূহে অধিরোহণ করাই শিক্ষার অভিক্রম। শিক্ষার পদ্ধতিটি আয়ত্ত করাই শিক্ষার একটি প্রধান বাধা, সেই ছাঁচটি একবার গড়িয়া লইতে পারিলে অনেক কঠিন শিক্ষা সহজ হইয়া আসে। ব্যাকরণশিক্ষা ভাষাশিক্ষার একটি প্রণালী।

কিন্তু যে-ভাষার কিছুই জানি না সেই ভাষার ব্যাকরণ হইতেই যদি প্রথম ব্যাকরণ শিক্ষা হয়, তবে শিশুদের মস্তিষ্কের প্রতি কী অন্যায় উৎপীড়ন করা হয়। কর্তা কর্ম ক্রিয়া প্রভৃতি অ্যাবস্ট্রাক্ট্‌ শব্দগুলি ছেলেদের পক্ষে কত কঠিন সকলেই জানে; উপর্যুপরি সহজ উদাহরণের দ্বারা ব্যাকরণের কঠিন সূত্রগুলি কথঞ্চিৎ বোধগম্য হয়। কিন্তু ভাষা এবং ব্যাকরণ দু'ই যখন বিদেশী তখন কাহার সাহায্যে কাহাকে বুঝিবে। তখন সূত্রও অপরিচিত, উদাহরণও অপরিচিত। যে ভাষা সর্বাপেক্ষা পরিচিত সেই ভাষার সাহায্যে ব্যাকরণজ্ঞান লাভ করাই প্রশস্ত নিয়ম; অবশেষে একবার ব্যাকরণ-জ্ঞান জন্মিলে সেই ব্যাকরণের সাহায্যে অপরিচিত ভাষাশিক্ষা সহজ হইয়া আসে।

অতএব, শিখিবার প্রণালীটি যদি একবার মাতৃভাষার সাহায্যে অপেক্ষাকৃত সহজে আয়ত্ত হইয়া আসে, মনটি যদি শিক্ষার জন্য প্রস্তুত হইয়া উঠে, তবে ধারণাশক্তি যে কতটা পরিপক্ক হইয়া উঠে, কত অনাবশ্যক পীড়ন, কঠিন চেষ্টা ও শরীরমনের অবসাদ হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়, কত অল্প সময়ে ও কত স্থায়ীরূপে নূতন শিক্ষা গ্রহণ করা যায়, তাহা যাঁহারা দৃষ্টান্ত দেখিয়াছেন তাঁহারাই জানেন।

বাল্যকাল হইতেই ইংরেজিভাষা শিক্ষা দেওয়া হউক কিন্তু বাংলার আনুষঙ্গিক রূপে অতি অল্পে অল্পে, তাহা হইলে বাংলাশিক্ষা ইংরেজিশিক্ষার সাহায্য করিবে। ইতিহাস ভূগোল অঙ্ক প্রভৃতি শিক্ষার বিষয়গুলি বাংলায় শিখাইয়া ইংরেজিকে কেবল ভাষাশিক্ষা রূপে শিখাইলে ভাষারূপে ইংরেজি শিখিবার সময় অধিক পাওয়া যায়; বুঝিয়া পড়িবার এবং অভ্যাস করিয়া লিখিবার যথার্থ অবসর থাকে।

সকলেই জানেন, আজকাল আমাদের ছাত্রেরা যে-পরিমাণে অনেক বিষয় শেখে সেই পরিমাণে ইংরেজি অল্প শেখে। তাহার প্রধান কারণ, আগাগোড়া মুখস্থ করিতে গিয়া ইংরেজি বুঝিবার এবং রচনা করিবার সময় পায় না। শিক্ষণীয় বিষয়গুলি যদি বাংলায় পাইতাম তবে ইংরেজিভাষাশিক্ষা যে কত সহজসাধ্য হইত তাহা বলা যায় না। তাহা হইলে শিক্ষার বিষয়গুলি এখনকার অপেক্ষা গভীরতর এবং ইংরেজি-ভাষাজ্ঞানের পরীক্ষা এখনকার অপেক্ষা অনায়াসে দুরূহতর করা যাইতে পারিত।

বঙ্কিমবাবুর ক্ষীণস্বর যাঁহাদের শ্রুতিগম্য হয় নাই, আমার এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধ তাঁহাদের দৃষ্টিগোচর হইবে না, হইলেও কোনো ফলের প্রত্যাশা করি না। কিন্তু যে-পাঠকগণ অনুগ্রহ অথবা অনুরাগ -বশত আমাদের বাংলাকাগজ পড়িয়া থাকেন তাঁহাদের প্রতি কিঞ্চিৎ ভরসা রাখি। তাঁহারা যদি দেশের মঙ্গলের জন্য কথাটা ভালো করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখেন, এবং ঘরে ঘরে আপন আপন সন্তানকে মাতৃস্তন্যের ন্যায় মাতৃভাষার দ্বারা সম্যক্‌রূপে পরিপুষ্ট ও পরিণত করিয়া তুলিতে চেষ্টা করেন তবে কালক্রমে দেশের যে শ্রী ও উন্নতি হইবে সভাসমিতিতে সহস্র বৎসর ইংরেজি বক্তৃতা করিয়াও সেরূপ হইবে না। কেবল ভয় হয় এইজন্য যে, বাঙালি স্থায়ী গৌরব অপেক্ষা ক্ষণিক অহংকার-তৃপ্তি অধিক ভালোবাসে, ভবিষ্যৎ কার্যসিদ্ধির অপেক্ষা উপস্থিত করতালির জন্য অধিক লালায়িত; এবং দেশের বৃহৎ কল্যাণ অপেক্ষা আশু ক্ষুদ্র স্বার্থের প্রলোভন গুরুতর; তাহা ছাড়া মুখে যেমনই গর্ব করি, আত্মশক্তি আত্মভাষা এবং কোনো আপনার জিনিসের প্রতিই আমাদের আন্তরিক বিশ্বাস নাই; মনে স্থির করিয়া বসিয়া আছি যে, ইংরেজ গবর্মেণ্ট আমাদের সমস্ত উন্নতিসাধন করিয়া দিবে,

আমরা কেবল দরখাস্ত করিব, ইংরেজিভাষাতেই আমাদের সমস্ত জাতীয়শিক্ষা সাধন করিবে, আমরা কেবল অভিধান ধরিয়া মুখস্থ করিয়া গেলেই হইবে।

'শিক্ষার আন্দোলনের ভূমিকা' নামক যে-প্রবন্ধটি পরিশিষ্টে মুদ্রিত হইয়াছে তাহা বঙ্গবিভাগ আন্দোলনের আনুষঙ্গিক শিক্ষাসমস্যা-সম্পর্কিত। ১৯০৫ সালের অক্টোবর মাসে বঙ্গবিভাগ আন্দোলনে ছাত্রগণের যোগদান নিষিদ্ধ করিয়া স্কুল-কলেজে সার্কুলার (কার্লাইল সার্কুলার) প্রেরিত হইয়াছে, স্টেটসম্যান পত্রে (২২ অক্টোবর ১৯০৫, ৫ কার্তিক ১৩১২) এই সংবাদ প্রকাশিত হইলে বিদ্যালয় বর্জন ও জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য বাংলাদেশে যে-আন্দোলন আরম্ভ হয়, তাহার বিস্তারিত বিবরণ (২৫ অগ্রহায়ণ, ১৩১২ পর্যন্ত)-সহ 'শিক্ষার আন্দোলন' বা 'শিক্ষা' নামে একটি পুস্তিকা ভাণ্ডার পত্রের বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়, বর্তমান প্রবন্ধটি তাহারই ভূমিকা।

'শিক্ষার আন্দোলন' হইতে বিদ্যালয় বর্জন ও জাতীয়বিদ্যালয় স্থাপনের ব্যবস্থা-কল্পে আহূত বিভিন্ন সভায় রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি বক্তৃতাও নিম্নে সংকলিত হইল—"বক্তা যে-ভাষায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন সে-ভাষায় বক্তৃতা প্রকাশ করা সম্ভব নহে। বক্তৃতার মর্মমাত্র সংকলিত হইয়াছে।"

১০ই কার্তিক [১৩১২] শুক্রবার অপরাহ্ণে পটলডাঙা মল্লিকবাড়িতে ছাত্রগণের এক বিরাট সভা হয়। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।…

সভাপতির বক্তৃতা

এখন বোধ হয় উত্তেজনা দ্বারা আপনাদের উত্তপ্ত রক্তকে আর উত্তপ্ততর করিবার কোনো প্রয়োজন নাই। আজ আপনারা যে-মন্তব্য[1] গ্রহণ করিলেন, কর্তৃপক্ষ তাহা হয়তো অসংগত মনে করিবেন। তাঁহারা চোখে খোঁচাও মারেন, আবার জল বাহির হইলে দোষও ধরেন। শুধু কর্তৃপক্ষ নয়, আমাদের দেশেও অনেক বিবেচক লোক আছেন, তাঁহারা মনে করেন যে, বিদ্যাভ্যাস ব্যতীত ছাত্রগণের অন্য কোনো কার্যে

[1] "গবর্মেণ্ট সম্প্রতি স্কুল ও কলেজের ছাত্রগণের বিরুদ্ধে যে-সার্কুলার জারি করিয়াছেন তাহাতে আমাদিগকে স্পষ্টভাবে স্বদেশের সেবা হইতে বিরত থাকিতে বলা হইয়াছে। ইহাতে আমরা কখনও সম্মত হইতে পারি না বা ভবিষ্যতে পারিব না। অতএব আমরা কলিকাতার ছাত্রবৃন্দ সম্মিলিত হইয়া প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করিতেছি যে, যদি গবর্মেণ্টের বিশ্ববিদ্যালয় আমাদিগকে পরিত্যাগ করিতে হয় তাহাও স্বীকার, তথাপি স্বদেশসেবারূপ যে মহাব্রত আমরা গ্রহণ করিয়াছি তাহা কখনও পরিত্যাগ করিব না।"— প্রস্তাবক শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু, অনুমোদক ফণিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সমর্থক চুনীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, সতীশচন্দ্র সিংহ ও মহম্মদ সিদ্দিক।

নিযুক্ত হওয়া অন্যায়। অধ্যয়নই যে ছাত্রজীবনের প্রধান কর্তব্য এবং অধ্যয়নে যতই অবহিত হইতে পারা যায়, ততই যে সফলতা লাভের বেশি সম্ভাবনা, এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু এ কথাও ঠিক যে, সকল দেশেই বিশেষ বিশেষ সংকটের সময় এ নিয়মের ব্যতিক্রম হইয়া থাকে। তখন বয়স্কেরা ব্যাবসা ছাড়িয়া, যুবকেরা আমোদপ্রমোদ ছাড়িয়া, ছাত্রেরা অধ্যয়ন ছাড়িয়া আন্দোলনে যোগদান করিয়া থাকেন। সর্বত্রই এইরূপ ঘটে এবং এরূপ ঘটাই স্বাভাবিক। বর্তমান সময়ে আমরা আমাদের মধ্যে নবজীবনের একটা উত্তেজনা অনুভব করিতেছি। বৃদ্ধেরাও বিষয়কর্ম পরিত্যাগ করিয়া এমন উৎসাহের সহিত বর্তমান আন্দোলনে মাতিয়া গিয়াছেন যে, তাঁহাদের আবার যদি কোনো বৃদ্ধতর অভিভাবক থাকিতেন, তবে তাঁহারা নিঃসন্দেহই বলিতেন যে, ইঁহাদের এই কাজ বৃদ্ধোচিত হইতেছে না।

ছাত্রগণ যে এ আন্দোলনে যোগ দিয়াছেন, তাহা নিতান্ত স্বাভাবিক, বিশেষত আমাদের দেশে। যে-সমাজের সমস্ত শক্তি সম্মিলিত হইয়া আপনার অভাব মোচনে নিযুক্ত থাকে, সে-সমাজে বরং ছাত্রেরা স্বতন্ত্র থাকিতে পারেন। আমাদের সমাজের তো সেরূপ স্বাস্থ্যের অবস্থা নহে। আমাদের রাজা বিদেশী, প্রজার বেদনা বোঝেন না, বুঝিলেও অনেক সময়ে উভয়ের স্বার্থের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। আবার ইঁহারাই আমাদের শিক্ষক। ইংরেজের সমাজ স্বাধীন, সেখানে রাজা ও প্রজার মধ্যে জেতা-বিজিতের সম্পর্ক নাই। কাজেই এমন বিরোধও উপস্থিত হয় না। সেখানকার ছাত্রেরা এই বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে যে, স্টেট সর্বপ্রযত্নে তাহাদের মঙ্গল চিন্তাই করিতেছে। কিন্তু বিশেষ কোনো সংকট উপস্থিত হইলে তাহারাও যে বিচলিত হইয়া থাকে, তাহার প্রমাণের অভাব নাই।

আমাদের দেশে শিক্ষার ভার যাঁহাদিগের হস্তে ন্যস্ত আছে, তাঁহাদের স্বার্থের সঙ্গে ছাত্রদের স্বার্থের বিরোধ। সুতরাং ছাত্রেরা যে সকল সময় সকল বিষয়ে শিক্ষা-গুরুদিগের অনুবর্তী হইয়া চলিবে, তাহা সম্ভবপরও নহে, সমাজের পক্ষে স্বাস্থ্যকরও নহে। সকলেই জানেন যে, মুখগহ্বর নিশ্বাস গ্রহণের জন্য অভিপ্রেত হয় নাই, নাসাই নিশ্বাস গ্রহণের প্রকৃত দ্বার। কিন্তু যখন ফুসফুস বিকৃত হইয়া পড়ে, তখন মুখগহ্বরকেই সেই কাজ করিতে হয়। সমাজে যদি কখনও এমনতরো অবস্থা উপস্থিত হয় যে, তাহার নাসা যথানির্দিষ্ট কাজ করিতে পারিতেছে না, তখন কি বলিব যে তার মুখ বন্ধ হইয়া থাকুক। ছাত্রেরা যদি আবালবৃদ্ধবনিতার সঙ্গে বর্তমান আন্দোলনে যোগ দিয়া থাকেন, তবে সে আনন্দেরই কথা। এই স্বদেশী-আন্দোলন যে কৃত্রিম, সে কথা তো কেহ বলিতে পারিবে না। আজ যে ছাত্রেরা উন্মত্ত, জনসাধারণ উত্তেজিত এবং বৃদ্ধেরাও উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছেন, ইহাতে স্পষ্টই মনে হয় যে, সকলে মিলিয়া দেশকে এক মহাসংকট হইতে রক্ষা করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছেন। ইহা দেখিয়া যাঁহারা আতঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছেন, তাঁহারা দেশকালপাত্রভেদে যে অবস্থার ভেদ হয়, তাহা বিবেচনা করেন না। আমাদের দেশের চাষাদিগকেও যদি আজ জিজ্ঞাসা করা যায়, 'তোমরা স্বদেশী জিনিস ব্যবহার করিতেছ কেন।' তবে তাহারা বলে 'হুকুম হইয়াছে'। হুকুমই বটে, কিন্তু এ হুকুম তো কোনো নেতার হুকুম নয়। কোন্ স্বর্গ হইতে এ হুকুম নামিয়া আসিয়াছে কে বলিতে

পারে। যে শক্তি আজ আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত হইয়াছে, কই পূর্বে তো কখনও তাহা উপলব্ধি করিতে পারি নাই। তাই আমার মনে হয় যে, এ হুকুম অমান্য করিতে পারে এমন শক্তি কাহারও নাই।

সুতরাং আজ যে গবর্মেণ্টের পরওয়ানায় আপনাদের তরুণ হৃদয় উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে, আমি তাহার কোনো ঠাণ্ডা চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে চাই না। আমি এ বিষয়ে আপনাদের সঙ্গে এক। আপনারা স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দিয়া— শুধু যোগ দিয়া নয়, বয়স্কদের মধ্যেও ইহা সঞ্চারিত করিয়া— বিধাতার হুকুম পালন করুন, প্রবীণেরা তাহাতে কোনো বাধা দিবেন না।

আবশ্যক হইলে দেশের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্রব পর্যন্ত পরিত্যাগ করিবেন, আপনারা এই প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। এই অপমানকর [সরকারী] পরোয়ানায় আপনারা যে ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছেন, আমি তাহা দেখিতে পাইতেছি। আপনারা যে এ সংকল্প রক্ষা করিতে পারিবেন, তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। আপনাদের কর্তব্য আপনারা করিয়াছেন। এখন প্রবীণ লোকদিগের কর্তব্য আপনাদিগকে যথার্থভাবে চালনা করা। যদি এই অপমানে আপনারা সত্য সত্যই ক্ষুব্ধ এবং ব্যথিত হইয়া থাকেন, তবে প্রবীণ ব্যক্তিরা আপনাদিগকে কখনও পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না। এখন তাঁহারা নিঃসন্দেহই চিন্তা করিতেছেন— কী উপায়ে ইহার প্রতিকার হইতে পারে।

কর্তৃপক্ষের তাড়নায় ছাত্রগণ বেদনা বোধ করিয়া যে এতদূর অগ্রসর হইতে পারিয়াছেন, গবর্মেণ্টের চাকরি ও গবর্মেণ্টের সম্মানের আশা বিসর্জন দিয়া স্বদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের অপেক্ষা করিতেছেন, ইহা অত্যন্ত শুভলক্ষণ বলিতে হইবে। আমাদের সমাজ যদি নিজের বিদ্যাদানের ভার নিজে না গ্রহণ করেন, তবে একদিন ঠেকিতেই হইবে। আজকার এই অবমাননা যে নূতন, তাহা নহে; অনেক দিন হইতেই ইহার সূত্র আরম্ভ হইয়াছে। আমাদের উচ্চশিক্ষার উপর গবর্মেণ্টের অনুকূল দৃষ্টি নাই; সুতরাং গবর্মেণ্ট যদি এই পরোয়ানা প্রত্যাহারও করেন, তবুও আমরা তাঁহাদের হাতে শিক্ষার ভার সমর্পণ করিয়া শান্ত থাকিতে পারিব না। গবর্মেণ্ট এ দেশের অনুকূল শিক্ষা কখনও দিতে পারেন না। ইহার কারণ অক্ষমতাও হইতে পারে, অনিচ্ছাও হইতে পারে। অক্ষমতা— কেননা যেখানে হৃদয়ের যোগ না থাকে, সেখানে প্রকৃত শিক্ষা দেওয়া যায় না; অনিচ্ছা— কেননা গবর্মেণ্ট জানেন যে, তাঁহাদিগের সাহিত্য ও ইতিহাস প্রভৃতি হইতে শিক্ষা লাভ করিয়া আমাদের চিত্ত যে-ভাবে গঠিত হইয়া উঠিতেছে, তাহা তাঁহাদের স্বার্থের পক্ষে অনুকূল নহে। ইহাতে আমরা আমাদের প্রকৃত অবস্থার আলোচনা করিয়া মূলগত প্রতিকারের পন্থা অনুসন্ধান করিব, এইটিই স্বাভাবিক। আর আমরাও যে এতদিন আবেদন আন্দোলন প্রভৃতিতে খুব বিনীত বিনম্র ভাবের পরিচয় দিয়া আসিতেছি, তাহা বলিতে পারা যায় না। গবর্মেণ্ট এ-সকল কথা বেশ বোঝেন। এমন অবস্থায় তাঁহাদের উপর শিক্ষার ভার অর্পণ করিয়া আমরা কেমন করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি।

বাস্তবিক বর্তমান প্রণালীর বিদ্যাশিক্ষা আমাদের পক্ষে কোনোমতেই কল্যাণকর হইতে পারে না। বিদেশী অধ্যাপক অশ্রদ্ধার সঙ্গে শিক্ষা দেন। শিক্ষালাভের সঙ্গে

সঙ্গে তাঁহাদের নিকট হইতে আমরা এমন-একটা জিনিস পাই, যাহা আমাদের মনুষ্যত্ব বিকাশের পক্ষে অনুকূল নহে। আমাদের উপনিষদে আছে, “শ্রদ্ধয়া দেয়ম্, অশ্রদ্ধয়া অদেয়ম্।” অশ্রদ্ধার সহিত দান করিলে দানের প্রকৃত ফললাভ হয় না। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা আমাদের অন্তঃকরণকে অস্থিমজ্জাকে একেবারে দাসত্বে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছে। তাই আমাদের নিজেদের শিক্ষার ভার নিজেদের হাতে রাখিতেই হইবে। পূর্বে যখন দেশ ঘোরতর অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল, তখনও আমাদের সমাজ আপনাকে আপনি শিক্ষা দিয়াছে, আপনার ভিতরে আর প্রতিকূলতা জন্মায় নাই। আজ আমাদের অন্তঃকরণের সম্মুখে যে বৃহৎ প্রয়োজন জাগিয়া উঠিয়াছে তাহাকে সার্থক করিতে হইলে যাহাতে আমরা নিজেদের শিক্ষাকে স্বাধীন করিতে পারি অধ্যবসায়ের সহিত, শান্তির সহিত, সাধনার সহিত, আমাদিগকে তাহারই ব্যবস্থা করিতে হইবে।

গবর্মেন্ট নিজের বিশ্ববিদ্যালয়কে যে অপমান করিয়াছেন, তাহা নিজেকেই অপমান করা। ইহার জন্য গবর্মেন্টের বিশ্ববিদ্যালয় বিধ্বস্ত হইলে আমরা দূরে গিয়া নিজেদের বিদ্যামন্দির প্রতিষ্ঠিত করিব। আমরা ভারি দুর্বল, ভারি অসহায়, এই ভাবিয়াই আমরা এতদিন আমাদিগকে এরূপ অশক্ত করিয়া রাখিয়াছিলাম। আজ আর আমরা ভয় পাই না। গবর্মেন্ট নিজের জিনিস চূর্ণ করুন, আমরা এই অপমানের মূলোচ্ছেদ করিবার জন্য ভারতের সরস্বতীকে আবার ভারতের নিজের মন্দিরে আনিয়া প্রতিষ্ঠিত করি।

জানি না আমাদের নেতারা বিষয়টিকে ঠিক কিরূপ ভাবে দেখিবেন। যদি দেশের হৃদয় এইদিকে যথার্থই উন্মুখ হইয়া থাকে, তবে স্থায়ীভাবে এ অপমানের প্রতিকারের জন্য তাঁহারা নিঃসন্দেহ চেষ্টিত হইবেন। ইহার চেয়েও গুরুতর আশার কথা এই যে, এ পর্যন্ত যে-সকল ঘটনা ঘটিয়াছে তাহা নেতৃগণের বা আপনাদের কাহারও রচিত নয়, তাহা বিধাতারই অমোঘ বিধানে ঘটিয়াছে। এই আন্দোলনের সফলতার ভার তাঁহার হাতে, দেশের আবালবৃদ্ধবনিতাকে তিনিই শক্তি দিবেন। আপনারা নিজের আদর্শের কাছে, স্বদেশের কাছে, ঈশ্বরের কাছে সত্য থাকিবেন; তাহা হইলে আর কাহারও মুখাপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইবে না।

১৬ই কার্তিক বৃহস্পতিবার [১৩১২] ‘ফিল্ড এণ্ড একাডেমী’ ভবনে মেম্বর এবং ছাত্রগণের এক সান্ধ্যসম্মিলন হয়।···

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর [শিক্ষা এবং স্বদেশী আন্দোলন সম্বন্ধে] আলোচনা উত্থাপন করিয়া বলেন যে, বর্তমান বঙ্গব্যবচ্ছেদঘটিত ব্যাপারটা সার্বজনীন। ছাত্ররা যে ইহাতে যোগদান করিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত স্বাভাবিক, ইহার জন্য তাঁহাদিগকে কোনো দোষ দেওয়া যায় না। নেতৃগণ আশানুরূপ ত্যাগস্বীকার করিতেছেন না বলিয়া যে একটা কথা উঠিয়াছে, সে সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, যদি নেতৃগণ এ বিষয়ে বাস্তবিকই অপরাধী হন, তবে সে-অপরাধ একা তাঁহাদের নয়, আমাদের পাঁচজনেরই; কেননা আমাদের পাঁচজনের শক্তি সংহত হওয়াতেই নেতার শক্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই-যে আমাদের মধ্যে পরস্পারের প্রতি অনাস্থার ভাব এটি খুব অমঙ্গলকর, ইহাতে আমাদের বলক্ষয়

হইবার সম্ভাবনা। জাতীয় ধনভাণ্ডার সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, উহার ইংরেজি নাম দেওয়াটাই মস্ত ভুল হইয়াছে। ইংরেজি নাম শুনিলে মনে একটা বিরাট ভাবের উদয় হয়। যদি এই ভাণ্ডারের নাম National Fund না রাখিয়া আমরা 'বঙ্গভাণ্ডার' রাখিতাম, তাহা হইলে ৭০ হাজার টাকা উঠিয়াছে শুনিয়া আমাদের তেমন দুঃখ হইত না। জাতীয় ধনভাণ্ডারে অল্প টাকা উঠিয়াছে বলিয়া যাঁহারা আক্ষেপ করেন, তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, এত অল্পদিনের মধ্যে আমরা পূর্বে কখনও দেশের নিকট হইতে এমনতরো উত্তর পাই নাই। আমরা সাহেবদের নিন্দাপ্রশংসাকে বড়ো ভয় করি। আমাদের ক্ষুদ্র আয়োজন দেখিয়া সাহেবরা কী মনে করিতেছে এ বিষয়ে যদি আমরা বেশি ভাবনা না করি, তবে আমাদের নিজের যাহা সাধ্য তাহা অনেকটা শান্তি ও উৎসাহের সঙ্গে করিয়া উঠিতে পারিব। যোগদানের সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, আজ যদি যথার্থই আমাদের প্রয়োজন উপস্থিত হইয়া থাকে, তবে দেশের ব্যবসায়বুদ্ধি আপনা-আপনি আমাদের অভাবমোচনে নিযুক্ত হইবে। এত আন্দোলনেও তেমন কোনো কাজ দেখা যাইতেছে না বলিয়া কেহ কেহ যে আক্ষেপ করিতেছেন সে-সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, প্রথম-উত্তেজনার আবেগ কতকটা শান্ত হইয়া এখন কার্যের সময় আসিয়াছে। এখন নিঃসন্দেহেই অনেকে নীরবে কাজ করিতেছেন, সুতরাং আমাদের নিরাশ হওয়ার কোনো কারণ নাই। বর্তমান শিক্ষাসমস্যা সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, গবর্মেণ্ট যদি দুই দিন পরে এই পরওয়ানা প্রত্যাহারও করেন, তবু যেন আমরা ইহার শিক্ষাটি কখনও ভুলিয়া না যাই। আমাদের শিক্ষাকে স্বাধীন করিবার জন্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিবার সময় এখন উপস্থিত হইয়াছে। ছাত্রেরা ধীরভাবে বিচার করিয়া দেখিবেন যে, তাঁহারা সত্যসত্যই গবর্মেণ্টের সম্মান এবং চাকুরির মায়া পরিত্যাগ করিবার জন্য প্রস্তুত আছেন কি না। যদি তাঁহারা যথার্থই প্রস্তুত হইয়া থাকেন তবে নেতৃবর্গ নিঃসন্দেহ তাঁহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিবেন।

১৯শে কার্তিক [১৩১২] অপরাহ্ণে 'ডন সোসাইটি'তে একটি ছাত্রসভার অধিবেশন হয়।…

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর [বর্তমান শিক্ষাসমস্যা সম্বন্ধে] আলোচনা উত্থাপন করিয়া বলেন যে, বাংলাদেশে আজ যে-নবজীবনের উত্তেজনা লক্ষিত হইতেছে, তাহা দুই ভাগে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে— বিদেশী পণ্য বর্জনের সংকল্পে এবং স্বদেশের শিক্ষাকে স্বাধীন করিবার আকাঙ্ক্ষায়। কিরূপে স্বদেশী দ্রব্যের অভাবমোচন হইবে, তাহা ধীরভাবে চিন্তা না করিয়াই যেমন আমরা বিদেশী পণ্য বর্জনের সংকল্প করিয়াছিলাম, তেমনই বিশুদ্ধ উৎসাহের সহিত যদি আজ আমরা স্বদেশের শিক্ষার ভার স্বহস্তে গ্রহণ করি, তবে আরম্ভ যত সামান্যই হউক না কেন আমরা ভবিষ্যতে নিঃসন্দেহ সফলতালাভ করিতে পারিব। ছাত্রেরা যদি গবর্মেণ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের অপমান সহ্য করিতে না পারিয়া জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকেন, তবে তাঁহাদের সংকল্প দৃঢ় রাখিবেন। তাহা হইলে নেতারাও তাঁহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা না করিয়া থাকিতে

পারিবেন না। কিন্তু ছাত্রগণের এ কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এ উদ্যোগে প্রথমেই আকাঙ্ক্ষার অনুরূপ ফললাভের আশা করা যাইতে পারে না।[১]

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছাত্রগণের প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে তাঁহার বিশ্বাস যে, ছাত্রগণ সংকল্পে দৃঢ় থাকিলে নেতারা অবশ্যই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিবেন। এখনও এ বিষয়ে কথাবার্তা চলিতেছে। অনেক ধনীসন্তান এ জন্য অর্থসাহায্য করিতেও প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। এ বিষয়ে অন্যের কথা তিনি দৃঢ়ভাবে বলিতে পারেন না। নেতৃগণের মধ্যে এখনও কাহারও কাহারও সন্দেহ আছে যে, নূতন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে ছাত্রগণ তাহাতে প্রবেশ করিবেন কি না। ছাত্রেরা সভা করিয়া নেতাদিগের নিকট ডেপুটেশন পাঠাইয়া বা সতীশবাবুর [ডন সোসাইটির শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়] প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিয়া এ সন্দেহ ভঞ্জন করিতে পারেন। প্রথম অবস্থাতেই আমাদের দেশের লোকের নিকট বেশি আশা করা দুরাশা। এতদিন আমরা কেবল বিদেশীর রুদ্ধ দ্বারেই আঘাত করিয়াছি, এখন কিছু দিন স্বদেশীর দ্বারে আঘাত করিতে হইবে। প্রত্যাখ্যাত হইলেও তাহাতে আমাদের কোনো অপমান নাই, কেননা তাহারা আমাদেরই নিজের লোক। অভিভাবকেরা ছাত্রগণকে কেন সম্মতি দিবেন না, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। আজ যে উত্তেজনার তরঙ্গ উঠিয়াছে, তাহা কি অভিভাবকদিগের হৃদয়ও স্পর্শ করে নাই। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি শিক্ষার বন্দোবস্ত প্রথমেই না হয়, তবে অবশ্যই তাহা ইংরেজের বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। প্রয়োজন হইলে বিদেশেও যাইতে হইবে। বিশেষ বিশেষ শিক্ষাকে কোনো গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিলে চলিবে না। ছাত্রেরা সাময়িক আন্দোলনে যোগ দিবে কি না এ সম্বন্ধে তিনি তাঁহার পূর্বপ্রকাশিত মতের পুনরুক্তি করিয়া বলেন যে, ছাত্রজীবনে যদি কাহারও স্বদেশের সুখদুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষার সহিত পরিচয় না হয়, তবে পঁচিশ বৎসর বয়সের পরে যে তাহা হইবে, ইহা কখনোই স্বাভাবিক নহে, দেশের পক্ষে তাহা কল্যাণকরও হইতে পারে না। আজ যে-সকল ছাত্র গবর্মেন্টের কৃত অপমানে বিশ্ববিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া প্রস্তাবিত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তাঁহাদের সম্মুখে যে কুসুমাস্তৃত পথ

---

[১] "অতঃপর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রবাবুর আহ্বানে যুবকদের মধ্যে শ্রীনরেশচন্দ্র সেন, শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত, শ্রীনৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীমহিমচন্দ্র রায়, শ্রীচুনীলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত এ বিষয়ের কিছু কিছু আলোচনা করেন। তাঁহাদের আলোচনায় প্রকাশ পায় যে, এ বিষয়ে নেতৃবর্গকে প্রথমে অগ্রসর হইতে হইবে, প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ে জীবিকোপার্জনের কোনো ব্যবস্থা করিতে হইবে, এবং অভিভাবকগণের মত প্রথমে গঠিত করিতে হইবে। 'অভিভাবকগণের সম্মতি যদি না পাওয়া যায় তবে কী করা কর্তব্য।' 'ইঞ্জিনিয়ারিং, ডাক্তারি ও ভূবিদ্যা শিক্ষার ব্যবস্থা যদি নববিশ্ববিদ্যালয় প্রথমেই না করিয়া উঠিতে পারেন, তবে ছাত্রেরা কী করিবেন।' 'ছাত্রেরা তো প্রস্তুত আছেন নেতারা কতদূর অগ্রসর হইলেন।' ইত্যাদি প্রশ্নও উত্থাপিত হয়।"

রহিয়াছে, তাহা বলা যায় না। তাঁহাদিগকে নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়া ভবিষ্যদ্‌-বংশীয়দিগের জন্য পথ প্রস্তুত করিতে হইবে। ছাত্রেরা কি তাহাতে প্রস্তুত আছেন। আজ জোয়ারের সময় তাঁহারা যে-আত্মদানের সংকল্প গ্রহণ করিবেন, ভাঁটার সময় যেন তাহা হইতে ভ্রষ্ট না হন।

[সভার] উপসংহারে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন যে, ছাত্রমণ্ডলী জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য আত্মবিসর্জন করিবার যে-সংকল্প করিয়াছেন, তাহার জন্য তাঁহারা দেশের শুভাকাঙ্ক্ষীমাত্রেরই ধন্যবাদার্হ। যদি তাঁহারা এই সংকল্প রক্ষা করিতে পারেন, তবে এই দিন বাংলার ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

এই আন্দোলনের ফলে যে 'জাতীয় শিক্ষাসমাজ' বা 'জাতীয় শিক্ষাপরিষৎ' প্রতিষ্ঠিত হয় তাহার প্রাক্‌কালে আহূত বিভিন্ন মন্ত্রণাসভা, গঠনপ্রণালী-আলোচনা-সমিতি হইতে আরম্ভ করিয়া জাতীয় শিক্ষাপরিষৎ প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত, ও তাহার পর ওই প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত নানা কর্মভারের সহিত রবীন্দ্রনাথ অনেকদিন যুক্ত ছিলেন।[১]

শব্দতত্ত্ব

শব্দতত্ত্ব গদ্যগ্রন্থাবলীর পঞ্চদশ ভাগ রূপে ১৩১৫ সালে [১৯০৯] প্রকাশিত হয়।

১৩১৫ বা তাহার পূর্ববর্তীকালে লিখিত শব্দতত্ত্ববিষয়ক যে-সকল রচনা কোনো কারণবশত প্রচলিত গ্রন্থে সংকলিত হয় নাই, তাহাদের অধিকাংশই বর্তমান খণ্ডের পরিশিষ্টে মুদ্রিত হইল। রচনাবলী সংস্করণের শব্দতত্ত্বসংক্রান্ত প্রবন্ধাবলীর পাঠপ্রস্তুত কার্যে শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন, শ্রীহাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী ও শ্রীনিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী সহযোগিতা করিয়াছেন।

প্রবন্ধগুলির সাময়িক পত্রে প্রথম প্রকাশের আনুপূর্বিক সূচী পরে প্রদত্ত হইল।

---

[১] দ্রষ্টব্য :

১। জাতীয় শিক্ষাপরিষৎ প্রতিষ্ঠা উৎসবে রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা : 'জাতীয় বিদ্যালয়'— রবীন্দ্র-রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, পৃ. ৩১৩।

'শিক্ষাসমস্যা'— রবীন্দ্র-রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, পৃ. ২৯৫।

২। 'সৌন্দর্যবোধ', 'বিশ্বসাহিত্য', 'সৌন্দর্য ও সাহিত্য' ইত্যাদি জাতীয়-শিক্ষাপরিষদে প্রদত্ত বক্তৃতাবলী —'সাহিত্য', রবীন্দ্র-রচনাবলী, অষ্টম খণ্ড।

৩। জাতীয় শিক্ষাপরিষদের প্রশ্নপত্র— 'আদর্শ প্রশ্ন' পুস্তিকার পরিশিষ্ট, রবীন্দ্র-রচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ, দ্বিতীয় খণ্ড।

শব্দতত্ত্ব

বাংলা উচ্চারণ	বালক, ১২৯২ আশ্বিন
স্বরবর্ণ অ	সাধনা, ১২৯৯ আষাঢ়
স্বরবর্ণ এ	সাধনা, ১২৯৯ কার্তিক
টা টো টে	সাধনা, ১২৯৯ অগ্রহায়ণ
বীম্‌সের বাংলা ব্যাকরণ	ভারতী, ১৩০৫ পৌষ
বাংলা বহুবচন	ভারতী, ১৩০৫ জ্যৈষ্ঠ
সম্বন্ধে কার	ভারতী, ১৩০৫ শ্রাবণ
বাংলা শব্দদ্বৈত	সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩০৭ (৭ম ভাগ, ১ম সংখ্যা)
ধ্বন্যাত্মক শব্দ	সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩০৭ (৭ম ভাগ, ৪র্থ সংখ্যা)
বাংলা কৃৎ ও তদ্ধিত[১]	সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩০৮ (৮ম ভাগ, ৩য় সংখ্যা)
ভাষার ইঙ্গিত[২]	ভারতী, ১৩১১ আষাঢ়, শ্রাবণ

পরিশিষ্ট[৩]

একটি প্রশ্ন	বালক, ১২৯২ অগ্রহায়ণ
সংজ্ঞাবিচার	বালক, ১২৯২ ফাল্গুন
'নিছনি' : ১, ২[৪]	সাধনা, ১২৯৮ চৈত্র, ১২৯৯ বৈশা
পহুঁ	সাধনা, ১২৯৯ জ্যৈষ্ঠ
প্রত্যুত্তর : ১, ২	সাধনা, ১২৯৯ শ্রাবণ, চৈত্র
ভাষাবিচ্ছেদ	ভারতী, ১৩০৫ শ্রাবণ
উপসর্গসমালোচনা	ভারতী, ১৩০৬ বৈশাখ
প্রাকৃত ও সংস্কৃত	বঙ্গদর্শন, ১৩০৮ আষাঢ়
বাংলা ব্যাকরণ[৫]	বঙ্গদর্শন, ১৩০৮ পৌষ

---

[১] বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের ১৩০৮ সালের পঞ্চম মাসিক অধিবেশনে (১২ আশ্বিন) পঠিত।

[২] বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের ১৩১১ সালের প্রথম বিশেষ অধিবেশনে (১৪ জ্যৈষ্ঠ, ২৭ মে ১৯০৪) ইউনিভার্‌সিটি ইন্‌স্টিটিউট্‌ হলে পঠিত।

[৩] 'বঙ্গভাষা' প্রবন্ধে (ভারতী, ১৩০৫ বৈশাখ) রবীন্দ্রনাথ প্রথম "বাংলাভাষাতত্ত্ব বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিবার ইচ্ছা" প্রকাশ করেন। উক্ত প্রবন্ধটি দীনেশচন্দ্র সেনের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের সমালোচনা, রবীন্দ্র-রচনাবলী, অষ্টম খণ্ডে (পৃ. ৪৮৮) 'সাহিত্য' গ্রন্থের পরিশিষ্টে মুদ্রিত হইয়াছে।

[৪] 'নিছনি' ২ সংখ্যক আলোচনাটি বৈশাখের (১২৯৯) সাধনায় দানেন্দ্রকুমার রায়ের প্রশ্নের উত্তরে পাদটীকাস্বরূপ প্রকাশিত।

[৫] বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের ১৩০৮ সালের সপ্তম মাসিক অধিবেশনে (২৪ অগ্রহায়ণ) পঠিত।

'বাংলা বহুবচন' এবং 'বাংলা কৃৎ ও তদ্ধিত' প্রবন্ধ দুইটির সাময়িক পত্রে প্রকাশিত পূর্ণতর পাঠ বর্তমান সংস্করণে মুদ্রিত হইল। এই সূত্রে পরিষৎ-পত্রিকায় মুদ্রিত শেষোক্ত প্রবন্ধের সম্পাদক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী -কৃত ভ্রমসংশোধনটুকু উদ্ধারযোগ্য :

'বাংলা কৃৎ ও তদ্ধিত' প্রবন্ধে দুই-একটি সংস্কৃত প্রত্যয়যুক্ত সংস্কৃতশব্দ উদাহরণ মধ্যে স্থান পাইয়াছে; যথা— ছাগল[1], বাচাল। প্রত্যেক শব্দ ধরিয়া বিচার করিলে ওইরূপ উদাহরণ আরও মিলিতে পারে। তাহাতে মূল প্রবন্ধের অঙ্গহানি হইবে না।

১৩০৮ সালে বাংলাব্যাকরণ সম্পর্কিত যে 'আন্দোলনে'র সূত্রপাত হয়[2] হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও রবীন্দ্রনাথ তাহার অগ্রণীস্বরূপ। 'ধ্বন্যাত্মক শব্দ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ পাঠকদের "খাঁটি বাংলাশব্দের শ্রেণীবদ্ধ তালিকা সংকলনে"র যে-আহ্বান করিয়াছিলেন তাহা অতি "শীঘ্র সার্থকতা লাভ করে"।[3] "রবিবাবুর লিখিত ও [পরিষৎ] পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলিতে চলিত বাংলাশব্দগুলির সংগ্রহ ও আলোচনা" হয়। "এই শ্রেণীর শব্দের একটি তালিকা যাহা বিদ্যাসাগর মহাশয় সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা পত্রিকায় বাহির" হয়।[4] "পত্রিকাসম্পাদকও এই শ্রেণীর শব্দসংগ্রহের জন্য পাঠকবর্গকে আহ্বান" করেন।[5]

সাহিত্য-পরিষদের তৃতীয় মাসিক অধিবেশনে (১১ শ্রাবণ ১৩০৮) "হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহোদয় বৈজ্ঞানিক প্রণালীর অনুগত বাংলাব্যাকরণ প্রণয়নের আবশ্যকতা অতি সুন্দররূপে প্রতিপন্ন" করেন।[6] শাস্ত্রী মহোদয়ের প্রবন্ধ উপলক্ষ করিয়া সেই অধিবেশনে যে-'বিচার বিতর্ক'[7] উপস্থিত হয় তাহাতে হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় "ব্যাকরণের উদ্দেশ্য

---

[1] এইটি এবং অন্যান্য কয়েকটি উদাহরণ গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় আর মুদ্রিত হয় নাই।

[2] দ্রষ্টব্য : সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৮ম ভাগ (১৩০৮) :

বাংলাব্যাকরণ— রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, পৃ. ২০১-২২৯।

বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের কার্যবিবরণ, পৃ. /০-৫।৶।

[3] দ্রষ্টব্য : বাংলা-শব্দ-তত্ত্ব— শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস : সাহিত্য-পরিরষৎ-পত্রিকা, ৮ম ভাগ ১ম সংখ্যা পৃ. ২২-২৯ ।

[4] শব্দ-সংগ্রহ : সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৮ম ভাগ ২য় সংখ্যা পৃ. ৭৩-১৩০।

[5] সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা— ৮ম ভাগ ; ১ম সংখ্যা পৃ. ২৯, ২য় সংখ্যা পৃ. ৭৩।

[6] বাংলাব্যাকরণ— হরপ্রসাদ শাস্ত্রী : সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৮ম ভাগ ১ম সংখ্যা।

[7] এই বিচারবিতর্কে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যোগ দিয়াছিলেন : বীরেশ্বর পাঁড়ে, চারুচন্দ্র ঘোষ, সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, রবীন্দ্রনাথ, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, যোগীন্দ্রনাথ বসু, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি।

সুন্দররূপে বুঝাইয়া” বলেন :

> আমাদের বাংলাভাষার ব্যাকরণ যাঁহারা গড়িতে যাইবেন তাঁহাদের ইহা মনে রাখা উচিত যে, তাঁহারা ভাষায় যাহা আছে তাহারই প্রয়োগ-প্রকৃতি গঠনপ্রণালীর নিয়মাদি কিরূপ তাহা ব্যাখ্যা করিবেন মাত্র ; কেহ কিছু গড়িবেন না।
>
> ··· শিক্ষার বিস্তারের জন্য রচনার ভাষা যত কথিত ভাষার নিকটবর্তী হইবে ততই সুফল ফলিবে। ভাষা অর্থে যদ্দারা ভাষণ করা যায়, সুতরাং তাহা কথিত ভাষার নিকটবর্তী হওয়াই উচিত।

“তৎপরে শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বলেন, হীরেন্দ্রবাবু যাহা বলিয়াছেন, প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়ে তদতিরিক্ত বলিবার আর কিছুই নাই ; নিঃশেষ করিয়া সকল কথার উত্তর দিয়াছেন। ·· ভাষা যে আমরা নিজে ইচ্ছা করিলে গড়িতে পারি ভাঙিতে পারি এরূপ নহে। সংস্কৃতের সহিত বাংলার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সহজে বুঝা যায়, কিন্তু কোথায় কোথায় কিরূপ পার্থক্য আছে সেগুলি লক্ষ করাই এখন আবশ্যক। তবেই ইহার বর্তমান আকৃতি জানা যাইবে, তবেই ব্যাকরণ গঠনের চেষ্টা হইতে পারিবে। আমারও মনে হয় যে, বাংলাব্যাকরণ সংস্কৃতমূলক হইবে কেন। সংস্কৃতশব্দের বাহুল্য বাংলায় বেশি বলিয়াই ভাষার গঠনাদিও সংস্কৃতব্যাকরণানুসারে করিতে হইবে ? বাংলাভাষার প্রকৃতি কাঠামো যে সম্পূর্ণ তফাত ইহা না বুঝিলে চলিবে কেন। তবে সংস্কৃতব্যাকরণ আলোচনা করা আবশ্যক, নতুবা আমরা ঠিক পথে চলিতে পারিব না।”[১]

সভাপতি শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার বক্তব্যে বলেন :

> ··· আজকার প্রবন্ধের আলোচনায় দেখা গেল, মত দ্বিবিধ হইয়াছে। সংস্কৃতানুসারে ব্যাকরণ আর বাংলাভাষার প্রকৃতিগত ব্যাকরণ। উভয়ের সামঞ্জস্য আবশ্যক।··· আমার নিজের মনের ঝোঁক শাস্ত্রী-মহাশয়ের মতের সঙ্গেই মিলে। লিখিত ভাষা কথিত ভাষায় প্রভেদ যত কম থাকে ততই ভালো।

পরিষদের পঞ্চম মাসিক অধিবেশনে (১২ আশ্বিন ১৩০৮) রবীন্দ্রনাথ ‘বাংলা কৃৎ ও তদ্ধিত’ প্রবন্ধ পাঠ করেন। ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় এই প্রবন্ধের “সংগ্রহাতিরিক্ত আরও কতকগুলি প্রত্যয়ের উদাহরণ” সভায় উপস্থিত করেন। উহা রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের “পরিশিষ্টরূপে গৃহীত ও মুদ্রিত হয়”।[২]

সভার আলোচনায় ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন :

> ··· বাংলাবর্ণমালা সংস্কারের পূর্বে বাংলাব্যাকরণ ভাববার সময়ই এখনও হয় নি···। আমার বোধ হয়, ব্যাকরণের চেষ্টা রেখে দিয়ে এখন পরিষৎ শব্দ সংগ্রহ করুন।

---

[১] দ্রষ্টব্য বঙ্গীয়-সাহিত্যপরিষদের কার্যবিবরণ— ১৩০৮ (সা. প. প.— পৃ. ১।৶০-১।৵০)।

[২] বাংলা কৃৎ ও তদ্ধিত— ব্যোমকেশ মুস্তফী : সা. প. প. ৮ম ভাগ ৪র্থ সংখ্যা পৃ. ২২৯-২৪০। দ্রষ্টব্য সম্পাদকীয় মন্তব্য, ঐ পৃ. ২৪১।

সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলেন :

> … প্রাদেশিক শব্দ সংগ্রহ করিয়া রবীন্দ্রবাবুর এই চেষ্টার পূর্ণতা সম্পাদন করা উচিত।… শাস্ত্রী মহাশয় ও রবীন্দ্রবাবু বাংলাভাষার প্রকৃতিনির্ণয়ে যেরূপ পরিশ্রম করিতেছেন, তাহাতে তাঁহাদিগকে বাংলাভাষার পাণিনি বলিলেই হয়।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেন :

> … একমাস পূর্বে আমি এ বিষয়ে আলোচনা আরম্ভ করি, রবীন্দ্রবাবুর মতো লোকে যে এত শীঘ্র সহায়তা করিবেন সে আশা করি নাই। আরও অনেকে প্রস্তুত হইতেছেন।… যে-সকল বাংলাশব্দের উপর কাহারও কোনোদিন দৃষ্টি পড়ে নাই, রবীন্দ্রবাবুর এই প্রবন্ধের পর তাহাদের প্রতি অনেকেরই দৃষ্টি পড়িবে।

১৩০৮ সালের অগ্রহায়ণের ভারতীতে ‘নূতন বাংলাব্যাকরণ’ নামক একটি প্রবন্ধে পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের সুদীর্ঘ এক প্রতিবাদ প্রকাশ করেন। পরিষদের সপ্তম মাসিক অধিবেশনে (২৪ অগ্রহায়ণ, ১৩০৮) রবীন্দ্রনাথ ‘বাংলাব্যাকরণ’[১] প্রবন্ধে তাহার উত্তর দেন। শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী, বলাইচাঁদ গোস্বামী, প্রমথ চৌধুরী, উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব, বীরেশ্বর পাঁড়ে, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, রাজেন্দ্র বিদ্যাভূষণ, সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, প্রমথনাথ তর্কভূষণ প্রমুখ সভ্যগণ সেদিনের আলোচনায় ও বিতর্কে যোগদান করেন। আলোচনার শেষে রবীন্দ্রনাথ যাহা বলেন নিম্নে উদ্ধৃত হইল :

এত কথার পর আমার একটা কৈফিয়ত দেওয়া আবশ্যক হইতেছে। আমি বলিয়াছি বাংলাব্যাকরণ বাংলানিয়মে চলিবে, সংস্কৃতনিয়মে চলিবে না, এ কথার প্রতিবাদ কেন হয় বুঝি না। পণ্ডিতমহাশয়েরা মুখে যাহা বলিয়াই প্রতিবাদ করুন না কেন, মনে মনে আমার কথাটা স্বীকার না করিয়া পারিবেন না। তদ্ধিত ও কৃৎ প্রত্যয়ান্ত কতকগুলি খাঁটি বাংলাশব্দ সংগ্রহ করিয়া আমি ইতিপূর্বে পরিষদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছিলাম। আমিই ব্যাকরণ লিখিতেছি বা লিখিব এরূপ দুরভিসন্ধি আমার? আমি কতকগুলা শব্দ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছি, ভবিষ্যৎ বৈয়াকরণের কার্যের জন্য উপকরণ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছি বলিয়াই কি আমার এতটা অপরাধ হইয়াছে। যাঁহারা এই-সকল শব্দকে slang বলিয়া ঘৃণা করেন আর ভাষার মধ্যে আমিই এই-সকল slang আমদানি করিতেছি বলিয়া আমার উপর খড়্গহস্ত হইয়া উঠিতেছেন, তাঁহাদের একটা কথা বলিবার আছে, আমি আমদানি করিতেছি এটা কী রকম কথা। পিতৃ-পিতামহাদি হইতে এই-সকল শব্দ কি আমরা পাই নাই। আজ সবগুলাকে কুড়াইয়া

---

[১] দ্রষ্টব্য : রবীন্দ্র-রচনাবলী, বর্তমান খণ্ড, পরিশিষ্ট।

একত্র করিবার চেষ্টা করিতেছি, ব্যবহার করিবেন আপনারা। তাহাদের মধ্যে যদি সংগ্রহের দোষে দু-একটা বিজাতীয় শব্দ আসিয়া পড়িয়া থাকে, তাহাতে আপনাদের ক্ষতি কী। ব্যবহারের সময়ে বিচার করিয়া লইবেন। সংগ্রহকারকের হস্তে বিচারভার দিতে নাই, তাহা হইলে অনেক আসল জিনিস বাদ পড়িয়া যাইতে পারে। প্রত্যয়গুলির আমি যে-রূপ উল্লেখ করিয়া গিয়াছি সেইগুলিই প্রত্যয়ের প্রকৃত রূপ বলিয়া আমি আপনাদের গ্রাহ্য করিতে বলি না। আমার নিজেরও, সে বিষয়ে সন্দেহ যে নাই এমন নহে। আরও একটা কথা, আমি যতগুলা প্রত্যয়ের উদাহরণ দিয়াছি তাহা দেখিয়া আপনাদেরও কি ধারণা হয় না যে, বাংলাপ্রত্যয় বলিয়া কতকগুলা পদার্থ বাস্তবিকই আছে,— তা সেগুলার রূপ আমি যেরূপ নির্ণয় করিয়াছি তাহাই হউক আর আপনারা বিচার করিয়া যাহা স্থির করিতে পারেন তাহাই হউক। অনেকের মনের গূঢ় ভাব এই যে, অধিকাংশ কথাই যখন সংস্কৃতশব্দের অপভ্রংশ, তখন সংস্কৃত-ব্যাকরণের দ্বারা বাংলাব্যাকরণের কাজ কেন চলিবে না। তাহা চলিবে না, চলিতে পারে না, তাহার কতকগুলা কারণ উদাহরণ দিয়া অদ্যকার প্রবন্ধে দেখাইয়াছি। অথবা সংস্কৃতব্যাকরণের নিয়ম কতটা চলিবে বা না চলিবে সেটা বিচার করা আবশ্যক। আমি তো কতকগুলা প্রশ্ন ও কতকগুলা সন্দেহ লইয়া আপনাদের সম্মুখে খাড়া করিয়াছি। সেগুলার উত্তর দেওয়া বা মীমাংসা করার ভার আপনাদের। ম্যালেরিয়া কিসে যায় জিজ্ঞাসা করিলেই যদি প্রশ্নকর্তাকে ম্যালেরিয়ার প্রতিকার করিতে হয় তা হইলে ম্যালেরিয়া দূর করা আর ঘটে না। সুতরাং শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় যেভাবে আমার প্রতিবাদ করিয়াছেন তাহাতে কার্য সিদ্ধ হইবে না। আমি যাহা বলিয়াছি তাহার মীমাংসা আবশ্যক। আমার গলদ যথেষ্ট আছে কিন্তু তাই বলিয়া তাহাতে আসল কথার কী ক্ষতি বৃদ্ধি হইল। বাংলাব্যাকরণে কতটা পরিমাণ সংস্কৃতনিয়মাদি চলিবে বা চলিবে না তাহা নির্ণয় করা আবশ্যক। আমার শব্দ সংগ্রহ দেখিয়া যাঁহারা ভাবিতেছেন যে, ভাষা হইতে সংস্কৃতশব্দগুলির চিরনির্বাসনের জন্য আমরা বদ্ধপরিকর হইয়াছি তাঁহারা ভুল করিয়াছেন। কিছুই আত্যন্তিক রকম ভালো বলি না। সংস্কৃতশব্দের সমাসঘটাচ্ছন্ন ভাষাও কোনোদিন বাংলাভাষার আদর্শ হইয়া দাঁড়াইবে না বা কেবল হুতোমী ভাষাও সকলের নিকট গ্রাহ্য হইবে না। তা কোনো দেশেই হয় না। একসময়ে ইংলণ্ডে Anglo saxon -দিগের মধ্যে ল্যাটিন শব্দ লওয়ার আপত্তি হইয়াছিল কিন্তু তাহা টিঁকিল না। অনেক ল্যাটিন শব্দ ঢুকিয়া পড়িল। তাহার অনেক আছে, অনেক গিয়াছে। এত পাকাপাকির মধ্যেও অনেক রহিয়া গিয়াছে। বাংলাভাষায় সে অবস্থা হয় নাই। সমস্ত সংস্কৃতশব্দ হজম

করিয়া ইহা চলিতে পারে না। বাংলাভাষায় অনেক বিষয়ের শব্দ নাই ; সে-সকল নাই তাহার কারণ এই, ভাষায় যে-সকল কথা বলিবার আবশ্যক কোনোদিন হয় নাই সুতরাং সে-সকল বিষয় বলিতে গেলে অপর ভাষার নিকট ঋণী হইতেই হইবে। আবার বাংলাভাষায় কতকগুলি সংস্কৃতের অপভ্রষ্ট শব্দের এমন ভিন্নার্থ দাঁড়াইয়া গিয়াছে যে, সেগুলির সেই অর্থ বাদ দিলে বাংলাভাষায় শব্দাভাব ঘটিবে। সংস্কৃত 'ঘৃণা' বাংলায় 'ঘেন্না' হইয়াছে কিন্তু তাহাতে 'ঘৃণা'র অর্থ বজায় নাই। 'পিরীতি' শব্দে 'প্রীতি'র অর্থ নাই। কাজেই এ-সকল শব্দের মূলানুসন্ধান না করিলে বিশেষ ফল কী হইবে। এইরূপ অর্থান্তর দেখিয়া মনে হয় অপ্রকাশিত গ্রন্থরাশি প্রকাশিত হইলে, আমাদের বাংলাশব্দভাণ্ডার অপূর্ণ থাকিবে না। খাঁটি বাংলাশব্দ লইয়াই সকল ভাব প্রকাশ করা যাইতে পারে। বাংলাশব্দের বানান লইয়া যে দাঁড়ি টানিবার কথা উঠিয়াছে সে সম্বন্ধে আমি এই পর্যন্ত বলি, আমি কিছুই পাকাপাকি করিয়া দিই নাই। এ সম্বন্ধে আমা অপেক্ষা দীনেশবাবু ভালো বলিতে পারেন, কত প্রাচীন কাল হইতে কোন্ শব্দের কী বানান লেখা চলিয়া আসিতেছে। আমার মনে হয় যখন 'শ্রবণ' হইতে 'শোনা' লিখিবার সময়ে 'ন' লেখা হয়, মূর্ধন্য 'ণ' লিখিলে ভুল হয় তখন 'স্বর্ণ' হইতে 'সোনা' যদি 'ন' দিয়া লিখি তবে ভুল কেন হইবে। এই-সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া বাংলাব্যাকরণের বিষয় মীমাংসা করা আবশ্যক। আমি যাহা বলিয়াছি তাহা যে অপরিবর্তনীয়, তাহাই যে সর্বথা গ্রাহ্য, এ কথা যেন কেহ মনে না করেন। আমি উপকরণ সংগ্রহ করিয়া দিতেছি, আপনারা দেশের পণ্ডিতবর্গ তাহার ব্যবহার করুন, বাংলাব্যাকরণ কিরূপ হইবে তাহা স্থির করুন।

সভাপতি সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার বক্তব্যে বলেন :

> …শ্রীমান রবীন্দ্রনাথ যে-শব্দরাশি সংগ্রহ করিয়াছেন[১] তাহাদের ব্যবহার ও গঠন সম্বন্ধে নিয়মাদি বাংলাব্যাকরণে থাকা আবশ্যক। যাঁহারা এগুলি slang বলিয়া অশ্রদ্ধা করেন তাঁহারা বাংলাভাষার একাংশ বাদ দিতে চাহেন।…

শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় রবীন্দ্রনাথের এই প্রবন্ধের প্রতিবাদে পরিষদের অষ্টম মাসিক অধিবেশনে (২৮ পৌষ ১৩০৮) 'ব্যাকরণ ও বাংলাভাষা' নামক এক প্রবন্ধ পাঠ করেন।[২] আলোচনার শেষে সভাপতি সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন :

> শ্রীমান রবীন্দ্রনাথ কতকগুলি বাংলাপ্রত্যয়ের উদাহরণ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন, তাহাতে ভুল নাই, এ কথা তিনিও বলেন না। তাহাতে দুটা-একটা ভুল যে না আছে তাহাও নহে। সংস্কৃতঅভিধান ও

---

[১] দ্রষ্টব্য ধ্বন্যাত্মক শব্দ, বাংলা কৃৎ ও তদ্ধিত, বাংলাক্রিয়াপদের তালিকা : রচনাবলী, ১২শ খণ্ড।

[২] ব্যাকরণ ও বাংলাভাষা— ভারতী, ১৩০৮ ফাল্গুন।

ব্যাকরণের অন্তর্গত শব্দসমষ্টি ছাড়া ভাষার আর-একটি দিক যে আছে, তাহা দেখাইয়া দেওয়া তাঁহার উদ্দেশ্য।··· প্রত্যয়াদির রূপ রবীন্দ্র যাহা স্থির করিয়াছেন তাহাই হউক, আর অন্যরূপই হউক, তাহাতে বড়ো ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। তাহা আলোচনার মুখে স্থির হইবে।

১৩১১ সালে পরিষদের প্রথম বিশেষ অধিবেশনে (১৪ জ্যৈষ্ঠ) রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক 'ভাষার ইঙ্গিত' প্রবন্ধটি পাঠের পর যে-আলোচনা হয় তাহাতে সভায় উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ[১], গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়[২] ও

---

[১] বাংলাভাষার গতিনির্দেশ ও লক্ষকারীদিগের দুই দল। এক দলের নেতা রবীন্দ্রবাবু। সামান্য হইতে উচ্চশ্রেণীর লোকে কথাবার্তার ভাষায় যে-সকল শব্দ ব্যবহার করে, সেগুলি লেখার ভাষায় আমরা ব্যবহার করি না। তৎপরিবর্তে অন্য শব্দ সৃষ্টি করিয়া যদি ব্যবহার করি— তাহা হইলে ভাষার জীবনীশক্তি থাকে না। কথিত ভাষার শব্দের শক্তি ও মাধুর্য রবীন্দ্রবাবু দ্বারা প্রকাশিত হইতেছে, তিনি তাহা অনুভব করিয়াছেন। তাঁহার 'ধ্বন্যাত্মক শব্দ' প্রভৃতি প্রবন্ধ ইহারই ফল। এ-সকল চলিত কথার শব্দ প্রদেশভেদে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন অর্থেও ব্যবহৃত হয়। ধ্বন্যাত্মক শব্দ পরিবর্তনশীল। সংস্কৃতসাহিত্যেও অল্পসংখ্যক ধ্বন্যাত্মক শব্দ দেখা যায়। এই-সকল ধ্বন্যাত্মক শব্দ সাহিত্যে ব্যবহার করা বড়ো কঠিন। ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলি জীবিত শব্দ। সেগুলিকে রবীন্দ্রবাবুর কথিত নিয়মাদি দ্বারা শ্রেণীবদ্ধ করিয়া ব্যাকরণের আবরণ দিয়া পাঠ করিতে গেলে, তাহাদের মাধুর্য নষ্ট হইবে বলিয়া মনে হয়। এ যুগের শব্দরহস্য সংগৃহীত হউক, কিন্তু সাহিত্যে তাহাদের বহুল ব্যবহার প্রার্থনীয় নহে।—সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ।

[২] আমিও রবীন্দ্রবাবুকে তাঁহার এই অপূর্ব গবেষণামূলক প্রবন্ধের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি। আপনারা জোড়াতাড়া দিয়া লউন। ভাষার ইঙ্গিত সকল বিষয়েই আছে। ভাষাতত্ত্ববিদেরা বলেন, এই-সকল ধ্বন্যাত্মক শব্দ দ্বিবিধ, এক দল বলেন জন্তুধ্বনি হইতে, অপর দল বলেন মনুষ্যধ্বনি হইতে উৎপন্ন। ইহাদের ইংরেজি নাম Bow-ow Theory ও Pugh-Pugh Theory। রবীন্দ্রবাবু লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি আর জগদীশবাবু লব্ধপ্রতিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক। জগদীশবাবু বলেন, এমন অনেক রঙ আছে যাহা এ চোখে দেখা যায় না— এ চোখের ততটা বোধশক্তি নাই। শক্তির বৃদ্ধি হইলে আবার এই চোখেই দেখা যায়। অব্যক্ত ধ্বনির শব্দগুলির রহস্যবোধ সেইরূপ সকলের কানে হয় না। যে-কানের বোধশক্তি বর্ধিত সে-কানে হয়, কবি রবীন্দ্রবাবুর তাহা হইয়াছে। বিদ্যাভূষণ মহাশয় উঁহাদের ক্ষণভঙ্গুর বলিয়া মনে করেন। যদিই তাহা হয় তবে একটা-দুইটা হইতে পারে, কিন্তু তাহাদের দল সমস্তই নহে। বিদ্যাভূষণ মহাশয় উঁহাদের বহুল ব্যবহার ইচ্ছা করেন না। তিনি না করিলেও লিখিত ভাষায় উঁহাদের প্রয়োজন আছে। নাটকে তাহার যথেষ্ট উদাহরণ দেখা যায়। অপণ্ডিত ব্যক্তির কথোপকথন লিপিবদ্ধ করিতে হইলে উঁহাদের প্রয়োজন। এই-সকল শব্দ এত ছোটো যে, দু-একজন সহৃদয় কবি ইহাদের স্বরূপ দেখিতে চাহেন না। রবিবাবু একজন বৈজ্ঞানিক কবি। তিনি ইহাদের স্বরূপ যেভাবে দেখাইয়াছেন, তাহাতে উঁহাদের আর ছোটোত্ব নাই। তবে রবীন্দ্রবাবু বড়ো নজরে উঁহাদিগকে যতই ছোটো দেখুন, আমাদের কাছে এগুলি এখন অতি বড়ো জিনিস। ভাষার প্রাকৃতত্ত্ব এখন উঁহাদের উপরে নির্ভর করিতেছে। রবীন্দ্রবাবুর একটা কথার সহিত আমার মতভেদ আছে। বাংলা ও সংস্কৃত ভাষায় যে-সম্বন্ধ তাহা দেহ-পরিচ্ছদ সম্বন্ধ নহে; দেহের উৎকৃষ্ট অংশ বটে। দেহ-পরিচ্ছদ সম্বন্ধ হইলে বাংলাভাষাকে শবদেহ বলিতে হয়, কিন্তু তাহা নহে। জীবনীশক্তি বাংলাতেও আছে শব্দরূপ, ধাতুরূপ, সব বাংলা। কোনোটা একটু বর্ধিত কোনোটা একটু কর্তিত, ইহা দ্বারা আমি যেমন বাংলাভাষাকে একটু বাড়াইলাম তেমনই একটু কমাইয়াও দিলাম। তর্কের খাতিরে কাহাকেও অপদস্থ করিতে নাই। যাহার যে নাম সেই নামে ডাকিলে শীঘ্র ডাক শোনা যায়।—গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত৩ (সভাপতি) যোগদান করেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উক্ত আলোচনা-প্রসঙ্গে বলেন :

পণ্ডিত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় যে-সকল কথার উল্লেখ করিয়াছেন, তজ্জন্য আমি কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। বাংলাভাষার আকৃতি কিরূপ হইলে ভালো হয়, সে সম্বন্ধে আমার মত যে কী, তাহা আমি এ প্রবন্ধে বলি নাই, বলিতে আসিও নাই। সংস্কৃতভাষার সাহায্য ভিন্ন বাংলাভাষা যে সুসংগতভাবে প্রকাশ করা যায়, তাহা বিশ্বাস করি না। আমার এ প্রবন্ধ ব্যাকরণমূলক। চলিত কথাগুলির মধ্যে ব্যাকরণের যে-একটি সূক্ষ্ম সূত্র বর্তমান আছে, আমি তাহাই টানিয়া বাহির করিয়া আপনাদের দেখাইতেছি। আপনারা দেখুন, আমি যাহা বাহির করিয়াছি তাহা ঠিক কি না, তাহা টেঁকে কি না। কেহ যেন মনে না করেন, আমি এই-সকল শব্দ অবাধে যেখানে-সেখানে সাহিত্যে ব্যবহার করিতে চাই। আমি সে-পক্ষে বিধান দিবার চেষ্টা করি নাই। ভাষায় যাহা আছে, আমি তাহাই ব্যাখ্যা করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। লিখিত ভাষায় এ-সকল শব্দ চলিবে কি না তাহা বিচার্য। 'আবশ্যক

---

৩ প্রবন্ধপাঠকের সহিত আমার একটা বিশেষ মতভেদ আছে। তিনি বলেন, এই সকল বিষয় অকিঞ্চিৎকর ও বিস্মরণযোগ্য, আমি তাহা কিছুতেই স্বীকার করি না। অন্য কোনো বিষয়ে আমার সহিত তাঁহার কোনো মতভেদ নাই। তাঁহার প্রবন্ধ রচনানির্দেশের নিয়মপ্রকাশক নহে। বিদ্যাভূষণ মহাশয় আশঙ্কিত হইয়াছেন কেন বলিতে পারি না। সংস্কৃত ছাড়িয়া বাংলাভাষা চলে না, কিন্তু তাই বলিয়া সংস্কৃতের অনাবশ্যক প্রলেপ দিয়া বাংলাকে ভারাক্রান্ত করিবার আবশ্যক কী। রবীন্দ্রবাবু যে-সকল শব্দ সম্বন্ধে আজ নানাবিধ তথ্য প্রকাশ করিলেন, বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাহাদিগকে ভঙ্গুর বলিতেছেন কেন। কতকগুলি শব্দ কেন, সমস্ত ভাষাই তো ভঙ্গুর। সংস্কৃতসাহিত্যের বৈদিক শব্দই আর এখন কি ব্যবহার হয়, না সে ভাষা চলে? সেক্সপিয়রের ভাষা, ড্রাইডেনের ভাষা এখনকার ইংরেজিসাহিত্যে অপ্রচলিত হইয়া গিয়াছে। সেক্সপিয়র অপেক্ষা ড্রাইডেন আধুনিক। তাঁহার শব্দগুলা পর্যন্ত অব্যবহার্য হইয়া যাইতেছে। যোগ্যতমের উদ্‌বর্তন ভাষাতত্ত্বেও খাটে। রবীন্দ্রবাবু এই-সকল শব্দকে চিরস্থায়ী করিতে চেষ্টা পান নাই। শব্দকে স্থায়ী করিতে কেহ পারে না। মহাকবি-প্রয়োগে কতকটা হয়, সম্পূর্ণ হয় না। সেক্সপিয়র তাহার উদাহরণ। বিভক্তিও ভাষার ইঙ্গিত। ইংরেজিতে বিভক্তির preposition পূর্বনিপাত এবং বাংলায় পরনিপাত (post-position) হয়। যেমন 'to me' ও 'গাছ-থেকে'। রবীন্দ্রবাবু কবির দৃষ্টিতে মাতৃভক্তের ভক্তিতে এই-সকল আবিষ্কার করিয়াছেন। খুটখাট্ শব্দ খুট্‌নাট্ হইয়া গেলে আত্মার দেহান্তর গ্রহণবৎ হয়। রবীন্দ্রবাবু আমাদের চিরপরিচিত শব্দগুলিকে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে দেখিয়াছেন এবং দেখাইয়াছেন। এই-সকল শব্দের ভাষায় বহুল ব্যবহার হইবে কি না তাহা আর এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে না। নাটকে এই সকল শব্দ গৃহীত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। সুরচিত নাটক ভাষায় বহুকাল থাকিবে। বৈজ্ঞানিকের চক্ষে কিছুই নগণ্য হইতে পারে না। সেইরূপ ভাষাতত্ত্ববিদের নিকট কোনো শব্দই উপেক্ষিত হইবার নহে। ব্যাকরণ আইননিগড় নয়। ভাষার স্বরূপ, ভাষার ইঙ্গিত, বিভক্তি প্রভৃতিকে ব্যাকরণ বৈজ্ঞানিক ভাবে দেখাইয়া দেয়। সিংহ বর্ণনায় কেশর বাদ দেওয়া যাহা, লাঙ্গুল বাদ দেওয়া তাহা। ধ্বন্যাত্মক শব্দ বাদ দিলে ভাষাতত্ত্বালোচকের দৃষ্টি ভ্রান্ত হইবে। —হীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

হয় চলিয়া যাইবে। প্রাদেশিকতা কথিত ভাষায় আছে সত্য, কিন্তু এই প্রাদেশিকতাগুলি কি আলোচ্য নহে। আমারও চেষ্টা আছে এবং পরিষৎও চেষ্টা করিতেছেন। সমস্ত প্রাদেশিক শব্দ সংগ্রহ করিতে পারিলে, ভাষার অভিধানাদি কি পূর্ণাবয়ব হইবে না। আমি তো বলিয়াছি, আমি এই প্রদেশের শব্দ লইয়াই আলোচনা করিয়াছি। আমার কার্য স্বতন্ত্র নহে, আমি পরিষদের চেষ্টাকেই অগ্রসর করিয়া দিতেছি। সংস্কৃত শব্দসকল বাংলায় ব্যবহারে বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সহিত আমার মতভেদ নাই। বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলেন, ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলি পরিবর্তনশীল, কিন্তু আমার বিশ্বাস এগুলি সহজে পরিবর্তনীয় নহে। বড়ো বড়ো কথাগুলির অর্থ, ভাব ও ব্যবহারই পরিবর্তিত হইয়া থাকে। সংস্কৃত অনেক শব্দ বাংলায় পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে, তাহার উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। ধ্বন্যাত্মক শব্দ পরিবর্তিত হইবে কেন। বাঙালি কি খিল্ খিল্ করিয়া হাসিবে না, প্যান্ প্যান্ করিয়া কাঁদিবে না, ঘ্যান্ ঘ্যান্ করিয়া চাহিবে না? প্রাকৃত বাংলা লিখিত ভাষায় যে আমি চালাইতে চাহি, তাহা নহে; তবে চলিবে কি না, তাহাদের প্রয়োজন হইবে কি না বা আছে কি না, তাহার বিচারক পাঠকগণ।

পরিশিষ্টের 'প্রাকৃত ও সংস্কৃত' প্রবন্ধটি সম্পাদকীয় মন্তব্যরূপে বঙ্গদর্শনে (১৩০৮) প্রকাশিত হয়। শ্রীনাথবাবুর প্রবন্ধে যে-উদাহরণের কথা রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করিয়াছেন নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল:

৫০।৬০ বৎসর পূর্বে যে-সকল বাংলাপুস্তক লিখিত হইয়াছে, তাহাতে পর্যন্ত বাংলাকে প্রাকৃত বলা হইয়াছে। যথা—

শনির মাহাত্ম্য আছে স্কন্দ-পুরাণেতে,
'পরাকৃত' বিনে কেহ না পারে বুঝিতে।
অতএব পয়ার প্রবন্ধে তাহা বলি,
একচিত্তে শুন সবে শনির পাঁচালী।
(পূর্ববঙ্গে প্রচলিত 'শনির পাঁচালী')

বাবু দীনেশচন্দ্র সেনও তাঁহার 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' নামক পুস্তকে বলিতে বাধ্য হইয়াছেন, "পূর্বে ভারতের কথিত ভাষামাত্রই, বোধহয়, প্রাকৃত-সংজ্ঞায় অভিহিত হইত এবং এইরূপ বাংলাভাষাকেও প্রাকৃত বলিত। যথা—

ভারতের পুণ্যকথা শ্রদ্ধা দূর নহে।
'পরাকৃত' পদবন্ধে রাজেন্দ্রদাসে কহে।
(২০০ দুইশত বৎসরের প্রাচীন হস্তলিখিত সঞ্জয়কৃত মহাভারত)।"[১]

'বিবিধ' প্রধানত ১৩০৮ সালের বৈশাখ ও আষাঢ়ের বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত মাসিক-সাহিত্য-সমালোচনা হইতে সংকলিত হইয়াছে।

---

[১] ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা—শ্রীনাথ সেন। বঙ্গদর্শন, ১৩০৮ আষাঢ়, পৃ. ১৩৫।

উহার প্রথম অনুচ্ছেদটি ভারতীর (১৩০৫ অগ্রহায়ণ) সাময়িক সাহিত্য হইতে এবং সর্বশেষ অনুচ্ছেদটি ভাণ্ডারের (১৩১২ বৈশাখ) ৫২ পৃষ্ঠার পাদটীকা হইতে সংকলিত।

এই সূত্রে সাধনার (৪র্থ বর্ষ ১ম ভাগ) ১৯০ পৃষ্ঠার পাদটীকার একটি অংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :

> "কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ
> কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতিযুক্তঃ।...

'প্রৈতি' শব্দটির প্রতি আমরা পাঠকদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে ইচ্ছা করি। বাংলাভাষায় এই শব্দটির অভাব আছে। যেখানে বেগপ্রাপ্তি বুঝাইতে ইংরেজিতে impulse শব্দের ব্যবহার হয় আমাদের বিবেচনায় বাংলায় সেই স্থলে প্রৈতি শব্দের প্রয়োগ হইতে পারে।"

'বাংলা ক্রিয়াপদের তালিকা' পুস্তিকাটি বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের সহকারী সম্পাদক ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের একটি নিবেদনসহ প্রচারিত হয়। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সৌজন্যে প্রাপ্ত একখণ্ড পুস্তিকা হইতে নিম্নে উহা মুদ্রিত হইল :

বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের প্রধান উদ্দেশ্য বাংলাভাষার অভিধান ও ব্যাকরণ সংকলন। এই উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য পরিষৎ সর্বপ্রথমে বাংলাভাষার যাবতীয় শব্দ সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। পূর্বে পরিষৎ-পত্রিকায় বিদ্যাপতির শব্দসংগ্রহ প্রকাশিত হইয়াছিল। মধ্যে দু-একজন মাতৃভাষানুরাগী ব্যক্তি স্ব স্ব ইচ্ছামতো শব্দসংগ্রহ করিয়া পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু একটা প্রণালী অনুসারে সংগ্রহকার্য চলিতে না থাকিলে কোনোদিন কার্যের উন্নতি এবং সমাপ্তি ঘটিবে না, এই বিবেচনায় বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সংগৃহীত 'বাংলা ক্রিয়াপদের' তালিকা প্রকাশ করিয়া আপনাদের নিকট পাঠাইতেছেন।

বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের একান্ত অনুরোধ, আপনি বা আপনার বন্ধুবান্ধবের সাহায্যে এই তালিকার অতিরিক্ত বাংলাক্রিয়াপদের সংগ্রহ করিয়া দিলে পরিষদের বিশেষ সাহায্য হইবে। সংগ্রহ-বিষয়ে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয়ে মহাশয়ের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি—

১। শব্দটির চলিত উচ্চারণ অর্থাৎ কথোপকথনকালে যে উচ্চারণ ব্যবহৃত হয়, তাহাই লিখিবেন; তাহাকে শুদ্ধ করিয়া বা লিখিত ভাষায় কিরূপে ব্যবহার করিলে ভালো হয়, তাহা বিবেচনা করিয়া তদনুসারে তাহার উচ্চারণ পরিবর্তন করিবেন না।

২। আপনি যে-জেলার অধিবাসী সেই জেলার উচ্চারণ অনুসারে লিখিবেন। যদি আপনি প্রবাসী অর্থাৎ এখন যে-জেলায় বাস করেন সে-জেলার অধিবাসী না হন, তবে আপনার স্বদেশী উচ্চারণ অনুসারে লিখিবেন, এবং সুবিধা হইলে প্রবাসের উচ্চারণও দিবেন।

৩। বাংলাভাষার শব্দসংগ্রহ সকল জেলা হইতেই হওয়া আবশ্যক; এমন অনেক কথা আছে যাহা এক স্থানে প্রচলিত, কিন্তু অন্য স্থানে নাই বা অন্য স্থানে তৎপরিবর্তে অন্য শব্দ চলিত আছে। এ-সকল

শব্দও সংগৃহীত হওয়া আবশ্যক। হয়তো এমন শব্দও আছে, যাহার উচ্চারণ নানা স্থানে এক কিন্তু অনেকস্থলে অর্থভেদ আছে। সেগুলির অর্থ পর্যন্তও সংগৃহীত হওয়া উচিত।

৪। স্বতন্ত্র কাগজে বা এই পুস্তিকার মধ্যে বর্ণানুক্রমে শব্দ সংগৃহীত হইলেই ভালো হয়।

৫। কেবল যে ক্রিয়াপদই সংগ্রহ করিতে হইবে এরূপ নহে; অবসর সুবিধা এবং ইচ্ছাক্রমে এইরূপে অন্যান্য শ্রেণীর শব্দ এবং কৃষিদ্রব্য, গৃহজাত দ্রব্য, গৃহসজ্জার দ্রব্য, মৎস্য, বৃক্ষ, লতা, শস্যদ্রব্য প্রভৃতির নামাদি সংগ্রহ করিলে পরিষদের বিশেষ উপকার হইবে।

বর্ণানুক্রমিক সূচী

অযোগ্য ভক্তি ২৫০
আকাশ আমায় ভরল আলোয় ১০২
আচারের অত্যাচার ২০৫
আজ এই দিনের শেষে ৫৪
আজ প্রভাতের আকাশটি এই ৫৬
আদিম আর্য-নিবাস ৪৭২
আদিম সম্বল ৪৭৫
আনন্দ-গান উঠুক তবে বাজি' ৪১
আবরণ ৩২২
আমরা খুঁজি খেলার সাথি ১১২
আমরা চলি সমুখপানে ৫
আমরা নূতন প্রাণের চর ১১৩
আমাদের খেপিয়ে বেড়ায় যে ১১৫
আমাদের পাকবে না চুল গো ১০৮
আমাদের ভয় কাহারে ১১১
আমার কাছে রাজা আমার রইল অজানা ৪৮
আমার মনের জানলাটি আজ হঠাৎ গেল খুলে ৫৫
আমি যাব না গো অমনি চলে ১৩৪
আমি যে বেসেছি ভালো এই জগতেরে ৩৯
আয় রে তবে মাত্‌ রে সবে আনন্দে ১৪৪
আর নাই যে দেরি নাই যে দেরি ১২৩
আলোচনা : নকলের নাকাল সম্বন্ধে ৪৯৬
আহার সম্বন্ধে চন্দ্রনাথবাবুর মত ৪৬১
ইতিহাসকথা ৫২০
উপসর্গ-সমালোচনা ৫৫১
এই কথাটাই ছিলেম ভুলে ১২৯
এইক্ষণে মোর হৃদয়ের প্রান্তে ৬৬
এই দেহটির ভেলা নিয়ে দিয়েছি সাঁতার গো ৫২
একটি প্রশ্ন ৫২৯
এ কথা জানিতে তুমি, ভারত-ঈশ্বর শা-জাহান ১৪
এতদিন যে বসেছিলেম পথ চেয়ে আর কাল গুনে ১৩১
এবার তো যৌবনের কাছে মেনেছ, হার মেনেছ ১৩০

এবার যে ওই এল সর্বনেশে গো ৩
এবারে ফাল্গুনের দিনে সিন্ধুতীরের কুঞ্জবীথিকায় ৪৭
ওগো দখিন হাওয়া, পথিক হাওয়া ১০১
ওগো নদী, আপন বেগে পাগল-পারা ১০২
ওর ভাব দেখে যে পায় হাসি ১২৩
ওরে তোদের ত্বর সহে না আর ৪২
ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা ১
ওরে ভাই ফাগুন লেগেছে বনে বনে ১০৩
কত লক্ষ বরষের তপস্যার ফলে ৩৪
কর্তব্যনীতি ৪৭৮
কর্মের উমেদার ৪৬৭
কে তোমারে দিল প্রাণ ২৩
কোট বা চাপকান ২২৩
কোন্ ক্ষণে সৃজনের সমুদ্রমন্থনে ৪৫
চলি গো, চলি গো, যাই গো চলে ১১৭
চোখের আলোয় দেখেছিলেম চোখের বাহিরে ১৩৮
ছাড়্ গো তোরা ছাড়্ গো ১১২, ১১৪
জাতীয় বিদ্যালয় ৩১৩
জানি আমার পায়ের শব্দ রাত্রে দিনে শুনতে তুমি পাও ... ৫৫
টা টো টে ৩৪৮
তুই ফেলে এসেছিস কারে ১৩৩
তুমি কি কেবল ছবি, শুধু পটে লিখা ১০
তুমি দেবে, তুমি মোরে দেবে ৩০
তোমায় নতুন করেই পাব বলে ১৪২
তোমার শঙ্খ ধুলায় পড়ে ৬
তোমারে কি বার বার করেছিনু অপমান ৬৯
দূর হতে কি শুনিস মৃত্যুর গর্জন, ওরে দীন ৬০
ধীরে বন্ধু ধীরে ধীরে ১২৮
ধ্বন্যাত্মক শব্দ ৩৭৪
নকলের নাকাল ২২৯
'নিছনি'—১, ২ ... ... ৫৩৫, ৫৩৭
নিত্য তোমার পায়ের কাছে ৫৩
পউষের পাতা-ঝরা তপোবনে ৩২
পথ দিয়ে কে যায় গো চলে ৯৪
'পহুঁ' ৫৩৯
পাখিরে দিয়েছ গান, গায় সেই গান ৪৯

পুরাতন বৎসরের জীর্ণ ক্লান্ত রাত্রি … … ৭৬
পূর্ব ও পশ্চিম … … ২৬১
পূর্বপ্রশ্নের অনুবৃত্তি … … ৫১৫
প্রত্যুত্তর : পঁহু-প্রসঙ্গ—১, ২ … … ৫৪১, ৫৪৩
প্রসঙ্গকথা—১, ২ … … ৫০৫, ৫১০
প্রাইমারি শিক্ষা … … ৫১২
প্রাকৃত ও সংস্কৃত … … ৫৬৩
প্রাচ্য ও প্রতীচ্য … … ২৩৬
প্রাচ্য সমাজ … … ৪৫৭
বসন্তে ফুল গাঁথল আমার জয়ের মালা … … ১৩৬
বাংলা উচ্চারণ … … ৩৩৭
বাংলা কৃৎ ও তদ্ধিত … … ৩৮২
বাংলা ক্রিয়াপদের তালিকা … … ৫৮৫
বাংলা বহুবচন … … ৩৫৮
বাংলা ব্যাকরণ … … ৫৬৪
বাংলা শব্দদ্বৈত … … ৩৭১
বিজ্ঞানসভা … … ৫১৮
বিদায় নিয়ে গিয়েছিলেম বারে বারে … … ১২৯
বিদেশীয় অতিথি এবং দেশীয় আতিথ্য … … ৪৮৪
বিবিধ (শব্দতত্ত্ব) … … ৫৭৯
বিলাসের ফাঁস … … ২১৭
বিশ্বের বিপুল বস্তুরাশি … … ৩৫
বীম্‌সের বাংলা ব্যাকরণ … … ৩৫০
ব্যাধি ও প্রতিকার … … ৪৮৯
ভাবনা নিয়ে মরিস কেন খেপে … … ৭০
ভালোমানুষ নই রে মোরা … … ১২০-১২১
ভাষাবিচ্ছেদ … … ৫৪৬
ভাষার ইঙ্গিত … … ৩৯৭
মত্ত সাগর দিল পাড়ি গহন রাত্রিকালে … … ৮
মুসলমান মহিলা … … ৪৫৫
মোদের যেমন খেলা তেমনি যে কাজ … … ১০৬-১০৭
মোর গান এরা সব শৈবালের দল … … ৩৪
মোরা চলব না … … ১২৬
যখন আমায় হাতে ধরে … … ৪৩
যতক্ষণ স্থির হয়ে থাকি … … ৩৮
যে-কথা বলিতে চাই … … ৬৭

যেদিন উদিলে তুমি, বিশ্বকবি, দূর সিন্ধুপারে … … ৬৫
যেদিন তুমি আপনি ছিলে একা … … ৫০
যে-বসন্ত একদিন করেছিল কত কোলাহল … … ৪৭
যৌবন রে, তুই কি রবি সুখের খাঁচাতে … … ৭৪
রমাবাইয়ের বক্তৃতা উপলক্ষে … … ৪৫০
শিক্ষার আন্দোলনের ভূমিকা … … ৫২৩
শিক্ষার হেরফের … … ২৭৭
শিক্ষার হেরফের প্রবন্ধের অনুবৃত্তি … … ৫০১
শিক্ষা-সংস্কার … … ২৮৯
শিক্ষাসমস্যা … … ২৯৫
সংজ্ঞাবিচার … … ৫৩০
সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলমের স্রোতখানি বাঁকা … … ৫৭
সবাই যারে সব দিতেছে … … ১৩৫
সমুদ্রযাত্রা … … ২১১
সম্বন্ধে কার … … ৩৬৮
সর্বদেহের ব্যাকুলতা কী বলতে চায় বাণী … … ৬৪
সূচনা : ফাল্গুনী … … ৮৭
স্বরবর্ণ অ … … ৩৪৩
স্বরবর্ণ এ … … ৩৪৫
স্বর্গ কোথায় জানিস কি তা ভাই … … ৪৬
স্বাধীন শিক্ষা … … ৫২১
স্মৃতিরক্ষা … … ৪৯৯
হবে জয়, হবে জয়, হবে জয় রে … … ১৪০
হিন্দুবিবাহ … … ৪১৩
হে প্রিয়, আজি এ প্রাতে … … ২৫
হে বিরাট নদী … … ২০
হে ভুবন আমি যতক্ষণ … … ৩৭
হে মোর সুন্দর … … ২৭

রবীন্দ্র রচনাবলী

ত্রয়োদশ খণ্ড

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সূচী

চিত্রসূচী ।৵০

কবিতা ও গান

পলাতকা ৩
শিশু ভোলানাথ ৬৩

নাটক ও প্রহসন

গুরু ১৯
অরূপ রতন ১৬১
ঋণশোধ ২১৩

উপন্যাস ও গল্প

চার অধ্যায় ২৬৫

প্রবন্ধ

ধর্ম ৩৩৩
শান্তিনিকেতন ১-৩ ৪৪৭
গ্রন্থ-পরিচয় ৫৩৫
বর্ণানুক্রমিক সূচী ৫৪৭

চিত্রসূচী

জাতীয় মহাসমিতির উদ্বোধনে রবীন্দ্রনাথ, ১৯১৭ ৩

গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক অঙ্কিত চিত্র

রবীন্দ্রনাথ ৬৪

স্ট্রাসবুর্গ, ১৯২১

রবীন্দ্রনাথ ২২৪

প্রাগ, ১৯২১

কবিতা ও গান

পলাতকা

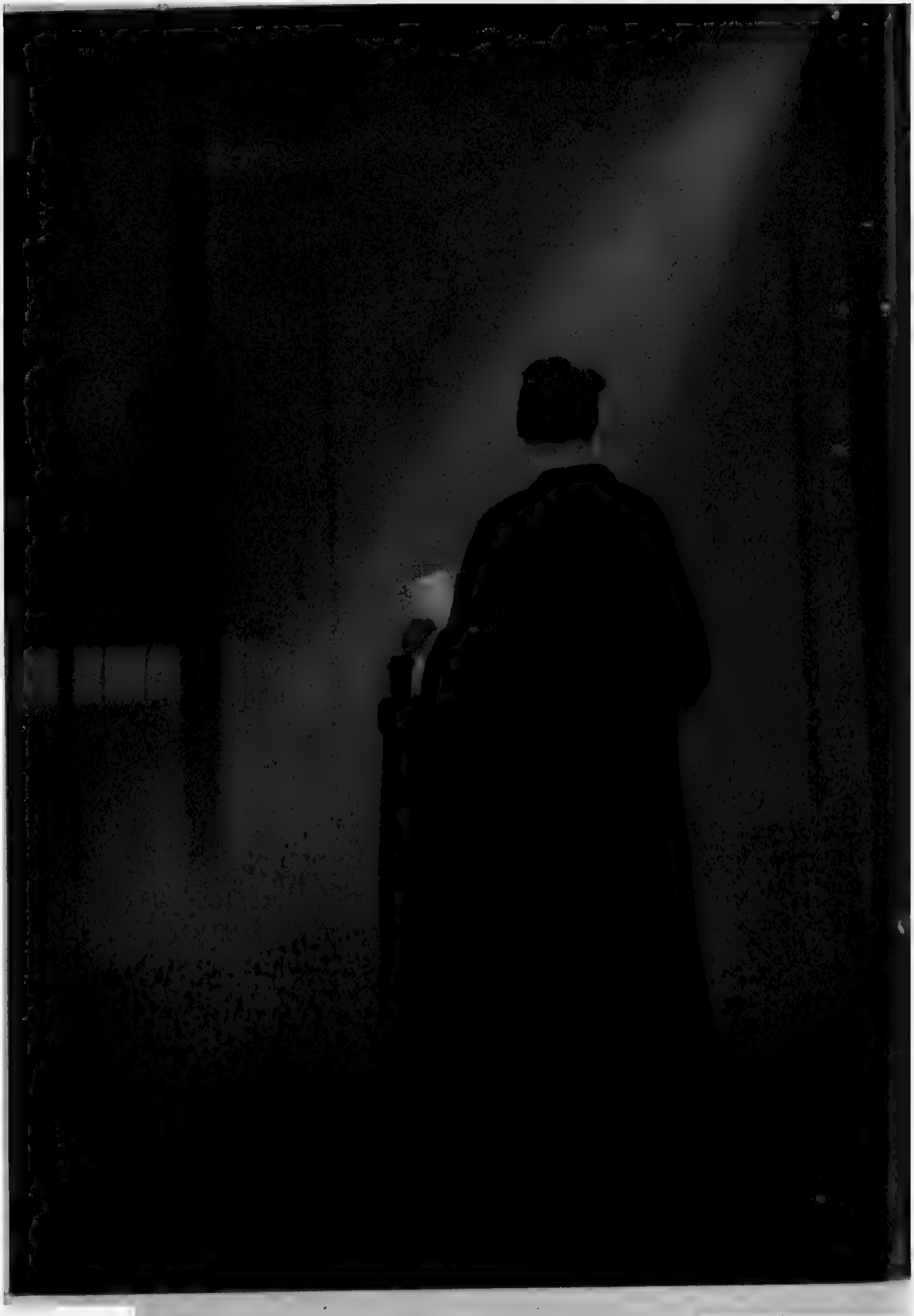

জাতীয় মহাসমিতির উদ্বোধনে রবীন্দ্রনাথ

কলিকাতা, ১৯১৭

গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত চিত্র

পলাতকা

পলাতকা

ঐ যেখানে শিরীষ গাছে
ঝুরু-ঝুরু কচি পাতার নাচে
ঘাসের 'পরে ছায়াখানি কাঁপায় থরথর
ঝরা ফুলের গন্ধে ভরভর—
ঐখানে মোর পোষা হরিণ চরত আপন মনে
হেনা-বেড়ার কোণে
শীতের রোদে সারা সকালবেলা।
তারি সঙ্গে করত খেলা
পাহাড়-থেকে-আনা
ঘন রাঙা রোঁয়ায় ঢাকা একটি কুকুরছানা।
যেন তারা দুই বিদেশের দুটি ছেলে
মিলেছে এক পাঠশালাতে, একসাথে তাই বেড়ায় হেসে খেলে।
হাটের দিনে পথের কত লোকে
বেড়ার কাছে দাঁড়িয়ে যেত, দেখত অবাক-চোখে।

ফাগুন মাসে জাগল পাগল দখিন হাওয়া,
শিউরে উঠে আকাশ যেন কোন্ প্রেমিকের রঙিন-চিঠি-পাওয়া।
শালের বনে ফুলের মাতন হল শুরু,
পাতায় পাতায় ঘাসে ঘাসে লাগল কাঁপন দুরুদুরু।
হরিণ যে কার উদাস-করা বাণী
হঠাৎ কখন শুনতে পেলে আমরা তা কি জানি।

তাই যে কালো চোখের কোণে
চাউনি তাহার উতল হল অকারণে ;
তাই সে থেকে থেকে
হঠাৎ আপন ছায়া দেখে
চমকে দাঁড়ায় বেঁকে ।

একদা এক বিকালবেলায়
আমলকীবন অধীর যখন ঝিকিমিকি আলোর খেলায়,
তপ্ত হাওয়া ব্যথিয়ে ওঠে আমের বোলের বাসে,
মাঠের পরে মাঠ হয়ে পার ছুটল হরিণ নিরুদ্দেশের আশে ।
সম্মুখে তার জীবনমরণ সকল একাকার,
অজানিতের ভয় কিছু নেই আর ।

ভেবেছিলেম আঁধার হলে পরে
ফিরবে ঘরে
চেনা হাতের আদর পাবার তরে ।
কুকুরছানা বারে বারে এসে
কাছে ঘেঁষে ঘেঁষে
কেঁদে-কেঁদে চোখের চাওয়ায় শুধায় জনে জনে,
“কোথায় গেল, কোথায় গেল, কেন তারে না দেখি অঙ্গনে ।”
আহার ত্যেজে বেড়ায় সে যে, এল না তার সাথি ।
আঁধার হল, জ্বলল ঘরে বাতি ;
উঠল তারা ; মাঠে-মাঠে নামল নীরব রাতি ।
আতুর চোখের প্রশ্ন নিয়ে ফেরে কুকুর বাইরে ঘরে,
“নাই সে কেন, যায় কেন সে কাহার তরে ।”

কেন যে তা সে-ই কি জানে । গেছে সে যার ডাকে
কোনো কালে দেখে নাই যে তাকে ।

আকাশ হতে, আলোক হতে, নতুন পাতার কাঁচা সবুজ হতে
দিশাহারা দখিন হাওয়ার স্রোতে
রক্তে তাহার কেমন এলোমেলো
কিসের খবর এল।
বুকে যে তার বাজল বাঁশি বহুযুগের ফাগুন-দিনের সুরে—
কোথায় অনেক দূরে
রয়েছে তার আপন চেয়ে আরো আপন জন।
তারেই অন্বেষণ।
জন্ম হতে আছে যেন মর্মে তারি লেগে,
আছে যেন ছুটে চলার বেগে,
আছে যেন চল-চপল চোখের কোণে জেগে।
কোনো কালে চেনে নাই সে যারে
সেই তো তাহার চেনাশোনার খেলাধুলা ঘোচায় একেবারে।
আঁধার তারে ডাক দিয়েছে কেঁদে,
আলোক তারে রাখল না আর বেঁধে॥

চিরদিনের দাগা

ওপার হতে এপার পানে খেয়া-নৌকো বেয়ে
ভাগ্য নেয়ে
দলে দলে আনছে ছেলেমেয়ে।
সবাই সমান তারা
এক সাজিতে ভরে-আনা চাঁপাফুলের পারা।
তাহার পরে অন্ধকারে
কোন্ ঘরে সে পৌঁছিয়ে দেয় কারে!
তখন তাদের আরম্ভ হয় নব নব কাহিনী-জাল বোনা-
দুঃখে সুখে দিনমুহূর্ত গোনা।

একে একে তিনটি মেয়ের পরে
শৈল যখন জন্মাল তার বাপের ঘরে,
জননী তার লজ্জা পেল ; ভাবল কোথা থেকে
অবাঞ্ছিত কাঙালটারে আনল ঘরে ডেকে।
বৃষ্টিধারা চাইছে যখন চাষি
নামল যেন শিলাবৃষ্টিরাশি।

বিনা-দোষের অপরাধে শৈলবালার জীবন হল শুরু,
পদে পদে অপরাধের বোঝা হল গুরু।
কারণ বিনা যে-অনাদর আপনি ওঠে জেগে
বেড়েই চলে সে যে আপন বেগে।
মা তারে কয় "পোড়ারমুখী", শাসন করে বাপ,—
এ কোন্ অভিশাপ
হতভাগী আনলি বয়ে—শুধু কেবল বেঁচে-থাকার পাপ।
যতই তারা দিত ওরে গালি
নির্মলারে দেখত মলিন মাখিয়ে তারে আপন কথার কালি।
নিজের মনের বিকারটিরেই শৈল ওরা কয়,
ওদের শৈল বিধির শৈল নয়।

আমি বৃদ্ধ ছিনু ওদের প্রতিবেশী।
পাড়ায় কেবল আমার সঙ্গে দুষ্টু মেয়ের ছিল মেশামেশি।
"দাদা" বলে
গলা আমার জড়িয়ে ধরে বসত আমার কোলে।
নাম শুধালে শৈল আমায় বলত হাসি হাসি—
"আমার নাম যে দুষ্টু, সর্বনাশী!"
যখন তারে শুধাতেম তার মুখটি তুলে ধরে
"আমি কে তোর বল দেখি ভাই মোরে?"
বলত "দাদা, তুই যে আমার বর!"—
এমনি করে হাসাহাসি হত পরস্পর।

বিয়ের বয়স হল তবু কোনোমতে হয় না বিয়ে তার—
তাহে বাড়ায় অপরাধের ভার।
অবশেষে বর্মা থেকে পাত্র গেল জুটি।
অল্পদিনের ছুটি;
শুভকর্ম সেরে তাড়াতাড়ি
মেয়েটিরে সঙ্গে নিয়ে রেঙ্গুনে তার দিতে হবে পাড়ি।
শৈলকে যেই বলতে গেলেম হেসে—
"বুড়ো বরকে হেলা করে নবীনকে ভাই বরণ করলি শেষে?"
অমনি যে তার দু-চোখ গেল ভেসে
ঝরঝরিয়ে চোখের জলে। আমি বলি, "ছি ছি,
কেন, শৈল, কাঁদিস মিছিমিছি,
করিস অমঙ্গল।"
বলতে গিয়ে চক্ষে আমার রাখতে নারি জল।

বাজল বিয়ের বাঁশি,
অনাদরের ঘর ছেড়ে হায় বিদায় হল দুষ্টু সর্বনাশী।
যাবার বেলা বলে গেল, "দাদা, তোমার রইল নিমন্ত্রণ,
তিন-সত্যি—যেয়ো যেয়ো।" "যাব, যাব, যাব বই কি বোন।"
আর কিছু না বলে
আশীর্বাদের মোতির মালা পরিয়ে দিলেম গলে।

চতুর্থ দিন প্রাতে
খবর এল, ইরাবতীর সাগর-মোহানাতে
ওদের জাহাজ ডুবে গেছে কিসের ধাক্কা খেয়ে।
আবার ভাগ্য নেয়ে
শৈলরে তার সঙ্গে নিয়ে কোন পারে হায় গেল নৌকো বেয়ে
কেন এল কেনই গেল কেই বা তাহা জানে।
নিমন্ত্রণটি রেখে গেল শুধু আমার প্রাণে।

যাব যাব যাব, দিদি, অধিক দেরি নাই,
তিন-সত্যি আছে তোমার, সে-কথা কি ভুলতে পারি ভাই
আরো একটি চিহ্ন তাহার রেখে গেছে ঘরে
খবর পেলেম পরে।
গালিয়ে বুকের ব্যথা
লিখে রাখি এইখানে সেই কথা।

দিনের পরে দিন চলে যায়, ওদের বাড়ি যাই নে আমি আর
নিয়ে আপন একলা প্রাণের ভার
আপন মনে
থাকি আপন কোণে।
হেনকালে একদা মোর ঘরে
সন্ধ্যাবেলায় বাপ এল তার কিসের তরে।
বললে, "খুড়ো একটা কথা আছে,
বলি তোমার কাছে।
শৈল যখন ছোটো ছিল, একদা মোর বাক্স খুলে দেখি
হিসাব-লেখা খাতার 'পরে এ কী
হিজিবিজি কালির আঁচড়। মাথায় যেন পড়ল ক্রোধের বাজ।
বোঝা গেল শৈলরি এ কাজ।
মারা-ধরা গালিমন্দ কিছুতে তার হয় না কোনো ফল,—
হঠাৎ তখন মনে এল শাস্তির কৌশল।
মানা করে দিলেম তারে
তোমার বাড়ি যাওয়া একেবারে।
সবার চেয়ে কঠিন দণ্ড! চুপ করে সে রইল বাক্যহীন
বিদ্রোহিণী বিষম ক্রোধে। অবশেষে বারো দিনের দিন
গরবিনী গর্ব ভেঙে বললে এসে, 'আমি
আর কখনো করব না দুষ্টামি।'
আঁচড়-কাটা সেই হিসাবের খাতা,
সেই কখানা পাতা
আজকে আমার মুখের পানে চেয়ে আছে তারি চোখের মতো।

হিসাবের সেই অঙ্কগুলার সময় হল গত ;—
সে শাস্তি নেই, সে তুষ্টু নেই ;
রইল শুধু এই
চিরদিনের দাগ।
শিশু-হাতের আঁচড় কটি আমার বুকে লাগা।”

মুক্তি

ডাক্তারে যা বলে বলুক নাকো,
রাখো রাখো খুলে রাখো,
শিয়রের ওই জানলা দুটো,—গায়ে লাগুক হাওয়া।
ওষুধ ? আমার ফুরিয়ে গেছে ওষুধ খাওয়া।
তিতো কড়া কত ওষুধ খেলেম এ জীবনে,
দিনে দিনে ক্ষণে ক্ষণে।
বেঁচে থাকা, সেই যেন এক রোগ ;
কত রকম কবিরাজি, কতই মুষ্টিযোগ,
একটুমাত্র অসাবধানেই, বিষম কর্মভোগ।
এইটে ভালো, ঐটে মন্দ, যে যা বলে সবার কথা মেনে,
নামিয়ে চক্ষু, মাথায় ঘোমটা টেনে,
বাইশ বছর কাটিয়ে দিলেম এই তোমাদের ঘরে।
তাই তো ঘরে পরে,
সবাই আমায় বললে লক্ষ্মী সতী,
ভালোমানুষ অতি !

এ সংসারে এসেছিলেম ন-বছরের মেয়ে,
তার পরে এই পরিবারের দীর্ঘ গলি বেয়ে
দশের ইচ্ছা বোঝাই-করা এই জীবনটা টেনে টেনে শেষে
পৌঁছিনু আজ পথের প্রান্তে এসে।

সুখের দুখের কথা
একটুখানি ভাবব এমন সময় ছিল কোথা।
এই জীবনটা ভালো, কিংবা মন্দ, কিংবা যা-হ'ক-একটা-কিছু
সে-কথাটা বুঝব কখন, দেখব কখন ভেবে আগুপিছু।
একটানা এক ক্লান্ত সুরে
কাজের চাকা চলছে ঘুরে ঘুরে।
বাইশ বছর রয়েছি সেই এক-চাকাতেই বাঁধা
পাকের ঘোরে আঁধা।
জানি নাই তো আমি যে কী, জানি নাই এ বৃহৎ বসুন্ধরা
কী অর্থে যে ভরা।
শুনি নাই তো মানুষের কী বাণী
মহাকালের বীণায় বাজে। আমি কেবল জানি,
রাঁধার পরে খাওয়া, আবার খাওয়ার পরে রাঁধা,
বাইশ বছর এক-চাকাতেই বাঁধা।
মনে হচ্ছে সেই চাকাটা—ঐ যে থামল যেন ;
থামুক তবে। আবার ওষুধ কেন।

বসন্তকাল বাইশ বছর এসেছিল বনের আঙিনায়।
গন্ধে বিভোল দক্ষিণ বায়
দিয়েছিল জলস্থলের মর্ম-দোলায় দোল ;
হেঁকেছিল, "খোল্ রে দুয়ার খোল্।"
সে যে কখন আসত যেত জানতে পেতেম না যে।
হয়তো মনের মাঝে
সংগোপনে দিত নাড়া ; হয়তো ঘরের কাজে
আচম্বিতে ভুল ঘটাত ; হয়তো বাজত বুকে
জন্মান্তরের ব্যথা ; কারণ-ভোলা দুঃখে সুখে
হয়তো পরান রইত চেয়ে যেন রে কার পায়ের শব্দ শুনে,
বিহ্বল ফাল্গুনে।
তুমি আসতে আপিস থেকে, যেতে সন্ধ্যাবেলায়
পাড়ায় কোথা শতরঞ্চ খেলায়।

থাক্ সে-কথা।
আজকে কেন মনে আসে প্রাণের যত ক্ষণিক ব্যাকুলতা।

প্রথম আমার জীবনে এই বাইশ বছর পরে
বসন্তকাল এসেছে মোর ঘরে।
জানলা দিয়ে চেয়ে আকাশপানে
আনন্দে আজ ক্ষণে ক্ষণে জেগে উঠছে প্রাণে—
আমি নারী, আমি মহীয়সী,
আমার সুরে সুর বেঁধেছে জ্যোৎস্না-বীণায় নিদ্রাবিহীন শশী।
আমি নইলে মিথ্যা হত সন্ধ্যাতারা ওঠা,
মিথ্যা হত কাননে ফুল-ফোটা।

বাইশ বছর ধরে
মনে ছিল বন্দী আমি অনন্তকাল তোমাদের এই ঘরে।
দুঃখ তবু ছিল না তার তরে,
অসাড় মনে দিন কেটেছে, আরো কাটত আরো বাঁচলে পরে।
যেথায় যত জ্ঞাতি
লক্ষ্মী বলে করে আমার খ্যাতি;
এই জীবনে সেই যেন মোর পরম সার্থকতা—
ঘরের কোণে পাঁচের মুখের কথা!
আজকে কখন মোর
কাটল বাঁধন-ডোর।
জনম মরণ এক হয়েছে ওই যে অকূল বিরাট মোহানায়,
ঐ অতলে কোথায় মিলে যায়
ভাঁড়ার-ঘরের দেয়াল যত
একটু ফেনার মতো।

এতদিনে প্রথম যেন বাজে
বিয়ের বাঁশি বিশ্ব-আকাশ মাঝে।
তুচ্ছ বাইশ বছর আমার ঘরের কোণের ধুলায় পড়ে থাক।

মরণ-বাসরঘরে আমায় যে দিয়েছে ডাক
দ্বারে আমার প্রার্থী সে যে, নয় সে কেবল প্রভু,
হেলা আমায় করবে না সে কভু।
চায় সে আমার কাছে
আমার মাঝে গভীর গোপন যে সুধারস আছে
গ্রহতারার সভার মাঝখানে সে
ঐ যে আমার মুখে চেয়ে দাঁড়িয়ে হোথায় রইল নির্নিমেষে।
মধুর ভুবন, মধুর আমি নারী,
মধুর মরণ, ওগো আমার অনন্ত ভিখারি।
দাও, খুলে দাও দ্বার,
ব্যর্থ বাইশ বছর হতে পার করে দাও কালের পারাবার

ফাঁকি

বিনুর বয়স তেইশ তখন, রোগে ধরল তারে।
ওষুধে ডাক্তারে
ব্যাধির চেয়ে আধি হল বড়ো ;
নানা ছাপের জমল শিশি, নানা মাপের কৌটো হল জড়ো।
বছর দেড়েক চিকিৎসাতে করলে যখন অস্থি জরজর
তখন বললে, “হাওয়া বদল করো।”
এই সুযোগে বিনু এবার চাপল প্রথম রেলের গাড়ি,
বিয়ের পরে ছাড়ল প্রথম শ্বশুরবাড়ি।

নিবিড় ঘন পরিবারের আড়ালে আবডালে
মোদের হত দেখাশুনো ভাঙা লয়ের তালে ;
মিলন ছিল ছাড়া ছাড়া,
চাপা হাসি টুকরো কথার নানান জোড়াতাড়া।
আজকে হঠাৎ ধরিত্রী তার আকাশভরা সকল আলো ধরে
বরবধূরে নিলে বরণ করে।

রোগা মুখের মস্ত বড়ো দুটি চোখে
বিনুর যেন নতুন করে শুভদৃষ্টি হল নতুন লোকে।
রেল-লাইনের ওপার থেকে
কাঙাল যখন ফেরে ভিক্ষা হেঁকে,
বিনু আপন বাক্স খুলে
টাকা সিকে যা হাতে পায় তুলে
কাগজ দিয়ে মুড়ে
দেয় সে ছুঁড়ে ছুঁড়ে।
সবার দুঃখ দূর না হলে পরে
আনন্দ তার আপনারি ভার বইবে কেমন করে।
সংসারের ঐ ভাঙা ঘাটের কিনার হতে
আজ আমাদের ভাসান যেন চিরপ্রেমের স্রোতে,—
তাই যেন আজ দানে ধ্যানে
ভরতে হবে সে-যাত্রাটি বিশ্বের কল্যাণে।
বিনুর মনে জাগছে বারেবার
নিখিলে আজ একলা শুধু আমিই কেবল তার ;
কেউ কোথা নেই আর
শ্বশুর ভাশুর সামনে পিছে ডাইনে বাঁয়ে ;
সেই কথাটা মনে ক'রে পুলক দিল গায়ে।

বিলাসপুরের ইস্টেশনে বদল হবে গাড়ি ;
তাড়াতাড়ি
নামতে হল। ছ-ঘণ্টা কাল থামতে হবে যাত্রিশালায়,
মনে হল এ এক বিষম বালাই।
বিনু বললে, "কেন, এ তো বেশ।"
তার মনে আজ নেই যে খুশির শেষ।
পথের বাঁশি পায়ে পায়ে তারে যে আজ করেছে চঞ্চলা,—
আনন্দে তাই এক হল তার পৌঁছনো আর চলা।

যাত্রিশালার দুয়ার খুলে আমায় বলে,—
"দেখো, দেখো, এক্কাগাড়ি কেমন চলে।
আর দেখেছ বাছুরটি ঐ, আ মরে যাই, চিকন নধর দেহ,
মায়ের চোখে কী সুগভীর স্নেহ।
ঐ যেখানে দিঘির উঁচু পাড়ি,—
শিশুগাছের তলাটিতে পাঁচিলঘেরা ছোট্ট বাড়ি
ঐ যে রেলের কাছে,—
ইস্টেশনের বাবু থাকে?—আহা ওরা কেমন সুখে আছে।"

যাত্রীঘরে বিছানাটা দিলেম পেতে,
বলে দিলেম, "বিনু এবার চুপটি করে ঘুমোও আরামেতে।"
প্ল্যাটফরমে চেয়ার টেনে
পড়তে শুরু করে দিলেম ইংরেজি এক নভেল কিনে এনে।
গেল কত মালের গাড়ি, গেল প্যাসেঞ্জার,
ঘণ্টা তিনেক হয়ে গেল পার।
এমন সময় যাত্রীঘরের দ্বারের কাছে
বাহির হয়ে বললে বিনু, "কথা একটা আছে।"
ঘরে ঢুকে দেখি কে এক হিন্দুস্থানি মেয়ে
আমার মুখে চেয়ে
সেলাম করে বাহির হয়ে রইল ধরে বারান্দাটার থাম।
বিনু বললে, "রুক্‌মিনী ওর নাম।
ঐ যে হোথায় কুয়োর ধারে সারবাঁধা ঘরগুলি
ঐখানে ওর বাসা আছে, স্বামী রেলের কুলি।
তেরো-শ কোন্ সনে
দেশে ওদের আকাল হল,—স্বামী-স্ত্রী দুইজনে
পালিয়ে এল জমিদারের অত্যাচারে।
সাত বিঘে ওর জমি ছিল কোন্-এক গাঁয়ে কী-এক নদীর ধারে—"
বাধা দিয়ে আমি বললেম হেসে,
রুক্‌মিনীর এই জীবনচরিত শেষ না হতেই গাড়ি পড়বে এসে।

আমার মতে, একটু যদি সংক্ষেপেতে সার
অধিক ক্ষতি হবে না তায় কারো।”
বাঁকিয়ে ভুরু, পাকিয়ে চক্ষু, বিনু বললে খেপে—
“কক্‌খনো না, বলব না সংক্ষেপে।
আপিস যাবার তাড়া তো নেই, ভাবনা কিসের তবে।
আগাগোড়া সব শুনতেই হবে।”
নভেল-পড়া নেশাটুকু কোথায় গেল মিশে।
রেলের কুলির লম্বা কাহিনী সে
বিস্তারিত শুনে গেলেম আমি।
আসল কথা শেষে ছিল, সেইটে কিছু দামি।
কুলির মেয়ের বিয়ে হবে, তাই
পইচে তাবিজ বাজুবন্ধ গড়িয়ে দেওয়া চাই;
অনেক টেনেটুনে তবু পঁচিশ টাকা খরচ হবে তারি;
সে ভাবনাটা ভারি
রুক্‌মিনীরে করেছে বিব্রত।
তাই এবারের মতো
আমার ’পরে ভার
কুলি নারীর ভাবনা ঘোচাবার।
আজকে গাড়ি-চড়ার আগে একেবারে থোকে
পঁচিশ টাকা দিতেই হবে ওকে।

অবাক কাণ্ড এ কী।
এমন কথা মানুষ শুনেছে কি।
জাতে হয়তো মেথর হবে, কিংবা নেহাত ওঁচা,
যাত্রীঘরের করে ঝাড়ামোছা,
পঁচিশ টাকা দিতেই হবে তাকে!
এমন হলে দেউলে হতে কদিন বাকি থাকে।
“আচ্ছা, আচ্ছা, হবে, হবে। আমি দেখছি মোট
এক-শ টাকার আছে একটা নোট,

সেটা আবার ভাঙানো নেই !"
বিনু বললে, "এই
ইস্টিশনেই ভাঙিয়ে নিলেই হবে।"
"আচ্ছা, দেব তবে"
এই বলে সেই মেয়েটাকে আড়ালেতে নিয়ে গেলেম ডেকে,-
আচ্ছা করেই দিলেম তারে হেঁকে,—
"কেমন তোমার নোকরি থাকে দেখব আমি !
প্যাসেঞ্জারকে ঠকিয়ে বেড়াও ! ঘোচাব নষ্টামি !"
কেঁদে যখন পড়ল পায়ে ধরে
দু-টাকা তার হাতে দিয়ে দিলেম বিদায় করে।

জীবন-দেউল আঁধার করে নিবল হঠাৎ আলো।
ফিরে এলেম দু-মাস যেই ফুরাল।
বিলাসপুরে এবার যখন এলেম নামি,
একলা আমি।
শেষ নিমেষে নিয়ে আমার পায়ের ধূলি
বিনু আমায় বলেছিল, "এ জীবনের যা-কিছু আর ভুলি
শেষ দুটি মাস অনন্তকাল মাথায় রবে মম
বৈকুণ্ঠেতে নারায়ণীর সিঁথের 'পরে নিত্য-সিঁদুর সম।
এই দুটি মাস সুধায় দিলে ভরে
বিদায় নিলেম সেই কথাটি স্মরণ করে।"

ওগো অন্তর্যামী,
বিনুরে আজ জানাতে চাই আমি
সেই দু-মাসের অর্ঘ্যে আমার বিষম বাকি,
পঁচিশ টাকার ফাঁকি।
দিই যদি আজ রুক্মিণীরে লক্ষ টাকা
তবুও তো ভরবে না সেই ফাঁকা।

বিনু যে সেই দু-মাসটিরে নিয়ে গেছে আপন সাথে,
জানল না তো ফাঁকিসুদ্ধ দিলেম তারি হাতে।

বিলাসপুরে নেমে আমি শুধাই সবার কাছে
"রুকৃমিনী সে কোথায় আছে ?"
প্রশ্ন শুনে অবাক মানে,—
রুকৃমিনী কে তাই বা ক-জন জানে।
অনেক ভেবে "ঝামরু কুলির বউ" বললেম যেই,
বললে সবে, "এখন তারা এখানে কেউ নেই।"
শুধাই আমি, "কোথায় পাব তাকে।"
ইস্টেশনের বড়োবাবু রেগে বলেন, "সে খবর কে রাখে।"
টিকিটবাবু বললে হেসে, "তারা মাসেক আগে
গেছে চলে দার্জিলিঙে কিংবা খসরুবাগে,
কিংবা আরাকানে।"
শুধাই যত, "ঠিকানা তার কেউ কি জানে।"—
তারা কেবল বিরক্ত হয়, তার ঠিকানায় কার আছে কোন্ কাজ।
কেমন করে বোঝাই আমি—ওগো আমার আজ
সবার চেয়ে তুচ্ছ তারে সবার চেয়ে পরম প্রয়োজন ;
ফাঁকির বোঝা নামাতে মোর আছে সেই একজন।
"এই দুটি মাস সুধায় দিলে ভরে"
বিনুর মুখের শেষ কথা সেই বইব কেমন করে।
রয়ে গেলেম দায়ী
মিথ্যা আমার হল চিরস্থায়ী।

মায়ের সম্মান

অপূর্বদের বাড়ি
অনেক ছিল চৌকি টেবিল, পাঁচটা-সাতটা গাড়ি ;
ছিল কুকুর ; ছিল বেড়াল ; নানান রঙের ঘোড়া
কিছু না হয় ছিল ছ-সাতজোড়া ;
দেউড়ি-ভরা দোবে চোবে, ছিল চাকর দাসী,
ছিল সহিস বেহারা চাপরাসি।
—আর ছিল এক মাসি।

স্বামীটি তার সংসারে বৈরাগী,
কেউ জানে না গেছেন কোথায় মোক্ষ পাবার লাগি
স্ত্রীর হাতে তার ফেলে
বালক দুটি ছেলে।
অনাত্মীয়ের ঘরে গেলে স্বামীর বংশে নিন্দা লাগে পাছে
তাই সে হেথায় আছে
ধনী বোনের দ্বারে।
একটিমাত্র চেষ্টা যে তার কী করে আপনারে
মুছবে একেবারে।
পাছে কারো চক্ষে পড়ে, পাছে তারে দেখে
কেউ বা বলে ওঠে, “আপদ জুটল কোথা থেকে”,—
আস্তে চলে, আস্তে বলে, সবার চেয়ে জায়গা জোড়ে কম,
সবার চেয়ে বেশি পরিশ্রম।

কিন্তু যে তার কানাই বলাই নেহাত ছোট্ট ছেলে ;
তাদের তরে রেখেছিলেন মেলে
বিধাতা যে প্রকাণ্ড এই ধরা ;
অঙ্গে তাদের দুরন্ত প্রাণ, কণ্ঠ তাদের কলরবে ভরা।

শিশুচিত্ত-উৎসধারা বন্ধ করে দিতে
বিষম ব্যথা বাজে মায়ের চিতে।
কাতর চোখে করুণ সুরে মা বলে, “চুপ চুপ—”
একটু যদি চঞ্চলতা দেখায় কোনোরূপ।
ক্ষুধা পেলে কান্না তাদের অসভ্যতা,
তাদের মুখে মানায় নাকো চেঁচিয়ে কথা ;
খুশি হলে রাখবে চাপি
কোনোমতেই করবে নাকো লাফালাফি।
অপূর্ব আর পূর্ণ ছিল এদের একবয়সী ;
তাদের সঙ্গে খেলতে গেলে এরা হত পদে পদেই দোষী।
তারা এদের মারত ধড়াধ্বড় ;
এরা যদি উলটে দিত চড়,
থাকত নাকো গণ্ডগোলের সীমা,—
উভয় পক্ষেরি মা
কানাই বলাই দোঁহার ’পরে পড়ত ঝড়ের মতো,—
বিষম কাণ্ড হত
ডাইনে বাঁয়ে দু-ধার থেকে মারের ’পরে মেরে।
বিনা দোষে শাস্তি দিয়ে কোলের বাছাদেরে
ঘরের দুয়ার বন্ধ করে মাসি
থাকত উপবাসী,—
চোখের জলে বক্ষ যেত ভাসি।

অবশেষে দুটি ছেলে মেনে নিল নিজেদের এই দশা।
তখন তাদের চলাফেরা ওঠাবসা
স্তব্ধ হল, শান্ত হল, হায়
পাখিহারা পক্ষিনীড়ের প্রায়।
এ সংসারে বেঁচে থাকার দাবি
ভাঁটায় ভাঁটায় নেবে নেবে একেবারে তলায় গেল নাবি ;

ঘুচে গেল ন্যায়বিচারের আশা,
রুদ্ধ হল নালিশ করার ভাষা।
সকল দুঃখ দুটি ভায়ে করল পরিপাক
নিঃশব্দ নির্বাক।
চক্ষে আঁধার দেখত ক্ষুধার ঝোঁকে—
পাছে খাবার না থাকে, আর পাছে মায়ের চোখে
জল দেখা দেয়, তাই
বাইরে কোথাও লুকিয়ে থাকত, বলত, "ক্ষুধা নাই।"
অসুখ করলে দিত চাপা ; দেবতা মানুষ কারে
একটুমাত্র জবাব করা ছাড়ল একেবারে।
প্রথম যখন ইস্কুলেতে প্রাইজ পেল এরা
ক্লাসে সবার সেরা,
অপূর্ব আর পূর্ণ এল শূন্যহাতে বাড়ি।
প্রমাদ গনি, দীর্ঘ নিশাস ছাড়ি
মা ডেকে কয় কানাই-বলাইয়েরে,—
"ওরে বাছা, ওদের হাতেই দে রে
তোদের প্রাইজ দুটি।
তার পরে যা ছুটি
খেলা করতে চৌধুরিদের ঘরে।
সন্ধ্যা হলে পরে
আসিস ফিরে, প্রাইজ পেলি কেউ যেন না শোনে।"
এই বলে মা নিয়ে ঘরের কোণে
দুটি আসন পেতে
আপন হাতের খইয়ের মোওয়া দিল তাদের খেতে।

এমনি করে অপমানের তলে
দুঃখদহন বহন করে দুটি ভাইয়ে মানুষ হয়ে চলে।
এই জীবনের ভার
যত হালকা হতে পারে করলে এরা চূড়ান্ত তাহার

সবার চেয়ে ব্যথা এদের মায়ের অসম্মান,—
আগুন তারি শিখার সমান
জ্বলছে এদের প্রাণপ্রদীপের মুখে।
সেই আলোটি দোঁহায় দুঃখে সুখে
যাচ্ছে নিয়ে একটি লক্ষ্যপানে—
জননীরে করবে জয়ী সকল মনে প্রাণে।

কানাই বলাই

কালেজেতে পড়ছে দুটি ভাই।
এমন সময় গোপনে এক রাতে
অপূর্ব তার মায়ের বাক্স ভাঙল আপন হাতে,
করল চুরি পান্নামোতির হার,—
থিয়েটারের শখ চেপেছে তার।
পুলিস-ডাকাডাকি নিয়ে পাড়া যেন ভূমিকম্পে নড়ে;
যখন ধরা পড়ে-পড়ে
অপূর্ব সেই মোতির মালাটিরে
ধীরে ধীরে
কানাইদাদার শোবার ঘরে বালিশ দিয়ে ঢেকে
লুকিয়ে দিল রেখে।
যখন বাহির হল শেষে
সবাই বললে এসে—
"তাই না শাস্ত্রে করে মানা
দুধে কলায় পুষতে সাপের ছানা।
ছেলেমানুষ, দোষ কী ওদের, মা আছে এর তলে।
ভালো করলে মন্দ ঘটে কলিকালের ফলে।"

কানাই বলাই জ্বলে ওঠে প্রলয়বহ্নিপ্রায়,
খুনোখুনি করতে ছুটে যায়।

মা বললেন, "আছেন ভগবান,
নির্দোষীদের অপমানে তাঁরি অপমান।"
দুই ছেলেরে সঙ্গে নিয়ে বাহির হলেন মাসি ;
রইল চেয়ে দোবে চোবে, রইল চেয়ে সকল চাকর দাসী,
ঘোড়ার সহিস বেহারা চাপরাসি।

অপমানের তীব্র আলোক জেলে
মাকে নিয়ে দুটি ছেলে
পার হল ঘোর দুঃখদশা চলে চলে কঠিন কাঁটার পথে।
কানাই বলাই মস্ত উকিল বড়ো আদালতে।
মনের মতো বউ এসেছে, একটি-দুটি আসছে নাতনী নাতি,—
জুটল মেলা সুখের দিনের সাথি।
মা বললেন, "মিটবে এবার চিরদিনের আশ—
মরার আগে করব কাশীবাস।"
অবশেষে একদা আশ্বিনে
পুজোর ছুটির দিনে
মনের মতো বাড়ি দেখে
দুই ভাইয়েতে মাকে নিয়ে তীর্থে এল রেখে।

বছরখানেক না পেরোতেই শ্রাবণমাসের শেষে
হঠাৎ কখন মা ফিরলেন দেশে।
বাড়িসুদ্ধ অবাক সবাই,—মা বললেন, "তোরা আমার ছেলে
তোদের এমন বুদ্ধি হল অপূর্বকে পুরতে দিবি জেলে?"
কানাই বললে, "তোমার ছেলে বলেই
তোমার অপমানের জ্বালা মনের মধ্যে নিত্য আছে জ্বলেই।
মিথ্যে চুরির দাগা দিয়ে সবার চোখের 'পরে
আমার মাকে ঘরের বাহির করে
সেই কথাটা এ জীবনে ভুলি যদি তবে
মহাপাতক হবে।"

মা বললেন, "ভুলবি কেন। মনে যদি থাকে তাহার তাপ
তাহলে কি তেমন ভীষণ অপমানের চাপ
চাপানো যায় আর কাহারো 'পরে
বাইরে কিংবা ঘরে।
মনে কি নেই সেদিন যখন দেউড়ি দিয়ে
বেরিয়ে এলেম তোদের দুটি সঙ্গে নিয়ে
তখন আমার মনে হল যদি আমি স্বপ্নমাত্র হই
জেগে দেখি আমি যদি কোথাও কিছু নই
তাহলে হয় ভালো।
মনে হল শত্রু আমার আকাশভরা আলো,
দেবতা আমার শত্রু, আমার শত্রু বসুন্ধরা—
মাটির ডালি আমার অসীম লজ্জা দিয়ে ভরা।
তাইতো বলি বিশ্বজোড়া সে লাঞ্ছনা
তেমন করে পায় না যেন কোনোজনা
বিধির কাছে এই করি প্রার্থনা।"

ব্যাপারটা কী ঘটেছিল অল্প লোকেই জানে,
বলে রাখি সে-কথা এইখানে।

বারো বছর পরে
অপূর্ব রায় দেখা দিল কানাইদাদার ঘরে।
একে একে তিনটে থিয়েটার
ভাঙাগড়া শেষ করে সে হল ক্যাশিয়ার
সদাগরের আপিসেতে। সেখানে আজ শেষে
তবিল-ভাঙার জাল হিসাবে দায়ে ঠেকেছে সে।
হাতে বেড়ি পড়ল বুঝি; তাই সে এল ছুটে
উকিল দাদার ঘরে, সেথায় পড়ল মাথা কুটে।
কানাই বললে, "মনে কি নেই?" অপূর্ব কয় নতমুখে
"অনেকদিন সে গেছে চুকেবুকে।"

"ঢুকে গেছে ?" কানাই উঠল বিষম রাগে জ্বলে,
"এতদিনের পরে যেন আশা হচ্ছে ঢুকে যাবে বলে।"
নিচের তলায় বলাই আপিস করে—
অপূর্ব রায় ভয়ে ভয়ে ঢুকল তারি ঘরে।
বললে, "আমায় রক্ষা করো।"
বলাই কেঁপে উঠল থরথর।
অধিক কথা কয় না সে যে; ঘণ্টা নেড়ে ডাকল দরোয়ানে।
অপূর্ব তার মেজাজ দেখে বেরিয়ে এল মানে।

অপূর্বদের মা তিনি হন মস্ত ঘরের গৃহিণী যে ;
এদের ঘরে নিজে
আসতে গেলে হয় যে তাঁদের মাথা নত।
অনেক রকম করে ইতস্তত
পত্র দিয়ে পূর্ণকে তাই পাঠিয়ে দিলেন কাশী।
পূর্ণ বললে, "রক্ষা করো মাসি।"

এরি পরে কাশী থেকে মা আসলেন ফিরে।
কানাই তাঁরে বললে ধীরে ধীরে—
"জান তো মা, তোমার বাক্য মোদের শিরোধার্য,
এটা কিন্তু নিতান্ত অকার্য।
বিধি তাদের দেবেন শাস্তি, আমরা করব রক্ষে,
উচিত নয় মা সেটা কারো পক্ষে।"
কানাই যদি নরম হয় বা, বলাই রইল রুখে
অপ্রসন্ন মুখে।
বললে, "হেথায় নিজে এসে মাসি তোমার পড়ুন পায়ে ধরে
দেখব তখন বিবেচনা করে।"

মা বললেন, "তোরা বলিস কী এ।
একটা দুঃখ দূর করতে গিয়ে

আরেক দুঃখে বিদ্ধ করবি মর্ম !
এই কি তোদের ধর্ম !"
এত বলি বাহির হয়ে চলেন তাড়াতাড়ি ;
তারা বলে, "যাচ্ছ কোথায় ।" মা বললেন, "অপূর্বদের বাড়ি ।
দুঃখে তাদের বক্ষ আমার কাটে
রইব আমি তাদের ঘরে যতদিন না বিপদ তাদের কাটে ।"
"রসো, রসো, থামো, থামো, করছ এ কী ।
আচ্ছা, ভেবে দেখি ।
তোমার ইচ্ছা যবে
আচ্ছা না হয় যা বলছ তাই হবে ।"
আর কি থামেন তিনি ।
গেলেন একাকিনী
অপূর্বদের ঘরে তাদের মাসি ।
ছিল না আর দোবে চোবে, ছিল না চাপরাসি ।
প্রণাম করল লুটিয়ে পায়ে বিপিনের মা, পুরোনো সেই দাসী ।

নিষ্কৃতি

মা কেঁদে কয়, "মঞ্জুলী মোর ঐ তো কচি মেয়ে,
ওরি সঙ্গে বিয়ে দেবে ?—বয়সে ওর চেয়ে
পাঁচগুনো সে বড়ো ;—
তাকে দেখে বাছা আমার ভয়েই জড়সড় ।
এমন বিয়ে ঘটতে দেব নাকো ।"

বাপ বললে, "কান্না তোমার রাখো !
পঞ্চাননকে পাওয়া গেছে অনেক দিনের খোঁজে,
জান না কি মস্ত কুলীন ও যে ।
সমাজে তো উঠতে হবে সেটা কি কেউ ভাব ।
ওকে ছাড়লে পাত্র কোথায় পাব ।"

মা বললে, "কেন ঐ যে চাটুজ্যেদের পুলিন,
নাই বা হল কুলীন,—
দেখতে যেমন তেমনি স্বভাবখানি,
পাস করে ফের পেয়েছে জলপানি,
সোনার টুকরো ছেলে।
এক-পাড়াতে থাকে ওরা—ওরি সঙ্গে হেসে খেলে
মেয়ে আমার মানুষ হল ; ওকে যদি বলি আমি আজই
এক্‌খনি হয় রাজি।"

বাপ বললে, "থামো,
আরে আরে রামোঃ।
ওরা আছে সমাজের সব তলায়।
বামুন কি হয় পইতে দিলেই গলায় ?
দেখতে শুনতে ভালো হলেই পাত্র হল ! রাধে !
স্ত্রীবুদ্ধি কি শাস্ত্রে বলে সাধে।"

যেদিন ওরা গিনি দিয়ে দেখলে কনের মুখ
সেদিন থেকে মঞ্জুলিকার বুক
প্রতি পলের গোপন কাঁটায় হল রক্তে মাখা।
মায়ের স্নেহ অন্তর্যামী, তার কাছে তো রয় না কিছুই ঢাকা ;
মায়ের ব্যথা মেয়ের ব্যথা চলতে খেতে শুতে
ঘরের আকাশ প্রতিক্ষণে হানছে যেন বেদনা-বিদ্যুতে।

অটলতার গভীর গর্ব বাপের মনে জাগে,—
সুখে দুঃখে দ্বেষে রাগে
ধর্ম থেকে নড়েন তিনি নাই হেন দৌর্বল্য।
তাঁর জীবনের রথের চাকা চলল
লোহার বাঁধা রাস্তা দিয়ে প্রতিক্ষণেই,
কোনোমতেই ইঞ্চিখানেক এদিক-ওদিক একটু হবার জো নেই।

তিনি বলেন, তাঁর সাধনা বড়োই সুকঠোর,
আর কিছু নয়, শুধুই মনের জোর,
অষ্টাবক্র জমদগ্নি প্রভৃতি সব ঋষির সঙ্গে তুল্য,
মেয়েমানুষ বুঝবে না তার মূল্য।

অন্তঃশীলা অশ্রুনদীর নীরব নীরে
দুটি নারীর দিন বয়ে যায় ধীরে।
অবশেষে বৈশাখে এক রাতে
মঞ্জুলিকার বিয়ে হল পঞ্চাননের সাথে।
বিদায়বেলায় মেয়েকে বাপ বলে দিলেন মাথায় হস্ত ধরি
"হও তুমি সাবিত্রীর মতো এই কামনা করি।"

কিমাশ্চর্যমতঃপরং, বাপের সাধন-জোরে
আশীর্বাদের প্রথম অংশ দু-মাস যেতেই ফলল কেমন করে—
পঞ্চাননকে ধরল এসে যমে;
কিন্তু মেয়ের কপালক্রমে
ফলল না তার শেষের দিকটা, দিলে না যম ফিরে,
মঞ্জুলিকা বাপের ঘরে ফিরে এল সিঁদুর মুছে শিরে।

দুঃখে সুখে দিন হয়ে যায় গত
স্রোতের জলে ঝরে-পড়া ভেসে-যাওয়া ফুলের মতো,
অবশেষে হল
মঞ্জুলিকার বয়স ভরা ষোলো।
কখন শিশুকালে
হৃদয়-লতার পাতার অন্তরালে
বেরিয়েছিল একটি কুঁড়ি
প্রাণের গোপন রহস্যতল ফুঁড়ি;
জানত না তো আপনাকে সে,
শুধায় নি তার নাম কোনোদিন বাহির হতে খেপা বাতাস এসে,

সেই কুঁড়ি আজ অন্তরে তার উঠছে ফুটে
মধুর রসে ভরে উঠে'।
সে যে প্রেমের ফুল
আপন রাঙা পাপড়িভারে আপনি সমাকুল।
আপনাকে তার চিনতে যে আর নাইকো বাকি,
তাইতো থাকি থাকি
চমকে ওঠে নিজের পানে চেয়ে।
আকাশপারের বাণী তারে ডাক দিয়ে যায় আলোর ঝরনা বেয়ে;
রাতের অন্ধকারে
কোন্ অসীমের রোদনভরা বেদন লাগে তারে।
বাহির হতে তার
ঘুচে গেছে সকল অলংকার;
অন্তর তার রাঙিয়ে ওঠে স্তরে স্তরে,
তাই দেখে সে আপনি ভেবে মরে।
কখন কাজের ফাঁকে
জানলা ধরে চুপ করে সে বাইরে চেয়ে থাকে—
যেখানে ওই শজনে গাছের ফুলের ঝুরি বেড়ার গায়ে
রাশি রাশি হাসির ঘায়ে
আকাশটারে পাগল করে দিবসরাতি।

যে ছিল তার ছেলেবেলার খেলাঘরের সাথি
আজ সে কেমন করে
জলস্থলের হৃদয়খানি দিল ভরে।
অরূপ হয়ে সে যেন আজ সকল রূপে রূপে
মিশিয়ে গেল চুপে চুপে।
পায়ের শব্দ তারি
মর্মরিত পাতায় পাতায় গিয়েছে সঞ্চারি।
কানে কানে তারি করুণ বাণী
মৌমাছিদের পাখার গুনগুনানি।

মেয়ের নীরব মুখে
কী দেখে মা, শেল বাজে তার বুকে।
না-বলা কোন্ গোপন কথার মায়া
মঞ্জুলিকার কালো চোখে ঘনিয়ে তোলে জলভরা এক ছায়া
অশ্রু-ভেজা গভীর প্রাণের ব্যথা
এনে দিল অধরে তার শরৎনিশির স্তব্ধ ব্যাকুলতা।
মায়ের মুখে অন্ন রোচে নাকো—
কেঁদে বলে, "হায় ভগবান, অভাগীরে ফেলে কোথায় থাক।

একদা বাপ দুপুরবেলায় ভোজন সাঙ্গ করে
গুড়গুড়িটার নলটা মুখে ধরে,
ঘুমের আগে, যেমন চিরাভ্যাস,
পড়তেছিলেন ইংরেজি এক প্রেমের উপন্যাস।
মা বললেন, বাতাস করে গায়ে,
কখনো বা হাত বুলিয়ে পায়ে,
"যার খুশি সে নিন্দে করুক, মরুক বিষে জ্বরে
আমি কিন্তু পারি যেমন করে
মঞ্জুলিকার দেবই দেব বিয়ে।"

বাপ বললেন, কঠিন হেসে, "তোমরা মায়ে ঝিয়ে
এক লগ্নেই বিয়ে ক'রো আমার মরার পরে,
সেই কটা দিন থাকো ধৈর্য ধরে।"
এই বলে তাঁর গুড়গুড়িতে দিলেন মৃদু টান।
মা বললেন, "উঃ কী পাষাণ প্রাণ,
স্নেহমায়া কিচ্ছু কি নেই ঘটে।"
বাপ বললেন, "আমি পাষাণ বটে।
ধর্মের পথ কঠিন বড়ো, ননির পুতুল হলে
এতদিনে কেঁদেই যেতেম গলে।"

মা বললেন, "হায় রে কপাল। বোঝাবই বা কারে।
তোমার এ সংসারে
ভরা ভোগের মধ্যখানে দুয়ার এঁটে
পলে পলে শুকিয়ে মরবে ছাতি ফেটে
একলা কেবল একটুকু ঐ মেয়ে,
ত্রিভুবনে অধর্ম আর নেই কিছু এর চেয়ে।
তোমার পুঁথির শুকনো পাতায় নেই তো কোথাও প্রাণ,
দরদ কোথায় বাজে সেটা অন্তর্যামী জানেন ভগবান।"

বাপ একটু হাসল কেবল, ভাবলে, "মেয়েমানুষ
হৃদয়তাপের ভাপে-ভরা ফানুস।
জীবন একটা কঠিন সাধন—নেই সে ওদের জ্ঞান।"
এই বলে ফের চলল পড়া ইংরেজি সেই প্রেমের উপাখ্যান।

দুখের তাপে জ্বলে জ্বলে অবশেষে নিবল মায়ের তাপ;
সংসারেতে একা পড়লেন বাপ।
বড়ো ছেলে বাস করে তার স্ত্রীপুত্রদের সাথে
বিদেশে পাটনাতে।
দুই মেয়ে তার কেউ থাকে না কাছে,
শ্বশুরবাড়ি আছে।
একটি থাকে ফরিদপুরে,
আরেক মেয়ে থাকে আরো দূরে
মাদ্রাজে কোন্ বিন্ধ্যাগিরির পার।
পড়ল মঞ্জুলিকার 'পরে বাপের সেবাভার।
রাঁধুনে ব্রাহ্মণের হাতে খেতে করেন ঘৃণা,
স্ত্রীর রান্না বিনা
অন্নপানে হত না তাঁর রুচি।
সকালবেলায় ভাতের পালা, সন্ধ্যাবেলায় রুটি কিংবা লুচি;
ভাতের সঙ্গে মাছের ঘটা,
ভাজাভুজি হত পাঁচটা-ছটা;

পাঁঠা হত রুটি-লুচির সাথে।
মঞ্জুলিকা দুবেলা সব আগাগোড়া রাঁধে আপন হাতে।
একাদশী ইত্যাদি তার সকল তিথিতেই
রাঁধার ফর্দ এই।
বাপের ঘরটি আপনি মোছে ঝাড়ে
রৌদ্রে দিয়ে গরম পোশাক আপনি তোলে পাড়ে।
ডেস্কে বাক্সে কাগজপত্র সাজায় থাকে থাকে,
ধোবার বাড়ির ফর্দ টুকে রাখে।
গয়লানী আর মুদির হিসাব রাখতে চেষ্টা করে,
ঠিক দিতে ভুল হলে তখন বাপের কাছে ধমক খেয়ে মরে।
কাসুন্দি তার কোনোমতেই হয় না মায়ের মতো,
তাই নিয়ে তার কত
নালিশ শুনতে হয়।
তা ছাড়া তার পান-সাজাটা মনের মতো নয়।
মায়ের সঙ্গে তুলনাতে পদেপদেই ঘটে যে তার ত্রুটি।
মোটামুটি—
আজকালকার মেয়েরা কেউ নয় সেকালের মতো।
হয়ে নীরব নত,
মঞ্জুলী সব সহ্য করে, সর্বদাই সে শান্ত,
কাজ করে অক্লান্ত।
যেমন করে মাতা বারংবার
শিশু ছেলের সহস্র আবদার
হেসে সকল বহন করেন স্নেহের কৌতুকে,
তেমনি করেই সুপ্রসন্ন মুখে
মঞ্জুলী তার বাপের নালিশ দণ্ডে দণ্ডে শোনে,
হাসে মনে মনে।
বাবার কাছে মায়ের স্মৃতি কতই মূল্যবান
সেই কথাটা মনে ক'রে গর্বসুখে পূর্ণ তাহার প্রাণ।
"আমার মায়ের যত্ন যে-জন পেয়েছে একবার
আর কিছু কি পছন্দ হয় তার।"

হোলির সময় বাপকে সেবার বাতে ধরল ভারি।
পাড়ায় পুলিন করছিল ডাক্তারি,
ডাকতে হল তারে।
হৃদয়যন্ত্র বিকল হতে পারে
ছিল এমন ভয়।
পুলিনকে তাই দিনের মধ্যে বারেবারেই আসতে যেতে হয়
মঞ্জুলী তার সনে
সহজভাবে কইবে কথা যতই করে মনে
ততই বাধে আরো।
এমন বিপদ কারো
হয় কি কোনোদিন।
গলাটি তার কাঁপে কেন, কেন এতই ক্ষীণ,
চোখের পাতা কেন
কিসের ভারে জড়িয়ে আসে যেন।
ভয়ে মরে বিরহিণী
শুনতে যেন পাবে কেহ রক্তে যে তা'র বাজে রিনিরিনি।
পদ্মপাতায় শিশির যেন, মনখানি তার বুকে
দিবারাত্রি টলছে কেন এমনতরো ধরা-পড়ার মুখে।

ব্যামো সেরে আসছে ক্রমে,
গাঁঠের ব্যথা অনেক এল কমে।
রোগী শয্যা ছেড়ে
একটু এখন চলে হাত-পা নেড়ে।
এমন সময় সন্ধ্যাবেলা
হাওয়ায় যখন যূথীবনের পরানখানি মেলা,
আঁধার যখন চাঁদের সঙ্গে কথা বলতে যেয়ে
চুপ ক'রে শেষ তাকিয়ে থাকে চেয়ে,
তখন পুলিন রোগী সেবার পরামর্শ-ছলে
মঞ্জুলীরে পাশের ঘরে ডেকে বলে—

"জান তুমি তোমার মায়ের সাধ ছিল এই চিতে
মোদের দোঁহার বিয়ে দিতে।
সে ইচ্ছাটি তাঁরি
পুরাতে চাই যেমন করেই পারি।
এমন করে আর কেন দিন কাটাই মিছিমিছি।"

"না না, ছি ছি, ছি ছি।"
এই ব'লে সে মঞ্জুলিকা দু-হাত দিয়ে মুখখানি তার ঢেকে
ছুটে গেল ঘরের থেকে।
আপন ঘরে দুয়ার দিয়ে পড়ল মেঝের 'পরে—
ঝরঝরিয়ে ঝরঝরিয়ে বুক ফেটে তার অশ্রু ঝরে পড়ে।
ভাবলে, "পোড়া মনের কথা এড়ায় নি ওঁর চোখ।
আর কেন গো। এবার মরণ হ'ক।"

মঞ্জুলিকা বাপের সেবায় লাগল দ্বিগুণ ক'রে
অষ্টপ্রহর ধরে।
আবশ্যকটা সারা হলে তখন লাগে অনাবশ্যক কাজে,
যে-বাসনটা মাজা হল আবার সেটা মাজে।
দু-তিন ঘণ্টা পর
একবার যে-ঘর ঝেড়েছে ফের ঝাড়ে সেই ঘর।
কখন যে স্নান, কখন যে তার আহার,
ঠিক ছিল না তাহার।
কাজের কামাই ছিল নাকো যতক্ষণ না রাত্রি এগারোটায়
শ্রান্ত হয়ে আপনি ঘুমে মেঝের 'পরে লোটায়।
যে দেখল সে-ই অবাক হয়ে রইল চেয়ে,
বললে, "ধন্যি মেয়ে।"

বাপ শুনে কয় বুক ফুলিয়ে, "গর্ব করি নেকো,
কিন্তু তবু আমার মেয়ে সেটা স্মরণ রেখো।

ব্রহ্মচর্য ব্রত
আমার কাছেই শিক্ষা যে ওর। নইলে দেখতে অন্যরকম হত।
আজকালকার দিনে
সংযমেরি কঠোর সাধন বিনে
সমাজেতে রয় না কোনো বাঁধ,
মেয়েরা তাই শিখছে কেবল বিবিয়ানার ছাঁদ।”

স্ত্রীর মরণের পরে যবে
সবেমাত্র এগারো মাস হবে,
গুজব গেল শোনা
এই বাড়িতে ঘটক করে আনাগোনা।
প্রথম শুনে মঞ্জুলিকার হয় নিকো বিশ্বাস,
তার পরে সব রকম দেখে ছাড়লে সে নিশ্বাস।
ব্যস্ত সবাই, কেমনতরো ভাব
আসছে ঘরে নানারকম বিলিতি আসবাব।
দেখলে বাপের নতুন করে সাজসজ্জা শুরু,
হঠাৎ কালো ভ্রমরকৃষ্ণ ভুরু,
পাকাচুল সব কখন হল কটা,
চাদরেতে যখন-তখন গন্ধ মাখার ঘটা।

মার কথা আজ মঞ্জুলিকার পড়ল মনে
বুকভাঙা এক বিষম ব্যথার সনে।
হ'ক না মৃত্যু, তবু
এ-বাড়ির এই হাওয়ার সঙ্গে বিরহ তাঁর ঘটে নাই তো কভু।
কল্যাণী সেই মূর্তিখানি সুধামাখা
এ সংসারের মর্মে ছিল আঁকা;
সাধ্বীর সেই সাধনপুণ্য ছিল ঘরের মাঝে,
তাঁরি পরশ ছিল সকল কাজে।
এ সংসারে তাঁর হবে আজ পরম মৃত্যু, বিষম অপমান—
সেই ভেবে যে মঞ্জুলিকার ভেঙে পড়ল প্রাণ।

ছেড়ে লজ্জাভয়
কন্যা তখন নিঃসংকোচে কয়
বাপের কাছে গিয়ে,—
"তুমি নাকি করতে যাবে বিয়ে।
আমরা তোমার ছেলেমেয়ে নাতনী-নাতি যত
সবার মাথা করবে নত?
মায়ের কথা ভুলবে তবে?
তোমার প্রাণ কি এত কঠিন হবে।"

বাবা বললে শুষ্ক হাসে,
"কঠিন আমি কেই বা জানে না সে?
আমার পক্ষে বিয়ে করা বিষম কঠোর কর্ম,
কিন্তু গৃহধর্ম
স্ত্রী না হলে অপূর্ণ যে রয়
মনু হতে মহাভারত সকল শাস্ত্রে কয়।
সহজ তো নয় ধর্মপথে হাঁটা,
এ তো কেবল হৃদয় নিয়ে নয়কো কাঁদাকাটা।
যে করে ভয় দুঃখ নিতে দুঃখ দিতে
সে কাপুরুষ কেনই আসে পৃথিবীতে।"

বাখরগঞ্জে মেয়ের বাপের ঘর।
সেথায় গেলেন বর
বিয়ের কদিন আগে। বৌকে নিয়ে শেষে
যখন ফিরে এলেন দেশে,
ঘরেতে নেই মঞ্জুলিকা। খবর পেলেন চিঠি পড়ে
পুলিন তাকে বিয়ে করে
গেছে দোঁহে ফরাক্কাবাদ চলে,
সেইখানেতেই ঘর পাতবে ব'লে।
আগুন হয়ে বাপ
বারে বারে দিলেন অভিশাপ।

মালা

আমি যেদিন সভায় গেলেম প্রাতে,
সিংহাসনে রানীর হাতে
ছিল সোনার থালা,
তারি 'পরে একটি শুধু ছিল মণির মালা।

কাশী কাঞ্চী কানোজ কোশল অঙ্গ বঙ্গ মদ্র মগধ হতে
বহুমুখী জনধারার স্রোতে
দলে দলে যাত্রী আসে
ব্যগ্র কলোচ্ছ্বাসে।
যারে শুধাই "কোথায় যাবে?" সে-ই তখনি বলে
"রানীর সভাতলে।"
যারে শুধাই "কেন যাবে?" কয় সে তেজে চক্ষে দীপ্ত জ্বালা
"নেব বিজয়মালা।"

কেউ বা ঘোড়ায় কেউ বা রথে
ছুটে চলে, বিরাম চায় না পথে।
মনে যেন আগুন উঠল খেপে,
চঞ্চলিত বীণার তারে যৌবন মোর উঠল কেঁপে কেঁপে।
মনে মনে কইনু হর্ষে, "ওগো জ্যোতির্ময়ী,
তোমার সভায় হব আমি জয়ী।
শূন্য ক'রে থালা
নেব বিজয়মালা।"

একটি ছিল তরুণ যাত্রী, করুণ তাহার মুখ,
প্রভাত-তারার মতো যে তার নয়নদুটি কী লাগি উৎসুক।
সবাই যখন ছুটে চলে
সে যে তরুর তলে

আপন মনে বসে থাকে।
আকাশ যেন শুধায় তাকে—
যার কথা সে ভাবে কী তার নাম।
আমি তারে যখন শুধালাম—
"মালার আশায় যাও বুঝি ঐ হাতে নিয়ে শূন্য তোমার ডালা ?"
সে বলে, "ভাই, চাই নে বিজয়মালা !"

তারে দেখে সবাই হাসে ;
মনে ভাবে, "এও কেন মোদের সাথে আসে
আশা করার ভরসাও যার নাইকো মনে,
আগে হতেই হার মেনে যে চলে রণে।"
সবার তরে জায়গা সে দেয় মেলে,
আগেভাগে যাবার লাগি ছুটে যায় না আর-সবারে ঠেলে।
কিন্তু নিত্য সজাগ থাকে ;
পথ চলেছে যেন রে কার বাঁশির অধীর ডাকে
হাতে নিয়ে রিক্ত আপন থালা ;
তবু বলে, চায় না বিজয়মালা।

সিংহাসনে একলা ব'সে রানী
মূর্তিমতী বাণী।
ঝংকারিয়া গুঞ্জরিয়া সভার মাঝে
আমার বীণা বাজে।
কখনো বা দীপক রাগে
চমক লাগে,
তারা বৃষ্টি করে ;
কখনো বা মল্লারে তার অশ্রুধারার পাগল-ঝোরা ঝরে।
আর সকলে গান শুনিয়ে নতশিরে
সন্ধ্যাবেলার অন্ধকারে ধীরে ধীরে
গেছে ঘরে ফিরে।

তারা জানে, যেই ফুরাবে আমার পালা,
আমি পাব রানীর বিজয়মালা।

আমাদের সেই তরুণ সাথি বসে থাকে ধুলায় আসনতলে;
কথাটি না ব'লে।
দৈবে যদি একটি-আধটি চাঁপার কলি
পড়ে স্খলি
রানীর আঁচল হতে মাটির 'পরে,
সবার অগোচরে
সেইটি যত্নে নিয়ে তুলে
পরে কর্ণমূলে।
সভাভঙ্গ হবার বেলায় দিনের শেষে
যদি তারে বলি হেসে—
"প্রদীপ জ্বালার সময় হল সাঁঝে
এখনো কি রইবে সভামাঝে।"
সে হেসে কয়, "সব সময়েই আমার পালা,
আমি যে ভাই চাই নে বিজয়মালা।"

আষাঢ় শ্রাবণ অবশেষে
গেল ভেসে
ছিন্নমেঘের পালে,—
গুরু গুরু মৃদঙ্গ তার বাজিয়ে দিয়ে আমার গানের তালে।
শরৎ এল, শরৎ গেল চলে;
নীল আকাশের কোলে
রৌদ্রজলের কান্নাহাসি হল সারা;
আমার সুরের থরে থরে ছড়িয়ে গেল শিউলিফুলের ঝারা।
ফাগুন-চৈত্র আম-মউলের সৌরভে আতুর,
দখিন হাওয়ায় আঁচল ভরে নিয়ে গেল আমার গানের সুর।
কণ্ঠে আমার একে একে সকল ঋতুর গান
হল অবসান।

তখন রানী আসন হতে উঠে'
আমার করপুটে
তুলে দিলেন, শূন্য ক'রে থালা,
আপন বিজয়মালা।

পথে যখন বাহির হলেম মালা মাথায় প'রে
মনে হল বিশ্ব আমার চতুর্দিকে ঘোরে
ঘূর্ণি ধুলার মতো।
মানুষ শত শত
ঘিরল আমায় দলে দলে—
কেউ বা কৌতূহলে,
কেউ বা স্তুতিচ্ছলে,
কেউ বা গ্লানির পঙ্ক দিতে গায়।
হায় রে হায়
এক নিমেষে স্বচ্ছ আকাশ ধূসর হয়ে যায়।
এই ধরণীর লাজুক যত সুখ,
ছোটোখাটো আনন্দেরি সরল হাসিটুক,
নদীচরের ভীরু হংসদলের মতো
কোথায় হল গত।
আমি মনে মনে ভাবি, "এ কি দহনজ্বালা
আমার বিজয়মালা।"

ওগো রানী, তোমার হাতে আর কিছু কি নেই।
শুধু কেবল বিজয়মালা এই ?
জীবন আমার জুড়ায় না যে ;
বক্ষে বাজে
তোমার মালার ভার ;—
এই যে পুরস্কার
এ তো কেবল বাইরে আমার গলায় মাথায় পরি ;

কী দিয়ে যে হৃদয় ভরি
সেই তো খুঁজে মরি।
তৃষ্ণা আমার বাড়ে শুধু মালার তাপে;
কিসের শাপে
ওগো রানী শূন্য ক'রে তোমার সোনার থালা
পেলেম বিজয়মালা?

আমার কেমন মনে হল আরো যেন অনেক কাছে বাকি-
সে নইলে সব ফাঁকি।
এ শুধু আধখানা,
কোন্ মানিকের অভাব আছে এ মালা তাই কানা;
হয় নি পাওয়া সেই কথাটাই কেন মনের মাঝে
এমন করে বাজে।
চল্ রে ফিরে বিড়ম্বিত আবার ফিরে চল্,
দেখবি খুঁজে বিজন সভাতল,—
যদি রে তোর ভাগ্যদোষে
ধুলায় কিছু পড়ে থাকে খসে।
যদি সোনার থালা
লুকিয়ে রাখে আর-কোনো এক মালা।

সন্ধ্যাকাশে শান্ত তপন হাওয়া;
দেখি সভার দুয়ার বন্ধ, ক্ষান্ত তখন সকল চাওয়া-পাওয়া।
নাই কোলাহল, নাইকো ঠেলাঠেলি,
তরুশ্রেণী স্তব্ধ যেন শিবের মতন যোগের আসন মেলি।
বিজন পথে আঁধার গগনতলে
আমার মালার রতনগুলি আর কি তেমন জ্বলে।
আকাশের ঐ তারার কাছে
লজ্জা পেয়ে মুখ লুকিয়ে আছে।
দিনের আলোয় ভুলিয়েছিল মুগ্ধ আঁখি
আঁধারে তার ধরা পড়ল ফাঁকি।

এরি লাগি এত বিবাদ, সারাদিনের এত দুখের পালা ?
লও ফিরে লও তোমার বিজয়মালা।

ঘনিয়ে এল রাতি।
হঠাৎ দেখি তারার আলোয় সেই যে আমার পথের তরুণ সাথি
আপন মনে
গান গেয়ে যায় রানীর কুঞ্জবনে।
আমি তারে শুধাই ধীরে, "কোথায় তুমি এই নিভৃতের মাঝে
রয়েছ কোন্‌ কাজে।"
সে হেসে কয়, "ফুরিয়ে গেলে সভার পালা,
ফুরিয়ে গেলে জয়ের মালা,
তখন রানীর আসন পড়ে বকুলবীথিকাতে,
আমি একা বীণা বাজাই রাতে।"
শুধাই তারে, "কী পেলে তাঁর কাছে।"
সে কয় শুনে, "এই যে আমার বুকের মাঝে আলো করে আছে।
কেউ দেখে নি রানীর কোলে পদ্মপাতার ডালা,
তারি মধ্যে গোপন ছিল, জয়মালা নয়, এ যে বরণমালা।"

ভোলা

হঠাৎ আমার হল মনে
শিবের জটার গঙ্গা যেন শুকিয়ে গেল অকারণে ;—
থামল তাহার হাস্য-উছল বাণী ;
থামল তাহার নৃত্য-নূপুর ঝরঝরানি ;
সূর্য-আলোর সঙ্গে তাহার ফেনার কোলাকুলি,
হাওয়ার সঙ্গে ঢেউয়ের দোলাদুলি
স্তব্ধ হল এক নিমেষে
বিজু যখন চলে গেল মরণপারের দেশে
বাপের বাহুর বাঁধন কেটে।

মনে হল আমার ঘরের সকাল যেন মরেছে বুক ফেটে।
ভোরবেলা তার বিষম গণ্ডগোলে
ঘুম-ভাঙনের সাগরমাঝে আর কি তুফান তোলে।
ছুটোছুটির উপদ্রবে
ব্যস্ত হত সবে,
হাঁ হাঁ করে ছুটে আসত "আরে আরে করিস কী তুই" ব'লে ;
ভূমিকম্পে গৃহস্থালি উঠত যেন টলে।
আজ যত তার দস্যুপনা, যা-কিছু হাঁকডাক
চাক-ভরা মৌমাছির মতো উড়ে গেছে শূন্য করে চাক।
আমার এ সংসারে
অত্যাচারের সুধা-উৎস বন্ধ হয়ে গেল একেবারে ;
তাই এ ঘরের প্রাণ
লোটায় ম্রিয়মাণ
জল-পালানো দিঘির পদ্ম যেন।
খাট-পালঙ্ক শূন্যে চেয়ে শুধায় শুধু, "কেন, নাই সে কেন।"
সবাই তারে দুষ্টু বলত, ধরত আমার দোষ,
মনে করত শাসন বিনা বড়ো হলে ঘটাবে আপসোস।
সমুদ্র-ঢেউ যেমন বাঁধন টুটে
ফেনিয়ে গড়িয়ে গর্জে ছুটে
ফিরে ফিরে ফুলে ফুলে কূলে কূলে দুলে দুলে পড়ে লুটে লুটে
ধরার বক্ষতলে,
দুরন্ত তার দুষ্টুমিটি তেমনি বিষম বলে
দিনের মধ্যে সহস্রবার করে
বাপের বক্ষ দিত অসীম চঞ্চলতায় ভরে।
বয়সের এই পর্দা-ঘেরা শান্ত ঘরে
আমার মধ্যে একটি সে কোন্ চির-বালক লুকিয়ে খেলা করে ;
বিজুর হাতে পেলে নাড়া
সেই যে দিত সাড়া।
সমান-বয়স ছিল আমার কোন্খানে তার সনে,
সেইখানে তার সাথি ছিলেম সকল প্রাণে মনে।

আমার বক্ষ সেইখানে এক-তালে,
উঠত বেজে তারি খেলার অশান্ত গোলমালে।
বৃষ্টিধারা সাথে নিয়ে মোদের দ্বারে ঝড় দিত যেই হানা
কাটিয়ে দিয়ে বিজুর মায়ের মানা
অট্ট হেসে আমরা দোঁহে
মাঠের মধ্যে ছুটে গেছি উদ্দাম বিদ্রোহে।
পাকা আমের কালে
তারে নিয়ে বসে গাছের ডালে
দুপুরবেলায় খেয়েছি আম করে কাড়াকাড়ি—
তাই দেখে সব পাড়ার লোকে বলে গেছে, “বিষম বাড়াবাড়ি।”
বারে বারে
আমার লেখার ব্যাঘাত হত, বিজুর মা তাই রেগে বলত তারে
“দেখিস নে তোর বাবা আছেন কাজে ?”
বিজু তখন লাজে
বাইরে চলে যেত। আমার দ্বিগুণ ব্যাঘাত হত লেখাপড়ায় ;
মনে হত, “টেবিলখানা কেউ কেন না নড়ায়।”

ভোর না হতে রাতি
সেদিন যখন বিজু গেল ছেড়ে খেলা, ছেড়ে খেলার সাথি,
মনে হল এতদিনে বুড়োবয়সখানা
পুরল ষোলো আনা।
কাজের ব্যাঘাত হবে না আর কোনোমতে,
চলব এবার প্রবীণতার পাকা পথে
লক্ষ্য করে বৈতরণীর ঘাট,
গম্ভীরতার স্তম্ভিত ভার বহন করে প্রাণটা হবে কাঠ।
সময় নষ্ট হবে না আর দিনে রাতে
দৌড়োবে মন লেখার খাতার শুকনো পাতে পাতে,—
বৈঠকেতে চলবে আলোচনা
কেবলি সৎপরামর্শ কেবলি সদ্‌বিবেচনা।

ঘরের সকল আকাশ ব্যেপে
দারুণ শূন্য রয়েছে মোর চৌকি-টেবিল চেপে।
তাই সেথানে টিকতে নাহি পারি ;
বৈরাগ্যে মন ভারি,
উঠোনেতে করছিনু পায়চারি।
এমন সময় উঠল মাটি কেঁপে
হঠাৎ কে এক ঝড়ের মতো বুকের 'পরে পড়ল আমায় ঝেঁপে
চমক লাগল শিরে শিরে,
হঠাৎ মনে হল বুঝি বিজুই আমার এল আবার ফিরে।
আমি শুধাই, "কে রে, কী রে।"
"আমি ভোলা", সে শুধু এই কয়,
এই যেন তার সকল পরিচয়,
আর কিছু নেই বাকি।
আমি তখন অচেনারে দু-হাত দিয়ে বক্ষে চেপে রাখি,
সে বললে "ঐ বাইরে তেঁতুলগাছে
ঘুড়ি আমার আটকে আছে
ছাড়িয়ে দাও না এসে।"
এই বলে সে
হাত ধরে মোর চলল নিয়ে টেনে।

ওরে ওরে এইমতো যার হাজার হুকুম মেনে
কেটেছিল নটা বছর, তারি হুকুম আজো মর্ত্যতলে
ঘুরে বেড়ায় তেমনি নানান ছলে।
ওরে ওরে বুঝে নিলেম আজ
ফুরোয় নি মোর কাজ।
আমার রাজা, আমার সখা, আমার বাছা আজো
কত সাজেই সাজো।
নতুন হয়ে আমার বুকে এলে,
চিরদিনের সহজ পথটি আপনি খুঁজে পেলে।
আবার আমার লেখার সময় টেবিল গেল নড়ে,

আবার হঠাৎ উলটে পড়ে
দোয়াত হল খালি,
খাতার পাতায় ছড়িয়ে গেল কালি।
আবার কুড়োই ঝিনুক শামুক নুড়ি
গোলা নিয়ে আবার ছোঁড়াছুঁড়ি।
আবার আমার নষ্ট সময় ভ্রষ্ট কাজে
উলটপালট গণ্ডগোলের মাঝে
ফেলাছড়া-ভাঙাচোরার 'পর
আমার প্রাণের চিরবালক নতুন করে বাঁধল খেলাঘর
বয়সের এই দুয়ার পেয়ে খোলা।
আবার বক্ষে লাগিয়ে দোলা
এল তার দৌরাত্ম্য নিয়ে এই ভুবনের চিরকালের ভোলা।

ছিন্ন পত্র

কর্ম যখন দেবতা হয়ে জুড়ে বসে পূজার বেদী,
মন্দিরে তার পাষাণ-প্রাচীর অভ্রভেদী
চতুর্দিকেই থাকে ঘিরে ;
তারি মধ্যে জীবন যখন শুকিয়ে আসে ধীরে ধীরে
পায় না আলো, পায় না বাতাস, পায় না ফাঁকা, পায় না কোনো রস,
কেবল টাকা, কেবল সে পায় যশ,
তখন সে কোন্ মোহের পাকে
মরণদশা ঘটেছে তার, সেই কথাটাই ভুলে থাকে।

আমি ছিলেম জড়িয়ে পড়ে সেই বিপাকের ফাঁসে ;
বৃহৎ সর্বনাশে
হারিয়েছিলেম বিশ্বজগৎখানি।
নীল আকাশের সোনার বাণী

সকাল-সাঁঝের বীণার তারে
পৌঁছোত না মোর বাতায়ন-দ্বারে।
ঋতুর পরে আসত ঋতু শুধু কেবল পঞ্জিকারি পাতে,
আমার আঙিনাতে
আনত না তার রঙিন পাতার ফুলের নিমন্ত্রণ।
অন্তরে মোর লুকিয়ে ছিল কী যে সে ক্রন্দন
জানব এমন পাই নি অবকাশ।
প্রাণের উপবাস
সংগোপনে বহন করে কর্মরথে
সমারোহে চলতেছিলেম নিষ্ফলতার মরুপথে।
তিনটে চারটে সভা ছিল জুড়ে আমার কাঁধ;
দৈনিকে আর সাপ্তাহিকে ছাড়তে হত নকল সিংহনাদ;
বীডন কুঞ্জে মীটিং হলে আমি হতেম বক্তা;
রিপোর্ট লিখতে হত তক্তা তক্তা;
যুদ্ধ হত সেনেট-সিণ্ডিকেটে,
তার উপরে আপিস আছে, এমনি করে কেবল খেটে খেটে
দিনরাত্রি যেত কোথায় দিয়ে।
বন্ধুরা সব বলত, "করছ কী এ।
মারা যাবে শেষে!"
আমি বলতেম হেসে,
"কী করি ভাই, খাটতে কি হয় সাধে।
একটু যদি ঢিল দিয়েছি অমনি গলদ বাধে,
কাজ বেড়ে যায় আরো—
কী করি তার উপায় বলতে পার?"
বিশ্বকর্মার সদর আপিস ছিল যেন আমার 'পরেই ন্যস্ত,
অহোরাত্রি এমনি আমার ভাবটা ব্যতিব্যস্ত।

সেদিন তখন দু-তিন রাত্রি ধরে
গত সনের রিপোর্টখানা লিখেছি খুব জোরে

বাছাই হবে নতুন সনের সেক্রেটারি
হপ্তা তিনেক মরতে হবে ভোট কুড়োতে তারি।
শীতের দিনে যেমন পত্রভার
খসিয়ে ফেলে গাছগুলো সব কেবল শাখা-সার,
আমার হল তেমনি দশা ;
সকাল হতে সন্ধ্যা-নাগাদ এক টেবিলেই বসা ;
কেবল পত্র রওনা করা,
কেবল শুকিয়ে মরা।
খবর আসে "খাবার তৈরি", নিই নে কথা কানে,
আবার যদি খবর আনে,
বলি ক্রোধের ভরে
"মরি এমন নেই অবসর, খাওয়া তো থাক পরে।"

বেলা যখন আড়াইটে প্রায়, নিঝুম হল পাড়া,
আর সকলে স্তব্ধ কেবল গোটাপাঁচেক চড়ুই পাখি ছাড়া ;
এমন সময় বেহারাটা ডাকের পত্র নিয়ে
হাতে গেল দিয়ে।
জরুরি কোন্ কাজের চিঠি ভেবে
খুলে দেখি বাঁকা লাইন, কাঁচা আখর চলছে উঠে নেবে,
নাইকো দাঁড়ি-কমা,
শেষ লাইনে নাম লেখা তার মনোরমা।
আর হল না পড়া,
মনে হল কোন্ বিধবার ভিক্ষাপত্র মিথ্যা কথায় গড়া,
চিঠিখানা ছিঁড়ে ফেলে আবার লাগি কাজে।
এমনি করে কোন্ অতলের মাঝে
হপ্তা তিনেক গেল ডুবে।
সূর্য ওঠে পশ্চিমে কি পুবে,
সেই কথাটাই ভুলে গেছি, চলছি এমন চোটে।
এমন সময় ভোটে

আমার হল হার,
শত্রুদলে আসন আমার করলে অধিকার ;
তাহার পরে খালি
কাগজপত্রে চলল গালাগালি ।

কাজের মাঝে অনেকটা ফাঁক হঠাৎ পড়ল হাতে,
সেটা নিয়ে কী করব তাই ভাবছি বসে আরামকেদারাতে ;
এমন সময় হঠাৎ দখিন-পবনভরে
ছেঁড়া চিঠির টুকরো এসে পড়ল আমার কোলের ’পরে ।
অন্যমনে হাতে তুলে
এই কথাটা পড়ল চোখে, “মনুরে কি গেছ এখন ভুলে ।”
মনু ?   আমার মনোরমা ?   ছেলেবেলার সেই মনু কি এই ।
অমনি হঠাৎ এক নিমেষেই
সকল শূন্য ভ’রে,
হারিয়ে-যাওয়া বসন্ত মোর বন্যা হয়ে ডুবিয়ে দিল মোরে ।
সেই তো আমার অনেক কালের পড়োশিনী,
পায়ে পায়ে বাজাত মল রিনিঝিনি ।
সেই তো আমার এই জনমের ভোর-গগনের তারা
অসীম হতে এসেছে পথহারা ;
সেই তো আমার শিশুকালের শিউলিফুলের কোলে
শুভ্র শিশির দোলে ;
সেই তো আমার মুগ্ধ চোখের প্রথম আলো,
এই ভুবনের সকল ভালোর প্রথম ভালো ।
মনে পড়ে, ঘুমের থেকে যেমনি জেগে ওঠা
অমনি ওদের বাড়ির পানে ছোটা ।
ওরি সঙ্গে শুরু হত দিনের প্রথম খেলা ;
মনে পড়ে, পিঠের ’পরে চুলটি মেলা
সেই আনন্দমূর্তিখানি, স্নিগ্ধ ডাগর আঁখি,
কণ্ঠ তাহার সুধায় মাখামাখি ।

অসীম ধৈর্যে সইত সে মোর হাজার অত্যাচার,
সকল কথায় মানত মন্টু হার।
উঠে গাছের আগডালেতে দোলা খেতেম জোরে,
ভয় দেখাতেম পড়ি-পড়ি ক'রে,
কাঁদো-কাঁদো কণ্ঠে তাহার করুণ মিনতি সে,
ভুলতে পারি কি সে।
মনে পড়ে নীরব ব্যথা তার,
বাবার কাছে যখন খেতেম মার;
ফেলেছে সে কত চোখেরজল,
মোর অপরাধ ঢাকা দিতে খুঁজত কত ছল।
আরো কিছু বড়ো হলে
আমার কাছে নিত সে তারবাংলা পড়া বলে।
নামতাটা তার কেবল যেত বেধে,
তাই নিয়ে মোর একটু হাসি সইত না সে, উঠত লাজে কেঁদে।
আমার হাতে মোটা মোটা ইংরেজি বই দেখে
ভাবত মনে, গেছে যেন কোন্ আকাশে ঠেকে
রাশীকৃত মোর বিদ্যার বোঝা।
যা-কিছু সব বিষম কঠিন, আমার কাছে যেন নেহাত সোজা।
হেনকালে হঠাৎ সেবার,
দশমীতে বারিগ্রামে ঠাকুর ভাসান দেবার
রাস্তা নিয়ে দুই পক্ষের চাকর-দরোয়ানে
বকাবকি লাঠালাঠি বেধে গেল গলির মধ্যখানে।
তাই নিয়ে শেষ বাবার সঙ্গে মন্টুর বাবার বাধল মকদ্দমা,
কেউ কাহারে করলে না আর ক্ষমা।
দুয়ার মোদের বন্ধ হল,
আকাশ যেন কালো মেঘে অন্ধ হল,
হঠাৎ এল কোন্ দশমী সঙ্গে নিয়ে ঝঞ্ঝার গর্জন,
মোর প্রতিমার হল বিসর্জন।

দেখাশোনা ঘুচল যখন এলেম যখন দূরে,
তখন প্রথম শুনতে পেলেম কোন্ প্রভাতী সুরে
প্রাণের বীণা বেজেছিল কাহার হাতে।
নিবিড় বেদনাতে
মুখখানি তার উঠল ফুটে আঁধার পটে সন্ধ্যাতারার মতো
একই সঙ্গে জানিয়ে দিলে সে যে আমার কত,
সে যে আমার কতখানিই নয়!
প্রেমের শিখা জ্বলল তখন, নিবল যখন চোখের পরিচয়।

কত বছর গেল চলে
আবার গ্রামে গিয়েছিলেম পরীক্ষা পাস হলে।
গিয়ে দেখি, ওদের বাড়ি কিনেছে কোন্ পাটের কুঠিয়াল,
হল অনেক কাল।
বিয়ে করে মনুর স্বামী
কোন্ দেশে যে নিয়ে গেছে, ঠিকানা তার খুঁজে না পাই আমি।
সেই মনু আজ এতকালের অজ্ঞাতবাস টুটে
কোন্ কথাটি পাঠাল তার পত্রপুটে।
কোন্ বেদনা দিল তারে নিষ্ঠুর সংসার—
মৃত্যু সে কি? ক্ষতি সে কি? সে কি অত্যাচার?
কেবল কি তার বাল্যসখার কাছে
হৃদয়ব্যথার সান্ত্বনা তার আছে।
ছিন্ন চিঠির বাকি
বিশ্বমাঝে কোথায় আছে খুঁজে পাব না কি?
“মনুরে কি গেছ ভুলে?”
এ প্রশ্ন কি অনন্ত কাল রইবে দুলে
মোর জগতের চোখের পাতায় একটি ফোঁটা চোখের জলের মতো?
কত চিঠির জবাব লিখব কত,
এই কথাটির জবাব শুধু নিত্য বুকে জ্বলবে বহ্নিশিখা
অক্ষরেতে হবে না আর লিখা।

কালো মেয়ে

মরচে-পড়া গরাদে ঐ, ভাঙা জানলাখানি ;
পাশের বাড়ির কালো মেয়ে নন্দরানী
ঐখানেতে বসে থাকে একা,
শুকনো নদীর ঘাটে যেন বিনা কাজে নৌকোখানি ঠেকা।

বছর বছর করে ক্রমে
বয়স উঠছে জমে।
বর জোটে না, চিন্তিত তার বাপ ;
সমস্ত এই পরিবারের নিত্য মনস্তাপ
দীর্ঘশ্বাসের ঘূর্ণি হাওয়ায় আছে যেন ঘিরে
দিবসরাত্রি কালো মেয়েটিরে।
সামনে-বাড়ির নিচের তলায় আমি থাকি "মেস্‌"-এ ;
বহুকষ্টে শেষে
কলেজেতে পার হয়েছি একটা পরীক্ষায়।
আর কি চলা যায়
এমন করে এগ্‌জামিনের লগি ঠেলে ঠেলে।
দুইবেলাতেই পড়িয়ে ছেলে
একটা বেলা খেয়েছি আধপেটা
ভিক্ষা করা সেটা
সইত না একবারে,
তবু গেছি প্রিন্সিপালের দ্বারে
বিনি মাইনেয়, নেহাত পক্ষে, আধা মাইনেয়, ভর্তি হবার জন্যে।
এক সময়ে মনে ছিল আধেক রাজ্য এবং রাজার কন্যে
পাবার আমার ছিল দাবি,
মনে ছিল ধনমানের রুদ্ধ ঘরের সোনার চাবি
জন্মকালে বিধি যেন দিয়েছিলেন রেখে
আমার গোপন শক্তিমাঝে ঢেকে।

আজকে দেখি নব্যবঙ্গে
শক্তিটা মোর ঢাকাই রইল, চাবিটা তার সঙ্গে।
মনে হচ্ছে ময়নাপাখির খাঁচায়
অদৃষ্ট তার দারুণ রঙ্গে ময়ূরটাকে নাচায়;
পদে পদে পুচ্ছে বাধে লোহার শলা,
কোন্ কৃপণের রচনা এই নাট্যকলা।
কোথায় মুক্ত অরণ্যানী, কোথায় মত্ত বাদল-মেঘের ভেরী।
এ কী বাঁধন রাখল আমায় ঘেরি।

ঘুরে ঘুরে উমেদারির ব্যর্থ আশে
শুকিয়ে মরি রোদ্দুরে আর উপবাসে।
প্রাণটা হাঁপায়, মাথা ঘোরে,
তক্তপোশে শুয়ে পড়ি ধপাস করে।
হাতপাখাটার বাতাস খেতে খেতে
হঠাৎ আমার চোখ পড়ে যায় উপরেতে,—
মরচে-পড়া গরাদে ঐ, ভাঙা জানলাখানি,
বসে আছে পাশের বাড়ির কালো মেয়ে নন্দরানী।
মনে হয় যে রোদের পরে বৃষ্টিভরা থমকে-যাওয়া মেঘে
ক্লান্ত পরান জুড়িয়ে গেল কালো পরশ লেগে।
আমি যে ওর হৃদয়খানি চোখের 'পরে স্পষ্ট দেখি আঁকা;—
ও যেন জুঁইফুলের বাগান সন্ধ্যা-ছায়ায় ঢাকা;
একটুখানি চাঁদের রেখা কৃষ্ণপক্ষে স্তব্ধ নিশীথ রাতে
কালো জলের গহন কিনারাতে।
লাজুক ভীরু ঝরনাখানি ঝিরি ঝিরি
কালো পাথর বেয়ে বেয়ে লুকিয়ে ঝরে ধীরি ধীরি।
রাত-জাগা এক পাখি,
মৃদু করুণ কাকুতি তার তারার মাঝে মিলায় থাকি থাকি।
ও যেন কোন্ ভোরের স্বপন কান্নাভরা,
ঘন ঘুমের নীলাঞ্চলের বাঁধন দিয়ে ধরা।

রাখাল ছেলের সঙ্গে বসে বটের ছায়ে
ছেলেবেলায় বাঁশের বাঁশি বাজিয়েছিলেম গাঁয়ে।
সেই বাঁশিটির টান
ছুটির দিনে হঠাৎ কেমন আকুল করল প্রাণ।
আমি ছাড়া সকল ছেলেই গেছে যে যার দেশে,
একলা থাকি "মেস্‌"-এ।
সকালসাঁঝে মাঝে মাঝে বাজাই ঘরের কোণে
মেঠো গানের সুর যা ছিল মনে।

ঐ যে ওদের কালো মেয়ে নন্দরানী
যেমনতরো ওর ভাঙা ঐ জানলাখানি,
যেখানে ওর কালো চোখের তারা
কালো আকাশতলে দিশাহারা ;
যেখানে ওর এলোচুলের স্তরে স্তরে
বাতাস এসে করত খেলা আলসভরে ;
যেখানে ওর গভীর মনের নীরব কথাখানি
আপন দোসর খুঁজে পেত আলোর নীরব বাণী ;
তেমনি আমার বাঁশের বাঁশি আপনভোলা,
চারদিকে মোর চাপা দেয়াল, ঐ বাঁশিটি আমার জানলা খোলা।
ঐখানেতেই গুটিকয়েক তান
ঐ মেয়েটির সঙ্গে আমার ঘুচিয়ে দিত অসীম ব্যবধান।
এ সংসারে অচেনাদের ছায়ার মতন আনাগোনা
কেবল বাঁশির সুরের দেশে দুই অজানার রইল জানাশোনা।
যে-কথাটা কান্না হয়ে বোবার মতন ঘুরে বেড়ায় বুকে
উঠল ফুটে বাঁশির মুখে।
বাঁশির ধারেই একটু আলো, একটুখানি হাওয়া,
যে-পাওয়াটি যায় না দেখা স্পর্শ-অতীত একটুকু সেই-পাওয়া।

আসল

বয়স ছিল আট,
পড়ার ঘরে বসে বসে ভুলে যেতেম পাঠ।
জানলা দিয়ে দেখা যেত মুখুজ্যেদের বাড়ির পাশে
একটুখানি প'ড়ো জমি, শুকনো শীর্ণ ঘাসে
দেখায় যেন উপবাসীর মতো।
পাড়ার আবর্জনা যত
ঐখানেতেই উঠছে জমে
একধারেতে ক্রমে
পাহাড়-সমান উঁচু হল প্রতিবেশীর রান্নাঘরের ছাই
গোটাকয়েক আকন্দগাছ, আর কোনো গাছ নাই;
দশ-বারোটা শালিখপাখি
তুমুল ঝগড়া বাধিয়ে দিয়ে করত ডাকাডাকি;
দুপুরবেলায় ভাঙা গলায় কাকের দলে
কী যে প্রশ্ন হাঁকত শূন্যে কিসের কৌতূহলে।

পাড়ার মধ্যে ঐ জমিটাই কোনো কাজের নয়;
সবার যাতে নাই প্রয়োজন লক্ষ্মীছাড়ার তাই ছিল সঞ্চয়:
তেলের ভাঙা ক্যানেস্তারা, টুকরো হাঁড়ির কানা,
অনেক কালের জীর্ণ বেতের কেদারা একখানা,
ফুটো এনামেলের গেলাস, থিয়েটারের ছেঁড়া বিজ্ঞাপন,
মরচে-পড়া টিনের লণ্ঠন,
সিগারেটের শূন্য বাক্স, খোলা চিঠির খাম,
অদরকারের মুক্তি হেথায়, অনাদরের অমর স্বর্গধাম।

তখন আমার বয়স ছিল আট,
করতে হত ভূবৃত্তান্ত পাঠ।
পড়ার ঘরের দেয়ালে চারপাশে
ম্যাপগুলো এই পৃথিবীকে ব্যঙ্গ করত নীরব পরিহাসে;

পাহাড়গুলো মরে-যাওয়া শুঁয়োপোকার মতো,
নদীগুলো যত
অচল রেখার মিথ্যা কথায় অবাক হয়ে রইত থতমত,
সাগরগুলো ফাঁকা,
দেশগুলো সব জীবনশূন্য কালো-আখর-আঁকা।
হাঁপিয়ে উঠত পরান আমার ধরণীর এই শিকল-রেখার রূপে,—
আমি চুপে চুপে
মেঝের 'পরে বসে যেতেম ঐ জানলার পাশে।
ঐ যেখানে শুকনো জমি শুকনো শীর্ণ ঘাসে
পড়ে আছে এলোখেলো, তাকিয়ে ওরি পানে
কার সাথে মোর মনের কথা চলত কানে কানে।
ঐ যেখানে ছাইয়ের গাদা আছে
বসুন্ধরা দাঁড়িয়ে হোথায় দেখা দিতেন এই ছেলেটির কাছে।
মাথার 'পরে উদার নীলাঞ্চল
সোনার আভায় করত ঝলমল।
সাত সমুদ্র তেরো নদীর সুদূর পারের বাণী
আমার কাছে দিতেন আনি।
ম্যাপের সঙ্গে হত না তার মিল,
বইয়ের সঙ্গে ঐক্য তাহার ছিল না এক তিল।
তার চেহারা নয় তো অমন মস্ত ফাঁকা
আঁচড়-কাটা আখর-আঁকা,—
নয় সে তো কোন্ মাইল-মাপা বিশ্ব,
অসীম যে তার দৃশ্য ; আবার অসীম সে অদৃশ্য।

এখন আমার বয়স হল ষাট,—
গুরুতর কাজের ঝঞ্ঝাট।
পাগল করে দিল পলিটিক্‌সে,
কোন্‌টা সত্য কোন্‌টা স্বপ্ন আজকে নাগাদ হয় নি জানা ঠিক সে ;
ইতিহাসের নজির টেনে, সোজা
একটা দেশের ঘাড়ে চাপাই আরেক দেশের কর্মফলের বোঝা,

সমাজ কোথায় পড়ে থাকে, নিয়ে সমাজতত্ত্ব
মাসিক পত্রে প্রবন্ধ উন্মত্ত।
যত লিখছি কাব্য
ততই নোংরা সমালোচন হতেছে অশ্রাব্য।
কথায় কেবল কথারি ফল ফলে,
পুঁথির সঙ্গে মিলিয়ে পুঁথি কেবলমাত্র পুঁথিই বেড়ে চলে

আজ আমার এই ষাট বছরের বয়সকালে
পুঁথির সৃষ্টি জগৎটার এই বন্দীশালে
হাঁপিয়ে উঠলে প্রাণ
পালিয়ে যাবার একটি আছে স্থান।
সেই মহেশের পাশে
পাড়ায় যারে পাগল বলে হাসে।
পাছে পাছে
ছেলেগুলো সঙ্গে যে তার লেগেই আছে।
তাদের কলরবে
নানান উপদ্রবে
একমুহূর্ত পায় না শান্তি,
তবু তাহার নাই কিছুতেই ক্লান্তি।
বেগার-খাটা কাজ
তারি ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে কেউ মানে না লাজ।
সকালবেলায় ধরে ভজন গলা ছেড়ে,
যতই সে গায়, বেসুর ততই চলে বেড়ে।
তাই নিয়ে কেউ ঠাট্টা করলে এসে
মহেশ বলে হেসে,
"আমার এ গান শোনাই যাঁরে,
বেসুর শুনে হাসেন তিনি, বুক ভরে সেই হাসির পুরস্কারে।
তিনি জানেন, সুর রয়েছে প্রাণের গভীর তলায়,
বেসুর কেবল পাগলের এই গলায়।"

সকল প্রয়োজনের বাহির সে যে সৃষ্টিছাড়া,
তার ঘরে তাই সকলে পায় সাড়া।
একটা রোগা কুকুর ছিল, নাম ছিল তার ভুতো,
একদা কার ঘরের দাওয়ায় ঢুকেছিল অনাহূত,—
মারের চোটে জরজর
পথের ধারে পড়ে ছিল মর-মর,
খোঁড়া কুকুরটারে
বাঁচিয়ে তুলে রাখলে মহেশ আপন ঘরের দ্বারে।
আরেকটি তার পোষ্য ছিল, ডাকনাম তার ঝুমি,
কেউ জানে না জাত যে কী তার, মুসলমান কি কাহার কিংবা কুর্মি।
সে-বছরে প্রয়াগেতে কুম্ভমেলায় নেয়ে
ফিরে আসতে পথে দেখে চার বছরের মেয়ে
কেঁদে বেড়ায় বেলা দুপুর ছুটোয়।
মা নাকি তার ওলাউঠোয়
মরেছে সেই সকালবেলায়;
মেয়েটি তাই বিষম ভিড়ের ঠেলায়
পাক খেয়ে সে বেড়াচ্ছিল ভয়েই ভেবাচেকা,—
মহেশকে যেই দেখা
কী ভেবে যে হাত বাড়াল জানি না কোন্ ভুলে;
অমনি পাগল নিল তারে কাঁধের 'পরে তুলে,
ভোলানাথের জটায় যেন ধুতরোফুলের কুঁড়ি;
সে অবধি তার ঘরের কোণটি জুড়ি
ঝুমি আছে ঐ পাগলের পাগলামির এক স্বচ্ছ শীতল ধারা
হিমালয়ে নির্ঝরিণীর পারা।
এখন তাহার বয়স হবে দশ,
খেতে শুতে অষ্টপ্রহর মহেশ তারি বশ।
আছে পাগল ঐ মেয়েটির খেলার পুতুল হয়ে
যত্নসেবার অত্যাচারটা সয়ে।
সন্ধ্যাবেলায় পাড়ার থেকে ফিরে
যেমনি মহেশ ঘরের মধ্যে ঢোকে ধীরে ধীরে,

পথ-হারানো মেয়ের বুকে আজো যেন জাগায় ব্যাকুলতা—
বুকের 'পরে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে গলা ধ'রে আবোলতাবোল কথা।
এই আদরের প্রথম-বানের টান
হলে অবসান
ওদের বাসায় আমি যেতেম রাতে।
সামান্য কোন্ কথা হত এই পাগলের সাথে।
নাইকো পুঁথি, নাইকো ছবি, নাই কোনো আসবাব,
চিরকালের মানুষ যিনি ঐ ঘরে তাঁর ছিল আবির্ভাব।
তারার মতো আপন আলো নিয়ে বুকের তলে—
যে-মানুষটি যুগ হতে যুগান্তরে চলে,
প্রাণখানি যাঁর বাঁশির মতো সীমাহীনের হাতে
সরল সুরে বাজে দিনে রাতে,
যাঁর চরণের স্পর্শে
ধুলায় ধুলায় বসুন্ধরা উঠল কেঁপে হর্ষে,—
আমি যেন দেখতে পেতেম তাঁরে
দীনের বাসায়, এই পাগলের ভাঙা ঘরের দ্বারে।
রাজনীতি আর সমাজনীতি পুঁথির যত বুলি
যেতেম সবই ভুলি।
ভুলে যেতেম রাজার কা'রা মস্ত বড়ো প্রতিনিধি
বালুর 'পরে রেখার মতো গড়ছে রাজ্য, লিখছে বিধানবিধি।

ঠাকুরদাদার ছুটি

তোমার ছুটি নীল আকাশে,
তোমার ছুটি মাঠে,
তোমার ছুটি থইহারা ঐ
দিঘির ঘাটে ঘাটে।
তোমার ছুটি তেঁতুলতলায়,
গোলাবাড়ির কোণে,

তোমার ছুটি ঝোপেঝাপে
পারুলডাঙার বনে।
তোমার ছুটির আশা কাঁপে
কাঁচা ধানের খেতে,
তোমার ছুটির খুশি নাচে
নদীর তরঙ্গেতে।

আমি তোমার চশমাপরা
বুড়ো ঠাকুরদাদা,
বিষয়-কাজের মাকড়সাটার
বিষম জালে বাঁধা।
আমার ছুটি সেজে বেড়ায়
তোমার ছুটির সাজে,
তোমার কণ্ঠে আমার ছুটির
মধুর বাঁশি বাজে।
আমার ছুটি তোমারি ঐ
চপল চোখের নাচে,
তোমার ছুটির মাঝখানেতেই
আমার ছুটি আছে।

তোমার ছুটির খেয়া বেয়ে
শরৎ এল মাঝি।
শিউলি-কানন সাজায় তোমার
শুভ্র ছুটির সাজি।
শিশির-হাওয়া শিরশিরিয়ে
কখন রাতারাতি
হিমালয়ের থেকে আসে
তোমার ছুটির সাথি।
আশ্বিনের এই আলো এল
ফুল-ফোটানো ভোরে

তোমার ছুটির রঙে রঙিন
চাদরখানি প'রে।

আমার ঘরে ছুটির বন্যা
তোমার লাফে-ঝাঁপে;
কাজকর্ম হিসাবকিতাব
থরথরিয়ে কাঁপে।
গলা আমার জড়িয়ে ধর,
ঝাঁপিয়ে পড় কোলে,
সেই তো আমার অসীম ছুটি
প্রাণের তুফান তোলে।
তোমার ছুটি কে যে জোগায়
জানি নে তার রীত,
আমার ছুটি জোগাও তুমি,
ঐখানে মোর জিত।

হারিয়ে-যাওয়া

ছোট্ট আমার মেয়ে
সঙ্গিনীদের ডাক শুনতে পেয়ে
সিঁড়ি দিয়ে নিচের তলায় যাচ্ছিল সে নেমে
অন্ধকারে ভয়ে ভয়ে থেমে থেমে।
হাতে ছিল প্রদীপখানি,
আঁচল দিয়ে আড়াল ক'রে চলছিল সাবধানী

আমি ছিলাম ছাতে
তারায় ভরা চৈত্রমাসের রাতে।
হঠাৎ মেয়ের কান্না শুনে, উঠে
দেখতে গেলেম ছুটে।

সিঁড়ির মধ্যে যেতে যেতে
প্রদীপটা তার নিবে গেছে বাতাসেতে।
শুধাই তারে, "কী হয়েছে, বামী।"
সে কেঁদে কয় নিচে থেকে, "হারিয়ে গেছি আমি।"

তারায় ভরা চৈত্রমাসের রাতে
ফিরে গিয়ে ছাতে
মনে হল আকাশপানে চেয়ে
আমার বামীর মতোই যেন অমনি কে এক মেয়ে
নীলাম্বরের আঁচলখানি ঘিরে
দীপশিখাটি বাঁচিয়ে একা চলছে ধীরে ধীরে।
নিবত যদি আলো, যদি হঠাৎ যেত থামি
আকাশ ভরে উঠত কেঁদে, "হারিয়ে গেছি আমি।"

শেষ গান

যারা আমার সাঁঝসকালের গানের দীপে জ্বালিয়ে দিলে আলো
আপন হিয়ার পরশ দিয়ে; এই জীবনের সকল সাদা কালো
যাদের আলোক-ছায়ার লীলা; মনের মানুষ বাইরে বেড়ায় যারা
তাদের প্রাণের ঝরনা-স্রোতে আমার পরান হয়ে হাজার ধারা
চলছে বয়ে চতুর্দিকে। নয় তো কেবল কালের যোগে আয়ু,
নয় সে কেবল দিনরজনীর সাতনলি হার, নয় সে নিশ্বাস-বায়ু।
নানান প্রাণের প্রীতির মিলন নিবিড় হয়ে স্বজনবন্ধুজনে
পরমায়ুর পাত্রখানি জীবনসুধায় ভরছে ক্ষণে ক্ষণে।
একের বাঁচন সবার বাঁচার বন্যাবেগে আপন সীমা হারায়
বহুদূরে; নিমেষগুলির ফলের গুচ্ছ ভরে রসের ধারায়।
অতীত হয়ে তবুও তারা বর্তমানের বৃন্তদোলায় দোলে,—
গর্ভ-বাঁধন কাটিয়ে শিশু তবু যেমন মায়ের বক্ষে কোলে

বন্দী থাকে নিবিড় প্রেমের গ্রন্থি দিয়ে। তাই তো যখন শেষে
একে একে আপন জনে সূর্য-আলোর অন্তরালের দেশে
আঁখির নাগাল এড়িয়ে পালায়, তখন রিক্ত শুষ্ক জীবন মম
শীর্ণ রেখায় মিলিয়ে আসে বর্ষাশেষের নির্ঝরিণীসম
শূন্য বালুর একটি প্রান্তে ক্লান্ত সলিল স্রস্ত অবহেলায়।
তাই যারা আজ রইল পাশে এই জীবনের সূর্য-ডোবার বেলায়
তাদের হাতে হাত দিয়ে তুই গান গেয়ে নে থাকতে দিনের আলো—
ব'লে নে ভাই, এই যে দেখা এই যে ছোঁওয়া, এই ভালো এই ভালো।
এই ভালো আজ এ সংগমে কান্নাহাসির গঙ্গাযমুনায়
ঢেউ খেয়েছি, ডুব দিয়েছি, ঘট ভরেছি, নিয়েছি বিদায়।
এই ভালো রে ফুলের সঙ্গে আলোয় জাগা, গান গাওয়া এই ভাষায়;
তারার সাথে নিশীথ রাতে ঘুমিয়ে-পড়া নূতন প্রাণের আশায়।

শেষ প্রতিষ্ঠা

এই কথা সদা শুনি, "গেছে চলে", "গেছে চলে।"
তবু রাখি ব'লে
ব'লো না, "সে নাই।"
সে-কথাটা মিথ্যা, তাই
কিছুতেই সহে না যে,
মর্মে গিয়ে বাজে।

মানুষের কাছে
যাওয়া-আসা ভাগ হয়ে আছে।
তাই তার ভাষা
বহে শুধু আধখানা আশা।
আমি চাই সেইখানে মিলাইতে প্রাণ
যে-সমুদ্রে আছে নাই পূর্ণ হয়ে রয়েছে সমান।

শিশু ভোলানাথ

শিশু ভোলানাথ

শিশু ভোলানাথ

ওরে মোর শিশু ভোলানাথ,
তুলি দুই হাত
যেখানে করিস পদপাত
বিষম তাণ্ডবে তোর লণ্ডভণ্ড হয়ে যায় সব ;
আপন বিভব
আপনি করিস নষ্ট হেলাভরে ;
প্রলয়ের ঘূর্ণ-চক্র'পরে
চূর্ণ খেলেনার ধূলি উড়ে দিকে দিকে ;
আপন সৃষ্টিকে
ধ্বংস হতে ধ্বংসমাঝে মুক্তি দিস অনর্গল,
খেলারে করিস রক্ষা ছিন্ন করি খেলেনা-শৃঙ্খল ।

অকিঞ্চন, তোর কাছে কিছুরি তো কোনো মূল্য নাই,
রচিস যা তোর ইচ্ছা তাই
যাহা খুশি তাই দিয়ে,
তার পর ভুলে যাস যাহা ইচ্ছা তাই নিয়ে ।
আবরণ তোরে নাহি পারে সম্বরিতে, দিগম্বর,
স্রস্ত ছিন্ন পড়ে ধূলি'পর ।
লজ্জাহীন সজ্জাহীন বিত্তহীন আপনা-বিস্মৃত,
অন্তরে ঐশ্বর্য তোর, অন্তরে অমৃত ।
দারিদ্র্য করে না দীন, ধূলি তোরে করে না অশুচি,
নৃত্যের বিক্ষোভে তোর সব গ্লানি নিত্য যায় ঘুচি ।

ওরে শিশু ভোলানাথ, মোরে ভক্ত ব'লে
নে রে তোর তাণ্ডবের দলে ;
দে রে চিত্তে মোর
সকল-ভোলার ঐ ঘোর,
খেলেনা-ভাঙার খেলা দে আমারে বলি।
আপন সৃষ্টির বন্ধ আপনি ছিঁড়িয়া যদি চলি
তবে তোর মত্ত নর্তনের চালে
আমার সকল গান ছন্দে ছন্দে মিলে যাবে তালে।

শিশুর জীবন

ছোটো ছেলে হওয়ার সাহস
আছে কি এক ফোঁটা,
তাই তো এমন বুড়ো হয়েই মরি।
তিলে তিলে জমাই কেবল,
জমাই এটা ওটা,
পলে পলে বাক্স বোঝাই করি।
কালকে-দিনের ভাবনা এসে
আজ-দিনেরে মারলে ঠেসে
কাল তুলি ফের পরদিনের বোঝা।
সাধের জিনিস ঘরে এনেই
দেখি, এনে ফল কিছু নেই
খোঁজের পরে আবার চলে খোঁজা।

ভবিষ্যতের ভয়ে ভীত
দেখতে না পাই পথ,
তাকিয়ে থাকি পরশু দিনের পানে,
ভবিষ্যৎ তো চিরকালই
থাকবে ভবিষ্যৎ,
ছুটি তবে মিলবে বা কোন্‌খানে ?

বুদ্ধি-দীপের আলো জ্বালি'
হাওয়ায় শিখা কাঁপছে খালি,—
হিসেব করে পা টিপে পথ হাঁটি।
মন্ত্রণা দেয় কতজনা,
সূক্ষ্ম বিচার-বিবেচনা,
পদে-পদে হাজার খুঁটিনাটি।

শিশু হবার ভরসা আবার
জাগুক আমার প্রাণে,
লাগুক হাওয়া নির্ভাবনার পালে,
ভবিষ্যতের মুখোশখানা
খসাব একটানে,
দেখব তারেই বর্তমানের কালে।
ছাদের কোণে পুকুরপারে
জানব নিত্য-অজানারে
মিশিয়ে রবে অচেনা আর চেনা ;
জমিয়ে ধুলো সাজিয়ে ঢেলা
তৈরি হবে আমার খেলা,
সুখ রবে মোর বিনামূল্যেই কেনা।

বড়ো হবার দায় নিয়ে, এই
বড়োর হাটে এসে
নিত্য চলে ঠেলাঠেলির পালা।
যাবার বেলায় বিশ্ব আমার
বিকিয়ে দিয়ে শেষে
শুধুই নেব ফাঁকা কথার ডালা !
কোন্‌টা সস্তা, কোন্‌টা দামি
ওজন করতে গিয়ে, আমি
বেলা আমার বইয়ে দেব দ্রুত,

সন্ধ্যা যখন আঁধার হবে
হঠাৎ মনে লাগবে তবে
কোনোটাই না হল মনঃপূত।

বাল্য দিয়ে যে-জীবনের
আরম্ভ হয় দিন
বাল্যে আবার হ'ক না তাহা সারা।
জলে স্থলে সঙ্গ আবার
পাক না বাঁধন-হীন,
ধুলায় ফিরে আসুক না পথহারা।
সম্ভাবনার ডাঙা হতে
অসম্ভবের উতল স্রোতে
দিই না পাড়ি স্বপন-তরী নিয়ে।
আবার মনে বুঝি না এই,
বস্তু বলে কিছুই তো নেই
বিশ্ব গড়া যা খুশি তাই দিয়ে।

প্রথম যেদিন এসেছিলেম
নবীন পৃথ্বীতলে
রবির আলোয় জীবন মেলে দিয়ে,
সে যেন কোন্ জগৎ-জোড়া
ছেলেখেলার ছলে,
কোথাথেকে কেই বা জানে কী এ!
শিশির যেমন রাতে রাতে,
কে যে তারে লুকিয়ে গাঁথে,
ঝিল্লি বাজায় গোপন ঝিনিঝিনি।
ভোরবেলা যেই চেয়ে দেখি,
আলোর সঙ্গে আলোর এ কী
ইশারাতে চলছে চেনাচিনি।

সেদিন মনে জেনেছিলেম
নীল আকাশের পথে
ছুটির হাওয়ায় ঘুর লাগাল বুঝি !
যা-কিছু সব চলেছে ঐ
ছেলেখেলার রথে
যে-যার আপন দোসর খুঁজি খুঁজি ।
গাছে খেলা ফুল-ভরানো
ফুলে খেলা ফল-ধরানো,
ফলের খেলা অঙ্কুরে অঙ্কুরে ।
স্থলের খেলা জলের কোলে,
জলের খেলা হাওয়ার দোলে,
হাওয়ার খেলা আপন বাঁশির সুরে ।

ছেলের সঙ্গে আছ তুমি
নিত্য ছেলেমানুষ,
নিয়ে তোমার মালমসলার ঝুলি ।
আকাশেতে ওড়াও তোমার
কতরকম ফানুস
মেঘে বোলাও রংবেরঙের তুলি ।
সেদিন আমি আপন মনে
ফিরেছিলেম তোমার সনে,
খেলেছিলেম হাত মিলিয়ে হাতে ।
ভাসিয়েছিলেম রাশি রাশি
কথায় গাঁথা কান্নাহাসি
তোমারি সব ভাসান-খেলার সাথে ।

ঋতুর তরী বোঝাই কর
রঙিন ফুলে ফুলে,
কালের স্রোতে যায় তারা সব ভেসে

আবার তারা ঘাটে লাগে
হাওয়ায় দুলে দুলে
এই ধরণীর কূলে কূলে এসে।
মিলিয়েছিলেম বিশ্ব-ডালায়
তোমার ফুলে আমার মালায়,
সাজিয়েছিলেম ঋতুর তরণীতে,
আশা আমার আছে মনে
বকুল কেয়া শিউলি সনে
ফিরে ফিরে আসবে ধরণীতে।

সেদিন যখন গান গেয়েছি
আপন মনে নিজে,
বিনা কাজে দিন গিয়েছে চলে,
তখন আমি চোখে তোমার
হাসি দেখেছি যে,
চিনেছিলে আমায় সাথি বলে।
তোমার ধুলো তোমার আলো
আমার মনে লাগত ভালো,
শুনেছিলেম উদাস-করা বাঁশি।
বুঝেছিলে সে-ফাল্গুনে
আমার সে-গান শুনে শুনে
তোমারো গান আমি ভালোবাসি।

দিন গেল ঐ মাঠে বাটে,
আঁধার নেমে প'ল ;
এপার থেকে বিদায় মেলে যদি
তবে তোমার সন্ধ্যেবেলার
খেয়াতে পাল তোলো,
পার হব এই হাটের ঘাটের নদী।

আবার, ওগো শিশুর সাথি,
শিশুর ভুবন দাও তো পাতি
করব খেলা তোমায় আমায় একা।
চেয়ে তোমার মুখের দিকে
তোমায়, তোমার জগৎটিকে
সহজ চোখে দেখব সহজ দেখা।

৪ কার্তিক ১৩২৮

তালগাছ

তালগাছ এক পায়ে দাঁড়িয়ে
সব গাছ ছাড়িয়ে
উঁকি মারে আকাশে।
মনে সাধ, কালো মেঘ ফুঁড়ে যায়
একেবারে উড়ে যায়;
কোথা পাবে পাখা সে?

তাই তো সে ঠিক তার মাথাতে
গোল গোল পাতাতে
ইচ্ছাটি মেলে তার,—
মনে মনে ভাবে, বুঝি ডানা এই,
উড়ে যেতে মানা নেই
বাসাখানি ফেলে তার।

সারাদিন ঝরঝর থখর
কাঁপে পাতা-পত্তর,
ওড়ে যেন ভাবে ও,
মনে মনে আকাশেতে বেড়িয়ে
তাহাদের এড়িয়ে
যেন কোথা যাবে ও।

তার পরে হাওয়া যেই নেমে যায়,
পাতা-কাঁপা থেমে যায়,
ফেরে তার মনটি
যেই ভাবে, মা যে হয় মাটি তার
ভালো লাগে আরবার
পৃথিবীর কোণটি।

২ কার্তিক ১৩২৮

বুড়ী

এক যে ছিল চাঁদের কোণায়
চরকা-কাটা বুড়ী
পুরাণে তার বয়স লেখে
সাত-শ হাজার কুড়ি।
সাদা সুতোয় জাল বোনে সে
হয় না বুনন সারা
পণ ছিল তার ধরবে জালে
লক্ষ কোটি তারা।

হেনকালে কখন আঁখি
পড়ল ঘুমে ঢুলে,
স্বপনে তার বয়সখানা
বেবাক গেল ভুলে।
ঘুমের পথে পথ হারিয়ে,
মায়ের কোলে এসে
পূর্ণ চাঁদের হাসিখানি
ছড়িয়ে দিল হেসে।

সন্ধ্যেবেলায় আকাশ চেয়ে
কী পড়ে তার মনে।
চাঁদকে করে ডাকাডাকি,
চাঁদ হাসে আর শোনে।
যে-পথ দিয়ে এসেছিল
স্বপন-সাগর তীরে
দু-হাত তুলে সে-পথ দিয়ে
চায় সে যেতে ফিরে।

হেনকালে মায়ের মুখে
যেমনি আঁখি তোলে
চাঁদে ফেরার পথখানি যে
তক্‌খনি সে ভোলে।
কেউ জানে না কোথায় বাসা
এল কী পথ বেয়ে,
কেউ জানে না এই মেয়ে সেই
আদ্যিকালের মেয়ে।

বয়সখানার খ্যাতি তবু
রইল জগৎ জুড়ি—
পাড়ার লোকে যে দেখে সেই
ডাকে, "বুড়ী বুড়ী"।
সব-চেয়ে যে পুরানো সে,
কোন্ মন্ত্রের বলে
সব-চেয়ে আজ নতুন হয়ে
নামল ধরাতলে।

১৫ ভাদ্র ১৩২৮

রবিবার

সোম মঙ্গল বুধ এরা সব
আসে তাড়াতাড়ি,
এদের ঘরে আছে বুঝি
মস্ত হাওয়াগাড়ি ?
রবিবার সে কেন, মা গো,
এমন দেরি করে ?
ধীরে ধীরে পৌছয় সে
সকল বারের পরে।
আকাশপারে তার বাড়িটি
দূর কি সবার চেয়ে ?
সে বুঝি, মা, তোমার মতো
গরিব-ঘরের মেয়ে ?

সোম মঙ্গল বুধের খেয়াল
থাকবারই জন্যেই,
বাড়ি-ফেরার দিকে ওদের
একটুও মন নেই।
রবিবারকে কে যে এমন
বিষম তাড়া করে,
ঘণ্টাগুলো বাজায় যেন
আধ ঘণ্টার পরে।
আকাশ-পারে বাড়িতে তার
কাজ আছে সব-চেয়ে
সে বুঝি, মা, তোমার মতো
গরিব-ঘরের মেয়ে।

সোম মঙ্গল বুধের যেন
মুখগুলো সব হাঁড়ি,

ছোটো ছেলের সঙ্গে তাদের
বিষম আড়াআড়ি।
কিন্তু শনির রাতের শেষে
যেমনি উঠি জেগে,
রবিবারের মুখে দেখি
হাসিই আছে লেগে।
যাবার বেলায় যায় সে কেঁদে
মোদের মুখে চেয়ে।
সে বুঝি, মা, তোমার মতো
গরিব ঘরের মেয়ে॥

৫ আশ্বিন ১৩২৮

সময়হারা

যত ঘণ্টা, যত মিনিট, সময় আছে যত
শেষ যদি হয় চিরকালের মতো,
তখন স্কুলে নেই বা গেলেম; কেউ যদি কয় মন্দ,
আমি বলব, "দশটা বাজাই বন্ধ।"
তাধিন তাধিন তাধিন।

শুই নে বলে রাগিস যদি, আমি বলব তোরে,
"রাত না হলে রাত হবে কী করে।
নটা বাজাই থামল যখন, কেমন করে শুই।
দেরি বলে নেই তো, মা, কিচ্ছুই।"
তাধিন তাধিন তাধিন।

যত জানিস রূপকথা, মা, সব যদি যাস বলে
রাত হবে না, রাত যাবে না চলে;
সময় যদি ফুরোয় তবে ফুরোয় না তো খেলা,
ফুরোয় না তো গল্প বলার বেলা।
তাধিন তাধিন তাধিন।

মনে পড়া

মাকে আমার পড়ে না মনে।
শুধু কখন খেলতে গিয়ে
হঠাৎ অকারণে
একটা কী সুর গুনগুনিয়ে
কানে আমার বাজে,
মায়ের কথা মিলায় যেন
আমার খেলার মাঝে।
মা বুঝি গান গাইত, আমার
দোলনা ঠেলে ঠেলে;
মা গিয়েছে, যেতে যেতে
গানটি গেছে ফেলে।

মাকে আমার পড়ে না মনে।
শুধু যখন আশ্বিনেতে
ভোরে শিউলিবনে
শিশির-ভেজা হাওয়া বেয়ে
ফুলের গন্ধ আসে,
তখন কেন মায়ের কথা
আমার মনে ভাসে?
কবে বুঝি আনত মা সেই
ফুলের সাজি বয়ে,
পুজোর গন্ধ আসে যে তাই
মায়ের গন্ধ হয়ে।

মাকে আমার পড়ে না মনে।
শুধু যখন বসি গিয়ে
শোবার ঘরের কোণে;

জানলা থেকে তাকাই দূরে
নীল আকাশের দিকে
মনে হয়, মা আমার পানে
চাইছে অনিমিখে।
কোলের 'পরে ধরে কবে
দেখত আমায় চেয়ে,
সেই চাউনি রেখে গেছে
সারা আকাশ ছেয়ে।

৯ আশ্বিন ১৩২৮

পুতুল ভাঙা

"সাত-আটটে সাতাশ," আমি
বলেছিলেম বলে
গুরুমশায় আমার 'পরে
উঠল রাগে জ্বলে।
মা গো, তুমি পাঁচ পয়সায়
এবার রথের দিনে
সেই যে রঙিন পুতুলখানি
আপনি দিলে কিনে
খাতার নিচে ছিল ঢাকা;
দেখালে এক ছেলে,
গুরুমশায় রেগেমেগে
ভেঙে দিলেন ফেলে।
বল্লেন, "তোর দিনরাত্তির
কেবল যত খেলা।
একটুও তোর মন বসে না
পড়াশুনোর বেলা!"

মা গো, আমি জানাই কাকে ?
ওঁর কি গুরু আছে ?
আমি যদি নালিশ করি
একুখনি তাঁর কাছে ?
কোনোরকম খেলার পুতুল
নেই কি, মা, ওঁর ঘরে ?
সত্যি কি ওঁর একটুও মন
নেই পুতুলের 'পরে ?
সকালসাঁজে তাদের নিয়ে
করতে গিয়ে খেলা
কোনো পড়ায় করেন নি কি
কোনোরকম হেলা ?
ওঁর যদি সেই পুতুল নিয়ে
ভাঙেন কেহ রাগে,
বল দেখি, মা, ওঁর মনে তা
কেমনতরো লাগে ?

৯ আশ্বিন ১৩২৮

মুর্খু

নেই বা হলেম যেমন তোমার
অম্বিকে গোঁসাই।
আমি তো, মা, চাই নে হতে
পণ্ডিতমশাই।
নাই যদি হই ভালো ছেলে,
কেবল যদি বেড়াই খেলে,
তুঁতের ডালে খুঁজে বেড়াই
গুটিপোকার গুটি,

মুখ্খু হয়ে রইব তবে ?
আমার তাতে কীই বা হবে,
মুখ্খু যারা তাদেরি তো
সমস্তখন ছুটি।

তারাই তো সব রাখাল ছেলে
গোরু চরায় মাঠে।
নদীর ধারে বনে বনে
তাদের বেলা কাটে।
ডিঙির 'পরে পাল তুলে দেয়,
ঢেউয়ের মুখে নাও খুলে দেয়,
ঝাউ কাটতে যায় চলে সব
নদীপারের চরে।
তারাই মাঠে মাচা পেতে
পাখি তাড়ায় ফসল-খেতে,
বাঁকে করে দই নিয়ে যায়
পাড়ার ঘরে ঘরে।

কাস্তে হাতে চুবড়ি মাথায়,
সন্ধ্যে হলে পরে
ফেরে গাঁয়ে কৃষাণ ছেলে,
মন যে কেমন করে।
যখন গিয়ে পাঠশালাতে
দাগা বুলোই খাতার পাতে,
গুরুমশাই দুপুরবেলায়
বসে বসে ঢোলে,
হাঁকিয়ে গাড়ি কোন্ গাড়োয়ান
মাঠের পথে যায় গেয়ে গান,
শুনে আমি পণ করি যে
মুখ্খু হব বলে।

দুপুরবেলায় চিল ডেকে যায় ;
হঠাৎ হাওয়া আসি
বাঁশবাগানে বাজায় যেন
সাপ খেলাবার বাঁশি ।
পুবের দিকে বনের কোলে
বাদল-বেলার আঁচল দোলে,
ডালে ডালে উছলে ওঠে
শিরীষফুলের ঢেউ ।
এরা যে পাঠ-ভোলার দলে
পাঠশালা সব ছাড়তে বলে,
আমি জানি এরা তো, মা,
পণ্ডিত নয় কেউ ।

যারা অনেক পুঁথি পড়েন
তাঁদের অনেক মান ।
ঘরে ঘরে সবার কাছে
তাঁরা আদর পান ।
সঙ্গে তাঁদের ফেরে চেলা,
ধুমধামে যায় সারাবেলা,
আমি তো, মা, চাই নে আদর
তোমার আদর ছাড়া ।
তুমি যদি, মুর্খু বলে
আমাকে মা না নাও কোলে
তবে আমি পালিয়ে যাব
বাদলা মেঘের পাড়া ।

সেখান থেকে বৃষ্টি হয়ে
ভিজিয়ে দেব চুল ।
ঘাটে যখন যাবে, আমি
করব হুলুস্থুল ।

রাত থাকতে অনেক ভোরে
আসব নেমে আঁধার করে,
ঝড়ের হাওয়ায় ঢুকব ঘরে
দুয়ার ঠেলে ফেলে,
তুমি বলবে মেলে আঁখি,
"দুষ্টু দেয়া খেপল না কি?"
আমি বলব, "খেপেছে আজ
তোমার মুর্খু ছেলে।

১০ আশ্বিন ১৩২৮

সাত সমুদ্র পারে

দেখছ না কি, নীল মেঘে আজ
আকাশ অন্ধকার।
সাত সমুদ্র তেরো নদী
আজকে হব পার।
নাই গোবিন্দ, নাই মুকুন্দ,
নাইকো হরিশ খোঁড়া,
তাই ভাবি যে কাকে আমি
করব আমার ঘোড়া।

কাগজ ছিঁড়ে এনেছি এই
বাবার খাতা থেকে,
নৌকো দে না বানিয়ে, অমনি
দিস, মা, ছবি এঁকে।
রাগ করবেন বাবা বুঝি
দিল্লি থেকে ফিরে?
ততক্ষণ যে চলে যাব
সাত সমুদ্র তীরে।

এমনি কি তোর কাজ আছে, মা,
কাজ তো রোজই থাকে
বাবার চিঠি এক্‌খুনি কি
দিতেই হবে ডাকে?
নাই বা চিঠি ডাকে দিলে
আমার কথা রাখো,
আজকে না হয় বাবার চিঠি
মাসি লিখুন নাকো!

আমার এ যে দরকারি কাজ
বুঝতে পার না কি?
দেরি হলেই একেবারে
সব যে হবে ফাঁকি।
মেঘ কেটে যেই রোদ উঠবে
বৃষ্টি বন্ধ হলে
সাত সমুদ্র তেরো নদী
কোথায় যাবে চলে!

১০ আশ্বিন [১৩২৮]

জ্যোতিষী

ঐ যে রাতের তারা
জানিস কি, মা, কারা?
সারাটিখন ঘুম না জানে
চেয়ে থাকে মাটির পানে
যেন কেমনধারা!
আমার যেমন নেইকো ডানা,
আকাশপানে উড়তে মানা,
মনটা কেমন করে,

তেমনি ওদের পা নেই বলে
পারে না যে আসতে চলে
এই পৃথিবীর 'পরে।

সকালে যে নদীর বাঁকে
জল নিতে যাস কলসী কাঁখে
শজনেতলার ঘাটে
সেথায় ওদের আকাশ থেকে
আপন ছায়া দেখে দেখে
সারা পহর কাটে।
ভাবে ওরা চেয়ে চেয়ে,
হতেম যদি গাঁয়ের মেয়ে
তবে সকালসাঁজে
কলসীখানি ধরে বুকে
সাঁতরে নিতেম মনের সুখে
ভরা নদীর মাঝে।

আর আমাদের ছাতের কোণে
তাকায়, যেথা গভীর বনে
রাক্ষসদের ঘরে
রাজকন্যা ঘুমিয়ে থাকে,
সোনার কাঠি ছুঁইয়ে তাকে
জাগাই শয্যা'পরে।
ভাবে ওরা, আকাশ ফেলে
হত যদি তোমার ছেলে,
এইখানে এই ছাতে
দিন কাটাত খেলায় খেলায়
তার পরে সেই রাতের বেলায়
ঘুমোত তোর সাথে।

যেদিন আমি নিষুত রাতে
হঠাৎ উঠি বিছানাতে
স্বপন থেকে জেগে'
জানলা দিয়ে দেখি চেয়ে
তারাগুলি আকাশ ছেয়ে
ঝাপসা আছে মেঘে !
বসে বসে ক্ষণে ক্ষণে
সেদিন আমার হয় যে মনে
ওদের স্বপ্ন বলে।
অন্ধকারের ঘুম লাগে যেই
ওরা আসে সেই পহরেই,
ভোর বেলা যায় চলে।
আঁধার রাতি অন্ধ ও যে,
দেখতে না পায়, আলো খোঁজে,
সবই হারিয়ে ফেলে।
তাই আকাশে মাদুর পেতে
সমস্তখন স্বপনেতে
দেখা-দেখা খেলে।

১০ আশ্বিন ১৩২৮

খেলা-ভোলা

তুই কি ভাবিস, দিনরাত্তির
খেলতে আমার মন ?
কক্‌খনো তা সত্যি না, মা,—
আমার কথা শোন।
সেদিন ভোরে দেখি উঠে
বৃষ্টিবাদল গেছে ছুটে,

রোদ উঠেছে ঝিলমিলিয়ে—
বাঁশের ডালে ডালে ;
ছুটির দিনে কেমন সুরে
পুজোর সানাই বাজছে দূরে,
তিনটে শালিখ ঝগড়া করে
রান্নাঘরের চালে ;—
খেলনাগুলো সামনে মেলি'
কী যে খেলি, কী যে খেলি,
সেই কথাটাই সমস্তখন
ভাবনু আপন মনে।
লাগল না ঠিক কোনো খেলাই,
কেটে গেল সারাবেলাই,
রেলিং ধরে রইনু বসে
বারান্দাটার কোণে।

খেলা-ভোলার দিন, মা, আমার
আসে মাঝে মাঝে।
সেদিন আমার মনের ভিতর
কেমনতরো বাজে।
শীতের বেলায় দুই পহরে
দূরে কাদের ছাদের 'পরে
ছোট্ট মেয়ে রোদ্দুরে দেয়
বেগনি রঙের শাড়ি।
চেয়ে চেয়ে চুপ করে রই,
তেপান্তরের পার বুঝি ঐ,
মনে ভাবি ঐখানেতেই
আছে রাজার বাড়ি।
থাকত যদি মেঘে-ওড়া
পক্ষিরাজের বাচ্ছা ঘোড়া

তক্‌খুনি যে যেতেম তারে
লাগাম দিয়ে কষে।
যেতে যেতে নদীর তীরে
ব্যাঙ্গমা আর ব্যাঙ্গমীরে
পথ শুধিয়ে নিতেম আমি
গাছের তলায় বসে।

একেক দিন যে দেখেছি, তুই
বাবার চিঠি হাতে
চুপ করে কী ভাবিস বসে
ঠেস দিয়ে জানলাতে।
মনে হয় তোর মুখে চেয়ে
তুই যেন কোন্‌দেশের মেয়ে,
যেন আমার অনেক কালের
অনেক দূরের মা।
কাছে গিয়ে হাতখানি ছুঁই
হারিয়ে-ফেলা মা যেন তুই,
মাঠ-পারে কোন্ বটের তলার
বাঁশির সুরের মা।
খেলার কথা যায় যে ভেসে,
মনে ভাবি কোন্ কালে সে
কোন্ দেশে তোর বাড়ি ছিল
কোন্ সাগরের কূলে।
ফিরে যেতে ইচ্ছে করে
অজানা সেই দ্বীপের ঘরে
তোমায় আমায় ভোরবেলাতে
নৌকোতে পাল তুলে

১১ আশ্বিন ১৩২৮

পথহারা

আজকে আমি কতদূর যে
গিয়েছিলেম চলে।
যত তুমি ভাবতে পার
তার চেয়ে সে অনেক আরো,
শেষ করতে পারব না তা
তোমায় ব'লে ব'লে।

অনেক দূর সে, আরো দূর সে,
আরো অনেক দূর।
মাঝখানেতে কত যে বেত,
কত যে বাঁশ, কত যে খেত,
ছাড়িয়ে ওদের ঠাকুরবাড়ি
ছাড়িয়ে তালিমপুর।

পেরিয়ে গেলেম যেতে যেতে
সাত-কুশি সব গ্রাম,
ধানের গোলা গুনব কত
জোদ্দারদের গোলার মতো,
সেখানে যে মোড়ল কারা
জানি নে তার নাম।

একে একে মাঠ পেরোলুম
কত মাঠের পরে।
তার পরে, উঃ, বলি মা শোন্,
সামনে এল প্রকাণ্ড বন,
ভিতরে তার ঢুকতে গেলে
গা ছম-ছম করে।

জামতলাতে বুড়ী ছিল,
বললে "খবরদার" !
আমি বললেম বারণ শুনে
"ছ-পণ কড়ি এই নে গুনে,"
যতক্ষণ সে গুনতে থাকে
হয়ে গেলাম পার ।

কিছুরি শেষ নেই কোথাও
আকাশ পাতাল জুড়ি' ।
যতই চলি যতই চলি
বেড়েই চলে বনের গলি,
কালো মুখোশপরা আঁধার
সাজল জুজুবুড়ী ।

খেজুরগাছের মাথায় বসে
দেখছে কারা ঝুঁকি ।
কারা যে সব ঝোপের পাশে
একটুখানি মুচকে হাসে,
বেঁটে বেঁটে মানুষগুলো
কেবল মারে উঁকি ।

আমায় যেন চোখ টিপছে
বুড়ো গাছের গুঁড়ি ।
লম্বা লম্বা কাদের পা যে
ঝুলছে ডালের মাঝে মাঝে,
মনে হচ্ছে পিঠে আমার
কে দিল সুড়সুড়ি ।

ফিসফিসিয়ে কইছে কথা
দেখতে না পাই কে সে ।

অন্ধকারে দুদ্দাড়িয়ে
কে যে কারে যায় তাড়িয়ে,
কী জানি কী গা চেটে যায়
হঠাৎ কাছে এসে।

ফুরোয় না পথ ভাবছি আমি
ফিরব কেমন করে।
সামনে দেখি কিসের ছায়া,—
ডেকে বলি, "শেয়াল ভায়া,
মায়ের গাঁয়ের পথ তোরা কেউ
দেখিয়ে দে না মোরে।"

কয় না কিছুই, চুপটি করে
কেবল মাথা নাড়ে।
সিঙ্গিমামা কোথা থেকে
হঠাৎ কখন এসে ডেকে
কে জানে, মা, হালুম ক'রে
প'ড়ল যে কার ঘাড়ে।

বল দেখি তুই, কেমন করে
ফিরে পেলেম মাকে?
কেউ জানে না কেমন করে;
কানে কানে বলব তোরে?—
যেমনি স্বপন ভেঙে গেল
সিঙ্গিমামার ডাকে।

১৫ আশ্বিন ১৩২৮

সংশয়ী

কোথায় যেতে ইচ্ছে করে
শুধাস কি, মা, তাই ?
যেখান থেকে এসেছিলেম
সেথায় যেতে চাই।
কিন্তু সে যে কোন্ জায়গা
ভাবি অনেকবার।
মনে আমার পড়ে না তো
একটুখানি তার।
ভাবনা আমার দেখে, বাবা
বললে সেদিন হেসে
"সে-জায়গাটি মেঘের পারে
সন্ধ্যাতারার দেশে।"
তুমি বল, "সে-দেশখানি
মাটির নিচে আছে,
যেখান থেকে ছাড়া পেয়ে
ফুল ফোটে সব গাছে।"
মাসি বলে, "সে-দেশ আমার
আছে সাগরতলে,—
যেখানেতে আঁধার ঘরে
লুকিয়ে মানিক জ্বলে।"
দাদা আমার চুল টেনে দেয়,
বলে, "বোকা ওরে,
হাওয়ায় সে-দেশ মিলিয়ে আছে
দেখবি কেমন করে ?"
আমি শুনে ভাবি, আছে
সকল জায়গাতেই।
সিধু মাস্টার বলে শুধু
"কোনোখানেই নেই।"

রাজা ও রানী

এক যে ছিল রাজা
সেদিন আমায় দিল সাজা।
ভোরের রাতে উঠে
আমি গিয়েছিলুম ছুটে,
দেখতে ডালিম গাছে
বনের পিরভু কেমন নাচে।
ডালে ছিলেম চড়ে,
সেটা ভেঙেই গেল পড়ে।
সেদিন হল মানা
আমার পেয়ারা পেড়ে আনা,
রথ দেখতে যাওয়া,
আমার চিঁড়ের পুলি খাওয়া।
কে দিল সেই সাজা,
জান কে ছিল সেই রাজা?

এক যে ছিল রানী
আমি তার কথা সব মানি।
সাজার খবর পেয়ে
আমায় দেখল কেবল চেয়ে।
বললে না তো কিছু,
কেবল মুখটি করে নিচু
আপন ঘরে গিয়ে
সেদিন রইল আগল দিয়ে।
হল না তার খাওয়া,
কিংবা রথ দেখতে যাওয়া।
নিল আমায় কোলে
সাজার সময় সারা হলে।

গলা ভাঙা-ভাঙা,
তার চোখ-দুখানি রাঙা।
কে ছিল সেই রানী
আমি জানি জানি জানি।

দূর

পুজোর ছুটি আসে যখন
বকসারেতে যাবার পথে—
দূরের দেশে যাচ্ছি ভেবে
ঘুম হয় না কোনোমতে।
সেখানে যেই নতুন বাসায়
হপ্তা দুয়েক খেলায় কাটে
দূর কি আবার পালিয়ে আসে
আমাদেরি বাড়ির ঘাটে!
দূরের সঙ্গে কাছের কেবল
কেনই যে এই লুকোচুরি,
দূর কেন যে করে এমন
দিনরাত্তির ঘোরাঘুরি।
আমরা যেমন ছুটি হলে
ঘরবাড়ি সব ফেলে রেখে
রেলে চড়ে পশ্চিমে যাই
বেরিয়ে পড়ি দেশের থেকে,
তেমনিতরো সকালবেলা
ছুটিয়ে আলো আকাশেতে
রাতের থেকে দিন যে বেরোয়
দূরকে বুঝি খুঁজে পেতে?
সে-ও তো যায় পশ্চিমেতেই,
ঘুরে ঘুরে সন্ধ্যে হলে,

তখন দেখে রাতের মাঝেই
দূর সে আবার গেছে চলে।
সবাই যেন পলাতকা
মন টেকে না কাছের বাসায়।
দলে দলে পলে পলে
কেবল চলে দূরের আশায়।
পাতায় পাতায় পায়ের ধ্বনি,
ঢেউয়ে ঢেউয়ে ডাকাডাকি,
হাওয়ায় হাওয়ায় যাওয়ার বাঁশি
কেবল বাজে থাকি থাকি।
আমায় এরা যেতে বলে,
যদি বা যাই, জানি তবে
দূরকে খুঁজে খুঁজে শেষে
মায়ের কাছেই ফিরতে হবে।

বাউল

দূরে অশথতলায়
পুঁতির কণ্ঠিখানি গলায়
বাউল দাঁড়িয়ে কেন আছ?
সামনে আঙিনাতে
তোমার একতারাটি হাতে
তুমি সুর লাগিয়ে নাচ!
পথে করতে খেলা
আমার কখন হল বেলা
আমায় শাস্তি দিল তাই।
ইচ্ছে হোথায় নাবি
কিন্তু ঘরে বন্ধ চাবি
আমার বেরোতে পথ নাই।

বাড়ি ফেরার তরে
তোমায় কেউ না তাড়া করে
তোমার নাই কোনো পাঠশালা
সমস্ত দিন কাটে
তোমার পথে ঘাটে মাঠে
তোমার ঘরেতে নেই তালা।
তাই তো তোমার নাচে
আমার প্রাণ যেন ভাই বাঁচে,
আমার মন যেন পায় ছুটি,
ওগো তোমার নাচে
যেন ঢেউয়ের দোলা আছে,
ঝড়ে গাছের লুটোপুটি।
অনেক দূরের দেশ
আমার চোখে লাগায় রেশ,
যখন তোমায় দেখি পথে।
দেখতে যে পায় মন
যেন নাম-না-জানা বন
কোন্ পথহারা পর্বতে।
হঠাৎ মনে লাগে,
যেন অনেক দিনের আগে,
আমি অমনি ছিলেম ছাড়া।
সেদিন গেল ছেড়ে,
আমার পথ নিল কে কেড়ে,
আমার হারাল একতারা।
কে নিল গো টেনে,
আমায় পাঠশালাতে এনে,
আমার এল গুরুমশায়।
মন সদা যায় চলে
যত ঘরছাড়াদের দলে
তারে ঘরে কেন বসায়?

কও তো আমায়, ভাই,
তোমার গুরুমশায় নাই ?
আমি যখন দেখি ভেবে
বুঝতে পারি খাঁটি,
তোমার বুকের একতারাটি,
তোমায় ঐ তো পড়া দেবে।
তোমার কানে কানে
ওরি গুনগুনানি গানে
তোমায় কোন্ কথা যে কয় !
সব কি তুমি বোঝ ?
তারি মানে যেন খোঁজ
কেবল ফিরে' ভুবনময়।
ওরি কাছে বুঝি
আছে তোমার নাচের পুঁজি,
তোমার খেপা পায়ের ছুটি ?
ওরি সুরের বোলে
তোমার গলার মালা দোলে,
তোমার দোলে মাথার ঝুঁটি।
মন যে আমার পালায়
তোমার একতারা-পাঠশালায়,
আমায় ভুলিয়ে দিতে পার ?
নেবে আমায় সাথে ?
এ-সব পণ্ডিতেরি হাতে
আমায় কেন সবাই মার ?
ভুলিয়ে দিয়ে পড়া
আমায় শেখাও সুরে-গড়া
তোমার তালা-ভাঙার পাঠ।
আর কিছু না চাই,
যেন আকাশখানা পাই,
আর পালিয়ে যাবার মাঠ

দূরে কেন আছ ?
দ্বারের আগল ধরে নাচ,
বাউল আমারি এইখানে।
সমস্ত দিন ধরে
যেন মাতন ওঠে ভরে
তোমার ভাঙন-লাগা গানে।

দুষ্টু

তোমার কাছে আমিই দুষ্টু,
ভালো যে আর সবাই।
মিত্তিরদের কালু নিলু
ভারি ঠাণ্ডা ক-ভাই !
যতীশ ভালো, সতীশ ভালো,
ন্যাড়া নবীন ভালো,
তুমি বল ওরাই কেমন
ঘর করে রয় আলো।
মাখন বাবুর দুটি ছেলে
দুষ্টু তো নয় কেউ—
গেটে তাদের কুকুর বাঁধা
কর্তেছে ঘেউ ঘেউ।
পাঁচকড়ি ঘোষ লক্ষ্মী ছেলে,
দত্তপাড়ার গবাই,
তোমার কাছে আমিই দুষ্টু
ভালো যে আর সবাই।
তোমার কথা আমি যেন
শুনি নে কক্‌খনোই,
জামাকাপড় যেন আমার
সাফ থাকে না কোনোই !

খেলা করতে বেলা করি,
বৃষ্টিতে যাই ভিজে,
দুষ্টুপনা আরো আছে
অমনি কত কী যে !
বাবা আমার চেয়ে ভালো ?
সত্যি বলো তুমি,
তোমার কাছে করেন নি কি
একটুও দুষ্টুমি ?
যা বল সব শোনেন তিনি,
কিচ্ছু ভোলেন নাকো ?
খেলা ছেড়ে আসেন চলে
যেমনি তুমি ডাক ?

ইচ্ছামতী

যখন যেমন মনে করি
তাই হতে পাই যদি
আমি তবে একখানি হই
ইচ্ছামতী নদী।
রইবে আমার দখিন ধারে
সূর্য ওঠার পার,
বাঁয়ের ধারে সন্ধ্যেবেলায়
নামবে অন্ধকার।
আমি কইব মনের কথা
দুই পারেরি সাথে,
আধেক কথা দিনের বেলায়,
আধেক কথা রাতে।

যখন ঘুরে ঘুরে বেড়াই
আপন গাঁয়ের ঘাটে

ঠিক তখনি গান গেয়ে যাই
দূরের মাঠে মাঠে।
গাঁয়ের মানুষ চিনি, যারা
নাইতে আসে জলে,
গোরু মহিষ নিয়ে যারা
সাঁতরে ওপার চলে।
দূরের মানুষ যারা তাদের
নতুনতরো বেশ,
নাম জানি নে, গ্রাম জানি নে
অদ্ভুতের একশেষ।

জলের উপর ঝলোমলো
টুকরো আলোর রাশি।
ঢেউয়ে ঢেউয়ে পরীর নাচন,
হাততালি আর হাসি।
নিচের তলায় তলিয়ে যেথায়
গেছে ঘাটের ধাপ
সেইখানেতে কারা সবাই
রয়েছে চুপচাপ।
কোণে কোণে আপন মনে
করছে তারা কা কে।
আমারি ভয় করবে কেমন
তাকাতে সেই দিকে।

গাঁয়ের লোকে চিনবে আমার
কেবল একটুখানি।
বাকি কোথায় হারিয়ে যাবে
আমিই সে কি জানি?
একধারেতে মাঠে ঘাটে
সবুজ বরন শুধু,

আর একধারে বালুর চরে
রৌদ্র করে ধু ধু।
দিনের বেলায় যাওয়া আসা,
রাত্তিরে থম থম!
ডাঙার পানে চেয়ে চেয়ে
করবে গা ছম ছম।

২৩ আশ্বিন ১৩২৮

অন্য মা

আমার মা না হয়ে, তুমি
আর কারো মা হলে
ভাবছ তোমায় চিনতেম না,
যেতেম না ঐ কোলে?
মজা আরো হত ভারি,
দুই জায়গায় থাকত বাড়ি,
আমি থাকতেম এই গাঁয়েতে,
তুমি পারের গাঁয়ে।
এইখানেতেই দিনের বেলা
যা-কিছু সব হত খেলা,
দিন ফুরোলেই তোমার কাছে
পেরিয়ে যেতেম নায়ে।
হঠাৎ এসে পিছন দিকে
আমি বলতেম, "বল্ দেখি কে?"
তুমি ভাবতে, চেনার মতো
চিনি নে তো তবু।
তখন কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে
আমি বলতেম গলা ধরে—
"আমায় তোমার চিনতে হবেই,
আমি তোমার অবু!"

ঐ পারেতে যখন তুমি
        আনতে যেতে জল,—
এই পারেতে তখন ঘাটে
        বল্ দেখি কে বল্?
কাগজ-গড়া নৌকোটিকে
ভাসিয়ে দিতেম তোমার দিকে,
যদি গিয়ে পৌঁছোত সে
        বুঝতে কি, সে কার?
সাঁতার আমি শিখি নি যে
নইলে আমি যেতেম নিজে,
আমার পারের থেকে আমি
        যেতেম তোমার পার।
মায়ের পারে অবুর পারে
থাকত তফাত, কেউ তো কারে
ধরতে গিয়ে পেত নাকো,
        রইত না একসাথে।
দিনের বেলায় ঘুরে ঘুরে
দেখা-দেখি দূরে দূরে,—
সন্ধ্যেবেলায় মিলে যেত
        অবুতে আর মাতে।

কিন্তু হঠাৎ কোনোদিনে
        যদি বিপিন মাঝি
পার করতে তোমার পারে
        নাই হত মা রাজি
ঘরে তোমার প্রদীপ জ্বেলে
ছাতের 'পরে মাদুর মেলে
বসতে তুমি, পায়ের কাছে
        বসত ক্ষান্ত বুড়ী,

উঠত তারা সাত ভায়েতে,
ডাকত শেয়াল ধানের খেতে,
উড়ো ছায়ার মতো বাদুড়
কোথায় যেত উড়ি।
তখন কি মা, দেরি দেখে
ভয় হত না থেকে থেকে,
পার হয়ে, মা, আসতে হতই
অবু যেথায় আছে।
তখন কি আর ছাড়া পেতে?
দিতেম কি আর ফিরে যেতে?
ধরা পড়ত মায়ের ওপার
অবুর পারের কাছে।

দুয়োরানী

ইচ্ছে করে মা, যদি তুই
হতিস দুয়োরানী!
ছেড়ে দিতে এমনি কি ভয়
তোমার এ ঘরখানি।
ঐখানে ঐ পুকুরপারে
জিয়ল গাছের বেড়ার ধারে
ও যেন ঘোর বনের মধ্যে
কেউ কোথাও নেই।
ঐখানে ঝাউতলা জুড়ে
বাঁধব তোমার ছোট্ট কুঁড়ে,
শুকনো পাতা বিছিয়ে ঘরে
থাকব দুজনেই।
বাঘ ভাল্লুক অনেক আছে
আসবে না কেউ তোমার কাছে,

দিনরাত্তির কোমর বেঁধে
থাকব পাহারাতে।
রাক্ষসেরা ঝোপে ঝাড়ে
মারবে উঁকি আড়ে আড়ে
দেখবে আমি দাঁড়িয়ে আছি
ধনুক নিয়ে হাতে।

আঁচলেতে খই নিয়ে তুই
যেই দাঁড়াবি দ্বারে
অমনি যত বনের হরিণ
আসবে সারে সারে।
শিংগুলি সব আঁকাবাঁকা,
গায়েতে দাগ চাকা চাকা,
লুটিয়ে তারা পড়বে ভুঁয়ে
পায়ের কাছে এসে।
ওরা সবাই আমায় বোঝে,
করবে না ভয় একটুও যে,
হাত বুলিয়ে দেব গায়ে,
বসবে কাছে ঘেঁসে।
ফলসা-বনে গাছে গাছে
ফল ধরে মেঘ করে আছে,
ঐখানেতে ময়ূর এসে
নাচ দেখিয়ে যাবে।
শালিখরা সব মিছিমিছি
লাগিয়ে দেবে কিচিমিচি,
কাঠবেড়ালি লেজটি তুলে
হাত থেকে ধান খাবে

দিন ফুরোবে, সাঁজের আঁধার
নামবে তালের গাছে।

তখন এসে ঘরের কোণে
বসব কোলের কাছে।
থাকবে না তোর কাজ কিছু তো,
রইবে না তোর কোনো ছুতো,
রূপ-কথা তোর বলতে হবে
রোজই নতুন করে।
সীতার বনবাসের ছড়া
সবগুলি তোর আছে পড়া;
সুর করে তাই আগাগোড়া
গাইতে হবে তোরে।
তার পরে সেই অশথবনে
ডাকবে পেঁচা, আমার মনে
একটুখানি ভয় করবে
রাত্রি নিষুত হলে।
তোমার বুকে মুখটি গুঁজে
ঘুমেতে চোখ আসবে বুজে
তখন আবার বাবার কাছে
যাস নে যেন চলে!

১৪ আশ্বিন ১৩২৮

রাজমিস্ত্রি

বয়স আমার হবে তিরিশ,
দেখতে আমায় ছোটো,
আমি নই, মা, তোমার শিরিশ,
আমি হচ্ছি নোটো।
আমি যে রোজ সকাল হলে
যাই শহরের দিকে চলে
তমিজ মিঞার গোরুর গাড়ি চড়ে

সকাল থেকে সারা দুপুর
ইঁট সাজিয়ে ইঁটের উপর
খেয়ালমতো দেয়াল তুলি গড়ে।
ভাবছ তুমি নিয়ে ঢেলা
ঘর-গড়া সে আমার খেলা,
ককখনো না সত্যিকার সে কোঠা।
ছোটো বাড়ি নয় তো মোটে,
তিনতলা পর্যন্ত ওঠে,
থামগুলো তার এমনি মোটা মোটা।
কিন্তু যদি শুধাও আমায়
ঐখানেতেই কেন থামায়?
দোষ কী ছিল ষাট-সত্তর তলা?
ইঁট সুরকি জুড়ে জুড়ে
একেবারে আকাশ ফুঁড়ে
হয় না কেন কেবল গেঁথে চলা?
গাঁথতে গাঁথতে কোথায় শেষে
ছাত কেন না তারায় মেশে?
আমিও তাই ভাবি নিজে নিজে।
কোথাও গিয়ে কেন থামি
যখন শুধাও, তখন আমি
জানি নে তো তার উত্তর কী যে।

যখন খুশি ছাতের মাথায়
উঠছি ভারা বেয়ে।
সত্যি কথা বলি, তাতে
মজা খেলার চেয়ে।
সমস্ত দিন ছাত-পিটুনী
গান গেয়ে ছাত পিটোয় শুনি,
অনেক নিচে চলছে গাড়িঘোড়া

বাসনওআলা থালা বাজায় ;
সুর করে ঐ হাঁক দিয়ে যায়
আতাওআলা নিয়ে ফলের ঝোড়া।
সাড়ে চারটে বেজে ওঠে,
ছেলেরা সব বাসায় ছোটে
হোহো করে উড়িয়ে দিয়ে ধুলো।
রোদ্দুর যেই আসে পড়ে
পুবের মুখে কোথায় ওড়ে
দলে দলে ডাক দিয়ে কাকগুলো।
আমি তখন দিনের শেষে
ভারার থেকে নেমে এসে
আবার ফিরে আসি আপন গাঁয়ে।
জান তো, মা, আমার পাড়া
যেখানে ওই খুঁটি গাড়া
পুকুরপাড়ে গাজনতলার বাঁয়ে।
তোরা যদি শুধাস মোরে
খড়ের চালায় রই কী করে ?
কোঠা যখন গড়তে পারি নিজে ;
আমার ঘর যে কেন তবে
সব-চেয়ে না বড়ো হবে ?
জানি নে তো তার উত্তর কী যে !

৬ কার্তিক ১৩২৮

ঘুমের তত্ত্ব

জাগার থেকে ঘুমোই, আবার
ঘুমের থেকে জাগি,—
অনেক সময় ভাবি মনে
কেন, কিসের লাগি ?

আমাকে, মা, যখন তুমি
ঘুম পাড়িয়ে রাখ
তখন তুমি হারিয়ে গিয়ে
তবু হারাও নাকো।
রাতে সূর্য, দিনে তারা
পাই নে, হাজার খুঁজি
তখন তা'রা ঘুমের সূর্য,
ঘুমের তারা বুঝি?
শীতের দিনে কনকচাঁপা
যায় না দেখা গাছে,
ঘুমের মধ্যে লুকিয়ে থাকে
নেই তবুও আছে।
রাজকন্যে থাকে, আমার
সিঁড়ির নিচের ঘরে।
দাদা বলে, "দেখিয়ে দে তো,"
বিশ্বাস না করে।
কিন্তু, মা, তুই জানিস নে কি
আমার সে রাজকন্যে
ঘুমের তলায় তলিয়ে থাকে,
দেখি নে সেইজন্যে।

নেই তবুও আছে এমন
নেই কি কত জিনিস?
আমি তাদের অনেক জানি,
তুই কি তাদের চিনিস?
যেদিন তাদের রাত পোয়াবে
উঠবে চক্ষু মেলি
সেদিন তোমার ঘরে হবে
বিষম ঠেলাঠেলি।

নাপিত ভায়া, শেয়াল ভায়া,
ব্যাঙ্গমা বেঙ্গুমী
ভিড় ক'রে সব আসবে যখন
কী যে করবে তুমি!
তখন তুমি ঘুমিয়ে প'ড়ো,
আমিই জেগে থেকে
নানারকম খেলায় তাদের
দেব ভুলিয়ে রেখে।
তার পরে যেই জাগবে তুমি
লাগবে তাদের ঘুম,
তখন কোথাও কিচ্ছুই নেই
সমস্ত নিজ্‌ঝুম।

২৭ আশ্বিন ১৩২৮

দুই আমি

বৃষ্টি কোথায় লুকিয়ে বেড়ায়
উড়ো মেঘের দল হয়ে,
সেই দেখা দেয় আর-এক ধারায়
শ্রাবণ-ধারার জল হয়ে।
আমি ভাবি চুপটি করে
মোর দশা হয় ঐ যদি!
কেই বা জানে আমি আবার
আর-একজনও হই যদি!
একজনারেই তোমরা চেন
আর-এক আমি কারোই না।
কেমনতরো ভাবখানা তার
মনে আনতে পারই না।

হয়তো বা ঐ মেঘের মতোই
নতুন নতুন রূপ ধরে
কখন সে যে ডাক দিয়ে যায়,
কখন থাকে চুপ করে।
কখন বা সে পুবের কোণে
আলো-নদীর বাঁধ বাঁধে,
কখন বা সে আধেক রাতে
চাঁদকে ধরার ফাঁদ ফাঁদে।
শেষে তোমার ঘরের কথা
মনেতে তার যেই আসে,
আমার মতন হয়ে আবার
তোমার কাছে সেই আসে।
আমার ভিতর লুকিয়ে আছে
দুই রকমের দুই খেলা,
একটা সে ঐ আকাশ-ওড়া,
আরেকটা এই ভুঁই-খেলা।

২৮ আশ্বিন ১৩২৮

মর্ত্যবাসী

কাকা বলেন, সময় হলে
সবাই চলে
যায় কোথা সেই স্বর্গ-পারে
বল্ তো কাকী
সত্যি তা কি
একেবারে?
তিনি বলেন, যাবার আগে
তন্দ্রা লাগে
ঘণ্টা কখন ওঠে বাজি,

ঘাসের পাশে
তখন আসে
ঘাটের মাঝি।
বাবা গেছেন এমনি করে
কখন ভোরে
তখন আমি বিছানাতে।
তেমনি মাখন
গেল কখন
অনেক রাতে।
কিন্তু আমি বলছি তোমায়
সকল সময়
তোমার কাছেই করব খেলা,
রইব জোরে
গলা ধরে
রাতের বেলা।
সময় হলে মানব না তো,
জানব না তো,
ঘণ্টা মাঝির বাজল কবে।
তাই কি রাজা
দেবেন সাজা
আমায় তবে ?
তোমরা বল, স্বর্গ ভালো
সেথায় আলো
রঙে রঙে আকাশ রাঙায়,
সারা বেলা
ফুলের খেলা
পারুলডাঙায় !
হ'ক না ভালো যত ইচ্ছে—
কেড়ে নিচ্ছে
কেই বা তাকে বলো, কাকী ?

যেমন আছি
তোমার কাছেই
তেমনি থাকি !
ঐ আমাদের গোলাবাড়ি,
গোরুর গাড়ি
পড়ে আছে চাকা-ভাঙা,
গাবের ডালে
পাতার লালে
আকাশ রাঙা।
সেথা বেড়ায় যক্ষি বুড়ী
গুড়ি গুড়ি
আসশেওড়ার ঝোপে ঝাপে।
ফুলের গাছে
দোয়েল নাচে,
ছায়া কাঁপে।
লুকিয়ে আমি সেথা পলাই,
কানাই বলাই
দু-ভাই আসে পাড়ার থেকে।
ভাঙা গাড়ি
দোলাই নাড়ি
ঝোঁকে ঝোঁকে।
সন্ধ্যেবেলায় গল্প বলে
রাখ কোলে,
মিটমিটিয়ে জ্বলে বাতি।
চালতা-শাখে
পেঁচা ডাকে,
বাড়ে রাতি।
স্বর্গে যাওয়া দেব ফাঁকি
বলছি, কাকী,
দেখব আমায় কে কী করে।

চিরকালই
রইব খালি
তোমার ঘরে।

২৯ আশ্বিন ১৩২৮

বাণী-বিনিময়

মা, যদি তুই আকাশ হতিস,
আমি চাঁপার গাছ,
তোর সাথে মোর বিনি-কথায়
হত কথার নাচ।
তোর হাওয়া মোর ডালে ডালে
কেবল থেকে থেকে
কতরকম নাচন দিয়ে
আমায় যেত ডেকে।
মা ব'লে তার সাড়া দেব
কথা কোথায় পাই,
পাতায় পাতায় সাড়া আমার
নেচে উঠত তাই।
তোর আলো মোর শিশির-ফোঁটায়
আমার কানে কানে
টলমলিয়ে কী বলত যে
ঝলমলানির গানে।
আমি তখন ফুটিয়ে দিতেম
আমার যত কুঁড়ি,
কথা কইতে গিয়ে তারা
নাচন দিত জুড়ি।
উড়ো মেঘের ছায়াটি তোর
কোথায় থেকে এসে

আমার ছায়ায় ঘনিয়ে উঠে’
কোথায় যেত ভেসে।
সেই হত তোর বাদল-বেলার
রূপকথাটির মতো ;
রাজপুত্তুর ঘর ছেড়ে যায়
পেরিয়ে রাজ্য কত ;
সেই আমারে বলে যেত
কোথায় আলেখ-লতা,
সাগরপারের দৈত্যপুরের
রাজকন্যার কথা ;
দেখতে পেতেম দুয়োরানীর
চক্ষু ভর-ভর,
শিউরে উঠে পাতা আমার
কাঁপত থরথর।
হঠাৎ কখন বৃষ্টি তোমার
হাওয়ার পাছে পাছে
নামত আমার পাতায় পাতায়
টাপুর-টুপুর নাচে ;
সেই হত তোর কাঁদন-সুরে
রামায়ণের পড়া,
সেই হত তোর গুনগুনিয়ে
শ্রাবণ-দিনের ছড়া।
মা, তুই হতিস নীলবরনী,
আমি সবুজ কাঁচা ;
তোর হত, মা, আলোর হাসি,
আমার পাতার নাচা।
তোর হত, মা, উপর থেকে
নয়ন মেলে চাওয়া,
আমার হত আঁকুবাঁকু
হাত তুলে গান গাওয়া।

তোর হত, মা, চিরকালের
তারায় মণিমালা,
আমার হত দিনে দিনে
ফুল-ফোটাবার পালা।

বৃষ্টি রৌদ্র

ঝুঁটি-বাঁধা ডাকাত সেজে
দল বেঁধে মেঘ চলেছে যে
আজকে সারাবেলা।
কালো ঝাঁপির মধ্যে ভরে
সূর্যিকে নেয় চুরি করে,
ভয়-দেখাবার খেলা।
বাতাস তাদের ধরতে মিছে
হাঁপিয়ে ছোটে পিছে পিছে,
যায় না তাদের ধরা।
আজ যেন ওই জড়োসড়ো
আকাশ জুড়ে মস্ত বড়ো
মন-কেমন-করা।
বটের ডালে ডানা-ভিজে
কাক বসে ওই ভাবছে কী যে,
চড়ুইগুলো চুপ।
বৃষ্টি হয়ে গেছে ভোরে
শজনেপাতায় ঝরে ঝরে
জল পড়ে টুপটুপ।
লেজের মধ্যে মাথা থুয়ে
খ্যাঁদন কুকুর আছে শুয়ে
কেমন একরকম।

দালানটাতে ঘুরে ঘুরে
পায়রাগুলো কাঁদন-সুরে
ডাকছে বকবকম।
কার্তিকে ঐ ধানের খেতে
ভিজে হাওয়া উঠল মেতে
সবুজ ঢেউয়ের 'পরে।
পরশ লেগে দিশে দিশে
হিহি করে ধানের শিষে
শীতের কাঁপন ধরে।
ঘোষাল-পাড়ার লক্ষ্মী বুড়ী
ছেঁড়া কাঁথায় মুড়িসুড়ি
গেছে পুকুরপাড়ে,
দেখতে ভালো পায় না চোখে
বিড়বিড়িয়ে বকে বকে
শাক তোলে, ঘাড় নাড়ে।
ঐ ঝমাঝম বৃষ্টি নামে
মাঠের পারে দূরের গ্রামে
ঝাপসা বাঁশের বন।
গোরুটা কার থেকে থেকে
খোঁটায়-বাঁধা উঠছে ডেকে
ভিজছে সারাক্ষণ।
গদাই কুমোর অনেক ভোরে
সাজিয়ে নিয়ে উঁচু ক'রে
হাঁড়ির উপর হাঁড়ি
চলছে রবিবারের হাটে
গামছা মাথায় জলের ছাঁটে
হাঁকিয়ে গোরুর গাড়ি।
বন্ধু আমার রইল খেলা,
ছুটির দিনে সারাবেলা
কাটবে কেমন করে?

মনে হচ্ছে এমনিতরো
ঝরবে বৃষ্টি ঝরঝর
দিনরাত্তির ধরে!
এমন সময় পুবের কোণে
কখন যেন অন্যমনে
ফাঁক ধরে ঐ মেঘে,
মুখের চাদর সরিয়ে ফেলে
হঠাৎ চোখের পাতা মেলে
আকাশ ওঠে জেগে।
ছিঁড়ে-যাওয়া মেঘের থেকে
পুকুরে রোদ পড়ে বেঁকে,
লাগায় ঝিলিমিলি।
বাঁশবাগানের মাথায় মাথায়
তেঁতুলগাছের পাতায় পাতায়
হাসায় খিলিখিলি।
হঠাৎ কিসের মন্ত্র এসে
ভুলিয়ে দিলে একনিমেষে
বাদলবেলার কথা।
হারিয়ে-পাওয়া আলোটিরে
নাচায় ডালে ফিরে ফিরে
বেড়ার ঝুমকোলতা।
উপর নিচে আকাশ ভরে
এমন বাদল কেমন করে
হয়, সে-কথাই ভাবি।
উলটপালট খেলাটি এই,
সাজের তো তার সীমানা নেই,
কার কাছে তার চাবি?
এমন যে ঘোর মন-খারাপি
বুকের মধ্যে ছিল চাপি
সমস্ত খন আজি

হঠাৎ দেখি সবই মিছে
নাই কিছু তার আগে পিছে
এ যেন কার বাজি

নাটক ও প্রহসন

গুরু

সহজে অভিনয়যোগ্য করিবার অভিপ্রায়ে অচলায়তন নাটকটি “গুরু’ নামে এবং কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত এবং লঘুতর আকারে প্রকাশ করা হইল।

শান্তিনিকেতন
১লা ফাল্গুন
১৩২৪

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গুরু

১

অচলায়তন

একদল বালক

প্রথম। ওরে ভাই শুনেছিস ?

দ্বিতীয়। শুনেছি—কিন্তু চুপ কর !

তৃতীয়। কেন বল দেখি ?

দ্বিতীয়। কী জানি বললে যদি অপরাধ হয় ?

প্রথম। কিন্তু উপাধ্যায়মশায় নিজে যে আমাকে বলেছেন।

তৃতীয়। কী বলেছেন বল না।

প্রথম। গুরু আসছেন।

সকলে। গুরু আসছেন !

তৃতীয়। ভয় করছে না ভাই ?

দ্বিতীয়। ভয় করছে।

প্রথম। আমার ভয় করছে না, মনে হচ্ছে মজা।

তৃতীয়। কিন্তু ভাই গুরু কী ?

দ্বিতীয়। তা জানি নে।

তৃতীয়। কে জানে ?

দ্বিতীয়। এখানে কেউ জানে না।

প্রথম। শুনেছি গুরু খুব বড়ো, খুব মস্ত বড়ো।

তৃতীয়। তাহলে এখানে কোথায় ধরবে ?

প্রথম। পঞ্চকদাদা বলেন অচলায়তনে তাঁকে কোথাও ধরবে না।

তৃতীয়। কোথাও না ?

প্রথম। কোথাও না।

তৃতীয়। তাহলে কী হবে ?

প্রথম। ভারি মজা হবে। [প্রস্থান

পঞ্চকের প্রবেশ

পঞ্চক। গান

তুমি ডাক দিয়েছ কোন্ সকালে কেউ তা জানে না।
আমার মন যে কাঁদে আপন মনে কেউ তা মানে না॥

ওরে ভাই, কে আছিস ভাই। কাকে ডেকে বলব, গুরু আসছেন।

সঞ্জীবের প্রবেশ

সঞ্জীব। তাই তো শুনেছি। কিন্তু কে এসে খবর দিলে বলো তো।

পঞ্চক। কে দিলে তা তো কেউ বলে না।

সঞ্জীব। কিন্তু গুরু আসছেন বলে তুমি তো তৈরি হচ্ছ না, পঞ্চক?

পঞ্চক। বাঃ, সেইজন্যেই তো পুঁথিপত্র সব ফেলে দিয়েছি।

সঞ্জীব। সেই বুঝি তোমার তৈরি হওয়া?

পঞ্চক। আরে, গুরু যখন না থাকেন তখনই পুঁথিপত্র। গুরু যখন আসবেন তখন ওই সব জঞ্জাল সরিয়ে দিয়ে সময় খোলসা করতে হবে। আমি সেই পুঁথি বন্ধ করবার কাজে ভয়ানক ব্যস্ত।

সঞ্জীব। তাই তো দেখছি। [প্রস্থান

পঞ্চক। গান

ফিরি আমি উদাস প্রাণে, তাকাই সবার মুখের পানে,
তোমার মতো এমন টানে কেউ তো টানে না।

ওহে জয়োত্তম, তুমি কাঁধে কিসের বোঝা নিয়ে চলেছ? বোঝা ফেলো। গুরু আসছেন যে।

জয়োত্তম। আরে ছুঁয়ো না, এ-সব মাঙ্গল্য। গুরুর জন্যে সিংহদ্বার সাজাতে চলেছি।

পঞ্চক। গুরু কোন্ দ্বার দিয়ে ঢুকবেন তা জানবে কী করে?

জয়োত্তম। তা তো বটেই। অচলায়তনে জানবার লোক কেবল তুমিই আছ।

পঞ্চক। তোমরাও জান না আমিও জানি নে—তফাতটা এই যে, তোমরা বোঝা বয়ে মর, আমি হালকা হয়ে বসে আছি।

জয়োত্তম। আচ্ছা, এখন পথ ছাড়ো, আমার সময় নেই। [প্রস্থান

পঞ্চক। গান

বেজে ওঠে পঞ্চমে স্বর, কেঁপে ওঠে বন্ধ এ ঘর,
বাহির হতে দুয়ারে কর কেউ তো হানে না।

মহাপঞ্চকের প্রবেশ

মহাপঞ্চক। গান! অচলায়তনে গান! মতিভ্রম হয়েছে!

পঞ্চক। এবার দাদা স্বয়ং তোমাকেও গান ধরতে হবে। একধার থেকে মতিভ্রমের পালা আরম্ভ হল।

মহাপঞ্চক। আমি মহাপঞ্চক গান ধরব! ঠাট্টা আমার সঙ্গে!

পঞ্চক। ঠাট্টা নয়। অচলায়তনে এবার মন্ত্র ঘুচে গান আরম্ভ হবে। এই বোবা পাথরগুলো থেকে সুর বেরোবে।

মহাপঞ্চক। কেন বলো তো?

পঞ্চক। গুরু আসছেন যে! তাই আমার কেবলই মন্তরে ভুল হচ্ছে!

মহাপঞ্চক। গুরু এলে তোমার জন্যে লজ্জায় মুখ দেখাতে পারব না।

পঞ্চক। তার জন্যে ভাবনা কী। নির্লজ্জ হয়ে একলা আমিই মুখ দেখাব!

মহাপঞ্চক। মন্তরে ভুল হলে গুরু তোমাকে আয়তন থেকে দূর করে দেবেন।

পঞ্চক। সেই ভরসাতেই তাঁর জন্যে অপেক্ষা করে আছি।

মহাপঞ্চক। অমিতায়ুর্ধারণী মন্ত্রটা—

পঞ্চক। সেই মন্ত্রটা স্বয়ং গুরুর কাছ থেকে শিখব বলেই তো আগাগোড়া ভোলবার চেষ্টায় আছি। সেইজন্যেই গান ধরেছি দাদা।

মহাপঞ্চক। ওই শঙ্খ বাজল। এখন আমার সপ্তকুমারিকা গাথা পাঠের সময়। কিন্তু বলে যাচ্ছি সময় নষ্ট ক'রো না। গুরু আসছেন।

পঞ্চক। গান

আকাশে কার ব্যাকুলতা বাতাস বহে কার বারতা,
এ পথে সেই গোপন কথা কেউ তো আনে না॥

ও কী ও। কান্না শুনি যে। এ নিশ্চয়ই সুভদ্র। আমাদের এই অচলায়চনে ওই বালকের চোখের জল আর শুকোল না। ওর কান্না আমি সইতে পারি নে।

প্রস্থান ও বালক সুভদ্রকে লইয়া পুনঃপ্রবেশ

পঞ্চক। তোর কোনো ভয় নেই ভাই, কোনো ভয় নেই। তুই আমার কাছে বল—কী হয়েছে বল।

সুভদ্র। আমি পাপ করেছি।

পঞ্চক। পাপ করেছিস? কী পাপ?

সুভদ্র। সে আমি বলতে পারব না। ভয়ানক পাপ। আমার কী হবে?

পঞ্চক। তোর সব পাপ আমি কেড়ে নেব, তুই বল।

সুভদ্র। আমি আমাদের আয়তনের উত্তর দিকের—

পঞ্চক। উত্তর দিকের?

সুভদ্র। হাঁ, উত্তর দিকের জানলা খুলে—

পঞ্চক। জানলা খুলে কী করলি?

সুভদ্র। বাইরেটা দেখে ফেলেছি!

পঞ্চক। দেখে ফেলেছিস? শুনে লোভ হচ্ছে যে।

সুভদ্র। হাঁ পঞ্চকদাদা। কিন্তু বেশিক্ষণ না—একবার দেখেই তখনই বন্ধ করে ফেলেছি। কোন্ প্রায়শ্চিত্ত করলে আমার পাপ যাবে?

পঞ্চক। ভুলে গেছি ভাই। প্রায়শ্চিত্ত বিশ-পঁচিশ হাজার রকম আছে;—আমি যদি এই আয়তনে না আসতুম তাহলে তার বারো আনাই কেবল পুঁথিতে লেখা থাকত—আমি আসার পর প্রায় তার সব-কটাই ব্যবহারে লাগাতে পেরেছি, কিন্তু মনে রাখতে পারি নি।

বালকদলের প্রবেশ

প্রথম। অ্যাঁ, সুভদ্র। তুমি বুঝি এখানে!

দ্বিতীয়। জান পঞ্চকদাদা, সুভদ্র কী ভয়ানক পাপ করেছে?

পঞ্চক। চুপ চুপ। ভয় নেই সুভদ্র, কাঁদছিস কেন ভাই? প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় তো করবি। প্রায়শ্চিত্ত করতে ভারি মজা। এখানে রোজই একঘেয়ে রকমের দিন কাটে, প্রায়শ্চিত্ত না থাকলে তো মানুষ টিঁকতেই পারত না।

প্রথম। (চুপিচুপি) জান পঞ্চকদাদা, সুভদ্র উত্তর দিকের জানলা—

পঞ্চক। আচ্ছা, আচ্ছা, সুভদ্রের মতো তোদের অত সাহস আছে?

দ্বিতীয়। আমাদের আয়তনের উত্তর দিকটা যে একজটা দেবীর!

তৃতীয়। সেদিক থেকে আমাদের আয়তনে যদি একটুও হাওয়া ঢোকে তাহলে যে সে—

পঞ্চক। তাহলে কী?

তৃতীয়। সে যে ভয়ানক।

পঞ্চক। কী ভয়ানক শুনিই না।

তৃতীয়। জানি নে, কিন্তু সে ভয়ানক।

সুভদ্র। পঞ্চকদাদা, আমি আর কখনো খুলব না পঞ্চকদাদা। আমার কী হবে?

পঞ্চক। শোন বলি সুভদ্র, কিসে কী হয় আমি ভাই কিছুই জানি নে—কিন্তু যাই হ'ক না, আমি তাতে একটুও ভয় করি নে।

সুভদ্র। ভয় কর না?

সকল ছেলে। ভয় কর না?

পঞ্চক। না। আমি তো বলি, দেখিই না কী হয়।

সকলে। (কাছে ঘেঁষিয়া) আচ্ছা দাদা, তুমি বুঝি অনেক দেখেছ?

পঞ্চক। দেখেছি বই কি। ও-মাসে শনিবারে যেদিন মহাময়ূরী দেবীর পূজা পড়ল, সেদিন আমি কাঁসার থালায় ইঁদুরের গর্তের মাটি রেখে, তার উপর পাচটা শেয়ালকাঁটার পাতা আর তিনটে মাষকলাই সাজিয়ে নিজে আঠারো বার ফুঁ দিয়েছি।

সকলে। অ্যাঁ। কী ভয়ানক। আঠারো বার!

সুভদ্র। পঞ্চকদাদা, তোমার কী হল?

পঞ্চক। তিনদিনের দিন যে সাপটা এসে আমাকে নিশ্চয় কামড়াবে কথা ছিল, সে আজ পর্যন্ত আমাকে খুঁজে বের করতে পারে নি।

প্রথম। কিন্তু ভয়ানক পাপ করেছ তুমি।

দ্বিতীয়। মহাময়ূরী দেবী ভয়ানক রাগ করেছেন।

পঞ্চক। তাঁর রাগটা কী রকম সেইটে দেখবার জন্যেই তো এ কাজ করেছি।

সুভদ্র। কিন্তু পঞ্চকদাদা, যদি তোমাকে সাপে কামড়াত।

পঞ্চক। তাহলে মাথা থেকে পা পর্যন্ত কোথাও কোনো সন্দেহ থাকত না।—ভাই সুভদ্র, জানলা খুলে তুই কী দেখলি বল দেখি।

দ্বিতীয়। না না, বলিস নে।

তৃতীয়। না, সে আমরা শুনতে পারব না—কী ভয়ানক।

প্রথম। আচ্ছা, একটু,—খুব একটুখানি বল ভাই।

সুভদ্র। আমি দেখলুম সেখানে পাহাড়, গোরু চরছে—

বালকগণ। (কানে আঙুল দিয়া) ও বাবা, না না, আর শুনব না। আর ব'লো না সুভদ্র। ওই যে উপাধ্যায়মশায় আসছেন। চল চল—আর না।

পঞ্চক। কেন? এখন তোমাদের কী?

প্রথম। বেশ, তাও জান না বুঝি? আজ যে পূর্বফাল্গুনী নক্ষত্র—

পঞ্চক। তাতে কী?

দ্বিতীয়। আজ কাকিনী সরোবরের নৈর্ঋত কোণে ঢোঁড়া সাপের খোলস খুঁজতে হবে না?

পঞ্চক। কেন রে?

প্রথম। তুমি কিছু জান না পঞ্চকদাদা। সেই খোলস কালো রঙের ঘোড়ার লেজের সাতগাছি চুল দিয়ে বেঁধে পুড়িয়ে ধোঁয়া করতে হবে যে।

দ্বিতীয়। আজ যে পিতৃপুরুষেরা সেই ধোঁয়া ঘ্রাণ করতে আসবেন।

পঞ্চক। তাতে তাঁদের কষ্ট হবে না?

প্রথম। পুণ্য হবে যে, ভয়ানক পুণ্য। [সুভদ্র ব্যতীত বালকগণের প্রস্থান

উপাধ্যায়ের প্রবেশ

সুভদ্র। উপাধ্যায়মশায়।

পঞ্চক। আরে পালা পালা। উপাধ্যায়মশায়ের কাছ থেকে একটু পরমার্থতত্ত্ব শুনতে হবে এখন বিরক্ত করিস নে, একেবারে দৌড়ে পালা।

উপাধ্যায়। কী সুভদ্র, তোমার বক্তব্য কী শীঘ্র বলে যাও।

সুভদ্র। আমি ভয়ানক পাপ করেছি।

পঞ্চক। ভারি পণ্ডিত কিনা। পাপ করেছি! পালা বলছি।

উপাধ্যায়। (উৎসাহিত হইয়া) পাপ করেছ? ওকে তাড়া দিচ্ছ কেন? সুভদ্র শুনে যাও।

পঞ্চক। আর রক্ষা নেই, পাপের একটুকু গন্ধ পেলে একেবারে মাছির মতো ছোটে।

উপাধ্যায়। কী বলছিলে?

সুভদ্র। আমি পাপ করেছি।

উপাধ্যায়। পাপ করেছ? আচ্ছা বেশ। তাহলে বসো। শোনা যাক।

সুভদ্র। আমি আয়তনের উত্তর দিকের—

উপাধ্যায়। বলো, বলো, উত্তর দিকের দেয়ালে আঁক কেটেছ?

সুভদ্র। না, আমি উত্তর দিকের জানলায়—

উপাধ্যায়। বুঝেছি, কনুই ঠেকিয়েছ। তাহলে তো সেদিকে আমাদের যতগুলি যজ্ঞের পাত্র আছে সমস্তই ফেলা যাবে। সাত মাসের বাছুরকে দিয়ে ওই জানলা না চাটাতে পারলে শোধন হবে না।

পঞ্চক। এটা আপনি ভুল বলছেন। ক্রিয়াসংগ্রহে আছে ভূমিকুষ্মাণ্ডের বোঁটা দিয়ে একবার—

উপাধ্যায়। তোমার তো স্পর্ধা কম দেখি নে। কুলদত্তের ক্রিয়াসংগ্রহের অষ্টাদশ অধ্যায়টি কি কোনোদিন খুলে দেখা হয়েছে।

পঞ্চক। (জনান্তিকে) সুভদ্র যাও তুমি।—কিন্তু কুলদত্তকে তো আমি—

উপাধ্যায়। কুলদত্তকে মান না? আচ্ছা, ভরদ্বাজ মিশ্রের প্রয়োগপ্রজ্ঞপ্তি তো মানতেই হবে—তাতে—

সুভদ্র। উপাধ্যায় মশায় আমি ভয়ানক পাপ করেছি।

পঞ্চক। আবার! সেই কথাই তো হচ্ছে। তুই চুপ কর।

উপাধ্যায়। সুভদ্র, উত্তরের দেয়ালে যে আঁক কেটেছ সে চতুষ্কোণ, না গোলাকার?

সুভদ্র। আঁক কাটি নি। আমি জানলা খুলে বাইরে চেয়েছিলুম।

উপাধ্যায়। (বসিয়া পড়িয়া) আঃ সর্বনাশ। করেছিস কী। আজ তিন-শ পঁয়তাল্লিশ বছর ওই জানলা কেউ খোলে নি তা জানিস?

সুভদ্র। আমার কী হবে।

পঞ্চক। সুভদ্রকে আলিঙ্গন করিয়া তোমার জয়জয়কার হবে সুভদ্র। তিন-শ পঁয়তাল্লিশ বছরের আগল তুমি ঘুচিয়েছ। তোমার এই অসামান্য সাহস দেখে উপাধ্যায়-মশায়ের মুখে আর কথা নেই। গুরু আসার পথ তুমিই প্রথম খোলসা করে দিলে।

[সুভদ্রকে টানিয়া লইয়া প্রস্থান

উপাধ্যায়। জানি নে কী সর্বনাশ হবে। উত্তরের অধিষ্ঠাত্রী যে একজটা দেবী! বালকের দুই চক্ষু মুহূর্তেই পাথর হয়ে গেল না কেন তাই ভাবছি। যাই আচার্যদেবকে জানাই গে!

[প্রস্থান

আচার্য ও উপাচার্যের প্রবেশ

আচার্য। এতকাল পরে আমাদের গুরু আসছেন।

উপাচার্য। তিনি প্রসন্ন হয়েছেন।

আচার্য। প্রসন্ন হয়েছেন? তা হবে। হয়তো প্রসন্নই হয়েছেন। কিন্তু কেমন করে জানব।

উপাচার্য। নইলে তিনি আসবেন কেন।

আচার্য। এক-এক সময়ে মনে ভয় হয় যে, হয়তো অপরাধের মাত্রা পূর্ণ হয়েছে বলেই তিনি আসছেন।

উপাচার্য। না, আচার্যদেব, এমন কথা বলবেন না। আমরা কঠোর নিয়ম সমস্তই নিঃশেষে পালন করেছি—কোনো ত্রুটি ঘটে নি।

আচার্য। কঠোর নিয়ম? হাঁ, সমস্তই পালিত হয়েছে।

উপাচার্য। বজ্রশুদ্ধিব্রত আমাদের আয়তনে এইবার নিয়ে ঠিক সাতাত্তর বার পূর্ণ হয়েছে। আর কোনো আয়তনে এ কি সম্ভবপর হয়।

আচার্য। না আর কোথাও হতে পারে না।

উপাচার্য। কিন্তু তবু আপনার মনে এমন দ্বিধা হচ্ছে কেন?

আচার্য। সুতসোম, তোমার মনে কি তুমি শান্তি পেয়েছ?

উপাচার্য। আমার তো একমুহূর্তের জন্যে অশান্তি নেই।

আচার্য। অশান্তি নেই?

উপাচার্য। কিছুমাত্র না। আমার অহোরাত্র একেবারে নিয়মে বাঁধা। এর চেয়ে আর শান্তি কী হতে পারে?

আচার্য। ঠিক, ঠিক,—ঠিক বলেছ সুতসোম। অচেনার মধ্যে গিয়ে কোথায় তার অন্ত পাব। এখানে সমস্তই জানা, সমস্তই অভ্যস্ত—এখানকার সমস্ত প্রশ্নের উত্তর এখানকারই সমস্ত শাস্ত্রের ভিতর থেকে পাওয়া যায়—তার জন্যে একটুও বাইরে যাবার দরকার হয় না। এই তো নিশ্চল শান্তি!

উপাচার্য। আচার্যদেব, আপনাকে এমন বিচলিত হতে কখনো দেখি নি।

আচার্য। কী জানি, আমার কেমন মনে হচ্ছে কেবল একলা আমিই না, চারিদিকে সমস্তই বিচলিত হয়ে উঠছে। আমার মনে হচ্ছে আমাদের এখানকার দেয়ালের প্রত্যেক পাথরটা পর্যন্ত বিচলিত। তুমি এটা অনুভব করতে পারছ না সুতসোম?

উপাচার্য। কিছুমাত্র না। এখানকার অটল স্তব্ধতার লেশমাত্র বিচ্যুতি দেখতে পাচ্ছি নে। আমাদের তো বিচলিত হবার কথাও না। আমাদের সমস্ত শিক্ষা কোন্ কালে সমাধা হয়ে গেছে। আমাদের সমস্ত লাভ সমাপ্ত, সমস্ত সঞ্চয় পর্যাপ্ত। ওই যে পঞ্চক আসছে। পাথরের মধ্যে কি ঘাস বেরোয়। এমন ছেলে আমাদের আয়তনে কী করে সম্ভব হল। ওই আমাদের দুর্লক্ষণ। এই আয়তনের মধ্যে ও কেবল আপনাকেই মানে। আপনি ওকে একটু ভর্ৎসনা করে দেবেন।

আচার্য। আচ্ছা তুমি যাও। আমি ওর সঙ্গে একটু নিভৃতে কথা কয়ে দেখি।

[উপাচার্যের প্রস্থান

পঞ্চকের প্রবেশ

আচার্য। (পঞ্চকের গায়ে হাত দিয়া) বৎস, পঞ্চক।

পঞ্চক। করলেন কী। আমাকে ছুঁলেন?

আচার্য। কেন, বাধা কী আছে।

পঞ্চক। আমি যে আচার রক্ষা করতে পারি নি।

আচার্য। কেন পার নি বৎস।

পঞ্চক। প্রভু, কেন, তা আমি বলতে পারি নে। আমার পারবার উপায় নেই।

আচার্য। সৌম্য, তুমি তো জান, এখানকার যে নিয়ম সেই নিয়মকে আশ্রয় করে হাজার বছর হাজার হাজার লোক নিশ্চিন্ত আছে। আমরা যে খুশি তাকে কি ভাঙতে পারি।

পঞ্চক। আচার্যদেব, যে-নিয়ম সত্য তাকে ভাঙতে না দিলে তার যে পরীক্ষা হয় না। তাই কি ঠিক নয়?

আচার্য। যাও বৎস, তোমার পথে তুমি যাও। আমাকে কোনো কথা জিজ্ঞাসা ক'রো না।

পঞ্চক। আচার্যদেব, আপনি জানেন না কিন্তু আপনিই আমাকে নিয়মের চাকার নিচে থেকে টেনে নিয়েছেন।

আচার্য। কেমন করে বৎস।

পঞ্চক। তা জানি নে, কিন্তু আপনি আমাকে এমন একটা-কিছু দিয়েছেন যা আচারের চেয়ে নিয়মের চেয়ে অনেক বেশি।

আচার্য। তুমি কী কর না কর আমি কোনোদিন জিজ্ঞাসা করি নে, কিন্তু আজ একটি কথা জিজ্ঞাসা করব। তুমি কি অচলায়তনের বাইরে গিয়ে যূনক জাতির সঙ্গে মেশ।

পঞ্চক। আপনি কি এর উত্তর শুনতে চান।

আচার্য। না না থাক, ব'লো না। কিন্তু যূনকেরা যে অত্যন্ত ম্লেচ্ছ। তাদের সহবাস কি—

পঞ্চক। তাদের সম্বন্ধে আপনার কি কোনো বিশেষ আদেশ আছে?

আচার্য। না না, আদেশ আমার কিছুই নেই। যদি ভুল করতে হয় তবে ভুল করো গে—তুমি ভুল করো গে—আমাদের কথা শুনো না।

পঞ্চক। ওই উপাচার্য আসছেন—বোধ করি কাজের কথা আছে—বিদায় হই।

[প্রস্থান

উপাধ্যায় ও উপাচার্যের প্রবেশ

উপাচার্য। (উপাধ্যায়ের প্রতি) আচার্যদেবকে তো বলতেই হবে। উনি নিতান্ত উদ্বিগ্ন হবেন—কিন্তু দায়িত্ব যে ওঁরই।

আচার্য। উপাধ্যায়, কোনো সংবাদ আছে নাকি।

উপাধ্যায়। অত্যন্ত মন্দ সংবাদ।

আচার্য। অতএব সেটা সত্বর বলা উচিত।

উপাধ্যায়। আচার্যদেব, সুভদ্র আমাদের আয়তনের উত্তর দিকের জানলা খুলে বাইরে দৃষ্টিপাত করেছে।

আচার্য। উত্তর দিকটা তো একজটা দেবীর।

উপাধ্যায়। সেই তো ভাবনা। আমাদের আয়তনের মন্ত্রপূত রুদ্ধ বাতাসকে সেখানকার হাওয়া কতটা দূর পর্যন্ত আক্রমণ করেছে বলা তো যায় না।

উপাচার্য। এখন কথা হচ্ছে এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কী।

আচার্য। আমার তো স্মরণ হয় না। উপাধ্যায় বোধ করি—

উপাধ্যায়। না, আমিও তো মনে আনতে পারি নে। আজ তিন-শ বছর এ প্রায়শ্চিত্তটার প্রয়োজন হয় নি—সবাই ভুলেই গেছে। ওই যে মহাপঞ্চক আসছে—যদি কারও জানা থাকে তো সে ওর।

মহাপঞ্চকের প্রবেশ

উপাধ্যায়। মহাপঞ্চক, সব শুনেছ বোধ করি।

মহাপঞ্চক। সেই জন্যেই তো এলুম ; আমরা এখন সকলেই অশুচি, বাহিরের হাওয়া আমাদের আয়তনে প্রবেশ করেছে।

উপাচার্য। এর প্রায়শ্চিত্ত কী, আমাদের কারও স্মরণ নেই। তুমিই হয়তো বলতে পার।

মহাপঞ্চক। ক্রিয়াকল্পতরুতে এর কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না—একমাত্র ভগবান জ্বলনানন্তকৃত আধিকর্মিক বর্ষায়ণে লিখছে, অপরাধীকে ছয়মাস মহাতামস সাধন করতে হবে।

উপাচার্য। মহাতামস ?

মহাপঞ্চক। হাঁ, ওকে অন্ধকারে রেখে দিতে হবে, আলোকের এক রশ্মিমাত্রও দেখতে পাবে না। কেননা আলোকের দ্বারা যে-অপরাধ অন্ধকারের দ্বারাই তার ক্ষালন।

উপাচার্য। তা হলে, মহাপঞ্চক, সমস্ত ভার তোমার উপর রইল।

উপাধ্যায়। চলো আমিও তোমার সঙ্গে যাই। ততক্ষণ সুভদ্রকে হিঙ্গুমর্দনকুণ্ডে স্নান করিয়ে আনি গে। [সকলের গমনোদ্যম

আচার্য। শোনো, প্রয়োজন নেই।

উপাধ্যায়। কিসের প্রয়োজন নেই।

আচার্য। প্রায়শ্চিত্তের।

মহাপঞ্চক। প্রয়োজন নেই বলছেন! আধিকর্মিক বর্ষায়ণ খুলে আমি এখনই দেখিয়ে দিচ্ছি—

আচার্য। দরকার নেই—সুভদ্রকে কোনো প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে না, আমি আশীর্বাদ করে তার—

মহাপঞ্চক। এও কি কখনো সম্ভব হয়। যা কোনো শাস্ত্রে নেই আপনি কি তাই—

আচার্য। না, হতে দেব না, যদি কোনো অপরাধ ঘটে সে আমার। তোমাদের ভয় নেই।

উপাধ্যায়। এ রকম দুর্বলতা তো আপনার কোনোদিন দেখি নি। এই তো সেবার অষ্টাঙ্গশুদ্ধি উপবাসে তৃতীয় রাত্রে বালক কুশলশীল জল জল করে পিপাসায় প্রাণত্যাগ করলে কিন্তু তবু তার মুখে যখন এক বিন্দু জল দেওয়া গেল না, তখন তো আপনি নীরব হয়ে ছিলেন। তুচ্ছ মানুষের প্রাণ আজ আছে কাল নেই, কিন্তু সনাতন ধর্মবিধি তো চিরকালের।

সুভদ্রকে লইয়া পঞ্চকের প্রবেশ

পঞ্চক। ভয় নেই সুভদ্র, তোর কোনো ভয় নেই—এই শিশুটিকে অভয় দাও প্রভু।

আচার্য। বৎস, তুমি কোনো পাপ কর নি। যারা বিনা অপরাধে তোমাকে হাজার হাজার বৎসর ধরে মুখ বিকৃত করে ভয় দেখাচ্ছে, পাপ তাদেরই। এস পঞ্চক।

[সুভদ্রকে কোলে লইয়া পঞ্চকের সঙ্গে প্রস্থান

উপাধ্যায়। এ কী হল উপাচার্যমশায়? [উপাচার্যের প্রস্থান

মহাপঞ্চক। আমরা অশুচি হয়ে রইলুম, আমাদের যাগযজ্ঞ ব্রত-উপবাস সকলই পণ্ড হতে থাকল, এ তো সহ্য করা শক্ত।

উপাধ্যায়। এ সহ্য করা চলবেই না। আচার্য কি শেষে আমাদের ম্লেচ্ছের সঙ্গে সমান করে দিতে চান?

মহাপঞ্চক। উনি আজ সুভদ্রকে বাঁচাতে গিয়ে সনাতন ধর্মকে বিনাশ করবেন! এ কী রকম বুদ্ধিবিকার ওঁর ঘটল? এ অবস্থায় ওঁকে আচার্য বলে গণ্য করাই চলবে না।

সঞ্জীব, বিশ্বম্ভর, জয়োত্তমের প্রবেশ

সঞ্জীব। এতদিন এখানে সব ঠিক চলছিল। যেই গুরু আসবেন রব উঠল অমনি কেন এই সব অনাচার ঘটতে লাগল?

বিশ্বম্ভর। আচার্য অদীনপুণ্য যদি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ না করেন, তবে তিনি যেমন আছেন থাকুন কিন্তু আমরা তাঁর কোনো অনুশাসন মানব না।

জয়োত্তম। তিনি বলেন, তাঁর গুরু তাঁকে যে আসনে বসিয়েছেন তাঁর গুরুই তাঁকে সেই আসন থেকে নামিয়ে দেবেন, সেইজন্যে তিনি অপেক্ষা করছেন।

অধ্যেতার প্রবেশ

উপাধ্যায়। কী গো অধ্যেতা, ব্যাপার কী?

অধ্যেতা। সুভদ্রকে মহাতামসে বসায় কার সাধ্য?

মহাপঞ্চক। কেন কী বিঘ্ন ঘটেছে?

অধ্যেতা। মূর্তিমান বিঘ্ন রয়েছে তোমার ভাই।

মহাপঞ্চক। পঞ্চক?

অধ্যেতা। হাঁ। আমি ডাকতেই সুভদ্র ছুটে এল কিন্তু পঞ্চক তাকে কেড়ে নিয়ে গেল।

মহাপঞ্চক। না, এই নরাধমকে নিয়ে আর চলল না। অনেক সহ্য করেছি। এবার ওকে নির্বাসন দেওয়াই স্থির। কিন্তু অধ্যেতা, তুমি এটা সহ্য করলে?

অধ্যেতা। আমি কি তোমার পঞ্চককে ভয় করি? স্বয়ং আচার্য অদীনপুণ্য এসে তাকে আদেশ করলেন তাই তো সে সাহস পেলে।

সঞ্জীব। স্বয়ং আমাদের আচার্য!

বিশ্বম্ভর। ক্রমে এ-সব হচ্ছে কী। এতদিন এই আয়তনে আছি কখনো তো এমন অনাচারের কথা শুনি নি। আর স্বয়ং আমাদের আচার্যের এই কীর্তি!

জয়োত্তম। তাঁকে একবার জিজ্ঞাসা করেই দেখা যাক না!

বিশ্বম্ভর। না না, আচার্যকে আমরা—

মহাপঞ্চক। কী করবে আচার্যকে, বলেই ফেলো।

বিশ্বম্ভর। তাই তো ভাবছি কী করা যায়। তাঁকে না হয়—আপনি বলে দিন না কী করতে হবে।

মহাপঞ্চক। আমি বলছি তাঁকে সংযত করে রাখতে হবে।

সঞ্জীব। কেমন করে?

মহাপঞ্চক। কেমন করে আবার কী। মত্ত হস্তীকে যেমন করে সংযত করতে হয় তেমনি করে।

জয়োত্তম। আমাদের আচার্যদেবকে কি তা হলে—

মহাপঞ্চক। হাঁ, তাঁকে বন্ধ করে রাখতে হবে। চুপ করে রইলে যে। পারবে না?

আচার্যের প্রবেশ

আচার্য। বৎস, এতদিন তোমরা আমাকে আচার্য বলে মেনেছ, আজ তোমাদের সামনে আমার বিচারের দিন এসেছে। আমি স্বীকার করছি অপরাধের অন্ত নেই, অন্ত নেই, তার প্রায়শ্চিত্ত আমাকেই করতে হবে।

সঞ্জীব। তবে আর দেরি করেন কেন? এদিকে যে আমাদের সর্বনাশ হয়।

আচার্য। গুরু চলে গেলেন আমরা তাঁর জায়গায় পুঁথি নিয়ে বসলুম; সেই জীর্ণ পুঁথির ভাণ্ডারে প্রতিদিন তোমরা দলে দলে আমার কাছে তোমাদের তরুণ হৃদয়টি মেলে ধরে কী চাইতে এসেছিলে? অমৃতবাণী? কিন্তু আমার তালু যে শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। রসনায় যে রসের লেশমাত্র নেই। এবার নিয়ে এস সেই বাণী, গুরু, নিয়ে এস হৃদয়ের বাণী। প্রাণকে প্রাণ দিয়ে জাগিয়ে দিয়ে যাও।

পঞ্চক। (ছুটিয়া প্রবেশ করিয়া) তোমার নববর্ষার সজল হাওয়ায় উড়ে যাক সব শুকনো পাতা—আয় রে নবীন কিশলয়—তোরা ছুটে আয়, তোরা ফুটে বেরো। ভাই জয়োত্তম, শুনছ না, আকাশের ঘননীল মেঘের মধ্যে মুক্তির ডাক উঠেছে—আজ নৃত্য কর রে নৃত্য কর।

গান

ওরে ওরে ওরে আমার মন মেতেছে
তারে আজ থামায় কে রে।
সে যে আকাশ পানে হাত পেতেছে
তারে আজ নামায় কে রে।

প্রথমে জয়োত্তমের, পরে বিশ্বম্ভরের, পরে সঞ্জীবের নৃত্যগীতে যোগ

মহাপঞ্চক। পঞ্চক, নির্লজ্জ বানর কোথাকার, থাম বলছি থাম।

পঞ্চক। গান

ওরে আমার মন মেতেছে
আমারে থামায় কে রে।

মহাপঞ্চক। উপাধ্যায়, আমি তোমাকে বলি নি একজটা দেবীর শাপ আরম্ভ হয়েছে? দেখছ, কী করে তিনি আমাদের সকলের বুদ্ধিকে বিচলিত করে তুলছেন— ক্রমে দেখবে অচলায়তনের একটি পাথরও আর থাকবে না।

পঞ্চক। না, থাকবে না, থাকবে না, পাথরগুলো সব পাগল হয়ে যাবে; তারা কে কোথায় ছুটে বেরিয়ে পড়বে, তারা গান ধরবে—

ওরে ভাই, নাচ রে ও ভাই নাচ রে—
আজ ছাড়া পেয়ে বাঁচ রে,—
লাজভয় ঘুচিয়ে দে রে;
তোরে আজ থামায় কে রে!

মহাপঞ্চক। উপাধ্যায়, হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখছ কী। সর্বনাশ শুরু হয়েছে, বুঝতে পারছ না। ওরে সব ছন্নমতি মূর্খ, অভিশপ্ত বর্বর, আজ তোদের নাচবার দিন?

পঞ্চক। সর্বনাশের বাজনা বাজলেই নাচ শুরু হয় দাদা।

মহাপঞ্চক। চুপ কর লক্ষ্মীছাড়া। ছাত্রগণ, তোমরা আত্মবিস্মৃত হ'য়ো না। ঘোর বিপদ আসন্ন সে-কথা স্মরণ রেখো।

বিশ্বম্ভর। আচার্যদেব পায়ে ধরি, সুভদ্রকে আমাদের হাতে দিন, তাকে তার প্রায়শ্চিত্ত থেকে নিরস্ত করবেন না।

আচার্য। না বৎস, এমন অনুরোধ ক'রো না।

সঞ্জীব। ভেবে দেখুন, সুভদ্রের কতবড়ো ভাগ্য। মহাতামস ক-জন লোকে পারে। ও যে ধরাতলে দেবত্ব লাভ করবে।

আচার্য। গায়ের জোরে দেবতা গড়বার পাপে আমাকে লিপ্ত ক'রো না। সে মানুষ, সে শিশু, সেইজন্যেই সে দেবতাদের প্রিয়।

জয়োত্তম। দেখুন আপনি আমাদের আচার্য, আমাদের প্রণম্য, কিন্তু যে অন্যায় কাজ করছেন, তাতে আমরা বলপ্রয়োগ করতে বাধ্য হব।

আচার্য। করো, বলপ্রয়োগ করো, আমাকে মেনো না, আমাকে মারো, আমি অপমানেরই যোগ্য, তোমাদের হাত দিয়ে আমার যে শাস্তি আরম্ভ হল তাতেই বুঝতে পারছি গুরুর আবির্ভাব হয়েছে। কিন্তু সেই জন্যেই বলছি শাস্তির কারণ আর বাড়তে দেব না। সুভদ্রকে তোমাদের হাতে দিতে পারব না।

বিশ্বম্ভর। পারবেন না?

আচার্য। না।

মহাপঞ্চক। তাহলে আর দ্বিধা করা নয়। বিশ্বম্ভর, এখন তোমাদের উচিত ওঁকে

জোর করে ধরে নিয়ে ঘরে বন্ধ করা। ভীরু, কেউ সাহস করছ না? আমাকেই তবে এ কাজ করতে হবে?

জয়োত্তম। খবরদার—আচার্যদেবের গায়ে হাত দিতে পারবে না।

বিশ্বম্ভর। না না, মহাপঞ্চক, ওঁকে অপমান করলে আমরা সইতে পারব না।

সঞ্জীব। আমরা সকলে মিলে পায়ে ধরে ওঁকে রাজি করাব। একা সুভদ্রের প্রতি দয়া করে উনি কি আমাদের সকলের অমঙ্গল ঘটাবেন?

বিশ্বম্ভর। এই অচলায়তনের এমন কত শিশু উপবাসে প্রাণত্যাগ করেছে—তাতে ক্ষতি কী হয়েছে।

সুভদ্রের প্রবেশ

সুভদ্র। আমাকে মহাতামস ব্রত করাও।

পঞ্চক। সর্বনাশ করলে। ঘুমিয়ে পড়েছে দেখে আমি এখানে এসেছিলুম কখন জেগে উঠে চলে এসেছে।

আচার্য। বৎস সুভদ্র, এস আমার কোলে। যাকে পাপ বলে ভয় করছ সে পাপ আমার—আমিই প্রায়শ্চিত্ত করব।

বিশ্বম্ভর। না না, আয় রে আয় সুভদ্র, তুই মানুষ না, তুই দেবতা।

সঞ্জীব। তুই ধন্য।

বিশ্বম্ভর। তোর বয়সে মহাতামস করা আর কারও ভাগ্যে ঘটে নি। সার্থক তোর মা তোকে গর্ভে ধারণ করেছিলেন।

উপাধ্যায়। আহা সুভদ্র, তুই আমাদের অচলায়তনেরই বালক বটে।

মহাপঞ্চক। আচার্য, এখনও কি তুমি জোর করে এই বালককে এই মহাপুণ্য থেকে বঞ্চিত করতে চাচ্ছ?

আচার্য। হায় হায়, এই দেখেই তো আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। তোমরা যদি ওকে কাঁদিয়ে আমার হাত থেকে ছিঁড়ে কেড়ে নিয়ে যেতে তাহলেও আমার এত বেদনা হত না। কিন্তু দেখছি হাজার বছরের নিষ্ঠুর মুষ্টি অতটুকু শিশুর মনকেও চেপে ধরেছে, একেবারে পাঁচ আঙুলের দাগ বসিয়ে দিয়েছে রে। কখন সময় পেল সে। সে কী গর্ভের মধ্যেও কাজ করে।

পঞ্চক। সুভদ্র, আয় ভাই, প্রায়শ্চিত্ত করতে যাই—আমিও যাব তোর সঙ্গে।

আচার্য। বৎস, আমিও যাব।

সুভদ্র। না না, আমাকে যে একলা থাকতে হবে—লোক থাকলে যে পাপ হবে।

মহাপঞ্চক। ধন্য শিশু, তুমি তোমার ওই প্রাচীন আচার্যকে আজ শিক্ষা দিলে। এস তুমি আমার সঙ্গে।

আচার্য। না, আমি যতক্ষণ তোমাদের আচার্য আছি ততক্ষণ আমার আদেশ ব্যতীত কোনো ব্রত আরম্ভ বা শেষ হতেই পারে না। আমি নিষেধ করছি। সুভদ্র, আচার্যের কথা অমান্য ক'রো না—এস পঞ্চক ওকে কোলে করে নিয়ে এস।

[সুভদ্রকে লইয়া পঞ্চকের ও আচার্যের এবং উপাধ্যায়ের প্রস্থান

মহাপঞ্চক। ধিক! তোমাদের মতো ভীরুদের দুর্গতি হতে রক্ষা করে এমন সাধ্য কারও নেই। তোমরা নিজেও মরবে অন্য সকলকেও মারবে।

পদাতিকের প্রবেশ

পদাতিক। স্থবিরপত্তনের রাজা আসছেন।

মহাপঞ্চক। ব্যাপারখানা কী। এ যে আমাদের রাজা মন্থরগুপ্ত।

রাজার প্রবেশ

রাজা। নরদেবগণ, তোমাদের সকলকে নমস্কার।

সকলে। জয়োস্তু রাজন্।

মহাপঞ্চক। কুশল তো?

রাজা। অত্যন্ত মন্দ সংবাদ। প্রত্যন্তদেশের দূতেরা এসে খবর দিল যে দাদাঠাকুরের দল এসে আমাদের রাজ্যসীমার কাছে বাসা বেঁধেছে।

মহাপঞ্চক। দাদাঠাকুরের দল কারা?

রাজা। ওই যে যূনকরা।

মহাপঞ্চক। যূনকরা যদি একবার আমাদের প্রাচীর ভাঙে তাহলে যে সমস্ত লণ্ডভণ্ড করে দেবে।

রাজা। সেইজন্যেই তো ছুটে এলুম। চণ্ডক বলে একজন যূনক আমাদের স্থবিরক সম্প্রদায়ের মন্ত্র পাবার জন্যে গোপনে তপস্যা করছিল। আমি সংবাদ পেয়েই তার শিরশ্ছেদ করেছি।

মহাপঞ্চক। ভালোই করেছেন। কিন্তু এদিকে আমাদের অচলায়তনের মধ্যেই যে পাপ প্রবেশ করেছে তার কী করলেন? আমাদের পরাভবের আর দেরি কী?

রাজা। সে কী কথা।

সঞ্জীব। আয়তনে একজটা দেবীর শাপ লেগেছে।

রাজা। একজটা দেবীর শাপ! সর্বনাশ। কেন তাঁর শাপ?

মহাপঞ্চক। যে উত্তরদিকে তাঁর অধিষ্ঠান এখানে একদিন সেইদিককার জানালা খোলা হয়েছে।

রাজা। (বসিয়া পড়িয়া) তবে তো আর আশা নেই।

মহাপঞ্চক। আচার্য অদীনপুণ্য এ-পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে দিচ্ছেন না।

বিশ্বম্ভর। তিনি জোর করে আমাদের ঠেকিয়ে রেখেছেন।

রাজা। দাও, দাও, অদীনপুণ্যকে এখনই নির্বাসিত করে দাও।

মহাপঞ্চক। আগামী অমাবস্যায়—

রাজা। না না, এখন তিথিনক্ষত্র দেখবার সময় নেই। বিপদ আসন্ন। সংকটের সময় আমি আমার রাজ-অধিকার খাটাতে পারি—শাস্ত্রে তার বিধান আছে।

মহাপঞ্চক। হাঁ আছে। কিন্তু আচার্য কে হবে ?

রাজা। তুমি, তুমি। এখনই আমি তোমাকে আচার্যের পদে প্রতিষ্ঠিত করে দিলুম। দিক্‌পালগণ সাক্ষী, এই ব্রহ্মচারিগণ সাক্ষী।

মহাপঞ্চক। অদীনপুণ্যকে কোথায় নির্বাসিত করতে চান ?

রাজা। আয়তনের বাইরে নয়। কী জানি যদি যূনকদের সঙ্গে যোগ দেন। আয়তনের প্রান্তে যে দর্ভকপাড়া আছে সেইখানে তাঁকে বদ্ধ করে রেখো।

জয়োত্তম। আচার্য অদীনপুণ্যকে দর্ভকদের পাড়ায় ? তারা যে অন্ত্যজজাতি—অশুচি পতিত।

মহাপঞ্চক। যিনি স্পর্ধাপূর্বক আচার লঙ্ঘন করেন, অনাচারীদের মধ্যে নির্বাসনই তাঁর উচিত দণ্ড। মনে ক'রো না আমার ভাই বলে পঞ্চককে ক্ষমা করব। তারও সেই দর্ভকপাড়ায় গতি।

দূতের প্রবেশ

দূত। শুনলুম গুরু খুব কাছে এসেছেন।

রাজা। কে বললে ?

দূত। চারিদিকেই কথা উঠেছে।

রাজা। তাহলে তো তাঁর অভ্যর্থনার আয়োজন করতে হবে। মহাপঞ্চক, অচলায়তনের সমস্ত জানলা বন্ধ করে শুদ্ধিমন্ত্র পাঠ করাতে থাকো।

মহাপঞ্চক। জানলা বন্ধ সম্বন্ধে ভাববেন না। মন্ত্রের ভার আমি নিচ্ছি।

[রাজার প্রস্থান

পঞ্চক কোথায় ?

জয়োত্তম। শুনলুম সে প্রাচীর ডিঙিয়ে যূনকদের কাছে গেছে।

মহাপঞ্চক। পাষণ্ড। আর যেন সে আয়তনে ফিরে না আসে। গুরু আসবার আগেই এখানকার সমস্ত উপদ্রব দূর করা চাই। ওহে ব্রহ্মচারিগণ, মন্ত্র পড়বার জন্যে স্নান করে প্রস্তুত হয়ে এস।

২

পাহাড় মাঠ

পঞ্চকের গান

এ পথ গেছে কোন্‌খানে গো কোন্‌খানে—
তা কে জানে তা কে জানে।
কোন্ পাহাড়ের পারে, কোন্ সাগরের ধারে,
কোন্ দুরাশার দিকপানে—
তা কে জানে তা কে জানে।
এ পথ দিয়ে কে আসে যায় কোন্‌খানে
তা কে জানে তা কে জানে।
কেমন যে তার বাণী, কেমন হাসিখানি,
যায় সে কাহার সন্ধানে
তা কে জানে তা কে জানে।

পশ্চাতে আসিয়া যূনকদলের নৃত্য

পঞ্চক। ও কী রে। তোরা কখন পিছনে এসে নাচতে লেগেছিস।

প্রথম যূনক। আমরা নাচবার সুযোগ পেলেই নাচি, পা দুটোকে স্থির রাখতে পারি নে।

দ্বিতীয় যূনক। আয় ভাই ওকে সুদ্ধ কাঁধে করে নিয়ে একবার নাচি।

পঞ্চক। আরে না না, আমাকে ছুঁস নে রে ছুঁস নে।

তৃতীয় যূনক। ওই রে। ওকে অচলায়তনের ভূতে পেয়েছে। যূনককে ও ছোঁবে না।

পঞ্চক। জানিস, আমাদের গুরু আসবেন?

প্রথম যূনক। সত্যি নাকি। তিনি মানুষটি কী রকম? তাঁর মধ্যে নতুন কিছু আছে?

পঞ্চক। নতুনও আছে, পুরোনোও আছে।

দ্বিতীয় যূনক। আচ্ছা এলে খবর দিয়ো—একবার দেখব তাঁকে।

পঞ্চক। তোরা দেখবি কী রে। সর্বনাশ। তিনি তো যূনকদের গুরু নন। তাঁর কথা তোদের কানে পাছে এক অক্ষরও যায় সেজন্যে তোদের দিকের প্রাচীরের বাইরে সাত সার রাজার সৈন্য পাহারা দেবে। তোদেরও তো গুরু আছে—তাকে নিয়েই—

তৃতীয় যূনক। গুরু! আমাদের আবার গুরু কোথায়। আমরা তো হলুম দাদাঠাকুরের দল। এ পর্যন্ত আমরা তো কোনো গুরুকে মানি নি।

প্রথম যূনক। সেইজন্যেই তো ও জিনিসটা কী রকম দেখতে ইচ্ছা করে।

দ্বিতীয় যূনক। আমাদের মধ্যে একজন, তার নাম চণ্ডক—তার কী জানি ভারি লোভ হয়েছে; সে ভেবেছে তোমাদের কোনো গুরুর কাছে মন্ত্র নিয়ে আশ্চর্য কী একটা ফল পাবে—তাই সে লুকিয়ে চলে গেছে।

তৃতীয় যূনক। কিন্তু যূনক বলে কেউ তাকে মন্ত্র দিতে চায় না। সেও ছাড়বার ছেলে নয়, সে লেগেই রয়েছে। তোমরা মন্ত্র দাও না বলেই মন্ত্র আদায় করবার জন্যে তার এত জেদ।

প্রথম যূনক। কিন্তু পঞ্চকদাদা, আমাদের ছুঁলে কি তোমার গুরু রাগ করবেন?

পঞ্চক। বলতে পারি নে—কী জানি যদি অপরাধ নেন। ওরে, তোরা যে সবাই সব রকম কাজই করিস—সেইটে যে বড়ো দোষ। তোরা চাষ করিস তো?

প্রথম যূনক। চাষ করি বই কী, খুব করি। পৃথিবীতে জন্মেছি পৃথিবীকে সেটা খুব কষে বুঝিয়ে দিয়ে তবে ছাড়ি।

গান

আমরা চাষ করি আনন্দে।
মাঠে মাঠে বেলা কাটে সকাল হতে সন্ধ্যে।
রৌদ্র ওঠে, বৃষ্টি পড়ে, বাঁশের বনে পাতা নড়ে,
বাতাস ওঠে ভরে ভরে চষা মাটির গন্ধে।
সবুজ প্রাণের গানের লেখা, রেখায় রেখায় দেয় রে দেখা,
মাতে রে কোন্ তরুণ কবি নৃত্যদোদুল ছন্দে।
ধানের শিষে পুলক ছোটে, সকল ধরা হেসে ওঠে,
অঘ্রানেরি সোনার রোদে পূর্ণিমারি চন্দ্রে॥

পঞ্চম। আচ্ছা, না হয় তোরা চাষই করিস সেও কোনোমতে সহ্য হয়—কিন্তু কে বলছিল তোরা কাঁকুড়ের চাষ করিস ?

প্রথম যূনক। করি বই কি।

পঞ্চম। কাঁকুড়! ছি ছি। খেঁসারিডালেরও চাষ করিস বুঝি ?

তৃতীয় যূনক। কেন করব না। এখান থেকেই তো কাঁকুড় খেঁসারিডাল তোমাদের বাজারে যায়।

পঞ্চক। তা তো যায়, কিন্তু জানিস নে কাঁকুড় আর খেঁসারিডাল যারা চাষ করে তাদের আমরা ঘরে ঢুকতে দিই নে।

প্রথম যূনক। কেন।

পঞ্চক। কেন কী রে ? ওটা যে নিষেধ।

প্রথম যূনক। কেন নিষেধ ?

পঞ্চক। শোনো একবার। নিষেধ, তার আবার কেন। সাধে তোদের মুখদর্শন পাপ। এই সহজ কথাটা বুঝিস নে যে কাঁকুড় আর খেঁসারিডালের চাষটা ভয়ানক খারাপ।

দ্বিতীয় যূনক। কেন ? ওটা কি তোমরা খাও না ?

পঞ্চক। খাই বই কি, খুব আদর করে খাই—কিন্তু ওটা যারা চাষ করে তাদের ছায়া মাড়াই নে।

দ্বিতীয় যূনক। কেন ?

পঞ্চক। ফের কেন। তোরা যে এতবড়ো নিরেট মূর্খ তা জানতুম না। আমাদের পিতামহ বিকন্তী কাঁকুড়ের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সে খবর রাখিস নে বুঝি ?

দ্বিতীয় যূনক। কাঁকুড়ের মধ্যে কেন ?

পঞ্চক। আবার কেন ? তোরা যে ওই এক কেনর জ্বালায় আমাকে অতিষ্ঠ করে তুললি।

তৃতীয় যূনক। আর, খেঁসারির ডাল ?

পঞ্চক। একবার কোন্‌ যুগে একটা খেঁসারিডালের গুঁড়ো উপবাসের দিন কোন এক মস্ত বুড়োর ঠিক গোঁফের উপর উড়ে পড়েছিল; তাতে তাঁর উপবাসের পুণ্যফল থেকে ষষ্টিসহস্র ভাগের এক ভাগ কম পড়ে গিয়েছিল; তাই তখনই সেইখানে দাঁড়িয়ে উঠে তিনি জগতের সমস্ত খেঁসারিডালের খেতের উপর অভিশাপ দিয়ে গেছেন। এতবড়ো তেজ! তোরা হলে কী করতিস বল দেখি!

প্রথম যূনক। আমাদের কথা বল কেন। উপবাসের দিনে খেঁসারিডাল যদি গোঁফের উপর পর্যন্ত এগিয়ে আসে তাহলে তাকে আরও একটু এগিয়ে নিই।

পঞ্চক। আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, সত্যি করে বলিস—তোরা কি লোহার কাজ করে থাকিস?

প্রথম যূনক। লোহার কাজ করি বই কি, খুব করি।

পঞ্চক। রাম রাম। আমরা সনাতন কাল থেকে কেবল তামা-পিতলের কাজ করে আসছি। লোহা গলাতে পারি কিন্তু সব দিন নয়। ষষ্ঠীর দিনে যদি মঙ্গলবার পড়ে তবেই স্নান করে আমরা হাপর ছুঁতে পারি কিন্তু তাই বলে লোহা পিটোনো সে তো হতেই পারে না।

প্রথম যূনক। কেন, লোহা কী অপরাধটা করেছে?

পঞ্চক। আরে ওটা যে লোহা সে তো তোকে মানতেই হবে।

প্রথম যূনক। তা তো হবে।

পঞ্চক। তবে আর কী—এই বুঝে নে না।

দ্বিতীয় যূনক। তবু একটা তো কারণ আছে।

পঞ্চক। কারণ নিশ্চয়ই আছে কিন্তু কেবল সেটা পুঁথির মধ্যে। আচ্ছা, তোদের মন্ত্র কেউ পড়ায় নি?

দ্বিতীয় যূনক। মন্ত্র! কিসের মন্ত্র।

পঞ্চক। এই মনে কর যেমন বজ্রবিদারণ মন্ত্র—তট তট তোতয় তোতয়—

তৃতীয় যূনক। ওর মানে কী?

পঞ্চক। আবার! মানে! তোর আস্পর্ধা তো কম নয়। সব কথাতেই মানে! কেয়ূরী মন্ত্রটা জানিস?

প্রথম যূনক। না।

পঞ্চক। মরীচী?

প্রথম যূনক। না।

পঞ্চক। মহাশীতবতী?

প্রথম যূনক। না।

পঞ্চক। উষ্ণীষবিজয়?

প্রথম যূনক। না।

পঞ্চম। নাপিত ক্ষৌর করতে করতে যেদিন তোদের বাঁ গালে রক্ত পাড়িয়ে দেয় সেদিন করিস কী?

তৃতীয় যূনক। সেদিন নাপিতের দুই গালে চড় কষিয়ে দিই।

পঞ্চক। না রে না, আমি বলছি সেদিন নদী পার হবার দরকার হলে তোরা খেয়া নৌকোয় উঠতে পারিস?

তৃতীয় যূনক। খুব পারি।

পঞ্চক। ওরে, তোরা আমাকে মাটি করলি রে। আমি আর থাকতে পারছি নে। তোদের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে আর সাহস হচ্ছে না। এমন জবাব যদি আর-একটা শুনতে পাই তাহলে তোদের বুকে করে পাগলের মত নাচব, আমার জাতমান কিছু থাকবে না। ভাই, তোরা সব কাজই করতে পাস? তোদের দাদাঠাকুর কিছুতেই তোদের মানা করে না?

যূনকগণের গান

সব কাজে হাত লাগাই মোরা সব কাজেই।
বাধাবাঁধন নেই গো নেই।
দেখি, খুঁজি, বুঝি,
কেবল ভাঙি, গড়ি, যুঝি,
মোরা সব দেশেতেই বেড়াই ঘুরে সব সাজেই।
পারি, নাই বা পারি,
না হয় জিতি কিংবা হারি,
যদি অমনিতে হাল ছাড়ি, মরি সেই লাজেই।
আপন হাতের জোরে
আমরা তুলি সৃজন করে,
আমরা প্রাণ দিয়ে ঘর বাঁধি, থাকি তার মাঝেই।

পঞ্চক। সর্বনাশ করলে রে—আমার সর্বনাশ করলে। আমার আর ভদ্রতা রাখলে না। এদের তালে তালে আমারও পা দুটো নেচে উঠছে। আমাকে সুদ্ধ এরা টানবে দেখছি। কোন্‌দিন আমিও লোহা পিটোব রে লোহা পিটোব—কিন্তু থেঁসারির ডাল—না না, পালা ভাই, পালা তোরা। দেখছিস না পড়ব বলে পুঁথি সংগ্রহ করে এনেছি।

আর একদল যূনকের প্রবেশ

প্রথম যূনক। ও ভাই পঞ্চক, দাদাঠাকুর আসছে।

দ্বিতীয় যূনক। এখন রাখো তোমার পুঁথি রাখো—দাদাঠাকুর আসছে।

দাদাঠাকুরের প্রবেশ

প্রথম যূনক। দাদাঠাকুর।

দাদাঠাকুর। কী রে।

দ্বিতীয় যূনক। দাদাঠাকুর।

দাদাঠাকুর। কী চাই রে।

তৃতীয় যূনক। কিছু চাই নে—একবার তোমাকে ডেকে নিচ্ছি।

পঞ্চক। দাদাঠাকুর।

দাদাঠাকুর। কী ভাই, পঞ্চক যে।

পঞ্চক। ওরা সবাই তোমায় ডাকছে, আমারও কেমন ডাকতে ইচ্ছে হল। যতই ভাবছি ওদের দলে মিশব না ততই আরও জড়িয়ে পড়ছি।

প্রথম যূনক। আমাদের দাদাঠাকুরকে নিয়ে আবার দল কিসের। উনি আমাদের সব দলের শতদল পদ্ম।

পঞ্চক। ও ভাই তোদের দাদাঠাকুরকে নিয়ে তোরা তো দিনরাত মাতামাতি করছিস, একবার আমাকে ছেড়ে দে, আমি একটু নিরালায় বসে কথা কই। ভয় নেই, ওঁকে আমাদের অচলায়তনে নিয়ে গিয়ে কপাট দিয়ে রাখব না।

প্রথম যূনক। নিয়ে যাও না। সে তো ভালোই হয়। তাহলে কপাটের বাপের সাধ্য নেই বন্ধ থাকে। উনি গেলে তোমাদের অচলায়তনের পাথরগুলো সুদ্ধ নাচতে আরম্ভ করবে, পুঁথিগুলোর মধ্যে বাঁশি বাজবে।

পঞ্চক। দাদাঠাকুর, শুনছি আমাদের গুরু আসছেন।

দাদাঠাকুর। গুরু। কী বিপদ। ভারি উৎপাত করবে তা হলে তো।

পঞ্চক। একটু উৎপাত হলে যে বাঁচি। চুপচাপ থেকে প্রাণ হাঁপিয়ে উঠছে।

দাদাঠাকুর। আচ্ছা বেশ, তোমার গুরু এলে তাকে দেখে নেওয়া যাবে। এখন তুমি আছ কেমন বলো তো ?

পঞ্চক। ভয়ানক টানাটানির মধ্যে আছি ঠাকুর। মনে মনে প্রার্থনা করছি গুরু এসে যেদিকে হ'ক একদিকে আমাকে ঠিক করে রাখুন—হয় এখানকার খোলা হাওয়ার মধ্যে অভয় দিয়ে ছাড়া দিন, নয় তো খুব কষে পুঁথি চাপা দিয়ে রাখুন; মাথা থেকে পা পর্যন্ত আগাগোড়া একেবারে সমান চ্যাপ্টা হয়ে যাই।

একদল যূনকের প্রবেশ

দাদাঠাকুর। কী রে, এত ব্যস্ত হয়ে ছুটে এলি কেন ?

প্রথম যূনক। চণ্ডককে মেরে ফেলেছে।

দাদাঠাকুর। কে মেরেছে ?

দ্বিতীয় যূনক। স্থবিরপত্তনের রাজা।

পঞ্চক। আমাদের রাজা? কেন, মারতে গেল কেন?

দ্বিতীয় যূনক। স্থবিরক হয়ে ওঠবার জন্যে চণ্ডক বনের মধ্যে এক পোড়ো মন্দিরে তপস্যা করেছিল। ওদের রাজা মন্থরগুপ্ত সেই খবর পেয়ে তাকে কেটে ফেলেছে।

তৃতীয় যূনক। আগে ওদের দেশের প্রাচীর পঁয়ত্রিশ হাত উঁচু ছিল, এবার আশি হাত উঁচু করবার জন্যে লোক লাগিয়ে দিয়েছে, পাছে পৃথিবীর সব লোক লাফ দিয়ে গিয়ে হঠাৎ স্থবিরক হয়ে ওঠে।

চতুর্থ যূনক। আমাদের দেশ থেকে দশজন যূনক ধরে নিয়ে গেছে, হয়তো ওদের কালঝণ্টি দেবীর কাছে বলি দেবে।

দাদাঠাকুর। চলো তবে।

প্রথম যূনক। কোথায়?

দাদাঠাকুর। স্থবিরপত্তনে।

দ্বিতীয় যূনক। এখনই?

দাদাঠাকুর। হাঁ এখনই।

সকলে। ওরে চল্ রে চল্।

দাদাঠাকুর। আমাদের রাজার আদেশ আছে ওদের পাপ যখন প্রাচীরের আকার ধরে আকাশের জ্যোতি আচ্ছন্ন করতে উঠবে তখন সেই প্রাচীর ধুলোয় লুটিয়ে দিতে হবে।

প্রথম যূনক। দেব ধুলোয় লুটিয়ে।

সকলে। দেব লুটিয়ে।

দাদাঠাকুর। ওদের সেই ভাঙা প্রাচীরের উপর দিয়ে রাজপথ তৈরি করে দেব।

সকলে। হাঁ, রাজপথ তৈরি করে দেব।

দাদাঠাকুর। আমাদের রাজার বিজয়রথ তার উপর দিয়ে চলবে।

সকলে। হাঁ, চলবে, চলবে।

পঞ্চক। দাদাঠাকুর, এ কী ব্যাপার?

প্রথম যূনক। চলো, পঞ্চক, তুমি চলো।

দাদাঠাকুর। না না, পঞ্চক না। যাও ভাই তুমি তোমার অচলায়তনে ফিরে যাও। যখন সময় হবে দেখা হবে।

পঞ্চক। কী জানি ঠাকুর, যদিও আমি কোনো কর্মের না, তবুও ইচ্ছে করছে তোমাদের সঙ্গে ছুটে বেরিয়ে পড়ি।

দাদাঠাকুর। না পঞ্চক, তোমার গুরু আসবেন, তুমি অপেক্ষা করো গে। [প্রস্থান

৩

দর্ভকপল্লী

পঞ্চক ও দর্ভকদল

পঞ্চক। নির্বাসন, আমার নির্বাসন রে। বেঁচে গেছি, বেঁচে গেছি!

প্রথম দর্ভক। তোমাদের কী খেতে দেব ঠাকুর?

পঞ্চক। তোদের যা আছে তাই আমরা খাব।

দ্বিতীয় দর্ভক। আমাদের খাবার? সে কি হয়? সে যে সব ছোঁওয়া হয়ে গেছে।

পঞ্চক। সেজন্যে ভাবিস নে ভাই। পেটের খিদে যে আগুন, সে কারও ছোঁয়া মানে না, সবই পবিত্র করে। ওরে তোরা সকালবেলায় করিস কী বল তো। ষড়ক্ষরিত দিয়ে একবার ঘটশুদ্ধি করে নিবি নে?

তৃতীয় দর্ভক। ঠাকুর, আমরা নীচ দর্ভক জাত—আমরা ও-সব কিছুই জানি নে। আজ কত পুরুষ ধরে এখানে বাস করে আসছি কোনোদিন তো তোমাদের পায়ের ধুলো পড়ে নি। আজ তোমাদের মন্ত্র পড়ে আমাদের বাপ-পিতামহকে উদ্ধার করে দাও ঠাকুর।

পঞ্চক। সর্বনাশ। বলিস কী। এখানেও মন্ত্র পড়তে হবে। তাহলে নির্বাসনের দরকার কী ছিল। তা, সকালবেলা তোরা কী করিস বল তো?

প্রথম দর্ভক। আমরা শাস্ত্র জানি নে, আমরা নাম গান করি।

পঞ্চক। সে কী রকম ব্যাপার? শোনা দেখি একটা।

দ্বিতীয় দর্ভক। ঠাকুর, সে তুমি শুনে হাসবে।

পঞ্চক। আমিই তো ভাই এতদিন লোক হাসিয়ে আসছি—তোরা আমাকেও হাসাবি—শুনেও মন খুশি হয়। কিছু ভাবিস নে—নির্ভয়ে শুনিয়ে দে।

প্রথম দর্ভক। আচ্ছা ভাই আয় তবে—গান ধর।

গান

ও অকূলের কূল, ও অগতির গতি,
ও অনাথের নাথ, ও পতিতের পতি।
ও নয়নের আলো, ও রসনার মধু,
ও রতনের হার, ও পরানের বঁধু।
ও অপরূপ রূপ, ও মনোহর কথা,
ও চরমের সুখ, ও মরমের ব্যথা।

ও ভিখারির ধন, ও অবোলার বোল—
ও জনমের দোলা, ও মরণের কোল।

পঞ্চক। দে ভাই, আমার মন্ত্রতন্ত্র সব ভুলিয়ে দে, আমার বিদ্যাসাধ্যি সব কেড়ে নে, দে আমাকে তোদের ওই গান শিখিয়ে দে!

আচার্যের প্রবেশ

প্রথম দর্ভক। বাবাঠাকুর, আমাদের সমস্ত পাড়া আজ ত্রাণ পেয়ে গেল। এতদিন তোমার চরণধুলো ত এখানে পড়ে নি।

আচার্য। সে আমার অভাগ্য, সে আমারই অভাগ্য।

দ্বিতীয় দর্ভক। বাবা, তোমার স্নানের জল কাকে দিয়ে তোলাব? এখানে তো—

আচার্য। বাবা, তোরাই তুলে আনবি।

প্রথম দর্ভক। আমরা তুলে আনব—সে কী হয়।

আচার্য। হাঁ বাবা, তোদের তোলা জলে আজ আমার অভিষেক হবে।

দ্বিতীয় দর্ভক। ওরে চল্ তবে ভাই চল্। আমাদের পাটলা নদী থেকে জল আনি গে। [দর্ভকদলের প্রস্থান

পঞ্চক। মনে হচ্ছে যেন ভিজে মাটির গন্ধ পাচ্ছি, কোথায় যেন বর্ষা নেমেছে।

আচার্য। ওই পঞ্চক শুনতে পাচ্ছ কি?

পঞ্চক। কী বলুন দেখি?

আচার্য। আমার মনে হচ্ছে যেন সুভদ্র কাঁদছে।

পঞ্চক। এখান থেকে কি শোনা যাবে? এ বোধ হয় আর কোনো শব্দ।

আচার্য। তা হবে পঞ্চক, আমি তার কান্না আমার বুকের মধ্যে করে এনেছি। তার কান্নাটা এমন করে আমাকে বেজেছে কেন জান? সে যে কান্না রাখতে পারে না তবু কিছুতে মানতে চায় না সে কাঁদছে।

পঞ্চক। এতক্ষণে ওরা তাকে মহাতামসে বসিয়েছে—আর সকলে মিলে খুব দূরে থেকে বাহবা দিয়ে বলছে সুভদ্র দেবশিশু। আর কিছু না, আমি যদি রাজা হতুম তা হলে ওদের সবাইকে কানে ধরে দেবতা করে দিতুম—কিছুতে ছাড়তুম না।

আচার্য। ওরা ওদের দেবতাকে কাঁদাচ্ছে পঞ্চক। সেই দেবতারই কান্নায় এ রাজ্যের সকল আকাশ আকুল হয়ে উঠেছে। তবু ওদের পাষাণের বেড়া এখনও শতধা বিদীর্ণ হয়ে গেল না।

দর্ভকদলের প্রবেশ

পঞ্চক। কী ভাই, তোরা এত ব্যস্ত কিসের?

প্রথম দর্ভক। শুনছি অচলায়তনে কারা সব লড়াই করতে এসেছে।

আচার্য। লড়াই কিসের? আজ তো গুরু আসবার কথা।

দ্বিতীয় দর্ভক। না না, লড়াই হচ্ছে খবর পেয়েছি। সমস্ত ভেঙেচুরে একাকার করে দিলে যে।

তৃতীয় দর্ভক। বাবাঠাকুর, তোমরা যদি হুকুম কর আমরা যাই ঠেকাই গিয়ে।

আচার্য। ওখানে তো লোক ঢের আছে তোমাদের ভয় নেই বাবা।

প্রথম দর্ভক। লোক তো আছে, কিন্তু তারা লড়াই করতে পারবে কেন?

দ্বিতীয় দর্ভক। শুনেছি কতরকম মন্ত্রলেখা তাগাতাবিজ দিয়ে তারা দুখানা হাত আগাগোড়া কষে বেঁধে রেখেছে। খোলে না, পাছে কাজ করতে গেলেই তাদের হাতের গুণ নষ্ট হয়।

পঞ্চক। আচার্যদেব, এদের সংবাদটা সত্যই হবে। কাল সমস্ত রাত মনে হচ্ছিল চারদিকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যেন ভেঙেচুরে পড়ছে। ঘুমের ঘোরে ভাবছিলুম স্বপ্ন বুঝি।

আচার্য। তবে কি গুরু আসেন নি?

পঞ্চক। হয়তো বা দাদা ভুল করে আমার গুরুরই সঙ্গে লড়াই বাধিয়ে বসেছেন। আটক নেই। রাত্রে তাঁকে হঠাৎ দেখে হয়তো যমদূত বলে ভুল করেছিলেন।

প্রথম দর্ভক। আমরা শুনেছি কে বলছিল গুরুও এসেছেন।

আচার্য। গুরুও এসেছেন? সে কী রকম হল?

পঞ্চক। তবে লড়াই করতে কারা এসেছে বল তো?

প্রথম দর্ভক। লোকের মুখে শুনি তাদের নাকি বলে দাদাঠাকুরের দল।

পঞ্চক। দাদাঠাকুরের দল। বল বল শুনি, ঠিক বলছিস তো রে?

প্রথম দর্ভক। বাবাঠাকুর, হুকুম করো, একবার ওদের সঙ্গে লড়ে আসি—দেখিয়ে দিই এখানে মানুষ আছে।

পঞ্চক। আয় না ভাই আমিও তোদের সঙ্গে চলব রে।

দ্বিতীয় দর্ভক। তুমিও লড়বে নাকি ঠাকুর?

পঞ্চক। হাঁ লড়ব।

আচার্য। কী বলছ পঞ্চক। তোমাকে লড়তে কে ডাকছে?

মালীর প্রবেশ

মালী। আচার্যদেব আমাদের গুরু আসছেন।

আচার্য। বলিস কী? গুরু? তিনি এখানে আসছেন? আমাকে আহ্বান করলেই তো আমি যেতুম।

প্রথম দর্ভক। এখানে তোমাদের গুরু এলে তাঁকে বসাব কোথায়?

দ্বিতীয় দর্ভক। বাবাঠাকুর, তুমি এখানে তাঁর বসবার জায়গাটাকে একটু শোধন করে নাও—আমরা তফাতে সরে যাই।

আর একদল দর্ভকের প্রবেশ

প্রথম দর্ভক। বাবাঠাকুর, এ তোমাদের গুরু নয়—সে এ পাড়ায় আসবে কেন? এ যে আমাদের গোঁসাই।

দ্বিতীয় দর্ভক। আমাদের গোঁসাই?

প্রথম দর্ভক। হাঁ রে হাঁ, আমাদের গোঁসাই। এমন সাজ তার আর কখনো দেখি নি। একেবারে চোখ ঝলসে যায়।

তৃতীয় দর্ভক। ঘরে কী আছে রে ভাই সব বের কর।

দ্বিতীয় দর্ভক। বনের জাম আছে রে।

চতুর্থ দর্ভক। আমার ঘরে খেজুর আছে।

প্রথম দর্ভক। কালো গরুর দুধ শিগগির দুয়ে আন দাদা।

দাদাঠাকুরের প্রবেশ

আচার্য। (প্রণাম করিয়া) জয় গুরুজির জয়।

পঞ্চক। এ কী। এ যে দাদাঠাকুর। গুরু কোথায়?

দর্ভকদল। গোঁসাই ঠাকুর। প্রণাম হই। খবর দিয়ে এলে না কেন? তোমার ভোগ যে তৈরি হয় নি।

দাদাঠাকুর। কেন ভাই, তোদের ঘরে আজ রান্না চড়ে নি নাকি? তোরাও মন্ত্র নিয়ে উপোস করতে আরম্ভ করেছিস না কি রে?

প্রথম দর্ভক। আমরা আজ শুধু মাষকলাই আর ভাত চড়িয়েছি। ঘরে আর কিছু ছিল না।

দাদাঠাকুর। আমারও তাতেই হয়ে যাবে।

পঞ্চক। দাদাঠাকুর, আমার ভারি গর্ব ছিল এ রাজ্যে একলা আমিই কেবল চিনি তোমাকে। কারও যে চিনতে আর বাকি নেই।

প্রথম দর্ভক। ওই তো আমাদের গোঁসাই পূর্ণিমার দিনে এসে আমাদের পিঠে খেয়ে গেছে, তার পর এই কতদিন পরে দেখা। চল ভাই আমাদের যা আছে সব সংগ্রহ করে আনি। [প্রস্থান

দাদাঠাকুর। আচার্য, তুমি এ কী করেছ।

আচার্য। কী যে করেছি তা বোঝবারও শক্তি আমার নেই। তবে এইটুকু বুঝি—আমি সব নষ্ট করেছি।

দাদাঠাকুর। যিনি তোমাকে মুক্তি দেবেন তাঁকেই তুমি কেবল বাঁধবার চেষ্টা করেছ।

আচার্য। কিন্তু বাঁধতে তো পারি নি ঠাকুর। তাঁকে বাঁধছি মনে করে যতগুলো পাক দিয়েছি সব পাক কেবল নিজের চারদিকেই জড়িয়েছি। যে হাত দিয়ে সেই বাঁধন খোলা যেতে পারত সেই হাতটা সুদ্ধ বেঁধে ফেলেছি।

দাদাঠাকুর। যিনি সব জায়গায় আপনি ধরা দিয়ে বসে আছেন তাঁকে একটা জায়গায় ধরতে গেলেই তাঁকে হারাতে হয়।

আচার্য। আদেশ করো প্রভু। ভুল করেছিলুম জেনেও সে ভুল ভাঙতে পারি নি। পথ হারিয়েছি তা জানতুম, যতই চলছি ততই পথ হতে কেবল বেশি দূরে গিয়ে পড়ছি তাও বুঝতে পেরেছিলুম, কিন্তু ভয়ে থামতে পারছিলুম না। এই চক্রে হাজার বার ঘুরে বেড়ানোকেই পথ খুঁজে পাবার উপায় বলে মনে করেছিলুম।

দাদাঠাকুর। যে চক্র কেবল অভ্যাসের চক্র, যা কোনো জায়গাতেই নিয়ে যায় না, কেবল নিজের মধ্যেই ঘুরিয়ে মারে, তার থেকেই বের করে সোজা রাস্তায় বিশ্বের সকল যাত্রীর সঙ্গে দাঁড় করিয়ে দেবার জন্যেই আমি আজ এসেছি।

আচার্য। ধন্য করেছ।—কিন্তু এতদিন আস নি কেন প্রভু? আমাদের আয়তনের পাশেই এই দর্ভকপাড়ায় তুমি আনাগোনা করছ আর কত বৎসর হয়ে গেল আমাদের আর দেখা দিলে না?

দাদাঠাকুর। এদের দেখা দেওয়ার রাস্তা যে সোজা। তোমাদের সঙ্গে দেখা করা তো সহজ করে রাখ নি।

পঞ্চক। ভালোই করেছি, তোমার শক্তি পরীক্ষা করে নিয়েছি। তুমি আমাদের পথ সহজ করে দেবে, কিন্তু তোমার পথ সহজ নয়। এখন, আমি ভাবছি তোমাকে ডাকব কী বলে? দাদাঠাকুর, না গুরু?

দাদাঠাকুর। যে জানতে চায় না যে আমি তাকে চালাচ্ছি আমি তার দাদাঠাকুর, আর যে আমার আদেশ নিয়ে চলতে চায় আমি তার গুরু।

পঞ্চক। প্রভু, তুমি তাহলে আমার দুইই। আমাকে আমিই চালাচ্ছি, আর আমাকে তুমিই চালাচ্ছ এই দুটোই আমি মিশিয়ে জানতে চাই। আমি তো যূনক নই, তোমাকে মেনে চলতে ভয় নেই। তোমার মুখের আদেশকেই আনন্দে আমার মনের ইচ্ছা করে তুলতে পারব। এবার তবে তোমার সঙ্গে তোমারই বোঝা মাথায় নিয়ে বেরিয়ে পড়ি ঠাকুর।

দাদাঠাকুর। আমি তোমার জায়গা ঠিক করে রেখেছি।

পঞ্চক। কোথায় ঠাকুর?

দাদাঠাকুর। ওই অচলায়তনে।

পঞ্চক। আবার অচলায়তনে? আমার কারাদণ্ডের মেয়াদ ফুরোয় নি?

দাদাঠাকুর। কারাগার যা ছিল সে তো আমি ভেঙে ফেলেছি, এখন সেই উপকরণ দিয়ে সেইখানেই তোমাকে মন্দির গেঁথে তুলতে হবে।

পঞ্চক। কিন্তু অচলায়তনের লোকে যে আমাকে আপন বলে গ্রহণ করবে না প্রভু।

দাদাঠাকুর। ওরা তোমাকে গ্রহণ করতে চাচ্ছে না, সেইজন্যেই ওখানে তোমার সব চেয়ে দরকার। ওরা তোমাকে ঠেলে দিচ্ছে বলেই তুমি ওদের ঠেলতে পারবে না।

পঞ্চক। আমাকে কী করতে হবে?

দাদাঠাকুর। যে যেখানে ছড়িয়ে আছে সবাইকে ডাক দিয়ে আনতে হবে।

পঞ্চক। সবাইকে কি কুলোবে?

দাদাঠাকুর। না যদি কুলোয় তাহলে দেয়াল আবার আর-একদিন ভাঙতেই হবে। আমি এখন চললুম অচলায়তনের দ্বার খুলতে। [প্রস্থান

৪

অচলায়তন

মহাপঞ্চক, সঞ্জীব, বিশ্বম্ভর, জয়োত্তম

মহাপঞ্চক। তোমরা অত ব্যস্ত হয়ে পড়ছ কেন? কোনো ভয় নেই।

বিশ্বম্ভর। তুমি তো বলছ ভয় নেই, এই যে খবর এল শত্রুসৈন্য অচলায়তনের প্রাচীর ফুটো করে দিয়েছে।

মহাপঞ্চক। এ-কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। শিলা জলে ভাসে! ম্লেচ্ছরা অচলায়তনের প্রাচীর ফুটো করে দেবে! পাগল হয়েছ!

সঞ্জীব। কে যে বললে দেখে এসেছে।

মহাপঞ্চক। সে স্বপ্ন দেখেছে।

জয়োত্তম। আজই তো আমাদের গুরুর আসবার কথা।

মহাপঞ্চক। তাঁর জন্যে সমস্ত আয়োজন ঠিক হয়ে গেছে; কেবল যে ছেলের

মাবাপ ভাইবোন কেউ মরে নি এমন নবম গর্ভের সন্তান এখনও জুটিয়ে আনতে পারলে না—দ্বারে দাঁড়িয়ে কে যে মহারক্ষা পড়বে ঠিক করতে পারছি নে।

সঞ্জীব। গুরু এলে তাঁকে চিনে নেবে কে? আচার্য অদীনপুণ্য তাঁকে জানতেন। আমরা তো কেউ তাঁকে দেখি নি।

মহাপঞ্চক। আমাদের আয়তনে যে শাঁখ বাজায় সেই বৃদ্ধ তাঁকে দেখেছে। আমাদের পূজার ফুল যে জোগায় সেও তাঁকে জানে।

বিশ্বম্ভর। ওই যে উপাধ্যায় ব্যস্ত হয়ে ছুটে আসছেন।

মহাপঞ্চক। নিশ্চয় গুরু আসার সংবাদ পেয়েছেন। কিন্তু মহারক্ষা পাঠের কী করা যায়। ঠিক লক্ষণসম্পন্ন ছেলে তো পাওয়া গেল না।

উপাধ্যায়ের প্রবেশ

মহাপঞ্চক। কত দূর?

উপাধ্যায়। কত দূর কী? এসে পড়েছে যে।

মহাপঞ্চক। কই দ্বারে তো এখনও শাঁখ বাজালে না?

উপাধ্যায়। বিশেষ দরকার দেখি নে—কারণ দ্বারের চিহ্নও দেখতে পাচ্ছি নে—ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে।

মহাপঞ্চক। বল কী? দ্বার ভেঙেছে?

উপাধ্যায়। শুধু দ্বার নয়, প্রাচীরগুলোকে এমনি সমান করে শুইয়ে দিয়েছে যে তাদের সম্বন্ধে আর কোনো চিন্তা করবার দরকার নেই। ওই দেখছ না আলো?

মহাপঞ্চক। কিন্তু আমাদের দৈবজ্ঞ যে গণনা করে স্পষ্ট দেখিয়ে দিয়ে গেল যে—

উপাধ্যায়। তার চেয়ে ঢের স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে শত্রুসৈন্যদের রক্তবর্ণ টুপিগুলো। এই যে সব ফাঁক হয়ে গেছে।

ছাত্রগণ। কী সর্বনাশ!

সঞ্জীব। কিসের মন্ত্র তোমার মহাপঞ্চক?

বিশ্বম্ভর। আমি তো তখনই বলেছিলুম, এ-সব কাজ এই কাঁচা বয়সের পুঁথিপড়া অকালপক্কদের দিয়ে হবার নয়।

সঞ্জীব। কিন্তু এখন করা যায় কী?

জয়োত্তম। আমাদের আচার্যদেবকে এখনই ফিরিয়ে আনি গে। তিনি থাকলে এ বিপত্তি ঘটতেই পারত না। হাজার হ'ক লোকটা পাকা।

সঞ্জীব। কিন্তু দেখো মহাপঞ্চক, আমাদের আয়তনের যদি কোনো বিপত্তি ঘটে তাহলে তোমাকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলব।

উপাধ্যায়। সে পরিশ্রমটা তোমাদের করতে হবে না, উপযুক্ত লোক আসছে।

মহাপঞ্চক। তোমরা মিথ্যা বিচলিত হচ্ছ। বাইরের প্রাচীর ভাঙতে পারে, কিন্তু ভিতরের লোহার দরজা বন্ধ আছে। সে যখন ভাঙবে তখন চন্দ্রসূর্য নিবে যাবে। আমি অভয় দিচ্ছি তোমরা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে অচলায়তনের রক্ষক-দেবতার আশ্চর্য শক্তি দেখে নাও।

উপাধ্যায়। তার চেয়ে দেখি কোন্ দিক দিয়ে বেরোবার রাস্তা।

বিশ্বম্ভর। আমাদেরও ত সেই ইচ্ছা। কিন্তু এখান থেকে বেরোবার পথ যে জানিই নে। কোনোদিন বেরোতে হবে বলে স্বপ্নেও মনে করি নি।

সঞ্জীব। শুনছ—ওই শুনছ, ভেঙে পড়ল সব।

ছাত্রগণ। কী হবে আমাদের। নিশ্চয় দরজা ভেঙেছে। এই যে একেবারে নীল আকাশ।

বালকদলের প্রবেশ

উপাধ্যায়। কী রে তোরা সব নৃত্য করছিস কেন ?

প্রথম বালক। আজ এ কী মজা হল।

উপাধ্যায়। মজাটা কী রকম শুনি ?

দ্বিতীয় বালক। আজ চারদিক থেকেই আলো আসছে—সব যেন ফাঁক হয়ে গেছে।

তৃতীয় বালক। এত আলো তো আমরা কোনোদিন দেখি নি।

প্রথম বালক। কোথাকার পাখির ডাক এখান থেকেই শোনা যাচ্ছে।

দ্বিতীয় বালক। এ-সব পাখির ডাক আমরা তো কোনোদিন শুনি নি। এ তো আমাদের খাঁচার ময়নার মতো একেবারেই নয়।

প্রথম বালক। আজ আমাদের খুব ছুটতে ইচ্ছে করছে। তাতে কি দোষ হবে মহাপঞ্চকদাদা ?

মহাপঞ্চক। আজকের কথা ঠিক বলতে পারছি নে। আজ কোনো নিয়ম রক্ষা করা চলবে বলে বোধ হচ্ছে না।

প্রথম বালক। আজ তাহলে আমাদের ষড়াসন বন্ধ ?

মহাপঞ্চক। হাঁ বন্ধ।

সকলে। ওরে কী মজা রে কী মজা।

দ্বিতীয় বালক। আজ পংক্তিধৌতির দরকার নেই ?

মহাপঞ্চক। না।

সকলে। ওরে কী মজা। আঃ আজ চারদিকে কী আলো।

জয়োত্তম। আমারও মনটা নেচে উঠছে বিশ্বম্ভর! এ কি ভয়, না আনন্দ, কিছুই বুঝতে পারছি নে।

বিশ্বম্ভর। আজ একটা অদ্ভুত কাণ্ড হচ্ছে জয়োত্তম।

সঞ্জীব। কিন্তু ব্যাপারটা যে কী, ভেবে উঠতে পারছি নে। ওরে ছেলেগুলো, তোরা হঠাৎ এত খুশি হয়ে উঠলি কেন বল দেখি।

প্রথম বালক। দেখছ না, সমস্ত আকাশটা যেন ঘরের মধ্যে দৌড়ে এসেছে।

দ্বিতীয় বালক। মনে হচ্ছে ছুটি—আমাদের ছুটি। [বালকদের প্রস্থান

জয়োত্তম। দেখো মহাপঞ্চকদাদা, আমার মনে হচ্ছে ভয় কিছুই নেই—নইলে ছেলেদের মন এমন অকারণে খুশি হয়ে উঠল কেন?

মহাপঞ্চক। ভয় নেই সে তো আমি বরাবর বলে আসছি।

শঙ্খবাদক ও মালীর প্রবেশ

উভয়ে। গুরু আসছেন।

সকলে। গুরু!

মহাপঞ্চক। শুনলে তো। আমি নিশ্চয় জানতুম তোমাদের আশঙ্কা বৃথা।

সকলে। ভয় নেই আর ভয় নেই।

বিশ্বম্ভর। মহাপঞ্চক যখন আছেন তখন কি আমাদের ভয় থাকতে পারে।

সকলে। জয় আচার্য মহাপঞ্চকের।

যোদ্ধবেশে দাদাঠাকুরের প্রবেশ

শঙ্খবাদক ও মালী। (প্রণাম করিয়া) জয় গুরুজির জয়!

সকলে স্তম্ভিত

মহাপঞ্চক। উপাধ্যায় এই কি গুরু?

উপাধ্যায়। তাই তো শুনছি।

মহাপঞ্চক। তুমি কি আমাদের গুরু?

দাদাঠাকুর। হাঁ! তুমি আমাকে চিনবে না কিন্তু আমিই তোমাদের গুরু।

মহাপঞ্চক। তুমি গুরু? তুমি আমাদের সমস্ত নিয়ম লঙ্ঘন করে এ কোন্ পথ দিয়ে এলে? তোমাকে কে মানবে?

দাদাঠাকুর। আমাকে মানবে না জানি, কিন্তু আমিই তোমাদের গুরু।

মহাপঞ্চক। তুমি গুরু? তবে এই শত্রুবেশে কেন?

দাদাঠাকুর। এই তো আমার গুরুর বেশ। তুমি যে আমার সঙ্গে লড়াই করবে—সেই লড়াই আমার গুরুর অভ্যর্থনা।

মহাপঞ্চক। কেন তুমি আমাদের প্রাচীর ভেঙে দিয়ে এলে?

দাদাঠাকুর। তুমি কোথাও তোমার গুরুর প্রবেশের পথ রাখ নি।

মহাপঞ্চক। তুমি কি মনে করেছ তুমি অস্ত্র হাতে করে এসেছ বলে আমি তোমার কাছে হার মানব?

দাদাঠাকুর। না, এখনই না। কিন্তু দিনে দিনে হার মানতে হবে, পদে পদে।

মহাপঞ্চক। আমাকে নিরস্ত্র দেখে ভাবছ আমি তোমাকে আঘাত করতে পারি নে?

দাদাঠাকুর। আঘাত করতে পার কিন্তু আহত করতে পার না—আমি যে তোমার গুরু।

মহাপঞ্চক। উপাধ্যায়, তোমরা এঁকে প্রণাম করবে নাকি?

উপাধ্যায়। দয়া করে উনি যদি আমাদের প্রণাম গ্রহণ করেন তাহলে প্রণাম করব বই কি—তা নইলে যে—

মহাপঞ্চক। না, আমি তোমাকে প্রণাম করব না।

দাদাঠাকুর। আমি তোমার প্রণাম গ্রহণ করব না—আমি তোমাকে প্রণত করব।

মহাপঞ্চক। তুমি আমাদের পূজা নিতে আস নি?

দাদাঠাকুর। আমি তোমাদের পূজা নিতে আসি নি, অপমান নিতে এসেছি।

মহাপঞ্চক। তোমার পশ্চাতে অস্ত্রধারী এ কারা?

দাদাঠাকুর। এরা আমার অনুবর্তী—এরা যূনক।

সকলে। যূনক!

মহাপঞ্চক। এরাই তোমার অনুবর্তী?

দাদাঠাকুর। হাঁ।

মহাপঞ্চক। এই মন্ত্রহীন কর্মকাণ্ডহীন ম্লেচ্ছদল! আমি এই আয়তনের আচার্য—আমি তোমাকে আদেশ করছি তুমি এখনই ওই ম্লেচ্ছদলকে সঙ্গে নিয়ে বাহির হয়ে যাও।

দাদাঠাকুর। আমি যাকে আচার্য নিযুক্ত করব সেই আচার্য; আমি যা আদেশ করব সেই আদেশ।

মহাপঞ্চক। উপাধ্যায়, আমরা এমন করে দাঁড়িয়ে থাকলে চলবে না। এস আমরা

এদের এখান থেকে বাহির করে দিয়ে আমাদের আয়তনের সমস্ত দরজাগুলো আবার একবার দ্বিগুণ দৃঢ় করে বন্ধ করি।

উপাধ্যায়। এরাই আমাদের বাহির করে দেবে, সেই সম্ভাবনাটাই প্রবল বলে বোধ হচ্ছে।

প্রথম যূনক। অচলায়তনের দরজার কথা বলছ—সে আমরা আকাশের সঙ্গে দিব্যি সমান করে দিয়েছি।

উপাধ্যায়। বেশ করেছ ভাই। আমাদের ভারি অসুবিধা হচ্ছিল। এত তালা-চাবির ভাবনাও ভাবতে হত।

মহাপঞ্চক। পাথরের প্রাচীর তোমরা ভাঙতে পার, লোহার দরজা তোমরা খুলতে পার, কিন্তু আমি আমার ইন্দ্রিয়ের সমস্ত দ্বার রোধ করে এই বসলুম—যদি প্রায়োপবেশনে মরি তবু তোমাদের হাওয়া তোমাদের আলো লেশমাত্র আমাকে স্পর্শ করতে দেব না।

প্রথম যূনক। এ পাগলটা কোথাকার রে। এই তলোয়ারের ডগা দিয়ে ওর মাথার খুলিটা ফাঁক করে দিলে ওর বুদ্ধিতে একটু হাওয়া লাগতে পারে।

মহাপঞ্চক। কিসের ভয় দেখাও আমায়। তোমরা মেরে ফেলতে পার, তার বেশি ক্ষমতা তোমাদের নেই।

প্রথম যূনক। ঠাকুর, এই লোকটাকে বন্দী করে নিয়ে যাই—আমাদের দেশের লোকের ভারি মজা লাগবে।

দাদাঠাকুর। ওকে বন্দী করবে তোমরা? এমন কী বন্ধন তোমাদের হাতে আছে।

দ্বিতীয় যূনক। ওকে কি কোনো শাস্তিই দেব না?

দাদাঠাকুর। শাস্তি দেবে! ওকে স্পর্শ করতেও পারবে না। ও আজ যেখানে বসেছে সেখানে তোমাদের তলোয়ার পৌঁছোয় না।

বালকদলের প্রবেশ

সকলে। তুমি আমাদের গুরু?

দাদাঠাকুর। হাঁ, আমি তোমাদের গুরু।

সকলে। আমরা প্রণাম করি।

দাদাঠাকুর। বৎস তোমরা মহাজীবন লাভ করো।

প্রথম বালক। ঠাকুর, তুমি আমাদের কী করবে?

দাদাঠাকুর। আমি তোমাদের সঙ্গে খেলব।

সকলে। খেলবে?

দাদাঠাকুর। নইলে তোমাদের গুরু হয়ে সুখ কিসের?

সকলে। কোথায় খেলবে?

দাদাঠাকুর। আমার খেলার মস্ত মাঠ আছে।

প্রথম বালক। মস্ত! এই ঘরের মতো মস্ত?

দাদাঠাকুর। এর চেয়ে অনেক বড়ো।

দ্বিতীয় বালক। এর চেয়েও বড়ো? ওই আঙিনাটার মতো?

দাদাঠাকুর। তার চেয়ে বড়ো।

দ্বিতীয় বালক। তার চেয়ে বড়ো! উঃ কী ভয়ানক!

প্রথম বালক। সেখানে খেলতে গেলে পাপ হবে না?

দাদাঠাকুর। কিসের পাপ?

দ্বিতীয় বালক। খোলা জায়গায় গেলে পাপ হয় না?

দাদাঠাকুর। খোলা জায়গাতেই সব পাপ পালিয়ে যায়।

সকলে। কখন নিয়ে যাবে?

দাদাঠাকুর। এখানকার কাজ শেষ হলেই।

জয়োত্তম। (প্রণাম করিয়া) প্রভু, আমিও যাব।

বিশ্বম্ভর। সঞ্জীব, আর দ্বিধা করলে কেবল সময় নষ্ট হবে। প্রভু, ওই বালকের সঙ্গে আমাদেরও ডেকে নাও।

সঞ্জীব। মহাপঞ্চকদাদা, তুমিও এস না।

মহাপঞ্চক। না, আমি না।

সুভদ্রের প্রবেশ

সুভদ্র। গুরু।

দাদাঠাকুর। কী বাবা।

সুভদ্র। আমি যে পাপ করেছি তার তো প্রায়শ্চিত্ত শেষ হল না।

দাদাঠাকুর। তার আর কিছু বাকি নেই।

সুভদ্র। বাকি নেই?

দাদাঠাকুর। না। আমি সমস্ত চুরমার করে ধুলোয় লুটিয়ে দিয়েছি।

সুভদ্র। একজটা দেবী—

দাদাঠাকুর। একজটা দেবী! উত্তরের দিকের দেয়ালটা ভাঙবামাত্রই একজটা

দেবীর সঙ্গে আমাদের এমনি মিল হয়ে গেল যে সে আর কোনো দিন জটা তুলিয়ে কাউকে ভয় দেখাবে না। এখন তাকে দেখলে মনে হবে সে আকাশের আলো— তার সমস্ত জটা আষাঢ়ের নবীন মেঘের মধ্যে জড়িয়ে গিয়েছে।

সুভদ্র। এখন আমি কী করব?

পঞ্চক। এখন তুমি আছ ভাই আর আমি আছি। দুজনে মিলে কেবলই উত্তর দক্ষিণ পুব পশ্চিমের সমস্ত দরজাজানালাগুলো খুলে খুলে বেড়াব।

যূনক ও দর্ভকদলের প্রবেশ ও গুরুকে প্রদক্ষিণ করিয়া গান

ভেঙেছে দুয়ার, এসেছ জ্যোতির্ময়,
তোমারি হউক জয়।
তিমির-বিদার উদার অভ্যুদয়,
তোমারি হউক জয়।
হে বিজয়ী বীর, নবজীবনের প্রাতে
নবীন আশার খড়্গ তোমার হাতে,
জীর্ণ আবেশ কাটো সুকঠোর ঘাতে,
বন্ধন হ'ক ক্ষয়।
তোমারি হউক জয়।
এস দুঃসহ, এস নির্দয়,
তোমারি হউক জয়।
এস নির্মল, এস এস নির্ভয়,
তোমারি হউক জয়।
প্রভাতসূর্য, এসেছ রুদ্রসাজে,
দুঃখের পথে তোমার তূর্য বাজে,
অরুণবহ্নি জ্বালাও চিত্তমাঝে
মৃত্যুর হ'ক লয়।
তোমারি হউক জয়।

অরূপ রতন

ভূমিকা

সুদর্শনা রাজাকে বাহিরে খুঁজিয়াছিল। যেখানে বস্তুকে চোখে দেখা যায়, হাতে ছোঁওয়া যায়, ভাণ্ডারে সঞ্চয় করা যায়, যেখানে ধনজন খ্যাতি, সেইখানে সে বরমাল্য পাঠাইয়াছিল। বুদ্ধির অভিমানে সে নিশ্চয় স্থির করিয়াছিল যে, বুদ্ধির জোরে সে বাহিরেই জীবনের সার্থকতা লাভ করিবে। তাহার সঙ্গিনী সুরঙ্গমা তাহাকে বলিয়াছিল, অন্তরের নিভৃত কক্ষে যেখানে প্রভু স্বয়ং আসিয়া আহ্বান করেন সেখানে তাঁহাকে চিনিয়া লইলে তবেই বাহিরে সর্বত্র তাঁহাকে চিনিয়া লইতে ভুল হইবে না ;—নহিলে যাহারা মায়ার দ্বারা চোখ ভোলায় তাহাদিগকে রাজা বলিয়া ভুল হইবে। সুদর্শনা এ-কথা মানিল না। সে সুবর্ণের রূপ দেখিয়া তাহার কাছে মনে মনে আত্মসমর্পণ করিল। তখন কেমন করিয়া তাহার চারিদিকে আগুন লাগিল, অন্তরের রাজাকে ছাড়িতেই কেমন করিয়া তাহাকে লইয়া বাহিরের নানা মিথ্যা রাজার দলে লড়াই বাধিয়া গেল,—সেই অগ্নিদাহের ভিতর দিয়া কেমন করিয়া আপন রাজার সহিত তাহার পরিচয় ঘটিল, কেমন করিয়া দুঃখের আঘাতে তাহার অভিমান ক্ষয় হইল এবং অবশেষে কেমন করিয়া হার মানিয়া প্রাসাদ ছাড়িয়া পথে দাঁড়াইয়া তবে সে তাহার সেই প্রভুর সঙ্গলাভ করিল, যে-প্রভু সকল দেশে, সকল কালে, সকল রূপে, আপন অন্তরের আনন্দরসে যাঁহাকে উপলব্ধি করা যায়,—এ নাটকে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে।

এই নাট্য-রূপকটি ‘রাজা’ নাটকের অভিনয়যোগ্য সংক্ষিপ্ত সংস্করণ—নূতন করিয়া পুনর্লিখিত।

মাঘ ১৩২৬ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রস্তাবনা

গান

চোখ যে ওদের ছুটে চলে গো—
ধনের বাটে মানের বাটে রূপের হাটে
দলে দলে গো ॥
দেখবে ব'লে করেছে পণ,
দেখবে কারে জানে না মন,
প্রেমের দেখা দেখে যখন
চোখ ভেসে যায় চোখের জলে গো ॥
আমায় তোরা ডাকিস না রে,
আমি যাব খেয়ার ঘাটে অরূপ রসের পারাবারে
উদাস হাওয়া লাগে পালে,
পারের পানে যাবার কালে
চোখ দুটোরে ডুবিয়ে যাব
অকূল সুধা-সাগর তলে গো ॥

অরূপ রতন

১

প্রাসাদ-কুঞ্জ

সুরঙ্গমা। প্রভু একটা কথা আছে।

নেপথ্যে। কী বলো।

সুরঙ্গমা। রাজকন্যা সুদর্শনা যে তোমাকেই বরণ করতে চায়, তাকে কি দয়া করবে না ?

নেপথ্যে। সে কি আমাকে চেনে ?

সুরঙ্গমা। না প্রভু, সে তোমাকে চিনতে চায়। তুমি তাকে নিজেই চিনিয়ে দেবে, নইলে তার সাধ্য কী।

নেপথ্যে। অনেক বাধা আছে।

সুরঙ্গমা। তাই তো তাকে কৃপা করতে হবে।

নেপথ্যে। বহু দুঃখে যে আবরণ দূর হয়।

সুরঙ্গমা। সেই দুঃখই তাকে দিয়ো, তাকে দিয়ো।

নেপথ্যে। আমার নাম নিয়ে সকলের চেয়ে বড়ো হবে, এই অহংকারে সে আমাকে চায়।

সুরঙ্গমা। এই সুযোগে তার অহংকার দাও ভেঙে। সকলের নিচে নামিয়ে তোমার পায়ের কাছে নিয়ে এস তাকে।

নেপথ্যে। সুদর্শনাকে ব'লো, আমি তাকে গ্রহণ করব অন্ধকারে।

সুরঙ্গমা। বাঁশি বাজবে না, আলো জ্বলবে না, সমারোহ হবে না ?

নেপথ্যে। না।

সুরঙ্গমা। বরণডালায় সে কি ফুলের মালা তোমাকে দেবে না ?

নেপথ্যে। সে ফুল এখনও ফোটে নি।

সুরঙ্গমা। সে-ই ভালো মহারাজ। অন্ধকারেই বীজ থাকে, অঙ্কুরিত হলে আপনিই আসে আলোয়।

বাহির হতে আহ্বান। সুরঙ্গমা।

সুরঙ্গমা। ওই আসছেন রাজকুমারী সুদর্শনা।

সুদর্শনার প্রবেশ

সুদর্শনা। তোমার এখানে আকাশে যেন অর্ঘ্য সাজানো, যেন শিশির-ধোওয়া সকালবেলার স্পর্শ। তুমি এখানকার বাতাসে কী ছিটিয়ে দিয়েছ বলো দেখি।

সুরঙ্গমা। সুর ছিটিয়েছি।

সুদর্শনা। আমাকে সেই রাজাধিরাজের কথা বলো সুরঙ্গমা, আমি শুনি।

সুরঙ্গমা। মুখের কথায় বলে উঠতে পারি নে।

সুদর্শনা। বলো, তিনি কি খুব সুন্দর?

সুরঙ্গমা। সুন্দর? একদিন সুন্দরকে নিয়ে খেলতে গিয়েছিলুম, খেলা ভাঙল যেদিন, বুক ফেটে গেল, সেইদিন বুঝলুম সুন্দর কাকে বলে। একদিন তাকে ভয়ংকর ব'লে ভয় পেয়েছি, আজ তাকে ভয়ংকর ব'লে আনন্দ করি—তাকে বলি তুমি ঝড়, তাকে বলি তুমি দুঃখ, তাকে বলি তুমি মরণ, সব শেষে বলি—তুমি আনন্দ।

গান

আমি যখন ছিলেম অন্ধ,
সুখের খেলায় বেলা গেছে পাই নি তো আনন্দ॥
খেলা ঘরের দেয়াল গেঁথে
খেয়াল নিয়ে ছিলেম মেতে,
ভিত ভেঙে যেই আসলে ঘরে
ঘুচল আমার বন্ধ,
সুখের খেলা আর রোচে না
পেয়েছি আনন্দ॥
ভীষণ আমার, রুদ্র আমার,
নিদ্রা গেল ক্ষুদ্র আমার,
উগ্র ব্যথায় নূতন ক'রে
বাঁধলে আমার ছন্দ।
যেদিন তুমি অগ্নিবেশে
সব-কিছু মোর নিলে এসে,
সেদিন আমি পূর্ণ হলেম ঘুচল আমার দ্বন্দ্ব,
দুঃখ সুখের পারে তোমায় পেয়েছি আনন্দ॥

সুদর্শনা। প্রথমটা তুমি তাঁকে চিনতে পার নি?

সুরঙ্গমা। না।

সুদর্শনা। কিন্তু দেখো, তাঁকে চিনতে আমার একটুও দেরি হবে না। আমার কাছে তিনি সুন্দর হয়ে দেখা দেবেন।

সুরঙ্গমা। তার আগে একটা কথা তোমাকে মেনে নিতে হবে।

সুদর্শনা। নেব, আমার কিছুতে দ্বিধা নেই।

সুরঙ্গমা। তিনি বলেছেন, অন্ধকারেই তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে।

সুদর্শনা। চিরদিন?

সুরঙ্গমা। সে-কথা বলতে পারি নে।

সুদর্শনা। আচ্ছা, আমি সবই মেনে নিচ্ছি। কিন্তু আমার কাছে তিনি লুকিয়ে থাকতে পারবেন না। দিন যদি স্থির হয়ে থাকে সবাইকে তো জানাতে হবে।

সুরঙ্গমা। জানিয়ে কী করবে। সে অন্ধকারে সকলের তো স্থান নেই।

সুদর্শনা। আমি রাজাধিরাজকে লাভ করেছি সে-কথা কাউকে জানাতে পারব না?

সুরঙ্গমা। জানাতে পার কিন্তু কেউ বিশ্বাস করবে না।

সুদর্শনা। এতবড়ো কথাটা বিশ্বাস করবে না, সে কি হয়?

সুরঙ্গমা। লোক ডেকে প্রমাণ দিতে পারবে না যে।

সুদর্শনা। পারবই, নিশ্চয় পারব।

সুরঙ্গমা। আচ্ছা চেষ্টা দেখো।

সুদর্শনা। সুরঙ্গমা, তোমার মতো আমি অত বেশি নম্র নই, আমি শক্ত আছি। সকলের কাছে তিনি আমাকে স্বীকার করে নেবেন—এ তিনি এড়াতে পারবেন না।

সুরঙ্গমা। সে-কথা আজকে ভাববার দরকার নেই রাজকুমারী, তুমি নিজে তাঁকে সম্পূর্ণ স্বীকার করে নিয়ো, তাহলেই সব সহজ হবে।

সুদর্শনা। ও-কথা কেন বলছ? আমি তো সেইজন্যেই প্রস্তুত হয়ে রয়েছি। আর কিন্তু বিলম্ব ক'রো না।

সুরঙ্গমা। তাঁর দিকে সমস্তই প্রস্তুত হয়েই আছে। আজ আমরা তবে বিদায় হই।

সুদর্শনা। কোথায় যাচ্ছ?

সুরঙ্গমা। বসন্ত-উৎসব কাছে এল, তার আয়োজন করতে হবে।

সুদর্শনা। কী রকমের আয়োজনটা হওয়া চাই?

সুরঙ্গমা। মাধবীকুঞ্জকে তো তাড়া দিতে হয় না। আমের বনেও মুকুল আপনি ধরে। আমাদের মানুষের শক্তিতে যার যেটা দেবার সেটা সহজে প্রকাশ হতে চায় না। কিন্তু সেদিন সেটা আবৃত থাকলে চলবে না। কেউ দেবে গান, কেউ দেবে নাচ।

সুদর্শনা। আমি সেদিন কী দেব সুরঙ্গমা?

সুরঙ্গমা। সে-কথা তুমিই বলতে পার।

সুদর্শনা। আমি নিজ হাতে মালা গেঁথে সুন্দরকে অর্ঘ্য পাঠাব।

সুরঙ্গমা। সে-ই ভালো।

সুদর্শনা। তাঁকে দেখব কী করে?

সুরঙ্গমা। সে তিনিই জানেন।

সুদর্শনা। আমাকে কোথায় যেতে হবে?

সুরঙ্গমা। কোথাও না, এইখানেই।

সুদর্শনা। কী বল সুরঙ্গমা, অন্ধকারের সভা এইখানেই? যেখানে চিরদিন আছি এইখানেই? সাজতে হবে না?

সুরঙ্গমা। নাই বা সাজলে। একদিন তিনিই সাজাবেন যে-সাজে তোমাকে মানায়।

গান

প্রভু, বলো বলো কবে
তোমার পথের ধুলার রঙে রঙে
আঁচল রঙিন হবে।
তোমার বনের রাঙা ধূলি
ফুটায় পূজার কুসুমগুলি,
সেই ধূলি হায় কখন আমায়
আপন করি' লবে॥
প্রণাম দিতে চরণতলে
ধুলার কাঙাল যাত্রিদলে
চলে যারা, আপন ব'লে
চিনবে আমায় সবে॥

সুদর্শনা। আমার তো আর একটুও দেরি করতে ইচ্ছে করছে না।

সুরঙ্গমা। ক'রো না দেরি—তাঁকে ডাকো, এইখানেই দয়া করবেন।

সুদর্শনা। সুরঙ্গমা, আমি তো মনে করি যে ডাকছি, সাড়া পাই নে। বোধ হয় ডাকতে জানি নে। তুমি আমার হয়ে ডাকো না—তোমার কণ্ঠ তিনি চেনেন।

সুরঙ্গমার গান

খোলো খোলো দ্বার রাখিয়ো না আর
বাহিরে আমায় দাঁড়ায়ে।
দাও সাড়া দাও, এই দিকে চাও
এস দুই বাহু বাড়ায়ে॥
কাজ হয়ে গেছে সারা,
উঠেছে সন্ধ্যাতারা,
আলোকের খেয়া হয়ে গেল দেয়া
অস্তসাগর পারায়ে॥
ভরি লয়ে ঝারি এনেছি তো বারি
সেজেছি তো শুচি দুকূলে,
বেঁধেছি তো চুল, তুলেছি তো ফুল
গেঁথেছি তো মালা মুকুলে।
ধেনু এল গোঠে ফিরে
পাখিরা এসেছে নীড়ে,
পথ ছিল যত জুড়িয়া জগত
আঁধারে গিয়েছে হারায়ে॥

ধীরে ধীরে আলো নিবে গিয়ে অন্ধকার হয়ে গেল

সুদর্শনা। অন্ধকারে আমি যে কিছুই দেখতে পাচ্ছি নে। তুমি কি এর মধ্যে আছ?

নেপথ্যে। এই তো আমি আছি।

সুদর্শনা। আমি তোমাকে বরণ করব, সে কি না দেখেই?

নেপথ্যে। চোখে দেখতে গেলে ভুল দেখবে—অন্তরে দেখো মন শুদ্ধ করে।

সুদর্শনা। ভয়ে যে আমার বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠছে।

নেপথ্যে। প্রেমের মধ্যে ভয় না থাকলে রস নিবিড় হয় না।

সুদর্শনা। এই অন্ধকারে তুমি আমাকে দেখতে পাচ্ছ?

নেপথ্যে। হাঁ পাচ্ছি।

সুদর্শনা। কী রকম দেখছ?

নেপথ্যে। আমি দেখতে পাচ্ছি তোমার মধ্যে দেহ নিয়েছে যুগযুগান্তরের ধ্যান, লোকলোকান্তরের আলোক, বহু শত শরৎ-বসন্তের ফুল ফল। তুমি বহুপুরাতনের নূতন রূপ।

সুদর্শনা। বলো বলো এমনি ক'রে বলো। মনে হচ্ছে যেন অনাদিকালের গান জন্মজন্মান্তর থেকে শুনে আসছি। কিন্তু প্রভু, এ যে কঠিন কালো লোহার মতো অন্ধকার, এ যে আমার উপর চেপে আছে ঘুমের মতো, মূর্ছার মতো, মৃত্যুর মতো। এ জায়গায় তোমাতে আমাতে মিল হবে কেমন ক'রে? না না, হবে না মিলন, হবে না। এখানে নয়, চোখের দেখার জগতেই তোমাকে দেখব—সেইখানেই যে আমি আছি।

নেপথ্যে। আচ্ছা দেখো। তোমাকে নিজে চিনে নিতে হবে।

সুদর্শনা। চিনে নেব, লক্ষ লোকের মধ্যে চিনে নেব, ভুল হবে না।

নেপথ্যে। বসন্ত-পূর্ণিমার উৎসবে সকল লোকের মধ্যে আমাকে দেখবার চেষ্টা ক'রো। সুরঙ্গমা।

সুরঙ্গমা। কী প্রভু।

নেপথ্যে। বসন্ত-পূর্ণিমার উৎসব তো এল।

সুরঙ্গমা। আমাকে কী কাজ করতে হবে?

নেপথ্যে। আজ তোমার কাজের দিন নয়, সাজের দিন। পুষ্পবনের আনন্দে মিলিয়ে দিয়ো প্রাণের আনন্দ।

সুরঙ্গমা। তাই হবে প্রভু।

নেপথ্যে। সুদর্শনা আমাকে চোখে দেখতে চান।

সুরঙ্গমা। কোথায় দেখবেন?

নেপথ্যে। যেখানে পঞ্চমে বাঁশি বাজবে, পুষ্পকেশরের ফাগ উড়বে, আলোয় ছায়ায় হবে গলাগলি সেই দক্ষিণের কুঞ্জবনে।

সুরঙ্গমা। চোখে ধাঁধা লাগবে না?

নেপথ্যে। সুদর্শনার কৌতূহল হয়েছে।

সুরঙ্গমা। কৌতূহলের জিনিস তো পথে ঘাটে ছড়াছড়ি। তুমি যে কৌতূহলের অতীত।

গান

কোথা বাইরে দূরে যায় রে উড়ে, হায় রে হায়,
তোমার চপল আঁখি বনের পাখি বনে পালায়॥
ওগো হৃদয়ে যবে মোহন রবে বাজবে বাঁশি,
তখন আপনি সেধে ফিরবে কেঁদে পরবে ফাঁসি,
তখন ঘুচবে ত্বরা ঘুরিয়া মরা হেথা হোথায়—
আহা আজি সে আঁখি বনের পাখি বনে পালায়॥
চেয়ে দেখিস না রে হৃদয়-দ্বারে কে আসে যায়,
তোরা শুনিস কানে বারতা আনে দখিন বায়।
আজি ফুলের বাসে সুখের হাসে আকুল গানে
চির বসন্ত যে তোমারি খোঁজে এসেছে প্রাণে,
তারে বাহিরে খুঁজি' ফিরিছ বুঝি পাগল প্রায়,
আহা আজি সে আঁখি বনের পাখি বনে পালায়॥

[উভয়ের প্রস্থান

২

উৎসব-ক্ষেত্র

বিদেশী পথিকদল ও প্রহরীর প্রবেশ

বিরাজদত্ত। ওগো মশায়।

প্রহরী। কেন গো?

ভদ্রসেন। রাস্তা কোথায়? এখানে রাজাও দেখি নে রাস্তাও দেখি নে। আমরা বিদেশী, আমাদের রাস্তা ব'লে দাও।

প্রহরী। কিসের রাস্তা?

মাধব। ওই যে শুনেছি আজ অধরা-রাজার দেশে উৎসব হবে। কোন্ দিক দিয়ে যাওয়া যাবে?

প্রহরী। এখানে সব রাস্তাই রাস্তা। যেদিক দিয়ে যাবে ঠিক পৌঁছোবে। সামনে চলে যাও।

বিরাজদত্ত। শোনো একবার কথা শোনো। বলে, সবই এক রাস্তা। তাই যদি হবে তবে এতগুলোর দরকার ছিল কী?

মাধব। তা ভাই রাগ করিস কেন? যে দেশের যেমন ব্যবস্থা। আমাদের দেশে তো রাস্তা নেই বললেই হয়—বাঁকাচোরা গলি, সে তো গোলকধাঁধা। আমাদের রাজা বলে, খোলা রাস্তা না থাকাই ভালো—রাস্তা পেলেই প্রজারা বেরিয়ে চলে যাবে। এদেশে উলটো, যেতেও কেউ ঠেকায় না, আসতেও কেউ মানা করে না—তবু মানুষও তো ঢের দেখছি—এমন খোলা পেলে আমাদের রাজ্য উজাড় হয়ে যেত।

বিরাজদত্ত। ওহে মাধব, তোমার ওই একটা বড়ো দোষ।

মাধব। কী দোষ দেখলে?

বিরাজদত্ত। নিজের দেশের তুমি বড়ো নিন্দে কর। খোলা রাস্তাটাই বুঝি ভালো হল? বলো তো ভাই ভদ্রসেন, খোলা রাস্তাটাকে বলে কিনা ভালো।

ভদ্রসেন। ভাই বিরাজদত্ত, বরাবরই তো দেখে আসছ মাধবের ওই এক রকম ত্যাড়া বুদ্ধি। কোন্ দিন বিপদে পড়বেন—রাজার কানে যদি যায় তাহলে ম'লে ওকে শ্মশানে ফেলবার লোক পাবেন না।

বিরাজদত্ত। আমাদের তো ভাই এই খোলা রাস্তার দেশে এসে অবধি খেয়ে শুয়ে সুখ নেই—দিনরাত গা-ঘিনঘিন করছে। কে আসছে কে যাচ্ছে তার কোনো ঠিক-ঠিকানাই নেই—রাম রাম।

ভদ্রসেন। সেও তো ওই মাধবের পরামর্শ শুনেই এসেছি। আমাদের গুষ্টিতে এমন কখনো হয় নি। আমার বাবাকে তো জান—কতবড়ো মহাত্মা লোক ছিল—শাস্ত্রমতে ঠিক উনপঞ্চাশ হাত মেপে গণ্ডি কেটে তার মধ্যেই সমস্ত জীবনটা কাটিয়ে দিলে—একদিনের জন্যে তার বাইরে পা ফেলে নি। মৃত্যুর পর কথা উঠল ওই উনপঞ্চাশ হাতের মধ্যেই তো দাহ করতে হয়—সে এক বিষম মুশকিল—শেষকালে শাস্ত্রী বিধান দিলে উনপঞ্চাশে যে দুটো অঙ্ক আছে তার বাইরে যাবার জো নেই, অতএব ওই চার নয় উনপঞ্চাশকে উলটে নিয়ে নয় চার চুরানব্বই করে দাও—তবেই তো তাকে বাড়ির বাইরে পোড়াতে পারি, নইলে ঘরেই দাহ করতে হত। বাবা, এত আঁটাআঁটি! এ কি যে-সে দেশ পেয়েছ!

বিরাজদত্ত। বটেই তো, মরতে গেলেও ভাবতে হবে এ কি কম কথা।

ভদ্রসেন। সেই দেশের মাটিতে শরীর, তবু মাধব বলে কিনা, খোলা রাস্তাই ভালো। [সকলের প্রস্থান

সদলে ঠাকুরদার প্রবেশ

ঠাকুরদা। ওরে দক্ষিনে হাওয়ার সঙ্গে সমান পাল্লা দিতে হবে—হার মানলে চলবে না—আজ সব রাস্তাই গানে ভাসিয়ে দিয়ে চলব।

মেয়ের দলের প্রবেশ

প্রথমা। ঠাকুরদা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, উৎসবটা হচ্ছে কোথায়?

ঠাকুরদা। যেদিকে চাইবে সেইদিকেই।

প্রথমা। একেই বলে তোমাদের রাজাধিরাজের উৎসব!

ঠাকুরদা। আমরা তো তাই বলি।

দ্বিতীয়া। আমাদের দেশের সব চেয়ে খুদে সামন্তরাজও এর চেয়ে ঘটা করে পথে বেরোয়।

ঠাকুরদা। নিজেকে না চেনাতে পারলে তারা যে বঞ্চিত।

তৃতীয়া। আর তোমরা যে কোন্ না-দেখা রাজার কথা বলছ?

ঠাকুরদা। তাঁকে না চিনতে পারলে আমরাই বঞ্চিত।

প্রথমা। চেনবার উপায়টা কী করেছ?

ঠাকুরদা। তাঁর সঙ্গে সুর মেলাচ্ছি। এই যে দখিন হাওয়া দিয়েছে, আমের বোল ধরেছে, সমান সুরে সাড়া দিতে পারলে ভিতরে ভিতরে জানাজানি হয়।

দ্বিতীয়া। তোমাদের কর্তারা ঢাকঢোলের বায়না দেন নি বুঝি? তোমাদের উপরেই সব বরাত?

ঠাকুরদা। তা নয় তো কী। ভাড়া করে সমারোহ? তোমরা আমরা আছি কী করতে? ওরে তোরা ধর না ভাই গান।

গান

আজি দখিন দুয়ার খোলা—
এস হে, এস হে, এস হে, আমার
বসন্ত এস।
দিব হৃদয়-দোলায় দোলা,
এস হে, এস হে, এস হে, আমার
বসন্ত এস।
নব শ্যামল শোভন রথে
এস বকুল-বিছানো পথে,
এস বাজায়ে ব্যাকুল বেণু,
মেখে পিয়াল ফুলের রেণু,
এস হে, এস হে, এস হে, আমার
বসন্ত এস।

এস ঘনপল্লবপুঞ্জে
এস হে, এস হে, এস হে।
এস বনমল্লিকাকুঞ্জে
এস হে, এস হে, এস হে।
মৃদু মধুর মদির হেসে
এস পাগল হাওয়ার দেশে,
তোমার উতলা উত্তরীয়
তুমি আকাশে উড়ায়ে দিয়ো,
এস হে, এস হে, এস হে, আমার
বসন্ত এস ॥

[মেয়েদের প্রস্থান

পুব দুয়ারটা হল। এবার চলো পশ্চিম দুয়ারটার দিকে।

দেশী পথিকদলের প্রবেশ

কৌণ্ডিল্য। ঠাকুরদা, এই প্রাচীন বয়সে ছেলের দলকে নিয়ে মেতে বেড়াচ্ছ যে ?

ঠাকুরদা। নবীনকে ডাক দিতে বেরিয়েছি।

জনার্দন। সেটা কি তোমাকে শোভা পায় ?

ঠাকুরদা। ওরে পাকা পাতাই তো ঝরবার সময় নতুন পাতাকে জাগিয়ে দিয়ে যায়।

গান

আমার জীর্ণ পাতা যাবার বেলায় বারে বারে
ডাক দিয়ে যায় নতুন পাতার দ্বারে দ্বারে।

কৌণ্ডিল্য। ডাক দিয়েছ সে তো দেখতে পাচ্ছি, পাড়া অস্থির করে তুলেছ। কিন্তু এর দরকার ছিল কি।

ঠাকুরদা। আমারই নবীন বয়সকে ওদের মধ্যে খুঁজে পাচ্ছি—বুড়োটা ঢাকা পড়ে গেল।

গান

তাই তো আমার এই জীবনের বনচ্ছায়ে
ফাগুন আসে ফিরে ফিরে দখিন বায়ে,
নতুন সুরে গান উড়ে যায় আকাশ পারে,
নতুন রঙে ফুল ফোটে তাই ভারে ভারে ॥

কৌণ্ডিল্য। তা তুমি নতুন হয়েই রইলে সে-কথা সত্যি, বুড়ো হবার সময় পেলে না।

ঠাকুরদা। নিজে নতুন না হলে সেই নতুনকে যে পাই নে।

গান

ওগো আমার নিত্য নূতন দাঁড়াও হেসে
চলব তোমার নিমন্ত্রণে নবীন বেশে।
দিনের শেষে নিবল যখন পথের আলো,
সাগরতীরে যাত্রা আমার যেই ফুরাল,
তোমার বাঁশি বাজে সাঁঝের অন্ধকারে
শূন্যে আমার উঠল তারা সারে সারে॥

কৌণ্ডিল্য। রাখো দাদা, তোমার গান রাখো। আজকের দিনে একটা কথা মনে বড়ো লাগছে।

ঠাকুরদা। কী বলো দেখি।

কৌণ্ডিল্য। এবার দেশবিদেশের লোক এসেছে, সবাই বলছে সবই দেখেছি ভালো কিন্তু রাজা দেখি নে কেন—কাউকে জবাব দিতে পারি নে। এখানে ওইটে বড়ো একটা ফাঁকা রয়ে গেছে।

ঠাকুরদা। ফাঁকা! আমাদের এই দেশে রাজা এক জায়গায় দেখা দেয় না বলেই তো সমস্ত রাজ্যটা একেবারে রাজায় ঠাসা হয়ে রয়েছে—তাকে বল ফাঁকা! সে যে আমাদের সবাইকেই রাজা করে দিয়েছে।

গান

আমরা সবাই রাজা আমাদের এই
রাজার রাজত্বে।
নইলে মোদের রাজার সনে
মিলব কী স্বত্বে॥
আমরা যা খুশি তাই করি
তবু তাঁর খুশিতেই চরি,
আমরা নই বাঁধা নই দাসের রাজার
ত্রাসের দাসত্বে।

নইলে মোদের রাজার সনে
মিলব কী স্বত্বে ॥
রাজা সবারে দেন মান
সে মান আপনি ফিরে পান,
মোদের খাটো করে রাখে নি কেউ
কোনো অসত্যে,
নইলে মোদের রাজার সনে
মিলব কী স্বত্বে।
আমরা চলব আপন মতে
শেষে মিলব তাঁরি পথে,
মোরা মরব না কেউ বিফলতার
বিষম আবর্তে।
নইলে মোদের রাজার সনে
মিলব কী স্বত্বে?

কুম্ভ। কিন্তু দাদা, যা বল তাঁকে দেখতে পায় না বলে লোকে অনায়াসে তাঁর নামে যা খুশি বলে, সেইটে অসহ্য হয়।

জনার্দন। এই দেখো না, আমাকে গাল দিলে শাস্তি আছে কিন্তু রাজাকে গাল দিলে কেউ তার মুখ বন্ধ করবার নেই।

ঠাকুরদা। ওর মানে আছে; প্রজার মধ্যে যে-রাজাটুকু মিশিয়ে আছে তারই গায়ে আঘাত লাগে, তাকে ছাড়িয়ে যিনি তাঁর গায়ে কিছুই বাজে না। সূর্যের যে তেজ প্রদীপে আছে তাতে ফুঁটুকু সয় না, কিন্তু হাজার লোকে মিলে সূর্যে ফুঁ দিলে সূর্য অম্লান হয়েই থাকেন। [সকলের প্রস্থান

বিদেশীদলের পুনঃপ্রবেশ

বিরাজদত্ত। দেখো ভাই ভদ্রসেন, আসল কথাটা হচ্ছে, এদের মূলেই রাজা নেই। সকলে মিলে একটা গুজব রটিয়ে রেখেছে।

ভদ্রসেন। আমারও তো তাই মনে হয়েছে। সকল দেশেই রাজাকে দেখে দেশসুদ্ধ লোকের আত্মাপুরুষ বাঁশপাতার মতো হীহী করে কাঁপতে থাকে, আর এখানে রাজাকে খুঁজেও মেলে না! কিছু না হ'ক, মাঝে মাঝে বিনা কারণে এক-একবার যদি চোখ পাকিয়ে বলে, বেটার শির লেও, তাহলেও বুঝি রাজার মতো রাজা আছে বটে।

মাধব। কিন্তু এ-রাজ্যে আগাগোড়া যেমন নিয়ম দেখছি, রাজা না থাকলে তো এমন হয় না।

বিরাজদত্ত। এতকাল রাজার দেশে বাস করে এই বুদ্ধি হল তোমার? নিয়মই যদি থাকবে তাহলে রাজা থাকবার দরকার কী?

মাধব। এই দেখো না, আজ এত লোক মিলে আনন্দ করছে—রাজা না থাকলে এরা এমন করে মিলতেই পারত না।

বিরাজদত্ত। ওহে মাধব, আসল কথাটাই যে তুমি এড়িয়ে যাচ্ছ। একটা নিয়ম আছে—সেটা তো দেখছি, উৎসব হচ্ছে সেটাও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, সেখানে তো কোনো গোল বাধছে না—কিন্তু রাজা কোথায়, তাকে দেখলে কোথায়, সেইটে বলো।

মাধব। আমার কথাটা হচ্ছে এই যে, তোমরা তো এমন রাজ্য জান যেখানে রাজা কেবল চোখেই দেখা যায় কিন্তু রাজ্যের মধ্যে তার কোনো পরিচয় নেই, সেখানে কেবল ভূতের কীর্তন—কিন্তু এখানে দেখো—

ভদ্রসেন। আবার ঘুরে ফিরে সেই একই কথা! তুমি বিরাজদত্তর আসল কথাটার উত্তর দাও না হে—হাঁ, কি, না? রাজাকে দেখেছ, কি, দেখ নি?

বিরাজদত্ত। রেখে দাও ভাই ভদ্রসেন, ওর ন্যায়শাস্ত্রটা পর্যন্ত এ-দেশী রকমের হয়ে উঠছে। বিনা চক্ষে ও যখন দেখতে শুরু করেছে তখন আর ভরসা নেই। বিনা অন্নে কিছুদিন ওকে আহার করতে দিলে আবার বুদ্ধিটা সাধারণ লোকের মতো পরিষ্কার হয়ে আসতে পারে। [সকলের প্রস্থান

বাউলের প্রবেশ

গান

আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে
তাই হেরি তায় সকল খানে।
আছে সে নয়নতারায় আলোকধারায়,
তাই না হারায়,
ওগো তাই দেখি তায় যেথায় সেথায়
তাকাই আমি যেদিক পানে॥
আমি তার মুখের কথা
শুনব বলে গেলাম কোথা,
শোনা হল না, হল না,

আজ ফিরে এসে নিজের দেশে
এই যে শুনি,
শুনি তাহার বাণী আপন গানে ॥
কে তোরা খুঁজিস তারে
কাঙাল-বেশে দ্বারে দ্বারে,
দেখা মেলে না মেলে না,—
ও তোরা আয় রে ধেয়ে দেখ্ রে চেয়ে
আমার বুকে—
ওরে দেখ্ রে আমার দুই নয়ানে ॥ [প্রস্থান

একদল পদাতিক ও দেশী পথিকের প্রবেশ

প্রথম পদাতিক। সরে যাও সব, সরে যাও। তফাত যাও।

কৌণ্ডিল্য। ইস, তাই তো। মস্ত লোক বটে। লম্বা পা ফেলে চলছেন। কেন রে বাপু, সরব কেন? আমরা সব পথের কুকুর না কি?

দ্বিতীয় পদাতিক। আমাদের রাজা আসছেন।

জনার্দন। রাজা? কোথাকার রাজা?

প্রথম পদাতিক। আমাদের এই দেশের রাজা।

কুম্ভ। লোকটা পাগল হল নাকি? আমাদের এই অবাক দেশের রাজা পাইক নিয়ে হাঁকতে হাঁকতে আবার রাস্তায় কবে বেরোয়?

দ্বিতীয় পদাতিক। মহারাজ আজ আর গোপন থাকবেন না, তিনি স্বয়ং আজ উৎসব করবেন।

জনার্দন। সত্যি না কি ভাই?

দ্বিতীয় পদাতিক। ওই দেখো না নিশেন উড়ছে।

কৌণ্ডিল্য। তাই তো রে, ওটা নিশেনই তো বটে।

দ্বিতীয় পদাতিক। নিশেনে কিংশুক ফুল আঁকা আছে, দেখছ না?

কুম্ভ। ওরে কিংশুক ফুলই তো বটে, মিথ্যে বলে নি—একেবারে টকটক করছে।

প্রথম পদাতিক। তবে! কথাটা যে বড়ো বিশ্বাস হল না!

জনার্দন। না দাদা, আমি তো অবিশ্বাস করি নি। ওই কুম্ভই গোলমাল করেছিল। আমি একটি কথাও বলি নি।

প্রথম পদাতিক। ওটা বোধ হয় শূন্যকুম্ভ, তাই আওয়াজ বেশি।

দ্বিতীয় পদাতিক। লোকটা কে হে? তোমাদের কে হয়?

কৌণ্ডিল্য। কেউ না, কেউ না। আমাদের গ্রামের যে মোড়ল, ও তার খুড়শ্বশুর—অন্য পাড়ায় বাড়ি।

দ্বিতীয় পদাতিক। হাঁ হাঁ, খুড়শ্বশুর গোছের চেহারা বটে, বুদ্ধিটাও নেহাত খুড়শ্বশুরে ধাঁচার।

কুম্ভ। অনেক দুঃখে বুদ্ধিটা এইরকম হয়েছে। এই যে সেদিন কোথা থেকে এক রাজা বেরোল, নামের গোড়ায় তিন-শ পঁয়তাল্লিশটা শ্রী লাগিয়ে ঢাক পিটোতে পিটোতে শহর ঘুরে বেড়াল—আমি তার পিছনে কি কম ফিরেছি? কত ভোগ দিলেম কত সেবা করলেম, ভিটেমাটি বিকিয়ে যাবার জো হল। শেষকালে তার রাজাগিরি রইল কোথায়? লোকে যখন তার কাছে তালুক চায়, মুলুক চায় সে তখন পাঁজিপুঁথি খুলে শুভদিন কিছুতেই খুঁজে পায় না। কিন্তু আমাদের কাছে খাজনা নেবার বেলায় মঘা অশ্লেষা ত্র্যস্পর্শ কিছুই তো বাধত না।

দ্বিতীয় পদাতিক। হাঁ হে কুম্ভ, আমাদের রাজাকে তুমি সেই রকম মেকি রাজা বলতে চাও।

কুম্ভ। না বাবা, রাগ ক'রো না। আমি নাকে খত দিচ্ছি—যতদূর সরতে বল তত দূরই সরে দাঁড়াব।

দ্বিতীয় পদাতিক। আচ্ছা, বেশ এইখানে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকো। রাজা এলেন বলে—আমরা এগিয়ে গিয়ে রাস্তা ঠিক করে রাখি। [পদাতিকদের প্রস্থান

জনার্দন। কুম্ভ, তোমার ওই মুখের দোষেই তুমি মরবে!

কুম্ভ। না ভাই জনার্দন, ও মুখের দোষ নয়, ও কপালের দোষ। যেবারে মিছে রাজা বেরোল একটি কথাও কই নি—অত্যন্ত ভালোমানুষের মতো নিজের সর্বনাশ করেছি—আর এবার হয়তো বা সত্যি রাজা বেরিয়েছে, তাই বেফাঁস কথাটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল। ওটা কপাল।

জনার্দন। আমি এই বুঝি, রাজা সত্যি হ'ক মিথ্যে হ'ক, মেনে চলতেই হবে। আমরা কি রাজা চিনি যে বিচার করব। অন্ধকারে ঢেলা মারা—যত বেশি মারবে একটা না একটা লেগে যাবে। আমি তাই একধার থেকে গড় করে যাই—সত্যি হলে লাভ, মিথ্যে হলেই বা লোকসান কী।

কুম্ভ। ঢেলাগুলো নেহাত ঢেলা হলে ভাবনা ছিল না—দামি জিনিস—বাজে খরচ করতে গিয়ে ফতুর হতে হয়।

কৌণ্ডিল্য। ওই যে আসছেন রাজা। আহা রাজার মতন রাজা বটে। কী চেহারা। যেন ননির পুতুল। কেমন হে কুম্ভ, এখন কী মনে হচ্ছে।

কুম্ভ। দেখাচ্ছে ভালো—কী জানি ভাই হতে পারে।

কৌণ্ডিল্য। ঠিক যেন রাজাটি গড়ে রেখেছে। ভয় হয়, পাছে রোদ্দুর লাগলে গলে যায়।

রাজবেশধারীর প্রবেশ

সকলে। জয় মহারাজের জয়।

জনার্দন। দর্শনের জন্যে সকাল থেকে দাঁড়িয়ে। দয়া রাখবেন।

কুম্ভ। বড়ো ধাঁধা ঠেকছে, ঠাকুরদাকে ডেকে আনি। [সকলের প্রস্থান

বিদেশী পথিকদলের প্রবেশ

মাধব। ওরে রাজা রে রাজা। দেখবি আয়।

বিরাজদত্ত। মনে রেখো রাজা, আমি কুশলীবস্তুর উদয়দত্তর নাতি। আমার নাম বিরাজদত্ত। রাজা বেরিয়েছে শুনেই ছুটেছি, লোকের কারও কথায় কান দিই নি—আমি সকলের আগে তোমাকে মেনেছি।

ভদ্রসেন। শোনো একবার, আমি যে ভোর থেকে এখানে দাঁড়িয়ে—তখনও কাক ডাকে নি—এতক্ষণ ছিলে কোথায়? রাজা, আমি বিক্রমস্থলীর ভদ্রসেন ভক্তকে স্মরণ রেখো।

রাজবেশী। তোমাদের ভক্তিতে বড়ো প্রীত হলেম।

বিরাজদত্ত। মহারাজ, আমাদের অভাব বিস্তর—এতদিন দর্শন পাই নি, জানাব কাকে?

রাজবেশী। তোমাদের সমস্ত অভাব মিটিয়ে দেব। [রাজবেশীর প্রস্থান

দেশী পথিকদের প্রবেশ

কৌণ্ডিল্য। ওরে পিছিয়ে থাকলে চলবে না—ভিড়ে মিশে গেলে রাজার চোখে পড়ব না।

বিরাজদত্ত। দেখ্ দেখ্ একবার নরোত্তমের কাণ্ডখানা দেখ্! আমরা এত লোক আছি, সবাইকে ঠেলেঠুলে কোথা থেকে এক তালপাতার পাখা নিয়ে রাজাকে বাতাস করতে লেগে গেছে।

কৌণ্ডিল্য। তাই তো হে, লোকটার আস্পর্ধা তো কম নয়।

মাধব। ওকে জোর করে ধরে সরিয়ে দিতে হচ্ছে—ও কি রাজার পাশে দাঁড়াবার যুগ্যি।

কৌণ্ডিল্য। ওহে রাজা কি আর এটুকু বুঝবে না? এযে অতিভক্তি।

বিরাজদত্ত। না হে না—রাজাদের যদি মগজই থাকবে তাহলে মুকুট থাকবার দরকার কী। ওই তালপাখার হাওয়া খেয়েই ভুলবে। [সকলের প্রস্থান

ঠাকুরদাকে লইয়া কুম্ভের প্রবেশ

কুম্ভ। এখনই এই রাস্তা দিয়েই যে গেল।

ঠাকুরদা। রাস্তা দিয়ে গেলেই রাজা হয় নাকি রে।

কুম্ভ। দাদা, একেবারে স্পষ্ট চোখে দেখা গেল—একজন না দুজন না, রাস্তার দুধারের লোক তাকে দেখে নিয়েছে।

ঠাকুরদা। সেইজন্যেই তো সন্দেহ। কবে আমার রাজা রাস্তার লোকের চোখ ধাঁধিয়ে বেড়ায়।

কুম্ভ। তা আজকে যদি মর্জি হয়ে থাকে, বলা যায় কী।

ঠাকুরদা। বলা যায় রে বলা যায়—আমার রাজার মর্জি বরাবর ঠিক আছে—ঘড়ি-ঘড়ি বদলায় না!

কুম্ভ। কিন্তু কী বলব দাদা—একেবারে ননির পুতুলটি। ইচ্ছে করে সর্বাঙ্গ দিয়ে তাকে ছায়া করে রাখি।

ঠাকুরদা। তোর এমন বুদ্ধি কবে হল? আমার রাজা ননির পুতুল, আর তুই তাকে ছায়া করে রাখবি!

কুম্ভ। যা বল দাদা, দেখতে বড়ো সুন্দর—আজ তো এত লোক জুটেছে অমনটি কাউকে দেখলুম না।

ঠাকুরদা। আমার রাজা তোদের চোখেই পড়ত না।

কুম্ভ। ধ্বজা দেখতে পেলুম যে গো। লোকে যে বলে, এই উৎসবে রাজা বেরিয়েছে।

ঠাকুরদা। বেরিয়েছে বই কি। কিন্তু সঙ্গে পাইক নেই, বাদ্যি নেই।

কুম্ভ। কেউ বুঝি ধরতেই পারে না।

ঠাকুরদা। হয়তো কেউ কেউ পারে।

কুম্ভ। যে পারে সে বোধ হয় যা চায় তা-ই পায়।

ঠাকুরদা। সে কিচ্ছু চায় না। ভিক্ষুকের কর্ম নয় রাজাকে চেনা। ছোটো ভিক্ষুক বড়ো ভিক্ষুককেই রাজা বলে মনে করে বসে। [সকলের প্রস্থান

রাজা বিজয়বর্মা, বিক্রমবাহু ও বসুসেনের প্রবেশ

বসুসেন। এই উৎসবের রাজা কি আমাদেরও দেখা দেবে না?

বিক্রম। এর রাজত্ব করবার প্রণালী কী রকম? রাজার বনে উৎসব, সেখানেও সাধারণ লোকের কারও কোনো বাধা নেই?

বিজয়। আমাদের জন্যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জায়গা তৈরি করে রাখা উচিত ছিল।

বিক্রম। জোর করে নিজেরা তৈরি করে নেব।

বিজয়। এই সব দেখেই সন্দেহ হয়, এখানে রাজা নেই, একটা ফাঁকি চলে আসছে।

বিক্রম। কিন্তু কান্তিকরাজকন্যা সুদর্শনা তো দৃষ্টিগোচর।

বিজয়। তাঁকে দেখা চাই। যিনি দেখা দেন না তাঁর জন্যে আমার ঔৎসুক্য নেই, কিন্তু যিনি দেখবার যোগ্য তাঁকে না দেখে ফিরে গেলে ঠকতে হবে।

বিক্রম। একটা ফন্দি দেখাই যাক না।

বসুসেন। ফন্দি জিনিসটা খুব ভালো, যদি তার মধ্যে নিজে আটকা না পড়া যায়।

বিক্রম। এদিকে এরা কারা আসছে? সং না কি? রাজা সেজেছে।

বিজয়। এ তামাশা এখানকার রাজা সইতে পারে কিন্তু আমরা সইব না তো।

বসুসেন। কোথাকার গ্রাম্যরাজা হতেও পারে।

পদাতিকগণের প্রবেশ

বিক্রম। তোমাদের রাজা কোথাকার?

প্রথম পদাতিক। এই দেশের। তিনি আজ উৎসব করতে বেরিয়েছেন।

[পদাতিকগণের প্রস্থান

বিজয়। এ কী কথা। এখানকার রাজা বেরিয়েছে!

বসুসেন। তাই তো। তা হলে এঁকেই দেখে ফিরতে হবে! অন্য দর্শনীয়টা?

বিক্রম। শোন কেন? এখানে রাজা নেই বলেই যে-খুশি নির্ভাবনায় আপনাকে রাজা বলে পরিচয় দেয়। দেখছ না, যেন সেজে এসেছে—অত্যন্ত বেশি সাজ।

বসুসেন। কিন্তু লোকটাকে দেখাচ্ছে ভালো, চোখ ভোলাবার মতো চেহারাটা আছে।

বিক্রম। চোখ ভুলতে পারে কিন্তু ভালো করে তাকালেই ভুল থাকে না। আমি তোমাদের সামনেই ওর ফাঁকি ধরে দিচ্ছি।

রাজবেশী সুবর্ণের প্রবেশ

সুবর্ণ। রাজগণ, স্বাগত। এখানে তোমাদের অভ্যর্থনার কোনো ত্রুটি হয় নি তো?

রাজগণ। (কপট বিনয়ে নমস্কার করিয়া) কিছু না।

বিক্রম। যে অভাব ছিল তা মহারাজের দর্শনেই পূর্ণ হয়েছে।

সুবর্ণ। আমি সাধারণের দর্শনীয় নই কিন্তু তোমরা আমার অনুগত, এই জন্যই একবার দেখা দিতে এলুম।

বিক্রম। অনুগ্রহের এত আতিশয্য সহ্য করা কঠিন।

সুবর্ণ। আমি অধিকক্ষণ থাকব না।

বিক্রম। সেটা অনুভবেই বুঝেছি—বেশিক্ষণ স্থায়ী হবার ভাব দেখছি নে।

সুবর্ণ। ইতিমধ্যে যদি কোনো প্রার্থনা থাকে—

বিক্রম। আছে বই কি। কিন্তু অনুচরদের সামনে জানাতে লজ্জা বোধ করি।

সুবর্ণ। (অনুবর্তীদের প্রতি) ক্ষণকালের জন্য তোমরা দূরে যাও—(রাজগণের প্রতি) এইবার তোমাদের প্রার্থনা অসংকোচে জানাতে পার।

বিক্রম। অসংকোচেই জানাব—তোমারও যেন লেশমাত্র সংকোচ হয় না।

সুবর্ণ। না, সে আশঙ্কা ক'রো না।

বিক্রম। এস তবে—মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে আমাদের প্রত্যেককে প্রণাম করো।

সুবর্ণ। বোধ হচ্ছে আমার ভৃত্যগণ বারুণী মদটা রাজশিবিরে কিছু মুক্তহস্তেই বিতরণ করেছে।

বিক্রম। ভণ্ডরাজ, মদ যাকে বলে সেটা তোমার ভাগেই অতিমাত্রায় পড়েছে সেই জন্যেই এখন ধুলোয় লোটাবার অবস্থা হয়েছে।

সুবর্ণ। রাজগণ, পরিহাসটা রাজোচিত নয়।

বিক্রম। পরিহাসের অধিকার যাদের আছে তারা নিকটেই প্রস্তুত। সেনাপতি।

সুবর্ণ। আর প্রয়োজন নেই। স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি আপনারা আমার প্রণম্য। মাথা আপনিই নত হচ্ছে, কোনো তীক্ষ্ণ উপায়ে তাকে ধুলায় টানবার দরকার হবে না। আপনারা যখন আমাকে চিনেছেন তখন আমিও আপনাদের চিনে নিলুম। অতএব এই আমার প্রণাম গ্রহণ করুন। যদি দয়া করে পালাতে অনুমতি দেন তাহলে বিলম্ব করব না।

বিক্রম। পালাবে কেন? তোমাকেই আমরা এখানকার রাজা করে দিচ্ছি—পরিহাসটা শেষ করেই যাওয়া যাক। দলবল কিছু আছে?

সুবর্ণ। আছে। আরম্ভে যখন আমার দল বেশি ছিল না, তখন সবাই সন্দেহ করছিল—লোক যত বেড়ে গেল, সন্দেহ ততই দূর হল। এখন ভিড়ের লোক নিজেদের ভিড় দেখেই মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছে, আমাকে কোনো কষ্ট পেতে হচ্ছে না।

বিক্রম। বেশ কথা। এখন থেকে আমরা তোমায় সাহায্য করব। কিন্তু তোমাকে আমাদেরও একটা কাজ করে দিতে হবে।

সুবর্ণ। আপনাদের দত্ত আদেশ এবং মুকুট আমি মাথায় করে রাখব।

বিক্রম। আর কিছু চাই নে, রাজকুমারী সুদর্শনাকে দেখতে চাই—সেইটে তোমাকে করে দিতে হবে।

সুবর্ণ। যথাসাধ্য চেষ্টার ত্রুটি হবে না।

বিক্রম। তোমার সাধ্যের উপর ভরসা নেই, আমাদের বুদ্ধিমতো চলতে হবে। আমার পরামর্শ শোনো, ভুল ক'রো না।

সুবর্ণ। ভুল হবে না।

বিক্রম। কররোদ্যানের মধ্যেই রাজকুমারী সুদর্শনার প্রাসাদ।

সুবর্ণ। হাঁ মহারাজ।

বিক্রম। সেই উদ্যানে আগুন লাগাবে। তার পর অগ্নিদাহের গোলমালে কাজ সিদ্ধ করব।

সুবর্ণ। অন্যথা হবে না।

বিক্রম। দেখো হে ভণ্ডরাজ, আমরা মিথ্যা সাবধান হচ্ছি, এদেশে রাজা নেই।

সুবর্ণ। আমি সেই অরাজকতা দূর করতে বেরিয়েছি, সাধারণের জন্যে সত্য হ'ক মিথ্যা হ'ক, একটা রাজা খাড়া করা চাই; নইলে অনিষ্ট ঘটে। একটা কথা বুঝতে পারছি নে মহারাজ।

বিক্রম। আমার অনেক কথাই তুমি বুঝতে পারবে না। তবু বলো শুনি।

সুবর্ণ। রাজকুমারীর পিতা-মহারাজের কাছে দূত পাঠিয়ে কন্যাকে যথারীতি প্রার্থনা করুন না।

বিক্রম। সে তো সকলেই করে থাকে। আমি তো সকলের দলে নই। আগুন করবে আমার ঘটকালি, আমি বিপদ ঘটিয়ে বিপদের পারে যাব।

সুবর্ণ। আপনি তো পারে যাবেন মহারাজ, আমি সামান্য লোক, পার পর্যন্ত না পৌঁছোতেও পারি।

বিক্রম। অসম্ভব নয়। কিন্তু তাতে কী আসে যায়। সামান্য লোক, কাজে লাগবে এই যথেষ্ট, তার পরে থাকবে কি না থাকবে সেটা ভাববার কথাই নয়।—চলো আর বিলম্ব ক'রো না।

বিজয়। দেখো দেখো, সেই লোকটা আবার একদল লোক নিয়ে আসছে।

বসুসেন। ও যেন উৎসবের খেয়া পার করছে; নতুন নতুন দলকে দ্বারের কাছ পর্যন্ত পৌঁছে দিচ্ছে।

সদলে ঠাকুরদার প্রবেশ

বিজয়। কী হে, তুমি যে কখন কোথা দিয়ে ঘুরে আসছ, তার ঠিকানা পাবার জো নেই।

ঠাকুরদা। আমরা নটরাজের চেলা, তিনি ঘুরছেন আর ঘুরিয়ে বেড়াচ্ছেন। কোথাও দাঁড়িয়ে থাকবার জো কী—শিঙ্গা যে বেজে উঠছে।

নৃত্য ও গীত

মম চিত্তে নিতি নৃত্যে কে যে নাচে
তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ।
তারি সঙ্গে কী মৃদঙ্গে সদা বাজে
তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ॥
হাসিকান্না হীরাপান্না দোলে ভালে,
কাঁপে ছন্দে ভালোমন্দ তালে তালে,
নাচে জন্ম নাচে মৃত্যু পাছে পাছে,
তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ।
কী আনন্দ, কী আনন্দ, কী আনন্দ
দিবারাত্রি নাচে মুক্তি নাচে বন্ধ,
সে তরঙ্গে ছুটি রঙ্গে পাছে পাছে
তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ॥

[প্রস্থান

বসুসেন। লোকটার মধ্যে কিছু কৌতুক আছে।

বিক্রম। কিন্তু এ-সব লোকের কৌতুকে যোগ দেওয়া কিছু নয়—প্রশ্রয় দেওয়া হয়—চলো সরে যাই। [রাজাদের প্রস্থান

৩

কুঞ্জ-বাতায়ন

সুরঙ্গমার গান

বাহিরে ভুল হানবে যখন
অন্তরে ভুল ভাঙবে কি ?
বিষাদ-বিষে জ্বলে শেষে
তোমার প্রসাদ মাঙবে কি ?
রৌদ্রদাহ হলে সারা
নামবে কি ওর বর্ষাধারা ?
লাজের রাঙা মিটলে, হৃদয়
প্রেমের রঙে রাঙবে কি ?
যতই যাবে দূরের পানে
বাঁধন ততই কঠিন হয়ে
টানবে না কি ব্যথার টানে ?
অভিমানের কালো মেঘে
বাদল হাওয়া লাগবে বেগে,
নয়নজলের আবেগ তখন
কোনোই বাধা মানবে কি ?

সুদর্শনার প্রবেশ

সুদর্শনা। সুরঙ্গমা, ভুল তোরা করতে পারিস, কিন্তু আমার কখনোই ভুল হতে পারে না। আমি হব রানী। ওই তো আমার রাজাই বটে।

সুরঙ্গমা। কাকে তুমি রাজা বলছ ?

সুদর্শনা। ওই যার মাথায় ফুলের ছাতা ধরে আছে।

সুরঙ্গমা। ওই যাঁর পতাকায় কিংশুক আঁকা ?

সুদর্শনা। আমি তো দেখবামাত্রই চিনেছি, তোর মনে কেন সন্দেহ আসছে।

সুরঙ্গমা। ও তোমার রাজা নয়। আমি যে ওকে চিনি।

সুদর্শনা। ও কে ?

সুরঙ্গমা। ও সুবর্ণ। ও জুয়ো খেলে বেড়ায়।

সুদর্শনা। মিথ্যে কথা বলিস নে। সবাই ওকে রাজা বলছে। তুই বুঝি সকলের চেয়ে বেশি জানিস।

সুরঙ্গমা। ও যে সবাইকে মিথ্যে লোভ দেখাচ্ছে, সেইজন্যে সবাই ওর বশ হয়েছে। যখন ভুল ভাঙবে তখন হায় হায় করে মরবে।

সুদর্শনা। তোর বড়ো অহংকার হয়েছে। তুই আমার চেয়ে চিনিস?

সুরঙ্গমা। যদি আমার অহংকার থাকত, তাহলে আমি চিনতে পারতুম না।

সুদর্শনা। আমি ওঁকেই মালা পাঠিয়ে দিয়েছি।

সুরঙ্গমা। সে মালা সাপ হয়ে তোমাকে এসে দংশন করবে।

সুদর্শনা। আমাকে অভিসম্পাত? তোর তো আস্পর্ধা কম নয়। যা এখান থেকে চলে, আমি তোর মুখ দেখব না। [সুরঙ্গমার প্রস্থান

আমার মন আজ এমনই চঞ্চল হয়েছে। এমন তো কোনোদিন হয় না। সুরঙ্গমা।

সুরঙ্গমার প্রবেশ

সুদর্শনা। আমার মালা কি ভুল পথেই গেছে?

সুরঙ্গমা। হাঁ।

সুদর্শনা। আবার সেই একই কথা? আচ্ছা বেশ, ভুল করেছি, বেশ করেছি। তিনি কেন নিজে দেখা দিয়ে ভুল ভাঙিয়ে দেন না? কিন্তু তোর কথা মানব না। যা আমার কাছ থেকে—মিছিমিছি আমার মনে ধাঁধা লাগিয়ে দিস নে। [সুরঙ্গমার প্রস্থান

ভগবান চন্দ্রমা, আজ আমার চঞ্চলতার উপরে তুমি কেবলই কটাক্ষপাত করছ। স্মিত কৌতুকে সমস্ত আকাশ ভরে গেল যে। প্রতিহারী।

প্রতিহারীর প্রবেশ

প্রতিহারী। কী রাজকুমারী।

সুদর্শনা। ওই যে আম্রবনবীথিকায় উৎসববালকেরা গান গেয়ে যাচ্ছে, ডাক ডাক ওদের ডেকে নিয়ে আয়। একটু গান শুনি। [প্রতিহারীর প্রস্থান

বালকগণের প্রবেশ

এস এস সব মূর্তিমান কিশোর বসন্ত, ধরো তোমাদের গান। আমার সমস্ত দেহমন গান গাইছে, কণ্ঠে আসছে না। আমার হয়ে তোমরা গাও।

বালকগণের গান

কার হাতে এই মালা তোমার পাঠালে
আজ ফাগুনদিনের সকালে।
তার বর্ণে তোমার নামের রেখা,
গন্ধে তোমার ছন্দ লেখা,
সেই মালাটি বেঁধেছি মোর কপালে
আজ ফাগুনদিনের সকালে॥
গানটি তোমার চলে এল আকাশে
আজ ফাগুন দিনের বাতাসে।
ওগো আমার নামটি তোমার সুরে
কেমন করে দিলে জুড়ে,
লুকিয়ে তুমি ঐ গানেরি আড়ালে,
আজ ফাগুনদিনের সকালে॥

সুদর্শনা। হয়েছে হয়েছে, আর না। তোমাদের এই গান শুনে চোখে জল ভরে আসছে—আমার মনে হচ্ছে যা পাবার জিনিস তাকে হাতে পাবার জো নেই—তাকে হাতে পাবার দরকার নেই। [প্রণাম করিয়া বালকগণের প্রস্থান

কুঞ্জদ্বার

ঠাকুরদা ও দেশী পথিকদের প্রবেশ

ঠাকুরদা। কী ভাই, হল তোমাদের?

কৌণ্ডিল্য। খুব হল ঠাকুরদা। এই দেখো না একেবারে লালে লাল করে দিয়েছে। কেউ বাকি নেই।

ঠাকুরদা। বলিস কী? রাজাগুলোকে সুদ্ধ রাঙিয়েছে না কি?

জনার্দন। ওরে বাস রে! কাছে ঘেঁষে কে! তারা সব বেড়ার মধ্যে খাড়া হয়ে রইল।

ঠাকুরদা। হায় হায় বড়ো ফাঁকিতে পড়েছে। একটুও রং ধরাতে পারলি নে? জোর করে ঢুকে পড়তে হয়।

কুম্ভ। ও দাদা, তাদের রাঙা, সে আর-এক রঙের। তাদের চক্ষু রাঙা, তাদের

পাইকগুলোর পাগড়ি রাঙা, তার উপরে খোলা তলোয়ারের যে রকম ভঙ্গি দেখলুম একটু কাছে ঘেঁষলেই একেবারে চরম রাঙা রাঙিয়ে দিত।

ঠাকুরদা। বেশ করেছিস ঘেঁষিস নি। পৃথিবীতে ওদের নির্বাসনদণ্ড—ওদের তফাতে রেখে চলতেই হবে।

বাউলের প্রবেশ ও গান

যা ছিল কালো ধলো
তোমার রঙে রঙে রাঙা হল।
যেমন রাঙাবরণ তোমার চরণ
তার সনে আর ভেদ না র'ল॥
রাঙা হল বসন ভূষণ,
রাঙা হল শয়ন স্বপন,
মন হল কেমন দেখ রে, যেমন
রাঙা কমল টলমল!

ঠাকুরদা। বেশ ভাই বেশ—খুব খেলা জমেছিল?

বাউল। খুব খুব। সব লালে লাল। কেবল আকাশের চাঁদটাই ফাঁকি দিয়েছে—সাদাই রয়ে গেল।

ঠাকুরদা। বাইরে থেকে দেখাচ্ছে যেন বড়ো ভালোমানুষ। ওর সাদা চাদরটা খুলে দেখতিস যদি তাহলে ওর বিদ্যে ধরা পড়ত। চুপি চুপি ও যে আজ কত রং ছড়িয়েছে এখানে দাঁড়িয়ে সব দেখেছি। অথচ ও নিজে কি এমনি সাদাই থেকে যাবে?

গান

আহা তোমার সঙ্গে প্রাণের খেলা
প্রিয় আমার ওগো প্রিয়।
বড়ো উতলা আজ পরান আমার
খেলাতে হার মানবে কি ও?
কেবল তুমিই কি গো এমনি ভাবে
রাঙিয়ে মোরে পালিয়ে যাবে?
তুমি সাধ করে নাথ ধরা দিয়ে
আমারো রং বক্ষে নিয়ো—
এই হৃৎকমলের রাঙা রেণু
রাঙাবে ঐ উত্তরীয়। [সকলের প্রস্থান

সুবর্ণ ও রাজা বিক্রমবাহুর প্রবেশ

সুবর্ণ। এ কী কাণ্ড করেছ রাজা বিক্রমবাহু ?

বিক্রম। আমি কেবল এই প্রাসাদের কাছটাতেই আগুন ধরাতে চেয়েছিলুম, সে আগুন যে এত শীঘ্র এমন চারিদিকে ধরে উঠবে সে আমি মনেও করি নি। এ বাগান থেকে বেরোবার পথ কোথায় শীঘ্র বলে দাও।

সুবর্ণ। পথ কোথায় আমি তো কিছুই জানি নে। যারা আমাদের এখানে এনেছিল তাদের একজনকেও দেখছি নে।

বিক্রম। তুমি তো এদেশেরই লোক—পথ নিশ্চয় জান।

সুবর্ণ। অন্তঃপুরের বাগানে কোনোদিনই প্রবেশ করি নি।

বিক্রম। সে আমি বুঝি নে, তোমাকে পথ বলতেই হবে, নইলে তোমাকে দু-টুকরো করে কেটে ফেলব।

সুবর্ণ। তাতে প্রাণ বেরোবে, পথ বেরোবার কোনো উপায় হবে না।

বিক্রম। তবে কেন বলে বেড়াচ্ছিলে তুমিই এখানকার রাজা ?

সুবর্ণ। আমি রাজা না, রাজা না। (মাটিতে পড়িয়া জোড় করে) কোথায় আমার রাজা, রক্ষা করো। আমি পাপিষ্ঠ, আমাকে রক্ষা করো। আমি বিদ্রোহী, আমাকে দণ্ড দাও, কিন্তু রক্ষা করো।

বিক্রম। অমন শূন্যতার কাছে চীৎকার করে লাভ কী ? ততক্ষণ পথ বের করবার চেষ্টা করা যাক।

সুবর্ণ। আমি এইখানেই পড়ে রইলুম—আমার যা হবার তাই হবে।

বিক্রম। সে হবে না। পুড়ে মরি তো একলা মরব না—তোমাকে সঙ্গী নেব।

নেপথ্য হইতে। রক্ষা করো, রক্ষা করো। চারিদিকে আগুন।

বিক্রম। মূঢ় ওঠো, আর দেরি না।

সুদর্শনার প্রবেশ

সুদর্শনা। রাজা, রক্ষা করো। আগুনে ঘিরেছে।

সুবর্ণ। কোথায় রাজা ? আমি রাজা নই।

সুদর্শনা। তুমি রাজা নও ?

সুবর্ণ। আমি ভণ্ড, আমি পাষণ্ড ! (মুকুট মাটিতে ফেলিয়া) আমার ছলনা ধূলিসাৎ হ'ক। [রাজা বিক্রমের সহিত প্রস্থান

সুদর্শনা। রাজা নয়? এ রাজা নয়? তবে ভগবান হুতাশন, দগ্ধ করো আমাকে ; আমি তোমারই হাতে আত্মসমর্পণ করব।

নেপথ্যে। ওদিকে কোথায় যাও। তোমার অন্তঃপুরের চারিদিকে আগুন ধরে গেছে, ওর মধ্যে প্রবেশ ক'রো না।

সুরঙ্গমার প্রবেশ

সুরঙ্গমা। এস।

সুদর্শনা। কোথায় যাব?

সুরঙ্গমা। ওই আগুনের ভিতর দিয়েই চলো।

সুদর্শনা। সে কী কথা?

সুরঙ্গমা। আগুনকে বিশ্বাস করো, যাকে বিশ্বাস করেছিলে, এ তার চেয়ে ভালো।

সুদর্শনা। রাজা কোথায়?

সুরঙ্গমা। রাজাই আছেন ওই আগুনের মধ্যে। তিনি সোনাকে পুড়িয়ে নেবেন।

সুদর্শনা। সত্যি বলছিস?

সুরঙ্গমা। আমি তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি, আগুনের ভিতরকার রাস্তা জানি।

[উভয়ের প্রস্থান

গানের দলের প্রবেশ

গান

আগুনে হল আগুনময়।
জয় আগুনের জয়।
মিথ্যা যত হৃদয় জুড়ে
এইবেলা সব যাক না পুড়ে',
মরণ-মাঝে তোর জীবনের হ'ক রে পরিচয়॥
আগুন এবার চলল রে সন্ধানে
কলঙ্ক তোর লুকিয়ে কোথায় প্রাণে।
আড়াল তোমার যাক না ঘুচে,
লজ্জা তোমার যাক রে মুছে,
চিরদিনের মতো তোমার ছাই হয়ে যাক ভয়॥

[গানের দলের প্রস্থান

সুদর্শনা ও সুরঙ্গমার পুনঃপ্রবেশ

সুরঙ্গমা। ভয় নেই, তোমার ভয় নেই।

সুদর্শনা। ভয় আমার নেই—কিন্তু লজ্জা! লজ্জা যে আগুনের মতো আমার সঙ্গে সঙ্গে এসেছে। আমার মুখ চোখ, আমার সমস্ত হৃদয়টাকে রাঙা করে রেখেছে।

সুরঙ্গমা। এ দাহ মিটতে সময় লাগবে।

সুদর্শনা। কোনোদিন মিটবে না, কোনোদিন মিটবে না।

সুরঙ্গমা। হতাশ হ'য়ো না। তোমার সাধ তো মিটেছে, আগুনের মধ্যেই তো আজ দেখে নিলে।

সুদর্শনা। আমি কি এমন সর্বনাশের মধ্যে দেখতে চেয়েছিলুম? কী দেখলুম জানি নে, কিন্তু বুকের মধ্যে এখনও কাঁপছে।

সুরঙ্গমা। কেমন দেখলে?

সুদর্শনা। ভয়ানক, সে ভয়ানক। সে আমার স্মরণ করতেও ভয় হয়। কালো, কালো। আমার মনে হল ধূমকেতু যে আকাশে উঠেছে সেই আকাশের মতো কালো—ঝড়ের মেঘের মতো কালো—কূলশূন্য সমুদ্রের মতো কালো। [প্রস্থান

সুরঙ্গমা। যে কালো দেখে আজ তোমার বুক কেঁপে গেছে সেই কালোতেই এক দিন তোমার হৃদয় স্নিগ্ধ হয়ে যাবে। নইলে ভালোবাসা কিসের?

গান

আমি রূপে তোমায় ভোলাব না,
ভালোবাসায় ভোলাব।
আমি হাত দিয়ে দ্বার খুলব না গো
গান দিয়ে দ্বার খোলাব॥
ভরাব না ভূষণভারে,
সাজাব না ফুলের হারে,
প্রেমকে আমার মালা করে
গলায় তোমার দোলাব॥
জানবে না কেউ কোন্ তুফানে
তরঙ্গদল নাচবে প্রাণে,
চাঁদের মতো অলখ টানে
জোয়ারে ঢেউ তোলাব॥

সুদর্শনার পুনঃপ্রবেশ

সুদর্শনা। কিন্তু কেন সে আমাকে জোর করে পথ আটকায় না? কেশের গুচ্ছ ধরে কেন সে আমাকে টেনে রেখে দেয় না? আমাকে কিছু সে বলছে না, সেই জন্যেই আরও অসহ্য বোধ হচ্ছে।

সুরঙ্গমা। রাজা কিছু বলছে না, কে তোমাকে বললে?

সুদর্শনা। অমন করে নয়, চীৎকার করে বজ্রগর্জনে—আমার কান থেকে অন্য সকল কথা ডুবিয়ে দিয়ে। রাজা, আমাকে এত সহজে ছেড়ে দিয়ো না, যেতে দিয়ো না।

সুরঙ্গমা। ছেড়ে দেবেন, কিন্তু যেতে দেবেন কেন?

সুদর্শনা। যেতে দেবেন না? আমি যাবই।

সুরঙ্গমা। আচ্ছা যাও।

সুদর্শনা। আমার দোষ নেই। আমাকে জোর করে তিনি ধরে রাখতে পারতেন কিন্তু রাখলেন না। আমাকে বাঁধলেন না—আমি চললুম। এইবার তাঁর প্রহরীদের হুকুম দিন, আমাকে ঠেকাক।

সুরঙ্গমা। কেউ ঠেকাবে না। ঝড়ের মুখে ছিন্ন মেঘ যেমন অবাধে চলে তেমনি তুমি অবাধে চলে যাও।

সুদর্শনা। ক্রমেই বেগ বেড়ে উঠছে—এবার নোঙর ছিঁড়ল। হয়তো ডুবব কিন্তু আর ফিরব না। [দ্রুত প্রস্থান

৪

রাজপথ

নাগরিকদলের প্রবেশ

প্রথম। এটি ঘটালেন আমাদের রাজকন্যা সুদর্শনা।

দ্বিতীয়। সকল সর্বনাশের মূলেই স্ত্রীলোক আছে। বেদেই তো আছে,—কী আছে বলো না হে বটুকেশ্বর। তুমি বামুনের ছেলে।

তৃতীয়। আছে আছে বই কি। বেদে যা খুঁজবে, তাই পাওয়া যাবে—অষ্টাবক্র বলেছেন, নারীণাঞ্চনখিনাঞ্চশৃঙ্গিণাং শস্ত্রপাণিনাং—অর্থাৎ কিনা—

দ্বিতীয়। আরে বুঝেছি বুঝেছি—আমি থাকি তর্করত্নপাড়ায়,—অনুস্বার-বিসর্গের একটা ফোঁটা আমার কাছে এড়াবার জো নেই।

প্রথম। আমাদের এ হল যেন কলির রামায়ণ। কোথা থেকে ঘরে ঢুকে পড়ল দশমুণ্ড রাবণ, আচমকা লঙ্কাকাণ্ড বাধিয়ে দিল।

তৃতীয়। যুদ্ধের হাওয়া তো চলছে, এদিকে রাজকন্যা যে কোথায় অদর্শন হয়েছেন কেউ খোঁজ পায় না। মহারাজ তো বন্দী, এদিকে কে যে লড়াই চালাচ্ছে তারও কোনো ঠিকানা নেই।

দ্বিতীয়। কিন্তু আমি ভাবছি, এখন আমাদের উপায় কী? আমাদের ছিল এক রাজা এখন সাতটা হতে চলল, বেদে পুরাণে কোথাও তো এর তুলনা মেলে না।

প্রথম। মেলে বই কি—পঞ্চপাণ্ডবের কথা ভেবে দেখো।

তৃতীয়। আরে সে হল পঞ্চপতি—

প্রথম। একই কথা। তারা হল পতি, এরা হল নৃপতি। কোনোটারই বাড়াবাড়ি সুবিধে নয়।

তৃতীয়। আমাদের পাঁচকড়ি একেবারে বেদব্যাস হয়ে উঠল হে—রামায়ণ মহাভারত ছাড়া কথাই কয় না।

দ্বিতীয়। তোরা তো রামায়ণ মহাভারত নিয়ে পথের মধ্যে আসর জমিয়েছিস, এদিকে আমাদের নিজের কুরুক্ষেত্রে কী ঘটছে খবর কেউ রাখিস নে।

প্রথম। ওরে বাবা—সেখানে যাবে কে? খবর যখন আসবে তখন ঘাড়ের উপর এসে আপনি পড়বে—জানতে বাকি থাকবে না।

দ্বিতীয়। ভয় কিসের রে?

প্রথম। তা তো সত্যি। তুমি যাও না।

তৃতীয়। আচ্ছা, চলো না ধনঞ্জয়ের ওখানে। সে সব খবর জানে।

দ্বিতীয়। না জানলেও বানিয়ে দিতে জানে। [সকলের প্রস্থান

সুদর্শনা ও সুরঙ্গমার প্রবেশ

সুদর্শনা। একদিন আমাকে সকলে সৌভাগ্যবতী বলত, আমি যেখানে যেতুম সেখানেই ঐশ্বর্যের আলো জ্বলে উঠত। আজ আমি এ কী অকল্যাণ সঙ্গে করে এনেছি। তাই আমি ঘর ছেড়ে পথে এলুম।

সুরঙ্গমা। মা, যতক্ষণ না সেই রাজার ঘরে পৌঁছোবে ততক্ষণ তো পথই বন্ধু।

সুদর্শনা। চুপ কর, চুপ কর, তার কথা আর বলিস নে।

সুরঙ্গমা। তুমি যে তাঁর কাছেই ফিরে যাচ্ছ।

সুদর্শনা। কখনোই না।

সুরঙ্গমা। কার উপরে রাগ করছ মা!

সুদর্শনা। আমি তার নাম করতেও চাই নে।

সুরঙ্গমা। আচ্ছা, নাম ক'রো না, তাঁর সবুর সইবে।

সুদর্শনা। আমি পথে বেরোলুম, সঙ্গে সে এল না?

সুরঙ্গমা। সমস্ত পথ জুড়ে আছেন তিনি।

সুদর্শনা। একবার বারণও করলে না? চুপ করে রইলি যে? বল না, তোর রাজার এ কী রকম ব্যবহার?

সুরঙ্গমা। সে তো সবাই জানে, আমার রাজা নিষ্ঠুর। তাঁকে কি কেউ কোনোদিন টলাতে পারে?

সুদর্শনা। তবে তুই এমন দিনরাত ডাকিস কেন?

সুরঙ্গমা। সে যেন এমনি পর্বতের মতোই চিরদিন কঠিন থাকে। আমার দুঃখ আমার থাক, সেই কঠিনেরই জয় হ'ক। [সুদর্শনার প্রস্থান

সুরঙ্গমার গান

ওগো আমার প্রাণের ঠাকুর,
তোমার প্রেম তোমারে এমন করে
করেছে নিষ্ঠুর।
তুমি বসে থাকতে দেবে না যে,
দিবানিশি তাই তো বাজে
পরান মাঝে এমন কঠিন সুর॥
ওগো আমার প্রাণের ঠাকুর,
তোমার লাগি' দুঃখ আমার
হয় যেন মধুর।
তোমার খোঁজা খোঁজায় মোরে,
তোমার বেদন কাঁদায় ওরে,
আরাম যত করে কোথায় দূর।

[সুরঙ্গমার প্রস্থান

রাজা বিক্রম ও সুবর্ণের প্রবেশ

বিক্রম। কে যে বললে সুদর্শনা এই পথ দিয়ে পালিয়েছে। যুদ্ধে তার বাপকে বন্দী করা মিথ্যে হবে যদি সে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে যায়।

সুবর্ণ। পালিয়ে যদি গিয়ে থাকে, তাহলে তো বিপদ কেটে গেছে। এখন ক্ষান্ত হ'ন।

বিক্রম। কেন বলো তো ?

সুবর্ণ। দুঃসাহসিকতা হচ্ছে।

বিক্রম। তাই যদি না হবে, তবে কাজে প্রবৃত্ত হয়ে সুখ কী ?

সুবর্ণ। কান্তিকরাজকে ভয় না করলেও চলে কিন্তু—

বিক্রম। ওই কিন্তুটাকে ভয় করতে শুরু করলে জগতে টেকা দায় হয়।

সুবর্ণ। মহারাজ, ওই কিন্তুটাকে না হয় মন থেকে উড়িয়ে দিলেন, কিন্তু ও যে বাইরে থেকেই হঠাৎ উড়ে এসে দেখা দেয়। ভেবে দেখুন না, বাগানে কী কাণ্ডটা হল। খুব করেই আটঘাট বেঁধেছিলেন, তার মধ্যে কোথা থেকে অগ্নিমূর্তি ধরে ঢুকে পড়ল একটা কিন্তু।

বসুসেন ও বিজয়বর্মার প্রবেশ

বসুসেন। অন্তঃপুর ঘুরে এলুম কোথাও তো তাকে পাওয়া গেল না। দৈবজ্ঞ যে বলেছিল, আমাদের যাত্রা শুভ, সেটা বুঝি মিথ্যা হল।

বিজয়। পাওয়ার চেয়ে না পাওয়াতেই হয়তো শুভ, কে বলতে পারে ?

বিক্রম। এ কী উদাসীনের মতো কথা বলছ।

বসুসেন। এ কী। ভূমিকম্প না কি।

বিক্রম। ভূমিই কাঁপছে বটে, কিন্তু তাই বলে পা কাঁপতে দেওয়া হবে না।

বসুসেন। এটা দুর্লক্ষণ।

বিক্রম। কোনো লক্ষণই দুর্লক্ষণ নয়, যদি সঙ্গে ভয় না থাকে।

বসুসেন। দৃষ্ট কিছুকে ভয় করি নে কিন্তু অদৃষ্ট পুরুষের সঙ্গে লড়াই চলে না।

বিক্রম। অদৃষ্ট দৃষ্ট হয়েই আসেন, তখন তাঁর সঙ্গে খুবই লড়াই চলে।

দূতের প্রবেশ

দূত। মহারাজ। সৈন্যরা প্রায় সকলে পালিয়েছে।

বিক্রম। কেন ?

দূত। তাদের মধ্যে অকারণে কেমন একটা আতঙ্ক ঢুকে গেল—কাউকে আর ঠেকিয়ে রাখা যাচ্ছে না।

বিক্রম। আচ্ছা, তাদের ফিরিয়ে আনছি। যুদ্ধের পর হারা চলে কিন্তু যুদ্ধের আগে হার মানতে পারব না। [বিক্রমবাহু ও দূতের প্রস্থান

বিজয়। যার জন্য যুদ্ধ সেও পালায়, যাদের নিয়ে যুদ্ধ তারাও পালায়, এখন আমাদেরই কি পালানো দোষের ?

বসুসেন। মনে ধাঁধা লেগেছে, কিন্তু স্থির করতে পারছি নে। [উভয়ের প্রস্থান

সুরঙ্গমার প্রবেশ

গান

বসন্ত, তোর শেষ করে দে রঙ্গ,
ফুল ফোটাবার খ্যাপামি, তার
উদ্দাম তরঙ্গ ॥
উড়িয়ে দেবার, ছড়িয়ে দেবার
মাতন তোমার থামুক এবার,
নীড়ে ফিরে আসুক তোমার
পথহারা বিহঙ্গ ॥
সাধের মুকুল কতই পড়ল ঝরে
তারা ধুলা হল, ধুলা দিল ভরে।
প্রখর তাপে জরো-জরো
ফল ফলাবার শাসন ধরো,
হেলাফেলার পালা তোমার
এই বেলা হ'ক ভঙ্গ ॥

সুদর্শনার প্রবেশ

সুদর্শনা। এ কী হল ? ঘুরেফিরে সেই একই জায়গায় এসে পড়ছি। ওই যে গোলমাল শোনা যাচ্ছে, মনে হচ্ছে আমার চারিদিকেই যুদ্ধ চলছে। ওই যে আকাশ ধুলোয় অন্ধকার। আমি কি এই ঘূর্ণি ধুলোর সঙ্গে সঙ্গেই অনন্তকাল ঘুরে বেড়াব ? এর থেকে বেরোই কেমন করে ?

সুরঙ্গমা। তুমি যে কেবল চলে যেতেই চাচ্ছ, ফিরতে চাচ্ছ না, সেই জন্য কোথাও পৌঁছোতে পাচ্ছ না।

সুদর্শনা। কোথায় ফেরবার কথা তুই বলছিস ?

সুরঙ্গমা। আমাদের রাজার কাছে। আমি বলে রাখছি, যে-পথ তাঁর কাছে না নিয়ে যাবে সে-পথের অন্ত পাবে না কোথাও।

সৈনিকের প্রবেশ

সুদর্শনা। কে তুমি?

সৈনিক। আমি নগরের রাজপ্রাসাদের দ্বারী।

সুদর্শনা। শীঘ্র বলো সেখানকার খবর কী।

সৈনিক। মহারাজ বন্দী হয়েছেন।

সুদর্শনা। কে বন্দী হয়েছেন?

সৈনিক। আপনার পিতা।

সুদর্শনা। আমার পিতা! কার বন্দী হয়েছেন?

সৈনিক। রাজা বিক্রমবাহুর। [সৈনিকের প্রস্থান

সুদর্শনা। রাজা, রাজা, দুঃখ তো আমি সইতে প্রস্তুত হয়েই বেরিয়েছিলেম, কিন্তু আমার দুঃখ চারদিকে ছড়িয়ে দিলে কেন? যে আগুন আমার বাগানে লেগেছিল সেই আগুন কি আমি সঙ্গে করে নিয়ে চলেছি? আমার পিতা তোমার কাছে কী দোষ করেছেন?

সুরঙ্গমা। আমরা যে কেউ একলা নই। ভালোমন্দ সবাইকেই ভাগ করে নিতে হয়। সেইজন্যেই তো ভয়, একলার জন্যে ভয় কিসের?

সুদর্শনা। সুরঙ্গমা।

সুরঙ্গমা। কী রাজকুমারী।

সুদর্শনা। তোর রাজার যদি রক্ষা করবার শক্তি থাকত, তাহলে আজ তিনি কি নিশ্চিন্ত হয়ে থাকতে পারতেন?

সুরঙ্গমা। আমাকে কেন বলছ? আমার রাজার হয়ে উত্তর দেবার শক্তি কি আমার আছে? উত্তর যদি দেন তো নিজেই এমনি করে দেবেন যে কারও কিছু বুঝতে বাকি থাকবে না।

সুদর্শনা। রাজা, আমার পিতাকে রক্ষা করবার জন্যে যদি তুমি আসতে, তাহলে তোমার যশ বাড়ত বই কমত না। [প্রস্থানোদ্যম

সুরঙ্গমা। কোথায় যাচ্ছ?

সুদর্শনা। রাজা বিক্রমের শিবিরে। আমাকে বন্দী করুন তিনি, আমার পিতাকে ছেড়ে দিন। আমি নিজেকে যতদূর নত করতে পারি করব, দেখি কোথায় এসে ঠেকলে তোর রাজার সিংহাসন নড়ে। [উভয়ের প্রস্থান

বসুসেন ও বিজয়বর্মার প্রবেশ

বসুসেন। যুদ্ধের আরম্ভেই যুদ্ধ শেষ হয়ে আছে, ভাঙা সৈন্য কুড়িয়ে এনে কখনো লড়াই চলে?

বিজয়। বিক্রমবাহুকে কিছুতেই ফেরাতে পারলুম না।

বসুসেন। সে আত্মবিনাশের নেশায় উন্মত্ত।

বিজয়। কিন্তু কে আমাকে বললে, রণক্ষেত্রে সে যেমনি গিয়ে পৌঁছেছে অমনি তার বুকে লেগেছে ঘা। এতক্ষণে তার কী হল কিছুই বলা যায় না।

বসুসেন। আমার কাছে এইটেই সব চেয়ে অদ্ভুত ঠেকছে যে, আমরা আয়োজন করলুম কতদিন থেকে, সমারোহ হল ঢের, কিন্তু শেষ হবার বেলায় এক পলকেই কী যে হয়ে গেল ভালো বুঝতে পারা গেল না।

বিজয়। রাত্রির সমস্ত তারা যেমন প্রভাতসূর্যের এক কটাক্ষেই নিবে যায়।

বসুসেন। এখন চলো।

বিজয়। কোথায়?

বসুসেন। ধরা দিতে।

বিজয়। ধরা দিতে, না পালাতে?

বসুসেন। পালানোর চেয়ে ধরা দেওয়া সহজ হবে। [উভয়ের প্রস্থান

সুরঙ্গমার প্রবেশ

গান

এখনো গেল না আঁধার,
এখনো রহিল বাধা।
এখনো মরণ-ব্রত
জীবনে হল না সাধা।
কবে যে দুঃখজ্বালা
হবে রে বিজয়মালা,
ঝলিবে অরুণরাগে
নিশীথরাতের কাঁদা।
এখনো নিজেরি ছায়া
রচিছে কত যে মায়া।
এখনো কেন যে মিছে
চাহিছে কেবলি পিছে,
চকিতে বিজলি আলো
চোখেতে লাগাল ধাঁধা॥

সুদর্শনার প্রবেশ

সুরঙ্গমা। এ লজ্জা কাটবে।

সুদর্শনা। কাটবে বই কি সুরঙ্গমা—সমস্ত পৃথিবীর কাছে আমার নিচু হবার দিন এসেছে। কিন্তু কই রাজা এখনও কেন আমাকে নিতে আসছেন না? আরও কিসের জন্যে তিনি অপেক্ষা করছেন?

সুরঙ্গমা। আমি তো বলেছি, আমার রাজা নিষ্ঠুর—বড়ো নিষ্ঠুর।

সুদর্শনা। সুরঙ্গমা, তুই যা একবার তাঁর খবর নিয়ে আয় গে।

সুরঙ্গমা। কোথায় তাঁর খবর নেব তা তো কিছুই জানি নে। ঠাকুরদাকে ডাকতে পাঠিয়েছি—তিনি এলে হয়তো তাঁর কাছ থেকে সংবাদ পাওয়া যাবে।

সুদর্শনা। হায় কপাল, লোককে ডেকে ডেকে তাঁর খবর নিতে হবে আমার এমন দশা হয়েছে!—না না, দুঃখ করব না—যা হওয়া উচিত ছিল তাই হয়েছে—ভালোই হয়েছে—কিছু অন্যায় হয় নি।

ঠাকুরদার প্রবেশ

সুদর্শনা। শুনেছি তুমি আমার রাজার বন্ধু—আমার প্রণাম গ্রহণ করো, আমাকে আশীর্বাদ করো।

ঠাকুরদা। কর কী, কর কী। আমি কারও প্রণাম গ্রহণ করি নে। আমার সঙ্গে সকলের হাসির সম্বন্ধ।

সুদর্শনা। তোমার সেই হাসি দেখিয়ে দাও—আমাকে সুসংবাদ দিয়ে যাও। বলো আমার রাজা কখন আমাকে নিতে আসবেন?

ঠাকুরদা। ওই তো বড়ো শক্ত কথা জিজ্ঞাসা করলে। আমার বন্ধুর ভাবগতিক কিছুই বুঝি নে, তার আর বলব কী। যুদ্ধ তো শেষ হয়ে গেল, তিনি যে কোথায় তার কোনো সন্ধান নেই।

সুদর্শনা। চলে গিয়েছেন?

ঠাকুরদা। সাড়াশব্দ তো কিছুই পাই নে।

সুদর্শনা। চলে গিয়েছেন? তোমার বন্ধু এমনি বন্ধু।

ঠাকুরদা। সেইজন্যে লোকে তাকে নিন্দেও করে সন্দেহও করে। কিন্তু আমার রাজা তাতে খেয়ালও করে না।

সুদর্শনা। চলে গেলেন? ওরে, ওরে, কী কঠিন, কী কঠিন। একেবারে পাথর, একেবারে বজ্র। সমস্ত বুক দিয়ে ঠেলেছি—বুক ফেটে গেল—কিন্তু নড়ল না। ঠাকুরদা, এমন বন্ধুকে নিয়ে তোমার চলে কী করে?

ঠাকুরদাদা। চিনে নিয়েছি যে—সুখে দুঃখে তাকে চিনে নিয়েছি—এখন আর সে কাঁদাতে পারে না।

সুদর্শনা। আমাকেও কি সে চিনতে দেবে না?

ঠাকুরদাদা। দেবে বই কি। নইলে এত দুঃখ দিচ্ছে কেন? ভালো করে চিনিয়ে তবে ছাড়বে, সে তো সহজ লোক নয়।

সুদর্শনা। আচ্ছা আচ্ছা, দেখব তার কতবড়ো নিষ্ঠুরতা। পথের ধারে আমি চুপ করে পড়ে থাকব—এক পা-ও নড়ব না—দেখি সে কেমন না আসে।

ঠাকুরদা। দিদি তোমার বয়স অল্প—জেদ করে অনেকদিন পড়ে থাকতে পার—কিন্তু আমার যে এক মুহূর্ত গেলেও লোকসান হয়। পাই না-পাই একবার খুঁজতে বেরোব। [প্রস্থান

সুদর্শনা। চাই নে, তাকে চাই নে। সুরঙ্গমা, তোর রাজাকে আমি চাই নে। কিসের জন্যে সে যুদ্ধ করতে এল? আমার জন্যে একেবারেই না? কেবল বীরত্ব দেখাবার জন্যে?

সুরঙ্গমা। দেখাবার ইচ্ছে তাঁর যদি থাকত তাহলে এমন করে দেখাতেন কারও আর সন্দেহ থাকত না। দেখান আর কই?

সুদর্শনা। যা যা চলে যা—তোর কথা অসহ্য বোধ হচ্ছে। এত নত করলে তবু সাধ মিটল না? বিশ্বসুদ্ধ লোকের সামনে এইখানে ফেলে রেখে দিয়ে চলে গেল?

[উভয়ের প্রস্থান

নাগরিকদলের প্রবেশ

প্রথম। ওহে এতগুলো রাজা একত্র হয়ে লড়াই বাধিয়ে দিলে, ভাবলুম খুব তামাশা হবে—কিন্তু দেখতে দেখতে কী যে হয়ে গেল, বোঝাই গেল না।

দ্বিতীয়। দেখলে না, ওদের নিজেদের মধ্যে গোলমাল লেগে গেল, কেউ কাউকে বিশ্বাস করে না।

তৃতীয়। পরামর্শ ঠিক রইল না যে। কেউ এগোতে চায় কেউ পিছোতে চায়—কেউ এদিকে যায় কেউ ওদিকে যায়, একে কি আর যুদ্ধ বলে? কিন্তু লড়েছিল রাজা বিক্রমবাহু, সে-কথা বলতেই হবে।

প্রথম। সে যে হেরেও হারতে চায় না।

দ্বিতীয়। শেষকালে অস্ত্রটা তার বুকে এসে লাগল।

তৃতীয়। সে যে পদে পদেই হারছিল, তা যেন টেরও পাচ্ছিল না।

প্রথম। অন্য রাজারা তো তাকে ফেলে কে কোথায় পালাল, তার ঠিক নেই।

[সকলের প্রস্থান

অন্য দলের প্রবেশ

প্রথম। শুনেছি বিক্রমবাহু মরে নি।

তৃতীয়। না, কিন্তু বিক্রমবাহুর বিচারটা কী রকম হল?

দ্বিতীয়। শুনেছি বিচারকর্তা স্বহস্তে রাজমুকুট পরিয়ে দিয়েছে।

তৃতীয়। এটা কিন্তু একেবারেই বোঝা গেল না।

দ্বিতীয়। বিচারটা যেন কেমন বেখাপ রকম শোনাচ্ছে।

প্রথম। তা তো বটেই। অপরাধ যা কিছু করেছে, সে তো ওই বিক্রমবাহুই।

দ্বিতীয়। আমি যদি বিচারক হতুম, তাহলে কি আর আস্ত রাখতুম? ওর আর চিহ্ন দেখাই যেত না।

তৃতীয়। কী জানি, বিচারকর্তাকে দেখি নে, তার বুদ্ধিটাও দেখা যায় না।

প্রথম। ওদের বুদ্ধি ব'লে কিছু আছে কি! এর মধ্যে সবই মর্জি। কেউ তো বলবার লোক নেই।

দ্বিতীয়। যা বলিস ভাই, আমাদের হাতে শাসনের ভার যদি পড়ত, তাহলে এর চেয়ে ঢের ভালো করে চালাতে পারতুম।

তৃতীয়। সে কি একবার করে বলতে। [সকলের প্রস্থান

ঠাকুরদা ও বিক্রমবাহুর প্রবেশ

ঠাকুরদা। এ কী বিক্রমরাজ, তুমি পথে যে।

বিক্রম। তোমার রাজা আমাকে পথেই বের করেছে।

ঠাকুরদা। ওই তো তার স্বভাব।

বিক্রম। তার পরে আর নিজের দেখা নেই।

ঠাকুরদা। সেও তার এক কৌতুক।

বিক্রম। কিন্তু আমাকে এমন করে আর কতদিন এড়াবে? যখন কিছুতেই তাকে রাজা বলে মানতেই চাই নি তখন কোথা থেকে কালবৈশাখীর মতো এসে এক মুহূর্তে আমার ধ্বজা পতাকা ভেঙে উড়িয়ে ছারখার করে দিলে আর আজ তার কাছে হার মানবার জন্যে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছি, তার আর দেখাই নেই।

ঠাকুরদা। তা হ'ক, সে যতবড়ো রাজাই হ'ক হার-মানার কাছে তাকে হার মানতেই হবে। কিন্তু রাজন, রাত্রে বেরিয়েছ যে।

বিক্রম। ওই লজ্জাটুকু এখনও ছাড়তে পারি নি। রাজা বিক্রম থালায় মুকুট সাজিয়ে তোমার রাজার মন্দির খুঁজে বেড়াচ্ছে, এই যদি দিনের আলোয় লোকে দেখে তাহলে যে তারা হাসবে।

ঠাকুরদা। লোকের ওই দশা বটে। যা দেখে চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে যায় তাই দেখেই বাঁদররা হাসে।

বিক্রম। কিন্তু ঠাকুরদা, তুমিও পথে যে।

ঠাকুরদাদা। আমিও সর্বনাশের পথ চেয়ে আছি।

গান

আমার সকল নিয়ে বসে আছি
সর্বনাশের আশায়।
আমি তার লাগি পথ চেয়ে আছি
পথে যে জন ভাসায়॥

বিক্রম। কিন্তু ঠাকুরদা, যে ধরা দেবে না তার কাছে ধরা দিয়ে লাভ কী বলো।

ঠাকুরদাদা। তার কাছে ধরা দিলে এক সঙ্গেই ধরাও দেওয়া হয় ছাড়াও পাওয়া যায়।

যে জন দেয় না দেখা যায় না দেখে
ভালোবাসে আড়াল থেকে,
আমার মন মজেছে সেই গভীরের
গোপন ভালোবাসায়॥ [উভয়ের প্রস্থান

সুরঙ্গমার প্রবেশ

গান

পথের সাথি, নমি বারম্বার।
পথিকজনের লহ নমস্কার॥
ওগো বিদায়, ওগো ক্ষতি
ওগো দিনশেষের পতি,
ভাঙা-বাসার লহ নমস্কার॥
ওগো নব প্রভাতজ্যোতি,
ওগো চিরদিনের গতি,
নব আশার লহ নমস্কার।
জীবনরথের হে সারথি,
আমি নিত্য পথের পথী,
পথে চলার লহ নমস্কার॥

সুদর্শনার প্রবেশ

সুদর্শনা। বেঁচেছি, বেঁচেছি সুরঙ্গমা। হার মেনে তবে বেঁচেছি। ওরে বাস রে। কী কঠিন অভিমান। কিছুতেই গলতে চায় না। আমার রাজা কেন আমার কাছে আসতে যাবে—আমিই তার কাছে যাব, এই কথাটা কোনোমতেই মনকে বলাতে পারছিলুম না। সমস্ত রাতটা পথে পড়ে ধুলোয় লুটিয়ে কেঁদেছি—দক্ষিনে হাওয়া বুকের বেদনার মতো হুহু করে বয়েছে, আর কৃষ্ণচতুর্দশীর অন্ধকারে বউ-কথা-কও চার পহর রাত কেবলই ডেকেছে—সে যেন অন্ধকারের কান্না।

সুরঙ্গমা। আহা কালকের রাতটা মনে হয়েছিল যেন কিছুতেই আর পোহাতে চায় না।

সুদর্শনা। কিন্তু বললে বিশ্বাস করবি নে, তারই মধ্যে বার বার আমার মনে হচ্ছিল কোথায় যেন তার বীণা বাজছে। যে নিষ্ঠুর, তার কঠিন হাতে কি অমন মিনতির সুর বাজে? বাইরের লোক আমার অসম্মানটাই দেখে গেল—কিন্তু গোপন রাত্রের সেই সুরটা কেবল আমার হৃদয় ছাড়া আর তো কেউ শুনল না। সে বীণা তুই কি শুনেছিলি সুরঙ্গমা? না, সে আমার স্বপ্ন?

সুরঙ্গমা। সেই বীণা শুনব বলেই তো তোমার কাছে কাছে আছি। অভিমান-গলানো সুর বাজবে জেনেই কান পেতে পড়ে ছিলুম। [উভয়ের প্রস্থান

গানের দলের প্রবেশ

গান

আমার অভিমানের বদলে আজ
নেব তোমার মালা।
আজ নিশিশেষে শেষ করে দিই
চোখের জলের পালা॥
আমার কঠিন হৃদয়টারে
ফেলে দিলেম পথের ধারে,
তোমার চরণ দেবে তারে মধুর
পরশ পাষাণ-গালা॥
ছিল আমার আঁধারখানি,
তারে তুমিই নিলে টানি,
তোমার প্রেম এল যে আগুন হয়ে
করল তারে আলা।

সেই যে আমার কাছে আমি
ছিল সবার চেয়ে দামি
তারে উজাড় করে সাজিয়ে দিলেম
তোমার বরণডালা ॥ [প্রস্থান

সুদর্শনা ও সুরঙ্গমার পুনঃপ্রবেশ

সুদর্শনা। তার পণটাই রইল—পথে বের করলে তবে ছাড়লে। মিলন হলে এই কথাটাই তাকে বলব যে, আমিই এসেছি, তোমার আসার অপেক্ষা করি নি। বলব চোখের জল ফেলতে ফেলতে এসেছি—কঠিন পথ ভাঙতে ভাঙতে এসেছি। এ গর্ব আমি ছাড়ব না।

সুরঙ্গমা। কিন্তু সে গর্বও তোমার টিঁকবে না। সে যে তোমারও আগে এসেছিল নইলে তোমাকে বার করে কার সাধ্য।

সুদর্শনা। তা হয়তো এসেছিল—আভাস পেয়েছিলুম কিন্তু বিশ্বাস করতে পারি নি। যতক্ষণ অভিমান করে বসে ছিলুম ততক্ষণ মনে হয়েছিল সেও আমাকে ছেড়ে গিয়েছে—অভিমান ভাসিয়ে দিয়ে যখনই রাস্তায় বেরিয়ে পড়লুম তখনই মনে হল সেও বেরিয়ে এসেছে, রাস্তা থেকেই তাকে পাওয়া শুরু করেছি। এখন আমার মনে আর কোনো ভাবনা নেই। তার জন্যে এত যে দুঃখ এই দুঃখই আমাকে তার সঙ্গ দিচ্ছে—এত কষ্টের রাস্তা আমার পায়ের তলায় যেন সুরে সুরে বেজে উঠছে—এ যেন আমার বীণা, আমার দুঃখের বীণা—এরই বেদনার গানে তিনি এই কঠিন পাথরে এই শুকনো ধুলোয় আপনি বেরিয়ে এসেছেন—আমার হাত ধরেছেন—সেই আমার অন্ধকারের মধ্যে যেমন করে হাত ধরতেন—হঠাৎ চমকে উঠে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠত—এও সেইরকম। কে বললে, তিনি নেই—সুরঙ্গমা, তুই কি বুঝতে পারছিস নে তিনি লুকিয়ে এসেছেন ?

সুরঙ্গমার গান

আমার আর হবে না দেরি,
আমি শুনেছি ওই বাজে তোমার ভেরী।
তুমি কি নাথ দাঁড়িয়ে আছ
আমার যাবার পথে,
মনে হয় যে ক্ষণে ক্ষণে
মোর বাতায়ন হতে
তোমায় যেন হেরি ॥

আমার স্বপন হল সারা
এখন প্রাণে বীণা বাজায় ভোরের তারা।
দেবার মতো যা ছিল মোর
নাই কিছু আর হাতে
তোমার আশীর্বাদের মালা
নেব কেবল মাথে
আমার ললাট ঘেরি॥

সুদর্শনা। ও কে ও। চেয়ে দেখ্ সুরঙ্গমা, এত রাত্রে এই আঁধারে পথে আরও একজন পথিক বেরিয়েছে যে।

সুরঙ্গমা। মা, এ যে বিক্রম রাজা দেখছি।

সুদর্শনা। বিক্রম রাজা?

সুরঙ্গমা। ভয় ক'রো না।

সুদর্শনা। ভয়! ভয় কেন করব। ভয়ের দিন আমার আর নেই।

রাজা বিক্রমবাহুর প্রবেশ

বিক্রম। তুমিও চলেছ বুঝি। আমিও এই এক পথেরই পথিক। আমাকে কিছুমাত্র ভয় ক'রো না।

সুদর্শনা। ভালোই হয়েছে বিক্রমরাজ—আমরা দুজনে তাঁর কাছে পাশাপাশি চলেছি এ ঠিক হয়েছে। ঘর ছেড়ে বেরোবার মুখেই তোমার সঙ্গে আমার যোগ হয়েছিল—আজ ঘরে ফেরবার পথে সেই যোগই যে এমন শুভযোগ হয়ে উঠবে তা আগে কে মনে করতে পারত।

বিক্রম। কিন্তু তুমি যে হেঁটে চলেছ এ তো তোমাকে শোভা পায় না। যদি অনুমতি কর তাহলে এখনই রথ আনিয়ে দিতে পারি।

সুদর্শনা। না না, অমন কথা ব'লো না—যে-পথ দিয়ে তাঁর কাছ থেকে দূরে এসেছি, সেই পথের সমস্ত ধুলোটা পা দিয়ে মাড়িয়ে মাড়িয়ে ফিরব তবেই আমার বেরিয়ে আসা সার্থক হবে। রথে করে নিয়ে গেলে আমাকে ফাঁকি দেওয়া হবে।

সুরঙ্গমা। মহারাজ, তুমিও তো আজ ধুলোয়। এ পথে তো হাতি ঘোড়া রথ কারও দেখি নি।

সুদর্শনা। যখন প্রাসাদে ছিলুম তখন কেবল সোনারুপোর মধ্যেই পা ফেলেছি—আজ তাঁর ধুলোর মধ্যে চলে আমার সেই ভাগ্যদোষ খণ্ডিয়ে নেব। আজ আমার

সেই ধুলোমাটির রাজার সঙ্গে পদে পদে এই ধুলোমাটিতে মিলন হচ্ছে, এ সুখের খবর কে জানত।

সুরঙ্গমা। ওই দেখো, পূর্বদিকে চেয়ে দেখো ভোর হয়ে আসছে। আর দেরি নেই—তাঁর প্রাসাদের সোনার চূড়ার শিখর দেখা যাচ্ছে।

ঠাকুরদার প্রবেশ

ঠাকুরদা। ভোর হল, দিদি, ভোর হল।

সুদর্শনা। তোমাদের আশীর্বাদে পৌঁচেছি।

ঠাকুরদা। কিন্তু আমাদের রাজার রকম দেখেছ? রথ নেই, বাদ্য নেই, সমারোহ নেই।

সুদর্শনা। বল কী, সমারোহ নেই? ওই যে আকাশ একেবারে রাঙা, ফুলগন্ধের অভ্যর্থনায় বাতাস একেবারে পরিপূর্ণ।

ঠাকুরদা। তা হ'ক, আমাদের রাজা যত নিষ্ঠুর হ'ক আমরা তো তেমন কঠিন হতে পারি নে—আমাদের যে ব্যথা লাগে। এই দীনবেশে তুমি রাজভবনে যাচ্ছ, এ কি আমরা সহ্য করতে পারি? একটু দাঁড়াও, আমি ছুটে গিয়ে তোমার জন্যে রানীর বেশ নিয়ে আসি।

সুদর্শনা। না না না। সে বেশ তিনি আমাকে চিরদিনের মতো ছাড়িয়েছেন—সবার সামনে আমাকে দাসীর বেশ পরিয়েছেন—বেঁচেছি বেঁচেছি—আমি আজ তাঁর দাসী—যে-কেউ তাঁর আছে, আমি আজ সকলের নিচে।

ঠাকুরদা। শত্রুপক্ষ তোমার এ-দশা দেখে পরিহাস করবে, সেইটে আমাদের অসহ্য হয়।

সুদর্শনা। শত্রুপক্ষের পরিহাস অক্ষয় হ'ক—তারা আমার গায়ে ধুলো দিক। আজকের দিনের অভিসারে সেই ধুলোই আমার অঙ্গরাগ।

ঠাকুরদা। এর উপরে আর কথা নেই। এখন আমাদের বসন্ত-উৎসবের শেষ খেলাটাই চলুক—ফুলের রেণু এখন থাক, দক্ষিনে হাওয়ায় এবার ধুলো উড়িয়ে দিক। সকলে মিলে আজ ধূসর হয়ে প্রভুর কাছে যাব। গিয়ে দেখব তাঁর গায়েও ধুলো মাখা। তাঁকে বুঝি কেউ ছাড়ে, মনে করছ? যে পায় তাঁর গায়ে মুঠো মুঠো ধুলো দেয় যে।

বিক্রম। ঠাকুরদা, তোমাদের এই ধুলোর খেলায় আমাকেও ভুলো না। আমার এই রাজবেশটাকে এমনি মাটি করে নিয়ে যেতে হবে যাতে একে আর চেনা না যায়।

ঠাকুরদা। সে আর দেরি হবে না ভাই। যেখানে নেবে এসেছ এখানে যত তোমার মিথ্যে মান সব ঘুচে গেছে—এখন দেখতে দেখতে রং ফিরে যাবে। আর এই আমাদের রানীকে দেখো, ও নিজের উপর ভারি রাগ করেছিল—মনে করেছিল গয়না ফেলে দিয়ে নিজের ভুবনমোহন রূপকে লাঞ্ছনা দেবে, কিন্তু সে রূপ অপমানের আঘাতে আরও ফুটে পড়েছে—সে যেন কোথাও আর কিছু ঢাকা নেই। আমাদের রাজাটির নিজের নাকি রূপের সম্পর্ক নেই তাই তো বিচিত্র রূপ সে এত ভালোবাসে, এই রূপই তো তার বক্ষের অলংকার। সেই রূপ আপন গর্বের আবরণ ঘুচিয়ে দিয়েছে—আজ আমার রাজার ঘরে কী সুরে যে এতক্ষণে বীণা বেজে উঠেছে, তাই শোনবার জন্যে প্রাণটা ছটফট করছে।

সুরঙ্গমা। ওই যে সূর্য উঠল। [সকলের প্রস্থান

গান

ভোর হল বিভাবরী, পথ হল অবসান।
শুন ওই লোকে লোকে উঠে আলোকেরি গান॥
ধন্য হলি ওরে পান্থ
রজনী-জাগর-ক্লান্ত,
ধন্য হল মরি মরি ধুলায় ধূসর প্রাণ॥
বনের কোলের কাছে
সমীরণ জাগিয়াছে;
মধুভিক্ষু সারে সারে
আগত কুঞ্জের দ্বারে।
হল তব যাত্রা সারা,
মোছো মোছো অশ্রুধারা,
লজ্জা ভয় গেল ঝরি,
ঘুচিল রে অভিমান॥

অন্ধকার ঘর

সুদর্শনা। প্রভু, যে আদর কেড়ে নিয়েছ সে আদর আর ফিরিয়ে দিয়ো না ; আমি তোমার চরণের দাসী, আমাকে সেবার অধিকার দাও।

রাজা। আমাকে সইতে পারবে ?

সুদর্শনা। পারব রাজা পারব। আমার প্রমোদবনে আমার রানীর ঘরে তোমাকে দেখতে চেয়েছিলুম—সেখানে তোমার দাসের অধম দাসকেও তোমার চেয়ে চোখে সুন্দর ঠেকে। তোমাকে তেমন করে দেখবার তৃষ্ণা আমার একেবারে ঘুচে গেছে—তুমি সুন্দর নও প্রভু সুন্দর নও, তুমি অনুপম।

রাজা। তোমারই মধ্যে আমার উপমা আছে।

সুদর্শনা। যদি থাকে তো সেও অনুপম।

রাজা। আজ এই অন্ধকার ঘরের দ্বার একেবারে খুলে দিলুম—এখানকার লীলা শেষ হল। এস, এবার আমার সঙ্গে এস, বাইরে চলে এস—আলোয়।

সুদর্শনা। যাবার আগে আমার অন্ধকারের প্রভুকে আমার নিষ্ঠুরকে আমার ভয়ানককে প্রণাম করে নিই। [প্রস্থান

গান

অরূপ বীণা রূপের আড়ালে লুকিয়ে বাজে,
সে বীণা আজি উঠিল বাজি' হৃদয়মাঝে ॥
ভুবন আমার ভরিল সুরে,
ভেদ ঘুচে যায় নিকটে দূরে,
সেই রাগিণী লেগেছে আমার সকল কাজে ॥
হাতে পাওয়ার চোখে চাওয়ার সকল বাঁধন,
গেল কেটে আজ সফল হল সকল কাঁদন।
সুরের রসে হারিয়ে যাওয়া
সেই তো দেখা সেই তো পাওয়া,
বিরহ মিলন মিলে গেল আজ সমান সাজে ॥

ঋণশোধ

গান

হৃদয়ে ছিলে জেগে,
দেখি আজ শরৎ মেঘে।
কেমনে আজকে ভোরে
গেল গো গেল সরে
তোমার ঐ আঁচলখানি
শিশিরের ছোঁওয়া লেগে ॥
কী যে গান গাহিতে চাই,
বাণী মোর খুঁজে না পাই।
সে যে ঐ শিউলিদলে
ছড়াল কাননতলে,
সে যে ঐ ক্ষণিক ধারায়
উড়ে যায় বায়ুবেগে ॥

পাত্রগণ

সম্রাট বিজয়াদিত্য
শেখর কবি
ঠাকুরদাদা
লক্ষেশ্বর
উপনন্দ
রাজা সোমপাল
রাজদূত
অমাত্য
বালকগণ

ভূমিকা

রাজসভা

সম্রাট বিজয়াদিত্য ও মন্ত্রী

মন্ত্রী। মহারাজ, এই হচ্ছে রাজনীতি।

বিজয়াদিত্য। কী তোমার রাজনীতি ?

মন্ত্রী। রাজ্য রাখতে গেলে রাজ্য বাড়াতে হবে। ও যেন মানুষের দেহের মতো, বৃদ্ধি যেমনি বন্ধ হয় ক্ষয়ও তেমনি শুরু হতে থাকে।

বিজয়াদিত্য। রাজ্য যতই বাড়বে তাকে রক্ষা করবার দায়ও তো ততই বাড়বে—তাহলে থামবে কোথায় ?

মন্ত্রী। কোথাও না। কেবলই জয় করতে হবে, কেননা প্রতাপ জিনিসটা যেখানে থামে সেইখানে নিবে যায়।

বিজয়াদিত্য। তাহলে তোমার পরামর্শ কী ?

মন্ত্রী। আমাদের উত্তর-পশ্চিম সীমানায় যে মানিকপুর আছে সেইটে জয় করে নেবার এই অবসর উপস্থিত হয়েছে।

বিজয়াদিত্য। সেই অবসর আমি দিলুম উড়িয়ে। আমার রাজনীতির কথা আমি তোমাকে বলব ?

মন্ত্রী। বলুন।

বিজয়াদিত্য। রাজ্যের লোভ মিটবে বলেই আমি রাজত্ব করি, বাড়বে বলে নয়। রাজা হয়েছি বলেই দেখতে পেয়েছি রাজ্যটা কিছুই নয়।

মন্ত্রী। বলেন কী মহারাজ ? ওর মধ্যে কোনো সত্যই কি—

বিজয়াদিত্য। ওর মধ্যে একমাত্র সত্য হচ্ছে রাজা হওয়া। আমি রাজা হতে চাই।

মন্ত্রী। সেইজন্তেই তো—

রাজা। সেইজন্তেই তো আমি রাজ্যে লোভ করতে চাই নে। কোনো সাম্রাজ্যই তো আজ পর্যন্ত টেঁকে নি—যে সাম্রাজ্য যতই বড়োই হ'ক। কিন্তু একবারের মতো যে সত্যকার রাজা হতে পেরেছে চিরকালের মতো সে বেঁচে রইল।

মন্ত্রী। কিন্তু সৈন্যদল প্রস্তুত আছে।

রাজা। ভালোই হয়েছে।

মন্ত্রী। তবে কি—

বিজয়াদিত্য। তাদের লাগিয়ে দাও শারদোৎসবের কাজে।

সেনাপতির প্রবেশ

সেনাপতি। মহারাজ, শরৎকালে জয়যাত্রায় বেরোবার নিয়ম—মহারাজের পূর্বপুরুষেরা—

বিজয়াদিত্য। আমিও বেরোব ঠিক করেছি।

সেনাপতি। তাহলে আদেশ করুন কী ভাবে প্রস্তুত হতে হবে।

বিজয়াদিত্য। তোমাদের কাউকে সঙ্গে আসতে হবে না।

সেনাপতি। বলেন কী মহারাজ ?

বিজয়াদিত্য। আমি একলা যাব।

সেনাপতি। সে কী কথা ?

বিজয়াদিত্য। সে তোমরা বুঝবে না। কবি কোথায় ?

মন্ত্রী। তাঁকে আমরা পাঠিয়ে দিচ্ছি। [উভয়ের প্রস্থান

শেখরের প্রবেশ

বিজয়াদিত্য। কবি।

শেখর। কী মহারাজ।

বিজয়াদিত্য। আমার পিতার সিংহাসনে এক বছর মাত্র আমি বসেছি—কিন্তু মনে হচ্ছে আমাদের বংশে যতদিন যত রাজা হয়েছে সকলের বয়স একত্র হয়ে আমার ঘাড়ে চেপে বসেছে। রাজাকে নবীন করবার কী উপায় আমাকে বলে দাও তো।

শেখর। সিংহাসন থেকে একবার মাটিতে পা ফেলেন দিকি। ওই মাটির মধ্যে জীবন-যৌবনের জাদুমন্ত্র রয়েছে।

বিজয়াদিত্য। আমার সিংহাসনের খাঁচার দরজা আমি চিরদিনের মতো খুলে রাখতে চাই—যাতে মাটির সঙ্গে আমার সহজ আনাগোনা চলে।

শেখর। যাতে শিউলির মালার সঙ্গে আপনার মুক্তোর মালার অদল-বদল হয়। তাহলে এই শরৎকালে আপনার ওই রাজবেশটা একবার খোলেন—আপন বলে চিনতে কারও ভুল হবে না।

বিজয়াদিত্য। আছে আমার সন্ন্যাসীর বেশ—ধুলোর সঙ্গে তার সুর মেলে। কবি তোমাকেও কিন্তু আমার সঙ্গে যেতে হবে।

শেখর। না মহারাজ, আমাকে যদি সঙ্গে নেন তাহলে আপনার 'পরে মন্ত্রী আর সেনাপতির বিষম অশ্রদ্ধা হবে, আর আমার 'পরে হবে রাগ।

বিজয়াদিত্য। ঠিক বটে। মন্ত্রীর মনে এই বড়ো ক্ষোভ যে, রাজত্ব পাবার যে পিতৃঋণ, সে শোধ করবার জন্যে আমার মন নেই।

শেখর। আমার মস্ত দোষ এই যে, আমি কেবল স্মরণ করাই, এই যে বিশ্ব আমাদের চিত্তে অমৃত ঢেলে দিচ্ছে তার ঋণ আমাদের শোধ করতে হবে।

বিজয়াদিত্য। অমৃতের বদলে অমৃত দিয়ে তবে তো সেই ঋণ শোধ করতে হয়। তোমার হাতে সেই শক্তি আছে। তোমার কবিতার ভিতর দিয়ে তুমি বিশ্বকে অমৃত ফিরিয়ে দিচ্ছ। কিন্তু আমার কী ক্ষমতা আছে বলো। আমি তো কেবলমাত্র রাজত্ব করি।

শেখর। প্রেমও যে অমৃত, মহারাজ। আজ সকালের সোনার আলোয় পাতায় পাতায় শিশির যখন বীণার ঝংকারের মতো ঝলমল করে উঠল তখন সেই সুরের জবাবটি ভালোবাসার আনন্দ ছাড়া আর কিছুতে নেই। আমার কথা যদি বলেন সেই আনন্দ আজ আমার চিত্তে অসীম বিরহ-বেদনায় উপচে পড়ছে—

গান

আজি শরত তপনে প্রভাত স্বপনে
কী জানি পরান কী যে চায়—
ওই শেফালির শাখে কী বলিয়া ডাকে
বিহগ বিহগী কী যে গায়।

বিজয়াদিত্য। তুমি আমাকে ঘরে টিঁকতে দিলে না দেখছি। চললেম আমি অমৃতের ঋণ শোধ করতে।

শেখর। গান

আজ মধুর বাতাসে হৃদয় উদাসে
রহে না আবাসে মন হায়!
কোন্ কুসুমের আশে কোন্ ফুলবাসে
সুনীল আকাশে মন ধায়।

বিজয়াদিত্য। কবি, ভালোবাসা তো দেব, কিন্তু কোথায় দেব?

শেখর। মহারাজ, যেদিন সময় আসে, যেদিন ডাক পড়ে, সেদিন বাজে-খরচের

দিন, একেবারে ঢেলে দিতে হয়, পথে পথে বনে বনে। আজ সেই দিন এসেছে— আমার মন দিশেহারা হয়েছে।

গান

আমি যদি রচি গান অথির পরান
সে গান শোনাব কারে আর।
আমি যদি গাঁথি মালা লয়ে ফুলডালা
কাহারে পরাব ফুলহার।
আমি আমার এ প্রাণ যদি করি দান
দিব প্রাণ তবে কার পায়?
সদা ভয় হয় মনে, পাছে অযতনে
মনে মনে কেহ ব্যথা পায়!

বিজয়াদিত্য। বুঝেছি, কবি, আজ আর কথা নেই, আজ অমৃতের ঋণ শোধ করতে বেরোব। তুমি একবার মন্ত্রীকে ডেকে দাও। [শেখরের প্রস্থান

মন্ত্রীর প্রবেশ

বিজয়াদিত্য। মন্ত্রী, আমি আজই বাহির হব।

মন্ত্রী। তার আয়োজন—

বিজয়াদিত্য। বিনা আয়োজনে।

মন্ত্রী। মহারাজ, কী এমন বিশেষ কর্তব্য আছে যে—

বিজয়াদিত্য। আছে কর্তব্য। আমি সেই বীনকারকে ডাকতে যাব।

মন্ত্রী। বীনকার? সেই সুরসেন? আমি এখনই লোক পাঠিয়ে দিচ্ছি।

বিজয়াদিত্য। না না, রাজার ডাকে বীণার ঠিক সুরটি বাজে না। আমি তার দরজার বাইরে মাটিতে বসে শুনব, তারপরে যদি ডাক পড়ে তবে ঘরের ভিতরে গিয়ে বসে শুনব।

মন্ত্রী। মহারাজ, এ কী কথা বলছেন?

বিজয়াদিত্য। সিংহাসনে সুর পৌঁছোয় না। শ্রোতার আসন থেকে আমাকে চিরদিন বঞ্চিত করতে পারবে না। আমি মাটিতে বসব মেঠো ফুলের সঙ্গে এক পংক্তিতে। কবিকে ডেকে দাও তো মন্ত্রী।

মন্ত্রী। দিচ্ছি এখনই দিচ্ছি। [মন্ত্রীর প্রস্থান

শেখরের প্রবেশ

বিজয়াদিত্য। কবি, আমার বেরোবার সময় হল। যাবার আগে সেই মেঠো ফুলের গানটা শুনিয়ে দাও।

শেখর। গান

যখন সারা নিশি ছিলেম শুয়ে
বিজন ভুঁয়ে
মেঠো ফুলের পাশাপাশি ;
তখন শুনেছিলেম তারার বাঁশি।
যখন সকাল বেলা খুঁজে দেখি
স্বপ্নে শোনা সে সুর এ কি
আমার মেঠো ফুলের চোখের জলে উঠে ভাসি।
এ সুর আমি খুঁজেছিলেম রাজার ঘরে
শেষে ধরা দিল ধরার ধূলির 'পরে।
এ যে ঘাসের কোলে আলোর ভাষা
আকাশ থেকে ভেসে-আসা,
এ যে মাটির কোলে মানিক-খসা হাসিরাশি।

মন্ত্রীর প্রবেশ

মন্ত্রী। মহারাজ, বেতসিনীতীরে পিঙ্গরীতে বীনকার সুরসেনের বাস। যখন আপনি সেখানে যাওয়াই স্থির করেছেন তখন সেই সঙ্গে একটা রাজকার্যও সম্পন্ন করতে পারেন।

বিজয়াদিত্য। সেখানে রাজকার্য আছে না কি ?

মন্ত্রী। হাঁ মহারাজ। পিঙ্গরীর রাজা সোমপাল প্রকাশ্য সভায় সর্বদাই মহারাজের নামে স্পর্ধাবাক্য ব্যবহার করে থাকেন। তাঁকে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন।

বিজয়াদিত্য। বড় কৌতূহল হচ্ছে, মন্ত্রী। স্তুতিবাক্য অনেক শুনেছি, কিন্তু কোনোদিন নিজের কানে স্পর্ধাবাক্য শুনি নি।

মন্ত্রী। ভগবানের কৃপায় কোনোদিন যেন না শুনতে হয়।

বিজয়াদিত্য। রাজা হবার ওই তো বিড়ম্বনা। পরিহাস করে তোমরা আমাদের

বল পৃথিবীপতি কিন্তু পৃথিবীকে সিংহাসনের মাপে ছোটো করে তোমরা আমাদের খেলনা বানিয়ে দিয়েছ—সব দেখা দেখতে পাই নে, সব শোনা শোনবার জো নেই।

মন্ত্রী। যাদের সব দেখাই দেখতে হয়, সব শোনাই শুনতে হয় তারাই তো হতভাগ্য।

বিজয়াদিত্য। সেই হতভাগ্যদের দশাই আমি পরীক্ষা করে দেখব। সোমপালের স্পর্ধাবাক্য আমি নিজের কানে শুনব।

মন্ত্রী। তাহলে শেখরই মহারাজের সঙ্গে যাবেন, আর কেউ না?

শেখর। না মন্ত্রী, এ-যাত্রায় আমার প্রয়োজন নেই। জানলার দরকার হয় যেখানে প্রাচীর আছে—যেখানে খোলা আকাশ সেখানে জানলায় কী হবে?—রাজসভায় কবিকে না হলে চলে না।

মন্ত্রী। তোমার কথা বুঝলেম না। [প্রস্থান

শেখর। মহারাজ, চার দিকের ভ্রূভঙ্গি দেখে বুঝতে পারছি আপনি চলে গেলে কবির পক্ষে এখানে অরাজক হবে। আমিও আপনারই পথ ধরলেম।

বিজয়াদিত্য। ভালো হল কবি, আজ শরতের নিমন্ত্রণ রাখতে চলেছি—তুমি সঙ্গে না থাকলে তার প্রতিসম্ভাষণের বাণী পেতেম কোথায়?

ঋণশোধ

বেতসিনী নদীর তীর

বালকগণ

গান

মেঘের কোলে রোদ হেসেছে
বাদল গেছে টুটি,
আজ আমাদের ছুটি, ও ভাই,
আজ আমাদের ছুটি।
কী করি আজ ভেবে না পাই,
পথ হারিয়ে কোন্ বনে যাই,
কোন্ মাঠে যে ছুটে বেড়াই,
সকল ছেলে জুটি।
কেয়া পাতায় নৌকো গড়ে
সাজিয়ে দেব ফুলে,
তাল দিঘিতে ভাসিয়ে দেব,
চলবে দুলে দুলে।
রাখাল ছেলের সঙ্গে ধেনু
চরাব আজ বাজিয়ে বেণু,
মাখব গায়ে ফুলের রেণু
চাঁপার বনে লুটি।
আজ আমাদের ছুটি, ও ভাই,
আজ আমাদের ছুটি।

লক্ষেশ্বর। (ঘর হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া) ছেলেগুলো তো জ্বালালে। ওরে চোবে। ওরে গিরধারিলাল। ধর্ তো ছোঁড়াগুলোকে ধর্ তো।

ছেলেরা। (দূরে ছুটিয়া গিয়া হাততালি দিয়া) ওরে লক্ষ্মীপেঁচা বেরিয়েছে রে, লক্ষ্মীপেঁচা বেরিয়েছে।

লক্ষেশ্বর। হনুমন্ত সিং, ওদের কান পাকড়ে আন্ তো; একটাকেও ছাড়িস নে।

ঠাকুরদাদার প্রবেশ

ঠাকুরদাদা। কী হয়েছে লখাদাদা। মার-মূর্তি কেন?

লক্ষেশ্বর। আরে দেখো না! সকাল বেলা কানের কাছে চেঁচাতে আরম্ভ করেছে।

ঠাকুরদাদা। আজ যে শরতে ওদের ছুটি, একটু আমোদ করবে না? গান গাইলেও তোমার কানে খোঁচা মারে! হায় রে হায়, ভগবান তোমাকে এত শাস্তিও দিচ্ছেন!

লক্ষেশ্বর। গান গাবার বুঝি সময় নেই! আমার হিসাব লিখতে ভুল হয়ে যায় যে। আজ আমার সমস্ত দিনটাই মাটি করলে!

ঠাকুরদাদা। তা ঠিক! হিসেব ভুলিয়ে দেবার ওস্তাদ ওরা। ওদের সাড়া পেলে আমার বয়সের হিসাবে প্রায় পঞ্চাশ পঞ্চান্ন বছরের গরমিল হয়ে যায়। ওরে বাঁদরগুলো আয় তো রে! চল তোদের পঞ্চাননতলার মাঠটা ঘুরিয়ে আনি। যাও দাদা, তোমার দপ্তর নিয়ে বসো গে! আর হিসেবে ভুল হবে না। [লক্ষেশ্বরের প্রস্থান

ঠাকুরদাদাকে ঘিরিয়া ছেলেদের নৃত্য

প্রথম। হাঁ ঠাকুরদা চলো।

দ্বিতীয়। আমাদের আজ গল্প বলতে হবে।

তৃতীয়। না গল্প না, বটতলায় বসে আজ ঠাকুরদার পাঁচালি হবে।

চতুর্থ। বটতলায় না, ঠাকুরদা আজ পারুলডাঙায় চলো।

ঠাকুরদাদা। চুপ, চুপ, চুপ। অমন গোলমাল লাগাস যদি তো লখাদাদা আবার ছুটে আসবে।

লক্ষেশ্বরের পুনঃপ্রবেশ

লক্ষেশ্বর। কোন্ পোড়ারমুখো আমার কলম নিয়েছে রে।

[ছেলেদের লইয়া ঠাকুরদাদার প্রস্থান

উপনন্দের প্রবেশ

লক্ষেশ্বর। কী রে তোর প্রভু কিছু টাকা পাঠিয়ে দিলে? অনেক পাওনা বাকি।

উপনন্দ। কাল রাত্রে আমার প্রভুর মৃত্যু হয়েছে।

লক্ষেশ্বর। মৃত্যু! মৃত্যু হলে চলবে কেন। আমার টাকাগুলোর কী হবে?

উপনন্দ। তাঁর তো কিছুই নেই। যে বীণা বাজিয়ে উপার্জন করে তোমার ঋণ শোধ করতেন সেই বীণাটি আছে মাত্র।

লক্ষেশ্বর। বীণাটি আছে মাত্র। কী শুভ সংবাদটাই দিলে।

উপনন্দ। আমি শুভ সংবাদ দিতে আসি নি! আমি একদিন পথের ভিক্ষুক ছিলেম, তিনিই আমাকে আশ্রয় দিয়ে তাঁর বহুদুঃখের অন্নের ভাগে আমাকে মানুষ করেছেন। তোমার কাছে দাসত্ব করে আমি সেই মহাত্মার ঋণ শোধ করব।

লক্ষেশ্বর। বটে! তাই বুঝি তাঁর অভাবে আমার বহুদুঃখের অন্নে ভাগ বসাবার মতলব করেছ। আমি তত বড়ো গর্দভ নই। আচ্ছা, তুই কী করতে পারিস বল দেখি!

উপনন্দ। আমি চিত্রবিচিত্র করে পুঁথি নকল করতে পারি। তোমার অন্ন আমি চাই নে। আমি নিজে উপার্জন করে যা পারি খাব—তোমার ঋণও শোধ করব।

লক্ষেশ্বর। আমাদের বীনকারটিও যেমন নির্বোধ ছিল ছেলেটাকেও দেখছি ঠিক তেমনি করেই বানিয়ে গেছে। হতভাগা ছোঁড়াটা পরের দায় ঘাড়ে নিয়েই মরবে। এক-একজনের ওই-রকম মরাই স্বভাব।—আচ্ছা বেশ, মাসের ঠিক তিন তারিখের মধ্যেই নিয়মমতো টাকা দিতে হবে। নইলে—

উপনন্দ। নইলে আবার কী! আমাকে ভয় দেখাচ্ছ মিছে। আমার কী আছে যে তুমি আমার কিছু করবে। আমি আমার প্রভুকে স্মরণ করে ইচ্ছা করেই তোমার কাছে বন্ধন স্বীকার করেছি। আমাকে ভয় দেখিয়ো না বলছি।

লক্ষেশ্বর। না না, ভয় দেখাব না। তুমি লক্ষ্মীছেলে, সোনার চাঁদ ছেলে। টাকাটা ঠিক মতো দিয়ো বাবা। নইলে আমার ঘরে দেবতা আছে তার ভোগ কমিয়ে দিতে হবে—সেটাতে তোমারই পাপ হবে। [উপনন্দের প্রস্থান

ওই যে, আমার ছেলেটা এইখানে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে! আমি কোন্‌খানে টাকা পুঁতে রাখি ও নিশ্চয় সেই খোঁজে ফেরে। ওদেরই ভয়েই তো আমাকে এক সুরঙ্গ হতে আর এক সুরঙ্গে টাকা বদল করে বেড়াতে হয়। ধনপতি, এখানে কেন রে! তোর মতলবটা কী বল্ দেখি!

ধনপতি। ছেলেরা আজ সকলেই এই বেতসিনীর ধারে আমোদ করবে বলে আসছে,—আমাকে ছুটি দিলে আমিও তাদের সঙ্গে খেলি।

লক্ষেশ্বর। বেতসিনীর ধারে! ওই রে খবর পেয়েছে বুঝি। বেতসিনীর ধারেই তো আমি সেই গজমোতির কৌটো পুঁতে রেখেছি। (ধনপতির প্রতি) না না, খবরদার বলছি, সে-সব না। চল্ শীঘ্র চল্, নামতা মুখস্থ করতে হবে।

ধনপতি। (নিশ্বাস ফেলিয়া) আজ এমন সুন্দর দিনটা।

লক্ষেশ্বর। দিন আবার সুন্দর কী রে। এই রকম বুদ্ধি মাথায় ঢুকলেই ছোঁড়াটা মরবে আর কি। যা বলছি ঘরে যা। (ধনপতির প্রস্থান) ভারি বিশ্রী দিন। আশ্বিনের এই রোদ্দুর দেখলে আমার সুদ্ধ মাথা খারাপ করে দেয়, কিছুতে কাজে মন দিতে পারি নে। মনে করছি মলয়দ্বীপে গিয়ে কিছু চন্দন জোগাড় করবার জন্যে বেরিয়ে পড়লে হয়।

শেখর কবির প্রবেশ

এ লোকটা আবার এখানে কে আসে? কে হে তুমি? এখানে তুমি কী করতে ঘুরে বেড়াচ্ছ?

শেখর। আমি সন্ধান করতে বেরিয়েছি।

লক্ষেশ্বর। ভাব দেখে তাই বুঝেছি। কিন্তু কিসের সন্ধানে বলো দেখি?

শেখর। সেইটে এখনও ঠিক করতে পারি নি।

লক্ষেশ্বর। বয়স তো কম নয়, তবু এখনও ঠিক হয় নি? তবে কী উপায়ে ঠিক হবে?

শেখর। ঠিক জিনিসে যেমনি চোখ পড়বে।

লক্ষেশ্বর। ঠিক জিনিস কি এই রকম মাঠে-ঘাটে ছড়ানো থাকে।

শেখর। তাইতো শুনেছি। ঘরের মধ্যে সন্ধান করে তো পেলেম না।

লক্ষেশ্বর। লোকটা বলে কী? তুমি ঘরে বাইরে সন্ধান করবার ব্যবসা ধরেছ—রাজা খবর পেলে যে তোমাকে আর ঘরের বার হতে দেবে না। পাহারা বসিয়ে দেবে।

শেখর। আমি রাজাকে সুদ্ধ এই ব্যবসা ধরাব—যা মাঠে-ঘাটে ছড়ানো আছে তাই সংগ্রহ করবার বিদ্যে তাঁকে শেখাতে চাই।

লক্ষেশ্বর। কথাটা আর একটু স্পষ্ট করে বলো তো।

শেখর। তাহলে একেবারেই বুঝতে পারবে না।

লক্ষেশ্বর। ওহে বাপু, তোমার ওই সন্ধানের কাজটা ঠিক আমার এই ঘরের কাছটাতে না হয়ে কিছু তফাতে হলে আমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারি।

শেখর। আমাকে দেখে তোমার ভয় হচ্ছে কেন বলো তো।

লক্ষেশ্বর। সত্যি কথা বলব? তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তুমি রাজার চর। কোথা থেকে কি আদায় করা যেতে পারে রাজাকে সেই সন্ধান দেওয়াই তোমার মতলব।

শেখর। আদায় করবার জায়গা তো আমি খুঁজি বটে। তোমার বুদ্ধি আছে হে।

লক্ষেশ্বর। আছে বই কি। সেইজন্যেই হাত জোড় করে বলছি আমার ঘরটার দিকে উঁকি দিয়ো না—আমি তোমাকে খুশি করে দেব।

শেখর। তোমার চেহারা দেখেই বুঝেছি সন্ধান করবার মতো ঘর তোমার নয়।

লক্ষেশ্বর। আশ্চর্য তোমার বুদ্ধি বটে। এ নইলে রাজকর্মচারী হবে কোন্ গুণে? রাজা বেছে বেছে লোক রাখে বটে। অকিঞ্চনের মুখ দেখলেই চিনতে পার?

শেখর। তা পারি। অতএব তোমার ঘরে আমার আনাগোনা চলবে না।

লক্ষেশ্বর। তোমার উপরে ভক্তি হচ্ছে। তাহলে আর বিলম্ব ক'রো না—এইখান থেকে একটুখানি—

শেখর। আমি তফাতেই যাচ্ছি—তফাতে যাব বলেই বেরিয়েছি। [প্রস্থান

লক্ষেশ্বর। "তফাতে যাব বলেই বেরিয়েছি"! লোকটা যখন কথা কয় সব ঝাপসা ঠেকে। রাজারা স্পষ্ট কথা সহ্য করতে পারে না, তাই বোধ হয় দায়ে পড়ে এই রকম অভ্যাস করেছে। [প্রস্থান

পুঁথি প্রভৃতি লইয়া উপনন্দের প্রবেশ ও একটি কোণে লিখিতে বসা

ঠাকুরদাদা ও বালকগণের প্রবেশ

গান

আজ ধানের খেতে রৌদ্রছায়ায়
লুকোচুরি খেলা।
নীল আকাশে কে ভাসালে
সাদা মেঘের ভেলা।

একজন বালক। ঠাকুরদা, তুমি আমাদের দলে।

দ্বিতীয় বালক। না ঠাকুরদা, সে হবে না, তুমি আমাদের দলে।

ঠাকুরদাদা। না ভাই, আমি ভাগাভাগির খেলায় নেই; সে সব হয়ে বয়ে গেছে। আমি সকল দলের মাঝখানে থাকব, কাউকে বাদ দিতে পারব না। এবার গানটা ধর্।

গান

আজ ভ্রমর ভোলে মধু খেতে
উড়ে বেড়ায় আলোয় মেতে,

আজ কিসের তরে নদীর চরে
চখাচখীর মেলা।

অন্য দল আসিয়া। ঠাকুরদা, এই বুঝি! আমাদের তুমি ডেকে আনলে না কেন। তোমার সঙ্গে আড়ি। জন্মের মতো আড়ি।

ঠাকুরদাদা। এত বড়ো দণ্ড। নিজেরা দোষ করে আমাকে শাস্তি! আমি তোদের ডেকে বের করব, না তোরা আমাকে ডেকে বাইরে টেনে আনবি। না ভাই, আজ ঝগড়া না, গান ধর।

গান

ওরে যাব না, আজ ঘরে রে ভাই
যাব না আজ ঘরে।
ওরে আকাশ ভেঙে বাহিরকে আজ
নেব রে লুঠ করে।
যেন জোয়ার জলে ফেনার রাশি
বাতাসে আজ ছুটছে হাসি,
আজ বিনা কাজে বাজিয়ে বাঁশি
কাটবে সকল বেলা।

প্রথম বালক। ঠাকুরদা, ওই দেখো কে আসছে, ওকে ত কখনো দেখি নি।

ঠাকুরদাদা। পাগড়ি দেখে মনে হচ্ছে লোকটা পরদেশী।

প্রথম বালক। পরদেশী! ভারি মজা।

দ্বিতীয় বালক। আমি পরদেশী হব ঠাকুরদা।

তৃতীয় বালক। আমিও হব পরদেশী—কী মজা।

সকলে। আমরা সবাই পরদেশী হব।

প্রথম বালক। আমাদের ওই রকম পাগড়ি বানিয়ে দাও ঠাকুরদা, তোমার পায়ে পড়ি।

শেখরের প্রবেশ

প্রথম বালক। তুমি পরদেশী?

শেখর। ঠিক বলেছ।

দ্বিতীয় বালক। তুমি কী কর?

শেখর। আমি সব জায়গাই দেশ খুঁজে বেড়াই।

তৃতীয় বালক। তার মানে কী, পরদেশী?

শেখর। দেখো না, শরৎকালে রাজারা দেশ জয় করতে বেরোয়—তার আসল কারণ পৃথিবীর অধীশ্বর হলেও এখনও তারা দেশ খুঁজে পায় নি, কোনো কালে পাবেও না।

প্রথম বালক। কেন পাবে না?

শেখর। তারা নির্বোধ, মনে করে লড়াই করে দেশ পাওয়া যায়। বিনা লড়াইয়ে যারা জয় করতে জানে তারাই আপন দেশ খুঁজে পায়।

দ্বিতীয় বালক। তুমি খুঁজে পেয়েছ?

শেখর। বড়ো শক্ত। কেননা, মানুষে লুকিয়ে রাখে। ওই বাড়িটার কাছে সন্ধানে গিয়েছিলেম একটা মানুষ ছুটে এসে বললে, এ তোমার জায়গা নয়, এ আমার।

সকলে। ও বুঝেছি। লক্ষ্মীপেঁচা।

প্রথম বালক। তার কোটরের কাছে গেলেই সে ঠোকর দিতে আসে।

দ্বিতীয় বালক। কিন্তু পরদেশী, আমাদের কাছে তোমার কোনো ভয় নেই।

শেখর। বাবা, তাহলে তোমাদের মধ্যেই আমার দেশ খুঁজে পাব।

গান

আমারে ডাক দিল কে ভিতর পানে—
ওরা যে ডাকতে জানে।
আশ্বিনে ওই শিউলি শাখে
মৌমাছিরে যেমন ডাকে
প্রভাতে সৌরভের গানে।
ঘর-ছাড়া আজ ঘর পেল যে,
আপন মনে রইল মজে।
হাওয়ায় হাওয়ায় কেমন করে
খবর যে তার পৌঁছোল রে,
ঘরছাড়া ওই মেঘের কানে।

ঠাকুরদাদা। ও ভাই, আমার জায়গা তোমাকে ছেড়ে দিলেম।

শেখর। ছাড়তে হবে কেন? দুজনেরই জায়গা আছে।

ঠাকুরদাদা। তোমাকে চিনে নিয়েছি। তুমি মন ভোলাতে জান।

শেখর। আমার নিজের মন ভুলেছে বলেই আমি মন ভুলিয়ে বেড়াই।

প্রথম বালক। তার মানে কী পরদেশী? কেমন করে মন ভোলে?

শেখর। গান

কেন যে মন ভোলে আমার মন জানে না।
তারে মানা করে কে, আমার মন মানে না।
কেউ বোঝে না তারে,
সে যে বোঝে না আপনারে,
সবাই লজ্জা দিয়ে যায়, সে তো কানে আনে না।
তার খেয়া গেল পারে
সে যে রইল নদীর ধারে।
কাজ করে সব সারা
(ঐ) এগিয়ে গেল কারা
আনমনা-মন সেদিকপানে দৃষ্টি হানে না।

ঠাকুরদাদা। তোমাকে ছাড়ছি নে ভাই, নিজের মনের কথা তোমার মুখ থেকে শুনে নেব।

ছেলেরা। আমরা তোমাকে ছাড়ব না।

শেখর। তোমরা ছাড়লে আমিই বুঝি তোমাদের ছাড়ব মনে করছ? একবার চারদিকটা ঘুরে আসছি—কোথায় এলুম একবার বুঝে নিই। [প্রস্থান

প্রথম বালক। ঠাকুরদা, ওই দেখো, ওই দেখো সন্ন্যাসী আসছে।

দ্বিতীয় বালক। বেশ হয়েছে, বেশ হয়েছে, আমরা সন্ন্যাসীকে নিয়ে খেলব। আমরা সব চেলা সাজব।

তৃতীয় বালক। আমরা ওঁর সঙ্গে বেরিয়ে যাব, কোন্ দেশে চলে যাব কেউ খুঁজেও পাবে না।

ঠাকুরদাদা। আরে চুপ, চুপ।

সকলে। সন্ন্যাসী ঠাকুর, সন্ন্যাসী ঠাকুর।

ঠাকুরদাদা। আরে থাম্ থাম্। ঠাকুর রাগ করবে।

সন্ন্যাসীর প্রবেশ

বালকগণ। সন্ন্যাসী ঠাকুর, তুমি কি আমাদের উপর রাগ করবে? আজ আমরা সব তোমার চেলা হব।

সন্ন্যাসী। হা হা হা হা। এ তো খুব ভালো কথা। তার পরে আবার তোমরা সব শিশু-সন্ন্যাসী সেজো, আমি তোমাদের বুড়ো চেলা সাজব। এ বেশ খেলা, এ চমৎকার খেলা।

ঠাকুরদাদা। প্রণাম হই। আপনি কে ?

সন্ন্যাসী। আমি ছাত্র।

ঠাকুরদাদা। আপনি ছাত্র !

সন্ন্যাসী। হাঁ, পুঁথিপত্র সব পোড়াবার জন্যে বের হয়েছি।

ঠাকুরদাদা। ও ঠাকুর বুঝেছি। বিদ্যের বোঝা সমস্ত ঝেড়ে ফেলে দিব্যি একেবারে হালকা হয়ে সমুদ্রে পাড়ি দেবেন।

সন্ন্যাসী। চোখের পাতার উপরে পুঁথির পাতাগুলো আড়াল করে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে—সেইগুলো খসিয়ে ফেলতে চাই।

ঠাকুরদাদা। বেশ, বেশ, আমাকেও একটু পায়ের ধুলো দেবেন। প্রভু, আপনার নাম বোধ করি শুনেছি—আপনি তো স্বামী অপূর্বানন্দ।

ছেলেরা। সন্ন্যাসী ঠাকুর, ঠাকুরদা কী মিথ্যে বকছেন। এমনি করে আমাদের ছুটি বয়ে যাবে।

সন্ন্যাসী। ঠিক বলেছ, বৎস, আমারও ছুটি ফুরিয়ে আসছে।

ছেলেরা। তোমার কতদিনের ছুটি ?

সন্ন্যাসী। খুব অল্পদিনের। আমার গুরুমশায় তাড়া করে বেরিয়েছেন, তিনি বেশি দূরে নেই, এলেন বলে।

ছেলেরা। ও বাবা, তোমারও গুরুমশায় !

প্রথম বালক। সন্ন্যাসী ঠাকুর, চলো আমাদের যেখানে হয় নিয়ে চলো। তোমার যেখানে খুশি।

ঠাকুরদাদা। আমিও পিছনে আছি, ঠাকুর আমাকেও ভুলো না।

সন্ন্যাসী। আহা, ও ছেলেটি কে ? গাছের তলায় এমন দিনে পুঁথির মধ্যে ডুবে রয়েছে।

বালকগণ। উপনন্দ।

প্রথম বালক। ভাই উপনন্দ, এস ভাই। আমরা আজ সন্ন্যাসী ঠাকুরের চেলা সেজেছি, তুমিও চলো আমাদের সঙ্গে। তুমি হবে সর্দার চেলা।

উপনন্দ। না ভাই, আমার কাজ আছে।

ছেলেরা। কিচ্ছু কাজ নেই, তুমি এস।

উপনন্দ। আমার পুঁথি নকল করতে অনেকখানি বাকি আছে।

ছেলেরা। সে বুঝি কাজ! ভারি তো কাজ। ঠাকুর, তুমি ওকে বলো না। ও আমাদের কথা শুনবে না। কিন্তু উপনন্দকে না হলে মজা হবে না।

সন্ন্যাসী। (পাশে বসিয়া) বাছা, তুমি কী কাজ করছ। আজ তো কাজের দিন না।

উপনন্দ। (সন্ন্যাসীর মুখের দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া, পায়ের ধুলা লইয়া) আজ ছুটির দিন—কিন্তু আমার ঋণ আছে, শোধ করতে হবে, তাই আজ কাজ করছি।

ঠাকুরদাদা। উপনন্দ, জগতে তোমার আবার ঋণ কিসের ভাই?

উপনন্দ। ঠাকুরদা, আমার প্রভু মারা গিয়েছেন; তিনি লক্ষেশ্বরের কাছে ঋণী; সেই ঋণ আমি পুঁথি লিখে শোধ দেব।

ঠাকুরদাদা। হায় হায়, তোমার মতো কাঁচা বয়সের ছেলেকেও ঋণ শোধ করতে হয়। আর এমন দিনেও ঋণশোধ। ঠাকুর, আজ নতুন উত্তরে হাওয়ায় ওপারে কাশের বনে ঢেউ দিয়েছে, এপারে ধানের খেতের সবুজে চোখ একেবারে ডুবিয়ে দিলে, শিউলি বন থেকে আকাশে আজ পুজোর গন্ধ ভরে উঠেছে, এরই মাঝখানে ওই ছেলেটি আজ ঋণশোধের আয়োজনে বসে গেছে এও কি চক্ষে দেখা যায়?

সন্ন্যাসী। বল কী, এর চেয়ে সুন্দর কি আর কিছু আছে। ওই ছেলেটিই তো আজ সারদার বরপুত্র হয়ে তাঁর কোল উজ্জ্বল করে বসেছে। তিনি তাঁর আকাশের সমস্ত সোনার আলো দিয়ে ওকে বুকে চেপে ধরেছেন। আহা, আজ এই বালকের ঋণশোধের মত এমন শুভ্র ফুলটি কি কোথাও ফুটেছে, চেয়ে দেখো তো। লেখো, লেখো, বাবা, তুমি লেখো, আমি দেখি। তুমি পঙ্‌ক্তির পর পঙ্‌ক্তি লিখছ, আর ছুটির পর ছুটি পাচ্ছ,—তোমার এত ছুটির আয়োজন আমরা তো পণ্ড করতে পারব না। দাও বাবা, একটা পুঁথি আমাকে দাও, আমিও লিখি। এমন দিনটা সার্থক হ'ক।

ঠাকুরদাদা। আছে আছে চশমাটা ট্যাঁকে আছে, আমিও বসে যাই না।

প্রথম বালক। ঠাকুর, আমরাও লিখব। সে বেশ মজা হবে।

দ্বিতীয় বালক। হাঁ হাঁ, সে বেশ মজা হবে।

উপনন্দ। বল কী ঠাকুর, তোমাদের যে ভারি কষ্ট হবে।

সন্ন্যাসী। সেইজন্যেই বসে গেছি। আজ আমরা সব মজা করে কষ্ট করব। কী বল, বাবাসকল। আজ একটা কিছু কষ্ট না করলে আনন্দ হচ্ছে না।

সকলে। (হাততালি দিয়া) হাঁ, হাঁ, নইলে মজা কিসের।

প্রথম বালক। দাও, দাও, আমাকে একটা পুঁথি দাও।

দ্বিতীয় বালক। আমাকেও একটা দাও না।

উপনন্দ। তোমরা পারবে তো ভাই?

প্রথম বালক। খুব পারব। কেন পারব না।

উপনন্দ। শ্রান্ত হবে না তো?

দ্বিতীয় বালক। কক্‌খনো না।

উপনন্দ। খুব ধরে ধরে লিখতে হবে কিন্তু।

প্রথম বালক। তা বুঝি পারি নে। আচ্ছা তুমি দেখো।

উপনন্দ। ভুল থাকলে চলবে না।

দ্বিতীয় বালক। কিচ্ছু ভুল থাকবে না।

প্রথম বালক। এ বেশ মজা হচ্ছে। পুঁথি শেষ করব তবে ছাড়ব।

দ্বিতীয় বালক। নইলে ওঠা হবে না।

তৃতীয় বালক। কী বল ঠাকুরদা, আজ লেখা শেষ করে দিয়ে তবে উপনন্দকে নিয়ে নৌকো বাচ করতে যাব। বেশ মজা।

ছেলেরা। এই যে পরদেশী, আমাদের পরদেশী।

শেখরের প্রবেশ

সন্ন্যাসী। এ কী। তুমি পরদেশী না কি?

শেখর। পর-দেশী আমার সাজমাত্র, আসলে আমি সব-দেশী।

সন্ন্যাসী। সাজের দরকার কী ছিল?

শেখর। রাজাকে সাজতে হয় সন্ন্যাসী, রাজা যে কী জিনিস সেই বোঝবার জন্যে। যে-মানুষ সব দেশেই দেশকে খুঁজতে চায় তাকে পরদেশী সাজতে হয়। এই আমাদের ঠাকুরদা বুড়ো হয়ে বসে আছেন ওটাও ওঁর সাজমাত্র—উনি যে বালক সেটা উনি বার্ধক্যের ভিতর দিয়ে খুব ভালো করে চিনে নিচ্ছেন।

ঠাকুরদাদা। ভাই, এ খবর তুমি পেলে কোথা থেকে?

শেখর। সাজের ভিতর থেকে মানুষকে খুঁজে বের করা, সেই তো আমার কাজ। ঠাকুরদা, আমি আগে থাকতে তোমাকে বলে রাখছি এই যে মানুষটিকে দেখছ উনি বড় যে-সে লোক নন—একদিন হয়তো চিনতে পারবে।

ঠাকুরদাদা। সে আমি কিছু কিছু চিনেছি—নিজের বুদ্ধির গুণে নয় ওঁরই দীপ্তির গুণে।

সন্ন্যাসী। আর এই পরদেশীকে কী রকম ঠেকছে ঠাকুরদা।

ঠাকুরদাদা। সে আর কী বলব, যেন একেবারে চিরদিনের চেনা।

সন্ন্যাসী। ঠিক বলেছ, আমার পক্ষেও তাই। কিন্তু আবার ক্ষণে ক্ষণে মনে হয় যেন ওঁকে চেনবার জো নেই। উনি যে কিসের খোঁজে কখন কোথায় ফেরেন তা বোঝা শক্ত।

গান

শেখর। আমি তারেই খুঁজে বেড়াই যে রয় মনে, আমার মনে।
ও সে আছে বলে
আকাশ জুড়ে ফোটে তারা রাতে, প্রাতে ফুল ফুটে রয় বনে।
সে আছে বলে চোখের তারার আলোয়
এত রূপের খেলা রঙের মেলা অসীম সাদায় কালোয়,
ও সে সঙ্গে থাকে বলে
আমার অঙ্গে অঙ্গে পুলক লাগায় দখিন সমীরণে।
তারি বাণী হঠাৎ উঠে পুরে
আনমনা কোন্ তানের মাঝে আমার গানের সুরে।
দুখের দোলে হঠাৎ মোরে দোলায়
কাজের মাঝে লুকিয়ে থেকে
আমারে কাজ ভোলায়।
সে মোর চিরদিনের বলে
তারি পুলকে মোর পলকগুলি ভরে ক্ষণে ক্ষণে।

প্রথম বালক। কিন্তু আর লিখতে ভালো লাগছে না।

দ্বিতীয় বালক। না, আর নয়।

সকলে। আজ এই পর্যন্ত থাক।

উপনন্দ। আমাকে বাঁচালে। এখন পুঁথিগুলি ফিরে দাও।

প্রথম বালক। আচ্ছা পরদেশী, তুমি এত গান গাও কেন?

শেখর। আর কোনো গুণ যদি থাকত তাহলে গাইতেম না। ওই দেখ না কেন, তোমাদের সেই লক্ষ্মীপেঁচা তো গান গায় না।

সকলে। না, সে চেঁচায়।

শেখর। তার মানে, সার বস্তুর দ্বারা ভরতি হয়ে ও একেবারে নিরেট।

দ্বিতীয় বালক। পরদেশী, তোমার দেশের গল্প তুমি আমাদের শোনাবে?

শেখর। আমার দেশের গল্প ভারি অদ্ভুত।

সকলে। আমরা অদ্ভুত গল্প শুনব।

শেখর। আচ্ছা, তাহলে চলো, কোপাই নদীর ধার দিয়ে একবার পারুলডাঙায় তোমাদের ঘুরিয়ে নিয়ে আসি গে। চলতে চলতে গল্প হবে।

সন্ন্যাসী। এই দেখো, ওর সঙ্গে আমরা পারব না—আমাদের সব চেলা ভাঙিয়ে নিলে।

শেখর। ভাঙিয়ে নেওয়া সহজ, কিন্তু টিঁকিয়ে রাখা শক্ত। এখনই ফিরে আসবে।

[বালকদলের সঙ্গে শেখরের প্রস্থান

সন্ন্যাসী। বাবা উপনন্দ, তোমার প্রভুর কী নাম ছিল?

উপনন্দ। সুরসেন।

সন্ন্যাসী। সুরসেন! বীণাচার্য!

উপনন্দ। হাঁ ঠাকুর, তুমি তাঁকে জানতে?

সন্ন্যাসী। আমি তাঁর বীণা শুনব আশা করেই এখানে এসেছিলেম।

উপনন্দ। তাঁর কি এত খ্যাতি ছিল?

ঠাকুরদাদা। তিনি কি এত বড়ো গুণী? তুমি তাঁর বাজনা শোনবার জন্যেই এদেশে এসেছ? তবে তো আমরা তাঁকে চিনি নি?

সন্ন্যাসী। এখানকার রাজা?

ঠাকুরদাদা। এখানকার রাজা তো কোনোদিন তাঁকে জানেন নি, চক্ষেও দেখেন নি। তুমি তাঁর বীণা কোথায় শুনলে?

সন্ন্যাসী। তোমরা হয়তো জান না বিজয়াদিত্য বলে একজন রাজা—

ঠাকুরদাদা। বল কী ঠাকুর। আমরা অত্যন্ত মূর্খ, গ্রাম্য, তাই বলে বিজয়াদিত্যের নাম জানব না এও কি হয়? তিনি যে আমাদের চক্রবর্তী সম্রাট।

সন্ন্যাসী। তা হবে। তা সেই লোকটির সভায় একদিন সুরসেন বীণা বাজিয়েছিলেন, তখন শুনেছিলেম। রাজা তাঁকে রাজধানীতে রাখবার জন্যে অনেক চেষ্টা করেও কিছুতেই পারেন নি।

ঠাকুরদাদা। হায় হায়, এত বড়ো লোকের আমরা কোনো আদর করতে পারি নি।

সন্ন্যাসী। বাবা উপনন্দ, তোমার সঙ্গে তাঁর কী রকমে সম্বন্ধ হল?

উপনন্দ। ছোটো বয়সে আমার বাপ মারা গেলে আমি অন্য দেশ থেকে এই নগরে আশ্রয়ের জন্যে এসেছিলেম। সেদিন শ্রাবণমাসের সকাল বেলায় আকাশ ভেঙে বৃষ্টি পড়ছিল, আমি লোকনাথের মন্দিরের এককোণে দাঁড়াব বলে প্রবেশ করছিলেম।

পুরোহিত আমাকে বোধ হয় নীচ জাত মনে করে তাড়িয়ে দিলেন। সেদিন সকালে সেইখানে বসে আমার প্রভু বীণা বাজাচ্ছিলেন। তিনি তখনই মন্দির ছেড়ে এসে আমার গলা জড়িয়ে ধরলেন—বললেন, এস বাবা, আমার ঘরে এস। সেই দিন থেকে ছেলের মতো তিনি আমাকে কাছে রেখে মানুষ করেছেন—লোকে তাঁকে কত কথা বলেছে তিনি কান দেন নি। আমি তাঁকে বলেছিলেম, প্রভু, আমাকে বীণা বাজাতে শেখান, আমি তাহলে কিছু কিছু উপার্জন করে আপনার হাতে দিতে পারব, তিনি বললেন, বাবা, এ বিদ্যা পেট ভরাবার নয়; আমার আর এক বিদ্যা জানা আছে তাই তোমাকে শিখিয়ে দিচ্ছি। এই বলে আমাকে রং দিয়ে চিত্র করে পুঁথি লিখতে শিখিয়েছেন। যখন অত্যন্ত অচল হয়ে উঠত তখন তিনি মাঝে মাঝে বিদেশে গিয়ে বীণা বাজিয়ে টাকা নিয়ে আসতেন। এখানে তাঁকে সকলে পাগল বলেই জানত।

সন্ন্যাসী। সুরসেনের বীণা শুনতে পেলেম না, কিন্তু বাবা উপনন্দ, তোমার কল্যাণে তাঁর আর এক বীণা শুনে নিলুম, এর সুর কোনোদিন ভুলব না। বাবা, লেখো, লেখো। আমরা ততক্ষণ আমাদের দলবলের খবর নিয়ে আসি গে। [প্রস্থান

শেখর ও রাজা সোমপালের প্রবেশ

শেখর। বিজয়াদিত্যকে তুমি হার মানাতে চাও তাহলে আগে ওই অপূর্বানন্দ সন্ন্যাসীকে বশ করো। রাজা সোমপাল, তিনিও নিশ্চয় তোমার মনের কথা জানেন।

সোমপাল। কোথায় তাঁকে পাব?

শেখর। তিনি এখানেই এসেছেন আমি জানি। কাছাকাছি কোথাও আছেন।

সোমপাল। দেখো আমি লোক চিনি। তোমাকে দেখে আমার মনে হচ্ছে তোমার দ্বারা আমার কাজ উদ্ধার হবে।

শেখর। তা হতেও পারে, অসম্ভব নয়। বিজয়াদিত্যকে বশ করবার ফন্দি আমি হয়তো তোমাকে কিছু কিছু বলে দিতে পারব।

সোমপাল। দেখো, তোমাকে আমি রাজমন্ত্রী করে দেব।

শেখর। আমার যদি মন্ত্রণা চাও তাহলে আমাকে মন্ত্রী ক'রো না। মন্ত্রণা দেওয়াই যার কাজ তার মন্ত্রণা কোনো রাজার ভালো লাগে না। বিজয়াদিত্যের সভায় যে একজন কবি আছে আমি দেখেছি—

সোমপাল। আরে ছি ছি, সে-ও আবার কবি হল! ওই তো রায়শেখরের কথা বলছ?

শেখর। হাঁ সেই বটে।

সোমপাল। সে আমার বিদূষকেরও যোগ্য নয়।

শেখর। একেবারেই নয়।

সোমপাল। বিজয়াদিত্য যেমন রাজা তার কবিটিও তেমনি।

শেখর। তাই তো অনেকে বলে। তোমার সভায় তাকে—

সোমপাল। আমার সভায় যতক্ষণ আমি আছি ততক্ষণ কিছুতেই—

শেখর। নিশ্চয়ই। ততক্ষণ সে—

সোমপাল। সে-কথা পরে হবে। এখন সন্ন্যাসীকে তুমি খুঁজে বের করো ; দেখা হলেই তাকে আমার রাজসভায় পাঠিয়ে দিয়ো, বিলম্ব ক'রো না। আমি বরঞ্চ আমার দূতকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। [উভয়ের প্রস্থান

সন্ন্যাসী ও ঠাকুরদাদার প্রবেশ

সন্ন্যাসী। উপনন্দ, ওই যে পরদেশী এসেছে ওকে দেখে তোমার মনে হয় না কি, তোমার আচার্য সুরসেনেরই ও জুড়ি ?

উপনন্দ। আমার মনে হচ্ছিল আমি যেন তাঁরই বীণা শুনছি।

সন্ন্যাসী। তুমি যেমন তাঁকে পেয়েছিলে তেমনি করেই এই মানুষটিকে পাবে।

উপনন্দ। উনি কি আমাকে নেবেন ?

সন্ন্যাসী। ওর মুখ দেখেই কি বুঝতে পার নি ?

উপনন্দ। পেরেছি। আমার প্রভুই বুঝি ওঁকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

লক্ষেশ্বরের প্রবেশ

লক্ষেশ্বর। আ সর্বনাশ! যেখানটিতে আমি কৌটো পুঁতে রেখেছিলুম ঠিক সেই জায়গাটিতেই যে উপনন্দ বসে গেছে! আমি ভেবেছিলেম ছোঁড়াটা বোকা বুঝি তাই পরের ঋণ শুধতে এসেছে। তা তো নয় দেখছি। পরের ঘাড় ভাঙাই ওর ব্যবসা। আমার গজমোতির খবর পেয়েছে। একটা সন্ন্যাসীকেও কোথা থেকে জুটিয়ে এনেছে দেখছি। সন্ন্যাসী হাত চেলে জায়গাটা বের করে দেবে। উপনন্দ।

উপনন্দ। কী।

লক্ষেশ্বর। ওঠ্, ওঠ্, ওই জায়গা থেকে। এখানে কী করতে এসেছিস ?

উপনন্দ। অমন করে চোখ রাঙাও কেন ? এ কি তোমার জায়গা না কি ?

লক্ষেশ্বর। এটা আমার জায়গা কি না সে খোঁজে তোমার দরকার কী হে বাপু। ভারি সেয়ানা দেখছি। তুমি বড়ো ভালোমানুষটি সেজে আমার কাছে এসেছিলে। আমি বলি সত্যিই বুঝি প্রভুর ঋণশোধ করবার জন্যেই ছোঁড়াটা আমার কাছে এসেছে— কেননা, সেটা রাজার আইনেও আছে—

উপনন্দ। আমি তো সেইজন্যেই এখানে পুঁথি লিখতে এসেছি।

লক্ষেশ্বর। সেইজন্যেই এসেছ বটে। আমার বয়স কত আন্দাজ করছ বাপু। আমি কি শিশু।

সন্ন্যাসী। কেন বাবা, তুমি কী সন্দেহ করছ?

লক্ষেশ্বর। কী সন্দেহ করছি! তুমি তা কিছু জান না! বড়ো সাধু! ভণ্ড সন্ন্যাসী কোথাকার।

ঠাকুরদাদা। আরে কী বলিস লখা? আমার ঠাকুরকে অপমান!

উপনন্দ। এই রং-বাটা নোড়া দিয়ে তোমার মুখ গুঁড়িয়ে দেব না। টাকা হয়েছে বলে অহংকার। কাকে কী বলতে হয় জান না। [সন্ন্যাসীর পশ্চাতে লক্ষেশ্বরের লুকায়ন

সন্ন্যাসী। আরে কর কী ঠাকুরদা, কর কী বাবা। লক্ষেশ্বর তোমাদের চেয়ে ঢের বেশি মানুষ চেনে। যেমনি দেখেছে অমনি ধরা পড়ে গেছে। ভণ্ড সন্ন্যাসী যাকে বলে। বাবা লক্ষেশ্বর, এত দেশের এত মানুষ ভুলিয়ে এলেম, তোমাকে ভোলাতে পারলেম না।

লক্ষেশ্বর। না, ঠিক ঠাওরাতে পারছি নে। হয়তো ভালো করি নি। আবার শাপ দেবে, কি, কী করবে। তিনখানা জাহাজ এখনও সমুদ্রে আছে। (পায়ের ধুলা লইয়া) প্রণাম হই ঠাকুর,—হঠাৎ চিনতে পারি নি। বিরূপাক্ষের মন্দিরে আমাদের ওই বিকটানন্দ বলে একটা সন্ন্যাসী আছে আমি বলি সেই ভণ্ডটাই বুঝি। ঠাকুরদা, তুমি এক কাজ করো। সন্ন্যাসী ঠাকুরকে আমার ঘরে নিয়ে যাও আমি ওঁকে কিছু ভিক্ষে দিয়ে দেব। আমি চললেম বলে। তোমরা এগোও।

ঠাকুরদাদা। তোমার বড়ো দয়া। তোমার ঘরের এক মুঠো চাল নেবার জন্যে ঠাকুর সাত সিন্ধু পেরিয়ে এসেছেন।

সন্ন্যাসী। বল কী ঠাকুরদা! এক মুঠো চাল যেখানে দুর্লভ সেখান থেকে সেটি নিতে হবে বই কি। বাবা লক্ষেশ্বর, চলো তোমার ঘরে।

লক্ষেশ্বর। আমি পরে যাচ্ছি, তোমরা এগোও। উপনন্দ, তুমি আগে ওঠো। ওঠো, শীঘ্র ওঠো বলছি, তোলো তোমার পুঁথিপত্র।

উপনন্দ। আচ্ছা তবে উঠলেম, কিন্তু তোমার সঙ্গে আমার কোনো সম্বন্ধ রইল না।

লক্ষেশ্বর। না থাকলেই যে বাঁচি বাবা! আমার সম্বন্ধে কাজ কী। এত দিন তো আমার বেশ চলে যাচ্ছিল।

উপনন্দ। আমি যে ঋণ স্বীকার করেছিলেম তোমার কাছে এই অপমান সহ্য করেই তার থেকে মুক্তি গ্রহণ করলেম। বাস চুকে গেল। [প্রস্থান

লক্ষেশ্বর। ওরে। সব ঘোড়সওয়ার আসে কোথা থেকে। রাজা আমার গজমোতির খবর পেলে না কি! এর চেয়ে উপনন্দ যে ছিল ভালো। এখন কী করি। (সন্ন্যাসীকে ধরিয়া) ঠাকুর, তোমার পায়ে ধরি, তুমি ঠিক এইখানটিতে বসো—এই যে এইখানে—আর একটু বাঁ দিকে সরে এস—এই হয়েছে। খুব চেপে বসো। রাজাই আসুক আর সম্রাটই আসুক তুমি কোনোমতেই এখান থেকে উঠো না। তাহলে আমি তোমাকে খুশি করে দেব।

ঠাকুরদাদা। আরে লখা করে কী। হঠাৎ খেপে গেল না কি।

লক্ষেশ্বর। ঠাকুর, আমি তবে একটু আড়ালে যাই। আমাকে দেখলেই রাজার টাকার কথা মনে পড়ে যায়। শত্রুরা লাগিয়েছে আমি সব টাকা পুঁতে রেখেছি—শুনে অবধি রাজা যে কত জায়গায় কূপ খুঁড়তে আরম্ভ করেছেন তার ঠিকানা নেই। জিজ্ঞাসা করলে বলেন প্রজাদের জলদান করছেন। কোন্‌দিন আমার ভিটেবাড়ির ভিত কেটে জলদানের হুকুম হবে, সেই ভয়ে রাত্রে ঘুমোতে পারি নে। [প্রস্থান

রাজদূতের প্রবেশ

রাজদূত। সন্ন্যাসী ঠাকুর প্রণাম হই। আপনিই তো অপূর্বানন্দ।

সন্ন্যাসী। কেউ কেউ আমাকে তাই বলেই তো জানে।

রাজদূত। আপনার অসামান্য ক্ষমতার কথা চারিদিকে রাষ্ট্র হয়ে গেছে। আমাদের মহারাজ সোমপাল আপনার সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছা করেন।

সন্ন্যাসী। যখনই আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন তখনই আমাকে দেখতে পাবেন।

রাজদূত। আপনি তাহলে যদি একবার—

সন্ন্যাসী। আমি একজনের কাছে প্রতিশ্রুত আছি এইখানেই আমি অচল হয়ে বসে থাকব। অতএব আমার মতো অকিঞ্চন অকর্মণ্যকেও তোমার রাজার যদি বিশেষ প্রয়োজন থাকে তাহলে তাঁকে এইখানেই আসতে হবে।

রাজদূত। রাজোদ্যান অতি নিকটেই—ওইখানেই তিনি অপেক্ষা করছেন।

সন্ন্যাসী। যদি নিকটেই হয় তবে তো তাঁর আসতে কোনো কষ্ট হবে না।

রাজদূত। যে আজ্ঞা, তবে ঠাকুরের ইচ্ছা তাঁকে জানাই গে। [প্রস্থান

ঠাকুরদাদা। প্রভু, এখানে রাজসমাগমের সম্ভাবনা হয়ে এল আমি তবে বিদায় হই।

সন্ন্যাসী। ঠাকুরদা, তুমি আমার শিশু বন্ধুগুলিকে নিয়ে ততক্ষণ আসর জমিয়ে রাখো, আমি বেশি বিলম্ব করব না।

ঠাকুরদাদা। রাজার উৎপাতই ঘটুক আর অরাজকতাই হ'ক আমি প্রভুর চরণ ছাড়ছি নে। [প্রস্থান

লক্ষেশ্বরের প্রবেশ

লক্ষেশ্বর। ঠাকুর তুমিই অপূর্বানন্দ! তবে তো বড়ো অপরাধ হয়ে গেছে। আমাকে মাপ করতে হবে।

সন্ন্যাসী। তুমি আমাকে ভণ্ডতপস্বী বলেছ এই যদি তোমার অপরাধ হয় আমি তোমাকে মাপ করলেম।

লক্ষেশ্বর। বাবাঠাকুর শুধু মাপ করতে তো সকলেই পারে—সে ফাঁকিতে আমার কী হবে। আমাকে একটা কিছু ভালো রকম বর দিতে হচ্ছে। যখন দেখা পেয়েছি তখন শুধুহাতে ফিরছি নে।

সন্ন্যাসী। কী বর চাই।

লক্ষেশ্বর। লোকে যতটা মনে করে ততটা নয়, তবে কি না আমার অল্পস্বল্প কিছু জমেছে—সে অতি যৎসামান্য—তাতে আমার মনের আকাঙ্ক্ষা তো মিটছে না। শরৎকাল এসেছে, আর ঘরে বসে থাকতে পারছি নে—এখন বাণিজ্যে বেরোতে হবে। কোথায় গেলে সুবিধা হতে পারে আমাকে সেই সন্ধানটি বলে দিতে হবে—আমাকে আর যেন ঘুরে বেড়াতে না হয়।

সন্ন্যাসী। আমিও সেই সন্ধানেই আছি আর যেন ঘুরতে না হয়।

লক্ষেশ্বর। বল কী ঠাকুর।

সন্ন্যাসী। আমি সত্যই বলছি।

লক্ষেশ্বর। ওঃ তবে সেই কথাটাই বলো। বাবা, তোমরা আমাদের চেয়েও সেয়ানা।

সন্ন্যাসী। তার সন্দেহ আছে!

লক্ষেশ্বর। (কাছে ঘেঁষিয়া বসিয়া মৃদুস্বরে) সন্ধান কিছু পেয়েছ?

সন্ন্যাসী। কিছু পেয়েছি বই কি। নইলে এমন করে ঘুরে বেড়াব কেন?

লক্ষেশ্বর। (সন্ন্যাসীর পা চাপিয়া ধরিয়া) বাবাঠাকুর আর একটু খোলসা করে বলো। তোমার পা ছুঁয়ে বলছি আমিও তোমাকে একেবারে ফাঁকি দেব না। কী খুঁজছ বলো তো, আমি কাউকে বলব না।

সন্ন্যাসী। তবে শোনো। লক্ষ্মী যে সোনার পদ্মটির উপরে পা দুখানি রাখেন আমি সেই পদ্মটির খোঁজে আছি।

লক্ষেশ্বর। ও বাবা, সে তো কম কথা নয়। তাহলে যে একেবারে সকল ল্যাঠাই

চোকে। ঠাকুর, ভেবে ভেবে এ তো তুমি আচ্ছা বুদ্ধি ঠাওরেছ। কোনোগতিকে পদ্মটি যদি জোগাড় করে আন তাহলে লক্ষ্মীকে আর তোমার খুঁজতে হবে না, লক্ষ্মীই তোমাকে খুঁজে বেড়াবেন ; এ নইলে আমাদের চঞ্চলা ঠাকরুনটিকে তো জব্দ করবার জো নেই। তোমার কাছে তাঁর পা দুখানিই বাঁধা থাকবে। তা তুমি সন্ন্যাসী মানুষ, একলা পেরে উঠবে ? এতে তো খরচপত্র আছে। এক কাজ করো না বাবা, আমরা ভাগে ব্যবসা করি।

সন্ন্যাসী। তাহলে তোমাকে যে সন্ন্যাসী হতে হবে। বহুকাল সোনা ছুঁতেই পাবে না।

লক্ষেশ্বর। সে যে শক্ত কথা।

সন্ন্যাসী। সব ব্যবসা যদি ছাড়তে পার তবেই এ ব্যবসা চলবে।

লক্ষেশ্বর। শেষকালে দুকূল যাবে না তো ? যদি একেবারে ফাঁকিতে না পড়ি তাহলে তোমার তল্পি বয়ে তোমার পিছন পিছন চলতে রাজি আছি। সত্যি বলছি ঠাকুর, কারও কথায় বড়ো সহজে বিশ্বাস করি নে—কিন্তু তোমার কথাটা কেমন মনে লাগছে। আচ্ছা। আচ্ছা রাজি। তোমার চেলাই হব। ওই রে রাজা আসছে। আমি তবে একটু আড়ালে দাঁড়াই গে।

বন্দিগণের গান

রাজরাজেন্দ্র জয় জয়তু জয় হে।
ব্যাপ্ত পরতাপ তব বিশ্বময় হে।
দুষ্টদলদলন তব দণ্ড ভয়কারী,
শত্রুজনদর্পহর দীপ্ত তরবারি,
সংকট শরণ্য তুমি দৈন্যদুখহারী,
মুক্ত অবরোধ তব অভ্যুদয় হে॥

রাজা সোমপালের প্রবেশ

সোমপাল। প্রণাম হই ঠাকুর।

সন্ন্যাসী। জয় হ'ক, কী বাসনা তোমার।

সোমপাল। সে-কথা নিশ্চয় তোমার অগোচর নেই। আমি অখণ্ড রাজ্যের অধীশ্বর হতে চাই প্রভু।

সন্ন্যাসী। তাহলে গোড়া থেকে শুরু করো। তোমার খণ্ডরাজ্যটি ছেড়ে দাও।

সোমপাল। পরিহাস নয় ঠাকুর। বিজয়াদিত্যের প্রতাপ আমার অসহ্য বোধ হয়, আমি তার সামন্ত হয়ে থাকতে পারব না।

সন্ন্যাসী। রাজন, তবে সত্য কথা বলি, আমার পক্ষেও সে-ব্যক্তি অসহ্য হয়ে উঠেছে।

সোমপাল। বল কী ঠাকুর!

সন্ন্যাসী। এক বর্ণও মিথ্যা বলছি নে। তাকে বশ করবার জন্যেই আমি মন্ত্রসাধনা করছি।

সোমপাল। তাই তুমি সন্ন্যাসী হয়েছ?

সন্ন্যাসী। তাই বটে।

সোমপাল। মন্ত্রে সিদ্ধিলাভ হবে?

সন্ন্যাসী। অসম্ভব নেই।

সোমপাল। তাহলে ঠাকুর আমার কথা মনে রেখো। তুমি যা চাও আমি তোমাকে দেব। যদি সে বশ মানে তাহলে আমার কাছে যদি—

সন্ন্যাসী। তা বেশ, সেই চক্রবর্তী সম্রাটকে আমি তোমার সভায় ধরে আনব।

সোমপাল। কিন্তু বিলম্ব করতে ইচ্ছা করছে না। শরৎকাল এসেছে—সকালবেলা উঠে বেতসিনীর জলের উপর যখন আশ্বিনের রৌদ্র পড়ে তখন আমার সৈন্যসামন্ত নিয়ে দিগ্বিজয়ে বেরিয়ে পড়তে ইচ্ছে করে। যদি আশীর্বাদ কর তাহলে—

সন্ন্যাসী। কোনো প্রয়োজন নেই; শরৎকালেই আমি তাকে তোমার কাছে সমর্পণ করব, এই তো উপযুক্ত কাল। তুমি তাকে নিয়ে কী করবে?

সোমপাল। আমার একটা কোনো কাজে লাগিয়ে দেব—তার অহংকার দূর করতে হবে।

সন্ন্যাসী। এ তো খুব ভালো কথা। যদি তার অহংকার চূর্ণ করতে পার তাহলে ভারি খুশি হব।

সোমপাল। ঠাকুর, চলো আমার রাজভবনে।

সন্ন্যাসী। সেটি পারছি নে। আমার দলের লোকদের অপেক্ষায় আছি। তুমি যাও বাবা। আমার জন্যে কিছু ভেবো না। তোমার মনের বাসনা যে আমাকে ব্যক্ত করে বলেছ এতে আমার ভারি আনন্দ হচ্ছে। বিজয়াদিত্যের যে এত শত্রু জমে উঠেছে তা তো আমি জানতেম না।

সোমপাল। তবে বিদায় হই। প্রণাম। [প্রস্থান

(পুনশ্চ ফিরিয়া আসিয়া) আচ্ছা ঠাকুর, তুমি তো বিজয়াদিত্যকে জান, সত্য করে বলো দেখি, লোকে তার সম্বন্ধে যতটা রটনা করে ততটা কি সত্য?

সন্ন্যাসী। কিছুমাত্র না। লোকে তাকে একটা মস্ত রাজা বলে মনে করে কিন্তু সে নিতান্তই সাধারণ মানুষের মতো। তার সাজসজ্জা দেখেই লোকে ভুলে গেছে।

সোমপাল। বল কী ঠাকুর, হা হা হা হা! আমিও তাই ঠাউরেছিলেম। অ্যাঁ, নিতান্তই সাধারণ মানুষ।

সন্ন্যাসী। আমার ইচ্ছে আছে আমি তাকে সেইটে আচ্ছা করে বুঝিয়ে দেব। সে যে রাজার পোশাক পরে ফাঁকি দিয়ে অন্য পাঁচ জনের চেয়ে নিজেকে মস্ত একটা কিছু বলে মনে করে আমি তার সেই ভুলটা একেবারে ঘুচিয়ে দেব।

সোমপাল। ঠাকুর, তুমি সব ফাঁস করে দাও। ও যে মিথ্যে রাজা, ভুয়ো রাজা, সে যেন আর ছাপা না থাকে। ওর বড়ো অহংকার হয়েছে।

সন্ন্যাসী। আমি তো সেই চেষ্টাতেই আছি। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো, যতক্ষণ না আমার অভিপ্রায় সিদ্ধ হয় আমি সহজে ছাড়ব না।

সোমপাল। প্রণাম। [প্রস্থান

উপনন্দের প্রবেশ

উপনন্দ। ঠাকুর, আমার মনের ভার তো গেল না।

সন্ন্যাসী। কী হল বাবা।

উপনন্দ। মনে করেছিলেম লক্ষেশ্বর যখন আমাকে অপমান করেছে তখন ওর কাছে আমি আর ঋণ স্বীকার করব না। তাই পুঁথিপত্র নিয়ে ঘরে ফিরে গিয়েছিলেম। সেখানে আমার প্রভুর বীণাটি নিয়ে তার ধুলো ঝাড়তে গিয়ে তারগুলি বেজে উঠল—অমনি আমার মনটার ভিতর যে কেমন হল সে আমি বলতে পারি নে। সেই বীণার কাছে লুটিয়ে পড়ে বুক ফেটে আমার চোখের জল পড়তে লাগল। মনে হল আমার প্রভুর কাছে আমি অপরাধ করেছি। লক্ষেশ্বরের কাছে আমার প্রভু ঋণী হয়ে রইলেন আর আমি নিশ্চিন্ত হয়ে আছি। ঠাকুর, এ তো আমার কোনোমতেই সহ্য হচ্ছে না। ইচ্ছে করছে আমার প্রভুর জন্যে আজ আমি অসাধ্য কিছু একটা করি। আমি তোমাকে মিথ্যা বলছি নে—তাঁর ঋণ শোধ করতে যদি আজ প্রাণ দিতে পারি তাহলে আমার খুব আনন্দ হবে,—মনে হবে আজকের এই সুন্দর শরতের দিন আমার পক্ষে সার্থক হল।

সন্ন্যাসী। বাবা, তুমি যা বলছ সত্যই বলছ।

উপনন্দ। ঠাকুর, তুমি তো অনেক দেশ ঘুরেছ আমার মতো অকর্মণ্যকেও হাজার কার্ষাপণ দিয়ে কিনতে পারেন এমন মহাত্মা কেউ আছেন? তাহলেই ঋণটা শোধ হয়ে

যায়। এ নগরে যদি চেষ্টা করি তাহলে বালক বলে ছোটো জাত বলে সকলে আমাকে খুব কম দাম দেবে।

সন্ন্যাসী। না বাবা, তোমার মূল্য এখানে কেউ বুঝবে না। আমি ভাবছি কি যিনি তোমার প্রভুকে অত্যন্ত আদর করতেন সেই বিজয়াদিত্য বলে রাজাটার কাছে গেলে কেমন হয়?

উপনন্দ। বিজয়াদিত্য? তিনি যে আমাদের সম্রাট।

সন্ন্যাসী। তাই না কি?

উপনন্দ। তুমি জান না বুঝি?

সন্ন্যাসী। তা হবে। না হয় তাই হল।

উপনন্দ। আমার মতো ছেলেকে তিনি কি দাম দিয়ে কিনবেন?

সন্ন্যাসী। বাবা, বিনামূল্যে কেনবার মতো ক্ষমতা তাঁর যদি থাকে তাহলে বিনামূল্যেই কিনবেন। কিন্তু তোমার ঋণটুকু শোধ করে না দিতে পারলে তাঁর এত ঋণ জমবে যে তাঁর রাজভাণ্ডার লজ্জিত হবে, এ আমি তোমাকে সত্যই বলছি।

উপনন্দ। ঠাকুর এও কি সম্ভব?

সন্ন্যাসী। বাবা, জগতে কেবল কি এক লক্ষেশ্বরই সম্ভব, তার চেয়ে বড়ো সম্ভাবনা কি আর কিছুই নেই?

উপনন্দ। আচ্ছা, যদি সে সম্ভব হয় তো হবে, কিন্তু আমি ততদিন পুঁথিগুলি নকল করে কিছু কিছু শোধ করতে থাকি—নইলে আমার মনে বড়ো গ্লানি হচ্ছে।

সন্ন্যাসী। ঠিক কথা বলেছ বাবা। বোঝা মাথায় তুলে নাও, কারও প্রত্যাশায় ফেলে রেখে সময় বইয়ে দিয়ো না।

উপনন্দ। তাহলে চললেম ঠাকুর। তোমার কথা শুনে আমি মনে কত যে বল পেয়েছি সে আমি বলে উঠতে পারি নে। [প্রস্থান

লক্ষেশ্বরের প্রবেশ

লক্ষেশ্বর। ঠাকুর, অনেক ভেবে দেখলেম—পারব না। তোমার চেলা হওয়া আমার কর্ম নয়। যা পেয়েছি তা অনেক দুঃখে পেয়েছি, তোমার এক কথায় সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে শেষকালে হায় হায় করে মরব। আমার বেশি আশায় কাজ নেই।

সন্ন্যাসী। সে-কথাটা বুঝলেই হল।

লক্ষেশ্বর। ঠাকুর, এবার একটুখানি উঠতে হচ্ছে।

সন্ন্যাসী। (উঠিয়া) তাহলে তোমার কাছ থেকে ছুটি পাওয়া গেল।

লক্ষেশ্বর। (মাটি ও শুষ্কপত্র সরাইয়া কৌটা বাহির করিয়া) ঠাকুর, এইটুকুর জন্যে আজ সকাল থেকে সমস্ত হিসাব কিতাব ফেলে রেখে এই জায়গাটার চারদিকে ভূতের মতো ঘুরে বেড়িয়েছি। এই যে গজমোতি, এ আমি তোমাকে আজ প্রথম দেখালেম। আজ পর্যন্ত কেবলই এটাকে লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়িয়েছি; তোমাকে দেখাতে পেয়ে মনটা তবু একটু হালকা হল। (সন্ন্যাসীর হাতের কাছে অগ্রসর করিয়াই তাড়াতাড়ি ফিরাইয়া লইয়া) না হল না। তোমাকে যে এত বিশ্বাস করলেম, তবু এ জিনিস একটিবার তোমার হাতে তুলে দিই এমন শক্তি আমার নেই। এই যে আলোতে এটাকে তুলে ধরেছি আমার বুকের ভিতরে যেন গুরগুর করছে। আচ্ছা ঠাকুর, বিজয়াদিত্য কেমন লোক বলো তো। তাকে বিক্রি করতে গেলে সে তো দাম না দিয়ে এটা আমার কাছ থেকে জোর করে কেড়ে নেবে না? আমার ওই এক মুশকিল হয়েছে। আমি এটা বেচতেও পারছি নে, রাখতেও পারছি নে, এর জন্যে আমার রাত্রে ঘুম হয় না। বিজয়াদিত্যকে তুমি বিশ্বাস কর?

সন্ন্যাসী। সব সময়ে কি তাকে বিশ্বাস করা যায়?

লক্ষেশ্বর। সেই তো মুশকিলের কথা। আমি দেখছি এটা মাটিতেই পোঁতা থাকবে, হঠাৎ কোন্‌দিন মরে যাব, কেউ সন্ধানও পাবে না।

সন্ন্যাসী। রাজাও না, সম্রাটও না, ওই মাটিই সব ফাঁকি দিয়ে নেবে। তোমাকেও নেবে, আমাকেও নেবে।

লক্ষেশ্বর। তা নিক গে, কিন্তু আমার কেবলই ভাবনা হয় আমি মরে গেলে কোথা থেকে কে এসে হঠাৎ হয়তো খুঁড়তে খুঁড়তে ওটা পেয়ে যাবে। যাই হ'ক ঠাকুর, কিন্তু তোমার মুখে ওই সোনার পদ্মর কথাটা আমার কাছে বড়ো ভালো লাগল। আমার কেমন মনে হচ্ছে ওটা তুমি হয়তো খুঁজে বের করতে পারবে। কিন্তু তা হ'ক গে, আমি তোমার চেলা হতে পারব না। প্রণাম। [প্রস্থান

ঠাকুরদাদা ও শেখরের প্রবেশ

সন্ন্যাসী। ওহে পরদেশী, তুমি তো মানুষের ভিতরকার মতলব সব দেখতে পাও। তুমি জান আমি বেরিয়েছিলুম বিশ্বের ঋণ শোধ করতে।

ঠাকুরদাদা। কী ঋণ প্রভু আমাকে একটু বুঝিয়ে বলবেন না?

সন্ন্যাসী। আনন্দের ঋণ ঠাকুরদা। শরতে যে সোনার আলোর সুধা ঢেলে দিয়েছে—তার শোধ করতে চাই যদি তো হৃদয় ঢেলে দিতে হবে। ওহে উদাসী, তুমি বল কী?

শেখর। গান

দেওয়া নেওয়া ফিরিয়ে দেওয়া
তোমায় আমায়
জনম জনম এই চলেছে
মরণ কভু তারে থামায় ?
যখন তোমার গানে আমি জাগি
আকাশে চাই তোমার লাগি,
আবার একতারাতে আমার গানে
মাটির পানে তোমায় নামায়।
ওগো তোমার সোনার আলোর ধারা
তার ধারি ধার,
আমার কালো মাটির ফুল ফুটিয়ে
শোধ করি তার।
আমার শরৎ-রাতের শেফালি বন
সৌরভেতে মাতে যখন,
তখন পালটা সে তান লাগে তব
শ্রাবণ-রাতের প্রেম-বরিষায়।

সন্ন্যাসী। এই ঋণশোধের ছবি আমি দেখে নিলেম ওই উপনন্দের মধ্যে। ওই তো প্রেমের ঋণ প্রেম দিয়ে শুধছে। উপনন্দকে তুমি দেখেছ ?

শেখর। হাঁ তাকে দেখে নিয়েছি, বুঝেও নিয়েছি। ছেলেদের মুখে উপনন্দ আর ঠাকুরদা এই দুই নাম বাজছে। তাদের কাছ থেকে ওর সব খবর পেলুম।

সন্ন্যাসী। ওকে সবাই ভালোবাসে, কেননা ও যে দুঃখের শোভায় সুন্দর।

শেখর। ঠাকুর, যদি তাকিয়ে দেখ তবে দেখবে সব সুন্দরই দুঃখের শোভায় সুন্দর। এই যে ধানের খেত আজ সবুজ ঐশ্বর্যে ভরে উঠেছে এর শিকড়ে শিকড়ে পাতায় পাতায় ত্যাগ। মাটি থেকে জল থেকে হাওয়া থেকে যা-কিছু ও পেয়েছে সমস্তই আপন প্রাণের ভিতর দিয়ে একেবারে নিংড়ে নিয়ে মঞ্জরীতে মঞ্জরীতে উৎসর্গ করে দিলে। তাই তো চোখ জুড়িয়ে গেল।

সন্ন্যাসী। ঠিক বলেছ উদাসী, প্রেমের আনন্দে উপনন্দ দুঃখের ভিতর দিয়ে জীবনের ভরা খেতের ফসল ফলিয়ে তুললে।

শেখর। ওই দুঃখের রতনমালা বিশ্বের কণ্ঠে ঝলমল করছে।

গান

তোমার সোনার থালায় সাজাব আজ
দুখের অশ্রুধার।
জননী গো, গাঁথব তোমার
গলার মুক্তাহার।
চন্দ্রসূর্য পায়ের কাছে
মালা হয়ে জড়িয়ে আছে,
তোমার বুকে শোভা পাবে আমার
দুখের অলংকার।
ধনধান্য তোমারি ধন
কী করবে তা কও,
দিতে চাও তো দিয়ো আমায়,
নিতে চাও তো লও।
দুঃখ আমার ঘরের জিনিস,
খাঁটি রতন তুই তো চিনিস,
তোর প্রসাদ দিয়ে তারে কিনিস
এ মোর অহংকার॥

লক্ষেশ্বরের প্রবেশ

লক্ষেশ্বর। এই যে, এ লোকটি এখানে এসে জুটেছে। (চোখ টিপিয়া) ঠাকুরদা, এঁকে চিনতে পেরেছ কি, ইনি একজন সন্ধানী লোক।

শেখর। সেইজন্যেই তো তোমাকে ছেড়ে এখন এঁকে ধরেছি।

লক্ষেশ্বর। এঁকে দেখে ঠাউরেছ ওঁর সঞ্চয় কিছু আছে, আমার মত অকিঞ্চন না।

শেখর। ঠিক বটে। সেইজন্যে লেগে আছি, আদায় না করে ছাড়ছি নে।

লক্ষেশ্বর। কিন্তু এতক্ষণ তোমরা তিনজনে মিলে চুপিচুপি কী পরামর্শ করছিলে বলো দেখি?

সন্ন্যাসী। আমাদের সেই সোনার পদ্মের পরামর্শ।

লক্ষেশ্বর। অ্যাঁ! এরই মধ্যে সমস্ত ফাঁস করে বসে আছ? বাবা, তুমি এই ব্যবসাবুদ্ধি নিয়ে সোনার পদ্মর আমদানি করবে? তবেই হয়েছে। তুমি যেই মনে করলে

আমি রাজি হলেম না অমনি তাড়াতাড়ি অংশীদার খুঁজতে লেগে গেছ! কিন্তু এসব কি ঠাকুরদার কর্ম। ওঁর পুঁজিই বা কী।

সন্ন্যাসী। তুমি খবর পাও নি। কিন্তু একেবারে পুঁজি নেই তা নয়। ভিতরে ভিতরে জমিয়েছে।

লক্ষেশ্বর। (ঠাকুরদাদার পিঠ চাপড়াইয়া) সত্যি না কি ঠাকুরদা? বড়ো তো ফাঁকি দিয়ে আসছ। তোমাকে তো চিনতেম না। লোকে আমাকেই সন্দেহ করে, তোমাকে তো স্বয়ং রাজাও সন্দেহ করে না। তাহলে এতদিনে খানাতল্লাশি পড়ে যেত। আমি তো, দাদা, গুপ্তচরের ভয়ে ঘরে চাকরবাকর রাখি নে।

ঠাকুরদাদা। তবে যে আজ সকালে ছেলে তাড়াবার বেলায় উর্ধ্বস্বরে চোবে, তেওয়ারি, গিরধারিলালকে হাঁক পাড়ছিলে।

লক্ষেশ্বর। যখন নিশ্চয় জানি হাঁক পাড়লেও কেউ আসবে না, তখন উর্ধ্বস্বরের জোরেই আসর গরম করে তুলতে হয়। কিন্তু বলে তো ভালো করলেম না। মানুষের সঙ্গে কথা কবার তো বিপদই ওই। সেইজন্যেই কারও কাছে ঘেঁষি নে। দেখো দাদা, ফাঁস করে দিয়ো না।

ঠাকুরদাদা। ভয় নেই তোমার।

লক্ষেশ্বর। ভয় না থাকলেও তবু ভয় ঘোচে কই। ওই যে ঝাঁকে ঝাঁকে মানুষ আসছে। ওই দেখছ না দূরে—আকাশে যে ধুলো উড়িয়ে দিয়েছে। সবাই খবর পেয়েছে স্বামী অপূর্বানন্দ এসেছেন। এবার পায়ের ধুলো নিয়ে তোমার পায়ের তেলো হাঁটু পর্যন্ত খইয়ে দেবে। যাই হ'ক তুমি যে-রকম আলগা মানুষ দেখছি, সেই কথাটা আর কারও কাছে ফাঁস ক'রো না—অংশীদার আর বাড়িয়ো না। [প্রস্থান

সন্ন্যাসী। ঠাকুরদা, আর তো দেরি করলে চলবে না। লোকজন জুটতে আরম্ভ করেছে, পুত্র দাও ধন দাও করে আমাকে একেবারে মাটি করে দেবে। ছেলেগুলিকে এইবেলা ডাকো। তারা ধন চায় না, পুত্র চায় না, তাদের সঙ্গে খেলা জুড়ে দিলেই পুত্রধনের কাঙালরা আমাকে ত্যাগ করবে।

ঠাকুরদাদা। ছেলেদের আর ডাকতে হবে না। ওই যে আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। এল বলে। [দ্রুত প্রস্থান

শেখরকে সঙ্গে লইয়া ছেলেদের প্রবেশ

ছেলেরা। সন্ন্যাসী ঠাকুর। সন্ন্যাসী ঠাকুর।

সন্ন্যাসী। কী বাবা।

ছেলেরা। তুমি আমাদের নিয়ে খেলো।

সন্ন্যাসী। সে কি হয় বাবা! আমার কি সে ক্ষমতা আছে? তোমরা আমাকে নিয়ে খেলাও।

ছেলেরা। কী খেলা খেলবে?

সন্ন্যাসী। আমরা আজ শারদোৎসব খেলব।

প্রথম বালক। সে বেশ হবে।

দ্বিতীয় বালক। সে বেশ মজা হবে।

তৃতীয় বালক। সে কী খেলা ঠাকুর?

চতুর্থ বালক। সে কেমন করে খেলতে হয়?

সন্ন্যাসী। এই পরদেশীকে তোমাদের সহায় করো, এ মানুষটি সকল খেলাই খেলতে জানে।

প্রথম বালক। সে বেশ মজা হবে।

দ্বিতীয় বালক। পরদেশী, তুমি বলে দাও আমাদের কী করতে হবে।

শেখর। আচ্ছা, তাহলে চল তোমাদের সাজিয়ে নিয়ে আসি গে।

[বালকগণকে লইয়া কবির প্রস্থান

একদল লোকের প্রবেশ

প্রথম ব্যক্তি। ওরে সন্ন্যাসী কোথায় গেল রে।

দ্বিতীয় ব্যক্তি। কই বাবা, সন্ন্যাসী কই।

ঠাকুরদাদা। এই যে আমাদের সন্ন্যাসী।

প্রথম ব্যক্তি। ও যেন খেলার সন্ন্যাসী। সত্যিকার সন্ন্যাসী কোথায় গেলেন।

সন্ন্যাসী। সত্যিকার সন্ন্যাসী কি সহজে মেলে। আমি একদল ছেলেকে নিয়ে সন্ন্যাসী সন্ন্যাসী খেলছি।

প্রথম ব্যক্তি। ও তোমার কী-রকম খেলা গা!

দ্বিতীয় ব্যক্তি। ওতে যে অপরাধ হবে।

তৃতীয় ব্যক্তি। ফেলো ফেলো তোমার জটা ফেলো।

চতুর্থ ব্যক্তি। ওরে দেখ না গেরুয়া পরেছে। কিন্তু এটা দামি জিনিস রে।

প্রথম ব্যক্তি। বাবা, তোমার এই শখের সন্ন্যাসীর সাজ কেন।

সন্ন্যাসী। আমি যে কবির কাছে দীক্ষা নিয়েছিলুম।

দ্বিতীয় ব্যক্তি। কবির কাছে? এ যে শুনি নতুন কথা। আমাদের গাঁয়ে আছে

ভূষণ কবি, কৈবর্তর পো, লেখে ভালো, কিন্তু দীক্ষা দিতে এলে তার ঘরে আগুন লাগিয়ে দিতুম না।

প্রথম ব্যক্তি। তবে যে আমাদের কে একজন বললে কোথাকার কোন্ একজন স্বামী এসেছে।

সন্ন্যাসী। যদি-বা এসে থাকে তাকে দিয়ে তোমাদের কোনো কাজ হবে না।

দ্বিতীয় ব্যক্তি। কেন? সে ভণ্ড না কি?

সন্ন্যাসী। তা নয় তো কী?

তৃতীয় ব্যক্তি। বাবা, তোমার চেহারাটি কিন্তু ভালো। তুমি মন্ত্রতন্ত্র কিছু শিখেছ?

সন্ন্যাসী। শেখবার ইচ্ছা তো আছে কিন্তু শেখায় কে?

তৃতীয় ব্যক্তি। একটি লোক আছে বাবা—সে থাকে ভৈরবপুরে, লোকটা বেতাল-সিদ্ধ। একটি লোকের ছেলে মারা যাচ্ছিল, তার বাপ এসে ধরে পড়তেই লোকটা করলে কী, সেই ছেলেটার প্রাণপুরুষকে একটা নেকড়ে বাঘের মধ্যে চালান করে দিলে। বললে বিশ্বাস করবে না, ছেলেটা ম'লো বটে কিন্তু নেকড়েটা আজও দিব্যি বেঁচে আছে। না, হাসছ কী, আমার সম্বন্ধী স্বচক্ষে দেখে এসেছে। সেই নেকড়েটাকে মারতে গেলে বাপ লাঠি হাতে ছুটে আসে। তাকে দুবেলা ছাগল খাইয়ে লোকটা ফতুর হয়ে গেল। বিদ্যে যদি শিখতে চাও তো সেই সন্ন্যাসীর কাছে যাও।

প্রথম ব্যক্তি। ওরে চল্ রে বেলা হয়ে গেল। সন্ন্যাসী ফন্ন্যাসি সব মিথ্যে। সে-কথা আমি তো তখনই বলেছিলেম। আজকালকার দিনে কি আর সে-রকম যোগবল আছে।

দ্বিতীয় ব্যক্তি। সে তো সত্যি। কিন্তু আমাকে যে কালুর মা বললে তার ভাগনে নিজের চক্ষে দেখে এসেছে সন্ন্যাসী একটান গাঁজা টেনে কলকেটা যেমনি উপুড় করলে অমনি তার মধ্যে থেকে এক ভাঁড় মদ আর একটা আস্ত মড়ার মাথার খুলি বেরিয়ে পড়ল।

তৃতীয় ব্যক্তি। বল কী, নিজের চক্ষে দেখেছে?

দ্বিতীয় ব্যক্তি। হাঁ রে, নিজের চক্ষে বই কি।

তৃতীয় ব্যক্তি। আছে রে আছে, সিদ্ধপুরুষ আছে; ভাগ্যে যদি থাকে তবে তো দর্শন পাব। তা চল্ না ভাই, কোন্‌দিকে গেল একবার দেখে আসি গে। [প্রস্থান

লক্ষেশ্বরের প্রবেশ

লক্ষেশ্বর। দেখো ঠাকুর, তোমার মন্তর যদি ফিরিয়ে না নাও তো ভালো হবে না বলছি। কী মুশকিলেই ফেলেছ, আমার হিসাবের খাতা মাটি হয়ে গেল। একবার

মনটা বলে যাই সোনার পদ্মর খোঁজে,আবার বলি থাক গে ও-সব বাজে কথা। একবার মনে ভাবি, এবার বুঝি তবে ঠাকুরদাই জিতলে বা, আবার ভাবি মরুক গে ঠাকুরদা। ঠাকুর, এ তো ভালো কথা নয়। চেলা-ধরা ব্যবসা দেখছি তোমার। কিন্তু সে হবে না, কোনোমতেই হবে না। চুপ করে হাসছ কী। আমি বলছি আমাকে পারবে না— আমার শক্ত হাড়। লক্ষেশ্বর কোনোদিন তোমার চেলাগিরিতে ভিড়বে না। [প্রস্থান

ফুল লইয়া ছেলেদের সঙ্গে শেখরের প্রবেশ

সন্ন্যাসী। এবার অর্ঘ্য সাজানো যাক। এ যে টগর, এই বুঝি মালতী, শেফালিকাও অনেক এনেছ দেখছি। সমস্তই শুভ্র, শুভ্র, শুভ্র। এবারে সকলে মিলে শারদোৎসবের আবাহন গানটি ধরো। কবি, তুমি ধরিয়ে দাও। ঠাকুরদা, তুমিও যোগ দিয়ো।

গান

আমরা বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ, আমরা
গেঁথেছি শেফালি মালা।
নবীন ধানের মঞ্জরী দিয়ে
সাজিয়ে এনেছি ডালা।
এস গো শারদলক্ষ্মী, তোমার
শুভ্র মেঘের রথে,
এস নির্মল নীল পথে,
এস ধৌত শ্যামল আলো-ঝলমল
বনগিরি পর্বতে।
এস মুকুটে পরিয়া শ্বেত শতদল
শীতল শিশির-ঢালা॥
ঝরা মালতীর ফুলে
আসন-বিছানো নিভৃত কুঞ্জে
ভরা গঙ্গার কূলে,
ফিরিছে মরাল ডানা পাতিবারে
তোমার চরণমূলে।
গুঞ্জর তান তুলিয়ো তোমার
সোনার বীণার তারে
মৃদু মধু ঝংকারে,

হাসিঢালা সুর গলিয়া পড়িবে
ক্ষণিক অশ্রুধারে।
রহিয়া রহিয়া যে পরশমণি
ঝলকে অলককোণে,
পলকের তরে সকরুণ করে
বুলায়ো বুলায়ো মনে।
সোনা হয়ে যাবে সকল ভাবনা,
আঁধার হইবে আলা॥

শেখর। পৌঁছেছে, গান আকাশের পারে গিয়ে পৌঁছেছে। দ্বার খুলেছে তাঁর। দেখতে পাচ্ছ কি, শারদা বেরিয়েছেন। দেখতে পাচ্ছ না? আচ্ছা তাহলে আগে ধ্যানের গানটি গেয়ে নিই।

গান

লেগেছে অমল ধবল পালে মন্দ মধুর হাওয়া।
দেখি নাই কভু দেখি নাই এমন তরণী বাওয়া।
কোন্ সাগরের পার হতে আনে
কোন্ সুদূরের ধন।
ভেসে যেতে চায় মন,
ফেলে যেতে চায় এই কিনারায়
সব চাওয়া সব পাওয়া।
পিছনে ঝরিছে ঝর ঝর জল
গুরু গুরু দেয়া ডাকে,
মুখে এসে পড়ে অরুণ কিরণ
ছিন্ন মেঘের ফাঁকে।
ওগো কাণ্ডারী, কে গো তুমি, কার
হাসিকান্নার ধন।
ভেবে মরে মোর মন
কোন্ সুরে আজ বাঁধিবে যন্ত্র
কী মন্ত্র হবে গাওয়া॥

এবারে আর দেখতে পাই নি বলবার জো নেই।

প্রথম বালক। কই দেখিয়ে দাও না।

শেখর। ওই যে সাদা মেঘ ভেসে আসছে।

দ্বিতীয় বালক। হাঁ হাঁ ভেসে আসছে।

তৃতীয় বালক। হাঁ আমিও দেখেছি।

শেখর। ওই যে আকাশ ভরে গেল।

প্রথম বালক। কিসে?

শেখর। কিসে! এই তো স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে আলোতে, আনন্দে। বাতাসে শিশিরের পরশ পাচ্ছ না?

দ্বিতীয় বালক। হাঁ পাচ্ছি।

শেখর। তবে আর কী! চক্ষু সার্থক হয়েছে, শরীর পবিত্র হয়েছে, মন প্রশান্ত হয়েছে। এসেছেন, এসেছেন, আমাদের মাঝখানেই এসেছেন। দেখছ না বেতসিনী নদীর ভাবটা। আর ধানের খেত কী রকম চঞ্চল হয়ে উঠেছে। এবার বরণের গানটা ধরিয়ে দিই। গাও।

গান

আমার নয়ন-ভুলানো এলে।
আমি কী হেরিলাম হৃদয় মেলে।

শেখর। সমস্ত বনে বনে নদীর ধারে ধারে গেয়ে আসি গে।

[ছেলেদের লইয়া গাহিতে গাহিতে শেখরের প্রস্থান

লক্ষেশ্বরের প্রবেশ

ঠাকুরদাদা। এ কী হল! লখা গেরুয়া ধরেছে যে।

লক্ষেশ্বর। সন্ন্যাসী ঠাকুর, এবার আর কথা নেই। আমি তোমারই চেলা। এই নাও আমার গজমোতির কৌটো—এই আমার মণিমাণিক্যের পেটিকা তোমারই কাছে রইল। দেখো ঠাকুর, সাবধানে রেখো।

সন্ন্যাসী। তোমার এমন মতি কেন হল লক্ষেশ্বর?

লক্ষেশ্বর। সহজে হয় নি প্রভু! সম্রাট বিজয়াদিত্যের সৈন্য আসছে। এবার আমার ঘরে কি আর কিছু থাকবে? তোমার গায়ে তো কেউ হাত দিতে পারবে না, এ-সমস্ত তোমার কাছেই রাখলেম। তোমার চেলাকে তুমি রক্ষা করো বাবা, আমি তোমার শরণাগত।

সোমপালের প্রবেশ

সোমপাল। সন্ন্যাসী ঠাকুর।

সন্ন্যাসী। বসো, বসো, তুমি যে হাঁপিয়ে পড়েছ। একটু বিশ্রাম করো।

সোমপাল। বিশ্রাম করবার সময় নেই। ঠাকুর, চরের মুখে সংবাদ পাওয়া গেল যে, বিজয়াদিত্যের পতাকা দেখা দিয়েছে—তাঁর সৈন্যদল আসছে।

সন্ন্যাসী। বল কী। বোধ হয় শরৎকালের আনন্দে তাঁকে আর ঘরে টিঁকতে দেয় নি। তিনি রাজ্যবিস্তার করতে বেরিয়েছেন।

সোমপাল। কী সর্বনাশ। রাজ্যবিস্তার করতে বেরিয়েছেন!

সন্ন্যাসী। বাবা, এতে দুঃখিত হলে চলবে কেন? তুমিও তো রাজ্যবিস্তার করবার উদ্‌যোগে ছিলে।

সোমপাল। না, সে হল স্বতন্ত্র কথা। তাই বলে আমার এই রাজ্যটুকুতে—তা সে যাই হ'ক, আমি তোমার শরণাগত। এই বিপদ হতে আমাকে বাঁচাতেই হবে, বোধ হয় কোনো দুষ্টলোক তাঁর কাছে লাগিয়েছে যে আমি তাঁকে লঙ্ঘন করতে ইচ্ছা করেছি; তুমি তাঁকে ব'লো সে-কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা, সর্বৈব মিথ্যা। আমি কি এমনি উন্মত্ত? আমার রাজচক্রবর্তী হবার দরকার কী? আমার শক্তিই বা এমন কী আছে?

সন্ন্যাসী। ঠাকুরদা।

ঠাকুরদাদা। কী প্রভু?

সন্ন্যাসী। দেখো, আমি গেরুয়া পরে এবং গুটিকতক ছেলেকে মাত্র নিয়ে শারদোৎসব কেমন জমিয়ে তুলেছিলেম আর ওই চক্রবর্তী সম্রাটটা তার সমস্ত সৈন্যসামন্ত নিয়ে এমন দুর্লভ উৎসব কেবল নষ্টই করতে পারে। লোকটা কী-রকম দুর্ভাগা দেখেছ।

সোমপাল। চুপ করো, চুপ করো ঠাকুর। কে আবার কোন্ দিক থেকে শুনতে পাবে।

সন্ন্যাসী। ওই বিজয়াদিত্যের পরে আমার—

সোমপাল। আরে চুপ, চুপ। তুমি সর্বনাশ করবে দেখছি। তাঁর প্রতি তোমার মনের ভাব যাই থাক সে তুমি মনেই রেখে দাও।

সন্ন্যাসী। তোমার সঙ্গে পূর্বেও তো সে-বিষয়ে কিছু আলোচনা হয়ে গেছে।

সোমপাল। কী মুশকিলেই পড়লেম। সে-সব কথা কেন ঠাকুর, সে এখন থাক্ না। ওহে লক্ষেশ্বর, তুমি এখানে বসে বসে কী শুনছ। এখান থেকে যাও না।

লক্ষেশ্বর। মহারাজ, যাই এমন আমার সাধ্য কী আছে। একেবারে পাথর দিয়ে চেপে রেখেছে। যমে না নড়ালে আমার আর নড়চড় নেই। নইলে মহারাজের সামনে আমি যে ইচ্ছাসুখে বসে থাকি এমন আমার স্বভাবই নয়।

বিজয়াদিত্যের অমাত্যগণের প্রবেশ

মন্ত্রী। জয় হ'ক মহারাজাধিরাজচক্রবর্তী বিজয়াদিত্য। [ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম

সোমপাল। আরে করেন কী, করেন কী। আমাকে পরিহাস করছেন নাকি। আমি বিজয়াদিত্য নই। আমি তাঁর চরণাশ্রিত সামন্ত সোমপাল।

মন্ত্রী। মহারাজ, সময় তো অতীত হয়েছে এক্ষণে রাজধানীতে ফিরে চলুন।

সন্ন্যাসী। ঠাকুরদা, পূর্বেই তো বলেছিলেম পাঠশালা ছেড়ে পালিয়েছি কিন্তু গুরুমশায় পিছন পিছন তাড়া করেছেন।

ঠাকুরদাদা। প্রভু এ কী কাণ্ড। আমি তো স্বপ্ন দেখছি নে!

সন্ন্যাসী। স্বপ্ন তুমিই দেখছ কি এঁরাই দেখছেন তা নিশ্চয় করে কে বলবে?

ঠাকুরদাদা। তবে কি—

সন্ন্যাসী। হাঁ, এঁরা কয়জনে আমাকে বিজয়াদিত্য বলেই তো জানেন।

ঠাকুরদাদা। প্রভু, আমিই তো তবে জিতেছি। এই কয়দণ্ডে আমি তোমার যে পরিচয়টি পেয়েছি তা এঁরা পর্যন্ত পান নি। কিন্তু বড়ো সংকটে ফেললে তো ঠাকুর।

লক্ষেশ্বর। আমিও বড়ো সংকটে পড়েছি মহারাজ। আমি সম্রাটের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে সন্ন্যাসীর হাতে ধরা দিয়েছি, এখন আমি যে কার হাতে আছি সেটা ভেবেই পাচ্ছি নে।

সোমপাল। মহারাজ দাসকে কি পরীক্ষা করতে বেরিয়েছিলেন?

সন্ন্যাসী। না সোমপাল, আমি নিজের পরীক্ষাতেই বেরিয়েছিলেম।

সোমপাল। মহারাজ, আপনি যে শরতের বিজয়যাত্রায় বেরিয়েছেন আজ তার পরিচয় পাওয়া গেল। আজ আমার হার মেনে আনন্দ।

উপনন্দের প্রবেশ

উপনন্দ। ঠাকুর। এ কী, রাজা যে। এরা সব কারা। [পলায়নোদ্যম

সন্ন্যাসী। এস, এস, বাবা, এস। কি বলছিলে বলো। (উপনন্দ নিরুত্তর) এঁদের সামনে বলতে লজ্জা করছ? আচ্ছা, তবে সোমপাল একটু অবসর নাও। তোমরাও—

উপনন্দ। সে কী কথা। ইনি যে আমাদের রাজা, এঁর কাছে আমাকে অপরাধী ক'রো না। আমি তোমাকে বলতে এসেছিলেম এই কদিন পুঁথি লিখে আজ তার পারিশ্রমিক তিন কাহন পেয়েছি। এই দেখো।

সন্ন্যাসী। আমার হাতে দাও বাবা। তুমি ভাবছ এই তোমার বহুমূল্য তিন কার্যাপণ আমি লক্ষেশ্বরের হাতে ঋণশোধের জন্য দেব? এ আমি নিজে নিলেম। আমি এখানে শারদার উৎসব করেছি এ আমার তারই দক্ষিণা। কী বল বাবা!

উপনন্দ। ঠাকুর তুমি নেবে?

সন্ন্যাসী। নেব বই কি। তুমি ভাবছ সন্ন্যাসী হয়েছি বলেই আমার কিছুতে লোভ নেই? এ-সব জিনিসে আমার ভারি লোভ।

লক্ষেশ্বর। সর্বনাশ! তবেই হয়েছে। ডাইনের হাতে পুত্র সমর্পণ করে বসে আছি দেখছি।

সন্ন্যাসী। ওগো শ্রেষ্ঠী।

শ্রেষ্ঠী। আদেশ করুন।

সন্ন্যাসী। এই লোকটিকে হাজার কার্যাপণ গুনে দাও।

শ্রেষ্ঠী। যে আদেশ।

উপনন্দ। তবে ইনিই কি আমাকে কিনে নিলেন?

সন্ন্যাসী। উনি তোমাকে কিনে নেন ওঁর এমন সাধ্য কী। তুমি আমার।

উপনন্দ। (পা জড়াইয়া ধরিয়া) আমি কোন্ পুণ্য করেছিলেম যে আমার এমন ভাগ্য হল।

সন্ন্যাসী। ওগো সুভূতি।

মন্ত্রী। আজ্ঞা।

সন্ন্যাসী। আমার পুত্র নেই বলে তোমরা সর্বদা আক্ষেপ করতে। এবারে সন্ন্যাসধর্মের জোরে এই পুত্রটি লাভ করেছি।

লক্ষেশ্বর। হায় হায় আমার বয়স বেশি হয়ে গেছে বলে কী সুযোগটাই পেরিয়ে গেল।

মন্ত্রী। বড়ো আনন্দ। তা ইনি কোন্ রাজগৃহে—

সন্ন্যাসী। ইনি যে-গৃহে জন্মেছেন সে গৃহে জগতের অনেক বড়ো বড়ো বীর জন্মগ্রহণ করেছেন—পুরাণ ইতিহাস খুঁজে সে আমি তোমাকে পরে দেখিয়ে দেব। লক্ষেশ্বর।

লক্ষেশ্বর। কী আদেশ।

সন্ন্যাসী। বিজয়াদিত্যের হাত থেকে তোমার মণিমাণিক্য আমি রক্ষা করেছি এই তোমাকে ফিরে দিলেম।

লক্ষেশ্বর। মহারাজ, যদি গোপনে ফিরিয়ে দিতেন তাহলেই যথার্থ রক্ষা করতেন, এখন রক্ষা করে কে?

সন্ন্যাসী। এখন বিজয়াদিত্য স্বয়ং রক্ষা করবেন, তোমার ভয় নেই। কিন্তু তোমার কাছে আমার কিছু প্রাপ্য আছে।

লক্ষেশ্বর। সর্বনাশ করলে।

সন্ন্যাসী। ঠাকুরদা সাক্ষী আছেন।

লক্ষেশ্বর। এখন সকলেই মিথ্যে সাক্ষ্য দেবে।

সন্ন্যাসী। আমাকে ভিক্ষা দিতে চেয়েছিলে। তোমার কাছে এক মুঠো চাল পাওনা আছে। রাজার মুষ্টি কি ভরাতে পারবে?

লক্ষেশ্বর। মহারাজ, আমি সন্ন্যাসীর মুষ্টি দেখেই কথাটা পেড়েছিলেম।

সন্ন্যাসী। তবে তোমার ভয় নেই, যাও।

লক্ষেশ্বর। মহারাজ, ইচ্ছে করেন যদি তবে এইবার কিছু উপদেশ দিতে পারেন।

সন্ন্যাসী। এখনও দেরি আছে।

লক্ষেশ্বর। তবে প্রণাম হই। চারদিকে সকলেই কৌটোটার দিকে বড্ড তাকাচ্ছে। [প্রস্থান

সন্ন্যাসী। রাজা সোমপাল, তোমার কাছে আমার একটি প্রার্থনা আছে।

সোমপাল। সে কী কথা! সমস্তই মহারাজের, যে আদেশ করবেন,—

সন্ন্যাসী। তোমার রাজ্য থেকে আমি একটি বন্দী নিয়ে যেতে চাই।

সোমপাল। যাকে ইচ্ছা নাম করুন সৈন্য পাঠিয়ে দিচ্ছি। না হয় আমি নিজেই যাব।

সন্ন্যাসী। বেশি দূরে পাঠাতে হবে না। (ঠাকুরদাদাকে দেখাইয়া) তোমার এই প্রজাটিকে চাই।

সোমপাল। কেবল মাত্র এঁকে! মহারাজ যদি ইচ্ছা করেন তবে আমার রাজ্যে যে শ্রুতিধর স্মৃতিভূষণ আছেন তাঁকে আপনার সভায় নিয়ে যেতে পারেন।

সন্ন্যাসী। না, অত বড়ো লোককে নিয়ে আমার সুবিধা হবে না আমি এঁকেই চাই। আমার প্রাসাদে অনেক জিনিস আছে কেবল বয়স্য নেই।

ঠাকুরদাদা। বয়সে মিলবে না প্রভু, গুণেও না; তবে কিনা ভক্তি দিয়ে সমস্ত অমিল ভরিয়ে তুলতে পারব এই ভরসা আছে।

সন্ন্যাসী। ঠাকুরদা, সময় খারাপ হলে বন্ধুরা পালায় তাই তো দেখছি। আমার উৎসবের বন্ধুরা এখন সব কোথায়? রাজদ্বারের গন্ধ পেয়েই দৌড় দিয়েছে না কি।

ঠাকুরদাদা। কারও পালাবার পথ কি রেখেছ? আটঘাট ঘিরে ফেলেছ যে। ওই আসছে।

শেখরের সঙ্গে বালকগণের প্রবেশ

সকলে। সন্ন্যাসী ঠাকুর, সন্ন্যাসী ঠাকুর।

সন্ন্যাসী। (উঠিয়া দাঁড়াইয়া) এস, বাবা, সব এস।

সকলে। এ কী! এ যে রাজা। আরে পালা, পালা। [পলায়নোদ্যম।

ঠাকুরদাদা। আরে পালাস নে পালাস নে।

সন্ন্যাসী। তোমরা পালাবে কি, উনিই পালাচ্ছেন। যাও সোমপাল, সভা প্রস্তুত করো গে, আমি যাচ্ছি।

সোমপাল। যে আদেশ। [প্রস্থান

বালকেরা। আমরা বনে পথে সব জায়গায় গেয়ে গেয়ে এসেছি এইবার এখানে গান শেষ করি।

শেখর। হাঁ ভাই, তোরা ঠাকুরকে প্রদক্ষিণ করে করে গান গা।

সকলের গান

আমার নয়ন-ভুলানো এলে।
আমি কী হেরিলাম হৃদয় মেলে।
শিউলিতলার পাশে পাশে,
ঝরা ফুলের রাশে রাশে,
শিশির-ভেজা ঘাসে ঘাসে
অরুণরাঙা চরণ ফেলে
নয়ন-ভুলানো এলে।
আলোছায়ার আঁচলখানি
লুটিয়ে পড়ে বনে বনে,
ফুলগুলি ঐ মুখে চেয়ে
কী কথা কয় মনে মনে।
তোমায় মোরা করব বরণ,
মুখের ঢাকা করো হরণ,
ঐটুকু ঐ মেঘাবরণ
দু-হাত দিয়ে ফেলো ঠেলে।
নয়ন-ভুলানো এলে।

বনদেবীর দ্বারে দ্বারে
শুনি গভীর শঙ্খধ্বনি,
আকাশবীণার তারে তারে
জাগে তোমার আগমনী।
কোথায় সোনার নূপুর বাজে,
বুঝি আমার হিয়ার মাঝে,
সকল ভাবে, সকল কাজে
পাষাণ-গালা সুধা ঢেলে—
নয়ন-ভুলানো এলে।

উপন্যাস ও গল্প

চার অধ্যায়

চার অধ্যায়

ভূমিকা

এলার মনে পড়ে তার জীবনের প্রথম সূচনা বিদ্রোহের মধ্যে। তার মা মায়াময়ীর ছিল বাতিকের ধাত, তাঁর ব্যবহারটা বিচার-বিবেচনার প্রশস্ত পথ ধরে চলতে পারত না। বেহিসাবি মেজাজের অসংযত ঝাপটায় সংসারকে তিনি যখন-তখন ক্ষুব্ধ করে তুলতেন, শাসন করতেন অন্যায় করে, সন্দেহ করতেন অকারণে। মেয়ে যখন অপরাধ অস্বীকার করত, ফস করে বলতেন, মিথ্যে কথা বলছিস। অথচ অবিমিশ্র সত্যকথা বলা মেয়ের একটা ব্যসন বললেই হয়। এজন্যেই সে শাস্তি পেয়েছে সব-চেয়ে বেশি। সকল রকম অবিচারের বিরুদ্ধে অসহিষ্ণুতা তার স্বভাবে প্রবল হয়ে উঠেছে। তার মার কাছে মনে হয়েছে, এইটেই স্ত্রীধর্মনীতির বিরুদ্ধ।

একটা কথা সে বাল্যকাল থেকে বুঝেছে যে, দুর্বলতা অত্যাচারের প্রধান বাহন। ওদের পরিবারে যে-সকল আশ্রিত অন্নজীবী ছিল, যারা পরের অনুগ্রহ-নিগ্রহের সংকীর্ণ বেড়া-দেওয়া ক্ষেত্রের মধ্যে নিঃসহায়ভাবে আবদ্ধ তারাই কলুষিত করেছে ওদের পরিবারের আবহাওয়াকে, তারাই ওর মায়ের অন্ধ প্রভুত্বচর্চাকে বাধাবিহীন করে তুলেছে। এই অস্বাস্থ্যকর অবস্থার প্রতিক্রিয়ারূপেই ওর মনে অল্পবয়স থেকেই স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা এত দুর্দাম হয়ে উঠেছিল।

এলার বাপ নরেশ দাশগুপ্ত সাইকলজিতে বিলিতি বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিগ্রি নিয়ে এসেছেন। তীক্ষ্ণ তাঁর বৈজ্ঞানিক বিচারশক্তি, অধ্যাপনায় তিনি বিশেষভাবে যশস্বী। প্রাদেশিক প্রাইভেট কলেজে তিনি স্থান নিয়েছেন যেহেতু সেই প্রদেশে তাঁর জন্ম, সাংসারিক উন্নতির দিকে তাঁর লোভ কম, সে-সম্বন্ধে দক্ষতাও সামান্য। ভুল করে লোককে বিশ্বাস করা ও বিশ্বাস করে নিজের ক্ষতি করা বারবারকার অভিজ্ঞতাতেও তাঁর শোধন হয় নি। ঠকিয়ে কিংবা অনায়াসে যারা উপকার আদায় করে তাদের কৃতঘ্নতা সব-চেয়ে অকরুণ। যখন সেটা প্রকাশ পেত সেটাকে মনস্তত্ত্বের বিশেষ তথ্য বলে মানুষটি অনায়াসে স্বীকার করে নিতেন, মনে বা মুখে নালিশ করতেন না। বিষয়বুদ্ধির ত্রুটি নিয়ে স্ত্রীর কাছে কখনো তিনি ক্ষমা পান নি, খোঁটা খেয়েছেন প্রতিদিন। নালিশের কারণ অতীতকালবর্তী হলেও তাঁর স্ত্রী কখনো ভুলতে পারতেন না, যখন-তখন তীক্ষ্ণ খোঁচায় উসকিয়ে দিয়ে তার দাহকে ঠাণ্ডা হতে দেওয়া অসাধ্য করে তুলতেন।

বিশ্বাসপরায়ণ ঔদার্যগুণেই তার বাপকে কেবলই ঠকতে ও দুঃখ পেতে দেখে বাপের উপর এলার ছিল সদাব্যথিত স্নেহ—যেমন সকরুণ স্নেহ মায়ের থাকে অবুঝ বালকের 'পরে। সব-চেয়ে তাকে আঘাত করত যখন মায়ের কলহের ভাষায় তীব্র ইঙ্গিত থাকত যে, বুদ্ধিবিবেচনায় তিনি তাঁর স্বামীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ। এলা নানা উপলক্ষ্যে মায়ের কাছে তার বাবার অসম্মান দেখতে পেয়েছে, তা নিয়ে নিষ্ফল আক্রোশে চোখের জলে রাত্রে তার বালিশ গেছে ভিজে। এ-রকম অতিমাত্র ধৈর্য অন্যায় বলে এলা অনেক সময় তার বাবাকে মনে মনে অপরাধী না করে থাকতে পারে নি।

অত্যন্ত পীড়িত হয়ে একদিন এলা বাবাকে বলেছিল, "এ-রকম অন্যায় চুপ করে সহ্য করাই অন্যায়।"

নরেশ বললেন, "স্বভাবের প্রতিবাদ করাও যা আর তপ্ত লোহায় হাত বুলিয়ে তাকে ঠাণ্ডা করতে যাওয়াও তাই, তাতে বীরত্ব থাকতে পারে কিন্তু আরাম নেই।"

"চুপ করে থাকাতে আরাম আরও কম"—বলে এলা দ্রুত চলে গেল।

এদিকে সংসারে এলা দেখতে পায়, যারা মায়ের মন জুগিয়ে চলবার কৌশল জানে তাদের চক্রান্তে নিষ্ঠুর অন্যায় ঘটে অপরাধহীনের প্রতি। এলা সইতে পারে না, উত্তেজিত হয়ে সত্য প্রমাণ উপস্থিত করে বিচারকর্ত্রীর সামনে। কিন্তু কর্তৃত্বের অহমিকার কাছে অকাট্য যুক্তিই দুঃসহ স্পর্ধা। অনুকূল ঝ'ড়ো হাওয়ার মতো তাতে বিচারের নৌকো এগিয়ে দেয় না, নৌকো দেয় কাত করে।

এই পরিবারে আরও একটি উপসর্গ ছিল যা এলার মনকে নিয়ত আঘাত করেছে। সে তার মায়ের শুচিবায়ু। একদিন কোনো মুসলমান অভ্যাগতকে বসবার জন্যে এলা মাদুর পেতে দিয়েছিল—সে মাদুর মা ফেলে দিলেন, গালচে দিলে দোষ হত না। এলার তার্কিক মন, তর্ক না করে থাকতে পারে না। বাবাকে একদিন জিজ্ঞাসা করলে, "আচ্ছা এই সব ছোঁয়াছুঁয়ি নাওয়াখাওয়া নিয়ে কটকেনা মেয়েদেরই কেন এত পেয়ে বসে? এতে হৃদয়ের তো স্থান নেই, বরং বিরুদ্ধতা আছে; এ তো কেবল যন্ত্রের মতো অন্ধভাবে মেনে চলা।" সাইকলজিস্ট বাবা বললেন, "মেয়েদের হাজার বছরের হাতকড়ি-লাগানো মন; তারা মানবে, প্রশ্ন করবে না,—এইটেতেই সমাজ-মনিবের কাছে বকশিশ পেয়েছে, সেইজন্যে মানাটা যত বেশি অন্ধ হয় তার দাম তাদের কাছে তত বড়ো হয়ে ওঠে। মেয়েলি পুরুষদেরও এই দশা।" আচারের নিরর্থকতা সম্বন্ধে এলা বারবার মাকে প্রশ্ন না করে থাকতে পারে নি, বারবার তার উত্তর পেয়েছে ভর্ৎসনায়। নিয়ত এই ধাক্কায় এলার মন অবাধ্যতার দিকে ঝুঁকে পড়েছে।

নরেশ দেখলেন পারিবারিক এই সব দ্বন্দ্বে মেয়ের শরীর খারাপ হয়ে উঠছে, সেটা

তাঁকে অত্যন্ত বাজল। এমন সময় একদিন এলা একটা বিশেষ অবিচারে কঠোরভাবে আহত হয়ে নরেশের কাছে এসে জানাল, "বাবা, আমাকে কলকাতায় বোর্ডিঙে পাঠাও। প্রস্তাবটা তাদের দুজনের পক্ষেই দুঃখকর, কিন্তু বাপ অবস্থা বুঝলেন, এবং মায়াময়ীর দিক থেকে প্রতিকূল ঝঞ্ঝাঘাতের মধ্যেও এলাকে পাঠিয়ে দিলেন দূরে। আপন নিষ্করুণ সংসারে নিমগ্ন হয়ে রইলেন অধ্যয়ন-অধ্যাপনায়।

মা বললেন, "শহরে পাঠিয়ে মেয়েকে মেমসাহেব বানাতে চাও তো বানাও কিন্তু ওই তোমার আদুরে মেয়েকে প্রাণান্ত ভুগতে হবে শ্বশুরঘর করবার দিনে। তখন আমাকে দোষ দিয়ো না।" মেয়ের ব্যবহারে কলিকালোচিত স্বাতন্ত্র্যের দুর্লক্ষণ দেখে এই আশঙ্কা তার মা বারবার প্রকাশ করেছেন। এলা তার ভাবী শাশুড়ীর হাড় জ্বালাতন করবে সেই সম্ভাবনা নিশ্চিত জেনে সেই কাল্পনিক গৃহিণীর প্রতি তাঁর অনুকম্পা মুখর হয়ে উঠত। এর থেকে মেয়ের মনে ধারণা দৃঢ় হয়েছিল যে, বিয়ের জন্যে মেয়েদের প্রস্তুত হতে হয় আত্মসম্মানকে পঙ্গু করে, ন্যায়-অন্যায়বোধকে অসাড় করে দিয়ে।

এলা যখন ম্যাট্রিক পার হয়ে কলেজে প্রবেশ করেছে তখন মায়ের মৃত্যু হল। নরেশ মাঝে মাঝে বিয়ের প্রস্তাবে মেয়েকে রাজি করতে চেষ্টা করেছেন। এলা অপূর্ব-সুন্দরী, পাত্রের তরফে প্রার্থীর অভাব ছিল না, কিন্তু বিবাহের প্রতি বিমুখতা তার সংস্কারগত। মেয়ে পরীক্ষাগুলো পাস করলে, তাকে অবিবাহিত রেখেই বাপ গেলেন মারা।

সুরেশ ছিল তাঁর কনিষ্ঠ ভাই। নরেশ এই ভাইকে মানুষ করেছেন, শেষ পর্যন্ত পড়িয়েছেন খরচ দিয়ে। দু-বছরের মতো তাকে বিলেতে পাঠিয়ে স্ত্রীর কাছে লাঞ্ছিত এবং মহাজনের কাছে ঋণী হয়েছেন। সুরেশ এখন ডাকবিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারী। কর্ম উপলক্ষ্যে ঘুরতে হয় নানা প্রদেশে। তাঁরই উপর পড়ল এলার ভার। একান্ত যত্ন করেই ভার নিলেন।

সুরেশের স্ত্রীর নাম মাধবী। তিনি যে-পরিবারের মেয়ে সে-পরিবারে স্ত্রীলোকদের পরিমিত পড়াশুনোই ছিল প্রচলিত; তার পরিমাণ মাঝারি মাপের চেয়ে কম বই বেশি নয়। স্বামী বিলেত থেকে ফিরে এসে উচ্চপদ নিয়ে দূরে দূরে যখন ঘুরতেন তখন তাঁকে বাইরের নানা লোকের সঙ্গে সামাজিকতা করতে হত। কিছুদিন অভ্যাসের পরে মাধবী নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণে বিজাতীয় লৌকিকতা পালন করতে অভ্যস্ত হয়েছিলেন। এমন কি, গোরাদের ক্লাবেও পঙ্গু ইংরেজি ভাষাকে সকারণ ও অকারণ হাসির দ্বারা পূরণ করে কাজ চালিয়ে আসতে পারতেন।

এমন সময় সুরেশ কোনো প্রদেশের বড়ো শহরে যখন আছেন এলা এল তাঁর ঘরে; রূপে গুণে বিদ্যায় কাকার মনে গর্ব জাগিয়ে তুললে। ওঁর উপরিওআলা বা সহকর্মী

এবং দেশী ও বিলিতি আলাপী-পরিচিতদের কাছে নানা উপলক্ষ্যে এলাকে প্রকাশিত করবার জন্যে তিনি ব্যগ্র হয়ে উঠলেন। এলার স্ত্রীবুদ্ধিতে বুঝতে বাকি রইল না যে, এর ফল ভালো হচ্ছে না। মাধবী মিথ্যা আরামের ভান করে ক্ষণে ক্ষণে বলতে লাগলেন, "বাঁচা গেল—বিলিতি কায়দার সামাজিকতার দায় আমার ঘাড়ে চাপানো কেন বাপু। আমার না আছে বিদ্যে, না আছে বুদ্ধি।" ভাবগতিক দেখে এলা নিজের চারিদিকে প্রায় একটা জেনানা খাড়া করে তুললে। সুরেশের মেয়ে সুরমার পড়াবার ভার সে অতিরিক্ত উৎসাহের সঙ্গে নিলে। একটা থীসিস লিখতে লাগিয়ে দিলে তার বাকি সময়টুকু। বিষয়টা বাংলা মঙ্গলকাব্য ও চসারের কাব্যের তুলনা। এই নিয়ে সুরেশ মহা উৎসাহিত। এই সংবাদটা চারদিকে প্রচার করে দিলেন। মাধবী মুখ বাঁকা করে বললেন, "বাড়াবাড়ি।"

স্বামীকে বললেন, "এলার কাছে কস করে মেয়েকে পড়তে দিলে! কেন, অধর মাস্টার কী দোষ করেছে? যাই বল না আমি কিন্তু—"

সুরেশ অবাক হয়ে বললেন, "কী বল তুমি! এলার সঙ্গে অধরের তুলনা!"

"দুটো নোটবই মুখস্থ করে পাস করলেই বিদ্যে হয় না,"—বলে ঘাড় বেঁকিয়ে গৃহিণী ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেলেন।

একটা কথা স্বামীকে বলতেও তাঁর মুখে বাধে—"সুরমার বয়স তেরো পেরোতে চলল, আজ বাদে কাল পাত্র খুঁজতে দেশ ঝেঁটিয়ে বেড়াতে হবে, তখন এলা সুরমার কাছে থাকলে—ছেলেগুলোর চোখে যে ক্যাকাসে কটা রঙের নেশা—ওরা কি জানে কাকে বলে সুন্দর?" দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেন আর ভাবেন, এ-সব কথা কর্তাকে জানিয়ে ফল নেই, পুরুষরা যে সংসার-কানা।

যত শীঘ্র হয় এলার বিয়ে হয়ে যাক এই চেষ্টায় উঠে পড়ে লাগলেন গৃহিণী। বেশি চেষ্টা করতে হয় না, ভালো ভালো পাত্র আপনি এসে জোটে—এমন সব পাত্র, সুরমার সঙ্গে যাদের সম্বন্ধ ঘটাবার জন্য মাধবী লুব্ধ হয়ে ওঠেন। অথচ এলা তাদের বারে বারে নিরাশ করে ফিরিয়ে দেয়।

ভাইঝির একগুঁয়ে অবিবেচনায় উদ্বিগ্ন হলেন সুরেশ, কাকী হলেন অত্যন্ত অসহিষ্ণু। তিনি জানেন সৎপাত্রকে উপেক্ষা করা সমর্থবয়সের বাঙালি মেয়ের পক্ষে অপরাধ। নানারকম বয়সোচিত দুর্যোগের আশঙ্কা করতে লাগলেন, এবং দায়িত্ববোধে অভিভূত হল তাঁর অন্তঃকরণ। এলা স্পষ্টই বুঝতে পারলে যে, সে তার কাকার স্নেহের সঙ্গে কাকার সংসারের দ্বন্দ্ব ঘটাতে বসেছে।

এমন সময়ে ইন্দ্রনাথ এলেন সেই শহরে। দেশের ছাত্রেরা তাঁকে মানত রাজ-

চক্রবর্তীর মতো। অসাধারণ তাঁর তেজ, আর বিদ্যায় খ্যাতিও প্রভূত। একদিন সুরেশের ওখানে তাঁর নিমন্ত্রণ। সেদিন কোনো এক সুযোগে এলা অপরিচয়সত্ত্বেও অসংকোচে তাঁর কাছে এসে বললে "আমাকে আপনার কোনো একটা কাজ দিতে পারেন না?"

আজকালকার দিনে এ-রকম আবেদন বিশেষ আশ্চর্যের নয় কিন্তু তবু মেয়েটির দীপ্তি দেখে চমক লাগল ইন্দ্রনাথের। তিনি বললেন, "কলকাতায় সম্প্রতি নারায়ণী হাই স্কুল মেয়েদের জন্যে খোলা হয়েছে। তোমাকে তার কর্ত্রীপদ দিতে পারি, প্রস্তুত আছ?"

"প্রস্তুত আছি যদি আমাকে বিশ্বাস করেন।"

ইন্দ্রনাথ এলার মুখের দিকে তাঁর উজ্জ্বল দৃষ্টি রেখে বললেন, "আমি লোক চিনি। তোমাকে বিশ্বাস করতে আমার মুহূর্তকাল বিলম্ব হয় নি। তোমাকে দেখবামাত্রই মনে হয়েছে, তুমি নবযুগের দূতী, নবযুগের আহ্বান তোমার মধ্যে।"

হঠাৎ ইন্দ্রনাথের মুখে এমন কথা শুনে এলার বুকের মধ্যে কেঁপে উঠল।

সে বললে, "আপনার কথায় আমার ভয় হয়। ভুল করে আমাকে বাড়াবেন না। আপনার ধারণার যোগ্য হবার জন্যে দুঃসাধ্য চেষ্টা করতে গেলে ভেঙে পড়ব। আমার শক্তির সীমার মধ্যে যতটা পারি বাঁচিয়ে চলব আপনার আদর্শ, কিন্তু ভান করতে পারব না।"

ইন্দ্রনাথ বললেন, "সংসারের বন্ধনে কোনোদিন বদ্ধ হবে না এই প্রতিজ্ঞা তোমাকে স্বীকার করতে হবে। তুমি সমাজের নও তুমি দেশের।"

এলা মাথা তুলে বললে "এই প্রতিজ্ঞাই আমার।"

কাকা গমনোদ্যত এলাকে বললেন "তোকে আর কোনোদিন বিয়ের কথা বলব না। তুই আমার কাছেই থাক্। এখানেই পাড়ার মেয়েদের পড়াবার ভার নিয়ে একটা ছোটোখাটো ক্লাস খুললে দোষ কী।"

কাকী স্নেহার্দ্র স্বামীর অবিবেচনায় বিরক্ত হয়ে বললেন, "ওর বয়স হয়েছে, ও নিজের দায় নিজেই নিতে চায়, সে ভালোই তো। তুমি কেন বাধা দিতে যাও মাঝের থেকে। তুমি যা-ই মনে কর না কেন, আমি বলে রাখছি ওর ভাবনা আমি ভাবতে পারব না।"

এলা খুব জোর করেই বললে, "আমি কাজ পেয়েছি, কাজ করতেই যাব।"

এলা কাজ করতেই গেল।

এই ভূমিকার পরে পাঁচ বছর উত্তীর্ণ হল, এখন কাহিনী অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়

দৃশ্য—চায়ের দোকান। তারই একপাশে একটি ছোটো ঘর। সেই ঘরে বিক্রির জন্যে সাজানো কিছু স্কুলকালেজপাঠ্য বই, অনেকগুলিই সেকেণ্ডহাণ্ড। কিছু আছে য়ুরোপীয় আধুনিক গল্প-নাটকের ইংরেজি তর্জমা। সেগুলো অল্পবিত্ত ছেলেরা পাত উলটিয়ে পড়ে চলে যায়, দোকানদার আপত্তি করে না। স্বত্বাধিকারী কানাই গুপ্ত, পুলিসের পেনশনভোগী সাবেক সাব-ইনস্পেক্টর।

সামনে সদর রাস্তা, বাঁ পাশ দিয়ে গেছে গলি। যারা নিভৃতে চা খেতে চায় তাদের জন্যে ঘরের এক অংশ ছিন্নপ্রায় চটের পর্দা দিয়ে ভাগ করা। আজ সেইদিকটাতে একটা বিশেষ আয়োজনের লক্ষণ। যথেষ্ট পরিমাণ টুলচৌকির অসদ্ভাব পূরণ করেছে দার্জিলিং চা কোম্পানির মার্কা-মারা প্যাকবাক্স। চায়ের পাত্রেও অগত্যা বৈসাদৃশ্য, তাদের কতকগুলি নীলরঙের এনামেলের, কতকগুলি সাদা চীনামাটির। টেবিলে হাতলভাঙা দুধের জগে ফুলের তোড়া। বেলা প্রায় তিনটে। ছেলেরা এলালতাকে নিমন্ত্রণের সময় নির্দেশ করে দিয়েছিল ঠিক আড়াইটায়। বলেছিল, এক মিনিট পিছিয়ে এলে চলবে না। অসময়ে নিমন্ত্রণ, যেহেতু ঐ সময়টাতেই দোকান শূন্য থাকে। চা-পিপাসুর ভিড় লাগে সাড়ে চারটার পর থেকে। এলা ঠিক সময়েই উপস্থিত। কোথাও ছেলেদের একজনেরও দেখা নেই। একলা বসে তাই ভাবছিল—তবে কি শুনতে তারিখের ভুল হয়েছে। এমন সময় ইন্দ্রনাথকে ঘরে ঢুকতে দেখে চমকে উঠল। এ-জায়গায় তাঁকে কোনোমতেই আশা করা যায় না।

ইন্দ্রনাথ য়ুরোপে কাটিয়েছেন অনেক দিন, বিশেষ খ্যাতি পেয়েছেন সায়ান্সে। যথেষ্ট উঁচুপদে প্রবেশের অধিকার তাঁর ছিল; য়ুরোপীয় অধ্যাপকদের প্রশংসাপত্র ছিল উদার ভাষায়। য়ুরোপে থাকতে ভারতীয় কোনো একজন পোলিটিক্যাল বদনামির সঙ্গে তাঁর কদাচিৎ দেখাসাক্ষাৎ হয়েছিল, দেশে ফিরে এলে তারই লাঞ্ছনা তাঁকে সকল কর্মে বাধা দিতে লাগল। অবশেষে ইংলণ্ডের খ্যাতনামা কোনো বিজ্ঞান-আচার্যের বিশেষ সুপারিশে অধ্যাপনার কাজ পেয়েছিলেন, কিন্তু সে কাজ অযোগ্য অধিনায়কের অধীনে। অযোগ্যতার সঙ্গে ঈর্ষা থাকে প্রখর, তাই তাঁর বৈজ্ঞানিক গবেষণার চেষ্টা উপরওআলার হাত থেকে ব্যাঘাত পেতে লাগল পদে পদে। শেষে এমন জায়গায় তাঁকে বদলি হতে হল যেখানে ল্যাবরেটরি নেই।

বুঝতে পারলেন এদেশে তাঁর জীবনে সর্বোচ্চ অধ্যবসায়ের পথ অবরুদ্ধ। একই প্রদক্ষিণপথে অধ্যাপনার চিরাভ্যস্ত চাকা ঘুরিয়ে অবশেষে কিঞ্চিৎ পেনশন ভোগ করে জীবলীলা সংবরণ করবেন, নিজের এই দুর্গতির আশঙ্কা তিনি কিছুতেই স্বীকার করতে পারলেন না। তিনি নিশ্চিত জানতেন অন্য যে-কোনো দেশে সম্মানলাভের শক্তি তাঁর প্রচুর ছিল।

একদা ইন্দ্রনাথ জার্মান ফরাসি ভাষা শেখাবার একটা প্রাইভেট ক্লাস খুললেন, সেই সঙ্গে ভার নিলেন বটানি ও জিয়লজিতে কালেজের ছাত্রদের সাহায্য করবার। ক্রমে এই ক্ষুদ্র অনুষ্ঠানের গোপন তলদেশ বেয়ে একটা অপ্রকাশ্য সাধনার জটিল শিকড় জেলখানার প্রাঙ্গণের মাঝখান দিয়ে ছড়িয়ে পড়ল বহুদূরে।

ইন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করলেন, "এলা, তুমি যে এখানে ?"

এলা বললে, "আপনি আমার বাড়িতে ওদের যাওয়া নিষেধ করেছেন সেইজন্যে ছেলেরা এখানেই আমাকে ডেকেছে।"

"সে খবর আগেই পেয়েছি। পেয়েই জরুর তাদের অন্যত্র কাজে লাগিয়ে দিলুম। ওদের সকলের হয়ে অ্যাপলজি করতে এসেছি। বিলও শোধ করে দেব।"

"কেন আপনি আমার নিমন্ত্রণ ভেঙে দিলেন ?"

"ছেলেদের সঙ্গে তোমার সহৃদয়তার সম্পর্ক আছে সেই কথাটা চাপা দেবার জন্যে। কাল দেখতে পাবে তোমার নাম করে একটা প্রবন্ধ কাগজে পাঠিয়ে দিয়েছি।"

"আপনি লিখেছেন ? আপনার কলমে বেনামি চলে না ; লোকে ওটাকে অকৃত্রিম বলে বিশ্বাস করবে না।"

"বাঁ হাত দিয়ে কাঁচা করে লেখা ; বুদ্ধির পরিচয় নেই, সদুপদেশ আছে।"

"কী রকম ?"

"তুমি লিখছ—ছেলেরা অকালবোধনে দেশকে মারতে বসেছে। বঙ্গনারীদের কাছে তোমার সকরুণ আপিল এই যে, তারা যেন লক্ষ্মীছাড়াদের মাথা ঠাণ্ডা করে। বলেছ—দূর থেকে ভর্ৎসনা করলে কানে পৌঁছোবে না। ওদের মাঝখানে গিয়ে পড়তে হবে, যেখানে ওদের নেশার আড্ডা। শাসনকর্তাদের সন্দেহ হতে পারে, তা হ'ক। বলেছ—তোমরা মায়ের জাত ; ওদের শাস্তি নিজে নিয়েও যদি ওদের বাঁচাতে পার,. মরণ সার্থক হবে। আজকাল সর্বদাই বলে থাক—তোমরা মায়ের জাত, ওই কথাটাকে লবণাম্বুতে ভিজিয়ে লেখার মধ্যে বসিয়ে দিয়েছি। মাতৃবৎসল পাঠকের চোখে জল আসবে। যদি তুমি পুরুষ হতে, এর পরে রায়বাহাদুর পদবী পাওয়া অসম্ভব হত না।"

"আপনি যা লিখেছেন সেটা যে একেবারেই আমার কথা হতে পারে না তা আমি বলব না। এই সর্বনেশে ছেলেগুলোকে আমি ভালোবাসি—অমন ছেলে আছে কোথায়! একদিন ওদের সঙ্গে কালেজে পড়েছি। প্রথম প্রথম ওরা আমার নামে বোর্ডে লিখেছে যা-তা—পিছন থেকে ছোটো এলাচ বলে চেঁচিয়ে ডেকেই ভালোমানুষের মতো আকাশের দিকে তাকিয়েছে। ফোর্থ ইয়ারে পড়ত আমার বন্ধু ইন্দ্রাণী—তাকে বলত বড়ো এলাচ, সে-বেচারার বহরে কিছু বাহুল্য ছিল, রংটাও উজ্জ্বল ছিল না। এই সব ছোটোখাটো উৎপাত নিয়ে অনেক মেয়ে রাগারাগি করত, আমি কিন্তু ছেলেদের পক্ষ নিয়েছি। আমি জানতুম, আমরা ওদের চোখে অনভ্যস্ত তাই ওদের ব্যবহারটা হয়ে পড়ে এলোমেলো—কদর্যও হয় কখনো কখনো, কিন্তু সেটা ওদের স্বাভাবিক নয়। যখন অভ্যেস হয়ে গেল, সুর আপনি এল সহজ হয়ে। ছোটো এলাচ হল এলাদি। মাঝে মাঝে কারও সুরে মধুর রস লেগেছে—কেনই বা লাগবে না? আমি কখনো ভয় করি নি তা নিয়ে। আমার অভিজ্ঞতায় দেখেছি ছেলেদের সঙ্গে ব্যবহার করা খুবই সহজ, মেয়েরা জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে যদি ওদের মৃগয়া করবার দিকে ঝোঁক না দেয়। তার পরে একে একে দেখলুম ওদের মধ্যে সব-চেয়ে ভালো যারা, যাদের ইতরতা নেই, মেয়েদের 'পরে সম্মান যাদের পুরুষের যোগ্য—"

"অর্থাৎ কলকাতার রসিক ছেলেদের মতো যাদের রস গাঁজিয়ে-ওঠা নয়—"

"হাঁ তারাই, ছুটল মৃত্যুদূতের পিছন পিছন মরিয়া হয়ে, তারা প্রায় সবাই আমারই মতো বাঙাল। ওরাই যদি মরতে ছোটে আমি চাই নে ঘরের কোণে বেঁচে থাকতে। কিন্তু দেখুন মাস্টারমশায়, সত্যি কথা বলব। যতই দিন যাচ্ছে, আমাদের উদ্দেশ্যটা উদ্দেশ্য না হয়ে নেশা হয়ে উঠছে। আমাদের কাজের পদ্ধতি চলেছে যেন নিজের বেতালা ঝোঁকে বিচারশক্তির বাইরে। ভালো লাগছে না। অমন সব ছেলেদের কোন্ অন্ধশক্তির কাছে বলি দেওয়া হচ্ছে! আমার বুক ফেটে যায়।"

"বৎসে, এই যে ধিক্কার এটাই কুরুক্ষেত্রের উপক্রমণিকা। অর্জুনের মনেও ক্ষোভ লেগেছিল। ডাক্তারি শেখবার গোড়ায় মড়া কাটবার সময় ঘৃণায় প্রায় মূর্ছা গিয়েছিলুম। ওই ঘৃণাটাই ঘৃণ্য। শক্তির গোড়ায় নিষ্ঠুরের সাধনা, শেষে হয়তো ক্ষমা। তোমরা বলে থাক—মেয়েরা মায়ের জাত, কথাটা গৌরবের নয়। মা তো প্রকৃতির হাতে স্বতই বানানো। জন্তুজানোয়াররাও বাদ যায় না। তার চেয়ে বড়ো কথা তোমরা শক্তিরূপিণী, এইটেকেই প্রমাণ করতে হবে দয়ামায়ার জলাজমি পেরিয়ে গিয়ে শক্ত ডাঙায়। শক্তি দাও, পুরুষকে শক্তি দাও।"

"এ-সব মস্ত কথা বলে আপনি ভোলাচ্ছেন আমাদের। আমরা আসলে যা, তার চেয়ে দাবি করছেন অনেক বেশি। এতটা সইবে না।"

"দাবির জোরেই দাবি সত্য হয়। তোমাদের আমরা যা বিশ্বাস করতে থাকব তোমরা তাই হয়ে উঠবে। তোমরাও তেমনি করে আমাদের বিশ্বাস করো যাতে আমাদের সাধনা সত্য হয়।"

"আপনাকে কথা কওয়াতে ভালোবাসি কিন্তু এখন সে নয়। আমি নিজে কিছু বলতে ইচ্ছে করি।"

"আচ্ছা। তাহলে এখানে নয়, চলো ওই পিছনের ঘরটাতে।"

পর্দাটানা আধা অন্ধকার ঘরে গেল ওরা। সেখানে একখানা পুরোনো টেবিল, তার দুধারে দুখানা বেঞ্চ, দেয়ালে একটা বড়ো সাইজের ভারতবর্ষের ম্যাপ।

"আপনি একটা অন্যায় করছেন—এ-কথা না বলে থাকতে পারলুম না।"

ইন্দ্রনাথকে এমন করে বলতে একমাত্র এলাই পারে। তবু তার পক্ষেও বলা সহজ নয়, তাই অস্বাভাবিক জোর লাগল গলায়।

ইন্দ্রনাথকে ভালো দেখতে বললে সবটা বলা হয় না। ওর চেহারায় আছে একটা কঠিন আকর্ষণশক্তি। যেন একটা বজ্র বাঁধা আছে সুদূরে ওর অন্তরে, তার গর্জন কানে আসে না, তার নিষ্ঠুর দীপ্তি মাঝে মাঝে ছুটে বেরিয়ে পড়ে। মুখের ভাবে মাজাঘষা ভদ্রতা, শান-দেওয়া ছুরির মতো। কড়া কথা বলতে বাধে না কিন্তু হেসে বলে; গলার সুর রাগের বেগেও চড়ে না, রাগ প্রকাশ পায় হাসিতে। যতটুকু পরিচ্ছন্নতায় মর্যাদা রক্ষা হয় ততটুকু কখনো ভোলে না এবং অতিক্রমও করে না। চুল অনতিপরিমাণে ছাঁটা, যত্ন না করলেও এলোমেলো হবার আশঙ্কা নেই। মুখের রঙ বাদামি, লালের আভাস দেওয়া। ভুরুর উপর দুইপাশে প্রশস্ত টানা কপাল, দৃষ্টিতে কঠিন বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা, ঠোঁটে অবিচলিত সংকল্প এবং প্রভুত্বের গৌরব। অত্যন্ত দুঃসাধ্য রকমের দাবি সে অনায়াসে করতে পারে, জানে সেই দাবি সহজে অগ্রাহ্য হবে না। কেউ জানে তার বুদ্ধি অসামান্য, কেউ জানে তার শক্তি অলৌকিক। তার 'পরে কারও আছে সীমাহীন শ্রদ্ধা, কারও আছে অকারণ ভয়।

ইন্দ্রনাথ হাসিমুখে বললে, "কী অন্যায়?"

"আপনি উমাকে বিয়ে করতে হুকুম করেছেন, সে তো বিয়ে করতে চায় না।"

"কে বললে চায় না?"

"সে নিজেই বলে।"

"হয়তো সে নিজে ঠিক জানে না, কিংবা নিজে ঠিক বলে না।"

"সে আপনার সামনে প্রতিজ্ঞা করেছিল বিয়ে করবে না।"

"তখন সেটা ছিল সত্য, এখন সেটা সত্য নেই। মুখের কথায় সত্য সৃষ্টি করা যায় না। প্রতিজ্ঞা উমা আপনিই ভাঙত, আমি ভাঙালুম, ওর অপরাধ বাঁচিয়ে দিলুম।"

"প্রতিজ্ঞা রাখা না-রাখার দায়িত্ব ওরই, না হয় ভাঙত, না হয় করত অপরাধ।"

"ভাঙতে ভাঙতে আশেপাশে ভাঙচুর করত বিস্তর, লোকসান হত আমাদের সকলেরই।"

"ও কিন্তু বড়ো কান্নাকাটি করছে।"

"তাহলে কান্নাকাটির দিন আর বাড়তে দেব না—কাল-পরশুর মধ্যেই বিয়ে চুকিয়ে দেওয়া যাবে।"

"কাল-পরশুর পরেও তো ওর সমস্ত জীবনটাই আছে।"

"মেয়েদের বিয়ের আগেকার কান্না প্রভাতে মেঘডম্বরং।"

"আপনি নিষ্ঠুর!"

"কেননা, মানুষকে যে-বিধাতা ভালোবাসেন তিনি নিষ্ঠুর, জন্তুকেই তিনি প্রশ্রয় দেন।"

"আপনি জানেন উমা সুকুমারকে ভালোবাসে।"

"সেইজন্যেই ওকে তফাত করতে চাই।"

"ভালোবাসার শাস্তি?"

"ভালোবাসার শাস্তির কোনো মানে নেই। তাহলে বসন্ত রোগ হয়েছে বলেও শাস্তি দিতে হয়। কিন্তু গুটি বেরোলে ঘর থেকে বের করে রোগীকে হাঁসপাতালে পাঠানোই শ্রেয়।"

"সুকুমারের সঙ্গে বিয়ে দিলেই তো হয়।"

"সুকুমার তো কোনো অপরাধ করে নি। ওর মতো ছেলে আমাদের মধ্যে কজন আছে?"

"ও যদি নিজেই উমাকে বিয়ে করতে রাজি হয়?"

"অসম্ভব নয়। সেইজন্যেই এত তাড়া। ওর মতো উঁচুদরের পুরুষের মনে বিভ্রম ঘটানো মেয়েদের পক্ষে সহজ;—সৌজন্যকে প্রশ্রয় বলে সুকুমারের কাছে প্রমাণ করা দুই-এক ফোঁটা চোখের জলেই সম্ভব হতে পারে। রাগ করছ শুনে?"

"রাগ করব কেন? মেয়েরা নিঃশব্দ নৈপুণ্যে প্রশ্রয় ঘটিয়েছে আর তার দায় মানতে হয়েছে পুরুষকে, আমার অভিজ্ঞতায় এমন ঘটনার অভাব নেই। সময় হয়েছে সত্যের

অনুরোধে ন্যায়বিচার করবার। আমি সেটা করে থাকি বলেই মেয়েরা আমাকে দেখতে পারে না। যার সঙ্গে উমার বিয়ের হুকুম সেই ভোগীলালের মত কী?"

"সেই নিষ্কণ্টক ভালোমানুষের মতামত বলে কোনো উপসর্গ নেই। বাঙালির মেয়েমাত্রকেই সে বিধাতার অপূর্ব সৃষ্টি বলে জানে। ও-রকম মুগ্ধ স্বভাবের ছেলেকে দলের বাইরের আঙিনায় সরিয়ে ফেলা দরকার। জঞ্জাল ফেলবার সব-চেয়ে ভালো ঝুড়ি বিবাহ।"

"এই সমস্ত উৎপাতের আশঙ্কা সত্ত্বেও আপনি মেয়ে-পুরুষকে একত্র করেছেন কেন?"

"শরীরটাতে ছাই দিয়েছে যে-সন্ন্যাসী, আর প্রবৃত্তিকে ছাই করেছে যে-ভস্মকুণ্ড সেই ক্লীবদের নিয়ে কাজ হবে না বলে। যখন দেখব আমাদের দলের কোনো অগ্নি-উপাসক অসাবধানে নিজের মধ্যেই অগ্নিকাণ্ড করতে বসেছে—দেব তাদের সরিয়ে। আমাদের অগ্নিকাণ্ড দেশ জুড়ে, নেবানো মন দিয়ে তা হবে না, আর হবে না তাদের দিয়ে আগুন যারা চাপতে জানে না।"

গম্ভীর মুখে এলা বসে রইল। কিছুক্ষণ বাদে চোখ নামিয়ে বললে, "আমাকে আপনি তবে ছেড়ে দিন।"

"এতখানি ক্ষতি করতে বল কেন?"

"আপনি জানেন না।"

"জানি নে কে বললে? দেখা গেল একদিন তোমার খদ্দরে একটুখানি রং লেগেছে। জানা গেল অন্তরে অরুণোদয়। বুঝতে পারি একটা কোন্ পায়ের শব্দের প্রত্যাশায় তোমার কান পাতা থাকে। গেল শুক্রবারে যখন এলুম তোমার ঘরে, তুমি ভেবেছিলে আর-কেউ বা। দেখলুম মনটা ঠিক করে নিতে কিছু সময় লাগল। লজ্জা ক'রো না তুমি, এতে অসংগত কিছুই নেই।"

কর্ণমূল লাল করে চুপ করে রইল এলা।

ইন্দ্রনাথ বললে, "তুমি একজনকে ভালোবেসেছ, এই তো? তোমার মন তো জড় পাষাণে গড়া নয়। যাকে ভালোবাস তাকেও জানি। অনুশোচনার কারণ কিছুই দেখছি নে।"

"আপনি বলেছিলেন একমনা হয়ে কাজ করতে হবে। সকল অবস্থায় তা সম্ভব না হতে পারে।"

"সকলের পক্ষে নয়। কিন্তু ভালোবাসার গুরুভারে তোমার ব্রত ডোবাতে পারে তুমি তেমন মেয়ে নও।"

"কিন্তু—"

"এর মধ্যে কিন্তু কিছুই নেই—তুমি কিছুতেই নিষ্কৃতি পাবে না।"

"আমি তো আপনাদের কোনো কাজে লাগি নে, সে আপনি জানেন।"

"তোমার কাছ থেকে কাজ চাই নে, কাজের কথা সব জানাইও নে তোমাকে। কেমন করে তুমি নিজে বুঝবে তোমার হাতের রক্তচন্দনের ফোঁটা ছেলেদের মনে কী আগুন জালিয়ে দেয়। সেটুকু বাদ দিয়ে কেবল শুখো মাইনের কাজ করাতে গেলে পুরো কাজ পাব না। আমরা কামিনীকাঞ্চনত্যাগী নই। যেখানে কাঞ্চনের প্রভাব সেখানে কাঞ্চনকে অবজ্ঞা করি নে, যেখানে কামিনীর প্রভাব সেখানে কামিনীকে বেদীতে বসিয়েছি।"

"আপনার কাছে মিথ্যে বলব না, বুঝতে পারছি আমার ভালোবাসা দিনে দিনেই আমার অন্য সকল ভালোবাসাকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে।"

"কোনো ভয় নেই, খুব ভালোবাসো। শুধু মা মা স্বরে দেশকে যারা ডাকাডাকি করে, তারা চিরশিশু। দেশ বৃদ্ধ শিশুদের মা নয়, দেশ অর্ধনারীশ্বর—মেয়ে-পুরুষের মিলনে তার উপলব্ধি। এই মিলনকে নিস্তেজ ক'রো না সংসার-পিঁজরের বেঁধে।"

"কিন্তু তবে আপনি যে ওই উমা—"

"উমা! কালু!—ভালোবাসার শুষ্ক রুদ্ররূপ ওরা সইতে পারবে কী করে? যে দাম্পত্যের ঘাটে ওদের সকল সাধনার অন্ত্যেষ্টিসংকার, সময় থাকতে সেখানেই দুজনকে গঙ্গাযাত্রায় পাঠাচ্ছি।—সে-কথা থাক্। শোনা গেল তোমার ঘরে ডাকাত ঢুকেছিল পরশু রাত্রে।"

"হাঁ, ঢুকেছিল।"

"তোমার জুজুৎসু শিক্ষায় ফল পেয়েছিলে কি?"

"আমার বিশ্বাস ডাকাতের কবজি দিয়েছি ভেঙে।"

"মনটার ভিতর আহা উহু করে ওঠে নি?"

"করত কিন্তু ভয় ছিল ও আমাকে অপমান করবে। ও যদি যন্ত্রণায় হার মানত আমি শেষ পর্যন্ত মোচড় দিতে পারতুম না।"

"চিনতে পেরেছিলে সে কে?"

"অন্ধকারে দেখতে পাই নি।"

"যদি পেতে তাহলে জানতে, সে অনাদি।"

"আহা সে কী কথা। আমাদের অনাদি! সে যে ছেলেমানুষ।"

"আমিই তাকে পাঠিয়েছিলুম।"

"আপনিই! কেন এমন কাজ করলেন?"

"তোমারও পরীক্ষা হল, তারও।"

"কী নিষ্ঠুর।"

"ছিলুম নিচের ঘরে, তখনই হাড় ঠিক করে দিয়েছি। তুমি নিজেকে মনে কর ব্যথাকাতর। বোঝাতে চেয়েছিলুম বিপদের মুখে কাতরতা স্বাভাবিক নয়। সেদিন তোমাকে বললুম, ছাগলছানাটাকে পিস্তল করে মারতে। তুমি বললে, কিছুতেই পারবে না। তোমার পিসতুত বোন বাহাদুরি করে মারলে গুলি। যখন দেখলে জন্তটা পা ভেঙে পড়ে গেল, কাঠিন্যের ভান করে হা হা করে হেসে উঠল। হিস্টিরিয়ার হাসি, সেদিন রাত্তিরে তার ঘুম হয় নি। কিন্তু তোমাকে যদি বাঘে খেতে আসত আর তুমি যদি ভীতু না হতে তাহলে তখনই তাকে মারতে, দ্বিধা করতে না। আমরা সেই বাঘটাকে মনের সামনে স্পষ্ট দেখছি, দয়ামায়া দিয়েছি বিসর্জন, নইলে নিজেকে সেন্টিমেন্টাল বলে ঘৃণা করতুম। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে এই কথাটাই বুঝিয়েছিলেন। নির্দয় হবে না কিন্তু কর্তব্যের বেলা নির্মম হতে হবে। বুঝতে পেরেছ?"

"পেরেছি।"

"যদি বুঝে থাক একটা প্রশ্ন করব। তুমি অতীনকে ভালোবাস?"

কোনো উত্তর না দিয়ে এলা চুপ করে রইল।

"যদি কখনো সে আমাদের সকলকে বিপদে ফেলে, তাকে নিজের হাতে মারতে পার না?"

"তার পক্ষে এতই অসম্ভব যে হাঁ বলতে আমার মুখে বাধবে না।"

"যদিই সম্ভব হয়?"

"মুখে যা-ই বলি না কেন, নিজেকে কি শেষ পর্যন্ত জানি?"

"জানতেই হবে নিজেকে। সমস্ত নিদারুণ সম্ভাবনা প্রত্যহ কল্পনা করে নিজেকে প্রস্তুত রাখতে হবে।"

"আমি নিশ্চিত বলছি, আপনি আমাকে ভুল করে বেছে নিয়েছেন।"

"আমি নিশ্চিত জানি আমি ভুল করি নি।"

"মাস্টারমশায়, আপনার পায়ে পড়ি, দিন অতীনকে নিষ্কৃতি।"

"আমি নিষ্কৃতি দেবার কে? ও বাঁধা পড়েছে নিজেরই সংকল্পের বন্ধনে। ওর মন থেকে দ্বিধা কোনো কালেই মিটবে না, রুচিতে ঘা লাগবে প্রতিমুহূর্তে, তবু ওর আত্মসম্মান ওকে নিয়ে যাবে শেষ পর্যন্ত।"

"লোক চিনতে আপনি কি কখনো ভুল করেন না?"

"করি। অনেক মানুষ আছে যাদের স্বভাবে দু-রকম বুনোনির কাজ। দুটোর মধ্যে মিল নেই। অথচ দুটোই সত্য। তারা নিজেকেও নিজে ভুল করে।"

ভারি গলায় আওয়াজ এল, "কী হে ভায়া।"

"কানাই বুঝি? এস এস।"

কানাইগুপ্ত এল ঘরে। বেঁটে মোটা মানুষটি আধবুড়ো। সপ্তাহখানেক দাড়িগোঁফ কামাবার অবকাশ ছিল না, কণ্টকিত হয়ে উঠেছে মুখমণ্ডল। সামনের মাথায় টাক; ধুতির উপর মোটা খদ্দরের চাদর, ধোবার প্রসাদ-বঞ্চিত, জামা নেই। হাত দুটো দেহের পরিমাণে খাটো, মনে হয়, সর্বদা কাজে উদ্যত, দলের লোকের যথাসম্ভব অন্নসংস্থানের জন্যেই কানাইয়ের চায়ের দোকান।

কানাই তার স্বাভাবিক চাপা ভাঙা গলায় বললে, "ভায়া, তোমার খ্যাতি আছে বাক্‌সংযমে, তুমি মুনি বললেই হয়। এলাদি তোমার সেই খ্যাতি বুঝি দিলে মাটি করে।"

ইন্দ্রনাথ হেসে বললে, "কথা না-বলারই সাধনা আমাদের। নিয়মটাকে রক্ষা করবার জন্যেই ব্যতিক্রমের দরকার। এই মেয়েটি নিজে কথা বলে না, অন্যকে কথা বলবার ফাঁক দেয়, বাক্যের 'পরে এ একটি বহুমূল্য আতিথ্য।"

"কী বল তুমি ভায়া। এলাদি কথা বলে না! তোমার কাছে চুপ, কিন্তু যেখানে মুখ খোলে সেখানে বাণীর বন্যা। আমি তো মাথাপাকা মানুষ, সাড়া পেলেই খাতাপত্র ফেলে আড়াল থেকে ওর কথা শুনতে আসি। এখন আমার প্রতি একটু মনোযোগ দিতে হবে। এলাদির মতো কণ্ঠ নয় আমার, কিন্তু সংক্ষেপে যেটুকু বলব তা মর্মে প্রবেশ করবে।"

এলা তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল। ইন্দ্রনাথ বললে, "যাবার আগে একটা কথা তোমাকে জানিয়ে রাখি। দলের লোকের কাছে আমি তোমাকে নিন্দে করে থাকি। এমন কি, এমন কথাও বলেছি, যে, একদিন তোমাকে হয়তো একেবারে নিশ্চিহ্ন সরিয়ে দিতে হবে। বলেছি, অতীনকে তুমি ভাঙিয়ে নিচ্ছ, সেই ভাঙনে আরও কিছু ভাঙবে।"

"বলতে বলতে কথাটাকে সত্য করে তুলছেন কেন? কী জানি, এখানকার সঙ্গে হয়তো আমার একটা অসামঞ্জস্য আছে।"

"থাকা সত্ত্বেও তোমাকে সন্দেহ করি নে। কিন্তু তবু ওদের কাছে তোমার নিন্দে করি। তোমার শত্রু কেউ নেই এই জনপ্রবাদ, কিন্তু দেখতে পাই তোমার বারো আনা অনুরক্তের বাংলাদেশী মন নিন্দা বিশ্বাস করবার আগ্রহে লালায়িত হয়ে ওঠে। এই

নিন্দাবিলাসীরা নিষ্ঠাহীন। এদের নাম খাতায় টুকে রাখি। অনেকগুলো পাতা ভরতি হল।"

"মাস্টারমশায়, ওরা নিন্দে ভালোবাসে বলেই নিন্দে করে, আমার উপর রাগ আছে বলে নয়।"

"অজাতশত্রু নাম শুনেছ এলা। এরা সবাই জাতশত্রু। জন্মকাল থেকেই এদের অহৈতুক শত্রুতা বাংলাদেশের অভ্যুত্থানের সমস্ত চেষ্টাকে কেবলই ধূলিসাৎ করছে।"

"ভায়া, আজ এই পর্যন্ত, বিষয়টা আগামীবারে সমাপ্য। এলাদি, তোমার চায়ের নিমন্ত্রণ ভাঙবার মূলে যদি গোপনে আমি থাকি, কিছু মনে ক'রো না। আমার চায়ের দোকানটাতে কুলুপ পড়বার সময় আসন্ন। বোধ হয় মাইল শ-তিন তফাতে গিয়ে এবার নাপিতের দোকান খুলতে হবে। ইতিমধ্যে অলকানন্দা তৈল পাঁচ পিপে তৈরি করে রেখেছি। মহাদেবের জটা নিংড়ে বের-করা। একটা সার্টিফিকেট দিয়ো বৎসে, ব'লো, অলকা তেল মাখার পর থেকে চুল-বাঁধা একটা আপদ হয়েছে, দীর্ঘায়মানা বেণী সামলে তোলা স্বয়ং দশভুজা দেবীর দুঃসাধ্য।"

যাবার সময় এলা দরজার কাছে এসে মুখ ফিরিয়ে বললে, "মাস্টারমশায়, মনে রইল আপনার কথা, প্রস্তুত থাকব। আমাকে সরাবার দিন হয়তো আসবে, নিঃশব্দেই মিলিয়ে যাব।"

এলা চলে গেলে ইন্দ্রনাথ বললে, "তোমাকে চঞ্চল দেখছি কেন হে কানাই?"

"সম্প্রতি রাস্তার ধারে আমার ওই সামনের টেবিলেই বসে গোটাতিনেক গুণ্ডা ছেলে বীররস প্রচার করছিল। আওয়াজে বোঝা যায় জন বৃষভেরই পুষ্যি বাছুর। আমি সিডিশনের নমুনা সুদ্ধ ওদের নামে পুলিসে রিপোর্ট করে দিয়েছি।"

"আন্দাজ করতে ভুল কর নি তো কানাই?"

"বরং ভুল করে সন্দেহ করা ভালো, কিন্তু সন্দেহ না করে ভুল করা সাংঘাতিক। খাঁটি বোকাই যদি হয় তাহলে কেউ ওদের বাঁচাতে পারবে না, আর যদি হয় খাঁটি দুশমন তাহলে ওদের মারবে কে? আমার রিপোর্টে উন্নতিই হবে। সেদিন চড়া গলায় শয়তানি শাসনপ্রণালীর উপর দিয়ে রক্তগঙ্গা বওয়াবার প্রস্তাব তুলেছিল। নিশ্চয়ই অভয়চরণ রক্ষিত এদের উপাধি। একদিন সন্ধ্যাবেলায় ক্যাশবাক্স নিয়ে হিসেব মেলাতে বসেছিলুম। হঠাৎ একটা ধুলোমাখা ছেঁড়াকাপড়-পরা ছেলে এসে চুপি চুপি বললে, টাকা চাই পঁচিশটা, যেতে হবে দিনাজপুরে। আমাদের মথুর মামার নাম করলে। আমি লাফ দিয়ে উঠে চীৎকার করে বলে উঠলুম, শয়তান, এতবড়ো আস্পর্ধা তোমার। এখনই ধরিয়ে দেব পুলিসের হাতে।—সময় হাতে

একটুও ছিল না, নইলে প্রহসনটা শেষ করতুম, নিয়ে যেতুম থানায়। তোমার ছেলেরা যারা পাশের ঘরে বসে চা খাচ্ছিল তারা আমার উপর অগ্নিশর্মা; ওকে দেবে বলে চাঁদা তোলবার চেষ্টা করতে গিয়ে দেখলে, সবার পকেট কুড়িয়ে তেরো আনার বেশি ফণ্ড উঠল না। ছেলেটা আমার মূর্তি দেখে সরে পড়েছে।"

"তবে তো দেখছি তোমার ঢাকনির ফুটো দিয়ে গন্ধ বেরিয়ে পড়েছে—মাছির আমদানি শুরু হল।"

"সন্দেহ নেই। ভায়া, এখনই ছড়িয়ে ফেলো তোমার ছেলেগুলোকে দূরে দূরে—ওদের একজনও যেন বেকার না থাকে। Ostensible means of livelihood প্রত্যেকেরই থাকা চাই।"

"চাই নিশ্চয়ই। কিন্তু উপায় ঠাউরেছ?"

"অনেকদিন থেকে। হাত খোলসা ছিল না, নিজে করতে পারি নি। ভেবে রেখেছি, উপকরণও জমিয়েছি ধীরে ধীরে। মাধব কবিরাজ বিক্রি করে জ্বরাশনি বটিকা, তার বারো আনা কুইনীন। সেগুলো তার কাছ থেকে নিয়ে লেবেল বদলে নাম দেব ম্যালেরিয়ারি গুটিকা, কুইনীনের পিছনে অনেকখানি মিথ্যে কথা জুড়তে হবে। প্রতুল সেনকে লাগানো যাবে ক্যাম্বিসের ব্যাগ হাতে ওই গুটিকা প্রচার করার কাজে। তোমার নিবারণ ফার্স্ট ক্লাস এম. এসসি লজ্জা ত্যাগ করে পড়ুক ভৈরবী কবচ নিয়ে, এই কবচে সপ্তধাতুর উপরে নব্য রসায়নের আরও গোটাকতক নূতন ধাতুর নাম জড়িয়ে প্রাচীন ঋষিদের সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব সম্মিলন সাধনা করা যেতে পারে। জগবন্ধু সংস্কৃত শ্লোকের উপর ব্যাকরণের ভেলকি লাগিয়ে উচ্চস্বরে প্রমাণ করতে থাকুক যে, চাণক্য জন্মেছিলেন বাংলাদেশে নেত্রকোণায়, আমারও জন্মস্থান ওই সাবডিবিশনে। এই নিয়ে সাংঘাতিক কথা-কাটাকাটি চলুক সাহিত্যে, অবশেষে চাণক্য-জয়ন্তী করা যাবে আমারই প্রপিতামহের প'ড়ো ভিটের 'পরে। তোমাদের ক্যাম্বেলি ডাক্তার তারিণী সাণ্ডেল মা শীতলার মন্দির নির্মাণের জন্যে চাঁদা চেয়ে পাড়া অস্থির করে বেড়াক। আসল কথা হচ্ছে, তোমার সব-চেয়ে মাথাউঁচু গ্রেনেডিয়ার ছেলের দলকে কিছুদিন বাজে ব্যবসায়ে ঢাকা দিয়ে রাখতে হবে—কেউ বা ওদের বোকা বলুক, কেউ বা বলুক ওরা চতুর বিষয়ী লোক।"

ইন্দ্রনাথ হেসে বললে, "তোমার কথা শুনে আমার ইচ্ছে হচ্ছে একটা ব্যবসায়ে লাগি। আর-কিছুর জন্যে না, কেবল দেউলে হবার কার্যপ্রণালী এবং সাইকোলজি অনুশীলন করবার জন্যে।"

কানাই বললে, "তুমি যে-ব্যবসায়ে লেগেছ ভায়া, সেটা আজ হ'ক বা কাল হ'ক

নিশ্চিত দেউলে হবারই মুখে আছে। যারা দেউলে হয় তারা বোঝে না বলে হয় তা নয়, তারা লোকসানের রাস্তা কোনোমতে ছাড়তে পারে না বলেই হয়—দেউলে হওয়ার মরণটান একটা সাব্লাইম আকর্ষণ। ও-বিষয়টা বর্তমানে আলোচনা করে ফল নেই ; একটা প্রশ্ন মনে আছে সেটা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে নিই। এলার মতো সুন্দরী সর্বদা দেখতে পাওয়া যায় না—এ-কথা মান কি না ?"

"মানি বই কি।"

"তাহলে ওকে তোমাদের মধ্যে রেখেছ কোন্ সাহসে ?"

"কানাই, এতদিনে আমাকে তোমার বোঝা উচিত ছিল। আগুনকে যে ভয় করে সে আগুনকে ব্যবহার করতে পারে না। আমার কাজে আমি আগুনকে বাদ দিতে চাই নে।"

"অর্থাৎ তাতে কাজ নষ্ট হ'ক বা না হ'ক, তুমি কেয়ার কর না।"

"সৃষ্টিকর্তা আগুন নিয়ে খেলা করে। নিশ্চিত ফলের হিসেব করে সৃষ্টির কাজ চলে না ; অনিশ্চিতের প্রত্যাশাতেই তার বিরাট প্রবর্তনা। ঠাণ্ডা মালমসলা নিয়ে বুড়ো আঙুলে টিপে টিপে যে পুতুল গড়া হয় তার বাজারদর খতিয়ে লোভ করবার মন আমার নয়। ওই যে অতীন ছেলেটা এসেছে এলার টানে, ওর মধ্যে বিপদ ঘটাবার ডাইনামাইট আছে,—ওর প্রতি তাই আমার এত ঔৎসুক্য।"

"ভায়া, তোমার এই ভীষণ ল্যাবরেটরিতে আমরা ঝাড়ন কাঁধে বেহারার কাজ করি মাত্র। খেপে ওঠে যদি কোনো গ্যাস, যদি কোনো যন্ত্র ফেটে ফুটে ছিটকে পড়ে তাহলে আমাদের কপাল ভাঙবে সাতখানা হয়ে। সেটা নিয়ে গর্ব করবার মতো জোর আমাদের খুলির তলায় নেই।"

"জবাব দিয়ে বিদায় নেও না কেন ?"

"ফলের লোভ যে আছে আমাদের, তোমার না থাকতে পারে। তোমারই দালালদের মুখে একদা শুনেছিলুম Elixir of life হয়তো মিলতে পারে। তোমার এই সর্বনেশে রিসর্চের চক্রান্তে গরিব আমরা ধরা দিয়েছি নিশ্চিত আশারই টানে, অনিশ্চিতের কুহকে নয়। তুমি এটাকে দেখছ জুয়োখেলার দিক থেকে, আমরা দেখছি ব্যবসার সাদা চোখে। অবশেষে খতেনের খাতায় আগুন লাগিয়ে আমাদের সঙ্গে ঠাট্টা ক'রো না, ভায়া। ওর প্রত্যেক সিকি পয়সায় আছে আমাদের বুকের রক্ত।"

"আমার মনে কোনো অন্ধ বিশ্বাস নেই কানাই। হারজিতের কথা ভাবা একেবারে ছেড়ে দিয়েছি। প্রকাণ্ড কর্মের ক্ষেত্রে আমি কর্তা, এইখানেই আমাকে

মানায় বলেই আমি আছি,,—এখানে হারও বড়ো জিতও বড়ো। ওরা চারদিকের দরজা বন্ধ করে আমাকে ছোটো করতে চেয়েছিল, মরতে মরতে প্রমাণ করতে চাই আমি বড়ো। আমার ডাক শুনে কত মানুষের মতো মানুষ মৃত্যুকে অবজ্ঞা করে চারিদিকে এসে জুটল; সে তো তুমি দেখতে পাচ্ছ কানাই। কেন? আমি ডাকতে পারি বলেই। সেই কথাটা ভালো করে জেনে এবং জানিয়ে যাব, তার পরে যা হয় হ'ক। তোমাকে তো বাইরে থেকে একদিন দেখতে ছিল সামান্য কিন্তু তোমার অসামান্যকে আমি প্রকাশিত করেছি। রসিয়ে তুললুম তোমাদের, মানুষ নিয়ে এই আমার রসায়নের সাধনা। আর বেশি কী চাই? ঐতিহাসিক মহাকাব্যের সমাপ্তি হতে পারে পরাজয়ের মহাশ্মশানে। কিন্তু মহাকাব্য তো বটে। গোলামি-চাপা এই খর্ব মনুষ্যত্বের দেশে মরার মতো মরতে পারাও যে একটা সুযোগ।"

"ভায়া, আমার মতো অকাল্পনিক প্র্যাক্‌টিক্যাল লোককেও তুমি টান মেরে এনেছ ঘোরতর পাগলামির তাণ্ডব নৃত্যমঞ্চে। ভাবি যখন, এ রহস্যের অন্ত পাই নে আমি।"

"আমি কাঙালের মতো করে কিছুই চাই নে বলেই তোমাদের 'পরে আমার এত জোর। মায়া দিয়ে ভুলিয়ে লোভ দেখিয়ে ডাকি নে কাউকে। ডাক দিই অসাধ্যের মধ্যে, ফলের জন্যে নয়, বীর্য প্রমাণের জন্যে। আমার স্বভাবটা ইম্‌পার্সোন্যাল। যা অনিবার্য তাকে আমি অক্ষুব্ধমনে স্বীকার করে নিতে পারি। ইতিহাস তো পড়েছি, দেখেছি কত মহা মহা সাম্রাজ্য গৌরবের অভ্রভেদী শিখরে উঠেছিল আজ তারা ধুলোয় মিলিয়ে গেছে,—তাদের হিসাবের খাতায় কোথায় মস্ত একটা দেনা জমে উঠেছিল যা তারা শোধ করে নি। আর এই দেশ যেহেতু এ আমারই দেশ, সৌভাগ্যের চিরস্বত্ব নিয়ে ইতিহাসের উঁচু গদিতে গদিয়ান হয়ে বসে থাকবে পরাভবের সমস্ত কারণগুলোর গায়ে সিঁদুরচন্দন মাখিয়ে ঘণ্টা নেড়ে পুজো করতে করতে, বোকার মতো এমন আবদার করব কার কাছে? আমি তা কখনোই করি নে। বৈজ্ঞানিকের নির্মোহ মন নিয়ে মেনে নিই যার মরণদশা সে মরবেই।"

"তবে!"

"তবে! দেশের চরম দুরবস্থা আমার মাথা হেঁট করতে পারবে না, আমি তারও অনেক ঊর্ধ্বে—আত্মার অবসাদ ঘটতে দেব না মরবার সমস্ত লক্ষণ দেখেও।"

"আর আমরা!"

"তোমরা কি খোকা! মাঝদরিয়ায় যে-জাহাজের তলা গিয়েছে সাত জায়গায় ফাঁক হয়ে, কেঁদে কেটে মন্ত্র পড়ে কর্তার দোহাই পেড়ে তাকে বাঁচাতে পারবে?"

"না যদি পারি তবে?"

"তবে কী। তোমরা কজনে জেনে শুনে সেই ডুবোজাহাজেই ঝড়ের মুখে সাংঘাতিক পাল তুলে দিয়েছ, তোমাদের পাঁজর কাঁপে নি। এমন যে-কজনকে পাই ডুবতে ডুবতে তাদের নিয়েই আমাদের জিত। রসাতলে যাবার জন্যে যে-দেশ অন্ধভাবে প্রস্তুত তারি মাস্তুলে তোমরা শেষ পর্যন্ত জয়ধ্বজা উড়িয়েছ, তোমরা না করেছ মিথ্যে আশা, না করেছ কাঙালপনা, না কেঁদেছ নৈরাশ্যে হাউ হাউ করে। তোমরা তবু হাল ছাড় নি যখন জলে ভরেছে জাহাজের খোল। হাল ছাড়াতেই কাপুরুষতা—বাস, আমার কাজ হয়ে গেছে তোমাদের যে-কজনকে পেয়েছি তাদেরই নিয়ে। তার পরে? কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।"

"তুমি যা বলছ তার মধ্যে থেকে একটা প্রধান কথা বাদ গেছে বলে বোধ হয়।"

"কোন্ কথাটা?"

"তোমার মনে কি রাগও নেই? এত ইম্পার্সোন্যাল তুমি!"

"রাগ কার 'পরে?"

"ইংরেজের 'পরে।"

"যে জোয়ান মদ খেয়ে চোখ লাল না করলে লড়তে পারেই না, সেই গ্রাম্যকে আমি অবজ্ঞা করি। রাগের মাথায় কর্তব্য করতে গেলে অকর্তব্য করার সম্ভাবনাই বেশি।"

"তা হ'ক, কিন্তু রাগের কারণ থাকলে রাগ না করাটা অমানবিক।"

"সমস্ত য়ুরোপের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে, আমি ইংরেজকেও জানি। যত পশ্চিমী জাত আছে তার মধ্যে ওরা সব-চেয়ে বড়ো জাত। রিপুর তাড়ায় ওরা যে মারতে পারে না তা নয় কিন্তু পুরোপুরি পারে না—লজ্জা পায়। ওদের নিজেদের মধ্যে যারা বড়ো তাদেরই কাছে জবাবদিহি করতে ওদের সব-চেয়ে ভয়;—ওরা নিজেকে ভোলায় তাদেরও ভোলায়। ওদের উপরে যতটা রাগ করলে ফুল স্টীম বানিয়ে তোলা যায় ততটা রাগ করা আমার দ্বারা সম্ভব হয় না।"

"অদ্ভুত তুমি।"

"ষোলো আনা মারের চোটে আমাদের মেরুদণ্ড ওরা চিরকালের মতো গুঁড়িয়ে দিতে পারত। সেটা ওরা পারলে না। আমি ওদের মনুষ্যত্বকে বাহাদুরি দিই। পরের দেশ শাসন করতে করতে সেই মনুষ্যত্ব ক্ষয় হয়ে আসছে তাতেই মরণদশা ধরছে ওদের ভিতর থেকে। এত বেশি বিদেশের বোঝা আর কোনো জাতের ঘাড়ে নেই এতে ওদের স্বভাব যাচ্ছে নষ্ট হয়ে।"

"সে ওরা বুঝবে। কিন্তু তোমার এই অধ্যবসায়কে প্রায় অহৈতুক করে তুলেছ এটা আমার কাছে বাড়াবাড়ি ঠেকে।"

"অত্যন্ত ভুল। আমি অবিচার করব না, উন্মত্ত হব না, দেশকে দেবী বলে মা মা বলে অশ্রুপাত করব না, তবু কাজ করব, এতেই আমার জোর।"

"শত্রুকে যদি শত্রু ব'লে তাকে দ্বেষ না কর তবে তার বিরুদ্ধে হাত চালাবে কী করে?"

"রাস্তায় পাথর পড়ে থাকলে তার বিরুদ্ধে হাতিয়ার চালাই যেমন ক'রে, অপ্রমত্ত বুদ্ধি নিয়ে। ওরা ভালো কি মন্দ সেটা তর্কের বিষয় নয়। ওদের রাজত্ব বিদেশী রাজত্ব, সেটাতে ভিতর থেকে আমাদের আত্মলোপ করছে—এই স্বভাববিরুদ্ধ অবস্থাকে নড়াতে চেষ্টা করে আমার মানবস্বভাবকে আমি স্বীকার করি।"

"কিন্তু সফলতা সম্বন্ধে তোমার নিশ্চিত আশা নেই।"

"নাই রইল, তবু নিজের স্বভাবের অপমান ঘটাব না—সামনে মৃত্যুই যদি সব-চেয়ে নিশ্চিত হয় তবুও। পরাভবের আশঙ্কা আছে বলেই স্পর্ধা করে তাকে উপেক্ষা করে আত্মমর্যাদা রাখতে হবে। আমি তো মনে করি এইটেই আজ আমাদের শেষ কর্তব্য।"

"ওই আসছেন রক্তগঙ্গা বওয়াবার মেকি ভগীরথ। ওঁকে চা খাইয়ে আসি গে। সেই সঙ্গে স্পষ্টভাষায় খবরও দেব যে, পুলিসকে সব কথা রিপোর্ট করা হয়েছে। তোমার দলের বোকারা আমাকে লিঞ্চ্ করে না বসে।"

দ্বিতীয় অধ্যায়

এলা বসে আছে কেদারায়, পিঠে বালিশ গোঁজা। লিখছে একমনে। পায়ের উপর পা তোলা। দেশবন্ধুর মূর্তি-আঁকা খাতা কাঠের বোর্ডে কোলের উপর আড় করে ধরা। দিন ফুরোতে দেরি নেই, কিন্তু তখনও চুল রয়েছে অযত্নে। বেগনি রঙের খদ্দরের শাড়ি গায়ে, সেটাতে মলিনতা অব্যক্ত থাকে, তাই নিভৃতে ব্যবহারে তার অনাদৃত প্রয়োজন। এলার হাতে একজোড়া লালরং-করা শাঁখা, গলায় একছড়া সোনার হার। হাতির দাঁতের মতো গৌরবর্ণ শরীরটি আঁটসাঁট; মনে হয় বয়স খুব কম কিন্তু মুখে পরিণত বুদ্ধির গাম্ভীর্য। খদ্দরের সবুজ রঙের চাদরে ঢাকা সংকীর্ণ লোহার খাট ঘরের প্রান্তে দেয়াল-ঘেঁষা। নারায়ণী স্কুলের তাঁতে-বোনা শতরঞ্চ মেঝের উপর পাতা। একধারে লেখবার ছোটো টেবিলে ব্লটিং প্যাড; তার একপাশে কলম-পেনসিল সাজানো দোয়াত-দান, অন্যধারে পিতলের ঘটিতে গন্ধরাজ ফুল। দেয়ালে ঝুলছে কোনো একটি দূরবর্তী কালের ফোটোগ্রাফের প্রেতাত্মা, ক্ষীণ হলদে রেখায় বিলীনপ্রায়। অন্ধকার হল, আলো জ্বালবার সময় এসেছে। উঠি-উঠি করছে এমন সময় খদ্দরের পর্দাটা সরিয়ে দিয়ে অতীন্দ্র দমকা হাওয়ার মতো ঘরে ঢুকেই ডাক দিল, "এলী।"

এলা খুশিতে চমকে উঠে বললে, "অসভ্য, জানান না দিয়ে এ ঘরে আসতে সাহস কর।"

এলার পায়ের কাছে ধপ করে মেঝের উপর বসে অতীন বললে, "জীবনটা অতি ছোটো, কায়দাকানুন অতি দীর্ঘ, নিয়ম বাঁচিয়ে চলবার উপযুক্ত পরমায়ু ছিল সনাতন যুগে মান্ধাতার। কলিকালে তার টানাটানি পড়েছে।"

"আমার কাপড় ছাড়া হয় নি এখনও।"

"ভালোই। তাহলে আমার সঙ্গে মিশ খাবে। তুমি থাকবে রথে, আমি থাকব পদাতিক হয়ে—এ-রকম দ্বন্দ্ব সমন্বয় নিয়মে অধর্ম। এককালে আমি ছিলুম নিখুঁত ভদ্রলোক, খোলসটা তুমিই দিয়েছ ঘুচিয়ে। বর্তমান বেশভূষাটা দেখছ কী রকম?"

"অভিধানে ওকে বেশভূষা বলে না।"

"কী বলে তবে?"

"শব্দ পাচ্ছি নে খুঁজে। বোধ হয় ভাষায় নেই। আমার সামনেটাতেই ওই যে বাঁকাচোরা ছেঁড়ার দাগ, ও কি তোমার স্বকৃত সেলাইয়ের লম্বা বিজ্ঞাপন?"

"ভাগ্যের আঘাত দারুণ হলেও বুক পেতেই নিয়ে থাকি—ওটা তারই পরিচয়। এ জামা দরজিকে দিতে সাহস হয় না, তার তো আত্মসম্মানবোধ আছে।"

"আমাকে দিলে না কেন?"

"নব যুগের সংস্কারভার নিয়েছ, তার উপরে পুরোনো জামার সংস্কার?"

"ওটাকে সহ্য করবার এমনই কী দরকার ছিল?"

"যে দরকারে ভদ্রলোক তার স্ত্রীকে সহ্য করে।"

"তার অর্থ?"

"তার অর্থ, একটির বেশি নেই বলে।"

"কী বল তুমি অন্ত! বিশ্বসংসারে তোমার ওই একটি বই জামা আর নেই?"

"বাড়িয়ে বলা অন্যায়, তাই কমিয়ে বললুম। পূর্ব আশ্রমে শ্রীযুক্ত অতীন্দ্রবাবুর জামা ছিল বহুসংখ্যক ও বহুবিধ। এমন সময়ে দেশে এল বন্যা। তুমি বক্তৃতায় বললে, যে অশ্রুপ্লাবিত দুর্দিনে, (মনে আছে অশ্রুপ্লাবিত বিশেষণটা?) বহু নরনারীর লজ্জা রক্ষার মতো কাপড় জুটছে না, সে সময়ে আবশ্যকের অতিরিক্ত কাপড় যার আছে লজ্জা তারই। বেশ গুছিয়ে বলেছিলে। তখনও তোমার সম্বন্ধে প্রকাশ্যে হাসতে সাহস ছিল না। মনে মনে হেসেছিলুম। নিশ্চিত জানতুম আবশ্যকের বেশি জামা ছিল তোমার বাক্সে। কিন্তু মেয়েদের পঞ্চাশ রঙের পঞ্চাশটা জামা থাকলেও পঞ্চাশটাই অত্যাবশ্যক। সেদিন দেশহিতৈষিণীদের মধ্যে রেষারেষি চলছিল,—কে কত দান সংগ্রহ করতে পারে। এনে দিলুম আমার কাপড়ের তোরঙ্গ তোমার চরণতলে। হাততালি দিয়ে উঠলে খুশিতে।"

"সে কী কথা! আমি কি জানি অমন নিঃশেষ করে দেবে?"

"আশ্চর্য হও কেন? দুঃসাধ্য ক্ষতিসাধনের শক্তি এই দেহে দুর্জয়বেগে সঞ্চার করলে কে? সংগ্রহের ভার যদি থাকত আমাদের গণেশ মজুমদারের 'পরে তাহলে তার পৌরুষ আমার কাপড়ের বাক্সে ক্ষতি করত অতি সামান্য।"

"ছি ছি অন্ত, কেন আমাকে বললে না?"

"দুঃখ ক'রো না। একান্ত শোচনীয় নয়, দুটো জামা রাঙিয়ে রেখে দিলুম নিত্য আবশ্যকের গরজে, পালা করে কেচে পরা চলছে। আরও দুটো আছে আপদ্ধর্মের জন্যে ভাঁজ করা। যদি কোনোদিন সন্দিগ্ধ সংসারে ভদ্রবংশীয় বলে প্রমাণ দেবার প্রয়োজন ঘটে সেই জামা দুটোতে ধোবা-দরজির সার্টিফিকেট রইল।"

"সৃষ্টিকর্তার সার্টিফিকেট রয়েছে ওই চেহারাতেই—সাক্ষী ডাকতে হবে না তোমার।"

"স্তুতি! নারীর দরবারে স্তবের অত্যুক্তি চিরদিন পুরুষদেরই অধিকারভুক্ত, তুমি উলটিয়ে দিতে চাও?"

"হাঁ চাই। প্রচার করতে চাই, আধুনিক কালে মেয়েদের অধিকার বেড়ে চলেছে। পুরুষের সম্বন্ধেও সত্য বলতে তাদের বাধা নেই। নব্য সাহিত্যে দেখি বাঙালি মেয়েরা নিজেদেরই প্রশংসায় মুখরা, দেবীপ্রতিমা বানাবার কুমোরের কাজটা নিজেরাই নিয়েছে। স্বজাতির গুণগরিমার উপরে সাহিত্যিক রং চড়াচ্ছে। সেটা তাদের অঙ্গরাগেরই শামিল, স্বহস্তের বাঁটা, বিধাতার হাতের নয়। আমার এতে লজ্জা করে। এখন চলো বসবার ঘরে।"

"এ-ঘরেও বসবার জায়গা আছে। আমি তো একাই একটা বিরাট সভা নই।"

"আচ্ছা তবে বলো জরুরি কথাটা কী?"

"হঠাৎ কবিতার একটা পদ মনে পড়ে গেছে অথচ কোথায় পড়েছি কিছুতেই মনে আসছে না। সকাল থেকে হাওয়া হাতড়িয়ে বেড়াচ্ছি। তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে এলুম।"

"অত্যন্ত জরুরি দেখছি। আচ্ছা বলো।"

"একটু ভেবে বলো কার রচনা—

তোমার চোখে দেখেছিলাম
আমার সর্বনাশ।"

"কোনো নামজাদা কবির তো নয়ই।"

"পূর্বশ্রুত বলে মনে হচ্ছে না তোমার?"

"চেনা গলার আভাস পাচ্ছি একটুখানি। অন্ত লাইনটা গেছে কোথায়?"

"আমার বিশ্বাস ছিল, অন্ত লাইনটা আপনিই তোমার মনে আসবে।"

"তোমার মুখে যদি একবার শুনি তাহলে নিশ্চয় মনে আসবে।"

"তবে শোনো—

প্রহরশেষের আলোয় রাঙা
সেদিন চৈত্রমাস,
তোমার চোখে দেখেছিলাম
আমার সর্বনাশ।"

অতীনের মাথায় করাঘাত করে এলা বললে, "আজকাল কী পাগলামি শুরু করেছ তুমি?"

"সেই চৈত্রমাসের বারবেলা থেকেই আমার পাগলামি শুরু। যে-সব দিন চরমে

না পৌঁছোতেই ফুরিয়ে যায় তারা ছায়ামূর্তি নিয়ে ঘুরে বেড়ায় কল্পলোকের দিগন্তে। তোমার সঙ্গে আমার মিলন সেই মরীচিকার বাসরঘরে। আজ সেইখানে তোমাকে ডাক দিতে এলুম—কাজের ক্ষতি করব।"

কাঠের বোর্ড আর খাতাখানা মেজের উপর ফেলে দিয়ে এলা বললে, "থাক্ পড়ে আমার কাজ। আলোটা জ্বেলে দিই।"

"না থাক্—আলো প্রত্যক্ষকে প্রমাণ করে, চলো দীপহীন পথে অপ্রত্যক্ষের দিকে। চার বছরের কিছু কম হবে, স্টীমারে খেয়া পার হচ্ছি মোকামার ঘাটে। তখনও আঁকড়ে ছিলুম পৈতৃক সম্পত্তির ভাঙা কিনারটাকে সেটা ছিল দেনার গর্তে ভরা। তখনও দেহে মনে শৌখিনতার রং লেগে ছিল দেউলে দিনান্তের মেঘের মতো। গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবি, পাট-করা মুগার চাদর কাঁধে, একলা বসে আছি ফার্স্ট ক্লাস ডেক-এ বেতের কেদারায়। ফেলে-দেওয়া খবরের কাগজের পাতাগুলো ফরফর করে এধারে ওধারে উড়ে বেড়াচ্ছিল, মজা লাগছিল দেখতে, মনে হচ্ছিল মূর্তিমতী জনশ্রুতির এলোমেলো নৃত্য। তুমি জনসাধারণের দলে, কোমর বেঁধে ডেক-প্যাসেঞ্জার। হঠাৎ আমার পশ্চাদ্বর্তী অগোচরতার মধ্যে থেকে দ্রুতবেগে এসে পড়লে আমার সামনে। আজও চোখের উপর দেখতে পাচ্ছি তোমার সেই ব্রাউন রঙের শাড়ি; খোঁপার সঙ্গে কাঁটায় বেঁধা তোমার মাথার কাপড় মুখের দুইধারে হাওয়ায় ফুলে উঠেছে। চেষ্টাকৃত অসংকোচের ভান করেই প্রশ্ন করলে, আপনি খদ্দর পরেন না কেন?—মনে পড়ছে?"

"খুব স্পষ্ট। তোমার মনের ছবিকে তুমি কথা কওয়াতে পার, আমার ছবি বোবা।"

"আমি আজ সেদিনের পুনরুক্তি করে যাব, তোমাকে শুনতে হবে।"

"শুনব না তো কী। সেদিন যেখানে আমার নূতন জীবনের ধুয়ো, পুনঃ পুনঃ সেখানে আমার মন ফিরে আসতে চায়।"

"তোমার গলার সুরটি শুনেই আমার সর্বশরীর চমকে উঠল, সেই সুর আমার মনের মধ্যে এসে লাগল হঠাৎ আলোর ছটার মতো; যেন আকাশ থেকে কোন্ এক অপরূপ পাখি ছোঁ মেরে নিয়ে গেল আমার চিরদিনটাকে। অপরিচিতা মেয়েটির অভাবনীয় স্পর্ধায় যদি রাগ করতে পারতুম তাহলে সেদিনকার খেয়াতরী এতবড়ো আঘাটায় পৌঁছিয়ে দিত না—ভদ্রপাড়াতেই শেষ পর্যন্ত দিন কাটত চলতি রাস্তায়। মনটা আর্দ্র দেশালাইকাঠির মতো, রাগের আগুন জ্বলল না। অহংকার আমার স্বভাবের সর্বপ্রধান সদ্‌গুণ, তাই ধাঁ করে মনে হল, মেয়েটি যদি আমাকে বিশেষভাবে পছন্দ না করত

তাহলে এমন বিশেষভাবে ধমক দিতে আসত না, খদ্দরপ্রচার—ও একটা ছুতো, সত্যি কিনা বলো।"

"ওগো, কতবার বলেছি,—অনেকক্ষণ ধরে ডেকের কোণে বসে তোমাকে চেয়ে চেয়ে দেখছিলুম। ভুলে গিয়েছিলুম আর-কেউ সেটা লক্ষ্য করছে কি না। জীবনে সেই আমার সব-চেয়ে আশ্চর্য একচমকের চিরপরিচয়। মন বললে, কোথা থেকে এল এই অতিদূর জাতের মানুষটি, চারদিকের পরিমাপে তৈরি নয়, শেওলার মধ্যে শতদল পদ্ম। তখনই মনে মনে পণ করলুম এই দুর্লভ মানুষটিকে টেনে আনতে হবে, কেবল আমার নিজের কাছে নয়, আমাদের সকলের কাছে।"

"আমার কপালে তোমার একবচনের চাওয়াটা চাপা পড়ল বহুবচনের চাওয়ার তলায়।"

"আমার উপায় ছিল না অন্তু। দ্রৌপদীকে দেখবার আগেই কুন্তী বলেছিলেন, তোমরা সবাই মিলে ভাগ করে নিয়ো। তুমি আসবার আগেই শপথ করে দেশের আদেশ স্বীকার করেছি, বলেছি আমার একলার জন্যে কিছুই রাখব না। দেশের কাছে আমি বাগ্‌দত্তা।"

"অধার্মিক তোমার পণগ্রহণ, এ পণকে রক্ষা করাও প্রতিদিন তোমার স্বধর্মবিদ্রোহ। পণ যদি ভাঙতে তবে সত্যরক্ষা হত। যে লোভ পবিত্র যা অন্তর্যামীর আদেশবাণী, তাকে দলের পায়ে দলিত করেছ, এর শাস্তি তোমাকে পেতে হবে।"

"অন্তু, শাস্তির সীমা নেই, দিনরাত মারছে আমাকে। যে আশ্চর্য সৌভাগ্য সকল সাধনার অতীত, যা দৈবের অযাচিত দান তা এল আমার সামনে, তবু নিতে পারলুম না। হৃদয়ে হৃদয়ে গাঁঠ বাঁধা, তৎসত্ত্বেও এতবড়ো দুঃসহ বৈধব্য কোনো মেয়ের ভাগ্যে যেন না ঘটে। একটা মন্ত্রপড়া বেড়ার মধ্যে ছিলুম, কিন্তু তোমাকে দেখবামাত্র মন উৎসুক হয়ে উঠল, বললে, ভাঙুক সব বেড়া। এমন বিপ্লব ঘটতে পারে সে-কথা কোনোদিন ভাবতে পারি নি। এর আগে কখনো মন বিচলিত হয় নি বললে মিথ্যে বলা হবে। কিন্তু চঞ্চলতা জয় করে খুশি হয়েছি নিজের শক্তির গর্বে। জয় করবার সেই গর্ব আজ নেই, ইচ্ছে হারিয়েছি—বাহিরের কথা ছেড়ে দাও, অন্তরের দিকে তাকিয়ে দেখো, হেরেছি আমি। তুমি বীর, আমি তোমার বন্দিনী।"

"আমিও হেরেছি আমার সেই বন্দিনীর কাছে। হার শেষ হয় নি, প্রতি মুহূর্তের যুদ্ধে প্রতি মুহূর্তেই হারছি।"

"অন্তু, ফার্স্ট ক্লাস ডেক-এ যখন অপূর্ব আবির্ভাবের মতো আমাকে দূর থেকে দেখা দিয়েছিলে তখনও জানতুম থার্ড ক্লাসের টিকিটটা আমাদের আধুনিক আভিজাত্যের

একটা উজ্জ্বল নিদর্শন। অবশেষে তুমি চড়লে রেলগাড়িতে সেকেণ্ডক্লাসে। আমার দেহমনকে প্রবল টান দিলে সেই ক্লাসের দিকে। এমন কি, মনে একটা চাতুরীর কল্পনা এসেছিল, ভেবেছিলুম, ট্রেন ছাড়বার শেষমুহূর্তে উঠে পড়ব তোমার গাড়িতে, বলব,—তাড়াতাড়িতে ভুলে উঠেছি। কাব্যশাস্ত্রে মেয়েরাই অভিসার করে এসেছে, সংসারবিধিতে বাধা আছে বলেই কবিদের এই করুণা। উসখুস-করা মনের যত সব এলোমেলো ইচ্ছে ভিতরের আঁধার কোঠায় ঘুর খেয়ে খেয়ে দেয়ালে মাথা ঠুকে ঠুকে বেড়ায়। এদের কথা মেয়েরা পর্দার বাইরে কিছুতে স্বীকার করতে চায় না। তুমি আমাকে স্বীকার করিয়েছ।"

"কেন স্বীকার করলে?"

"নারীজাতির গুমর ভেঙে কেবল ওই স্বীকারটুকুই তোমাকে দিতে পেরেছি, আর তো কিছু পারি নি।"

হঠাৎ অতীন এলার হাত চেপে ধরে বলে উঠল, "কেন পারলে না? কিসের বাধা ছিল আমাকে গ্রহণ করতে? সমাজ? জাতিভেদ?"

"ছি, ছি, এমন কথা মনেও ক'রো না। বাইরে বাধা নয়, বাধা অন্তরে।"

"যথেষ্ট ভালোবাস নি?"

"ওই যথেষ্ট কথাটার কোনো মানে নেই অন্তু। যে শক্তি হাত দিয়ে পর্বতকে ঠেলতে পারে নি তাকে দুর্বল বলে অপবাদ দিয়ো না। শপথ করে সত্য গ্রহণ করেছিলুম, বিয়ে করব না। না করলেও হয়তো বিয়ে সম্ভব হত না।"

"কেন হত না?"

"রাগ ক'রো না অন্তু, ভালোবাসি বলেই সংকোচ। আমি নিঃস্ব, কতটুকুই বা তোমাকে দিতে পারি!"

"স্পষ্ট করেই বলো।"

"অনেকবার বলেছি।"

"আবার বলো, আজ সব বলাকওয়া শেষ করে নিতে চাই, এর পরে আর জিজ্ঞাসা করব না।"

বাইরে থেকে ডাক এল, "দিদিমণি।"

"কী রে অখিল, আয় না ভিতরে।"

ছেলেটার বয়স ষোলো কিংবা আঠারো হবে। জোরালো দুষ্টুমি-ভরা প্রিয়দর্শন চেহারা। ঝোঁকড়া চুল ঝাঁকড়ামাকড়া, কচি শামলা রং, চঞ্চল চোখদুটো জ্বলজ্বল করছে। খাকি রঙের শর্টপরা, কোমর পর্যন্ত ছাঁটা সেই রঙেরই একটা বোতাম-খোলা

জামা, বুক বের করা; শর্টের দুইদিককার পকেট নানা বাজে সম্পত্তিতে ফুলে-ওঠা, বুকের পকেটে বিচিত্র ফলাওআলা একটা হরিণের শিঙের ছুরি; কখনো বা সে খেলার নৌকো কখনো এরোপ্লেনের নমুনা বানায়। সম্প্রতি মল্লিক কোম্পানির আয়ুর্বৈদিক বাগানে রেখে এসেছে জলতোলা হাওয়া-যন্ত্র; বিস্কুটের টিন প্রভৃতি নানা ফালতো জিনিস জোড়াতাড়া দিয়ে তারই নকলের চেষ্টা চলছে। আঙুল কেটেছে, তার উপরে ন্যাকড়া জড়ানো, এলা জিজ্ঞাসা করলে কানেই আনে না। এলা এই বাপমা-মরা ছেলের দূরসম্পর্কের আত্মীয়, অনেক উৎপাত সহ্য করে। কার কাছ থেকে বেঁটে জাতের এক বাঁদর অখিল সস্তা দামে কিনেছে। জন্তুটা ভাঁড়ারে চৌর্যবৃত্তিতে সুদক্ষ। এলার ছোটো পরিবারে এই জন্তুটা একটা মস্ত অত্যাচার।

ঘরে ঢুকেই অখিল সলজ্জ দ্রুতবেগে পা ছুঁয়ে এলাকে প্রণাম করলে। এলা বুঝলে প্রণামটা একটা কোনো বিশেষ অনুষ্ঠানের অন্তর্গত, কেননা ভক্তিবৃত্তিটা অখিলের স্বভাবসিদ্ধ নয়।

এলা বললে, “তোর অন্তুদাদাকে প্রণাম করবি নে?”

কোনো জবাব না দিয়ে অখিল অতীনের দিকে পিঠ ফিরিয়ে খাড়া দাঁড়িয়ে রইল। অতীন উচ্চস্বরে হেসে উঠল। অখিলের পিঠ চাপড়িয়ে বললে, “শাবাশ, মাথা যদি হেঁট করতেই হয় তো এক-দেবতার পায়ে। সেই একেশ্বরীর কাছে আমারও মাথা হেঁট, এখন প্রসাদের ভাগ নিয়ে রাগারাগি ক'রো না ভাই, উদ্‌বৃত্তই বেশি।”

এলা অখিলকে বললে, “তোর কী কথা আছে বলে যা।”

অখিল বললে, “কাল আমার মায়ের মৃত্যুদিন।”

“তাই তো। একেবারে ভুলে গিয়েছিলুম। কাউকে শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ করতে চাস?”

“কাউকে না।”

“তবে কী চাস?”

“পড়ার ছুটি চাই তিন দিন।”

“কী করবি ছুটি নিয়ে?”

“খরগোশের খাঁচা বানাব।”

“খরগোশ তোর একটিও বাকি নেই, খাঁচা বানাবি কার জন্যে?”

অতীন হেসে বললে, “খরগোশ তো কল্পনা করলেই হয়, খাঁচাটা বানানোই আসল কথা। মানুষ অনিত্য, আসে আর যায় কিন্তু নিত্যকালের মতো পাকা করে তাদের খাঁচা বানাবার ভার নিয়েছেন ভগবান মনু থেকে আরম্ভ করে মনুর আধুনিক অবতার পর্যন্ত। এই কাজে তাঁদের ভীষণ শখ।”

"আচ্ছা, অখিল যা তোর ছুটি।"

দ্বিতীয় কথাটি না বলে অখিল দৌড়ে চলে গেল।

অতীন বললে, "ওকে পোষ মানাতে পারলুম না। আমার সাবেক সম্পত্তির ঝড়তিপড়তির মধ্যে ছিল একটা কব্জিঘড়ি, আধুনিক ছেলেদের পক্ষে সাত রাজার ধন। একদিন সেটা ওকে দিতে গিয়েছিলুম। মাথা ঝাঁকানি দিয়ে চলে গেল। এর থেকে বুঝবে ওতে আমাতে ব্যাপারটা কম্যুন্যাল হয়ে উঠেছে, অন্ত-অখিল রায়ট হবার লক্ষণ।"

"ছেলেদের সঙ্গে ভাব করতে তোমার জুড়ি কেউ নেই, তবু এই বাঁদরটার কাছে হার মানলে কেন?"

"মাঝখানে আছে তৃতীয় পক্ষ, নইলে ওতে আমাতে হরিহর বনে যেতুম। থাক্ সে-কথা; এখন বলো, তোমার কৈফিয়তটা কী? কেন আমাকে সরিয়ে রাখলে?"

"একটা সোজা কথা কেন তুমি মনে রাখ না যে, তোমার চেয়ে আমি বয়সে বড়ো?"

"কারণ এই সোজা কথাটা ভুলতে পারি নি যে, তোমার বয়স আটাশ, আমার বয়স আটাশ পেরিয়ে কয়েক মাস। প্রমাণ করা খুব সহজ, কারণ দলিলটা তাম্রশাসনে ব্রাহ্মীলিপিতে লেখা নয়।"

"আমার আটাশ তোমার আটাশকে বহুদূরে পেরিয়ে গেছে। তোমার আটাশে যৌবনের সব সলতেই নির্ধূম জ্বলছে। এখনও তোমার জানলা খোলা যাদের দিকে, তারা অনাগত তারা অভাবিত।

"এলী, আমার কথাটা কিছুতে বুঝতে চাচ্ছ না বলেই বুঝছ না। দলের কাছে ভগবানের সত্যের বিরুদ্ধে সত্য নিয়েছ তাই নানা তর্ক বানিয়ে নিজেকে ভোলাচ্ছ, আমাকেও। ভোলাও কিন্তু এ-কথা ব'লো না আমার জীবনে এখনও অনাগত অভাবিত দূরে রয়ে গেছে। এসেছে সে, সে তুমি। তবুও আজও সে অনাগত। চিরদিনই কি তবে জানলা খোলা থাকবে তার দিকে? সেই শূন্যের ভিতর দিয়ে কেবলই বাজবে আমার আর্ত স্বর, চাই তোমাকে চাই, আর অন্য দিক দিয়ে ফিরে আসবে না কোনো উত্তর?"

"ফিরে আসছে না, এমন কথা বলছ কী করে অকৃতজ্ঞ? চাই, চাই, চাই, তোমার চেয়ে বেশি কিছুই চাই নে এ জগতে। যে-সময়ে দেখা হলে শুভদৃষ্টি সম্পূর্ণ হত সে-সময়ে হয় নি যে দেখা। কিন্তু তবু বলছি ভাগ্যে হয় নি।"

"কেন? কী ক্ষতি হত তাতে?"

"আমার জীবন সার্থক হত, কতটুকুই বা তার দাম। কারও মতো নও যে তুমি; মস্ত তুমি। তফাতে আছি বলেই দেখতে পেলুম সেই তোমার অলোকসামান্য প্রকাশ। সামান্য আমাকে দিয়ে তোমাকে জড়িয়ে ফেলবার কথা কল্পনা করতে আমার ভয় করে। আমার ছোটো সংসারে প্রতিদিনের তুচ্ছতায় মানুষ হবে তুমি! আমি কত উপরে মুখ তুলে তোমার মাথা দেখতে পাই তোমাকে বোঝাব কেমন করে? মেয়েদের সম্বল জীবনের যত সব খুঁটিনাটি, সেই বোঝা দিয়ে তোমাদের মতো পুরুষের জীবনকেও চাপা দিতে ভয় পায় না এমন মেয়ে হয়তো আছে; তারা ট্র্যাজেডি ঘটিয়েছে কত আমি তা জানি। চোখের সামনে দেখেছি লতার জালে বনস্পতিকে বাড়তে দিল না; সেই মেয়েরা বুঝি মনে করে তাদের জড়িয়ে ধরাই যথেষ্ট।"

"এলা, যে পায় সেই জানে যথেষ্ট কাকে বলে।"

"নিজেকে ভোলাতে চাই নে, অন্তু। প্রকৃতি আমাদের আজন্ম অপমান করেছে। আমরা বায়োলজির সংকল্প বহন করে এসেছি জগতে। সঙ্গে সঙ্গে এনেছি জীবপ্রকৃতির নিজের জোগানো অস্ত্র ও মন্ত্র। সেগুলো ঠিকমতো ব্যবহার করতে জানলেই সস্তায় আমরা জিতে নিতে পারি আমাদের সিংহাসন। সাধনার ক্ষেত্রে পুরুষকে প্রমাণ করতে হয় তার শ্রেষ্ঠতা। সেই শ্রেষ্ঠতা যে কী, ভাগ্যক্রমে আমি তা জানবার সুযোগ পেয়েছি। পুরুষরা আমাদের চেয়ে অনেক বড়ো।"

"মাথায় বড়ো।"

"হাঁ মাথায় বড়োই তো। প্রকৃতিকে অতিক্রম করে বড়ো হবার তোরণদ্বার সেই মাথায়। আমার বুদ্ধিসুদ্ধি যথেষ্ট থাক্ না-থাক্ আমি নম্র হয়ে নিজেকে নিবেদন করতে পেরেছি সেই উপরের দিকে চেয়ে।"

"কোনো নীচ উৎপাত করে নি?"

"করেছে। আমাদের টানে যারা নেমে আসে বায়োলজির নিচের তলায়, তারা বিশ্রী হয়ে বিগড়ে যায়। ব্যক্তিগত বিশেষ ইচ্ছে বা প্রয়োজন না থাকলেও নিচে টেনে আনবার একটা সাধারণ ষড়যন্ত্রে আমরা সমস্ত মেয়ে এক হয়ে যোগ দিয়েছি, সাজে সজ্জায় হাবেভাবে বানানো কথায়।"

"বোকাদের ভোলাবার জন্যে?"

"হাঁ গো, তোমরা বোকা! অতি সহজ মন্ত্রেই ভোল, তাই আমাদের এত গুমর। আমরা বোকাদের ভালোবেসেছি, তবু তাদের স্থূল বোকামির সর্বোচ্চ শিখরে দেখেছি সূর্যোদয়, আলো এনেছে তারা, পূজা করেছি তখন। অনেক দেখেছি ইতর নোংরা নিন্দুক, অনেক দেখেছি কৃপণ কুৎসিত। সব বাদ দিয়ে সব মেনে নিয়ে তবু অনেক

বাকি থাকে। সেই বাকিদেরই দেখেছি উজ্জ্বল আলোয়। তাদের অনেকের নাম থাকবে না কারও মনে, তবু তারা বড়ো।"

"এলী, তোমার কথা শুনে লজ্জা করছে, মনে হচ্ছে একটা প্রতিবাদ না করলে ভালো শোনাবে না। তবু ভালোও লাগছে। কিন্তু সত্য কথায় তোমার কাছে হার মানতে পারব না। আমাদের দেশের পুরুষদের যে কাপুরুষতার লক্ষণ ছেলেবেলা থেকে দেখেছি, যার কথা আমাকে বারবার ভাবিয়েছে সে আমি আজ তোমার কাছে বলব। আমি দেখেছি আমার জানা পরিবারের মধ্যে এবং আমার নিজের পরিবারেও শাশুড়ীর অসহ্য অন্যায় আধিপত্য। শাশুড়ীর অত্যাচারের কথা চিরকাল এদেশে প্রচলিত।"

"হাঁ সে তো জানি। নিজের ঘরে দেখেছি, যে-মানুষ হাড়ে দুর্বল, দুর্বলের যম সে—তার মতো নিষ্ঠুর কেউ হতে পারে না।"

"এলা, ও-কথা বলে তুমি তোমার ভাবী শাশুড়ীর নিন্দার ভূমিকা করে রেখো না। নববধূর 'পরে অমানুষিক অত্যাচারের খবর প্রায় শুনতে পাই, আর দেখি তার প্রধান নায়িকা শাশুড়ী। কিন্তু শাশুড়ীকে অপ্রতিহত অন্যায় করবার অধিকার দিয়েছে কে? সে তো ওই মায়ের খোকারা। অত্যাচারিণীর বিরুদ্ধে নিজের স্ত্রীর সম্ভ্রম রাখবার শক্তি নেই যাদের সেই নাবালকদের কখনোই কি বিয়ে করবার বয়স হয়? যখন হয় তখন তারা স্ত্রীর খোকা হয়ে ওঠে। যেখানে পুরুষের পৌরুষ দুর্বল সেখানেই মেয়েরা নেবে আসে আর নাবায় নীচতার দিকে। আজ দেখি আমাদের দেশে যারা বড়ো-কিছু করবার সংকল্প করে তারা মেয়েকে ত্যাগ করতে চায়—মেয়েকে ভয় করে সেই স্ত্রৈণ কাপুরুষেরা। সেইজন্যেই এই কাপুরুষের দেশে তুমি পণ করেছ বিয়ে করবে না, পাছে কোনো কচি মন বেঁকে যায় তোমার মেয়েলি প্রভাবে। যথার্থ পুরুষ যারা, তারা যথার্থ মেয়ের জোরেই চরিতার্থ হবে—বিধাতার নিজের হাতের এই হুকুমনামা আছে আমাদের রক্তে। যে সেই বিধিলিপিকে ব্যর্থ করে সে পুরুষ নামের যোগ্য নয়। পরীক্ষার ভার ছিল তোমার হাতে, আমাকে পরীক্ষা করে দেখলে না কেন?"

"অন্তু, তর্ক করতে পারতুম কিন্তু তোমার সঙ্গে তর্ক করব না। কেননা, জানি তুমি নিতান্ত ক্ষোভের মুখে এই সব কুযুক্তি পেড়েছ। আমার পণের কথা কিছুতেই ভুলতে পারছ না।"

"না ভুলতে পারব না। তুমি বললে কি না, পুরুষেরা মস্ত বড়ো, মেয়েরা তাদের ছোটো করবে এই তোমার ভয়! মেয়েদের বড়ো হবার দরকারই হয় না। তারা যতটুকু ততটুকুই সুসম্পূর্ণ। হতভাগা যে-পুরুষ বড়ো নয় সে অসম্পূর্ণ, তার জন্যে সৃষ্টিকর্তা লজ্জিত।"

"অন্ত, সেই অসম্পূর্ণের মধ্যেও আমরা বিধাতার ইচ্ছাটা দেখতে পাই—সেটা বড়ো ইচ্ছা।"

"এলী, বিধাতার ইচ্ছাটাই যে বড়ো তা বলতে পারি নে, তাঁর কল্পনাটাও কোনো অংশে ছোটো নয়। সেই কল্পনার তুলির ছোঁওয়ায় জাদু লেগেছে মেয়েদের প্রকৃতিতে. তারা সংসারের ক্ষেত্রে এনেছে আর্টিস্টের সাধনা, রঙে সুরে আপন দেহে মনে প্রাণে অনির্বচনীয়কে প্রকাশ করছে। এটা সহজ শক্তির কর্ম, সেইজন্তেই এটা সহজ নয়। ওই যে তোমার শাঁখের মতো চিকন রঙের কণ্ঠে সোনার হারটি দেখা দিয়েছে ওর জন্তে তোমাকে নোটবই মুখস্থ করতে হয় নি। আপনার জীবনলোকে রূপের সৃষ্টিতে রস জোগাতে পারল না, এমন হতভাগিনী আছে, মোটা সোনার বালা পরে গিন্নীপনা করে সেই মুখরা ; নয় তো দাসী হয়ে জীবন কাটায় উঠোন নিকিয়ে। সংসারে এই সব অকিঞ্চিৎকরের সীমাসংখ্যা নেই।"

"সৃষ্টিকর্তাকেই দোষ দেব অন্ত। লড়াই করবার শক্তি কেন দেন নি মেয়েদের ? বঞ্চনা করে কেন তাদের আপনাকে বাঁচাতে হয় ? পৃথিবীতে সব-চেয়ে জঘন্ত যে স্পাইয়ের ব্যবসা সেই ব্যবসাতে মেয়েদের নৈপুণ্য পুরুষের চেয়ে বেশি এ-কথা যখন বইয়ে পড়লুম তখন বিধাতার পায়ে মাথা ঠুকে বলেছি সাতজন্মে যেন মেয়ে হয়ে না জন্মাই। আমি মেয়ের চোখে দেখেছি পুরুষকে, তাই সব কাটিয়ে তাদের ভালোকে দেখতে পেয়েছি, তাদের বড়োকে। যখন দেশের কথা ভাবি তখন সেই সব সোনার টুকরো ছেলেদের কথাই ভাবি, আমার দেশ তারাই। তারা ভুল যদি করে, খুব বড়ো করেই ভুল করে। আমার বুক ফেটে যায় যখন ভাবি আপন ঘরে এরা জায়গা পেল না। আমি ওদেরই মা, ওদেরই বোন, ওদেরই মেয়ে—এই কথা মনে করে বুক ভরে ওঠে আমার। নিজেকে সেবিকা বলতে ইংরেজি-পড়া মেয়েদের মুখে বাধে—কিন্তু আমার সমস্ত হৃদয় বলে ওঠে আমি সেবিকা, তোমাদের সেবা করা আমার সার্থকতা। আমাদের ভালোবাসার চরম এই ভক্তিতে।"

"ভালোই তো ; তোমার সেই ভক্তির জন্তে অনেক পুরুষ আছে, কিন্তু আমাকে কেন ? ভক্তি না হলেও আমার চলবে। মেয়েদের সম্বন্ধে যে ফর্দটা তুমি দিলে, মা বোন মেয়ে, তার মধ্যে প্রধান একটা বাদ পড়ে গেল, আমারই কপালদোষে।"

"তোমার নিজের চেয়ে তোমাকে আমি বেশি জানি অন্ত। আমার আদরের ছোটো খাঁচায় দুদিনে তোমার ডানা উঠত ছটফটিয়ে। যে-তৃপ্তির সামান্ত উপকরণ আমাদের হাতে, তার আয়োজন তোমার কাছে একদিন ঠেকত অনিতে এসে। তখন জানতে পারতে আমি কতই গরিব। তাই আমার সমস্ত দাবি ভুলে নিয়েছি, সম্পূর্ণমনে

সঁপে দিয়েছি তোমাকে দেশের হাতে। সেখানে তোমার শক্তি স্থান-সংকোচে দুঃখ পাবে না।"

অত্যন্ত ব্যথার জায়গায় যেন ঘা লাগল, জ্বলে উঠল অতীনের দুই চোখ। পায়চারি করে এল ঘরের এধার থেকে ওধারে। তার পরে এলার সামনে এসে দাঁড়িয়ে বললে, "তোমাকে শক্ত কথা বলবার সময় এসেছে। জিজ্ঞাসা করি দেশের কাছে হ'ক যার কাছেই হ'ক তুমি আমাকে সঁপে দেবার কে? তুমি সঁপে দিতে পারতে মাধুর্যের দান, যা তোমার যথার্থ আপন সামগ্রী। তাকে সেবা বল তো তাই বলো, বরদান বল যদি তাও বলতে পারো; অহংকার করতে যদি দাও তো করব অহংকার, নম্র হয়ে যদি আসতে বল দ্বারে তবে তাও আসতে পারি। কিন্তু তোমার আপন দানের অধিকারকে আজ দেখছ তুমি ছোটো করে। নারীর মহিমায় অন্তরের ঐশ্বর্য যা তুমি দিতে পারতে, তা সরিয়ে নিয়ে তুমি বলছ—দেশকে দিলে আমার হাতে। পার না দিতে, পার না, কেউ পারে না। দেশ নিয়ে এক হাত থেকে আর-এক হাতে নাড়ানাড়ি চলে না।"

বিবর্ণ হয়ে এল এলার মুখ। বললে, "কী বলছ, ভালো বুঝতে পারছি নে।"

"আমি বলছি নারীকে কেন্দ্র করে যে-মাধুর্যলোক বিস্তৃত, তার প্রসার যদি বা দেখতে হয় ছোটো, অন্তরে তার গভীরতার সীমা নেই,—সে খাঁচা নয়। কিন্তু দেশ উপাধি দিয়ে যার মধ্যে আমার বাসা নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলে তোমাদের দলের বানানো দেশে—অন্যের পক্ষে যাই হ'ক আমার স্বভাবের পক্ষে সেই তো খাঁচা। আমার আপন শক্তি তার মধ্যে সম্পূর্ণ প্রকাশ পায় না বলেই অসুস্থ হয়ে পড়ে, বিকৃতি ঘটে তার, যা তার যথার্থ আপন নয় তাকেই ব্যক্ত করতে গিয়ে পাগলামি করে, লজ্জা পাই, অথচ বেরোবার দরজা বন্ধ। জান না, আমার ডানা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে, দুই পায়ে আঁট হয়ে লেগেছে বেড়ি। আপন দেশে আপন স্থান নেবার দায় ছিল আপন শক্তিতেই, সে শক্তি আমার ছিল। কেন তুমি আমাকে সে-কথা ভুলিয়ে দিলে?"

"ক্লিষ্টকণ্ঠে এলা বললে, "তুমি ভুললে কেন, অন্তু?"

"ভোলাবার শক্তি তোমাদের অমোঘ, নইলে ভুলেছি বলে লজ্জা করতুম। আমি হাজারবার করে মানব যে, তুমি আমাকে ভোলাতে পার, যদি না ভুলতুম, সন্দেহ করতুম আমার পৌরুষকে।"

"তাই যদি হয় তবে আমাকে ভর্ৎসনা করছ কেন?"

"কেন? সেই কথাটাই বলছি। ভুলিয়ে তুমি সেইখানেই নিয়ে যাও যেখানে তোমার আপন বিশ্ব, আপন অধিকার। দলের লোকের কথার প্রতিধ্বনি করে

বললে, জগতে একটিমাত্র কর্তব্যের পথ বেঁধে দিয়েছ তোমরা কজনে। তোমাদের সেই শানবাঁধানো সরকারি কর্তব্যপথে ঘুর খেয়ে কেবলই ঘুলিয়ে উঠছে আমার জীবনস্রোত।"

"সরকারি কর্তব্য ?"

"হাঁ তোমাদের স্বদেশী কর্তব্যের জগন্নাথের রথ। মন্ত্রদাতা বললেন, সকলে মিলে একখানা মোটা দড়ি কাঁধে নিয়ে টানতে থাকো দুই চক্ষু বুজে—এই একমাত্র কাজ। হাজার হাজার ছেলে কোমর বেঁধে ধরল দড়ি। কত পড়ল চাকার তলায়, কত হল চিরজন্মের মতো পঙ্গু। এমন সময় লাগল মন্ত্র উলটোরথের যাত্রায়। ফিরল রথ। যাদের হাড় ভেঙেছে তাদের হাড় জোড়া লাগবে না, পঙ্গুর দলকে ঝাঁটিয়ে ফেললে পথের ধুলোর গাদায়। আপন শক্তির 'পরে বিশ্বাসকে গোড়াতেই এমনি করে ঘুচিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে, সবাই সরকারি পুতুলের ছাঁচে নিজেকে ঢালাই করতে দিতে স্পর্ধা করেই রাজি হল। সর্দারের দড়ির টানে সবাই যখন একই নাচ নাচতে শুরু করলে, আশ্চর্য হয়ে ভাবলে—একেই বলে শক্তির নাচ। নাচনওআলা যেই একটু আলগা দেয়, বাতিল হয়ে যায় হাজার হাজার মানুষ-পুতুল।"

"অন্তু, ওদের অনেকেই যে পাগলামি করে পা ফেলতে লাগল, তাল রাখতে পারলে না।"

"গোড়াতেই জানা উচিত ছিল মানুষ বেশিক্ষণ পুতুল-নাচ নাচতে পারে না। মানুষের স্বভাবকে হয়তো সংস্কার করতে পার, তাতে সময় লাগে। স্বভাবকে মেরে ফেলে মানুষকে পুতুল বানালে কাজ সহজ হয় মনে করা ভুল। মানুষকে আত্মশক্তির বৈচিত্র্যবান জীব মনে করলেই সত্য মনে করা হয়। আমাকে সেই জীব বলে শ্রদ্ধা যদি করতে তাহলে আমাকে দলে তোমার টানতে না, বুকে টানতে।"

"অন্তু, গোড়াতেই কেন আমাকে অপমান করে তাড়িয়ে দিলে না ? কেন আমাকে অপরাধী করলে ?"

"সে তো তোমাকে বারবার বলেছি। তোমার সঙ্গে মিলতে চেয়েছিলুম এইটে অত্যন্ত সহজ কথা। দুর্জয় সেই লোভ। প্রচলিত পথটা ছিল বন্ধ। মরিয়া হয়ে জীবন পণ করলুম বাঁকা পথে। তুমি মুগ্ধ হলে। আজ জেনেছি আমাকে মরতে হবে এই রাস্তায়। সেই মরাটা চুকে গেলে তুমি আমাকে দু-হাত বাড়িয়ে ফিরে ডাকবে—ডাকবে তোমার শূন্য বুকের কাছে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত।"

"পায়ে পড়ি, অমন করে ব'লো না।"

"বোকার মতো বলছি, রোমান্টিক শোনাচ্ছে। যেন দেহহীন বস্তুহীন পাওয়াকে

পাওয়া বলে! যেন তোমার সেদিনকার বিরহ আজকের দিনের প্রতিহত মিলনের এক কড়াও দাম শোধ করতে পারে!"

"আজ তোমাকে কথায় পেয়েছে, অন্তু।"

"কী বলছ! আজ পেয়েছে! চিরকাল পেয়েছে। যখন আমার বয়স অল্প, ভালো করে মুখ ফোটে নি, তখন সেই মৌনের অন্ধকারের ভিতর থেকে কথা ফুটে ফুটে উঠছিল, কত উপমা কত তুলনা কত অসংলগ্ন বাণী। বয়স হল, সাহিত্যলোকে প্রবেশ করলুম, দেখলুম ইতিহাসের পথে পথে রাজ্যসাম্রাজ্যের ভগ্নস্তূপ, দেখলুম বীরের রণসজ্জা পড়ে আছে ভেঙে, বিদীর্ণ জয়স্তম্ভের ফাটলে উঠেছে অশথগাছ; বহু শতাব্দীর বহু প্রয়াস ধুলার স্তূপে স্তব্ধ। কালের সেই আবর্জনারাশির সর্বোচ্চে দেখলুম অটল বাণীর সিংহাসন। সেই সিংহাসনের পায়ের কাছে যুগযুগান্তরের তরঙ্গ পড়ছে লুটিয়ে লুটিয়ে। কতদিন কল্পনা করেছি সেই সিংহাসনের সোনার স্তম্ভে অলংকার রচনা করবার ভার নিয়ে এসেছি আমিও। তোমার অন্তু চিরদিন কথায়-পাওয়া মানুষ। তাকে কোনোদিন ঠিকমতো চিনবে সে-আশা আর রইল না—তাকে কি না ভরতি করে নিলে দলের শতরঞ্চ খেলার বোড়ের মধ্যে।"

এলা চৌকি থেকে নেমে পড়ে অতীনের পায়ের উপর মাথা রাখলে। অতীন তাকে টেনে তুলে পাশে বসালে। বললে, "তোমার এই ছিপছিপে দেহখানিকে কথা দিয়ে দিয়েই মনে মনে সাজিয়েছি, তুমি আমার সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতা, তুমি আমার সুখমিতি বা দুঃখমিতি বা। আমার চারিদিকে আছে অদৃশ্য আবরণ, বাণীর আবরণ, সাহিত্যের অমরাবতী থেকে নেমে এসে ভিড় ঠেকিয়ে রাখে তারা। আমি চিরস্বতন্ত্র, সে-কথা জানেন তোমাদের মাস্টারমশায়, তবু আমাকে বিশ্বাস করেন কেন?"

"সেইজন্যেই বিশ্বাস করেন। সবার সঙ্গে মিলতে হলে সবার মধ্যে নাবতে হয় তোমাকে। তুমি কিছুতেই নাবতে পার না। তোমার 'পরে আমার বিশ্বাস সেইজন্যেই। কোনো মেয়ে কোনো পুরুষকে এত বিশ্বাস করতে পারে নি। তুমি যদি সাধারণ পুরুষ হতে তাহলে সাধারণ মেয়ের মতোই আমি তোমাকে ভয় করতুম। নির্ভয় তোমার সঙ্গ।"

"ধিক সেই নির্ভয়কে। ভয় করলেই পুরুষকে উপলব্ধি করতে। দেশের জন্যে দুঃসাহস দাবি কর, তোমার মতো মহীয়সীর জন্যে করবে না কেন? কাপুরুষ আমি। অসম্মতির নিষেধ ভেদ করে কেন তোমাকে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে পারি নি বহুপূর্বে যখন সময় হাতে ছিল? ভদ্রতা! ভালোবাসা তো বর্বর! তার বর্বরতা পাথর ঠেলে পথ করবার জন্যে। পাগলাঝোরা সে, ভদ্রশহরের পোষ-মানা কলের জল নয়।"

এলা দ্রুত উঠে পড়ে বললে, "চলো অন্তু, ঘরে চলো।"

অতীন উঠে দাঁড়াল, বললে "জয়! এতদিন পরে শুরু হল জয়! জিত হল আমার। যৌবন যখন প্রথম এসেছিল তখনও মেয়েদের চিনি নি। কল্পনায় তাদের দুর্গম দূরে রেখে দেখেছি; প্রমাণ করবার সময় বয়ে গেল যে, তোমরা যা চাও তাই আমি। অন্তরে আমি পুরুষ, আমি বর্বর উদ্দাম। সময় যদি না হারাতুম এখনই তোমাকে বজ্রবন্ধনে চেপে ধরতুম, তোমার পাঁজরের হাড় টনটন করে উঠত; তোমাকে ভাববার সময় দিতুম না, কাঁদবার মতো নিশ্বাস তোমার বাকি থাকত না, নিষ্ঠুরের মতো টেনে নিয়ে যেতুম আপন কক্ষপথে। আজ যে-পথে এসে পড়েছি এ-পথ ক্ষুরধারার মতো সংকীর্ণ, এখানে দুজনে পাশাপাশি চলবার জায়গা নেই।"

"দস্যু আমার, কেড়ে নিতে হবে না গো, নাও, এই নাও, এই নাও।" এই বলে দু-হাত বাড়িয়ে গেল অতীনের কাছে, চোখ বুজে তার বুকের উপর পড়ে তার মুখের দিকে মুখ তুলে ধরলে।

জানালা থেকে এলা রাস্তার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ বলে উঠল, "সর্বনাশ! ওই দেখতে পাচ্ছ?"

"কী বলো দেখি?"

"ওই যে রাস্তার মোড়ে। নিশ্চয় বটু—এখানেই আসছে।"

"আসবার যোগ্য জায়গা সে চেনে।"

"ওকে দেখলে আমার সমস্ত শরীর সংকুচিত হয়ে ওঠে। ওর স্বভাবে অনেকখানি মাংস, অনেকখানি ক্লেদ। যত চেষ্টা করি পাশ কাটিয়ে চলতে, ওকে দূরে ঠেকিয়ে রাখতে, ততই ও কাছে এসে পড়ে। অশুচি, অশুচি ওই মানুষটা।"

"আমিও ওকে সহ্য করতে পারি নে এলা।"

"ওর সম্বন্ধে অন্যায় কল্পনা করছি বলে নিজেকে শান্ত করবার অনেক চেষ্টা করি—কোনোমতেই পারি নে। ওর ড্যাবা ড্যাবা চোখ দুটো দূরের থেকে লালায়িত স্পর্শে যেন আমার অপমান করে।"

"ওর প্রতি ভ্রূক্ষেপ ক'রো না এলা। মনে মনে ওর অস্তিত্বকে একেবারে উপেক্ষা করতে পার না?"

"ওকে ভয় করি বলেই মন থেকে সরাতে পারি নে। ওর একটা ভিতরকার চেহারা দেখতে পাই কুৎসিত অক্টোপস জন্তুর মতো। মনে হয় ও আপনার অন্তর থেকে আটটা চটচটে পা বের করে আমাকে একদিন অসম্মানে ঘিরে ফেলবে—কেবলই তারই চক্রান্ত করছে। একে তুমি আমার অবুঝ মেয়েলি আশঙ্কা বলে হেসে উড়িয়ে দিতে

পায়, কিন্তু এই ভয়টা ভূতে পাওয়ার মতো আমাকে পেয়েছে। শুধু আমার জন্যে নয়, তোমার জন্যে আমার আরও ভয় হয়, আমি জানি তোমার দিকে ওর ঈর্ষা সাপের ফণার মতো ফোঁস ফোঁস করছে।"

"এলা, ওর মতো জন্তুদের সাহস নেই, আছে দুর্গন্ধ, তাই কেউ ওদের ঘাঁটাতে চায় না। কিন্তু আমাকে ও সর্বান্তঃকরণে ভয় করে, আমি ভয়ংকর বলে যে তা নয়, আমি ওর থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রজাতীয় বলে।"

"দেখো অন্তু, জীবনে অনেক দুঃখবিপদের সম্ভাবনা আমি ভেবেছি, তার জন্যে প্রস্তুতও আছি কিন্তু একদিন কোনো দুর্যোগে যেন ওর কবলে না পড়ি, তার চেয়ে মৃত্যু ভালো।" অন্তুর হাত চেপে ধরলে, যেন এখনই উদ্ধার করবার সময় হয়েছে।

"জানো অন্তু, হিংস্র জন্তুর হাতে অপমৃত্যুর কল্পনা কখনো কখনো মনে আসে, তখন দেবতাকে জানাই, বাঘে খায় ভালুকে খায় সেও ভালো, কিন্তু আমাকে পাঁকের মধ্যে টেনে নিয়ে কুমিরে খাবে—এ যেন কিছুতে না ঘটে।"

"আমি কি বাঘভালুকের কোঠায় না কি ?"

"না গো, তুমি আমার নরসিংহ, তোমার হাতে মরণেই আমার মুক্তি। ওই শোনো পায়ের শব্দ। উপরে উঠে এল বলে।"

অতীন্দ্র ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে জোর গলায় বললে, "বটু, এখানে নয়, চলো নিচে বসবার ঘরে।"

বটু বললে, "এলাদি—"

"এলাদি এখন কাপড় ছাড়তে গেলেন, চলো নিচে।"

"কাপড় ছাড়তে ? এত দেরিতে ? সাড়ে আটটা—"

"হাঁ হাঁ, আমিই দেরি করিয়ে দিয়েছি।"

"কেবল একটা কথা। পাঁচ মিনিট।"

"তিনি স্নানের ঘরে গেছেন। বলে গেছেন, এ ঘরে কেউ আসে তাঁর ইচ্ছে নয়।"

"আপনি ?"

"আমি ছাড়া।"

বটু খুব স্পষ্ট একটা ঠোঁটবাঁকা হাসি হাসলে। বললে, "আমরা চিরকাল রইলুম ব্যাকরণের সাধারণ নিয়মে, আর আপনি দুদিন এসেই উঠে পড়েছেন, আর্ষপ্রয়োগে। এক্‌সেপশন্‌ পিছল পথের আশ্রয়, বেশিকাল সয় না বলে রেখে দিলুম।" বলে তর তর করে নেমে চলে গেল।

ছোটো একটা করাত হাতে দোলাতে দোলাতে অখিল এসে বললে, "চিঠি।" ওর অসমাপ্ত সৃষ্টিকাজের মাঝখানে থেকে উঠে এসেছে।

"তোমার দিদিমণির ?"

"না আপনার। আপনারই হাতে দিতে বললে।"

"কে ?"

"চিনি নে।" বলেই চিঠিখানা দিয়ে চলে গেল। চিঠির কাগজের লাল রং দেখেই অতীন বুঝলে, এটা ডেন্‌জর সিগ্‌ন্যাল। গোপন ভাষায় লেখা চিঠি জুড়ে দেখলে—এলার বাড়িতে আর নয়, তাকে কিছু না জানিয়ে এই মুহূর্তে চলে এসো।"

কর্মের যে-শাসন স্বীকার করে নিয়েছে তাকে অসম্মান করাকে অতীন আত্মসম্মানের বিরুদ্ধ বলেই জানে। চিঠিখানা যথারীতি কুটিকুটি করে ছিঁড়ে ফেললে। মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াল রুদ্ধ নাবার ঘরের বাইরে। পরক্ষণে দ্রুতবেগে গেল বেরিয়ে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে একবার দোতলার দিকে তাকালে। জানলা খোলা, বাইরে থেকে দেখা যায় আরামকেদারার একটা অংশ, আর তার সঙ্গে সংলগ্ন লালেতে হলদেতে ডোরা-কাটা চৌকো বালিশের এক কোণা। লাফ দিয়ে অতীন চলতি ট্রাম গাড়িতে চড়ে বসল।

তৃতীয় অধ্যায়

গায়ে গায়ে ঠেসাঠেসি ফিকে-সবুজ গাঢ়-সবুজ হলদে-সবুজ ব্রাউন-সবুজ রঙের গুল্মে বনস্পতিতে জড়িত নিবিড়তা, বাঁশপাতা-পচা পাঁকের স্তরে ভরে-ওঠা ডোবা; তারই পাশ দিয়ে আঁকাবাঁকা গলি, গোরুর গাড়ির চাকায় বিক্ষত। ওল, কচু, ঘেঁটু, মনসা, মাঝে মাঝে আস্শেওড়ার বেড়া। কচিৎ ফাঁকের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় আল দিয়ে বাঁধা কচিধানের খেতে জল দাঁড়িয়েছে। গলি শেষ হয়েছে গঙ্গার ঘাটে। সেকালের ছোটো ছোটো ইঁট দিয়ে গাঁথা ভাঙা ফাটা ঘাট কাত হয়ে পড়েছে. তলায় চর পড়ে গঙ্গা গেছে সরে, কিছুদূরে তীরে ঘাট পেরিয়ে জঙ্গলের মধ্যে একটা পুরোনো ভাঙা বাড়ির অভিশপ্ত ছায়ায় দেড়শ বছর আগেকার মাতৃহত্যাপাতকীর ভূত আশ্রয় নিয়েছে বলে জনপ্রবাদ। অনেককাল কোনো সজীব স্বত্বাধিকারী সেই অশরীরীর বিরুদ্ধে আপন দাবি স্থাপনের চেষ্টামাত্র করে নি। দৃশ্যটা এইখানকার পরিত্যক্ত পুরোনো পুজোর দালান, তার সামনে শেওলা-পড়া রাবিশে এবড়োখেবড়ো প্রশস্ত আঙিনা। কিছুদূরে নদীর ধারে ভেঙে-পড়া দেউল, ভাঙা রাসমঞ্চ, প্রাচীন প্রাচীরের ভগ্নাবশেষ, ডাঙায় তোলা পাঁজর বের-করা ভাঙা নৌকো ঝুরি-নামা বটগাছের অন্ধকার তলায়।

এইখানে দিনের শেষ প্রহরে অতীনের বর্তমান বাসস্থানে ছায়াচ্ছন্ন দালানে প্রবেশ করল কানাই গুপ্ত। চমকে উঠল অতীন, কেননা এখানকার ঠিকানা কানাইয়েরও জানবার কথা ছিল না।"

"আপনি যে!"

কানাই বললে, "গোয়েন্দাগিরিতে বেরিয়েছি।"

"ঠাট্টাটা বুঝিয়ে দেবেন।"

"ঠাট্টা নয়। আমি তোমাদের রসদ-জোগানদারদের সামান্য একজন। চায়ের দোকানে শনি প্রবেশ করলে; বেরিয়ে পড়লুম। সঙ্গে সঙ্গে চলল ওদের কুদৃষ্টি। শেষকালে ওদেরই গোয়েন্দার খাতায় নাম লিখিয়ে এলুম। নিমতলা ঘাটের রাস্তা ছাড়া কোনো রাস্তা নেই যাদের সামনে, তাদের পক্ষে এটা গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড, দেশের বুকের উপর দিয়ে পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত বরাবর লম্বমান।"

"চা বানানো ছেড়ে খবর বানাচ্ছেন?"

"বানালে এ ব্যবসা চলে না। বিশুদ্ধ খাঁটি খবরই দিতে হয়। যে-শিকার জালে পড়েইছে আমি তার ফাঁস টেনে দিই। তোমাদের হরেনের সাড়ে পনেরো আনা খবর ওদের কাছে পৌঁছোল, শেষ বাহুল্য খবরটা আমি দিয়েছি। সে এখন জলপাইগুড়িতে সরকারি ধর্মশালায়।"

"এবার বুঝি আমার পালা ?"

"ঘনিয়ে এসেছে। কাজ অনেকখানি এগিয়ে এনেছে বটু। আমার অংশে যেটুকু পড়ল তাতে কিছু সময় পাবে। সাবেক বাসায় থাকতে হঠাৎ তোমার ডায়ারি হারিয়েছিল। মনে আছে ?"

"খুব মনে আছে।"

"সেটা পুলিসের হাতে নিশ্চিত পড়ত, কাজেই আমাকেই চুরি করতে হল।"

"আপনি !"

"হাঁ, সাধু যার সংকল্প ভগবান তার সহায়। একদিন সেটা লিখছিলে, আমারই কৌশলে সরে গেলে পাঁচ মিনিটের জন্যে। সেই সময়ে সরিয়েছি।"

অতীন মাথায় হাত দিয়ে বললে, "সবটা পড়েছেন ?"

"নিশ্চিত পড়েছি। পড়তে পড়তে রাত হয়ে গেল দেড়টা। বাংলা ভাষায় এত তেজ এত রস তা আগে জানতুম না। ওর মধ্যে গোপনীয় কথা আছে বই কি। কিন্তু সেটা ব্রিটিশসাম্রাজ্য সম্পর্কে নয়।"

"কাজটা কি ভালো করেছেন ?"

"কত ভালো করেছি তা বলতে পারি নে। তুমি সাহিত্যিক, তুমি সমস্ত খাতায় খুঁটিনাটি কথা কিছু লেখ নি, কারও নাম পর্যন্ত নেই। কেবল ভাবের দিক থেকে এত ঘৃণা এত অশ্রদ্ধা যে, তা কোনো পেনশনভোগী মন্ত্রিপদপ্রার্থীর কলম দিয়ে বেরোলে রাজদরবারে তার মোক্ষলাভ হত। বটু যদি তোমার সঙ্গে না লাগত তাহলে ওই খাতাখানাই তোমার গ্রহস্বস্ত্যয়নের কাজ করত।"

"বলেন কী। সবটাই পড়েছেন ?"

"পড়েছি বইকি। কী বলব বাবাজি, আমার যদি মেয়ে থাকত আর এমন লেখা যদি সে তোমার কলম থেকে বের করতে পারত তাহলে সার্থক মানতুম আপন পিতৃপদকে। সত্যি কথা বলি, তোমাকে দলে জড়িয়ে ইন্দ্রনাথ ভায়া দেশের লোকসান করেছেন।"

"আপনার এই ব্যবসার কথা দলের সবাই জানে ?"

"কেউ না।"

"মাস্টারমশায় ?"

"বুদ্ধিমান, আন্দাজ করতে পারেন কিন্তু আমাকে জিজ্ঞাসাও করেন নি, শোনেন নি আমার মুখ থেকে।"

"আমাকে বললেন যে !"

"এইটেই আশ্চর্য কথা। আমার মতো সন্দেহজীবী মানুষ কাউকে যদি বিশ্বাস না

করতে পারে তাহলে দম আটকে মরে। আমি ভাবুক নই, বোকাও নই, তাই ডায়ারি রাখি নি, যদি রাখতুম তোমার হাতে দিতে পারলে মন খোলসা হত।"

"মাস্টারমশায়—"

"মাস্টারমশায়ের কাছে খবর দেওয়া চলে কিন্তু মন খোলা চলে না। ইন্দ্রনাথের প্রধান মন্ত্রী আমি, কিন্তু তার সব কথা আমি যে জানি তা মনেও ক'রো না। এমন কথা আছে যা আন্দাজ করতেও সাহস হয় না। আমার বিশ্বাস, আমাদের দলের যারা আপনি ঝরে পড়ে, ইন্দ্রনাথ আমার মতোই তাদের ঝেঁটিয়ে ফেলে পুলিসের পাঁশতলায়। কাজটা গর্হিত কিন্তু নিষ্পাপ। বলে রাখছি, একদিন ওরই বা আমারই সাহায্যে তোমার হাতে শেষ হাতকড়ি পড়বে, তখন কিছু মনে ক'রো না যেন। তোমার এ-বাড়িতে আসার খবর বটুই প্রথম থানার কানাকানি-বিভাগে জানিয়েছে। কাজেই আমাকে টেক্কা দিতে হল, ফোটোগ্রাফ তুলে ওদের কাছে দিয়েছি। এখন কাজের কথা বলি। চব্বিশ ঘণ্টা তোমাকে সময় দিচ্ছি, তার পরেও যদি এখানে থাক তাহলে আমিই তোমাকে থানার পথে এগিয়ে দেব। এখান থেকে কোথায় যেতে হবে সবিস্তারে তার রাস্তাঘাট এই লিখে দিয়েছি—এর অক্ষর তোমার জানা আছে, তবু মুখস্থ করেই ছিঁড়ে ফেলো। এই দেখো ম্যাপ। রাস্তার এপাশে তোমার বাসা, ইস্কুলবাড়ির কোণের ঘরে। ঠিক সামনে পুলিসের থানা। সেখানে আছে আমার কোনো এক সম্পর্কে নাতি, রাইটর কনস্টেবল, তাকে রাঘব বোয়াল বলি। তিনপুরুষে পশ্চিমে বাস। বাংলা পড়াবার মাস্টারি পেয়েছ তুমি। সেখানে গেলেই রাঘব তোমার তোরঙ্গ ঘাঁটবে, পকেট ঝাড়া দেবে, গুঁতোগাঁতাও দিতে পারে। সেইটেকেই ভগবানের দয়া বলে মনে ক'রো। বাঙালি মাত্রই যে শ্যালকসম্প্রদায়ভুক্ত এই তত্ত্বটি রঘুবীরের হিন্দিভাষায় সর্বদাই প্রকাশ পেয়ে থাকে। তুমি তার কোনোপ্রকার রূঢ় প্রতিবাদের চেষ্টামাত্র ক'রো না, প্রাণ থাকতে এদেশে ফিরে এসো না। বাইসিক্‌লটা রইল বাইরে। ইশারা যখনই পাবে সেই মুহূর্তে চড়ে ব'সো। এস বাবাজি, শেষ দিনের মতো কোলাকুলি করে নিই।"
কোলাকুলি হয়ে গেলে চলে গেল কানাই।

অতীন চুপ করে বসে রইল। তাকিয়ে দেখতে লাগল অন্তরের দিকে। অকালে এসে পড়ল তার জীবনের শেষ অঙ্ক, যবনিকা আসন্নপতনমুখী, দীপ নিবে এসেছে। যাত্রা আরম্ভ হয়েছিল নির্মল ভোরের আলোয়; সেখান থেকে আজ অনেক দূরে এসে পড়েছে। পথে পা বাড়াবার সময় যে পাথেয় হাতে ছিল তার কিছুই বাকি নেই; পথের শেষভাগে নিজেকে কেবলই ঠকিয়ে খেয়েছে; একদিন হঠাৎ পথের একটা বাঁকের মুখে সৌন্দর্যের যে আশ্চর্য দান নিয়ে ভাগ্যলক্ষ্মী তার সামনে দাঁড়িয়েছিল সে যেন

অলৌকিক ; তেমন অপরিসীম ঐশ্বর্য প্রত্যক্ষ হবে ওর জীবনে, সে-কথা এর আগে ও কখনোই সম্ভব বলে ভাবতে পারে নি, কেবল তার কল্পরূপ দেখেছে কাব্যে ইতিহাসে ; বারেবারে মনে হয়েছে দান্তে বিয়াত্রিচে নূতন জন্ম নিল ওদের দুজনের মধ্যে। সেই ঐতিহাসিক প্রেরণা ওর মনের ভিতরে কথা কয়েছে, দান্তের মতোই রাষ্ট্রীয় বিপ্লবের আবর্তের মধ্যে অতীন পড়েছিল ঝাঁপ দিয়ে, কিন্তু তার সত্য কোথায়, বীর্য কোথায়, গৌরব কোথায়, দেখতে দেখতে অনিবার্য বেগে যে পাঁকের মধ্যে ওকে টেনে নিয়ে এল সেই মুখোশপরা চুরিডাকাতি-খুনোখুনির অন্ধকারে ইতিহাসের আলোকস্তম্ভ কখনো উঠবে না। আত্মার সর্বনাশ ঘটিয়ে অবশেষে আজ সে দেখছে কোনো যথার্থ ফল নেই এতে, নিঃসংশয় পরাভব সামনে। পরাভবেরও মূল্য আছে কিন্তু আত্মার পরাভবের নয়, যে-পরাভব টেনে আনল গোপনচারী বীভৎস বিভীষিকায়, যার অর্থ নেই যার অন্ত নেই।

দিনের আলো ম্লান হয়ে এল। ঝিঁঝি পোকার ডাক উঠেছে প্রাঙ্গণে, কোথায় গরুর গাড়ি চলেছে তার আর্তস্বর শোনা যায়।

হঠাৎ ঘরের মধ্যে দ্রুতপদে এসে পড়ল এলা, আত্মহত্যার জন্যে একঝোঁকে মানুষ জলে পড়ে যেমন ভাবে তেমনি আলুথালু অন্ধবেগে। অতীন লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠতেই তার বুকের উপর সে ঝাঁপিয়ে পড়ল। বাষ্পরুদ্ধস্বরে বলতে লাগল, "অতীন, অতীন, পারলুম না থাকতে।"

অতীন ধীরে ধীরে ওকে ছাড়িয়ে নিয়ে সামনে সরিয়ে ধরে ওর অশ্রুসিক্ত মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। বললে, "এলা, কী কাণ্ড করলে তুমি ?"

সে বললে, "কিছু জানি নে, কী করেছি।"

"এ ঠিকানা কেমন করে জানলে ?"

এলা গভীর অভিমানে বললে, "তোমার ঠিকানা তুমি তো জানাও নি।"

"যে তোমাকে জানিয়েছে সে তোমার বন্ধু নয়।"

"তাও আমি নিশ্চিত জানি কিন্তু তোমার কোনো পথ না জানতে পারলে শূন্যে শূন্যে মন ঘুরে বেড়ায়, অসহ্য হয়ে ওঠে। শত্রুমিত্র বিচার করবার মতো অবস্থা আমার নয়। কতকাল তোমাকে দেখি নি বলো দেখি ?"

"ধন্য তুমি !"

"তুমি ধন্য অন্তু ! যেমনি আমার বাড়িতে আসা নিষেধ হল অমনি সেটা তো মেনে নিতে পারলে !"

"ওটা আমার স্বাভাবিক স্পর্ধা। প্রচণ্ড ইচ্ছে আমাকে অজগর সাপের মতো দিনরাত পাক দিয়ে দিয়ে পিষেছিল তবু তাকে মানতে পারলুম না। ওরা আমাকে

বলে সেন্টিমেন্টাল, মনে ঠিক করে রেখেছিল সংকটের সময় প্রমাণ হবে আমি ভিজে মাটিতেই তৈরি। ওরা ভাবতেই পারে না সেন্টিমেন্টেই আমার অমোঘশক্তি।"

"মাস্টারমশায়ও তা জানেন।"

"এলী, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে এই ভূতুড়ে পাড়া সৃষ্টি হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত কোনো বাঙালি ভদ্রমহিলা এই জায়গাটার স্বরূপ নির্ধারণ করে নি।"

"তার কারণ, বাংলাদেশের কোনো ভদ্রমহিলার অদৃষ্টে এতবড়ো গরজ এমন দুঃসহ হয়ে কোনোদিন প্রকাশ পায় নি।"

"কিন্তু এলী, আজ তুমি যে কাজ করলে সেটা অবৈধ।"

"জানি সে-কথা, মানব আমার দুর্বলতা, তবু ভাঙব নিয়ম, শুধু নিজের হয়ে না, তোমার হয়েও। প্রতিদিন আমার মন বলেছে তুমি ডাকছ আমাকে। সাড়া দিতে পারি নে বলে যে প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে। বলো, আমি এসেছি বলে খুশি হয়েছ!"

"এত খুশি হয়েছি যে তা প্রমাণ করবার জন্যে বিপদ স্বীকার করতে রাজি আছি।"

"না না, তোমার কেন হবে বিপদ। যা হয় তা আমার হ'ক। তাহলে আমি যাই অন্তু।"

"কিছুতেই না। তুমি নিয়ম ভেঙে চলে এসেছ, আমি নিয়ম ভেঙে তোমাকে ধরে রাখব। দুজনে মিলে অপরাধ সমান করে নেওয়া যাক। নতুন বিস্ময়ের বসন্তী রঙে একদিন দেখেছিলুম তোমার ওই মুখ, সে আজ যুগান্তরে পিছিয়ে গেছে। আজ সেই দিনটিকে আবাহন করা যাক এই প'ড়ো ঘরটার মধ্যে। এস, আরও কাছে।"

"বসো, ঘরটা একটুখানি গুছিয়ে নেবার চেষ্টা করি।"

"হায় রে, টাকের মাথায় চিরুনি চালাবার চেষ্টা!"৮

এলা একবার চারিদিক ঘুরে দেখলে। মেঝের উপর কম্বল, তার উপর চাটাই। বালিশের বদলে বই দিয়ে ভরা একটা পুরোনো ক্যাম্বিসের থলি। লেখাপড়া করবার জন্যে একখানা প্যাকবাক্স। কোণে জলের কলসী মাটির ভাঁড় দিয়ে ঢাকা। জীর্ণ চাঙারিতে একছড়া কলা, তার মধ্যে এনামেল-উঠে-যাওয়া একখানা বাটি, দৈবাৎ সুযোগ ঘটলে চা খাওয়া চলে। ঘরের অন্য প্রান্তে একটা বড়ো চওড়া সিন্দুক, তার উপরে গণেশের একটি মাটির মূর্তি। তার থেকে প্রমাণ হয় এখানে অতীতের কোনো এক দোসর আছে। এক থাম থেকে আর-এক থাম পর্যন্ত দড়ি খাটানো, তাতে নানা রঙের ছোপ-লাগা অনেকগুলো ময়লা গামছা। স্যাঁতসেতে ঘরে শ্বাসরুদ্ধ আকাশের বাষ্পঘন গন্ধ।

ঠিক এমন না হ'ক এই জাতের দৃশ্য এলা দেখেছে মাঝে মাঝে। কখনো বিশেষ দুঃখ পায় নি, বরঞ্চ ত্যাগবীর ছেলেদেরকে মনে মনে বাহাদুরি দিয়েছে। একদা এক

জঙ্গলের ধারে দেখেছিল অনিপুণ হাতে রান্নার চেষ্টায় প'ড়ো চালের খড়বাখারি জ্বালানো চুলোর ভস্মাবশেষ ; মনে হয়েছিল রাষ্ট্রবিপ্লবী রোমান্সের এ একটা অঙ্গারে আঁকা ছবি। আজ কিন্তু কষ্টে ওর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এল। আরামের বাহুবেষ্টনে ঘেরা ধনীর ছেলেকে অবজ্ঞা করাই এলার অভ্যস্ত। কিন্তু অতীনকে এই অপরিচ্ছন্ন মলিন অভাবজীর্ণ অকিঞ্চনতার মধ্যে কিছুতে ওর মন মিশ খাওয়াতে পারে না।

এলার উদ্বিগ্ন মুখ দেখে অতীন হেসে উঠল, বললে, "আমার ঐশ্বর্য দেখছ স্তম্ভিত হয়ে। তার যে বিরাট অংশটা দেখা যাচ্ছে না, সেইটেতেই তুমি বিস্মিত। আমাদের পা খোলসা রাখতে হয়—দৌড় মারবার সময় মানুষও পিছু ডাকে না, জিনিসপত্রও না। কিছুদূরে পাটকলের মজুরদের বস্‌তি, তারা আমাকে মাস্টারবাবু বলে ডাকে। চিঠি পড়িয়ে নেয়, ঠিকানা লিখিয়ে নেয়, বুঝিয়ে নেয় দেনাপাওনার রসিদ ঠিক হল কি না। এদের কোনো কোনো সন্তানবৎসলার শখ, ছেলেকে একদিন মজুরশ্রেণী থেকে হজুর-শ্রেণীতে ওঠাবে। আমার সাহায্য চায়, কলফুলুরি দেয় এনে, কারও বা ঘরে গরু আছে দুধ জুগিয়ে থাকে।"

"অন্তু, কোণে ওই যে সিন্দুক আছে ওটা কার সম্পত্তি ?"

"অজায়গায় একলা থাকলেই বেশি করে চোখে পড়তে হয়। অলক্ষীর ঝাঁটার মুখে রাস্তার থেকে এসে পড়েছে এই ঘরটাতে মাড়োয়ারি, তৃতীয় বারকার দেউলে। আমার সন্দেহ হচ্ছে দেউলে হওয়াই ওর সর্বপ্রধান ব্যবসা। এই প'ড়ো দালানটা ওর দুজন ভাইপোর ট্রেনিং অ্যাকাডেমি। তারা ভোরবেলায় ছাতু খেয়ে কাজ করতে আসে, বস্‌তির মেয়েদের জন্যে সস্তাদামের কাপড় রঙায়, বেচে মূলধনের সুদ দেয়, আসলেরও কিছু কিছু শোধ করে। ওই যে মাটির গামলাগুলো দেখছ, ও আমি আমার বক্ষের রান্নায় ব্যবহার করি নে ; ওগুলোতে রং গোলা হয়। কাপড়গুলো তুলে রেখে যায় ওই বাক্সের ভিতর, তা ছাড়া ওতে আছে বস্‌তির মেয়েদের প্রসাধনযোগ্য নানা জিনিস ;—বেলোয়ারি চুড়ি চিরুনি ছোটো আয়না পিতলের বাজু। রক্ষা করবার ভার আমার উপর আর প্রেতাত্মার উপর। বেলা তিনটের সময় সওদা করতে বেরোয়, এখানে আর ফেরে না। কলকাতায় মাড়োয়ারি জানি নে কিসের দালালি করে। আমার ইংরেজি জানার লোভে আমাকে অংশীদার করতে চেয়েছিল, জীবের প্রতি দয়া করে রাজি হই নি। আমার আর্থিক অবস্থারও সন্ধান নেবার চেষ্টা ছিল, বুঝিয়ে দিয়েছি পূর্বপুরুষের ঘরে যা ছিল মজুত আজ তারই চোদ্দ আনা ওদেরই পূর্বপুরুষের ঘরে জন্মান্তরিত।"

"এখানে তোমার মেয়াদ কতদিনের ?"

"আন্দাজ করছি চব্বিশ ঘণ্টা। ওই আঙিনার রসে-বিগলিত নানা রঙের লীলা

সমানে চলবে দিনের পর দিন, অতীন্দ্র বিলীন হয়ে যাবে পাণ্ডুবর্ণ দূরদিগন্তে। আমার ছোঁয়াচ লেগেছে যে-মাড়োয়ারিকে তাকে বেড়ি-পরা মহামারীতে না পায় এই আমি কামনা করি। এখনও বিনা মূলধনে আমার ভাগ্যভাগী হবার সম্ভাবনা যে তার নেই তা বলতে পারি নে।"

"তোমার ভবিষ্যৎ ঠিকানাটা ?"

"হুকুম নেই বলবার।"

"তাহলে কি কল্পনাও করতে পারব না তুমি আছ কোথায় ?"

"কল্পনা করতে দোষ কী। মানস সরোবরের তীরটা ভালো জায়গা।"

ইতিমধ্যে ঝুলির ভিতর থেকে বইগুলো বের করে এলা উলটেপালটে দেখছে। কাব্য, তার কিছু ইংরেজি, আর দুই-একখানা বাংলা।

অতীন বললে, "এতদিন ওগুলো বয়ে বেড়িয়েছি পাছে নিজের জাত ভুলি। ওরই বাণীলোকে ছিল আমার আদি বসতি। পাতা খুললেই পেনসিলে চিহ্নিত তার রাস্তাগলির নির্দেশ পাবে। আর আজ! এই দেখো চেয়ে।"

এলা হঠাৎ মাটিতে লুটিয়ে অতীনের পা জড়িয়ে ধরলে। বললে, "মাপ করো, অন্তু, আমাকে মাপ করো।"

"তোমাকে মাপ করবার কী আছে এলী ? ভগবান যদি থাকেন, তাঁর যদি থাকে অসীম দয়া তবে তিনি যেন আমাকে মাপ করেন।"

"যখন তোমাকে চিনতুম না তখন তোমাকে এই রাস্তায় দাঁড় করিয়েছি।"

অতীন হেসে উঠে বললে, "নিজেরই পাগলামির ফুল স্টীমে এই অস্থানে পৌঁছেছি সে-খ্যাতিটুকুও দেবে না আমাকে ? আমাকে নাবালকের কোঠায় ফেলে অভিভাবকগিরি করতে এলে আমি সইব না বলে রাখছি। তার চেয়ে মঞ্চ থেকে নেবে এস ; আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলো—এস এস বঁধু এস আধো আঁচরে বসো।"

"হয়তো বলতুম কিন্তু আজ তুমি এমন করে খেপে উঠলে কেন ?"

"খেপব না ? বললে কিনা ভুজমৃণালের জোরে তুমি আমাকে পথে বের করেছ !"

"সত্যি কথা বললে রাগ কর কেন ?"

"সত্যি কথা হল ? আমি ছিটকে পড়েছি রাস্তায় অন্তরের বেগে, তুমি উপলক্ষ্যমাত্র। অন্য কোনো শ্রেণীর বঙ্গমহিলাকে উপলক্ষ্য পেলে এতদিনে গোরা-কালা-সম্মিলনী ক্লাবে ব্রিজ খেলতে যেতুম, ঘোড়দৌড়ের মাঠে গবর্নরের বক্সের অভিমুখে স্বর্গারোহণপর্বের সাধনা করতুম। যদি প্রমাণ হয় আমি মূঢ় তবে জাঁক করে বলব সে মূঢ়তা স্বয়ং আমারই, যাকে বলে ভগবদ্দত্ত প্রতিভা।"

"অন্তু, দোহাই তোমার, আর বাজে বকুনি ব'কো না! তোমার জীবিকা আমিই ভাসিয়ে দিয়েছি এ দুঃখ কখনো ভুলতে পারব না। দেখতে পাচ্ছি তোমার জীবনের মূল গেছে ছিন্ন হয়ে।"

"এতক্ষণে সেই মেয়ের প্রকাশ হল, যে-মেয়েটি রিয়ল্। একটুতেই ধরা পড়ে দেশোদ্ধারের রঙ্গমঞ্চে তুমি রোম্যাণ্টিক। যে-সংসারে কাঁসার থালায় দুধভাত মাছের মুড়ো তারই কেন্দ্রে বসে আছ তালপাতার পাখা হাতে। যেখানে পোলিটিক্যাল ঠ্যাঙার গুঁতি সেখানে আলুথালু চুলে চোখদুটো পাকিয়ে এসে পড় অপ্রকৃতিস্থতার ঝোঁকে, সহজবুদ্ধি নিয়ে নয়।"

"এত কথাও বলতে পার, অন্তু, মেয়েমানুষও তোমার কাছে হার মানে।"

"মেয়েমানুষ কথা বলতে পারে নাকি! তারা তো শুধু বকে। কথার টর্নেডো দিয়ে সনাতন মূঢ়তার ভিত ভাঙব বলে একদিন মনের মধ্যে ঝড়ো মেঘ জমে উঠেছিল। সেই মূঢ়তার উপরেই তোমাদের জয়স্তম্ভ গাঁথতে বেরিয়েছ কেবল গায়ের জোরে।"

"তোমার পায়ে পড়ি আমাকে বুঝিয়ে দাও আমার ভুলে তুমি ভুল কেন করলে? কেন নিলে জীবিকাবর্জনের দুঃখ?"

"ওটা আমার ব্যঞ্জনা, ইংরেজিতে যাকে বলে জেস্চার। ওটা আমার নিবেদনকালের ভাষা। যদি দুঃখ না মানতুম তাহলে মুখ ফিরিয়ে চলে যেতে, কিছুতে বুঝতে না তোমাকে কতখানি ভালোবেসেছি। সেই কথাটা উড়িয়ে দিয়ে ব'লো না ওটা দেশকে ভালোবাসা।"

"দেশ এর মধ্যে নেই অন্তু?"

"দেশের সাধনা আর তোমার সাধনা এক হয়েছে বলেই দেশ এর মধ্যে আছে। একদিন বীর্যের জোরে যোগ্যতা দেখিয়ে পেতে হ'ত মেয়েকে। আজ সেই মরণপণের সুযোগ পেয়েছি। সে-কথাটা ভুলে [illegible]মাত্র আমার জীবিকার অভাব নিয়ে তোমার ব্যথা লেগেছে অন্নপূর্ণা!"

"আমরা মেয়েরা সাংসারিক। সংসারে অকুলোন সইতে পারি নে। আমার একটা কথা তোমাকে রাখতেই হবে। আমার আছে পৈতৃক বাড়ি, আরও আছে কিছু জমা টাকা। দোহাই তোমার, বার বার দোহাই দিচ্ছি, কথা রাখো, আমার কাছে টাকা নিতে সংকোচ ক'রো না। জানি তোমার খুবই দরকার।"

"খুবই দরকার পড়লে ম্যাট্রিকুলেশনের নোটবই লেখা থেকে আরম্ভ করে কুলিগিরি পর্যন্ত খোলা রয়েছে।"

"আমি মানছি, অন্তু, আমার সমস্ত জমা টাকা দেশের কাজে এতদিনে খরচ করে

ফেলা উচিত ছিল। কিন্তু উপার্জনে আমাদের সুযোগ কম বলেই সঞ্চয়ে আমাদের অন্ধ আসক্তি। ভীতু আমরা।"

"ওটা তোমাদের সহজবুদ্ধির উপদেশ। নিঃসম্বলতায় মেয়েদের শ্রী নষ্ট হয়।"

"আমাদের ছোটো নীড়, সেখানে টুকিটাকি কিছু আমরা জমা করি। কিন্তু সে তো কেবল বাঁচবার প্রয়োজনে নয়, ভালোবাসার প্রয়োজনে। আমার যা-কিছু সমস্তই তোমার জন্যে, এ-কথা যদি বুঝিয়ে দিতে পারি তাহলে বাঁচি।"

"কিছুতেই বুঝব না ও-কথাটা। আজ পর্যন্ত মেয়েরা জুগিয়েছে সেবা, পুরুষরা জুগিয়েছে জীবিকা। তার বিপরীত ঘটলে মাথা হেঁট হয়। যে-চাওয়া নিয়ে অসংকোচে তোমার কাছে হাত পাততে পারি তাকে ঠেকিয়ে দিয়ে তুমি পণের বাঁধ বেঁধেছ। সেদিন নারায়ণী ইস্কুলের খাতা নিয়ে হিসেব মেলাচ্ছিলে। বসে পড়লুম কাছে, ঝড়ের ঘা খেয়ে চিল যেমন ধুলায় পড়ে তেমনি। মার-খাওয়া মন নিয়ে এসেছিলুম। কর্তব্যের যেমন-তেমন একটা ছাপমারা জিনিসে মেয়েদের নিষ্ঠা পাণ্ডার পায়ে তাদের অটল ভক্তির মতোই, ছাড়িয়ে নেওয়া অসম্ভব। মুখ তুলে চাইলে না। বসে বসে এক দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে ইচ্ছা করছিলুম ওই সুকুমার আঙুলগুলির ডগা দিয়ে স্পর্শসুধা পড়ুক ঝরে আমার দেহে মনে। দরদ লাগল না তোমার কোনোখানেই; কৃপণ, সেটুকুও দিতে পারলে না! মনে মনে বললুম, আরও বেশি দাম দিতে হবে বুঝি। একদিন কাটা মাথা কাটা দেহ নিয়ে পড়ব মাটিতে, তখন ভেঙে-পড়া প্রাণটাকে নেবে তোমার কোলে তুলে।"

এলার চোখ ছলছলিয়ে এল, বললে, "আঃ, তোমার সঙ্গে পারি নে, অন্তু! এটুকু না চেয়ে নিতে পারলে না? কেড়ে নিলে না কেন আমার খাতা? বুঝতে পার না, তোমারই সংকোচ আমাকে সংকুচিত করে। অন্তু, তোমার স্বভাব এক জায়গায় মেয়েদের মতো। ইচ্ছা থাকতে পারে প্রবল কিন্তু উদ্দামভাবে তার দাবি প্রকাশ করতে তোমার রুচিতে ঠেকে।"

"বংশগত ধারণা, ছেলেবেলা থেকে রক্তে মাংসে জড়ানো। বরাবর ভেবে এসেছি মেয়েদের দেহে মনে একটা শুচিতার মর্যাদা আছে; তাদের দেহের সম্মানকে সশঙ্কচিত্তে রক্ষা করা আমাদের পূর্বপুরুষগত অভ্যাস। আমার কুণ্ঠিত মনকে একটুমাত্র প্রশ্রয় দেবার জন্যে তোমার মন যদি কখনো আর্দ্র হয় তবে আমার পক্ষ থেকে ভিক্ষে চাইবার অপেক্ষা ক'রো না। আমি শিখি নি তেমন করে চাইতে। ক্ষুধার সীমা নেই, তাই বলে পেটুক হতে পারব না, ওটা আমার ধাতে নেই। আমার কামনার কৌলীন্য নষ্ট করতে পারি নে।"

এলা অতীনের কাছে এসে ঘেঁষে বসল, তার মাথা বুকে টেনে নিয়ে তার উপরে

নিজের মাথা হেলিয়ে রাখলে। কখনো কখনো আস্তে আস্তে চুলের মধ্যে আঙুল বুলিয়ে দিতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে অতীন মাথা তুলে বসে এলার হাত চেপে ধরলে। বললে, "যে-দিন মোকামায় খেয়াজাহাজে চড়েছিলুম সেদিন ভাগ্যদেবী পিতামহী অদৃশ্য মুহূর্তে কান মলে দিয়ে গেলেন তা বুঝতে পারি নি। তার অনতিকাল পর থেকেই মনটা কেবল আকাশকুসুম চয়ন করে বেড়াচ্ছে স্মৃতির আকাশে। সেদিনের কথা তোমার কাছে পুরোনো হয়েছে কি?"

"একটুও না।"

"তাহলে শোনো। ভারি মাল নিচের ডেক থেকে গাড়িতে নিয়ে গেছে আমার বিহারী চাকরটা। কাছে ছিল ছোটো একটা চামড়ার কেস—এদিক ওদিকে তাকাচ্ছি কুলির অপেক্ষায়। নেহাত ভালোমানুষের মতো হঠাৎ কাছে এসে বললে, কুলি চান? দরকার কী! আমি নিচ্ছি।—হাঁ হাঁ করেন কী, করেন কী বলতে বলতেই সেটা তুলে ফেললে। আমার বিপত্তি দেখে যেন পুনশ্চ নিবেদনে বললে, সংকোচ বোধ করেন তো এক কাজ করুন, আমার বাক্সটা ওই আছে তুলে নিন, পরস্পর ঋণ শোধ হয়ে যাবে।—তুলতে হল। আমার কেসের চেয়ে সাতগুণ ভারি। হাতলটা ধরে ডান হাতে বাঁ হাতে বদল করতে করতে টলতে টলতে রেলগাড়ির থার্ডক্লাস কামরায় টেনে তুললেম। তখন সিল্কের জামা ঘামে ভিজে, নিশ্বাস দ্রুত, নিস্তব্ধ অট্টহাস্য তোমার মুখে। হয়তো বা করুণা কোনো একটা জায়গায় লুকোনো ছিল, সেটা প্রকাশ করা অকর্তব্য মনে করেছিলে। সেদিন আমাকে মানুষ করবার মহৎ দায়িত্ব ছিল তোমারই হাতে।"

"ছী ছী, ব'লো না, ব'লো না, মনে করতে লজ্জা বোধ হয়। কী ছিলুম তখন, কী বোকা, কী অদ্ভুত! তখন তুমি হাসি চেপে রাখতে বলেই আমার স্পর্ধা বেড়ে গিয়েছিল। সহ্য করেছিলে কী করে? মেয়েদের কি বুদ্ধি থাকবার কোনো দরকার নেই?"

"থাক্ বা না থাক্ তাতে তো কিছু আসে যায় নি। সেদিন যে-পরিবেষের মধ্যে আমার কাছে দেখা দিয়েছিলে সে তো হায়ার ম্যাথম্যাটিক্স্ নয়, লজিক্ নয়। সেটা যাকে বলে মোহ। শংকরাচার্যের মতো মহামল্লও যার উপর মুদ্গরপাত করে একটু টোল খাওয়াতে পারেন নি। তখন বেলা পড়ে এসেছে, আকাশে যাকে বলে কনে-দেখা মেঘ। গঙ্গার জল লাল আভায় টলটল করছে। ওই ছিপছিপে ক্ষিপ্রগমন শরীরটি সেই রাঙা আলোর ভূমিকায় চিরদিন আঁকা রয়ে গেল আমার মনে। কী হল তার পরে? তোমার ডাক শুনলুম কানে। কিন্তু এসে পড়েছি কোথায়? তোমার থেকে কতদূরে! তুমিও কি জান তার সব বিবরণ?"

"আমাকে জানতে দাও না কেন অন্তু?"

"বারণ মানতে হয়। শুধু তাই কি? কী হবে সব কথা বলে?—আলো কমে গিয়েছে, এস আরও কাছে এস। আমার চোখ ছুটো এসেছে ছুটির দরবারে তোমার কাছে। একমাত্র তোমার কাছেই আমার ছুটি। অতি ছোটো তার আয়তন, সোনার জলে রাঙানো ফ্রেমের মতো। তারই মধ্যে ছবিটিকে বাঁধিয়ে নিই নে কেন? ওই যে তোমার দুই-একগুছি অশিষ্ট চুল আলগা হয়ে চোখের উপর এসে পড়েছে, দ্রুত হাতে তুলে তুলে দিচ্ছ, কালো পাড়-দেওয়া তসরের শাড়ি, ব্রোচ নেই কাঁধে, আঁচলটা মাথার চুলে বিঁধিয়ে রাখা, চোখে ক্লান্ত ক্লেশের ছায়া, ঠোঁটে মিনতির আভাস, চারিদিকে দিনের আলো ডুবে এসেছে শেষ অস্পষ্টতায়। এই যা দেখছি এইটিই আশ্চর্য সত্য, এর মানে কী, কাউকে বুঝিয়ে বলতে পারব না, কোনো এক অদ্বিতীয় কবির হাতেই ধরা দিতে পারল না বলে এর অব্যক্ত মাধুর্যের মধ্যে এত গভীর বিষাদ। এই ছোটো একটি অপরূপ পরিপূর্ণতাকে চারদিকে ভ্রূকুটি করে ঘিরে আছে বড়োনামওআলা বড়োছায়া-ওআলা বিকৃতি।"

"কী বলছ, অন্তু!"

"অনেকখানি মিথ্যে। মনে পড়ছে কুলি-বস্‌তিতে আমাকে বাসা নিতে বলেছিলে। তোমার মনের মধ্যে ছিল আমার বংশের অভিমানকে ধূলিসাৎ করবার অভিপ্রায়। তোমার সেই সুমহৎ অধ্যবসায়ে আমার মজা লাগল। ডিমক্রাটিক্ পিক্‌নিকে নাবা গেল। গাড়োয়ান-পাড়াতে ঘুরলুম। দাদা-খুড়োর সম্পর্ক পাতিয়ে চললুম বহুবিধ মোষের গোয়ালঘরের পাশে পাশে। কিন্তু তাদেরও বুঝতে বাকি ছিল না, আমারও নয় যে এই সম্পর্কের ছাপগুলো ধোপ সইবে না। নিশ্চয় এমন মহৎ লোক আছেন সব যন্ত্রেই যাঁদের সুর বাজে, এমন কি, তুলো-ধোনা যন্ত্রেও। আমরা নকল করতে গেলে সুর মেলে না। দেখো নি তোমাদের পাড়ায় খ্রীস্টশিষ্যকে; ব্রাদার বলে যাকে-তাকে বুকে চেপে ধরা তার অনুষ্ঠানের অঙ্গ। এতে খ্রীস্টকে ব্যঙ্গ করা হয়।"

"কী হয়েছে তোমার অন্তু! কোন্ ক্ষোভের মুখে এ-সব কথা বলছ? তুমি কি বলতে চাও কর্তব্যকে কর্তব্য বলে মানা যায় না অরুচি কাটিয়ে দিয়েও?"

"রুচির কথা হচ্ছে না এলী, স্বভাবের কথা। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বীরের কর্তব্যই করতে বলেছিলেন অত্যন্ত অরুচি সত্ত্বেও; কুরুক্ষেত্র চাষ করবার উদ্দেশে এগ্রিকাল্‌চারাল ইকনমিক্‌স্ চর্চা করতে বলেন নি।"

"শ্রীকৃষ্ণ তোমাকে হলে কী বলতেন, অন্তু?"

"অনেকদিন আগেই কানে কানে বলে রেখেছেন। সেই তাঁর কানে-কানে কথাটাকে মুখ খুলে বলবার ভার ছিল আমার 'পরে। নির্বিচারে সবারই একই কর্তব্য,

গুরুমশায় কানে ধরে এই কথাটা বলতেই এত কৃত্রিমতার সৃষ্টি হয়েছে। তোমাকে মুখের উপরই বলছি ওদের যে-পাড়ায় অহংকার করে নম্রতা করতে যাও সেখানে তোমারও জায়গা নেই। দেবী! সবাই দেবী তোমরা। নকল দেবীর কৃত্রিম সাজ, মেয়েদের অন্ত সাজেরই মতো, পুরুষ-দর্জির দোকানে বানানো।"

"দেখো অন্তু, আজও বুঝতে পারি নে যে-পথ তোমার নয়, সে-পথ থেকে কেন তুমি জোর করে ফিরে আস নি?"

"তাহলে বলি। অনেক কথা জানতুম না অনেক কথা ভাবি নি এই পথে প্রবেশ করবার আগে। একে একে এমন সব ছেলেকে কাছে দেখলুম, বয়সে যারা ছোটো না হলে যাদের পায়ের ধুলো নিতুম। আরা চোখের সামনে কী দেখেছে, কী সয়েছে, কী অপমান হয়েছে তাদের, সে-সব দুর্বিষহ কথা কোথাও প্রকাশ হবে না। এরই অসহ্য ব্যথায় আমাকে খেপিয়ে তুলেছিল। বারবার মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছি, ভয়ে হার মানব না, পীড়নে হার মানব না, পাথরের দেয়ালে মাথা ঠুকে মরব তবু তুড়ি মেরে উপেক্ষা করব সেই হৃদয়হীন দেয়ালটাকে।"

"তারপরে কি তোমার মত বদলে গেল?"

"শোনো আমার কথা। শক্তিমানের বিরুদ্ধে যে লড়াই করে, সে উপায়বিহীন হলেও সে-ই শক্তিমানের সমকক্ষ দাঁড়ায়; তাতে তার সম্মান রক্ষা হয়। সেই সম্মানের অধিকার আমি কল্পনা করেছিলুম। দিন যতই এগোতে থাকল চোখের সামনে দেখা গেল,—অসাধারণ উচ্চ মনের ছেলে অল্পে অল্পে মনুষ্যত্ব খোয়াতে থাকল। এতবড়ো লোকসান আর কিছুই নেই। নিশ্চিত জানতুম আমার কথা হেসে উড়িয়ে দেবে, রেগে বিদ্রূপ করবে, তবু ওদের বলেছি অন্যায়ে অন্যায়কারীর সমান হলেও তাতে হার, পরাজয়ের আগে মরবার আগে প্রমাণ করে যেতে হবে আমরা ওদের চেয়ে মানবধর্মে বড়ো—নইলে এতবড়ো বলিষ্ঠের সঙ্গে এমনতরো হারের খেলা খেলছি কেন? নির্বুদ্ধিতার আত্মঘাতের জন্যে?—আমার কথা ওদের কেউ বোঝে নি তা নয়। কিন্তু কত জনই বা!"

"তখনও ওদের ছাড়লে না কেন?"

"আর কি ছাড়তে পারি? তখন যে শাস্তির নিষ্ঠুর জাল সম্পূর্ণ জড়িয়ে এসেছে ওদের চারদিকে। ওদের ইতিহাস নিজে দেখলুম, বুঝতে পেরেছি ওদের মর্মান্তিক বেদনা, সেইজন্যেই রাগই করি আর ঘৃণাই করি, তবু বিপন্নদের ত্যাগ করতে পারি নে। কিন্তু একটা কথা এই অভিজ্ঞতায় সম্পূর্ণ বুঝেছি, গায়ের জোরে আমরা যাদের অত্যন্ত অসমকক্ষ তাদের সঙ্গে গায়ের জোরের মল্লযুদ্ধ করতে চেষ্টা করলে আন্তরিক দুর্গতি

শোচনীয় হয়ে ওঠে। রোগ সব শরীরেই দুঃখের কিন্তু ক্ষীণ শরীরে মারাত্মক। মনুষ্যত্বের অপমান করেও কিছুদিনের মতো জয়ডঙ্কা বাজিয়ে চলতে পারে তারা যাদের আছে বাহুবল, কিন্তু আমরা পারব না। আগাগোড়া কলঙ্কে কালো হয়ে পরাভবের শেষসীমায় অখ্যাতির অন্ধকারে মিশিয়ে যাব আমরা।"

"কিছুকাল থেকে এই ভয়ংকর ট্র্যাজেডির চেহারা আমার কাছেও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে অন্তু। গৌরবের আহ্বানে নেমেছিলেম কিন্তু লজ্জা বেড়ে উঠছে প্রতিদিন। এখন আমরা কী করতে পারি বলো আমাকে।"

"সব মানুষের সামনেই ধর্মক্ষেত্রে ধর্মযুদ্ধ আছে, সেখানে মৃতো বাপি তেন লোকত্রয়ং জিতং। কিন্তু অন্তত আমাদের কজনের জন্যে এ-যাত্রায় সে-ক্ষেত্রের পথ বন্ধ। এখানকার কর্মফল এখানেই নিঃশেষে চুকিয়ে দিয়ে যেতে হবে।"

"সব বুঝতে পারছি, তবু অন্তু আমাদের দেশের কাজ নিয়ে কিছুদিন থেকে এমন কঠিন ধিক্কার দিয়ে তুমি কথা বল, সে আমাকে বড়ো বাজে।"

"তার কারণ কী সে-কথা এখন আর না বললেও হয়, সময় চলে গেছে।"

"তবু বলো।"

"আমি আজ স্বীকার করব তোমার কাছে,—তোমরা যাকে পেট্রিয়ট বলো আমি সেই পেট্রিয়ট নই। পেট্রিয়টিজ্‌মের চেয়ে যা বড়ো তাকে যারা সর্বোচ্চে না মানে তাদের পেট্রিয়টিজ্‌ম কুমিরের পিঠে চড়ে পার হবার খেয়ানৌকো। মিথ্যাচরণ, নীচতা, পরস্পরকে অবিশ্বাস, ক্ষমতালাভের চক্রান্ত, গুপ্তচরবৃত্তি একদিন তাদের টেনে নিয়ে যাবে পাঁকের তলায়। এ আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। এই গর্তর ভিতরকার কুশ্রী জগৎটার মধ্যে দিনরাত মিথ্যের বিষাক্ত হাওয়ায় কখনোই নিজের স্বভাবে সেই পৌরুষকে রক্ষা করতে পারব না যাতে পৃথিবীতে কোনো বড়ো কাজ করতে পারা যায়।"

"আচ্ছা অন্তু, তুমি যাকে আত্মঘাত বল সে কি কেবল আমাদেরই দেশে?"

"তা বলি নে। দেশের আত্মাকে মেরে দেশের প্রাণ বাঁচিয়ে তোলা যায় এই ভয়ংকর মিথ্যে কথা পৃথিবীসুদ্ধ ন্যাশনালিস্ট আজকাল পাশবগর্জনে ঘোষণা করতে বসেছে, তার প্রতিবাদ আমার বুকের মধ্যে অসহ্য আবেগে গুমরে গুমরে উঠছে—এই কথা সত্যভাষায় হয়তো বলতে পারতুম, সুরঙ্গের মধ্যে লুকোচুরি করে দেশ-উদ্ধারচেষ্টার চেয়ে সেটা হত চিরকালের বড়ো কথা। কিন্তু এ-জন্মের মতো বলবার সময় হল না। আমার বেদনা তাই আজ এত নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছে।"

এলা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে, বললে, "ফিরে এস অন্তু।"

"আর ফেরবার পথ নেই।"

"কেন নেই ?"

"অজায়গায় যদি এসে পড়ি সেখানকারও দায়িত্ব আছে শেষ পর্যন্ত।"

এলা অতীনের গলা জড়িয়ে ধরে বললে, "ফিরে এস, অন্তু। এত বছর ধরে যে-বিশ্বাসের মধ্যে বাসা নিয়েছিলুম তার ভিত তুমি ভেঙে দিয়েছ। আজ আছি ভেসে-চলা ভাঙা নৌকো আঁকড়িয়ে। আমাকেও উদ্ধার করে নিয়ে যাও।—অমন চুপ করে বসে থেকো না, বলো অন্তু, একটা কথা বলো। এখনই তুমি হুকুম করো আমি ভাঙব পণ। ভুল করেছি আমি। আমাকে মাপ করো।"

"উপায় নেই।"

"কেন উপায় নেই ? নিশ্চয় আছে।"

"তীর লক্ষ্য হারাতে পারে তূণে ফিরতে পারে না।"

"আমি স্বয়ংবরা, আমাকে বিয়ে করো অন্তু। আর সময় নষ্ট করতে পারব না—গান্ধর্ব বিবাহ হ'ক, সহধর্মিণী করে নিয়ে যাও তোমার পথে।"

"বিপদের পথ হলে নিয়ে যেতুম সঙ্গে। কিন্তু যেখানে ধর্ম নষ্ট হয়েছে সেখানে তোমাকে সহধর্মিণী করতে পারব না।—থাক্ থাক্ ও-সব কথা থাক্। এ-জীবনের নৌকো-ডুবির অবসানে কিছু সত্য এখনও বাকি আছে। তারই কথাটা শুনি তোমার মুখে।"

"কী বলব ?"

"বলো, তুমি ভালোবেসেছ।"

"হাঁ বেসেছি।"

"বলো, আমি তোমাকে ভালোবেসেছি সে-কথা তোমার মনে থাকবে আমি যখন থাকব না তখনও।"

এলা নিরুত্তরে চুপ করে বসে রইল, জল পড়তে লাগল দুই চোখে। অনেকক্ষণ পরে বাষ্পরুদ্ধ গলায় বললে, "আবার বলছি, অন্তু, কিছু নাও আমার হাত থেকে—নাও এই আমার গলার হার।"

এই বলে পায়ের উপর রাখল হার।

"কিছুতেই না।"

"কেন, অভিমান ?"

"হাঁ, অভিমান। এমন দিন ছিল তখন যদি দিতে, পরতুম গলায়—আজ দিলে পকেটে, অন্নাভাবের গর্তটার মধ্যে। ভিক্ষে নেব না তোমার কাছে।"

এলা অতীনের পায়ের কাছে লুটিয়ে বললে, "নাও আমাকে তোমার সঙ্গিনী করে।"

"লোভ দেখিয়ো না, এলা। অনেকবার বলেছি আমার পথ তোমার নয়।"

"তবে সে-পথ তোমারও নয়। ফিরে এস, ফিরে এস।"

"পথ আমার নয়, আমিই পথের। গলার ফাঁসকে গলার গয়না কেউ বলে না।"

"অন্তু, নিশ্চয় জেনো, তুমি চলে গেলে একমুহূর্ত আমি বাঁচব না। তুমি ছাড়া আর কেউ নেই আমার, এ-কথায় আজ যদি বা সন্দেহ কর, একান্ত মনে আশা করি মৃত্যুর পরে সে সন্দেহ সম্পূর্ণ ঘোচাবার একটা কোনো রাস্তা কোথাও আছে।"

হঠাৎ অতীন লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। তীরের মতো তীক্ষ্ণ হুইস্‌লের শব্দ এল দূর থেকে। চমকে বলে উঠল, "চললুম।"

এলা তাকে জড়িয়ে ধরলে, বললে, "আর-একটু থাকো।"

"না।"

"কোথায় যাচ্ছ ?"

"কিচ্ছু জানি নে।"

এলা অতীনের পা জড়িয়ে ধরে বললে, "আমি তোমার সেবিকা, তোমার চরণের সেবিকা, আমাকে ফেলে যেয়ো না, ফেলে যেয়ো না।"

একটুক্ষণ থমকে দাঁড়িয়ে রইল অতীন। দ্বিতীয়বার হুইস্‌লের শব্দ এল। অতীন গর্জন করে বললে, "ছেড়ে দাও।" বলে নিজেকে ছিনিয়ে নিয়ে চলে গেল।

তখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। এলা মেঝের উপর উপুড় হয়ে পড়ে। তার বুকের ভিতরটা শুকিয়ে গেছে, তার চোখে জল নেই। এমন সময় গম্ভীর গলার ডাক শুনতে পেল, "এলা।"

চমকে উঠে বসল। দেখলে ইলেকট্রিক্‌ টর্চ হাতে ইন্দ্রনাথ। তখনই উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "ফিরিয়ে আনুন অন্তুকে।"

"সে-কথা থাক্‌। এখানে কেন এলে ?"

"বিপদ আছে জেনেই এসেছি।"

তীব্র ভর্ৎসনার সুরে ইন্দ্রনাথ বললেন, "তোমার বিপদের কথা কে ভাবছে ? এখানকার খবর তোমাকে কে দিলে ?"

"বটু।"

"তবু বুঝলে না মতলব ?"

"বোঝবার বুদ্ধি আমার ছিল না। প্রাণ হাঁপিয়ে উঠেছিল।"

"তোমাকে মারতে পারলে এখনই মারতুম। যাও ঘরে ফিরে। ট্যাক্সি আছে বাইরে।"

চতুর্থ অধ্যায়

"আবার অখিল !—পালিয়েছিস বোর্ডিং থেকে ! তোর সঙ্গে কোনোমতে পারবার জো নেই। বারবার বলছি, এ-বাড়িতে খবরদার আসিস নে। মরবি যে।"

অখিল কোনো উত্তর না দিয়ে গলার সুর নামিয়ে বললে, "একজন দাড়িওআলা কে পিছনের পাঁচিল টপকিয়ে বাগানে ঢুকল। তাই তোমার এ-ঘরে ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিলুম।—ওই শোনো পায়ের শব্দ।" অখিল তার ছুরির সব-চেয়ে মোটা ফলাটা খুলে দাঁড়াল।

এলা বললে, "ছুরি খুলতে হবে না তোমাকে, বীরপুরুষ। দে বলছি।" ওর হাত থেকে ছুরি কেড়ে নিলে।

সিঁড়ি থেকে আওয়াজ এল, "ভয় নেই, আমি অন্তু।"

মুহূর্তে এলার মুখ পাংশুবর্ণ হয়ে এল—বললে, "দে দরজা খুলে।"

দরজা খুলে দিয়ে অখিল জিজ্ঞাসা করলে, "সেই দাড়িওআলা কোথায় ?"

"দাড়ি নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে বাগানে, বাকি মানুষটাকে পাবে এইখানেই। যাও খোঁজ করো গে দাড়ির।" অখিল চলে গেল।

এলা পাথরের মূর্তির মতো ক্ষণকাল একদৃষ্টে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। বললে, "অন্তু, এ কী চেহারা তোমার ?"

অতীন বললে, "মনোহর নয়।"

"তবে কি সত্যি ?"

"কী সত্যি ?"

"তোমাকে সর্বনেশে ব্যামোয় ধরেছে।"

"নানা ডাক্তারের নানা মত, বিশ্বাস না করলেও চলে।"

"নিশ্চয় তোমার খাওয়া হয় নি।"

"ও-কথাটা থাক্। সময় নষ্ট ক'রো না।"

"কেন এলে, অন্তু, কেন এলে ? এরা যে তোমাকে ধরবার অপেক্ষায় আছে।"

"ওদের নিরাশ করতে চাই নে।"

অতীনের হাত চেপে ধরে এলা বললে, "কেন এলে এই নিশ্চিত বিপদের মধ্যে। এখন উপায় কী ?"

"কেন এলুম সেই কথাটা যাবার ঠিক আগেই বলে চলে যাব। ইতিমধ্যে

যতক্ষণ পারি ওই কথাটাই ভুলে থাকতে চাই। নিচের দরজাগুলো বন্ধ করে দিয়ে আসি গে।"

খানিক পরে উপরে এসে বললে, "চলো ছাদে। নিচের তলাকার আলোর বাল্‌বগুলো সব খুলে নিয়েছি। ভয় পেয়ো না।"

দুজনে ছাদে এসে ছাদে প্রবেশের দরজা বন্ধ করে দিলে। বন্ধ দরজায় ঠেসান দিয়ে বসল অতীন, এলা বসল তার সামনে।

"এলা, মন সহজ করো। যেন কিছু হয় নি, যেন আমরা দুজনে আছি লঙ্কাকাণ্ড আরম্ভ হবার আগে সুন্দরকাণ্ডে। তোমার হাত অমন বরফের মতো ঠাণ্ডা কেন? কাঁপছে যে। দাও গরম করে দিই।"

এলার হাত দুখানি নিয়ে অতীন জামার নিচে বুকের উপর চেপে রাখলে। তখন দূরের পাড়ায় বিয়েবাড়িতে সানাই বাজছে।

"ভয় করছে, এলী?"

"কিসের ভয়?"

"সমস্ত কিছুর। প্রত্যেক মুহূর্তের।"

"ভয় তোমার জন্যে, অন্তু, আর কিছুর জন্যে নয়।"

অতীন বললে, "এলী, মনে করতে চেষ্টা করো আমরা আছি পঞ্চাশ কি এক-শ বছর পরেকার এমনি এক নিস্তব্ধ রাতে। উপস্থিতের গণ্ডিটা নিতান্ত সংকীর্ণ, তার মধ্যে ভয়ভাবনা দুঃখকষ্ট সমস্তই প্রকাণ্ডতার ভান করে দেখা দেয়। বর্তমান সেই নীচ পদার্থ যার ছোটো মুখে বড়ো কথা। ভয় দেখায় সে মুখোশ পরে—যেন আমরা মুহূর্তের কোলে নাচানো শিশু। মৃত্যু মুখোশখানা টান মেরে ফেলে দেয়। মৃত্যু অত্যুক্তি করে না। যা অত্যন্ত করে চেয়েছি তার গায়ে মোটা অঙ্কের দাম লেখা ছিল বর্তমানের ফাঁকির কলমে, যা অত্যন্ত করে হারিয়েছি তার গায়ে দুদিনের কালি লেবেল মেরে লিখেছে অপরিসীম দুঃখ। মিথ্যে কথা! জীবনটা জালিয়াত, সে অনন্তকালের হস্তাক্ষর জাল করে চালাতে চায়। মৃত্যু এসে হাসে, বঞ্চনার দলিলটা লোপ করে দেয়। সে হাসি নিষ্ঠুর হাসি নয়, বিদ্রূপের হাসি নয়, শিবের হাসির মতো সে শান্ত সুন্দর হাসি, মোহরাত্রির অবসানে। এলী, রাত্রে একলা বসে কখনো মৃত্যুর স্নিগ্ধ সুগভীর মুক্তি অনুভব করেছ, যার মধ্যে চিরকালের ক্ষমা?"

"তোমার মতো বড়ো করে দেখবার শক্তি আমার নেই অন্তু,—তবু তোমাদের কথা মনে করে উদ্বেগে যখন অভিভূত হয়ে পড়ে মন,—তখন এই কথাটা খুব নিশ্চিত করে অনুভব করতে চেষ্টা করি যে মরা সহজ।"

"ভীরু, মৃত্যুকে পালাবার পথ বলে মনে করছ কেন? মৃত্যু সব-চেয়ে নিশ্চিত—জীবনের সব গতিস্রোতের চরম সমুদ্র, সব সত্যমিথ্যা ভালোমন্দর নিঃশেষ সমন্বয় তার মধ্যে। এইরাত্রে এখনই আমরা আছি সেই বিরাটের প্রসারিত বাহুর বেষ্টনে আমরা দুজনে—মনে পড়ছে ইবসেনের চারিটি লাইন—

Upwards
Towards the peaks,
Towards the stars,
Towards the vast silence."

এলা অতীনের হাত কোলে নিয়ে বসে রইল স্তব্ধ হয়ে। হঠাৎ অতীন হেসে উঠল। বললে, "পিছনে মরণের কালো পর্দাখানা নিশ্চল টানা রয়েছে অসীমে, তারই উপর জীবনের কৌতুকনাট্য নেচে চলছে অন্তিম অঙ্কের দিকে। তারই একটা ছবি আজ দেখো চেয়ে। আজ তিন বছর আগে এই ছাদের উপর তুমি আমার জন্মদিনের উৎসব করেছিলে, মনে আছে?"

"খুব মনে আছে।"

"তোমার ভক্ত ছেলের দল সবাই এসেছিল। ভোজের আয়োজন ঘটা করে হয় নি। চিঁড়ে ভেজেছিলে সঙ্গে ছিল কলাইশুঁটি সিদ্ধ, মরিচের গুঁড়ো ছিটানো; ডিমের বড়াও ছিল মনে পড়ছে। সবাই মিলে খেল কাড়াকাড়ি করে। হঠাৎ মতিলাল হাতপা ছুঁড়ে শুরু করলে, আজ নবযুগে অতীনবাবুর নবজন্মের দিন—আমি লাফ দিয়ে উঠে তার মুখ চেপে ধরলুম, বললুম, বক্তৃতা যদি কর, তবে তোমার পুরোনো জন্মের দিনটা এইখানেই কাবার। বটু বললে, ছী ছী অতীনবাবু, বক্তৃতার ভ্রূণহত্যা?—নবযুগ, নবজন্ম, মৃত্যুর তোরণ প্রভৃতি ওদের বাঁধাবুলিগুলো শুনলে আমার লজ্জা করে। ওরা প্রাণপণে চেষ্টা করেছে আমার মনের উপর ওদের দলের তুলি বুলোতে,—কিছুতে রং ধরল না।"

"অন্ত, নির্বোধ আমি; আমিই ভেবেছিলুম তোমাকে মিলিয়ে নেব আমাদের সকল পদাতিকের সঙ্গে এক উর্দি পরিয়ে।"

"তাই আমাকে দেখিয়ে দেখিয়ে ওদের সঙ্গে ঘোরতর দিদিয়ানা করতে। ভেবেছিলে আমার সংশোধনের পক্ষে কিছু ঈর্ষার প্রয়োজন আছে। স্নেহযত্ন কুশলসম্ভাষণ বিশেষ মন্ত্রণা অনাবশ্যক উদ্বেগ মনিহারির রঙিন সামগ্রীর মতো ওদের সামনে সাজিয়ে রেখেছিলে তোমার পসরায়। আজও তোমার করুণ প্রশ্ন কানে শুনতে পাচ্ছি, নন্দকুমার তোমার চোখমুখ লাল দেখছি কেন। বেচারা ভালোমানুষ, সত্যের অনুরোধে মাথাধরা অস্বীকার করতে না-করতে ছেঁড়া ন্যাকড়ায় জলপটি এসে উপস্থিত। আমি মুগ্ধ তবু

বুঝতুম এই অতি অমায়িক দিদিয়ানা তোমার অতি পবিত্র ভারতবর্ষের বিশেষ ফরমাশের। একেবারে আদর্শ স্বদেশী দিদিবৃত্তি।"

"আঃ চুপ করো, চুপ করো অন্তু।"

"অনেক বাজে জিনিসের বাহুল্য ছিল সেদিন তোমার মধ্যে, অনেক হাস্যকর ভড়ং—সে কথা তোমাকে মানতেই হবে।"

"মানছি, মানছি এক-শবার মানছি। তুমিই সে সমস্ত নিঃশেষে ঘুচিয়ে দিয়েছ। তবে আজ আবার অমন নিষ্ঠুর করে বলছ কেন?"

"কোন্ মনস্তাপে বলছি, শোনো। জীবিকা থেকে ভ্রষ্ট করেছ বলে সেদিন আমার কাছে মাপ চাইছিলে। যথার্থ জীবনের পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়েছি অথচ সেই সর্বনাশের পরিবর্তে যা দাবি করতে পারতুম তা মেটে নি। আমি ভেঙেছি আমার স্বভাবকে, কুসংস্কারে অন্ধ তুমি ভাঙতে পারলে না তোমার পণকে যার মধ্যে সত্য ছিল না; এজন্যে মাপ চাওয়া কি বাহুল্য ছিল? জানি তুমি ভাবছ, এতটা কী করে সম্ভব হল।"

"হাঁ অন্তু, আমার বিস্ময় কিছুতেই যায় না—জানি নে আমার এমন কী শক্তি ছিল।"

"তুমি কী করে জানবে? তোমাদের শক্তি তোমাদের নিজের নয়, ও মহামায়ার। কী আশ্চর্য সুর তোমার কণ্ঠে, আমার মনের অসীম আকাশে ধ্বনির নীহারিকা সৃষ্টি করে। আর তোমার এই হাতখানি, ওই আঙুলগুলি, সত্যমিথ্যে সব-কিছুর 'পরে পরশমণি ছুঁইয়ে দিতে পারে। জানি নে, কী মোহের বেগে, ধিক্‌কার দিতে দিতেই নিয়েছি স্খলিত জীবনের অসম্মান। ইতিহাসে পড়েছি এমন বিপত্তির কথা, কিন্তু আমার মতো বুদ্ধি-অভিমানীর মধ্যে এটা যে ঘটতে পারে কখনো তা ভাবতে পারতুম না। এবার জাল ছেঁড়বার সময় এল, তাই আজ বলব তোমাকে সত্য কথা, যত কঠোর হ'ক।"

"বলো, বলো, যা বলতে হয় বলো। দয়া ক'রো না আমাকে। আমি নির্মম, নির্জীব, আমি মূঢ়—তোমাকে বোঝবার শক্তি আমার কোনোকালে ছিল না। অতুল্য যা তাই এসেছিল হাত বাড়িয়ে আমার কাছে, অযোগ্য আমি, মূল্য দিই নি। বহুভাগ্যের ধন চিরজন্মের মতো চলে গেল। এর চেয়ে শাস্তি যদি থাকে, দাও শাস্তি।"

"থাক্, থাক্, শাস্তির কথা। ক্ষমাই করব আমি। মৃত্যু যে ক্ষমা করে সেই অসীম ক্ষমা। সেইজন্যেই আজ এসেছি।"

"সেইজন্যে?"

"হাঁ কেবলমাত্র সেইজন্যে।"

"না-ই ক্ষমা জানাতে তুমি। কিন্তু কেন এলে এমন করে বেড়া আগুনের মধ্যে?

জানি, জানি, বাঁচবার ইচ্ছে নেই তোমার। তা যদি হয় তাহলে কটা দিন কেবলমাত্র আমাকে দাও, দাও তোমার সেবা করবার শেষ অধিকার। পায়ে পড়ি তোমার।"

"কী হবে সেবা! ফুটো জীবনের ঘটে ঢালবে সুধা! তুমি জান না, কী অসহ্য ক্ষোভ আমার। শুশ্রূষা দিয়ে তার কী করতে পার, যে-মানুষ আপন সত্য হারিয়েছে!"

"সত্য হারাও নি অন্তু। সত্য তোমার অন্তরে আছে অক্ষুণ্ণ হয়ে।"

"হারিয়েছি, হারিয়েছি।"

"ব'লো না ব'লো না অমন কথা।"

"আমি যে কী যদি জানতে পারতে তোমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত শিউরে উঠত।"

"অন্তু, আত্মনিন্দা বাড়িয়ে তুলছ কল্পনায়। নিষ্কামভাবে যা করেছ তার কলঙ্ক কখনোই লাগবে না তোমার স্বভাবে।"

"স্বভাবকেই হত্যা করেছি, সব হত্যার চেয়ে পাপ। কোনো অহিতকেই সমূলে মারতে পারি নি, সমূলে মেরেছি কেবল নিজেকে। সেই পাপে, আজ তোমাকে হাতে পেলেও তোমার সঙ্গে মিলতে পারব না। পাণিগ্রহণ! এই হাত নিয়ে! কিন্তু কেন এ-সব কথা! সমস্ত কালো দাগ মুছবে যমকন্যার কালো জলে, তারই কিনারায় এসে বসেছি। আজ বলা যাক্ যত সব হালকা কথা হাসতে হাসতে। সেই জন্মদিনের ইতিবৃত্তটা শেষ করে দিই। কী বল, এলী?"

"অন্তু, মন দিতে পারছি নে।"

"আমাদের দুজনের জীবনে মন দেবার যোগ্য যা-কিছু আছে সে কেবল ওইরকম গোটাকয়েক হালকা দিনের মধ্যে। ভোলবার যোগ্য ভারি ভারি দিনই তো বহুবিস্তর।"

"আচ্ছা, বলো অন্তু।"

"জন্মদিনের খাওয়া হয়ে গেল। হঠাৎ নীরদের শখ হল পলাশির যুদ্ধ আবৃত্তি করবে। উঠে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে গিরিশ ঘোষের ভঙ্গিতে আউড়িয়ে গেল—

কোথা যাও ফিরে চাও সহস্র কিরণ,
বারেক ফিরিয়া চাও ওগো দিনমণি।

নীরদ লোক ভালো, অত্যন্ত সাদাসিধে, কিন্তু নির্দয় তার স্মরণশক্তি। সভাটা ভেঙে ফেলবার জন্যে আমার মন যখন হন্যে হয়ে উঠেছে তখন ওরা ভবেশকে গান গাইতে অনুরোধ করলে। ভবেশ বললে, হার্মোনিয়ম সঙ্গে না থাকলে ও হাঁ করতে পারে না।—তোমার ঘরে ওই পাপটা ছিল না। ফাঁড়া কাটল। আশান্বিত মনে

ভাবছি এইবার উপসংহার, এমন সময় সতু খামকা তর্ক তুললে, মানুষ জন্মায় জন্মদিনে না জন্মতিথিতে ? যত বলি থামো সে থামে না। তর্কের মধ্যে দেশাত্মবোধের ঝাঁজ লাগল, চড়তে লাগল গলার আওয়াজ, বন্ধুবিচ্ছেদ হয় আর কি। বিষম রাগ হল তোমার উপরে। আমার জন্মদিনকে একটা সামান্য উপলক্ষ্য করেছিলে, মহত্তর লক্ষ্য ছিল কর্মভাইদের একত্র করা।"

"কোন্‌টা লক্ষ্য কোনটা উপলক্ষ্য বাইরে থেকে বিচার ক'রো না অন্তু। শাস্তির যোগ্য আমি, কিন্তু অন্যায় শাস্তির না। মনে নেই তোমার, সেইবারকার জন্মদিনেই অতীন্দ্রবাবু আমার মুখে নাম নিলেন অন্তু ? সেটা তো খুব ছোটো কথা নয়। তোমার অন্তু নামের ইতিহাসটা বলো শুনি।"

"সখী, তবে শ্রবণ করো। তখন বয়স আমার চার-পাঁচ বছর, মাথায় ছিলুম ছোটো, কথা ছিল না মুখে, শুনেছি বোকার মতো ছিল চোখের চাহনি। জ্যেঠামশায় পশ্চিম থেকে এসে আমাকে প্রথম দেখলেন। কোলে তুলে নিলেন, বললেন, এই বালখিল্যটার নাম অতীন্দ্র রেখেছে কে ? অতিশয়োক্তি অলংকার, এর নাম দাও অনতীন্দ্র। সেই অনতি শব্দটা স্নেহের কণ্ঠে অন্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। তোমার কাছেও একদিন অতি হয়েছে অনতি, ইচ্ছে করে খুইয়েছে মান।"

হঠাৎ অতীন চমকে উঠে থেমে গেল। বললে, "পায়ের শব্দ শুনছি যেন।"

এলা বললে, "অখিল।"

আওয়াজ এল, "দিদিমণি।"

ছাদে আসবার দরজা খুলে দিয়ে এলা জিজ্ঞাসা করলে, "কী।"

অখিল বললে, "খাবার।"

বাড়িতে রান্নার ব্যবস্থা নেই। অদূরবর্তী দিশি রেস্‌টোরাঁ থেকে বরাদ্দমত খাবার দিয়ে যায়।

এলা বললে, "অন্তু, চলো খেতে।"

"খাওয়ার কথা ব'লো না। না খেয়ে মরতে মানুষের অনেকদিন লাগে। নইলে ভারতবর্ষ টিঁকত না। ভাই অখিল, আর রাগ রেখো না মনে। আমার ভাগটা তুমিই খেয়ে নাও। তার পরে পলায়নেন সমাপয়েৎ—দৌড় দিয়ো যত পার।"

অখিল চলে গেল।

দুজনে ছাদের মেঝের উপর বসল। অতীন আবার শুরু করলে। "সেদিনকার জন্মদিন চলতে লাগল একটানা, কেউ নড়বার নাম করে না। আমি ঘন ঘন ঘড়ি দেখছি, ওটা একটা ইঙ্গিত রাতকানাদের কাছে। শেষকালে তোমাকে বললুম,

সকাল সকাল তোমার শুতে যাওয়া উচিত, এই সেদিন ইনফ্লুয়েঞ্জা থেকে উঠেছ।—প্রশ্ন উঠল, 'কটা বেজেছে?' উত্তর, 'সাড়ে দশটা।' সভা ভাঙবার দুটো-একটা হাইতোলা গড়িমসি-করা লক্ষণ দেখা গেল। বটু বললে, বসে রইলেন যে অতীনবাবু? চলুন একসঙ্গে যাওয়া যাক্।—কোথায়? না, মেথরদের বস্তিতে; হঠাৎ গিয়ে পড়ে ওদের মদ খাওয়া বন্ধ করতে হবে।—সর্বশরীর জ্বলে উঠল। বললুম, মদ তো বন্ধ করবে, তার বদলে দেবে কী।—বিষয়টা নিয়ে এতটা উত্তেজিত হবার দরকার ছিল না। ফল হল, যারা চলে যাচ্ছিল তারা দাঁড়িয়ে গেল। শুরু হল—আপনি কি তবে বলতে চান—তীব্রস্বরে বলে উঠলুম—কিছু বলতে চাই নে।—এতটা বেশি ঝাঁজও বেমানান হল। গলা ভারি করে তোমার দিকে আধখানা চোখে চেয়ে বললুম, তবে আজ আসি।—দোতলায় তোমার ঘরের সামনে পর্যন্ত এসে পা চলতে চায় না। কী বুদ্ধি হল বুকের পকেট চাপড়িয়ে বললুম, ফাউণ্টেন পেনটা বুঝি ফেলে এসেছি। বটু বললে, আমিই খুঁজে আনছি—বলেই দ্রুত চলে গেল ছাদে। পিছু পিছু ছুটলুম আমি। খানিকটা খোঁজবার ভান করে বটু ঈষৎ হেসে বললে, দেখুন তো বোধ করি পকেটেই আছে। নিশ্চিত জানতুম আমার ফাউণ্টেন পেনটা আবিষ্কার করতে হলে ভূগোল সন্ধানের প্রয়োজন আমার নিজের বাসাতেই। স্পষ্ট বলতে হল, এলাদির সঙ্গে বিশেষ কথা আছে। বটু বললে, বেশ তো অপেক্ষা করছি। আমি বললুম, অপেক্ষা করতে হবে না, যাও। বটু ঈষৎ হেসে বললে, রাগ করেন কেন অতীনবাবু, আমি চললুম।"

আবার পায়ের শব্দ শুনে অতীন চমকে উঠে থামল। অখিল এল ছাদে। বললে, "কে একজন এই চিরকুট দিয়েছে অতীনবাবুকে। তাকে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রেখেছি।"

এলার বুক ধড়াস করে উঠল, বললে, "কে এল?"

অতীন বললে, "বাবুকে ঢুকতে দাও ঘরে।" অখিল জোরের সঙ্গে বললে, "না, দেব না।"

অতীন বললে "ভয় নেই, বাবুকে তুমি চেন; অনেকবার দেখেছ।"

"না চিনি নে।"

"খুব চেন। আমি বলছি, ভয় নেই, আমি আছি।"

এলা বললে, "অখিল, যা তুই মিথ্যে ভয় করিস নে।"

অখিল চলে গেল।

এলা জিজ্ঞাসা করলে, "বটু এসেছে না কি?"

"না বটু নয়।"

"বলো না, কে এসেছে। আমার ভালো লাগছে না।"

"থাক্ সে-কথা, যা বলছিলুম বলতে দাও।"

"অন্তু, কিছুতেই মন দিতে পারছি নে।"

"এলা, শেষ করতে দাও আমার কাহিনী। বেশি দেরি নেই।—তুমি উঠে এলে ছাদে। মৃদুগন্ধ পেলুম রজনীগন্ধার। ফুলের গুচ্ছটি সবার কাছ থেকে লুকিয়ে রেখেছিলে একলা আমার হাতে দেবে বলে। আমাদের সম্বন্ধের ক্ষেত্রে অন্তর জীবনলীলা শুরু হল এই লাজুক ফুলের গোপন অভ্যর্থনায়, তার পর থেকে অতীন্দ্রনাথের বিদ্যাবুদ্ধি গাম্ভীর্য ক্রমে ক্রমে তলিয়ে গেল অতলস্পর্শ আত্মবিস্মৃতিতে। সেইদিন প্রথম তুমি আমার গলা জড়িয়ে ধরলে, বললে, এই নাও জন্মদিনের উপহার—সেই পেয়েছি প্রথম চুম্বন। আজ দাবি করতে এসেছি শেষ চুম্বনের।"

অখিল এসে বললে, "বাবুটি দরজায় ধাক্কা মারতে শুরু করেছে। ভাঙল বুঝি। বলছে, জরুরি কথা।"

"ভয় নেই অখিল, দরজা ভাঙবার আগেই তাকে ঠাণ্ডা করব। বাবুকে ওইখানেই অনাথ করে রেখে তুমি এখনই পালাও অন্য ঠিকানায়। আমি আছি এলাদির খবর নিতে।"

এলা অখিলকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে তার মাথায় চুমো খেয়ে বললে, "সোনা আমার, লক্ষ্মী আমার, ভাই আমার, তুই চলে যা। তোর জন্যে কখানা নোট আমার আঁচলে বেঁধে রেখেছি, তোর এলাদির আশীর্বাদ। আমার পা ছুঁয়ে বল্, এখনই তুই যাবি, দেরি করবি নে।"

অতীন বললে, "অখিল আমার একটি পরামর্শ তোমাকে শুনতেই হবে। যদি তোমাকে কখনো কোনো প্রশ্ন কেউ জিজ্ঞাসা করে তুমি ঠিক কথাই বলবে। ব'লো এই রাত এগারোটার সময় আমিই তোমাকে জোর করে এ-বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছি। চলো কথাটাকে সত্য করে আসি।"

এলা আর-একবার অখিলকে কাছে টেনে নিয়ে বললে, "আমার জন্যে ভাবিস নে ভাই। তোর অন্তুদা রইল, কোনো ভয় নেই।"

অখিলকে যখন ঠেলে নিয়ে অতীন চলেছে এলা বললে, "আমিও যাই তোমার সঙ্গে অন্তু।"

আদেশের স্বরে অতীন বললে, "না, কিছুতেই না।"

ছাদের ছোটো পাঁচিলটার উপর বুক চেপে ধরে এলা দাঁড়িয়ে রইল—কণ্ঠের কাছে গুমরে গুমরে উঠতে লাগল কান্না, বুঝলে আজ রাত্রে ওর কাছ থেকে চিরকালের মতো অখিল গেল চলে।

ফিরে এল অতীন। এলা জিজ্ঞাসা করলে, "কী হল, অন্ত?"

অতীন বললে "অখিল গেছে। ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছি।"

"আর সেই লোকটি?"

"তাকেও দিয়েছি ছেড়ে। সে বসে বসে ভাবছিল কাজে ফাঁকি দিয়ে আমি বুঝি কেবল গল্পই করছি। যেন নতুন একটা আরব্য উপন্যাস শুরু হয়েছে। আরব্য উপন্যাসই বটে, সমস্তটাই গল্প, একেবারেই আজগবি গল্প। ভয় করছে এলা? আমাকে ভয় নেই তোমার?"

"তোমাকে ভয়, কী যে বল।"

"কী না করতে পারি আমি! পড়েছি পতনের শেষ সীমায়। সেদিন আমাদের দল অনাথা বিধবার সর্বস্ব লুঠ করে এনেছে। মন্মথ ছিল বুড়ীর গ্রামসম্পর্কে চেনা লোক—খবর দিয়ে পথ দেখিয়ে সে-ই এনেছে দলকে। ছদ্মবেশের মধ্যেও বিধবা তাকে চিনতে পেরে বলে উঠল, মন্নু, বাবা তুই এমন কাজ করতে পারলি? তার পরে বুড়ীকে আর বাঁচতে দিলে না। যাকে বলি দেশের প্রয়োজন সেই আত্মধর্মনাশের প্রয়োজনে টাকাটা এই হাত দিয়েই পৌঁছেছে যথাস্থানে। আমার উপবাস ভেঙেছি সেই টাকাতেই। এতদিন পরে যথার্থ দাগি হয়েছি চোরের কলঙ্কে, চোরাই মাল ছুঁয়েছি, ভোগ করেছি। চোর অতীন্দ্রের নাম বটু ফাঁস করে দিয়েছে। পাছে প্রমাণাভাবে শাস্তি না পাই বা অল্প শাস্তি পাই সেইজন্য পুলিস-সুপারিন্টেণ্ডেন্টের মারফত সে-মকদ্দমা ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে দায়ের না হয়ে যাতে বাঙালি জয়ন্ত হাজরার এজলাসে ওঠে কমিশনরের কাছ থেকে সেই হুকুম আনাবে বলে মন্ত্রণা করে রেখেছে। সে নিশ্চিত জানে, কাল ধরা পড়বই। ইতিমধ্যে ভয় ক'রো আমাকে, আমি নিজে ভয় করি আমার মৃত আত্মার কালো ভূতটাকে। আজ তোমার ঘরে কেউ নেই।"

"কেন, তুমি আছ।"

"আমার হাত থেকে বাঁচাবে কে?"

"নেই বা বাঁচালে।"

"তোমারই আপন মণ্ডলীতে একদিন যারা ছিল এলাদির সব দেশভাই—ভাইফোঁটা দিয়েছ যাদের কপালে প্রতিবৎসর—তাদেরই মধ্যে কথা উঠেছে যে তোমার বেঁচে থাকা উচিত নয়।"

"তাদের চেয়ে বেশি অপরাধ আমি কী করেছি?"

"অনেক কথা জান তুমি, অনেকের নামধাম। পীড়ন করলে বেরিয়ে পড়বে।"

"কখনোই না।"

"কী করে বলব যে-মানুষটা এসেছিল আজ, এই হুকুম নিয়েই সে আসে নি? হুকুমের জোর কত সে তো জান তুমি।"

এলা চমকে উঠে বললে, "সত্যি বলছ অন্তু, সত্যি?"

"একটা খবর পেয়েছি আমরা।"

"কী খবর?"

"আজ ভোররাত্রে পুলিস আসবে তোমাকে ধরতে।"

"নিশ্চিত জানতুম একদিন পুলিস আমাকে ধরতে আসছে।"

"কেমন করে জানলে?"

"কাল বটুর চিঠি পেয়েছি, সে খবর দিয়েছে পুলিস আমাকে ধরবে, লিখেছে—সে এখনও আমাকে বাঁচাতে পারে।"

"কী উপায়ে?"

"বলছে, যদি আমি তাকে বিয়ে করি তাহলে সে আমার জামিন হয়ে আমার দায় গ্রহণ করবে।"

অন্ধকার হয়ে উঠল অতীনের মুখ, জিজ্ঞাসা করলে, "কী জবাব দিলে তুমি?"

এলা বললে, "আমি সেই চিঠির উপরে কেবল লিখে দিলুম, পিশাচ। আর-কিছু নয়।"

"খবর পেয়েছি, সেই বটুই আসবে কাল পুলিসকে সঙ্গে নিয়ে। তোমার সম্মতি পেলেই বাঘের রক্ষে রক্ষা করে তোমাকে কুমিরের গর্তে আশ্রয় দেবার হিতব্রতে সে উঠে পড়ে লাগবে। তার হৃদয় কোমল।"

এলা অতীনের পা জড়িয়ে ধরে বললে, "মারো আমাকে অন্তু, নিজের হাতে। তার চেয়ে সৌভাগ্য আমার কিছু হতে পারে না।" মেঝের থেকে উঠে দাঁড়িয়ে অতীনকে বার বার চুমো খেয়ে খেয়ে বললে, "মারো এইবার মারো।" ছিঁড়ে ফেললে বুকের জামা।

অতীন পাথরের মূর্তির মতো কঠিন হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

এলা বললে, "একটুও ভেবো না অন্তু। আমি যে তোমার, সম্পূর্ণ ই তোমার—মরণেও তোমার। নাও আমাকে। নোংরা হাত লাগতে দিয়ো না আমার গায়ে, আমার এ দেহ তোমার।"

অতীন কঠিন সুরে বললে, "যাও এখনই শুতে যাও, হুকুম করছি শুতে যাও।"

অতীনকে বুকে চেপে ধরে এলা বলতে লাগল।—"অন্তু, অন্তু আমার, আমার রাজা,

আমার দেবতা, তোমাকে কত ভালোবেসেছি আজ পর্যন্ত সম্পূর্ণ করে তা জানাতে পারলুম না। সেই ভালোবাসার দোহাই, মারো, আমাকে মারো।"

অতীন এলার হাত জোর করে ধরে তাকে শোবার ঘরে টেনে নিয়ে গেল, বললে, "শোও, এখনই শোও। ঘুমোও।"

"ঘুম হবে না।"

"ঘুমোবার ওষুধ আছে আমার হাতে।"

"কিছু দরকার নেই অন্তু। আমার চৈতন্যের শেষ মুহূর্ত তুমিই নাও। ক্লোরোফর্ম এনেছ? দাও ওটাকে ফেলে। ভীরু নই আমি; জেগে থেকে যাতে মরি তোমার কোলে তাই করো। শেষ চুম্বন আজ অফুরান হল অন্তু। অন্তু।"

দূরের থেকে হুইস্‌লের শব্দ এল।

ক্যাণ্ডি, সিংহল
৫ জুন, ১৯৩৪

প্রবন্ধ

ধর্ম

ধর্ম

উৎসব

সংসারে প্রতিদিন আমরা যে সত্যকে স্বার্থের বিক্ষিপ্ততায় ভুলিয়া থাকি উৎসবের বিশেষ দিনে সেই অখণ্ড সত্যকে স্বীকার করিবার দিন—এইজন্য উৎসবের মধ্যে মিলন চাই। একলার উৎসব হইলে চলে না। বস্তুত বিশ্বের সকল জিনিসকেই আমরা যখন বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখি, তখনই এই সত্যকে আমরা দেখিতে পাই না—তখনই প্রত্যেক খণ্ডপদার্থ প্রত্যেক খণ্ডঘটনা আমাদের মনোযোগকে স্বতন্ত্ররূপে আঘাত করিতে থাকে। ইহাতে পদে পদে আমাদের চেষ্টা বাড়িয়া উঠে, কষ্ট বাড়িয়া যায়, তাহাতে আমাদের আনন্দ থাকে না। এইজন্য আমাদের প্রতিদিনের স্বার্থের মধ্যে স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে পূর্ণতা নাই, পরিতৃপ্তি নাই, তাহার সম্পূর্ণ তাৎপর্য পাই না, তাহার রাগিণী হারাইয়া ফেলি—তাহার চরমসত্য আমাদের অগোচরে থাকে। কিন্তু যে মাহেন্দ্রক্ষণে আমরা খণ্ডকে মিলিত করিয়া দেখি, সেই ক্ষণেই সেই মিলনেই আমরা সত্যকে উপলব্ধি করি এবং এই অনুভূতিতেই আমাদের আনন্দ। তখনই আমরা দেখিতে পাই—

নিখিলে তব কী মহোৎসব। বন্দন করে বিশ্ব
শ্রীসম্পদভূমানন্দ নির্ভয় শরণে।

সেইজন্যই বলিতেছিলাম, উৎসব একলার নহে। মিলনের মধ্যেই সত্যের প্রকাশ—সেই মিলনের মধ্যেই সত্যকে অনুভব করা উৎসবের সম্পূর্ণতা। একলার মধ্যে যাহা ধ্যানযোগে বুঝিবার চেষ্টা করি, নিখিলের মধ্যে তাহাই প্রত্যক্ষ করিলে তবেই আমাদের উপলব্ধি সম্পূর্ণ হয়।

মিলনের মধ্যে যে সত্য, তাহা কেবল বিজ্ঞান নহে তাহা আনন্দ, তাহা রসস্বরূপ, তাহা প্রেম। তাহা আংশিক নহে, তাহা সমগ্র; কারণ, তাহা কেবল বুদ্ধিকে নহে, তাহা হৃদয়কেও পূর্ণ করে। যিনি নানাস্থান হইতে আমাদের সকলকে একের দিকে আকর্ষণ করিতেছেন, যাঁহার সম্মুখে, যাঁহার দক্ষিণকরতলচ্ছায়ায় আমরা সকলে মুখামুখি করিয়া বসিয়া আছি, তিনি নীরস সত্য নহেন, তিনি প্রেম। এই প্রেমই উৎসবের দেবতা—মিলনই তাঁহার সজীব সচেতন মন্দির।

মিলনের যে শক্তি, প্রেমের যে প্রবল সত্যতা, তাহার পরিচয় আমরা পৃথিবীতে পদে পদে পাইয়াছি। পৃথিবীতে ভয়কে যদি কেহ সম্পূর্ণ অতিক্রম করিতে পারে, বিপদকে তুচ্ছ করিতে পারে, ক্ষতিকে অগ্রাহ্য করিতে পারে, মৃত্যুকে উপেক্ষা করিতে পারে, তবে তাহা প্রেম। স্বার্থপরতাকে আমরা জগতের একটা সুকঠিন সত্য বলিয়া জানিয়াছি, সেই স্বার্থপরতার সুদৃঢ় জালকে অনায়াসে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া দেয় প্রেম। যে হতভাগ্য দেশবাসীরা পরস্পরের সুখে দুঃখে সম্পদে বিপদে এক হইয়া মিলিতে পারে না, তাহারা জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ সত্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে বলিয়া শ্রী হইতে ভ্রষ্ট হয়—তাহারা ত্যাগ করিতে পারে না, সুতরাং লাভ করিতে জানে না—তাহারা প্রাণ দিতে পারে না, সুতরাং তাহাদের জীবনধারণ করা বিড়ম্বনা। তাহারা পৃথিবীতে নিয়তই ভয়ে ভীত হইয়া, অপমানে লাঞ্ছিত হইয়া দীনপ্রাণে নতশিরে ভ্রমণ করে। ইহার কারণ কী? ইহার কারণ এই যে, তাহারা সত্যকে পাইতেছে না, প্রেমকে পাইতেছে না, এইজন্যই কোনোমতেই বল পাইতেছে না। আমরা সত্যকে যে-পরিমাণে উপলব্ধি করি, তাহার জন্য সেই পরিমাণে মূল্য দিতে পারি—আমরা ভাইকে যতখানি সত্য বলিয়া জানি, ভাইয়ের জন্য ততখানি ত্যাগ করিতে পারি। আমাদিগকে যে জলস্থল বেষ্টিত করিয়া আছে, আমরা যে-সকল লোকের মাঝখানে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, যথেষ্টপরিমাণে যদি তাহাদের সত্যতা অনুভব করিতে না পারি, তবে তাহাদের জন্য আত্মোৎসর্গ করিতে পারিব না।

তাই বলিতেছি, সত্য প্রেমরূপে আমাদের অন্তঃকরণে আবির্ভূত হইলেই সত্যের সম্পূর্ণ বিকাশ হয়। তখন বুদ্ধির দ্বিধা হইতে, মৃত্যুপীড়া হইতে, স্বার্থের বন্ধন ও ক্ষতির আশঙ্কা হইতে আমরা মুক্তিলাভ করি। তখন এই অস্থির সংসারের মাঝখানে আমাদের চিত্ত এমন একটি চরম স্থিতির আদর্শ খুঁজিয়া পায়, যাহার উপর সে আপনার সর্বস্ব সমর্পণ করিতে প্রস্তুত হয়।

প্রাত্যহিক উদ্‌ভ্রান্তির মধ্যে মাঝে মাঝে এই স্থিতির সুখ, এই প্রেমের স্বাদ পাইবার জন্যই মানুষ উৎসবক্ষেত্রে সকল মানুষকে একত্রে আহ্বান করে। সেদিন তাহার ব্যবহার প্রাত্যহিক ব্যবহারের বিপরীত হইয়া উঠে। সেদিন একলার গৃহ সকলের গৃহ হয়, একলার ধন সকলের জন্য ব্যয়িত হয়। সেদিন ধনী দরিদ্রকে সম্মানদান করে, সেদিন পণ্ডিত মূর্খকে আসনদান করে। কারণ আত্মপর ধনিদরিদ্র পণ্ডিতমূর্খ এই জগতে একই প্রেমের দ্বারা বিধৃত হইয়া আছে, ইহাই পরম সত্য—এই সত্যেরই প্রকৃত উপলব্ধি পরমানন্দ। উৎসবদিনের অবারিত মিলন এই উপলব্ধিরই অবসর। যে ব্যক্তি এই উপলব্ধি হইতে একেবারেই বঞ্চিত হইল, সে ব্যক্তি উন্মুক্ত উৎসবসম্পদের মাঝখানে আসিয়াও দীনভাবে রিক্তহস্তে ফিরিয়া চলিয়া গেল।

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম—ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ। কিন্তু এই জ্ঞানময় অনন্তসত্য কিরূপে প্রকাশ পাইতেছেন? "আনন্দরূপমমৃতং যদ্‌বিভাতি"—তিনি আনন্দরূপে অমৃতরূপে প্রকাশ পাইতেছেন; যাহা কিছু প্রকাশ পাইতেছে তাহা তাঁহার আনন্দরূপ, তাঁহার অমৃতরূপ অর্থাৎ তাঁহার প্রেম। বিশ্বজগৎ তাঁহার অমৃতময় আনন্দ, তাঁহার প্রেম।

সত্যের পরিপূর্ণতাই প্রকাশ, সত্যের পরিপূর্ণতাই প্রেম, আনন্দ। আমরা তো লৌকিক ব্যাপারেই দেখিয়াছি অপূর্ণ সত্য অপরিস্ফুট। এবং ইহাও দেখিয়াছি যে, যে-সত্য আমরা যত সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিব, তাহাতেই আমাদের তত আনন্দ, তত প্রেম। উদাসীনের নিকট একটা তৃণে কোনো আনন্দ নাই, তৃণ তাহার নিকট তুচ্ছ, তৃণের প্রকাশ তাহার নিকট অত্যন্ত ক্ষীণ। কিন্তু উদ্ভিদ্‌বেত্তার নিকট তৃণের মধ্যে যথেষ্ট আনন্দ আছে, কারণ তৃণের প্রকাশ তাহার নিকট অত্যন্ত ব্যাপক, উদ্ভিদ্‌পর্যায়ের মধ্যে তৃণের সত্য যে ক্ষুদ্র নহে, তাহা সে জানে। যে ব্যক্তি আধ্যাত্মিক দৃষ্টিদ্বারা তৃণকে দেখিতে জানে তৃণের মধ্যে তাহার আনন্দ আরও পরিপূর্ণ—তাহার নিকট নিখিলের প্রকাশ এই তৃণের প্রকাশের মধ্যে প্রতিবিম্বিত। তৃণের সত্য তাহার নিকট ক্ষুদ্র সত্য অস্ফুট সত্য নয় বলিয়াই সে তাহার আনন্দ তাহার প্রেম উদ্বোধিত করে। যে মানুষের প্রকাশ আমার নিকট ক্ষুদ্র, আমার নিকট অস্ফুট, তাহাতে আমার প্রেম অসম্পূর্ণ। যে মানুষকে আমি এতখানি সত্য বলিয়া জানি যে, তাহার জন্য প্রাণ দিতে পারি, তাহাতে আমার আনন্দ, আমার প্রেম। অন্যের স্বার্থ অপেক্ষা নিজের স্বার্থ আমার কাছে এত অধিক সত্য যে, অন্যের স্বার্থসাধনে আমার প্রেম নাই—কিন্তু বুদ্ধদেবের নিকট জীবমাত্রেরই প্রকাশ এত সুপরিস্ফুট যে তাহাদের মঙ্গলচিন্তায় তিনি রাজ্যত্যাগ করিয়াছিলেন।

তাই বলিতেছি, আনন্দ হইতেই সত্যের প্রকাশ এবং সত্যের প্রকাশ হইতেই আনন্দ। আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে—এই যে যাহা-কিছু হইয়াছে, ইহা সমস্তই আনন্দ হইতেই জাত। অতএব যতক্ষণ পর্যন্ত এই জগৎ আমাদের নিকট সেই আনন্দরূপে, প্রেমরূপে ব্যক্ত না হয়, ততক্ষণ তাহা পূর্ণসত্যরূপেই ব্যক্ত হইল না। জগতে আমাদের আনন্দ, জগতে আমাদের প্রেমই সত্যের প্রকাশরূপের উপলব্ধি। জগৎ আছে—এটুকু সত্য কিছুই নহে, কিন্তু জগৎ আনন্দ—এই সত্যই পূর্ণ।

আনন্দ কেমন করিয়া আপনাকে প্রকাশ করে? প্রাচুর্যে, ঐশ্বর্যে, সৌন্দর্যে। জগৎ-প্রকাশে কোথাও দারিদ্র্য নাই, কৃপণতা নাই, যেটুকুমাত্র প্রয়োজন তাহারই মধ্যে সমস্ত অবসান নাই। এই যে লক্ষ লক্ষ নক্ষত্র হইতে আলোকের ঝরনা আকাশময় ঝরিয়া

পড়িতেছে, যেখানে আসিয়া ঠেকিতেছে সেখানে বর্ণে-তাপে-প্রাণে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে, ইহা আনন্দের প্রাচুর্য। প্রয়োজন যতটুকু, ইহা তাহার চেয়ে অনেক বেশি—ইহা অজস্র। বসন্তকালে লতাগুল্মের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে কুঁড়ি ধরিয়া ফুল ফুটিয়া পাতা গজাইয়া একেবারে যে মাতামাতি আরম্ভ হয়, আম্রশাখায় মুকুল ভরিয়া উঠিয়া তাহার তলদেশে অনর্থক রাশিরাশি ঝরিয়া পড়ে, ইহা আনন্দের প্রাচুর্য। সূর্যোদয়ে সূর্যাস্তে মেঘের মুখে যে কত পরিবর্তমান বিচিত্র রঙের পাগলামি প্রকাশ হইতে থাকে, ইহার কোনো প্রয়োজন দেখি না—ইহা আনন্দের প্রাচুর্য। প্রভাতে পাখিদের শত শত কণ্ঠ হইতে উদ্গিরিত সুরের উচ্ছ্বাসে অরুণগগনে যেন চারিদিক হইতে গানের হোরিখেলা চলিতে থাকে, ইহাও প্রয়োজনের অতিরিক্ত, ইহা আনন্দেরই প্রাচুর্য। আনন্দ উদার, আনন্দ অকৃপণ,—সৌন্দর্যে-সম্পদে আনন্দ আপনাকে নিঃশেষে বিলাইতে গিয়া আপনার আর অন্ত পায় না।

উৎসবের দিনে আমরা যে সত্যের নামে বহুতর লোকে সম্মিলিত হই, তাহা আনন্দ, তাহা প্রেম। উৎসবে পরস্পরকে পরস্পরের কোনো প্রয়োজন নাই—সকল প্রয়োজনের অধিক যাহা, উৎসব তাহাই লইয়া। এইজন্য উৎসবের একটা প্রধান লক্ষণ প্রাচুর্য। এইজন্য উৎসবদিনে আমরা প্রতিদিনের কার্পণ্য পরিহার করি—প্রতিদিন যেরূপ প্রয়োজন হিসাব করিয়া চলি, আজ তাহা অকাতরে জলাঞ্জলি দিতে হয়। দৈন্যের দিন অনেক আছে, আজ ঐশ্বর্যের দিন।

আজ সৌন্দর্যের দিন। সৌন্দর্যও প্রয়োজনের বাড়া। ইহা আবশ্যকের নহে, ইহা আনন্দের বিকাশ—ইহা প্রেমের ভাষা। ফুল যদি সুন্দর না হইত, তবু সে আমার জ্ঞানগম্য হইত, ইন্দ্রিয়গম্য হইত—কিন্তু ফুল যে আমাকে সৌন্দর্য দেয়, সেটা অতিরিক্ত দান। এই বাহুল্যদানই আমার নিকট হইতে বাহুল্য প্রতিদান গ্রহণ করে—সেই যে বাহুল্য প্রতিদান, তাহাই প্রেম। এই বাহুল্য প্রতিদানটুকু লইয়া ফুলেরই বা কী, আর কাহারই বা কী। কিন্তু একদিকে এই বাহুল্য সৌন্দর্য, আর একদিকে এই বাহুল্য প্রেম, ইহা লইয়াই জগতের নিত্যোৎসব—ইহাই আনন্দসমুদ্রের তরঙ্গলীলা।

তাই উৎসবের দিন সৌন্দর্যের দিন। এই দিনকে আমরা ফুলপাতার দ্বারা সাজাই, দীপমালার দ্বারা উজ্জ্বল করি, সংগীতের দ্বারা মধুর করিয়া তুলি।

এইরূপে মিলনের দ্বারা, প্রাচুর্যের দ্বারা, সৌন্দর্যের দ্বারা আমরা উৎসবের দিনকে বৎসরের সাধারণ দিনগুলির মুকুটমণিস্বরূপ করিয়া তুলি। যিনি আনন্দের প্রাচুর্যে, ঐশ্বর্যে, সৌন্দর্যে বিশ্বজগতের মধ্যে অমৃতরূপে প্রকাশমান—আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি—উৎসবের দিনে তাঁহারই উপলব্ধিদ্বারা পূর্ণ হইয়া আমাদের মনুষ্যত্ব আপন ক্ষণিক

অবস্থাগত সমস্ত দৈন্য দূর করিবে এবং অন্তরাত্মার চিরন্তন ঐশ্বর্য ও সৌন্দর্য প্রেমের আনন্দে অনুভব ও বিকাশ করিতে থাকিবে। এই দিনে সে অনুভব করিবে, সে ক্ষুদ্র নহে, সে বিচ্ছিন্ন নহে, বিশ্বই তাহার নিকেতন, সত্যই তাহার আশ্রয়, প্রেম তাহার চরমগতি, সকলেই তাহার আপন—ক্ষমা তাহার পক্ষে স্বাভাবিক, ত্যাগ তাহার পক্ষে সহজ, মৃত্যু তাহার পক্ষে নাই।

কিন্তু বলা বাহুল্য, উৎসবের এই আয়োজন তেমন দুঃসাধ্য নহে, ইহার উপলব্ধি যেমন দুরূহ। উৎসব অপরূপসুন্দর শতদলপদ্মের ন্যায় যখন বিকশিত হইয়া উঠে তখন আমাদের মধ্যে কতজন আছেন যাঁহারা মধুকরের মতো ইহার সুগন্ধ মধুকোষের মধ্যে নিমগ্ন হইয়া ইহার সুধারস উপভোগ করিতে পারেন? এদিনেও সম্মিলনকে আমরা কেবল জনতা করিয়া ফেলি, আয়োজনকে কেবল আড়ম্বর করিয়া তুলি। এদিনেও তুচ্ছ কৌতূহলে আমাদের চিত্ত কেবল বাহিরেই বিক্ষিপ্ত হইয়া বেড়ায়। যে আনন্দ অন্তরীক্ষে অন্তহীন জ্যোতিষ্কলোকের শিখায় শিখায় নিরন্তর আন্দোলিত, আমাদের গৃহপ্রাঙ্গণে দীপমালা জ্বালাইয়া আমরা কি সেই আনন্দের তরঙ্গে আমাদের আনন্দকে সচেতনভাবে মিলিত করিয়াছি? আমাদের এই সংগীতধ্বনি কি আমাদিগকে জগতের সেই গভীরতম অন্তঃপুরে প্রবাহিত করিয়া লইয়া যাইতেছে—যেখানে বিশ্বভুবনের সমস্ত সুর তাহার আপাতপ্রতীয়মান সমস্ত বিরোধ-বিশৃঙ্খলতা মিলাইয়া দিয়া প্রতি মুহূর্তেই পরিপূর্ণ রাগিণীরূপে উন্মেষিত হইয়া উঠিতেছে?

হায়, প্রত্যেক দিনে যে দরিদ্র, একদিনে সে ঐশ্বর্যলাভ করিবে কী করিয়া? প্রত্যেক দিনে যাহার জীবন শোভা হইতে নির্বাসিত, হঠাৎ একদিনেই সে সুন্দরের সহিত একাসনে বসিবে কেমন করিয়া? দিনে দিনে যে ব্যক্তি সত্যে-প্রেমে প্রস্তুত হইয়াছে, এই উৎসবের দিনে তাহারই উৎসব। হে বিশ্বযজ্ঞপ্রাঙ্গণের উৎসব-দেবতা, আমি কে? আজি উৎসবদিনে এই আসন গ্রহণ করিবার অধিকার আমার কী আছে? জীবনের নৌকাকে আমি যে প্রতিদিন দাঁড় টানিয়া বাহিয়া চলিয়াছি, সে কি তোমার মহোৎসবের সোনাবাঁধানো ঘাটে আসিয়া আজও পৌঁছিয়াছে? তাহার বাধা কি একটি? তাহার লক্ষ্য কি ঠিক থাকে? প্রতিকূল তরঙ্গের আঘাত সে কি সামলাইতে পারিল? দিনের পর দিন কোথায় সে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে? আজ কোথা হইতে সহসা তোমার উৎসবে সকলকে আহ্বানের ভার লইয়া, হে অন্তর্যামিন্‌, আমার অন্তরাত্মা তোমার সমক্ষে লজ্জিত হইতেছে। তাহাকে ক্ষমা করিয়া তুমিই তাহাকে আহ্বান করো। একদিন নহে, প্রত্যহ তাহাকে আহ্বান করো। ফিরাও, ফিরাও, তাহাকে আত্মাভিমান হইতে ফিরাও। দুর্বল প্রবৃত্তির নিদারুণ অপমান হইতে তাহাকে রক্ষা করো। বুদ্ধির

জটিলতার মধ্যে আর তাহাকে নিষ্ফল হইতে দিয়ো না। তাহাকে প্রতিদিন তোমার বিশ্বলোকে, তোমার আনন্দলোকে, তোমার সৌন্দর্যলোকে আকর্ষণ করিয়া তাহার চিরজীবনের সমস্ত দৈন্য চূর্ণ করিয়া ফেলো। যে মহাপুরুষগণ তোমার নিত্যোৎসবের নিমন্ত্রণে আহূত, যাঁহারা প্রতিদিনই নিখিললোকের সহিত তোমার আনন্দভোজে আসনগ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহাকে বিনম্রনতশিরে তাঁহাদের পদধূলি মাথায় তুলিয়া লইতে দাও। তাহার মিথ্যা গর্ব, তাহার ব্যর্থ চেষ্টা, তাহার বিক্ষিপ্ত প্রবৃত্তি আজই তুমি অপসারিত করিয়া দাও—কাল হইতেই সে যেন নত হইয়া তোমার আসনের সর্বনিম্নস্থানে ধূলিতলে বসিবার অধিকারী হইতে পারে। তোমার উৎসব-সভার মহাসংগীত সেখানে কান পাতিয়া শুনা যাইবে, তোমার আনন্দ-উৎসের রসস্রোত সেখানকার ধূলিকেও অভিষিক্ত করিবে। কিন্তু যেখানে অহংকার, যেখানে তর্ক, যেখানে বিরোধ, যেখানে খ্যাতিপ্রতিপত্তির জন্য প্রতিযোগিতা, যেখানে মঙ্গলকর্মও লোকে লুব্ধভাবে গর্বিতভাবে করে, যেখানে পুণ্যকর্ম অভ্যস্ত আচারমাত্রে পর্যবসিত—সেখানে সমস্ত আচ্ছন্ন, সমস্ত রুদ্ধ, সেখানে ক্ষুদ্র বৃহৎরূপে প্রতিভাত হয়, বৃহৎ ক্ষুদ্র হইয়া পড়ে, সেখানে তোমার বিশ্বযজ্ঞোৎসবের আহ্বান উপহসিত হইয়া ফিরিয়া আসে। সেখানে তোমার সূর্য আলোক দেয় কিন্তু তোমার স্বহস্তলিখিত আলোক-লিপি লইয়া প্রবেশ করিতে পারে না, সেখানে তোমার উদার বায়ু নিঃশ্বাস জোগায় মাত্র, অন্তঃকরণের মধ্যে বিশ্বপ্রাণকে সমীরিত করিতে পারে না। সেই উদ্ধত কারাগারের পাষাণপ্রাসাদ হইতে তাহাকে উদ্ধার করো—তোমার উৎসব-প্রাঙ্গণের ধুলায় তাহাকে লুটাইতে দাও। জগতে কেহই তাহাকে না চিনুক, কেহই না মানুক, সে যেন এক প্রান্তে থাকিয়া তোমাকে চিনে তোমাকে মানিয়া চলে। এই সৌভাগ্য কবে তাহার ঘটিবে তাহা জানি না, কবে তুমি তাহাকে তোমার উৎসবের অধিকারী করিবে তাহা তুমিই জান—আপাতত তাহার এই নিবেদন যে, এই প্রার্থনাটিও তাহার অন্তরে যেন যথার্থ সত্য হইয়া উঠে—সত্যকে সে যেন সত্যই চায়, অমৃতকে সে যেন মৌখিক যাচ্ঞাবাক্যের দ্বারা অপমান না করে।

১৩১২

দিন ও রাত্রি

সূর্য অস্ত গিয়াছে। অন্ধকার অবগুণ্ঠনের অন্তরালে সন্ধ্যার সীমন্তের শেষ স্বর্ণলেখাটুকু অন্তর্হিত হইয়াছে। রাত্রিকাল আসন্ন।

এই যে, দিন এবং রাত্রি প্রত্যহই আমাদের জীবনকে একবার আলোকে একবার অন্ধকারে তালে তালে আঘাত করিয়া যাইতেছে, ইহারা আমাদের চিত্তবীণায় কী রাগিণী ধ্বনিত করিয়া তুলিতেছে? এইরূপে প্রতিদিন আমাদের মধ্যে যে এক অপরূপ ছন্দ রচিত হইতেছে, তাহার মধ্যে কি কোনো বৃহৎ অর্থ নাই? আমরা এই যে অনন্ত গগনতলের নাড়িস্পন্দনের ন্যায় দিনরাত্রির নিয়মিত উত্থানপতনের অভিঘাতের মধ্যে বাড়িয়া উঠিতেছি, আমাদের জীবনের মধ্যে এই আলোক-অন্ধকারের নিত্য গতিবিধির একটা তাৎপর্য কি গ্রথিত হইয়া যাইতেছে না? তটভূমির উপরে প্রতি বর্ষায় যে একটা জলপ্লাবন বহিয়া যাইতেছে এবং তাহার পরে শরৎকালে সে আবার জল হইতে জাগিয়া-উঠিয়া শস্যবপনের জন্য প্রস্তুত হইতেছে—এই বর্ষা ও শরতের গতায়াত তটভূমির স্তরে স্তরে কি নিজের ইতিহাস রাখিয়া যায় না?

দিনের পর এই যে রাত্রির অবতরণ, রাত্রির পর এই যে দিনের অভ্যুদয়, ইহার পরম বিস্ময়করতা হইতে আমরা চিরাভ্যাসবশত যেন বঞ্চিত না হই। সূর্য একসময়ে হঠাৎ আকাশতলে তাহার আলোকের পুঁথি বন্ধ করিয়া দিয়া চলিয়া যায়—রাত্রি নিঃশব্দকরে আর-একটি নূতন গ্রন্থের নূতন অধ্যায় বিশ্বলোকের সহস্র অনিমেষনেত্রের সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেয়, ইহা আমাদের পক্ষে সামান্য ব্যাপার নহে।

এই অল্পকালের পরিবর্তন কী বিপুল, কী আশ্চর্য। কী অনায়াসে মুহূর্তকালের মধ্যেই বিশ্বসংসার ভাব হইতে ভাবান্তরে পদার্পণ করে। অথচ মাঝখানে কোনো বিপ্লব নাই, বিচ্ছেদের কোনো তীব্র আঘাত নাই, একের অবসান ও অন্যের আরম্ভের মধ্যে কী স্নিগ্ধ শান্তি, কী সৌম্য সৌন্দর্য।

দিনের আলোকে, সকল পদার্থের পরস্পরের যে প্রভেদ, যে পার্থক্য, তাহাই বড়ো হইয়া, স্পষ্ট হইয়া, আমাদের প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে। আলোক আমাদের পরস্পরের মধ্যে একটা ব্যবধানের কাজ করে—আমাদের প্রত্যেকের সীমা পরিস্ফুটরূপে নির্ণয় করিয়া দেয়। দিনের বেলায় আমরা যে-যার আপন-আপন কাজের দ্বারা স্বতন্ত্র, সেই কাজের চেষ্টায় সংঘাতে পরস্পরের মধ্যে বিরোধও বাধিয়া যায়। দিনে আমরা সকলেই নিজ নিজ শক্তি প্রয়োগ করিয়া জগতে নিজেকে জয়ী করিবার চেষ্টায় নিযুক্ত। তখন আমাদের আপন-আপন কর্মশালাই আমাদের কাছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আর-সমস্ত বৃহৎ

ব্যাপারের চেয়ে বৃহত্তম—এবং নিজ নিজ কর্মোদ্‌যোগের আকর্ষণই জগতের আর সমস্ত মহৎ আকর্ষণের চেয়ে আমাদের কাছে মহত্তম হইয়া উঠে।

এমন সময় নীলাম্বরা রাত্রি নিঃশব্দপদে আসিয়া নিখিলের উপরে স্নিগ্ধ করস্পর্শ করিবামাত্র আমাদের পরস্পরের বাহ্যপ্রভেদ অস্পষ্ট হইয়া আসে—তখন আমাদের পরস্পরের মধ্যে গভীরতম যে ঐক্য, তাহাই অন্তরের মধ্যে অনুভব করিবার অবকাশ ঘটে। এইজন্য রাত্রি প্রেমের সময়, মিলনের কাল।

ইহাই ঠিক করিয়া বুঝিতে পারিলে জানিব—দিন আমাদিগকে যাহা দেয়, রাত্রি শুদ্ধমাত্র যে তাহা অপহরণ করে, তাহা নহে, অন্ধকার যে কেবলমাত্র অভাব ও শূন্যতা আনয়ন করে, তাহা নহে—তাহারও দিবার জিনিস আছে এবং যাহা দেয়, তাহা মহামূল্য। সে যে কেবল সুপ্তির দ্বারা আমাদের ক্ষতিপূরণ করে,—আমাদের ক্লান্তি অপনোদন করিয়া দেয় মাত্র, তাহা নহে। সে আমাদের প্রেমের নিভৃত নির্ভরস্থান; সে আমাদের মিলনের মহাদেশ।

শক্তিতে আমাদের গতি, প্রেমে আমাদের স্থিতি। শক্তি কর্মের মধ্যে আপনাকে ধাবিত করে, প্রেম বিশ্রামের মধ্যে আপনাকে পুঞ্জীভূত করে। শক্তি আপনাকে বিক্ষিপ্ত করিতে থাকে—সে চঞ্চল, প্রেম আপনাকে সংহত করিয়া আনে—সে স্থির। আমাদের চিত্ত যাহাদিগকে ভালোবাসে, সংসারে কেবল তাহাদেরই মধ্যে সে বিরামলাভ করে, আমাদের চিত্ত যখন বিশ্রামের অবকাশ পায়, তখনই সে সম্পূর্ণভাবে ভালোবাসিতে পারে। জগতে আমাদের যথার্থ যে বিরাম, তাহা প্রেম;—প্রেমহীন যে বিরাম, তাহা জড়ত্বমাত্র।

এই কারণে কর্মশালা প্রকৃত মিলনের স্থান নহে, স্বার্থে আমরা একত্র হইতে পারি, কিন্তু এক হইতে পারি না। প্রভুভৃত্যের মিলন সম্পূর্ণ মিলন নহে, বন্ধুদের মিলনই সম্পূর্ণ মিলন। বন্ধুত্বের মিলন বিশ্রামের মধ্যে বিকশিত হয়—তাহাতে কর্মের তাড়না নাই, তাহাতে প্রয়োজনের বাধ্যতা নাই। তাহা অহেতুক।

এইজন্য দিবাবসানে আমাদের প্রয়োজন যখন শেষ হয়, আমাদের কর্মের বেগ যখন শান্ত হয়, তখনই সমস্ত আবশ্যকের অতীত যে প্রেম, সে আপনার যথার্থ অবকাশ পায়। আমাদের কর্মের সহায় যে ইন্দ্রিয়বোধ সে যখন অন্ধকারে আবৃত হইয়া পড়ে, তখন ব্যাঘাতহীন আমাদের হৃদয়ের শক্তি বাড়িয়া উঠে, তখন আমাদের স্নেহপ্রেম সহজ হয়—আমাদের মিলন সম্পূর্ণ হয়।

তাই বলিতেছিলাম, রাত্রি যে কেবল হরণ করে, তাহা নহে, সে দানও করে। আমাদের এক যায়, আমরা আর পাই; এবং যায় বলিয়াই আমরা তাহা পাইতে পারি।

দিনে সংসারক্ষেত্রে আমাদের শক্তিপ্রয়োগের সুখ, রাত্রে তাহা অভিভূত হয় বলিয়াই নিখিলের মধ্যে আমরা আত্মসমর্পণের আনন্দ পাই। দিনে স্বার্থসাধনচেষ্টায় আমাদের কর্তৃত্ব-অভিমান তৃপ্ত হয়, রাত্রি তাহাকে খর্ব করে বলিয়াই প্রেম এবং শান্তির অধিকার লাভ করি। দিনে আলোকে-পরিচ্ছিন্ন এই পৃথিবীকে আমরা উজ্জ্বলরূপে পাই, রাত্রে তাহা ম্লান হয় বলিয়াই অগণ্য জ্যোতিষ্কলোক উদ্‌ঘাটিত হইয়া যায়।

আমরা একই সময়ে সীমাকে এবং অসীমকে, অহংকে এবং অখিলকে, বিচিত্রকে এবং এককে সম্পূর্ণভাবে পাইতে পারি না বলিয়াই একবার দিন আসিয়া আমাদের চক্ষু খুলিয়া দেয়, একবার রাত্রি আসিয়া আমাদের হৃদয়ের দ্বার উদ্‌ঘাটিত করে। একবার আলোক আসিয়া আমাদিগকে কেন্দ্রের মধ্যে নিবিষ্ট করে, একবার অন্ধকার আসিয়া আমাদিগকে পরিধির সহিত পরিচিত করিতে থাকে।

এইজন্য রাত্রিই উৎসবের বিশেষ সময়। এখন বিশ্বভুবন অন্ধকারের মাতৃকক্ষে আসিয়া সমবেত হইয়াছে। যে অন্ধকার হইতে জগৎচরাচর ভূমিষ্ঠ হইয়াছে, যে অন্ধকার হইতে আলোক-নির্ঝরিণী নিরন্তর উৎসারিত হইতেছে, যেখানে বিশ্বের সমস্ত উদ্‌যোগ নিঃশব্দে শক্তিসঞ্চয় করিতেছে, সমস্ত ক্লান্তি সুপ্তিসুধার মধ্যে নিমগ্ন হইয়া নবজীবনের জন্য প্রস্তুত হইতেছে, যে নিস্তব্ধ মহান্ধকারগর্ভ হইতে এক-একটি উজ্জ্বল দিবস নীলসমুদ্র হইতে এক-একটি ফেনিল তরঙ্গের ন্যায় একবার আকাশে উত্থিত হইয়া আবার সেই সমুদ্রের মধ্যে শয়ান হইতেছে, সেই অন্ধকার আমাদের নিকট যাহা গোপন করিতেছে, তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক প্রকাশ করিতেছে। সে না থাকিলে লোকলোকান্তরের বার্তা আমরা পাইতাম না, আলোক আমাদিগকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিত।

এই রজনীর অন্ধকার প্রত্যহ একবার করিয়া দিবালোকের স্বর্ণসিংহদ্বার মুক্ত করিয়া আমাদিগকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অন্তঃপুরের মধ্যে আনিয়া উপস্থিত করে, বিশ্বজননীর এক অখণ্ড নীলাঞ্চল আমাদের সকলের উপরে টানিয়া দেয়। সন্তান যখন মাতার আলিঙ্গন-পাশের মধ্যে সম্পূর্ণ প্রচ্ছন্ন হইয়া কিছুই দেখে না-শোনে না, তখনই নিবিড়তরভাবে মাতাকে অনুভব করে—সেই অনুভূতি দেখা-শোনার চেয়ে অনেক বেশি ঐকান্তিক—স্তব্ধ অন্ধকার তেমনি যখন আমাদের দেখা-শোনাকে শান্ত করিয়া দেয়, তখনই আমরা এক শয্যাতলে নিখিলকে ও নিখিলমাতাকে আমাদের বক্ষের কাছে অত্যন্ত নিবিড়ভাবে নিকটবর্তী করিয়া অনুভব করি। তখন নিজের অভাব নিজের শক্তি নিজের কাজ বাড়িয়া উঠিয়া আমাদের চারিদিকে প্রাচীর তুলিয়া দেয় না, অত্যুগ্র ভেদবোধ আমাদের প্রত্যেককে খণ্ড-খণ্ড পৃথক-পৃথক করিয়া রাখে না, মহৎ নিঃশব্দতার মধ্য দিয়া নিখিলের

নিশ্বাস আমাদের গায়ের উপরে আসিয়া পড়ে, এবং নিত্যজাগ্রত নিখিলজননীর অনিমেষদৃষ্টি আমাদের শিয়রের কাছে প্রত্যক্ষগম্য হইয়া উঠে।

আমাদের রজনীর উৎসব সেই নিভৃতনিগূঢ় অথচ বিশ্বব্যাপী জননীকক্ষের উৎসব। এখন আমরা কাজের কথা ভুলি, সংগ্রামের কথা ভুলি, আত্মশক্তি-অভিমানের চর্চা ভুলি, আমরা সকলে মিলিয়া তাঁহার প্রসন্ন মুখচ্ছবির ভিখারি হইয়া দাঁড়াই—বলি, জননী, যখন প্রয়োজন ছিল, তখন তোমার কাছে ক্ষুধার অন্ন, কর্মের শক্তি, পথের পাথেয় প্রার্থনা করিয়াছিলাম—কিন্তু এখন সমস্ত প্রয়োজনকে বাহিরে ফেলিয়া আসিয়া তোমার এই কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছি, এখন একান্ত তোমাকেই প্রার্থনা করি। আমি তোমার কাছে এখন আর হাত পাতিব না—কেবলমাত্র তুমি আমাকে স্পর্শ করো, মার্জনা করো, গ্রহণ করো। তোমার রজনী-মহাসমুদ্রে অবগাহন-স্নান করিয়া বিশ্বজগৎ যখন কাল উজ্জ্বল-বেশে নির্মলললাটে প্রভাত-আলোকে দণ্ডায়মান হইবে, তখন যেন আমি তাহার সঙ্গে সমান হইয়া দাঁড়াইতে পারি—তখন যেন আমার গ্লানি না থাকে, আমার ক্লান্তি দূর হয়—তখন যেন আমি অন্তরের সহিত বলিতে পারি—সকলের কল্যাণ হউক, কল্যাণ হউক, যেন বলিতে পারি—সকলের মধ্যে যিনি আছেন, তাঁহাকে আমি দেখিতেছি,—তাঁহার যাহা প্রসাদ, তিনি অদ্য সমস্তদিন আমাকে যাহা দিবেন, তাহাই আমি ভোগ করিব, আমি কিছুতেই লোভ করিব না।

প্রাতঃকালে যিনি আমাদের পিতা হইয়া আমাদিগকে কর্মশালায় প্রেরণ করিয়াছিলেন, সন্ধ্যাকালে তিনিই আমাদের মাতা হইয়া আমাদিগকে তাঁহার অন্তঃপুরে আকর্ষণ করিয়া লইতেছেন। প্রাতঃকালে তিনি আমাদিগকে ভার দিয়াছিলেন, সন্ধ্যাকালে তিনি আমাদের ভার লইতেছেন। প্রত্যহই দিনে-রাত্রে এই যে দুই বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে আমাদের জীবন আন্দোলিত হইতেছে—একবার পিতা আমাদিগকে বহির্দেশে পাঠাইতেছেন, একবার মাতা আমাদিগকে অন্তঃপুরে টানিতেছেন, একবার নিজের দিকে ধাবিত হইতেছি, একবার অখিলের দিকে প্রত্যাবর্তন করিতেছি, ইহার মধ্যে আমাদের জীবন ও মৃত্যুর গভীর রহস্যচ্ছবি আলোক-অন্ধকারের তুলিকাপাতে প্রতিদিন বিচিত্র হইতেছে।

আমাদের কাব্যে-গানে আয়ু-অবসানের সহিত আমরা দিনান্তের উপমা দিয়া থাকি—কিন্তু সকল সময়ে তাহার সম্পূর্ণ ভাবটি আমরা হৃদয়ংগম করি না, আমরা কেবল অবসানেরই দিকটা দেখিয়া বিষাদের নিঃশ্বাস ফেলি, পরিপূরণের দিকটা দেখি না। আমরা ইহা ভাবিয়া দেখি না, প্রত্যহ দিবাবসানে এত বড়ো যে একটা বিপরীত ব্যাপার ঘটিতেছে, আমাদের শক্তির যে এমন-একটা বিপর্যয়দশা উপস্থিত হইতেছে, তাহাতে

তো কিছুই বিশ্লিষ্ট হইয়া যাইতেছে না, জগৎ জুড়িয়া তো হাহাকারধ্বনি উঠিতেছে না, মহাকাশতলে বিশ্বের আরামেরই নিশ্বাস পড়িতেছে।

দিবস আমাদের জীবনেরই প্রতিকৃতি বটে। দিনের আলোক যেমন আর-সমস্ত লোককে আবৃত করিয়া আমাদের কর্মস্থান এই পৃথিবীকেই একমাত্র জাজ্বল্যমান করিয়া তুলে, আমাদের জীবনও আমাদের চতুর্দিকে তেমনি একটি বেষ্টন রচনা করে,— সেইজন্যই আমাদের জীবনের অন্তর্গত যাহা-কিছু, তাহাই আমাদের কাছে এত একান্ত, ইহার চেয়ে বড়ো যে আর-কিছু আছে, তাহা সহসা আমাদের মনেই হয় না। দিনের বেলাতেও তো আকাশ ভরিয়া জ্যোতিষ্কলোক বিরাজ করিতেছে, কিন্তু দেখিতে পাই কই? যে আলোক আমাদের কর্মস্থানের ভিতরে জ্বলিতেছে, সেই আলোকই বাহিরের অন্য-সমস্তকে বিগুণতর অন্ধকারময় করিয়া রাখে। তেমনি আমাদের এই জীবনকে চতুর্দিকে বেষ্টন করিয়া শতসহস্র জ্যোতির্ময় বিচিত্ররহস্য নানা আকারে বিরাজ করিতেছে, কিন্তু আমরা দেখিতে পাই কই? যে চেতনা যে বুদ্ধি যে ইন্দ্রিয়শক্তি আমাদের জীবনের পথকে উজ্জ্বল করে, আমাদের কর্মসাধনেরই পরিধিসীমার মধ্যে আমাদের মনোযোগকে প্রবল করিয়া তোলে, সেই জ্যোতিই আমাদের জীবনের বহিঃসীমার সমস্তই আমাদের নিকট অগোচর রাখিয়া দেয়।

জীবনে যখন আমরাই কর্তা, যখন সংসারই সর্বপ্রধান, যখন আমাদের সুখদুঃখচক্রের পরিধি আমাদের আয়ুকালের মধ্যেই বিশেষভাবে পরিচ্ছিন্ন বলিয়া প্রতিভাত হইতে থাকে, এমন সময় দিন অবসান হইয়া যায়, জীবনের সূর্য অস্তাচলের অন্তরালে গিয়া পড়ে, মৃত্যু আমাদিগকে অঞ্চলে আচ্ছন্ন করিয়া কোলে তুলিয়া লয়। তখন সেই-যে অন্ধকারের আবরণ, সে কি কেবলই অভাব, কেবলই শূন্যতা? আমাদের কাছে কি তাহার একটি সুগভীর ও সুবিপুল প্রকাশ নাই? আমাদের জীবনাকাশের অন্তরালে যে অসীমতা নিত্যকাল বিরাজ করিতেছে, মৃত্যুর তিমিরপটে তাহা কি দেখিতে দেখিতে আমাদের চতুর্দিকে আবিষ্কৃত হইয়া পড়ে না? তখন কি সহসা আমাদের এই সীমাবচ্ছিন্ন জীবনকে অসংখ্য জীবনলোকের সহিত যুক্ত করিয়া দেখিতে পাই না? দিবসের বিচ্ছিন্ন পৃথিবীকে সন্ধ্যাকাশে যখন সমস্ত গ্রহদলের সঙ্গে নক্ষত্রমণ্ডলীর মধ্যে সংযুক্ত করিয়া জানিতে পারি, তখন সমস্তটির যেমন একটি বৃহৎ ছন্দ একটি প্রকাণ্ড তাৎপর্য আমাদের চিত্তের মধ্যে প্রসারিত হইয়া উঠে, তেমনি মৃত্যুর পরে বিশ্বের সহিত যোগযুক্ত আমাদের জীবনের বিপুল তাৎপর্য কি আমাদের কাছে অতি সহজেই প্রকাশিত হয় না? জীবিতকালে যাহাকে আমরা একক করিয়া পৃথক করিয়া দেখি, মৃত্যুর পরে তাহাকেই আমরা বিরাটের মধ্যে সম্পূর্ণ করিয়া দেখিবার অবকাশ পাই। আমাদের জীবনের চেষ্টা আমাদের

জীবিকার সংগ্রাম যখন ক্ষান্ত হইয়া যায়, তখন সেই গভীর নিস্তব্ধতায় আমরা আপনাকে অসীমেরই মধ্যে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাই, নিজের ব্যক্তিগত সীমার মধ্যে নহে, নিজের সংসারগত শক্তির মধ্যে নহে।

এইরূপে জীবন হইতে মৃত্যুতে পদার্পণ দিন হইতে রাত্রিতে সংক্রমণেরই অনুরূপ। ইহা বাহির হইতে অন্তঃপুরে প্রবেশ, কর্মশালা হইতে মাতৃক্রোড়ে আত্মসমর্পণ, পরস্পরের সহিত পার্থক্য ও বিরোধ হইতে নিখিলের সহিত মিলনের মধ্যে আত্মানুভূতি।

শক্তি আপনাকে ঘোষণা করে, প্রেম আপনাকে আবৃত রাখে। শক্তির ক্ষেত্র আলোক, প্রেমের ক্ষেত্র অন্ধকার। প্রেম অন্তরালের মধ্য হইতেই পালন করে, লালন করে, অন্তরালের মধ্যেই আকর্ষণ করিয়া আনে। বিশ্বের সমস্ত ভাণ্ডার বিশ্বজননীর গোপন অন্তঃপুরের মধ্যে। তাই আমরা কিছুই জানি না কোথা হইতে এই নিঃশেষ-বিহীন প্রাণের ধারা লোকে লোকে প্রবাহিত হইতেছে, কোথা হইতে এই অনির্বাণ চেতনার আলোক জীবে জীবে জ্বলিয়া উঠিতেছে, কোথা হইতে এই নিত্যসঞ্জীবিত ধীশক্তি চিত্তে চিত্তে জাগ্রত হইতেছে। আমরা জানি না এই পুরাতন জগতের ক্লান্তি কোথায় দূর হয়, জীর্ণ-জরার ললাটের শিথিল বলিরেখা কোথায় কোন্ অমৃত-করস্পর্শে মুছিয়া গিয়া আবার নবীনতার সৌকুমার্য লাভ করে, জানি না, কণা-পরিমাণ বীজের মধ্যে বিপুল বনস্পতির মহাশক্তি কোথায় কেমন করিয়া প্রচ্ছন্ন থাকে। জগতের এই যে আবরণ, যে আবরণের মধ্যে জগতের সমস্ত উদ্‌যোগ অদৃশ্য হইয়া কাজ করে সমস্ত চেষ্টা বিরামলাভ করিয়া যথাকালে নবীভূত হইয়া উঠে, ইহা প্রেমেরই আবরণ। সুপ্তির মধ্যে এই প্রেমই স্তম্ভিত, মৃত্যুর মধ্যে এই প্রেমই প্রগাঢ়, অন্ধকারের মধ্যে এই প্রেমই পুঞ্জীকৃত, আলোকের মধ্যে এই প্রেমই চঞ্চলশক্তির পশ্চাতে থাকিয়া অদৃশ্য, জীবনের মধ্যে এই প্রেমই আমাদের কর্তৃত্বের অন্তরালে থাকিয়া প্রতিমুহূর্তে বলপ্রেরণ প্রতিমুহূর্তে ক্ষতিপূরণ করিতেছে।

হে মহাতিমিরাবগুণ্ঠিতা রমণীয়া রজনী, তুমি পক্ষিমাতার বিপুল পক্ষপুটের ন্যায় শাবকদিগকে সুকোমল মোহাচ্ছাদনে আবৃত করিয়া অবতীর্ণ হইতেছ; তোমার মধ্যে বিশ্বধাত্রীর পরমস্পর্শ নিবিড়ভাবে নিগূঢ়ভাবে অনুভব করিতে চাহি। তোমার অন্ধকার আমাদের ক্লান্ত ইন্দ্রিয়কে আচ্ছন্ন রাখিয়া আমাদের হৃদয়কে উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিক, আমাদের শক্তিকে অভিভূত করিয়া আমাদের প্রেমকে উদ্বোধিত করিয়া তুলুক, আমাদের নিজের কর্তৃত্বপ্রয়োগের অহংকারসুখকে খর্ব করিয়া মাতার আলিঙ্গনপাশে নিঃশেষে আপনাকে বর্জন করিবার আনন্দকেই গরীয়ান করুক।

হে বিরাম-বিভাবরীর ঈশ্বরী মাতা, হে অন্ধকারের অধিদেবতা, হে সুপ্তির মধ্যে

জাগ্রত, হে মৃত্যুর মধ্যে বিরাজমান, তোমার নক্ষত্রদীপিত অঙ্গনতলে তোমার চরণচ্ছায়ায় লুণ্ঠিত হইলাম। আমি এখন আর কোনো ভয় করিব না, কেবল আপন ভার তোমার দ্বারে বিসর্জন দিব ; কোনো চিন্তা করিব না, কেবল চিত্তকে তোমার কাছে একান্ত সমর্পণ করিব ; কোনো চেষ্টা করিব না, কেবল তোমার ইচ্ছায় আমার ইচ্ছাকে বিলীন করিব ; কোনো বিচার করিব না, কেবল তোমার সেই আনন্দে আমার প্রেমকে নিমগ্ন করিয়া দিব, যে—

> আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রয়ন্তি অভিসংবিশন্তি।

ওই দেখিতেছি, তোমার মহান্ধকার রূপের মধ্যে বিশ্বভুবনের সমস্ত আলোকপুঞ্জ কেবল বিন্দু-বিন্দু-জ্যোতীরূপে একত্র সমবেত হইয়াছে। দিনের বেলায় পৃথিবীর ছোটো ছোটো চাঞ্চল্য, আমাদের নিজকৃত তুচ্ছ আন্দোলন আমাদের কাছে কত বিপুল-বৃহৎরূপে দেখা দেয়।—কিন্তু আকাশের ওই যে নক্ষত্রসকল, যাহাদের উদ্দাম বেগ আমরা মনে ধারণাই করিতে পারি না, যাহাদের উচ্ছ্বসিত আলোকতরঙ্গের আলোড়ন আমাদের কল্পনাকে পরাস্ত করিয়া দেয়,—তোমার মধ্যে তাহাদের সেই প্রচণ্ড আন্দোলন তো কিছুই নহে, তোমার অন্ধকার বসনাঞ্চলতলে তোমার অবনত স্থিরদৃষ্টির নিম্নে তাহারা স্তন্যপাননিরত সুপ্তশিশুর মতো নিশ্চল নিস্তব্ধ। তোমার বিরাট ক্রোড়ে তাহাদের অস্থিরতাও স্থিরত্ব, তাহাদের দুঃসহ তীব্রতেজ মাধুর্যরূপে প্রকাশমান। ইহা দেখিয়া এ রাত্রে আমার তুচ্ছ চাঞ্চল্যের আস্ফালন, আমার ক্ষণিক তেজের অভিমান, আমার ক্ষুদ্র দুঃখের আক্ষেপ, কিছুই আর থাকে না,—তোমার মধ্যে আমি সমস্তই স্থির করিলাম, সমস্ত আবৃত করিলাম, সমস্ত শান্ত করিলাম, তুমি আমাকে গ্রহণ করো—আমাকে রক্ষা করো,

> যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্।

আমি এখন তোমার নিকট শক্তি প্রার্থনা করি না, আমাকে প্রেম দাও ; আমি সংসারে জয়ী হইতে চাহি না, তোমার নিকট প্রণত হইতে চাই ; আমি সুখদুঃখকে অবজ্ঞা করিতে চাহি না, সুখদুঃখকে তোমার মঙ্গলহস্তের দান বলিয়া বিনয়ে গ্রহণ করিতে চাই। মৃত্যু যখন আমার কর্মশালার দ্বারে দাঁড়াইয়া নীরবসংকেতে আহ্বান করিবে, তখন যেন তাহার অনুসরণ করিয়া, জননী, তোমার অন্তঃপুরের শান্তিকক্ষে নিঃশঙ্কহৃদয়ের মধ্যে আমি ক্ষমা লইয়া যাই, প্রীতি লইয়া যাই, কল্যাণ লইয়া যাই—বিরোধের সমস্ত দাহ যেন সেদিন সন্ধ্যাস্নানে জুড়াইয়া যায়, সমস্ত বাসনার পঙ্ক যেন ধৌত হয়, সমস্ত কুটিলতাকে যেন সরল, সমস্ত বিকৃতিকে যেন সংস্কৃত করিয়া যাইতে পারি। যদি সে অবকাশ না ঘটে, যদি ক্ষুদ্রবল নিঃশেষিত হইয়া যায়, তবু তোমার বিশ্ববিধানের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিয়া যেন দিন হইতে রাত্রে, জীবন হইতে মৃত্যুতে, আমার অক্ষমতা হইতে তোমার

করুণার মধ্যে একান্তভাবে আত্মবিসর্জন করিতে পারি। ইহা যেন মনে রাখি—জীবনকে তুমিই আমার প্রিয় করিয়াছিলে, মরণকেও তুমিই আমার প্রিয় করিবে,—তোমার দক্ষিণহস্তে তুমি আমাকে সংসারে প্রেরণ করিয়াছিলে, তোমার বামহস্তে তুমি আমাকে ক্রোড়ে আকর্ষণ করিয়া লইবে,—তোমার আলোক আমাকে শক্তি দিয়াছিল, তোমার অন্ধকার আমাকে শান্তি দিবে।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

১৩১০

মনুষ্যত্ব

"উত্তিষ্ঠত! জাগ্রত!" উত্থান করো, জাগ্রত হও—এই বাণী উদ্‌ঘোষিত হইয়া গেছে। আমরা কে শুনিয়াছি, কে শুনি নাই, জানি না—কিন্তু "উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত" এই বাক্য বারবার আমাদের দ্বারে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। সংসারের প্রত্যেক বাধা প্রত্যেক দুঃখ প্রত্যেক বিচ্ছেদ কতশতবার আমাদের অন্তরাত্মার তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে আঘাত দিয়া যে-ঝংকার দিয়াছে, তাহাতে কেবল এই বাণীই ঝংকৃত হইয়া উঠিয়াছে—"উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত,"—উত্থান করো, জাগ্রত হও। অশ্রুশিশিরধৌত আমাদের নবজাগরণের জন্ত নিখিল অনিমেষনেত্রে প্রতীক্ষা করিয়া আছে—কবে সেই প্রভাত আসিবে, কবে সেই রাত্রির অন্ধকার অপগত হইয়া আমাদের অপূর্ব বিকাশকে নির্মল নবোদিত অরুণালোকে উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিবে। কবে আমাদের বহুদিনের বেদনা সফল হইবে, আমাদের অশ্রুধারা সার্থক হইবে।

পুষ্পকে আজ প্রাতঃকালে বলিতে হয় নাই যে, 'রজনী প্রভাত হইল—তুমি আজ প্রস্ফুটিত হইয়া ওঠো!' বনে বনে আজ বিচিত্র পুষ্পগুলি অতি অনায়াসেই বিশ্বজগতের অন্তর্গূঢ় আনন্দকে বর্ণে গন্ধে শোভায় বিকশিত করিয়া মাধুর্যের দ্বারা নিখিলের সহিত কমনীয়ভাবে আপনার সম্বন্ধস্থাপন করিয়াছে। পুষ্প আপনাকেও পীড়ন করে নাই, অন্ত কাহাকেও আঘাত করে নাই, কোনো অবস্থায় দ্বিধার লক্ষণ দেখায় নাই, সহজ-সার্থকতায় আদ্যোপান্ত প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে।

ইহা দেখিয়া মনের মধ্যে এই আক্ষেপ জন্মে যে, আমার জীবন কেন বিশ্বব্যাপী আনন্দকিরণপাতে এমনি সহজে, এমনি সম্পূর্ণভাবে বিকশিত হইয়া উঠে না? সে তাহার সমস্ত দলগুলি সংকুচিত করিয়া আপনার মধ্যে এত প্রাণপণে কী আঁকড়িয়া রাখিতেছে? প্রভাতে তরুণ সূর্য আসিয়া অরুণকরে তাহার দ্বারে আঘাত করিতেছে, বলিতেছে, 'আমি যেমন করিয়া আমার চম্পক-কিরণরাজি সমস্ত আকাশময় মেলিয়া

দিয়াছি, তুমি তেমন সহজে আনন্দে বিশ্বের মাঝখানে আপনাকে অবাধিত করিয়া দাও।' রজনী নিঃশব্দপদে আসিয়া স্নিগ্ধহস্তে তাহাকে স্পর্শ করিয়া বলিতেছে, 'আমি যেমন করিয়া আমার অতলস্পর্শ অন্ধকারের মধ্য হইতে আমার সমস্ত জ্যোতিঃসম্পদ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছি, তুমি তেমনি করিয়া একবার অন্তরের গভীর-তলের দ্বার নিঃশব্দে উদ্‌ঘাটন করিয়া দাও—আত্মার প্রচ্ছন্ন রাজভাণ্ডার একমুহূর্তে বিস্মিত বিশ্বের সম্মুখীন করো।' নিখিল জগৎ প্রতিক্ষণেই তাহার বিচিত্র স্পর্শের দ্বারা আমাদিগকে এই কথাই বলিতেছে, 'আপনাকে বিকশিত করো, আপনাকে সমর্পণ করো, আপনার দিক হইতে একবার সকলের দিকে ফেরো, এই জল-স্থল-আকাশে, এই সুখদুঃখের বিচিত্র সংসারে অনির্বচনীয় ব্রহ্মের প্রতি আপনাকে একবার সম্পূর্ণ উন্মুখ করিয়া ধরো।'

কিন্তু বাধার অন্ত নাই—প্রভাতের ফুলের মতো করিয়া এমন সহজে এমন পরিপূর্ণভাবে আত্মোৎসর্গ করিতে পারি না। আপনাকে আপনার মধ্যেই আবৃত করিয়া রাখি, চারিদিকে নিখিলের আনন্দ-অভ্যুদয় ব্যর্থ হইতে থাকে।

কে বলিবে, ব্যর্থ হইতে থাকে? প্রত্যেক মানুষের মধ্যে যে অনন্ত জীবন রহিয়াছে তাহার সফলতার পরিমাণ কে করিতে পারে? পুষ্পের মতো আমাদের ক্ষণকালীন সম্পূর্ণতা নহে। নদী যেমন তাহার বহুদীর্ঘ তটদ্বয়ের ধারাবাহিক বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া কত পর্বত-প্রান্তর-মরু-কানন-নগর-গ্রামকে তরঙ্গাভিহত করিয়া আপন সুদীর্ঘযাত্রার বিপুল সঞ্চয়কে প্রতিমুহূর্তে নিঃশেষে মহাসমুদ্রের নিকট উৎসর্গ করিতে থাকে, কোনোকালে তাহার অন্ত থাকে না,—তাহার অবিশ্রাম প্রবাহধারারও অন্ত থাকে না, তাহার চরম বিরামেরও সীমা থাকে না—মনুষ্যত্বকে সেইরূপ বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়া বিপুলভাবে মহৎ সার্থকতা লাভ করিতে হয়। তাহার সফলতা সহজ নহে। নদীর ন্যায় প্রতিপদে সে নিজের পথ নিজের বলে, নিজের বেগে রচনা করিয়া চলে। কোনো কূল গড়িয়া কোনো কূল ভাঙিয়া, কোথাও বিভক্ত হইয়া কোথাও সংযুক্ত হইয়া, নব নব বাধা দ্বারা আবর্তবেগে ঘূর্ণিত হইয়া সে আপনাকে আপনি বৃহৎ করিয়া সৃষ্টি করিতে থাকে; অবশেষে যখন সে আপনার সীমাবিহীন পরিণামে আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন সে বিচিত্রকে অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে বলিয়াই মহান একের সহিত তাহার মিলন সম্পূর্ণ হয়। বাধা যদি না থাকিত, তবে সে বৃহৎ হইতে পারিত না—বৃহৎ না হইলে বিরাটের মধ্যে তাহার বিকাশ পরিপূর্ণ হইত না।

দুঃখ আছে—সংসারে দুঃখের শেষ নাই। সেই দুঃখের আঘাতে, সেই দুঃখের বেগে সংসারে প্রকাণ্ড ভাঙন-গড়ন চলিতেছে—ইহাতে অহরহ যে তরঙ্গ উঠিতেছে, তাহার কতই ধ্বনি, কতই বর্ণ, কতই গতিভঙ্গিমা। মানুষ যদি ক্ষুদ্র হইত এবং

ক্ষুদ্রতাতেই মানুষের যদি শেষ হইত, তবে দুঃখের মতো অসংগত কিছুই হইতে পারিত না। এত দুঃখ ক্ষুদ্রের নহে। মহতেরই গৌরব দুঃখ। বিশ্বসংসারের মধ্যে মনুষ্যত্বই সেই দুঃখের মহিমায় মহীয়ান্ অশ্রুজলেই তাহার রাজ্যাভিষেক হইয়াছে। পুষ্পের দুঃখ নাই, পশুপক্ষীর দুঃখসীমা সংকীর্ণ—মানুষের দুঃখ বিচিত্র, তাহা গভীর, অনেক সময়ে তাহা অনির্বচনীয়—এই সংসারের মধ্যে তাহার বেদনার সীমা যেন সম্পূর্ণ করিয়া পাওয়া যায় না।

এই দুঃখই মানুষকে বৃহৎ করে, মানুষকে আপন বৃহত্ত্বসম্বন্ধে জাগ্রত-সচেতন করিয়া তোলে, এবং এই বৃহত্ত্বেই মানুষকে আনন্দের অধিকারী করিয়া তোলে। কারণ,

ভূমৈব সুখং, নাল্পে সুখমস্তি—অল্পে আমাদের আনন্দ নাই।

যাহাতে আমাদের খর্বতা, আমাদের স্বল্পতা, তাহা অনেক সময়ে আমাদের আরামের হইতে পারে, কিন্তু তাহা আমাদের আনন্দের নহে। যাহা আমরা বীর্যের দ্বারা না পাই, অশ্রুর দ্বারা না পাই, যাহা অনায়াসের তাহা আমরা সম্পূর্ণ পাই না—যাহাকে দুঃখের মধ্য দিয়া কঠিনভাবে লাভ করি, হৃদয় তাহাকেই নিবিড়ভাবে সমগ্রভাবে প্রাপ্ত হয়। মনুষ্যত্ব আমাদের পরমদুঃখের ধন, তাহা বীর্যের দ্বারাই লভ্য। প্রত্যহ পদে পদে বাধা অতিক্রম করিয়া যদি তাহাকে পাইতে না হইত, তবে তাহাকে পাইয়াও পাইতাম না—যদি তাহা সুলভ হইত, তবে আমাদের হৃদয় তাহাকে সর্বতোভাবে গ্রহণ করিত না। কিন্তু তাহা দুঃখের দ্বারা দুর্লভ, তাহা মৃত্যুশঙ্কার দ্বারা দুর্লভ, তাহা ভয়-বিপদের দ্বারা দুর্লভ, তাহা নানাভিমুখী প্রবৃত্তির সংক্ষোভের দ্বারা দুর্লভ। এই দুর্লভ মনুষ্যত্বকে অর্জন করিবার চেষ্টায় আত্মা আপনার সমস্ত শক্তি অনুভব করিতে থাকে। সেই অনুভূতিতেই তাহার প্রকৃত আনন্দ। ইহাতেই তাহার যথার্থ আত্মপরিচয়। ইহাতেই সে জানিতে পায়, দুঃখের ঊর্ধ্বে তাহার মস্তক, মৃত্যুর ঊর্ধ্বে তাহার প্রতিষ্ঠা। এইরূপে সংসারের বিচিত্র অভিঘাতে, দুঃখবাধার সহিত নিরন্তর সংগ্রামে যে আত্মার সমস্ত শক্তি জাগ্রত, সমস্ত তেজ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে, সেই আত্মাই ব্রহ্মকে যথার্থভাবে লাভ করিবার উদ্যম প্রাপ্ত হয়—ক্ষুদ্র আরামের মধ্যে, ভোগবিলাসের মধ্যে যে আত্মা জড়ত্বে আবিষ্ট হইয়া আছে, ব্রহ্মের আনন্দ তাহার নহে। সেইজন্য উপনিষদ্ বলিয়াছেন

নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।

এই আত্মা (জীবাত্মাই বল, পরমাত্মাই বল) ইনি বলহীনের দ্বারা লভ্য নহেন।

সমগ্র শক্তিকে সম্পূর্ণভাবে প্রয়োগ করিবার যত উপলক্ষ্য ঘটে, ততই আত্মাকে প্রকৃতভাবে লাভ করিবার উপায় হয়।

এইজন্যই পুষ্পের পক্ষে পুষ্পত্ব যত সহজ, মানুষের পক্ষে মনুষ্যত্ব তত সহজ নহে।

মনুষ্যত্বের মধ্য দিয়া মানুষকে যাহা পাইতে হইবে, তাহা নিদ্রিত অবস্থায় পাইবার নহে। এইজন্যই সংসারের সমস্ত কঠিন আঘাত আমাদিগকে এই কথা বলিতেছে,

> উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।
> ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।
> উঠ, জাগো, যথার্থ গুরুকে প্রাপ্ত হইয়া বোধলাভ করো।
> সেই পথ শাণিত ক্ষুরধারের ন্যায় দুর্গম, কবিরা এইরূপ বলেন।

অতএব প্রভাতে যখন বনে-উপবনে পুষ্প-পল্লবের মধ্যে তাহাদের ক্ষুদ্র সম্পূর্ণতা তাহাদের সহজ শোভা পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে, তখন মানুষ আপন দুর্গম পথ আপন দুঃসহ দুঃখ আপন বৃহৎ অসমাপ্তির গৌরবে মহত্তর বিচিত্রতর আনন্দের গীত কি গাহিবে না? যে প্রভাতে তরুলতার মধ্যে কেবল পুষ্পের বিকাশ এবং পল্লবের হিল্লোল, পাখির গান এবং ছায়ালোকের স্পন্দন, সেই শিশিরধৌত জ্যোতির্ময় প্রভাতে মানুষের সম্মুখে সংসার—তাহার সংগ্রামক্ষেত্র—সেই রমণীয় প্রভাতে মানুষকেই বদ্ধপরিকর হইয়া তাহার প্রতিদিনের দুরূহ জয়চেষ্টার পথে ধাবিত হইতে হইবে, ক্লেশকে বরণ করিয়া লইতে হইবে, সুখদুঃখের উত্তাল তরঙ্গের উপর দিয়া তাহাকে তরণী বাহিতে হইবে—কারণ, মানুষ মহৎ, কারণ, মনুষ্যত্ব সুকঠিন, এবং মানুষের যে পথ, "দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।"

কিন্তু সংসারের মধ্যেই যদি সংসারের শেষ দেখি, তবে দুঃখকষ্টের পরিমাণ অত্যন্ত উৎকট হইয়া উঠে, তাহার সামঞ্জস্য থাকে না। তবে এই বিষম ভার কে বহন করিবে? কেনই বা বহন করিবে? কিন্তু যেমন নদীর এক প্রান্তে পরমবিরাম সমুদ্র, অন্যদিকে সুদীর্ঘতটনিরুদ্ধ অবিরাম-ধুধ্যমান জলধারা, তেমনি আমাদেরও যদি একই সময়ে একদিকে ব্রহ্মের মধ্যে বিশ্রাম ও অন্যদিকে সংসারের মধ্যে অবিশ্রাম গতিবেগ না থাকে, তবে এই গতির কোনোই তাৎপর্য থাকে না, আমাদের প্রাণপণ চেষ্টা অদ্ভুত উন্মত্ততা হইয়া দাঁড়ায়। ব্রহ্মের মধ্যেই আমাদের সংসারের পরিণাম, আমাদের কর্মের গতি। শাস্ত্র বলিয়াছেন—ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ

> যদ্‌যৎ কর্ম প্রকুর্বীত তদ্‌ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ।
> যে-যে কর্ম করিবেন, তাহা ব্রহ্মে সমর্পণ করিবেন।

ইহাতে একই কালে কর্ম এবং বিরাম, চেষ্টা এবং শান্তি, দুঃখ এবং আনন্দ। ইহাতে একদিকে আমাদের আত্মার কর্তৃত্ব থাকে ও অন্যদিকে যেখানে সেই কর্তৃত্বের নিঃশেষে বিলয়, সেইখানে সেই কর্তৃত্বকে প্রতিক্ষণে বিসর্জন দিয়া আমরা প্রেমের আনন্দ লাভ করি।

প্রেম তো কিছু না দিয়া বাঁচিতে পারে না। আমাদের কর্ম, আমাদের কর্তৃত্ব যদি

একেবারেই আমাদের না হইত, তবে ব্রহ্মের মধ্যে বিসর্জন দিতাম কী? তবে ভক্তি তাহার সার্থকতালাভ করিত কেমন করিয়া? সংসারেই আমাদের কর্ম, আমাদের কর্তৃত্ব তাহাই আমাদের দিবার জিনিস। আমাদের প্রেমের চরম সার্থকতা হইবে,— যখন আমাদের সমস্ত কর্ম, সমস্ত কর্তৃত্ব আনন্দে ব্রহ্মকে সমর্পণ করিতে পারিব। নতুবা কর্ম আমাদের পক্ষে নিরর্থক ভার ও কর্তৃত্ব বস্তুত সংসারের দাসত্ব হইয়া উঠিবে। পতিব্রতা স্ত্রীর পক্ষে তাহার পতিগৃহের কর্মই গৌরবের, তাহা আনন্দের—সে কর্ম তাহার বন্ধন নহে, পতিপ্রেমের মধ্যেই তাহা প্রতিক্ষণেই মুক্তিলাভ করিতেছে—এক পতিপ্রেমের মধ্যেই তাহার বিচিত্র কর্মের অখণ্ড ঐক্য, তাহার নানাদুঃখের এক আনন্দ-অবসান, ব্রহ্মের সংসারে আমরা যখন ব্রহ্মের কর্ম করিব, সকল কর্ম ব্রহ্মকে দিব, তখন সেই কর্ম এবং মুক্তি একই কথা হইয়া দাঁড়াইবে, তখন এক ব্রহ্মে আমাদের সমস্ত কর্মের বৈচিত্র্য বিলীন হইবে, সমস্ত দুঃখের ঝংকার একটি আনন্দসংগীতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে।

প্রেম যাহা দান করে, সেই দান যতই কঠিন হয়, তত তাহার সার্থকতার আনন্দ নিবিড় হয়। সন্তানের প্রতি জননীর স্নেহ দুঃখের দ্বারাই সম্পূর্ণ প্রীতিমাত্রই কষ্টদ্বারা আপনাকে সমগ্রভাবে সপ্রমাণ করিয়া কৃতার্থ হয়। ব্রহ্মের প্রতি যখন আমাদের প্রীতি জাগ্রত হইবে, তখন আমাদের সংসারধর্ম দুঃখক্লেশের দ্বারাই সার্থক হইবে, তাহা আমাদের প্রেমকেই প্রতিদিন উজ্জ্বল করিবে, অলংকৃত করিবে; ব্রহ্মের প্রতি আমাদের আত্মোৎসর্গকে দুঃখের মূল্যেই মূল্যবান করিয়া তুলিবে।

হে প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু, শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মন, আমার দৃষ্টি, শ্রবণ, চিন্তা, আমার সমস্ত কর্ম, তোমার অভিমুখেই অহরহ চলিতেছে ইহা আমি জানি না বলিয়াই, ইহা আমার ইচ্ছাকৃত নহে বলিয়াই দুঃখ পাই। আমি সমস্তকেই অন্ধভাবে বলপূর্বক আমার বলিতে চাই বল রক্ষা হয় না, আমার কিছুই থাকে না। নিখিলের দিক হইতে, তোমার দিক হইতে সমস্ত নিজের দিকে টানিয়া-টানিয়া রাখিবার নিষ্ফল চেষ্টায় প্রতিদিন পীড়িত হইতে থাকি। আজ আমি আর কিছুই চাই না, আমি আজ পাইবার প্রার্থনা করিব না, আজ আমি দিতে চাই, দিবার শক্তি চাই। তোমার কাছে আমি আপনাকে পরিপূর্ণরূপে রিক্ত করিব, রিক্ত করিয়া পরিপূর্ণ করিব। তোমার সংসারে কর্মের দ্বারা তোমার যে সেবা করিব, তাহা নিরন্তর হইয়া আমার প্রেমকে জাগ্রত নিষ্ঠাবান করিয়া রাখুক, তোমার অমৃতসমুদ্রের মধ্যে অতলস্পর্শ যে বিশ্রাম, তাহাও আমাকে অবসানহীন শান্তি দান করুক। তুমি দিনে দিনে স্তরে স্তরে আমাকে শতদল পদ্মের ন্যায় বিশ্বজগতের মধ্যে বিকশিত করিয়া তোমারই পূজার অর্ঘ্যরূপে গ্রহণ করো।

১৩১০

ধর্মের সরল আদর্শ

আমার গৃহকোণের জন্য যদি একটি প্রদীপ আমাকে জালিতে হয়, তবে তাহার জন্য আমাকে কত আয়োজন করিতে হয়—সেটুকুর জন্য কতলোকের উপর আমার নির্ভর। কোথায় সর্ষপ-বপন হইতেছে, কোথায় তৈল-নিকাশন চলিতেছে, কোথায় তাহার ক্রয়-বিক্রয়—তাহার পরে দীপসজ্জারই বা কত উদ্‌যোগ - এত জটিলতায় যে আলোকটুকু পাওয়া যায় তাহা কত অল্প। তাহাতে আমার ঘরের কাজ চলিয়া যায়, কিন্তু বাহিরের অন্ধকারকে দ্বিগুণ ঘনীভূত করিয়া তোলে।

বিশ্বপ্রকাশক প্রভাতের আলোককে গ্রহণ করিবার জন্য কাহারও উপরে আমাকে নির্ভর করিতে হয় না,—তাহা আমাকে রচনা করিতে হয় না, কেবলমাত্র জাগরণ করিতে হয়। চক্ষু মেলিয়া ঘরের দ্বার মুক্ত করিলেই সে আলোককে আর কেহ ঠেকাইয়া রাখিতে পারে না।

যদি কেহ বলে প্রভাতের আলোককে দর্শন করিবার জন্য একটি অত্যন্ত নিগূঢ় কৌশল কোথাও গুপ্ত আছে, তবে তৎক্ষণাৎ এই কথা মনে হয়, নিশ্চয় তাহা প্রভাতের আলোক নহে—নিশ্চয় তাহা কোনো কৃত্রিম আলোক—সংসারের কোনো বিশেষ-ব্যবহারযোগ্য কোনো ক্ষুদ্র আলোক। কারণ, বৃহৎ আলোক আমাদের মস্তকের উপরে আপনি বর্ষিত হইয়া থাকে—ক্ষুদ্র আলোকের জন্যই অনেক কলকারখানা প্রস্তুত করিতে হয়।

যেমন এই আলোক, তেমনি ধর্ম। তাহাও এইরূপ অজস্র, তাহা এইরূপ সরল। তাহা ঈশ্বরের আপনাকে দান,—তাহা নিত্য, তাহা ভূমা, তাহা আমাদিগকে বেষ্টন করিয়া আমাদের অন্তরবাহিরকে ওতপ্রোত করিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিয়াছে। তাহাকে পাইবার জন্য কেবল চাহিলেই হইল, কেবল হৃদয়কে উন্মীলিত করিলেই হইল। আকাশপূর্ণ দিবালোককে উদ্‌যোগ করিয়া পাইতে হইলে যেমন আমাদের পক্ষে পাওয়া অসম্ভব হইত, তেমনি আমাদের অনন্তজীবনের সম্বল ধর্মকে বিশেষ আয়োজনের দ্বারা পাইতে হইলে সে পাওয়া কোনোকালে ঘটিয়া উঠিত না।

আমরা নিজে যাহা রচনা করিতে যাই, তাহা জটিল হইয়া পড়ে। আমাদের সমাজ জটিল, আমাদের সংসার জটিল, আমাদের জীবনযাত্রা জটিল। এই জটিলতা আপন বহুধাবিভক্ত বৈচিত্র্যের দ্বারা অনেক সময় বিপুলতা ও প্রবলতার ভান করিয়া আমাদের মূঢ়চিত্তকে অভিভূত করিয়া দেয়। যে দার্শনিক গ্রন্থের লেখা অত্যন্ত ঘোরালো, আমাদের অজ্ঞবুদ্ধি তাহার মধ্যেই বিশেষ পাণ্ডিত্য আরোপ করিয়া বিস্ময় অনুভব করে।

যে সভ্যতার সমস্ত গতিপদ্ধতি দুরূহ ও বিমিশ্রিত, যাহার কলকারখানা আয়োজন-উপকরণ বহুলবিস্তৃত, তাহা আমাদের দুর্বল অন্তঃকরণকে বিহ্বল করিয়া দেয়। কিন্তু যে দার্শনিক দর্শনকে সহজ করিয়া দেখাইতে পারেন, তিনিই যথার্থ ক্ষমতাশালী, ধীশক্তিমান; যে সভ্যতা আপনার সমস্ত ব্যবস্থাকে সরলতার দ্বারা সুশৃঙ্খল ও সর্বত্র সুগম করিয়া আনিতে পারে, সেই সভ্যতাই যথার্থ উন্নততর। বাহিরে দেখিতে যেমনই হউক, জটিলতাই দুর্বলতা, তাহা অকৃতার্থতা,—পূর্ণতাই সরলতা। ধর্ম সেই পরিপূর্ণতার, সুতরাং সরলতার, একমাত্র চরমতম আদর্শ।

কিন্তু এমনি আমাদের দুর্ভাগ্য, সেই ধর্মকেই মানুষ সংসারের সর্বাপেক্ষা জটিলতা দ্বারা আকীর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। তাহা অশেষ তন্ত্রে-মন্ত্রে, কৃত্রিম ক্রিয়াকর্মে, জটিল মতবাদে, বিচিত্র কল্পনায় এমনি গহন দুর্গম হইয়া উঠিয়াছে যে, মানুষের সেই স্বকৃত অন্ধকারময় জটিলতার মধ্যে প্রত্যহ এক-একজন অধ্যবসায়ী এক-এক নূতন পথ কাটিয়া নব নব সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিতেছে। সেই ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় ও মতবাদের সংঘর্ষে জগতে বিরোধ-বিদ্বেষ অশান্তি-অমঙ্গলের আর সীমা নাই।

এমন হইল কেন? ইহার একমাত্র কারণ, সর্বান্তঃকরণে আমরা নিজেকে ধর্মের অনুগত না করিয়া ধর্মকে নিজের অনুরূপ করিবার চেষ্টা করিয়াছি বলিয়া। ধর্মকে আমরা সংসারের অন্যান্য আবশ্যকদ্রব্যের ন্যায় নিজেদের বিশেষব্যবহারযোগ্য করিয়া লইবার জন্য আপন-আপন পরিমাপে তাহাকে বিশেষভাবে খর্ব করিয়া লই বলিয়া।

ধর্ম আমাদের পক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ আবশ্যক সন্দেহ নাই—কিন্তু সেইজন্যই তাহাকে নিজের উপযোগী করিয়া লইতে গেলেই তাহার সেই সর্বশ্রেষ্ঠ আবশ্যকতাই নষ্ট হইয়া যায়। তাহা দেশকালপাত্রের ক্ষুদ্র প্রভেদের অতীত, তাহা নিরঞ্জন বিকারবিহীন বলিয়াই তাহা আমাদের চিরদিনের পক্ষে আমাদের সমস্ত অবস্থার পক্ষে এত একান্ত আবশ্যক। তাহা আমাদের অতীত বলিয়াই তাহা আমাদিগকে নিত্যকাল সমস্ত পরিবর্তনের মধ্যে ধ্রুব অবলম্বন দান করে।

কিন্তু ধর্মকে ধারণা করিতে হইবে তো। ধারণা করিতে হইলে তাহাকে আমাদের প্রকৃতির অনুযায়ী করিয়া লইতে হয়। অথচ মানবপ্রকৃতি বিচিত্র,—সুতরাং সেই বৈচিত্র্য অনুসারে যাহা এক, তাহা অনেক হইয়া উঠে। যেখানে অনেক, সেখানে জটিলতা অনিবার্য—যেখানে জটিলতা, সেখানে বিরোধ আপনি আসিয়া পড়ে।

কিন্তু ধর্মকে ধারণা করিতে হইবে না। ধর্মরাজ ঈশ্বর ধারণার অতীত। যাহা ধারণা করি, তাহা তিনি নহেন, তাহা আর-কিছু, তাহা ধর্ম নহে, তাহা সংসার।

সুতরাং তাহাতে সংসারের সমস্ত লক্ষণ ফুটিয়া উঠে। সংসারের লক্ষণ বৈচিত্র্য, সংসারের লক্ষণ বিরোধ।

যাহা ধারণা করিতে পারি, তাহাতে আমাদের তৃপ্তির অবসান হইয়া যায়, যাহা ধারণা করি, তাহাতে প্রতিক্ষণে বিকার ঘটিতে থাকে। সুখের আশাতেই আমরা সমস্ত-কিছু ধারণা করিতে যাই, কিন্তু যাহা ধারণা করি, তাহাতে আমাদের সুখের অবসান হয়। এইজন্য উপনিষদে আছে—

যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি।
যাহা ভূমা তাহাই সুখ, যাহা অল্প তাহাতে সুখ নাই।

সেই ভূমাকে যদি আমরা ধারণাযোগ্য করিবার জন্য অল্প করিয়া লই, তবে তাহা দুঃখসৃষ্টি করিবে,—দুঃখ হইতে রক্ষা করিবে কী করিয়া? অতএব সংসারে থাকিয়া ভূমাকে উপলব্ধি করিতে হইবে, কিন্তু সংসারের দ্বারা সেই ভূমাকে খণ্ডিত-জড়িত করিলে চলিবে না।

একটি উদাহরণ দিই। গৃহ আমাদের পক্ষে প্রয়োজনীয়, তাহা আমাদের বাসযোগ্য। মুক্ত আকাশ আমাদের পক্ষে সেরূপ বাসযোগ্য নহে, কিন্তু এই মুক্ত আকাশকে মুক্ত রাখাই আমাদের পক্ষে একান্ত আবশ্যক। মুক্ত আকাশের সহিত আমাদের গৃহস্থিত আকাশের অবাধ যোগ রাখিলেই তবেই আমাদের গৃহ আমাদের পক্ষে কারাগার, আমাদের পক্ষে কবরস্বরূপ হয় না। কিন্তু যদি বলি, আকাশকে গৃহেরই মতো আমার আপনার করিয়া লইব - যদি আকাশের মধ্যে কেবলই প্রাচীর তুলিতে থাকি, তবে তাহাতে আমাদের গৃহেরই বিস্তার ঘটিতে থাকে, মুক্ত আকাশ দূর হইতে সুদূরে চলিয়া যায়। আমরা যদি বৃহৎ ছাদ পত্তন করিয়া সমস্ত আকাশকে আমার আপনার করিয়া লইলাম বলিয়া কল্পনা করি, তবে আলোকের জন্মভূমি, ভূর্ভুবঃস্বর্লোকের অনন্ত ক্রীড়াক্ষেত্র আকাশ হইতে নিজেকে বঞ্চিত করি। যাহা নিতান্ত সহজেই পাওয়া যায়, সহজে ব্যতীত আর-কোনো উপায়ে যাহা পাওয়া যায় না, নিজের প্রভূত চেষ্টার দ্বারাতেই তাহাকে একেবারে দুর্লভ করিয়া তোলা হয়। বেষ্টন করিয়া লইয়া সংসারের আর-সমস্ত পাওয়াকে আমরা পাইতে পারি,— কেবল ধর্মকে, ধর্মের অধীশ্বরকে বেষ্টন ভাঙিয়া দিয়া আমরা পাই। সংসারের লাভের পদ্ধতিদ্বারা সংসারের অতীতকে পাওয়া যায় না। বস্তুত যেখানে আমরা না পাইবার আনন্দের অধিকারী, সেখানে পাইবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া আমরা হারাই মাত্র। সেইজন্য ঋষি বলিয়াছেন—

যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন॥

মনের সহিত বাক্য যাঁহাকে না পাইয়া নিবৃত্ত হয়, সেই ব্রহ্মের আনন্দ যিনি জানিয়াছেন, তিনি কিছু হইতেই ভয় পান না।

ধর্মের সরল আদর্শ একদিন আমাদের ভারতবর্ষেরই ছিল। উপনিষদের মধ্যে তাহার পরিচয় পাই। তাহার মধ্যে যে ব্রহ্মের প্রকাশ আছে, তাহা পরিপূর্ণ, তাহা অখণ্ড, তাহা আমাদের কল্পনা-জালদ্বারা বিজড়িত নহে। উপনিষদ্ বলিয়াছেন —

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম

তিনিই সত্য, নতুবা এ জগৎসংসার কিছুই সত্য হইত না। তিনিই জ্ঞান, এই যাহা-কিছু তাহা তাঁহারই জ্ঞান, তিনি যাহা জানিতেছেন তাহাই আছে, তাহাই সত্য। তিনি অনন্ত। তিনি অনন্ত সত্য, তিনি অনন্ত জ্ঞান।

এই বিচিত্র জগৎসংসারকে উপনিষদ্ ব্রহ্মের অনন্ত সত্যে, ব্রহ্মের অনন্ত জ্ঞানে বিলীন করিয়া দেখিয়াছেন। উপনিষদ্ কোনো বিশেষ লোক কল্পনা করেন নাই, কোনো বিশেষ মন্দির রচনা করেন নাই, কোনো বিশেষ স্থানে তাঁহার বিশেষ মূর্তি স্থাপন করেন নাই—একমাত্র তাঁহাকেই পরিপূর্ণভাবে সর্বত্র উপলব্ধি করিয়া সকলপ্রকার জটিলতা সকলপ্রকার কল্পনার চাঞ্চল্যকে দূরে নিরাকৃত করিয়া দিয়াছেন। ধর্মের বিশুদ্ধ সরলতার এমন বিরাট আদর্শ আর কোথায় আছে?

উপনিষদের এই ব্রহ্ম আমাদের অগম্য, এই কথা নির্বিচারে উচ্চারণ করিয়া ঋষিদের অমর বাণীগুলিকে আমরা যেন আমাদের ব্যবহারের বাহিরে নির্বাসিত করিয়া না রাখি। আকাশ লোষ্ট্রখণ্ডের ন্যায় আমাদের গ্রহণযোগ্য নয় বলিয়া আমরা আকাশকে দুর্গম বলিতে পারি না। বস্তুত সেই কারণেই তাহা সুগম। যাহা ধারণাযোগ্য, যাহা স্পর্শগম্য, তাহাই আমাদিগকে বাধা দেয়। আমাদের স্বহস্তরচিত ক্ষুদ্র প্রাচীর দুর্গম, কিন্তু অনন্ত আকাশ দুর্গম নহে। প্রাচীরকে লঙ্ঘন করিতে হয়, কিন্তু আকাশকে লঙ্ঘন করিবার কোনো অর্থই নাই। প্রভাতের অরুণালোক স্বর্ণমুষ্টির ন্যায় সঞ্চয়যোগ্য নহে, সেই কারণেই কি অরুণালোককে দুর্লভ বলিতে হইবে? বস্তুত একমুষ্টি স্বর্ণই কি দুর্লভ নহে, আর আকাশপূর্ণ প্রভাতকিরণ কি কাহাকেও ক্রয় করিয়া আনিতে হয়? প্রভাতের আলোককে মূল্য দিয়া ক্রয় করিবার কল্পনাই মনে আসিতে পারে না—তাহা দুর্মূল্য নহে, তাহা অমূল্য।

উপনিষদের ব্রহ্ম সেইরূপ। তিনি অন্তরে-বাহিরে সর্বত্র—তিনি অন্তরতম, তিনি সুদূরতম। তাঁহার সত্যে আমরা সত্য, তাঁহার আনন্দে আমরা ব্যক্ত।

কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ
যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ।

কেই বা শরীরচেষ্টা করিত, কেই বা জীবিত থাকিত, যদি আকাশে এই আনন্দ না থাকিতেন।

মহাকাশ পূর্ণ করিয়া নিরন্তর সেই আনন্দ বিরাজ করিতেছেন বলিয়াই আমরা প্রতিক্ষণে নিশ্বাস লইতেছি, আমরা প্রতিমুহূর্তে প্রাণধারণ করিতেছি—

এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি।

এই আনন্দের কণামাত্র আনন্দকে অন্যান্য জীবসকল উপভোগ করিতেছে।

আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে,
আনন্দেন জাতানি জীবন্তি,
আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি।

সেই সর্বব্যাপী আনন্দ হইতেই এই সমস্ত প্রাণী জন্মিতেছে, সেই সর্বব্যাপী আনন্দের দ্বারাই এই সমস্ত প্রাণী জীবিত আছে, সেই সর্বব্যাপী আনন্দের মধ্যেই ইহারা গমন করে, প্রবেশ করে।

ঈশ্বর-সম্বন্ধে যত কথা আছে, এই কথাই সর্বাপেক্ষ সরল, সর্বাপেক্ষা সহজ। ব্রহ্মের এই ভাব গ্রহণ করিবার জন্য কিছু কল্পনা করিতে হয় না, কিছু রচনা করিতে হয় না, দূরে যাইতে হয় না, দিনক্ষণের অপেক্ষা করিতে হয় না,—হৃদয়ের মধ্যে আগ্রহ উপস্থিত হইলেই, তাঁহাকে উপলব্ধি করিবার যথার্থ ইচ্ছা জন্মিলেই, নিশ্বাসের মধ্যে তাঁহার আনন্দ প্রবাহিত হয়, প্রাণে তাঁহার আনন্দ কম্পিত হয়, বুদ্ধিতে তাঁহার আনন্দ বিকীর্ণ হয়, ভোগে তাঁহার আনন্দ প্রতিবিম্বিত দেখি। দিনের আলোক যেমন কেবলমাত্র চক্ষু মেলিবার অপেক্ষা রাখে, ব্রহ্মের আনন্দ সেইরূপ হৃদয়-উন্মীলনের অপেক্ষা রাখে মাত্র।

আমি একদা একখানি নৌকায় একাকী বাস করিতেছিলাম। একদিন সায়াহ্নে একটি মোমের বাতি জ্বালাইয়া পড়িতে পড়িতে অনেক রাত হইয়া গেল। শ্রান্ত হইয়া যেমনি বাতি নিবাইয়া দিলাম, অমনি একমুহূর্তে পূর্ণিমার চন্দ্রালোক চারিদিকের মুক্ত বাতায়ন দিয়া আমার কক্ষ পরিপূর্ণ করিয়া দিল।[1] আমার স্বহস্তজ্বালিত একটিমাত্র ক্ষুদ্র বাতি এই আকাশপরিপ্লাবী অজস্র আলোককে আমার নিকট হইতে অগোচর করিয়া রাখিয়াছিল। এই অপরিমেয় জ্যোতিঃসম্পদ্ লাভ করিবার জন্য আমাকে আর কিছুই করিতে হয় নাই, কেবল সেই বাতিটি এক ফুংকারে নিবাইয়া দিতে হইয়াছিল। তাহার পরে কী পাইলাম! বাতির মতো কোনো নাড়িবার জিনিস পাই নাই, সিন্দুকে ভরিবার জিনিস পাই নাই—পাইয়াছিলাম আলোক আনন্দ সৌন্দর্য শান্তি। যাহাকে সরাইয়াছিলাম, তাহার চেয়ে অনেক বেশি পাইয়াছিলাম—অথচ উভয়কে পাইবার পদ্ধতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

ব্রহ্মকে পাইবার জন্য সোনা পাইবার মতো চেষ্টা না করিয়া আলোক পাইবার মতো চেষ্টা করিতে হয়। সোনা পাইবার মতো চেষ্টা করিতে গেলে নানা বিরোধ-

---

[1] তুলনীয় "পূর্ণিমা," 'চিত্রা,' রবীন্দ্র-রচনাবলী চতুর্থ খণ্ড পৃ. ৭০ ; 'ছিন্নপত্র' হইতে উদ্ধৃত পত্র (শিলাইদা, ১২ ডিসেম্বর ১৮৯৫), রবীন্দ্র-রচনাবলী চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ৫৫৮।

বিদ্বেষ-বাধাবিপত্তির প্রাদুর্ভাব হয়, আর, আলোক পাইবার মতো চেষ্টা করিলে সমস্ত সহজ সরল হইয়া যায়। আমরা জানি বা না জানি, ব্রহ্মের সহিত আমাদের যে নিত্য সম্বন্ধ আছে, সেই সম্বন্ধের মধ্যে নিজের চিত্তকে উদ্‌বোধিত করিয়া তোলাই ব্রহ্মপ্রাপ্তির সাধনা।

ভারতবর্ষে এই উদ্‌বোধনের যে মন্ত্র আছে, তাহাও অত্যন্ত সরল। তাহা একনিশ্বাসেই উচ্চারিত হয়—তাহা গায়ত্রীমন্ত্র। ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ—গায়ত্রীর এই অংশটুকুর নাম ব্যাহৃতি। ব্যাহৃতিশব্দের অর্থ—চারিদিক হইতে আহরণ করিয়া আনা। প্রথমত ভূলোক-ভুবর্লোক-স্বর্লোক অর্থাৎ সমস্ত বিশ্বজগৎকে মনের মধ্যে আহরণ করিয়া আনিতে হয়—মনে করিতে হয়, আমি বিশ্বভুবনের অধিবাসী—আমি কোনো বিশেষ-প্রদেশবাসী নহি—আমি যে রাজ-অট্টালিকার মধ্যে বাসস্থান পাইয়াছি, লোকলোকান্তর তাহার এক-একটি কক্ষ। এইরূপে, যিনি যথার্থ আর্য, তিনি অন্তত প্রত্যহ একবার চন্দ্রসূর্য গ্রহতারকার মাঝখানে নিজেকে দণ্ডায়মান করেন, পৃথিবীকে অতিক্রম করিয়া নিখিল জগতের সহিত আপনার চিরসম্বন্ধ একবার উপলব্ধি করিয়া লন···স্বাস্থ্যকামী যেরূপ রুদ্ধগৃহ ছাড়িয়া প্রত্যূষে একবার উন্মুক্ত মাঠের বায়ু সেবন করিয়া আসেন, সেইরূপ আর্য সাধু দিনের মধ্যে একবার নিখিলের মধ্যে, ভূর্ভুবঃ-স্বর্লোকের মধ্যে নিজের চিত্তকে প্রেরণ করেন। তিনি সেই অগণ্যজ্যোতিষ্কখচিত বিশ্বলোকের মাঝখানে দাঁড়াইয়া কী মন্ত্র উচ্চারণ করেন—

তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি।
এই বিশ্বপ্রসবিতা দেবতার বরণীয় শক্তি ধ্যান করি।

এই বিশ্বলোকের মধ্যে সেই বিশ্বলোকেশ্বরের যে শক্তি প্রত্যক্ষ, তাহাকেই ধ্যান করি। একবার উপলব্ধি করি বিপুল বিশ্বজগৎ একসঙ্গে এই মুহূর্তে এবং প্রতিমুহূর্তেই তাঁহা হইতে অবিশ্রাম বিকীর্ণ হইতেছে। আমরা যাহাকে দেখিয়া শেষ করিতে পারি না, জানিয়া অন্ত করিতে পারি না, তাহা সমগ্রভাবে নিয়তই তিনি প্রেরণ করিতেছেন। এই বিশ্বপ্রকাশক অসীম শক্তির সহিত আমার অব্যবহিত সম্পর্ক কী সূত্রে? কোন্ সূত্র অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে ধ্যান করিব?

ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ—

যিনি আমাদিগকে বুদ্ধিবৃত্তিসকল প্রেরণ করিতেছেন, তাঁহার প্রেরিত সেই ধীসূত্রেই তাঁহাকে ধ্যান করিব। সূর্যের প্রকাশ আমরা প্রত্যক্ষভাবে কিসের দ্বারা জানি? সূর্য নিজে আমাদিগকে যে কিরণ প্রেরণ করিতেছেন, সেই কিরণেরই দ্বারা। সেইরূপ বিশ্বজগতের সবিতা আমাদের মধ্যে অহরহ যে ধীশক্তি প্রেরণ করিতেছেন—যে শক্তি

থাকাতেই আমি নিজেকে ও বাহিরের সমস্ত প্রত্যক্ষব্যাপারকে উপলব্ধি করিতেছি—সেই ধীশক্তি তাঁহারই শক্তি—এবং সেই ধীশক্তি দ্বারাই তাঁহারই শক্তি প্রত্যক্ষভাবে অন্তরের মধ্যে অন্তরতমরূপে অনুভব করিতে পারি। বাহিরে যেমন ভূর্ভুবঃস্বর্লোকের সবিতৃরূপে তাঁহাকে জগৎচরাচরের মধ্যে উপলব্ধি করি, অন্তরের মধ্যেও সেইরূপ আমার ধীশক্তির অবিশ্রাম প্রেরয়িতা বলিয়া তাঁহাকে অব্যবহিতভাবে উপলব্ধি করিতে পারি। বাহিরে জগৎ এবং আমার অন্তরে ধী, এ দুইই একই শক্তির বিকাশ, ইহা জানিলে জগতের সহিত আমার চিত্তের এবং আমার চিত্তের সহিত সেই সচ্চিদানন্দের ঘনিষ্ঠ যোগ অনুভব করিয়া সংকীর্ণতা হইতে স্বার্থ হইতে ভয় হইতে বিষাদ হইতে মুক্তিলাভ করি। এইরূপে গায়ত্রীমন্ত্রে বাহিরের সহিত অন্তরের, এবং অন্তরের সহিত অন্তরতমের যোগসাধন করে।

ব্রহ্মকে ধ্যান করিবার এই যে প্রাচীন বৈদিক পদ্ধতি ইহা যেমন উদার, তেমনি সরল। ইহা সর্বপ্রকার-কৃত্রিমতা-পরিশূন্য। বাহিরের বিশ্বজগৎ এবং অন্তরের ধী, ইহা কাহাকেও কোথাও অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতে হয় না—ইহা ছাড়া আমাদের আর কিছুই নাই। এই জগৎকে এবং এই বুদ্ধিকে তাঁহার অশ্রান্তশক্তি দ্বারা তিনিই অহরহ প্রেরণ করিতেছেন, এই কথা স্মরণ করিলে তাঁহার সহিত আমাদের সম্বন্ধ যেমন গভীরভাবে সমগ্রভাবে একান্তভাবে হৃদয়ংগম হয়, এমন আর কোন্ কৌশলে, কোন্ আয়োজনে, কোন্ কৃত্রিম উপায়ে, কোন্ কল্পনানৈপুণ্যে হইতে পারে, তাহা আমি জানি না। ইহার মধ্যে তর্কবিতর্কের কোনো স্থান নাই, মতবাদ নাই, ব্যক্তিবিশেষগত প্রকৃতির কোনো সংকীর্ণতা নাই।

আমাদের এই ব্রহ্মের ধ্যান যেরূপ সরল অথচ বিরাট, আমাদের উপনিষদের প্রার্থনাটিও ঠিক সেইরূপ।

বিদেশীরা এবং তাঁহাদের প্রিয়ছাত্র স্বদেশীরা বলেন, প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্র পাপের প্রতি প্রচুর মনোযোগ করে নাই, ইহাই হিন্দুধর্মের অসম্পূর্ণতা ও নিকৃষ্টতার পরিচয়।—বস্তুত ইহাই হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতার প্রমাণ। আমরা পাপপুণ্যের একেবারে মূলে গিয়াছিলাম। অনন্ত আনন্দস্বরূপের সহিত চিত্তের সম্মিলন, ইহার প্রতিই আমাদের শাস্ত্রের সমস্ত চেষ্টা নিবদ্ধ ছিল—তাঁহাকে যথার্থভাবে পাইলে, এক কথায় সমস্ত পাপ দূর হয়, সমস্ত পুণ্য লাভ হয়। মাতাকে যদি কেবলই উপদেশ দিতে হয় যে, তুমি ছেলের কাজে অনবধান হইয়ো না, তোমাকে এই করিতে হইবে, তোমাকে এই করিতে হইবে না, তবে উপদেশের আর অন্ত থাকে না—কিন্তু যদি বলি তুমি ছেলেকে ভালোবাসো, তবে দ্বিতীয় কোনো কথাই বলিতে হয় না, সমস্ত সরল

হইয়া আসে। ফলত সেই ভালোবাসা ব্যতিরেকে মাতার কর্ম সম্ভবপর হইতেই পারে না। তেমনি যদি বলি, অন্তরের মধ্যে ব্রহ্মের প্রকাশ হউক, তবে পাপসম্বন্ধে আর কোনো কথাই বলিতে হয় না। পাপের দিক হইতে যদি দেখি, তবে জটিলতার অন্ত নাই—তাহা ছেদন করিয়া, দাহন করিয়া, নির্মূল করিয়া কেমন করিয়া যে বিনাশ করিতে হয়, তাহা ভাবিয়া শেষ করা যায় না - সেদিক হইতে দেখিতে গেলে ধর্মকে বিরাট বিভীষিকা করিয়া তুলিতে হয়—কিন্তু আনন্দময়ের দিক হইতে দেখিলে তৎক্ষণাৎ পাপ কুহেলিকার মতো অন্তর্হিত হয়। পাশ্চাত্য ধর্মশাস্ত্রে পাপ ও পাপ হইতে মুক্তি নিরতিশয় জটিল ও নিদারুণ, মানুষের বুদ্ধি তাহাকে উত্তরোত্তর গহন করিয়া তুলিয়াছে এবং সেই বিচিত্র পাপতন্ত্রের দ্বারা ঈশ্বরকে খণ্ডিত করিয়া, দুর্গম করিয়া ধর্মকে দুর্বল করিয়াছে।

অসতো মা সদ্‌গময় তমসো মা জ্যোতির্গময় মৃত্যোর্মামৃতং গময়।

অসৎ হইতে সত্যে লইয়া যাও, অন্ধকার হইতে জ্যোতিতে লইয়া যাও, মৃত্যু হইতে অমৃতে লইয়া যাও।

আমাদের অভাব কেবল সত্যের অভাব, আলোকের অভাব, অমৃতের অভাব - আমাদের জীবনের সমস্ত দুঃখ পাপ নিরানন্দ কেবল এইজন্যই। সত্যের, জ্যোতির, অমৃতের ঐশ্বর্য যিনি কিছু পাইয়াছেন, তিনিই জানেন, ইহাতে আমাদের জীবনের সমস্ত অভাবের একেবারে মূলচ্ছেদ করিয়া দেয়। যে-সকল ব্যাঘাতে তাঁহার প্রকাশকে আমাদের নিকট হইতে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে, তাহাই বিচিত্ররূপ ধারণ করিয়া আমাদিগকে নানা দুঃখ এবং অকৃতার্থতার মধ্যে অবতীর্ণ করিয়া দেয়। সেইজন্যই আমাদের মন অসত্য, অন্ধকার ও বিনাশের আবরণ হইতে রক্ষা চাহে। যখন সে বলে আমার দুঃখ দূর করো, তখন সে শেষ পর্যন্ত না বুঝিলেও এই কথাই বলে —যখন সে বলে আমার দৈন্যমোচন করো, তখন সে যথার্থ কী চাহিতেছে, তাহা না জানিলেও এই কথাই বলে। যখন সে বলে আমাকে পাপ হইতে রক্ষা করো, তখনও এই কথা। সে না বুঝিয়াও বলে -

আবিরাবীর্ম এধি।

হে স্বপ্রকাশ, আমার নিকট প্রকাশিত হও।

আমরা ধ্যানযোগে আমাদের অন্তরবাহিরকে যেমন বিশ্বেশ্বরের দ্বারাই বিকীর্ণ দেখিতে চেষ্টা করিব, তেমনি আমরা প্রার্থনা করিব যে, যে সত্য যে জ্যোতি যে অমৃতের মধ্যে আমরা নিত্যই রহিয়াছি, তাহাকে সচেতনভাবে জানিবার যাহা-কিছু বাধা, সেই অসত্য সেই অন্ধকার সেই মৃত্যু যেন দূর হইয়া যায়। যাহা নাই তাহা চাই না, আমাদের যাহা আছে তাহাকেই পাইব, ইহাই আমাদের প্রার্থনার বিষয়,—যাহা দূরে তাহাকে

সন্ধান করিব না, যাহা আমাদের ধীশক্তিতেই প্রকাশিত তাহাকেই আমরা উপলব্ধি করিব, ইহাই আমাদের ধ্যানের লক্ষ্য। আমাদের প্রাচীন ভারতবর্ষের ধর্ম এইরূপ সরল, এইরূপ উদার, এইরূপ অন্তরঙ্গ, তাহাতে স্বরচিত কল্পনাকুহকের স্পর্শ নাই।

জীবনযাত্রাসম্বন্ধেও ভারতবর্ষের উপদেশ এইরূপ সরল এবং মূলগামী। ভারতবর্ষ বলে—

সন্তোষং হৃদি সংস্থাপ্য সুখার্থী সংযতো ভবেৎ।
সুখার্থী সন্তোষকে হৃদয়ের মধ্যে স্থাপন করিয়া সংযত হইবেন।

সুখ যিনি চান তিনি সন্তোষকে গ্রহণ করিবেন, সন্তোষ যিনি চান তিনি সংযম অভ্যাস করিবেন। এ-কথা বলিবার তাৎপর্য এই যে, সুখের উপায় বাহিরে নাই, তাহা অন্তরেই আছে—তাহা উপকরণজালের বিপুল জটিলতার মধ্যে নাই, তাহা সংযত চিত্তের নির্মল সরলতার মধ্যে বিরাজমান। উপকরণসঞ্চয়ের আদি-অন্ত নাই, বাসনাবহ্নিতে যত আহুতি দেওয়া যায়, সমস্ত ভস্ম হইয়া ক্ষুধিতশিখা ক্রমশই বিস্তৃত হইতে থাকে, ক্রমেই সে নিজের অধিকার হইতে পরের অধিকারে যায়, তাহার লোলুপতা ক্রমেই বিশ্বের প্রতি দারুণভাব ধারণ করে। সুখকে বাহিরে কল্পনা করিয়া বিশ্বকে মৃগয়ার মৃগের মতো নিষ্ঠুরবেগে তাড়না করিয়া ফিরিলে জীবনের শেষমুহূর্ত পর্যন্ত কেবল ছুটাছুটিই সার হয় এবং পরিণামে শিকারির উদ্দাম অশ্ব তাহাকে কোন্ অপঘাতের মধ্যে নিক্ষেপ করে, তাহার উদ্দেশ পাওয়া যায় না।

এইরূপ উন্মত্তভাবে যখন আমরা ছুটিতে থাকি, তখন আমাদের আগ্রহের অসহ্যবেগে সমস্ত জগৎ অস্পষ্ট হইয়া যায়। আমাদের চারিদিকে পদে পদে যে-সকল অযাচিত আনন্দ প্রভূত প্রাচুর্যের সহিত অহরহ প্রতীক্ষা করিয়া আছে, তাহাদিগকে অনায়াসেই আমরা লঙ্ঘন করিয়া, দলন করিয়া, বিচ্ছিন্ন করিয়া চলিয়া যাই। জগতের অক্ষয় আনন্দের ভাণ্ডারকে আমরা কেবল ছুটিতে ছুটিতেই দেখিতে পাই না। এইজন্যই ভারতবর্ষ বলিতেছেন—

সংযতো ভবেৎ।
প্রবৃত্তিবেগ সংযত করো।

চাঞ্চল্য দূর হইলেই সন্তোষের স্তব্ধতার মধ্যে জগতের সমস্ত বৃহৎ আনন্দগুলি আপনি প্রকাশিত হইবে। গতিবেগের প্রমত্ততাবশতই আমরা সংসারের যে-সকল স্নেহ-প্রেম-সৌন্দর্যকে, প্রতিদিনের শতশত মঙ্গলভাবের আদানপ্রদানকে লক্ষ্য করিতে পারি নাই, সংযত হইয়া স্থির হইয়া তাহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই তাহাদের ভিতরকার সমস্ত ঐশ্বর্য অতি সহজেই অবারিত হইয়া যায়।

যাহা নাই, তাহারই শিকারে বাহির হইতে হইবে, ভারতবর্ষ এ পরামর্শ দেয় না—

ছুটাছুটিই যে চরম সার্থকতা, এ-কথা ভারতবর্ষের নহে। যাহা অন্তরে বাহিরে চারিদিকেই আছে, যাহা অজস্র, যাহা ধ্রুব, যাহা সহজ, ভারতবর্ষ তাহাকেই লাভ করিতে পরামর্শ দেয়,—কারণ, তাহাই সত্য, তাহাই নিত্য। যিনি অন্তরে আছেন তাঁহাকে অন্তরেই লাভ করিতে ভারতবর্ষ বলে, যিনি বিশ্বে আছেন তাঁহাকে বিশ্বের মধ্যেই উপলব্ধি করা ভারতবর্ষের সাধনা—আমরা যে অমৃতলোকে সহজেই বাস করিতেছি, দৃষ্টির বাধা দূর করিয়া তাহাকে প্রত্যক্ষ করিবার জন্যই ভারতবর্ষের প্রার্থনা—চিত্তসরোবরের যে অনাবিল অচাঞ্চল্য, যাহার নাম সন্তোষ, আনন্দের যাহা দর্পণ, তাহাকেই সমস্ত ক্ষোভ হইতে রক্ষা করা, ইহাই ভারতবর্ষের শিক্ষা। কিছু কল্পনা করা নহে, রচনা করা নহে, আহরণ করা নহে; জাগরিত হওয়া, বিকশিত হওয়া, প্রতিষ্ঠিত হওয়া,—যাহা আছে তাহাকে গ্রহণ করিবার জন্য অত্যন্ত সরল হওয়া। যাহা সত্য তাহা সত্য বলিয়াই আমাদের নিকটতম,—সত্য বলিয়াই তাহা দিবালোকের ন্যায় আমাদের সকলেরই প্রাপ্য, তাহা আমাদের স্বরচিত নহে বলিয়াই তাহা আমাদের পক্ষে সুগম, তাহা আমাদের সম্যক্‌-ধারণার অতীত বলিয়াই তাহা আমাদের চিরজীবনের আশ্রয়,—তাহার প্রতিনিধিমাত্রই তাহা অপেক্ষা সুদূর—তাহাকে আমাদের কোনো আবশ্যক-বিশেষের উপযোগিরূপে, বিশেষ আয়ত্তিগম্যরূপে সহজ করিতে চেষ্টা করিতে গেলেই তাহাকে কঠিন করা হয়, তাহাকে পরিত্যাগ করা হয়,—অধীর হইয়া তাহাকে বাহ্যাড়ম্বরের মধ্যে খুঁজিয়া বেড়াইলে নিজের সৃষ্টিকেই খুঁজিয়া ফিরিতে হয়—এইরূপে চেষ্টার উপস্থিত উত্তেজনামাত্র লাভ করি, কিন্তু চরম সার্থকতা প্রাপ্ত হই না। আজ আমরা ভারতবর্ষের সেই উপদেশ ভুলিয়াছি, তাহার অকলঙ্ক সরলতম বিরাটতম একনিষ্ঠ আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া শতধাবিভক্ত খর্বতা-খণ্ডতার দুর্গম গহনমধ্যে মায়ামৃগীর অনুধাবন করিয়া ফিরিতেছি।

হে ভারতবর্ষের চিরারাধ্যতম অন্তর্যামী বিধাতৃপুরুষ, তুমি আমাদের ভারতবর্ষকে সফল করো। ভারতবর্ষের সফলতার পথ একান্ত সরল একনিষ্ঠতার পথ। তোমার মধ্যেই তাহার ধর্ম, কর্ম, তাহার চিত্ত পরম ঐক্যলাভ করিয়া জগতের, সমাজের, জীবনের সমস্ত জটিলতার নির্মল সহজ মীমাংসা করিয়াছিল। যাহা স্বার্থের, বিরোধের, সংশয়ের নানা শাখাপ্রশাখার মধ্যে আমাদিগকে উত্তীর্ণ করিয়া দেয়, যাহা বিবিধের আকর্ষণে আমাদের প্রবৃত্তিকে নানা অভিমুখে বিক্ষিপ্ত করে, যাহা উপকরণের নানা জঞ্জালের মধ্যে আমাদের চেষ্টাকে নানা আকারে ভ্রাম্যমাণ করিতে থাকে, তাহা ভারতবর্ষের পন্থা নহে। ভারতবর্ষের পথ একের পথ, তাহা বাধাবর্জিত তোমারই পথ—আমাদের বৃদ্ধ পিতামহদের পদাঙ্কচিহ্নিত সেই প্রাচীন প্রশস্ত পুরাতন সরল রাজপথ যদি পরিত্যাগ না

করি, তবে কোনোমতেই আমরা ব্যর্থ হইব না। জগতের মধ্যে অদ্য দারুণ দুর্যোগের দুর্দিন উপস্থিত হইয়াছে—চারিদিকে যুদ্ধভেরী বাজিয়া উঠিয়াছে—বাণিজ্যরথ দুর্বলকে ধূলির সহিত দলন করিয়া ঘর্ঘরশব্দে চারিদিকে ধাবিত হইয়াছে—স্বার্থের ঝঞ্ঝাবায়ু প্রলয়-গর্জনে চারিদিকে পাক খাইয়া ফিরিতেছে—হে বিধাতঃ, পৃথিবীর লোক আজ তোমার সিংহাসন শূন্য মনে করিতেছে, ধর্মকে অভ্যাসজনিত সংস্কারমাত্র মনে করিয়া নিশ্চিন্তচিত্তে যথেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হইয়াছে—হে শান্তং শিবমদ্বৈতম্ এই ঝঞ্ঝাবর্তে আমরা ক্ষুব্ধ হইব না, শুষ্কমৃত পত্ররাশির ন্যায় ইহার দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া ধূলিধ্বজা তুলিয়া দিগ্‌বিদিকে ভ্রাম্যমাণ হইব না—আমরা পৃথিবীব্যাপী প্রলয়-তাণ্ডবের মধ্যে একমনে একাগ্রনিষ্ঠায় এই বিপুল বিশ্বাস যেন দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়া থাকি যে—

অধর্মেণৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রাণি পশ্যতি
ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি।

অধর্মের দ্বারা আপাতত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়া যায়, আপাতত মঙ্গল দেখা যায়, আপাতত শত্রুরা পরাজিত হইতে থাকে, কিন্তু সমূলে বিনাশ পাইতে হয়।

একদিন নানা দুঃখ ও আঘাতে বৃহৎ শ্মশানের মধ্যে এই দুর্যোগের নিবৃত্তি হইবে—তখন যদি মানবসমাজ এই কথা বলে যে, শক্তির পূজা ক্ষমতার মত্ততা স্বার্থের দারুণ দুশ্চেষ্টা যখন প্রবলতম, মোহান্ধকার যখন ঘনীভূত এবং দলবদ্ধ ক্ষুধিত আত্মম্ভরিতা যখন উত্তরে-দক্ষিণে পূর্বে-পশ্চিমে গর্জন করিয়া ফিরিতেছিল, তখনও ভারতবর্ষ আপন ধর্ম হারায় নাই, বিশ্বাস ত্যাগ করে নাই, একমাত্র নিত্যসত্যের প্রতি নিষ্ঠা স্থির রাখিয়াছিল—সকলের ঊর্ধ্বে নির্বিকার একের পতাকা প্রাণপণ দৃঢ়মুষ্টিতে ধরিয়াছিল—এবং সমস্ত আলোড়ন-গর্জনের মধ্যে মা ভৈঃ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া বলিতেছিল—

আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন—

একের আনন্দ, ব্রহ্মের আনন্দ, যিনি জানিয়াছেন, তিনি কিছু হইতেই ভয়প্রাপ্ত হন না

ইহাই যদি সম্ভবপর হয়, তবে ভারতবর্ষে ঋষিদের জন্ম, উপনিষদের শিক্ষা, গীতার উপদেশ, বহুশতাব্দী হইতে নানা দুঃখ অবমাননা, সমস্তই সার্থক হইবে—ধৈর্যের দ্বারা সার্থক হইবে, ধর্মের দ্বারা সার্থক হইবে, ব্রহ্মের দ্বারা সার্থক হইবে—দম্ভের দ্বারা নহে, প্রতাপের দ্বারা নহে, স্বার্থসিদ্ধির দ্বারা নহে।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

১৩০৯

প্রাচীন ভারতের “একঃ”

বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকস্তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্বম্।

বৃক্ষের ন্যায় আকাশে স্তব্ধ হইয়া আছেন সেই এক। সেই পুরুষে সেই পরিপূর্ণে এ সমস্তই পূর্ণ।

যথা সৌম্য বয়াংসি বাসোবৃক্ষং সম্প্রতিষ্ঠন্তে। এবং হ বৈ তৎ সর্বং পর আত্মনি সম্প্রতিষ্ঠতে।

হে সৌম্য, পক্ষিসকল যেমন বাসবৃক্ষে আসিয়া স্থির হয়, তেমনি এই যাহা কিছু, সমস্তই পরমাত্মায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে।

নদী যেমন নানা বক্রপথে সরলপথে, নানা শাখা-উপশাখা বহন করিয়া, নানা নির্ঝরধারায় পরিপুষ্ট হইয়া, নানা বাধাবিপত্তি ভেদ করিয়া এক মহাসমুদ্রের দিকে ধাবমান হয়—মনুষ্যের চিত্ত সেইরূপ গম্যস্থান না জানিয়াও অসীম বিশ্ববৈচিত্র্যে কেবলই এক হইতে আর একের দিকে কোথায় চলিয়াছিল? কুতূহলী বিজ্ঞান খণ্ডখণ্ড পদার্থের দ্বারে দ্বারে অণুপরমাণুর মধ্যে কাহার সন্ধান করিতেছিল? স্নেহ-প্রীতি পদে পদে বিরহ-বিস্মৃতি-মৃত্যুবিচ্ছেদের দ্বারা পীড়িত হইয়া, অন্তহীন তৃষ্ণার দ্বারা তাড়িত হইয়া, পথে পথে কাহাকে প্রার্থনা করিয়া ফিরিতেছিল? ভয়াতুরা ভক্তি তাহার পূজার অর্ঘ্য মস্তকে লইয়া অগ্নি-সূর্য-বায়ু-বজ্র-মেঘের মধ্যে কোথায় উদ্‌ভ্রান্ত হইতেছিল?

এমন সময়ে সেই অন্তবিহীন পথপরম্পরায় ভ্রাম্যমাণ দিশাহারা পথিক শুনিতে পাইল—পথের প্রান্তে ছায়া-নিবিড় তপোবনের গম্ভীর মন্ত্রে এই বার্তা উদ্‌গীত হইতেছে—

বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেক স্তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্বম্।

বৃক্ষের ন্যায় আকাশে স্তব্ধ হইয়া আছেন সেই এক। সেই পুরুষে সেই পরিপূর্ণে এ সমস্তই পূর্ণ।

সমস্ত পথ শেষ হইল, সমস্ত পথের কষ্ট দূর হইয়া গেল। তখন অন্তহীন কার্য-কারণের ক্লান্তিকর শাখাপ্রশাখা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া জ্ঞান বলিল—

একধৈবানুদ্রষ্টব্যমেতদপ্রমেয়ং ধ্রুবম্।

বিচিত্র বিশ্বের চঞ্চল বহুত্বের মধ্যে এই অপরিমেয় ধ্রুবকে একধাই দেখিতে হইবে।

সহস্র বিভীষিকা ও বিস্ময়ের মধ্যে দেবতা-সন্ধানভ্রান্ত ভক্তি তখন বলিল—

এষ সর্বেশ্বর এষ ভূতাধিপতিরেষ ভূতপাল এষ সেতুর্বিধরণ এষাং লোকানামসম্ভেদায়।

এই একই সকলের ঈশ্বর, সকল জীবের অধিপতি, সকল জীবের পালনকর্তা—এই একই সেতুস্বরূপ হইয়া সকল লোককে ধারণ করিয়া ধ্বংস হইতে রক্ষা করিতেছেন।

বাহিরের বহুতর আঘাতে আকর্ষণে ক্লিষ্ট-বিক্ষিপ্ত প্রেম কহিল—

তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ
প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্বস্মাদন্তরতরং যদয়মাত্মা।

সেই যে এক, তিনি সকল হইতে অন্তরতর পরমাত্মা, তিনিই পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয়, অন্য সকল হইতেই প্রিয়।

মুহূর্তেই বিশ্বের বহুত্ববিরোধের মধ্যে একের ধ্রুবশান্তি পরিপূর্ণ হইয়া দেখা দিল,— একের সত্য, একের অভয়, একের আনন্দ, বিচ্ছিন্ন জগৎকে এক করিয়া অপ্রমেয় সৌন্দর্যে গাঁথিয়া তুলিল।

শিশির-নিষিক্ত শীতের প্রত্যুষে পূর্বদিক যখন অরুণবর্ণ, লঘুবাষ্পাচ্ছন্ন বিশাল প্রান্তরের মধ্যে আসন্ন জাগরণের একটি অখণ্ড শান্তি বিরাজমান,—যখন মনে হয়, যেন জীবধাত্রী মাতা বসুন্ধরা ব্রাহ্মমুহূর্তে প্রথম নেত্র উন্মীলন করিয়াছেন, এখনও সেই বিশ্বগেহিনী তাঁহার বিপুল গৃহের অসংখ্যজীবপালনকার্য আরম্ভ করেন নাই, তিনি যেন, দিবসারম্ভে ওংকারমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া জগন্মন্দিরের উদ্‌ঘাটিত স্বর্ণতোরণদ্বারে ব্রহ্মাণ্ডপতির নিকট মস্তক অবনত করিয়া স্তব্ধ হইয়া আছেন—তখন যদি চিন্তা করিয়া দেখি, তবে প্রতীতি হইবে, সেই নির্জন নিঃশব্দ নীহারমণ্ডিত প্রান্তরের মধ্যে প্রয়াসের অন্ত নাই। প্রত্যেক তৃণদলের অণুতে অণুতে জীবনের বিচিত্র চেষ্টা নিরন্তর, প্রত্যেক শিশিরের কণায় কণায় সংযোজন-বিযোজন-আকর্ষণ-বিকর্ষণের কার্য বিশ্রামবিহীন। অথচ এই অশ্রান্ত অপরিমেয় কর্মব্যাপারের মধ্যে শান্তিসৌন্দর্য অচল হইয়া আছে। অদ্য এই মুহূর্তে এই প্রকাণ্ড পৃথিবীকে যে প্রচণ্ড-শক্তি প্রবলবেগে শূন্যে আকর্ষণ করিয়া লইয়া চলিয়াছে, সে শক্তি আমাদের কাছে কথাটিমাত্র কহিতেছে না, শব্দটিমাত্র করিতেছে না। অদ্য এই মুহূর্তে পৃথিবীকে পরিবেষ্টন করিয়া সমস্ত মহাসমুদ্রে যে লক্ষ-লক্ষ তরঙ্গ সগর্জন তাণ্ডবনৃত্য করিতেছে, শতসহস্র নদনদীনির্ঝরে যে কল্লোল উঠিতেছে, অরণ্যে-অরণ্যে যে আন্দোলন, পল্লবে-পল্লবে যে মর্মরধ্বনি, আমরা তাহার কী জানিতেছি। বিশ্বব্যাপী যে মহাকর্মশালায় দিবারাত্রি লক্ষকোটি জ্যোতিষ্কদীপের নির্বাণ নাই, তাহার অনন্ত কলরব কাহাকে বধির করিয়াছে,— তাহার প্রচণ্ড প্রয়াসের দৃশ্য কাহাকে পীড়িত করিতেছে? এই কর্মজালবেষ্টিত পৃথিবীকে যখন বৃহদ্‌ভাবে দেখি, তখন দেখি, তাহা চিরদিন অক্লান্ত অক্লিষ্ট প্রশান্ত সুন্দর—এত কর্মে এত চেষ্টায় এত জন্মমৃত্যু-সুখদুঃখের অবিশ্রাম চক্ররেখায় সে চিহ্নিত চিহ্নিত ভারাক্রান্ত হয় নাই। চিরদিনই তাহার প্রভাত কী সৌম্যসুন্দর, তাহার মধ্যাহ্ন কী শান্তগম্ভীর, তাহার সায়াহ্ন কী করুণ-কোমল, তাহার রাত্রি কী উদার-উদাসীন। এত বৈচিত্র্য এবং প্রয়াসের মধ্যে এই স্থির শান্তি এবং সৌন্দর্য এত কলরবের মধ্যে এই পরিপূর্ণ সংগীত কী করিয়া সম্ভবপর হইল? ইহার এক উত্তর এই যে—

বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ।
মহাকাশে বৃক্ষের ন্যায় স্তব্ধ হইয়া আছেন, সেই এক।

সেইজন্যই বৈচিত্র্যও সুন্দর এবং বিশ্বকর্মের মধ্যেও বিশ্বব্যাপী শান্তি বিরাজমান।

গভীর রাত্রে অনাবৃত আকাশতলে চারিদিককে কী নিভৃত এবং নিজেকে কী একাকী বলিয়া মনে হয়। অথচ তখন আলোকের যবনিকা অপসারিত হইয়া গিয়া হঠাৎ আমরা জানিতে পাই যে, অন্ধকার সভাতলে জ্যোতিষ্কলোকের অনন্ত জনতার মধ্যে আমরা দণ্ডায়মান। এ কী অপরূপ আশ্চর্য, অনন্ত জগতের নিভৃত নির্জনতা। কত জ্যোতির্ময় এবং কত জ্যোতির্হীন মহাসূর্যমণ্ডল, কত অগণ্য যোজনব্যাপী চক্রপথে ঘূর্ণনৃত্য, কত উদ্দাম বাষ্পসংঘাত, কত ভীষণ অগ্নি-উচ্ছ্বাস—তাহারই মধ্যস্থলে আমি সম্পূর্ণ নিভৃতে– একান্ত নির্জনে রহিয়াছি– শান্তি এবং বিরামের সীমা নাই। এমন সম্ভব হইল কী করিয়া? ইহার কারণ—

বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ।

নহিলে এই জগৎ, যাহা বিচিত্র, যাহা অগণ্য, যাহার প্রত্যেক কণা-কণিকাটিও কম্পিত-ঘূর্ণিত, তাহা কী ভয়ংকর। বৈচিত্র্য যদি একবিরহিত হয়, অগণ্যতা যদি একসূত্রে গ্রথিত না হয়, উদ্যত শক্তিসকল যদি স্তব্ধ একের দ্বারা ধৃত হইয়া না থাকে, তবে তাহা কী করাল, তবে বিশ্বসংসার কী অনির্বচনীয় বিভীষিকা। তবে আমরা দুর্ধর্ষ জগৎপুঞ্জের মধ্যে কাহার বলে এত নিশ্চিন্ত হইয়া আছি? এই মহা-অপরিচিত, যাহার প্রত্যেক কণাটিও আমাদের কাছে দুর্ভেদ্য রহস্য, কাহার বিশ্বাসে আমরা ইহাকে চিরপরিচিত মাতৃক্রোড়ের মতো অনুভব করিতেছি। এই যে আসনের উপর আমি এখনই বসিয়া আছি, ইহার মধ্যে সংযোজনবিযোজনের যে মহাশক্তি কাজ করিতেছে, তাহা এই আসন হইতে আরম্ভ করিয়া সূর্যলোক-নক্ষত্রলোক পর্যন্ত অবিচ্ছিন্ন-অখণ্ড ভাবে চলিয়া গেছে, তাহা যুগযুগান্তর হইতে নিরন্তরভাবে লোকলোকান্তরকে পিণ্ডীকৃত-পৃথক্কৃত করিতেছে, আমি তাহারই ক্রোড়ের উপর নির্ভয়ে আরামে বসিয়া আছি তাহার ভীষণ সত্তাকে জানিতেও পারিতেছি না—সেই বিশ্বব্যাপী বিরাট ব্যাপার আমার বিশ্রামের লেশমাত্র ক্ষতি করিতেছে না। ইহার মধ্যে আমরা খেলিতেছি, গৃহনির্মাণ করিতেছি—এ আমাদের কে? ইহাকে প্রশ্ন করিলে এ কোনোই উত্তর দেয় না। ইহা দিকে-দিকে আকাশ হইতে আকাশান্তরে নিরুদ্দেশ হইয়া শতধা-সহস্রধা চলিয়া গেছে—এই মূক মূঢ় মহাবহুরূপীর সঙ্গে কে আমাদের এমন প্রিয়, পরিচিত, আত্মীয়সম্বন্ধ বাঁধিয়া দিয়াছেন? তিনি—যিনি,

বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ।

এই এককে আমরা বিশ্বের বৈচিত্র্যের মধ্যে সুন্দর এবং বিশ্বের শক্তির মধ্যে শান্তিস্বরূপে দেখিতেছি, তেমনি মানুষের সংসারের মধ্যে সেই স্তব্ধ একের ভাবটি কী? সেই ভাবটি মঙ্গল। এখানে আঘাতপ্রতিঘাতের সীমা নাই, এখানে সুখদুঃখ বিরহমিলন

বিপৎসম্পদ লাভক্ষতিতে সংসারের সর্বত্র সর্বক্ষণ বিক্ষুব্ধ হইয়া আছে। কিন্তু এই চাঞ্চল্য এই সংগ্রামের মধ্যে সেই এক নিয়ত স্তব্ধ হইয়া আছেন বলিয়া সংসার ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না। সেইজন্যই নানা বিরোধবিদ্বেষের মধ্যেও পিতামাতার সহিত পুত্র, ভ্রাতার সহিত ভ্রাতা, প্রতিবেশীর সহিত প্রতিবেশী, নিকটের সহিত দূর, প্রত্যহ প্রতিমুহূর্তেই গ্রথিত হইয়া উঠিতেছে। সেই ঐক্যজাল আমরা ক্ষণিকের আক্ষেপে যতই ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিতেছি, ততই তাহা আপনি জোড়া লাগিয়া যাইতেছে। যেমন খণ্ডভাবে আমরা জগতের মধ্যে অসংখ্য কদর্যতা দেখিতে পাই, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও সমস্ত জগৎ মহাসৌন্দর্যে প্রকাশিত - তেমনি খণ্ডভাবে সংসারে পাপতাপের সীমা নাই, তথাপি সমস্ত সংসার অবিচ্ছিন্ন মঙ্গলসূত্রে চিরদিন ধৃত হইয়া আছে। ইহার অংশের মধ্যে কত অশান্তি কত অসামঞ্জস্য দেখিতে পাই, তবু দেখি, ইহার সমগ্রের মঙ্গল-আদর্শ কিছুতে নষ্ট হয় না। সেইজন্য মানুষ সংসারকে এমন সহজে আশ্রয় করিয়া আছে। এত বৃহৎ লোকসংঘ, এত অসংখ্য অনাত্মীয়, এত প্রবল স্বার্থসংঘাত, তবু এ সংসার রমণীয়, তবু ইহা আমাদিগকে রক্ষা ও পালন করিবার চেষ্টা করে, নষ্ট করে না। ইহার দুঃখতাপও মহামঙ্গলসংগীতের একতানে অপূর্ব ছন্দে মিলিত হইয়া উঠিতেছে—কেননা,

বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ।

আমরা আমাদের জীবনকে প্রতিক্ষণে খণ্ডখণ্ড করি বলিয়াই সংসারতাপ দুঃসহ হয়। সমস্ত ক্ষুদ্র বিচ্ছিন্নতাকে সেই মহান একের মধ্যে গ্রথিত করিতে পারিলে, সমস্ত আক্ষেপ-বিক্ষেপের হাত হইতে পরিত্রাণ পাই। সমস্ত হৃদয়বৃত্তি সমস্ত কর্মচেষ্টাকে তাঁহার দ্বারা সমাচ্ছন্ন করিয়া দেখিলে কোন্ বাধায় আমার অধীরতা, কোন্ বিঘ্নে আমার নৈরাশ্য, কোন্ লোকের কথায় আমার ক্ষোভ, কোন্ ক্ষমতায় আমার অহংকার, কোন্ বিফলতায় আমার গ্লানি! তাহা হইলেই আমার সকল কর্মের মধ্যেই ধৈর্য ও শান্তি, সকল হৃদবৃত্তির মধ্যেই সৌন্দর্য ও মঙ্গল উদ্ভাসিত হয়, দুঃখতাপ পুণ্যে বিকশিত এবং সংসারের সমস্ত আঘাতবেদনা মাধুর্যে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। তখন সর্বত্র সেই শুভ্র একের মঙ্গলবন্ধন অনুভব করিয়া সংসারে দুঃখের অস্তিত্বকে দুর্ভেদ্য প্রহেলিকা বলিয়া গণ্য করি না—দুঃখের মধ্যে, শোকের মধ্যে, অভাবের মধ্যে নতমস্তকে তাঁহাকেই স্বীকার করি—যাঁহার মধ্যে যুগযুগান্তর হইতে সমস্ত জগৎ-সংসারের সমস্ত দুঃখতাপের সমস্ত তাৎপর্য অখণ্ড মঙ্গলে পরিসমাপ্ত হইয়া আছে।

মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি।

মৃত্যু হইতে সে মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয়, যে ইঁহাকে নানা করিয়া দেখে।

খণ্ডতার মধ্যে কদর্যতা, সৌন্দর্য একের মধ্যে; খণ্ডতার মধ্যে প্রয়াস, শান্তি একের

মধ্যে; খণ্ডতার মধ্যে বিরোধ, মঙ্গল একের মধ্যে; তেমনি খণ্ডতার মধ্যেই মৃত্যু, অমৃত সেই একের মধ্যে। সেই একককে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিলে, সহস্রের হাত হইতে আপনাকে আর রক্ষা করিতে পারি না। তবে বিষয় প্রবল হইয়া উঠে, ধন-জন-মান বড়ো আকার ধারণ করিয়া আমাদিগকে ঘুরাইতে থাকে, অশ্বরথ-ইষ্টককাষ্ঠ মর্যাদালাভ করে, দ্রব্যসামগ্রী-সংগ্রহচেষ্টার অন্ত থাকে না, প্রতিবেশীর সহিত নিরন্তর প্রতিযোগিতা জাগিয়া উঠে, জীবনের শেষদিন পর্যন্ত কাড়াকাড়ি-হানাহানির মধ্যে নিজেকে খণ্ড খণ্ড করিতে থাকি, এবং মৃত্যু যখন আমাদের এই ভাণ্ডারঘার হইতে আমাদিগকে অকস্মাৎ আকর্ষণ করিয়া লইয়া যায়, তখন সেই শেষ মুহূর্তে সমস্ত জীবনের বহুবিরোধের সঞ্চিত স্তূপাকার দ্রব্যসামগ্রীগুলাকেই প্রিয়তম বলিয়া, আত্মার পরম আশ্রয়স্থল বলিয়া, অন্তিমবলে বক্ষে আকর্ষণ করিয়া ধরিতে চাহি।

মনসৈবেদমাপ্তব্যং নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।

মনের দ্বারাই ইহা পাওয়া যায় যে, ইঁহাতে 'নানা' কিছুই নাই।

বিশ্বজগতের মধ্যে যে অপ্রমেয় ধ্রুব রহিয়াছেন, তিনি বাহ্যত একভাবে কোথাও প্রতিভাত নহেন,—মনই নানার মধ্যে সেই একককে দেখে, সেই একককে প্রার্থনা করে, সেই একককে আশ্রয় করিয়া আপনাকে চরিতার্থ করে। নানার মধ্যে সেই একককে না পাইলে মনের সুখশান্তিমঙ্গল নাই, তাহার উদ্‌ভ্রান্ত-ভ্রমণের অবসান নাই। সে ধ্রুব একের সহিত মন আপনাকে দৃঢ়ভাবে যুক্ত করিতে না পারিলে, সে অমৃতের সহিত যুক্ত হয় না—সে খণ্ডখণ্ড মৃত্যুদ্বারা আহত তাড়িত বিক্ষিপ্ত হইয়া বেড়ায়। মন আপনার স্বাভাবিকধর্মবশতই কখনো জানিয়া, কখনো না জানিয়া, কখনো বক্রপথে কখনো সরলপথে, সকল জ্ঞানের মধ্যে—সকল ভাবের মধ্যে অহরহ সেই পরম ঐক্যের পরম আনন্দকে সন্ধান করিয়া ফিরে। যখন পায়, তখন একমুহূর্তেই বলিয়া উঠে—আমি অমৃতকে পাইয়াছি,—বলিয়া উঠে—

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্ত-
মাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি।

অন্ধকারের পরে আমি এই জ্যোতির্ময় মহান পুরুষকে জানিয়াছি। যাঁহারা ইঁহাকে জানেন, তাঁহারা অমর হন।

পত্নী মৈত্রেয়ীকে সমস্ত সম্পত্তি দিয়া যাজ্ঞবল্ক্য যখন বনে যাইতে উদ্যত হইলেন, তখন মৈত্রেয়ী স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—এ সমস্ত লইয়া আমি কি অমর হইব? যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন, না, যাহারা উপকরণ লইয়া থাকে, তাহাদের যেরূপ, তোমারও সেইরূপ জীবন হইবে। তখন মৈত্রেয়ী কহিলেন—

যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাম্ ?

যাহার দ্বারা আমি অমৃতা না হইব, তাহা লইয়া আমি কী করিব ?

যাহা বহু, যাহা বিচ্ছিন্ন, যাহা মৃত্যুর দ্বারা আক্রান্ত, তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া মৈত্রেয়ী অখণ্ড অমৃত একের মধ্যে আশ্রয় প্রার্থনা করিয়াছিলেন। মৃত্যু এই জগতের সহিত, বিচিত্রের সহিত, অনেকের সহিত, আমাদের সম্বন্ধের পরিবর্তন করিয়া দেয়—কিন্তু সেই একের সহিত আমাদের পরিবর্তন ঘটাইতে পারে না। অতএব যে সাধক সমস্ত অন্তঃকরণের সহিত সেই একককে আশ্রয় করিয়াছেন, তিনি অমৃতকে বরণ করিয়াছেন ; তাঁহার কোনো ক্ষতির ভয় নাই, বিচ্ছেদের আশঙ্কা নাই। তিনি জানেন, জীবনের সুখদুঃখ নিয়ত চঞ্চল, কিন্তু তাহার মধ্যে সেই কল্যাণরূপী এক স্তব্ধ হইয়া রহিয়াছেন, লাভক্ষতি নিত্য আসিতেছে যাইতেছে, কিন্তু সেই এক পরমলাভ আত্মার মধ্যে স্তব্ধ হইয়া বিরাজ করিতেছেন ; বিপৎসম্পদ্ মুহূর্তে-মুহূর্তে আবর্তিত হইতেছে, কিন্তু—

এষাস্য পরমা গতিঃ, এষাস্য পরমা সম্পৎ,

এষোহস্য পরমো লোকঃ, এষোহস্য পরম আনন্দঃ।

সেই এক রহিয়াছেন—যিনি জীবের পরমা গতি, যিনি জীবের পরমা সম্পৎ, যিনি জীবের পরম লোক, যিনি জীবের পরম আনন্দ।

রেশম-পশম আসন-বসন কাষ্ঠ-লোষ্ট্র স্বর্ণ-রৌপ্য লইয়া কে বিরোধ করিবে ? তাহারা আমার কে ? তাহারা আমাকে কী দিতে পারে ? তাহারা আমার পরমসম্পৎকে অন্তরাল করিতেছে, তাহাতে দিবারাত্রির মধ্যে লেশমাত্র ক্ষোভ অনুভব করিতেছি না, কেবল তাহাদের পুঞ্জীকৃত সঞ্চয়ে গর্ববোধ করিতেছি। হস্তি-অশ্ব-কাচ-প্রস্তরেরই গৌরব, আত্মার গৌরব নাই, শূন্য হৃদয়ে হৃদয়েশ্বরের স্থান নাই। সর্বাপেক্ষা হীনতম দীনতা যে পরমার্থহীনতা, তাহার দ্বারা সমস্ত অন্তঃকরণ রিক্ত শ্রীহীন মলিন, কেবল বসনে-ভূষণে উপকরণে-আয়োজনে আমি স্ফীত। জগদীশ্বরের কাজ করিতে পারি না ; কেননা শয্যা-আসন-বেশভূষার কাছে দাসখত লিখিয়া দিয়াছি, জড়-উপকরণ জঞ্জালের কাছে মাথা বিকাইয়া বসিয়াছি সেই সকল ধূলিময় পদার্থের ধুলা ঝাড়িতেই আমার দিন যায়। ঈশ্বরের কাজে আমার কিছু দিবার সামর্থ্য নাই, কারণ খট্টাপর্যঙ্ক-অশ্বরথে আমার সমস্ত দান নিঃশেষিত। সমস্ত মঙ্গলকর্ম পড়িয়া রহিল, কারণ পাঁচজনের মুখে নিজের নামকে ধ্বনিত করিয়া তুলিয়া আড়ম্বরে জীবনযাপন করিতেই আমার সমস্ত চেষ্টার অবসান। শতছিদ্র কলসের মধ্যে জলসঞ্চয় করিবার জন্য জীবনের শেষমুহূর্ত পর্যন্ত ব্যাপৃত রহিয়াছি, অবারিত অমৃতপারাবার সম্মুখে স্তব্ধ হইয়া রহিয়াছে ; যিনি সকল সত্যের সত্য, অন্তরে-বাহিরে জ্ঞানে-ধর্মে কোথাও তাঁহাকে দেখি না—এতবড়ো অন্ধতা লইয়া আমি পরিতৃপ্ত। যিনি আনন্দরূপমমৃতম্, যে আনন্দের কণামাত্র

আনন্দে সমস্ত জীবজন্তুর প্রাণের চেষ্টা মনের চেষ্টা প্রীতির চেষ্টা পুণ্যের চেষ্টা উৎসাহিত রহিয়াছে, তাঁহাতে আমার আনন্দ নাই, আমার আনন্দ আমার গর্ব কেবল উপকরণসামগ্রীতে,—এমন বৃহৎ জড়ত্বে আমি পরিবৃত ; যাঁহার অদৃশ্য অঙ্গুলিনির্দেশে জীবপ্রকৃতি অজ্ঞাত অকীর্তিত সহস্র সহস্র বৎসরের মধ্য দিয়া স্বার্থ হইতে পরমার্থে, স্বেচ্ছাচার হইতে সংযমে, একাকতা হইতে সমাজতন্ত্রে উপনীত হইয়াছে, যিনি মহদ্‌ভয়ং বজ্রমুদ্যতম্, যিনি দগ্ধেন্ধন ইবানলঃ, সর্বকালে সর্বলোকে যিনি আমার ঈশ্বর, তাঁহার আদেশবাক্য আমার কর্ণগোচর হয় না, তাঁহার কর্মে আমার কোনো আস্থা নাই, কেবল জীবনের কয়েকদিনমাত্র যে-কয়েকটি লোককে পাঁচজন বলিয়া জানি, তাহাদেরই ভয়ে এবং তাহাদেরই চাটুবাক্যে চালিত হওয়াই আমার দুর্লভ মানবজন্মের একমাত্র লক্ষ্য—এমন মহামূঢ়তার দ্বারা আমি সমাচ্ছন্ন। আমি জানি না, আমি দেখিতে পাই না—

বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকস্তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্বম্।

আমার কাছে সমস্ত জগৎ ছিন্নবিচ্ছিন্ন, সমস্ত বিজ্ঞান খণ্ডবিখণ্ড, সমস্ত জীবনের লক্ষ্য ক্ষুদ্রক্ষুদ্র সহস্র অংশে বিভক্ত বিদীর্ণ।

হে অনন্ত বিশ্বসংসারের পরম এক পরমাত্মন্, তুমি আমার সমস্ত চিত্তকে গ্রহণ করো। তুমি সমস্ত জগতের সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও পূর্ণ করিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিয়াছ, তোমার সেই পূর্ণতা আমি আমার দেহে-মনে, অন্তরে-বাহিরে, জ্ঞানে-কর্মে-ভাবে যেন প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিতে পারি। আমি আপনাকে সর্বতোভাবে তোমার দ্বারা আবৃত রাখিয়া নীরবে নিরভিমানে তোমার কর্ম করিতে চাই। অহরহ তুমি আদেশ করো. তুমি আহ্বান করো, তোমার প্রসন্নদৃষ্টিদ্বারা আমাকে আনন্দ দাও, তোমার দক্ষিণবাহুদ্বারা আমাকে বল দান করো। অবসাদের দুর্দিন যখন আসিবে, বন্ধুরা যখন নিরস্ত হইবে, লোকেরা যখন লাঞ্ছনা করিবে, আনুকূল্য যখন দুর্লভ হইবে, তুমি আমাকে পরাস্ত-ভূলুণ্ঠিত হইতে দিয়ো না ; আমাকে সহস্রের মুখাপেক্ষী করিয়ো না ; আমাকে সহস্রের ভয়ে ভীত, সহস্রের বাক্যে বিচলিত, সহস্রের আকর্ষণে বিক্ষিপ্ত হইতে যেন না হয়। এক-তুমি আমার চিত্তের একাসনে অধীশ্বর হও, আমার সমস্ত কর্মকে একাকী অধিকার করো, আমার সমস্ত অভিমানকে দমন করিয়া আমার সমস্ত প্রবৃত্তিকে তোমার পদপ্রান্তে একত্রে সংযত করিয়া রাখো। হে অক্ষরপুরুষ, পুরাতন ভারতবর্ষে তোমা হইতে যখন পুরাণী প্রজ্ঞা প্রসৃত হইয়াছিল, তখন আমাদের সরলহৃদয় পিতামহগণ ব্রহ্মের অভয় ব্রহ্মের আনন্দ যে কী, তাহা জানিয়াছিলেন। তাঁহারা একের বলে বলী, একের তেজে তেজস্বী, একের গৌরবে মহীয়ান হইয়াছিলেন। পতিত ভারতবর্ষের জন্য পুনর্বার সেই প্রজ্ঞালোকিত নির্মল নির্ভয় জ্যোতির্ময় দিন তোমার নিকটে প্রার্থনা করি। পৃথিবীতলে

আর-একবার আমাদিগকে তোমার সিংহাসনের দিকে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে দাও। আমরা কেবল যুদ্ধবিগ্রহ-যন্ত্রতন্ত্র-বাণিজ্যব্যবসায়ের দ্বারা নহে, আমরা সুকঠিন সুনির্মল সন্তোষবলিষ্ঠ ব্রহ্মচর্যের দ্বারা মহিমান্বিত হইয়া উঠিতে চাহি। আমরা রাজত্ব চাই না, প্রভুত্ব চাই না, ঐশ্বর্য চাই না, প্রত্যহ একবার ভূর্ভুবঃস্বর্লোকের মধ্যে তোমার মহাসভাতলে একাকী দণ্ডায়মান হইবার অধিকার চাই। তাহা হইলে আর আমাদের অপমান নাই, অধীনতা নাই, দারিদ্র্য নাই। আমাদের বেশভূষা দীন হউক, আমাদের উপকরণসামগ্রী বিরল হউক, তাহাতে যেন লেশমাত্র লজ্জা না পাই— কিন্তু চিত্তে যেন ভয় না থাকে, ক্ষুদ্রতা না থাকে, বন্ধন না থাকে, আত্মার মর্যাদা সকল মর্যাদার ঊর্ধ্বে থাকে, তোমারই দীপ্তিতে ব্রহ্মপরায়ণ ভারতবর্ষের মুকুটবিহীন উন্নত ললাট যেন জ্যোতিষ্মং হইয়া উঠে। আমাদের চতুর্দিকে সভ্যতাভিমানী বিজ্ঞানমদমত্ত বাহুবলগর্বিত স্বার্থনিষ্ঠুর জাতিরা যাহা লইয়া অহরহ নখদন্ত শানিত করিতেছে, পরস্পরের প্রতি সতর্ক-রুষ্ট কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতেছে, পৃথিবীকে আতঙ্কে কম্পান্বিত ও ভ্রাতৃশোণিতপাতে পঙ্কিল করিয়া তুলিতেছে, সেই সকল কাম্যবস্তু এবং সেই পরিস্ফীত আত্মাভিমানের দ্বারা তাহারা কখনোই অমর হইবে না, তাহাদের যন্ত্রতন্ত্র, তাহাদের বিজ্ঞান, তাহাদের পর্বতপ্রমাণ উপকরণ তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবে না। তাহাদের সেই বলমত্ততা ধনমত্ততা সেই উপকরণবহুলতার প্রতি ভারতবর্ষের যেন লোভ না জন্মে। হে অদ্বিতীয় এক, তপস্বিনী ভারতভূমি যেন তাহার বল্কলবসন পরিয়া তোমার দিকে তাকাইয়া ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ীর সেই মধুরকণ্ঠে বলিতে পারে—

যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাম্ ?

যাহা দ্বারা আমি অমৃতা না হইব, তাহা লইয়া আমি কী করিব ?

কামান-ধূম্র এবং স্বর্ণধূলির দ্বারা সমাচ্ছন্ন তমসাবৃত রাষ্ট্রগৌরবের দিকে ভারতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়ো না ; তোমার সেই অনন্তকার লোকের প্রতি দীন ভারতের নতশির উত্থিত করো।

যদাঽতমস্তন্ন দিবা ন রাত্রির্ন সন্ন চাসচ্ছিব এব কেবলঃ।

যখন তোমার সেই অনন্তকার আবির্ভূত হয়, তখন কোথায় দিবা, কোথায় রাত্রি, কোথায় সৎ, কোথায় অসৎ। শিব এব কেবলঃ, তখন কেবল শিব, কেবল মঙ্গল।

নমঃ শম্ভবায় চ ময়োভবায় চ,
নমঃ শংকরায় চ ময়স্করায় চ,
নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ।

হে শম্ভব, হে ময়োভব, তোমাকে নমস্কার ; হে শংকর, হে ময়স্কর, তোমাকে নমস্কার ; হে শিব, হে শিবতর তোমাকে নমস্কার।

১৩০৮

প্রার্থনা

সকলেই জানেন একটা গল্প আছে—দেবতা একজনকে তিনটে বর দিতে চাহিয়াছিলেন। এত বড়ো সুযোগটাতে হতভাগ্য কী যে চাহিবে, ভাবিয়া বিহ্বল হইল—শেষকালে উদ্‌ভ্রান্তচিত্তে যে-তিনটে প্রার্থনা জানাইল, তাহা এমনি অকিঞ্চিৎকর যে, তাহার পরে চিরজীবন অনুতাপ করিয়া তাহার দিন কাটিল।

এই গল্পের তাৎপর্য এই যে, আমরা মনে করি পৃথিবীতে আর কিছু জানি বা না-জানি, ইচ্ছাটাই বুঝি আমাদের কাছে সব-চেয়ে জাজ্বল্যমান—আমি সব-চেয়ে কী চাই, তাহাই বুঝি সব-চেয়ে আমার কাছে সুস্পষ্ট—কিন্তু সেটা ভ্রম; আমার যথার্থ ইচ্ছা আমার অগোচর।

অগোচরে থাকিবার একটা কারণ আছে—সেই ইচ্ছাই আমাকে নানা অনুকূল ও প্রতিকূল অবস্থার ভিতর দিয়া গড়িয়া তুলিবার ভার লইয়াছে। যে বিরাট ইচ্ছা সমস্ত মানুষকে মানুষ করিয়া তুলিতে উদ্‌যোগী, সেই ইচ্ছাই আমার অন্তরে থাকিয়া কাজ করিতেছে। ততক্ষণ পর্যন্ত সেই ইচ্ছা লুকাইয়া কাজ করে,—যতক্ষণ পর্যন্ত আমি আপনাকে সর্বাংশে তাহার অনুকূল করিয়া তুলিতে না পারি। তাহার উপরে হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার আমরা লাভ করি নাই বলিয়াই সে আমাদিগকে ধরা দেয় না।

আমার সব-চয়ে সত্য ইচ্ছা নিত্য ইচ্ছা কোন্‌টা? যে-ইচ্ছা আমার সার্থকতাসাধনে নিরত। আমার সার্থকতা আমার কাছে যতদিন পর্যন্ত রহস্য, সেই ইচ্ছাও ততদিন আমার কাছে গুপ্ত। কিসে আমার পেট ভরিবে, আমার নাম হইবে, তাহা বলা শক্ত নয়—কিন্তু কিসে আমি সম্পূর্ণ হইব, তাহা পৃথিবীতে কয়জন লোক আবিষ্কার করিতে পারিয়াছে? আমি কী, আমার মধ্যে যে-একটা প্রকাশচেষ্টা চলিতেছে তাহার পরিণাম কী, তাহার গতি কোন্‌ দিকে, তাহা স্পষ্ট করিয়া কে জানে?

অতএব দেবতা যদি বর দিতে আসেন, তবে হঠাৎ দেখি, প্রার্থনা জানাইবার জন্যও প্রস্তুত নই। তখন এই কথা বলিতে হয়, আমার যথার্থ প্রার্থনা কী, তাহা জানিবার জন্য আমাকে সুদীর্ঘ সময় দাও। নহিলে উপস্থিতমতো হঠাৎ একটা-কিছু চাহিতে গিয়া হয়তো ভয়ানক ফাঁকিতে পড়িতে হইবে।

বস্তুত আমরা সেই সময় লইয়াছি—আমাদের জীবনটা এই কাজেই আছে। আমরা কী প্রার্থনা করিব, তাহাই অহরহ পরখ করিতেছি। আজ বলিতেছি খেলা, কাল বলিতেছি ধন, পরদিন বলিতেছি মান—এমনি করিয়া সংসারকে অবিশ্রাম মন্থন করিতেছি,—আলোড়ন করিতেছি। কিসের জন্য? আমি যথার্থ কী চাই, তাহারই

সন্ধান পাইবার জন্য। মনে করিতেছি—টাকা খুঁজিতেছি, বন্ধু খুঁজিতেছি, মান খুঁজিতেছি; কিন্তু আসলে আর-কিছু নয়, কাহাকে যে খুঁজিতেছি, তাহাই নানাস্থানে খুঁজিয়া বেড়াইতেছি—আমার প্রার্থনা কী, তাহাই জানি না।

যাঁহারা আপনাদের অন্তরের প্রার্থনা খুঁজিয়া পাইয়াছেন বলেন,—শোনা গিয়াছে তাঁহারা কী বলেন। তাঁহারা বলেন, একটিমাত্র প্রার্থনা আছে তাহা এই—

অসতো মা সদ্‌গময়
তমসো মা জ্যোতির্গময়
মৃত্যোর্মামৃতং গময়।
আবিরাবীর্ম এধি।
রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং
তেন মাং পাহি নিত্যম্‌।

অসত্য হইতে আমাকে সত্যে লইয়া যাও, অন্ধকার হইতে আমাকে জ্যোতিতে লইয়া যাও, মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃতে লইয়া যাও। হে স্বপ্রকাশ, আমার নিকটে প্রকাশিত হও। রুদ্র, তোমার যে প্রসন্ন মুখ, তাহার দ্বারা আমাকে সর্বদাই রক্ষা করো।

কিন্তু কানে শুনিয়া কোনো ফল নাই এবং মুখে উচ্চারণ করিয়া যাওয়া আরও বৃথা। আমরা যখন সত্যকে আলোককে অমৃতকে যথার্থ চাহিব, সমস্ত জীবনে তাহার পরিচয় দিব, তখনই এ-প্রার্থনা সার্থক হইবে। যে প্রার্থনা আমি নিজে মনের মধ্যে পাই নাই, তাহা পূর্ণ হইবার কোনো পথ আমার সম্মুখে নাই। অতএব, সবই শুনিলাম বটে, মন্ত্রও কর্ণগোচর হইল—কিন্তু তবু এখনও প্রার্থনা করিবার পূর্বে প্রার্থনাটিকে সমস্ত জীবন দিয়া খুঁজিয়া পাইতে হইবে।

বনস্পতি হইয়া উঠিবার একমাত্র প্রার্থনা বীজের শস্যাংশের মধ্যে সংহতভাবে নিগূঢ়ভাবে নিহিত হইয়া আছে—কিন্তু যতক্ষণ তাহা অঙ্কুরিত হইয়া আকাশে আলোকে মাথা না তুলিয়াছে, ততক্ষণ তাহা না থাকারই তুল্য হইয়া আছে। সত্যের আকাঙ্ক্ষা, অমৃতের আকাঙ্ক্ষা আমাদের সকল আকাঙ্ক্ষার অন্তর্নিহিত, কিন্তু ততক্ষণ আমরা তাহাকে জানিই না, যতক্ষণ না সে আমাদের সমস্ত ধূলিস্তর বিদীর্ণ করিয়া মুক্ত আকাশে পাতা মেলিতে পারে।

আমাদের এই যথার্থ প্রার্থনাটি কী, তাহা অনেক সময় অন্যের ভিতর দিয়া আমাদিগকে জানিতে হয়। জগতের মহাপুরুষেরা আমাদিগকে নিজের অন্তর্গূঢ় ইচ্ছাটিকে জানিবার সহায়তা করেন। আমরা চিরকাল মনে করিয়া আসিতেছি, আমরা বুঝি পেট ভরাইতেই চাই, আরাম করিতেই চাই—কিন্তু যখন দেখি, কেহ ধন-মান-আরামকে উপেক্ষা করিয়া সত্য, আলোক ও অমৃতের জন্য জীবন উৎসর্গ করিতেছেন,

তখন হঠাৎ একরকম করিয়া বুঝিতে পারি যে, আমার অন্তরাত্মার মধ্যে যে ইচ্ছা আমার অগোচরে কাজ করিতেছে, তাহাকেই তিনি তাঁহার জীবনের মধ্যে উপলব্ধি করিয়াছেন। আমার ইচ্ছাকে যখন তাঁহার মধ্যে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই, তখন অন্তত ক্ষণকালের জন্যও জানিতে পারি—কিসের প্রতি আমার যথার্থ ভক্তি, কী আমার অন্তরের আকাঙ্ক্ষা।

তখন আরও একটা কথা বোঝা যায়। ইহা বুঝিতে পারি যে, যে-সমস্ত ইচ্ছা প্রতিক্ষণে আমার স্থূলগোচর, যাহারা কেবলই আমাকে তাড়না করে, তাহারাই আমার অন্তরতম ইচ্ছাকে, আমার সার্থকতালাভের প্রার্থনাকে বাধা দিতেছে, স্ফূর্তি দিতেছে না, তাহাকে কেবলই আমার চেতনার অন্তরালবর্তী, আমার চেষ্টার বহির্গত করিয়া রাখিয়াছে।

আর, যাঁহার কথা বলিতেছি, তাঁহার পক্ষে ঠিক ইহার বিপরীত। যে মঙ্গল-ইচ্ছা, যে সার্থকতার ইচ্ছা বিশ্বমানবের মজ্জাস্বরূপ, যাহা মানবসমাজের মধ্যে চিরদিনই অকথিত বাণীতে এই মন্ত্র গান করিতেছে—অসতো মা সদ্‌গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মামৃতং গময় - এই ইচ্ছাই তাঁহার কাছে সর্বাপেক্ষা প্রত্যক্ষ, আর-সমস্ত ইচ্ছা ছায়ার মতো তাহার পশ্চাদ্বর্তী, তাহার পদতলগত। তিনি জানেন—সত্য, আলোক, অমৃতই চাই, মানুষের ইহা না হইলেই নয় অন্নবস্ত্র-ধনমানকে তিনি ক্ষণিক ও আংশিক আবশ্যক বলিয়াই জানেন। বিশ্বমানবের অন্তর্নিহিত এই ইচ্ছাশক্তি তাঁহার ভিতর দিয়া জগতে প্রত্যক্ষ হয় বলিয়া, প্রমাণিত হয় বলিয়াই তিনি চিরকালের জন্য মানবের সামগ্রী হইয়া উঠেন। আর আমরা খাই পরি, টাকা করি, নাম করি, মরি ও পুড়িয়া ছাই হইয়া যাই—মানবের চিরন্তন সত্য ইচ্ছাকে আমাদের যে-জীবনের মধ্যে প্রতিফলিত করিতে পারি না, মানবসমাজে সে-জীবনের ক্ষণিক মূল্য ক্ষণকালের মধ্যেই নিঃশেষ হইয়া যায়।

কিন্তু মহাপুরুষদের দৃষ্টান্ত আনিলে একটা ভুল বুঝিবার সম্ভাবনা থাকে। মনে হইতে পারে যে, ক্ষমতাসাধ্য প্রতিভাসাধ্য কর্মের দ্বারাতেই বুঝি মানুষ সত্য, আলোক ও অমৃতানুসন্ধানের পরিচয় দেয়।

তাহা কোনোমতেই নহে। তাহা যদি হইত, তবে পৃথিবীর অধিকাংশ লোক অমৃতের আশামাত্র করিতে পারিত না। যাহা সাধারণ বুদ্ধিবল-বাহুবলের পক্ষে দুঃসাধ্য, তাহাতেই প্রতিভা বা অসামান্য শারীরিক শক্তির প্রয়োজন, কিন্তু সত্যকে অবলম্বন করা, আলোককে গ্রহণ করা, অমৃতকে বরণ করিয়া লওয়া, ইহা কেবল একান্তভাবে, যথার্থভাবে ইচ্ছার কর্ম। ইহা আর কিছু নয়—যাহা কাছেই আছে, তাহাকেই পাওয়া।

ইহা মনে রাখিতে হইবে, আমাদিগকে যাহা-কিছু দিবার তাহা আমাদের প্রার্থনার

বহুপূর্বেই দেওয়া হইয়া গেছে। আমাদের যথার্থ ঈপ্সিতধনের দ্বারা আমরা পরিবেষ্টিত। বাকি আছে কেবল লইবার চেষ্টা—তাহাই যথার্থ প্রার্থনা।

ঈশ্বর এইখানেই আমাদের গৌরব রক্ষা করিয়াছেন। তিনিই সব দিয়াছেন, অথচ এটুকু আমাদের বলিবার মুখ রাখিয়াছেন যে, আমরাই লইয়াছি। এই লওয়াটাই সফলতা, ইহাই লাভ,—পাওয়াটা সকল সময়ে লাভ নহে—তাহা অধিকাংশস্থলেই পাইয়াও না-পাওয়া, এবং অবশিষ্টস্থলে বিষম একটা বোঝা। আর্থিক-পারমার্থিক সকল বিষয়েই এ-কথা খাটে।

ঋষি বলিয়াছেন—

আবিরাবীর্ম এধি। হে স্বপ্রকাশ, আমার নিকট প্রকাশিত হও।

তুমি তো স্বপ্রকাশ, আপনা-আপনি প্রকাশিত আছই, এখন, আমার কাছে প্রকাশিত হও, এই আমার প্রার্থনা। তোমার পক্ষে প্রকাশের অভাব নাই, আমার পক্ষে সেই প্রকাশ উপলব্ধির সুযোগ বাকি আছে। যতক্ষণ আমি তোমাকে না দেখিব, ততক্ষণ তুমি পরিপূর্ণপ্রকাশ হইলেও আমার কাছে দেখা দিবে না। সূর্য তো আপন আলোকে আপনি প্রকাশিত হইয়াই আছেন, এখন আমারই কেবল চোখ খুলিবার, জাগ্রত হইবার অপেক্ষা। যখন আমাদের চোখ খুলিবার ইচ্ছা হয়, আমরা চোখ খুলি, তখন সূর্য আমাদিগকে নূতন করিয়া কিছু দেন না, তিনি যে আপনাকে আপনি দান করিয়া রাখিয়াছেন, ইহাই আমরা মুহূর্তের মধ্যে বুঝিতে পারি।

অতএব দেখা যাইতেছে—আমরা যে কী চাই, তাহা যথার্থভাবে জানিতে পারাই প্রার্থনার আরম্ভ। যখন তাহা জানিতে পারিলাম, তখন সিদ্ধির আর বড়ো বিলম্ব থাকে না, তখন দূরে যাইবার প্রয়োজন হয় না। তখন বুঝিতে পারা যায়, সমস্ত মানবের নিত্য আকাঙ্ক্ষা আমার মধ্যে জাগ্রত হইয়াছে—এই সুমহৎ-আকাঙ্ক্ষাই আপনার মধ্যে আপনার সফলতা অতি সুন্দরভাবে, অতি সহজভাবে বহন করিয়া আনে।

আমাদের ছোটো বড়ো সকল ইচ্ছাকেই মানবের এই বড়ো ইচ্ছা, এই মর্মগত প্রার্থনা দিয়া যাচাই করিয়া লইতে হইবে। নিশ্চয় বুঝিতে হইবে, আমাদের যে-কোনো ইচ্ছা এই সত্য-আলোক-অমৃতের ইচ্ছাকে অতিক্রম করে, তাহাই আমাদিগকে খর্ব করে, তাহাই কেবল আমাকে নহে, সমস্ত মানবকে পশ্চাতের দিকে টানিতে থাকে।

এ-যে কেবল আমাদের খাওয়া-পরা, আমাদের ধনমান-অর্জন সম্বন্ধেই খাটে তাহা নহে—আমাদের বড়ো বড়ো চেষ্টাসম্বন্ধে আরও বেশি করিয়াই খাটে।

যেমন দেশহিতৈষা। এ-প্রবৃত্তি যদিও আমাদিগকে আত্মত্যাগ ও দুষ্কর তপঃসাধনের

দিকে লইয়া যায়, তবু ইহা মানবত্বের গুরুতর-অন্তরায়-স্বরূপ হইয়া উঠিতে পারে। ইহার প্রমাণ আমাদের সম্মুখেই, আমাদের নিকটেই রহিয়াছে। য়ুরোপীয় জাতিরা ইহাকেই তাহাদের চরম লক্ষ্য পরম ধর্ম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। ইহা প্রতিদিনই সত্যকে আলোককে অমৃতকে য়ুরোপের দৃষ্টি হইতে আড়াল করিতেছে। য়ুরোপের স্বদেশাসক্তিই মানবত্বলাভের ইচ্ছাকে সার্থকতালাভের ইচ্ছাকে প্রবলবেগে প্রতিহত করিতেছে এবং য়ুরোপীয় সভ্যতা অধিকাংশ পৃথিবীর পক্ষে প্রকাণ্ড বিভীষিকা হইয়া উঠিতেছে। য়ুরোপ কেবলই মাটি চাহিতেছে, সোনা চাহিতেছে, প্রভুত্ব চাহিতেছে – এমন লোলুপভাবে এমন ভীষণভাবে চাহিতেছে যে, সত্য, আলোক ও অমৃতের জন্য মানবের যে চিরন্তন প্রার্থনা, তাহা য়ুরোপের কাছে উত্তরোত্তর প্রচ্ছন্ন হইয়া গিয়া তাহাকে উদ্দাম করিয়া তুলিতেছে। ইহাই বিনাশের পথ – পথ নহে, – ইহাই মৃত্যু।

আমাদের সম্মুখে, আমাদের অত্যন্ত নিকটে য়ুরোপের এই দৃষ্টান্ত আমাদিগকে প্রতিদিন মোহাভিভূত করিয়া তুলিতেছে। কিন্তু ভারতবর্ষকে এই কথাই কেবল মনে রাখিতে হইবে যে, সত্য-আলোক-অমৃতই প্রার্থনার সামগ্রী বিষয়ানুরাগই হউক আর দেশানুরাগই হউক, আপনার উদ্দেশ্য বা উদ্দেশ্যসাধনের উপায়ে যেখানেই এই সত্য, আলোক ও অমৃতকে অতিক্রম করিতে চাহে, সেখানেই তাহাকে অভিশাপ দিয়া বলিতে হইবে – "বিনিপাত"! বলা কঠিন, প্রলোভন প্রবল, ক্ষমতার মোহ অতিক্রম করা অতি দুঃসাধ্য, তবু ভারতবর্ষ এই কথা সুস্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন—

অধর্মেণৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রাণি পশ্যতি।
ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি॥

১৩১১

ধর্মপ্রচার

'এস আমরা ফললাভ করি' বলিয়া হঠাৎ উৎসাহে তখনই পথে বাহির হইয়া পড়াই যে ফললাভের উপায়, তাহা কেহই বলিবেন না। কারণ কেবলমাত্র সদিচ্ছা এবং সদুৎসাহের বলে ফল সৃষ্টি করা যায় না বীজ হইতে বৃক্ষ এবং বৃক্ষ হইতে ফল জন্মে। দলবদ্ধ উৎসাহের দ্বারাতেও সে-নিয়মের অন্যথা ঘটিতে পারে না। বীজ ও বৃক্ষের সহিত সম্পর্ক না রাখিয়া আমরা যদি অন্য উপায়ে ফললাভের আকাঙ্ক্ষা করি, তবে সেই ঘরগড়া কৃত্রিম ফল খেলার পক্ষে গৃহসজ্জার পক্ষে অতি উত্তম হইতে পারে – কিন্তু তাহা আমাদের যথার্থ ক্ষুধানিবৃত্তির পক্ষে অত্যন্ত অনুপযোগী হয়।

আমাদের দেশে আধুনিক ধর্মসমাজে আমরা এই কথাটা ভাবি না। আমরা

মনে করি, দল বাঁধিলেই বুঝি ফল পাওয়া যায়। শেষকালে মনে করি দল বাঁধাটাই ফল।

ক্ষণে ক্ষণে আমাদের উৎসাহ হয়, প্রচার করিতে হইবে। হঠাৎ অনুতাপ হয়, কিছু করিতেছি না। যেন করাটাই সব-চেয়ে প্রধান—কী করিব, কে করিবে, সেটা বড়ো-একটা ভাবিবার কথা নয়।

কিন্তু এ-কথাটা সর্বদাই স্মরণ রাখা দরকার যে, ধর্মপ্রচারকার্যে ধর্মটা আগে, প্রচারটা তাহার পরে। প্রচার করিলেই তবে ধর্মরক্ষা হইবে, তাহা নহে, ধর্মকে রক্ষা করিলেই প্রচার আপনি হইবে।

মনুষ্যত্বের সমস্ত মহাসত্যগুলিই পুরাতন এবং 'ঈশ্বর আছেন' এ-কথা পুরাণতম। এই পুরাতনকে মানুষের কাছে চিরদিন নূতন করিয়া রাখাই মহাপুরুষের কাজ। জগতের চিরন্তন ধর্মগুরুগণ কোনো নূতন সত্য আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা নহে- তাঁহারা পুরাতনকে তাঁহাদের জীবনের মধ্যে নূতন করিয়া পাইয়াছেন এবং সংসারের মধ্যে তাহাকে নূতন করিয়া তুলিয়াছেন।

নব নব বসন্ত নব নব পুষ্প সৃষ্টি করে না—সেরূপ নূতনত্বে আমাদের প্রয়োজন নাই। আমরা আমাদের চিরকালের পুরাতন ফুলগুলিকেই বর্ষে বর্ষে বসন্তে বসন্তে নূতন করিয়া দেখিতে চাই। সংসারের যাহা-কিছু মহোত্তম, যাহা মহার্ঘতম, তাহা পুরাতন, তাহা সরল, তাহার মধ্যে গোপন কিছুই নাই; যাঁহাদের অভ্যুদয় বসন্তের ন্যায় অনির্বচনীয় জীবন ও যৌবনের দক্ষিণসমীরণ মহাসমুদ্রবক্ষ হইতে সঙ্গে করিয়া আনে, তাঁহারা সহসা এই পুরাতনকে অপূর্ব করিয়া তোলেন—অতিপরিচিতকে নিজ জীবনের নব নব বর্ণে গন্ধে রূপে সজীব সরস প্রস্ফুটিত করিয়া মধুপিপাসুগণকে দিগ্‌দিগন্ত হইতে আকর্ষণ করিয়া আনেন।

আমরা ধর্মনীতির সর্বজনবিদিত সহজ সত্যগুলি এবং ঈশ্বরের শক্তি ও করুণা প্রত্যহ পুনরাবৃত্তি করিয়া সত্যকে কিছুমাত্র অগ্রসর করি না, বরঞ্চ অভ্যস্তবাক্যের তাড়নায় বোধশক্তিকে আড়ষ্ট করিয়া ফেলি। যে-সকল কথা অত্যন্ত জানা, তাহাদিগকে একটা নিয়ম বাঁধিয়া বারংবার শুনাইতে গেলে, হয় আমাদের মনোযোগ একেবারে নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়ে, নয় আমাদের হৃদয় বিদ্রোহী হইয়া উঠে।

বিপদ কেবল এই একমাত্র নহে। অনুভূতিরও একটা অভ্যাস আছে। আমরা বিশেষ স্থানে বিশেষ ভাষাবিন্যাসে একপ্রকার ভাবাবেগ মাদকতার ন্যায় অভ্যাস করিয়া ফেলিতে পারি। সেই অভ্যস্ত আবেগকে আমরা আধ্যাত্মিক সফলতা বলিয়া ভ্রম করি—কিন্তু তাহা একপ্রকার সম্মোহনমাত্র।

এইরূপেও ধর্ম যখন সম্প্রদায়বিশেষে বদ্ধ হইয়া পড়ে, তখন তাহা সম্প্রদায়স্থ অধিকাংশ লোকের কাছে হয় অভ্যস্ত অসাড়তায়, নয় অভ্যস্ত সম্মোহনে পরিণত হইয়া থাকে। তাহার প্রধান কারণ, চিরপুরাতন ধর্মকে নূতন করিয়া বিশেষভাবে আপনার করিবার এবং সেই সূত্রে তাহাকে পুনর্বার বিশেষভাবে সমস্ত মানবের উপযোগী করিবার ক্ষমতা যাহাদের নাই, ধর্মরক্ষা ও ধর্মপ্রচারের ভার তাহারাই গ্রহণ করে। তাহারা মনে করে, আমরা নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিলে সমাজের ক্ষতি হইবে।

ধর্মকে যাহারা সম্পূর্ণ উপলব্ধি না করিয়া প্রচার করিতে চেষ্টা করে, তাহারা ক্রমশই ধর্মকে জীবন হইতে দূরে ঠেলিয়া দিতে থাকে। ইহারা ধর্মকে বিশেষ গণ্ডি আঁকিয়া একটা বিশেষ সীমানার মধ্যে বদ্ধ করে। ধর্ম বিশেষ দিনের বিশেষ স্থানের বিশেষ প্রণালীর ধর্ম হইয়া উঠে। তাহার কোথাও কিছু ব্যত্যয় হইলেই সম্প্রদায়ের মধ্যে হুলুস্থুল পড়িয়া যায়। বিষয়ী নিজের জমির সীমানা এত সতর্কতার সহিত বাঁচাইতে চেষ্টা করে না, ধর্মব্যবসায়ী যেমন প্রচণ্ড উৎসাহের সহিত ধর্মের স্বরচিত গণ্ডি রক্ষা করিবার জন্য সংগ্রাম করিতে থাকে। এই গণ্ডিরক্ষাকেই তাহারা ধর্মরক্ষা বলিয়া জ্ঞান করে। বিজ্ঞানের কোনো নূতন মূলতত্ত্ব আবিষ্কৃত হইলে তাহারা প্রথমে ইহাই দেখে যে, সে-তত্ত্ব তাহাদের গণ্ডির সীমানায় হস্তক্ষেপ করিতেছে কিনা ; যদি করে, তবে ধর্ম গেল বলিয়া তাহারা ভীত হইয়া উঠে। ধর্মের বৃন্তটিকে তাহারা এতই ক্ষীণ করিয়া রাখে যে, প্রত্যেক বায়ুহিল্লোলকে তাহারা শত্রুপক্ষ বলিয়া জ্ঞান করে। ধর্মকে তাহারা সংসার হইতে বহুদূরে স্থাপিত করে—পাছে ধর্ম-সীমানার মধ্যে মানুষ আপন হাস্য, আপন ক্রন্দন, আপন প্রাত্যহিক ব্যাপারকে, আপন জীবনের অধিকাংশকে লইয়া উপস্থিত হয়। সপ্তাহের এক দিনের এক অংশকে, গৃহের এক কোণকে বা নগরের একটি মন্দিরকে ধর্মের জন্য উৎসর্গ করা হয়—বাকি সমস্ত দেশকালের সহিত ইহার একটি পার্থক্য, এমন কি, ইহার একটি বিরোধ ক্রমশ সুপরিস্ফুট হইয়া উঠে। দেহের সহিত আত্মার, সংসারের সহিত ব্রহ্মের, এক সম্প্রদায়ের সহিত অন্য সম্প্রদায়ের বৈষম্য ও বিদ্রোহভাব স্থাপন করাই, মনুষ্যত্বের মাঝখানে গৃহবিচ্ছেদ উপস্থিত করাই যেন ধর্মের বিশেষ লক্ষ্য হইয়া দাঁড়ায়।

অথচ সংসারে একমাত্র যাহা সমস্ত বৈষম্যের মধ্যে ঐক্য, সমস্ত বিরোধের মধ্যে শান্তি আনয়ন করে, সমস্ত বিচ্ছেদের মধ্যে একমাত্র যাহা মিলনের সেতু, তাহাকেই ধর্ম বলা যায়। তাহা মনুষ্যত্বের এক অংশে অবস্থিত হইয়া অপর অংশের সহিত অহরহ কলহ করে না—সমস্ত মনুষ্যত্ব তাহার অন্তর্ভূত—তাহাই যথার্থভাবে মনুষ্যত্বের ছোটো-বড়ো, অন্তর-বাহির সর্বাংশে পূর্ণ সামঞ্জস্য। সেই সুবৃহৎ সামঞ্জস্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে

মনুষ্যত্ব সত্য হইতে স্খলিত হয়, সৌন্দর্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়ে। সেই অমোঘ ধর্মের আদর্শকে যদি গির্জার গণ্ডির মধ্যে নির্বাসিত করিয়া দিয়া অন্য যে-কোনো উপস্থিত প্রয়োজনের আদর্শদ্বারা সংসারের ব্যবহার চালাইতে যাই, তাহাতে সর্বনাশী অমঙ্গলের সৃষ্টি হইতে থাকে।

কিন্তু ভারতবর্ষের এ-আদর্শ সনাতন নহে। আমাদের ধর্ম রিলিজন নহে, তাহা মনুষ্যত্বের একাংশ নহে—তাহা পলিটিক্স হইতে তিরস্কৃত, যুদ্ধ হইতে বহিষ্কৃত, ব্যবসায় হইতে নির্বাসিত, প্রাত্যহিক ব্যবহার হইতে দূরবর্তী নহে। সমাজের কোনো বিশেষ অংশে তাহাকে প্রাচীরবদ্ধ করিয়া মানুষের আরাম-আমোদ হইতে কাব্য-কলা হইতে জ্ঞানবিজ্ঞান হইতে তাহার সীমানা-রক্ষার জন্য সর্বদা পাহারা দাঁড়াইয়া নাই। ব্রহ্মচর্য গার্হস্থ্য বানপ্রস্থ প্রভৃতি আশ্রমগুলি এই ধর্মকেই জীবনের মধ্যে সংসারের মধ্যে সর্বতোভাবে সার্থক করিবার সোপান। ধর্ম সংসারের আংশিক প্রয়োজন সাধনার জন্য নহে, সমগ্র সংসারই ধর্মসাধনের জন্য। এইরূপে ধর্ম গৃহের মধ্যে গৃহধর্ম, রাজত্বের মধ্যে রাজধর্ম হইয়া ভারতবর্ষের সমগ্র সমাজকে একটি অখণ্ড তাৎপর্য দান করিয়াছিল। সেইজন্য ভারতবর্ষে, যাহা অধর্ম, তাহাই অনুপযোগী ছিল—ধর্মের দ্বারাই সফলতা বিচার করা হইত, অন্য সফলতা দ্বারা ধর্মের বিচার চলিত না।

এইজন্য ভারতবর্ষীয় আর্যসমাজে শিক্ষার কালকে ব্রহ্মচর্য নাম দেওয়া হইয়াছিল। ভারতবর্ষ জানিত, ব্রহ্মলাভের দ্বারা মনুষ্যত্বলাভই শিক্ষা। সেই শিক্ষা ব্যতীত গৃহস্থতনয় গৃহী, রাজপুত্র রাজা হইতে পারে না। কারণ গৃহকর্মের মধ্য দিয়াই ব্রহ্মলাভ, রাজকর্মের মধ্য দিয়াই ব্রহ্মপ্রাপ্তি ভারতবর্ষের লক্ষ্য। সকল কর্ম সকল আশ্রমের সাহায্যেই ব্রহ্ম-উপলব্ধি যখন ভারতবর্ষের চরমসাধনা, তখন ব্রহ্মচর্যই তাহার শিক্ষা না হইয়া থাকিতে পারে না।

যে যাহা যথার্থভাবে চায়, সে তাহার উপায় সেইরূপ যথার্থভাবে অবলম্বন করে। য়ুরোপ যাহা কামনা করে, বাল্যকাল হইতে তাহার পথ সে প্রস্তুত করে, তাহার সমাজে তাহার প্রাত্যহিক জীবনে সেই লক্ষ্য জ্ঞাতসারে এবং অজ্ঞাতসারে সে ধরিয়া রাখে। এই কারণেই য়ুরোপ দেশজয় করে, ঐশ্বর্য লাভ করে, প্রাকৃতিক শক্তিকে নিজের সেবা-কার্যে নিযুক্ত করিয়া আপনাকে পরম চরিতার্থ জ্ঞান করে। তাহার উদ্দেশ্য ও উপায়ের মধ্যে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য আছে বলিয়াই সে সিদ্ধকাম হইয়াছে। এইজন্য য়ুরোপীয়েরা বলিয়া থাকে, তাহাদের পাবলিক-স্কুলে, তাহাদের ক্রিকেটক্ষেত্রে তাহারা রণজয়ের চর্চা করিয়া লক্ষ্যসিদ্ধির জন্য প্রস্তুত হইতে থাকে।

এককালে আমরা সেইরূপ যথার্থভাবেই ব্রহ্মলাভকে যখন চরমলাভ বলিয়া জ্ঞান

করিয়াছিলাম, তখন সমাজের সর্বত্রই তাহার যথার্থ উপায় অবলম্বিত হইয়াছিল। তখন য়ুরোপীয় রিলিজন-চর্চার আদর্শকে আমাদের দেশ কখনোই ধর্মলাভের আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিত না। সুতরাং ধর্মপালন তখন সংকুচিত হইয়া বিশেষভাবে রবিবার বা আর-কোনো বারের সামগ্রী হইয়া উঠে নাই। ব্রহ্মচর্য তাহার শিক্ষা ছিল, গৃহাশ্রম তাহার সাধনা ছিল, সমস্ত সমাজ তাহার অনুকূল ছিল—এবং যে ঋষিরা লব্ধকাম হইয়া বলিয়া উঠিয়াছিলেন—

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ

যাঁহারা বলিয়াছিলেন—

আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন

তাঁহারাই তাহার গুরু ছিলেন।

ধর্মকে যে আমরা শৌখিনের ধর্ম করিয়া তুলিব; আমরা যে মনে করিব, অজস্র ভোগবিলাসের একপার্শ্বে ধর্মকেও একটুখানি স্থান দেওয়া আবশ্যক, নতুবা ভব্যতারক্ষা হয় না, নতুবা ঘরের ছেলেমেয়েদের জীবনে যেটুকু ধর্মের সংস্রব রাখা শোভন, তাহা রাখিবার উপায় থাকে না; আমরা যে মনে করিব, আমাদের আদর্শভূত পাশ্চাত্যসমাজে ভদ্রপরিবারেরা ধর্মকে যেটুকুপরিমাণে স্বীকার করা ভদ্রতারক্ষার অঙ্গ বলিয়া গণ্য করেন, আমরাও সর্ববিষয়ে তাঁহাদের অনুবর্তন করিয়া অগত্যা সেইটুকুপরিমাণ ধর্মের ব্যবস্থা না রাখিলে লজ্জার কারণ হইবে; তবে আমাদের সেই ভদ্রতাবিলাসের আসবাবের সঙ্গে ভারতের সুমহৎ ব্রহ্মনামকে জড়িত করিয়া রাখিলে আমাদের পিতামহদের পবিত্রতম সাধনাকে চটুলতম পরিহাসে পরিণত করা হইবে।

যাঁহারা ব্রহ্মকে সর্বত্র উপলব্ধি করিয়াছিলেন, সেই ঋষিরা কী বলিয়াছিলেন? তাঁহারা বলেন—

ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্।

বিশ্বজগতে যাহা-কিছু চলিতেছে, সমস্তকেই ঈশ্বরের দ্বারা আবৃত দেখিতে হইবে—এবং তিনি যাহা দান করিয়াছেন তাহাই ভোগ করিতে হইবে—অন্যের ধনে লোভ করিবে না।

ইহার অর্থ এমন নহে যে, 'ঈশ্বর সর্বব্যাপী' এই কথাটা স্বীকার করিয়া লইয়া, তাহার পরে সংসারে যেমন ইচ্ছা, তেমনি করিয়া চলা। যথার্থভাবে ঈশ্বরের দ্বারা সমস্তকে আচ্ছন্ন করিয়া দেখিবার অর্থ অত্যন্ত বৃহৎ—সেরূপ করিয়া না দেখিলে সংসারকে সত্য করিয়া দেখা হয় না এবং জীবনকে অন্ধ করিয়া রাখা হয়।

"ঈশা বাস্যমিদং সর্বম্"—ইহা কাজের কথা—ইহা কাল্পনিক কিছু নহে—ইহা

কেবল শুনিয়া জানার এবং উচ্চারণদ্বারা মানিয়া লইবার মন্ত্র নহে। গুরুর নিকট এই মন্ত্র গ্রহণ করিয়া লইয়া তাহার পরে দিনে দিনে পদে পদে ইহাকে জীবনের মধ্যে সফল করিতে হইবে। সংসারকে ক্রমে ক্রমে ঈশ্বরের মধ্যে ব্যাপ্ত করিয়া দেখিতে হইবে। পিতাকে সেই পিতার মধ্যে, মাতাকে সেই মাতার মধ্যে, বন্ধুকে সেই বন্ধুর মধ্যে, প্রতিবেশী, স্বদেশী ও মনুষ্যসমাজকে সেই সর্বভূতান্তরাত্মার মধ্যে উপলব্ধি করিতে হইবে।

ঋষিরা যে ব্রহ্মকে কতখানি সত্য বলিয়া দেখিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাদের একটি কথাতেই বুঝিতে পারি—তাঁহারা বলিয়াছেন—

তেষামেবৈষ ব্রহ্মলোকো যেষাং তপো ব্রহ্মচর্যং যেষু সত্যং প্রতিষ্ঠিতম্।

এই যে ব্রহ্মলোক—অর্থাৎ যে ব্রহ্মলোক সর্বত্রই রহিয়াছে—ইহা তাঁহাদেরই, তপস্যা যাঁহাদের, ব্রহ্মচর্য যাঁহাদের, সত্য যাঁহাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত।

অর্থাৎ যাঁহারা যথার্থভাবে ইচ্ছা করেন, যথার্থভাবে চেষ্টা করেন, যথার্থ উপায় অবলম্বন করেন। তপস্যা একটা কোনো কৌশলবিশেষ নহে, তাহা কোনো গোপনরহস্য নহে—

ঋতং তপঃ সত্যং তপঃ শ্রুতং তপঃ শান্তং তপো দানং তপো যজ্ঞস্তপো ভূর্ভুবঃসুবর্ব্রহ্মৈতদুপাস্স্বৈতৎ তপঃ।

ঋতই তপস্যা, সত্যই তপস্যা, শ্রুত তপস্যা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ তপস্যা, দান তপস্যা, কর্ম তপস্যা এবং ভূর্লোক-ভুবর্লোক-স্বর্লোকব্যাপী এই যে ব্রহ্ম, ইঁহার উপাসনাই তপস্যা।

অর্থাৎ ব্রহ্মচর্যের দ্বারা বল তেজ শান্তি সন্তোষ নিষ্ঠা ও পবিত্রতা লাভ করিয়া, দান ও কর্ম দ্বারা স্বার্থপাশ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া তবে অন্তরে-বাহিরে আত্মায়-পরে লোক-লোকান্তরে ব্রহ্মকে লাভ করা যায়।

উপনিষদ বলেন, যিনি ব্রহ্মকে জানিয়াছেন, তিনি

সর্বমেবাবিবেশ, সকলের মধ্যে প্রবেশ করেন।

বিশ্ব হইতে আমরা যে পরিমাণে বিমুখ হই, ব্রহ্ম হইতেই আমরা সেই পরিমাণে বিমুখ হইতে থাকি। আমরা ধৈর্যলাভ করিলাম কি না, অভয়লাভ করিলাম কি না, ক্ষমা আমাদের পক্ষে সহজ হইল কি না, আত্মবিস্মৃত মঙ্গলভাব আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক হইল কি না, পরনিন্দা আমাদের পক্ষে অপ্রিয় ও পরের প্রতি ঈর্ষার উদ্রেক আমাদের পক্ষে পরম লজ্জার বিষয় হইল কি না, বৈষয়িকতার বন্ধন ঐশ্বর্য-আড়ম্বরের প্রলোভন-পাশ ক্রমশ শিথিল হইতেছে কি না, এবং সর্বাপেক্ষা যাহাকে বশ করা দুরূহ সেই উদ্যত আত্মাভিমান বংশীরববিমুগ্ধ ভুজঙ্গমের ন্যায় ক্রমে ক্রমে আপন মস্তক নত করিতেছে

কি না, ইহাই অনুধাবন করিলে আমরা যথার্থভাবে দেখিব, ব্রহ্মের মধ্যে আমরা কতদূর পর্যন্ত অগ্রসর হইতে পারিয়াছি, ব্রহ্মের দ্বারা নিখিলজগৎকে কতদূর পর্যন্ত সত্যরূপে আবৃত দেখিয়াছি।

আমরা বিশ্বের অন্তসর্বত্র ব্রহ্মের আবির্ভাব কেবলমাত্র সাধারণভাবে জ্ঞানে জানিতে পারি। জল-স্থল-আকাশ-গ্রহ-নক্ষত্রের সহিত আমাদের হৃদয়ের আদানপ্রদান চলে না—তাহাদের সহিত আমাদের মঙ্গলকর্মের সম্বন্ধ নাই। আমরা জ্ঞানে-প্রেমে-কর্মে অর্থাৎ সম্পূর্ণভাবে কেবল মানুষকেই পাইতে পারি। এইজন্য মানুষের মধ্যেই পূর্ণতরভাবে ব্রহ্মের উপলব্ধি মানুষের পক্ষে সম্ভবপর। নিখিল মানবাত্মার মধ্যে আমরা সেই পরমাত্মাকে নিকটতম অন্তরতমরূপে জানিয়া তাঁহাকে বারবার নমস্কার করি। “সর্বভূতান্তরাত্মা” ব্রহ্ম এই মনুষ্যত্বের ক্রোড়েই আমাদিগকে মাতার ন্যায় ধারণ করিয়াছেন, এই বিশ্বমানবের স্তন্যরসপ্রবাহে ব্রহ্ম আমাদিগকে চিরকালসঞ্চিত প্রাণ বুদ্ধি প্রীতি ও উদ্যমে নিরন্তর পরিপূর্ণ করিয়া রাখিতেছেন, এই বিশ্বমানবের কণ্ঠ হইতে ব্রহ্ম আমাদের মুখে পরমাশ্চর্য ভাষার সঞ্চার করিয়া দিতেছেন, এই বিশ্বমানবের অন্তঃপুরে আমরা চিরকালরচিত কাব্যকাহিনী শুনিতেছি, এই বিশ্বমানবের রাজভাণ্ডারে আমাদের জন্য জ্ঞান ও ধর্ম প্রতিদিন পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতেছে। এই মানবাত্মার মধ্যে সেই বিশ্বাত্মাকে প্রত্যক্ষ করিলে আমাদের পরিতৃপ্তি ঘনিষ্ঠ হয়—কারণ মানবসমাজের উত্তরোত্তর বিকাশমান অপরূপ রহস্যময় ইতিহাসের মধ্যে ব্রহ্মের আবির্ভাবকে কেবল জানামাত্র আমাদের পক্ষে যথেষ্ট আনন্দ নহে, মানবের বিচিত্র প্রীতিসম্বন্ধের মধ্যে ব্রহ্মের প্রীতিরস নিশ্চয়ভাবে অনুভব করিতে পারা আমাদের অনুভূতির চরম সার্থকতা এবং প্রীতিবৃত্তির স্বাভাবিক পরিণাম যে কর্ম, সেই কর্মদ্বারা মানবের সেবারূপে ব্রহ্মের সেবা করিয়া আমাদের কর্মপরতার পরম সাফল্য। আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি হৃদয়বৃত্তি কর্মবৃত্তি আমাদের সমস্ত শক্তি সমগ্রভাবে প্রয়োগ করিলে তবে আমাদের অধিকার আমাদের পক্ষে যথাসম্ভব সম্পূর্ণ হয়। এইজন্য ব্রহ্মের অধিকারকে বুদ্ধি প্রীতি ও কর্ম দ্বারা আমাদের পক্ষে সম্পূর্ণ করিবার ক্ষেত্র মনুষ্যত্ব ছাড়া আর কোথাও নাই। মাতা যেমন একমাত্র মাতৃসম্বন্ধেই শিশুর পক্ষে সর্বাপেক্ষা নিকট সর্বাপেক্ষা প্রত্যক্ষ, সংসারের সহিত তাঁহার অন্যান্য বিচিত্র সম্বন্ধ শিশুর নিকট অগোচর এবং অব্যবহার্য, তেমনি ব্রহ্ম মানুষের নিকট একমাত্র মনুষ্যত্বের মধ্যেই সর্বাপেক্ষা সত্যরূপে প্রত্যক্ষরূপে বিরাজমান—এই সম্বন্ধের মধ্য দিয়াই আমরা তাঁহাকে জানি, তাঁহাকে প্রীতি করি, তাঁহার কর্ম করি। এইজন্য মানবসংসারের মধ্যেই প্রতিদিনের ছোটো বড়ো সমস্ত কর্মের মধ্যেই ব্রহ্মের উপাসনা মানুষের পক্ষে একমাত্র সত্য উপাসনা। অন্য উপাসনা আংশিক কেবল জ্ঞানের

উপাসনা, কেবল ভাবের উপাসনা,— সেই উপাসনাদ্বারা আমরা ক্ষণে ক্ষণে ব্রহ্মকে স্পর্শ করিতে পারি, কিন্তু ব্রহ্মকে লাভ করিতে পারি না।

এ-কথা সকলেই জানেন, অনেক সময়ে মানুষ যাহাকে উপায়রূপে আশ্রয় করে, তাহাকেই উদ্দেশ্যরূপে বরণ করিয়া লয়, যাহাকে রাজ্যলাভের সহায়মাত্র বলিয়া ডাকিয়া লয়, সেই রাজসিংহাসন অধিকার করিয়া বসে। আমাদের ধর্মসমাজরচনাতেও সে বিপদ আছে। আমরা ধর্মলাভের জন্য ধর্মসমাজ স্থাপন করি, শেষকালে ধর্মসমাজই ধর্মের স্থান অধিকার করে। আমাদের নিজের চেষ্টারচিত সামগ্রী আমাদের সমস্ত মমতা ক্রমে এমন করিয়া নিঃশেষে আকর্ষণ করিয়া লয় যে, ধর্ম, যাহা আমাদের স্বরচিত নহে, তাহা ইহার পশ্চাতে পড়িয়া যায়। তখন, আমাদের সমাজের বাহিরে যে আর-কোথাও ধর্মের স্থান থাকিতে পারে, সে-কথা স্বীকার করিতে কষ্টবোধ হয়। ইহা হইতে ধর্মের বৈষয়িকতা আসিয়া পড়ে। দেশলুব্ধগণ যে-ভাবে দেশ জয় করিতে বাহির হয়, আমরা সেই ভাবেই ধর্মসমাজের ধ্বজা লইয়া বাহির হই। অন্যান্য দলের সহিত তুলনা করিয়া আমাদের দলের লোকবল, অর্থবল, আমাদের দলের মন্দিরসংখ্যা গণনা করিতে থাকি। মঙ্গলকর্মে মঙ্গলসাধনের আনন্দ অপেক্ষা মঙ্গলসাধনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা বড়ো হইয়া উঠে। দলাদলির আগুন কিছুতেই নেবে না, কেবলই বাড়িয়া চলিতে থাকে। আমাদের এখনকার প্রধান কর্তব্য এই যে, ধর্মকে যেন আমরা ধর্মসমাজের হস্তে পীড়িত হইতে না দিই। ব্রহ্ম ধন্য—তিনি সর্বদেশে, সর্বকালে, সর্বজীবে ধন্য—তিনি কোনো দলের নহেন, কোনো সমাজের নহেন, কোনো বিশেষ ধর্মপ্রণালীর নহেন, তাঁহাকে লইয়া ধর্মের বিষয়কর্ম ফাঁদিয়া বসা চলে না। ব্রহ্মচারী শিষ্য জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"স ভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি"—"হে ভগবন্, তিনি কোথায় প্রতিষ্ঠিত আছেন?" ব্রহ্মবাদী গুরু উত্তর করিলেন—"স্বে মহিম্নি"—"আপন মহিমাতে।" তাঁহারই সেই মহিমার মধ্যে তাঁহার প্রতিষ্ঠা অনুভব করিতে হইবে—আমাদের রচনার মধ্যে নহে।

১৩১০

বর্ষশেষ

পুরাতন বর্ষের সূর্য পশ্চিম প্রান্তরের প্রান্তে নিঃশব্দে অস্তমিত হইল। যে কয়-বৎসর পৃথিবীতে কাটাইলাম অদ্য তাহারই বিদায়যাত্রার নিঃশব্দ পক্ষধ্বনি এই নির্বাণালোক নিস্তব্ধ আকাশের মধ্যে যেন অনুভব করিতেছি। সে অজ্ঞাত সমুদ্র-পারগামী পক্ষীর মতো কোথায় চলিয়া গেল তাহার আর কোনো চিহ্ন নাই।

হে চিরদিনের চিরন্তন, অতীত জীবনকে এই যে আজ বিদায় দিতেছি এই বিদায়কে তুমি সার্থক করো—আশ্বাস দাও যে, যাহা নষ্ট হইল বলিয়া শোক করিতেছি তাহার সকলই যথাকালে তোমার মধ্যে সফল হইতেছে। আজি যে প্রশান্ত বিষাদ সমস্ত সন্ধ্যাকাশকে আচ্ছন্ন করিয়া আমাদের হৃদয়কে আবৃত করিতেছে, তাহা সুন্দর হউক, মধুময় হউক, তাহার মধ্যে অবসাদের ছায়ামাত্র না পড়ুক। আজ বর্ষাবসানের অবসানদিনে বিগত জীবনের উদ্দেশে আমাদের ঋষি পিতামহদিগের আনন্দময় মৃত্যুমন্ত্র উচ্চারণ করি

ওঁ মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।
মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ।
মধু নক্তম্ উতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ।-
মধুমান্নো বনস্পতির্মধুমাং অস্তু সূর্যঃ। ওঁ।

বায়ু মধু বহন করিতেছে। নদী সিন্ধু সকল মধুক্ষরণ করিতেছে। ওষধী বনস্পতি সকল মধুময় হউক। রাত্রি মধু হউক উষা মধু হউক, পৃথিবীর ধূলি মধুমৎ হউক। সূর্য মধুমান হউক।

রাত্রি যেমন আগামী দিবসকে নবীন করে, নিদ্রা যেমন আগামী জাগরণকে উজ্জ্বল করে, তেমনি অদ্যকার বর্ষাবসান যে গত জীবনের স্মৃতির বেদনাকে সন্ধ্যার ঝিল্লি-ঝংকারসুপ্ত অন্ধকারের মতো হৃদয়ের মধ্যে ব্যাপ্ত করিয়া দিতেছে, তাহা যেন নববর্ষের প্রভাতের জন্য আমাদের আগামী বৎসরের আশামুকুলকে লালন করিয়া বিকশিত করিয়া তুলে। যাহা যায় তাহা যেন শূন্যতা রাখিয়া যায় না, তাহা যেন পূর্ণতার জন্য স্থান করিয়া যায়। যে বেদনা হৃদয়কে অধিকার করে তাহা যেন নব আনন্দকে জন্ম দিবার বেদনা হয়।

যে বিষাদ ধ্যানের পূর্বাভাস, যে শান্তি মঙ্গল কর্মনিষ্ঠার জননী, যে বৈরাগ্য উদার প্রেমের অবলম্বন, যে নির্মল শোক তোমার নিকটে আত্মসমর্পণের মন্ত্রগুরু তাহাই

আজিকার আসন্ন রজনীর অগ্রগামী হইয়া আমাদিগকে সন্ধ্যাদীপোজ্জ্বল গৃহপ্রত্যাগত শ্রান্ত বালকের মতো অঞ্চলের মধ্যে আবৃত করিয়া লউক।

পৃথিবীতে সকল বস্তুই আসিতেছে এবং যাইতেছে—কিছুই স্থির নহে; সকলই চঞ্চল- বর্ষশেষের সন্ধ্যায় এই কথাই তপ্ত দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত হৃদয়ের মধ্যে প্রবাহিত হইতে থাকে। কিন্তু যাহা আছে, যাহা চিরকাল স্থির থাকে, যাহাকে কেহই হরণ করিতে পারে না, যাহা আমাদের অন্তরের অন্তরে বিরাজমান—গত বর্ষে সেই ধ্রুবের কি কোনো পরিচয় পাই নাই—জীবনে কি তাহার কোনো লক্ষণ চিহ্নিত হয় নাই? সকলই কি কেবল আসিয়াছে এবং গিয়াছে? আজ স্তব্ধভাবে ধ্যান করিয়া বলিতেছি তাহা নহে—যাহা আসিয়াছে এবং যাহা গিয়াছে তাহার কোথাও যাইবার সাধ্য নাই, হে নিস্তব্ধ, তাহা তোমার মধ্যে বিধৃত হইয়া আছে। যে তারা নিবিয়াছে তাহা তোমার মধ্যে নিবে নাই, যে পুষ্প ঝরিয়াছে তাহা তোমার মধ্যে বিকশিত—আমি যাহার লয় দেখিতেছি তোমার নিকট হইতে তাহা কোনোকালেই চ্যুত হইতে পারে না। আজ সন্ধ্যার অন্ধকারে শান্ত হইয়া তোমার মধ্যে নিখিলের সেই স্থিরত্ব অনুভব করি। বিশ্বের প্রতীয়মান চঞ্চলতাকে অবসানকে বিচ্ছেদকে আজ একেবারে ভুলিয়া যাই। গত বৎসর যদি তাহার উড্ডীন পক্ষপুটে আমাদের কোনো প্রিয়জনকে হরণ করিয়া যায় তবে হে পরিণামের আশ্রয়, করজোড়ে সমস্ত হৃদয়ের সহিত তোমারই প্রতি তাহাকে সমর্পণ করিলাম। জীবনে যে তোমার ছিল মৃত্যুতেও সে তোমারই। আমি তাহার সহিত আমার বলিয়া যে-সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিলাম তাহা ক্ষণকালের—তাহা ছিন্ন হইয়াছে। আজ তোমারই মধ্যে তাহার সহিত যে-সম্বন্ধ স্বীকার করিতেছি তাহার আর বিচ্ছেদ নাই। সেও তোমার ক্রোড়ে আছে আমিও তোমার ক্রোড়ে রহিয়াছি। অসীম জগদরণ্যের মধ্যে আমিও হারাই নাই, সেও হারায় নাই,—তোমার মধ্যে অতি নিকটে অতি নিকটতম স্থানে তাহার সাড়া পাইতেছি।

বিগত বৎসর যদি আমার কোনো চিরপালিত অপূর্ণ আশাকে শাখাচ্ছিন্ন করিয়া থাকে তবে, হে পরিপূর্ণস্বরূপ, অদ্য নতমস্তকে একান্ত ধৈর্যের সহিত তাহাকে তোমারি নিকটে সমর্পণ করিয়া ক্ষত উদ্যমে পুনরায় বারিসেচন করিবার জন্য প্রত্যাবৃত্ত হইলাম। তুমি আমাকে পরাভূত হইতে দিয়ো না। একদিন তোমার অভাবনীয় কৃপাবলে আমার অসিদ্ধ সাধনগুলিকে অপূর্বভাবে সম্পূর্ণ করিয়া স্বহস্তে সহসা আমার ললাটে স্থাপনপূর্বক আমাকে বিস্মিত ও চরিতার্থ করিবে এই আশাই আমি হৃদয়ে গ্রহণ করিলাম।

যে-কোনো ক্ষতি যে-কোনো অন্যায় যে-কোনো অবমাননা বিগত বৎসর আমার

মস্তকে নিক্ষেপ করিয়া থাকুক, কার্যে যে-কোনো বাধা, প্রণয়ে যে-কোনো আঘাত, লোকের নিকট হইতে যে-কোনো প্রতিকূলতা দ্বারা আমাকে পীড়ন করিয়া থাক—তবু তাহাকে আমার মস্তকের উপরে তোমারই আশিস-হস্তস্পর্শ বলিয়া অদ্য তাহাকে প্রণাম করিতেছি। গত বৎসরের প্রথম দিন নীরব স্মিতমুখে তাহার বস্ত্রাঞ্চলের মধ্যে তোমার নিকট হইতে আমার জন্য কী লইয়া আসিয়াছিল সেদিন তাহা আমাকে জানায় নাই—আমাকে কী যে দান করিল আজ তাহাও আমাকে বলিয়া গেল না, মুখ আবৃত করিয়া নিঃশব্দপদে চলিয়া গেল। দিনে রাত্রিতে আলোকে অন্ধকারে তাহার সুখদুঃখের দূতগুলি আমার হৃদয়গুহাতলে কী সঞ্চিত করিয়া গেল সে-সম্বন্ধে আমার অনেক ভ্রম আছে, আমি নিশ্চয় কিছুই জানি না,—একদিন তোমার আদেশে ভাণ্ডারের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইলে যাহা দেখিব তাহার জন্য আগে হইতেই অদ্য সন্ধ্যায় বর্ষাবসানকে ভক্তির সহিত প্রণতি করিয়া কৃতজ্ঞতার বিদায় সম্ভাষণ জানাইতেছি।

এই বর্ষশেষের শুভ সন্ধ্যায় হে নাথ, তোমার ক্ষমা মস্তকে লইয়া সকলকে ক্ষমা করি, তোমার প্রেম হৃদয়ে অনুভব করিয়া সকলকে প্রীতি করি, তোমার মঙ্গলভাব ধ্যান করিয়া সকলের মঙ্গল কামনা করি। আগামী বর্ষে যেন ধৈর্যের সহিত সহ্য করি, বীর্যের সহিত কর্ম করি, আশার সহিত প্রতীক্ষা করি, আনন্দের সহিত ত্যাগ করি এবং ভক্তির সহিত সর্বদা সর্বত্র সঞ্চরণ করি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্

১৩০৮

নববর্ষ

যে অক্ষর পুরুষকে আশ্রয় করিয়া

অহোরাত্রাণ্যর্ধমাসা মাসা ঋতবঃ সম্বৎসরা ইতি বিধৃতাস্তিষ্ঠন্তি,

দিন এবং রাত্রি, পক্ষ এবং মাস, ঋতু এবং সম্বৎসর বিধৃত হইয়া অবস্থিতি করিতেছে,

তিনি অদ্য নববর্ষের প্রথম প্রাতঃসূর্যকিরণে আমাদিগকে স্পর্শ করিলেন। এই স্পর্শের দ্বারা তিনি তাঁহার জ্যোতির্লোকে তাঁহার আনন্দলোকে আমাদিগকে নববর্ষের আহ্বান প্রেরণ করিলেন। তিনি এখনই কহিলেন, পুত্র, আমার এই নীলাম্বরবেষ্টিত তৃণ-ধান্যশ্যামল ধরণীতলে তোমাকে জীবন ধারণ করিতে বর দিলাম—তুমি আনন্দিত হও, তুমি বললাভ করো।

প্রান্তরের মধ্যে পুণ্যনিকেতনে নববর্ষের প্রথম নির্মল আলোকের দ্বারা আমাদের অভিষেক হইল। আমাদের নবজীবনের অভিষেক। মানবজীবনের যে মহোচ্চ

সিংহাসনে বিশ্ববিধাতা আমাদিগকে বসিতে স্থান দিয়াছেন তাহা আজ আমরা নবগৌরবে অনুভব করিব। আমরা বলিব, হে ব্রহ্মাণ্ডপতি, এই যে অরুণরাগরক্ত নীলাকাশের তলে আমরা জাগ্রত হইলাম আমরা ধন্য। এই যে চিরপুরাতন অন্নপূর্ণা বসুন্ধরাকে আমরা দেখিতেছি আমরা ধন্য। এই যে গীতগন্ধবর্ণস্পন্দনে আন্দোলিত বিশ্বসরোবরের মাঝখানে আমাদের চিত্তশতদল জ্যোতিঃপরিপ্লাবিত অনন্তের দিকে উদ্ভিন্ন হইয়া উঠিতেছে আমরা ধন্য। অদ্যকার প্রভাতে এই যে জ্যোতির্ধারা আমাদের উপর বর্ষিত হইতেছে ইহার মধ্যে তোমার অমৃত আছে, তাহা ব্যর্থ হইবে না, তাহা আমরা গ্রহণ করিব; এই যে বৃষ্টিধৌত বিশাল পৃথিবীর বিস্তীর্ণ শ্যামলতা ইহার মধ্যে তোমার অমৃত ব্যাপ্ত হইয়া আছে তাহা ব্যর্থ হইবে না, তাহা আমরা গ্রহণ করিব। এই যে নিশ্চল মহাকাশ আমাদের মস্তকের উপর তাহার স্থির হস্ত স্থাপন করিয়াছে তাহা তোমারই অমৃতভারে নিস্তব্ধ তাহা ব্যর্থ হইবে না, তাহা আমরা গ্রহণ করিব।

এই মহিমান্বিত জগতে অদ্যকার নববর্ষদিন আমাদের জীবনের মধ্যে যে গৌরব বহন করিয়া আনিল, এই পৃথিবীতে বাস করিবার গৌরব, এই আলোকে বিচরণ করিবার গৌরব, এই আকাশতলে আসীন হইবার গৌরব তাহা যদি পরিপূর্ণভাবে চিত্তের মধ্যে গ্রহণ করি তবে আর বিষাদ নাই, নৈরাশ্য নাই, ভয় নাই, মৃত্যু নাই। তবে সেই ঋষিবাক্য বুঝিতে পারি—

কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ।

কেই বা শরীরচেষ্টা করিত কেই বা প্রাণধারণ করিত যদি এই আকাশে আনন্দ না থাকিতেন।

আকাশ পরিপূর্ণ করিয়া তিনি আনন্দিত তাই আমার হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত, আমার রক্ত প্রবাহিত, আমার চেতনা তরঙ্গিত। তিনি আনন্দিত তাই সূর্যলোকের বিরাট যজ্ঞহোমে অগ্নি-উৎস উৎসারিত; তিনি আনন্দিত তাই পৃথিবীর সর্বাঙ্গ পরিবেষ্টন করিয়া তৃণদল সমীরণে কম্পিত হইতেছে; তিনি আনন্দিত তাই গ্রহে নক্ষত্রে আলোকের অনন্ত উৎসব। আমার মধ্যে তিনি আনন্দিত তাই আমি আছি—তাই আমি গ্রহতারকার সহিত লোকলোকান্তরের সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত—তাঁহার আনন্দে আমি অমর, সমস্ত বিশ্বের সহিত আমার সমান মর্যাদা।

তাঁহার প্রতিনিমেষের ইচ্ছাই আমাদের প্রতিমুহূর্তের অস্তিত্ব, আজ নববর্ষের দিনে এই কথা যদি উপলব্ধি করি—আমাদের মধ্যে তাঁহার অক্ষয় আনন্দ যদি স্তব্ধ গভীরভাবে অন্তরে উপভোগ করি—তবে সংসারের কোনো বাহ্য ঘটনাকে আমার চেয়ে প্রবলতর

মনে করিয়া অভিভূত হইব না—কারণ ঘটনাবলী তাহার সুখদুঃখ বিরহমিলন লাভক্ষতি জন্মমৃত্যু লইয়া আমাদিগকে ক্ষণে ক্ষণে স্পর্শ করে ও অপসারিত হইয়া যায়। বৃহত্তম বিপদই বা কতদিনের, মহত্তম দুঃখই বা কতখানি, দুঃসহতম বিচ্ছেদই বা আমাদের কতটুকু হরণ করে—তাঁহার আনন্দ থাকে; দুঃখ সেই আনন্দেরই রহস্য, মৃত্যু সেই আনন্দেরই রহস্য। এই রহস্য ভেদ না করিতে পারি নাই পারিলাম—আমাদের বোধশক্তিতে এই শাশ্বত আনন্দ এত বিপরীত আকারে এত বিবিধভাবে কেন প্রতীয়মান হইতেছে তাহা নাই জানিলাম—কিন্তু ইহা যদি নিশ্চয় জানি এক মুহূর্ত সর্বত্র সেই পরিপূর্ণ আনন্দ না থাকিলে সমস্তই তৎক্ষণাৎ ছায়ার ন্যায় বিলীন হইয়া যায়—যদি জানি,

আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে আনন্দেন জাতানি জীবন্তি আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি

তবে—

আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন।

নিজের মধ্যে ও নিজের বাহিরে সেই ব্রহ্মের আনন্দ জানিয়া কোনো অবস্থাতেই আর ভয় পাওয়া যায় না।

স্বার্থের জড়তা এবং পাপের আবর্ত ব্রহ্মের এই নিত্যবিরাজমান আনন্দের অনুভূতি হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত করে। তখন সহস্র রাজা আমাদের নিকট হইতে করগ্রহণে উদ্যত হয়, সহস্র প্রভু আমাদিগকে সহস্র কাজে চারিদিকে ঘূর্ণ্যমান করে। তখন যাহা কিছু আমাদের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয় তাহাই বড়ো হইয়া উঠে—তখন সকল বিরহই ব্যাকুল, সকল বিপদই বিভ্রান্ত করিয়া তোলে—সকলকেই চূড়ান্ত বলিয়া ভ্রম হয়। লোভের বিষয় সম্মুখে উপস্থিত হইলেই মনে হয় তাহাকে না পাইলে নয়, বাসনার বিষয় উপস্থিত হইলেই মনে হয় ইহাকে পাইলেই আমার চরম সার্থকতা। ক্ষুদ্রতার এই সকল অবিশ্রাম ক্ষোভে ভূমা আমাদের নিকটে অগোচর হইয়া থাকেন, এবং প্রত্যেক ক্ষুদ্র ঘটনা আমাদিগকে প্রতিপদে অপমানিত করিয়া যায়।

সেইজন্যই আমাদের প্রতিদিনের প্রার্থনা এই যে,

অসতো মা সদ্‌গময় তমসো মা জ্যোতির্গময় মৃত্যোর্মামৃতং গময়।

আমাকে অসত্য হইতে সত্যে লইয়া যাও;—প্রতি নিমেষের খণ্ডতা হইতে তোমার অনন্ত পরিপূর্ণতার মধ্যে আমাকে উপনীত করো;—অন্ধকার হইতে আমাকে জ্যোতিতে লইয়া যাও;—অহংকারের যে অন্তরাল, বিশ্বজগৎ আমার সম্মুখে যে স্বাতন্ত্র্য লইয়া দাঁড়ায়, আমাকে এবং জগৎকে তোমার ভিতর দিয়া না দেখিবার যে অন্ধকার তাহা

হইতে আমাকে মুক্ত করো ; মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃতে লইয়া যাও,—আমার প্রবৃত্তি আমাকে মৃত্যুদোলায় চড়াইয়া দোল দিতেছে, মুহূর্তকাল অবসর দিতেছে না ; আমার মধ্যে আমার ইচ্ছাগুলাকে খর্ব করিয়া আমার মধ্যে তোমার আনন্দকে প্রকাশমান করো, সেই আনন্দই অমৃতলোক।

আজিকার নববর্ষদিনে ইহাই আমাদের বিশেষ প্রার্থনা। সত্য, আলোক ও অমৃতের জন্ত আমরা করপুট করিয়া দাঁড়াইয়াছি। বলিতেছি—

আবিরাবীর্মএধি।

হে স্বপ্রকাশ, তুমি আমাদের নিকটে প্রকাশিত হও।

অন্তরে বাহিরে তুমি উদ্ভাসিত হইলেই, প্রবৃত্তির দাসত্ব জগতের দৌরাত্ম্য কোথায় চলিয়া যায়—তখন তোমার মধ্যে সমস্ত দেশকালের একটি অনবচ্ছিন্ন সামঞ্জস্য একটি পরিপূর্ণ সমাপ্তি দেখিয়া সুগভীর শান্তির মধ্যে আমরা নিমগ্ন ও নিস্তব্ধ হইয়া যাই। তখন, যে চেষ্টাহীন বলে সমস্ত জগৎ সহজে বিধৃত তাহা আমাদের হৃদয়ে অবতীর্ণ হয়, যে চেষ্টাহীন সৌন্দর্যে নিখিল ভুবন পরস্পর গ্রথিত তাহা আমাদের জীবনে আবির্ভূত হয়। তখন আমি যে তোমাকে আত্মসমর্পণ করিতেছি এ-কথা মনে থাকে না—তোমার সমস্ত জগতের এক সঙ্গে তুমিই আমাকে লইতেছ এই কথাই আমার মনে হয়।

সেই স্বপ্রকাশ যতদিন না আমাদের নিকটে আপনাকে প্রকাশ করিবেন ততদিন যেন নিজের ভিতর হইতে তাঁহার দিকে বাহির হইবার একটা দ্বার উন্মুক্ত থাকে। সেই পথ দিয়া প্রত্যহ প্রভাতে তাঁহার কাছে নিজেকে উৎসর্গ করিয়া আসিতে পারি। আমাদের জীবনের একটা দিনের সহিত আর-একটা দিনের যে বন্ধন সে যেন শুধু স্বার্থের বন্ধন না হয়, জড় অভ্যাস-সূত্রের বন্ধন না হয়—একটা বৎসরের সহিত আর-একটা বৎসরকে যেন প্রাত্যহিক নিবেদনের দ্বারা তাঁহারই সম্বন্ধে আবদ্ধ করিয়া সম্পূর্ণ করিয়া তুলিতে পারি। এমন কোনো সূত্রে যেন মানবজীবনের দুর্লভ মুহূর্তগুলিকে না বাঁধিতে থাকি যাহা মৃত্যুর স্পর্শমাত্রে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। জীবনের যে বৎসরটা গেছে তাহা পূজার পদ্মের ন্তায় তাঁহাকে উৎসর্গ করিতে পারি নাই—তাহার তিন শত পঁয়ষট্টি দল দিনে দিনে ছিন্ন করিয়া লইয়া পঙ্কের মধ্যে ফেলিয়া দিয়াছি। অদ্য বৎসরের অনুদ্‌ঘাটিত প্রথম মুকুল সূর্যের আলোকে মাথা তুলিয়াছে ইহাকে আমরা খণ্ডিত করিব না, সৌন্দর্যে সৌগন্ধ্যে শুভ্রতায় ইহাকে সম্পূর্ণ করিয়া তুলিব। তাহা কখনোই অসাধ্য নহে—সে-শক্তি আমাদের মধ্যে আছে—

নাত্মানমবমন্যেত।

নিজেকে অপমান অবজ্ঞা করিয়ো না।

ন হ্যাত্মপরিভূতস্য ভূতির্ভবতি শোভনা।

আপনাকে যে ব্যক্তি হীন বলিয়া অবমান করে করে তাহার কখনোই শোভন ঐশ্বর্য লাভ হয় না।

ধর্মের যে আদর্শ সর্বশ্রেষ্ঠ, যে আদর্শে ব্রহ্মের জ্যোতি বিশুদ্ধভাবে প্রতিফলিত হয়, তাহা কল্পনাগম্য অসাধ্য নহে, তাহা রক্ষা করিবার তেজ আমাদের মধ্যে আছে;— নিজেকে জাগ্রত রাখিবার শক্তি আমাদের আছে;—এবং জাগ্রত থাকিলে অন্যায় অসত্য হিংসা ঈর্ষা প্রলোভন দ্বারের নিকটে আসিয়া দূরে চলিয়া যায়। আমরা ভয় ত্যাগ করিতে পারি, হীনতা পরিহার করিতে পারি, আমরা প্রাণ বিসর্জন করিতে পারি— এ ক্ষমতা আমাদের প্রত্যেকের আছে। কেবল দীনতায় সেই শক্তিকে অবিশ্বাস করি বলিয়া তাহাকে ব্যবহার করিতে পারি না। সেই শক্তি আমাদিগকে কী ভূমানন্দে কী চরম সার্থকতায় লইয়া যাইতে পারে তাহা জানি না বলিয়াই আত্মার সেই শক্তিকে আমরা স্বার্থে এবং ব্যর্থ চেষ্টায় এবং পাপের আয়োজনে নিযুক্ত করি। মনে করি অর্থলাভেই আমাদের চরম সুখ, বাসনাতৃপ্তিতেই আমাদের পরমানন্দ, ইচ্ছার বাধা মোচনেই আমাদের পরম মুক্তি। আমাদের যে-শক্তি চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে তাহাকে একাগ্রধারায় ব্রহ্মের দিকে প্রবাহিত করিয়া দিলে জীবনের কর্ম সহজ হয়, সুখদুঃখ সহজ হয়, মৃত্যু সহজ হয়। সেই শক্তি আমাদিগকে বর্ষার স্রোতের মতো অনায়াসেই বহন করিয়া লইয়া যায়; দুঃখশোক বিপদ-আপদ বাধাবিঘ্ন, তাহার পথের সম্মুখে শরবনের মতো মাথা নত করিয়া দেয়, তাহাকে প্রতিহত করিতে পারে না।

পুনর্বার বলিতেছি, এই শক্তি আমাদের মধ্যে আছে। কেবল, চারিদিকে ছড়াইয়া আছে বলিয়াই তাহার উপর নিজের সমস্ত ভার সমর্পণ করিয়া গতিলাভ করিতে পারি না। নিজেকে প্রত্যহ নিজেই বহন করিতে হয়। প্রত্যেক কাজ আমাদের স্কন্ধের উপর আসিয়া পড়ে; প্রত্যেক কাজের আশানৈরাশ্য-লাভক্ষতির সমস্ত ঋণ নিজেকে শেষ কড়া পর্যন্ত শোধ করিতে হয়। স্রোতের উপর যেমন মাঝির নৌকা থাকে এবং নৌকার উপরেই তাহার সমস্ত বোঝা থাকে তেমনি ব্রহ্মের প্রতি যাঁহার চিত্ত একাগ্রভাবে ধাবমান, তাঁহার সমস্ত সংসার এই পরিপূর্ণ ভাবের স্রোতে ভাসিয়া চলিয়া যায় এবং কোনো বোঝা তাঁহার স্কন্ধকে পীড়িত করে না।

নববর্ষের প্রাতঃসূর্যালোকে দাঁড়াইয়া অদ্য আমাদের হৃদয়কে চারিদিক হইতে আহ্বান করি। ভারতবর্ষের যে পৈতৃক মঙ্গলশঙ্খ গৃহের প্রান্তে উপেক্ষিত হইয়া পড়িয়া আছে সমস্ত প্রাণের নিশ্বাস তাহাতে পরিপূর্ণ করি—সেই মধুর গম্ভীর শঙ্খধ্বনি শুনিলে

আমাদের বিক্ষিপ্ত চিত্ত অহংকার হইতে স্বার্থ হইতে বিলাস হইতে প্রলোভন হইতে ছুটিয়া আসিবে। আজ শতধারা একধারা হইয়া গোমুখীর মুখনিঃসৃত সমুদ্রবাহিনী গঙ্গার ন্যায় প্রবাহিত হইবে—তাহা হইলে মুহূর্তের মধ্যে প্রান্তরশায়ী এই নির্জন তীর্থ যথার্থই হরিদ্বার তীর্থ হইয়া উঠিবে।

হে ব্রহ্মাণ্ডপতি, অদ্য নববর্ষের প্রভাতে তোমার জ্যোতিঃস্নাত তরুণ সূর্য পুরোহিত হইয়া নিঃশব্দে আমাদের আলোকের অভিষেক সম্পন্ন করিল। আমাদের ললাটে আলোক স্পর্শ করিয়াছে। আমাদের দুই চক্ষু আলোকে ধৌত হইয়াছে। আমাদের পথ আলোকে রঞ্জিত হইয়াছে। আমাদের সদ্যোজাগ্রত হৃদয় ব্রতগ্রহণের জন্য তোমার সম্মুখে উপবিষ্ট হইয়াছে। যে-শরীরকে অদ্য তোমার সমীরণ স্পর্শ করিল তাহাকে যেন প্রতিদিন পবিত্র রাখিয়া তোমার কর্মে নিযুক্ত করি। যে-মস্তকে তোমার প্রভাতকিরণ বর্ষিত হইল সে-মস্তককে ভয় লজ্জা ও হীনতার অবনতি হইতে রক্ষা করিয়া তোমারই পূজায় প্রণত করি। তোমার নামগানধারা আজ প্রত্যুষে যে-হৃদয়কে পুণ্যবারিতে স্নান করাইল, সে যেন আনন্দে পাপকে পরিহার করিতে পারে, আনন্দে তোমার কল্যাণকর্মে জীবনকে উৎসর্গ করিতে পারে, আনন্দে দারিদ্র্যকে ভূষণ করিতে পারে, আনন্দে দুঃখকে মহীয়ান্ করিতে পারে, এবং আনন্দে মৃত্যুকে অমৃতরূপে বরণ করিতে পারে। আজিকার প্রভাতকে কালি যেন বিস্মৃত না হই। প্রতিদিনের প্রাতঃসূর্য যেন আমাদিগকে লজ্জিত না দেখে; তাহার নির্মল আলোক আমাদের নির্মলতার, তাহার তেজ আমাদের তেজের সাক্ষী হইয়া যায়—এবং প্রতি সন্ধ্যাকালে আমাদের প্রত্যেক দিনটিকে নির্মল অর্ঘ্যের ন্যায় তাহার রক্তিম স্বর্ণথালিতে বহন করিয়া তোমার সিংহাসনের সম্মুখে স্থাপন করিতে পারে। হে পিতা, আমার মধ্যে নিয়তকাল তোমার যে আনন্দ স্তব্ধ হইয়া আছে, যে আনন্দে তুমি আমাকে নিমেষকালও পরিত্যাগ কর নাই, যে আনন্দে তুমি আমাকে জগতে জগতে রক্ষা করিতেছ, যে আনন্দে সূর্যোদয় প্রতিদিনই আমার নিকটে অপূর্ব, সূর্যাস্ত প্রতিসন্ধ্যায় আমার নিকট রমণীয়, যে আনন্দে অজ্ঞাত ভুবন আমার আত্মীয়, অগণ্য নক্ষত্র আমার সুপ্তরাত্রির মণিমালা, যে আনন্দে জন্মমাত্রেই আমি বহুলোকের প্রিয় পরিচিত, সমস্ত অতীত মানবের মনুষ্যত্বের উত্তরাধিকারী, যে আনন্দে দুঃখ নৈরাশ্য বিপদ মৃত্যু কিছুই লেশমাত্র নিরর্থক নহে,—আমি যেন প্রবৃত্তির ক্ষোভে পাপের লজ্জায় আমার মধ্যে তোমার সেই আনন্দ-মন্দিরের দ্বার নিজের নিকটে রুদ্ধ করিয়া রাখিয়া পথের পঙ্কে যদৃচ্ছা লুণ্ঠিত হওয়াকেই আমার সুখ আমার স্বাধীনতা বলিয়া ভ্রম না করি। জগৎ তোমার জগৎ, আলোক তোমার আলোক, প্রাণ তোমার নিশ্বাস, এই কথা স্মরণে রাখিয়া জীবনধারণের যে পরম পবিত্র গৌরব তাহার অধিকারী হই, অস্তিত্বের যে অপার

অজ্ঞেয় রহস্য তাহা বহন করিবার উপযুক্ত হই—এবং প্রতিদিন তোমাকে এই বলিয়া ধ্যান করি—

ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়োযোনঃ প্রচোদয়াৎ।

বিশ্বসবিতা এই সমস্ত ভূলোক ভুবর্লোক স্বর্লোককে যেমন প্রত্যেক নিমেষেই প্রকাশের মধ্যে প্রেরণ করিতেছেন—তেমনি তিনি আমার বুদ্ধিবৃত্তিকে প্রতি নিমেষে প্রেরণ করিতেছেন—তাঁহার প্রেরিত এই জগৎ দিয়া সেই জগদীশ্বরকে উপলব্ধি করি—তাঁহার প্রেরিত এই বুদ্ধি দিয়া সেই চেতনস্বরূপকে ধ্যান করি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্

১৩০৯

উৎসবের দিন

সকালবেলায় অন্ধকার ছিন্ন করিয়া ফেলিয়া আলোক যেমনি ফুটিয়া বাহির হয়, অমনি বনে-উপবনে পাখিদের উৎসব পড়িয়া যায়। সে-উৎসব কিসের উৎসব? কেন এই সমস্ত বিহঙ্গের দল নাচিয়া-কুঁদিয়া গান গাহিয়া এমন অস্থির হইয়া উঠে? তাহার কারণ এই, প্রতিদিন প্রভাতে আলোকের স্পর্শে পাখিরা নূতন করিয়া আপনার প্রাণশক্তি অনুভব করে। দেখিবার শক্তি, উড়িবার শক্তি, খাদ্যসন্ধান করিবার শক্তি তাহার মধ্যে জাগ্রত হইয়া তাহাকে গৌরবান্বিত করিয়া তোলে—আলোকে উদ্ভাসিত এই বিচিত্র বিশ্বের মধ্যে সে আপনার প্রাণবান গতিবান চেতনাবান পক্ষিজন্ম সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিয়া অন্তরের আনন্দকে সংগীতের উৎসে উৎসারিত করিয়া দেয়।

জগতের যেখানে অব্যাহতশক্তির প্রচুর প্রকাশ, সেইখানেই যেন মূর্তিমান উৎসব। সেইজন্য হেমন্তের সূর্যকিরণে অগ্রহায়ণের পক্বশস্যসমুদ্রে সোনার উৎসব হিল্লোলিত হইতে থাকে—সেইজন্য আম্রমঞ্জরীর নিবিড় গন্ধে ব্যাকুল নববসন্তে পুষ্পবিচিত্র কুঞ্জবনে উৎসবের উৎসাহ উদ্দাম হইয়া উঠে। প্রকৃতির মধ্যে এইরূপে আমরা নানাস্থানে নানাভাবে শক্তির জয়োৎসব দেখিতে পাই।

মানুষের উৎসব কবে? মানুষ যেদিন আপনার মনুষ্যত্বের শক্তি বিশেষভাবে স্মরণ করে, বিশেষভাবে উপলব্ধি করে, সেইদিন। যেদিন আমরা আপনাদিগকে প্রাত্যহিক প্রয়োজনের দ্বারা চালিত করি, সেদিন না—যেদিন আমরা আপনাদিগকে সাংসারিক সুখদুঃখের দ্বারা ক্ষুব্ধ করি, সেদিন না—যেদিন প্রাকৃতিক নিয়মপরম্পরার হস্তে আপনাদিগকে ক্রীড়াপুত্তলির মতো ক্ষুদ্র ও জড়ভাবে অনুভব করি, সেদিন আমাদের

উৎসবের দিন নহে ;—সেদিন তো আমরা জড়ের মতো উদ্ভিদের মতো সাধারণ জন্তুর মতো—সেদিন তো আমরা আমাদের নিজের মধ্যে সর্বজয়ী মানবশক্তি উপলব্ধি করি না—সেদিন আমাদের আনন্দ কিসের ? সেদিন আমরা গৃহে অবরুদ্ধ, সেদিন আমরা কর্মে ক্লিষ্ট—সেদিন আমরা উজ্জ্বলভাবে আপনাকে ভূষিত করি না—সেদিন আমরা উদারভাবে কাহাকেও আহ্বান করি না—সেদিন আমাদের ঘরে সংসারচক্রের ঘর্ঘরধ্বনি শোনা যায়, কিন্তু সংগীত শোনা যায় না।

প্রতিদিন মানুষ ক্ষুদ্র দীন একাকী—কিন্তু উৎসবের দিনে মানুষ বৃহৎ, সেদিন সে সমস্ত মানুষের সঙ্গে একত্র হইয়া বৃহৎ, সেদিন সে সমস্ত মনুষ্যত্বের শক্তি অনুভব করিয়া মহৎ।

হে ভ্রাতৃগণ, আজ আমি তোমাদের সকলকে ভাই বলিয়া সম্ভাষণ করিতেছি—আজ, আলোক জ্বলিয়াছে, সংগীত ধ্বনিতেছে, দ্বার খুলিয়াছে—আজ মনুষ্যত্বের গৌরব আমাদিগকে স্পর্শ করিয়াছে—আজ আমরা কেহ একাকী নহি—আজ আমরা সকলে মিলিয়া এক—আজ অতীত সহস্রবৎসরের অমৃতবাণী আমাদের কর্ণে ধ্বনিত হইতেছে—আজ অনাগত সহস্রবৎসর আমাদের কণ্ঠস্বরকে বহন করিবার জন্য সম্মুখে প্রতীক্ষা করিয়া আছে।

আজ আমাদের কিসের উৎসব ? শক্তির উৎসব। মানুষের মধ্যে কী আশ্চর্যশক্তি আশ্চর্যরূপে প্রকাশ পাইতেছে ! আপনার সমস্ত ক্ষুদ্র প্রয়োজনকে অতিক্রম করিয়া মানুষ কোন্ ঊর্ধ্বে গিয়া দাঁড়াইয়াছে। জ্ঞানী জ্ঞানের কোন্ দুর্লক্ষ্য দুর্গমতার মধ্যে ধাবমান হইয়াছে, প্রেমিক প্রেমের কোন্ পরিপূর্ণ আত্মবিসর্জনের মধ্যে গিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছে, কর্মী কর্মের কোন্ অশ্রান্ত দুঃসাধ্য সাধনের মধ্যে অকুতোভয়ে প্রবেশ করিয়াছে ? জ্ঞানে প্রেমে কর্মে মানুষ যে অপরিমেয় শক্তিকে প্রকাশ করিয়াছে, আজ আমরা সেই শক্তির গৌরব স্মরণ করিয়া উৎসব করিব। আজ আমরা আপনাকে, ব্যক্তিবিশেষ নহে, কিন্তু মানুষ বলিয়া জানিয়া ধন্য হইব।

মানুষের সমস্ত প্রয়োজনকে দুরূহ করিয়া দিয়া ঈশ্বর মানুষের গৌরব বাড়াইয়াছেন। পশুর জন্য মাঠ ভরিয়া তৃণ পড়িয়া আছে, মানুষকে অন্নের জন্য প্রাণপণ করিয়া মরিতে হয়। প্রতিদিন আমরা যে অন্নগ্রহণ করিতেছি, তাহার পশ্চাতে মানুষের বুদ্ধি মানুষের উদ্যম মানুষের উদ্‌যোগ রহিয়াছে—আমাদের অন্নমুষ্টি আমাদের গৌরব। পশুর গাত্রবস্ত্রের অভাব একদিনের জন্যও নাই, মানুষ উলঙ্গ হইয়া জন্মগ্রহণ করে। শক্তির দ্বারা আপন অভাবকে জয় করিয়া মানুষকে আপন অঙ্গ আচ্ছাদন করিতে হইয়াছে—গাত্রবস্ত্র মনুষ্যত্বের গৌরব। আত্মরক্ষার উপায় সঙ্গে লইয়া মানুষ ভূমিষ্ঠ হয় নাই,

আপন শক্তির দ্বারা তাহাকে আপন অস্ত্র নির্মাণ করিতে হইয়াছে—কোমল ত্বক্ এবং দুর্বল শরীর লইয়া মানুষ যে আজ সমস্ত প্রাণিসমাজের মধ্যে আপনাকে জয়ী করিয়াছে, ইহা মানবশক্তির গৌরব। মানুষকে দুঃখ দিয়া ঈশ্বর মানুষকে সার্থক করিয়াছেন,—তাহাকে নিজের পূর্ণশক্তি অনুভব করিবার অধিকারী করিয়াছেন।

মানুষের এই শক্তি যদি নিজের প্রয়োজন সাধনের সীমার মধ্যেই সার্থকতা লাভ করিত, তাহা হইলেও আমাদের পক্ষে যথেষ্ট হইত, তাহা হইলেও আমরা জগতের সমস্ত জীবের উপরে আপনার শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করিতে পারিতাম। কিন্তু আমাদের শক্তির মধ্যে কোন্ মহাসমুদ্র হইতে এ কী জোয়ার আসিয়াছে—সে আমাদের সমস্ত অভাবের কূল ছাপাইয়া সমস্ত প্রয়োজনকে লঙ্ঘন করিয়া অহর্নিশি অক্লান্ত উদ্যমের সহিত এ কোন্ অসীমের রাজ্যে কোন্ অনির্বচনীয় আনন্দের অভিমুখে ধাবমান হইয়াছে। যাহাকে জানিবার জন্য সমস্ত পরিত্যাগ করিতেছে, তাহাকে জানিবার ইহার কী প্রয়োজন। যাহার নিকট আত্মসমর্পণ করিবার জন্য ইহার সমস্ত অন্তরাত্মা ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে তাহার সহিত ইহার আবশ্যকের সম্বন্ধ কোথায়। যাহার কর্ম করিবার জন্য এ আপনার আরাম, স্বার্থ, এমন কি, প্রাণকে পর্যন্ত তুচ্ছ করিতেছে, তাহার সঙ্গে ইহার দেনাপাওনার হিসাব লেখা থাকিতেছে কই। আশ্চর্য। ইহাই আশ্চর্য। আনন্দ। ইহাই আনন্দ। যেখানটা মানুষের সমস্ত আবশ্যকসীমার বাহিরে চলিয়া গেছে, সেইখানেই মানুষের গভীরতম সর্বোচ্চতম শক্তি সর্বদাই আপনাকে স্বাধীন আনন্দে উধাও করিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে। জগতের আর কোথাও ইহার কোনো তুলনা দেখি না। মনুষ্যশক্তির এই প্রয়োজনাতীত পরম গৌরব অদ্যকার উৎসবে আনন্দসংগীতে ধ্বনিত হইতেছে। এই শক্তি অভাবের উপরে জয়ী, ভয়শোকের উপরে জয়ী, মৃত্যুর উপরে জয়ী। আজ অতীত-ভবিষ্যতের সুমহান মানবলোকের দিকে দৃষ্টিস্থাপনপূর্বক মানবাত্মার মধ্যে এই অভ্রভেদী চিরন্তনশক্তিকে প্রত্যক্ষ করিয়া আপনাকে সার্থক করিব।

একদা কত-সহস্র-বৎসর পূর্বে মানুষ এই কথা বলিয়াছে—

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্ আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।

আমি সেই মহান্ পুরুষকে জানিয়াছি, যিনি জ্যোতির্ময়, যিনি অন্ধকারের পরপারবর্তী।

এই প্রত্যক্ষ পৃথিবীতে ইহাই আমাদের জানা আবশ্যক যে, কোথায় আমাদের খাদ্য, কোথায় আমাদের খাদক, কোথায় আমাদের আরাম, কোথায় আমাদের ব্যাঘাত—কিন্তু এই সমস্ত জানাকে বহুদূর পশ্চাতে ফেলিয়া মানুষ চিররহস্য অন্ধকারের এ কোন্ পরপারে, এ কোন্ জ্যোতির্লোকে কিসের প্রত্যাশায় চলিয়া গেছে। মানুষ এই যে তাহার সমস্ত প্রত্যক্ষ প্রয়োজনের অভ্যন্তরেও সেই তিমিরাতীত জ্যোতির্ময় মহান

পুরুষকে জানিয়াছে, আজ আমরা মানুষের সেই আশ্চর্য জ্ঞানের গৌরব লইয়া উৎসব করিতে বসিয়াছি। যে জ্ঞানের শক্তি কোনো সংকীর্ণতা কোনো নিত্যনৈমিত্তিক আবশ্যকের মধ্যে বদ্ধ থাকিতে চাহে না, যে জ্ঞানের শক্তি কেবলমাত্র মুক্তির আনন্দ উপলব্ধি করিবার জন্য সীমাহীনের মধ্যে পরম সাহসের সহিত আপন পক্ষ বিস্তার করিয়া দেয়, যে তেজস্বী জ্ঞান আপন শক্তিকে কোনো প্রয়োজনসাধনের উপায়রূপে নহে, পরন্তু চরমশক্তিরূপেই অনুভব করিবার জন্য অগ্রসর—মনুষ্যত্বের মধ্যে অদ্য আমরা সেই জ্ঞান সেই শক্তিকে স্পর্শ করিয়া কৃতার্থ হইব।

কত-সহস্র-বৎসর পূর্বে মানুষ একদা এই কথা উচ্চারণ করিয়াছে

আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন।
ব্রহ্মের আনন্দ যিনি জানিয়াছেন, তিনি কিছু হইতেই ভয় পান না।

এই পৃথিবীতে যেখানে প্রবল দুর্বলকে পীড়ন করিতেছে, যেখানে ব্যাধি-বিচ্ছেদ-মৃত্যু প্রতিদিনের ঘটনা, বিপদ যেখানে অদৃশ্য থাকিয়া প্রতি পদক্ষেপে আমাদের প্রতীক্ষা করে এবং প্রতিকারের উপায় যেখানে অধিকাংশস্থলে আমাদের আয়ত্তাধীন নহে, সেখানে মানুষ সমস্ত প্রাকৃতিক নিয়মের ঊর্ধ্বে মস্তক তুলিয়া এ কী কথা বলিয়াছে যে, আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন! আজ আমরা দুর্বল মানুষের মুখের এই প্রবল অভয়বাণী লইয়া উৎসব করিতে বসিয়াছি। সহস্রশীর্ষ ভয়ের করাল কবলের সম্মুখে দাঁড়াইয়া যে মানুষ অকুণ্ঠিতচিত্তে বলিতে পারিয়াছে, ব্রহ্ম আছেন, ভয় নাই—অদ্য আপনাকে সেই মানুষের অন্তর্গত জানিয়া গৌরব লাভ করিব।

বহুসহস্রবৎসর পূর্বের উচ্চারিত এই বাণী আজিও ধ্বনিত হইতেছে—

তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্বস্মাৎ অন্তরতর যদয়মাত্মা।
অন্তরতর এই যে আত্মা, ইনি এই পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয়, অন্য সমস্ত হইতেই প্রিয়।

সংসারের সমস্ত স্নেহপ্রেমের সামগ্রীর মধ্যে মানুষের যে প্রেম সম্পূর্ণ তৃপ্ত হয় নাই, সংসারের সমস্ত প্রিয়পদার্থের অন্তরে তাহার অন্তরতর যে প্রিয়তম, যিনি সমস্ত আত্মীয়পরের অন্তরতর, যিনি সমস্ত দূর-নিকটের অন্তরতর, তাঁহার প্রতি যে প্রেম এমন প্রবল আবেগে এমন অসংশয়ে আকৃষ্ট হইয়াছে—আমরা জানি, মানুষের যে পরমতম প্রেম আপনার সমস্ত প্রিয়সামগ্রীকে একমুহূর্তে বিসর্জন দিতে উদ্যত হয়, মানুষের সেই পরমাশ্চর্য প্রেমশক্তির গৌরব অদ্য আমরা উপলব্ধি করিয়া উৎসব করিতে সমাগত হইয়াছি।

সন্তানের জন্য আমরা মানুষকে দুঃসাধ্যকর্মে প্রবৃত্ত হইতে দেখিয়াছি, অনেক

জন্তুকেও সেরূপ দেখিয়াছি—স্বদেশীয়-স্বদলের জন্যও আমরা মানুষকে দুরূহ চেষ্টা প্রয়োগ করিতে দেখিয়াছি—পিপীলিকাকেও মধুমক্ষিকাকেও সেরূপ দেখিয়াছি। কিন্তু মানুষের কর্ম যেখানে আপনাকে, আপনার সন্তানকে এবং আপনার দলকেও অতিক্রম করিয়া গেছে, সেইখানেই আমরা মনুষ্যত্বের পূর্ণশক্তির বিকাশে পরম গৌরব লাভ করিয়াছি। বুদ্ধদেবের করুণা সন্তানবাৎসল্য নহে, দেশানুরাগও নহে—বৎস যেমন গাভী-মাতার পূর্ণস্তন হইতে দুগ্ধ আকর্ষণ করিয়া লয়, সেইরূপ ক্ষুদ্র অথবা মহৎ কোনো-শ্রেণীর স্বার্থপ্রবৃত্তি সেই করুণাকে আকর্ষণ করিয়া লইতেছে না। তাহা জলভারাক্রান্ত নিবিড় মেঘের ন্যায় আপনার প্রভূত প্রাচুর্যে আপনাকে নির্বিশেষে সর্বলোকের উপরে বর্ষণ করিতেছে। ইহাই পরিপূর্ণতার চিত্র, ইহাই ঐশ্বর্য। ঈশ্বর প্রয়োজনবশত নহে, শক্তির অপরিসীম প্রাচুর্যবশতই আপনাকে নির্বিশেষে নিয়তই বিশ্বরূপে দান করিতেছেন। মানুষের মধ্যেও যখন আমরা সেইরূপ, শক্তির প্রয়োজনাতীত প্রাচুর্য ও স্বতঃপ্রবৃত্ত উৎসর্জন দেখিতে পাই, তখনই মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের প্রকাশ বিশেষভাবে অনুভব করি। বুদ্ধদেব বলিয়াছেন—

মাতা যথা নিযং পুত্তং আয়ুসা একপুত্তমনুরক্খে।
এবম্পি সব্বভূতেসু মানসম্ভাবযে অপরিমাণং।
মেত্তঞ্চ সর্ব্বলোকস্মিং মানসম্ভাবযে অপরিমাণং।
উদ্ধং অধো চ তিরিযঞ্চ অসম্বাধং অবেরমসপত্তং।
তিট্‌ঠঞ্চরং নিসিন্নো বা সযানো বা যাবতস্‌স বিগতমিদ্ধো।
এতং সতিং অধিট্‌ঠেয্যং ব্রহ্মমেতং বিহারমিধমাহু।

মাতা যেমন প্রাণ দিয়াও নিজের পুত্রকে রক্ষা করেন, এইরূপ সকল প্রাণীর প্রতি অপরিমাণ দয়াভাব জন্মাইবে। ঊর্ধ্বদিকে, অধোদিকে, চতুর্দিকে সমস্ত জগতের প্রতি বাধাশূন্য, হিংসাশূন্য, শত্রুতাশূন্য মানসে অপরিমাণ দয়াভাব জন্মাইবে। কি দাঁড়াইতে, কি চলিতে, কি বসিতে, কি শুইতে, যাবৎ নিদ্রিত না হইবে, এই মৈত্রভাবে অধিষ্ঠিত থাকিবে—ইহাকেই ব্রহ্মবিহার বলে।

এই যে ব্রহ্মবিহারের কথা ভগবান বুদ্ধ বলিয়াছেন, ইহা মুখের কথা নহে, ইহা অভ্যস্ত নীতিকথা নহে—আমরা জানি, ইহা তাঁহার জীবনের মধ্য হইতে সত্য হইয়া উদ্ভূত হইয়াছে। ইহা লইয়া অদ্য আমরা গৌরব করিব। এই বিশ্বব্যাপী চিরজাগ্রত করুণা, এই ব্রহ্মবিহার, এই সমস্ত-আবশ্যকের অতীত অহেতুক অপরিমেয় মৈত্রীশক্তি, মানুষের মধ্যে কেবল কথার কথা হইয়া থাকে নাই, ইহা কোনো-না-কোনো স্থানে সত্য হইয়া উঠিয়াছিল। এই শক্তিকে আর আমরা অবিশ্বাস করিতে পারি না—এই শক্তি

মনুষ্যত্বের ভাণ্ডারে চিরদিনের মতো সঞ্চিত হইয়া গেল। যে মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের অপর্যাপ্ত দয়াশক্তির এমন সত্যরূপে বিকাশ হইয়াছে, আপনাকে সেই মানুষ জানিয়া উৎসব করিতেছি।

এই ভারতবর্ষে একদিন মহাসম্রাট অশোক তাঁহার রাজশক্তিকে ধর্মবিস্তারকার্যে মঙ্গলসাধনকার্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। রাজশক্তির মাদকতা যে কী সুতীব্র তাহা আমরা সকলেই জানি—সেই শক্তি ক্ষুধিত অগ্নির মতো গৃহ হইতে গৃহান্তরে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে দেশ হইতে দেশান্তরে আপনার জ্বালাময়ী লোলুপ রসনাকে প্রেরণ করিবার জন্য ব্যগ্র। সেই বিশ্বলুব্ধ রাজশক্তিকে মহারাজ অশোক মঙ্গলের দাসত্বে নিযুক্ত করিয়াছিলেন—তৃপ্তিহীন ভোগকে বিসর্জন দিয়া তিনি শ্রান্তিহীন সেবাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। রাজত্বের পক্ষে ইহা প্রয়োজনীয় ছিল না—ইহা যুদ্ধসজ্জা নহে, দেশজয় নহে, বাণিজ্যবিস্তার নহে—ইহা মঙ্গলশক্তির অপর্যাপ্ত প্রাচুর্য—ইহা সহসা চক্রবর্তী রাজাকে আশ্রয় করিয়া তাঁহার সমস্ত রাজাড়ম্বরকে একমুহূর্তে হীনপ্রভ করিয়া দিয়া সমস্ত মনুষ্যত্বকে সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে। কত বড়ো বড়ো রাজার বড়ো বড়ো সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত বিস্মৃত ধূলিসাৎ হইয়া গিয়াছে—কিন্তু অশোকের মধ্যে এই মঙ্গলশক্তির মহান আবির্ভাব, ইহা আমাদের গৌরবের ধন হইয়া আজও আমাদের মধ্যে শক্তিসঞ্চার করিতেছে। মানুষের মধ্যে যাহা-কিছু সত্য হইয়া উঠিয়াছে, তাহার গৌরব হইতে তাহার সহায়তা হইতে মানুষ আর কোনোদিন বঞ্চিত হইবে না। আজ মানুষের মধ্যে, সমস্ত-স্বার্থজয়ী এই অদ্ভুত মঙ্গলশক্তির মহিমা স্মরণ করিয়া আমরা পরিচিত-অপরিচিত সকলে মিলিয়া উৎসব করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। মানুষের এই সকল মহত্ত্ব আজ আমাদের দীনতমকে আমাদের শ্রেষ্ঠতমের সহিত এক গৌরবের বন্ধনে মিলিত করিয়াছে। আজ আমরা মানুষের এই সকল অবারিত সাধারণসম্পদের সমান অধিকারের সূত্রে ভাই হইয়াছি—আজ মনুষ্যত্বের মাতৃশালায় আমাদের ভ্রাতৃসম্মিলন।

ঈশ্বরের শক্তিবিকাশকে আমরা প্রভাতের জ্যোতিরুন্মেষের মধ্যে দেখিয়াছি, ফাল্গুনের পুষ্পপর্যাপ্তির মধ্যে দেখিয়াছি, মহাসমুদ্রের নীলাম্বুনৃত্যের মধ্যে দেখিয়াছি, কিন্তু সমগ্র মানবের মধ্যে যেদিন তাহার বিরাট বিকাশ দেখিতে সমাগত হই, সেইদিন আমাদের মহামহোৎসব। মনুষ্যত্বের মধ্যে ঈশ্বরের মহিমা যে শত শত অভ্রভেদী শিখরমালায় জাগ্রত-বিরাজিত সেখানে সেই উত্তুঙ্গ শৈলাশ্রমে আমরা মানবমাহাত্ম্যের ঈশ্বরকে মানবসংঘের মধ্যে বসিয়া পূজা করিতে আসিয়াছি।

আমাদের ভারতবর্ষে সমস্ত উৎসবই এই মহান ভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত, এ-কথা আমরা প্রতিদিন ভুলিতে বসিয়াছি। আমাদের জীবনের যে-সমস্ত ঘটনাকে উৎসবের

ঘটনা করিয়াছি, তাহার প্রত্যেকটাতেই আমরা বিশ্বমানবের গৌরব অর্পণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। জন্মোৎসব হইতে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান পর্যন্ত কোনোটাকেই আমরা ব্যক্তিগত ঘটনার ক্ষুদ্রতার মধ্যে বদ্ধ করিয়া রাখি নাই। এই সকল উৎসবে আমরা সংকীর্ণতা বিসর্জন দিই—সেদিন আমাদের গৃহের দ্বার একেবারে উন্মুক্ত হইয়া যায়, কেবল আত্মীয়স্বজনের জন্য নহে, কেবল বন্ধুবান্ধবের জন্য নহে, রবাহূত-অনাহূতের জন্য। পুত্র যে জন্মগ্রহণ করে, সে আমার ঘরে নহে, সমস্ত মানুষের ঘরে। সমস্ত মানুষের গৌরবের অধিকারী হইয়া সে জন্মগ্রহণ করে। তাহার জন্ম-মঙ্গলের আনন্দে সমস্ত মানুষকে আহ্বান করিব না? সে যদি শুদ্ধমাত্র আমার ঘরে ভূমিষ্ঠ হইত, তবে তাহার মতো দীনহীন জগতে আর কে থাকিত। সমস্ত মানুষ যে তাহার জন্য অন্ন বস্ত্র আবাস ভাষা জ্ঞান ধর্ম প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে। মানুষের অন্তরস্থিত সেই নিত্যচেতন মঙ্গলশক্তির ক্রোড়ে জন্মগ্রহণ করিয়া সে যে একমুহূর্তে ধন্য হইয়াছে। তাহার জন্ম উপলক্ষ্যে একদিন গৃহের সমস্ত দ্বার খুলিয়া দিয়া যদি সমস্ত মানুষকে স্মরণ না করি, তবে কবে করিব। অন্য সমাজ যাহাকে গৃহের ঘটনা করিয়াছে, ভারতসমাজ তাহাকে জগতের ঘটনা করিয়াছে; এবং এই জগতের ঘটনাই জগদীশ্বরের পূর্ণমঙ্গল আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করিবার যথার্থ অবকাশ। বিবাহব্যাপারকেও ভারতবর্ষ কেবলমাত্র পতিপত্নীর আনন্দমিলনের ঘটনা বলিয়া জানে না। প্রত্যেক মঙ্গলবিবাহকে মানবসমাজের এক-একটি স্তম্ভস্বরূপ জানিয়া ভারতবর্ষ তাহা সমস্ত মানবের ব্যাপার করিয়া তুলিয়াছে—এই উৎসবেও ভারতের গৃহস্থ সমস্ত মনুষ্যকে অতিথিরূপে গৃহে অভ্যর্থনা করে—তাহা করিলেই যথার্থভাবে ঈশ্বরকে গৃহে আবাহন করা হয়—শুদ্ধমাত্র ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করিলেই হয় না। এইরূপে গৃহের প্রত্যেক বিশেষ ঘটনায় আমরা এক-একদিন গৃহকে ভুলিয়া সমস্ত মানবের সহিত মিলিত হই এবং সেইদিন সমস্ত মানবের মধ্যে ঈশ্বরের সহিত আমাদের মিলনের দিন।

হায়, এখন আমরা আমাদের উৎসবকে প্রতিদিন সংকীর্ণ করিয়া আনিতেছি। এতকালে যাহা বিনয়রসাপ্লুত মঙ্গলের ব্যাপার ছিল, এখন তাহা ঐশ্বর্যমদোদ্ধত আড়ম্বরে পরিণত হইয়াছে। এখন আমাদের হৃদয় সংকুচিত, আমাদের দ্বার রুদ্ধ। এখন কেবল বন্ধুবান্ধব এবং ধনিমানী ছাড়া মঙ্গলকর্মের দিনে আমাদের ঘরে আর কাহারও স্থান হয় না। আজ আমরা মানবসাধারণকে দূর করিয়া নিজেকে বিচ্ছিন্ন-ক্ষুদ্র করিয়া, ঈশ্বরের বাধাহীন পবিত্রপ্রকাশ হইতে বঞ্চিত করিয়া বড়ো হইলাম বলিয়া কল্পনা করি। আজ আমাদের দীপালোক উজ্জ্বলতর খাদ্য প্রচুরতর আয়োজন বিচিত্রতর হইয়াছে—কিন্তু মঙ্গলময় অন্তর্যামী দেখিতেছেন আমাদের শুষ্কতা আমাদের দীনতা আমাদের

নির্লজ্জ কৃপণতা। আড়ম্বর দিনে দিনে যতই বাড়িতেছে, ততই এই দীপালোকে এই গৃহসজ্জায় এই রসলেশশূন্য কৃত্রিমতার মধ্যে সেই শান্তমঙ্গলস্বরূপের প্রশান্ত-প্রসন্নমুখচ্ছবি আমাদের মদান্ধ দৃষ্টিপথ হইতে আচ্ছন্ন হইয়া যাইতেছে। এখন আমরা কেবল আপনাকেই দেখিতেছি, আপনার স্বর্ণরৌপ্যের চাকচিক্য দেখাইতেছি, আপনার নাম শুনিতেছি ও শুনাইতেছি।

হে ঈশ্বর, তুমি আজ আমাদিগকে আহ্বান করো। বৃহৎ মনুষ্যত্বের মধ্যে আহ্বান করো। আজ উৎসবের দিন শুদ্ধমাত্র ভাবরসসম্ভোগের দিন নহে, শুদ্ধমাত্র মাধুর্যের মধ্যে নিমগ্ন হইবার দিন নহে—আজ বৃহৎ সম্মিলনের মধ্যে শক্তি-উপলব্ধির দিন, শক্তিসংগ্রহের দিন। আজ তুমি আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন জীবনের প্রাত্যহিক জড়ত্ব প্রাত্যহিক ঔদাসীন্য হইতে উদ্বোধিত করো প্রতিদিনের নির্বীর্য নিশ্চেষ্টতা হইতে আরাম-আবেশ হইতে উদ্ধার করো। যে কঠোরতায় যে উদ্যমে যে আত্মবিসর্জনে আমাদের সার্থকতা, তাহার মধ্যে আজ আমাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করো। আমরা এতগুলি মানুষ একত্র হইয়াছি। আজ যদি, যুগে যুগে তোমার মনুষ্যসমাজের মধ্যে যে সত্যের গৌরব যে প্রেমের গৌরব যে মঙ্গলের গৌরব যে কঠিনবীর্য নির্ভীক মহত্বের গৌরব উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা না দেখিতে পাই, দেখি কেবল ক্ষুদ্র দীপের আলোক, তুচ্ছ ধনের আড়ম্বর, তবে সমস্তই ব্যর্থ হইয়া গেল—যুগে যুগে মহাপুরুষের কণ্ঠ হইতে যে-সকল অভয়বাণী-অমৃতবাণী উৎসারিত হইয়াছে, তাহা যদি মহাকালের মঙ্গলশঙ্খনির্ঘোষের মতো আজ না শুনিতে পাই—শুনি কেবল লৌকিকতার কলকলা এবং সাম্প্রদায়িকতার বাগ্‌বিন্যাস—তবে সমস্তই ব্যর্থ হইয়া গেল। এই সমস্ত ধনাড়ম্বরের নিবিড় কুজ্ঝটিকারাশি ভেদ করিয়া একবার সেই সমস্ত পবিত্র দৃশ্যের মধ্যে লইয়া যাও—যেখানে ধূলিশয্যায় নগ্নদেহে তোমার সাধক বসিয়া আছেন যেখানে তোমার সর্বত্যাগী সেবক কর্তব্যের কঠিনপথে রিক্তহস্তে ধাবমান হইয়াছেন—যেখানে তোমার বরপুত্রগণ দারিদ্র্যের দ্বারা নিষ্পিষ্ট, বিষয়ীদের দ্বারা পরিত্যক্ত, মদান্ধদের দ্বারা অপমানিত। হায় দেব, সেখানে কোথায় দীপচ্ছটা, কোথায় বাদ্যোদ্যম, কোথায় স্বর্ণভাণ্ডার, কোথায় মণিমাল্য। কিন্তু সেইখানে তেজ, সেইখানে শক্তি, সেইখানে দিব্যৈশ্বর্য, সেইখানেই তুমি। দূর করো, দূর করো এই সমস্ত আবরণ আচ্ছাদন, এই সমস্ত ক্ষুদ্র দম্ভ, এই সমস্ত মিথ্যা কোলাহল, এই সমস্ত অপবিত্র আয়োজন—মনুষ্যত্বের সেই অভ্রভেদিচূড়াবিশিষ্ট নিরাভরণ নিস্তব্ধ রাজনিকেতনের দ্বারের সম্মুখে অদ্য আমাকে দাঁড়-করাইয়া দাও। সেখানে, সেই কঠিন ক্ষেত্রে, সেই রিক্ত নির্জনতার মধ্যে, সেই বহুযুগের অনিমেষ দৃষ্টিপাতের সম্মুখে তোমার নিকট হইতে দীক্ষা লইব প্রভু।

দাও হস্তে তুলি
নিজহাতে তোমার অমোঘ শরগুলি,
তোমার অক্ষয় তূণ। অস্ত্রে দীক্ষা দেহ
রণগুরু। তোমার প্রবল পিতৃস্নেহ
ধ্বনিয়া উঠুক আজি কঠিন আদেশে।
করো মোরে সম্মানিত নববীরবেশে,
দুরূহ কর্তব্যভারে, দুঃসহ কঠোর
বেদনায়। পরাইয়া দাও অঙ্গে মোর
ক্ষতচিহ্ন-অলংকার। ধন্য করো দাসে
সফল চেষ্টায় আর নিষ্ফল প্রয়াসে।

১৩১১

দুঃখ

জগৎসংসারের বিধান সম্বন্ধে যখনই আমরা ভাবিয়া দেখিতে যাই তখনই, এ বিশ্বরাজ্যে দুঃখ কেন আছে, এই প্রশ্নই সকলের চেয়ে আমাদিগকে সংশয়ে আন্দোলিত করিয়া তোলে। আমরা কেহ বা তাহাকে মানবপিতামহের আদিম পাপের শাস্তি বলিয়া থাকি—কেহবা তাহাকে জন্মান্তরের কর্মফল বলিয়া জানি—কিন্তু তাহাতে দুঃখ তো দুঃখই থাকিয়া যায়।

না থাকিয়া যে জো নাই। দুঃখের তত্ত্ব আর সৃষ্টির তত্ত্ব যে একেবারে একসঙ্গে বাঁধা। কারণ, অপূর্ণতাই তো দুঃখ এবং সৃষ্টিই যে অপূর্ণ।

সেই অপূর্ণতাই বা কেন? এটা একবারে গোড়ার কথা। সৃষ্টি অপূর্ণ হইবে না, দেশে কালে বিভক্ত হইবে না, কার্যকারণে আবদ্ধ হইবে না, এমন সৃষ্টিছাড়া আশা আমরা মনেও আনিতে পারি না।

অপূর্ণের মধ্য দিয়া নহিলে পূর্ণের প্রকাশ হইবে কেমন করিয়া?

উপনিষৎ বলিয়াছেন যাহা কিছু প্রকাশ পাইতেছে তাহা তাঁহারই অমৃত আনন্দরূপ। তাঁহার মৃত্যুহীন ইচ্ছাই এই সমস্ত রূপে ব্যক্ত হইতেছে।

ঈশ্বরের এই যে প্রকাশ, উপনিষৎ ইহাকে তিন ভাগ করিয়া দেখিয়াছেন। একটি প্রকাশ জগতে, আর-একটি প্রকাশ মানবসমাজে, আর একটি প্রকাশ মানবাত্মায়। একটি শান্তং, একটি শিবং, একটি অদ্বৈতং।

শান্তম্ আপনাতেই আপনি স্তব্ধ থাকিলে তো প্রকাশ পাইতেই পারেন না ;—এই যে চঞ্চল বিশ্বজগৎ কেবলই ঘুরিতেছে, ইহার প্রচণ্ড গতির মধ্যেই তিনি অচঞ্চল নিয়মস্বরূপে আপন শান্তরূপকে ব্যক্ত করিতেছেন। শান্ত এই সমস্ত চাঞ্চল্যকে বিধৃত করিয়া আছেন বলিয়াই তিনি শান্ত, নহিলে তাঁহার প্রকাশ কোথায়।

শিবম্ কেবল আপনাতেই আপনি স্থির থাকিলে তাঁহাকে শিবই বলিতে পারি না। সংসারে চেষ্টা ও দুঃখের সীমা নাই, সেই কর্মক্লেশের মধ্যেই অমোঘ মঙ্গলের দ্বারা তিনি আপনার শিবস্বরূপ প্রকাশ করিতেছেন। মঙ্গল সংসারের সমস্ত দুঃখ তাপকে অতিক্রম করিয়া আছেন বলিয়াই তিনি মঙ্গল, তিনি ধর্ম, নহিলে তাঁহার প্রকাশ কোথায় ?

অদ্বৈত যদি আপনাতে আপনি এক হইয়া থাকিতেন তবে সেই ঐক্যের প্রকাশ হইত কী করিয়া ? আমাদের চিত্ত সংসারে আপনপরের ভেদবৈচিত্র্যের দ্বারা কেবলই আহত প্রতিহত হইতেছে ; সেই ভেদের মধ্যেই প্রেমের দ্বারা তিনি আপনার অদ্বৈতরূপ প্রকাশ করিতেছেন। প্রেম যদি সমস্ত ভেদের মধ্যেই সম্বন্ধ স্থাপন না করিত তবে অদ্বৈত কাহাকে অবলম্বন করিয়া আপনাকে প্রকাশ করিতেন ?

জগৎ অপূর্ণ বলিয়াই তাহা চঞ্চল, মানবসমাজ অপূর্ণ বলিয়াই তাহা সচেষ্ট, এবং আমাদের আত্মবোধ অপূর্ণ বলিয়াই আমরা আত্মাকে এবং অন্য সমস্তকে বিভিন্ন করিয়াই জানি। কিন্তু সেই চাঞ্চল্যের মধ্যেই শান্তি, দুঃখচেষ্টার মধ্যেই সফলতা এবং বিভেদের মধ্যেই প্রেম।

অতএব এ-কথা মনে রাখিতে হইবে পূর্ণতার বিপরীত শূন্যতা ; কিন্তু অপূর্ণতা পূর্ণতার বিপরীত নহে, বিরুদ্ধে নহে, তাহা পূর্ণতারই বিকাশ। গান যখন চলিতেছে যখন তাহা সমে আসিয়া শেষ হয় নাই তখন তাহা সম্পূর্ণ গান নহে বটে কিন্তু তাহা গানের বিপরীতও নহে, তাহার অংশে অংশে সেই সম্পূর্ণ গানেরই আনন্দ তরঙ্গিত হইতেছে।

এ নহিলে রস কেমন করিয়া হয় ? রসো বৈ সঃ। তিনিই যে রসস্বরূপ। অপূর্ণকে প্রতি নিমেষেই তিনি পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতেছেন বলিয়াই তো তিনি রস। তাঁহাতে করিয়া সমস্ত ভরিয়া উঠিতেছে, ইহাই রসের আকৃতি, ইহাই রসের প্রকৃতি। সেইজন্যই জগতের প্রকাশ আনন্দরূপমমৃতং—ইহাই আনন্দের রূপ, ইহা আনন্দের অমৃতরূপ।

সেইজন্যই এই অপূর্ণ জগৎ শূন্য নহে, মিথ্যা নহে। সেইজন্যই এ-জগতে রূপের মধ্যে অপরূপ, শব্দের মধ্যে বেদনা, ঘ্রাণের মধ্যে ব্যাকুলতা আমাদিগকে কোন্ অনির্বচনীয়তায় নিমগ্ন করিয়া দিতেছে। সেইজন্য আকাশ কেবলমাত্র আমাদিগকে বেষ্টন করিয়া নাই তাহা আমাদের হৃদয়কে বিস্ফারিত করিয়া দিতেছে ; আলোক কেবল

আমাদের দৃষ্টিকে সার্থক করিতেছে না তাহা আমাদের অন্তঃকরণকে উদ্বোধিত করিয়া তুলিতেছে এবং যাহা কিছু আছে তাহা কেবল আছে মাত্র নহে, তাহাতে আমাদের চিত্তকে চেতনায়, আমাদের আত্মাকে সত্যে সম্পূর্ণ করিতেছে।

যখন দেখি শীতকালের পদ্মার নিস্তরঙ্গ নীলকান্ত জলস্রোত পীতাভ বালুতটের নিঃশব্দ নির্জনতার মধ্য দিয়া নিরুদ্দেশ হইয়া যাইতেছে—তখন কী বলিব, এ কী হইতেছে। নদীর জল বহিতেছে এই বলিলেই তো সব বলা হইল না—এমন কি, কিছুই বলা হইল না। তাহার আশ্চর্য শক্তি ও আশ্চর্য সৌন্দর্যের কী বলা হইল। সেই বচনের অতীত পরম পদার্থকে সেই অপরূপ রূপকে, সেই ধ্বনিহীন সংগীতকে, এই জলের ধারা কেমন করিয়া এত গভীরভাবে ব্যক্ত করিতেছে। এ তো কেবলমাত্র জল ও মাটি—"মৃৎপিণ্ডো জলরেখয়া বলয়িতঃ"— কিন্তু যাহা প্রকাশ হইয়া উঠিতেছে তাহা কী। তাহাই আনন্দরূপমমৃতম্, তাহাই আনন্দের অমৃতরূপ।

আবার কালবৈশাখীর প্রচণ্ড ঝড়েও এই নদীকে দেখিয়াছি। বালি উড়িয়া সূর্যাস্তের রক্তচ্ছটাকে পাণ্ডুবর্ণ করিয়া তুলিয়াছে কশাহত কালোঘোড়ার মসৃণ চর্মের মতো নদীর জল রহিয়া রহিয়া কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে পরপারের স্তব্ধ তরুশ্রেণীর উপরকার আকাশে একটা নিঃস্পন্দ আতঙ্কের বিবর্ণতা ফুটিয়া উঠিয়াছে, তার পর সেই জলস্থল-আকাশের জালের মাঝখানে নিজের ছিন্নবিচ্ছিন্ন মেঘমধ্যে জড়িত আবর্তিত হইয়া উন্মত্ত ঝড় একেবারে দিশাহারা হইয়া আসিয়া পড়িল সেই আবির্ভাব দেখিয়াছি। তাহা কি কেবল মেঘ এবং বাতাস, ধুলা এবং বালি, জল এবং ডাঙা? এই সমস্ত অকিঞ্চিৎকরের মধ্যে এ যে অপরূপের দর্শন। এই তো রস। ইহা তো শুধু বীণার কাঠ ও তার নহে ইহাই বীণার সংগীত। এই সংগীতেই আনন্দের পরিচয় সেই আনন্দরূপমমৃতম্।

আবার মানুষের মধ্যে যাহা দেখিয়াছি তাহা মানুষকে কতদূরেই ছাড়াইয়া গেছে। রহস্যের অন্ত পাই নাই। শক্তি এবং প্রীতি কত লোকের এবং কত জাতির ইতিহাসে কত আশ্চর্য আকার ধরিয়া কত অচিন্ত্য ঘটনা ও কত অসাধ্যসাধনের মধ্যে সীমার বন্ধনকে বিদীর্ণ করিয়া ভূমাকে প্রত্যক্ষ করাইয়া দিয়াছে। মানুষের মধ্যে ইহাই আনন্দরূপমমৃতম্।

কে যেন বিশ্বমহোৎসবে এই নীলাকাশের মহাপ্রাঙ্গণে অপূর্ণতার পাত পাড়িয়া গিয়াছেন—সেইখানে আমরা পূর্ণতার ভোজে বসিয়া গিয়াছি। সেই পূর্ণতা কত বিচিত্র রূপে এবং কত বিচিত্র স্বাদে ক্ষণে ক্ষণে আমাদিগকে অভাবনীয় ও অনির্বচনীয় চেতনার বিস্ময়ে জাগ্রত করিয়া তুলিতেছে।

এমন নহিলে রসস্বরূপ রস দিবেন কেমন করিয়া। এই রস অপূর্ণতার সুকঠিন দুঃখকে কানায় কানায় ভরিয়া তুলিয়া উছলিয়া পড়িয়া যাইতেছে। এই দুঃখের সোনার পাত্রটি কঠিন বলিয়াই কি ইহাকে ভাঙিয়া চুরমার করিয়া এতবড়ো রসের ভোজকে ব্যর্থ করিবার চেষ্টা করিতে হইবে; না, পরিবেষণের লক্ষ্মীকে ডাকিয়া বলিব হ'ক হ'ক কঠিন হ'ক কিন্তু ইহাকে ভরপুর করিয়া দাও, আনন্দ ইহাকে ছাপাইয়া উঠুক?

জগতের এই অপূর্ণতা যেমন পূর্ণতার বিপরীত নহে, কিন্তু তাহা যেমন পূর্ণতারই একটি প্রকাশ তেমনি এই অপূর্ণতার নিত্যসহচর দুঃখও আনন্দের বিপরীত নহে তাহা আনন্দেরই অঙ্গ। অর্থাৎ দুঃখের পরিপূর্ণতা ও সার্থকতা দুঃখই নহে তাহা আনন্দ। দুঃখও আনন্দরূপমমৃতম্।

এ-কথা কেমন করিয়া বলি? ইহাকে সম্পূর্ণ প্রমাণ করিবই বা কী করিয়া?

কিন্তু অমাবস্যার অন্ধকারে অনন্ত জ্যোতিষ্কলোককে যেমন প্রকাশ করিয়া দেয়, তেমনি দুঃখের নিবিড়তম তমসার মধ্যে অবতীর্ণ হইয়া আত্মা কি কোনোদিনই আনন্দলোকের ধ্রুবদীপ্তি দেখিতে পায় নাই—হঠাৎ কি কখনোই বলিয়া উঠে নাই — বুঝিয়াছি, দুঃখের রহস্য বুঝিয়াছি, আর কখনো সংশয় করিব না? পরম দুঃখের শেষ প্রান্ত যেখানে গিয়া মিলিয়া গেছে সেখানে কি আমাদের হৃদয় কোনো শুভমুহূর্তে চাহিয়া দেখে নাই? অমৃত ও মৃত্যু, আনন্দ ও দুঃখ সেখানে কি এক হইয়া যায় নাই, সেইদিকেই কি তাকাইয়া ঋষি বলেন নাই

যস্যচ্ছায়ামৃতং যস্য মৃত্যুঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম।

অমৃত যাঁহার ছায়া এবং মৃত্যুও যাঁহার ছায়া তিনি ছাড়া আর কোন্ দেবতাকে পূজা করিব।

ইহা কি তর্কের বিষয়, ইহা কি আমাদের উপলব্ধির বিষয় নহে? সমস্ত মানুষের অন্তরের মধ্যে এই উপলব্ধি গভীরভাবে আছে বলিয়াই মানুষ দুঃখকেই পূজা করিয়া আসিয়াছে আরামকে নহে। জগতের ইতিহাসে মানুষের পরমপূজ্যগণ দুঃখেরই অবতার, আরামে লালিত লক্ষ্মীর ক্রীতদাস নহে।

অতএব দুঃখকে আমরা দুর্বলতাবশত খর্ব করিব না, অস্বীকার করিব না, দুঃখের দ্বারাই আনন্দকে আমরা বড়ো করিয়া এবং মঙ্গলকে আমরা সত্য করিয়া জানিব।

এ-কথা আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে অপূর্ণতার গৌরবই দুঃখ; দুঃখই এই অপূর্ণতার সম্পৎ, দুঃখই তাহার একমাত্র মূলধন। মানুষ সত্যপদার্থ যাহা কিছু পায় তাহা দুঃখের দ্বারাই পায় বলিয়াই তাহার মনুষ্যত্ব। তাহার ক্ষমতা অল্প বটে কিন্তু ঈশ্বর তাহাকে ভিক্ষুক করেন নাই। সে শুধু চাহিয়াই কিছু পায় না, দুঃখ করিয়া

পায়। আর যত কিছু ধন সে তো তাহার নহে—সে সমস্তই বিশ্বেশ্বরের– কিন্তু দুঃখ যে তাহার নিতান্তই আপনার। সেই দুঃখের ঐশ্বর্যেই অপূর্ণ জীব পূর্ণস্বরূপের সহিত আপনার গর্বের সম্বন্ধ রক্ষা করিয়াছে, তাহাকে লজ্জা পাইতে হয় নাই। সাধনার দ্বারা আমরা ঈশ্বরকে পাই, তপস্যার দ্বারা আমরা ব্রহ্মকে লাভ করি—তাহার অর্থই এই, ঈশ্বরের মধ্যে যেমন পূর্ণতা আছে আমাদের মধ্যে তেমনই পূর্ণতার মূল্য আছে—তাহাই দুঃখ; সেই দুঃখই সাধনা, সেই দুঃখই তপস্যা, সেই দুঃখেরই পরিণাম আনন্দ মুক্তি ঈশ্বর।

আমাদের পক্ষ হইতে ঈশ্বরকে যদি কিছু দিতে হয় তবে কী দিব, কী দিতে পারি? তাঁহার ধন তাঁহাকে দিয়া তো তৃপ্তি নাই—আমাদের একটিমাত্র যে আপনার ধন দুঃখধন আছে তাহাই তাঁহাকে সমর্পণ করিতে হয়। এই দুঃখকেই তিনি আনন্দ দিয়া, তিনি আপনাকে দিয়া পূর্ণ করিয়া দেন— নহিলে তিনি আনন্দ ঢালিবেন কোন্‌খানে? আমাদের এই আপন ঘরের পাত্রটি না থাকিলে তাঁহার সুধা তিনি দান করিতেন কী করিয়া। এই কথাই আমরা গৌরব করিয়া বলিতে পারি। দানেই ঐশ্বর্যের পূর্ণতা। হে ভগবান, আনন্দকে দান করিবার বর্ষণ করিবার প্রবাহিত করিবার এই যে তোমার শক্তি ইহা তোমার পূর্ণতারই অঙ্গ। আনন্দ আপনাতে বদ্ধ হইয়া সম্পূর্ণ হয় না, আনন্দ আপনাকে ত্যাগ করিয়াই সার্থক—তোমার সেই আপনাকে দান করিবার পরিপূর্ণতা আমরাই বহন করিতেছি, আমাদের দুঃখের দ্বারা বহন করিতেছি, এই আমাদের বড়ো অভিমান; এইখানেই তোমাতে আমাতে মিলিয়াছি, এইখানেই তোমার ঐশ্বর্যে আমার ঐশ্বর্যে যোগ—এইখানে তুমি আমাদের অতীত নহ, এইখানেই তুমি আমাদের মধ্যে নামিয়া আসিয়াছ; তুমি তোমার অগণ্য গ্রহসূর্যনক্ষত্র-খচিত মহাসিংহাসন হইতে আমাদের এই দুঃখের জীবনে তোমার লীলা সম্পূর্ণ করিতে আসিয়াছ। হে রাজা, তুমি আমাদের দুঃখের রাজা; হঠাৎ যখন অর্ধরাত্রে তোমার রথচক্রের বজ্রগর্জনে মেদিনী বলির পশুর হৃৎপিণ্ডের মতো কাঁপিয়া উঠে তখন জীবনে তোমার সেই প্রচণ্ড আবির্ভাবের মহাক্ষণে যেন তোমার জয়ধ্বনি করিতে পারি, হে দুঃখের ধন, তোমাকে চাহি না এমন কথা সেদিন যেন ভয়ে না বলি;—সেদিন যেন দ্বার ভাঙিয়া ফেলিয়া তোমাকে ঘরে প্রবেশ করিতে না হয়—যেন সম্পূর্ণ জাগ্রত হইয়া সিংহদ্বার খুলিয়া দিয়া তোমার উদ্দীপ্ত ললাটের দিকে দুই চক্ষু তুলিয়া বলিতে পারি, হে দারুণ, তুমিই আমার প্রিয়।

আমরা দুঃখের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া অনেকবার বলিবার চেষ্টা করিয়া থাকি যে আমরা সুখদুঃখকে সমান করিয়া বোধ করিব। কোনো উপায়ে চিত্তকে অসাড় করিয়া

ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে সেরূপ উদাসীন হওয়া হয়তো অসম্ভব না হইতে পারে। কিন্তু সুখদুঃখ তো কেবলই নিজের নহে, তাহা যে জগতের সমস্ত জীবের সঙ্গে জড়িত। আমার দুঃখবোধ চলিয়া গেলেই তো সংসার হইতে দুঃখ দূর হয় না।

অতএব, কেবলমাত্র নিজের মধ্যে নহে, দুঃখকে তাহার সেই বিরাট রঙ্গভূমির মাঝখানে দেখিতে হইবে যেখানে সে আপনার বহ্নির তাপে বজ্রের আঘাতে কত জাতি কত রাজ্য কত সমাজ গড়িয়া তুলিতেছে; যেখানে সে মানুষের জিজ্ঞাসাকে দুর্গম পথে ধাবিত করিতেছে, মানুষের ইচ্ছাকে দুর্ভেদ্য বাধার ভিতর দিয়া উদ্ভিন্ন করিয়া তুলিতেছে এবং মানুষের চেষ্টাকে কোনো ক্ষুদ্র সফলতার মধ্যে নিঃশেষিত হইতে দিতেছে না; যেখানে যুদ্ধবিগ্রহ দুর্ভিক্ষমারী অন্যায় অত্যাচার তাহার সহায়; যেখানে রক্তসরোবরের মাঝখান হইতে শুভ্র শান্তিকে সে বিকশিত করিয়া তুলিতেছে, দারিদ্র্যের নিষ্ঠুর তাপের দ্বারা শোষণ করিয়া বর্ষণের মেঘকে রচনা করিতেছে এবং যেখানে হলধরমূর্তিতে সুতীক্ষ্ণ লাঙল দিয়া সে মানব-হৃদয়কে বারংবার শত শত রেখায় দীর্ণ বিদীর্ণ করিয়াই তাহাকে ফলবান করিয়া তুলিতেছে। সেখানে সেই দুঃখের হস্ত হইতে পরিত্রাণকে পরিত্রাণ বলে না—সেই পরিত্রাণই মৃত্যু—সেখানে স্বেচ্ছায় অঞ্জলি রচনা করিয়া যে তাহাকে প্রথম অর্ঘ্য না দিয়াছে সে নিজেই বিড়ম্বিত হইয়াছে।

মানুষের এই যে দুঃখ ইহা কেবল কোমল অশ্রুবাষ্পে আচ্ছন্ন নহে, ইহা রুদ্রতেজে উদ্দীপ্ত। বিশ্বজগতে তেজঃপদার্থ যেমন, মানুষের চিত্তে দুঃখ সেইরূপ; তাহাই আলোক, তাহাই তাপ, তাহাই গতি, তাহাই প্রাণ; তাহাই চক্রপথে ঘুরিতে ঘুরিতে মানব-সমাজে নূতন নূতন কর্মলোক ও সৌন্দর্যলোক সৃষ্টি করিতেছে—এই দুঃখের তাপ কোথাও বা প্রকাশ পাইয়া কোথাও বা প্রচ্ছন্ন থাকিয়া মানব-সংসারের সমস্ত বায়ুপ্রবাহগুলিকে বহমান করিয়া রাখিয়াছে।

মানুষের এই দুঃখকে আমরা ক্ষুদ্র করিয়া বা দুর্বলভাবে দেখিব না। আমরা বক্ষ বিস্ফারিত ও মস্তক উন্নত করিয়াই ইহাকে স্বীকার করিব। এই দুঃখের শক্তির দ্বারা নিজেকে ভস্ম করিব না, নিজেকে কঠিন করিয়া গড়িয়া তুলিব। দুঃখের দ্বারা নিজেকে উপরে না তুলিয়া নিজেকে অভিভূত করিয়া অতলে তলাইয়া দেওয়াই দুঃখের অবমাননা—যাহাকে যথার্থভাবে বহন করিতে পারিলেই জীবন সার্থক হয় তাহার দ্বারা আত্মহত্যা সাধন করিতে বসিলে দুঃখদেবতার কাছে অপরাধী হইতে হয়। দুঃখের দ্বারা আত্মাকে অবজ্ঞা না করি, দুঃখের দ্বারাই যেন আত্মার সম্মান উপলব্ধি করিতে পারি। দুঃখ ছাড়া সে সম্মান বুঝিবার আর কোনো পন্থা নাই।

কারণ, পূর্বেই আভাস দিয়াছি দুঃখই জগতে একমাত্র সকল পদার্থের মূল্য। মানুষ

যাহা কিছু নির্মাণ করিয়াছে তাহা দুঃখ দিয়াই করিয়াছে। দুঃখ দিয়া যাহা না করিয়াছে তাহা তাহার সম্পূর্ণ আপন হয় না।

সেইজন্য ত্যাগের দ্বারা দানের দ্বারা তপস্যার দ্বারা দুঃখের দ্বারাই আমরা আপন আত্মাকে গভীররূপে লাভ করি—সুখের দ্বারা আরামের দ্বারা নহে। দুঃখ ছাড়া আর কোনো উপায়েই আপন শক্তিকে আমরা জানিতে পারি না। এবং আপন শক্তিকে যতই কম করিয়া জানি আত্মার গৌরবও তত কম করিয়া বুঝি যথার্থ আনন্দও তত অগভীর হইয়া থাকে।

রামায়ণে কবি রামকে সীতাকে লক্ষ্মণকে ভরতকে দুঃখের দ্বারাই মহিমান্বিত করিয়া তুলিয়াছেন। রামায়ণের কাব্যরসে মানুষ যে আনন্দের মঙ্গলময় মূর্তি দেখিয়াছে দুঃখই তাহাকে ধারণ করিয়া আছে। মহাভারতেও সেইরূপ। মানুষের ইতিহাসে যত বীরত্ব যত মহত্ত্ব সমস্তই দুঃখের আসনে প্রতিষ্ঠিত। মাতৃস্নেহের মূল্য দুঃখে, পাতিব্রত্যের মূল্য দুঃখে, বীর্যের মূল্য দুঃখে, পুণ্যের মূল্য দুঃখে।

এই মূল্যটুকু ঈশ্বর যদি মানুষের নিকট হইতে হরণ করিয়া লইয়া যান, যদি তাহাকে অবিমিশ্র সুখ ও আরামের মধ্যে লালিত করিয়া রাখেন, তবেই আমাদের অপূর্ণতা যথার্থ লজ্জাকর হয়, তাহার মর্যাদা একেবারে চলিয়া যায়। তাহা হইলে কিছুকেই আর আপনার অর্জিত বলিতে পারি না, সমস্তই দানের সামগ্রী হইয়া উঠে। আজ ঈশ্বরের শস্যকে কর্ষণের দুঃখের দ্বারা আমরা আমার করিতেছি, ঈশ্বরের পানীয় জলকে বহনের দুঃখের দ্বারা আমার করিতেছি, ঈশ্বরের অগ্নিকে ঘর্ষণের দুঃখের দ্বারা আমার করিতেছি। ঈশ্বর আমাদের অত্যন্ত প্রয়োজনের সামগ্রীকেও সহজে দিয়া আমাদের অসম্মান করেন নাই;—ঈশ্বরের দানকেও বিশেষরূপে আমাদের করিয়া লইলে তবেই তাহাকে পাই নহিলে তাহাকে পাই না। সেই দুঃখ তুলিয়া লইলে জগৎসংসারে আমাদের সমস্ত দাবি চলিয়া যায়, আমাদের নিজের কোনো দলিল থাকে না;—আমরা কেবল দাতার ঘরে বাস করি, নিজের ঘরে নহে। কিন্তু তাহাই যথার্থ অভাব—মানুষের পক্ষে দুঃখের অভাবের মতো এতবড়ো অভাব আর কিছু হইতেই পারে না।

উপনিষৎ বলিয়াছেন—

> স তপোহতপ্যত স তপস্তপ্ত্বা সর্বমসৃজত যদিদং কিঞ্চ।
>
> তিনি তপ করিলেন, তিনি তপ করিয়া এই যাহা কিছু সমস্ত সৃষ্টি করিলেন।

সেই তাঁহার তপই দুঃখরূপে জগতে বিরাজ করিতেছে। আমরা অন্তরে বাহিরে যাহা কিছু সৃষ্টি করিতে যাই সমস্তই তপ করিয়া করিতে হয়—আমাদের সমস্ত জন্মই বেদনার মধ্য দিয়া, সমস্ত লাভই ত্যাগের পথ বাহিয়া, সমস্ত অমৃতত্বই মৃত্যুর সোপান অতিক্রম

করিয়া। ঈশ্বরের সৃষ্টির তপস্যাকে আমরা এমনি করিয়াই বহন করিতেছি। তাঁহারই তপের তাপ নব নব রূপে মানুষের অন্তরে নব নব প্রকাশকে উন্মেষিত করিতেছে।

সেই তপস্যাই আনন্দের অঙ্গ। সেইজন্য আর-একদিক দিয়া বলা হইয়াছে

আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে।
আনন্দ হইতেই এই ভূত সকল উৎপন্ন হইয়াছে।

আনন্দ ব্যতীত সৃষ্টির এতবড়ো দুঃখকে বহন করিবে কে।

কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ।

কৃষক চাষ করিয়া যে ফসল ফলাইতেছে সেই ফসলে তাহার তপস্যা যতবড়ো, তাহার আনন্দও ততখানি। সম্রাটের সাম্রাজ্যরচনা বৃহৎ দুঃখ এবং বৃহৎ আনন্দ, দেশভক্তের দেশকে প্রাণ দিয়া গড়িয়া তোলা পরম দুঃখ এবং পরম আনন্দ—জ্ঞানীর জ্ঞানলাভ এবং প্রেমিকের প্রিয়সাধনাও তাই।

খ্রীস্টান শাস্ত্রে বলে ঈশ্বর মানবগৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া বেদনার ভার বহন ও দুঃখের কণ্টক-কিরীট মাথায় পরিয়াছিলেন। মানুষের সকল প্রকার পরিত্রাণের একমাত্র মূল্যই সেই দুঃখ। মানুষের নিতান্ত আপন সামগ্রী যে দুঃখ, প্রেমের দ্বারা তাহাকে ঈশ্বরও আপন করিয়া এই দুঃখসংগমে মানুষের সঙ্গে মিলিয়াছেন—দুঃখকে অপরিসীম মুক্তিতে ও আনন্দে উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছেন—ইহাই খ্রীস্টানধর্মের মর্মকথা।

আমাদের দেশেও কোনো সম্প্রদায়ের সাধকেরা ঈশ্বরকে দুঃখদারুণ ভীষণ মূর্তির মধ্যেই মা বলিয়া ডাকিয়াছেন। সে-মূর্তিকে বাহ্যত কোথাও তাঁহারা মধুর ও কোমল, শোভন ও সুখকর করিবার লেশমাত্র চেষ্টা করেন নাই। সংহার-রূপকেই তাঁহারা জননী বলিয়া অনুভব করিতেছেন। এই সংহারের বিভীষিকার মধ্যেই তাঁহারা শক্তি ও শিবের সম্মিলন প্রত্যক্ষ করিবার সাধনা করেন।

শক্তিতে ও ভক্তিতে যাহারা দুর্বল, তাহারাই কেবল সুখস্বাচ্ছন্দ্য-শোভাসম্পদের মধ্যেই ঈশ্বরের আবির্ভাবকে সত্য বলিয়া অনুভব করিতে চায়। তাহারা বলে ধনমানই ঈশ্বরের প্রসাদ, সৌন্দর্যই ঈশ্বরের মূর্তি, সংসারসুখের সফলতাই ঈশ্বরের আশীর্বাদ এবং তাহাই পুণ্যের পুরস্কার। ঈশ্বরের দয়াকে তাহারা বড়োই সকরুণ বড়োই কোমলকান্ত রূপে দেখে। সেইজন্যই এই সকল দুর্বলচিত্ত সুখের পূজারিগণ ঈশ্বরের দয়াকে নিজের লোভের, মোহের ও ভীরুতার সহায় বলিয়া ক্ষুদ্র ও খণ্ডিত করিয়া জানে।

কিন্তু হে ভীষণ, তোমার দয়াকে তোমার আনন্দকে কোথায় সীমাবদ্ধ করিব? কেবল সুখে, কেবল সম্পদে, কেবল জীবনে, কেবল নিরাপদ নিরাতঙ্কতায়? দুঃখ বিপদ মৃত্যু ও ভয়কে তোমা হইতে পৃথক করিয়া তোমার বিরুদ্ধে দাঁড় করাইয়া জানিতে

হইবে ? তাহা নহে। হে পিতা, তুমিই দুঃখ তুমিই বিপদ, হে মাতা, তুমিই মৃত্যু তুমিই ভয়। তুমিই

ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং।

তুমিই

লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ সমন্তাৎ লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈর্জ্বলদ্ভিঃ
তেজোভিরাপূর্য জগৎ সমগ্রং ভাসস্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষ্ণোঃ।

সমগ্র লোককে তোমার জ্বলৎবদনের দ্বারা গ্রাস করিতে করিতে লেহন করিতেছ, সমস্ত জগৎকে তেজের দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া, হে বিষ্ণু, তোমার উগ্রজ্যোতি প্রতপ্ত হইতেছে।

হে রুদ্র, তোমারই দুঃখরূপ তোমারই মৃত্যুরূপ দেখিলে আমরা দুঃখ ও মৃত্যুর মোহ হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া তোমাকেই লাভ করি। নতুবা ভয়ে ভয়ে তোমার বিশ্বজগতে কাপুরুষের মতো সংকুচিত হইয়া বেড়াইতে হয়—সত্যের নিকট নিঃসংশয়ে আপনাকে সম্পূর্ণ সমর্পণ করিতে পারি না। তখন দয়াময় বলিয়া ভয়ে তোমার নিকটে দয়া চাহি—তোমার কাছে তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনি—তোমার হাত হইতে আপনাকে রক্ষা করিবার জন্য তোমার কাছে ক্রন্দন করি।

কিন্তু হে প্রচণ্ড, আমি তোমার কাছে সেই শক্তি প্রার্থনা করি যাহাতে তোমার দয়াকে দুর্বলভাবে নিজের আরামের নিজের ক্ষুদ্রতার উপযোগী করিয়া না কল্পনা করি—তোমাকে অসম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিয়া নিজেকে না প্রবঞ্চিত করি। কম্পিত হৃৎপিণ্ড লইয়া অশ্রুসিক্ত নেত্রে তোমাকে দয়াময় বলিয়া নিজেকে ভুলাইব না ;—তুমি যে মানুষকে যুগে যুগে অসত্য হইতে সত্যে অন্ধকার হইতে জ্যোতিতে মৃত্যু হইতে অমৃতে উদ্ধার করিতেছ, সেই যে উদ্ধারের পথ সে তো আরামের পথ নহে সে যে পরম দুঃখেরই পথ। মানুষের অন্তরাত্মা প্রার্থনা করিতেছে

আবিরাবীর্ম এধি।

হে আবিঃ, তুমি আমার নিকট আবির্ভূত হও।

হে প্রকাশ, তুমি আমার কাছে প্রকাশিত হও—এ প্রকাশ তো সহজ নহে। এ যে প্রাণান্তিক প্রকাশ। অসত্য যে আপনাকে দগ্ধ করিয়া তবেই সত্যে উজ্জ্বল হইয়া উঠে, অন্ধকার যে আপনাকে বিসর্জন করিয়া তবেই জ্যোতিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে এবং মৃত্যু যে আপনাকে বিদীর্ণ করিয়া তবেই অমৃতে উদ্ভিন্ন হইয়া উঠে। হে আবিঃ, মানুষের জ্ঞানে মানুষের কর্মে মানুষের সমাজে তোমার আবির্ভাব এইরূপেই। এই কারণে ঋষি তোমাকে করুণাময় বলিয়া ব্যর্থ সম্বোধন করেন নাই। তোমাকে বলিয়াছেন,

রুদ্র, যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্‌।

হে রুদ্র, তোমার যে প্রসন্ন মুখ তাহার দ্বারা আমাকে সর্বদা রক্ষা করো।

হে রুদ্র, তোমার যে সেই রক্ষা, তাহা ভয় হইতে রক্ষা নহে, বিপদ হইতে রক্ষা নহে, মৃত্যু হইতে রক্ষা নহে,—তাহা জড়তা হইতে রক্ষা, ব্যর্থতা হইতে রক্ষা, তোমার অপ্রকাশ হইতে রক্ষা। হে রুদ্র, তোমার প্রসন্নমুখ কখন দেখি, যখন আমরা ধনের বিলাসে লালিত, মানের মদে মত্ত, খ্যাতির অহংকারে আত্মবিস্মৃত, যখন আমরা নিরাপদ অকর্মণ্যতার মধ্যে সুখসুপ্ত তখন? নহে, নহে, কদাচ নহে। যখন আমরা অজ্ঞানের বিরুদ্ধে অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াই, যখন আমরা ভয়ে ভাবনায় সত্যকে লেশমাত্র অস্বীকার না করি, যখন আমরা দুরূহ ও অপ্রিয় কর্মকেও গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত না হই, যখন আমরা কোনো সুবিধা কোনো শাসনকেই তোমার চেয়ে বড়ো বলিয়া মান্য না করি—তখনই বধে বন্ধনে আঘাতে অপমানে দারিদ্র্যে দুর্যোগে, হে রুদ্র, তোমার প্রসন্ন মুখের জ্যোতি জীবনকে মহিমান্বিত করিয়া তুলে। তখন দুঃখ এবং মৃত্যু, বিঘ্ন এবং বিপদ প্রবল সংঘাতের দ্বারা তোমার প্রচণ্ড আনন্দভেরী ধ্বনিত করিয়া আমাদের সমস্ত চিত্তকে জাগরিত করিয়া দেয়। নতুবা সুখে আমাদের সুখ নাই, ধনে আমাদের মঙ্গল নাই, আলস্যে আমাদের বিশ্রাম নাই। হে ভয়ংকর, হে প্রলয়ংকর, হে শংকর, হে ময়স্কর, হে পিতা, হে বন্ধু, অন্তঃকরণের সমস্ত জাগ্রত শক্তির দ্বারা উদ্যত চেষ্টার দ্বারা অপরাজিত চিত্তের দ্বারা তোমাকে ভয়ে দুঃখে মৃত্যুতে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিব, কিছুতেই কুণ্ঠিত অভিভূত হইব না এই ক্ষমতা আমাদের মধ্যে উত্তরোত্তর বিকাশ লাভ করিতে থাকুক এই আশীর্বাদ করো। জাগাও হে জাগাও—যে ব্যক্তি ও যে জাতি আপন শক্তি ও ধনসম্পদকেই জগতের সর্বাপেক্ষা শ্রেয় বলিয়া অন্ধ হইয়া উঠিয়াছে তাহাকে প্রলয়ের মধ্যে যখন একমুহূর্তে জাগাইয়া তুলিবে তখন, হে রুদ্র, সেই উদ্ধত ঐশ্বর্যের বিদীর্ণ প্রাচীর ভেদ করিয়া তোমার যে জ্যোতি বিকীর্ণ হইবে তাহাকে আমরা যেন সৌভাগ্য বলিয়া জানিতে পারি—এবং যে ব্যক্তি ও যে জাতি আপন শক্তি ও সম্পদকে একেবারেই অবিশ্বাস করিয়া জড়তা, দৈন্য ও অপমানের মধ্যে নির্জীব অসাড় হইয়া পড়িয়া আছে তাহাকে যখন দুর্ভিক্ষ ও মারী ও প্রবলের অবিচার আঘাতের পর আঘাতে অস্থিমজ্জায় কম্পান্বিত করিয়া তুলিবে তখন তোমার সেই দুঃসহ দুর্দিনকে আমরা যেন সমস্ত জীবন সমর্পণ করিয়া সম্মান করি—এবং তোমার সেই ভীষণ আবির্ভাবের সম্মুখে দাঁড়াইয়া যেন বলিতে পারি—

আবিরাবীর্ম এধি—রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্‌।

দারিদ্র্য ভিক্ষুক না করিয়া যেন আমাদিগকে দুর্গম পথের পথিক করে, এবং দুর্ভিক্ষ

ও মারী আমাদিগকে মৃত্যুর মধ্যে নিমজ্জিত না করিয়া সচেষ্টতর জীবনের দিকে আকর্ষণ করে। দুঃখ আমাদের শক্তির কারণ হউক, শোক আমাদের মুক্তির কারণ হউক, এবং লোকভয় রাজভয় ও মৃত্যুভয় আমাদের জয়ের কারণ হউক। বিপদের কঠোর পরীক্ষায় আমাদের মনুষ্যত্বকে সম্পূর্ণ সপ্রমাণ করিলে তবেই, হে রুদ্র, তোমার দক্ষিণমুখ আমাদিগকে পরিত্রাণ করিবে ; নতুবা অশক্তের প্রতি অনুগ্রহ, অলসের প্রতি প্রশ্রয়, ভীরুর প্রতি দয়া কদাচই তাহা করিবে না—কারণ সেই দয়াই দুর্গতি, সেই দয়াই অবমাননা ; এবং হে মহারাজ, সে দয়া তোমার দয়া নহে।

১৩১৪

শান্তং শিবমদ্বৈতম্

অনন্ত বিশ্বের প্রচণ্ড শক্তিসংঘ দশদিকে ছুটিয়াছে, যিনি শান্তং, তিনি কেন্দ্রস্থলে ধ্রুব হইয়া অচ্ছেদ্য শান্তির বল্গা দিয়া সকলকেই বাঁধিয়া রাখিয়াছেন, কেহ কাহাকেও অতিক্রম করিতে পারিতেছে না। মৃত্যু চতুর্দিকে সঞ্চরণ করিতেছে কিন্তু কিছুই ধ্বংস করিতেছে না, জগতের সমস্ত চেষ্টা স্ব স্ব স্থানে একমাত্র প্রবল কিন্তু তাহাদের সকলের মধ্যে আশ্চর্য সামঞ্জস্য ঘটিয়া অনন্ত আকাশে এক বিপুল সৌন্দর্যের বিকাশ হইতেছে। কতই ওঠাপড়া কতই ভাঙাচোরা চলিতেছে, কত হানাহানি কত বিপ্লব, তবু লক্ষ লক্ষ বৎসরের অবিশ্রাম আঘাতচিহ্ন বিশ্বের চিরনূতন মুখচ্ছবিতে লক্ষ্যই করিতে পারি না। সংসারের অনন্ত চলাচল অনন্ত কোলাহলের মর্মস্থান হইতে নিত্যকাল এক মন্ত্র ধ্বনিত হইতেছে শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ। যিনি শান্তং তাঁহারই আনন্দমূর্তি চরাচরের মহাসনের উপরে ধ্রুবরূপে প্রতিষ্ঠিত।

আমাদের অন্তরাত্মাতেও সেই শান্তং যে নিয়ত বিরাজ করিতেছেন, তাঁহার সাক্ষাৎলাভ হইবে কী উপায়ে? সেই শান্তস্বরূপের উপাসনা করিতে হইবে কেমন করিয়া? তাঁহার শান্তরূপ আমাদের কাছে প্রকাশ হইবে কবে?

আমরা নিজেরা শান্ত হইলেই সেই শান্তস্বরূপের আবির্ভাব আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হইবে। আমাদের অতিক্ষুদ্র অশান্তিতে জগতের কতখানি যে আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, তাহা কি লক্ষ্য করিয়া দেখি নাই? নিভৃত নদীতীরে প্রশান্ত সন্ধ্যায় আমরা দুজনমাত্র লোক যদি কলহ করি, তবে সায়াহ্নের যে অপরিমেয় স্নিগ্ধ নিঃশব্দতা আমাদের পদতলের তৃণাগ্র হইতে আরম্ভ করিয়া সুদূরতম নক্ষত্রলোক পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে, দুটিমাত্র অতিক্ষুদ্র ব্যক্তির অতিক্ষুদ্র কণ্ঠের কলকলায় তাহা আমরা অনুভবও করিতে

পারি না। আমার মনের এতটুকু ভয়ে জগৎচরাচর বিভীষিকাময় হইয়া উঠে, আমার মনের এতটুকু লোভে আমার নিকটে সমস্ত বৃহৎ সংসারের মুখশ্রীতে যেন বিকার ঘটে। তাই বলিতেছি, যিনি শান্তং, তাঁহাকে সত্যভাবে অনুভব করিব কী করিয়া, যদি আমি শান্ত না হই? আমাদের অন্তঃকরণের চাঞ্চল্য কেবল নিজের তরঙ্গগুলাকেই বড়ো করিয়া দেখায়, তাহারই কল্লোল বিশ্বের অন্তরতম বাণীকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে।

নানাদিকে আমাদের নানা প্রবৃত্তি যে উদ্দাম হইয়া ছুটিয়াছে, আমাদের মনকে তাহারা একবার এ-পথে একবার ও-পথে ছিঁড়িয়া লইয়া চলিয়াছে, ইহাদের সকলকে দৃঢ়রশ্মিদ্বারা সংযত করিয়া সকলকে পরস্পরের সহিত সামঞ্জস্যের নিয়মে আবদ্ধ করিয়া অন্তঃকরণের মধ্যে কর্তৃত্বলাভ করিলে, চঞ্চল পরিধির মাঝখানে অচঞ্চল কেন্দ্রকে স্থাপিত করিয়া নিজেকে স্থির করিতে পারিলে তবেই এই বিশ্বচরাচরের মধ্যে যিনি শান্তং, তাঁহার উপাসনা তাঁহার উপলব্ধি সম্ভব হইতে পারে।

জীবনের হ্রাসকে, শক্তির অভাবকে আমরা শান্তি বলিয়া কল্পনা করি। জীবনহীন শান্তি তো মৃত্যু, শক্তিহীন শান্তি তো সুপ্তি। সমস্ত জীবনের সমস্ত শক্তির অচল-প্রতিষ্ঠ আধারস্বরূপ যাহা বিরাজ করিতেছে, তাহাই শান্তি; অদৃশ্য থাকিয়া সমস্ত সুরকে যিনি সংগীত, সমস্ত ঘটনাকে যিনি ইতিহাস করিয়া তুলিতেছেন, একের সহিত অন্যের যিনি সেতু, সমস্ত দিনরাত্রি-মাসপক্ষ-ঋতুসংবৎসর চলিতে চলিতেও যাঁহার দ্বারা বিধৃত হইয়া আছে, তিনিই শান্তম্। নিজের সমস্ত শক্তিকে যে সাধক বিক্ষিপ্ত না করিয়া ধারণ করিতে পারিয়াছেন, তাঁহার নিকটে এই পরম শান্তস্বরূপ প্রত্যক্ষ।

বাষ্পই যে রেলগাড়ি চালায়, তাহা নহে, বাষ্পকে যে স্থিরবুদ্ধি লৌহশৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়াছে, সে-ই গাড়ি চালায়। গাড়ির কলটা চলিতেছে, গাড়ির চাকাগুলা ছুটিতেছে, তবুও গাড়ির মধ্যে গাড়ির এই চলাটাই কর্তা নহে, সমস্ত চলার মধ্যে অচল হইয়া যে আছে, যথেষ্টপরিমাণ চলাকে যথেষ্টপরিমাণ না-চলার দ্বারা যে ব্যক্তি প্রতিমুহূর্তে স্থিরভাবে নিয়মিত করিতেছে, সেই কর্তা। একটা বৃহৎ কারখানার মধ্যে কোনো অজ্ঞ লোক যদি প্রবেশ করে, তবে সে মনে করে, এ একটা দানবীয় ব্যাপার; চাকার প্রত্যেক আবর্তন, লৌহদণ্ডের প্রত্যেক আস্ফালন, বাষ্পপুঞ্জের প্রত্যেক উচ্ছ্বাস তাহার মনকে একেবারে বিভ্রান্ত করিতে থাকে, কিন্তু অভিজ্ঞ ব্যক্তি এই সমস্ত নড়াচড়া-চলাফিরার মূলে একটি স্থির শান্তি দেখিতে পায়—সে জানে ভয়কে অভয় করিয়াছে কে, শক্তিকে সফল করিতেছে কে, গতির মধ্যে স্থিতি কোথায়, কর্মের মধ্যে পরিণামটা কী। সে জানে এই শক্তি যাহাকে আশ্রয় করিয়া চলিতেছে, তাহা শান্তি, সে জানে যেখানে এই শক্তির

সার্থক পরিণাম, সেখানেও শান্তি। শান্তির মধ্যে সমস্ত গতির, সমস্ত শক্তির তাৎপর্য পাইয়া সে নির্ভয় হয়, সে আনন্দিত হয়।

এই জগতের মধ্যে যে প্রবল প্রচণ্ড শক্তি কেবলমাত্র শক্তিরূপে বিভীষিকা, শান্তং তাহাকেই ফলে-ফুলে প্রাণে-সৌন্দর্যে মঙ্গলময় করিয়া তুলিয়াছেন। কারণ, যিনি শান্তং, তিনিই শিবং। এই শান্তস্বরূপ জগতের সমস্ত উদ্দামশক্তিকে ধারণ করিয়া একটি মঙ্গললক্ষ্যের দিকে লইয়া চলিয়াছেন। শক্তি এই শান্তি হইতে উদ্‌গত ও শান্তির দ্বারা বিধৃত বলিয়াই তাহা মঙ্গলরূপে প্রকাশিত। তাহা ধাত্রীর মতো নিখিল-জগৎকে অনাদিকাল হইতে অনিদ্রভাবে প্রত্যেক মুহূর্তেই রক্ষা করিতেছে। তাহা সকলের মাঝখানে আসীন হইয়া বিশ্বসংসারের ছোটো হইতে বড়ো পর্যন্ত প্রত্যেক পদার্থকে পরস্পরের সহিত অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধবন্ধনে বাঁধিয়া তুলিতেছে। পৃথিবীর ধূলিকণাটুকুও লক্ষযোজনদূরবর্তী সূর্যচন্দ্রগ্রহতারার সঙ্গে নাড়ির যোগে যুক্ত। কেহ. কাহারও পক্ষে অনাবশ্যক নহে। এক বিপুল পরিবার এক বিরাট কলেবর রূপে নিখিল বিশ্ব তাহার প্রত্যেক অংশ-প্রত্যংশ তাহার প্রত্যেক অণুপরমাণুর মধ্য দিয়া একই রক্ষণসূত্রে, একই পালনসূত্রে গ্রথিত। সেই রক্ষণী শক্তি সেই পালনী শক্তি নানা মূর্তি ধরিয়া জগতে সঞ্চরণ করিতেছে; মৃত্যু তাহার এক রূপ, ক্ষতি তাহার এক রূপ, দুঃখ তাহার এক রূপ; সেই মৃত্যু, ক্ষতি ও দুঃখের মধ্য দিয়াও নবতর প্রকাশের লীলা আনন্দে অভিব্যক্ত হইয়া উঠিতেছে। জন্মমৃত্যু সুখদুঃখ লাভক্ষতি সকলেরই মধ্যেই শিবং শান্তরূপে বিরাজমান। নহিলে এ-সকল ভার এক মুহূর্ত বহন করিত কে। নহিলে আজ যাহা সম্বন্ধবন্ধনরূপে আমাদের পরস্পরকে আকর্ষণ করিয়া রাখিয়াছে, তাহা যে আঘাত করিয়া আমাদিগকে চূর্ণ করিয়া ফেলিত। যাহা আলিঙ্গন, তাহাই যে পীড়ন হইয়া উঠিত। আজ সূর্য আমার মঙ্গল করিতেছে, গ্রহতারা আমার মঙ্গল করিতেছে, জল-স্থল-আকাশ আমার মঙ্গল করিতেছে, যে বিশ্বের একটি বালুকণাকেও আমি সম্পূর্ণ জানি না, তাহারই বিরাট প্রাঙ্গণে আমি ঘরের ছেলের মতো নিশ্চিন্তমনে খেলা করিতেছি; আমিও যেমন সকলের, সকলেও তেমনি আমার—ইহা কেমন করিয়া ঘটিল? যিনি এই প্রশ্নের একটিমাত্র উত্তর, তিনি নিখিলের সকল আকর্ষণে সকল সম্বন্ধ সকল কর্মের মধ্যে নিগূঢ় হইয়া নিস্তব্ধ হইয়া সকলকে রক্ষা করিতেছেন। তিনি শিবম্।

এই শিবস্বরূপকে সত্যভাবে উপলব্ধি করিতে হইলে আমাদিগকেও সমস্ত অশিব পরিহার করিয়া শিব হইতে হইবে। অর্থাৎ শুভকর্মে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। যেমন শক্তিহীনতার মধ্যে শান্তি নাই, তেমনি কর্মহীনতার মধ্যে মঙ্গলকে কেহ পাইতে পারে

না। ঔদাসীন্যে মঙ্গল নাই। কর্মসমুদ্র মন্থন করিয়াই মঙ্গলের অমৃত লাভ করা যায়। ভালোমন্দের দ্বন্দ্ব দেবদৈত্যের সংঘাতের ভিতর দিয়া দুর্গম সংসারপথের দুরূহ বাধাসকল কাটাইয়া তবে সেই মঙ্গল-নিকেতনের দ্বারে গিয়া পৌঁছিতে পারি—শুভকর্মসাধনদ্বারা সমস্ত ক্ষতিবিপদ ক্ষোভবিক্ষোভের ঊর্ধ্বে নিজের অপরাজিত হৃদয়ের মধ্যে মঙ্গলকে যখন ধারণ করিব, তখনই জগতের সকল কর্মের সকল উত্থানপতনের মধ্যে সুস্পষ্ট দেখিতে পাইব, তিনি রহিয়াছেন, যিনি শান্তং যিনি শিবম্। তখন ঘোরতর দুর্লক্ষণ দেখিয়াও ভয় পাইব না; নৈরাশ্যের ঘনান্ধকারে আমাদের সমস্ত শক্তিকে যেখানে পরাস্ত দেখিব সেখানেও জানিব, তিনি রাখিয়াছেন, যিনি শিবম্।

তিনি অদ্বৈতম্। তিনি অদ্বিতীয়, তিনি এক।

সংসারের সব-কিছুকে পৃথক করিয়া বিচিত্র করিয়া গণনা করিতে গেলে বুদ্ধি অভিভূত হইয়া পড়ে, আমাদিগকে হার মানিতে হয়। তবু তো সংখ্যার অতীত এই বৈচিত্র্যের মহাসমুদ্রের মধ্যে আমরা পাগল হইয়া যাই নাই, আমরা তো চিন্তা করিতে পারিতেছি; অতি ক্ষুদ্র আমরাও এই অপরিসীম বৈচিত্র্যের সঙ্গে তো একটা ব্যবহারিক সম্বন্ধ পাতাইতে পারিয়াছি। প্রত্যেক ধূলিকণাটির সম্বন্ধে আমাদিগকে তো প্রতিমুহূর্তে স্বতন্ত্র করিয়া ভাবিতে হয় না, সমস্ত পৃথিবীকে তো আমরা একসঙ্গে গ্রহণ করিয়া লই, তাহাতে তো কিছুই বাধে না। কত বস্তু, কত কর্ম, কত মানুষ; কত লক্ষকোটি বিষয় আমাদের জ্ঞানের মধ্যে বোঝাই হইতেছে; কিন্তু সে-বোঝার ভারে আমাদের হৃদয়মন তো একেবারে পিষিয়া যায় না। কেন যায় না? সমস্ত গণনাতীত বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যসঞ্চার করিয়া তিনি যে আছেন, যিনি একমাত্র, যিনি অদ্বৈতম্। তাই সমস্ত ভার লঘু হইয়া গেছে। তাই মানুষের মন আপনার সকল বোঝা নামাইয়া নিষ্কৃতি পাইবার জন্য অনেকের মধ্যে খুঁজিয়া ফিরিতেছে তাঁহাকেই, যিনি অদ্বৈতম্। আমাদের সকলকে লইয়া যদি এই এক না থাকিতেন, তবে আমরা কেহ কাহাকেও কিছুমাত্র জানিতাম কি? তবে আমাদের পরস্পরের মধ্যে কোনোপ্রকারের আদানপ্রদান কিছুমাত্র হইতে পারিত কি? তবে আমরা পরস্পরের ভার ও পরস্পরের আঘাত এক মুহূর্তও সহ্য করিতে পারিতাম কি? বহুর মধ্যে ঐক্যের সন্ধান পাইলেই তবে আমাদের বুদ্ধির শ্রান্তি দূর হইয়া যায়, পরের সহিত আপনার ঐক্য উপলব্ধি করিলে তবেই আমাদের হৃদয় আনন্দিত হয়। বাস্তবিক প্রধানত আমরা যাহা-কিছু চাই তাহার লক্ষ্যই এই ঐক্য। আমরা ধন চাই, কারণ, এক ধনের মধ্যে ছোটোবড়ো বহুতর বিষয় ঐক্যলাভ করিয়াছে; সেইজন্য বহুতর বিষয়কে প্রত্যহ পৃথকরূপে সংগ্রহ করিবার দুঃখ ও বিচ্ছিন্নতা ধনের দ্বারাই দূর হয়। আমরা খ্যাতি চাই, কারণ, এক

খ্যাতির দ্বারা নানা লোকের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ একেবারেই বাড়িয়া যায়—খ্যাতি যাহার নাই, সকল লোকের সঙ্গে সে যেন পৃথক। ভাবিয়া দেখিলে দেখিতে পাইব, পার্থক্য যেখানে, মানুষের দুঃখ সেখানে, ক্লান্তি সেখানে; কারণ মানুষের সীমা সেখানেই। যে আত্মীয়, তাহার সঙ্গ আমাকে শ্রান্ত করে না; যে বন্ধু, সে আমার চিত্তকে প্রতিহত করে না; যাহাকে আমার নহে বলিয়া জানি, সেই আমাকে বাধা দেয়, সেই, হয় অভাবের, নয় বিরোধের কষ্ট দিয়া আমাকে কিছু-না-কিছু পীড়িত করে। পৃথিবীতে আমরা সমস্ত মিলনের মধ্যে সমস্ত সম্বন্ধের মধ্যে ঐক্যবোধ করিবামাত্র যে আনন্দ অনুভব করি, তাহাতে সেই অদ্বৈতকে নির্দেশ করিতেছে। আমাদের সকল আকাঙ্ক্ষার মূলেই জ্ঞানে-অজ্ঞানে সেই অদ্বৈতের সন্ধান রহিয়াছে। অদ্বৈতই আনন্দ।

এই যিনি অদ্বৈতং, তাঁহার উপাসনা করিব কেমন করিয়া? পরকে আপন করিয়া, অহমিকাকে খর্ব করিয়া, বিরোধের কাঁটা উৎপাটন করিয়া, প্রেমের পথ প্রশস্ত করিয়া।

আত্মবৎ সর্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স পশ্যতি।
সকল প্রাণীকে আত্মবৎ যে দেখে, সেই যথার্থ দেখে।

কারণ, সে জগতের সমস্ত পার্থক্যের মধ্যে পরম সত্য যে অদ্বৈতং, তাঁহাকেই দেখে। অন্যকে যখন আঘাত করিতে যাই, তখন সেই অদ্বৈতের উপলব্ধিকে হারাই, সেইজন্য তাহাতে দুঃখ দিই ও দুঃখ পাই: নিজের স্বার্থের দিকে যখন তাকাই, তখন সেই অদ্বৈতং প্রচ্ছন্ন হইয়া যান, সেইজন্য স্বার্থসাধনার মধ্যে এত মোহ, এত দুঃখ।

জ্ঞানে কর্মে ও প্রেমে শান্তকে শিবকে ও অদ্বৈতকে উপলব্ধি করিবার একটি পর্যায় উপনিষদের 'শান্তং শিবমদ্বৈতম্' মন্ত্রে কেমন নিগূঢ়ভাবে নিহিত আছে, তাহাই আলোচনা করিয়া দেখো।

প্রথমে শান্তম্। আরম্ভেই জগতের বিচিত্রশক্তি মানুষের চোখে পড়ে। যতক্ষণ শান্তিতে তাহার পর্যাপ্তি দেখিতে না পাই, ততক্ষণ পর্যন্ত কত ভয় কত সংশয় কত অমূলক কল্পনা। সকল শক্তির মূলে যখন অমোঘ নিয়মের মধ্যে দেখিতে পাই শান্তং, তখন আমাদের কল্পনা শান্তি পায়। শক্তির মধ্যে তিনি নিয়মস্বরূপ, তিনি শান্তম্। মানুষ আপন অন্তঃকরণের মধ্যেও প্রবৃত্তিরূপিণী অনেকগুলি শক্তি লইয়া সংসারে প্রবেশ করে; যতক্ষণ তাহাদের উপর কর্তৃত্বলাভ না করিতে পারে, ততক্ষণ পদে পদে বিপদ, ততক্ষণ দুঃখের সীমা নাই। অতএব এই সমস্ত শক্তিকে শান্তির মধ্যে সংযমন করিয়া আনাই মানুষের জীবনের সর্বপ্রথম কাজ। এই সাধনায় যখন সিদ্ধ হইব, তখন জলে-স্থলে-আকাশে সেই শান্তস্বরূপকে দেখিব, যিনি জগতের অসংখ্য শক্তিকে

নিয়মিত করিয়া অনাদি-অনন্তকাল স্থির হইয়া আছেন। এইজন্য আমাদের জীবনের প্রথম আশ্রম ব্রহ্মচর্য—শক্তির মধ্যে শান্তিলাভের সাধনা।

পরে শিবম্। সংযমের দ্বারা শক্তিকে আয়ত্ত করিতে পারিলেই তবে কর্ম করা সহজ হয়। এইরূপে কর্ম যখন আরম্ভ করি, তখন নানা লোকের সঙ্গে নানা সম্বন্ধে জড়াইয়া পড়িতে হয়। এই আত্মপরের সংস্রবেই যত ভালোমন্দ যত পাপপুণ্য যত আঘাত-প্রতিঘাত। শান্তি যেমন শক্তিকে যথোচিতভাবে সংবরণ করিয়া তাহাদের বিরোধভঞ্জন করিয়া দেয়, তেমনি সংসারে আত্মপরের শতসহস্র সম্বন্ধের অপরিসীম জটিলতার মধ্যে কে সামঞ্জস্য স্থাপন করে? মঙ্গল। শান্তি না থাকিলে জগৎপ্রকৃতির প্রলয়, মঙ্গল না থাকিলে মানবসমাজের ধ্বংস। শান্তকে শক্তিসংকুল জগতে উপলব্ধি করিতে হইবে, শিবকে সম্বন্ধসংকুল সংসারে উপলব্ধি করিতে হইবে। তাঁহার শান্তস্বরূপকে জ্ঞানের দ্বারা ও তাঁহার শিবস্বরূপকে শুভকর্মের দ্বারা মনে ধারণা করিতে হইবে। আমাদের শাস্ত্রে বিধান আছে, প্রথমে ব্রহ্মচর্য, পরে গার্হস্থ্য,—প্রথমে শিক্ষার দ্বারা প্রস্তুত হওয়া, পরে কর্মের দ্বারা পরিপক্ব হওয়া। প্রথমে শান্তং, পরে শিবম্।

তার পরে অদ্বৈতম্। এইখানেই সমাপ্তি। শিক্ষাতেও সমাপ্তি নয়, কর্মেও সমাপ্তি নয়। কেনই বা শিখিব, কেনই বা খাটিব? একটা কোথাও তো তাহার পরিণাম আছে। সেই পরিণাম অদ্বৈতম্। তাহাই নিরবচ্ছিন্ন প্রেম, তাহাই নির্বিকার আনন্দ। মঙ্গলকর্মের সাধনায় যখন কর্মের বন্ধন ক্ষয় হইয়া যায়, অহংকারের তীব্রতা নষ্ট হইয়া আসে, যখন আত্মপরের সমস্ত সম্বন্ধের বিরোধ ঘুচিয়া যায়, তখনই নম্রতাদ্বারা ক্ষমার দ্বারা করুণার দ্বারা প্রেমের পথ প্রস্তুত হইয়া আসে। তখন অদ্বৈতম্। তখন সমস্ত সাধনার সিদ্ধি, সমস্ত কর্মের অবসান। তখন মানবজীবন তাহার প্রারম্ভ হইতে পরিণাম পর্যন্ত পরিপূর্ণ;—কোথাও সে আর অসংগত অসমাপ্ত অর্থহীন নহে।

হে পরমাত্মন্, মানবজীবনের সকল প্রার্থনার অভ্যন্তরে একটিমাত্র গভীরতম প্রার্থনা আছে, তাহা আমরা বুঝিতে জানি বা না জানি, তাহা আমরা মুখে বলি বা না বলি, আমাদের ভ্রমের মধ্যেও আমাদের দুঃখের মধ্যেও আমাদের অন্তরাত্মা হইতে সে প্রার্থনা সর্বদাই তোমার অভিমুখে পথ খুঁজিয়া চলিতেছে। সে প্রার্থনা এই যে, আমাদের সমস্ত জ্ঞানের দ্বারা যেন শান্তকে জানিতে পারি, আমাদের সমস্ত কর্মের দ্বারা যেন শিবকে দেখিতে পাই, আমাদের সমস্ত প্রেমের দ্বারা যেন অদ্বৈতকে উপলব্ধি করি। ফললাভের প্রত্যাশা সাহস করিয়া তোমাকে জানাইতে পারি না, কিন্তু আমার আকাঙ্ক্ষা এইমাত্র যে, সমস্ত বিঘ্ন-বিক্ষেপ-বিকৃতির মধ্যেও এই প্রার্থনা যেন সমস্ত শক্তির সহিত সত্যভাবে তোমার নিকট উপস্থিত করিতে পারি। অন্য সমস্ত বাসনাকে ব্যর্থ করিয়া, হে অন্তর্যামিন্,

আমার এই প্রার্থনাকেই গ্রহণ করো যে, আমি কদাপি যেন জ্ঞানে কর্মে প্রেমে উপলব্ধি করিতে পারি, যে, তুমি শান্তং শিবম্ অদ্বৈতম্।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

১৩১৩

স্বাতন্ত্র্যের পরিণাম

মানুষকে দুই কূল বাঁচাইয়া চলিতে হয়; তাহার নিজের স্বাতন্ত্র্য এবং সকলের সঙ্গে মিল,—দুই বিপরীত কূল। দুটির মধ্যে একটিকেও বাদ দিলে আমাদের মঙ্গল নাই।

স্বাতন্ত্র্য জিনিসটা যে মানুষের পক্ষে বহুমূল্য, তাহা মানুষের ব্যবহারেই বুঝা যায়। ধন দিয়া প্রাণ দিয়া নিজের স্বাতন্ত্র্যকে বজায় রাখিবার জন্য মানুষ কিনা লড়াই করিয়া থাকে।

নিজের বিশেষত্বকে সম্পূর্ণ করিবার জন্য সে কোথাও কোনো বাধা মানিতে চায় না। ইহাতে যেখানে বাধা পায় সেইখানেই তাহার বেদনা লাগে। সেইখানেই সে ক্রুদ্ধ হয়, লুব্ধ হয়, হনন করে, হরণ করে।

কিন্তু আমাদের স্বাতন্ত্র্য তো অবাধে চলিতে পারে না। প্রথমত, সে যে-সকল মালমসলা যে-সকল ধনজন লইয়া আপনার কলেবর গড়িয়া তুলিতে চায়, তাহাদেরও স্বাতন্ত্র্য আছে; আমাদের ইচ্ছামতো কেবল গায়ের জোরে তাহাদিগকে নিজের কাজে লাগাইতে পারি না। তখন আমাদের স্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে তাহাদের স্বাতন্ত্র্যের একটা বোঝাপড়া চলিতে থাকে। সেখানে বুদ্ধির সাহায্যে বিজ্ঞানের সাহায্যে আমরা একটা আপস করিয়া লই। সেখানে পরের স্বাতন্ত্র্যের খাতিরে নিজের স্বাতন্ত্র্যকে কিছুপরিমাণে খাটো করিয়া না আনিলে একেবারে নিষ্ফল হইতে হয়। তখন কেবলই স্বাতন্ত্র্য মানিয়া নয়, নিয়ম মানিয়া জয়ী হইতে চেষ্টা হয়।

কিন্তু এটা দায়ে পড়িয়া করা—ইহাতে সুখ নাই। একেবারে যে সুখ নাই তাহা নহে। বাধাকে যথাসম্ভব নিজের প্রয়োজনের অনুগত করিয়া আনিতে যে বুদ্ধি ও যে শক্তি খাটে, তাহাতেই সুখ আছে। অর্থাৎ কেবল পাইবার সুখ নয়, খাটাইবার সুখ। ইহাতে নিজের স্বাতন্ত্র্যের জোর স্বাতন্ত্র্যের গৌরব অনুভব করা যায়—বাধা না পাইলে তাহা করা যাইত না। এইরূপে যে অহংকারের উত্তেজনা জন্মে, তাহাতে আমাদের জিতিবার ইচ্ছা প্রতিযোগিতার চেষ্টা বাড়িয়া উঠে। পাথরের বাধা পাইলে ঝরনার জল

যেমন ফেনাইয়া ডিঙাইয়া উঠিতে চায়, তেমনি পরস্পরের বাধায় আমাদের পরস্পরের স্বাতন্ত্র্য ঠেলিয়া ফুলিয়া উঠে।

যাই হ'ক, ইহা লড়াই। বুদ্ধিতে বুদ্ধিতে শক্তিতে শক্তিতে চেষ্টায় চেষ্টায় লড়াই। প্রথমে এই লড়াই বেশির ভাগ গায়ের জোরই খাটাইত, ভাঙিয়া-চুরিয়া কাজ-উদ্ধারের চেষ্টা করিত। ইহাতে যাহাকে চাই, তাহাকেও ছারখার করা হইত; যে চায়, সেও ছারখার হইত, অপব্যয়ের সীমা থাকিত না। তাহার পরে বুদ্ধি আসিয়া কর্মকৌশলের অবতারণা করিল। সে গ্রন্থি ছেদন করিতে চাহিল না, গ্রন্থি মোচন করিতে বসিল। এ কাজটা ইচ্ছার অন্ধতা বা অধৈর্যের দ্বারা হইবার জো নাই; শান্ত হইয়া সংযত হইয়া শিক্ষিত হইয়া ইহাতে প্রবৃত্ত হইতে হয়। এখানে জিতিবার চেষ্টা নিজের সমস্ত অপব্যয় বন্ধ করিয়া নিজের বলকে গোপন করিয়া বলী হইয়াছে। ঝরনা যেমন উপত্যকায় পড়িয়া কতকটা বেগ সংবরণ করিয়া প্রশস্ত হইয়া উঠে, আমাদের স্বাতন্ত্র্যের বেগ তেমনি বাহুবল ছাড়িয়া বিজ্ঞানে আসিয়া আপনার উগ্রতা ছাড়িয়া উদারতা লাভ করে।

ইহা আপনিই হয়। জোর কেবল নিজেকেই জানে, অন্যকে মানিতে চায় না। কিন্তু বুদ্ধি কেবল নিজের স্বাতন্ত্র্য লইয়া কাজ করিতে পারে না। অন্যের মধ্যে তাহাকে প্রবেশ করিয়া সন্ধান করিতে হয়—অন্যকে সে যতই বেশি করিয়া বুঝিতে পারিবে, ততই নিজের কাজ উদ্ধার করিতে পারিবে, অন্যকে বুঝিতে গেলে, অন্যের দরজায় ঢুকিতে গেলে নিজেকে অন্যের নিয়মের অনুগত করিতেই হয়। এইরূপে স্বাতন্ত্র্যের চেষ্টা জয়ী হইতে গিয়াই নিজেকে পরাধীন না করিয়া থাকিতে পারে না।

এ-পর্যন্ত কেবল প্রতিযোগিতার রণক্ষেত্রে আমাদের পরস্পরের স্বাতন্ত্র্যের জয়ী হইবার চেষ্টাই দেখা গেল। ডারউয়িনের প্রাকৃতিক নির্বাচনতত্ত্ব এই রণভূমিতে লড়াইয়ের তত্ত্ব—এখানে কেহ কাহাকেও রেয়াত করে না, সকলেই সকলের চেয়ে বড়ো হইতে চায়।

কিন্তু ক্রপট্‌কিন প্রভৃতি আধুনিক বিজ্ঞানবিৎরা দেখাইতেছেন যে পরস্পরকে জিতিবার চেষ্টা নিজেকে টেঁকাইয়া রাখিবার চেষ্টাই প্রাণিসমাজের একমাত্র চেষ্টা নয়। দল বাঁধিবার, পরস্পরকে সাহায্য করিবার ইচ্ছা, ঠেলিয়া উঠিবার চেষ্টার চেয়ে অল্প প্রবল নহে; বস্তুত নিজের বাসনাকে খর্ব করিয়াও পরস্পরকে সাহায্য করিবার ইচ্ছাই প্রাণীদের মধ্যে উন্নতির প্রধান উপায় হইয়াছে।

তবেই দেখিতেছি একদিকে প্রত্যেকের স্বাতন্ত্র্যের স্ফূর্তি এবং অন্যদিকে সমগ্রের সহিত সামঞ্জস্য, এই দুই নীতিই একসঙ্গে কাজ করিতেছে। অহংকার এবং প্রেম, বিকর্ষণ এবং আকর্ষণ সৃষ্টিকে একসঙ্গে গড়িয়া তুলিতেছে।

স্বাতন্ত্র্যেও পূর্ণতালাভ করিব এবং মিলনেও নিজেকে পূর্ণভাবে সমর্পণ করিব, ইহা হইলেই মানুষের সার্থকতা ঘটে। অর্জন করিয়া আমার পুষ্টি হইবে এবং বর্জন করিয়া আমার আনন্দ হইবে, জগতের মধ্যে এই দুই বিপরীত নীতির মিলন দেখা যাইতেছে। ফলত, নিজেকে যদি পূর্ণ করিয়া না সঞ্চিত করি, তবে নিজেকে পূর্ণরূপে দান করিব কী করিয়া। সে কতটুকু দান হইবে। যতবড়ো অহংকার তাহা বিসর্জন করিয়া ততবড়ো প্রেম।

এই যে আমি, অতিক্ষুদ্র আমি, এতবড়ো জগতের মাঝখানেও সেই আমি স্বতন্ত্র। চারিদিকে কত তেজ কত বেগ কত বস্তু কত ভার, তাহার আর সীমা নাই, কিন্তু আমার অহংকারকে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চূর্ণ করিতে পারে নাই, আমি এতটুকু হইলেও স্বতন্ত্র। আমার যে অহংকার সকলের মধ্যেও ক্ষুদ্র আমাকে ঠেলিয়া রাখিয়াছে, এই অহংকার যে ঈশ্বরের ভোগের জন্য প্রস্তুত হইতেছে। ইহা নিঃশেষ করিয়া তাঁহাকে দিয়া ফেলিলে তবেই যে আনন্দের চূড়ান্ত। ইহাকে জাগাইবার সমস্ত দুঃসহ দুঃখের তবেই যে অবসান। ভগবানের এই ভোগের সামগ্রীটিকে নষ্ট করিয়া ফেলিবে কে।

আমাদের স্বাতন্ত্র্যকে ঈশ্বরে সম্পূর্ণ সমর্পণ করিবার পূর্ববর্তী অবস্থায় যত-কিছু দ্বন্দ্ব। তখনই একদিকে স্বার্থ, আর একদিকে প্রেম; একদিকে প্রবৃত্তি, আর একদিকে নিবৃত্তি। সেই দোলায়মান অবস্থায়, এই দ্বন্দ্বের মাঝখানেই যাহা সৌন্দর্যকে ফুটাইয়া তোলে, যাহা ঐক্যের আদর্শ রক্ষা করে, তাহাকেই বলি মঙ্গল। যাহা একদিকে আমার স্বাতন্ত্র্য, অন্যদিকে অন্যের স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করিয়াও পরস্পরের আঘাতে বেসুর বাজাইয়া তোলে না, যাহা স্বতন্ত্রকে এক সমগ্রের শান্তি দান করে, যাহা দুই অহংকারকে এক সৌন্দর্যের পরিণয়সূত্রে বাঁধিয়া দেয়, তাহাই মঙ্গল। শক্তি স্বাতন্ত্র্যকে বাড়াইয়া তোলে, মঙ্গল স্বাতন্ত্র্যকে সুন্দর করে, প্রেম স্বাতন্ত্র্যকে বিসর্জন দেয়। মঙ্গল সেই শক্তি ও প্রেমের মাঝখানে থাকিয়া প্রবল অর্জনকে একান্ত বিসর্জনের দিকেই অগ্রসর করিতে থাকে। এই দ্বন্দ্বের অবস্থাতেই মঙ্গলের রশ্মি লাগিয়া মানবসংসারে সৌন্দর্য প্রাতঃসন্ধ্যার মেঘের মতো বিচিত্র হইয়া উঠে।

নিজের সঙ্গে পরের, স্বার্থের সঙ্গে প্রেমের যেখানে সংঘাত, সেখানে মঙ্গলকে রক্ষা করা বড়ো সুন্দর এবং বড়ো কঠিন। কবিত্ব যেমন সুন্দর তেমনি সুন্দর, এবং কবিত্ব যেমন কঠিন তেমনি কঠিন।

কবি যে-ভাষায় কবিত্বপ্রকাশ করিতে চায়, সে-ভাষা তো তাহার নিজের সৃষ্টি নহে। কবি জন্মিবার বহুকাল পূর্বেই সে-ভাষা আপনার একটা স্বাতন্ত্র্য ফুটাইয়া তুলিয়াছে। কবি যে-ভাবটি যেমন করিয়া ব্যক্ত করিতে চায়, ভাষা ঠিক তেমনটি করিয়া রাশ মানে

না। তখন কবির ভাবের স্বাতন্ত্র্য এবং ভাবপ্রকাশের উপায়ের স্বাতন্ত্র্যে একটা দ্বন্দ্ব হয়। যদি সেই দ্বন্দ্বটা কেবল দ্বন্দ্ব-আকারেই পাঠকের চোখে পড়িতে থাকে, তবে পাঠক কাব্যের নিন্দা করে, বলে, ভাষার সঙ্গে ভাবের মিল হয় নাই। এমন স্থলে কথাটার অর্থগ্রহ হইলেও তাহা হৃদয়কে তৃপ্ত করিতে পারে না। যে-কবি ভাবের স্বাতন্ত্র্য এবং ভাষার স্বাতন্ত্র্যের অনিবার্য দ্বন্দ্বকে ছাপাইয়া সৌন্দর্যরক্ষা করিতে পারেন, তিনি ধন্য হন। যেটা বলিবার কথা তাহা পুরা বলা কঠিন, ভাষার বাধাবশত কতক বলা যায় এবং কতক বলা যায় না—কিন্তু তবু সৌন্দর্যকে ফুটাইয়া তুলিতে হইবে, কবির এই কাজ। ভাবের যেটুকু ক্ষতি হইয়াছে সৌন্দর্য তাহার চেয়ে অনেক বেশি পূরণ করিয়া দেয়।

তেমনি আমাদের স্বাতন্ত্র্যকে সংসারের মধ্যে প্রকাশ করিতেছি ; সে সংসার তো আমার নিজের হাতে গড়া নয় ; সে আমাকে পদে পদে বাধা দেয়। যেমনটি হইলে সকল দিকে আমার পুরা বিকাশ হইতে পারিত, তেমন আয়োজনটি চারিদিকে নাই ; সুতরাং সংসারে আমার সঙ্গে বাহিরের দ্বন্দ্ব আছেই। কাহারও জীবনে সেই দ্বন্দ্বটাই কেবলই চোখে পড়িতে থাকে ; সে কেবলই বেসুরই বাজাইয়া তোলে। আর কোনো কোনো গুণী সংসারে এই অনিবার্য দ্বন্দ্বের মধ্যেই সংগীত সৃষ্টি করেন, তিনি তাঁহার সমস্ত অভাব ও ব্যাঘাতের উপরেই সৌন্দর্য রক্ষা করেন। মঙ্গলই সেই সৌন্দর্য। সংসারের প্রতিঘাতে তাঁহাদের অবাধ স্বাতন্ত্র্যবিকাশের যে ক্ষতি হয়, মঙ্গল তাহার চেয়ে অনেক বেশি পূরণ করিয়া দেয়। বস্তুত দ্বন্দ্বের বাধাই মঙ্গলের সৌন্দর্যকে প্রকাশিত হইয়া উঠিবার অবকাশ দেয় ; স্বার্থের ক্ষতিই ক্ষতিপূরণের প্রধান উপায় হইয়া উঠে।

এমনি করিয়া দেখা যাইতেছে, স্বাতন্ত্র্য আপনাকে সফলতা দিবার জন্যই আপনারই খর্বতা স্বীকার করিতে থাকে ; নহিলে তাহা বিকৃতিতে গিয়া পৌঁছে এবং বিকৃতি বিনাশে গিয়া উপনীত হইবেই। স্বাতন্ত্র্য যেখানে মঙ্গলের অনুসরণ করিয়া প্রেমের দিকে না গেছে, সেখানে সে বিনাশের দিকেই চলিতেছে। অতিবৃদ্ধিদ্বারা সে বিকৃতি প্রাপ্ত হইলে বিশ্বপ্রকৃতি তাহার বিরুদ্ধ হইয়া উঠে ; কিছুদিনের মতো উপদ্রব করিয়া তাহাকে মরিতেই হয়।

অতএব মানুষের স্বাতন্ত্র্য যখন মঙ্গলের সহায়তায় সমস্ত দ্বন্দ্বকে নিরস্ত করিয়া দিয়া সুন্দর হইয়া উঠে, তখনই বিশ্বাত্মার সহিত মিলনে সম্পূর্ণ আত্মবিসর্জনের জন্য সে প্রস্তুত হয়। বস্তুত আমাদের দুর্দান্ত স্বাতন্ত্র্য মঙ্গলসোপান হইতে প্রেমে উত্তীর্ণ হইয়া তবেই সম্পূর্ণ হয়, সমাপ্ত হয়।

১৩১৩

ততঃ কিম্

আহারসংগ্রহ ও আত্মরক্ষা করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে শিখিলেই পশুপাখির শেখা সম্পূর্ণ হয়; সে জীবলীলা সম্পন্ন করিবার জন্যই প্রস্তুত হয়।

মানুষ শুধু জীব নহে, মানুষ সামাজিক জীব। সুতরাং জীবনধারণ করা এবং সমাজের যোগ্য হওয়া, এই উভয়ের জন্যই মানুষকে প্রস্তুত হইতে হয়।

কিন্তু সামাজিক জীব বলিলেই মানুষের সব কথা ফুরায় না। মানুষকে আত্মারূপে দেখিলে সমাজে তাহার অন্ত পাওয়া যায় না। যাহারা মানুষকে সেইভাবে দেখিয়াছে, তাহারা বলিয়াছে,

আত্মানং বিদ্ধি—আত্মাকে জানো।

আত্মাকে উপলব্ধি করাই তাহারা মানুষের চরমসিদ্ধি বলিয়া গণ্য করিয়াছে।

নিচের ধাপ বরাবর উপরের ধাপেরই অনুগত। সামাজিক জীবের পক্ষে শুদ্ধমাত্র জীবলীলা সমাজধর্মের অনুবর্তী। ক্ষুধা পাইলেই খাওয়া জীবের প্রবৃত্তি—কিন্তু সামাজিক জীবকে সেই আদিমপ্রবৃত্তি খর্ব করিয়া চলিতে হয়। সমাজের দিকে তাকাইয়া অনেক সময় ক্ষুধাতৃষ্ণাকে উপেক্ষা করাই আমরা ধর্ম বলি। এমন কি, সমাজের জন্য প্রাণ দেওয়া অর্থাৎ জীবধর্ম ত্যাগ করাও শ্রেয় বলিয়া গণ্য হয়। তবেই দেখা যাইতেছে, জীবধর্মকে সংযত করিয়া সমাজধর্মের অনুকূল করাই সামাজিক জীবের শিক্ষার প্রধান কাজ।

কিন্তু মানুষের সত্যকে যাহারা এইখানেই সীমাবদ্ধ না করিয়া পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করিতে ইচ্ছা করে, তাহারা জীবধর্ম ও সমাজধর্ম উভয়কেই সেই আত্ম-উপলব্ধির অনুগত করিবার সাধনাকেই শিক্ষা বলিয়া জানে। এক কথায় মানবাত্মার মুক্তিই তাহাদের কাছে মানবজীবনের চরমলক্ষ্য—জীবনধারণ ও সমাজরক্ষার সমস্ত লক্ষ্যই ইহার অনুবর্তী।

তবেই দেখা যাইতেছে, মানুষ বলিতে যে যেমন বুঝিয়াছে, সে সেই অনুসারেই মানুষের শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্তন করিতে চাহিয়াছে—কারণ, মানুষ করিয়া তোলাই শিক্ষা।

আমরা প্রাচীন সংহিতায় ছাত্রশিক্ষার যে আদর্শ দেখিতে পাই, তাহা কবে হইতে এবং কতদূর পর্যন্ত দেশে চলিয়াছিল, তাহার ঐতিহাসিক বিচার করিতে আমি অক্ষম। অন্তত এইটুকু নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে, যাঁহারা সমাজের নিয়ন্তা ছিলেন তাঁহাদের মনে শিক্ষার উদ্দেশ্য কী ছিল; তাঁহারা মানুষকে কী বলিয়া জানিতেন এবং সেই মানুষকে গড়িয়া তুলিবার জন্য কোন্ উপায়কে সকলের চেয়ে উপযুক্ত বলিয়া মনে করিয়াছিলেন।

সংসারে কিছুই নিত্য নয়, অতএব সংসার অসার অপবিত্র এবং তাহাকে ত্যাগ করাই শ্রেয়, এইরূপ বৈরাগ্যধর্মের শ্রেষ্ঠতা য়ুরোপে সাধুগণ মধ্যযুগে প্রচার করিতেন। তখন সন্ন্যাসিদলের যথেষ্ট প্রাদুর্ভাব ছিল। য়ুরোপের এখনকার ভাবখানা এই যে, সংসারটা কিছুই নয় বলিয়া মানুষের প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির মধ্যে একটা চিরস্থায়ী দেবাসুরের ঝগড়া বাধাইয়া রাখিলে মনুষ্যত্বকে খর্ব করা হয়। সংসারের হিতসাধন করাই সংসারীর জীবনের শেষ লক্ষ্য—ইহাই ধর্মনীতি। এই ধর্মনীতিকে প্রবলভাবে আশ্রয় করিতে গেলে সংসারকে মায়া-ছায়া বলিয়া উড়াইয়া দিলে চলে না। এই সংসারক্ষেত্রে জীবনের শেষদণ্ড পর্যন্ত পুরাদমে কাজ করিতে পারাই বীরত্ব—লাগামজোতা অবস্থাতেই মরা অর্থাৎ কাজে বিশ্রাম না দিয়াই জীবন শেষ করা ইংরেজের কাছে গৌরবের বিষয় বলিয়া গণ্য হয়।

সংসার যে অনিত্য এ-কথা ভুলিয়া, মৃত্যু যে নিশ্চিত এ-কথা মনের মধ্যে পোষণ না করিয়া, সংসারের সঙ্গে চিরন্তন-সম্বন্ধ-স্থাপনের চেষ্টা করায় য়ুরোপীয়জাতি একটা বিশেষ বললাভ করিয়াছে, সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। ইহার বিপরীত অবস্থাকে ইহারা morbid অর্থাৎ রুগ্‌ণ অবস্থা বলিয়া থাকে। সুতরাং ইহাদের শিক্ষার উদ্দেশ্য এই যে, ছাত্ররা এমন করিয়া মানুষ হইবে, যাহাতে তাহারা শেষ পর্যন্ত প্রাণপণবলে সংসারের কর্মক্ষেত্রে লড়াই করিতে পারে। জীবনকে ইহারা সংগ্রাম বলিয়া জানে; বিজ্ঞানও ইহাদিগকে এই শিক্ষা দেয় যে, জীবিকার লড়াইয়ে যাহারা জেতে, তাহারাই পৃথিবীতে টিকিয়া যায়। একদিকে "চাইই চাই, নহিলেই নয়" মনের এই গৃধ্নুভাবকে খুব সতেজ রাখিবার জন্য ইহাদের চেষ্টা, অপর দিকে মুঠাটাও ইহারা খুব শক্ত করিতে থাকে। আটঘাট বাঁধিয়া রশারশি কষিয়া দশ আঙুল দিয়া ইহারা আঁটিয়া ধরিতে জানে। পৃথিবীকে কোনো অংশেই এবং কোনোমতেই ছাড়িব না, ইহাই সবলে বলিতে বলিতে মাটি কামড়াইয়া মরিয়া যাওয়া ইহাদের পক্ষে বীরের মৃত্যু। সব জানিব, সব কাড়িব, সব রাখিব, এই প্রতিজ্ঞার সার্থকতা সাধন করিবার শিক্ষাই ইহাদের শিক্ষা।

আমরা বলিয়া আসিয়াছি,

> গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্মমাচরেৎ।
>
> মৃত্যু যেন চুলের ঝুঁটি ধরিয়া আছে, এই মনে করিয়া ধর্মাচরণ করিবে।

য়ুরোপের সন্ন্যাসীরাও যে এ-কথা বলে নাই, তাহা নহে এবং সংসারীকে ভয় দেখাইবার জন্য মৃত্যুর বিভীষিকাকে তাহারা সাহিত্যে, চিত্রে এবং নানাস্থানে প্রত্যক্ষ করিবার চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু আমাদের প্রাচীন সংহিতার মধ্যে যে ভাবটা দেখা যায়, তাহার একটু বিশেষত্ব আছে।

সংসারের সঙ্গে আমার সম্বন্ধের অন্ত নাই, এমন মনে করিয়া কাজ করিলে কাজ ভাল হয় কি মন্দ হয়, সে পরের কথা—কিন্তু ইহাতে সন্দেহ নাই যে, সে-কথা মিথ্যা। সংসারে আমাদের সমুদয় সম্বন্ধেরই যে অবসান আছে, এতবড়ো সত্য কথা আর কিছুই নাই। প্রয়োজনের খাতিরে গালি দিয়া সত্যকে মিথ্যা বলিয়া চালাইলেও সে সমানে আপনার কাজ করিয়া যায়;—সোনার রাজদণ্ডকেই যে রাজা চরম বলিয়া জানে, তাহারও হাত হইতে চরমে সেই রাজদণ্ড ধুলায় খসিয়া পড়ে; লোকালয়ে প্রতিষ্ঠালাভকেই যে-ব্যক্তি একমাত্র লক্ষ্য বলিয়া জানে, সমস্ত জীবনের সমস্ত চেষ্টার শেষে তাহাকে সেই লোকালয় একলা ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হয়। বড়ো বড়ো কীর্তি লুপ্ত হইয়া যায় এবং বড়ো বড়ো জাতিকেও উন্নতির নাট্যমঞ্চ হইতে প্রদীপ নিবাইয়া দিয়া রঙ্গলীলা সমাধা করিতে হয়। এ-সব অত্যন্ত পুরাতন কথা, তবু ইহা কিছুমাত্র মিথ্যা নহে।

সকল সম্বন্ধেরই অবসান হয়, কিন্তু তাই বলিয়া অবসান হইবার পূর্বে তাহাকে অস্বীকার করিলে তো চলে না। অবসানের পরে যাহা সত্য, অবসানের পূর্বে তো তাহা সত্য। যাহা যে-পরিমাণে সত্য তাহাকে সেই পরিমাণে যদি না মানি, তবে, হয় সে আমাদিগকে কানে ধরিয়া মানাইবে, নয় তো কোনোদিন কোনোদিক দিয়া সুদসুদ্ধ শোধ করিয়া লইবে।

ছাত্র বিদ্যালয়ে চিরদিন পড়ে না, পড়ার একদিন অবসান হয়ই। কিন্তু যতদিন বিদ্যালয়ে আছে, ততদিন সে যদি পড়াটাকে যথার্থভাবে স্বীকার করিয়া লয়, তবেই পড়ার অবসানটা প্রকৃত হয়—তবেই বিদ্যালয় হইতে নিষ্কৃতি তাহার পক্ষে সম্পূর্ণ হয়। যদি সে জোর করিয়া বিদ্যালয় হইতে অবসর লয়, তবে চিরদিন ধরিয়া অসম্পূর্ণ বিদ্যার ফল তাহাকে ভোগ করিতে হয়। পথ গম্যস্থান নয়, এ-কথা ঠিক;—পথের সমাপ্তিই আমাদের লক্ষ্য, কিন্তু আগে পথটাকে ভোগ না করিলে তাহার সমাপ্তিটাই অসম্ভব হইয়া পড়ে।

তবেই দেখা যাইতেছে, জগতের সম্বন্ধগুলিকে আমরা ধ্বংস করিতে পারি না, তাহাদের ভিতর দিয়া গিয়া তাহাদিগকে উত্তীর্ণ হইতে পারি। অর্থাৎ সকল সম্বন্ধ যেখানে আসিয়া মিলিয়াছে, সেইখানে পৌঁছিতে পারি। অতএব, ঠিকভাবে এই ভিতর দিয়া যাওয়াটাই সাধনা—কোনো সম্বন্ধকে নাই বলিয়া বিমুখ হওয়াই সাধনা নহে। পথকে যদি বৈরাগ্যের জোরে ছাড়িয়া দাও, অপথে তবে সাতগুণ বেশি ঘুর খাইয়া মরিতে হইবে।

জর্মান মহাকবি গ্যয়টে তাঁহার ফাউস্ট নাটকে দেখাইয়াছেন, যে-ব্যক্তি মানব-

প্রবৃত্তিকে উপবাসী রাখিয়া সংসারের লীলাভূমি হইতে উচ্চে নিভৃতে বসিয়া জ্ঞানসংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত ছিল, সংসারের ধুলার উপরে বহুজোরে আছাড় খাইয়া তাহাকে কেমনতরো শক্ত জ্ঞান লাভ করিতে হইয়াছিল। মুক্তির প্রতি অসময়ে অযথা লোভ করিয়া যেটুকু ফাঁকি দিতে যাইব, সেটুকু তো শোধ করিতেই হইবে, তাহার উপরে আবার ফাঁকির চেষ্টার জন্য দণ্ড আছে। বেশি তাড়াতাড়ি করিতে গেলেই বেশি বিলম্ব ঘটিয়া যায়।

বস্তুত গ্রহণ এবং বর্জন, বন্ধন এবং বৈরাগ্য, এই দুটাই সমান সত্য—একের মধ্যেই অন্যটির বাসা, কেহ কাহাকেও ছাড়িয়া সত্য নহে। দুইকে যথার্থরূপে মিলাইতে পারিলেই তবে পূর্ণতা লাভ করিতে পারা যায়। শংকর ত্যাগের এবং অন্নপূর্ণা ভোগের মূর্তি—উভয়ে মিলিয়া যখন একাঙ্গ হইয়া যায়, তখনই সম্পূর্ণতার আনন্দ। আমাদের জীবনে যেখানেই এই শিব ও শিবানীর বিচ্ছেদ, যেখানেই বন্ধন ও মুক্তির একত্রে প্রতিষ্ঠা নাই, যেখানেই অনুরাগ ও বৈরাগ্যের বিরোধ ঘটিয়াছে সেইখানেই যত অশান্তি, যত নিরানন্দ। সেইখানেই আমরা লইতে চাই, দিতে চাই না; সেইখানেই আমরা নিজের দিকে টানি, অন্যের দিকে তাকাই না; সেইখানেই আমরা যাহাকে ভোগ করি, তাহার আর অন্ত দেখিতে পাই না—অন্ত দেখিলে বিধাতাকে ধিক্‌কার দিয়া হাহাকার করিতে থাকি; সেখানেই কর্মে আমাদের প্রতিযোগিতা, ধর্মেও আমাদের বিদ্বেষ; সেখানেই কোনো-কিছুরই যেন স্বাভাবিক পরিণাম নাই, অপঘাতমৃত্যুতেই সমস্ত ব্যাপারের অকস্মাৎ বিলোপ।

জীবনটাকে না হয় যুদ্ধ বলিয়াই গণ্য করা গেল। এই যুদ্ধ ব্যাপারে যদি কেবল ব্যূহের মধ্যে প্রবেশ করিবার বিদ্যা আমাদের শেখা থাকে, ব্যূহ হইতে বাহির হইবার কৌশল আমরা না জানি, তবে সপ্তরথী ঘিরিয়া যে আমাদিগকে মারিবে। সেরূপ মরিয়াও আমরা বীরত্ব দেখাইতে পারি, কিন্তু যুদ্ধে জয় তো তাহাকে বলে না। অপর পক্ষে, যাহারা ব্যূহের মধ্যে একেবারে প্রবেশ করিতেই বিরত, সেই কাপুরুষদের বীরের সদ্‌গতি নাই। প্রবেশ করা এবং বাহির হওয়া, এই দুয়ের দ্বারাতেই জীবনের চরিতার্থতা।

প্রাচীন সংহিতাকারগণ হিন্দুসমাজে হরগৌরীকে অভেদাঙ্গ করিতে চাহিয়াছিলেন—বিশ্বচরাচর যে গ্রহণ ও বর্জন, যে আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ, যে কেন্দ্রানুগ ও কেন্দ্রাতিগ, যে স্ত্রী ও পুরুষ ভাবের নিয়ত সামঞ্জস্যের উপর প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া সত্য ও সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে, সমাজকে তাঁহারা প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত সকল দিকে সেই বৃহৎ সামঞ্জস্যের উপরে স্থাপিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। শিব ও শক্তির, নিবৃত্তি ও প্রবৃত্তির সম্মিলনই সমাজের একমাত্র মঙ্গল, এবং শিব ও শক্তির বিরোধই সমাজের সমস্ত অমঙ্গলের কারণ, ইহাই তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন।

এই সামঞ্জস্যকে আশ্রয় করিতে হইলে প্রথমে মানুষকে সত্যভাবে দেখিতে হইবে। অর্থাৎ তাহাকে কোনো একটা বিশেষ প্রয়োজনের দিক হইতে দেখিলে চলিবে না। আমরা যদি আম্রকে অম্বল খাওয়ার দিক হইতে দেখি, তাহা হইলে তাহাকে সমগ্রভাবে দেখি না; এইজন্য তাহার স্বাভাবিক পরিণামে বাধা ঘটাই; তাহাকে কাঁচা পাড়িয়া আনিয়া তাহার কষিটাকে মাটি করিয়া দিই। গাছকে যদি জ্বালানি কাঠ বলিয়াই দেখি, তবে তাহার ফলফুলপাতার কোনো তাৎপর্যই দেখিতে পাই না। তেমনি মানুষকে যদি রাজ্যরক্ষার উপায় মনে করি, তবে তাহাকে সৈনিক করিয়া তুলিব, তাহাকে যদি জাতীয়সমৃদ্ধিবৃদ্ধির হেতু বলিয়া গণ্য করি, তবে তাহাকে বণিক করিবার একান্ত চেষ্টা করিব—এমনি করিয়া আমাদের আবহমান সংস্কার অনুসারে যেটাকেই আমরা পৃথিবীতে সকলের চেয়ে অভিলষিত বলিয়া জানি, মানুষকে তাহারই উপকরণমাত্র বলিয়া দেখিব ও সেই প্রয়োজনসাধনকেই মানুষের সার্থকতা বলিয়া মনে করিব। এমন করিয়া দেখাতে কোনো হিত হয় না, তাহা নহে—কিন্তু সামঞ্জস্য নষ্ট হইয়া শেষকালে অহিত আসিয়া পড়ে—এবং যাহাকে তারা মনে করিয়া আকাশে উড়াই তাহা খানিকক্ষণ ঠিক তারার মতোই ভঙ্গি করে, তাহার পরে পুড়িয়া ছাই হইয়া মাটিতে পড়িয়া যায়।

আমাদের দেশে একদিন মানুষকে সমস্ত প্রয়োজনের চেয়ে কিরূপ বড়ো করিয়া দেখা হইয়াছিল, তাহা সাধরণে প্রচলিত একটি চাণক্যশ্লোকেই দেখা যায়—

ত্যজেদেকং কুলস্যার্থে গ্রামস্যার্থে কুলং ত্যজেৎ
গ্রামং জনপদস্যার্থে আত্মার্থে পৃথিবীং ত্যজেৎ।

মানুষের আত্মা কুলের চেয়ে, গ্রামের চেয়ে, দেশের চেয়ে, সমস্ত পৃথিবীর চেয়ে বড়ো। অন্তত কাহারও চেয়ে ছোটো নয়। প্রথমে মানুষের আত্মাকে এইরূপে সমস্ত দৈশিক ও ক্ষণিক প্রয়োজন হইতে পৃথক করিয়া তাহাকে বিশুদ্ধ ও বৃহৎ করিয়া দেখিতে হইবে, তবেই সংসারের সমস্ত প্রয়োজনের সঙ্গে তাহার সত্যসম্বন্ধ, জীবনের ক্ষেত্রের মধ্যে তাহার যথার্থ স্থান, নির্ণয় করা সম্ভবপর হয়।

আমাদের দেশে তাই করা হইয়াছিল; শাস্ত্রকারগণ মানুষের আত্মাকে অত্যন্ত বড়ো করিয়া দেখিয়াছিলেন। মানুষের মর্যাদার কোথাও সীমা ছিল না, ব্রহ্মের মধ্যেই তাহার সমাপ্তি। আর যাহাতেই মানুষকে শেষ করিয়া দেখ, তাহাকে মিথ্যা করিয়া দেখা হয়—তাহাকে citizen করিয়া দেখো, কিন্তু কোথায় আছে city আর কোথায় আছে সে, cityতে তাহার পর্যাপ্তি নহে; তাহাকে patriot করিয়া দেখো, কিন্তু দেশেই তাহার শেষ পাওয়া যায় না, দেশ তো জলবিম্ব; সমস্ত পৃথিবীই বা কী।

ভর্তৃহরি, যিনি এক সময়ে রাজা ছিলেন, তিনি বলিয়াছেন—

প্রাপ্তাঃ শ্রিয়ঃ সকলকামদুঘাস্ততঃ কিং
ন্যস্তং পদং শিরসি বিদ্বিষতাং ততঃ কিম্।
সম্পাদিতাঃ প্রণয়িনো বিভবৈস্ততঃ কিং
কল্পস্থিতাস্তনুভৃতাং তনবস্ততঃ কিম্।

সকলকাম্যফলপ্রদ লক্ষ্মীকেই না হয় লাভ করিলে, তাহাতেই বা কী; শত্রুদের মাথার উপরেই না হয় পা রাখিলে, তাহাতেই বা কী; না হয় বিভবের বলে বহু সুহৃদ্ সংগ্রহ করিলে, তাহাতেই বা কী; দেহধারীদের দেহগুলিকে না হয় কল্পকাল বাঁচাইয়া রাখিলে তাহাতেই বা কী।

অর্থাৎ এই সমস্ত কামনার বিষয়ের দ্বারা মানুষকে খাটো করিয়া দেখিলে চলিবে না, মানুষ ইহার চেয়েও বড়ো। মানুষের সেই যে সকলের চেয়ে বড়ো সত্য, যাহা অনাদি হইতে অনন্তের অভিমুখ, তাহাকে মনে রাখিলে তবেই তাহার জীবনকে সজ্ঞানভাবে সম্পূর্ণতার পথে চালনা করিবার উপায় করা যাইতে পারে। কিন্তু মানুষকে যদি সংসারের জীব বলিয়াই মানি, তবে তাহাকে সংসারের প্রয়োজনের মধ্যেই আবদ্ধ করিয়া ছোটো করিয়া ছাঁটিয়া কাটিয়া লই।

আমাদের দেশের প্রাচীন মনীষীরা মানুষের আত্মাকে বড়ো করিয়া দেখিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদের জীবনযাত্রার আদর্শ য়ুরোপের সহিত স্বতন্ত্র হইয়াছে—তাঁহারা জীবনের শেষমুহূর্ত পর্যন্ত খাটিয়া মরাকে গৌরবের বিষয় মনে করেন নাই—কর্মকেই তাঁহারা শেষলক্ষ্য না করিয়া কর্মের দ্বারা কর্মকে ক্ষয় করাই চরম সাধনার বিষয় বলিয়া জানিয়াছিলেন। আত্মার মুক্তিই যে প্রত্যেক মানুষের একমাত্র শ্রেয়, এবিষয়ে তাঁহাদের সন্দেহ ছিল না।

য়ুরোপে স্বাধীনতার গৌরব সকল সময়েই গাওয়া হইয়া থাকে। এই স্বাধীনতার অর্থ আহরণ করিবার স্বাধীনতা, ভোগ করিবার স্বাধীনতা, কাজ করিবার স্বাধীনতা। এ স্বাধীনতা বড়ো কম জিনিস নয়—এ সংসারে ইহাকে রক্ষা করিতে অনেক শক্তি এবং আয়োজন আবশ্যক হয়। কিন্তু প্রাচীন ভারতবর্ষ ইহার প্রতিও অবজ্ঞা করিয়া বলিয়াছিল—ততঃ কিম্। এ স্বাধীনতাকে সে স্বাধীনতা বলিয়াই স্বীকার করে নাই। ভারতবর্ষ কামনার উপরে, কর্মের উপরেও স্বাধীন হইতে চাহিয়াছিল।

কিন্তু স্বাধীন হইলাম মনে করিলেই তো স্বাধীন হওয়া যায় না।—নিয়ম অর্থাৎ অধীনতার ভিতর দিয়া না গেলে স্বাধীন হওয়া যায় না। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতাকে যদি বড়ো

মনে কর, তবে সৈনিকরূপে অধীন হইতে হইবে, বণিকরূপে অধীন হইতে হইবে। ইংলণ্ডে যে কত লক্ষ সৈনিক আছে, তাহারা কি স্বাধীন? মনুষ্যত্বকে যে তাহারা মানুষমারা কলে পরিণত করিয়াছে, তাহারা সজীব বন্দুকমাত্র। কত লক্ষ মজুর খনির অন্ধ রসাতলে, কারখানার অগ্নিকুণ্ডে থাকিয়া ইংলণ্ডের রাজ্যশ্রীর পায়ের তলায় বুকের রক্ত দিয়া আলতা পরাইতেছে। তাহারা কি স্বাধীন? তাহারা তো নির্জীব কলের সজীব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। য়ুরোপে স্বাধীনতার ফলভোগ করিতেছে কয়জন? তবে স্বাধীনতা কাহাকে বলে? Individualism অর্থাৎ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য য়ুরোপের সাধনার বিষয় হইতে পারে, কিন্তু ব্যক্তির পরতন্ত্রতা এত বেশি কি অন্যত্র দেখা গিয়াছে?

ইহার উত্তরে একটা স্বতোবিরোধী কথা বলিতে হয়। পরতন্ত্রতার ভিতর দিয়াই স্বাতন্ত্র্যে যাইবার পথ। বাণিজ্যে তুমি যতবড়ো লাভের টাকা আনিতে চাও, ততবড়ো মূলধনের টাকা ফেলিতে হইবে। টাকা কিছুই খাটিতেছে না, কেবলই লাভ করিতেছে, ইহা হয় না। স্বাতন্ত্র্য তেমনি সুদের মতো, বিপুল পরতন্ত্রতা খাটাইয়া তবে সেইটুকু লাভ হইতেছে—আগাগোড়া সমস্তটাই লাভ, আগাগোড়া সমস্তই স্বাধীনতা, এ কখনো সম্ভবপর নহে।

আমাদের দেশেরও সাধনার বিষয় ছিল Individualism—ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য। কিন্তু সে তো কোনো ছোটোখাটো স্বাতন্ত্র্য নয়। সেই স্বাতন্ত্র্যের আদর্শ একেবারে মুক্তিতে গিয়া ঠেকিয়াছে। ভারতবর্ষ প্রত্যেক লোককে জীবনের প্রতিদিনের ভিতর দিয়া, সমাজের প্রত্যেক সম্বন্ধের ভিতর দিয়া সেই মুক্তির অধিকার দিবার চেষ্টা করিয়াছে। য়ুরোপে যেমন কঠোর পরতন্ত্রতার ভিতর দিয়া স্বাতন্ত্র্য বিকাশ পাইতেছে, আমাদের দেশেও তেমনি নিয়মসংযমের নিবিড় বন্ধনের ভিতর দিয়াই মুক্তির উপায় নির্দিষ্ট হইয়াছে। সেই মুক্তির পরিণামকে লক্ষ্য হইতে বাদ দিয়া যদি কেবল নিয়মসংযমকেই একান্ত করিয়া দেখি, তবে বলিতেই হয়, আমাদের দেশে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের খর্বতা বড়ো বেশি।

আসল কথা, কোনো দেশের যখন দুর্গতির দিন আসে, তখন সে মুখ্য জিনিসটাকে হারায়, অথচ গৌণটা জঞ্জাল হইয়া জায়গা জুড়িয়া বসে। তখন পাখি উড়িয়া পালায়, খাঁচা পড়িয়া থাকে। আমাদের দেশেও তাই ঘটিয়াছে। আমরা এখনও নানাবিধ বাঁধাবাঁধি মানিয়া চলি, অথচ তাহার পরিণামের প্রতি লক্ষ্য নাই। মুক্তির সাধনা আমাদের মনের মধ্যে আমাদের ইচ্ছার মধ্যে নাই, অথচ তাহার বন্ধনগুলি আমরা আপাদমস্তক বহন করিয়া বেড়াইতেছি। ইহাতে আমাদের দেশের যে মুক্তির আদর্শ, তাহা তো নষ্ট হইতেছেই; য়ুরোপের যে স্বাধীনতার আদর্শ, তাহার পথেও পদে

পদে বাধা পড়িতেছে। সাত্ত্বিকতার যে পূর্ণতা তাহা ভুলিয়াছি, রাজসিকতার যে ঐশ্বর্য তাহাও দুর্লভ হইয়াছে, কেবল তামসিকতার যে নিরর্থক অভ্যাসগত বোঝা তাহাই বহন করিয়া নিজেকে অকর্মণ্য করিয়া তুলিতেছি। অতএব এখনকার দিনে আমাদের দিকে তাকাইয়া যদি কেহ বলে, ভারতবর্ষের সমাজ মানুষকে কেবল আচারে-বিচারে আটেঘাটে বন্ধন করিবারই ফাঁদ, তবে মনে রাগ হইতে পারে কিন্তু জবাব দেওয়া কঠিন। পুকুর যখন শুকাইয়া গেছে, তখন তাহাকে যদি কেহ গর্ত বলে, তবে তাহা আমাদের পৈতৃকসম্পত্তি হইলেও চুপ করিয়া থাকিতে হয়। আসল কথা, সরোবরের পূর্ণতা এককালে যতই সুগভীর ছিল, শুষ্ক অবস্থায় তাহার রিক্ততার গর্তটাও ততই প্রকাণ্ড হইয়া থাকে।

ভারতবর্ষেও মুক্তির লক্ষ্য যে একদা কত সচেষ্ট ছিল, তাহা এখনকার দিনের নিরর্থক বাঁধাবাঁধি, অনাবশ্যক আচারবিচারের দ্বারাই বুঝা যায়। য়ুরোপেও কালক্রমে যখন শক্তির হ্রাস হইবে, তখন বাঁধনের অসহ্য ভারের দ্বারাই তাহার পূর্বতন স্বাতন্ত্র্যচেষ্টার পরিমাপ হইবে। এখনই কি ভার অনুভব করিয়া সে অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতেছে না? এখনই কি তাহার উপায় ক্রমশ উদ্দেশ্যকে ছাড়াইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছে না?

কিন্তু সে তর্ক থাক; আসল কথা এই, যদি লক্ষ্য সজাগ থাকে, তবে নিয়মসংযমের বন্ধনই মুক্তির একমাত্র উপায়। ভারতবর্ষ একদিন নিয়মের দ্বারা সমাজকে খুব করিয়া বাঁধিয়াছিল। মানুষ সমাজের মধ্য দিয়া সমাজকে ছাড়াইয়া যাইবে বলিয়াই বাঁধিয়াছিল। ঘোড়াকে তাহার সওয়ার লাগাম দিয়া বাঁধে কেন, এবং নিজেই বা তাহার সঙ্গে রেকাবের দ্বারা বদ্ধ হয় কেন—ছুটিতে হইবে বলিয়া, দূরের লক্ষ্যস্থানে যাইতে হইবে বলিয়া। ভারতবর্ষ জানিত, সমাজ মানুষের শেষলক্ষ্য নহে, মানুষের চির-অবলম্বন নহে—সমাজ হইয়াছে মানুষকে মুক্তির পথে অগ্রসর করিয়া দিবার জন্য। সংসারের বন্ধন ভারতবর্ষ বরঞ্চ বেশি করিয়াই স্বীকার করিয়াছে তাহার হাত হইতে বেশি করিয়া নিষ্কৃতি পাইবার অভিপ্রায়ে।

এইরূপে বন্ধন ও মুক্তি, উপায় ও উদ্দেশ্য, উভয়কেই মান্য করিবার কথা প্রাচীন উপনিষদের মধ্যেও দেখা যায়। ঈশোপনিষৎ বলিতেছেন—

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যে অবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ।

যাহারা কেবলমাত্র অবিদ্যা অর্থাৎ সংসারের উপাসনা করে, তাহারা অন্ধতমসের মধ্যে প্রবেশ করে; তদপেক্ষাও ভূয় অন্ধকারের মধ্যে প্রবেশ করে তাহারা, যাহারা কেবলমাত্র ব্রহ্মবিদ্যায় নিরত।

বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে।

বিদ্যা এবং অবিদ্যা উভয়কেই যিনি একত্র করিয়া জানেন, তিনি অবিদ্যাদ্বারা মৃত্যু হইতে উত্তীর্ণ হইয়া বিদ্যাদ্বারা অমৃত প্রাপ্ত হন।

মৃত্যুকে প্রথমে উত্তীর্ণ হইতে হইবে, তাহার পরে অমৃতলাভ। সংসারের ভিতর দিয়া এই মৃত্যুকে উত্তীর্ণ হইতে হয়। কর্মের মধ্যে প্রবৃত্তিকে যথার্থভাবে নিযুক্ত করিয়া আগে সেই প্রবৃত্তিকে ও কর্মকে ক্ষয় করিয়া ফেলা, তার পরে ব্রহ্মলাভের কথা—সংসারকে বলপূর্বক অস্বীকার করিয়া কেহ অমৃতের অধিকার পাইতে পারে না।

কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ।
এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম লিপ্যতে নরে।

কর্ম করিয়া শতবৎসর ইহলোকে জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করিবে,—হে নর, তোমার পক্ষে ইহার আর অন্যথা নাই; কর্মে লিপ্ত হইবে না, এমন পথ নাই।

মানুষকে পূর্ণতালাভ করিতে হইলে পরিপূর্ণ জীবন এবং সম্পূর্ণ কর্মের প্রয়োজন হয়। জীবন সম্পূর্ণ হইলেই জীবনের প্রয়োজন নিঃশেষ হইয়া যায়, কর্ম সমাপ্ত হইলেই কর্মের বন্ধন শিথিল হইয়া আসে।

জীবনকে ও জীবনের অবসানকে, কর্মকে ও কর্মের সমাপ্তিকে এইরূপ অত্যন্ত সহজভাবে গ্রহণ করিতে হইলে যে-কথাটি মনে রাখিতে হইবে, তাহা ঈশোপনিষদের প্রথম শ্লোকেই রহিয়াছে—

ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
ঈশ্বরের দ্বারা এই জগতের সমস্ত যাহা-কিছু আচ্ছন্ন জানিবে।

এবং

তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্।

তিনি যাহা ত্যাগ করিতেছেন—তিনি যাহা দিতেছেন, তাহাই ভোগ করিবে, অন্য কাহারও ধনে লোভ করিবে না।

সংসারকে যদি ব্রহ্মের দ্বারা আচ্ছন্ন বলিয়া জানিতে পারি, তাহা হইলে সংসারের বিষ কাটিয়া যায়, তাহার সংকীর্ণতা দূর হইয়া তাহার বন্ধন আমাদিগকে আঁটিয়া ধরে না। এবং সংসারের ভোগকে ঈশ্বরের দান বলিয়া গ্রহণ করিলে কাড়াকাড়ি-মারামারি থামিয়া যায়।

এইরূপে সংসারকে, সংসারের সুখকে, কর্মকে ও জীবনকে ব্রহ্ম-উপলব্ধির সঙ্গে যুক্ত করিয়া খুব বড়ো করিয়া জানাটা হইল সমাজ-রচনার, জীবন-নির্বাহের গোড়াকার কথা।

ভারতবর্ষ এই ভূমার সুরেই সমাজকে বাঁধিবার চেষ্টা করিয়াছিল। সমাজকে বাঁধিয়া মানুষের আত্মাকে মুক্তি দিবার চেষ্টা করিয়াছিল। শরীরকে অপবিত্র বলিয়া পীড়া দিতে চায় নাই, সমাজকে কলুষিত বলিয়া পরিহার করিতে চায় নাই, জীবনকে অনিত্য বলিয়া অবজ্ঞা করিতে চায় নাই—সে সমস্তকেই ব্রহ্মের দ্বারা অখণ্ড-পরিপূর্ণ করিতে চাহিয়াছিল।

য়ুরোপে মানুষের জীবনের দুইটি ভাগ দেখা যায়। এক শেখার অবস্থা—তাহার পরে সংসারের কাজ করিবার অবস্থা। এইখানেই শেষ।

কিন্তু কাজ জিনিসটাকে তো কোনো-কিছুর শেষ বলা যায় না। লাভই শেষ। শক্তিকে শুদ্ধমাত্র খাটাইয়া চলাই তো শক্তির পরিণাম নহে, সিদ্ধিতে পৌঁছানোই পরিণাম। আগুনে কেবল ইন্ধন চাপানোই তো লক্ষ্য নহে, রন্ধনেই তাহার সার্থকতা। কিন্তু য়ুরোপ মানুষকে এমন-কোনো জায়গায় লক্ষ্যস্থাপন করিতে দেয় নাই, কাজ যেখানে তাহার স্বাভাবিক পরিণামে আসিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিতে পারে। টাকা সংগ্রহ করিতে চাও, সংগ্রহের তো শেষ নাই; জগতের খবর জানিতে চাও, জানার তো অন্ত নাই; সভ্যতাকে progress বলিয়া থাক, প্রোগ্রেসশব্দের অর্থই এই দাঁড়াইয়াছে যে, কেবলই পথে চলা কোথাও ঘরে না পৌঁছানো। এইজন্য জীবনকে না-শেষের মধ্যে হঠাৎ শেষ করা, না-থামার মধ্যে হঠাৎ থামিয়া যাওয়া য়ুরোপের জীবনযাত্রা। **Not the game but the chase**—শিকার পাওয়া নহে, শিকারের পশ্চাতে অনুধাবন করাই য়ুরোপের কাছে আনন্দের সারভাগ বলিয়া গণ্য হয়।

যাহা হাতে পাওয়া যায়, তাহাতে সুখ নাই, এ-কথা কি আমরাও বলি না? আমরাও বলি—

> নিঃস্বো বষ্টি শতং শতী দশশতং লক্ষং সহস্রাধিপো
> লক্ষেশঃ ক্ষিতিপালতাং ক্ষিতিপতিশ্চক্রেশ্বরত্বং পুনঃ।
> চক্রেশঃ পুনরিন্দ্রতাং সুরপতির্ব্রাহ্মং পদং বাঞ্ছতি
> ব্রহ্মা বিষ্ণুপদং হরিঃ শিবপদং ত্বাশাবধিং কো গতঃ।

এক কথায়, যে যাহা পায়, তাহাতে তাহার আশা মিটে না—যতই বেশি পাও না কেন, তাহার চেয়ে বেশি পাইবার দিকে মন ছুটে। তবে আর কাজের অন্ত হইবে কেমন করিয়া? পাওয়াতে যখন চাওয়ার শেষ নহে, তখন অসম্পূর্ণ আশার মধ্যে অসমাপ্ত কর্ম লইয়া মরাই মানুষের একমাত্র গতি বলিয়া মনে হয়।

এইখানে ভারতবর্ষ বলিয়াছেন, আর-সমস্ত পাওয়ার এই লক্ষণ বটে, কিন্তু এক

জায়গায় পাওয়ার সমাপ্তি আছে। সেইখানেই যদি লক্ষ্যস্থাপন করি, তবে কাজের অবসান হইবে, আমরা ছুটি পাইব। কোনোখানেই চাওয়ার শেষ নাই, জগৎটা এতবড়ো একটা ফাঁকি, জীবনটা এতবড়ো একটা পাগলামি হইতেই পারে না। মানুষের জীবনসংগীতে কেবলই অবিশ্রাম তানই আছে, আর কোনো জায়গাতেই সম নাই, এ-কথা আমরা মানি না। অবশ্য এ-কথা বলিতে হইবে, তান যতই মনোহর হউক, তাহার মধ্যে গানের অকস্মাৎ শেষ হইলে রসবোধে আঘাত লাগে সমে আসিয়া শেষ হইলে সমস্ত তানের লীলা নিবিড় আনন্দের মধ্যে পরিসমাপ্ত হয়।

ভারতবর্ষ তাই কাজের মাঝখানে জীবনকে মৃত্যু দ্বারা হঠাৎ বিচ্ছিন্ন হইতে উপদেশ দেন নাই। পুরাদমের মধ্যেই সাঁকো ভাঙিয়া হঠাৎ অতলে তলাইয়া যাইতে বলেন নাই, তাহাকে ইস্টিশনে আনিয়া পৌঁছাইয়া দিতে চাহিয়াছেন। সংসার কোনোদিন সমাপ্ত হইবে না, এ-কথা ঠিক; জীবসৃষ্টির আরম্ভ হইতে আজ পর্যন্ত, উন্নতি-অবনতির ঢেউখেলার মধ্য দিয়া সংসার চলিয়া আসিতেছে, তাহার বিরাম নাই। কিন্তু প্রত্যেক মানুষের সংসারলীলার যখন শেষ আছে, তখন মানুষ যদি একটা সম্পূর্ণতার উপলব্ধিকে না জানিয়া প্রস্থান করে, তবে তাহার কী হইল?

বাহিরে কিছুর শেষ নাই, কেবলই একটা হইতে আর-একটা বাড়িয়াই চলিয়াছে। এই চির-চলমান বহিঃসংসারের দোলায় দুলিয়া আমরা মানুষ হইয়াছি—আমার পক্ষে একদিন সে-দোলার কাজ ফুরাইলেও কোনোদিন একবারে তাহার কাজ শেষ হইবে না। এই কথা মনে করিয়া, আমার যতটুকু সাধ্য, এই প্রবাহের পথকে আগে ঠেলিয়া দিতে হইবে। ইহার জ্ঞানের ভাণ্ডারে আমার সাধ্যমত জ্ঞান, ইহার কর্মের চক্রে আমার সাধ্যমত বেগ সঞ্চার করিয়া দিতে হইবে। কিন্তু তাই বলিয়া বাহিরের এই অশেষের মধ্যে আমিসুদ্ধ ভাসিয়া গেলে নষ্ট হইতে হইবে। অন্তরের মধ্যে একটা সমাধার পন্থা আছে। বাহিরে উপকরণের অন্ত নাই, কিন্তু অন্তরে সন্তোষ আছে; বাহিরে দুঃখবেদনার অন্ত নাই, কিন্তু অন্তরে ধৈর্য আছে; বাহিরে প্রতিকূলতার অন্ত নাই, কিন্তু অন্তরে ক্ষমা আছে; বাহিরে লোকের সহিত সম্বন্ধভাবের অন্ত নাই, কিন্তু অন্তরে প্রেম আছে; বাহিরে সংসারের অন্ত নাই, কিন্তু আত্মাতে আত্মা সম্পূর্ণ। একদিকের অশেষের দ্বারাতেই আর-একদিকের অখণ্ডতার উপলব্ধি পরিপূর্ণ হইয়া থাকে। গতির দ্বারাতেই স্থিতিকে মাপিয়া লইতে হয়।

এইজন্য ভারতবর্ষ মানুষের জীবনকে যেরূপে বিভক্ত করিয়াছিলেন, কর্ম তাহার মাঝখানে ও মুক্তি তাহার শেষে।

দিন যেমন চার স্বাভাবিক অংশে বিভক্ত—পূর্বাহ্ণ, মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ণ এবং সায়াহ্ন,

ভারতবর্ষ জীবনকে সেইরূপ চারি আশ্রমে ভাগ করিয়াছিল। এই বিভাগ স্বভাবকে অনুসরণ করিয়াই হইয়াছিল। আলোক ও উত্তাপের ক্রমশ বৃদ্ধি এবং ক্রমশ হ্রাস যেমন দিনের আছে, তেমনি মানুষেরও ইন্দ্রিয়শক্তির ক্রমশ উন্নতি এবং ক্রমশ অবনতি আছে। সেই স্বাভাবিক ক্রমকে অবলম্বন করিয়া ভারতবর্ষ জীবনের আরম্ভ হইতে জীবনান্ত পর্যন্ত একটি অখণ্ড তাৎপর্যকে বহন করিয়া লইয়া গেছে। প্রথমে শিক্ষা, তাহার পরে সংসার, তাহার পরে বন্ধনগুলিকে শিথিল্ করা, তাহার পরে মুক্তি ও মৃত্যুর মধ্যে প্রবেশ—ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও প্রব্রজ্যা।

আধুনিককালে আমরা জীবনের সঙ্গে মৃত্যুর একটা বিরোধ অনুভব করি। মৃত্যু যে জীবনের পরিণাম, তাহা নহে, মৃত্যু যেন জীবনের শত্রু। জীবনের পর্বে পর্বে আমরা অক্ষমভাবে মৃত্যুর সঙ্গে ঝগড়া করিয়া চলিতে থাকি। যৌবন চলিয়া গেলেও আমরা যৌবনকে টানাটানি করিয়া রাখিতে চাই। ভোগের আগুন নিবিয়া আসিতে থাকিলেও আমরা নানাপ্রকার কাঠখড় জোগাইয়া তাহাকে জাগাইয়া রাখিতে চাই। ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস হইয়া আসিলেও আমরা প্রাণপণে কাজ করিতে চেষ্টা করি। মুষ্টি যখন স্বভাবতই শিথিল হইয়া আসে, তখনও আমরা কোনোমতেই কোনো-কিছুর দখল ছাড়িতে চাই না। প্রভাত ও মধ্যাহ্ন ছাড়া আমাদের জীবনের আর-কোনো অংশকে আমরা কিছুতেই স্বীকার করিতে ইচ্ছা করি না। অবশেষে যখন আমাদের চেয়ে প্রবলতর শক্তি কানে ধরিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য করায়, তখন হয় বিদ্রোহ, নয় বিবাদ উপস্থিত হয়—তখন আমাদের সেই পরাভব কেবল রণে ভঙ্গরূপেই পরিণত হয়, তাহাকে কোনো কাজে লাগাইতেই পারি না। যে পরিণামগুলি নিশ্চয় পরিণাম, তাহাদিগকে সহজে গ্রহণ করিবার শিক্ষা হয় নাই বলিয়া কিছুই নিজে ছাড়িয়া দিই না, সমস্ত নিজের কাছ হইতে কাড়িয়া লইতে দিই। সত্যকে অস্বীকার করি বলিয়া পদেপদেই সত্যের নিকটে পরাস্ত হইতে থাকি।

কাঁচা আম শক্ত বোঁটা লইয়া ডালকে খুব জোরে আকর্ষণ করিয়া আছে, তাহার অপরিণত আঁটির গায়ে তাহার অপরিণত শাঁস আঁটিয়া লাগিয়া আছে। কিন্তু প্রত্যহ সে যতটুকু পাকিতেছে, ততটুকু পরিমাণে তাহার বোঁটা ঢিলা হইতেছে, তাহার আঁটি শাঁস হইতে আলগা, সমস্ত ফলটা গাছ হইতে পৃথক হইয়া আসিতেছে। ফল যে একদিন গাছের বাঁধন হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হইয়া যাইবে, ইহাই তাহার সফলতা—গাছকে চিরকাল আঁটিয়া ধরিয়া থাকিলেই সে ব্যর্থ। ফলের মতো আমাদের ইন্দ্রিয়শক্তিও একদিন সংসারের ডাল হইতে সমস্ত রস আকর্ষণ করিয়া লইয়া শেষকালে এই ডালকে ত্যাগ করিয়া ধূলিসাৎ হয়। ইহা জগতের নিয়মেই হয়, ইহার উপরে

আমাদের হাত নাই। কিন্তু ভিতরে যেখানে আমাদের স্বাধীন মনুষ্যত্ব, যেখানে আমাদের ইচ্ছাশক্তির লীলা, সেখানকার পরিণতির পক্ষে ইচ্ছাশক্তিই একটা প্রধান শক্তি। এঞ্জিনের বয়লারের গায়ে যে তাপমান যন্ত্রটা আছে, তাহার পারা স্বভাবের নিয়মেই ওঠে বা নামে, কিন্তু ভিতরের আগুনের আঁচটাকে এই সংকেত বুঝিয়া বাড়াইব কি কমাইব, তাহা এঞ্জিনিয়ারের ইচ্ছার উপরেই নির্ভর করে। আমাদের ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাসবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের প্রবৃত্তির উত্তেজনা ও কর্মে উৎসাহকে বাড়াইব কি কমাইব, তাহা আমাদের হাতে। সেই যথাসময়ে বাড়ানো-কমানোর দ্বারাতেই আমরা সফলতালাভ করি।

পাকা ফলে একদিকে বোঁটা দুর্বল ও শাঁস আলগা হইতে থাকে বটে, তেমনি অন্যদিকে তাহার আঁটি শক্ত হইয়া নূতন প্রাণের সম্বল লাভ করিতে থাকে। আমাদের মধ্যেও সেই হরণ-পূরণ আছে। আমাদেরও বাহিরে হ্রাসের সঙ্গে ভিতরে বৃদ্ধির যোগ আছে। কিন্তু ভিতরের কাজে মানুষের নিজের ইচ্ছা বলবান বলিয়া এই বৃদ্ধি এই পরিণতি আমাদের সাধনার অপেক্ষা রাখে। সেইজন্যই দেখিতে পাই, দাঁত পড়িল, চুল পাকিল, শরীরের তেজ কমিল, মানুষ তাহার আয়ুর শেষপ্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইল, তবু কোনোমতেই সহজে সংসার হইতে আপন বোঁটা আলগা হইতে দিল না—প্রাণপণে সমস্ত আঁকড়াইয়া ধরিয়া রহিল, এমন কি, মৃত্যুর পরেও সংসারের ক্ষুদ্র বিষয়েও তাহার ইচ্ছাই বলবান রহিবে, ইহা লইয়া জীবনের শেষমুহূর্ত পর্যন্ত চিন্তা করিতে লাগিল। আধুনিককাল ইহাকে গর্বের বিষয় মনে করে, কিন্তু ইহা গৌরবের বিষয় নহে।

ত্যাগ করিতেই হইবে এবং ত্যাগের দ্বারাই আমরা লাভ করি। ইহা জগতের মর্মগত সত্য। ফুলকে পাপড়ি খসাইতেই হয়, তবে ফল ধরে, ফলকে ঝরিয়া পড়িতেই হয়, তবে গাছ হয়। গর্ভের শিশুকে গর্ভাশ্রয় ছাড়িয়া পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হইতে হয়। ভূমিষ্ঠ হইয়া শরীরে-মনে সে নিজের মধ্যে বাড়িতে থাকে, তখন তাহার আর কোনো কর্তব্য নাই। তাহার ইন্দ্রিয়শক্তি তাহার বুদ্ধি-বিদ্যা বাড়ার একটা সীমায় আসিলে তাহাকে আবার নিজের মধ্য হইতে সংসারের মধ্যে ভূমিষ্ঠ হইতে হয়। এইখানে পুষ্ট শরীর, শিক্ষিত মন ও সবল প্রবৃত্তি লইয়া সে পরিবার ও প্রতিবেশীদের মাঝখানে নিবিষ্ট হয়। ইহাই তাহার দ্বিতীয় শরীর, তাহার বৃহৎ কলেবর। তাহার পরে শরীর জীর্ণ ও প্রবৃত্তি ক্ষীণ হইয়া আসে, তখন সে আপনার বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও অনাসক্ত প্রবীণতা লইয়া আপন ক্ষুদ্রসংসার হইতে বৃহত্তর সংসারে জন্মগ্রহণ করে; তাহার শিক্ষা, জ্ঞান ও বুদ্ধি একদিকে সাধারণমানবের কাজে লাগিতে থাকে, অন্যদিকে সে অবসরপ্রাপ্ত

মানবজীবনের সঙ্গে নিত্যজীবনের সম্বন্ধ স্থাপন করিতে থাকে। তাহার পরে পৃথিবীর নাড়ির বন্ধন সম্পূর্ণ ক্ষয় করিয়া দিয়া সে অতিসহজে মৃত্যুর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায় ও অনন্তলোকের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে। এইরূপে সে শরীর হইতে সমাজে, সমাজ হইতে নিখিলে, নিখিল হইতে অধ্যাত্মক্ষেত্রে মানবজন্মকে শেষপরিণতি দান করে।

প্রাচীন সংহিতাকারগণ আমাদের শিক্ষাকে আমাদের গার্হস্থ্যকে অনন্তের মধ্যে সেই শেষ পরিণামের অভিমুখ করিতে চাহিয়াছিলেন। সমস্ত জীবনকে জীবনের পরিণামের অনুকূল করিতে চাহিয়াছিলেন। সেইজন্য আমাদের শিক্ষা কেবল বিষয়-শিক্ষা কেবল গ্রন্থশিক্ষা ছিল না, তাহা ছিল ব্রহ্মচর্য। নিয়মসংযমের অভ্যাসদ্বারা এমন একটি বললাভ হইত, যাহাতে ভোগ এবং ত্যাগ উভয়ই আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক হইত। সমস্ত জীবনই নাকি ধর্মাচরণ, কারণ, তাহার লক্ষ্য ব্রহ্মের মধ্যে মুক্তি, সেইজন্য সেই জীবন বহন করিবার শিক্ষাও ধর্মব্রত ছিল। এই ব্রত শ্রদ্ধার সহিত ভক্তির সহিত নিষ্ঠার সহিত অতিসাবধানে যাপন করিতে হইত। মানুষের পক্ষে যাহা একমাত্র পরমসত্য, সেই সত্যকে সম্মুখে রাখিয়া বালক তাহার জীবনের পথে প্রবেশ করিবার জন্য প্রস্তুত হইত।

বাহিরের শক্তির সঙ্গে ভিতরের শক্তির সামঞ্জস্যক্রিয়া প্রাণের লক্ষণ বলিয়া কথিত হইয়াছে। গাছপালায় এই সামঞ্জস্যের কাজ যন্ত্রের মতো ঘটে। আলোকের বাতাসের খাদ্যরসের উত্তেজনার প্রতিক্রিয়ার দ্বারা তাহার প্রাণের কাজ চলিতে থাকে। আমাদের দেহেও সেইরূপ ঘটে। জিহ্বায় খাদ্যসংযোগের উত্তেজনায় আপনি রস ক্ষরিয়া আসে, পাকযন্ত্রেও খাদ্যের সংস্পর্শে সহজেই পাকরসের উদ্রেক হয়। আমাদের শরীরের প্রাণক্রিয়া বাহিরের বিশ্বশক্তির সহজ প্রতিক্রিয়া।

কিন্তু আমাদের আবার মন বলিয়া ইচ্ছা বলিয়া আর-একটা পদার্থ যোগ হওয়াতে প্রাণের উপর আর একটা উপসর্গ বাড়িয়া গেছে। খাইবার অন্যান্য উত্তেজনার সঙ্গে খাইবার আনন্দ একটা আসিয়াছে। তাহাতে করিয়া আহারের কাজটা শুধু আমাদের আবশ্যকের কাজ নহে, আমাদের খুশির কাজ হইয়া উঠিয়াছে। ইহাতে প্রকৃতির কাজের সঙ্গে আমাদের একটা মানসিক সম্বন্ধ বাড়িয়া গেছে। দেহের সঙ্গে দেহের বাহিরের শক্তির একটা সামঞ্জস্য প্রাণের মধ্যে ঘটিতেছে, আবার তাহার সঙ্গে ইচ্ছা-শক্তির একটা সামঞ্জস্য মনের মধ্যে ঘটিতেছে। ইহাতে মানুষের প্রকৃতিযন্ত্রের সাধনা বড়ো শক্ত হইয়া উঠিয়াছে। বিশ্বশক্তির সঙ্গে প্রাণশক্তির সুর অনেকদিন হইতে বাঁধিয়া চুকিয়া গেছে, সেজন্য বড়ো ভাবিতে হয় না, কিন্তু ইচ্ছাশক্তির সুরবাঁধা লইয়া আমাদিগকে অহরহ ঝঞ্চাট পোহাইতে হয়। খাদ্যদ্রব্যে প্রাণশক্তির আবশ্যক

হয়তো ফুরাইল, কিন্তু আমাদের ইচ্ছার তাগিদ শেষ হইল না—শরীরের আবশ্যকসাধনে সে যে আনন্দ পাইল, সেই আনন্দকে সে আবশ্যকের বাহিরেও টানিয়া লইয়া যাইতে চেষ্টা করিল—সে নানা কৃত্রিম উপায়ে বিমুখ রসনাকে রসসিক্ত করিতে ও শ্রান্ত পাকযন্ত্রকে উত্তেজিত করিতে লাগিল, এমনি করিয়া বাহিরের সহিত প্রাণের এবং প্রাণের সহিত মনের একতানতা নষ্ট করিয়া সে নানা অনাবশ্যক চেষ্টা, অনাবশ্যক উপকরণ ও শাখাপল্লবান্বিত দুঃখের সৃষ্টি করিয়া চলিল। আমাদের যাহা প্রয়োজন, তাহার সংগ্রহই যথেষ্ট দুরূহ, তাহার উপরে ভূরিপরিমাণ অনাবশ্যকের বোঝা চাপিয়া সেই আবশ্যকের আয়োজনও কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে। শুধু তাহাই নয়—ইচ্ছা যখন একবার স্বভাবের সীমা লঙ্ঘন করে, তখন কোথাও তাহার আর থামিবার কারণ থাকে না, তখন সে "হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্ধতে"—কেবল সে চাই চাই করিয়া বাড়িয়াই চলে। পৃথিবীতে নিজের এবং পরের পনেরো আনা দুঃখের কারণ ইহাই। অথচ এই ইচ্ছাশক্তিকেই বিশ্বশক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্যে আনাই আমাদের পরমানন্দের হেতু। এইজন্য ইচ্ছাকে নষ্ট করা আমাদের সাধনার বিষয় নহে, ইচ্ছাকে বিশ্ব-ইচ্ছার সঙ্গে একসুরে বাঁধাই আমাদের সকল শিক্ষার চরমলক্ষ্য। গোড়ায় তাহা যদি না করি, তবে আমাদের চঞ্চল মনে জ্ঞান লক্ষ্যভ্রষ্ট, প্রেম কলুষিত ও কর্ম বৃথা পরিভ্রান্ত হইতে থাকে। জ্ঞান, প্রেম ও কর্ম বিশ্বের সহিত সহজ মিলনে মিলিত না হইয়া আমাদের আত্মম্ভরি ইচ্ছার কৃত্রিম সৃষ্টিসকলের মধ্যে মরীচিকা-অনুসরণে নিযুক্ত হইতে থাকে।

এইজন্য আমাদের আয়ুর প্রথম ভাগে ব্রহ্মচর্যপালনদ্বারা ইচ্ছাকে তাহার যথাবিহিত সীমার মধ্যে সহজে সঞ্চরণ করিবার অভ্যাস করাইতে হইবে। ইহাতেই আমাদের বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মানসপ্রকৃতির সুর বাঁধা হইয়া আসিবে। তাহার পরে সেই সুরে তোমার সাধ্যমতো ও ইচ্ছামতো যে-কোনো রাগিণী বাজাও না কেন, সত্যের সুরকে মঙ্গলের সুরকে আনন্দের সুরকে আঘাত করিবে না।

এইরূপে শিক্ষার কাল যাপন করিয়া সংসারধর্মে প্রবৃত্ত হইতে হইবে।

মনু বলিয়াছেন—

ন তথৈতানি শক্যন্তে সংনিয়ন্তুমসেবয়া।
বিষয়েষু প্রজুষ্টানি যথা জ্ঞানেন নিত্যশঃ।

বিষয়ের সেবা না করিয়া সেরূপ সংযমন করা যায় না, বিষয়ে নিযুক্ত থাকিয়া জ্ঞানের দ্বারা নিত্যশ যেমন করিয়া করা যায়।

অর্থাৎ বিষয়ে নিযুক্ত না হইলে জ্ঞান পূর্ণতালাভ করে না, এবং যে সংযম জ্ঞানের দ্বারা লব্ধ নহে, তাহা পূর্ণসংযম নহে—তাহা জড় অভ্যাস বা অনভিজ্ঞতার অন্তরালমাত্র—তাহা প্রকৃতির মূলগত নহে, তাহা বাহ্যিক।

সংযমের সঙ্গে প্রবৃত্তিকে চালনা করিবার শিক্ষা ও সাধনা থাকিলেই কর্ম, বিশেষত মঙ্গলকর্ম করা সহজ ও সুখসাধ্য হয়। সেই অবস্থাতেই গৃহাশ্রম জগতের কল্যাণের আধার হইয়া উঠে। সেই অবস্থাতেই গৃহাশ্রম মানুষের মুক্তিপথে অগ্রসর হইবার বাধা নহে, সহায় হয়। সেই অবস্থাতেই গৃহস্থ যে-কোনো কর্ম করেন, তাহা সহজে ব্রহ্মকে সমর্পণ করিয়া আনন্দিত হইতে পারেন। গৃহের সমস্ত কর্ম যখন মঙ্গলকর্ম হয়,—তাহা যখন ধর্মকর্ম হইয়া উঠে, তখন, সেই কর্মের বন্ধন মানুষকে বাঁধিয়া একেবারে জর্জরীভূত করিয়া দেয় না। যথাসময়ে সে-বন্ধন অনায়াসে স্খলিত হইয়া যায়, যথাসময়ে সে-কর্মের একটা স্বাভাবিক পরিসমাপ্তি আপনি আসে।

আয়ুর দ্বিতীয় ভাগকে এইরূপে সংসারধর্মে নিযুক্ত করিয়া শরীরের তেজ যখন হ্রাস হইতে থাকিবে, তখন এ-কথা মনে রাখিতে হইবে যে, এই ক্ষেত্রের কাজ শেষ হইল—সেই খবরটা আসিল। শেষ হইল খবর পাইয়া চাকরি-বরখাস্ত হতভাগার মতো নিজেকে দীন বলিয়া দেখিতে হইবে না। আমার সমস্ত গেল, ইহাকেই অনুশোচনার বিষয় করিলে চলিবে না, এখন আরও বড়ো পরিধিবিশিষ্ট ক্ষেত্রের মধ্যে প্রবেশ করিতে হইবে বলিয়া সেইদিকে আশার সহিত বলের সহিত মুখ ফিরাইতে হইবে। যাহা গায়ের জোরের, যাহা ইন্দ্রিয়শক্তির, যাহা প্রবৃত্তিসকলের ক্ষেত্র ছিল, তাহা এবারে পিছনে পড়িয়া রহিল—সেখানে যাহা-কিছু ফসল জন্মাইয়াছি, তাহা কাটিয়া মাড়াই করিয়া গোলা-বোঝাই করিয়া দিয়া এ মজুরি শেষ করিয়া চলিলাম—এবার সন্ধ্যা আসিতেছে—আপিসের কুঠরি ছাড়িয়া বড়ো রাস্তা ধরিতে হইবে। ঘরে না পৌঁছিলে তো চরমশান্তি নাই। যেখানে যত-কিছু সহিলাম, কত-কিছু খাটিলাম, সে কিসের জন্য? ঘরের জন্য তো? সেই ঘরই ভূমা—সেই ঘরই আনন্দ—যে আনন্দ হইতে আমরা আসিয়াছি, যে আনন্দে আমরা যাইব। তাহা যদি না হয়, তবে ততঃ কিম্, ততঃ কিম্, ততঃ কিম্।

তাই গৃহাশ্রমের কাজ সারিয়া সন্তানের হাতে সংসারের ভার সমর্পণ করিয়া এবার বড়ো রাস্তায় বাহির হইবার সময়। এবার বাহিরের খোলা বাতাসে বুক ভরিয়া লইতে হইবে—খোলা আকাশের আলোতে দৃষ্টিকে নিমগ্ন এবং শরীরের সমস্ত রোমকূপকে পুলকিত করিতে হইবে। এবার একদিককার পালা সমাধা হইল। আঁতুড়ঘরে নাড়ি কাটা পড়িল, এখন অন্য জগতে স্বাধীন সঞ্চরণের অধিকার লাভ করিতে হইবে।

শিশু গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইলেও সম্পূর্ণ স্বাধীন হইবার পূর্বে কিছুকাল মাতার কাছেকাছেই থাকে। বিযুক্ত হইয়াও যুক্ত থাকে, সম্পূর্ণ বিযুক্ত হইবার জন্য প্রস্তুত হয়। বানপ্রস্থ-আশ্রমও সেইরূপ। সংসারের গর্ভ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াও বাহিরের দিক

হইতে সংসারের সঙ্গে সেই তৃতীয়-আশ্রমধারীর যোগ থাকে। বাহিরের দিক হইতে সে সংসারকে আপনার জীবনের সঞ্চিত জ্ঞানের ফলদান করে এবং সংসার হইতে সহায়তা গ্রহণ করে। এই দান-গ্রহণ সংসারীর মতো একান্তভাবে করে না, মুক্তভাবে করে।

অবশেষে আয়ুর চতুর্থভাগে এমন দিন আসে, যখন এই বন্ধনটুকুও ফেলিয়া একাকী সেই পরম একের সম্মুখীন হইতে হয়। মঙ্গলকর্মের দ্বারা পৃথিবীর সমস্ত সম্বন্ধকে পূর্ণপরিণতি দান করিয়া আনন্দস্বরূপের সহিত চিরন্তন সম্বন্ধকে লাভ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে হয়। পতিব্রতা স্ত্রী যেমন সমস্তদিন সংসারের নানা লোকের সহিত নানা সম্বন্ধ পালন করিয়া নানা কর্ম সমাধা করিয়া স্বামীরই কর্ম করেন, স্বামীরই সম্বন্ধ যথার্থভাবে স্বীকার করেন; অবশেষে দিন-অবসান হইলে একে একে কাজের জিনিসগুলি তুলিয়া রাখিয়া, কাজের কাপড় ছাড়িয়া, গা ধুইয়া, কর্মস্থানের চিহ্ন মুছিয়া নির্মল মিলনবেশে একাকিনী স্বামীর সহিত একমাত্র পূর্ণসম্বন্ধের অধিকার গ্রহণ করিবার জন্য নির্জনগৃহে প্রবেশ করেন, সমাপ্তকর্ম পুরুষ সেইরূপ একে একে কাজের জীবনের সমস্ত খণ্ডতা ঘুচাইয়া দিয়া অসীমের সহিত সম্মিলনের জন্য প্রস্তুত হইয়া অবশেষে একাকী সেই একের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হন এবং সম্পূর্ণ জীবনকে এই পরিপূর্ণ সমাপ্তির মধ্যে অখণ্ড সার্থকতা দান করেন। এইরূপেই মানবজীবন আদ্যোপান্ত সত্য হয়, জীবন মৃত্যুকে লঙ্ঘন করিতে বৃথা চেষ্টা করে না ও মৃত্যু শত্রুপক্ষের ন্যায় জীবনকে আক্রমণ করিয়া বলপূর্বক পরাস্ত করে না। জীবনকে আর আমরা যেমন করিয়াই খণ্ডবিখণ্ড-বিক্ষিপ্ত করি, অন্য যে-কোনো অভিপ্রায়কেই আমরা চরম বলিয়া জ্ঞান করি এবং তাহাকে আমরা দেশ-উদ্ধার, লোকহিত বা যে-কোনো বড়ো নাম দিই না কেন, তাহার মধ্যে সম্পূর্ণতা থাকে না—তাহা আমাদিগকে মাঝপথে অকস্মাৎ পরিত্যাগ করে, তাহার মধ্য হইতে এই প্রশ্নই কেবলই বাজিতে থাকে—ততঃ কিম্, ততঃ কিম্, ততঃ কিম্। আর ভারতবর্ষ চারি আশ্রমের মধ্য দিয়া মানুষের জীবনকে বাল্য, যৌবন, প্রৌঢ়বয়স ও বার্ধক্যের স্বাভাবিক বিভাগের অনুগত করিয়া অধ্যায়ে অধ্যায়ে যেরূপ একমাত্র সমাপ্তির দিকে লইয়া গিয়াছেন, তাহাতে বিশাল বিশ্বসংগীতের সহিত মানুষের জীবন অবিরোধে সম্মিলিত হয়। বিদ্রোহ-বিরোধ থাকে না; অশিক্ষিত প্রবৃত্তি আপনার উপযুক্ত স্থানকাল বিস্মৃত হইয়া যে-সকল গুরুতর অশান্তির সৃষ্টি করিতে থাকে, তাহারই মধ্যে বিভ্রান্ত ও নিখিলের সহিত সহজ-সত্যসম্বন্ধ-ভ্রষ্ট হইয়া পৃথিবীর মধ্যে উৎপাতস্বরূপ হইয়া উঠিতে হয় না।

আমি জানি, এইখানে একটা প্রশ্ন উদয় হইবে যে, একটা দেশের সকল লোককেই কি এই আদর্শে গড়িয়া তোলা যায়? তাহার উত্তরে আমি এই কথা বলি যে, যখন

ঘরে আলো জ্বলে, তখন কি পিলসুজ হইতে আরম্ভ করিয়া পলিতা পর্যন্ত প্রদীপের সমস্তটাই জ্বলে? জীবনযাপনসম্বন্ধে ধর্মসম্বন্ধে যে-দেশের যে-কোনো আদর্শই থাক না কেন, তাহা সমস্ত দেশের মুখাগ্রভাগেই উজ্জ্বলরূপে প্রকাশ পায়। কিন্তু পলিতার ডগাটামাত্র জ্বলাকেই সমস্ত দীপের জ্বলা বলে। তেমনি দেশের এক অংশমাত্র যে ভাবকে পূর্ণরূপে আয়ত্ত করেন, সমস্ত দেশেরই তাহা লাভ। বস্তুত সেই অংশটুকুমাত্রকে পূর্ণতা দিবার জন্য সমস্ত দেশকে প্রস্তুত হইতে হয়, সমস্ত সমাজকে অনুকূল হইতে হয়—ডালের আগায় ফল ধরাইতে গাছের শিকড় এবং গুঁড়িকে সচেষ্ট থাকিতে হয়। ভারতবর্ষে যদি এমন দিন আসে যে, আমাদের দেশের মান্যশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা সর্বোচ্চ সত্য এবং সর্বোচ্চ মঙ্গলকেই আর-সমস্ত খণ্ড প্রয়োজনের ঊর্ধ্বে তুলিয়া চিরজীবনের সাধনার সামগ্রী করিয়া রাখেন, তবে তাঁহাদের সাধনা ও সার্থকতা সমস্ত দেশের মধ্যে একটা বিশেষ গতি একটা বিশেষ শক্তি সঞ্চার করিবেই। একদিন ভারতবর্ষে ঋষিরা যখন ব্রহ্মের সাধনায় রত ছিলেন, তখন সমস্ত আর্যসমাজের মধ্যেই—রাজকার্যে যুদ্ধে বাণিজ্যে সাহিত্যে শিল্পে ধর্মার্চনায়—সর্বত্রই সেই ব্রহ্মের সুর বাজিয়াছিল, কর্মের মধ্যে মোক্ষের ভাব বিরাজ করিয়াছিল—ভারতবর্ষের সমস্ত সমাজস্থিতি মৈত্রেয়ীর ন্যায় বলিতেছিল, "যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাম্।" সে বাণী চিরদিনের মতোই নীরব হইয়া গেছে এমনিই যদি আমাদের ধারণা হয়, তবে আমাদের এই মৃতসমাজকে এত উপকরণ জোগাইয়া বৃথা সেবা করিয়া মরিতেছি কেন? তবে তো এই মুহূর্তেই আপাদমস্তকে পরজাতির অনুকরণ করাই আমাদের পক্ষে শ্রেয়—কারণ, পরিণামহীন ব্যর্থতার বোঝা অকারণে বহিয়া পড়িয়া থাকার চেয়ে সজীবভাবে কিছু-একটা হইয়া উঠার চেষ্টা করা ভালো। কিন্তু এ-কথা কখনোই মানিব না। আমাদের প্রকৃতি মানিবে না। যতই দুর্গতি হউক, আমাদের অন্তরতম স্থান এমনভাবে তৈরি হইয়া আছে যে, কোনো অসম্পূর্ণ অধিকারকে আমাদের মন পরমলাভ বলিয়া সায় দিতে পারিবে না। এখনও যদি কোনো সাধক তাঁহার জীবনের যন্ত্রে সংসারের সকল চাওয়া সকল পাওয়ার চেয়ে উচ্চতম সপ্তকে একটা বড়ো সুর বাজাইয়া তোলেন, সেটা আমাদের হৃদয়ের তারে তখনই প্রতিঝংকৃত হইতে থাকে—তাহাকে আমরা ঠেকাইতে পারি না। প্রতাপ এবং ঐশ্বর্যের প্রতিযোগিতাকে আমরা যতবড়ো কণ্ঠে যতবড়ো করিয়াই প্রচার করিবার চেষ্টা করিতেছি, আমরা সমস্ত মনপ্রাণ দিয়া তাহা গ্রহণ করিতে পারিতেছি না। তাহা আমাদের মনের বাহির্দ্বারে একটা গোলমাল পাকাইয়া তুলিয়াছে মাত্র। আমাদের সমাজে আজকাল বিবাহ প্রভৃতি ক্রিয়াকর্মে দেশী রোশনচৌকির সঙ্গে সঙ্গে একইকালে গড়ের বাদ্য বাজানো হয় দেখিতে পাই। ইহাতে

সংগীত ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া কেবল একটা সুরের গণ্ডগোল হইতে থাকে। এই বিষম গণ্ডগোলের ঝঞ্ঝনার মধ্যে মনোযোগ দিলেই বুঝা যায় যে, রোশনচৌকির বৈরাগ্যগাম্ভীর্য-মিশ্রিত করুণ শাহানাই আমাদের উৎসবের চিরন্তন হৃদয়ের মধ্য হইতে বাজিতেছে, আর গড়ের বাদ্য তাহার প্রচণ্ড কাংস্যকণ্ঠ ও স্ফীতোদর জয়ঢাকটা লইয়া কেবলমাত্র ধনের অহংকার কেবলমাত্র ফ্যাশানের আড়ম্বরকে অভ্রভেদী করিয়া সমস্ত গভীরতর অন্তরতর সুরকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে। তাহা আমাদের মঙ্গল-অনুষ্ঠানের মধ্যে একটা গর্বপরিপূর্ণ অসামঞ্জস্যকেই অত্যুৎকট করিয়া তুলিতেছে—তাহা আমাদের উৎসবের চিরদিনের বেদনার সঙ্গে আপনার সুর মিলাইতেছে না। আমাদের জীবনের সকল দিকেই এমনিতরো একটা খাপছাড়া জোড়াতাড়া ব্যাপার ঘটিতেছে। য়ুরোপীয় সভ্যতার প্রতাপ ও ঐশ্বর্যের আয়োজন আমাদের দৃষ্টিকে মুগ্ধ করিয়াছে; তাহার অসংগত ক্ষীণ অনুকরণের দ্বারা আমরা আমাদের আড়ম্বর-আস্ফালনের প্রবৃত্তিকে খুব দৌড় করাইতেছি; আমাদের দেউড়ির কাছে তাহার বড়ো জয়ঢাকটা কাঠি পিটাইয়া খুবই শব্দ করিতেছে, কিন্তু সে আমাদের অন্তঃপুরের খবর রাখে, সে জানে, সেখানকার মঙ্গলশঙ্খ এই বাহ্যাড়ম্বরের ধমকে নীরব হইয়া যায় নাই, ভাড়া-করা গড়ের বাদ্য একসময় যখন গড়ের মধ্যে ফিরিয়া যায়, তখনও ঘরের এই শঙ্খ আকাশে উৎসবের মঙ্গলধ্বনি ঘোষণা করে। আমরা ইংরেজের রাষ্ট্রনীতি সমাজনীতি বাণিজ্যনীতির উপযোগিতা খুব করিয়া স্বীকার ও প্রচার করিতেছি, কিন্তু তাহাতে কোনোমতেই আমাদের সমস্ত হৃদয়কে পূর্ণভাবে আকর্ষণ করিতেছে না। আমরা সকলের চেয়ে বড়ো সুর যাহা শুনিয়াছি, এ সুর যে তাহাকে আঘাত করিতেছে—আমাদের অন্তরাত্মা এক জায়গায় ইহাকে কেবলই অস্বীকার করিতেছে।

আমরা কোনোদিন এমনতরো হাটের মানুষ ছিলাম না। আজ আমরা হাটের মধ্যে বাহির হইয়া ঠেলাঠেলি ও চীৎকার করিতেছি—ইতর হইয়া উঠিয়াছি, কলহে মাতিয়াছি, পদ ও পদবী লইয়া কাড়াকাড়ি করিতেছি, বড়ো অক্ষরের ও উচ্চকণ্ঠের বিজ্ঞাপনের দ্বারা নিজেকে আর পাঁচজনের চেয়ে অগ্রসর করিয়া ঘোষণা করিবার প্রাণপণ চেষ্টা চলিতেছে। অথচ ইহা একটা নকল। ইহার মধ্যে সত্য অতি অল্পই আছে। ইহার মধ্যে শান্তি নাই, গাম্ভীর্য নাই, শিষ্টতাশীলতার সংযম নাই, শ্রী নাই। এই নকলের যুগ আসিবার পূর্বে আমাদের মধ্যে এমন একটা স্বাভাবিক মর্যাদা ছিল যে, দারিদ্র্যেও আমাদিগকে মানাইত, মোটা ভাত মোটা কাপড়ে আমাদের গৌরব নষ্ট করিতে পারিত না। কর্ণ যেমন তাঁহার কবচকুণ্ডল লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তখনকার দিনে আমরা সেইরূপ একটা স্বাভাবিক আভিজাত্যের কবচ লইয়াই

জন্মিতাম। সেই কবচেই আমাদিগকে বহুদিনের অধীনতা ও দুঃখদারিদ্র্যের মধ্যেও বাঁচাইয়া রাখিয়াছে—আমাদের সম্মান নষ্ট করিতে পারে নাই। কারণ, আমাদের সে সম্মান বাহিরের আহরণ-করা ধন ছিল না, সে আমাদের অন্তরের সামগ্রী ছিল। সেই সহজাত কবচখানি আমাদের কাছ হইতে কে ভুলাইয়া লইল। ইহাতেই আমাদের আত্মরক্ষার উপায় চলিয়া গেছে। এখন আমরা বিশ্বের মধ্যে লজ্জিত। এখন আমাদের বেশে-ভূষায় আয়োজনে-উপকরণে একটু কোথাও কিছু খাটো পড়িয়া গেলেই আমরা আর মাথা তুলিতে পারি না। সম্মান এখন বাহিরের জিনিস হইয়া পড়িয়াছে, তাই উপাধির জন্য খ্যাতির জন্য আমরা বাহিরের দিকে ছুটিয়াছি, বাহিরের আড়ম্বরকে কেবলই বাড়াইয়া তুলিতেছি, এবং কোথাও একটু-কিছু ছিদ্র বাহির হইবার উপক্রম হইলেই তাহাকে মিথ্যার তালি দিয়া ঢাকা দিবার চেষ্টা করিতেছি। কিন্তু ইহার অন্ত কোথায়? যে ভদ্রতা আমাদের অন্তরের সামগ্রী ছিল, তাহাকে আজ যদি বাহিরে টানিয়া জুতার দোকান, কাপড়ের দোকান, ঘোড়ার হাট এবং গাড়ির কারখানায় ঘোরাইতে আরম্ভ করি, তবে কোথায় লইয়া গিয়া তাহাকে বলিব, বস্‌, হইয়াছে, এখন বিশ্রাম করো। আমরা সন্তোষকেই সুখের পূর্ণতা বলিয়া জানিতাম; কারণ, সন্তোষ অন্তরের সামগ্রী—এখন সেই সুখকে যদি হাটে-হাটে ঘাটে-ঘাটে খুঁজিয়া ফিরিতে হয়, তবে কবে বলিতে পারিব, সুখ পাইয়াছি। এখন আমাদের ভদ্রতাকে সস্তা কাপড়ে অপমান করে, বিলাতি গৃহসজ্জার অভাবে উপহাস করে, চেকবহির অঙ্কপাতের ন্যূনতায় তাহার প্রতি কলঙ্কপাত করে—এমন ভদ্রতাকে মজুরের মতো বহন করিয়া গৌরববোধ করা যে কত লজ্জাকর, তাহাই আমরা ভুলিতে বসিয়াছি। আর যে-সকল পরিণামহীন উত্তেজনা উন্মাদনাকে আমরা সুখ বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছি, তাহার দ্বারা আমাদের মতো বহির্বিষয়ে পরাধীন জাতিকে অন্তঃকরণেও দাসানুদাস করিয়াছে।

কিন্তু তবু বলিতেছি, এই উপসর্গ এখনও আমাদের মজ্জার মধ্যে প্রবেশ করে নাই। এখনও ইহা বাহিরেই পড়িয়া আছে; এবং বাহিরে আছে বলিয়াই ইহার কলরব এত বেশি—সেইজন্যই ইহার এত আতিশয্য ও অতিশয়োক্তির প্রয়োজন হয়। এখনও এ আমাদের গভীরতর স্বভাবের অনুগত হয় নাই বলিয়াই সন্তরণ-মূঢ়ের সাঁতারকাটার মতো ইহাকে লইয়া আমাদিগকে এমন উন্মত্তের ন্যায় আস্ফালন করিতে হয়।

কিন্তু একবার কেহ যদি আমাদের মধ্যে দাঁড়াইয়া যথার্থ অধিকারের সহিত এ-কথা বলেন যে, "অসম্পূর্ণ প্রয়াসে, উন্মত্ত প্রতিযোগিতায়, অনিত্য ঐশ্বর্যে আমাদের শ্রেয় নহে—জীবনের একটি পরিপূর্ণ পরিণাম আছে, সকল কর্ম সকল সাধনার একটি পরিপূর্ণ

পরিসমাপ্তি আছে, এবং সেই পরিণাম সেই পরিসমাপ্তিই আমাদের প্রত্যেকের একমাত্র চরম চরিতার্থতা ;—তাহার নিকটে আর সমস্তই তুচ্ছ”—তবে আজও এই হাট-বাজারের কোলাহলের মধ্যেও আমাদের সমস্ত হৃদয় সায় দিয়া উঠে, বলে, “সত্য, ইহাই সত্য, ইহার চেয়ে সত্য আর কিছুই নাই।” তখন, ইস্কুলে যে-সকল ইতিহাসের পড়া মুখস্থ করিয়াছিলাম ; কাড়াকাড়ি-মারামারির কথা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অভিমানকেই সর্বোচ্চ সিংহাসনে নররক্ত দিয়া অভিষেক করিবার কথা অত্যন্ত ক্ষীণ-খর্ব হইয়া আসে ; তখন লালকুর্তিপরা অক্ষৌহিণী সেনার দম্ভ, উন্নতমাস্তুল বৃহদাকার যুদ্ধ-জাহাজের ঔদ্ধত্য আমাদের চিত্তকে আর অভিভূত করে না ;—আমাদের মর্মস্থলে ভারতবর্ষের বহুযুগের একটি সজলজলদগম্ভীর ওংকারধ্বনি নিত্যজীবনের আদিস্বরটিকে জগতের সমস্ত কোলাহলের ঊর্ধ্বে জাগাইয়া তুলে। ইহাকে আমরা কোনোমতেই অস্বীকার করিতে পারিব না ; যদি করি, তবে ইহার পরিবর্তে আমরা এমন কিছুই পাইব না, যাহার দ্বারা আমরা মাথা তুলিয়া দাঁড়াইব, যাহার দ্বারা আমরা আপনাকে রক্ষা করিতে পারিব। আমরা কেবলই তরবারির ছটা, বাণিজ্যের ঘটা, কলকারখানার রক্তচক্ষু এবং স্বর্গের প্রতিস্পর্ধী যে ঐশ্বর্য উত্তরোত্তর আপনার উপকরণস্তূপকে উচ্চে তুলিয়া আকাশের সীমা মাপিবার ভান করিতেছে, তাহার উৎকটমূর্তি দেখিয়া সমস্ত মনেপ্রাণে কেবলই পরাস্তপরাভূত হইতে থাকিব, কেবলই সংকুচিতশঙ্কিত হইয়া পৃথিবীর রাজপথে ভিক্ষাসম্বল দীনহীনের মতো ফিরিয়া বেড়াইব।

অথচ এ-কথাও আমি কোনোমতেই স্বীকার করি না যে, আমরা যাহাকে শ্রেয় বলিতেছি, তাহা কেবল আমাদের পক্ষেই শ্রেয়। আমরা অক্ষম বলিয়া ধর্মকে দায়ে পড়িয়া বরণ করিতে হইবে, তাহাকে দারিদ্র্য গোপন করিবার একটা কৌশলস্বরূপে গ্রহণ করিতে হইবে, এ-কথা কখনোই সত্য নহে। প্রাচীন সংহিতাকার মানবজীবনের যে আদর্শ আমাদের সম্মুখে ধরিয়াছেন, তাহা কেবলমাত্র কোনো-একটি বিশেষ জাতির বিশেষ অবস্থার পক্ষেই সত্য, তাহা নহে। ইহাই একমাত্র সত্য আদর্শ, সুতরাং ইহাই সকল মানুষেরই পক্ষে মঙ্গলের হেতু। প্রথম বয়সে শ্রদ্ধার দ্বারা সংযমের দ্বারা ব্রহ্মচর্যের দ্বারা প্রস্তুত হইয়া দ্বিতীয় বয়সে সংসার-আশ্রমে মঙ্গলকর্মে আত্মাকে পরিপুষ্ট করিতে হইবে ; তৃতীয় বয়সে উদারতর ক্ষেত্রে একে একে সমস্ত বন্ধন শিথিল করিয়া অবশেষে আনন্দের সহিত মৃত্যুকে মোক্ষের নামান্তররূপে গ্রহণ করিবে—মানুষের জীবনকে এমন করিয়া চালাইলেই তবে তাহার আদ্যন্তসংগত পূর্ণতাৎপর্য পাওয়া যায়। তবেই সমুদ্র হইতে যে মেঘ উৎপন্ন হইয়া পর্বতের রহস্যগূঢ় গুহা হইতে নদীরূপে বাহির হইল, সমস্ত যাত্রাশেষে আবার তাহাকে সেই সমুদ্রের মধ্যেই পূর্ণতররূপে সম্মিলিত হইতে

দেখিয়া তৃপ্তিলাভ করি। মাঝপথে যেখানেই হউক, তাহার অকস্মাৎ অবসান অসংগত অসমাপ্ত। এ-কথা যদি অন্তরের সঙ্গে বুঝিতে পারি, তবে বলিতেই হইবে, এই সত্যকেই উপলব্ধি করিবার জন্য সকল জাতিকেই নানা পথ দিয়া নানা আঘাতে ঠেকিয়া বারংবার চেষ্টা করিতেই হইবে। ইহার কাছে বিলাসীর উপকরণ, নেশনের প্রতাপ, রাজার ঐশ্বর্য, বণিকের সমৃদ্ধি, সমস্তই গৌণ; মানুষের আত্মাকে জয়ী হইতে হইবে, মানুষের আত্মাকে মুক্ত হইতে হইবে, তবেই মানুষের এতকালের সমস্ত চেষ্টা সার্থক হইবে—নহিলে ততঃ কিম্‌, ততঃ কিম্‌, ততঃ কিম্‌।

১৩১৩

আনন্দরূপ

সত্যং জ্ঞানমনন্তম্‌। তিনি সত্য, তিনি জ্ঞান, তিনি অনন্ত। এই অনন্ত সত্যে, অনন্ত জ্ঞানে তিনি আপনাতে আপনি বিরাজিত। সেখানে আমরা তাঁহাকে কোথায় পাইব। সেখান হইতে যে বাক্যমন নিবৃত্ত হইয়া আসে।

কিন্তু উপনিষদ্‌ এ-কথাও বলেন যে, এই সত্যং জ্ঞানমনন্তম্‌ আমাদের কাছে প্রকাশ পাইতেছেন। তিনি অগোচর নহেন। কিন্তু তিনি কই প্রকাশ পাইতেছেন। কোথায়?

আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি। তাঁহার আনন্দরূপ অমৃতরূপ আমাদের কাছে প্রকাশ পাইতেছে। তিনি যে আনন্দিত, তিনি যে রসস্বরূপ, ইহাই আমাদের নিকট প্রকাশমান।

কোথায় প্রকাশমান?—এ প্রশ্ন কি জিজ্ঞাসা করিতে হইবে? যাহা অপ্রকাশিত, তাহার সম্বন্ধেই প্রশ্ন চলিতে পারে, কিন্তু যাহা প্রকাশিত, তাহাকে "কোথায়" বলিয়া কে সন্ধান করিয়া বেড়ায়?

প্রকাশ কোন্‌খানে? এই যে চারিদিকে যাহা দেখিতেছি, তাহাই যে প্রকাশ। এই যে সম্মুখে, এই যে পার্শ্বে, এই যে অধোতে, এই যে ঊর্ধ্বে—এই যে কিছুই গুপ্ত নাই। এ যে সমস্তই সুস্পষ্ট। এ যে আমার ইন্দ্রিয়মনকে অহোরাত্রি অধিকার করিয়া রহিয়াছে। স এবাধস্তাৎ স উপরিষ্টাৎ স পশ্চাৎ স পুরস্তাৎ স দক্ষিণতঃ স উত্তরতঃ। এই তো প্রকাশ, এ-ছাড়া আর প্রকাশ কোথায়?

এই যে যাহাকে আমরা প্রকাশ বলিতেছি, এ কেমন করিয়া হইল? তাঁহার ইচ্ছায়, তাঁহার আনন্দে, তাঁহার অমৃতে। আর তো কোনো কারণ থাকিতেই পারে

না। তিনি আনন্দিত, সমস্ত প্রকাশ এই কথাই বলিতেছে। যাহা-কিছু আছে, এ-সমস্তই তাঁহার আনন্দরূপ, তাঁহার অমৃতরূপ সুতরাং ইহার কিছুই অপ্রকাশ হইতে পারে না। তাঁহার আনন্দকে কে আচ্ছন্ন করিবে? এমন মহান্ধকার কোথায় আছে? ইহার কণাটিকেও ধ্বংস করিতে পারে, এমন শক্তি কার। এমন মৃত্যু কোথায়? এ যে অমৃত।

সত্যং জ্ঞানমনন্তম্। তিনি বাক্যের মনের অতীত। কিন্তু অতীত হইয়া রহিলেন কই? এই যে দশদিকে তিনি আনন্দরূপে আপনাকে একেবারে দান করিয়া ফেলিতেছেন। তিনি তো লুকাইলেন না। যেখানে আনন্দে অমৃতে তিনি অজস্র ধরা দিয়াছেন, সেখানে প্রাচুর্যের অন্ত কোথায়, সেখানে বৈচিত্র্যের যে সীমা নাই; সেখানে কী ঐশ্বর্য, কী সৌন্দর্য। সেখানে আকাশ যে শতধা বিদীর্ণ হইয়া আলোকে আলোকে নক্ষত্রে নক্ষত্রে খচিত হইয়া উঠিল, সেখানে রূপ যে কেবলই নূতন নূতন, সেখানে প্রাণের প্রবাহ যে আর ফুরায় না। তিনি যে আনন্দরূপে নিজেকে নিয়তই দান করিতে বসিয়াছেন— লোকে-লোকান্তরে সে-দান আর ধারণ করিতে পারিতেছে না—যুগে-যুগান্তরে তাহার আর অন্ত দেখিতে পাই না। কে বলে, তাঁহাকে দেখা যায় না; কে বলে, তিনি শ্রবণের অতীত; কে বলে, তিনি ধরা দেন না। তিনিই যে প্রকাশমান—আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি। সহস্র চক্ষু থাকিলেও যে দেখিয়া শেষ করিতে পারিতাম না, সহস্র কর্ণ থাকিলেও শোনা ফুরাইত কবে। যদি ধরিতেই চাও, তবে বাহু কতদূর বিস্তার করিলে সে-ধরার অন্ত হইবে। এ যে আশ্চর্য। মানুষজন্ম লইয়া এই নীল আকাশের মধ্যে কী চোখই মেলিয়াছি। এ কী দেখাই দেখিলাম। দুটি কর্ণপুট দিয়া অনন্ত রহস্যলীলাময় স্বরের ধারা অহরহ পান করিয়া যে ফুরাইল না। সমস্ত শরীরটা যে আলোকের স্পর্শে বায়ুর স্পর্শে স্নেহের স্পর্শে প্রেমের স্পর্শে কল্যাণের স্পর্শে বিদ্যুৎতন্ত্রীখচিত অলৌকিক বীণার মতো বারংবার স্পন্দিত-ঝংকৃত হইয়া উঠিতেছে। ধন্য হইলাম, আমরা ধন্য হইলাম—এই প্রকাশের মধ্যে প্রকাশিত হইয়া ধন্য হইলাম— পরিপূর্ণ আনন্দের এই আশ্চর্য অপরিমেয় প্রাচুর্যের মধ্যে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐশ্বর্যের মধ্যে আমরা ধন্য হইলাম। পৃথিবীর ধূলির সঙ্গে তৃণের সঙ্গে কীটপতঙ্গের সঙ্গে গ্রহতারাসূর্যচন্দ্রের সঙ্গে আমরা ধন্য হইলাম।

ধূলিকে আজ ধূলি বলিয়া অবজ্ঞা করিয়ো না, তৃণকে আজ তৃণজ্ঞান করিয়ো না,— তোমার ইচ্ছায় এ ধূলিকে পৃথিবী হইতে মুছিতে পার না, এ ধূলি তাঁহার ইচ্ছা; তোমার ইচ্ছায় এ তৃণকে অবমানিত করিতে পার না, এ শ্যামল তৃণ তাঁহারই আনন্দ মূর্তিমান। তাঁহার আনন্দপ্রবাহ আলোকে উচ্ছ্বসিত হইয়া আজ বহুলক্ষক্রোশ দূর হইতে নব-

জাগরণের দেবদূতরূপে তোমার সুপ্তির মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, ইহাকে ভক্তির সহিত অন্তঃকরণে গ্রহণ করো, ইহার স্পর্শের যোগে আপনাকে সমস্ত আকাশে ব্যাপ্ত করিয়া দাও।

আজ প্রভাতের এই মুহূর্তে পৃথিবীর অর্ধভূখণ্ডে নবজাগ্রত সংসারে কর্মের কী তরঙ্গই জাগিয়া উঠিয়াছে। এই সমস্ত প্রবল প্রয়াস এই সমস্ত বিপুল উদ্‌যোগে যত পুঞ্জপুঞ্জ সুখদুঃখ-বিপৎসম্পদ্‌ গ্রামে-গ্রামে নগরে-নগরে দূরে-দূরান্তরে হিল্লোলিত-ফেনায়িত হইয়া উঠিতেছে, সমস্তই কেবল তাঁহার ইচ্ছা, তাঁহার আনন্দ, ইহাই জানিয়া পৃথিবীর সমস্ত লোকালয়ের কর্মকলরবের সংগীতকে একবার স্তব্ধ হইয়া অধ্যাত্মকর্ণে শ্রবণ করো—তার পরে সমস্ত অন্তঃকরণ দিয়া বলো—সুখে-দুঃখে তাঁহারই আনন্দ, লাভে-ক্ষতিতে তাঁহারই আনন্দ, জন্মে-মরণে তাঁহারই আনন্দ—সেই "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্‌ ন বিভেতি কুতশ্চন"—ব্রহ্মের আনন্দকে যিনি জানেন, তিনি কাহা হইতেও ভয়প্রাপ্ত হন না।

ক্ষুদ্র স্বার্থ ভুলিয়া, ক্ষুদ্র অহমিকা দূর করিয়া তোমার নিজের অন্তঃকরণকে একবার আনন্দে জাগাইয়া তোলো—তবেই আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি, আনন্দরূপে অমৃতরূপে যিনি চতুর্দিকেই প্রকাশ পাইতেছেন, সেই আনন্দময়ের উপাসনা সম্পূর্ণ হইবে। কোনো ভয় কোনো সংশয় কোনো দীনতা মনের মধ্যে রাখিয়ো না; আনন্দে প্রভাতে জাগ্রত হও, আনন্দে দিনের কর্ম করো, দিবাবসানে নিঃশব্দ স্নিগ্ধ অন্ধকারের মধ্যে আনন্দে আত্মসমর্পণ করিয়া দাও, কোথাও যাইতে হইবে না, কোথাও খুঁজিতে হইবে না, সর্বত্রই যে আনন্দরূপে তিনি বিরাজ করিতেছেন, সেই আনন্দরূপের মধ্যে তুমি আনন্দলাভ করিতে শিক্ষা করো—যাহা-কিছু তোমার সম্মুখে উপস্থিত, পূর্ণ আনন্দের সহিত তাহাকে স্বীকার করিয়া লইবার সাধনা করো—

সম্পদে সংকটে থাকো কল্যাণে
থাকো আনন্দে নিন্দা অপমানে।
সবারে ক্ষমা করি থাকো আনন্দে
চির-অমৃত-নির্ঝরে শান্তিরসপানে।

নিজের এই ক্ষুদ্র চোখের দীপ্তিটুকু যদি আমরা নষ্ট করিয়া ফেলি, তবে আকাশভরা আলো তো আর দেখিতে পাই না; তেমনি আমাদের ছোটো মনের ছোটো ছোটো বিষাদ-অবসাদ-নৈরাশ্য নিরানন্দ আমাদিগকে অন্ধ করিয়া দেয়—আনন্দরূপমমৃতং আমরা আর দেখিতে পাই না—নিজের কালিমাদ্বারা আমরা একেবারে পরিবেষ্টিত হইয়া থাকি, চারিদিকে কেবল ভাঙাচোরা কেবল অসম্পূর্ণতা কেবল অভাব দেখি;—কানা যেমন মধ্যাহ্নের আলোকে কালো দেখে, আমাদেরও সেই দশা ঘটে। একবার চোখ

যদি খোলে, যদি দৃষ্টি পাই, হৃদয়ের মধ্যে নিমেষের মধ্যেও যদি সেই আনন্দ সপ্তকে-সপ্তকে বাজিয়া উঠে, যে-আনন্দে জগদ্ব্যাপী আনন্দের সমস্ত সুর মিলিয়া যায়, তবে যেখানেই চোখ পড়ে সেখানে তাঁহাকেই দেখি,—আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি। বধে-বন্ধনে দুঃখে-দারিদ্র্যে অপকারে-অপমানেও তাঁহাকেই দেখি—আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি। তখন মুহূর্তেই বুঝিতে পারি, প্রকাশমাত্রই তাঁহারই প্রকাশ—এবং প্রকাশমাত্রই আনন্দরূপমমৃতম্। তখন বুঝিতে পারি, যে আনন্দে আকাশে-আকাশে আলোক উদ্ভাসিত, আমাতেও সেই পরিপূর্ণ আনন্দেরই প্রকাশ—সেই আনন্দে আমি কাহারও চেয়ে কিছুমাত্র ন্যূন নহি, আমি সকলেরই সমান, আমি জগতের সঙ্গে এক। সেই আনন্দে আমার ভয় নাই ক্ষতি নাই অসম্মান নাই। আমি আছি, কারণ আমাতে পরিপূর্ণ আনন্দ আছেন, কে তাহার কণামাত্রও অপলাপ করিতে পারে? এমন কী ঘটনা ঘটিতে পারে, যাহাতে তাহার লেশমাত্র ক্ষুণ্ণতা হইবে? তাই আজ আনন্দের দিনে, আজ উৎসবের প্রভাতে আমরা যেন সমস্ত অন্তরের সহিত বলিতে পারি – এষাস্য পরমা গতিঃ এষাস্য পরমা সম্পৎ, এষোহস্য পরমো লোক এষোহস্য পরম আনন্দঃ—এবং প্রার্থনা করি, যেন সেই আনন্দের এমন একটু অংশ লাভ করিতে পারি, যাহাতে সমস্ত জীবনের প্রত্যেক দিনে সর্বত্র তাঁহাকেই স্বীকার করি, ভয়কে নয়, দ্বিধাকে নয়, শোককে নয়—তাঁহাকেই স্বীকার করি—আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি। তিনি প্রচুররূপে আপনাকে দান করিতেছেন, আমরা প্রচুররূপে গ্রহণ করিতে পারিব না কেন? তিনি প্রচুর ঐশ্বর্যে এই যে দিগ্‌দিগন্ত পূর্ণ করিয়া রহিয়াছেন, আমরা সংকুচিত হইয়া দীন হইয়া অতি ক্ষুদ্র আকাঙ্ক্ষা লইয়া সেই অবারিত ঐশ্বর্যের অধিকার হইতে নিজেকে বঞ্চিত করিব কেন? হাত বাড়াও। বক্ষকে বিস্তৃত করিয়া দাও। দুই হাত ভরিয়া চোখ ভরিয়া প্রাণ ভরিয়া অবাধ আনন্দে সমস্ত গ্রহণ করো। তাঁহার প্রসন্নদৃষ্টি যে সর্বত্র হইতেই তোমাকে দেখিতেছে—তুমি একবার তোমার দুই চোখের সমস্ত জড়তা সমস্ত বিষাদ মুছিয়া ফেলো—তোমার দুই চক্ষুকে প্রসন্ন করিয়া চাহিয়া দেখো, তখনই দেখিবে, তাঁহারই প্রসন্নসুন্দর কল্যাণমুখ তোমাকে অনন্তকাল রক্ষা করিতেছে—সে কী প্রকাশ, সে কী সৌন্দর্য, সে কী প্রেম, সে কী আনন্দরূপমমৃতম্। যেখানে দানের লেশমাত্র কৃপণতা নাই সেখানে গ্রহণে এমন কৃপণতা কেন? ওরে মূঢ়, ওরে অবিশ্বাসী, তোর সম্মুখেই সেই আনন্দমুখের দিকে তাকাইয়া সমস্ত প্রাণমনকে প্রসারিত করিয়া পাতিয়া ধর্—বলের সহিত বল্—'অল্প নহে, আমার সবই চাই। ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি'। তুমি যতটা দিতেছ, আমি সমস্তটাই লইব। আমি ছোটোটার জন্য বড়োটাকে বাদ দিব না, আমি একটার জন্য অন্যটা হইতে বঞ্চিত হইব না, আমি এমন সহজ মন

লইব, যাহা দশদিক ছাপাইয়া আছে, যাহার অর্জনে আনন্দ, রক্ষণে আনন্দ, যাহার বিনাশ নাই, যাহার জন্ত জগতে কাহারও সঙ্গে বিরোধ করিতে হয় না। তোমার যে প্রেম নানা দেশে, নানা কালে, নানা রসে, নানা ঘটনায় অবিশ্রাম আনন্দে-অমৃতে বিকাশিত, কোথাও যাহার প্রকাশের অন্ত নাই, তাহাকেই একান্তভাবে উপলব্ধি করিতে পারি, এমন প্রেম তোমার প্রসাদে আমার অন্তরে অঙ্কুরিত হইয়া উঠুক।

যেখানে সমস্তই দেওয়া হইতেছে, সেখানে কেবল পাওয়ার ক্ষমতা হারাইয়া যেন কাঙালের মতো না ঘুরিয়া বেড়াই। যেখানে আনন্দরূপমমৃতং তুমি আপনাকে স্বয়ং প্রকাশিত করিয়া রহিয়াছ, সেখানে চিরজীবন আমার এমন বিভ্রান্তি না ঘটে যে, সর্বদাই সর্বত্রই তোমাকে দেখিয়াও না দেখি এবং কেবল শোকদুঃখ শ্রান্তিজরা বিচ্ছেদক্ষতি লইয়া হাহাকার করিতে করিতে সংসার হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া যাই।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

১৩১৩

শান্তিনিকেতন

শান্তিনিকেতন

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত

উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত! সকাল বেলায় তো ঈশ্বরের আলো আপনি এসে আমাদের ঘুম ভাঙিয়ে দেয়—সমস্ত রাত্রির গভীর নিদ্রা একমুহূর্তেই ভেঙে যায়। কিন্তু সন্ধ্যাবেলাকার মোহ কে ভাঙাবে। সমস্ত দীর্ঘদিনের চিন্তা ও কর্ম হতে উৎক্ষিপ্ত একটা কুহকের আবেষ্টন, তার থেকে চিত্তকে নির্মল উদার শান্তির মধ্যে বাহির করে আনব কী করে? সমস্ত দিনটা একটা মাকড়সার মতো জালের উপর জাল বিস্তার করে আমাদের নানাদিক থেকে জড়িয়ে রয়েছে—চিরন্তনকে, ভূমাকে একেবারে আড়াল করে রয়েছে—এই সমস্ত জালকে কাটিয়ে চেতনাকে অনন্তের মধ্যে জাগ্রত করে তুলব কী করে! ওরে, "উত্তিষ্ঠত। জাগ্রত।"

দিন যখন নানা কর্ম নানা চিন্তা নানা প্রবৃত্তির ভিতর দিয়ে একটি একটি পাক আমাদের চারদিকে জড়াতে থাকে, বিশ্ব এবং আমার আত্মার মাঝখানে একটা আবরণ গড়ে তুলতে থাকে, সেই সময়েই যদি মাঝে মাঝে আমাদের চেতনাকে সতর্ক করতে না থাকি—"উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত." এই জাগরণের মন্ত্র যদি ক্ষণে ক্ষণে দিনের সমস্ত বিচিত্রব্যাপারের মাঝখানেই আমাদের অন্তরাত্মা থেকে ধ্বনিত হয়ে না উঠতে থাকে তাহলে পাকের পর পাক পড়ে ফাঁসের পর ফাঁস লেগে শেষ কালে আমাদের অসাড় করে ফেলে; তখন আবল্য থেকে নিজেকে টেনে বের করতে আমাদের আর ইচ্ছাও থাকে না, নিজের চারিদিকের বেষ্টনকেই অত্যন্ত সত্য বলে জানি—তার অতীত যে উন্মুক্ত বিশুদ্ধ শাশ্বত সত্য তার প্রতি আমাদের বিশ্বাসই থাকে না, এমন কি তার প্রতি সংশয় অনুভব করবারও সচেষ্টতা আমাদের চলে যায়। অতএব সমস্ত দিন যখন নানা ব্যাপারের কলধ্বনি, তখন মনের গভীরতার মধ্যে একটি একতারা যন্ত্রে যেন বাজতে থাকে ওরে, "উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত।"

১৭ অগ্রহায়ণ ১৩১৫

সংশয়

সংশয়ের যে বেদনা সেও যে ভালো। কিন্তু যে প্রকাণ্ড জড়তার কুণ্ডলীর পাকে সংশয়কেও আবৃত করে থাকে—তার হাত থেকে যেন মুক্তিলাভ করি। নিজের অজ্ঞতাসম্বন্ধে অজ্ঞানতার মতো অজ্ঞান আর তো কিছু নেই। ঈশ্বরকে যে জানি নে,

তাঁকে যে পাই নি এইটে যখন অনুভবমাত্র না করি তখনকার যে আত্মবিস্মৃত নিশ্চিন্ততা সেইটে থেকে উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত। সেই অসাড়তাকে বিচলিত করে গভীরতর বেদনা জেগে উঠুক। আমি বুঝছি নে আমি পাচ্ছি নে আমাদের অন্তরতম প্রকৃতি এই বলে যেন কেঁদে উঠতে পারে। মনের সমস্ত তারে এই গান বেজে উঠুক "সংশয় তিমির মাঝে না হেরি গতি হে।"

আমরা মনে করি যে ব্যক্তি নাস্তিক সেই সংশয়ী কিন্তু আমরা যেহেতু ঈশ্বরকে স্বীকার করি অতএব আমরা আর সংশয়ী নই। বাস্, এই বলে আমরা নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছি—এবং ঈশ্বর সম্বন্ধে যাদের সঙ্গে আমাদের মতে না মেলে তাদেরই আমরা পাষণ্ড বলি, নাস্তিক বলি, সংশয়াত্মা বলি। এই নিয়ে সংসারে কত দলাদলি, কত বিবাদ বিরোধ, কত শাসন পীড়ন তার আর অন্ত নাই। আমাদের দল এবং আমাদের দলের বাহির এই দুইভাগে মানুষকে বিভক্ত করে আমরা ঈশ্বরের অধিকারকে নিজের দলের বিশেষ সম্পত্তি বলে গণ্য করে আরামে বসে আছি। এসম্বন্ধে কোনো চিন্তা নেই সন্দেহ নেই।

এই ব'লে কেবল কথাটুকুর মধ্যে ঈশ্বরকে স্বীকার করে আমরা সমস্ত সংসার থেকে তাঁকে নির্বাসিত করে দেখছি। আমরা এমন ভাবে গৃহে এবং সমাজে বাস করছি যেন সে গৃহে সে সমাজে ঈশ্বর নেই। আমরা জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এই বিশ্বজগতের ভিতর দিয়ে এমন ভাবে চলে যাই যেন এ জগতে সেই বিশ্বভুবনেশ্বরের কোনো স্থান নেই। আমরা সকাল বেলায় আশ্চর্য আলোকের অভ্যুদয়ের মধ্যে জাগ্রত হয়ে সেই অদ্ভুত আবির্ভাবের মধ্যে তাঁকে দেখতে পাই নে এবং রাত্রিকালে যখন অনিমেষজাগ্রত নিঃশব্দ জ্যোতিষ্কলোকের মাঝখানে আমরা নিদ্রার গভীরতার মধ্যে প্রবেশ করতে যাই তখন এই আশ্চর্য শয়নাগারের বিপুলমহিমান্বিত অন্ধকার শয্যাতলের কোনো এক প্রান্তেও সেই বিশ্বজননীর নিস্তব্ধগম্ভীর স্নিগ্ধমূর্তি অনুভব করি নে। এই অনির্বচনীয় অদ্ভুত জগৎকে আমরা নিজের জমিজমা ঘরবাড়ির মধ্যেই সংকীর্ণ করে দেখতে সংকোচবোধ করি নে। আমরা যেন ঈশ্বরের জগতে জন্মাই নি—নিজের ঘরেই জন্মেছি—এখানে আমি আমি আমি ছাড়া আর কোনো কথাই নেই— তবু আমরা বলি আমরা ঈশ্বরকে মানি, তাঁর সম্বন্ধে আমার মধ্যে কোনো সংশয় নেই।

আমার গৃহের মধ্যে সংসারের মধ্যে আমরা কোনো দিন এমন করে চলি নে যাতে প্রকাশ পায় যে এই গৃহের গৃহদেবতা তিনি, এই সংসার-রথকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন সেই মহাসারথি। আমিই ঘরের কর্তা, আমিই সংসারের সংসারী। ভোরের বেলা ঘুম ভাঙবামাত্রই সেই চিন্তাই শুরু হয় এবং রাত্রে ঘুম এসে সেই চিন্তাকেই ক্ষণকালের

স্ত আবৃত করে। "আমির" দ্বারাই এই গৃহ এই সংসার ঠাসা রয়েছে—কত দলিল, কত দস্তাবেজ, কত বিলিব্যবস্থা, কত বাদবিসংবাদ! কিন্তু ঈশ্বর কোথায়। কেবল মুখের কথায়! আর কোথাও যে তিলধারণের স্থান নেই।

এই মুখের কথায় ঈশ্বরকে স্বীকার করার মতো নিজেকে ফাঁকি দেবার আর কি কিছু আছে। আমি এই সম্প্রদায়ভুক্ত, আমাদের এই মত, আমি এই কথা বলি—ঈশ্বরকে এইটুকুমাত্র ফাঁকির জায়গা ছেড়ে দিয়ে তার পরে বাকি সমস্ত জায়গাটা অসংকোচে নিজে জুড়ে বসবার যে স্পর্ধা, সেই স্পর্ধা আপনাকে আপনি জানে না বলেই এত ভয়ানক। এই স্পর্ধা সংশয়ের সমস্ত বেদনাকে নিঃসাড় করে রাখে। আমরা যে জানি নে এটাও জানতে দেয় না।

সংশয়ের বেদনা তখনই জেগে ওঠে যখন গোপনভাবে ঈশ্বর আমাদের চৈতন্যের একটা দিকে স্পর্শ করেন। তখন সংসারের মধ্যে থেকেও সংসার আমাদের কান্না থামাতে পারে না। এবং তাঁর দিকে দুই বাহু প্রসারিত করেও অন্ধকারে তাঁর নাগাল পাই নে। তখন এইটে জানা আরম্ভ হয় যে, যা পেয়েছি তাতে কোনোমতেই আমার চলবে না এবং যা না হলে আমার চলা অসম্ভব তা আমি কিছুতেই পাচ্ছি নে। এমন অসহ্য কষ্টের অবস্থা আর কিছুই নেই।

যখন প্রসবের সময় আসন্ন তখন গর্ভের শিশুকে একদিকে নাড়ি সম্পূর্ণ ছাড়ছে না অন্যদিকে ভূমিষ্ঠ হবার বেগ তাকে আকর্ষণ করছে। মুক্তির সঙ্গে বন্ধনের টানাটানির তখনও কোনো মীমাংসা হয় নি। এই সময়ের বেদনাই জন্মদানের পূর্বসূচনা, এই বেদনার অভাবকেই চিকিৎসক ভয় করেন।

যথার্থ সংশয়ের বেদনাও আত্মাকে সত্যের মধ্যে মুক্তিদানের বেদনা। সংসার একদিকে তাকে আপনার মধ্যে আবৃত আচ্ছন্ন করে রেখেছে বিমুক্ত সত্য অন্যদিকে তার অলক্ষ্যে তাকে আহ্বান করছে—সে অন্ধকারের মধ্যেই আছে অথচ আলোককে না জেনেই সে আলোকের আকর্ষণ অনুভব করছে। সে মনে করছে বুঝি তার এই ব্যাকুলতার কোনো পরিণাম নেই, কেননা সে তো সম্মুখে পরিণামকে দেখতে পাচ্ছে না, সে গর্ভস্থ শিশুর মতো নিজের আবরণকেই চার দিকে অনুভব করছে।

আসুক সেই অসহ্য বেদনা—সমস্ত প্রকৃতি কাঁদতে থাক—সে কান্নার অবসান হবে। কিন্তু যে-কান্না বেদনায় জেগে ওঠে নি, ফুটে ওঠে নি, জড়তার শত বেষ্টনের মধ্যে প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে—তার যে কোনো পরিণাম নেই। সে যে রক্তেমাংসে অস্থিমজ্জায় জড়িয়ে রয়েই গেল—তার ভার যে চব্বিশঘণ্টা নাড়িতে নাড়িতে বহন করে বেড়াতে হবে।

যেদিন সংশয়ের ক্রন্দন আমাদের মধ্যে সত্য হয়ে ওঠে, সেদিন আমরা সম্প্রদায়ের

মত, দর্শনের তর্ক ও শাস্ত্রের বাক্য নিয়ে আরাম পাই নে ; সেদিন আমরা একমুহূর্তেই বুঝতে পারি প্রেম ছাড়া আমাদের আর কোনো উপায় নেই—সেদিন আমাদের প্রার্থনা এই হয় যে, "প্রেম-আলোকে প্রকাশো জগপতি হে।"

জ্ঞানের প্রকাশে আমাদের সংশয়ের সমস্ত অন্ধকার দূর হয় না। আমরা জেনেও জানি নে কখন? যখন আমাদের মধ্যে প্রেমের প্রকাশ হয় না। একবার ভেবে দেখো না এই পৃথিবীতে কত শত সহস্র লোক আমাকে বেষ্টন করে আছে। তাদের যে জানি নে তা নয়, কিন্তু তারা আমার পক্ষে কিছুই নয়। সংসারে আমি এমন ভাবে চলি যেন এই অগণ্য লোক তাদের সুখদুঃখ নিয়ে নেই। তবে কারা আছে? যারা আমার আত্মীয়স্বজন, আমার প্রিয়ব্যক্তি, তারাই অগণ্য জীবকে ছাড়িয়ে আছে। এই কয়েকটি লোকই আমার সংসার। কেননা এদেরই আমি প্রেমের আলোতে দেখেছি। এদেরই আমি কমবেশি পরিমাণে আমার আত্মারই সমান করে দেখেছি। আমার আত্মা যে সত্য, আত্মপ্রেমে সেটা আমার কাছে একান্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে—সেই প্রেম যাদের মধ্যে প্রসারিত হতে পেরেছে তাদেরই আমি আত্মীয় বলে জানি—তাই তাদের সম্বন্ধে আমার কোনো সংশয় নেই, তারা আমার পক্ষে অনেকটা আমারই মতো সত্য।

ঈশ্বর যে আছেন এবং সর্বত্রই আছেন এ-কথাটা যে আমার জানার অভাব আছে তা নয় কিন্তু আমি অহরহ সম্পূর্ণ এমন ভাবেই চলি যেন তিনি কোনোখানেই নেই। এর কারণ কী? তাঁর প্রতি আমার প্রেম জন্মে নি, সুতরাং তিনি থাকলেই বা কী, না থাকলেই বা কী? তাঁর চেয়ে আমার নিজের ঘরের অতি তুচ্ছ বস্তুও আমার কাছে বেশি করে আছে। প্রেম নেই বলেই তাঁর দিকে আমাদের সমস্ত-চোখ চায় না, আমাদের সমস্ত কান যায় না, আমাদের সমস্ত মন খোলে না। এইজন্যেই যিনি সকলের চেয়ে আছেন তাঁকেই সকলের চেয়ে পাই নে—তাই এমন একটা অভাব জীবনে থেকে যায় যা আর কিছুতেই কোনোমতেই পোরাতে পারে না। ঈশ্বর থেকেও থাকেন না—এতবড়ো প্রকাণ্ড না-থাকা আমাদের পক্ষে আর কী আছে। এই না-থাকার ভারে আমরা প্রতিমুহূর্তেই মরছি। এই না-থাকার মানে আর কিছুই না, আমাদের প্রেমের অভাব। এই না-থাকারই শুষ্কতায় জগতের সমস্ত লাবণ্য মারা গেল, জীবনের সমস্ত সৌন্দর্য নষ্ট হল। যিনি আছেন তিনি নেই এতবড়ো ক্ষতি কী দিয়ে পূরণ হবে! কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। দিনে রাত্রে এইজন্যেই যে গেলুম। সব জানি সব বুঝি, কিন্তু সমস্তই ব্যর্থ—

প্রেম-আলোকে প্রকাশো জগপতি হে।

২৩ অগ্রহায়ণ ১৩১৫

অভাব

ঈশ্বরকে যে আমরা দিন রাত্রি বাদ দিয়ে চলছি তাতে আমাদের সাংসারিক ক্ষতি যদি সিকি পয়সাও হত তাহলে তখনই সতর্ক হয়ে উঠতুম। কিন্তু সে বিপদ নেই; সূর্য আমাদের আলো দিচ্ছে, পৃথিবী আমাদের অন্ন দিচ্ছে, বৃহৎ লোকালয় তার সহস্র নাড়ি দিয়ে আমাদের সহস্র অভাব পূরণ করে চলেছে। তবে সংসারকে ঈশ্বরবর্জিত করে আমাদের কী অভাব হচ্ছে। হায়, যে অভাব হচ্ছে তা যতক্ষণ না জানতে পারি ততক্ষণ আরামে নিঃসংশয়ে থাকি এবং সচ্ছল সংসারের মধ্যে বাস করে মনে করি আমরা ঈশ্বরের বিশেষ অনুগৃহীত ব্যক্তি।

কিন্তু ক্ষতিটা কী হয় তা কেমন করে বোঝানো যেতে পারে?

এইখানে দৃষ্টান্তস্বরূপে আমার একটি স্বপ্নের কথা বলি। আমি নিতান্ত বালককালে মাতৃহীন। আমার বড়ো বয়সের জীবনে মার অধিষ্ঠান ছিল না। কাল রাত্রে স্বপ্ন দেখলুম আমি যেন বাল্যকালেই রয়ে গেছি। গঙ্গার ধারের বাগানবাড়িতে মা একটি ঘরে বসে রয়েছেন। মা আছেন তো আছেন—তাঁর আবির্ভাব তো সকল সময়ে চেতনাকে অধিকার করে থাকে না। আমিও মাতার প্রতি মন না দিয়ে তাঁর ঘরের পাশ দিয়ে চলে গেলুম। বারান্দায় গিয়ে একমুহূর্তে আমার হঠাৎ কী হল জানি নে—আমার মনে এই কথাটা জেগে উঠল যে মা আছেন। তখনই তাঁর ঘরে গিয়ে তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে তাঁকে প্রণাম করলুম। তিনি আমার হাত ধরে আমাকে বললেন "তুমি এসেছ!"

এইখানেই স্বপ্ন ভেঙে গেল। আমি ভাবতে লাগলুম—মায়ের বাড়িতেই বাস করছি, তাঁর ঘরের দুয়ার দিয়েই দশবার করে আনাগোনা করি—তিনি আছেন এটা জানি সন্দেহ নেই কিন্তু যেন নেই এমনি ভাবেই সংসার চলছে। তাতে ক্ষতিটা কী হচ্ছে। তাঁর ভাঁড়ারের দ্বার তিনি বন্ধ করেন নি, তাঁর অন্ন তিনি পরিবেষণ করছেন, যখন ঘুমিয়ে থাকি তখনও তাঁর পাখা আমাকে বীজন করছে। কেবল ওইটুকু হচ্ছে না, তিনি আমার হাতটি ধরে বলছেন না, তুমি এসেছ! অন্ন জল ধন জন সমস্তই আছে কিন্তু সেই স্বরটি সেই স্পর্শটি কোথায়! মন যখন সম্পূর্ণ জেগে উঠে সেইটিকেই চায় এবং চেয়ে যখন না পায়, কেবল উপকরণগুলো ঘরে ঘরে খুঁজে বেড়ায় তখন অন্নজল তার আর কিছুতেই রোচে না।

একবার ভালো করে ভেবে দেখো, জগতে কোনো জিনিসের কাছে কোনো মানুষের

কাছে যাওয়া আমাদের জীবনে অল্পই ঘটে। পরম আত্মীয়ের নিকট দিয়েও আমরা প্রত্যহ আনাগোনা করি বটে কিন্তু দৈবাৎ একমুহূর্ত তার কাছে গিয়ে পৌঁছোই। কত দিন তার সঙ্গে নিভৃতে কথা কয়েছি এবং সকাল সন্ধ্যার আলোকে একসঙ্গে বেড়িয়েছি কিন্তু এর মধ্যে হয়তো সকলের চেয়ে কেবল একদিনের কথা মনে পড়ে যেদিন হৃদয় পরিপূর্ণ হয়ে উঠে মনে হয়েছে আমি তার কাছে এসেছি। এমন শত সহস্র লোক আছে যারা সমস্ত জীবনে একবারও কোনো জিনিসের কোনো মানুষের কাছে আসে নি। জগতে জন্মেছে কিন্তু জগতের সঙ্গে তাদের অব্যবহিত সংস্পর্শ ঘটে নি। ঘটে নি যে, এও তারা একেবারেই জানে না। তারা যে সকলের সঙ্গে হাসছে খেলছে গল্পগুজব করছে, নানা লোকের সঙ্গে দেনা পাওনা আনাগোনা চলছে তারা ভাবছে এই তো আমি সকলের সঙ্গে আছি। এইরূপ সঙ্গে থাকার মধ্যে সঙ্গটা যে কতই যৎসামান্য সে তার বোধের অতীত।

আত্মার দৃষ্টি

বাল্যকালে আমার দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে গিয়েছিল কিন্তু আমি তা জানতুম না। আমি ভাবতুম দেখা বুঝি এই রকমই—সকলে বুঝি এই পরিমাণেই দেখে। একদিন দৈবাৎ লীলাচ্ছলে আমার কোনো সঙ্গীর চশমা নিয়ে চোখে পরেই দেখি, সব জিনিস স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। তখন মনে হল আমি যেন হঠাৎ সকলের কাছে এসে পড়েছি, সমস্তকে এই যে স্পষ্ট দেখা ও কাছে পাওয়ার আনন্দ, এর দ্বারা বিশ্বভুবনকে যেন হঠাৎ দ্বিগুণ করে লাভ করলাম—অথচ এতদিন যে আমি এত লোকসান বহন করে বেড়াচ্ছি তা জানতুমই না।

এ যেমন চোখ দিয়ে কাছে আসা, তেমনি আত্মা দিয়ে কাছে আসা আছে। সেই রকম করে যারই কাছে আসি সেই আমার হাত তুলে ধরে বলে, তুমি এসেছ! এই যে জল বায়ু চন্দ্র সূর্য, আমাদের পরমবন্ধু, এরা আমাদের নানা কাজ করছে, কিন্তু আমাদের হাত ধরছে না, আনন্দিত হয়ে বলছে না, তুমি এসেছ! যদি তাদের তেমনি কাছে যেতে পারতুম, যদি তাদের সেই স্পর্শ সেই সম্ভাষণ লাভ করতুম তাহলে মুহূর্তের মধ্যে বুঝতে পারতুম তাদের কৃত সমস্ত উপকারের চেয়ে এইটুকু কত বড়ো। মানুষের মধ্যে আমি চিরজীবন বাস করলুম কিন্তু মানুষ আমাকে স্পর্শ করে বলছে না, তুমি এসেছ! আমি একটা আবরণের মধ্যে আবৃত হয়ে পৃথিবীতে সঞ্চরণ করছি। ডিমের মধ্যে পক্ষিশিশু যেমন পৃথিবীতে জন্মেও জন্মলাভ করে না এও সেই রকম।

এই অস্ফুট চেতনার ডিমের ভিতর থেকে জন্মলাভই আধ্যাত্মিক জন্ম। সেই জন্মের দ্বারাই আমরা দ্বিজ হব। সেই জন্মই জগতে যথার্থরূপে জন্ম—জীবচৈতন্যের বিশ্বচৈতন্যের মধ্যে জন্ম। তখনই পক্ষিশিশু পক্ষিমাতার পক্ষপুটের সম্পূর্ণ সংস্পর্শ লাভ করে—তখনই মানুষ সর্বত্রই সেই সর্বকে প্রাপ্ত হয়। সেই প্রাপ্ত হওয়া যে কী আশ্চর্য সার্থকতা কী অনির্বচনীয় আনন্দ তা আমরা জানি নে কিন্তু জীবনে কি ক্ষণে ক্ষণে তার আভাসমাত্রও পাই নে!

আধ্যাত্মিকতায় আমাদের আর কিছু দেয় না আমাদের ঔদাসীন্য আমাদের অসাড়তা ঘুচিয়ে দেয়। অর্থাৎ তখনই আমরা চেতনার দ্বারা চেতনাকে, আত্মার দ্বারা আত্মাকে পাই। সেই রকম করে যখন পাই তখন আর আমাদের বুঝতে বাকি থাকে না যে সমস্তই তাঁর আনন্দরূপ।

তৃণ থেকে মানুষ পর্যন্ত জগতে যেখানেই আমার চিত্ত উদাসীন থাকে সেখানেই আমাদের আধ্যাত্মিকতা সীমাবদ্ধ হয়েছে এটি জানতে হবে। আমাদের চেতনা আমাদের আত্মা যখন সর্বত্র প্রসারিত হয় তখন জগতের সমস্ত সত্তাকে আমাদের সত্তার দ্বারাই অনুভব করি, ইন্দ্রিয়ের দ্বারা নয়, বুদ্ধির দ্বারা নয়, বৈজ্ঞানিক যুক্তির দ্বারা নয়। সেই পরিপূর্ণ অনুভূতি একটি আশ্চর্য ব্যাপার। এই সমুখের গাছটিকেও যদি সেই সত্তারূপে গভীররূপে অনুভব করি তবে যে আমার সমস্ত সত্তা আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। তাই দেখি নে বলে একে চোখ দিয়ে দেখবামাত্র এতে আমার কোনো প্রয়োজন নেই বলে এর সম্মুখ দিয়ে চলে যাই, এই গাছের সত্যে আমার সত্যকে জাগিয়ে তুলে আমাকে আনন্দের অধিকারী করে না। মানুষকেও আমরা আত্মা দিয়ে দেখি নে—ইন্দ্রিয় দিয়ে যুক্তি দিয়ে স্বার্থ দিয়ে সংসার দিয়ে সংস্কার দিয়ে দেখি—তাকে পরিবারের মানুষ, বা প্রয়োজনের মানুষ, বা নিঃসম্পর্ক মানুষ বা কোনো একটা বিশেষ শ্রেণীভুক্ত মানুষ বলেই দেখি—সুতরাং সেই সীমাতেই গিয়ে আমার পরিচয় ঠেকে যায়—সেই খানেই দরজা বন্ধ—তার ভিতরে আর প্রবেশ করতে পারি নে—তাকেও আত্মা বলে আমার আত্মা প্রত্যক্ষ ভাবে সম্ভাষণ করতে পারে না। যদি পারত তবে পরস্পর হাত ধরে বলত, তুমি এসেছ!

আধ্যাত্মিক সাধনার যে চরম লক্ষ্য কী তা উপনিষদে স্পষ্ট লেখা আছে—

তে সর্বগং সর্বতঃ প্রাপ্য ধীরা যুক্তাত্মানঃ সর্বমেবাবিশন্তি।

ধীর ব্যক্তিরা সর্বব্যাপীকে সকল দিক থেকে পেয়ে যুক্তাত্মা হয়ে সর্বত্রই প্রবেশ করেন।

এই যে সর্বত্র প্রবেশ করবার ক্ষমতাই শেষ ক্ষমতা। প্রবেশ করার মানেই হচ্ছে যুক্তাত্মা হওয়া। যখন সমস্ত পাপের সমস্ত অভ্যাসের সংস্কারের আবরণ থেকে মুক্ত

হয়ে আমাদের আত্মা সর্বত্রই আত্মার সঙ্গে যুক্ত হয় তখনই সে সর্বত্র প্রবেশ করে—সেই আত্মায় গিয়ে না পৌঁছোলে সে দ্বারে এসে ঠেকে—সে মৃত্যুতেই আবদ্ধ হয়, অমৃতং যদ্বিভাতি, অমৃতরূপে যিনি সকলের মধ্যেই প্রকাশমান সেই অমৃতের মধ্যে আত্মা পৌঁছোতে পারে না— সে আর সমস্তই দেখে কেবল আনন্দরূপমমৃতং দেখে না।

এই যে আত্মা দিয়ে বিশ্বের সর্বত্র আত্মার মধ্যে প্রবেশ করা এই তো আমাদের সাধনার লক্ষ্য। প্রতিদিন এই পথেই যে আমরা চলছি এটা তো আমাদের উপলব্ধি করতে হবে। অন্ধভাবে জড়ভাবে তো এটা হবে না। চেতন ভাবেই তো চেতনার বিস্তার হতে থাকবে। প্রতিদিন তো আমাদের বুঝতে হবে একটু একটু করে আমাদের প্রবেশপথ খুলে যাচ্ছে আমাদের অধিকার ব্যাপ্ত হচ্ছে। সকলের সঙ্গে বেশি করে মিলতে পাচ্ছি, ক্রমে ক্রমে সমস্ত বিরোধ কেটে যাচ্ছে—মানুষের সঙ্গে মিলনের মধ্যে, সংসারের কর্মের মধ্যে, ভূমার প্রকাশ প্রতিদিন অব্যাহত হয়ে আসছে। আমিত্ব বলে যে সুদুর্ভেদ্য আবরণ আমাকে সকলের সঙ্গে অত্যন্ত বিভক্ত করে রেখেছিল তা ধীরে ধীরে ক্ষীণ হয়ে আসছে, ক্রমেই তা স্বচ্ছ হয়ে তার ভিতর থেকে নিখিলের আলো ক্রমে ক্রমে স্ফুটতর হয়ে দেখা যাচ্ছে—আমি আমার দ্বারা কাউকে আচ্ছন্ন কাউকে বিকৃত করছি নে, আমার মধ্যে অন্যের এবং অন্যের মধ্যে আমার বাধা প্রত্যহই কেটে যাচ্ছে।

পাপ

এমনি করে আত্মা যখন আত্মাকে চায় আর কিছুতেই তাকে থামিয়ে রাখতে পারে না তখনই পাপ জিনিসটা কী তা আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারি। আমাদের চৈতন্য যখন বরফগলা ঝরনার মতো ছুটে বেরোতে চায় তখনই পাপের বাধাকে সে সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে পারে—এক মুহূর্ত আর তাকে ভুলে থাকতে পারে না—তাকে ক্ষয় করবার জন্যে তাকে সরিয়ে ফেলবার জন্যে আমাদের পীড়িত চৈতন্য পাপের চারিদিকে ফেনিল হয়ে উঠতে থাকে। বস্তুত আমাদের চিত্ত যখন চলতে থাকে তখন সে তার গতির সংঘাতেই ছোটো নুড়িটিকেও অনুভব করে, কিছুই তার আর অগোচর থাকে না।

তার পূর্বে পাপ পুণ্যকে আমরা সামাজিক ভালোমন্দ সুবিধা-অসুবিধার জিনিস বলেই জানি। চরিত্রকে এমন করে গড়ি যাতে লোকসমাজের উপযুক্ত হই, যাতে ভদ্রতার আদর্শ রক্ষা হয়। সেইটুকুতে কৃতকার্য হলেই আমাদের মনে আর কোনো সংকোচ থাকে না; আমরা মনে করি চরিত্রনীতির যে উপযোগিতা তা আমার দ্বারা সিদ্ধ হল।

এমন সময় একদিন যখন আত্মা জেগে ওঠে, জগতের মধ্যে সে আত্মাকে খোঁজে তখন সে দেখতে পায় যে শুধু ভদ্রতার কাজ নয়, শুধু সমাজ রক্ষা করা নয়—প্রয়োজন আরও বড়ো, বাধা আরও গভীর। উপর থেকে কেটে কুটে রাস্তা সাফ করে দিয়েছি, সংসারের পথে কোনো বাধা দিচ্ছে না, কারও চোখে পড়ছে না ; কিন্তু শিকড়গুলো সমস্তই ভিতরে রয়ে গেছে—তারা পরস্পরে ভিতরে ভিতরে জড়াজড়ি করে একেবারে জাল বুনে রেখেছে, আধ্যাত্মিক চাষ-আবাদে সেখানে পদে পদে ঠেকে যেতে হয়। অতি ক্ষুদ্র অতি সূক্ষ্ম শিকড়টিও জড়িয়ে ধরে, আবরণ রচনা করে। তখন পূর্বে যে পাপটি চোখে পড়ে নি তাকেও দেখতে পাই এবং পাপ জিনিসটা আমাদের পরম সার্থকতার পথে যে কী রকম বাধা তাও বুঝতে পারি। তখন মানুষের দিকে না তাকিয়ে কোনো সামাজিক প্রয়োজনের দিকে না তাকিয়ে পাপকে কেবল পাপ বলেই সমস্ত অন্তঃকরণের সঙ্গে ঠেলা দিতে থাকি—তাকে সহ করা অসম্ভব হয়ে উঠে। সে যে চরম মিলনের, পরম প্রেমের পথ দলবল নিয়ে জুড়ে বসে আছে—তার সম্বন্ধে অন্যকে বা নিজেকে ফাঁকি দেওয়া আর চলবে না—লোকের কাছে ভালো হয়ে আর কোনো সুখ নেই—তখন সমস্ত অন্তঃকরণ দিয়ে সেই নির্মল স্বরূপকে বলতে হবে, বিশ্বানি দুরিতানি পরাসুব—সমস্ত পাপ দূর করো—একেবারে বিশ্বদুরিত সমস্ত পাপ—একটুও বাকি থাকলে চলবে না—কেননা তুমি শুদ্ধং অপাপবিদ্ধং, আত্মা তোমাকেই চায় সেই তার একমাত্র যথার্থ চাওয়া, সেই তার শেষ চাওয়া। হে সর্বগ, তোমাকে, সর্বতঃ প্রাপ্য, সকল দিক থেকে পেয়ে যুক্তাত্মা হব, সকলের মধ্যেই প্রবেশ লাভ করব সেই আশ্চর্য সৌভাগ্যের ধারণাও এখন আমার মনে হয় না কিন্তু এই অনুগ্রহটুকু করতে হবে, যে, তোমার পরিপূর্ণ প্রকাশের অধিকারী নাই হই তবু আমার রুদ্ধদ্বারের ছিদ্র দিয়ে তোমার সেইটুকু আলোক আসুক যে আলোকে ঘরের আবদ্ধ অন্ধকারকে আমি অন্ধকার বলে জানতে পারি। রাত্রে দ্বার জানালা বন্ধ করে অচেতন হয়ে ঘুমিয়ে ছিলুম। সকাল বেলায় দ্বারের ফাঁক দিয়ে যখন আলো ঢুকল তখন জড়শয্যায় পড়ে থেকে হঠাৎ বাইরের সুনির্মল প্রভাতের আবির্ভাব আমার তন্দ্রালস চিত্তকে আঘাত করল। তখন তপ্তশয্যার তাপ অসহ্য বোধ হল, তখন নিজের নিঃশ্বাস-কলুষিত বদ্ধ ঘরের বাতাস আমার নিঃশ্বাস রোধ করতে লাগল ; তখন তো আর থাকতে পারা গেল না ; তখন উন্মুক্ত নিখিলের স্নিগ্ধতা নির্মলতা পবিত্রতা, সমস্ত সৌন্দর্য সৌগন্ধ্য সংগীতের আভাস আমাকে আহ্বান করে বাইরে নিয়ে এল। তুমি তেমনি করে আমার আবরণের কোনো দুই একটা ছিদ্রের ভিতর দিয়ে তোমার আলোকের দূতকে তোমার মুক্তির বার্তাবহকে প্রেরণ করো—তাহলেই নিজের আবদ্ধতার তাপ এবং কলুষ এবং অন্ধকার আমাকে

আর সুস্থির হতে দেবে না, আরামের শয্যা আমাকে দগ্ধ করতে থাকবে, তখন বলতেই হবে যেনাহং নামৃতঃ স্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্।

২৫ অগ্রহায়ণ

দুঃখ

আমাদের উপাসনার মন্ত্রে আছে, নমঃ সম্ভবায় চ ময়োভবায় চ—সুখকরকে নমস্কার করি, কল্যাণকরকে নমস্কার। কিন্তু আমরা সুখকরকেই নমস্কার করি, কল্যাণকরকে সব সময়ে নমস্কার করতে পারি নে। কল্যাণকর যে শুধু সুখকর নন, তিনি যে দুঃখকর। আমরা সুখকেই তাঁর দান বলে জানি আর দুঃখকে কোনো দুর্দৈবকৃত বিড়ম্বনা বলেই জ্ঞান করি।

এই জন্যে দুঃখভীরু বেদনাকাতর আমরা দুঃখ থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্যে নানা প্রকার আবরণ রচনা করি, আমরা কেবলই লুকিয়ে থাকতে চাই। তাতে কী হয়? তাতে সত্যের পূর্ণ সংস্পর্শ থেকে আমরা বঞ্চিত হই।

ধনী বিলাসী সমস্ত আয়াস থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে কেবল আরামের মধ্যে পরিবৃত হয়ে থাকে। তাতে কী হয়? তাতে সে নিজেকে পঙ্গু করে ফেলে; নিজের হাত-পায়ের উপর তার অধিকার থাকে না, যে সমস্ত শক্তি নিয়ে সে পৃথিবীতে জন্মেছিল সেগুলি কর্ম অভাবে পরিণত হতে পারে না, মুষড়ে যায়, বিগড়ে যায়। স্বরচিত আবরণের মধ্যে সে একটি কৃত্রিম জগতে বাস করে। কৃত্রিম জগৎ আমাদের প্রকৃতিকে কখনোই তার সমস্ত স্বাভাবিক খাদ্য জোগাতে পারে না, এইজন্যে সে অবস্থায় আমাদের স্বভাব একটি ঘরগড়া পুতুলের মতো হয়ে ওঠে, পূর্ণতালাভ করে না।

দুঃখের আঘাত থেকে আমাদের মনকে ভয়ে ভয়ে কেবলই বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করলে জগতে আমাদের অসম্পূর্ণভাবে বাস করা হয় সুতরাং তাতে কখনোই আমাদের স্বাস্থ্যরক্ষা ও শক্তির পরিণতি হয় না। পৃথিবীতে এসে যে ব্যক্তি দুঃখ পেলে না সে লোক ঈশ্বরের কাছ থেকে তার সব পাওনা পেলে না—তার পাথেয় কম পড়ে গেল।

যাদের স্বভাব অতিবেদনাশীল, আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধব সবাই তাদের বাঁচিয়ে চলে;—সে ছোটোকে বড়ো করে তোলে বলেই লোকে কেবলই বলে কাজ নেই—তার সম্বন্ধে লোকের কথাবার্তা ব্যবহার কিছুই স্বাভাবিক হয় না। সে সব কথা শোনে না কিংবা ঠিক কথা শোনে না—তার যা উপযুক্ত পাওনা তা সে সবটা পায় না কিংবা

ঠিক মতো পায় না। এতে তার মঙ্গল হতেই পারে না। যে ব্যক্তি বন্ধুর কাছ থেকে কখনো আঘাত পায় না কেবলই প্রশ্রয় পায় সে হতভাগ্য বন্ধুত্বের পূর্ণ আস্বাদ থেকে বঞ্চিত হয়—বন্ধুরা তার সম্বন্ধে পূর্ণরূপে বন্ধু হয়ে উঠতে পারে না।

জগতে এই যে আমাদের দুঃখের পাওনা এ যে সম্পূর্ণ ন্যায়সংগত হবেই তা নয়। যাকে আমরা অন্যায় বলি অবিচার বলি তাও আমাদের গ্রহণ করতে হবে—অত্যন্ত সাবধানে সূক্ষ্মহিসাবের খাতা খুলে কেবলমাত্র ন্যায্যটুকুর ভিতর দিয়েই নিজেকে মানুষ করে তোলা—সে তো হয়েও ওঠে না এবং হলেও তাতে আমাদের মঙ্গল হয় না। অন্যায় এবং অবিচারকেও আমরা উপযুক্ত ভাবে গ্রহণ করতে পারি এমন আমাদের সামর্থ্য থাকা চাই।

পৃথিবীতে আমাদের ভাগে যে সুখ পড়ে তাও কি একেবারে ঠিক হিসাবমতো পড়ে, অনেক সময়েই কি আমরা গাঁঠের থেকে যা দাম দিয়েছি তার চেয়ে বেশি খরিদ করে ফেলি নে? কিন্তু কখনো তো মনে করি নে আমি তার অযোগ্য। সবটুকুই তো দিব্য অসংকোচে দখল করি। দুঃখের বেলাতেই কি কেবল ন্যায় অন্যায়ের হিসাব মেলাতে হবে? ঠিক হিসাব মিলিয়ে কোনো জিনিস যে আমরা পাই নে।

তার একটি কারণ আছে। গ্রহণ এবং বর্জনের ভিতর দিয়েই আমাদের প্রাণের ক্রিয়া চলতে থাকে—কেন্দ্রানুগ এবং কেন্দ্রাতিগ এই দুটো শক্তিই আমাদের পক্ষে সমান গৌরবের—আমাদের প্রাণের আমাদের বুদ্ধির আমাদের সৌন্দর্যবোধের আমাদের মঙ্গল প্রবৃত্তির, বস্তুত আমাদের সমস্ত শ্রেষ্ঠতার মূল ধর্মই এই যে সে যে কেবলমাত্র নেবে তা নয় সে ত্যাগও করবে।

এইজন্যই আমাদের আহার্য পদার্থে ঠিক হিসাবমতো আমাদের প্রয়োজনের উপকরণ থাকে না তাতে যেমন খাদ্য অংশ আছে তেমনি অখাদ্য অংশও আছে। এই অখাদ্য অংশ শরীর পরিত্যাগ করে। যদি ঠিক ওজনমতো নিছক খাদ্য পদার্থ আমরা গ্রহণ করি তাহলে আমাদের চলে না, শরীর ব্যাধিগ্রস্ত হয়। কারণ কেবল কি আমাদের পাকশক্তি ও পাকযন্ত্র আছে?—আমাদের ত্যাগশক্তি ও ত্যাগযন্ত্র আছে—সেই শক্তি সেই যন্ত্রকেও আমাদের কাজ দিতে হবে, তবেই গ্রহণ বর্জনের সামঞ্জস্যে প্রাণের পূর্ণতাসাধন ঘটবে।

সংসারে তেমনি আমরা যে কেবলমাত্র ন্যায্যটুকু পাব, কেউ আমাদের প্রতি কোনো অবিচার করবে না এও বিধান নয়। সংসারে এই ন্যায়ের সঙ্গে অন্যায় মিশ্রিত থাকা আমাদের চরিত্রের পক্ষে একান্ত আবশ্যক। নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়ার মতো আমাদের চরিত্রের এমন একটি সহজ ক্ষমতা থাকা চাই যাতে আমাদের যেটুকু প্রাপ্য সেটুকু অনায়াসে গ্রহণ করি এবং যেটুকু ত্যাজ্য সেটুকু বিনাক্ষোভে ত্যাগ করতে পারি।

অতএব দুঃখ এবং আঘাত ন্যায্য হ'ক বা অন্যায্য হ'ক তার সংস্পর্শ থেকে নিজেকে নিঃশেষে বাঁচিয়ে চলবার অতিচেষ্টায় আমাদের মনুষ্যত্বকে দুর্বল ও ব্যাধিগ্রস্ত করে তোলে।

এই ভীরুতায় শুধুমাত্র বিলাসিতার পেলবতা ও দৌর্বল্য জন্মে তা নয় যে-সমস্ত অতিবেদনাশীল লোক আঘাতের ভয়ে নিজেকে আবৃত করে তাদের শুচিতা নষ্ট হয়—আবরণের ভিতরে ভিতরে তাদের অনেক মলিনতা জমতে থাকে;—যতই লোকের ভয়ে তারা সেগুলো লোকচক্ষুর সামনে বের করতে না চায় ততোই সেগুলো দূষিত হয়ে উঠে স্বাস্থ্যকে বিকৃত করতে থাকে। পৃথিবীর নিন্দা অবিচার দুঃখকষ্টকে যারা অবাধে অসংকোচে গ্রহণ করতে পারে তারা কেবল বলিষ্ঠ হয় তা নয় তারা নির্মল হয়, অনাবৃত জীবনের উপর দিয়ে জগতের পূর্ণসংঘাত লেগে তাদের কলুষ ক্ষয় হয়ে যেতে থাকে।

অতএব সমস্ত মনপ্রাণ নিয়ে প্রস্তুত হও—যিনি সুখকর তাঁকে প্রণাম করো এবং যিনি দুঃখকর তাঁকেও প্রণাম করো—তা হলেই স্বাস্থ্যলাভ করবে শক্তিলাভ করবে—যিনি শিব যিনি শিবতর তাঁকেই প্রণাম করা হবে।

২৬ অগ্রহায়ণ ১৩১৫

ত্যাগ

প্রতিদিন প্রাতে আমরা যে এই উপাসনা করছি যদি তার মধ্যে কিছু সত্য থাকে তবে তার সাহায্যে আমরা প্রত্যহ অল্পে অল্পে ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হচ্ছি। নিতান্তই প্রস্তুত হওয়া চাই, কারণ, সংসারের মধ্যে একটি ত্যাগের ধর্ম আছে, তার বিধান অমোঘ। সে আমাদের কোথাও দাঁড়াতে দিতে চায় না; সে বলে কেবলই ছাড়তে হবে এবং এগোতে হবে। এমন কোথাও কিছুই দেখতে পাচ্ছি নে যেখানে পৌঁছে বলতে পারি এইখানেই সমস্ত সমাপ্ত হল, পরিপূর্ণ হল, অতএব এখান থেকে আর কোনোকালেই নড়ব না।

সংসারের ধর্মই যখন কেবল ধরে রাখা নয়, সরিয়ে দেওয়া, এগিয়ে দেওয়া—তখন তারই সঙ্গে আমাদের ইচ্ছার সামঞ্জস্য সাধন না করলে দুটোতে কেবলই ঠোকাঠুকি হতে থাকে। আমরা যদি কেবলই বলি আমরা থাকব আমরা রাখব আর সংসার বলে তোমাকে ছাড়তে হবে চলতে হবে তাহলে বিষম কষ্ট উৎপন্ন হতে থাকে।

আমাদের ইচ্ছাকে পরাস্ত হতে হয়—যা আমরা ছাড়তে চাই নে তা আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়। অতএব আমাদের ইচ্ছাকেও এই বিশ্বধর্মের সুরে বাঁধতে হবে।

বিশ্বধর্মের সঙ্গে আমাদের ইচ্ছাকে মেলাতে পারলেই আমরা বস্তুত স্বাধীন হই। স্বাধীনতার নিয়মই তাই। আমি স্বেচ্ছায় বিশ্বের সঙ্গে যোগ না দিই যদি, তাহলেই বিশ্ব আমার প্রতি জবরদস্তি করে আমাকে তার অনুগত করবে—তখন আমার আনন্দ থাকবে না, গৌরব থাকবে না তখন দাসের মতো সংসারের কানমলা খাব।

অতএব একদিন এ কথা যেন সংসার না বলতে পারে যে তোমার কাছ থেকে কেড়ে নেব, আমিই যেন বলতে পারি আমি ত্যাগ করব। কিন্তু প্রতিদিনই যদি ইচ্ছাকে এই ত্যাগের অভিমুখে প্রস্তুত না করি তবে মৃত্যু ও ক্ষতি যখন তার বড়ো বড়ো দাবি নিয়ে আমাদের সম্মুখে এসে দাঁড়াবে তখন তাকে কোনোমতে ফাঁকি দিতে ইচ্ছা হবে অথচ সেখানে একেবারেই ফাঁকি চলবে না—সে বড়ো দুঃখের দিন উপস্থিত হবে।

এই ত্যাগের দ্বারা আমরা দারিদ্র্য ও রিক্ততা লাভ করি এমন কথা যেন আমাদের মনে না হয়। পূর্ণতররূপে লাভ করবার জন্যেই আমাদের ত্যাগ।

আমরা যেটা থেকে বেরিয়ে না আসব সেটাকে আমরা পাব না। গর্ভের মধ্যে আবৃত শিশু তার মাকে পায় না—সে যখন নাড়ির বন্ধন কাটিয়ে ভূমিষ্ঠ হয়, স্বাধীন হয়, তখনই সে তার মাকে পূর্ণতরভাবে পায়।

এই জগতের গর্ভাবরণের মধ্যে থেকে আমাদের সেই রকম করে মুক্ত হতে হবে—তাহলেই যথার্থভাবে আমরা জগৎকে পাব—কারণ, স্বাধীনভাবে পাব। আমরা জগতের মধ্যে বদ্ধ হয়ে ভ্রূণের মতো জগৎকে দেখতেই পাই নে—যিনি মুক্ত হয়েছেন, তিনিই জগৎকে জানেন, জগৎকে পান।

এইজন্যই বলছি, যে লোক সংসারের ভিতরে জড়িয়ে রয়েছে সেই যে আসল সংসারী তা নয়—যে সংসার থেকে বেরিয়ে এসেছে সেই সংসারী—কারণ, সে তখন সংসারের থাকে না সংসার তারই হয়। সেই সত্য করে বলতে পারে আমার সংসার।

ঘোড়া গাড়ির সঙ্গে লাগামে বদ্ধ হয়ে গাড়ি চালায়—কিন্তু ঘোড়া কি বলতে পারে গাড়িটা আমার? বস্তুত গাড়ির চাকার সঙ্গে তার বেশি তফাত কী? যে সারথি মুক্ত থেকে গাড়ি চালায় গাড়ির উপরে কর্তৃত্ব তারই।

যদি কর্তা হতে চাই তবে মুক্ত হতে হবে। এইজন্য গীতা সেই যোগকেই কর্মযোগ

বলেছেন যে যোগে আমরা অনাসক্ত হয়ে কর্ম করি। অনাসক্ত হয়ে কর্ম করলেই কর্মের উপর আমার পূর্ণ অধিকার জন্মে—নইলে কর্মের সঙ্গে জড়ীভূত হয়ে আমরা কর্মেরই অঙ্গীভূত হয়ে পড়ি, আমরা কর্মী হই নে।

অতএব সংসারকে লাভ করতে হলে আমাদের সংসারের বাইরে যেতে হবে, এবং কর্মকে সাধন করতে গেলে আসক্তি পরিহার করে আমাদের কর্ম করতে হবে।

তার মানেই হল এই যে, সংসারে নেওয়া এবং দেওয়া এই যে দুটো বিপরীত ধর্ম আছে এই দুই বিপরীতের সামঞ্জস্য করতে হবে—এর মধ্যে একটা একান্ত হয়ে উঠলেই তাতে অকল্যাণ ঘটে। যদি নেওয়াটাই একমাত্র বড়ো হয় তাহলে আমরা আবদ্ধ হই, আর যদি দেওয়াটাই একমাত্র বড়ো হয় তাহলে আমরা বঞ্চিত হই। যদি কর্মটা মুক্তিবিবর্জিত হয় তাহলে আমরা দাস হই আর যদি মুক্তি কর্মবিহীন হয় তাহলে আমরা বিলুপ্ত হই।

বস্তুত ত্যাগ জিনিসটা শূন্যতা নয়, তা অধিকারের পূর্ণতা। নাবালক যখন সম্পত্তিতে পূর্ণ অধিকারী না হয় তখন সে দান বিক্রয় করতে পারে না—তখন তার কেবল ভোগের ক্ষুদ্র অধিকার থাকে ত্যাগের মহৎ অধিকার থাকে না। আমরা যে অবস্থায় কেবল জমাতে পারি কিন্তু প্রাণ ধরে দিতে পারি নে সে অবস্থায় আমাদের সেই সঞ্চিত সামগ্রীর সম্বন্ধে আমাদের স্বাধীনতা থাকে না।

এইজন্যে খ্রীস্ট বলে গিয়েছেন, যে লোক ধনী তার পক্ষে মুক্তি বড়ো কঠিন। কেননা যেটুকু ধন সে ছাড়তে না পারে সেইটুকু ধনই যে তাকে বাঁধে এই বন্ধনটাকে যে যতই বড়ো করে তুলেছে সে যে ততই বিপদে পড়েছে।

এই সমস্ত বন্ধন প্রত্যহ শিথিল হয়ে আসছে প্রত্যহ ত্যাগ আমাদের পক্ষে সহজ হয়ে আসছে আমাদের উপাসনা থেকে এই ফলটি যেন লাভ করি। নানা আসক্তির নিবিড় আকর্ষণে আমাদের প্রকৃতি একেবারে পাথরের মতো আঁট হয়ে আছে। উপাসনার সময় অমৃতের ঝরনা ঝরতে থাক- আমাদের অণুপরমাণুর ছিদ্রের ভিতর দিয়ে প্রবেশ করতে থাক্—এই পাষাণটাকে দিনে দিনে বিশ্লিষ্ট করতে থাক্, আর্দ্র করতে থাক্, তার পরে ক্রমে এটা ধইয়ে দিয়ে সরিয়ে দিয়ে জীবনের মাঝখানে একটি বৃহৎ অবকাশ রচনা করে সেই অবকাশটিকে পূর্ণ করে দিক। দেখো, একবার ভিতরের দিকে চেয়ে দেখো—অন্তরের সংকোচনগুলি তাঁর নামের আঘাতে প্রতিদিন প্রসারিত হয়ে আসছে, সমস্ত প্রসন্ন হচ্ছে, শান্ত হচ্ছে, কর্ম সহজ হচ্ছে, সকলের সঙ্গে সম্বন্ধ সত্য ও সরল হচ্ছে, এবং ঈশ্বরের মহিমা এই মানবজীবনের মধ্যে ধন্য হয়ে উঠছে।

২৭ অগ্রহায়ণ ১৩১৫

ত্যাগের ফল

কিন্তু ত্যাগ কেন করব এ প্রশ্নটার চরম উত্তরটি এখনও মনের মধ্যে এসে পৌঁছোল না। শাস্ত্রে উত্তর দেয় ত্যাগ না করলে স্বাধীন হওয়া যায় না, যেটিকে ত্যাগ না করব সেইটিই আমাদের বদ্ধ করে রাখবে—ত্যাগের দ্বারা আমরা মুক্ত হব।

মুক্তিলাভ করব এ কথাটার জোর যে আমাদের কাছে নেই। আমরা তো মুক্তি চাচ্ছি নে; আমাদের ভিতরে যে অধীনতার একটা বিষম ঝোঁক আছে—আমরা যে ইচ্ছা করে খুশি হয়ে সংসারের অধীন হয়েছি—আমরা ঘটিবাটি থালার অধীন, আমরা ভৃত্যেরও অধীন, আমরা কথার অধীন, প্রথার অধীন, অসংখ্য প্রবৃত্তির অধীন—এতবড়ো জন্ম-অধীন দাসানুদাসকে এ কথা বলাই মিথ্যা যে, মুক্তিতে তোমার সার্থকতা আছে; যে ব্যক্তি স্বভাবত এবং স্বেচ্ছাক্রমেই বদ্ধ তাকে মুক্তির প্রলোভন দেখানো মিথ্যা।

বস্তুত মুক্তি তার কাছে শূন্যতা, নির্বাণ, মরুভূমি। যে মুক্তির মধ্যে তার ঘর-দুয়ার ঘটিবাটি টাকাকড়ি কিছুই নেই, যা কিছুকে সে একমাত্র আশ্রয় বলে জানত তার সমস্তই বিলুপ্ত—সে মুক্তি তার কাছে বিভীষিকা, বিনাশ।

আমরা যে ত্যাগ করব তা যদি শূন্যতার মধ্যেই ত্যাগ হয় তবে সে তো একেবারেই লোকসান। একটি কানাকড়িকেও সেই রকম শূন্যের মধ্যে বিসর্জন দেওয়া আমাদের পক্ষে একেবারে অসহ্য।

কিন্তু ত্যাগ তো শূন্যের মধ্যে নয়। যদ্‌ যদ্‌ কর্ম প্রকুর্বীত তদ্‌ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ—যা কিছু করবে সমস্তই ব্রহ্মে সমর্পণ করবে। তোমার সংসারকে তোমার প্রিয়জনকে তোমার সমস্ত কিছুকেই তাঁকে নিবেদন করে দাও—এই যে ত্যাগ এ যে পরিপূর্ণতার মধ্যে বিসর্জন।

পূর্ণের মধ্যে যাকে ত্যাগ করি তাকেই সত্যরূপে পূর্ণরূপে লাভ করি এ কথা পূর্বেই বলেছি। কিন্তু এতেও কথা শেষ হয় না। কেবলমাত্র লাভের কথায় কোনো কথার সমাপ্তি হতে পারে না—লাভ করে কী হবে এ প্রশ্ন থেকে যায়। স্বাধীন হয়েই বা কী হবে, পূর্ণতা লাভ করেই বা কী হবে?

যখন কোনো ছেলেকে পয়সা দিই সে জিজ্ঞাসা করতে পারে পয়সা নিয়ে কী হবে? উত্তর যদি দিই বাজারে যাবে তাহলেও প্রশ্ন এই যে বাজারে গিয়ে কী হবে? পুতুল কিনবে। পুতুল কিনে কী হবে? খেলা করবে। খেলা করে কী হবে? তখন একটি উত্তরে সব প্রশ্নের শেষ হয়ে যায়—খুশি হবে। খুশি হয়ে কী হবে এ প্রশ্ন কেউ

কখনো অন্তরের থেকে বলে না। ইচ্ছার পূর্ণ চরিতার্থতা হয়ে যে আনন্দ ঘটে সেই আনন্দের মধ্যেই সকল প্রশ্ন সকল সন্ধান নিঃশেষিত হয়ে যায়।

কেমন করে সংগ্রহ করব যার দ্বারা ত্যাগের শক্তি জন্মাবে? আমাদের এই প্রতিদিনের উপাসনার মধ্যে আমরা কিছু কিছু সংগ্রহ করছি। এই প্রাতঃকালে সেই চৈতন্যস্বরূপের সঙ্গে নিজের চৈতন্যকে নিবিড় ভাবে পরিবেষ্টিত করে দেখবার জন্যে আমাকে যে ক্ষণকালের জন্যেও সমস্ত আবরণ ত্যাগ করতে হচ্ছে অনাবৃত হয়ে সদ্যোজাত শিশুর মতো তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করতে হচ্ছে এতেই আমার দিনে দিনে কিছু কিছু করে জমে উঠবে। আনন্দের সঙ্গে আনন্দ, প্রেমের সঙ্গে প্রেমের মিলন নিশ্চয় ক্রমশই কিছু না কিছু সহজ হয়ে আসছে।

কেমন করে ত্যাগ করব? সংসারের মাঝখানে থেকে অন্তত একটা মঙ্গলের যজ্ঞ আরম্ভ করে দাও। সেই মঙ্গল-যজ্ঞের জন্য তোমার ভাণ্ডারের একটা অতি ছোটো দরজাও যদি খুলে রাখ তাহলে দেখবে আজ যে অনভ্যাসের দ্বারে একটু টান দিতে গেলেই আর্তনাদ করে উঠছে, যার মরচে-পড়া তালায় চাবি ঘুরছে না—ক্রমেই তা খোলা অতি সহজ ব্যাপারের মতো হয়ে উঠবে—একটি শুভ উপলক্ষে ত্যাগ আরম্ভ হয়ে তা ক্রমশই বিস্তৃত হতে থাকবে। সংসারকে তো আমরা অহোরাত্র সমস্তই দিই, ভগবানকেও কিছু দাও—প্রতিদিন একবার অন্তত মুষ্টিভিক্ষা দাও—সেই নিস্পৃহ ভিখারি তাঁর ভিক্ষাপাত্রটি হাতে হাসিমুখে প্রতিদিনই আমাদের দ্বারে আসছেন এবং প্রতিদিনই ফিরে যাচ্ছেন। তাঁকে যদি একমুঠো করে দান করা আমরা অভ্যাস করি তবে সেই দানই আমাদের সকলের চেয়ে বড়ো হয়ে উঠবে: ক্রমে সে আর আমাদের মুঠোয় ধরবে না, ক্রমে কিছুই আর হাতে রাখতে পারব না। কিন্তু তাঁকে যেটুকু দেব সেটুকু গোপনে দিতে হবে, তাঁর জন্যে কোনো মানুষের কাছে এতটুকু খ্যাতি চাইলে চলবে না। কেননা লোককে দেখিয়ে দেওয়া সেটুকু এক রকম করে দিয়ে অন্যরকম করে হরণ করা। সেই মহাভিক্ষুকে যা দিতে হবে তা অল্প হলেও নিঃশেষে দেওয়া চাই। তার হিসেব রাখলে হবে না, তার রসিদ চাইলে চলবে না। দিনের মধ্যে আমাদের একটা কোনো দান যেন এইরূপ পরিপূর্ণ দান হতে পারে—সে যেন সেই পরিপূর্ণ স্বরূপের কাছে পরিপূর্ণ ত্যাগ হয় এবং সংসারের মধ্যে এইটুকু ব্যাপারে কেবল তাঁরই সঙ্গে একাকী আমার প্রত্যহ একটি গোপন সাক্ষাতের অবকাশ ঘটে।

২৮ অগ্রহায়ণ ১৩১৫

প্রেম

বেদমন্ত্রে আছে মৃত্যুও তাঁর ছায়া, অমৃতও তাঁর ছায়া—উভয়কেই তিনি নিজের মধ্যে এক করে রেখেছেন। যাঁর মধ্যে সমস্ত দ্বন্দ্বের অবসান হয়ে আছে তিনিই হচ্ছেন চরম সত্য। তিনিই বিশুদ্ধতম জ্যোতি, তিনিই নির্মলতম অন্ধকার।

সংসারের সমস্ত বিপরীতের সমন্বয় যদি কোনো একটি সত্যের মধ্যে না ঘটে তবে তাকে চরম সত্য বলে মানা যায় না। তবে তার মধ্যে যেটুকু কুলোল না তার জন্যে আর একটা সত্যকে মানতে হয়, এবং সে দুটিকে পরস্পরের বিরুদ্ধ বলেই ধরে নিতে হয়। তাহলেই অমৃতের জন্যে ঈশ্বরকে এবং মৃত্যুর জন্যে শয়তানকে মানতে হয়।

কিন্তু আমরা ব্রহ্মের কোনো শরিককে মানি নে—আমরা জানি তিনিই সত্য, খণ্ড সত্যের সমস্ত বিরোধ তাঁর মধ্যে সামঞ্জস্য লাভ করেছে; আমরা জানি তিনিই এক; খণ্ড সত্তার সমস্ত বিচ্ছিন্নতা তাঁর মধ্যে সম্মিলিত হয়ে আছে।

কিন্তু এ তো হল তত্ত্ব কথা। তিনি সত্য একথা জানলে কেবল জ্ঞানে জানা হয়—এর সঙ্গে আমাদের হৃদয়ের যোগ কোথায়। এই সত্যের কি কোনো রসই নেই।

তা বললে চলবে কী করে। সমস্ত সত্য যেমন তাঁতে মিলেছে তেমনি সমস্ত রসও তাঁতে মিলে গেছে। সেইজন্যে উপনিষৎ তাঁকে শুধু সত্য বলেন নি, তাঁকে রসস্বরূপ বলেছেন—তাঁকে সেই পরিপূর্ণ রসরূপে জানলে জানার সার্থকতা হয়।

তাহলে দাঁড়ায় এই যিনি চরম সত্য তিনিই পরম রস। অর্থাৎ তিনি প্রেমস্বরূপ। নইলে তাঁর মধ্যে কিছুরই সমাধান হতে পারতই না - ভেদ ভেদই থাকত, বিরোধ কেবলই আঘাত করত এবং মৃত্যু কেবলই হরণ করে নিত। তাঁর মধ্যে যে সমস্তই মেলে—সেটা একটা জ্ঞানতত্ত্বের মিলন নয়—তাঁর মধ্যে একটি প্রেমতত্ত্ব আছে—সেইজন্য সমস্তকে মিলতেই হয়—সেইজন্যই বিচ্ছেদ বিরোধ কখনোই চিরন্তন সত্য বস্তু হয়ে উঠতে পারে না।

ইচ্ছার শেষ চরিতার্থতা প্রেমে। প্রেমে—কেন, কী হবে, এ সমস্ত প্রশ্ন থাকতেই পারে না—প্রেম আপনিই আপনার জবাবদিহি, আপনিই আপনার লক্ষ্য।

যদি বল ত্যাগের দ্বারা ত্যক্তবস্তু থেকে মুক্তিলাভ করবে তাতে আমাদের মন সায় দেয় না, যদি বল ত্যাগের দ্বারা ত্যক্তবস্তুকে পূর্ণতররূপে লাভ করবে তাহলেও আমাদের মনের সম্পূর্ণরূপে সাড়া পাওয়া যায় না। যদি বল ত্যাগের দ্বারা প্রেমকে পাওয়া যাবে,

তাহলে মন আর কথাটি কইতে পারে না—এ কথাটাকে যদি সে ঠিকমতো অবধান করে শোনে তবে তাকে বলে উঠতেই হবে "তাহলে যে বাঁচি।"

ত্যাগের সঙ্গে প্রেমের ভারি একটা সম্বন্ধ আছে—এমন সম্বন্ধ যে, কে আগে কে পরে তা ঠিক করাই দায়। প্রেম ছাড়া ত্যাগ হয় না, আবার ত্যাগ ছাড়া প্রেম হতে পারে না। যা আমাদের কাছ থেকে প্রয়োজনের তাগিদে বা অত্যাচারের তাড়নায় ছিনিয়ে নেওয়া হয় সে তো ত্যাগই নয় - আমরা প্রেমে যা দিই তাই সম্পূর্ণ দিই, কিছুই তার আর রাখি নে, সেই দেওয়াতেই দানকে সার্থক মনে করি। কিন্তু এই যে প্রেম এও ত্যাগের সাধনাতেই শেষে আমাদের কাছে ধরা দেয়। যে লোক চিরকাল কেবল আপনার দিকেই টানে, নিজের অহংকারকেই জয়ী করবার জন্যে ব্যস্ত সেই স্বার্থপর সেই দাম্ভিক ব্যক্তির মনে প্রেমের উদয় হয় না—প্রেমের সূর্য একবারে কুহেলিকায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকে।

স্বার্থের বন্ধন ছাড়তে হবে, অহংকারের নাগপাশ মোচন করতে হবে, যা কেবল জমাবার জন্যেই জীবনপাত করেছি প্রত্যহ তা ত্যাগ করতে বসতে হবে—ত্যাগটা যেন ক্রমশই সহজ হয়ে আসে, নিজের দিকের টানটা যেন প্রত্যহই আলগা হয়ে আসে। তাহলেই কি যাকে মুক্তি বলে তাই পাব। হাঁ মুক্তি পাবে। মুক্তি পেয়ে কী পাব। মুক্তির যা চরম লক্ষ্য সেই প্রেমকে পাব।

প্রেম কে? তিনিই প্রেম যিনি কোনো প্রয়োজন নেই তবু আমাদের জন্য সমস্তই ত্যাগ করছেন, তিনিই প্রেমস্বরূপ। তিনি নিজের শক্তিকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ভিতর দিয়ে নিয়ত আমাদের জন্য উৎসর্জন করছেন—সমস্ত সৃষ্টি তাঁর কৃত উৎসর্গ। আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে—আনন্দ থেকেই এই যা কিছু সমস্ত সৃষ্টি হচ্ছে, দায়ে পড়ে কিছুই হচ্ছে না - সেই স্বয়ম্ভূ সেই স্বতউৎসারিত প্রেমই সমস্ত সৃষ্টির মূল।

এই প্রেমস্বরূপের সঙ্গে আমাদের সম্পূর্ণ যোগ হলেই আমাদের সমুদয় ইচ্ছার পরিপূর্ণ চরিতার্থতা হবে। সম্পূর্ণ যোগ হতে গেলেই যার সঙ্গে যোগ হবে তার মতন হতে হবে। প্রেমের সঙ্গে প্রেমের দ্বারাই যোগ হবে।

কিন্তু প্রেম যে মুক্ত, সে যে স্বাধীন। দাসত্বের সঙ্গে প্রেমের আর কোনো তফাতই নেই—কেবল দাসত্ব বদ্ধ আর প্রেম মুক্ত। প্রেম নিজের নিয়মেই নিজে চূড়ান্ত ভাবে প্রতিষ্ঠিত, সে নিজের চেয়ে উপরের আর কারও কাছে কোনো বিষয়ে কোনো কৈফিয়ত দেয় না।

সুতরাং প্রেমস্বরূপের সঙ্গে মিলতে গেলে আমাদের সম্পূর্ণ স্বাধীন হতে হবে। স্বাধীন ছাড়া স্বাধীনের সঙ্গে আদান প্রদান চলতে পারে না। তাঁর সঙ্গে আমাদের এই

কথাবার্তা হয়ে গেছে, তিনি আমাদের বলে রেখেছেন তুমি মুক্ত হয়ে আমার কাছে এস—যে ব্যক্তি দাস তার জন্য আমার আম দরবার খোলা আছে বটে কিন্তু সে আমার খাস দরবারে প্রবেশ করতে পারবে না।

এক এক সময় মনের আগ্রহে আমরা তাঁর সেই খাস দরবারের দরজার কাছে ছুটে যাই—কিন্তু দ্বারী বারবার আমাদের ফিরিয়ে দেয়। বলে, তোমার নিমন্ত্রণ-পত্র কই। খুঁজতে গিয়ে দেখি আমার কাছে যে-কটা নিমন্ত্রণ আছে সে ধনের নিমন্ত্রণ, যশের নিমন্ত্রণ, অমৃতের নিমন্ত্রণ নয়। বারবার ফিরে আসতে হল—বারবার!

টিকিট-পরীক্ষককে ফাঁকি দেবার জো নেই। আমরা দাম দিয়ে যে ইস্টেশনের টিকিট কিনেছি সেই ইস্টেশনেই আমাদের নামতে হবে। আমরা বহুকালের সাধনা এবং বহুদুঃখের সঞ্চয় দিয়ে এই সংসার লাইনেরই নানা গম্যস্থানের টিকিট কিনেছি অন্য লাইনে তা চলবে না। এবার থেকে প্রতিদিন আবার অন্য লাইনের টাকা সংগ্রহ করতে হবে। এবার থেকে যা কিছু সংগ্রহ এবং যা কিছু ত্যাগ করতে হবে সে কেবল সেই প্রেমের জন্যে।

সামঞ্জস্য

আমরা আর কোনো চরম কথা জানি বা না জানি নিজের ভিতর থেকে একটি চরম কথা বুঝে নিয়েছি সেটি হচ্ছে এই যে, একমাত্র প্রেমের মধ্যেই সমস্ত দ্বন্দ্ব এক সঙ্গে মিলে থাকতে পারে। যুক্তিতে তারা কাটাকাটি করে, কর্মেতে তারা মারামারি করে, কিছুতেই তারা মিলতে চায় না, প্রেমেতে সমস্তই মিটমাট হয়ে যায়। তর্কক্ষেত্রে কর্মক্ষেত্রে যারা দিতিপুত্র ও অদিতিপুত্রের মতো পরস্পরকে একেবারে বিনাশ করবার জন্যেই সর্বদা উদ্যত, প্রেমের মধ্যে তারা আপন ভাই।

তর্কের ক্ষেত্রে দ্বৈত এবং অদ্বৈত পরস্পরের একান্ত বিরোধী; হাঁ যেমন না-কে কাটে, না যেমন হাঁ-কে কাটে তারা তেমনি বিরোধী। কিন্তু প্রেমের ক্ষেত্রে দ্বৈত এবং অদ্বৈত ঠিক একই স্থান জুড়ে রয়েছে। প্রেমেতে একই কালে দুই হওয়াও চাই এক হওয়াও চাই। এই দুই প্রকাণ্ড বিরোধের কোনোটাই বাদ দিলে চলে না—আবার তাদের বিরুদ্ধরূপে থাকলেও চলবে না। যা বিরুদ্ধ তাকে অবিরুদ্ধ হয়ে থাকতে হবে এই এক সৃষ্টিছাড়া কাণ্ড এ কেবল প্রেমেতেই ঘটে। এইজন্যই কেন যে আমি অন্যের জন্যে নিজেকে উৎসর্গ করতে যাই নিজের ভিতরকার এই রহস্য তলিয়ে বুঝতে পারি নে—কিন্তু স্বার্থ জিনিসটা বোঝা কিছুই শক্ত নয়।

ভগবান প্রেমস্বরূপ কিনা তাই তিনি এককে নিয়ে দুই করেছেন আবার দুইকে নিয়ে এক করেছেন। স্পষ্টই যে দেখতে পাচ্ছি দুই যেমন সত্য, একও তেমনি সত্য। এই অদ্ভুত ব্যাপারটাকেও তো যুক্তির দ্বারা নাগাল পাওয়া যাবে না এ যে প্রেমের কাণ্ড।

উপনিষদে ঈশ্বরের সম্বন্ধে এইজন্যে কেবলই বিরুদ্ধ কথাই দেখতে পাই। য একোহবর্ণো বহুধাশক্তিযোগাৎ বর্ণাননেকান্নিহিতার্থোদধাতি। তিনি এক, এবং তাঁর কোনো বর্ণ নেই অথচ বহুশক্তি নিয়ে সেই জাতিহীন এক, অনেক জাতির গভীর প্রয়োজনসকল বিধান করছেন। যিনি এক তিনি আবার কোথা থেকে অনেকের প্রয়োজন সকল বিধান করতে যান। তিনি যে প্রেমস্বরূপ—তাই, শুধু এক হয়ে তাঁর চলে না, অনেকের বিধান নিয়েই তিনি থাকেন।

স পর্যগাৎ শুক্রং আবার তিনিই ব্যদধাৎশাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ—অর্থাৎ অনন্তদেশে তিনি শুদ্ধ হয়ে ব্যাপ্ত হয়ে আছেন, আবার অনন্তকালে তিনি বিধান করছেন, তিনি কাজ করছেন। একাধারে স্থিতিও তিনি গতিও তিনি।

আমাদের প্রকৃতির মধ্যেও এই স্থিতি ও গতির সামঞ্জস্য আমরা একটিমাত্র জায়গায় দেখতে পাই; সে হচ্ছে প্রেমে। এই চঞ্চল সংসারের মধ্যে যেখানে আমাদের প্রেম কেবলমাত্র সেইখানেই আমাদের চিত্তের স্থিতি—আর সমস্তকে আমরা ছুঁই আর চলে যাই, ধরি আর ছেড়ে দিই, যেখানে প্রেম সেইখানেই আমাদের মন স্থির হয়। অথচ সেইখানেই তার ক্রিয়াও বেশি। সেইখানেই আমাদের মন সকলের চেয়ে সচল। প্রেমেতেই যেখানে স্থির করায় সেইখানেই অস্থির করে। প্রেমের মধ্যেই স্থিতিগতি এক নাম নিয়ে আছে।

কর্মক্ষেত্রে ত্যাগ এবং লাভ ভিন্ন শ্রেণীভুক্ত—তারা বিপরীতপর্যায়ের। প্রেমেতে ত্যাগও যা লাভও তাই। যাকে ভালোবাসি তাকে যা দিই সেই দেওয়াটাই লাভ। আনন্দের হিসাবের খাতায় জমা খরচ একই জায়গায়—সেখানে দেওয়াও যা পাওয়াও তাই। ভগবানও সৃষ্টিতে এই যে আনন্দের যজ্ঞ এই যে প্রেমের খেলা ফেঁদেছেন এতে তিনি নিজেকে দিয়ে নিজেকেই লাভ করছেন। এই দেওয়াপাওয়াকে একেবারে এক করে দেওয়াকেই বলে প্রেম।

দর্শনশাস্ত্রে মস্ত একটা তর্ক আছে, ঈশ্বর পুরুষ কি অপুরুষ তিনি সগুণ কি নির্গুণ, তিনি personal কি impersonal? প্রেমের মধ্যে এই হাঁ না একসঙ্গে মিলে আছে। প্রেমের একটা কোটি সগুণ, আর একটা কোটি নির্গুণ। তার একদিক বলে আমি আছি আর একদিক বলে আমি নেই। "আমি" না হলেও প্রেম নেই,

"আমি" না ছাড়লেও প্রেম নেই। সেইজন্যে ভগবান সগুণ কি নির্গুণ সে সমস্ত তর্কের কথা কেবল তর্কের ক্ষেত্রেই চলে—সে তর্ক তাঁকে স্পর্শও করতে পারে না।

পাশ্চাত্য ধর্মতত্ত্বে বলে আমাদের অনন্ত উন্নতি—আমরা ক্রমাগতই তাঁর দিকে যাই কোনো কালে তাঁর কাছে যাই নে। আমাদের উপনিষৎ বলেছেন আমরা তাঁর কাছে যেতেও পারি নে আবার তাঁর কাছে যেতেও পারি তাঁকে পাইও না, তাঁকে পাইও। যতোবাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসাসহ—আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন। এমন অদ্ভুত বিরুদ্ধ কথা একই শ্লোকের দুই চরণের মধ্যে তো এমন সুস্পষ্ট করে আর কোথাও শোনা যায় নি। শুধু বাক্য ফেরে না মনও তাঁকে না পেয়ে ফিরে আসে - এ একেবারে সাফ জবাব। অথচ সেই ব্রহ্মের আনন্দকে যিনি জেনেছেন তিনি আর কিছু থেকে ভয় পান না। তবেই তো যাঁকে একেবারেই জানা যায় না তাঁকে এমনি জানা যায় যে আর কিছু থেকেই ভয় থাকে না। সেই জানাটা কিসের জানা? আনন্দের জানা। প্রেমের জানা। এ হচ্ছে সমস্ত জানাকে লঙ্ঘন করে জানা। প্রেমের মধ্যেই না জানার সঙ্গে জানার ঐকান্তিক বিরোধ নেই। স্ত্রী তার স্বামীকে জ্ঞানের পরিচয়ে সকল দিক থেকে সম্পূর্ণ না জানতে পারে কিন্তু প্রেমের জানায় আনন্দের জানায় এমন করে জানতে পারে যে, কোনো জ্ঞানী তেমন করে জানতে পারে না। প্রেমের ভিতরকার এই এক অদ্ভুত রহস্য যে, যেখানে একদিকে কিছুই জানি নে সেখানে অন্যদিকে সম্পূর্ণ জানি। প্রেমেতেই অসীম সীমার মধ্যে ধরা দিচ্ছেন এবং সীমা অসীমকে আলিঙ্গন করছে তর্কের দ্বারা এর কোনো মীমাংসা করবার জো নেই।

ধর্মশাস্ত্রে তো দেখা যায় মুক্তি এবং বন্ধনে এমন বিরুদ্ধ সম্বন্ধ যে, কেউ কাউকে রেয়াত করে না। বন্ধনকে নিঃশেষে নিকাশ করে দিয়ে মুক্তিলাভ করতে হবে এই আমাদের প্রতি উপদেশ। স্বাধীনতা জিনিসটা যেন একটা চূড়ান্ত জিনিস পাশ্চাত্য শাস্ত্রেও এই সংস্কার আমাদের মনে বদ্ধমূল করে দিয়েছে। কিন্তু একটি ক্ষেত্র আছে যেখানে অধীনতা এবং স্বাধীনতা ঠিক সমান গৌরব ভোগ করে একথা আমাদের ভুললে চলবে না। সে হচ্ছে প্রেমে। সেখানে অধীনতা স্বাধীনতার কাছে এক চুলও মাথা হেঁট করে না। প্রেমই সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং প্রেমই সম্পূর্ণ অধীন।

ঈশ্বর তো কেবলমাত্র মুক্ত নন তাহলে তো তিনি একেবারে নিষ্ক্রিয় হতেন। তিনি নিজেকে বেঁধেছেন। না যদি বাঁধতেন তাহলে সৃষ্টিই হত না এবং সৃষ্টির মধ্যে কোনো নিয়ম কোনো তাৎপর্যই দেখা যেত না। তাঁর যে আনন্দরূপ,

যে-রূপে তিনি প্রকাশ পাচ্ছেন এই তো তাঁর বন্ধনের রূপ। এই বন্ধনেই তিনি আমাদের কাছে আপন, আমাদের কাছে সুন্দর। এই বন্ধন তাঁর আমাদের সঙ্গে প্রণয়বন্ধন। এই তাঁর নিজকৃত স্বাধীন বন্ধনেই তো তিনি আমাদের সখা, আমাদের পিতা। এই বন্ধনে যদি তিনি ধরা না দিতেন তাহলে আমরা বলতে পারতুম না যে, স এব বন্ধুর্জনিতা স বিধাতা, তিনিই বন্ধু তিনিই পিতা তিনিই বিধাতা। এত বড়ো একটা আশ্চর্য কথা মানুষের মুখ দিয়ে বের হতেই পারত না। কোন্‌টা বড়ো কথা? ঈশ্বর শুদ্ধবুদ্ধমুক্ত, এইটে? না, তিনি আমাদের সঙ্গে পিতৃত্বে সখিত্বে পতিত্বে বদ্ধ—এইটে? দুটোই সমান বড়ো কথা। অধীনতাকে অত্যন্ত ছোটো করে দেখে তার সম্বন্ধে আমাদের একটা হীন সংস্কার হয়ে গেছে। এ রকম অন্ধ সংস্কার আরও আমাদের অনেক আছে। যেমন আমরা ছোটোকে মনে করি তুচ্ছ, বড়োকেই মনে করি মহৎ—যেন গণিতশাস্ত্রের দ্বারা কাউকে মহত্ত্ব দিতে পারে! তেমনি সীমাকে আমরা গাল দিয়ে থাকি। যেন, সীমা জিনিসটা যে কী তা আমরা কিছুই জানি! সীমা একটি পরমাশ্চর্য রহস্য। এই সীমাই তো অসীমকে প্রকাশ করছে। এ কী অনির্বচনীয়। এর কী আশ্চর্য রূপ, কী আশ্চর্য গুণ, কী আশ্চর্য বিকাশ। এক রূপ হতে আর এক রূপ, এক গুণ হতে আর এক গুণ, এক শক্তি হতে আর এক শক্তি—এরই বা নাশ কোথায়। এরই বা সীমা কোন্‌খানে। সীমা যে ধারণাতীত বৈচিত্র্যে, যে অগণনীয় বহুলত্বে, যে অশেষ পরিবর্তনপরম্পরায় প্রকাশ পাচ্ছে তাকে অবজ্ঞা করতে পারে এতবড়ো সাধ্য আছে কার। বস্তুত আমরা নিজের ভাষাকেই নিজে অবজ্ঞা করি কিন্তু সীমা পদার্থকে অবজ্ঞা করি এমন অধিকার আমাদের নেই। অসীমের অপেক্ষা সীমা কোনো অংশেই কম আশ্চর্য নয়, অব্যক্তের অপেক্ষা ব্যক্ত কোনোমতেই অশ্রদ্ধেয় নয়।

স্বাধীনতা অধীনতা নিয়েও আমরা কথার খেলা করি। অধীনতাও যে স্বাধীনতার সঙ্গেই এক আসনে বসে রাজত্ব করে একথা আমরা ভুলে যাই। স্বাধীনতাই যে আমরা চাই তা নয়, অধীনতাও আমরা চাই। যে চাওয়াতে আমাদের ভিতরকার এই দুই চাওয়ারই সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য হয় সেই হচ্ছে প্রেমের চাওয়া। বন্ধনকে স্বীকার করে বন্ধনকে অতিক্রম করব এই হচ্ছে প্রেমের কাজ। প্রেম যেমন স্বাধীন এমন স্বাধীন আর দ্বিতীয় কেউ নেই আবার প্রেমের যে অধীনতা এতবড়ো অধীনতাই বা জগতে কোথায় আছে।

অধীনতা জিনিসটা যে কতো বড়ো মহিমান্বিত বৈষ্ণবধর্মে সেইটে আমাদের

দেখিয়েছে। অদ্ভুত সাহসের সঙ্গে অসংকোচে বলেছে ভগবান জীবের কাছে নিজেকে বাঁধা রেখেছেন—সেই পরম গৌরবের উপরেই জীবের অস্তিত্ব। আমাদের পরম অভিমান এই যে তিনি আমাদের ছেড়ে থাকতে পারেন নি—এই বন্ধনটি তিনি মেনেছেন—নইলে আমরা আছি কী করে।

মা যেমন সন্তানের, প্রণয়ী যেমন প্রণয়ীর সেবা করে তিনি তেমনি বিশ্ব জুড়ে আমাদের সেবা করছেন। তিনি নিজে সেবক হয়ে সেবা জিনিসকে অসীম মাহাত্ম্য দিয়েছেন। তাঁর প্রকাণ্ড জগৎটি নিয়ে তিনি তো খুব ধুমধাম করতে পারতেন কিন্তু আমাদের মন ভোলাবার এত চেষ্টা কেন? নানা ছলে নানা কলায় বিশ্বের সঙ্গে আমাদের এত অসংখ্য ভালো লাগাবার সম্পর্ক পাতিয়ে দিচ্ছেন কেন? এই ভালো লাগাবার অপ্রয়োজনীয় আয়োজনের কি অন্ত আছে? তিনি নানা দিক থেকে কেবলই বলছেন তোমাকে আমার আনন্দ দিচ্ছি তোমার আনন্দ আমাকে দাও। তিনি যে নিজেকে চারিদিকেই সীমার অপরূপ ছন্দে বেঁধেছেন—নইলে প্রেমের গীতিকাব্য প্রকাশ হয় না যে।

এই প্রেমস্বরূপের সঙ্গে আমাদের প্রেম যেখানেই ভালো করে না মিলছে সেইখানে সমস্ত জগতে তার বেসুরটা বাজছে। সেইখানে কত দুঃখ যে জাগছে তার সীমা নেই—চোখের জল বয়ে যাচ্ছে। ওগো প্রেমিক, তুমি যে প্রেম কেড়ে নেবে না তুমি যে মন ভুলিয়ে নেবে—একদিন সমস্ত মনে প্রাণে কাঁদিয়ে তার পরে তোমার প্রেমের ঋণ শোধ করাবে। তাই এত বিলম্ব হয়ে যাচ্ছে—তাই তো, সন্ধ্যা হয়ে আসে তবু আমার অভিসারের সজ্জা হল না।

২৯ অগ্রহায়ণ ১৩১৫

কী চাই?

আমরা এতদিন প্রত্যহ আমাদের উপাসনা থেকে কী ফল চেয়েছিলুম। আমরা চেয়েছিলুম শান্তি। ভেবেছিলুম এই উপাসনা বনস্পতির মতো আমাদের ছায়া দেবে, প্রতিদিন সংসারের তাপ থেকে আমাদের বাঁচাবে।

কিন্তু শান্তিকে চাইলে শান্তি পাওয়া যায় না। তার চেয়ে আরও অনেক বেশি না চাইলে শান্তির প্রার্থনাও বিফল হয়।

জ্বরের রোগী কাতর হয়ে বলে আমার এই জ্বালাটা জুড়োক; হয়তো জলে ঝাঁপ

দিয়ে পড়ে। তাতে যেটুকু শান্তি হয় সেটা তো স্থায়ী হয় না—এমন কি তাতে তাপ বেড়ে যেতে পারে। রোগী যদি শান্তি চায়, স্বাস্থ্য না চায় তবে সে শান্তিও পায় না স্বাস্থ্যও পায় না।

আমাদেরও শান্তিতে চলবে না, প্রেম দরকার। বরঞ্চ মনে ওই যে একটুকু শান্তি পাওয়া যায়, কিছুক্ষণের জন্যে একটা স্নিগ্ধতার আবরণ আমাদের উপরে এসে পড়ে সেটাতে আমাদের ভুলায়,—আমরা মনে নিশ্চিন্ত হয়ে বসি আমাদের উপাসনা সার্থক হল—কিন্তু ভিতরের দিকে সার্থকতা দেখতে পাই নে।

কেননা, দেখতে পাই, ব্যাধি যে যায় না। সমস্ত দিন নানা ঘটনায় দেখতে পাই সংসারের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ সহজ হয় নি। রোগীর সঙ্গে তার বাহিরের প্রকৃতির সম্বন্ধ যে রকম সেইরকম হয়ে আছে। বাহিরে যেখানে সামান্য ঠাণ্ডা রোগীর দেহে সেখানে অসহ্য শীত; বাহিরের স্পর্শ যেখানে অতি মৃদু রোগীর দেহে সেখানে দুঃসহ বেদনা। আমাদেরও সেই দশা, বাহিরের সঙ্গে ব্যবহারে আমাদের ওজন ঠিক থাকছে না। ছোটো কথা অত্যন্ত বড়ো করে শুনছি, ছোটো ব্যাপার অত্যন্ত ভারি হয়ে উঠছে।

ভার বাড়ে কখন; না, কেন্দ্রের দিকে ভারাকর্ষণ যখন বেশি হয়। পৃথিবীতে যে হালকা জিনিস আমরা সহজেই তুলছি, যদি বৃহস্পতিগ্রহে যাই তবে সেখানে সেটুকুও আমাদের হাড় গুঁড়িয়ে দিতে পারে। কেননা সেখানে এই কেন্দ্রের দিকের আকর্ষণ পৃথিবীর চেয়ে অনেক বেশি। আমরাও তাই দেখছি আমাদের নিজের কেন্দ্রের দিকের টানটা অত্যন্ত বেশি—আমাদের স্বার্থ ভিতরের দিকেই টানছে, অহংকার ভিতরের দিকেই টানছে, এইজন্যেই সব জিনিসই অত্যন্ত ভারি হয়ে উঠছে—যা তুচ্ছ তা কেবলমাত্র আমার ওই ভিতরের টানের জোরেই আমাকে কেবলই চাপছে—সব জিনিসই আমাকে ঠেসে ধরেছে—সব কথাই আমাকে ঠেলে দিচ্ছে—ক্ষণকালের শান্তির দ্বারা এটাকে ভুলে থেকে আমাদের লাভটা কী।

এই চাপটা হালকা হয় কখন? প্রেমে। তখন যে ওই টানটা বাহিরের দিকে যায়। আমাদের জীবনে অনেকবার তার পরিচয় পেয়েছি। যেদিন প্রণয়ীর সঙ্গে আমাদের প্রণয় বিশেষভাবে সার্থক হয়েছে সেদিন কেবল যে আকাশের আলো উজ্জ্বলতর, বনের শ্যামলতা শ্যামলতর হয়েছে তা নয় সেদিন আমাদের সংসারের ভারাকর্ষণের টান একেবারে আলগা হয়ে গেছে। অন্যদিন ভিক্ষুককে যখন একপয়সামাত্র দিই সেদিন তাকে আধুলি দিয়ে ফেলি; অর্থাৎ অন্যদিন এক পয়সায় যে ভার ছিল আজ বত্রিশ পয়সায় সেই ভার। অন্য দিন যে-কাজে হয়রান

হয়ে পড়তুম আজ সে-কাজে ক্লান্তি নেই—হঠাৎ কাজ হালকা হয়ে গেছে। পয়সা সেই পয়সাই আছে, কাজ সেই কাজই আছে, কেবল তার ওজন কমে গেছে কেননা টান যে আজ আমার নিজের কেন্দ্রের দিকে নয়; প্রেমে যে আমাকে বাইরে টান দিয়ে একেবারে এক মুহূর্তে সমস্ত জগতের বোঝা নামিয়ে দিয়ে গেছে।

আমাদের সাধনা যেমনই হ'ক আমাদের সংসার সেই সঙ্গে যদি হালকা হতে না থাকে তবে বুঝব যে হল না। যদি বুঝি টাকার ওজন তেমনি ভয়ানক আছে, উপকরণের বোঝা তেমনিই আমাকে চেপে আছে, তার মধ্যে অতি ছোটো টুকুকেও ফেলে দিতে পারি এমন বল আমার নেই; যদি দেখি কাজ যত বড়ো তার ভার যেন তার চেয়ে অনেক বেশি তাহলে বুঝতে হবে প্রেম জোটে নি—আমাদের বরণসভায় বর আসে নি।

তবে আর ওই শান্তিটুকু নিয়ে কী হবে? ওতে আমাদের আসল জিনিসটা ফাঁকি দিয়ে অল্পে সন্তুষ্ট করে রাখবে। প্রেমের মধ্যে শুধু শান্তি নেই তাতে অশান্তিও আছে; জোয়ারের জলের মতো কেবল যে তার পূর্ণতা তা নয় তারই মতো তার গতিবেগও আছে;—সে আমাদের ভরিয়ে দিয়ে বসিয়ে রাখবে না, সে আমাদের ভাঁটার মুখের থেকে ফিরিয়ে উলটো টানে টেনে নিয়ে যাবে—তখন এই অচল সংসারটাকে নিয়ে কেবলই গুণ-টানাটানি লগি-ঠেলাঠেলি করে মরতে হবে না—সে হুহু করে ভেসে চলবে।

যতদিন সেই প্রেমের টান না ধরে ততদিন শান্তিতে কাজ নেই—ততদিন অশান্তিকে যেন অনুভব করতে পারি। ততদিন যেন বেদনাকে নিয়ে রাত্রে শুতে যাই এবং বেদনাকে নিয়ে সকাল বেলায় জেগে উঠি—চোখের জলে ভাসিয়ে দাও, স্থির থাকতে দিয়ো না।

প্রতিদিন প্রাতে যখন অন্ধকারের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হয়ে যায়, তখন যেন দেখতে পাই বন্ধু দাঁড়িয়ে আছ, সুখের দিন হ'ক, দুঃখের দিন হ'ক, বিপদের দিন হ'ক, তোমার সঙ্গে আমার দেখা হল, আজ আমার আর ভাবনা নেই, আমার আজ সমস্তই সহ্য হবে। যখন প্রেম না থাকে, হে সখা, তখনই শান্তির জন্যে দরবার করি। তখন অল্প পুঁজিতে যে কোনো আঘাত সইতে পারি নে—কিন্তু যখন প্রেমের অভ্যুদয় হয় তখন যে-দুঃখ যে-অশান্তিতে সেই প্রেমের পরীক্ষা হবে সেই দুঃখ সেই অশান্তিকেও মাথায় তুলে নিতে পারি। হে বন্ধু, উপাসনার সময় আমি আর শান্তি চাইব না—আমি কেবল প্রেম চাইব। প্রেম শান্তিরূপেও আসবে অশান্তিরূপেও আসবে, সুখ হয়েও আসবে দুঃখ হয়েও আসবে—সে যে-কোনো

বেশেই আসুক তার মুখের দিকে চেয়ে যেন বলতে পারি তোমাকে চিনেছি, বন্ধু তোমাকে চিনেছি।

৩০ অগ্রহায়ণ ১৩১৫

প্রার্থনা

উপনিষৎ ভারতবর্ষের ব্রহ্মজ্ঞানের বনস্পতি। এ যে কেবল সুন্দর শ্যামল ছায়াময় তা নয়, এ বৃহৎ এবং এ কঠিন। এর মধ্যে যে কেবল সিদ্ধির প্রাচুর্য পল্লবিত তা নয় এতে তপস্যার কঠোরতা ঊর্ধ্বগামী হয়ে রয়েছে। সেই অভ্রভেদী সুদৃঢ় অটলতার মধ্যে একটি মধুর ফুল ফুটে আছে—তার গন্ধে আমাদের ব্যাকুল করে তুলেছে। সেটি ওই মৈত্রেয়ীর প্রার্থনা-মন্ত্রটি।

যাজ্ঞবল্ক্য যখন গৃহত্যাগ করবার সময় তাঁর পত্নী দুটিকে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি দান করে যেতে উদ্যত হলেন তখন মৈত্রেয়ী জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা বলো তো এ-সব নিয়ে কি আমি অমর হব? যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, না, তা হবে না, তবে কি না উপকরণবস্তের যেমনতরো জীবন তোমার জীবন সেই রকম হবে। সংসারীরা যেমন করে তাদের ঘরদুয়ার গোরুবাছুর অশনবসন নিয়ে স্বচ্ছন্দে দিন কাটায় তোমরাও তেমনি করে দিন কাটাতে পারবে।

মৈত্রেয়ী তখন একমুহূর্তে বলে উঠলেন "যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্।" যার দ্বারা আমি অমৃতা না হব তা নিয়ে আমি কী করব। এ তো কঠোর জ্ঞানের কথা নয়—তিনি তো চিন্তার দ্বারা ধ্যানের দ্বারা কোন্‌টা নিত্য কোন্‌টা অনিত্য তার বিবেকলাভ করে এ-কথা বলেন নি—তাঁর মনের মধ্যে একটি কষ্টিপাথর ছিল যার উপরে সংসারের সমস্ত উপকরণকে একবার ঘষে নিয়েই তিনি বলে উঠলেন "আমি যা চাই এ তো তা নয়।"

উপনিষদে সমস্ত পুরুষ ঋষিদের জ্ঞানগম্ভীর বাণীর মধ্যে একটিমাত্র স্ত্রীকণ্ঠের এই একটিমাত্র ব্যাকুল বাক্য ধ্বনিত হয়ে উঠেছে এবং সে ধ্বনি বিলীন হয়ে যায় নি—সেই ধ্বনি তাঁদের মেঘমন্দ্র শান্ত স্বরের মাঝখানে অপূর্ব একটি অশ্রুপূর্ণ মাধুর্য জাগ্রত করে রেখেছে। মানুষের মধ্যে যে পুরুষ আছে উপনিষদে নানাদিকে নানাভাবে আমরা তারই সাক্ষাৎ পেয়েছিলুম এমন সময়ে হঠাৎ এক প্রান্তে দেখা গেল মানুষের মধ্যে যে নারী রয়েছেন তিনিও সৌন্দর্য বিকীর্ণ করে দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

আমাদের অন্তর-প্রকৃতির মধ্যে একটি নারী রয়েছেন। আমরা তাঁর কাছে আমাদের সমুদয় সঞ্চয় এনে দিই। আমরা ধন এনে বলি এই নাও। খ্যাতি এনে বলি এই তুমি জমিয়ে রাখো। আমাদের পুরুষ সমস্ত জীবন প্রাণপণ পরিশ্রম করে কতদিক থেকে কত কী যে আনছে তার ঠিক নেই—স্ত্রীটিকে বলছে এই নিয়ে তুমি ঘর ফাঁদো, বেশ গুছিয়ে ঘরকন্না করো, এই নিয়ে তুমি সুখে থাকো। আমাদের অন্তরের তপস্বিনী এখনও স্পষ্ট করে বলতে পারছে না যে, এ সবে আমার কোনো ফল হবে না, সে মনে করছে হয়তো আমি যা চাচ্ছি তা বুঝি এইই। কিন্তু তবু সব নিয়েও সব পেলুম বলে তার মন মানছে না। সে ভাবছে হয়তো পাওয়ার পরিমাণটা আরও বাড়াতে হবে—টাকা আরও চাই, খ্যাতি আরও দরকার, ক্ষমতা আরও না হলে চলছে না। কিন্তু সেই আরও-র শেষ হয় না। বস্তুত সে যে অমৃতই চায় এবং এই উপকরণগুলো যে অমৃত নয় এটা একদিন তাকে বুঝতেই হবে—একদিন একমুহূর্তে সমস্ত জীবনের স্তূপাকার সঞ্চয়কে এক পাশে আবর্জনার মতো ঠেলে দিয়ে তাকে বলে উঠতেই হবে—যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্!

কিন্তু মৈত্রেয়ী ওই যে বলেছিলেন, আমি যাতে অমৃতা না হব তা নিয়ে আমি কী করব, তার মানেটা কী। অমর হওয়ার মানে কি এই পার্থিব শরীরটাকে অনন্তকাল বহন করে চলা। অথবা মৃত্যুর পরেও কোনোরূপে জন্মান্তরে বা অবস্থান্তরে টিঁকে থাকা? মৈত্রেয়ী যে শরীরের অমরতা চান নি এবং আত্মার নিত্যতা সম্বন্ধেও তাঁর কোনো দুশ্চিন্তা ছিল না এ-কথা নিশ্চিত। তবে তিনি কীভাবে অমৃতা হতে চেয়েছিলেন।

তিনি এই কথা বলেছিলেন, সংসারে আমরা তো কেবলই একটার ভিতর দিয়ে আর একটাতে চলেছি—কিছুতেই তো স্থির হয়ে থাকতে পারছি নে। আমার মনের বিষয়গুলোও সরে যায় আমার মনও সরে যায়। যাকে আমার চিত্ত অবলম্বন করে তাকে যখন ছাড়ি তখন তার সম্বন্ধে আমার মৃত্যু ঘটে। এমনি করে ক্রমাগত এক মৃত্যুর ভিতর দিয়ে আর মৃত্যুতে চলেছি—এই যে মৃত্যুর পর্যায় এর আর অন্ত নেই।

অথচ আমার মন এমন কিছুকে চায় যার থেকে তাকে আর নড়তে হবে না – যেটা পেলে সে বলতে পারে এ-ছাড়া আমি আর বেশি চাই নে—যাকে পেলে আর ছাড়া-ছাড়ির কোনো কথাই উঠবে না। তাহলেই তো মৃত্যুর হাত একেবারে এড়ানো যায়। এমন কোন্ মানুষ এমন কোন্ উপকরণ আছে যাকে

নিয়ে বলতে পারি এই আমার চিরজীবনের সম্বল লাভ হয়ে গেল—আর কিছুই দরকার নেই!

সেইজন্যেই তো স্বামীর ত্যক্ত সমস্ত বিষয় সম্পত্তি ঠেলে ফেলে দিয়ে মৈত্রেয়ী বলে উঠেছিলেন, এসব নিয়ে আমি কী করব। আমি যে অমৃতকে চাই।

আচ্ছা, বেশ, উপকরণ তো অমৃত নয়, তাহলে অমৃত কী! আমরা জানি অমৃত কী। পৃথিবীতে একেবারে যে তার স্বাদ পাই নি তা নয়। যদি না পেতুম তাহলে তার জন্যে আমাদের কান্না উঠত না। আমরা সংসারের সমস্ত বিষয়ের মধ্যে কেবলই তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি, তার কারণ ক্ষণে-ক্ষণে সে আমাদের স্পর্শ করে যায়।

মৃত্যুর মধ্যে এই অমৃতের স্পর্শ আমরা কোন্‌খানে পাই? যেখানে আমাদের প্রেম আছে। এই প্রেমেই আমরা অনন্তের স্বাদ পাই। প্রেমই সীমার মধ্যে অসীমতার ছায়া ফেলে পুরাতনকে নবীন করে রাখে, মৃত্যুকে কিছুতেই স্বীকার করে না। সংসারের বিচিত্র বিষয়ের মধ্যে এই যে প্রেমের আভাস দেখতে পেয়ে আমরা মৃত্যুর অতীত পরম পদার্থের পরিচয় পাই, তাঁর স্বরূপ যে প্রেমস্বরূপ তা বুঝতে পারি—এই প্রেমকেই যখন পরিপূর্ণরূপে পাবার জন্যে আমাদের অন্তরাত্মার সত্য আকাঙ্ক্ষা আবিষ্কার করি তখন আমরা সমস্ত উপকরণকে অনায়াসেই ঠেলে দিয়ে বলতে পারি "যেনাহং নামৃতঃ স্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্।"

এই যে বলা, এটি যখন রমণীর মুখের থেকে উঠেছে তখন কী স্পষ্ট, কী সত্য, কী মধুর হয়েই উঠেছে। সমস্ত চিন্তা সমস্ত যুক্তি পরিহার করে কী অনায়াসেই এটি ধ্বনিত হয়ে উঠেছে। ওগো, আমি ঘর-দুয়ার কিছুই চাই নে আমি প্রেম চাই—এ কী কান্না।

মৈত্রেয়ীর সেই সরল কান্নাটি যে প্রার্থনারূপ ধারণ করে জাগ্রত হয়ে উঠেছিল তেমন আশ্চর্য পরিপূর্ণ প্রার্থনা কি জগতে আর কোথাও কখনো শোনা গিয়েছে? সমস্ত মানবহৃদয়ের একান্ত প্রার্থনাটি এই রমণীর ব্যাকুলকণ্ঠে চিরন্তনকালের জন্যে বাণীলাভ করেছে। এই প্রার্থনাই আমাদের প্রত্যেকের একমাত্র প্রার্থনা, এবং এই প্রার্থনাই বিশ্বমানবের বিরাট ইতিহাসে যুগে যুগান্তরে উচ্চারিত হয়ে আসছে।

যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্ এই কথাটি সবেগে বলেই কি সেই ব্রহ্মবাদিনী তখনই জোড়হাতে উঠে দাঁড়ালেন এবং তাঁর অশ্রুপ্লাবিত মুখটি আকাশের দিকে তুলে বলে উঠলেন—অসতো মা সদ্‌গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মামৃতংগময়—আবিরাবীর্ম এধি—রুদ্র যত্তে দক্ষিণংমুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্?

উপনিষদে পুরুষের কণ্ঠে আমরা অনেক গভীর উপলব্ধির কথা পেয়েছি কিন্তু কেবল স্ত্রীর কণ্ঠেই এই একটি গভীর প্রার্থনা লাভ করেছি। আমরা যথার্থ কী চাই অথচ কী নেই তার একাগ্র অনুভূতি প্রেমকাতর রমণীহৃদয় থেকেই অতি সহজে প্রকাশ পেয়েছে।—হে সত্য, সমস্ত অসত্য হতে আমাকে তোমার মধ্যে নিয়ে যাও, নইলে যে আমাদের প্রেম উপবাসী হয়ে থাকে, হে জ্যোতি, গভীর অন্ধকার হতে আমাকে তোমার মধ্যে নিয়ে যাও, নইলে যে আমাদের প্রেম কারারুদ্ধ হয়ে থাকে, হে অমৃত, নিরন্তর মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে আমাকে তোমার মধ্যে নিয়ে যাও, নইলে যে আমাদের প্রেম আসন্নরাত্রির পথিকের মতো নিরাশ্রয় হয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। হে প্রকাশ, তুমি আমার কাছে প্রকাশিত হও তাহলেই আমার সমস্ত প্রেম সার্থক হবে। আবিরাবীর্ম এধি—হে আবিঃ হে প্রকাশ, তুমি তো চিরপ্রকাশ, কিন্তু তুমি একবার আমার হও, আমার হয়ে প্রকাশ পাও—আমাতে তোমার প্রকাশ পূর্ণ হ'ক। হে রুদ্র হে ভয়ানক—তুমি যে পাপের অন্ধকারে বিরহরূপে দুঃসহ রুদ্র, যত্তে দক্ষিণংমুখং, তোমার যে প্রসন্নসুন্দর মুখ, তোমার যে প্রেমের মুখ, তাই আমাকে দেখাও—তেন মাং পাহি নিত্যম্—তাই দেখিয়ে আমাকে রক্ষা করো, আমাকে বাঁচাও, আমাকে নিত্যকালের মতো বাঁচাও—তোমার সেই প্রেমের প্রকাশ, সেই প্রসন্নতাই আমার অনন্তকালের পরিত্রাণ।

হে তপস্বিনী মৈত্রেয়ী, এস সংসারের উপকরণপীড়িতের হৃদয়ের মধ্যে তোমার পবিত্র চরণ দুটি আজ স্থাপন করো—তোমার সেই অমৃতের প্রার্থনাটি তোমার মৃত্যুহীন মধুর কণ্ঠে আমার হৃদয়ে উচ্চারণ করে যাও—নিত্যকাল যে কেমন করে রক্ষা পেতে হবে আমার মনে তার যেন লেশমাত্র সন্দেহ না থাকে।

২ পৌষ ১৩১৫

২

বিকার-শঙ্কা

প্রেমের সাধনায় বিকারের আশঙ্কা আছে। প্রেমের একটা দিক আছে যেটা প্রধানত রসেরই দিক—সেইটের প্রলোভনে জড়িয়ে পড়লে কেবলমাত্র সেইখানেই ঠেকে যেতে হয়—তখন কেবল রসসম্ভোগকেই আমরা সাধনার চরম সিদ্ধি বলে জ্ঞান করি। তখন এই নেশায় আমাদের পেয়ে বসে। এই নেশাকেই দিনরাত্রি জাগিয়ে তুলে আমরা কর্মের কঠোরতা জ্ঞানের বিশুদ্ধতাকে ভুলে থাকতে চাই– কর্মকে বিস্মৃত হই, জ্ঞানকে অমান্য করি।

এমনি করে বস্তুত আমরা গাছকে কেটে ফেলে ফুলকে নেবার চেষ্টা করি, ফুলের সৌন্দর্যে যতই মুগ্ধ হই না, গাছকে যদি তার সঙ্গে তুলনায় নিন্দিত করে, তাকে কঠোর বলে, তাকে দুরারোহ বলে উৎপাটন করে ফুলটি তুলে নেবার চেষ্টা করি তাহলে তখনকার মতো ফুলকে পাওয়া যায় কিন্তু চিরদিন সেই ফুল নূতন নূতন করে ফোটবার মূল আশ্রয়কেই নষ্ট করা হয়। এমনি করে ফুলটির প্রতিই একান্ত লক্ষ্য করে তার প্রতি অবিচার এবং অত্যাচারই করে থাকি।

কাব্যের থেকে আমরা ভাবের রস গ্রহণ করে পরিতৃপ্ত হই। কিন্তু সেই রসের সম্পূর্ণতা নির্ভর করে কিসের উপরে? তার তিনটি আশ্রয় আছে। একটি হচ্ছে কাব্যের কলেবর—ছন্দ এবং ভাষা; তা ছাড়া ভাবকে যেটির পরে যেটিকে যেরূপে সাজালে তার প্রকাশটি সুন্দর হয় সেই বিন্যাসনৈপুণ্য। এই কলেবর রচনার কাজ যেমন-তেমন করে চলে না—কঠিন নিয়ম রক্ষা করে চলতে হয়—তার একটু ব্যাঘাত হলেই যতিঃপতন ঘটে, কানকে পীড়িত করে, ভাবের প্রকাশ বাধা প্রাপ্ত হয়। অতএব এই ছন্দ, ভাষা এবং ভাববিন্যাসে কবিকে নিয়মের বন্ধন স্বীকার করতেই হয়, এতে যথেচ্ছাচার খাটে না। তার পরে আর-একটা বড়ো আশ্রয় আছে সেটা হচ্ছে জ্ঞানের আশ্রয়। সমস্ত শ্রেষ্ঠকাব্যের ভিতরে এমন একটা কিছু থাকে যাতে আমাদের জ্ঞান তৃপ্ত হয়, যাতে আমাদের মননবৃত্তিকেও উদ্বোধিত করে তোলে। কবি যদি অত্যন্তই খামখেয়ালি এমন একটা বিষয় নিয়ে কাব্য রচনা করেন যাতে আমাদের জ্ঞানের কোনো খাদ্য না থাকে অথবা যাতে সত্যের বিকৃতিবশত মননশক্তিকে পীড়িত করে তোলে তবে সে-কাব্যে রসের প্রকাশ বাধা প্রাপ্ত হয়—সে-কাব্য স্থায়িভাবে ও গভীরভাবে আমাদের আনন্দ দিতে পারে না। তার তৃতীয় আশ্রয় এবং শেষ আশ্রয়

হচ্ছে ভাবের আশ্রয়—এই ভাবের সংস্পর্শে আমাদের হৃদয় আনন্দিত হয়ে ওঠে। অতএব শ্রেষ্ঠকাব্যে প্রথমে আমাদের কানের এবং কলাবোধের তৃপ্তি, তার পরে আমাদের বুদ্ধির তৃপ্তি ও তার পরে হৃদয়ের তৃপ্তি ঘটলে তবেই আমাদের সমগ্র প্রকৃতির তৃপ্তির সঙ্গে সঙ্গে কাব্যের যে-রস তাই আমাদের স্থায়িরূপে প্রগাঢ়রূপে অন্তরকে অধিকার করে। নইলে, হয় রসের ক্ষীণতা ক্ষণিকতা, নয় রসের বিকার ঘটে।

চিনি মধু গুড়ের যখন বিকার ঘটে তখন সে গাঁজিয়ে ওঠে, তখন সে ম'দো হয়ে ওঠে, তখন সে আপনার পাত্রটিকে ফাটিয়ে ফেলে। মানসিক রসের বিকৃতিতেও আমাদের মধ্যে প্রমত্ততা আনে, তখন আর সে বন্ধন মানে না, অধৈর্য-অশান্তিতে সে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। এই রসের উন্মত্ততায় আমাদের চিত্ত যখন উন্মথিত হতে থাকে তখন সেইটেকেই সিদ্ধি বলে জ্ঞান করি। কিন্তু নেশাকে কখনোই সিদ্ধি বলা চলে না, অসতীত্বকে প্রেম বলা চলে না, জ্বরবিকারের দুর্বার উত্তেজনাকে স্বাস্থ্যের বলপ্রকাশ বলা চলে না। মত্ততার মধ্যে যে একটা উগ্র প্রবলতা আছে সেটা বস্তুত লাভ নয়—সেটাতে নিজের স্বভাবের অন্য সবদিক থেকেই হরণ করে কেবল একটিমাত্র দিককে অস্বাভাবিকরূপে স্ফীত করে তোলা হয়। তাতে যে কেবল যে-সকল অংশের থেকে হরণ করা হয় তাদেরই ক্ষতি ও কৃশতা ঘটে তা নয়, যে অংশকে ফাঁপিয়ে মাতিয়ে তোলা হয় তারও ভালো হয় না। কারণ, স্বভাবের ভিন্ন ভিন্ন অংশ যখন সহজভাবে সক্রিয় থাকে তখনই প্রত্যেকটির যোগে প্রত্যেকটি সার্থক হয়ে থাকে—একটির থেকে আর-একটি যদি চুরি করে তবে যার চুরি যায় তারও ক্ষতি হয় এবং চোরও নষ্ট হতে থাকে।

তাই বলছিলুম, প্রেম যদি সত্য থেকে জ্ঞান থেকে চুরি করে মত্ত হয়ে বেড়ায়, তার সংযম ও ধৈর্য নষ্ট হয়, তার কল্পনাবৃত্তি উচ্ছৃঙ্খল হয়ে ওঠে তবে সে নিজের প্রতিষ্ঠাকে নিজের হাতে নষ্ট করে—নিজেকে লক্ষ্মীছাড়া করে তোলে।

আমরা যে প্রেমের সাধনা করব সে সতী স্ত্রীর সাধনা। তাতে সতীর তিন লক্ষণই থাকবে—তাতে হ্রী থাকবে, ধী থাকবে এবং শ্রী থাকবে।[1] তাতে সংযম থাকবে, সুবিবেচনা থাকবে এবং সৌন্দর্য থাকবে। এই প্রেম সংসারের মধ্যে চলায় ফেরায়, কথায় বার্তায়, কাজে কর্মে, দেনায় পাওনায়, ছোটোয় বড়োয়, সুখে দুঃখে, ব্যাপ্তভাবে সুতরাং সংযতভাবে নির্মলভাবে মধুরভাবে প্রকাশ পেতে থাকবে। প্রেমের যে একটি স্বাভাবিক হ্রী আছে সেই লজ্জার আবরণটুকু থাকলেই তবে সে বৃহৎভাবে পরিব্যাপ্ত

---

[1] স্ত্রীলোকের কোন্ গুণগুলি শ্রেষ্ঠ তাহার উত্তরে পরম পূজনীয় শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর অগ্রজ মহাশয় কোনো একটি খাতায় লিখিয়াছিলেন—শ্রী, হ্রী ও ধী।

হতে পারে, নইলে কোনো একটা দিকেই সে জ্বলে উঠে হয়তো কর্মকে নষ্ট করে, জ্ঞানকে বিকৃত করে, সংসারকে আঘাত করে, নিজেকে একদমে খরচ করে ফেলে। হ্রী দ্বারাই সতী স্ত্রী আপনার প্রেমকে ধারণ করে, তাকে নানাদিকে বিকীর্ণ করে দেয়—এইরূপে সে-প্রেম কাউকে দগ্ধ করে না, সকলকে আলোকিত করে। আমাদের পৃথিবীর এই রকমের একটি আবরণ আছে—সেটি হচ্ছে বাতাসের আবরণ। এই আবরণটির দ্বারাই ধরণী সূর্যের আলোককে পরিমিত এবং ব্যাপকভাবে সর্বত্র বিকীর্ণ করে দেয়। এই আবরণটি না থাকলে রৌদ্র যেখানটিতে পড়ত সেখানটিকে দগ্ধ এবং রুদ্ররূপে উজ্জ্বল করত এবং ঠিক তার পাশেই যেখানে ছায়া সেখানে হিমশীতল মৃত্যু ও নিবিড়তম অন্ধকার বিরাজ করত। অসতীর যে প্রেমে হ্রী নেই, সংযম নেই, সে প্রেম নিজেকে পরিমিতভাবে সর্বত্র বিকীর্ণ করতে পারে না, সে প্রেম এক জায়গায় উগ্রজ্বালা এবং ঠিক তার পাশেই তেজোহীন আলোকবঞ্চিত ঔদাসীন্য বিস্তার করে।

আমাদেরও এই মানস-পুরীর সতীর প্রেমে ধী থাকবে, জ্ঞানের বিশুদ্ধতা থাকবে। এ প্রেম সংস্কারজালে জড়িত মূঢ় প্রেম নয়। পশুদের মতো একটা সংস্কারগত অন্ধ প্রেম নয়। এর দৃষ্টি জাগ্রত, এর চিত্ত উন্মুক্ত। কোনো কল্পনার দ্রব্য দিয়ে এ নিজেকে ভুলিয়ে রাখতে চায় না—এ যাকে চায় তার অবাধ পরিচয় চায়, তার সম্বন্ধে সে যে নিজের জ্ঞানকে অপমানিত করে রাখবে এ সে সহ্য করতে পারে না। এর মনে মনে কেবলই এই ভয় হয় যে পাছে পাবার একান্ত আগ্রহে একটা কোনো ভুলকে পেয়েই সে নিজেকে শান্ত করে রাখে। পাখি যেমন ডিমে তা দেবার জন্যেই ব্যাকুল, তাই সে একটা নুড়ি পেলেও তাতে তা দিতে বসে, তেমনি পাছে আমাদের প্রেম কোনোমতে কেবল আত্মসমর্পণ করতেই ব্যগ্র হয়, কাকে যে আত্মসমর্পণ করছে সেটার দিকে পাছে তার কোনো খেয়াল না থাকে এই আশঙ্কাটুকু যায় না—পতিকে দেখে নেবার জন্যে সন্ধ্যার অন্ধকারে নিজের প্রদীপটিকে যেন সে সাবধানে জ্বালিয়ে রাখতে চায়।

তার পরে আমাদের এই সতীর প্রেমে শ্রী থাকবে, সৌন্দর্যের আনন্দময়তা থাকবে। কিন্তু যদি হ্রীর অভাব ঘটে, যদি ধীর বিকার ঘটে, তবে এই শ্রীও নষ্ট হয়ে যায়।

সতী আত্মা যে প্রার্থনা উচ্চারণ করেছিলেন তার মধ্যে প্রেমের কোনো অঙ্গের অভাব ছিল না। তিনি যে অমৃত চেয়েছিলেন, তা পরিপূর্ণ প্রেম—তা কর্মহীন জ্ঞানহীন প্রমত্ত প্রেম নয়। তিনি বলেছিলেন, অসতো মা সদ্‌গময়—অসত্য হতে আমাকে সত্যে নিয়ে যাও। তিনি বলেছিলেন, আমি যাঁকে চাই তিনি যে সত্য, নিজেকে সকল দিকে সত্যের নিয়মে সত্যের বন্ধনে না বাঁধলে তাঁর সঙ্গে যে আমার পরিণয়বন্ধন সমাপ্ত হবে না। বাক্যে চিন্তায় কর্মে সত্য হতে হবে, তাহলেই যিনি

বিশ্বজগতে সত্য, যিনি বিশ্বসমাজে সত্য তাঁর সঙ্গে আমাদের সম্মিলন সত্য হয়ে উঠবে, নইলে পদে পদে বাধতে থাকবে। এ সাধনা কঠিন সাধনা, এ পুণ্যের সাধনা, এ কর্মের সাধনা।

তার পরে তিনি বলেছিলেন, তমসো মা জ্যোতির্গময়। তিনি যে জ্ঞানস্বরূপ— বিশ্বজগতের মধ্যে তিনি যেমন ধ্রুব সত্যরূপে আছেন, তেমনি সেই সত্যকে যে আমরা জানছি সেই জ্ঞান যে জ্ঞানস্বরূপেরই প্রকাশ। সেইজন্যই তো গায়ত্রী মন্ত্রে একদিকে ভূলোক-ভুবর্লোক-স্বর্লোকের মধ্যে তাঁর সত্য প্রত্যক্ষ করবার নির্দেশ আছে তেমনি অন্যদিকে আমাদের জ্ঞানের মধ্যে তাঁর জ্ঞানকে উপলব্ধি করবারও উপদেশ আছে— যিনি ধীকে প্রেরণ করছেন তাঁকে জ্ঞানের মধ্যে ধীস্বরূপ বলেই জানতে হবে। বিশ্বভুবনের মধ্যে সেই সত্যের সঙ্গে মিলতে হবে, জ্ঞানের মধ্যে সেই জ্ঞানের সঙ্গে মিলতে হবে। ধ্যানের দ্বারা যোগের দ্বারা এই মিলন।

তার পরের প্রার্থনা মৃত্যোর্মামৃতংগময়। আমরা আমাদের প্রেমকে মৃত্যুর মধ্যে পীড়িত খণ্ডিত করছি; তোমার অনন্ত প্রেম অখণ্ড আনন্দের মধ্যে তাকে সার্থক করো। আমাদের অন্তঃকরণের বহুবিভক্ত রসের উৎস, হে রসস্বরূপ, তোমার পরিপূর্ণ রসসমুদ্রে মিলিত হয়ে চরিতার্থ হ'ক। এমনি করে অন্তরাত্মা সত্যের সংযমে, জ্ঞানের আলোকে ও আনন্দের রসে পরিপূর্ণ হয়ে, প্রকাশই যাঁর স্বরূপ তাঁকে নিজের মধ্যে লাভ করুক তাহলেই রুদ্রের যে প্রেমমুখ তাই আমাদের চিরন্তন কাল রক্ষা করবে।

৩ পৌষ

দেখা

এই তো দিনের পর দিন, আলোকের পর আলোক আসছে। কতকাল থেকেই আসছে, প্রত্যহই আসছে। এই আলোকের দূতটি পুষ্পকুঞ্জে প্রতিদিন প্রাতেই একটি আশ্বাস বহন করে আনছে; যে-কুঁড়িগুলির ঈষৎ একটু উদ্‌গম হয়েছে মাত্র তাদের বলছে, তোমরা আজ জান না কিন্তু তোমরাও তোমাদের সমস্ত দলগুলি একেবারে মেলে দিয়ে সুগন্ধে সৌন্দর্যে একেবারে বিকশিত হয়ে উঠবে। এই আলোকের দূতটি শস্যক্ষেত্রের উপরে তার জ্যোতির্ময় আশীর্বাদ স্থাপন করে প্রতিদিন এই কথাটি বলছে, "তোমরা মনে করছ, আজ যে বায়ুতে হিল্লোলিত হয়ে তোমরা শ্যামল মাধুর্যে চারিদিকের চক্ষু জুড়িয়ে দিয়েছ এতেই বুঝি তোমাদের সব হয়ে গেল, কিন্তু তা নয় একদিন তোমাদের জীবনের

মাঝখানটি হতে একটি শিষ উঠে একেবারে স্তরে স্তরে ফসলে ভরে যাবে।" যে ফুল ফোটে নি আলোক প্রতিদিন সেই ফুলের প্রতীক্ষা নিয়ে আসছে—যে ফসল ধরে নি আলোকের বাণী সেই ফসলের নিশ্চিত আশ্বাসে পরিপূর্ণ। এই জ্যোতির্ময় আশা প্রতিদিনই পুষ্পকুঞ্জকে এবং শস্তক্ষেত্রকে দেখা দিয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু এই প্রতিদিনের আলোক, এ তো কেবল ফুলের বনে এবং শস্তের খেতে আসছে না। এ যে রোজই সকালে আমাদের ঘুমের পর্দা খুলে দিচ্ছে। আমাদেরই কাছে এর কি কোনো কথা নেই। আমাদের কাছেও এই আলো কি প্রত্যহ এমন কোনো আশা আনছে না, যে আশার সকল মূর্তি হয়তো কুঁড়িটুকুর মতো নিতান্ত অন্ধভাবে আমাদের ভিতরে রয়েছে, যার শিষটি এখনও আমাদের জীবনের কেন্দ্রস্থল থেকে ঊর্ধ্ব আকাশের দিকে মাথা তোলে নি?

আলো কেবল একটিমাত্র কথা প্রতিদিন আমাদের বলছে—"দেখো।" বাস্‌। "একবার চেয়ে দেখো।" আর কিছুই না।

আমরা চোখ মেলি, আমরা দেখি। কিন্তু সেই দেখাটুকু দেখার একটু কুঁড়িমাত্র, এখনও তা অন্ধ। সেই দেখায় দেখার সমস্ত ফসল ধরবার মতো স্বর্গাভিগামী শিষটি এখনও ধরে নি। বিকশিত দেখা এখনও হয় নি, ভরপুর দেখা এখনও দেখি নি।

কিন্তু তবু রোজ সকালবেলায় বহুযোজন দূর থেকে আলো এসে বলছে—দেখো। সেই যে একই মন্ত্র রোজই আমাদের কানে উচ্চারণ করে যাচ্ছে তার মধ্যে একটি অশ্রান্ত আশ্বাস প্রচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে—আমাদের এই দেখার ভিতরে এমন একটি দেখার অঙ্কুর রয়েছে যার পূর্ণ পরিণতির উপলব্ধি এখনও আমাদের মধ্যে জাগ্রত হয়ে ওঠে নি।

কিন্তু এ-কথা মনে ক'রো না আমার এই কথাগুলি অলংকারমাত্র। মনে ক'রো না, আমি রূপকে কথা কচ্ছি। আমি জ্ঞানের কথা ধ্যানের কথা কিছু বলছি নে, আমি নিতান্তই সরলভাবে চোখে দেখার কথাই বলছি।

আলোক যে-দেখাটা দেখায় সে তো ছোটোখাটো কিছুই নয়। শুধু আমাদের নিজের শয্যাটুকু শুধু ঘরটুকু তো দেখায় না—দিগন্তবিস্তৃত আকাশমণ্ডলের নীলোজ্জ্বল থালাটির মধ্যে যে সামগ্রী সাজিয়ে সে আমাদের সম্মুখে ধরে, সে কী অদ্ভুত জিনিস। তার মধ্যে বিস্ময়ের যে অন্ত পাওয়া যায় না। আমাদের প্রতিদিনের যেটুকু দরকার তার চেয়ে সে যে কতই বেশি।

এই যে বৃহৎ ব্যাপারটা আমরা রোজ দেখছি এই দেখাটা কি নিতান্তই একটা বাহুল্য ব্যাপার। এ কি নিতান্ত অকারণে মুক্তহস্ত ধনীর অপব্যয়ের মতো আমাদের

চারদিকে কেবল নষ্ট হবার জন্যেই হয়েছে। এতবড়ো দৃশ্যের মাঝখানে থেকে আমরা কিছু টাকা জমিয়ে, কিছু খ্যাতি নিয়ে, কিছু ক্ষমতা ফলিয়েই যেমনি একদিন চোখ বুজব অমনি এমন বিরাটজগতে চোখ মেলে চাবার আশ্চর্য সুযোগ একেবারে চূড়ান্ত হয়ে শেষ হয়ে যাবে! এই পৃথিবীতে যে আমরা প্রতিদিন চোখ মেলে চেয়েছিলুম এবং আলোক এই চোখকে প্রতিদিনই অভিষিক্ত করেছিল, তার কি পুরা হিসাব ওই টাকা এবং খ্যাতি এবং ভোগের মধ্যে পাওয়া যায়?

না, তা পাওয়া যায় না। তাই আমি বলছি এই আলোক অন্ধ কুঁড়িটির কাছে প্রত্যহই যেমন একটি অভাবনীয় বিকাশের কথা বলে যাচ্ছে, আমাদের দেখাকেও সে তেমনি করেই আশা দিয়ে যাচ্ছে যে, একটি চরম দেখা একটি পরম দেখা আছে সেটি তোমার মধ্যেই আছে। সেইটি একদিন ফুটে উঠবে বলেই রোজ আমি তোমার কাছে আনাগোনা করছি।

তুমি কি ভাবছ, চোখ বুজে ধ্যানযোগে দেখবার কথা আমি বলছি? আমি এই চর্মচক্ষে দেখার কথাই বলছি। চর্মচক্ষুকে চর্মচক্ষু বলে গাল দিলে চলবে কেন? একে শারীরিক বলে তুমি ঘৃণা করবে এতবড়ো লোকটি তুমি কে? আমি বলছি এই চোখ দিয়েই এই চর্মচক্ষু দিয়েই এমন দেখা দেখবার আছে যা চরম দেখা—তাই যদি না থাকত তবে আলোক বৃথা আমাদের জাগ্রত করছে, তবে এতবড়ো এই গ্রহতারা-চন্দ্রসূর্যখচিত প্রাণে সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ বিশ্বজগৎ বৃথা আমাদের চারিদিকে অহোরাত্র নানা আকারে আত্মপ্রকাশ করছে। এই জগতের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করার চরম সফলতা কি বিজ্ঞান? সূর্যের চারদিকে পৃথিবী ঘুরছে—নক্ষত্রগুলি এক-একটি সূর্যমণ্ডল, এই কথাগুলি আমরা জানব বলেই এতবড়ো জগতের সামনে আমাদের এই দুটি চোখের পাতা খুলে গেছে? এ জেনেই বা কী হবে।

জেনে হয়তো অনেক লাভ হতে পারে কিন্তু জানার লাভ সে তো জানারই লাভ; তাতে জ্ঞানের তহবিল পূর্ণ হচ্ছে—তা হ'ক। কিন্তু আমি যে বলছি চোখে দেখার কথা। আমি বলছি, এই চোখেই আমরা যা দেখতে পাব তা এখনও পাই নি। আমাদের সামনে আমাদের চারদিকে যা আছে তার কোনোটাকেই আমরা দেখতে পাই নি—ওই তৃণটিকেও না। আমাদের মনই আমাদের চোখকে চেপে রয়েছে—সে যে কত মাথামুণ্ড ভাবনা নিয়ে আছে তার ঠিকানা নেই—সেই অশনবসনের ভাবনা নিয়ে সে আমাদের দৃষ্টিকে ঝাপসা করে রেখেছে—সে কত লোকের মুখ থেকে কত সংস্কার নিয়ে জমা করেছে—তার যে কত বাঁধা শব্দ আছে, কত বাঁধা মত আছে তার সীমা নেই, সে কাকে যে বলে শরীর কাকে যে বলে আত্মা, কাকে যে বলে হেয় কাকে

যে বলে শ্রেয়, কাকে যে বলে সীমা কাকে যে বলে অসীম তার ঠিকানা নেই—এই সমস্ত সংস্কারের দ্বারা চাপা দেওয়াতে আমাদের দৃষ্টি নির্মল নির্মুক্তভাবে জগতের সংস্রব লাভ করতেই পারে না।

আলোক তাই প্রত্যহই আমাদের চক্ষুকে নিদ্রালসতা থেকে ধৌত করে দিয়ে বলছে তুমি স্পষ্ট করে দেখো, তুমি নির্মল হয়ে দেখো, পদ্ম যে-রকম সম্পূর্ণ উন্মুক্ত হয়ে সূর্যকে দেখে তেমনি করে দেখো। কাকে দেখবে। তাঁকে, যাঁকে ধ্যানে দেখা যায়? না তাঁকে না, যাঁকে চোখে দেখা যায় তাঁকেই। সেই রূপের নিকেতনকে, যাঁর থেকে গণনাতীত রূপের ধারা অনন্তকাল থেকে ঝরে পড়ছে। চারিদিকেই রূপ—কেবলই এক রূপ থেকে আর-এক রূপের খেলা; কোথাও তার আর শেষ পাওয়া যায় না—দেখেও পাই নে, ভেবেও পাই নে। রূপের ঝরনা দিকে দিকে থেকে কেবলই প্রতিহত হয়ে সেই অনন্তরূপসাগরে গিয়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়ছে। সেই অপরূপ অনন্তরূপকে তাঁর রূপের লীলার মধ্যেই যখন দেখব তখন পৃথিবীর আলোকে একদিন আমাদের চোখ মেলা সার্থক হবে, আমাদের প্রতিদিনকার আলোকের অভিষেক চরিতার্থ হবে। আজ যা দেখছি, এই যে চারিদিকে আমার যে-কেউ আছে যা-কিছু আছে এদের একদিন যে কেমন করে, কী পরিপূর্ণ চৈতন্যযোগে দেখব তা আজ মনে করতে পারি নে—কিন্তু এটুকু জানি আমাদের এই চোখের দেখার সামনে সমস্ত জগৎকে সাজিয়ে আলোক আমাদের কাছে যে আশার বার্তা আনছে তা এখনও কিছুই সম্পূর্ণ হয় নি। এই গাছের রূপটি যে তাঁর আনন্দরূপ সে-দেখা এখনও আমাদের দেখা হয় নি—মানুষের মুখে যে তাঁর অমৃতরূপ সে-দেখার এখনও অনেক বাকি—“আনন্দরূপমমৃতং” এই কথাটি যেদিন আমার এই দুই চক্ষু বলবে সেইদিনেই তারা সার্থক হবে। সেইদিনই তাঁর সেই পরমসুন্দর প্রসন্নমুখ তাঁর দক্ষিণং মুখং একেবারে আকাশে তাকিয়ে দেখতে পাবে। তখনই সর্বত্রই নমস্কারে আমাদের মাথা নত হয়ে পড়বে—তখন ওষধিবনস্পতির কাছেও আমাদের স্পর্ধা থাকবে না—তখন আমরা সত্য করেই বলতে পারব, যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ, য ওষধিষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ।

৪ পৌষ

শোনা

কাল সন্ধ্যা থেকে এই গানটি কেবলই আমার মনের মধ্যে ঝংকৃত হচ্ছে—"বাজে বাজে রম্যবীণা বাজে।" আমি কোনোমতেই ভুলতে পারছি নে—

বাজে বাজে রম্যবীণা বাজে।
অমল কমল মাঝে, জ্যোৎস্না রজনী মাঝে,
কাজল ঘন মাঝে, নিশি আঁধার মাঝে,
কুসুম সুরভি মাঝে বীণ-রণন শুনি যে
প্রেমে প্রেমে বাজে।

কাল রাত্রে ছাদে দাঁড়িয়ে নক্ষত্রলোকের দিকে চেয়ে আমার মন সম্পূর্ণ স্বীকার করেছে "বাজে বাজে রম্যবীণা বাজে।" এ কবিকথা নয় এ বাক্যালংকার নয়—আকাশ এবং কালকে পরিপূর্ণ করে অহোরাত্র সংগীত বেজে উঠছে।

বাতাসে যখন ঢেউয়ের সঙ্গে ঢেউ সুন্দর করে খেলিয়ে ওঠে তখন তাদের সেই আশ্চর্য মিলন এবং সৌন্দর্যকে আমাদের চোখ দেখতে পায় না, আমাদের কানের মধ্যে সেই লীলা গান হয়ে প্রকাশ পায়। আবার আকাশের মধ্যে যখন আলোর ঢেউ ধারায় ধারায় বিচিত্র তালে নৃত্য করতে থাকে তখন সেই অপরূপ লীলার কোনো খবর আমাদের কান পায় না, চোখের মধ্যে সেইটে রূপ হয়ে দেখা দেয়। যদি এই মহাকাশের লীলাকেও আমরা কানের সিংহদ্বার দিয়ে অভ্যর্থনা করতে পারতুম তাহলে বিশ্ববীণার এই ঝংকারকে আমরা গান বলেও চিনতে পারতুম।

এই প্রকাণ্ড বিপুল বিশ্ব-গানের বন্যা যখন সমস্ত আকাশ ছাপিয়ে আমাদের চিত্তের অভিমুখে ছুটে আসে তখন তাকে এক পথ দিয়ে গ্রহণ করতেই পারি নে, নানা দ্বার খুলে দিতে হয় চোখ দিয়ে, কান দিয়ে, স্পর্শেন্দ্রিয় দিয়ে, নানা দিক দিয়ে তাকে নানারকম করে নিই। এই একতান মহাসংগীতকে আমরা দেখি, শুনি, ছুঁই, শুঁকি, আস্বাদন করি।

এই বিশ্বের অনেকখানিকেই যদিও আমরা চোখে দেখি, কানে শুনি নে, তবুও বহুকাল থেকে অনেক কবি এই বিশ্বকে গানই বলেছেন। গ্রীসের ভাবুকেরা আকাশে জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর গতায়াতকে নক্ষত্রলোকের গান বলেই বর্ণনা করেছেন। কবিরা বিশ্বভুবনের রূপবিন্যাসের সঙ্গে চিত্রকলার উপমা অতি অল্পই দিয়েছেন তার একটা কারণ, বিশ্বের মধ্যে নিয়ত একটা গতির চাঞ্চল্য আছে কিন্তু শুধু তাই নয়—এর মধ্যে গভীরতর একটা কারণ আছে।

ছবি যে আঁকে তার পট চাই, তুলি চাই, রং চাই, তার বাইরের আয়োজন অনেক। তার পরে সে যখন আঁকতে থাকে তখন তার আরম্ভের রেখাতে সমস্ত ছবির আনন্দ দেখা যায় না—অনেক রেখা এবং অনেক বর্ণ মিললে পর তবেই পরিণামের আভাস পাওয়া যায়। তার পরে, আঁকা হয়ে গেলে চিত্রকর চলে গেলেও সে ছবি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে—চিত্রকরের সঙ্গে তার আর কোনো একান্ত সম্বন্ধ থাকে না।

কিন্তু যে গান করে গানের সমস্ত আয়োজন তার নিজেরই মধ্যে—আনন্দ যার, সুর তারই, কথাও তার—কোনোটাই বাইরের নয়। হৃদয় যেন একেবারে অব্যবহিতভাবে নিজেকে প্রকাশ করে, কোনো উপকরণের ব্যবধানও তার নেই। এইজন্যে গান যদিচ একটা সম্পূর্ণতার অপেক্ষা রাখে তবু তার প্রত্যেক অসম্পূর্ণ সুরটিও হৃদয়কে যেন প্রকাশ করতে থাকে। হৃদয়ের এই প্রকাশে শুধু যে উপকরণের ব্যবধান নেই তা নয়—কথা জিনিসটাও একটা ব্যবধান—কেননা ভেবে তার অর্থ বুঝতে হয়—গানে সেই অর্থ বোঝবারও প্রয়োজন নেই—কোনো অর্থ না থাকলেও কেবলমাত্র সুরই যা বলবার তা অনির্বচনীয় রকম করে বলে। তার পরে আবার গানের সঙ্গে গায়কের এক মুহূর্তও বিচ্ছেদ নেই—গান ফেলে রেখে গায়ক চলে গেলে গানও তার সঙ্গে সঙ্গেই চলে যায়। গায়কের প্রাণের সঙ্গে শক্তির সঙ্গে আনন্দের সঙ্গে গানের সুর একেবারে চিরমিলিত হয়েই প্রকাশ পায়। যেখানে গান সেখানেই গায়ক, এর আর কোনো ব্যত্যয় নেই।

এই বিশ্বসংগীতটিও তার গায়ক থেকে এক মুহূর্তও ছাড়া নেই। তাঁর বাইরের উপকরণ থেকেও এ গড়া নয়। একেবারে তাঁরই চিত্ত তাঁরই নিশ্বাসে তাঁরই আনন্দরূপ ধরে উঠছে। এ গান একেবারে সম্পূর্ণ হয়ে তাঁর অন্তরে রয়েছে, অথচ ক্রমাভিব্যক্তরূপে প্রকাশ পাচ্ছে, কিন্তু এর প্রত্যেক সুরই সেই সম্পূর্ণ গানের আবির্ভাব এক সুরকে আর-এক সুরের সঙ্গে আনন্দে সংযুক্ত করে চলেছে। এই বিশ্বগানের যখন কোনো বচনগম্য অর্থও না পাই তখনও আমাদের চিত্তের কাছে এর প্রকাশ কোনো বাধা পায় না। এ যে চিত্তের কাছে চিত্তের অব্যবহিত প্রকাশ।

গায়ত্রীমন্ত্রে তাই তো শুনতে পাই সেই বিশ্বসবিতার ভর্গ তাঁর তেজ তাঁর শক্তি ভূর্ভুবঃ স্বঃ হয়ে কেবলই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে এবং তাঁরই সেই এক শক্তি কেবলই ধীরূপে আমাদের অন্তরে বিকীর্ণ হচ্ছে। কেবলই উঠছে, কেবলই আসছে সুরের পর সুর, সুরের পর সুর।

কাল কৃষ্ণএকাদশীর নিভৃত রাত্রের নিবিড় অন্ধকারকে পূর্ণ করে সেই বীনকার তাঁর রম্য বীণা বাজাচ্ছিলেন; জগতের প্রান্তে আমি একলা দাঁড়িয়ে শুনছিলুম; সেই

ঝংকারে অনন্ত আকাশের সমস্ত নক্ষত্রলোক ঝংকৃত হয়ে অপূর্ব নিঃশব্দ সংগীতে গাঁথা পড়ছিল। তার পরে যখন শুতে গেলুম তখন এই কথাটি মনে নিয়ে নিদ্রিত হলুম যে, আমি যখন সুপ্তিতে অচেতন থাকব তখনও সেই জাগ্রত বীনকারের নিশীথ রাত্রের বীণা বন্ধ হবে না - তখনও তাঁর যে ঝংকারের তালে নক্ষত্রমণ্ডলীর নৃত্য চলছে সেই তালে তালেই আমার নিদ্রানিভৃত দেহ-নাট্যশালায় প্রাণের নৃত্য চলতে থাকবে, আমার হৃৎপিণ্ডের নৃত্য থামবে না, সর্বাঙ্গে রক্ত নাচবে এবং লক্ষ লক্ষ জীবকোষ আমার সমস্ত শরীরে সেই জ্যোতিষ্কসভার সংগীতচ্ছন্দেই স্পন্দিত হতে থাকবে।

"বাজে বাজে রম্যবীণা বাজে।" আবার আমাদের ওস্তাদজি আমাদের হাতেও একটি করে ছোটো বীণা দিয়েছেন। তাঁর ইচ্ছে আমরাও তাঁর সঙ্গে সুর মিলিয়ে বাজাতে শিখি। তাঁর সভায় তাঁরই সঙ্গে বসে আমরা একটু একটু সংগত করব এই তাঁর স্নেহের অভিপ্রায়। জীবনের বীণাটি ছোটো কিন্তু এতে কত তারই চড়িয়েছেন। সব তারগুলি সুর মিলিয়ে বাঁধা কি কম কথা! এটা হয় তো ওটা হয় না, মন যদি হল তো আবার শরীর বাদী হয়—একদিন যদি হল তো আবার আর-একদিন তার নেবে যায়। কিন্তু ছাড়লে চলবে না। একদিন তাঁর মুখ থেকে এ-কথাটি শুনতে হবে—বাহবা, পুত্র, বেশ। এই জীবনের বীণাটি একদিন তাঁর পায়ের কাছে গুঞ্জরিয়া গুঞ্জরিয়া তার সব রাগিণীটি বাজিয়ে তুলবে। এখন কেবল এই কথাটি মনে রাখতে হবে যে, সব তারগুলি বেশ এঁটে বাঁধা চাই—ঢিল দিলেই ঝনঝন খনখন করে। যেমন এঁটে বাঁধতে হবে তেমনি তাকে মুক্তও রাখতে হবে—তার উপরে কিছু চাপা পড়লে সে আর বাজতে চায় না। নির্মল সুরটুকু যদি চাও তবে দেখো তারে যেন ধুলো না পড়ে – মরচে না পড়ে—আর প্রতিদিন তাঁর পদপ্রান্তে বসে প্রার্থনা ক'রো– হে আমার গুরু, তুমি আমাকে বেসুর থেকে সুর নিয়ে যাও।

৫ পৌষ

হিসাব

রোজ কেবল লাভের কথাটাই শোনাতে ইচ্ছে হয়। হিসাবের কথাটা পাড়তে মন যায় না। ইচ্ছে করে কেবল রসের কথাটা নিয়েই নাড়াচাড়া করি, যে-পাত্রের মধ্যে সেই রস থাকে সেটাকে বড়ো কঠিন বলে মনে হয়।

কিন্তু অমৃতের নিচের তলায় সত্য বসে রয়েছেন তাঁকে একেবারে বাদ দিয়ে সেই আনন্দলোকে যাবার জো নেই।

সত্য হচ্ছেন নিয়মস্বরূপ। তাঁকে মানতে হলেই তাঁর সমস্ত বাঁধন মানতেই হয়। যা কিছু সত্য অর্থাৎ যা কিছু আছে এবং থাকে তা কোনোমতেই বন্ধনহীন হতে পারে না—তা কোনো নিয়মে আছে বলেই আছে। যে-সত্যের কোনো নিয়ম নেই, বন্ধন নেই, সে তো স্বপ্ন, সে তো খেয়াল সে তো স্বপ্নের চেয়েও মিথ্যা, খেয়ালের চেয়েও শূন্য।

যিনি পূর্ণ সত্যস্বরূপ তিনি অন্যের নিয়মে বদ্ধ হন না তাঁর নিজের নিয়ম নিজেরই মধ্যে। তা যদি না থাকে, তিনি আপনাকে যদি আপনি বেঁধে না থাকেন, তবে তাঁর থেকে কিছুই হতে পারে না, কিছুই রক্ষা পেতে পারে না। তবে উন্মত্ততার তাণ্ডবনৃত্যে কোনো কিছুর কিছুই ঠিকানা থাকত না।

কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি সত্যের রূপই হচ্ছে নিয়ম – একেবারে অব্যর্থ নিয়ম—তার কোনো প্রান্তেও লেশমাত্র ব্যত্যয় নেই। এইজন্যেই এই সত্যের বন্ধনে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বিধৃত হয়ে আছে, এইজন্যই সত্যের সঙ্গে আমাদের বুদ্ধির যোগ আছে এবং তার প্রতি আমাদের সম্পূর্ণ নির্ভর আছে।

গাছের যেমন গোড়াতেই দরকার শিকড় দিয়ে ভূমিকে আঁকড়ে ধরা আমাদেরও তেমনি গোড়ায় প্রয়োজন হচ্ছে স্থূল সূক্ষ্ম অসংখ্য শিকড় দিয়ে সত্যের উপরে প্রতিষ্ঠালাভ করা।

আমরা ইচ্ছা করি না করি, এ সাধনা আমাদের করতেই হয়। শিশু বলে আমি পা ফেলে চলব; কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত বহু সাধনায় সে চলার নিয়মটিকে পালন করে ভারাকর্ষণের সঙ্গে আপন করতে না পারে ততক্ষণ তার আর উপায় নেই—শুধু বললেই হবে না, আমি চলব।

এই চলবার নিয়মকে শিশু যখনই গ্রহণ করে এ-নিয়ম আর তখন তাকে পীড়া দেয় না। শুধু যে পীড়া দেয় না তা নয় তাকে আনন্দ দেয়; সত্য-নিয়মের বন্ধনকে স্বীকার করবামাত্রই শিশু নিজের গতিশক্তিকে লাভ করে আহ্লাদিত হয়।

এমনি করে ক্রমে ক্রমে যখন সে জলের সত্য মাটির সত্য আগুনের সত্যকে সম্পূর্ণ মানতে শেখে তখন যে কেবল তার কতকগুলি অসুবিধা দূর হয় তা নয়, জল মাটি আগুন সম্বন্ধে তার শক্তি সফল হয়ে উঠে তাকে আনন্দ দেয়।

শুধু বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে নয়, সমাজের সঙ্গেও শিশুকে সত্য সম্বন্ধে যুক্ত হয়ে ওঠবার জন্যে বিস্তর সাধনা করতে হয়, তাকে বিস্তর নিয়ম স্বীকার করতে হয়—তাকে অনেক রকম আবদার থামাতে হয়, অনেক রাগ কমাতে হয়—নিজেকে অনেক রকম করে বাঁধতে হয় এবং অনেকের সঙ্গে বাঁধতে হয়। যখন এই বন্ধন-

গুলি মানা তার পক্ষে সহজ হয় তখন সমাজের মধ্যে বাস করা তার পক্ষে আনন্দের হয়ে ওঠে—তখনই তার সামাজিক শক্তি সেই সকল বিচিত্র নিয়মবন্ধনের সাহায্যেই বাধামুক্ত হয়ে স্ফূর্তিলাভ করে।

এমনি করে অধিকাংশ মানুষই যখন বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে এবং সমাজের মধ্যে মোটামুটি রকমে চলনসই হয়ে ওঠে তখনই তারা নিশ্চিন্ত হয়. এবং নিজেকে অনিন্দনীয় মনে করে খুশি হয়।

কিন্তু এমন টাকা আছে যা গাঁয়ে চলে কিন্তু শহরে চলে না শহরের বাজে দোকানে চলে যায় কিন্তু ব্যাঙ্কে চলে না। ব্যাঙ্কে তাকে ভাঙাতে গেলেই সেখানে যে পোদ্দারটি আছে সে একেবারে স্পর্শমাত্রেই তাকে তৎক্ষণাৎ মেকি বলে বাতিল করে দেয়।

আমাদেরও সেই দশা—আমরা ঘরের মধ্যে গাঁয়ের মধ্যে সমাজের মধ্যে নিজেকে চলনসই করে রেখেছি কিন্তু বড়ো ব্যাঙ্কে যখন দাঁড়াই তখনই পোদ্দারের কাছে একমুহূর্তে আমাদের সমস্ত খাদ ধরা পড়ে যায়।

সেখানে যদি চলতি হতে চাই তবে সত্য হতে হবে, আরও সত্য হতে হবে। আরও অনেক বাঁধনে নিজেকে বাঁধতে হবে, আরও অনেক দায় মানতে হবে। সেই অমৃতের বাজারে এতটুকু মেকিও চলে না—একেবারে খাঁটি সত্য না হলে অমৃত কেনবার আশা করাও যায় না।

তাই বলছিলুম কেবল অমৃতরসের কথা তো বললেই হবে না, তার হিসাবটাও দেখতে হবে।

আমরা নিজের হিসাব যখন মেলাতে বসি তখন দু-চার টাকার গরমিল হলেও বলি ওতে কিছু আসে যায় না। এমনি করে রোজই গরমিলের অংশ কেবলই জমে উঠছে। প্রকৃতির সঙ্গে এবং মানুষের সঙ্গে ব্যবহারে প্রত্যহই ছোটোবড়ো কত অসত্য কত অন্যায়ই চালিয়ে দিচ্ছি সে-সম্বন্ধে যদি কথা ওঠে তো বলে বসি অমন তো আকৃসার হয়েই থাকে, অমন তো কত লোকেই করে—ওতে ক'রে এমন ঘটে না যে আমি ভদ্রসমাজের বার হয়ে যাই।

ঘ'রো হিসাবের খাতায় এইরকম শৈথিল্য বটে কিন্তু যারা জাতিতে সাধু, যারা মহাজন, তারা লাখটাকার কারবারে এক পয়সার হিসাবটি না মিললে সমস্ত রাত্রি ঘুমোতে পারে না। যারা মস্ত লাভের দিকে তাকিয়ে আছে তারা ছোট্টো গরমিলকেও ভয়ায়—তারা হিসাবকে একেবারে নিখুঁত সত্য না করে বাঁচে না।

তাই বলছিলুম সেই যে পরম রস প্রেমরস—তার মহাজন যদি হতে চাই তবে

হিসাবের খাতাকে নীরস বলে একটু ফাঁকি দিলেও চলবে না। যিনি অমৃতের ভাণ্ডারী তাঁর কাছে বেহিসাবি আবদার একেবারেই খাটবে না। তিনি যে মস্ত হিসাবি -- এই প্রকাণ্ড জগদ্‌ব্যাপারে কোথাও হিসাবের গোল হয় না—তাঁর কাছে কোন্ লজ্জায় গিয়ে বলব, আমি আর কিছু জানি নে, আর কিছু মানি নে, আমাকে কেবল প্রেম দাও, আমাকে প্রেমে মাতাল করে তোলো।

আত্মা যেদিন অমৃতের জন্যে কেঁদে ওঠে তখন সর্বপ্রথমেই বলে—অসতো মা সদ্‌গময়—আমার জীবনকে আমার চিত্তকে সমস্ত উচ্ছৃঙ্খল অসত্য হতে সত্যে বেঁধে ফেলো—অমৃতের কথা তার পরে।

আমাদেরও প্রতিদিন সেই প্রার্থনাই করতে হবে বলতে হবে, অসতো মা সদ্‌গময়—বন্ধনহীন অসংযত অসত্যের মধ্যে আমাদের মন হাজার টুকরো করে ছড়িয়ে ফেলতে দিয়ো না—তাকে অটুট সত্যের সূত্রে সম্পূর্ণ করে বেঁধে ফেলো—তার পরে সে হার তোমার গলায় যদি পরাতে চাই তবে আমাকে লজ্জা পেতে হবে না।

৬ পৌষ

শান্তিনিকেতনে ৭ই পৌষের উৎসব

উৎসব তো আমরা রচনা করতে পারি নে যদি সুযোগ হয় তবে উৎসব আমরা আবিষ্কার করতে পারি।

সত্য যেখানেই সুন্দর হয়ে প্রকাশ পায় সেইখানেই উৎসব। সে-প্রকাশ কবেই বা বন্ধ আছে। পাখি তো রোজই ভোর-রাত্রি থেকেই ব্যস্ত হয়ে ওঠে তার সকালবেলাকার গীতোৎসবের নিত্য নিমন্ত্রণ রক্ষা করবার জন্যে। আর প্রভাতের আনন্দসভাটিকে সাজিয়ে তোলবার জন্য একটি অন্ধকার পুরুষ সমস্ত রাত্রি কত যে গোপন আয়োজন করে তার কি সীমা আছে। শুতে যাবার আগে একবার যদি কেবল তাকিয়ে দেখি তবে দেখতে পাই নে কি, জগতের নিত্য উৎসবের মহাবিজ্ঞাপন সমস্ত আকাশ জুড়ে কে টাঙিয়ে দিয়েছে।

এর মধ্যে আমাদের উৎসবটা কবে? যেদিন আমরা সময় করতে পারি সেই দিন। যেদিন হঠাৎ হুঁশ হয় যে আমাদের নিমন্ত্রণ আছে এবং সে নিমন্ত্রণ প্রতিদিন মারা যাচ্ছে। যেদিন স্নান করে সাজ করে ঘর ছেড়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ি।

সেই দিন উৎসবের সকালে আকাশের দিকে তাকিয়ে বলি—বাঃ আজ আলোটি কী মধুর, কী পবিত্র। আরে মূঢ়, এ আলো কবে মধুর ছিল না, কবে পবিত্র ছিল না। তুমি একটা বিশেষ দিনের গায়ে একটা বিশেষ চিহ্ন কেটে দিয়েছ বলেই কি আকাশের আলো উজ্জ্বল হয়ে জ্বলেছে।

আর কিছু নয়—আজকে নিমন্ত্রণরক্ষা করতে এসেছি অন্যদিন করি নি, এইমাত্র তফাত। আয়োজনটা এমনিই প্রতিদিনই ছিল, প্রতিদিনই আছে। জগৎ যে আনন্দরূপ এইটে আজ দেখব বলে কাজকর্ম ফেলে এসেছি। শুধু তাই নয়, আমিও নিজের আনন্দময় স্বরূপটিকেই ছুটি দিয়েছি আজ বলেছি, থাক আজ দেনাপাওনার টানাটানি, ঘুচুক আজ আত্মপরের ভেদ, মরুক আজ সমস্ত কার্পণ্য, বাহির হ'ক আজ যত ঐশ্বর্য আছে। যে আনন্দ জলে স্থলে আকাশে সর্বত্র বিরাজমান সেই আনন্দকে আজ আমার আনন্দনিকেতনের মধ্যে দেখব যে উৎসব নিখিলের উৎসব সেই উৎসবকে আজ আমার উৎসব করে তুলব।

বিশ্বের একটা মহল তো নয়। তার নানা মহলে নানা রকম উৎসবের ব্যবস্থা হয়ে আছে। সজনে নির্জনে নানাক্ষেত্রে উৎসবের নানা ভিন্ন ভাব, আনন্দের নানা ভিন্ন মূর্তি। নীলাকাশতলে প্রসারিত প্রান্তরের মাঝখানে এই ছায়ানিবিড় নিভৃত আশ্রমের যে প্রতিদিনের উৎসব, আমরা আশ্রমের আশ্রিতগণ কি সেই উৎসবে সূর্যতারা ও তরুশ্রেণীর সঙ্গে কোনোদিন যোগ দিয়েছি? আমরা এই আশ্রমটিকে কি তার সমস্ত সত্যে ও সৌন্দর্যে দেখেছি? দেখি নি। এই আশ্রমের মাঝখানে থেকেও আমরা প্রতিদিন প্রাতে সংসারের মধ্যেই জেগেছি এবং প্রতিদিন রাত্রে সংসারের কোলেই শুয়েছি।

৩৬৪ দিন পরে আজ আমরা আশ্রমবাসিগণ এই আশ্রমকে দেখতে এসেছি। যখন সূর্য পূর্বগগনকে আলো করে ছিল, তখন দেখতে পাই নি—যখন আকাশ ভরে তারার দীপমালা জ্বলেছিল তখনও দেখতে পাই নি আজ আমাদের এই কটা তেলের আলো বাতির আলো জ্বালিয়ে একে দেখব! তা হ'ক, তাতে অপরাধ নেই। মহেশ্বরের মহোৎসবের সঙ্গে যোগ দিতে গেলে আমাদেরও যেটুকু আলোর সম্বল আছে তাও বের করতে হয়। শুধু তাঁর আলোতেই তাঁকে দেখব এ যদি হত তাহলে সহজেই চুকে যেত—কিন্তু এইটুকু কড়ার তিনি আমাদের দিয়ে করিয়ে নিয়েছেন যে, আমাদের আলোটুকুও জ্বালতে হবে—নইলে দর্শন হবে না, মিলন ঘটবে না—আমাদের যে অহংকারটি দিয়ে রেখেছেন সে এরই জন্যে। অহংকারের আগুন জেলে আমরা মহোৎসবের মশাল তৈরি করব। তাই চিরজাগ্রত আনন্দকে দেখবার জন্যে আমার

নিজে এইটুকু আনন্দকেও জাগিয়ে তুলতে হয়, সেই চিরপ্রকাশিত জ্ঞানকেও জানবার জন্যে আমার জ্ঞানটুকুর ক্ষুদ্র পলতেটিকে উসকে দিতে হয়—আর যাঁর প্রেম আপনি প্রবাহিত হয়ে ছাপিয়ে পড়ছে তাঁর সেই অফুরান প্রেমকেও আমরা উপলব্ধি করতে পারি নে যদি ছোটো জুঁইফুলটির মতো আমাদের এই এতটুকু প্রেমকে না ফুটিয়ে তুলতে পারি।

এইজন্যেই বিশ্বেশ্বরের জগদ্ব্যাপী মহোৎসবেও আমরা ঠিকমতো যোগ দিতে পারি না যদি আমরা নিজের ক্ষুদ্র আয়োজনটুকু নিয়ে উৎসব না করি। আমাদের অহংকার আজ তাই আকাশপরিপূর্ণ জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর চোখের সামনে নিজের এই দরিদ্র আলো কয়টা নির্লজ্জভাবে জ্বালিয়েছে। আমাদের অভিমান এই যে, আমরা নিজের আলো দিয়েই তাঁকে দেখব। আমাদের এই অভিমানে মহাদেব খুশি—তিনি হাসছেন। আমাদের এই প্রদীপ কটা জ্বালা দেখে সেই কোটি সূর্যের অধিপতি আনন্দিত হয়েছেন। এই তো তাঁর প্রসন্ন মুখ দেখবার শুভ অবসর। এই সুযোগটিতে আমাদের সমস্ত চেতনাকে জাগিয়ে তুলতে হবে। এই চেতনা আমাদের সমস্ত শরীরে জেগে উঠে রোমে রোমে পুলকিত হ'ক—এই চেতনা দিবালোকের তরঙ্গে তরঙ্গে স্পন্দিত হ'ক, নিশীথরাত্রির অন্ধকারের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হ'ক—আজ সে যেন ঘরের কোণে ঘরের চিন্তায় বিক্ষিপ্ত না হয়, নিখিলের পক্ষে যেন মিথ্যা হয়ে না থাকে—আজ সে কোনোখানে সংকুচিত হয়ে বঞ্চিত না হয়। অনন্ত সভার সমস্ত আয়োজন, সমস্ত দর্শন স্পর্শন মিলন কেবল এই চৈতন্যের উদ্বোধনের অপেক্ষায় আছে— এইজন্যে আলো জ্বলছে, বাঁশি বাজছে— দূতগুলি চতুর্দিক থেকেই দ্বারে এসে দাঁড়িয়েছে—সমস্তই প্রস্তুত—ওরে চেতনা তুই কোথায়। ওরে উত্তিষ্ঠত জাগ্রত।

৭ পৌষ

দীক্ষা

একদিন যাঁর চেতনা বিলাসের আরামশয্যা থেকে হঠাৎ জেগে উঠেছিল—এই ৭ই পৌষ দিনটি সেই দেবেন্দ্রনাথের দিন। এই দিনটিকে তিনি আমাদের জন্যে দান করে গিয়েছেন। রত্ন যেমন করে দান করতে হয় তেমনি করে দান করেছেন। এই দিনটিকে এই আশ্রমের কৌটোটির মধ্যে স্থাপন করে দিয়ে গেছেন। আজ কৌটো উদ্ঘাটন করে রত্নটিকে এই প্রান্তরের আকাশের মধ্যে তুলে ধরে দেখব—এখানকার ধূলিবিহীন নির্মল নিভৃত আকাশতলে যে নক্ষত্রমণ্ডলী দীপ্তি পাচ্ছে সেই

তারাগুলির মাঝখানে তাকে তুলে ধরে দেখব। সেই সাধকের জীবনের ৭ই পৌষকে আজ উদ্‌ঘাটন করার দিন—সেই নিয়ে আমরা আজ উৎসব করি।

এই ৭ই পৌষের দিনে সেই ভক্ত তাঁর দীক্ষাগ্রহণ করেছিলেন—সেই দীক্ষার যে কতবড়ো অর্থ আজকের দিন কি সে-কথা আমাদের কাছে কিছু বলছে? সেই কথাটি না শুনে গেলে কী জন্যেই বা এসেছি আর কী নিয়েই বা যাব?

সেই যেদিন তাঁর জীবনে এই ৭ই পৌষের সূর্য একদিন উদিত হয়েছিল সেই দিনে আলোও জ্বলে নি, জনসমাগমও হয় নি—সেই শীতের নির্মল দিনটি শান্ত ছিল স্তব্ধ ছিল। সেই দিনে যে কী ঘটছে তা তিনি নিজেও সম্পূর্ণ জানেন নি, কেবল অন্তর্যামী বিধাতা পুরুষ জানছিলেন।

সেই যে দীক্ষা সেদিন তিনি গ্রহণ করেছিলেন সেটি সহজ ব্যাপার নয়। সে শুধু শান্তির দীক্ষা নয় সে অগ্নির দীক্ষা। তাঁর প্রভু সেদিন তাঁকে বলেছিলেন, এই যে জিনিসটি তুমি আজ আমার হাত থেকে নিলে এটি যে সত্য—এর ভার যখন গ্রহণ করেছ, তখন তোমার আর আরাম নেই, তোমাকে রাত্রিদিন জাগ্রত থাকতে হবে। এই সত্যকে রক্ষা করতে তোমার যদি সমস্তই যায় তো সমস্তই যাক। কিন্তু সাবধান, তোমার হাতে আমার সত্যের অসম্মান না ঘটে।

তাঁর প্রভুর কাছ থেকে এই সত্যের দান নিয়ে তার পরে আর তো তিনি ঘুমোতে পারেন নি। তাঁর আত্মীয় গেল, ঘর গেল, সমাজ গেল, নিন্দায় দেশ ছেয়ে গেল—এতবড়ো বৃহৎ সংসার, এত মানী বন্ধু, এত ধনী আত্মীয়, এত তাঁর সহায়—সমস্তের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটে গেল এমন দীক্ষা তিনি নিয়েছিলেন। জগতের সমস্ত আনুকূল্যকে বিমুখ করে দিয়ে এই সত্যটি নিয়ে তিনি দেশে দেশে অরণ্যে পর্বতে ভ্রমণ করে বেড়িয়েছেন। এ যে প্রভুর সত্য। এই অগ্নি রক্ষার ভার নিয়ে আর আরাম নেই আর নিদ্রা নেই। রুদ্রদেবের সেই অগ্নিদীক্ষা আজকের দিনের উৎসবের মাঝখানে আছে। কিন্তু সে কি প্রচ্ছন্নই থাকবে? এই গীত-বাদ্যকোলাহলের মাঝখানে প্রবেশ করে সেই ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং যিনি, তাঁর দীপ্ত সত্যের বজ্রমূর্তি আজ প্রত্যক্ষ করে যাবে না? গুরুর হাত হতে সেই যে "বজ্রমুদ্যতং" তিনি গ্রহণ করেছিলেন এই ৭ই পৌষের মর্মস্থানে সেই বজ্রতেজ রয়েছে।

কিন্তু শুধু বজ্র নয়, শুধু পরীক্ষা নয়, সেই দীক্ষার মধ্যে যে কী বরাভয় আছে তাও দেখে যেতে হবে। সেই ধনিসন্তানের জীবনে যে সংকটের দিন এসেছিল তা তো সকলের জানা আছে। যে বিপুল ঐশ্বর্য রাজহর্ম্যের মতো একদিন তাঁর

আশ্রয় ছিল সেইটে যখন অকস্মাৎ তাঁর মাথার উপরে ভেঙে পড়ে তাঁকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেবার উদ্যোগ করেছিল তখন সেই ভয়ংকর বিপৎপতনের মাঝখানে একমাত্র এই সত্যদীক্ষা তাঁকে আবৃত করে রক্ষা করেছিল—সেই দিন তাঁর আর-কোনো পার্থিব সহায় ছিল না। এই দীক্ষা শুধু যে দুর্দিনের দারুণ আঘাত থেকে তাঁকে বাঁচিয়েছিল তা নয়—প্রলোভনের দারুণতর আক্রমণ থেকে তাঁকে রক্ষা করেছিল।

আজকের এই ৭ই পৌষের মাঝখানে তাঁর সেই সত্যদীক্ষার রুদ্রদীপ্তি এবং বরাভয়রূপ দুইই রয়েছে—সেটি যদি আমরা দেখতে পাই এবং লেশমাত্রও গ্রহণ করতে পারি তবে ধন্য হব; সত্যের দীক্ষা যে কাকে বলে আজ যদি ভক্তির সঙ্গে তাই স্মরণ করে যেতে পারি তাহলে ধন্য হব। এর মধ্যে ফাঁকি নেই, লুকোচুরি নেই, দ্বিধা নেই, দুই দিক বজায় রেখে চলবার চাতুরী নেই, নিজেকে ভোলাবার জন্যে সুনিপুণ মিথ্যাযুক্তি নেই, সমাজকে প্রসন্ন করবার জন্যে বুদ্ধির দুই চক্ষু অন্ধ করা নেই, মানুষের হাটে বিকিয়ে দেবার জন্যে ভগবানের ধন চুরি করা নেই। সেই সত্যকে সমস্ত দুঃখপীড়নের মধ্যে স্বীকার করে নিলে তার পরে একেবারে নির্ভয়—ধূলিঘর ভেঙে দিয়ে একেবারে পিতৃভবনের অধিকার লাভ—চিরজীবনের যে গম্যস্থান যে অমৃতনিকেতন সেই পথের যিনি একমাত্র বন্ধু তাঁরই আশ্রয়প্রাপ্তি, সত্যদীক্ষার এই অর্থ।

সেই সাধু সাধক তাঁর জীবনের সকলের চেয়ে বড়ো দিনটিকে তাঁর দীক্ষার দিনটিকে এই নির্জন প্রান্তরের মুক্ত আকাশ ও নির্মল আলোকের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করে রেখে দিয়ে গেছেন। তাঁর সেই মহাদিনটির চারিদিকে এই মন্দির, এই আশ্রম, এই বিদ্যালয় প্রতিদিন আকার ধারণ করে উঠছে; আমাদের জীবন, আমাদের হৃদয়, আমাদের চেতনা একে বেষ্টন করে দাঁড়িয়েছে; এই দিনটির আহ্বানে কল্যাণ মূর্তিমান হয়ে এখানে আবির্ভূত হয়েছে; এবং তাঁর সেই সত্যদীক্ষার দিনটি ধনী ও দরিদ্রকে, বালক ও বৃদ্ধকে, জ্ঞানী ও মূর্খকে বর্ষে বর্ষে আনন্দ-উৎসবে আমন্ত্রণ করে আনছে। এই দিনটিকে যেন আমাদের অন্যমনস্ক জীবনের দ্বারপ্রান্তে দাঁড় করিয়ে না রাখি—একে ভক্তিপূর্বক সমাদর করে ভিতরে ডেকে নাও—আমাদের তুচ্ছ জীবনের প্রতিদিনের যে দৈন্য তাকে কল্যাণে পূর্ণ করো।

হে দীক্ষাদাতা, হে গুরু, এখনও যদি প্রস্তুত হয়ে না থাকি তো প্রস্তুত করো, আঘাত করো, চেতনাকে সর্বত্র উদ্যত করো—ফিরিয়ে দিয়ো না, ফিরিয়ে দিয়ো না—

দুর্বল বলে, তোমার সভাসদদের সকলের পশ্চাতে ঠেলে রেখো না। এই জীবনে সত্যকে গ্রহণ করতেই হবে—নির্ভয়ে এবং অসংকোচে। অসত্যের স্তূপাকার আবর্জনার মধ্যে ব্যর্থ জীবনকে নিক্ষেপ করব না। দীক্ষা গ্রহণ করতে হবে—তুমি শক্তি দাও।

৭ পৌষ

মানুষ

কালকের উৎসবমেলার দোকানি পসারিরা এখনও চলে যায় নি। সমস্ত রাত তারা এই মাঠের মধ্যে আগুন জ্বেলে গল্প করে গান গেয়ে বাজনা বাজিয়ে কাটিয়ে দিয়েছে।

কৃষ্ণচতুর্দশীর শীতরাত্রি। আমি যখন আমাদের নিত্য উপাসনার স্থানে এসে বসলুম তখনও রাত্রি প্রভাত হতে বিলম্ব আছে। চারিদিকে নিবিড় অন্ধকার ;—এখানকার ধূলিবাষ্পশূন্য স্বচ্ছ আকাশের তারাগুলি দেবচক্ষুর অক্লিষ্ট জাগরণের মতো অম্লানভাবে প্রকাশ পাচ্ছে। মাঠের মাঝে মাঝে আগুন জ্বলছে ভাঙামেলার লোকেরা শুকনো পাতা জ্বালিয়ে আগুন পোয়াচ্ছে।

অন্যদিন এই ব্রাহ্মমুহূর্তে কী শান্তি, কী স্তব্ধতা। বাগানের সমস্ত পাখি জেগে গেয়ে উঠলেও সে স্তব্ধতা নষ্ট হয় না—শালবনের মর্মরিত পল্লবরাশির মধ্যে পৌষের উত্তুরে হাওয়া দুরন্ত হয়ে উঠলেও সেই শান্তিকে স্পর্শ করে না।

কিন্তু কয়জন মানুষে মিলে যখন কলরব করে তখন প্রভাত-প্রকৃতির এই স্তব্ধতা কেন এমন ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। উপাসনার জন্যে সাধক পশুপক্ষিহীন স্থান তো খোঁজে না, মানুষহীন স্থান খুঁজে বেড়ায় কেন ?

তার কারণ এই যে, বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পূর্ণ ঐক্য নেই। বিশ্বপ্রবাহের সঙ্গে মানুষ একটানে একতালে চলে না। এইজন্যেই যেখানেই মানুষ থাকে সেইখানেই চারিদিকে সে নিজের একটা তরঙ্গ তোলে, সে একটিমাত্র কথা না বললেও তারার মতো নিঃশব্দ ও একটুমাত্র নড়াচড়া না করলেও বনস্পতির মতো নিস্তব্ধ থাকে না। তার অস্তিত্বই অগ্রসর হয়ে আঘাত করে।

ভগবান ইচ্ছা করেই বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সামঞ্জস্য একটুখানি নষ্ট করে দিয়েছেন—এই তাঁর আনন্দের কৌতুক। ওই যে আমাদের পঞ্চভূতের মধ্যে একটু বুদ্ধির সঞ্চার করেছেন, একটা অহংকার যোজনা করে বসে আছেন—তাতে করেই

আমরা বিশ্ব থেকে আলাদা হয়ে গেছি—ওই জিনিসটার দ্বারাতেই আমাদের পংক্তি নষ্ট হয়ে গেছে। এইজন্যেই গ্রহসূর্যতারার সঙ্গে আমরা আর মিল রক্ষা করে চলতে পারি নে—আমরা যেখানে আছি সেখানে যে আমরা আছি এ-কথাটা আর কারও ভোলবার জো থাকে না।

ভগবান আমাদের সেই সামঞ্জস্যটি নষ্ট করে প্রকৃতির কাছ থেকে আমাদের একঘরে করে দেওয়াতে সকালবেলা থেকে রাত্রি পর্যন্ত আমাদের নিজের কাজের ধন্দায় নিজে ঘুরে বেড়াতে হয়।

ওই সামঞ্জস্যটি ভেঙে গেছে বলেই আমাদের প্রকৃতির মধ্যে বিরাট বিশ্বের শান্তি নেই—আমাদের ভিতরকার নানা মহল থেকে রব উঠেছে, চাই, চাই, চাই। শরীর বলছে চাই, মন বলছে চাই, হৃদয় বলছে চাই—এক মুহূর্তও এই রবের বিশ্রাম নেই। যদি সমস্তর সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন মিল থাকত তাহলে আমাদের মধ্যে এই হাজার সুরে চাওয়ার বালাই থাকত না।

আজ অন্ধকার প্রত্যূষে বসে আমার চারিদিকে সেই বিচিত্র চাওয়ার কোলাহল শুনছিলুম—কত দরকারের হাঁক। ওরে গোরুটা কোথায় গেল, অমুক কই, আগুন চাই রে, তামাক কোথায়, গাড়িটা ডাক রে, হাঁড়িটা পড়ে রইল যে।

এক জাতের পাখি সকালে যখন গান গায় তখন তারা একসুরে একরকমেরই গান গায়—কিন্তু মানুষের এই যে কলধ্বনি তাতে এক জনের সঙ্গে আর-এক জনের না আছে বাণীর মিল, না আছে সুরের।

কেননা ভগবান ওই যে অহংকারটি জুড়ে দিয়ে আমাদের জগতের সঙ্গে ভেদ জন্মিয়ে দিয়েছেন তাতে আমাদের প্রত্যেককে স্বতন্ত্র করে দিয়েছেন। আমাদের রুচি আকাঙ্ক্ষা চেষ্টা সমস্তই এক-একটি ভিন্ন ভিন্ন কেন্দ্র আশ্রয় করে এক-একটি অপরূপ মূর্তি ধরে বসে আছে। কাজেই একের সঙ্গে আরের ঠেকাঠেকি ঠোকাঠুকি চলেইছে। কাড়াকাড়ি-টানাটানির অন্ত নেই। তাতে কত বেসুর কত উত্তাপ যে জন্মাচ্ছে তার আর সীমা নেই। সেই বেসুরে পীড়িত সেই তাপে তপ্ত আমাদের স্বাতন্ত্র্যগত অসামঞ্জস্য কেবলই সামঞ্জস্যকে প্রার্থনা করছে, সেইজন্যেই আমরা কেবলমাত্র খেয়ে পরে জীবন ধারণ করে বাঁচি নে। আমরা একটা সুরকে একটা মিলকে চাচ্ছি। সে চাওয়াটা আমাদের খাওয়াপরার চাওয়ার চেয়ে বেশি বই কম নয়—সামঞ্জস্য আমাদের নিতান্তই চাই। সেইজন্যেই কথা নেই বার্তা নেই আমরা কাব্য রচনা করতে বসে গেছি—কত লিখছি কত আঁকছি কত গড়ছি। কত গৃহ কত সমাজ বাঁধছি কত ধর্মমত ফাঁদছি—আমাদের কত অনুষ্ঠান, কত প্রতিষ্ঠান, কত প্রথা। এই সামঞ্জস্যের আকাঙ্ক্ষার তাগিদে

নানা দেশের মানুষ কত নানা আকৃতির রাজ্যতন্ত্র গড়ে তুলছে। কত আইন, কত শাসন, কত রকম-বেরকমের শিক্ষাদীক্ষা। কী করলে নানা মানুষের নানা অহংকারকে সাজিয়ে একটি বিচিত্র সুন্দর ঐক্য স্থাপিত হতে পারে এই চেষ্টায় এই তপস্যায় পৃথিবী জুড়ে সমস্ত মানুষ ব্যস্ত হয়ে রয়েছে।

এই চেষ্টার তাড়নাতেই মানুষ আপনার একটা সৃষ্টি তৈরি করে তুলছে—নিখিল সৃষ্টি থেকে এই অহংকারের মধ্যে নির্বাসিত হওয়াতেই তার এই নিজের সৃষ্টির এত অধিক প্রয়োজন হয়ে উঠেছে। মানুষের ইতিহাস কেবলই এই সৃষ্টির ইতিহাস, এই সমন্বয়ের ইতিহাস ;—তার সমস্ত ধর্ম ও কর্ম, সমস্ত ভাব ও কল্পনার মধ্যে কেবলই এই অমিলের মেলবার ইতিহাস রচিত হচ্ছে। পেতে চাই, পেতে চাই, মিলতে চাই, মিলতে চাই। এ ছাড়া আর কথা নেই।

সেইজন্যে এই মাঠ জুড়ে নানা লোকের নানা স্বতন্ত্র প্রয়োজনের নানা কলরবের মধ্যে যখন শুনলুম একজন গান গাচ্ছে, "হরি আমায় বিনামূল্যে পার করে দাও" তখন সেই গানটির ভিতর এই সমস্ত কলরবের মাঝখানটির কথা আমি শুনতে পেলুম। সমস্ত চাওয়ার ভিতরকার চাওয়া হচ্ছে এই পার হতে চাওয়া। যে বিচ্ছিন্ন সে কেবলই বলছে, ওগো আমাকে এই বিচ্ছেদ উত্তীর্ণ করে দাও। এই বিচ্ছেদ পার হলেই তবে যে প্রেম পূর্ণ হয়। এই প্রেম পূর্ণ না হলে কোনো কিছু পেয়েই আমার তৃপ্তি নেই—নইলে কেবলই মৃত্যু থেকে মৃত্যুতে যাচ্ছি—একের থেকে আরে ঘুরে মরছি—মিলে গেলেই এই বিষম আপদ চুকে যায়।

কিন্তু যে মিলটি হচ্ছে অমৃত, তাকে পেতে গেলেই তো বিচ্ছেদের ভিতর দিয়েই পেতে হয়। মিলে থাকলে তো মিলকে পাওয়া হয় না।

সেইজন্যে ঈশ্বর যে অহংকার দিয়ে আমাদের বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছেন সেটা তাঁর প্রেমেরই লীলা। অহংকার না হলে বিচ্ছেদ হয় না, বিচ্ছেদ না হলে মিলন হয় না, মিলন না হলে প্রেম হয় না। মানুষ তাই বিচ্ছেদপারাবারের পারে বসে প্রেমকেই নানা আকারে চাইতে চাইতে নানা রকমের তরী গড়ে তুলছে—এ সমস্তই তার পার হবার তরণী—রাজ্যতন্ত্রই বল, সমাজতন্ত্রই বল, আর ধর্মতন্ত্রই বল।

কিন্তু তাই যদি হয় তবে পার হয়ে যাব কোথায় ? তবে কি অহংকারকে একেবারেই লুপ্ত করে দিয়ে সম্পূর্ণ অবিচ্ছেদের দেশে যাওয়াই অমৃতলোক প্রাপ্তি ? সেই দেশেই তো ধুলা মাটি পাথর রয়েছে। তারা তো সমষ্টির সঙ্গে একতানে মিলে চলেছে কোনো বিচ্ছেদ জানে না। এই রকমের আত্মবিলয়ের জন্যেই কি মানুষ কাঁদছে ?

কখনোই নয়। তা যদি হত সকল প্রকার বিলয়ের মধ্যেই সে সান্ত্বনা পেত আনন্দ

পেত। বিলুপ্তিকে যে মানুষ সর্বান্তঃকরণে ভয় করে তার প্রমাণ-প্রয়োগের কোনো দরকার নেই। কিছু একটা গেল এ-কথার স্মরণ তার সুখের স্মরণ নয়। এই আশঙ্কা এবং এই স্মরণের সঙ্গেই তার জীবনের গভীর বিষাদ জড়িত—সে ধরে রাখতে চায় অথচ ধরে রাখতে পারে না। মানুষ সর্বান্তঃকরণে যদি কিছুকে না চায় তো সে বিলয়কে।

তাই যদি হল তবে যে অসামঞ্জস্য যে বিচ্ছেদের উপর তার স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠিত, সেইটেকে কি সে চায়? তাও তো চায় না। এই বিচ্ছেদ এই অসামঞ্জস্যের জন্যেই তো সে চিরদিন কেঁদে মরছে। তার যত পাপ যত তাপ সে তো একেই আশ্রয় করে। এইজন্যেই তো সে গান গেয়ে উঠছে—হরি আমায় বিনামূল্যে পার করো। কিন্তু পারে যাওয়া যদি লুপ্ত হওয়াই হল তবে তো আমরা মুশকিলেই পড়েছি। তবে তো এপারে দুঃখ আর ওপারে ফাঁকি।

আমরা কিন্তু দুঃখকেও চাই নে ফাঁকিকেও চাই নে। তবে আমরা কী চাই, আর সেটা পাবই বা কী করে।

আমরা প্রেমকেই চাই। কখন সেই প্রেমকে পাই? যখন বিচ্ছেদ-মিলনের সামঞ্জস্য ঘটে; যখন বিচ্ছেদ মিলনকে নাশ করে না এবং মিলনও বিচ্ছেদকে গ্রাস করে না—দুই যখন একসঙ্গে থাকে, অথচ তাদের মধ্যে আর বিরোধ থাকে না—তারা পরস্পরের সহায় হয়।

এই ভেদ ও ঐক্যের সামঞ্জস্যের জন্যেই আমাদের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা। আমরা এর কোনোটাকেই ছাড়তে চাই নে। আমাদের যা কিছু প্রয়াস যা কিছু সৃষ্টি সে কেবল এই ভেদ ও অভেদের অবিরুদ্ধ ঐক্যের মূর্তি দেখবার জন্যেই—দুইয়ের মধ্যেই এককে লাভ করবার জন্যে। আমাদের প্রেমের ভগবান যখন আমাদের পার করবেন তখন তিনি আমাদের চিরদুঃখের বিচ্ছেদকেই চিরন্তন আনন্দের বিচ্ছেদ করে তুলবেন। তখন তিনি আমাদের এই বিচ্ছেদের পাত্র ভরেই মিলনের সুধা পান করাবেন। তখনই বুঝিয়ে দেবেন বিচ্ছেদটি কী অমূল্য রত্ন।

৮ পৌষ

ভাঙা হাট

মানুষের মনটা কেবলই যেমন বলছে চাই, চাই, চাই—তেমনি তার পিছনে পিছনেই আর-একটি কথা বলছে চাই নে, চাই নে, চাই নে। এইমাত্র বলে, না হলে নয়, পরক্ষণেই বলে কোনো দরকার নেই।

ভাঙা মেলার লোকেরা কাল রাত্রে বলেছিল, গোটাকতক কাঠকুটো লতাপাতা পেলে বেঁচে যাই, তখন এমনি হয়েছিল যে, না হলে চলে না। শীতে খোলা মাঠের মধ্যে ওই একটুখানি আশ্রয় রচনা করাই জগতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুতর প্রয়োজনসাধন বলে মনে হয়েছিল। কোনোমতে একটা চুলো বানিয়ে শুকনো পাতা জ্বালিয়ে যা হ'ক কিছু একটা বেঁধে নিয়ে আহার করবার চেষ্টাও অত্যন্ত প্রবল হয়েছিল। এ চাওয়া ও চেষ্টার কাছে পৃথিবীর আর-সমস্ত ব্যাপারই ছোটো হয়ে গিয়েছিল।

কোনো গতিকে এই কাঠকুটো পাতালতা সংগ্রহ হয়েছিল। কিন্তু আজ রাত্রি না যেতেই শুনতে পাচ্ছি—"ওরে গাড়ি কোথায় রে, গোরু জোত রে।" যেতে হবে, এবার গ্রামে যেতে হবে। এই চলে যাওয়ার প্রয়োজনটাই এখন সকলের বড়ো। কাল রাত্রিবেলাকার একান্ত প্রয়োজনগুলো আজ আবর্জনা হয়ে পড়ে রইল,—কাল যাকে বলেছিল বড়ো দরকার, আজ তাকে পরিত্যাগ করে যাবার জন্যে ব্যতিব্যস্ত।

বিশ্বমানবও এমনি করেই এক যুগ থেকে আর-এক যুগে যাবার আয়োজন করছে। যখন নূতন প্রভাত উঠছে, যখন রাত ভোর হবে হবে করছে—তখন এ ওকে ঠেলাঠেলি করে ডাকছে—ওরে চল্ রে—ওরে গোরু কোথায় রে, ওরে গাড়ি কোথায়। তখন ওই রাত্রির অত্যন্ত প্রয়োজনের সামগ্রীগুলো এই দিনের আলোতে অত্যন্ত আবর্জনা হয়ে লজ্জিত হয়ে পড়ে রইল। শুকনো পাতা থেকে এখনও ধোঁয়া উঠছে, তার ছাইগুলো জমে উঠছে। ভাঙা হাঁড়িসরা-শালপাতায় মাঠ বিকীর্ণ। আশ্রয়গৃহগুলি আশ্রিতদের দ্বারা পরিত্যক্ত হয়ে অত্যন্ত শ্রীভ্রষ্ট ও লজ্জিত হয়ে আছে। সমস্তই রইল—পূর্বাকাশ রাঙা হয়ে উঠেছে—এবারে যাত্রা করে বেরোতে হবে। আবার, আবার আর-এক যুগের প্রয়োজন সংগ্রহ করতে হবে। তখন মনে হবে এইবারকার এই প্রয়োজনগুলিই চরম—আর কোনো দিন ভোরের বেলায় গাড়িতে গোরু জুততে হবে না। এই বলে আবার কাঠকুটো ডালপালা সংগ্রহে প্রবৃত্ত হওয়া যায়। কিন্তু তখনও এই অত্যন্ত একান্ত প্রয়োজনের দূর সম্মুখ দিগন্ত থেকে করুণ ভৈরবীসুরে বাণী আসছে, প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন নেই।

যদি এই সুরটুকু না থাকত—যদি এই অত্যন্ত প্রয়োজনের ভিতরেই অত্যন্ত অপ্রয়োজন বাস না করত তাহলে কি আমরা বাঁচতে পারতুম। প্রয়োজন যদি সত্যই একান্ত হত তাহলে তার ভয়ংকর চাপ কে সহ্য করতে পারত। অত্যন্ত অপ্রয়োজনের দিন ও রাত্রি এই অত্যন্ত প্রয়োজনের ভার হরণ করে রয়েছে বলেই আমরা দরকারের অতি প্রবল মাধ্যাকর্ষণের মধ্যেও চলাফেরা করে বেড়াতে পারছি। সেইজন্যেই ভোরের আলো দেখা দেবামাত্রই রাশীকৃত বোঝা যেখানে-সেখানে যেমন-তেমন করে ফেলে রেখে আমরা গাড়িতে চড়ে বসতে পারছি। "কিছুই থাকে না" বলে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলছি—তেমনি "কিছুই নড়ে না" বলে হতাশ হয়ে পড়ছি নে। থাকছেও বটে যাচ্ছেও বটে, এই দুইয়ের মাঝখানে আমরা ফাঁকও পেয়েছি আশ্রয়ও পেয়েছি—আমাদের ঘরও জুটেছে আলোবাতাসও মারা যায় নি।

৮ পৌষ

উৎসব-শেষ

আমরা অনেক সময় উৎসব করে ফতুর হয়ে যাই। ঋণশোধ করতেই দিন বয়ে যায়। অল্পসম্বল ব্যক্তি যদি একদিনের জন্যে রাজা হওয়ার শখ মেটাতে যায় তবে তার দশদিনকে সে দেউলে করে দেয়, আর তো কোনো উপায় নেই।

সেইজন্যে উৎসবের পরদিন আমাদের কাছে বড়ো ম্লান। সেদিন আকাশের আলোর উজ্জ্বলতা চলে যায়—সেদিন অবসাদে হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে।

কিন্তু উপায় নেই। মানুষ বৎসরে অন্তত একটা দিন নিজের কার্পণ্য দূর করে তবে সেই অকৃপণের সঙ্গে আদানপ্রদানের সম্বন্ধ স্থাপন করতে চায়। ঐশ্বর্যের দ্বারা সেই ঈশ্বরকে উপলব্ধি করে।

দুই রকমের উপলব্ধি আছে। এক রকম—দরিদ্র যেমন ধনীকে উপলব্ধি করে, দানপ্রাপ্তির দ্বারা। এই উপলব্ধিতে পার্থক্যটাকেই বেশি করে বোঝা যায়। আর-এক রকম উপলব্ধি হচ্ছে সমকক্ষতার উপলব্ধি। সেই স্থলে আমাকে দ্বারের বাইরে বসে থাকতে হয় না—কতকটা এক আজিমে বসা চলে।

প্রতিদিন যখন আমরা দীনভাবে থাকি তখন নিরানন্দ চিত্তটা আনন্দময়ের কাছে ভিক্ষুকতা করে। উৎসবের দিনে সেও বলতে চায়, আজ কেবল নেওয়া নয় আজ আমিও তোমার মতো আনন্দ করব—আজ আমার দীনতা নেই কৃপণতা নেই, আজ আমার আনন্দ এবং আমার ত্যাগ তোমারই মতো অজস্র।

এইরূপে ঐশ্বর্য জিনিসটি কী, অকৃপণ প্রাচুর্য কাকে বলে সেটা নিজের মধ্যে অনুভব করলে ঈশ্বর যে কেবলমাত্র আমার অনুগ্রহকর্তা নন তিনি যে আমার আত্মীয় সেটা আমি বুঝি এবং প্রমাণ করি।

কিন্তু এইটে বুঝতে এবং প্রচার করতে গিয়ে অনেক সময় শেষে দুঃখ পেতে হয়। পরদিনের ছড়ানো উচ্ছিষ্ট, গলা বাতি এবং শুকনো মালার দিকে তাকিয়ে মন উদাস হয়ে যায়—তখন আর চিত্তের রাজকীয় ঔদার্য থাকে না—হিসাবের কথাটা মনে পড়ে মন ক্লিষ্ট হয়ে ওঠে।

কিন্তু দুঃখ পেতে হয় না তাকে যে প্রতিদিনই কিছু কিছু সম্বল জমিয়ে তোলে—প্রতিদিনই যে লোক উৎসবের আয়োজন করে চলেছে—যার উৎসবদিনের সঙ্গে প্রতিদিনের সম্পূর্ণ পার্থক্য নেই, পরস্পর নাড়ির যোগ আছে।

এটি না হলেই আমাদের ঋণ করে উৎসব করতে হয়। আনন্দ করি বটে কিন্তু সে আনন্দের অধিকাংশই ঠিক নিজের কড়ি দিয়ে করি নে—তার পনেরো আনাই ধারে চালাই। লোক-সমাগম থেকে ধার করি, ফুলের মালা থেকে, আলো থেকে, সভাসজ্জা থেকে ধার করি—গান থেকে বাজনা থেকে বক্তৃতা থেকে ধার নিই। সেদিনকার উত্তেজনায় চেতনাই থাকে না যে ধারে চালাচ্ছি—পরদিনে যখন ফুল শুকোয়, আলো নেবে, লোক চলে যায় তখন দেনার প্রকাণ্ড শূন্যতাটা চোখে পড়ে হৃদয়কে ব্যাকুল করে।

আমাদের এই দৈন্যবশতই উৎসবদেবতাকে আমরা উৎসবের সঙ্গে সঙ্গেই বিসর্জন দিয়ে বসি—উৎসবের অধিপতিকে প্রতিদিনের সিংহাসনে বসাবার কোনো আয়োজন করি নে।

আমাদের সৌভাগ্য এই যে আমরা কয়জন প্রতিদিন প্রত্যুষে এই মন্দির-প্রাঙ্গণে একত্রে মিলে কিছু কিছু জমাচ্ছিলুম—আমরা এই উৎসবের মেলায় একেবারেই রবাহূত বিদেশীর মতো জুটি নি,—আমাদের প্রতিদিনের সকালবেলায় সব-কটিই হাতে হাতেই বাজে খরচ হয়ে যায় নি। আমার উৎসবকর্তাকে বোধ করি বলতে পেরেছি যে তোমার সঙ্গে আমার কিছু পরিচয় আছে, তোমার নিমন্ত্রণ আমি পেয়েছি।

তার পরে আমাদের উৎসবকে হঠাৎ এক দিনেই সাঙ্গ করে দেব না—এই উৎসবকে আমাদের দৈনিক উৎসবের মধ্যে প্রবাহিত করে দেব। প্রতিদিন প্রাতঃকালেই আমাদের দশজনের এই উৎসব চলতে থাকবে। আমাদের প্রতিদিনের সমস্ত তুচ্ছতা এবং আত্মবিস্মৃতির মধ্যে অন্তত একবার করে দিনারম্ভে জগতের নিত্য উৎসবের ঐশ্বর্যকে উপলব্ধি করে যাব। যখন প্রত্যহই উষা তাঁর আলোকটি হাতে করে

পূর্বদিকের প্রান্তে এসে দাঁড়াবেন তখন আমরা কয় জনেই স্তব্ধ হয়ে বসে অনুভব করব আমাদের প্রত্যেক দিনই মহিমান্বিত ঐশ্বর্যময়,—আমাদের জীবনের তুচ্ছতা তাকে লেশমাত্র মলিন করে নি—প্রতিদিনই সে নবীন, সে উজ্জ্বল, সে পরমাশ্চর্য—তার হাতের অমৃতপাত্র একেবারে উপুড় করে ঢেলেও তার এক বিন্দু ক্ষয় হয় না।

৭ পৌষ

সঞ্চয়-তৃষ্ণা

একদিনের প্রয়োজনের বেশি যিনি সঞ্চয় করেন না আমাদের প্রাচীন সংহিতায় সেই দ্বিজ গৃহীকেই প্রশংসা করছেন। কেননা একবার সঞ্চয় করতে আরম্ভ করলে ক্রমে আমরা সঞ্চয়ের কল হয়ে উঠি, তখন আমাদের সঞ্চয় প্রয়োজনকেই বহুদূরে ছাড়িয়ে চলে যায়, এমনি কি, প্রয়োজনকেই বঞ্চিত ও পীড়িত করতে থাকে।

আধ্যাত্মিক সঞ্চয় সম্বন্ধেও যে এ-কথা খাটে না তা নয়। আমরা যদি কোনো পুণ্যকে মনে করি যে ভবিষ্যৎ কোনো একটা ফললাভের জন্যে তাকে জমাচ্ছি, তা হলে জমানোটাই আমাদের পেয়ে বসে—তার সম্বন্ধে আমরা কৃপণের মতো হয়ে উঠি—তার সম্বন্ধে আমাদের স্বাভাবিকতা একেবারে চলে যায়; সব কথাতেই কেবল আমরা সুদের দিকে তাকাই, লাভের হিসাব করতে থাকি।

এমন অবস্থায় পুণ্য আমাদের আনন্দকে উপবাসী করে রাখে এবং মনে করে উপবাস করেই সেই পুণ্যের বৃদ্ধিলাভ হচ্ছে। এইরূপ আধ্যাত্মিক সাধনাক্ষেত্রেও অনেক কৃপণ আহারকে জমিয়ে তুলে প্রাণকে নষ্ট করে।

আধ্যাত্মিক গৃহস্থালিতে আমরা কালকের জন্যে আজকে ভাবব না। তা যদি করি তবে আজকেরটাকেই বঞ্চিত করব। আমরা জমানোর কথা চিন্তাই করব না, আমরা খরচই জানি। আমাদের প্রতিদিনের উপাসনা যেন আমাদের প্রতিদিনের নিঃশেষ সামগ্রী হয়। মনে করব না তার থেকে আমরা শান্তিলাভ করব, পুণ্যলাভ করব, ভবিষ্যতে কোনো একসময়ে পরিত্রাণলাভ করব, বা আর কিছু। যা কিছু সংগ্রহ হয়েছে তা হাতে হাতে সমস্তই তাঁকে ঢেলে শেষ করে দিতে হবে; তাঁকেই সব দেওয়াতেই সেই দেওয়ার শেষ।

যদি আমরা মনে করি তাঁর উপাসনা করে আমার পুণ্য হচ্ছে তাহলে সমস্ত পূজা ঈশ্বরকে দেওয়া হয় না পুণ্যের জন্যেই তার অনেকখানি জমানো হয়। যদি মনে করতে আরম্ভ করি ঈশ্বরের যে কাজ করছি তার থেকে লোকহিত হবে তাহলে লোকহিতের উত্তেজনাটা ক্রমেই ঈশ্বরের প্রসাদলাভকে খর্ব করে দিয়ে বেড়ে উঠতে থাকে।

ধর্মব্যাপারে এই পাপের ছিদ্র দিয়েই বিষয়কর্মের সাংসারিকতার চেয়ে তীব্রতর সাংসারিকতা প্রবেশলাভ করে। তার থেকেই ক্রোধ বিদ্বেষ পরনিন্দা পরপীড়ন নিশাচরগণ ধর্মের নামে তাদের গুহাগহ্বর থেকে বেরিয়ে পড়ে—মতের সঙ্গে মতের যুদ্ধে পৃথিবী একেবারে রক্তাক্ত হয়ে ওঠে। তখন ঈশ্বরকে পিছনে ঠেলে রেখে আমরা এগিয়ে চলতে থাকি। আমরা হিত করব, আমরা পুণ্য করব, আমরা ঈশ্বরকে প্রচার করব এই কথাটাই ক্রমে ভীষণ হয়ে বেড়ে উঠতে থাকে—ঈশ্বর করবেন সে আর মনে থাকে না। তখন ঈশ্বরের ভৃত্যেরাই ঈশ্বরের পথ রোধ করে দাঁড়ায়,—কোথায় থাকে শান্তি, কোথায় থাকে হিত, কোথায় থাকে পুণ্য।

তাই আমার এক-একবার ভয় হয় আমিও বা সকালবেলায় ক্রমে ঈশ্বরকে বাদ দিয়ে ঈশ্বরের কথা জমাবার ব্যবসা খুলেছি। তোমরা কী করলে বুঝবে, তোমাদের কী করলে ভালো লাগবে, কী করলে আমার কথা হিতকর হয়ে উঠবে এই ভাবনা ক্রমে বুঝি আমাকে পেয়ে বসে। তার ফল হবে এই যে, উপাসনার উপলক্ষ্যে এমন একটা কিছু জমানো চলতে থাকবে যার দিকে আমার বারো আনা মন পড়ে থাকবে—যদি কেউ বলে তোমার কথা ভালো বোঝা যাচ্ছে না - বা তুমি ভালো সাজিয়ে বলতে পার নি তাহলে আমার রাগ হবে।

শুধু তাই নয়, আমার কথার দ্বারা অন্য লোকে ফল পাবে এই চিন্তা গুরুতর হয়ে উঠলে অন্য লোকের উপর জুলুম করবার প্রবৃত্তি ঘাড়ে চেপে বসে। যদি দেখি যে মনের মতো ফল হচ্ছে না তাহলে জবরদস্তি করতে ইচ্ছা করে, তখন, নিজের শক্তি ও অধিকারকে নয়, অন্যেরই বুদ্ধি ও স্বভাবকে ধিক্কার দিতে প্রবৃত্তি জন্মে। তখন আর মনের সঙ্গে শ্রদ্ধার সঙ্গে বলতে পারি নে যে ঈশ্বর তাঁর বহুধাশক্তিযোগে বিচিত্র উপায়ে বিচিত্র মানবের মঙ্গল করুন - তখন আমাদের অসহিষ্ণু উত্তম এই কথাই বলতে থাকে যে আমারই শক্তি আমারই বাক্য আমারই উপায়ে পৃথিবীর লোককে আমারই মতে বাধ্য করে তাদের ভালো করুক।

সেইজন্যে ওই আমাদের প্রতিদিনের উপাসনা থেকে এই যে কিছু কিছু করে কথা বাঁচাচ্ছি একেই আমি ভয় করি। এই কথা আমার বোঝা না হ'ক, আমার বন্ধন না হ'ক, আমার পথের বাধা না হ'ক। এই কথা সম্পূর্ণই তোমার সেবায় উৎসর্গীকৃত মনে করে যেন নিজ খাতে এর কোনো হিসাব না রাখি। এর যদি কোনো ফল থাকে তবে তুমি ফলাও—আমার মমতার নাড়ি বিচ্ছিন্ন করে এ যেন ভূমিষ্ঠ হয়। হে নীরব, এই প্রভাতের উপাসনার সমস্ত বাক্যকে তুমি গ্রহণের দ্বারাই সফল করো, আমার কণ্টকিত অহংকারের বৃন্ত থেকে একে একেবারে উৎপাটিত করে নাও।

১০ পৌষ

পার করো

সেই যে সেদিন ভাঙামেলার ভোর রাত্রে নানা হাসিতামাশা-গোলমাল-তুচ্ছকথার মাঝখানে গান উঠেছিল—হরি আমায় পার করো - সে আমি ভুলতে পারছি নে, সে আমাকে আজও বিস্মিত করছে।

এই যে কথাটা মানুষ এতদিন থেকে বলে আসছে, আমায় পার করো, এটা একটা আশ্চর্য কথা। তার এই আকাঙ্ক্ষাটা আপনাকে আপনি সম্পূর্ণ জানে কি না তাও বুঝতে পারি নে।

যদি কোনো সাধক সংসারের সমস্ত চেষ্টা ছেড়েছুড়ে দিয়ে তাঁর সাধন-সমুদ্রের কূলে এসে দাঁড়িয়ে বলেন, হে সিদ্ধিদাতা, তুমি আমাকে সিদ্ধির কূলে পার করে দাও তবে তার মানে বুঝতে পারি। কিন্তু যার সম্মুখে কোনো উদ্দেশ্য নেই, কোনো সাধনা নেই—তার নাবিক কোথায়, তার সমুদ্র কোথায়, সে কী পার হতে চাচ্ছে? তার এপারটাই বা কোথায় আর ওপারটাই বা কোথায়?

আমরা আমাদের কাজকর্মের ভিড়ের মাঝখানে থেকেই বলছি, হরি পার করো; গাড়োয়ান যখন গাড়ি চালাচ্ছে, বলছে পার করো; মুদি যখন চালডাল ওজন করছে, বলছে পার করো।

মনে ক'রো না তারা বলছে আমাদের এই কর্ম হতেই পার করো। তারা কর্মের মধ্যে থেকেই পার হতে চাচ্ছে সেইজন্যে গান গাবার সময় তাদের কাজ কামাই যাচ্ছে না।

হে আনন্দসমুদ্র, এপারও তোমার ওপারও তোমার। কিন্তু একটা পারকে যখন আমার পার বলি তখন ওপারের সঙ্গে তার বিচ্ছেদ ঘটে। তখন সে আপনার সম্পূর্ণতার অনুভব হতে ভ্রষ্ট হয়, ওপারের জন্যে ভিতরে ভিতরে কেবলই তার প্রাণ কাঁদতে থাকে। আমার পারের আমিটি তোমার পারের তুমির বিরহে বিরহিণী। পার হবার জন্যে তাই এত ডাকাডাকি।

এইটে আমার ঘর বলে আমি-লোকটা দিনরাত্রি খেটে মরছে, যতক্ষণ না বলতে পারছে এইটে তোমারও ঘর, ততক্ষণ তার যে কত দাহ কত বন্ধন কত ক্ষতি তার সীমা নেই—ততক্ষণ ঘরের কাজ করতে করতে তার অন্তরাত্মা কেঁদে গাইতে থাকে, হরি আমায় পার করো। যখনই সে আমার ঘরকে তোমার ঘর করে তুলতে পারে তখনই সে ঘরের মধ্যে থেকে পার হয়ে যায়। আমার কর্ম মনে ক'রে আমি লোকটা রাত্রিদিন যখন হাঁসফাঁস করে বেড়ায়, তখন সে কত আঘাত পায় আর কত আঘাত করে, তখনই

তার গান, আমায় পার করো—যখন সে বলতে পারে, তোমার কর্ম, তখন সে পার হয়ে গেছে।

আমার ঘরকে তোমার ঘর করব, আমার কর্মকে তোমার কর্ম করব তবেই তো আমাতে তোমাতে মিল হবে। আমার ঘর ছেড়ে তোমার ঘরে যাব, আমার কর্ম ছেড়ে তোমার কর্মে যাব এ-কথা আমাদের প্রাণের কথা নয়। কেননা, এও যে বিচ্ছেদের কথা। যে-আমির মধ্যে তুমি নেই, আর যে-তুমির মধ্যে আমি নেই দুইই আমার পক্ষে সমান।

এইজন্যেই আমাদের ঘরের মাঝখানেই, আমাদের কাজকর্মের হাটের মধ্যেই দিনরাত রব উঠছে, হরি আমায় পার করো। এইখানেই সমুদ্র, এইখানেই পার।

১১ পৌষ

এপার ওপার

যার সঙ্গে আমার সামান্য পরিচয় আছে মাত্র সে আমার পাশে বসে থাকলেও তার আর আমার মাঝখানে একটি সমুদ্র পড়ে থাকে—সেটি হচ্ছে অচৈতন্যের সমুদ্র, ঔদাসীন্যের সমুদ্র। যদি কোনোদিন সেই লোক আমার প্রাণের বন্ধু হয়ে ওঠে তখনই সমুদ্র পার হয়ে যাই। তখন আকাশের ব্যবধান মিথ্যা হয়ে যায়, দেহের ব্যবধানও ব্যবধান থাকে না, এমন কি, মৃত্যুর ব্যবধানও অন্তরাল রচনা করে না। যে অহংকার আমাদের পরস্পরের চারদিকে পাচিল তুলে পরস্পরকে অতিনিকটেও দূর করে রাখে, সে যার জন্যে পথ ছেড়ে দেয় সেই আমাদের আপন হয়ে ওঠে।

সেইজন্যে কাল বলেছিলুম সমুদ্র পার হওয়া কোনো একটা সুদূরে পাড়ি দেবার ব্যাপার নয়, সে হচ্ছে কাছের জিনিসকেই কাছের করে নেওয়া।

বস্তুত আমাদের যত কাছের জিনিস যত দূরে রয়েছে তার দূরত্বটাও ততই ভয়ানক। এই কারণেই, আমরা আত্মীয়কে যখন পর করি তখন পরের চেয়ে তাকে বেশি পর করি। যার ঘনিষ্ঠ সংস্রবে আছি তাকে যখন অনুভবমাত্র করি নে তখন সেই অসাড়তা মৃত্যুর অসাড়তার চেয়ে অনেক বেশি।

এই কারণেই, জগতের সকলের চেয়ে যিনি অন্তরতম তাঁকেই যখন দূর বলে জানি তখন তিনি জগতের সকলের চেয়ে দূরে গিয়ে পড়েন—যিনি আমাদের প্রাণের প্রাণ তিনি ওই স্থূল দেয়ালের চেয়ে দূরে দাঁড়ান—সংসারে তখন এমন কোনো দূরত্ব নেই

যার চেয়ে দূরে তিনি সরে না যান। এই দূরত্বের বেদনা আমরা স্পষ্ট করে উপলব্ধি করি নে বটে কিন্তু এই দূরত্বের ভারে আমাদের প্রতিদিনের অস্তিত্ব, আমাদের ঘরদুয়ার, কাজকর্ম, আমাদের সমস্ত সামাজিক সম্বন্ধ ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে।

অথচ যে সমুদ্রপারের জন্যে আমরা কেঁদে বেড়াচ্ছি সে পারটা যে কত কাছে—এমন কি, এপারের চেয়েও যে সে কাছে, সে-কথা, যাঁরা জানেন, তাঁরা অত্যন্ত স্পষ্ট করেই বলেছেন। শুনলে হঠাৎ আমাদের চমক লাগে—মনে হয় এত কাছের কথাকেও আমরা এতই দূর করে জেনেছিলুম। একেই বলেছিলুম অগম্য, অপার, অসাধ্য।

যাঁরা সমুদ্র পার হয়েছেন তাঁরা কী বলেন। তাঁরা বলেন, এষাস্য পরমাগতিঃ এষাস্য পরমাসম্পৎ, এষোহস্য পরমোলোকঃ, এষোহস্য পরম আনন্দঃ। এষঃ মানে ইনি—এই সামনেই যিনি, এই কাছেই যিনি আছেন। অস্য মানে ইহার—সেও খুব নিকটের ইহার। ইনিই হচ্ছেন ইহার পরম গতি। যিনি যার পরম গতি তিনি তার থেকে লেশমাত্র দূরে নেই। এতই কাছে যে তাঁকে ইনি বললেই হয়, তাঁর নাম করবারও দরকার নেই—"এই যে ইনি" বলা ছাড়া তাঁর আর কোনো পরিচয় দেবার প্রয়োজন হয় না। ইনিই হচ্ছেন ইহার সমস্তই। ইনি যে কে এবং ইহার যে কাহার সে আর বলাই হল না। সমুদ্রের এপারে যে আছে সে তো ওপারের লোককে এষঃ বলে না, ইনি বলে না।

ইনি হচ্ছেন ইহার পরমাগতি। আমরা যে চলি, আমাদের চালায় কে? আমরা মনে করি টাকা আমাদের চালায়, খ্যাতি আমাদের চালায়, মানুষ আমাদের চালায়; যিনি পার হয়েছেন তিনি বলেন ইনিই ইহার গতি—এঁর টানেই এ চলেছে—টাকার টান, খ্যাতির টান, মানুষের টান, সব টানের মধ্যে পরম টান হচ্ছে এঁর—সব টান যেতে পারে কিন্তু সে টান থেকেই যায়—কেননা সব যাওয়ার মধ্যেই তাঁর কাছে যাওয়ার তাগিদ রয়েছে। টাকাও বলে না তুমি এইখানেই থেকে যাও, খ্যাতিও বলে না, মানুষও বলে না—সবাই বলে তুমি চলো—যিনি পরমাগতি তিনিই গতি দিচ্ছেন, আর কেউ যে পথের মধ্যে বরাবরের মতো আটক করে রাখবে এমন সাধ্য আছে কার?

আমরা হয়তো মনে করতে পারি পৃথিবী যে আমাকে টানছে সেটা পৃথিবীরই টান, কিন্তু তাই যদি হবে, পৃথিবীকে টানে কে? সূর্যকে কে আকর্ষণ করছে? এই যে বিশ্বব্যাপী আকর্ষণের জোরে গ্রহতারানক্ষত্রকে ঘোরাচ্ছে, কাউকে নিশ্চল থাকতে দিচ্ছে না। সেই বিরাট কেন্দ্রাকর্ষণের কেন্দ্র তো পৃথিবীতে নেই। একটি পরমাগতি আছে, যা আমারও গতি, পৃথিবীরও গতি, সূর্যেরও গতি।

এই পরমাগতির কথা স্মরণ করেই উপনিষৎ বলেছেন "কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ"—কেই বা কোনোপ্রকারের কিছুমাত্র চেষ্টা করত যদি আকাশ পরিপূর্ণ করে সেই আনন্দ না থাকতেন। সেই আনন্দই বিশ্বকে অনন্তগতি দান করে রয়েছেন—আকাশপূর্ণ সেই আনন্দ আছেন বলেই আমার চোখের পাতাটি আমি খুলতে পারছি।

তাই আমি বলছি, আমার পরমাগতি দূরে নেই, আমার সকল তুচ্ছ গতির মধ্যেই সেই পরমাগতি আছেন। যেমন আপেল ফলটি মাটিতে পড়ার মধ্যেই বিশ্বব্যাপী কেন্দ্রাকর্ষণশক্তি আছে। আমার শরীরের সকল চলা এবং আমার মনের সকল চেষ্টার যিনি পরমাগতি, তিনি হচ্ছেন এষঃ, এই ইনি। সেই গতির কেন্দ্র দূরে নয়—এই যে এইখানেই।

তার পরে যিনি আমাদের পরম সম্পৎ, আমাদের পরম আশ্রয়, আমাদের পরম আনন্দ—তিনি আমাদের প্রতিদিনের সমস্ত সম্পদ, প্রতিদিনের সমস্ত আশ্রয় এবং প্রতিদিনের সমস্ত আনন্দের মধ্যেই রয়েছেন। আমাদের ধনজন, আমাদের ঘরদুয়ার, আমাদের সমস্ত রসভোগের মধ্যেই যিনি পরমরূপে রয়েছেন তিনি যে এষঃ—তিনি যে ইনি—এই যে এইখানেই।

আমার সমস্ত গতিতে সেই পরম গতিকে, আমার সমস্ত সম্পদে সেই পরম সম্পদকে, আমার সমস্ত আশ্রয়ে সেই পরম আশ্রয়কে আমার সমস্ত আনন্দেই সেই পরম আনন্দকে এষঃ বলে জানব—একেই বলে পার হওয়া।

১২ পৌষ

৩

দিন

প্রতিদিনই আলোক এবং অন্ধকার, নিদ্রা এবং জাগরণ, সংকোচন এবং প্রসারণের মধ্যে দিয়ে আমাদের জীবন চলেছে—একবার তার জোয়ার একবার তার ভাঁটা। রাত্রে নিদ্রার সময় আমাদের সমস্ত ইন্দ্রিয়-মনের শক্তি আমাদের নিজের মধ্যেই সংহৃত হয়ে আসে। সকাল বেলায় সমস্ত জগতের দিকে ধাবিত হয়।

শক্তি যখন কেবল আমাদের নিজের মধ্যে সমাহৃত হয় সেই সময়েই কি আমরা নিজেকে বেশি করে জানি, বেশি করে পাই? আর সকালে যখন আমাদের শক্তি অন্যের দিকে নানা পথে বিকীর্ণ হতে থাকে তখনই কি আমরা নিজেকে হারাই?

ঠিক তার উলটো। কেবল নিজের মধ্যে যখন আমরা আসি তখন আমরা অচেতন, যখন সকলের দিকে যাই তখন আমরা জাগ্রত, তখনই আমরা নিজেকে জানি। যখন আমরা একা তখন আমরা কেউ নই।

আমাদের যথার্থ তাৎপর্য আমাদের নিজেদের মধ্যে নেই, তা জগতের সমস্তের মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে—সেইজন্যে আমরা বুদ্ধি দিয়ে, হৃদয় দিয়ে, কর্ম দিয়ে কেবলই সমস্তকে খুঁজছি, কেবলই সমস্তের সঙ্গে যুক্ত হতে চাচ্ছি নইলে যে নিজেকে পাই নে। আত্মাকে সর্বত্র উপলব্ধি করব এই হচ্ছে আত্মার একমাত্র আকাঙ্ক্ষা।

আপেল ফলের পতন-শক্তিকে যখন জ্ঞানী বিশ্বের সকল বস্তুর মধ্যেই দর্শন করলেন তখন তাঁর বুদ্ধি অত্যন্ত পরিতৃপ্ত হল। কারণ, সত্যকে সর্বত্র দেখলেই তার সত্যমূর্তি প্রকাশ পায় এবং সেই মূর্তিই আমাদের আনন্দ দান করে।

তেমনি আমরা আমাদের নিজেকে সর্বত্র ব্যাপ্ত দেখব এই হলেই নিজেকে সত্যরূপে দেখা হয়। নিজের এই সত্যকে যতই ব্যাপক করে জানব ততই আমাদের আনন্দ হবে। যে কেউ আমাদের আপনাকে তার নিজের ভিতর থেকে বাইরের দিকে টেনে নিয়ে তাকে আমাদের কাছে সত্যতররূপে প্রকাশ করে তাকেই আমরা আত্মীয় বলি, সেই আমাদের আনন্দ দেয়।

এই কারণেই মানবাত্মা বহু প্রাচীন যুগ হতে গৃহ বল, সমাজ বল, রাজ্য বল, যা কিছু সৃষ্টি করছে তার ভিতরকার একটি মাত্র মূল তাৎপর্য এই যে, মানুষ একাকিত্ব

পরিহার করে বহুর মধ্যে বিচিত্রের মধ্যে আপনার নানা শক্তিকে নানা সম্বন্ধে বিস্তৃত করে দিয়ে নিজেকে বৃহৎক্ষেত্রে উপলব্ধি করবে—এই তার যথার্থ সুখ। এইজন্যেই বলা হয়েছে "ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি"—ভূমাই সুখ অল্পে সুখ নেই। তার কারণ, অল্পে আত্মাও অল্প হয়।

যে সমাজ সভ্য সেই সমাজ বহুকে বিচিত্রভাবে আত্মার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত করে বলেই সে সমাজের গৌরব। নইলে কেবল উপকরণবাহুল্য এবং সুবিধার সমাবেশ তার সার্থকতা নয়।

সভ্যসমাজে যেখানে জ্ঞান প্রেম ও কর্মচেষ্টা নিয়ত দূরপ্রসারিত ক্ষেত্রে সর্বদাই সচেষ্ট হয়ে আছে সেইখানে যে-মানুষ বাস করে সে ক্ষুদ্র হয়ে থাকে না। সে ব্যক্তির শক্তি অল্প হলেও সে শক্তি সহজেই নিজেকে সার্থক করবার অবকাশ পায়। এইজন্যেই সকলের যোগে ভূমার যোগে সভ্যসমাজবাসী প্রত্যেকেই যথাসম্ভব বলিষ্ঠ হয়ে ওঠে।

যে সমাজ সভ্য নয় সে সমাজে স্বভাববলিষ্ঠ লোকও দুর্বল হয়ে থাকে, কারণ সে সমাজের লোকেরা আপনাকে যথেষ্ট পরিমাণে পায় না। সে সমাজে যে-সকল প্রতিষ্ঠান আছে সে কেবল ঘরের উপযোগী গ্রামের উপযোগী, ভূমার সঙ্গে যে-সকল সংকীর্ণ প্রতিষ্ঠানের যোগ নেই—সেখানে চিত্তসমুদ্রের জোয়ার এসে পৌঁছোয় না; এইজন্যে সেখানে মানুষ নিজের সত্য নিজের গৌরব অনুভব করে শক্তিলাভ করতে পারে না, সে সর্বত্র পরাভূত হয়ে থাকে। তার দারিদ্র্যের অন্ত থাকে না।

এইজন্যেই আমাদের সভ্যতার সাধনা করতে হবে, রেলওয়ে টেলিগ্রাফের জন্যে নয়। কারণ, রেলওয়ে টেলিগ্রাফেরও শেষ গম্যস্থান হচ্ছে মানুষ—কোনো স্থানীয় ইস্টেশন বিশেষ নয়।

এই সভ্যতা-সাধনার গোড়াকার কথাই হচ্ছে ধর্মবুদ্ধি। যতই আপনার প্রসার অল্প হয় ততই ধর্মবুদ্ধি অল্প হলেও চলে। নিজের ঘরে সংকীর্ণ জায়গায় যখন কাজ করি তখন ধর্মবুদ্ধি সংকীর্ণ হলেও বিশেষ ক্ষতি হয় না। কিন্তু যেখানে বহুলোককে বহুবন্ধনে বাঁধতে হয় সেখানে ধর্মবুদ্ধি প্রবল হওয়া চাই। সেখানে ধৈর্যবীর্য অধ্যবসায় ত্যাগ সেবাপরতা লোকহিতৈষা সমস্তই খুব বড়ো রকমের না হলে নয়। বস্তু কোনো মতেই বৃহৎ হয়ে উঠতে পারে না যদি তাকে ধরে রাখবার উপযোগী ধর্মও বৃহৎ না হয়—ধর্ম যখনই দুর্বল হয় তখনই বৃহৎ সমাজ বিশ্লিষ্ট হয়ে ভেঙে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে কখনোই কেউ তাকে বাঁধতে পারে না।

অতএব যখনই বহুব্যাপারবিশিষ্ট বহুদূরব্যাপ্ত বহুশক্তিশালী কোনো সভ্যসমাজকে

দেখব তখনই গোড়াতেই ধরে নিতে হবে তার ভিতরে একটি প্রবল ধর্মবুদ্ধি আছে—নইলে এতলোককে পরস্পরে বিশ্বাস পরস্পরে যোগ, এক মুহূর্তও থাকতে পারে না।

আমাদের দেশের সমাজেও সমস্ত ক্ষুদ্রতা বিচ্ছিন্নতা দূর করে জ্ঞানে প্রেমে কর্মে ভূমার প্রতিষ্ঠা করতে না পারলে মানবাত্মা কখনোই বলিষ্ঠ এবং আনন্দিত হতে পারবে না। সাধারণের সঙ্গে প্রত্যেকের যোগ যতই নানা প্রকার আচারে বিচারে বাধা প্রাপ্ত হতে থাকবে ততই আমাদের নিরানন্দ, অক্ষমতা ও দারিদ্র্য কেবলই বেড়ে চলবে। আমাদের দেশে বহুর সঙ্গে ঐক্যযোগের নানা সুযোগ রচনা করতে না পারলে আমাদের মহত্ত্বের তপস্যা চলবে-না।

সেই সুযোগ রচনা করবার জন্যে আমরা নানাদিক থেকে চেষ্টা করছি। কিন্তু ছোটো-বড়ো আমরা যা কিছু বেঁধে তুলতে চাচ্ছি তার মধ্যে যদি কেবলই বিশ্লিষ্টতা এসে পড়ছে এইটেই দেখা যায় তাহলে নিশ্চয়ই বুঝতে হবে গোড়ায় ধর্মবুদ্ধির দুর্বলতা আছে—নিশ্চয়ই সত্যের অভাব আছে, ত্যাগের কার্পণ্য আছে, ইচ্ছার জড়তা আছে; নিশ্চয়ই শ্রদ্ধার বল নেই এবং পূজার উপকরণ থেকে আমাদের আত্মাভিমান নিজের জন্য বৃহৎ অংশ চুরি করবার চেষ্টা করছে; নিশ্চয়ই পরস্পরের প্রতি ঈর্ষা রয়েছে, ক্ষমা নেই; এবং মঙ্গলকেই মঙ্গলের চরম ফলরূপে গণ্য করতে না পারাতে আমাদের অধ্যবসায় ক্ষুদ্র বাধাতেই নিরস্ত হয়ে যাচ্ছে।

অতএব আমাদের সতর্ক হতে হবে। যেখানে কৃতকার্যতার বাধা ঘটবে সেখানে নির্বাক উপকরণের প্রতি দোষারোপ করে যেন নিশ্চিন্ত হবার চেষ্টা না করি। পাপ আছে তাই বাঁধছে না, ধর্মের অভাব আছে তাই কিছুই ধরা যাচ্ছে না। এইজন্যেই আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে ক্ষুদ্র হয়ে সর্ববিষয়েই নিষ্ফল হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি—এইজন্যেই আমাদের জ্ঞানের সঙ্গে জ্ঞান, প্রাণের সঙ্গে প্রাণ, চেষ্টার সঙ্গে চেষ্টা সম্মিলিত হয়ে মানবাত্মার উপযুক্ত বিহারক্ষেত্র নির্মাণ করছে না—আমাদের আত্মা কোনোমতেই সেই বিশ্বকর্মা বিরাট পুরুষের সঙ্গে যুক্ত হবার যোগ্য নিজের বিরাট রূপ ধারণ করতে পারছে না।

১৩ পৌষ

রাত্রি

গতকল্য রাত্রি এবং দিন, নিদ্রা এবং জাগরণের একটি কথা বলা হয় নি। সেটাই হচ্ছে প্রধান কথা।

যখন আমরা জাগ্রত থাকি তখন আমাদের শক্তির সঙ্গে শক্তির লীলা ঘটে। বিশ্বকর্মার বিশ্বকর্মের সঙ্গে আমাদের কর্মের যোগসাধন হয়। যিনি “বহুধাশক্তিযোগাৎ বর্ণাননেকান্নিহিতার্থোদধাতি”—তাঁরই সেই বহুবিভক্ত শক্তির বিচিত্র প্রবাহ-পথে আমাদের চেষ্টাকে চালন করে আমরা শক্তির আশ্চর্য গতিসকল আবিষ্কার করে আনন্দিত হই। এক সময়ে যেখানে মনে করেছিলুম শক্তির শেষ, চলতে গিয়ে দেখতে পাই সেখান থেকে পথ আবার একটা নূতন বাঁক নিয়েছে ;—এমনি করে জগদ্ব্যাপারের সেই বহুধাশক্তির মধ্যে নিজের শক্তিকেও বহুধা করে দিয়ে তার সঙ্গে সকল দিকে সমান গতিলাভ করবার জন্যে আমাদের চিত্ত উৎসাহিত হয়ে ওঠে।

এমনি করে আমাদের জাগ্রত চৈতন্য সমস্ত ইন্দ্রিয়শক্তি ও মানসশক্তির জালকে চতুর্দিকে নিক্ষেপ করে নানা বেগ, নানা স্পর্শ, নানা লাভের দ্বারা নিজেকে সার্থক করে।

কিন্তু কেবলই জাল বাইচ করে তো জেলের চলে না। জালে গ্রন্থি পড়ে, জাল ছিঁড়ে আসে, জাল মলিন হয়। তখন আবার সেগুলো সংশোধন করে নেবার জন্যে জাল-বাওয়া একেবারে বন্ধ করে দিতে হয়।

রাত্রে নিদ্রার সময় আমরা প্রাণের জাল-বাওয়া, চেতনার জাল-বাওয়া একেবারে বন্ধ করে দিই। তখন সংশোধন ও ক্ষতি-পূরণের সময়। তখন আমাদের ছিন্নভিন্ন গ্রন্থিল মলিন জালটিকে তাঁর হাতে সমর্পণ করে দিতে হয় “য এষ সুপ্তেষু জাগর্তি কামং কামং পুরুষো নির্মিমাণঃ” যে পুরুষ, সকলে যখন সুপ্ত তখন জাগ্রত থেকে, প্রয়োজনসকলকে নির্মাণ করছেন।

অতএব একবার করে নিজের সমস্ত চেষ্টাকে সংবরণ করে সম্পূর্ণভাবে সেই বিশ্বপ্রাণের হাতে আমাদের প্রাণকে সমর্পণ করে দিতে হয়—সেই সময়ে আমরা গাছপালার সমান হয়ে যাই, প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের কোনো বিচ্ছেদ থাকে না, আমাদের অহংকারের একেবারে নিবৃত্তি হয়, তখনই আমরা নিখিলের অন্তর্বর্তী যে গভীর আরাম তাকেই লাভ করি। জেগে উঠে বুঝতে পারি যে, বিশ্রামকে আমরা এতক্ষণ কেবলমাত্র শূন্যতারূপে পাই নি, তা একটা পূর্ণ বস্তু, আমাদের নিশ্চেষ্টতা নিশ্চৈতন্যের মধ্যেও সে একটা

আরাম—সেটা হচ্ছে বিশাল বিশ্বপ্রকৃতির মূলগত আরাম – যে আরামের শ্যামল মূর্তি ও নির্বাক প্রকাশ আমরা শাখাপল্লবিত নিস্তব্ধ বনস্পতির মধ্যে দেখতে পাই।

এই যেমন আমাদের প্রাণকে প্রতি রাত্রে প্রকৃতির হাতে সমর্পণ করে দিয়ে আমরা প্রভাতে নূতন প্রাণচেষ্টার জন্যে পুনরায় প্রস্তুত হয়ে উঠি – তেমনি দিনের মধ্যে অন্তত একবার করে আমাদের আত্মাকে পরমাত্মার হাতে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করে দেবার প্রয়োজন আছে—নইলে আবর্জনা জমে ওঠে, ভাঙাচোরাগুলো সারে না, তাপ বাড়তেই থাকে – কাম ক্রোধ লোভ প্রভৃতি প্রবৃত্তিগুলো তাদের প্রয়োজনকে অতিক্রম করে অন্তরে বাহিরে বিদ্রোহ রচনা করে।

সেইজন্যে প্রভাতে উপাসনার সময়ে আমাদের সকল চেষ্টাকে ক্ষান্ত করে সব রিপুকে শান্ত করে কিছুকালের জন্যে পরমাত্মার সঙ্গে আমাদের আপনার পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য স্থাপন করে নেওয়া দরকার – সেই সময়ে আমাদের অন্তরের মধ্যে পরমাত্মাকে সম্পূর্ণ পথ ছেড়ে দিতে হবে; তাহলে সেই একান্ত আত্মবিসর্জনের সুগভীর শান্তির সুযোগে আমাদের মনের ব্যাধির মধ্যে স্বাস্থ্যের সঞ্চার হবে, সমস্ত সংকোচন প্রসারিত হয়ে যাবে এবং হৃদয়গ্রন্থিগুলি শিথিল হয়ে আসবে।

তার পরে উপাসনাশান্ত সেই আমাদের অন্তরপ্রকৃতি যখন সংসারে বিচিত্রের মধ্যে, বহুর মধ্যে বিভক্ত হয়ে ব্যাপ্ত হয়ে নানা আকারে প্রকারে আত্মোপলব্ধিতে প্রবৃত্ত হবে তখন সকল কাজে সে গম্ভীরভাবে পবিত্রভাবে নিযুক্ত হতে পারবে, তখন কথায় কথায় চতুর্দিককে সে আঘাত দিতে থাকবে না, তখন তার সমস্ত চেষ্টার মধ্যে শান্তি থাকবে। বিশাল বিশ্বের বিচিত্র ব্যাপারের মধ্যে যেমন একটি আশ্চর্য সামঞ্জস্য আছে, যেটি থাকাতে সমস্ত চেষ্টার মূর্তি শান্ত ও শক্তির মূর্তি সুন্দর হয়ে উঠেছে – যেটি থাকাতে বিশ্বজগৎ একটা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাশালা অথবা প্রকাণ্ড কারখানাঘরের মতো কঠোর আকার ধারণ করে নি – আমাদের চেষ্টার মধ্যে সেই সামঞ্জস্য থাকবে, আমাদের কর্মের মধ্যে সেই সৌন্দর্য ফুটে উঠবে। ঈশ্বর যেমন করে কাজ করেন, কিছুক্ষণ তাঁর কাছে আমাদের সমস্ত অহংকারটি নিবৃত্ত করে দিয়ে তাঁর সেই পরম সুন্দর কৌশলটি শিখে নেব। আপনাকে তাঁর চরণপ্রান্তে উপস্থিত করে দিয়ে বলব, জননী, প্রাতঃকালে এঁর উপরে তোমার নিপুণ হস্তটি একবার স্পর্শ করে দাও—তাহলে গতকল্যকার সংসারের আঘাতে এর উপরে যে সকল ছিন্নতা এসেছে তা সমস্তই সেরে যাবে।

আমরা যদি প্রতিদিন দিবাসারম্ভে তাঁর পবিত্র হস্তের স্পর্শ ললাটে গ্রহণ করে নিয়ে যাই এবং সে কথা যদি স্মরণ রাখি তবে ললাটকে আর ধূলিতে লুণ্ঠিত করতে পারব না। এই উপাসনার সুরটি যেন তানপুরার সুরের মতো আমাদের মধ্যে সমস্তদিন নিয়তই

বাজতে থাকে—যাতে আমাদের প্রত্যেক কথাটি এবং ব্যবহারটিকে সেই সুরের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে বিচার করতে পারি এবং সমস্ত দিনকে বিশুদ্ধ সংগীতে পরিণত করে সংসারের কর্মক্ষেত্রকে আনন্দক্ষেত্র করে তুলতে পারি।

১৪ পৌষ

প্রভাতে

প্রভাতের এই পবিত্র প্রশান্ত মুহূর্তে নিজের আত্মাকে পরমাত্মার মধ্যে একবার সম্পূর্ণ সমাবৃত করে দেখো সমস্ত ব্যবধান দূর হয়ে যাক। নিমগ্ন হয়ে যাই, নিবিষ্ট হয়ে যাই, তিনি নিবিড়ভাবে আমাদের আত্মাকে গ্রহণ করেছেন এই উপলব্ধি দ্বারা একান্ত পরিপূর্ণ হয়ে উঠি।

নইলে আমাদের আপনার সত্য পরিচয় হয় না। ভূমার সঙ্গে যোগযুক্ত করে না দেখলে নিজেকে ক্ষুদ্র বলে ভ্রম হয়, নিজেকে দুর্বল বলে মিথ্যা ধারণা হয়। আমি যে কিছুমাত্র ক্ষুদ্র নই, অশক্ত নই, মানবসমাজে মহাপুরুষেরা তার প্রমাণ দিয়েছেন—তাঁদের যে সিদ্ধি সে আমাদের প্রত্যেকের সিদ্ধি—আমাদের প্রত্যেক আত্মার শক্তি তাঁদের মধ্যে প্রত্যক্ষ হয়েছে। বাতির ঊর্ধ্বভাগ যখন আলোকশিখা লাভ করেছে তখন সে লাভ সমস্ত বাতির বাতির নিতান্ত নিম্ন ভাগেও সেই জ্বলবার ক্ষমতা রয়েছে - যখন সময় হবে সেও জ্বলবে—যখন সময় না হবে তখন সে উপরের জ্বলন্ত অংশকে ধারণ করে থাকবে। প্রতিদিন প্রভাতের উপাসনায় নিজের ভিতরকার মানবাত্মার সেই মাহাত্ম্যকে আমরা যেন একেবারে বাধামুক্ত করে দেখে নিতে পারি। নিজেকে দীন দরিদ্র বলে আমাদের যে ভ্রম আছে সেই ভ্রম যেন দূর করে যেতে পারি। আমরা যে কেবল ঘরের কোণে জন্মলাভ করেছি বলে একটা সংস্কার নিয়ে বসে আছি সেটা যেন ত্যাগ করে স্পষ্ট অনুভব করি ভূর্ভুবঃ স্বর্লোকে আমার এই শরীরের জন্ম সেইজন্যে বহুলক্ষ যোজন দূর পথ হতে আমাদের জ্যোতিষ্ক কুটুম্বগণ আমাদের তত্ত্ব নেবার জন্যে আলোকের দূত পাঠিয়ে দিচ্ছেন। আর আমার অহংকারটুকুর মধ্যেই যে আমার আত্মার চরম আবাস তা নয়—যে অধ্যাত্মলোকে তার স্থিতি সে হচ্ছে ব্রহ্মলোক। যে জগৎসভায় আমরা এসেছি এখানে রাজত্ব করবার আমাদের অধিকার, এখানে আমরা দাসত্ব করতে আসি নি। যিনি ভূমা তিনি স্বয়ং আমাদের ললাটে রাজটিকা পরিয়ে পাঠিয়েছেন। অতএব আমরা যেন নিজেকে অকুলীন বলে মাথা হেঁট করে সংকুচিত হয়ে সংসারে সঞ্চরণ না করি—নিজের অনন্ত আভিজাত্যের গৌরবে নিজের উচ্চ স্থানটি যেন গ্রহণ করতে পারি।

আকাশের অন্ধকার যেমন নিতান্ত কাল্পনিক পদার্থের মতো দেখতে দেখতে কেটে গেল—আমাদের অন্তরপ্রকৃতির চারদিক থেকে সমস্ত মিথ্যা সংস্কার তেমনি করে মুহূর্তে কেটে যাক। আমাদের আত্মা উদয়োন্মুখ সূর্যের মতো আমাদের চিত্তগগনে তার বাধামুক্ত জ্যোতির্ময় স্বরূপে প্রকাশ পাক—তার উজ্জ্বল চৈতন্যে তার নির্মল আলোকে আমাদের সংসারক্ষেত্র সর্বত্র পূর্ণভাবে উদ্ভাসিত হ'ক।

১৫ পৌষ

বিশেষ

জগতের সর্বসাধারণের সঙ্গে সাধারণভাবে আমার মিল আছে—ধূলির সঙ্গে পাথরের সঙ্গে আমার মিল আছে, ঘাসের সঙ্গে গাছের সঙ্গে আমার মিল আছে; পশুপক্ষীর সঙ্গে আমার মিল আছে, সাধারণ মানুষের সঙ্গে আমার মিল আছে; কিন্তু এক জায়গায় একেবারে মিল নেই—যেখানে আমি হচ্ছি বিশেষ। আমি যাকে আজ আমি বলছি এর আর কোনো দ্বিতীয় নেই। ঈশ্বরের অনন্ত বিশ্বসৃষ্টির মধ্যে এ-সৃষ্টি সম্পূর্ণ অপূর্ব—এ কেবলমাত্র আমি, একলা আমি, অনুপম অতুলনীয় আমি। এই আমির যে জগৎ সে একলা আমারই জগৎ—সেই মহা বিজনলোকে আমার অন্তর্যামী ছাড়া আর কারও প্রবেশ করবার কোনো জো নেই।

হে আমার প্রভু, সেই যে একলা আমি, বিশেষ আমি, তার মধ্যে তোমার বিশেষ আনন্দ, বিশেষ আবির্ভাব আছে—সেই বিশেষ আবির্ভাবটি আর কোনো দেশে কোনো কালে নেই। আমার সেই বিশিষ্টতাকে আমি সার্থক করব প্রভু। আমি নামক তোমার সকল হতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এই যে একটি বিশেষ লীলা আছে, এই বিশেষ লীলায় তোমার সঙ্গে যোগ দেব। এইখানে একের সঙ্গে এক হয়ে মিলব।

পৃথিবীর ক্ষেত্রে আমার এই মানবজন্ম তোমার সেই বিশেষ লীলাটিকে যেন সৌন্দর্যের সঙ্গে সংগীতের সঙ্গে পবিত্রতার সঙ্গে মহত্ত্বের সঙ্গে সচেতনভাবে বহন করে নিয়ে যায়। আমাতে তোমার যে একটি বিশেষ অধিষ্ঠান আছে সে কথা যেন কোনোদিন কোনোমতেই না ভোলে। অনন্ত বিশ্বসংসারে এই যে একটি আমি হয়েছি মানবজীবনে এই আমি সার্থক হ'ক।

এই আমিটিকে আর সকল হতে স্বতন্ত্র করে অনাদিকাল থেকে তুমি বহন করে আনছ। সূর্য চন্দ্র গ্রহ তারার মধ্যে দিয়ে একে হাতে ধরে নিয়ে এসেছ কিন্তু কারও

সঙ্গে একে জড়িয়ে ফেল নি। কোন্ নীহারিকার জ্যোতির্ময় বাষ্পনির্ঝর থেকে অণুপরমাণুকে চালন করে কত পুষ্টি, কত পরিবর্তন, কত পরিণতির মধ্যে দিয়ে এই আমিকে আজ এই শরীরে ফুটিয়ে তুলেছ। তোমার সেই অনাদিকালের সঙ্গ আমার এই দেহটির মধ্যে সঞ্চিত হয়ে আছে। অনাদিকাল থেকে আজ পর্যন্ত অনন্ত সৃষ্টির মাঝখান দিয়ে একটি বিশেষ রেখাপাত হয়ে এসেছে সেটি হচ্ছে এই আমির রেখা—সেই রেখাপথে তোমার সঙ্গে আমি বরাবর চলে এসেছি। সেই তুমি আমার অনাদি পথের চালক, অনন্ত পথের অদ্বিতীয় বন্ধু তোমাকে আমার সেই একলা বন্ধুরূপে আমার জীবনের মধ্যে উপলব্ধি করব। আর কোনো কিছুই তোমার সমান না হ'ক, তোমার চেয়ে বড়ো না হ'ক। আর আমার এই যে সাধারণ জীবন যা নানা ক্ষুধাতৃষ্ণা চিন্তাচেষ্টা দ্বারা আমি সমস্ত তরুলতা পশুপক্ষীর সঙ্গে একত্রে মিলে ভোগ করছি সেইটেই নানাদিক দিয়ে প্রবল হয়ে না ওঠে, আমাতে তোমার যে একটি বিশেষ স্পর্শ, বিশেষ ক্রিয়া, বিশেষ আনন্দ অনন্তকালের সুহৃদ ও সারথিরূপে রয়েছে তাকে যেন আচ্ছন্ন করে না দাঁড়ায়। আমি যেখানে জগতের সামিল সেখানে তোমাকে জগদীশ্বর বলে মানি, তোমার সব নিয়ম পালন করবার চেষ্টা করি, না পালন করলে তোমার শাস্তি গ্রহণ করি—কিন্তু আমিরূপে তোমাকে আমি আমার একমাত্র বলে জানতে চাই। সেইখানে তুমি আমাকে স্বাধীন করে দিয়েছ—কেননা স্বাধীন না হলে প্রেম সার্থক হবে না, ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছা মিলবে না, লীলার সঙ্গে লীলার যোগ হতে পারবে না। এইজন্যে এই স্বাধীনতার আমি-ক্ষেত্রেই আমার সব দুঃখের চেয়ে পরম দুঃখ তোমার সঙ্গে বিচ্ছেদ অর্থাৎ অহংকারের দুঃখ, আর, সব সুখের চেয়ে পরম সুখ তোমার সঙ্গে মিলন, অর্থাৎ প্রেমের সুখ। এই অহংকারের দুঃখ কেমন করে ঘুচবে সেই ভেবেই বুদ্ধ তপস্যা করেছিলেন এবং এই অহংকারের দুঃখ কেমন করে ঘোচে সেই জানিয়েই খ্রীস্ট প্রাণ দিয়েছিলেন। হে পুত্র হতে প্রিয়, বিত্ত হতে প্রিয়, হে অন্তরতম প্রিয়তম, এই আমি-নিকেতনেই যে তোমার চরমলীলা। সেইজন্যেই তো এইখানেই এত নিদারুণ দুঃখ এবং সে দুঃখের এমন অপরিসীম অবসান—সেইজন্যেই তো এইখানেই মৃত্যু—এবং অমৃত সেই মৃত্যুর বক্ষ বিদীর্ণ করে উৎসারিত হচ্ছে। এই দুঃখ ও সুখ, বিচ্ছেদ ও মিলন, অমৃত ও মৃত্যু, এই তোমার দক্ষিণ ও বাম দুই বাহু, এর মধ্যে সম্পূর্ণ ধরা দিয়ে যেন বলতে পারি, আমার সব মিটেছে, আমি আর কিছুই চাই নে।

১৬ পৌষ ১৩১৫

প্রেমের অধিকার

কাল রাত্রে এই গানটা আমার মনের মধ্যে বাজছিল—

"নাথ হে, প্রেমপথে সব বাধা ভাঙিয়া দাও।
মাঝে কিছু রেখো না, থেকো না দূরে।
নির্জনে সজনে অন্তরে বাহিরে নিত্য তোমারে হেরিব,
সব বাধা ভাঙিয়া দাও।"

কিন্তু এ কেমন প্রার্থনা। এ প্রেম কার সঙ্গে। মানুষ কেমন করে একথা কল্পনাতে এনেছে এবং মুখে উচ্চারণ করেছে যে বিশ্বভুবনেশ্বরের সঙ্গে তার প্রেম হবে।

বিশ্বভুবন বলতে কতখানি বোঝায় এবং তার তুলনায় একজন মানুষ যে কত ক্ষুদ্র সে কথা মনে করলে যে মুখ দিয়ে কথা সরে না। সমস্ত মানুষের মধ্যে আমি ক্ষুদ্র, আমার সুখ-দুঃখ কতই অকিঞ্চিৎকর। সৌরজগতের মধ্যে সেই মানুষ এক মুষ্টি বালুকার মতো যৎসামান্য—এবং সমস্ত নক্ষত্রলোকের মধ্যে এই সৌরজগতের স্থান এত ছোটো যে অঙ্কের দ্বারা তার গণনা করা দুঃসাধ্য।

সেই সমস্ত অগণ্য অপরিচিত লোকলোকান্তরের অধিবাসী এই মুহূর্তেই সেই বিশ্বেশ্বরের মহারাজ্যে তাদের অভাবনীয় জীবনযাত্রা বহন করছে। এমন সকল জ্যোতিষ্কলোক অনন্ত আকাশের গভীরতার মধ্যে নিমগ্ন হয়ে রয়েছে যার আলোক যুগযুগান্তর হতে অবিশ্রাম যাত্রা করে আজও আমাদের দূরবীক্ষণ ক্ষেত্রে এসে প্রবেশ করে নি। সেই সমস্ত অজ্ঞাত অদৃশ্য লোকও সেই পরমপুরুষের পরমশক্তির উপরে প্রতিমুহূর্তেই একান্ত নির্ভর করে রয়েছে, আমরা তার কিছুই জানি নে।

এমন যে অচিন্তনীয় ব্রহ্মাণ্ডের পরমেশ্বর—তাঁরই সঙ্গে এই কণার কণা, অণুর অণু, বলে কিনা প্রেম করবে! অর্থাৎ, তাঁর রাজসিংহাসনে তাঁর পাশে গিয়ে বসবে! অনন্ত আকাশে নক্ষত্রে নক্ষত্রে তাঁর জগৎযজ্ঞের হোমহুতাশন যুগযুগান্তর জ্বলছে আমি সেই যজ্ঞক্ষেত্রের অসীম জনতার একটি প্রান্তে দাঁড়িয়ে কোন্ দাবির জোরে দ্বারীকে বলছি এই যজ্ঞেশ্বরের এক শয্যায় আমাকে আসন দিতে হবে!

বড়ো হয়ে ওঠবার জন্যে মানুষের আকাঙ্ক্ষার সীমা নেই একথা জানা কথা। শুনেছি না কি আলেকজাণ্ডার এমনি ভাবে কথা বলেছিলেন যে একটা পৃথিবী জয় করে তাঁর সুখ হচ্ছে না, আর একটা পৃথিবী যদি থাকত তবে তিনি জয়যাত্রায় বেরোতেন।

দুবেলা যার অন্ন জোটে না সেও কুবেরের ভাণ্ডারের স্বপ্ন দেখে। মানুষের আকাঙ্ক্ষা যে কোনো কল্পনাকেই অসম্ভব বলে মানে না এমন প্রমাণ অনেক আছে।

মানুষ জগদীশ্বরের সঙ্গে প্রেম করতে চায় এও কি তার সেই অত্যাকাঙ্ক্ষারই একটা চরম উন্মত্ততা? তার অহংকারেরই একটা অশান্ত পরিচয়?

কিন্তু এর মধ্যে তো অহংকারের লক্ষণ নেই। তাঁর প্রেমের জন্যে যে লোক খেপেছে—সে যে নিজেকে দীন করে—সকলের পিছনে সে যে দাঁড়ায় এবং যাঁরা ঈশ্বরের প্রেমের দরবারের দরবারি তাঁদের পায়ের ধুলো পেলেও সে যে বাঁচে। কোনো ক্ষমতা কোনো ঐশ্বর্যের কাঙাল সে নয়—সমস্তই সে যে ত্যাগ করবার জন্যেই প্রস্তুত হয়েছে।

সেইজন্যেই জগৎসৃষ্টির মধ্যে এইটেই সকলের চেয়ে আশ্চর্য বলে আমার মনে হয় যে, মানুষ তাঁর প্রেম চায়—এবং সকল প্রেমের চেয়ে সেইটেকেই বড়ো সত্য, বড়ো লাভ বলে চায়। কেন চায়? কেননা মানুষ যে অধিকার পেয়েছে। এই প্রেমের দাবি যিনি জন্মিয়ে দিয়েছেন তাঁরই সঙ্গে যে প্রেম এতে আর ভয় লজ্জা কিসের।

তিনি যে আমাকে একটি বিশেষ আমি করে তুলে সমস্ত জগৎ থেকে স্বতন্ত্র করে দিয়েছেন এইখানেই যে আমার সকলের চেয়ে বড়ো দাবি—সমস্ত সূর্য চন্দ্র তারার চেয়ে বড়ো দাবি। সর্বত্র বিশ্বের ভারাকর্ষণের টান আছে, আমার এই স্বাতন্ত্র্যটুকুর উপর তার কোনো টান নেই। যদি থাকত তাহলে সে যে একে ধূলিরাশির সঙ্গে মিশিয়ে এক করে দিত।

প্রকাণ্ড জগতের চাপ এই আমিটুকুর উপর নেই বলেই এই আমিটি নিজের গৌরব রক্ষা করে কেমন মাথা তুলে চলেছে। পুরাণে বলে কাশী সমস্ত পৃথিবীর বাইরে। বস্তুত আমিই সেই কাশী। আমি জগতের মাঝখানে থেকে সমস্ত জগতের বাইরে।

সেইজন্যেই জগতের সঙ্গে নিজেকে ওজন করে ক্ষুদ্র বললে তো চলবে না। তার সঙ্গে আমি তো তুলনীয় নই।

আমি যে একজন বিশেষ আমি। আমাতে তাঁর শাসন নেই, আমাতে তাঁর বিশেষ আনন্দ। সেই আনন্দের উপরেই আমি আছি, বিশ্বনিয়মের উপরে নেই, এইজন্যেই এই আমির ব্যাপারটি একেবারে সৃষ্টিছাড়া। এইজন্যেই এই পরমাশ্চর্য আমির দিকেই তাকিয়ে উপনিষৎ বলে গিয়েছেন "দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।" বলেছেন, এই আমি আর তিনি, সমান বৃক্ষের ডালে দুই পাখির মতো, দুই সখা একেবারে পাশাপাশি বসে আছেন।

তাঁর জগতের রাজ্যে আমাকে খাজনা দিতে হয়; এই জলস্থল আকাশ বাতাসের

অনেক রকমের ট্যাক্স আছে সমস্তই আমাকে কড়ায় গণ্ডায় চুকিয়ে দিতে হয়—যেখানে কিছু দেনা পড়ে সেইখানেই প্রাণ বেরিয়ে যায়। কিন্তু আমার এই আমিটুকু একেবারে লাখেরাজ, ওইখানেই বন্ধুর মন্দির কিনা, আমার সঙ্গে তাঁর কথা এই যে, তুমি ইচ্ছা করে আমাকে যা দেবে তাই নেব - যদি না দাও তবু আমার যা দেবার তার থেকে বঞ্চিত করব না।

এমন যদি না হত তবে তাঁর জগৎরাজ্যের একলা রাজা হয়ে তাঁর আনন্দ কী হত। কোথাও যাঁর কোনো সমান নেই তিনি কী ভয়ংকর একলা, কী অনন্ত একলা। তিনি ইচ্ছা করে কেবল প্রেমের জোরে এই একাধিপত্য এক জায়গায় পরিত্যাগ করেছেন। তিনি আমার এই আমিটুকুর কুঞ্জবনে বিশেষ করে নেমে এসেছেন—বন্ধু হয়ে আপনি ধরা দিয়েছেন। বলে দিয়েছেন, "আমার চন্দ্র সূর্যের সঙ্গে তোমার নিজের দামের হিসাব করতে হবে না। কেননা ওজন দরে তোমার দাম নয়। তোমার দাম আমার আনন্দের মধ্যে—তোমার সঙ্গেই আমার বিশেষ প্রেম বলেই তুমি তুমি হয়েছ।"

এইখানেই আমার এত গৌরব যে তাঁকে সুদ্ধ আমি অস্বীকার করতে পারি। বলতে পারি আমি তোমাকে চাই নে। সে কথা তাঁর ধূলি জলকে বলতে গেলে তারা সহ্য করে না, তারা তখনই আমাকে মারতে আসে। কিন্তু তাঁকে যখন বলি, তোমাকে আমি চাই নে, আমি টাকা চাই, খ্যাতি চাই—তিনি বলেন আচ্ছা বেশ। বলে চুপ করে সরে বসে থাকেন।

এ দিকে কখন এক সময়ে হুঁশ হয় যে আমার আত্মার যে নিভৃত নিকেতন, সেখানকার চাবি তো আমার খাতাঞ্চির হাতে নেই—টাকা কড়ি ধন দৌলত তো সেখানে কোনোমতে পৌঁছোয় না। ফাঁক থেকেই যায়। সেখানকার সেই একলাঘরটি জগতের আর একটি মহান একলা ছাড়া কেউ কোনোমতেই ভরাতে পারে না। যে দিন বলতে পারব আমার টাকায় কাজ নেই, খ্যাতিতে কাজ নেই, কিছুতে কাজ নেই, তুমি এস; যে দিন বলতে পারব চন্দ্রসূর্যহীন আমার এই একলা ঘরটিতে তুমি আমার আর আমি তোমার, সেই দিন আমার বরশয্যায় বর এসে বসবেন—সেই দিন আমার আমি সার্থক হবে।

সে দিন একটি আশ্চর্য ব্যাপার এই ঘটবে যে, নিজেকে যতই দীন বলে জানব তাঁর প্রেমকে ততই বড়ো করে বুঝব। তাঁর প্রেমের ঐশ্বর্যের উপলব্ধিতে তাঁর প্রেমকেই অনন্ত বলে জানব নিজেকে বড়ো করে দাঁড়াব না। জ্ঞান পেলে নিজেকে জ্ঞানী বলে গর্ব হয় কিন্তু প্রেম পেলে নিজেকে অধম বলে জেনেও আনন্দ হয়। পাত্র যতই গভীররূপে শূন্য হয় সুধারসে ভরে উঠলে ততই সে বেশি করে পূর্ণ হয়। এইজন্যে প্রেম যখন লাভ

করি তখন নিজেকে বড়ো করে জানাবার কোনো ইচ্ছাই হয় না—বরঞ্চ নিজের অত্যন্ত দীনতা নিজেকে অত্যন্ত সুখ দেয়—তখন তাঁর লীলার ভিতরকার একটি মস্ত বিরোধের সার্থকতা বুঝতে পারি এবং সেই বিরোধকে স্বীকার করে আনন্দের সঙ্গে বলতে পারি যে, জগতে আমি যতই ক্ষুদ্র যতই দীন দুর্বল নিজের আমি-নিকেতনে তাঁর প্রেমের দ্বারা আমি ততই পরিপূর্ণ, ততই কৃতার্থ। আমি অনন্ত ভাবে দীন বলেই দুর্বল বলেই তাঁর অনন্ত প্রেমের দ্বারা ধন্য হয়েছি।

১৭ পৌষ

ইচ্ছা

সকাল বেলা থেকেই আমার সংসারের কথা ভাবতে আরম্ভ করেছি। কেননা, এ যে আমার সংসার। আমার ইচ্ছাটুকুই হচ্ছে এই সংসারের কেন্দ্র। আমি কী চাই কী না চাই, আমি কাকে রাখব কাকে ছাড়ব সেই কথাকে মাঝখানে নিয়েই আমার সংসার।

আমাকে বিশ্বভুবনের ভাবনা ভাবতে হয় না। আমার ইচ্ছার দ্বারা সূর্য উঠছে না, বায়ু বইছে না, অণুপরমাণুতে মিলন হয়ে বিচ্ছেদ হয়ে সৃষ্টিরক্ষা হচ্ছে না। কিন্তু আমি নিজের ইচ্ছাশক্তিকে মূলে রেখে যে সৃষ্টি গড়ে তুলছি তার ভাবনা আমাকে সকলের চেয়ে বড়ো ভাবনা করেই ভাবতে হয় কেননা সেটা যে আমারই ভাবনা।

তাই এত বড়ো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ব্যাপারের ঠিক মাঝখানে থেকেও আমার এই অতি ছোটো সংসারের অতি ছোটো কথা আমার কাছে ছোটো বলে মনে হয় না। আমার প্রভাতের সামান্য আয়োজন চেষ্টা প্রভাতের সুমহৎ সূর্যোদয়ের সম্মুখে লেশমাত্র লজ্জিত হয় না ; এমন কি, তাকে অনায়াসে বিস্মৃত হয়ে চলতে পারে।

এই তো দেখতে পাচ্ছি দুইটি ইচ্ছা পরস্পর সংলগ্ন হয়ে কাজ করছে। একটি হচ্ছে বিশ্ব-জগতের ভিতরকার ইচ্ছা, আর একটি আমার এই ক্ষুদ্র জগতের ভিতরকার ইচ্ছা। রাজা তো রাজত্ব করেন আবার তাঁর অধীনস্থ তালুকদার, সেও সেই মহারাজ্যের মাঝখানেই আপনার রাজত্বটুকু বসিয়েছে। তার মধ্যেও রাজৈশ্বর্যের সমস্ত লক্ষণ আছে—কেননা ওই ক্ষুদ্র সীমাটুকুর মধ্যে তার ইচ্ছা তার কর্তৃত্ব বিরাজমান।

এই যে আমাদের আমি-জগতের মধ্যে ঈশ্বর আমাদের প্রত্যেককে রাজা করে দিয়েছেন – যে লোক রাস্তার ধুলো ঝাঁট দিচ্ছে সেও তার আমি-অধিকারের মধ্যে স্বয়ং সর্বশ্রেষ্ঠ—একথার আলোচনা পূর্বে হয়ে গেছে। যিনি ইচ্ছাময় তিনি আমাদের

প্রত্যেককে একটি করে ইচ্ছার তালুক দান করেছেন—দানপত্রে আছে "যাবচ্চন্দ্র দিবাকরৌ" আমরা একে ভোগ করতে পারব।

আমাদের এই চিরন্তন ইচ্ছার অধিকার নিয়ে আমরা এক-একবার অহংকারে উন্মত্ত হয়ে উঠি। বলি, যে, আমার নিজের ইচ্ছা ছাড়া আর কাউকেই মানি নে—এই বলে সকলকে লঙ্ঘন করার দ্বারাই আমার ইচ্ছা যে স্বাধীন এইটে আমরা স্পর্ধার সঙ্গে অনুভব করতে চাই।

কিন্তু ইচ্ছার মধ্যে আর একটি তত্ত্ব আছে—স্বাধীনতায় তার চরম সুখ নয়। শরীর যেমন শরীরকে চায়, মন যেমন মনকে চায়, বস্তু যেমন বস্তুকে আকর্ষণ করে—ইচ্ছা তেমনি ইচ্ছাকে না চেয়ে থাকতে পারে না। অন্য ইচ্ছার সঙ্গে মিলিত না হতে পারলে এই একলা ইচ্ছা আপনার সার্থকতা অনুভব করে না। যেখানে কেবলমাত্র প্রয়োজনের কথা সেখানে জোর খাটানো চলে—জোর করে খাবার কেড়ে খেয়ে ক্ষুধা মেটে। কিন্তু ইচ্ছা যেখানে প্রয়োজনহীন, যেখানে অহেতুকভাবে সে নিজের বিশুদ্ধ স্বরূপে থাকে, সেখানে সে যা চায় তাতে একেবারেই জোর খাটে না, কারণ, সেখানে সে ইচ্ছাকেই চায়। সেখানে কোনো বস্তু, কোনো উপকরণ, কোনো স্বাধীনতার গর্ব, কোনো ক্ষমতা তার ক্ষুধা মেটাতে পারে না—সেখানে সে আর একটি ইচ্ছাকে চায়। সেখানে সে যদি কোনো উপহার সামগ্রীকে গ্রহণ করে তবে সেটাকে সামগ্রী বলে গ্রহণ করে না—যে ব্যক্তি দান করেছে তারই ইচ্ছার নিদর্শন বলে গ্রহণ করে—তার ইচ্ছারই দামে এর দাম। মাতার সেবা যে ছেলের কাছে এত মূল্যবান সে তো কেবল সেবা বলেই মূল্যবান নয়, মাতার ইচ্ছা বলেই তার এত গৌরব ;– দাসের দাসত্ব নিয়ে আমার ইচ্ছার আকাঙ্ক্ষা মেটে না—বন্ধুর ইচ্ছাকৃত আত্মসমর্পণের জন্যেই সে পথ চেয়ে থাকে।

এমনি করে ইচ্ছা যেখানে অন্য ইচ্ছাকে চায় সেখানে সে আর স্বাধীন থাকে না। সেখানে নিজেকে তার খর্ব করতেই হয়। এমন কি, তাকে আমরা বলি ইচ্ছা বিসর্জন দেওয়া। ইচ্ছার এই যে অধীনতা এমন অধীনতা আর নেই। দাসতম দাসকেও আমরা কাজে প্রবৃত্ত করতে পারি কিন্তু তার ইচ্ছাকে সমর্পণ করতে বাধ্য করতে পারি নে।

আমার যে সংসারে আমার ইচ্ছাই হচ্ছে মূল কর্তা সেখানে আমার একটা সর্বপ্রধান কাজ হচ্ছে অন্যের ইচ্ছার সঙ্গে নিজের ইচ্ছা সম্মিলিত করা। যত তা করতে পারব ততই আমার ইচ্ছার রাজ্য বিস্তৃত হতে থাকবে—আমার সংসার ততই বৃহৎ হয়ে উঠবে। সেই গৃহিণীই হচ্ছে যথার্থ গৃহিণী যে পিতামাতা ভাইবোন স্বামী পুত্র দাসদাসী

পাড়া প্রতিবেশী সকলের ইচ্ছার সঙ্গে নিজের ইচ্ছাকে সুসংগত করে আপনার সংসারকে পরিপূর্ণ সামঞ্জস্যে গঠিত করে তুলতে পারে। এমন গৃহিণীকে সর্বদাই নিজের ইচ্ছাকে খাটো করতে হয় ত্যাগ করতে হয় তবেই তার এই ইচ্ছাধিষ্ঠিত রাজ্যটি সম্পূর্ণ হয়। সে যদি সকলের সেবক না হয় তবে সে কর্ত্রী হতেই পারে না।

তাই বলছিলুম আমাদের যে ইচ্ছার মধ্যে স্বাধীনতার সকলের চেয়ে বিশুদ্ধ স্বরূপ, সেই ইচ্ছার মধ্যেই অধীনতারও সকলের চেয়ে বিশুদ্ধ মূর্তি। ইচ্ছা যে অহংকারের মধ্যে আপনাকে স্বাধীন বলে প্রকাশ করেই সার্থক হয় তা নয়, ইচ্ছা প্রেমের মধ্যে নিজেকে অধীন বলে স্বীকার করাতেই চরম সার্থকতা লাভ করে। ইচ্ছা আপনাকে উদ্ধত করে নিজের যে ঘোষণা করে তাতেই তার শেষ কথা থাকে না, নিজেকে বিসর্জন করার মধ্যেই তার পরম শক্তি চরম লক্ষ্য নিহিত।

ইচ্ছার এই যে স্বাভাবিক ধর্ম যে অন্য ইচ্ছাকে সে চায়, কেবল জোরের উপরে তার আনন্দ নেই। ঈশ্বরের ইচ্ছার মধ্যেও সে ধর্ম আমরা দেখতি পাচ্ছি। তিনি ইচ্ছাকে চান। এই চাওয়াটুকু সত্য হবে বলেই তিনি আমার ইচ্ছাকে আমারই করে দিয়েছেন-- বিশ্বনিয়মের জালে একে একেবারে নিঃশেষে বেঁধে ফেলেন নি—বিশ্বসাম্রাজ্যে আর সমস্তই তাঁর ঐশ্বর্য, কেবল ওই একটি জিনিস তিনি নিজে রাখেন নি—সেটি হচ্ছে আমার ইচ্ছা,—ওইটি তিনি কেড়ে নেন না—চেয়ে নেন, মন ভুলিয়ে নেন। ওই একটি জিনিস আছে যেটি আমি তাঁকে সত্যই দিতে পারি। ফুল যদি দিই সে তাঁরই ফুল, জল যদি দিই সে তাঁরই জল—কেবল ইচ্ছা যদি সমর্পণ করি তো সে আমারই ইচ্ছা বটে।

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর আমার সেই ইচ্ছাটুকুর জন্যে প্রতিদিন যে আমার দ্বারে আসছেন আর যাচ্ছেন তার নানা নিদর্শন আছে। এইখানে তিনি তাঁর ঐশ্বর্য খর্ব করেছেন, কেননা এখানেই তাঁর প্রেমের লীলা। এইখানে নেমে এসেই তাঁর প্রেমের সম্পদ প্রকাশ করেছেন—আমারও ইচ্ছার কাছে তাঁর ইচ্ছাকে সংগত করে তাঁর অনন্ত ইচ্ছাকে প্রকাশ করেছেন—কেননা ইচ্ছার কাছে ছাড়া ইচ্ছার চরম প্রকাশ হবে কোথায়? তিনি বলছেন, রাজখাজনা নয়, আমাকে প্রেম দাও।

তোমাকে প্রেম দিতে হবে বলেই তো তুমি এত কাণ্ড করেছ। আমার মধ্যে এই এক অদ্ভুত আমির লীলা ফেঁদে বসেছ—এবং আমাকে এই একটি ইচ্ছার সম্পদ দিয়ে সেটি পাবার জন্যে আমার কাছেও হাত পেতে দাঁড়িয়েছ।

১৮ পৌষ

সৌন্দর্য

ঈশ্বর সত্যং। তাঁর সত্যকে আমরা স্বীকার করতে বাধ্য। সত্যকে এতটুকুমাত্র স্বীকার না করলে আমাদের নিষ্কৃতি নেই। সুতরাং অমোঘ সত্যকে আমরা জলে স্থলে আকাশে সর্বত্র দেখতে পাচ্ছি।

কিন্তু তিনি তো শুধু সত্য নন—তিনি "আনন্দরূপমমৃতং।" তিনি আনন্দরূপ, অমৃতরূপ। সেই তাঁর আনন্দরূপকে দেখছি কোথায়?

আমি পূর্বেই আভাস দিয়েছি আনন্দ স্বভাবতই মুক্ত। তার উপরে জোর খাটে না, হিসাব চলে না। এই কারণে আমরা যেদিন আনন্দের উৎসব করি সেদিন প্রতিদিনের বাঁধা নিয়মকে শিথিল করে দিই—সেদিন স্বার্থকে শিথিল করি, প্রয়োজনকে শিথিল করি, আত্মপরের ভেদকে শিথিল করি, সংসারের কঠিন সংকোচকে শিথিল করি—তবেই ঘরের মাঝখানে এমন একটুখানি ফাঁকা জায়গা তৈরি হয় যেখানে আনন্দের প্রকাশ সম্ভবপর হয়। সত্য বাঁধনকেই মানে, আনন্দ বাঁধন মানে না।

এইজন্য বিশ্বপ্রকৃতিতে সত্যের মূর্তি দেখতে পাই নিয়মে, এবং আনন্দের মূর্তি দেখি সৌন্দর্যে। এইজন্য সত্যরূপের পরিচয় আমাদের পক্ষে অত্যাবশ্যক, আনন্দরূপের পরিচয় আমাদের না হলেও চলে। প্রভাতে সূর্যোদয়ে আলো হয় এই কথাটা জানা এবং এটাকে ব্যবহারে লাগানো আমাদের নিতান্ত দরকার কিন্তু প্রভাত যে সুন্দর সুপ্রশান্ত এটুকু না জানলে আমাদের কোনো কাজের কোনো ক্ষতিই হয় না।

জল স্থল আকাশ আমাদের নানা বন্ধনে বদ্ধ করছে কিন্তু এই জল স্থল আকাশে নানা বর্ণে গন্ধে গীতে সৌন্দর্যের যে বিপুল বিচিত্র আয়োজন সে আমাদের কিছুতে বাধ্য করে না, তার দিকে না তাকিয়ে চলে গেলে সে আমাদের অরসিক বলে গালিও দেয় না।

অতএব দেখতে পাচ্ছি, জগতের সত্যলোকে আমরা বদ্ধ, সৌন্দর্যলোকে আমরা স্বাধীন। সত্যকে যুক্তির দ্বারা অখণ্ডনীয়রূপে প্রমাণ করতে পারি, সৌন্দর্যকে আমাদের স্বাধীন আনন্দ ছাড়া আর কিছুর দ্বারাই প্রমাণ করবার জো নেই। যে ব্যক্তি তুড়ি দিয়ে বলে "ছাই তোমার সৌন্দর্য" মহাবিশ্বের লক্ষ্মীকেও তার কাছে একেবারে চুপ করে যেতে হয়। কোনো আইন নেই, কোনো পেয়াদা নেই যার দ্বারা এই সৌন্দর্যকে সে দায়ে পড়ে মেনে নিতে পারে।

অতএব জগতে ঈশ্বরের এই যে অপরূপ রহস্যময় সৌন্দর্যের আয়োজন এ আমাদের কাছে কোনো মাসুল কোনো খাজনা আদায় করে না, এ আমাদের স্বাধীন ইচ্ছাকে চায়—বলে আমাতে তোমার আনন্দ হ'ক ; তুমি স্বত আমাকে গ্রহণ করো।

তাই আমি বলছিলুম, আমাদের অন্তরাত্মার আমি-ক্ষেত্রের একটা সৃষ্টিছাড়া নিকেতনে সেই আনন্দময়ের যে যাতায়াত আছে জগৎ জুড়ে তার নিদর্শন পড়ে রয়েছে। আকাশের নীলিমায়, বনের শ্যামলতায়, ফুলের গন্ধে সর্বত্রই তাঁর সেই পায়ের চিহ্ন ধরা পড়েছে যে। সেখানে যদি তিনি রাজবেশ ধরে আসতেন তাহলে জোড়হাত করে তাঁকে মানতুম—কিন্তু তিনি যে বন্ধুর বেশে ধীরপদে আসেন, একেবারে একলা আসেন, সঙ্গে তাঁর পদাতিকগুলো শাসনদণ্ড হাতে জয়ডঙ্কা বাজিয়ে কেউ আসে না—সেইজন্যে পাপ ঘুম ভাঙতেই চায় না, দরজা বন্ধই থাকে।

কিন্তু এমন করলে তো চলবে না—শাসনের দায় নেই বলেই লক্ষ্মীছাড়া যদি প্রেমের দায় স্বেচ্ছায় সঙ্গে স্বীকার না করে তবে জন্মজন্ম সে কেবল দাস, দাসানুদাস হয়েই ঘুরে মরবে। মানবজন্ম যে আনন্দের জন্য সে খবরটা সে যে একেবারে পাবেই না। ওরে, অন্তরের যে নিভৃততম আবাসে চন্দ্রসূর্যের দৃষ্টি পৌঁছোয় না, যেখানে কোনো অন্তরঙ্গ মানুষেরও প্রবেশপথ নেই, যেখানে কেবল একলা তাঁরই আসনপাতা সেইখানকার দরজাটা খুলে দে, আলো জেলে তোল্। যেমন প্রভাতে সুস্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তাঁর আলোক আমাকে সর্বাঙ্গে পরিবেষ্টন করে আছে যেন ঠিক তেমনি প্রত্যক্ষ বুঝতে পারি তাঁর আনন্দ, তাঁর ইচ্ছা, তাঁর প্রেম আমার জীবনকে সর্বত্র নীরন্ধ্র নিবিড়ভাবে পরিবৃত করে আছে। তিনিও পণ করে বসে আছেন তাঁর এই আনন্দমূর্তি তিনি আমাদের জোর করে দেখাবেন না—বরঞ্চ তিনি প্রতিদিনই ফিরে ফিরে যাবেন, বরঞ্চ তাঁর এই জগৎজোড়া সৌন্দর্যের আয়োজন প্রতিদিন আমার কাছে ব্যর্থ হবে তবু তিনি এতটুকু জোর করবেন না। যেদিন আমার প্রেম জাগবে সেদিন তাঁর প্রেম. আর লেশমাত্র গোপন থাকবে না। কেন যে আমি "আমি" হয়ে এতদিন এত দুঃখে দ্বারে দ্বারে ঘুরে মরেছি সেদিন সেই বিরহদুঃখের রহস্য একমুহূর্তেই ফাঁস হয়ে যাবে।

১৯ পৌষ

প্রার্থনার সত্য

কেউ কেউ বলেন উপাসনায় প্রার্থনার কোনো স্থান নেই—উপাসনা কেবলমাত্র ধ্যান। ঈশ্বরের স্বরূপকে মনে উপলব্ধি করা।

সে কথা স্বীকার করতে পারতুম যদি জগতে আমরা ইচ্ছার কোনো প্রকাশ না দেখতে পেতুম। আমরা লোহার কাছে প্রার্থনা করি নে, পাথরের কাছে প্রার্থনা করি নে—যার ইচ্ছাবৃত্তি আছে তার কাছেই প্রার্থনা জানাই।

ঈশ্বর যদি কেবল সত্যস্বরূপ হতেন, কেবল অব্যর্থ নিয়মরূপে তাঁর প্রকাশ হত তাহলে তাঁর কাছে প্রার্থনার কথা আমাদের কল্পনাতেও উদিত হতে পারত না। কিন্তু তিনি না কি "আনন্দরূপমমৃতং," তিনি নাকি ইচ্ছাময়, প্রেমময়, আনন্দময়, সেইজন্যে কেবলমাত্র বিজ্ঞানের দ্বারা তাঁকে আমরা জানি নে, ইচ্ছার দ্বারাই তাঁর ইচ্ছাস্বরূপকে আনন্দস্বরূপকে জানতে হয়।

পূর্বেই বলেছি জগতে ইচ্ছার একটি নিদর্শন পেয়েছি সৌন্দর্যে। এই সৌন্দর্য আমাদের ইচ্ছাকে জাগ্রত করে এবং ইচ্ছার উপরেই তার নির্ভর। এইজন্য আমরা সৌন্দর্যকে উপকরণরূপে ব্যবহার করি প্রেমের ক্ষেত্রে, প্রয়োজনের ক্ষেত্রে নয়। এই জন্য আমাদের সজ্জা, সংগীত, সৌন্দর্য সেইখানেই, যেখানে ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছার যোগ, আনন্দের সঙ্গে আনন্দের মিলন। জগদীশ্বর তাঁর জগতে এই অনাবশ্যক সৌন্দর্যের এমন বিপুল আয়োজন করেছেন বলেই আমাদের হৃদয় বুঝেছে জগৎ একটি মিলনের ক্ষেত্র—নইলে এখানকার এত সাজসজ্জা একেবারেই বাহুল্য।

জগতে হৃদয়েরও একটা বোঝবার বিষয় আছে, সে কথা একেবারে উড়িয়ে দিলে চলবে কেন? একদিকে আলোক আছে বলেই আমাদের চক্ষু আছে; একদিকে সত্য আছে বলেই আমাদের চৈতন্য আছে,—একদিকে জ্ঞান আছে বলেই আমাদের বুদ্ধি আছে; তেমনি আর একদিকে কী আছে আমাদের মধ্যে হৃদয় হচ্ছে যার প্রতিরূপ? উপনিষৎ এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন—"রসোবৈ সঃ।" তিনিই হচ্ছেন রস—তিনিই আনন্দ।

পূর্বেই আভাস দিয়েছি আমরা শক্তির দ্বারা প্রয়োজন সাধন করতে পারি, যুক্তির দ্বারা জ্ঞান লাভ করতে পারি কিন্তু আনন্দের সম্বন্ধে শক্তি এবং যুক্তি কেবল দ্বার পর্যন্ত এসে ঠেকে যায়—তাদের বাইরেই দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। এই আনন্দের সঙ্গে একেবারে অন্তঃপুরের সম্বন্ধ হচ্ছে ইচ্ছার। আনন্দে কোনোরকম জোর খাটে না—সেখানে কেবল ইচ্ছা কেবল খুশি।

আমার মধ্যে এই ইচ্ছার নিকেতন হচ্ছে হৃদয়। আমার সেই ইচ্ছাময় হৃদয় কি শূন্যে প্রতিষ্ঠিত! তার পুষ্টি হচ্ছে মিথ্যায়, তার গম্য স্থান হচ্ছে ব্যর্থতার মধ্যে? তবে এই অদ্ভুত উপসর্গটা এল কোথা থেকে, একমুহূর্ত আছে কোন্‌ উপায়ে। জগতের মধ্যে কি কেবল একটিমাত্রই ফাঁকি আছে। এবং সেই ফাঁকিটিই আমার এই হৃদয়?

কখনোই নয়। আমাদের এই ইচ্ছা-রসময় হৃদয়টি জগদ্ব্যাপী ইচ্ছারসের নাড়ির সঙ্গে বাঁধা—সেইখান থেকেই সে আনন্দরস পেয়ে বেঁচে আছে—না পেলে তার প্রাণ বেরিয়ে যায়—সে অন্নবস্ত্র চায় না, বিত্তসাধ্য চায় না, অমৃত চায়, প্রেম চায়। যা চায় তা ক্ষুদ্ররূপে সংসারে এবং চরমরূপে তাঁতে আছে বলেই চায়—নইলে কেবল রুদ্ধদ্বারে মাথাখুঁড়ে মরবার জন্যে তার সৃষ্টি হয় নি।

অতএব হৃদয় আপনাকে জানে বলেই নিশ্চয় জানে তার একটি পরিপূর্ণ কৃতার্থতা অনন্তের মধ্যে আছে। ইচ্ছা কেবল তার দিকেই আছে তা নয়, অন্যদিকেও আছে—অন্যদিকে না থাকলে সে নিমেষকালও থাকত না—এতটুকু কণামাত্রও থাকত না যাতে নিশ্বাসপ্রশ্বাসরূপ প্রাণের ক্রিয়াটুকুও চলতে পারে। সেইজন্যেই উপনিষৎ এত জোর করে বলেছেন, "কোহ্যেবান্যাৎ কঃপ্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ, এষ হ্যেবানন্দয়তি" কেই বা শরীরের চেষ্টা করত, কেই বা প্রাণধারণ করত, যদি আকাশে এই আনন্দ না থাকতেন—ইনিই আনন্দ দেন।

ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছার মাঝখানে দৌত্যসাধন করে প্রার্থনা। দুই ইচ্ছার মাঝখানে যে বিচ্ছেদ আছে সেই বিচ্ছেদের উপরে ব্যাকুলবেশে দাঁড়িয়ে আছে ওই প্রার্থনা দূতী। এইজন্যে অসাধারণ সাহসের সঙ্গে বৈষ্ণব বলেছেন যে, জগতের বিচিত্র সৌন্দর্যে ভগবানের বাঁশির যে নানা সুর বেজে উঠছে সে কেবল আমাদের জন্যে তাঁর প্রার্থনা—আমাদের হৃদয়কে তিনি এই অনির্বচনীয় সংগীতে ডাক দিয়ে চাচ্ছেন সেইজন্যেই তো এই সৌন্দর্য-সংগীত আমাদের হৃদয়ের বিরহবেদনাকে জাগিয়ে তোলে।

সেই ইচ্ছাময় এমনি মধুরস্বরে যেখানে আমাদের ইচ্ছাকে চাচ্ছেন সেখানে তাঁর সমস্ত জোরকে একেবারে সংবরণ করেছেন—যে প্রচণ্ড জোরে তিনি সৌরজগৎকে সূর্যের সঙ্গে অমোঘরূপে বেঁধে দিয়েছেন, সেই জোরের লেশমাত্র এখানে নেই—সেইজন্যে এমন করুণ এমন মধুর সুরে এমন নানা বিচিত্র রসে বাঁশি বাজছে—আহ্বানের আর অন্ত নেই।

তাঁর এমন আহ্বানে আমাদেরও মনের প্রার্থনা কি জাগবে না? সে কি তার বিরহের ধূলি-আসনে লুটিয়ে কেঁদে উঠবে না? অসত্য অন্ধকার এবং মৃত্যুর নিরানন্দ

নির্বাসন থেকে অভিসারযাত্রার সময়ে এই প্রার্থনাদূতীই কি তার কম্পিত দীপশিখাটি নিয়ে আমাদের পথ দেখিয়ে চলবে না ?

যতদিন আমাদের হৃদয় আছে, যতদিন প্রেমস্বরূপ ভগবান তাঁর নানাসৌন্দর্য দ্বারা এই জগৎকে আনন্দনিকেতন করে সাজাচ্ছেন, ততদিন তাঁর সঙ্গে মিলন না হলে মানুষের বেদনা ঘুচবে কী করে ? ততদিন কোন্ সন্দেহকঠোর জ্ঞানাভিমান মানুষের প্রার্থনাকে অপমানিত করে ফিরিয়ে দিতে পারে।

এই আমাদের প্রার্থনাটি যে বিশ্বমানবের অন্তরের পঙ্কশয্যা থেকে ব্যাকুল শতদলের মতো তার সমস্ত জলরাশির আবরণ ঠেলে আলোকের অভিমুখে মুখ তুলছে—তার সমস্ত সৌগন্ধ্য এবং শিশিরাশ্রুসিক্ত সৌন্দর্য উদ্‌ঘাটিত করে দিয়ে বলছে—"অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মামৃতং গময়।" মানবহৃদয়ের এই পরিপূর্ণ প্রার্থনার পূজোপহারটিকে মোহ বলে তিরস্কৃত করতে পারে এত বড়ো নিদারুণ শুষ্কতা কার আছে ?

২০ পৌষ

বিধান

এই ইচ্ছা প্রেম আনন্দের কথাটা উঠলেই তার উলটো কথাটা এসে মনের মধ্যে আঘাত করতে থাকে। সে বলে তবে এত শাসন বন্ধন কেন ? যা চাই তা পাই নে কেন, যা চাই নে তা ঘাড়ে এসে পড়ে কেন ?

এইখানে মানুষ তর্কের দ্বারা নয় কেবলমাত্র বিশ্বাসের দ্বারা এর উত্তর দিতে চেষ্টা করছে। সে বলছে "স এব বন্ধুর্জনিতা স বিধাতা।"

অর্থাৎ যিনি আমাকে প্রকাশ করেছেন "স এব বন্ধুঃ" তিনি তো আমার বন্ধু হবেনই। আমাতে যদি তাঁর আনন্দ না থাকত তবে তো আমি থাকতুমই না। আবার "স বিধাতা।" বিধাতা আর দ্বিতীয় কেউ নয়—যিনি জনিতা, তিনিই বন্ধু, বিধানকর্তাও তিনি—অতএব বিধান যাই হ'ক মূলে কোনো ভয় নেই।

কিন্তু বিধান জিনিসটা তো খামখেয়ালি হলে চলে না ; আজ একরকম কাল অন্যরকম—আমার পক্ষে একরকম অন্যের পক্ষে অন্যরকম—কখন কী রকম তার কোনো স্থিরতা নেই, এ তো বিধান নয়। বিধান যে বিশ্ববিধান।

এই বিধানের অবিচ্ছিন্ন সূত্রে এই পৃথিবীর ধূলি থেকে নক্ষত্রলোক পর্যন্ত এক সঙ্গে গাঁথা রয়েছে। আমার সুখ সুবিধার জন্য যদি বলি, তোমার বিধানের সূত্র এক জায়গায়

ছিন্ন করে দাও—এক জায়গায় অন্য সকলের সঙ্গে আমার নিয়মের বিশেষ পার্থক্য করে দাও তাহলে বস্তুত বলা হয় যে এই কাদাটুকু পার হতে আমার কাপড়ে দাগ লাগছে অতএব এই ব্রহ্মাণ্ডের মণিহারের ঐক্যসূত্রটিকে ছিঁড়ে সমস্ত সূর্যতারাকে রাস্তায় ছড়িয়ে ফেলে দাও।

এই বিধান জিনিসটা কারও একলার নয় এবং কোনো একখণ্ড সময়ের নয়—এই বিশ্ববিধানের যোগেই সমষ্টির সঙ্গে আমরা প্রত্যেকে যুক্ত হয়ে আছি এবং কোনো কালে সে যোগের বিচ্ছেদ নেই। উপনিষৎ বলেছেন, যিনি বিশ্বের প্রভু, তিনি "যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাৎ শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ" তিনি নিত্যকাল হতে এবং নিত্যকালের জন্য সমস্তই যথার্থরূপে বিধান করছেন। এই বিধানের মূলে শাশ্বতকাল—এ বিধান অনাদি অনন্তকালের বিধান তারপরে আবার এই বিধান যাথাতথ্যতঃ বিহিত হচ্ছে—এর আদ্যোপান্তই যথাতথ্য—কোথাও ছেদ নেই, অসংগতি নেই। আধুনিক বিজ্ঞানশাস্ত্র বিশ্ববিধান সম্বন্ধে এর চেয়ে জোর করে এবং পরিষ্কার করে কিছু বলে নি।

কিন্তু শুধু তাই যদি হয়, যদি কেবল অমোঘ নিয়মের লৌহ-সিংহাসনে তিনি কেবল বিধাতারূপেই বসে থাকেন তাহলে তো সেই বিধাতার সামনে আমরা কাঠ-পাথর ধূলি-বালিরই সমান হই। তাহলে তো আমরা শিকলে বাঁধা বন্দী।

কিন্তু তিনি শুধু তো বিধাতা নন, "স এব বন্ধুঃ"—তিনিই যে বন্ধু।

বিধাতার প্রকাশ তো বিশ্বচরাচরে দেখছি, বন্ধুর প্রকাশ কোন্‌খানে? বন্ধুর প্রকাশ তো নিয়মের ক্ষেত্র নয়—সে প্রকাশ আমার অন্তরের মধ্যে প্রেমের ক্ষেত্রে ছাড়া আর কোথায় হবে?

বিধাতার কর্মক্ষেত্র এই বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে—আর বন্ধুর আনন্দনিকেতন আমার জীবাত্মায়।

মানুষ একদিকে প্রকৃতি আর একদিকে আত্মা—একদিকে রাজার খাজনা জোগায় আর একদিকে বন্ধুর ডালি সাজায়। একদিকে সত্যের সাহায্যে তাকে মঙ্গল পেতে হয়, আর একদিকে মঙ্গলের ভিতর দিয়ে তাকে সুন্দর হয়ে উঠতে হয়।

ঈশ্বরের ইচ্ছা যেদিকে নিয়মরূপে প্রকাশ পায় সেইদিকে প্রকৃতি—আর ঈশ্বরের ইচ্ছা যেদিকে আনন্দরূপে প্রকাশ পায় সেইদিকে আত্মা। এই প্রকৃতির ধর্ম বন্ধন—আর আত্মার ধর্ম মুক্তি। এই সত্য এবং আনন্দ, বন্ধন এবং মুক্তি তাঁর বাম এবং দক্ষিণ বাহু। এই দুই বাহু দিয়েই তিনি মানুষকে ধরে রেখেছেন।

যেদিকে আমি ইঁট কাঠ গাছ পাথরের সমান সেই সাধারণ দিকে ঈশ্বরের সর্বব্যাপী নিয়ম কোনো মতেই আমাকে সাধারণ থেকে লেশমাত্র তফাত হতে দেয় না—আর

যেদিকে আমি বিশেষ ভাবে আছি সেই স্বাতন্ত্র্যের দিকে ঈশ্বরের বিশেষ আনন্দ কোনো মতেই আমাকে সকলের সঙ্গে মিলে যেতে দেয় না। বিধাতা আমাকে সকলের করেছেন আর বন্ধু আমাকে আপনার করেছেন—সেই সকলের সামগ্রী আমার প্রকৃতি, আর সেই তাঁর আপনার সামগ্রী আমার জীবাত্মা।

২১ পৌষ।

তিন

প্রকৃতির দিকে নিয়ম, আর আমাদের আত্মার দিকে আনন্দ। নিয়মের দ্বারাই নিয়মের সঙ্গে এবং আনন্দের দ্বারাই আনন্দের সঙ্গে আমাদের যোগ হতে পারে।

এইজন্যে যেদিকে আমি সর্বসাধারণের, যেদিকে আমি বিশ্বপ্রকৃতির, যেদিকে আমি মানবপ্রকৃতির, সেদিকে যদি আমি নিজেকে নিয়মের অনুগত না করি, তাহলে আমি কেবলই ব্যর্থ হই এবং অশান্তির সৃষ্টি করি। একটি ধূলিকণার কাজ থেকেও আমি ভুলিয়ে কাজ আদায় করতে পারি নে—তার নিয়ম আমি মানলে তবেই সে আমার নিয়ম মানে।

এইজন্যে আমাদের প্রথম শিক্ষা হচ্ছে প্রকৃতির নিয়ম শিক্ষা এবং নিজেকে নিয়মের অনুগত করতে শেখা। এই শিক্ষার দ্বারাই আমরা সত্যের পরিচয় লাভ করি।

এই শিক্ষাটির পরিণাম যিনি, তিনিই হচ্ছেন "শান্তম্"। যেখানেই নিয়মের ভ্রষ্টতা যেখানেই নিয়মের সঙ্গে নিয়মের যোগ হয় নি সেইখানেই অশান্তি। যেখানেই পরিপূর্ণ যোগ হয়েছে সেখানেই শান্তম্ যিনি, তাঁর পরিপূর্ণ উপলব্ধি।

প্রকৃতির মধ্যে ঈশ্বরের কোন্ স্বরূপ দেখতে পাই? তাঁর শান্তস্বরূপ। সেখানে, যারা ক্ষুদ্র করে দেখে তারা প্রয়াসকে দেখে, যারা বৃহৎ করে দেখে তারা শান্তিকেই দেখতে পায়। যদি নিয়ম ছিন্ন হত, যদি নিয়ম শাশ্বত এবং যথাতথ না হত, তাহলে মুহূর্তের মধ্যে এই বিপুল বিশ্বশান্তি ধ্বংস হয়ে একটি অর্থহীন পরিণামহীন প্রলয়ের প্রচণ্ড নৃত্য আরম্ভ হত, তাহলে বিশ্বসংসারে বিরোধই জয়ী হয়ে তার নখদন্ত দিয়ে সমস্ত ছিন্নভিন্ন করে ফেলত। কিন্তু চেয়ে দেখো, সূর্যনক্ষত্রলোকের প্রবল উত্তেজনার মধ্যে অটল নিয়মাসনে মহাশান্তি বিরাজ করছেন। সত্যের স্বরূপই হচ্ছে শান্তম্।

সত্য শান্তম্ বলেই শিবম্। শান্তম্ বলেই তিনি সকলকে ধারণ করেন, রক্ষা করেন, সকলেই তাঁতে ধ্রুব আশ্রয় পেয়েছে। আমরাও যেখানে সংযত না হয়েছি অর্থাৎ যেখানে

সত্যকে জানি নি এবং সত্যের সঙ্গে সত্যরক্ষা করে চলি নি সেখানে আমাদের অন্তরে বাহিরে অশান্তি এবং সেই অশান্তিই অমঙ্গল—নিয়মের সঙ্গে নিয়মের বিচ্ছেদই অশিব।

যিনি শিবম্‌ তাঁর মধ্যেই অদ্বৈতম্‌ প্রকাশমান। সত্য যেখানে শিবস্বরূপ, সেইখানেই তিনি আনন্দময় প্রেমময়, সেইখানেই তাঁর সকলের সঙ্গে মিলন। মঙ্গলের মধ্যে ছাড়া মিলন নেই—অমঙ্গলই হচ্ছে বিরোধ বিচ্ছেদের অপদেবতা।

একদিকে সত্য অন্যদিকে আনন্দ, মাঝখানে মঙ্গল। তাই এই মঙ্গলের মধ্যে দিয়েই আমাদের আনন্দলোকে যেতে হয়।

আমাদের দেশে যে তিন আশ্রম ছিল—ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য ও বানপ্রস্থ, তা ঈশ্বরের এই তিন স্বরূপের উপর প্রতিষ্ঠিত। শান্তস্বরূপ, শিবস্বরূপ, অদ্বৈতস্বরূপ।

ব্রহ্মচর্যের দ্বারা জীবনে শান্তস্বরূপকে লাভ করলে তবে গৃহধর্মের মধ্যে শিবস্বরূপকে উপলব্ধি করা সম্ভবপর হয়—নতুবা গার্হস্থ্য অকল্যাণের আকর হয়ে ওঠে। সংসারে সেই মঙ্গলের প্রতিষ্ঠা করতে হলেই স্বার্থবৃত্তিসকল সম্পূর্ণ পরাহত হয় এবং যথার্থ মিলনের ধর্ম যে কিরূপ নির্মল আত্মবিসর্জনের উপরে স্থাপিত তা আমরা বুঝতে পারি। যখন তা সম্পূর্ণ বুঝি তখনই যিনি অদ্বৈতম্‌ সেই ঐক্যরূপী পরমাত্মার সঙ্গে সর্বপ্রকার বাধাহীন প্রেমের মিলন সম্ভবপর হয়। আরম্ভে সত্যের পরিচয়, মধ্যে মঙ্গলের পরিচয়, পরিণামে আনন্দের পরিচয়। প্রথমে জ্ঞান, পরে কর্ম, পরে প্রেম।

এইজন্যে যেমন আমাদের ধ্যানের মন্ত্র শান্তম্‌ শিবম্‌ অদ্বৈতম্‌—তেমনি আমাদের প্রার্থনার মন্ত্র “অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মামৃতং গময়।” অসত্য হতে সত্যে, পাপ হতে পুণ্যে এবং আসক্তি হতে প্রেমে নিয়ে যাও। তবেই হে প্রকাশ, তুমি আমার প্রকাশ হবে, তবেই হে রুদ্র, আমার জীবনে তুমি প্রসন্ন হয়ে উঠবে।

সত্যে শেষ নয়, মঙ্গলে শেষ নয়, অদ্বৈতেই শেষ। জগৎপ্রকৃতিতে শেষ নয়, সমাজপ্রকৃতিতেও শেষ নয়, পরমাত্মাতেই শেষ, এই হচ্ছে আমাদের ভারতবর্ষের বাণী—এই বাণীটিকে জীবনে যেন সার্থক করতে পারি এই আমাদের প্রার্থনা হ'ক।

২১ পৌষ

পার্থক্য

ঈশ্বর যে কেবল মানুষকেই পার্থক্য দান করেছেন আর প্রকৃতির সঙ্গে মিলে এক হয়ে রয়েছেন একথা বললে চলবে কেন? প্রকৃতির সঙ্গেও তাঁর একটি স্বাতন্ত্র্য আছে নইলে প্রকৃতির উপরে তাঁর তো কোনো ক্রিয়া চলত না।

তফাত এই যে, মানুষ জানে সে স্বতন্ত্র—শুধু তাই নয়, সে এও জানে যে ওই স্বাতন্ত্র্যে তার অপমান নয় তার গৌরব। বাপ যখন বয়ঃপ্রাপ্ত ছেলেকে নিজের তহবিল থেকে একটি স্বতন্ত্র তহবিল করে দেন তখন এই পার্থক্যের দ্বারা তাকে তিরস্কৃত করেন না—বস্তুত এই পার্থক্যেই তাঁর একটি বিশেষ স্নেহ প্রকাশ পায় এবং এই পার্থক্যের মহাগৌরবটুকু মানুষ কোনোমতেই ভুলতে পারে না।

মানুষ নিজের সেই স্বাতন্ত্র্য-গৌরবের অধিকারটি নিয়ে নিজে ব্যবহার করছে। প্রকৃতির মধ্যে সেই অহংকার নেই, সে জানে না সে কী পেয়েছে।

ঈশ্বর এই প্রকৃতিকে কী দিয়ে পৃথক করে দিয়েছেন? নিয়ম দিয়ে।

নিয়ম দিয়ে না যদি পৃথক করে দিতেন তাহলে প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর ইচ্ছার যোগ থাকত না। একাকার হয়ে থাকলে ইচ্ছার গতিবিধির পথ থাকে না।

যে লোক দাবাবড়ে খেলায় নিজের ইচ্ছাকে প্রয়োগ করতে চায় সে প্রথমে নিজের ইচ্ছাকে বাধা দেয়। কেমন করে? নিয়ম রচনা করে। প্রত্যেক ঘুঁটিকে সে নিয়মে বদ্ধ করে দেয়। এই যে নিয়ম এ বস্তুত ঘুঁটির মধ্যে নেই—যে খেলবে তারই ইচ্ছার মধ্যে। ইচ্ছা নিজেই নিয়ম স্থাপন করে সেই নিয়মের উপরে নিজেকে প্রয়োগ করতে থাকে তবেই খেলা সম্ভব হয়।

বিশ্বজগতে ঈশ্বর জলের নিয়ম, স্থলের নিয়ম, বাতাসের নিয়ম, আলোর নিয়ম, মনের নিয়ম, নানা প্রকার নিয়ম বিস্তার করে দিয়েছেন। এই নিয়মকেই আমরা বলি সীমা। এই সীমা প্রকৃতি কোথাও থেকে মাথায় করে এনেছে তা তো নয়। তার ইচ্ছাই নিজের মধ্যে এই নিয়মকে এই সীমাকে স্থাপন করেছে—নতুবা, ইচ্ছা বেকার থাকে, কাজ পায় না। এইজন্যেই যিনি অসীম তিনিই সীমার আকর হয়ে উঠেছেন—কেবলমাত্র ইচ্ছার দ্বারা, আনন্দের দ্বারা। সেই কারণেই উপনিষৎ বলেন, “আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে।” সেইজন্যেই বলেন “আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি” যিনি প্রকাশ পাচ্ছেন তাঁর যা কিছু রূপ তা আনন্দরূপ—অর্থাৎ মূর্তিমান ইচ্ছা—ইচ্ছা আপনাকে সীমায় বেঁধেছে, রূপে বেঁধেছে।

প্রকৃতিতে ঈশ্বর নিয়মের দ্বারা সীমার দ্বারা যে পার্থক্য সৃষ্টি করে দিয়েছেন সে যদি

কেবলমাত্রই পার্থক্য হত তাহলে জগৎ তো সমষ্টিরূপ ধারণ করত না। তাহলে অসংখ্য বিচ্ছিন্নতা এমনি বিচ্ছিন্ন হত যে কেবলমাত্র সংখ্যাসূত্রেও তাদের একাকারে আনবার কিছুই থাকত না।

অতএব এর মধ্যে আর একটি জিনিস আছে যা এই চিরন্তন পার্থক্যকে চিরকালই অতিক্রম করছে। সেটি কী? সেটি হচ্ছে শক্তি। ঈশ্বরের শক্তি এই সমস্ত পার্থক্যের উপর কাজ করে একে এক অভিপ্রায়ে বাঁধছে। সমস্ত স্বতন্ত্র নিয়মবদ্ধ দাবাবড়ের ঘুঁটির মধ্যে একই খেলোয়াড়ের শক্তি একটি এক-তাৎপর্যবিশিষ্ট খেলাকে অভিব্যক্ত করে তুলছে।

এইজন্যই তাঁকে ঋষিরা বলেছেন "কবিঃ"। কবি যেমন ভাষার স্বাতন্ত্র্যকে নিজের ইচ্ছার অধীনে নিজের শক্তির অনুগত করে সুন্দর ছন্দোবিন্যাসের ভিতর দিয়ে একটি আশ্চর্য অর্থ উদ্ভাবিত করে তুলছে—তিনিও তেমনি "বহুধাশক্তি যোগাৎ বর্ণাননেকান্নিহিতার্থোদধাতি" অর্থাৎ শক্তিকে বহুর মধ্যে চালিত করে বহুর সঙ্গে যুক্ত করে অনেক বর্ণের ভিতর থেকে একটি নিহিত অর্থ ফুটিয়ে তুলছেন—নইলে সমস্তই অর্থহীন হত।

"শক্তিযোগাৎ" শক্তি যোগের দ্বারা। শক্তি একটি যোগ। এই যোগের দ্বারাই ঈশ্বর সীমাদ্বারা পৃথক্‌কৃত প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন - নিয়মের সীমারূপ পার্থক্যের মধ্যে দাঁড়িয়ে তাঁর শক্তি দেশের সঙ্গে দেশান্তরের, রূপের সঙ্গে রূপান্তরের, কালের সঙ্গে কালান্তরের বহুবিচিত্রসংযোগ সাধন করে এক অপূর্ব বিশ্বকাব্য সৃজন করে চলেছে।

এমনি করে যিনি অসীম তিনি সীমার দ্বারাই নিজেকে ব্যক্ত করছেন, যিনি অকালস্বরূপ খণ্ডকালের দ্বারা তাঁর প্রকাশ চলেছে। এই পরমাশ্চর্য রহস্যকেই বিজ্ঞানশাস্ত্রে বলে পরিণামবাদ। যিনি আপনাতেই আপনি পর্যাপ্ত তিনি ক্রমের ভিতর দিয়ে নিজের ইচ্ছাকে বিচিত্ররূপে মূর্তিমান করছেন—জগৎ-রচনায় করছেন, মানবসমাজের ইতিহাসে করছেন।

প্রকৃতির মধ্যে নিয়মের সীমাই হচ্ছে পার্থক্য, আর আত্মার মধ্যে অহংকারের সীমাই হচ্ছে পার্থক্য। এই সীমা যদি তিনি স্থাপিত না করতেন তাহলে তাঁর প্রেমের লীলা কোনোমতে সম্ভবপর হত না। জীবাত্মার স্বাতন্ত্র্যের ভিতর দিয়ে তাঁর প্রেম কাজ করছে। তাঁর শক্তির ক্ষেত্র হচ্ছে নিয়মবদ্ধ প্রকৃতি, আর তাঁর প্রেমের ক্ষেত্র হচ্ছে অহংকারবদ্ধ জীবাত্মা। এই অহংকারকে জীবাত্মার সীমা বলে তাকে তিরস্কার করলে চলবে না। জীবাত্মার এই অহংকারে পরমাত্মা নিজের আনন্দের মধ্যে সীমা স্থাপন করেছেন—নতুবা তাঁর আনন্দের কোনো কর্ম থাকে না।

এই অহংকারে যদি কেবল পার্থক্যই সর্বপ্রধান হত তাহলে আত্মায় আত্মায় বিরোধ হবার মতোও সংঘাত ঘটতে পারত না—আত্মার সঙ্গে আত্মার কোনো দিক থেকে কোনো সংস্পর্শই থাকতে পারত না। কিন্তু তাঁর প্রেম সমস্ত আত্মাকে আত্মীয় করবার পথে চলেছে, পরস্পরকে যোজনা করে প্রত্যেক স্বাতন্ত্র্যের নিহিতার্থটিকে জাগ্রত করে তুলছে। নতুবা জীবাত্মার স্বাতন্ত্র্য ভয়ংকর নিরর্থক হত।

এখানেও সেই আশ্চর্য রহস্য। পরিপূর্ণ আনন্দ অপূর্ণের দ্বারাই আপনার আনন্দলীলা বিকশিত করে তুলছেন। বহুতর দুঃখ সুখ বিচ্ছেদ মিলনের ভিতর দিয়ে ছায়ালোক-বিচিত্র এই প্রেমের অভিব্যক্তি কেবলই অগ্রসর হচ্ছে। স্বার্থ ও অভিমানের ঘাত প্রতিঘাতে কত আঁকা বাঁকা পথ নিয়ে, কত বিস্তারের মধ্যে দিয়ে, ছোটোবড়ো কত আসক্তি অনুরক্তিকে বিদীর্ণ করে জীবাত্মার প্রেমের নদী প্রেমসমুদ্রের দিকে গিয়ে মিলছে। প্রেমের শতদল পদ্ম অহংকারের বৃন্ত আশ্রয় করে আত্ম হতে গৃহে, গৃহ হতে সমাজে, সমাজ হতে দেশে, দেশ হতে মানবে, মানব হতে বিশ্বাত্মায় ও বিশ্বাত্মা হতে পরমাত্মায় একটি একটি করে পাপড়ি খুলে দিয়ে বিকাশের লীলা সমাধান করছে।

২৩ পৌষ

প্রকৃতি

প্রকৃতি ঈশ্বরের শক্তির ক্ষেত্র, আর জীবাত্মা তাঁর প্রেমের ক্ষেত্র একথা বলা হয়েছে। প্রকৃতিতে শক্তির দ্বারা তিনি নিজেকে ‘প্রচার’ করছেন, আর জীবাত্মায় প্রেমের দ্বারা তিনি নিজেকে ‘দান’ করছেন।

অধিকাংশ মানুষ এই দুই দিকে ওজন সমান রেখে চলতে পারে না। কেউ বা প্রাকৃতিক দিকেই সাধনা প্রয়োগ করে, কেউ বা আধ্যাত্মিক দিকে। ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যেও এসম্বন্ধে ভিন্নতা প্রকাশ পায়।

প্রকৃতির ক্ষেত্রে যাদের সাধনা তারা শক্তি লাভ করে, তারা ঐশ্বর্যশালী হয়, তারা রাজ্য সাম্রাজ্য বিস্তার করে। তারা অন্নপূর্ণার বরলাভ করে পরিপুষ্ট হয়।

তারা সর্ববিষয়ে বড়ো হয়ে ওঠবার জন্যে পরস্পর ঠেলাঠেলি করতে করতে একটা খুব বড়ো জিনিস লাভ করে। অর্থাৎ তাদের মধ্যে যাঁরা শ্রেষ্ঠ তাঁদের শ্রেষ্ঠলাভ হচ্ছে ধর্মনীতি।

কারণ, বড়ো হয়ে উঠতে গেলে, শক্তিশালী হয়ে উঠতে গেলেই অনেকের সঙ্গে মিলতে হয়। এই মিলন সাধনের উপরেই শক্তির সার্থকতা নির্ভর করে। কিন্তু বড়ো রকমে, স্থায়ী রকমে, সকলের চেয়ে সার্থক রকমে, মিলতে গেলেই এমন একটি নিয়মকে স্বীকার করতে হয় যা মঙ্গলের নিয়ম—অর্থাৎ বিশ্বের নিয়ম—অর্থাৎ ধর্মনীতি। এই নিয়মকে স্বীকার করলেই সমস্ত বিশ্ব আনুকূল্য করে—যেখানে অস্বীকার করা যায় সেইখানেই সমস্ত বিশ্বের আঘাত লাগতে থাকে—সেই আঘাত লাগতে লাগতে কোন্ সময়ে যে ছিদ্র দেখা দেয় তা চোখেই পড়ে না—অবশেষে বহুদিনের কীর্তি দেখতে দেখতে ভূমিসাৎ হয়ে যায়।

যাঁরা শক্তির ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে কাজ করেন তাঁদের বড়ো বড়ো সাধকেরা এই নিয়মকে বিশেষ করে আবিষ্কার করেন। তাঁরা জানেন নিয়মই শক্তির প্রতিষ্ঠাস্থল, তা ঈশ্বরের সম্বন্ধেও যেমন মানুষের সম্বন্ধেও তেমনি। নিয়মকে যেখানে লঙ্ঘন করব শক্তিকে সেইখানেই নিরাশ্রয় করা হবে। যার আপিসে নিয়ম নেই সে অশক্ত কর্মী। যার গৃহে নিয়ম নেই সে অশক্ত গৃহী। যে রাষ্ট্রব্যাপারে নিয়ম লঙ্ঘন হয় সেখানে অশক্ত শাসনতন্ত্র। যার বুদ্ধি বিশ্বব্যাপারে নিয়মকে দেখতে পায় না সে জীবনের সর্ব বিষয়েই অশক্ত, অকৃতার্থ, পরাভূত।

এইজন্য যথার্থ শক্তির সাধকেরা নিয়মকে বুদ্ধিতে স্বীকার করেন, বিশ্বে স্বীকার করেন, নিজের কর্মে স্বীকার করেন। এইজন্যেই তাঁরা যোজনা করতে পারেন, রচনা করতে পারেন, লাভ করতে পারেন। এইরূপে তাঁরা যে পরিমাণে সত্যশালী হন সেই পরিমাণেই ঐশ্বর্যশালী হয়ে উঠতে থাকেন।

কিন্তু এর একটি মুশকিল হচ্ছে এই যে, অনেক সময়ে তাঁরা এই ধর্মনীতিকেই মানুষের শেষ সম্বল বলে জ্ঞান করেন। যার সাহায্যে কেবলই কর্ম করা যায়, কেবলই শক্তি, কেবলই উন্নতি লাভ করা যায় সেইটেকেই তাঁরা চরম শ্রেয় বলে জানেন। এইজন্যে বৈজ্ঞানিক সত্যকেই তাঁরা চরম সত্য বলে জ্ঞান করেন এবং সকল কর্মের আশ্রয়ভূত ধর্মনীতিকেই তাঁরা পরম পদার্থ বলে অনুভব করেন।

কিন্তু যারা শক্তির ক্ষেত্রেই তাদের সমস্ত পাওয়াকে সীমাবদ্ধ করে রাখে তারা ঐশ্বর্যকে পায়, ঈশ্বরকে পায় না। কারণ ঈশ্বর সেখানে নিজেকে প্রচ্ছন্ন রেখে নিজের ঐশ্বর্যকে উদ্‌ঘাটন করেছেন।

এই অনন্ত ঐশ্বর্যসমুদ্র পার হয়ে ঈশ্বরে গিয়ে পৌঁছোবে এমন সাধ্য কার আছে। ঐশ্বর্যের তো অন্ত নেই, শক্তিরও শেষ নেই। সেইজন্যে ওপথে ক্রমাগতই অন্তহীন একের থেকে আরের দিকে চলতে হয়। সেইজন্যেই মানুষ এই রাস্তায় চলতে চলতে

বলতে থাকে—ঈশ্বর নেই, কেবলই এই আছে, এবং এই আছে; আর আছে, এবং আরও আছে।

ঈশ্বরের সমান না হতে পারলে তাঁকে উপলব্ধি করব কী করে? আমরা যতই রেলগাড়ি চালাই আর টেলিগ্রাফের তার বসাই শক্তিক্ষেত্রে আমরা ঈশ্বর হতে অনন্ত দূরে থেকে যাই। যদি স্পর্ধা করে তাঁর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করবার চেষ্টা করি তাহলে আমাদের চেষ্টা আপন অধিকারকে লঙ্ঘন করে ব্যাসকাশীর মতো অভিশপ্ত এবং বিশ্বামিত্রের সৃষ্টজগতের মতো বিনাশপ্রাপ্ত হয়।

এইজন্যই জগতের সমস্ত ধর্মসাধকেরা বারংবার বলেছেন, ঐশ্বর্যপথের পথিকদের পক্ষে ঈশ্বরদর্শন অত্যন্ত দুঃসাধ্য। অন্তহীন চেষ্টা চরমতাহীন পথে তাদের কেবলই ভুলিয়ে ভুলিয়ে নিয়ে যায়।

অতএব ঈশ্বরকে বাহিরে অর্থাৎ তাঁর শক্তির ক্ষেত্রে কোনো জায়গায় আমরা লাভ করতে পারি নে। সেখানে যে বালুকণাটির অন্তরালে তিনি রয়েছেন সেই বালুকণাটিকে নিঃশেষে অতিক্রম করে এমন সাধ্য কোনো বৈজ্ঞানিকের কোনো যান্ত্রিকের নেই। অতএব শক্তির ক্ষেত্রে যে লোক ঈশ্বরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে যায় সে অর্জুনের মতো ছদ্মবেশী মহাদেবকে বাণ মারে—সে বাণ তাঁকে স্পর্শ করে না—সেখানে না হেরে উপায় নেই।

এই শক্তির ক্ষেত্রে আমরা ঈশ্বরের দুই মূর্তি দেখতে পাই এক হচ্ছে অন্নপূর্ণা মূর্তি—এই মূর্তি ঐশ্বর্যের দ্বারা আমাদের শক্তিকে পরিপুষ্ট করে তোলে; আর এক হচ্ছে করালী কালী মূর্তি—এই মূর্তি আমাদের সীমাবদ্ধ শক্তিকে সংহরণ করে নেয়; আমাদের কোনো দিক দিয়ে শক্তির চরমতায় যেতে দেয় না – না টাকায়, না খ্যাতিতে, না অন্য কোনো বাসনার বিষয়ে। বড়ো বড়ো রাজ্যসাম্রাজ্য ধূলিসাৎ হয়ে যায়—বড়ো বড়ো ঐশ্বর্যভাণ্ডার ভুক্তশেষ নারিকেলের খোলার মতো পড়ে থাকে। এখানে পাওয়ার মূর্তি খুব সুন্দর, উজ্জ্বল এবং মহিমান্বিত, কিন্তু যাওয়ার মূর্তি, হয় বিষাদে পরিপূর্ণ নয় ভয়ংকর। তা শূন্যতার চেয়ে শূন্যতর, কারণ, তা পূর্ণতার অন্তর্ধান।

কিন্তু যেমনই হ'ক এখানে পাওয়াও চরম নয়, যাওয়াও চরম নয়—এখানে পাওয়া এবং যাওয়ার আবর্তন কেবলই চলেছে। সুতরাং এই শক্তির ক্ষেত্র মানুষের স্থিতির ক্ষেত্র নয়। এর কোনোখানে এসে মানুষ চিরদিনের মতো বলে না যে এইখানে পৌঁছোনো গেল।

২৪ পৌষ

গ্রন্থ-পরিচয়

[রচনাবলীর বর্তমান খণ্ডে মুদ্রিত গ্রন্থগুলির প্রথম প্রকাশের তারিখ ও গ্রন্থসংক্রান্ত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য গ্রন্থ-পরিচয়ে সংকলিত হইল। এই খণ্ডে মুদ্রিত কোনো কোনো রচনা সম্বন্ধে কবির নিজের মন্তব্যও এই বিভাগে মুদ্রিত হইল। পূর্ণতর তথ্যসংগ্রহ সর্বশেষ খণ্ডে একটি পঞ্জীতে প্রকাশিত হইবে।]

পলাতকা

পলাতকা ১৩২৫ (১৯১৮) সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

শিশু ভোলানাথ

শিশু ভোলানাথ ১৩২৯ (১৯২২) সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

শিশু ভোলানাথ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারিতে ('যাত্রী') লিখিয়াছেন :

> একজন অপরিচিত যুবকের সঙ্গে একদিন এক-মোটরে নিমন্ত্রণ-সভায় যাচ্ছিলুম। তিনি আমাকে কথাপ্রসঙ্গে খবর দিলেন যে, আজকাল পদ্য আকারে যে-সব রচনা করছি সেগুলি লোকে তেমন পছন্দ করছে না। যারা পছন্দ করছে না তাদের সুযোগ্য প্রতিনিধিস্বরূপে তিনি উল্লেখ করলেন তাঁর কোনো কোনো আত্মীয়ের কথা—সেই আত্মীয়েরা কবি ;—আর যে-সব পদ্য-রচনা লোকে পছন্দ করে না, তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করলেন আমার গানগুলো, আর আমার শিশু ভোলানাথ নামক আধুনিক কাব্যগ্রন্থ। তিনি বললেন, আমার বন্ধুরাও আশঙ্কা করছেন আমার কাব্য লেখবার শক্তি ক্রমেই ম্লান হয়ে আসছে।
>
> কালের ধর্মই এই। মর্ত্যলোকে বসন্ত-ঋতু চিরকাল থাকে না। মানুষের ক্ষমতার ক্ষয় আছে, অবসান আছে। যদি কখনো কিছু দিয়ে থাকি, তবে মূল্য দেবার সময় তারই হিসাবটা স্মরণ করা ভালো। রাত্রিশেষে দীপের আলো নেববার সময় যখন সে তার শিখার পাখাতে বার-কতক শেষ ঝাপটা দিয়ে লীলা সাঙ্গ করে, তখন আশা দিয়ে নিরাশ করবার দাবিতে প্রদীপের নামে নালিশ করাটা বৈধ নয়। দাবিটাই যার বেহিসাবী, দাবি অপূরণ হবার হিসাবটাতেও তার ভুল থাকবেই। পঁচানব্বই বছর বয়সে একটা মানুষ

ফস করে মারা গেল বলে চিকিৎসাশাস্ত্রটাকে ধিক্‌কার দেওয়া বৃথা বাক্যব্যয়। অতএব কেউ যদি বলে আমার বয়স যতই বাড়ছে আমার আয়ু ততই কমে যাচ্ছে, তাহলে তাকে আমি নিন্দুক বলি নে, বড়োজোর এই বলি যে, লোকটা বাজে কথা এমনভাবে বলে যেন সেটা দৈববাণী। কালক্রমে আমার ক্ষমতা হ্রাস হয়ে যাচ্ছে, এই বিধিলিপি নিয়ে যুবক হোক বৃদ্ধ হোক, কবি হোক অকবি হোক, কারো সঙ্গে তকরার করার চেয়ে ততক্ষণ একটা গান লেখা ভালো মনে করি, তা সেটা পছন্দসই হোক আর না হোক। এমন কি সেই অবসরে শিশু ভোলানাথের জাতের কবিতা যদি লিখতে পারি, তাহলেও মনটা খুশি থাকে।...

ওই শিশু ভোলানাথের কবিতাগুলো খামকা কেন লিখতে বসেছিলুম? সেও লোকরঞ্জনের জন্যে নয়,—নিতান্ত নিজের গরজে।

পূর্বেই বলেছি, কিছুকাল আমেরিকার প্রৌঢ়তার মরুপারে ঘোরতর কার্যপটুতার পাথরের দুর্গে আটকা পড়েছিলুম। সেদিন খুব স্পষ্ট বুঝেছিলুম জমিয়ে তোলবার মতো. এতবড়ো মিথ্যে ব্যাপার জগতে আর কিছুই নেই। এই জমাবার জমাদারটা বিশ্বের চিরচঞ্চলতাকে বাধা দেবার স্পর্ধা করে; কিন্তু কিছুই থাকবে না, আজ বাদে কাল সব সাফ হয়ে যাবে। যে-স্রোতের ঘূর্ণিপাকে এক-এক জায়গায় এই সব বস্তুর পিণ্ডগুলোকে স্তূপাকার করে দিয়ে গেছে, সেই স্রোতেরই অবিরত বেগে *ঠেলে ঠেলে* সমস্ত ভাসিয়ে নীল সমুদ্রে নিয়ে যাবে—পৃথিবীর বক্ষ সুস্থ হবে। পৃথিবীতে সৃষ্টির যে লীলাশক্তি আছে সে যে নির্লোভ, সে নিরাসক্ত, সে অকৃপণ,—সে কিছু জমতে দেয় না; কেননা জমার জঞ্জালে তার সৃষ্টির পথ আটকায়,—সে যে নিত্যনূতনের নিরন্তর প্রকাশের জন্যে তার অবকাশকে নির্মল করে রেখে দিতে চায়। লোভী মানুষ কোথা থেকে জঞ্জাল জড়ো করে সেইগুলোকে আগলে রাখবার জন্যে নিগড়বদ্ধ লক্ষ লক্ষ দাসকে দিয়ে প্রকাণ্ড সব ভাণ্ডার তৈরি করে তুলছে। সেই ধ্বংসশাপগ্রস্ত ভাণ্ডারের কারাগারে জড়বস্তুপুঞ্জের অন্ধকারে বাসা বেঁধে সঞ্চয়গর্বের ঔদ্ধত্যে মহাকালকে কৃপণটা বিদ্রূপ করছে,—এ বিদ্রূপ মহাকাল কখনোই সইবে না। আকাশের উপর দিয়ে যেমন ধুলানিবিড় আঁধি ক্ষণকালের জন্যে সূর্যকে পরাভূত করে দিয়ে তার পরে নিজের দৌরাত্ম্যের কোনো চিহ্ন না রেখে চলে যায়, এ-সব তেমনি করেই শূন্যের মধ্যে বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

কিছুকালের জন্যে আমি এই বস্তু-উদ্‌গারের অন্ধযন্ত্রের মুখে এই বস্তুসঞ্চয়ের

অন্ধভাণ্ডারে বদ্ধ হয়ে আতিথ্যহীন সন্দেহের বিষবাষ্পে শ্বাসরুদ্ধপ্রায় অবস্থায় কাটিয়েছিলুম। তখন আমি এই ঘন দেয়ালের বাইরের রাস্তা থেকে চিরপথিকের পায়ের শব্দ শুনতে পেতুম। সেই শব্দের ছন্দই যে আমার রক্তের মধ্যে বাজে, আমার ধ্যানের মধ্যে ধ্বনিত হয়। আমি সেদিন স্পষ্ট বুঝেছিলুম, আমি ওই পথিকের সহচর।

আমেরিকার বস্তুগ্রাস থেকে বেরিয়ে এসেই শিশু ভোলানাথ লিখতে বসেছিলুম। বন্দী যেমন ফাঁক পেলেই ছুটে আসে সমুদ্রের ধারে হাওয়া খেতে তেমনি করে। দেয়ালের মধ্যে কিছুকাল সম্পূর্ণ আটকা পড়লে তবেই মানুষ স্পষ্ট করে আবিষ্কার করে, তার চিত্তের জন্যে এতবড়ো আকাশেরই ফাঁকাটা দরকার। প্রবীণের কেল্লার মধ্যে আটকা পড়ে সেদিন আমি তেমনি করেই আবিষ্কার করেছিলুম, অন্তরের মধ্যে যে-শিশু আছে তারই খেলার ক্ষেত্র লোকে-লোকান্তরে বিস্তৃত। এইজন্যে কল্পনায় সেই শিশুলীলার মধ্যে ডুব দিলুম, সেই শিশুলীলার তরঙ্গে সাঁতার কাটলুম, মনটাকে স্নিগ্ধ করবার জন্যে, নির্মল করবার জন্যে, মুক্ত করবার জন্যে।…

৭ অক্টোবর ১৯২৪

"সময়হারা" কবিতাটি ১৩৩০ বৈশাখের সন্দেশ পত্রিকা হইতে শিশু ভোলানাথ গ্রন্থে রচনাবলী-সংস্করণে নূতন সংকলিত হইল।

গুরু

গুরু ১৩২৫ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এই নাটকটি অচলায়তনের "কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত এবং লঘুতর" আকার। এই রূপান্তরে রবীন্দ্রনাথ অচলায়তনের অনেক অংশ বর্জন করেন এবং কয়েকটি নূতন অংশ যোগ করেন।

বর্তমান সংস্করণের পাঠ প্রস্তুত করিতে গুরুর পাণ্ডুলিপি শ্রীসুহৃৎকুমার মুখোপাধ্যায়ের সৌজন্যে ব্যবহার করিবার সুযোগ পাইয়াছি।

গুরু প্রসঙ্গে অচলায়তনের গ্রন্থপরিচয় (রবীন্দ্র-রচনাবলী, একাদশ খণ্ড) দ্রষ্টব্য।

অরূপ রতন

অরূপ রতন ১৩২৬ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। "এই নাট্য-রূপকটি রাজা নাটকের অভিনয়যোগ্য সংক্ষিপ্ত সংস্করণ নূতন করিয়া পুনর্লিখিত।" অভিনয় উপলক্ষ্যে

১৩৪২ সালে অরূপ রতনের পুনঃপরিবর্তিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়—রবীন্দ্র-রচনাবলীতে এই সংস্করণের পাঠ মুদ্রিত হইয়াছে।

অরূপ রতন প্রসঙ্গে রাজার গ্রন্থপরিচয় (রবীন্দ্র-রচনাবলী, দশম খণ্ড) দ্রষ্টব্য।

ঋণশোধ

ঋণশোধ ১৩২৮ (১৯২১) সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। ইহা শারদোৎসবের রূপান্তর।

১৩২৮ সালের আশ্বিনে শান্তিনিকেতনে অভিনয়োপলক্ষে ইহাতে কয়েকটি নূতন অংশ যোজিত হয়, অভিনয়সৌকর্যের জন্য কোনো কোনো অংশ বর্জিত হয় ; এই পরিবর্তনগুলি কোথাও মুদ্রিত আকারে নাই। শ্রীপ্রমথনাথ বিশী এই অভিনয়ে প্রতিকার ছিলেন, তাঁহার সৌজন্যে অভিনয়ের সময়ে তাঁহার ব্যবহৃত পুস্তকখানি দেখিবার সুযোগ পাইয়াছি ; অভিনয়-উপলক্ষ্যে নূতন-লিখিত বলিয়া নির্দিষ্ট অংশগুলি উহা হইতে নিচে মুদ্রিত হইল :

[১] পৃ. ২২৫, 'সকল ছেলে জুটি'র পরে বসিবে। তুলনীয় পৃ. ২৩০-৩১।

[প্রথম বালক।] ও ভাই, ও কে আসছে ?

[দ্বিতীয় বালক।] ও পরদেশী।

বিজয়াদিত্যের প্রবেশ

বিজয়াদিত্য। না ভাই, আমি সবদেশী।

ছেলেরা। তুমি কী কর ?

বিজয়াদিত্য। আমি সব জায়গাতেই আপন দেশ দেখে বেড়াই।

[ছেলেরা।] তার মানে কী ?

বিজয়াদিত্য। দেখো না, রাজাগুলো দেশ পাবার জন্যে লড়াই করে মরে। তার মানে, পৃথিবীর রাজা তবু নিজের দেশ পায় নি।

ছেলেরা। তুমি পেয়েছ ?

বিজয়াদিত্য। পেয়েছি কিনা পরীক্ষা করতে বেরিয়েছি।

ছেলেরা। বেশ মজা, আমরাও সবদেশী হব। তোমাকে আমরা ছাড়ব না।

---

[১] এই উদ্ধৃতাংশের সর্বত্র পত্রাঙ্কদ্বারা রবীন্দ্র-রচনাবলীর বর্তমান খণ্ডের পৃষ্ঠাসংখ্যা নির্দেশ করা হইয়াছে।

বিজয়াদিত্য। তোমরা ছাড়লে আমিই কি তোমাদের ছাড়ব? কী করবে আমাকে নিয়ে?

ছেলেরা। আজ আমাদের ছুটি, তোমাকে নিয়ে আজ তোমার সেই সবদেশে বেরিয়ে যাব।

বিজয়াদিত্য। আচ্ছা বেশ, তাহলে আমি আমার সবদেশীর সাজ পরে আসি গে। [প্রস্থান

দ্বিতীয় দলের প্রবেশ

পৃ. ২৩০, সপ্তম ছত্র, 'ঝগড়া না, গান ধর্।' বর্জিত। তাহার পরে বসিবে

ছেলেরা। ওই যে সবদেশী এসেছে।

সন্ন্যাসীর প্রবেশ

পৃ. ২৩৫, ত্রয়োদশ ছত্র, 'নৌকো বাচ করতে যাব। বেশ মজা।' ইহার পরে বসিবে

প্রথম বালক। কিন্তু লেখা শেষ করতে করতে আমাদের ছুটি ফুরিয়ে যাবে।

ছেলেরা। এই লেখার খেলা কিন্তু আর ভালো লাগছে না।

পৃ. ২৩৬, 'উপনন্দ। আমাকে বাঁচালে। এখন পুঁথিগুলি ফিরে দাও।' ইহার পরে বসিবে

তোমরা অন্য খেলা খেলো গে।

সন্ন্যাসী। গান

'কোন্ খেলা যে খেলব কখন ভাবি বসে সেই কথাটাই' ইত্যাদি.

পৃ. ২৩৬, 'সকলে। না, সে চেঁচায়।' ইহার পরে বসিবে

তুমি কিন্তু যেয়ো না সন্ন্যাসী— আমরা কোপাই নদীর ধারে ছুটোছুটি করে আবার এখনি চলে আসছি। [প্রস্থান

পৃ. ২৪১, দ্বাদশ ছত্র, 'রাত্রে ঘুমোতে পারিনে [প্রস্থান।' ইহার পরে বসিবে

সন্ন্যাসী। ওই লক্ষেশ্বরের কথাগুলো ··[১] শরতের আলোর উপর ওর হিসাবের খাতার কালো ছাপ একেবারে লেপে দিয়ে যায়।

ঠাকুরদা। আর ওর আওয়াজটা এমন যে আশ্বিনে হাওয়ার শ্বাসরোধ হতে থাকে।

সন্ন্যাসী। ঠাকুরদা, তোমার গান দিয়ে হাওয়াটাকে শোধন করে রসিয়ে দিয়ে যাও।

[১] পাণ্ডুলিপি নষ্ট হইয়াছে।

ঠাকুরদা। গান

'শরৎ আলোর কমলবনে' ইত্যাদি

[লক্ষেশ্বরকে আসিতে দেখিয়া দ্রুত প্রস্থান

পৃ. ২৪৭, শেষ দুই ছত্রে 'ওহে উদাসী, তুমি বল কী?' বর্জিত; তাহার পরে নিম্নমুদ্রিত ছত্র বসিবে।

পৃ. ২৪৮, শেখরের গানও বর্জিত।

এমনি করে চক্র চলেছে, পাচ্ছি আর দিচ্ছি।

পৃ. ২৫১, নবম ও দশম ছত্র বর্জিত; তৎপরিবর্তে বসিবে

সন্ন্যাসী। আচ্ছা এক কাজ করো · কাশবন থেকে কাশ তুলে আনো আর আঁচল ভরে আনো ধানের মঞ্জরী। শিউলিফুলের মালা তোমাদের তো গাঁথাই আছে। সেগুলো সব নিয়ে এস।

পৃ ২৫২, দ্বিতীয় ছত্রের অনুবৃত্তি

ওরে ভাই তার একটা গান শুনবি?

ওরে রে লক্ষ্মণ, এ কী কুলক্ষণ
বিপদ ঘটেছে বিলক্ষণ
(ভাই) জানকীরে দিয়ে এস বন।

পৃ. ২৫৫, 'এবার বরণের গানটা ধরিয়ে দিই। গাও। ইহার পরিবর্তে

ঠাকুরদা, এবার সুরে সুর মেলাবার রঙে রং মেলাবার গানটা ধরো।

গান

'সবার রঙে রং মেশাতে হবে' ইত্যাদি।

এই নূতন অংশগুলি সন্নিবেশের প্রয়োজনে, এবং সহজে অভিনয়যোগ্য করিবার জন্য কোনো কোনো অংশ বর্জিতও হইয়াছিল; পাদটীকায় সেই বর্জিত অংশগুলি নির্দিষ্ট হইল।[১] এইরূপ বর্জনের পর সংগতিরক্ষার্থ, কোনো কোনো স্থলে সংলাপ বর্জন না

---

[১] পৃ. ২২৮-২৯. 'শেখর কবির প্রবেশ' হইতে 'অভ্যেস করেছে। [প্রস্থান।' পর্যন্ত বর্জিত।

পৃ. ২৩০-৩১ 'ঠাকুরদা, ওই দেখো' হইতে 'এ চমৎকার খেলা' পর্যন্ত বর্জিত।

২৩২ পৃষ্ঠায় কবিশেখরের 'কেন যে মন ভোলে' গানটিতে 'সে তো কাছে আসে না'র পর, ছেলেরা। পরদেশী তোমার সঙ্গী কি কেউ নেই।' এই বাক্যটি বসাইবার, ও গানের পরবর্তী দুই ছত্র 'আমার খেয়া গেল পারে, আমি রইনু নদীর ধারে।' এইরূপ পরিবর্তনের নির্দেশ আলোচ্য গ্রন্থখানিতে রহিয়াছে। সম্ভবত অন্য কোনো বারের অভিনয়ে, যেবারে এই বর্জিত বলিয়া নির্দিষ্ট অংশ অভিনীত হইয়াছিল, তাহাতে এই বাক্যটি ব্যবহৃত হইয়াছিল।

করিয়াও বক্তা-পরিবর্তনের নির্দেশ বইখানিতে আছে ; যেমন শেখরের উক্তি অন্যের মুখে বসানো হইয়াছে।

ঋণশোধের সহিত শারদোৎসবের প্রধান পার্থক্য, ঋণশোধে ভূমিকা ও শেখর-চরিত্রের সন্নিবেশ।

ঋণশোধ প্রসঙ্গে শারদোৎসবের গ্রন্থপরিচয় (রবীন্দ্র-রচনাবলী, সপ্তম খণ্ড) দ্রষ্টব্য।

২১৭-২০ পৃষ্ঠায় 'রাজা' স্থলে সর্বত্র 'বিজয়াদিত্য' পড়িতে হইবে।

চার অধ্যায়

চার অধ্যায় ১৩৪১ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

চার অধ্যায়ের প্রথম সংস্করণে রবীন্দ্রনাথের নিম্নমুদ্রিত ভূমিকাটি প্রকাশিত হইয়াছিল :

আভাস

> একদা ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় যখন **Twentieth Century** মাসিক পত্রের সম্পাদনায় নিযুক্ত তখন সেই পত্রে তিনি আমার নূতন-প্রকাশিত নৈবেদ্য গ্রন্থের এক সমালোচনা লেখেন। তৎপূর্বে আমার কোনো কাব্যের এমন অকুণ্ঠিত প্রশংসাবাদ কোথাও দেখি নি। সেই উপলক্ষ্যে তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়।

পৃ. ২৩৫-৩৬ 'ছেলেরা। এই যে পরদেশী, আমাদের পরদেশী' হইতে 'সকলে। আজ এই পর্যন্ত থাক।' পর্যন্ত বর্জিত।

পৃ. ২৩৬-৩৭ 'শেখর। তার মানে' হইতে '[বালকদলের সঙ্গে শেখরের প্রস্থান। পর্যন্ত বর্জিত।

পৃ. ২৩৮-৩৯ 'শেখর ও রাজা সোমপালের প্রবেশ' হইতে 'ওঁকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন।' পর্যন্ত বর্জিত।

পৃ. ২৪১-৪২ 'রাজদূতের প্রবেশ' হইতে 'চরণ ছাড়ছি নে [প্রস্থান।' পর্যন্ত বর্জিত।

পৃ. ২৪০ তৃতীয়-চতুর্থ ছত্র, 'এ নইলে…জো নেই।' বর্জিত

পৃ. ২৪৩ বন্দিগণের গান বর্জিত।

পৃ. ২৪৭ 'ঠাকুরদাদা ও শেখরের প্রবেশ' এর পরিবর্তে 'ঠাকুরদাদার প্রবেশ।'

পৃ. ২৪৮ 'উপনন্দকে তুমি দেখেছ' হইতে 'ওর সব খবর পেলুম।' পর্যন্ত বর্জিত।

পৃ. ২২৯ 'লক্ষেশ্বর। এই যে, এ লোকটি' হইতে 'আদায় না করে ছাড়ছি নে।' পর্যন্ত বর্জিত।
'কিন্তু এতক্ষণ তোমরা তিনজনে'র পরিবর্তে 'এতক্ষণ তোমরা দুজনে' হইবে।

পৃ. ২৫৪ 'লেগেছে অমল ধবল পালে'র পরিবর্তে 'হৃদয়ে ছিলে জেগে।'

পৃ. ২৫৫ 'আমার নয়ন-ভুলানো এলে' গানটি বর্জিত।

তিনি ছিলেন রোমান ক্যাথলিক সন্ন্যাসী, অপর পক্ষে বৈদান্তিক,—তেজস্বী, নির্ভীক, ত্যাগী, বহুশ্রুত ও অসামান্যপ্রভাবশালী। অধ্যাত্মবিদ্যায় তাঁর অসাধারণ নিষ্ঠা ও ধীশক্তি আমাকে তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধায় আকৃষ্ট করে।

শান্তিনিকেতন আশ্রমে বিদ্যায়তন প্রতিষ্ঠায় তাঁকেই আমার প্রথম সহযোগী পাই। এই উপলক্ষ্যে কতদিন আশ্রমের সংলগ্ন গ্রামপথে পদচারণ করতে করতে তিনি আমার সঙ্গে আলোচনাকালে যে-সকল দুরূহ তত্ত্বের গ্রন্থিমোচন করতেন আজও তা মনে করে বিস্মিত হই।

এমন সময়ে লর্ড কর্জন বঙ্গব্যবচ্ছেদ-ব্যাপারে দৃঢ়সংকল্প হলেন। এই উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রক্ষেত্রে প্রথম হিন্দুমুসলমান-বিচ্ছেদের রক্তবর্ণ রেখাপাত হল। এই বিচ্ছেদ ক্রমশ আমাদের ভাষা সাহিত্য আমাদের সংস্কৃতিকে খণ্ডিত করবে, সমস্ত বাঙালিজাতকে কৃশ করে দেবে এই আশঙ্কা দেশকে প্রবল উদ্বেগে আলোড়িত করে দিল। বৈধ আন্দোলনের পন্থায় ফল দেখা গেল না। লর্ড মর্লি বললেন, যা স্থির হয়ে গেছে তাকে অস্থির করা চলবে না। সেই সময়ে দেশব্যাপী চিত্তমথনে যে আবর্ত আলোড়িত হয়ে উঠল তারই মধ্যে একদিন দেখলুম এই সন্ন্যাসী ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন। স্বয়ং বের করলেন "সন্ধ্যা" কাগজ, তীব্র ভাষায় যে মদির রস ঢালতে লাগলেন তাতে সমস্ত দেশের রক্তে অগ্নিজ্বালা বইয়ে দিলে। এই কাগজেই প্রথমে দেখা গেল বাংলাদেশে আভাসে ইঙ্গিতে বিভীষিকাপন্থার সূচনা। বৈদান্তিক সন্ন্যাসীর এতবড়ো প্রচণ্ড পরিবর্তন আমার কল্পনার অতীত ছিল।

এই সময়ে দীর্ঘকাল তাঁর সঙ্গে আমার দেখাসাক্ষাৎ হয় নি। মনে করেছিলুম হয়তো আমার সঙ্গে তাঁর রাষ্ট্র-আন্দোলনপ্রণালীর প্রভেদ অনুভব করে আমার প্রতি তিনি বিমুখ হয়েছিলেন অবজ্ঞাবশতই।

নানাদিকে নানা উৎপাতের উপসর্গ দেখা দিতে লাগল। সেই অন্ধ উন্মত্ততার দিনে একদিন যখন জোড়াসাঁকোয় তেতালায় ঘরে একলা বসে ছিলেম হঠাৎ এলেন উপাধ্যায়। কথাবার্তার মধ্যে আমাদের সেই পূর্বকালের আলোচনার প্রসঙ্গও কিছু উঠেছিল। আলাপের শেষে তিনি বিদায় নিয়ে উঠলেন। চৌকাঠ পর্যন্ত গিয়ে একবার মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ালেন। বললেন, "রবিবাবু, আমার খুব পতন হয়েছে।" এই বলেই আর অপেক্ষা করলেন না, গেলেন চলে। স্পষ্ট বুঝতে পারলুম, এই মর্মান্তিক কথাটি বলবার জন্যেই তাঁর আসা। তখন কর্মজাল জড়িয়ে ধরেছে, নিষ্কৃতির উপায় ছিল না।

> এই তাঁর সঙ্গে আমার শেষ দেখা ও শেষ কথা।
> উপন্যাসের আরম্ভে এই ঘটনাটি উল্লেখযোগ্য।

চার অধ্যায়, বিশেষত উহার "আভাস" বা ভূমিকা সাময়িক পত্রে তীব্রভাবে সমালোচিত হয়। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ১৩৪২ সালের বৈশাখের প্রবাসীতে যে প্রত্যুত্তর প্রকাশ করেন, নিচে তাহা মুদ্রিত হইল :

চার অধ্যায় সম্বন্ধে কৈফিয়ত

> আমার চার অধ্যায় গল্পটি সম্বন্ধে যত তর্ক ও আলোচনা উঠেছে তার অধিকাংশই সাহিত্যবিচারের বাইরে পড়ে গেছে। এটা স্বাভাবিক, কারণ, এই গল্পের যে ভূমিকা, সেটা রাষ্ট্রচেষ্টা-আলোড়িত বর্তমান বাংলাদেশের আবেগের বর্ণে উজ্জ্বল করে রঞ্জিত। আমরা কেবল যে তার অত্যন্ত বেশি কাছে আছি তা নয় তার তাপ আমাদের মনে সর্বদাই বিকীরিত হচ্ছে। এইজন্যেই গল্পের চেয়ে গল্পের ভূমিকাটাই অনেক পাঠকের কাছে মুখ্যভাবে প্রতিভাত। এই অধুনাতন কালের চিত্ত-আন্দোলন দূর অতীতে সরে গিয়ে যখন ইতিহাসের উত্তাপবিহীন আলোচ্য বিষয়মাত্রে পরিণত হবে তখন পাঠকের কল্পনা গল্পটিকে অনাসক্তভাবে গ্রহণ করতে বাধা পাবে না এই আশা করি। অর্থাৎ তখন এর সাহিত্যরূপ স্পষ্ট হতে পারবে।
>
> এই রচনা সম্বন্ধে লেখকের তরফ থেকে আমার যা বক্তব্য সেটা বলে রাখি। বইটা লেখবার সময় আমি কী লিখতে বসেছিলুম সেটা আমার জানা সুতরাং এই ব্যক্তিগত খবরটা আমিই দিতে পারি ; সেটা কী হয়ে উঠেছে সে-কথা পাঠক ও সমালোচক আপন বুদ্ধি ও রুচি অনুসারে বিচার করবেন। সেই বুদ্ধির মাত্রাভেদ ও রুচির বৈচিত্র্য স্বাভাবিক, সুতরাং আলোচনা হতে থাকবে নানা ছাঁচের ও নানা মূল্যের, কালের উপর নির্ভর করে সে-সম্বন্ধে উদাসীন থাকাই লেখকের কর্তব্য।
>
> যেটাকে এই বইয়ের একমাত্র আখ্যানবস্তু বলা যেতে পারে সেটা এলা ও অতীন্দ্রের ভালোবাসা। নরনারীর ভালোবাসার গতি ও প্রকৃতি কেবল যে নায়কনায়িকার চরিত্রের বিশেষত্বের উপর নির্ভর করে তা নয় চারিদিকের অবস্থার ঘাতপ্রতিঘাতের উপরেও। নদী আপন নির্ঝরপ্রকৃতিকে নিয়ে আসে আপন জন্মশিখর থেকে, কিন্তু সে আপন বিশেষরূপ নেয় তটভূমির প্রকৃতি থেকে। ভালোবাসারও সেই দশা, একদিকে আছে তার আন্তরিক সংরাগ,

আর-একদিকে তার বাহিরের সংবাধ। এই দুইয়ে মিলে তার সমগ্র চিত্রের বৈশিষ্ট্য। এলা ও অতীনের ভালোবাসার সেই বৈশিষ্ট্য এই গল্পে মূর্তিমান করতে চেয়েছি। তাদের স্বভাবের মূলধনটাও দেখাতে হয়েছে, সেইসঙ্গেই দেখাতে হয়েছে যে-অবস্থার সঙ্গে তাদের শেষ পর্যন্ত কারবার করতে হল তারও বিবরণ।

বাইরের এই অবস্থা যেটা আমাদের রাষ্ট্রপ্রচেষ্টার নানা সংঘট্টনে তৈরি, সেটার অনেকখানি অগত্যা আমার নিজের দৃষ্টিতে দেখা, ও তার কিছু কিছু আভাস আমার নিজের অভিজ্ঞতাকে স্পর্শ করেছে। তার সংবেদন ভিন্ন লোকের কাছে ভিন্ন রকমের হওয়ারই কথা, তার সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতারও পার্থক্য আছে। কিন্তু গল্পটাকে যদি সাহিত্যের বিষয় বলে মানতে হয় তাহলে এ নিয়ে তর্ক অনাবশ্যক, গল্পের ভূমিকারূপে আমার ভূমিকাকেই স্বীকার করে নিতে হবে। খ্রীস্টানও যদি কুমারসম্ভব পড়তে চায় তাহলে কালিদাসের বর্ণিত হরপার্বতীর আখ্যানকেই তার সত্য বলে মানা চাই, তা নিয়ে ধর্মতত্ত্বঘটিত তর্ক চলবে না। এই পৌরাণিক আখ্যানে সাংখ্যতত্ত্ব বিশুদ্ধভাবে নিরূপিত হয়েছে কিনা সে-প্রশ্ন উত্তর দেবার যোগ্যই নয়, আসল কথাটা এই যে, এই আখ্যানের ভূমিকায় হরপার্বতীর প্রেম ও মিলনটাই মুখ্যভাবে গোচর। এমন কি কুমারের জন্মবিবরণকেও কালিদাস উপেক্ষা করেছেন।

যদি কোনো পাঠক বলেন আমার গল্পের ভূমিকা কোনো কোনো অংশে বা অনেক অংশে আমার স্বকপোলকল্পিত তাহলে গল্প-লিখিয়ে হিসাবে সে অভিযোগ মেনে নিলেও ক্ষতি হবে না। ইন্দ্রনাথ দ্বারা চালিত প্রচেষ্টার কী পরিণাম হল, কী হল বটুর বা কানাইয়ের সে সংবাদটাকে কোনো স্থান দেওয়া হয় নি, উপসংহারে একমাত্র ব্যঞ্জনা অন্তু-এলার প্রেমের, এই উপসংহারের দ্বারা ওই প্রেমের রূপটিকেই সম্পূর্ণতা দেওয়া হল।

গল্পের উপক্রমণিকায় উপাধ্যায়ের কথাটা কেন এল এ-প্রশ্ন নিশ্চয়ই জিজ্ঞাস্য। অতীনের চরিত্রে দুটি ট্র্যাজেডি ঘটেছে, এক সে এলাকে পেলে না, আর সে নিজের স্বভাব থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে। এই শেষোক্ত ব্যাপারটি স্বভাববিশেষে মনস্তত্ত্ব হিসাবে বাস্তব হতে পারে তারই সাক্ষ্য উপস্থিত করার লোভ সংবরণ করতে পারি নি। ভয় ছিল পাছে কেউ ভাবে যে, এই সম্ভাবনাটি কবিজাতীয় বিশেষ মত বা মেজাজ দিয়ে গড়া। এর বাস্তবতা সম্বন্ধে অসন্দিগ্ধ হলে এর বেদনার তীব্রতা পাঠকের মনে প্রবল হতে পারে এই আশা করেছিলুম। তা

হোক তবু গল্পের দিক থেকে এর কোনো মূল্য নেই সে-কথা মানি। গল্পের সাক্ষ্য গল্পের মধ্যে থাকাই ভালো।

একজন মহিলা আমাকে চিঠিতে জানিয়েছেন যে তাঁর মতে ইন্দ্রনাথের চরিত্রে উপাধ্যায়ের জীবনের বহিরংশ প্রকাশ পেয়েছে আর অতীন্দ্রের চরিত্রে ব্যক্ত হয়েছে তাঁর অন্তরতর প্রকৃতি। এ-কথাটি প্রণিধানযোগ্য সন্দেহ নেই।

আর-একটা তর্ক আছে। গল্পের প্রসঙ্গে বিপ্লবচেষ্টাসংক্রান্ত মতামত পাত্রদের মুখে প্রকাশ পেয়েছে। কোনো মতই যদি কোথাও না থাকত তাহলে গল্পের ভূমিকাটা হত নিরর্থক। ধরে নিতে হবে যারা বলছে, তাদেরই চরিত্রের সমর্থনের জন্যে এই সব মত। যদি কেউ সন্দেহ করেন এ-সকল মতের কোনো-কোনোটা আমার মতের সঙ্গে মেলে তবে বলব “এহ বাহ্য”। এ-কথাটা মিথ্যে হলেও গল্পের মধ্যে তার যে মূল্য, সত্য হলেও তাই। কোনো মতপ্রকাশের দ্বারা পাত্রদের চরিত্রের যদি ব্যত্যয় ঘটে থাকে তাহলেই সেটা হবে অপরাধ।

যদি কোনো অধ্যাপক কোনোদিন নিঃসংশয়ে প্রমাণ করতে পারেন যে হ্যামলেটের মুখের অনেক কথা এবং তার ভাবভঙ্গী কবির নিজের, সেটা সত্য হোক আর মিথ্যে হোক তাতে নাটকের নাট্যত্বের হ্রাসবৃদ্ধি হয় না। তাঁর নাটকে কোথাও তাঁর নিজের ব্যক্তিত্ব কোনো ইঙ্গিতে প্রকাশ পায় নি এমনতরো অবিশ্বাস্য কথাও যদি কেউ বলেন তবে তার দ্বারাও তাঁর নাটক সম্বন্ধে কিছুই বলা হয় না।

অবশেষে সংক্ষেপে আমার মন্তব্যটি জানাই:

চার অধ্যায়ের রচনায় কোনো বিশেষ মত বা উপদেশ আছে কিনা সে-তর্ক সাহিত্যবিচারে অনাবশ্যক। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে এর মূল অবলম্বন কোনো আধুনিক বাঙালী নায়কনায়িকার প্রেমের ইতিহাস। সেই প্রেমের নাট্যরসাত্মক বিশেষত্ব ঘটিয়েছে বাংলাদেশের বিপ্লবপ্রচেষ্টার ভূমিকায়। এখানে সেই বিপ্লবের বর্ণনা-অংশ গৌণ মাত্র; এই বিপ্লবের ঝোড়ো আবহাওয়ায় দুজনের প্রেমের মধ্যে যে তীব্রতা যে বেদনা এনেছে সেইটেতেই সাহিত্যের পরিচয়। তর্ক ও উপদেশের বিষয় সাময়িক পত্রের প্রবন্ধের উপকরণ।

৮ চৈত্র, ১৩৪১

ধর্ম

ধর্ম গদ্যগ্রন্থাবলীর ষোড়শ ভাগরূপে ১৩১৫ সালে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি অধিকাংশই শান্তিনিকেতনে বর্ষশেষ, নববর্ষ, বা পৌষোৎসবে, বা/এবং আদি ব্রাহ্মসমাজ কর্তৃক অনুষ্ঠিত মাঘোৎসবে কথিত বা পঠিত; 'ধর্মপ্রচার' ১৩১০ সালের '১২ই মাঘ আলোচনা-সমিতির বিশেষ অধিবেশনে সিটিকলেজ হলে পঠিত হয়' এবং 'ততঃ কিম্' 'ওভারটুন হলে আহূত আলোচনা-সমিতির বিশেষ অধিবেশনে' পঠিত হয়।

শান্তিনিকেতন

শান্তিনিকেতন সতেরো খণ্ডে ১৯০৯-১৬ সালে প্রকাশিত হয়। ১৩১৫ অগ্রহায়ণ হইতে ১৩২১ পৌষ পর্যন্ত শান্তিনিকেতন মন্দিরে ও অন্যত্র বিভিন্ন অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ যে-সকল উপদেশ দিয়াছিলেন তাহার অধিকাংশই এই সতেরো খণ্ডে সংগৃহীত হইয়াছিল। রবীন্দ্র-রচনাবলীর বর্তমান খণ্ডে ইহার তিন খণ্ড মুদ্রিত হইল।

এই উপদেশাবলীর অনেকগুলি মৌখিক ভাষণ, পরে বক্তাকর্তৃক নূতন করিয়া লিখিত; কতকগুলি লিখিত ভাষণ।

১৩৪১-৪২ সালে শান্তিনিকেতন সতেরো খণ্ড, অন্যান্য কয়েকটি উপদেশ সহ, দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়, নানাস্থানে পাঠ-পরিবর্তনও হয়।

রবীন্দ্র-রচনাবলীতে শান্তিনিকেতন প্রথম সংস্করণ অনুসারে মুদ্রিত হইল।

বর্ণানুক্রমিক সূচী

মা ৯৯
অপূর্বদের বাড়ি ১৮
অভাব ৪৫৩
অরূপ বীণা রূপের আড়ালে ২১২
আগুনে হল আগুনময় ১৯৩
আজকে আমি কতদূর যে ৮৭
আজ ধানের খেতে রৌদ্রছায়ায় ২২৯
আজি দখিন দুয়ার খোলা ১৭৫
আজি শরত তপনে প্রভাত স্বপনে ২২১
আত্মার দৃষ্টি ৪৫৪
আনন্দরূপ ৪৪১
আমরা চাষ করি আনন্দে ১৪১
আমরা বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ ২৫৩
আমরা সবাই রাজা ১৭৭
আমার অভিমানের বদলে আজ ২০৬
আমার আর হবে না দেরি ২০৭
আমার জীর্ণ পাতা ১৭৬
আমার নয়ন-ভুলানো এলে ২৬০
আমার প্রাণের মানুষ ১৭৯
আমার মা না হয়ে তুমি ৯৯
আমার সকল নিয়ে বসে আছি ২০৫
আমারে ডাক দিল কে ২৩১
আমি তারেই খুঁজে বেড়াই ২৩৬
আমি যখন ছিলেম অন্ধ ১৩৮
আমি যেদিন সভায় গেলেম ৩৬
আমি রূপে তোমায় ভোলাব না ১৯৪
আসল ৫৪
আহা তোমার সঙ্গে প্রাণের খেলা ১৯১
ইচ্ছা ৫১৯
ইচ্ছামতী ৯৭

ইচ্ছে করে মা, যদি তুই … … ১০১
উত্তিষ্ঠত জাগ্রত … … ৪৪৯
উৎসব … … ৩৩৫
উৎসব-শেষ … … ৫০০
উৎসবের দিন … … ৩৭২
এই কথা সদা শুনি … … ৬২
এক যে ছিল চাঁদের কোণায় … … ৭২
এক যে ছিল রাজা … … ৯১
এখনো গেল না আঁধার … … ২০১
এ পথ গেছে কোন্‌খানে … … ১৪০
এপার ওপার … … ৫০৫
ঐ যেখানে শিরীষ গাছে … … ৩
ঐ যে রাতের তারা … … ৮২
ও অকূলের কূল … … ১৪৭
ওগো আমার প্রাণের ঠাকুর … … ১৯৭
ওপার হতে এপার পানে … … ৫
ওরে ওরে ওরে আমার মন … … ১৩৫
ওরে মোর শিশু ভোলানাথ … … ৬৫
কর্ম যখন দেবতা হয়ে … … ৪৫
কাকা বলেন, সময় হলে … … ১০৮
কার হাতে এই মালা তোমার … … ১৯০
কালো মেয়ে … … ৫১
কী চাই … … ৪৭১
কেন যে মন ভোলে … … ২৩২
কোথা বাইরে দূরে যায় রে উড়ে … … ১৭৩
কোথায় যেতে ইচ্ছে করে … … ৯০
খেলা-ভোলা … … ৮৪
খোলো খোলো দ্বার … … ১৭১
ঘুমের তত্ত্ব … … ১০৫
চিরদিনের দাগা … … ৫

চোখ যে ওদের ছুটে চলে গো ১৬৫
ছিন্ন পত্র ৪৫
ছোটো ছেলে হওয়ার সাহস ৬৬
ছোট্ট আমার মেয়ে ৬০
জাগার থেকে ঘুমোই ১০৫
জ্যোতিষী ৮২
ঝুঁটি-বাঁধা ডাকাত সেজে ১১৩
ঠাকুরদাদার ছুটি ৫৮
ডাক্তারে যা বলে বলুক নাকো ৯
ততঃ কিম্ ৪২০
তাল গাছ ৭১
তালগাছ এক পায়ে দাঁড়িয়ে ৭১
তিন ৫২৮
তুই কি ভাবিস, দিনরাত্তির ৮৪
তুমি ডাক দিয়েছ কোন্ সকালে ১২৪
তোমার কাছে আমিই দুষ্টু ৯৬
তোমার ছুটি নীল আকাশে ৫৮
তোমার সোনার থালায় ২৪৯
ত্যাগ ৪৬০
ত্যাগের ফল ৪৬৩
দিন ৫০৮
দিন ও রাত্রি ৩৪১
দীক্ষা ৪৯২
দুই আমি ১০৭
দুঃখ ৪০০
দুঃখ ৪৫৮
দুয়োরানী ১০১
দুষ্টু ৯৬
দূর ৯২
দূরে অশথ তলায় ৯৩

দেওয়া নেওয়া ফিরিয়ে দেওয়া ২৪৮
দেখছ না কি নীল মেঘে আজ ৮১
দেখা ৪৮১
ধর্মপ্রচার ৩৭৬
ধর্মের সরল আদর্শ ৩৫৩
নববর্ষ ৩৮৬
নিষ্কৃতি ২৫
নেই বা হলেম যেমন তোমার ৭৮
পথহারা ৮৭
পথের সাথি, নমি বারম্বার ২০৫
পলাতকা ৩
পাপ ৪৫৬
পার করো ৫০৪
পার্থক্য ৫৩০
পুজোর ছুটি আসে যখন ৯২
পুতুল ভাঙা ৭৭
প্রকৃতি ৫৩২
প্রভাতে ৫১৩
প্রভু, বলো বলো কবে ১৭০
প্রাচীন ভারতের "একঃ" ৩৬৪
প্রার্থনা ৩৭২
প্রার্থনা ৪৭৪
প্রার্থনার সত্য ৫২৪
প্রেম ৪৬৫
প্রেমের অধিকার ৫১৬
ফাঁকি ৯২
বয়স আমার হবে তিরিশ ১০৩
বয়স ছিল আট ৫৪
বর্ষশেষ ৩৮৪
বসন্ত, তোর শেষ করে দে রঙ্গ ১৯৯

বাউল ৯৩
বাণী-বিনিময় ১১১
বাহিরে ভুল হানবে যখন ১৮৮
বিকার-শঙ্কা ৪৭৮
বিধান ৫২৩
বিনুর বয়স তেইশ তখন ১২
বিশেষ ৫১৪
বুড়ী ৭২
বৃষ্টি কোথায় লুকিয়ে বেড়ায় ১০৭
বৃষ্টি রৌদ্র ১১৩
ভাঙা হাট ৪৯৯
ভেঙেছে দুয়ার এসেছ জ্যোতির্ময় ১৫৯
ভোর হল বিভাবরী ২১০
ভোলা ৪১
মনুষ্যত্ব ৩৪৮
মনে পড়া ৭৬
মম চিত্তে নিতি নৃত্যে ১৮৭
মরচে-পড়া গরাদে ওই ৫১
মর্ত্যবাসী ১০৮
মাকে আমার পড়ে না মনে ৭৬
মা কেঁদে কয় ২৫
মানুষ ৪৯৫
মা, যদি তুই আকাশ হতিস ১১১
মায়ের সম্মান ১৮
মালা ৩৬
মুক্তি ৯
মূর্খ ৭৮
মেঘের কোলে রোদ হেসেছে ২২৫
যখন যেমন মনে করি ৯৭
যখন সারা নিশি ছিলেম শুয়ে ২২৩

যত ঘণ্টা, যত মিনিট ৭৫
যা ছিল কালো ধলো ১৯১
যারা আমার সাঁঝসকালের ৬১
রবিবার ৭৪
রাজমিস্ত্রি ১০৩
রাজরাজেন্দ্র জয় জয়তু ২৪৩
রাজা ও রানী ৯১
রাত্রি ৫১১
লেগেছে অমল ধবল পালে ২৫৪
শান্তং শিবমদ্বৈতম্ ৪১০
শান্তিনিকেতনে ৭ই পৌষের উৎসব ৪৯০
শিশু ভোলানাথ ৬৫
শিশুর জীবন ৬৬
শেষ গান ৬১
শেষ প্রতিষ্ঠা ৬২
শোনা ৪৮৫
সংশয় ৪৪৯
সংশয়ী ৯০
সঞ্চয়-তৃষ্ণা ৫০২
সব কাজে হাত লাগাই মোরা ১৪৪
সময়হারা ৭৫
“সাত-আটটে সাতাশ” আমি ৭৭
সাত সমুদ্র পারে ৮১
সামঞ্জস্য ৪৬৭
সোম মঙ্গল বুধ এরা সব ৭৪
সৌন্দর্য ৫২২
স্বাতন্ত্র্যের পরিণাম ৪১৬
হঠাৎ আমার হল মনে ৪১
হারিয়ে যাওয়া ৬০
হিসাব ৪৮৭
হৃদয়ে ছিলে জেগে ২১৫

রবীন্দ্র রচনাবলী

চতুর্দশ খণ্ড

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্র-রচনাবলী

চতুর্দশ খণ্ড

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

70,758

বিশ্বভারতী
২, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা

প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন
বিশ্বভারতী, ৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা

প্রথম প্রকাশ চৈত্র, ১৩৪৭
পুনর্মুদ্রণ আষাঢ়, ১৩৬০

কাগজের মলাট ৮৲
রেক্সিনে বাঁধাই ১১৲

মুদ্রাকর শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
শান্তিনিকেতন প্রেস, শান্তিনিকেতন

সূচী

চিত্রসূচী ।৶০

কবিতা ও গান

পূরবী ১

লেখন ১৫৫

নাটক ও প্রহসন

মুক্তধারা ১৮৫

উপন্যাস ও গল্প

গল্পগুচ্ছ ২৪৩

প্রবন্ধ

শান্তিনিকেতন ৪-১০ ২৮৩

গ্রন্থ-পরিচয় ৫২১

বর্ণানুক্রমিক সূচী ৫৪১

চিত্রসূচী

তৃতীয়া ৩

'আশা' কবিতার পাণ্ডুলিপি ৬৯

রবীন্দ্রনাথ ও 'বিজয়া' ১০৫

পূরবীর পাণ্ডুলিপির একটি পৃষ্ঠার কবিকৃত লিপিচিত্রণ ১১২

কবিতা ও গান

পূরবী

উৎসর্গ

বিজয়ার করকমলে

তৃতীয়া

পূরবী

পূরবী

যারা আমার সাঁঝ-সকালের গানের দীপে জ্বালিয়ে দিলে আলো
আপন হিয়ার পরশ দিয়ে ; এই জীবনের সকল সাদা কালো
যাদের আলো-ছায়ার লীলা ; সেই যে আমার আপন মানুষগুলি
নিজের প্রাণের স্রোতের 'পরে আমার প্রাণের ঝরনা নিল তুলি ;
তাদের সাথে একটি ধারায় মিলিয়ে চলে, সেই তো আমার আয়ু,
নাই সে কেবল দিন-গণনার পাঁজির পাতায়, নয় সে নিশ্বাস-বায়ু।
তাদের বাঁচায় আমার বাঁচা আপন সীমা ছাড়ায় বহু দূরে ;
নিমেষগুলির ফল পেকে যায় নানা দিনের সুধার রসে পুরে ;
অতীত কালের আনন্দরূপ বর্তমানের বৃন্ত-দোলায় দোলে,—
গর্ভ হতে মুক্ত শিশু তবুও যেন মায়ের বক্ষে কোলে
বন্দী থাকে নিবিড় প্রেমের বাঁধন দিয়ে। তাই তো যখন শেষে
একে একে আপন জনে সূর্য-আলোর অন্তরালের দেশে
আঁখির নাগাল এড়িয়ে পালায়, তখন রিক্ত শীর্ণ জীবন মম
শুষ্ক রেখায় মিলিয়ে আসে বর্ষাশেষের নির্ঝরিণী সম
শূন্য বালুর একটি প্রান্তে ক্লান্ত বারি স্রস্ত অবহেলায়।
তাই যারা আজ রইল পাশে এই জীবনের অপরাহ্ণবেলায়
তাদের হাতে হাত দিয়ে তুই গান গেয়ে নে থাকতে দিনের আলো,—
বলে নে ভাই, "এই যা দেখা, এই যা ছোঁওয়া, এই ভালো এই ভালো।
এই ভালো আজ এ সংগমে কান্নাহাসির গঙ্গা-যমুনায়
ঢেউ খেয়েছি, ডুব দিয়েছি, ঘট ভরেছি, নিয়েছি বিদায়।
এই ভালো রে প্রাণের রঙ্গে এই আসঙ্গ সকল অঙ্গে মনে
পুণ্য ধরার ধুলো মাটি ফল হাওয়া জল তৃণ তরুর সনে।
এই ভালো রে ফুলের সঙ্গে আলোয় জাগা, গান গাওয়া এই ভাষায়,
তারার সাথে নিশীথ রাতে ঘুমিয়ে পড়া নূতন প্রাতের আশায়।"

বিজয়ী

তখন তারা দৃপ্ত-বেগের বিজয়-রথে
ছুটছিল বীর মত্ত অধীর, রক্ত-ধূলির পথবিপথে।
তখন তাদের চতুর্দিকেই রাত্রিবেলার প্রহর যত
স্বপ্নে-চলার পথিক-মতো
মন্দগমন ছন্দে লুটায় মন্থর কোন ক্লান্ত বায়ে;
বিহঙ্গ-গান শান্ত তখন অন্ধ রাতের পক্ষছায়ে।

মশাল তাদের রুদ্রজ্বালায় উঠল জ্বলে,—
অন্ধকারের ঊর্ধ্বতলে
বহ্নিদলের রক্তকমল ফুটল প্রবল দম্ভভরে;
দূর-গগনের স্তব্ধ তারা মুগ্ধ ভ্রমর তাহার 'পরে।
ভাবল পথিক, এই যে তাদের মশাল-শিখা,
নয় সে কেবল দণ্ডপলের মরীচিকা।

ভাবল তা'রা, এই শিখাটাই ধ্রুবজ্যোতির তারার সাথে
মৃত্যুহীনের দখিন হাতে
জ্বলবে বিপুল বিশ্বতলে।
ভাবল তা'রা এই শিখারই ভীষণ বলে
রাত্রি-রানীর দুর্গ-প্রাচীর দগ্ধ হবে,
অন্ধকারের রুদ্ধ কপাট দীর্ণ করে ছিনিয়ে লবে
নিত্যকালের বিত্তরাশি;
ধরিত্রীকে করবে আপন ভোগের দাসী।

ঐ বাজে রে ঘণ্টা বাজে।
চমকে উঠেই হঠাৎ দেখে অন্ধ ছিল তন্দ্রামাঝে।
আপনাকে হায় দেখছিল কোন্ স্বপ্নাবেশে
যক্ষপুরীর সিংহাসনে লক্ষমণির রাজার বেশে;
মহেশ্বরের বিশ্ব যেন লুঠ করেছে অট্ট হেসে।

শূন্যে নবীন সূর্য জাগে।
ঐ যে তাহার বিশ্ব-চেতন কেতন-আগে
জ্বলছে নূতন দীপ্তিরতন তিমির-মথন শুভ্ররাগে;
মশাল-ভস্ম লুপ্তি-ধুলায় নিত্যদিনের সুপ্তি মাগে।
আনন্দলোক দ্বার খুলেছে, আকাশ পুলকময়,
জয় ভূলোকের, জয় দ্যুলোকের, জয় আলোকের জয়।

মাটির ডাক

১

শালবনের ঐ আঁচল ব্যেপে
যেদিন হাওয়া উঠত খেপে
ফাগুন-বেলার বিপুল ব্যাকুলতায়,
যেদিন দিকে দিগন্তরে
লাগত পুলক কী মন্তরে
কচি পাতার প্রথম কলকথায়,
সেদিন মনে হত কেন
ঐ ভাষারি বাণী যেন
লুকিয়ে আছে হৃদয়কুঞ্জছায়ে;
তাই অমনি নবীন রাগে
কিশলয়ের সাড়া লাগে
শিউরে-ওঠা আমার সারা গায়ে।
আবার যেদিন আশ্বিনেতে
নদীর ধারে ফসল-খেতে
সূর্য-ওঠার রাঙা-রঙিন বেলায়
নীল আকাশের কূলে কূলে
সবুজ সাগর উঠত দুলে
কচি ধানের খামখেয়ালি খেলায়—

সেদিন আমার হত মনে
ঐ সবুজের নিমন্ত্রণে
যেন আমার প্রাণের আছে দাবি ;
তাই তো হিয়া ছুটে পালায়
যেতে তারি যজ্ঞশালায়,
কোন্ ভুলে হায় হারিয়েছিল চাবি।

২

কার কথা এই আকাশ বেয়ে
ফেলে আমার হৃদয় ছেয়ে,
বলে দিনে, বলে গভীর রাতে,
"যে-জননীর কোলের 'পরে
জন্মেছিলি মর্ত-ঘরে,
প্রাণ ভরা তোর যাহার বেদনাতে,
তাহার বক্ষ হতে তোরে
কে এনেছে হরণ করে,
ঘিরে তোরে রাখে নানান পাকে!
বাঁধন-ছেঁড়া তোর সে নাড়ী
সইবে না এই ছাড়াছাড়ি,
ফিরে ফিরে চাইবে আপন মাকে।"
শুনে আমি ভাবি মনে,
তাই ব্যথা এই অকারণে,
প্রাণের মাঝে তাই তো ঠেকে ফাঁকা,
তাই বাজে কার করুণ সুরে—
"গেছিস দূরে, অনেক দূরে,"
কী যেন তাই চোখের 'পরে ঢাকা।
তাই এতদিন সকল খানে
কিসের অভাব জাগে প্রাণে
ভালো করে পাই নি তাহা বুঝে ;

ফিরেছি তাই নানামতে
নানান হাটে, নানান পথে
হারানো কোল কেবল খুঁজে খুঁজে।

৩

আজকে খবর পেলেম খাঁটি—
মা আমার এই শ্যামল মাটি,
অন্নে ভরা শোভার নিকেতন;
অভ্রভেদী মন্দিরে তার
বেদী আছে প্রাণদেবতার,
ফুল দিয়ে তার নিত্য আরাধন।
এইখানে তার অঙ্ক-মাঝে
প্রভাতরবির শঙ্খ বাজে;
আলোর ধারায় গানের ধারা মেশে,
এইখানে সে পূজার কালে
সন্ধ্যারতির প্রদীপ জ্বালে
শান্ত মনে ক্লান্ত দিনের শেষে।
হেথা হতে গেলেম দূরে
কোথা যে ইটকাঠের পুরে
বেড়া-ঘেরা বিষম নির্বাসনে,
তৃপ্তি যে নাই, কেবল নেশা,
ঠেলাঠেলি, নাই তো মেশা,
আবর্জনা জমে উপার্জনে।
যন্ত্র-জাঁতায় পরান কাঁদায়,
ফিরি ধনের গোলকধাঁধায়,
শূন্যতারে সাজাই নানা সাজে;
পথ বেড়ে যায় ঘুরে ঘুরে,
লক্ষ্য কোথায় পালায় দূরে,
কাজ ফলে না অবকাশের মাঝে।

৪

যাই ফিরে যাই মাটির বুকে,
যাই চলে যাই মুক্তি-সুখে,
ইটের শিকল দিই ফেলে দিই টুটে,
আজ ধরণী আপন হাতে
অন্ন দিলেন আমার পাতে,
ফল দিয়েছেন সাজিয়ে পত্রপুটে।
আজকে মাঠের ঘাসে ঘাসে
নিঃশ্বাসে মোর খবর আসে
কোথায় আছে বিশ্বজনের প্রাণ,
ছয় ঋতু ধায় আকাশ-তলায়,
তার সাথে আর আমার চলায়
আজ হতে না রইল ব্যবধান।
যে-দূতগুলি গগনপারের,
আমার ঘরের রুদ্ধ দ্বারের
বাইরে দিয়েই ফিরে ফিরে যায়,
আজ হয়েছে খোলাখুলি
তাদের সাথে কোলাকুলি,
মাঠের ধারে পথতরুর ছায়।
কী ভুল ভুলেছিলেম, আহা,
সব চেয়ে যা নিকট, তাহা
সুদূর হয়ে ছিল এতদিন,
কাছেকে আজ পেলেম কাছে—
চারদিকে এই যে ঘর আছে
তার দিকে আজ ফিরল উদাসীন।

২৩ ফাল্গুন, ১৩২৮

পঁচিশে বৈশাখ

রাত্রি হল ভোর।
আজি মোর
জন্মের স্মরণপূর্ণ বাণী,
প্রভাতের রৌদ্রে-লেখা লিপিখানি
হাতে করে আনি',
দ্বারে আসি দিল ডাক
পঁচিশে বৈশাখ।

দিগন্তে আরক্ত রবি ;
অরণ্যের ম্লান ছায়া বাজে যেন বিষণ্ণ ভৈরবী।
শাল-তাল-শিরীষের মিলিত মর্মরে
বনান্তের ধ্যান ভঙ্গ করে।
রক্তপথ শুষ্ক মাঠে,
যেন তিলকের রেখা সন্ন্যাসীর উদার ললাটে।

এই দিন বৎসরে বৎসরে
নানা বেশে ফিরে আসে ধরণীর 'পরে,—
আতাম্র আম্রের বনে ক্ষণে ক্ষণে সাড়া দিয়ে,
তরুণ তালের গুচ্ছে নাড়া দিয়ে,
মধ্যদিনে অকস্মাৎ শুষ্কপত্রে তাড়া দিয়ে,
কখনো বা আপনারে ছাড়া দিয়ে
কালবৈশাখীর মত্ত মেঘে
বন্ধহীন বেগে।
আর সে একান্তে আসে
মোর পাশে

পীত উত্তরীয়তলে লয়ে মোর প্রাণদেবতার
স্বহস্তে সজ্জিত উপহার—
নীলকান্ত আকাশের থালা,
তারি 'পরে ভুবনের উচ্ছলিত সুধার পিয়ালা।

এই দিন এল আজ প্রাতে
যে অনন্ত সমুদ্রের শঙ্খ নিয়ে হাতে,
তাহার নির্ঘোষ বাজে
ঘন ঘন মোর বক্ষ-মাঝে।
জন্ম-মরণের
দিগ্বলয়-চক্ররেখা জীবনেরে দিয়েছিল ঘের,
সে আজি মিলাল।
শুভ্র আলো
কালের বাঁশরি হতে উচ্ছ্বসি যেন রে
শূন্য দিল ভরে।
আলোকের অসীম সংগীতে
চিত্ত মোর ঝংকারিছে সুরে সুরে রণিত তন্ত্রীতে

উদয় দিক্প্রান্ত-তলে নেমে এসে
শান্ত হেসে
এই দিন বলে আজি মোর কানে,
"অম্লান নূতন হয়ে অসংখ্যের মাঝখানে
একদিন তুমি এসেছিলে
এ নিখিলে
নবমল্লিকার গন্ধে,
সপ্তপর্ণ-পল্লবের পবন হিল্লোল-দোল-ছন্দে,
শ্যামলের বুকে,
নির্নিমেষ নীলিমার নয়নসম্মুখে।

সেই যে নূতন তুমি,
তোমারে ললাট চুমি
এসেছি জাগাতে
বৈশাখের উদ্দীপ্ত প্রভাতে।

হে নূতন,
দেখা দিক্ আরবার জন্মের প্রথম শুভক্ষণ।
আচ্ছন্ন করেছে তারে আজি
শীর্ণ নিমেষের যত ধূলিকীর্ণ জীর্ণ পত্ররাজি।
মনে রেখো, হে নবীন,
তোমার প্রথম জন্মদিন
ক্ষয়হীন ;—
যেমন প্রথম জন্ম নির্ঝরের প্রতি পলে পলে ;
তরঙ্গে তরঙ্গে সিন্ধু যেমন উছলে
প্রতিক্ষণে
প্রথম জীবনে।
হে নূতন,
হ'ক তব জাগরণ
ভস্ম হতে দীপ্ত হুতাশন।

হে নূতন,
তোমার প্রকাশ হ'ক কুজ্ঝটিকা করি' উদ্ঘাটন
সূর্যের মতন।
বসন্তের জয়ধ্বজা ধরি',
শূন্য শাখে কিশলয় মুহূর্তে অরণ্য দেয় ভরি—
সেই মতো, হে নূতন,
রিক্ততার বক্ষ ভেদি আপনারে করো উন্মোচন।
ব্যক্ত হ'ক জীবনের জয়,
ব্যক্ত হ'ক, তোমা মাঝে অনন্তের অক্লান্ত বিস্ময়।"

উদয়-দিগন্তে ঐ শুভ্র শঙ্খ বাজে
মোর চিত্তমাঝে
চির-নূতনেরে দিল ডাক
পঁচিশে বৈশাখ।

২৫ বৈশাখ, ১৩২৯

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

বর্ষার নবীন মেঘ এল ধরণীর পূর্বদ্বারে,
বাজাইল বজ্রভেরী। হে কবি, দিবে না সাড়া তারে
তোমার নবীন ছন্দে? আজিকার কাজরি গাথায়
ঝুলনের দোলা লাগে ডালে ডালে পাতায় পাতায়;
বর্ষে বর্ষে এ দোলায় দিত তাল তোমার যে-বাণী
বিদ্যুৎ-নাচন গানে, সে আজি ললাটে কর হানি
বিধবার বেশে কেন নিঃশব্দে লুটায় ধূলি-'পরে?
আশ্বিনে উৎসব-সাজে শরৎ সুন্দর শুভ্র করে
শেফালির সাজি নিয়ে দেখা দিবে তোমার অঙ্গনে;
প্রতি বর্ষে দিত সে যে শুক্লরাতে জ্যোৎস্নার চন্দনে
ভালে তব বরণের টিকা; কবি, আজ হতে সে কি
বারে বারে আসি তব শূন্যকক্ষে, তোমারে না দেখি
উদ্দেশে ঝরায়ে যাবে শিশির-সিঞ্চিত পুষ্পগুলি
নীরব-সংগীত তব দ্বারে?

জানি তুমি প্রাণ খুলি
এ সুন্দরী ধরণীরে ভালোবেসেছিলে। তাই তারে
সাজায়েছ দিনে দিনে নিত্য নব সংগীতের হারে।
অন্যায় অসত্য যত, যত কিছু অত্যাচার পাপ
কুটিল কুৎসিত ক্রূর, তার 'পরে তব অভিশাপ
বর্ষিয়াছ ক্ষিপ্রবেগে অর্জুনের অগ্নিবাণ সম,
তুমি সত্যবীর, তুমি সুকঠোর, নির্মল, নির্মম,

করুণ, কোমল। তুমি বঙ্গভারতীর তন্ত্রী 'পরে
একটি অপূর্ব তন্ত্র এসেছিলে পরাবার তরে।
সে-তন্ত্র হয়েছে বাঁধা; আজ হতে বাণীর উৎসবে
তোমার আপন সুর কখনো ধ্বনিবে মন্দ্ররবে,
কখনো মঞ্জুল গুঞ্জরণে। বঙ্গের অঙ্গনতলে
বর্ষা-বসন্তের নৃত্যে বর্ষে বর্ষে উল্লাস উথলে;
সেথা তুমি এঁকে গেলে বর্ণে বর্ণে বিচিত্র রেখায়
আলিম্পন; কোকিলের কুহুরবে, শিখীর কেকায়
দিয়ে গেলে তোমার সংগীত; কাননের পল্লবে কুসুমে
রেখে গেলে আনন্দের হিল্লোল তোমার। বঙ্গভূমে
যে তরুণ যাত্রিদল রুদ্ধদ্বার-রাত্রি-অবসানে
নিঃশঙ্কে বাহির হবে নবজীবনের অভিযানে
নব নব সংকটের পথে পথে, তাহাদের লাগি
অন্ধকার নিশীথিনী তুমি, কবি, কাটাইলে জাগি
জয়মাল্য বিরচিয়া, রেখে গেলে গানের পাথেয়
বহ্নিতেজে পূর্ণ করি; অনাগত যুগের সাথেও
ছন্দে ছন্দে নানাসূত্রে বেঁধে গেলে বন্ধুত্বের ডোর,
গ্রন্থি দিলে চিন্ময় বন্ধনে, হে তরুণ বন্ধু মোর,
সত্যের পূজারি।

আজো যারা জন্মে নাই তব দেশে,
দেখে নাই যাহারা তোমারে, তুমি তাদের উদ্দেশে
দেখার অতীত রূপে আপনারে করে গেলে দান
দূরকালে। তাহাদের কাছে তুমি নিত্য-গাওয়া গান
মূর্তিহীন। কিন্তু যারা পেয়েছিল প্রত্যক্ষ তোমায়
অনুক্ষণ তারা যা হারাল তার সন্ধান কোথায়,
কোথায় সান্ত্বনা? বন্ধুমিলনের দিনে বারংবার।
উৎসব-রসের পাত্র পূর্ণ তুমি করেছ আমার
প্রাণে তব, গানে তব, প্রেমে তব, সৌজন্যে, শ্রদ্ধায়,
আনন্দের দানে ও গ্রহণে। সখা, আজ হতে, হায়,

জানি মনে, ক্ষণে ক্ষণে চমকি উঠিবে মোর হিয়া
তুমি আস নাই বলে, অকস্মাৎ রহিয়া রহিয়া
করুণ স্মৃতির ছায়া ম্লান করি দিবে সভাতলে
আলাপ আলোক হাস্য প্রচ্ছন্ন গভীর অশ্রুজলে।

আজিকে একেলা বসি শোকের প্রদোষ-অন্ধকারে,
মৃত্যুতরঙ্গিণীধারা-মুখরিত ভাঙনের ধারে
তোমারে শুধাই,—আজি বাধা কি গো ঘুচিল চোখের
সুন্দর কি ধরা দিল অনিন্দিত নন্দন-লোকের
আলোকে সম্মুখে তব, উদয়শৈলের তলে আজি
নবসূর্য বন্দনায় কোথায় ভরিলে তব সাজি
নব ছন্দে, নূতন আনন্দগানে ? সে-গানের সুর
লাগিছে আমার কানে অশ্রুসাথে মিলিত মধুর
প্রভাত-আলোকে আজি ; আছে তাহে সমাপ্তির ব্যথা,
আছে তাহে নবতন আরম্ভের মঙ্গল-বারতা ;
আছে তাহে ভৈরবীতে বিদায়ের বিষণ্ণ মূর্ছনা,
আছে ভৈরবের সুরে মিলনের আসন্ন অর্চনা।

যে খেয়ার কর্ণধার তোমারে নিয়েছে সিন্ধুপারে
আষাঢ়ের সজল ছায়ায়, তার সাথে বারে বারে
হয়েছে আমার চেনা ; কতবার তারি সারিগানে
নিশান্তের নিদ্রা ভেঙে ব্যথায় বেজেছে মোর প্রাণে
অজানা পথের ডাক, সূর্যাস্তপারের স্বর্ণরেখা
ইঙ্গিত করেছে মোরে। পুনঃ আজ তার সাথে দেখা
মেঘে-ভরা বৃষ্টিঝরা দিনে। সেই মোরে দিল আনি
ঝরে-পড়া কদম্বের কেশর-সুগন্ধি লিপিখানি
তব শেষ-বিদায়ের। নিয়ে যাব ইহার উত্তর
নিজ হাতে কবে আমি, ওই খেয়া 'পরে করি' ভর,

না জানি সে কোন্ শান্ত শিউলি-ঝরার শুক্লরাতে,
দক্ষিণের দোলা-লাগা পাখি-জাগা বসন্তপ্রভাতে ;
নবমল্লিকার কোন্ আমন্ত্রণ-দিনে ; শ্রাবণের
ঝিল্লিমন্দ্র-সঘন সন্ধ্যায় ; মুখরিত প্লাবনের
অশান্ত নিশীথ রাত্রে ; হেমন্তের দিনান্তবেলায়
কুহেলি-গুণ্ঠনতলে ।

ধরণীতে প্রাণের খেলায়
সংসারের যাত্রাপথে এসেছি তোমার বহু আগে,
সুখে দুঃখে চলেছি আপন মনে ; তুমি অনুরাগে
এসেছিলে আমার পশ্চাতে, বাঁশিখানি লয়ে হাতে
মুক্ত মনে, দীপ্ত তেজে, ভারতীর বরমাল্য মাথে ।
আজ তুমি গেলে আগে ; ধরিত্রীর রাত্রি আর দিন
তোমা হতে গেল খসি, সর্ব আবরণ করি লীন
চিরন্তন হলে তুমি, মর্ত্য কবি, মুহূর্তের মাঝে ।
গেলে সেই বিশ্বচিত্তলোকে, যেথা সুগম্ভীর বাজে
অনন্তের বীণা, যার শব্দহীন সংগীতধারায়
ছুটেছে রূপের বন্যা গ্রহে সূর্যে তারায় তারায় ।
সেথা তুমি অগ্রজ আমার ; যদি কভু দেখা হয়,
পাব তবে সেথা তব কোন্ অপরূপ পরিচয়
কোন্ ছন্দে, কোন্ রূপে ? যেমনি অপূর্ব হ'ক নাকো,
তবু আশা করি যেন মনের একটি কোণে রাখ
ধরণীর ধূলির স্মরণ, লাজে ভয়ে দুঃখে সুখে
বিজড়িত,—আশা করি, মর্ত্যজন্মে ছিল তব মুখে
যে-বিনম্র স্নিগ্ধ হাস্য, যে স্বচ্ছ সতেজ সরলতা,
সহজ সত্যের প্রভা, বিরল সংযত শান্ত কথা,
তাই দিয়ে আরবার পাই যেন তব অভ্যর্থনা
অমর্ত্যলোকের দ্বারে,—ব্যর্থ নাহি হ'ক এ কামনা ।

আষাঢ়, ১৩২৯

শিলঙের চিঠি

শ্রীমতী শোভনা দেবী ও শ্রীমতী নলিনী দেবী কল্যাণীয়াসু

ছন্দে লেখা একটি চিঠি চেয়েছিলে মোর কাছে,
ভাবছি বসে, এই কলমের আর কি তেমন জোর আছে।
তরুণ বেলায় ছিল আমার পদ্য লেখার বদ-অভ্যাস,
মনে ছিল হই বুঝি বা বাল্মীকি কি বেদব্যাস,
কিছু না হ'ক 'লঙ্‌ফেলো'দের হব আমি সমান তো,
এখন মাথা ঠাণ্ডা হয়ে হয়েছে সেই ভ্রমান্ত।
এখন শুধু গদ্য লিখি, তাও আবার কদাচিৎ,
আসল ভালো লাগে খাটে থাকতে পড়ে সদা চিৎ।
যা হ'ক একটা খ্যাতি আছে অনেক দিনের তৈরি সে,
শক্তি এখন কম পড়েছে তাই হয়েছে বৈরী সে;
সেই সেকালের নেশা তবু মনের মধ্যে ফিরছে তো,
নতুন যুগের লোকের কাছে বড়াই রাখার ইচ্ছে তো।
তাই বসেছি ডেস্কে আমার, ডাক দিয়েছি চাকরকে,
"কলম লে আও, কাগজ লে আও, কালি লে আও, ধাঁ করকে
ভাবছি যদি তোমরা দুজন বছর তিরিশ পূর্বেতে
গরজ ক'রে আসতে কাছে, কিছু তবু সুর পেতে।
সেদিন যখন আজকে দিনের বাপ-খুড়ো সব নাবালক,
বর্তমানের সুবুদ্ধিরা প্রায় ছিল সব হাবা লোক,
তখন যদি বলতে আমায় লিখতে পয়ার মিল করে,
লাইনগুলো পোকার মতো বেরোত পিল-পিল ক'রে।
পঞ্জিকাটা মান না কি, দিন দেখাটায় লক্ষ্য নেই?
লগ্নটি সব বইয়ে দিয়ে আজ এসেছ অক্ষণেই।
যা হ'ক তবু যা পারি তাই জুড়ব কথা ছন্দেতে,
কবিত্ব-ভূত আবার এসে চাপুক আমার স্কন্ধেতে।

শিলংগিরির বর্ণনা চাও ?   আচ্ছা না হয় তাই হবে,
উচ্চদরের কাব্যকলা না যদি হয় নাই হবে,—
মিল বাঁচাব, মেনে যাব মাত্রা দেবার বিধান তো ;
তার বেশি আর করলে আশা ঠকবে এবার নিতান্ত ।

গর্মি যখন ছুটল না আর পাখার হাওয়ায় শরবতে,
ঠাণ্ডা হতে দৌড়ে এলুম শিলঙ নামক পর্বতে ।
মেঘ-বিছানো শৈলমালা গহন-ছায়া অরণ্যে
ক্লান্ত জনে ডাক দিয়ে কয়, "কোলে আমার শরণ নে ।
ঝরনা ঝরে কলকলিয়ে আঁকাবাঁকা ভঙ্গিতে,
বুকের মাঝে কয় কথা যে সোহাগ-ঝরা সংগীতে ।
বাতাস কেবল ঘুরে বেড়ায় পাইন বনের পল্লবে,
নিঃশ্বাসে তার বিষ নাশে আর অবল মানুষ বল লভে ।
পাথর-কাটা পথ চলেছে বাঁকে বাঁকে পাক দিয়ে,
নতুন নতুন শোভার চমক দেয় দেখা তার ফাঁক দিয়ে
দার্জিলিঙের তুলনাতে ঠাণ্ডা হেথায় কম হবে,
একটা খদর চাদর হলেই শীত-ভাঙানো সম্ভবে ।
চেরাপুঞ্জি কাছেই বটে, নামজাদা তার বৃষ্টিপাত ;
মোদের 'পরে বাদল মেঘের নেই ততদূর দৃষ্টিপাত ।

এখানে খুব লাগল ভালো গাছের ফাঁকে চন্দ্রোদয়,
আর ভালো এই হাওয়ায় যখন পাইন-পাতার গন্ধ বয় ;
বেশ আছি এই বনে বনে, যখন-তখন ফুল তুলি,
নাম-না-জানা পাখি নাচে, শিষ দিয়ে যায় বুলবুলি ।
ভালো লাগে দুপুরবেলায় মন্দমধুর ঠাণ্ডাটি,
ভোলায় রে মন দেবদারু-বন গিরিদেবের পাণ্ডাটি ।
ভালো লাগে আলোছায়ার নানারকম আঁক কাটা,
দিব্যি দেখায় শৈলবুকে শস্ত-খেতের থাক কাটা

ভালো লাগে রৌদ্র যখন পড়ে মেঘের ফন্দিতে,
রবির সাথে ইন্দ্র মেলেন নীল-সোনালির সন্ধিতে।
নয় ভালো এই গুর্খাদলের কুচকাওয়াজের কাণ্ডটা,
তা ছাড়া ঐ ব্যাগ্রপাইপ নামক বাদ্যভাণ্ডটা।
ঘন ঘন বাজায় শিঙা—আকাশ করে সরগরম,
গুলিগোলার ধড়ধড়ানি, বুকের মধ্যে থরথরম।
আর ভালো নয় মোটরগাড়ির ঘোর বেসুরো হাঁক দেওয়া,
নিরপরাধ পদাতিকের সর্বদেহে পাঁক দেওয়া।
তা ছাড়া সব পিসু মাছি কাশি হাঁচি ইত্যাদি,
কখনো বা খাওয়ার দোষে রুখে দাঁড়ায় পিত্তাদি;
এমনতরো ছোটোখাটো একটা কিংবা অর্ধটা
যৎসামান্য উপদ্রবের নাই বা দিলাম ফর্দটা।
দোষ গাইতে চাই যদি তো তাল করা যায় বিন্দুকে;
মোটের উপর শিলঙ ভালোই যাই না বলুক নিন্দুকে।
আমার মতে জগৎটাতে ভালোটারই প্রাধান্য,—
মন্দ যদি তিন-চল্লিশ, ভালোর সংখ্যা সাতান্ন।
বর্ণনাটা ক্ষান্ত করি, অনেকগুলো কাজ বাকি,
আছে চায়ের নেমন্তন্ন, এখনো তার সাজ বাকি।

ছড়া কিংবা কাব্য কভু লিখবে পরের ফরমাশে
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জেনো নয়কো তেমন শর্মা সে।
তথাপি এই ছন্দ রচে করেছি কাল নষ্ট তো;
এইখানেতে কারণটি তার বলে রাখি স্পষ্টত,—
তোমরা দুজন বয়সেতে ছোটোই হবে বোধ করি,
আর আমি তো পরমায়ুর ষাট দিয়েছি শোধ করি
তবু আমার পক্ক কেশের লম্বা দাড়ির সম্ভ্রমে.
আমাকে যে ভয় কর নি দুর্বাসা কি যম ভ্রমে,
মোর ঠিকানায় পত্র দিতে হয় নি কলম কম্পিত,
কবিতাতে লিখতে চিঠি হুকুম এল লম্ফিত,

এইটে দেখে মনটা আমার পূর্ণ হল উৎসাহে,
মনে হল, বৃদ্ধ আমি মন্দ লোকের কুৎসা এ।
মনে হল আজো আছে কম বয়সের রঙ্গিমা
জরার কোপে দাড়ি গোঁপে হয় নি জবড়জঙ্গিমা।
তাই বুঝি সব ছোটো যারা তারা যে কোন্ বিশ্বাসে
এক বয়সী বলে আমায় চিনেছে এক নিঃশ্বাসে।
এই ভাবনায় সেই হতে মন এমনিতরো খুশ আছে,
ডাকছে ভোলা "খাবার এল" আমার কি তার হুঁশ আছে?
জানলা দিয়ে বৃষ্টিতে গা ভেজে যদি ভিজুক তো,
ভুলেই গেলাম লিখতে নাটক আছি আমি নিযুক্ত।
মনকে ডাকি, "হে আত্মারাম, ছুটুক তোমার কবিত্ব,
ছোট্টো দুটি মেয়ের কাছে ফুটুক রবির রবিত্ব।"

জিৎভূমি, শিলং
২৬ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩০

যাত্রা

আশ্বিনের রাত্রিশেষে ঝরে-পড়া শিউলি-ফুলের
আগ্রহে আকুল বনতল; তারা মরণকূলের
উৎসবে ছুটেছে দলে দলে; শুধু বলে, "চলো চলো।"
অশ্রুবাষ্প-কুহেলিতে দিগন্তের চক্ষু ছলছল,
ধরিত্রীর আর্দ্রবক্ষে তৃণে তৃণে কম্পন সঞ্চারে,
তবু ওই প্রভাতের যাত্রিদল বিদায়ের দ্বারে
হাস্যমুখে ঊর্ধ্বপানে চায়, দেখে অরুণ আলোর
তরণী দিয়েছে খেয়া, হংসশুভ্র মেঘের ঝালর
দোলে তার চন্দ্রাতপতলে।
ওরে, এতক্ষণে বুঝি
তারা ঝরা নির্ঝরের স্রোতঃপথে পথ খুঁজি খুঁজি
গেছে সাত ভাই চম্পা; কেতকীর রেণুতে রেণুতে
ছেয়েছে যাত্রার পথ; দিগ্বধূর বেণুতে বেণুতে

বেজেছে ছুটির গান ; ভাঁটার নদীর ঢেউগুলি
মুক্তির কল্লোলে মাতে, নৃত্যবেগে ঊর্ধ্বে বাহু তুলি'
উচ্ছলিয়া বলে, "চলো, চলো।" বাউল উত্তরে-হাওয়া
ধেয়েছে দক্ষিণ মুখে, মরণের রুদ্রনেশা-পাওয়া ;
বাজায় অশান্ত ছন্দে তাল পল্লবের করতাল,
ফুকারে বৈরাগ্যমন্ত্র ; স্পর্শে তার হয়েছে মাতাল
প্রান্তরের প্রান্তে প্রান্তে কাশের মঞ্জরী, কাঁপে তারা
ভয়কুণ্ঠ উৎকণ্ঠিত সুখে—বলে, "বৃন্তবন্ধহারা
যাব উদ্দামের পথে, যাব আনন্দিত সর্বনাশে,
রিক্তবৃষ্টি মেঘ সাথে, সৃষ্টিছাড়া ঝড়ের বাতাসে,
যাব, যেথা শংকরের টলমল চরণ পাতনে
জাহ্নবীতরঙ্গমন্দ্র-মুখরিত তাণ্ডব-মাতনে
গেছে উড়ে জটাভ্রষ্ট ধুতুরার ছিন্নভিন্ন দল,
কক্ষচ্যুত ধূমকেতু লক্ষ্যহারা প্রলয়-উজ্জ্বল
আত্মঘাত-মদমত্ত আপনারে দীর্ণ কীর্ণ করে
নির্মম উল্লাসবেগে, খণ্ড খণ্ড উল্কাপিণ্ড ঝরে,
কণ্টকিয়া তোলে ছায়াপথ।"
ওরা ডেকে বলে, "কবি,
সে তীর্থে কি তুমি সঙ্গে যাবে, যেথা অস্তগামী রবি
সন্ধ্যামেঘে রচে বেদী নক্ষত্রের বন্দনাসভায়,
যেথা তার সর্বশেষ রশ্মিটির রক্তিম জবায়
সাজায় অন্তিম অর্ঘ্য ; যেথায় নিঃশব্দ বেণু 'পরে
সংগীত স্তম্ভিত থাকে মরণের নিস্তব্ধ অধরে।"

কবি বলে, "যাত্রী আমি, চলিব রাত্রির নিমন্ত্রণে
যেখানে সে চিরন্তন দেয়ালির উৎসবপ্রাঙ্গণে
মৃত্যুদূত নিয়ে গেছে আমার আনন্দদীপগুলি,
যেথা মোর জীবনের প্রত্যূষের সুগন্ধি শিউলি
মাল্য হয়ে গাঁথা আছে অনন্তের অঙ্গদে কুণ্ডলে,
ইন্দ্রাণীর স্বয়ম্বর-বরমাল্য সাথে ; দলে দলে

যেথা মোর অকৃতার্থ আশাগুলি, অসিদ্ধ সাধনা,
মন্দির-অঙ্গনদ্বারে প্রতিহত কত আরাধনা
নন্দন-মন্দারগন্ধ-লুব্ধ যেন মধুকর-পাঁতি,
গেছে উড়ি মর্ত্যের দুর্ভিক্ষ ছাড়ি।
আমি তব সাথি,
হে শেফালি, শরৎ-নিশির স্বপ্ন, শিশিরসিঞ্চিত
প্রভাতের বিচ্ছেদবেদনা, মোর সুচিরসঞ্চিত
অসমাপ্ত সংগীতের ডালিখানি নিয়ে বক্ষতলে,
সমর্পিব নির্বাকের নির্বাণ বাণীর হোমানলে।"

৫ আশ্বিন, ১৩৩০

তপোভঙ্গ

যৌবনবেদনা-রসে উচ্ছল আমার দিনগুলি,
হে কালের অধীশ্বর, অন্যমনে গিয়েছ কি ভুলি,
হে ভোলা সন্ন্যাসী।
চঞ্চল চৈত্রের রাতে
কিংশুকমঞ্জরী সাথে
শূন্যের অকূলে তারা অযত্নে গেল কি সব ভাসি?

আশ্বিনের বৃষ্টিহারা শীর্ণশুভ্র মেঘের ভেলায়
গেল বিস্মৃতির ঘাটে স্বেচ্ছাচারী হাওয়ার খেলায়
নির্মম হেলায়?

একদা সে দিনগুলি তোমার পিঙ্গল জটাজালে
শ্বেত রক্ত নীল পীত নানা পুষ্পে বিচিত্র সাজালে,
গেছ কি পাসরি।

দস্যু তারা হেসে হেসে
হে ভিক্ষুক, নিল শেষে
তোমার ডম্বরু শিঙা, হাতে দিল মঞ্জিরা বাঁশরি।

গন্ধভারে আমন্থর বসন্তের উন্মাদন-রসে
ভরি' তব কমণ্ডলু নিমজ্জিল নিবিড় আলসে
মাধুর্যরভসে।

সেদিন তপস্যা তব অকস্মাৎ শূন্যে গেল ভেসে
শুষ্ক-পত্রে ঘূর্ণ-বেগে গীত-রিক্ত হিম-মরুদেশে,
উত্তরের মুখে।
তব ধ্যানমন্ত্রটিরে
আনিল বাহির তীরে
পুষ্পগন্ধে লক্ষ্যহারা দক্ষিণের বায়ুর কৌতুকে।

সে-মন্ত্রে উঠিল মাতি সেঁউতি কাঞ্চন করবিকা,
সে-মন্ত্রে নবীনপত্রে জ্বালি দিল অরণ্যবীথিকা
শ্যাম বহ্নিশিখা।

বসন্তের বন্যাস্রোতে সন্ন্যাসের হল অবসান;
জটিল জটার বন্ধে জাহ্নবীর অশ্রু-কলতান
শুনিলে তন্ময়।
সেদিন ঐশ্বর্য তব
উন্মেষিল নব নব
অন্তরে উদ্বেল হল আপনাতে আপন বিস্ময়।

আপনি সন্ধান পেলে আপনার সৌন্দর্য উদার,
আনন্দে ধরিলে হাতে জ্যোতির্ময় পাত্রটি সুধার
বিশ্বের ক্ষুধার।

সেদিন, উন্মত্ত তুমি, যে-নৃত্যে ফিরিলে বনে বনে
সে-নৃত্যের ছন্দে-লয়ে সংগীত রচিনু ক্ষণে ক্ষণে
তব সঙ্গ ধ'রে।
ললাটের চন্দ্রালোকে
নন্দনের স্বপ্ন-চোখে
নিত্য-নূতনের লীলা দেখেছিনু চিত্ত মোর ভ'রে।

দেখেছিনু সুন্দরের অন্তর্লীন হাসির রঙ্গিমা,
দেখেছিনু লজ্জিতের পুলকের কুণ্ঠিত ভঙ্গিমা,
রূপ-তরঙ্গিমা।

সেদিনের পানপাত্র, আজ তার ঘুচালে পূর্ণতা?
মুছিলে, চুম্বনরাগে চিহ্নিত বঙ্কিম রেখা-লতা
রক্তিম-অঙ্কনে?
অগীত সংগীতধার,
অশ্রুর সঞ্চয়ভার
অযত্নে লুণ্ঠিত সে কি ভগ্নভাণ্ডে তোমার অঙ্গনে?

তোমার তাণ্ডব নৃত্যে চূর্ণ চূর্ণ হয়েছে সে ধূলি?
নিঃস্ব কালবৈশাখীর নিঃশ্বাসে কি উঠিছে আকুলি
লুপ্ত দিনগুলি?

নহে নহে, আছে তারা; নিয়েছ তাদের সংহরিয়া
নিগূঢ় ধ্যানের রাত্রে, নিঃশব্দের মাঝে সম্বরিয়া
রাখ সংগোপনে।
তোমার জটায় হারা
গঙ্গা আজ শান্তধারা,
তোমার ললাটে চন্দ্র গুপ্ত আজি সুপ্তির বন্ধনে।

আবার কী লীলাচ্ছলে অকিঞ্চন সেজেছ বাহিরে।
অন্ধকারে নিঃস্বনিছে যত দূরে দিগন্তে চাহি রে—
"নাহি রে, নাহি রে।"

কালের রাখাল তুমি, সন্ধ্যায় তোমার শিঙা বাজে,
দিন-ধেনু ফিরে আসে স্তব্ধ তব গোষ্ঠগৃহমাঝে,
উৎকণ্ঠিত বেগে।
নির্জন প্রান্তরতলে
আলেয়ার আলো জ্বলে,
বিদ্যুৎ-বহ্নির সর্প হানে ফণা যুগান্তের মেঘে।

চঞ্চল মুহূর্ত যত অন্ধকারে দুঃসহ নৈরাশে
নিবিড় নিবদ্ধ হয়ে তপস্যার নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে
শান্ত হয়ে আসে।

জানি জানি, এ তপস্যা দীর্ঘরাত্রি করিছে সন্ধান
চঞ্চলের নৃত্যস্রোতে আপন উন্মত্ত অবসান
দুরন্ত উল্লাসে।
বন্দী যৌবনের দিন
আবার শৃঙ্খলহীন
বারে বারে বাহিরিবে ব্যগ্র বেগে উচ্চ কলোচ্ছ্বাসে।

বিদ্রোহী নবীন বীর, স্থবিরের শাসন-নাশন,
বারে বারে দেখা দিবে; আমি রচি তারি সিংহাসন,
তারি সম্ভাষণ।

তপোভঙ্গ-দূত আমি মহেন্দ্রের, হে রুদ্র সন্ন্যাসী,
স্বর্গের চক্রান্ত আমি। আমি কবি যুগে যুগে আসি
তব তপোবনে।
দুর্জয়ের জয়মালা
পূর্ণ করে মোর ডালা,
উদ্দামের উতরোল বাজে মোর ছন্দের ক্রন্দনে।

ব্যথার প্রলাপে মোর গোলাপে গোলাপে জাগে বাণী,
কিশলয়ে কিশলয়ে কৌতূহল-কোলাহল আনি'
মোর গান হানি।

হে শুষ্ক বল্কলধারী বৈরাগী, ছলনা জানি সব,
সুন্দরের হাতে চাও আনন্দে একান্ত পরাভব
ছদ্মরণবেশে।
বারে বারে পঞ্চশরে
অগ্নিতেজে দগ্ধ করে
দ্বিগুণ উজ্জ্বল করি' বারে বারে বাঁচাইবে শেষে।

বারে বারে তারি তূণ সম্মোহনে ভরি দিব ব'লে
আমি কবি সংগীতের ইন্দ্রজাল নিয়ে আসি চলে
মৃত্তিকার কোলে।

জানি জানি, বারংবার প্রেয়সীর পীড়িত প্রার্থনা
শুনিয়া জাগিতে চাও আচম্বিতে, ওগো অন্যমনা,
নূতন উৎসাহে।

তাই তুমি ধ্যানচ্ছলে
বিলীন বিরহতলে,
উমাকে কাঁদাতে চাও বিচ্ছেদের দীপ্তদুঃখদাহে।
ভগ্ন তপস্যার পরে মিলনের বিচিত্র সে ছবি
দেখি আমি যুগে যুগে, বীণাতন্ত্রে বাজাই ভৈরবী,
আমি সেই কবি।

আমারে চেনে না তব শ্মশানের বৈরাগ্যবিলাসী,
দারিদ্র্যের উগ্র দর্পে খলখল ওঠে অট্টহাসি
দেখে মোর সাজ।

হেনকালে মধুমাসে
মিলনের লগ্ন আসে,
উমার কপোলে লাগে স্মিতহাস্য-বিকশিত লাজ।
সেদিন কবিরে ডাকো বিবাহের যাত্রাপথতলে,
পুষ্পমাল্যমাঙ্গল্যের সাজি লয়ে, সপ্তর্ষির দলে
কবি সঙ্গে চলে।

ভৈরব, সেদিন তব প্রেতসঙ্গিদল রক্ত-আঁখি
দেখে তব শুভ্রতনু রক্তাংশুকে রহিয়াছে ঢাকি,
প্রাতঃসূর্যরুচি।

অস্থিমালা গেছে খুলে
মাধবীবল্লরীমূলে,

ভালে মাখা পুষ্পরেণু, চিতাভস্ম কোথা গেছে মুছি
কৌতুকে হাসেন উমা কটাক্ষে লক্ষিয়া কবি পানে ;
সে হাস্যে মন্দ্রিল বাঁশি সুন্দরের জয়ধ্বনিগানে
কবির পরানে।

কার্তিক, ১৩৩০

ভাঙা মন্দির

১

পুণ্যলোভীর নাই হল ভিড়
শূন্য তোমার অঙ্গনে,
জীর্ণ হে তুমি দীর্ণ দেবতালয়।
অর্ঘ্যের আলো নাই বা সাজাল
পুষ্পে প্রদীপে চন্দনে,
যাত্রীরা তব বিস্মৃত-পরিচয়।
সম্মুখপানে দেখো দেখি চেয়ে,
ফাল্গুনে তব প্রাঙ্গণ ছেয়ে
বনফুলদল ঐ এল ধেয়ে
উল্লাসে চারিধারে।
দক্ষিণ বায়ে কোন্ আহ্বান
শূন্যে জাগায় বন্দনাগান,
কী খেয়াতরীর পায় সন্ধান
আসে পৃথ্বীর পারে ?
গন্ধের থালি বর্ণের ডালি
আনে নির্জন অঙ্গনে,
জীর্ণ হে তুমি দীর্ণ দেবতালয়,
বকুল শিমুল আকন্দ ফুল
কাঞ্চন জবা রঙ্গনে
পূজা-তরঙ্গ দুলে অম্বরময়।

২

প্রতিমা না হয় হয়েছে চূর্ণ,
বেদীতে না হয় শূন্যতা,
জীর্ণ হে তুমি দীর্ণ দেবতালয়,
না হয় ধুলায় হল লুণ্ঠিত
আছিল যে-চূড়া উন্নতা,
সজ্জা না থাকে কিসের লজ্জা ভয় ?
বাহিরে তোমার ঐ দেখো ছবি,
ভগ্নভিত্তিলগ্ন মাধবী,
নীলাম্বরের প্রাঙ্গণে রবি
হেরিয়া হাসিছে স্নেহে।
বাতাসে পুলকি আলোকে আকুলি
আন্দোলি উঠে মঞ্জরীগুলি,
নবীন প্রাণের হিল্লোল তুলি
প্রাচীন তোমার গেহে।
সুন্দর এসে ঐ হেসে হেসে
ভরি দিল তব শূন্যতা,
জীর্ণ হে তুমি দীর্ণ দেবতালয়।
ভিত্তিরন্ধ্রে বাজে আনন্দে
ঢাকি দিয়া তব ক্ষুণ্ণতা
রূপের শঙ্খে অসংখ্য জয় জয়।

৩

সেবার প্রহরে নাই আসিল রে
যত সন্ন্যাসী-সজ্জনে,
জীর্ণ হে তুমি দীর্ণ দেবতালয়।
নাই মুখরিল পার্বণ-ক্ষণ
ঘন জনতার গর্জনে,
অতিথি-ভোগের না রহিল সঞ্চয়।

পূজার মঞ্চে বিহঙ্গদল
কুলায় বাঁধিয়া করে কোলাহল,
তাই তো হেথায় জীববৎসল
আসিছেন ফিরে ফিরে।
নিত্য সেবার পেয়ে আয়োজন
তৃপ্ত পরানে করিছে কূজন,
উৎসবরসে সেই তো পূজন
জীবন-উৎসতীরে।
নাইকো দেবতা ভেবে সেই কথা
গেল সন্ন্যাসী-সজ্জনে,
জীর্ণ হে তুমি দীর্ণ দেবতালয়।
সেই অবকাশে দেবতা যে আসে,—
প্রসাদ-অমৃত-মজ্জনে
স্খলিত ভিত্তি হল যে পুণ্যময়॥

মাঘ, ১৩৩০

আগমনী

মাঘের বুকে সকৌতুকে কে আজি এল, তাহা
বুঝিতে পার তুমি?
শোন নি কানে, হঠাৎ গানে কহিল, "আহা, আহা,"
সকল বনভূমি?
শুষ্ক জরা পুষ্প-ঝরা,
হিমের বায়ে কাঁপন-ধরা
শিথিল মন্থর;
"কে এল" বলি তরাসি উঠে শীতের সহচর।

গোপনে এল, স্বপনে এল, এল সে মায়া-পথে,
পায়ের ধ্বনি নাহি।

ছায়াতে এল, কায়াতে এল, এল সে মনোরথে
দখিন-হাওয়া বাহি
অশোক-বনে নবীন পাতা
আকাশ পানে তুলিল মাথা,
কহিল, "এসেছ কি ?"
মর্মরিয়া থরথর কাঁপিল আমলকী ।

কাহারে চেয়ে উঠিল গেয়ে দোয়েল চাঁপা-শাখে
"শোনো গো, শোনো শোনো ।"
শ্যামা না জানে প্রভাতী-গানে কী নামে তারে ডাকে
আছে কি নাম কোনো ?
কোকিল শুধু মুহুর্মুহু
আপন মনে কুহরে কুহু
ব্যথায় ভরা বাণী ।
কপোত বুঝি শুধায় শুধু, "জানি কি, তারে জানি ?"

আমের বোলে কী কলরোলে সুবাস ওঠে মাতি'
অসহ উচ্ছ্বাসে ।
আপন মনে মাধবী ভনে কেবলি দিবারাতি,
"মোরে সে ভালোবাসে ।"
অধীর হাওয়া নদীর পারে
খ্যাপার মতো কহিছে কারে
"বলো তো কী-যে করি ?"
শিহরি উঠি শিরীষ বলে, "কে ডাকে মরি, মরি ।"

কেন যে আজি উঠিল বাজি আকাশ-কাঁদা বাঁশি
জানিস তাহা না কি ?
রঙিন যত মেঘের মতো কী যায় মনে ভাসি
কেন যে থাকি থাকি ?

অবুঝ তোরা, তাহারে বুঝি
দূরের পানে ফিরিস খুঁজি ;
বাহিরে আঁখি বাঁধা,
প্রাণের মাঝে চাহিস না যে তাই তো লাগে ধাঁধা

পুলকে-কাঁপা কনকচাঁপা বুকের মধু-কোষে
পেয়েছে দ্বার নাড়া,
এমন করে কুঞ্জ ভরে সহজে তাই তো সে
দিয়েছে তারি সাড়া।
সহসা বনমল্লিকা যে
পেয়েছে তারে আপন মাঝে,
ছুটিয়া দলে দলে
"এই যে তুমি, এই যে তুমি" আঙুল তুলে বলে।

পেয়েছে তারা, গেয়েছে তারা, জেনেছে তারা সব
আপন মাঝখানে,
তাই এ শীতে জাগাল গীতে বিপুল কলরব
দ্বিধাবিহীন তানে।
ওদের সাথে জাগ্ রে কবি,
হৃৎকমলে দেখ্ সে ছবি,
ভাঙুক মোহঘোর।
বনের তলে নবীন এল, মনের তলে তোর।

আলোতে তোরে দিক না ভরে ভোরের নব রবি,
বাজ্ রে বীণা বাজ্।
গগন-কোলে হাওয়ার দোলে ওঠ্ রে দুলে কবি,
ফুরাল তোর কাজ।
বিদায় নিয়ে যাবার আগে
পড়ুক টান ভিতর বাগে,
বাহিরে পাস ছুটি।
প্রেমের ডোরে বাঁধুক তোরে বাঁধন যাক টুটি॥

মাঘ, ১৩৩০

উৎসবের দিন

ভয় নিত্য জেগে আছে প্রেমের শিয়র-কাছে,
মিলন-সুখের বক্ষোমাঝে।
আনন্দের হৃৎস্পন্দনে আন্দোলিছে ক্ষণে-ক্ষণে
বেদনার রুদ্র দেবতা যে।
তাই আজ উৎসবের ভোরবেলা হতে
বাষ্পাকুল অরুণের করুণ আলোতে
উল্লাস-কল্লোলতলে ভৈরবী রাগিণী কেঁদে বাজে
মিলন-সুখের বক্ষোমাঝে।

নবীন পল্লবপুটে মর্মরি মর্মরি উঠে
দূর বিরহের দীর্ঘশ্বাস ;
উষার সীমন্তে লেখা উদয়-সিন্দুর-রেখা
মনে আনে সন্ধ্যার আকাশ।
আম্রের মুকুল-গন্ধে ব্যাকুল কী সুর
অরণ্যছায়ার হিয়া করিছে বিধুর ;
অশ্রুর অশ্রুত ধ্বনি ফাল্গুনের মর্মে করে বাস,
দূর বিরহের দীর্ঘশ্বাস।

দিগন্তের স্বর্ণদ্বারে কতবার বারে বারে
এসেছিল সৌভাগ্য-লগন।
আশার লাবণ্যে-ভরা জেগেছিল বসুন্ধরা,
হেসেছিল প্রভাত-গগন।
কত না উৎসুক-বুকে পথপানে ধাওয়া,
কত না চকিত-চক্ষে প্রতীক্ষার চাওয়া
বারেবারে বসন্তেরে করেছিল চাঞ্চল্যে-মগন,
এসেছিল সৌভাগ্য-লগন।

আজ উৎসবের সুরে তারা মরে ঘুরে ঘুরে ;
বাতাসেরে করে যে উদাস।
তাদের পরশ পায়, কী মায়াতে ভরে যায়
প্রভাতের স্নিগ্ধ অবকাশ।
তাদের চমক লাগে চম্পকশাখায়,
কাঁপে তারা মৌমাছির গুঞ্জিত পাখায়,
সেতারের তারে তারে মূর্ছনায় তাদের আভাস
বাতাসেরে করিল উদাস।

কালস্রোতে এ অকূলে আলোচ্ছায়া দুলে দুলে
চলে নিত্য অজানার টানে।
বাঁশি কেন রহি রহি সে-আহ্বান আনে বহি'
আজি এই উল্লাসের গানে ?
চঞ্চলেরে শুনাইছে শুব্ধতার ভাষা,
যার রাত্রি-নীড়ে আসে যত শঙ্কা আশা।
বাঁশি কেন প্রশ্ন করে, "বিশ্ব কোন্ অনন্তের পানে
চলে নিত্য অজানার টানে ?"

যায় যাক, যায় যাক্, আসুক দূরের ডাক,
যাক ছিঁড়ে সকল বন্ধন।
চলার সংঘাত-বেগে সংগীত উঠুক জেগে
আকাশের হৃদয়-নন্দন।
মুহূর্তের নৃত্যচ্ছন্দে ক্ষণিকের দল
যাক পথে মত্ত হয়ে বাজায়ে মাদল ;
অনিত্যের স্রোত বেয়ে যাক ভেসে হাসি ও ক্রন্দন,
যাক ছিঁড়ে সকল বন্ধন।

ফাল্গুন, ১৩৩০

গানের সাজি

গানের সাজি এনেছি আজি
ঢাকাটি তার লও গো খুলে
দেখো তো চেয়ে কী আছে।
যে থাকে মনে স্বপন-বনে
ছায়ার দেশে ভাবের কূলে
সে বুঝি কিছু দিয়াছে।
কী যে সে তাহা আমি কি জানি,
ভাষায় চাপা কোন্ সে বাণী
সুরের ফুলে গন্ধখানি
ছন্দে বাঁধি গিয়াছে,
সে ফুল বুঝি হয়েছে পুঁজি,
দেখো তো চেয়ে কী আছে।

দেখো তো, সখী দিয়েছে ও কি
সুখের কাঁদা দুখের হাসি,
দুরাশাভরা চাহনি ?
দিয়েছে কি না ভোরের বীণা,
দিয়েছে কি সে রাতের বাঁশি
গহন-গান গাহনি ?
বিপুল ব্যথা ফাগুন-বেলা,
সোহাগ কভু, কভু বা হেলা,
আপন মনে আগুন-খেলা
পরানমন-দাহনি,—
দেখো তো ডালা, সে স্মৃতি-ঢালা
আছে আকুল চাহনি ?

ডেকেছ কবে মধুর রবে
মিটালে কবে প্রাণের ক্ষুধা
তোমার করপরশে,
সহসা এসে করুণ হেসে
কখন চোখে ঢালিলে সুধা
ক্ষণিক তব দরশে,—
বাসনা জাগে নিভৃতে চিতে
সে-সব দান ফিরায়ে দিতে
আমার দিনশেষের গীতে ;
সফল তারে করো হে ।
গানের সাজি খোলো গো আজি
করুণ করপরশে ।

রসে বিলীন সে-সব দিন
ভরেছে আজি বরণডালা
চরম তব বরণে ।
সুরের ডোরে গাঁথনি ক'রে
রচিয়া মম বিরহমালা
রাখিয়া যাব চরণে ।
একদা তব মনে না রবে,
স্বপনে এরা মিলাবে কবে,
তাহারি আগে ঝরুক তবে
অমৃতময় মরণে
ফাগুনে তোরে বরণ ক'রে
সকল শেষ বরণে ॥

ফাল্গুন, ১৩৩০

লীলাসঙ্গিনী

দুয়ার-বাহিরে যেমনি চাহি রে
মনে হল যেন চিনি,—
কবে, নিরুপমা, ওগো প্রিয়তমা,
ছিলে লীলাসঙ্গিনী ?
কাজে ফেলে মোরে চলে গেলে কোন্ দূরে,
মনে পড়ে গেল আজি বুঝি বন্ধুরে ?
ডাকিলে আবার কবেকার চেনা সুরে—
বাজাইলে কিঙ্কিণী।
বিস্মরণের গোধূলিক্ষণের
আলোতে তোমারে চিনি।

এলোচুলে বহে এনেছ কী মোহে
সেদিনের পরিমল ?
বকুলগন্ধে আনে বসন্ত
কবেকার সম্বল ?
চৈত্র-হাওয়ায় উতলা কুঞ্জমাঝে
চারু চরণের ছায়ামঞ্জীর বাজে,
সেদিনের তুমি এলে এদিনের সাজে
ওগো চিরচঞ্চল।
অঞ্চল হতে ঝরে বায়ুস্রোতে
সেদিনের পরিমল।

মনে আছে সে কি সব কাজ, সখী,
ভুলায়েছ বারে বারে।
বন্ধ দুয়ার খুলেছ আমার
কঙ্কণ-ঝংকারে।

ইশারা তোমার বাতাসে বাতাসে ভেসে
ঘুরে ঘুরে যেত মোর বাতায়নে এসে,
কখনো আমের নবমুকুলের বেশে,
কভু নবমেঘভারে।
চকিতে চকিতে চল-চাহনিতে
ভুলায়েছ বারে বারে।

নদী-কূলে কূলে কল্লোল তুলে
গিয়েছিলে ডেকে ডেকে।
বনপথে আসি করিতে উদাসী
কেতকীর রেণু মেখে।
বর্ষাশেষের গগন-কোনায় কোনায়,
সন্ধ্যামেঘের পুঞ্জ সোনায় সোনায়
নির্জন ক্ষণে কখন অন্যমনায়
ছুঁয়ে গেছ থেকে থেকে।
কখনো হাসিতে কখনো বাঁশিতে
গিয়েছিলে ডেকে ডেকে।

কী লক্ষ্য নিয়ে এসেছ এ-বেলা
কাজের কক্ষ-কোণে?
সাথি খুঁজিতে কি ফিরিছ একেলা
তব খেলা-প্রাঙ্গণে?
নিয়ে যাবে মোরে নীলাম্বরের তলে
ঘরছাড়া যত দিশাহারাদের দলে,
অযাত্রা-পথে যাত্রী যাহারা চলে
নিষ্ফল আয়োজনে?
কাজ ভোলাবারে ফেরো বারে বারে
কাজের কক্ষ-কোণে।

আবার সাজাতে হবে আভরণে
মানসপ্রতিমাগুলি ?
কল্পনাপটে নেশার বরনে
বুলাব রসের তুলি ?
বিবাগি মনের ভাবনা ফাগুন-প্রাতে
উড়ে চলে যাবে উৎসুক বেদনাতে,
কলগুঞ্জিত মৌমাছিদের সাথে
পাখায় পুষ্পধূলি।
আবার নিভৃতে হবে কি রচিতে
মানস প্রতিমাগুলি ?

দেখো না কি, হায়, বেলা চলে যায়,—
সারা হয়ে এল দিন।
বাজে পূরবীর ছন্দে রবির
শেষ রাগিণীর বীন।
এতদিন হেথা ছিনু আমি পরবাসী,
হারিয়ে ফেলেছি সেদিনের সেই বাঁশি,
আজ সন্ধ্যায় প্রাণ ওঠে নিঃশ্বাসি
গানহারা উদাসীন।
কেন অবেলায় ডেকেছ খেলায়,
সারা হয়ে এল দিন।

এবার কি তবে শেষ খেলা হবে
নিশীথ-অন্ধকারে ?
মনে মনে বুঝি হবে খোঁজাখুঁজি
অমাবস্যার পারে ?
মালতীলতায় যাহারে দেখেছি প্রাতে
তারায় তারায় তারি লুকাচুরি রাতে ?
সুর বেজেছিল যাহার পরশ-পাতে
নীরবে লভিব তারে ?

দিনের দুরাশা স্বপনের ভাষা
রচিবে অন্ধকারে ?

যদি রাত হয়—না করিব ভয়,—
চিনি যে তোমারে চিনি।
চোখে নাই দেখি, তবু ছলিবে কি,
হে গোপন-রঙ্গিণী ?
নিমেষে আঁচল ছুঁয়ে যায় যদি চলে
তবু সব কথা যাবে সে আমায় বলে,
তিমিরে তোমার পরশ-লহরী দোলে
হে রস-তরঙ্গিণী !
হে আমার প্রিয়, আবার ভুলিয়ো,
চিনি যে তোমারে চিনি।

ফাল্গুন, ১৩৩০

শেষ অর্ঘ্য

যে-তারা মহেন্দ্রক্ষণে প্রত্যুষবেলায়
প্রথম শুনাল মোরে নিশান্তের বাণী
শান্তমুখে নিখিলের আনন্দমেলায়
স্নিগ্ধকণ্ঠে ডেকে নিয়ে এল ; দিল আনি
ইন্দ্রাণীর হাসিখানি দিনের খেলায়
প্রাণের প্রাঙ্গণে ; যে সুন্দরী, যে ক্ষণিকা
নিঃশব্দ চরণে আসি, কম্পিত পরশে
চম্পক-অঙ্গুলি-পাতে তন্দ্রাযবনিকা
সহাস্যে সরায়ে দিল, স্বপ্নের আলসে
ছোঁয়াল পরশমণি জ্যোতির কণিকা ;
অন্তরের কণ্ঠহারে নিবিড় হরষে
প্রথম দুলায়ে দিল রূপের মণিকা ;
এ-সন্ধ্যার অন্ধকারে চলিনু খুঁজিতে,
সঞ্চিত অশ্রুর অর্ঘ্যে তাহারে পূজিতে।

ফাল্গুন, ১৩৩০

বেঠিক পথের পথিক

বেঠিক পথের পথিক আমার
অচিন সে জন রে।
চকিত চলার ক্বচিৎ হাওয়ায়
মন কেমন করে।
নবীন চিকন অশথ-পাতায়,
আলোর চমক কানন মাতায়,
যে রূপ জাগায় চোখের আগায়
কিসের স্বপন সে।
কী চাই, কী চাই, বচন না পাই
মনের মতন রে।

অচিন বেদন আমার ভাষায়
মিশায় যখন রে
আপন গানের গভীর নেশায়
মন কেমন করে।
তরল চোখের তিমির তারায়
যখন আমার পরান হারায়,
বাজায় সেতার সেই অচেনার
মায়ার স্বপন যে।
কী চাই, কী চাই, সুর যে না পাই
মনের মতন রে।

হেলায় খেলায় কোন্ অবেলায়
হঠাৎ মিলন রে।
সুখের দুখের দুয়ের মেলায়
মন কেমন করে।
বঁধুর বাহুর মধুর পরশ
কায়ায় জাগায় মায়ার হরষ,

তাহার মাঝার সেই অচেনার
চপল স্বপন যে,
কী চাই, কী চাই,- বাঁধন না পাই
মনের মতন রে।

প্রিয়ার হিয়ার ছায়ায় মিলায়
অচিন সে জন যে।
ছুঁই কি না ছুঁই বুঝি না কিছুই
মন কেমন করে।
চরণে তাহার পরান বুলাই
অরূপ দোলায় রূপেরে দুলাই;
আঁখির দেখায় আঁচল ঠেকায়
অধরা স্বপন যে।
চেনা অচেনায় মিলন ঘটায়
মনের মতন রে।

ফাল্গুন, ১৩৩০

বকুল-বনের পাখি

শোনো শোনো ওগো, বকুল-বনের পাখি,
দেখো তো, আমায় চিনিতে পারিবে না কি?
নই আমি কবি, নই জ্ঞান-অভিমানী,
মান-অপমান কী পেয়েছি নাহি জানি,
দেখেছ কি মোর দূরে-যাওয়া মনখানি,
উড়ে-যাওয়া মোর আঁখি?
আমাতে কি কিছু দেখেছ তোমারি সম,
অসীম-নীলিমা-তিয়াষি বন্ধু মম?

শোনো শোনো ওগো, বকুল-বনের পাখি,
কবে দেখেছিলে মনে পড়ে সে-কথা কি?

বালক ছিলাম, কিছু নহে তার বাড়া,
রবির আলোর কোলেতে ছিলেম ছাড়া,
চাঁপার গন্ধ বাতাসের প্রাণ-কাড়া
যেত মোরে ডাকি ডাকি।
সহজ রসের ঝরনা-ধারার 'পরে
গান ভাসাতেম সহজ সুখের ভরে।

শোনো শোনো, ওগো বকুল-বনের পাখি,
কাছে এসেছিনু ভুলিতে পারিবে তা কি ?
নগ্ন পরান লয়ে আমি কোন্ সুখে
সারা আকাশের ছিনু যেন বুকে বুকে,
বেলা চলে যেত অবিরত কৌতুকে
সব কাজে দিয়ে ফাঁকি।
শ্যামলা ধরার নাড়ীতে যে-তাল বাজে
নাচিত আমার অধীর মনের মাঝে।

শোনো শোনো, ওগো বকুল-বনের পাখি,
দূরে চলে এনু, বাজে তার বেদনা কি ?
আষাঢ়ের মেঘ রহে না কি মোরে চাহি ?
সেই নদী যায় সেই কলতান গাহি,—
তাহার মাঝে কি আমার অভাব নাহি ?
কিছু কি থাকে না বাকি ?
বালক গিয়েছে হারায়ে, সে-কথা লয়ে
কোনো আঁখিজল যায় নি কোথাও বয়ে ?

শোনো শোনো, ওগো বকুল-বনের পাখি,
আর বার তারে ফিরিয়া ডাকিবে না কি ?
যায় নি সেদিন যেদিন আমারে টানে,
ধরার খুশিতে আছে সে সকল খানে ;
আজ বেঁধে দাও আমার শেষের গানে
তোমার গানের রাখি।

আবার বারেক ফিরে চিনে লও মোরে,
বিদায়ের আগে লও গো আপন ক'রে।

শোনো শোনো, ওগো বকুল-বনের পাখি,
সেদিন চিনেছ আজিও চিনিবে না কি ?
পারঘাটে যদি যেতে হয় এইবার,
খেয়াল-খেয়ায় পাড়ি দিয়ে হব পার,
শেষের পেয়ালা ভরে দাও, হে আমার
সুরের সুরার সাকী।
আর কিছু নই, তোমারি গানের সাথি,
এই কথা জেনে আসুক ঘুমের রাতি।

শোনো শোনো, ওগো বকুল-বনের পাখি,
মুক্তির টিকা ললাটে দাও তো আঁকি।
যাবার বেলায় যাব না ছদ্মবেশে,
খ্যাতির মুকুট খসে যাক নিঃশেষে,
কর্মের এই বর্ম যাক না ফেঁসে,
কীর্তি যাক না ঢাকি।
ডেকে লও মোরে নামহারাদের দলে
চিহ্নবিহীন উধাও পথের তলে।

শোনো শোনো, ওগো বকুল-বনের পাখি
যাই যবে যেন কিছুই না যাই রাখি।
ফুলের মতন সাঁঝে পড়ি যেন ঝরে,
তারার মতন যাই যেন রাত-ভোরে,
হাওয়ার মতন বনের গন্ধ হ'রে
চলে যাই গান হাঁকি'।
বেণুপল্লব-মর্মর-রব সনে
মিলাই যেন গো সোনার গোধূলি-খনে।

ফাল্গুন, ১৩৩০

সাবিত্রী

ঘন অশ্রুবাষ্পে ভরা মেঘের দুর্যোগে খড়্গ হানি
ফেলো, ফেলো টুটি।
হে সূর্য, হে মোর বন্ধু, জ্যোতির কনকপদ্মখানি
দেখা দিক্ ফুটি।
বহ্নিবীণা বক্ষে লয়ে, দীপ্ত কেশে, উদ্বোধিনী বাণী
সে-পদ্মের কেন্দ্রমাঝে নিত্য রাজে, জানি তারে জানি।
মোর জন্মকালে
প্রথম প্রত্যুষে মম তাহারি চুম্বন দিলে আনি
আমার কপালে।

সে-চুম্বনে উচ্ছলিল জ্বালার তরঙ্গ মোর প্রাণে,
অগ্নির প্রবাহ।
উচ্ছ্বসি উঠিল মন্দ্রি বারংবার মোর গানে গানে
শান্তিহীন দাহ।
ছন্দের বন্যায় মোর রক্ত নাচে সে-চুম্বন লেগে
উন্মাদ সংগীত কোথা ভেসে যায় উদ্দাম আবেগে,
আপনা-বিস্মৃত।
সে চুম্বন-মন্ত্রে বক্ষে অজানা ক্রন্দন উঠে জেগে
ব্যথায় বিস্মিত।

তোমার হোমাগ্নি মাঝে আমার সত্যের আছে ছবি,
তারে নমো নম।
তমিস্র সুপ্তির কূলে যে-বংশী বাজাও, আদি কবি,
ধ্বংস করি তম,
সে-বংশী আমারি চিত্ত, রন্ধ্রে তারি উঠিছে গুঞ্জরি
মেঘে মেঘে বর্ণচ্ছটা, কুঞ্জে কুঞ্জে মাধবীমঞ্জরী,
নির্ঝরে কল্লোল।

তাহারি ছন্দের ভঙ্গে সর্ব অঙ্গে উঠিছে সঞ্চরি
জীবনহিল্লোল ॥

এ প্রাণ তোমারি এক ছিন্ন তান, সুরের তরণী ;
আয়ুস্রোত-মুখে
হাসিয়া ভাসায়ে দিলে লীলাচ্ছলে, কৌতুকে ধরণী
বেঁধে নিল বুকে।
আশ্বিনের রৌদ্রে সেই বন্দী প্রাণ হয় বিস্ফুরিত
উৎকণ্ঠার বেগে, যেন শেফালির শিশিরচ্ছুরিত
উৎসুক আলোক।
তরঙ্গহিল্লোলে নাচে রশ্মি তব, বিস্ময়ে পূরিত
করে মুগ্ধ চোখ।

তেজের ভাণ্ডার হতে কী আমাতে দিয়েছ যে ভরে
কেই বা সে জানে ?
কী জাল হতেছে বোনা স্বপ্নে স্বপ্নে নানা বর্ণডোরে
মোর গুপ্ত-প্রাণে ?
তোমার দূতীরা আঁকে ভুবন-অঙ্গনে আলিম্পনা।
মুহূর্তে সে ইন্দ্রজাল অপরূপ রূপের কল্পনা
মুছে যায় সরে।
তেমনি সহজ হ'ক হাসিকান্না ভাবনাবেদনা,
না বাঁধুক মোরে।

তারা সবে মিলে থাক্ অরণ্যের স্পন্দিত পল্লবে,
শ্রাবণ-বর্ষণে ;
যোগ দিক নির্ঝরের মঞ্জীর-গুঞ্জন-কলরবে
উপলঘর্ষণে।
ঝঞ্ঝার মদিরামত্ত বৈশাখের তাণ্ডবলীলায়
বৈরাগী বসন্ত যবে আপনার বৈভব বিলায়;
সঙ্গে যেন থাকে।

তার পরে যেন তারা সর্বহারা দিগন্তে মিলায়,
চিহ্ন নাহি রাখে।

হে রবি, প্রাঙ্গণে তব শরতের সোনার বাঁশিতে
জাগিল মূর্ছনা।
আলোতে শিশিরে বিশ্ব দিকে দিকে অশ্রুতে হাসিতে
চঞ্চল উন্মনা।
জানি না কী মত্ততায়, কী আহ্বানে আমার রাগিণী
ধেয়ে যায় অন্যমনে শূন্যপথে হয়ে বিবাগিনী,
লয়ে তার ডালি।
সে কি তব সভাস্থলে স্বপ্নাবেশে চলে একাকিনী
আলোর কাঙালি?

দাও, খুলে দাও দ্বার, ওই তার বেলা হল শেষ,
বুকে লও তারে।
শান্তি-অভিষেক হ'ক, ধৌত হ'ক সকল আবেশ
অগ্নি-উৎসধারে।
সীমন্তে, গোধূলি-লগ্নে দিয়ো এঁকে সন্ধ্যার সিন্দুর,
প্রদোষের তারা দিয়ে লিখো রেখা আলোক-বিন্দুর
তার স্নিগ্ধ ভালে।
দিনান্ত-সংগীতধ্বনি সুগম্ভীর বাজুক সিন্ধুর
তরঙ্গের তালে॥

হারুনা-মারু জাহাজ
২৬ সেপ্টেম্বর, ১৯২৪

পূর্ণতা

১

স্তব্ধরাতে একদিন
নিদ্রাহীন
আবেগের আন্দোলনে তুমি
বলেছিলে নতশিরে
অশ্রুনীরে
ধীরে মোর করতল চুমি—
"তুমি দূরে যাও যদি,
নিরবধি
শূন্যতার সীমাশূন্য ভারে
সমস্ত ভুবন মম
মরুসম
রুক্ষ হয়ে যাবে একেবারে।
আকাশ-বিস্তীর্ণ ক্লান্তি
সব শান্তি
চিত্ত হতে করিবে হরণ,—
নিরানন্দ নিরালোক
স্তব্ধ শোক
মরণের অধিক মরণ॥"

২

শুনে, তোর মুখখানি
বক্ষে আনি
বলেছিনু তোরে কানে কানে,-
"তুই যদি যাস দূরে
তোরি সুরে
বেদনা-বিদ্যুৎ গানে গানে

ঝলিয়া উঠিবে নিত্য,
মোর চিত্ত
সচকিবে আলোকে আলোকে
বিরহ বিচিত্র খেলা
সারা বেলা
পাতিবে আমার বক্ষে চোখে।
তুমি খুঁজে পাবে প্রিয়ে,
দূরে গিয়ে
মর্মের নিকটতম দ্বার,—
আমার ভুবনে তবে
পূর্ণ হবে
তোমার চরম অধিকার॥"

৩

দুজনের সেই বাণী
কানাকানি,
শুনেছিল সপ্তর্ষির তারা;
রজনীগন্ধার বনে
ক্ষণে ক্ষণে
বহে গেল সে বাণীর ধারা।
তার পরে চুপে চুপে
মৃত্যুরূপে
মধ্যে এল বিচ্ছেদ অপার।
দেখাশুনা হল সারা,
স্পর্শহারা
সে অনন্তে বাক্য নাহি আর
তবু শূন্য শূন্য নয়,
ব্যথাময়
অগ্নিবাষ্পে পূর্ণ সে গগন।

একা-একা সে অগ্নিতে
দীপ্তগীতে
সৃষ্টি করি স্বপ্নের ভুবন ॥

হারুনা-মারু জাহাজ,
১ অক্টোবর, ১৯২৪

আহ্বান

আমারে যে ডাক দেবে, এ জীবনে তারে বারম্বার
ফিরেছি ডাকিয়া।
সে নারী বিচিত্র বেশে মৃদু হেসে খুলিয়াছে দ্বার
থাকিয়া থাকিয়া।
দীপখানি তুলে ধ'রে, মুখে চেয়ে, ক্ষণকাল থামি
চিনেছে আমারে।
তারি সেই চাওয়া, সেই চেনার আলোক দিয়ে আমি
চিনি আপনারে ॥

সহস্রের বন্যাস্রোতে জন্ম হতে মৃত্যুর আঁধারে
চলে যাই ভেসে।
নিজেরে হারায়ে ফেলি অস্পষ্টের প্রচ্ছন্ন পাথারে
কোন্ নিরুদ্দেশে।
নামহীন দীপ্তিহীন তৃপ্তিহীন আত্মবিস্মৃতির
তমসার মাঝে
কোথা হতে অকস্মাৎ কর মোরে খুঁজিয়া বাহির
তাহা বুঝি না যে ॥

তব কণ্ঠে মোর নাম যেই শুনি, গান গেয়ে উঠি—
"আছি আমি আছি।"
সেই আপনার গানে লুপ্তির কুয়াশা ফেলে টুটি,
বাঁচি, আমি বাঁচি।

তুমি মোরে চাও যবে, অব্যক্তের অখ্যাত আবাসে
আলো উঠে জ্বলে,
অসাড়ের সাড়া জাগে, নিশ্চল তুষার গলে আসে
নৃত্য-কলরোলে ॥

নিঃশব্দচরণে উষা নিখিলের সুপ্তির দুয়ারে
দাঁড়ায় একাকী,
রক্ত-অবগুণ্ঠনের অন্তরালে নাম ধরি কারে
চলে যায় ডাকি।
অমনি প্রভাত তার বীণা হাতে বাহিরিয়া আসে,
শূন্য ভরে গানে,
ঐশ্বর্য ছড়ায়ে দেয় মুক্তহস্তে আকাশে আকাশে,
ক্লান্তি নাহি জানে ॥

কোন্ জ্যোতির্ময়ী হোথা অমরাবতীর বাতায়নে
রচিতেছে গান
আলোকের বর্ণে বর্ণে; নির্নিমেষ উদ্দীপ্ত নয়নে
করিছে আহ্বান।
তাই তো চাঞ্চল্য জাগে মাটির গভীর অন্ধকারে;
রোমাঞ্চিত তৃণে
ধরণী ক্রন্দিয়া উঠে, প্রাণস্পন্দ ছুটে চারিধারে
বিপিনে বিপিনে ॥

তাই তো গোপন ধন খুঁজে পায় অকিঞ্চন ধূলি
নিরুদ্ধ ভাণ্ডারে।
বর্ণে গন্ধে রূপে রসে আপনার দৈন্য যায় ভুলি
পত্রপুষ্পভারে।
দেবতার প্রার্থনায় কার্পণ্যের বদ্ধ মুষ্টি খুলে,
রিক্ততারে টুটি

রহস্য সমুদ্রতল উন্মথিয়া উঠে উপকূলে
রত্ন মুঠি মুঠি ॥

তুমি সে আকাশভ্রষ্ট প্রবাসী আলোক, হে কল্যাণী,
দেবতার দূতী।
মর্ত্যের গৃহের প্রান্তে বহিয়া এনেছে তব বাণী
স্বর্গের আকূতি।
ভঙ্গুর মাটির ভাণ্ডে গুপ্ত আছে যে অমৃতবারি
মৃত্যুর আড়ালে,
দেবতার হয়ে হেথা তাহারি সন্ধানে তুমি, নারী,
দু-বাহু বাড়ালে ॥

তাই তো কবির চিত্তে কল্পলোকে টুটিল অর্গল
বেদনার বেগে,
মানসতরঙ্গতলে বাণীর সংগীত-শতদল
নেচে ওঠে জেগে।
সুপ্তির তিমির বক্ষ দীর্ণ করে তেজস্বী তাপস
দীপ্তির কৃপাণে;
বীরের দক্ষিণ হস্ত মুক্তিমন্ত্রে বজ্র করে বশ,
অসত্যেরে হানে ॥

হে অভিসারিকা, তব বহুদূর পদধ্বনি লাগি,
আপনার মনে,
বাণীহীন প্রতীক্ষায় আমি আজ একা বসে জাগি,
নির্জন প্রাঙ্গণে।
দীপ চাহে তব শিখা, মৌনী বীণা ধেয়ায় তোমার
অঙ্গুলি-পরশ।
তারায় তারায় খোঁজে তৃষ্ণায় আতুর অন্ধকার
সঙ্গসুধারস ॥

নিদ্রাহীন বেদনায় ভাবি, কবে আসিবে পরানে
চরম আহ্বান ?
মনে জানি, এ জীবনে সাঙ্গ হয় নাই পূর্ণ তানে
মোর শেষ গান।
কোথা তুমি, শেষবার যে ছোঁয়াবে তব স্পর্শমণি
আমার সংগীতে ?
মহানিস্তব্ধের প্রান্তে কোথা বসে রয়েছ, রমণী,
নীরব নিশীথে ?

মহেন্দ্রের বজ্র হতে কালো চক্ষে বিদ্যুতের আলো
আনো, আনো ডাকি,
বর্ষণ-কাঙাল মোর মেঘের অন্তরে বহ্নি জ্বালো,
হে কালবৈশাখী।
অশ্রুভারে ক্লান্ত তার স্তব্ধ মূক অবরুদ্ধ দান
কালো হয়ে উঠে।
বন্যাবেগে মুক্ত করো, রিক্ত করি করো পরিত্রাণ,
সব লও লুটে॥

তার পরে যাও যদি যেয়ো চলি ; দিগন্ত অঙ্গন
হয়ে যাবে স্থির।
বিরহের শুভ্রতায় শূন্যে দেখা দিবে চিরন্তন
শান্তি সুগম্ভীর।
স্বচ্ছ আনন্দের মাঝে মিলে যাবে সর্বশেষ লাভ,
সর্বশেষ ক্ষতি ;
দুঃখে সুখে পূর্ণ হবে অরূপ-সুন্দর আবির্ভাব,
অশ্রুধৌত জ্যোতি॥

ওরে পান্থ, কোথা তোর দিনান্তের যাত্রাসহচরী ?
দক্ষিণ-পবন

বহুক্ষণ চলে গেছে অরণ্যের পল্লব মর্মরি' ;
নিকুঞ্জভবন
গন্ধের ইঙ্গিত দিয়ে বসন্তের উৎসবের পথ
করে না প্রচার।
কাহারে ডাকিস তুই, গেছে চলে তার স্বর্ণরথ
কোন্ সিন্ধুপার॥

জানি জানি আপনার অন্তরের গহনবাসীরে
আজিও না চিনি।
সন্ধ্যারতিলগ্নে কেন আসিলে না নিভৃত মন্দিরে
শেষ পূজারিনী ?
কেন সাজালে না দীপ, তোমার পূজার মন্ত্র-গানে
জাগায়ে দিলে না
তিমির রাত্রির বাণী, গোপনে যা লীন আছে প্রাণে
দিনের অচেনা॥

অসমাপ্ত পরিচয়, অসম্পূর্ণ নৈবেদ্যের থালি
নিতে হল তুলে।
রচিয়া রাখে নি মোর প্রেয়সী কি বরণের ডালি
মরণের কূলে ?
সেখানে কি পুষ্পবনে গীতহীনা রজনীর তারা
নব জন্ম লভি
এই নীরবের বক্ষে নব ছন্দে ছুটাবে ফোয়ারা
প্রভাতী ভৈরবী॥

হারুনা-মারু জাহাজ,
১ অক্টোবর, ১৯২৪

ছবি

শুক্ল চিহ্ন এঁকে দিয়ে শান্ত সিন্ধুবুকে
তরী চলে পশ্চিমের মুখে।
আলোক-চুম্বনে নীল জল
করে ঝলমল।
দিগন্তে মেঘের জালে বিজড়িত দিনান্তের মোহ,
সূর্যাস্তের শেষ সমারোহ।
ঊর্ধ্বে যায় দেখা
তৃতীয়ার শীর্ণ শশিলেখা।
যেন কে উলঙ্গ শিশু কোথায় এসেছে জানে না সে,
নিঃসংকোচে হাসে।
বহে মন্দ মন্থর বাতাস
সঙ্গশূন্য সায়াহ্নের বৈরাগ্য-নিঃশ্বাস।
স্বর্গসুখে ক্লান্ত কোন্ দেবতার বাঁশির পূরবী
শূন্যতলে ধরে এই ছবি।
ক্ষণকাল পরে যাবে ঘুচে,
উদাসীন রজনীর কালো কেশে সব দেবে মুছে॥

এমনি রঙের খেলা নিত্য খেলে আলো আর ছায়া,
এমনি চঞ্চল মায়া
জীবন-অম্বরতলে ;
দুঃখে সুখে বর্ণে বর্ণে লিখা
চিহ্নহীন পদচারী কালের প্রান্তরে মরীচিকা।
তার পরে দিন যায়, অস্ত যায় রবি ;
যুগে যুগে মুছে যায় লক্ষ লক্ষ রাগরক্ত ছবি।
তুই হেথা কবি,
এ বিশ্বের মৃত্যুর নিঃশ্বাস
আপন বাঁশিতে ভরি গানে তারে বাঁচাইতে চাস।

হারুনা-মারু জাহাজ
২ অক্টোবর, ১৯২৪

লিপি

হে ধরণী, কেন প্রতিদিন
তৃপ্তিহীন
একই লিপি পড় ফিরে ফিরে ?
প্রত্যুষে গোপনে ধীরে ধীরে
আঁধারের খুলিয়া পেটিকা,
স্বর্ণবর্ণে লিখা
প্রভাতের মর্মবাণী
বক্ষে টেনে আনি'
গুঞ্জরিয়া কত সুরে আবৃত্তি কর যে মুগ্ধমনে ॥

বহুযুগ হয়ে গেল কোন্ শুভক্ষণে
বাষ্পের গুণ্ঠনখানি প্রথমে পড়িল যবে খুলে,
আকাশে চাহিলে মুখ তুলে।
অমর জ্যোতির মূর্তি দেখা দিল আঁখির সম্মুখে।
রোমাঞ্চিত বুকে
পরম বিস্ময় তব জাগিল তখনি।
নিঃশব্দ বরণ-মন্ত্রধ্বনি
উচ্ছ্বসিল পর্বতের শিখরে শিখরে।
কলোল্লাসে উদ্‌ঘোষিল নৃত্যমত্ত সাগরে সাগরে
জয়, জয়, জয়।
ঝঞ্ঝা তার বন্ধ টুটে ছুটে ছুটে কয়
"জাগো রে, জাগো রে,"
বনে বনান্তরে ॥

প্রথম সে দর্শনের অসীম বিস্ময়
এখনো যে কাঁপে বক্ষোময়।

তলে তলে আন্দোলিয়া উঠে তব ধূলি
তৃণে তৃণে কণ্ঠ তুলি
উর্ধ্বে চেয়ে কয়—
জয়, জয়, জয়।
সে বিস্ময় পুষ্পে পর্ণে গন্ধে বর্ণে ফেটে ফেটে পড়ে ;
প্রাণের দুরন্ত ঝড়ে,
রূপের উন্মত্ত নৃত্যে, বিশ্বময়
ছড়ায় দক্ষিণে বামে সৃজন প্রলয় ;
সে বিস্ময় সুখে দুঃখে গর্জি উঠি কয়,—
জয়, জয়, জয়।

তোমাদের মাঝখানে আকাশ অনন্ত ব্যবধান ;
উর্ধ্ব হতে তাই নামে গান।
চিরবিরহের নীল পত্রখানি 'পরে
তাই লিপি লেখা হয় অগ্নির অক্ষরে।
বক্ষে তারে রাখ,
শ্যাম আচ্ছাদনে ঢাক ;
বাক্যগুলি
পুষ্পদলে রেখে দাও তুলি,—
মধুবিন্দু হয়ে থাকে নিভৃত গোপনে ;
পদ্মের রেণুর মাঝে গন্ধের স্বপনে
বন্দী কর তারে ;
তরুণীর প্রেমাবিষ্ট আঁখির ঘনিষ্ঠ অন্ধকারে
রাখ তারে ভরি ;
সিন্ধুর কল্লোলে মিলি, নারিকেল পল্লবে মর্মরি,
সে বাণী ধ্বনিতে থাকে তোমার অন্তরে ;
মধ্যাহ্নে শোনো সে বাণী অরণ্যের নির্জন নির্ঝরে॥

বিরহিণী, সে-লিপির যে-উত্তর লিখিতে উন্মনা
আজো তাহা সাঙ্গ হইল না।

যুগে যুগে বারম্বার লিখে লিখে
বারম্বার মুছে ফেল ; তাই দিকে দিকে
সে ছিন্ন কথার চিহ্ন পুঞ্জ হয়ে থাকে ;
অবশেষে একদিন জলজ্জটা ভীষণ বৈশাখে
উন্মত্ত ধূলির ঘূর্ণিপাকে
সব দাও ফেলে
অবহেলে,
আত্মবিদ্রোহের অসন্তোষে।
তার পরে আর বার বসে বসে
নূতন আগ্রহে লেখ নূতন ভাষায়।
যুগযুগান্তর চলে যায়॥

কত শিল্পী, কত কবি তোমার সে লিপির লিখনে
বসে গেছে একমনে।
শিখিতে চাহিছে তব ভাষা,
বুঝিতে চাহিছে তব অন্তরের আশা।
তোমার মনের কথা আমারি মনের কথা টানে,
চাও মোর পানে।
চকিত ইঙ্গিত তব, বসনপ্রান্তের ভঙ্গীখানি
অঙ্কিত করুক মোর বাণী।
শরতে দিগন্ততলে
ছলছলে
তোমার যে অশ্রুর আভাস,
আমার সংগীতে তারি পড়ুক নিঃশ্বাস।
অকারণ চাঞ্চল্যের দোলা লেগে
ক্ষণে ক্ষণে ওঠে জেগে
কটিতটে যে কলকিঙ্কিণী,
মোর ছন্দে দাও ঢেলে তারি রিনিরিনি,
ওগো বিরহিণী॥

দূর হতে আলোকের বরমাল্য এসে
খসিয়া পড়িল তব কেশে,
স্পর্শে তারি কভু হাসি কভু অশ্রুজলে
উৎকণ্ঠিত আকাঙ্ক্ষায় বক্ষতলে
ওঠে যে ক্রন্দন,
মোর ছন্দে চিরদিন দোলে যেন তাহারি স্পন্দন।
স্বর্গ হতে মিলনের সুধা
মর্ত্যের বিচ্ছেদ-পাত্রে সংগোপনে রেখেছ, বসুধা,
তারি লাগি নিত্যক্ষুধা,
বিরহিণী অয়ি,
মোর সুরে হ'ক জ্বালাময়ী॥

হারুনা-মারু জাহাজ
৪ অক্টোবর, ১৯২৪

ক্ষণিকা

খোলো খোলো হে আকাশ, স্তব্ধ তব নীল যবনিকা,-
খুঁজে নিতে দাও সেই আনন্দের হারানো কণিকা।
কবে সে যে এসেছিল আমার হৃদয়ে যুগান্তরে,
গোধূলিবেলার পান্থ জনশূন্য এ মোর প্রান্তরে,
লয়ে তার ভীরু দীপশিখা।
দিগন্তের কোন্ পারে চলে গেল আমার ক্ষণিকা॥

ভেবেছিনু গেছি ভুলে ; ভেবেছিনু পদচিহ্নগুলি
পদে পদে মুছে নিল সর্বনাশী অবিশ্বাসী ধূলি।
আজ দেখি সেদিনের সেই ক্ষীণ পদধ্বনি তার
আমার গানের ছন্দ গোপনে করেছে অধিকার ;
দেখি তারি অদৃশ্য অঙ্গুলি
স্বপ্নে অশ্রুসরোবরে ক্ষণে ক্ষণে দেয় ঢেউ তুলি॥

বিরহের দূতী এসে তার সে স্তিমিত দীপখানি
চিত্তের অজানা কক্ষে কখন রাখিয়া দিল আনি।
সেখানে যে বীণা আছে অকস্মাৎ একটি আঘাতে
মুহূর্ত বাজিয়াছিল ; তার পরে শব্দহীন রাতে
বেদনাপদ্মের বীণাপাণি
সন্ধান করিছে সেই অন্ধকারে-থেমে-যাওয়া বাণী ॥

সেদিন ঢেকেছে তারে কী এক ছায়ার সংকোচন,
নিজের অধৈর্য দিয়ে পারে নি তা করিতে মোচন।
তার সেই ত্রস্ত আঁখি, সুনিবিড় তিমিরের তলে
যে-রহস্য নিয়ে চলে গেল, নিত্য তাই পলে পলে
মনে মনে করি যে লুণ্ঠন।
চিরকাল স্বপ্নে মোর খুলি তার সে অবগুণ্ঠন ॥

হে আত্মবিস্মৃত, যদি দ্রুত তুমি না যেতে চমকি,
বারেক ফিরায়ে মুখ পথমাঝে দাঁড়াতে থমকি,
তা হলে পড়িত ধরা রোমাঞ্চিত নিঃশব্দ নিশায়
দুজনের জীবনের ছিল যা চরম অভিপ্রায়।
তা হলে পরমলগ্নে, সখী
সে ক্ষণকালের দীপে চিরকাল উঠিত আলোকি ॥

হে পান্থ, সে পথে তব ধূলি আজ করি যে সন্ধান ;—
বঞ্চিত মুহূর্তখানি পড়ে আছে, সেই তব দান।
অপূর্ণের লেখাগুলি তুলে দেখি বুঝিতে না পারি,
চিহ্ন কোনো রেখে যাবে, মনে তাই ছিল কি তোমারি ?
ছিন্ন ফুল, এ কি মিছে ভান ?
কথা ছিল শুধাবার, সময় হল যে অবসান ॥

গেল না ছায়ার বাধা ; না-বোঝার প্রদোষ-আলোকে
স্বপ্নের চঞ্চল মূর্তি জাগায় আমার দীপ্ত চোখে

সংশয়-মোহের নেশা ;—সে মূর্তি ফিরিছে কাছে কাছে
আলোতে আঁধারে মেশা,—তবু সে অনন্ত দূরে আছে
মায়াচ্ছন্ন লোকে।
অচেনার মরীচিকা আকুলিছে ক্ষণিকার শোকে॥

খোলো খোলো হে আকাশ, স্তব্ধ তব নীল যবনিকা।
খুঁজিব তারার মাঝে চঞ্চলের মালার মণিকা।
খুঁজিব সেথায় আমি যেথা হতে আসে ক্ষণতরে
আশ্বিনে গোধূলি আলো, যেথা হতে নামে পৃথ্বী'পরে
শ্রাবণের সায়াহ্ন-যূথিকা ;
যেথা হতে পরে ঝড় বিদ্যুতের ক্ষণদীপ্ত টিকা॥

হারুনা-মারু জাহাজ
৬ অক্টোবর, ১৯২৪

খেলা

সন্ধ্যাবেলায় এ কোন্ খেলায় করলে নিমন্ত্রণ,
ওগো খেলার সাথি!
হঠাৎ কেন চমকে তোলে শূন্য এ প্রাঙ্গণ
রঙিন শিখার বাতি।
কোন্ সে ভোরের রঙের খেয়াল কোন্ আলোতে ঢেকে
সমস্ত দিন বুকের তলায় লুকিয়ে দিলে রেখে,
অরুণ-আভাস ছানিয়ে নিয়ে পদ্মবনের থেকে
রাঙিয়ে দিলে রাতি?
উদয়-ছবি শেষ হবে কি অস্ত-সোনায় এঁকে
জ্বালিয়ে সাঁঝের বাতি॥

হারিয়ে-ফেলা বাঁশি আমার পালিয়েছিল বুঝি
লুকোচুরির ছলে?

বনের পারে আবার তারে কোথায় পেলে খুঁজি
শুকনো পাতার তলে ?
যে-সুর তুমি শিখিয়েছিলে বসে আমার পাশে
সকালবেলায় বটের তলায় শিশির-ভেজা ঘাসে,
সে আজ ওঠে হঠাৎ বেজে বুকের দীর্ঘশ্বাসে,
উছল চোখের জলে,—
কাঁপত যে-সুর ক্ষণে ক্ষণে দুরন্ত বাতাসে
শুকনো পাতার তলে ॥

মোর প্রভাতের খেলার সাথি আনত ভরে সাজি
সোনার চাঁপাফুলে।
অন্ধকারে গন্ধ তারি ঐ যে আসে আজি
একি পথের ভুলে ?
বকুলবীথির তলে তলে আজ কি নতুন বেশে
সেই খেলাতেই ডাকতে এল আবার ফিরে এসে ?
সেই সাজি তার দখিন হাতে, তেমনি আকুল কেশে
চাঁপার গুচ্ছ দুলে।
সেই অজানা হতে আসে এই অজানার দেশে
এ কি পথের ভুলে ॥

আমার কাছে কী চাও তুমি, ওগো খেলার গুরু,
কেমন খেলার ধারা।
চাও কি তুমি যেমন করে হল দিনের শুরু,
তেমনি হবে সারা।
সেদিন ভোরে দেখেছিলাম প্রথম জেগে উঠে
নিরুদ্দেশের পাগল হাওয়ায় আগল গেছে টুটে,
কাজ-ভোলা সব খ্যাপার দলে তেমনি আবার জুটে
করবে দিশেহারা।
স্বপন-মৃগ ছুটিয়ে দিয়ে পিছনে তার ছুটে
তেমনি হব সারা ॥

বাঁধা পথের বাঁধন মেনে চলতি কাজের স্রোতে
চলতে দেবে নাকো ?
সন্ধ্যাবেলায় জোনাক-জ্বালা বনের আঁধার হতে
তাই কি আমায় ডাক ?
সকল চিন্তা উধাও ক'রে অকারণের টানে,
অবুঝ ব্যথার চঞ্চলতা জাগিয়ে দিয়ে প্রাণে,
থরথরিয়ে কাঁপিয়ে বাতাস ছুটির গানে গানে
দাঁড়িয়ে কোথায় থাক ?
না জেনে পথ পড়ব তোমার বুকেরি মাঝখানে
তাই আমারে ডাক ।

জানি জানি, তুমি আমার চাও না পূজার মালা,
ওগো খেলার সাথি ।
এই জনহীন অঙ্গনেতে গন্ধপ্রদীপ জ্বালা,
নয় আরতির বাতি ।
তোমার খেলায় আমার খেলা মিলিয়ে দেব তবে
নিশীথিনীর স্তব্ধ সভায় তারার মহোৎসবে,
তোমার বীণার ধ্বনির সাথে আমার বাঁশির রবে
পূর্ণ হবে রাতি ।
তোমার আলোয় আমার আলো মিলিয়ে খেলা হবে,
নয় আরতির বাতি ॥

হারুনা-মারু জাহাজ
৭ অক্টোবর, ১৯২৪

অপরিচিতা

পথ বাকি আর নাই তো আমার, চলে এলাম একা ;
তোমার সাথে কই হল গো দেখা ?
কুয়াশাতে ঘন আকাশ, ম্লান শীতের ক্ষণে
ফুল-ঝরাবার বাতাস বেড়ায় কাঁপন-লাগা বনে ।
সকল শেষের শিউলিটি যেই ধুলায় হবে ধূলি,
সঙ্গিনীহীন পাখি যখন গান যাবে তার ভুলি
হয়তো তুমি আপন মনে আসবে সোনার রথে
শুকনো পাতা ঝরা ফুলের পথে ॥

পুলক লেগেছিল মনে পথের নূতন বাঁকে
হঠাৎ সেদিন কোন্ মধুরের ডাকে ।
দূরের থেকে ক্ষণে-ক্ষণে রঙের আভাস এসে
গগন-কোণে চমক হেনে গেছে কোথায় ভেসে ;
মনের ভুলে ভেবেছিলাম তুমিই বুঝি এলে,
গন্ধরাজের গন্ধে তোমার গোপন মায়া মেলে ।
হয়তো তুমি এসেছিলে, যায় নি আড়ালখানা,
চোখের দেখায় হয় নি প্রাণের জানা ॥

হয়তো সেদিন তোমার আঁখির ঘন তিমির ব্যেপে
অশ্রুজলের আবেশ গেছে কেঁপে
হয়তো আমায় দেখেছিলে বাঁকিয়ে বাঁকা ভুরু,
বক্ষ তোমার করেছিল ক্ষণেক দুরু দুরু
সেদিন হতে স্বপ্ন তোমার ভোরের আধো-ঘুমে
রাঙিয়েছিল হয়তো ব্যথার রক্তিম কুঙ্কুমে ;
আধেক চাওয়ায় ভুলে যাওয়ায় হয়েছে জাল-বোনা,
তোমায় আমায় হয় নি জানাশোনা ॥

তোমার পথের ধারে ধারে তাই এবারের মতো
রেখে গেলাম গান গাঁথিলাম যত।
মনের মাঝে বাজল যেদিন দূর চরণের ধ্বনি
সেদিন আমি গেয়েছিলাম তোমার আগমনী;
দখিন বাতাস ফেলেছে শ্বাস রাতের আকাশ ঘেরি
সেদিন আমি গেয়েছি গান তোমার বিরহেরি;
ভোরের বেলায় অশ্রুভরা অধীর অভিমান
ভৈরবীতে জাগিয়েছিল গান॥

এ গানগুলি তোমার বলে চিনবে কখনো কি?
ক্ষতি কি তায়, নাই চিনিলে, সখী।
তবু তোমায় গাইতে হবে, নাই তাহে সংশয়,
তোমার কণ্ঠে বাজবে তখন আমার পরিচয়;
যারে তুমি বাসবে ভালো, আমার গানের সুরে
বরণ করে নিতে হবে সেই তব বন্ধুরে।
রোদন খুঁজে ফিরবে তোমার প্রাণের বেদনখানি,
আমার গানে মিলবে তাহার বাণী॥

তোমার ফাগুন উঠবে জেগে, ভরবে আমের বোলে,
তখন আমি কোথায় যাব চলে।
পূর্ণ চাঁদের আসবে আসর, মুগ্ধ বসুন্ধরা,
বকুলবীথির ছায়াখানি মধুর মূর্ছাভরা;
হয়তো সেদিন বক্ষে তোমার মিলন-মালা গাঁথা;
হয়তো সেদিন ব্যর্থ আশায় সিক্ত চোখের পাতা;
সেদিন আমি আসব না তো নিয়ে আমার দান;
তোমার লাগি রেখে গেলেম গান॥

আণ্ডেস জাহাজ
১৮ অক্টোবর, ১৯২৪

আনমনা

আনমনা গো, আনমনা,
তোমার কাছে আমার বাণীর মালাখানি আনব না।
বার্তা আমার ব্যর্থ হবে, সত্য আমার বুঝবে কবে ?
তোমারো মন জানব না,
আনমনা গো আনমনা।
লগ্ন যদি হয় অনুকূল মৌন মধুর সাঁঝে,
নয়ন তোমার মগ্ন যখন ম্লান আলোর মাঝে,
দেব তোমায় শান্ত সুরের সান্ত্বনা
আনমনা গো আনমনা॥

জনশূন্য তটের পানে ফিরবে হাঁসের দল ;
স্বচ্ছ নদীর জল
আকাশ পানে রইবে পেতে কান,
বুকের তলে শুনবে বলে গ্রহতারার গান ;
কুলায়-ফেরা পাখি
নীল আকাশের বিরামখানি রাখবে ডানায় ঢাকি ;
বেণুশাখার অন্তরালে অস্তপারের রবি
আঁকবে মেঘে মুছবে আবার শেষ-বিদায়ের ছবি ;
স্তব্ধ হবে দিনের বেলার ক্ষুব্ধ হাওয়ার দোলা,
তখন তোমার মন যদি রয় খোলা ;—
তখন সন্ধ্যাতারা
পায় যদি তার সাড়া
তোমার উদার আঁখিতারার পারে ;
কনকচাঁপার গন্ধ-ছোঁওয়া বনের অন্ধকারে
ক্লান্তি-অলস ভাবনা যদি ফুল বিছানো ভুঁয়ে
মেলিয়ে ছায়া এলিয়ে থাকে শুয়ে ;

ছন্দে গাঁথা বাণী তখন পড়ব তোমার কানে
মন্দ মৃদুল তানে,
ঝিল্লি যেমন শালের বনে নিদ্রানীরব রাতে
অন্ধকারের জপের মালায় একটানা সুর গাঁথে।
একলা তোমার বিজন প্রাণের প্রাঙ্গণে
প্রান্তে বসে একমনে
এঁকে যাব আমার গানের আলপনা,
আনমনা গো আনমনা।

আণ্ডেস জাহাজ
১৮ অক্টোবর, ১৯২৪

বিস্মরণ

মনে আছে কার দেওয়া সেই ফুল?
সে-ফুল যদি শুকিয়ে গিয়ে থাকে
তবে তারে সাজিয়ে রাখাই ভুল,
মিথ্যে কেন কাঁদিয়ে রাখ তাকে?
ধুলায় তারি শান্তি, তারি গতি,
এই সমাদর ক'রো তাহার প্রতি
সময় যখন গেছে, তখন তারে
ভুলো একেবারে।

মাঘের শেষে নাগকেশরের ফুলে
আকাশে বয় মন-হারানো হাওয়া;
বনের বক্ষ উঠেছে আজ দুলে,
চামেলি ওই কার যেন পথ-চাওয়া।
ছায়ায় ছায়ায় কাদের কানাকানি,
চোখে-চোখে নীরব জানাজানি,
এ উৎসবে শুকনো ফুলের লাজ
ঘুচিয়ে দিয়ো আজ।

যদি বা তার ফুরিয়ে থাকে বেলা,
মনে জেনো দুঃখ তাহে নাই ;
করেছিল ক্ষণকালের খেলা,
পেয়েছিল ক্ষণকালের ঠাঁই ।
অলকে সে কানের কাছে দুলি
বলেছিল নীরব কথাগুলি,
গন্ধ তাহার ফিরেছে পথ ভুলে
তোমার এলোচুলে ।

সেই মাধুরী আজ কি হবে ফাঁকি ?
লুকিয়ে সে কি রয় নি কোনোখানে ?
কাহিনী তার থাকবে না আর বাকি
কোনো স্বপ্নে, কোনো গন্ধে গানে ?
আরেক দিনের বনচ্ছায়ায় লিখা
ফিরবে না কি তাহার মরীচিকা ?
অশ্রুতে তার আভাস দিবে নাকি
আরেক দিনের আঁখি ।

না-হয় তা-ও লুপ্ত যদিই হয়,
তার লাগি শোক, সে-ও তো সেই পথে ।
এ জগতে সদাই ঘটে ক্ষয়,
ক্ষতি তবু হয় না কোনোমতে ।
শুকিয়ে-পড়া পুষ্পদলের ধূলি
এ ধরণী যায় যদি বা ভুলি—
সেই ধুলারি বিস্মরণের কোলে
নতুন কুসুম দোলে ।

আণ্ডেস জাহাজ
১৯ অক্টোবর, ১৯২৪

আশা

মস্ত যে-সব কাণ্ড করি, শক্ত তেমন নয়;
জগৎ-হিতের তরে ফিরি বিশ্বজগৎময়।
সঙ্গীর ভিড় বেড়ে চলে; অনেক লেখাপড়া,
অনেক ভাষায় বকাবকি, অনেক ভাঙাগড়া।
ক্রমে ক্রমে জাল গেঁথে যায়, গিঁঠের পরে গিঁঠ,
মহল পরে মহল ওঠে, ইঁটের পরে ইঁট।
কীর্তিরে কেউ ভালো বলে, মন্দ বলে কেহ,
বিশ্বাসে কেউ কাছে আসে, কেউ করে সন্দেহ।
কিছু খাঁটি, কিছু ভেজাল, মসলা যেমন জোটে,
মোটের 'পরে একটা কিছু হয়ে ওঠেই ওঠে।

কিন্তু যে-সব ছোটো আশা করুণ অতিশয়,
সহজ বটে শুনতে লাগে, মোটেই সহজ নয়।
একটুকু সুখ গানে সুরে ফুলের গন্ধে মেশা,
গাছের-ছায়ায়-স্বপ্ন-দেখা অবকাশের নেশা,
মনে ভাবি চাইলে পাব; যখন তারে চাহি,
তখন দেখি চঞ্চলা সে কোনোখানেই নাহি।
অরূপ অকূল বাষ্পমাঝে বিধি কোমর বেঁধে
আকাশটারে কাঁপিয়ে যখন সৃষ্টি দিলেন ফেঁদে,
আদ্যযুগের খাটুনিতে পাহাড় হল উচ্চ,
লক্ষযুগের স্বপ্নে পেলেন প্রথম ফুলের গুচ্ছ।

বহুদিন মনে ছিল আশা
ধরণীর এক কোণে
রহিব আপন মনে;
ধন নয়, মান নয়, একটুকু বাসা
করেছিনু আশা।
গাছটির স্নিগ্ধ ছায়া, নদীটির ধারা,
ঘরে আনা গোধূলিতে সন্ধ্যাটির তারা,

চামেলির গন্ধটুকু জানালার ধারে,
ভোরের প্রথম আলো জলের ওপারে।
তাহারে জড়ায়ে ঘিরে
ভরিয়া তুলিবে ধীরে
জীবনের কদিনের কাঁদা আর হাসা;
ধন নয়, মান নয়, একটুকু বাসা
করেছিনু আশা।

বহুদিন মনে ছিল আশা
অন্তরের ধ্যানখানি
লভিবে সম্পূর্ণ বাণী;
ধন নয়, মান নয়, আপনার ভাষা
করেছিনু আশা।
মেঘে মেঘে এঁকে যায় অস্তগামী রবি
কল্পনার শেষ রঙে সমাপ্তির ছবি,
আপন স্বপনলোক আলোকে ছায়ায়
রঙে রসে রচি দিব তেমনি মায়ায়।
তাহারে জড়ায়ে ঘিরে
ভরিয়া তুলিবে ধীরে
জীবনের কদিনের কাঁদা আর হাসা।
ধন নয়, মান নয়, ধেয়ানের ভাষা
করেছিনু আশা।

বহুদিন মনে ছিল আশা
প্রাণের গভীর ক্ষুধা
পাবে তার শেষ সুধা;
ধন নয়, মান নয়, কিছু ভালোবাসা
করেছিনু আশা।
হৃদয়ের সুর দিয়ে নামটুকু ডাকা,
অকারণে কাছে এসে হাতে হাত রাখা,

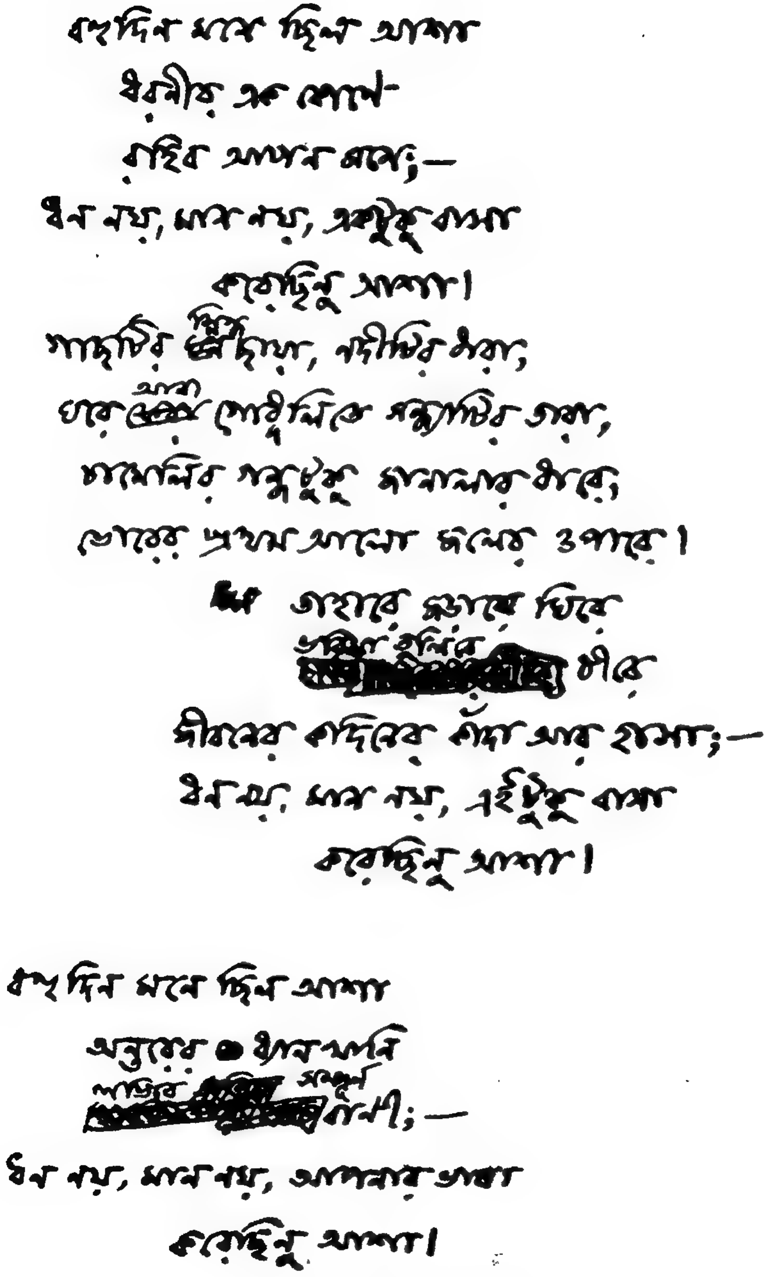

বহুদিন মনে ছিল আশা
ধরণীর এক কোণে
রহিব আপন মনে;—
ধন নয়, মান নয়, একটুকু বাসা
করেছিনু আশা।
গাছটির ~~[illegible]~~ স্নিগ্ধ ছায়া, নদীটির ধারা,
ঘরে ~~[illegible]~~ আনা গোধূলিতে সন্ধ্যাটির তারা,
চামেলির গন্ধটুকু জানালার ধারে,
ভোরের প্রথম আলো জলের ওপারে।
~~[illegible]~~ তাহারে জড়ায়ে ঘিরে
ভরিয়া তুলিব ~~[illegible]~~ ধীরে
জীবনের কদিনের কাঁদা আর হাসা;—
ধন নয়, মান নয়, এইটুকু বাসা
করেছিনু আশা।

বহুদিন মনে ছিল আশা
অন্তরের ~~[illegible]~~ ধ্যানখানি
লভিবে ~~[illegible]~~ সম্পূর্ণ ~~[illegible]~~ বাণী;—
ধন নয়, মান নয়, আপনার ভাষা
করেছিনু আশা।

'আশা' কবিতার পাণ্ডুলিপি

দূরে গেলে একা বসে মনে মনে ভাবা,
কাছে এলে দুই চোখে কথা-ভরা আভা।
তাহারে জড়ায়ে ঘিরে
ভরিয়া তুলিবে ধীরে
জীবনের কদিনের কাঁদা আর হাসা।
ধন নয়, মান নয়, কিছু ভালোবাসা
করেছিনু আশা।

আণ্ডেস জাহাজ
১৯ অক্টোবর, ১৯২৪

বাতাস

গোলাপ বলে, ওগো বাতাস, প্রলাপ তোমার বুঝতে কে বা পারে,
কেন এসে ঘা দিলে মোর দ্বারে?
বাতাস বলে, ওগো গোলাপ, আমার ভাষা বোঝ বা নাই বোঝ,
আমি জানি কাহার পরশ খোঁজ;
সেই প্রভাতের আলো এল, আমি কেবল ভাঙিয়ে দিলাম ঘুম
হে মোর কুসুম।

পাখি বলে, ওগো বাতাস, কী তুমি চাও বুঝিয়ে বলো মোরে,
কুলায় আমার দুলাও কেন ভোরে?
বাতাস বলে, ওগো পাখি, আমার ভাষা বোঝ বা নাই বোঝ,
আমি জানি তুমি কারে খোঁজ;
সেই আকাশে জাগল আলো আমি কেবল দিনু তোমায় আনি
সীমাহীনের বাণী।

নদী বলে, ওগো বাতাস, বুঝতে নারি কী-যে তোমার কথা,
কিসের লাগি এতই চঞ্চলতা।
বাতাস বলে, ওগো নদী, আমার ভাষা বোঝ বা নাই বোঝ,
জানি তোমার বিলয় যেথা খোঁজ;
সেই সাগরের ছন্দ আমি এনে দিলাম তোমার বুকের কাছে,
তোমার ঢেউয়ের নাচে।

অরণ্য কয়, ওগো বাতাস, নাহি জানি বুঝি কি নাই বুঝি
তোমার ভাষায় কাহার চরণ পূজি।
বাতাস বলে, হে অরণ্য, আমার ভাষা বোঝ বা নাই বোঝ,
আমি জানি কাহার মিলন খোঁজ ;
সেই বসন্ত এল পথে, আমি কেবল সুর জাগাতে পারি
তাহার পূর্ণতারি।

শুধায় সবে, ওগো বাতাস, তবে তোমার আপন কথা কী যে
বলো মোদের, কী চাও তুমি নিজে ?
বাতাস বলে, আমি পথিক, আমার ভাষা বোঝ বা নাই বোঝ
আমি বুঝি তোমরা কারে খোঁজ,—
আমি শুধু যাই চলে আর সেই অজানার আভাস করি দান,
আমার শুধু গান।

লিসবন বন্দর, আণ্ডেস জাহাজ
২০ অক্টোবর, ১৯২৪

স্বপ্ন

তোমায় আমি দেখি নাকো, শুধু তোমার স্বপ্ন দেখি,
তুমি আমায় বারে বারে শুধাও, "ওগো সত্য সে কি ?"
কী জানি গো, হয়তো বুঝি
তোমার মাঝে কেবল খুঁজি
এই জনমের রূপের তলে আর-জনমের ভাবের স্মৃতি।
হয়তো হেরি তোমার চোখে
আদিযুগের ইন্দ্রলোকে
শিশু চাঁদের পথ-ভোলানো পারিজাতের ছায়াবীথি।
এই কূলেতে ডাকি যখন সাড়া যে দাও সেই ওপারে,
পরশ তোমার ছাড়িয়ে কান্না বাজে মায়ার বীণার তারে।
হয়তো-হবে সত্য তাই,
হয়তো তোমার স্বপন, আমার আপন মনের মত্ততাই।

আমি বলি স্বপ্ন যাহা তার চেয়ে কি সত্য আছে ?
যে-তুমি মোর দূরের মানুষ সেই-তুমি মোর কাছের কাছে।
সেই-তুমি আর নও তো বাঁধন,
স্বপ্নরূপে মুক্তিসাধন,
ফুলের সাথে তারার সাথে তোমার সাথে সেথায় মেলা।
নিত্যকালের বিদেশিনী,
তোমায় চিনি, নাই বা চিনি,
তোমার লীলায় ঢেউ তুলে যায় কভু সোহাগ, কভু হেলা।
চিত্তে তোমার মূর্তি নিয়ে ভাবসাগরের খেয়ায় চড়ি।
বিধির মনের কল্পনারে আপন মনে নতুন গড়ি।
আমার কাছে সত্য তাই,
মন-ভরানো পাওয়ায় ভরা বাইরে-পাওয়ার ব্যর্থতাই।

আপনি তুমি দেখেছ কি আপন মাঝে সত্য কী যে ?
দিতে যদি চাও তা কারে, দিতে কি তাই পার নিজে ?
হয়তো তারে দুঃখদিনে
অগ্নি-আলোয় পাবে চিনে,
তখন তোমার নিবিড় বেদন নিবেদনের জ্বালবে শিখা।
অমৃত যে হয় নি মথন,
তাই তোমাতে এই অযতন ;
তাই তোমারে ঘিরে আছে ছলন-ছায়ার কুহেলিকা।
নিত্যকালের আপন তোমার লুকিয়ে বেড়ায় মিথ্যা সাজে,—
ক্ষণে ক্ষণে ধরা পড়ে শুধু আমার স্বপন-মাঝে।
আমি জানি সত্য তাই,
মরণ-দুঃখে অমর জাগে, অমৃতেরি তত্ত্ব তাই।

পুষ্পমালার গ্রন্থিখানা অনাদরে পড়ুক ছিঁড়ে,
ফুরাক বেলা, জীর্ণ খেলা হারাক হেলাফেলার ভিড়ে।
ছল করে যা পিছু ডাকে
পিছন ফিরে চাস নে তাকে,

ডাকে না যে যাবার বেলায় যাস নে তাহার পিছে পিছে।
যাওয়া-আসা-পথের ধুলায়
চপল পায়ের চিহ্নগুলায়
গনে গনে আপন মনে কাটাস নে দিন মিছে মিছে।
কী হবে তোর বোঝাই করে ব্যর্থ দিনের আবর্জনা;
স্বপ্ন শুধুই মর্ত্যে অমর, আর সকলি বিড়ম্বনা।
নিত্য প্রাণের সত্য তাই,
প্রাণ দিয়ে তুই রচিস যারে,—অসীম পথের পথ্য তাই।

লিসবন বন্দর, আণ্ডেস জাহাজ
২০ অক্টোবর, ১৯২৪

সমুদ্র

হে সমুদ্র, স্তব্ধচিত্তে শুনেছিনু গর্জন তোমার
রাত্রিবেলা; মনে হল গাঢ় নীল নিঃসীম নিদ্রার
স্বপ্ন ওঠে কেঁদে কেঁদে। নাই, নাই তোমার সান্ত্বনা;
যুগযুগান্তর ধরি নিরন্তর সৃষ্টির যন্ত্রণা
তোমার রহস্য-গর্ভে ছিন্ন করি রুদ্ধ আবরণ
প্রকাশ সন্ধান করে। কত মহাদ্বীপ মহাবন
এ তরল রঙ্গশালে রূপে প্রাণে কত নৃত্যে গানে
দেখা দিয়ে কিছুকাল, ডুবে গেছে নেপথ্যের পানে
নিঃশব্দ গভীরে। হারানো সে চিহ্নহারা যুগগুলি
মূর্তিহীন ব্যর্থতায় নিত্য অন্ধ আন্দোলন তুলি
হানিছে তরঙ্গ তব। সব রূপ সব নৃত্য তার
ফেনিল তোমার নীলে বিলীন দুলিছে একাকার।
স্থলে তুমি নানা গান উৎক্ষেপে করেছ আবর্জন,
জলে তব এক গান, অব্যক্তের অস্থির গর্জন।

২

হে সমুদ্র, একা আমি মধ্যরাতে নিদ্রাহীন চোখে
কল্লোল-মন্দ্রের মধ্যে দাঁড়াইয়া স্তব্ধ ঊর্ধ্বলোকে

চাহিলাম; শুনিলাম নক্ষত্রের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বাজে
আকাশের বিপুল ক্রন্দন; দেখিলাম শূন্যমাঝে
আঁধারের আলোক-ব্যগ্রতা। কত শত মন্বন্তরে
কত জ্যোতির্লোক গূঢ় বহ্নিময় বেদনার ভরে
অস্ফুটের আচ্ছাদন দীর্ণ করি' তীক্ষ্ণ রশ্মিঘাতে
কালের বক্ষের মাঝে পেল স্থান প্রোজ্জ্বল প্রভাতে
প্রকাশ-উৎসবদিনে। যুগসন্ধ্যা কবে এল তার
ডুবে গেল অলক্ষ্যে অতলে। রূপ-নিঃস্ব হাহাকার
অদৃশ্য বুভুক্ষু ভিক্ষু ফিরিছে বিশ্বের তীরে তীরে,
ধুলায় ধুলায় তার আঘাত লাগিছে ফিরে ফিরে।
ছিল যা প্রদীপ্তরূপে নানা ছন্দে বিচিত্র চঞ্চল
আজ অন্ধ তরঙ্গের কম্পনে হানিছে শূন্যতল।

৩

হে সমুদ্র, চাহিলাম আপন গহন চিত্তপানে;
কোথায় সঞ্চয় তার, অন্ত তার কোথায় কে জানে।
ওই শোনো সংখ্যাহীন সংজ্ঞাহীন অজানা ক্রন্দন
অমূর্ত আঁধারে ফিরে, অকারণে জাগায় স্পন্দন
বক্ষতলে। এক কালে ছিল রূপ, ছিল বুঝি ভাষা;
বিশ্বগীতি-নির্ঝরের তীরে তীরে বুঝি কত বাসা
বেঁধেছিল কোন্ জন্মে;—দুঃখে সুখে নানা বর্ণে রাঙি
তাহাদের রঙ্গমঞ্চ হঠাৎ পড়িল কবে ভাঙি
অতৃপ্ত আশার ধূলিস্তূপে। আকার হারাল তারা,
আবাস তাদের নাহি। খ্যাতিহারা সেই স্মৃতিহারা
সৃষ্টিছাড়া ব্যর্থ ব্যথা প্রাণের নিভৃত লীলাঘরে
কোণে কোণে ঘোরে শুধু মূর্তি তরে, আশ্রয়ের তরে।
রাগে অনুরাগে যারা বিচিত্র আছিল কত রূপে,
আজ শূন্য দীর্ঘশ্বাস আঁধারে ফিরিছে চুপে চুপে।

আণ্ডেস জাহাজ
২১ অক্টোবর, ১৯২৪

মুক্তি

মুক্তি নানা মূর্তি ধরি দেখা দিতে আসে নানা জনে,—
এক পন্থা নহে।
পরিপূর্ণতার সুধা নানা স্বাদে ভুবনে ভুবনে
নানা স্রোতে বহে।
সৃষ্টি মোর সৃষ্টি সাথে মেলে যেথা, সেথা পাই ছাড়া,
মুক্তি যে আমারে তাই সংগীতের মাঝে দেয় সাড়া,
সেথা আমি খেলা-খ্যাপা বালকের মতো লক্ষ্মীছাড়া,
লক্ষ্যহীন নগ্ন নিরুদ্দেশ।
সেথা মোর চির নব, সেথা মোর চিরন্তন শেষ।

মাঝে মাঝে গানে মোর সুর আসে, যে সুরে, হে গুণী,
তোমারে চিনায়।
বেঁধে দিয়ো নিজ হাতে সেই নিত্য সুরের ফাল্গুনী
আমার বীণায়।
তাহলে বুঝিব আমি ধূলি কোন্ ছন্দে হয় ফুল
বসন্তের ইন্দ্রজালে অরণ্যেরে করিয়া ব্যাকুল;
নব নব মায়াচ্ছায়া কোন্ নৃত্যে নিয়ত দোদুল
বর্ণ বর্ণ ঋতুর দোলায়।
তোমারি আপন সুর কোন্ তালে তোমারে ভোলায়।

যেদিন আমার গান মিলে যাবে তোমার গানের
সুরের ভঙ্গীতে
মুক্তির সংগমতীর্থ পাব আমি আমারি প্রাণের
আপন সংগীতে।

সেদিন বুঝিব মনে নাই নাই বস্তুর বন্ধন,
শূন্যে শূন্যে রূপ ধরে তোমারি এ বীণার স্পন্দন ;
নেমে যাবে সব বোঝা, থেমে যাবে সকল ক্রন্দন,
ছন্দে তালে ভুলিব আপনা,
বিশ্বগীত-পদ্মদলে স্তব্ধ হবে অশান্ত ভাবনা।

সঁপি দিব সুখ দুঃখ আশা ও নৈরাশ্য যত কিছু
তব বীণাতারে,—
ধরিবে গানের মূর্তি, একান্তে করিয়া মাথা নিচু
শুনিব তাহারে।
দেখিব তাদের যেথা ইন্দ্রধনু অকস্মাৎ ফুটে ;
দিগন্তে বনের প্রান্তে উষার উত্তরী যেথা লুটে ;
বিবাগি ফুলের গন্ধ মধ্যাহ্নে যেথায় যায় ছুটে ;
নীড়ে-ধাওয়া পাখির ডানায়
সায়াহ্ন-গগন যেথা দিবসেরে বিদায় জানায়।

সেদিন আমার রক্তে শুনা যাবে দিবসরাত্রির
নৃত্যের নূপুর।
নক্ষত্র বাজাবে বক্ষে বংশীধ্বনি আকাশযাত্রীর
আলোকবেণুর।
সেদিন বিশ্বের তৃণ মোর অঙ্গে হবে রোমাঞ্চিত,
আমার হৃদয় হবে কিংশুকের রক্তিমালাঞ্ছিত ;
সেদিন আমার মুক্তি, যবে হবে, হে চিরবাঞ্ছিত,
তোমার লীলায় মোর লীলা,—
যেদিন তোমার সঙ্গে গীতরঙ্গে তালে তালে মিলা।

আণ্ডেস জাহাজ
২২ অক্টোবর, ১৯২৪

ঝড়

অন্ধ কেবিন আলোয় আঁধার গোলা,
বন্ধ বাতাস কিসের গন্ধে ঘোলা।
মুখ-ধোবার ঐ ব্যাপারখানা দাঁড়িয়ে আছে সোজা,
ক্লান্ত চোখের বোঝা।
দুলছে কাপড় peg এ
বিজলি-পাখার হাওয়ার ঝাপট লেগে।
গায়ে গায়ে ঘেঁষে
জিনিসপত্র আছে কায়ক্লেশে।
বিছানাটা কৃপণ-গতিকের
অনিচ্ছাতে ক্ষণকালের সহায় পথিকের।
ঘরে আছে যে-কটা আসবাব
নিত্য যতই দেখি, ভাবি ওদের মুখের ভাব
নারাজ ভৃত্যসম,
পাশেই থাকে মম,
কোনোমতে করে কেবল কাজচলাগোছ সেবা।
এমন ঘরে আঠারো দিন থাকতে পারে কেবা?
কষ্ট বলে একটা দানব ছোট্টো খাঁচায় পুরে
নিয়ে চলে আমায় কত দূরে।
নীল আকাশে নীল সাগরে অসীম আছে বসে,
কী জানি কোন্ দোষে
ঠেলেঠুলে চেপেচুপে মোরে
সেখান হতে করেছে একঘরে।

হেনকালে ক্ষুদ্র দুখের ক্ষুদ্র ফাটল বেয়ে
কেমন করে এল হঠাৎ ধেয়ে
বিশ্বধরার বক্ষ হতে বিপুল দুখের প্রবল বন্যাধারা;
এক নিমেষে আমারে সে করলে আত্মহারা,
আনলে আপন বৃহৎ সান্ত্বনারে,
আনলে আপন গর্জনেতে ইন্দ্রলোকের অভয়ঘোষণারে।

মহাদেবের তপের জটা হতে
মুক্তিমন্দাকিনী এল কূল-ডোবানো স্রোতে ;
বললে আমার চিত্ত ঘিরে ঘিরে,
ভস্ম আবার ফিরে পাবে জীবন-অগ্নিরে।
বললে, আমি সুরলোকের অশ্রুজলের দান,
মরুর পাথর গলিয়ে ফেলে ফলাই অমর প্রাণ।
মৃত্যুজয়ের ডমরুরব শোনাই কলস্বরে,
মহাকালের তাণ্ডবতাল সদাই বাজাই উদ্দাম নির্ঝরে।

স্বপ্নসম টুটে
এই কেবিনের দেওয়াল গেল ছুটে।
রোগশয্যা মম
হল উদার কৈলাসেরি শৈলশিখর সম।
আমার মনপ্রাণ
উঠল গেয়ে রুদ্রেরি জয়গান :

সুপ্তির জড়িমাঘোরে
তীরে থেকে তোরা ও'রে
করেছিস ভয়,
যে-ঝড় সহসা কানে
বজ্রের গর্জন আনে—
"নয়, নয়, নয়।"

তোরা বলেছিলি তাকে
"বাঁধিয়াছি ঘর।
মিলেছে পাখির ডাকে
তরুর মর্মর।
পেয়েছি তৃষ্ণার জল,
ফলেছে ক্ষুধার ফল,
ভাণ্ডারে হয়েছে ভরা লক্ষ্মীর সঞ্চয়।"

ঝড়, বিদ্যুতের ছন্দে
ডেকে ওঠে মেঘমন্দ্রে,—
"নয়, নয়, নয়।"

সমুদ্রে আমার তরী;
আসিয়াছি ছিন্ন করি'
তীরের আশ্রয়।
ঝড় বন্ধু তাই কানে
মাঙ্গল্যের মন্ত্র আনে—
"জয়, জয়, জয়।"

আমি যে সে-প্রচণ্ডেরে
করেছি বিশ্বাস,—
তরীর পালে সে যে রে
রুদ্রেরি নিঃশ্বাস।
বলে সে বক্ষের কাছে,
"আছে আছে, পার আছে,
সন্দেহ-বন্ধন ছিঁড়ি, লহ পরিচয়।"
বলে ঝড় অবিশ্রান্ত,
"তুমি পান্থ, আমি পান্থ,
জয়, জয়, জয়।"

যায় ছিঁড়ে, যায় উড়ে—
বলেছিলি মাথা খুঁড়ে,
"এ দেখি প্রলয়
ঝড় বলে, "ভয় নাই,
যাহা দিতে পার, তাই
রয়, রয়, রয়।"

চলেছি সম্মুখ-পানে
চাহিব না পিছু।
ভাসিল বন্যার টানে
ছিল যত কিছু।
রাখি যাহা, তাই বোঝা,
তারে খোওয়া, তারে খোঁজা,
নিত্যই গণনা তারে, তারি নিত্য ক্ষয়।
ঝড় বলে, "এ তরঙ্গে
যাহা ফেলে দাও রঙ্গে
রয়, রয়, রয়।"

এ মোর যাত্রীর বাঁশি
ঝঞ্ঝার উদ্দাম হাসি
নিয়ে গাঁথে সুর—
বলে সে, "বাসনা অন্ধ,
নিশ্চল শৃঙ্খল-বন্ধ
দূর, দূর, দূর।"

গাহে "পশ্চাতের কীর্তি,
সম্মুখের আশা
তার মধ্যে ফেঁদে ভিত্তি
বাঁধিস নে বাসা।
নে তোর মৃদঙ্গে শিখে
তরঙ্গের ছন্দটিকে,
বৈরাগীর নৃত্যভঙ্গী চঞ্চল সিন্ধুর
যত লোভ, যত শঙ্কা
দাসত্বের জয়ডঙ্কা,
দূর, দূর, দূর।"

এস গো ধ্বংসের নাড়া,
পথভোলা, ঘরছাড়া,
এস গো দুর্জয়।
ঝাপটি মৃত্যুর ডানা
শূন্যে দিয়ে যাও হানা—
“নয়, নয়, নয়।”

আবেশের রসে মত্ত
আরামশয্যায়
বিজড়িত যে-জড়ত্ব
মজ্জায় মজ্জায়,—
কার্পণ্যের বন্ধ দ্বারে,
সংগ্রহের অন্ধকারে
যে আত্মসংকোচ নিত্য গুপ্ত হয়ে রয়,
হানো তারে হে নিঃশঙ্ক,
ঘোষুক তোমার শঙ্খ—
“নয়, নয়, নয়।”

আণ্ডেস জাহাজ
২৪ অক্টোবর, ১৯২৪

পদধ্বনি

আঁধারে প্রচ্ছন্ন ঘন বনে
আশঙ্কার পরশনে
হরিণের থরথর হৃৎপিণ্ড যেমন—
সেইমতো রাত্রি দ্বিপ্রহরে
শয্যা মোর ক্ষণতরে
সহসা কাঁপিল অকারণ

পদধ্বনি, কার পদধ্বনি
শুনিনু তখনি ?
মোর জন্মনক্ষত্রের অদৃশ্য জগতে
মোর ভাগ্য মোর তরে বার্তা লয়ে ফিরিছে কি পথে ?

পদধ্বনি, কার পদধ্বনি ?
অজানার যাত্রী কে গো ? ভয়ে কেঁপে উঠিল ধরণী ।
এই কি নির্মম সেই যে আপন চরণের তলে
পদে পদে চিরদিন
উদাসীন
পিছনের পথ মুছে চলে ?
এ কি সেই নিত্যশিশু, কিছু নাহি চাহে,—
নিজের খেলেনা-চূর্ণ
ভাসাইছে অসম্পূর্ণ
খেলার প্রবাহে ?
ভাঙিয়া স্বপ্নের ঘোর,
ছিঁড়ি মোর
শয্যার বন্ধনমোহ, এ রাত্রিবেলায়
মোরে কি করিবে সঙ্গী প্রলয়ের ভাসান-খেলায় ?

হ'ক তাই
ভয় নাই, ভয় নাই,
এ খেলা খেলেছি বারম্বার
জীবনে আমার ।
জানি জানি, ভাঙিয়া নূতন করে তোলা ;
ভুলায়ে পূর্বের পথ অপূর্বের পথে দ্বার খোলা ;
বাঁধন গিয়েছে যবে চুকে
তারি ছিন্ন রশিগুলি কুড়ায়ে কৌতুকে

বার বার গাঁথা হল দোলা।
নিয়ে যত মুহূর্তের ভোলা
চিরস্মরণের ধন
গোপনে হয়েছে আয়োজন।

পদধ্বনি, কার পদধ্বনি
চিরদিন, শুনেছি এমনি
বারে বারে ?
একি বাজে মৃত্যুসিন্ধুপারে ?
একি মোর আপন বক্ষেতে ?
ডাকে মোরে ক্ষণে ক্ষণে কিসের সংকেতে ?
তবে কি হবেই যেতে ?
সব বন্ধ করিবে ছেদন ?
ওগো কোন্ বন্ধু তুমি, কোন্ সঙ্গী দিতেছ বেদন
বিচ্ছেদের তীর হতে ?
তরী কি ভাসাব স্রোতে ?
হে বিরহী,
আমার অন্তরে দাও কহি
ডাক মোরে কী খেলা খেলাতে
আতঙ্কিত নিশীথবেলাতে ?
বারে বারে দিয়েছ নিঃসঙ্গ করি ;
এ শূন্য প্রাণের পাত্র কোন্ সঙ্গসুধা দিয়ে ভরি
তুলে নেবে মিলন-উৎসবে ?
সূর্যাস্তের পথ দিয়ে যবে
সন্ধ্যাতারা উঠে আসে নক্ষত্রসভায়,
প্রহর না যেতে যেতে
কী সংকেতে
সব সঙ্গ ফেলে রেখে অস্তপথে ফিরে চলে যায় ?
সেও কি এমনি
শোনে পদধ্বনি ?

তারে কি বিরহী
বলে কিছু দিগন্তের অন্তরালে রহি ?
পদধ্বনি, কার পদধ্বনি ?
দিনশেষে
কম্পিত বক্ষের মাঝে এসে
কী শব্দে ডাকিছে কোন্ অজানা রজনী ।

আণ্ডেস জাহাজ
২৪ অক্টোবর, ১৯২৪

প্রকাশ

খুঁজতে যখন এলাম সেদিন কোথায় তোমার গোপন অশ্রুজল,
সে-পথ আমায় দাও নি তুমি বলে।
বাহির-দ্বারে অধীর খেলা, ভিড়ের মধ্যে হাসির কোলাহল,
দেখে এলেম চলে।
এই ছবি মোর ছিল মনে,—
নির্জন মন্দিরের কোণে
দিনের অবসানে
সন্ধ্যাপ্রদীপ আছে চেয়ে ধ্যানের চোখে সন্ধ্যাতারার পানে।
নিভৃত ঘর কাহার লাগি
নিশীথ রাতে রইল জাগি,
খুলল না তার দ্বার।
হে চঞ্চলা, তুমি বুঝি
আপনিও পথ পাও নি খুঁজি,
তোমার কাছে সে ঘর অন্ধকার।

জানি তোমার নিকুঞ্জে আজ পলাশ-শাখায় রঙের নেশা লাগে,
আপন গন্ধে বকুল মাতোয়ারা।

কাঙাল সুরে দখিন বাতাস বনে বনে গুপ্ত কী ধন মাগে,
বেড়ায় নিদ্রাহারা।
হায় গো তুমি জান না যে
তোমার মনের তীর্থমাঝে
পূজা হয় নি আজো।
দেবতা তোমার বুভুক্ষিত, মিথ্যা-ভূষায় কী সাজ তুমি সাজ।
হল সুখের শয়ন পাতা,
কণ্ঠহারের মানিক গাঁথা,
প্রমোদ-রাতের গান,
হয় নি কেবল চোখের জলে
লুটিয়ে মাথা ধুলার তলে
আপনভোলা সকল-শেষের দান।

ভোলাও যখন, তখন সে কোন্ মায়ার ঢাকা পড়ে তোমার 'পরে;
ভুলবে যখন, তখন প্রকাশ পাবে,—
উষার মতো অমল হাসি জাগবে তোমার আঁখির নীলাম্বরে
গভীর অনুভাবে।
ভোগ সে নহে, নয় বাসনা,
নয় আপনার উপাসনা,
নয়কো অভিমান;
সরল প্রেমের সহজ প্রকাশ, বাইরে যে তার নাই রে পরিমাণ।
আপন প্রাণের চরম কথা
বুঝবে যখন, চঞ্চলতা
তখন হবে চুপ।
তখন দুঃখ-সাগরতীরে
লক্ষ্মী উঠে আসবে ধীরে
রূপের কোলে পরম অপরূপ।

আণ্ডেস জাহাজ
২৬ অক্টোবর, ১৯২৪

শেষ

হে অশেষ, তব হাতে শেষ
ধরে কী অপূর্ব বেশ,
কী মহিমা।
জ্যোতির্হীন সীমা
মৃত্যুর অগ্নিতে জ্বলি
যায় গলি,
গড়ে তোলে অসীমের অলংকার।
হয় সে অমৃতপাত্র, সীমার ফুরালে অহংকার।
শেষের দীপালি-রাত্রে, হে অশেষ
অমা-অন্ধকার-রন্ধ্রে দেখা যায় তোমার উদ্দেশ।

ভোরের বাতাসে
শেফালি ঝরিয়া পড়ে ঘাসে,
তারাহারা রাত্রির বীণার
চরম ঝংকার।
যামিনীর তন্দ্রাহীন দীর্ঘ পথ ঘুরি
প্রভাত-আকাশে চন্দ্র, করুণ মাধুরী
শেষ করে যায় তার,
উদয়সূর্যের পানে শান্ত নমস্কার।
যখন কর্মের দিন
ম্লান ক্ষীণ,
গোষ্ঠে-চলা ধেনুসম সন্ধ্যার সমীরে
চলে ধীরে আঁধারের তীরে—
তখন সোনার পাত্র হতে
কী অজস্র স্রোতে
তাহারে করাও স্নান অন্তিমের সৌন্দর্যধারায়?
যখন বর্ষার মেঘ নিঃশেষে হারায়
বর্ষণের সকল সম্বল,
শরতে শিশুর জন্ম দাও তারে শুভ্র সমুজ্জ্বল।—

হে অশেষ, তোমার অঙ্গনে
ভারমুক্ত তার সাথে ক্ষণে ক্ষণে
খেলায়ে রঙের খেলা,
ভাসায়ে আলোর ভেলা,
বিচিত্র করিয়া তোল তার শেষ বেলা।

ক্লান্ত আমি তারি লাগি, অন্তর তৃষিত—
কত দূরে আছে সেই খেলাভরা মুক্তির অমৃত।
বধূ যথা গোধূলিতে শেষ ঘট ভ'রে,
বেণুচ্ছায়াঘন পথে অন্ধকারে ফিরে যায় ঘরে,
সেই মতো, হে সুন্দর, মোর অবসান
তোমার মাধুরী হতে
সুধাস্রোতে
ভরে নিতে চায় তার দিনান্তের গান।
হে ভীষণ, তব স্পর্শঘাত
অকস্মাৎ
মোর গূঢ় চিত্ত হতে কবে
চরম বেদনা-উৎস মুক্ত করি অগ্নিমহোৎসবে
অপূর্ণের যত দুঃখ, যত অসম্মান
উচ্ছ্বাসিত রুদ্র হাস্যে করি দিবে শেষ দীপ্যমান।

আণ্ডেস জাহাজ
২৯ অক্টোবর, ১৯২৪
Equator পার হয়ে আজ দক্ষিণ মেরুর মুখে

দোসর

দোসর আমার, দোসর ওগো, কোথা থেকে
কোন্ শিশুকাল হতে আমায় গেলে ডেকে।
তাই তো আমি চিরজনম একলা থাকি,
সকল বাঁধন টুটল আমার, একটি কেবল রইল বাকি—
সেই তো তোমার ডাকার বাঁধন, অলখ ডোরে
দিনে দিনে বাঁধল মোরে।

দোসর ওগো, দোসর আমার, সে ডাক তব
কত ভাষায় কয় যে কথা নব নব।
চমকে উঠে ছুটি যে তাই বাতায়নে,
সকল কাজে বাধা পড়ে, বসে থাকি আপন মনে ;—
পারের পাখি আকাশে ধায় উধাও গানে
চেয়ে থাকি তাহার পানে।

দোসর আমার, দোসর ওগো, যে বাতাসে
বসন্ত তার পুলক জাগায় ঘাসে ঘাসে,
ফুল-ফোটানো তোমার লিপি সেই কি আনে
গুঞ্জরিয়া মর্মরিয়া কী বলে যায় কানে কানে,
কে যেন তা বোঝে আমার বক্ষতলে,
ভাসে নয়ন অশ্রুজলে।

দোসর ওগো, দোসর আমার, কোন্ সুদূরে
ঘরছাড়া মোর ভাবনা বাউল বেড়ায় ঘুরে।
তারে যখন শুধাই, সে তো কয় না কথা,
নিয়ে আসে স্তব্ধ গভীর নীলাম্বরের নীরবতা।
একতারা তার বাজায় কভু গুনগুনিয়ে,
রাত কেটে যায় তাই শুনিয়ে।

দোসর ওগো, দোসর আমার, উঠল হাওয়া,—
এবার তবে হ'ক আমাদের তরী বাওয়া।
দিনে দিনে পূর্ণ হল ব্যথার বোঝা,
তীরে তীরে ভাঙন লাগে, মিথ্যে কিসের বাসা খোঁজা।
একে একে সকল রশি গেছে খুলে,
ভাসিয়ে এবার দাও অকূলে।

দোসর ওগো, দোসর আমার, দাও না দেখা,
সময় হল একার সাথে মিলুক একা।

নিবিড় নীরব অন্ধকারে রাতের বেলায়
অনেক দিনের দূরের ডাকা পূর্ণ করো কাছের খেলায়।
তোমায় আমায় নতুন পালা হ'ক না এবার
হাতে হাতে দেবার নেবার।

আণ্ডেস জাহাজ
২৮ অক্টোবর, ১৯২৪

অবসান

পারের ঘাটা পাঠাল তরী ছায়ার পাল তুলে,
আজি আমার প্রাণের উপকূলে।
মনের মাঝে কে কয় ফিরে ফিরে—
বাঁশির সুরে ভরিয়া দাও গোধূলি-আলোটিরে।
সাঁঝের হাওয়া করুণ হ'ক দিনের অবসানে
পাড়ি দেবার গানে।

সময় যদি এসেছে তবে সময় যেন পাই,
নিভৃত খনে আপন মনে গাই।
আভাস যত বেড়ায় ঘুরে মনে—
অশ্রুঘন কুহেলিকায় লুকায় কোণে কোণে,—
আজিকে তারা পড়ুক ধরা, মিলুক পূরবীতে
একটি সংগীতে।

সন্ধ্যা মম, কোন্ কথাটি প্রাণের কথা তব,
আমার গানে, বলো, কী আমি কব।
দিনের শেষে যে-ফুল পড়ে ঝরে
তাহারি শেষ নিঃশ্বাসে কি বাঁশিটি নেব ভরে?
অথবা ব'সে বাঁধিব সুর যে-তারা ওঠে রাতে
তাহারি মহিমাতে।

সন্ধ্যা মম, যে-পার হতে ভাসিল মোর তরী
গাব কি আজি বিদায়গান ওরি ?
অথবা সেই অদেখা দূর পারে
প্রাণের চিরদিনের আশা পাঠাব অজানারে ?
বলিব,—যত হারানো বাণী তোমার রজনীতে
চলিনু খুঁজে নিতে।

আণ্ডেস জাহাজ
৩০ অক্টোবর, ১৯২৪

তারা

আকাশভরা তারার মাঝে আমার তারা কই ?
ওই হবে কি ওই ?
রাঙা আভার আভাস মাঝে, সন্ধ্যারবির রাগে
সিন্ধুপারের ঢেউয়ের ছিটে ওই যাহারে লাগে,
ওই যে লাজুক আলোখানি, ওই যে গো নামহারা,
ওই কি আমার হবে আপন তারা ?

জোয়ারভাঁটার স্রোতের টানে আমার বেলা কাটে
কেবল ঘাটে ঘাটে।
এমনি করে পথে পথে অনেক হল খোঁজা,
এমনি করে হাটে হাটে জমল অনেক বোঝা ;—
ইমনে আজ বাঁশি বাজে, মন যে কেমন করে
আকাশে মোর আপন তারার তরে।

দূরে এসে তার ভাষা কি ভুলেছি কোন্‌খনে ?
পড়বে না কি মনে ?
ঘরে-ফেরার প্রদীপ আমার রাখল কোথায় জেলে
পথে-চাওয়া করুণ চোখের কিরণখানি মেলে ?
কোন্ রাতে যে মেটাবে মোর তপ্ত দিনের তৃষা,
খুঁজে খুঁজে পাব না তার দিশা ?

ক্ষণে ক্ষণে কাজের মাঝে দেয় নি কি যার নাড়া—
পাই নি কি তার সাড়া ?
বাতায়নের মুক্তপথে স্বচ্ছ শরৎ-রাতে
তার আলোটি মেশে নি কি মোর স্বপনের সাথে ?
হঠাৎ তারি সুরখানি কি ফাগুন-হাওয়া বেয়ে
আসে নি মোর গানের 'পরে ধেয়ে ?

কানে কানে কথাটি তার অনেক সুখে দুখে
বেজেছে মোর বুকে।
মাঝে মাঝে তারি বাতাস আমার পালে এসে
নিয়ে গেছে হঠাৎ আমায় আনমনাদের দেশে,
পথ-হারানো বনের ছায়ায় কোন্ মায়াতে ভুলে
গেঁথেছি হার নাম-না-জানা ফুলে।

আমার তারার মন্ত্র নিয়ে এলেম ধরাতলে
লক্ষ্যহারার দলে।
বাসায় এল পথের হাওয়া, কাজের মাঝে খেলা,
ভাসল ভিড়ের মুখর স্রোতে একলা প্রাণের ভেলা,
বিচ্ছেদেরি লাগল বাদল মিলন-ঘন রাতে
বাঁধনহারা শ্রাবণ-ধারাপাতে।

ফিরে যাবার সময় হল তাই তো চেয়ে রই,
আমার তারা কই ?
গভীর রাতে প্রদীপগুলি নিবেছে এই পারে
বাসাহারা গন্ধ বেড়ায় বনের অন্ধকারে ;
সুর ঘুমাল নীরব নীড়ে, গান হল মোর সারা,
কোন্ আকাশে আমার আপন তারা ?

আণ্ডেস জাহাজ
১ নভেম্বর, ১৯২৪

কৃতজ্ঞ

বলেছিনু "ভুলিব না", যবে তব ছল-ছল আঁখি
নীরবে চাহিল মুখে। ক্ষমা ক'রো যদি ভুলে থাকি।
সে যে বহুদিন হল। সেদিনের চুম্বনের 'পরে
কত নববসন্তের মাধবীমঞ্জরী থরে থরে
শুকায়ে পড়িয়া গেছে; মধ্যাহ্নের কপোতকাকলি
তারি 'পরে ক্লান্ত ঘুম চাপা দিয়ে এল গেল চলি
কতদিন ফিরে ফিরে। তব কালো নয়নের দিঠি
মোর প্রাণে লিখেছিল প্রথম প্রেমের সেই চিঠি
লজ্জাভয়ে; তোমার সে হৃদয়ের স্বাক্ষরের 'পরে
চঞ্চল আলোকছায়া কত কাল প্রহরে প্রহরে
বুলায়ে গিয়েছে তুলি, কত সন্ধ্যা দিয়ে গেছে এঁকে
তারি 'পরে সোনার বিস্মৃতি, কত রাত্রি গেছে রেখে
অস্পষ্ট রেখার জালে আপনার স্বপনলিখন,
তাহারে আচ্ছন্ন করি। প্রতিমুহূর্তটি প্রতিক্ষণ
বাঁকাচোরা নানা চিত্রে চিন্তাহীন বালকের প্রায়
আপনার স্মৃতিলিপি চিত্তপটে এঁকে এঁকে যায়,
লুপ্ত করি পরস্পরে বিস্মৃতির জাল দেয় বুনে।
সেদিনের ফাল্গুনের বাণী যদি আজি এ ফাল্গুনে
ভুলে থাকি, বেদনার দীপ হতে কখন নীরবে
অগ্নিশিখা নিবে গিয়ে থাকে যদি, ক্ষমা ক'রো তবে।
তবু জানি, একদিন তুমি দেখা দিয়েছিলে বলে
গানের ফসল মোর এ জীবনে উঠেছিল ফলে,
আজো নাই শেষ; রবির আলোক হতে একদিন
ধ্বনিয়া তুলেছে তার মর্মবাণী, বাজায়েছে বীন
তোমার আঁখির আলো। তোমার পরশ নাহি আর,
কিন্তু কী পরশমণি রেখে গেছ অন্তরে আমার,—
বিশ্বের অমৃতছবি আজিও তো দেখা দেয় মোরে
ক্ষণে ক্ষণে,—অকারণ আনন্দের সুধাপাত্র ভ'রে

আমারে কবায় পান। ক্ষমা ক'রো যদি ভুলে থাকি।
তবু জানি একদিন তুমি মোরে নিয়েছিলে ডাকি
হৃদিমাঝে; আমি তাই আমার ভাগ্যেরে ক্ষমা করি—
যত দুঃখে যত শোকে দিন মোর দিয়েছে সে ভরি
সব ভুলে গিয়ে। পিপাসার জলপাত্র নিয়েছে সে
মুখ হতে, কতবার ছলনা করেছে হেসে হেসে,
ভেঙেছে বিশ্বাস, অকস্মাৎ ডুবায়েছে ভরা তরী
তীরের সম্মুখে নিয়ে এসে,—সব তার ক্ষমা করি।
আজ তুমি আর নাই, দূর হতে গেছ তুমি দূরে,
বিধুর হয়েছে সন্ধ্যা মুছে-যাওয়া তোমার সিন্দুরে,
সঙ্গীহীন এ জীবন শূন্যঘরে হয়েছে শ্রীহীন,
সব মানি,—সব চেয়ে মানি তুমি ছিলে একদিন।

আণ্ডেস জাহাজ
২ নভেম্বর, ১৯২৪

দুঃখ-সম্পদ

দুঃখ, তব যন্ত্রণায় যে-দুর্দিনে চিত্ত উঠে ভরি,
দেহে মনে চতুর্দিকে তোমার প্রহরী
রোধ করে বাহিরের সান্ত্বনার দ্বার,
সেইক্ষণে প্রাণ আপনার
নিগূঢ় ভাণ্ডার হতে গভীর সান্ত্বনা
বাহির করিয়া আনে; অমৃতের কণা
গলে আসে অশ্রুজলে;
সে-আনন্দ দেখা দেয় অন্তরের তলে
যে আপন পরিপূর্ণতায়
আপন করিয়া লয় দুঃখবেদনায়।

তখন সে মহা-অন্ধকারে
অনির্বাণ আলোকের পাই দেখা অন্তরমাঝারে।
তখন বুঝিতে পারি আপনার মাঝে
আপন অমরাবতী চিরদিন গোপনে বিরাজে।

আণ্ডেস জাহাজ
৪ নভেম্বর, ১৯২৪

মৃত্যুর আহ্বান

জন্ম হয়েছিল তোর সকলের কোলে
আনন্দকল্লোলে।
নীলাকাশ, আলো, ফুল, পাখি,
জননীর আঁখি,
শ্রাবণের বৃষ্টিধারা, শরতের শিশিরের কণা,
প্রাণের প্রথম অভ্যর্থনা।
জন্ম সেই
এক নিমিষেই
অন্তহীন দান,
জন্ম সে যে গৃহমাঝে গৃহীরে আহ্বান।

মৃত্যু তোর হ'ক দূরে নিশীথে নির্জনে
হ'ক সেই পথে যেথা সমুদ্রের তরঙ্গগর্জনে
গৃহহীন পথিকেরি
নৃত্যছন্দে নিত্যকাল বাজিতেছে ভেরী।
অজানা অরণ্যে যেথা উঠিতেছে উদাস মর্মর,
বিদেশের বিবাগি নির্ঝর
বিদায়-গানের তালে হাসিয়া বাজায় করতালি।
যেথায় অপরিচিত নক্ষত্রের আরতির থালি
চলিয়াছে অনন্তের মন্দির-সন্ধানে,
পিছু ফিরে চাহিবার কিছু যেথা নাই কোনোখানে

দুয়ার রহিবে খোলা ; ধরিত্রীর সমুদ্র-পর্বত
কেহ ডাকিবে না কাছে, সকলেই দেখাইবে পথ ।
শিয়রে নিশীথরাত্রি রহিবে নির্বাক,
মৃত্যু সে যে পথিকেরে ডাক ।

আণ্ডেস জাহাজ
৩ নভেম্বর, ১৯২৪

দান

কাঁকনজোড়া এনে দিলেম যবে
ভেবেছিলেম হয়তো খুশি হবে ।
তুলে তুমি নিলে হাতের 'পরে,
ঘুরিয়ে তুমি দেখলে ক্ষণেক তরে,
পরেছিলে হয়তো গিয়ে ঘরে,
হয়তো বা তা রেখেছিলে খুলে
এলে যেদিন বিদায় নেবার রাতে
কাঁকন দুটি দেখি নাই তো হাতে,
হয়তো এলে ভুলে

দেয় যে জনা কী দশা পায় তাকে ?
দেওয়ার কথা কেনই মনে রাখে ?
পাকা যে ফল পড়ল মাটির টানে
শাখা আবার চায় কি তাহার পানে ?
বাতাসেতে উড়িয়ে-দেওয়া গানে
তারে কি আর স্মরণ করে পাখি ?
দিতে যারা জানে এ সংসারে
এমন করেই তারা দিতে পারে
কিছু না রয় বাকি ।

নিতে যারা জানে তারাই জানে,
বোঝে তারা মূল্যটি কোন্‌খানে।
তারাই জানে বুকের রত্নহারে
সেই মণিটি কজন দিতে পারে
হৃদয় দিয়ে দেখিতে হয় যারে
যে পায় তারে পায় সে অবহেলে।
পাওয়ার মতন পাওয়া যারে কহে
সহজ বলেই সহজ তাহা নহে,
দৈবে তারে মেলে।

ভাবি যখন ভেবে না পাই তবে
দেবার মতো কী আছে এই ভবে।
কোন্‌ খনিতে কোন্‌ ধনভাণ্ডারে,
সাগরতলে কিম্বা সাগরপারে,
যক্ষরাজের লক্ষমণির হারে
যা আছে তা কিছুই তো নয়, প্রিয়ে।
তাই তো বলি যা কিছু মোর দান
গ্রহণ করেই করবে মূল্যবান,
আপন হৃদয় দিয়ে।

আণ্ডেস জাহাজ
৩ নভেম্বর, ১৯২৪

সমাপন

এবারের মতো করো শেষ
প্রাণে যদি পেয়ে থাক চরমের পরম উদ্দেশ ;
যদি অবসান সুমধুর
আপন বীণার তারে সকল বেসুর
সুরে বেঁধে তুলে থাকে ;
অস্তরবি যদি তোরে ডাকে

দিনেরে মাভৈঃ বলে যেমন সে ডেকে নিয়ে যায়
অন্ধকার অজানায় ;
সুন্দরের শেষ অর্চনায়
আপনার রশ্মিচ্ছটা সম্পূর্ণ করিয়া দেয় সারা ;
যদি সন্ধ্যাতারা
অসীমের বাতায়নতলে
শান্তির প্রদীপশিখা দেখায় কেমন করে জ্বলে ;
যদি রাত্রি তার
খুলে দেয় নীরবের দ্বার,
নিয়ে যায় নিঃশব্দ সংকেতে ধীরে ধীরে
সকল বাণীর শেষ সাগর-সংগম তীর্থতীরে
সেই শতদল হতে যদি গন্ধ পেয়ে থাক তার
মানস-সরসে যাহা শেষ অর্ঘ্য, শেষ নমস্কার।

আণ্ডেস জাহাজ
৫ নভেম্বর, ১৯২৪

ভাবী কাল

ক্ষমা ক'রো, যদি গর্বভরে
মনে মনে ছবি দেখি,— মোর কাব্যখানি লয়ে করে
দূর ভাবী শতাব্দীর অয়ি সপ্তদশী
একেলা পড়িছ তব বাতায়নে বসি।
আকাশেতে শশী
ছন্দের ভরিয়া রন্ধ্র ঢালিছে গভীর নীরবতা
কথার অতীত সুরে পূর্ণ করি কথা ;
হয়তো উঠিছে বক্ষ নেচে
হয়তো ভাবিছ, "যদি থাকিত সে বেঁচে,
আমারে বাসিত বুঝি ভালো।"

হয়তো বলিছ মনে, "সে নাহি আসিবে আর কভু,
তারি লাগি তবু
মোর বাতায়নতলে আজ রাত্রে জ্বালিলাম আলো।"

আণ্ডেস জাহাজ
৬ নভেম্বর, ১৯২৪

অতীত কাল

সেই ভালো, প্রতি যুগ আনে না আপন অবসান,
সম্পূর্ণ করে না তার গান ;
অতৃপ্তির দীর্ঘশ্বাস রেখে দিয়ে যায় সে বাতাসে।
তাই যবে পরযুগে বাঁশির উচ্ছ্বাসে
বেজে ওঠে গানখানি
তার মাঝে সুদূরের বাণী
কোথায় লুকায়ে থাকে, কী বলে সে বুঝিতে কে পারে ;
যুগান্তরের ব্যথা প্রত্যহের ব্যথার মাঝারে
মিলায় অশ্রুর বাষ্পজাল ;
অতীতের সূর্যাস্তের কাল
আপনার সকরুণ বর্ণচ্ছটা মেলে
মৃত্যুর ঐশ্বর্য দেয় ঢেলে,
নিমেষের বেদনারে করে সুবিপুল।
তাই বসন্তের ফুল
নাম-ভুলে-যাওয়া
প্রেয়সীর নিঃশ্বাসের হাওয়া
যুগান্তর-সাগরের দ্বীপান্তর হতে বহি আনে।
যেন কী অজানা ভাষা মিশে যায় প্রণয়ীর কানে
পরিচিত ভাষাটির সাথে,—
মিলনের রাতে।

আণ্ডেস জাহাজ
৭ নভেম্বর, ১৯২৪

বেদনার লীলা

গানগুলি বেদনার খেলা যে আমার,
কিছুতে ফুরায় না সে আর।
যেখানে স্রোতের জল পীড়নের পাকে
আবর্তে ঘুরিতে থাকে ;—
সূর্যের কিরণ সেথা নৃত্য করে ;—
ফেনপুঞ্জ স্তরে স্তরে
দিবারাতি
রঙের খেলায় ওঠে মাতি।
শিশু রুদ্র হাসে খল খল,
দোলে টল মল
লীলাভরে।
প্রচণ্ডের সৃষ্টিগুলি প্রহরে প্রহরে
ওঠে পড়ে আসে যায় একান্ত হেলায়,
নিরর্থ খেলায়।
গানগুলি সেইমতো বেদনার খেলা যে আমার,
কিছুতে ফুরায় না সে আর।

আণ্ডেস জাহাজ
৭ নভেম্বর, ১৯২৪

শীত

শীতের হাওয়া হঠাৎ ছুটে এল
গানের বেলা শেষ না হতে হতে ?
মনের কথা ছড়িয়ে এলোমেলো
ভাসিয়ে দিল শুকনো পাতার স্রোতে।
মনের কথা যত
উজান তরীর মতো ;

পালে যখন হাওয়ার বলে
মরণ-পারে নিয়ে চলে,
চোখের জলের স্রোত যে তাদের টানে
পিছু ঘাটের পানে
যেথায় তুমি, প্রিয়ে,
একলা বসে আপন মনে
আঁচল মাথায় দিয়ে।

ঘোরে তারা শুকনো পাতার পাকে,
কাঁপন-ভরা হিমের বায়ুভরে?
ঝরা ফুলের পাপড়ি তাদের ঢাকে,
লুটায় কেন মরা ঘাসের 'পরে?
হল কি দিন সারা?
বিদায় নেবে তারা?
এবার বুঝি কুয়াশাতে
লুকিয়ে তারা পোউষ-রাতে
ধুলার ডাকে সাড়া দিতে চলে
যেথায় ভূমিতলে
একলা তুমি, প্রিয়ে,
বসে আছ আপন মনে
আঁচল মাথায় দিয়ে?

মন যে বলে, নয় কখনোই নয়,
ফুরায় নি তো, ফুরাবার এই ভান;
মন যে বলে, শুনি আকাশময়
যাবার মুখে ফিরে আসার গান।
শীর্ণ শীতের লতা
আমার মনের কথা
হিমের রাতে লুকিয়ে রাখে
নগ্ন শাখার ফাঁকে ফাঁকে,

ফাল্গুনেতে ফিরিয়ে দেবে ফুলে
তোমার চরণমূলে
যেথায় তুমি, প্রিয়ে,
একলা বসে আপন মনে
আঁচল মাথায় দিয়ে।

বুয়েনোস এয়ারিস
১০ নভেম্বর, ১৯২৪

কিশোর প্রেম

অনেক দিনের কথা সে যে অনেক দিনের কথা;
পুরানো এই ঘাটের ধারে
ফিরে এল কোন্ জোয়ারে
পুরানো সেই কিশোর প্রেমের করুণ ব্যাকুলতা?
সে যে অনেক দিনের কথা।

আজকে মনে পড়েছে সেই নির্জন অঙ্গন।
সেই প্রদোষের অন্ধকারে
এল আমার অধর-পারে
ক্লান্ত ভীরু পাখির মতো কম্পিত চুম্বন।
সেদিন নির্জন অঙ্গন।

তখন জানা ছিল না তো ভালোবাসার ভাষা;
যেন প্রথম দখিন বায়ে
শিহর লেগেছিল গায়ে;
চাঁপাকুঁড়ির বুকের মাঝে অস্ফুট কোন্ আশা,
সে যে অজানা কোন্ ভাষা।

সেই সেদিনের আসাযাওয়া, আধেক জানাজানি,
হঠাৎ হাতে হাতে ঠেকা,
বোবা চোখের চেয়ে দেখা,
মনে পড়ে ভীরু হিয়ার না-বলা সেই বাণী,
সেই আধেক জানাজানি।

এই জীবনে সেই তো আমার প্রথম ফাগুন মাস।
ফুটল না তার মুকুলগুলি,
শুধু তারা হাওয়ায় দুলি
অবেলাতে ফেলে গেছে চরম দীর্ঘশ্বাস,
আমার প্রথম ফাগুন মাস।

ঝরে-পড়া সেই মুকুলের শেষ-না-করা কথা
আজকে আমার সুরে গানে
পায় খুঁজে তার গোপন মানে,
আজ বেদনায় উঠল ফুটে তার সেদিনের ব্যথা,
সেই শেষ-না-করা কথা।

পারে যাওয়ার উধাও পাখি সেই কিশোরের ভাষা,
প্রাণের পারের কুলায় ছাড়ি
শূন্য আকাশ দিল পাড়ি,
আজ এসে মোর স্বপন মাঝে পেয়েছে তার বাসা,
আমার সেই কিশোরের ভাষা।

বুয়েনোস এয়ারিস
১১ নভেম্বর, ১৯২৪

প্রভাত

স্বর্ণসুধা-ঢালা এই প্রভাতের বুকে
যাপিলাম সুখে,
পরিপূর্ণ অবকাশ করিলাম পান।
মুদিল অলস পাখা মুগ্ধ মোর গান।
যেন আমি নিস্তব্ধ মৌমাছি
আকাশ-পদ্মের মাঝে একান্ত একেলা বসে আছি।
যেন আমি আলোকের নিঃশব্দ নির্ঝরে
মন্থর মুহূর্তগুলি ভাসায়ে দিতেছি লীলাভরে।
ধরণীর বক্ষ ভেদি যেথা হতে উঠিতেছে ধারা
পুষ্পের ফোয়ারা,
তৃণের লহরী,
সেখানে হৃদয় মোর রাখিয়াছি ধরি ;
ধীরে চিত্ত উঠিতেছে ভরি
সৌরভের স্রোতে।
ধূলি-উৎস হতে
প্রকাশের অক্লান্ত উৎসাহ,
জন্মমৃত্যু-তরঙ্গিত রূপের প্রবাহ
স্পন্দিত করিছে মোর বক্ষস্থল আজি।
রক্তে মোর উঠে বাজ
তরঙ্গের অরণ্যের সম্মিলিত স্বর,
নিখিল মর্মর।
এ বিশ্বের স্পর্শের সাগর
আজ মোর সর্ব অঙ্গ করেছে মগন।
এই স্বচ্ছ উদার গগন
বাজায় অদৃশ্য শঙ্খ শব্দহীন সুর।
আমার নয়নে মনে ঢেলে দেয় সুনীল সুদূর।

বুয়েনোস এয়ারিস
১১ নভেম্বর, ১৯২৪

বিদেশী ফুল

হে বিদেশী ফুল, যবে আমি পুছিলাম—
"কী তোমার নাম",
হাসিয়া দুলালে মাথা, বুঝিলাম তবে
নামেতে কী হবে।
আর কিছু নয়,
হাসিতে তোমার পরিচয়।

হে বিদেশী ফুল, যবে তোমারে বুকের কাছে ধরে
শুধালেম, "বলো বলো মোরে
কোথা তুমি থাক,"
হাসিয়া দুলালে মাথা, কহিলে, "জানি না, জানি নাকো।"
বুঝিলাম তবে
শুনিয়া কী হবে
থাক কোন্ দেশে।
যে তোমারে বোঝে ভালোবেসে
তাহার হৃদয়ে তব ঠাঁই,
আর কোথা নাই।

হে বিদেশী ফুল, আমি কানে কানে শুধানু আবার,
"ভাষা কী তোমার ?"
হাসিয়া দুলালে শুধু মাথা,
চারিদিকে মর্মরিল পাতা।
আমি কহিলাম, "জানি, জানি,
সৌরভের বাণী
নীরবে জানায় তব আশা।
নিঃশ্বাসে ভরেছে মোর সেই তব নিঃশ্বাসের ভাষা।"

হে বিদেশী ফুল, আমি যেদিন প্রথম এনু ভোরে—
শুধালেম, "চেন তুমি মোরে ?"

রবীন্দ্রনাথ ও 'বিজয়া' ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো

হাসিয়া দুলালে মাথা, ভাবিলাম, তাহে একরতি
নাহি কারো ক্ষতি
কহিলাম, "বোঝ নি কি তোমার পরশে
হৃদয় ভরেছে মোর রসে ?
কেই বা আমারে চেনে এর চেয়ে বেশি,
হে ফুল বিদেশী।"

হে বিদেশী ফুল, যবে তোমারে শুধাই, "বলো দেখি,
মোরে ভুলিবে কি ?"
হাসিয়া দুলাও মাথা ; জানি জানি মোরে ক্ষণে ক্ষণে
পড়িবে যে মনে।
দুই দিন পরে
চলে যাব দেশান্তরে,
তখন দূরের টানে স্বপ্নে আমি হব তব চেনা ;—
মোরে ভুলিবে না।

বুয়েনোস এয়ারিস
১২ নভেম্বর, ১৯২৪

অতিথি

প্রবাসের দিন মোর পরিপূর্ণ করি দিলে, নারী,
মাধুর্যসুধায় ; কত সহজে করিলে আপনারি
দূরদেশী পথিকেরে ; যেমন সহজে সন্ধ্যাকাশে
আমার অজানা তারা স্বর্গ হতে স্থির স্নিগ্ধ হাসে
আমারে করিল অভ্যর্থনা ; নির্জন এ বাতায়নে
একেলা দাঁড়ায়ে যবে চাহিলাম দক্ষিণ-গগনে
উর্ধ্ব হতে একতানে এল প্রাণে আলোকেরি বাণী,—
শুনিনু গম্ভীর স্বর, "তোমারে যে জানি মোরা জানি ;
আঁধারের কোল হতে যেদিন কোলেতে নিল ক্ষিতি
মোদের অতিথি তুমি, চিরদিন আলোর অতিথি।"

তেমনি তারার মতো মুখে মোর চাহিলে, কল্যাণী,
কহিলে তেমনি স্বরে, "তোমারে যে জানি আমি জানি
জানি না তো ভাষা তব, হে নারী, শুনেছি তব গীতি,
"প্রেমের অতিথি কবি, চিরদিন আমারি অতিথি।"

বুয়েনোস এয়ারিস
১৫ নভেম্বর, ১৯২৪

অন্তর্হিতা

প্রদীপ যখন নিবেছিল,
আঁধার যখন রাতি,
দুয়ার যখন বন্ধ ছিল,
ছিল না কেউ সাথি।
মনে হল অন্ধকারে
কে এসেছে বাহির-দ্বারে,
মনে হল শুনি যেন
পায়ের ধ্বনি কার,
রাতের হাওয়ায় বাজল বুঝি
কঙ্কণ-ঝংকার।

বারেক শুধু মনে হল
খুলি, দুয়ার খুলি।
ক্ষণেক পরে ঘুমের ঘোরে
কখন গেনু ভুলি।
"কোন্ অতিথি দ্বারের কাছে
একলা রাতে বসে আছে?"
ক্ষণে ক্ষণে তন্দ্রা ভেঙে
মন শুধাল যবে,
বলেছিলেম, আর কিছু নয়,
স্বপ্ন আমার হবে।

মাঝ-গগনে সপ্ত-ঋষি
স্তব্ধ গভীর রাতে
জানলা হতে আমায় যেন
ডাকল ইশারাতে।
মনে হল, শয়ন ফেলে
দিই না কেন আলো জ্বেলে,
আলসভরে রইনু শুয়ে
হল না দীপ জ্বালা।
প্রহর পরে কাটল প্রহর,
বন্ধ রইল তালা।

জাগল কখন দখিন-হাওয়া
কাঁপল বনের হিয়া,
স্বপ্নে কথা-কওয়ার মতো
উঠল মর্মরিয়া।
যূথীর গন্ধ ক্ষণে ক্ষণে
মূর্ছিল মোর বাতায়নে,
শিহর দিয়ে গেল, আমার
সকল অঙ্গ চুমে।
জেগে উঠে আবার কখন
ভরল নয়ন ঘুমে।

ভোরের তারা পুব-গগনে
যখন হল গত
বিদায়রাতির একটি ফোঁটা
চোখের জলের মতো,
হঠাৎ মনে হল তবে,
যেন কাহার করুণ রবে

শিরীষ ফুলের গন্ধে আকুল
বনের বীথি ব্যেপে
শিশির-ভেজা তৃণগুলি
উঠল কেঁপে কেঁপে।

শয়ন ছেড়ে উঠে তখন
খুলে দিলেম দ্বার,
হায় রে, ধুলায় বিছিয়ে গেছে
যূথীর মালা কার।
ঐ যে দূরে, নয়ন নত
বনের ছায়ায় ছায়ার মতো
মায়ার মতো মিলিয়ে গেল
অরুণ-আলোয় মিশে,
ঐ বুঝি মোর বাহির-দ্বারের
রাতের অতিথি সে।

আজ হতে মোর ঘরের দুয়ার
রাখব খুলে রাতে।
প্রদীপখানি রইবে জ্বালা
বাহির-জানালাতে।
আজ হতে কার পরশ লাগি
পথ তাকিয়ে রইব জাগি;
আর কোনোদিন আসবে না কি
আমার পরান ছেয়ে
যূথীর মালার গন্ধখানি
রাতের বাতাস বেয়ে?

বুয়েনোস এয়ারিস
১৬ নভেম্বর, ১৯২৪

আশঙ্কা

ভালোবাসার মূল্য আমায় দু-হাত ভরে
যতই দেবে বেশি করে,
ততই আমার অন্তরের এই গভীর ফাঁকি
আপনি ধরা পড়বে না কি ?
তাহার চেয়ে ঋণের রাশি রিক্ত করি
যাই না নিয়ে শূন্য তরী।
বরং রব ক্ষুধায় কাতর ভালো সে-ও,
সুধায় ভরা হৃদয় তোমার
ফিরিয়ে নিয়ে চলে যেয়ো।

পাছে আমার আপন ব্যথা মিটাইতে
ব্যথা জাগাই তোমার চিতে,
পাছে আমার আপন বোঝা লাঘব তরে
চাপাই বোঝা তোমার 'পরে,
পাছে আমার একলা প্রাণের ক্ষুব্ধ ডাকে
রাত্রে তোমায় জাগিয়ে রাখে,
সেই ভয়েতেই মনের কথা কই নে খুলে ;
ভুলতে যদি পার তবে
সেই ভালো গো যেয়ো ভুলে।

বিজন পথে চলেছিলেম, তুমি এলে
মুখে আমার নয়ন মেলে।
ভেবেছিলেম বলি তোমায়, সঙ্গে চলো,
আমায় কিছু কথা বলো।
হঠাৎ তোমার মুখে চেয়ে কী কারণে
ভয় হল যে আমার মনে।

দেখেছিলেম সুপ্ত আগুন লুকিয়ে জ্বলে
তোমার প্রাণের নিশীথ রাতের
অন্ধকারের গভীর তলে।

তপস্বিনী, তোমার তপের শিখাগুলি
হঠাৎ যদি জাগিয়ে তুলি,
তবে যে সেই দীপ্ত আলোয় আড়াল টুটে
দৈন্য আমার উঠবে ফুটে।
হবি হবে তোমার প্রেমের হোমাগ্নিতে
এমন কী মোর আছে দিতে।
তাই তো আমি বলি তোমায় নতশিরে
তোমার দেখার স্মৃতি নিয়ে
একলা আমি যাব ফিরে।

বুয়েনোস এয়ারিস
১৭ নভেম্বর, ১৯২৪

শেষ বসন্ত

আজিকার দিন না ফুরাতে
হবে মোর এ আশা পুরাতে—
শুধু এবারের মতো
বসন্তের ফুল যত
যাব মোরা দুজনে কুড়াতে।
তোমার কাননতলে ফাল্গুন আসিবে বারম্বার,
তাহারি একটি শুধু মাগি আমি দুয়ারে তোমার।

বেলা কবে গিয়াছে বৃথাই
এত কাল ভুলে ছিনু তাই।

হঠাৎ তোমার চোখে
দেখিয়াছি সন্ধ্যালোকে
আমার সময় আর নাই।
তাই আমি একে একে গনিতেছি কৃপণের সম
ব্যাকুল সংকোচভরে বসন্তশেষের দিন মম।

ভয় রাখিয়ো না তুমি মনে;
তোমার বিকচ ফুলবনে
দেরি করিব না মিছে
ফিরে চাহিব না পিছে,
দিনশেষে বিদায়ের ক্ষণে।
চাব না তোমার চোখে আঁখিজল পাব আশা করি',
রাখিবারে চিরদিন স্মৃতিরে করুণা-রসে ভরি।

ফিরিয়া যেয়ো না শোন শোন,
সূর্য অস্ত যায় নি এখনো।
সময় রয়েছে বাকি;
সময়েরে দিতে ফাঁকি
ভাবনা রেখো না মনে কোনো।
পাতার আড়াল হতে বিকালের আলোটুকু এসে
আরো কিছুখন ধরে ঝলুক তোমার কালো কেশে।

হাসিয়ো মধুর উচ্চহাসে
অকারণ নির্মম উল্লাসে,
বনসরসীর তীরে
ভীরু কাঠবিড়ালিরে
সহসা চকিত ক'রো ত্রাসে।
ভুলে-যাওয়া কথাগুলি কানে কানে করায়ে স্মরণ
দিব না মন্থর করি ওই তব চঞ্চল চরণ।

তার পরে যেয়ো তুমি চলে
ঝরা পাতা দ্রুতপদে দলে,
নীড়ে-ফেরা পাখি যবে
অস্ফুট কাকলিরবে
দিনান্তেরে ক্ষুব্ধ করি তোলে।
বেণুবনচ্ছায়াঘন সন্ধ্যায় তোমার ছবি দূরে
মিলাইবে গোধূলির বাঁশরির সর্বশেষ সুরে।

রাত্রি যবে হবে অন্ধকার
বাতায়নে বসিয়ো তোমার।
সব ছেড়ে যাব, প্রিয়ে,
সমুখের পথ দিয়ে,
ফিরে দেখা হবে না তো আর।
ফেলে দিয়ো ভোরে-গাঁথা ম্লান মল্লিকার মালাখানি
সেই হবে স্পর্শ তব, সেই হবে বিদায়ের বাণী।

বুয়েনোস এয়ারিস
২১ নভেম্বর, ১৯২৪

বিপাশা

মায়ামৃগী, নাই বা তুমি
পড়লে প্রেমের ফাঁদে
ফাগুন-রাতে চোরা মেঘে
নাই হরিল চাঁদে।
বাঁধন-কাটা ভাবনা তোমার
হাওয়ায় পাখা মেলে,
দেহমনে চঞ্চলতার
নিত্য যে ঢেউ খেলে।

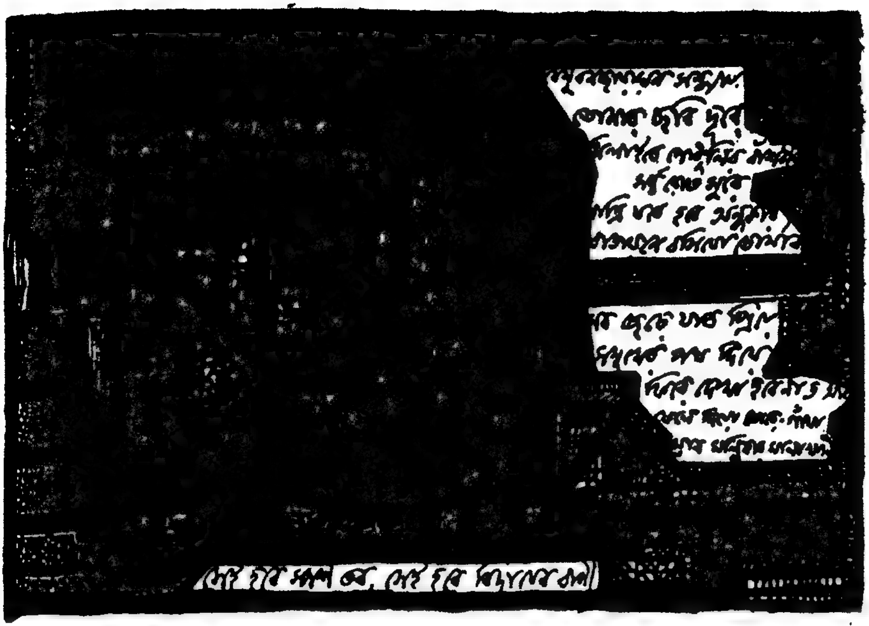

২৭ নবেম্বর
বুয়েনোস্ এয়ারিস।

পূরবীর পাণ্ডুলিপির একটি পৃষ্ঠার কবিকৃত লিপিচিত্রণ

ঝরনা-ধারার মতো সদাই
মুক্ত তোমার গতি,
নাই বা নিলে তটের শরণ
তায় বা কিসের ক্ষতি ?
শরৎপ্রাতের মেঘ যে তুমি
শুভ্র আলোয় ধোওয়া,
একটুখানি অরুণ-আভার
সোনার হাসি-ছোঁওয়া ;
শূন্য পথে মনোরথে
ফের আকাশ পার,
বুকের মাঝে নাই বহিলে
অশ্রু-জলের ভার ?
এমনি করেই যাও খেলে যাও
অকারণের খেলা ;
ছুটির স্রোতে যাক না ভেসে
হালকা খুশির ভেলা।
পথে চাওয়ার ক্লান্তি কেন
নামবে আঁখির পাতে,
কাছের সোহাগ ছাড়বে কেন
দূরের দুরাশাতে ;
তোমার পায়ের নূপুরখানি
বাজাক নিত্যকাল
অশোকবনের চিকন পাতার
চমক-আলোর তাল।
রাতের গায়ে পুলক দিয়ে
জোনাক যেমন জ্বলে
তেমনি তোমার খেয়ালগুলি
উড়ুক স্বপনতলে।
যারা তোমার সঙ্গ-কাঙাল
বাইরে বেড়ায় ঘুরে,

ভিড় যেন না করে তোমার
মনের অন্তঃপুরে।
সরোবরের পদ্ম তুমি,
আপন চারিদিকে
মেলে রেখো তরল জলের
সরল বিস্তৃতিকে।
গন্ধ তোমার হ'ক না সবার,
মনে রেখো তবু
বৃন্ত যেন চুরির ছুরি
নাগাল না পায় কভু।
আমার কথা শুধাও যদি—
চাবার তরেই চাই,
পাবার তরে চিত্তে আমার
ভাবনা কিছুই নাই।
তোমার পানে নিবিড় টানের
বেদন-ভরা সুখ
মনকে আমার রাখে যেন
নিয়ত উৎসুক।
চাই না তোমায় ধরতে আমি
মোর বাসনায় ঢেকে,
আকাশ থেকেই গান গেয়ে যাও
নয় খাঁচাটার থেকে।

বুয়েনোস এয়ারিস
২২ নভেম্বর, ১৯২৪

চাবি

বিধাতা যেদিন মোর মন
করিলা সৃজন
বহু কক্ষে ভাগ করা হর্ম্যের মতন,
শুধু তার বাহিরের ঘরে
প্রস্তুত রহিল সজ্জা নানামতো অতিথির তরে ;
নীরব নির্জন অন্তঃপুরে
তালা তার বন্ধ করি চাবিখানি ফেলি দিলা দূরে ।
মাঝে মাঝে পান্থ এসে দাঁড়ায়েছে দ্বারে,
বলিয়াছে, "খুলে দাও" । উপায় জানি না খুলিবারে ।
বাহিরে আকাশ তাই ধুলায় আকুল করে হাওয়া ;
সেখানেই যত খেলা, যত মেলা, যত আসাযাওয়া ।

অন্তরের জনহীন পথে
হিমে-ভেজা ঘাসে ঘাসে শেফালিকা লুটায় শরতে ।
আষাঢ়ের আর্দ্রবায়ুভরে
কদম্বকেশরে
চিহ্ন তার পড়ে ঢাকা ।
চৈত্র সে বিচিত্র বর্ণে কুসুমের আলিম্পনে আঁকা ।
সেথায় লাজুক পাখি ছায়াঘন শাখে,
মধ্যাহ্নে করুণ কণ্ঠে উদাসীন প্রেয়সীরে ডাকে ।
সন্ধ্যাতারা দিগন্তের কোণে
শিরীষ পাতার ফাঁকে কান পেতে শোনে
যেন কার পদধ্বনি দক্ষিণ-বাতাসে ।
ঝরাপাতা-বিছানো সে ঘাসে
বাঁশরি বাজাই আমি কুসুম-সুগন্ধি অবকাশে ।

দূরে চেয়ে থাকি একা
মনে করি যদি কভু পাই তার দেখা

যে-পথিক একদিন অজানা সমুদ্র উপকূলে
কুড়ায়ে পেয়েছে চাবি ; বক্ষে নিয়ে তুলে
শুনিতে পেয়েছে যেন অনাদি কালের কোন্ বাণী ;
সেই হতে ফিরিতেছে বিরাম না জানি।
অবশেষে
মৌমাছির পরিচিত এ নিভৃত পথপ্রান্তে এসে
যাত্রা তার হবে অবসান ;
খুলিবে সে গুপ্ত দ্বার কেহ যার পায় নি সন্ধান

বুয়েনোস এয়ারিস
২৬ নভেম্বর, ১৯২৪

বৈতরণী

ওগো বৈতরণী,
তরল খড়্গের মতো ধারা তব, নাই তার ধ্বনি,
নাই তার তরঙ্গভঙ্গিমা ;
নাই রূপ, নাই স্পর্শ, ছন্দে তার নাই কোনো সীমা ;
অমাবস্যা রজনীর
সুপ্তি সুগভীর
মৌনী প্রহরের মতো
নিরাকার পদচারে শূন্যে শূন্যে ধায় অবিরত।
প্রাণের অরণ্যতট হতে
দণ্ড পল খসে খসে পড়ে তব অন্ধকার স্রোতে।
রূপের না থাকে চিহ্ন, নাহি থাকে বর্ণের বর্ণনা,
বাণীর না থাকে এক কণা।

ওগো বৈতরণী,
কতবার খেয়ার তরণী
এসেছিল এই ঘাটে আমার এ বিশ্বের আলোতে।
নিয়ে গেল কালহীন তোমার কালোতে

কত মোর উৎসবের বাতি,
আমার প্রাণের আশা, আমার গানের কত সাথি,
দিবসেরে রিক্ত করি', তিক্ত করি' আমার রাত্রিরে।
সেই হতে চিত্ত মোর নিয়েছে আশ্রয় তব তীরে।

ওগো বৈতরণী,
অদৃষ্টের উপকূলে থেমে গেছে যেথায় ধরণী
সেথায় নির্জনে
দেখি আমি আপনার মনে
তোমার অরূপ-তলে সব রূপ পূর্ণ হয়ে ফুটে,
সব গান দীপ্ত হয়ে উঠে,
শ্রবণের পরপারে
তব নিঃশব্দের কণ্ঠহারে।
যে-সুন্দর বসেছিল মোর পাশে এসে
ক্ষণিকের ক্ষীণ ছদ্মবেশে,
যে চিরমধুর।
দ্রুতপদে চলে গেল নিমেষের বাজায়ে নূপুর,
প্রলয়ের অন্তরালে গাহে তারা অনন্তের সুর।
চোখের জলের মতো
একটি বর্ষণে যারা হয়ে গেছে গত,
চিত্তের নিশীথ রাত্রে গাঁথে তারা নক্ষত্রমালিকা;
অনির্বাণ আলোকেতে সাজায় অক্ষয় দীপালিকা।

বুয়েনোস এয়ারিস
২৭ নভেম্বর, ১৯২৪

প্রভাতী

চপল ভ্রমর, হে কালো কাজল আঁখি,
খনে খনে এসে চলে যাও থাকি থাকি।
হৃদয়কমল টুটিয়া সকল বন্ধ
বাতাসে বাতাসে মেলি দেয় তার গন্ধ,
তোমারে পাঠায় ডাকি,
হে কালো কাজল আঁখি।

যেথায় তাহার গোপন সোনার রেণু
সেথা বাজে তার বেণু;
বলে, এস, এস, লও খুঁজে লও মোরে,
মধুসঞ্চয় দিয়ো না ব্যর্থ করে,
এস এ বক্ষ মাঝে,
কবে হবে দিন আঁধারে বিলীন সাঁঝে।

দেখো চেয়ে কোন্ উতলা পবনবেগে
সুরের আঘাত লেগে
মোর সরোবরে জলতল ছলছলি
এপারে ওপারে করে কী যে বলাবলি,
তরঙ্গ উঠে জেগে।
গিয়েছে আঁধার গোপনে-কাঁদার রাতি,
নিখিল ভুবন হেরো কী আশায় মাতি
আছে অঞ্জলি পাতি।

হেরো গগনের নীল শতদলখানি
মেলিল নীরব বাণী।
অরুণ-পক্ষ প্রসারি সকৌতুকে
সোনার ভ্রমর আসিল তাহার বুকে
কোথা হতে নাহি জানি।

চপল ভ্রমর, হে কালো কাজল আঁখি
এখনো তোমার সময় আসিল না কি ?
মোর রজনীর ভেঙেছে তিমির বাঁধ
পাও নি কি সংবাদ ?
জেগে-ওঠা প্রাণে উথলিছে ব্যাকুলতা,
দিকে দিকে আজি রটে নি কি সে-বারতা ?
শোন নি কী গাহে পাখি ?
হে কালো কাজল আঁখি।

শিশির-শিহরা পল্লব ঝলমল,
বেণুশাখাগুলি থনে থনে টলমল,
অরুপণ বনে ছেয়ে গেল ফুলদল
কিছু না রহিল বাকি।
এল যে আমার মন-বিলাবার বেলা,
খেলিব এবার সব-হারাবার খেলা,
যা-কিছু দেবার রাখিব না আর ঢাকি,
হে কালো কাজল আঁখি।

বুয়েনোস এয়ারিস
১ ডিসেম্বর, ১৯২৪

মধু

মৌমাছির মতো আমি চাহি না ভাণ্ডার ভরিবারে
বসন্তেরে ব্যর্থ করিবারে।
সে তো কভু পায় না সন্ধান
কোথা আছে প্রভাতের পরিপূর্ণ দান।
তাহার শ্রবণ ভরে
আপন গুঞ্জনস্বরে,
হারায় সে নিখিলের গান।

জানে না ফুলের গন্ধে আছে কোন করুণ বিষাদ,
সে জানে তা সংগ্রহের পথের সংবাদ।
চাহে নি সে অরণ্যের পানে,
লতার লাবণ্য নাহি জানে,
পড়ে নি ফুলের বর্ণে বসন্তের মর্মবাণী লেখা।
মধুকণা লক্ষ্য তার, তারি কক্ষ আছে শুধু শেখা।

পাখির মতন মন শুধু উড়িবার সুখ চাহে
উধাও উৎসাহে;
আকাশের বক্ষ হতে ডানা ভরি তার
স্বর্ণ-আলোকের মধু নিতে চায়, নাহি যার ভার,
নাহি যার ক্ষয়,
নাহি যার নিরুদ্ধ সঞ্চয়,
যার বাধা নাই,
যারে পাই তবু নাহি পাই,
যার তরে নহে লোভ, নহে ক্ষোভ, নহে তীক্ষ্ণ রীষ,
নহে শূল, নহে গুপ্ত বিষ।

বুয়েনোস এয়ারিস
৪ ডিসেম্বর, ১৯২৪

তৃতীয়া

কাছের থেকে দেয় না ধরা, দূরের থেকে ডাকে
তিন বছরের প্রিয়া আমার, দুঃখ জানাই কাকে।
কণ্ঠেতে ওর দিয়ে গেছে দখিন-হাওয়ার দান
তিন বসন্তে দোয়েল শ্যামার তিন বছরের গান।
তবু কেন আমারে ওর এতই কৃপণতা,
বারেক ডেকে দৌড়ে পালায়, কইতে না চায় কথা।

তবু ভাবি, যাই কেন হ'ক অদৃষ্ট মোর ভালো,
অমন সুরে ডাকে আমার মানিক আমার আলো।
কপাল মন্দ হলে টানে আরো নিচের তলায়,
হৃদয়টি ওর হ'ক না কঠোর, মিষ্টি তো ওর গলায়।

আলো যেমন চমকে বেড়ায় আমলকীর ঐ গাছে
তিন বছরের প্রিয়া আমার দূরের থেকে নাচে।
লুকিয়ে কখন বিলিয়ে গেছে বনের হিল্লোল
অঙ্গে উহার বেণুশাখার তিন ফাগুনের দোল।
তবু ক্ষণিক হেলাভরে হৃদয় করি লুট
শেষ না হতেই নাচের পালা কোন্‌খানে দেয় ছুট।
আমি ভাবি এই বা কী কম, প্রাণে তো ঢেউ তোলে,
ওর মনেতে যা হয় তা হ'ক আমার তো মন দোলে।
হৃদয় না হয় নাই বা পেলাম মাধুরী পাই নাচে,
ভাবের অভাব রইল না হয়, ছন্দটা তো আছে।

বন্দী হতে চাই যে কোমল ঐ বাহুবন্ধনে,
তিন বছরের প্রিয়ার আমার নাই সে খেয়াল মনে।
সোনার প্রভাত দিয়েছে ওর সর্বদেহ ছুঁয়ে
শিউলি ফুলের তিন শরতের পরশ দিয়ে ধুয়ে
বুঝতে নারি আমার বেলায় কেন টানাটানি।
ক্ষয় নাহি যায় সেই সুধা নয় দিত একটুখানি।
তবু ভাবি বিধি আমায় নিতান্ত নয় বাম,
মাঝে মাঝে দেয় সে দেখা তারি কি কম দাম?
পরশ না পাই, হরষ পাব চোখের চাওয়া চেয়ে,
রূপের ঝোরা বইবে আমার বুকের পাহাড় বেয়ে।

কবি ব'লে লোকসমাজে আছে তো মোর ঠাঁই,
তিন বছরের প্রিয়ার কাছে কবির আদর নাই।
জানে না যে ছন্দে আমার পাতি নাচের ফাঁদ,
দোলার টানে বাঁধন মানে দূর আকাশের চাঁদ।

পলাতকার দল যত সব দখিন-হাওয়ার চেলা
আপনি তারা বশ মেনে যায় আমার গানের বেলা।
ছোট্টো ওরি হৃদয়খানি দেয় না শুধু ধরা,
ঝগড়ু বোকার বরণমালা গাঁথে স্বয়ম্বরা।
যখন দেখি এমন বুদ্ধি, এমন তাহার রুচি,
আমারে ওর পছন্দ নয়, যায় সে লজ্জা ঘুচি।

এমন দিনও আসবে আমার, আছি সে-পথ চেয়ে,
তিন বছরের প্রিয়া হবেন বিশ বছরের মেয়ে।
স্বর্গ-ভোলা পারিজাতের গন্ধখানি এসে
খ্যাপা হাওয়ায় বুকের ভিতর ফিরবে ভেসে ভেসে।
কথায় যারে যায় না ধরা এমন আভাস যত
মর্মরিবে বাদল-রাতের রিমিঝিমির মতো।
সৃষ্টিছাড়া ব্যথা যত, নাই যাহাদের বাসা,
ঘুরে ঘুরে গানের সুরে খুঁজবে আপন ভাষা।
দেখবে তখন ঝগড়ু বোকা কী করতে বা পারে,
শেষকালে সেই আসতে হবেই এই কবিটির দ্বারে।

বুয়েনোস এয়ারিস
৪ ডিসেম্বর, ১৯২৪

অদেখা

আসিবে সে, আজি সেই আশাতে
শোন নি কি, দু-জনাকে
নাম ধরে ঐ ডাকে
নিশিদিন আকাশের ভাষাতে?
সুর বুকে আসে ভাসি,
পথ চেনাবার বাঁশি
বাজে কোন্ ওপারের বাসাতে।

ফুল ফোটে বনতলে
ইশারায় মোরে বলে
"আসিবে সে" ; আছি সেই আশাতে।

এল না তো এখনো সে এল না।
আলো-আঁধারের ঘোরে
যে-ডাক শুনিনু ভোরে,
সে শুধু স্বপন, সে কি ছলনা ?
হায় বেড়ে যায় বেলা,
কবে শুরু হবে খেলা,
সাজায়ে বসিয়া আছি খেলনা,
কিছু ভালো কিছু ভাঙা,
কিছু কালো, কিছু রাঙা,
যারে নিয়ে খেলা সে তো এল না।

আসে নি তো এখনো সে আসে নি।
ভেবেছিনু আসে যদি,
পাড়ি দেব ভরা নদী,
বসে আছি, আজো তরী ভাসে নি।
মিলায় সিঁদুর আলো,
গোধূলি সে হয় কালো,
কোথা সে স্বপন-বন-বাসিনী ?
মালতীর মালাগাছি,
কোলে নিয়ে বসে আছি,
যারে দেব, এখনো সে আসে নি।

এসেছে সে, মন বলে, এসেছে।
সুবাস-আভাসখানি
মনে হয় যেন জানি,
রাতের বাতাসে আজ ভেসেছে।

বুঝিয়াছি অনুভবে
বনমর্মর-রবে
সে তার গোপন হাসি হেসেছে।
অদেখার পরশেতে
আঁধার উঠেছে মেতে,
মন জানে, এসেছে সে এসেছে।

বুয়েনোস এয়ারিস
৭ ডিসেম্বর, ১৯২৪

চঞ্চল

হায় রে তোরে রাখব ধরে,
ভালোবাসা,
মনে ছিল এই দুরাশা।
পাথর দিয়ে ভিত্তি ফেঁদে
বাসা যে তোর দিলেম বেঁধে
এল তুফান সর্বনাশা!
মনে আমার ছিল যে রে
ঘিরব তোরে হাসির ঘেরে ;—
চোখের জলে হল ভাসা।
অনেক দুঃখে গেছে বোঝা
বেঁধে রাখা নয় তো সোজা,
সুখের ভিতে নহে তোমার
অচল বাসা।

এবার আমি সব-ফুরানো
পথের শেষে
বাঁধব বাসা মেঘের দেশে

ক্ষণে ক্ষণে নিত্যনব
বদল ক'রো মূর্তি তব
রঙ-ফেরানো মায়ার বেশে।
কখনো বা জ্যোৎস্নাভরা
কখনো বা বাদলঝরা
খেয়াল তোমার কেঁদে হেসে।
যেই হাওয়াতে হেলাভরে
মিলিয়ে যাবে দিগন্তরে
সেই হাওয়াতেই ফিরে ফিরে
আসবে ভেসে।

কঠিন মাটি বানের জলে
যায় যে বয়ে,
শৈলপাষাণ যায় তো খয়ে।
কালের ঘায়ে সেই তো মরে
অটল বলের গর্বভরে
থাকতে যে চায় অচল হয়ে।
জানে যারা চলার ধারা
নিত্য থাকে নূতন তারা,
হারায় যারা রয়ে রয়ে।
ভালোবাসা, তোমারে তাই
মরণ দিয়ে বরিতে চাই,
চঞ্চলতার লীলা তোমার
রইব সয়ে।

বুয়েনোস এয়ারিস
১০ ডিসেম্বর, ১৯২৪

প্রবাহিণী

দুর্গম দূর শৈলশিরের
    স্তব্ধ তুষার নই তো আমি ;
আপনাহারা ঝরনা-ধারা
    ধূলির ধরায় যাই যে নামি ।
সরোবরের গম্ভীরতায়
    ফেনিল নাচের মাতন ঢালি ;
অচল শিলার ভ্রূ-ভঙ্গিমায়
    বাজাই চপল করতালি ।
মন্দ্র-সুরের মন্ত্র শুনাই
    গভীর গুহার আঁধার তলে,
গহন বনের ভাঙাই ধেয়ান
    উচ্চহাসির কোলাহলে ।
শুভ্র ফেনের কুন্দমালায়
    বিন্ধ্যগিরির বক্ষ সাজাই,
যোগীশ্বরের জটার মধ্যে
    তরঙ্গিণীর নূপুর বাজাই ।
বৃদ্ধ বটের লুব্ধ শিকড়
    আমার বেণী ধরিতে চায় ;
স্বর্ণকিরণ শিশুর মতন
    অঙ্ক আমার ভরিতে চায় ।
নাই কোনো মোর ভয়ভাবনা,
    নাই কোনো মোর অচল রীতি ।
গতি আমার সকল দিকেই,
    শুভ আমার সকল তিথি ।
বক্ষে আমার কালোর ধারা,
    আলোর ধারা আমার চোখে,
স্বর্গে আমার সুর চলে যায়,
    নৃত্য আমার মর্ত্যলোকে ।

অশ্রুহাসির যুগল ধারা
ছোটে আমার ডাইনে বামে।
অচল গানের সাগরমাঝে
চপল গানের যাত্রা থামে।

বুয়েনোস এয়ারিস
১১ ডিসেম্বর, ১৯২৪

আকন্দ

সন্ধ্যা-আলোর সোনার খেয়া পাড়ি যখন দিল গগন-পারে
অকূল অন্ধকারে,
ঝমঝমিয়ে এল রাত্রি ভুবনডাঙার মাঠে
একলা আমি গোয়ালপাড়ার বাটে।
নতুন-কোঁটা গানের কুঁড়ি দেব বলে দিনুর হাতে আনি
মনে নিয়ে সুরের গুনগুনানি
চলেছিলেম, এমন সময় যেন সে কোন্ পল্লীর কণ্ঠখানি
বাতাসেতে বাজিয়ে দিল বিনা ভাষার বাণী,
বললে আমায় "দাঁড়াও ক্ষণেক তরে,
ওগো পথিক তোমার লাগি চেয়ে আছি যুগে যুগান্তরে।
আমায় নেবে চিনে
সেই সুলগন এল এতদিনে।
পথের ধারে দাঁড়িয়ে আমি, মনে গোপন আশা,
কবির ছন্দে বাঁধব আমার বাসা।"
দেখা হল, চেনা হল সাঁঝের আঁধারেতে,
বলে এলেম, "তোমার আসন কাব্যে দেব পেতে।"

সেই কথা আজ পড়ল মনে হঠাৎ হেথায় এসে
সাগরপারের দেশে,—
মন-কেমনের হাওয়ার পাকে অনেক স্মৃতি বেড়ায় মনে ঘুরে'
তারি মধ্যে বাজল করুণ সুরে—

"ভুলো না গো ভুলো না এই পথবাসিনীর কথা,
আজো আমি দাঁড়িয়ে আছি, বাসা আমার কোথা ?"
শপথ আমার, তোমরা ব'লো তারে,
তার কথাটি দাঁড়িয়েছিল মনের পথের ধারে,—
ব'লো তারে চোখের দেখা ফুটেছে আজ গানে,—
লিখনখানি রাখিনু এইখানে ।
আকন্দবল্লভ রবি

যেদিন প্রথম কবি-গান
বসন্তের জাগাল আহ্বান
ছন্দের উৎসবসভাতলে,
সেদিন মালতী যূথী জাতি
কৌতূহলে উঠেছিল মাতি
ছুটে এসেছিল দলে দলে ।
আসিল মল্লিকা চম্পা কুরুবক কাঞ্চন করবী
সুরের বরণমাল্যে সবারে বরিয়া নিল কবি ।
কী সংকোচে এলে না যে, সভার দুয়ার হল বন্ধ ।
সব পিছে রহিলে আকন্দ ।

মোরে তুমি লজ্জা কর নাই,
আমার সম্মান মানি তাই,
আমারে সহজে নিলে ডাকি ।
আপনারে আপনি জানালে ;
উপেক্ষার ছায়ার আড়ালে
পরিচয় রাখিলে না ঢাকি ।
মনে পড়ে একদিন সন্ধ্যাবেলা চলেছিনু একা,
তুমি বুঝি ভেবেছিলে কী জানি না পাই পাছে দেখা,
অদৃশ্য লিখনখানি, তোমার করুণ ভীরু গন্ধ
বায়ুভরে পাঠালে আকন্দ ।

হিয়া মোর উঠিল চমকি
পথমাঝে দাঁড়ানু থমকি,
তোমারে খুঁজিনু চারিধারে।
পল্লবের আবরণ টানি
আছিলে কাব্যের দুয়োরানী
পথপ্রান্তে গোপন আঁধারে।
সঙ্গী যারা ছিল ঘিরে তারা সবে নামগোত্রহীন,
কাড়িতে জানে না তারা পথিকের আঁখি উদাসীন
ভরিল আমার চিত্ত বিস্ময়ের গভীর আনন্দ,
চিনিলাম তোমারে আকন্দ।

দেখা হয় নাই তোমা সনে
প্রাসাদের কুসুমকাননে,
জনতার প্রগল্‌ভ আদরে।
নিদ্রাহীন প্রদীপ-আলোকে
পড় নি অশান্ত মোর চোখে
প্রমোদের মুখর বাসরে।
অবজ্ঞার নির্জনতা তোমারে দিয়েছে কাছে আনি,
সন্ধ্যার প্রথম তারা জানে তাহা, আর আমি জানি।
নিভৃতে লেগেছে প্রাণে তোমার নিঃশ্বাস মৃদু মন্দ,
নম্রহাসি উদাসী আকন্দ।

আকাশের একবিন্দু নীলে
তোমার পরান ডুবাইলে,
শিখে নিলে আনন্দের ভাষা।
বক্ষে তব শুভ্র রেখা এঁকে
আপন স্বাক্ষর গেছে রেখে
রবির সুদূর ভালোবাসা।

দেবতার প্রিয় তুমি, গুপ্ত রাখ গৌরব তোমার,
শান্ত তুমি, তৃপ্ত তুমি, অনাদরে তোমার বিহার।
জেনেছি তোমারে, তাই জানাতে রচিনু এই ছন্দ,
মৌমাছির বন্ধু হে আকন্দ।

চাপাড মালাল
১৬ ডিসেম্বর, ১৯২৪

কঙ্কাল

পশুর কঙ্কাল ওই মাঠের পথের একপাশে
পড়ে আছে ঘাসে,
যে-ঘাস একদা তারে দিয়েছিল বল,
দিয়েছিল বিশ্রাম কোমল।

পড়ে আছে পাণ্ডু অস্থিরাশি,
কালের নীরস অট্টহাসি।
সে যেন রে মরণের অঙ্গুলিনির্দেশ,
ইঙ্গিতে কহিছে মোরে, একদা পশুর যেথা শেষ,
সেথায় তোমারো অন্ত, ভেদ নাহি লেশ।
তোমারো প্রাণের সুরা ফুরাইলে পরে
ভাঙা পাত্র পড়ে রবে অমনি ধুলায় অনাদরে।

আমি বলিলাম, মৃত্যু, করি না বিশ্বাস
তব শূন্যতার উপহাস।
মোর নহে শুধুমাত্র প্রাণ
সর্ব বিত্ত রিক্ত করি যার হয় যাত্রা অবসান;
যাহা ফুরাইলে দিন
শূন্য অস্থি দিয়ে শোধে আহারনিদ্রার শেষ ঋণ।

ভেবেছি জেনেছি যাহা, বলেছি, শুনেছি যাহা কানে,
সহসা গেয়েছি যাহা গানে
ধরে নি তা মরণের বেড়া-ঘেরা প্রাণে ;
যা পেয়েছি, যা করেছি দান
মর্ত্যে তার কোথা পরিমাণ ?

আমার মনের নৃত্য, কতবার জীবন-মৃত্যুরে
লঙ্ঘিয়া চলিয়া গেছে চিরসুন্দরের সুরপুরে।
চিরকাল তরে সে কি থেমে যাবে শেষে
কঙ্কালের সীমানায় এসে ?
যে আমার সত্য পরিচয়
মাংসে তার পরিমাপ নয় ;
পদাঘাতে জীর্ণ তারে নাহি করে দণ্ডপলগুলি,
সর্বস্বান্ত নাহি করে পথপ্রান্তে ধূলি।

আমি যে রূপের পদ্মে করেছি অরূপ-মধু পান,
দুঃখের বক্ষের মাঝে আনন্দের পেয়েছি সন্ধান,
অনন্ত মৌনের বাণী শুনেছি অন্তরে,
দেখেছি জ্যোতির পথ শূন্যময় আঁধার প্রান্তরে
নহি আমি বিধির বৃহৎ পরিহাস,
অসীম ঐশ্বর্য দিয়ে রচিত মহৎ সর্বনাশ।

চাপাড মালাল
১৭ ডিসেম্বর, ১৯২৪

চিঠি

শ্রীমান দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর কল্যাণীয়েষু,

দূর প্রবাসে সন্ধ্যাবেলায় বাসায় ফিরে এনু,
হঠাৎ যেন বাজল কোথায় ফুলের বুকের বেণু।
আতি-পাতি খুঁজে শেষে বুঝি ব্যাপারখানা,
বাগানে সেই জুঁই ফুটেছে চিরদিনের জানা।
গন্ধটি তার পুরোপুরি বাংলাদেশের বাণী,
একটুও তো দেয় না আভাস এই দেশী ইস্পানি
প্রকাশ্যে তার থাক্ না যতই সাদা মুখের ঢঙ।
কোমলতায় লুকিয়ে রাখে শ্যামল বুকের রঙ।
হেথায় মুখর ফুলের হাটে আছে কি তার দাম?
চারু কণ্ঠে ঠাঁই নাহি তার, ধুলায় পরিণাম।

যূথী বলে, "আতিথ্য লও, একটুখানি বসো।"
আমি বলি চমকে উঠে, আরে রসো, রসো;
জিতবে গন্ধ হারবে কি গান?   নৈব কদাচিৎ।
তাড়াতাড়ি গান রচিলাম; জানিনে কার জিৎ।
তিনটে সাগর পাড়ি দিয়ে একদা এই গান,
অবশেষে বোলপুরে সে হবে বিদ্যমান।
এই বিরহীর কথা স্মরি গেয়ো সেদিন, দিনু,
জুঁইবাগানের আরেক দিনের গান যা রচেছিনু।
ঘরের খবর পাই নে কিছুই, গুজোব শুনি নাকি
কুলিশপাণি পুলিস সেথায় লাগায় হাঁকাহাঁকি।
শুনছি নাকি বাংলাদেশের গান হাসি সব ঠেলে
কুলুপ দিয়ে করছে আটক আলিপুরের জেলে।
হিমালয়ে যোগীশ্বরের রোষের কথা জানি,
অনঙ্গেরে জ্বালিয়েছিলেন চোখের আগুন হানি।
এবার নাকি সেই ভূধরে কলির ভূদেব যারা
বাংলাদেশের যৌবনেরে জ্বালিয়ে করবে সারা।
সিমলে নাকি দারুণ গরম, শুনছি দার্জিলিঙে
নকল শিবের তাণ্ডবে আজ পুলিস বাজায় শিঙে।

জানি তুমি বলবে আমায়, থামো একটুখানি,
বেণুবীণার লগ্ন এ নয়, শিকল ঝমঝমানি।
শুনে আমি রাগব মনে, ক'রো না সেই ভয়,
সময় আমার আছে বলেই এখন সময় নয়।
যাদের নিয়ে কাণ্ড আমার তারা তো নয় ফাঁকি,
গিলটি-করা তকমা ঝোলা নয় তাহাদের খাকি।
কপাল জুড়ে নেই তো তাদের পালোয়ানের টিকা,
তাদের তিলক নিত্যকালের সোনার রঙে লিখা।
যেদিন তবে সাঙ্গ হবে পালোয়ানির পালা,
সেদিনো তো সাজাবে যূঁই দেবার্চনার থালা।
সেই থালাতে আপন ভাইয়ের রক্ত ছিটোয় যারা,
লড়বে তারাই চিরটা কাল? গড়বে পাষাণ-কারা?
রাজপ্রতাপের দম্ভ সে তো এক দমকের বায়ু,
সবুর করতে পারে এমন নাই তো তাহার আয়ু।
ধৈর্য বীর্য ক্ষমা দয়া ন্যায়ের বেড়া টুটে
লোভের ক্ষোভের ক্রোধের তাড়ায় বেড়ায় ছুটে ছুটে।
আজ আছে কাল নাই বলে তাই তাড়াতাড়ির তালে
কড়া মেজাজ দাপিয়ে বেড়ায় বাড়াবাড়ির চালে।
পাকা রাস্তা বানিয়ে বসে দুঃখীর বুক জুড়ি
ভগবানের ব্যথার 'পরে হাঁকায় সে চার-ঘুড়ি।
তাই তো প্রেমের মাল্য গাথার নাইকো অবকাশ,
হাতকড়ারই কড়াকড়ি, দড়াদড়ির ফাঁস।
শান্ত হবার সাধনা কই, চলে কলের রথে,
সংক্ষেপে তাই শান্তি খোঁজে উলটো-দিকের পথে।
জানে সেথায় বিধির নিষেধ, তর সহে না তবু,
ধর্মেরে যায় ঠেলা মেরে গায়ের-জোরের প্রভু।
রক্ত-রঙের ফসল ফলে তাড়াতাড়ির বীজে,
বিনাশ তারে আপন গোলায় বোঝাই করে নিজে।
বাহুর দম্ভ, রাহুর মতো, একটু সময় পেলে
নিত্যকালের সূর্যকে সে এক-গরাসে গেলে।
নিমেষ পরেই উগরে দিয়ে মেলায় ছায়ার মতো,
সূর্যদেবের গায়ে কোথাও রয় না কোনো ক্ষত।
বারে বারে সহস্রবার হয়েছে এই খেলা,
নতুন রাহু ভাবে তবু হবে না মোর বেলা।

কাণ্ড দেখে পশুপক্ষী ফুকরে ওঠে ভয়ে,
অনন্ত দেব শান্ত থাকেন ক্ষণিক অপচয়ে।

টুটল কত বিজয় তোরণ, লুটল প্রাসাদ চুড়ো,
কত রাজার কত গারদ ধুলোয় হ'লো গুঁড়ো।
আলিপুরের জেলখানাও মিলিয়ে যাবে যবে
তখনো এই বিশ্ব দুলাল ফুলের সবুর সবে।
রঙিন কুর্তি, সঙিন মূর্তি রইবে না কিচ্ছুই,
তখনো এই বনের কোণে ফুটবে লাজুক জুঁই।
ভাঙবে শিকল টুকরো হয়ে ছিঁড়বে রাঙা পাগ,
চূর্ণ করা দর্পে মরণ খেলবে হোলির ফাগ।
পাগলা আইন লোক হাসাবে কালের প্রহসনে,
মধুর আমার বঁধু রবেন কাব্য-সিংহাসনে।
সময়েরে ছিনিয়ে নিলেই হয় সে অসময়,
ক্রুদ্ধ প্রভুর সয় না সবুর, প্রেমের সবুর সয়।
প্রতাপ যখন চেঁচিয়ে করে দুঃখ দেবার বড়াই,
জেনো মনে, তখন তাহার বিধির সঙ্গে লড়াই।
দুঃখ সহার তপস্যাতেই হ'ক বাঙালির জয়,
ভয়কে যারা মানে তারাই জাগিয়ে রাখে ভয়।
মৃত্যুকে যে এড়িয়ে চলে মৃত্যু তারেই টানে,
মৃত্যু যারা বুক পেতে লয় বাঁচতে তারাই জানে।
পালোয়ানের চেলারা সব ওঠে যেদিন খেপে,
ফোঁসে সর্প হিংসা-দর্প সকল পৃথ্বী ব্যেপে,
বীভৎস তার ক্ষুধার জ্বালায় জাগে দানব ভায়া,
গর্জি বলে আমিই সত্য; দেবতা মিথ্যা মায়া;
সেদিন যেন কৃপা আমায় করেন ভগবান,
মেশীন-গান-এর সম্মুখে গাই জুঁই ফুলের এই গান;

স্বপ্নসম পরবাসে এলি পাশে কোথা হতে তুই,
ও আমার জুঁই।
অজানা ভাষার দেশে
সহসা বলিলি এসে,
"আমারে চেন কি?"

তোর পানে চেয়ে চেয়ে
হৃদয় উঠিল গেয়ে,
চিনি, চিনি, সখী।
কত প্রাতে জানায়েছে চিরপরিচিত তোর হাসি,
"আমি ভালোবাসি।"

বিরহব্যথার মতো এলি প্রাণে কোথা হতে তুই,
ও আমার জুঁই।
আজ তাই পড়ে মনে
বাদল-সাঁঝের বনে
ঝর ঝর ধারা,
মাঠে মাঠে ভিজে হাওয়া
যেন কী স্বপনে-পাওয়া,
ঘুরে ঘুরে সারা।
সজল তিমির-তলে তোর গন্ধ বলেছে নিঃশ্বাসি',
"আমি ভালোবাসি।"

মিলন-সুখের মতো কোথা হতে এসেছিস তুই,
ও আমার জুঁই।
মনে পড়ে কত রাতে
দীপ জ্বলে জানালাতে
বাতাসে চঞ্চল।
মাধুরী ধরে না প্রাণে,
কী বেদনা বক্ষে আনে,
চক্ষে আনে জল।
সে-রাতে তোমার মালা বলেছে মর্মের কাছে আসি',
"আমি ভালোবাসি।"

অসীম কালের যেন দীর্ঘশ্বাস বহেছিস তুই,
ও আমার জুঁই।

বক্ষে এনেছিস কার
যুগযুগান্তের ভার,
ব্যর্থ পথ-চাওয়া ;
বারে বারে দ্বারে এসে
কোন্ নীরবের দেশে
ফিরে ফিরে যাওয়া ?
তোর মাঝে কেঁদে বাজে চিরপ্রত্যাশার কোন্ বাঁশি
"আমি ভালোবাসি ।"

বুয়েনোস এয়ারিস
২০ ডিসেম্বর, ১৯২৪

বিরহিণী

তিন বছরের বিরহিণী জানলাখানি ধরে
কোন্ অলক্ষ্য তারার পানে তাকাও অমন করে ?
অতীত কালের বোঝার তলায় আমরা চাপা থাকি,
ভাবী কালের প্রদোষ-আলোয় মগ্ন তোমার আঁখি ।
তাই তোমার ঐ কাঁদন-হাসির সবটা বুঝি না যে,
স্বপন দেখে অনাগত তোমার প্রাণের মাঝে ।
কোন্ সাগরের তীর দেখেছ জানে না তো কেউ,
হাসির আভায় নাচে সে কোন্ সুদূর অশ্রু-ঢেউ ।
সেখানে কোন্ রাজপুত্তুর চিরদিনের দেশে
তোমার লাগি সাজতে গেছে প্রতিদিনের বেশে ।
সেখানে সে বাজায় বাঁশি রূপকথারি ছায়ে,
সেই রাগিণীর তালে তোমার নাচন লাগে গায়ে ।
আপনি তুমি জান না তো আছ কাহার আশায়,
অনামারে ডাক দিয়েছ চোখের নীরব ভাষায় ।

হয়তো সে কোন্ সকালবেলা শিশির-ঝরা পথে
জাগরণের কেতন তুলে আসবে সোনার রথে,
কিম্বা পূর্ণ চাঁদের লগ্নে, বৃহস্পতির দশায় ;—
দুঃখ আমার, আর সে যে হ'ক, নয় সে দাদামশায়।

বুয়েনোস এয়ারিস
২০ ডিসেম্বর, ১৯২৪

না-পাওয়া

ওগো মোর না-পাওয়া গো, ভোরের অরুণ-আভাসনে
ঘুমে ছুঁয়ে যাও মোর পাওয়ার পাখিরে ক্ষণে ক্ষণে।
সহসা স্বপন টুটে'
তাই সে যে গেয়ে উঠে,
কিছু তার বুঝি নাহি বুঝি।
তাই সে যে পাখা মেলে
উড়ে যায় ঘর ফেলে,
ফিরে আসে কারে খুঁজি খুঁজি।

ওগো মোর না-পাওয়া গো, সায়াহ্নের করুণ কিরণে
পূরবীতে ডাক দাও আমার পাওয়ারে ক্ষণে ক্ষণে।
হিয়া তাই ওঠে কেঁদে,
রাখিতে পারি না বেঁধে,
অকারণে দূরে থাকে চেয়ে,—
মলিন আকাশতলে
যেন কোন্ খেয়া চলে,
কে যে যায় সারি গান গেয়ে।

ওগো মোর না-পাওয়া গো, বসন্তনিশীথ-সমীরণে
অভিসারে আসিতেছ আমার পাওয়ার কুঞ্জবনে।
কে জানাল সে-কথা যে
গোপন হৃদয়মাঝে
আজো তাহা বুঝিতে পারি নি
মনে হয় পলে পলে
দূর পথে বেজে চলে
ঝিল্লি-রবে তাহার কিঙ্কিণী॥

ওগো মোর না-পাওয়া গো, কখন আসিয়া সংগোপনে
আমার পাওয়ার বীণা কাঁপাও অঙ্গুলিপরশনে।
কার গানে কার সুর
মিলে গেছে সুমধুর
ভাগ করে কে লইবে চিনে।
ওরা এসে বলে, এ কী,
বুঝাইয়া বলো দেখি।
আমি বলি, বুঝাতে পারি নে।

ওগো মোর না-পাওয়া গো, শ্রাবণের অশান্ত পবনে
কদম্ববনের গন্ধে জড়িত বৃষ্টির বরিষণে
আমার পাওয়ার কানে
জানি নে তো মোর গানে
কার কথা বলি আমি কারে।
"কী কহ," সে যবে পুছে
তখন সন্দেহ ঘুচে,
আমার বন্দনা না-পাওয়ারে।

বুয়েনোস এয়ারিস
২৪ ডিসেম্বর, ১৯২৪

সৃষ্টিকর্তা

জানি আমি মোর কাব্য ভালোবেসেছেন মোর বিধি,
ফিরে যে পেলেন তিনি দ্বিগুণ আপন-দেওয়া নিধি।
তাঁর বসন্তের ফুল বাতাসে কেমন বলে বাণী
সে যে তিনি মোর গানে বারম্বার নিয়েছেন জানি।
আমি শুনায়েছি তাঁরে, শ্রাবণরাত্রির বৃষ্টিধারা
কী অনাদি বিচ্ছেদের জাগায় বেদন সঙ্গীহারা।
যেদিন পূর্ণিমা রাতে পুষ্পিত শালের বনে বনে
শরীরী ছায়ার মতো একা ফিরি আপনার মনে
গুঞ্জরিয়া অসমাপ্ত সুর, শালের মঞ্জরী যত
কী যেন শুনিতে চাহে ব্যগ্রতায় করি' শির নত,
ছায়াতে তিনিও সাথে ফেরেন নিঃশব্দ পদচারে,
বাঁশির উত্তর তাঁর আমার বাঁশিতে শুনিবারে।
যেদিন প্রিয়ার কালো চক্ষুর সজল করুণায়
রাত্রির প্রহরমাঝে অন্ধকারে নিবিড় ঘনায়
নিঃশব্দ বেদনা, তার দুটি হাতে মোর হাত রাখি'
স্তিমিত প্রদীপালোকে মুখে তার স্তব্ধ চেয়ে থাকি,
তখন আঁধারে বসি' আকাশের তারকার মাঝে
অপেক্ষা করেন তিনি, শুনিতে কখন বীণা বাজে
যে-সুরে আপনি তিনি উন্মাদিনী অভিসারিণীরে
ডাকিছেন সর্বহারা মিলনের প্রলয়তিমিরে।

বুয়েনোস এয়ারিস
২৫ ডিসেম্বর, ১৯২৪

বীণা-হারা

যবে এসে নাড়া দিলে দ্বার
চমকি উঠিনু লাজে,
খুঁজে দেখি গৃহমাঝে
বীণা ফেলে এসেছি আমার,
ওগো বীনকার।
সেদিন মেঘের ভারে
নদীর পশ্চিম পারে
ঘন হল দিগন্তের ভুরু,
বৃষ্টির নাচনে মাতা,
বনে মর্মরিল পাতা,
দেয়া গরজিল গুরু গুরু।
ভরা হল আয়োজন,
ভাবিনু ভরিবে মন
বক্ষে জেগে উঠিবে মল্লার,
হায়, লাগিল না সুর
কোথায় সে বহুদূর
বীণা ফেলে এসেছি আমার।

কণ্ঠে নিয়ে এলে পুষ্পহার।
পুরস্কার পাব আশে
খুঁজে দেখি চারিপাশে
বীণা ফেলে এসেছি আমার,
ওগো বীনকার।
প্রবাসে বনের ছায়ে
সহসা আমার গায়ে
ফাল্গুনের ছোঁয়া লাগে একী ?

এপারের যত পাখি
সবাই কহিল ডাকি'
ওপারের গান গাও দেখি।
ভাবিলাম মোর ছন্দে
মিলাব ফুলের গন্ধে
আনন্দের বসন্তবাহার।
খুঁজিয়া দেখিনু বুকে,
কহিলাম নতমুখে,
"বীণা ফেলে এসেছি আমার।"

এল বুঝি মিলনের বার
আকাশ ভরিল ওই ;
শুধাইলে, "সুর কই ?"
বীণা ফেলে এসেছি আমার
ওগো বীনকার।
অস্তরবি গোধূলিতে
বলে গেল পূরবীতে
আর তো অধিক নাই দেরি।
রাঙা আলোকের জবা
সাজিয়ে তুলেছে সভা,
সিংহদ্বারে বাজিয়াছে ভেরি।
সুদূর আকাশতলে
ধ্রুবতারা ডেকে বলে,
"তারে তারে জাগাও ঝংকার।"
কানাড়াতে সাহানাতে
জাগিতে হবে যে রাতে,—
বীণা ফেলে এসেছি আমার।

এলে নিয়ে শিখা বেদনার।
গানে যে বরিব তা'রে,—
চাহিলাম চারিধারে,—
বীণা ফেলে এসেছি আমার,
ওগো বীনকার।
কাজ হয়ে গেছে সারা,
নিশীথে উঠেছে তারা,
মিলে গেছে বাটে আর মাঠে।
দীপহীন বাঁধা তরী
সারা দীর্ঘ রাত ধরি'
ছুলিয়া ছুলিয়া ওঠে ঘাটে।
যে-শিখা গিয়েছে নিবে
অগ্নি দিয়ে জ্বেলে দিবে
সে-আলোতে হতে হবে পার।
শুনেছি গানের তালে
সুবাতাস লাগে পালে ;
বীণা ফেলে এসেছি আমার।

সান ইসিড্রো
২৭ ডিসেম্বর, ১৯২৪

বনস্পতি

পূর্ণতার সাধনায় বনস্পতি চাহে উর্ধ্বপানে ;
পুঞ্জ পুঞ্জ পল্লবে পল্লবে
নিত্য তার সাড়া জাগে বিরাটের নিঃশব্দ আহ্বানে,
মন্ত্র জপে মর্মরিত রবে।
ধ্রুবত্বের মূর্তি সে যে, দৃঢ়তা শাখায় প্রশাখায়
বিপুল প্রাণের বহে ভার।
তবু তার শ্যামলতা কম্পমান ভীরু বেদনায়
আন্দোলিয়া উঠে বারম্বার।

দয়া ক'রো, দয়া ক'রো, আরণ্যক এই তপস্বীরে,
ধৈর্য ধরো, ওগো দিগঙ্গনা,
ব্যর্থ করিবারে তার অশান্ত আবেগে ফিরে ফিরে
বনের অঙ্গনে মাতিয়ো না।
এ কী তীব্র প্রেম, এ যে শিলাবৃষ্টি নির্মম দুঃসহ,—
দুরন্ত চুম্বন-বেগে তব
ছিঁড়িতে ঝরাতে চাও অন্ধ সুখে, কহ মোরে কহ,
কিশোর কোরক নব নব॥

অকস্মাৎ দস্যুতায় তারে রিক্ত করি নিতে চাও
সর্বস্ব তাহার তব সাথে?
ছিন্ন করি লবে যাহা চিহ্ন তার রবে না কোথাও,
হবে তারে মুহূর্তে হারাতে।
যে লুব্ধ ধূলির তলে লুকাতে চাহিবে তব লাভ
সে তোমারে ফাঁকি দেবে শেষে।
লুণ্ঠনের ধন লুঠি সর্বগ্রাসী দারুণ অভাব
উঠিবে কঠিন হাসি হেসে॥

আসুক তোমার প্রেম দীপ্তিরূপে নীলাম্বরতলে,
শান্তিরূপে এস দিগঙ্গনা।
উঠুক স্পন্দিত হয়ে শাখে শাখে পল্লবে বল্কলে
সুগম্ভীর তোমার বন্দনা।
দাও তারে সেই তেজ মহত্ত্বে যাহার সমাধান,
সার্থক হ'ক সে বনস্পতি।
বিশ্বের অঞ্জলি যেন ভরিয়া করিতে পারে দান
তপস্যার পূর্ণ পরিণতি।

উঠুক তোমার প্রেম রূপ ধরি তার সর্বমাঝে
নিত্য নব পত্রে ফলে ফুলে।
গোপনে আঁধারে তার যে অনন্ত নিয়ত বিরাজে
আবরণ দাও তার খুলে।

তাহার গৌরবে নহ তোমারি স্পর্শের পরিচয়,
আপনার চরম বারতা।
তারি লাভে লাভ করো বিনা লোভে সম্পদ অক্ষয়,
তারি ফলে তব সফলতা।

সান ইসিড্রো
২৮ ডিসেম্বর, ১৯২৪

পথ

আমি পথ, দূরে দূরে দেশে দেশে ফিরে ফিরে শেষে
দুয়ার-বাহিরে থামি এসে
ভিতরেতে গাঁথা চলে নানা সূত্রে রচনার ধারা,
আমি পাই ক্ষণে ক্ষণে তারি ছিন্ন অংশ অর্থহারা,
সেথা হতে লেখে মোর ধূলিপটে দীপরশ্মিরেখা
অসম্পূর্ণ লেখা।

জীবনের সৌধমাঝে কত কক্ষ কত না মহলা,
তলার উপরে কত তলা।
আজন্মবিধবা তারি এক প্রান্তে রয়েছি একাকী,
সবার নিকটে থেকে তবুও অসীম-দূরে থাকি,
লক্ষ্য নহি, উপলক্ষ্য, দেশ নহি আমি যে উদ্দেশ,
মোর নাহি শেষ।

উৎসবসভায় যেতে যে পায় আহ্বান-পত্রখানি
তাহারে বহন করে আনি।
সে-লিপির খণ্ডগুলি মোর বক্ষে উড়ে এসে পড়ে,
ধুলায় করিয়া লুপ্ত তাদের উড়ায়ে দিই ঝড়ে,
আমি মালা গেঁথে চলি শত শত জীর্ণ শতাব্দীর
বহু বিস্মৃতির।

কেহ যারে নাহি শোনে, সবাই যাহারে বলে, "জানি",
আমি সেই পুরাতন বাণী।
বণিকের পণ্যযান, হে তুমি রাজার জয়রথ,
আমি চলিবার পথ, সেই আমি ভুলিবার পথ,
তীব্র-দুঃখ মহা-দম্ভ, চিহ্ন মুছে গিয়েছে সবাই
কিছু নাই, নাই।

কভু সুখে, কভু দুঃখে নিয়ে চলি ; সুদিন দুর্দিন
নাহি বুঝি আমি উদাসীন।
বারবার কচি ঘাস কোথা হতে আসে মোর কোলে,
চলে যায়,—সে-ও যায় যে যায় তাহারে দ'লে দ'লে,
বিচিত্রের প্রয়োজনে অবিচিত্র আমি শূন্যময়,
কিছু নাহি রয়।

বসিতে না চাহে কেহ, কাহারো কিছু না সহে দেরি,
কারো নই, তাই সকলেরি।
বামে মোর শস্যক্ষেত্র দক্ষিণে আমার লোকালয়,
প্রাণ সেথা দুই হস্তে বর্তমান আঁকড়িয়া রয়।
আমি সর্ববন্ধহীন নিত্য চলি তারি মধ্যখানে,
ভবিষ্যের পানে।

তাই আমি চির-রিক্ত কিছু নাহি থাকে মোর পুঁজি,
কিছু নাহি পাই, নাহি খুঁজি।
আমারে ভুলিবে ব'লে যাত্রীদল গান গাহে সুরে,
পারি নে রাখিতে তাহা, সে-গান চলিয়া যায় দূরে।
বসন্ত আমার বুকে আসে যবে ধুলায় আকুল,
নাহি দেয় ফুল।

পৌঁছিয়া ক্ষতির প্রান্তে বিত্তহীন একদিন শেষে
শয্যা পাতে মোর পাশে এসে।

পান্থের পাথেয় হতে খসে পড়ে যাহা ভাঙাচোরা,
ধূলিরে বঞ্চনা করি কাড়িয়া তুলিয়া লয় ওরা ;
আমি রিক্ত, ওরা রিক্ত, মোর ’পরে নাই প্রীতিলেশ,
মোরে করে দ্বেষ।

শুধু শিশু বোঝে মোরে, আমারে সে জানে ছুটি ব’লে,
ঘর ছেড়ে আসে তাই চলে।
নিষেধ বা অনুমতি মোর মাঝে না দেয় পাহারা,
আবশ্যকে নাহি রচে বিবিধের বস্তুময় কারা,
বিধাতার মতো শিশু লীলা দিয়ে শূন্য দেয় ভরে
শিশু বোঝে মোরে।

বিলুপ্তির ধূলি দিয়ে যাহা খুশি সৃষ্টি করে তাই,
এই আছে এই তারা নাই।
ভিত্তিহীন ঘর বেঁধে আনন্দে কাটায়ে দেয় বেলা
মূল্য যার কিছু নাই তাই দিয়ে মূল্যহীন খেলা,
ভাঙাগড়া দুই নিয়ে নৃত্য তার অখণ্ড উল্লাসে,
মোরে ভালোবাসে।

সান ইসিড্রো
২৯ ডিসেম্বর, ১৯২৪

মিলন

জীবন-মরণের স্রোতের ধারা
যেখানে এসে গেছে থামি
সেখানে মিলেছিনু সময়হারা
একদা তুমি আর আমি।
চলেছি আজ একা ভেসে
কোথা যে কত দূর দেশে,

তরণী দুলিতেছে ঝড়ে ;—
এখন কেন মনে পড়ে
যেখানে ধরণীর সীমার শেষে
স্বর্গ আসিয়াছে নামি
সেখানে একদিন মিলেছি এসে
কেবল তুমি আর আমি।

সেখানে বসেছিনু আপন-ভোলা
আমরা দোঁহে পাশে পাশে।
সেদিন বুঝেছিনু কিসের দোলা
দুলিয়া উঠে ঘাসে ঘাসে।
কিসের খুশি উঠে কেঁপে
নিখিল চরাচর ব্যেপে,
কেমনে আলোকের জয়
আঁধারে হল তারাময় ;
প্রাণের নিশ্বাস কী মহাবেগে
ছুটেছে দশদিক্‌গামী,
সেদিন বুঝেছিনু যেদিন জেগে
চাহিনু তুমি আর আমি।

বিজনে বসেছিনু আকাশ চাহি
তোমার হাত নিয়ে হাতে
দোঁহার কারো মুখে কথাটি নাহি,
নিমেষ নাহি আঁখিপাতে।
সেদিন বুঝেছিনু প্রাণে
ভাষার সীমা কোন্‌খানে,
বিশ্ব-হৃদয়ের মাঝে
বাণীর বীণা কোথা বাজে,

কিসের বেদনা সে বনের বুকে
কুসুমে ফোটে দিনযামী,
বুঝিনু, যবে দোঁহে ব্যাকুল সুখে
কাঁদিনু তুমি আর আমি।

বুঝিনু কী আগুনে ফাগুন হাওয়া
গোপনে আপনারে দাহে ;—
কেন-যে অরুণের করুণ চাওয়া
নিজেরে মিলাইতে চাহে ;
অকূলে হারাইতে নদী
কেন যে ধায় নিরবধি ;
বিজুলি আপনায় বাণে
কেন যে আপনারে হানে ;
রজনী কী খেলা যে প্রভাত সনে
খেলিছে পরাজয়কামী,
বুঝিনু যবে দোঁহে পরান-পণে
খেলিনু তুমি আর আমি।

জুলিয়ো চেজারে জাহাজ
৯ জানুয়ারি, ১৯২৫

অন্ধকার

উদয়াস্ত দুই তটে অবিচ্ছিন্ন আসন তোমার,
নিগূঢ় সুন্দর অন্ধকার।
প্রভাত-আলোকচ্ছটা শুভ্র তব আদি শঙ্খধ্বনি
চিত্তের কন্দরে মোর বেজেছিল, একদা যেমনি
নূতন চেয়েছি আঁখি তুলি ;
সে তব সংকেত-মন্ত্র ধ্বনিয়াছে, হে মৌনী মহান,
কর্মের তরঙ্গে মোর ; স্বপ্ন-উৎস হতে মোর গান
উঠেছে ব্যাকুলি।

নিস্তব্ধের সে আহ্বানে, বাহিয়া জীবনযাত্রা মম,
—সিন্ধুগামী তরঙ্গিণীসম—
এতকাল চলেছিনু তোমারি সুদূর অভিসারে
বঙ্কিম জটিল পথে সুখে দুঃখে বন্ধুর সংসারে
অনির্দেশ অলক্ষ্যের পানে।
কভু পথতরুচ্ছায়ে খেলাঘর করেছি রচনা,
শেষ না হইতে খেলা চলিয়া এসেছি অন্যমনা
অশেষের টানে।

আজি মোর ক্লান্তি ঘেরি দিবসের অন্তিম প্রহর
গোধূলির ছায়ায় ধূসর।
হে গম্ভীর, আসিয়াছি তোমার সোনার সিংহদ্বারে
যেখানে দিনান্তরবি আপন চরম নমস্কারে
তোমার চরণে নত হল।
যেথা রিক্ত নিঃস্ব দিবা প্রাচীন ভিক্ষুর জীর্ণবেশে
নূতন প্রাণের লাগি তোমার প্রাঙ্গণতলে এসে
বলে "দ্বার খোলো"।

দিনের আড়ালে থেকে কী চেয়েছি পাই নি উদ্দেশ,
আজ সে-সন্ধান হ'ক শেষ।
হে চিরনির্মল, তব শান্তি দিয়ে স্পর্শ করো চোখ,
দৃষ্টির সম্মুখে মম এইবার নির্বারিত হ'ক
আঁধারের আলোকভাণ্ডার।
নিয়ে যাও সেইখানে নিঃশব্দের গূঢ় গুহা হতে
যেখানে বিশ্বের কণ্ঠে নিঃসরিছে চিরন্তন স্রোতে
সংগীত তোমার।

দিনের সংগ্রহ হতে আজি কোন্ অর্ঘ্য নিয়ে যাই
তোমার মন্দিরে ভাবি তাই।
কত না শ্রেষ্ঠীর হাতে পেয়েছি কীর্তির পুরস্কার,
সযত্নে এসেছি বহে সেই সব রত্ন-অলংকার,

ফিরিয়াছি দেশ হতে দেশে।
শেষে আজ চেয়ে দেখি, যবে মোর যাত্রা হল সারা,
দিনের আলোর সাথে ম্লান হয়ে এসেছে তাহারা
তব দ্বারে এসে।

রাত্রির নিকষে হায় কত সোনা হয়ে যায় মিছে,
সে-বোঝা ফেলিয়া যাব পিছে।
কিছু বাকি আছে তবু, প্রাতে মোর যাত্রাসহচরী
অকারণে দিয়েছিল মোর হাতে মাধবীমঞ্জরী,
আজো তাহা অম্লান বিরাজে।
শিশিরের ছোঁয়া যেন এখনো রয়েছে তার গায়,
এ জন্মের সেই দান রেখে দেব তোমার থালায়
নক্ষত্রের মাঝে।

হে নিত্য নবীন, কবে তোমারি গোপন কক্ষ হতে
পাড়ি দিল এ ফুল আলোতে।
সুপ্তি হতে জেগে দেখি, বসন্তে একদা রাত্রিশেষে
অরুণকিরণ সাথে এ মাধুরী আসিয়াছে ভেসে
হৃদয়ের বিজন পুলিনে।
দিবসের ধুলা এরে কিছুতে পারে নি কাড়িবারে,
সেই তব নিজ দান বহিয়া আনিনু তব দ্বারে,
তুমি লও চিনে।

হে চরম, এরি গন্ধে তোমারি আনন্দ এল মিশে,
বুঝেও তখন বুঝি নি সে।
তব লিপি বর্ণে বর্ণে লেখা ছিল এরি পাতে পাতে,
তাই নিয়ে গোপনে সে এসেছিল তোমারে চিনাতে,
কিছু যেন জেনেছি আভাসে।
আজিকে সন্ধ্যায় যবে সব শব্দ হল অবসান
আমার ধেয়ান হতে জাগিয়া উঠিছে এরি গান
তোমার আকাশে।

জুলিয়ো চেজারে জাহাজ
১০ জানুয়ারি, ১৯২৫

প্রাণগঙ্গা

প্রতিদিন নদীস্রোতে পুষ্পপত্র করি অর্ঘ্য দান
পূজারির পূজা অবসান।
আমিও তেমনি যত্নে মোর ডালি ভরি
গানের অঞ্জলি দান করি
প্রাণের জাহ্নবী-জলধারে,
পূজি আমি তারে।

বিগলিত প্রেমের আনন্দবারি সে যে,
এসেছে বৈকুণ্ঠধাম ত্যেজে।
মৃত্যুঞ্জয় শিবের অসীম জটাজালে
ঘুরে ঘুরে কালে কালে
তপস্যার তাপ লেগে প্রবাহ পবিত্র হল তার।
কত না যুগের পাপভার
নিঃশেষে ভাসায়ে দিল অতলের মাঝে।
তরঙ্গে তরঙ্গে তার বাজে
ভবিষ্যের মঙ্গলসংগীত।
তটে তটে বাঁকে বাঁকে অনন্তের চলেছে ইঙ্গিত।

দৈবস্পর্শে তার
আমারে সে ধূলি হতে করিল উদ্ধার;
অঙ্গে অঙ্গে দিল তার তরঙ্গের দোল;
কণ্ঠে দিল আপন কল্লোল।
আলোকের নৃত্যে মোর চক্ষু দিল ভরি
বর্ণের লহরী।
খুলে গেল অনন্তের কালো উত্তরীয়,
কত রূপে দেখা দিল প্রিয়,
অনির্বচনীয়।

তাই মোর গান
কুসুম-অঞ্জলি-অর্ঘ্যদান
প্রাণজাহ্নবীরে।
তাহারি আবর্তে ফিরে ফিরে
এ পূজার কোনো ফুল যাও যদি ভাসে চিরদিন,
বিস্মৃতির তলে হয় লীন,
তবে তার লাগি, কহ,
কার সাথে আমার কলহ ?
এই নীলাম্বরতলে তৃণরোমাঙ্কিত ধরণীতে,
বসন্তে বর্ষায় গ্রীষ্মে শীতে
প্রতিদিবসের পূজা প্রতিদিন করি' অবসান
ধন্য হয়ে ভেসে যাক গান।

জুলিয়ো চেজারে জাহাজ
১৬ জানুয়ারি, ১৯২৫

বদল

হাসির কুসুম আনিল সে, ডালি ভরি
আমি আনিলাম দুখ-বাদলের ফল।
শুধালেম তারে "যদি এ বদল করি
হার হবে কার বল্।"
হাসি' কৌতুকে কহিল সে সুন্দরী
"এস না, বদল করি।
দিয়ে মোর হার লব ফলভার
অশ্রুর রসে ভরা।"
চাহিয়া দেখিনু মুখপানে তার
নিদয়া সে মনোহরা।

সে লইল তুলে আমার ফলের ডালা,
করতালি দিল হাসিয়া সকৌতুকে।
আমি লইলাম তাহার ফুলের মালা,
তুলিয়া ধরিনু বুকে।
"মোর হল জয়" হেসে হেসে কয়,
দূরে চলে গেল ত্বরা।
উঠিল তপন মধ্যগগনদেশে,
আসিল দারুণ খরা,
সন্ধ্যায় দেখি তপ্ত দিনের শেষে
ফুলগুলি সব ঝরা।

জুলিয়ো চেজারে জাহাজ
১৭ জানুয়ারি, ১৯২৫

ইটালিয়া

কহিলাম, "ওগো রানী,
কত কবি এল চরণে তোমার উপহার দিল আনি।
এসেছি শুনিয়া তাই,
উষার দুয়ারে পাখির মতন গান গেয়ে চলে যাই।"
শুনিয়া দাঁড়ালে তব বাতায়ন-'পরে
ঘোমটা আড়ালে কহিলে করুণ স্বরে,
"এখন শীতের দিন
কুয়াশায় ঢাকা আকাশ আমার, কানন কুসুমহীন।"

কহিলাম, "ওগো রানী,
সাগরপারের নিকুঞ্জ হতে এনেছি বাঁশরিখানি।
উতারো ঘোমটা তব,
বারেক তোমার কালো নয়নের আলোখানি দেখে লব।"

কহিলে, "আমার হয় নি রঙিন সাজ,
হে অধীর কবি, ফিরে যাও তুমি আজ;
মধুর ফাগুন মাসে
কুসুম-আসনে বসিব যখন ডেকে লব মোর পাশে।"

কহিলাম, "ওগো রানী,
সফল হয়েছে যাত্রা আমার শুনেছি আশার বাণী।
বসন্তসমীরণে
তব আহ্বানমন্ত্র ফুটিবে কুসুমে আমার বনে।
মধুপমুখর গন্ধমাতাল দিনে
ওই জানালার পথখানি লব চিনে,
আসিবে সে সুসময়।
আজিকে বিদায় নেবার বেলায় গাহিব তোমার জয়।"

মিলান
২৪ জানুয়ারি, ১৯২৫

লেখক

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বুডাপেস্ট

২৬ কার্ত্তিক

১৩৩৩

ভূমিকা

এই লেখাগুলি শুরু হয়েছিল চীনে জাপানে। পাখায় কাগজে রুমালে কিছু লিখে দেবার জন্য লোকের অনুরোধেই এর উৎপত্তি। তারপরে স্বদেশে ও অন্যদেশেও তাগিদ পেয়েছি। এমনি করে এই টুকরো লেখাগুলি জমে উঠল। এর প্রধান মূল্য হাতের অক্ষরে ব্যক্তিগত পরিচয়ের। সে পরিচয় কেবল অক্ষরে নয়, দ্রুতলিখিত ভাবের মধ্যেও তার থাকে। ছাপার অক্ষরে সেই ব্যক্তিগত সংস্পর্শ নষ্ট হয়—সে অবস্থায় এই সব লেখা বাতি-নেবা দীপদানের মতো হাস্যকর ও ব্যর্থ হতে পারে। তাই জর্মনিতে হাতের অক্ষর ছাপাবার উপায় আছে খবর পেয়ে লেখাগুলি ছাপিয়ে দেওয়া গেল। অনবধানতায় কতকগুলি ভুলচুক ঘটেছে। সে সব ত্রুটিতেও ব্যক্তিগত পরিচয়েরই আভাস রয়ে গেল॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

The lines in the following pages had their origin in China and Japan where the author was asked for his writings on fans or pieces of silk.

Rabindranath Tagore

Nov. 7. 1926
Balatonfüred. Hungary.

লেখন

স্বপ্ন আমার জোনাকি,
দীপ্ত প্রাণের মণিকা,
স্তব্ধ আঁধার নিশীথে
উড়িছে আলোর কণিকা॥

My fancies are fireflies
specks of living light—
twinkling in the dark.

আমার লিখন ফুটে পথধারে
ক্ষণিক কালের ফুলে,
চলিতে চলিতে দেখে যারা তারে
চলিতে চলিতে ভুলে॥

The same voice murmurs
in these desultory lines
which is born in wayside pansies
letting hasty glances pass by.

প্রজাপতি সে তো বরষ না গণে,
নিমেষ গণিয়া বাঁচে,
সময় তাহার যথেষ্ট তাই আছে॥

The butterfly does not count years
but moments
and therefore has enough time.

ঘুমের আঁধার কোটরের তলে স্বপ্ন পাখির বাসা
কুড়ায়ে এনেছে মুখর দিনের খসে-পড়া ভাঙা ভাষা।

ভারী কাজের বোঝাই তরী কালের পারাবারে
পাড়ি দিতে গিয়ে কখন ডোবে আপন ভারে।
তার চেয়ে মোর এই ক-খানা হালকা কথার গান
হয়তো ভেসে রইবে স্রোতে তাই করে যাই দান।

বসন্ত সে কুঁড়ি ফুলের দল
হাওয়ায় কত ওড়ায় অবহেলায়।
নাহি ভাবে ভাবী কালের ফল,
ক্ষণকালের খামখেয়ালি খেলায়।

স্ফুলিঙ্গ তার পাখায় পেল
ক্ষণকালের ছন্দ।
উড়ে গিয়ে ফুরিয়ে গেল
সেই তারি আনন্দ।

সুন্দরী ছায়ার পানে তরু চেয়ে থাকে,
সে তার আপন, তবু পায় না তাহাকে।

আমার প্রেম রবি-কিরণ হেন
জ্যোতির্ময় মুক্তি দিয়ে তোমারে ঘেরে যেন।

মাটির সুপ্তিবন্ধন হতে আনন্দ পায় ছাড়া,
ঝলকে ঝলকে পাতায় পাতায় ছুটে এসে দেয় নাড়া।

অতল আঁধার নিশা-পারাবার, তাহারি উপরিতলে।
দিন সে রঙিন বুদ্বুদ সম অসীমে ভাসিয়া চলে।

ভীরু মোর দান ভরসা না পায়
মনে সে যে রবে কারো,
হয়তো বা তাই তব করুণায়
মনে রাখিতেও পারো।

ফাগুন, শিশুর মতো, ধূলিতে রঙিন ছবি আঁকে,
ক্ষণে ক্ষণে মুছে ফেলে, চলে যায়, মনেও না থাকে।

দেবমন্দির-আঙিনাতলে শিশুরা করেছে মেলা,
দেবতা ভোলেন পূজারি দলে, দেখেন শিশুর খেলা।

তোমার বনে ফুটেছে শ্বেত করবী,
আমার বনে রাঙা,
দোঁহার আঁখি চিনিল দোঁহে নীরবে
ফাগুনে ঘুম ভাঙা।

আকাশ ধরারে বাহুতে বেড়িয়া রাখে,
তবুও আপনি অসীম সুদূরে থাকে।

দূর এসেছিল কাছে,
ফুরাইলে দিন, দূরে চলে গিয়ে আরো সে নিকটে আছে।

ওগো অনন্ত কালো,
ভীরু এ দীপের আলো,
তারি ছোট ভয় করিবারে জয় অগণ্য তারা জ্বালো।

আমার বাণীর পতঙ্গ গুহাচর
আয় গহ্বর ছেড়ে
গোধূলিতে এল শেষ যাত্রার অবসর,
হারিয়ে যা পাখা নেড়ে।

দাঁড়ায়ে গিরি, শির
মেঘে তুলে,
দেখে না সরসীর
বিনতি।
অচল উদাসীর
পদমূলে
ব্যাকুল রূপসীর
মিনতি।

ভাসিয়ে দিয়ে মেঘের ভেলা
খেলেন আলো-ছায়ার খেলা,
শিশুর মতো শিশুর সাথে
কাটান হেসে প্রভাত বেলা।

মেঘ সে বাষ্পগিরি,
গিরি সে বাষ্পমেঘ,
কালের স্বপ্নে যুগে যুগে ফিরি ফিরি
এ কিসের ভাবাবেগ।

চান ভগবান প্রেম দিয়ে তাঁর
গড়া হবে দেবালয়,
মানুষ আকাশে উঁচু করে তোলে
ইঁট পাথরের জয়।

শিখারে কহিল
হাওয়া,
"তোমারে তো চাই
পাওয়া।"
যেমনি জিনিতে চাহিল ছিনিতে
নিবে গেল দাবি-দাওয়া।

দুই তীরে তার বিরহ ঘটায়ে
সমুদ্র করে দান
অতল প্রেমের অশ্রু জলের গান।

তারায় দীপ জ্বালেন যিনি
গগনতলে
থাকেন চেয়ে ধরার দীপ
কখন জ্বলে।
মোর গানে গানে, প্রভু, আমি পাই পরশ তোমার,
নির্ঝরধারায় শৈল যেমন পরশে পারাবার।

নানা রঙের ফুলের মতো উষা মিলায় যবে
শুভ্র ফলের মতন সূর্য আসেন সগৌরবে।

আঁধার সে যেন বিরহিণী বধূ
অঞ্চলে ঢাকা মুখ,
পথিক আলোর ফিরিবার আশে
বসে আছে উৎসুক।

হে আমার ফুল, ভোগী মূর্খের মালে
না হ'ক তোমার গতি,
এই জেনো তব নবীন প্রভাতকালে
আশিস তোমার প্রতি।

চলিতে চলিতে খেলার পুতুল খেলার বেগের সাথে
একে একে কত ভেঙে পড়ে যায়, পড়ে থাকে পশ্চাতে।

বিলম্বে উঠেছ তুমি কৃষ্ণপক্ষ শশী,
রজনীগন্ধা যে তবু চেয়ে আছে বসি।

আকাশে উঠিল বাতাস তবুও নোঙর রহিল পাঁকে,
অধীর তরণী খুঁজিয়া না পায় কোথায় সে মুখ ঢাকে।

আকাশের নীল
বনের শ্যামলে চায়।
মাঝখানে তার
হাওয়া করে হায় হায়।

কীটেরে দয়া করিয়ো, ফুল,
সে নহে মধুকর।
প্রেম যে তার বিষম ভুল
করিল জর্জর।

মাটির প্রদীপ সারা দিবসের অবহেলা লয় মেনে,
রাত্রে শিখার চুম্বন পাবে জেনে।

দিনের রৌদ্রে আবৃত বেদনা বচনহারা,
আঁধারে যে তাহা জ্বলে রজনীর দীপ্ত তারা।

গানের কাঙাল এ বীণার তার বেসুরে মরিছে কেঁদে।
দাও তার সুর বেঁধে।

নিভৃত প্রাণের নিবিড় ছায়ায় নীরব নীড়ের 'পরে
কথাহীন ব্যথা একা একা বাস করে।

আলো যবে ভালোবেসে মালা দেয় আঁধারের গলে,
সৃষ্টি তারে বলে।

আলোকের স্মৃতি ছায়া বুকে করে রাখে,
ছবি বলি তাকে।

ফুলে ফুলে যবে ফাগুন আত্মহারা
প্রেম যে তখন মোহন মদের ধারা।
কুসুম-ফোটার দিন হলে অবসান
তখন সে প্রেম প্রাণের অন্নপান।

দিন হয়ে গেল গত।
শুনিতেছি বসে নীরব আঁধারে
আঘাত করিছে হৃদয় দুয়ারে
দূর-প্রভাতের ঘরে-ফিরে আসা
পথিক দুরাশা যত।

জীর্ণ জয়-তোরণ-ধূলি 'পর
ছেলেরা রচে ধূলির খেলাঘর।

রঙের খেয়ালে আপনা খোয়ালে
হে মেঘ, করিলে খেলা।
চাঁদের আসরে যবে ডাকে তোরে
ফুরাল যে তোর বেলা।

স্খলিত পালক ধুলায় জীর্ণ
পড়িয়া থাকে।
আকাশে ওড়ার স্মরণচিহ্ন
কিছু না রাখে।

পথে হল দেরি, ঝরে গেল চেরি
দিন বৃথা গেল, প্রিয়া।
তবুও তোমার ক্ষমা-হাসি বহি
দেখা দিল আজেলিয়া।

যখন পথিক এলেম কুসুমবনে
শুধু আছে কুঁড়ি দুটি।
চলে যাব যবে, বসন্ত সমীরণে
কুসুম উঠিবে ফুটি।

হে মহাসাগর বিপদের লোভ দিয়া
ভুলায়ে বাহির করেছ মানবহিয়া।
নিত্য তোমার জয়ের ভীষণ বাণী
দুঃসাহসের পথে তারে আনে টানি।

গগনে গগনে নব নব দেশে রবি
নব প্রাতে জাগে নূতন জনম লভি।

জোনাকি সে ধূলি খুঁজে সারা,
জানে না আকাশে আছে তারা।

যবে কাজ করি
প্রভু দেয় মোরে মান।
যবে গান করি
ভালোবাসে ভগবান।

একটি পুষ্পকলি
এনেছিনু দিব বলি',
হায় তুমি চাও সমস্ত বনভূমি,
লও, তাই লও তুমি।

বসন্ত, তুমি এসেছ হেথায়
বুঝি হল পথ ভুল।
এলে যদি তবে জীর্ণ শাখায়
একটি ফুটাও ফুল।

চাহিয়া প্রভাত রবির নয়নে
গোলাপ উঠিল ফুটে।
"রাখিব তোমায় চিরকাল মনে"
বলিয়া পড়িল টুটে।

আকাশে তো আমি রাখি নাই, মোর
উড়িবার ইতিহাস।
তবু, উড়েছিনু এই মোর উল্লাস।

লাজুক ছায়া বনের তলে
আলোরে ভালোবাসে।
পাতা সে কথা ফুলেরে বলে,
ফুল তা শুনে হাসে।

আকাশের তারায় তারায়
বিধাতার যে হাসিটি জ্বলে
ক্ষণজীবী জোনাকি এনেছে
সেই হাসি এ ধরণীতলে।

কুয়াশা যদি বা ফেলে পরাভবে ঘিরি
তবু নিজ মহিমায় অবিচল গিরি।

পর্বতমালা আকাশের পানে চাহিয়া না কহে কথা,
অগমের লাগি ওরা ধরণীর স্তম্ভিত ব্যাকুলতা।

একদিন ফুল দিয়েছিলে, হায়,
কাঁটা বিঁধে গেছে তার।
তবু, সুন্দর, হাসিয়া তোমায়
করিনু নমস্কার।

হে বন্ধু, জেনো মোর ভালোবাসা,
কোনো দায় নাহি তার।
আপনি সে পায় আপন পুরস্কার।

স্বল্প সেও স্বল্প নয় বড়োকে ফেলে ছেয়ে।
দু-চারিজন অনেক বেশি বহুজনের চেয়ে।

সংগীতে যখন সত্য শোনে নিজ বাণী
সৌন্দর্যে তখন ফোটে তার হাসিখানি।

আমি জানি মোর ফুলগুলি ফুটে হরষে
না-জানা সে কোন্ শুভ চুম্বন পরশে।

বুদ্‌বুদ সে তো বদ্ধ আপন ঘেরে,
শূন্যে মিলায়, জানে না সমুদ্রেরে।

বিরহপ্রদীপে জ্বলুক দিবসরাতি
মিলনস্মৃতির নির্বাণহীন বাতি।

মেঘের দল বিলাপ করে
আঁধার হল দেখে।
ভুলেছে বুঝি নিজেই তারা
সূর্য দিল ঢেকে।

ভিক্ষুবেশে দ্বারে তার "দাও" বলি দাঁড়ালে দেবতা
মানুষ সহসা পায় আপনার ঐশ্বর্যবারতা।

গুণীর লাগিয়া বাঁশি চাহে পথপানে,
বাঁশির লাগিয়া গুণী ফিরিছে সন্ধানে।

অসীম আকাশ শূন্য প্রসারি রাখে,
হোথায় পৃথিবী মনে মনে তার
অমরার ছবি আঁকে।

কুন্দকলি ক্ষুদ্র বলি নাই দুঃখ, নাই তার লাজ,
পূর্ণতা অন্তরে তার অগোচরে করিছে বিরাজ।
বসন্তের বাণীখানি আবরণে পড়িয়াছে বাঁধা,
সুন্দর হাসিয়া বহে প্রকাশের সুন্দর এ বাধা।

ফুলগুলি যেন কথা,
পাতাগুলি যেন চারিদিকে তার
পুঞ্জিত নীরবতা।

দিবসের অপরাধ সন্ধ্যা যদি ক্ষমা করে তবে
তাহে তার শান্তিলাভ হবে।

আকর্ষণগুণে প্রেম এক ক'রে তোলে।
শক্তি শুধু বেঁধে রাখে শিকলে শিকলে।

মহাতরু বহে
বহু বরষের ভার।
যেন সে বিরাট
এক মুহূর্ত তার।

পথের প্রান্তে আমার তীর্থ নয়,
পথের দুধারে আছে মোর দেবালয়।

ধরায় যেদিন প্রথম জাগিল
কুসুমবন
সেদিন এসেছে আমার গানের
নিমন্ত্রণ।

হিতৈষীর স্বার্থহীন অত্যাচার যত
ধরণীরে সব চেয়ে করেছে বিক্ষত।

স্তব্ধ অতল শব্দবিহীন মহাসমুদ্রতলে
বিশ্ব ফেনার পুঞ্জ সদাই ভাঙিয়া জুড়িয়া চলে।

নব-জনমের পুরা দাম দিব যেই
তখনি মুক্তি পাওয়া যাবে সহজেই।

গোঁয়ার কেবল গায়ের জোরেই বাঁকাইয়া দেয় চাবি,
শেষকালে তার কুড়াল ধরিয়া করে মহা দাবাদাবি।

জন্ম মোদের রাতের আঁধার
রহস্য হতে
দিনের আলোর সুমহত্তর
রহস্যস্রোতে।

আমার প্রাণের গানের পাখির দল
তোমার কণ্ঠে বাসা খুঁজিবারে
হল আজি চঞ্চল।

নিমেষকালের খেয়ালের লীলাভরে
অনাদরে যাহা দান কর অকাতরে
শরৎ-রাতের খসে-পড়া তারাসম
উজ্জ্বলি উঠে প্রাণের আঁধার মম।

মোর কাগজের খেলার নৌকা ভেসে চলে যায় সোজা
বহিয়া আমার অকাজ দিনের অলসবেলার বোঝা।

অকালে যখন বসন্ত আসে শীতের আঙিনা 'পরে
ফিরে যায় দ্বিধাভরে।
আমের মুকুল ছুটে বাহিরায়, কিছু না বিচার করে,
ফেরে না সে, শুধু মরে।

হে প্রেম, যখন ক্ষমা কর তুমি সব অভিমান ত্যেজে,
কঠিন শাস্তি সে যে।
হে মাধুরী, তুমি কঠোর আঘাতে যখন নীরব রহ
সেই বড়ো দুঃসহ।

দেবতার সৃষ্টি বিশ্ব মরণে নূতন হয়ে উঠে।
অসুরের অনাসৃষ্টি আপন অস্তিত্বভারে টুটে।

বৃক্ষ সে তো আধুনিক, পুষ্প সেই অতি পুরাতন,
আদিম বীজের বার্তা সেই আনে করিয়া বহন।

নূতন প্রেম সে ঘুরে ঘুরে মরে শূন্য আকাশমাঝে
পুরানো প্রেমের রিক্ত বাসায় বাসা তার মেলে না যে।

সকল চাঁপাই দেয় মোর প্রাণে আনি
চির পুরাতন একটি চাঁপার বাণী।

দুঃখের আগুন কোন্ জ্যোতির্ময় পথরেখা টানে
বেদনার পরপার পানে।

ফেলে যবে যাও একা থুয়ে
আকাশের নীলিমায় কার ছোঁওয়া যায় ছুঁয়ে ছুঁয়ে।
বনে বনে বাতাসে বাতাসে
চলার আভাস কার শিহরিয়া উঠে ঘাসে ঘাসে।

উষা একা একা আঁধারের দ্বারে ঝংকারে বীণাখানি
যেমনি সূর্য বাহিরিয়া আসে মিলায় ঘোমটা টানি।

শিশির রবিরে শুধু জানে
বিন্দুরূপে আপন বুকের মাঝখানে।

আপন অসীম নিষ্ফলতার পাকে
মরু চিরদিন বন্দী হইয়া থাকে।

ধরণীর যজ্ঞ-অগ্নি বৃক্ষরূপে শিখা তার তুলে;
স্ফুলিঙ্গ ছড়ায় ফুলে ফুলে।

ফুরাইলে দিবসের পালা
আকাশ সূর্যেরে জপে লয়ে তারকার জপমালা।

দিনে দিনে মোর কর্ম আপন দিনের মজুরি পায়।
প্রেম সে আমার চিরদিবসের চরম মূল্য চায়।

কর্ম আপন দিনের মজুরি রাখিতে চাহে না বাকি।
যে প্রেমে আমার চরম মূল্য তারি তরে চেয়ে থাকি।

আলোকের সাথে মেলে আঁধারের ভাষা,
মেলে না কুয়াশা।

বিদেশে অচেনা ফুল পথিক কবিরে ডেকে কহে—
"যে দেশ আমার, কবি, সেই দেশ তোমারো কি নহে?"

পুঁথি-কাটা ওই পোকা
মানুষকে জানে বোকা।
বই কেন সে যে চিবিয়ে খায় না
এই লাগে তার ধোঁকা।

আকাশে মন কেন তাকায় ফলের আশা পুষি?
কুসুম যদি ফোটে শাখায় তা নিয়ে থাক্ খুশি।

অনন্তকালের ভালে মহেন্দ্রের বেদনার ছায়া,
মেঘাচ্ছ অম্বরে আজি তারি যেন মূর্তিমতী মায়া।

সূর্যাস্তের রঙে রাঙা ধরা যেন পরিণত ফল,
আঁধার রজনী তারে ছিঁড়িতে বাড়ায় করতল।

প্রজাপতি পায় অবকাশ
ভালোবাসিবারে কমলেরে।
মধুকর সদা বারোমাস
মধু খুঁজে খুঁজে শুধু ফেরে।
মায়াজাল দিয়া কুয়াশা জড়ায়
প্রভাতেরে চারিধারে,—
অন্ধ করিয়া বন্দী করে যে তারে।

শুকতারা মনে করে শুধু একা মোর তরে
অরুণের আলো।
উষা বলে, "ভালো, সেই ভালো"।

অজানা ফুলের গন্ধের মতো
তোমার হাসিটি, প্রিয়,
সরল মধুর, কি অনির্বচনীয়।

মৃতের যতই বাড়াই মিথ্যা মূল্য,
মরণেরি শুধু ঘটে ততই বাহুল্য।

পারের তরীর পালের হাওয়ার পিছে
তীরের হৃদয় কান্না পাঠায় মিছে।

সত্য তার সীমা ভালোবাসে
সেথায় সে মেলে আসি সুন্দরের পাশে।

নটরাজ নৃত্য করে নব নব সুন্দরের নাটে,
বসন্তের পুষ্পরঙ্গে শস্যের তরঙ্গে মাঠে মাঠে।
তাঁহারি অক্ষয় নৃত্য, হে গৌরী, তোমার অঙ্গে মনে,
চিত্তের মাধুর্যে তব, ধ্যানে তব, তোমার লিখনে।

দিন দেয় তার সোনার বীণা
নীরব তারার করে—
চিরদিবসের সুর বাঁধিবার তরে।

ভক্তি ভোরের পাখি
রাতের আঁধার শেষ না হতেই "আলো" ব'লে ওঠে ডাকি।

সন্ধ্যায় দিনের পাত্র রিক্ত হলে ফেলে দেয় তারে
নক্ষত্রের প্রাঙ্গণমাঝারে।
রাত্রি তারে অন্ধকারে ধৌত করে পুন ভরি দিতে
প্রভাতের নবীন অমৃতে।

দিনের কর্মে মোর প্রেম যেন
শক্তি যজে,
রাতের মিলনে পরম শান্তি
মিলিবে তবে।

ভোরের ফুল গিয়েছে যারা
দিনের আলো ত্যেজে
আঁধারে তা'রা ফিরিয়া আসে
সাঁঝের তারা সেজে।

যাবার যা সে যাবেই, তারে
না দিলে খুলে যায়
ক্ষতির সাথে মিলায়ে বাধা
করিবে একাকার।

সাগরের কানে জোয়ার-বেলায়
ধীরে কয় তটভূমি ;
"তরঙ্গ তব যা বলিতে চায়
তাই লিখে দাও তুমি।"
সাগর ব্যাকুল ফেন-অক্ষরে
যতবার লেখে লেখা
চির-চঞ্চল অতৃপ্তিভরে
ততবার মোছে রেখা।

পুরানো মাঝে যা কিছু ছিল
চিরকালের ধন
নূতন, তুমি এনেছ তাই
করিয়া আহরণ।

মিলননিশীথে ধরণী ভাবিছে
চাঁদের কেমন ভাষা,
কোনো কথা নেই, শুধু মুখ চেয়ে হাসা।

স্তব্ধ হয়ে কেন্দ্র আছে না দেখা যায় তারে
চক্র যত নৃত্য করি ফিরিছে চারিধারে।

দিবসের দীপে শুধু থাকে তেল
রাতে দীপ আলো দেয়।
দোঁহার তুলনা করা শুধু অন্যায়।

গিরি যে তুষার নিজে রাখে, তার
ভার তারে চেপে রহে।
গলায়ে যা দেয় ঝরনাধারায়
চরাচর তারে বহে।

কাছে থাকার আড়ালখানা
ভেদ ক'রে
তোমার প্রেম দেখিতে যেন
পায় মোরে।

ওই শুন বনে বনে কুঁড়ি বলে তপনেরে ডাকি—
"খুলে দাও আঁখি"।

ধরার মাটির তলে বন্দী হয়ে যে-আনন্দ আছে
কচিপাতা হয়ে এল দলে দলে অশথের গাছে।
বাতাসে মুক্তির দোলে ছুটি পেল ক্ষণিক বাঁচিতে
নিস্তব্ধ অন্ধের স্বপ্ন দেহ নিল আলোয় নাচিতে।

খেলার খেয়ালবশে কাগজের তরী
স্মৃতির খেলেনা দিয়ে দিয়েছিনু ভরি;
যদি ঘাটে গিয়ে ঠেকে প্রভাতবেলায়
তুলে নিয়ো তোমাদের প্রাণের খেলায়।

দিনের আলোক যবে রাত্রির অতলে
হয়ে যায় হারা
আঁধারের ধ্যাননেত্রে দীপ্ত হয়ে জ্বলে
শত লক্ষ তারা।

আলোহীন বাহিরের আশাহীন দয়াহীন ক্ষতি
পূর্ণ করে দেয় যেন অন্তরের অন্তহীন জ্যোতি।

অস্তরবির আলো-শতদল
মুদিল অন্ধকারে।
ফুটিয়া উঠুক নবীন ভাষায়
ভ্রান্তিবিহীন নবীন আশায়
নব উদয়ের পারে।

জীবন খাতার অনেক পাতাই
এমনিতরো শূন্য থাকে।
আপন মনের খেয়ান দিয়ে
পূর্ণ করে লও না তাকে।
সেথায় তোমার গোপন কবি
রচুক আপন স্বর্গছবি,
পরশ করুক দৈববাণী
সেথায় তোমার কল্পনাকে।

দেবতা যে চায় পরিতে গলায়
মানুষের গাঁথা মালা,
মাটির কোলেতে তাই রেখে যায়
আপন ফুলের ডালা।

সূর্যপানে চেয়ে ভাবে মল্লিকামুকুল
কখন ফুটিবে মোর অত বড়ো ফুল।

সোনার মুকুট ভাসাইয়া দাও
সন্ধ্যা মেঘের তরীতে।
যাও চলে রবি বেশভূষা খুলে
মরণ মহেশ্বরের দেউলে
নীরবে প্রণাম করিতে।

সন্ধ্যার প্রদীপ মোর রাত্রির তারারে
বন্দে নমস্কারে।

শিশিরের মালা গাঁথা শরতের তৃণাগ্র-সূচিতে
নিমেষে মিলায়,—তবু নিখিলের মাধুর্য-রুচিতে
স্থান তার চির স্থির ; মণিমালা রাজেন্দ্রের গলে
আছে, তবু নাই সে যে, নিত্য নষ্ট প্রতি পলে পলে।

দিবসে যাহারে করিয়াছিলাম হেলা
সেই তো আমার প্রদীপ রাতের বেলা।

ঝরে-পড়া ফুল আপনার মনে বলে—
বসন্ত আর নাই এ ধরণীতলে।

বসন্তবায়ু, কুসুম-কেশর
গেছ কি ভুলি ?
নগরের পথে ঘুরিয়া বেড়াও
উড়ায়ে ধূলি।

হে অচেনা, তব আঁখিতে আমার
আঁখি কারে পায় খুঁজি।
যুগান্তরের চেনা চাহনিটি
আঁধারে লুকানো বুঝি।

দখিন হতে আনিলে, বায়ু,
ফুলের জাগরণ,
দখিন মুখে ফিরিবে যবে
উজাড় হবে বন।

ওগো হংসের পাঁতি,
শীত-পবনের সাথি,
ওড়ার মদিরা পাখায় করিছ পান।
দূরের স্বপনে মেশা
নভো-নীলিমার নেশা,
বলো, সেই রসে কেমনে ভরিব গান।

শিশির-সিক্ত বন-মর্মর
ব্যাকুল করিল কেন।
ভোরের স্বপনে অনামা প্রিয়ার
কানে কানে কথা যেন।

দিনান্তের ললাট লেপি'
রক্ত আলো চন্দনে
দিগ্বধূরা ঢাকিল আঁখি
শব্দহীন ক্রন্দনে।

নীরব যিনি তাঁহার বাণী নামিলে মোর বাণীতে
তখন আমি তাঁরেও জানি মোরেও পাই জানিতে

কাঁটাতে আমার অপরাধ আছে
দোষ নাহি মোর ফুলে।
কাঁটা, ওগো প্রিয়, থাক্ মোর কাছে,
ফুল তুমি নিয়ো তুলে।

চেয়ে দেখি হোথা তব জানালায়
স্তিমিত প্রদীপখানি
নিবিড় রাতের নিভৃত বীণায়
কী বাজায় কী বা জানি।

পৌরপথের বিরহী তরুর কানে
বাতাস কেন বা বনের বারতা আনে।

ও যে চেরিফুল তব বন-বিহারিণী,
আমার বকুল বলিছে "তোমারে চিনি"।

ধনীর প্রাসাদ বিকট ক্ষুধিত রাহু
বস্তুপিণ্ড-বোঝায় বদ্ধ বাহু।
মনে পড়ে সেই দীনের রিক্ত ঘরে
বাহুবিমুক্ত আলিঙ্গনের তরে।

গিরির দুরাশা উড়িবারে
ঘুরে মরে মেঘের আকারে

দূর হতে যারে পেয়েছি পাশে
কাছের চেয়ে সে কাছেতে আসে।

উতল সাগরের অধীর ক্রন্দন
নীরব আকাশের মাগিছে চুম্বন।

চাঁদ কহে, "শোন্
শুকতারা,
রজনী যখন
হল সারা
যাবার বেলায়
কেন শেষে
দেখা দিতে হায়
এলি হেসে,
আলো আঁধারের
মাঝে এসে
করিলি আমায়
দিশে হারা।"

হতভাগ্য মেঘ পায় প্রভাতের সোনা,—
সন্ধ্যা না হতে ফুরায়ে ফেলিয়া
ভেসে যায় আনমনা।

ভেবেছিনু গনি গনি লব সব তারা
গনিতে গনিতে রাত হয়ে যায় সারা,
বাছিতে বাছিতে কিছু না পাইনু বেছে।
আজ বুঝিলাম, যদি না চাহিয়া চাই
তবেই তো একসাথে সব-কিছু পাই ;
সিন্ধুরে তাকায়ে দেখো, মরিয়ো না সেঁচে

তোমারে, প্রিয়ে, হৃদয় দিয়ে
জানি তবুও জানি নি।
সকল কথা বল নি অভিমানিনী।

লিলি, তোমারে গেঁথেছি হারে, আপন বলে চিনি,
তবুও তুমি রবে কি বিদেশিনী।

ফুলের লাগি তাকায়ে ছিলি শীতে
ফলের আশা ওরে!
ফুটিল ফুল ফাগুন-রজনীতে
বিফলে গেল ঝরে।

নিমেষকালের অতিথি যাহারা পথে আনাগোনা করে,
আমার গাছের ছায়া তাহাদেরি তরে।
যে জনার লাগি চিরদিন মোর আঁখি পথ চেয়ে থাকে
আমার গাছের ফল তারি তরে পাকে।

বহ্নি যবে বাঁধা থাকে তরুর মর্মের মাঝখানে
ফলে ফুলে পল্লবে বিরাজে।
যখন উদ্দাম শিখা লজ্জাহীনা বন্ধন না মানে
মরে যায় ব্যর্থ ভস্মমাঝে।

কানন কুসুম-উপহার দেয় চাঁদে
সাগর আপন শূন্যতা নিয়ে কাঁদে।

লেখনী জানে না কোন্ অঙ্গুলি লিখিছে
লেখে যাহা তাও তার কাছে সবি মিছে।

মন্দ যাহা নিন্দা তার রাখ না বটে বাকি।
ভালো যেটুকু মূল্য তার কেন বা দাও ফাঁকি।

আকাশ কভু পাতে না ফাঁদ
কাড়িয়ে নিতে চাঁদে,
বিনা বাঁধনে তাই তো চাঁদ
নিজেরে নিজে বাঁধে।

সমস্ত আকাশভরা আলোর মহিমা
তৃণের শিশিরমাঝে খোঁজে নিজ সীমা,

প্রভাত-আলোরে বিদ্রূপ করে ও কি
ক্ষুরের ফলার নিষ্ঠুর ঝকমকি ?

একা এক শূন্যমাত্র নাই অবলম্ব,
দুই দেখা দিলে হয় একের আরম্ভ।

প্রভেদেরে মান যদি ঐক্য পাবে তবে,
প্রভেদ ভাঙিতে গেলে ভেদবৃদ্ধি হবে।

মৃত্যুর ধর্মই এক, প্রাণধর্ম নানা,
দেবতা মরিলে হবে ধর্ম একখানা।

আঁধার একেরে দেখে একাকার ক'রে,
আলোক একেরে দেখে নানাদিক ধ'রে।

ফুল দেখিবার যোগ্য চক্ষু যার রহে
সেই যেন কাঁটা দেখে, অন্তে নহে নহে।

ধুলায় মারিলে লাথি ঢোকে চোখে মুখে।
জল ঢালো, বালাই নিমেষে যাবে চুকে।

ভালো করিবারে যার বিষম ব্যস্ততা
ভালো হইবারে তার অবসর কোথা।

ভালো যে করিতে পারে ফেরে দ্বারে এসে,
ভালো যে বাসিতে পারে সর্বত্র প্রবেশে।

আগে খোঁড়া করে দিয়ে পরে লও পিঠে
তারে যদি দয়া বল, শোনায় না মিঠে।

হয় কাজ আছে তব নয় কাজ নাই
কিন্তু "কাজ করা যাক" বলিয়ো না ভাই।

কাজ সে তো মানুষের, এই কথা ঠিক।
কাজের মানুষ কিন্তু ধিক তারে ধিক।

এককান শঙ্খ শোনে আপনারি অঙ্গে,
সিন্ধুর গুঞ্জন শোনে সিন্ধুর তরঙ্গে॥

প্রাণেরে মৃত্যুর ছাপ মূল্য করে দান,
প্রাণ দিয়া লভি তাই যাহা মূল্যবান॥

রস যেথা নাই সেথা যত কিছু খোঁচা,
মরুভূমে জন্মে শুধু কাঁটাগাছ বোঁচা॥

দর্পণে যাহারে দেখি সেই আমি ছায়া,
তারে লয়ে গর্ব্ব করি অপূর্ব্ব এ মায়া॥

আপনি আপনা চেয়ে বড়ো যদি হবে
নিজেকে নিজের কাছে নত করো তবে॥

প্রেমেরে যে করিয়াছে ব্যবসার অঙ্গ
প্রেম দূরে বসে বসে দেখে তার রঙ্গ॥

দুঃখেরে যখন প্রেম করে শিরোমণি
তাহারে আনন্দ বলে চিনি কি তখনি॥

অমৃত যে সত্য, তার নাহি পরিমাণ,
[illegible] নিত্য নিত্য করিছে প্রমাণ॥

নাটক ও প্রহসন

মুক্তধারা

মুক্তধারা

উত্তরকূট পার্বত্য প্রদেশ। সেখানকার উত্তরভৈরব-মন্দিরে যাইবার পথ। দূরে আকাশে একটা অভ্রভেদী লৌহযন্ত্রের মাথাটা দেখা যাইতেছে এবং তাহার অপরদিকে ভৈরব-মন্দির-চূড়ার ত্রিশূল। পথের পার্শ্বে আমবাগানে রাজা রণজিতের শিবির। আজ অমাবস্যায় ভৈরবের মন্দিরে আরতি, সেখানে রাজা পদব্রজে যাইবেন, পথে শিবিরে বিশ্রাম করিতেছেন। তাঁহার সভার যন্ত্ররাজ বিভূতি বহুবৎসরের চেষ্টায় লৌহযন্ত্রের বাঁধ তুলিয়া মুক্তধারা ঝরনাকে বাঁধিয়াছেন। এই অসামান্য কীর্তিকে পুরস্কৃত করিবার উপলক্ষ্যে উত্তরকূটের সমস্ত লোক ভৈরব-মন্দির-প্রাঙ্গণে উৎসব করিতে চলিয়াছে। ভৈরব-মন্ত্রে দীক্ষিত সন্ন্যাসিদল সমস্তদিন স্তবগান করিয়া বেড়াইতেছে। তাহাদের কাহারও হাতে ধূপাধারে ধূপ জ্বলিতেছে, কাহারও হাতে শঙ্খ, কাহারও ঘণ্টা। গানের মাঝে মাঝে তালে তালে ঘণ্টা বাজিতেছে।

গান

জয় ভৈরব, জয় শংকর,
জয় জয় জয় প্রলয়ংকর,
শংকর শংকর।
জয় সংশয়ভেদন,
জয় বন্ধন-ছেদন,
জয় সংকট-সংহর
শংকর শংকর।

[সন্ন্যাসিদল গাহিতে গাহিতে প্রস্থান করিল

পূজার নৈবেদ্য লইয়া একজন বিদেশী পথিকের প্রবেশ

উত্তরকূটের নাগরিককে সে প্রশ্ন করিল

পথিক। আকাশে ওটা কী গড়ে তুলেছে? দেখতে ভয় লাগে।

নাগরিক। জান না? বিদেশী বুঝি? ওটা যন্ত্র।

পথিক। কিসের যন্ত্র?

নাগরিক। আমাদের যন্ত্ররাজ বিভূতি পঁচিশ বছর ধরে যেটা তৈরি করছিল, সেটা ওই তো শেষ হয়েছে, তাই আজ উৎসব।

পথিক। যন্ত্রের কাজটা কী ?

নাগরিক। মুক্তধারা ঝরনাকে বেঁধেছে।

পথিক। বাবা রে। ওটাকে অসুরের মাথার মতো দেখাচ্ছে, মাংস নেই, চোয়াল ঝোলা। তোমাদের উত্তরকূটের শিয়রের কাছে অমন হাঁ করে দাঁড়িয়ে; দিনরাত্তির দেখতে দেখতে তোমাদের প্রাণপুরুষ যে শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাবে।

নাগরিক। আমাদের প্রাণপুরুষ মজবুত আছে, ভাবনা ক'রো না।

পথিক। তা হতে পারে, কিন্তু ওটা অমনতরো সূর্যতারার সামনে মেলে রাখবার জিনিস নয়, ঢাকা দিতে পারলেই ভালো হত। দেখতে পাচ্ছ না যেন দিনরাত্তির সমস্ত আকাশকে রাগিয়ে দিচ্ছে।

নাগরিক। আজ ভৈরবের আরতি দেখতে যাবে না ?

পথিক। দেখব বলেই বেরিয়েছিলুম। প্রতিবৎসরই তো এই সময় আসি, কিন্তু মন্দিরের উপরের আকাশে কখনো এমনতরো বাধা দেখি নি। হঠাৎ ওইটের দিকে তাকিয়ে আজ আমার গা শিউরে উঠল—ও যে অমন করে মন্দিরের মাথা ছাড়িয়ে গেল এটা যেন স্পর্ধার মতো দেখাচ্ছে। দিয়ে আসি নৈবেদ্য, কিন্তু মন প্রসন্ন হচ্ছে না। [প্রস্থান

একজন স্ত্রীলোকের প্রবেশ

একখানি শুভ্র চাদর তাহার মাথা ঘিরিয়া সর্বাঙ্গ ঢাকিয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িতেছে

স্ত্রীলোক। সুমন। আমার সুমন। (নাগরিকের প্রতি) বাবা আমার সুমন এখনও ফিরল না। তোমরা তো সবাই ফিরেছ।

নাগরিক। কে তুমি ?

স্ত্রীলোক। আমি জনাই গাঁয়ের অম্বা। সে যে আমার চোখের আলো, আমার প্রাণের নিশ্বাস, আমার সুমন।

নাগরিক। তার কী হয়েছে বাছা ?

অম্বা। তাকে যে কোথায় নিয়ে গেল। আমি ভৈরবের মন্দিরে পুজো দিতে গিয়েছিলুম—ফিরে এসে দেখি তাকে নিয়ে গেছে।

পথিক। তা হলে মুক্তধারার বাঁধ বাঁধতে তাকে নিয়ে গিয়েছিল।

অম্বা। আমি শুনেছি এই পথ দিয়ে তাকে নিয়ে গেল, ওই গৌরীশিখরের পশ্চিমে—সেখানে আমার দৃষ্টি পৌঁছয় না, তার পরে আর পথ দেখতে পাই নে।

পথিক। কেঁদে কী হবে ? আমরা চলেছি ভৈরবের মন্দিরে আরতি দেখতে। আজ আমাদের বড়ো দিন, তুমিও চলো।

অম্বা। না বাবা, সেদিনও তো ভৈরবের আরতিতে গিয়েছিলুম। তখন থেকে পুজো দিতে যেতে আমার ভয় হয়। দেখো আমি বলি তোমাকে, আমাদের পুজো বাবার কাছে পৌঁছচ্ছে না—পথের থেকে কেড়ে নিচ্ছে।

নাগরিক। কে নিচ্ছে?

অম্বা। যে আমার বুকের থেকে সুমনকে নিয়ে গেল সে। সে যে কে এখনও তো বুঝলুম না। সুমন, আমার সুমন, বাবা সুমন। [উভয়ের প্রস্থান

উত্তরকূটের যুবরাজ অভিজিৎ যন্ত্ররাজ বিভূতির নিকট দূত পাঠাইয়াছেন। বিভূতি যখন মন্দিরের দিকে চলিয়াছে তখন দূতের সহিত তাহার সাক্ষাৎ।

দূত। যন্ত্ররাজ বিভূতি, যুবরাজ আমাকে পাঠিয়ে দিলেন।

বিভূতি। কী তাঁর আদেশ?

দূত। এতকাল ধরে তুমি আমাদের মুক্তধারার ঝরনাকে বাঁধ দিয়ে বাঁধতে লেগেছ। বারবার ভেঙে গেল, কত লোক ধুলোবালি চাপা পড়ল, কত লোক বন্যায় ভেসে গেল। আজ শেষে—

বিভূতি। তাদের প্রাণ দেওয়া ব্যর্থ হয় নি। আমার বাঁধ সম্পূর্ণ হয়েছে।

দূত। শিবতরাইয়ের প্রজারা এখনও এ খবর জানে না। তারা বিশ্বাস করতেই পারে না যে, দেবতা তাদের যে জল দিয়েছেন কোনো মানুষ তা বন্ধ করতে পারে।

বিভূতি। দেবতা তাদের কেবল জলই দিয়েছেন, আমাকে দিয়েছেন জলকে বাঁধবার শক্তি।

দূত। তারা নিশ্চিন্ত আছে, জানে না আর সপ্তাহ পরেই তাদের চাষের খেত—

বিভূতি। চাষের খেতের কথা কী বলছ?

দূত। সেই খেত শুকিয়ে মারাই কি তোমার বাঁধ বাঁধার উদ্দেশ্য ছিল না?

বিভূতি। বালি-পাথর-জলের ষড়যন্ত্র ভেদ করে মানুষের বুদ্ধি হবে জয়ী এই ছিল উদ্দেশ্য। কোন্ চাষির কোন্ ভুট্টার খেত মারা যাবে সে-কথা ভাববার সময় ছিল না।

দূত। যুবরাজ জিজ্ঞাসা করছেন এখনও কি ভাববার সময় হয় নি?

বিভূতি। না, আমি যন্ত্রশক্তির মহিমার কথা ভাবছি।

দূত। ক্ষুধিতের কান্না তোমার সে ভাবনা ভাঙাতে পারবে না?

বিভূতি। না। জলের বেগে আমার বাঁধ ভাঙে না, কান্নার জোরে আমার যন্ত্র টলে না।

দূত। অভিশাপের ভয় নেই তোমার?

বিভূতি। অভিশাপ! দেখো, উত্তরকূটে যখন মজুর পাওয়া যাচ্ছিল না তখন রাজার আদেশে চণ্ডপত্তনের প্রত্যেক ঘর থেকে আঠারো বছরের উপর বয়সের ছেলেকে আমরা আনিয়ে নিয়েছি। তারা তো অনেকেই ফেরে নি। সেখানকার কত মায়ের অভিশাপের উপর আমার যন্ত্র জয়ী হয়েছে। দৈবশক্তির সঙ্গে যার লড়াই, মানুষের অভিশাপকে সে গ্রাহ্য করে?

দূত। যুবরাজ বলছেন কীর্তি গড়ে তোলবার গৌরব তো লাভ হয়েছেই, এখন কীর্তি নিজে ভাঙবার যে আরও বড়ো গৌরব তাই লাভ করো।

বিভূতি। কীর্তি যখন গড়া শেষ হয় নি তখন সে আমার ছিল; এখন সে উত্তরকূটের সকলের। ভাঙবার অধিকার আর আমার নেই।

দূত। যুবরাজ বলছেন ভাঙবার অধিকার তিনিই গ্রহণ করবেন।

বিভূতি। স্বয়ং উত্তরকূটের যুবরাজ এমন কথা বলেন? তিনি কি আমাদেরই নন? তিনি কি শিবতরাইয়ের?

দূত। তিনি বলেন—উত্তরকূটে কেবল যন্ত্রের রাজত্ব নয়, সেখানে দেবতাও আছেন, এই কথা প্রমাণ করা চাই।

বিভূতি। যন্ত্রের জোরে দেবতার পদ নিজেই নেব এই কথা প্রমাণ করবার ভার আমার উপর। যুবরাজকে ব'লো আমার এই বাঁধযন্ত্রের মুঠো একটুও আলগা করতে পারা যায় এমন পথ খোলা রাখি নি।

দূত। ভাঙনের যিনি দেবতা তিনি সব সময় বড়ো পথ দিয়ে চলাচল করেন না। তাঁর জন্যে যে-সব ছিদ্রপথ থাকে সে কারও চোখে পড়ে না।

বিভূতি। (চমকিয়া) ছিদ্র? সে আবার কী? ছিদ্রের কথা তুমি কী জান?

দূত। আমি কি জানি? যাঁর জানবার দরকার তিনি জেনে নেবেন।

[দূতের প্রস্থান

উত্তরকূটের নাগরিকগণ উৎসব করিতে মন্দিরে চলিয়াছে। বিভূতিকে দেখিয়া

১। বাঃ যন্ত্ররাজ, তুমি তো বেশ লোক। কখন ফাঁকি দিয়ে আগে চলে এসেছ টেরও পাই নি।

২। সে তো ওর চিরকালের অভ্যেস। ও কখন ভিতরে ভিতরে এগিয়ে সবাইকে ছাড়িয়ে চলে যায় বোঝাই যায় না। সেই তো আমাদের চবুয়াগাঁয়ের নেড়া বিভূতি, আমাদের একসঙ্গেই কৈলেস-গুরুর কানমলা খেলে, আর কখন সে আমাদের সবাইকে ছাড়িয়ে এসে এতবড়ো কাণ্ডটা করে বসল।

৩। ওরে গবরু, মুড়িটা নিয়ে হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলি কেন ? বিভূতিকে আর কখনো চক্ষে দেখিস নি কি ? মালাগুলো বের কর্, পরিয়ে দিই।

বিভূতি। থাক্ থাক্ আর নয়।

৩। আর নয় তো কী ? যেমন তুমি হঠাৎ মস্ত হয়ে উঠেছ তেমনি তোমার গলাটা যদি উটের মতো হঠাৎ লম্বা হয়ে উঠত আর উত্তরকূটের সব মানুষে মিলে তার উপর তোমার গলায় মালার বোঝা চাপিয়ে দিত তাহলেই ঠিক মানাত।

২। ভাই, হরিশ ঢাকি তো এখনও এসে পৌঁছোল না।

১। বেটা কুঁড়ের সর্দার, ওর পিঠের চামড়ায় ঢাকের চাঁটি লাগালে তবে—

৩। সেটা কাজের কথা নয়। চাঁটি লাগাতে ওর হাত আমাদের চেয়ে মজবুত।

৪। মনে করেছিলুম বিশাই সামন্তের রথটা চেয়ে এনে আজ বিভূতিদাদার রথযাত্রা করাব। কিন্তু রাজাই নাকি আজ পায়ে হেঁটে মন্দিরে যাবেন।

৫। ভালোই হয়েছে। সামন্তের রথের যে দশা, একেবারে দশরথ। পথের মধ্যে কথায় কথায় দশখানা হয়ে পড়ে।

৩। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ। দশরথ। আমাদের লম্বু এক-একটা কথা বলে ভালো। দশরথ।

৫। সাধে বলি। ছেলের বিয়েতে ওই রথটা চেয়ে নিয়েছিলুম। যত চড়েছি তার চেয়ে টেনেছি অনেক বেশি।

৪। এক কাজ কর। বিভূতিকে কাঁধে করে নিয়ে যাই।

বিভূতি। আরে কর কী। কর কী।

৫। না, না, এই তো চাই। উত্তরকূটের কোলে তোমার জন্ম, কিন্তু তুমি আজ তার ঘাড়ে চেপেছ। তোমার মাথা সবাইকে ছাড়িয়ে গিয়েছে।

[কাঁধের উপর লাঠি সাজাইয়া তাহার উপর বিভূতিকে তুলিয়া লইল।

সকলে। জয় যন্ত্ররাজ বিভূতির জয়।

গান

নমো যন্ত্র, নমো যন্ত্র, নমো যন্ত্র, নমো যন্ত্র।
তুমি চক্রমুখরমন্দ্রিত,
তুমি বজ্রবহ্নিবন্দিত,
তব বস্তুবিশ্ববক্ষোদংশ
ধ্বংস-বিকট দন্ত।

তব দীপ্ত অগ্নি শত শতঘ্নী
বিঘ্নবিজয় পন্থ।
তব লৌহগলন শৈলদলন
অচল-চলন মন্ত্র।
কভু কাষ্ঠলোষ্ট্রইষ্টকদৃঢ়
ঘনপিনদ্ধ কায়া,
কভু ভূতল-জল-অন্তরীক্ষ-
লঙ্ঘন লঘুমায়া,
তব খনি-খনিত্র-নখ-বিদীর্ণ
ক্ষিতি বিকীর্ণ-অন্ত্র,
তব পঞ্চভূত-বন্ধনকর
ইন্দ্রজাল তন্ত্র।

[বিভূতিকে লইয়া সকলে প্রস্থান করিল

উত্তরকূটের রাজা রণজিৎ ও তাঁহার মন্ত্রী শিবিরের দিক হইতে আসিয়া প্রবেশ করিলেন

রণজিৎ। শিবতরাইয়ের প্রজাদের কিছুতেই তো বাধ্য করতে পারলে না। এতদিন পরে মুক্তধারার জলকে আয়ত্ত করে বিভূতি ওদের বশ মানাবার উপায় করে দিলে। কিন্তু মন্ত্রী তোমার তো তেমন উৎসাহ দেখছি নে। ঈর্ষা?

মন্ত্রী। ক্ষমা করবেন, মহারাজ। খন্তা-কোদাল হাতে মাটি-পাথরের সঙ্গে পালোয়ানি আমাদের কাজ নয়। রাষ্ট্রনীতি আমাদের অস্ত্র, মানুষের মন নিয়ে আমাদের কারবার। যুবরাজকে শিবতরাইয়ের শাসনভার দেবার মন্ত্রণা আমিই দিয়েছিলুম, তাতে যে বাঁধ বাঁধা হতে পারত সে কম নয়।

রণজিৎ। তাতে ফল হল কী? দুবছর খাজনা বাকি। এমনতরো দুর্ভিক্ষ তো সেখানে বারে বারেই ঘটে, তাই বলে রাজার প্রাপ্য তো বন্ধ হয় না।

মন্ত্রী। খাজনার চেয়ে দুর্মূল্য জিনিস আদায় হচ্ছিল, এমন সময় তাঁকে ফিরে আসতে আদেশ করলেন। রাজকার্যে ছোটোদের অবজ্ঞা করতে নেই। মনে রাখবেন, যখন অসহ্য হয় তখন দুঃখের জোরে ছোটোরা বড়োদের ছাড়িয়ে বড়ো হয়ে ওঠে।

রণজিৎ। তোমার মন্ত্রণার সুর ক্ষণে ক্ষণে বদলায়। কতবার বলেছ উপরে চড়ে বসে নিচে চাপ দেওয়া সহজ, আর বিদেশী প্রজাদের সেই চাপে রাখাই রাজনীতি।— এ-কথা বল নি?

মন্ত্রী। বলেছিলুম। তখন অবস্থা অন্যরকম ছিল, আমার মন্ত্রণা সময়োচিত হয়েছিল। কিন্তু এখন—

রণজিৎ। যুবরাজকে শিবতরাইয়ে পাঠাবার ইচ্ছে আমার একেবারেই ছিল না।

মন্ত্রী। কেন মহারাজ?

রণজিৎ। যে প্রজারা দূরের লোক, তাদের কাছে গিয়ে ঘেঁষাঘেঁষি করলে তাদের ভয় ভেঙে যায়। প্রীতি দিয়ে পাওয়া যায় আপন লোককে, পরকে পাওয়া যায় ভয় জাগিয়ে রেখে।

মন্ত্রী। মহারাজ, যুবরাজকে শিবতরাইয়ে পাঠাবার আসল কারণটা ভুলছেন। কিছুদিন থেকে তাঁর মন অত্যন্ত উতলা দেখা গিয়েছিল। আমাদের সন্দেহ হল যে, তিনি হয়তো কোনো সূত্রে জানতে পেরেছেন যে তাঁর জন্ম রাজবাড়িতে নয়, তাঁকে মুক্তধারার ঝরনাতলা থেকে কুড়িয়ে পাওয়া গেছে। তাই তাঁকে ভুলিয়ে রাখবার জন্যে—

রণজিৎ। তা তো জানি—ইদানীং ও যে প্রায় রাত্রে একলা ঝরনাতলায় গিয়ে শুয়ে থাকত। খবর পেয়ে একদিন রাত্রে সেখানে গেলুম, ওকে জিজ্ঞাসা করলুম, "কী হয়েছে অভিজিৎ, এখানে কেন?" ও বললে, "এই জলের শব্দে আমি আমার মাতৃভাষা শুনতে পাই।"

মন্ত্রী। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম, "তোমার কী হয়েছে যুবরাজ? রাজবাড়িতে আজকাল তোমাকে প্রায় দেখতে পাই নে কেন?" তিনি বললেন, "আমি পৃথিবীতে এসেছি পথ কাটবার জন্যে, এই খবর আমার কাছে এসে পৌঁছেছে।"

রণজিৎ। ওই ছেলের যে রাজচক্রবর্তীর লক্ষণ আছে এ বিশ্বাস আমার ভেঙে যাচ্ছে।

মন্ত্রী। যিনি এই দৈবলক্ষণের কথা বলেছিলেন তিনি যে মহারাজের গুরুর গুরু অভিরামস্বামী।

রণজিৎ। ভুল করেছেন তিনি। ওকে নিয়ে কেবলই আমার ক্ষতি হচ্ছে। শিবতরাইয়ের পশম যাতে বিদেশের হাটে বেরিয়ে না যায় এইজন্যে পিতামহদের আমল থেকে নন্দিসংকটের পথ আটক করা আছে। সেই পথটাই অভিজিৎ কেটে দিলে। উত্তরকূটের অন্নবস্ত্র দুর্মূল্য হয়ে উঠবে যে।

মন্ত্রী। অল্প বয়স কিনা। যুবরাজ কেবল শিবতরাইয়ের দিক থেকেই—

রণজিৎ। কিন্তু এ যে নিজের লোকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। শিবতরাইয়ের ওই যে ধনঞ্জয় বৈরাগীটা প্রজাদের খেপিয়ে বেড়ায়, এর মধ্যে নিশ্চয় সেও আছে। এবার কণ্ঠিসুদ্ধ তার কণ্ঠটা চেপে ধরতে হবে। তাকে বন্দী করা চাই।

মন্ত্রী। মহারাজের ইচ্ছায় প্রতিবাদ করতে সাহস করি নে। কিন্তু জানেন তো এমন সব দুর্যোগ আছে যাকে আটকে রাখার চেয়ে ছাড়া রাখাই নিরাপদ।

রণজিৎ। আচ্ছা সেজন্যে চিন্তা ক'রো না।

মন্ত্রী। আমি চিন্তা করি না, মহারাজকেই চিন্তা করতে বলি।

প্রতিহারীর প্রবেশ

প্রতিহারী। মোহনগড়ের খুড়া মহারাজ বিশ্বজিৎ অদূরে। [প্রস্থান

রণজিৎ। ওই আর-একজন। অভিজিৎকে নষ্ট করার দলে উনি অগ্রগণ্য। আত্মীয়রূপী পর হচ্ছে কুঁজো মানুষের কুঁজ, পিছনে লেগেই থাকে, কেটেও ফেলা যায় না, বহন করাও দুঃখ।—ও কিসের শব্দ?

মন্ত্রী। ভৈরবপন্থীর দল মন্দির প্রদক্ষিণে বেরিয়েছে।

ভৈরবপন্থীদের প্রবেশ ও গান

তিমির-হৃদবিদারণ
জলদগ্নি-নিদারুণ,
মরুশ্মশান-সঞ্চর,
শংকর শংকর।
বজ্রঘোষ-বাণী,
রুদ্র, শূলপাণি,
মৃত্যুসিন্ধু-সন্তর,
শংকর শংকর। [প্রস্থান

রণজিতের খুড়া মোহনগড়ের রাজা বিশ্বজিৎ প্রবেশ করিলেন

তাঁর শুভ্র কেশ, শুভ্র বস্ত্র, শুভ্র উষ্ণীষ

রণজিৎ। প্রণাম। খুড়া মহারাজ, তুমি আজ উত্তরভৈরবের মন্দিরে পূজায় যোগ দিতে আসবে এ সৌভাগ্য প্রত্যাশা করি নি।

বিশ্বজিৎ। উত্তরভৈরব আজকের পূজা গ্রহণ করবেন না এই কথা জানাতে এসেছি।

রণজিৎ। তোমার এই দুর্বাক্য আমাদের মহোৎসবকে আজ—

বিশ্বজিৎ। কী নিয়ে মহোৎসব? বিশ্বের সকল তৃষিতের জন্যে দেবদেবের কমণ্ডলু যে জলধারা ঢেলে দিচ্ছেন সেই মুক্ত জলকে তোমরা বন্ধ করলে কেন?

রণজিৎ। শত্রু দমনের জন্যে।

বিশ্বজিৎ। মহাদেবকে শত্রু করতে ভয় নেই?

রণজিৎ। যিনি উত্তরকূটের পুরদেবতা, আমাদের জয়ে তাঁরই জয়। সেইজন্যেই আমাদের পক্ষ নিয়ে তিনি তাঁর নিজের দান ফিরিয়ে নিয়েছেন। তৃষ্ণার শূলে শিবতরাইকে বিদ্ধ করে তাকে তিনি উত্তরকূটের সিংহাসনের তলায় ফেলে দিয়ে যাবেন।

বিশ্বজিৎ। তবে তোমাদের পূজা পূজাই নয়, বেতন।

রণজিৎ। খুড়া মহারাজ, তুমি পরের পক্ষপাতী, আত্মীয়ের বিরোধী। তোমার শিক্ষাতেই অভিজিৎ নিজের রাজ্যকে নিজের বলে গ্রহণ করতে পারছে না।

বিশ্বজিৎ। আমার শিক্ষায়? একদিন আমি তোমাদেরই দলে ছিলেম না? চণ্ডপত্তনে যখন তুমি বিদ্রোহ সৃষ্টি করেছিলে সেখানকার প্রজার সর্বনাশ করে সে বিদ্রোহ আমি দমন করি নি? শেষে কখন ওই বালক অভিজিৎ আমার হৃদয়ের মধ্যে এল— আলোর মতো এল। অন্ধকারে না দেখতে পেয়ে যাদের আঘাত করেছিলুম তাদের আপন বলে দেখতে পেলুম। রাজচক্রবর্তীর লক্ষণ দেখে যাকে গ্রহণ করলে তাকে তোমার ওই উত্তরকূটের সিংহাসনটুকুর মধ্যেই আটকে রাখতে চাও?

রণজিৎ। মুক্তধারার ঝরনাতলায় অভিজিৎকে কুড়িয়ে পাওয়া গিয়েছিল এ-কথা তুমিই ওর কাছে প্রকাশ করেছ বুঝি?

বিশ্বজিৎ। হাঁ, আমিই। সেদিন আমাদের প্রাসাদে ওর দেয়ালির নিমন্ত্রণ ছিল। গোধূলির সময় দেখি অলিন্দে ও একলা দাঁড়িয়ে গৌরীশিখরের দিকে তাকিয়ে আছে। জিজ্ঞাসা করলুম, "কী দেখছ, ভাই?" সে বললে, "যে-সব পথ এখনও কাটা হয় নি ওই দুর্গম পাহাড়ের উপর দিয়ে সেই ভাবীকালের পথ দেখতে পাচ্ছি—দূরকে নিকট করবার পথ।" শুনে তখনই মনে হল, মুক্তধারার উৎসের কাছে কোন্ ঘরছাড়া মা ওকে জন্ম দিয়ে গেছে, ওকে ধরে রাখবে কে? আর থাকতে পারলুম না, ওকে বললুম, "ভাই, তোমার জন্মক্ষণে গিরিরাজ তোমাকে পথে অভ্যর্থনা করেছেন,—ঘরের শঙ্খ তোমাকে ঘরে ডাকে নি।"

রণজিৎ। এতক্ষণে বুঝলুম।

বিশ্বজিৎ। কী বুঝলে?

রণজিৎ। এই কথা শুনেই উত্তরকূটের রাজগৃহ থেকে অভিজিতের মমতা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। সেইটেই স্পর্ধা করে দেখাবার জন্যে নন্দিসংকটের পথ সে খুলে দিয়েছে।

বিশ্বজিৎ। ক্ষতি কী হয়েছে? যে পথ খুলে যায় সে পথ সকলেরই—যেমন উত্তরকূটের তেমনি শিবতরাইয়ের।

রণজিৎ। খুড়া মহারাজ, তুমি আত্মীয়, গুরুজন, তাই এতকাল ধৈর্য রেখেছি। কিন্তু আর নয়, স্বজনবিদ্রোহী তুমি, এ রাজ্য ত্যাগ করে যাও।

বিশ্বজিৎ। আমি ত্যাগ করতে পারব না। তোমরা আমাকে ত্যাগ যদি কর তবে সহ্য করব। [প্রস্থান

অম্বার প্রবেশ

অম্বা। (রাজার প্রতি) ওগো তোমরা কে? সূর্য তো অস্ত যায়—আমার সুমন তো এখনও ফিরল না।

রণজিৎ। তুমি কে?

অম্বা। আমি কেউ না। যে আমার সব ছিল তাকে এই পথ দিয়ে নিয়ে গেল। এ পথের শেষ কি নেই? সুমন কি তবে এখনও চলেছে, কেবলই চলেছে, পশ্চিমে গৌরীশিখর পেরিয়ে যেখানে সূর্য ডুবছে, আলো ডুবছে, সব ডুবছে?

রণজিৎ। মন্ত্রী, এ বুঝি—

মন্ত্রী। হাঁ মহারাজ, সেই বাঁধ বাঁধার কাজেই—

রণজিৎ। (অম্বাকে) তুমি খেদ ক'রো না। আমি জানি, পৃথিবীতে সকলের চেয়ে চরম যে দান তোমার ছেলে আজ তাই পেয়েছে।

অম্বা। তাই যদি সত্যি হবে তাহলে সে-দান সন্ধ্যেবেলায় সে আমার হাতে এনে দিত, আমি যে তার মা।

রণজিৎ। দেবে এনে। সেই সন্ধ্যে এখনও আসে নি।

অম্বা। তোমার কথা সত্যি হ'ক, বাবা। ভৈরবমন্দিরের পথে পথে আমি তার জন্যে অপেক্ষা করব। সুমন। [প্রস্থান

একদল ছাত্র লইয়া অদূরে গাছের তলায় উত্তরকূটের গুরুমশায় প্রবেশ করিল

গুরু। খেলে, খেলে, বেত খেলে দেখছি। খুব গলা ছেড়ে বল্, জয় রাজরাজেশ্বর।

ছাত্রগণ। জয় রাজরা—

গুরু। (হাতের কাছে দুই একটা ছেলেকে থাবড়া মারিয়া)—জেশ্বর।

ছাত্রগণ। জেশ্বর।

গুরু। শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী—

ছাত্রগণ। শ্রী শ্রী শ্রী—

গুরু। (ঠেলা মারিয়া) পাঁচবার।

ছাত্রগণ। পাঁচবার।

গুরু। লক্ষ্মীছাড়া বাঁদর। বল্ শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী—

ছাত্রগণ। শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী—

গুরু। উত্তরকূটাধিপতির জয়—

ছাত্রগণ। উত্তরকূটা—

গুরু। —ধিপতির

ছাত্রগণ। ধিপতির

গুরু। জয়।

ছাত্রগণ। জয়।

রণজিৎ। তোমরা কোথায় যাচ্ছ?

গুরু। আমাদের যন্ত্ররাজ বিভূতিকে মহারাজ শিরোপা দেবেন তাই ছেলেদের নিয়ে যাচ্ছি আনন্দ করতে। যাতে উত্তরকূটের গৌরবে এরা শিশুকাল হতেই গৌরব করতে শেখে তার কোনো উপলক্ষ্যই বাদ দিতে চাই নে।

রণজিৎ। বিভূতি কি করেছে এরা সবাই জানে তো?

ছেলেরা। (লাফাইয়া হাততালি দিয়া) জানি, শিবতরাইয়ের খাবার জল বন্ধ করে দিয়েছেন।

রণজিৎ। কেন দিয়েছেন?

ছেলেরা। (উৎসাহে) ওদের জব্দ করার জন্যে।

রণজিৎ। কেন জব্দ করা?

ছেলেরা। ওরা যে খারাপ লোক।

রণজিৎ। কেন খারাপ?

ছেলেরা। ওরা খুব খারাপ, ভয়ানক খারাপ, সবাই জানে।

রণজিৎ। কেন খারাপ তা জান না?

গুরু। জানে বই কি, মহারাজ। কী রে, তোরা পড়িস নি—বইয়ে পড়িস নি—ওদের ধর্ম খুব খারাপ—

ছেলেরা। হাঁ, হাঁ, ওদের ধর্ম খুব খারাপ।

গুরু। আর ওরা আমাদের মতো—কী বল্ না—(নাক দেখাইয়া)

ছেলেরা। নাক উঁচু নয়।

গুরু। আচ্ছা, আমাদের গণাচার্য কী প্রমাণ করে দিয়েছেন—নাক উঁচু থাকলে কী হয়?

ছেলেরা। খুব বড়ো জাত হয়।

গুরু। তারা কী করে? বল্ না—পৃথিবীতে—বল্—তারাই সকলের উপর জয়ী হয়, না?

ছেলেরা। হাঁ, জয়ী হয়।

গুরু। উত্তরকূটের মানুষ কোনোদিন যুদ্ধে হেরেছে জানিস?

ছেলেরা। কোনোদিনই না।

গুরু। আমাদের পিতামহ-মহারাজ প্রাগ্‌জিৎ দু-শ তিরেনব্বই জন সৈন্য নিয়ে একত্রিশ হাজার সাড়ে সাত-শ দক্ষিণী বর্বরদের হটিয়ে দিয়েছিলেন না?

ছেলেরা। হাঁ দিয়েছিলেন।

গুরু। নিশ্চয়ই জানবেন, মহারাজ, উত্তরকূটের বাইরে যে হতভাগারা মাতৃগর্ভে জন্মায়, একদিন এইসব ছেলেরাই তাদের বিভীষিকা হয়ে উঠবে। এ যদি না হয় তবে আমি মিথ্যে গুরু। কতবড়ো দায়িত্ব যে আমাদের সে আমি একদণ্ডও ভুলি নে। আমরাই তো মানুষ তৈরি করে দিই, আপনার অমাত্যরা তাঁদের নিয়ে ব্যবহার করেন। অথচ তাঁরাই বা কী পান আর আমরাই বা কী পাই তুলনা করে দেখবেন।

মন্ত্রী। কিন্তু ওই ছাত্ররাই যে তোমাদের পুরস্কার।

গুরু। বড়ো সুন্দর বলেছেন, মন্ত্রীমশায়, ছাত্ররাই আমাদের পুরস্কার। আহা, কিন্তু খাদ্যসামগ্রী বড়ো দুর্মূল্য—এই দেখেন না কেন, গব্যঘৃত, যেটা ছিল—

মন্ত্রী। আচ্ছা বেশ, তোমার এই গব্যঘৃতের কথাটা চিন্তা করব। এখন যাও, পূজার সময় নিকট হল।

[জয়ধ্বনি করাইয়া ছাত্রদের লইয়া গুরুমশায় প্রস্থান করিল।

রণজিৎ। তোমার এই গুরুর মাথার খুলির মধ্যে অন্য কোনো ঘৃত নেই, গব্যঘৃতই আছে।

মন্ত্রী। পঞ্চগব্যের একটা কিছু আছেই। কিন্তু, মহারাজ, এইসব মানুষই কাজে লাগে। ওকে যেমনটি বলে দেওয়া গেছে, দিনের পর দিন ও ঠিক তেমনিটি করে চলেছে। বুদ্ধি বেশি থাকলে কাজ কলের মতো চলে না।

রণজিৎ। মন্ত্রী, ওটা কী, আকাশে?

মন্ত্রী। মহারাজ, ভুলে যাচ্ছেন, ওটাই তো বিভূতির সেই যন্ত্রের চূড়া।

রণজিৎ। এমন স্পষ্ট তো কোনোদিন দেখা যায় না।

মন্ত্রী। আজ সকালে ঝড় হয়ে আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেছে, তাই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

রণজিৎ। দেখেছ, ওর পিছন থেকে সূর্য যেন ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছেন। আর ওটাকে দানবের উদ্যত মুষ্টির মতো দেখাচ্ছে। অতটা বেশি উঁচু করে তোলা ভালো হয় নি।

মন্ত্রী। আমাদের আকাশের বুকে যেন শেল বিঁধে রয়েছে মনে হচ্ছে।

রণজিৎ। এখন মন্দিরে যাবার সময় হল। [উভয়ের প্রস্থান

উত্তরকূটের দ্বিতীয়দল নাগরিকের প্রবেশ

১। দেখলি তো, আজকাল বিভূতি আমাদের কী রকম এড়িয়ে এড়িয়ে চলে। ও যে আমাদের মধ্যেই মানুষ সে কথাটাকে চামড়ার থেকে ঘষে ফেলতে চায়। একদিন বুঝতে পারবেন খাপের চেয়ে তলোয়ার বড়ো হয়ে উঠলে ভালো হয় না।

২। তা যা বলিস, ভাই, বিভূতি উত্তরকূটের নাম রেখেছে বটে।

১। আরে রেখে দে, তোরা ওকে নিয়ে বড়ো বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেছিস। ওই যে বাঁধটি বাঁধতে ওর জিব বেরিয়ে পড়েছে ওটা কিছু না হবে তো দশবার ভেঙেছে।

৩। আবার যে ভাঙবে না তাই বা কে জানে?

১। দেখেছিস তো বাঁধের উত্তর দিকের সেই ঢিবিটা?

২। কেন, কেন, কী হয়েছে?

১। কী হয়েছে? এটা জানিস নে? যে দেখছে সেই তো বলছে—

২। কী বলছে ভাই?

১। কী বলছে? ন্যাকা নাকি রে? এও আবার জিগ্‌গেস করতে হয় নাকি? আগাগোড়াই—সে আর কী বলব।

২। তবু ব্যাপারটা কী একটু বুঝিয়ে বল্ না—

১। রঞ্জন, তুই অবাক করলি। একটু সবুর কর্ না, পষ্ট বুঝবি হঠাৎ যখন একেবারে—

২। সর্বনাশ। বলিস কী দাদা? হঠাৎ একেবারে?

১। হাঁ ভাই, ঝগড়ুর কাছে শুনে নিস। সে নিজে মেপে জুখে দেখে এসেছে।

২। ঝগড়ুর ওই গুণটি আছে, ওর মাথা ঠাণ্ডা। সবাই যখন বাহবা দিতে থাকে, ও তখন কোথা থেকে মাপকাটি বের করে বসে।

৩। আচ্ছা ভাই, কেউ কেউ যে বলে বিভূতির যা কিছু বিদ্যে সব—

১। আমি নিজে জানি বেঙ্কটবর্মার কাছ থেকে চুরি। হাঁ, সে ছিল বটে গুণীর মতো গুণী—কত বড়ো মাথা—ওরে বাস রে! অথচ বিভূতি পায় শিরোপা, আর সে গরিব না খেতে পেয়েই মারা গেল।

৩। শুধুই কি না খেতে পেয়ে ?

১। আরে না খেতে পেয়ে কি কার হাতের দেওয়া কী খেতে পেয়ে সে কথায় কাজ কী ? আবার কে কোন্ দিক থেকে—নিন্দুকের তো অভাব নেই। এ দেশের মানুষ যে কেউ কারও ভালো সইতে পারে না।

২। তা তোরা যাই বলিস লোকটা কিন্তু—

১। আহা, তা হবে না কেন ? কোন্ মাটিতে ওর জন্ম, বুঝে দেখ্ ওই চবুয়া গাঁয়ে আমার বুড়ো দাদা ছিল, তার নাম শুনেছিস তো ?

২। আরে বাস রে ! তাঁর নাম উত্তরকূটের কে না জানে ? তিনি তো সেই—ওই যে কী বলে—

১। হাঁ, হাঁ, ভাস্কর। নস্যি তৈরি করার এত বড়ো ওস্তাদ এ মুল্লুকে হয় নি। তাঁর হাতের নস্যি না হলে রাজা শত্রুজিতের একদিনও চলত না।

৩। সে সব কথা হবে, এখন মন্দিরে চল্। আমরা হলুম বিভূতির এক গাঁয়ের লোক—আমাদের হাতের মালা আগে নিয়ে তবে অন্য কথা। আর আমরাই তো বসব তার ডাইনে।

নেপথ্যে। যেয়ো না ভাই, যেয়ো না, ফিরে যাও।

২। ওই শোনো বটুক বুড়ো বেরিয়েছে।

বটুকের প্রবেশ

গায়ে ছেঁড়া কম্বল, হাতে বাঁকা ডালের লাঠি, চুল উস্কোখুস্কো

১। কী বটু, যাচ্ছ কোথায় ?

বটু। সাবধান, বাবা, সাবধান। যেয়ো না ও পথে, সময় থাকতে ফিরে যাও।

২। কেন বলো তো ?

বটু। বলি দেবে, নরবলি। আমার দুই জোয়ান নাতিকে জোর করে নিয়ে গেল, আর তারা ফিরল না।

৩। বলি কার কাছে দেবে, খুড়ো ?

বটু। তৃষ্ণা, তৃষ্ণা দানবীর কাছে।

২। সে আবার কে ?

বটু। সে যত খায় তত চায়—তার শুক রসনা ঘি-খাওয়া আগুনের শিখার মতো কেবলই বেড়ে চলে।

১। পাগলা! আমরা তো যাচ্ছি উত্তর-ভৈরবের মন্দিরে, সেখানে তৃষ্ণা দানবী কোথায়?

বটু। খবর পাও নি? ভৈরবকে যে আজ ওরা মন্দির থেকে বিদায় করতে চলেছে। তৃষ্ণা বসবে বেদীতে।

২। চুপ চুপ পাগলা। এসব কথা শুনলে উত্তরকূটের মানুষ তোকে কুটে ফেলবে।

বটু। তারা তো আমার গায়ে ধুলো দিচ্ছে, ছেলেরা মারছে ঢেলা। সবাই বলে তোর নাতি দুটো প্রাণ দিয়েছে সে তাদের সৌভাগ্য।

১। তারা তো মিথ্যে বলে না।

বটু। বলে না মিথ্যে? প্রাণের বদলে প্রাণ যদি না মেলে, মৃত্যু দিয়ে যদি মৃত্যুকেই ডাকা হয়, তবে ভৈরব এত বড়ো ক্ষতি সইবেন কেন? সাবধান, বাবা, সাবধান, যেয়ো না ও পথে। [প্রস্থান

২। দেখো, দাদা, আমার গায়ে কিন্তু কাঁটা দিয়ে উঠছে।

১। মধু, তুই বেজায় ভীতু। চল্‌ চল্‌। [সকলের প্রস্থান

যুবরাজ অভিজিৎ ও রাজকুমার সঞ্জয়ের প্রবেশ

সঞ্জয়। বুঝতে পারছি নে, যুবরাজ, রাজবাড়ি ছেড়ে কেন বেরিয়ে যাচ্ছ?

অভিজিৎ। সব কথা তুমি বুঝবে না। আমার জীবনের স্রোত রাজবাড়ির পাথর ডিঙিয়ে চলে যাবে এই কথাটা কানে নিয়েই পৃথিবীতে এসেছি।

সঞ্জয়। কিছু দিন থেকেই তোমাকে উতলা দেখছি। আমাদের সঙ্গে তুমি যে বাঁধনে বাঁধা সেটা তোমার মনের মধ্যে আলগা হয়ে আসছিল। আজ কি সেটা ছিঁড়ল।

অভিজিৎ। ওই দেখো সঞ্জয়, গৌরীশিখরের উপর সূর্যাস্তের মূর্তি। কোন্‌ আগুনের পাখি মেঘের ডানা মেলে রাত্রির দিকে উড়ে চলেছে। আমার এই পথযাত্রার ছবি অস্তসূর্য আকাশে এঁকে দিলে।

সঞ্জয়। দেখছ না, যুবরাজ, ওই যন্ত্রের চূড়াটা সূর্যাস্ত-মেঘের বুক ফুঁড়ে দাঁড়িয়ে আছে। যেন উড়ন্ত পাখির বুকে বাণ বিঁধেছে, সে তার ডানা ঝুলিয়ে রাত্রির গহ্বরের দিকে পড়ে যাচ্ছে। আমার এ ভালো লাগছে না। এখন বিশ্রামের সময় এল। চলো, যুবরাজ, রাজবাড়িতে।

অভিজিৎ। যেখানে বাধা সেখানে কি বিশ্রাম আছে?

সঞ্জয়। রাজবাড়িতে যে তোমার বাধা, এতদিন পরে সে কথা তুমি কি করে বুঝলে?

অভিজিৎ। বুঝলুম, যখন শোনা গেল মুক্তধারায় ওরা বাঁধ বেঁধেছে।

সঞ্জয়। তোমার এ কথার অর্থ আমি পাই নে।

অভিজিৎ। মানুষের ভিতরকার রহস্য বিধাতা বাইরের কোথাও না কোথাও লিখে রেখে দেন; আমার অন্তরের কথা আছে ওই মুক্তধারার মধ্যে। তারই পায়ে ওরা যখন লোহার বেড়ি পরিয়ে দিলে তখন হঠাৎ যেন চমক ভেঙে বুঝতে পারলুম উত্তরকূটের সিংহাসনই আমার জীবন-স্রোতের বাঁধ। পথে বেরিয়েছি তারই পথ খুলে দেবার জন্যে।

সঞ্জয়। যুবরাজ, আমাকেও তোমার সঙ্গী করে নাও।

অভিজিৎ। না ভাই, নিজের পথ তোমাকে খুঁজে বের করতে হবে। আমার পিছনে যদি চল তাহলে আমিই তোমার পথকে আড়াল করব।

সঞ্জয়। তুমি অত কঠোর হ'য়ো না, আমাকে বাজছে।

অভিজিৎ। তুমি আমার হৃদয় জান, সেইজন্যে আঘাত পেয়েও তুমি আমাকে বুঝবে।

সঞ্জয়। কোথায় তোমার ডাক পড়েছে তুমি চলেছ, তা নিয়ে আমি প্রশ্ন করতে চাই নে। কিন্তু যুবরাজ, এই যে সন্ধ্যে হয়ে এসেছে, রাজবাড়িতে ওই যে বন্দীরা দিনাবসানের গান ধরলে, এরও কি কোনো ডাক নেই? যা কঠিন তার গৌরব থাকতে পারে, কিন্তু যা মধুর তারও মূল্য আছে।

অভিজিৎ। ভাই, তারই মূল্য দেবার জন্যেই কঠিনের সাধনা।

সঞ্জয়। সকালে যে আসনে তুমি পূজায় বস, মনে আছে তো সেদিন তার সামনে একটি শ্বেত পদ্ম দেখে তুমি অবাক হয়েছিলে? তুমি জাগবার আগেই কোন্ ভোরে ওই পদ্মটি লুকিয়ে কে তুলে এনেছে, জানতে দেয় নি সে কে—কিন্তু এইটুকুর মধ্যে কত সুধাই আছে সে কথা কি আজ মনে করবার নেই? সেই ভীরু, যে আপনাকে গোপন করেছে, কিন্তু আপনার পূজা গোপন করতে পারে নি, তার মুখ তোমার মনে পড়ছে না?

অভিজিৎ। পড়ছে বই কি। সেইজন্যেই সইতে পারছি নে ওই বীভৎসটাকে যা এই ধরণীর সংগীত রোধ করে দিয়ে আকাশে লোহার দাঁত মেলে অট্টহাস্য করছে। স্বর্গকে ভালো লেগেছে বলেই দৈত্যের সঙ্গে লড়াই করতে যেতে দ্বিধা করি নে।

সঞ্জয়। গোধূলির আলোটি ওই নীল পাহাড়ের উপরে মূর্ছিত হয়ে রয়েছে এর মধ্যে দিয়ে একটা কান্নার মূর্তি তোমার হৃদয়ে এসে পৌঁছচ্ছে না?

অভিজিৎ। হাঁ, পৌঁছচ্ছে। আমারও বুক কান্নায় ভরে রয়েছে। আমি কঠোরতার অভিমান রাখি নে।—চেয়ে দেখো ওই পাখি দেবদারু-গাছের চূড়ার ডালটির উপর একলা বসে আছে; ও কি নীড়ে যাবে, না, অন্ধকারের ভিতর দিয়ে দূর প্রবাসের অরণ্যে

যাত্রা করবে জানি নে ; কিন্তু ও যে এই সূর্যাস্তের আকাশের দিকে চুপ করে চেয়ে আছে সেই চেয়ে থাকার সুরটি আমার হৃদয়ে এসে বাজছে, সুন্দর এই পৃথিবী। যা কিছু আমার জীবনকে মধুময় করেছে সে সমস্তকেই আজ আমি নমস্কার করি।

বটুর প্রবেশ

বটু। যেতে দিলে না, মেরে ফিরিয়ে দিলে।

অভিজিৎ। কি হয়েছে, বটু, তোমার কপাল ফেটে রক্ত পড়ছে যে।

বটু। আমি সকলকে সাবধান করতে বেরিয়েছিলুম, বলছিলুম, "যেয়ো না ও পথে, ফিরে যাও।"

অভিজিৎ। কেন, কী হয়েছে ?

বটু। জান না, যুবরাজ ? ওরা যে আজ যন্ত্রবেদীর উপর তৃষ্ণারাক্ষসীর প্রতিষ্ঠা করবে। মানুষ-বলি চায়।

সঞ্জয়। সে কী কথা ?

বটু। সেই বেদী গাঁথবার সময় আমার দুই নাতির রক্ত ঢেলে দিয়েছে। মনে করেছিলুম পাপের বেদী আপনি ভেঙে পড়ে যাবে। কিন্তু এখনও তো ভাঙল না, ভৈরব তো জাগলেন না।

অভিজিৎ। ভাঙবে। সময় এসেছে।

বটু। (কাছে আসিয়া চুপে চুপে) তবে শুনেছ বুঝি ? ভৈরবের আহ্বান শুনেছ ?

অভিজিৎ। শুনেছি।

বটু। সর্বনাশ। তবে তো তোমার নিষ্কৃতি নেই।

অভিজিৎ। না, নেই।

বটু। এই দেখছ না, আমার মাথা দিয়ে রক্ত পড়ছে, সর্বাঙ্গে ধুলো। সইতে পারবে কি, যুবরাজ, যখন বক্ষ বিদীর্ণ হয়ে যাবে!

অভিজিৎ। ভৈরবের প্রসাদে সইতে পারব।

বটু। চারিদিকে সবাই যখন শত্রু হবে ? আপন লোক যখন ধিক্‌কার দেবে ?

অভিজিৎ। সইতেই হবে।

বটু। তাহলে ভয় নেই ?

অভিজিৎ। না ভয় নেই।

বটু। বেশ বেশ। তাহলে বটুকে মনে রেখো। আমিও ওই পথে। ভৈরব আমার কপালে এই যে রক্ততিলক এঁকে দিয়েছেন তার থেকে অন্ধকারেও আমাকে চিনতে পারবে। [বটুর প্রস্থান

রাজপ্রহরী উদ্ধবের প্রবেশ

উদ্ধব। নন্দিসংকটের পথ কেন খুলে দিলে যুবরাজ?

অভিজিৎ। শিবতরাইয়ের লোকদের নিত্যদুর্ভিক্ষ থেকে বাঁচাবার জন্যে।

উদ্ধব। মহারাজ তো তাদের সাহায্যের জন্যে প্রস্তুত, তাঁর তো দয়ামায়া আছে।

অভিজিৎ। ডান-হাতের কার্পণ্য দিয়ে পথ বন্ধ করে বাঁ-হাতের বদান্যতায় বাঁচানো যায় না। তাই ওদের অন্ন-চলাচলের পথ খুলে দিয়েছি। দয়ার উপর নির্ভর করার দীনতা আমি দেখতে পারি নে।

উদ্ধব। মহারাজ বলেন, নন্দিসংকটের গড় ভেঙে দিয়ে তুমি উত্তরকূটের ভোজন-পাত্রের তলা খসিয়ে দিয়েছ।

অভিজিৎ। চিরদিন শিবতরাইয়ের অন্নজীবী হয়ে থাকবার দুর্গতি থেকে উত্তরকূটকে মুক্তি দিয়েছি।

উদ্ধব। দুঃসাহসের কাজ করেছ। মহারাজ খবর পেয়েছেন এর বেশি আর কিছু বলতে পারব না। যদি পার তো এখনই চলে যাও। পথে দাঁড়িয়ে তোমার সঙ্গে কথা কওয়াও নিরাপদ নয়। [উদ্ধবের প্রস্থান

অম্বার প্রবেশ

অম্বা। সুমন। বাবা সুমন। যে পথ দিয়ে তাকে নিয়ে গেল সে পথ দিয়ে তোমরা কি কেউ যাও নি?

অভিজিৎ। তোমার ছেলেকে নিয়ে গেছে?

অম্বা। হাঁ, ওই পশ্চিমে, যেখানে সূর্যি ডোবে, যেখানে দিন ফুরোয়।

অভিজিৎ। ওই পথেই আমি যাব।

অম্বা। তাহলে দুঃখিনীর একটা কথা রেখো—যখন তার দেখা পাবে, ব'লো মা তার জন্যে পথ চেয়ে আছে।

অভিজিৎ। বলব।

অম্বা। বাবা, তুমি চিরজীবী হও। সুমন, আমার সুমন। [প্রস্থান

ভৈরবপন্থীদের প্রবেশ

গান

জয় ভৈরব, জয় শংকর,
জয় জয় জয় প্রলয়ংকর।
জয় সংশয়-ভেদন জয় বন্ধন-ছেদন
জয় সংকট-সংহর,
শংকর, শংকর। [প্রস্থান

সেনাপতি বিজয়পালের প্রবেশ

বিজয়পাল। যুবরাজ, রাজকুমার, আমার বিনীত অভিবাদন গ্রহণ করুন। মহারাজের কাছ থেকে আসছি।

অভিজিৎ। কী তাঁর আদেশ?

বিজয়পাল। গোপনে বলব।

সঞ্জয়। (অভিজিতের হাত চাপিয়া ধরিয়া) গোপন কেন? আমার কাছেও গোপন?

বিজয়পাল। সেই তো আদেশ। যুবরাজ একবার রাজশিবিরে পদার্পণ করুন।

সঞ্জয়। আমিও সঙ্গে যাব।

বিজয়পাল। মহারাজ তা ইচ্ছা করেন না।

সঞ্জয়। আমি তবে এই পথেই অপেক্ষা করব।

[অভিজিৎকে লইয়া বিজয়পাল শিবিরের দিকে প্রস্থান করিল

বাউলের প্রবেশ

গান

ও তো আর ফিরবে না রে, ফিরবে না আর, ফিরবে না রে।
ঝড়ের মুখে ভাসল তরী
কূলে আর ভিড়বে না রে।
কোন্ পাগলে নিল ডেকে,
কাঁদন গেল পিছে রেখে,
ওকে তোর বাহুর বাঁধন ঘিরবে না রে। [প্রস্থান

ফুলওয়ালীর প্রবেশ

ফুলওয়ালী। বাবা, উত্তরকূটের বিভূতি মানুষটি কে?

সঞ্জয়। কেন, তাকে তোমার কী প্রয়োজন?

ফুলওয়ালী। আমি বিদেশী, দেওতলি থেকে আসছি। শুনেছি উত্তরকূটের সবাই তাঁর পথে পথে পুষ্পবৃষ্টি করছে। সাধুপুরুষ বুঝি? বাবার দর্শন করব বলে নিজের মালঞ্চের ফুল এনেছি।

সঞ্জয়। সাধুপুরুষ না হ'ক, বুদ্ধিমান পুরুষ বটে।

ফুলওয়ালী। কী কাজ করেছেন তিনি?

সঞ্জয়। আমাদের ঝরনাটাকে বেঁধেছেন।

ফুলওয়ালী। তাই পুজো? বাঁধে কি দেবতার কাজ হবে?

সঞ্জয়। না, দেবতার হাতে বেড়ি পড়বে।

ফুলওয়ালী। তাই পুষ্পবৃষ্টি? বুঝলুম না।

সঞ্জয়। না বোঝাই ভালো। দেবতার ফুল অপাত্রে নষ্ট ক'রো না, ফিরে যাও।—শোনো, শোনো, আমাকে তোমার ওই শ্বেতপদ্মটি বেচবে?

ফুলওয়ালী। সাধুকে দেব মনন করে যে ফুল এনেছিলুম সে তো বেচতে পারব না।

সঞ্জয়। আমি যে-সাধুকে সব চেয়ে ভক্তি করি তাঁকেই দেব।

ফুলওয়ালী। তবে এই নাও। না, মূল্য নেব না। বাবাকে আমার প্রণাম জানিয়ো। ব'লো আমি দেওতলির দুখনী ফুলওয়ালী। [প্রস্থান

বিজয়পালের প্রবেশ

সঞ্জয়। দাদা কোথায়?

বিজয়পাল। শিবিরে তিনি বন্দী।

সঞ্জয়। যুবরাজ বন্দী! এ কী স্পর্ধা।

বিজয়পাল। এই দেখো মহারাজের আদেশপত্র।

সঞ্জয়। এ কার ষড়যন্ত্র? তাঁর কাছে আমাকে একবার যেতে দাও।

বিজয়পাল। ক্ষমা করবেন।

সঞ্জয়। আমাকেও বন্দী করো, আমি বিদ্রোহী।

বিজয়পাল। আদেশ নেই।

সঞ্জয়। আচ্ছা, আদেশ নিতে এখনই চল্লুম। (কিছু দূরে গিয়া ফিরিয়া আসিয়া) বিজয়পাল, এই পদ্মটি আমার নাম করে দাদাকে দিয়ো। [উভয়ের প্রস্থান

শিবতরাইয়ের বৈরাগী ধনঞ্জয়ের প্রবেশ[1]

গান

আমি মায়ের সাগর পাড়ি দেব
বিষম ঝড়ের বায়ে
আমার ভয়-ভাঙা এই নায়ে।
মাভৈঃ বাণীর ভরসা নিয়ে
ছেঁড়াপালে বুক ফুলিয়ে

---

[1] এই নাটকের পাত্র ধনঞ্জয় ও তাহার কথোপকথনের অনেকটা অংশ "প্রায়শ্চিত্ত" নামক আমার একটি নাটক হইতে লওয়া। সেই নাটক এখন হইতে পনেরো বছরেরও পূর্বে লিখিত।

তোমার ওই পারেতেই যাবে তরী
ছায়াবটের ছায়ে।
পথ আমারে সেই দেখাবে
যে আমারে চায়—
আমি অভয়মনে ছাড়ব তরী
এই শুধু মোর দায়।
দিন ফুরোলে জানি জানি
পৌঁছে ঘাটে দেব আনি
আমার দুঃখদিনের রক্তকমল
তোমার করুণ পায়ে।

শিবতরাইয়ের একদল প্রজার প্রবেশ

ধনঞ্জয়। একেবারে মুখ চুন যে! কেন রে, কী হয়েছে?

১। প্রভু, রাজশ্যালক চণ্ডপালের মার তো সহ্য হয় না। সে আমাদের যুবরাজকেই মানে না, সেইটেতেই আরও অসহ্য হয়।

ধনঞ্জয়। ওরে আজও মারকে জিততে পারলি নে? আজও লাগে?

২। রাজার দেউড়িতে ধরে নিয়ে মার। বড়ো অপমান।

ধনঞ্জয়। তোদের মানকে নিজের কাছে রাখিস নে; ভিতরে যে ঠাকুরটি আছেন তাঁরই পায়ের কাছে রেখে আয়, সেখানে অপমান পৌঁছোবে না।

গণেশ সর্দারের প্রবেশ

গণেশ। আর সহ্য হয় না, হাত দুটো নিশপিশ করছে।

ধনঞ্জয়। তাহলে হাত দুটো বেহাত হয়েছে বল্‌।

গণেশ। ঠাকুর, একবার হুকুম করো ওই ষণ্ডামার্ক চণ্ডপালের দণ্ডটা খসিয়ে নিয়ে মার কাকে বলে একবার দেখিয়ে দিই।

ধনঞ্জয়। মার কাকে না বলে তা দেখাতে পারিস নে? জোর বেশি লাগে বুঝি? ঢেউকে বাড়ি মারলে ঢেউ থামে না, হালটাকে স্থির করে রাখলে ঢেউ জয় করা যায়।

৪। তাহলে কী করতে বল?

ধনঞ্জয়। মার জিনিসটাকেই একেবারে গোড়া ঘেঁষে কোপ লাগাও।

৩। সেটা কী করে হবে প্রভু?

ধনঞ্জয়। মাথা তুলে যেমনি বলতে পারবি লাগছে না, অমনি মারের শিকড় যাবে কাটা।

২। লাগছে না বলা যে শক্ত।

ধনঞ্জয়। আসল মানুষটি যে, তার লাগে না, সে যে আলোর শিখা। লাগে জন্তুটার, সে যে মাংস, মার খেয়ে কেঁই কেঁই করে মরে। হাঁ করে রইলি যে? কথাটা বুঝলি নে?

২। তোমাকেই আমরা বুঝি, কথা তোমার নাই বা বুঝলুম।

ধনঞ্জয়। তাহলেই সর্বনাশ হয়েছে।

গণেশ। কথা বুঝতে সময় লাগে, সে তর সয় না; তোমাকে বুঝে নিয়েছি, তাতেই সকাল-সকাল তরে যাব।

ধনঞ্জয়। তার পরে বিকেল যখন হবে। তখন দেখবি কূলের কাছে তরী এসে ডুবেছে। যে কথাটা পাকা, সেটাকে ভিতর থেকে পাকা করে না যদি বুঝিস তো মজবি।

গণেশ। ও কথা ব'লো না, ঠাকুর। তোমার চরণাশ্রয় যখন পেয়েছি তখন যে করে হ'ক বুঝেছি।

ধনঞ্জয়। বুঝিস নি যে তা আর বুঝতে বাকি নেই। তোদের চোখ রয়েছে রাঙিয়ে, তোদের গলা দিয়ে সুর বেরোল না। একটু সুর ধরিয়ে দেব?

গান

আরো, আরো, প্রভু, আরো, আরো।
এমনি করেই মারো, মারো।

ওরে ভীতু, মার এড়াবার জন্যেই তোরা হয় মরতে নয় পালাতে থাকিস, দুটো একই কথা। দুটোতেই পশুর দলে ভেড়ায়, পশুপতির দেখা মেলে না।

লুকিয়ে থাকি আমি পালিয়ে বেড়াই,
ভয়ে ভয়ে কেবল তোমায় এড়াই;
যা-কিছু আছে সব কাড়ো কাড়ো।

দেখ বাবা, আমি মৃত্যুঞ্জয়ের সঙ্গে বোঝা-পড়া করতে চলেছি। বলতে চাই, "মার আমায় বাজে কি না তুমি নিজে বাজিয়ে নাও।" যে ডরে কিম্বা ডর দেখায় তার বোঝা ঘাড়ে নিয়ে এগোতে পারব না।

এবার যা করবার তা সারো, সারো,
আমিই হারি, কিম্বা তুমিই হার।

হাটে ঘাটে বাটে করি খেলা,
কেবল হেসে খেলে গেছে বেলা,
দেখি কেমনে কাঁদাতে পার।

সকলে। শাবাশ, ঠাকুর, তাই সই।—
দেখি কেমনে কাঁদাতে পার।

২। কিন্তু তুমি কোথায় চলেছ, বলো তো?

ধনঞ্জয়। রাজার উৎসবে।

৩। ঠাকুর, রাজার পক্ষে যেটা উৎসব তোমার পক্ষে সেটা কী দাঁড়ায় বলা যায় কি? সেখানে কী করতে যাবে?

ধনঞ্জয়। রাজসভায় নাম রেখে আসব।

৪। রাজা তোমাকে একবার হাতের কাছে পেলে—না, না, সে হবে না।

ধনঞ্জয়। হবে না কী রে? খুব হবে, পেট ভরে হবে।

১। রাজাকে ভয় কর না তুমি, কিন্তু আমাদের ভয় লাগে।

ধনঞ্জয়। তোরা যে মনে মনে মারতে চাস তাই ভয় করিস, আমি মারতে চাই নে তাই ভয় করি নে। যার হিংসা আছে ভয় তাকে কামড়ে লেগে থাকে।

২। আচ্ছা, আমরাও তোমার সঙ্গে যাব।

৩। রাজার কাছে দরবার করব।

ধনঞ্জয়। কী চাইবি রে?

৩। চাইবার তো আছে ঢের, দেয় তবে তো?

ধনঞ্জয়। রাজত্ব চাইবি নে?

৩। ঠাট্টা করছ, ঠাকুর?

ধনঞ্জয়। ঠাট্টা কেন করব? এক পায়ে চলার মতো কি দুঃখ আছে? রাজত্ব একলা যদি রাজারই হয়, প্রজার না হয়, তাহলে সেই খোঁড়া রাজত্বের লাফানি দেখে তোরা চমকে উঠতে পারিস কিন্তু দেবতার চোখে জল আসে। ওরে রাজার খাতিরেই রাজত্ব দাবি করতে হবে।

২। যখন তাড়া লাগাবে?

ধনঞ্জয়। রাজদরবারের উপরতলার মানুষ যখন নালিশ মঞ্জুর করেন তখন রাজার তাড়া রাজাকেই তেড়ে আসে।

গান

ভুলে যাই থেকে থেকে
তোমার আসন 'পরে বসাতে চাও
নাম আমাদের হেঁকে হেঁকে।

সত্যি কথা বলব, বাবা? যতক্ষণ তাঁরই আসন বলে না চিনবি ততক্ষণ সিংহাসনে দাবি খাটবে না, রাজারও নয়, প্রজারও না। ও তো বুক-ফুলিয়ে বসবার জায়গা নয়, হাত জোড় করে বসা চাই।

দ্বারী মোদের চেনে না যে,
বাধা দেয় পথের মাঝে,
বাহিরে দাঁড়িয়ে আছি,
লও ভিতরে ডেকে ডেকে।

দ্বারী কি সাধে চেনে না? ধুলোয় ধুলোয় কপালের রাজটিকা যে মিলিয়ে এসেছে। ভিতরে বশ মানল না, বাইরে রাজত্ব করতে ছুটবি? রাজা হলেই রাজাসনে বসে; রাজাসনে বসলেই রাজা হয় না।

মোদের প্রাণ দিয়েছ আপন হাতে
মান দিয়েছ তারি সাথে।
থেকেও সে মান থাকে না যে
লোভে আর ভয়ে লাজে,
ম্লান হয় দিনে দিনে,
যায় ধুলোতে ঢেকে ঢেকে।

১। যাই বল, রাজদুয়োরে কেন যে চলেছ বুঝতে পারলুম না।

ধনঞ্জয়। কেন, বলব? মনে বড়ো ধোঁকা লেগেছে।

১। সে কী কথা?

ধনঞ্জয়। তোরা আমাকে যত জড়িয়ে ধরছিস তোদের সাঁতার শেখা ততই পিছিয়ে যাচ্ছে। আমারও পার হওয়া দায় হল। তাই ছুটি নেবার জন্যে চলেছি সেইখানে, যেখানে আমাকে কেউ মানে না।

১। কিন্তু রাজা তোমাকে তো সহজে ছাড়বে না।

ধনঞ্জয়। ছাড়বে কেন রে। যদি আমাকে বাঁধতে পারে তাহলে আর ভাবনা রইল কী?

গান

আমাকে যে বাঁধবে ধরে এই হবে যার সাধন,
সে কি অমনি হবে?
আমার কাছে পড়লে বাঁধা সেই হবে মোর বাঁধন,
সে কি অমনি হবে?
কে আমারে ভরসা করে আনতে আপন বশে?
সে কি অমনি হবে?
আপনাকে সে করুক না বশ, মজুক প্রেমের রসে,
সে কি অমনি হবে?
আমাকে যে কাঁদাবে তার ভাগ্যে আছে কাঁদন
সে কি অমনি হবে?

২। কিন্তু বাবাঠাকুর, তোমার গায়ে যদি হাত তোলে সইতে পারব না।

ধনঞ্জয়। আমার এই গা বিকিয়েছি যাঁর পায়ে তিনি যদি সন, তবে তোদেরও সইবে।

১। আচ্ছা, চলো ঠাকুর, শুনে আসি, শুনিয়ে আসি, তার পরে কপালে যা থাকে।

ধনঞ্জয়। তবে তোরা এইখানে ব'স, এ জায়গায় কখনো আসি নি, পথঘাটের খবরটা নিয়ে আসি। [প্রস্থান

১। দেখছিস, ভাই, কী চেহারা ওই উত্তরকূটের মানুষগুলোর? যেন একতাল মাংস নিয়ে বিধাতা গড়তে শুরু করেছিলেন শেষ করে উঠতে ফুরসৎ পান নি।

২। আর দেখেছিস ওদের মালকোঁচা মেরে কাপড় পরবার ধরনটা?

৩। যেন নিজেকে বস্তায় বেঁধেছে, একটুখানি পাছে লোকসান হয়।

১। ওরা মজুরি করবার জন্যেই জন্ম নিয়েছে, কেবল সাত ঘাটের জল পেরিয়ে সাত হাটেই ঘুরে বেড়ায়।

২। ওদের যে শিক্ষাই নেই, ওদের যা শাস্তর তার মধ্যে আছে কী?

১। কিচ্ছু না, কিচ্ছু না, দেখিস নি তার অক্ষরগুলো উইপোকার মতো।

২। উইপোকাই তো বটে। ওদের বিদ্যে যেখানে লাগে সেখানে কেটে টুকরো টুকরো করে।

৩। আর গড়ে তোলে মাটির ঢিবি।

২। ওদের অস্তর দিয়ে মারে প্রাণটাকে, আর শাস্তর দিয়ে মারে মনটাকে।

২। পাপ, পাপ। আমাদের গুরু বলে ওদের ছায়া মাড়ানো নৈব নৈবচ। কেন জানিস?

৩। কেন বল তো?

২। তা জানিস নে? সমুদ্রমন্থনের পর দেবতার ভাঁড় থেকে অমৃত গড়িয়ে যে মাটিতে পড়েছিল আমাদের শিবতরাইয়ের পূর্বপুরুষ সেই মাটি দিয়ে গড়া। আর দৈত্যরা যখন দেবতার উচ্ছিষ্ট ভাঁড় চেটে চেটে নর্দমায় ফেলে দিলে তখন সেই ভাঁড়-ভাঙা পোড়া-মাটি দিয়ে উত্তরকূটের মানুষকে গড়া হয়। তাই ওরা শক্ত, কিন্তু থুঃ—অপবিত্র।

৩। এ তুই কোথায় পেলি?

২। স্বয়ং গুরু বলে দিয়েছেন।

৩। (উদ্দেশে প্রণাম করিয়া) গুরু, তুমিই সত্য।

উত্তরকূটের একদল নাগরিকের প্রবেশ

উ ১। আর সব হল ভালো, কিন্তু কামারের ছেলে বিভূতিকে রাজা একেবারে ক্ষত্রিয় করে নিলে সেটা তো—

উ ২। ওসব হল ঘরের কথা, সে আমাদের গাঁয়ে ফিরে গিয়ে বুঝে পড়ে নেব। এখন বল্, জয় যন্ত্ররাজ বিভূতির জয়।

উ ৩। ক্ষত্রিয়ের অস্ত্রে বৈশ্যের যন্ত্রে যে মিলিয়েছে, জয় সেই যন্ত্ররাজ বিভূতির জয়।

উ ১। ও ভাই, ওই যে দেখি শিবতরাইয়ের মানুষ।

উ ২। কী করে বুঝলি?

উ ১। কান-ঢাকা টুপি দেখছিস নে? কীরকম অদ্ভুত দেখতে? যেন উপর থেকে থাবড়া মেরে হঠাৎ কে ওদের বাড় বন্ধ করে দিয়েছে।

উ ২। আচ্ছা, এত দেশ থাকতে ওরা কান-ঢাকা টুপি পরে কেন? ওরা কি ভাবে কানটা বিধাতার মতিভ্রম?

উ ১। কানের উপর বাঁধ বেঁধেছে বুদ্ধি পাছে বেরিয়ে যায়। (সকলের হাস্য)

উ ৩। তাই? না, ভুলক্রমে বুদ্ধি পাছে ভিতরে ঢুকে পড়ে। (হাস্য)

উ ১। পাছে উত্তরকূটের কানমলার ভূত ওদের কানদুটোকে পেয়ে বসে। (হাস্য) ওরে শিবতরাইয়ের অজবুগের দল, সাড়া নেই, শব্দ নেই, হয়েছে কী রে?

উ ৩। জানিস নে আজ আমাদের বড়ো দিন। বল্ যন্ত্ররাজ বিভূতির জয়।

উ ১। চুপ করে রইলি যে? গলা বুজে গেছে? টুঁটি চেপে না ধরলে আওয়াজ বেরোবে না বুঝি? বল্ যন্ত্ররাজ বিভূতির জয়!

গণেশ। কেন বিভূতির জয়? কী করেছে সে?

উ ১। বলে কী? কী করেছে? এত বড়ো খবরটা এখনও পৌঁছয় নি? কানঢাকা টুপির গুণ দেখলি তো?

উ ৩। তোদের পিপাসার জল যে তার হাতে; সে দয়া না করলে অনাবৃষ্টির ব্যাঙগুলোর মতো শুকিয়ে মরে যাবি।

শি ২। পিপাসার জল বিভূতির হাতে? হঠাৎ সে দেবতা হয়ে উঠল নাকি?

উ ২। দেবতাকে ছুটি দিয়ে দেবতার কাজ নিজেই চালিয়ে নেবে।

শি ১। দেবতার কাজ! তার একটা নমুনা দেখি তো?

উ ১। ওই যে মুক্তধারার বাঁধ। [শিবতরাইয়ের সকলের উচ্চহাস্য

উ ১। এটা কি তোরা ঠাট্টা ঠাউরেছিস?

গণেশ। ঠাট্টা নয়? মুক্তধারা বাঁধবে? ভৈরব স্বহস্তে যা দিয়েছেন, তোমাদের কামারের ছেলে তাই কাড়বে?

উ ১। স্বচক্ষে দেখ্ না, ওই আকাশে।

শি ১। বাপ রে। ওটা কী রে?

শি ২। যেন মস্ত একটা লোহার ফড়িং, আকাশে লাফ মারতে যাচ্ছে।

উ ১। ওই ফড়িঙের ঠ্যাং দিয়ে তোমাদের জল আটকেছে।

গণেশ। রেখে দাও সব বাজে কথা। কোন্ দিন বলবে ওই ফড়িঙের ডানায় বসে তোমাদের কামারের পো চাঁদ ধরতে বেরিয়েছে।

উ ১। ওই দেখো কান ঢাকার গুণ! ওরা শুনেও শুনবে না তাই তো মরে।

শি ১। আমরা মরেও মরব না পণ করেছি।

উ ৩। বেশ করেছ, বাঁচাবে কে?

গণেশ। আমাদের দেবতাকে দেখ নি? প্রত্যক্ষ দেবতা? আমাদের ধনঞ্জয় ঠাকুর? তার একটা দেহ মন্দিরে, একটা দেহ বাইরে।

উ ৩। কানঢাকারা বলে কী? ওদের মরণ কেউ ঠেকাতে পারবে না।

[উত্তরকূটের দলের প্রস্থান

ধনঞ্জয়ের প্রবেশ

ধনঞ্জয়। কী বলছিলি রে বোকা? আমারই উপর তোদের বাঁচাবার ভার? তাহলে তো সাতবার মরে ভূত হয়ে রয়েছিস।

গণেশ। উত্তরকূটের ওরা আমাদের শাসিয়ে গেল যে, বিভূতি মুক্তধারার বাঁধ বেঁধেছে।

ধনঞ্জয়। বাঁধ বেঁধেছে, বললে ?

গণেশ। হাঁ, ঠাকুর।

ধনঞ্জয়। সব কথাটা শুনলি নে বুঝি ?

গণেশ। ও কি শোনবার কথা ? হেসে উড়িয়ে দিলুম।

ধনঞ্জয়। তোদের সব কানগুলো একা আমারই জিম্মায় রেখেছিস ? তোদের সবার শোনা আমাকেই শুনতে হবে ?

শি ৩। ওর মধ্যে শোনবার আছে কী, ঠাকুর ?

ধনঞ্জয়। বলিস কী রে ? যে শক্তি দুরন্ত তাকে বেঁধে ফেলা কি কম কথা ? তা সে অন্তরেই হ'ক আর বাইরেই হ'ক।

গণেশ। ঠাকুর, তাই বলে আমাদের পিপাসার জল আটকাবে ?

ধনঞ্জয়। সে হল আর-এক কথা। ওটা ভৈরব সইবেন না। তোরা ব'স, আমি সন্ধান নিয়ে আসি গে। জগৎটা বাণীময় রে, তার যেদিকটাতে শোনা বন্ধ করবি সেইদিক থেকেই মৃত্যুবাণ আসবে। [ধনঞ্জয়ের প্রস্থান

শিবতরাইয়ের একজন নাগরিকের প্রবেশ

শি ৩। এ কী বিষণ যে। খবর কী ?

বিষণ। যুবরাজকে রাজা শিবতরাই থেকে ডেকে নিয়ে এসেছে, তাকে সেখানে আর রাখবে না।

সকলে। সে হবে না, কিছুতেই হবে না।

বিষণ। কী করবি ?

সকলে। ফিরিয়ে নিয়ে যাব।

বিষণ। কী করে ?

সকলে। জোর করে।

বিষণ। রাজার সঙ্গে পারবি ?

সকলে। রাজাকে মানি নে।

রণজিৎ ও মন্ত্রীর প্রবেশ

রণজিৎ। কাকে মানিস নে ?

সকলে। প্রণাম।

গণেশ। তোমার কাছে দরবার করতে এসেছি।

রণজিৎ। কিসের দরবার ?

সকলে। আমরা যুবরাজকে চাই!

রণজিৎ। বলিস কী?

১। হাঁ, যুবরাজকে শিবতরাইয়ে নিয়ে যাব।

রণজিৎ। আর মনের আনন্দে খাজনা দেবার কথাটা ভুলে যাবি?

সকলে। অন্ন বিনে মরছি যে।

রণজিৎ। তোদের সর্দার কোথায়?

২। (গণেশকে দেখাইয়া) এই যে আমাদের গণেশ সর্দার।

রণজিৎ। ও নয়, তোদের বৈরাগী।

গণেশ। ওই আসছেন।

ধনঞ্জয়ের প্রবেশ

রণজিৎ। তুমি এই সমস্ত প্রজাদের খেপিয়েছ?

ধনঞ্জয়। খ্যাপাই বই কি, নিজেও খেপি।

গান

আমারে পাড়ায় পাড়ায় খেপিয়ে বেড়ায় কোন্ খ্যাপা সে?
ওরে আকাশ জুড়ে মোহন সুরে
কী যে বাজায় কোন্ বাতাসে?
গেল রে গেল বেলা,
পাগলের কেমন খেলা?
ডেকে সে আকুল করে, দেয় না ধরা,
তারে কানন গিরি খুঁজে ফিরি
কেঁদে মরি কোন্ হুতাশে।

রণজিৎ। পাগলামি করে কথা চাপা দিতে পারবে না। খাজনা দেবে কি না, বলো।

ধনঞ্জয়। না, মহারাজ, দেব না।

রণজিৎ। দেবে না? এত বড়ো আস্পর্ধা?

ধনঞ্জয়। যা তোমার নয় তা তোমাকে দিতে পারব না।

রণজিৎ। আমার নয়?

ধনঞ্জয়। আমার উদ্‌বৃত্ত অন্ন তোমার, ক্ষুধার অন্ন তোমার নয়।

রণজিৎ। তুমিই প্রজাদের বারণ কর খাজনা দিতে?

ধনঞ্জয়। ওরা তো ভয়ে দিয়ে ফেলতে চায়, আমি বারণ করে বলি, প্রাণ যিনি তাঁকেই প্রাণ দিয়েছেন যিনি।

রণজিৎ। তোমার ভরসা চাপা দিয়ে ওদের ভয়টাকে ঢেকে রাখছ বই তো নয়। বাইরের ভরসা একটু ফুটো হলেই ভিতরের ভয় সাতগুণ জোরে বেরিয়ে পড়বে। তখন ওরা মরবে যে। দেখো, বৈরাগী, তোমার কপালে দুঃখ আছে।

ধনঞ্জয়। যে দুঃখ কপালে ছিল সে দুঃখ বুকে তুলে নিয়েছি। দুঃখের উপরওআলা সেইখানে বাস করবেন।

রণজিৎ। (প্রজাদের প্রতি) আমি তোদের বলছি, তোরা শিবতরাইয়ে ফিরে যা। বৈরাগী, তুমি এইখানেই রইলে।

সকলে। আমাদের প্রাণ থাকতে সে হবে না।

ধনঞ্জয়। গান

রইল বলে রাখলে কারে?
হুকুম তোমার ফলবে কবে?
টানাটানি টিকবে না, ভাই,
রবার যেটা সেটাই রবে।

রাজা, টেনে কিছুই রাখতে পারবে না। সহজে রাখবার শক্তি যদি থাকে তবেই রাখা চলবে।

রণজিৎ। মানে কী হল?

ধনঞ্জয়। যিনি সব দেন তিনিই সব রাখেন। লোভ করে যা রাখতে চাইবে সে হল চোরাই মাল, সে টিঁকবে না।

গান

যা-খুশি তাই করতে পার,
গায়ের জোরে রাখ মার,
যাঁর গায়ে তার ব্যথা বাজে
তিনিই যা সন সেটাই সবে।

রাজা, ভুল করছ এই, যে, ভাবছ জগৎটাকে কেড়ে নিলেই জগৎ তোমার হল। ছেড়ে রাখলেই যাকে পাও, মুঠোর মধ্যে চাপতে গেলেই দেখবে সে ফসকে গেছে।

গান

ভাবছ, হবে তুমি যা চাও,
জগৎটাকে তুমিই নাচাও,

দেখবে হঠাৎ নয়ন মেলে
হয় না যেটা সেটাও হবে।

রণজিৎ। মন্ত্রী, বৈরাগীকে এইখানেই ধরে রেখে দাও।

মন্ত্রী। মহারাজ—

রণজিৎ। আদেশটা তোমার মনের মতো হচ্ছে না?

মন্ত্রী। শাসনের ভীষণ যন্ত্র তো তৈরি হয়েছে, তার উপরে ভয় আরও চড়াতে গেলে সব যাবে ভেঙে।

প্রজারা। এ আমাদের সহ্য হবে না।

ধনঞ্জয়। যা বলছি, ফিরে যা।

১। ঠাকুর, যুবরাজকেও যে হারিয়েছি, শোন নি বুঝি?

২। তাহলে কাকে নিয়ে মনের জোর পাব?

ধনঞ্জয়। আমার জোরেই কি তোদের জোর? একথা যদি বলিস তাহলে যে আমাকে সুদ্ধ দুর্বল করবি।

গণেশ। ওকথা বলে আজ ফাঁকি দিয়ো না। আমাদের সকলের জোর একা তোমারই মধ্যে।

ধনঞ্জয়। তবে আমার হার হয়েছে। আমাকে সরে দাঁড়াতে হল।

সকলে। কেন ঠাকুর?

ধনঞ্জয়। আমাকে পেয়ে আপনাকে হারাবি? এত বড়ো লোকসান মেটাতে পারি এমন সাধ্য কি আমার আছে? বড়ো লজ্জা পেলুম।

১। সে কী কথা ঠাকুর? আচ্ছা, যা করতে বল তাই করব।

ধনঞ্জয়। আমাকে ছেড়ে দিয়ে চলে যা।

২। চলে গিয়ে কী করব? তুমি আমাদের ছেড়ে থাকতে পারবে? আমাদের ভালোবাস না?

ধনঞ্জয়। ভালোবেসে তোদের চেপে মারার চেয়ে ভালোবেসে তোদের ছেড়ে থাকাই ভালো। যা, আর কথা নয়, চলে যা।

সকলে। আচ্ছা, ঠাকুর চললুম, কিন্তু—

ধনঞ্জয়। কিন্তু কী রে। একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে যা, উপরে মাথা তুলে।

সকলে। আচ্ছা, তবে চলি।

ধনঞ্জয়। ওকে চলা বলে? জোরে।

গণেশ। চললুম, কিন্তু আমাদের বলবুদ্ধি রইল এইখানে পড়ে। [প্রস্থান

রণজিৎ। কী বৈরাগী, চুপ করে রইলে যে।

ধনঞ্জয়। ভাবনা ধরিয়ে দিয়েছে, রাজা।

রণজিৎ। কিসের ভাবনা?

ধনঞ্জয়। তোমার চণ্ডপালের দণ্ড লাগিয়েও যা করতে পার নি আমি দেখছি তাই করে বসে আছি। এতদিন ঠাউরেছিলুম আমি ওদের বলবুদ্ধি বাড়াচ্ছি; আজ মুখের উপর বলে গেল আমিই ওদের বলবুদ্ধি হরণ করেছি।

রণজিৎ। এমনটা হয় কী করে?

ধনঞ্জয়। ওদের যতই মাতিয়ে তুলেছি ততই পাকিয়ে তোলা হয় নি আর কি। দেনা যাদের অনেক বাকি, শুধু কেবল দৌড় লাগিয়ে দিয়ে তাদের দেনা শোধ হয় না তো। ওরা ভাবে আমি বিধাতার চেয়ে বড়ো, তাঁর কাছে ওরা যা ধারে আমি যেন তা নামঞ্জুর করে দিতে পারি। তাই চক্ষু বুজে আমাকেই আঁকড়ে থাকে।

রণজিৎ। ওরা যে তোমাকেই দেবতা বলে জেনেছে।

ধনঞ্জয়। তাই আমাতেই এসে ঠেকে গেল, আসল দেবতা পর্যন্ত পৌঁছোল না। ভিতরে থেকে যিনি ওদের চালাতে পারতেন বাইরে থেকে তাঁকে রেখেছি ঠেকিয়ে।

রণজিৎ। রাজার খাজনা যখন ওরা দিতে আসে তখন বাধা দাও, আর দেবতার পুজো যখন তোমার পায়ের কাছে এসে পড়ে তখন তোমার বাজে না?

ধনঞ্জয়। ওরে বাপ রে। বাজে না তো কী। দৌড় মেরে পালাতে পারলে বাঁচি। আমাকে পুজো দিয়ে ওরা অন্তরে অন্তরে দেউলে হতে চলল, সে দেনার দায় যে আমারও ঘাড়ে পড়বে, দেবতা ছাড়বেন না।

রণজিৎ। এখন তোমার কর্তব্য?

ধনঞ্জয়। তফাতে থাকা। আমি যদি পাকা করে ওদের মনের বাঁধ বেঁধে থাকি, তা হলে তোমার বিভূতিকে আর আমাকে ভৈরব যেন এক সঙ্গেই তাড়া লাগান।

রণজিৎ। তবে আর দেরি কেন? সরো না।

ধনঞ্জয়। আমি সরে দাঁড়ালেই ওরা একেবারে তোমার চণ্ডপালের ঘাড়ের উপর গিয়ে চড়াও হবে। তখন যে-দণ্ড আমার পাওনা সেটা পড়বে ওদেরই মাথার খুলির উপরে। এই ভাবনায় সরতে পারি নে।

রণজিৎ। নিজে সরতে না পার আমিই সরিয়ে দিচ্ছি। উদ্ধব, বৈরাগীকে এখন শিবিরে বন্দী করে রাখো।

ধনঞ্জয়। গান

তোর শিকল আমায় বিকল করবে না।
তোর মারে মরম মরবে না।
তাঁর আপন হাতের ছাড়-চিঠি সেই যে,
আমার মনের ভিতর রয়েছে এই যে,
তোদের ধরা আমায় ধরবে না।
যে-পথ দিয়ে আমার চলাচল
তোর প্রহরী তার খোঁজ পাবে কী বল?
আমি তাঁর দুয়ারে পৌঁছে গেছি রে,
মোরে তোর দুয়ারে ঠেকাবে কি রে?
তোর ভয়ে পরান ভরবে না।

[ধনঞ্জয়কে লইয়া উদ্ধবের প্রস্থান

রণজিৎ। মন্ত্রী, বন্দিশালায় অভিজিৎকে দেখে এস গে। যদি দেখ সে আপন কৃতকর্মের জন্যে অনুতপ্ত, তাহলে—

মন্ত্রী। মহারাজ, আপনি স্বয়ং গিয়ে একবার—

রণজিৎ। না, না, সে নিজরাজ্যবিদ্রোহী, যতক্ষণ অপরাধ স্বীকার না করে ততক্ষণ তার মুখদর্শন করব না। আমি রাজধানীতে যাচ্ছি, সেখানে আমাকে সংবাদ দিয়ো।

[রাজার প্রস্থান

ভৈরবপন্থীর প্রবেশ

গান

তিমির-হৃদ্‌বিদারণ
জলদগ্নি-নিদারুণ,
মরু-শ্মশান-সঞ্চর,
শংকর শংকর।
বজ্রঘোষ বাণী,
রুদ্র, শূলপাণি,
মৃত্যুসিন্ধু-সন্তর,
শংকর, শংকর। [প্রস্থান

উদ্ধবের প্রবেশ

উদ্ধব। এ কী? যুবরাজের সঙ্গে দেখা না করেই মহারাজ চলে গেলেন?

মন্ত্রী। পাছে মুখ দেখে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয় এই ভয়ে। এতক্ষণ ধরে বৈরাগীর সঙ্গে কথা কচ্ছিলেন মনের মধ্যে এই দ্বিধা নিয়ে। শিবিরের মধ্যেও যেতে পারছিলেন না, শিবির ছেড়ে যেতেও পা উঠছিল না। যাই যুবরাজকে দেখে আসি গে। [প্রস্থান

দুইজন স্ত্রীলোকের প্রবেশ

১। মাসী, ওরা কেন সবাই এমন রেগে উঠেছে? কেন বলছে যুবরাজ অন্যায় করেছেন—আমি এ বুঝতেও পারি নে, সইতেও পারি নে।

২। বুঝতে পারিস নে উত্তরকূটের মেয়ে হয়ে? উনি নন্দিসংকটের রাস্তা খুলে দিয়েছেন।

১। আমি জানি নে তাতে অপরাধ কী হয়েছে। কিন্তু আমি কিছুতেই বিশ্বাস করি নে যে যুবরাজ অন্যায় করেছেন।

২। তুই ছেলেমানুষ, অনেক দুঃখ পেয়ে তবে একদিন বুঝবি বাইরে থেকে যাদের ভালো বলে বোধ হয় তাদেরই বেশি সন্দেহ করতে হয়।

১। কিন্তু যুবরাজকে কী সন্দেহ করছ তোমরা?

২। সবাই বলছে যে শিবতরাইয়ের লোকদের বশ করে নিয়ে, উনি এখনই উত্তরকূটের সিংহাসন জয় করতে চান,—ওঁর আর তর সইছে না।

১। সিংহাসনের কী দরকার ছিল ওঁর। উনি তো সবারই হৃদয় জয় করে নিয়েছেন। যারা ওঁর নিন্দে করছে তাদেরই বিশ্বাস করব আর যুবরাজকে বিশ্বাস করব না?

২। তুই চুপ কর্। একরত্তি মেয়ে, তোর মুখে এসব কথা সাজে না। দেশসুদ্ধ লোক যাকে অভিসম্পাত করছে তুই হঠাৎ তার—

১। আমি দেশসুদ্ধ লোকের সামনে দাঁড়িয়ে একথা বলতে পারি যে—

২। চুপ চুপ।

২। কেন চুপ? আমার চোখ ফেটে জল বেরোতে চায়। যুবরাজকে আমি সবচেয়ে বিশ্বাস করি এই কথাটা প্রকাশ করবার জন্যে আমার যা হয় একটা কিছু করতে ইচ্ছা করছে। আমার এই লম্বা চুল আমি আজ ভৈরবের কাছে মানত করব—বলব, "বাবা, তুমি জানিয়ে দাও যে যুবরাজেরই জয়, যারা নিন্দুক তারা মিথ্যে।"

২। চুপ চুপ চুপ। কোথা থেকে কে শুনতে পাবে। মেয়েটা বিপদ ঘটাবে দেখছি। [উভয়ের প্রস্থান

উত্তরকূটের একদল নাগরিকের প্রবেশ

১। কিছুতেই ছাড়ছি নে, চল্ রাজার কাছে যাই।

২। ফল কী হবে? যুবরাজ যে রাজার বুকের মানিক, তাঁর অপরাধের বিচার করতে পারবেন না, মাঝের থেকে রাগ করবেন আমাদের 'পরে।

১। করুন রাগ, স্পষ্ট কথা বলব কপালে যাই থাক।

৩। এদিকে যুবরাজ আমাদের এত ভালোবাসা দেখান, ভাব করেন যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেড়ে দেবেন, আর তলে তলে তাঁরই এই কীর্তি? হঠাৎ শিবতরাই তাঁর কাছে উত্তরকূটের চেয়ে বড়ো হয়ে উঠল?

১। এমন হলে পৃথিবীতে আর ধর্ম রইল কোথা? বলো তো দাদা?

৩। কাউকে চেনবার জো নেই।

১। রাজা ওঁকে শাস্তি না দেন তো আমরা দেব।

২। কী করবি?

১। এদেশে ওঁর ঠাঁই হচ্ছে না। যে পথ কেটেছেন সেই পথ দিয়ে ওঁকেই বেরিয়ে যেতে হবে।

৩। কিন্তু ওই তো চবুয়া গাঁয়ের লোক বললে, তিনি শিবতরাইয়ে নেই, এখানে রাজার বাড়িতেও তাঁকে পাওয়া যাচ্ছে না।

১। রাজা তাকে নিশ্চয়ই লুকিয়েছে।

৩। লুকিয়েছে? ইস, দেয়াল ভেঙে বের করব।

১। ঘরে আগুন লাগিয়ে বের করব।

৩। আমাদের ফাঁকি দেবে? মরি মরব তবু—

উদ্ধবের সহিত মন্ত্রীর প্রবেশ

মন্ত্রী। কী হয়েছে?

১। লুকোচুরি চলবে না। বের করো যুবরাজকে।

মন্ত্রী। আরে বাপু, আমি বের করবার কে?

২। তোমরাই তো মন্ত্রণা দিয়ে তাঁকে—পারবে না কিন্তু, আমরা টেনে বের করব।

মন্ত্রী। আচ্ছা, তবে নিজের হাতে রাজত্ব নাও, রাজার গারদ থেকে ছাড়িয়ে আনো।

৩। গারদ থেকে?

মন্ত্রী। মহারাজ তাকে বন্দী করেছেন।

সকলে। জয় মহারাজের, জয় উত্তরকূটের।

২। চল্ রে, আমরা গারদে ঢুকব, সেখানে গিয়ে—

মন্ত্রী। গিয়ে কী করবি ?

২। বিভূতির গলায় মালা থেকে ফুল খসিয়ে দড়িগাছটা ওর গলায় ঝুলিয়ে আসব।

৩। গলায় কেন, হাতে। বাঁধ বাঁধার সম্মানের উচ্ছিষ্ট দিয়ে পথ-কাটার হাতে দড়ি পড়বে।

মন্ত্রী। যুবরাজ পথ ভেঙেছেন বলে অপরাধ, আর তোমরা ব্যবস্থা ভাঙবে, তাতে অপরাধ নেই ?

২। আহা, ও যে সম্পূর্ণ আলাদা কথা। আচ্ছা বেশ, যদি ব্যবস্থা ভাঙি তো কী হবে ?

মন্ত্রী। পায়ের তলায় মাটি পছন্দ হল না বলে শূন্যে ঝাঁপিয়ে পড়া হবে। সেটাও পছন্দ হবে না বলে রাখছি। একটা ব্যবস্থা আগে করে তবে অন্য ব্যবস্থাটা ভাঙতে হয়।

৩। আচ্ছা, তবে পারদ থাক, রাজবাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে মহারাজের জয়ধ্বনি করে আসি গে।

৩। ও ভাই, ওই দেখ্‌। সূর্য অস্ত গেছে, আকাশ অন্ধকার হয়ে এল, কিন্তু বিভূতির যন্ত্রের ওই চূড়াটা এখনও জ্বলছে। রোদ্‌দুরের মদ খেয়ে যেন লাল হয়ে রয়েছে।

২। আর ভৈরব-মন্দিরের ত্রিশূলটাকে অস্তসূর্যের আলো আঁকড়ে রয়েছে যেন ডোববার ভয়ে। কী রকম দেখাচ্ছে। [নাগরিকদের প্রস্থান

মন্ত্রী। মহারাজ কেন যে যুবরাজকে এই শিবিরে বন্দী করতে বলেছিলেন এখন বুঝেছি।

উদ্ধব। কেন ?

মন্ত্রী। প্রজাদের হাত থেকে ওঁকে বাঁচাবার জন্যে। কিন্তু ভালো ঠেকছে না। লোকের উত্তেজনা কেবলই বেড়ে উঠছে।

সঞ্জয়ের প্রবেশ

সঞ্জয়। মহারাজকে বেশি আগ্রহ দেখাতে সাহস করলুম না, তাতে তাঁর সংকল্প আরও দৃঢ় হয়ে ওঠে।

মন্ত্রী। রাজকুমার, শান্ত থাকবেন, উৎপাতকে আরও জটিল করে তুলবেন না।

সঞ্জয়। বিদ্রোহ ঘটিয়ে আমিও বন্দী হতে চাই।

মন্ত্রী। তার চেয়ে মুক্ত থেকে বন্ধন মোচনের চিন্তা করুন।

সঞ্জয়। সেই চেষ্টাতেই প্রজাদের মধ্যে গিয়েছিলুম। জানতুম যুবরাজকে তারা প্রাণের অধিক ভালোবাসে,—তাঁর বন্ধন ওরা সইবে না। গিয়ে দেখি নন্দিসংকটের খবর পেয়ে তারা আগুন হয়ে আছে।

মন্ত্রী। তবেই বুঝছেন, বন্দিশালাতেই যুবরাজ নিরাপদ।

সঞ্জয়। আমি চিরদিন তাঁরই অনুবর্তী, বন্দিশালাতেও আমাকে তাঁর অনুসরণ করতে দাও।

মন্ত্রী। কী হবে?

সঞ্জয়। পৃথিবীতে কোনো একলা মানুষই এক নয়, সে অর্ধেক। আর-এক জনের সঙ্গে মিল হলে তবেই সে ঐক্য পায়। যুবরাজের সঙ্গে আমার সেই মিল।

মন্ত্রী। রাজকুমার, সে কথা মানি। কিন্তু সেই সত্য মিল যেখানে, সেখানে কাছে কাছে থাকবার দরকার হয় না। আকাশের মেঘ আর সমুদ্রের জল অন্তরে একই, তাই বাইরে তারা পৃথক হয়ে ঐক্যটিকে সার্থক করে। যুবরাজ আজ যেখানে নেই, সেইখানেই তিনি তোমার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পান।

সঞ্জয়। মন্ত্রী, এ তো তোমার নিজের কথা বলে শোনাচ্ছে না, এ যেন যুবরাজের মুখের কথা।

মন্ত্রী। তাঁর কথা এখানকার হাওয়ায় ছড়িয়ে আছে, ব্যবহার করি, অথচ ভুলে যাই তাঁর কি আমার।

সঞ্জয়। কিন্তু কথাটি মনে করিয়ে দিয়ে ভালো করেছ, দূর থেকে তাঁরই কাজ করব। যাই মহারাজের কাছে।

মন্ত্রী। কী করতে?

সঞ্জয়। শিবতরাইয়ের শাসনভার প্রার্থনা করব।

মন্ত্রী। সময় যে বড়ো সংকটের, এখন কি—

সঞ্জয়। সেইজন্তেই এই তো উপযুক্ত সময়। [উভয়ের প্রস্থান

বিশ্বজিতের প্রবেশ

বিশ্বজিৎ। ও কে ও? উদ্ধব বুঝি?

উদ্ধব। হাঁ, খুড়া মহারাজ।

বিশ্বজিৎ। অন্ধকারের জন্তে অপেক্ষা করছিলুম, আমার চিঠি পেয়েছ তো?

উদ্ধব। পেয়েছি।

বিশ্বজিৎ। সেই মতো কাজ হয়েছে?

উদ্ধব। অল্প পরেই জানতে পারবে। কিন্তু—

বিশ্বজিৎ। মনে সংশয় ক'রো না। মহারাজ ওকে নিজে মুক্তি দিতে প্রস্তুত নন, কিন্তু তাঁকে না জানিয়ে কোনো উপায়ে আর কেউ যদি একাজ সাধন করে তাহলে তিনি বেঁচে যাবেন।

উদ্ধব। কিন্তু সেই আর-কেউকে কিছুতে ক্ষমা করবেন না।

বিশ্বজিৎ। আমার সৈন্য আছে, তারা তোমাকে আর তোমার প্রহরীদের বন্দী করে নিয়ে যাবে। দায় আমারই।

নেপথ্যে। আগুন, আগুন।

উদ্ধব। ওই হয়েছে। বন্দিশালার সংলগ্ন পাকশালার তাঁবুতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। এই সুযোগে বন্দী ছুটিকে বের করে দিই।

কিছুক্ষণ পরে অভিজিতের প্রবেশ

অভিজিৎ। এ কী দাদামশায় যে।

বিশ্বজিৎ। তোমাকে বন্দী করতে এসেছি। মোহনগড়ে যেতে হবে।

অভিজিৎ। আমাকে আজ কিছুতেই বন্দী করতে পারবে না, না ক্রোধে, না স্নেহে। তোমরা ভাবছ তোমরাই আগুন লাগিয়েছ? না, এ আগুন যেমন করেই হ'ক লাগত। আজ আমার বন্দী থাকবার অবকাশ নেই।

বিশ্বজিৎ। কেন, ভাই, কী তোমার কাজ?

অভিজিৎ। জন্মকালের ঋণ শোধ করতে হবে। স্রোতের পথ আমার ধাত্রী, তার বন্ধন মোচন করব।

বিশ্বজিৎ। তার অনেক সময় আছে, আজ নয়।

অভিজিৎ। সময় এখনই এসেছে এই কথাই জানি, কিন্তু সময় আবার আসবে কি না সে কথা কেউ জানি নে।

বিশ্বজিৎ। আমরাও তোমার সঙ্গে যোগ দেব।

অভিজিৎ। না, সকলের এক কাজ নয়, আমার উপর যে কাজ পড়েছে সে একলা আমারই।

বিশ্বজিৎ। তোমার শিবতরাইয়ের ভক্তদল যে তোমার কাজে হাত দেবার জন্যে অপেক্ষা করে আছে, তাদের ডাকবে না?

অভিজিৎ। যে ডাক আমি শুনেছি সেই ডাক যদি তারাও শুনত তবে আমার জন্যে অপেক্ষা করত না। আমার ডাকে তারা পথ ভুলবে।

বিশ্বজিৎ। ভাই, অন্ধকার হয়ে এসেছে যে।

অভিজিৎ। যেখান থেকে ডাক এসেছে সেইখান থেকে আলোও আসবে।

বিশ্বজিৎ। তোমাকে বাধা দিতে পারি এমন শক্তি আমার নেই। অন্ধকারের মধ্যে একলা চলেছ তবুও তোমাকে বিদায় দিয়ে ফিরতে হবে। কেবল একটি আশ্বাসের কথা বলে যাও যে, আবার মিলন ঘটবে।

অভিজিৎ। তোমার সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ হবার নয় এই কথাটি মনে রেখো।

[দুই জনের দুই পথে প্রস্থান

ধনঞ্জয়ের প্রবেশ

গান

আগুন, আমার ভাই,
আমি তোমারি জয় গাই।
তোমার শিকল-ভাঙা এমন রাঙা
মূর্তি দেখি নাই।
দুহাত তুলে আকাশ পানে
মেতেছ আজ কিসের গানে?
এ কী আনন্দময় নৃত্য অভয়
বলিহারি যাই।
যেদিন ভবের মেয়াদ ফুরোবে, ভাই,
আগল যাবে সরে
সেদিন হাতের দড়ি পায়ের দড়ি
দিবি রে ছাই করে।
সেদিন আমার অঙ্গ তোমার অঙ্গে
ঐ নাচনে নাচবে রঙ্গে,
সকল দাহ মিটবে দাহে,
ঘুচবে সব বালাই।

বটুর প্রবেশ

বটু। ঠাকুর, দিন তো গেল, অন্ধকার হয়ে এল।

ধনঞ্জয়। বাবা, বাইরের আলোর উপর ভরসা রাখাই অভ্যাস, তাই অন্ধকার হলেই একেবারে অন্ধকার দেখি।

বটু। ভেবেছিলুম ভৈরবের নৃত্য আজই আরম্ভ হবে, কিন্তু যন্ত্ররাজ কি তাঁরও হাত পা যন্ত্র দিয়ে বেঁধে দিলে ?

ধনঞ্জয়। ভৈরবের নৃত্য যখন সবে আরম্ভ হয় তখন চোখে পড়ে না। যখন শেষ হবার পালা আসে তখন প্রকাশ হয়ে পড়ে।

বটু। ভরসা দাও, প্রভু, বড়ো ভয় ধরিয়েছে।—জাগো, ভৈরব, জাগো। আলো নিবেছে, পথ ডুবেছে, সাড়া পাই নে মৃত্যুঞ্জয়! ভয়কে মারো ভয় লাগিয়ে। জাগো, ভৈরব, জাগো! [প্রস্থান

উত্তরকূটের নাগরিকদলের প্রবেশ

১। মিথ্যে কথা। রাজধানীর গারদে সে নেই। ওকে লুকিয়ে রেখেছে।

২। দেখব, কোথায় লুকিয়ে রাখে।

ধনঞ্জয়। না, বাবা, কোথাও পারবে না লুকিয়ে রাখতে। পড়বে দেয়াল, ভাঙবে দরজা, আলো ছুটে বের হয়ে আসবে—সমস্ত প্রকাশ হয়ে পড়বে।

১। এ আবার কে রে ? বুকের ভিতরটায় হঠাৎ চমকিয়ে দিলে।

৩। তা বেশ হয়েছে। একজন কাউকে চাই। তা এই বৈরাগীটাকেই ধর। ওকে বাঁধ।

ধনঞ্জয়। যে মানুষ ধরা দিয়ে বসে আছে তাকে ধরবে কী করে ?

১। সাধুগিরি রাখো, আমরা ও সব মানি নে।

ধনঞ্জয়। না মানাই তো ভালো। প্রভু স্বয়ং হাতে ধরে তোমাদের মানিয়ে নেবেন। তোমরা ভাগ্যবান। আমি যে-সব অভাগাদের জানি তারা কেবল মেনে মেনেই গুরুকে খোয়ালে। আমাকে সুদ্ধ তারা মানার তাড়ায় দেশছাড়া করেছে।

১। তাদের গুরু কে ?

ধনঞ্জয়। যার হাতে তারা মার খায়।

১। তা হলে তোমার উপর গুরুগিরি আমরাই শুরু করি না কেন ?

ধনঞ্জয়। রাজি আছি, বাবা। দেখে নিই ঠিকমতো পাঠ দিতে পারি কি না। পরীক্ষা হ'ক।

২। সন্দেহ হচ্ছে তুমিই আমাদের যুবরাজকে নিয়ে কিছু চালাকি করেছ।

ধনঞ্জয়। তোমাদের যুবরাজ আমার চেয়েও চালাক, তাঁর চালাকি আমাকে নিয়ে।

২। দেখলি তো, কথাটার মানে আছে। দুজনে একটা কী ফন্দি চলছে।

১। নইলে এত রাত্রে এখানে ঘুরে বেড়ায় কেন ? যুবরাজকে শিবতরাইয়ে

সরাবার চেষ্টা। এইখানেই ওকে বেঁধে রেখে যাই। তার পরে যুবরাজের সন্ধান পেলে ওর সঙ্গে বোঝা-পড়া করব। ওহে, কুন্দন, বাঁধো না। দড়িগাছটা তো তোমার কাছেই আছে।

কুন্দন। এই নাও না দড়ি, তুমিই বাঁধো না।

২। ওরে, তোরা কি উত্তরকূটের মানুষ? দে, আমাকে দে। (বাঁধিতে বাঁধিতে) কেমন হে, গুরু কী বলছেন?

ধনঞ্জয়। কষে চেপে ধরেছেন, সহজে ছাড়ছেন না।

ভৈরবপন্থীর প্রবেশ

গান

তিমির-হৃদবিদারণ
জলদগ্নি-নিদারুণ,
মরুশ্মশান-সঞ্চর,
শংকর শংকর।
বজ্রঘোষ-বাণী
রুদ্র, শূলপাণি,
মৃত্যু-সিন্ধু-সন্তর,
শংকর শংকর। [প্রস্থান

কুন্দন। ওই দেখো চেয়ে। গোধূলির আলো যতই নিবে আসছে আমাদের যন্ত্রের চূড়াটা ততই কালো হয়ে উঠছে।

১। দিনের বেলায় ও সূর্যের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এসেছে, অন্ধকারে ও রাত্রিবেলাকার কালোর সঙ্গে টক্কর দিতে লেগেছে। ওকে ভূতের মতো দেখাচ্ছে।

কুন্দন। বিভূতি তার কীর্তিটাকে এমন করে গড়ল কেন ভাই? উত্তরকূটের যে দিকেই ফিরি ওর দিকে না তাকিয়ে থাকবার জো নেই, ও যেন একটা বিকট চীৎকারের মতো।

চতুর্থ নাগরিকের প্রবেশ

৪। খবর পাওয়া গেল, ওই আমবাগানের পিছনে রাজার শিবির পড়েছে, সেখানে যুবরাজকে রেখে দিয়েছে।

২। এতক্ষণে বোঝা গেল। তাই বটে বৈরাগী এই পথেই ঘুরছে। ও থাক্ এইখানেই বাঁধা পড়ে। ততক্ষণ দেখে আসি। [নাগরিকদের প্রস্থান

ধনঞ্জয়। গান

শুধু কি   তার বেঁধেই তোর কাজ ফুরাবে,
গুণী মোর, ও গুণী ?
বাঁধাবীণা রইবে পড়ে এমনি ভাবে,
গুণী মোর, ও গুণী ?
তাহলে   হার হল যে হার হল
শুধু   বাঁধাবাঁধিই সার হল
গুণী মোর, ও গুণী !
বাঁধনে   যদি তোমার হাত লাগে,
তাহলেই সুর জাগে,
গুণী মোর, ও গুণী।
না হলে   ধুলায় পড়ে লাজ কুড়াবে।

নাগরিকদের পুনঃপ্রবেশ

১। এ কী কাণ্ড ?

২। খুড়ো মহারাজ যুবরাজকে সমস্ত প্রহরীসুদ্ধ মোহনগড়ে নিয়ে গেলেন। এর মানে কী হল ?

কুন্দন। উত্তরকূটের রক্ত তো ওঁর শিরায় আছে। পাছে এখানে যুবরাজের উচিত বিচার না হয় সেইজন্যে তাঁকে জোর করে বন্দী করে নিয়ে গেছেন।

১। ভারি অন্যায়। একে অত্যাচার বলে। আমাদের যুবরাজকে আমরা শাস্তি দিতে পারব না ?

২। এর উচিত বিধান হচ্ছে—বুঝলে, দাদা—

১। হাঁ, হাঁ, ওঁদের সেই সোনার খনিটা—

কুন্দন। আর জানিস তো, ভাই, ওঁর গোঠে কিছু না হবে তো পঁচিশ হাজার গোরু আছে।

১। তার সব কটি গুনে নিয়ে তবে—কী অন্যায়। অসহ্য অন্যায়।

৩। আর ওঁদের সেই জাফরানের খেত, তার থেকে অন্তত পাঁচ বৎসরে—

২। হাঁ, হাঁ, সেটা দিতে হবে ওঁকে দণ্ড। কিন্তু এখন এই বৈরাগীকে নিয়ে কী করা যায় ?

১। ও ওইখানেই থাক্‌ না পড়ে। [নাগরিকদের প্রস্থান

ধনঞ্জয়। গান

ফেলে রাখলেই কি পড়ে রবে? (ও অবোধ)
যে তার দাম জানে সে কুড়িয়ে লবে। (ও অবোধ)
ওরে কোন্ রতন তা দেখ্ না ভাবি,
ওর 'পরে কি ধুলোর দাবি?
ও হারিয়ে গেলে তাঁরি গলার
হার গাঁথা যে ব্যর্থ হবে।
ওর খোঁজ পড়েছে জানিস নে তা?
তাই দূত বেরোল হেথা সেথা।
যারে করলি হেলা সবাই মিলি,
আদর যে তার বাড়িয়ে দিলি,
যারে দরদ দিলি, তার ব্যথা কি
সেই দরদির প্রাণে স'বে?

কুন্দনের পুনঃপ্রবেশ

কুন্দন। ঠাকুর, তোমার বাঁধনটা খুলে দি, অপরাধ নিয়ো না। তুমি এখনই বাড়ি পালাও। কী জানি আজ রাত্রে—

ধনঞ্জয়। কী জানি আজ রাত্রে যদি ডাক পড়ে সেইজন্যেই তো বাড়ি পালাবার জো নাই।

কুন্দন। এখানে তোমার ডাক কোথায়?

ধনঞ্জয়। উৎসবের শেষ পালাটায়।

কুন্দন। তুমি শিবতরাইয়ের মানুষ হয়ে উত্তরকূটের—

ধনঞ্জয়। ভৈরবের উৎসবে এখন শিবতরাইয়ের আরতিই কেবল বাকি আছে।

নেপথ্যে। জাগো, ভৈরব, জাগো!

কুন্দন। আমার ভালো বোধ হচ্ছে না, চললেম। [উভয়ের প্রস্থান

উত্তরকূটের দুইজন রাজদূতের প্রবেশ

১। এখন কোন্ দিকে যাই? নওআমুণ্ডে যারা ছাগল চরায় তারা তো বললে, তারা দেখেছে যুবরাজ একলা এই পথ দিয়ে পশ্চিমের দিকে গেছেন।

২। আজ রাত্রে তাঁকে খুঁজে বের করতেই হবে মহারাজের হুকুম।

১। মোহনগড়ে তাঁকে নিয়ে গেছে বলে কথা উঠেছে। কিন্তু অন্ধা পাগলীর কথা শুনে স্পষ্ট বোধ হচ্ছে সে যাকে দেখেছে সে আমাদের যুবরাজ—আর তিনি এই পথ দিয়েই উঠেছেন।

২। কিন্তু এই অন্ধকারে তিনি একলা কোথায় যে যাবেন বোঝা যাচ্ছে না।

১। আলো না হলে আমরা তো এক পা এগোতে পারব না। কোটপালের কাছ থেকে আলো সংগ্রহ করে আনি গে। [উভয়ের প্রস্থান

একজন পথিকের প্রবেশ

পথিক (চীৎকার করিয়া)। ওরে বুধ—ন, শম্ভু—উ। বিপদে ফেললে। আমাকে এগিয়ে দিলে, বললে, চড়াই পথ বেয়ে সোজা এসে আমাকে ধরবে। কারও দেখা নেই। অন্ধকারে ওই কালো যন্ত্রটা ইশারা করছে। ভয় লাগিয়ে দিলে। কে আসে? কে হে? জবাব দাও না কেন? বুধন না কি?

২ পথিক। আমি নিমকু, বাতিওআলা। রাজধানীতে সমস্ত রাত আলো জ্বলবে, বাতির দরকার। তুমি কে?

১ পথিক। আমি হব্বা, যাত্রার দলে গান করি। পথের মধ্যে দেখতে পেলে কি আন্দু অধিকারীর দল?

নিমকু। অনেক মানুষ আসছে, কাকে চিনব?

হব্বা। অনেক মানুষের মধ্যে তাকে ধ'রো না, আমাদের আন্দু। সে একেবারে আস্ত একখানি মানুষ—ভিড়ের মধ্যে তাকে খুঁটে বের করতে হয় না—সবাইকে ঠেলে দেখা দেয়। দাদা, তোমার ওই ঝুড়িটার মধ্যে বোধ করি বাতি অনেকগুলো আছে, একখানা দাও না। ঘরের লোকের চেয়ে রাস্তার লোকের আলোর দরকার বেশি।

নিমকু। দাম কত দেবে?

হব্বা। দামই যদি দিতে পারতুম তবে তো তোমার সঙ্গে হেঁকে কথা কইতুম, মিঠে সুর বের করব কেন?

নিমকু। রসিক বট হে। [প্রস্থান

হব্বা। বাতি দিলে না, কিন্তু রসিক বলে চিনে নিলে। সেটা কম কথা নয়। রসিকের গুণ এই, ঘোর অন্ধকারেও তাকে চেনা যায়।—উঃ, ঝিঁঝির ডাকে আকাশটার গা ঝিমঝিম করছে। নাঃ বাতিওআলার সঙ্গে রসিকতা না করে ডাকাতি করলে কাজে লাগত।

আর-একজন পথিকের প্রবেশ

পথিক। হেইয়ো!

হুব্বা। বাবা রে, চমকিয়ে দাও কেন?

পথিক। এখন চলো!

হুব্বা। চলব বলেই তো বেরিয়েছিলুম। দলের লোককে ছাড়িয়ে চলতে গিয়ে কি রকম অচল হয়ে পড়তে হয় সেই তত্ত্বটা মনে মনে হজম করবার চেষ্টা করছি।

পথিক। দলের লোক তৈরি আছে এখন তুমি গিয়ে জুটলেই হবে।

হুব্বা। কথাটা কী বললে? আমরা তিনমোহনার লোক, আমাদের একটা বদ অভ্যেস আছে পষ্ট কথা না হলে বুঝতেই পারি নে। দলের লোক বলছ কাকে?

পথিক। আমরা চবুয়া গাঁয়ের লোক, পষ্ট বোঝাবার বদ অভ্যেসে হাত পাকিয়েছি। (ধাক্কা দিয়া) এইবার বুঝলে তো?

হুব্বা। উঃ বুঝেছি। ওর সোজা মানে হচ্ছে, আমাকে চলতেই হবে মর্জি থাক আর না থাক। কোথায় চলব? এবার একটু মোলায়েম করে জবাব দিয়ো। তোমার আলাপের প্রথম ধাক্কাতেই আমার বুদ্ধি পরিষ্কার হয়ে এসেছে।

পথিক। শিবতরাইয়ে যেতে হবে।

হুব্বা। শিবতরাইয়ে? এই অমাবস্যারাত্রে? সেখানে পালাটা কিসের?

পথিক। নন্দিসংকটের ভাঙা গড় ফিরে গাঁথবার পালা।

হুব্বা। ভাঙা গড় আমাকে দিয়ে গাঁথাবে? দাদা, অন্ধকারে আমার চেহারাটা দেখতে পাচ্ছ না বলেই এত বড়ো শক্ত কথাটা বললে। আমি হচ্ছি—

পথিক। তুমি যেই হও না কেন, দুখানা হাত আছে তো?

হুব্বা। নেহাত না থাকলে নয় বলেই আছে নইলে একে কি—

পথিক। হাতের পরিচয় মুখের কথায় হয় না, যথাস্থানেই হবে, এখন ওঠো।

দ্বিতীয় পথিকের প্রবেশ

২ পথিক। ওই আর-একজন লোককে পেয়েছি কঙ্কর।

কঙ্কর। লোকটা কে?

৩। আমি কেউ না; বাবা, আমি লছমন, উত্তরভৈরবের মন্দিরে ঘণ্টা বাজাই।

কঙ্কর। সে তো ভালো কথা, হাতে জোর আছে। চলো শিবতরাই।

লছমন। যাব তো, কিন্তু মন্দিরের ঘণ্টা—

কঙ্কর। বাবা ভৈরব নিজের ঘণ্টা নিজেই বাজাবেন।

লছমন। দোহাই তোমাদের, আমার স্ত্রী রোগে ভুগছে।

কঙ্কর। তুমি চলে গেলে তার রোগ হয় সারবে, নয় সে মরবে; তুমি থাকলেও ঠিক তাই হত।

হুব্বা। ভাই লছমন, চুপ করে মেনে যাও। কাজটাতে বিপদ আছে বটে, কিন্তু আপত্তিতেও বিপদ কম নেই, আমি একটু আভাস পেয়েছি।

কঙ্কর। ওই যে, নরসিঙের গলা শোনা যাচ্ছে। কী নরসিং খবর ভালো তো।

কয়েকজন লোককে লইয়া নরসিঙের প্রবেশ

নরসিং। এই দেখো, দল জুটিয়ে এনেছি। আরও কয়দল আগেই রওনা হয়েছে।

কঙ্কর। তা হলে চলো, পথের মধ্যে আরও কিছু কিছু জুটবে।

দলের একজন। আমি যাব না।

কঙ্কর। কেন যাবে না? কী হয়েছে?

উক্ত ব্যক্তি। কিছু হয় নি, আমি যাব না।

কঙ্কর। লোকটার নাম কী, নরসিং?

নরসিং। ওর নাম বনোয়ারি, পদ্মবীজের মালা তৈরি করে।

কঙ্কর। আচ্ছা, ওর সঙ্গে একটু বোঝাপড়া করে নিই—কেন যাবে না বলো তো?

বনোয়ারি। প্রবৃত্তি নেই। শিবতরাইয়ের লোকের সঙ্গে আমার ঝগড়া নেই। ওরা আমাদের শত্রু নয়।

কঙ্কর। আচ্ছা, না হয় আমরাই ওদের শত্রু হলুম, তারও তো একটা কর্তব্য আছে?

বনোয়ারি। আমি অন্যায় করতে পারব না।

কঙ্কর। ন্যায় অন্যায় ভাববার স্বাতন্ত্র্য যেখানে সেইখানেই অন্যায় হচ্ছে অন্যায়। উত্তরকূট বিরাট, তার অংশরূপে যে কাজ তোমার দ্বারা হবে তার কোনো দায়িত্বই তোমার নেই।

বনোয়ারি। উত্তরকূটকে ছাড়িয়ে থাকেন এমন বিরাটও আছেন। উত্তরকূটও তাঁর যেমন অংশ, শিবতরাইও তেমনি।

কঙ্কর। ওহে নরসিং, লোকটা তর্ক করে যে। দেশের পক্ষে ওর বাড়া আপদ আর নেই।

নরসিং। শক্ত কাজে লাগিয়ে দিলেই তর্ক ঝাড়াই হয়ে যায়। তাই ওকে টেনে নিয়ে চলেছি।

বনোয়ারি। তাতে তোমাদের ভার হয়ে থাকব, কোনো কাজে লাগব না।

কম্বর। উত্তরকূটের ভার তুমি, তোমাকে বর্জন করবার উপায় খুঁজছি।

হুব্বা। বনোয়ারি খুড়ো, তুমি বিচার করে সব কথা বুঝতে চাও বলেই, যারা বিনা বিচারে বুঝিয়ে থাকে তাদের সঙ্গে তোমার এত ঠোকাঠুকি বাধে। হয় তাদের প্রণালীটা কায়দা করে নাও, নয় নিজের প্রণালীটা ছেড়ে ঠাণ্ডা হয়ে বসে থাকো।

বনোয়ারি। তোমার প্রণালীটা কী।

হুব্বা। আমি গান গাই। সেটা এখানে খাটবে না বলেই সুর বের করছি নে— নইলে এতক্ষণে তান লাগিয়ে দিতুম।

কম্বর। (বনোয়ারির প্রতি) এখন তোমার অভিপ্রায় কী?

বনোয়ারি। আমি এক পা নড়ব না।

কম্বর। তাহলে আমরাই তোমাকে নড়াব। বাঁধো ওকে।

হুব্বা। একটা কথা বলি, কম্বর দাদা, রাগ ক'রো না। ওকে বয়ে নিয়ে যেতে যে জোরটা খরচ করবে সেইটে বাঁচাতে পারলে কাজে লাগত।

কম্বর। উত্তরকূটের সেবায় যারা অনিচ্ছুক তাদের দমন করা একটা কাজ, সময় থাকতে এই কথাটা বুঝে দেখো।

হুব্বা। এরই মধ্যে বুঝে নিয়েছি। [নরসিং ও কম্বর ছাড়া আর সকলের প্রস্থান

নরসিং। ওই যে বিভূতি আসছে। যন্ত্ররাজ বিভূতির জয়।

বিভূতির প্রবেশ

কম্বর। কাজ অনেকটা এগিয়েছে, লোকও কম জোটে নি। কিন্তু তুমি এখানে কেন? তোমাকে নিয়ে সবাই যে উৎসব করবে।

বিভূতি। উৎসবে আমার শখ নেই।

নরসিং। কেন বলো তো?

বিভূতি। আমার কীর্তি খর্ব করবার জন্যেই নন্দিসংকটের গড় ভাঙার খবর ঠিক আজ এসে পৌঁছোল। আমার সঙ্গে একটা প্রতিযোগিতা চলছে।

কম্বর। কার প্রতিযোগিতা, যন্ত্ররাজ?

বিভূতি। নাম করতে চাই নে, সবাই জান। উত্তরকূটে তাঁর বেশি আদর হবে, না আমার, এই হয়ে দাঁড়াল সমস্যা। একটা কথা তোমাদের জানা নেই; এর মধ্যে

আমার কাছে কোনো পক্ষ থেকে দূত এসেছিল আমার মন ভাঙাতে; আমার মুক্তধারার বাঁধ ভাঙবে এমন শাসনবাক্যেরও আভাস দিয়ে গেল।

নরসিং। এত বড়ো কথা?

কঙ্কর। তুমি সহ্য করলে, বিভূতি?

বিভূতি। প্রলাপবাক্যের প্রতিবাদ চলে না।

কঙ্কর। কিন্তু বিভূতি, এত বেশি নিঃসংশয় হওয়া কি ভালো? তুমিই তো বলেছিলে বাঁধের বন্ধন দুই এক জায়গায় আলগা আছে, তার সন্ধান জানলে অল্প একটুখানিতেই—

বিভূতি। সন্ধান যে জানবে সে এও জানবে যে, সেই ছিদ্র খুলতে গেলে তার রক্ষা নেই, বন্যায় তখনই ভাসিয়ে নিয়ে যাবে।

নরসিং। পাহারা রাখলে ভালো করতে না?

বিভূতি। সে ছিদ্রের কাছে যম স্বয়ং পাহারা দিচ্ছেন। বাঁধের জন্যে কিছুমাত্র আশঙ্কা নেই। আপাতত ওই নন্দিসংকটের পথটা আটকে দিতে পারলে আমার আর কোনো খেদ থাকে না।

কঙ্কর। তোমার পক্ষে এ তো কঠিন নয়।

বিভূতি। না, আমার যন্ত্র প্রস্তুত আছে। মুশকিল এই যে, ওই গিরিপথটা সংকীর্ণ, অনায়াসেই অল্প কয়েক জনেই বাধা দিতে পারে।

নরসিং। বাধা কত দেবে? মরতে মরতে গেঁথে তুলব।

বিভূতি। মরবার লোক বিস্তর চাই।

কঙ্কর। মারবার লোক থাকলে মরবার লোকের অভাব ঘটে না।

নেপথ্যে। জাগো, ভৈরব, জাগো।

ধনঞ্জয়ের প্রবেশ

কঙ্কর। ওই দেখো, যাবার মুখে অযাত্রা।

বিভূতি। বৈরাগী, তোমাদের মতো সাধুরা ভৈরবকে এ পর্যন্ত জাগাতে পারলে না, আর যাকে পাষণ্ড বল সেই আমি ভৈরবকে জাগাতে চলেছি।

ধনঞ্জয়। সে কথা মানি, জাগাবার ভার তোমাদের উপরেই।

বিভূতি। এ কিন্তু তোমাদের ঘণ্টা নেড়ে আরতির দীপ জ্বালিয়ে জাগানো নয়।

ধনঞ্জয়। না, তোমরা শিকল দিয়ে তাঁকে বাঁধবে, তিনি শিকল ছেঁড়বার জন্যে জাগবেন।

বিভূতি। সহজ শিকল আমাদের নয়, পাকের পর পাক, গ্রন্থির পর গ্রন্থি।

ধনঞ্জয়। সব চেয়ে দুঃসাধ্য যখন হয় তখনই তাঁর সময় আসে।

ভৈরবপন্থীর প্রবেশ

গান

জয় ভৈরব, জয় শংকর,
জয় জয় জয় প্রলয়ংকর।
জয় সংশয়-ভেদন,
জয় বন্ধন-ছেদন,
জয় সংকট-সংহর,
শংকর, শংকর। [প্রস্থান

রণজিৎ ও মন্ত্রীর প্রবেশ

মন্ত্রী। মহারাজ, শিবির একেবারে শূন্য, অনেকখানি পুড়েছে। অল্প কয়জন প্রহরী ছিল, তারা তো—

রণজিৎ। তারা যেখানেই থাক না, অভিজিৎ কোথায় জানা চাই।

কঙ্কর। মহারাজ, যুবরাজের শাস্তি আমরা দাবি করি।

রণজিৎ। শাস্তির যে যোগ্য তার শাস্তি দিতে আমি কি তোমাদের অপেক্ষা করে থাকি?

কঙ্কর। তাঁকে খুঁজে না পেয়ে লোকের মনে সংশয় উপস্থিত হয়েছে।

রণজিৎ। কী! সংশয়! কার সম্বন্ধে?

কঙ্কর। ক্ষমা করবেন, মহারাজ। প্রজাদের মনের ভাব আপনার জানা চাই। যুবরাজকে খুঁজে পেতে যতই বিলম্ব হচ্ছে ততই তাদের অধৈর্য এত বেড়ে উঠছে যে, যখন তাঁকে পাওয়া যাবে তখন তারা শাস্তির জন্যে মহারাজের অপেক্ষা করবে না।

বিভূতি। মহারাজের আদেশের অপেক্ষা না করেই নন্দিসংকটের ভাঙা দুর্গ গড়ে তোলবার ভার আমরা নিজের হাতে নিয়েছি।

রণজিৎ। আমার হাতে কেন রাখতে পারলে না?

বিভূতি। যেটা আপনারই বংশের অপকীর্তি, তাতে আপনারও গোপন সম্মতি আছে এ রকম সন্দেহ হওয়া মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক।

মন্ত্রী। মহারাজ, আজ জনসাধারণের মন একদিকে আত্মশ্লাঘায় অন্যদিকে ক্রোধে উত্তেজিত। আজ অধৈর্যের দ্বারা অধৈর্যকে উদ্দাম করে তুলবেন না।

রণজিৎ। ওখানে ও কে দাঁড়িয়ে? ধনঞ্জয় বৈরাগী?

ধনঞ্জয়। বৈরাগীটাকেও মহারাজের মনে আছে দেখছি।

রণজিৎ। যুবরাজ কোথায় তা তুমি নিশ্চিত জান।

ধনঞ্জয়। না, মহারাজ, যা আমি নিশ্চিত জানি তা চেপে রাখতে পারি নে, তাই বিপদে পড়ি।

রণজিৎ। তবে এখানে কী করছ?

ধনঞ্জয়। যুবরাজের প্রকাশের জন্যে অপেক্ষা করছি।

নেপথ্যে। সুমন, বাবা সুমন। অন্ধকার হয়ে এল, সব অন্ধকার হয়ে এল।

রাজা। ও কে ও?

মন্ত্রী। সেই অম্বা পাগলী।

অম্বার প্রবেশ

অম্বা। কই, সে তো ফিরল না।

রণজিৎ। কেন খুঁজছ তাকে? সময় হয়েছিল, ভৈরব তাকে ডেকে নিয়েছেন।

অম্বা। ভৈরব কি কেবল ডেকেই নেন? ভৈরব কি কখনো ফিরিয়ে দেন না? চুপিচুপি? গভীর রাত্রে?—সুমন, সুমন। [প্রস্থান

চরের প্রবেশ

চর। শিবতরাই থেকে হাজার হাজার লোক চলে আসছে।

বিভূতি। সে কী কথা? আমরা হঠাৎ গিয়ে তাদের নিরস্ত্র করব এই তো ঠিক ছিল। নিশ্চয় তোমাদের কোনো বিশ্বাসঘাতক তাদের খবর দিয়েছে। কঙ্কর, তোমরা কয়জন ছাড়া ভিতরের কথা কেউ তো জানে না। তাহলে কী করে—

কঙ্কর। কী বিভূতি! আমাদেরও সন্দেহ কর না কি?

বিভূতি। সন্দেহ করার সীমা কোথাও নেই।

কঙ্কর। তাহলে আমরাও তোমাকে সন্দেহ করি।

বিভূতি। সে অধিকার তোমাদের আছে। যাই হ'ক সময় হলে এর একটা বোঝা-পড়া করতে হবে।

রণজিৎ। (চরের প্রতি) তারা কী অভিপ্রায়ে আসছে তুমি জান?

চর। তারা শুনেছে—যুবরাজ বন্দী হয়েছেন, তাই পণ করেছে তাঁকে খুঁজে বের করবে। এখান থেকে মুক্ত করে তাঁকে ওরা শিবতরাইয়ের রাজা করতে চায়।

বিভূতি। আমরাও খুঁজছি যুবরাজকে, আর ওরাও খুঁজছে, দেখি কার হাতে পড়েন।

ধনঞ্জয়। তোমাদের দুই দলেরই হাতে পড়বেন, তাঁর মনে পক্ষপাত নেই।

চর। ওই যে আসছে শিবতরাইয়ের গণেশ সর্দার।

গণেশের প্রবেশ

গণেশ (ধনঞ্জয়ের প্রতি)। ঠাকুর, পাব তো তাঁকে?

ধনঞ্জয়। হাঁ রে, পাবি।

গণেশ। নিশ্চয় করে বলো।

ধনঞ্জয়। পাবি রে।

রণজিৎ। কাকে খুঁজছিস?

গণেশ। এই যে রাজা, ছেড়ে দিতে হবে।

রণজিৎ। কাকে রে?

গণেশ। আমাদের যুবরাজকে। তোমরা তাকে চাও না, আমরা তাকে চাই। আমাদের সবই তোমরা আটক করে রাখবে? ওকেও?

ধনঞ্জয়। মানুষ চিনলি নে, বোকা? ওকে আটক করে এমন সাধ্য আছে কার?

গণেশ। ওকে আমাদের রাজা করে রাখব।

ধনঞ্জয়। রাখবি বই কি। ও রাজবেশ পরে আসবে।

ভৈরবপন্থীর প্রবেশ

গান

তিমির-হৃদ্‌বিদারণ
জলদগ্নি-নিদারুণ,
মরুশ্মশান-সঞ্চর,
শংকর, শংকর।
বজ্রঘোষ-বাণী,
রুদ্র, শূলপাণি,
মৃত্যুসিন্ধু-সন্তর,
শংকর, শংকর। [প্রস্থান

নেপথ্যে। মা ডাকে, মা ডাকে। ফিরে আয়, সুমন ফিরে আয়।

বিভূতি। ও কী শুনি? ও কিসের শব্দ?

ধনঞ্জয়। অন্ধকারের বুকের ভিতর খিল খিল করে হেসে উঠল যে।

বিভূতি। আঃ থামো না, শব্দটা কোন্ দিকে বলো তো?

নেপথ্যে। জয় হ'ক, ভৈরব।

বিভূতি। এ তো স্পষ্টই জলস্রোতের শব্দ।

ধনঞ্জয়। নাচ আরম্ভের প্রথম ডমরুধ্বনি।

বিভূতি। শব্দ বেড়ে উঠছে যে, বেড়ে উঠছে।

কঙ্কর। এ যেন—

নরসিং। বোধ হচ্ছে যেন—

বিভূতি। হাঁ, হাঁ, সন্দেহ নেই। মুক্তধারা ছুটেছে। বাঁধ কে ভাঙলে? কে ভাঙলে?—তার নিস্তার নেই। [কঙ্কর, নরসিং ও বিভূতির দ্রুত প্রস্থান

রণজিৎ। মন্ত্রী, এ কী কাণ্ড?

ধনঞ্জয়। বাঁধ-ভাঙার উৎসবে ডাক পড়েছে।

গান

বাজে রে বাজে ডমরু বাজে
হৃদয় মাঝে, হৃদয় মাঝে।

মন্ত্রী। মহারাজ এ যেন—

রণজিৎ। হাঁ, এ যেন তাঁরই—

মন্ত্রী। তিনি ছাড়া আর তো কারও—

রণজিৎ। এমন সাহস আর কার?

ধনঞ্জয়। গান

নাচে রে নাচে চরণ নাচে,
প্রাণের কাছে, প্রাণের কাছে।

রণজিৎ। শাস্তি দিতে হয় আমি শাস্তি দেব। কিন্তু এইসব উন্মত্ত প্রজাদের হাত থেকে—আমার অভিজিৎ দেবতার প্রিয়, দেবতারা তাকে রক্ষা করুন।

গণেশ। প্রভু, ব্যাপার কী হল কিছু তো বুঝতে পারছি নে।

ধনঞ্জয়। গান

প্রহর জাগে, প্রহরী জাগে,
তারায় তারায় কাঁপন লাগে।

রণজিৎ। ওই পায়ের শব্দ শুনছি যেন। অভিজিৎ, অভিজিৎ।

মন্ত্রী। ওই যেন আসছেন।

ধনঞ্জয়। গান

মরমে মরমে বেদনা ফুটে,
বাঁধন টুটে, বাঁধন টুটে।

সঞ্জয়ের প্রবেশ

রণজিৎ। এ যে সঞ্জয়। অভিজিৎ কোথায়?

সঞ্জয়। মুক্তধারার স্রোত তাঁকে নিয়ে গেল, আমরা তাঁকে পেলুম না।

রণজিৎ। কি বলছ, কুমার।

সঞ্জয়। যুবরাজ মুক্তধারার বাঁধ ভেঙেছেন।

রণজিৎ। বুঝেছি, সেই মুক্তিতে তিনি মুক্তি পেয়েছেন। সঞ্জয়, তোমাকে কি তিনি সঙ্গে নিয়েছিলেন?

সঞ্জয়। না, কিন্তু আমি মনে বুঝেছিলুম তিনি ওইখানেই যাবেন, আমি গিয়ে অন্ধকারে তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছিলুম, কিন্তু ওই পর্যন্ত—বাধা দিলেন, আমাকে শেষ পর্যন্ত যেতে দিলেন না।

রণজিৎ। কী হল আর-একটু বলো।

সঞ্জয়। ওই বাঁধের একটা ত্রুটির সন্ধান কী করে তিনি জেনেছিলেন। সেইখানে যন্ত্রাসুরকে তিনি আঘাত করলেন, যন্ত্রাসুর তাঁকে সেই আঘাত ফিরিয়ে দিলে। তখন মুক্তধারা তাঁর সেই আহত দেহকে মায়ের মতো কোলে তুলে নিয়ে চলে গেল।

গণেশ। যুবরাজকে আমরা যে খুঁজতে বেরিয়েছিলুম তাহলে তাঁকে কি আর পাব না।

ধনঞ্জয়। চিরকালের মতো পেয়ে গেলি।

ভৈরবপন্থীর প্রবেশ

গান

জয় ভৈরব, জয় শংকর,
জয় জয় জয় প্রলয়ংকর।

জয় সংশয়-ভেদন,
জয় বন্ধন-ছেদন,
জয় সংকট-সংহর,
শংকর, শংকর।
তিমির-হৃদ্‌বিদারণ
জলদগ্নি নিদারুণ,
মরু-শ্মশান-সঞ্চর,
শংকর, শংকর।
বজ্রঘোষ-বাণী,
রুদ্র, শূলপাণি,
মৃত্যুসিন্ধু-সন্তর,
শংকর, শংকর।

পৌষসংক্রান্তি, ১৩২৮
শান্তিনিকেতন

উপন্যাস ও গল্প

গল্পগুচ্ছ

গল্পগুচ্ছ

ঘাটের কথা

পাষাণে ঘটনা যদি অঙ্কিত হইত তবে কতদিনকার কত কথা আমার সোপানে সোপানে পাঠ করিতে পারিতে। পুরাতন কথা যদি শুনিতে চাও, তবে আমার এই ধাপে বইস; মনোযোগ দিয়া জলকল্লোলে কান পাতিয়া থাকো, বহুদিনকার কত বিস্মৃত কথা শুনিতে পাইবে।

আমার আর-একদিনের কথা মনে পড়িতেছে। সেও ঠিক এইরূপ দিন। আশ্বিন মাস পড়িতে আর দুই-চারি দিন বাকি আছে। ভোরের বেলায় অতি ঈষৎ মধুর নবীন শীতের বাতাস নিদ্রোত্থিতের দেহে নূতন প্রাণ আনিয়া দিতেছে। তরু-পল্লব অমনি একটু একটু শিহরিয়া উঠিতেছে।

ভরা গঙ্গা। আমার চারিটিমাত্র ধাপ জলের উপরে জাগিয়া আছে। জলের সঙ্গে স্থলের সঙ্গে যেন গলাগলি। তীরে আম্রকাননের নিচে যেখানে কচুবন জন্মিয়াছে, সেখান পর্যন্ত গঙ্গার জল গিয়াছে। নদীর ওই বাঁকের কাছে তিনটে পুরাতন ইটের পাঁজা চারিদিকে জলের মধ্যে জাগিয়া রহিয়াছে। জেলেদের যে নৌকাগুলি ডাঙার বাবলাগাছের গুঁড়ির সঙ্গে বাঁধা ছিল সেগুলি প্রভাতে জোয়ারের জলে ভাসিয়া উঠিয়া টলমল করিতেছে—দুরন্তযৌবন জোয়ারের জল রঙ্গ করিয়া তাহাদের দুই পাশে ছল ছল আঘাত করিতেছে, তাহাদের কর্ণ ধরিয়া মধুর পরিহাসে নাড়া দিয়া যাইতেছে।

ভরা গঙ্গার উপরে শরৎপ্রভাতের যে রৌদ্র পড়িয়াছে, তাহার কাঁচা সোনার মতো রং, চাঁপা ফুলের মতো রং। রৌদ্রের এমন রং আর কোনো সময়ে দেখা যায় না। চড়ার উপরে কাশবনের উপরে রৌদ্র পড়িয়াছে। এখনও কাশফুল সব ফুটে নাই, ফুটিতে আরম্ভ করিয়াছে মাত্র।

রাম রাম বলিয়া মাঝিরা নৌকা খুলিয়া দিল। পাখিরা যেমন আলোতে পাখা মেলিয়া আনন্দে নীল আকাশে উড়িয়াছে, ছোটো ছোটো নৌকাগুলি তেমনি ছোটো ছোটো পাল ফুলাইয়া সূর্যকিরণে বাহির হইয়াছে। তাহাদের পাখি বলিয়া মনে

হয় ; তাহারা রাজহাঁসের মতো জলে ভাসিতেছে, কিন্তু আনন্দে পাখা দুটি আকাশে ছড়াইয়া দিয়াছে।

ভট্টাচার্য মহাশয় ঠিক নিয়মিত সময়ে কোশাকুশি লইয়া স্নান করিতে আসিয়াছেন। মেয়েরা দুই-একজন করিয়া জল লইতে আসিয়াছে।

সে বড়ো বেশি দিনের কথা নহে। তোমাদের অনেক দিন বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু আমার মনে হইতেছে এই সেদিনের কথা। আমার দিনগুলি কিনা গঙ্গার স্রোতের উপর খেলাইতে খেলাইতে ভাসিয়া যায়, বহুকাল ধরিয়া স্থিরভাবে তাহাই দেখিতেছি—এইজন্য সময় বড়ো দীর্ঘ বলিয়া মনে হয় না। আমার দিনের আলো রাত্রের ছায়া প্রতিদিন গঙ্গার উপরে পড়ে আবার প্রতিদিন গঙ্গার উপর হইতে মুছিয়া যায়, কোথাও তাহাদের ছবি রাখিয়া যায় না। সেইজন্য, যদিও আমাকে বৃদ্ধের মতো দেখিতে হইয়াছে, আমার হৃদয় চিরকাল নবীন। বহুবৎসরের স্মৃতির শৈবালভারে আচ্ছন্ন হইয়া আমার সূর্যকিরণ মারা পড়ে নাই। দৈবাৎ একটা ছিন্ন শৈবাল ভাসিয়া আসিয়া গায়ে লাগিয়া থাকে, আবার স্রোতে ভাসিয়া যায়। তাই বলিয়া যে কিছু নাই এমন বলিতে পারি না। যেখানে গঙ্গার স্রোত পৌছায় না, সেখানে আমার ছিদ্রে ছিদ্রে যে লতাগুল্মশৈবাল জন্মিয়াছে, তাহারাই আমার পুরাতনের সাক্ষী, তাহারাই পুরাতন কালকে স্নেহপাশে বাঁধিয়া চিরদিন শ্যামল মধুর চিরদিন নূতন করিয়া রাখিয়াছে। গঙ্গা প্রতিদিন আমার কাছ হইতে এক-এক ধাপ সরিয়া যাইতেছেন, আমিও এক-এক ধাপ করিয়া পুরাতন হইতেছি।

চক্রবর্তীদের বাড়ির ওই যে বৃদ্ধা স্নান করিয়া নামাবলী গায়ে কাঁপিতে কাঁপিতে মালা জপিতে জপিতে বাড়ি ফিরিয়া যাইতেছেন উঁহার মাতামহী তখন এতটুকু ছিল। আমার মনে আছে তাহার এক খেলা ছিল, সে প্রত্যহ একটা ঘৃতকুমারীর পাতা গঙ্গার জলে ভাসাইয়া দিত ; আমার দক্ষিণ বাহুর কাছে একটা পাকের মতো ছিল, সেইখানে পাতাটা ক্রমাগত ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইত, সে কলসী রাখিয়া দাঁড়াইয়া তাহাই দেখিত। যখন দেখিলাম কিছুদিন বাদে সেই মেয়েটিই আবার ডাগর হইয়া উঠিয়া তাহার নিজের একটি মেয়ে সঙ্গে লইয়া জল লইতে আসিল, সে মেয়েও আবার বড়ো হইল, বালিকারা জল ছুড়িয়া দুরন্তপনা করিলে তিনিও আবার তাহাদিগকে শাসন করিতেন ও ভদ্রোচিত ব্যবহার শিক্ষা দিতেন, তখন আমার সেই ঘৃতকুমারীর নৌকা ভাসানো মনে পড়িত ও বড়ো কৌতুক বোধ হইত।

যে-কথাটা বলিব মনে করি সে আর আসে না। একটা কথা বলিতে বলিতে স্রোতে আর-একটা কথা ভাসিয়া আসে। কথা আসে, কথা যায়, ধরিয়া রাখিতে পারি

না। কেবল এক-একটা কাহিনী সেই ব্রতকুমারীর নৌকাগুলির মতো পাকে পড়িয়া অবিশ্রাম ফিরিয়া ফিরিয়া আসে। তেমনি একটা কাহিনী তাহার পসরা লইয়া আজ আমার কাছে ফিরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছে কখন ডোবে কখন ডোবে। পাতাটুকুরই মতো সে অতি ছোটো, তাহাতে বেশি কিছু নাই, দুটি খেলার ফুল আছে। তাহাকে ডুবিতে দেখিলে কোমলপ্রাণা বালিকা কেবলমাত্র একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বাড়ি ফিরিয়া যাইবে।

মন্দিরের পাশে যেখানে ওই গোঁসাইদের গোয়ালঘরের বেড়া দেখিতেছ, ওইখানে একটা বাবলা গাছ ছিল। তাহারই তলায় সপ্তাহে একদিন করিয়া হাট বসিত। তখনও গোঁসাইরা এখানে বসতি করে নাই। যেখানে তাহাদের চণ্ডীমণ্ডপ পড়িয়াছে, ওইখানে একটা গোলপাতার ছাউনি ছিল মাত্র।

এই যে অশথ গাছ আজ আমার পঞ্জরে পঞ্জরে বাহু প্রসারণ করিয়া সুবিকট সুদীর্ঘ কঠিন অঙ্গুলিজালের ন্যায় শিকড়গুলির দ্বারা আমার বিদীর্ণ পাষাণ-প্রাণ মুঠা করিয়া রাখিয়াছে, এ তখন এতটুকু একটুখানি চারা ছিল মাত্র। কচি কচি পাতাগুলি লইয়া মাথা তুলিয়া উঠিতেছিল। রৌদ্র উঠিলে ইহার পাতার ছায়াগুলি আমার উপর সমস্ত দিন ধরিয়া খেলা করিত, ইহার নবীন শিকড়গুলি শিশুর অঙ্গুলির ন্যায় আমার বুকের কাছে কিলবিল করিত। কেহ ইহার একটি পাতা ছিঁড়িলে আমার ব্যথা বাজিত।

যদিও বয়স অনেক হইয়াছিল তবু তখনও আমি সিধা ছিলাম। আজ যেমন মেরুদণ্ড ভাঙিয়া অষ্টাবক্রের মতো বাঁকিয়া চুরিয়া গিয়াছি, গভীর ত্রিবলিরেখার মতো সহস্র জায়গায় ফাটল ধরিয়াছে, আমার গর্ভের মধ্যে বিশ্বের ভেক তাহাদের শীতকালের সুদীর্ঘ নিদ্রার আয়োজন করিতেছে, তখন আমার সে দশা ছিল না। কেবল আমার বামবাহুর বাহিরের দিকে দুইখানি ইঁটের অভাব ছিল, সেই গর্তটির মধ্যে একটা ফিঙে বাসা করিয়াছিল। ভোরের বেলায় যখন সে উস্খুস্ করিয়া জাগিয়া উঠিত, মৎস্যপুচ্ছের ন্যায় তাহার জোড়াপুচ্ছ দুই-চারিবার দ্রুত নাচাইয়া শিস দিয়া আকাশে উড়িয়া যাইত, তখন জানিতাম, কুসুমের ঘাটে আসিবার সময় হইয়াছে।

যে মেয়েটির কথা বলিতেছি ঘাটের অন্যান্য মেয়েরা তাহাকে কুসুম বলিয়া ডাকিত। বোধ করি কুসুমই তাহার নাম হইবে। জলের উপরে যখন কুসুমের ছোটো ছায়াটি পড়িত, তখন আমার সাধ যাইত সে ছায়াটি যদি ধরিয়া রাখিতে পারি, সে ছায়াটি যদি আমার পাষাণে বাঁধিয়া রাখিতে পারি; এমনি তাহার একটি মাধুরী ছিল। সে যখন আমার পাষাণের উপর পা ফেলিত ও তাহার চারগাছি মল বাজিতে থাকিত, তখন

আমার শৈবালগুল্মগুলি যেন পুলকিত হইয়া উঠিত। কুসুম যে খুব বেশি খেলা করিত বা গল্প করিত, বা হাসিতামাশা করিত তাহা নহে, তথাপি আশ্চর্য এই, তাহার যত সঙ্গিনী এমন আর কাহারও নয়। যত দুরন্ত মেয়েদের তাহাকে না হইলে চলিত না। কেহ তাহাকে বলিত কুসি, কেহ তাহাকে বলিত খুশি, কেহ তাহাকে বলিত রাক্কুসি। তাহার মা তাহাকে বলিত কুসমি। যখন তখন দেখিতাম কুসুম জলের ধারে বসিয়া আছে। জলের সঙ্গে তাহার হৃদয়ের সঙ্গে বিশেষ যেন কী মিল ছিল। সে জল ভারি ভালোবাসিত।

কিছুদিন পরে কুসুমকে আর দেখিতে পাই না। ভুবন আর স্বর্ণ ঘাটে আসিয়া কাঁদিত। শুনিলাম তাহাদের কুসি-খুশি-রাক্কুসিকে শ্বশুরবাড়ি লইয়া গিয়াছে। শুনিলাম, যেখানে তাহাকে লইয়া গেছে, সেখানে নাকি গঙ্গা নাই। সেখানে আবার কারা সব নূতন লোক, নূতন ঘরবাড়ি, নূতন পথঘাট। জলের পদ্মটিকে কে যেন ডাঙায় রোপণ করিতে লইয়া গেল।

ক্রমে কুসুমের কথা একরকম ভুলিয়া গেছি। এক বৎসর হইয়া গেছে। ঘাটের মেয়েরা কুসুমের গল্পও বড়ো করে না। একদিন সন্ধ্যার সময়ে বহুকালের পরিচিত পায়ের স্পর্শে সহসা যেন চমক লাগিল। মনে হইল যেন কুসুমের পা। তাহাই বটে, কিন্তু সে পায়ে আর মল বাজিতেছে না। সে পায়ের সে সংগীত নাই। কুসুমের পায়ের স্পর্শ ও মলের শব্দ চিরকাল একত্র অনুভব করিয়া আসিতেছি—আজ সহসা সেই মলের শব্দটি না শুনিতে পাইয়া সন্ধ্যাবেলাকার জলের কল্লোল কেমন বিষণ্ণ শুনাইতে লাগিল, আম্রবনের মধ্যে পাতা ঝরঝর করিয়া বাতাস কেমন হা হা করিয়া উঠিল।

কুসুম বিধবা হইয়াছে। শুনিলাম তাহার স্বামী বিদেশে চাকরি করিত; দুই-একদিন ছাড়া স্বামীর সহিত সাক্ষাৎই হয় নাই। পত্রযোগে বৈধব্যের সংবাদ পাইয়া আট বৎসর বয়সে মাথার সিঁদুর মুছিয়া গায়ের গহনা ফেলিয়া আবার তাহার দেশে সেই গঙ্গার ধারে ফিরিয়া আসিয়াছে। কিন্তু, তাহার সঙ্গিনীদেরও বড়ো কেহ নাই। ভুবন স্বর্ণ অমলা শ্বশুরঘর করিতে গিয়াছে। কেবল শরৎ আছে, কিন্তু শুনিতেছি অগ্রহায়ণ মাসে তাহারও বিবাহ হইয়া যাইবে। কুসুম নিতান্ত একলা পড়িয়াছে। কিন্তু, সে যখন দুটি হাঁটুর উপর মাথা রাখিয়া চুপ করিয়া আমার ধাপে বসিয়া থাকিত, তখন আমার মনে হইত যেন নদীর ঢেউগুলি সবাই মিলিয়া হাত তুলিয়া তাহাকে কুসি-খুশি-রাক্কুসি বলিয়া ডাকাডাকি করিত।

বর্ষার আরম্ভে গঙ্গা যেমন প্রতিদিন দেখিতে দেখিতে ভরিয়া উঠে, কুসুম তেমনি দেখিতে দেখিতে প্রতিদিন সৌন্দর্যে যৌবনে ভরিয়া উঠিতে লাগিল। কিন্তু তাহার মলিন

বসন করুণ মুখ শান্ত স্বভাবে তাহার যৌবনের উপর এমন একটি ছায়াময় আবরণ রচনা করিয়া দিয়াছিল যে, সে যৌবন সে বিকশিত রূপ সাধারণের চোখে পড়িত না। কুসুম যে বড়ো হইয়াছে এ যেন কেহ দেখিতে পাইত না। আমি তো পাইতাম না। আমি কুসুমকে সেই বালিকাটির চেয়ে বড়ো কখনো দেখি নাই। তাহার মল ছিল না বটে, কিন্তু সে যখন চলিত আমি সেই মলের শব্দ শুনিতে পাইতাম। এমনি করিয়া দশ বৎসর কখন কাটিয়া গেল গাঁয়ের লোকেরা কেহ যেন জানিতেই পারিল না।

এই আজ যেমন দেখিতেছ, সে বৎসরেও ভাদ্র মাসের শেষাশেষি এমন একদিন আসিয়াছিল। তোমাদের প্রপিতামহীরা সেদিন সকালে উঠিয়া এমনিতরো মধুর সূর্যের আলো দেখিতে পাইয়াছিলেন। তাঁহারা যখন এতখানি ঘোমটা টানিয়া কলসী তুলিয়া লইয়া আমার উপরে প্রভাতের আলো আরও আলোময় করিবার জন্য গাছপালার মধ্য দিয়া গ্রামের উঁচুনিচু রাস্তার ভিতর দিয়া গল্প করিতে করিতে চলিয়া আসিতেন তখন তোমাদের সম্ভাবনাও তাঁহাদের মনের এক পার্শ্বে উদিত হইত না। তোমরা যেমন ঠিক মনে করিতে পার না, তোমাদের দিদিমারাও সত্যসত্যই একদিন খেলা করিয়া বেড়াইতেন, আজিকার দিন যেমন সত্য, যেমন জীবন্ত, সেদিনও ঠিক তেমনি সত্য ছিল, তোমাদের মতো তরুণ হৃদয়খানি লইয়া সুখে দুঃখে তাঁহারা তোমাদেরই মতো টলমল করিয়া দুলিয়াছেন, তেমনি আজিকার এই শরতের দিন,—তাঁহারা-হীন, তাঁহাদের সুখদুঃখের স্মৃতিলেশমাত্রহীন আজিকার এই শরতের সূর্যকরোজ্জ্বল আনন্দচ্ছবি—তাঁহাদের কল্পনার নিকটে তদপেক্ষাও অগোচর ছিল।

সেদিন ভোর হইতে প্রথম উত্তরের বাতাস অল্প অল্প করিয়া বহিতে আরম্ভ করিয়া ফুটন্ত বাবলা ফুলগুলি আমার উপরে এক-আধটা উড়াইয়া ফেলিতে ছিল। আমার পাষাণের উপরে একটু একটু শিশিরের রেখা পড়িয়াছিল। সেই দিন সকালে কোথা হইতে গৌরতনু সৌম্যোজ্জ্বলমুখচ্ছবি দীর্ঘকায় এক নবীন সন্ন্যাসী আসিয়া আমার সম্মুখস্থ ওই শিবমন্দিরে আশ্রয় লইলেন। সন্ন্যাসীর আগমনবার্তা গ্রামে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। মেয়েরা কলসী রাখিয়া বাবাঠাকুরকে প্রণাম করিবার জন্য মন্দিরে গিয়া ভিড় করিল।

ভিড় প্রতিদিন বাড়িতে লাগিল। একে সন্ন্যাসী, তাহাতে অনুপম রূপ, তাহাতে তিনি কাহাকেও অবহেলা করিতেন না, ছেলেদের কোলে লইয়া বসাইতেন, জননীদিগকে ঘরকন্নার কথা জিজ্ঞাসা করিতেন। নারীসমাজে অল্পকালের মধ্যেই তাঁহার অত্যন্ত প্রতিপত্তি হইল। তাঁহার কাছে পুরুষও বিস্তর আসিত। কোনোদিন ভাগবত পাঠ করিতেন, কোনোদিন ভগবদ্গীতার ব্যাখ্যা করিতেন, কোনোদিন মন্দিরে বসিয়া নানা শাস্ত্র লইয়া আন্দোলন করিতেন। তাঁহার নিকটে কেহ উপদেশ লইতে আসিত, কেহ

মন্ত্র লইতে আসিত। কেহ রোগের ঔষধ জানিতে আসিত। মেয়েরা ঘাটে আসিয়া বলাবলি করিত—আহা কী রূপ! মনে হয় যেন মহাদেব সশরীরে তাঁহার মন্দিরে আসিয়া অধিষ্ঠিত হইয়াছেন।

যখন সন্ন্যাসী প্রতিদিন প্রত্যূষে সূর্যোদয়ের পূর্বে শুকতারাকে সম্মুখে রাখিয়া গঙ্গার জলে নিমগ্ন হইয়া ধীরগম্ভীরস্বরে সন্ধ্যাবন্দনা করিতেন, তখন আমি জলের কল্লোল শুনিতে পাইতাম না। তাঁহার সেই কণ্ঠস্বর শুনিতে শুনিতে প্রতিদিন গঙ্গার পূর্ব উপকূলের আকাশ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিত, মেঘের ধারে ধারে অরুণ রঙের রেখা পড়িত, অন্ধকার যেন বিকাশোন্মুখ কুঁড়ির আবরণ-পুটের মতো ফাটিয়া চারিদিকে নামিয়া পড়িত ও আকাশ-সরোবরে উষাকুসুমের লাল আভা অল্প অল্প করিয়া বাহির হইয়া আসিত। আমার মনে হইত যে, এই মহাপুরুষ গঙ্গার জলে দাঁড়াইয়া পূর্বের দিকে চাহিয়া যে এক মহামন্ত্র পাঠ করেন তাহারই এক-একটি শব্দ উচ্চারিত হইতে থাকে আর নিশীথিনীর কুহক ভাঙিয়া যায়, চন্দ্র-তারা পশ্চিমে নামিয়া পড়ে, সূর্য পূর্বাকাশে উঠিতে থাকে, জগতের দৃশ্যপট পরিবর্তিত হইয়া যায়। এ কে মায়াবী। স্নান করিয়া যখন সন্ন্যাসী হোমশিখার ন্যায় তাঁহার দীর্ঘ শুভ্র পুণ্যতনু লইয়া জল হইতে উঠিতেন, তাঁহার জটাজূট হইতে জল ঝরিয়া পড়িত, তখন নবীন সূর্যকিরণ তাঁহার সর্বাঙ্গে পড়িয়া প্রতিফলিত হইতে থাকিত।

এমন আরও কয়েক মাস কাটিয়া গেল। চৈত্র মাসে সূর্যগ্রহণের সময় বিস্তর লোক গঙ্গাস্নানে আসিল। বাবলাতলায় মস্ত হাট বসিল। এই উপলক্ষে সন্ন্যাসীকে দেখিবার জন্যও লোকসমাগম হইল। যে গ্রামে কুসুমের শ্বশুরবাড়ি সেখান হইতেও অনেকগুলি মেয়ে আসিয়াছিল।

সকালে আমার ধাপে বসিয়া সন্ন্যাসী জপ করিতেছিলেন, তাঁহাকে দেখিয়াই সহসা একজন মেয়ে আর-এক জনের গা টিপিয়া বলিয়া উঠিল, "ওলো, এ যে আমাদের কুসুমের স্বামী।"

আর-একজন দুই আঙুলে ঘোমটা কিছু ফাঁক করিয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল, "ওমা, তাইতো গা, এ যে আমাদের চাটুজ্যেদের বাড়ির ছোটোদাদাবাবু।"

আর একজন ঘোমটার বড়ো ঘটা করিত না, সে কহিল, "আহা, তেমনি কপাল, তেমনি নাক, তেমনি চোখ।"

আর-একজন সন্ন্যাসীর দিকে মনোযোগ না করিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া কলসী দিয়া জল ঠেলিয়া বলিল, "আহা সে কি আর আছে। সে কি আর আসবে। কুসুমের কি তেমনি কপাল।"

তখন কেহ কহিল, "তার এত দাড়ি ছিল না।"

কেহ বলিল, "সে এমন একহারা ছিল না।"

কেহ কহিল, "সে যেন এতটা লম্বা নয়।"

এইরূপে এ-কথাটার একরূপ নিষ্পত্তি হইয়া গেল, আর উঠিতে পাইল না।

গ্রামের আর সকলেই সন্ন্যাসীকে দেখিয়াছিল, কেবল কুসুম দেখে নাই। অধিক লোকসমাগম হওয়াতে কুসুম আমার কাছে আসা একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছিল। একদিন সন্ধ্যাবেলা পূর্ণিমা তিথিতে চাঁদ উঠিতে দেখিয়া বুঝি আমাদের পুরাতন সম্বন্ধ তাহার মনে পড়িল।

তখন ঘাটে আর কেহ লোক ছিল না। ঝিঁঝি পোকা ঝিঁ ঝিঁ করিতেছিল। মন্দিরের কাঁসর ঘণ্টা বাজা এই কিছুক্ষণ হইল শেষ হইয়া গেল, তাহার শেষ শব্দতরঙ্গ ক্ষীণতর হইয়া পরপারের ছায়াময় বনশ্রেণীর মধ্যে ছায়ার মতো মিলাইয়া গেছে। পরিপূর্ণ জ্যোৎস্না। জোয়ারের জল ছল ছল করিতেছে। আমার উপরে ছায়াটি ফেলিয়া কুসুম বসিয়া আছে। বাতাস বড়ো ছিল না, গাছপালা নিস্তব্ধ। কুসুমের সম্মুখে গঙ্গার বক্ষে অবারিত প্রসারিত জ্যোৎস্না—কুসুমের পশ্চাতে আশে পাশে ঝোপে ঝাপে গাছে পালায়, মন্দিরের ছায়ায়, ভাঙা ঘরের ভিত্তিতে, পুষ্করিণীর ধারে, তালবনে অন্ধকার গা ঢাকা দিয়া মুখে মুড়ি দিয়া বসিয়া আছে। ছাতিম গাছের শাখায় বাদুড় ঝুলিতেছে। মন্দিরের চূড়ায় বসিয়া পেচক কাঁদিয়া উঠিতেছে। লোকালয়ের কাছে শৃগালের উর্ধ্ব-চীৎকার ধ্বনি উঠিল ও থামিয়া গেল।

সন্ন্যাসী ধীরে ধীরে মন্দিরের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। ঘাটে আসিয়া দুই-এক সোপান নামিয়া একাকিনী রমণীকে দেখিয়া ফিরিয়া যাইবেন মনে করিতেছেন—এমন সময়ে সহসা কুসুম মুখ তুলিয়া পশ্চাতে চাহিয়া দেখিল।

তাহার মাথার উপর হইতে কাপড় পড়িয়া গেল। উর্ধ্বমুখ ফুটন্ত ফুলের উপরে যেমন জ্যোৎস্না পড়ে, মুখ তুলিতেই কুসুমের মুখের উপর তেমনি জ্যোৎস্না পড়িল। সেই মুহূর্তেই উভয়ের দেখা হইল। যেন চেনাশোনা হইল। মনে হইল যেন পূর্বজন্মের পরিচয় ছিল।

মাথার উপর দিয়া পেচক ডাকিয়া চলিয়া গেল। শব্দে সচকিত হইয়া আত্মসংবরণ করিয়া কুসুম মাথার কাপড় তুলিয়া দিল। উঠিয়া সন্ন্যাসীর পায়ের কাছে লুটাইয়া প্রণাম করিল।

সন্ন্যাসী আশীর্বাদ করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কী।"

কুসুম কহিল, "আমার নাম কুসুম।"

সে-রাত্রে আর কোনো কথা হইল না। কুসুমের ঘর খুব কাছেই ছিল, কুসুম ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। সে-রাত্রে সন্ন্যাসী অনেকক্ষণ পর্যন্ত আমার সোপানে বসিয়া ছিলেন। অবশেষে যখন পূর্বের চাঁদ পশ্চিমে আসিল, সন্ন্যাসীর পশ্চাতের ছায়া সম্মুখে আসিয়া পড়িল, তখন তিনি উঠিয়া মন্দিরে গিয়া প্রবেশ করিলেন।

তাহার পরদিন হইতে আমি দেখিতাম কুসুম প্রত্যহ আসিয়া সন্ন্যাসীর পদধূলি লইয়া যাইত। সন্ন্যাসী যখন শাস্ত্রব্যাখ্যা করিতেন তখন সে একধারে দাঁড়াইয়া শুনিত। সন্ন্যাসী প্রাতঃসন্ধ্যা সমাপন করিয়া কুসুমকে ডাকিয়া তাহাকে ধর্মের কথা বলিতেন। সব কথা সে কি বুঝিতে পারিত। কিন্তু অত্যন্ত মনোযোগের সহিত সে চুপ করিয়া বসিয়া শুনিত। সন্ন্যাসী তাহাকে যেমন উপদেশ করিতেন সে অবিকল তাহাই পালন করিত। প্রত্যহ সে মন্দিরের কাজ করিত—দেবসেবায় আলস্য করিত না—পূজার ফুল তুলিত—গঙ্গা হইতে জল তুলিয়া মন্দির ধৌত করিত।

সন্ন্যাসী তাহাকে যে-সকল কথা বলিয়া দিতেন, আমার সোপানে বসিয়া সে তাহাই ভাবিত। ধীরে ধীরে তাহার যেন দৃষ্টি প্রসারিত হইয়া গেল, হৃদয় উদ্‌ঘাটিত হইয়া গেল। সে যাহা দেখে নাই তাহা দেখিতে লাগিল, যাহা শোনে নাই তাহা শুনিতে লাগিল। তাহার প্রশান্ত মুখে যে একটি ম্লান ছায়া ছিল, তাহা দূর হইয়া গেল। সে যখন ভক্তিভরে প্রভাতে সন্ন্যাসীর পায়ের কাছে লুটাইয়া পড়িত, তখন তাহাকে দেবতার নিকটে উৎসর্গীকৃত শিশিরধৌত পূজার ফুলের মতো দেখাইত। একটি সুবিমল প্রফুল্লতা তাহার সর্বশরীর আলো করিয়া তুলিল।

শীতকালের এই অবসান সময়ে শীতের বাতাস বয়, আবার এক-একদিন সন্ধ্যাবেলায় সহসা দক্ষিণ হইতে বসন্তের বাতাস দিতে থাকে, আকাশে হিমের ভাব একেবারে দূর হইয়া যায়—অনেক দিন পরে গ্রামের মধ্যে বাঁশি বাজিয়া উঠে, গানের শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। মাঝিরা স্রোতে নৌকা ভাসাইয়া দাঁড় বন্ধ করিয়া শ্যামের গান গাহিতে থাকে। শাখা হইতে শাখান্তরে পাখিরা সহসা পরম উল্লাসে উত্তর-প্রত্যুত্তর করিতে আরম্ভ করে। সময়টা এইরূপ আসিয়াছে।

বসন্তের বাতাস লাগিয়া আমার পাষাণ-হৃদয়ের মধ্যে অল্পে অল্পে যেন যৌবনের সঞ্চার হইতেছে; আমার প্রাণের ভিতরকার সেই নবযৌবনোচ্ছ্বাস আকর্ষণ করিয়াই যেন আমার লতাগুল্মগুলি দেখিতে দেখিতে ফুলে ফুলে একেবারে বিকশিত হইয়া উঠিতেছে। এ সময়ে কুসুমকে আর দেখিতে পাই না। কিছুদিন হইতে সে আর মন্দিরেও আসে না, ঘাটেও আসে না, সন্ন্যাসীর কাছে তাহাকে আর দেখা যায় না।

ইতিমধ্যে কী হইল আমি কিছুই জানিতে পারি নাই। কিছুকাল পরে একদিন সন্ধ্যাবেলায় আমারই সোপানে সন্ন্যাসীর সহিত কুসুমের সাক্ষাৎ হইল।

কুসুম মুখ নত করিয়া কহিল, "প্রভু, আমাকে কি ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন।"

"হাঁ তোমাকে দেখিতে পাই না কেন। আজকাল দেবসেবায় তোমার এত অবহেলা কেন।"

কুসুম চুপ করিয়া রহিল।

"আমার কাছে তোমার মনের কথা প্রকাশ করিয়া বলো।"

কুসুম ঈষৎ মুখ ফিরাইয়া কহিল, "প্রভু, আমি পাপীয়সী সেইজন্যই এই অবহেলা।"

সন্ন্যাসী অত্যন্ত স্নেহপূর্ণ স্বরে বলিলেন, "কুসুম, তোমার হৃদয়ে অশান্তি উপস্থিত হইয়াছে, আমি তাহা বুঝিতে পারিয়াছি।"

কুসুম যেন চমকিয়া উঠিল—সে হয়তো মনে করিল, সন্ন্যাসী কতটা না জানি বুঝিয়াছেন। তাহার চোখ অল্পে অল্পে জলে ভরিয়া আসিল, সে সেইখানে বসিয়া পড়িল; মুখে আঁচল ঢাকিয়া সোপানে সন্ন্যাসীর পায়ের কাছে বসিয়া কাঁদিতে লাগিল।

সন্ন্যাসী কিছুদূরে সরিয়া গিয়া কহিলেন, "তোমার অশান্তির কথা আমাকে সমস্ত ব্যক্ত করিয়া বলো, আমি তোমাকে শান্তির পথ দেখাইয়া দিব।"

কুসুম অটল ভক্তির স্বরে কহিল, কিন্তু মাঝে মাঝে থামিল, মাঝে মাঝে কথা বাধিয়া গেল—"আপনি আদেশ করেন তো অবশ্য বলিব। তবে, আমি ভালো করিয়া বলিতে পারিব না, কিন্তু আপনি বোধ করি মনে মনে সকলই জানিতেছেন। প্রভু, আমি একজনকে দেবতার মতো ভক্তি করিতাম, আমি তাঁহাকে পূজা করিতাম, সেই আনন্দে আমার হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া ছিল। কিন্তু একদিন রাত্রে স্বপ্নে দেখিলাম যেন তিনি আমার হৃদয়ের স্বামী, কোথায় যেন একটি বকুলবনে বসিয়া তাঁহার বামহস্তে আমার দক্ষিণ হস্ত লইয়া আমাকে তিনি প্রেমের কথা বলিতেছেন। এ ঘটনা আমার কিছুই অসম্ভব কিছুই আশ্চর্য মনে হইল না। স্বপ্ন ভাঙিয়া গেল, তবু স্বপ্নের ঘোর ভাঙিল না। তাহার পরদিন যখন তাঁহাকে দেখিলাম আর পূর্বের মতো দেখিলাম না। মনে সেই স্বপ্নের ছবিই উদয় হইতে লাগিল। ভয়ে দূরে পলাইলাম, কিন্তু সে ছবি আমার সঙ্গে সঙ্গে রহিল। সেই অবধি আমার হৃদয়ের অশান্তি আর দূর হয় না—আমার সমস্ত অন্ধকার হইয়া গেছে।"

যখন কুসুম অশ্রু মুছিয়া মুছিয়া এই কথাগুলি বলিতেছিল, তখন আমি অনুভব করিতেছিলাম সন্ন্যাসী সবলে তাঁহার দক্ষিণ পদতল দিয়া আমার পাষাণ চাপিয়া ছিলেন।

কুসুমের কথা শেষ হইলে সন্ন্যাসী বলিলেন, "যাহাকে স্বপ্ন দেখিয়াছ সে কে বলিতে হইবে।"

কুসুম জোড়হাতে কহিল, "তাহা বলিতে পারিব না।"

সন্ন্যাসী কহিলেন, "তোমার মঙ্গলের জন্য জিজ্ঞাসা করিতেছি, সে কে স্পষ্ট করিয়া বলো।"

কুসুম সবলে নিজের কোমল হাত দুটি পীড়ন করিয়া হাতজোড় করিয়া বলিল, "নিতান্ত সে কি বলিতেই হইবে।"

সন্ন্যাসী কহিলেন, "হাঁ বলিতেই হইবে।"

কুসুম তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিল, "প্রভু, সে তুমি।"

যেমনি তাহার নিজের কথা নিজের কানে গিয়া পৌঁছিল, অমনি সে মূর্ছিত হইয়া আমার কঠিন কোলে পড়িয়া গেল। সন্ন্যাসী প্রস্তরের মূর্তির মতো দাঁড়াইয়া রহিলেন।

যখন মূর্ছা ভাঙিয়া কুসুম উঠিয়া বসিল, তখন সন্ন্যাসী ধীরে ধীরে কহিলেন, "তুমি আমার সকল কথাই পালন করিয়াছ; আর একটি কথা বলিব পালন করিতে হইবে। আমি আজই এখান হইতে চলিলাম, আমার সঙ্গে তোমার দেখা না হয়। আমাকে তোমার ভুলিতে হইবে। বলো এই সাধনা করিবে।" কুসুম উঠিয়া দাঁড়াইয়া সন্ন্যাসীর মুখের পানে চাহিয়া ধীর স্বরে কহিল, "প্রভু, তাহাই হইবে।"

সন্ন্যাসী কহিলেন, "তবে আমি চলিলাম।"

কুসুম আর কিছু না বলিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল, তাঁহার পায়ের ধুলা মাথায় তুলিয়া লইল। সন্ন্যাসী চলিয়া গেলেন।

কুসুম কহিল, "তিনি আদেশ করিয়া গিয়াছেন তাঁহাকে ভুলিতে হইবে।" বলিয়া ধীরে ধীরে গঙ্গার জলে নামিল।

এতটুকু বেলা হইতে সে এই জলের ধারে কাটাইয়াছে, শ্রান্তির সময় এ জল যদি হাত বাড়াইয়া তাহাকে কোলে করিয়া না লইবে, তবে আর কে লইবে। চাঁদ অস্ত গেল, রাত্রি ঘোর অন্ধকার হইল। জলের শব্দ শুনিতে পাইলাম, আর কিছু বুঝিতে পারিলাম না। অন্ধকারে বাতাস হূহু করিতে লাগিল; পাছে তিলমাত্র কিছু দেখা যায় বলিয়া সে যেন ফুঁ দিয়া আকাশের তারাগুলিকে নিবাইয়া দিতে চায়।

আমার কোলে যে খেলা করিত সে আজ তাহার খেলা সমাপন করিয়া আমার কোল হইতে কোথায় সরিয়া গেল, জানিতে পারিলাম না।

কার্তিক, ১২৯১

রাজপথের কথা

আমি রাজপথ। অহল্যা যেমন মুনির শাপে পাষাণ হইয়া পড়িয়া ছিল, আমিও যেন তেমনি কাহার শাপে চিরনিদ্রিত সুদীর্ঘ অজগর সর্পের ন্যায় অরণ্যপর্বতের মধ্য দিয়া, বৃক্ষশ্রেণীর ছায়া দিয়া, সুবিস্তীর্ণ প্রান্তরের বক্ষের উপর দিয়া দেশদেশান্তর বেষ্টন করিয়া বহুদিন ধরিয়া জড়শয়নে শয়ান রহিয়াছি। অসীম ধৈর্যের সহিত ধুলায় লুটাইয়া শাপান্তকালের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া আছি। আমি চিরদিন স্থির অবিচল, চিরদিন একই ভাবে শুইয়া আছি, কিন্তু তবুও আমার এক মুহূর্তের জন্যও বিশ্রাম নাই। এতটুকু বিশ্রাম নাই যে, আমার এই কঠিন শুষ্ক শয্যার উপরে একটিমাত্র কচি স্নিগ্ধ শ্যামল ঘাস উঠাইতে পারি; এতটুকু সময় নাই যে, আমার শিয়রের কাছে অতি ক্ষুদ্র একটি নীলবর্ণের বনফুল ফুটাইতে পারি। কথা কহিতে পারি না, অথচ অন্ধভাবে সকলই অনুভব করিতেছি। রাত্রিদিন পদশব্দ; কেবলই পদশব্দ। আমার এই গভীর জড়নিদ্রার মধ্যে লক্ষ লক্ষ চরণের শব্দ অহর্নিশ দুঃস্বপ্নের ন্যায় আবর্তিত হইতেছে। আমি চরণের স্পর্শে হৃদয় পাঠ করিতে পারি। আমি বুঝিতে পারি, কে গৃহে যাইতেছে কে বিদেশে যাইতেছে, কে কাজে যাইতেছে, কে বিশ্রামে যাইতেছে, কে উৎসবে যাইতেছে, কে শ্মশানে যাইতেছে। যাহার সুখের সংসার আছে, স্নেহের ছায়া আছে, সে প্রতি পদক্ষেপে সুখের ছবি আঁকিয়া আঁকিয়া চলে; সে প্রতি পদক্ষেপে মাটিতে আশার বীজ রোপিয়া রোপিয়া যায়, মনে হয় যেখানে যেখানে তাহার পা পড়িয়াছে, সেখানে যেন মুহূর্তের মধ্যে এক-একটি করিয়া লতা অঙ্কুরিত পুষ্পিত হইয়া উঠিবে। যাহার গৃহ নাই আশ্রয় নাই, তাহার পদক্ষেপের মধ্যে আশা নাই অর্থ নাই, তাহার পদক্ষেপের দক্ষিণ নাই, বাম নাই, তাহার চরণ যেন বলিতে থাকে, আমি চলিই বা কেন থামিই বা কেন, তাহার পদক্ষেপে আমার শুষ্ক ধূলি যেন আরও শুকাইয়া যায়।

পৃথিবীর কোনো কাহিনী আমি সম্পূর্ণ শুনিতে পাই না। আজ শত শত বৎসর ধরিয়া আমি কত লক্ষ লোকের কত হাসি কত গান কত কথা শুনিয়া আসিতেছি; কিন্তু কেবল খানিকটা মাত্র শুনিতে পাই। বাকিটুকু শুনিবার জন্য যখন আমি কান পাতিয়া থাকি, তখন দেখি সে লোক আর নাই। এমন কত বৎসরের কত ভাঙা কথা ভাঙা গান আমার ধূলির সহিত ধূলি হইয়া গেছে, আমার ধূলির সহিত উড়িয়া বেড়ায়, তাহা কি কেহ জানিতে পায়। ওই শুন, এক জন গাহিল, "তারে বলি বলি আর বলা হল না।"—আহা, একটু দাঁড়াও, গানটা শেষ করিয়া যাও, সব কথাটা শুনি। কই আর দাঁড়াইল। গাহিতে গাহিতে কোথায় চলিয়া গেল, শেষটা শোনা

গেল না। ওই একটিমাত্র পদ অর্ধেক রাত্রি ধরিয়া আমার কানে ধ্বনিত হইতে থাকিবে। মনে মনে ভাবিব, ও কে গেল। কোথায় যাইতেছে না জানি। যে কথাটা বলা হইল না, তাহাই কি আবার বলিতে যাইতেছে। এবার যখন পথে আবার দেখা হইবে, সে যখন মুখ তুলিয়া ইহার মুখের দিকে চাহিবে, তখন বলি বলি করিয়া আবার যদি বলা না হয়। তখন নত শির করিয়া মুখ ফিরাইয়া অতি ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসিবার সময় আবার যদি গায় "তারে বলি বলি আর বলা হল না।"

সমাপ্তি ও স্থায়িত্ব হয়তো কোথাও আছে, কিন্তু আমি তো দেখিতে পাই না। একটি চরণচিহ্নও তো আমি বেশিক্ষণ ধরিয়া রাখিতে পারি না। অবিশ্রাম চিহ্ন পড়িতেছে, আবার নূতন পদ আসিয়া অন্য পদের চিহ্ন মুছিয়া যাইতেছে। যে চলিয়া যায় সে তো পশ্চাতে কিছু রাখিয়া যায় না, যদি তাহার মাথার বোঝা হইতে কিছু পড়িয়া যায়, সহস্র চরণের তলে অবিশ্রাম দলিত হইয়া কিছুক্ষণেই তাহা ধূলিতে মিশাইয়া যায়। তবে এমনও দেখিয়াছি বটে, কোনো কোনো মহাজনের পুণ্যস্তূপের মধ্য হইতে এমন সকল অমর বীজ পড়িয়া গেছে যাহা ধূলিতে পড়িয়া অঙ্কুরিত ও বর্ধিত হইয়া আমার পার্শ্বে স্থায়ীরূপে বিরাজ করিতেছে, এবং নূতন পথিকদিগকে ছায়া দান করিতেছে।

আমি কাহারও লক্ষ্য নহি, আমি সকলের উপায়মাত্র। আমি কাহারও গৃহ নহি, আমি সকলকে গৃহে লইয়া যাই। আমার অহরহ এই শোক, আমাতে কেহ চরণ রাখে না, আমার উপরে কেহ দাঁড়াইতে চাহে না। যাহাদের গৃহ সুদূরে অবস্থিত, তাহারা আমাকেই অভিশাপ দেয়, আমি যে পরম ধৈর্যে তাহাদিগকে গৃহের দ্বার পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিই তাহার জন্য কৃতজ্ঞতা কই পাই। গৃহে গিয়া বিরাম, গৃহে গিয়া আনন্দ, গৃহে গিয়া সুখসম্মিলন, আর আমার উপরে কেবল শ্রান্তির ভার, কেবল অনিচ্ছাকৃত শ্রম, কেবল বিচ্ছেদ। কেবল কি সুদূর হইতে, গৃহবাতায়ন হইতে, মধুর হাস্যলহরী পাখা তুলিয়া সূর্যালোকে বাহির হইয়া আমার কাছে আসিবামাত্র সচকিতে শূন্যে মিলাইয়া যাইবে। গৃহের সেই আনন্দের কণা আমি কি একটুখানি পাইব না!

কখনো কখনো তাহাও পাই। বালকবালিকারা হাসিতে হাসিতে কলরব করিতে করিতে আমার কাছে আসিয়া খেলা করে। তাহাদের গৃহের আনন্দ তাহারা পথে লইয়া আসে। তাহাদের পিতার আশীর্বাদ মাতার স্নেহ গৃহ হইতে বাহির হইয়া পথের মধ্যে আসিয়াও যেন গৃহ রচনা করিয়া দেয়। আমার ধূলিতে তাহারা স্নেহ দিয়া যায়। আমার ধূলিকে তাহারা রাশীকৃত করে, ও তাহাদের ছোটো ছোটো হাতগুলি দিয়া সেই স্তূপকে মৃদু মৃদু আঘাত করিয়া পরম স্নেহে ঘুম পাড়াইতে চায়। বিমল হৃদয়

লইয়া বসিয়া বসিয়া তাহার সহিত কথা কয়। হায় হায়, এত স্নেহ পাইয়াও সে তাহার উত্তর দিতে পারে না।

ছোটো ছোটো কোমল পাগুলি যখন আমার উপর দিয়া চলিয়া যায়, তখন আপনাকে বড়ো কঠিন বলিয়া মনে হয়; মনে হয় উহাদের পায়ে বাজিতেছে। কুসুমের দলের ন্যায় কোমল হইতে সাধ যায়। রাধিকা বলিয়াছেন—

যাঁহা যাঁহা অরুণ-চরণ চলি যাতা,
তাঁহা তাঁহা ধরণী হই এ মঝু গাতা।

অরুণ-চরণগুলি এমন কঠিন ধরণীর উপরে চলে কেন। কিন্তু তা যদি না চলিত, তবে বোধ করি কোথাও শ্যামল তৃণ জন্মিত না।

প্রতিদিন যাহারা নিয়মিত আমার উপরে চলে, তাহাদিগকে আমি বিশেষরূপে চিনি। তাহারা জানে না তাহাদের জন্য আমি প্রতীক্ষা করিয়া থাকি। আমি মনে মনে তাহাদের মূর্তি কল্পনা করিয়া লইয়াছি। বহুদিন হইল, এমনি একজন কে তাহার কোমল চরণ দুখানি লইয়া প্রতিদিন অপরাহ্ণে বহুদূর হইতে আসিত—ছোটো দুটি নূপুর রুনু ঝুনু করিয়া তাহার পায়ে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বাজিত। বুঝি তাহার ঠোঁট দুটি কথা কহিবার ঠোঁট নহে, বুঝি তাহার বড়ো বড়ো চোখ দুটি সন্ধ্যার আকাশের মতো বড়ো ম্লানভাবে মুখের দিকে চাহিয়া থাকিত। যেখানে ওই বাঁধানো বটগাছের বামদিকে আমার একটি শাখা লোকালয়ের দিকে চলিয়া গেছে, সেখানে সে শ্রান্তদেহে গাছের তলায় চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিত। আর একজন কে দিনের কাজ সমাপন করিয়া অন্যমনে গান গাহিতে গাহিতে সেই সময়ে লোকালয়ের দিকে চলিয়া যাইত। সে বোধ করি, কোনো দিকে চাহিত না, কোনোখানে দাঁড়াইত না,—হয়তো বা আকাশের তারার দিকে চাহিত, তাহার গৃহের দ্বারে গিয়া পূরবী গান সমাপ্ত করিত। সে চলিয়া গেলে বালিকা শ্রান্তপদে আবার যে-পথ দিয়া আসিয়াছিল, সেই পথে ফিরিয়া যাইত। বালিকা যখন ফিরিত তখন জানিতাম অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে; সন্ধ্যার অন্ধকার হিমস্পর্শ সর্বাঙ্গে অনুভব করিতে পারিতাম। তখন গোধূলির কাকের ডাক একেবারে থামিয়া যাইত; পথিকেরা আর কেহ বড়ো চলিত না। সন্ধ্যার বাতাসে থাকিয়া থাকিয়া বাঁশবন ঝরঝর ঝরঝর শব্দ করিয়া উঠিত। এমন কতদিন, এমন প্রতিদিন, সে ধীরে ধীরে আসিত ধীরে ধীরে যাইত। একদিন ফাল্গুন মাসের শেষাশেষি অপরাহ্ণে যখন বিস্তর আম্রমুকুলের কেশর বাতাসে ঝরিয়া পড়িতেছে—তখন আর একজন যে আসে সে আর আসিল না। সেদিন অনেক রাত্রে বালিকা বাড়িতে ফিরিয়া গেল। যেমন মাঝে মাঝে গাছ হইতে শুষ্ক পাতা ঝরিয়া পড়িতেছিল, তেমনি মাঝে মাঝে দুই এক ফোঁটা অশ্রুজল

আমার নীরস তপ্ত ধূলির উপরে পড়িয়া মিলাইতেছিল। আবার তাহার পরদিন অপরাহ্ণে বালিকা সেইখানে সেই তরুতলে আসিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু সেদিনও আর একজন আসিল না। আবার রাত্রে সে ধীরে ধীরে বাড়িমুখে ফিরিল। কিছুদূরে গিয়া আর সে চলিতে পারিল না। আমার উপরে ধূলির উপরে লুটাইয়া পড়িল। দুই বাহুতে মুখ ঢাকিয়া বুক ফাটিয়া কাঁদিতে লাগিল। কে গো মা, আজি এই বিজন রাত্রে আমার বক্ষেও কি কেহ আশ্রয় লইতে আসে। তুই যাহার কাছ হইতে ফিরিয়া আসিলি সে কি আমার চেয়েও কঠিন। তুই যাহাকে ডাকিয়া সাড়া পাইলি না সে কি আমার চেয়েও মূক। তুই যাহার মুখের পানে চাহিলি সে কি আমার চেয়েও অন্ধ।

বালিকা উঠিল, দাঁড়াইল, চোখ মুছিল—পথ ছাড়িয়া পার্শ্ববর্তী বনের মধ্যে চলিয়া গেল। হয়তো সে গৃহে ফিরিয়া গেল, হয়তো এখনও সে প্রতিদিন শান্তমুখে গৃহের কাজ করে—হয়তো সে কাহাকেও কোনো দুঃখের কথা বলে না; কেবল এক-একদিন সন্ধ্যাবেলায় গৃহের অঙ্গনে চাঁদের আলোতে পা ছড়াইয়া বসিয়া থাকে, কেহ ডাকিলেই আবার তখনই চমকিয়া উঠিয়া ঘরে চলিয়া যায়। কিন্তু তাহার পরদিন হইতে আজ পর্যন্তও আমি আর তাহার চরণস্পর্শ অনুভব করি নাই।

এমন কত পদশব্দ নীরব হইয়া গেছে, আমি কি এত মনে করিয়া রাখিতে পারি। কেবল সেই পায়ের করুণ নূপুরধ্বনি এখনও মাঝে মাঝে মনে পড়ে। কিন্তু আমার কি আর একদণ্ড শোক করিবার অবসর আছে। শোক কাহার জন্য করিব। এমন কত আসে, কত যায়।

কী প্রখর রৌদ্র। উহু-হুহু। এক-একবার নিশ্বাস ফেলিতেছি আর তপ্ত ধুলা সুনীল আকাশ ধূসর করিয়া উড়িয়া যাইতেছে। ধনী দরিদ্র, সুখী দুঃখী, জরা যৌবন, হাসি কান্না, জন্ম মৃত্যু সমস্তই আমার উপর দিয়া একই নিশ্বাসে ধূলির স্রোতের মতো উড়িয়া চলিয়াছে। এই জন্য পথের হাসিও নাই, কান্নাও নাই। গৃহই অতীতের জন্য শোক করে, বর্তমানের জন্য ভাবে, ভবিষ্যতের আশা-পথ চাহিয়া থাকে। কিন্তু পথ প্রতি বর্তমান নিমেষের শতসহস্র নূতন অভ্যাগতকে লইয়াই ব্যস্ত। এমন স্থানে নিজের পদগৌরবের প্রতি বিশ্বাস করিয়া অত্যন্ত সদর্পে পদক্ষেপ করিয়া কে নিজের চির-চরণচিহ্ন রাখিয়া যাইতে প্রয়াস পাইতেছে। এখানকার বাতাসে যে দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া যাইতেছ, তুমি চলিয়া গেলে কি তাহারা তোমার পশ্চাতে পড়িয়া তোমার জন্য বিলাপ করিতে থাকিবে, নূতন অতিথিদের চক্ষে অশ্রু আকর্ষণ করিয়া আনিবে? বাতাসের উপরে বাতাস কি স্থায়ী হয়। না না, বৃথা চেষ্টা। আমি কিছুই পড়িয়া থাকিতে দিই না, হাসিও না, কান্নাও না। আমিই কেবল পড়িয়া আছি।

অগ্রহায়ণ, ১২৯১

মুকুট

প্রথম পরিচ্ছেদ

ত্রিপুরার রাজা অমরমাণিক্যের কনিষ্ঠ পুত্র রাজধর সেনাপতি ইশা খাঁকে বলিলেন, “দেখো, সেনাপতি, আমি বারবার বলিতেছি তুমি আমাকে অসম্মান করিয়ো না।”

পাঠান ইশা খাঁ কতকগুলি তীরের ফলা লইয়া তাহাদের ধার পরীক্ষা করিতেছিলেন। রাজধরের কথা শুনিয়া কিছুই বলিলেন না, কেবল মুখ তুলিয়া ভুরু উঠাইয়া একবার তাঁহার মুখের দিকে চাহিলেন। আবার তখনই মুখ নত করিয়া তীরের ফলার দিকে মনোযোগ দিলেন।

রাজধর বলিলেন, “ভবিষ্যতে যদি তুমি আমার নাম ধরিয়া ডাক, তবে আমি তাহার সমুচিত প্রতিবিধান করিব।”

বৃদ্ধ ইশা খাঁ সহসা মাথা তুলিয়া বজ্রস্বরে বলিয়া উঠিলেন, “বটে!”

রাজধর তাঁহার তলোয়ারের খাপের আগা মেঝের পাথরের উপরে ঠক করিয়া ঠুকিয়া বলিলেন, “হাঁ।”

ইশা খাঁ বালক রাজধরের বুক ফুলানোর ভঙ্গি ও তলোয়ারের আস্ফালন দেখিয়া থাকিতে পারিলেন না—হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। রাজধরের সমস্ত মুখ, চোখের সাদাটা পর্যন্ত লাল হইয়া উঠিল।

ইশা খাঁ উপহাসের স্বরে হাসিয়া হাত জোড় করিয়া বলিলেন, “মহামহিম মহারাজাধিরাজকে কী বলিয়া ডাকিতে হইবে। হুজুর, জনাব, জাঁহাপনা, শাহেন শা—”

রাজধর তাঁহার স্বাভাবিক কর্কশ স্বর দ্বিগুণ কর্কশ করিয়া কহিলেন, “আমি তোমার ছাত্র বটে, কিন্তু আমি রাজকুমার—তাহা তোমার মনে নাই!”

ইশা খাঁ তীব্রস্বরে কহিলেন, “বস্‌। চুপ। আর অধিক কথা কহিয়ো না। আমার অন্য কাজ আছে।” বলিয়া পুনরায় তীরের ফলার প্রতি মন দিলেন।

এমন সময় ত্রিপুরার দ্বিতীয় রাজপুত্র ইন্দ্রকুমার তাঁহার দীর্ঘপ্রস্থ বিপুল বলিষ্ঠ দেহ লইয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন। মাথা হেলাইয়া হাসিয়া বলিলেন, “খাঁ সাহেব, আজিকার ব্যাপারটা কী।”

ইন্দ্রকুমারের কণ্ঠ শুনিয়া বৃদ্ধ ইশা খাঁ তীরের ফলা রাখিয়া সস্নেহে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন—হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—“শোনো তো বাবা, বড়ো তামাশার কথা।

তোমার এই কনিষ্ঠটিকে, মহারাজ চক্রবর্তীকে জাঁহাপনা জনাব বলিয়া না ডাকিলে উঁহার অপমান বোধ হয়।" বলিয়া আবার তীরের ফলা লইয়া পড়িলেন।

"সত্য নাকি।" বলিয়া ইন্দ্রকুমার হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

রাজধর বিষম ক্রোধে বলিলেন, "চুপ করো দাদা।"

ইন্দ্রকুমার বলিলেন, "রাজধর, তোমাকে কী বলিয়া ডাকিতে হইবে। জাঁহাপনা। হা হা হা হা।"

রাজধর কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন, "দাদা, চুপ করো বলিতেছি।"

ইন্দ্রকুমার আবার হাসিয়া বলিলেন, "জনাব।"

রাজধর অধীর হইয়া বলিলেন, "দাদা, তুমি নিতান্ত নির্বোধ।"

ইন্দ্রকুমার হাসিয়া রাজধরের পৃষ্ঠে হাত বুলাইয়া বলিলেন, "ঠাণ্ডা হও ভাই, ঠাণ্ডা হও। তোমার বুদ্ধি তোমার থাক্। আমি তোমার বুদ্ধি কাড়িয়া লইতেছি না।"

ঈশা খাঁ কাজ করিতে করিতে আড়চোখে চাহিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "উঁহার বুদ্ধি সম্প্রতি অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছে।"

ইন্দ্রকুমার বলিলেন, "নাগাল পাওয়া যায় না।"

রাজধর গসগস করিয়া চলিয়া গেলেন। চলনের দাপে খাপের মধ্যে তলোয়ারখানা ঝনঝন করিতে লাগিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাজকুমার রাজধরের বয়স উনিশ বৎসর। শ্যামবর্ণ, বেঁটে, দেহের গঠন বলিষ্ঠ। সেকালে অন্য রাজপুত্রেরা যেমন বড়ো বড়ো চুল রাখিতেন ইহার তেমন ছিল না। ইহার সোজা সোজা মোটা চুল ছোটো করিয়া ছাঁটা। ছোটো ছোটো চোখ, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। দাঁতগুলি কিছু বড়ো। গলার আওয়াজ ছেলেবেলা হইতেই কেমন কর্কশ। রাজধরের বুদ্ধি অত্যন্ত বেশি এইরূপ সকলের বিশ্বাস, তাঁহার নিজের বিশ্বাসও তাই। এই বুদ্ধির বলে তিনি আপনার দুই দাদাকে অত্যন্ত হেয়জ্ঞান করিতেন। রাজধরের প্রবল প্রতাপে বাড়িসুদ্ধ সকলে অস্থির। আবশ্যক থাক্ না থাক্ একখানা তলোয়ার মাটিতে ঠুকিয়া ঠুকিয়া তিনি বাড়িময় কর্তৃত্ব করিয়া বেড়ান। রাজবাটীর চাকরবাকরেরা তাঁহাকে রাজা বলিয়া মহারাজ বলিয়া হাতজোড় করিয়া সেলাম করিয়া প্রণাম করিয়া কিছুতে নিস্তার পায় না। সকল জিনিসেই তাঁহার হাত, সকল জিনিসই তিনি নিজে দখল করিতে চান। সে-বিষয়ে তাঁহার চক্ষুলজ্জাটুকু পর্যন্ত নাই। একবার যুবরাজ

চন্দ্রনারায়ণের একটা ঘোড়া তিনি রীতিমত দখল করিয়াছিলেন, দেখিয়া যুবরাজ ঈষৎ হাসিলেন, কিন্তু কিছু বলিলেন না। আর একবার কুমার ইন্দ্রকুমারের রুপার পাত লাগানো একটা ধনুক অম্লানবদনে অধিকার করিয়াছিলেন—ইন্দ্রকুমার চটিয়া বলিলেন, “দেখো, যে জিনিস লইয়াছ উহা আমি আর ফিরাইয়া লইতে চাহি না, কিন্তু ফের যদি তুমি আমার জিনিসে হাত দাও, তবে আমি এমন করিয়া দিব যে, ও-হাতে আর জিনিস তুলিতে পারিবে না।” কিন্তু রাজধর দাদাদের কথা বড়ো গ্রাহ্য করিতেন না। লোকে তাঁহার আচরণ দেখিয়া আড়ালে বলিত, “ছোটোকুমারের রাজার ঘরে জন্ম বটে, কিন্তু রাজার ছেলের মতো কিছুই দেখি না।”

কিন্তু মহারাজা অমরমাণিক্য রাজধরকে কিছু বেশি ভালোবাসিতেন। রাজধর তাহা জানিতেন। আজ পিতার কাছে গিয়া ঈশা খাঁর নামে নালিশ করিলেন।

রাজা ঈশা খাঁকে ডাকাইয়া আনিলেন। বলিলেন, “সেনাপতি, রাজকুমারদের এখন বয়স হইয়াছে। এখন উঁহাদিগকে যথোচিত সম্মান করা উচিত।”

“মহারাজ বাল্যকালে যখন আমার কাছে যুদ্ধ শিক্ষা করিতেন তখন মহারাজকে যেরূপ সম্মান করিতাম, রাজকুমারগণকে তাহা অপেক্ষা কম সম্মান করি না।”

রাজধর বলিলেন, “আমার অনুরোধ, তুমি আমার নাম ধরিয়া ডাকিয়ো না।”

ঈশা খাঁ বিদ্যুদ্বেগে মুখ ফিরাইয়া কহিলেন, “চুপ করো বৎস। আমি তোমার পিতার সহিত কথা কহিতেছি। মহারাজ, মার্জনা করিবেন, আপনার এই কনিষ্ঠ পুত্রটি রাজপরিবারের উপযুক্ত হয় নাই। ইহার হাতে তলোয়ার শোভা পায় না। এ বড়ো হইলে মুনশির মতো কলম চালাইতে পারিবে—আর কোনো কাজে লাগিবে না।”

এমন সময়ে চন্দ্রনারায়ণ ও ইন্দ্রকুমার সেখানে উপস্থিত হইলেন। ঈশা খাঁ তাঁহাদের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, “চাহিয়া দেখুন মহারাজ, এই তো যুবরাজ বটে। এই তো রাজপুত্র বটে।”

রাজা রাজধরের দিকে চাহিয়া বলিলেন, “রাজধর, খাঁ সাহেব কী বলিতেছেন। তুমি অস্ত্রবিদ্যায় উঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে পার নাই?”

রাজধর বলিলেন, “মহারাজ, আমাদের ধনুর্বিদ্যার পরীক্ষা গ্রহণ করুন, পরীক্ষায় যদি আমি সর্বশ্রেষ্ঠ না হই তবে আমাকে পরিত্যাগ করিবেন। আমি রাজবাটী ছাড়িয়া চলিয়া যাইব।”

রাজা বলিলেন, “আচ্ছা, আগামী সপ্তাহে পরীক্ষা হইবে। তোমাদের মধ্যে যিনি উত্তীর্ণ হইবেন, তাঁহাকে আমার হীরকখচিত তলোয়ার পুরস্কার দিব।”

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ইন্দ্রকুমার ধনুর্বিদ্যায় অসাধারণ ছিলেন। শুনা যায় একবার তাঁহার এক অনুচর প্রাসাদের ছাদের উপর হইতে একটা মোহর নিচে ফেলিয়া দেয়, সেই মোহর মাটিতে পড়িতে না পড়িতে তীর মারিয়া কুমার তাহাকে শত হাত দূরে ফেলিয়াছিলেন। রাজধর রাগের মাথায় পিতার সম্মুখে দম্ভ করিয়া আসিলেন বটে, কিন্তু মনের ভিতরে বড়ো ভাবনা পড়িয়া গেল। যুবরাজ চন্দ্রনারায়ণের জন্য বড়ো ভাবনা নাই—তীর-ছোঁড়া বিদ্যা তাঁহার ভালো আসিত না, কিন্তু ইন্দ্রকুমারের সঙ্গে আঁটিয়া উঠা দায়। রাজধর অনেক ভাবিয়া অবশেষে একটা ফন্দি ঠাওরাইলেন। হাসিয়া মনে মনে বলিলেন, "তীর ছুঁড়িতে পারি না-পারি, আমার বুদ্ধি তীরের মতো—তাহাতে সকল লক্ষ্যই ভেদ হয়।"

কাল পরীক্ষার দিন। যে-জায়গাতে পরীক্ষা হইবে, যুবরাজ, ইশা খাঁ ও ইন্দ্রকুমার সেই জমি তদারক করিতে গিয়াছেন। রাজধর আসিয়া বলিলেন, "দাদা, আজ পূর্ণিমা আছে—আজ রাত্রে যখন বাঘ গোমতী নদীতে জল খাইতে আসিবে, তখন নদীতীরে বাঘ শিকার করিতে গেলে হয় না?"

ইন্দ্রকুমার আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, "কী আশ্চর্য। রাজধরের যে আজ শিকারে প্রবৃত্তি হইল? এমন তো কখনো দেখা যায় না।"

ইশা খাঁ রাজধরের প্রতি ঘৃণার কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, "উনি আবার শিকারি নন, উনি জাল পাতিয়া ঘরের মধ্যে শিকার করেন। উঁহার বড়ো ভয়ানক শিকার। রাজসভায় একটি জীব নাই যে উঁহার ফাঁদে একবার-না-একবার না পড়িয়াছে।"

চন্দ্রনারায়ণ দেখিলেন কথাটা রাজধরের মনে লাগিয়াছে—ব্যথিত হইয়া বলিলেন, "সেনাপতি সাহেব, তোমার তলোয়ারও যেমন তোমার কথাও তেমনি, উভয়ই শাণিত—যাহার উপরে গিয়া পড়ে, তাহার মর্মচ্ছেদ করে।"

রাজধর হাসিয়া বলিলেন, "না দাদা, আমার জন্য বেশি ভাবিয়ো না। খাঁ সাহেব অনেক শান দিয়া কথা কহেন বটে, কিন্তু আমার কানের মধ্যে পালকের মতো প্রবেশ করে।"

ইশা খাঁ হঠাৎ চটিয়া উঠিয়া পাকা গোঁফে চাড়া দিয়া বলিলেন, "তোমার কান আছে নাকি। তা যদি থাকিত, তাহা হইলে এতদিন তোমাকে সিধা করিতে পারিতাম।" বৃদ্ধ ইশা খাঁ কাহাকেও বড়ো মান্য করিতেন না।

ইন্দ্রকুমার হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। চন্দ্রনারায়ণ গম্ভীর হইয়া রহিলেন, কিছু বলিলেন না। যুবরাজ বিরক্ত হইয়াছেন বুঝিয়া ইন্দ্রকুমার তৎক্ষণাৎ হাসি থামাইয়া তাঁহার কাছে গেলেন—মৃদুভাবে বলিলেন, "দাদা তোমার কী মত। আজ রাত্রে শিকার করিতে যাইবে কি।"

চন্দ্রনারায়ণ কহিলেন, "তোমার সঙ্গে ভাই শিকার করিতে যাওয়া মিথ্যা, তাহা হইলে নিতান্ত নিরামিষ শিকার করিতে হয়। তুমি বনে গিয়া যত জন্তু মারিয়া আন, আর আমরা কেবল লাউ কুমড়া কচু কাঁঠাল শিকার করিয়া আনি।"

ইশা খাঁ পরম হৃষ্ট হইয়া হাসিতে লাগিলেন—সস্নেহে ইন্দ্রকুমারের পিঠ চাপড়াইয়া বলিলেন, "যুবরাজ ঠিক কথা বলিতেছেন পুত্র। তোমার তীর সকলের আগে গিয়া ছোটে এবং নির্ঘাত গিয়া লাগে। তোমার সঙ্গে কে পারিয়া উঠিবে।"

ইন্দ্রকুমার বলিলেন, "না না দাদা, ঠাট্টা নয়—যাইতে হইবে। তুমি না গেলে কে শিকার করিতে যাইবে।"

যুবরাজ বলিলেন, "আচ্ছা চলো। আজ রাজধরের শিকারের ইচ্ছা হইয়াছে, উহাকে নিরাশ করিব না।"

সহাস্য ইন্দ্রকুমার চকিতের মধ্যে ম্লান হইয়া বলিলেন, "কেন দাদা, আমার ইচ্ছা হইয়াছে বলিয়া কি যাইতে নাই।"

চন্দ্রনারায়ণ বলিলেন, "সে কী কথা ভাই, তোমার সঙ্গে তো রোজই শিকারে যাইতেছি—"

ইন্দ্রকুমার বলিলেন, "তাই সেটা পুরাতন হইয়া গেছে।"

চন্দ্রনারায়ণ বিমর্ষ হইয়া বলিলেন, "তুমি আমার কথা এমন করিয়া ভুল বুঝিলে বড়ো ব্যথা লাগে।"

ইন্দ্রকুমার হাসিয়া তাড়াতাড়ি বলিলেন, "না দাদা, আমি ঠাট্টা করিতেছিলাম। শিকারে যাইব না তো কী। চলো তার আয়োজন করি গে।"

ইশা খাঁ মনে মনে কহিলেন, "ইন্দ্রকুমার বুকে দশটা বাণ সহিতে পারে, কিন্তু দাদার একটু সামান্য অনাদর সহিতে পারে না।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

শিকারের বন্দোবস্ত সমস্ত স্থির হইলে পরে রাজধর আস্তে আস্তে ইন্দ্রকুমারের স্ত্রী কমলাদেবীর কক্ষে গিয়া উপস্থিত। কমলাদেবী হাসিয়া বলিলেন, "এ কী ঠাকুরপো। একেবারে তীরধনুক বর্মচর্ম লইয়া যে। আমাকে মারিবে নাকি।"

রাজধর বলিলেন, "ঠাকুরানী, আমরা আজ তিন ভাই শিকার করিতে যাইব তাই এই বেশ।"

কমলাদেবী আশ্চর্য হইয়া কহিলেন, "তিন ভাই! তুমিও যাইবে না কি। আজ তিন ভাই একত্র হইবে। এ তো ভালো লক্ষণ নয়। এ যে ত্র্যহস্পর্শ হইল।"

যেন বড়ো ঠাট্টা হইল এই ভাবে রাজধর হা হা করিয়া হাসিলেন, কিন্তু বিশেষ কিছু বলিলেন না।

কমলাদেবী কহিলেন, "না না, তাহা হইবে না—রোজ-রোজ শিকার করিতে যাইবেন আর আমি ঘরে বসিয়া ভাবিয়া মরি।"

রাজধর বলিলেন, "আজ আবার রাত্রে শিকার।"

কমলাদেবী মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "সে কখনোই হইবে না। দেখিব আজ কেমন করিয়া যান।"

রাজধর বলিলেন, "ঠাকুরানী, এক কাজ করো, ধনুকবাণগুলি লুকাইয়া রাখো।"

কমলাদেবী কহিলেন, "কোথায় লুকাইব।"

রাজধর। আমার কাছে দাও, আমি লুকাইয়া রাখিব।

কমলাদেবী হাসিয়া কহিলেন, "মন্দ কথা নয়, সে বড়ো রঙ্গ হইবে।" কিন্তু মনে মনে বলিলেন, "তোমার একটা কী মতলব আছে। তুমি যে কেবল আমার উপকার করিতে আসিয়াছ তাহা বোধ হয় না।"

"এস, অস্ত্রশালায় এস" বলিয়া কমলাদেবী রাজধরকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন। চাবি লইয়া ইন্দ্রকুমারের অস্ত্রশালার দ্বার খুলিয়া দিলেন। রাজধর যেমন ভিতরে প্রবেশ করিলেন অমনি কমলাদেবী দ্বারে তালা লাগাইয়া দিলেন, রাজধর ঘরের মধ্যে বদ্ধ হইয়া রহিলেন। কমলাদেবী বাহির হইতে হাসিয়া বলিলেন, "ঠাকুরপো, আমি তবে আজ আসি।"

এদিকে সন্ধ্যার সময় ইন্দ্রকুমার অন্তঃপুরে আসিয়া অস্ত্রশালার চাবি কোথাও খুঁজিয়া পাইতেছেন না। কমলাদেবী হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "হাঁগা, আমাকে খুঁজিতেছ বুঝি, আমি তো হারাই নাই।" শিকারের সময় বহিয়া যায় দেখিয়া ইন্দ্রকুমার দ্বিগুণ ব্যস্ত হইয়া খোঁজ করিতে লাগিলেন। কমলাদেবী তাঁহাকে বাধা দিয়া আবার তাঁহার মুখের কাছে গিয়া দাঁড়াইলেন—হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "হাঁগা, দেখিতে কি পাও না। চোখের সম্মুখে তবু ঘরময় বেড়াইতেছ।" ইন্দ্রকুমার কিঞ্চিৎ কাতরস্বরে কহিলেন, "দেবী, এখন বাধা দিয়ো না—আমার একটা বড়ো আবশ্যকের জিনিস হারাইয়াছে।"

কমলাদেবী কহিলেন, "আমি জানি তোমার কী হারাইয়াছে। আমার একটা কথা যদি রাখ তো খুঁজিয়া দিতে পারি।"

ইন্দ্রকুমার বলিলেন, "আচ্ছা রাখিব।"

কমলাদেবী বলিলেন, "তবে শোনো। আজ তুমি শিকার করিতে যাইতে পারিবে না। এই লও তোমার চাবি।"

ইন্দ্রকুমার বলিলেন, "সে হয় না—এ-কথা রাখিতে পারি না।"

কমলাদেবী বলিলেন, "চন্দ্রবংশে জন্মিয়া এই বুঝি তোমার আচরণ। একটা সামান্য প্রতিজ্ঞা রাখিতে পার না।"

ইন্দ্রকুমার হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, তোমার কথাই রহিল। আজ আমি শিকারে যাইব না।"

কমলাদেবী। তোমাদের আর কিছু হারাইয়াছে? মনে করিয়া দেখো দেখি।

ইন্দ্রকুমার। কই, মনে পড়ে না তো।

কমলাদেবী। তোমাদের সাত-রাজার-ধন মানিক? তোমাদের সোনার চাঁদ?

ইন্দ্রকুমার মৃদু হাসিয়া ঘাড় নাড়িলেন। কমলাদেবী কহিলেন, "তবে এস, দেখো'সে।" বলিয়া অস্ত্রশালার দ্বারে গিয়া দ্বার খুলিয়া দিলেন। কুমার দেখিলেন রাজধর ঘরের মেজেতে চুপ করিয়া বসিয়া আছেন—দেখিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন—"এ কী, রাজধর অস্ত্রশালায় যে।"

কমলাদেবী বলিলেন, "উনি আমাদের ব্রহ্মাস্ত্র।"

ইন্দ্রকুমার বলিলেন, "তা বটে, উনি সকল অস্ত্রের চেয়ে তীক্ষ্ণ।"

রাজধর মনে মনে বলিলেন, "তোমাদের জিহ্বার চেয়ে নয়।" রাজধর ঘর হইতে বাহির হইয়া বাঁচিলেন।

তখন কমলাদেবী গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "না কুমার, তুমি শিকার করিতে যাও। আমি তোমার সত্য ফিরাইয়া লইলাম।"

ইন্দ্রকুমার বলিলেন, "শিকার করিব? আচ্ছা।" বলিয়া ধনুকে তীর যোজনা করিয়া অতিধীরে কমলাদেবীর দিকে নিক্ষেপ করিলেন। তীর তাঁহার পায়ের কাছে পড়িয়া গেল—কুমার বলিলেন, "আমার লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইল।"

কমলাদেবী বলিলেন, "না, পরিহাস না। তুমি শিকারে যাও।"

ইন্দ্রকুমার কিছু বলিলেন না। ধনুর্বাণ ঘরের মধ্যে ফেলিয়া বাহির হইয়া গেলেন। যুবরাজকে বলিলেন, "দাদা, আজ শিকারের সুবিধা হইল না।" চন্দ্রনারায়ণ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "বুঝিয়াছি।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

আজ পরীক্ষার দিন। রাজবাটির বাহিরের মাঠে বিস্তর লোক জড়ো হইয়াছে। রাজার ছত্র ও সিংহাসন প্রভাতের আলোকে ঝকঝক করিতেছে। জায়গাটা পাহাড়ে, উঁচুনিচু—লোকে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে, চারিদিকে যেন মানুষের মাথার ঢেউ উঠিয়াছে। ছেলেগুলো গাছের উপর চড়িয়া বসিয়াছে। একটা ছেলে গাছের ডাল হইতে আস্তে আস্তে হাত বাড়াইয়া একজন মোটা মানুষের মাথা হইতে পাগড়ি তুলিয়া আর-একজনের মাথায় পরাইয়া দিয়াছে। যাহার পাগড়ি সে-ব্যক্তি চটিয়া ছেলেটাকে গ্রেফতার করিবার জন্য নিষ্ফল প্রয়াস পাইতেছে, অবশেষে নিরাশ হইয়া সজোরে গাছের ডাল নাড়া দিতেছে, ছোঁড়াটা মুখভঙ্গি করিয়া ডালের উপর বাঁদরের মতো নাচিতেছে। মোটা মানুষের দুর্দশা ও রাগ দেখিয়া সেদিকে একটা হো হো হাসি পড়িয়া গিয়াছে। একজন একহাঁড়ি দই মাথায় করিয়া বাড়ি যাইতেছিল, পথে জনতা দেখিয়া সে দাঁড়াইয়া গিয়াছিল—হঠাৎ দেখে তাহার মাথায় হাঁড়ি নাই, হাঁড়িটা মুহূর্তের মধ্যে হাতে হাতে কতদূর চলিয়া গিয়াছে তাহার ঠিকানা নাই—দইওআলা খানিকক্ষণ হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল। একজন বলিল, "ভাই, তুমি দইয়ের বদলে ঘোল খাইয়া গেলে, কিঞ্চিৎ লোকসান হইল বই তো নয়।" দইওআলা পরম সান্ত্বনা পাইয়া গেল। হারু নাপিতের 'পরে গাঁ-সুদ্ধ লোক চটা ছিল। তাহাকে ভিড়ের মধ্যে দেখিয়া লোকে তাহার নামে ছড়া কাটিতে লাগিল। সে যত খেপিতে লাগিল খেপাইবার দল তত বাড়িয়া উঠিল—চারিদিকে চটাপট হাততালি পড়িতে লাগিল। আটার প্রকার আওয়াজ বাহির হইতে লাগিল। সে-ব্যক্তি মুখচক্ষু লাল করিয়া চটিয়া গলদ্‌ঘর্ম হইয়া, চাদর ভূমিতে লুটাইয়া, একপাটি চটিজুতা ভিড়ের মধ্যে হারাইয়া বিশ্বের লোককে অভিশাপ দিতে দিতে বাড়ি ফিরিয়া গেল। ঠাসাঠাসি ভিড়ের মাঝে মাঝে এক-একটা ছোটো ছেলে আত্মীয়ের কাঁধের উপর চড়িয়া কান্না জুড়িয়া দিয়াছে। এমন কত জায়গায় কত কলরব উঠিয়াছে তাহার ঠিকানা নাই। হঠাৎ নহবত বাজিয়া উঠিল। সমস্ত কোলাহল ভাসাইয়া দিয়া জয় জয় শব্দে আকাশ প্লাবিত হইয়া গেল। কোলের ছেলে যতগুলো ছিল ভয়ে সমস্বরে কাঁদিয়া উঠিল—গাঁয়ে গাঁয়ে পাড়ায় পাড়ায় কুকুরগুলো ঊর্ধ্বমুখ হইয়া খেউ খেউ করিয়া ডাকিয়া উঠিল। পাখি যেখানে যত ছিল ভয়ে গাছের ডাল ছাড়িয়া আকাশে উড়িল। কেবল গোটাকতক বুদ্ধিমান কাক সুদূরে গাম্ভারি গাছের ডালে বসিয়া দক্ষিণে ও বামে ঘাড় হেলাইয়া একাগ্রচিত্তে অনেক বিবেচনা করিতে লাগিল এবং একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ অসন্দিগ্ধচিত্তে কা কা

করিয়া ডাকিয়া উঠিতে লাগিল। রাজা আসিয়া সিংহাসনে বসিয়াছেন। পাত্রমিত্র সভাসদ্‌গণ আসিয়াছেন। রাজকুমারগণ ধনুর্বাণ হস্তে আসিয়াছেন। নিশান লইয়া নিশানধারী আসিয়াছে। ভাট আসিয়াছে। সৈন্যগণ পশ্চাতে কাতার দিয়া দাঁড়াইয়াছে। বাজনদারগণ মাথা নাড়াইয়া নাচিয়া সবলে পরমোৎসাহে ঢোল পিটাইতেছে। মহা ধুম পড়িয়া গিয়াছে। পরীক্ষার সময় যখন হইল, ঈশা খাঁ রাজকুমারগণকে প্রস্তুত হইতে কহিলেন। ইন্দ্রকুমার যুবরাজকে কহিলেন, "দাদা, আজ তোমাকে জিতিতে হইবে, তাহা না হইলে চলিবে না।"

যুবরাজ হাসিয়া বলিলেন, "চলিবে না তো কী। আমার একটা ক্ষুদ্র তীর লক্ষ্যভ্রষ্ট হইলেও জগৎ সংসার যেমন চলিতেছিল তেমনি চলিবে। আর যদিই বা না চলিত, তবু আমার জিতিবার কোনো সম্ভাবনা দেখিতেছি না।"

ইন্দ্রকুমার বলিলেন, "দাদা, তুমি যদি হার তো আমিও ইচ্ছাপূর্বক লক্ষ্যভ্রষ্ট হইব।"

যুবরাজ ইন্দ্রকুমারের হাত ধরিয়া কহিলেন, "না ভাই, ছেলেমানুষি করিয়ো না—ওস্তাদের নাম রক্ষা করিতে হইবে।"

রাজধর বিবর্ণ শুষ্ক চিন্তাকুল মুখে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

ঈশা খাঁ আসিয়া কহিলেন, "যুবরাজ, সময় হইয়াছে, ধনুক গ্রহণ করো।"

যুবরাজ দেবতার নাম করিয়া ধনুক গ্রহণ করিলেন। প্রায় দুইশত হাত দূরে গোটাপাঁচ-ছয় কলাগাছের গুঁড়ি একত্র বাঁধিয়া স্থাপিত হইয়াছে। মাঝে একটা কচুর পাতা চোখের মতো করিয়া বসানো আছে। তাহার ঠিক মাঝখানে চোখের তারার মতো আকারে কালো চিহ্ন অঙ্কিত। সেই চিহ্নই লক্ষ্যস্থল। দর্শকেরা অর্ধচন্দ্র আকারে মাঠ ঘেরিয়া দাঁড়াইয়া আছে—যেদিকে লক্ষ্য স্থাপিত, সেদিকে যাওয়া নিষেধ।

যুবরাজ ধনুকে বাণ যোজনা করিলেন। লক্ষ্য স্থির করিলেন। বাণ নিক্ষেপ করিলেন। বাণ লক্ষ্যের উপর দিয়া চলিয়া গেল। ঈশা খাঁ তাঁহার গোঁফসুদ্ধ দাড়িসুদ্ধ মুখ বিকৃত করিলেন—পাকা ভুরু কুঞ্চিত করিলেন। কিন্তু কিছু বলিলেন না। ইন্দ্রকুমার বিষণ্ণ হইয়া এমন ভাব ধারণ করিলেন, যেন তাঁহাকেই লজ্জিত করিবার জন্য দাদা ইচ্ছা করিয়া এই কীর্তিটি করিলেন। অস্থিরভাবে ধনুক নাড়িতে নাড়িতে ঈশা খাঁকে বলিলেন, "দাদা মন দিলেই সমস্ত পারেন, কিন্তু কিছুতেই মন দেন না।"

ঈশা খাঁ বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "তোমার দাদার বুদ্ধি আর-সকল জায়গাতেই খেলে, কেবল তীরের আগায় খেলে না, তার কারণ, বুদ্ধি তেমন সূক্ষ্ম নয়।"

ইন্দ্রকুমার ভারি চটিয়া একটা উত্তর দিতে যাইতেছিলেন। ঈশা খাঁ বুঝিতে পারিয়া

দ্রুত সরিয়া গিয়া রাজধরকে বলিলেন, "কুমার, এবার তুমি লক্ষ্যভেদ করো মহারাজা দেখুন।"

রাজধর বলিলেন, "আগে দাদার হউক।"

ঈশা খাঁ রুষ্ট হইয়া কহিলেন, "এখন উত্তর করিবার সময় নয়। আমার আদেশ পালন করো।"

রাজধর চটিলেন, কিন্তু কিছু বলিলেন না। ধনুর্বাণ তুলিয়া লইলেন। লক্ষ্য স্থির করিয়া নিক্ষেপ করিলেন। তীর মাটিতে বিদ্ধ হইল। যুবরাজ রাজধরকে কহিলেন, "তোমার বাণ অনেকটা নিকটে গিয়াছে—আর-একটু হইলেই লক্ষ্য বিদ্ধ হইত।"

রাজধর অম্লানবদনে কহিলেন, "লক্ষ্য তো বিদ্ধ হইয়াছে, দূর হইতে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে না।"

যুবরাজ কহিলেন, "না, তোমার দৃষ্টির ভ্রম হইয়াছে, লক্ষ্য বিদ্ধ হয় নাই।"

রাজধর কহিলেন, "হাঁ, বিদ্ধ হইয়াছে। কাছে গেলেই দেখা যাইবে।" যুবরাজ আর কিছু বলিলেন না।

অবশেষে ঈশা খাঁর আদেশক্রমে ইন্দ্রকুমার নিতান্ত অনিচ্ছাসহকারে ধনুক তুলিয়া লইলেন। যুবরাজ তাঁহার কাছে গিয়া কাতরস্বরে কহিলেন, "ভাই, আমি অক্ষম—আমার উপর রাগ করা অন্যায়—তুমি যদি আজ লক্ষ্য ভেদ করিতে না পার, তবে তোমার ভ্রষ্টলক্ষ্য তীর আমার হৃদয় বিদীর্ণ করিবে, ইহা নিশ্চয় জানিয়ো।"

ইন্দ্রকুমার যুবরাজের পদধূলি লইয়া কহিলেন, "দাদা, তোমার আশীর্বাদে আজ লক্ষ্য ভেদ করিব, ইহার অন্যথা হইবে না।"

ইন্দ্রকুমার তীর নিক্ষেপ করিলেন, লক্ষ্য বিদ্ধ হইল। বাজনা বাজিল। চারিদিকে জয়ধ্বনি উঠিল। যুবরাজ যখন ইন্দ্রকুমারকে আলিঙ্গন করিলেন, আনন্দে ইন্দ্রকুমারের চক্ষু ছল ছল করিয়া আসিল। ঈশা খাঁ পরম স্নেহে কহিলেন, "পুত্র, আল্লার কৃপায় তুমি দীর্ঘজীবী হইয়া থাকো।"

মহারাজা যখন ইন্দ্রকুমারকে পুরস্কার দিবার উদ্‌যোগ করিতেছেন, এমন সময়ে রাজধর গিয়া কহিলেন, "মহারাজ, আপনাদের ভ্রম হইয়াছে। আমার তীর লক্ষ্য ভেদ করিয়াছে।"

মহারাজ কহিলেন, "কখনোই না।"

রাজধর কহিলেন, "মহারাজ, কাছে গিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখুন।"

সকলে লক্ষ্যের কাছে গেলেন। দেখিলেন যে-তীর মাটিতে বিদ্ধ তাহার ফলায় ইন্দ্রকুমারের নাম খোদিত—আর যে-তীর লক্ষ্যে বিদ্ধ তাহাতে রাজধরের নাম খোদিত।

রাজধর কহিলেন, “বিচার করুন মহারাজ।”

ইশা খাঁ কহিলেন, “নিশ্চয়ই তূণ বদল হইয়াছে।”

কিন্তু পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল তূণ বদল হয় নাই। সকলে পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করিতে লাগিলেন।

ইশা খাঁ বলিলেন, “পুনর্বার পরীক্ষা করা হউক।”

রাজধর বিষম অভিমান করিয়া কহিলেন, “তাহাতে আমি সম্মত হইতে পারি না। আমার প্রতি এ বড়ো অন্যায় অবিশ্বাস। আমি তো পুরস্কার চাই না, মধ্যম কুমার বাহাদুরকে পুরস্কার দেওয়া হউক।” বলিয়া পুরস্কারের তলোয়ার ইন্দ্রকুমারের দিকে অগ্রসর করিয়া দিলেন।

ইন্দ্রকুমার দারুণ ঘৃণার সহিত বলিয়া উঠিলেন, “ধিক্। তোমার হাত হইতে এ পুরস্কার গ্রাহ্য করে কে। এ তুমি লও।” বলিয়া তলোয়ারখানা ঝনঝন করিয়া রাজধরের পায়ের কাছে ফেলিয়া দিলেন। রাজধর হাসিয়া নমস্কার করিয়া তাহা তুলিয়া লইলেন।

তখন ইন্দ্রকুমার কম্পিতস্বরে পিতাকে কহিলেন, “মহারাজ, আরাকানপতির সহিত শীঘ্রই যুদ্ধ হইবে। সেই যুদ্ধে গিয়া আমি পুরস্কার আনিব। মহারাজ, আদেশ করুন।”

ইশা খাঁ ইন্দ্রকুমারের হাত ধরিয়া কঠোরস্বরে কহিলেন, “তুমি আজ মহারাজের অপমান করিয়াছ। উঁহার তলোয়ার ছুঁড়িয়া ফেলিয়াছ। ইহার সমুচিত শাস্তি আবশ্যক।”

ইন্দ্রকুমার সবলে হাত ছাড়াইয়া লইয়া কহিলেন, “বৃদ্ধ, আমাকে স্পর্শ করিয়ো না।”

বৃদ্ধ ইশা খাঁ সহসা বিষণ্ণ হইয়া ক্ষুব্ধস্বরে কহিলেন, “পুত্র, এ কী পুত্র। আমার 'পরে এই ব্যবহার। তুমি আজ আত্মবিস্মৃত হইয়াছ বৎস।”

ইন্দ্রকুমারের চোখে জল উথলিয়া উঠিল। তিনি কহিলেন, “সেনাপতি সাহেব, আমাকে মাপ করো, আমি আজ যথার্থই আত্মবিস্মৃত হইয়াছি।”

যুবরাজ স্নেহের স্বরে কহিলেন, “শান্ত হও ভাই—গৃহে ফিরিয়া চলো।”

ইন্দ্রকুমার পিতার পদধূলি লইয়া কহিলেন, “পিতা, অপরাধ মার্জনা করুন।” গৃহে ফিরিবার সময় যুবরাজকে কহিলেন, “দাদা, আজ আমার যথার্থই পরাজয় হইয়াছে।”

রাজধর যে কেমন করিয়া জিতিলেন তাহা কেহ বুঝিতে পারিলেন না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

রাজধর পরীক্ষা-দিনের পূর্বে যখন কমলাদেবীর সাহায্যে ইন্দ্রকুমারের অস্ত্রশালায় প্রবেশ করিয়াছিলেন, তখনই ইন্দ্রকুমারের তূণ হইতে ইন্দ্রকুমারের নামাঙ্কিত একটি তীর নিজের তূণে তুলিয়া লইয়া ছিলেন এবং নিজের নামাঙ্কিত একটি তীর ইন্দ্রকুমারের তূণে এমন স্থানে এমন ভাবে স্থাপিত করিয়াছিলেন, যাহাতে সেইটিই সহজে ও সর্বাগ্রে তাঁহার হাতে উঠিতে পারে। রাজধর যাহা মনে করিয়াছিলেন, তাহাই ঘটিল। ইন্দ্রকুমার দৈবক্রমে রাজধরের স্থাপিত তীরই তুলিয়া লইয়াছিলেন—সেইজন্যই পরীক্ষাস্থলে এমন গোলমাল হইয়াছিল। কালক্রমে যখন সমস্ত শান্তভাব ধারণ করিল তখন ইন্দ্রকুমার রাজধরের চাতুরী কতকটা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু সে-কথা আর কাহাকেও কিছু বলিলেন না—কিন্তু রাজধরের প্রতি তাঁহার ঘৃণা আরও দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিল।

ইন্দ্রকুমার মহারাজের কাছে বার বার বলিতে লাগিলেন, "মহারাজ, আরাকানপতির সহিত যুদ্ধে আমাকে পাঠান।"

মহারাজ অনেক বিবেচনা করিতে লাগিলেন।

আমরা যে-সময়ের গল্প বলিতেছি সে আজ প্রায় তিন-শ বৎসরের কথা। তখন ত্রিপুরা স্বাধীন ছিল এবং চট্টগ্রাম ত্রিপুরার অধীন ছিল। আরাকান চট্টগ্রামের সংলগ্ন। আরাকানপতি মাঝে মাঝে চট্টগ্রাম আক্রমণ করিতেন। এইজন্য আরাকানের সঙ্গে ত্রিপুরার মাঝে মাঝে বিবাদ বাধিত। অমরমাণিক্যের সহিত আরাকানপতির সম্প্রতি সেইরূপ একটি বিবাদ বাধিয়াছে। যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখিয়া ইন্দ্রকুমার যুদ্ধে যাইবার প্রস্তাব করিয়াছেন। রাজা অনেক বিবেচনা করিয়া অবশেষে সম্মতি দিলেন। তিন ভাইয়ে পাঁচ হাজার করিয়া পনেরো হাজার সৈন্য লইয়া চট্টগ্রাম অভিমুখে চলিলেন। ইশা খাঁ সৈন্যাধ্যক্ষ হইয়া গেলেন।

কর্ণফুলি নদীর পশ্চিম ধারে শিবির-স্থাপন হইল। আরাকানের সৈন্য কতক নদীর ওপারে কতক এপারে। আরাকানপতি অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া নদীর পরপারে আছেন। এবং তাঁহার বাইশ হাজার সৈন্য যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া আক্রমণের প্রতীক্ষায় নদীর পশ্চিম পারে অপেক্ষা করিয়া আছে।

যুদ্ধের ক্ষেত্র পর্বতময়। সমুখাসমুখি দুই পাহাড়ের উপর দুই পক্ষের সৈন্য স্থাপিত হইয়াছে। উভয় পক্ষে যদি যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হয়, তবে মাঝের উপত্যকায় দুই সৈন্যের সংঘর্ষ উপস্থিত হইতে পারে। পর্বতের চারিদিকে হরীতকী আমলকী শাল ও

গাম্ভারির বন। মাঝে মাঝে গ্রামবাসীদের শূন্য গৃহ পড়িয়া রহিয়াছে, তাহারা ঘর ছাড়িয়া পালাইয়াছে। মাঝে মাঝে শস্যক্ষেত্র। পাহাড়িরা সেখানে ধান কাপাস তরমুজ আলু একত্রে রোপণ করিয়া গিয়াছে। আবার এক-এক জায়গায় জুমিয়া চাষারা এক-একটা পাহাড় সমস্ত দগ্ধ করিয়া কালো করিয়া রাখিয়াছে, বর্ষার পর সেখানে শস্য বপন হইবে। দক্ষিণে কর্ণফুলি, বামে দুর্গম পর্বত।

এইখানে প্রায় এক সপ্তাহকাল উভয় পক্ষ পরস্পরের আক্রমণপ্রতীক্ষায় বসিয়া আছে। ইন্দ্রকুমার যুদ্ধের জন্য অস্থির হইয়াছেন, কিন্তু যুবরাজের ইচ্ছা বিপক্ষপক্ষেরা আগে আসিয়া আক্রমণ করে। সেইজন্য বিলম্ব করিতেছেন—কিন্তু তাহারাও নড়িতে চাহে না, স্থির হইয়া আছে। অবশেষে আক্রমণ করাই স্থির হইল।

সমস্ত রাত্রি আক্রমণের আয়োজন চলিতে লাগিল। রাজধর প্রস্তাব করিলেন, “দাদা, তোমরা দুইজনে তোমাদের দশ হাজার সৈন্য লইয়া আক্রমণ করো। আমার পাঁচ হাজার হাতে থাক্, আবশ্যকের সময় কাজে লাগিবে।”

ইন্দ্রকুমার হাসিয়া বলিলেন, “রাজধর তফাতে থাকিতে চান।”

যুবরাজ কহিলেন, “না, হাসির কথা নয়। রাজধরের প্রস্তাব আমার ভালো বোধ হইতেছে।” ইশা খাঁও তাহাই বলিলেন। রাজধরের প্রস্তাব গ্রাহ্য হইল।

যুবরাজ ও ইন্দ্রকুমারের অধীনে দশ হাজার সৈন্য পাঁচ ভাগে ভাগ করা হইল। প্রত্যেক ভাগে দুই হাজার করিয়া সৈন্য রহিল। স্থির হইল, একেবারে শত্রুব্যূহের পাঁচ জায়গায় আক্রমণ করিয়া ব্যূহভেদ করিবার চেষ্টা করা হইবে। সর্বপ্রথম সারে ধানুকীরা রহিল, তার পরে তলোয়ার বর্শা প্রভৃতি লইয়া অন্য পদাতিকেরা রহিল এবং সর্বশেষে অশ্বারোহীরা সার বাঁধিয়া চলিল।

আরাকানের মগ সৈন্যেরা দীর্ঘ এক বাঁশবনের পশ্চাতে ব্যূহরচনা করিয়াছিল। প্রথম দিনের আক্রমণে কিছুই হইল না। ত্রিপুরার সৈন্য ব্যূহ ভেদ করিতে পারিল না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় দিন সমস্ত দিন নিষ্ফল যুদ্ধ অবসানে রাত্রি যখন নিশীথ হইল—যখন উভয় পক্ষের সৈন্যেরা বিশ্রামলাভ করিতেছে, দুই পাহাড়ের উপর দুই শিবিরের স্থানে স্থানে কেবল এক-একটা আগুন জ্বলিতেছে, শৃগালেরা রণক্ষেত্রে ছিন্ন হস্তপদ ও মৃতদেহের মধ্যে থাকিয়া থাকিয়া দলে দলে কাঁদিয়া উঠিতেছে—তখন শিবিরের দুই ক্রোশ দূরে রাজধর তাঁহার পাঁচ হাজার সৈন্য লইয়া সারবন্দি নৌকা বাঁধিয়া কর্ণফুলি

নদীর উপরে নৌকার সেতু নির্মাণ করিয়াছেন। একটি মশাল নাই, শব্দ নাই, সেতুর উপর দিয়া অতিসাবধানে সৈন্য পার করিতেছেন। নিচে দিয়া যেমন অন্ধকারে নদীর স্রোত বহিয়া যাইতেছে তেমনই উপর দিয়া মানুষের স্রোত অবিচ্ছিন্ন বহিয়া যাইতেছে। নদীতে ভাঁটা পড়িয়াছে। পরপারের পর্বতময় দুর্গম পাড় দিয়া সৈন্যেরা অতিকষ্টে উঠিতেছে। রাজধরের প্রতি সৈন্যাধ্যক্ষ ইশা খাঁর আদেশ ছিল যে, রাজধর রাত্রিযোগে তাঁহার সৈন্যদের লইয়া নদী বাহিয়া উত্তর দিকে যাত্রা করিবেন—তীরে উঠিয়া বিপক্ষ সৈন্যদের পশ্চাদ্ভাগে লুক্কায়িত থাকিবেন। প্রভাতে যুবরাজ ও ইন্দ্রকুমার সম্মুখভাগে আক্রমণ করিবেন—বিপক্ষেরা যুদ্ধে শ্রান্ত হইলে পর সংকেত পাইলে রাজধর সহসা পশ্চাৎ হইতে আক্রমণ করিবেন। সেইজন্যই এত নৌকার বন্দোবস্ত হইয়াছে। কিন্তু রাজধর ইশা খাঁর আদেশ কই পালন করিলেন। তিনি তো সৈন্য লইয়া নদীর পরপারে উত্তীর্ণ হইলেন। তিনি আর-এক কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন। কিন্তু কাহাকেও কিছু বলেন নাই। তিনি নিঃশব্দে আরাকানের রাজার শিবিরাভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। চতুর্দিকে পর্বত, মাঝে উপত্যকা, রাজার শিবির তাহারই মাঝখানেই অবস্থিত। শিবিরে নির্ভয়ে সকলে নিদ্রিত। মাঝে মাঝে অগ্নিশিখা দেখিয়া দূর হইতে শিবিরের স্থান নির্ণয় হইতেছে। পর্বতের উপর হইতে বড়ো বড়ো বনের ভিতর দিয়া রাজধরের পাঁচ হাজার সৈন্য অতি সাবধানে উপত্যকার দিকে নামিতে লাগিল—বর্ষাকালে যেমন পর্বতের সর্বাঙ্গ দিয়া গাছের শিকড় ধুইয়া ঘোলা হইয়া জলধারা নামিতে থাকে, তেমনি পাঁচ সহস্র মানুষ, পাঁচ সহস্র তলোয়ার, অন্ধকারের ভিতর দিয়া গাছের নিচে দিয়া সহস্র পথে আঁকিয়া বাঁকিয়া যেন নিম্নাভিমুখে ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। কিছু শব্দ নাই, মন্দগতি। সহসা পাঁচ সহস্র সৈন্যের ভীষণ চীৎকার উঠিল—ক্ষুদ্র শিবির যেন বিদীর্ণ হইয়া গেল—এবং তাহার ভিতর হইতে মানুষগুলা কিলবিল করিয়া বাহির হইয়া পড়িল। কেহ মনে করিল দুঃস্বপ্ন, কেহ মনে করিল প্রেতের উৎপাত, কেহ কিছুই মনে করিতে পারিল না।

রাজা বিনা রক্তপাতে বন্দী হইলেন। রাজা বলিলেন, "আমাকে বন্দী করিলে বা বধ করিলে যুদ্ধের অবসান হইবে না। আমি বন্দী হইবামাত্র সৈন্যেরা আমার ভাই হামচুপামুকে রাজা করিবে। যুদ্ধ যেমন চলিতেছিল তেমনই চলিবে। আমি বরঞ্চ পরাজয় স্বীকার করিয়া সন্ধিপত্র লিখিয়া দিই, আমার বন্ধন মোচন করিয়া দিন।"

রাজধর তাহাতেই সম্মত হইলেন। আরাকানরাজ পরাজয় স্বীকার করিয়া সন্ধিপত্র লিখিয়া দিলেন। একটি হস্তিদন্তনির্মিত মুকুট, পাঁচশত মণিপুরী ঘোড়া ও তিনটে বড়ো হাতি উপহার দিলেন, এইরূপ নানা ব্যবস্থা করিতে করিতে প্রভাত হইল—বেলা

হইয়া গেল। সুদীর্ঘ রাত্রে সমস্তই ভূতের ব্যাপার বলিয়া মনে হইতেছিল, দিনের বেলা আরাকানের সৈন্যগণ আপনাদের অপমান স্পষ্ট অনুভব করিতে পারিল। চারিদিকে বড়ো বড়ো পাহাড় সূর্যালোকে সহস্রচক্ষু হইয়া তাহাদিগের দিকে তাকাইয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল। রাজধর আরাকানপতিকে কহিলেন, "আর বিলম্ব নয়—শীঘ্র যুদ্ধ নিবারণ করিবার এক আদেশপত্র আপনার সেনাপতির নিকট পাঠাইয়া দিন। ওপারে এতক্ষণে ঘোর যুদ্ধ বাধিয়া গেছে।"

কতকগুলি সৈন্য সহিত দূতের হস্তে আদেশপত্র পাঠানো হইল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

অতি প্রত্যুষেই অন্ধকার দূর হইতে না হইতেই যুবরাজ ও ইন্দ্রকুমার দুই ভাগে পশ্চিমে ও পূর্বে মগদিগকে আক্রমণ করিতে চলিয়াছেন। সৈন্যের অল্পতা লইয়া রূপনারায়ণ হাজারি দুঃখ করিতেছিলেন—তিনি বলিতেছিলেন—আর পাঁচ হাজার লইয়া আসিলেই আর ভাবনা ছিল না। ইন্দ্রকুমার বলিলেন, "ত্রিপুরারির অনুগ্রহ যদি হয় তবে এই কয় জন সৈন্য লইয়াই জিতিব, আর যদি না হয় তবে বিপদ আমাদের উপর দিয়াই যাক, ত্রিপুরাবাসী যত কম মরে ততই ভালো। কিন্তু হরের কৃপায় আজ আমরা জিতিবই।" এই বলিয়া হর হর বোম্ বোম্ রব তুলিয়া কৃপাণ বর্শা লইয়া ঘোড়ায় চড়িয়া বিপক্ষদের অভিমুখে ছুটিলেন—তাঁহার দীপ্ত উৎসাহ তাঁহার সৈন্যদের মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। গ্রীষ্মকালে দক্ষিনা বাতাসে খড়ের চালের উপর দিয়া আগুন যেমন ছোটে তাঁহার সৈন্যেরা তেমনি ছুটিতে লাগিল। কেহই তাহাদের গতিরোধ করিতে পারিল না। বিপক্ষদের দক্ষিণ দিকের ব্যূহ ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। হাতাহাতি যুদ্ধ বাধিল। মানুষের মাথা ও দেহ কাটা-শস্যের মতো শস্যক্ষেত্রের উপর গিয়া পড়িতে লাগিল। ইন্দ্রকুমারের ঘোড়া কাটা পড়িল। তিনি মাটিতে পড়িয়া গেলেন। রব উঠিল তিনি মারা পড়িয়াছেন। কুঠারঘাতে এক মগ অশ্বারোহীকে অশ্বচ্যুত করিয়া ইন্দ্রকুমার তৎক্ষণাৎ তাহার ঘোড়ার উপর চড়িয়া বসিলেন। রেকাবের উপর দাঁড়াইয়া তাঁহার রক্তাক্ত তলোয়ার আকাশে সূর্যালোকে উঠাইয়া বজ্রস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "হর হর বোম্ বোম্।" যুদ্ধের আগুন দ্বিগুণ জ্বলিয়া উঠিল। এই সকল ব্যাপার দেখিয়া মগদিগের বামদিকের ব্যূহের সৈন্যগণ আক্রমণের প্রতীক্ষা না করিয়া সহসা বাহির হইয়া যুবরাজের সৈন্যের উপর গিয়া পড়িল। যুবরাজের সৈন্যগণ সহসা এরূপ আক্রমণ প্রত্যাশা করে নাই। তাহারা মুহূর্তের মধ্যে বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িল।

তাহাদের নিজের অশ্ব নিজের পদাতিকদের উপর গিয়া পড়িল, কোন্ দিকে যাইবে ঠিকানা পাইল না। যুবরাজ ও ইশা খাঁ আসমসাহসের সহিত সৈন্যদের সংযত করিয়া লইতে প্রাণপণ চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য হইতে পারিলেন না। অদূরে রাজধরের সৈন্য লুক্কায়িত আছে কল্পনা করিয়া সংকেতস্বরূপ বার বার তূরীনিনাদ করিলেন কিন্তু রাজধরের সৈন্যের কোনো লক্ষণ প্রকাশ পাইল না। ইশা খাঁ বলিলেন, "তাঁহাকে ডাকা বৃথা। সে শৃগাল দিনের বেলা গর্ত হইতে বাহির হইবে না।" ইশা খাঁ ঘোড়া হইতে মাটিতে লাফাইয়া পড়িলেন। পশ্চিম মুখ হইয়া সত্বর নামাজ পড়িয়া লইলেন। মরিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া মরিয়া হইয়া লড়িতে লাগিলেন। চারিদিকে মৃত্যু যতই ঘেরিতে লাগিল, দুর্দান্ত যৌবন ততই যেন তাঁহার দেহে ফিরিয়া আসিতে লাগিল।

এমন সময় ইন্দ্রকুমার শত্রুদের এক অংশ সম্পূর্ণ জয় করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। আসিয়া দেখিলেন যুবরাজের একদল অশ্বারোহী সৈন্য ছিন্নভিন্ন হইয়া পালাইতেছে, তিনি তাহাদিগকে ফিরাইয়া লইলেন। বিদ্যুদ্‌বেগে যুবরাজের সাহায্যার্থে আসিলেন। কিন্তু সে বিশৃঙ্খলার মধ্যে কিছুই কূলকিনারা পাইলেন না। ঘূর্ণা বাতাসে মরুভূমির বালুকারাশি যেমন ঘুরিতে থাকে, উপত্যকার মাঝখানে যুদ্ধ তেমনই পাক খাইতে লাগিল। রাজধরের সাহায্য প্রার্থনা করিয়া বার বার তূরীধ্বনি উঠিল, কিন্তু তাহার উত্তর পাওয়া গেল না।

সহসা কী মন্ত্রবলে সমস্ত থামিয়া গেল, যে যেখানে ছিল স্থির হইয়া দাঁড়াইল— আহতের আর্তনাদ ও অশ্বের হ্রেষা ছাড়া আর শব্দ রহিল না। সন্ধির নিশান লইয়া লোক আসিয়াছে। মগদের রাজা পরাজয় স্বীকার করিয়াছেন। হর হর বোম্ বোম্ শব্দে আকাশ বিদীর্ণ হইয়া গেল। মগ-সৈন্যগণ আশ্চর্য হইয়া পরস্পরের মুখ চাহিতে লাগিল।

নবম পরিচ্ছেদ

রাজধর যখন জয়োপহার লইয়া আসিলেন, তখন তাঁহার মুখে এত হাসি যে তাঁহার ছোটো চোখ দুটা বিন্দুর মতো হইয়া পিট পিট করিতে লাগিল। হাতির দাঁতের মুকুট বাহির করিয়া ইন্দ্রকুমারকে দেখাইয়া কহিলেন, "এই দেখো, যুদ্ধের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এই পুরস্কার পাইয়াছি।"

ইন্দ্রকুমার ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "যুদ্ধ? যুদ্ধ তুমি কোথায় করিলে। এ পুরস্কার তোমার নহে। এ মুকুট যুবরাজ পরিবেন।"

রাজধর কহিলেন, "আমি জয় করিয়া আনিয়াছি ; এ মুকুট আমি পরিব।"

যুবরাজ কহিলেন, "রাজধর ঠিক কথা বলিতেছেন, এ মুকুট রাজধরেরই প্রাপ্য।"

ঈশা খাঁ চটিয়া রাজধরকে বলিলেন, "তুমি মুকুট পরিয়া দেশে যাইবে! তুমি সৈন্যাধ্যক্ষের আদেশ লঙ্ঘন করিয়া যুদ্ধ হইতে পালাইলে এ কলঙ্ক একটা মুকুটে ঢাকা পড়িবে না। তুমি একটা ভাঙা হাঁড়ির কানা পরিয়া দেশে যাও, তোমাকে সাজিবে ভালো।"

রাজধর বলিলেন, "খাঁ সাহেব, এখন তো তোমার মুখে খুব বোল ফুটিতেছে—কিন্তু আমি না থাকিলে তোমরা এতক্ষণ থাকিতে কোথায়।"

ইন্দ্রকুমার বলিলেন, "যেখানেই থাকি, যুদ্ধ ছাড়িয়া গর্তের মধ্যে লুকাইয়া থাকিতাম না।"

যুবরাজ বলিলেন, "ইন্দ্রকুমার, তুমি অন্যায় বলিতেছ, সত্য কথা বলিতে কী, রাজধর না থাকিলে আজ আমাদের বিপদ হইত।"

ইন্দ্রকুমার বলিলেন, "রাজধর না থাকিলে আজ আমাদের কোনো বিপদ হইত না। রাজধর না থাকিলে এ মুকুট আমি যুদ্ধ করিয়া আনিতাম—রাজধর চুরি করিয়া আনিয়াছে। দাদা, এ মুকুট আনিয়া আমি তোমাকে পরাইয়া দিতাম—নিজে পারিতাম না।"

যুবরাজ মুকুট হাতে লইয়া রাজধরকে বলিলেন, "ভাই, তুমিই আজ জিতিয়াছ। তুমি না থাকিলে অল্প সৈন্য লইয়া আমাদের কী বিপদ হইত জানি না। এ মুকুট আমি তোমাকে পরাইয়া দিতেছি।" বলিয়া রাজধরের মাথায় মুকুট পরাইয়া দিলেন।

ইন্দ্রকুমারের বক্ষ যেন বিদীর্ণ হইয়া গেল—তিনি রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "দাদা, রাজধর শৃগালের মতো গোপনে রাত্রিযোগে চুরি করিয়া এই রাজমুকুট পুরস্কার পাইল ; আর আমি যে প্রাণপণে যুদ্ধ করিলাম—তোমার মুখ হইতে একটা প্রশংসার বাক্যও শুনিতে পাইলাম না। তুমি কি না বলিলে রাজধর না থাকিলে কেহ তোমাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে পারিত না। কেন দাদা, আমি কি সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত তোমার চোখের সামনে যুদ্ধ করি নাই—আমি কি যুদ্ধ ছাড়িয়া পালাইয়া গিয়াছিলাম—আমি কি কখনো ভীরুতা দেখাইয়াছি। আমি কি শত্রু-সৈন্যকে ছিন্নভিন্ন করিয়া তোমার সাহায্যের জন্য আসি নাই। কী দেখিয়া তুমি বলিলে যে, তোমার পরম স্নেহের রাজধর ব্যতীত কেহ তোমাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে পারিত না।"

যুবরাজ একান্ত ক্ষুব্ধ হইয়া বলিলেন, "ভাই, আমি নিজের বিপদের কথা বলিতেছি না—"

কথা শেষ হইতে না হইতে অভিমানে ইন্দ্রকুমার ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

ঈশা খাঁ যুবরাজকে বলিলেন, "যুবরাজ, এ মুকুট তোমার কাহাকেও দিবার অধিকার নাই। আমি সেনাপতি, এ মুকুট আমি যাহাকে দিব তাহারই হইবে।" বলিয়া ঈশা খাঁ রাজধরের মাথা হইতে মুকুট তুলিয়া যুবরাজের মাথায় দিতে গেলেন।

যুবরাজ সরিয়া গিয়া বলিলেন, "না, এ আমি গ্রহণ করিতে পারি না।"

ঈশা খাঁ বলিলেন, "তবে থাক্। এ মুকুট কেহ পাইবে না।" বলিয়া পদাঘাতে মুকুট কর্ণফুলি নদীর জলে ফেলিয়া দিলেন। বলিলেন, "রাজধর যুদ্ধের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াছেন—রাজধর শাস্তির যোগ্য।"

দশম পরিচ্ছেদ

ইন্দ্রকুমার তাঁহার সমস্ত সৈন্য লইয়া আহতহৃদয়ে শিবির হইতে দূরে চলিয়া গেলেন। যুদ্ধ অবসান হইয়া গিয়াছে। ত্রিপুরার সৈন্য শিবির তুলিয়া দেশে ফিরিবার উপক্রম করিতেছে। এমন সময় সহসা এক ব্যাঘাত ঘটিল।

ঈশা খাঁ যখন মুকুট কাড়িয়া লইলেন, তখন রাজধর মনে মনে কহিলেন, "আমি না থাকিলে তোমরা কেমন করিয়া উদ্ধার পাও একবার দেখিব।"

তাহার পরদিন রাজধর গোপনে আরাকানপতির শিবিরে এক পত্র পাঠাইয়া দিলেন। এই পত্রে তিনি ত্রিপুরার সৈন্যের মধ্যে আত্মবিচ্ছেদের সংবাদ দিয়া আরাকানপতিকে যুদ্ধে আহ্বান করিলেন।

ইন্দ্রকুমার যখন স্বতন্ত্র হইয়া সৈন্যসমেত স্বদেশাভিমুখে বহুদূর অগ্রসর হইয়াছেন এবং যুবরাজের সৈন্যেরা শিবির তুলিয়া গৃহের অভিমুখে যাত্রা করিতেছে, তখন সহসা মগেরা পশ্চাৎ হইতে আক্রমণ করিল—রাজধর সৈন্য লইয়া কোথায় সরিয়া পড়িলেন তাহার উদ্দেশ পাওয়া গেল না।

যুবরাজের হতাবশিষ্ট তিন সহস্র সৈন্য প্রায় তাহার চতুর্গুণ মগ-সৈন্য কর্তৃক হঠাৎ বেষ্টিত হইল। ঈশা খাঁ যুবরাজকে বলিলেন, "আজ আর পরিত্রাণ নাই। যুদ্ধের ভার আমার উপর দিয়া তুমি পলায়ন করো।"

যুবরাজ দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "পালাইলেও তো একদিন মরিতে হইবে।" চারিদিকে চাহিয়া বলিলেন, "পালাইব বা কোথা। এখানে মরিবার যেমন সুবিধা পালাইবার তেমন সুবিধা নাই। হে ঈশ্বর, সকলই তোমার ইচ্ছা।"

ঈশা খাঁ বলিলেন, "তবে আইস, আজ সমারোহ করিয়া মরা যাক।" বলিয়া

প্রাচীরবৎ শত্রুসৈন্যের এক দুর্বল অংশ লক্ষ্য করিয়া সমস্ত সৈন্য বিদ্যুদ্‌বেগে ছুটাইয়া দিলেন। পালাইবার পথ রুদ্ধ দেখিয়া সৈন্যেরা উন্মত্তের ন্যায় লড়িতে লাগিল। ইশা খাঁ দুই হাতে দুই তলোয়ার লইলেন—তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে একটি লোক তিষ্ঠিতে পারিল না। যুদ্ধক্ষেত্রের একস্থানে একটি ক্ষুদ্র উৎস উঠিতেছিল তাহার জল রক্তে লাল হইয়া উঠিল।

ইশা খাঁ শত্রুর ব্যূহ ভাঙিয়া ফেলিয়া লড়িতে লড়িতে প্রায় পর্বতের শিখর পর্যন্ত উঠিয়াছেন, এমন সময় এক তীর আসিয়া তাঁহার বক্ষে বিদ্ধ হইল। তিনি আল্লার নাম উচ্চারণ করিয়া ঘোড়ার উপর হইতে পড়িয়া গেলেন।

যুবরাজের বাহুতে এক তীর, পৃষ্ঠে এক তীর এবং তাঁহার বাহন হাতির পঞ্জরে এক তীর বিদ্ধ হইল। মাহুত হত হইয়া পড়িয়া গিয়াছে। হাতি যুদ্ধক্ষেত্র ফেলিয়া উন্মাদের মতো ছুটিতে লাগিল। যুবরাজ তাহাকে ফিরাইবার অনেক চেষ্টা করিলেন, সে ফিরিল না। অবশেষে তিনি যন্ত্রণায় ও রক্তপাতে দুর্বল হইয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে অনেক দূরে কর্ণফুলি নদীর তীরে হাতির পিঠ হইতে মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ

আজ রাত্রে চাঁদ উঠিয়াছে। অন্যদিন রাত্রে যে সবুজ মাঠের উপরে চাঁদের আলো বিচিত্রবর্ণ ছোটো ছোটো বনফুলের উপর আসিয়া পড়িত, আজ সেখানে সহস্র সহস্র মানুষের হাতপা কাটামুণ্ড ও মৃতদেহের উপরে আসিয়া পড়িয়াছে—যে স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ উৎসের জলে সমস্ত রাত ধরিয়া চন্দ্রের প্রতিবিম্ব নৃত্য করিত, সে উৎস মৃত অশ্বের দেহে প্রায় রুদ্ধ—তাহার জল রক্তে লাল হইয়া গেছে। কিন্তু দিনের বেলা মধ্যাহ্নের রৌদ্রে যেখানে মৃত্যুর ভীষণ উৎসব হইতেছিল, ভয় ক্রোধ নিরাশা হিংসা সহস্র হৃদয় হইতে অনবরত ফেনাইয়া উঠিতেছিল, অস্ত্রের ঝন ঝন উন্মাদের চীৎকার আহতের আর্তনাদ অশ্বের হ্রেষা রণশঙ্খের ধ্বনিতে নীল আকাশ যেন মথিত হইতেছিল—রাত্রে চাঁদের আলোতে সেখানে কী অগাধ শান্তি কী সুগভীর বিষাদ। মৃত্যুর নৃত্য যেন ফুরাইয়া গেছে, কেবল প্রকাণ্ড নাট্যশালার চারিদিকে উৎসবের ভগ্নাবশেষ পড়িয়া আছে। সাড়াশব্দ নাই, প্রাণ নাই, চেতনা নাই, হৃদয়ের তরঙ্গ স্তব্ধ। একদিকে পর্বতের সুদীর্ঘ ছায়া পড়িয়াছে—একদিকে চাঁদের আলো। মাঝে মাঝে পাঁচ-ছয়টা করিয়া বড়ো বড়ো গাছ ঝাঁকড়া মাথা লইয়া শাখাপ্রশাখা জটাজুট আঁধার করিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে।

ইন্দ্রকুমার যুদ্ধের সমস্ত সংবাদ পাইয়া যখন যুবরাজকে খুঁজিতে আসিয়াছেন, তখন তিনি কর্ণফুলি নদীর তীরে ঘাসের শয্যার উপর শুইয়া আছেন। মাঝে মাঝে অঞ্জলি পুরিয়া জলপান করিতেছেন, মাঝে মাঝে নিতান্ত অবসন্ন হইয়া চোখ বুজিয়া আসিতেছে। দূর সমুদ্রের দিক হইতে বাতাস আসিতেছে। কানের কাছে কুল কুল করিয়া নদীর জল বহিয়া আসিতেছে। জনপ্রাণী নাই। চারিদিকে বিজন পর্বত দাঁড়াইয়া আছে, বিজন অরণ্য ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে—আকাশে চন্দ্র একাকী, জ্যোৎস্নালোকে অনন্ত নীলাকাশ পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গিয়াছে।

এমন সময়ে ইন্দ্রকুমার যখন বিদীর্ণহৃদয়ে "দাদা" বলিয়া ডাকিয়া উঠিলেন, তখন আকাশপাতাল যেন শিহরিয়া উঠিল। চন্দ্রনারায়ণ চমকিয়া জাগিয়া "এস ভাই" বলিয়া আলিঙ্গনের জন্য দুই হাত বাড়াইয়া দিলেন। ইন্দ্রকুমার দাদার আলিঙ্গনের মধ্যে বদ্ধ হইয়া শিশুর মতো কাঁদিতে লাগিলেন।

চন্দ্রনারায়ণ ধীরে ধীরে বলিলেন, "আঃ বাঁচিলাম ভাই। তুমি আসিবে জানিয়াই এতক্ষণে কোনোমতে আমার প্রাণ বাহির হইতেছিল না। ইন্দ্রকুমার, তুমি আমার উপরে অভিমান করিয়াছিলে, তোমার সেই অভিমান লইয়া কি আমি মরিতে পারি। আজ আবার দেখা হইল, তোমার প্রেম আবার ফিরিয়া পাইলাম—এখন মরিতে আর কোনো কষ্ট নাই।" বলিয়া দুই হাতে তাঁহার তীর উৎপাটন করিলেন। রক্ত ছুটিয়া পড়িল, তাঁহার শরীর হিম হইয়া আসিল—মৃদুস্বরে বলিলেন, "মরিলাম তাহাতে দুঃখ নাই কিন্তু আমাদের পরাজয় হইল।"

ইন্দ্রকুমার কাঁদিয়া কহিলেন, "পরাজয় তোমার হয় নাই দাদা, পরাজয় আমারই হইয়াছে।"

চন্দ্রনারায়ণ ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া হাতজোড় করিয়া কহিলেন, "দয়াময়, ভবের খেলা শেষ করিয়া আসিলাম, এখন তোমার কোলে স্থান দাও।" বলিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিলেন।

ভোরের বেলা নদীর পশ্চিম পাড়ে চন্দ্র যখন পাণ্ডুবর্ণ হইয়া আসিল চন্দ্রনারায়ণের মুদ্রিতনেত্র মুখচ্ছবিও তখন পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেল। চন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার জীবন অস্তমিত হইল।

পরিশিষ্ট

বিজয়ী মগ সৈন্যেরা সমস্ত চট্টগ্রাম ত্রিপুরার নিকট হইতে কাড়িয়া লইল। ত্রিপুরার রাজধানী উদয়পুর পর্যন্ত লুণ্ঠন করিল। অমরমাণিক্য দেওঘাটে পালাইয়া গিয়া অপমানে আত্মহত্যা করিয়া মরিলেন। ইন্দ্রকুমার মগদের সহিত যুদ্ধ করিয়াই মরেন—জীবন ও কলঙ্ক লইয়া দেশে ফিরিতে তাঁহার ইচ্ছা ছিল না।

রাজধর রাজা হইয়া কেবল তিন বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন—তিনি গোমতীর জলে ডুবিয়া মরেন।

ইন্দ্রকুমার যখন যুদ্ধে যান তখন তাঁহার স্ত্রী গর্ভবতী ছিলেন। তাঁহারই পুত্র কল্যাণমাণিক্য রাজধরের মৃত্যুর পরে রাজা হন। তিনি পিতার ন্যায় বীর ছিলেন। যখন সম্রাট শাজাহানের সৈন্য ত্রিপুরা আক্রমণ করে, তখন কল্যাণমাণিক্য তাহাদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন।

বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ, ১২৯২

প্রবন্ধ

শান্তিনিকেতন

শান্তিনিকেতন

৪

পাওয়া

শক্তির ক্ষেত্রে যারা কাজ করে তারা অনন্ত উন্নতির কথা বলে। অর্থাৎ অনন্ত গতির উপরেই তারা জোর দেয়, অনন্ত স্থিতির উপর নয়। তারা অনন্ত চেষ্টার কথাই বলে, অনন্ত লাভের কথা বলে না।

এইজন্য ধর্মনীতিই তাদের শেষ সম্বল। নীতি কিনা নিয়ে যাবার জিনিস—তা পথের পাথেয়। যারা পথকেই মানে তারা নীতিকেই চরমরূপে মানে—তারা গৃহের সম্বলের কথা চিন্তা করে না। কারণ যে গৃহে কোনোকালেই মানুষ পৌঁছোবে না, সে গৃহকে মানলেও হয়, না মানলেও হয়। যে উন্নতি অনন্ত উন্নতি তাকে উন্নতি না বললে ক্ষতি হয় না।

কিন্তু শক্তিভক্তেরা বলে চলাটাই আনন্দ—কারণ তাতে শক্তির চালনা হয়; লাভে শক্তির কর্ম শেষ হয়ে গিয়ে নিশ্চেষ্ট তামসিকতায় নিয়ে গিয়ে ফেলে; বস্তুতঃ ঐশ্বর্য-পদার্থের গৌরবই এই যে সে আমাদের কোনো লাভের মধ্যে এনে ধরে রাখে না, সে আমাদের অগ্রসর করতে থাকে।

যতক্ষণ আমাদের শক্তি থাকে ততক্ষণ ঐশ্বর্য আমাদের থামতে দেয় না;—কিন্তু দুর্গতির পূর্বে দেখতে পাই মানুষ বলতে থাকে, এইটেই আমি চেয়েছিলুম এবং এইটেই আমি পেয়েছি। তখন পথিকধর্ম সে বিসর্জন দিয়ে সঞ্চয়ীর ধর্ম গ্রহণ করতে থাকে—তখন সে আর সম্মুখের দিকে তাকায় না, যা পেয়েছে সেইটেকে কী করলে আটেঘাটে বাঁধা যায় রক্ষা করা যায়, সেই কথাই সে ভাবতে থাকে।

কিন্তু সংসার জিনিসটা যে কেবলই সরে, কেবলই সরায়। এখানে হয় সরতে থাকো, নয় মরতে থাকো। এখানে যে বলেছে আমার যথেষ্ট হয়েছে, এইবার যথেষ্টের মধ্যে বাসা বাঁধব, সেই ডুবেছে।

ইতিহাসে বড়ো বড়ো জাতির মধ্যেও দেখতে পাই যে, তারা এক জায়গায় এসে বলে এইবার আমার পূর্ণতা হয়েছে—এইবার আমি সঞ্চয় করব, রক্ষা করব, বাঁধাবাঁধি হিসাব বরাদ্দ করব, এইবার আমি ভোগ করব;—তখন আর সে নূতন তত্ত্বকে বিশ্বাস

করে না—তখন তার এতদিনের পথের সম্বল ধর্মনীতিকে দুর্বলতা বলে উপহাস ও অপমান করতে থাকে, মনে করে এখন আর এর প্রয়োজন নেই—এখন আমি বলী, আমি জয়ী, আমি প্রতিষ্ঠিত।

কিন্তু প্রবাহের উপরে যে লোক প্রতিষ্ঠার ভিত্তি স্থাপন করতে চায় তার যে দশা হয় সে কারও অগোচর নেই। তাকে ডুবতেই হয়। এমন কত জাতি ডুবে গেছে।

কেবলই উন্নতি, কেবলই গতি, পরিণাম কোথাও নেই এমন একটা অদ্ভুত কথার উৎপত্তি হয়েছে এই কারণেই। কারণ, মানুষ দেখেছে সংসারে থামতে গেলেই মরতে হয়। এই নিয়মকে যারা উপলব্ধি করেছে তারা স্থিতি ও লাভকে অস্বীকার করে।

স্থিতিহীন গতি, লাভহীন চেষ্টাই যদি মানুষের ভাগ্য হয় তবে এমন ভয়ানক দুর্ভাগ্য আর কী হতে পারে। এ-কথা ঐশ্বর্য-গর্বের উন্মত্ততায় অন্ধ হয়ে বলা চলে কিন্তু এ-কথা আমাদের অন্তরাত্মা কখনোই সম্পূর্ণ সম্মতির সঙ্গে বলতে পারে না।

তার কারণ, একটা জায়গায় আমাদের পাওয়ার পন্থা আছে। সে হচ্ছে যেখানে ঈশ্বর স্বয়ং নিজেকে ধরা দিয়েছেন। সেখানে আমরা তাঁকে পাই কেন, না তিনি নিজেকে দিতে চান বলেই পাই।

কোথায় পাই? বাহিরে নয়, প্রকৃতিতে নয়, বিজ্ঞানতত্ত্বে নয়, শক্তিতে নয়—পাই জীবাত্মায়। কারণ, সেখানে তাঁর আনন্দ, তাঁর প্রেম। সেখানে তিনি নিজেকে দিতেই চান। যদি কোনো বাধা থাকে তো সে আমাদেরই দিকে—তাঁর দিকে নয়।

এই প্রেমে পাওয়ার মধ্যে তামসিকতা নেই জড়ত্ব নেই। এই যে লাভ এ চরম লাভ বটে কিন্তু পঞ্চত্বলাভের মতো এতে আমরা বিনষ্ট হই নে। তার কারণ আমরা পূর্বেই একদিন আলোচনা করেছি। শক্তির পাওয়া ব্যাপারে পেলেই শক্তি নিশ্চেষ্ট হয় কিন্তু প্রেমের পাওয়ায় পেলে প্রেম নিশ্চেষ্ট হয় না—বরঞ্চ তার চেষ্টা আরও গভীররূপে জাগ্রত হয়।

এইজন্যে এই যে প্রেমের ক্ষেত্রে ঈশ্বর আমাদের কাছে ধরা দেন—এই ধরা দেওয়ার দরুন তিনি আমাদের কাছে ছোটো হয়ে যান না—তাঁর পাওয়ার আনন্দ নিরন্তর প্রবাহিত হয়—সেই পাওয়া নিত্য নূতন থাকে।

মানুষের মধ্যেও যখন আমাদের সত্য প্রেম জাগ্রত হয়ে ওঠে তখন সেই প্রেমের বিষয়কে লাভ করেও লাভের অন্ত থাকে না—এমন স্থলে ব্রহ্মের কথা কী বলব? সেই কথায় উপনিষৎ বলেছেন—

আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন

ব্রহ্মের আনন্দ ব্রহ্মের প্রেম যিনি জেনেছেন তিনি কোনোকালেই আর ভয় পান না।

অতএব মানুষের একটা এমন পাওয়া আছে যার সম্বন্ধে চিরকালের কথাটা প্রয়োগ করা যেতে পারে।

ভারতবর্ষ এই পাওয়ার দিকেই খুব করে মন দিয়েছিলেন। সেইজন্যেই ভারতবর্ষের হৃদয় মৈত্রেয়ীর মুখ দিয়ে বলেছেন—যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্? সেইজন্যে মৃত্যুর দিক থেকে অমৃতের দিকে ভারতবর্ষ আপনার আকাঙ্ক্ষা প্রেরণ করেছিলেন।

সেদিকে যারা মন দিয়েছে বাইরে থেকে দেখে তাদের বড়ো বলে তো বোধ হয় না। তাদের উপকরণ কোথায়? ঐশ্বর্য কোথায়?

শক্তির ক্ষেত্রে যারা সফল হয় তারা আপনাকে বড়ো করে সফল হয়—আর অধ্যাত্মক্ষেত্রে যারা সফল হয় তারা আপনাকে ত্যাগ করে সফল হয়। এইজন্য দীন যে সে সেখানে ধন্য। যে অহংকার করবার কিছুই রাখে নি সেই ধন্য—কেননা, ঈশ্বর স্বয়ং যেখানে নত হয়ে আমার কাছে এসেছেন, সেখানে যে নত হতে পারবে সেই তাঁকে পূর্ণভাবে গ্রহণ করতে পারবে। এইজন্যেই প্রতিদিন প্রার্থনা করি, "নমস্তেঽস্তু"—তোমাকে যেন নমস্কার করতে পারি, যেন নত হতে পারি, নিজের অভিমান কোথাও কিছু যেন না থাকে।

জগতে তুমি রাজা অসীম প্রতাপ,
হৃদয়ে তুমি হৃদয়নাথ হৃদয়হরণ রূপ।
নীলাম্বর জ্যোতি-খচিত চরণপ্রান্তে প্রসারিত,
ফিরে সভয়ে নিয়মপথে অনন্তলোক।
নিভৃত হৃদয়মাঝে কিবা প্রসন্ন মুখচ্ছবি,
প্রেমপরিপূর্ণ মধুরভাতি।
ভকতহৃদয়ে তব করুণারস সতত বহে,
দীনজনে সতত কর অভয়দান।

২৫ পৌষ

সমগ্র

এই প্রাতঃকালে যিনি আমাদের জাগালেন তিনি আমাদের সবদিক দিয়েই জাগালেন। এই যে আলোটি ফুটে পড়েছে এ আমাদের কর্মের ক্ষেত্রেও আলো দিচ্ছে, জ্ঞানের ক্ষেত্রেও আলো দিচ্ছে—সৌন্দর্যক্ষেত্রকেও আলোকিত করছে। এই

ভিন্ন ভিন্ন পথের জন্তে তিনি ভিন্ন ভিন্ন দূত পাঠান নি—তাঁর একই দূত সকল পথেরই দূত হয়ে হাস্যমুখে আমাদের সম্মুখে অবতীর্ণ হয়েছে।

কিন্তু আমাদের বোঝবার প্রক্রিয়াই এই যে সত্যকে আমরা একমুহূর্তে সমগ্র করে দেখতে পাই নে। প্রথম খণ্ড খণ্ড করে, তার পরে জোড়া দিয়ে দেখি। এই উপায়ে খণ্ডের হিসাবে সত্য করে দেখতে গিয়ে সমগ্রের হিসাবে ভুল করে দেখি। ছবিতে একটি পরিপ্রেক্ষণতত্ত্ব আছে—তদনুসারে দূরকে ছোটো করে এবং নিকটকে বড়ো করে আঁকতে হয়। তা যদি না করি তবে ছবিটি আমাদের কাছে সত্য বলে মনে হয় না। কিন্তু সমগ্র সত্যের কাছে দূর নিকট নেই, সবই সমান নিকট। এইজন্তে নিকটকে বড়ো করে ও দূরকে ছোটো করে দেখা সারা হলে তার পরে সমগ্র সত্যের মধ্যে তাকে সংশোধন করে নিতে হয়।

মানুষ একসঙ্গে সমস্তকে দেখবার চেষ্টা করলে সমস্তকেই ঝাপসা দেখে বলেই প্রথমে খণ্ড খণ্ড করে তার পরে সমস্তর মধ্যে সেটা মিলিয়ে নেয়। এইজন্য কেবল খণ্ডকে দেখে সমগ্রকে যদি সম্পূর্ণ অস্বীকার করে তবে তার ভয়ংকর জবাবদিহি আছে; আবার কেবল সমগ্রকে লক্ষ্য করে খণ্ডকে যদি বিলুপ্ত করে দেখে তবে সেই শূন্যতা তার পক্ষে একেবারে ব্যর্থ হয়।

এ কয়দিন আমরা প্রাকৃতিক ক্ষেত্র এবং আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রকে স্বতন্ত্র করে দেখছিলুম। এ রকম না করলে তাদের সুস্পষ্ট চিত্র আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ হতে পারে না। কিন্তু প্রত্যেকটিকে যখন সুস্পষ্টভাবে জানা সারা হয়ে যায় তখন একটা মস্ত ভুল সংশোধনের সময় আসে। তখন পুনর্বার এই দুটিকে একের মধ্যে যদি না দেখি তাহলে বিপদ ঘটে।

এই প্রাকৃতিক ও আধ্যাত্মিক যেখানে পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য লাভ করেছে সেখান থেকে আমাদের লক্ষ্য যেন একান্ত স্খলিত না হয়। যেখানে সত্যের মধ্যে উভয়ের আত্মীয়তা আছে সেখানে মিথ্যার দ্বারা আত্মবিচ্ছেদ না ঘটাই। কেবলমাত্র ভাবা, কেবল তর্ক, কেবল মোহের দ্বারা প্রাচীর গেঁথে তুলে সেইটাকেই সত্য পদার্থ বলে যেন ভুল না করি।

পূর্ব এবং পশ্চিম দিক যেমন একটি অখণ্ড গোলকের মধ্যে বিধৃত হয়ে আছে—প্রাকৃতিক এবং আধ্যাত্মিক তেমনি একটি অখণ্ডতার দ্বারা বিধৃত। এর মধ্যে একটিকে পরিহার করতে গেলেই আমরা সমগ্রতার কাছে অপরাধী হব—এবং সে অপরাধের দণ্ড অবশ্যম্ভাবী।

ভারতবর্ষ যে পরিমাণে আধ্যাত্মিকতার দিকে অতিরিক্ত ঝোঁক দিয়ে প্রকৃতির দিকে ওজন হারিয়েছে, সেই পরিমাণে তাকে আজ পর্যন্ত জরিমানার টাকা গুনে দিয়ে আসতে

হচ্ছে। এমন কি, তার যথাসর্বস্ব বিকিয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে। ভারতবর্ষ যে আজ শ্রীভ্রষ্ট হয়েছে তার কারণ এই যে সে একচক্ষু হরিণের মতো জানত না যে, যেদিকে তার দৃষ্টি থাকবে না সেই দিক থেকেই ব্যাধের মৃত্যুবাণ এসে তাকে আঘাত করবে। প্রাকৃতিক দিকে সে নিশ্চিন্তভাবে কানা ছিল—প্রকৃতি তাকে মৃত্যুবাণ মেরেছে।

এ-কথা যদি সত্য হয় যে পাশ্চাত্য জাতি প্রাকৃতিক ক্ষেত্রেই সম্পূর্ণ জয়লাভ করবার জন্যে একেবারে উন্মত্ত হয়ে উঠেছে তাহলে একথা নিশ্চয় জানতে হবে একদিন তার পরাজয়ের ব্রহ্মাস্ত্র অন্যদিক থেকে এসে তার মর্মস্থানে বাজবে।

মূলে যাদের ঐক্য আছে, সেই ঐক্য মূল থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিলে তারা যে কেবল পৃথক হয়, তা নয়, তারা পরস্পরের বিরোধী হয়। ঐক্যের সহজ টানে যারা আত্মীয়রূপে থাকে, বিচ্ছিন্নতার ভিতর দিয়ে তারা প্রলয়সংঘাতে আকৃষ্ট হয়।

অর্জুন এবং কর্ণ সহোদর ভাই। মাঝখানে কুন্তীর বন্ধন তারা যদি না হারিয়ে ফেলত তাহলে পরস্পরের যোগে তারা প্রবল বলী হত;—সেই মূল বন্ধনটি বিস্মৃত হওয়াতেই তারা কেবলই বলেছে, হয় আমি মরব, নয় তুমি মরবে।

তেমনি আমাদের সাধনাকে যদি অত্যন্ত ভাবে প্রকৃতি অথবা আত্মার দিকে স্থাপন করি তাহলে আমাদের ভিতরকার প্রকৃতি এবং আত্মার মধ্যে লড়াই বেধে যায়। তখন প্রকৃতি বলে, আত্মা মরুক আমি থাকি, আত্মা বলে প্রকৃতিটা নিঃশেষে মরুক আমি একাধিপত্য করি। তখন প্রকৃতির দলের লোকেরা কর্মকেই প্রচণ্ড এবং উপকরণকেই প্রকাণ্ড করে তুলতে চেষ্টা করে; এর মধ্যে আর দয়ামায়া নেই, বিরাম বিশ্রাম নেই। ওদিকে আত্মার দলের লোকেরা প্রকৃতির রসদ একেবারে বন্ধ করে বসে, কর্মের পাট একেবারে তুলে দেয়, নানাপ্রকার উৎকট কৌশলের দ্বারা প্রকৃতিকে একেবারে নির্মূল করতে চেষ্টা করে—জানে না সেই একই মূলের উপরে তার আত্মার কল্যাণও অবস্থিত।

এইরূপে যে দুইটি পরস্পরের পরমাত্মীয় পরম সহায়, মানুষ তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ স্থাপন করে তাদের পরম শত্রু করে তোলে। এমন নিদারুণ শত্রুতা আর নেই—কারণ, এই দুই পক্ষই পরম ক্ষমতাশালী।

অতএব, প্রকৃতি এবং আত্মা, মানুষের এই দুই দিককে আমরা যখন স্বতন্ত্র করে দেখেছি তখন যত শীঘ্র সম্ভব এদের দুটিকে পরিপূর্ণ অখণ্ডতার মধ্যে সম্মিলিতরূপে দেখা আবশ্যক। আমরা যেন এই দুটি অনন্তবন্ধুর বন্ধুত্বসূত্রে অন্যায় টান দিতে গিয়ে উভয়কে কুপিত করে না তুলি।

২৬ পৌষ

কর্ম

আমাদের দেশের জ্ঞানী সম্প্রদায় কর্মকে বন্ধন বলে থাকেন। এই বন্ধন থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে নিষ্ক্রিয় হওয়াকেই তাঁরা মুক্তি বলেন। এইজন্য কর্মক্ষেত্র প্রকৃতিকে তাঁরা ধ্বংস করে নিশ্চিন্ত হতে চান।

এইজন্য ব্রহ্মকেও তাঁরা নিষ্ক্রিয় বলেন এবং যা কিছু জাগতিক ক্রিয়া, একে মায়া বলে একেবারে অস্বীকার করেন।

কিন্তু উপনিষৎ বলেন—

যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি, তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব, তদ্‌ব্রহ্ম।

যাঁর থেকে সমস্তই জন্মাচ্ছে, যাঁর দ্বারা জীবন ধারণ করছে, যাঁতে প্রয়াণ ও প্রবেশ করছে তাঁকে জানতে ইচ্ছা করো, তিনিই ব্রহ্ম।

অতএব উপনিষদের ব্রহ্মবাদী বলেন, ব্রহ্মই সমস্ত ক্রিয়ার আধার।

তা যদি হয় তবে কি তিনি এই সকল কর্মের দ্বারা বদ্ধ?

একদিকে কর্ম আপনিই হচ্ছে, আর একদিকে ব্রহ্ম স্বতন্ত্র হয়ে রয়েছেন, পরস্পরে কোনো যোগ নেই, এ কথাও যেমন আমরা বলতে পারি নে, তেমনি তাঁর কর্ম মাকড়শার জালের মতো শামুকের খোলার মতো তাঁর নিজেকে বদ্ধ করছে একথাও বলা চলে না।

এই জন্যই পরক্ষণে ব্রহ্মবাদী বলছেন—

আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি।

ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ। সেই আনন্দ হতেই সমস্ত উৎপন্ন, জীবিত, সচেষ্ট এবং রূপান্তরিত হচ্ছে।

কর্ম দুই রকমে হয়—এক অভাবের থেকে হয়, আর প্রাচুর্য থেকে হয়। অর্থাৎ প্রয়োজন থেকে হয় বা আনন্দ থেকে হয়।

প্রয়োজন থেকে অভাব থেকে আমরা যে কর্ম করি সেই কর্মই আমাদের বন্ধন, আনন্দ থেকে যা করি সে তো বন্ধন নয়—বস্তুত সেই কর্মই মুক্তি।

এই জন্য আনন্দের স্বভাবই হচ্ছে ক্রিয়া—আনন্দ স্বতই নিজেকে বিচিত্র প্রকাশের মধ্যে মুক্তিদান করতে থাকে। সেই জন্যই অনন্ত আনন্দের অনন্ত প্রকাশ। ব্রহ্ম যে আনন্দ সে এই অনিঃশেষ প্রকাশধর্মের দ্বারাই অহরহ প্রমাণ হচ্ছে। তাঁর ক্রিয়ার মধ্যে তিনি আনন্দ এইজন্য তাঁর কর্মের মধ্যেই তিনি মুক্তস্বরূপ।

আমরাও দেখেছি আমাদের আনন্দের কর্মের মধ্যেই আমরা মুক্ত। আমরা প্রিয়-বন্ধুর যে কাজ করি সে কাজ আমাদের দাসত্বে বদ্ধ করে না। শুধু বদ্ধ করে না তা নয় সেই কর্মই আমাদের মুক্ত করে। কারণ, আনন্দের নিষ্ক্রিয়তাই তার বন্ধন, কর্মই তার মুক্তি।

তবে কর্ম কখন বন্ধন? যখন তার মূল আনন্দ থেকে সে বিচ্যুত হয়। বন্ধুর বন্ধুত্বটুকু যদি আমাদের অগোচর থাকে যদি কেবল তার কাজমাত্রই আমাদের চোখে পড়ে তবে সেই বিনাবেতনের প্রাণপণ কাজকে তার প্রতি একটা ভয়ংকর অত্যাচার বলে আমাদের কাছে প্রতিভাত হবে।

কিন্তু বস্তুত তার প্রতি অত্যাচার কোন্‌টা হবে? যদি তার কাজ বন্ধ করে দিই। কারণ কর্মের মুক্তি আনন্দের মধ্যে এবং আনন্দের মুক্তি কর্মে। সমস্ত কর্মের লক্ষ্য আনন্দের দিকে এবং আনন্দের লক্ষ্য কর্মের দিকে।

এইজন্য উপনিষৎ আমাদের কর্ম নিষেধ করেন নি। ঈশোপনিষৎ বলেছেন, মানুষ কর্মে প্রবৃত্ত হবে না এ কোনোমতে হতেই পারে না।

এইজন্য তিনি পুনশ্চ বলেছেন যারা কেবল অবিদ্যার অর্থাৎ সংসারের কর্মে রত তারা অন্ধকারে পড়ে, আর যারা বিদ্যায় অর্থাৎ কেবল ব্রহ্মজ্ঞানে রত তারা ততোধিক অন্ধকারে পড়ে।

এই সমস্যার মীমাংসাস্বরূপ বলেছেন কর্ম এবং ব্রহ্মজ্ঞান উভয়েরই প্রয়োজন আছে।

অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে।

কর্মের দ্বারা মৃত্যু উত্তীর্ণ হয়ে বিদ্যাদ্বারা জীব অমৃত লাভ করে।

ব্রহ্মহীন কর্ম অন্ধকার এবং কর্মহীন ব্রহ্ম ততোধিক শূন্যতা। কারণ, তাকে নাস্তিকতা বললেও হয়। যে আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম হতে সমস্ত কিছুই হচ্ছে সেই ব্রহ্মকে এই সমস্ত-কিছু-বিবর্জিত করে দেখলে সমস্তকে ত্যাগ করা হয়, সেই সঙ্গে তাঁকেও ত্যাগ করা হয়।

যাই হ'ক আনন্দের ধর্ম যদি কর্ম হয় তবে কর্মের দ্বারাই সেই আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মের সঙ্গে আমাদের যোগ হতে পারে। গীতায় একেই বলে কর্মযোগ।

কর্মযোগের একটি লৌকিকরূপ পৃথিবীতে আমরা দেখেছি। সে হচ্ছে পতিব্রতা স্ত্রীর সংসারযাত্রা। সতী স্ত্রীর সমস্ত সংসার-কর্মের মূলে আছে স্বামীর প্রতি প্রেম; স্বামীর প্রতি আনন্দ। এইজন্য, সংসারকর্মকে তিনি স্বামীর কর্ম জেনেই আনন্দ বোধ করেন—কোনো ক্রীতদাসীও তাঁর মতো এমন করে কাজ করতে পারে না। এই কাজ যদি একান্ত তাঁর নিজের প্রয়োজনের কাজ হত তাহলে এর ভার বহন করা তাঁর পক্ষে

দুঃসাধ্য হত। কিন্তু এই সংসারকর্ম তাঁর পক্ষে কর্মযোগ। এই কর্মের দ্বারাই তিনি স্বামীর সঙ্গে বিচিত্রভাবে মিলিত হচ্ছেন।

আমাদের কর্মক্ষেত্র এই কর্মযোগের যদি তপোবন হয় তবে কর্ম আমাদের পক্ষে বন্ধন হয় না। তাহলে, সতী স্ত্রী যেমন কর্মের দ্বারাই কর্মকে উত্তীর্ণ হয়ে প্রেমকে লাভ করেন আমরাও তেমনি কর্মের দ্বারাই কর্মের সংসারকে উত্তীর্ণ হয়ে—মৃত্যুং তীর্ত্বা—অমৃতকে লাভ করি।

এইজন্যই গৃহস্থের প্রতি উপদেশ আছে তিনি যে যে কাজ করবেন তা নিজেকে যেন নিবেদন না করেন—তা করলেই কর্ম তাঁকে নাগপাশে বাঁধবে এবং ঈর্ষাদ্বেষ লোভক্ষোভের বিষনিঃশ্বাসে তিনি জর্জরিত হতে থাকবেন, তিনি—যদ্যৎ কর্ম প্রকুর্বীত তদ্‌ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ—যে যে কর্ম করবেন সমস্ত ব্রহ্মকে সমর্পণ করবেন। তাহলে, সতী গৃহিণী যেমন সংসারের সমস্ত ভোগের অংশ পরিত্যাগ করেন অথচ সংসারের সমস্ত ভার অশ্রান্ত যত্নে বহন করেন—কারণ কর্মকে তিনি স্বার্থসাধনরূপে জানেন না আনন্দ-সাধনরূপেই জানেন—আমরাও তেমনি কর্মের আসক্তি দূর করে কর্মের ফলাকাঙ্ক্ষা বিসর্জন করে, কর্মকে বিশুদ্ধ আনন্দময় করে তুলতে পারব—এবং যে আনন্দ আকাশে না থাকলে—কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ—কেই বা কিছুমাত্র চেষ্টা করত, কেই বা প্রাণ ধারণ করত। জগতের সেই সকল চেষ্টার আকর পরমানন্দের সঙ্গে আমাদের সকল চেষ্টাকে যুক্ত করে জেনে আমরা কোনোকালেও এবং কাহা হতেও ভয়প্রাপ্ত হব না।

২৭ পৌষ

শক্তি

জ্ঞান, প্রেম ও শক্তি এই তিন ধারা যেখানে একত্র সংগত সেইখানেই আনন্দতীর্থ। আমাদের মধ্যে জ্ঞান, প্রেম ও কর্মের যে পরিমাণে পূর্ণ মিলন সেই পরিমাণেই আমাদের পূর্ণ আনন্দ। বিচ্ছেদ ঘটলেই পীড়া উৎপন্ন হয়।

এইজন্যে কোনো একটা সংক্ষেপ উপায়ের প্রলোভনে যেখানে আমরা ফাঁকি দেব সেখানে আমরা নিজেকেই ফাঁকি দেব। যদি মনে করি দ্বারীকে ডিঙিয়ে রাজার সঙ্গে দেখা করব তাহলে দেউড়িতে এমনি আমাদের লাঞ্ছনা হবে যে, রাজদর্শনই দুঃসাধ্য হয়ে উঠবে। যদি মনে করি নিয়মকে বর্জন করে নিয়মের ঊর্ধ্বে উঠব তাহলে কুপিত নিয়মের হাতে আমাদের দুঃখের একশেষ হবে।

বিধানকে সম্পূর্ণ স্বীকার করে তবেই বিধানের মধ্যে আমাদের কর্তৃত্ব জন্মে। গৃহের যে কর্তা হতে চায় গৃহের সমস্ত নিয়ম সংযম তাকেই সকলের চেয়ে বেশি মানতে হয়—সেই স্বীকারের দ্বারাই সেই কর্তৃত্বের অধিকার লাভ করে।

এই কারণেই বলছিলুম, সংসারের মধ্যে থেকেই আমরা সংসারের উর্ধ্বে উঠতে পারি—কর্মের মধ্যে থেকেই আমরা কর্মের চেয়ে বড়ো হতে পারি। পরিত্যাগ করে, পলায়ন করে কোনোমতেই তা সম্ভব হয় না।

কারণ, আমাদের যে মুক্তি, সে স্বভাবের দ্বারা হলেই সত্য হয়, অভাবের দ্বারা হলে হয় না। পূর্ণতার দ্বারা হলেই তবে সে সার্থক হয়, শূন্যতার দ্বারা সে শূন্য ফলই লাভ করে।

অতএব যিনি মুক্তস্বরূপ সেই ব্রহ্মের দিকে লক্ষ্য করো। তিনি না-রূপেই মুক্ত নন তিনি হাঁ-রূপেই মুক্ত। তিনি ওঁ; অর্থাৎ তিনি হাঁ।

এইজন্য ব্রহ্মর্ষি তাঁকে নিষ্ক্রিয় বলেন নি, অত্যন্ত স্পষ্ট করেই তাঁকে সক্রিয় বলেছেন। তাঁরা বলেছেন—

পরাস্ত শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ।

শুনেছি এঁর পরমা শক্তি এবং এঁর বিবিধা শক্তি এবং এঁর জ্ঞানক্রিয়া ও বলক্রিয়া স্বাভাবিকী।

ব্রহ্মের পক্ষে ক্রিয়া হচ্ছে স্বাভাবিক—অর্থাৎ তাঁর স্বভাবেই সেই ক্রিয়ার মূল, বাইরে নয়। তিনি করছেন, তাঁকে কেউ করাচ্ছে না।

এইরূপে তিনি তাঁর কর্মের মধ্যেই মুক্ত—কেননা এই কর্ম তাঁর স্বাভাবিক। আমাদের মধ্যেও কর্মের স্বাভাবিকতা আছে। আমাদের শক্তি, কর্মের মধ্যে উন্মুক্ত হতে চায়। কেবল বাইরের প্রয়োজনবশত নয়, অন্তরের স্ফূর্তিবশত।

সেই কারণে কর্মেই আমাদের স্বাভাবিক মুক্তি। কর্মেই আমরা বাহির হই প্রকাশ পাই। কিন্তু যাতেই মুক্তি তাতেই বন্ধন ঘটতে পারে। নৌকোর যে গুণ দিয়ে তাকে টেনে নেওয়া যায় সেই গুণ দিয়েই তাকে বাঁধা যেতে পারে। গুণ যখন তাকে বাইরের দিকে টানে তখনই সে চলে, যখন নিজের দিকেই বেঁধে রাখে তখনই সে পড়ে থাকে।

আমাদেরও কর্ম যখন স্বার্থের সংকীর্ণতার মধ্যেই কেবল পাক দিতে থাকে তখন কর্ম ভয়ংকর বন্ধন। তখন আমাদের শক্তি সেই পরাশক্তির বিরুদ্ধে চলে, বিবিধা শক্তির বিরুদ্ধে চলে। তখন সে ভূমার দিকে চলে না, বহুর দিকে চলে না, নিজের ক্ষুদ্রতার মধ্যেই আবদ্ধ হয়। তখন এই শক্তিতে আমাদের মুক্তি দেয় না, আনন্দ দেয় না, তার বিপরীতেই আমাদের নিয়ে যায়। যে ব্যক্তি কর্মহীন অলস সেই রুদ্ধ। যে ব্যক্তি ক্ষুদ্রকর্মা স্বার্থপর, জগৎসংসার তার সপ্রশ্র কারাবাস। সে স্বার্থের কারাগারে অহোরাত্র একটা ক্ষুদ্র পরিধির কেন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করে ঘানি টানছে এবং এই পরিশ্রমের ফলকে সে

যে চিরদিনের মতো আয়ত্ত করে রাখবে এমন সাধ্য তার নেই ; এ তাকে পরিত্যাগ করতেই হয়, তার কেবল পরিশ্রমই সার।

অতএব কর্মকে স্বার্থের দিক থেকে পরমার্থের দিকে নিয়ে যাওয়াই মুক্তি—কর্মত্যাগ করা মুক্তি নয়। আমরা যে-কোনো কর্মই করি—তা ছোটোই হ'ক আর বড়োই হ'ক সেই পরমাত্মার স্বাভাবিকী বিশ্বক্রিয়ার সঙ্গে তাকে যোগযুক্ত করে দেখলে সেই কর্ম আমাদের আর বদ্ধ করতে পারবে না—সেই কর্ম সত্যকর্ম, মঙ্গলকর্ম এবং আনন্দের কর্ম হয়ে উঠবে।

২৮ পৌষ

প্রাণ

আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবান্ এষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ

ব্রহ্মবিদদের মধ্যে যাঁরা শ্রেষ্ঠ পরমাত্মায় তাঁদের ক্রীড়া, পরমাত্মায় তাঁদের আনন্দ এবং তাঁরা ক্রিয়াবান।

শুধু তাঁদের আনন্দ নয়, তাঁদের কর্মও আছে।

এই শ্লোকটির প্রথমার্ধটুকু তুললেই কথাটার অর্থ স্পষ্টতর হবে।

প্রাণোহ্যেষ যঃ সর্বভূতৈর্বিভাতি বিজানন্ বিদ্বান্ ভবতে নাতিবাদী।

এই যিনি প্রাণরূপে সকলের মধ্যে প্রকাশ পাচ্ছেন—এঁকে যিনি জানেন তিনি এঁকে অতিক্রম করে কোনো কথা বলেন না।

প্রাণের মধ্যে আনন্দ এবং কর্ম এই দুটো জিনিস একত্র মিলিত হয়ে রয়েছে। প্রাণের সচেষ্টতাতেই প্রাণের আনন্দ—প্রাণের আনন্দেই তার সচেষ্টতা।

অতএব, ব্রহ্মই যদি সমস্ত সৃষ্টির প্রাণস্বরূপ হন, তিনিই যদি সৃষ্টির মধ্যে গতির দ্বারা আনন্দ ও আনন্দের দ্বারা গতি সঞ্চার করছেন, তবে যিনি ব্রহ্মবাদী তিনি শুধু ব্রহ্মকে নিয়ে আনন্দ করবেন না তো, তিনি ব্রহ্মকে নিয়ে কর্মও করবেন।

তিনি যে ব্রহ্মবাদী। তিনি তো শুধু ব্রহ্মকে জানেন তা নয়, তিনি যে ব্রহ্মকে বলেন। না বললে তাঁর আনন্দ বাঁধ মানবে কেন ? তিনি বিশ্বের প্রাণস্বরূপ ব্রহ্মকে প্রাণের মধ্যে নিয়ে "ভবতে নাতিবাদী।" অর্থাৎ ব্রহ্মকে বাদ দিয়ে কোনো কথা বলতে চান না—তিনি ব্রহ্মকেই বলতে চান।

মানুষ ব্রহ্মকে কেমন করে বলে ? সেতারের তার যেমন করে গানকে বলে। সে নিজের সমস্ত গতির দ্বারা, স্পন্দনের দ্বারা, ক্রিয়ার দ্বারাই বলে—সর্বতোভাবে গানকে প্রকাশের দ্বারাই সে নিজের সার্থকতা সাধন করে।

ব্রহ্ম, নিজেকে কেমন করে বলছেন? নিজের ক্রিয়ার দ্বারা অনন্ত আকাশকে আলোকে ও আকারে পরিপূর্ণ করে স্পন্দিত করে ঝংকৃত করে তিনি বলছেন—আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি—তিনি কর্মের মধ্যেই আপন আনন্দবাণী বলছেন, আপন অমৃতসংগীত বলছেন। তাঁর সেই আনন্দ এবং তাঁর কর্ম একেবারে একাকার হয়ে দ্যুলোকে ভূলোকে বিকীর্ণ হয়ে পড়েছে।

ব্রহ্মবাদীও যখন ব্রহ্মকে বলবেন তখন আর কেমন করে বলবেন? তাঁকে কর্মের দ্বারাই বলতে হবে। তাঁকে ক্রিয়াবান হতে হবে।

সে কর্ম কেমন কর্ম? না, যে কর্মদ্বারা প্রকাশ পায় তিনি "আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ" পরমাত্মায় তাঁর ক্রীড়া, পরমাত্মায় তাঁর আনন্দ। যে কর্মে প্রকাশ পায় তাঁর আনন্দ নিজের স্বার্থসাধনে নয়, নিজের গৌরব বিস্তারে নয়। তিনি যে "নাতিবাদী"—তিনি পরমাত্মাকে ছাড়া নিজের কর্মে আর কাউকেই প্রকাশ করতে চান না।

তাই সেই "ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ" তাঁর জীবনের প্রত্যেক কাজে নানা ভাষায় নানা রূপে এই সংগীত ধ্বনিত করে তুলছেন—শান্তম্ শিবমদ্বৈতম্। জগৎক্রিয়ার সঙ্গে তাঁর জীবনক্রিয়া এক ছন্দে এক রাগিণীতে গান করছে।

অন্তরের মধ্যে যা আত্মক্রীড়া, যা পরমাত্মার সঙ্গে ক্রীড়া, বাহিরে সেইটিই যে জীবনের কর্ম। অন্তরের সেই আনন্দ বাহিরের সেই কর্মে উচ্ছ্বসিত হচ্ছে, বাহিরের সেই কর্ম অন্তরের সেই আনন্দে আবার ফিরে ফিরে যাচ্ছে। এমনি করে অন্তরে বাহিরে আনন্দ ও কর্মের অপূর্ব সুন্দর আবর্তন চলছে এবং সেই আবর্তনবেগে নব নব মঙ্গললোকের সৃষ্টি হচ্ছে। সেই আবর্তনবেগে জ্যোতি উদ্দীপ্ত হচ্ছে, প্রেম উৎসারিত হয়ে উঠছে।

এমনি করে, যিনি চরাচর নিখিলে প্রাণরূপে অর্থাৎ একইকালে আনন্দ ও কর্মরূপে প্রকাশমান সেই প্রাণকে ব্রহ্মবিৎ আপনার প্রাণের দ্বারাই প্রকাশ করেন।

সেইজন্তে আমার প্রার্থনা এই যে, হে প্রাণস্বরূপ, আমার সেতারের তারে যেন মরচে না পড়ে, যেন ধুলো না জমে—বিশ্বপ্রাণের স্পন্দনাভিঘাতে সে দিনরাত বাজতে থাকুক—কর্ম সংগীতে বাজতে থাকুক—তোমারই নামে বাজতে থাকুক। প্রবল আঘাতে মাঝে মাঝে যদি তার ছিঁড়ে যায় তো সেও ভালো কিন্তু শিথিল না হয়, মলিন না হয়, ব্যর্থ না হয়। ক্রমেই তার স্বর প্রবল হ'ক, গভীর হ'ক, সমস্ত অস্পষ্টতা পরিহার করে সত্য হয়ে উঠুক—প্রকৃতির মধ্যে ব্যাপ্ত এবং মানবাত্মার মধ্যে প্রতিধ্বনিত হ'ক—হে আবি তোমার আবির্ভাবের দ্বারা সে ধন্য হ'ক।

২৯ পৌষ

১৪।২০

জগতে মুক্তি

ভারতবর্ষে একদিন অদ্বৈতবাদ কর্মকে অজ্ঞানের, অবিদ্যার কোঠায় নির্বাসিত করে অত্যন্ত বিশুদ্ধ হতে চেয়েছিলেন। বলেছিলেন ব্রহ্ম যখন নিষ্ক্রিয় তখন ব্রহ্মলাভ করতে গেলে কর্মকে সমূলে ছেদন করা আবশ্যক।

সেই অদ্বৈতবাদের ধারা ক্রমে যখন দ্বৈতবাদের নানা শাখাময়ী নদীতে পরিণত হল তখন ব্রহ্ম এবং অবিদ্যাকে নিয়ে একটা দ্বিধা উৎপন্ন হল।

তখন দ্বৈতবাদী ভারত জগৎ এবং জগতের মূলে দুইটি তত্ত্ব স্বীকার করলেন। প্রকৃতি ও পুরুষ।

অর্থাৎ ব্রহ্মকে তাঁরা নিষ্ক্রিয় নির্গুণ বলে একপাশে সরিয়ে রেখে দিলেন এবং শক্তিকে জগৎক্রিয়ার মূলে যেন স্বতন্ত্র সত্তারূপে স্বীকার করলেন। এইরূপে ব্রহ্ম যে কর্ম দ্বারা বদ্ধ নন এ কথাও বললেন অথচ কর্ম যে একেবারে কিছুই নয় তাও বলা হল না। শক্তি ও শক্তির কার্য থেকে শক্তিমানকে দূরে বসিয়ে তাঁকে একটা খুব বড়ো পদ দিয়ে তাঁর সঙ্গে সমস্ত সম্বন্ধ একেবারে পরিত্যাগ করলেন।

শুধু তাই নয়, এই ব্রহ্মই যে পরাস্ত, তিনিই যে ছোটো সে-কথাও নানা রূপকের দ্বারা প্রচার করতে লাগলেন।

এমনটি যে ঘটল তার মূলে একটি সত্য আছে।

মুক্তির মধ্যে একইকালে একটি নির্গুণ দিক এবং একটি সগুণ দিক দেখা যায়। তারা একত্র বিরাজিত। আমরা সেটা আমাদের নিজের মধ্যে থেকেই বুঝতে পারি। সেই কথাটার আলোচনা করবার চেষ্টা করা যাক।

একদিন জগতের মধ্যে একটি অখণ্ড নিয়মকে আমরা আবিষ্কার করি নি। তখন মনে হয়েছে, জগতে কোনো এক বা অনেক শক্তির কৃপা আছে কিন্তু বিধান নেই। যখন তখন যা খুশি তাই হতে পারে। অর্থাৎ যা কিছু হচ্ছে তা এমনি একতরফা হচ্ছে যে আমার দিক থেকে তার দিকে যে যাব এমন রাস্তা বন্ধ—সমস্ত রাস্তাই হচ্ছে তার দিক থেকে আমার দিকে—আমার পক্ষে কেবল ভিক্ষার রাস্তাটি খোলা।

এমন অবস্থায় মানুষকে কেবলই সকলের হাতে পায়ে ধরে বেড়াতে হয়। আগুনকে বলতে হয় তুমি দয়া করে জ্বলো, বাতাসকে বলতে হয় তুমি দয়া করে বও, সূর্যকে বলতে হয় তুমি যদি কৃপা করে না উদয় হও তবে আমার রাত্রি দূর হবে না।

ভয় কিছুতেই ঘোচে না। অব্যবস্থিতচিত্তস্য প্রসাদোঽপি ভয়ংকরঃ—যেখানে

ব্যবস্থা দেখতে পাই নে প্রসাদেও মন নিশ্চিন্ত হয় না। কারণ, সেই প্রসাদের উপর আমার নিজের কোনো দাবি নেই, সেটা একেবারেই একতরফা জিনিস।

অথচ যার সঙ্গে এতবড়ো কারবার তার সঙ্গে মানুষ নিজের একটা যোগের পথ না খুলে যে বাঁচতে পারে না। কিন্তু তার মধ্যে যদি কোনো নিয়ম না থাকে তবে তার সঙ্গে যোগেরও তো কোনো নিয়ম থাকতে পারে না।

এমন অবস্থায় যে লোকই তাকে যে রকমই তুকতাক বলে তাই সে আঁকড়ে থাকতে চায়, সেই তুকতাক যে মিথ্যে তাও তাকে বোঝানো অসম্ভব—কারণ, বোঝাতে গেলেও নিয়মের দোহাই দিয়েই তো বোঝাতে হয়। কাজেই মানুষ মন্ত্রতন্ত্র তাগা-তাবিজ এবং অর্থহীন বিচিত্র বাহ্যপ্রক্রিয়া নিয়ে অস্থির হয়ে বেড়াতে থাকে।

জগতে এ রকম করে থাকা ঠিক পরের বাড়ি থাকা। সেও আবার এমন পর যে খামখেয়ালিতার অবতার। হয়তো পাত পেড়ে দিয়ে গেল কিন্তু অন্ন আর দিলই না, হয়তো হঠাৎ হুকুম হল আজই এখনই ঘর ছেড়ে বেরোতে হবে।

এই রকম জগতে, পরান্নভোজী পরাবসথশায়ী হয়ে মানুষ পীড়িত এবং অবমানিত হয়। সে নিজেকে বদ্ধ বলেই জানে ও দীন বলে শোক করতে থাকে।

এর থেকে মুক্তি কখন পাই? এর থেকে পালিয়ে গিয়ে নয়—কারণ, পালিয়ে যাব কোথায়? মরবার পথও যে এ আগলে বসে আছে।

জ্ঞান যখন বিশ্বজগতে অখণ্ড নিয়মকে আবিষ্কার করে—যখন দেখে কার্যকারণের কোথাও ছেদ নেই তখন সে মুক্তিলাভ করে।

কেননা, জ্ঞান তখন জ্ঞানকেই দেখে। এমন কিছুকে পায় যার সঙ্গে তার যোগ আছে, যা তার আপনারই। তার নিজের যে আলোক সর্বত্রই সেই আলোক। এমন কি, সর্বত্রই সেই আলোক অখণ্ডরূপে না থাকলে সে নিজেই বা কোথায় থাকত।

এতদিনে জ্ঞান মুক্তি পেলে। সে আর তো বাধা পেল না। সে বলল, আঃ বাঁচা গেল, এ যে আমাদেরই বাড়ি—এ যে আমার পিতৃভবন। আর তো আমাকে সংকুচিত হয়ে অপমানিত হয়ে থাকতে হবে না। এতদিন স্বপ্ন দেখছিলুম যেন কোন্ পাগলাগারদে আছি—আজ স্বপ্ন ভেঙেই দেখি—শিয়রের কাছে পিতা বসে আছেন, সমস্তই আমার আপনার।

এই তো হল জ্ঞানের মুক্তি। বাইরের কিছু থেকে নয়—নিজেরই কল্পনা থেকে।

কিন্তু এই মুক্তির মধ্যেই জ্ঞান চুপচাপ বসে থাকে না। তার মন্ত্রতন্ত্র তাগা-তাবিজের শিকল-ছিন্ন ভিন্ন করে এই মুক্তির ক্ষেত্রে তার শক্তিকে প্রয়োগ করে।

যখন আমরা আত্মীয়ের পরিচয় পাই তখন সেই পরিচয়ের উপরেই তো চুপচাপ করে বসে থাকতে পারি নে, তখন আত্মীয়ের সঙ্গে আত্মীয়তার আদান প্রদান করবার জন্য উদ্যত হয়ে উঠি।

জ্ঞান যখন জগতে জ্ঞানের পরিচয় পায় তখন তার সঙ্গে কাজে যোগ দিতে প্রবৃত্ত হয়। তখন পূর্বের চেয়ে তার কাজ ঢের বেড়ে যায়—কারণ, মুক্তির ক্ষেত্রে শক্তির অধিকার বহুবিস্তৃত হয়ে পড়ে। তখন জ্ঞানের সঙ্গে জ্ঞানের যোগে জাগ্রত শক্তি বহুধা হয়ে প্রসারিত হতে থাকে।

তবেই দেখা যাচ্ছে জ্ঞান বিশ্বজ্ঞানের মধ্যে আপনাকে উপলব্ধি ক'রে আর চুপ ক'রে থাকতে পারে না। তখন শক্তিযোগে কর্মদ্বারা নিজেকে সার্থক করতে থাকে।

প্রথমে অজ্ঞান থেকে মুক্তির মধ্যে জ্ঞান নিজেকে লাভ করে—তার পরে নিজেকে দান করা তার কাজ। কর্মের দ্বারা সে নিজেকে দান করে, সৃষ্টি করে, অর্থাৎ সর্জন করে, অর্থাৎ যে শক্তিকে পরের ঘরে বন্দীর মতো থেকে কেবলই বদ্ধ করে রেখেছিল সেই শক্তিকেই আত্মীয় ঘরে নিরতই ত্যাগ করে সে হাঁপ ছেড়ে বাঁচে।

অতএব দেখা যাচ্ছে মুক্তির সঙ্গে সঙ্গেই কর্মের বৃদ্ধি বই হ্রাস নয়।

কিন্তু কর্ম যে অধীনতা। সে কথা স্বীকার করতেই হবে। কর্মকে সত্যের অনুগত হতেই হবে, নিয়মের অনুগত হতেই হবে, নইলে সে কর্মই হতে পারবে না।

তা কী করা যাবে? নিন্দাই কর আর যাই কর, আমাদের ভিতরকার শক্তি সত্যের অধীন হতেই চাচ্ছেন। সেই তাঁর প্রার্থনা। সেইজন্যেই মহাদেবের প্রসাদপ্রার্থী পার্বতীর মতো তিনি তপস্যা করছেন।

জ্ঞান যে দিন পুরোহিত হয়ে সত্যের সঙ্গে আমাদের শক্তির পরিণয় সাধন করিয়ে দেন তখনই আমাদের শক্তি সতী হন—তখন তাঁর বন্ধ্যাদশা আর থাকে না। তিনি সত্যের অধীন হওয়াতেই সত্যের ঘরে কর্তৃত্বলাভ করতে পারেন।

অতএব, কেবল মুক্তির দ্বারা সাফল্য নয়—তারও পরের কথা হচ্ছে অধীনতা। দানের দ্বারা অর্জন যেমন তেমনি এই অধীনতার দ্বারাই মুক্তি সম্পূর্ণ সার্থক হয়। এইজন্যই দ্বৈতশাস্ত্রে নির্গুণ ব্রহ্মের উপরে সগুণ ভগবানকে ঘোষণা করেন। আমাদের প্রেম, জ্ঞান ও শক্তি এই তিনকেই পূর্ণভাবে ছাড়া দিতে পারলেই তবেই তো তাকে মুক্তি বলব—নির্গুণ ব্রহ্মে তার যে কোনো স্থান নেই।

১ মাঘ

সমাজে মুক্তি

মানুষের কাছে কেবল জগৎপ্রকৃতি নয় সমাজপ্রকৃতি বলে আর একটি আশ্রয় আছে। এই সমাজের সঙ্গে মানুষের কোন্ সম্বন্ধটা সত্য সে কথা ভাবতে হয়। কারণ সেই সত্য সম্বন্ধেই মানুষ সমাজে মুক্তিলাভ করে—মিথ্যাকে সে যতখানি আসন দেয় ততখানিই বদ্ধ হয়ে থাকে।

আমরা অনেক সময় বলেছি ও মনে করেছি প্রয়োজনের তাগিদেই মানুষ সমাজে বদ্ধ হয়েছে। আমরা একত্রে দল বাঁধলে বিস্তর সুবিধা আছে। রাজা আমার বিচার করে, পুলিস আমার পাহারা দেয়, পৌরপরিষৎ আমার রাস্তা ঝাঁট দিয়ে যায়, ম্যাঞ্চেস্টার আমার কাপড় জোগায় এবং জ্ঞানলাভ প্রভৃতি আরও বড়ো বড়ো উদ্দেশ্যও এই উপায়ে সহজ হয়ে আসে। অতএব মানুষের সমাজ সমাজস্থ প্রত্যেকের স্বার্থ সাধনের প্রকৃষ্ট উপায়।

এই প্রয়োজনের তাগিদেই মানুষ সমাজে আবদ্ধ হয়েছে এই কথাকেই অন্তরের সঙ্গে যদি সত্য বলে জানি তাহলে সমাজকে মানবহৃদয়ের কারাগার বলতে হয়—সমাজকে একটা প্রকাণ্ড এঞ্জিনওআলা কারখানা বলে মানতে হয়—ক্ষুধানলদীপ্ত প্রয়োজনই সেই কলের কয়লা জোগাচ্ছে।

যে হতভাগ্য এই রকম অত্যন্ত প্রয়োজনওআলা হয়ে সংসারের খাটুনি খেটে মরে সে তো কৃপাপাত্র সন্দেহ নেই।

সংসারের এই বন্দিশাল-মূর্তি দেখেই তো সন্ন্যাসী বিদ্রোহ করে ওঠে—সে বলে প্রয়োজনের তাড়ায় আমি সমাজের হরিণবাড়িতে পাথর ভেঙে মরব? কোনোমতেই না। জানি আমি প্রয়োজনের অনেক বড়ো। ম্যাঞ্চেস্টার আমার কাপড় জোগাবে? দরকার কী। আমি কাপড় ফেলে দিয়ে বনে চলে যাব। বাণিজ্যের জাহাজ দেশ-বিদেশ থেকে আমার খাদ্য এনে দেবে? দরকার নেই—আমি বনে গিয়ে ফল মূল খেয়ে থাকব।

কিন্তু বনে গেলেও যখন প্রয়োজন আমার পিছনে পিছনে নানা আকারে তাড়া করে তখন এতবড়ো স্পর্ধা আমাদের মুখে সম্পূর্ণ শোভা পায় না।

তবে সংসারের মধ্যে আমাদের মুক্তি কোন্‌খানে? প্রেমে। যখনই জানব প্রয়োজনই মানবসমাজের মূলগত নয়—প্রেমই এর নিগূঢ় এবং চরম আশ্রয়—তখনই এক মুহূর্তে আমরা বন্ধনমুক্ত হয়ে যাব। তখনই বলে উঠব—প্রেম! আঃ

বাঁচা গেল। তবে আর কথা নেই। কেননা, প্রেম যে আমারই জিনিস। এ তো আমাকে বাহির থেকে তাড়া লাগিয়ে বাধ্য করে না। প্রেমই যদি মানব-সমাজের তত্ত্ব হয় তবে সে তো আমারই তত্ত্ব। অতএব প্রেমের দ্বারা মুহূর্তেই আমি প্রয়োজনের সংসার থেকে মুক্ত আনন্দের সংসারে উত্তীর্ণ হলুম।—যেন পলকে স্বপ্ন ভেঙে গেল।

এই তো গেল মুক্তি। তার পরে; তার পরে অধীনতা। প্রেম মুক্তি পাবামাত্রই সেই মুক্তিক্ষেত্রে আপনার শক্তিকে চরিতার্থ করবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। তখন তার কাজ পূর্বের চেয়ে অনেক বেশি বেড়ে ওঠে। তখন সে পৃথিবীর দীন দরিদ্রেরও দাস, তখন সে মূঢ় অধমেরও সেবক। এই হচ্ছে মুক্তির পরিণাম।

যে মুক্ত তার তো ওজর নেই। সে তো বলতে পারবে না, আমার আপিস আছে, আমার মনিব আছে, বাইরে থেকে তাড়া আছে। কাজেই যেখান থেকে ডাক পড়ে তার আর না বলবার জো নেই। মুক্তির এত বড়ো দায়। আনন্দের দায়ের মতো দায় আর কোথায় আছে।

যদি বলি মানুষ মুক্তি চায় তবে মিথ্যা কথা বলা হয়। মানুষ মুক্তির চেয়ে ঢের বেশি চায় মানুষ অধীন হতেই চায়। যার অধীন হলে অধীনতার অন্ত থাকে না তারই অধীন হবার জন্যে সে কাঁদছে। সে বলছে হে পরম প্রেম, তুমি যে আমার অধীন, আমি কবে তোমার অধীন হব! অধীনতার সঙ্গে অধীনতার পূর্ণ মিলন হবে কবে। যেখানে আমি উদ্ধত, গর্বিত, স্বতন্ত্র সেইখানেই আমি পীড়িত, আমি ব্যর্থ। হে নাথ আমাকে অধীন করে নত করে বাঁচাও। যতদিন আমি এই মিথ্যেটাকে অত্যন্ত করে জেনেছিলুম যে আমিই হচ্ছে আমি, তার অধিক আমি আর নেই ততদিন আমি কী ঘোরাই ঘুরেছি। আমার ধন আমার মনের বোঝা নিয়ে মরেছি। যখনই স্বপ্ন ভেঙে যায় বুঝতে পারি তুমি পরম আমি আছ—আমার আমি তারই জোরে আমি—তখনই এক মুহূর্তে মুক্তিলাভ করি। কিন্তু শুধু তো মুক্তিলাভ নয়। তার পরে পরম অধীনতা। পরম আমির কাছে সমস্ত আমিত্বর অভিমান জলাঞ্জলি দিয়ে একেবারে অনন্ত পরিপূর্ণ অধীনতার পরমানন্দ।

১ মাঘ

মত

আত্মা যে শরীরকে আশ্রয় করে সেই শরীর তাকে ত্যাগ করতে হয়। কারণ, আত্মা শরীরের চেয়ে বড়ো। কোনো বিশেষ এক শরীর যদি আত্মাকে বরাবর ধারণ করে থাকতে পারত তাহলে আত্মা যে শরীরের মধ্যে থেকেও শরীরকে অতিক্রম করে তা আমরা জানতেই পারতুম না। এই কারণেই আমরা মৃত্যুর দ্বারা আত্মার মহত্ত্ব অবগত হই।

আত্মা এই হ্রাসবৃদ্ধিমরণশীল শরীরের মধ্যে নিজেকে ব্যক্ত করে। তার এই প্রকাশ বাধাপ্রাপ্ত প্রকাশ, সম্পূর্ণ প্রকাশ নয়; এই জন্যে শরীরকেই আত্মা বলে যে জানে সে সম্পূর্ণ সত্য জানে না।

মানুষের সত্যজ্ঞান এক-একটি মতবাদকে আশ্রয় করে নিজেকে প্রকাশ করতে চেষ্টা করে। কিন্তু সেই মতবাদটি সত্যের শরীর, সুতরাং এক হিসাবে সত্যের চেয়ে অনেক ছোটো এবং অসম্পূর্ণ।

এই জন্যে সত্যকে বারংবার মতদেহ পরিবর্তন করতে হয়। বৃহৎ সত্য তার অসম্পূর্ণ মতদেহের সমস্ত শক্তিকে শেষ করে ফেলে, তাকে জীর্ণ করে, বৃদ্ধ করে, অবশেষে যখন কোনো দিকেই আর কুলোয় না, নানা প্রকারেই সে অপ্রয়োজনীয় বাধাস্বরূপ হয়ে আসে তখন তার মৃত্যুর সময় আসে; তখন তার নানাপ্রকার বিকার ও ব্যাধি ঘটতে থাকে ও শেষে মৃত্যু হয়।

আত্মা যে কোনো একটা বিশেষ শরীর নয় এবং সমস্ত বিশেষ শরীরকেই সে অতিক্রম করে এই কথাটা যেমন উপলব্ধি করা আমাদের দরকার এবং এই উপলব্ধি জন্মালে যেমন আত্মার বিকার ও মৃত্যুর কল্পনায় আমরা ভীত ও পীড়িত হই নে—সেই রকম, মানুষ যে সকল মহৎ সত্যকে নানা দেশে নানা কালে নানা রূপে প্রকাশ করতে চেষ্টা করছে এক-একবার তাকে তার মতদেহ থেকে স্বতন্ত্র করে সত্য আত্মাকে স্বীকার করা আমাদের পক্ষে অত্যন্ত আবশ্যক। তাহলেই সত্যের অমৃতস্বরূপ জানতে পেরে আমরা আনন্দিত হই।

নইলে কেবলই মত এবং বাক্য নিয়ে বিবাদ করে আমরা অধীর হতে থাকি, এবং আমার মত স্থাপন করব ও অন্যের মত খণ্ডন করব এই অহংকার সুতীব্র হয়ে উঠে জগতে পীড়ার সৃষ্টি করে। এইরূপ বিবাদের সময় মতই প্রবল হয়ে উঠে সত্যকে যতই দূরে ফেলতে থাকে বিরোধের বিষও ততই তীব্রতর হয়ে ওঠে। এই

কারণে, মতের অত্যাচার যেমন নিষ্ঠুর ও মতের উন্মত্ততা যেমন উদ্দাম এমন আর কিছুই না। এই কারণেই সত্য আমাদের ধৈর্যদান করে কিন্তু মত আমাদের ধৈর্যহরণ করে।

দৃষ্টান্তস্বরূপে বলতে পারি অদ্বৈতবাদ ও দ্বৈতবাদ নিয়ে যখন আমরা বিবাদ করি তখন আমরা মত নিয়েই বিবাদ করি, সত্য নিয়ে নয়—সুতরাং সত্যকে আচ্ছন্ন করে বিস্মৃত হয়ে আমরা একদিকে ক্ষতিগ্রস্ত হই, আর একদিকে বিরোধ করে আমাদের দুঃখ ঘটে।

আমাদের মধ্যে যাঁরা নিজেকে দ্বৈতবাদী বলে ঘোষণা করেন তাঁরা অদ্বৈতবাদকে বিভীষিকা বলে কল্পনা করেন। সেখানে তাঁরা মতের সঙ্গে রাগারাগি করে সত্যকে পর্যন্ত এক-ঘরে করতে চান।

যাঁরা "অদ্বৈতম্" এই সত্যটিকে লাভ করেছেন তাঁদের সেই লাভটির মধ্যে প্রবেশ করো। তাঁদের কথায় যদি এমন কিছু থাকে যা তোমাকে আঘাত করে সেদিকে মন দেবার দরকার নেই।

মায়াবাদ! শুনলেই অসহিষ্ণু হয়ে ওঠ কেন? মিথ্যা কি নেই? নিজের মধ্যে তার কি কোনো পরিচয় পাওয়া যায় নি? সত্য কি আমাদের কাছে একেবারেই উন্মুক্ত? আমরা কি এককে আর বলে জানি নে? কাঠকে দগ্ধ করে যেমন আগুন জ্বলে আমাদের অজ্ঞানকে, অবিদ্যাকে, মায়াকে দগ্ধ করেই কি আমাদের সত্যের জ্ঞান জ্বলছে না? আমাদের পক্ষে সেই মায়ার ইন্ধন জ্ঞানের জ্যোতি লাভের জন্য প্রয়োজনীয় হতে পারে কিন্তু এই মিথ্যা কি ব্রহ্মে আছে?

অনন্তের মধ্যে ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান যে একেবারে পর্যবসিত হয়ে আছে, অথচ আমার কাছে খণ্ডভাবে তা পরিবর্তনপরম্পরারূপে চলেছে, কোথাও তার পর্যাপ্তি নেই। এক জায়গায় ব্রহ্মের মধ্যে যদি কোনো পরিসমাপ্তি না থাকে তবে আমরা এই যে খণ্ড কালের ক্রিয়াকে অসমাপ্ত বলছি একে অসমাপ্ত আখ্যা দেবারও কোনো তাৎপর্য থাকত না।

এই খণ্ডকালের অসমাপ্তি একদিকে অনন্তকে প্রকাশও করছে একদিকে আচ্ছন্নও করছে। যেদিকে আচ্ছন্ন করছে সেদিকে তাকে কী বলব? তাকে মায়া বলব না কি, মিথ্যা বলব না কি? তবে "মিথ্যা" শব্দটার স্থান কোথায়?

যিনি খণ্ড কালের সমস্ত খণ্ডতা সমস্ত ক্রমিকতার আক্রমণ থেকে ক্ষণকালের জন্যও বিমুক্ত হয়ে অনন্ত পরিসমাপ্তির নির্বিকার নিরঞ্জন অতলস্পর্শ মধ্যে নিজেকে নিঃশেষে নিমজ্জিত করে দিয়ে সেই শুদ্ধ শান্ত গভীর অদ্বৈতরসসমুদ্রে নিবিড়ানন্দের নিশ্চল

স্থিতিলাভ করেছেন তাঁকে আমি ভক্তির সঙ্গে নমস্কার করি। আমি তাঁর সঙ্গে কোনো কথা নিয়ে বাদপ্রতিবাদ করতে চাই নে।

কেননা, আমি যে অনুভব করছি, মিথ্যার বোঝায় আমার জীবন ক্লান্ত। আমি যে দেখতে পাচ্ছি, যে পদার্থটাকে "আমি" বলে ঠিক করে বসে আছি, তারই থালা ঘটি বাটি তারই স্থাবর অস্থাবরের বোঝাকে সত্য পদার্থ বলে ভ্রম করে সমস্ত জীবন টেনে বেড়াচ্ছি—যতই দুঃখ পাই কোনোমতেই তাকেই ফেলতে পারি নে। অথচ অন্তরাত্মার ভিতরে একটা বাণী আছে, ও সমস্ত মিথ্যা, ও সমস্ত তোমাকে ত্যাগ করতেই হবে। মিথ্যার বস্তাকে সত্য বলে বহন করতে গেলে তুমি বাঁচবে না—তাহলে তোমার "মহতী বিনষ্টিঃ"।

নিজের অহংকারকে, নিজের দেহকে, টাকাকড়িকে, খ্যাতি-প্রতিপত্তিকে একান্ত সত্য বলে জেনে অস্থির হয়ে বেড়াচ্ছি এই যদি হয় তবে এই মিথ্যার সীমা কোথায় টানব? বুদ্ধির মূলে যে ভ্রম থাকাতে আমি নিজেকে ভুল জানছি, সেই ভ্রমই কি সমস্ত জগৎ-সম্বন্ধেও আমাদের ভোলাচ্ছে না? সেই ভ্রমই কি আমার জগতের কেন্দ্রস্থলে আমার "আমি"টিকে স্থাপন করে মরীচিকা রচনা করছে না? তাই, ইচ্ছা কি করে না, এই মাকড়সার জাল একেবারে ছিন্ন ভিন্ন পরিষ্কার করে দিয়ে সেই পরমাত্মার, সেই পরম-আমির, সেই একটিমাত্র আমির মাঝখানে অহংকারের সমস্ত আবরণ-বিবর্জিত হয়ে অবগাহন করি—ভারমুক্ত হয়ে, বাসনামুক্ত হয়ে, মলিনতামুক্ত হয়ে একেবারে সুবৃহৎ পরিত্রাণ লাভ করি।

এই ইচ্ছা যে অন্তরে আছে, এই বৈরাগ্য যে সমস্ত উপকরণের ধাঁধার মাঝখানে পথভ্রষ্ট বালকের মতো থেকে থেকে কেঁদে উঠছে। তবে আমি মায়াবাদকে গাল দেব কোন্ মুখে। আমার মনের মধ্যে যে এক শ্মশানবাসী বসে আছে, সে যে আর কিছুই জানে না, সে যে কেবল জানে—একমেবাদ্বিতীয়ম্।

২ মাঘ

নির্বিশেষ

সংসার পদার্থটা আলো-আঁধার ভালোমন্দ জন্মমৃত্যু প্রভৃতি দ্বন্দ্বের নিকেতন এ কথা অত্যন্ত পুরাতন। এই দ্বন্দ্বের দ্বারাই সমস্ত খণ্ডিত। আকর্ষণ-শক্তি বিপ্রকর্ষণ-শক্তি, কেন্দ্রানুগ শক্তি কেন্দ্রাতিগ শক্তি কেবলই বিরুদ্ধতা দ্বারাই সৃষ্টিকে জাগ্রত করে রেখেছে।

কিন্তু এই বিরুদ্ধতাই যদি একান্ত সত্য হত তাহলে জগতের মধ্যে আমরা যুদ্ধকেই দেখতুম—শান্তিকে কোথাও কিছুমাত্র দেখতুম না।

অথচ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে সমস্ত দ্বন্দ্বযুদ্ধের উপরে অখণ্ড শান্তি বিরাজমান। তার কারণ এই বিরোধ সংসারেই আছে ব্রহ্মে নেই।

আমরা তর্কের জোরে সোজা লাইনকে অনন্তকাল সোজা করে টেনে নিয়ে চলতে পারি। আমরা মনে করি অন্ধকারকে সোজা করে টেনে চললে সে অনন্তকাল অন্ধকারই থাকবে—কারণ, অন্ধকারের একটা বিশিষ্টতা আছে সেই বিশিষ্টতার কুত্রাপি অবসান নেই।

তর্কে এই প্রকার সোজা লাইন থাকতে পারে কিন্তু সত্যে নেই। সত্যে গোল লাইন। অন্ধকারকে টেনে চলতে গেলে ধীরে ধীরে বেঁকে বেঁকে একজায়গায় সে আলোয় গোল হয়ে ওঠে। সুখকে সোজা লাইনে টানতে গেলে সে দুঃখে এসে বেঁকে দাঁড়ায়—ভ্রমকে ঠেলে চলতে চলতে এক জায়গায় সে সংশোধনের রেখায় আপনি এসে পড়ে।

এর একটিমাত্র কারণ অনন্তের মধ্যে বিরুদ্ধতার পক্ষপাত নেই। অখণ্ড আকাশ-গোলকের মধ্যে পূর্বদিকের পূর্বত্ব নেই—পশ্চিমের পশ্চিমত্ব নেই—পূর্ব পশ্চিমের মাঝখানে কোনো বিরোধ নেই, এমন কি, বিচ্ছেদও নেই। পূর্বপশ্চিমের বিশেষত্ব খণ্ড-আমির বিশেষত্বকে আশ্রয় করেই আছে।

এই যে জিনিসটা ব্রহ্মের স্বরূপে নেই অথচ আছে তাকে কী নাম দেওয়া যেতে পারে? বেদান্ত তাকে মায়া নাম দিয়েছেন—অর্থাৎ ব্রহ্ম যে সত্য, এ সে সত্য নয়। এ মায়া। যখনই ব্রহ্মের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে যাই তখনই একে আর দেখা যায় না। ব্রহ্মের দিক থেকে দেখতে গেলেই এ সমস্তই অখণ্ড গোলকে অনন্তভাবে পরিসমাপ্ত। আমার দিক দিয়ে দেখতে গেলেই বিরোধের মধ্যে প্রভেদের মধ্যে বহুর মধ্যে বিচিত্র বিশেষে বিভক্ত।

এইজন্য যাঁরা সেই অখণ্ড অদ্বৈতের সাধনা করেন তাঁরা ব্রহ্মকে বিশেষ হতে মুক্ত করে বিশুদ্ধভাবে জানেন। ব্রহ্মকে নির্বিশেষ জানেন। এবং এই নির্বিশেষকে উপলব্ধি করাকেই তাঁরা জ্ঞানের চরম লক্ষ্য করেন।

এই যে অদ্বৈতের বিরাট সাধনা, ছোটো বড়ো নানা মাত্রায় মানুষ এতে প্রবৃত্ত আছে। একেই মানুষ মুক্তি বলে। আপেল ফল পড়াকে মানুষ এক সময়ে একটা স্বতন্ত্র বিশেষ ঘটনা বলেই জানত। তারপরে তাকে একটা বিশ্বব্যাপী অতিবিশেষের সঙ্গে যুক্ত করে দিয়ে জ্ঞানের বন্ধনমোচন করে দিলে। এইটি করাতেই মানুষ জ্ঞানের সার্থকতা লাভ করলে।

মানুষ অহংকারকে যখন একান্ত বিশেষ করে জানে তখন সে নিজের সেই আমিকে নিয়ে সকল দুষ্কর্মই করতে পারে। মানুষের ধর্মবোধ তাকে নিয়তই শিক্ষা দিচ্ছে তোমার আমি একান্ত নয়। তোমার আমিকে সমাজ-আমির মধ্যে মুক্তি দাও। অর্থাৎ তোমার বিশেষত্বকে অতিবিশেষের অভিমুখে নিয়ে চলো।

এই অতিবিশেষের অভিমুখে যদি বিশেষত্বকে না নিয়ে যাই তাহলে সংসার নিদারুণ বিশিষ্ট মূর্তি ধারণ করে আমাদের ঘাড়ের উপর চেপে বসে—তার সমস্ত পদার্থই একান্ত বোঝা হয়ে ওঠে। টাকা তখন অত্যন্ত একান্ত হয়ে উঠে অ-টাকাকে এমনি বিরুদ্ধ করে তোলে যে টাকার বোঝা কিছুতেই আর আমরা নামাতে পারি নে।

এই বন্ধন এই বোঝা থেকে মুক্তি দেবার জন্যে মানুষের মধ্যে বড়ো বড়ো ভাব, মঙ্গল ভাব, ধর্মভাব কত রকম করে কাজ করছে। বড়োর মধ্যে ছোটোর বিশেষত্বগুলি নিজের ঐকান্তিকতা ত্যাগ করে, এই জন্যে বড়োর মধ্যে বিশেষের দৌরাত্ম্য কম পড়াতে মানুষ বড়ো ভাবের আনন্দে ছোটোর বন্ধন, টাকার বন্ধন, খ্যাতির বন্ধন ত্যাগ করতে পারে।

তাই দেখা যাচ্ছে নির্বিশেষের অভিমুখেই মানুষের সমস্ত উচ্চ আকাঙ্ক্ষা সমস্ত উন্নতির চেষ্টা কাজ করছে।

অদ্বৈতবাদ, মায়াবাদ, বৈরাগ্যবাদ মানুষের এই ভাবকে এই সত্যকে সমুজ্জ্বল করে দেখেছে। সুতরাং মানুষকে অদ্বৈতবাদ একটা বৃহৎ সম্পদ দান করেছে। তার মধ্যে নানা অব্যক্ত অর্ধব্যক্তভাবে যে-সত্য কাজ করছিল, সমস্ত আবরণ সরিয়ে দিয়ে তাঁরই সম্পূর্ণ পরিচয় দিয়েছে।

কিন্তু যেখানেই হ'ক বিশিষ্টতা বলে একটা পদার্থ এসেছে। তাকে মিথ্যাই বলি মায়াই বলি, তার মস্ত একটা জোর, সে আছে। এই জোর সে পায় কোথা থেকে?

ব্রহ্ম ছাড়া আর কোনো শক্তি (তাকে শয়তান বল বা আর কোনো নাম দাও) কি বাইরে থেকে জোর করে এই মায়াকে আরোপ করে দিয়েছে? সে তো কোনোমতে মনেও করতে পারি নে।

উপনিষদে এই প্রশ্নের উত্তর এই যে, আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে ; ব্রহ্মের আনন্দ থেকেই এ সমস্ত যা কিছু হচ্ছে। এ তাঁর ইচ্ছা—তাঁর আনন্দ। বাইরের জোর নয়।

এমনি করে বিশেষের পথ পার হয়ে সেই নির্বিশেষে আনন্দের মধ্যে যেমনি পৌঁছোনো যায় অমনি লাইন ঘুরে আবার বিশেষের দিকে ফিরে আসে। কিন্তু তখন এই সমস্ত বিশেষকে আনন্দের ভিতর দিয়ে দেখতে পাই—আর সে আমাদের বদ্ধ করতে

পারে না। কর্ম তখন আনন্দের কর্ম হয়ে ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে বেঁচে যায়—সংসার তখন আনন্দময় হয়ে ওঠে। কর্মই তখন চরম হয় না, সংসারই তখন চরম হয় না, আনন্দই তখন চরম হয়।

এমনি করে মুক্তি আমাদের যোগে নিয়ে আসে, বৈরাগ্য আমাদের প্রেমে উত্তীর্ণ করে দেয়।

৩ মাঘ

দুই

স পর্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধং।
কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূর্যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ।

উপনিষদের এই মন্ত্রটিকে আমি অনেকদিন অবজ্ঞা করে এসেছি। নানা কারণেই এই মন্ত্রটিকে খাপছাড়া এবং অদ্ভুত মনে হত।

বাল্যকাল থেকে আমরা এই মন্ত্রের অর্থ এই ভাবে শুনে আসছি—

তিনি সর্বব্যাপী, নির্মল, নিরবয়ব, শিরা ও ব্রণরহিত, শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ। তিনি সর্বদর্শী, মনের নিয়ন্তা, সকলের শ্রেষ্ঠ ও স্বপ্রকাশ; তিনি সর্বকালে প্রজাদিগকে যথোপযুক্ত অর্থসকল বিধান করিতেছেন।

ঈশ্বরের নাম এবং স্বরূপের তালিকা নানা স্থানে শুনে শুনে আমাদের অভ্যস্ত হয়ে গেছে। এখন এগুলি আবৃত্তি করা এত সহজ হয়ে পড়েছে যে এজন্য আর চিন্তা করতে হয় না—সুতরাং যে শোনে তারও চিন্তা উদ্রেক করে না।

বাল্যকালে উল্লিখিত মন্ত্রটিকে আমি চিন্তার দ্বারা গ্রহণ করি নি, বরঞ্চ আমার চিন্তার মধ্যে একটি বিদ্রোহ ছিল। প্রথমত এর ব্যাকরণ এবং রচনা-প্রণালীতে ভারি একটা শৈথিল্য দেখতে পেতুম। তিনি সর্বব্যাপী—এই কথাটাকে একটা ক্রিয়াপদের দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে, যথা—স পর্যগাৎ; তার পরে তাঁর অন্য সংজ্ঞাগুলি শুক্রম্ অকায়ম্ প্রভৃতি বিশেষণ-পদের দ্বারা ব্যক্ত হয়েছে। দ্বিতীয়ত, শুক্রম্ অকায়ম এগুলি ক্লীবলিঙ্গ, তার পরেই হঠাৎ কবির্মনীষী প্রভৃতি পুংলিঙ্গ বিশেষণের প্রয়োগ হয়েছে। তৃতীয়ত ব্রহ্মের শরীর নেই এই পর্যন্তই সহ্য করা যায় কিন্তু ব্রণ নেই স্নায়ু নেই বললে এক তো বাহুল্য বলা হয় তার পরে আবার কথাটাকে অত্যন্ত নামিয়ে নিয়ে আসা হয়। এই সকল কারণে আমাদের উপাসনার এই মন্ত্রটি দীর্ঘকাল আমাকে করেছে।

অন্তঃকরণ যখন ভাবকে গ্রহণ করবার জন্যে প্রস্তুত থাকে না তখন শ্রদ্ধাহীন শ্রোতার কাছে কথাগুলি তার সমস্ত অর্থটা উদ্‌ঘাটিত করে দেয় না। অধ্যাত্মমন্ত্রকে যখন সাহিত্য-সমালোচকের কান দিয়ে শুনেছি তখন সাহিত্যের দিক দিয়েও তার ঠিক বিচার করতে পারি নি।

আমি সেজন্যে অনুতপ্ত নই বরঞ্চ আনন্দিত। মূল্যবান জিনিসকে তখনই লাভ করা সৌভাগ্য যখন তার মূল্য বোঝবার শক্তি কিছু পরিমাণে হয়েছে—যথার্থ অভাবের পূর্বে পেলে পাওয়ার আনন্দ ও সফলতা থেকে বঞ্চিত হতে হয়।

পূর্বে আমি দেখতে পাই নি যে এই মন্ত্রের দুটি ছত্রে দুটি ক্রিয়াপদ প্রধান স্থান অধিকার করে আছে। একটি হচ্ছে পর্যগাৎ—তিনি সর্বত্রই গিয়েছেন সর্বত্রই আছেন। আর একটি হচ্ছে ব্যদধাৎ—তিনি সমস্তই করেছেন। এই মন্ত্রের এক অর্ধে তিনি আছেন, অন্য অর্ধে তিনি করছেন।

যেখানে আছেন সেখানে ক্লীবলিঙ্গ বিশেষণ-পদ, যেখানে করছেন সেখানে পুংলিঙ্গ বিশেষণ। অতএব বাহুল্য কোনো কথা না বলে একটি ব্যাকরণের ইঙ্গিতের দ্বারা এই মন্ত্র একটি গভীর সার্থকতা লাভ করেছে।

তিনি সর্বত্র আছেন কেননা তিনি মুক্ত তাঁর কোথাও কোনো বাধা নেই। না আছে শরীরের বাধা, না আছে পাপের বাধা। তিনি আছেন এই ধ্যানটিকে সম্পূর্ণ করতে গেলে তাঁর সেই মুক্ত বিশুদ্ধ স্বরূপকে মনে উজ্জ্বল করে দেখতে হয়। তিনি যে কিছুতেই বদ্ধ নন এইটিই সর্বব্যাপিত্বের লক্ষণ।

শরীর যার আছে সে সর্বত্র নেই। শুধু সর্বত্র নেই তা নয় সে সর্বত্র নির্বিকারভাবে থাকতে পারে না কারণ শরীরের ধর্মই বিকার। তাঁর শরীর নেই সুতরাং তিনি নির্বিকার, তিনি অব্রণ। যার শরীর আছে সে ব্যক্তি স্নায়ু প্রভৃতির সাহায্যে নিজের প্রয়োজন সাধন করে—সে রকম সাহায্য তাঁর পক্ষে সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। শরীর নেই বলার দরুন কী বলা হল তা ওই অব্রণ ও অস্নাবির বিশেষণের দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে—তাঁর শারীরিক সীমা নেই সুতরাং তাঁর বিকার নেই এবং খণ্ডভাবে খণ্ড উপকরণের দ্বারা তাঁকে কাজ করতে হয় না। তিনি শুদ্ধং অপাপবিদ্ধং—কোনো প্রকার পাপ প্রবৃত্তি তাঁকে একদিকে হেলিয়ে একদিকে বেঁধে রাখে না। সুতরাং তিনি সর্বত্রই সম্পূর্ণ সমান। এই তো গেল—স পর্যগাৎ।

তার পরে—স ব্যদধাৎ; যেমন অনন্ত দেশে তিনি পর্যগাৎ তেমনি অনন্তকালে তিনি ব্যদধাৎ। ব্যদধাৎ শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ। নিত্য কাল হতে বিধান করেছেন এবং নিত্য কালের জন্য বিধান করছেন। সে বিধান কিছুমাত্র এলোমেলো নয়—

যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাৎ—যেখানকার যেটি অর্থ ঠিক সেইটেই একেবারে যথাতথরূপে বিধান করছেন। তার আর লেশমাত্র ব্যত্যয় হবার জো নেই।

এই যিনি বিধান করেন তাঁর স্বরূপ কী? তিনি কবি। এস্থলে কবি শব্দের প্রতিশব্দস্বরূপ সর্বদর্শী কথাটা ঠিক চলে না। কেননা এখানে তিনি যে কেবল দেখছেন তা নয় তিনি করছেন। কবি শুধু দেখেন জানেন তা নয় তিনি প্রকাশ করেন। তিনি যে কবি, অর্থাৎ তাঁর আনন্দ যে একটি সুশৃঙ্খল সুষমার মধ্যে সুবিহিত ছন্দে নিজেকে প্রকাশ করছে, তা তাঁর এই জগৎ মহাকাব্য দেখলেই টের পাওয়া যায়। জগৎ-প্রকৃতিতে তিনি কবি, মানুষের মনঃপ্রকৃতিতে তিনি অধীশ্বর। বিশ্বমানবের মন যে আপনা-আপনি যেমন-তেমন করে একটা কাণ্ড করছে তা নয় তিনি তাকে নিগূঢ়ভাবে নিয়ন্ত্রিত করে ক্ষুদ্র থেকে ভূমার দিকে, স্বার্থ থেকে পরমার্থের দিকে নিয়ে চলেছেন। তিনিই হচ্ছেন পরিভূঃ। কী জগৎপ্রকৃতি কী মানুষের মন সর্বত্র তাঁর প্রভুত্ব। কিন্তু তাঁর কবিত্ব ও প্রভুত্ব বাইরের কিছু থেকে নিয়মিত হচ্ছে না; তিনি স্বয়ম্ভূ—তিনি নিজেকেই নিজে প্রকাশ করেন। এই জন্যে তাঁর কর্মকে তাঁর বিধানকে বাইরে থেকে দেশে বা কালে বাধা দেবার কিছুই নেই—এবং এই কারণেই শাশ্বতকালে তাঁর বিধান, এবং যথাতথরূপে তাঁর বিধান।

আমাদের স্বভাবেও এই রকম ভাববাচ্য ও কর্মবাচ্য দুই বাচ্য আছে। আমরাও হই এবং করি। আমাদের হওয়া যতই বাধামুক্ত ও সম্পূর্ণ হবে আমাদের করাও ততই সুন্দর ও যথাযথ হয়ে উঠবে। আমাদের হওয়ার পূর্ণতা কিসে? না, পাপশূন্য বিশুদ্ধতায়। বৈরাগ্যদ্বারা আসক্তিবন্ধন থেকে মুক্ত হও—পবিত্র হও, নির্বিকার হও। সেই ব্রহ্মচর্য সাধনায় তোমার হওয়া যেমন সম্পূর্ণ হতে থাকবে, যতই তুমি তোমার বাধামুক্ত নিষ্পাপ চিত্তের দ্বারা সর্বত্র ব্যাপ্ত হতে থাকবে, যতই সকলের মধ্যে প্রবেশের অধিকার লাভ করবে—ততই তুমি সংসারকে কাব্য করে তুলবে, মনকে রাজ্য করে তুলবে, বাহিরে এবং অন্তরে প্রভুত্ব লাভ করবে। অর্থাৎ আত্মার স্বয়ম্ভূত্ব সুস্পষ্ট হবে, অনুভব করবে তোমার মধ্যে একটি মুক্তির অধিষ্ঠান আছে।

একই অনন্তচক্রে ভাব এবং কর্ম কেমন মিলিত হয়েছে, হওয়া থেকে করা স্বতই নিজের স্বয়ম্ভূ আনন্দে কেমন করে সৌন্দর্যে ও ঐশ্বর্যে বহুধা হয়ে উঠেছে, বিশুদ্ধ নির্বিশেষ বিচিত্র বিশেষের মধ্যে কেমন ধরা দিয়েছেন, যিনি অকায় তিনি কায়ের কাব্যরচনা করছেন, যিনি অপাপবিদ্ধ তিনি পাপপুণ্যময় মনের অধিপতি হয়েছেন—কোনোখানে এর আর ছেদ পাওয়া যায় না—উপনিষদের ওই একটি ছোটো মন্ত্রে সে-কথা সমস্তটা বলা হয়েছে।

৪ মাঘ, কলিকাতা

বিশ্বব্যাপী

যো দেবোঽগ্নৌ, যোঽপ্সু, যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ,
য ওষধিষু, যো বনস্পতিষু, তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ।

যে দেবতা অগ্নিতে, যিনি জলে, যিনি বিশ্বভুবনে প্রবিষ্ট হয়ে আছেন, যিনি ওষধিতে, যিনি বনস্পতিতে সেই দেবতাকে বারবার নমস্কার করি।

ঈশ্বর সর্বত্র আছেন এ-কথাটা আমাদের কাছে অত্যন্ত অভ্যস্ত হয়ে গেছে। এইজন্য এই মন্ত্র আমাদের কাছে অনাবশ্যক ঠেকে। অর্থাৎ এই মন্ত্রে আমাদের মনের মধ্যে কোনো চিন্তা জাগ্রত হয় না।

অথচ এ-কথাও সত্য যে ঈশ্বরের সর্বব্যাপিত্ব সম্বন্ধে আমরা যতই নিশ্চিন্ত হয়ে থাকি না কেন, তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ—এ আমাদের অভিজ্ঞতার কথা নয়—আমরা সেই দেবতাকে নমস্কার করতে পারি নে। ঈশ্বর সর্বব্যাপী এ আমাদের শোনা কথা মাত্র। শোনা কথা পুরাতন হয়ে যায় মৃত হয়ে যায়। এ-কথাও আমাদের পক্ষে মৃত।

কিন্তু এ-কথা যাঁরা কানে শুনে বলেন নি—যাঁরা মন্ত্রদ্রষ্টা, মন্ত্রটিকে যাঁরা দেখেছেন তবে বলতে পেরেছেন—তাঁদের সেই প্রত্যক্ষ উপলব্ধির বাণীকে অন্যমনস্ক হয়ে শুনলে চলে না। এ বাক্য যে কতখানি সত্য তা আমরা যেন সম্পূর্ণ সচেতনভাবে গ্রহণ করি।

যে জিনিসকে আমরা সর্বদাই ব্যবহার করি, যাতে আমাদের প্রয়োজন সাধন হয়, আমাদের কাছে তার তাৎপর্য অত্যন্ত সংকীর্ণ হয়ে যায়। স্বার্থ জিনিসটা যে কেবল নিজে ক্ষুদ্র তা নয় যার প্রতি সে হস্তক্ষেপ করে তাকেও ক্ষুদ্র করে তোলে। এমন কি, যে মানুষকে আমরা বিশেষভাবে প্রয়োজনে লাগাই সে আমাদের কাছে তার মানবত্ব পরিহার করে বিশেষ যন্ত্রের শামিল হয়ে ওঠে। কেরানি তার আপিসের মনিবের কাছে প্রধানত যন্ত্র, রাজার কাছে সৈন্যেরা যন্ত্র, যে চাষা আমাদের অন্নের সংস্থান করে দেয় সে সজীব লাঙল বললেই হয়। কোনো দেশের অধিপতি যদি একথা অত্যন্ত করে জানেন যে সেই দেশ থেকে তাঁদের নানাপ্রকার সুবিধা ঘটছে, তবে সেই দেশকে তাঁরা সুবিধার কঠিন জড় আবরণে বেষ্টিত করে দেখেন—প্রয়োজন-সম্বন্ধের অতীত যে চিত্ত তাকে তাঁরা দেখতে পারেন না।

জগৎকে আমরা অত্যন্ত ব্যবহারের সামগ্রী করে তুলেছি। এইজন্য তার জলস্থল-বাতাসকে আমরা অবজ্ঞা করি—তাদের আমরা অহংকৃত হয়ে ভৃত্য বলি এবং জগৎ আমাদের কাছে একটা যন্ত্র হয়ে ওঠে।

এই অবজ্ঞার দ্বারা আমরা নিজেকেই বঞ্চিত করি। যাকে আমরা বড়ো করে পেতুম তাকে ছোটো করে পাই, যাতে আমাদের চিত্তও পরিতৃপ্ত হত তাতে আমাদের কেবল পেট ভরে মাত্র।

যাঁরা জলস্থলবাতাসকে কেবল প্রতিদিনের ব্যবহারের দ্বারা জীর্ণ সংকীর্ণ করে দেখেন নি, যাঁরা নিত্য নবীন দৃষ্টি ও উজ্জ্বল জাগ্রত চৈতন্যের দ্বারা বিশ্বকে অন্তরের মধ্যে সমাদৃত অতিথির মতো গ্রহণ করেছেন এবং চরাচর সংসারের মাঝখানে জোড়হস্তে দাঁড়িয়ে উঠে বলেছেন—

> যো দেবোঽগ্নৌ, যোঽপ্‌সু, যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ,
> য ওষধিষু, যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ।

তাঁদের উচ্চারিত এই সজীব মন্ত্রটিকে জীবনের মধ্যে গ্রহণ করে ঈশ্বর যে সর্বব্যাপী এই জ্ঞানকে সর্বত্র সার্থক করো। যিনি সর্বত্র প্রত্যক্ষ, তাঁর প্রতি তোমার ভক্তি সর্বত্র উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠুক।

বোধশক্তিকে আর অলস রেখো না, দৃষ্টির পশ্চাতে সমস্ত চিত্তকে প্রেরণ করো। দক্ষিণে বামে, অধোতে ঊর্ধ্বে, সম্মুখে পশ্চাতে চেতনার দ্বারা চেতনার স্পর্শলাভ করো। তোমার মধ্যে অহোরাত্র যে ধীশক্তি বিকীর্ণ হচ্ছে সেই ধীশক্তির যোগে ভূর্ভুবঃস্বর্লোকে সর্বব্যাপী ধীকে ধ্যান করো—নিজের তুচ্ছতাদ্বারা অগ্নি জলকে তুচ্ছ ক'রো না। সমস্তই আশ্চর্য, সমস্তই পরিপূর্ণ। নমোনমঃ, নমোনমঃ—সর্বত্রই মাথা নত হ'ক হৃদয় নম্র হ'ক এবং আত্মীয়তা প্রসারিত হয়ে যাক। যাকে বিনামূল্যে পেয়েছ তাকে সচেতন সাধনার মূল্যে লাভ করো, যে অজস্র অক্ষয় সম্পদ বাহিরে রয়েছে তাকে অন্তরে গ্রহণ করে ধন্য হও।

য ওষধিষু, যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ—পূর্বছত্রে আছে যিনি অগ্নিতে, জলে, যিনি বিশ্বভুবনে প্রবিষ্ট হয়ে আছেন। তার পরে আছে যিনি ওষধিতে বনস্পতিতে তাঁকে বারবার নমস্কার করি।

হঠাৎ মনে হতে পারে প্রথম ছত্রেই কথাটা নিঃশেষ হয়ে গেছে—তিনি বিশ্বভুবনেই আছেন—তবে কেন শেষের দিকে কথাটাকে এত ছোটো করে ওষধি বনস্পতির নাম করা হল।

বস্তুত মানুষের কাছে এইটেই শেষের কথা। ঈশ্বর বিশ্বভুবনে আছেন একথা বলা শক্ত নয় এবং আমরা অনায়াসেই বলে থাকি, এ-কথা বলতে গেলে আমাদের উপলব্ধিকে অত্যন্ত সত্য করে তোলার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু তার পরেও যে-ঋষি বলেছেন তিনি এই ওষধিতে এই বনস্পতিতে আছেন সে-ঋষি মন্ত্রদ্রষ্টা। মন্ত্রকে তিনি কেবল মননের

ছায়া পান নি দর্শনের ছায়া পেয়েছেন। তিনি তাঁর তপোবনের তরুলতার মধ্যে কেমন পরিপূর্ণ চেতনভাবে ছিলেন, তিনি যে-নদীর জলে স্নান করতেন সে স্নান কী পবিত্র স্নান, কী সত্য স্নান, তিনি যে-ফল ভক্ষণ করেছিলেন তার স্বাদের মধ্যে কী অমৃতের স্বাদ ছিল, তাঁর চক্ষে প্রভাতের সূর্যোদয় কী গভীর গভীর কী অপরূপ প্রাণময় চৈতন্যময় সূর্যোদয়—সে-কথা মনে করলে হৃদয় পুলকিত হয়।

তিনি বিশ্বভুবনে আছেন এ-কথা বলে তাঁকে সহজে বিদায় করে দিলে চলবে না—কবে বলতে পারব তিনি এই ওষধিতে আছেন এই বনস্পতিতে আছেন।

৫ মাঘ

মৃত্যুর প্রকাশ

আজ পিতৃদেবের মৃত্যুর বাৎসরিক।

তিনি একদিন ৭ই পৌষে ধর্মদীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। শান্তিনিকেতনের আশ্রমে সেই তাঁর দীক্ষাদিনের বার্ষিক উৎসব আমরা সমাধা করে এসেছি।

সেই ৭ই পৌষে তিনি যে-দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন ৬ই মাঘ মৃত্যুর দিনে সেই দীক্ষাকে সম্পূর্ণ করে তাঁর মহৎ জীবনের ব্রত উদ্‌যাপন করে গেছেন।

শিখা থেকে শিখা জ্বালাতে হয়। তাঁর সেই পরিপূর্ণ জীবন থেকে আমাদের অগ্নি গ্রহণ করতে হবে।

এইজন্য ৭ই পৌষে যদি তাঁর দীক্ষা হয় ৬ই মাঘ আমাদের দীক্ষার দিন। তাঁর জীবনের সমাপ্তি আমাদের জীবনকে দীক্ষা দান করে। জীবনের দীক্ষা।

জীবনের ব্রত অতি কঠিন ব্রত, এই ব্রতের ক্ষেত্র অতি বৃহৎ, এর মন্ত্র অতি দুর্লভ, এর কর্ম অতি বিচিত্র, এর ত্যাগ অতি দুঃসাধ্য। যিনি দীর্ঘজীবনের নানা সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে, মানে অপমানে তাঁর একটি মন্ত্র কোনোদিন বিস্মৃত হন নি, তাঁর একটি লক্ষ্য হতে কোনোদিন বিচলিত হন নি, যাঁর জীবনে এই প্রার্থনা সত্য হয়ে উঠেছিল—মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্যাম্ মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোৎ, অনিরাকরণমস্তু—আমাকে ব্রহ্ম ত্যাগ করেন নি, আমি যেন তাঁকে ত্যাগ না করি, যেন তাঁকে পরিত্যাগ না হয়,—তাঁরই কাছ থেকে আজ আমরা বিক্ষিপ্ত জীবনকে এক পরমলক্ষ্যে সার্থকতা দান করবার মন্ত্র গ্রহণ করব।

পরিপক্ব ফল যেমন বৃন্তচ্যুত হয়ে নিজেকে সম্পূর্ণ দান করে—তেমনি মৃত্যুর দ্বারাই তিনি তাঁর জীবনকে আমাদের দান করে গেছেন। মৃত্যুর ভিতর দিয়ে না পেলে এমন

সম্পূর্ণ করে পাওয়া যায় না। জীবন নানা সীমার দ্বারা আপনাকে বেষ্টিত করে রক্ষা করে—সেই সীমা কিছু-না-কিছু বাধা রচনা করে।

মৃত্যুর দ্বারাই সেই মহাপুরুষ তাঁর জীবনকে সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গ করেছেন—তার সমস্ত বাধা দূর হয়ে গেছে—এই জীবনকে নিয়ে আমাদের কোনো সাংসারিক প্রয়োজনের তুচ্ছতা নেই, কোনো লৌকিক ও সাময়িক সম্বন্ধের ক্ষুদ্রতা নেই। তার সঙ্গে কেবল একটি মাত্র সম্পূর্ণ যোগ হয়েছে, সে হচ্ছে অমৃতের যোগ। মৃত্যুই এই অমৃতকে প্রকাশ করে।

মৃত্যু আজ তাঁর জীবনকে আমাদের প্রত্যেকের নিকটে এনে দিয়েছে, প্রত্যেকের অন্তরে এনে দিয়েছে। এখন আমরা যদি প্রস্তুত থাকি, যদি তাঁকে গ্রহণ করি, তবে তাঁর জীবনের সঙ্গে আমাদের জীবনের রাসায়নিক সম্মিলনের কোনো ব্যাঘাত থাকে না। তাঁর পার্থিব জীবনের উৎসর্গ আজ কিনা ব্রহ্মের মধ্যে সম্পূর্ণ হয়েছে সেইজন্যে তিনি আজ সম্পূর্ণরূপে আমাদের সকলের হয়েছেন। বনের ফুল পূজা-অবসানে প্রসাদীফুল হয়ে আজ বিশেষরূপেই সকলের সামগ্রী হয়েছেন। আজ সেই ফুলে তাঁর পূজার পুণ্য সম্পূর্ণ হয়েছে, আজ সেই ফুলে তাঁর দেবতার আশীর্বাদ মূর্তিমান হয়েছে। সেই পবিত্র নির্মাল্যটি মাথায় করে নিয়ে আজ আমরা বাড়ি চলে যাব এইজন্য তাঁর মৃত্যুদিনের উৎসব। বিশ্বপাবন মৃত্যু আজ স্বয়ং সেই মহৎজীবনকে আমাদের সম্মুখে উদ্‌ঘাটন করে দাঁড়িয়েছেন—অদ্যকার দিন আমাদের পক্ষে যেন ব্যর্থ না হয়।

একদিন কোন্ ৭ই পৌষে তিনি একলা অমৃতজীবনের দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন, সেদিনকার সংবাদ খুব অল্পলোকেই জেনেছিল। ৬ই মাঘে মৃত্যু যখন যবনিকা উদ্‌ঘাটন করে দাঁড়াল তখন কিছুই আর প্রচ্ছন্ন রইল না। তাঁর একদিনের সেই একলার দীক্ষা আজ আমরা সকলে মিলে গ্রহণ করবার অধিকারী হয়েছি। সেই অধিকারকে আমরা সার্থক করে যাব।

৬ মাঘ, কলিকাতা

৫

নবযুগের উৎসব

নিজের অসম্পূর্ণতার মধ্যে সম্পূর্ণ সত্যকে আবিষ্কার করতে সময় লাগে। আমরা যে যথার্থ কী, আমরা যে কী করছি, তার পরিণাম কী, তার তাৎপর্য কী সেইটি স্পষ্ট বোঝা সহজ কথা নয়।

বালক নিজেকে ঘরের ছেলে বলেই জানে। তার ঘরের সম্বন্ধকেই সে চরম সম্বন্ধ বলে জ্ঞান করে। সে জানে না সে ঘরের চেয়ে অনেক বড়ো। সে জানে না মানবজীবনে সকলের চেয়ে বড়ো সম্বন্ধ তার ঘরের বাইরেই।

সে মানুষ সুতরাং সে সমস্ত মানবের। সে যদি ফল হয় তবে তার বাপ মা কেবল বৃন্তমাত্র; সমস্ত মানববৃক্ষের সঙ্গে একেবারে শিকড় থেকে ডাল পর্যন্ত তার মজ্জাগত যোগ।

কিন্তু সে যে একান্তভাবে ঘরেরই নয়, সে যে মানুষ, এ-কথা শিশু অনেকদিন পর্যন্ত একেবারেই জানে না। তবু এ-কথা একদিন তাকে জানতেই হবে যে ঘর তাকে ঘরের মধ্যেই সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করবার জন্যে পালন করছে না, সে মানবসমাজের জন্যেই বেড়ে উঠছে।

আমরা আজ পঞ্চাশবৎসরের উর্ধ্বকাল এই ১১ই মাঘের উৎসব করে আসছি। আমরা কী করছি, এ উৎসব কিসের উৎসব, সে-কথা আমাদের বোঝবার সময় হয়েছে; আর বিলম্ব করলে চলবে না।

আমরা মনে করেছিলুম আমাদের এই উৎসব ব্রাহ্মসমাজের উৎসব। ব্রাহ্মসম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁদের সংবৎসরের ক্লান্তি ও অবসাদকে উৎসবের আনন্দে বিসর্জন দেবেন, তাঁদের ক্ষয়গ্রস্ত জীবনের ক্ষতিপূরণ করবেন, প্রতিদিনের সঞ্চিত মলিনতা ধৌত করে নেবেন, মহোৎসবক্ষেত্রে চিরনবীনতার যে অমৃত-উৎস আছে তারই জল পান করবেন এবং তাতেই স্নান করে নবজীবনে সদ্যোজাত শিশুর মতো প্রফুল্ল হয়ে উঠবেন।

এই লাভ এই আনন্দ ব্রাহ্মসমাজ উৎসবের থেকে গ্রহণ যদি করতে পারেন তবে ব্রাহ্মসম্প্রদায় ধন্য হবেন কিন্তু এইটুকুতেই উৎসবের শেষ পরিচয় আমরা লাভ করতে পারি নে। আমাদের এই উৎসব ব্রাহ্মসমাজের চেয়ে অনেক বড়ো; এমন কি, একে যদি ভারতবর্ষের উৎসব বলি তাহলেও একে ছোটো করা হবে।

আমি বলছি আমাদের এই উৎসব মানবসমাজের উৎসব। এ-কথা যদি সম্পূর্ণ প্রত্যয়ের সঙ্গে আজ না বলতে পারি তাহলে চিত্তের সংকোচ দূর হবে না; তাহলে এই উৎসবের ঐশ্বর্যভাণ্ডার আমাদের কাছে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত হবে না; আমরা ঠিক জেনে যাব না কিসের যজ্ঞে আমরা আহূত হয়েছি।

আমাদের উৎসবকে ব্রহ্মোৎসব বলব কিন্তু ব্রাহ্মোৎসব বলব না এই সংকল্প মনে নিয়ে আমি এসেছি; যিনি সত্যম্ তাঁর আলোকে এই উৎসবকে সমস্ত পৃথিবীতে আজ প্রসারিত করে দেখব; আমাদের এই প্রাঙ্গণ আজ পৃথিবীর মহাপ্রাঙ্গণ; এর ক্ষুদ্রতা নেই।

একদিন ভারতবর্ষ তাঁর তপোবনে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন—

শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা
আ যে দিব্যধামানি তস্থুঃ,
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।

হে অমৃতের পুত্রগণ যারা দিব্যধামে আছ সকলে শোনো—আমি জ্যোতির্ময় মহান পুরুষকে জেনেছি।

প্রদীপ আপনার আলোককে কেবল আপনার মধ্যে গোপন করে রাখতে পারে না। মহান্তম্ পুরুষং—মহান্ পুরুষকে মহৎ সত্যকে যাঁরা পেয়েছেন তাঁরা আর তো দরজা বন্ধ করে থাকতে পারেন না; এক মুহূর্তেই তাঁরা একেবারে বিশ্বলোকের মাঝখানে এসে দাঁড়ান; নিত্যকাল তাঁদের কণ্ঠকে আশ্রয় করে আপন মহাবাণী ঘোষণা করেন; দিব্যধামকে তাঁরা তাঁদের চারিদিকেই প্রসারিত দেখেন; আর, যে মানুষের মুখেই দৃষ্টিপাত করেন—সে মূর্খই হ'ক আর পণ্ডিতই হ'ক, সে রাজচক্রবর্তী হ'ক আর দীন দরিদ্রই হ'ক—অমৃতের পুত্র বলে তার পরিচয় প্রাপ্ত হন।

সেই যেদিন ভারতবর্ষের তপোবনে অনন্তের বার্তা এসে পৌঁচেছিল, সেদিন ভারতবর্ষ আপনাকে দিব্যধাম বলে জানতেন, সেদিন তিনি অমৃতের পুত্রদের সভায় অমৃতমন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন; সেদিন তিনি বলেছিলেন—

যস্তু সর্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি,
সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে।

যিনি সর্বভূতকেই পরমাত্মার মধ্যে এবং পরমাত্মাকে সর্বভূতের মধ্যে দেখেন তিনি কাউকেই আর ঘৃণা করেন না।

ভারতবর্ষ বলেছিলেন—

তে সর্বগং সর্বতঃ প্রাপ্য ধীরা যুক্তাত্মানঃ সর্বমেবাবিশন্তি।

যিনি সর্বব্যাপী, তাঁকে সর্বত্রই প্রাপ্ত হয়ে তাঁর সঙ্গে যোগযুক্ত ধীরেরা সকলের মধ্যেই প্রবেশ করেন।

সেদিন ভারতবর্ষ নিখিল লোকের মাঝখানে দাঁড়িয়েছিলেন; জলস্থল-আকাশকে পরিপূর্ণ দেখেছিলেন, ঊর্ধ্বপূর্ণংমধ্যপূর্ণমধঃপূর্ণং দেখেছিলেন। সেদিন সমস্ত অন্ধকার তাঁর কাছে উদ্‌ঘাটিত হয়ে গিয়েছিল। তিনি বলেছিলেন—বেদাহং। আমি জেনেছি, আমি পেয়েছি।

সেই দিনই ভারতবর্ষের উৎসবের দিন ছিল; কেননা সেইদিনই ভারতবর্ষ তাঁর অমৃতযজ্ঞে সর্বমানবকে অমৃতের পুত্র বলে আহ্বান করেছিলেন—তাঁর ঘৃণা ছিল না, অহংকার ছিল না। তিনি পরমাত্মার যোগে সকলের মধ্যেই প্রবেশ করেছিলেন। সে-দিন তাঁর আমন্ত্রণধ্বনি জগতের কোথাও সংকুচিত হয় নি; তাঁর ব্রহ্মমন্ত্র বিশ্বসংগীতের সঙ্গে একতানে মিলিত হয়ে নিত্যকালের মধ্যে প্রতিধ্বনিত হয়েছিল—সেই তাঁর ছিল উৎসবের দিন।

তার পরে বিধাতা জানেন কোথা হতে অপরাধ প্রবেশ করল। বিশ্বলোকের দ্বার চারিদিক হতে বন্ধ হতে লাগল নির্বাপিত প্রদীপের মতো ভারতবর্ষ আপনার মধ্যে আপনি অবরুদ্ধ হল। প্রবল স্রোতস্বিনী যখন বয়ে আসতে থাকে তখন যেমন দেখতে দেখতে পদে পদে বালির চর জেগে উঠে তার সমুদ্রগামিনী ধারার গতিরোধ করে দেয়, তাকে বহুতর ছোটো ছোটো জলাশয়ে বিভক্ত করে;—যে-ধারা দূরদূরান্তরের প্রাণদায়িনী ছিল, যা দেশদেশান্তরে সম্পদ বহন করে নিয়ে যেত, যে অশ্রান্ত ধারার কলধ্বনি জগৎসংগীতের তানপুরার মতো পর্বতশিখর থেকে মহাসমুদ্র পর্যন্ত নিরন্তর বাজতে থাকত—সেই বিশ্বকল্যাণী ধারাকে কেবল খণ্ড খণ্ড ভাবে এক-একটা ক্ষুদ্র গ্রামের সামগ্রী করে তোলে, সেই খণ্ডতাগুলি আপন পূর্বতন ঐক্যটিকে বিস্মৃত হয়ে বিশ্বনৃত্যে আর যোগ দেয় না, বিশ্বগীতসভায় আর স্থান পায় না,—সেই রকম করেই নিখিল মানবের সঙ্গে ভারতবর্ষের সম্বন্ধের পুণ্যধারা সহস্র সাম্প্রদায়িক বালুর চরে খণ্ডিত হয়ে গতিহীন হয়ে পড়ল।—তার পরে, হায়, সেই বিশ্ববাণী কোথায়? কোথায় সেই বিশ্বপ্রাণের তরঙ্গদোলা? রুদ্ধ জল যেমন কেবলই ভয় পায় অল্পমাত্র অশুচিতার পাছে তাকে কলুষিত করে, এইজন্যে সে যেমন স্নান-পানের নিষেধের দ্বারা নিজের চারিদিকে বেড়া তুলে দেয়, তেমনি আজ বদ্ধ ভারতবর্ষ কেবলই কলুষের আশঙ্কায় বাহিরের বৃহৎ সংস্রবকে সর্বতোভাবে দূরে রাখবার জন্যে নিষেধের প্রাচীর তুলে দিয়ে সূর্যালোক এবং বাতাসকে পর্যন্ত

তিরস্কৃত করেছেন,—কেবলই বিভাগ, কেবলই বাধা। বিশ্বের লোক গুরুর কাছে বসে যে দীক্ষা নেবে সে দীক্ষার মন্ত্র কোথায়, সে দীক্ষার অবারিত মন্দির কোথায়। সে আহ্বানবাণী কোথায় যে বাণী একদিন চারিদিকে এই বলে ধ্বনিত হয়েছিল—

যথাপঃ প্রবতাযন্তি যথা মাসা অহর্জরম্ এবং মাং ব্রহ্মচারিণোধাত আয়ন্তু সর্বতঃ স্বাহা।

জল যেমন স্বভাবতই নিম্নদেশে গমন করে, মাসসকল যেমন স্বভাবতই সংবৎসরের দিকে ধাবিত হয়, তেমনি সকল দিক হইতেই ব্রহ্মচারিগণ আমার নিকট আসুন, স্বাহা।

কিন্তু সেই স্বভাবের পথ যে আজ রুদ্ধ। ধর্ম জ্ঞান সমাজ তাদের সিংহদ্বার বন্ধ করে বসে আছে—কেবল অন্তঃপুরের যাতায়াতের জন্যে খিড়কির দরজার ব্যবহার চলছে মাত্র।

সত্যসম্পদের দারিদ্র্য না ঘটলে এমন দুর্গতি কখনোই হয় না। যে বলতে পেরেছে—বেদাহং, আমি জেনেছি, তাকে বেরিয়ে আসতেই হবে, তাকে বলতেই হবে—শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ।

এই রকম দৈন্যের নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে সমস্ত দ্বার জানালা বন্ধ করে যখন ঘুমোচ্ছিলুম এমন সময় একটি ভোরের পাখির কণ্ঠ থেকে আমাদের রুদ্ধ ঘরের মধ্যে বিশ্বের নিত্যসংগীতের সুর এসে পৌঁছোল—যে সুরে লোকলোকান্তর, যুগ-যুগান্তর সুর মিলিয়েছে, যে-সুরে পৃথিবীর ধূলির সঙ্গে সূর্য তারা একই আত্মীয়তার আনন্দে ঝংকৃত হয়েছে—সেই সুর একদিন শোনা গেল।

আবার যেন কে বললে—বেদাহমেতং, আমি এঁকে জেনেছি। কাকে জেনেছ? আদিত্যবর্ণং—জ্যোতির্ময়কে জেনেছি যাঁকে কেউ গোপন করতে পারে না। জ্যোতির্ময়? কই তাঁকে তো আমার গৃহসামগ্রীর মধ্যে দেখছি নে। না, তোমার অন্ধকার দিয়ে ঢেকে তাঁকে তোমার ঘরের মধ্যে চাপা দিয়ে রাখ নি। তাঁকে দেখছি তমসঃ পরস্তাৎ—তোমাদের সমস্ত রুদ্ধ অন্ধকারের পরপার হতে। তুমি যাকে তোমার সম্প্রদায়ের মধ্যে ধরে রেখেছ, পাছে আর কেউ সেখানে প্রবেশ করে বলে মন্দিরের দরজা বন্ধ করে দিয়েছ, সে যে অন্ধকার। নিখিল মানব সেখান থেকে ফিরে ফিরে যায়, সূর্য চন্দ্র সেখানে দৃষ্টিপাত করে না। সেখানে জ্ঞানের স্থানে শাস্ত্রের বাক্য, ভক্তির স্থানে পূজাপদ্ধতি, কর্মের স্থানে অভ্যস্ত আচার। সেখানে দ্বারে একজন ভয়ংকর 'না' বসে আছে, সে বলছে, না না, এখানে না—দূরে যাও, দূরে যাও। সে বলছে কান বন্ধ করো পাছে মন্ত্র কানে যায়, সরে বসো পাছে স্পর্শ লাগে, দরজা ঠেলো না পাছে তোমার দৃষ্টি পড়ে। এত 'না' দিয়ে তুমি যাকে ঢেকে রেখেছ আমি সেই অন্ধকারের কথা বলছি নে। কিন্তু—বেদাহমেতং। আমি তাঁকে জেনেছি যিনি নিখিলের; যাঁকে জানলে আর কাউকে

ঠেকিয়ে রাখা যায় না, কাউকে ঘৃণা করা যায় না ; যাঁকে জানলে নির্মল দেশ যেমন জলসকলকে স্বভাবতই আহ্বান করে, সংবৎসর যেমন মাসসকলকে স্বভাবতই আহ্বান করে তেমনি স্বভাবত সকলকেই অবাধে আহ্বান করবার অধিকার জন্মে, তাঁকেই জেনেছি।

ঘরের লোক ক্রুদ্ধ হয়ে ভিতর থেকে গর্জন করে উঠল—দূর করো, দূর করো, একে বের করে দাও। এ তো আমার ঘরের সামগ্রী নয়। এ তো আমার নিয়মকে মানবে না।

না, এ তোমার ঘরের না, এ তোমার নিয়মের বাধ্য নয়। কিন্তু পারবে না—আকাশের আলোককে গায়ের জোর দিয়ে ঠেলে ফেলতে পারবে না। তার সঙ্গে বিরোধ করতে গেলেও তাকে স্বীকার করতে হবে, প্রভাত এসেছে।

প্রভাত এসেছে, আমাদের উৎসব এই কথা বলছে। আমাদের এই উৎসব ঘরের উৎসব নয়, ব্রাহ্মসমাজের উৎসব নয়, মানবের চিত্তগগনে যে প্রভাতের উদয় হচ্ছে এ যে সেই সুমহৎ প্রভাতের উৎসব।

বহু যুগ পূর্বে এই প্রভাত-উৎসবের পবিত্র গম্ভীর মন্ত্র এই ভারতবর্ষের তপোবনে ধ্বনিত হয়েছিল—একমেবাদ্বিতীয়ম্। অদ্বিতীয় এক। পৃথিবীর এই পূর্বদিগন্তে আবার কোন্ জাগ্রত মহাপুরুষ অন্ধকার রাত্রির পরপার হতে সেই মন্ত্র বহন করে এনে স্তব্ধ আকাশের মধ্যে স্পন্দন সঞ্চার করে দিলেন। একমেবাদ্বিতীয়ম্। অদ্বিতীয় এক।

এই যে প্রভাতের মন্ত্র উদয়শিখরের উপরে দাঁড়িয়ে জানিয়ে দিলে যে, একসূর্য উদয় হচ্ছেন, এবার ছোটো ছোটো অসংখ্য প্রদীপ নেবাও। এই মন্ত্র কোনো এক-ঘরের মন্ত্র নয়, এই প্রভাত কোনো একটি দেশের প্রভাত নয়—হে পশ্চিম, তুমিও শোনো তুমি জাগ্রত হও। শৃণ্বন্তু বিশ্বে। হে বিশ্ববাসী, সকলে শোনো। পূর্বগগনের প্রান্তে একটি বাণী জেগে উঠেছে—বেদাহমেতং, আমি জানতে পারছি। তমসঃ পরস্তাৎ, অন্ধকারের পরপার থেকে আমি জানতে পারছি। নিশাবসানের আকাশ উদয়োন্মুখ আদিত্যের আসন্ন আবির্ভাবকে যেমন করে জানতে পারে তেমনি করে—

* বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।

এই নূতন যুগে পৃথিবীর মানবচিত্তে যে প্রভাত আসছে সেই নব প্রভাতের বার্তা বাংলাদেশে আজ আশি বৎসর হল প্রথম এসে উপস্থিত হয়েছিল। তখন পৃথিবীতে দেশের সঙ্গে দেশের বিরোধ, ধর্মের সঙ্গে ধর্মের সংগ্রাম ; তখন শাস্ত্রবাক্য এবং বাহ্য প্রথার লৌহসিংহাসনে বিভাগই ছিল রাজা—সেই ভেদবুদ্ধির প্রাচীরকৃত অন্ধকারের মধ্যে রাজা রামমোহন যখন অদ্বিতীয় একের আলোক তুলে ধরলেন তখন তিনি দেখতে পেলেন যে, যে ভারতবর্ষে হিন্দু মুসলমান ও খ্রীস্টানধর্ম আজ একত্র সমাগত হয়েছে সেই ভারতবর্ষেই বহু পূর্ব যুগে এই বিচিত্র আতিথিদের একসভায় বসাবার জন্যে আয়োজন

হয়ে গেছে। মানবসভ্যতা যখন দেশে দেশে নব নব বিকাশের শাখা-প্রশাখায় ব্যাপ্ত হতে চলেছিল তখন এই ভারতবর্ষ বারংবার মন্ত্র জপ করছিলেন—এক এক এক! তিনি বলছিলেন—ইহ চেৎ অবেদীৎ অথ সত্যমস্তি—এই এককেই যদি মানুষ জানে তবে সে সত্য হয়। ন চেৎ ইহ অবেদীৎ মহতী বিনষ্টিঃ—এই এককে যদি না জানে তবে তার মহতী বিনষ্টি। এ-পর্যন্ত পৃথিবীতে যত মিথ্যার প্রাদুর্ভাব হয়েছে সে কেবল এই মহান্ একের উপলব্ধি অভাবে। যত ক্ষুদ্রতা নিষ্ফলতা দৌর্বল্য সে এই একের থেকে বিচ্যুতিতে। যত মহাপুরুষের আবির্ভাব সে এই এককে প্রচার করতে। যত মহাবিপ্লবের আগমন সে এই এককে উদ্ধার করবার জন্যে।

যখন ঘোরতর বিভাগ বিরোধ বিক্ষিপ্ততার দুর্দিনের মধ্যে এই বাংলা দেশে অপ্রত্যাশিত অভাবনীয় রূপে এই বিশ্বব্যাপী একের মন্ত্র একমেবাদ্বিতীয়ম্ দ্বিধাবিহীন সুস্পষ্টস্বরে উচ্চারিত হয়ে উঠল তখন এ-কথা নিশ্চয় জানতে হবে, সমস্ত মানবচিত্তে কোথা হতে একটি নিগূঢ় জাগরণের বেগ সঞ্চারিত হয়েছে, এই বাংলা দেশে তার প্রথম সংবাদ ধ্বনিত হয়ে উঠেছে।

আমাদের দেশে আজ বিরাট মানবের আগমন হয়েছে। এখানে আমাদের রাজ্য নেই, বাণিজ্য নেই, গৌরব নেই, পৃথিবীতে আমরা সকলের চেয়ে মাথা নিচু করে রয়েছি—আমাদেরই এই দরিদ্র ঘরের অপমানিত শূন্যতার মাঝখানে বিরাট মানবের অভ্যুদয় হয়েছে। তিনি আজ আমাদেরই কাছে কর গ্রহণ করবেন বলে এসেছেন। সকল মানুষের কাছে নিত্যকালের ডালায় সাজিয়ে ধরতে পারি এমন কোনো রাজদুর্লভ অর্ঘ্য আমাদের এখানে সংগ্রহ হয়েছে নইলে আমাদের এ সৌভাগ্য হত না। আমাদের এই উৎসর্গ বটের তলায় নয়, ঘরের দালানে নয়, গ্রামের মণ্ডপে নয়, এ উৎসর্গ বিশ্বের প্রাঙ্গণে। এইখানেই তাঁর প্রাপ্য নেবেন বলে বিশ্বমানব তাঁর দূতকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন; তিনি আমাদের মন্ত্র দিয়ে গিয়েছেন—একমেবাদ্বিতীয়ম্। বলে গিয়েছেন, মনে রাখিস, সকল বৈচিত্র্যের মধ্যে মনে রাখিস অদ্বিতীয় এক। সকল বিরোধের মধ্যে ধরে রাখিস অদ্বিতীয় এক।

সেই মন্ত্রের পর থেকেই আর আমাদের নিদ্রা নেই দেখছি। "এক" আমাদের স্পর্শ করেছেন, আর আমরা সুস্থির থাকতে পারছি নে। আজ আমরা ঘর ছেড়ে দল ছেড়ে গ্রাম ছেড়ে বিশ্বপথের পথিক হব বলে চঞ্চল হয়ে উঠেছি। এ-পথের পাথেয় আছে বলে জানতুম না—এখন দেখছি অভাব নেই। ঘরে বাহিরে অনৈক্যের বাধা যারা নিতান্ত বিচ্ছিন্ন সমস্ত মানুষের মধ্যে তারাই "এক"কে প্রচার করবার হুকুম পেয়েছে। এক জায়গায় সম্বল আছে বলেই এমন হুকুম এসে পৌঁছোল।

তার পর থেকে আনাগোনা তো চলেইছে; একে একে দূত আসছে। এই দেশে এমন একটি বাণী তৈরি হচ্ছে যা পূর্বপশ্চিমকে এক দিব্যধামে আহ্বান করবে, যা একের আলোকে অমৃতের পুত্রগণকে অমৃতের পরিচয়ে মিলিত করবে। রামমোহন রায়ের আগমনের পর থেকে আমাদের দেশের চিন্তা বাক্য ও কর্ম, সম্পূর্ণ না জেনেও, একটি চিরন্তনের অভিমুখে চলেছে। আমরা কোনো একটি জায়গায় নিত্যকে লাভ করব এবং প্রকাশ করব এমন একটি গভীর আবেগ আমাদের অন্তরের মধ্যে জোয়ারের প্রথম টানের মতো স্ফীত হয়ে উঠছে। আমরা অনুভব করছি, সমাজের সঙ্গে সমাজ, বিজ্ঞানের সঙ্গে বিজ্ঞান, ধর্মের সঙ্গে ধর্ম যে এক পরমতীর্থে এক সাগর-সংগমে পুণ্যস্নান করতে পারে তারই রহস্য আমরা আবিষ্কার করব। সেই কাজ যেন ভিতরে ভিতরে আরম্ভ হয়ে গেছে; আমাদের দেশে পৃথিবীর যে একটি প্রাচীন গুরুকুল ছিল সেই গুরুকুলের দ্বার আবার যেন এখনই খুলবে এমনি আমাদের মনে হচ্ছে। কেননা কিছুকাল পূর্বে যেখানে একেবারে নিঃশব্দ ছিল এখন যে সেখানে কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে। আর ওই যে দেখছি বাতায়নে এক-একজন মাঝে মাঝে এসে দাঁড়াচ্ছেন, তাঁদের মুখ দেখে চেনা যাচ্ছে তাঁরা মুক্ত পৃথিবীর লোক, তাঁরা নিখিল মানবের আত্মীয়। পৃথিবীতে কালে কালে যে-সকল মহাপুরুষ ভিন্ন ভিন্ন দেশে আগমন করেছেন সেই যাজ্ঞবল্ক্য বিশ্বামিত্র বুদ্ধ খ্রীস্ট মহম্মদ সকলকেই তাঁরা ব্রহ্মের ব'লে চিনেছেন; তাঁরা মৃত বাক্য মৃত আচারের গোরস্থানে প্রাচীর তুলে বাস করেন না; তাঁদের বাক্য প্রতিধ্বনি নয়, কার্য অনুকরণ নয়, গতি অনুবৃত্তি নয়; তাঁরা মানবাত্মার মাহাত্ম্য-সংগীতকে এখনই বিশ্বলোকের রাজপথে ধ্বনিত করে তুলবেন। সেই মহা-সংগীতের মূল ধুয়াটি আমাদের গুরু ধরিয়ে দিয়ে গেছেন—একমেবাদ্বিতীয়ম্। সকল বিচিত্র তানকেই এই ধুয়াতেই বারংবার ফিরিয়ে আনতে হবে একমেবাদ্বিতীয়ম্।

আর আমাদের লুকিয়ে থাকবার জো নেই। এবার আমাদের প্রকাশিত হতে হবে—ব্রহ্মের আলোকে সকলের সামনে প্রকাশিত হতে হবে। বিশ্ববিধাতার নিকট থেকে পরিচয়পত্র নিয়ে সমুদয় মানুষের কাছে এসে দাঁড়াতে হবে। সেই পরিচয়পত্রটি তিনি তাঁর দূতকে দিয়ে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। কোন্ পরিচয় আমাদের? আমাদের পরিচয় এই যে, আমরা তারা যারা বলে না যে ঈশ্বর বিশেষ স্থানে বিশেষ বর্গে প্রতিষ্ঠিত। আমরা তারাই যারা বলে—একো বশী সর্বভূতান্তরাত্মা। সেই এক প্রভুই সর্বভূতের অন্তরাত্মা। আমরা তারাই যারা বলে না যে বাহিরের কোনো প্রক্রিয়া দ্বারা ঈশ্বরকে জানা যায় অথবা কোনো বিশেষ শাস্ত্রে ঈশ্বরের জ্ঞান বিশেষ লোকের জন্যে আবদ্ধ হয়ে আছে। আমরা বলি—হৃদা মনীষা মনসাভিক্লৃপ্তঃ—হৃদয়স্থিত সংশয়রহিত বুদ্ধির দ্বারাই তাঁকে

জানা যায়। আমরা তারাই যারা ঈশ্বরকে কোনো বিশেষ জাতির বিশেষ সভ্য বলি নে। আমরা বলি তিনি অবর্ণঃ, এবং—বর্ণাননেকান্নিহিতার্থো দধাতি, সর্ব বর্ণেরই প্রয়োজন বিধান করেন কোনো বর্ণকে বঞ্চিত করেন না; আমরা তারাই যারা এই বাণী ঘোষণার ভার নিয়েছি এক এক অদ্বিতীয় এক। তবে আমরা আর স্থানীয় ধর্ম এবং সাময়িক লোকাচারের মধ্যে বাঁধা পড়ে থাকব কেমন করে। আমরা একের আলোকে সকলের সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে প্রকাশ পাব। আমাদের উৎসব সেই প্রকাশের উৎসব, সেই বিশ্বলোকের মধ্যে প্রকাশের উৎসব, সেই কথা মনে রাখতে হবে। এই উৎসবে সেই প্রভাতের প্রথম রশ্মিপাত হয়েছে যে-প্রভাত একটি মহাদিনের অভ্যুদয় সূচনা করেছে।

সেই মহাদিন এসেছে অথচ এখনও সে আসে নি। অনাগত মহাভবিষ্যতে তার মূর্তি দেখতে পাচ্ছি। তার মধ্যে যে-সত্য বিরাজ করছে সে তো এমন সত্য নয় যাকে আমরা একেবারে লাভ করে আমাদের সম্প্রদায়ের লোহার সিন্দুকে দলিল-দস্তাবেজের সঙ্গে চাবি বন্ধ করে বসে আছি, যাকে বলব এ আমাদের ব্রাহ্মসমাজের ব্রাহ্মসম্প্রদায়ের। না। আমরা সম্পূর্ণ উপলব্ধি করি নি; আমরা যে কিসের জন্য এই উৎসবকে বর্ষে বর্ষে বহন করে আসছি তা ভালো করে বুঝতে পারি নি। আমরা স্থির করেছিলুম এই দিনে একদা ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হয়েছিল আমরা ব্রাহ্মরা তাই উৎসব করি। কথাটা এমন ক্ষুদ্র নয়। এষ দেবো বিশ্বকর্মা মহাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ, এই যে মহান আত্মা এই যে বিশ্বকর্মা দেবতা যিনি সর্বদা জনগণের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট আছেন তিনিই আজ বর্তমান যুগে জগতে ধর্মসমন্বয় জাতিসমন্বয়ের আহ্বান এই অখ্যাত বাংলাদেশের দ্বার হতে প্রেরণ করেছেন। আমরা তাই বলছি ধন্য, ধন্য, আমরা ধন্য। এই আশ্চর্য ইতিহাসের আনন্দকে আমরা মাঘোৎসবে জাগ্রত করছি। এই মহৎসত্যে আজ আমাদের উদ্বোধিত হতে হবে, বিধাতার এই মহতী কৃপায় যে গভীর দায়িত্ব তা আমাদের গ্রহণ করতে হবে। বুদ্ধিকে প্রশস্ত করো, হৃদয়কে প্রসারিত করো, নিজেকে দরিদ্র বলে জেনো না, দুর্বল বলে মেনো না। তপস্যায় প্রবৃত্ত হও, দুঃখকে বরণ করো, ক্ষুদ্র সমাজের মধ্যে আরাম ভোগ করবার জন্যে জ্ঞানকে মৃতপ্রায় এবং কর্মকে যন্ত্রবৎ ক'রো না—সত্যকে সকলের ঊর্ধ্বে স্বীকার করো এবং ব্রহ্মের আনন্দে জীবনকে পরিপূর্ণ করে অভয় প্রতিষ্ঠা লাভ করো।

হে জনগণের হৃদয়াসন-সন্নিবিষ্ট-বিশ্বকর্মা, তুমি যে আজ আমাদের নিয়ে তোমার কোন্ মহৎকর্ম রচনা করেছ, হে মহান আত্মা, তা এখনও আমরা সম্পূর্ণ বুঝতে পারি নি। তোমার ভগবৎশক্তি আমাদের বুদ্ধিকে কোন্‌খানে স্পর্শ করেছে, সেখানে কোথায় তোমার সৃষ্টিলীলা চলছে তা এখনও আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি, জগৎ সংসারে

আমাদের গৌরবান্বিত ভাগ্য যে কোন্ দিগন্তরালে আমাদের জন্যে প্রতীক্ষা করে আছে তা বুঝতে পারছি নে বলে আমাদের চেষ্টা ক্ষণে ক্ষণে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ছে, আমাদের দৈন্যবুদ্ধি ঘুচছে না, আমাদের সত্য উজ্জ্বল হয়ে উঠছে না, আমাদের দুঃখ এবং ত্যাগ মহত্ত্ব লাভ করছে না। সমস্তই ছোটো হয়ে পড়েছে, স্বার্থ আরাম অভ্যাস এবং লোকভয়ের চেয়ে বড়ো কিছুকেই চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি নে। এ-কথা বলবার বল পাচ্ছি নে যে, সমস্ত সংসার যদি আমার বিরুদ্ধ হয় তবু আমার পক্ষে তুমি আছ, কেননা, তোমার সংকল্প আমাতে সিদ্ধ হচ্ছে, আমার মধ্যে তোমার জয় হবে। হে পরমাত্মন, এই আত্ম-অবিশ্বাসের আশাহীন অন্ধকার থেকে, এই জীবনযাত্রায় নাস্তিকতার নিদারুণ কর্তৃত্ব থেকে আমাদের উদ্ধার করো, উদ্ধার করো, আমাদের সচেতন করো। তোমার যে অভিপ্রায়কে আমরা বহন করছি তার মহত্ত্ব উপলব্ধি করাও, তোমার আদেশে জগতে আমরা যে নবযুগের সিংহদ্বার উদ্‌ঘাটন করবার জন্যে যাত্রা করেছি সে পথের লক্ষ্য কী তা যেন সাম্প্রদায়িক মূঢ়তায় আমরা পথিমধ্যে বিস্মৃত হয়ে না বসে থাকি। জগতে তোমার বিচিত্র আনন্দরূপের মধ্যে এক অপরূপ অরূপকে নমস্কার করি, নানাদেশে নানাকালে তোমার নানা বিধানের মধ্যে এক শাশ্বত বিধানকে আমরা মাথা পেতে নিই—ভয় দূর হ'ক, অশ্রদ্ধা দূর হ'ক, অহংকার দূর হ'ক। তোমার থেকে কিছুই বিচ্ছিন্ন নেই, সমস্তই তোমার এক অমোঘ শক্তিতে বিধৃত এবং এক মঙ্গল-সংকল্পের বিশ্বব্যাপী আকর্ষণে চালিত এই কথা নিঃসংশয়ে জেনে সর্বত্রই ভক্তিকে প্রসারিত করে নতমস্তকে জোড়হাতে তোমারই সেই নিগূঢ় সংকল্পকে দেখবার চেষ্টা করি। তোমার সেই সংকল্প কোনো দেশে বদ্ধ নয় কোনো কালে খণ্ডিত নয়, পণ্ডিতেরা তাকে ঘরে বসে গড়তে পারে না, রাজা তাকে কৃত্রিম নিয়মে বাঁধতে পারে না এই কথা নিশ্চিত জেনে এবং সেই মহা সংকল্পের সঙ্গে আমাদের সমুদয় সংকল্পকে স্বেচ্ছাপূর্বক সম্মিলিত করে দিয়ে তোমার রাজধানীর রাজপথে যাত্রা করে বেরোই; আশার আলোকে আমাদের আকাশ প্লাবিত হয়ে যাক, হৃদয় বলতে থাক্—আনন্দং পরমানন্দং, এবং আমাদের এই দেশ আপনার বেদীর উপরে আর একবার দাঁড়িয়ে উঠে মানবসমাজের সমস্ত ভেদবিচ্ছেদের উপরে এই বাণী প্রচার করে দিক—

শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা
আ যে দিব্যধামানি তস্থুঃ।
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্।

ভাবুকতা ও পবিত্রতা

ভাবরসের জন্যে আমাদের হৃদয়ের একটা লোভ রয়েছে। আমরা কাব্য থেকে শিল্পকলা থেকে গল্প গান অভিনয় থেকে নানা উপায়ে ভাবরস সম্ভোগ করবার জন্যে নানা আয়োজন করে থাকি।

অনেক সময় আমরা উপাসনাকে সেই প্রকার ভাবের তৃপ্তিস্বরূপে অবলম্বন করতে ইচ্ছা করি। কিছুক্ষণের জন্যে একটা বিশেষ রস ভোগ করে আমরা মনে করি যেন আমরা একটা কিছু লাভ করলুম। ক্রমে এই ভোগের অভ্যাসটি একটি নেশার মতো হয়ে দাঁড়ায়। তখন মানুষ অন্যান্য রসলাভের জন্যে যেমন নানা আয়োজন করে, নানা লোক নিযুক্ত করে, নানা পণ্যদ্রব্য বিস্তার করে, এই রসের অভ্যস্ত নেশার জন্যেও সেই রকম নানাপ্রকার আয়োজন করে। যাঁরা ভালো করে বলতে পারেন সেই রকম লোক সংগ্রহ করে রসোদ্রেক করবার জন্যে নিয়মিত বক্তৃতাদির ব্যবস্থা করা হয়—ভগবৎ-রস নিয়মিত যোগান দেবার নানা দোকান তৈরি হয়ে ওঠে।

এই রকম ভাবের পাওয়াকেই পাওয়া ব'লে ভুল করা মানুষের দুর্বলতার একটি লক্ষণ। সংসারে নানাপ্রকারে আমরা তার পরিচয় পাই। এমন লোক দেখা যায় যারা অতি সহজেই গদ্‌গদ হয়ে ওঠে, সহজেই গলা জড়িয়ে ধরে মানুষকে ভাই বলতে পারে—যাদের দয়া সহজেই প্রকাশ পায়, অশ্রু সহজেই নিঃসারিত হয় এবং সেইরূপ ভাব-অনুভব ও ভাব-প্রকাশকেই তারা ফললাভ বলে গণ্য করে। সুতরাং ওইখানেই থেমে পড়ে, আর বেশিদূর যায় না।

এই ভাবের রসকে আমি নিরর্থক বলি নে। কিন্তু একেই যদি লক্ষ্য বলে ভুল করি তাহলে এই জিনিসটি যে কেবল নিরর্থক হয় তা নয়, এ অনিষ্টকর হয়ে ওঠে। এই ভাবকেই লক্ষ্য বলে ভুল মানুষ সহজেই করে, কারণ এর মধ্যে একটা নেশা আছে।

ঈশ্বরের আরাধনা-উপাসনার মধ্যে দুটি পাবার পন্থা আছে।

গাছ দুরকম করে খাদ্য সংগ্রহ করে। এক তার পল্লবগুলি দিয়ে বাতাস ও আলোক থেকে নিজের পুষ্টি গ্রহণ করে—আর এক তার শিকড় থেকে সে নিজের খাদ্য আকর্ষণ করে নেয়।

কখনো বৃষ্টি হচ্ছে, কখনো রৌদ্র উঠছে, কখনো শীতের বাতাস দিচ্ছে, কখনো বসন্তের হাওয়া বইছে—পল্লবগুলি চঞ্চল হয়ে উঠে তারই থেকে আপনার যা নেবার তা নিচ্ছে। তার পরে আবার শুকিয়ে ঝরে পড়ছে—আবার নতুন পাতা উঠছে।

কিন্তু শিকড়ের চাঞ্চল্য নেই। সে নিরন্তর স্তব্ধ হয়ে দৃঢ় হয়ে গভীরতার মধ্যে নিজেকে বিকীর্ণ করে দিয়ে নিয়ত আপনার খাদ্য নিজের একান্ত চেষ্টায় গ্রহণ করছে।

আমাদেরও শিকড় এবং পল্লব এই দুটো দিক আছে। আমাদের আধ্যাত্মিক খাদ্য এই দুই দিক থেকেই নিতে হবে।

শিকড়ের দিক থেকে নেওয়া হচ্ছে প্রধান ব্যাপার। এইটিই হচ্ছে চরিত্রের দিক, এটা ভাবের দিক নয়। উপাসনার মধ্যে এই চরিত্র দিয়ে যা আমরা গ্রহণ করি তাই আমাদের প্রধান খাদ্য। সেখানে চাঞ্চল্য নেই, সেখানে বৈচিত্র্যের অন্বেষণ নেই— সেইখানেই আমরা শান্ত হই, স্তব্ধ হই, ঈশ্বরের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হই। সেই জায়গাটির কাজ বড়ো অলক্ষ্য বড়ো গভীর। সে ভিতরে ভিতরে শক্তি ও প্রাণ সঞ্চার করে কিন্তু ভাব-ব্যক্তির দ্বারা নিজেকে প্রকাশ করে না। সে ধারণ করে, পোষণ করে এবং গোপনে থাকে।

এই চরিত্র যে-শক্তির দ্বারা প্রাণ বিস্তার করে তাকে বলে নিষ্ঠা। সে অশ্রুপূর্ণ ভাবের আবেগ নয়, সে নিষ্ঠা। সে নড়তে চায় না, সে যেখানে ধরে আছে সেখানে ধরেই আছে, কেবলই গভীর থেকে গভীরতরে গিয়ে নাবছে। সে শুভ্রচারিণী শান্ত পবিত্র সেবিকার মতো সকলের নিচে জোড়হাতে ভগবানের পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে আছে— দাঁড়িয়েই আছে।

হৃদয়ের কত পরিবর্তন। আজ তার যে-কথায় তৃপ্তি কাল তার তাতে বিতৃষ্ণা। তার মধ্যে জোয়ার ভাঁটা খেলছে, কখনো তার উল্লাস কখনো অবসাদ। গাছের পল্লবের মতো তার বিকাশ আজ নূতন হয়ে উঠছে কাল জীর্ণ হয়ে পড়ছে। এই পল্লবিত চঞ্চল হৃদয় নব নব ভাব-সংস্পর্শের জন্য ব্যাকুলতায় স্পন্দিত।

কিন্তু মূলের সঙ্গে চরিত্রের সঙ্গে যদি তার অবিচলিত অবিচ্ছিন্ন যোগ না থাকে তাহলে এই সকল ভাব-সংস্পর্শ তার পক্ষে আঘাত ও বিনাশেরই কারণ হয়। যে-গাছের শিকড় কেটে দেওয়া হয়েছে সূর্যের আলো তাকে শুকিয়ে ফেলে, বৃষ্টির জল তাকে পচিয়ে দেয়।

আমাদের চরিত্রের ভিতরকার নিষ্ঠা যদি যথেষ্ট পরিমাণে খাদ্য জোগানো বন্ধ করে দেয় তাহলে ভাবের ভোগ আমাদের পুষ্টিসাধন করে না কেবল বিকৃতি জন্মাতে থাকে। দুর্বল ক্ষীণ চিত্তের পক্ষে ভাবের খাদ্য কুপথ্য হয়ে ওঠে।

চরিত্রের মূল থেকে প্রত্যহ আমরা পবিত্রতা লাভ করলে তবেই ভাবুকতা আমাদের সহায় হয়। ভাবরসকে খুঁজে বেড়াবার দরকার নেই; সংসারে ভাবের বিচিত্র প্রবাহ নানা দিক থেকে আপনিই এসে পড়ছে। পবিত্রতাই সাধনার সামগ্রী। সেটা বাইরের

থেকে বর্ষিত হয় না—সেটা নিজের থেকে আকর্ষণ করে নিতে হয়। এই পবিত্রতাই আমাদের মূলের জিনিস, আর ভাবুকতা পল্লবের।

প্রত্যহ আমাদের উপাসনায় আমরা সুগভীর নিস্তব্ধভাবে সেই পবিত্রতা গ্রহণের দিকেই আমাদের চেতনাকে যেন উদ্বোধিত করে দিই। আর বেশি কিছু নয়, আমরা প্রতিদিন প্রভাতে সেই যিনি শুদ্ধং অপাপবিদ্ধং তাঁর সম্মুখে দাঁড়িয়ে তাঁর আশীর্বাদ গ্রহণ করব। তাঁকে নত হয়ে প্রণাম করে বলব, তোমার পায়ের ধুলো নিলুম আমার ললাট নির্মল হয়ে গেল। আজ আমার সমস্ত দিনের জীবনযাত্রার পাথেয় সঞ্চিত হল। প্রাতে তোমার সম্মুখে দাঁড়িয়েছি, তোমাকে প্রণাম করেছি, তোমার পদধূলি মাথায় তুলে সমস্ত দিনের কর্মে নির্মল সতেজভাবে তার পরিচয় গ্রহণ করব।

২ ফাল্গুন, ১৩১৫

অন্তর বাহির

আমরা মানুষ, মানুষের মধ্যে জন্মেছি। এই মানুষের সঙ্গে নানাপ্রকারে মেলবার জন্যে, তাদের সঙ্গে নানাপ্রকার আবশ্যকের ও আনন্দের আদানপ্রদান চালাবার জন্যে আমাদের অনেকগুলি প্রবৃত্তি আছে।

আমরা লোকালয়ে যখন থাকি তখন মানুষের সংসর্গে উত্তেজিত হয়ে সেই সমস্ত প্রবৃত্তি নানাদিকে নানাপ্রকারে নিজেকে প্রয়োগ করতে থাকে। কত দেখাশোনা, কত হাস্যালাপ, কত নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণ, কত লীলাখেলায় সে যে নিজেকে ব্যাপৃত করে তার সীমা নেই।

মানুষের প্রতি মানুষের স্বাভাবিক প্রেমবশতই যে আমাদের এই চাঞ্চল্য এবং উদ্যম প্রকাশ পায় তা নয়। সামাজিক এবং প্রেমিক একই লোক নয়—অনেক সময় তার বিপরীতই দেখতে পাই। অনেক সময় লক্ষ্য করা যায় সামাজিক ব্যক্তির মনে গভীরতর প্রেম ও দয়ার স্থান নেই।

সমাজ আমাদের ব্যাপৃত রাখে ;—নানা প্রকার সামাজিক আলাপ, সামাজিক কাজ, সামাজিক আমোদ সৃষ্টি করে আমাদের মনের উদ্যমকে আকর্ষণ করে নেয়। এই উদ্যমকে কোন্ কাজে লাগিয়ে কেমন করে মনকে শান্ত করব সে-কথা আর চিন্তা করতেই হয় না—লোক-লৌকিকতার বিচিত্র কৃত্রিম নালায় আপনি সে প্রবাহিত হয়ে যায়।

যে-ব্যক্তি অমিতব্যয়ী সে যে লোকের দুঃখ দূর করবার জন্যে দান করে নিজেকে নিঃস্ব করে তা নয়—ব্যয় করবার প্রবৃত্তিকে সে সংবরণ করতে পারে না। নানা রকমের খরচ করে তার উদ্যম ছাড়া পেয়ে খেলা করে খুশি হয়।

সমাজে আমাদের সামাজিকতা বহুলাংশে সেই ভাবে নিজের শক্তিকে খরচ করে, সে যে সমাজের লোকের প্রতি বিশেষ প্রীতিবশত তা নয় কিন্তু নিজেকে খরচ করে ফেলবার একটা প্রবৃত্তিবশত।

চর্চা দ্বারা এই প্রবৃত্তি কীরকম অপরিমিতরূপে বেড়ে উঠতে পারে তা যুরোপে যারা সমাজ-বিলাসী তাদের জীবন দেখলে বোঝা যায়। সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত তাদের বিশ্রাম নেই—উত্তেজনার পর উত্তেজনার আয়োজন। কোথায় শিকার, কোথায় নাচ, কোথায় খেলা, কোথায় ভোজ, কোথায় ঘোড়দৌড় এই নিয়ে তারা উন্মত্ত। তাদের জীবন কোনো লক্ষ্য স্থির করে কোনো পথ বেয়ে চলছে না, কেবল দিনের পর দিন রাত্রির পর রাত্রি এই উন্মাদনার রাশিচক্রে ঘুরছে।

আমাদের জীবনীশক্তির মধ্যে এত বেশি বেগ নেই বলে আমরা এতদূর যাই নে কিন্তু আমরাও সমস্ত দিন অপেক্ষাকৃত মৃদুতর ভাবে সামাজিক বাঁধা পথে কেবলমাত্র মনের শক্তিকে খরচ করবার জন্যেই খরচ করে থাকি। মনকে মুক্তি দেবার, শক্তিকে খাটিয়ে নেবার আর কোনো উপায় আমরা জানি নে।

দানে এবং ব্যয়ে অনেক তফাত। আমরা মানুষের জন্যে যা দান করি তা এক দিকে খরচ হয়ে অন্যদিকে মঙ্গলে পূর্ণ হয়ে ওঠে, কিন্তু মানুষের কাছে যা ব্যয় করি তা কেবলমাত্রই খরচ। তাতে দেখতে পাই আমাদের গভীরতর চিত্ত কেবলই নিঃস্ব হতে থাকে, সে ভরে ওঠে না। তার শক্তি হ্রাস হয়, তার ক্লান্তি আসে, অবসাদ আসে—নিজের রিক্ততা ও ব্যর্থতার ধিক্কারকে ভুলিয়ে রাখবার জন্যে কেবলই তাকে নূতন নূতন কৃত্রিমতা রচনা করে চলতে হয়—কোথাও থামতে গেলেই তার প্রাণ বেরিয়ে যায়।

এইজন্যে যাঁরা সাধক, পরমার্থ লাভের জন্যে নিজের শক্তিকে যাঁদের খাটানো আবশ্যক, তাঁরা অনেক সময়ে পাহাড়ে পর্বতে নির্জনে লোকালয় থেকে দূরে চলে যান। শক্তির নিরন্তর অজস্র অপব্যয়কে তাঁরা বাঁচাতে চান।

কিন্তু বাইরে এই নির্জনতা এই পর্বতগুহা কোথায় খুঁজে বেড়াব? সে তো সব সময় জোটে না। এবং মানুষকে একেবারে ত্যাগ করে যাওয়াও তো মানুষের ধর্ম নয়।

এই নির্জনতা এই পর্বতগুহা এই সমুদ্রতীর আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই আছে—আমাদের অন্তরের মধ্যেই আছে। যদি না থাকত তাহলে নির্জনতায় পর্বতগুহায় সমুদ্রতীরে তাকে পেতুম না।

সেই অন্তরের নিভৃত আশ্রমের সঙ্গে আমাদের পরিচয় সাধন করতে হবে। আমরা বাইরেকেই অত্যন্ত বেশি করে জানি, অন্তরের মধ্যে আমাদের যাতায়াত প্রায় নেই, সেই জন্যেই আমাদের জীবনের ওজন নষ্ট হয়ে গেছে। অর্থাৎ আমরা নিজের সমস্ত শক্তিকে বাইরেই অহরহ এই যে নিঃশেষ করে ফতুর হয়ে যাচ্ছি—বাইরের সংস্রব পরিহার করাই তার প্রতিকার নয়, কারণ মানুষকে ছেড়ে মানুষকে চলে যেতে বলা, রোগের চেয়ে চিকিৎসাকে গুরুতর করে তোলা। এর যথার্থ প্রতিকার হচ্ছে ভিতরের দিকেও আপনার প্রতিষ্ঠা লাভ করে অন্তরে বাহিরে নিজের সামঞ্জস্য স্থাপন করা। তাহলেই জীবন সহজেই নিজেকে উন্মত্ত অপব্যয় থেকে রক্ষা করতে পারে।

নইলে একদল ধর্মলুব্ধ লোককে দেখতে পাই তারা নিজের কথাকে, হাসিকে, উত্তমকে কেবলই মানদণ্ড হাতে করে হিসাবি কৃপণের মতো খর্ব করছে। তারা নিজের বরাদ্দ যতদূর কমানো সম্ভব তাই কমিয়ে নিজের মনুষ্যত্বকে কেবলই শুষ্ক কৃশ আনন্দহীন করাকেই সিদ্ধির লক্ষণ বলে মনে করছে।

কিন্তু এমন করলে চলবে না। আর যাই হ'ক মানুষকে সম্পূর্ণ সহজ হতে হবে উদ্দামভাবে বেহিসাবি হলেও চলবে না, কৃপণভাবে হিসাবি হলেও চলবে না।

এই মাঝখানের রাস্তায় দাঁড়াবার উপায় হচ্ছে, বাহিরের লোকালয়ের মধ্যে থেকেও অন্তরের নিভৃত নিকেতনের মধ্যে নিজের প্রতিষ্ঠা রক্ষা করা। বাহিরই আমাদের একমাত্র নয় অন্তরেই আমাদের গোড়াকার আশ্রয় রয়েছে তা বারংবার সকল আলাপের মধ্যে, আমোদের মধ্যে, কাজের মধ্যে অনুভব করতে হবে। সেই নিভৃত ভিতরের পথটিকে এমনি সরল করে তুলতে হবে যে, যখন-তখন ঘোরতর কাজকর্মের গোলযোগেও ধাঁ করে সেইখানে একবার ঘুরে আসা কিছুই শক্ত হবে না।

সেই যে আমাদের ভিতরের মহলটি আমাদের জনতাপূর্ণ কলরবমুখর কাজের ক্ষেত্রের মাঝখানে একটি অবকাশকে সর্বদা ধারণ করে আছে বেষ্টন করে আছে, এই অবকাশ তো কেবল শূন্যতা নয়। তা স্নেহে প্রেমে আনন্দে কল্যাণে পরিপূর্ণ। সেই অবকাশটিই হচ্ছেন তিনি যাঁর দ্বারা উপনিষৎ জগতের সমস্ত কিছুকেই আচ্ছন্ন দেখতে বলেছেন। ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ। সমস্ত কাজকে বেষ্টন করে সমস্ত মানুষকে বেষ্টন করে সর্বত্রই সেই পরিপূর্ণ অবকাশটি আছেন; তিনিই পরস্পরের যোগসাধন করছেন এবং পরস্পরের সংঘাত নিবারণ করছেন। সেই তাঁকেই নিভৃত চিত্তের মধ্যে নির্জন অবকাশরূপে নিরন্তর উপলব্ধি করবার অভ্যাস করো, শান্তিতে মঙ্গলে ও প্রেমে নিবিড়ভাবে পরিপূর্ণ অবকাশরূপে তাঁকে হৃদয়ের মধ্যে সর্বদাই জানো। যখন হাসছ খেলছ কাজ করছ তখনও একবার সেখানে যেতে

যেন কোনো বাধা না থাকে—বাহিরের দিকেই একেবারে কাত হয়ে উল্‌টে পড়ে তোমার সমস্ত কিছুকেই নিঃশেষ করে ঢেলে দিয়ো না। অন্তরের মধ্যে সেই প্রগাঢ় অমৃতময় অবকাশকে উপলব্ধি করতে থাকলে তবেই সংসার আর সংকটময় হয়ে উঠবে না, বিষয়ের বিষ আর জমে উঠতে পারবে না—বায়ু দূষিত হবে না, আলোক মলিন হবে না, তাপে সমস্ত মন তপ্ত হয়ে উঠবে না।

ভাবো তাঁরে অন্তরে যে বিরাজে, অন্য কথা ছাড়ো না।
সংসার সংকটে ত্রাণ নাহি কোনোমতে বিনা তাঁর সাধনা।

৩ ফাল্গুন

তীর্থ

আজ আবার বলছি—ভাবো তাঁরে অন্তরে যে বিরাজে! এই কথা যে প্রতিদিন বলার প্রয়োজন আছে। আমাদের অন্তরের মধ্যেই যে আমাদের চির আশ্রয় আছেন এ-কথা বলার প্রয়োজন কবে শেষ হবে?

কথা পুরাতন হয়ে ম্লান হয়ে আসে, তার ভিতরকার অর্থ ক্রমে আমাদের কাছে জীর্ণ হয়ে ওঠে, তখন তাকে আমরা অনাবশ্যক বলে পরিহার করি। কিন্তু প্রয়োজন দূর হয় কই?

সংসারে এই বাহিরটাই আমাদের সুপরিচিত, এইজন্যে বাহিরকেই আমাদের মন একমাত্র আশ্রয় বলে জানে। আমাদের অন্তরে যে অনন্ত জগৎ আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ফিরছে সেটা যেন আমাদের পক্ষে একেবারেই নেই। যদি তার সঙ্গে আমাদের পরিচয় বেশ সুস্পষ্ট হত তাহলে বাহিরের একাধিপত্য আমাদের পক্ষে এমন উদগ্র হয়ে উঠত না; তাহলে বাহিরে একটা ক্ষতি হবামাত্র সেটাকে এমন একান্ত ক্ষতি বলে মনে করতে পারতুম না, এবং বাহিরের নিয়মকেই চরম নিয়ম মনে করে তার অনুগত হয়ে চলাকেই আমাদের একমাত্র গতি বলে স্থির করতুম না।

আজ আমাদের মানদণ্ড, তুলাদণ্ড, কষ্টিপাথর সমস্তই বাইরে। লোকে কী বলবে, লোকে কী করবে সেই অনুসারেই আমাদের ভালোমন্দ সমস্ত ঠিক করে বসে আছি—এইজন্য লোকের কথা আমাদের মর্মে বাজে, লোকের কাজ আমাদের এমন করে বিচলিত করে, লোকভয় এমন চরম ভয়, লোকলজ্জা এমন একান্ত লজ্জা। এইজন্যে লোকে যখন আমাদের ত্যাগ করে তখন মনে হয় জগতে আমার আর কেউ নেই। তখন আমরা এ-কথা বলবার ভরসা পাই নে যে—

সবাই ছেড়েছে নাই যার কেহ,
তুমি আছ তার, আছে তব স্নেহ,
নিরাশ্রয় জন পথ যার গেহ
সেও আছে তব ভবনে।

সবাই যাকে পরিত্যাগ করেছে তার আত্মার মধ্যে সে যে এক মুহূর্তের জন্যে পরিত্যক্ত নয়; পথ যার গৃহ তার অন্তরের আশ্রয় যে কোনো মহাশক্তি অত্যাচারীও এক মুহূর্তের জন্যে কেড়ে নিতে পারে না; অন্তর্যামীর কাছে যে ব্যক্তি অপরাধ করে নি বাইরের লোক যে তাকে জেলে দিয়ে ফাঁসি দিয়ে কোনোমতেই দণ্ড দিতে পারে না।

অরাজক রাজত্বের প্রজার মতো আমরা সংসারে আছি, আমাদের কেউ রক্ষা করছে না, আমরা বাইরে পড়ে রয়েছি, আমাদের নানা শক্তিকে নানাদিকে কেড়েকুড়ে নিচ্ছে, কত অকারণ লুটপাট হয়ে যাচ্ছে তার ঠিকানা নেই। যার অস্ত্র শাণিত সে আমাদের মর্ম বিদ্ধ করছে, যার শক্তি বেশি সে আমাদের পায়ের তলায় রাখছে। সুখসমৃদ্ধির জন্যে আত্মরক্ষার জন্যে দ্বারে দ্বারে নানা লোকের শরণাপন্ন হয়ে বেড়াচ্ছি। একবার খবরও রাখি নে যে, অন্তরাত্মার অচল সিংহাসনে আমাদের রাজা বসে আছেন।

সেই খবর নেই বলেই তো সমস্ত বিচারের ভার বাইরের লোকের উপর দিয়ে বসে আছি, এবং আমিও অন্য লোককে বাইরে থেকে বিচার করছি। কাউকে সত্যভাবে ক্ষমা এবং নিত্যভাবে প্রীতি করতে পারছি নে, মঙ্গল-ইচ্ছা কেবলই সংকীর্ণ ও প্রতিহত হয়ে যাচ্ছে।

যতদিন সেই সত্যকে, সেই মঙ্গলকে, সেই প্রেমকে সম্পূর্ণ সহজভাবে না পাই, ততদিন প্রত্যহই বলতে হবে—ভাবো তাঁরে অন্তরে যে বিরাজে। নিজের অন্তরাত্মার মধ্যে সেই সত্যকে যথার্থ উপলব্ধি করতে না পারলে অন্যের মধ্যেও সেই সত্যকে দেখতে পাব না এবং অন্যের সঙ্গে আমাদের সত্য সম্বন্ধ স্থাপিত হবে না। যখন জানব যে পরমাত্মার মধ্যে আমি আছি এবং আমার মধ্যে পরমাত্মা রয়েছেন তখন অন্যের দিকে তাকিয়ে নিশ্চয় দেখতে পাব সেও পরমাত্মার মধ্যে রয়েছে এবং পরমাত্মা তার মধ্যে রয়েছেন—তখন তার প্রতি ক্ষমা প্রীতি সহিষ্ণুতা আমার পক্ষে সহজ হবে, তখন সংযম কেবল বাইরের নিয়মপালনমাত্র হবে না। যে-পর্যন্ত তা না হয়, যে-পর্যন্ত বাহিরই আমাদের কাছে একান্ত, যে-পর্যন্ত বাহিরই সমস্তকে অত্যন্ত আড়াল করে দাঁড়িয়ে সমস্ত অবকাশ রোধ করে ফেলে—সে-পর্যন্ত কেবলই বলতে হবে—

ভাবো তাঁরে অন্তরে যে বিরাজে, অন্য কথা ছাড়ো না।
সংসার সংকটে ত্রাণ নাহি কোনোমতে বিনা তাঁর সাধনা।

কেননা, সংসারকে একমাত্র জানলেই সংসার সংকটময় হয়ে ওঠে—তখনই সে অসহায় অনাথকে পেয়ে বসে, তার সর্বনাশ করে ছাড়ে।

প্রতিদিন এস, অন্তরে এস। সেখানে সব কোলাহল নিরস্ত হ'ক, কোনো আঘাত না পৌঁছোক, কোনো মলিনতা না স্পর্শ করুক। সেখানে ক্রোধকে পালন ক'রো না, লোভকে প্রশ্রয় দিয়ো না, বাসনাগুলিকে হাওয়া দিয়ে জ্বালিয়ে রেখো না, কেননা সেইখানেই তোমার তীর্থ, তোমার দেবমন্দির। সেখানে যদি একটু নিরালা না থাকে তবে জগতে কোথাও নিরালা পাবে না, সেখানে যদি কলুষ পোষণ কর তবে জগতে তোমার সমস্ত পুণ্যস্থানের কবাট বন্ধ। এস সেই অক্ষুব্ধ নির্মল অন্তরের মধ্যে এস, সেই অনন্তের সিন্ধুতীরে এস, সেই অত্যুচ্চের গিরিশিখরে এস। সেখানে করজোড়ে দাঁড়াও, সেখানে নত হয়ে নমস্কার করো। সেই সিন্ধুর উদার জলরাশি থেকে, সেই গিরিশৃঙ্গের নিত্যবহমান নির্ঝরধারা থেকে পুণ্যসলিল প্রতিদিন উপাসনান্তে বহন করে নিয়ে তোমার বাহিরের সংসারের উপর ছিটিয়ে দাও; সব পাপ যাবে, সব দাহ দূর হবে।

৪ ফাল্গুন

বিভাগ

ভিতরের সঙ্গে বাহিরের যে একটি সুনির্দিষ্ট বিভাগ থাকলে আমাদের জীবন সুবিহিত সুশৃঙ্খল সুসম্পূর্ণ হয়ে ওঠে সেইটে আমাদের ঘটে নি।

বিভাগটি ভালোরকম না হলে ঐক্যটিও ভালোরকম হয় না। অপরিণতি যখন পিণ্ডাকারে থাকে, যখন তার কলেবর বৈচিত্র্যে বিভক্ত না হয়েছে, তখন তার মধ্যে একের মূর্তি পরিস্ফুট হয় না।

আমাদের মধ্যে খুব একটি বড়ো বিভাগের স্থান আছে, সেটি হচ্ছে অন্তর এবং বাহিরের বিভাগ। যতদিন সেই বিভাগটি বেশ সুনির্দিষ্ট না হবে ততদিন অন্তর ও বাহিরের ঐক্যটিও পরিপূর্ণ তাৎপর্যে সুন্দর হয়ে উঠবে না।

এখন আমাদের এমনি হয়েছে আমাদের একটি মাত্র মহল। স্বার্থপরমার্থ নিত্য-অনিত্য সমস্তই আমাদের ওই এক জায়গায় যেমন-তেমন করে রাখা ছাড়া উপায় নেই। সেইজন্যে একটা অন্যটাকে আঘাত করে, বাধা দেয়, একের ক্ষতি অন্যের ক্ষতি হয়ে ওঠে।

যে-জিনিসটা বাহিরের তাকে বাহিরেই রাখতে হবে তাকে অন্তরে নিয়ে গিয়ে তুললে

সেখানে সেটা জঞ্জাল হয়ে ওঠে। যেখানে যার স্থান নয় সেখানে সে যে অনাবশ্যক তা নয় সেখানে সে অনিষ্টকর।

অতএব আমাদের জীবনের প্রধান সাধনাই এই বাহিরের জিনিস যাতে বাহিরেই থাকতে পারে ভিতরে গিয়ে যাতে সে বিকারের সৃষ্টি না করে।

সংসারে আমাদের পদে পদে ক্ষতি হয়, আজ যা আছে কাল তা থাকে না। সেই ক্ষতিকে আমরা বাহিরের সংসারেই কেন রাখি না, তাকে আমরা ভিতরে নিয়ে গিয়ে তুলি কেন?

গাছের পাতা আজ কিশলয়ে উদ্‌গত হয়ে কাল জীর্ণ হয়ে ঝরে পড়ে। কিন্তু সে তো বাইরেই ঝরে পড়ে যায়। সেই তার বাহিরের অনিবার্য ক্ষতিকে গাছ তার মজ্জার ভিতরে তো পোষণ করে না। বাহিরের ক্ষতি বাইরেই থাকে, অন্তরের পুষ্টি অন্তরেই অব্যাহতভাবে চলে।

কিন্তু আমরা সেই ভেদটুকুকে রক্ষা করি নে। আমরা বাইরের সমস্ত জমাখরচ ভিতরের খাতাতে পাকা করে লিখে অমন সোনার জলে বাঁধানো দামি বইটাকে নষ্ট করি। বাইরের বিকারকে ভিতরে পাপকল্পনারূপে চিহ্নিত করি, বাইরের আঘাতকে ভিতরে বেদনায় জমা করে রাখতে থাকি।

আমাদের ভিতরের মহলে একটা স্থায়িত্বের ধর্ম আছে—সেখানে জমা করবার জায়গা। এইজন্যে সেখানে এমন কিছু নিয়ে গিয়ে ফেলা ঠিক নয় যা জমাবার জিনিস নয়। তা নিতে গেলেই বিকারকে স্থায়ী করে তোলা হয়। মৃতদেহকে কেউ অন্তঃপুরের ভাণ্ডারে তুলে রাখে না, তাকে বাইরে মাটিতে, জলে বা আগুনেই সমর্পণ করে দিতে হয়।

মানুষের মধ্যে এই দুটি কক্ষ আছে, স্থায়িত্বের এবং অস্থায়িত্বের—অন্তরের এবং সংসারের।

অন্য জন্তুদের মধ্যেও সেটা অস্ফুটভাবে আছে—তেমন গভীরভাবে নেই। সেইজন্যে অন্য জন্তুরা একটা বিপদ থেকে বেঁচে গেছে। তারা, যেটা স্থায়ী নয় সেটাকে স্থায়ী করবার চেষ্টাও করে না, কারণ, স্থায়ী করবার উপায় তাদের হাতে নেই।

মানুষও অস্থায়ীকে একেবারে চিরস্থায়িত্ব দান করতে পারে না বটে কিন্তু অন্তরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে তার উপরে স্থায়িত্বের মালমসলা প্রয়োগ ক'রে তাকে যতদিন পারে টিঁকিয়ে রাখতে ত্রুটি করে না। তার অন্তরপ্রকৃতি নাকি স্থায়িত্বের নিকেতন এই জন্যেই তার সুবিধাটা ঘটেছে।

তার ফল হয়েছে এই যে, জন্তুদের মধ্যে যে-সকল প্রবৃত্তি প্রয়োজনের অনুগত হয়ে

আপন স্বাভাবিক কর্ম সমাধা করে একেবারে নিরস্ত হয়ে যায় মানুষ তাকে নিজের অন্তরের মধ্যে নিয়ে কল্পনার রসে ডুবিয়ে তাকে সঞ্চিত করে রাখে। প্রয়োজন সাধনের সঙ্গে সঙ্গে তাকে মরতে দেয় না। এইজন্যে বাইরে যথাস্থানে যার একটি যাথার্থ্য আছে অন্তরের মধ্যে সে পাপরূপে স্থায়ী হয়ে বসে। বাইরে যে-জিনিসটা অন্ন-সংগ্রহ-চেষ্টারূপে প্রাণ রক্ষা করবার উপায়, তাকেই যদি ভিতরে টেনে নিয়ে সঞ্চিত কর তবে সেইটেই তৃপ্তিহীন ঔদরিকতার নিত্যমূর্তি ধারণ করে স্বাস্থ্যকে নষ্ট করতেই থাকে।

তাই দেখতে পাচ্ছি আমাদের মধ্যে এই নিত্যের নিকেতন, পুণ্যের নিকেতন আছে বলেই আমাদের মধ্যে পাপের স্থান আছে। যা অনিত্য, বিশেষ সাময়িক প্রয়োজনে বিশেষ স্থানে যার প্রয়োগ এবং তার পরে যার শান্তি, তাকেই আমাদের অন্তরের নিত্যনিকেতনে নিয়ে বাঁধিয়ে রাখা এবং প্রত্যহই তার অনাবশ্যক খাদ্য জোগানোর জন্যে ঘুরে মরা, এইটেই হচ্ছে পাপ।

পুরাণে বলেছে অমৃত দেবতারই ভোগ্য, তা দৈত্যের খাদ্য নয়। যে-দৈত্য চুরি করে সেই অমৃত পান করেছিল তারই মাথাটা রাহু এবং লেজটা কেতু আকারে বৃথা বেঁচে থেকে নিদারুণ অমঙ্গলরূপে সমস্ত জগৎকে দুঃখ দিচ্ছে।

আমাদের যে-অন্তরভাণ্ডার দেবভোগ্য অমৃতের পাত্র রক্ষা করবার আগার, সেইখানে যদি দৈত্যকে গোপনে প্রবেশ করবার অধিকার দিই তবে সে চুরি করে অমৃত পান করে অমর হয়ে ওঠে। তার পর থেকে প্রতিদিন সেই বিকট অমঙ্গলটার খোরাক জোগাতে আমাদের স্বাস্থ্য সুখ সম্বল সংগতি নিঃশেষ হয়ে যায়। অমৃতের ভাণ্ডার আছে বলেই আমাদের এই দুর্গতি।

এই অমৃতের নিত্যনিকেতনে দৈত্যের কোনো অধিকার নেই বটে কিন্তু বাহিরে কর্মের ক্ষেত্রে তার প্রয়োজন যথেষ্ট। সে দুর্গম পথে ভার বহন করতে পারে, সে পর্বত বিদীর্ণ করে পথ করে দিতে পারে। তাকে দাসের বেতন যদি দাও তবে সে প্রভুর কাজ উদ্ধার করে দিয়ে কৃতার্থ হয়। কিন্তু অমৃত তো দাসের বেতন নয়, সে যে দেবতার পূজার ভোগ-সামগ্রী। তাকে অপাত্রে উৎসর্গ করাই পাপ। যাকে যথাকালে বাইরে থেকে মরতে দেওয়াই উচিত তাকে ভিতরে নিয়ে গিয়ে বাঁচিয়ে রাখলেই নিজের হাতে পাপকে সৃষ্টি করা হয়।

তাই বলছিলুম, যেটা বাইরের সেটাকে বাইরে রাখবার সাধনাই জীবনযাত্রার সাধনা।

৫ ফাল্গুন ১৩১৫

দ্রষ্টা

অন্তরকে বাইরের আক্রমণ থেকে বাঁচাও। দুইকে মিশিয়ে এক করে দেখো না। সমস্তটাকেই কেবলমাত্র সংসারের অন্তর্গত করে জেনো না। তা যদি কর তবে সংসার-সংকট থেকে উদ্ধার পাবার কোনো রাস্তা খুঁজে পাবে না।

থেকে থেকে ঘোরতর কর্মসংঘাতের মাঝখানেই নিজের অন্তরকে নির্লিপ্ত বলে অনুভব ক'রো। এই রকম ক্ষণে ক্ষণে বারংবার উপলব্ধি করতে হবে। খুব কোলাহলের ভিতরে থেকে একবার চকিতের মতো দেখে নিতে হবে, সেই অন্তরের মধ্যে কোনো কোলাহল পৌঁছোচ্ছে না। সেখানে শান্ত স্তব্ধ নির্মল। না, কোনোমতেই সেখানে বাহিরের কোনো চাঞ্চল্যকে প্রবেশ করতে দেব না। এই যে আনাগোনা, লোকলৌকিকতা, হাসি-খেলার মহা জনতা, এর মধ্যে বিদ্যুদ্বেগে একবার অন্তরের অন্তরে ঘুরে এস—দেখে এস সেখানে নিবাতনিষ্কম্প প্রদীপটি জ্বলছে, অনুত্তরঙ্গ সমুদ্র আপন অতলস্পর্শ গভীরতায় স্থির হয়ে রয়েছে, শোকের ক্রন্দন সেখানে পৌঁছোয় না, ক্রোধের গর্জন সেখানে শান্ত।

এই বিশ্বসংসারে এমন কিছু নেই, একটি কণাও নেই যার মধ্যে পরমাত্মা ওতপ্রোত হয়ে না রয়েছেন কিন্তু তবু তিনি দ্রষ্টা—কিছুর দ্বারা তিনি অধিকৃত নন। এই জগৎ তাঁরই বটে, তিনি এর সর্বত্রই আছেন বটে কিন্তু তবু তিনি এর অতীত হয়ে আছেন।

আমাদের অন্তরাত্মাকেও সেই রকম করেই জানবে—সংসার তাঁর, শরীর তাঁর, বুদ্ধি তাঁর, হৃদয় তাঁর। এই সংসারে, শরীরে, বুদ্ধিতে, হৃদয়ে তিনি পরিব্যাপ্ত হয়েই আছেন কিন্তু তবু আমাদের অন্তরাত্মা এই সংসার, শরীর, বুদ্ধি ও হৃদয়ের অতীত। তিনি দ্রষ্টা। এই যে-আমি সংসারে জন্মলাভ করে বিশেষ নাম ধরে নানা সুখ দুঃখ ভোগ করছে এই তাঁর বহিরংশকে তিনি সাক্ষীরূপেই দেখে যাচ্ছেন। আমরা যখন আত্মবিৎ হই, এই অন্তরাত্মাকে যখন সম্পূর্ণ উপলব্ধি করি, তখন আমরা নিজের নিত্য স্বরূপকে নিশ্চয় জেনে সমস্ত সুখ-দুঃখের মধ্যে থেকেও সুখ-দুঃখের অতীত হয়ে যাই, নিজের জীবনকে সংসারকে দ্রষ্টারূপে জানি।

এমনি করে সমস্ত কর্ম থেকে, সংসার থেকে, সমস্ত ক্ষোভ থেকে বিবিক্ত করে আত্মাকে যখন বিশুদ্ধ স্বরূপে জানি তখন দেখতে পাই তা শূন্য নয়, তখন নিজের অন্তরে সেই নির্মল নিস্তব্ধ পরম ব্যোমকে সেই চিদাকাশকে দেখি যেখানে—সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম নিহিতং গুহায়াং। নিজের মধ্যে সেই আশ্চর্য জ্যোতির্ময় পরম কোষকে জানতে পারি যেখানে সেই অতি শুভ্র জ্যোতির জ্যোতি বিরাজমান।

এইজন্যই উপনিষৎ বারংবার বলেছেন, অন্তরাত্মাকে জানো তাহলেই অমৃতকে জানবে, তাহলেই পরব্রহ্মকে জানবে। তাহলে সমস্তের মাঝখানে থেকেই, সকলের মধ্যে প্রবেশ করেই, কিছু পরিত্যাগ না করে মুক্তি পাবে—নান্যঃপন্থা বিদ্যতে অয়নায়।

৬ ফাল্গুন

নিত্যধাম

উপনিষৎ বলেছেন—

আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন।

ব্রহ্মের আনন্দ যিনি জেনেছেন তিনি কদাচই ভয় পান না।

সেই ব্রহ্মের আনন্দকে কোথায় দেখব, তাকে জানব কোন্‌খানে? অন্তরাত্মার মধ্যে।

আত্মাকে একবার অন্তর-নিকেতনে, তার নিত্যনিকেতনে দেখো—যেখানে আত্মা বাহিরের হর্ষশোকের অতীত, সংসারের সমস্ত চাঞ্চল্যের অতীত, সেই নিভৃত অন্তরতম গুহার মধ্যে প্রবেশ করে দেখো—দেখতে পাবে আত্মার মধ্যে পরমাত্মার আনন্দ নিশিদিন আবির্ভূত হয়ে রয়েছে একমুহূর্ত তার বিরাম নেই। পরমাত্মা এই জীবাত্মায় আনন্দিত। যেখানে সেই প্রেমের নিরন্তর মিলন সেইখানে প্রবেশ করো, সেইখানে তাকাও। তাহলেই ব্রহ্মের আনন্দ যে কী, তা নিজের অন্তরের মধ্যেই উপলব্ধি করবে, এবং তাহলেই কোনোদিন কিছু হতেই তোমার আর ভয় থাকবে না।

ভয় তোমার কোথায়? যেখানে আধিব্যাধি জরা-মৃত্যু বিচ্ছেদ-মিলন, যেখানে আনাগোনা, যেখানে সুখদুঃখ। আত্মাকে কেবলই যদি সেই বাহিরের সংসারেই দেখ—যদি তাকে কেবলই কার্য থেকে কার্যান্তরে, বিষয় থেকে বিষয়ান্তরেই উপলব্ধি করতে থাক, তাকে বিচিত্রের সঙ্গে চঞ্চলের সঙ্গেই একেবারে জড়িত মিশ্রিত করে এক করে জান, তাহলেই তাকে নিতান্ত দীন করে মলিন করে দেখবে, তাহলেই তাকে মৃত্যুর দ্বারা বেষ্টিত দেখে কেবলই শোক করতে থাকবে, যা সত্য নয় স্থায়ী নয় তাকেই আত্মার সঙ্গে জড়িত করে সত্য বলে স্থায়ী বলে ভ্রম করবে এবং শেষকালে সে-সমস্ত যখন সংসারের নিয়মে খসে পড়তে থাকবে তখন মনে হবে যেন আত্মারই ক্ষয় হচ্ছে বিনাশ হচ্ছে—এমনি করে বারংবার শোকে নৈরাশ্যে দগ্ধ হতে থাকবে। সংসারকেই তুমি ইচ্ছা করে বড় পদ দেওয়াতে সংসার তোমার দত্ত সেই জোরে তোমার আত্মাকে পদে পদে অভিভূত পরাস্ত করে দেবে। কিন্তু আত্মাকে অন্তরধামে নিত্যের মধ্যে ব্রহ্মের মধ্যে

দেখো তাহলেই হর্ষশোকের সমস্ত জোর চলে যাবে। তাহলে ক্ষতিতে, নিন্দাতে, পীড়াতে, মৃত্যুতে কিসেই বা ভয়? জয়ী, আত্মা জয়ী। আত্মা ক্ষণিক সংসারের দাসানুদাস নয়—আত্মা অনন্তে অমরতায় প্রতিষ্ঠিত। আত্মায় ব্রহ্মের আনন্দ আবির্ভূত। সেইজন্য আত্মাকে যাঁরা সত্যরূপে জানেন তাঁরা ব্রহ্মের আনন্দকে জানেন এবং ব্রহ্মের আনন্দকে যাঁরা জানেন তাঁরা—ন বিভেতি কদাচন।

পরমে ব্রহ্মণি যোজিতচিত্তঃ
নন্দতি নন্দতি নন্দত্যেব।

পরমব্রহ্মের মধ্যে যাঁরা আপনাকে যুক্ত করে দেখেছেন তাঁরা নন্দিত হন, নন্দিত হন, নন্দিতই হন।

আর সংসারে যাঁরা নিজেকে যুক্ত করে জানেন তাঁরা শোচতি শোচতি শোচত্যেব।

৭ ফাল্গুন ১৩১৫

পরিণয়

চারিদিকে সংসারে আমরা দেখছি—সৃষ্টিব্যাপার চলছেই। যা ব্যাপ্ত তা সংহত হচ্ছে, যা সংহত তা ব্যাপ্ত হচ্ছে। আঘাত হতে প্রতিঘাত, রূপ হতে রূপান্তর চলেইছে,—এক মুহূর্ত তার কোথাও বিরাম নেই। সকল জিনিসই পরিবর্তির পথে চলেছে কিন্তু কোনো জিনিসেরই পরিসমাপ্তি নেই। আমাদের শরীর-বুদ্ধি-মনও প্রকৃতির এই চক্রে ঘুরছে, ক্রমাগতই তার সংযোগ বিয়োগ হ্রাসবৃদ্ধি তার অবস্থান্তর চলেছে।

প্রকৃতির এই সূর্যতারাময় লক্ষকোটি চাকায় রথ ধাবিত হচ্ছে—কোথাও এর শেষ গম্যস্থান দেখি নে, কোথাও এর স্থির হবার নেই। আমরাও কি এই রথে চড়েই এই লক্ষ্যহীন অনন্তপথেই চলেছি, যেন এক জায়গায় যাবার আছে এইরকম মনে হচ্ছে অথচ কোনোকালে কোথাও পৌঁছোতে পারছি নে? আমাদের অস্তিত্বই কি এই রকম অবিশ্রাম চলা, এই রকম অনন্ত সন্ধান? এর মধ্যে কোথাও কোনোরকম প্রাপ্তির, কোনোরকম স্থিতির তত্ত্ব নেই?

এই যদি সত্য হয়, দেশকালের বাইরে আমাদের যদি কোনো গতিই না থাকে তাহলে যিনি দেশকালের অতীত, যিনি অভিব্যজ্যমান নন, যিনি আপনাতে পরিসমাপ্ত, তিনি আমাদের পক্ষে একেবারেই নেই। সেই পূর্ণতার স্থিতিধর্ম যদি আমাদের মধ্যে একান্তই না থাকে তবে অনন্তস্বরূপ পরব্রহ্মের প্রতি আমরা যা-কিছু বিশেষণ প্রয়োগ করি সে কেবল কতকগুলি কথা মাত্র, আমাদের কাছে তার কোনো

তা যদি হয় তবে এই ব্রহ্মের কথাটাকে একেবারেই ত্যাগ করতে হয়। যাকে কোনো কালেই পাব না তাঁকে অনন্তকাল খোঁজার মতো বিড়ম্বনা আর কী আছে? তাহলে এই কথাই বলতে হয় সংসারকেই পাওয়া যায়, সংসারই আমার আপনার, ব্রহ্ম আমার কেউ নন।

কিন্তু সংসারকেও তো পাওয়া যায় না। সংসার তো মায়ামৃগের মতো আমাদের কেবলই এগিয়ে নিয়ে দৌড় করায়, শেষ ধরা তো দেয় না। কেবলই খাটিয়ে মারে ছুটি দেয় না—ছুটি যদি দেয় তো একেবারে বরখাস্ত করে। এমন কোনো সম্বন্ধ স্বীকার করে না যা চরম সম্বন্ধ। ছ্যাকরা গাড়ির গাড়োয়ানের সঙ্গে ঘোড়ার যে সম্বন্ধ তার সঙ্গে আমাদেরও সেই সম্বন্ধ। অর্থাৎ সে কেবলই আমাদের চালাবে, খাওয়াবে সেও চালাবার জন্যে, মাঝে মাঝে যেটুকু বিশ্রাম করাবে সেও কেবল চালাবার জন্যে, চাবুক লাগাম সমস্তই চালাবার উপকরণ। যখন না চলব তখন খাওয়াবেও না; আস্তাবলেও রাখবে না, ভাগাড়ে ফেলে দেবে। অথচ এই চালাবার ফল ঘোড়া পায় না। ঘোড়া স্পষ্ট করে জানেও না সে ফল কে পাচ্ছে। ঘোড়া কেবল জানে যে তাকে চলতেই হবে; সে মূঢ়ের মতো কেবলই নিজেকে প্রশ্ন করছে, কোনো কিছুই পাচ্ছি নে, কোথাও গিয়ে পৌঁছোচ্ছি নে তবু দিনরাত কেবলই চলছি কেন? পেটের মধ্যে অগ্নিময় ক্ষুধার চাবুক পড়ছে, হৃদয় মনের মধ্যে কত শত জ্বালাময় ক্ষুধার চাবুক পড়ছে, কোথাও স্থির থাকতে দিচ্ছে না। এর অর্থ কী?

যাই হ'ক কথা হচ্ছে এই যে, সংসারকে তো কোনোখানেই পাচ্ছি নে, তার কোনোখানে এসেই থামছি নে—ব্রহ্মও কি সেই সংসারেরই মতো? তাঁকেও কি কোনোখানেই পাওয়া যাবে না? তিনিও কি আমাদের অনন্তকালই চালাবেন এবং সেই পাওয়াহীন চলাকেই অনন্ত উন্নতি বলে আমরা নিজের মনকে কেবলই কোনোমতে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করব?

তা নয়। ব্রহ্মকেই পাওয়া যায়, সংসারকে পাওয়া যায় না। কারণ, সংসারের মধ্যে পাওয়ার তত্ত্ব নেই—সংসারের তত্ত্বই হচ্ছে সরে যাওয়া, সুতরাং তাকেই চরমভাবে পাবার চেষ্টা করলে কেবল দুঃখই পাওয়া হবে। কিন্তু ব্রহ্মকেও চরমভাবে পাবার চেষ্টা করলে কেবল চেষ্টাই সার হবে একথা বলা কোনোমতেই চলবে না। পাওয়ার তত্ত্ব কেবল একমাত্র ব্রহ্মেই আছে। কেননা তিনিই হচ্ছেন সত্য।

আমাদের অন্তরাত্মার মধ্যে পরমাত্মাকে পাওয়া পরিসমাপ্ত হয়ে আছে। আমরা যেমন যেমন বুদ্ধিতে হৃদয়ে উপলব্ধি করছি তেমনি তেমনি তাঁকে পাচ্ছি—এ হতেই পারে না। অর্থাৎ যেটা ছিল না সেইটেকে আমরা গড়ে তুলছি, তাঁর সঙ্গে সম্বন্ধটা আমাদের

নিজের এই ক্ষুদ্র হৃদয় ও বুদ্ধির দ্বারা সৃষ্টি করছি এ ঠিক নয়। এই সম্বন্ধ যদি আমাদেরই দ্বারা গড়া হয় তবে তার উপরে আস্থা রাখা চলে না, তবে সে আমাদের আশ্রয় দিতে পারবে না। আমাদের মধ্যেই একটি নিত্যধাম আছে। সেখানে দেশ-কালের রাজত্ব নয়, সেখানে ক্রমশ সৃষ্টির পালা নেই। সেই অন্তরাত্মার নিত্যধামে পরমাত্মার পূর্ণ আবির্ভাব পরিসমাপ্ত হয়েই আছে। তাই উপনিষৎ বলছেন—

সত্যংজ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম যো বেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্ সোহশ্নুতে সর্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা।

সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যোম যে পরম ব্যোম যে চিদাকাশ অন্তরাকাশ সেইখানে আত্মার মধ্যে যিনি সত্যজ্ঞান ও অনন্তস্বরূপ পরব্রহ্মকে গভীরভাবে অবস্থিত জানেন তাঁর সমস্ত বাসনা পরিপূর্ণ হয়।

ব্রহ্ম কোনো একটি অনির্দেশ্য অন্তরের মধ্যে পরিপূর্ণ হয়ে আছেন একথা বলবার কোনো মানে নেই। তিনি আমাদেরই অন্তরাকাশে আমাদেরই অন্তরাত্মায় সত্যং জ্ঞানমনন্তং রূপে সুগভীরভাবে প্রতিষ্ঠিত আছেন, এইটি ঠিকমতো জানলে বাসনায় আমাদের আর বৃথা ঘুরিয়ে মারে না পরিপূর্ণতার উপলব্ধিতে আমরা স্থির হতে পারি।

সংসার আমাদের মধ্যে নেই কিন্তু ব্রহ্ম আমাদের মধ্যেই আছেন। এইজন্য সংসারকে সহস্র চেষ্টায় আমরা পাই নে, ব্রহ্মকে আমরা পেয়ে বসে আছি।

পরমাত্মা আমাদের আত্মাকে বরণ করে নিয়েছেন—তাঁর সঙ্গে এর পরিণয় একেবারে সমাধা হয়ে গেছে। তার আর কোনো কিছু বাকি নেই কেননা তিনি একে স্বয়ং বরণ করেছেন। কোন্ অনাদিকালে সেই পরিণয়ের মন্ত্র পড়া হয়ে গেছে। বলা হয়ে গেছে—যদেতং হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব। এর মধ্যে আর ক্রমাভিব্যক্তির পৌরোহিত্য নেই। তিনি "অস্য" "এষ" হয়ে আছেন। তিনি এর এই হয়ে বসেছেন, নাম করবার জো নেই। তাই তো ঋষি কবি বলেন—

এষাস্য পরমা গতিঃ, এষাস্য পরমা সম্পৎ, এষোহস্য পরমো লোকঃ, এষোহস্য পরম আনন্দঃ।

পরিণয় তো সমাপ্তই হয়ে গেছে, সেখানে আর কোনো কথা নেই। এখন কেবল অনন্ত প্রেমের লীলা। যাঁকে পাওয়া হয়ে গেছে তাঁকেই নানারকম করে পাচ্ছি—সুখে দুঃখে, বিপদে সম্পদে, লোকে লোকান্তরে। বধূ যখন সেই কথাটা ভালো করে বোঝে তখন তার আর কোনো ভাবনা থাকে না। তখন সংসারকে তার স্বামীর সংসার বলে জানে, সংসার তাকে আর পীড়া দিতে পারে না—সংসারে তার আর ক্লান্তি নেই, সংসারে তার প্রেম। তখন সে জানে যিনি সত্যং জ্ঞানমনন্তং হয়ে অন্তরাত্মাকে চিরদিনের মতো গ্রহণ করে আছেন, সংসারে তাঁরই আনন্দরূপমমৃতং বিভাতি—সংসারে তাঁরই প্রেমের

লীলা। এইখানেই নিত্যের সঙ্গে অনিত্যের চিরযোগ—আনন্দের অমৃতের যোগ। এইখানেই আমাদের সেই বরকে, সেই চিরপ্রাপ্তকে, সেই একমাত্র প্রাপ্তকে বিচিত্র বিচ্ছেদ-মিলনের মধ্যে দিয়ে, পাওয়া-না-পাওয়ার বহুতর ব্যবধান-পরম্পরার ভিতর দিয়ে নানা রকমে পাচ্ছি ;—যাকে পেয়েছি, তাঁকেই আবার হারিয়ে হারিয়ে পাচ্ছি, তাঁকেই নানা রসে পাচ্ছি। যে বধূর মূঢ়তা ঘুচেছে, এই কথাটা যে জেনেছে, এই রস যে বুঝেছে, সেই আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন। যে না জেনেছে, যে সেই বরকে ঘোমটা খুলে দেখে নি—বরের সংসারকেই কেবল দেখেছে সে যেখানে তার রানীর পদ সেখানে দাসী হয়ে থাকে। ভয়ে মরে, দুঃখে কাঁদে, মলিন হয়ে বেড়ায়—

দৌর্ভিক্ষ্যাৎ যাতি দৌর্ভিক্ষ্যং ক্লেশাৎ ক্লেশং ভয়াৎ ভয়ম্।

৯ ফাল্গুন ১৩১৫

৬

তিনতলা

আমাদের তিনটে অবস্থা দেখতে পাই। তিনটে বড়ো বড়ো স্তরে মানবজীবন গড়ে তুলছে; একটা প্রাকৃতিক, একটা ধর্মনৈতিক, একটা আধ্যাত্মিক।

প্রথম অবস্থায় প্রকৃতিই আমাদের সব। তখন আমরা বাইরেই থাকি। তখন প্রকৃতিই আমাদের সমস্ত উপলব্ধির কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায়। তখন বাইরের দিকেই আমাদের সমুদয় প্রবৃত্তি, সমুদয় চিন্তা, সমুদয় প্রয়াস। এমন কি, আমাদের মনের মধ্যে যা গড়ে ওঠে তাকেও আমরা বাইরে স্থাপন না করে থাকতে পারি না— আমাদের মনের জিনিসগুলিও আমাদের কল্পনায় বাহ্যরূপ গ্রহণ করতে থাকে। আমরা সত্য তাকেই বলি যাকে দেখতে ছুঁতে পাওয়া যায়। এইজন্য আমাদের দেবতাকেও আমরা কোনো বাহ্য পদার্থের মধ্যে বদ্ধ করে অথবা তাঁকে কোনো বাহ্যরূপ দান করে আমরা তাঁকে প্রাকৃতিক বিষয়েরই শামিল করে দিই। বাহিরের এই দেবতাকে আমরা বাহ্য প্রক্রিয়াদ্বারা শান্ত করবার চেষ্টা করি। তাঁর সম্মুখে বলি দিই, খাদ্য দিই, তাঁকে কাপড় পরাই। তখন দেবতার অনুশাসনগুলিও বাহ্য অনুশাসন। কোন্ নদীতে স্নান করলে পুণ্য, কোন্ খাদ্য আহার করলে পাপ, কোন্ দিকে মাথা রেখে শুতে হবে, কোন্ মন্ত্র কী-রকম নিয়মে কোন্ তিথিতে কোন্ দণ্ডে উচ্চারণ করা আবশ্যক, এই সমস্তই তখন ধর্মানুষ্ঠান।

এমনি করে দৃষ্টি ঘ্রাণ স্পর্শাদি দ্বারা মনের দ্বারা কল্পনার ভয়ের দ্বারা ভক্তির দ্বারা বাহিরকে নানারকম করে নেড়েচেড়ে তাকে নানারকমে আঘাত করে এবং তার দ্বারা আঘাত খেয়ে আমরা বাহিরের পরিচয়ের সীমায় এসে ঠেকি। তখন বাহিরকেই আর পূর্বের মতো একমাত্র বলে মনে হয় না। তখন তাকেই আমাদের একমাত্র গতি, একমাত্র আশ্রয়, একমাত্র সম্পদ বলে আর জানি নে। সে আমাদের সম্পূর্ণ আশাকে জাগিয়ে তুলে একদিন আমাদের সমস্ত মনকে টেনে নিয়েছিল বলেই যখন আমরা তার সীমা দেখতে পেলুম তখন তার উপরে আমাদের একান্ত অশ্রদ্ধা জন্মাল। তখন প্রকৃতিকে মায়াবিনী বলে গাল দিতে লাগলুম, সংসারকে একেবারে সর্বতোভাবে অস্বীকার করবার জন্যে মনে বিদ্রোহ জন্মাল। তখন বলতে লাগলুম, যার মধ্যে কেবলই আধিব্যাধি মৃত্যু, কেবলই ঘানির বলদের চলার মতো অনন্ত প্রদক্ষিণ

তাকেই আমরা সত্য বলে তারই কাছে আমরা সমস্ত আত্মসমর্পণ করেছিলুম, আমাদের এই মূঢ়তাকে ধিক্।

তখন বাহিরকে নিঃশেষে নিরস্ত করে দিয়ে আমরা অন্তরেই বাসা বাঁধবার চেষ্টা করলুম। যে-বাহিরকে একদিন রাজা বলে মেনেছিলুম তাকে কঠোর যুদ্ধে পরাস্ত করে দিয়ে ভিতরকেই জয়ী বলে প্রচার করলুম। যে-প্রবৃত্তিগুলি এতদিন বাহিরের পেয়াদা হয়ে আমাদের সর্বদাই বাহিরের তাগিদেই ঘুরিয়ে মেরেছিল তাদের জেলে দিয়ে শূলে চড়িয়ে ফাঁসি দিয়ে একেবারে নির্মূল করবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হলুম। যে সমস্ত কষ্ট ও অভাবের ভয় দেখিয়ে বাহির আমাদের দাসত্বের শৃঙ্খল পরিয়েছিল সেই সকল কষ্ট ও অভাবকে আমরা একেবারে তুচ্ছ করে দিলুম। রাজসূয় যজ্ঞ করে উত্তরে দক্ষিণে পূর্বে পশ্চিমে বাহিরের সমস্ত বীর্য ও প্রতাপ রাজাকে হার মানিয়ে জয়পতাকা আমাদের অন্তর-রাজধানীর উচ্চ প্রাসাদ-চূড়ায় উড়িয়ে দিলুম। বাসনার পায়ে শিকল পরিয়ে দিলুম। সুখ-দুঃখকে কড়া পাহারায় রাখলুম, পূর্বতন রাজত্বকে আগাগোড়া বিপর্যস্ত করে তবে ছাড়লুম।

এমনি করে বাহিরের একান্ত প্রভুত্বকে খর্ব করে যখন আমাদের অন্তরে প্রতিষ্ঠা-লাভ করলুম তখন অন্তরতম গুহার মধ্যে এ কী দেখি? এ তো জয়গর্ব নয়। এ তো কেবল আত্মশাসনের অতি-বিস্তারিত সুব্যবস্থা নয়। বাহিরের বন্ধনের স্থানে এ তো কেবল অন্তরের নিয়ম-বন্ধন নয়। শান্তদান্ত সমাহিত নির্মল চিদাকাশে এমন আনন্দ-জ্যোতি দেখলুম যা অন্তর এবং বাহির উভয়কেই উদ্ভাসিত করেছে, অন্তরের নিগূঢ় কেন্দ্র থেকে নিখিল বিশ্বের অভিমুখে যার মঙ্গলরশ্মিরাজি বিস্ফুরিত হচ্ছে।

তখন ভিতর বাহিরের সমস্ত দ্বন্দ্ব দূর হয়ে গেল। তখন জয় নয় তখন আনন্দ, তখন সংগ্রাম নয় তখন লীলা, তখন ভেদ নয় তখন মিলন, তখন আমি নয় তখন সব;—তখন বাহিরও নয়, ভিতরও নয়, তখন ব্রহ্ম—তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ। তখন আত্মা পরমাত্মার পরম মিলনে বিশ্বজগৎ সম্মিলিত। তখন স্বার্থবিহীন করুণা, ঔদ্ধত্যবিহীন ক্ষমা, অহংকারবিহীন প্রেম—তখন জ্ঞানভক্তিকর্মে বিচ্ছেদবিহীন পরিপূর্ণতা।

১০ ফাল্গুন ১৩১৫

বাসনা, ইচ্ছা, মঙ্গল

আমাদের সমস্ত কর্মচেষ্টাকে উদ্বোধিত করে তোলবার ভার সবপ্রথমে বাহিরের উপরেই ন্যস্ত থাকে। সে আমাদের নানা দিক দিয়ে নানা প্রকারে সজাগ চঞ্চল করে তোলে।

সে আমাদের জাগাবে, অভিভূত করবে না এই ছিল কথা। জাগব এইজন্যে যে নিজের চৈতন্যময় কর্তৃত্বকে অনুভব করব—দাসত্বের বোঝা বহন করব বলে নয়।

রাজার ছেলেকে মাস্টারের হাতে দেওয়া হয়েছে। মাস্টার তাকে শিখিয়ে পড়িয়ে তার মূঢ়তা জড়তা দূর করে তাকে মানুষের পূর্ণ অধিকারের যোগ্য করে দেবে, এই ছিল তার সঙ্গে বোঝাপড়া। রাজা যে কারও দাস নয় এই শিক্ষাই হচ্ছে তার সকল শিক্ষার শেষ।

কিন্তু মাস্টার অনেক সময় তার ছাত্রকে এমনি নানা প্রকারে অভিভূত করে ফেলে, মাস্টারের প্রতিই একান্ত নির্ভর করার মূঢ় সংস্কারে এমনি জড়িত করে যে, বড়ো হয়ে সে নামমাত্র সিংহাসনে বসে, সেই মাস্টারই রাজার উপর রাজত্ব করতে থাকে।

তেমনি বাহিরও যখন শিক্ষাদানের চেয়ে বেশি দূরে গিয়ে পৌঁছোয়, যখন সে আমাদের উপর চেপে পড়বার জো করে তখন তাকে একেবারে বরখাস্ত করে দিয়ে তার জাল কাটাবার পন্থাই হচ্ছে শ্রেয়ের পন্থা।

বাহির যে-শক্তি দ্বারা আমাদের চেষ্টাকে বাইরের দিকে টেনে নিয়ে যায় তাকে আমরা বলি বাসনা। এই বাসনায় আমাদের বাইরের বিচিত্র বিষয়ের অনুগত করে। যখন যেটা সামনে এসে দাঁড়ায় তখন সেইটেই আমাদের মনকে কাড়ে—এমনি করে আমাদের মন নানার মধ্যে বিক্ষিপ্ত হয়ে বেড়ায়। নানার সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের এই হচ্ছে সহজ উপায়।

এই বাসনা যদি ঠিক জায়গায় না থামে—এই বাসনার প্রবলতাই যদি জীবনের মধ্যে সব চেয়ে বড়ো হয়ে ওঠে, তাহলে আমাদের জীবন তামসিক অবস্থাকে ছাড়াতে পারে না, আমরা নিজের কর্তৃত্বকে অনুভব ও সপ্রমাণ করতে পারি না। বাহিরই কর্তা হয়ে থাকে, কোনোপ্রকার ঐশ্বর্যলাভ আমাদের পক্ষে অসম্ভব হয়। উপস্থিত অভাব, উপস্থিত আকর্ষণই আমাদের এক ক্ষুদ্রতা থেকে আর-এক ক্ষুদ্রতায় ঘুরিয়ে মারে। এমন অবস্থায় কোনো স্থায়ী জিনিসকে মানুষ গড়ে তুলতে পারে না।

এই বাসনা কোন্ জায়গায় গিয়ে থামে? ইচ্ছায়। বাসনার লক্ষ্য যেমন বাইরের

বিষয়ে, ইচ্ছার লক্ষ্য তেমনি ভিতরের অভিপ্রায়ে। উদ্দেশ্য জিনিসটা অন্তরের জিনিস। ইচ্ছা আমাদের বাসনাকে বাইরের পথে যেমন-তেমন করে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে দেয় না—সমস্ত চঞ্চল বাসনাকে সে একটা কোনো আন্তরিক উদ্দেশ্যের চারিদিকে বেঁধে ফেলে।

তখন কী হয়? না, যে-সকল বাসনা নানা প্রভুর আহ্বানে বাইরে ফিরত, তারা এক প্রভুর শাসনে ভিতরে স্থির হয়ে বসে। অনেক থেকে একের দিকে আসে।

টাকা করতে হবে এই উদ্দেশ্য যদি মনের ভিতরে রাখি তাহলে আমাদের বাসনাকে যেমন-তেমন করে ঘুরে বেড়াতে দিলে চলে না। অনেক লোভ সংবরণ করতে হয়, অনেক আরামের আকর্ষণকে বিসর্জন দিতে হয়, কোনো বাহ্য বিষয় যাতে আমাদের বাসনাকে এই উদ্দেশ্যের আনুগত্য থেকে ভুলিয়ে না নিতে পারে সে-জন্যে সর্বদাই সতর্ক থাকতে হয়। কিন্তু বাসনাই যদি আমাদের ইচ্ছার চেয়ে প্রবল হয় সে যদি উদ্দেশ্যকে না মানতে চায়, তাহলেই বাহিরের কর্তৃত্ব বড়ো হয়ে ভিতরের কর্তৃত্বকে খাটো করে দেয় এবং উদ্দেশ্য নষ্ট হয়ে যায়। তখন মানুষের সৃষ্টিকার্য চলে না। বাসনা যখন তার ভিতরের কূল পরিত্যাগ করে তখন সে সমস্ত ছারখার করে দেয়।

যেখানে ইচ্ছাশক্তি বলিষ্ঠ, কর্তৃত্ব যেখানে অন্তরে সুপ্রতিষ্ঠিত, সেখানে তামসিকতার আকর্ষণ এড়িয়ে মানুষ রাজসিকতার উৎকর্ষ লাভ করে। সেইখানে বিদ্যায় ঐশ্বর্যে প্রতাপে মানুষ ক্রমশই বিস্তার প্রাপ্ত হয়।

কিন্তু বাসনার বিষয় যেমন বহির্জগতে বিচিত্র তেমনি ইচ্ছার বিষয়ও তো অন্তর্জগতে একটি আধটি নয়। কত অভিপ্রায় মনে জাগে তার ঠিক নেই। বিদ্যার অভিপ্রায়, ধনের অভিপ্রায়, খ্যাতির অভিপ্রায় প্রভৃতি সকলেই স্ব স্ব প্রধান হয়ে উঠতে চায়। সেই ইচ্ছার অরাজক বিক্ষিপ্ততাও বাসনার বিক্ষিপ্ততার চেয়ে তো কম নয়।

তা ছাড়া আর একটা জিনিস দেখতে পাই। যখন বাসনার অনুগামী হয়ে বাহিরের সহস্র রাজাকে প্রভু করেছিলুম তখন যে-বেতন মিলত তাতে তো পেট ভরত না। সেইজন্যেই মানুষ বারংবার আক্ষেপ করে বলেছে বাসনার চাকরি বড়ো দুঃখের চাকরি। এতে যে খাদ্য পাই তাতে ক্ষুধা কেবল বাড়িয়ে তোলে এবং সহস্রের টানে ঘুরিয়ে মেরে কোনো জায়গায় শান্তি পেতে দেয় না।

আবার ইচ্ছার অনুগত হয়ে ভিতরের এক-একটি অভিপ্রায়ের পশ্চাতে যখন ঘুরে বেড়াই তখনও তো অনেক সময়ে মেকি টাকায় বেতন মেলে। শ্রান্তি আসে, অবসাদ আসে, দ্বিধা আসে। কেবলই উত্তেজনার মদিরার প্রয়োজন হয়—শান্তিরও অভাব ঘটে। বাসনা যেমন বাহিরের ধন্দায় ঘোরায়, ইচ্ছা তেমনি ভিতরের ধন্দায় ঘুরিয়ে মারে, এবং শেষকালে মজুরি দেবার বেলায় ফাঁকি দিয়ে সারে।

এইজন্য, বাসনাগুলোকে ইচ্ছার শাসনাধীনে ঐক্যবদ্ধ করা যেমন মানুষের ভিতরকার কামনা—সে-রকম না করতে পারলে সে যেমন কোনো সফলতা দেখতে পায় না তেমনি ইচ্ছাগুলিকেও কোনো এক প্রভুর অনুগত করা তার মূলগত প্রার্থনার বিষয়। এ না হলে সে বাঁচে না। বাহিরের শত্রুকে জয় করবার জন্যে ভিতরের যে সৈন্যদল সে জড় করলে নায়কের অভাবে সেই দুর্দান্ত সৈন্যগুলার হাতেই সে মারা পড়বার জো হয়। সৈন্যনায়ক রাজ্য দস্যুবিজিত রাজ্যের চেয়ে ভালো বটে, কিন্তু সেও সুখের রাজ্য নয়। তামসিকতায় প্রবৃত্তির প্রাধান্য, রাজসিকতায় শক্তির প্রাধান্য। এখানে সৈন্যের রাজত্ব।

কিন্তু রাজার রাজত্ব চাই। সেই সরাজকতার পরম কল্যাণ কখন উপভোগ করি? যখন বিশ্বইচ্ছার সঙ্গে নিজের সমস্ত ইচ্ছাকে সংগত করি।

সেই ইচ্ছাই জগতের এক ইচ্ছা, মঙ্গল ইচ্ছা। সে কেবল আমার ইচ্ছা নয়, কেবল তোমার ইচ্ছা নয়, সে নিখিলের মূলগত নিত্যকালের ইচ্ছা। সেই সকলের প্রভু। সেই এক প্রভুর মহারাজ্যে যখন আমার ইচ্ছার সৈন্যদলকে দাঁড় করাই তখনই তারা ঠিক জায়গায় দাঁড়ায়। তখন ত্যাগে ক্ষতি হয় না, ক্ষমায় বীর্যহানি হয় না, সেবায় দাসত্ব হয় না। তখন বিপদ ভয় দেখায় না, শাস্তি দণ্ড দিতে পারে না, মৃত্যু বিভীষিকা পরিহার করে। একদিন সকলে আমাকে পেয়েছিল, অবশেষে রাজাকে যখন পেলুম তখন আমি সকলকে পেলুম। যে বিশ্ব থেকে নিজের অন্তরের দুর্গে আত্মরক্ষার জন্যে প্রবেশ করেছিলুম সেই বিশ্বেই আবার নির্ভয়ে বাহির হলুম, রাজার ভৃত্যকে সেখানে সকলে সমাদর ক'রে গ্রহণ করলে।

১১ ফাল্গুন

স্বাভাবিকী ক্রিয়া

যে এক ইচ্ছা বিশ্বজগতের মূলে বিরাজ করছে তারই সম্বন্ধে উপনিষৎ বলেছেন—স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ। সেই একেরই জ্ঞানক্রিয়া এবং বলক্রিয়া স্বাভাবিকী। তা সহজ, তা স্বাধীন, তার উপরে বাইরের কোনো কৃত্রিম তাড়না নেই।

আমাদের ইচ্ছা যখন সেই মূল মঙ্গলইচ্ছার সঙ্গে সংগত হয় তখন তারও সমস্ত ক্রিয়া স্বাভাবিকী হয়। অর্থাৎ তার সমস্ত কাজকে কোনো প্রবৃত্তির তাড়নার দ্বারা ঘটায় না—অহংকার তাকে ঠেলা দেয় না, লোকসমাজের অনুকরণ তাকে সৃষ্টি করে না,

লোকের খ্যাতিই তাকে কোনোরকমে জীবিত করে রাখে না, সাম্প্রদায়িক দলবদ্ধতার উৎসাহ তাকে শক্তি জোগায় না, নিন্দা তাকে আঘাত করে না, উৎপীড়ন তাকে বাধা দেয় না, উপকরণের দৈন্য তাকে নিরস্ত করে না।

মঙ্গলইচ্ছার সঙ্গে যাদের ইচ্ছা সম্মিলিত হয়েছে তাঁরা যে বিশ্বজগতের সেই অমর শক্তি সেই স্বাভাবিকী ক্রিয়াশক্তিকে লাভ করেন ইতিহাসে তার অনেক প্রমাণ আছে। বুদ্ধদেব কপিলবাস্তুর সুখসমৃদ্ধি পরিহার করে যখন বিশ্বের মঙ্গল প্রচার করতে বেরিয়েছিলেন তখন কোথায় তাঁর রাজকোষ, কোথায় তাঁর সৈন্যসামন্ত। তখন বাহ্য উপকরণে তিনি তাঁর পৈতৃক রাজ্যের দীনতম অক্ষমতম প্রজার সঙ্গে সমান। কিন্তু তিনি যে বিশ্বের মঙ্গলইচ্ছার সঙ্গে তাঁর ইচ্ছাকে যোজিত করেছিলেন সেইজন্য তাঁর ইচ্ছা সেই পরাশক্তির স্বাভাবিকী ক্রিয়াকে লাভ করেছিল। সেইজন্যে কত শত শতাব্দী হল তাঁর মৃত্যু হয়ে গেছে কিন্তু তাঁর মঙ্গলইচ্ছার স্বাভাবিকী ক্রিয়া আজও চলছে। আজও বুদ্ধগয়ার নিভৃত মন্দিরে গিয়ে দেখি সুদূর জাপানের সমুদ্রতীর থেকে সংসারতাপতাপিত জেলে এসে অন্ধকার অর্ধরাত্রে বোধিদ্রুমের সম্মুখে বসে সেই বিশ্বকল্যাণী ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ করে দিয়ে জোড়হাতে বলছে—বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি। আজও তাঁর জীবন মানুষকে জীবন দিচ্ছে, তাঁর বাণী মানুষকে অভয় দান করছে—তাঁর সেই বহু সহস্র বৎসর পূর্বের ইচ্ছার ক্রিয়ার আজও ক্ষয় হল না।

যিশু কোন্ অখ্যাত গ্রামের প্রান্তে কোন্ এক পশুরক্ষণশালায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন, কোনো পণ্ডিতের ঘরে নয়, কোনো রাজার প্রাসাদে নয়, কোনো মহৈশ্বর্যশালী রাজধানীতে নয়, কোনো মহাপুণ্যক্ষেত্র তীর্থস্থানে নয়। যারা মাছ ধরে জীবিকা অর্জন করত এমন কয়েকজন মাত্র ইহুদি যুবক তাঁর শিষ্য হয়েছিল। যেদিন তাঁকে রোমরাজের প্রতিনিধি অনায়াসেই ক্রুসে বিদ্ধ করবার আদেশ দিলেন সেই দিনটি জগতের ইতিহাসে যে চিরদিন ধন্য হবে এমন কোনো লক্ষণ সেদিন কোথাও প্রকাশ পায় নি। তাঁর শত্রুরা মনে করলে সমস্তই চুকে বুকে গেল—এই অতি ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গটিকে একেবারে দলন করে নিবিয়ে দেওয়া গেল। কিন্তু কার সাধ্য নেবায়। ভগবান যিশু তাঁর ইচ্ছাকে তাঁর পিতার ইচ্ছার সঙ্গে যে মিলিয়ে দিয়েছিলেন—সেই ইচ্ছার মৃত্যু নেই, তার স্বাভাবিকী ক্রিয়ার ক্ষয় নেই। অত্যন্ত কৃশ এবং দীনভাবে যা নিজেকে প্রকাশ করেছিল তাই আজ দুই সহস্র বৎসর ধরে বিশ্বজয় করছে।

অখ্যাত অজ্ঞাত দৈন্যদারিদ্র্যের মধ্যেই সেই পরম মঙ্গলশক্তি যে আপনার স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়াকে প্রকাশ করেছেন ইতিহাসে বারংবার তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। হে অবিশ্বাসী, হে ভীরু, হে দুর্বল, সেই শক্তিকে আশ্রয় করো, সেই ক্রিয়াকে

লাভ করো—নিজেকে শক্তিহীন বলে বাইরের দিকে ভিক্ষাপাত্র তুলে ধরে বৃথা আক্ষেপে কাল হরণ ক'রো না—তোমার সামান্ত যা সম্বল আছে তা রাজার ঐশ্বর্যকে লজ্জা দেবে।

১১ ফাল্গুন

পরশরতন

তাঁর নাম পরশরতন
পাপি-হৃদয়-তাপহরণ—
প্রসাদ তাঁর শান্তিরূপ ভকতহৃদয়ে জাগে।

সেই পরশরতনটি প্রাতঃকালের এই উপাসনায় কি আমরা লাভ করি? যদি তার একটি কণামাত্রও লাভ করি তবে কেবল মনের মধ্যে একটি ভাবরসের উপলব্ধির মধ্যেই তাকে আবদ্ধ করে যেন না রাখি। তাকে স্পর্শ করাতে হবে—তার স্পর্শে আমার সমস্ত দিনটিকে সোনা করে তুলতে হবে।

দিনের মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে সেই পরশরতনটি দিয়ে আমার মুখের কথাকে স্পর্শ করাতে হবে, আমার মনের চিন্তাকে স্পর্শ করাতে হবে—আমার সংসারের কর্মকে স্পর্শ করাতে হবে।

তাহলে, যা হালকা ছিল একমুহূর্তে তাতে গৌরব সঞ্চার হবে, যা মলিন ছিল তা উজ্জ্বল হয়ে উঠবে, যার কোনো দাম ছিল না তার মূল্য অনেক বেড়ে যাবে।

আমাদের সকালবেলাকার এই উপাসনাটিকে ছোঁয়াব, সমস্তদিন সব-তাতে ছোঁয়াব—তাঁর নামকে ছোঁয়াব, তাঁর ধ্যানকে ছোঁয়াব, "শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্" এই মন্ত্রটিকে ছোঁয়াব, উপাসনাকে কেবল হৃদয়ের ধন করব না—তাকে চরিত্রের সম্বল করব, তার দ্বারা কেবল স্নিগ্ধতালাভ করব না—প্রতিষ্ঠালাভ করব।

লোকে প্রচলিত আছে প্রভাতের মেঘ ব্যর্থ হয়, তাতে বৃষ্টি দেয় না। আমাদের এই প্রভাতের উপাসনা যেন তেমনি ক্ষণকালের জন্ম আবির্ভূত হয়ে সকালবেলাকার হাওয়াতেই উড়ে চলে না যায়।

কেননা, যখন রৌদ্র প্রখর তখনই স্নিগ্ধতার দরকার, যখন তৃষ্ণা প্রবল তখনই বর্ষণ কাজে লাগে। সংসারের ঘোরতর কাজের মাঝখানেই শুষ্কতা আসে, দাহ জন্মায়। ভিড় যখন খুব জমেছে, কোলাহল যখন খুব জেগেছে তখনই আপনাকে হারিয়ে ফেলি।

আমাদের প্রভাতের সঞ্চয়কে সেই সময়েই যদি কোনো কাজে লাগাতে না পারি, সে যদি দেবত্র সম্পত্তির মতো মন্দিরেরই পূজার্চনার কাজে নিযুক্ত থাকে, সংসারের প্রয়োজনে তাকে খাটাবার জো না থাকে—তাহলে কোনো কাজ হল না।

দিনের মধ্যে এক-একটা সময় আছে যে সময়টা অত্যন্ত নীরস অত্যন্ত অনুদার। যে সময়ে ভূমা সকলের চেয়ে প্রচ্ছন্ন থাকেন—যে সময়ে, হয় আমরা একান্তই আপিসের জীব হয়ে উঠি, নয়তো আহার-পরিপাকের জড়তায় আমাদের অন্তরাত্মার উজ্জ্বলতা অত্যন্ত ম্লান হয়ে আসে, সেই শুষ্কতা ও জড়ত্বের আবেশকালে তুচ্ছতার আক্রমণকে আমরা যেন প্রশ্রয় না দিই—আত্মার মহিমাকে তখনও যেন প্রত্যক্ষগোচর করে রাখি। যেন তখনই মনে পড়ে আমরা দাঁড়িয়ে আছি ভূর্ভুবঃস্বর্লোকে, মনে পড়ে যে অনন্ত চৈতন্যস্বরূপ এই মুহূর্তে আমাদের অন্তরে চৈতন্য বিকীর্ণ করছেন, মনে পড়ে যে সেই শুদ্ধং অপাপবিদ্ধং এই মুহূর্তে আমাদের হৃদয়ের মধ্যে অধিষ্ঠিত হয়ে আছেন। সমস্ত হাস্যালাপ, সমস্ত কাজকর্ম, সমস্ত চাঞ্চল্যের অন্তরতম মূলে যেন একটি অবিচলিত পরিপূর্ণতার উপলব্ধি কখনো না সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন হয়ে যায়।

তাই বলে একথা যেন কেউ না মনে করেন যে, সংসারের সমস্ত হাসিগল্প সমস্ত আমোদ-আহ্লাদকে একেবারে বিসর্জন দেওয়াই সাধনা। যার সঙ্গে আমাদের যেটুকু স্বাভাবিক সম্বন্ধ আছে তাকে রক্ষা না করলেই সে আমাদের অস্বাভাবিক রকম করে পেয়ে বসে—ত্যাগ করবার কৃত্রিম চেষ্টাতেই ফাঁস আরও বেশি করে আঁট হয়ে ওঠে। স্বভাবত যে জিনিসটা বাইরের ক্ষণিক জিনিস, ত্যাগের চেষ্টায় অনেক সময় সেইটাই আমাদের অন্তরের ধ্যানের সামগ্রী হয়ে দাঁড়ায়।

ত্যাগ করব না, রক্ষা করব, কিন্তু ঠিক জায়গায় রক্ষা করব। ছোটোকে বড়ো করে তুলব না, শ্রেয়কে প্রেমের আসনে বসতে দেব না এবং সকল সময়ে সকল কর্মেই অন্তরের গূঢ় কক্ষের অচল দরবারে উপাসনাকে চলতে দেব। তিনি নেই এমন কথাটাকে কোনো সময়েই কোনোমতেই মনকে বুঝতে দেব না—কেননা সেটা একেবারেই মিথ্যা কথা।

প্রভাতে একান্ত ভক্তিতে তাঁর চরণের ধূলি মনের ভিতরে তুলে নিয়ে যাও—সেই আমাদের পরশরতন। আমাদের হাসিখেলা আমাদের কাজকর্ম আমাদের বিষয়-আশয় যা কিছু আছে তার উপর সেই ভক্তি ঠেকিয়ে দাও। আপনিই সমস্ত বড়ো হয়ে উঠবে, সমস্ত পবিত্র হয়ে উঠবে, সমস্তই তাঁর সম্মুখে উৎসর্গ করে দেবার যোগ্য হয়ে দাঁড়াবে।

১২ ফাল্গুন

অভ্যাস

যিনি পরম চৈতন্যস্বরূপ তাঁকে আমরা নির্মল চৈতন্যের দ্বারাই অন্তরাত্মার মধ্যে উপলব্ধি করব এই রয়েছে কথা। তিনি আর কোনোরকমে সস্তায় আমাদের কাছে ধরা দেবেন না—এতে যতই বিলম্ব হ'ক। সেইজন্যেই তাঁর দেখা দেওয়ার অপেক্ষায় কোনো কাজ বাকি নেই—আমাদের আহার ব্যবহার প্রাণন মনন সমস্তই চলছে। আমাদের জীবনের যে বিকাশ তাঁর দর্শনে গিয়ে পরিসমাপ্ত সে ধীরে ধীরে হ'ক বিলম্বে হ'ক, সেজন্যে তিনি কোনো অস্ত্রধারী পেয়াদাকে দিয়ে তাগিদ পাঠাচ্ছেন না। সেটি একটি পরিপূর্ণ সামগ্রী কি না, অনেক রৌদ্রবৃষ্টির পরম্পরায়, অনেক দিন ও রাত্রির শুশ্রূষায় তার হাজারটি দল একটি বৃন্তে ফুটে উঠবে।

সেইজন্যে মাঝে মাঝে আমার মনে এই সংশয়টি আসে যে, এই যে আমরা প্রাতঃকালে উপাসনার জন্যে অনেকে সমবেত হয়েছি, এখানে আমরা অনেক সময়েই অনেকেই আমাদের সম্পূর্ণ চিত্তটিকে তো আনতে পারি নে—তবে এ-কাজটি কি আমাদের ভালো হচ্ছে? নির্মল চৈতন্যের স্থানে অচেতনপ্রায় অভ্যাসকে নিযুক্ত করায় আমরা কি অন্যায় করছি নে?

আমার মনে এক-এক সময় অত্যন্ত সংকোচ বোধ হয়। মনে ভাবি যিনি আপনাকে প্রকাশ করবার জন্যে আমাদের ইচ্ছার উপর কিছুমাত্র জবরদস্তি করেন না তাঁর উপাসনায় পাছে আমরা লেশমাত্র অনিচ্ছাকে নিয়ে আসি, পাছে এখানে আসবার সময় কিছুমাত্র ক্লেশ বোধ করি, কিছুমাত্র আলস্যের বাধা ঘটে, পাছে তখন কোনো আমোদের বা কাজের আকর্ষণে আমাদের ভিতরে ভিতরে একটা বিমুখতার সৃষ্টি করে। উপাসনায় শৈথিল্য করলে, অন্য যাঁরা উপাসনা করেন তাঁরা যদি কিছু মনে করেন, যদি কেউ নিন্দা করেন বা বিরক্ত হন, পাছে এই তাগিদটাই সকলের চেয়ে বড়ো হয়ে ওঠে। সেই জন্যে এক-এক সময়ে বলতে ইচ্ছা করে মন সম্পূর্ণ অনুকূল সম্পূর্ণ ইচ্ছুক না হলে এ জায়গায় কেউ এসো না।

কিন্তু সংসারটা যে কী জিনিস তা যে জানি। এ-সংসারের অনেকটা পথ মাড়িয়ে আজ বার্ধক্যের দ্বারে এসে উত্তীর্ণ হয়েছি। জানি দুঃখ কাকে বলে, আঘাত কী প্রচণ্ড, বিপদ কেমন অভাবনীয়। যে-সময়ে আশ্রয়ের প্রয়োজন সকলের বেশি সেই সময়ে আশ্রয় কিরূপ দুর্লভ। তিনিহীন জীবন যে অত্যন্ত গৌরবহীন, চারদিকেই তাকে টানাটানি করে মারে। দেখতে দেখতে তার সুর নেবে যায়, তার কথা, চিন্তা, কাজ,

তুচ্ছ হয়ে আসে। সে জীবন যেন অনাবৃত—সে এবং তার বাইরের মাঝখানে কেউ যেন তাকে ঠেকাবার নেই। ক্ষতি একেবারেই তার গায়ে এসে লাগে, নিন্দা একেবারেই তার মর্মে এসে আঘাত করে, দুঃখ কোনো ভাবরসের মাঝখান দিয়ে সুন্দর বা মহৎ হয়ে ওঠে না। সুখ একেবারে মত্ততা এবং শোকের কারণ একেবারে মৃত্যুবাণ হয়ে এসে তাকে বাজে। এ-কথা যখন চিন্তা করে দেখি তখন সমস্ত সংকোচ মন হতে দূর হয়ে যায়—তখন ভীত হয়ে বলি, না, শৈথিল্য করলে চলবে না। একদিনও ভুলব না, প্রতিদিনই তাঁর সামনে এসে দাঁড়াতেই হবে, প্রতিদিন কেবল সংসারকেই প্রশ্রয় দিয়ে তাকেই কেবল বুকের সমস্ত রক্ত খাইয়ে প্রবল করে তুলে নিজেকে এমন অসহায়ভাবে একান্তই তার হাতে আপাদমস্তক সমর্পণ করে দেব না, দিনের মধ্যে অন্তত একবার এই কথাটা প্রত্যহই বলে যেতে হবে তুমি সংসারের চেয়ে বড়ো তুমি সকলের চেয়ে বড়ো।

যেমন করে পারি তেমনি করেই বলব। আমাদের শক্তি ক্ষুদ্র অন্তর্যামী তা জানেন। কোনোদিন আমাদের মনে কিছু জাগে কোনোদিন একেবারেই জাগে না—মনে বিক্ষেপ আসে, মনে ছায়া পড়ে। উপাসনার যে-মন্ত্র আবৃত্তি করি প্রতিদিন তার অর্থ উজ্জ্বল থাকে না। কিন্তু তবু নিষ্ঠা হারাব না। দিনের পর দিন এই দ্বারে এসে দাঁড়াব, দ্বার খুলুক আর নাই খুলুক। যদি এখানে আসতে কষ্ট বোধ হয় তবে সেই কষ্টকে অতিক্রম করেই আসব। যদি সংসারের কোনো বন্ধন মনকে টেনে রাখতে চায় তবে ক্ষণকালের জন্যে সেই সংসারকে এক পাশে ঠেলে রেখেই আসব।

কিছু না-ই জোটে যদি তবে এই অভ্যাসটুকুকেই প্রত্যহ তাঁর কাছে এনে উপস্থিত করব। সকলের চেয়ে যেটা কম দেওয়া অন্তত সেই দেওয়াটাও তাঁকে দেব। সেইটুকু দিতেও যে বাধাটা অতিক্রম করতে হয় যে জড়তা মোচন করতে হয় সেটাতেও যেন কুণ্ঠিত না হই। অত্যন্ত দরিদ্রের যে রিক্তপ্রায় দান সেও যেন প্রত্যহই নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁর কাছে এনে দিতে পারি। যাঁকে সমস্ত জীবন উৎসর্গ করবার কথা, দিনের সকল কর্মে সকল চিন্তায় যাঁকে রাজা করে বসিয়ে রাখতে হবে, তাঁকে কেবল মুখের কথা দেওয়া, কিন্তু তাও দিতে হবে। আগাগোড়া সমস্তই কেবল সংসারকে দেব আর তাঁকে কিছুই দেব না, তাঁকে প্রত্যেক দিনের মধ্যে একান্তই "না" করে রেখে দেব, এ তো কোনোমতেই হতে পারে না।

দিনের আরম্ভে প্রভাতের অরুণোদয়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে এই কথাটা একবার স্বীকার করে যেতেই হবে যে, পিতা নোঽসি—তুমি পিতা, আছ। আমি স্বীকার করছি তুমি পিতা। আমি স্বীকার করছি তুমি আছ। একবার বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মাঝখানে

দাঁড়িয়ে কেবল এই কথাটি বলে যাবার জন্যে তোমাদের সংসার ফেলে চলে আসতে হবে। কেবল সেইটুকু সময় থাক্ তোমাদের কাজকর্ম, থাক্ তোমাদের আমোদ-প্রমোদ। আর সমস্ত কথার উপরে এই কথাটি বলে যাও—পিতা নোঽসি।

তাঁর জগৎসংসারের কোলে জন্মে, তাঁর চন্দ্রসূর্যের আলোর মধ্যে চোখ মেলে জাগরণের প্রথম মুহূর্তে এই কথাটি তোমাদের জোড়হাতে প্রত্যহ বলে যেতে হবে: ওঁ পিতা নোঽসি। এ আমি তোমাদের জোর করেই বলে রাখছি। এত বড়ো বিশ্বে এবং এমন মহৎ মানবজীবনে তাঁকে কোনো জায়গাতেই একটুও স্বীকার করবে না—এ তো কিছুতেই হতে পারবে না। তোমার অপরিস্ফুট চেতনাকেও উপহার দাও, তোমার শূন্য হৃদয়কেও দান করো, তোমার শুষ্কতা রিক্ততাকেই তাঁর সম্মুখে ধরো, তোমার সুগভীর দৈন্যকেই তাঁর কাছে নিবেদন করো। তাহলেই যে দয়া অযাচিতভাবে প্রতিমুহূর্তেই তোমার উপরে বর্ষিত হচ্ছে সেই দয়া ক্রমশই উপলব্ধি করতে থাকবে। এবং প্রত্যহ ওই যে অল্প একটু বাতায়ন খুলবে সেইটুকু দিয়েই অন্তর্যামীর প্রেমমুখের প্রসন্ন হাস্য প্রত্যহই তোমার অন্তরকে জ্যোতিতে অভিষিক্ত করতে থাকবে।

১৩ ফাল্গুন

প্রার্থনা

হে সত্য, আমার এই অন্তরাত্মার মধ্যেই যে তুমি অন্তহীন সত্য—তুমি আছ। এই আত্মায় তুমি যে আছ, দেশে কালে গভীরতায় নিবিড়তায় তার আর সীমা নাই। এই আত্মা অনন্তকাল এই মন্ত্রটি বলে আসছে—সত্যং। তুমি আছ, তুমিই আছ। আত্মার অতলস্পর্শ গভীরতা হতে এই যে মন্ত্রটি উঠছে, তা যেন আমার মনের এবং সংসারের অন্যান্য সমস্ত শব্দকে ভরে সকলের উপরে জেগে ওঠে—সত্যং সত্যং সত্যং। সেই সত্যে আমাকে নিয়ে যাও—সেই আমার অন্তরাত্মার গূঢ়তম অনন্ত সত্যে—যেখানে "তুমি আছ" ছাড়া আর কোনো কথাটি নেই।

হে জ্যোতির্ময়, আমার চিদাকাশে তুমি জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ। তোমার অনন্ত আকাশের কোটি সূর্যলোকে যে জ্যোতি কুলোয় না, সেই জ্যোতিতে আমার অন্তরাত্মা চৈতন্যে সমুদ্ভাসিত। সেই আমার অন্তরাকাশের মাঝখানে আমাকে দাঁড় করিয়ে আমাকে আদ্যোপান্ত প্রদীপ্ত পবিত্রতায় ক্ষালন করে ফেলো, আমাকে জ্যোতির্ময় করো, আমার অন্য সমস্ত পরিবেষ্টনকে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে সেই শুভ্র শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ জ্যোতিঃশরীরকে লাভ করি।

হে অমৃতস্বরূপ, আমার অন্তরাত্মার নিভৃত ধামে তুমি আনন্দং পরমানন্দং। সেখানে কোনোকালেই তোমার মিলনের অন্ত নেই। সেখানে তুমি কেবল আছ না তুমি মিলেছ, সেখানে তোমার কেবল সত্য নয় সেখানে তোমার আনন্দ। সেই তোমার অনন্ত আনন্দকে তোমার জগৎসংসারে ছড়িয়ে দিয়েছ। গতিতে প্রাণে সৌন্দর্যে সে আর কিছুতে ফুরোয় না, অনন্ত আকাশে তাকে আর কোথাও ধরে না। সেই তোমার সীমাহীন আনন্দকেই আমার অন্তরাত্মার উপরে স্তব্ধ করে রেখেছি। সেখানে তোমার সৃষ্টির কাউকে প্রবেশ করতে দাও নি; সেখানে আলোক নেই, রূপ নেই, গতি নেই; কেবল নিস্তব্ধ নিবিড় তোমার আনন্দ রয়েছে। সেই আনন্দধামের মাঝখানে দাঁড়িয়ে একবার ডাক দাও প্রভু। আমি যে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছি, তোমার অমৃত-আহ্বান আমার সংসারের সর্বত্র ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হক, অতি দূরে চলে যাক, অতি গোপনে প্রবেশ করুক। সকল দিক থেকেই আমি যেন যাই যাই বলে সাড়া দিই। ডাক দাও— ওরে আয় আয়, ওরে ফিরে আয়, চলে আয়। এই অন্তরাত্মার অনন্ত আনন্দধামে আমার যা-কিছু সমস্তই এক জায়গায় এক হয়ে নিস্তব্ধ হয়ে চুপ করে বসুক, খুব গভীরে খুব গোপনে।

হে প্রকাশ, তোমার প্রকাশের দ্বারা আমাকে একেবারে নিঃশেষ করে ফেলো— আমার আর কিছুই বাকি রেখো না, কিছুই না, অহংকারের লেশমাত্র না। আমাকে একেবারেই তুমিময় করে তোলো। কেবলই তুমি, তুমি, তুমিময়। কেবলই তুমিময় জ্যোতি, কেবলই তুমিময় আনন্দ।

হে রুদ্র, পাপ দগ্ধ হয়ে ভস্ম হয়ে যাক। তোমার প্রচণ্ড তাপ বিকীর্ণ করো। কোথাও কিছু লুকিয়ে না থাকুক, শিকড় থেকে বীজভরা ফল পর্যন্ত সমস্ত দগ্ধ হয়ে যাক। এ যে বহুদিনের বহু দুশ্চেষ্টার ফল, শাখায় গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে পাতার আড়ালে আড়ালে ফলে রয়েছে। শিকড় হৃদয়ের রসাতল পর্যন্ত নেমে গিয়েছে। তোমার রুদ্রতাপের এমন ইন্ধন আর নেই। যখন দগ্ধ হবে তখনই এ সার্থক হতে থাকবে। তখন আলোকের মধ্যে তার অন্ত হবে।

তার পরে হে প্রসন্ন, তোমার প্রসন্নতা আমার সমস্ত চিন্তায় বাক্যে কর্মে বিকীর্ণ হতে থাক্। আমার সমস্ত শরীরের রোমে রোমে সেই তোমার পরমপুলকময় প্রসন্নতা প্রবেশ করে এই শরীরকে ভাগবতী তনু করে তুলুক। জগতে এই শরীর তোমার প্রসাদ-অমৃতের পবিত্র পাত্র হয়ে বিরাজ করুক। তোমার সেই প্রসন্নতা আমার বুদ্ধিকে প্রশান্ত করুক, হৃদয়কে পবিত্র করুক, শক্তিকে মঙ্গল করুক। তোমার প্রসন্নতা তোমার বিচ্ছেদসংকট থেকে আমাকে চিরদিন রক্ষা করুক। তোমার প্রসন্নতা আমার চিরন্তন

অন্তরের ধন হয়ে আমার চিরজীবনপথের সম্বল হয়ে থাক্‌। আমারই অন্তরাত্মার মধ্যে তোমার যে সত্য, যে জ্যোতি, যে অমৃত, যে প্রকাশ রয়েছে তোমার প্রসন্নতার দ্বারা যখন তাকে উপলব্ধি করব তখনই রক্ষা পাব।

১৪ ফাল্গুন

বৈরাগ্য

যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন—

ন বা অরে পুত্রস্য কামায় পুত্রঃ প্রিয়ো ভবতি—আত্মনস্তু কামায় পুত্রঃ প্রিয়ো ভবতি।

অর্থাৎ

পুত্রকে কামনা করছ বলেই যে পুত্র তোমার প্রিয় হয় তা নয় কিন্তু আত্মাকেই কামনা করছ বলে পুত্র প্রিয় হয়।

এর তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, আত্মা পুত্রের মধ্যে আপনাকেই অনুভব করে বলেই পুত্র তার আপন হয়, এবং সেইজন্যেই পুত্রে তার আনন্দ।

আত্মা যখন স্বার্থ এবং অহংকারের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ হয়ে নিরবচ্ছিন্ন একলা হয়ে থাকে তখন সে বড়োই ম্লান হয়ে থাকে, তখন তার সত্য স্ফূর্তি পায় না। এইজন্যেই আত্মা পুত্রের মধ্যে মিত্রের মধ্যে নানা লোকের মধ্যে নিজেকে উপলব্ধি করে আনন্দিত হয়ে থাকে কারণ তার সত্য পূর্ণতর হয়ে উঠতে থাকে।

ছেলেবেলায় বর্ণপরিচয়ে যখন ক খ গ প্রত্যেক অক্ষরকে স্বতন্ত্র করে শিখছিলুম তখন তাতে আনন্দ পাইনি। কারণ, এই স্বতন্ত্র অক্ষরগুলির কোনো সত্য পাচ্ছিলুম না। তার পরে অক্ষরগুলি যোজনা করে যখন "কর" "খল" প্রভৃতি পদ পাওয়া গেল তখন অক্ষর আমার কাছে তার তাৎপর্য প্রকাশ করাতে আমার মন কিছু কিছু সুখ অনুভব করতে লাগল। কিন্তু এরকম বিচ্ছিন্ন পদগুলি চিত্তকে যথেষ্ট রস দিতে পারে না—এতে ক্লেশ এবং ক্লান্তি এসে পড়ে। তার পরে আজও আমার স্পষ্ট মনে আছে যেদিন "জল পড়ে" "পাতা নড়ে" বাক্যগুলি পড়েছিলুম সেদিন ভারি আনন্দ হয়েছিল, কারণ, শব্দগুলি তখন পূর্ণতর অর্থে ভরে উঠল। এখন শুদ্ধমাত্র "জল পড়ে" "পাতা নড়ে" আবৃত্তি করতে মনে সুখ হয় না বিরক্তিবোধ হয়, এখন ব্যাপক অর্থযুক্ত বাক্যাবলীর মধ্যেই শব্দবিন্যাসকে সার্থক বলে উপলব্ধি করতে চাই।

বিচ্ছিন্ন আত্মা তেমনি বিচ্ছিন্ন পদের মতো। তার একার মধ্যে তার তাৎপর্যকে পূর্ণরূপে পাওয়া যায় না। এইজন্যেই আত্মা নিজের সত্যকে নানার মধ্যে উপলব্ধি করতে চেষ্টা করে। সে যখন আত্মীয় বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে যুক্ত হয় তখন সে নিজের

সার্থকতার একটা রূপ দেখতে পায়—সে যখন আত্মীয় পরকীয় বহুতর লোককে আপন করে জানে তখন সে আর ছোটো আত্মা থাকে না, তখন সে মহাত্মা হয়ে ওঠে।

এর একমাত্র কারণ আত্মার পরিপূর্ণ সত্যটি আছে পরমাত্মার মধ্যে। আমার আমি সেই একমাত্র মহা আমিতেই সার্থক। এইজন্যে সে জেনে এবং না জেনেও সেই পরম আমিকেই খুঁজছে। আমার আমি যখন পুত্রের আমিতে গিয়ে সংযুক্ত হয় তখন কী ঘটে? তখন, যে পরম আমি আমার আমির মধ্যেও আছেন পুত্রের আমির মধ্যেও আছেন তাঁকে উপলব্ধি করে আমার আনন্দ হয়।

কিন্তু তখন মুশকিল হয় এই যে, আমার আমি এই উপলক্ষে যে সেই বড়ো আমির কাছেই একটুখানি এগোল তা সে স্পষ্ট বুঝতে পারে না। সে মনে করে সে পুত্রকেই পেল এবং পুত্রের কোনো বিশেষ গুণবশতই পুত্র আনন্দ দেয়। সুতরাং এই আসক্তির বন্ধনেই সে আটকা পড়ে যায়। তখন সে পুত্র-মিত্রকে কেবলই জড়িয়ে বসে থাকতে চায়। তখন সে এই আসক্তির টানে অনেক পাপেও লিপ্ত হয়ে পড়ে।

এইজন্য সত্যজ্ঞানের দ্বারা বৈরাগ্য উদ্রেক করবার জন্যেই যাজ্ঞবল্ক্য বলছেন আমরা যথার্থত পুত্রকে চাই নে আত্মাকেই চাই। এ কথাটিকে ঠিকমতো বুঝলেই পুত্রের প্রতি আমাদের মুগ্ধ আসক্তি দূর হয়ে যায়। তখন উপলক্ষ্যই লক্ষ্য হয়ে আমাদের পথরোধ করতে পারে না।

যখন আমরা সাহিত্যের বৃহৎ তাৎপর্য বুঝে আনন্দ বোধ করতে থাকি, তখন প্রত্যেক কথাটি স্বতন্ত্রভাবে আমি আমি করে আমাদের মনকে আর বাধা দেয় না, প্রত্যেক কথা অর্থকেই প্রকাশ করে নিজেকে নয়। তখন কথা আপনার স্বাতন্ত্র্য যেন বিলুপ্ত করে দেয়।

তেমনি যখন আমরা সত্যকে জানি তখন সেই অখণ্ড সত্যের মধ্যেই সমস্ত খণ্ডতাকে জানি—তারা স্বতন্ত্র হয়ে উঠে আর আমার জ্ঞানকে আটক করে না। এই অবস্থাই বৈরাগ্যের অবস্থা। এই অবস্থায় সংসার আপনাকেই চরম ব'লে আমাদের সমস্ত মনকে কর্মকে গ্রাস করতে থাকে না।

কোনো কাব্যের তাৎপর্যের উপলব্ধি যখন আমাদের কাছে গভীর হয় উজ্জ্বল হয় তখনই তার প্রত্যেক শব্দের সার্থকতা সেই সমগ্র ভাবের মাধুর্যে আমাদের কাছে বিশেষ সৌন্দর্যময় হয়ে ওঠে। তখন যখন ফিরে দেখি দেখতে পাই কোনো শব্দটিই নিরর্থক নয় সমগ্রের রসটি প্রত্যেক পদের মধ্যেই প্রকাশ পাচ্ছে। তখন সেই কাব্যের প্রত্যেক পদটিই আমাদের কাছে বিশেষ আনন্দ ও বিস্ময়ের কারণ হয়ে ওঠে।

তখন তার পদগুলি সমগ্রের উপলব্ধিতে আমাদের বাধা না দিয়ে সহায়তা করে বলেই আমাদের কাছে বড়োই মূল্যবান হয়ে ওঠে।

তেমনি বৈরাগ্যে যখন স্বাতন্ত্র্যের মোহ কাটিয়ে ভূমার মধ্যে আমাদের মহাসত্যের পরিচয় সাধন করিয়ে দেয়, তখন সেই বৃহৎ পরিচয়ের ভিতর দিয়ে ফিরে এসে প্রত্যেক স্বাতন্ত্র্য সেই ভূমার রসে রসপরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। একদিন যাদের বানান করে পড়তে হচ্ছিল, যারা পদে পদে আমাদের পথরোধ করছিল, তারা প্রত্যেকে সেই ভূমার প্রতিই আমাদের বহন করে, রোধ করে না।

তখন যে আনন্দ সেই আনন্দই প্রেম। সেই প্রেমে বেঁধে রাখে না—সেই প্রেমে টেনে নিয়ে যায়। নির্মল নির্বাধ প্রেম। সেই প্রেমই মুক্তি—সমস্ত আসক্তির মৃত্যু। এই মৃত্যুরই সংকারমন্ত্র হচ্ছে—

মধুবাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ
মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ।
মধু নক্তম্ উতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ
মধুমান্নো বনস্পতির্মধুমাং অস্তু সূর্যঃ।

বায়ু মধু বহন করছে, নদীসিন্ধুসকল মধু ক্ষরণ করছে। ওষধি বনস্পতি সকল মধুময় হ'ক, রাত্রি মধু হ'ক, উষা মধু হ'ক, পৃথিবীর ধূলি মধুমৎ হ'ক, সূর্য মধুমান হ'ক।

যখন আসক্তির বন্ধন ছিন্ন হয়ে গেছে তখন জলস্থল-আকাশ, জড়জন্তু মনুষ্য সমস্তই অমৃতে পরিপূর্ণ—তখন আনন্দের অবধি নেই।

আসক্তি আমাদের চিত্তকে বিষয়ে আবদ্ধ করে। চিত্ত যখন সেই বিষয়ের ভিতরে বিষয়াতীত সত্যকে লাভ করে তখন প্রজাপতি যেমন গুটি কেটে বের হয় তেমনি সে বৈরাগ্য দ্বারা আসক্তি বন্ধন ছিন্ন করে ফেলে। আসক্তি ছিন্ন হয়ে গেলেই পূর্ণ সুন্দর প্রেম আনন্দরূপে সর্বত্রই প্রকাশ পায়। তখন, আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি—এই মন্ত্রের অর্থ বুঝতে পারি। যা-কিছু প্রকাশ পাচ্ছে সমস্তই সেই আনন্দরূপ সেই অমৃতরূপ। কোনো বস্তুই তখন আমি প্রকাশ হচ্ছি বলে আর অহংকার করে না প্রকাশ হচ্ছেন কেবল আনন্দ কেবল আনন্দ। সেই প্রকাশের মৃত্যু নেই। মৃত্যু অন্য সমস্তের কিন্তু সেই প্রকাশই অমৃত।

১৫ ফাল্গুন ১৩১৫

বিশ্বাস

সাধনা-আরম্ভে প্রথমেই সকলের চেয়ে একটি বড়ো বাধা আছে—সেইটি কাটিয়ে উঠতে পারলে অনেকটা কাজ এগিয়ে যায়।

সেটি হচ্ছে প্রত্যয়ের বাধা। অজ্ঞাতসমুদ্র পার হয়ে একটি কোনো তীরে গিয়ে ঠেকবই এই নিশ্চিত প্রত্যয়ই হচ্ছে কলম্বসের সিদ্ধির প্রথম এবং মহৎ সম্বল। আরও অনেকেই আটলান্টিক পাড়ি দিয়ে আমেরিকায় পৌঁছোতে পারত কিন্তু তাদের দীনচিত্তে ভরসা ছিল না; তাদের বিশ্বাস উজ্জ্বল ছিল না যে, কূল আছে; এইখানেই কলম্বসের সঙ্গে তাদের পার্থক্য।

আমরাও অধিকাংশ লোক সাধনাসমুদ্রে যে পাড়ি জমাই নে, তার প্রধান কারণ আমাদের অত্যন্ত নিশ্চিত প্রত্যয় জন্মে নি যে সে সমুদ্রের পার আছে। শাস্ত্র পড়েছি, লোকের কথাও শুনেছি, মুখে বলি হাঁ হাঁ বটে বটে, কিন্তু মানবজীবনের যে একটা চরম লক্ষ্য আছে সে-প্রত্যয় নিশ্চিত বিশ্বাসে পরিণত হয় নি। এইজন্য ধর্মসাধনটা নিতান্তই বাহ্যব্যাপার, নিতান্তই দশজনের অনুকরণ মাত্র হয়ে পড়ে। আমাদের সমস্ত আন্তরিক চেষ্টা তাতে উদ্বোধিত হয় নি।

এই বিশ্বাসের জড়তাবশতই লোককে ধর্মসাধনে প্রবৃত্ত করতে গেলে আমরা তাকে প্রতারণা করতে চেষ্টা করি, আমরা বলি এতে পুণ্য হবে। পুণ্য জিনিসটা কী? না, পুণ্য হচ্ছে একটি হ্যাণ্ডনোট যাতে ভগবান আমাদের কাছে ঋণ স্বীকার করেছেন, কোনো একরকম টাকায় তিনি কোনো এক সময়ে সেটা পরিশোধ করে দেবেন।

এই রকম একটা সুস্পষ্ট পুরস্কারের লোভ আমাদের স্থূল প্রত্যয়ের অনুকূল। কিন্তু সাধনার লক্ষ্যকে এইরকম বহির্বিষয় করে তুললে তার পথও ঠিক অন্তরের পথ হয় না, তার লাভও অন্তরের লাভ হয় না। সে একটা পারলৌকিক বৈষয়িকতার সৃষ্টি করে। সেই বৈষয়িকতা অন্যান্য বৈষয়িকতার চেয়ে কোনো অংশে কম নয়।

কিন্তু সাধনার লক্ষ্য হচ্ছে মানবজীবনের চরম লক্ষ্য। সে লক্ষ্য কখনোই বাহিরের কোনো স্থান নয়, যেমন স্বর্গ; বাহিরের কোনো পদ নয়, যেমন ইন্দ্রপদ; এমন কিছুই নয় যাকে দূরে গিয়ে সন্ধান করে বের করতে হবে, যার জন্যে পাণ্ডা পুরোহিতের শরণাপন্ন হতে হবে। এ কিছুতে হতেই পারে না।

মানজীবনের চরম লক্ষ্য কী এই প্রশ্নটি নিজেকে জিজ্ঞাসা করে নিজের কাছ থেকে এর একটি স্পষ্ট উত্তর বের করে নিতে হবে। কারও কোনো শোনা কথায়

এখানে কাজ চলবে না—কেননা এটি কোনো ছোটো কথা নয়, এটি একেবারে শেষ কথা। এটিকে যদি নিজের অন্তরাত্মার মধ্যে না পাই তবে বাইরে খুঁজে পাব না।

এই বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মাঝখানে আমি এসে দাঁড়িয়েছি এটি একটি মহাশ্চর্য ব্যাপার। এর চেয়ে বড়ো ব্যাপার আর কিছু নেই। আশ্চর্য এই আমি এসেছি—আশ্চর্য এই চারিদিক।

এই যে আমি এসে দাঁড়িয়েছি, কেবল খেয়ে ঘুমিয়ে গল্প করে কি এই আশ্চর্যটাকে ব্যাখ্যা করা যায়? প্রবৃত্তির চরিতার্থতাই কি একে প্রতিমুহূর্তে অপমানিত করবে এবং শেষ মুহূর্তে মৃত্যু এসে একে ঠাট্টা করে উড়িয়ে দিয়ে চলে যাবে?

এই ভূর্ভুবঃস্বর্লোকের মাঝখানটিতে দাঁড়িয়ে নিজের অন্তরাকাশের চৈতন্যলোকের মধ্যে নিস্তব্ধ হয়ে নিজেকে প্রশ্ন করো—কেন? এ সমস্ত কী জন্যে? এ প্রশ্নের উত্তর জল-স্থল-আকাশের কোথাও নেই—এ প্রশ্নের উত্তর নিজের অন্তরের মধ্যে নিহিত হয়ে রয়েছে।

এর একমাত্র উত্তর হচ্ছে আত্মাকে পেতে হবে। এ ছাড়া আর দ্বিতীয় কোনো কথা নেই। আত্মাকেই সত্য করে পূর্ণ করে জানতে হবে।

আত্মাকে যেখানে জানলে সত্য জানা হয় সেখানে আমরা দৃষ্টি দিচ্ছি নে। এইজন্যে আত্মাকে জানা বলে যে একটা পদার্থ আছে এই কথাটা আমাদের বিশ্বাসের ক্ষেত্রেই এসে পৌঁছোয় না।

আত্মাকে আমরা সংসারের মধ্যেই জানতে চাচ্ছি। তাকে কেবলই ঘর-দুয়োর ঘটিবাটির মধ্যেই জানছি। তার বেশি তাকে আমরা জানিই নে—এইজন্যে তাকে পাচ্ছি আর হারাচ্ছি, কেবল কাঁদছি আর ভয় পাচ্ছি। মনে করছি এটা না পেলেই আমি মলুম, আর ওটা পেলেই একেবারে ধন্য হয়ে গেলুম। এটাকে এবং ওটাকেই প্রধান করে জানছি, আত্মাকে তার কাছে খর্ব করে সেই প্রকাণ্ড দৈন্যের বোঝাকেই ঐশ্বর্যের গর্বে বহন করছি।

আত্মাকে সত্য করে জানলেই আত্মার সমস্ত ঐশ্বর্য লাভ হয়। মৃত্যুর সামগ্রীর মধ্যে অহরহ তাকে জড়িত করে তাকে শোকের বাষ্পে ভয়ের অন্ধকারে লুপ্তপ্রায় করে দেখার দুর্দিন কেটে যায়। পরমাত্মার মধ্যেই তার পরিপূর্ণ সত্য পরিপূর্ণ স্বরূপ প্রকাশ পায়—সংসারের মধ্যে নয়, বিষয়ের মধ্যে নয়, তার নিজের অহংকারের মধ্যে নয়।

আত্মা সত্যের পরিপূর্ণতার মধ্যে নিজেকে জানবে, সেই পরম উপলব্ধি দ্বারা সে বিনাশকে একেবারে অতিক্রম করবে। সে জ্ঞানজ্যোতির নির্মলতার মধ্যেই নিজেকে

জানবে। কামক্রোধলোভ যে-সমস্ত বিকারের অন্ধকার রচনা করে, তার থেকে আত্মা বিশুদ্ধ শুভ্র নির্মুক্ত পবিত্রতার মধ্যে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠবে এবং সর্বপ্রকার আসক্তির মৃত্যুবন্ধন থেকে প্রেমের অমৃতলোকে মুক্তিলাভ করে সে নিজেকে অমর বলেই জানবে। সে জানবে কার প্রকাশের মধ্যে তার প্রকাশ সত্য—সেই আবিঃ সেই প্রকাশস্বরূপকেই সে আত্মার পরম প্রকাশ বলে নিজের সমস্ত দৈন্য দূর করে দেবে এবং অন্তরে বাহিরে সর্বত্রই একটি প্রসন্নতা লাভ করে সে স্পষ্ট জানতে পারবে যে চিরদিনের জন্য রক্ষা পেয়েছে। সমস্ত ভয় হতে, সমস্ত শোক হতে, সমস্ত ক্ষুদ্রতা হতে রক্ষা পেয়েছে।

আত্মাকে পরমাত্মার মধ্যে লাভ করাই যে জীবনের চরম লক্ষ্য এই লক্ষ্যটিকে একান্ত প্রত্যয়ের সঙ্গে একাগ্রচিত্তে স্থির করে নিতে হবে। দেখো, দেখো, নিরীক্ষণ করে দেখো, সমস্ত চেষ্টাকে শুদ্ধ করে সমস্ত মনকে নিবিষ্ট করে নিরীক্ষণ করে দেখো। একটি চাকা কেবলই ঘুরছে তারই মাঝখানে একটি বিন্দু স্থির হয়ে আছে। সেই বিন্দুটিকে অর্জুন বিদ্ধ করে দ্রৌপদীকে পেয়েছিলেন। তিনি চাকার দিকে মন দেন নি বিন্দুর দিকেই সমস্ত মন সংহত করেছিলেন। সংসারের চাকা কেবলই ঘুরছে, লক্ষ্যটি তার মাঝখানে ধ্রুব হয়ে আছে। সেই ধ্রুবের দিকেই মন দিয়ে লক্ষ্য স্থির করতে হবে, চলার দিকে নয়। লক্ষ্যটি যে আছে সেটা নিশ্চয় করে দেখে নিতে হবে—চাকার ঘূর্ণাগতির মধ্যে দেখা বড়ো শক্ত—কিন্তু সিদ্ধি যদি চাই প্রথমে লক্ষ্যটিকে স্থির যেন দেখতে পারি।

১৬ ফাল্গুন ১৩১৫

সংহরণ

আমাদের সাধনার দ্বিতীয় বড়ো বাধা হচ্ছে সাধনার অনভ্যাস। কোনো রকম সাধনাতেই হয়তো আমাদের অভ্যাস হয় নি। যখন যেটা আমাদের সম্মুখে এসেছে সেইটের মধ্যেই হয়তো আমরা আকৃষ্ট হয়েছি, যেমন-তেমন করে ভাসতে ভাসতে যেখানে সেখানে ঠেকতে ঠেকতে আমরা চলে যাচ্ছি। সংসারের স্রোত আমাদের বিনা চেষ্টাতেই চলছে বলেই আমরা চলছি—আমাদের দাঁড়ও নেই, হালও নেই, পালও নেই।

কোনো একটি উদ্দেশ্যের একান্ত অনুগত করে শক্তিকে প্রবৃত্তিকে চতুর্দিক হতে সংগ্রহ করে আনা আমরা চর্চাই করি নি। এইজন্যে তারা সকলেই হাতের বার হয়ে যাবার জো হয়েছে। কে কোথায় যে আছে তার ঠিকানা নেই—ডাক দিলেই যে ছুটে

আসবে এমন সম্ভাবনা নেই। যে সব খাদ্য তাদের অভ্যস্ত এবং রুচিকর তারই প্রলোভন পেলে তবেই তারা আপনি জড় হয় নইলে কিছুতেই নয়।

নিজেকে চারিদিকে কেবল ছড়াছড়ি করাটাই অভ্যাস হয়ে গেছে। চিন্তাও ছড়িয়ে পড়ে, কর্মও এলিয়ে যায়, কিছুই আঁট বাঁধে না।

এরকম অবস্থায় যে কেবল সিদ্ধি নেই তা নয়, সত্যকার সুখও নেই। এতে আছে কেবল জড়তার তামসিক আবেশমাত্র।

কারণ, যখন আমাদের শক্তিকে প্রবৃত্তিকে কোনো উদ্দেশ্যের সঙ্গে যুক্ত করে দিই তখন সেই উদ্দেশ্যই তাদের বহন করে নিয়ে চলে। তখন তাদের ভার আর আমাদের নিজের ঘাড়ে পড়ে না। নতুবা তাদের বহন করে একবার এর উপর রাখছি একবার তার উপর রাখছি এমনি করে কেবলই টানাটানি করে নিয়ে বেড়াতে হয়। যখন কোথাও নামিয়ে রাখবার কোনো উপায় না পাই তখন কৃত্রিম উপায় সৃষ্টি করতে থাকি। কতই বাজে খেলা, বাজে আমোদ, বাজে উপকরণ। অবশেষে সেই কৃত্রিম আয়োজনগুলোও দ্বিতীয় বোঝা হয়ে আমাদের চতুর্দিকে চেপে ধরে। এমনি করে জীবনের ভার কেবলই জমে উঠতে থাকে, জীবনান্তকাল পর্যন্ত কোনোমতেই তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাই নে।

তাই বলছিলুম কেবলমাত্র সাধনার অবস্থাতেই একটা আনন্দ আছে সিদ্ধির কথা দূরে থাক্। মহৎলক্ষ্য অনুসরণে নিজের বিক্ষিপ্ততাকে একাগ্র করে এনে তাকে এক পথে চালনা করলে তাতেই যেন প্রাণ বেঁচে যায়। যেটুকু সচেষ্টতা থাকলে আমরা সাধনাকে আনন্দ বলে কোমর বেঁধে বক্ষ প্রসারিত করে প্রবৃত্ত হতে পারি সেটুকুও যদি আমাদের ভিতর থেকে খয়ে গিয়ে থাকে তবে বড়ো বিপদ। যেমন করে হ'ক, বারংবার স্খলিত হয়েও সেই সমস্ত শক্তিকে একাগ্র করবার চেষ্টাকে শক্ত করে তুলতে হবে। শিশু যেমন পড়তে পড়তে আঘাত পেতে পেতে চলতে শেখে তেমনি করেই তাকে চলতে শেখাতে হবে। কেননা সিদ্ধিলাভে প্রথমে লক্ষ্যটা যে সত্য সেই বিশ্বাসটি জাগানো চাই, তার পরে লক্ষ্যটি বাইরে না ভিতরে, পরিধিতে না কেন্দ্রে সেটি জানা চাই, তার পরে চাই সোজা পথ বেয়ে চলতে শেখা। স্থৈর্য এবং গতি দুই চাই। বিশ্বাসে চিত্ত স্থির হবে—এবং সাধনায় চেষ্টা গতি লাভ করবে।

১৬ ফাল্গুন ১৩১৫

নিষ্ঠা

যখন সিদ্ধির মূর্তি কিছু পরিমাণে দেখা দেয় তখন আনন্দে আমাদের আপনি টেনে নিয়ে চলে—তখন থামায় কার সাধ্য। তখন শ্রান্তি থাকে না, দুর্বলতা থাকে না।

কিন্তু সাধনার আরম্ভেই সেই সিদ্ধির মূর্তি তো নিজেকে এমন করে দূর থেকেও প্রকাশ করে না। অথচ পথটিও তো সুগম পথ নয়। চলি কিসের জোরে?

এই সময়ে আমাদের চালাবার ভার যিনি নেন তিনিই নিষ্ঠা। ভক্তি যখন জাগে, হৃদয় যখন পূর্ণ হয় তখন তো আর ভাবনা থাকে না, তখন তো পথকে আর পথ বলেই জ্ঞান হয় না, তখন একেবারে উড়ে চলি। কিন্তু ভক্তি যখন দূরে, হৃদয় যখন শূন্য সেই অত্যন্ত দুঃসময়ে আমাদের সহায় কে?

তখন আমাদের একমাত্র সহায় নিষ্ঠা। শুষ্ক চিত্তের মৃতভারকে সেই বহন করতে পারে।

মরুভূমির পথে যাদের চলতে হয় তাদের বাহন হচ্ছে উট। অত্যন্ত শক্ত সবল বাহন—এর কিছুমাত্র শৌখিনতা নেই। খাদ্য পাচ্ছে না তবু চলছে। পানীয় রস পাচ্ছে না তবু চলছে। বালি তপ্ত হয়ে উঠেছে তবু চলছে, নিঃশব্দে চলছে। যখন মনে হয় সামনে বুঝি এ মরুভূমির অন্ত নেই, বুঝি মৃত্যু ছাড়া আর গতি নেই তখনও তার চলা বন্ধ হয় না।

তেমনি শুষ্কতা রিক্ততার মরুপথে কিছু না খেয়ে কিছু না পেয়েও আমাদের চালিয়ে নিয়ে যেতে পারে সে কেবল নিষ্ঠা—তার এমনি শক্ত প্রাণ যে নিন্দাগ্লানির ভিতর থেকে কাঁটাগুল্মের মধ্যে থেকেও সে নিজের খাদ্য সংগ্রহ করে নিতে পারে। যখন মরুবায়ুর মৃত্যুময় ঝঞ্ঝা উন্মত্তের মতো ছুটে আসে, তখন সে ধুলোর উপর মাথা সম্পূর্ণ নত করে ঝড়কে মাথার উপর দিয়ে চলে যেতে দেয়। তার মতো এমন ধীর সহিষ্ণু এমন অধ্যবসায়ী কে আছে?

একঘেয়ে একটানা প্রান্তর—মাঝে মাঝে কেবল কল্পনার মরীচিকা পথ ভোলাতে আসে। সার্থকতার বিচিত্র রূপ ক্ষণে ক্ষণে দেখা দেয় না। মনে হয় যেন কালও যেখানে ছিলুম আজও সেখানেই আছি। মন দিতে চাই, মন ঘুরে বেড়ায়; হৃদয়কে ডাকাডাকি করি, হৃদয় সাড়া দেয় না। কেবলই মনে হয় ব্যর্থ উপাসনার চেষ্টায় ক্লিষ্ট হচ্ছি। কিন্তু সেই ব্যর্থ উপাসনার ভয়ানক ভার বহন করে নিষ্ঠা প্রত্যেক দিনই চলতে পারে—দিনের পর দিন, দিনের পর দিন।

অগ্রসর হচ্ছেই অগ্রসর হচ্ছেই—প্রতিদিন যে গম্যস্থানের কিছু কিছু করে কাছে আসছে তাতে সন্দেহমাত্র নেই। ওই দেখো হঠাৎ একদিন কোথা হতে ভক্তির ওয়েসিস দেখা দেয়—সুদূরপ্রসারিত দগ্ধ পাণ্ডুরতার মধ্যে মধুফলগুচ্ছপূর্ণ খর্জুরকুঞ্জের সুস্নিগ্ধ শ্যামলতা। সেই নিভৃত ছায়াতলে শীতল জলের উৎস বয়ে যাচ্ছে। সেই জল পান করে তাতে স্নান করে ছায়ায় বিশ্রাম করে আবার পথে যাত্রা করি। কিন্তু ভক্তির সেই মধুরতা সেই শীতল সরসতা তো বরাবর সঙ্গে সঙ্গে চলে না। তখন আবার সেই কঠিন শুষ্ক অশ্রান্ত নিষ্ঠা। তার একটি গুণ আছে, ভক্তির জল যদি সে কোনো সুযোগে একদিন পান করতে পায় তবে সে অনেকদিন পর্যন্ত তাকে ভিতরের গোপন আধারে জমিয়ে রাখতে পারে। ঘোরতর নীরসতার দিনেও সেই তার পিপাসার সম্বল।

সাধনায় যাঁকে পাওয়া যায় তাঁর প্রতি ভক্তিকেই আমরা ভক্তি বলি, কিন্তু নিষ্ঠা হচ্ছে সাধনারই প্রতি ভক্তি। এই কঠোর কঠিন শুষ্ক সাধনাই হচ্ছে নিষ্ঠার প্রাণের ধন। এতে তার একটি গভীরতর আনন্দই আছে। সে একটি অহেতুক পবিত্র আনন্দ। এই বজ্রসার আনন্দে সে নৈরাশ্যকে দূরে রেখে দেয়—সে মৃত্যুকেও ভয় করে না। এই আমাদের মরুপথের একমাত্র সঙ্গিনী নিষ্ঠা যেদিন পথের অন্তে এসে পৌঁছোয় সেদিন সে ভক্তির হাতে আমাদের সম্পূর্ণ সমর্পণ করে দিয়ে নিজেকে তার দাসীশালায় লুকিয়ে রেখে দেয়; কোনো অহংকার করে না, কোনো দাবি করে না—সার্থকতার দিনে আপনাকে অন্তরালে প্রচ্ছন্ন করেই তার সুখ।

১৭ ফাল্গুন

নিষ্ঠার কাজ

নিষ্ঠা যে কেবল আমাদের শুষ্ক কঠিন পথের উপর দিয়ে অক্লান্ত অধ্যবসায়ে চালন করে নিয়ে যায় তা নয়, সে আমাদের কেবলই সতর্ক করে দেয়। রোজই একভাবে চলতে চলতে আমাদের শৈথিল্য এবং অমনোযোগ আসতে থাকে। নিষ্ঠা কখনো ভুলতে চায় না—সে আমাদের ঠেলে দিয়ে বলে এ কী হচ্ছে। এ কী করছ। সে মনে করিয়ে দেয় ঠাণ্ডার সময় যদি এগিয়ে না থাক তবে রৌদ্রের সময় যে কষ্ট পাবে। সে দেখিয়ে দেয় তোমার জলাধারের ছিদ্র দিয়ে জল পড়ে যাচ্ছে পিপাসার সময় উপায় কী হবে।

আমরা সমস্ত দিন কত রকম করে যে শক্তির অপব্যয় করে চলি তার ঠিকানা নেই—কত বাজে কথায়, কত বাজে কাজে। নিষ্ঠা হঠাৎ স্মরণ করিয়ে দেয়, এই

যে-জিনিসটা এমন করে ফেলাছড়া করছ এটার যে খুব প্রয়োজন আছে। একটু চুপ করো, একটু স্থির হও, অত বাড়িয়ে ব'লো না, অমন মাত্রা ছাড়িয়ে চ'লো না, যে জল পান করবার জন্যে যত্নে সঞ্চিত করা দরকার সে জলে খামকা পা ডুবিয়ে ব'সো না। আমরা যখন খুব আত্মবিস্মৃত হয়ে একটা তুচ্ছতার ভিতরে একেবারে গলা পর্যন্ত নেবে গিয়েছি তখনও সে আমাদের ভোলে না—বলে, ছি, এ কী কাণ্ড! বুকের কাছেই সে বসে আছে, কিছুই তার দৃষ্টি এড়াতে চায় না।

সিদ্ধিলাভের কাছাকাছি গেলে প্রেমের সহজ প্রাজ্ঞতা লাভ হয়, তখন মাত্রাবোধ আপনি ঘটে। সহজ কবি যেমন সহজেই ছন্দোরক্ষা করে চলে আমরা তেমনি সহজেই জীবনকে আগাগোড়া সৌন্দর্যের মধ্যে বিশুদ্ধরূপে নিয়মিত করতে পারি। তখন স্খলন হওয়াই শক্ত হয়। কিন্তু রিক্ততার দিনে সেই আনন্দের সহজ শক্তি যখন থাকে না, তখন পদে পদে যতিপতন হয়; যেখানে থামবার নয় সেখানে আলস্য করি, যেখানে থামবার সেখানে বেগ সামলাতে পারি নে। তখন এই কঠোর নিষ্ঠাই আমাদের একমাত্র সহায়। তার ঘুম নেই সে জেগেই আছে। সে বলে ও কী! ওই যে একটা রাগের রক্ত আভা দেখা দিল। ওই যে নিজেকে একটু বেশি করে বাড়িয়ে দেখবার জন্যে তোমার চেষ্টা আছে। ওই যে শত্রুতার কাঁটা তোমার স্মৃতিতে বিঁধেই রইল। কেন, হঠাৎ গোপনে তোমার এত ক্ষোভ দেখি কেন! এই যে রাত্রে শুতে যাচ্ছ এই পবিত্র নির্মল নিদ্রার কক্ষে প্রবেশ করতে যাবার মতো শান্তি তোমার অন্তরে কোথায়!

সাধনার দিনে নিষ্ঠার এই নিত্য সতর্কতার স্পর্শই আমাদের সকলের চেয়ে প্রধান আনন্দ। এই নিষ্ঠা যে জেগে আছেন এইটে যতই জানতে পাই ততই বক্ষের মধ্যে নির্ভর অনুভব করি। যদি কোনোদিন কোনো আত্মবিস্মৃতির দুর্যোগে এঁর দেখা না পাই তবেই বিপদ গনি। যখন চরম সুহৃদকে না পাই তখন এই নিষ্ঠাই আমাদের পরম সুহৃদরূপে থাকেন। তাঁর কঠোর মূর্তি প্রতিদিন আমাদের কাছে শুভ্র সৌন্দর্যে মণ্ডিত হয়ে ওঠে। এই চাঞ্চল্যবর্জিত ভোগবিরত পুণ্যশ্রী তাপসিনী আমাদের রিক্ততার মধ্যে শক্তি শান্তি এবং জ্যোতি বিকীর্ণ করে দারিদ্র্যকে রমণীয় করে তোলেন।

গম্যস্থানের প্রতি কলম্বসের বিশ্বাস যখন সুদৃঢ় হল তখন নিষ্ঠাই তাঁকে পথচিহ্নহীন অপরিচিত সমুদ্রের পথে প্রত্যহ ভরসা দিয়েছিল। তাঁর নাবিকদের মনে সে বিশ্বাস দৃঢ় ছিল না, তাদের সমুদ্রযাত্রায় নিষ্ঠাও ছিল না। তারা প্রতিদিনই বাইরে থেকে একটা কিছু সফলতার মূর্তি দেখবার জন্যে ব্যস্ত ছিল; কিছু একটা না পেলে তাদের শক্তি অবসন্ন হয়ে পড়ে, এই জন্যে দিন যতই যেতে লাগল সমুদ্র যতই শেষ হয় না, তাদের অধৈর্য ততই বেড়ে উঠতে থাকে। তারা বিদ্রোহ করবার উপক্রম করে, তারা

ফিরে যেতে চায়। তবু কলম্বসের নিষ্ঠা বাইরে থেকে কোনো নিশ্চয় চিহ্ন না দেখতে পেয়েও নিঃশব্দে চলতে থাকে। কিন্তু এমন হয়ে এসেছে নাবিকদের আর ঠেকিয়ে রাখা যায় না, তারা জাহাজ ফেরায় বা! এমন সময় চিহ্ন দেখা দিল, তীর যে আছে তার আর কোনো সন্দেহ রইল না। তখন সকলেই আনন্দিত, সকলেই উৎসাহে এগিয়ে যেতে চায়। তখন কলম্বসকে সকলেই বন্ধু জ্ঞান করে, সকলেই তাকে ধন্যবাদ দেয়।

সাধনার প্রথমাবস্থায় সহায় কেউ নেই—সকলেই সন্দেহ প্রকাশ করে, সকলেই বাধা দেয়। বাইরেও এমন কোনো স্পষ্ট চিহ্ন দেখতে পাই নে যাকে আমরা সত্যবিশ্বাসের স্পষ্ট প্রমাণ বলে নিজের ও সকলের কাছে ধরে দেখাতে পারি। তখন সেই সমুদ্রের মাঝখানে সন্দেহ ও বিরুদ্ধতার মধ্যে নিষ্ঠা যেন এক মুহূর্ত সঙ্গ ত্যাগ না করে। যখন তীর কাছে আসবে, যখন তীরের পাখি তোমার মাস্তুলের উপর উড়ে বসবে, যখন তীরের ফুল সমুদ্রের তরঙ্গের উপর নৃত্য করবে তখন সাধুবাদ ও আনুকূল্যের অভাব থাকবে না; কিন্তু ততকাল প্রতিদিনই কেবল নিষ্ঠা—নৈরাশ্যজয়ী নিষ্ঠা, আঘাতসহিষ্ণু নিষ্ঠা, বাহিরের উৎসাহ-নিরপেক্ষ নিষ্ঠা, নিন্দায় অবিচলিত নিষ্ঠা—কোনো মতে কোনো কারণেই সেই নিষ্ঠা যেন ত্যাগ না করে। সে যেন কম্পাসের দিকে চেয়েই থাকে, সে যেন হাল আঁকড়ে বসেই থাকে।

১৭ ফাল্গুন

বিমুখতা

সেই বিশ্বকর্মা মহাত্মা যিনি জনগণের হৃদয়ের মধ্যে সন্নিবিষ্ট হয়ে কাজ করছেন—তিনি বড়ো প্রচ্ছন্ন হয়েই কাজ করেন। তাঁর কাজ অগ্রসর হচ্ছেই সন্দেহ নেই—কেবল সে কাজ যে চলছে তা আমরা জানি নে বলেই নিরানন্দ আছে। সেই কাজে আমাদের যেটুকু যোগ দেবার আছে তা দিই নি বলেই আমাদের জীবন যেন তাৎপর্যহীন হয়ে রয়েছে। কিন্তু তবু বিশ্বকর্মা তাঁর স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়ার আনন্দে প্রতিদিনই প্রতি মুহূর্তেই কাজ করছেন। তিনি আমার জীবনের একটি সূর্যকরোজ্জ্বল দিনকে চন্দ্রতারাখচিত রাত্রির সঙ্গে গাঁথছেন, আবার সেই জ্যোতিষ্কপুঞ্জখচিত রাত্রিকে জ্যোতির্ময় আর একটি দিনের সঙ্গে গেঁথে চলেছেন। আমার এই জীবনের মণিহার রচনায় তাঁর বড়ো আনন্দ। আমি যদি তাঁর সঙ্গে যোগ দিতুম তবে সেই আনন্দ আমারও হত। এই আশ্চর্য শিল্পরচনায় কত ছিদ্র করতে হচ্ছে, কত বিদ্ধ করতে হচ্ছে, কত দগ্ধ করতে

হচ্ছে, কত আঘাত করতে হয়েছে—সেই সমস্ত আঘাতের মধ্যেই বিশ্বকর্মার সৃজনের আনন্দে আমার অধিকার জন্মাত।

কিন্তু যে অন্তরের গুহার মধ্যে আনন্দিত বিশ্বকর্মা দিন রাত্রি বসে কাজ করছেন সেদিকে আমি তো তাকালুম না—আমি সমস্ত জীবন বাইরের দিকেই হাঁ করে তাকিয়ে রইলুম। দশজনের সঙ্গে মিলছি মিশছি হাসি গল্প করছি আর ভাবছি কোনো মতে দিন কেটে যাচ্ছে—যেন দিনটা কাটানোই হচ্ছে দিনটা পাবার উদ্দেশ্য। যেন দিনের কোনো অর্থ নেই।

আমরা যেন মানবজীবনের নাট্যশালায় প্রবেশ করে যেদিকে অভিনয় হচ্ছে সেদিকে মূঢ়ের মতো পিঠ ফিরিয়ে বসে আছি। নাট্যশালার থামগুলো চৌকিগুলো এবং লোকজনের ভিড়ই দেখছি। তার পরে যখন আলো নিবে গেল, যবনিকা পড়ে গেল, আর কিছুই দেখতে পাই নে, অন্ধকার নিবিড়—তখন হয়তো নিজেকে জিজ্ঞাসা করি, কী করতে এসেছিলুম, কেনই বা টিকিটের দাম দিলুম, এই থাম চৌকির অর্থ কী, এতগুলো লোকই বা এখানে জড় হয়েছে কী করতে? সমস্তই ফাঁকি, সমস্তই অর্থহীন ছেলেখেলা। হায়, আনন্দের অভিনয় যে নাট্যমঞ্চে হচ্ছে সে-দিকের কোনো খবরই পাওয়া গেল না।

জীবনের আনন্দলীলা যিনি করছেন তিনি যে এই ভিতরে বসেই করছেন—ওই থাম চৌকিগুলো যে বহিরঙ্গ মাত্র। ওইগুলিই প্রধান সামগ্রী নয়। একবার অন্তরের দিকে চোখ ফেরাও—তখনই সমস্ত মানে বুঝতে পারবে।

যে কাণ্ডটা হচ্ছে সমস্তই যে অন্তরে হচ্ছে। এই যে অন্ধকার কেটে গিয়ে এখনই ধীরে ধীরে সূর্যোদয় হচ্ছে একি কেবলই তোমার বাইরে? বাইরেই যদি হত তবে তুমি সেখানে কোন্ দিক দিয়ে প্রবেশ করতে? বিশ্বকর্মা যে তোমার চৈতন্যাকাশকে এই মুহূর্তে একেবারে অরুণরাগে প্লাবিত করে দিলেন। চেয়ে দেখো তোমারই অন্তরে তরুণ সূর্য সোনার পদ্মের কুঁড়ির মতো মাথা তুলে উঠছে, একটু একটু করে জ্যোতির পাপড়ি চারিদিকে ছড়িয়ে দেবার উপক্রম করছে—তোমারই অন্তরে। এই তো বিশ্বকর্মার আনন্দ। তোমারই এই জীবনের জমিতে তিনি এত সোনার সুতো রুপোর সুতো এত রং-বেরঙের সুতো দিয়ে অহরহ এতবড়ো একটা আশ্চর্য বুনানি বুনছেন—এ যে তোমার ভিতরেই—যা একেবারে বাইরে সে যে তোমার নয়।

তবে এখনই দেখো। এই প্রভাতকে তোমারই অন্তরের প্রভাত বলে দেখো, তোমারই চৈতন্যের মধ্যে তাঁর আনন্দ-সৃষ্টি বলে দেখো। এ আর কারও নয়, এ আর কোথাও নেই—তোমার এই প্রভাতটি একমাত্র তোমারই মধ্যে রয়েছে এবং সেখানে একলামাত্র তিনিই রয়েছেন। তোমার এই সুগভীর নির্জনতার মধ্যে তোমার এই

অন্তহীন চিদাকাশের মধ্যে তাঁর এই অদ্ভুত বিরাট লীলা— দিনে রাত্রে অবিশ্রাম। এই আশ্চর্য প্রভাতের দিকে পিঠ ফিরিয়ে একে কেবলই বাইরের দিকে দেখতে গেলে এতে আনন্দ পাবে না অর্থ পাবে না।

যখন আমি ইংলণ্ডে ছিলুম আমি তখন বালক। লণ্ডন থেকে কিছু দূরে এক জায়গায় আমার নিমন্ত্রণ ছিল। আমি সন্ধ্যার সময় রেলগাড়িতে চড়লুম। তখন শীতকাল। সেদিন কুহেলিকায় চারিদিক আচ্ছন্ন— বরফ পড়ছে। লণ্ডন ছাড়িয়ে স্টেশনগুলি বাম দিকে আসতে লাগল। যখন গাড়ি থামে আমি জানলা খুলে বাম দিকে মুখ বাড়িয়ে সেই কুয়াশালিপ্ত অস্পষ্টতার মধ্যে কোনো একব্যক্তিকে ডেকে স্টেশনের নাম জেনে নিতে লাগলুম। আমার গম্য স্টেশনটি শেষ স্টেশন। সেখানে যখন গাড়ি থামল আমি বাম দিকেই তাকালুম— সে-দিকে আলো নেই প্ল্যাটফর্ম নেই দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে রইলুম। ক্ষণকাল পরেই গাড়ি আবার লণ্ডনের অভিমুখে পিছোতে আরম্ভ করল। আমি বলি, এ কী হল। পরের স্টেশনে যখন থামল, জিজ্ঞাসা করলুম অমুক স্টেশন কোথায়? উত্তর শুনলুম সেখান থেকে তুমি যে এইমাত্র আসছ। । তাড়াতাড়ি নেবে পড়ে জিজ্ঞাসা করলুম এর পরের গাড়ি কখন পাওয়া যাবে? উত্তর পেলুম— অর্ধরাত্রে। গম্য স্টেশনটি ডান দিকে ছিল।

আমরা জীবনযাত্রায় কেবল বাঁ দিকের স্টেশনগুলিরই খোঁজ নিয়ে চলেছি। ডানদিকে কিছুই নেই বলে একেবারে নিশ্চিন্ত। একটার পর একটা পার হয়ে গেলুম। যে-স্থানে নামবার ছিল সেখানেও সংসারের দিকেই— ওই বামদিকেই— চেয়ে দেখলুম। দেখলুম সমস্ত অন্ধকার, সমস্ত কুয়াশায় অস্পষ্ট। যে-সুযোগ পাওয়া গিয়েছিল সে-সুযোগ কেটে গেল— গাড়ি ফিরে চলেছে। যেখানে নিমন্ত্রণ ছিল সেখানে আমোদ আহ্লাদ অতীত হতে চলল। আবার গাড়ি কখন পাওয়া যাবে। এই যে সুযোগ পেয়েছিলুম ঠিক এমন সুযোগ কখন পাব— কোন্ অর্ধরাত্রে।

মানবজীবনের ভিতর দিয়েই যে চরম স্থানে যাওয়া যেতে পারে এমন একটা স্টেশন আছে। সেখানে যদি না নামি— সেখানকার প্ল্যাটফর্ম যেদিকে সেদিকে যদি না তাকাই তবে সমস্ত যাত্রাই যে আমার কাছে একটা নিতান্ত কুহেলিকাবৃত নিরর্থক ব্যাপার বলে ঠেকবে তাতে সন্দেহ কী আছে। কেন যে টিকিটের দাম দিলুম, কেন যে গাড়িতে উঠলুম, অন্ধকার রাত্রির ভিতর দিয়ে কেন যে চললুম, কী যে হল কিছুই বোঝা গেল না। নিমন্ত্রণ আমার কোথায় ছিল, ভোজের আয়োজনটা কোথায় হয়েছে, ক্ষুধা আমার কোন্‌খানে মিটবে, আশ্রয় আমি কোন্‌খানে পাব— সে প্রশ্নের কোনো উত্তর না পেয়েই হতবুদ্ধি হয়ে যাত্রা শেষ করতে হল।

হে সত্য, আর কিছু নয়, যেদিকে তুমি, যেদিকে সত্য, সেইদিকে আমার মুখ ফিরিয়ে দাও—আমি যে কেবল অসত্যের দিকেই তাকিয়ে আছি। তোমার আনন্দলীলা-মঞ্চে তুমি সারি সারি আলো জ্বালিয়ে দিয়েছ—আমি তার উলটোদিকের অন্ধকারে তাকিয়ে ভেবে মরছি এ সমস্ত কী। তোমার জ্যোতির দিকে আমাকে ফেরাও। আমি কেবলই দেখছি মৃত্যু—তার কোনো মানেই ভেবে পাচ্ছি নে, ভয়ে সারা হয়ে যাচ্ছি। ঠিক তার ওপাশেই যে অমৃত রয়েছে, তার মধ্যে সমস্ত মানে রয়েছে সে-কথা আমাকে কে বুঝিয়ে দেবে? হে আবিঃ—তুমি যে প্রকাশরূপে নিরন্তর রয়েছ—সেই প্রকাশের দিকেই আমার দৃষ্টি নেই। আমি হতভাগ্য। সেইজন্য আমি কেবল তোমাকে রুদ্রই দেখছি—তোমার প্রসন্নতা যে আমার আত্মাকে নিয়ত পরিবেষ্টিত করে রয়েছে তা জানতেই পারছি নে। মার দিকে পিঠ করে শিশু অন্ধকার দেখে কেঁদে মরে—একবার পাশ ফিরলেই জানতে পারে মা যে তাকে আলিঙ্গন করেই রয়েছেন। তোমার প্রসন্নতার দিকেই তুমি আমাদের পাশ ফিরিয়ে নাও হে জননী, তাহলেই এক মুহূর্তে জানতে পারব আমি রক্ষা পেয়েই আছি, অনন্তকাল আমার রক্ষা, নইলে অরক্ষা-ভয়ের কান্না কোনোমতেই থামবে না।

১৮ ফাল্গুন

মরণ

ঈশ্বরের সঙ্গে খুব একটা শৌখিন রকমের যোগ রক্ষা করার মতলব মানুষের দেখতে পাই। যেখানে যা যেমন আছে তা ঠিক সেইরকম রেখে সেইসঙ্গে অমনি ঈশ্বরকেও রাখবার চেষ্টা। তাতে কিছুই নাড়ানাড়ি করতে হয় না। ঈশ্বরকে বলি, তুমি ঘরের মধ্যে এস কিন্তু সমস্ত বাঁচিয়ে এস—দেখো আমার কাঁচের ফুলদানিটা যেন না পড়ে যায়, ঘরের নানাস্থানে যে নানা পুতুল সাজিয়ে রেখেছি তার কোনোটা যেন ঘা লেগে ভেঙে না যায়। এ আসনটায় ব'সো না এটাতে আমার অমুক বসে, এ জায়গায় নয় এখানে আমি অমুক কাজ করে থাকি, এ ঘর নয় এ আমার অমুকের জন্যে সাজিয়ে রাখছি। এই করতে করতে সবচেয়ে কম জায়গা এবং সবচেয়ে অনাবশ্যক স্থানটাই আমরা তাঁর জন্যে ছেড়ে দিই।

মনে আছে আমার পিতার কোনো ভৃত্যের কাছে ছেলেবেলায় আমরা গল্প শুনেছি যে, সে যখন পুরীতীর্থে গিয়েছিল তার মহা ভাবনা পড়েছিল জগন্নাথকে কী দেবে। তাঁকে যা দেবে সে তো কখনো সে আর ভোগ করতে পারবে না সেইজন্যে সে যে

জিনিসের কথাই মনে করে কোনোটাই তার দিতে মন সরে না—যাতে তার অল্পমাত্রও লোভ আছে সেটাও, চিরদিনের মতো দেবার কথায়, মন আকুল করে তুলতে লাগল। শেষকালে বিস্তর ভেবে সে জগন্নাথকে বিলিতি বেগুন দিয়ে এল। এই ফলটিতেই সে লোকের সবচেয়ে কম লোভ ছিল।

আমরাও ঈশ্বরের জন্যে কেবলমাত্র সেইটুকুই ছাড়তে চাই যেটুকুতে আমাদের সবচেয়ে কম লোভ—যেটুকু আমাদের নিতান্ত উদ্‌বৃত্তের উদ্‌বৃত্ত। ঈশ্বরের নামগাঁথা দুটো একটা মন্ত্র পাঠ করা গেল, দুটি একটি সংগীত শোনা গেল, যাঁরা বেশ ভালো বক্তৃতা করতে পারেন তাঁদের কাছ থেকে নিয়মিত বক্তৃতা শোনা গেল। বললুম বেশ হল, বেশ লাগল, মনটা এখন বেশ পবিত্র ঠেকছে আমি ঈশ্বরের উপাসনা করলুম।

একেই আমরা বলি উপাসনা। যখন বিদ্যার ধনের বা মানুষের উপাসনা করি তখন সেটা এত সহজ উপাসনা হয় না, তখন উপাসনা যে কাকে বলে তা বুঝতে বাকি থাকে না। কেবল ঈশ্বরের উপাসনাটাই হচ্ছে উপাসনার মধ্যে সবচেয়ে ফাঁকি।

এর মানে আর কিছুই নয়, নিজের অংশটাকেই সবচেয়ে বড়ো করে ঘের দিয়ে নিয়ে ঈশ্বরকে একপাই অংশের শরিক করি এবং মনে করি আমার সকল দিক রক্ষা হল।

আমাদের দেশে একটা কথা প্রচলিত আছে "যা দ্বয়লোকসাধনী তনুভৃতাং সা চাতুরী চাতুরী"—যাতে দুই লোকেরই সাধনা হয় মানুষের সেই চাতুরীই চাতুরী।

কিন্তু যে-চাতুরী দুইলোক রক্ষার ভার নেয় শেষকালে সে ওই দুই লোকের মধ্যে একটা লোকের কথা ভুলতে থাকে, তার চাতুরী ঘুচে যায়। যে-লোকটি আমার দিকের লোক অধিকাংশ স্থলে সেই দিকের সীমানাই অজ্ঞাতসারে এবং জ্ঞাতসারে বেড়ে চলতে থাকে। ঈশ্বরের জন্যে ওই যে একপাই জমি রেখেছিলুম যদি তাতে কোনো পদার্থ থাকে, যদি সেটা নিতান্তই বালিচাপা মরুভূমি না হয়, তবে একটু একটু করে লাঙল ঠেলে ঠেলে সেটা আত্মসাৎ করে নেবার চেষ্টা করি। "আমি" জিনিসটা যে একটা মস্ত পাথর, তার ভার যে ভয়ানক ভার। যে-দিকটাতে সেই আমিটাকে চাপাই সেই দিকটাতেই যে ধীরে ধীরে সমস্তটাই কাত হয়ে পড়তে চায়। যদি রক্ষা পেতে চাও তবে ওইটেকেই একেবারে জলের মধ্যে ফেলে দিতে পারলেই ভালো হয়।

আসল কথা, সবটাই যদি ঈশ্বরকে দিতে পারি তাহলেই দুইলোক রক্ষা হয়—চাতুরী করতে গেলে হয় না। তাঁর মধ্যেই দুই লোক আছে। তাঁর মধ্যেই যদি আমাকে পাই তবে একসঙ্গেই তাঁকেও পাই আমাকেও পাই। আর তাঁর সঙ্গে যদি ভাগ বিভাগ করে সীমানা টেনে পাকা দলিল করে নিয়ে কাজ চালাতে চাই তাহলে সেটা একেবারেই পাকা কাজ হয় না, সেটা বিষয়কর্মের নামান্তর হয়। বিষয়কর্মের যে গতি তারও সেই

গতি—অর্থাৎ তার মধ্যে নিত্যতার লক্ষণ নেই—তার মধ্যে বিকার আসে এবং ক্রমে মৃত্যু দেখা দেয়।

ও সমস্ত চাতুরী ছেড়ে দিয়ে ঈশ্বরকে সম্পূর্ণই আত্মসমর্পণ করতে হবে এই কথাটাকেই পাকা করা যাক। আমার দুইয়ে কাজ নেই আমার একই ভালো। আমার অন্তরাত্মার মধ্যে একটি সতীর লক্ষণ আছে, সে চতুরা নয়, সে যথার্থই দুইকে চায় না, সে এককেই চায়; যখন সে এককে পায় তখনই সে সমস্তকেই পায়।

একাগ্র হয়ে সেই একের সাধনাই করব কিন্তু কঠিন সংকট এই যে, আজ পর্যন্ত সে জন্যে কোনো আয়োজন করা হয় নি। সেই পরমকে বাদ দিয়েই সমস্ত ব্যবস্থা করা হয়ে গেছে। জীবন এমনি ভাবে তৈরি হয়ে গেছে যে, কোনোমতে ঠেলে ঠুলে তাঁকে জায়গা করে দেওয়া একেবারে অসম্ভব হয়ে এসেছে।

পৃথিবীতে আর সমস্তই গোঁজামিলন দেওয়া যায়, যেখানে পাঁচজনের বন্দোবস্ত সেখানে ছজনকে ঢুকিয়ে দেওয়া খুব বেশি শক্ত নয়, কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে সেরকম গোঁজামিলন চালাতে গেলে একেবারেই চলে না। তিনি "পুনশ্চ নিবেদনের" সামগ্রী নন। তাঁর কথা যদি গোড়া থেকে ভুলেই থাকি তবে গোড়াগুড়ি সে ভুলটা সংশোধন না করে নিলে উপায় নেই। যা হয়ে গেছে তা হয়ে গেছে এখন অমনি এক রকম করে কাজ সেরে নেও এ-কথা তাঁর সম্বন্ধে কোনোমতেই খাটবে না।

ঈশ্বর-বিবর্জিত যে জীবনটা গড়ে তুলেছি তার আকর্ষণ যে কত প্রবল তা তখনই বুঝতে পারি যখন তাঁর দিকে যেতে চাই। যখন তার মধ্যেই বসে আছি তখন সে যে আমাকে বেঁধেছে তা বুঝতেই পারি নে। কিন্তু প্রত্যেক অভ্যাস প্রত্যেক সংস্কারটিই কী কঠিন গ্রন্থি। জ্ঞানে তাকে যতই তুচ্ছ বলে জানি নে কেন, কাজে তাকে ছাড়াতে পারি নে। একটা ছাড়ে তো দেখতে পাই তার পিছনে আরও পাঁচটা আছে।

সংসারকে চরম আশ্রয় বলে জেনে এতদিন বহুযত্নে দিনে দিনে একটি একটি করে অনেক জিনিস সংগ্রহ করেছি—তাদের প্রত্যেকটির ফাঁকে ফাঁকে আমার কত শিকড় জড়িয়ে গেছে তার ঠিকানা নেই—তারা সবাই আমার। তাদের কোনোটাকেই একটুমাত্র স্থানচ্যুত করতে গেলেই মনে হয় তবে আমি বাঁচব কী করে। তারা যে বাঁচবার জিনিস নয় তা বেশ জানি তবু চিরজীবনের সংস্কার তাদের প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে বলতে থাকে এদের না হলে আমার চলবে না যে। ধনকে আপনার বলে জানা যে নিতান্তই অভ্যাস হয়ে গেছে। সেই ধনের ঠিক ওজনটি যে আজ বুঝব সে শক্তি কোথায় পাই। বহুদীর্ঘকাল ধরে আমির ভারে সেই ধন যে পর্বতসমান ভারি হয়ে উঠেছে, তাকে একটুও নড়াতে গেলে যে বুকের পাঁজরে বেদনা ধরে।

এইজন্যেই ভগবান যিশু বলেছেন, যে-ব্যক্তি ধনী তার পক্ষে মুক্তি অত্যন্ত কঠিন। ধন এখানে শুধু টাকা নয়, জীবন যা-কিছুকেই দিনে দিনে আপনার বলে সঞ্চয় করে তোলে, যাকেই সে নিজের বলে মনে করে এবং নিজের দিকেই আঁকড়ে রাখে—সে ধনই হ'ক আর খ্যাতিই হ'ক এমন কি পুণ্যই হ'ক।

এমন কি, ওই পুণ্যের সঞ্চয়টা কম ঠকায় না। ওর একটি ভাব আছে যেন ও যা নিচ্ছে তা সব ঈশ্বরকেই দিচ্ছে। লোকের হিত করছি, ত্যাগ করছি, কষ্ট স্বীকার করছি, অতএব আর ভাবনা নেই। আমার সমস্ত উৎসাহ ঈশ্বরের উৎসাহ, সমস্ত কর্ম ঈশ্বরের কর্ম। কিন্তু এর মধ্যে যে অনেকখানি নিজের দিকেই জমাচ্ছি সে খেয়ালমাত্র নেই।

যেমন মনে করো আমাদের এই বিদ্যালয়। যেহেতু এটা মঙ্গলকাজ সেই হেতু এর যেন আর হিসেব দেখবার দরকার নেই, যেন এর সমস্তই ঈশ্বরের খাতাতেই জমা হচ্ছে। আমরা যে প্রতিদিন তহবিল ভাঙছি তার খোঁজও রাখি নে। এ বিদ্যালয় আমাদের বিদ্যালয়, এর সফলতা আমাদের সফলতা, এর দ্বারা আমরাই হিত করছি, এমনি করে এ বিদ্যালয় থেকে আমার দিকে কিছু কিছু করে জমা হচ্ছে। সেই সংগ্রহ আমার অবলম্বন হয়ে উঠছে, সেটা একটা বিষয় সম্পত্তির মতো হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এই কারণে তার জন্যে রাগারাগি টানাটানি হতে পারে, তার জন্যে মিথ্যে সাক্ষী সাজাতেও ইচ্ছা করে। পাছে কেউ কোনো ত্রুটি ধরে ফেলে এই ভয় হয়—লোকের কাছে এর অনিন্দনীয়তা প্রমাণ করে তোলবার জন্যে একটু বিশেষভাবে ঢাকাঢুকি দেবার আগ্রহ জন্মে। কেননা এসব যে আমার অভ্যাস, আমার নেশা, আমার খাদ্য হয়ে উঠছে। এর থেকে যদি ঈশ্বর আমাকে একটু বঞ্চিত করতে চান আমার সমস্ত প্রাণ ব্যাকুল হয়ে ওঠে। প্রতিদিনের অভ্যাসে বিদ্যালয় থেকে এই যে-অংশটুকু নিজের ভাগেই সঞ্চয় করে তুলছি সেইটে সরিয়ে দাও দেখি, মনে হবে এর কোথাও যেন আর আশ্রয় পাচ্ছি নে। তখন ঈশ্বরকে আর আশ্রয় বলে মনে হবে না।

এইজন্যে সঞ্চয়ীর পক্ষেই বড়ো শক্ত সমস্যা। সে ওই সঞ্চয়কেই চরম আশ্রয় বলে একেবারে অভ্যাস করে বসে আছে, ঈশ্বরকে তাই সে চারিদিকে সত্য করে অনুভব করতে পারে না, শেষ পর্যন্তই সে নিজের সঞ্চয়কে আঁকড়ে বসে থাকে।

অনেকদিন থেকে অনেক সঞ্চয় করে যে বসেছি—সে-সমস্তর কিছু বাদ দিতে মন সরে না। সেইজন্যে মনের মধ্যে যে চতুর হিসাবি কানে কলম গুঁজে বসে আছে সে কেবলই পরামর্শ দিচ্ছে—কিছু বাদ দেবার দরকার নেই, এরই মধ্যে কোনো রকম করে ঈশ্বরকে একটুখানি জায়গা করে দিলেই হবে।

না, তা হবে না—তার চেয়ে অসাধ্য আর কিছুই হতে পারে না। তবে কী করা কর্তব্য?

একবার সম্পূর্ণ মরতে হবে—তবেই নূতন করে ভগবানে জন্মানো যাবে। একেবারে গোড়াগুড়ি মরতে হবে।

এটা বেশ করে জানতে হবে, যে-জীবন আমার ছিল, সেটা সম্বন্ধে আমি মরে গেছি। আমি সে-লোক নই, আমার যা ছিল তার কিছুই নেই। আমি ধনে মরেছি, খ্যাতিতে মরেছি, আরামে মরেছি, আমি কেবলমাত্রই ভগবানে বেঁচেছি। নিতান্ত সদ্যোজাত শিশুটির মতো নিরুপায় অসহায় অনাবৃত হয়ে তাঁর কোলে জন্মগ্রহণ করেছি। তিনি ছাড়া আমার আর কিছুই নেই। তার পরে তাঁর সন্তানজন্ম সম্পূর্ণভাবে শুরু করে দাও, কিছুর পরে কোনো মমতা রেখো না।

পুনর্জন্মের পূর্বে এখন সেই মৃত্যুবেদনা। যাকে নিশ্চিত চরম বলে অত্যন্ত সত্য বলে জেনেছিলুম একটি একটি করে একটু একটু করে তার থেকে মরতে হবে। এস মৃত্যু এস—এস অমৃতের দূত এস—

এস অপ্রিয় বিরস তিক্ত,
এস গো অশ্রুসলিলসিক্ত
এস গো ভূষণবিহীন রিক্ত,
এস গো চিত্তপাবন।
এস গো পরম দুঃখনিলয়,
আশা-অঙ্কুর করহ বিলয়;
এস সংগ্রাম, এস মহাজয়,
এস গো মরণ-সাধন।

১৯ ফাল্গুন

ফল

ভিতরের সাধনা যখন আরম্ভ হয়ে গেছে তখন বাইরে তার কতকগুলি লক্ষণ আপনি প্রকাশ হয়ে পড়তে থাকে; সে লক্ষণগুলি কীরকম তা একটি উপমার সাহায্যে ব্যক্ত করতে চেষ্টা করি।

গাছের ফলকে মানুষ বরাবর নিজের সার্থকতার সঙ্গে তুলনা করে এসেছে। বস্তুত মানুষের লক্ষ্যসিদ্ধি, মানুষের চেষ্টার পরিণামের সঙ্গে সাদৃশ্য আছে এমন জিনিস যদি

জগতে কোথাও থাকে তবে সে গাছের ফলে। নিজের কর্মের রূপটিকে নিজের জীবনের পরিণামকে যেন ফলের মধ্যে আমরা চক্ষে প্রত্যক্ষ দেখতে পাই।

ফল জিনিসটা সমগ্র গাছের শেষ লক্ষ্য—পরিণত মানুষটি তেমনি সমস্ত সংসার-বৃক্ষের শেষলাভ।

কিন্তু মানুষের পরিণতি যে আরম্ভ হয়েছে তার লক্ষণ কী? একটি আমফল যে পাকছে তারই বা লক্ষণ কী?

সব প্রথমে দেখা যায়, তার বাইরে একটা প্রান্তে একটু রং ধরতে আরম্ভ করেছে, তার শ্যামবর্ণ ঘুচবে ঘুচবে করছে—সোনা হয়ে ওঠবার চেষ্টা।

আমাদেরও ভিতরে যখন পরিণতি আরম্ভ হয় বাইরে তার দীপ্তি দেখা দেয়। কিন্তু সব জায়গায় সমান নয়, কোথাও কালো কোথাও সোনা। তার সকল কাজ সকল ভাব সমান উজ্জ্বলতা পায় না, কিন্তু এখানে-ওখানে যেন জ্যোতি দেখা দিতে থাকে।

নিজের পাতারই সঙ্গে ফলের যে বর্ণসাদৃশ্য ছিল সেটা ক্রমশ ঘুচে আসতে থাকে, চারিদিকে আকাশের আলোর যে রং সেই রঙের সঙ্গেই তার মিলন হয়ে আসে। যে গাছে তার জন্ম সেই গাছের সঙ্গে নিজের রঙের পার্থক্য সে আর কিছুতেই সংবরণ করতে পারে না—চারিদিকের নিবিড় শ্যামলতার আচ্ছাদন থেকে সে বাহিরের আকাশে প্রকাশ পেয়ে উঠতে থাকে।

তার পরে তার বাহিরটি ক্রমশই কোমল হয়ে আসে। আগে বড়ো শক্ত আঁট ছিল কিন্তু এখন আর সে কঠোরতা নেই। দীপ্তিময় সুগন্ধময় কোমলতা।

পূর্বে তার যে-রস ছিল সে-রসে তীব্র অম্লতা ছিল এখন সমস্ত মাধুর্যে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। অর্থাৎ এখন তার বাইরের পদার্থ সমস্ত বাইরেরই হয়, সকলেরই ভোগের হয়, সকলকে আহ্বান করে কাউকে ঠেকাতে চায় না। সকলের কাছে সে কোমল সুন্দর হয়ে ওঠে। গভীরতর সার্থকতার অভাবেই মানুষের তীব্রতা কঠিনতা এমন উগ্রভাবে প্রকাশ পায়—সেই আনন্দের দৈন্যেই তার দৈন্য, সেইজন্যেই সে বাহিরকে আঘাত করতে উদ্যত হয়।

তার পরে তার ভিতরকার যেটি আসল জিনিস, তার আঁটি—যেটিকে বাইরে দেখাই যায় না, তার সঙ্গে তার বাহিরের অংশের একটা বিশ্লিষ্টতা ঘটতে থাকে। সেটা যে তার নিত্যপদার্থ নয় তা ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে আসে। তার শস্য অংশের সঙ্গে তার ছালটা পৃথক হতে থাকে, ছাল অনায়াসে শাঁস থেকে ছাড়িয়ে নেওয়া যায়, আবার তার শাঁসও আঁটি থেকে সম্পূর্ণ ছাড়িয়ে ফেলা সহজ হয়। তার বোঁটা এতদিন গাছকে আঁকড়ে ছিল, তাও আলগা হয়ে আসে। গাছের সঙ্গে নিজেকে সে আর অত্যন্ত এক

করে রাখে না—নিজের বাহিরের আচ্ছাদনের সঙ্গেও নিজের ভিতরের আঁটিকে সে নিতান্ত একাকার করে থাকে না।

সাধক তেমনি যখন নিজের ভিতরে নিজের অমরত্বকে লাভ করতে থাকেন, সেখানটি যখন সুদৃঢ় সুসম্পূর্ণ হয়ে ওঠে, তখন তাঁর বাইরের পদার্থটি ক্রমশই শিথিল হয়ে আসতে থাকে—তখন তাঁর লাভটা হয় ভিতরে, আর দানটা হয় বাইরে।

তখন তাঁর ভয় নেই, কেননা তখন তাঁর বাইরের ক্ষতিতে তাঁর ভিতরের ক্ষতি হয় না। তখন শাঁসকে আঁটি আঁকড়ে থাকে না; শাঁস কাটা পড়লে অনাবৃত আঁটির মৃত্যুদশা ঘটে না। তখন পাখিতে যদি ঠোকরায় ক্ষতি নেই, ঝড়ে যদি আঘাত করে বিপদ নেই, গাছ যদি শুকিয়ে যায় তাতেও মৃত্যু নেই। কারণ, ফল তখন আপন অমরত্বকে আপন অন্তরের মধ্যে নিশ্চিতরূপে উপলব্ধি করে, তখন সে "অতিমৃত্যুমেতি"। তখন সে আপনাকে আপনার নিত্যতার মধ্যেই সত্য বলে জানে, অনিত্যতার মধ্যেই নিজেকে সে নিজে বলে জানে না—নিজেকে সে শাঁস বলে জানে না, খোসা বলে জানে না, বোঁটা বলে জানে না—সুতরাং ওই শাঁস খোসা বোঁটার জন্যে তার আর কোনো ভয় ভাবনাই নেই।

এই অমৃতকে নিজের মধ্যে বিশেষরূপে লাভ করার অপেক্ষা আছে। সেইজন্যেই উপনিষৎ বারংবার বলেছেন, অমরতাকে লাভ করার একটি বিশেষ অবস্থা আছে—"য এতদ্‌বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি।"

ভিতরে যখন সেই অমৃতের সঞ্চার হয় তখন অমরাত্মা বাইরেকে আর একান্তরূপে ভোগ করতে চায় না। তখন, তার যা গন্ধ, যা বর্ণ, যা রস, যা আচ্ছাদন তাতে তার নিজের কোনো প্রয়োজন নেই—সে এ-সমস্তের মধ্যেই নিহিত থেকে একান্ত নির্লিপ্ত, এর ভালোমন্দ তার ভালোমন্দ আর নয়, এর থেকে সে কিছুই প্রার্থনা করে না।

তখন ভিতরে সে লাভ করে, বাইরে সে দান করে; ভিতরে তার দৃঢ়তা, বাইরে তার কোমলতা; ভিতরে সে নিত্যসত্যের, বাইরে সে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের; ভিতরে সে পুরুষ, বাইরে সে প্রকৃতি। তখন বাইরে তার প্রয়োজন থাকে না বলেই পূর্ণভাবে বাইরের প্রয়োজন সাধন করতে থাকে, তখন সে ফলভোগী পাখির ধর্ম ত্যাগ করে ফলদর্শী পাখির ধর্ম গ্রহণ করে। তখন সে আপনাতে আপনি সমাপ্ত হয়ে নির্ভয়ে নিঃসংকোচে সকলের জন্যে আপনাকে সমর্পণ করতে পারে। তখন তার যা-কিছু, সমস্তই তার প্রয়োজনের অতীত, সুতরাং সমস্তই তার ঐশ্বর্য।

২০ ফাল্গুন ১৩১৫

৭

সত্যকে দেখা

আমাদের ধ্যানের দ্বারা সৃষ্টিকর্তাকে তাঁর সৃষ্টির মাঝখানে ধ্যান করি। ভূর্ভুবঃস্বঃ তাঁ হতেই সৃষ্টি হচ্ছে, সূর্যচন্দ্র গ্রহতারা প্রতিমুহূর্তেই তাঁর থেকে প্রকাশ হচ্ছে, আমাদের চৈতন্য প্রতিমুহূর্তেই তাঁর থেকে প্রেরিত হচ্ছে, তিনিই অবিরত সমস্ত প্রকাশ করছেন, এই হচ্ছে আমাদের ধ্যান।

এই দেখাকেই বলে সত্যকে দেখা। আমরা সমস্ত ঘটনাকে কেবল বাহ্যঘটনা বলেই দেখি। তাতে আমাদের কোনো আনন্দ নেই। সে আমাদের কাছে পুরাতন হয়ে যায়, সে আমাদের কাছে দম-দেওয়া কলের মতো আকার ধারণ করে; এইজন্যে পাথরের নুড়ির উপর দিয়ে যেমন স্রোত চলে যায় সেই রকম করে জগৎস্রোত আমাদের মনের উপর দিয়ে অবিশ্রাম বয়ে যাচ্ছে। চিত্ত তাতে সাড়া দিচ্ছে না, চারিদিকের দৃশ্যগুলো তুচ্ছ এবং দিনগুলো অকিঞ্চিৎকর হয়ে দেখা দিচ্ছে। সেইজন্যে কৃত্রিম উত্তেজনা এবং নানা বৃথা কর্ম সৃষ্টিদ্বারা আমরা চেতনাকে জাগিয়ে রেখে তবে আমোদ পাই।

যখন কেবল ঘটনার দিকে তাকিয়ে থাকি তখন এই রকমই হয়। সে আমাদের রস দেয় না, খাদ্য দেয় না। সে কেবল আমাদের ইন্দ্রিয়কে মনকে হৃদয়কে কিছু দূর পর্যন্ত অধিকার করে, শেষ পর্যন্ত পৌঁছোয় না। এইজন্যে তার যেটুকু রস আছে তা উপরের থেকেই শুকিয়ে আসে, তা আমাদের গভীরতর চেতনাকে উদ্বোধিত করে না। সূর্য উঠছে তো উঠছে, নদী বইছে তো বইছে, গাছপালা বাড়ছে তো বাড়ছে, প্রতিদিনের কাজ নিয়মমতো চলছে তো চলছে। সেইজন্যে এমন কোনো দৃশ্য দেখতে ইচ্ছা করি যা প্রতিদিন দেখি নে, এমন কোনো ঘটনা জানতে কৌতূহল হয় যা আমাদের অভ্যস্ত ঘটনার সঙ্গে মেলে না।

কিন্তু সত্যকে যখন জানি তখন আমাদের আত্মা পরিতৃপ্ত হয়। সত্য চিরনবীন— তার রস অক্ষয়। সমস্ত ঘটনাবলীর মাঝখানে সেই অন্তরতম সত্যকে দেখলে দৃষ্টি সার্থক হয়। তখন সমস্তই মহত্ত্বে বিস্ময়ে আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে।

এইজন্যেই আমাদের ধ্যানের মন্ত্রে আমরা প্রতিদিন অন্তত একবার সমস্ত বিশ্বব্যাপারের মাঝখানে বিশ্বের যিনি পরমসত্য তাঁকে ধ্যান করবার চেষ্টা করে থাকি। ঘটনাপুঞ্জের মাঝখানে যিনি এক মূলশক্তি তাঁকে দর্শন করবার জন্যে দৃষ্টিকে অন্তরে

ফেরাই। তখন দৃষ্টি থেকে জড়ত্বের আবরণ ঘুচে যায়, জগৎ একটা যন্ত্রের মতো আমাদের অভ্যাসের কক্ষ জুড়ে পড়ে থাকে না, প্রতিমুহূর্তেই এই অনন্ত আকাশব্যাপী প্রকাণ্ড প্রকাশ একটি জ্ঞানময় সত্য হতে নিঃসৃত হচ্ছে বিকীর্ণ হচ্ছে ইহাই অনুভব করে আমাদের চেতনা পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। তখন অগ্নি জল ওষধি বনস্পতির মাঝখানে দাঁড়িয়ে বলতে পারি, অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত ব্রহ্ম, সর্বত্রই আনন্দরূপে অমৃতরূপে তাঁর প্রকাশ।

অগণ্য ঘটনাকে অগণ্য ঘটনারূপে দেখেই চলে যাব না—তার মাঝখানে অনন্ত সত্যকে স্থির হয়ে স্তব্ধ হয়ে দেখব এইজন্যই আমাদের ধ্যানের মন্ত্র গায়ত্রী।

ওঁ ভূর্ভুবঃস্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়োযোনঃ প্রচোদয়াৎ।

ভূলোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক, ইহাই যিনি নিয়ত সৃষ্টি করছেন, সেই দেবতার বরণীয় শক্তিকে ধ্যান করি—যিনি আমাদের ধীশক্তিকেও নিয়ত প্রেরণ করছেন।

৩ চৈত্র ১৩১৫

সৃষ্টি

এই যে আমরা কয়জন প্রাতঃকালে এইখানে উপাসনা করতে বসি—এও একটি সৃষ্টি। এর মাঝখানেও সেই সবিতা আছেন।

আমরা বলে থাকি এটা এইরকম হয়ে উঠেছে। আমরা দু-চার জনে পরামর্শ করলুম, তার পরে একত্র হয়ে বসলুম, তার পরে রোজ রোজ এই রকম চলে আসছে।

ঘটনা এই বটে কিন্তু সত্য এই নয়। ঘটনার দিক থেকে দেখলে এ একটি সামান্য ব্যাপার কিন্তু সত্যের দিক থেকে দেখলে এ বড়ো আশ্চর্য প্রতিদিনই আশ্চর্য। সত্য মাঝখানে এসে নানা অপরিচিতকে নানা দিক থেকে টেনে এই একটি উপাসনামণ্ডলী নিরন্তর সৃষ্টি করছেন। আমরা মনে করছি আমরা এখানে খানিকক্ষণের জন্যে বসে কাজ সেরে তার পরে অন্য কাজে চলে গেলুম, বাস চুকে গেল—কিন্তু এ তো ছোটো ব্যাপার নয়। আমরা যখন পড়ছি, পড়াচ্ছি, খাচ্ছি, বেড়াচ্ছি, তখনও এই আমাদের মণ্ডলীটির সৃষ্টিকর্তা এরই সৃষ্টিকার্যে রয়েছেন। সেই জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ বিশ্বকর্মা আমাদের মধ্যে কাজ করে চলেছেন, তিনি আমাদের এই কয় জন ভিন্ন ভিন্ন লোকের মনে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে এর উপকরণ সাজিয়ে তুলেছেন। তাঁর যেন আর অন্য কোনো কাজ নেই, বিশ্বসৃষ্টি তাঁর যত বড়ো কাজ এও যেন তাঁর তত বড়োই কাজ। আমাদের এই উপাসনালোকটি কেবলই হচ্ছে, হচ্ছে, হয়ে উঠছে—দিনরাত, দিনরাত। আমরা

যখন ঘুমোচ্ছি তখনও হচ্ছে, আমরা যখন ভুলে আছি তখনও হচ্ছে। সত্য যখন আছে, তখন কিছুই হচ্ছে না, বা একমুহূর্তও তার বিরাম আছে এ কখনো হতেই পারে না।

বিশ্বভুবনের মাঝখানে একটি সত্যং বিরাজ করছেন বলেই প্রতিদিনই বিশ্বভুবনকে তার যথাস্থানে যথানিয়মে দেখতে পাচ্ছি। আমাদের কয়জনের মাঝখানে একটি সত্যং কাজ করছেন বলেই প্রতিদিন প্রাতঃকালে আমরা এখানে এসে বসেছি। বিশ্বভুবন সেই এক সত্যকে প্রদক্ষিণ করে প্রণাম করছে। যেখানে আমাদের দুরবীন পৌঁছোয় না, মন পৌঁছোয় না, সেখানেও কত জ্যোতির্ময় লোক তাঁকে বেষ্টন করে করে বলছে নমোনমঃ। আমরাও তেমনি করেই আমাদের এই উপাসনালোকের সত্যকে বেষ্টন করে বসেছি, যিনি লোক-লোকান্তরের মাঝখানে বসে আছেন তিনি এই প্রাঙ্গণে বসে আছেন; কেবল যে আমাদের মধ্যে চৈতন্য বিকীর্ণ করছেন তা নয়, আমাদের কয়জনকে নিয়ে যে বিশেষ সৃষ্টি চলছে তারও শক্তি বিকীর্ণ করছেন, আমাদের কয়েকজনের মনকে এই বিশেষ ব্যাপারে নানারকম করে চালাচ্ছেন, আমাদের কয়জনের প্রকৃতি সংস্কার ও শিক্ষার নানা বৈচিত্র্যকে সেই এক এই মুহূর্তেই একটি ঐক্যের মধ্যে গড়ে তুলছেন এবং আমরা যখন এখান থেকে উঠে অন্যত্র চলে যাব তখনও তিনি তাঁর এই কাজে বিশ্রাম দেবেন না।

আমাদের মাঝখানের সেই সত্যকে আমাদের উপাসনাজগতের সেই সবিতাকে এইখানে প্রত্যক্ষ দর্শন করে যাব, তাঁকে প্রদক্ষিণ করে তাঁকে একসঙ্গে প্রণাম করে যাব। আমরা প্রত্যহ জেনে যাব, সূর্যচন্দ্র গ্রহতারা যেমন তাঁর অনন্ত সৃষ্টি আমাদের কয়জনকে যে এখানে বসিয়েছেন এও তাঁর তেমনি সৃষ্টি। তাঁর অবিরাম আনন্দ এই কাজটিতে প্রকাশিত হচ্ছে, সেই প্রকাশকে আমরা দেখে যাব।

৩ চৈত্র ১৩১৫

মৃত্যু ও অমৃত

সম্প্রতি অকস্মাৎ আমার একটি বন্ধুর মৃত্যু হয়েছে। এই উপলক্ষ্যে জগতে সকলের চেয়ে পরিচিত যে মৃত্যু তার সঙ্গে আর একবার নূতন পরিচয় হল।

জগৎটা গায়ের চামড়ার মতো আঁকড়ে ধরেছিল, মাঝখানে কোনো ফাঁক ছিল না। মৃত্যু যখন প্রত্যক্ষ হল তখন সেই জগৎটা যেন কিছু দূরে চলে গেল, আমার সঙ্গে আর যেন সে অত্যন্ত সংলগ্ন হয়ে রইল না।

এই বৈরাগ্যের দ্বারা আত্মা যেন নিজের স্বরূপ কিছু উপলব্ধি করতে পারল। সে যে

জগতের সঙ্গে একেবারে অচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত নয় তার যে একটি স্বকীয় প্রতিষ্ঠা আছে মৃত্যুর শিক্ষায় এই কথাটা যেন অনুভব করতে পারলুম।

যাঁর মৃত্যু হল তিনি ভোগী ছিলেন এবং তাঁর ঐশ্বর্যের অভাব ছিল না। তাঁর সেই ভোগের জীবন ভোগের আয়োজন—যা কেবল তাঁর কাছে নয়, সর্বসাধারণের কাছে অত্যন্ত সত্য বলে প্রতীয়মান হয়েছিল, যা বহুপ্রকার সাজে সজ্জায় জাঁকেজমকে লোকের চক্ষুকর্ণকে ঈর্ষা ও লুব্ধতায় আকৃষ্ট করে আকাশে মাথা তুলেছিল তা একটি মুহূর্তেই শ্মশানের ভস্মমুষ্টির মধ্যে অনাদরে বিলুপ্ত হয়ে গেল।

সংসার যে এতই মিথ্যা, তা যে কেবল স্বপ্ন কেবল মরীচিকা, নিশ্চিত মৃত্যুকে স্মরণ করে শাস্ত্র সেই কথা চিন্তা করবার জন্যে বারবার উপদেশ করেছেন। নতুবা আমরা কিছুই ত্যাগ করতে পারি নে এবং ভোগের বন্ধনে জড়িত থেকে আত্মা নিজের বিশুদ্ধ মুক্তস্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে না।

কিন্তু সংসারকে মিথ্যা মরীচিকা বলে ত্যাগকে সহজ করে তোলার মধ্যে সত্যও নেই গৌরবও নেই। যে দেশে আমাদের টাকা চলে না সেই দেশে এখানকার টাকার বোঝাটাকে জঞ্জালের মতো মাটিতে ফেলে দেওয়ার মধ্যে ঔদার্য কিছুই নেই। কোনোপ্রকারে সংসারকে যদি একেবারেই অলীক বলে নিজের কাছে যথার্থই সপ্রমাণ করতে পারি তাহলে ধনজনমান তো মন থেকে খসে পড়ে একেবারেই শূন্যের মধ্যে বিলীন হয়ে যাবে।

কিন্তু সেরকম ছেড়ে দেওয়া ফেলে দেওয়া নিতান্তই একটা রিক্ততা মাত্র। সে যেন স্বপ্ন ভেঙে যাওয়ার মতো—যা ছিল না তাকেই চমকে উঠে নেই বলে জানা।

বস্তুত সংসার তো মিথ্যা নয়, জোর করে তাকে মিথ্যা বলে লাভ কী। যিনি গেলেন তিনি গেলেন বটে কিন্তু সংসারে তো ক্ষতির কোনো লক্ষণই দেখি নে। সূর্যালোকে তো কোনো কালিমা পড়ে নি—আকাশের নীল নির্মলতায় মৃত্যুর চাকা তো ক্ষতির একটি রেখাও কাটতে পারে নি; অক্ষুণ্ন সংসারের ধারা আজও পূর্ণবেগেই চলেছে।

তবে অসত্য কোন্‌টা? এই সংসারকে আমার বলে জানা। এর একটি সূচ্যগ্র বিন্দুকেও আমার বলে আমি ধরে রাখতে পারব না। যে ব্যক্তি চিরজীবন কেবল ওই আমার উপরেই সমস্ত জিনিসের প্রতিষ্ঠা করতে চায় সেই বালির উপর ঘর বাঁধে। মৃত্যু যখন ঠেলা দেয় তখন সমস্তই ধুলায় পড়ে ধূলিসাৎ হয়।

আমি বলে যে কাঙালটা সব জিনিসকেই গালের মধ্যে দিতে চায়, সব জিনিসকেই মুঠোর মধ্যে পেতে চায়, মৃত্যু কেবল তাকেই ফাঁকি দেয়—তখন সে মনের খেদে সমস্ত সংসারকেই ফাঁকি বলে গাল দিতে থাকে, কিন্তু সংসার যেমন তেমনিই থেকে যায়, মৃত্যু তার গায়ে আঁচড়টি কাটতে পারে না।

অতএব মৃত্যুকে যখন কোথাও দেখি তখন সর্বত্রই তাকে দেখতে থাকা মনের একটা বিকার। যেখানে অহং সেইখানেই কেবল মৃত্যুর হাত পড়ে, আর কোথাও না। জগৎ কিছুই হারায় না, যা হারাবার সে কেবল অহং হারায়।

অতএব আমাদের যা কিছু দেবার সে কাকে দেব? সংসারকেই দেব, অহংকে দেব না। কারণ সংসারকে দিলেই সত্যকে দেওয়া হবে, অহংকে দিলেই মৃত্যুকে দেওয়া হবে। সংসারকে যা দেব সংসার তা রাখবে, অহংকে যা দেব অহং তা শত চেষ্টাতেও রাখতে পারবে না।

যে ব্যক্তি ভোগী সে অহংকেই সমস্ত পূজা জোগায়, সে চিরজীবন এই অহং-এর মুখ তাকিয়ে খেটে মরে। মৃত্যুর সময় তার সেই ভোগস্ফীত ক্ষুধার্ত অহং কপালে হাত দিয়ে বলে সমস্তই রইল পড়ে কিছুই নিয়ে যেতে পারলুম না।

মৃত্যুর কথা চিন্তা করে এই অহংটাকেই যদি চিরন্তন বলে না জানি তাহলেই যথেষ্ট হল না—কারণ, সেরকম বৈরাগ্যে কেবল শূন্যতাই আনে। সেই সঙ্গে এও জানতে হবে যে এই সংসারটা থাকবে। অতএব আমার যা কিছু দেবার তা শূন্যের মধ্যে ত্যাগরূপে দেব না, সংসারের মধ্যে দানরূপে দিতে হবে। এই দানের দ্বারাই আত্মার ঐশ্বর্য প্রকাশ হবে ত্যাগের দ্বারা নয়;—আত্মা নিজে কিছু নিতে চায় না সে দিতে চায়, এতেই তার মহত্ত্ব। সংসার তার দানের ক্ষেত্র এবং অহং তার দানের সামগ্রী।

ভগবান এই সংসারের মাঝখানে থেকে নিজেকে কেবলই দিচ্ছেন, তিনি নিজের জন্যে কিছুই নিচ্ছেন না। আমাদের আত্মাও যদি ভগবানের সেই প্রকৃতিকে পায় তবে সত্যকে লাভ করে। সেও সংসারের মাঝখানে ভগবানের পাশে তাঁর সখারূপে দাঁড়িয়ে নিজেকে সংসারের জন্য উৎসর্গ করবে, নিজের ভোগের জন্য লালায়িত হয়ে সমস্তই নিজের দিকে টানবে না। এই দেবার দিকেই অমৃত, নেবার দিকেই মৃত্যু। টাকাকড়ি শক্তি-সামর্থ্য সমস্তই সত্য যদি তা দান করি—যদি তা নিজে নিতে চাই তো সমস্তই মিথ্যা। সেই কথাটা যখন ভুলি তখন সমস্তই উলটা-পালটা হয়ে যায়—তখনই শোক দুঃখ ভয়, তখনই কাম ক্রোধ লোভ। তখনই, স্রোতের মুখে যে নৌকা আমাকেই বহন করে নিয়ে যেত, উজানে তাকে প্রাণপণে বহন করবার জন্য আমাকেই ঠেলাঠেলি টানাটানি করে মরতে হয়। যে জিনিস স্বভাবতই দেবার তাকে নেবার চেষ্টা করার এই পুরস্কার। যখন মনে করি যে নিজে নিচ্ছি তখন দিই সেটা মৃত্যুকে—এবং সেই সঙ্গে শোক চিন্তা ভয় প্রভৃতি মৃত্যুর অনুচরকে তাদের খোরাকিস্বরূপ হৃদয়ের রক্ত জোগাতে থাকি।

৪ চৈত্র

তরী বোঝাই

সোনার তরী বলে একটা কবিতা লিখেছিলুম এই উপলক্ষ্যে তার একটা মানে বলা যেতে পারে।

মানুষ সমস্ত জীবন ধরে ফসল চাষ করছে। তার জীবনের খেতটুকু দ্বীপের মতো, চারিদিকেই অব্যক্তের দ্বারা সে বেষ্টিত, ওই একটুখানিই তার কাছে ব্যক্ত হয়ে আছে। সেইজন্যে গীতা বলেছেন—

> অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত
> অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিবেদনা।

যখন কাল ঘনিয়ে আসছে, যখন চারিদিকের জল বেড়ে উঠছে, যখন আবার অব্যক্তের মধ্যে তার ওই চরটুকু তলিয়ে যাবার সময় হল—তখন তার সমস্ত জীবনের কর্মের যা কিছু নিত্য ফল তা সে ওই সংসারের তরণীতে বোঝাই করে দিতে পারে। সংসার সমস্তই নেবে, একটি কণাও ফেলে দেবে না। কিন্তু যখন মানুষ বলে ওই সঙ্গে আমাকেও নাও আমাকেও রাখো, তখন সংসার বলে তোমার জন্যে জায়গা কোথায়? তোমাকে নিয়ে আমার হবে কী? তোমার জীবনের ফসল যা কিছু রাখবার তা সমস্তই রাখব কিন্তু তুমি তো রাখবার যোগ্য নও।

প্রত্যেক মানুষ জীবনের কর্মের দ্বারা সংসারকে কিছু-না কিছু দান করছে, সংসার তার সমস্তই গ্রহণ করছে, রক্ষা করছে, কিছুই নষ্ট হতে দিচ্ছে না—কিন্তু মানুষ যখন সেই সঙ্গে অহংকেই চিরন্তন করে রাখতে চাচ্ছে তখন তার চেষ্টা বৃথা হচ্ছে। এই যে জীবনটি ভোগ করা গেল অহংটিকেই তার খাজনাস্বরূপ মৃত্যুর হাতে দিয়ে হিসাব চুকিয়ে যেতে হবে। ওটি কোনোমতেই জমাবার জিনিস নয়।

৪ চৈত্র

স্বভাবকে লাভ

আমাদের জীবনের একটিমাত্র সাধনা এই যে, আমাদের আত্মার যা স্বভাব সেই স্বভাবটিকেই যেন বাধামুক্ত করে তুলি।

আত্মার স্বভাব কী? পরমাত্মার যা স্বভাব আত্মারও স্বভাব তাই। পরমাত্মার স্বভাব কী? তিনি গ্রহণ করেন না, তিনি দান করেন।

তিনি সৃষ্টি করেন। সৃষ্টি করার অর্থই হচ্ছে বিসর্জন করা। এই যে তিনি বিসর্জন করেন এর মধ্যে কোনো দায় নেই, কোনো বাধ্যতা নেই। আনন্দের ধর্মই হচ্ছে স্বতই দান করা, স্বতই বিসর্জন করা। আমরাও তা জানি। আমাদের আনন্দ আমাদের প্রেম বিনা কারণে আত্মবিসর্জনেই আপনাকে চরিতার্থ করে। এইজন্যেই উপনিষৎ বলেন—আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। সেই আনন্দময়ের স্বভাবই এই।

আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার একটি সাধর্ম্য আছে। আমাদের আত্মাও নিয়ে খুশি নয় সে দিয়ে খুশি। নেব, কাড়ব, সঞ্চয় করব, এই বেগই যদি ব্যাধির বিকারের মতো জেগে ওঠে তাহলে ক্ষোভের ও তাপের সীমা থাকে না। যখন আমরা সমস্ত মন দিয়ে বলি, দেব, তখনই আমাদের আনন্দের দিন। তখনই সমস্ত ক্ষোভ দূর হয়, সমস্ত তাপ শান্ত হয়ে যায়।

আত্মার এই আনন্দময় স্বরূপটিকে উপলব্ধি করবার সাধনা করতে হবে। কেমন করে করব?

ওই যে একটা ক্ষুধিত অহং আছে, যে-কাঙাল সব জিনিসই মুঠো করে ধরতে চায়, যে-কৃপণ নেবার মতলব ছাড়া কিছু দেয় না ফলের মতলব ছাড়া কিছু করে না, সেই অহংটাকে বাইরে রাখতে হবে, তাকে পরমাত্মীয়ের মতো সমাদর করে অন্তঃপুরে ঢুকতে দেওয়া হবে না। সে বস্তুত আত্মার আত্মীয় নয় কেননা সে যে মরে, আর আত্মা যে অমর।

আত্মা যে, ন জায়তে ম্রিয়তে, না জন্মায় না মরে। কিন্তু ওই অহংটা জন্মেছে, তার একটা নামকরণ হয়েছে; কিছু না পারে তো অন্তত তার ওই নামটাকে স্থায়ী করবার জন্যে তার প্রাণপণ যত্ন।

এই যে আমার অহং, একে একটা বাইরের লোকের মতো আমি দেখব। যখন তার দুঃখ হবে তখন বলব তার দুঃখ হয়েছে। শুধু দুঃখ কেন, তার ধন জন খ্যাতি প্রতিপত্তি কিছুতে আমি অংশ নেব না।

আমি বলব না যে এ সমস্ত আমি পাচ্ছি আমি নিচ্ছি। প্রতিদিনই এই চেষ্টা করব আমার অহং যা কিছুকে আঁকড়ে ধরতে চায় আমি তাকে যেন গ্রহণ না করি। আমি বারবার করে বলব, ও আমার নয়, ও আমার বাইরে।

যা বাইরেকার তাকে বাইরে রাখতে প্রাণ সরে না বলে আবর্জনায় ভরে উঠলুম, বোঝায় চলা দায় হল। সেই মৃত্যুময় উপকরণের বিকারে প্রতিদিনই আমি মরছি।

এই মরণধর্মী অহংটাকেই আত্মার সঙ্গে জড়িয়ে তার শোকে, তার দুঃখে, তার ভারে ক্লান্ত হচ্ছি।

অহং-এর স্বভাব হচ্ছে নিজের দিকে টানা, আর আত্মার স্বভাব হচ্ছে বাইরের দিকে দেওয়া—এইজন্যে এই দুটোতে জড়িয়ে গেলে ভারি একটা পাকের সৃষ্টি হয়। একটা বেগ প্রবাহিত হয়ে যেতে চায়, আর একটা বেগ কেবলই ভিতরের দিকে আকর্ষণ করতে থাকে, ভারি একটা সংকট ঘনিয়ে ওঠে। আত্মা তার স্বভাবের বিরুদ্ধে আকৃষ্ট হয়ে ঘূর্ণিত হতে থাকে, সে অনন্তের অভিমুখে চলে না, সে একই বিন্দুর চারিদিকে ঘানির বলদের মতো পাক খায়। সে চলে অথচ এগোয় না—সুতরাং এ চলায় কেবল তার কষ্ট, এতে তার সার্থকতা নয়।

তাই বলছিলুম এই সংকট থেকে উদ্ধার পেতে হবে। অহং-এর সঙ্গে একেবারে এক হয়ে মিলে যাব না, তার সঙ্গে বিচ্ছেদ রাখব। দান করব, কর্ম করব, কিন্তু অহং যখন সেই কর্মের ফল হাতে করে তাকে লেহন করে দংশন করে নাচতে নাচতে উপস্থিত হবে তখন তার সেই উচ্ছিষ্ট ফলকে কোনোমতেই গ্রহণ করব না।

কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।

৫ চৈত্র

অহং

তবে অহং আছে কেন? এই অহং-এর যোগে আত্মা জগতের কোনো জিনিসকে আমার বলতে চায় কেন?

তার একটি কারণ আছে।

ঈশ্বর যা সৃষ্টি করেন তার জন্যে তাঁকে কিছুই সংগ্রহ করতে হয় না। তাঁর আনন্দ স্বভাবতই দানরূপে বিকীর্ণ হচ্ছে।

আমাদের তো সে ক্ষমতা নেই। দান করতে গেলে আমাদের যে উপকরণ চাই। সেই উপকরণ তো কেবলমাত্র আনন্দের দ্বারা আমরা সৃষ্টি করতে পারি নে।

তখন আমার অহং উপকরণ সংগ্রহ করে আনে। সে যা-কিছু সংগ্রহ করে তাকে সে আমার বলে। কারণ, তাকে নানা বাধা কাটিয়ে সংগ্রহ করতে হয়, এই বাধা কাটাতে তাকে শক্তি প্রয়োগ করতে হয়। সেই শক্তির দ্বারা এই উপকরণে তার অধিকার জন্মায়।

শক্তির দ্বারা অহং শুধু যে উপকরণ সংগ্রহ করে তা নয়, সে উপকরণকে বিশেষ-

ভাবে সাজায়, তাকে একটি বিশেষত্ব দান করে গড়ে তোলে। এই বিশেষত্ব-দানের দ্বারা সে যা-কিছু গড়ে তোলে তাকে সে নিজের জিনিস বলেই গৌরব বোধ করে।

এই গৌরবটুকু ঈশ্বর তাকে ভোগ করতে দিয়েছেন। এই গৌরবটুকু যদি সে বোধ না করবে তবে সে দান করবে কী করে? যদি কিছুই তার "আমার" না থাকে তবে সে দেবে কী?

অতএব দানের সামগ্রীটিকে প্রথমে একবার "আমার" করে নেবার জন্যে এই অহং-এর দরকার। বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর বলে রেখেছেন জগতের মধ্যে যেটুকুকেই আমার আত্মা এই অহং-এর গণ্ডি দিয়ে ঘিরে নিতে পারবে তাকে তিনি আমার বলতে দেবেন—কারণ তার প্রতি যদি মমত্বের অধিকার না জন্মে তবে আত্মা যে একেবারেই দরিদ্র হয়ে থাকবে। সে দেবে কী? বিশ্বভুবনের কিছুকেই তার আমার বলবার নেই।

ঈশ্বর ওইখানে নিজের অধিকারটি হারাতে রাজি হয়েছেন। বাপ যেমন ছোটো শিশুর সঙ্গে কুস্তির খেলা খেলতে খেলতে ইচ্ছাপূর্বক হার মেনে পড়ে যান, নইলে কুস্তির খেলাই হয় না, নইলে স্নেহের আনন্দ জমে না, নইলে ছেলের মুখে হাসি ফোটে না, সে হতাশ হয়ে পড়ে; তেমনি ঈশ্বর আমাদের মতো অনধিকারী শক্তিহীনের কাছে এক জায়গায় হার মানেন, এক জায়গায় তিনি হাসিমুখে বলতে দেন যে আমাদেরই জিত, বলতে দেন যে আমার শক্তিতেই হল, বলতে দেন যে আমারই টাকাকড়ি ধনজন আমারই সসাগরা বসুন্ধরা।

তা যদি না দেন তবে তিনি যে-খেলা খেলেন সেই আনন্দের খেলায়, সেই সৃষ্টির খেলায়, আমার আত্মা একেবারেই যোগ দিতে পারে না। তাকে খেলা বন্ধ করে হতাশ হয়ে চুপ করে বসে থাকতে হয়। সেইজন্য তিনি কাঠবিড়ালির পিঠে করুণ হাত বুলিয়ে বলেন, বাবা, কালসমুদ্রের উপরে তুমিও সেতু বাঁধছ বটে, শাবাশ তোমাকে!

এই যে তিনি আমার বলবার অধিকার দিয়েছেন, এই অধিকারটি কেন? এর চরম উদ্দেশ্যটি কী?

এর চরম উদ্দেশ্য এই যে পরমাত্মার সঙ্গে আত্মার যে একটি সমান ধর্ম আছে সেই ধর্মটি সার্থক হবে। সেই ধর্মটি হচ্ছে সৃষ্টির ধর্ম অর্থাৎ দেবার ধর্ম। দেবার ধর্মই হচ্ছে আনন্দের ধর্ম। আত্মার যথার্থস্বরূপ হচ্ছে আনন্দময়স্বরূপ—সেই স্বরূপে সে সৃষ্টিকর্তা, অর্থাৎ দাতা। সেই স্বরূপে সে কৃপণ নয়, সে কাঙাল নয়। অহং-এর দ্বারা আমরা 'আমার' জিনিস সংগ্রহ করি, নইলে বিসর্জন করবার আনন্দ যে ম্লান হয়ে যাবে।

নদীর জল যখন নদীতে আছে তখন সে সকলেরই জল—যখন আমার ঘড়ায় তুলে

আনি তখন সে আমার জল, তখন সেই জল আমার ঘড়ার বিশেষত্ব দ্বারা সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। কোনো তৃষ্ণাতুরকে যদি বলি নদীতে গিয়ে জল খাও গে তাহলে জল দান করা হল না—যদিচ সে জল প্রচুর বটে, এবং নদীও হয় তো অত্যন্ত কাছে। কিন্তু আমার পাত্র থেকে সেই নদীরই জল এক গণ্ডূষ দিলেও সেটা জল দান করা হল।

বনের ফুল তো দেবতার সম্মুখেই ফুটেছে। কিন্তু তাকে আমার ডালিতে সাজিয়ে একবার আমার করে নিলে তবে তার দ্বারা দেবতার পূজা হয়। দেবতাও তখন হেসে বলেন, হাঁ তোমার ফুল পেলুম। সেই হাসিতেই আমার ফুল তোলা সার্থক হয়ে যায়।

অহং আমাদের সেই ঘট, সেই ডালি। তার বেষ্টনের মধ্যে যা এসে পড়ে তাকেই “আমার” বলবার অধিকার জন্মায়—একবার সেই অধিকারটি না জন্মালে দানের অধিকার জন্মায় না।

তবেই দেখা যাচ্ছে, অহং-এর ধর্মই হচ্ছে সংগ্রহ করা, সঞ্চয় করা। সে কেবলই নেয়। পেলুম বলে যতই তার গৌরব বোধ হয় ততই তার নেবার আগ্রহ বেড়ে যায়। অহং-এর যদি এই রকম সব জিনিসেই নিজের নাম নিজের সিলমোহর চিহ্নিত করবার স্বভাব না থাকত তাহলে আত্মার যথার্থ কাজটি চলত না, সে দরিদ্র এবং জড়বৎ হয়ে থাকত।

কিন্তু অহং-এর এই নেবার ধর্মটিই যদি একমাত্র হয়ে ওঠে, আত্মার দেবার ধর্ম যদি আচ্ছন্ন হয়ে যায়, তবে কেবলমাত্র নেওয়ার লোলুপতার দ্বারা আমাদের দারিদ্র্য বীভৎস হয়ে দাঁড়ায়। তখন আত্মাকে আর দেখা যায় না, অহংটাই সর্বত্র ভয়ংকর হয়ে প্রকাশ পায়। তখন আমার আনন্দময়স্বরূপ কোথায়? তখন কেবল ঝগড়া, কেবল কান্না, কেবল ভয়, কেবল ভাবনা।

তখন ডালির ফুল নিয়ে আত্মা পূজা করতে পায় না। অহং বলে এ সমস্তই আমি নিলুম।

সে মনে করে আমি পেয়েছি। কিন্তু ডালির ফুল তো বনের ফুল নয় যে, কখনো ফুরোবে না, নিত্যই নূতন নূতন করে ফুটবে। পেলুম বলে যখন সে নিশ্চিন্ত হয়ে আছে ফুল তখন শুকিয়ে যাচ্ছে। দুদিনে সে কালো হয়ে গুঁড়িয়ে ধুলো হয়ে যায়, পাওয়া একেবারে ফাঁকি হয়ে যায়।

তখন বুঝতে পারি পাওয়া জিনিসটা নেওয়া জিনিসটা কখনোই নিত্য হতে পারে না। আমরা পাব নেব, আমার করব, কেবল দেওয়ার জন্য। নেওয়াটা কেবল দেওয়ারই উপলক্ষ্য—অহংটা কেবল অহংকারকে বিসর্জন করতে হবে বলেই। নিজের

দিকে একবার টেনে আনব বিশ্বের দিকে উৎসর্গ করবার অভিপ্রায়ে। ধনুকে তীর যোজনা করে প্রথমে নিজের দিকে তাকে যে আকর্ষণ করি সে তো নিজেকে বিদ্ধ করবার জন্যে নয়, সম্মুখেই তাকে ক্ষেপণ করবার জন্যে।

তাই বলছিলুম অহং যখন তার নিজের সঞ্চয়গুলি এনে আত্মার সম্মুখে ধরবে তখন আত্মাকে বলতে হবে, না ও আমার নয়, ও আমি নেব না। ও সমস্তই বাইরে রাখতে হবে, বাইরে দিতে হবে, ওর এক কণাও আমি ভিতরে তুলব না। অহং-এর এই সমস্ত নিরন্তর সঞ্চয়ের দ্বারা আত্মাকে বদ্ধ হয়ে থাকলে চলবে না। কারণ এই বদ্ধতা আত্মার স্বাভাবিক নয়, আত্মা দানের দ্বারা মুক্ত হয়। পরমাত্মা যেমন সৃষ্টির দ্বারা বদ্ধ নন, তিনি সৃষ্টির দ্বারাই মুক্ত, কেননা তিনি নিচ্ছেন না তিনি দিচ্ছেন, আত্মাও তেমনি অহং-এর রচনা দ্বারা বদ্ধ হবার জন্যে হয় নি, এই রচনাগুলিদ্বারাই সে মুক্ত হবে, তার আনন্দস্বরূপ মুক্ত হবে, কারণ এইগুলিই সে দান করবে। এই দানের দ্বারাই তার যথার্থ প্রকাশ। ঈশ্বরেরও আনন্দরূপ অমৃতরূপ বিসর্জনের দ্বারাই প্রকাশিত। সেই জন্য অহং তখনই আত্মার যথার্থ প্রকাশ হয়, যখন আত্মা তাকে উৎসর্গ করে দেয়, আত্মা তাকে নিজেই গ্রহণ না করে।

৬ চৈত্র

নদী ও কূল

অমর আত্মার সঙ্গে এই মরণধর্মী অহংটা আলোর সঙ্গে ছায়ার মতো যে নিয়তই লেগে রয়েছে। শিক্ষার দ্বারা, অভ্যাসের দ্বারা, ঘটনাসংঘাতের দ্বারা, স্থানিক এবং সাময়িক নানা প্রভাবের দ্বারা, শরীর মন হৃদয়ের প্রকৃতিগত প্রবৃত্তির বেগের দ্বারা অহরহ নানা সংস্কার গড়ে তুলছে এবং কেবলই এই সংস্কার-দেহটির পরিবর্তন ঘটাচ্ছে, আমাদের আত্মার নামরূপময় একটি চিরচঞ্চল পরিবেষ্টন তৈরি করছে। এই অহংকে যদি একেবারে মিথ্যা মায়া বলে উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করি তাহলেই সে যে ঘরে গিয়ে মরে থাকবে এমন আশঙ্কা নেই। যেমন সংসারকে মনের ক্ষোভে মিথ্যা বললেই সে মিথ্যা হয় না তেমনি এই অহংকে রাগ করে মিথ্যা অপবাদ দিলে তার তাতে ক্ষতিবৃদ্ধি ঘটে না।

আত্মার সঙ্গে তার একটি সত্য সম্বন্ধ আছে সেইখানেই সে সত্য, সেই সম্বন্ধের বিকার ঘটলেই সে মিথ্যা। এই উপলক্ষ্যে আমি একটি উপমার অবতারণ করতে চাই।

নদীর ধারাটা চিরন্তন। সে পর্বতের গুহা থেকে নিঃসৃত হয়ে সমুদ্রের অতলের মধ্যে প্রবেশ করছে। সে যে-ক্ষেত্রের উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে সেই ক্ষেত্র থেকে উপকরণ-রাশি তার গতিবেগে আহরিত হয়ে চর বেঁধে উঠছে—কোথাও নুড়ি, কোথাও বালি, কোথাও মাটি জমছে, তার সঙ্গে নানা দেশের কত ধাতুকণা এবং জৈব পদার্থ এসে মিলছে। এই চর কতবার ভাঙছে, কতবার গড়ছে, কত স্থান ও আকার পরিবর্তন করছে। এর কোথাও বা গাছপালা উঠছে, কোথাও বা মরুভূমি। কোথাও জলাশয়ে পাখি চরছে কোথাও বা বালির উপর কুমিরের ছানা হাঁ করে পড়ে রোদ পোয়াচ্ছে।

এই চিরপরিবর্তনশীল চরগুলিই যদি একান্ত প্রবল হয়ে ওঠে তাহলেই নদীর চিরন্তন ধারা বাধা পায়। ক্রমে ক্রমে নদী হয়ে পড়ে গৌণ, চরই হয়ে পড়ে মুখ্য। শেষকালে ফল্গুর মতো নদীটা একেবারেই আচ্ছন্ন হয়ে যেতে পারে।

আত্মা সেই চিরস্রোত নদীর মতো। অনাদি তার উৎপত্তিশিখর, অনন্ত তার সঞ্চারক্ষেত্র। আনন্দই তাকে গতিবেগ দিয়েছে, সেই গতির বিরাম নেই।

এই আত্মা যে-দেশ দিয়ে যে-কাল দিয়ে চলেছে তার গতিবেগে সেই দেশ ও সেই কালের নানা উপকরণ সঞ্চিত হয়ে তার একটি সংস্কাররূপ তৈরি হতে থাকে—এই জিনিসটি কেবলই ভাঙছে, গড়ছে, কেবলই আকার পরিবর্তন করছে।

কিন্তু সৃষ্টি কোনো কোনো অবস্থায় সৃষ্টিকর্তাকে ছাপিয়ে উঠতে পারে। আত্মাকেও তার দেশকালজাত অহং প্রবল হয়ে উঠে অবরুদ্ধ করতে পারে। এমন হতে পারে অহংটাকেই তার স্তূপাকার উপকরণসমেত দেখা যায়, আত্মাকে আর দেখা যায় না। অহং চারিদিকেই বড়ো হয়ে উঠে আত্মাকে বলতে থাকে—তুমি চলতে পাবে না, তুমি এইখানেই থেকে যাও; তুমি এই ধন-দৌলতেই থাকো, এই ঘরবাড়িতেই থাকো, এই খ্যাতি প্রতিপত্তিতেই থাকো।

যদি আত্মা আটকা পড়ে তবে তার স্বরূপ ক্লিষ্ট হয়, তার স্বভাব নষ্ট হয়। সে তার গতি হারায়। অনন্তের মুখে সে আর চলে না, সে মজে যায়, সে মরতে থাকে।

আত্মা দেশকালপাত্রের মধ্যে দিয়ে নানা উপকরণে এই যে নিজের উপকূল রচনা করতে থাকে তার প্রধান সার্থকতা এই যে, এই কূলের দ্বারাই তার গতি সাহায্যপ্রাপ্ত হয়। এই কূল না থাকলে সে ব্যাপ্ত হয়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে অচল হয়ে থাকত। অহং লোকে লোকান্তরে আত্মার গতিবেগকে বাড়িয়ে তার গতিপথকে এগিয়ে নিয়ে চলে। উপকূলই নদীর সীমা এবং নদীর রূপ—অহংই আত্মার সীমা আত্মার রূপ। এই রূপের

মধ্য দিয়েই আত্মার প্রবাহ, আত্মার প্রকাশ। এই প্রকাশ-পরম্পরার ভিতর দিয়েই সে নিজেকে নিয়ত উপলব্ধি করছে, অনন্তের মধ্যে সঞ্চরণ করছে। এই অহং-উপকূলের নানা ঘাতে প্রতিঘাতেই তার তরঙ্গ তার সংগীত।

কিন্তু যখনই উপকূলই প্রধান হয়ে উঠতে থাকে, যখন সে নদীর আনুগত্য না করে, তখনই গতির সহায় না হয়ে সে গতি রোধ করে। তখন অহং নিজে ব্যর্থ হয় এবং আত্মাকে ব্যর্থ করে। যেটুকু বাধায় আত্মা বেগ পায় তার চেয়ে অধিক বাধায় আত্মা অবরুদ্ধ হয়। তখন উপকূল নদীর সামগ্রী না হয়ে নদীই উপকূলের সামগ্রী হয়ে ওঠে এবং আত্মাই অহং-এর বশীভূত হয়ে নিজের অমরত্ব ভুলে সংসারে নিতান্ত দীনহীন হয়ে বাস করতে থাকে। নিজেকে দানের দ্বারা যে সার্থক হত, সঞ্চয়ের বহুতর শুষ্কবালুময় বেষ্টনের মধ্যে সে মৃত্যুশয্যায় পড়ে থাকে। তবু মরে না, কেবল নিজের দুর্গতিকেই ভোগ করে।

৭ চৈত্র

আত্মার প্রকাশ

প্রকাশ এবং যাঁর প্রকাশ উভয়ের মধ্যে একটি বৈপরীত্য থাকে, সেই বৈপরীত্যের সামঞ্জস্যের দ্বারাই উভয়ে সার্থকতা লাভ করে। বস্তুত বিরোধের মিলন ছাড়া প্রকাশ হতেই পারে না।

কর্মের মধ্যে শক্তির একটি বাধা আছে—সেই বাধাকে অতিক্রম করে কর্মের সঙ্গে সংগত হয় বলেই শক্তিকে শক্তি বলি। কর্মের মধ্যে শক্তির সেই বিরোধ যদি না থাকত তাহলে শক্তিকে শক্তিই বলতুম না। আবার, যদি কেবল বিরোধই থাকত তার কোনো সামঞ্জস্যই না থাকত তাহলেও শক্তিকে শক্তি বলা যেত না।

জগতের মধ্যে জগদীশ্বরের যে প্রকাশ, সে হচ্ছে সীমার মধ্যে অসীমের প্রকাশ। এই সীমায় অসীমে বৈপরীত্য আছে, তা না হলে অসীমের প্রকাশ হতে পারত না। কিন্তু কেবলই যদি বৈপরীত্যই থাকত তাহলেও সীমা অসীমকে আচ্ছন্ন করেই থাকত।

এক জায়গায় সীমার সঙ্গে অসীমের সামঞ্জস্য আছে। সে কোথায়? যেখানে সীমা আপনার সীমার মধ্যেই স্থির হয়ে বসে নেই, যেখানে সে অহরহই অসীমের দিকে চলেছে। সেই চলায় তার শেষ নেই—সেই চলায় সে অসীমকে প্রকাশ করছে।

মনে করো একটি বৃহৎ দৈর্ঘ্য স্থির হয়ে রয়েছে, ছোটো মাপকাঠি কী করে সেই দৈর্ঘ্যের বৃহত্ত্বকে প্রকাশ করে। না, ক্রমাগতই সেই স্তব্ধ দৈর্ঘ্যের পাশে পাশে চঞ্চল হয়ে

অগ্রসর হতে হতে। সে প্রত্যেকবার অগ্রসর হয়ে বলে, না এখনও শেষ হল না। সে যদি চুপ করে পড়ে থাকত তাহলে বৃহত্ত্বের সঙ্গে কেবলমাত্র নিজের বৈপরীত্যটুকুই জানত কিন্তু সে নাকি চলেছে এই চলার দ্বারাই বৃহত্ত্বকে পদে পদে উপলব্ধি করে চলেছে। এই চলার দ্বারা মাপকাঠি ক্ষুদ্র হয়েও বৃহত্ত্বকে প্রচার করছে। এইরূপে ক্ষুদ্রে বৃহত্তে বৈপরীত্যের মধ্যে যেখানে একটা সামঞ্জস্য ঘটছে সেইখানেই ক্ষুদ্রের দ্বারা বৃহত্তের প্রকাশ হচ্ছে।

জগৎও তেমনি সীমাবদ্ধভাবে কেবল স্থির নিশ্চল নয়—তার মধ্যে নিরন্তর একটি অভিব্যক্তি আছে একটি গতি আছে। রূপ হতে রূপান্তরে চলতে চলতে সে ক্রমাগতই বলছে আমার সীমার দ্বারা তাঁর প্রকাশকে শেষ করতে পারলুম না। এইরূপে রূপের দ্বারা জগৎ সীমাবদ্ধ হয়ে গতির দ্বারা অসীমকে প্রকাশ করছে। রূপের সীমাটি না থাকলে তার গতিও থাকতে পারত না, তার গতি না থাকলে অসীম তো অব্যক্ত হয়েই থাকতেন।

আত্মার প্রকাশরূপ যে অহং তার সঙ্গে আত্মার একটি বৈপরীত্য আছে। আত্মা ন জায়তে ম্রিয়তে। না জন্মায় না মরে। অহং জন্মমরণের মধ্য দিয়ে চলেছে। আত্মা দান করে, অহং সংগ্রহ করে, আত্মা অন্তরের মধ্যে সঞ্চরণ করতে চায়, অহং বিষয়ের মধ্যে আসক্ত হতে থাকে।

এই বৈপরীত্যের বিরোধের মধ্যে যদি একটি সামঞ্জস্য স্থাপিত না হয় তবে অহং আত্মাকে প্রকাশ না করে তাকে আচ্ছন্নই করবে।

অহং আপনার মৃত্যুর দ্বারাই আত্মার অমরত্ব প্রকাশ করে। কোনো সীমাবদ্ধ পদার্থ নিশ্চল হয়ে এই অমর আত্মাকে নিজের মধ্যে একভাবে রুদ্ধ করে রাখতে পারে না। অহং-এর মৃত্যুর দ্বারা আত্মা রূপকে বর্জন করতে করতেই নিজের রূপাতীত স্বরূপকে প্রকাশ করে। রূপ কেবলই বলে, একে আমি বাঁধতে পারলুম না, এ আমাকে নিরন্তর ছাড়িয়ে চলছে। এই জন্মমৃত্যুর দ্বারগুলি আত্মার পক্ষে রুদ্ধ দ্বার নয়। সে যেন তার রাজপথের বিজয়তোরণের মতো, তার মধ্য দিয়ে প্রবেশ করতে করতে সে চলে যাচ্ছে, এগুলি কেবল তার গতির পরিমাপ করছে মাত্র। অহং নিয়ত চঞ্চল হয়ে আত্মাকে কেবল মাপছে আর কেবলই বলছে—না, একে আমি সীমাবদ্ধ করে রাখতে পারলুম না। সে যেমন সব জিনিসকেই বদ্ধ করে রাখতে চায় তেমনি আত্মাকেও সে বাঁধতে চায়। বদ্ধ করতে চাওয়াই তার ধর্ম। অথচ একেবারে বদ্ধ করে রাখা তার ক্ষমতার মধ্যে নেই। যেমন বদ্ধ করা তার প্রবৃত্তি তেমনি বদ্ধ করাই যদি তার ক্ষমতা হত তবে অমন সর্বনেশে জিনিস আর কী হত।

তাই বলছিলুম অহং আত্মাকে যে কেবলই বাঁধছে এবং ছেড়ে দিচ্ছে সেই বাঁধা এবং ছেড়ে দেওয়ার দ্বারাই সে আত্মার মুক্ত-স্বভাবকে প্রকাশ করছে। যদি না বাঁধত তা হলে এই মুক্তির প্রকাশ কোথায় থাকত, যদি না ছেড়ে দিত তাহলেই বা কোথায় থাকত?

আত্মা দান করে এবং অহং সংগ্রহ করে, এই বৈপরীত্যের মধ্যে সামঞ্জস্য কোথায় সে কথার আলোচনা কাল করেছি। আত্মা দান করবে বলেই অহং সংগ্রহ করে, এইটেই হচ্ছে ওর সামঞ্জস্য। অহং সে কথা ভোলে—সে মনে করে সংগ্রহ করা ভোগেরই জন্যে। এই মিথ্যাকে যতই সে আঁকড়ে ধরতে চায় এই মিথ্যা ততই তাকে দুঃখ দেয় ফাঁকি দেয়। আত্মা তার অহংবৃক্ষে ফল ফলাবে বটে কিন্তু ফল আত্মসাৎ করবে না, দান করবে।

আমাদের জীবনের সাধনা এই যে, অহং-এর দ্বারা আমরা আত্মাকে প্রকাশ করব। যখন তা না করে ধনকে মানকে বিদ্যাকেই প্রকাশ করতে চাই তখন অহং নিজেকেই প্রকাশ করে, আত্মাকে প্রকাশ করে না। তখন ভাষা নিজের বাহাদুরি দেখাতে চায়, ভাব ম্লান হয়ে যায়।

যাঁরা সাধুপুরুষ তাঁদের অহং চোখেই পড়ে না, তাঁদের আত্মাকেই দেখি। সেই জন্যে তাঁদের মহাধনী মহামানী মহাবিদ্বান বলি নে—তাঁদের মহাত্মা বলি। তাঁদের জীবনে আত্মারই প্রকাশ সুতরাং তাঁদের জীবন সার্থক। তাঁদের অহং আত্মাকে মুক্তই করছে, বাধাগ্রস্ত করছে না।

এইজন্যেই আমাদের প্রার্থনা যে, আমরা যেন এই মানবজীবনে সত্যকেই প্রকাশ করি, অসত্যকে নিয়েই দিনরাত ব্যস্ত হয়ে না থাকি। আমরা যেন প্রবৃত্তির অন্ধকারের মধ্যেই আত্মাকে আচ্ছন্ন করে না রাখি, আত্মা যেন এই ঘোর অন্ধকারে আপনাকে আপনি না হারায়, মোহমুক্ত নির্মল জ্যোতিতে আপনাকে আপনি উপলব্ধি করে, সে যেন নানা অনিত্য উপকরণের সঞ্চয়ের মধ্যে পদে পদে আঘাত খেতে খেতে হাতড়ে না বেড়ায়, সে যেন আপনার অমৃতরূপকে আনন্দরূপকে তোমার মধ্যে লাভ করে। হে স্বপ্রকাশ, আত্মা যেন নিজের সকল প্রকাশের মধ্যে তোমাকেই প্রকাশ করে; নিজের অহংকেই প্রকাশ না করে; মানবজীবনকে একেবারে নিরর্থক করে না দেয়।

৮ চৈত্র

আদেশ

কোন্ কোন্ মন্দ কাজ করবে না। তার বিশেষ উল্লেখ করে সেইগুলিকে ধর্মশাস্ত্র ঈশ্বরের বিশেষ নিষেধরূপে প্রচার করেছেন।

সেরকম ভাবে প্রচার করলে মনে হয় যেন ঈশ্বর কতকগুলি নিজের ইচ্ছামত আইন করে দিয়েছেন সেই আইনগুলি লঙ্ঘন করলে বিশ্বরাজের কোপে পড়তে হবে। সে কথাটাকে এইরূপ ক্ষুদ্র ও কৃত্রিমভাবে মানতে পারি নে। তিনি কোনো বিশেষ আদেশ জানান নি, কেবল তাঁর একটি আদেশ তিনি ঘোষণা করেছেন, সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উপরে তাঁর সেই আদেশ, সেই একমাত্র আদেশ।

তিনি কেবলমাত্র বলেছেন, প্রকাশিত হও। সূর্যকেও তাই বলেছেন, পৃথিবীকেও তাই বলেছেন, মানুষকেও তাই বলেছেন। সূর্য তাই জ্যোতির্ময় হয়েছে, পৃথিবী তাই জীবধাত্রী হয়েছে, মানুষকেও তাই আত্মাকে প্রকাশ করতে হবে।

বিশ্বজগতের যে-কোনো প্রান্তে তাঁর এই আদেশ বাধা পাচ্ছে, সেইখানেই কুঁড়ি মুষড়ে যাচ্ছে, সেইখানেই নদী স্রোতোহীন হয়ে শৈবালজালে রুদ্ধ হচ্ছে—সেইখানেই বন্ধন বিকার বিনাশ।

বুদ্ধদেব যখন বেদনাপূর্ণ চিত্তে ধ্যান দ্বারা এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছিলেন যে, মানুষের বন্ধন বিকার বিনাশ কেন, দুঃখ জরা মৃত্যু কেন, তখন তিনি কোন্ উত্তর পেয়ে আনন্দিত হয়ে উঠেছিলেন? তখন তিনি এই উত্তরই পেয়েছিলেন যে, মানুষ আত্মাকে উপলব্ধি করলেই আত্মাকে প্রকাশ করলেই মুক্তিলাভ করবে। সেই প্রকাশের বাধাতেই তার দুঃখ—সেইখানেই তার পাপ।

এইজন্যে তিনি প্রথমে কতকগুলি নিষেধ স্বীকার করিয়ে মানুষকে শীল গ্রহণ করতে আদেশ করেন। তাকে বললেন তুমি লোভ ক'রো না, হিংসা ক'রো না, বিলাসে আসক্ত হ'য়ো না। যে-সমস্ত আবরণ তাকে বেষ্টন করে ধরেছে সেইগুলি প্রতিদিনের নিয়ত অভ্যাসে মোচন করে ফেলবার জন্যে তাকে উপদেশ দিলেন। সেই আবরণগুলি মোচন হলেই আত্মা আপনার বিশুদ্ধ স্বরূপটি লাভ করবে।

সেই স্বরূপটি কী? শূন্যতা নয়, নৈষ্কর্ম্য নয়। সে হচ্ছে মৈত্রী, করুণা, নিখিলের প্রতি প্রেম। বুদ্ধ কেবল বাসনা ত্যাগ করতে বলেন নি। তিনি প্রেমকে বিস্তার করতে বলেছেন। কারণ এই প্রেমকে বিস্তারের দ্বারাই আত্মা আপন স্বরূপকে পায়—সূর্য যেমন আলোককে বিকীর্ণ করার দ্বারাই আপনার স্বভাবকে পায়।

সর্বলোকে আপনাকে পরিকীর্ণ করা আত্মার ধর্ম—পরমাত্মারও সেই ধর্ম। তাঁর

সেই ধর্ম পরিপূর্ণ, কেননা তিনি শুদ্ধং অপাপবিদ্ধং। তিনি নির্বিকার, তাঁতে পাপের কোনো বাধা নেই। সেইজন্যে সর্বত্রই তাঁর প্রবেশ।

পাপের বন্ধন মোচন করলে আমাদেরও প্রবেশ অব্যাহত হবে। তখন আমরা কী হব? পরমাত্মার মতো সেই স্বরূপটি লাভ করব যে স্বরূপে তিনি কবি, মনীষী, প্রভু, স্বয়ম্ভু। আমরাও আনন্দময় কবি হব, মনের অধীশ্বর হব, দাসত্ব থেকে মুক্ত হব, আপন নির্মল আলোকে আপনি প্রকাশিত হব। তখন আত্মা সমস্ত চিন্তায় বাক্যে কর্মে আপনাকে শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্‌রূপে প্রকাশ করবে—আপনাকে ক্ষুব্ধ করে লুব্ধ করে খণ্ডবিখণ্ডিত করে দেখাবে না।

মৈত্রেয়ীর প্রার্থনাও সেই প্রকাশের প্রার্থনা। যে-প্রার্থনা বিশ্বের সমস্ত কুঁড়ির মধ্যে, কিশলয়ের মধ্যে, যে-প্রার্থনা দেশকালের অপরিতৃপ্ত গভীরতার মধ্য হতে নিয়ত উঠছে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক অণুতে পরমাণুতে যে-প্রার্থনা, যে-প্রার্থনার যুগযুগান্তরব্যাপী ক্রন্দনে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে বলেই বেদে এই অন্তরীক্ষকে ক্রন্দসী রোদসী বলেছে সেই মানবাত্মার চিরন্তন প্রার্থনাই মৈত্রেয়ীর প্রার্থনা। আমাকে প্রকাশ করো, আমাকে প্রকাশ করো। আমি অসত্যে আচ্ছন্ন আমাকে সত্যে প্রকাশ করো। আমি অন্ধকারে আবিষ্ট আমাকে জ্যোতিতে প্রকাশ করো, আমি মৃত্যুর দ্বারা আবিষ্ট আমাকে অমৃতে প্রকাশ করো। হে আবিঃ, হে পরিপূর্ণ প্রকাশ, তোমার মধ্যেই আমার প্রকাশ হ'ক, আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ কোনো বাধা না পাক—সেই প্রকাশ নির্মুক্ত হলেই তোমার দক্ষিণ মুখের জ্যোতিতে আমি চিরকালের জন্যে রক্ষা পাব। সেই প্রকাশের বাধাতেই তোমার অপ্রসন্নতা।

বুদ্ধ সমস্ত মানবের হয়ে নিজের জীবনে এই পরিপূর্ণ প্রকাশের প্রার্থনাই করেছিলেন—এ ছাড়া মানুষের আর দ্বিতীয় কোনো প্রার্থনাই নেই।

৯ চৈত্র

সাধন

আমরা অনেকেই প্রতিদিন এই বলে আক্ষেপ করছি যে, আমরা ঈশ্বরকে পাচ্ছি নে কেন? আমাদের মন বসছে না কেন? আমাদের ভাব জমছে না কেন?

সে কি অমনি হবে, আপনি হয়ে উঠবে? এতবড়ো লাভের খুব একটা বড়ো সাধনা নেই কি? ঈশ্বরকে পাওয়া বলতে কতখানি বোঝায় তা ঠিকমতো জানলে এ সম্বন্ধে বৃথা চঞ্চলতা অনেকটা দূর হয়।

ব্রহ্মকে পাওয়া বলতে যদি একটা কোনো চিন্তায় মনকে বসানো বা একটা কোনো ভাবে মনকে রসিয়ে তোলা হত তাহলে কোনো কথাই ছিল না—কিন্তু ব্রহ্মকে পাওয়া তো অমন একটি ছোটো ব্যাপার নয়। তার জন্যে শিক্ষা হল কই? তার জন্যে সমস্ত চিত্তকে একমনে নিযুক্ত করলুম কই? তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব। অর্থাৎ তপস্যার দ্বারা ব্রহ্মকে বিশেষরূপে জানতে চাও, এই যে উপদেশ সে-উপদেশের মতো তপস্যা হল কই।

কেবল কি নিয়মিত সময়ে তাঁর নাম করা নাম শোনাই তপস্যা? জীবনের অল্প একটু উদ্বৃত্ত জায়গা তাঁর জন্যে ছেড়ে দেওয়াই কি তপস্যা? সেইটুকুমাত্র ছেড়ে দিয়েই তুমি রোজ তার হিসেব নিকেশ করে নেবার তাগাদা কর। বল যে, এই তো উপাসনা করছি কিন্তু ব্রহ্মকে পাচ্ছি নে কেন? এত সস্তায় কোন্ জিনিসটা পেয়েছ?

কেবল পাঁচজন মানুষের সঙ্গে মিলে থাকবার উপযুক্ত হবার জন্যে কী তপস্যাই না করতে হয়েছে? বাপ মার কাছে শিক্ষা, প্রতিবেশীর কাছে শিক্ষা, বন্ধুর কাছে শিক্ষা, শত্রুর কাছে শিক্ষা, ইস্কুলে শিক্ষা, আপিসে শিক্ষা; রাজার শাসন, সমাজের শাসন, শাস্ত্রের শাসন। সেজন্য ক্রমাগতই প্রবৃত্তিকে দমন করতে হয়েছে, ব্যবহারকে সংযত করতে হয়েছে, ইচ্ছাবৃত্তিকে পরিমিত করতে হয়েছে। এত করেও পরিপূর্ণ সামাজিক জীব হয়ে উঠি নি,—কত অসতর্কতা কত শৈথিল্যবশত কত অপরাধ করি তার ঠিক নেই। তাই জীবনের শেষদিন পর্যন্ত আমাদের সমাজসাধনা চলেইছে।

সমাজবিহারের জন্য যদি এত কঠিন ও নিরন্তর সাধনা তবে ব্রহ্মবিহারের জন্য বুঝি কেবল মাঝে মাঝে নিয়মমত দুই চারিটি কথা শুনে বা দুই চারিটি কথা বলেই কাজ হয়ে যাবে।

এরকম আশা যদি কেউ করে তবে বোঝা যাবে সে-ব্যক্তি মুখে যাই বলুক, সাধনার লক্ষ্য যেখানে সে স্থাপন করেছে সেটা একটা ছোটো জায়গা। সে জায়গায় এমন কিছুই নেই যা তোমার সমস্ত সংসারের চেয়েও বড়ো—বরং এমন কিছু আছে যার চেয়ে তোমার সংসারের অধিকাংশ জিনিসই বড়ো।

এইটি মনে রাখতে হবে প্রতিদিন সকল কর্মের মধ্যে আমাদের সাধনাকে জাগিয়ে রাখতে হবে। এই সাধনাটিকে আমাদের গড়তে হবে। শরীরটিকে মনটিকে হৃদয়টিকে সকল দিক দিয়ে ব্রহ্মবিহারের অনুকূল করে তুলতে হবে।

সমাজের জন্য আমাদের এই শরীর মন হৃদয়কে আমরা তো একটু একটু করে গড়ে তুলেছি। শরীরকে সমাজের উপযোগী সাজ করতে অভ্যাস করিয়েছি—শরীর সমাজের উপযোগী লজ্জাসংকোচ করতে শিখেছে। তার হাত পা চাহনি হাসি সমাজের প্রয়োজন

অনুসারে শায়েস্তা হয়ে এসেছে। সভাস্থলে স্থির হয়ে বসতে তার আর কষ্ট হয় না, পরিচিত ভদ্রলোক দেখলে হাসিমুখে শিষ্ট সম্ভাষণ করতে তার আর চেষ্টা করতে হয় না। সমাজের সঙ্গে মিলে থাকবার জন্যে বিশেষ অভ্যাসের দ্বারা অনেক ভালোলাগা মন্দলাগা অনেক ঘৃণা ভয় এমন করে গড়ে তুলতে হয়েছে যে, সেগুলি শারীরিক সংস্কারে পরিণত হয়েছে; এমন কি, সেগুলি আমাদের সহজ সংস্কারের চেয়েও বড়ো হয়ে উঠেছে। এমনি করে কেবল শরীর নয় হৃদয় মনকে প্রতিদিন সমাজের ছাঁচে ফেলে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে গড়ে তুলতে হয়েছে।

ব্রহ্মবিহারের জন্যও শরীর মন হৃদয়কে সকল দিক দিয়েই সকল প্রকারেই নিজের চেষ্টায় গড়ে তুলতে হবে। যদি প্রশ্ন করবার কিছু থাকে তবে এইটেই প্রশ্ন করবার যে, আমি কি সেই চেষ্টা করছি? আমি কি ব্রহ্মকে পেয়েছি, সে প্রশ্ন এখন থাক্।

প্রথমে শরীরটাকে তো বিশুদ্ধ করে তুলতে হবে। আমাদের চোখ মুখ হাত পাকে এমন করতে হবে যে, পবিত্র সংযম তাদের পক্ষে একেবারে সংস্কারের মতো হয়ে আসবে। সম্মুখে যেখানে লজ্জার বিষয় আছে সেখানে মন লজ্জা করবার পূর্বে চক্ষু আপনি লজ্জিত হবে—যে-ঘটনায় সহিষ্ণুতার প্রয়োজন আছে সেখানে মন বিবেচনা করবার পূর্বে বাক্য আপনি ক্ষান্ত হবে, হাত পা আপনি স্তব্ধ হবে। এর জন্যে মুহূর্তে মুহূর্তে আমাদের চেষ্টার প্রয়োজন। তনুকে ভাগবতী তনু করে তুলতে হবে—এ তনু তপোবনের সঙ্গে কোথাও বিরোধ করবে না, অতি সহজেই সর্বত্রই তাঁর অনুগত হবে।

প্রতিদিন প্রত্যেক ব্যাপারে আমাদের বাসনাকে সংযত করে আমাদের ইচ্ছাকে মঙ্গলের মধ্যে বিস্তীর্ণ করতে হবে, অর্থাৎ ভগবানের যে-ইচ্ছা সর্বজীবের মধ্যে প্রসারিত, নিজের রাগ-দ্বেষ লোভ-ক্ষোভ ভুলে সেই ইচ্ছার সঙ্গে সচেষ্টভাবে যোগ দিতে হবে। সেই ইচ্ছার মধ্যে প্রত্যহই আমাদের ইচ্ছাকে অল্প অল্প করে ব্যাপ্ত করে দিতে হবে। যে পরিমাণে ব্যাপ্ত হতে থাকবে ঠিক সেই পরিমাণেই আমরা ব্রহ্মকে পাব। এক জায়গায় চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে যদি বলি যে দূর লক্ষ্যস্থানে পৌঁছোচ্ছি না কেন সে যেমন অসংগত বলা, নিজের ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে স্বার্থবেষ্টনের কেন্দ্রে অচল হয়ে বসে কেবলমাত্র জপতপের দ্বারা ব্রহ্মকে পাচ্ছি নে কেন, এ প্রশ্নও তেমনি অদ্ভুত।

১০ চৈত্র

ব্রহ্মবিহার

ব্রহ্মবিহারের এই সাধনার পথে বুদ্ধদেব মানুষকে প্রবর্তিত করবার জন্যে বিশেষরূপে উপদেশ দিয়েছেন। তিনি জানতেন কোনো পাবার যোগ্য জিনিস ফাঁকি দিয়ে পাওয়া যায় না, সেইজন্যে তিনি বেশি কথা না বলে একেবারে ভিত খোঁড়া থেকে কাজ আরম্ভ করে দিয়েছেন।

তিনি বলেছেন শীল গ্রহণ করাই মুক্তিপথের পাথেয় গ্রহণ করা। চরিত্র শব্দের অর্থই এই যাতে করে চলা যায়। শীলের দ্বারা সেই চরিত্র গড়ে ওঠে। শীল আমাদের চলবার সম্বল।

পাণং ন হানে, প্রাণীকে হত্যা করবে না, এই কথাটি শীল। ন চ দিন্নমাদিয়ে, যা তোমাকে দেওয়া হয় নি তা নেবে না। এই একটি শীল। মুসা ন ভাসে, মিথ্যা কথা বলবে না, এই একটি শীল। ন চ মজ্জপো সিয়া, মদ খাবে না, এই একটি শীল। এমনি করে যথাসাধ্য একটি একটি করে শীল সঞ্চয় করতে হবে।

আর্য শ্রাবকেরা প্রতিদিন নিজেদের এই শীলকে স্মরণ করেন—ইধ অরিয়সাবকো অত্তনো সীলানি অনুস্সরতি। শীলসকলকে কী বলে অনুস্মরণ করেন।

অখণ্ডানি, অচ্ছিদ্দানি, অসবলানি, অকম্মাসানি ভুজিস্সানি, বিঞ্ঞূপসত্থানি, অপরামট্‌ঠানি, সমাধিসংবত্তনিকানি।

অর্থাৎ

আমার এই শীল খণ্ডিত হয় নি, এতে ছিদ্র হয় নি, আমার এই শীল জোর করে রক্ষিত হয় নি অর্থাৎ ইচ্ছা করেই রাখছি, এই শীলে পাপ স্পর্শ করে নি, এই শীল ধন মান প্রভৃতি কোনো স্বার্থসাধনের জন্য আচরিত নয়, এই শীল বিজ্ঞজনের অনুমোদিত, এই শীল বিদলিত হয় নি এবং এই শীল মুক্তিপ্রবর্তন করবে।

এই বলে আর্যশ্রাবকগণ নিজ নিজ শীলের গুণ বারংবার স্মরণ করেন।

এই শীলগুলিই হচ্ছে মঙ্গল। মঙ্গললাভই প্রেম ও মুক্তিলাভের সোপান। বুদ্ধদেব কাকে যে মঙ্গল বলছেন তা "মঙ্গল সুত্তে" কথিত আছে। সেটি অনুবাদ করে দিই,

বহূ দেবা মনুস্সা চ মঙ্গলানি অচিন্তয়ুং
আকঙ্খমানা সোত্থানং ব্রূহি মঙ্গলমুত্তমং।

বুদ্ধকে প্রশ্ন করা হচ্ছে যে,

বহু দেবতা বহু মানুষ যাঁরা শুভ আকাঙ্ক্ষা করেন তাঁরা মঙ্গলের চিন্তা করে এসেছেন, সেই মঙ্গলটি কী বলো।

বুদ্ধ উত্তর দিচ্ছেন,

অসেবনা চ বালানং পণ্ডিতানঞ্চ সেবনা
পূজা চ পূজনেয্যানং এতং মঙ্গলমুত্তমং।

অসৎগণের সেবা না করা, সজ্জনের সেবা করা, পূজনীয়কে পূজা করা এই হচ্ছে উত্তম মঙ্গল।

পতিরূপদেসবাসো, পুব্বে চ কতপুঞ্‌ঞতা,
অত্তসম্মাপণিধি চ, এতং মঙ্গলমুত্তমং।

যে দেশে ধর্মসাধন বাধা পায় না সেই দেশে বাস, পূর্বকৃত পুণ্যকে বর্ধিত করা, আপনাকে সৎকর্মে প্রণিধান করা এই উত্তম মঙ্গল।

বহুসচ্চঞ্চ সিপ্‌পঞ্চ, বিনয়ো চ সুসিক্‌খিতো
সুভাসিতা চ যা বাচা, এতং মঙ্গলমুত্তমং।

বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন, বহু শিল্পশিক্ষা, বিনয়ে সুশিক্ষিত হওয়া এবং সুভাষিত বাক্য বলা এই উত্তম মঙ্গল।

মাতাপিতু-উপট্‌ঠানং পুত্তদারস্‌স সংগহো,
অনাকুলা চ কম্মানি এতং মঙ্গলমুত্তমং।

মাতা পিতাকে পূজা করা, স্ত্রী পুত্রের কল্যাণ করা, অনাকুল কর্ম করা এই উত্তম মঙ্গল।

দানঞ্চ ধম্মচরিয়ঞ্চ ঞ্‌ঞাতকানঞ্চ সংগহো
অনবজ্জানি কম্মানি, এতং মঙ্গলমুত্তমং।

দান, ধর্মচর্যা, জ্ঞাতিবর্গের উপকার, অনিন্দনীয় কর্ম এই উত্তম মঙ্গল।

আরতী বিরতি পাপা, মজ্জপানা চ সঞ্‌ঞমো
অপ্‌পমাদো চ ধম্মেসু, এতং মঙ্গলমুত্তমং।

পাপে অনাসক্তি এবং বিরতি, মদ্যপানে বিতৃষ্ণা, ধর্মকর্মে অপ্রমাদ এই উত্তম মঙ্গল।

গারবো চ নিবাতো চ, সন্তুট্‌ঠী চ কতঞ্‌ঞুতা
কালেন ধম্মসবনং এতং মঙ্গলমুত্তমং।

গৌরব অথচ নম্রতা, সন্তুষ্টি, কৃতজ্ঞতা, যথাকালে ধর্মকথাশ্রবণ এই উত্তম মঙ্গল।

খন্তী চ সোবচস্‌সতা সমণানঞ্চ দস্‌সনং
কালেন ধম্মসাকচ্ছা এতং মঙ্গলমুত্তমং।

ক্ষমা, প্রিয়বাদিতা, সাধুগণকে দর্শন, যথাকালে ধর্মালোচনা এই উত্তম মঙ্গল।

তপো চ ব্রহ্মচরিয়ঞ্চ অরিয়সচ্চান দস্‌সনং
নিব্বানসচ্ছিকিরিয়া এতং মঙ্গলমুত্তমং।

তপস্যা, ব্রহ্মচর্য, শ্রেষ্ঠ সত্যকে জানা, মুক্তিলাভের উপযুক্ত সৎকার্য এই উত্তম মঙ্গল।

ফুট্‌ঠস্‌স লোকধম্মেহি চিত্তং যস্‌স ন কম্পতি
অসোকং বিরজং খেমং এতং মঙ্গলমুত্তমং।

লাভ ক্ষতি নিন্দা প্রশংসা প্রভৃতি লোকধর্মের দ্বারা আঘাত পেলেও যার চিত্ত কম্পিত হয় না, যার শোক নেই, মলিনতা নেই, যার ভয় নেই সে উত্তম মঙ্গল পেয়েছে।

এতাদিসানি কত্বান, সব্বত্থমপরাজিতা
সব্বত্থ সোত্থি গচ্ছন্তি তেসং মঙ্গলমুত্তমন্তি

এই রকম যারা করেছে, তারা সর্বত্র অপরাজিত, তারা সর্বত্র স্বস্তি লাভ করে তাদের উত্তম মঙ্গল হয়।

যারা বলে ধর্মনীতিই বৌদ্ধধর্মের চরম তারা ঠিক কথা বলে না। মঙ্গল একটা উপায় মাত্র। তবে নির্বাণই চরম? তা হতে পারে কিন্তু সেই নির্বাণটি কী? সে কি শূন্যতা?

যদি শূন্যতাই হত তবে পূর্ণতার দ্বারা তাতে গিয়ে পৌঁছোনো যেত না। তবে কেবলই সমস্তকে অস্বীকার করতে করতে নয় নয় নয় বলতে বলতে একটার পর একটা ত্যাগ করতে করতেই সেই সর্বশূন্যতার মধ্যে নির্বাণ লাভ করা যেত।

কিন্তু বৌদ্ধধর্মে সে পথের ঠিক উলটা পথ দেখি যে। তাতে কেবল তো মঙ্গল দেখছি নে—মঙ্গলের চেয়েও বড়ো জিনিসটি দেখছি যে।

মঙ্গলের মধ্যেও একটা প্রয়োজনের ভাব আছে। অর্থাৎ তাতে একটা কোনো ভালো উদ্দেশ্য সাধন করে, কোনো একটা সুখ হয় বা সুযোগ হয়।

কিন্তু প্রেম যে সকল প্রয়োজনের বাড়া। কারণ প্রেম হচ্ছে স্বতই আনন্দ, স্বতই পূর্ণতা, সে কিছুই নেওয়ার অপেক্ষা করে না, সে যে কেবলই দেওয়া।

যে দেওয়ার মধ্যে কোনো নেওয়ার সম্বন্ধ নেই সেইটেই হচ্ছে শেষের কথা—সেইটেই ব্রহ্মের স্বরূপ—তিনি নেন না।

এই প্রেমের ভাবে, এই আদানবিহীন প্রদানের ভাবে আত্মাকে ক্রমশ পরিপূর্ণ করে তোলবার জন্যে বুদ্ধদেবের উপদেশ আছে, তিনি তার সাধনপ্রণালীও বলে দিয়েছেন।

এ তো বাসনা-সংহরণের প্রণালী নয়, এ তো বিশ্ব হতে বিমুখ হবার প্রণালী নয়, এ যে সকলের অভিমুখে আত্মাকে ব্যাপ্ত করবার পদ্ধতি। এই প্রণালীর নাম মেত্তিভাবনা—মৈত্রীভাবনা।

প্রতিদিন এই কথা ভাবতে হবে—

সব্বে সত্তা সুখিতা হোন্তু, অবেরা হোন্তু, অব্যাপজ্ঝা হোন্তু, সুখী অত্তানং পরিহরন্তু; সব্বে সত্তা মা যথালদ্ধসম্পত্তিতো বিগচ্ছন্তু।

সকল প্রাণী সুখিত হ'ক, শত্রুহীন হ'ক, অহিংসিত হ'ক, সুখী আত্মা হয়ে কাল হরণ করুক। সকল প্রাণী আপন যথালব্ধসম্পত্তি হতে বঞ্চিত না হ'ক।

১৪।২৬

মনে ক্রোধ দ্বেষ লোভ ঈর্ষা থাকলে এই মৈত্রিভাবনা সত্য হয় না—এইজন্য শীলগ্রহণ শীল-সাধন প্রয়োজন। কিন্তু শীলসাধনার পরিণাম হচ্ছে সর্বত্র মৈত্রীকে দয়াকে বাধাহীন করে বিস্তার। এই উপায়েই আত্মাকে সকলের মধ্যে উপলব্ধি করা সম্ভব হয়।

এই মৈত্রীভাবনার দ্বারা আত্মাকে সকলের মধ্যে প্রসারিত করা এ তো শূন্যতার পন্থা নয়।

তা যে নয় তা বুদ্ধ যাকে ব্রহ্মবিহার বলছেন তা অনুশীলন করলেই বোঝা যাবে।

করণীয় মত্থ কুসলেন
যন্তং সন্তং পদং অভিসমেচ্চ
সক্কো উজূ চ সুহুজূ চ,
সুবচো চস্‌স মুদু অনতিমানী।

শান্তপদ লাভ করে পরমার্থকুশল ব্যক্তির যা করণীয় তা এই—তিনি শক্তিমান, সরল, অতি সরল, সুভাষী, মৃদু, নম্র এবং অনভিমানী হবেন।

সন্তুস্‌সকো চ সুভরো চ,
অপ্‌পকিচ্চো চ সল্লহুকবুত্তি,
সন্তিন্দ্রিয়ো চ নিপকো চ
অপ্‌পগব্‌ভো কুলেসু অননুগিদ্ধো।

তিনি সন্তুষ্টহৃদয় হবেন, অল্পেই তাঁর ভরণ হবে, তিনি নিরুদ্বেগ, অল্পভোজী, শান্তেন্দ্রিয়, সদ্বিবেচক, অপ্রগল্‌ভ এবং সংসারে অনাসক্ত হবেন।

ন চ খুদ্দং সমাচরে কিঞ্চি
যেন বিঞ্‌ঞূ পরে উপবদেয়্যুং।
সুখিনো বা খেমিনো বা
সব্বে সত্তা ভবন্তু সুখিতত্তা।

এমন ক্ষুদ্র অন্যায়ও কিছু আচরণ করবেন না যার জন্যে অন্যে তাঁকে নিন্দা করতে পারে। তিনি কামনা করবেন সকল প্রাণী সুখী হ'ক নিরাপদ হ'ক সুস্থ হ'ক।

যে কেচি পাণভূতত্থি
তসা বা থাবরা বা অনবসেসা।
দীঘা বা যে মহন্তা বা
মজ্ঝিমা রস্‌সকা অণুকথূলা।
দিট্‌ঠা বা যে চ অদিট্‌ঠা
যে চ দূরে বসন্তি অবিদূরে।

ভূতা বা সম্ভবেসী বা
সব্বে সত্তা ভবন্তু সুখিতত্তা।

যে কোনো প্রাণী আছে, কী সবল কী দুর্বল, কী দীর্ঘ কী প্রকাণ্ড, কী মধ্যম কী হ্রস্ব, কী সূক্ষ্ম কী স্থূল, কী দৃষ্ট কী অদৃষ্ট, যারা দূরে বাস করছে বা যারা নিকটে, যারা জন্মেছে বা যারা জন্মাবে অবশেষে সকলেই সুখী আত্মা হ'ক।

ন পরোপরং নিকুব্বেথ
নাতিমঞ্ঞেথ কত্থচি ন কঞ্চি
ব্যারোসনা পটিঘসঞ্ঞা
নাঞ্ঞমঞ্ঞস্স দুক্খমিচ্ছেয্য।

পরস্পরকে বঞ্চনা ক'রো না—কোথাও কাউকে অবজ্ঞা ক'রো না, কায়ে বাক্যে বা মনে ক্রোধ করে অন্যের দুঃখ ইচ্ছা ক'রো না।

মাতা যথা নিযং পুত্তং
আযুসা একপুত্তমনুরক্খে
এবম্পি সব্বভূতেসু
মানসম্ভাবযে অপরিমাণং।

মা যেমন একটি মাত্র পুত্রকে নিজের আয়ু দিয়ে রক্ষা করেন সমস্ত প্রাণীতে সেই প্রকার অপরিমিত মানস রক্ষা করবে।

মেত্তঞ্চ সব্বলোকস্মিং
মানসং ভাবযে অপরিমাণং।
উদ্ধং অধো চ তিরিযঞ্চ
অসম্বাধং অবেরমসপত্তং।

ঊর্ধ্বে অধোতে চারদিকে সমস্ত জগতের প্রতি বাধাহীন, হিংসাহীন, শত্রুতাহীন অপরিমিত মানস এবং মৈত্রী রক্ষা করবে।

তিট্ঠং চরং নিসিন্নো বা
সযানো বা যাবতস্স বিগতমিদ্ধো
এতং সতিং অধিট্ঠেয্য
ব্রহ্মমেতং বিহারমিধমাহু।

যখন দাঁড়িয়ে আছ বা চলছ, বসে আছ বা শুয়ে আছ, যে পর্যন্ত না নিদ্রা আসে সে পর্যন্ত এই প্রকার স্মৃতিতে অধিষ্ঠিত হয়ে থাকাকে ব্রহ্মবিহার বলে।

অপরিমিত মানসকে প্রীতিভাবে মৈত্রীভাবে বিশ্বলোকে ভাবিত করে তোলাকে

ব্রহ্মবিহার বলে। সে প্রীতি সামান্য প্রীতি নয়—মা তাঁর একটিমাত্র পুত্রকে যেরকম ভালোবাসেন সেইরকম ভালোবাসা।

ব্রহ্মের অপরিমিত মানস যে বিশ্বের সর্বত্রই রয়েছে, একপুত্রের প্রতি মাতার যে প্রেম সেই প্রেম যে তাঁর সর্বত্র। তাঁরই সেই মানসের সঙ্গে মানস, প্রেমের সঙ্গে প্রেম না মেশালে সে তো ব্রহ্মবিহার হল না।

কথাটা খুব বড়ো। কিন্তু বড়ো কথাই যে হচ্ছে। বড়ো কথাকে ছোটো কথা করে তো লাভ নেই। ব্রহ্মকে চাওয়াই যে সকলের চেয়ে বড়োকে চাওয়া। উপনিষৎ বলেছেন ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ। ভূমাকেই—সকলের চেয়ে বড়োকেই—জানতে চাইবে।

সেই চাওয়া সেই পাওয়ার রূপটা কী সে তো স্পষ্ট করে পরিষ্কার করে সম্মুখে ধরতে হবে। ভগবান বুদ্ধ ব্রহ্মবিহারকে সুস্পষ্ট করে ধরেছেন—তাকে ছোটো করে ঝাপসা করে সকলের কাছে চলনসই করবার চেষ্টা করেন নি।

অপরিমিত মানসে অপরিমিত মৈত্রীকে সর্বত্র প্রসারিত করে দিলে ব্রহ্মের বিহারক্ষেত্রে ব্রহ্মের সঙ্গে মিলন হয়।

এই তো হল লক্ষ্য। কিন্তু এ তো আমরা একেবারে পারব না। এইদিকে আমাদের প্রত্যহ চলতে হবে। এই লক্ষ্যের সঙ্গে তুলনা করে প্রত্যহ বুঝতে পারব আমরা কতদূর অগ্রসর হলুম।

ঈশ্বরের প্রতি আমার প্রেম জন্মাচ্ছে কি না সে সম্বন্ধে আমরা নিজেকে নিজে ভোলাতে পারি। কিন্তু সকলের প্রতি আমার প্রেম বিস্তৃত হচ্ছে কিনা, আমার শত্রুতা ক্ষয় হচ্ছে কিনা, আমার মঙ্গলভাব বাড়ছে কিনা তার পরিমাণ স্থির করা শক্ত নয়।

একটা কোনো নির্দিষ্ট সাধনার সুস্পষ্ট পথ পাবার জন্যে মানুষের একটা ব্যাকুলতা আছে। বুদ্ধদেব একদিকে উদ্দেশ্যকে যেমন খর্ব করেন নি তেমনি তিনি পথকেও খুব নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। কেমন করে ভাবতে হবে এবং কেমন করে চলতে হবে তা তিনি খুব স্পষ্ট করে বলেছেন। প্রত্যহ শীলসাধনা দ্বারা তিনি আত্মাকে মোহ থেকে মুক্ত করতে উপদেশ দিয়েছেন এবং মৈত্রীভাবনা দ্বারা আত্মাকে ব্যাপ্ত করবার পথ দেখিয়েছেন। প্রতিদিন এই কথা স্মরণ করো যে আমার শীল অখণ্ড আছে অচ্ছিদ্র আছে এবং প্রতিদিন চিত্তকে এই ভাবনায় নিবিষ্ট করো যে ক্রমশ সকল বিরোধ কেটে গিয়ে আমার আত্মা সর্বভূতে প্রসারিত হচ্ছে। অর্থাৎ একদিকে বাধা কাটছে আর একদিকে স্বরূপ লাভ হচ্ছে। এই পদ্ধতিকে তো কোনোক্রমেই শূন্যতালাভের পদ্ধতি বলা যায় না। এই তো নিখিললাভের পদ্ধতি, এই তো আত্মলাভের পদ্ধতি, পরমাত্মলাভের পদ্ধতি।

১১ চৈত্র

পূর্ণতা

আর এক মহাপুরুষ যিনি তাঁর পিতার মহিমা প্রচার করতে জগতে এসেছিলেন, তিনি বলেছেন, তোমার পিতা যেরকম সম্পূর্ণ তুমি তেমনি সম্পূর্ণ হও।

এ-কথাটিও ছোটো কথা নয়। মানবাত্মার সম্পূর্ণতার আদর্শকে তিনি পরমাত্মার মধ্যে স্থাপন করে সেইদিকেই আমাদের লক্ষ্য স্থির করতে বলেছেন। সেই সম্পূর্ণতার মধ্যেই আমাদের ব্রহ্মবিহার, কোনো ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে নয়। পিতা যেমন সম্পূর্ণ, পুত্র তেমনি সম্পূর্ণ হতে নিয়ত চেষ্টা করবে। এ না হলে পিতাপুত্রে সত্যযোগ হবে কেমন করে।

এই সম্পূর্ণতার যে একটি লক্ষণ নির্দেশ করেছেন সেও বড়ো কম নয়। যেমন বলেছেন তোমার প্রতিবেশীকে তোমার আপনার মতো ভালোবাসো। কথাটাকে লেশমাত্র খাটো করে বলেন নি। বলেন নি যে প্রতিবেশীকে ভালোবাসো; বলেছেন, প্রতিবেশীকে আপনারই মতো ভালোবাসো। যিনি ব্রহ্মবিহার কামনা করেন তাঁকে এই ভালোবাসায় গিয়ে পৌঁছোতে হবে—এই পথেই তাঁকে চলা চাই।

ভগবান যিশু বলেছেন, শত্রুকেও প্রীতি করবে। শত্রুকে ক্ষমা করবে বলে ভয়ে ভয়ে মাঝপথে থেমে যান নি। শত্রুকে প্রীতি করবে বলে তিনি ব্রহ্মবিহার পর্যন্ত লক্ষ্যকে টেনে নিয়ে গিয়েছেন। বলেছেন, যে তোমার গায়ের জামা কেড়ে নেয় তাকে তোমার উত্তরীয় পর্যন্ত দান করো।

সংসারী লোকের পক্ষে এগুলি একেবারে অত্যুক্তি। তার কারণ, সংসারের চেয়ে বড়ো লক্ষ্যকে সে মনের সঙ্গে বিশ্বাস করে না। সংসারকে সে তার জামা ছেড়ে উত্তরীয় পর্যন্ত দিয়ে ফেলতে পারে যদি তাতে তার সাংসারিক প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। কিন্তু ব্রহ্মবিহারকে সে যদি প্রয়োজনের চেয়ে ছোটো বলে জানে তবে জামাটুকু দেওয়াও শক্ত হয়।

কিন্তু যাঁরা জীবের কাছে সেই ব্রহ্মকে সেই সকলের চেয়ে বড়োকেই ঘোষণা করতে এসেছেন তাঁরা তো সংসারী লোকের দুর্বল বাসনার মাপে ব্রহ্মকে অতি ছোটো করে দেখাতে চান নি। তাঁরা সকলের চেয়ে বড়ো কথাকেই অসংকোচে একেবারে শেষ পর্যন্ত বলেছেন।

এই বড়ো কথাকে এত বড়ো করে বলার দরুন তাঁরা আমাদের একটা মস্ত ভরসা দিয়েছেন। এর দ্বারা তাঁরা প্রকাশ করেছেন মনুষ্যত্বের গতি এতদূর পর্যন্তই যায়, তার প্রেম এত বড়োই প্রেম, তার ত্যাগ এত বড়োই ত্যাগ।

অতএব এই বড়ো লক্ষ্য এবং বড়ো পথে আমাদের হতাশ না করে আমাদের সাহস দেবে। নিজের অন্তরতর মাহাত্ম্যের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাকে বাড়িয়ে দেবে। আমাদের সমস্ত চেষ্টাকে পূর্ণভাবে উদ্‌বোধিত করে তুলবে।

লক্ষ্যকে অসত্যের দ্বারা কেটে ক্ষুদ্র করলে, উপায়কে দুর্বলতার দ্বারা বেড়া দিয়ে সংকীর্ণ করলে তাতে আমাদের ভরসাকে কমিয়ে দেয়—যা আমাদের পাবার তা পাই নে, যা পারবার তা পারি নে।

কিন্তু মহাপুরুষেরা আমাদের কাছে যখন মহৎ লক্ষ্য স্থাপিত করেছেন তখন তাঁরা আমাদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন। বুদ্ধ আমাদের কারও প্রতি অশ্রদ্ধা অনুভব করেন নি, যখন তিনি বলেছেন—মানসং ভাবয়ে অপরিমাণং। যিশু আমাদের মধ্যে দীনতমের প্রতিও অশ্রদ্ধা প্রকাশ করেন নি যখন তিনি বলেছেন, তোমার পিতা যেমন সম্পূর্ণ তুমি তেমনি সম্পূর্ণ হও।

তাঁদের সেই শ্রদ্ধায় আমরা নিজের প্রতি শ্রদ্ধালাভ করি। তখন আমরা ভূমাকে পাবার এই দুরূহ পথকে অসাধ্য পথ বলি নে—তখন আমরা তাঁদের কণ্ঠস্বর লক্ষ্য করে তাঁদের মাভৈঃ বাণী অনুসরণ করে এই অপরিমাণের মহাযাত্রায় আনন্দের সঙ্গে যাত্রা করি। যিশুর বাণী অত্যুক্তি নয়। যদি শ্রেয় চাও তবে এই সম্পূর্ণসত্যের সম্পূর্ণতাই শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করো।

একবার ভিতরের দিকে ভালো করে চেয়ে দেখো—প্রতি দিন কোন্‌খানে ঠেকছে। একজন মানুষের সঙ্গেও যখন মিলতে যাচ্ছি তখন কত জায়গায় বেধে যাচ্ছে। তার সঙ্গে মিল সম্পূর্ণ হচ্ছে না। অহংকারে ঠেকছে, স্বার্থে ঠেকছে, ক্রোধে ঠেকছে, লোভে ঠেকছে—অবিবেচনার দ্বারা আঘাত করছি, উদ্ধত হয়ে আঘাত পাচ্ছি। কোনোমতেই সেই নম্রতা মনের মধ্যে আনতে পারছি নে যার দ্বারা আত্মসমর্পণ অত্যন্ত সহজ এবং মধুর হয়। এই বাধা যখন স্পষ্ট রয়েছে দেখতে পাচ্ছি তখন আমার প্রকৃতিতে ব্রহ্মের সঙ্গে মিলনের বাধা যে অসংখ্য আছে তাতে কি আর সন্দেহ আছে? যাতে আমাকে একটি মানুষের সঙ্গেও সম্পূর্ণভাবে মিলতে দেবে না তাতেই যে ব্রহ্মের সঙ্গেও মিলনের বাধা স্থাপন করবে। যাতে প্রতিবেশী পর হবে তাতে তিনিও পর হবেন, যাতে শত্রুকে আঘাত করব তাতে তাঁকেও আঘাত করব। এইজন্য ব্রহ্মবিহারের কথা বলবার সময় সংসারের কোনো কথাকেই এতটুকু বাঁচিয়ে বলবার জো নেই। যাঁরা মহাপুরুষ তাঁরা কিছুই বাঁচিয়ে বলেন নি—হাতে রেখে কথা কন নি। তাঁরা বলছেন একেবারে নিঃশেষে মরে তবে তাতে বেঁচে উঠতে হবে। তাঁদের সেই পথ অবলম্বন করে প্রতিদিন অহংকারের দিকে স্বার্থের দিকে আমাদের নিঃশেষে মরতে হবে এবং মৈত্রীর দিকে

প্রেমের দিকে পরমাত্মার দিকে অপরিমাণরূপে বাঁচতে হবে। যাঁরা এই মহাপথে যাত্রা করবার জন্য মানবকে নির্ভর দিয়েছেন একান্ত ভক্তির সঙ্গে প্রণাম করে তাঁদের শরণাপন্ন হই।

১২ চৈত্র

নীড়ের শিক্ষা

এই অপরিমাণ পথটি নিঃশেষ না করে পরমাত্মার কোনো উপলব্ধি নেই, এ-কথা বললে মানুষের চেষ্টা অসাড় হয়ে পড়ে। এতদিন তাহলে খোরাক কী? মানুষ বাঁচবে কী নিয়ে?

শিশু মাতৃভাষা শেখে কী করে? মায়ের মুখ থেকে শুনতে শুনতে খেলতে খেলতে আনন্দে শেখে।

যতটুকুই সে শেখে—ততটুকুই সে প্রয়োগ করতে থাকে। তখন তার কথাগুলি আধো-আধো, ব্যাকরণ-ভুলে পরিপূর্ণ। তখন সেই অসম্পূর্ণ ভাষায় সে যতটুকু ভাব ব্যক্ত করতে পারে তাও খুব সংকীর্ণ। কিন্তু তবু শিশুবয়সে ভাষা শেখবার এই একটি স্বাভাবিক উপায়।

শিশুর ভাষায় এই অশুদ্ধতা এবং সংকীর্ণতা দেখে যদি শাসন করে দেওয়া যায় যে যতক্ষণ পর্যন্ত নিঃশেষে ব্যাকরণের সমস্ত নিয়মে না পাকা হতে পারবে ততক্ষণ ভাষায় শিশুর কোনো অধিকার থাকবে না, ততক্ষণ তাকে কথা শুনতে বা পড়তে দেওয়া হবে না, এবং সে কথা বলতেও পারবে না—তা হলে ভাষাশিক্ষা তার পক্ষে যে কেবল কষ্টকর হবে তা নয় তার পক্ষে অসাধ্য হয়ে উঠবে।

শিশু মুখে মুখে যে ভাষা গ্রহণ করছে, ব্যাকরণের ভিতর দিয়ে তাকেই আবার তাকে শিখে নিতে হবে, সেটাকে সর্বত্র পাকা করে নিতে হবে, কেবল সাধারণভাবে মোটামুটি কাজ চালাবার জন্যে নয়, তাকে গভীরতর, উচ্চতর, ব্যাপকতর ভাবে শোনা বলা ও লেখায় ব্যবহার করবার উপযোগী করতে হবে বলে রীতিমত চর্চার দ্বারা শিক্ষা করতে হবে। একদিকে পাওয়া আর-একদিকে শেখা। পাওয়াটা মুখের থেকে মুখে, প্রাণের থেকে প্রাণে, ভাবের থেকে ভাবে—আর শেখাটা নিয়মে, কর্মে; সেটা ক্রমে ক্রমে, পদে পদে। এই পাওয়া এবং শেখা দুটোই যদি পাশাপাশি না চলে, তাহলে হয় পাওয়াটা কাঁচা হয় নয় শেখাটা নীরস ব্যর্থ হতে থাকে।

বুদ্ধদেব কঠোর শিক্ষকের মতো দুর্বল মানুষকে বলেছিলেন এরা ভারি ভুল করে,

কাকে কী বোঝে, কাকে কী বলে তার কিছুই ঠিক নেই। তার একমাত্র কারণ এরা শেখবার পূর্বেই পাবার কথা তোলে। অতএব আগে এরা শিক্ষাটা সমাধা করুক তাহলে যথাসময়ে পাবার জিনিসটা এরা আপনিই পাবে—আগেভাগে চরম কথাটার কোনো উত্থাপনমাত্র এদের কাছে করা হবে না।

কিন্তু ওই চরম কথাটি কেবল যে গম্যস্থান তা তো নয়, ওটা যে পাথেয়ও বটে। ওটি কেবল স্থিতি দেবে তা নয় ও যে গতিও দেবে।

অতএব আমরা যতই ভুল করি যাই করি, কেবলমাত্র ব্যাকরণশিক্ষার কথা মানতে পারব না। কেবল পাঠশালায় শিক্ষকের কাছেই শিখব এ চলবে না, মায়ের কাছেও শিক্ষা পাব।

মায়ের কাছে যা পাই তার মধ্যে অনেক শক্ত নিয়ম অজ্ঞাতসারে আপনি অন্তঃসাৎ হয়ে থাকে, সেই সুযোগটুকু কি ছাড়া যায়?

পক্ষিশাবককে একদিন চরে খেতে হবে সন্দেহ নেই, একদিন তাকে নিজের ডানা বিস্তার করে উড়তে হবে। কিন্তু ইতিমধ্যে মার মুখ থেকে সে খাবার খায়। যদি তাকে বলি, যে পর্যন্ত না চরে খাবার শক্তি সম্পূর্ণ হবে সে পর্যন্ত খেতেই পাবে না তাহলে সে যে শুকিয়ে মরে যাবে।

আমরা যতদিন অশক্ত আছি ততদিন যেমন অল্প অল্প করে শক্তির চর্চা করব তেমনি প্রতিদিন ঈশ্বরের প্রসাদের জন্যে ক্ষুধিত চঞ্চুপুট মেলতে হবে; তাঁর কাছ থেকে সহজ কৃপার দৈনিক খাদ্যটুকু পাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে কলরব করতে হবে। এ ছাড়া উপায় দেখি নে।

এখন তো অনন্তে ওড়বার ডানা পাকা হয় নি, এখন তো নীড়েই পড়ে আছি। ছোটোখাটো কুটোকাটা দিয়ে যে সামান্য বাসা তৈরি হয়েছে এই আমার আশ্রম। এই আশ্রমের মধ্যে বদ্ধ থেকেই অনন্ত আকাশ হতে আহরিত খাদ্যের প্রত্যাশা যদি আমাদের একেবারেই ছেড়ে দিতে হয় তাহলে আমাদের কী দশা হবে?

তুমি বলতে পার ওই খাদ্যের দিকেই যদি তুমি তাকিয়ে থাক তাহলে চিরদিন নিশ্চেষ্ট হয়েই থাকবে, নিজের শক্তির পরিচয় পাবে না।

সে-শক্তিকে যে একেবারে চালনা করব না সে কথা বলি নে। ওড়বার প্রয়াসে দুর্বল পাখা আন্দোলন করে তাকে শক্ত করে তুলতে হবে। কিন্তু কৃপার খাদ্যটুকু প্রেমের পুষ্টিটুকু প্রতিদিনই সঙ্গে সঙ্গে চাই।

সেটি যদি নিয়মিত লাভ করি তাহলে যখনই পুরোপুরি বল পাব তখন নীড়ে ধরে রাখে এমন সাধ্য কার? বিহঙ্গ-শাবকের স্বাভাবিক ধর্মই যে অনন্ত আকাশে ওড়া।

তখন নিজের প্রকৃতির গরজেই, সে সংসারনীড়ে বাস করবে বটে কিন্তু অনন্ত আকাশে বিহার করবে।

এখন সে অক্ষম ডানাটি নিয়ে বাসায় পড়ে পড়ে কল্পনাও করতে পারে না যে আকাশে ওড়া সম্ভব। তার যে শক্তিটুকু আছে সেইটুকুকে অনেক পরিমাণে বাড়িয়ে দেখলেও সে কেবল ডালে ডালে লাফাবার কথাই মনে করতে পারে। সে যখন তার কোনো প্রবীণ সহোদরের কাছে আকাশে উধাও হবার কথা শোনে তখন সে মনে করে দাদা একটি অত্যুক্তি প্রয়োগ করছেন—যা বলছেন তার ঠিক মানে কখনোই এ নয় যে সত্যিই আকাশে ওড়া। ওই যে লাফাতে গেলে মাটির সংস্রব ছেড়ে যেটুকু নিরাধার উর্ধ্বে উঠতে হয় সেই ওঠাটুকুকেই তাঁরা আকাশে ওড়া বলে প্রকাশ করছেন—ওটা কবিত্বমাত্র, ওর মানে কখনোই এতটা হতে পারে না।

বস্তুত এই সংসারনীড়ের মধ্যে আমরা যে অবস্থায় আছি তাতে বুদ্ধদেব যাকে ব্রহ্মবিহার বলেছেন ভগবান যিশু যাকে সম্পূর্ণতালাভ বলেছেন, তাকে কোনোমতেই সম্পূর্ণ সত্য বলে মনে করতে পারি নে।

কিন্তু এ-সব আশ্চর্য কথা তাঁদেরই কথা যাঁরা জেনেছেন যাঁরা পেয়েছেন। সেই আশ্বাসের আনন্দ যেন একান্ত ভক্তিভরে গ্রহণ করি। আমাদের আত্মা দ্বিজশাবক, সে আকাশে ওড়বার জন্যেই প্রস্তুত হচ্ছে সেই বার্তা যাঁরা দিয়েছেন তাঁদের প্রতি যেন শ্রদ্ধা রক্ষা করি, তাঁদের বাণীকে আমরা যেন খর্ব করে তার প্রাণশক্তিকে নষ্ট করবার চেষ্টা না করি। প্রতিদিন ঈশ্বরের কাছে যখন তাঁর প্রসাদসুধা চাইব সেই সঙ্গে এই কথাও বলব আমার ডানাকেও তুমি সক্ষম করে তোলো। আমি কেবল আনন্দ চাই নে শিক্ষা চাই, ভাব চাই নে কর্ম চাই।

১৩ চৈত্র

ভূমা

বুদ্ধকে যখন মানুষ জিজ্ঞাসা করলে, কোথায় থেকে এই সমস্ত হয়েছে, আমরা কোথা থেকে এসেছি, আমরা কোথায় যাব ; তখন তিনি বললেন, তোমার ও সব কথায় কাজ কী ? আপাতত তোমার যেটা অত্যন্ত দরকার সেইটেতে তুমি মন দাও। তুমি বড়ো দুঃখে পড়েছ, তুমি যা চাও তা পাও না, যা পাও তা রাখতে পার না, যা রাখ তাতে তোমার আশা মেটে না। এই নিয়ে তোমার দুঃখের অবধি নেই। সেইটে মেটাবার

উপায় করে তবে অন্য কথা। এই বলে দুঃখনিবৃত্তিকেই তিনি পরম লক্ষ্য বলে তার থেকে মুক্তির পথে আমাদের ডাক দিলেন।

কিন্তু কথা এই যে, একান্ত দুঃখনিবৃত্তিকেই তো মানুষ পরম লক্ষ্য বলে ধরে নিতে পারে না। সে যে তার স্বভাবই নয়। আমি যে স্পষ্ট দেখছি দুঃখকে অঙ্গীকার করে নিতে সে আপত্তি করে না। অনেক সময় গায়ে পড়ে সে দুঃখকে বরণ করে নেয়।

আল্‌প্‌স্‌ পর্বতের দুর্গম শিখরের উপর একবার কেবল পদার্পণ করে আসবার জন্যে প্রাণপণ করা তার পক্ষে সম্পূর্ণ অনাবশ্যক, কিন্তু বিনা কারণে মানুষ সেই দুঃখ স্বীকার করতে প্রস্তুত হয়। এমন দৃষ্টান্ত ঢের আছে।

তার কারণ কী ? তার কারণ এই যে, দুঃখের সম্বন্ধে মানুষের একটা স্পর্ধা আছে। আমি দুঃখ সইতে পারি। আমার মধ্যে সেই শক্তি আছে এ-কথা মানুষ নিজেকে এবং অন্যকে জানাতে চায়।

আসল কথা, মানুষের সকলের চেয়ে সত্য ইচ্ছা হচ্ছে বড়ো হবার ইচ্ছা, সুখী হবার ইচ্ছা নয়। আলেকজাণ্ডারের হঠাৎ ইচ্ছা হল দুর্গম নদীগিরি মরু সমুদ্র পার হয়ে দিগ্বিজয় করে আসবেন। রাজসিংহাসনের আরাম ছেড়ে এমন দুঃসহ দুঃখের ভিতর দিয়ে তাঁকে পথে পথে ঘোরায় কে ? ঠিক রাজ্যলোভ নয়, বড়ো হবার ইচ্ছা। বড়ো হওয়ার দ্বারা নিজের শক্তিকে বড়ো করে উপলব্ধি করা। এই অভিপ্রায়ে মানুষ কোনো দুঃখ থেকে নিজেকে বাঁচাতে চায় না।

যে-লোক লক্ষপতি হবে বলে দিন রাত টাকা জমাচ্ছে—বিশ্রামের সুখ নেই, খাবার সুখ নেই, রাত্রে ঘুম নেই, লাভক্ষতির নিরন্তর আন্দোলনে মনে চিন্তার সীমা নেই—সে কীজন্যে এই অসহ কষ্ট স্বীকার করে নিয়েছে ? ধনের পথে যতদূর সম্ভব বড়ো হয়ে ওঠবার জন্যে।

তাকে এ-কথা বলা মিথ্যা যে তোমাকে দুঃখনিবারণের পথ বলে দিচ্ছি। তাকে এ-কথাও বলা মিথ্যা যে ভোগের বাসনা ত্যাগ করো, আরামের আকাঙ্ক্ষা মনে রেখো না। ভোগ এবং আরাম সে যেমন ত্যাগ করেছে এমন আর কে করতে পারে।

বুদ্ধদেব যে দুঃখ-নিবৃত্তির পথ দেখিয়ে দিয়েছেন, সে-পথের একটা সকলের চেয়ে বড়ো আকর্ষণ কী ? সে এই যে, অত্যন্ত দুঃখ স্বীকার করে এই পথে অগ্রসর হতে হয়। এই দুঃখস্বীকারের দ্বারা মানুষ আপনাকে বড়ো করে জানে। খুব বড়োরকম করে ত্যাগ, খুব বড়োরকম করে ব্রতপালনের মাহাত্ম্য মানুষের শক্তিকে বড়ো করে দেখায় বলে মানুষের মন তাতে ধাবিত হয়।

এই পথে অগ্রসর হয়ে যদি সত্যিই এমন কোনো একটা জায়গায় মানুষ ঠেকতে পারত যেখানে একান্ত দুঃখনিবৃত্তির শূন্যতা ছাড়া আর কিছুই নেই তাহলে ব্যাকুল হয়ে তাকে জগতে দুঃখের সন্ধানে বেরোতে হত।

অতএব মানুষকে যখন বলি দুঃখনিবৃত্তির উদ্দেশে তোমাকে সমস্ত সুখের বাসনা ত্যাগ করতে হবে তখন সে রাগ করে বলতে পারে, চাই নে আমি দুঃখনিবৃত্তি। ওর চেয়ে বড়ো কিছু একটাকে দিতে হবে কারণ মানুষ বড়োকেই চায়।

সেইজন্যে উপনিষৎ বলেছেন ভূমৈব সুখং। অর্থাৎ সুখ সুখই নয় বড়োই সুখ। ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ—এই বড়োকেই জানতে হবে এঁকেই পেতে হবে। এই কথাটির তাৎপর্য যদি ঠিকমতো বুঝি তাহলে কখনোই বলি নে যে, চাই নে তোমার বড়োকে।

কেননা, টাকায় বল, বিদ্যাতে বল, খ্যাতিতে বল, কোনো-না-কোনো বিষয়ে আমরা সুখকে ত্যাগ করে বড়োকেই চাচ্ছি। অথচ যাকে বড়ো বলে চাচ্ছি সে এমন বড়ো নয় যাকে পেয়ে আমার আত্মা বলতে পারে আমার সব পাওয়া হল।

অতএব যিনি ব্রহ্ম যিনি ভূমা যিনি সকলের বড়ো তাঁকেই মানুষের সামনে লক্ষ্যরূপে স্থাপন করলে মানুষের মন তাতে সায় দিতে পারে, দুঃখনিবৃত্তিকে নয়।

কেউ কেউ এ কথা বলতে পারেন তাঁকে উদ্দেশ্যরূপে স্থাপন করলেই কী আর না করলেই কী। এই সিদ্ধি এতই দূরে যে এখন থেকে এ সম্বন্ধে চিন্তা না করলেও চলে। আগে বাসনা দূর করো, শুচি হও; সবল হও— আগে কঠোর সাধনার সুদীর্ঘ পথ নিঃশেষে উত্তীর্ণ হও তার পরে তাঁর কথা হবে।

যিনি উদ্দেশ্য তাঁকে যদি গোড়া থেকেই সাধনার পথে কিছু-না-কিছু পাই তাহলে এই দীর্ঘ অরাজকতার অবকাশে সাধনাটাই সিদ্ধির স্থান অধিকার করে, শুচিতাটাই প্রাপ্তি বলে মনে হয়, অনুষ্ঠানটিই দেবতা হয়ে ওঠে; পদে পদে সকল বিষয়েই মানুষের এই বিপদ দেখা গেছে। অহরহ ব্যাকরণ পড়তে পড়তে মানুষ কেবলই বৈয়াকরণ হয়ে ওঠে, ব্যাকরণ যে সাহিত্যের সোপান সেই সাহিত্যে সে প্রবেশই করে না।

দুধে তেঁতুল দিয়ে সেই দুধকে দধি করবার চেষ্টা করলে হয়তো বহু চেষ্টাতেও সে দুধ না জমে উঠতে পারে, কিন্তু যে দইয়ে তার পরিণতি সেই দই গোড়াতেই যোগ করে দিলে দেখতে দেখতে দুধ সহজেই দই হয়ে উঠতে থাকে। তেমনি যেটা আমাদের পরিণামে, সেটাকে গোড়াতেই যোগ করে দিলে স্বভাবের সহজ নিয়মে পরিণাম সুসিদ্ধ হয়ে উঠতে থাকে।

আমরা যাঁকে সাধনার দ্বারা চাই, গোড়াতেই তাঁর হাতে আমাদের হাত সমর্পণ

করে দিতে হবে, তিনিই আমাদের হাতে ধরে তাঁরই দিকে নিয়ে চলবেন। তাহলে চলাও আনন্দ, পৌঁছনোও আনন্দ হয়ে উঠবে। তাহলে, অভাব থেকে ভাব হয় না, অসৎ থেকে সৎ হয় না, একেবারে না পাওয়া থেকে পাওয়া হয় না—এই উপদেশটাকে মেনে চলা হবে। যিনিই আনন্দরূপে আমাদের কাছে চিরদিন ধরা দেবেন, তিনিই কৃপারূপে আমাদের প্রতিদিন ধরে নিয়ে যাবেন।

১৪ চৈত্র

৮

ওঁ

ওঁ শব্দের অর্থ, হাঁ। আছে এবং পাওয়া গেল এই কথাটাকে স্বীকার। কাল আমরা ছান্দোগ্য উপনিষৎ আলোচনা করতে করতে ওঁ শব্দের এই তাৎপর্যের আভাস পেয়েছি।

যেখানে আমাদের আত্মা "হাঁ"কে পায় সেইখানেই সে বলে ওঁ।

দেবতারা এই হাঁকে যখন খুঁজতে বেরিয়েছিলেন তখন তাঁরা কোথায় খুঁজে শেষে কোথায় পেলেন? প্রথমে তাঁরা ইন্দ্রিয়ের দ্বারে দ্বারে আঘাত করলেন। বললেন চোখে দেখার মধ্যে এই হাঁকে পাওয়া যাবে। কিন্তু দেখলেন চোখে দেখার মধ্যে সম্পূর্ণতা নেই—তা হাঁ এবং নায়ে খণ্ডিত। তার মধ্যে পরিপূর্ণ বিশুদ্ধতা নেই—তা ভালোও দেখে মন্দও দেখে, খানিকটা দেখে খানিকটা দেখে না; সে দেখে কিন্তু শোনে না।

এমনি করে কান নাক বাক্য মন সর্বত্রই সন্ধান করে দেখলেন, সর্বত্রই খণ্ডতা আছে সর্বত্রই দ্বন্দ্ব আছে।

অবশেষে প্রাণের প্রাণে গিয়ে যখন পৌঁছোলেন তখন এই শরীরের মধ্যে একটা হাঁ পেলেন। কারণ এই প্রাণই শরীরের সব প্রাণকে অধিকার করে আছে। এই প্রাণের মধ্যেই সকল ইন্দ্রিয়ের সকল শক্তির ঐক্য। এই মহাপ্রাণ যতক্ষণ আছে ততক্ষণই চোখও দেখছে কানও শুনছে নাসিকাও ঘ্রাণ করছে। এর মধ্যে যে কেবল একটা "হাঁ" এবং অন্যটা "না" হয়ে আছে তা নয়, এর মধ্যে দৃষ্টি শ্রুতি আঘ্রাণ সকলগুলিই এক জায়গায় হাঁ হয়ে আছে। অতএব শরীরের মধ্যে এইখানেই আমরা পেলুম ওঁ। বাস, অঞ্জলি ভরে উঠল।

ছান্দোগ্য বলছেন মিথুনের মাঝখানে অর্থাৎ দুই যেখানে মিলেছে সেইখানেই এই ওঁ। যেখানে একদিকে ঋক্ একদিকে সাম, একদিকে বাক্য একদিকে সুর, একদিকে সত্য একদিকে প্রাণ ঐক্য লাভ করেছে সেইখানেই এই পরিপূর্ণতার সংগীত ওঁ।

যাঁর মধ্যে কিছুই বাদ পড়ে নি, যাঁর মধ্যে সমস্ত খণ্ডই অখণ্ড হয়েছে, সমস্ত বিরোধ মিলিত হয়েছে আমাদের আত্মা তাঁকেই অঞ্জলি জোড় করে হাঁ বলে স্বীকার করে নিতে চায়। তার পূর্বে সে নিজের পরম পরিতৃপ্তি স্বীকার করতে পারে না; তাকে ঠেকতে হয়, তাকে ঠকতে হয়, মনে করে ইন্দ্রিয়েই হাঁ, ধনেই হাঁ, মানেই হাঁ।

শেষকালে দেখে, এর সব তাতেই পাপ আছে, বন্ধ আছে, "না" তার সঙ্গে মিশিয়ে আছে।

সকল দ্বন্দ্বের সমাধানের মধ্যে উপনিষৎ সেই পরম পরিপূর্ণকে দেখেছেন বলেই সত্যের একদিকেই সমস্ত ঝোঁকটা দিয়ে তার অন্য দিকটাকে একেবারে নির্মূল করে দিতে চেষ্টা করেন নি। সেইজন্যে তিনি যেমন বলেছেন

এতজ্ জ্ঞেয়ং নিত্যমেবাত্মসংস্থং
নাতঃপরং বেদিতব্যং হি কিঞ্চিৎ।

অর্থাৎ

আত্মাতেই যিনি নিত্য স্থিতি করছেন তিনিই জানবার যোগ্য, তাঁর পর জানবার যোগ্য আর কিছুই নেই।

তেমনি আবার বলেছেন,—

তে সর্বগং সর্বতঃ প্রাপ্য ধীরা
যুক্তাত্মানঃ সর্বমেবাবিশন্তি।

অর্থাৎ—

সেই ধীরেরা যুক্তাত্মা হয়ে সর্বব্যাপীকে সকল দিক হতেই লাভ করে সর্বত্রই প্রবেশ করেন।

আত্মন্যেবাত্মানং পশ্যতি—নয়, কেবল আত্মার মধ্যেই আত্মাকে দেখা নয়, সেই দেখাই আবার সর্বত্রেই।

আমাদের ধ্যানের মন্ত্রে এক সীমায় রয়েছে ভূর্ভুবঃস্বঃ, অন্য সীমায় রয়েছে আমাদের ধী আমাদের চেতনা। মাঝখানে এই দুইকেই একে বেঁধে সেই বরণীয় দেবতা আছেন যিনি একদিকে ভূর্ভুবঃস্বঃকেও সৃষ্টি করছেন আর-এক দিকে আমাদের ধীশক্তিকেও প্রেরণ করছেন। কোনোটাকেই বাদ দিয়ে তিনি নেই। এইজন্যই তিনি ওঁ।

এইজন্যেই উপনিষৎ বলেছেন যারা অবিদ্যাকেই সংসারকেই একমাত্র করে জানে তারা অন্ধকারে পড়ে, আবার যারা বিদ্যাকে ব্রহ্মজ্ঞানকে ঐকান্তিক করে বিচ্ছিন্ন করে জানে তারা গভীরতর অন্ধকারে পড়ে। একদিকে বিদ্যা আর একদিকে অবিদ্যা, এক দিকে ব্রহ্মজ্ঞান এবং আর-একদিকে সংসার। এই দুইয়ের যেখানে সমাধান হয়েছে সেইখানেই আমাদের আত্মার স্থিতি।

দূরের দ্বারা নিকট বর্জিত নিকটের দ্বারা দূর বর্জিত, চলার দ্বারা থামা বর্জিত থামার দ্বারা চলা বর্জিত, অন্তরের দ্বারা বাহির বর্জিত বাহিরের দ্বারা অন্তর বর্জিত। কিন্তু

তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদন্তিকে
তদন্তরস্য সর্বস্য তৎ সর্বস্যা

তিনি চলেন অথচ চলেন না, তিনি দূরে অথচ নিকটে, তিনি সকলের অন্তরে অথচ তিনি সকলের বাহিরেও।

অর্থাৎ চলা না-চলা, দূর নিকট, ভিতর বাহির সমস্তর মাঝখানে সমস্তকে নিয়ে তিনি, কাউকে ছেড়ে তিনি নন। এইজন্য তিনি ওঁ।

তিনি প্রকাশ ও অপ্রকাশের মাঝখানে। একদিকে সমস্তই তিনি প্রকাশ করছেন আর-একদিকে কেউ তাঁকে প্রকাশ করে উঠতে পারছে না। তাই উপনিষদ বলেন—

ন তত্র সূর্যোভাতি ন চন্দ্রতারকা
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং
তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি।

সেখানে সূর্য আলো দেয় না, চন্দ্র তারাও না, এই বিদ্যুৎসকলও দীপ্তি দেয় না, কোথায় বা আছে এই অগ্নি—তিনি প্রকাশিত তাই সমস্ত প্রকাশমান, তাঁর আভাতেই সমস্ত বিভাত।

তিনি শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্। শান্তম্ বলতে এ বোঝায় না সেখানে গতির সংস্রব নেই। সকল বিরুদ্ধ গতিই সেখানে শান্তিতে ঐক্যলাভ করেছে। কেন্দ্রাতিগ এবং কেন্দ্রানুগ গতি, আকর্ষণের গতি এবং বিকর্ষণের গতি পরস্পরকে কাটতে চায় কিন্তু এই দুই বিরুদ্ধ গতিই তাঁর মধ্যে অবিরুদ্ধ বলেই তিনি শান্তম্। আমার স্বার্থ তোমার স্বার্থকে মানতে চায় না, তোমার স্বার্থ আমার স্বার্থকে মানতে চায় না, কিন্তু মাঝখানে যেখানে মঙ্গল সেখানে তোমার স্বার্থই আমার স্বার্থ এবং আমার স্বার্থই তোমার স্বার্থ। তিনি শিব, তাঁর মধ্যে সকলেরই স্বার্থ মঙ্গলে নিহিত রয়েছে। তিনি অদ্বিতীয় তিনি এক। তার মানে এ নয় যে, তবে এ সমস্ত কিছুই নেই। তার মানে, এই সমস্তই তাঁতে এক। আমি বলছি, আমি তুমি নয়, তুমি বলছ তুমি আমি নয়, এমন বিরুদ্ধ আমাকে-তোমাকে এক করে রয়েছেন সেই অদ্বৈতম্।

মিথুন যেখানে মিলেছে সেইখানেই হচ্ছেন তিনি—কেউ যেখানে বর্জিত হয় নি সেইখানেই তিনি। এই যে পরিপূর্ণতা যা সমস্তকে নিয়ে অথচ যা কোনো খণ্ডকে আশ্রয় করে নয়, যা চন্দ্রে নয় সূর্যে নয় মানুষে নয় অথচ সমস্ত চন্দ্র সূর্য মানুষে, যা কানে নয় চোখে নয় বাক্যে নয় মনে নয় অথচ সমস্ত কানে চোখে বাক্যে মনে, সেই এককেই, সেই তাঁকেই, সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে সেই পরিপূর্ণতাকেই স্বীকার হচ্ছে ওংকার।

১৫ চৈত্র

স্বভাবলাভ

মানুষের এক দিন ছিল যখন, সে যেখানে কিছু অদ্ভুত দেখত সেইখানে ঈশ্বরের কল্পনা করত। যদি দেখলে কোথাও জলের থেকে আগুন উঠছে অমনি সেখানে পূজার আয়োজন করত। তখন সে কোনো একটা অসামান্য লক্ষণ দেখে বা কল্পনা করে বলত, অমুক মানুষে দেবতা ভর করেছেন, অমুক গাছে দেবতার আবির্ভাব হয়েছে, অমুক মূর্তিতে দেবতা জাগ্রত হয়ে আছেন।

ক্রমে অখণ্ড বিশ্বনিয়মকে চরাচরে যখন সর্বত্র এক বলে দেখবার শিক্ষা মানুষের হল তখন সে জানতে পারল যে, যাকে অসামান্য বলে মনে হয়েছিল সেও সামান্য নিয়ম হতে ভ্রষ্ট নয়। তখনই ব্রহ্মের আবির্ভাবকে অখণ্ডভাবে সর্বত্র ব্যাপ্ত করে দেখবার অধিকার সে লাভ করল। এবং সেই বিরাট অবিচ্ছিন্ন ঐক্যের ধারণায় সে আনন্দ ও আশ্রয় পেল। তখনই মানুষের জ্ঞান প্রেম কর্ম মোহমুক্ত হয়ে প্রশস্ত এবং প্রসন্ন হয়ে উঠল। তার ধর্ম থেকে সমাজ থেকে রাজ্য থেকে মূঢ়তা ক্ষুদ্রতা দূর হতে লাগল।

এই দেখা হচ্ছে ব্রহ্মকে সর্বত্র দেখা, স্বভাবে দেখা।

কিন্তু সমস্ত স্বভাব থেকে চুরি করে এনে তাঁকে স্বেচ্ছাপূর্বক কোনো একটা কৃত্রিমতার মধ্যে বিশেষ করে দেখবার চেষ্টা এখনও মানুষের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। এমন কি কেউ কেউ স্পর্ধা করে বলেন সেইরকম করে দেখাই হচ্ছে প্রকৃষ্ট দেখা। সব রূপ হতে ছাড়িয়ে একটি কোনো বিশেষরূপে, সব মানুষ হতে সরিয়ে একটি কোনো বিশেষ মানুষে ঈশ্বরকে পূজা করাই তাঁরা বলেন পূজার চরম।

জানি, মানুষ এরকম কৃত্রিম উপায়ে কোনো একটা হৃদয়বৃত্তিকে অতিপরিমাণে বিক্ষুব্ধ করে তুলতে পারে, কোনো একটা রসকে অত্যন্ত তীব্র করে দাঁড় করাতে পারে। কিন্তু সেইটে করাই কি সাধনার লক্ষ্য?

অনেক সময় দেখা যায় অন্ধ হলে স্পর্শশক্তি অতিরিক্ত বেড়ে যায়। কিন্তু সেইরকম একদিকের চুরির দ্বারা অন্যদিককে উপচিয়ে তোলাকেই কি বলে শক্তির সার্থকতা? যেদিকটা নষ্ট হল সেদিকটার হিসাব কি দেখতে হবে না? সেদিকের দণ্ড হতে কি আমরা নিষ্কৃতি পাব?

কোনোপ্রকার বাহ্য ও সংকীর্ণ উপায়ের দ্বারা সম্মোহনকে মেসমেরিজ্‌মকে ধর্মসাধনার প্রধান অঙ্গ করে তুললে আমাদের চিত্ত স্বাস্থ্য থেকে স্বভাব থেকে সুতরাং

মঙ্গল থেকে বিচ্যুত হবেই হবে। আমরা ওজন হারাব—আমরা যেদিকটাতে এইরকম অসংগত ঝোঁক দেব সেইদিকটাকেই বিপর্যস্ত করে দেব।

বস্তুত স্বভাবের পরিপূর্ণতাকে লাভ করাই ধর্ম ও ধর্মনীতির শ্রেষ্ঠ লাভ। মানুষ নানা কারণে তার স্বভাবের ওজন রাখতে পারে না, সে সামঞ্জস্য হারিয়ে ফেলে—এই তো তার পাপের মূল এবং ধর্মনীতি তো এইজন্যই তাকে সংযমে প্রবৃত্ত করে।

এই সংযমের কাজটা কী? প্রবৃত্তিকে উন্মূল করা নয় প্রবৃত্তিকে নিয়মিত করা। কোনো একটা প্রবৃত্তি যখন বিশেষরূপ প্রশ্রয় পেয়ে স্বভাবের সামঞ্জস্যকে পীড়িত করে তখনই পাপের উৎপত্তি হয়। অর্জনস্পৃহা যখন অত্যন্ত উগ্র হয়ে উঠে টাকা অর্জনের দিকেই মানুষের শক্তিকে একান্ত বাঁধতে চায় তখনই সেটা লোভ হয়ে দাঁড়ায়। তখনই সে মানুষের চিত্তকে তার সমস্ত স্বাভাবিক দিক থেকে চুরি করে এই দিকেই জড়ো করে। এই প্রকারে স্বভাব থেকে যে-ব্যক্তি ভ্রষ্ট হয় সে কখনোই যথার্থ মঙ্গলকে পায় না সুতরাং ঈশ্বরকে লাভ তার পক্ষে অসাধ্য। কোনো মানুষের প্রতি অনুরাগ যখন স্বভাব থেকে আমাদের বিচ্যুত করে তখনই তা কাম হয়ে ওঠে। সেই কাম আমাদের ঈশ্বরলাভের বাধা।

এইজন্য সামঞ্জস্য থেকে বিকৃতি থেকে মানুষের চিত্তকে স্বভাবে উদ্ধার করাই হচ্ছে ধর্মনীতির একান্ত চেষ্টা।

উপনিষদে ঈশ্বরকে সর্বব্যাপী বলবার সময় যখন তাঁকে অপাপবিদ্ধ বলা হয়েছে তখন তার তাৎপর্য এই। তিনি স্বভাবে অবাধে পরিব্যাপ্ত। পাপ তাঁকে কোনো একটা বিশেষ সংকীর্ণতায় আকৃষ্ট আবদ্ধ করে অন্যত্র থেকে পরিহরণ করে নেয় না—এই গুণেই তিনি সর্বব্যাপী। আমাদের মধ্যে পাপ সমগ্রের ক্ষতি করে কোনো একটাকেই স্ফীত করতে থাকে। তাতে করে কেবল যে নিজের স্বভাবের মধ্যে নিজের সামঞ্জস্য থাকে না তা নয়, চারিদিকের সঙ্গে সমাজের সঙ্গে আমাদের সামঞ্জস্য নষ্ট হয়ে যায়।

ধর্মনীতিতে আমরা এই যে স্বভাবলাভের সাধনায় প্রবৃত্ত আছি, সমাজ এবং নীতিশাস্ত্র এজন্যে দিনরাত তাড়না করছে। এইখানেই কি এর শেষ? ঈশ্বরসাধনাতেও কি এই নিয়মের স্থান নেই? সেখানেও কি আমরা কোনো একটি ভাবকে কোনো একটি রসকে সংকীর্ণ অবলম্বনের দ্বারা অতিমাত্র আন্দোলিত করে তোলাকেই মানুষের একটি চরম লাভ বলে গণ্য করব?

দুর্বলের মনে একটা উত্তেজনা জাগিয়ে তার হৃদয়কে প্রলুব্ধ করবার জন্যে এই সকল উপায়ের প্রয়োজন এমন কথা অনেকে বলেন।

যে লোক মদ খেয়ে আনন্দ পায় তার সম্বন্ধে কি আমরা ওইরূপ তর্ক করতে পারি?

আমরা কি বলতে পারি মদেই যখন ও বিশেষ আনন্দ পায় তখন ওইটেই ওর পক্ষে শ্রেয়।

আমরা বরং এই কথাই বলি যে যাতে স্বাভাবিক সুখেই মাতালের অনুরাগ জন্মে সেই চেষ্টাই উচিত। যাতে বই পড়তে ভালো লাগে, যাতে লোকজনের সঙ্গে সহজে মিশে ওর সুখ হয়, যাতে প্রাত্যহিক কাজকর্মে ওর মন সহজে নিবিষ্ট হয় সেই পথই অবলম্বন করা কর্তব্য। যাতে একমাত্র মদের সংকীর্ণ উত্তেজনায় ওর চিত্ত আসক্ত না থেকে জীবনের বৃহৎ স্বভাবক্ষেত্রে সহজভাবে ব্যাপ্ত হয় সেইটে করাই মঙ্গল।

ভগবানের ধারণাকে একটা সংকীর্ণতার মধ্যে বেঁধে ভক্তির উত্তেজনাকে উগ্র নেশার মতো করে তোলাই যে মনুষ্যত্বের সার্থকতা এ-কথা বলা চলে না। ভগবানকেও তাঁর স্বভাবে পাবার সাধনা করতে হবে তাহলেই সেটা সত্য সাধনা হবে—তাঁকে আমাদের নিজের কোনো বিকৃতির উপযোগী করে নিয়ে তাঁকে নিয়ে মাতামাতি করাকেই আমরা মঙ্গল বলতে পারব না। তার মধ্যে একটা কোথাও সত্য চুরি আছে। তার মধ্যে এমন একটা অসামঞ্জস্য আছে যে, যে-ক্ষেত্রে তার আবির্ভাব সেখানে মোহকে আর ঠেকিয়ে রাখা যায় না। যিনি শক্ত লোক তিনি মদ সহ্য করতে পারেন তাঁর পক্ষে একরকম চলে যায় কিন্তু তাঁর দলে এসে যারা জমে তাদের আর কিছুই ঠিক-ঠিকানা থাকে না; তাদের আলাপ ক্রমেই প্রলাপ হয়ে ওঠে এবং উত্তেজনা উন্মাদনার পথে অপঘাত মৃত্যু লাভ করে।

১৬ চৈত্র

অখণ্ড পাওয়া

ব্রহ্মকে পেতে হবে। কিন্তু পাওয়া কাকে বলে?

সংসারে আমরা অশন বসন জিনিস পত্র প্রতিদিন কত কী পেয়ে এসেছি। পেতে হবে বললে মনে হয় তবে তেমনি করেই পেতে হবে। তেমনি করে না পেলে মনে করি তবে তো পাচ্ছি নে। তখন ব্যস্ত হয়ে ভগবানকে পাওয়াও যাতে আমাদের অন্যান্য পাওয়ার শামিল হয় সেই চেষ্টা করতে চাই। অর্থাৎ আমাদের আসবাবপত্রের যে ফর্দটা আছে, যাতে ধরা আছে আমার ঘোড়া আছে গাড়ি আছে আমার ঘটি আছে বাটি আছে তার মধ্যে ওটাও ধরে দিতে হবে আমার একটি ভগবান আছে।

কিন্তু ভালো করে ভেবে দেখার দরকার এই যে ঈশ্বরকে পাবার জন্যে আমাদের আত্মার যে একটি গভীর আকাঙ্ক্ষা আছে সেই আকাঙ্ক্ষার প্রকৃতি কী? সে কি অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে আরও একটা বড়ো জিনিসকে যোগ করবার আকাঙ্ক্ষা?

তা কখনোই নয়। কেননা যোগ করে করে জড়ো করে আমরা যে গেলুম। তেমনি করে সামগ্রীগুলোকে নিয়তই জোড়া দেবার নিরন্তর কষ্ট থেকে বাঁচাবার জন্যেই কি আমরা ঈশ্বরকে চাই নে? তাঁকেও কি আবার একটা তৃতীয় সামগ্রী করে আমাদের বিষয় সম্পত্তির সঙ্গে জোড়া দিয়ে বসব? আরও জঞ্জাল বাড়াব?

কিন্তু আমাদের আত্মা যে ব্রহ্মকে চায় তার মানেই হচ্ছে, সে বহুর দ্বারা পীড়িত এইজন্য সে এককে চায়, সে চঞ্চলের দ্বারা বিক্ষিপ্ত এইজন্য সে ধ্রুবকে চায়, নূতন কিছুকে বিশেষ কিছুকে চায় না। যিনি নিত্যোঽনিত্যানাং, সমস্ত অনিত্যের মধ্যে নিত্য হয়েই আছেন সেই নিত্যকে উপলব্ধি করতে চায়। যিনি রসানাং রসতমঃ, সমস্ত রসের মধ্যেই যিনি রসতম, তাঁকেই চায়; আর-একটা কোনো নূতন রসকে চায় না।

সেইজন্যে আমাদের প্রতি এই সাধনার উপদেশ যে, ঈশাবাস্য মিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ, জগতে যা কিছু আছে তারই সমস্তকে ঈশ্বরের দ্বারাই আবৃত করে দেখবে। আর-একটা কোনো অতিরিক্ত দেখবার জিনিস সন্ধান বা নির্মাণ করবে না। এই হলেই আত্মা আশ্রয় পাবে আনন্দ পাবে।

এমনি করে তো নিখিলের মধ্যে তাঁকে জানবে। আর ভোগ করবে কী? না, তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ, তিনি যা দান করছেন তাই ভোগ করবে। মাগৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনং, আর কারও ধনে লোভ করবে না।

এর মানে হচ্ছে এই যে, যেমন জগতে যা কিছু আছে তার সমস্তই তিনি পরিপূর্ণ করে আছেন এইটেই উপলব্ধি করতে হবে তেমনি তুমি যা কিছু পেয়েছ সমস্তই তিনি দিয়েছেন বলে জানতে হবে। তা হলেই কী হবে? না, তুমি যা কিছু পেয়েছ তার মধ্যেই তোমার পাওয়া তৃপ্ত হবে। আরও কিছু যোগ করে দাও এটা আমাদের প্রার্থনার বিষয় নয়—কারণ সে রকম দিয়ে দেওয়ার শেষ কোথায়? কিন্তু আমি যা-কিছু পেয়েছি সমস্তই তিনি দিয়েছেন এইটেই যেন উপলব্ধি করতে পারি। তাহলেই অল্পই হবে বহু, তাহলেই সীমার মধ্যে অসীমকে পাব। নইলে সীমাকেই ক্রমাগত জুড়ে জুড়ে বড়ো করে কখনোই অসীমকে পাওয়া যায় না—এবং কোটির পরে কোটিকে উপাসনা করেও সেই একের উপাসনায় গিয়ে পৌঁছোনো যেতে পারে না। জগতের সমস্ত খণ্ড প্রকাশ সার্থকতা লাভ করেছে তাঁর অখণ্ড প্রকাশে এবং আমাদের অসংখ্য ভোগের বস্তু সার্থকতা লাভ করেছে তাঁরই দানে। এইটেই ঠিকমতো জানতে পারলে ঈশ্বরকে পাবার জন্যে কোনো বিশেষ স্থানের কোনো বিশেষ রূপের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়াতে হয় না। এবং ভোগের তৃপ্তিহীন স্পৃহা মেটাবার জন্যে কোনো বিশেষ ভোগের সামগ্রীর জন্যে বিশেষভাবে লোলুপ হয়ে উঠতে হয় না।

১৭ চৈত্র

আত্মসমর্পণ

তাই বলছিলুম, ব্রহ্মকে ঠিক পাওয়ার কথাটা বলা চলে না। কেননা তিনি তো আপনাকে দিয়েই বসে আছেন—তাঁর তো কোনোখানে কমতি নেই—এ কথা তো বলা চলে না যে, এই জায়গায় তাঁর অভাব আছে অতএব আর-এক জায়গায় তাঁকে খুঁজে বেড়াতে হবে।

অতএব ব্রহ্মকে পেতে হবে এ-কথাটা বলা ঠিক চলে না—আপনাকে দিতে হবে বলতে হবে। ওইখানেই অভাব আছে—সেইজন্যেই মিলন হচ্ছে না। তিনি আপনাকে দিয়েছেন আমরা আপনাকে দিই নি। আমরা নানা প্রকার স্বার্থের অহংকারের ক্ষুদ্রতার বেড়া দিয়ে নিজেকে অত্যন্ত স্বতন্ত্র, এমন কি, বিরুদ্ধ করে রেখেছি।

এইজন্যই বুদ্ধদেব এই স্বাতন্ত্র্যের অতি কঠিন বেষ্টন নানা চেষ্টায় ক্রমে ক্রমে ক্ষয় করে ফেলবার উপদেশ করেছেন। এর চেয়ে বড়ো সত্তা বড়ো আনন্দ যদি কিছুই না থাকে তাহলে এই ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য নিরন্তর অভ্যাসে নষ্ট করে ফেলবার কোনো মানে নেই। কারণ, কিছুই যদি না থাকে তাহলে তো আমাদের এই অহং এই ব্যক্তিগত বিশেষত্বই একেবারে পরম লাভ—তাহলে একে আঁকড়ে না রেখে এত করে নষ্ট করব কেন?

কিন্তু আসল কথা এই যে, যিনি পরিপূর্ণরূপে নিজেকে দান করেছেন আমরাও তাঁর কাছে পরিপূর্ণরূপে নিজেকে দান না করলে তাঁকে প্রতিগ্রহ করাই হবে না। আমাদের দিকেই বাকি আছে।

তাঁর উপাসনা তাঁকে লাভ করবার উপাসনা নয়—আপনাকে দান করবার উপাসনা। দিনে দিনে ভক্তি দ্বারা ক্ষমা দ্বারা সন্তোষের দ্বারা সেবার দ্বারা তাঁর মধ্যে নিজেকে মঙ্গলে ও প্রেমে বাধাহীনরূপে ব্যাপ্ত করে দেওয়াই তাঁর উপাসনা।

অতএব আমরা যেন না বলি যে তাঁকে পাচ্ছি নে কেন, আমরা যেন বলতে পারি তাঁকে দিচ্ছি নে কেন? আমাদের প্রতিদিনের আক্ষেপ হচ্ছে এই যে—

আমার যা আছে আমি, সকল দিতে
পারি নি তোমারে নাথ।
আমার লাজ ভয়, আমার মান অপমান
সুখ দুখ ভাবনা।

দাও দাও দাও, সমস্ত ক্ষয় করো, সমস্ত খরচ করে ফেলো, তাহলেই পাওয়াতে একেবারে পূর্ণ হয়ে উঠবে।

মাঝে রয়েছে আবরণ কত শত কত মতো
তাই কেঁদে ফিরি, তাই তোমারে না পাই
মনে থেকে যায় তাই হে মনের বেদনা।

আমাদের যত দুঃখ যত বেদনা সে কেবল আপনাকে ঘোচাতে পারছি নে বলেই—সেইটে ঘুচলেই যে তৎক্ষণাৎ দেখতে পাব আমার সকল পাওয়াকে চিরকালই পেয়ে বসে আছি।

উপনিষৎ বলেছেন, ব্রহ্ম তল্লক্ষ্য মুচ্যতে—ব্রহ্মকেই লক্ষ্য বলা হয়। এই লক্ষ্যটি কিসের জন্যে? কিছুকে আহরণ করে নিজের দিকে টানবার জন্যে নয়—নিজেকে একেবারে হারাবার জন্যে। শরবৎ তন্ময়ো ভবেৎ। শর যেমন লক্ষ্যের মধ্যে সম্পূর্ণ প্রবেশ করে তন্ময় হয়ে যায় তেমনি করে তাঁর মধ্যে একেবারে আচ্ছন্ন হয়ে যেতে হবে।

এই তন্ময় হয়ে যাওয়াটা কেবল যে একটা ধ্যানের ব্যাপার আমি তা মনে করি নে। এটা হচ্ছে সমস্ত জীবনেরই ব্যাপার। সকল অবস্থায়, সকল চিন্তায়, সকল কাজে এই উপলব্ধি যেন মনের এক জায়গায় থাকে যে, আমি তাঁর মধ্যেই আছি; কোথাও বিচ্ছেদ নেই। এই জ্ঞানটি যেন মনের মধ্যে প্রতিদিনই ক্রমে ক্রমে একান্ত সহজ হয়ে আসে যে, কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। আমার শরীর মনের তুচ্ছতম চেষ্টাটিও থাকত না যদি আকাশপরিপূর্ণ আনন্দ না থাকতেন, তাঁরই আনন্দ, শক্তিরূপে ছোটো বড়ো সমস্ত ক্রিয়াকেই চেষ্টা দান করছে। আমি আছি তাঁরই মধ্যে, আমি করছি তাঁরই শক্তিতে এবং আমি ভোগ করছি তাঁরই দানে এই জ্ঞানটিকে নিশ্বাস-প্রশ্বাসের মতো সহজ করে তুলতে হবে এই আমাদের সাধনার লক্ষ্য। এই হলেই জগতে আমাদের থাকা করা এবং ভোগ, আমাদের সত্য মঙ্গল এবং সুখ সমস্তই সহজ হয়ে যাবে—কেননা যিনি স্বয়ম্ভূ, যাঁর জ্ঞান শক্তি ও কর্ম স্বাভাবিক তাঁর সঙ্গে আমাদের যোগকে আমরা চেতনার মধ্যে প্রাপ্ত হব। এইটি পাওয়ার জন্যেই আমাদের সকল চাওয়া।

১৮ চৈত্র

সমগ্র এক

পরমাত্মার মধ্যে আত্মাকে এইরূপ যোগযুক্ত করে উপলব্ধি করা এ কি কেবল জ্ঞানের দ্বারা হবে? তা কখনোই না। এতে প্রেমেরও প্রয়োজন।

কেননা আমাদের জ্ঞান যেমন সমস্ত খণ্ডতার মধ্যে সেই এক পরম সত্যকে চাচ্ছে তেমনি আমাদের প্রেমও সমস্ত ক্ষুদ্র রসের ভিতরে সেই সকল রসের রসতমকে সেই পরমানন্দস্বরূপকে চাচ্ছে—নইলে তার তৃপ্তি নেই।

জীবাত্মা যা কিছু নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে পেয়েছে তাই সে পরমাত্মার মধ্যে অসীমরূপে উপলব্ধি করতে চায়।

নিজের মধ্যে আমরা কী কী দেখছি।

প্রথমে দেখছি আমি আছি—আমি সত্য।

তার পরে দেখছি যেটুকু এখনই আছি এইটুকুতেই আমি শেষ নই। যা আমি হব, যা এখনও হই নি তাও আমার মধ্যে আছে। তাকে ধরতে পারি নে ছুঁতে পারি নে কিন্তু তা একটি রহস্যময় পদার্থরূপে আমার মধ্যে রয়েছে।

একে আমি বলি শক্তি। আমার দেহের শক্তি যে কেবল বর্তমানেই দেহকে প্রকাশ করে কৃতার্থ হয়ে বসে আছে তা নয়—সেই শক্তি দশ বৎসরের পরেও আমার এই দেহকে পুষ্ট করবে বর্ধিত করবে। যে পরিণাম এখন উপস্থিত নেই সেই পরিণামের দিকে শক্তি আমাকে বহন করবে।

আমাদের মানসিক শক্তিরও এইরূপ প্রকৃতি। আমাদের চিন্তাশক্তি যে কেবলমাত্র আমাদের চিন্তিত বিষয়গুলির মধ্যেই সম্পূর্ণ পর্যাপ্ত তা নয়—যা চিন্তা করি নি ভবিষ্যতে করব তার সম্বন্ধেও সে আছে। যা চিন্তা করতে পারতুম, প্রয়োজন উপস্থিত হলে যা চিন্তা করতুম তার সম্বন্ধেও সে আছে।

অতএব দেখা যাচ্ছে যা প্রত্যক্ষ সত্যরূপে বর্তমান, তার মধ্যে আর একটি পদার্থ বিদ্যমান, যা তাকে অতিক্রম করে অনাদি অতীত হতে অনন্ত ভবিষ্যতের দিকে ব্যাপ্ত।

এই যে শক্তি, যা আমাদের সত্যকে নিশ্চল জড়ত্বের মধ্যে নিঃশেষ করে রাখে নি, যা তাকে ছাড়িয়ে গিয়ে তাকে অনন্তের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে এ যে কেবলমাত্র গতিরূপে অহরহ আপনাকে অনাগতের অভিমুখে প্রকাশ করে চলেছে তা নয়, এর আর-একটি ভাব দেখছি। এ একের সঙ্গে আরকে, ব্যষ্টির সঙ্গে সমষ্টিকে যোজনা করছে।

যেমন আমাদের দেহের শক্তি। এ যে কেবল আমাদের আজকের এই দেহকে কালকের দেহের মধ্যে পরিণত করছে তা নয়, এ আমাদের দেহটিকে নিরন্তর একটি সমগ্রদেহ করে বেঁধে রাখছে। এ এমন করে কাজ করছে যাতে আমাদের শরীরের “আজ”ই একান্ত হয়ে না দাঁড়ায় শরীরের “কাল”ও আপনার দাবি রক্ষা করতে পারে—তেমনি আমাদের শরীরের একাংশই একান্ত হয়ে না ওঠে, শরীরের অন্যাংশের সঙ্গে তার এমন সম্বন্ধ থাকে যাতে পরস্পর পরস্পরের সহায় হয়। পায়ের জন্যে হাত মাথা পেট সকলেই খাটছে আবার হাত মাথা পেটের জন্যেও পা খেটে মরছে। এই

শক্তি হাতের স্বার্থকে পায়ের স্বার্থ করে রেখেছে পায়ের স্বার্থকে হাতের স্বার্থ করে রেখেছে।

এইটিই হচ্ছে শরীরের পক্ষে মঙ্গল। তার প্রত্যেক প্রত্যঙ্গ সমস্ত অঙ্গকে রক্ষা করছে; সমগ্র অঙ্গ প্রত্যেক প্রত্যঙ্গকে পালন করছে। অতএব শক্তি আয়ুরূপে শরীরকে অনাগত পরিণামের দিকে নিয়ে যাচ্ছে এবং মঙ্গলরূপে তাকে অখণ্ড সমগ্রতায় বন্ধন করছে, ধারণ করছে।

এই শক্তির প্রকাশ শুধু যে মঙ্গলে তা তো নয়, কেবল যে তার দ্বারা যন্ত্রের মতো রক্ষাকার্য চলে যাচ্ছে তা নয়, এর মধ্যে আবার একটি আনন্দ রয়েছে।

আয়ুর মধ্যে আনন্দ আছে। সমগ্র শরীরের মঙ্গলের মধ্যে স্বাস্থ্যের মধ্যে একটি আনন্দ আছে।

এই আনন্দকে ভাগ করলে দুটি জিনিস পাওয়া যায়, একটি হচ্ছে জ্ঞান এবং আর একটি প্রেম।

আমার মধ্যে যে একটি সমগ্রতা আছে তার সঙ্গে জ্ঞান আছে—সে জানছে আমি হচ্ছি আমি; আমি হচ্ছি একটি সম্পূর্ণ আমি।

শুধু জানছে নয় এই জানায় তার একটি প্রীতি আছে। এই একটি সম্পূর্ণতাকে সে এত ভালোবাসে যে এর কোনো ক্ষতি সে সহ্য করতে পারে না। এর মঙ্গলে তার লাভ, এর সেবায় তার আনন্দ।

তাহলে দেখতে পাচ্ছি, শক্তি একটি সমগ্রতাকে বাঁধছে, রাখছে এবং তাকে অহরহ একটি ভাবী সম্পূর্ণতার দিকে চালনা করে নিয়ে যাচ্ছে।

তার পরে দেখতে পাচ্ছি এই যে সমগ্রতা যার মধ্যে একটি সক্রিয় শক্তি অংশ প্রত্যংশকে এক করে রয়েছে, অতীত অনাগতকে এক করে রয়েছে—সেই শক্তির মধ্যে কেবল যে মঙ্গল রয়েছে অর্থাৎ সত্তা কেবল সমগ্র আকারে রক্ষা পাচ্ছে ও পরিণতি লাভ করছে তা নয়, তার মধ্যে একটি আনন্দ রয়েছে। অর্থাৎ তার মধ্যে একটি সমগ্রতার জ্ঞান এবং সমগ্রতার প্রেম আছে। সে সমস্তকে জানে এবং সমস্তকে ভালোবাসে।

যেটি আমার নিজের মধ্যে দেখছি, ঠিক এইটেই আবার সমাজের মধ্যে দেখছি। সমাজ-সত্তার ভিতরে একটি শক্তি বর্তমান, যা সমাজকে কেবলই বর্তমানে আবদ্ধ করছে না তাকে তার ভাবী পরিণতির দিকে নিয়ে যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, সমাজস্থ প্রত্যেকের স্বার্থকে সকলের স্বার্থ এবং সকলের স্বার্থকে প্রত্যেকের স্বার্থ করে তুলছে।

কিন্তু এই ব্যক্তিগত স্বার্থকে সমষ্টিগত মঙ্গলে পরিণত করাটা যে কেবল যন্ত্রবৎ জড় শাসনে ঘটে উঠছে তা নয়। এর মধ্যে প্রেম আছে। মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনে

একটা রস আছে। স্নেহ প্রেম দয়া দাক্ষিণ্য আমাদের পরস্পরের যোগকে স্বেচ্ছাকৃত আনন্দময় অর্থাৎ জ্ঞান ও প্রেমময় যোগরূপে জাগিয়ে তুলছে। আমরা দায়ে পড়ে নয় আনন্দের সঙ্গে স্বার্থ বিসর্জন করছি। মা ইচ্ছা করেই সন্তানের সেবা করছে; মানুষ অন্ধভাবে নয় সজ্ঞানে প্রেমের দ্বারাই সমাজের হিত করছে। এই যে বৃহৎ আমি, সামাজিক আমি, স্বাদেশিক আমি, মানবিক আমি, এর প্রেমের জোর এত যে, এই চৈতন্য যাকে যথার্থভাবে অধিকার করে সে এই বৃহতের প্রেমে নিজের ক্ষুদ্র আমির সুখ দুঃখ জীবন মৃত্যু সমস্ত অকাতরে তুচ্ছ করে। সমগ্রতার মধ্যে এতই আনন্দ; বিচ্ছিন্নতার মধ্যেই দুঃখ দুর্বলতা। তাই উপনিষৎ বলেছেন—ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি।

বিশ্বব্যাপী সমগ্রতার মধ্যে ব্রহ্মের শক্তি কেবল যে সত্যের সত্য ও মঙ্গলের মঙ্গলরূপে আছে তা নয় সেই শক্তি অপরিমেয় আনন্দরূপে বিরাজ করছে। এই বিশ্বের সমগ্রতাকে ব্রহ্ম জ্ঞানের দ্বারা পূর্ণ করে এবং প্রেমের দ্বারা আলিঙ্গন করে রয়েছেন। তাঁর সেই জ্ঞান এবং সেই প্রেম চিরনির্ঝরধারারূপে জীবাত্মার মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়ে চলেছে, কোনোদিন সে আর নিঃশেষ হল না।

এইজন্যেই পরমাত্মার সঙ্গে আত্মার যে মিলন, সে জ্ঞান প্রেম কর্মের মিলন। সেই মিলনই আনন্দের মিলন। সম্পূর্ণের সঙ্গে মিলতে গেলে সম্পূর্ণতার দ্বারাই মিলতে হবে—তবেই আমাদের যা কিছু আছে সমস্তই চরিতার্থ হবে।

১৯ চৈত্র

আত্মপ্রত্যয়

আমার দেহ প্রাণ চৈতন্য বুদ্ধি হৃদয় সমস্তটা নিয়ে আমি একটি এক। এই যে সমগ্রতা সম্পূর্ণতা, এ একটি এক বস্তু বলেই নিজেকে জানে এবং নিজেকে ভালোবাসে।

শুধু তাই নয় এইজন্য সর্বত্রই সে এককে সন্ধান করে এবং এককে পেলেই আনন্দিত হয়। বিচ্ছিন্নতা তাকে ক্লেশ দেয়—সে সম্পূর্ণতাকে চায়।

বস্তুত সে যা কিছু চায় তা কোনো-না-কোনো রূপে এই সম্পূর্ণতার সন্ধান। সে নিজের একের সঙ্গে চারিদিকের বহুকে বেঁধে নিয়ে ক্ষুদ্র এককে বৃহত্তর এক করে তুলতে চায়।

আমরা প্রত্যেকে নিজের মধ্যে এই যে ঐক্যের সম্পূর্ণতা লাভ করেছি এরই শক্তিতে আমরা জগতের আর সমস্ত ঐক্য উপলব্ধি করতে পারি। আমরা সমাজকে এক বলে

বুঝতে পারি, মানবকে এক বলে বুঝতে পারি, সমস্ত বিশ্বকে এক বলে বুঝতে পারি—এমন কি, সেই রকম এক করে যাকে না বুঝতে পারি তার তাৎপর্য পাই নে—তাকে নিয়ে আমাদের বুদ্ধি কেবল হাতড়ে বেড়াতে থাকে।

অতএব আমরা যে পরম এককে খুঁজছি সে কেবল আমাদের নিজের এই একের তাগিদেই। এই এক নিজের ঐক্যকে সেই পর্যন্ত না নিয়ে গিয়ে মাঝখানে কিছুতেই থামতে পারে না।

আমরা সমাজকে যে এক বলে জানি সেই জানবার ভিত্তি হচ্ছে আমাদের আত্মা—মানবকে এক বলে জানি সেই জানার ভিত্তি হচ্ছে এই আত্মা—বিশ্বকে যে এক বলে জানি তারও ভিত্তি হচ্ছে এই আত্মা এবং পরমাত্মাকে যে অদ্বৈতম্ বলে জানি তারও ভিত্তি হচ্ছে এই আত্মা। এইজন্যই উপনিষৎ বলেন, সাধক—আত্মন্যেবাত্মানং পশ্যতি—আত্মাতেই পরমাত্মাকে দেখেন। কারণ, আত্মাতে যে ঐক্য আছে সেই ঐক্যই পরম ঐক্যকে খোঁজে এবং পরম ঐক্যকে পায়। যে জ্ঞান তার নিজের ঐক্যকে আশ্রয় করে আত্মজ্ঞান হয়ে আছে সেই জ্ঞানই পরমাত্মার পরম জ্ঞানের মধ্যে চরম আশ্রয় পায়। এইজন্যই পরমাত্মাকে "একাত্মপ্রত্যয়সারং" বলা হয়েছে। অর্থাৎ নিজের প্রতি আত্মার যে একটি সহজ প্রত্যয় আছে সেই প্রত্যয়েরই সার হচ্ছেন তিনি। আমাদের আত্মা যে স্বভাবতই নিজেকে এক বলে জানে সেই এক জানারই সার হচ্ছে পরম এককে জানা। তেমনি আমাদের যে একটি আত্মপ্রেম আছে, আত্মাতে আত্মার আনন্দ, এই আনন্দই হচ্ছে মানবাত্মার প্রতি প্রেমের ভিত্তি, বিশ্বাত্মার প্রতি প্রেমের ভিত্তি, পরমাত্মার প্রতি প্রেমের ভিত্তি। অর্থাৎ এই আত্মপ্রেমেরই পরিপূর্ণতম সত্যতম বিকাশ হচ্ছে পরমাত্মার প্রতি প্রেম—সেই ভূমানন্দেই আত্মার আনন্দের পরিণতি। আমাদের আত্মপ্রেমের চরম সেই পরমাত্মার আনন্দ। তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োহন্যস্মাৎ সর্বস্মাৎ অন্তরতর যদয়মাত্মা।

২১ চৈত্র

ধীর যুক্তাত্মা

এই কথাটিকে আলোচনা করে কেবল কঠিন করে তোলা হচ্ছে। অথচ এইটিই আমাদের সকলের চেয়ে সহজ কথা—একেবারে গোড়াকার প্রথম কথা এবং শেষের শেষ কথা। আমরা নিজের মধ্যে একটি এক পেয়েছি এবং এককেই আমরা বহুর মধ্যে সর্বত্রই খুঁজে বেড়াচ্ছি। এমন কি, শিশু যখন নানা জিনিসকে ছুঁয়ে শুঁকে খেয়ে দেখবার

জন্যে চারিদিকে হাত বাড়াচ্ছে তখনও সে সেই এককেই খুঁজে বেড়াচ্ছে। আমরাও শিশুরই মতো নানা জিনিসকে ছুঁচ্ছি শুঁকছি মুখে দিচ্ছি, তাকে আঘাত করছি তার থেকে আঘাত পাচ্ছি, তাকে জমাচ্ছি এবং তাকে আবর্জনার মতো ফেলে দিচ্ছি। এই সমস্ত পরীক্ষা এই সমস্ত চেষ্টার ভিতর দিয়ে সমস্ত দুঃখে সমস্ত লাভে আমরা সেই এককেই চাচ্ছি। আমাদের জ্ঞান একে পৌঁছোতে চায়, আমাদের প্রেম একে মিলতে চায়। এ ছাড়া দ্বিতীয় কোনো কথা নেই।

আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দ আপনাকে নানারূপে নানাকালে প্রকাশ করছেন, আমরা সেই নানারূপকেই কেবল দেখছি, কিন্তু আমাদের আত্মা দেখতে চায় নানার ভিতর দিয়ে সেই মূল এক আনন্দকে। যতক্ষণ সেই মূল আনন্দের কোনো আভাস না দেখি ততক্ষণ কেবলই বস্তুর পর বস্তু, ঘটনার পর ঘটনা আমাদের ক্লান্ত করে ক্লিষ্ট করে আমাদের অন্তহীন পথে ঘুরিয়ে মারে। আমাদের বিজ্ঞান সমস্ত বস্তুর মধ্যে এক সত্যকে খুঁজছে, আমাদের ইতিহাস সমস্ত ঘটনার মধ্যে এক অভিপ্রায়কে খুঁজছে, আমাদের প্রেম সমস্ত সত্তার মধ্যে এক আনন্দকে খুঁজছে। নইলে সে কোনোখানেই বলতে পারছে না—ওঁ। বলতে পারছে না—হাঁ, পাওয়া গেল।

আমরা যখন একটা অন্ধকার ঘরে আমাদের প্রার্থনীয় বস্তুকে খুঁজে বেড়াই তখন চারিদিকে মাথা ঠুকতে থাকি উঁচট খেতে থাকি, তখন কত ছোটো জিনিসকে বড়ো মনে করি, কত তুচ্ছ জিনিসকে বহুমূল্য বলে মনে করি, কত জিনিসকে আঁকড়ে ধরে বলি এই তো পেয়েছি। তার পরে দেখি মুঠোর মধ্যেই সেটা গুঁড়িয়ে ধুলো হয়ে যায়।

আসল কথা এই অন্ধকারে আমি জানিই নে আমি কাকে চাচ্ছি। কিন্তু যেমনি একটি আলো জ্বালা হয় অমনি এক মুহূর্তেই সমস্ত সহজ হয়ে যায়—অমনি এতদিনের এত খোঁজা এত মাথা ঠোকার পরে এক পলকেই জানতে পারি যে, যা-সমস্ত আমার হাতে ঠেকছিল তাই আমার প্রার্থনীয় জিনিস নয়। যে মা এই সমস্ত ঘরটি সাজিয়ে চুপ করে বসে ছিলেন তিনিই আমার যথার্থ কামনার ধন। যেমনি আলোটি জ্বলল অমনি সব জিনিস ছেড়ে দু-হাত বাড়িয়ে ছুটে তাঁর কাছে গেলুম।

অথচ মাকে পাবামাত্রই অমনি তাঁর সঙ্গে সব জিনিসকেই একত্রে পাওয়া গেল, কোনো জিনিস স্বতন্ত্র হয়ে আমার পথের বাধারূপে আমাকে আটক করলে না। মাকে জানবামাত্র মায়ের এই সাজানো ঘরটি আমারই হয়ে গেল। তখন ঘরের সমস্ত আসবাব-পত্রের মধ্যে আমার সঞ্চরণ অবাধ হয়ে উঠল, তখন যে-জিনিসের ঠিক যে-ব্যবহার তা আমার আয়ত্ত হয়ে গেল, তখন জিনিসগুলো আমাকে অধিকার করল না, আমিই তাদের অধিকার করলুম।

তাই বলছিলুম কী জ্ঞানে কী প্রেমে কী কর্মে সেই এককে সেই আসল জিনিসটিকে পেলেই সমস্তই সহজ হয়ে যায়—জিনিসের সমস্ত ভার এক মুহূর্তে লাঘব হয়ে যায়। সাঁতারটি যেমনি জেনেছি অমনি অগাধ জলে বিহারও আমার পক্ষে যেন স্বাভাবিক হয়ে যায়, তখন অতল জলে ডুব দিলেও বিনাশে তলিয়ে যাই নে, আপনি ভেসে উঠি। এই সাঁতারটি না জানলেই জল প্রতিপদে আমাকে বাধা দেয় আমাকে মারতে চায়। যে জলে সঞ্চরণ সাঁতার জানলে আমার পক্ষে লীলা আমার পক্ষে আনন্দ, সাঁতার না জানলে সেই জলে সঞ্চরণই আমার পক্ষে দুঃখ আমার পক্ষে মৃত্যু। তখন অল্প জলেও হাত-পা ছুঁড়ে হাঁসফাঁস করে ক্লান্ত হয়ে পড়ি।

আমাদের আসল জানবার বিষয়কে পাবার বিষয়কে যেমনি লাভ করি অমনি এই সংসারের বিচিত্রতা আর আমাদের বাঁধতে পারে না, ঠেকাতে পারে না, মারতে পারে না। তখন, পূর্বে যা বিভীষিকা ছিল এখন সেইটেই সহজ হয়ে যায়—সংসারে তখন আমরা মুক্তভাবে আনন্দ পাই। সংসার তখন আমাদের অধিকার করে না, আমরাই সংসারকে অধিকার করি। তখন, পূর্বে পদে পদে আমাদের যে আক্ষেপ বিক্ষেপ যে-শক্তির অপব্যয় ছিল সেটা কেটে যায়।

সেইজন্যই উপনিষৎ বলেছেন, তে সর্বগং সর্বতঃ প্রাপ্য ধীরা যুক্তাত্মানঃ সর্বমেবাবিশন্তি, সেই সর্বব্যাপীকে যাঁরা সকল দিক থেকেই পেয়েছেন তাঁরা ধীর হয়ে যুক্তাত্মা হয়ে সর্বত্রই প্রবেশ করেন। প্রথমে তাঁরা ধৈর্য লাভ করেন, আর তাঁরা নানা বিষয় ও নানা ব্যাপারের মধ্যে কেবলই বিক্ষিপ্ত হয়ে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে বেড়ান না, তাঁরা অপ্রগল্‌ভ অপ্রমত্ত ধীর হন। তাঁরা যুক্তাত্মা হন, সেই পরম একের সঙ্গে যোগযুক্ত হন। নিজেকে কোনো অহংকার কোনো আসক্তি দ্বারা স্বতন্ত্র বিচ্ছিন্ন করেন না, একের সঙ্গে মিলিত হয়ে আনন্দে বিশ্বের সমস্ত বহুর মধ্যে প্রবেশ করেন, সমস্ত বহু তখন তাঁদের পথ ছেড়ে দেয়।

সেই সকল ধীর সেই সকল যুক্তাত্মাদের প্রণাম করে তাঁদেরই পথ আমরা অনুসরণ করব। সেই হচ্ছে একের সঙ্গে যোগের পথ, সেই হচ্ছে সকলের মধ্যেই প্রবেশের পথ, জ্ঞান প্রেম এবং কর্মের চরম পরিতৃপ্তির পথ।

২২ চৈত্র

শক্ত ও সহজ

সাধনার দুই অঙ্গ আছে। একটি ধরে রাখা আর একটি ছেড়ে দেওয়া। এক জায়গায় শক্ত হওয়া, আর এক জায়গায় সহজ হওয়া।

জাহাজ যে চলে তার দুটি অঙ্গ আছে। একটি হচ্ছে হাল, আর একটি হচ্ছে পাল। হাল খুব শক্ত করেই ধরে রাখতে হবে। ধ্রুবতারার দিকে লক্ষ্য স্থির রেখে সিধে পথ ধরে চলা চাই। এর জন্যে দিক জানা দরকার, নক্ষত্র পরিচয় হওয়া চাই, কোন্‌খানে বিপদ কোন্‌খানে সুযোগ সে সমস্ত সর্বদা মন দিয়ে বুঝে না চললে চলবে না। এর জন্যে অহরহ সচেষ্ট সতর্কতা এবং দৃঢ়তার প্রয়োজন। এর জন্যে জ্ঞান এবং শক্তি চাই।

আর একটি কাজ হচ্ছে অনুকূল হাওয়ার কাছে জাহাজকে সমর্পণ করা। জাহাজের যত পাল আছে সমস্তকে এমন করে ছড়িয়ে ধরা যে বাতাসের সুযোগ হতে সে যেন লেশমাত্র বঞ্চিত না হয়।

আধ্যাত্মিক সাধনাতেও তেমনি। যেমন একদিকে নিজের জ্ঞানকে বিশুদ্ধ এবং শক্তিকে সচেষ্ট রাখতে হবে তেমনি আর-একদিকে ঈশ্বরের ইচ্ছার কাছে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিবেদন করে দিতে হবে। তাঁর মধ্যে একেবারে সহজ হয়ে যেতে হবে।

নিজেকে নিয়মের পথে দৃঢ় করে ধরে রাখবার সাধনা অনেক জায়গায় দেখা যায় কিন্তু নিজেকে তাঁর হাতে সমর্পণ করে দেবার সাধনা অল্পই দেখতে পাই। এখানেও মানুষের যেন একটা কৃপণতা আছে। সে নিজেকে নিজের হাতে রাখতে চায়, ছাড়তে চায় না। একটা কোনো কঠোর ব্রতে সে প্রতিদিন নিজের শক্তির পরিচয় পায়। প্রতিদিন একটা হিসাব পেতে থাকে যে, নিয়ম দৃঢ় রেখে এতখানি চলা হল। এতেই তার একটা বিশেষ অভিমানের আনন্দ আছে।

নিজের জীবনকে ঈশ্বরের কাছে নিবেদন করে দেবার এ মানে নয় যে, আমি যা করছি সমস্তই তিনি করছেন এইটি কল্পনা করা। করছি কাজ আমি, অথচ নিচ্ছি তাঁর নাম, এবং দায়িক করছি তাঁকে—এমন দুর্বিপাক না যেন ঘটে।

ঈশ্বরের হাওয়ার কাছে জীবনটাকে একেবারে ঠিক করে ধরে রাখতে হবে। সেটিকে সম্পূর্ণ মানতে হবে। কাত হয়ে সেটিকে পাশ কাটিয়ে চললে হবে না। তাঁর আহ্বান তাঁর প্রেরণাকে পুরাপুরি গ্রহণ করবার মুখে জীবন প্রতিমুহূর্তে যেন আপনাকে

প্রসারিত করে রাখে। "কী ইচ্ছা প্রভু, কী আদেশ" এই প্রশ্নটিকে জাগ্রত করে রেখে সে যেন সর্বদা প্রস্তুত হয়ে থাকে। যা শ্রেয় তা যেন সহজেই তাকে চালায় এবং শেষ পর্যন্তই তাকে নিয়ে যায়।

জানামি ধর্মং ন চ মে প্রবৃত্তিঃ
জানাম্যধর্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ,
ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।

এ শ্লোকের মানে এমন নয় যে আমি ধর্মেই থাকি আর অধর্মেই থাকি তুমি আমাকে যেমন চালাচ্ছ আমি তেমনি চলছি। এর ভাব এই যে আমার প্রবৃত্তির উপরেই যদি আমি ভার দিই তবে সে আমাকে ধর্মের দিকে নিয়ে যায় না, অধর্ম থেকে নিরস্ত করে না; তাই হে প্রভু, স্থির করেছি তোমাকেই আমি হৃদয়ে রাখব এবং তুমি আমাকে যেদিকে চালাবে সেই দিকে চলব। স্বার্থ আমাকে যেদিকে চালাতে চায় সেদিকে চলব না, অহংকার আমাকে যে পথ থেকে নিবৃত্ত করতে চায় আমি সে পথ থেকে নিবৃত্ত হব না।

অতএব তাঁকে হৃদয়ের মধ্যে স্থাপিত করে তাঁর হাতে নিজের ভার সমর্পণ করা, প্রত্যহ আমাদের ইচ্ছাশক্তির এই একটিমাত্র সাধনা হ'ক।

এইটি করতে গেলে গোড়াতেই অহংকারকে তার চূড়ার উপর থেকে একেবারে নামিয়ে আনতে হবে। পৃথিবীর সকলের সঙ্গে সমান হও, সকলের পিছনে এসে দাঁড়াও, সকলের নীচে গিয়ে বসো, তাতে কোনো ক্ষতি নেই। তোমার দীনতা ঈশ্বরের প্রসাদে পরিপূর্ণ হয়ে উঠুক, তোমার নম্রতা সুমধুর অমৃত-ফলভারে সার্থক হউক। সর্বদা লড়াই করে নিজের জন্যে ওই একটুখানি স্বতন্ত্র জায়গা বাঁচিয়ে রাখবার কী দরকার, তার কী মূল্য? জগতের সকলের সমান হয়ে বসতে লজ্জা ক'রো না—সেইখানেই তিনি বসে আছেন। যেখানে সকলের চেয়ে উঁচু হয়ে থাকবার জন্যে তুমি একলা বসে আছ সেখানে তাঁর স্থান অতি সংকীর্ণ।

যতদিন তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ না করবে ততদিন তোমার হার-জিত তোমার সুখদুঃখ ঢেউয়ের মতো কেবলই টলাবে কেবলই ঘোরাবে। প্রত্যেকটার পুরো আঘাত তোমাকে নিতে হবে। যখন তোমার পালে তাঁর হাওয়া লাগবে তখন তরঙ্গ সমানই থাকবে কিন্তু তুমি হু হু করে চলে যাবে। তখন সেই তরঙ্গ আনন্দের তরঙ্গ। তখন প্রত্যেক তরঙ্গটি কেবল তোমাকে নমস্কার করতে থাকবে এবং এই কথাটিরই প্রমাণ দেবে যে, তুমি তাঁকে আত্মসমর্পণ করেছ।

তাই বলছিলুম জীবনযাত্রার সাধনায় নিজের শক্তির চর্চা যতই করি, ঈশ্বরের চিরপ্রবাহিত অনুকূল দক্ষিণ বায়ুর কাছে সমস্ত পালগুলি একেবারেই পূর্ণভাবে ছড়িয়ে দেবার কথাটা না ভুলি যেন।

২৪ চৈত্র

নমস্তেঽস্তু

কোনো লতা গোল গোল আঁকড়ি দিয়ে আপনার আশ্রয়কে বেষ্টন করে, কোনো লতা সরু সরু শিকড় মেলে দিয়ে আশ্রয়কে চেপে ধরে, কোনো লতা নিজের সমস্ত দেহকে দিয়েই তার অবলম্বনকে ঘিরে ফেলে।

আমরাও যে-সকল সম্বন্ধ দিয়ে ঈশ্বরকে ধরব তা একরকম নয়। আমরা তাঁকে পিতাভাবেও আশ্রয় করতে পারি, প্রভুভাবেও পারি, বন্ধুভাবেও পারি। জগতে যতরকম সম্বন্ধসূত্রেই আমরা নিজেকে বাঁধি সমস্তের মূলে তিনিই আছেন। যে-রসের দ্বারা সেই সেই সকল সম্বন্ধ পুষ্ট হয় সে রস তাঁরই। এইজন্যে সব সম্বন্ধই তাঁতে খাটতে পারে, সকল রকম ভাব দিয়েই মানুষ তাঁকে পেতে পারে।

সব সম্বন্ধের মধ্যে প্রথম সম্বন্ধ হচ্ছে পিতাপুত্রের সম্বন্ধ।

পিতা যত বড়োই হ'ন আর পুত্র যত ছোটোই হ'ক, উভয়ের মধ্যে শক্তির যতই বৈষম্য থাক তবু উভয়ের মধ্যে গভীরতর ঐক্য আছে। সেই ঐক্যটির যোগেই এতটুকু ছেলে তার এত বড়ো বাপকে লাভ করে।

ঈশ্বরকেও যদি পেতে চাই তবে তাঁকে একটি কোনো সম্বন্ধের ভিতর দিয়ে পেতে হবে, নইলে তিনি আমাদের কাছে কেবলমাত্র একটি দর্শনের তত্ত্ব, ন্যায়শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত হয়ে থাকবেন, আমাদের আপন হয়ে উঠবেন না।

তিনি তো কেবল আমাদের বুদ্ধির বিষয় নন, তিনি তার চেয়ে অনেক বেশি; তিনি আমাদের আপন। তিনি যদি আমাদের আপন না হতেন তা হলে সংসারে কেউ আমাদের আপন হত না, তা হলে আপন কথাটার কোনো মানেই থাকত না। তিনি যেমন বৃহৎ সূর্যকে এই ক্ষুদ্র পৃথিবীর আপন করে এত লক্ষ যোজন ক্রোশের দূরত্ব ঘুচিয়ে মাঝখানে রয়েছেন, তেমনি তিনিই নিজে এক মানুষের সঙ্গে আর এক মানুষের সম্বন্ধরূপে বিরাজ করছেন। নইলে একের সঙ্গে আরের ব্যবধান যে অনন্ত; মাঝখানে যদি অনন্ত মিলনের সেতু না থাকতেন তাহলে এই অনন্ত ব্যবধান পার হতুম কী করে!

অতএব তিনি দুরূহ তত্ত্বকথা নন তিনি অত্যন্ত আপন। সকল আপনের মধ্যেই তিনি একমাত্র চিরন্তন অখণ্ড আপন। গাছের ফলকে তিনি যে কেবল একটি সত্যরূপে গাছে ঝুলিয়ে রেখেছেন তা নয়, স্বাদে গন্ধে শোভায় তিনি বিশেষরূপে তাকে আমার আপন করে রেখেছেন। তিনিই আমার আপন বলে ফলকে নানা রসে আমার আপন করেছেন, নইলে ফলনামক সত্যটিকে আমি কোনোদিক থেকেই কোনো রকমেই এতটুকুও নাগাল পেতুম না।

কিন্তু আপন যে কতদূর পর্যন্ত যায়, কত গভীরতা পর্যন্ত, তা তিনি মানুষের সম্বন্ধে মানুষকে দেখিয়েছেন—শরীর মন হৃদয় সর্বত্র তার প্রবেশ, কোথাও তার বিচ্ছেদ নেই, বিরহ এবং মৃত্যুও তাকে বিচ্ছিন্ন করতে পারে না।

সেইজন্যে মানুষের এই সম্বন্ধগুলির মধ্য দিয়েই আমরা কতকটা উপলব্ধি করতে পারি, নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে যিনি আমাদের নিত্যকালের আপন তিনি আমাদের কী? সেই তিনি তাঁকে সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম বলে আমাদের শেষ কথা বলা হয় না। তার চেয়ে চরমতর অন্তরতর কথা হচ্ছে, তুমি আমার আপন, তুমি আমার মাতা, আমার পিতা, আমার বন্ধু, আমার প্রভু, আমার বিদ্যা, আমার ধন, ত্বমেব সর্বং মম দেবদেব। তুমি আমার এবং আমি তোমার, তোমাতে আমাতে এই যে যোগ, এই যোগটিই আমার সকলের চেয়ে বড়ো সত্য, আমার সকলের চেয়ে বড়ো সম্পদ। তুমি আমার মহত্তম সত্যতম আপনস্বরূপ।

ঈশ্বরের সঙ্গে এই যোগ উপলব্ধি করবার একটি মন্ত্র হচ্ছে—পিতা নোহসি, তুমি আমাদের পিতা। যিনি অনন্ত সত্য তাঁকে আমাদের আপন সত্য করবার এই একটি মন্ত্র, তুমি আমাদের পিতা।

আমি ছোটো, তুমি ব্রহ্ম, তবু তোমাতে আমাতে মিল আছে, তুমি পিতা। আমি অবোধ, তুমি অনন্ত জ্ঞান, তবু তোমাতে আমাতে মিল আছে, তুমি পিতা।

এই যে যোগ, এই যোগটি দিয়ে তোমাতে আমাতে বিশেষভাবে যাতায়াত, তোমাতে আমাতে বিশেষভাবে দেনাপাওনা। এই যোগটিকে যেন আমি সম্পূর্ণ সজ্ঞানে সম্পূর্ণ সবলে অবলম্বন করি। তাই আমার প্রার্থনা এই যে, পিতা নোবোধি, তুমি যে পিতা আমাকে সেই বোধটি দাও। তুমি তো—পিতা নোহসি, পিতা আছ; কিন্তু শুধু আছ বললে তো হবে না—পিতা নোবোধি, তুমি আমার পিতা হয়ে আছ এই বোধটি আমাকে দাও।

আমার চৈতন্য ও বুদ্ধি যোগে যে-কিছু জ্ঞান আমি পাচ্ছি সমস্তই তাঁর কাছ থেকে পাচ্ছি—ধিয়ো যোনঃ প্রচোদয়াৎ, যিনি আমাদের ধীশক্তিসকল প্রেরণ করছেন। যিনি

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে অখণ্ড এক করে রয়েছেন, তাঁর কাছ থেকে ছাড়া কোনো জ্ঞান, আর কোথা পাব! কিন্তু সেই সঙ্গে যেন এই বোধটুকু পাই যে তিনিই দিচ্ছেন।

তিনিই পিতারূপে আমাকে জ্ঞান দিচ্ছেন এই বোধটুকু আমার অন্তরে থাকলে তবেই তাঁকে আমি যথার্থভাবে নমস্কার করতে পারি। আমি সমস্তই তাঁর কাছ থেকে নিচ্ছি পাচ্ছি, তবু তাঁকে নমস্কার করতে পারছি নে, আমার মন শক্ত হয়েই আছে, মাথা উদ্ধত হয়েই রয়েছে। কেননা তাঁর সঙ্গে আমার যে যোগ সেটা আমার বোধে খুঁজে পাচ্ছি নে।

তাই আমাদের প্রার্থনা এই যে, নমস্তেঽস্তু। তোমাতে আমাদের নমস্কারটি যেন হয়। সেটি যেন নম্রতায় আত্মসমর্পণে পরিপূর্ণ হয়ে তোমার পায়ের কাছে এসে নামে। আমার সমস্ত জীবন যেন তোমার প্রতি নমস্কাররূপে পরিণত হয়।

তোমার সঙ্গে আমার সম্বন্ধই এই যে, তুমি আমাকে দেবে আর আমি নমস্কারে নত হয়ে পড়ে তা গ্রহণ করব। এই নমস্কারটি অতি মধুর। এ জলভারনত মেঘের মতো, ফলভারনত শাখার মতো রসে ও মঙ্গলে পরিপূর্ণ। এই নমস্কারের দ্বারা জীবন কল্যাণে ভরে ওঠে, সৌন্দর্যে উপচে পড়ে। এই নমস্কার যে কেবল নিবিড় মাধুর্য তা নয় এ প্রবল শক্তি। এ যেমন অনায়াসে গ্রহণ করে ও বহন করে উদ্ধত অহংকার তেমন করে পারে না। একে কেউ পরাভূত করতে পারে না। জীবন এই নমস্কারের দ্বারা সমস্ত আঘাত ক্ষতি বিপদ ও মৃত্যুর উপরে অতি সহজেই জয়ী হয়। এই নমস্কারের দ্বারা জীবনের সমস্ত ভার এক মুহূর্তে লঘু হয়ে যায়, পাপ তার উপর দিয়ে মুহূর্তকালীন বন্যার মতো চলে যায়, তাকে ভেঙে দিয়ে যেতে পারে না। এইজন্য প্রতিদিনই প্রার্থনা করি, নমস্তেঽস্তু। তোমাতে আমার নমস্কার হউক। সুখ আসুক দুঃখ আসুক, নমস্তেঽস্তু। মান আসুক অপমান আসুক, নমস্তেঽস্তু। তুমি শিক্ষা দিচ্ছ এই জেনে—নমস্তেঽস্তু। তুমি রক্ষা করছ এই জেনে—নমস্তেঽস্তু। তুমি নিত্য নিয়তই আমার কাছে আছ এই জেনে—নমস্তেঽস্তু। তোমার গৌরবেই আমার একমাত্র গৌরব এই জেনেই—নমস্তেঽস্তু। অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের অনন্তকালের অধীশ্বর তুমিই পিতা নোঽসি এই জেনেই—নমস্তেঽস্তু নমস্তেঽস্তু। বিষয়কেই আশ্রয় বলে জানা ঘুচিয়ে দাও, নমস্তেঽস্তু। সংসারকে প্রবল বলে জানা ঘুচিয়ে দাও, নমস্তেঽস্তু। আমাকেই বড়ো বলে জানা ঘুচিয়ে দাও, নমস্তেঽস্তু। তোমাকেই যথার্থরূপে নমস্কার করে চিরদিনের মতো পরিত্রাণ লাভ করি।

২৬ চৈত্র

মন্ত্রের বাঁধন

বীণার কোনো তার পিতলের, কোনো তার ইস্পাতের, কোনো তার মোটা, কোনো তার সরু, কোনো তার মধ্যম সুরে বাঁধবার, কোনো তার পঞ্চমে। কিন্তু তবু বাঁধতে হবে, তার থেকে একটা কোনো বিশুদ্ধ সুর জাগিয়ে তুলতে হবে, নইলে সব মাটি।

জগতে ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের কোনো বিশেষ আপন সম্বন্ধ স্থাপন করতে হবে। একটা কোনো বিশেষ সুর বাজাতে হবে।

সূর্য চন্দ্র তারা ওষধি বনস্পতি সকলেই এই বিশাল বিশ্বসংগীতে নিজের একটা-না-একটা বিশেষ সুর যোগ করে দিয়েছে। মানুষের জীবনকেও কি এই চির-উদ্‌গীত সংগীতে যোগ দিতে হবে না?

কিন্তু এখনও এই জীবনটাকে তারের মতো বাঁধি নি। এর মধ্যে এখনও কোনো গানের আবির্ভাব হয় নি। এ জীবন সূত্রবিচ্ছিন্ন বিচিত্র তুচ্ছতার মধ্যে অকৃতার্থ হয়ে আছে। যেমন করেই পারি এর একটি কোনো নিত্য সুরকে ধ্রুব করে তুলতে হবে।

তারকে বাঁধব কেমন করে?

ঈশ্বরের বীণায় অনেকগুলি বাঁধবার সম্বন্ধ আছে, তার মধ্যে নিজের মনের মতো একটি কিছু স্থির করে নিতে হবে।

মন্ত্র জিনিসটি একটি বাঁধবার উপায়। মন্ত্রকে অবলম্বন করে আমরা মননের বিষয়কে মনের সঙ্গে বেঁধে রাখি। এ যেন বীণার কানের মতো। তারকে এঁটে রাখে, খুলে পড়তে দেয় না।

বিবাহের সময় স্ত্রীপুরুষের কাপড়ে কাপড়ে গ্রন্থি বেঁধে দেয়, সেই সঙ্গে মন্ত্র পড়ে দেয়। সেই মন্ত্র মনের মধ্যেও গ্রন্থি বাঁধতে থাকে।

ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের যে গ্রন্থিবন্ধনের প্রয়োজন আছে মন্ত্র তার সহায়তা করে। এই মন্ত্রকে অবলম্বন করে আমরা তাঁর সঙ্গে একটা কোনো বিশেষ সম্বন্ধকে পাকা করে নেব।

সেইরূপ একটি মন্ত্র হচ্ছে—পিতা নোঽসি।

এই সুরে জীবনটাকে বাঁধলে সমস্ত চিন্তায় ও কর্মে একটি বিশেষ রাগিণী জেগে উঠবে। আমি তাঁর পুত্র এইটেই মূর্তি ধরে আমার সমস্তের মধ্যেই এই কথাটাই প্রকাশ করবে যে, আমি তাঁর পুত্র।

আজ আমি কিছুই প্রকাশ করছি নে। আহার করছি কাজ করছি বিশ্রাম করছি এই পর্যন্তই। কিন্তু অনন্ত কালে অনন্ত জগতে আমার পিতা যে আছেন তার কোনো

লক্ষণই প্রকাশ পাচ্ছে না। অনন্তের সঙ্গে আজও আমার কোনো গ্রন্থি কোথাও বাঁধা হয় নি।

ওই মন্ত্রটিকে দিয়ে জীবনের তার আজ বাঁধা যাক। আহারে বিহারে শয়নে স্বপনে ওই মন্ত্রটি বারংবার আমার মনের মধ্যে বাজতে থাক্‌, পিতা নোঽসি। জগতে আমার পিতা আছেন এই কথাটি সকলেই জানুক কারও কাছে গোপন না থাক্‌।

ভগবান যিশু ওই সুরটিকে পৃথিবীতে বাজিয়ে গিয়েছেন। এমনি ঠিক করে তাঁর জীবনের তার বাঁধা ছিল যে মরণান্তিক যন্ত্রণার দুঃসহ আঘাতেও সেই তার লেশমাত্র বেসুর বলে নি—সে কেবলই বলেছে, পিতা নোঽসি।

সেই যে সুরের আদর্শটি তিনি দেখিয়ে গেছেন সেই খাঁটি আদর্শের সঙ্গে একান্ত যত্নে মিশিয়ে তারটি বাঁধতে হবে, যাতে আর ভাবতে না হয়, যাতে সুখে দুঃখে প্রলোভনে আপনিই সে গেয়ে ওঠে, পিতা নোঽসি।

হে পিতা, আমি যে তোমার পুত্র এই সুরটি ঠিকমতো প্রকাশ করা বড়ো কম কথা নয়। কেননা, আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ। পুত্র যে পিতারই প্রকাশ। সন্তানের মধ্যে পিতাই যে স্বয়ং সন্তত হন। তোমারই অপাপবিদ্ধ আনন্দময় পরিপূর্ণতাকে যদি ব্যক্ত করে না তুলতে পারি তবে তো এই সুর বাজবে না যে, পিতা নোঽসি।

সেইজন্যেই এই আমার প্রতিদিনের একান্ত প্রার্থনা হ'ক, পিতা নো বোধি, নমস্তেঽস্তু।

২৭ চৈত্র

প্রাণ ও প্রেম

পিতানোঽসি এই মন্ত্রটি আমরা জীবনের মধ্যে গ্রহণ করব। কার কাছ থেকে গ্রহণ করব। যিনি পিতা তাঁর কাছ থেকেই গ্রহণ করব। তাঁকে বলব, তুমি যে পিতা, সে তুমিই আমাকে বুঝিয়ে দাও। আমার জীবনের সমস্ত ইতিহাসের ভিতর দিয়ে সমস্ত সুখ-দুঃখের ভিতর দিয়ে বুঝিয়ে দাও।

পিতার সঙ্গে আমাদের যে সম্বন্ধ সে তো কোনো তৈরি করা সম্বন্ধ নয়। রাজার সঙ্গে প্রজার, প্রভুর সঙ্গে ভৃত্যের একটা পরস্পর বোঝাপড়া আছে, সেই বোঝাপড়ার উপরেই তাদের সম্বন্ধ। কিন্তু পিতার সঙ্গে পুত্রের সম্বন্ধ বাহ্যিক নয় সে একেবারে আদিতম সম্বন্ধ। সে সম্বন্ধ পুত্রের অস্তিত্বের মূলে। অতএব এই গভীর আত্মীয়

সম্বন্ধ কোনো বাহ্য অনুষ্ঠান কোনো ক্রিয়াকলাপের দ্বারা রক্ষিত হয় না, কেবল ভক্তির দ্বারা এবং ভক্তিজনিত কর্মের দ্বারাই এই সম্বন্ধকে স্বীকার করতে হয়।

পিতার সঙ্গে পুত্রের মূল সম্বন্ধটি কোথায়? প্রাণের মধ্যে। পিতার প্রাণই সন্তানের প্রাণে সঞ্চারিত।

কেনোপনিষৎ প্রশ্ন করেছেন—কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতিযুক্তঃ? প্রাণ কাহার দ্বারা তার প্রথম প্রৈতি (energy) লাভ করেছে? এই প্রশ্নের মধ্যেই উত্তরটি প্রচ্ছন্ন রয়েছে, যিনি মহাপ্রাণ তাঁর দ্বারা।

জগতে কোনো প্রাণই তো একটি সংকীর্ণ সীমার মধ্যে নিজের মধ্যে নিজে আবদ্ধ নয়। সমস্ত জগতের প্রাণের সঙ্গে তার যোগ। আমার এই শরীরের মধ্যে যে প্রাণের চেষ্টা চলছে সে তো কেবলমাত্র এই শরীরের নয়। জগৎজোড়া আকর্ষণ বিকর্ষণ, জগৎজোড়া রাসায়নিক শক্তি, জল, বাতাস, আলোক ও উত্তাপ একে নিখিলপ্রাণের সঙ্গে যুক্ত করে রেখেছে। বিশ্বের প্রত্যেক অণুপরমাণুর মধ্যেও যে অবিশ্রাম চেষ্টা আছে আমার এই শরীরের চেষ্টাও সেই বিরাট প্রাণেরই একটি মাত্রা। সেইজন্তই উপনিষৎ বলেছেন—যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্, বিশ্বে এই যা কিছু চলছে সমস্তই প্রাণ হতে নিঃসৃত হয়ে প্রাণেই স্পন্দিত হচ্ছে। এই প্রাণের স্পন্দন দূরতম নক্ষত্রেও যেমন আমার হৃৎপিণ্ডেও তেমন, ঠিক একই সুরে একই তালে।

প্রাণ কেবল শরীরের নয়। মনেরও প্রাণ আছে। মনের মধ্যেও চেষ্টা আছে। মন চলছে, মন বাড়ছে, মনের ভাঙাগড়া পরিবর্তন হচ্ছে। এই স্পন্দিত তরঙ্গিত মন কখনোই কেবল আমার ক্ষুদ্র বেড়াটির মধ্যে আবদ্ধ নয়। ওই নর্তমান প্রাণের সঙ্গেই হাতধরাধরি করে নিখিল বিশ্বে সে আন্দোলিত হচ্ছে, নইলে আমি তাকে কোনোমতেই পেতে পারতুম না। মনের দ্বারা আমি সমস্ত জগতের মনের সঙ্গেই যুক্ত। সেইজন্তেই সর্বত্র তার গতিবিধি। নইলে আমার এই একঘরে অন্ধ মন কেবল আমারই অন্ধকারাগারে পড়ে দিনরাত্রি কেঁদে মরত।

আমার মনপ্রাণ অবিচ্ছিন্নভাবে নিখিল বিশ্বের ভিতর দিয়ে সেই অনন্ত কারণের সঙ্গে যোগযুক্ত। প্রতিমুহূর্তেই সেইখান হতে আমি প্রাণ, চৈতন্ত, ধীশক্তি লাভ করছি। এই কথাটিকে কেবল বিজ্ঞানে জানা নয় এই কথাটিকে ভক্তিদ্বারা উপলব্ধি করতে পারলে তবে ওই মন্ত্র সার্থক হবে, ওঁ পিতা নোহসি। আমার প্রাণের মধ্যে বিশ্বপ্রাণ, মনের মধ্যে বিশ্বমন আছে বললে এত বড়ো কথাটাকে সম্পূর্ণ গ্রহণ করা হয় না, একে বাইরেই বসিয়ে রাখা হয়। আমার প্রাণের মধ্যে পিতার প্রাণ আমার মনের মধ্যে পিতার মন আছে এই কথাটি নিজেকে ভালো করে জানাতে হবে।

পিতার দিক থেকে কেবল যে আমাদের দিকে প্রাণ প্রবাহিত হচ্ছে তা নয়। তাঁর দিক থেকে আমাদের দিকে অবিশ্রাম প্রেম সঞ্চারিত হচ্ছে। আমাদের মধ্যে কেবল যে একটা চেষ্টা আছে গতি আছে তা নয়, একটা আনন্দ আছে। আমরা কেবল বেঁচে আছি কাজ করছি নয়, আমরা রস পাচ্ছি। আমাদের দেখায় শোনায়, আহারে বিহারে, কাজে কর্মে, মানুষের সঙ্গে নানাপ্রকার যোগে নানা সুখ নানা প্রেম।

এই রসটি কোথা থেকে পাচ্ছি? এইটিই কি আমাদের মধ্যে বিচ্ছিন্ন? এটা কেবল আমার এই একটি ছোটো কারখানাঘরের সুড়ঙ্গের মধ্যে অন্ধকারে তৈরি হচ্ছে?

তা নয়। বিশ্বভুবনের মধ্যে সমস্তকে পরিপূর্ণ করে তিনি আনন্দিত। জলে স্থলে আকাশে তিনি আনন্দময়। তাঁর সেই আনন্দকে সেই প্রেমকে তিনি নিয়তই প্রেরণ করছেন, সেইজন্যেই আমি বেঁচে থেকে আনন্দিত, কাজ করে আনন্দিত, জেনে আনন্দিত, মানুষের সঙ্গে নানা সম্বন্ধে আনন্দিত। তাঁরই প্রেমের তরঙ্গ আমাকে কেবলই স্পর্শ করছে, আঘাত করছে, সচেতন করছে।

এই যে অহোরাত্র সেই ভূমার প্রেম নানা বর্ণে গন্ধে গীতে নানা স্নেহে সখ্যে শ্রদ্ধায় জোয়ারের বেগের মতো আমাদের মধ্যে এসে পড়ছে, এই বোধের দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে যেন আমরা বলি, ওঁ পিতা নোঽসি। কেবলই তিনি প্রাণে ও প্রেমে আমাকে ভরে দিচ্ছেন, এই অনুভূতিটি যেন আমরা না হারাই। এই অনুভূতি যাঁদের কাছে অত্যন্ত উজ্জ্বল ছিল তাঁরাই বলেছেন—কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। এষোহ্যেবানন্দয়াতি। কেই বা কিছুমাত্র শরীরচেষ্টা প্রাণের চেষ্টা করত। আকাশে যদি আনন্দ না থাকতেন। এই আনন্দই সকলকে আনন্দ দিচ্ছেন।

২৮ চৈত্র

ভয় ও আনন্দ

ওঁ পিতা নোঽসি এই মন্ত্রে দুটি ভাবের সামঞ্জস্য আছে। এক দিকে পিতার সঙ্গে পুত্রের সাম্য আছে। পুত্রের মধ্যে পিতা আপনাকেই প্রকাশ করেছেন।

আর এক দিকে পিতা হচ্ছেন বড়ো, পুত্র ছোটো।

এক দিকে অভেদের গৌরব, আর-এক দিকে ভেদের প্রণতি। পিতার সঙ্গে অভেদ নিয়ে আমরা আনন্দ করতে পারি কিন্তু স্পর্ধা করতে পারি নে। আমার যেখানে সীমা আছে সেখানে মাথা নত করতে হবে।

কিন্তু এই নতির মধ্যে অপমান নেই। কেননা তিনি কেবলমাত্র আমার বড়ো নন তিনি আমার আপন, আমার পিতা। তিনি আমারই বড়ো, আমি তাঁরই ছোটো। তাঁকে প্রণাম করে আমি আমার বড়ো আমাকেই প্রণাম করি। এর মধ্যে বাইরের কোনো তাড়না নেই—জবরদস্তি নেই। যে বড়োর মধ্যে আমি আছি, যে বড়োর মধ্যেই পরিপূর্ণ সার্থকতা তাঁকে প্রণাম করাই একমাত্র স্বাভাবিক প্রণাম। কিছু পাব বলে প্রণাম নয়, কিছু দেব বলে প্রণাম নয়, ভয়ে প্রণাম নয়, জোরে প্রণাম নয়। আমারই অনন্ত গৌরবের উপলব্ধির কাছে প্রণাম। এই প্রণামটির মহত্ত্ব অনুভব করেই প্রার্থনা করা হয়েছে, নমস্তেহস্তু, তোমাতে আমার নমস্কার সত্য হয়ে উঠুক।

তাঁকে পিতা নোহসি বলে স্বীকার করলে তাঁর সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধের একটি পরিমাণ রক্ষা হয়। তাঁকে নিয়ে কেবল ভাবরসে প্রমত্ত হবার যে একটি উচ্ছৃঙ্খল আত্মবিস্মৃতি আছে সেটি আমাদের আক্রমণ করতে পারে না। সম্ভ্রমের দ্বারা আমাদের আনন্দ গাম্ভীর্য লাভ করে, অচঞ্চল গৌরব প্রাপ্ত হয়।

প্রাচীন বেদ সমস্ত মানব-সম্বন্ধের মধ্যে কেবল এই পিতার সম্বন্ধটিকেই ঈশ্বরের মধ্যে বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করেছেন। মাতার সম্বন্ধকেও সেখানে তাঁরা স্থান দেন নি।

কারণ, মাতার সম্বন্ধেও একদিকে যেন ওজন কম আছে, একদিকে সম্পূর্ণতার অভাব আছে।

মাতা সন্তানের সুখ দেখেন, আরাম দেখেন; তার ক্ষুধাতৃপ্তি করেন, তার শোকে সান্ত্বনা দেন, তার রোগে শুশ্রূষা করেন। এ সমস্তই সন্তানের উপস্থিত অভাবনিবৃত্তির প্রতিই লক্ষ্য করে।

পিতার দৃষ্টি সন্তানের সমস্ত জীবনের বৃহৎক্ষেত্রে। তার সমস্ত জীবন সমগ্রভাবে সার্থক হবে এই তিনি কামনা করেন। এইজন্যই সন্তানের আরাম ও সুখই তাঁর কাছে একান্ত নয়। এইজন্য তিনি সন্তানকে দুঃখও দেন। তাকে শাসন করেন, তাকে বঞ্চিত করেন, যাতে নিয়ম লঙ্ঘন করে ভ্রষ্টতা প্রাপ্ত না হয় সেদিকে তিনি সর্বদা সতর্ক থাকেন।

অর্থাৎ পিতার মধ্যে মাতার স্নেহ আছে কিন্তু সে-স্নেহ সংকীর্ণ সীমায় বদ্ধ নয় বলেই তাকে অতি প্রকট করে দেখা যায় না এবং তাকে নিয়ে যেমন ইচ্ছা খেলা চলে না।

সেইজন্যে পিতাকে নমস্কার করবার সময় বলা হয়েছে, নমঃ সম্ভবায় চ ময়োভবায় চ; যিনি সুখকর তাঁকে নমস্কার যিনি কল্যাণকর তাঁকে নমস্কার।

পিতা কেবল আমাদের সুখের আয়োজন করেন না, তিনি মঙ্গলের বিধান করেন।

সেইজন্তেই সুখেও তাঁকে নমস্কার, দুঃখেও তাঁকে নমস্কার। ওইখানেই পিতার পূর্ণতা; তিনি দুঃখ দেন।

উপনিষৎ একদিকে বলেছেন, আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দ হতেই যা কিছু সমস্ত জন্মেছে। আবার আর-একদিকে বলেছেন, ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্যঃ। ইহার ভয়ে অগ্নি জলছে, ইহার ভয়ে সূর্য তাপ দিচ্ছে।

তাঁর আনন্দ উচ্ছৃঙ্খল আনন্দ নয়, তার মধ্যে একটি অমোঘ নিয়মের শাসন আছে। অনন্ত দেশে অনন্তকালে কোথাও একটি কণাও লেশমাত্র ভ্রষ্ট হতে পারে না। সেই অমোঘ নিয়মই হচ্ছে ভয়। তার সঙ্গে কিছুমাত্র চাতুরী খাটে না, সে কোথাও কাউকে তিলমাত্র প্রশ্রয় দেয় না।

যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতং মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতম্। এই যা কিছু জগৎ সমস্তই প্রাণ হতে নিঃসৃত হয়ে প্রাণেই কম্পিত হচ্ছে—সেই যে প্রাণ, যাঁর থেকে সমস্ত উদ্ভূত হয়েছে এবং যাঁর মধ্যে সমস্তই চলছে তিনি কী রকম? না, তিনি উদ্যত বজ্রের মতো মহা ভয়ংকর। সেইজন্তেই তো সমস্ত চলছে—নইলে বিশ্বব্যবস্থা উন্মত্ত প্রলাপের মতো অতি নিদারুণ হয়ে উঠত। আমাদের পিতা যে ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং। এই ভয়ের দ্বারাই অনাদি কাল থেকে সর্বত্র সকলের সীমা ঠিক আছে, সর্বত্র সকলের পরিমাণ রক্ষা হচ্ছে।

আমাদেরও যেদিকটা চলবার দিক, কী বাক্যে, কী ব্যবহারে সেই দিকে পিতা দাঁড়িয়ে আছেন—মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং। সেদিকে কোনো ব্যত্যয় নেই কোনো স্খলনের ক্ষমা নেই, কোনো পাপের নিষ্কৃতি নেই।

অতএব আমরা যখন বলি, পিতা নোঽসি, তার মধ্যে আদরের দাবি নেই, উন্মত্ততার প্রশ্রয় নেই। অত্যন্ত সংযত আত্মসংবৃত বিনম্র নমস্কার আছে। যে বলে পিতা নোঽসি, সে তাঁর সামনে "শান্তোদান্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ সমাহিতঃ" হয়ে থাকে। সে নিজেকে প্রত্যেক ক্ষুদ্র অধৈর্য ক্ষুদ্র আত্মবিস্মৃতি থেকে রক্ষা করে চলতে থাকে।

২৯ চৈত্র

নিয়ম ও মুক্তি

সুখ জিনিসটা কেবল আমার, কল্যাণ জিনিসটা সমস্ত জগতের। পিতার কাছে যখন প্রার্থনা করি—যদ্‌ভদ্রং তন্ন আসুব, যা ভালো তাই আমাদের দাও, তার মানে হচ্ছে সমস্ত জগতের ভালো আমাদের মধ্যে প্রেরণ করো। কারণ সেই ভালোই আমার পক্ষেও সত্য ভালো, আমার পক্ষেও নিত্য ভালো। যা বিশ্বের ভালো, তাই আমার ভালো কারণ যিনি বিশ্বের পিতা তিনিই আমার পিতা।

যেখানে কল্যাণ নিয়ে অর্থাৎ বিশ্বের ভালো নিয়ে কথা সেখানে অত্যন্ত কড়া নিয়ম। সেখানে উপস্থিত সুখসুবিধা কিছুই খাটে না ; সেখানে ব্যক্তিবিশেষের আরাম বিরামের স্থান নেই। সেখানে দুঃখও শ্রেয়, মৃত্যুও বরণীয়।

যেখানে বিশ্বের ভালো নিয়ে কথা সেখানে সমস্ত নিয়ম একেবারে শেষ পর্যন্ত মানতেই হবে। সেখানে কোনো বন্ধন কোনো দায়কেই অস্বীকার করতে পারব না।

আমাদের পিতা এইখানেই মহদ্‌ভয়ং বজ্রমুদ্যতং। এইখানেই তিনি পুত্রকে এক চুল প্রশ্রয় দেন না। বিশ্বের ভাগ থেকে একটি কণা হরণ করেও তিনি কোনো বিশেষ পুত্রের পাতে দেন না। এখানে কোনো স্তব-স্তুতি অনুনয়-বিনয় খাটে না।

তবে মুক্তি কাকে বলে ? এই নিয়মকে পরিপূর্ণভাবে আত্মসাৎ করে নেওয়াকেই বলে মুক্তি। নিয়ম যখন কোনো জায়গায় আমার বাইরের জিনিস হবে না সম্পূর্ণ আমার ভিতরকার জিনিস হবে তখনই সেই অবস্থাকে বলব মুক্তি।

এখনও নিয়মের সঙ্গে আমার সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য হয় নি। এখনও চলতে ফিরতে বাধে। এখনও সকলের ভালোকে আমার ভালো বলে অনুভব করি নে। সকলের ভালোর বিরুদ্ধে আমার অনেক স্থানেই বিদ্রোহ আছে।

এইজন্যে পিতার সঙ্গে আমার সম্পূর্ণ মিলন হচ্ছে না—পিতা আমার পক্ষে রুদ্র হয়ে আছেন। তাঁর শাসনকেই আমি পদে পদে অনুভব করছি তাঁর প্রসন্নতাকে নয়। পিতার মধ্যে পুত্রের সম্পূর্ণ মুক্তি হচ্ছে না।

অর্থাৎ মঙ্গল এখনও আমার পক্ষে ধর্ম হয়ে ওঠে নি। যার ধর্ম যেটা, সেটা তার পক্ষে বন্ধন নয় সেইটেই তাঁর আনন্দ। চোখের ধর্ম দেখা, তাই দেখাতেই চোখের আনন্দ, দেখায় বাধা পেলেই তার কষ্ট। মনের ধর্ম মনন করা, মননেই তার আনন্দ, মননে বাধা পেলেই তার দুঃখ।

বিশ্বের ভালো যখন আমার ধর্ম হয়ে উঠবে তখন সেইটেতেই আমার আনন্দ এবং তার বাধাতেই আমার পীড়া হবে।

মায়ের ধর্ম যেমন পুত্রস্নেহ ঈশ্বরের ধর্মই তেমনি মঙ্গল। সমস্ত জগৎচরাচরের ভালো করাই তাঁর স্বভাব, তাতেই তাঁর আনন্দ।

আমাদের স্বভাবেও সেই মঙ্গল আছে, সমগ্র হিতেই নিজের হিতবোধ মানুষের একটা ধর্ম। এই ধর্ম স্বার্থের বন্ধন কাটিয়ে পূর্ণপরিণত হয়ে ওঠবার জন্যে নিয়তই মনুষ্যসমাজে প্রয়াস পাচ্ছে। আমাদের এই ধর্ম অপরিণত এবং বাধাগ্রস্ত বলেই আমরা দুঃখ পাচ্ছি, পূর্ণ মঙ্গলের সঙ্গে মিলনের আনন্দ ঘটে উঠছে না।

যতদিন ভিতরের থেকে এই পরিণতিলাভ না হবে, এই বাধা কেটে গিয়ে আমাদের স্বভাব নিজেকে উপলব্ধি না করবে ততদিন বাহিরের বন্ধন আমাদের মানতেই হবে। ছেলের পক্ষে যতদিন চলাফেরা স্বাভাবিক হয়ে না ওঠে, ততদিন ধাত্রী বাইরে থেকে তার হাত ধরে তাকে চালায়। তখনই তার মুক্তি হয়, যখন চলার শক্তি তার স্বাভাবিক শক্তি হয়।

অতএব নিয়মের শাসন থেকে আমরা মুক্তিলাভ করব নিয়মকে এড়িয়ে নয়, নিয়মকে আপন করে নিয়ে। আমাদের দেশে একটা শ্লোক প্রচলিত আছে—প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে পুত্রং মিত্রবদাচরেৎ, ষোলো বছর বয়স হলে পুত্রের প্রতি মিত্রের মতো ব্যবহার করবে।

তার কারণ কী? তার কারণ এই, যে পর্যন্ত না পুত্রের শিক্ষা পরিণতি লাভ করবে, অর্থাৎ সেই সমস্ত শিক্ষা তার স্বভাবসিদ্ধ হয়ে উঠবে, ততক্ষণ তার প্রতি একটি বাইরের শাসন রাখার দরকার হয়। বাইরের শাসন যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ পুত্রের সঙ্গে পিতার অন্তরের যোগ কখনোই সম্পূর্ণ হতে পারে না। যখনই সেই বাইরের শাসনের প্রয়োজন চলে যায় তখনই পিতাপুত্রের মাঝখানের আনন্দ-সম্বন্ধ একেবারে অব্যাহত হয়ে ওঠে। তখনই সমস্ত অসত্য সত্যে বিলীন হয়, অন্ধকার জ্যোতিতে উদ্‌ভাসিত হয়, মৃত্যু অমৃতে নিঃশেষিত হয়ে যায়। তখনই পিতার প্রকাশ পুত্রের কাছে সম্পূর্ণ হয়। তখনই যিনি রুদ্ররূপে আঘাত করেছিলেন তিনিই প্রসন্নতাদ্বারা রক্ষা করেন। ভয় তখন আনন্দে এবং শাসন তখন মুক্তিতে পরিণত হয়; সত্য তখন প্রিয়-অপ্রিয়ের দ্বন্দ্ববর্জিত সৌন্দর্যে উজ্জ্বল হয়, মঙ্গল তখন ইচ্ছা-অনিচ্ছার দ্বিধাবর্জিত প্রেমে এসে উপনীত হয়। তখনই আমাদের মুক্তি। সে মুক্তিতে কিছুই বাদ পড়ে না, সমস্ত সম্পূর্ণ হয়; বন্ধন শূন্য হয়ে যায় না, বন্ধনই অবন্ধন হয়ে ওঠে, কর্ম চলে যায় না কিন্তু কর্মই আসক্তিশূন্য বিরামস্বরূপ ধারণ করে।

৩০ চৈত্র

দশের ইচ্ছা

আমার সমস্ত জীবন একদিন তাঁকে পিতা নোঽসি বলতে পারবে, আমি তাঁরই পুত্র এই কথাটা একদিন সম্পূর্ণ হয়ে উঠবে, এই আকাঙ্ক্ষাটিকে উজ্জ্বল করে ধরে রাখা বড়ো কঠিন।

অথচ আমাদের মনে কত অত্যাকাঙ্ক্ষা আছে, কত অসাধ্যসাধনের সংকল্প আছে, কিছুতেই সেগুলি নিরস্ত হতে চায় না। বাইরে থেকে যদি বা খাদ্য জোগাতে নাও পারি তবু বুকের রক্ত দিয়ে তাকে পোষণ করি।

অথচ যে-আকাঙ্ক্ষা সকলের চেয়ে বড়ো, যা সকলের চেয়ে চরমের দিকে যায়, তাকে প্রতিদিন জাগ্রত করে রাখা এত শক্ত কেন?

তার কারণ আছে। আমরা মনে করি আকাঙ্ক্ষা জিনিসটা আমার নিজেরই মনের সামগ্রী—আমিই ইচ্ছা করছি এবং সে ইচ্ছার আরম্ভ আমারই মধ্যে।

বস্তুত তা নয়। আমার মধ্যে আমার চতুর্দিক ইচ্ছা করে। আমার জারক রস আমার জঠরেরই উৎপন্ন সামগ্রী বটে কিন্তু আমার ইচ্ছা কেবল আমারই মনের উৎপন্ন পদার্থ নয়। অনেকের ইচ্ছা আমার মধ্যে ইচ্ছিত হয়ে ওঠে।

মাড়োয়ারিদিগের মধ্যে অনেক লোকেই টাকাকে ইচ্ছা করে। মাড়োয়ারির ঘরে একটি ছোটো ছেলেও টাকার ইচ্ছাকে পোষণ করে। কিন্তু এই ইচ্ছা কি তার একান্ত নিজের ইচ্ছা? সে ছেলে কিছুমাত্র বিচার করে দেখে না টাকা জিনিসটা কেন লোভনীয়। টাকার সাহায্যে যে ভালো খাবে ভালো পরবে সে-কথা তার মনেও নেই। কারণ বস্তুতই টাকার লোভে সে ভালো খাওয়া পরা পরিত্যাগ করেছে। টাকার দ্বারা সে অন্য কোনো সুখকে চাচ্ছে না, অন্য সব সুখকে অবজ্ঞা করছে, সে টাকাকেই চাচ্ছে।

এমনতরো একটা অহেতুক চাওয়া নিশিদিন মাড়োয়ারি ছেলের মনে প্রচণ্ড হয়ে আছে তার কারণ, এই ইচ্ছা তার একলার নয়, সকলে মিলেই তাকে ইচ্ছা করাচ্ছে, কোনোমতেই তার ইচ্ছাকে থামতে দিচ্ছে না।

কোনো সমাজে যদি কোনো একটা নিরর্থক আচরণের বিশেষ গৌরব থাকে তবে অনেক লোককেই দেখা যাবে সেই আচারের জন্য তারা নিজের সুখসুবিধা পরিত্যাগ করে তাতেই নিযুক্ত আছে। দশজনে এইটে আকাঙ্ক্ষা করে এই হচ্ছে ওর জোর, আর কোনো তাৎপর্য নেই।

যে-দেশে অনেক লোকেই দেশকে খুব বড়ো জিনিস বলে জানে সে-দেশে বালকেও দেশের জন্যে প্রাণ দিতে ব্যগ্র হয়ে ওঠে। অন্য দেশে এই দেশানুরাগের উপযোগিতা উপকারিতা সম্বন্ধে যতই আলোচনা হ'ক না তবু দেশহিতের আকাঙ্ক্ষা সত্য হয়ে মনের মধ্যে জেগে ওঠে না। কারণ দশের ইচ্ছা প্রত্যেকের ইচ্ছাকে জন্ম দিচ্ছে না, পালন করছে না।

বিশ্বপিতার সঙ্গে পুত্ররূপে আমাদের মিলন হবে, রাজচক্রবর্তী হওয়ার চেয়েও এটা বড়ো ইচ্ছা। কিন্তু এতবড়ো ইচ্ছাকেও অহরহ সত্য করে জাগিয়ে রাখা কঠিন হয়েছে এই জন্যেই। আমার চারিদিকের লোক এই ইচ্ছাটা আমার মধ্যে করছে না। এর চেয়ে ঢের যৎসামান্য, এমন কি, ঢের অর্থহীন ইচ্ছাকেও তারা আমার মনে সত্য করে তুলেছে এবং তাকে কোনোমতে নিবে যেতে দিচ্ছে না।

এখানে আমাকে একলাই ইচ্ছা করতে হবে। এই একটি মহৎ ইচ্ছাকে আমার নিজের মধ্যেই আমার নিজের শক্তিতেই সার্থক করে রাখতে হবে। দশ জনের কাছে আনুকূল্য প্রত্যাশা করলে হতাশ হব।

শুধু তাই নয়, শত সহস্র ক্ষুদ্র অর্থকে কৃত্রিম অর্থকে সংসারের লোক রাত্রিদিন আমার কাছে অত্যন্ত বড়ো করে সত্য করে রেখেছে। সেই ইচ্ছাগুলিকে শিশুকাল হতে একেবারে আমার সংস্কারগত করে রেখেছে। তারা কেবলই আমার মনকে টানছে, আমার চেষ্টাকে কাড়ছে। বুদ্ধিতে যদি বা বুঝি তারা তুচ্ছ এবং নিরর্থক কিন্তু দশের ইচ্ছাকে ঠেলতে পারি নে।

দশের ইচ্ছা যদি কেবল বাইরে থেকে তাড়না করে তবে তাকে কাটিয়ে ওঠা যায় কিন্তু সে যখন আমারই ইচ্ছা আকার ধরে আমারই চূড়ার উপরে বসে হাল চেপে ধরে, আমি যখন জানতেও পারি নে যে বাইরে থেকে সে আমার মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে তখন তার সঙ্গে লড়াই করবার ইচ্ছামাত্রও চলে যায়।

এত বড়ো একটা সম্মিলিত বিরুদ্ধতার প্রতিকূলে আমার একলা মনের ইচ্ছাটিকে জাগিয়ে রাখতে হবে এই হয়েছে আমার কঠিন সাধনা।

কিন্তু আশার কথা এই যে, নারায়ণকে যদি সারথি করি তবে অক্ষৌহিণী সেনাকে ভয় করতে হবে না। লড়াই এক দিনে শেষ হবে না কিন্তু শেষ হবেই, জিত হবে তার সন্দেহ নেই।

এই একলা লড়াইয়ের একটা মস্ত সুবিধা যে, এর মধ্যে কোনোমতেই ফাঁকি ঢোকাবার জো নেই। দশ জনের সঙ্গে ভিড়ে গিয়ে কোনো কৃত্রিমতাকে ঘটিয়ে তোলবার আশঙ্কা নেই। নিতান্ত খাঁটি হয়ে চলতে হবে।

টাকা, বিদ্যা, খ্যাতি প্রভৃতির একটা আকর্ষণ এই যে সেগুলোকে নিয়ে সকলে মিলে কাড়াকাড়ি করে। অতএব আমি যদি তার কিছু পাই তবে অন্যের চেয়ে আমার জিত হয়। এইজন্যেই সমস্ত উপার্জনের মধ্যে এত ঈর্ষা ক্রোধ লোভ রয়েছে। এই জন্যে লোকে এত ফাঁকি চালায়। যার অর্থ কম সে প্রাণপণে দেখাতে চেষ্টা করে তার অর্থ বেশি, যার বিদ্যা অল্প সে সেটা যথাসাধ্য গোপন করবার চেষ্টায় ফেরে।

এইসকল জিনিসের দ্বারা মানুষ মানুষের কাছে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে চায়, সুতরাং জিনিসে যদি কম পড়ে তবে ফাঁকিতে সেটা পূরণ করবার ইচ্ছা হয়। মানুষকে ঠকানোও একেবারে অসাধ্য নয়, এইজন্যে সংসারে অনেক প্রতারণা অনেক আড়ম্বর চলে, এইজন্যে ভিতরে যদি বা কিছু জমাতে পারি বাইরে তার সাজসরঞ্জাম করি অনেক বেশি।

যে-সব সামগ্রী দশের কাড়াকাড়ির সামগ্রী সেইগুলির সম্বন্ধে এই ফাঁকি অলক্ষ্যে নিজের অগোচরেও এসে পড়ে। ঠাট বজায় রাখবার চেষ্টাকে আমরা দোষের মনে করি নে। এমন কি, বাহিরের সাজের দ্বারা আমরা ভিতরের জিনিসকে পেলুম বলে নিজেকেও ভোলাই।

কিন্তু যেখানে আমার আকাঙ্ক্ষা ঈশ্বরের মধ্যেই প্রতিষ্ঠালাভের আকাঙ্ক্ষা সেখানে যদি ফাঁকি চালাবার চেষ্টা করি তবে যে একেবারে মূলেই ফাঁকি হবে। গয়লা দশের দুধে জল মিশিয়ে ব্যবসা চালাতে পারে কিন্তু নিজের দুধে জল মিশিয়ে তার মুনফা কী হবে।

অতএব এইখানে একেবারে সম্পূর্ণ সত্য হতে হবে। যিনি সত্যস্বরূপ তাঁকে কেউ কোনোদিন ফাঁকি দিয়ে পার পাবে না। যিনি অন্তর্যামী তাঁর কাছে জাল-জালিয়াতি খাটবে না। আমি তাঁর কাছে কতটা খাঁটি হলুম তা তিনিই জানবেন—মানুষকে যদি জানাবার ইচ্ছা মনের মধ্যে আসে তবে কোনো দিন জালদলিল বানিয়ে তাঁকে সুদ্ধ মানুষের হাটে বিকিয়ে দিয়ে বসে থাকবে। ওইখানে দশকে আসতে দিয়ো না, নিজেকে খুব করে বাঁচাও। তুমি যে তাঁকে চাও এই আকাঙ্ক্ষাটির দ্বারা তুমি তাঁকেই লাভ করতে চেষ্টা করো, এর দ্বারা মানুষকে ভোলাবার ইচ্ছা যেন তোমার মনের এক কোণেও না আসে। তোমার এই সাধনায় সবাই যদি তোমাকে পরিত্যাগ করে তাতে তোমার মঙ্গলই হবে, কারণ, ঈশ্বরের আসনে সবাইকে বসাবার প্রলোভন তোমার কেটে যাবে। ঈশ্বরকে যদি কোনোদিন পাও তবে কখনো তাঁকে একলা নিজের মধ্যে ধরে রাখতে পারবে না। কিন্তু সে একটি কঠিন সময়। দশের মধ্যে এসে পড়লেই জল মেশাবার লোভ সামলানো শক্ত হয়, মানুষ তখন মানুষকে চকম করে, তখন খাঁটি ভগবানকে

চালাতে পারি নে, লুকিয়ে লুকিয়ে খানিকটা নিজেকে মিশিয়ে দিয়ে বসে থাকি। ক্রমে নিজের মিশালটাই বেড়ে উঠতে থাকে, ক্রমে সত্যের বিকারে অমঙ্গলের সৃষ্টি হয়। অতএব পিতাকে যেদিন পিতা বলতে পারব সেদিন পিতাই যেন সে-কথা আমার মুখ থেকে শোনেন, মানুষ যদি শুনতে পায় তো যেন পাশের ঘর থেকেই শোনে।

৩১ চৈত্র

বর্ষশেষ

যাওয়া আসায় মিলে সংসার। এই দুটির মাঝখানে বিচ্ছেদ নেই। বিচ্ছেদ আমরা মনে মনে কল্পনা করি। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় একেবারেই এক হয়ে আছে। সর্বদাই এক হয়ে আছে। সেই এক হয়ে থাকাকেই বলে জগৎসংসার।

আজ বর্ষশেষের সঙ্গে কাল বর্ষারম্ভের কোনো ছেদ নেই—একেবারে নিঃশব্দে অতি সহজে এই শেষ ওই আরম্ভের মধ্যে প্রবেশ করছে।

কিন্তু এই শেষ এবং আরম্ভের মাঝখানে একবার থেমে দাঁড়ানো আমাদের পক্ষে দরকার। যাওয়া এবং আসাকে একবার বিচ্ছিন্ন করে জানতে হবে, নইলে এই দুটিকে মিলিয়ে জানতে পারব না।

সেইজন্যে আজ বর্ষশেষের দিনে আমরা কেবল যাওয়ার দিকেই মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়েছি। অস্তাচলকে সম্মুখে রেখে আজ আমাদের পশ্চিম মুখ করে উপাসনা। যং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি—সমস্ত যাওয়াই যাঁর মধ্যে প্রবেশ করছে, দিবসের শেষ মুহূর্তে যাঁর পায়ের কাছে সকলে নীরবে ভূমিষ্ঠ হয়ে নত হয়ে পড়ছে, আজ সায়াহ্নে তাঁকে আমরা নমস্কার করব।

অবসানকে বিদায়কে মৃত্যুকে আজ আমরা ভক্তির সঙ্গে গভীরভাবে জানব—তার প্রতি আমরা অবিচার করব না। তাকে তাঁরই ছায়া বলে জানব, যস্য ছায়ামৃতম্ যস্য মৃত্যুঃ।

মৃত্যু বড়ো সুন্দর বড়ো মধুর। মৃত্যুই জীবনকে মধুময় করে রেখেছে। জীবন বড়ো কঠিন; সে সবই চায়, সবই আঁকড়ে ধরে; তার বজ্রমুষ্টি কৃপণের মতো কিছুই ছাড়তে চায় না। মৃত্যুই তার কঠিনতাকে রসময় করেছে, তার আকর্ষণকে আলগা করেছে; মৃত্যুই তার নীরস চোখে জল এনে দেয়, তার পাষাণস্থিতিকে বিচলিত করে।

আসক্তির মতো নিষ্ঠুর শত্রু কিছুই নেই; সে নিজেকেই জানে, সে কাউকে দয়া করে

না, সে কারও জন্তে কিছুমাত্র পথ ছাড়তে চায় না। এই আসক্তিই হচ্ছে জীবনের ধর্ম ; সমস্তকেই সে নেবে বলে সকলের সঙ্গেই সে কেবল লড়াই করছে।

ত্যাগ বড়ো সুন্দর, বড়ো কোমল। সে দ্বার খুলে দেয়। সঞ্চয়কে সে কেবল এক জায়গায় স্তূপাকাররূপে উদ্ধত হয়ে উঠতে দেয় না। সে ছড়িয়ে দেয়, বিলিয়ে দেয়। মৃত্যুরই সেই ঔদার্য। মৃত্যুই পরিবেশন করে, বিতরণ করে। যা এক জায়গায় বড়ো হয়ে উঠতে চায় তাকে সর্বত্র বিস্তীর্ণ করে দেয়।

সংসারের উপরে মৃত্যু আছে বলেই আমরা ক্ষমা করতে পারি। নইলে আমাদের মনটা কিছুতে নরম হত না। সব যায়, চলে যায়, আমরাও যাই। এই বিষাদের ছায়ায় সর্বত্র একটি করুণা মাখিয়ে দিয়েছে। চারিদিকে পূরবী রাগিণীর কোমল সুরগুলি বাজিয়ে তুলে আমাদের মনকে আর্দ্র করেছে। এই বিদায়ের সুরটি যখন কানে এসে পৌঁছোয় তখন ক্ষমা খুবই সহজ হয়ে যায়, তখন বৈরাগ্য নিঃশব্দে এসে আমাদের নেবার জেদটাকে দেবার দিকে আস্তে আস্তে ফিরিয়ে দেয়।

কিছুই থাকে না এইটে যখন জানি তখন পাপকে দুঃখকে ক্ষতিকে আর একান্ত বলে জানি নে। দুর্গতি একটা ভয়ংকর বিভীষিকা হয়েই উঠত যদি জানতুম সে যেখানে আছে সেখান থেকে তার আর নড়চড় নেই। কিন্তু আমরা জানি সমস্তই সরছে এবং সেও সরছে সুতরাং তার সম্বন্ধে আমাদের হতাশ হতে হবে না। অনন্ত চলার মাঝখানে পাপ কেবল একটা জায়গাতেই পাপ, কিন্তু সেখান থেকে সে এগোচ্ছে। আমরা সব সময়ে দেখতে পাই নে কিন্তু সে চলছে। ওইখানেই তার পথের শেষ নয়—সে পরিবর্তনের মুখে, সংশোধনের মুখেই রয়েছে। পাপীর মধ্যে পাপ যদি স্থির হয়েই থাকত তাহলে সেই স্থিরত্বের উপর রুদ্রের অসীম শাসনদণ্ড ভয়ানক ভার হয়ে তাকে একেবারে বিলুপ্ত করে দিত। কিন্তু বিধাতার দণ্ড তো তাকে এক জায়গায় চেপে রাখছে না, সেই দণ্ড তাকে তাড়না করে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এই চালানোই তাঁর ক্ষমা। তাঁর মৃত্যু কেবলই মার্জনা করছে, কেবলই ক্ষমার অভিমুখে বহন করছে।

আজ বর্ষশেষ আমাদের জীবনকে কি তাঁর সেই ক্ষমার দ্বারে এনে উপনীত করবে না? যার উপরে মরণের শিলমোহর দেওয়া আছে, যা যাবার জিনিস তাকে কি আজও আমরা যেতে দেব না। বছর ভরে যেসব পাপের আবর্জনা সঞ্চয় করেছি, আজ বৎসরকে বিদায় দেবার সময় কি তার কিছুই বিদায় দিতে পারব না? ক্ষমা করে ক্ষমা নিয়ে নির্মল হয়ে নব বৎসরে প্রবেশ করতে পাব না?

আজ আমার মুষ্টি শিথিল হ'ক। কেবল কাড়ব এবং কেবল রাখব এই করে কোনো সুখ কোনো সার্থকতা পাই নি। যিনি সমস্ত গ্রহণ করেন আজ তাঁর সম্মুখে এসে,

ছাড়ব এবং মরব এই কথাটা আমার মন বলুক। আর তাঁর মধ্যে সম্পূর্ণ ছাড়তে সম্পূর্ণ মরতে এক মুহূর্তে পারব না; তবু ওই দিকেই মন নত হ'ক, নিজেকে দেবার দিকেই তার অঞ্জলি প্রসারিত করুক, সূর্যাস্তের সুরেই বাঁশ বাজতে থাক্, মৃত্যুর মোহন রাগিণীতেই প্রাণ কেঁদে উঠুক। নববর্ষের ভারগ্রহণের পূর্বে আজ সন্ধ্যাবেলায় সেই সর্বভার মোচনের সমুদ্রতটে সকল বোঝাই নামিয়ে দিয়ে আত্মসমর্পণের মধ্যে অবগাহন করি, নিস্তরঙ্গ নীল জলরাশির মধ্যে শীতল হই, বৎসরের অবসানকে অন্তরের মধ্যে পূর্ণভাবে গ্রহণ করে স্তব্ধ হই শান্ত হই পবিত্র হই।

৩১ চৈত্র

অনন্তের ইচ্ছা

আমার শরীরের মধ্যে কতকগুলি ইচ্ছা আছে যা আমার শরীরের গোচর। যেমন আমার খেতে ইচ্ছা করে, স্নান করতে ইচ্ছা করে, শীতের সময় গরম হতে ইচ্ছা করে।

কিন্তু সমস্ত শরীরের মধ্যে একটি ইচ্ছা আছে যা আমার অগোচরেই আছে। সেটি হচ্ছে স্বাস্থ্যের ইচ্ছা সে আমাকে খবর না জানিয়েই রোগে এবং অরোগে নিয়ত কাজ করছে। সে ব্যাধির সময় কত রকম প্রতিকারের আশ্চর্য ব্যবস্থা করছে তা আমরা জানিই নে এবং অরোগের সময় সমস্ত শরীরের মধ্যে বিচিত্র ক্রিয়ার সামঞ্জস্য-স্থাপনার জন্যে তার কৌশলের অন্ত নেই, তারও কোনো খবর সে আমাদের জানায় না। এই স্বাস্থ্যের ইচ্ছাটি শরীরের মূলে আমাদের চেতনার অগোচরে রাত্রিদিন নিদ্রায় জাগরণে অবিশ্রাম বিরাজ করছে।

শরীর সম্বন্ধে যে ব্যক্তি জ্ঞানী তিনি এইটিকেই জানেন। তিনি জানেন আমাদের মধ্যে একটি স্বাস্থ্যতত্ত্ব আছে। শরীরের এই মূল অব্যক্ত ইচ্ছাটিকে যিনি জেনেছেন তিনি শরীরগত সমস্ত ব্যক্ত ইচ্ছাকে এর অনুগত করে তোলেন। ব্যক্ত ইচ্ছা যখন খাব বলে আবদার করছে তখন তাকে তিনি এই অব্যক্ত স্বাস্থ্যের ইচ্ছারই শাসনে নিয়মিত করবার চেষ্টা করেন। শরীর সম্বন্ধে এইটেই হচ্ছে সাধনা।

পাঁচজনের সঙ্গে মিলে আমরা যে একটা সামাজিক শরীর রচনা করে আছি, তার মধ্যেও ব্যক্ত এবং অব্যক্ত ইচ্ছা আছে। সমাজের প্রত্যেকের নিজের স্বার্থ সুবিধা সুখ ও স্বাধীনতার জন্যে যে ইচ্ছা এইটেই তার ব্যক্ত ইচ্ছা। সকলেই বেশি পেতে চাচ্ছে, সকলেই জিততে চাচ্ছে, যত কম মূল্য দিয়ে যত বেশি পরিমাণ আদায় করতে পারে এই

সকলের ইচ্ছা। এই ইচ্ছার সংঘাতে কত ফাঁকি কত যুদ্ধ কত দলাদলি চলছে তার আর সীমা নেই।

কিন্তু এরই মধ্যে একটি অব্যক্ত ইচ্ছা ধ্রুব হয়ে আছে। তাকে প্রত্যক্ষ দেখা যাচ্ছে না কিন্তু সে আছেই না থাকলে কোনোমতেই সমাজ রক্ষা পেত না, সে হচ্ছে মঙ্গলের ইচ্ছা। অর্থাৎ সমস্ত সমাজের সুখ হ'ক ভালো হ'ক এই ইচ্ছা প্রত্যেকের মধ্যে নিগূঢ়ভাবেই আছে। এই থাকার উপরেই সমাজ বেঁধে উঠেছে, কোনো প্রত্যক্ষ সুবিধার উপরে নয়।

সমাজ সম্বন্ধে যাঁরা জ্ঞানী তাঁরা এইটেই জেনেছেন। তাঁরা সমুদয় সুখ সুবিধা স্বাধীনতার ব্যক্ত ইচ্ছাকে এই গভীরতর অব্যক্ত মঙ্গল ইচ্ছার অনুগত করতে চেষ্টা করেন। তাঁরা এই নিগূঢ় নিত্য ইচ্ছার কাছে সমস্ত অনিত্য ইচ্ছাকে ত্যাগ করতে পারেন।

আমাদের আত্মার মধ্যেও ব্যক্ত এবং অব্যক্ত ইচ্ছা আছে। আত্মা আপনাকে নানা দিকে বড়ো বলে অনুভব করতে চায়। সে ধনে বড়ো বিদ্যায় বড়ো খ্যাতিতে বড়ো হয়ে নিজেকে বড়ো জানতে চায়। এর জন্যে কাড়াকাড়ি মারামারির অন্ত নেই।

কিন্তু তার মধ্যে প্রতিনিয়ত একটি অব্যক্ত ইচ্ছা রয়েইছে। সকলের বড়ো, যিনি অনন্ত অখণ্ড এক, সেই ব্রহ্মের মধ্যে মিলনেই নিজেকে উপলব্ধি করবার ইচ্ছা তার মধ্যে নিগূঢ়রূপে ধ্রুবরূপে রয়েছে। এই অব্যক্ত ইচ্ছাই তার সকলের চেয়ে বড়ো ইচ্ছা।

তিনিই আত্মবিৎ যিনি এই কথাটি জানেন। তিনি আত্মার সমস্ত ইচ্ছাকে সেই নিগূঢ় এক ইচ্ছার অধীন করেন।

শরীরের নানা ইচ্ছা ঐক্যলাভ করেছে একটি একের মধ্যে সেইটি হচ্ছে স্বাস্থ্যের ইচ্ছা, এই গভীর ইচ্ছাটি শরীরের সমস্ত বর্তমান ইচ্ছাকে অতিক্রম করে অনাগতের মধ্যে চলে গেছে। শরীরের যে ভবিষ্যৎটি এখন নেই সেই ভবিষ্যৎকেও সে অধিকার করে রয়েছে।

সমাজশরীরেও নানা ইচ্ছা এক অন্তরতম গোপন ইচ্ছার মধ্যে ঐক্যলাভ করেছে; সে ওই মঙ্গলইচ্ছা। সে ইচ্ছাও বর্তমান সুখদুঃখের সীমা ছাড়িয়ে ভবিষ্যতের অভিমুখে চলে গেছে।

আত্মার অন্তরতম ইচ্ছা দেশে কালে কোথাও বদ্ধ নয়। তার যে-সকল ইচ্ছা কেবল পৃথিবীতেই সার্থক হতে পারে সেইসকল ইচ্ছার মধ্যেই তার সমাপ্তি নয়, অনন্তের সঙ্গে মিলনের আকাঙ্ক্ষাই তার জ্ঞান প্রেম কর্মকে কেবলই আকর্ষণ করছে; সে যেখানে গিয়ে পৌঁচচ্ছে সেখানে গিয়ে থামতে পারছে না। কেবলই ছাড়িয়ে নিয়ে যাবার ইচ্ছা তার সমস্ত ইচ্ছার ভিতরে নিরন্তর জাগ্রত হয়ে রয়েছে।

শরীরের মধ্যে এই স্বাস্থ্যের শান্তি, সমাজের মধ্যে মঙ্গল এবং আত্মার মধ্যে অদ্বিতীয়ের প্রেম, ইচ্ছারূপে বিরাজ করছে। এই ইচ্ছা অনন্তের ইচ্ছা, ব্রহ্মের ইচ্ছা। তাঁর এই ইচ্ছার সঙ্গে আমাদের সচেতন ইচ্ছাকে সংগত করে দেওয়াই আমাদের মুক্তি। এই ইচ্ছার সঙ্গে অসামঞ্জস্যই আমাদের বন্ধন, আমাদের দুঃখ। ব্রহ্মের যে ইচ্ছা আমাদের মধ্যে আছে সে আমাদের দেশকালের বাইরের দিকে নিয়ে যাবার ইচ্ছা, কোনো বর্তমানের বিশেষ স্বার্থ বা সুখের মধ্যে আবদ্ধ করবার ইচ্ছা নয়। সে-ইচ্ছা কিনা তাঁর প্রেম এইজন্যে সে তাঁরই দিকে আমাদের টানছে। এই অনন্ত প্রেম যা আমাদের মধ্যেই আছে, তার সঙ্গে আমাদের প্রেমকে যোগ করে দিয়ে আমাদের আনন্দকে বাধামুক্ত করে দেওয়াই আমাদের সাধনা। কী শরীরে, কী সমাজে, কী আত্মায়, সর্বত্রই আমরা এই যে দুটি ইচ্ছার ধারাকে দেখতে পাচ্ছি, একটি আমাদের গোচর অথচ চিরপরিবর্তনশীল, আর-একটি আমাদের অগোচর অথচ চিরন্তন; একটি কেবল বর্তমানের প্রতিই আকৃষ্ট, আর একটি অনাগতের দিকে আকর্ষণকারী; একটি কেবল ব্যক্তিবিশেষের মধ্যেই বদ্ধ, আর একটি নিখিলের সঙ্গে যোগযুক্ত। এই দুটি ইচ্ছার গতি নিরীক্ষণ করো, এর তাৎপর্য গ্রহণ করো। এদের উভয়ের মধ্যে মিলিত হবার যে একটা তত্ত্ব বিরোধের দ্বারাই নিজেকে ব্যক্ত করছে সেইটি উপলব্ধি করে এই মিলনের জন্যই সমস্ত জীবন প্রতিদিনই আপনাকে প্রস্তুত করো।

৩ বৈশাখ

পাওয়া ও না-পাওয়া

সেই পাওয়াতেই মানুষের মন আনন্দিত যে পাওয়ার সঙ্গে না-পাওয়া জড়িত হয়ে আছে।

যে-সুখ কেবলমাত্র পাওয়ার দ্বারাই আমাদের উন্মত্ত করে তোলে না—অনেকখানি না-পাওয়ার মধ্যে যার স্থিতি আছে বলেই যার ওজন ঠিক আছে—সেইজন্যেই যাকে আমরা গভীর সুখ বলি—অর্থাৎ, যে-সুখের সকল অংশই একেবারে সুস্পষ্ট সুব্যক্ত নয়, যার এক অংশ নিগূঢ়তার মধ্যে অগোচর, যা প্রকাশের মধ্যেই নিঃশেষিত নয়, তাকেই আমরা উচ্চ শ্রেণীর সুখ বলি।

পেট ভরে আহার করলে পর আহার করবার সুখটা সম্পূর্ণ পাওয়া যায়, দর্শনে স্পর্শনে ঘ্রাণে স্বাদে সর্বপ্রকারে তাকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করা হয়। সে-সুখের প্রতি যতই লোভ থাকুক মানুষ তাকে আনন্দের কোঠায় ফেলে না।

কিন্তু যে-সৌন্দর্যবোধকে আমরা কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়বোধের দ্বারা সেরে ফেলতে পারি নে—যা বীণার অনুরণনের মতো চেতনার মধ্যে স্পন্দিত হতে থাকে, যা সমাপ্ত হতেই চায় না, সে-আনন্দকে আমরা আহারের আনন্দের সঙ্গে এক শ্রেণীতে গণ্যই করি নে। কেবলমাত্র পাওয়া তাকে অপমানিত করে না, না পাওয়া তাকে গৌরব দান করে।

আমরা জগতে পাওয়ার মতো পাওয়া তাকেই বলি যে-পাওয়ার মধ্যে অনির্বচনীয়তা আছে। যে-জ্ঞান কেবলমাত্র একটি খবর, তার মূল্য অতি অল্প কেননা, সেটা একটা সংকীর্ণ জানার মধ্যেই ফুরিয়ে যায়। কিন্তু যে জ্ঞান তথ্য নয়, তত্ত্ব, অর্থাৎ যাকে কেবল একটি ঘটনার মধ্যে নিঃশেষ করা যায় না, যা অসংখ্য অতীত ঘটনার মধ্যেও আছে এবং যা অসংখ্য ভাবী ঘটনায় মধ্যেও আপনাকে প্রকাশ করবে, যা কেবল ঘটনা-বিশেষের মধ্যে ব্যক্ত বটে কিন্তু অনন্তের মধ্যে অব্যক্তরূপে বিরাজমান, সেই জ্ঞানেই আমাদের আনন্দ; কেবলমাত্র বিচ্ছিন্ন তুচ্ছ খবরে নিতান্ত জড়বুদ্ধি অলস লোকের বিলাস।

ক্ষণিক আমোদ বা ক্ষণিক প্রয়োজনে আমরা অনেক লোকের সঙ্গে মিলি, আমাদের কাছে তারা সেইটুকুর মধ্যেই নিঃশেষিত। কিন্তু যে আমার প্রিয়, কোনো এক সময়ের আলাপে আমোদে কোনো এক সময়ের প্রয়োজনে তার শেষ পাই নে। তার সঙ্গে যে-সময়ে যে-আলাপে যে-কর্মে নিযুক্ত আছি, সে-সময়কে সেই আলাপকে সেই কর্মকে বহুদূরে ছাড়িয়ে সে রয়েছে। কোনো বিশেষ দেশে বিশেষ কালে বিশেষ ঘটনায় আমরা তাকে সমাপ্ত করলুম বলে মনেই করতে পারি নে, সে আমার কাছে প্রাপ্ত অথচ অপ্রাপ্ত, এই অপ্রাপ্তি তাকে আমার কাছে এমন আনন্দময় করে রেখেছে।

এর থেকে বোঝা যায় আমাদের আত্মা যে পেতেই চাচ্ছে তা নয় সে না পেতেও চায়। এইজন্যেই সংসারের সমস্ত দৃষ্টস্পৃষ্টের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সে বলছে কেবলই পেয়ে পেয়ে আমি শ্রান্ত হয়ে গেলুম, আমার না-পাওয়ার ধন কোথায়? সেই চির-দিনের না-পাওয়াকে পেলে যে আমি বাঁচি।

যতোবাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন।

বাক্য মন যাঁকে না পেয়ে ফিরে আসে সেই আমার না-পাওয়া ব্রহ্মের আনন্দে আমি সমস্ত তুচ্ছ ভয় হতে যে রক্ষা পেতে পারি।

এইজন্যেই উপনিষৎ বলেছেন, অবিজ্ঞাতম্ বিজানতাং বিজ্ঞাতম্ অবিজানতাম্, যিনি বলেন আমি তাঁকে জানি নি তিনিই জানেন, যিনি বলেন আমি জেনেছি তিনি জানেন না।

আমি তাঁকে জানতে পারলুম না এ কথাটা জানবার অপেক্ষা আছে। পাখি যেমন করে জানে আমি আকাশ পার হতে পারলুম না তেমনি করে জানা চাই, পাখি আকাশকে জানে বলেই সে জানে যে আকাশ পার হওয়া গেল না। আকাশ পার হওয়া গেল না জানে বলেই তার আনন্দ, এইজন্যেই সে আকাশে উড়ে বেড়ায়। কোনো প্রাপ্তি নয়, কোনো সমাপ্তি নয়, কোনো প্রয়োজন নয়, কিন্তু উড়েই তার আনন্দ।

পাখি আকাশকে জানে বলেই সে জানে আমি আকাশকে শেষ করে জানলুম না এবং এই জেনে না-জানাতেই তার আনন্দ, ব্রহ্মকে জানার কথাতেও এই কথাটাই খাটে। সেইজন্যেই উপনিষৎ বলেন, নাহং মন্যে সুবেদেতি নো ন বেদেতি বেদ চ, আমি যে ব্রহ্মকে বেশ জেনেছি এও নয় আমি যে একেবারে জানি নে এও নয়।

কেউ কেউ বলেন আমরা ব্রহ্মকে একেবারেই জানতে চাই, যেমন করে এই সমস্ত জিনিসপত্র জানি; নইলে আমার কিছুই হল না।

আমি বলছি আমরা তা চাই নে। যদি চাইতুম তাহলে সংসারই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট ছিল। এখানে জিনিসপত্রের অন্ত কোথায়? এর উপরে আবার কেন? নীড়ের পাখি যেমন আকাশকে চায় তেমনি আমরা এমন কিছুকে চাই যাকে পাওয়া যায় না।

আমার মনে আছে, যাঁরা ব্রহ্মকে চান তাঁদের প্রতি বিদ্রূপ প্রকাশ করে একজন পণ্ডিত অনেকদিন হল বলেছিলেন—একদল গাঁজাখোর রাত্রে গাঁজা খাবার সভা করেছিল। টিকা ধরাবার আগুন ফুরিয়ে যাওয়াতে তারা সংকটে পড়েছিল। তখন রক্তবর্ণ হয়ে চাঁদ আকাশে উঠছিল। একজন বললে, ওই যে, ওই আলোতে টিকা ধরাব। বলে টিকা নিয়ে জানালার কাছে দাঁড়িয়ে চাঁদের অভিমুখে বাড়িয়ে ধরলে। টিকা ধরল না। তখন আর একজন বললে, দূর চাঁদ বুঝি অত কাছে! দে আমাকে দে। বলে সে আরও কিছু দূরে গিয়ে টিকা বাড়িয়ে ধরলে। এমনি করে সমস্ত গাঁজাখোরের শক্তি পরাস্ত হল—টিকা ধরল না।

এই গল্পের ভাবখানা হচ্ছে এই যে, যে-ব্রহ্মের সীমা পাওয়া যায় না তাঁর সঙ্গে কোনো সম্বন্ধস্থাপনের চেষ্টা এই রকম বিড়ম্বনা।

এর থেকে দেখা যাচ্ছে কারও কারও মতে সাংসারিক প্রার্থনা ছাড়া আমাদের মনে আর কোনো প্রার্থনা নেই। আমরা কেবল প্রয়োজনসিদ্ধিই চাই—টিকের আমাদের আগুন ধরাতে হবে।

এ কথাটা যে কত অমূলক তা ওই চাঁদের কথা ভাবলেই বোঝা যাবে। আমরা

দেশলাইকে যে ভাবে চাই চাঁদকে সে ভাবে চাই নে, চাঁদকে চাঁদ বলেই চাই, চাঁদ আমাদের বিশেষ কোনো সংকীর্ণ প্রয়োজনের অতীত বলেই তাকে চাই। সেই চির-অতৃপ্ত অসমাপ্ত পাওয়ার চাওয়াটাই সবচেয়ে বড়ো চাওয়া। সেইজন্যেই পূর্ণচন্দ্র আকাশে উঠলেই নদীতে নৌকায় ঘাটে গ্রামে পথে নগরের হর্ম্যতলে গাছের নীড়ে চারিদিক থেকে গান জেগে ওঠে, কারও টিকের আগুন ধরে না বলে কোথাও কোনো ক্ষোভ থাকে না।

ব্রহ্ম তো তাল বেতাল নন যে তাঁকে আমরা বশ করে নিয়ে প্রয়োজন সিদ্ধি করব। কেবল প্রয়োজন সিদ্ধিতেই পাওয়ার দরকার, আনন্দের পাওয়াতে ঠিক তার উলটো। তাতে না-পাওয়াটাই হচ্ছে সকলের চেয়ে বড়ো জিনিস। যে-জিনিস আমরা পাই তাতে আমাদের যে সুখ সে অহংকারের সুখ। আমার আয়ত্তের জিনিস আমার ভৃত্য আমার অধীন, আমি তার চেয়ে বড়ো।

কিন্তু এই সুখই মানুষের সবচেয়ে বড়ো সুখ নয়। আমার চেয়ে যে বড়ো তার কাছে আত্মসমর্পণ করার সুখই হচ্ছে আনন্দ। আমার যিনি অতীত আমি তাঁরই, এইটি জানাতেই অভয়, এইটি অনুভব করাতেই আনন্দ। যেখানে ভূমানন্দ সেখানে আমি বলি, আমি আর পারলুম না, আমি হাল ছেড়ে দিলুম, আমি গেলুম। গেল আমার অহংকার, গেল আমার শক্তির ঔদ্ধত্য। এই না পেয়ে ওঠার মধ্যে এই না পাওয়ার মধ্যে নিজেকে একান্ত ছেড়ে দেওয়াই মুক্তি।

মানুষ তো সমাপ্ত নয়, সে তো হয়ে বয়ে যায় নি, সে যেটুকু হয়েছে সে তো অতি অল্পই। তার না-হওয়াই যে অনন্ত। মানুষ যখন আপনার এই হওয়া-রূপী জীবের বর্তমান প্রয়োজন সাধন করতে চায় তখন প্রয়োজনের সামগ্রীকে নিজের অভাবের সঙ্গে একেবারে সম্পূর্ণ করে চারিদিকে মিলিয়ে নিতে হয়, তার বর্তমানটি একেবারে সম্পূর্ণ বর্তমানকেই চাচ্ছে। কিন্তু সে তো কেবলই বর্তমান নয়, সে তো কেবলই হওয়া-রূপী নয়, তার না-হওয়ারূপী অনন্ত যদি কিছুই না পায় তবে তার আনন্দ নেই। পাওয়ার সঙ্গে অনন্ত না-পাওয়া তার সেই অনন্ত না-হওয়াকে আশ্রয় দিচ্ছে, খাদ্য দিচ্ছে। এই জন্যেই মানুষ কেবলই বলে, অনেক দেখলুম অনেক শুনলুম অনেক বুঝলুম, কিন্তু আমার না-দেখার ধন না-শোনার ধন না-বোঝার ধন কোথায়? যা অনাদি বলেই অনন্ত, যা হয় না বলেই যায় না, যাকে পাই নে বলেই হারাই নে, যা আমাকে পেয়েছে বলেই আমি আছি, সেই অশেষের মধ্যে নিজেকে নিঃশেষ করবার জন্যেই আত্মা কাঁদছে। সেই অশেষকে সশেষ করতে চায় এমন ভয়ংকর নির্বোধ সে নয়। যাকে আশ্রয় করবে তাকে আশ্রয় দিতে চায় এমন সমূলে আত্মঘাতী নয়।

৪ বৈশাখ

হওয়া

পাওয়া মানেই আংশিকভাবে পাওয়া। প্রয়োজনের জন্যে আমরা যাকে পাই তাকে তো কেবল প্রয়োজনের মতোই পাই তার বেশি তো পাই নে। অন্ন কেবল খাওয়ার সঙ্গে মেলে, বস্ত্র কেবল পরার সঙ্গেই মেলে, বাড়ি কেবল বাসের সঙ্গে মেলে। এদের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ ওইসকল ক্ষুদ্র প্রয়োজনের সীমান্তে এসে ঠেকে, সেটাকে আর লঙ্ঘন করা যায় না।

এইরকম বিশেষ প্রয়োজনের সংকীর্ণ পাওয়াকেই আমরা লাভ বলি। সেইজন্যে ঈশ্বরকে লাভের কথা যখন ওঠে তখনও ভাষা এবং অভ্যাসের টানে ওইরকম লাভের কথাই মনে উদয় হয়। সে যেন কোনো বিশেষ স্থানে কোনো বিশেষ কালে লাভ, তাঁকে দর্শন মানে কোনো বিশেষ মূর্তিতে কোনো বিশেষ মন্দিরে বা বিশেষ কল্পনায় দর্শন।

কিন্তু পাওয়া বলতে যদি আমরা এই বুঝি তবে ঈশ্বরকে পাওয়া হতেই পারে না। আমরা যা-কিছুকে পেলুম বলে মনে করি সে আমাদের ঈশ্বর নয়। তিনি আমাদের পাওয়ার সম্পূর্ণ অতীত। তিনি আমাদের বিষয়-সম্পত্তি নন।

ও জায়গায় আমাদের কেবল হওয়া, পাওয়া নয়। তাঁকে আমরা পাব না, তাঁর মধ্যে আমরা হব। আমার সমস্ত শরীর মন হৃদয় নিয়ে আমি কেবলই হয়ে উঠতে থাকব। ছাড়তে ছাড়তে বাড়তে বাড়তে মরতে মরতে বাঁচতে বাঁচতে আমি কেবলই হব। পাওয়াটা কেবল এক অংশে পাওয়া, হওয়াটা যে একেবারে সমগ্রভাবে হওয়া, সে তো লাভ নয় সে বিকাশ।

ভীরু লোকে বলবে, বল কী। তুমি ব্রহ্ম হবে। এমন কথা তুমি মুখে আন কী করে!

হাঁ, আমি ব্রহ্মই হব। এ-কথা ছাড়া অন্য কথা আমি মুখে আনতে পারি নে। আমি অসংকোচেই বলব, আমি ব্রহ্ম হব। কিন্তু আমি ব্রহ্মকে পাব এতবড়ো স্পর্ধার কথা বলতে পারি নে।

তবে কি ব্রহ্মেতে আমাতে তফাত নেই? খুব তফাত আছে। তিনি ব্রহ্ম হয়েই আছেন, আমাকে ব্রহ্ম হতে হচ্ছে। তিনি হয়ে রয়েছেন, আমি হয়ে উঠছি, আমাদের দুজনের মধ্যে এই লীলা চলছে। হয়ে থাকার সঙ্গে হয়ে ওঠার নিয়ত মিলনেই আনন্দ।

নদী কেবলই বলছে আমি সমুদ্র হব। সে তার স্পর্ধা নয়—সে যে সত্য কথা,

সুতরাং সেই তার বিনয়। তাই সে সমুদ্রের সঙ্গে মিলিত হয়ে ক্রমাগতই সমুদ্র হয়ে যাচ্ছে—তার আর সমুদ্র হওয়া শেষ হল না।

বস্তুত চরমে সমুদ্র হতে থাকা ছাড়া তার আর গতিই নেই। তার দুই দীর্ঘ উপকূলে কত খেত কত শহর কত গ্রাম কত বন আছে তার ঠিক নেই। নদী তাদের তুষ্ট করতে পারে পুষ্ট করতে পারে, কিন্তু তাদের সঙ্গে মিলে যেতে পারে না। এই সমস্ত শহর গ্রাম বনের সঙ্গে তার কেবল আংশিক সম্পর্ক। নদী হাজার ইচ্ছা করলেও শহর গ্রাম বন হয়ে উঠতে পারে না।

সে কেবল সমুদ্রই হতে পারে। তার ছোটো সচল জল সেই বড়ো অচল জলের একই জাত। এইজন্যে তার সমস্ত উপকূল পার হয়ে বিশ্বের মধ্যে সে কেবল ওই বড়ো জলের সঙ্গেই এক হতে পারে।

সে সমুদ্র হতে পারে কিন্তু সে সমুদ্রকে পেতে পারে না। সমুদ্রকে সংগ্রহ করে এনে নিজের কোনো বিশেষ প্রয়োজনে তাকে কোনো বিশেষ গুহা গহ্বরে লুকিয়ে রাখতে পারে না, যদি কোনো ছোটো জলকে দেখিয়ে সে মূঢ়ের মতো বলে, হাঁ সমুদ্রকে এইখানে আমি নিজের সম্পত্তি করে রেখেছি তাকে উত্তর দেব, ও তোমার সম্পত্তি হতে পারে কিন্তু ও তোমার সমুদ্র নয়। তোমার চিরন্তন জলধারা এই জলটাকে চায় না, সে সমুদ্রকেই চায়। কেননা সে সমুদ্র হতে চাচ্ছে সে সমুদ্রকে পেতে চাচ্ছে না।

আমরাও কেবল ব্রহ্মই হতে পারি আর কিছুই হতে পারি নে। আর কোনো হওয়াতে তো আমরা সম্পূর্ণ হই নে। সমস্তই আমরা পেরিয়ে যাই; পেরোতে পারি নে ব্রহ্মকে। ছোটো সেখানে বড়ো হয়। কিন্তু তার সেই বড়ো হওয়া শেষ হয় না, এই তার আনন্দ।

আমরা এই আনন্দেরই সাধনা করব। আমরা ব্রহ্মে মিলিত হয়ে অহরহ কেবল ব্রহ্মই হতে থাকব। যেখানে বাধা পাব সেখানে হয় ভেঙে নয় এড়িয়ে যাব। অহংকার, স্বার্থ এবং জড়তা যেখানে নিষ্ফল বালির স্তূপ হয়ে পথরোধ করে দাঁড়াবে সেখানে প্রতিমুহূর্তে তাকে ক্ষয় করে ফেলব।

সকালবেলায় এইখানে বসে যে একটুখানি উপাসনা করি এই দেশকালবদ্ধ আংশিক জিনিসটাকে আমরা যেন সিদ্ধি বলে ভ্রম না করি। একটু রস, একটু ভাব, একটু চিন্তাই ব্রহ্ম নয়। এইটুকুমাত্রকে নিয়ে কোনোদিন জমছে কোনোদিন জমছে না বলে খুঁত খুঁত ক'রো না। এই সময় এবং এই অনুষ্ঠানটিকে একটি অভ্যস্ত আরামে পরিণত করে সেটাকে একটা পরমার্থ বলে কল্পনা ক'রো না। সমস্ত দিন সমস্ত চিন্তায় সমস্ত কাজে একেবারে সমগ্র নিজেকে ব্রহ্মের অভিমুখে চালনা করো—উলটোদিকে নয়,

নিজের দিকে নয়, কেবলই সেই ভূমার দিকে, শ্রেয়ের দিকে, অমৃতের দিকে। সমুদ্রে নদীর মতো তাঁর সঙ্গে মিলিত হও—তাহলে তোমার সমস্ত সত্তার ধারা কেবলই তিনিময় হতে থাকবে, কেবলই তুমি ব্রহ্ম হয়ে উঠবে। তাহলে তুমি তোমার সমস্ত জীবন দিয়ে সমস্ত অস্তিত্ব দিয়ে জানতে পারবে ব্রহ্মই তোমার পরমা গতি, পরমা সম্পৎ, পরম আশ্রয়, পরম আনন্দ, কেননা তাঁতেই তোমার পরম হওয়া।

৬ বৈশাখ

মুক্তি

এই যে সকালবেলাটি প্রতিদিন আমাদের কাছে প্রকাশিত হয় এতে আমাদের আনন্দ অল্পই। এই সকাল আমাদের অভ্যাসের দ্বারা জীর্ণ হয়ে গেছে।

অভ্যাস আমাদের নিজের মনের তুচ্ছতা দ্বারা সকল মহৎ জিনিসকেই তুচ্ছ করে দেয়। সে নাকি নিজে বদ্ধ এইজন্যে সে সমস্ত জিনিসকেই বদ্ধ করে দেয়।

আমরা যখন বিদেশে বেড়াতে যাই তখন কোনো নূতন পৃথিবীকে দেখতে যাই নে। এই মাটি এই জল এই আকাশকেই আমাদের অভ্যাস থেকে বিমুক্ত করে দেখতে যাই। আবরণটাকে ঘুচিয়ে এই পৃথিবীর উপরে চোখ মেললেই এই চিরদিনের পৃথিবীতেই সেই অভাবনীয়কে দেখতে পাই যিনি কোনোদিন পুরাতন নন। তখনই আনন্দ পাই।

যে আমাদের প্রিয়, অভ্যাস তাকে সহজে বেষ্টন করতে পারে না। এইজন্যই প্রিয়জন চিরদিনই অভাবনীয়কে অনন্তকে আমাদের কাছে প্রকাশ করতে পারে। তাকে যে আমরা দেখি সেই দেখাতেই আমাদের দেখা শেষ হয় না—সে আমাদের দেখা শোনা আমাদের সমস্ত বোধকেই ছাড়িয়ে বাকি থাকে। এইজন্যেই তাতে আমাদের আনন্দ।

তাই উপনিষৎ—আনন্দরূপমমৃতং—ঈশ্বরের আনন্দরূপকে অমৃত বলেছেন। আমাদের কাছে যা মরে যায় যা ফুরিয়ে যায় তাতে আমাদের আনন্দ নেই—যেখানে আমরা সীমার মধ্যে অসীমকে দেখি অমৃতকে দেখি সেইখানেই আমাদের আনন্দ।

এই অসীমই সত্য—তাঁকে দেখাই সত্যকে দেখা। যেখানে তা না দেখবে সেইখানেই বুঝতে হবে আমাদের নিজের জড়তা মূঢ়তা অভ্যাস ও সংস্কারের দ্বারা আমরা সত্যকে অবরুদ্ধ করেছি, সেইজন্যে তাতে আমরা আনন্দ পাচ্ছি নে।

বৈজ্ঞানিক বল, দার্শনিক বল, কবি বল, তাঁদের কাজই মানুষের এই সমস্ত মূঢ়তা ও

অভ্যাসের আবরণ মোচন করে এই জগতের মধ্যে সত্যের অনন্তরূপকে দেখানো, যা-কিছু দেখছি একেই সত্য করে দেখানো, নূতন কিছু তৈরি করা নয় কল্পনা করা নয়। এই সত্যকে মুক্ত করে দেখানোর মানেই হচ্ছে মানুষের আনন্দের অধিকার বাড়িয়ে দেওয়া।

যেমন ঘর ছেড়ে দিয়ে কোনো দূরদেশে যাওয়াকে অন্ধকারমুক্তি বলে না, ঘরের দরজাকে খুলে দেওয়াই বলে অন্ধকার-মোচন, তেমনি জগৎসংসারকে ত্যাগ করাই মুক্তি নয়; পাপ স্বার্থ অহংকার জড়তা মূঢ়তা ও সংস্কারের বন্ধন কাটিয়ে, যা দেখছি একেই সত্য করে দেখা, যা করছি একেই সত্য করে করা, যার মধ্যে আছি এরই মধ্যে সত্য করে থাকাই মুক্তি।

যদি এই কথাই সত্য হয় যে, ব্রহ্ম কেবল আপনার অব্যক্তস্বরূপেই আনন্দিত তাহলে তাঁর সেই অব্যক্তস্বরূপের মধ্যে বিলীন না হলে নিরানন্দের হাত থেকে আমাদের কোনোক্রমেই নিস্তার থাকত না। কিন্তু তা তো নয়, প্রকাশেই যে তাঁর আনন্দ। নইলে এই জগৎ তিনি প্রকাশ করলেন কেন? বাইরে থেকে কোনো প্রকাণ্ড পীড়া জোর করে তাঁকে প্রকাশ করিয়েছে? মায়া নামক কোনো একটা পদার্থ ব্রহ্মকে একেবারে অভিভূত করে নিজেকে প্রকাশমান করেছে?

সে তো হতেই পারে না। তাই উপনিষৎ বলেছেন, আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি, এই যে প্রকাশমান জগৎ এ আর কিছু নয়, তাঁর মৃত্যুহীন আনন্দই রূপধারণ করে প্রকাশ পাচ্ছে। আনন্দই তাঁর প্রকাশ, প্রকাশেই তাঁর আনন্দ।

তিনি যদি প্রকাশেই আনন্দিত তবে আমি কি আনন্দের জন্যে অপ্রকাশের সন্ধান করব। তাঁর যদি ইচ্ছাই হয় প্রকাশ, তবে আমার এই ক্ষুদ্র ইচ্ছাটুকুর দ্বারা আমি তাঁর সেই প্রকাশের হাত এড়াই বা কেমন করে?

তাঁর আনন্দের সঙ্গে যোগ না দিয়ে আমি কিছুতেই আনন্দিত হতে পারব না। এর সঙ্গে যেখানেই আমার যোগ সম্পূর্ণ হবে সেইখানেই আমার মুক্তি হবে সেইখানেই আমার আনন্দ হবে। বিশ্বের মধ্যে তাঁর প্রকাশকে অবাধে উপলব্ধি করেই আমি মুক্ত হব—নিজের মধ্যে তাঁর প্রকাশকে অবাধে দীপ্যমান করেই আমি মুক্ত হব। ভববন্ধন অর্থাৎ হওয়ার বন্ধন ছেদন করে মুক্তি নয়—হওয়াকেই বন্ধনস্বরূপ না করে মুক্তিস্বরূপ করাই হচ্ছে মুক্তি। কর্মকে পরিত্যাগ করাই মুক্তি নয়, কর্মকে আনন্দোদ্ভব কর্ম করাই মুক্তি। তিনি যেমন আনন্দ প্রকাশ করছেন তেমনি আনন্দেই প্রকাশকে বরণ করা, তিনি যেমন আনন্দে কর্ম করছেন তেমনি আনন্দেই কর্মকে গ্রহণ করা, একেই বলি মুক্তি। কিছুই বর্জন না করে সমস্তকেই সত্যভাবে স্বীকার করে মুক্তি।

প্রতিদিনের এই যে অত্যন্ত পৃথিবী আমার কাছে জীর্ণ, অত্যন্ত প্রভাত আমার কাছে ম্লান, কবে এরাই আমার কাছে নবীন ও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে? যেদিন প্রেমের দ্বারা আমার চেতনা নবশক্তিতে জাগ্রত হয়। যাকে ভালোবাসি আজ তার সঙ্গে দেখা হবে এই কথা স্মরণ হলে কাল যা কিছু শ্রীহীন ছিল আজ সেই সমস্তই সুন্দর হয়ে ওঠে। প্রেমের দ্বারা চেতনা যে পূর্ণশক্তি লাভ করে সেই পূর্ণতার দ্বারাই সে সীমার মধ্যে অসীমকে রূপের মধ্যে অপরূপকে দেখতে পায় তাকে নূতন কোথাও যেতে হয় না। ওই অভাবটুকুর দ্বারাই অসীম সত্য তার কাছে সীমায় বদ্ধ হয়ে ছিল।

বিশ্ব তাঁর আনন্দরূপ, কিন্তু আমরা রূপকে দেখছি আনন্দকে দেখছি নে, সেইজন্যে রূপ কেবল পদে পদে আমাদের আঘাত করছে, আনন্দকে যেমনি দেখব অমনি কেউ আর আমাদের কোনো বাধা দিতে পারবে না। সেই তো মুক্তি।

সেই মুক্তি বৈরাগ্যের মুক্তি নয় সেই মুক্তি প্রেমের মুক্তি। ত্যাগের মুক্তি নয় যোগের মুক্তি। লয়ের মুক্তি নয় প্রকাশের মুক্তি।

৭ বৈশাখ

মুক্তির পথ

যে-ভাষা জানি নে সেই ভাষায় কাব্য যদি শোনা যায় তবে শব্দগুলো কেবলই আমার কানে ঠেকতে থাকে, সেই ভাষা আমাকে পীড়া দেয়।

ভাষার সঙ্গে যখন পরিচয় হয় তখন শব্দ আর আমার বাধা হয় না। তখন তার ভিতরকার ভাবটি গ্রহণ করবামাত্র শব্দই আনন্দকর হয়ে ওঠে, তখন তাকে কাব্য বলে বুঝতে পারি ভোগ করতে পারি।

বালক যখন কোনো দুর্বোধ ভাষার কাব্য শোনার পীড়া হতে মুক্তি প্রার্থনা করে তখন কাব্যপাঠ বন্ধ করে তাকে যে মুক্তি দেওয়া যায় সে মুক্তির মূল্য অতি তুচ্ছ। কিন্তু সেই পাঠটিকে তার পক্ষে সত্য করে তুলে পূর্ণ করে তুলে তাকে যে মূঢ়তার পীড়া হতে মুক্তি দেওয়া হয় সেই হচ্ছে যথার্থ মুক্তি, চিরন্তন মুক্তি।

পৃথিবীতে তেমনি হওয়াতেই যদি আমরা দুঃখ পাই, তাকে আমরা ভবযন্ত্রণা বলি। জগৎ যদি আমাদের আনন্দ না দেয়, তবে বিশ্বকবির এই বিরাট কাব্যকে অর্থহীন অমূলক পদার্থ বলে এর থেকে নিষ্কৃতি পাওয়াকেই আমরা চরিতার্থতা বলব।

কিন্তু এই কাব্যখানিকে আমরা নিজের ইচ্ছামত ছিঁড়ে পুড়িয়ে একেবারে এর চিহ্ন লোপ করে দিতে পারি এমন কথা মনে করবার কোনো হেতু নেই।

সমুদ্রকে বিলুপ্ত করে দিয়ে সমুদ্র পার হবার চেষ্টা করার চেয়ে সমুদ্রে পাড়ি দিয়ে পার হওয়া ঢের বেশি সহজ। এ পর্যন্ত কোনো দেশের মানুষ সমুদ্র সেঁচে ফেলবার চেষ্টা করে নি, তারা সাধ্যমতো নৌকো জাহাজ বানিয়েছে।

বিশ্বকাব্যকে নিরর্থক অপবাদ দিয়ে গুড়িয়ে নষ্ট করবার তপস্যায় প্রবৃত্ত না হয়ে বিশ্বকাব্য শোনাকে সার্থক করে তোলাই হচ্ছে যথার্থ মুক্তি।

এই বিশ্বপ্রকাশের রূপের মধ্যে যখন আনন্দকে দেখব কেবলই রূপকে দেখব না, তখন রূপ আমাকে আর বাধা দেবে না। সে যে কেবল পথ ছেড়ে দেবে তা নয় আনন্দই দেবে। ভাবটি বোঝবামাত্র ভাষা যে কেবল তার পীড়াকরতা ত্যাগ করে তা নয় ভাষা তখন নিজের সৌন্দর্য উদ্‌ঘাটন করে আনন্দময় হয়ে ওঠে, ভাবে ভাষায় অন্তরে বাহিরে মিলন তখন আমাদের মুগ্ধ করে। তখন সেই ভাষার উপরে যদি কেউ কিছুমাত্র হস্তক্ষেপ করে সে আমাদের পক্ষে অসহ্য হয়ে ওঠে।

কিন্তু এই যে ভিতরকার আনন্দ এটা বাইরে থেকে বোঝা যায় না, এটা নিজের ভিতর থেকেই বুঝতে হয়। যে ভাষা জানি নে কেবলমাত্র বাইরে থেকে বইয়ের উপর চোখ বুলিয়ে বুলিয়ে কোনো কালেই তাকে পাওয়া যায় না। চোখ কান সেখান থেকে প্রতিহতই হতে থাকে। নিজের ভিতরকার জ্ঞানের শক্তিতেই তাকে বুঝতে হয়। যখন একবার ভিতর বুঝি তখন বাইরে আর কোনো বাধা থাকে না। তখন বাইরেও আনন্দ প্রকাশিত হয়।

আমার মধ্যে যখন আনন্দের আবির্ভাব হয় তখন বাইরের আনন্দরূপ আপনি আমার কাছে অমৃতে পূর্ণ হয়ে দেখা দেয়। পাওয়াই পাওয়াকে টেনে নিয়ে আসে। মরুভূমির রসহীন তপ্ত বাতাসের ঊর্ধ্ব দিয়ে কত মেঘ চলে যায়—শুষ্ক হাওয়া তার কাছ থেকে বৃষ্টি আদায় করে নিতে পারে না। যেখানে হাওয়ার মধ্যেই জল আছে সেখানে সজল মেঘের সঙ্গে তার যোগ হয়ে বর্ষণ উপস্থিত হয়।

আমার মধ্যে যদি আনন্দ না থাকে তবে বিশ্বের চিরানন্দপ্রবাহ আমার উপর দিয়ে নিরর্থক হয়েই চলে যায়—আমি তার কাছ থেকে রস আদায় করতে পারি নে।

আমার মধ্যে জ্ঞানের উন্মেষ হলে তখন সেই জ্ঞানদৃষ্টিতেই জানতে পারি বিশ্বের কোথাও জ্ঞানের ব্যত্যয় নেই, তাকেই আমরা বিজ্ঞান বলি। যে মূঢ়, যার জ্ঞানদৃষ্টি খোলে নি সে বিশ্বেও সর্বত্র মূঢ়তা দেখে, বিশ্ব তার কাছে ভূতপ্রেত দৈত্যদানায় বিভীষিকাপূর্ণ হয়ে ওঠে।

এমনি সকল বিষয়েই। আমার মধ্যে যদি প্রেম না জাগে আনন্দ না থাকে তবে

বিশ্ব আমার পক্ষে কারাগার। সেই কারাগার থেকে পালাবার চেষ্টা মিথ্যা, প্রেমকে জাগিয়ে তোলাই মুক্তি। কোনো ব্যায়ামের দ্বারা কোনো কৌশলের দ্বারা মুক্তি নেই।

বিজ্ঞানের সাধনা যেমন আমাদের প্রাকৃতিক জ্ঞানের বন্ধন মোচন করছে তেমনি মঙ্গলের সাধনাই আমাদের প্রেমের, আমাদের আনন্দের বন্ধন মোচন করে দেয়। এই মঙ্গলসাধনাই আমাদের সংকীর্ণ প্রেমকে প্রশস্ত, খামখেয়ালি প্রেমকে জ্ঞানসম্মত করে তোলে।

বিজ্ঞানে প্রকৃতির মধ্যে আমাদের জ্ঞান যোগযুক্ত হয়। সে বিচ্ছিন্ন জ্ঞান নয়, সে অতীতে বর্তমানে ভবিষ্যতে দূরে ও নিকটে সর্বত্র ঐক্যের দ্বারা অনন্তের সঙ্গে যুক্ত। মঙ্গলেও তেমনি প্রেম সর্বত্র যোগযুক্ত হয়। সমস্ত সাময়িকতা ও স্থানিকতাকে অতিক্রম করে সে অনন্তে মিলিত হয়। তার কাছে দূর নিকটের ভেদ ঘোচে, পরিচিত অপরিচিতের ভেদ ঘুচে যায়। তখনই প্রেমের বন্ধন মোচন হয়ে যায়। একেই তো বলে মুক্তি।

বুদ্ধদেব শূন্যকে মানতেন কি পূর্ণকে মানতেন সে তর্কের মধ্যে যেতে চাই নে। কিন্তু তিনি মঙ্গলসাধনার দ্বারা প্রেমকে বিশ্বচরাচরে মুক্ত করতে উপদেশ দিয়েছিলেন। তাঁর মুক্তির সাধনাই ছিল স্বার্থত্যাগ অহংকারত্যাগ ক্রোধত্যাগের সাধনা, ক্ষমার সাধনা দয়ার সাধনা প্রেমের সাধনা। এমনি করে প্রেম যখন অহং-এর শাসন অতিক্রম করে বিশ্বের মধ্যে অনন্তের মধ্যে মুক্ত হয়, তখন সে যা পায় তাকে যে নামই দাও না কেন, সে কেবল ভাষার বৈচিত্র্যমাত্র, কিন্তু সেই-ই মুক্তি। এই প্রেম যা যেখানে আছে কিছুকেই ত্যাগ করে না, সমস্তকেই সত্যময় করে পূর্ণতর করে উপলব্ধি করে। নিজেকে পূর্ণের মধ্যে সমর্পণ করবার কোনো বাধাই মানে না।

আত্মার মধ্যে পরমাত্মার অনন্ত প্রেম অনন্ত আনন্দকে অবাধে উপলব্ধি করবার উপায় হচ্ছে, পাপপরিশূন্য মঙ্গলসাধন। সেই উপলব্ধি যতই বন্ধনহীন যতই সত্য হতে থাকবে ততই বিশ্বসংসারে সমস্ত ইন্দ্রিয়বোধে চিন্তায় ভাবে কর্মে আমাদের আনন্দ অব্যাহত হবে। আমরা তখন পরমাত্মার দিক থেকেই জগৎকে দেখব—নিজের দিক থেকে নয়। তখনই জগতের সত্য আমাদের কাছে আনন্দে পরিপূর্ণ হবে, মহাকবির চিরন্তন কাব্য আমাদের কাছে সার্থক হয়ে উঠবে।

৭ বৈশাখ

৯

আশ্রম

শান্তিনিকেতনের বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে

প্রভাতের সূর্য যে উৎসবদিনটির পত্রদলগুলিকে দিকে দিকে উদ্‌ঘাটিত করে দিলেন তারই মর্মকোষের মধ্যে প্রবেশ করবার জন্যে আজ আমাদের আহ্বান আছে। তার স্বর্ণরেণুর অন্তরালে যে মধু সঞ্চিত আছে, সেখান থেকে কি কোনো সুগন্ধ আজ আমাদের হৃদয়ের মাঝখানে এসে পৌঁছোয় নি? এই বিশ্ব-উপবনের রহস্য-নিলয়ের ভিতরটিতে প্রবেশের সহজ অধিকার আছে যার, সেই চিত্তমধুকর কি আজও এখনও জাগল না? কোনো বাতাসে এখনও সে কি খবর পায় নি? আজকের দিন যে একটি অনেক দিনের খবর নিয়ে,বেরিয়েছে এবং সে যে সম্মুখের অনেক দিনের দিকেই চলেছে। সে যে দূর ভবিষ্যতের পথিক। আজ তাকে ধরে, দাঁড় করিয়ে আমাদের প্রশ্ন করতে হবে, তার যা কিছু কথা আছে সমস্ত আদায় করে নেওয়া চাই। সমস্ত মন দিয়ে না জিজ্ঞাসা করলে সে কাউকে কিছুই বলে না, তখন আমরা মনে করি, এই গান, এই বাদ্যধ্বনি, এই জনতার কোলাহল, এই বুঝি তার যা ছিল সমস্ত, আর বুঝি তার কোনো বাণী নেই। কিন্তু এমন করে তাকে যেতে দেওয়া হবে না, আজ এই সমস্ত কোলাহলের মধ্যে যে নিস্তব্ধ হয়ে আছে সেই পথিকটিকে জিজ্ঞাসা করো, আজ এ কিসের উৎসব?

প্রতি বৎসর বসন্তে আমের বনে ফলভরা শাখার মধ্যে দক্ষিণের বাতাস বইতে থাকে, সেই সময়ে আমের বনে তার বার্ষিক উৎসবের ঘটা। কিন্তু এই উৎসবের উৎসবত্ব কী নিয়ে, কিসের জন্যে? না, যে বীজ থেকে আমের গাছ জন্মেছে সেই বীজ অমর হয়ে গেছে এই শুভ খবরটি দেবার জন্যে। বৎসরে বৎসরে ফল ধরছে, সে ফলের মধ্যে সেই একই বীজ, সেই পুরাতন বীজ। সে আর কিছুতেই ফুরোচ্ছে না, সে নিত্যকালের পথে নিজেকে দ্বিগুণিত চতুর্গুণিত সহস্রগুণিত করে চলেছে।

শান্তিনিকেতনের সাংবৎসরিক উৎসবের সফলতার মর্মস্থান যদি উদ্‌ঘাটন করে দেখি তবে দেখতে পাব এর মধ্যে সেই বীজ অমর হয়ে আছে যে বীজ থেকে এই আশ্রমবনস্পতি জন্মলাভ করেছে।

সে হচ্ছে সেই দীক্ষাগ্রহণের বীজ। মহর্ষির সেই জীবনের দীক্ষা এই আশ্রম-বনস্পতিতে আজ আমাদের জন্যে ফলছে এবং আমাদের আগামীকালের উত্তরবংশীয়দের জন্যে ফলতেই চলবে।

বহুকাল পূর্বে কোন্‌ একদিনে মহর্ষি দীক্ষাগ্রহণ করেছিলেন, সে খবর কজন লোকই বা জানত? যারা জেনেছিল যারা দেখেছিল তারা মনে মনে ঠিক করেছিল এই একটি ঘটনা আজকে ঘটল এবং আজকেই এটা শেষ হয়ে গেল।

কিন্তু এই দীক্ষাগ্রহণ ব্যাপারটিকে সেই সুদূর কালের ৭ই পৌষ নিজের কয়েক ঘণ্টার মধ্যে নিঃশেষ করে ফেলতে পারে নি। সেই একটি দিনের মধ্যেই একে কুলিয়ে উঠল না। সেদিন যার খবর কেউ পায় নি এবং তারপরে বহুকাল পর্যন্ত যার পরিচয় পৃথিবীর কাছে অজ্ঞাত ছিল, সেই ৭ই পৌষের দীক্ষার দিন আজ অমর হয়ে বৎসরে বৎসরে উৎসবফল প্রসব করছে।

আমাদের জীবনে কত শত ঘটনা ঘটে যাচ্ছে কিন্তু চিরপ্রাণ তো তাদের স্পর্শ করে না, তারা ঘটছে এবং মিলিয়ে যাচ্ছে তার হিসেব কোথাও থাকছে না।

কিন্তু মহাপ্রাণ এসে কার জীবনের কোন্‌ মুহূর্তটিকে কখন লুকিয়ে স্পর্শ করে দেন, তার উপরে নিজের অদৃশ্য চিহ্নটি লিখে দিয়ে চলে যান, তারপরে তাকে কেউ না দেখুক না জানুক, সে হেলায় ফেলায় পড়ে থাক্‌, তাকে আবর্জনা বলে লোকে ঝেঁটিয়ে ফেলুক, সেদিনকার এবং তারপরে বহুদিনকার ইতিহাসের পাতে তার কোনো উল্লেখ না থাকুক, কিন্তু সে রয়ে গেল। জগতের রাশি রাশি মৃত্যু ও বিস্মৃতির মাঝখান থেকে সে আপনার অঙ্কুরটি নিয়ে অতি অনায়াসে মাথা তুলে ওঠে, নিত্যকালের সূর্যালোক এবং নিত্যকালের সমীরণ তাকে পালন করবার ভার গ্রহণ করে, সদাচঞ্চল সংসারের ভয়ংকর ঠেলাঠেলিতেও তাকে আর সরিয়ে ফেলতে পারে না।

মহর্ষির জীবনের একটি ৭ই পৌষকে সেই প্রাণস্বরূপ অমৃতপুরুষ একদিন নিঃশব্দে স্পর্শ করে গিয়েছেন, তার উপরে আর মৃত্যুর অধিকার রইল না। সেই দিনটি তাঁর জীবনের সমস্ত দিনকে ব্যাপ্ত করে কীরকম করে প্রকাশ পেয়েছে তা কারও অগোচর নেই। তারপরে তাঁর দীর্ঘ জীবনের মধ্যেও সেই দিনটির শেষ হয় নি। আজও সে বেঁচে আছে—শুধু বেঁচে নেই, তার প্রাণশক্তির বিকাশ ক্রমশই প্রবলতর হয়ে উঠছে।

পৃথিবীতে আমরা অধিকাংশ লোকই প্রচ্ছন্ন হয়ে আছি আমাদের মধ্যে সেই প্রকাশ নেই, যে-প্রকাশকে ঋষি আহ্বান করে বলেছেন, আবিরাবীর্ম এধি—হে

প্রকাশ, তুমি আমাতে প্রকাশিত হও। তাঁর সেই প্রকাশ যার জীবনে আবির্ভূত তিনি তো আর নিজের ঘরের প্রাচীরের দ্বারা নিজেকে আড়াল করে রাখতে পারেন না এবং তিনি নিজের আয়ুটুকুর মধ্যেই নিজে সমাপ্ত হয়ে থাকেন না। নিজের মধ্যে থেকে তাঁকে সর্বদেশে এবং নিত্যকালে বাহির হতেই হবে। সেই জন্যেই উপনিষৎ বলেছেন

যদৈতম্ অনুপশ্যতি আত্মানং দেবম্ অঞ্জসা।
ঈশানং ভূতভব্যস্য ন ততো বিজুগুপ্সতে।

যখন এই দেবতাকে এই পরমাত্মাকে এই ভূতভবিষ্যতের ঈশ্বরকে কোনো ব্যক্তি সাক্ষাৎ দেখতে পান তখন তিনি আর গোপনে থাকতে পারেন না।

তাঁকে যিনি সাক্ষাৎ দেখেছেন অর্থাৎ একেবারে নিজের অন্তরাত্মার মাঝখানেই দেখেছেন তাঁর আর পর্দা নেই, দেয়াল নেই, প্রাচীর নেই। তিনি সমস্ত দেশের, সমস্ত কালের। তাঁর কথার মধ্যে, আচরণের মধ্যে, নিত্যতার লক্ষণ আপনিই প্রকাশ পেতে থাকে।

এর কারণ কী? এর কারণ হচ্ছে এই যে, তিনি যে আত্মানং, সকল আত্মার আত্মাকে দেখেছেন। যারা সেই আত্মাকে দেখে নি তারা অহংকেই বড়ো করে দেখে। তারা বাহিরের দরজার কাছেই ঠেকে গিয়েছে। তারা কেবল আমার খাওয়া আমার পরা, আমার বুদ্ধি আমার মত, আমার খ্যাতি আমার বিত্ত—একেই প্রধান করে দেখে। এই যে অহংকার এতে সত্য নেই, নিত্য নেই; এ আলোকের দ্বারা নিজেকে প্রকাশ করতে পারে না, আঘাতের দ্বারা প্রকাশ করতে চেষ্টা করে।

কিন্তু যে-লোক আত্মাকে দেখেছে সে আর অহং-এর দিকে দৃক্‌পাত করতে চায় না। তার সমস্ত অহং-এর আয়োজন পুড়ে ছাই হয়ে যায়। যে-প্রদীপে আলোকের শিখা ধরে নি সেই তো নিজের প্রচুর তেল ও সলতের সঞ্চয় নিয়ে গর্ব করে। আর যাতে আলো একবার ধরে গিয়েছে সে কি আর নিজের তেল সলতের দিকে ফিরে তাকায়? সে ওই আলোটির পিছনে তার সমস্ত তেল সমস্ত সলতে উৎসর্গ করে দেয়। কিন্তু সে একেবারে প্রকাশ হয়ে পড়ে, সে আর নিজের আড়ালে গোপনে থাকতে পারে না।

ন ততো বিজুগুপ্সতে। কেন? কেননা তিনি অনুপশ্যতি আত্মানং দেবং। তিনি আত্মাকে দেখেছেন, দেবকে দেখেছেন। দেব শব্দের অর্থ দীপ্তিমান। আত্মা যে দেব, আত্মা যে জ্যোতির্ময়। আত্মা যে স্বতঃপ্রকাশিত। অহং প্রদীপ মাত্র, আর আত্মা যে আলোক। অহং দীপ যখন এই দীপ্তিকে এই আত্মাকে উপলব্ধি করে তখন

সে কি আর অহংকারের সঞ্চয় নিয়ে থাকে ? তখন সে আপনার সব দিয়েই সেই আলোককেই প্রকাশ করে।

সে যে তাঁকে দেখেছে যিনি ঈশানো ভূতভব্যস্য, যিনি অতীত ও ভবিষ্যতের অধিপতি। সেই জন্যেই সে যে সেই বৃহৎ কালের ক্ষেত্রেই আপনাকে এবং সব কিছুকেই দেখতে পায়। সে তো কোনো সাময়িক আসক্তির দ্বারা বদ্ধ হয় না, কোনো সাময়িক ক্ষোভের দ্বারা বিচলিত হতে পারে না। এই জন্যই তার বাক্য ও কর্ম নিত্য হয়ে ওঠে। তা কালে কালে ক্রমশই প্রবলতর হয়ে ব্যক্ত হতে থাকে। যদি বা কোনো এক সময়ে কোনো কারণে তা আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে তবে নিজের আচ্ছাদনকে দগ্ধ করে আবার নবীনতর উজ্জ্বলতায় সে দীপ্যমান হয়ে ওঠে।

মহর্ষির ৭ই পৌষের দীক্ষার উপরে আত্মার দীপ্তি পড়েছিল, তার উপরে ভূত ভবিষ্যতের যিনি ঈশান তাঁর আবির্ভাব হয়েছিল। এই জন্যে সেই দীক্ষা ভিতরে থেকে তাঁর জীবনকে ধনী গৃহের প্রস্তরকঠিন আচ্ছাদন থেকে সর্বদেশ সর্বকালের দিকে উদ্‌ঘাটিত করে দিয়েছে। এবং সেই ৭ই পৌষ এই শান্তিনিকেতন আশ্রমকে সৃষ্টি করেছে এবং এখনও প্রতিদিন একে সৃষ্টি করে তুলছে।

তিনি আজ প্রায় অর্ধ শতাব্দী হল যেদিন এর সপ্তপর্ণের ছায়ায় এসে বসলেন সেদিন তিনি জানতেন না যে, তাঁর জীবনের সাধনা এইখানে নিত্য হয়ে বিরাজ করবে। তিনি ভেবেছিলেন নির্জন উপাসনার জন্যে এখানে তিনি একটি বাগান তৈরি করেছেন। কিন্তু ন ততো বিজুগুপ্সতে। যে-জায়গায় বড়ো এসে দাঁড়ান সে-জায়গাকে ছোটো বেড়া দিয়ে আর ঘেরা যায় না। ধনীর সন্তান নিজেকে যেমন পারিবারিক ধনমানসম্ভ্রমের মধ্যে ধরে রাখতে পারেন নি সকলের কাছে তাঁকে বেরিয়ে পড়তে হয়েছে, তেমনি এই শান্তিনিকেতনকেও তিনি আর বাগান করে রাখতে পারলেন না। এ তাঁর বিষয়সম্পত্তির আবরণকে বিদীর্ণ করে ফেলে বেরিয়ে পড়েছে। এ আপনিই আজ আশ্রম হয়ে দাঁড়িয়েছে। যিনি ঈশানো ভূতভব্যস্য, তাঁর স্পর্শে বোলপুরের মাঠের এই ভূখণ্ডটুকু ভূত ও ভবিষ্যতের মধ্যে ব্যাপ্ত হয়ে দেখা দিয়েছে।

এই আশ্রমটির মধ্যে ভারতবর্ষের একটি ভূতকালের আবির্ভাব আছে। সে হচ্ছে সেই তপোবনের কাল। যে-কালে ভারতবর্ষ তপোবনে শিক্ষালাভ করেছে, তপোবনে সাধনা করেছে এবং সংসারের কর্ম সমাধা করে তপোবনে জীবিতেশ্বরের কাছে জীবনের শেষ নিশ্বাস নিবেদন করে দিয়েছে। যে-কালে ভারতবর্ষ জল স্থল আকাশের সঙ্গে আপনার যোগ স্থাপন করেছে এবং তরুলতা পশুপক্ষীর সঙ্গে আপনার বিচ্ছেদ দূর করে দিয়ে—সর্বভূতেষু চাত্মানং—আত্মাকে সর্বভূতের মধ্যে দর্শন করেছে।

শুধু ভূতকাল নয়, এই আশ্রমটির মধ্যে একটি ভবিষ্যৎকালের আবির্ভাব আছে। কারণ, সত্য কোনো অতীতকালের জিনিস হতেই পারে না। যা একেবারেই হয়ে চুকে গেছে, যার মধ্যে ভবিষ্যতে আর হবার কিছুই নেই তা মিথ্যা, তা মায়া। বিশ্বপ্রকৃতির মাঝখানে দাঁড়িয়ে আত্মার সঙ্গে ভূমার যোগসাধনা এই যদি সত্য সাধনা হয়, তবে এই সাধনার মধ্যে এসে উপস্থিত না হলে কোনো কালের কোনো সমস্যার মীমাংসা হতে পারবে না। এই সাধনা না থাকলে সত্যের সঙ্গে মঙ্গলকে আমরা এক করে দেখতে পাব না, মঙ্গলের সঙ্গে সুন্দরের আমরা বিচ্ছেদ ঘটিয়ে রাখব। এই সাধনা না থাকলে আমরা জগতে অনৈক্যকেই বড়ো করে জানব এবং স্বাতন্ত্র্যকেই পরম পদার্থ বলে জ্ঞান করব, পরস্পরকে খর্ব করে প্রবল হয়ে ওঠবার জন্য কেবলই ঠেলাঠেলি করতে থাকব। সমস্তকে এক করে নিয়ে যিনি শান্তং শিবং অদ্বৈতং-রূপে বিরাজ করছেন তাঁকে সর্বত্র উপলব্ধি করবার জন্যে না পাব অবকাশ না পাব মনের শান্তি।

অতএব সংসারের সমস্ত ঘাত-প্রতিঘাত কাড়াকাড়ি-মারামারি যাতে একান্ত হয়ে উত্তপ্ত হয়ে না ওঠে সে জন্যে এক জায়গায় শান্তং শিবং অদ্বৈতং-এর সুরটিকে বিশুদ্ধভাবে জাগিয়ে রাখবার জন্যে তপোবনের প্রয়োজন। সেখানে ক্ষণিকের আবর্ত নয়, সেখানে নিত্যের আবির্ভাব, সেখানে পরস্পরের বিচ্ছেদ নয় সেখানে সকলের সঙ্গে যোগের উপলব্ধি। সেখানকারই প্রার্থনামন্ত্র হচ্ছে, অসতোমা সদ্গময়, তমসোমা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মামৃতংগময়।

সেই তপোবনটি মহর্ষির জীবনের প্রভাবে এখানে আপনি হয়ে উঠেছে। এখানকার বিরাট প্রান্তরের মধ্যে তপস্যার দীপ্তি আপনিই বিস্তীর্ণ হয়েছে। এখানকার তরুলতার মধ্যে সাধনার নিবিড়তা আপনিই সঞ্চিত হয়ে উঠেছে। ঈশানো ভূতভব্যস্য এখানকার আকাশের মধ্যে তাঁর একটি বড়ো আসন পেতেছেন। সেই মহৎ আবির্ভাবটি আশ্রমবাসী প্রত্যেকের মধ্যে প্রতিদিন কাজ করছে। প্রত্যেক দিনটি প্রান্তরের প্রান্ত হতে নিঃশব্দে উঠে এসে তাদের দুই চক্ষুকে আলোকের অভিষেকে নির্মল করে দিচ্ছে। সমস্ত দিনই আকাশ অলক্ষ্যে তাদের অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করে জীবনের সমস্ত সংকোচগুলিকে দুই হাত দিয়ে ধীরে ধীরে প্রসারিত করে দিচ্ছে। তাদের হৃদয়ের গ্রন্থি অল্পে অল্পে মোচন হচ্ছে, তাদের সংস্কারের আবরণ ধীরে ধীরে ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে, তাদের ধৈর্য দৃঢ়তর ক্ষমা গভীরতর হয়ে উঠছে এবং আনন্দময় পরমাত্মার সঙ্গে তাদের অব্যবহিত চেতনাময় যোগের ব্যবধান একদিন ক্ষীণ হয়ে দূর হয়ে যাবে সেই শুভক্ষণের জন্যে তারা প্রতিদিন পূর্ণতর আশার সঙ্গে প্রতীক্ষা করে আছে। তারা দুঃখকে

অপমানকে আঘাতকে উদার শক্তির সঙ্গে বহন করবার জন্য দিনে দিনে প্রস্তুত হচ্ছে এবং যে জ্যোতির্ময় পরমানন্দধারা বিশ্বের দুই কূলকে উদ্বেল করে দিয়ে নিরন্তর-ধারায় দিগ্‌দিগন্তরে ঝরে পড়ে যাচ্ছে জীবনকে তারই কাছে নত করে ধরবার জন্যে তারা একটি আহ্বান শুনতে পাচ্ছে।

এই তপোবনটির মধ্যে একটি নিগূঢ় রহস্যময় সৃষ্টির কাজ চলছে সেই রহস্যটি আমাদের মধ্যে কে দেখতে পাচ্ছে! যে একটি জীবন দেহের আবরণ আজ ঘুচিয়ে দিয়ে পরমপ্রাণের পদপ্রান্তে আপনাকে সম্পূর্ণ সমর্পণ করে দিয়েছে সেই জীবনের ভারামুক্ত ভয়মুক্ত অতি বিশুদ্ধ আনন্দ এখানকার নিস্তব্ধ আকাশের মধ্যে নির্মল ভক্তিরসে সরস একটি পবিত্র বাণীকে কেবলই বিকীর্ণ করছে, কেবলই বলছে তিনি আমার প্রাণের আরাম আত্মার শান্তি মনের আনন্দ, সে বলা আর শেষ হচ্ছে না। সেই আনন্দের কাজ আর ফুরোল না।

জগতে একমাত্র আনন্দই যে সৃষ্টি করে, সৃষ্টির শক্তি তো আর কিছুরই নেই। এখানকার আকাশপ্লাবী অবারিত আলোকের মাঝখানে বসে আনন্দের সঙ্গে তাঁর যে আনন্দ মিলেছিল, সেই আনন্দ সেই আনন্দসম্মিলন তো শূন্যতার মধ্যে বিলীন হতে পারে না। এই আনন্দই আজও সৃষ্টি করছে, এই আশ্রমকে সৃষ্টি করে তুলছে, এখানকার গাছপালা শ্যামলতার উপরে একটি প্রগাঢ় শান্তির সুস্নিগ্ধ অঞ্জন প্রতিদিন যেন নিবিড় করে মাখিয়ে দিচ্ছে। অনেকদিনের অনেক সুগভীর আনন্দ-মুহূর্ত এখানকার সূর্যোদয়কে, সূর্যাস্তকে এবং নিশিথ রাত্রের নীরব নক্ষত্রলোককে দেবর্ষি নারদের বীণার তারগুলির মতো অনির্বচনীয় ভক্তির সুরে আজও কম্পিত করে তুলছে। সেই আনন্দসৃষ্টির অমৃতময় রহস্য আমরা আশ্রমবাসীরা কি প্রতিদিন উপলব্ধি করতে পারব না? একদিন একজন সাধক অকস্মাৎ কোথা থেকে কোথায় যেতে এই ছায়াশূন্য বিপুল প্রান্তরের মধ্যে যুগল সপ্তপর্ণ গাছের তলায় বসলেন, সেই দিনটি আর মরল না। সেই দিনটি বিশ্বকর্মার সৃষ্টিশক্তির মধ্যে চিরদিনের মতো আটকা পড়ে গেল। শূন্য প্রান্তরের পটের উপরে রঙের পর রং, প্রাণের পর প্রাণ ফলিয়ে তুলতে লাগল। যেখানে কিছুই ছিল না, যেখানে ছিল বিভীষিকা সেখানে একটি পূর্ণতার মূর্তি প্রথমে আভাসে দেখা দিল তার পরে ক্রমে ক্রমে দিনে দিনে বর্ণে বর্ণে স্পষ্টতর হয়ে উঠতে লাগল। এই যে আশ্চর্য রহস্য, জীবনের নিগূঢ় ক্রিয়া, আনন্দের নিত্যলীলা, সে কি আমরা এখানকার শালবনের মর্মরে, এখানকার আম্রবনের ছায়াতলে উপলব্ধি করতে পারব না? শরতের অপরিমেয় শুভ্রতা যখন এখানে শিউলি ফুলের অজস্র বিকাশের মধ্যে আপনাকে প্রভাতের পর প্রভাতে ব্যক্ত করে করে কিছুতে আর ক্লান্তি মানতে

চায় না তখন সেই অপর্যাপ্ত পুষ্পবৃষ্টির মধ্যে আরও একটি অপরূপ শুভ্রতায় অমৃতবর্ষণ কি নিঃশব্দে আমাদের জীবনের মধ্যে অবতীর্ণ হতে থাকে না? এই পৌষের শীতের প্রভাতে দিক্‌প্রান্তের উপর থেকে একটি সূক্ষ্ম শুভ্র কুহেলিকার আচ্ছাদন যখন উঠে যায়, আমলকীকুঞ্জের ফলভারপূর্ণ কম্পিত শাখাগুলির মধ্যে উত্তর বায়ু সূর্যকিরণকে পাতায় পাতায় নৃত্য করাতে থাকে এবং সমস্ত দিন শীতের রৌদ্র এখানকার অবাধ-প্রসারিত মাঠের উপরকার সুদূরতাকে একটি অনির্বচনীয় বাণীর দ্বারা ব্যাকুল করে তোলে, তখন এর ভিতর থেকে আর একটি গভীরতর আনন্দ-সাধনার স্মৃতি কি আমাদের হৃদয়ের মধ্যে ব্যাপ্ত হয়ে পড়ে না? একটি পবিত্র প্রভাব, একটি অপরূপ সৌন্দর্য, একটি পরম প্রেম কি ঋতুতে ঋতুতে ফলপুষ্পপল্লবের নব নব বিকাশে আমাদের সমস্ত অন্তঃকরণে তার অধিকার বিস্তার করছে না? নিশ্চয়ই করছে। কেননা এইখানেই যে একদিন সকলের চেয়ে বড়ো রহস্যনিকেতনের একটি দ্বার খুলে গিয়েছে। এখানে গাছের তলায় প্রেমের সঙ্গে প্রেম মিলেছে, দুই আনন্দ এক হয়েছে। যেই—এষঃ অস্য পরম আনন্দঃ, যে ইনি ইহার পরমানন্দ সেই ইনি এবং এ কতদিন এইখানে মিলেছে—হঠাৎ কত উষার আলোয়, কত দিনের অবসানবেলায়, কত নিশীথ রাত্রের নিস্তব্ধ প্রহরে—প্রেমের সঙ্গে প্রেম, আনন্দের সঙ্গে আনন্দ! সেদিন যে-দ্বার খোলা হয়েছে সেই দ্বারের সম্মুখে এসে আমরা দাঁড়িয়েছি, কিছুই কি শুনতে পাব না? কাউকেই কি দেখা যাবে না? সেই মুক্ত দ্বারের সামনে আজ আমাদের উৎসবের মেলা বসেছে, ভিতর থেকে কি একটি আনন্দগান বাহির হয়ে এসে আমাদের এই সমস্ত দিনের কলরবকে সুধাসিক্ত করে তুলবে না? না, তা কখনোই হতে পারে না। বিমুখ চিত্তও ফিরবে, পাষাণহৃদয়ও গলবে, শুষ্ক শাখাতেও ফুল ফুটে উঠবে। হে শান্তিনিকেতনের অধিদেবতা, পৃথিবীতে যেখানেই মানুষের চিত্ত বাধামুক্ত পরিপূর্ণ প্রেমের দ্বারা তোমাকে স্পর্শ করেছে সেইখানেই অমৃতবর্ষণে একটি আশ্চর্য শক্তি সঞ্জাত হয়েছে। সে-শক্তি কিছুতেই নষ্ট হয় না, সে-শক্তি চারিদিকের গাছপালাকেও জড়িয়ে ওঠে, চারিদিকের বাতাসকে পূর্ণ করে। কিন্তু তোমার এই একটি আশ্চর্য লীলা, শক্তিকে তুমি আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ করে রেখে দিতে চাও না। তোমার পৃথিবী আমাদের একটি প্রচণ্ড টানে টেনে রেখেছে, কিন্তু তার দড়িদড়া তার টানাটানি কিছুই চোখে পড়ে না। তোমার বাতাস আমাদের উপর যে ভার চাপিয়ে রেখেছে সেটি কম ভার নয়, কিন্তু বাতাসকে আমরা ভারী বলেই জানি নে। তোমার সূর্যালোক নানাপ্রকারে আমাদের উপর যে শক্তিপ্রয়োগ করছে যদি গণনা করতে যাই তার পরিমাণ দেখে আমরা স্তম্ভিত হয়ে যাই কিন্তু তাকে আমরা আলো বলেই জানি শক্তি বলে জানি নে।

তোমার শক্তির উপরে তুমি এই একটি হুকুম জারি করেছ সে লুকিয়ে লুকিয়ে আমাদের কাজ করবে এবং দেখাবে যেন সে খেলা করছে।

কিন্তু তোমার এই আধিভৌতিক শক্তি, যা আলো হয়ে আমাদের সামনে নানা রঙের ছবি আঁকছে, যা বাতাস হয়ে আমাদের কানে নানা সুরে গান করছে, যা বলছে "আমি জল," ব'লে আমাদের স্নান করাচ্ছে, যা বলছে "আমি স্থল," ব'লে আমাদের কোলে করে রেখেছে—যখন শক্তির সঙ্গে আমাদের জ্ঞানের যোগ হয়, যখন তাকে আমরা শক্তি বলেই জানতে পারি—তখন তার ক্রিয়াকে আমরা অনেক বেশি করে অনেক বিচিত্র করে লাভ করি। তখন তোমার যে-শক্তি আমাদের কাছে সম্পূর্ণ আত্মগোপন করে কাজ করছিল সে আর ন ততো বিজুগুপ্সতে। তখন বাষ্পের শক্তি আমাদের দূরে বহন করে, বিদ্যুতের শক্তি আমাদের দুঃসাধ্য প্রয়োজন সাধন করতে থাকে। তেমনি তোমার অধ্যাত্ম শক্তি আনন্দের প্রস্রবণ থেকে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে এই আশ্রমটির মধ্যে আপনিই নিঃশব্দে কাজ করে যাচ্ছে, দিনে দিনে ধীরে ধীরে গভীরে গোপনে। কিন্তু সচেতন সাধনার দ্বারা যে মুহূর্তে আমাদের বোধের সঙ্গে তার যোগ ঘটে যায় সেই মুহূর্ত হতেই সেই শক্তির ক্রিয়া দেখতে দেখতে আমাদের জীবনের মধ্যে পরিব্যাপ্ত ও বিচিত্র হয়ে ওঠে। তখন সেই যে কেবল একলা কাজ করে তা নয়, আমরাও তখন তাকে কাজে লাগাতে পারি। তখন তাতে আমাতে মিলে সে এক আশ্চর্য ব্যাপার হয়ে উঠতে থাকে। তখন যাকে কেবলমাত্র চোখে দেখতুম, কানে শুনতুম, অন্তর বাহিরের যোগে তার অনন্ত আনন্দরূপটি একেবারে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে—সে আর ন ততো বিজুগুপ্‌সতে। সে তো কেবল বস্তু নয়, কেবল ধ্বনি নয়, সেই আনন্দ, সেই আনন্দ।

জ্ঞানের যোগে আমরা জগতে তোমার শক্তিরূপ দেখি, অধ্যাত্মযোগে জগতে তোমার আনন্দরূপ দেখতে পাই। তোমার সাধকের এই আশ্রমটির যে একটি আনন্দরূপ আছে সেইটি দেখতে পেলেই আমাদের আশ্রমবাসের সার্থকতা হবে। কিন্তু সেটি তো অচেতনভাবে হবে না, সেটি তো মুখ ফিরিয়ে থাকলে পাব না। হে যোগী, তুমি যে আমাদের দিক থেকেও যোগ চাও—জ্ঞানের যোগ, প্রেমের যোগ, কর্মের যোগ। আমরা শক্তির দ্বারাই তোমার শক্তিকে পাব ভিক্ষার দ্বারা নয়, এই তোমার অভিপ্রায়। তোমার জগতে যে ভিক্ষুকতা করে সেই সবচেয়ে বঞ্চিত হয়। যে-সাধক আত্মার শক্তিকে জাগ্রত করে আত্মানং পরিপশ্যতি, ন ততো বিজুগুপ্সতে। সে এমনি পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে যে আপনাকে আর গোপন করতে পারে না। আজ উৎসবের দিনে তোমার কাছে সেই শক্তির দীক্ষা আমরা গ্রহণ করব। আমরা আজ

জাগ্রত হব, চিত্তকে সচেতন করব, হৃদয়কে নির্মল করব, আমরা আজ যথার্থভাবে এই আশ্রমের মধ্যে প্রবেশ করব। আমরা এই আশ্রমকে গভীর করে, বৃহৎ করে, সত্য করে, ভূত ও ভবিষ্যতের সঙ্গে একে সংযুক্ত করে দেখব, যে-সাধক এখানে তপস্যা করেছেন তাঁর আনন্দময় বাণী এর সর্বত্র বিকীর্ণ হয়ে রয়েছে সেটি আমরা অন্তরের মধ্যে অনুভব করব—এবং তাঁর সেই জীবনপূর্ণ বাণীর দ্বারা বাহিত হয়ে এখানকার ছায়ায় এবং আলোকে, আকাশে এবং প্রান্তরে, কর্মে এবং বিশ্রামে, আমাদের জীবন তোমার অচল আশ্রয়ে, নিবিড় প্রেমে, নিরতিশয় আনন্দে গিয়ে উত্তীর্ণ হবে এবং চন্দ্র সূর্য অগ্নি বায়ু তরুলতা পশুপক্ষী কীটপতঙ্গ সকলের মধ্যে তোমার গভীর শান্তি, উদার মঙ্গল ও প্রগাঢ় অদ্বৈতরস অনুভব করে শক্তিতে এবং ভক্তিতে সকল দিকেই পরিপূর্ণ হয়ে উঠতে থাকবে।

৭ পৌষ, প্রাতঃকাল, ১৩১৬

তপোবন

আধুনিক সভ্যতালক্ষ্মী যে-পদ্মের উপর বাস করেন সেটি ইঁট কাঠে তৈরি, সেটি শহর। উন্নতির সূর্য যতই মধ্যগগনে উঠছে ততই তার দলগুলি একটি একটি করে খুলে গিয়ে ক্রমশই চারিদিকে ব্যাপ্ত হয়ে পড়ছে। চুন সুরকির জয়যাত্রাকে বসুন্ধরা কোথাও ঠেকিয়ে রাখতে পারছে না।

এই শহরেই মানুষ বিদ্যা শিখছে, বিদ্যা প্রয়োগ করছে, ধন জমাচ্ছে, ধন খরচ করছে, নিজেকে নানাদিক থেকে শক্তি ও সম্পদে পূর্ণ করে তুলছে। এই সভ্যতার সকলের চেয়ে যা কিছু শ্রেষ্ঠ পদার্থ তা নগরের সামগ্রী।

বস্তুত এ ছাড়া অন্য রকম কল্পনা করা শক্ত। যেখানে অনেক মানুষের সম্মিলন সেখানে বিচিত্র বুদ্ধির সংঘাতে চিত্ত জাগ্রত হয়ে ওঠে এবং চারদিক থেকে ধাক্কা খেয়ে প্রত্যেকের শক্তি গতি প্রাপ্ত হয়। এমনি করে চিত্তসমুদ্রের মন্থন হতে থাকলে মানুষের নিগূঢ় সার পদার্থসকল আপনিই ভেসে উঠতে থাকে।

তার পরে মানুষের শক্তি যখন জেগে ওঠে তখন সে সহজেই এমন ক্ষেত্র চায় যেখানে আপনাকে ফলাও রকম করে প্রয়োগ করতে পারে। সে ক্ষেত্র কোথায়? যেখানে অনেক মানুষের অনেক প্রকার উদ্যম নানা সৃষ্টিকার্যে সর্বদাই সচেষ্ট হয়ে রয়েছে। সেই ক্ষেত্রই হচ্ছে শহর।

গোড়ায় মানুষ যখন খুব ভিড় করে এক জায়গায় শহর সৃষ্টি করে বসে, তখন সেটা

সভ্যতার আকর্ষণে নয়। অধিকাংশ স্থলেই শত্রুপক্ষের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্যে কোনো সুরক্ষিত সুবিধার জায়গায় মানুষ একত্র হয়ে থাকবার প্রয়োজন অনুভব করে। কিন্তু যে কারণেই হ'ক, অনেকে একত্র হবার একটা উপলক্ষ্য ঘটলেই সেখানে নানা লোকের প্রয়োজন এবং বুদ্ধি একটা কলেবরবদ্ধ আকার ধারণ করে এবং সেইখানেই সভ্যতার অভিব্যক্তি আপনি ঘটতে থাকে।

কিন্তু ভারতবর্ষে এই একটি আশ্চর্য ব্যাপার দেখা গেছে, এখানকার সভ্যতার মূল প্রস্রবণ শহরে নয়, বনে। ভারতবর্ষের প্রথমতম আশ্চর্য বিকাশ যেখানে দেখতে পাই সেখানে মানুষের সঙ্গে মানুষ অত্যন্ত ঘেঁষাঘেঁষি করে একেবারে পিণ্ড পাকিয়ে ওঠে নি। সেখানে গাছপালা নদী সরোবর মানুষের সঙ্গে মিলে থাকবার যথেষ্ট অবকাশ পেয়েছিল। সেখানে মানুষও ছিল, ফাঁকাও ছিল, ঠেলাঠেলি ছিল না। অথচ এই ফাঁকায় ভারতবর্ষের চিত্তকে জড়প্রায় করে দেয় নি বরঞ্চ তার চেতনাকে আরও উজ্জ্বল করে দিয়েছিল। এরকম ঘটনা জগতে আর কোথাও ঘটেছে বলে দেখা যায় না।

আমরা এই দেখেছি, যে-সব মানুষ অবস্থাগতিকে বনের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়ে, তারা বুনো হয়ে ওঠে। হয় তারা বাঘের মতো হিংস্র হয়, নয় তারা হরিণের মতো নির্বোধ হয়।

কিন্তু প্রাচীন ভারতবর্ষে দেখতে পাই অরণ্যের নির্জনতা মানুষের বুদ্ধিকে অভিভূত করে নি বরঞ্চ তাকে এমন একটি শক্তি দান করেছিল যে, সেই অরণ্যবাসনিঃসৃত সভ্যতার ধারা সমস্ত ভারতবর্ষকে অভিষিক্ত করে দিয়েছে এবং আজ পর্যন্ত তার প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায় নি।

এই রকমে আরণ্যকদের সাধনা থেকে ভারতবর্ষ সভ্যতার যে প্রৈতি (energy) লাভ করেছিল সেটা নাকি বাইরের সংঘাত থেকে ঘটে নি, নানা প্রয়োজনের প্রতিযোগিতা থেকে জাগে নি। এইজন্যে সেই শক্তিটা প্রধানত বহিরভিমুখী হয় নি। সে ধ্যানের দ্বারা বিশ্বের গভীরতার মধ্যে প্রবেশ করেছে, নিখিলের সঙ্গে আত্মার যোগ স্থাপন করেছে। সেইজন্যে ঐশ্বর্যের উপকরণেই প্রধানভাবে ভারতবর্ষ আপনার সভ্যতার পরিচয় দেয় নি। এই সভ্যতার যাঁরা কাণ্ডারী তাঁরা নির্জনবাসী, তাঁরা বিরলবসন তপস্বী।

সমুদ্রতীর যে-জাতিকে পালন করেছে তাকে বাণিজ্যসম্পদ দিয়েছে, মরুভূমি যাদের অন্নস্তন্যদানে ক্ষুধিত করে রেখেছে তারা দিগ্বিজয়ী হয়েছে। এমনি করে এক-একটি বিশেষ সুযোগে মানুষের শক্তি এক-একটি বিশেষ পথ পেয়েছে।

সমতল আর্যাবর্তের অরণ্যভূমিও ভারতবর্ষকে একটি বিশেষ সুযোগ দিয়েছিল। ভারতবর্ষের বুদ্ধিকে সে জগতের অন্তরতম রহস্যলোকের আবিষ্কারে প্রেরণ করেছিল। সেই মহাসমুদ্রতীরের নানা সুদূর দ্বীপ-দ্বীপান্তর থেকে সে যে-সমস্ত সম্পদ আহরণ করে এনেছিল, সমস্ত মানুষকেই দিনে দিনে তার প্রয়োজন স্বীকার করতেই হবে। যে ওষধি-বনস্পতির মধ্যে প্রকৃতির প্রাণের ক্রিয়া দিনে রাত্রে ও ঋতুতে ঋতুতে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে এবং প্রাণের লীলা নানা অপরূপ ভঙ্গিতে, ধ্বনিতে ও রূপবৈচিত্র্যে নিরন্তর নূতন নূতন ভাবে প্রকাশিত হতে থাকে তারই মাঝখানে ধ্যানপরায়ণ চিত্ত নিয়ে যাঁরা ছিলেন তাঁরা নিজের চারিদিকেই একটি আনন্দময় রহস্যকে সুস্পষ্ট উপলব্ধি করেছিলেন। সেইজন্যে তাঁরা এত সহজে বলতে পেরেছিলেন, যদিদং কিঞ্চ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতং, এই যা কিছু সমস্তই পরমপ্রাণ হতে নিঃসৃত হয়ে প্রাণের মধ্যেই কম্পিত হচ্ছে। তাঁরা স্বরচিত ইটকাঠলোহার কঠিন খাঁচার মধ্যে ছিলেন না, তাঁরা যেখানে বাস করতেন সেখানে বিশ্বব্যাপী বিরাট জীবনের সঙ্গে তাঁদের জীবনের অবারিত যোগ ছিল। এই বন তাঁদের ছায়া দিয়েছে, ফল ফুল দিয়েছে, কুশসমিৎ জুগিয়েছে, তাঁদের প্রতিদিনের সমস্ত কর্ম অবকাশ ও প্রয়োজনের সঙ্গে এই বনের আদানপ্রদানের জীবনময় সম্বন্ধ ছিল। এই উপায়েই নিজের জীবনকে তাঁরা চারিদিকের একটি বড়ো জীবনের সঙ্গে যুক্ত করে জানতে পেরেছিলেন। চতুর্দিককে তাঁরা শূন্য বলে, নির্জীব বলে, পৃথক বলে জানতেন না। বিশ্বপ্রকৃতির ভিতর দিয়ে আলোক, বাতাস, অন্নজল প্রভৃতি যে-সমস্ত দান তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন সেই দানগুলি যে মাটির নয়, গাছের নয়, শূন্য আকাশের নয়, একটি চেতনাময় অনন্ত আনন্দের মধ্যেই তার মূল প্রস্রবণ, এইটি তাঁরা একটি সহজ অনুভবের দ্বারা জানতে পেরেছিলেন। সেইজন্যেই নিশ্বাস আলো অন্নজল সমস্তই তাঁরা শ্রদ্ধার সঙ্গে ভক্তির সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন। এইজন্যেই নিখিলচরাচরকে নিজের প্রাণের দ্বারা, চেতনার দ্বারা, হৃদয়ের দ্বারা, বোধের দ্বারা, নিজের আত্মার সঙ্গে আত্মীয়রূপে এক করে পাওয়াই ভারতবর্ষের পাওয়া।

এর থেকেই বোঝা যাবে বন ভারতবর্ষের চিত্তকে নিজের নিভৃত ছায়ার মধ্যে নিগূঢ় প্রাণের মধ্যে কেমন করে পালন করেছে। ভারতবর্ষে যে দুই বড়ো বড়ো প্রাচীনযুগ চলে গেছে, বৈদিকযুগ ও বৌদ্ধযুগ, সেই দুই যুগকে বনই ধাত্রীরূপে ধারণ করেছে। কেবল বৈদিক ঋষিরা নন, ভগবান বুদ্ধও কত আম্রবন, কত বেণুবনে তাঁর উপদেশ বর্ষণ করেছেন। রাজপ্রাসাদে তাঁর স্থান কুলোয় নি, বনই তাঁকে বুকে করে নিয়েছিল।

ক্রমশ ভারতবর্ষে রাজ্য সাম্রাজ্য নগরনগরী স্থাপিত হয়েছে, দেশ-বিদেশের সঙ্গে তার পণ্য আদানপ্রদান চলেছে, অন্নলোলুপ কৃষিক্ষেত্র অল্পে অল্পে ছায়ানিভৃত অরণ্যগুলিকে দূর হতে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। কিন্তু সেই প্রতাপশালী ঐশ্বর্যপূর্ণ যৌবনদৃপ্ত ভারতবর্ষ বনের কাছে নিজের ঋণ স্বীকার করতে কোনো দিন লজ্জাবোধ করে নি। তপস্যাকেই সে সকল প্রয়াসের চেয়ে বেশি সম্মান দিয়েছে, এবং বনবাসী পুরাতন তপস্বীদেরই আপনাদের আদি পুরুষ বলে জেনে ভারতবর্ষের রাজা মহারাজাও গৌরব বোধ করেছেন। ভারতবর্ষের পুরাণ-কথায় যা কিছু মহৎ আশ্চর্য পবিত্র, যা কিছু শ্রেষ্ঠ এবং পূজ্য সমস্তই সেই প্রাচীন তপোবন-স্মৃতির সঙ্গেই জড়িত। বড়ো বড়ো রাজার রাজত্বের কথা সে মনে করে রাখবার জন্যে চেষ্টা করে নি কিন্তু নানাবিপ্লবের ভিতর দিয়েও বনের সামগ্রীকেই তার প্রাণের সামগ্রী করে আজ পর্যন্ত সে বহন করে এসেছে। মানব-ইতিহাসে এইটেই হচ্ছে ভারতবর্ষের বিশেষত্ব।

ভারতবর্ষে বিক্রমাদিত্য যখন রাজা, উজ্জয়িনী যখন মহানগরী, কালিদাস যখন কবি, তখন এদেশে তপোবনের যুগ চলে গেছে। তখন মানবের মহামেলার মাঝখানে এসে আমরা দাঁড়িয়েছি। তখন, চীন, হূন, শক, পারসিক, গ্রীক, রোমক, সকলে আমাদের চারিদিকে ভিড় করে এসেছে। তখন জনকের মতো রাজা একদিকে স্বহস্তে লাঙল নিয়ে চাষ করছেন, অন্য দিকে দেশ-দেশান্তর হতে আগত জ্ঞানপিপাসুদের ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা দিচ্ছেন, এ দৃশ্য দেখবার আর কাল ছিল না। কিন্তু সেদিনকার ঐশ্বর্যমদগর্বিত যুগেও তখনকার শ্রেষ্ঠ কবি তপোবনের কথা কেমন করে বলেছেন তা দেখলেই বোঝা যায় যে, তপোবন যখন আমাদের দৃষ্টির বাহিরে গেছে তখনও কতখানি আমাদের হৃদয় জুড়ে বসেছে।

কালিদাস যে বিশেষভাবে ভারতবর্ষের কবি, তা তাঁর তপোবন-চিত্র থেকেই সপ্রমাণ হয়। এমন পরিপূর্ণ আনন্দের সঙ্গে তপোবনের ধ্যানকে আর কে মূর্তিমান করতে পেরেছে!

রঘুবংশ কাব্যের যবনিকা যখনই উদ্‌ঘাটিত হল তখন প্রথমেই তপোবনের শান্ত সুন্দর পবিত্র দৃশ্যটি আমাদের চোখের সামনে প্রকাশিত হয়ে পড়ল।

সেই তপোবনে বনান্তর হতে কুশসমিৎ ফল আহরণ করে তপস্বীরা আসছেন এবং যেন একটি অদৃশ্য অগ্নি তাঁদের প্রত্যুদ্‌গমন করছে। সেখানে হরিণগুলি ঋষিপত্নীদের সন্তানের মতো; তারা নীবার ধান্যের অংশ পায় এবং নিঃসংকোচে কুটিরের দ্বার রোধ করে পড়ে থাকে। মুনিকন্যারা গাছে জল দিচ্ছেন এবং

আলবাল যেমনি জলে ভরে উঠছে অমনি তাঁরা সরে যাচ্ছেন। পাখিরা নিঃশঙ্কমনে আলবালের জল খেতে আসে, এই তাঁদের অভিপ্রায়। রৌদ্র পড়ে এসেছে, নীবার ধান্য কুটিরের প্রাঙ্গণে রাশীকৃত, এবং সেখানে হরিণরা শুয়ে রোমন্থন করছে। আহুতির সুগন্ধ ধূম বাতাসে প্রবাহিত হয়ে এসে আশ্রমোন্মুখ অতিথিদের সর্বশরীর পবিত্র করে দিচ্ছে।

তরুলতা পশুপক্ষী সকলের সঙ্গে মানুষের মিলনের পূর্ণতা, এই হচ্ছে এর ভিতরকার ভাব।

সমস্ত অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকের মধ্যে, ভোগলালসানিষ্ঠুর রাজপ্রাসাদকে ধিক্কার দিয়ে যে একটি তপোবন বিরাজ করছে তারও মূল সুরটি হচ্ছে ওই, চেতন অচেতন সকলেরই সঙ্গে মানুষের আত্মীয়-সম্বন্ধের পবিত্র মাধুর্য।

কাদম্বরীতে তপোবনের বর্ণনায় কবি লিখছেন—সেখানে বাতাসে লতাগুলি মাথা নত করে প্রণাম করছে, গাছগুলি ফুল ছড়িয়ে পূজা করছে, কুটিরের অঙ্গনে শ্যামাক ধান শুকোবার জন্যে মেলে দেওয়া আছে, সেখানে আমলক লবলী লবঙ্গ কদলী বদরী প্রভৃতি ফল সংগ্রহ করা হয়েছে; বটুদের অধ্যয়নে বনভূমি মুখরিত, বাচাল শুকেরা অনবরত-শ্রবণের দ্বারা অভ্যস্ত আহুতিমন্ত্র উচ্চারণ করছে, অরণ্যকুক্কুটেরা বৈশ্বদেব-বলিপিণ্ড আহার করছে; নিকটে জলাশয় থেকে কলহংসশাবকেরা এসে নীবারবলি খেয়ে যাচ্ছে; হরিণীরা জিহ্বাপল্লব দিয়ে মুনিবালকদের লেহন করছে।

এর ভিতরকার কথাটা হচ্ছে ওই। তরুলতা জীবজন্তুর সঙ্গে মানুষের বিচ্ছেদ দূর করে তপোবন প্রকাশ পাচ্ছে, এই পুরানো কথাই আমাদের দেশে বরাবর চলে এসেছে।

কেবল তপোবনের চিত্রেই যে এই ভাবটি প্রকাশ পেয়েছে তা নয়। মানুষের সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির সম্মিলনই আমাদের দেশের সমস্ত প্রসিদ্ধ কাব্যের মধ্যে পরিস্ফুট। যে-সকল ঘটনা মানবচরিত্রকে আশ্রয় করে ব্যক্ত হতে থাকে তাই না কি প্রধানত নাটকের উপাদান এই জন্যেই অন্যদেশের সাহিত্যে দেখতে পাই বিশ্বপ্রকৃতিকে নাটকে কেবল আভাসে রক্ষা করা হয় মাত্র, তার মধ্যে তাকে বেশি জায়গা দেবার অবকাশ থাকে না। আমাদের দেশের প্রাচীন যে নাটকগুলি আজ পর্যন্ত খ্যাতি রক্ষা করে আসছে তাতে দেখতে পাই প্রকৃতিও নাটকের মধ্যে নিজের অংশ থেকে বঞ্চিত হয় না।

মানুষকে বেষ্টন করে এই যে জগৎপ্রকৃতি আছে এ যে অত্যন্ত অন্তরঙ্গভাবে মানুষের সকল চিন্তা সকল কাজের সঙ্গে জড়িত হয়ে আছে। মানুষের লোকালয় যদি কেবলই

একান্ত মানবময় হয়ে ওঠে, এর ফাঁকে ফাঁকে যদি প্রকৃতি কোনোমতে প্রবেশাধিকার না পায় তাহলে আমাদের চিন্তা ও কর্ম ক্রমশ কলুষিত ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে নিজের অতলস্পর্শ আবর্জনার মধ্যে আত্মহত্যা করে মরে। এই যে প্রকৃতি আমাদের মধ্যে নিত্যনিয়ত কাজ করছে অথচ দেখাচ্ছে যেন সে চুপ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে, যেন আমরাই সব মস্ত কাজের লোক আর সে বেচারা নিতান্ত একটা বাহার মাত্র, এই প্রকৃতিকে আমাদের দেশের কবিরা বেশ করে চিনে নিয়েছেন। এই প্রকৃতি মানুষের সমস্ত সুখদুঃখের মধ্যে যে অনন্তের সুরটি মিলিয়ে রাখছে সেই সুরটিকে আমাদের দেশের প্রাচীন কবিরা সর্বদাই তাঁদের কাব্যের মধ্যে বাজিয়ে রেখেছেন।

ঋতুসংহার কালিদাসের কাঁচাবয়সের লেখা তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এর মধ্যে তরুণ-তরুণীর যে মিলনসংগীত আছে তাতে স্বরগ্রাম লালসার নিচের সপ্তক থেকেই শুরু হয়েছে, শকুন্তলা কুমারসম্ভবের মতো তপস্যার উচ্চতম সপ্তকে গিয়ে পৌঁছোয় নি।

কিন্তু কবি নবযৌবনের এই লালসাকে প্রকৃতির বিচিত্র ও বিরাট সুরের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে মুক্ত আকাশের মাঝখানে তাকে ঝংকৃত করে তুলেছেন। ধারাযন্ত্রমুখরিত নিদাঘদিনান্তের চন্দ্রকিরণ এর মধ্যে আপনার সুরটুকু যোজনা করেছে, বর্ষায় নবজলসেকে ছিন্নতাপ বনান্তে পবনচলিত কদম্বশাখা এর ছন্দে আন্দোলিত; আপক্কশালি-রুচিরা শারদলক্ষ্মী তাঁর হংসরব-নূপুরধ্বনিকে এর তালে তালে মন্ত্রিত করেছেন এবং বসন্তের দক্ষিণবায়ুচঞ্চল কুসুমিত আম্রশাখার কলমর্মর এরই তানে তানে বিস্তীর্ণ।

বিরাট প্রকৃতির মাঝখানে যেখানে যার স্বাভাবিক স্থান সেখানে তাকে স্থাপন করে দেখলে তার অত্যুগ্রতা থাকে না, সেইখান থেকে বিচ্ছিন্ন করে এনে কেবলমাত্র মানুষের গণ্ডির মধ্যে সংকীর্ণ করে দেখলে তাকে ব্যাধির মতো অত্যন্ত উত্তপ্ত এবং রক্তবর্ণ দেখতে হয়। শেক্‌স্‌পীয়রের দুই একটি খণ্ডকাব্য আছে নরনারীর আসক্তি তার বর্ণনীয় বিষয়। কিন্তু সেইসকল কাব্যে আসক্তিই একেবারে একান্ত, তার চারদিকে আর কিছুরই স্থান নেই; আকাশ নেই, বাতাস নেই, প্রকৃতির যে গীতগন্ধবর্ণবিচিত্র বিশাল আবরণে বিশ্বের সমস্ত লজ্জা রক্ষা করে আছে তার কোনো সম্পর্ক নেই। এইজন্যে সেসকল কাব্যে প্রবৃত্তির উন্মত্ততা অত্যন্ত দুঃসহরূপে প্রকাশ পাচ্ছে।

কুমারসম্ভবে তৃতীয় সর্গে যেখানে মদনের আকস্মিক আবির্ভাবে যৌবনচাঞ্চল্যের উদ্দীপনা বর্ণিত হয়েছে, সেখানে কালিদাস উন্মত্ততাকে একটি সংকীর্ণ সীমার মধ্যেই সর্বময় করে দেখাবার প্রয়াসমাত্র পান নি। আতশকাচের ভিতর দিয়ে একটি

বিন্দুমাত্রে সূর্যকিরণ সংহত হয়ে পড়লে সেখানে আগুন জ্বলে ওঠে, কিন্তু সেই সূর্যকিরণ যখন আকাশের সর্বত্র স্বভাবত ছড়িয়ে থাকে তখন সে তাপ দেয় বটে কিন্তু দগ্ধ করে না। কালিদাস বসন্ত-প্রকৃতির সর্বব্যাপী যৌবনলীলার মাঝখানে হরপার্বতীর মিলনচাঞ্চল্যকে নিবিষ্ট করে তার সম্ভ্রম রক্ষা করেছেন।

কালিদাস পুষ্পধনুর জ্যা-নির্ঘোষকে বিশ্বসংগীতের সুরের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন ও বেসুরো করে বাজান নি। যে-পটভূমিকার উপরে তিনি তাঁর ছবিটি এঁকেছেন সেটি তরুলতা পশুপক্ষীকে নিয়ে সমস্ত আকাশে অতি বিচিত্রবর্ণে বিস্তারিত।

কেবল তৃতীয় সর্গ নয় সমস্ত কুমারসম্ভব কাব্যটিই একটি বিশ্বব্যাপী পটভূমিকার উপরে অঙ্কিত। এই কাব্যের ভিতরকার কথাটি একটি গভীর এবং চিরন্তন কথা। যে পাপ দৈত্য প্রবল হয়ে উঠে হঠাৎ স্বর্গলোককে কোথা থেকে ছারখার করে দেয় তাকে পরাভূত করবার মতো বীরত্ব কোন্ উপায়ে জন্মগ্রহণ করে।

এই সমস্যাটি মানুষের চিরকালের সমস্যা। প্রত্যেক লোকের জীবনের সমস্যাও এই বটে আবার এই সমস্যা সমস্ত জাতির মধ্যে নূতন নূতন মূর্তিতে নিজেকে প্রকাশ করে।

কালিদাসের সময়েও একটি সমস্যা ভারতবর্ষে অত্যন্ত উৎকট হয়ে দেখা দিয়েছিল তা কবির কাব্য পড়লেই স্পষ্ট বোঝা যায়। প্রাচীনকালে হিন্দুসমাজে জীবনযাত্রার যে একটি সরলতা ও সংযম ছিল তখন সেটি ভেঙে এসেছিল। রাজারা তখন রাজধর্ম বিস্মৃত হয়ে আত্মসুখপরায়ণ ভোগী হয়ে উঠেছিলেন। এদিকে শকদের আক্রমণে ভারতবর্ষ তখন বারংবার দুর্গতি প্রাপ্ত হচ্ছিল।

তখন বাহিরের দিক থেকে দেখলে ভোগবিলাসের আয়োজনে, কাব্য সংগীত শিল্পকলার আলোচনায় ভারতবর্ষ সভ্যতার প্রকৃষ্টতা লাভ করেছিল। কালিদাসের কাব্যকলার মধ্যেও তখনকার সেই উপকরণবহুল সম্ভোগের সুর যে বাজে নি তা নয়। বস্তুত তাঁর কাব্যের বহিরংশ তখনকার কালেরই কারুকার্যে খচিত হয়েছিল। এই রকম একদিকে তখনকার কালের সঙ্গে তখনকার কবির যোগ আমরা দেখতে পাই।

কিন্তু এই প্রমোদভবনের স্বর্ণখচিত অন্তঃপুরের মাঝখানে বসে কাব্যলক্ষ্মী বৈরাগ্য-বিকল চিত্তে কিসের ধ্যানে নিযুক্ত ছিলেন? হৃদয় তো তাঁর এখানে ছিল না। তিনি এই আশ্চর্য কারুবিচিত্র মাণিক্যকঠিন কারাগার হতে কেবলই মুক্তিকামনা করছিলেন।

কালিদাসের কাব্যে বাহিরের সঙ্গে ভিতরের, অবস্থার সঙ্গে আকাঙ্ক্ষার একটা

বদ্ধ আছে। ভারতবর্ষের যে তপস্যার যুগ তখন অতীত হয়ে গিয়েছিল, ঐশ্বর্যশালী রাজসিংহাসনের পাশে বসে কবি সেই নির্মল সুদূরকালের দিকে একটি বেদনা বহন করে তাকিয়ে ছিলেন।

রঘুবংশ কাব্যে তিনি ভারতবর্ষের পুরাকালীন সূর্যবংশীয় রাজাদের চরিতগানে যে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন তার মধ্যে কবির সেই বেদনাটি নিগূঢ় হয়ে রয়েছে। তার প্রমাণ দেখুন।

আমাদের দেশের কাব্যে পরিণামকে অশুভকর ভাবে দেখানো ঠিক প্রথা নয়। বস্তুত যে-রামচন্দ্রের জীবনে রঘুর বংশ উচ্চতম চূড়ায় অধিরোহণ করেছে সেইখানেই কাব্য শেষ করলে তবেই কবির ভূমিকার বাক্যগুলি সার্থক হত।

তিনি ভূমিকায় বলেছেন—সেই যাঁরা জন্মকাল অবধি শুদ্ধ, যাঁরা ফলপ্রাপ্তি অবধি কর্ম করতেন, সমুদ্র অবধি যাঁদের রাজ্য, এবং স্বর্গ অবধি যাঁদের রথবর্ত্ম; যথাবিধি যাঁরা অগ্নিতে আহুতি দিতেন, যথাকাম যাঁরা প্রার্থীদের অভাব পূর্ণ করতেন, যথাপরাধ যাঁরা দণ্ড দিতেন এবং যথাকালে যাঁরা জাগ্রত হতেন; যাঁরা ত্যাগের জন্যে অর্থ সঞ্চয় করতেন, যাঁরা সত্যের জন্য মিতভাষী, যাঁরা যশের জন্য জয় ইচ্ছা করতেন এবং সন্তানলাভের জন্য যাঁদের দারগ্রহণ; শৈশবে যাঁরা বিদ্যাভ্যাস করতেন, যৌবনে যাঁদের বিষয়-সেবা ছিল, বার্ধক্যে যাঁরা মুনিবৃত্তি গ্রহণ করতেন এবং যোগান্তে যাঁদের দেহত্যাগ হত—আমি বাক্‌সম্পদে দরিদ্র হলেও সেই রঘুরাজদের বংশ কীর্তন করব, কারণ তাঁদের গুণ আমার কর্ণে প্রবেশ করে আমাকে চঞ্চল করে তুলেছে।

কিন্তু গুণকীর্তনেই এই কাব্যের শেষ নয়। কবিকে যে কিসে চঞ্চল করে তুলেছে, তা রঘুবংশের পরিণাম দেখলেই বুঝা যায়।

রঘুবংশ যাঁর নামে গৌরবলাভ করেছে তাঁর জন্মকাহিনী কী? তাঁর আরম্ভ কোথায়?

তপোবনে দিলীপদম্পতির তপস্যাতেই এমন রাজা জন্মেছেন। কালিদাস তাঁর রাজপ্রভুদের কাছে এই কথাটি নানা কাব্যে নানা কৌশলে বলেছেন যে, কঠিন তপস্যার ভিতর দিয়ে ছাড়া কোনো মহৎ ফললাভের কোনো সম্ভাবনা নেই। যে-রঘু উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিমের সমস্ত রাজাকে বীরতেজে পরাভূত করে পৃথিবীতে একচ্ছত্র রাজত্ব বিস্তার করেছিলেন তিনি তাঁর পিতামাতার তপঃসাধনার ধন। আবার যে-ভরত বীর্যবলে চক্রবর্তী সম্রাট হয়ে ভারতবর্ষকে নিজ নামে ধন্য করেছেন তাঁর জন্ম-ঘটনায় অবারিত প্রবৃত্তির যে কলঙ্ক পড়েছিল কবি তাকে তপস্যার অগ্নিতে দগ্ধ এবং দুঃখের অশ্রুজলে সম্পূর্ণ ধৌত না করে ছাড়েন নি।

রঘুবংশ আরম্ভ হল রাজোচিত ঐশ্বর্যগৌরবের বর্ণনায় নয়। সুদক্ষিণাকে বামে নিয়ে রাজা দিলীপ তপোবনে প্রবেশ করলেন। চতুঃসমুদ্র যাঁর অনন্যশাসনা পৃথিবীর পরিখা সেই রাজা অবিচলিত নিষ্ঠায় কঠোর সংযমে তপোবনধেনুর সেবায় নিযুক্ত হলেন।

সংযমে তপস্যায় তপোবনে রঘুবংশের আরম্ভ, আর মদিরায় ইন্দ্রিয়মত্ততায় প্রমোদ-ভবনে তার উপসংহার। এই শেষ সর্গের চিত্রে বর্ণনায় উজ্জ্বলতা যথেষ্ট আছে। কিন্তু যে-অগ্নি লোকালয়কে দগ্ধ করে সর্বনাশ করে সেও তো কম উজ্জ্বল নয়। এক পত্নীকে নিয়ে দিলীপের তপোবনে বাস শান্ত এবং অনতিপ্রকটবর্ণে অঙ্কিত, আর বহু নায়িকা নিয়ে অগ্নিবর্ণের আত্মঘাতসাধন অসংবৃত বাহুল্যের সঙ্গে যেন জ্বলন্ত রেখায় বর্ণিত।

প্রভাত যেমন শান্ত, যেমন পিঙ্গল-জটাধারী ঋষিবালকের মতো পবিত্র, প্রভাত যেমন মুক্তাপাণ্ডুর সৌম্য আলোকে শিশিরস্নিগ্ধ পৃথিবীর উপরে ধীরপদে অবতরণ করে এবং নবজীবনের অভ্যুদয়-বার্তায় জগৎকে উদ্‌বোধিত করে তোলে, কবির কাব্যেও তপস্যার দ্বারা সুসমাহিত রাজমাহাত্ম্য তেমনি স্নিগ্ধতেজে এবং সংযত বাণীতেই মহোদয়শালী রঘুবংশের সূচনা করেছিল। আর নানাবর্ণবিচিত্র মেঘজালের মধ্যে আবিষ্ট অপরাহ্ণ আপনার অদ্ভুত রশ্মিচ্ছটায় পশ্চিম আকাশকে যেমন ক্ষণকালের জন্যে প্রগল্‌ভ করে তোলে এবং দেখতে দেখতে ভীষণ ক্ষয় এসে তার সমস্ত মহিমা অপহরণ করতে থাকে, অবশেষে অনতিকালেই বাক্যহীন কর্মহীন অচেতন অন্ধকারের মধ্যে সমস্ত বিলুপ্ত হয়ে যায় কবি তেমনি করেই কাব্যের শেষ সর্গে বিচিত্র ভোগায়োজনের ভীষণ সমারোহের মধ্যেই রঘুবংশ-জ্যোতিষ্কের নির্বাপণ বর্ণনা করেছেন।

কাব্যের এই আরম্ভ এবং শেষের মধ্যে কবির একটি অন্তরের কথা প্রচ্ছন্ন আছে। তিনি নীরব দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে বলছেন, ছিল কী, আর হয়েছে কী। সেকালে যখন সম্মুখে ছিল অভ্যুদয় তখন তপস্যাই ছিল সকলের চেয়ে প্রধান ঐশ্বর্য আর একালে যখন সম্মুখে দেখা যাচ্ছে বিনাশ তখন বিলাসের উপকরণরাশির সীমা নেই, আর ভোগের অতৃপ্ত বহ্নি সহস্র শিখায় জ্বলে উঠে চারিদিকের চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে।

কালিদাসের অধিকাংশ কাব্যের মধ্যেই এই দ্বন্দ্বটি সুস্পষ্ট দেখা যায়। এই দ্বন্দ্বের সমাধান কোথায় কুমারসম্ভবে তাই দেখানো হয়েছে। কবি এই কাব্যে বলেছেন ত্যাগের সঙ্গে ঐশ্বর্যের, তপস্যার সঙ্গে প্রেমের সম্মিলনেই শৌর্যের উদ্ভব, সেই শৌর্যেই মানুষ সকলপ্রকার পরাভব হতে উদ্ধার পায়।

অর্থাৎ ত্যাগের ও ভোগের সামঞ্জস্যেই পূর্ণ শক্তি। ত্যাগী শিব যখন একাকী সমাধিমগ্ন তখনও স্বর্গরাজ্য অসহায়, আবার সতী যখন তাঁর পিতৃভবনের ঐশ্বর্যে একাকিনী আবদ্ধ তখনও দৈত্যের উপদ্রব প্রবল।

প্রবৃত্তি প্রবল হয়ে উঠলেই ত্যাগের ও ভোগের সামঞ্জস্য ভেঙে যায়।

কোনো একটি সংকীর্ণ জায়গায় যখন আমরা অহংকারকে বা বাসনাকে ঘনীভূত করি তখন আমরা সমগ্রের ক্ষতি করে অংশকে বড়ো করে তুলতে চেষ্টা করি। এর থেকে ঘটে অমঙ্গল। অংশের প্রতি আসক্তিবশত সমগ্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এই হচ্ছে পাপ।

এই জন্যই ত্যাগের প্রয়োজন। এই ত্যাগ নিজেকে রিক্ত করার জন্যে নয়, নিজেকে পূর্ণ করবার জন্যেই। ত্যাগ মানে আংশিককে ত্যাগ সমগ্রের জন্য, ক্ষণিককে ত্যাগ নিত্যের জন্য, অহংকারকে ত্যাগ প্রেমের জন্য, সুখকে ত্যাগ আনন্দের জন্য। এই জন্যেই উপনিষদে বলা হয়েছে, ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ, ত্যাগের দ্বারা ভোগ করবে, আসক্তির দ্বারা নয়।

প্রথমে পার্বতী মদনের সাহায্যে শিবকে চেয়েছিলেন, সে চেষ্টা ব্যর্থ হল, অবশেষে ত্যাগের সাহায্যে তপস্যার দ্বারাতেই তাঁকে লাভ করলেন।

কাম হচ্ছে কেবল অংশের প্রতিই আসক্ত, সমগ্রের প্রতি অন্ধ। কিন্তু শিব হচ্ছেন সকল দেশের সকল কালের, কামনা ত্যাগ না হলে তাঁর সঙ্গে মিলন ঘটতেই পারে না।

তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ, ত্যাগের দ্বারাই ভোগ করবে এইটি উপনিষদের অনুশাসন, এইটেই কুমারসম্ভব কাব্যের মর্মকথা, এবং এইটেই আমাদের তপোবনের সাধনা। লাভ করবার জন্যে ত্যাগ করবে।

Sacrifice এবং **resignation**, আত্মত্যাগ এবং দুঃখস্বীকার—এই দুটি পদার্থের মাহাত্ম্য আমরা কোনো কোনো ধর্মশাস্ত্রে বিশেষভাবে বর্ণিত দেখেছি। জগতের সৃষ্টিকার্যে উত্তাপ যেমন একটি প্রধান জিনিস, মানুষের জীবনগঠনে দুঃখও তেমনি একটি খুব বড়ো রাসায়নিক শক্তি; এর দ্বারা চিত্তের দুর্ভেদ্য কাঠিন্য গলে যায় এবং অসাধ্য হৃদয়গ্রন্থির ছেদন হয়। অতএব সংসারে যিনি দুঃখকে দুঃখরূপেই নম্রভাবে স্বীকার করে নিতে পারেন তিনি যথার্থ তপস্বী বটেন।

কিন্তু কেউ যেন মনে না করেন এই দুঃখস্বীকারকেই উপনিষৎ লক্ষ্য করছেন। ত্যাগকে দুঃখরূপে অঙ্গীকার করে নেওয়া নয়, ত্যাগকে ভোগরূপেই বরণ করে নেওয়া উপনিষদের অনুশাসন। উপনিষৎ যে-ত্যাগের কথা বলছেন সেই ত্যাগই পূর্ণতর

গ্রহণ, সেই ত্যাগই গভীরতর আনন্দ। সেই ত্যাগই নিখিলের সঙ্গে যোগ, ভূমার সঙ্গে মিলন। অতএব ভারতবর্ষের যে আদর্শ তপোবন, সে-তপোবন শরীরের বিরুদ্ধে আত্মার, সংসারের বিরুদ্ধে সন্ন্যাসের একটা নিরন্তর হাতাহাতি যুদ্ধ করবার মল্লক্ষেত্র নয়। যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ, অর্থাৎ যা-কিছু-সমস্তের সঙ্গে ত্যাগের দ্বারা বাধাহীন মিলন, এইটেই হচ্ছে তপোবনের সাধনা। এই জন্তেই তরুলতা পশুপক্ষীর সঙ্গে ভারতবর্ষের আত্মীয়-সম্বন্ধের যোগ এমন ঘনিষ্ঠ যে, অন্যদেশের লোকের কাছে সেটা অদ্ভুত মনে হয়।

এই জন্তেই আমাদের দেশের কবিত্বে যে প্রকৃতিপ্রেমের পরিচয় পাওয়া যায় অন্যদেশের কাব্যের সঙ্গে তার যেন একটা বিশিষ্টতা আছে। আমাদের এ প্রকৃতির প্রতি প্রভুত্ব করা নয়, প্রকৃতিকে ভোগ করা নয়, এ প্রকৃতির সঙ্গে সম্মিলন।

অথচ এই সম্মিলন অরণ্যবাসীর বর্বরতা নয়। তপোবন আফ্রিকার বন যদি হত তাহলে বলতে পারতুম প্রকৃতির সঙ্গে মিলে থাকা একটা তামসিকতা মাত্র। কিন্তু মানুষের চিত্ত যেখানে সাধনার দ্বারা জাগ্রত আছে সেখানকার মিলন কেবলমাত্র অভ্যাসের জড়ত্বজনিত হতে পারে না। সংস্কারের বাধা ক্ষয় হয়ে গেলে যে-মিলন স্বাভাবিক হয়ে ওঠে তপোবনের মিলন হচ্ছে তাই।

আমাদের কবিরা সকলেই বলেছেন, তপোবন শান্তরসাস্পদ। তপোবনের যে একটি বিশেষ রস আছে সেটি শান্তরস। শান্তরস হচ্ছে পরিপূর্ণতার রস। যেমন সাতটা বর্ণরশ্মি মিলে গেলে তবে সাদা রং হয় তেমনি চিত্তের প্রবাহ নানাভাগে বিভক্ত না হয়ে যখন অবিচ্ছিন্নভাবে নিখিলের সঙ্গে আপনার সামঞ্জস্যকে একেবারে কানায় কানায় ভরে তোলে তখনই শান্তরসের উদ্ভব হয়।

তপোবনে সেই শান্তরস। এখানে সূর্য অগ্নি বায়ু জল স্থল আকাশ তরুলতা মৃগ পক্ষী সকলের সঙ্গেই চেতনার একটি পরিপূর্ণ যোগ। এখানে চতুর্দিকের কিছুর সঙ্গেই মানুষের বিচ্ছেদ নেই এবং বিরোধ নেই।

ভারতবর্ষের তপোবনে এই যে একটি শান্তরসের সংগীত বাঁধা হয়েছিল এই সংগীতের আদর্শেই আমাদের দেশে অনেক মিশ্র রাগ-রাগিণীর সৃষ্টি হয়েছে। সেই জন্তেই আমাদের কাব্যে মানবব্যাপারের মাঝখানে প্রকৃতিকে এত বড়ো স্থান দেওয়া হয়েছে। এ কেবল সম্পূর্ণতার জন্তে আমাদের যে একটি স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা আছে সেই আকাঙ্ক্ষাকে পূরণ করবার উদ্দেশে।

অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকে যে দুটি তপোবন আছে সে দুটিই শকুন্তলার সুখদুঃখকে একটি বিশালতার মধ্যে সম্পূর্ণ করে দিয়েছে। তার একটি তপোবন পৃথিবীতে, আর

একটি স্বর্গলোকের সীমায়। একটি তপোবনে সহকারের সঙ্গে নবমল্লিকার মিলনোৎসবে নবযৌবনা ঋষিকন্যারা পুলকিত হয়ে উঠছেন, মাতৃহীন মৃগশিশুকে তাঁরা নীবারমুষ্টি দিয়ে পালন করছেন, কুশসূচিতে তার মুখ বিদ্ধ হলে ইঙ্গুদী তৈল মাখিয়ে শুশ্রূষা করছেন; এই তপোবনটি দুষ্মন্তশকুন্তলার প্রেমকে সারল্য, সৌন্দর্য এবং স্বাভাবিকতা দান করে তাকে বিশ্বসুরের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়েছে।

আর সন্ধ্যামেঘের মতো কিম্পুরুষ-পর্বত যে হেমকূট, যেখানে সুরাসুরগুরু মরীচি তাঁর পত্নীর সঙ্গে মিলে তপস্যা করছেন, লতাজালজড়িত যে হেমকূট পক্ষিনীড়খচিত অরণ্যজটামণ্ডল বহন করে যোগাসনে অচল শিবের মতো সূর্যের দিকে তাকিয়ে ধ্যানমগ্ন, যেখানে কেশর ধরে সিংহশিশুকে মাতার স্তন থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে যখন দুরন্ত তপস্বিবালক তার সঙ্গে খেলা করে তখন পশুর সেই দুঃখ ঋষিপত্নীর পক্ষে অসহ্য হয়ে ওঠে,—সেই তপোবন শকুন্তলার অপমানিত বিচ্ছেদদুঃখকে অতি বৃহৎ শান্তি ও পবিত্রতা দান করেছে।

একথা স্বীকার করতে হবে প্রথম তপোবনটি মর্ত্যলোকের, আর দ্বিতীয়টি অমৃতলোকের। অর্থাৎ প্রথমটি হচ্ছে যেমন হয়ে থাকে, দ্বিতীয়টি হচ্ছে যেমন হওয়া ভালো। এই "যেমন-হওয়া-ভালো"র দিকে "যেমন-হয়ে-থাকে" চলেছে। এরই দিকে চেয়ে সে আপনাকে শোধন করছে, পূর্ণ করছে। "যেমন-হয়ে-থাকে" হচ্ছেন সতী অর্থাৎ সত্য, আর "যেমন-হওয়া-ভালো" হচ্ছেন শিব অর্থাৎ মঙ্গল। কামনা ক্ষয় করে তপস্যার মধ্য দিয়ে এই সতী ও শিবের মিলন হয়। শকুন্তলার জীবনেও "যেমন-হয়ে-থাকে" তপস্যার দ্বারা অবশেষে "যেমন-হওয়া-ভালো"র মধ্যে এসে আপনাকে সফল করে তুলেছে। দুঃখের ভিতর দিয়ে মর্ত্য শেষকালে স্বর্গের প্রান্তে এসে উপনীত হয়েছে।

মানসলোকের এই যে দ্বিতীয় তপোবন এখানেও প্রকৃতিকে ত্যাগ করে মানুষ স্বতন্ত্র হয়ে ওঠে নি। স্বর্গে যাবার সময় যুধিষ্ঠির তাঁর কুকুরকে সঙ্গে নিয়েছিলেন। প্রাচীন ভারতের কাব্যে মানুষ যখন স্বর্গে পৌঁছোয় প্রকৃতিকে সঙ্গে নেয়, বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজে বড়ো হয়ে ওঠে না। মরীচির তপোবনে মানুষ যেমন তপস্বী হেমকূটও তেমনি তপস্বী, সিংহও সেখানে হিংসা ত্যাগ করে, গাছপালাও সেখানে ইচ্ছাপূর্বক প্রার্থীর অভাব পূরণ করে। মানুষ একা নয়, নিখিলকে নিয়ে সে সম্পূর্ণ, অতএব কল্যাণ যখন আবির্ভূত হয় তখন সকলের সঙ্গে যোগেই তার আবির্ভাব।

রামায়ণে রামের বনবাস হল। কেবল রাক্ষসের উপদ্রব ছাড়া সে বনবাসে তাঁদের আর কোনো দুঃখই ছিল না। তাঁরা বনের পর বন, নদীর পর নদী, পর্বতের পর

পর্বত পার হয়ে গেছেন, তাঁরা পর্ণকুটীরে বাস করেছেন, মাটিতে শুয়ে রাত্রি কাটিয়েছেন কিন্তু তাঁরা ক্লেশবোধ করেন নি। এই সমস্ত নদীগিরি অরণ্যের সঙ্গে তাঁদের হৃদয়ের মিলন ছিল। এখানে তাঁরা প্রবাসী নন।

অন্য দেশের কবি রাম লক্ষ্মণ সীতার মাহাত্ম্যকে উজ্জ্বল করে দেখাবার জন্যেই বনবাসের দুঃখকে খুব কঠোর করেই চিত্রিত করতেন। কিন্তু বাল্মীকি একেবারেই তা করেন নি—তিনি বনের আনন্দকেই বারংবার পুনরুক্তিদ্বারা কীর্তন করে চলেছেন।

রাজৈশ্বর্য যাঁদের অন্তঃকরণকে অভিভূত করে আছে বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মিলন কখনোই তাঁদের পক্ষে স্বাভাবিক হতে পারে না। সমাজগত সংস্কার ও চিরজন্মের কৃত্রিম অভ্যাস পদে পদেই তাঁদের বাধা না দিয়ে থাকতে পারে না। সেই সকল বাধার ভিতর থেকে প্রকৃতিকে তাঁরা কেবল প্রতিকূলই দেখতে থাকেন।

আমাদের রাজপুত্র ঐশ্বর্যে পালিত কিন্তু ঐশ্বর্যের আসক্তি তাঁর অন্তঃকরণকে অভিভূত করে নি। ধর্মের অনুরোধে বনবাস স্বীকার করাই তার প্রথম প্রমাণ। তাঁর চিত্ত স্বাধীন ছিল, শান্ত ছিল, এইজন্যেই তিনি অরণ্যে প্রবাসদুঃখ ভোগ করেন নি; এইজন্যেই তরুলতা পশুপক্ষী তাঁর হৃদয়কে কেবলই আনন্দ দিয়েছে। এই আনন্দ প্রভুত্বের আনন্দ নয়, ভোগের আনন্দ নয়, সম্মিলনের আনন্দ। এই আনন্দের ভিত্তিতে তপস্যা, আত্মসংযম। এর মধ্যেই উপনিষদের সেই বাণী, তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ।

কৌশল্যার রাজগৃহবধূ সীতা বনে চলেছেন—

একৈকং পাদপং গুল্মং লতাং বা পুষ্পশালিনীম্
অদৃষ্টরূপাং পশ্যন্তী রামং পপ্রচ্ছ সাবলা।
রমণীয়ান্ বহুবিধান্ পাদপান্ কুসুমোৎকরান্
সীতাবচনসংরব্ধ আনয়ামাস লক্ষ্মণঃ।
বিচিত্রবালুকাজলাং হংসসারসনাদিতাম্।
রেমে জনকরাজস্য সুতা প্রেক্ষ্য তদা নদীম্।

যে সকল তরুগুল্ম কিংবা পুষ্পশালিনী লতা সীতা পূর্বে কখনো দেখেন নি তাদের কথা তিনি রামকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। লক্ষ্মণ তাঁর অনুরোধে তাঁকে পুষ্পমঞ্জরীতে ভরা বহুবিধ গাছ তুলে এনে দিতে লাগলেন। সেখানে বিচিত্রবালুকাজলা হংসসারসমুখরিতা নদী দেখে জানকী মনে আনন্দ বোধ করলেন।

প্রথম বনে গিয়ে রাম চিত্রকূট পর্বতে যখন আশ্রয় গ্রহণ করলেন, তিনি

সুরম্যমাসাদ্য তু চিত্রকূটং
নদীঞ্চ তাং মাল্যবতীং সুতীর্থাং
ননন্দ হৃষ্টো মৃগপক্ষিজুষ্টাং
জহৌ চ দুঃখং পুরবিপ্রবাসাৎ।

সেই সুরম্য চিত্রকূট, সেই সুতীর্থা মাল্যবতী নদী, সেই মৃগপক্ষিসেবিতা বনভূমিকে প্রাপ্ত হয়ে পুরবিপ্রবাসের দুঃখকে ত্যাগ করে হৃষ্টমনে রাম আনন্দ করতে লাগলেন।

দীর্ঘকালোষিতস্তস্মিন্ গিরৌ গিরিবনপ্রিয়ঃ—গিরিবনপ্রিয় রাম দীর্ঘকাল সেই গিরিতে বাস করে একদিন সীতাকে চিত্রকূটশিখর দেখিয়ে বলছেন—

ন রাজ্যভ্রংশনং ভদ্রে ন সুহৃদ্ভির্বিনাভবঃ
মনো মে বাধতে দৃষ্ট্বা রমণীয়মিমং গিরিম্।

রমণীয় এই গিরিকে দেখে রাজ্যভ্রংশনও আমাকে দুঃখ দিচ্ছে না, সুহৃদ্‌গণের কাছ থেকে দূরে বাসও আমার পীড়ার কারণ হচ্ছে না।

সেখান থেকে রাম যখন দণ্ডকারণ্যে গেলেন সেখানে গগনে সূর্যমণ্ডলের মতো দুর্দর্শ প্রদীপ্ত তাপসাশ্রমমণ্ডল দেখতে পেলেন। এই আশ্রম শরণ্যং সর্বভূতানাম্। ইহা ব্রাহ্মীলক্ষ্মী দ্বারা সমাবৃত। কুটিরগুলি সুমার্জিত, চারিদিকে কত মৃগ কত পক্ষী।

রামের বনবাস এমনি করেই কেটেছিল—কোথাও বা রমণীয় বনে, কোথাও বা পবিত্র তপোবনে।

রামের প্রতি সীতার ও সীতার প্রতি রামের প্রেম তাঁদের পরস্পর থেকে প্রতিফলিত হয়ে চারিদিকের মৃগ পক্ষীকে আচ্ছন্ন করেছিল। তাঁদের প্রেমের যোগে তাঁরা কেবল নিজেদের সঙ্গে নয়, বিশ্বলোকের সঙ্গে যোগযুক্ত হয়েছিলেন। এইজন্য সীতাহরণের পর রাম সমস্ত অরণ্যকেই আপনার বিচ্ছেদবেদনার সহচর পেয়েছিলেন। সীতার অভাব কেবল রামের পক্ষে নয়—সমস্ত অরণ্যই যে সীতাকে হারিয়েছে। কারণ, রামসীতার বনবাসকালে অরণ্য একটি নূতন সম্পদ পেয়েছিল—সেটি হচ্ছে মানুষের প্রেম। সেই প্রেমে তার পল্লবঘনশ্যামলতাকে, তার ছায়াগম্ভীর গহনতার রহস্যকে একটি চেতনার সঞ্চারে রোমাঞ্চিত করে তুলেছিল।

শেক্‌স্‌পীয়রের As you like it নাটক একটি বনবাসকাহিনী—টেম্পেস্টও তাই, Midsummer night's dream ও অরণ্যের কাব্য। কিন্তু সে সকল কাব্যে মানুষের প্রভুত্ব ও প্রবৃত্তির লীলাই একেবারে একান্ত—অরণ্যের সঙ্গে সৌহার্দ্য দেখতে পাই নে।

অরণ্যবাসের সঙ্গে মানুষের চিত্তের সামঞ্জস্যসাধন ঘটে নি। হয় তাকে জয় করবার, নয় তাকে ত্যাগ করবার চেষ্টা সর্বদাই রয়েছে; হয় বিরোধ, নয় বিরাগ, নয় ঔদাসীন্য। মানুষের প্রকৃতি বিশ্বপ্রকৃতিকে ঠেলেঠুলে স্বতন্ত্র হয়ে উঠে আপনার গৌরব প্রকাশ করেছে।

মিলটনের প্যারাডাইস লস্ট কাব্যে আদি মানবদম্পতির স্বর্গারণ্যে বাস বিষয়টিই এমন যে অতি সহজেই সেই কাব্যে মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির মিলনটি সরল প্রেমের সম্বন্ধে বিরাট ও মধুর হয়ে প্রকাশ পাবার কথা। কবি প্রকৃতিসৌন্দর্যের বর্ণনা করেছেন, জীবজন্তুরা সেখানে হিংসা পরিত্যাগ করে একত্রে বাস করছে তাও বলেছেন, কিন্তু মানুষের সঙ্গে তাদের কোনো সাত্ত্বিক সম্বন্ধ নেই। তারা মানুষের ভোগের জন্যেই বিশেষ করে সৃষ্ট, মানুষ তাদের প্রভু। এমন আভাসটি কোথাও পাই নে যে এই আদি দম্পতি প্রেমের আনন্দ-প্রাচুর্যে তরুলতা পশুপক্ষীর সেবা করছেন, ভাবনাকে কল্পনাকে নদীগিরিঅরণ্যের সঙ্গে নানালীলায় সম্মিলিত করে তুলছেন। এই স্বর্গারণ্যের যে নিভৃত নিকুঞ্জটিতে মানবের প্রথম পিতামাতা বিশ্রাম করতেন সেখানে "Beast, bird, insect or worm durst enter none; such was their awe of man."—অর্থাৎ পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ কেউ প্রবেশ করতে সাহস করত না, মানুষের প্রতি এমনি তাদের একটি সভয় সম্ভ্রম ছিল।

এই যে নিখিলের সঙ্গে মানুষের বিচ্ছেদ, এর মূলে একটি গভীরতর বিচ্ছেদের কথা আছে। এর মধ্যে—ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ—জগতে যা কিছু আছে সমস্তকেই ঈশ্বরের দ্বারা সমাবৃত করে জানবে, এই বাণীটির অভাব আছে। এই পাশ্চাত্য কাব্য ঈশ্বরের সৃষ্টি ঈশ্বরের যশোকীর্তন করবার জন্যেই; ঈশ্বর স্বয়ং দূরে থেকে তাঁর এই বিশ্বরচনা থেকে বন্দনা গ্রহণ করছেন।

মানুষের সঙ্গেও আংশিক পরিমাণে প্রকৃতির সেই সম্বন্ধ প্রকাশ পেয়েছে অর্থাৎ প্রকৃতি মানুষের শ্রেষ্ঠতা প্রচারের জন্যে।

ভারতবর্ষও যে মানুষের শ্রেষ্ঠতা অস্বীকার করে তা নয়। কিন্তু প্রভুত্ব করাকেই ভোগ করাকেই সে শ্রেষ্ঠতার প্রধান লক্ষণ বলে মানে না। মানুষের শ্রেষ্ঠতার সর্বপ্রধান পরিচয়ই হচ্ছে এই যে, মানুষ সকলের সঙ্গে মিলিত হতে পারে! সে-মিলন মূঢ়তার মিলন নয় সে-মিলন চিত্তের মিলন, সুতরাং আনন্দের মিলন। এই আনন্দের কথাই আমাদের কাব্যে কীর্তিত।

উত্তরচরিতে রাম ও সীতার যে প্রেম, সেই প্রেম আনন্দের প্রাচুর্যবেগে চারি দিকের জলস্থল আকাশের মধ্যে প্রবেশ করেছে। তাই রাম দ্বিতীয়বার গোদাবরীর

গিরিতট দেখে বলে উঠেছিলেন, যত্র দ্রুমা অপি মৃগা অপি বন্ধবো মে। তাই সীতাবিচ্ছেদকালে তিনি তাঁদের পূর্বনিবাসভূমি দেখে আক্ষেপ করেছিলেন যে, মৈথিলী তাঁর করকমলবিকীর্ণ জল নীবার ও তৃণ দিয়ে যে-সকল গাছ পাখি ও হরিণদের পালন করেছিলেন তাদের দেখে আমার হৃদয় পাষাণগলার মতো গলে যাচ্ছে।

মেঘদূতে যক্ষের বিরহ নিজের দুঃখের টানে স্বতন্ত্র হয়ে একলা কোণে বসে বিলাপ করছে না। বিরহ-দুঃখই তার চিত্তকে নববর্ষায় প্রফুল্ল পৃথিবীর সমস্ত নগনদী-অরণ্যনগরীর মধ্যে পরিব্যাপ্ত করে দিয়েছে। মানুষের হৃদয়বেদনাকে কবি সংকীর্ণ করে দেখান নি, তাকে বিরাটের মধ্যে বিস্তীর্ণ করেছেন; এই জন্যই প্রভু-শাপগ্রস্ত একজন যক্ষের দুঃখবার্তা চিরকালের মতো বর্ষাঋতুর মর্মস্থান অধিকার করে প্রণয়ী-হৃদয়ের খেয়ালকে বিশ্বসংগীতের ধ্রুপদে এমন করে বেঁধে দিয়েছে।

ভারতবর্ষের এইটেই হচ্ছে বিশেষত্ব। তপস্যার ক্ষেত্রেও এই দেখি, যেখানে তার হৃদয়বৃত্তির লীলা সেখানেও এই দেখতে পাই।

মানুষ দুই রকম করে নিজের মহত্ত্ব উপলব্ধি করে—এক, স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে, আর-এক মিলনের মধ্যে। এক, ভোগের দ্বারা, আর-এক যোগের দ্বারা। ভারতবর্ষ স্বভাবতই শেষের পথ অবলম্বন করেছে। এইজন্যেই দেখতে পাই যেখানেই প্রকৃতির মধ্যে কোনো বিশেষ সৌন্দর্য বা মহিমার আবির্ভাব সেইখানেই ভারতবর্ষের তীর্থস্থান। মানবচিত্তের সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির মিলন যেখানে স্বভাবতই ঘটতে পারে সেই স্থানটিকেই ভারতবর্ষ পবিত্র তীর্থ বলে জেনেছে। এ সকল জায়গায় মানুষের প্রয়োজনের কোনো উপকরণই নেই, এখানে চাষও চলে না বাসও চলে না, এখানে পণ্য-সামগ্রীর আয়োজন নেই, এখানে রাজার রাজধানী নয়,—অন্তত সেই সমস্তই এখানে মুখ্য নয়। এখানে নিখিল প্রকৃতির সঙ্গে মানুষ আপনার যোগ উপলব্ধি ক'রে আত্মাকে সর্বগ ও বৃহৎ বলে জানে। এখানে প্রকৃতিকে নিজের প্রয়োজন সাধনের ক্ষেত্র বলে মানুষ জানে না, তাকে আত্মার উপলব্ধি সাধনের ক্ষেত্র বলেই মানুষ অনুভব করে, এইজন্যেই তা পুণ্যস্থান।

ভারতবর্ষের হিমালয় পবিত্র, ভারতবর্ষের বিন্ধ্যাচল পবিত্র, ভারতবর্ষের যে নদীগুলি লোকালয়সকলকে অক্ষয়ধারায় স্তন্য দান করে আসছে তারা সকলেই পুণ্য-সলিলা। হরিদ্বার পবিত্র, হৃষীকেশ পবিত্র, কেদারনাথ বদরিকাশ্রম পবিত্র, কৈলাস পবিত্র, মানস সরোবর পবিত্র, গঙ্গার মধ্যে যমুনার মিলন পবিত্র, সমুদ্রের মধ্যে গঙ্গার অবসান পবিত্র। যে বিরাট প্রকৃতির দ্বারা মানুষ পরিবেষ্টিত, যার আলোক এসে তার চক্ষুকে সার্থক করেছে, যার উত্তাপ তার সর্বাঙ্গে প্রাণকে স্পন্দিত করে তুলছে,

যার জলে তার অভিষেক, যার অন্নে তার জীবন, যার অভ্রভেদী রহস্য-নিকেতনের নানা দ্বার দিয়ে নানা দূত বেরিয়ে এসে শব্দে গন্ধে বর্ণে ভাবে মানুষের চৈতন্যকে নিত্যনিয়ত জাগ্রত করে রেখে দিয়েছে ভারতবর্ষ সেই প্রকৃতির মধ্যে আপনার ভক্তিবৃত্তিকে সর্বত্র ওতপ্রোত করে প্রসারিত করে দিয়েছে। । জগৎকে ভারতবর্ষ পূজার দ্বারা গ্রহণ করেছে, তাকে কেবলমাত্র উপভোগের দ্বারা খর্ব করে নি, তাকে ঔদাসীন্যের দ্বারা নিজের কর্মক্ষেত্রের বাইরে দূরে সরিয়ে রেখে দেয় নি; এই বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে পবিত্র যোগেই ভারতবর্ষ আপনাকে বৃহৎ করে সত্য করে জেনেছে, ভারতবর্ষের তীর্থস্থানগুলি এই কথাই ঘোষণা করছে।

বিদ্যালাভ করা কেবল বিদ্যালয়ের উপরেই নির্ভর করে না। প্রধানত ছাত্রের উপরেই নির্ভর করে। অনেক ছাত্র বিদ্যালয়ে যায়, এমন কি উপাধিও পায়, অথচ বিদ্যা পায় না। তেমনি তীর্থে অনেকেই যায় কিন্তু তীর্থের যথার্থ ফল সকলে লাভ করতে পারে না। যারা দেখবার জিনিসকে দেখবে না, পাবার জিনিসকে নেবে না, শেষ পর্যন্তই তাদের বিদ্যা পুঁথিগত ও ধর্ম বাহ্য আচারে আবদ্ধ থাকে। তারা তীর্থে যায় বটে কিন্তু যাওয়াকেই তারা পুণ্য মনে করে, পাওয়াকে নয়। তারা বিশেষ জল বা বিশেষ মাটির কোনো বস্তুগুণ আছে বলেই কল্পনা করে, এতে মানুষের লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়, যা চিত্তের সামগ্রী তাকে বস্তুর মধ্যে নির্বাসিত করে নষ্ট করে। আমাদের দেশে সাধনামার্জিত চিত্তশক্তি যতই মলিন হয়েছে এই নিরর্থক বাহ্যিকতা ততই বেড়ে উঠেছে এ-কথা স্বীকার করতেই হবে। কিন্তু আমাদের এই দুর্গতির দিনের জড়ত্বকেই আমি কোনোমতেই ভারতবর্ষের চিরন্তন অভিপ্রায় বলে গ্রহণ করতে পারি নে।

কোনো একটি বিশেষ নদীর জলে স্নান করলে নিজের অথবা ত্রিকোটিসংখ্যক পূর্বপুরুষের পারলৌকিক সদ্‌গতি ঘটার সম্ভাবনা আছে এ-বিশ্বাসকে আমি সমূলক বলে মেনে নিতে রাজি নই এবং এ-বিশ্বাসকে আমি বড়ো জিনিস বলে শ্রদ্ধা করি নে। কিন্তু অবগাহন স্নানের সময় নদীর জলকে যে-ব্যক্তি যথার্থ ভক্তির দ্বারা সর্বাঙ্গে এবং সমস্ত মনে গ্রহণ করতে পারে আমি তাকে ভক্তির পাত্র বলেই জ্ঞান করি। কারণ, নদীর জলকে সামান্য তরল পদার্থ বলে সাধারণ মানুষের যে একটা স্থূল সংস্কার, একটা তামসিক অবজ্ঞা আছে, সাত্ত্বিকতার দ্বারা অর্থাৎ চৈতন্যময়তার দ্বারা সেই জড় সংস্কারকে সে-লোক কাটিয়ে উঠেছে—এই জন্যে নদীর জলের সঙ্গে কেবলমাত্র তার শারীরিক ব্যবহারের বাহ্য সংস্রব ঘটে নি, তার সঙ্গে তার চিত্তের যোগসাধন হয়েছে। এই নদীর ভিতর দিয়ে পরম চৈতন্য তার চেতনাকে একভাবে স্পর্শ করেছেন। সেই

স্পর্শের দ্বারা স্নানের জল কেবল তার দেহের মলিনতা নয়, তার চিত্তেরও মোহপ্রলেপ মার্জনা করে দিচ্ছে।

অগ্নি জল মাটি অন্ন প্রভৃতি সামগ্রীর অনন্ত রহস্য পাছে অভ্যাসের দ্বারা আমাদের কাছে একেবারে মলিন হয়ে যায় এই জন্যে প্রত্যহই নানা কর্মে নানা অনুষ্ঠানে তাদের পবিত্রতা আমাদের স্মরণ করবার বিধি আছে। যে-লোক চেতনভাবে তাই স্মরণ করতে পারে, তাদের সঙ্গে যোগে ভূমার সঙ্গে আমাদের যোগ এ-কথা যার বোধশক্তি স্বীকার করতে পারে সে-লোক খুব একটি মহৎ সিদ্ধি লাভ করেছে। স্নানের জলকে আহারের অন্নকে শ্রদ্ধা করবার যে শিক্ষা সে মূঢ়তার শিক্ষা নয় তাতে জড়ত্বের প্রশ্রয় হয় না; কারণ, এই সমস্ত অভ্যস্ত সামগ্রীকে তুচ্ছ করাই হচ্ছে জড়তা, তার মধ্যেও চিত্তের উদ্বোধন এ কেবল চৈতন্যের বিশেষ বিকাশেই সম্ভবপর। অবশ্য, যে-ব্যক্তি মূঢ়, সত্যকে গ্রহণ করতে যার প্রকৃতিতে স্থূল বাধা আছে, সমস্ত সাধনাকেই সে বিকৃত করে এবং লক্ষ্যকে সে কেবলই ভুল জায়গায় স্থাপন করতে থাকে এ-কথা বলাই বাহুল্য।

বহুকোটি লোক, প্রায় একটি সমগ্র জাতি, মৎস্য মাংস আহার একেবারে পরিত্যাগ করেছে—পৃথিবীতে কোথাও এর তুলনা পাওয়া যায় না। মানুষের মধ্যে এমন জাতি দেখি নে যে আমিষ আহার না করে।

ভারতবর্ষ এই যে আমিষ পরিত্যাগ করেছে সে কৃচ্ছ্রব্রত সাধনের জন্যে নয়, নিজের শরীরের পীড়া দিয়ে কোনো শাস্ত্রোপদিষ্ট পুণ্যলাভের জন্যে নয়। তার একমাত্র উদ্দেশ্য, জীবের প্রতি হিংসা ত্যাগ করা।

এই হিংসা ত্যাগ না করলে জীবের সঙ্গে জীবের যোগসামঞ্জস্য নষ্ট হয়। প্রাণীকে যদি আমরা খেয়ে ফেলবার, পেট ভরাবার জিনিস বলে দেখি তবে কখনোই তাকে সত্যরূপে দেখতে পারি নে। তবে প্রাণ জিনিসটাকে এতই তুচ্ছ করে দেখা অভ্যস্ত হয়ে যায় যে, কেবল আহারের জন্য নয়, শুধুমাত্র প্রাণিহত্যা করাই আমোদের অঙ্গ হয়ে ওঠে। এবং নিদারুণ অহৈতুকী হিংসাকে জলে স্থলে আকাশে গুহায় গহ্বরে দেশে বিদেশে মানুষ ব্যাপ্ত করে দিতে থাকে।

এই যোগভ্রষ্টতা, এই বোধশক্তির অসাড়তা থেকে ভারতবর্ষ মানুষকে রক্ষা করবার জন্যে চেষ্টা করেছে।

মানুষের জ্ঞান বর্বরতা থেকে অনেক দূরে অগ্রসর হয়েছে তার একটি প্রধান লক্ষণ কী ? না, মানুষ বিজ্ঞানের সাহায্যে জগতের সর্বত্রই নিয়মকে দেখতে পাচ্ছে। যতক্ষণ পর্যন্ত তা না দেখতে পাচ্ছিল ততক্ষণ পর্যন্ত তার জ্ঞানের সম্পূর্ণ সার্থকতা ছিল না।

ততক্ষণ বিশ্বচরাচরে সে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাস করছিল—সে দেখছিল জ্ঞানের নিয়ম কেবল তার নিজের মধ্যেই আছে আর এই বিরাট বিশ্ব-ব্যাপারের মধ্যে নেই। এই জন্যেই তার জ্ঞান আছে বলেই সে যেন জগতে একঘরে হয়ে ছিল। কিন্তু আজ তার জ্ঞান অণু হতে অণুতম ও বৃহৎ হতে বৃহত্তম সকলের সঙ্গেই নিজের যোগস্থাপনা করতে প্রবৃত্ত হয়েছে। এই হচ্ছে বিজ্ঞানের সাধনা।

ভারতবর্ষ যে-সাধনাকে গ্রহণ করেছে সে হচ্ছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে চিত্তের যোগ, আত্মার যোগ, অর্থাৎ সম্পূর্ণ যোগ। কেবল জ্ঞানের যোগ নয়, বোধের যোগ।

গীতা বলেছেন

ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ,
মনসস্তু পরাবুদ্ধির্যোবুদ্ধেঃপরতস্তু সঃ।

ইন্দ্রিয়গণকে শ্রেষ্ঠ পদার্থ বলা হয়ে থাকে, কিন্তু ইন্দ্রিয়ের চেয়ে মন শ্রেষ্ঠ, আবার মনের চেয়ে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, আর বুদ্ধির চেয়ে যা শ্রেষ্ঠ তা হচ্ছেন তিনি।

ইন্দ্রিয়সকল কেন শ্রেষ্ঠ, না, ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিশ্বের সঙ্গে আমাদের যোগসাধন হয়, কিন্তু সে যোগ আংশিক। ইন্দ্রিয়ের চেয়ে মন শ্রেষ্ঠ, কারণ মনের দ্বারা যে জ্ঞানময় যোগ ঘটে তা ব্যাপকতর। কিন্তু জ্ঞানের যোগেও সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ দূর হয় না। মনের চেয়ে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, কারণ বোধের দ্বারা যে চৈতন্যময় যোগ, তা একেবারে পরিপূর্ণ। সেই যোগের দ্বারাই আমরা সমস্ত জগতের মধ্যে তাঁকেই উপলব্ধি করি যিনি সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

এই সকলের-চেয়ে-শ্রেষ্ঠকে সকলের মধ্যেই বোধের দ্বারা অনুভব করা ভারতবর্ষের সাধনা।

অতএব যদি আমরা মনে করি ভারতবর্ষের এই সাধনাতেই দীক্ষিত করা ভারতবাসীর শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত তবে এটা মনে স্থির রাখতে হবে যে কেবল ইন্দ্রিয়ের শিক্ষা নয়, কেবল জ্ঞানের শিক্ষা নয়, বোধের শিক্ষাকে আমাদের বিদ্যালয়ে প্রধান স্থান দিতে হবে। অর্থাৎ কেবল কারখানার দক্ষতা-শিক্ষা নয়, স্কুল-কলেজে পরীক্ষায় পাস করা নয়, আমাদের যথার্থ শিক্ষা তপোবনে; প্রকৃতির সঙ্গে মিলিত হয়ে, তপস্যার দ্বারা পবিত্র হয়ে।

আমাদের স্কুল-কলেজেও তপস্যা আছে কিন্তু সে মনের তপস্যা, জ্ঞানের তপস্যা। বোধের তপস্যা নয়।

জ্ঞানের তপস্যায় মনকে বাধামুক্ত করতে হয়। যেসকল পূর্বসংস্কার আমাদের মনের ধারণাকে এক-ঝোঁকা করে রাখে তাদের ক্রমে ক্রমে পরিষ্কার করে দিতে হয়।

যা নিকটে আছে বলে বড়ো এবং দূরে আছে বলে ছোটো, যা বাইরে আছে বলেই প্রত্যক্ষ এবং ভিতরে আছে বলেই প্রচ্ছন্ন, যা বিচ্ছিন্ন করে দেখলে নিরর্থক, সংযুক্ত করে দেখলেই সার্থক তাকে তার যাথার্থ্য রক্ষা করে দেখবার শিক্ষা দিতে হয়।

বোধের তপস্যার বাধা হচ্ছে রিপুর বাধা; প্রবৃত্তি অসংযত হয়ে উঠলে চিত্তের সাম্য থাকে না সুতরাং বোধ বিকৃত হয়ে যায়। কামনার জিনিসকে আমরা শ্রেয় দেখি, সে জিনিসটা সত্যই শ্রেয় বলে নয় আমাদের কামনা আছে বলেই; লোভের জিনিসকে আমরা বড়ো দেখি, সে জিনিসটা সত্যই বড়ো বলে নয় আমাদের লোভ আছে বলেই।

এই জন্যে ব্রহ্মচর্যের সংযমের দ্বারা বোধশক্তিকে বাধামুক্ত করবার শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। ভোগবিলাসের আকর্ষণ থেকে অভ্যাসকে মুক্তি দিতে হয়, যে সমস্ত সাময়িক উত্তেজনা লোকের চিত্তকে ক্ষুব্ধ এবং বিচারবুদ্ধিকে সামঞ্জস্যভ্রষ্ট করে দেয় তার ধাক্কা থেকে বাঁচিয়ে বুদ্ধিকে সরল করে বাড়তে দিতে হয়।

যেখানে সাধনা চলছে, যেখানে জীবনযাত্রা সরল ও নির্মল, যেখানে সামাজিক সংস্কারের সংকীর্ণতা নেই, যেখানে ব্যক্তিগত ও জাতিগত বিরোধবুদ্ধিকে দমন করবার চেষ্টা আছে, সেইখানেই ভারতবর্ষ যাকে বিশেষভাবে বিদ্যা বলেছে তাই লাভ করবার স্থান।

আমি জানি অনেকেই বলে উঠবেন এ একটা ভাবুকতার উচ্ছ্বাস, কাণ্ডজ্ঞান-বিহীনের দুরাশামাত্র। কিন্তু সে আমি কোনোমতেই স্বীকার করতে পারি নে। যা সত্য তা যদি অসাধ্য হয় তবে তা সত্যই নয়। অবশ্য, যা সকলের চেয়ে শ্রেয় তাই যে সকলের চেয়ে সহজ তা নয়, সেই জন্যেই তার সাধনা চাই। আসলে, প্রথম শক্ত হচ্ছে সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা করা। টাকা জিনিসটার দরকার আছে এই বিশ্বাস যখন ঠিক মনে জন্মায় তখন এ আপত্তি আমরা আর করি নে যে টাকা উপার্জন করা শক্ত। তেমনি ভারতবর্ষ যখন বিদ্যাকেই নিশ্চয়রূপে শ্রদ্ধা করেছিল তখন সেই বিদ্যালাভের সাধনাকে অসাধ্য বলে হেসে উড়িয়ে দেয় নি। তখন তপস্যা আপনি সত্য হয়ে উঠেছিল।

অতএব প্রথমত দেশের সেই সত্যের প্রতি দেশের লোকের শ্রদ্ধা যদি জন্মে তবে দুর্গম বাধার মধ্য দিয়েও তার পথ আপনিই তৈরি হয়ে উঠবে।

বর্তমানকালে এখনই দেশে এই রকম তপস্যার স্থান। এই রকম বিদ্যালয় যে অনেকগুলি হবে আমি এমনতরো আশা করি নে। কিন্তু আমরা যখন বিশেষভাবে জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করবার জন্যে সম্প্রতি জাগ্রত হয়ে উঠেছি তখন ভারতবর্ষের

বিদ্যালয় যেমনটি হওয়া উচিত অন্তত তার একটিমাত্র আদর্শ দেশের নানা চাঞ্চল্য, নানা বিরুদ্ধভাবের আন্দোলনের ঊর্ধ্বে জেগে ওঠা দরকার হয়েছে।

ন্যাশনাল বিদ্যাশিক্ষা বলতে য়ুরোপ যা বোঝে আমরা যদি তাই বুঝি তবে তা নিতান্তই বোঝার ভুল হবে। আমাদের দেশের কতকগুলি বিশেষ সংস্কার, আমাদের জাতের কতকগুলি লোকাচার, এইগুলির দ্বারা সীমাবদ্ধ করে আমাদের স্বাজাত্যের অভিমানকে অত্যুগ্র করে তোলবার উপায়কে আমি কোনোমতে ন্যাশনাল শিক্ষা বলে গণ্য করতে পারি নে। জাতীয়তাকে আমরা পরম পদার্থ বলে পূজা করি নে এইটেই হচ্ছে আমাদের জাতীয়তা—ভূমৈব সুখং, নাল্পে সুখমস্তি, ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ, এইটিই হচ্ছে আমাদের জাতীয়তার মন্ত্র।

প্রাচীন ভারতের তপোবনে যে মহাসাধনার বনস্পতি একদিন মাথা তুলে উঠেছিল এবং সর্বত্র তার শাখাপ্রশাখা বিস্তার করে সমাজের নানাদিককে অধিকার করে নিয়েছিল সেই ছিল আমাদের ন্যাশনাল সাধনা। সেই সাধনা যোগসাধনা। যোগসাধনা কোনো উৎকট শারীরিক মানসিক ব্যায়ামচর্চা নয়। যোগসাধনা মানে সমস্ত জীবনকে এমনভাবে চালনা করা যাতে স্বাতন্ত্র্যের দ্বারা বিক্রমশালী হয়ে ওঠাই আমাদের লক্ষ্য না হয়, মিলনের দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে ওঠাকেই আমরা চরম পরিণাম বলে মানি, ঐশ্বর্যকে সঞ্চিত করে তোলা নয় আত্মাকে সত্যে উপলব্ধি করাই আমরা সফলতা বলে স্বীকার করি।

বহু প্রাচীনকালে একদিন অরণ্যসংকুল ভারতবর্ষে আমাদের আর্য পিতামহেরা প্রবেশ করেছিলেন। আধুনিক ইতিহাসে য়ুরোপীয়দল ঠিক তেমনি করেই নূতন আবিষ্কৃত মহাদ্বীপের মহারণ্যে পথ উদ্‌ঘাটন করেছেন। তাঁদের মধ্যে সাহসিকগণ অগ্রগামী হয়ে অপরিচিত ভূখণ্ডসকলকে অনুবর্তীদের জন্যে অনুকূল করে নিয়েছেন। আমাদের দেশেও অগস্ত্য প্রভৃতি ঋষিরা অগ্রগামী ছিলেন। তাঁরা অপরিচিত দুর্গমতার বাধা অতিক্রম করে গহন অরণ্যকে বাসোপযোগী করে তুলেছিলেন। পূর্বতন অধিবাসীদের সঙ্গে প্রাণপণ লড়াই তখনও যেমন হয়েছিল এখনও তেমনি হয়েছে। কিন্তু এই দুই ইতিহাসের ধারা যদিও ঠিক একই অবস্থার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে তবু একই সমুদ্রে এসে পৌঁছোয় নি।

আমেরিকার অরণ্যে যে তপস্যা হয়েছে তার প্রভাবে বনের মধ্যে থেকে বড়ো বড়ো শহর ইন্দ্রজালের মতো জেগে উঠেছে। ভারতবর্ষেও তেমন করে শহরের সৃষ্টি হয় নি তা নয় কিন্তু ভারতবর্ষ সেই সঙ্গে অরণ্যকেও অঙ্গীকার করে নিয়েছিল। অরণ্য ভারতবর্ষের দ্বারা বিলুপ্ত হয় নি, ভারতবর্ষের দ্বারা সার্থক হয়েছিল, যা বর্বরের

আবাস ছিল তাই ঋষির তপোবন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আমেরিকায় অরণ্য যা অবশিষ্ট আছে তা আজ আমেরিকার প্রয়োজনের সামগ্রী, কোথাও বা তা ভোগের বস্তুও বটে, কিন্তু যোগের আশ্রম নয়। ভূমার উপলব্ধি দ্বারা এই অরণ্যগুলি পুণ্যস্থান হয়ে ওঠে নি। মানুষের শ্রেষ্ঠতর অন্তরতর প্রকৃতির সঙ্গে এই আরণ্য প্রকৃতির পবিত্র মিলন স্থাপিত হয় নি। অরণ্যকে নব্য আমেরিকা আপনার বড়ো জিনিস কিছুই দেয় নি, অরণ্যও তাকে আপনার বড়ো পরিচয় থেকে বঞ্চিত করেছে। নূতন আমেরিকা যেমন তার পুরাতন অধিবাসীদের প্রায় লুপ্তই করেছে আপনার সঙ্গে যুক্ত করে নি তেমনি অরণ্যগুলিকে আপনার সভ্যতার বাইরে ফেলে দিয়েছে তার সঙ্গে মিলিত করে নেয় নি। নগর-নগরীই আমেরিকার সভ্যতার প্রকৃষ্ট নিদর্শন—এই নগর-স্থাপনার দ্বারা মানুষ আপনার স্বাতন্ত্র্যের প্রতাপকে অভ্রভেদী করে প্রচার করেছে। আর তপোবনই ছিল ভারতবর্ষের সভ্যতার চরম নিদর্শন; এই বনের মধ্যে মানুষ নিখিল প্রকৃতির সঙ্গে আত্মার মিলনকেই শান্ত সমাহিতভাবে উপলব্ধি করেছে।

কেউ না মনে করেন ভারতবর্ষের এই সাধনাকেই আমি একমাত্র সাধনা বলে প্রচার করতে ইচ্ছা করি। আমি বরঞ্চ বিশেষ করে এই কথাই জানাতে চাই যে, মানুষের মধ্যে বৈচিত্র্যের সীমা নেই। সে তালগাছের মতো একটিমাত্র ঋজুরেখায় আকাশের দিকে ওঠে না, সে বটগাছের মতো অসংখ্য ডালেপালায় আপনাকে চারিদিকে বিস্তীর্ণ করে দেয়। তার যে-শাখাটি যেদিকে সহজে যেতে পারে তাকে সেই দিকেই সম্পূর্ণভাবে যেতে দিলে তবেই সমগ্র গাছটি পরিপূর্ণতা লাভ করে, সুতরাং সকল শাখারই তাতে মঙ্গল।

মানুষের ইতিহাস জীবধর্মী। সে নিগূঢ় প্রাণশক্তিতে বেড়ে ওঠে। সে লোহা পিতলের মতো ছাঁচে ঢালবার জিনিস নয়। বাজারে কোনো বিশেষকালে কোনো বিশেষ সভ্যতার মূল্য অত্যন্ত বেড়ে গেছে বলেই সমস্ত মানবসমাজকে একই কারখানায় ঢালাই করে ফ্যাশনের বশবর্তী মূঢ় খরিদ্দারকে খুশি করে দেবার দুরাশা একেবারেই বৃথা।

ছোটো পা সৌন্দর্য বা অভিজাত্যের লক্ষণ, এই মনে করে কৃত্রিম উপায়ে তাকে সংকুচিত করে চীনের মেয়ে ছোটো পা পায় নি, বিকৃত পা পেয়েছে। ভারতবর্ষও হঠাৎ জবরদস্তি দ্বারা নিজেকে য়ুরোপীয় আদর্শের অনুগত করতে গেলে প্রকৃত য়ুরোপ হবে না, বিকৃত ভারতবর্ষ হবে মাত্র।

এ-কথা দৃঢ়রূপে মনে রাখতে হবে, এক জাতির সঙ্গে অন্য জাতির অনুকরণ অনুসরণের সম্বন্ধ নয়, আদান-প্রদানের সম্বন্ধ। আমার যে-জিনিসের অভাব নেই

তোমারও যদি ঠিক সেই জিনিসটাই থাকে তবে তোমার সঙ্গে আমার আর অদলবদল চলতে পারে না, তাহলে তোমাকে সমকক্ষভাবে আমার আর প্রয়োজন হয় না। ভারতবর্ষ যদি খাঁটি ভারতবর্ষ হয়ে না ওঠে তবে পরের বাজারে মজুরিগিরি করা ছাড়া পৃথিবীতে তার আর কোনো প্রয়োজনই থাকবে না। তাহলে তার আপনার প্রতি আপনার সম্মান-বোধ চলে যাবে এবং আপনাতে আপনার আনন্দও থাকবে না।

তাই আজ আমাদের অবহিত হয়ে বিচার করতে হবে যে, যে-সত্যে ভারতবর্ষ আপনাকে আপনি নিশ্চিতভাবে লাভ করতে পারে সে সত্যটি কী। সে সত্য প্রধানত বণিগ্‌বৃত্তি নয়, স্বারাজ্য নয়, স্বাদেশিকতা নয়; সে সত্য বিশ্বজাগতিকতা। সেই সত্য ভারতবর্ষের তপোবনে সাধিত হয়েছে, উপনিষদে উচ্চারিত হয়েছে, গীতায় ব্যাখ্যাত হয়েছে। বুদ্ধদেব সেই সত্যকে পৃথিবীতে সর্বমানবের নিত্যব্যবহারে সফল করে তোলবার জন্যে তপস্যা করেছেন এবং কালক্রমে নানাবিধ দুর্গতি ও বিকৃতির মধ্যেও কবির, নানক প্রভৃতি ভারতবর্ষের পরবর্তী মহাপুরুষগণ সেই সত্যকেই প্রচার করে গেছেন। ভারতবর্ষের সত্য হচ্ছে জ্ঞানে অদ্বৈততত্ত্ব, ভাবে বিশ্বমৈত্রী এবং কর্মে যোগসাধনা। ভারতবর্ষের অন্তরের মধ্যে যে উদার তপস্যা গভীরভাবে সঞ্চিত হয়ে রয়েছে, সেই তপস্যা আজ হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ এবং ইংরেজকে আপনার মধ্যে এক করে নেবে বলে প্রতীক্ষা করছে; দাসভাবে নয়, জড়ভাবে নয়, সাত্ত্বিকভাবে, সাধকভাবে। যতদিন তা না ঘটবে ততদিন আমাদের দুঃখ পেতে হবে, অপমান সইতে হবে, ততদিন নানাদিক থেকে আমাদের বারংবার ব্যর্থ হতে হবে। ব্রহ্মচর্য, ব্রহ্মজ্ঞান, সর্বজীবে দয়া, সর্বভূতে আত্মোপলব্ধি একদিন এই ভারতে কেবল কাব্যকথা কেবল মতবাদরূপে ছিল না; প্রত্যেকের জীবনের মধ্যে একে সত্য করে তোলবার জন্যে অনুশাসন ছিল; সেই অনুশাসনকে আজ যদি আমরা বিস্মৃত না হই, আমাদের সমস্ত শিক্ষা-দীক্ষাকে সেই অনুশাসনের যদি অনুগত করি, তবেই আমাদের আত্মা বিরাটের মধ্যে আপনার স্বাধীনতা লাভ করবে এবং কোনো সাময়িক বাহ্য অবস্থা আমাদের সেই স্বাধীনতাকে বিলুপ্ত করতে পারবে না।

প্রবলতার মধ্যে সম্পূর্ণতার আদর্শ নেই। সমগ্রের সামঞ্জস্য নষ্ট করে প্রবলতা নিজেকে স্বতন্ত্র করে দেখায় বলেই তাকে বড়ো মনে হয় কিন্তু আসলে সে ক্ষুদ্র। ভারতবর্ষ এই প্রবলতাকে চায় নি, সে পরিপূর্ণতাকেই চেয়েছিল। এই পরিপূর্ণতা নিখিলের সঙ্গে যোগে, এই যোগ অহংকারকে দূর করে বিনম্র হয়ে। এই বিনম্রতা একটি আধ্যাত্মিক শক্তি, এ দুর্বল স্বভাবের অধিগম্য নয়। বায়ুর যে প্রবাহ নিত্য,

শান্ততার দ্বারাই ঝড়ের চেয়ে তার শক্তি বেশি। এই জন্যেই ঝড় চিরদিন টিঁকতে পারে না, এই জন্যেই ঝড় কেবল সংকীর্ণ স্থানকেই কিছুকালের জন্য ক্ষুব্ধ করে, আর শান্ত বায়ুপ্রবাহ সমস্ত পৃথিবীকে নিত্যকাল বেষ্টন করে থাকে। যথার্থ নম্রতা, যা সাত্ত্বিকতার তেজে উজ্জ্বল, যা ত্যাগ ও সংযমের কঠোর শক্তিতে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত সেই নম্রতাই সমস্তের সঙ্গে অবাধে যুক্ত হয়ে সত্যভাবে নিত্যভাবে সমস্তকে লাভ করে। সে কাউকে দূর করে না, বিচ্ছিন্ন করে না, আপনাকে ত্যাগ করে এবং সকলকেই আপন করে। এই জন্যেই ভগবান যিশু বলেছেন যে, যে বিনম্র সেই পৃথ্বীবিজয়ী, শ্রেষ্ঠধনের অধিকার একমাত্র তারই।

ছুটির পর

শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয়ে

ছুটির পর আমরা সকলে আবার এখানে একত্র হয়েছি। কর্ম থেকে মাঝে মাঝে আমরা যে এইরূপ অবসর নিই সে কর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন হবার জন্য নয়—কর্মের সঙ্গে যোগকে নবীন রাখবার এই উপায়।

মাঝে মাঝে কর্মক্ষেত্র থেকে যদি এই রকম দূরে না যাই তবে কর্মের যথার্থ তাৎপর্য আমরা বুঝতে পারি নে। অবিশ্রাম কর্মের মাঝখানে নিবিষ্ট হয়ে থাকলে কর্মটাকেই অতিশয় একান্ত করে দেখা হয়। কর্ম তখন মাকড়সার জালের মতো আমাদের চারদিক থেকে এমনি আচ্ছন্ন করে ধরে যে তার প্রকৃত উদ্দেশ্য কী তা বুঝবার সামর্থ্যই আমাদের থাকে না। এই জন্য অভ্যস্ত কর্মকে পুনরায় নূতন করে দেখবার সুযোগ লাভ করব বলেই এক একবার কর্ম থেকে আমরা সরে যাই। কেবল মাত্র ক্লান্ত শক্তিকে বিশ্রাম দেওয়াই তার উদ্দেশ্য নয়।

আমরা কেবলই কর্মকেই দেখব না। কর্তাকেও দেখতে হবে। কেবল আগুনের প্রখর তাপ ও এঞ্জিনের কঠোর শব্দের মধ্যে আমরা এই সংসার-কারখানার মুটে-মজুরের মতোই সর্বাঙ্গে কালিঝুল মেখে দিন কাটিয়ে দেব না। একবার দিনান্তে স্নান করে কাপড় ছেড়ে কারখানার মনিবকে যদি দেখে আসতে পারি তবে তাঁর সঙ্গে আমাদের কাজের যোগ নির্ণয় করে কলের একাধিপত্যের হাত এড়াতে পারি, তবেই কাজে আমাদের আনন্দ জন্মে। নতুবা কেবলই কলের চাকা চালাতে চালাতে আমরাও কলেরই শামিল হয়ে উঠি।

আজ ছুটির শেষে আমরা আবার আমাদের কর্মক্ষেত্রে এসে পৌঁচেছি। এবার কি আবার নূতন দৃষ্টিতে কর্মকে দেখছি না? এই কর্মের মর্মগত সত্যটি অভ্যাসবশত আমাদের কাছে ম্লান হয়ে গিয়েছিল তাকে পুনরায় উজ্জ্বল করে দেখে কি আনন্দ বোধ হচ্ছে না?

এ আনন্দ কিসের জন্যে? এ কি সফলতার মূর্তিকে প্রত্যক্ষ দেখে? এ কি এই মনে করে যে, আমরা যা করতে চেয়েছিলুম তা করে তুলেছি? এ কি আমাদের আত্মকীর্তির গর্বানুভবের আনন্দ?

তা নয়। কর্মকেই চরম মনে করে তার মধ্যে ডুবে থাকলে মানুষ কর্মকে নিয়ে আত্মশক্তির গর্ব উপলব্ধি করে। কিন্তু কর্মের ভিতরকার সত্যকে যখন আমরা দেখি তখন কর্মের চেয়ে বহুগুণে বড়ো জিনিসটিকে দেখি। তখন যেমন আমাদের অহংকার দূর হয়ে যায়, সম্ভ্রমে মাথা নত হয়ে পড়ে, তেমনি আর একদিকে আনন্দে আমাদের বক্ষ বিস্ফারিত হয়ে ওঠে। তখন আমাদের আনন্দময় প্রভুকে দেখতে পাই, কেবল লৌহময় কলের আস্ফালনকে দেখি না।

এখনকার এই বিদ্যালয়ের মধ্যে একটি মঙ্গলচেষ্টা আছে। কিন্তু সে কি কেবল একটি মঙ্গলের কল মাত্র। কেবল নিয়ম রচনা এবং নিয়মে চালানো? কেবল ভাষা শেখানো, অঙ্ক কষানো, খেটে মরা এবং খাটিয়ে মারা? কেবল মস্ত একটা ইস্কুল তৈরি করে মনে করা খুব একটা ফল পেলুম? তা নয়।

এই চেষ্টাকে বড়ো করে দেখা, এই চেষ্টার ফলকেই বড়ো ফল বলে গর্ব করা সে নিতান্তই ফাঁকি। মঙ্গল অনুষ্ঠানে মঙ্গল ফল লাভ হয় সন্দেহ নেই কিন্তু সে গৌণ ফল মাত্র। আসল কথাটি এই যে, মঙ্গল কর্মের মধ্যে মঙ্গলময়ের আবির্ভাব আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যদি ঠিক জায়গায় দৃষ্টি মেলে দেখি তবে মঙ্গল কর্মের উপরে সেই বিশ্বমঙ্গলকে দেখতে পাই। মঙ্গল অনুষ্ঠানের চরম সার্থকতা তাই। মঙ্গল কর্ম সেই বিশ্বকর্মাকে সত্যদৃষ্টিতে দেখবার একটি সাধনা। অলস যে, সে তাঁকে দেখতে পায় না। নিরুদ্যম যে, তার চিত্তে তাঁর প্রকাশ আচ্ছন্ন। এই জন্যই কর্ম, নইলে কর্মের মধ্যেই কর্মের গৌরব থাকতে পারে না।

যদি মনে জানি আমাদের এই কর্ম সেই কল্যাণময় বিশ্বকর্মাকেই লাভ করবার একটি সাধনা তাহলে কর্মের মধ্যে যা কিছু বিঘ্ন অভাব প্রতিকূলতা আছে তা আমাদের হতাশ করতে পারে না। কারণ, বিঘ্নকে অতিক্রম করাই যে আমাদের সাধনার অঙ্গ। বিঘ্ন না থাকলে যে আমাদের সাধনাই অসম্পূর্ণ হয়। তখন প্রতিকূলতাকে দেখলে কর্মনাশের ভয়ে আমরা ব্যাকুল হয়ে উঠি নে; কারণ, কর্মফলের

চেয়ে আরও যে বড়ো ফল আছে। প্রতিকূলতার সঙ্গে সংগ্রাম করলে আমরা কৃতকার্য হব বলে কোমর বাঁধলে চলবে না, বস্তুত কৃতকার্য হব কি না তা জানি নে, কিন্তু প্রতিকূলতার সহিত সংগ্রাম করতে করতে আমাদের অন্তরের বাধা ক্ষয় হয়, তাতে আমাদের তেজ ভস্মমুক্ত হয়ে ক্রমশ দীপ্যমান হয়ে ওঠে এবং সেই দীপ্তিতেই, যিনি বিশ্বপ্রকাশ, আমার চিত্তে তাঁর প্রকাশ উন্মুক্ত হতে থাকে। আনন্দিত হও যে, কর্মে বাধা আছে। আনন্দিত হও যে, কর্ম করতে গেলেই তোমাকে নানাদিক থেকে নানা আঘাত সইতে হবে এবং তুমি যেমনটি কল্পনা করছ বারংবার তার পরাভব ঘটবে। আনন্দিত হও যে, লোকে তোমাকে ভুল বুঝবে ও অপমানিত করবে। আনন্দিত হও যে, তুমি যে-বেতনটি পাবে বলে লোভ করে বসেছিলে বারংবার তা হতে বঞ্চিত হবে। কারণ, সেই তো সাধনা। যে-ব্যক্তি আগুন জ্বালতে চায়, সে-ব্যক্তির কাঠ পুড়ছে বলে দুঃখ করলে চলবে কেন? যে-কৃপণ শুধু শুষ্ক কাঠই স্তূপাকার করে তুলতে চায় তার কথা ছেড়ে দাও! তাই ছুটির পরে কর্মের সমস্ত বাধাবিঘ্ন সমস্ত অভাব অসম্পূর্ণতার মধ্যে আজ আনন্দের সঙ্গে প্রবেশ করছি। কাকে দেখে? যিনি কর্মের উপরে বসে আছেন তাঁর দিকেই চেয়ে।

তাঁর দিকে চাইলে কর্মের বল বাড়ে অথচ উগ্রতা চলে যায়। চেষ্টার চেষ্টারূপ আর দেখতে পাই নে, তার শান্তিমূর্তিই ব্যক্ত হয়। কাজ চলতে থাকে অথচ স্তব্ধতা আসে, ভরা জোয়ারের জলের মতো সমস্ত থমথম করতে থাকে। ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি ঘোষণা রটনা এ সমস্ত একেবারেই ঘুচে যায়। চিন্তায় বাক্যে কর্মে বাড়াবাড়ি কিছুমাত্র থাকে না। শক্তি তখন আপনাকে আপনি আড়াল করে দিয়ে সুন্দর হয়ে ওঠে—যেমন সুন্দর আজকের এই সন্ধ্যাকাশের নক্ষত্রমণ্ডলী! তার প্রচণ্ড তেজ, প্রবল গতি, তার ভয়ংকর উদ্যম কী পরিপূর্ণ শান্তির ছবি বিস্তার করে কী কমনীয় হাসিই হাসছে! আমরাও আমাদের কর্মের আসনে পরমশক্তির সেই শান্তিময় মহাসুন্দররূপ দেখে উদ্ধত চেষ্টাকে প্রশান্ত করব। কর্মের উদগ্র আক্ষেপকে সৌন্দর্যে মণ্ডিত করে আচ্ছন্ন করে দেব। আমাদের কর্ম—মধু দ্যৌঃ, মধু নক্তম্, মধুমৎ পার্থিবং রজঃ—এই সমস্তের সঙ্গে মিশে মধুময় হয়ে উঠবে।

বর্তমান যুগ

আমি পূর্বেই একটি কথা তোমাদিগকে বলেছি—তোমরা যে এই সময়ে জন্মগ্রহণ করতে পেরেছ, এ তোমাদের পক্ষে পরম সৌভাগ্যের বিষয় বলতে হবে। তোমরা জান না এই কাল কত বড়ো কাল, এর অভ্যন্তরে কী প্রচ্ছন্ন আছে। হাজার হাজার শতাব্দীর মধ্যে পৃথিবীতে এমন শতাব্দী খুব অল্পই এসেছে। কেবল আমাদের দেশে নয়, পৃথিবী জুড়ে এক উত্তাল তরঙ্গ উঠেছে। বিশ্বমানবপ্রকৃতির মধ্যে একটা চাঞ্চল্য প্রকাশ পেয়েছে—সবাই আজ জাগ্রত। পুরাতন জীর্ণ সংস্কার ত্যাগ করবার জন্য সকল প্রকার অন্যায়কে চূর্ণ করবার জন্য মানবমাত্রেই উঠে পড়ে লেগেছে—নূতন ভাবে জীবনকে দেশকে গড়ে তুলবে। বসন্ত এলে বৃক্ষ যেমন করে তার দেহ হতে শুষ্ক পত্র ঝেড়ে ফেলে নব পল্লবে সেজে ওঠে, মানবপ্রকৃতি কোন্ এক প্রাণপূর্ণ হাওয়ায় ঠিক তেমনি করে সেজে ওঠবার জন্য ব্যাকুল। মানবপ্রকৃতি পূর্ণতার আস্বাদ পেয়েছে একে এখন কোনোমতেই বাইরের শক্তি দ্বারা চেপে ছোটো করে রাখা চলবে না।

আসল জিনিসটা সহসা আমাদের চোখে পড়ে না, অনেক সময়ে এমন কি তার অস্তিত্ব পর্যন্তও অস্বীকার করে বসি। আজ আমরা বাহির হতে দেখছি চারিদিকে একটা তুমুল আন্দোলন উপস্থিত, যাকে আমরা পলিটিক্স (Politics) বলি। তাকে যত বড়ো করেই দেখি না কেন, সে নিতান্তই বাহিরের জিনিস। আমাদের আত্মাকে কিছুতে যদি জাগরিত করছে সত্য হয়, তবে তা ধর্ম ছাড়া আর কিছুই নয়। এই ধর্মের মূল-শক্তিটি প্রচ্ছন্ন থেকে কাজ করছে বলেই আমাদের চোখে ধরা পড়ছে না; পলিটিক্সের চাঞ্চল্যই আমাদের সমস্ত চিত্তকে আকর্ষণ করেছে। আমরা উপরকার তরঙ্গটাকেই দেখে থাকি, ভিতরকার স্রোতটাকে দেখি না। কিন্তু বস্তুত ভগবান যে মানবসমাজকে ধর্মের ভিতর দিয়ে একটা মস্ত নাড়া দিয়েছেন, এই তো বিংশ শতাব্দীর বার্তা। বিশ্বাস করো, অনুভব করো, উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম সমস্ত বিশ্বের ভিতর দিয়ে আজ এই ধর্মের বৈদ্যুতশক্তি ছুটে চলেছে। পৃথিবীতে আজ যে-কোনো তাপস সাধনায় প্রবৃত্ত আছে, তার পক্ষে এমন অনুকূল সময় আর আসবে না। আজ কি তোমাদের নিশ্চেষ্ট থাকবার দিন? তন্দ্রা কি ছুটবে না? আকাশ হতে যখন বর্ষণ হয়, ছোটো বড়ো যেখানে যত জলাশয় খনন করা আছে, জলে পূর্ণ হয়ে ওঠে। পৃথিবীতে আজ যেখানেই কোনো মঙ্গলের আধার পূর্ব হতে প্রস্তুত হয়ে আছে, সেখানেই তা কল্যাণে পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে। সার্থকতা আজ সহজ হয়ে এসেছে; এমন সুযোগকে ব্যর্থ হতে দিলে চলবে না। তোমরা আশ্রমবাসী

এই শুভযোগে আশ্রমকে সার্থক করে তোলো। প্রস্তরের উপর দিয়ে জলস্রোত যেমন করে বহে যায়, সেখানে দাঁড়াবার কোনোই স্থান পায় না, আমাদের হৃদয়ের উপর দিয়ে তেমনি করে এই প্রবাহ যেন বহে না যায়! ঈশ্বরের প্রসাদস্রোত আজ সমস্ত পৃথিবীর উপর দিয়ে বিশেষভাবে প্রবাহিত হবার সময় এখানে এসে একবারটি যেন পাক খেয়ে দাঁড়ায়। সমস্ত আশ্রমটি যেন কানায় কানায় ভরে ওঠে। শুধু আমাদের এই ক্ষুদ্র আশ্রমটি কেন, পৃথিবীর যেখানে যে-কোনো ছোটো বড়ো সাধনার ক্ষেত্র আছে মঙ্গল-বারিতে আজ পূর্ণ হ'ক। আশ্রমে বাস করে এই দিনে জীবনকে ব্যর্থ হতে দিও না। এখানে কি শুধু তুচ্ছ কথায় মেতে হিংসা দ্বেষের মধ্যে থেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থ নিয়ে দিন কাটাতে এসেছ? শুধু পড়া মুখস্থ করে পরীক্ষা পাস করে ফুটবল খেলে এতবড়ো একটা জীবনকে নিঃশেষ করে দেবে? কখনোই না—এ হতে পারে না। এই যুগের ধর্ম তোমাদের প্রাণকে স্পর্শ করুক। তপস্যার দ্বারা সুন্দর হয়ে তোমরা ফুটে ওঠো। আশ্রম-বাস তোমাদের সার্থক হ'ক। তোমরা যদি মনুষ্যত্বের সাধনাকে প্রাণপণ করে ধরে না রাখ, শুধু খেলা ধুলা পড়া শুনার ভিতর দিয়েই যদি জীবনকে চালিয়ে দাও, তবে যে তোমাদের অপরাধ হবে, তার আর মার্জনা নেই, কারণ তোমরা আশ্রমবাসী।

আবার বলি, তোমরা কোন্ কালে এই পৃথিবীতে এসেছ, ভালো করে সেই কালের বিষয় ভেবে দেখো। বর্তমান কালের একটি সুবিধা এই, বিশ্বের মধ্যে যে চাঞ্চল্য উঠেছে একই সময়ে সকল দেশের লোক তা অনুভব করছে। পূর্বে একস্থানে তরঙ্গ উঠলে অন্য স্থানের লোকেরা তার কোনোই খবর পেত না। প্রত্যেক দেশটি স্বতন্ত্র ছিল। এক দেশের খবর অন্য দেশে গিয়ে পৌঁছোবার উপায় ছিল না। এখন আর সে দিন নেই। দেশের কোনো স্থানে ঘা লেগে তরঙ্গ উঠলে সেই তরঙ্গ শুধু দেশের মধ্যে না, সমস্ত পৃথিবীর ভিতর দিয়ে তীরের মতো ছুটে চলে। আমরা সকলে এক হয়ে দাঁড়াই। কত দিক হতে আমরা বল পাই; সত্যকে আঁকড়ে ধরবার যে মহা নির্যাতন তাকে অনায়াসেই সহ্য করতে পারি; নানাদিক হতে দৃষ্টান্ত ও সমবেদনা এসে জোর দেয়—এ কি কম কথা। নিজেকে অসহায় বলে মনে করি-না। এই তো মহা সুযোগ। এমন দিনে আশ্রম-বাসের সুযোগকে হারিও না। জীবন যদি তোমাদের ব্যর্থ হয়, আশ্রমের কিছুই আসে যায় না—ক্ষতি তোমাদেরই। গাছ ভরে বউল আসে। সকল বউলেই যে ফল হয় এমন নয়। কত ঝরে পড়ে, শুকিয়ে যায়, তবু ফলের অভাব হয় না। ডাল ভরে ফল ফলে ওঠে। ফল হল না বলে গাছ দুঃখ করে না, দুঃখ ঝরা-বউলের, তারা যে ফলে পরিণত হয়ে উঠতে পারল না।

এই আশ্রম যখন প্রস্তুত হতেছিল, বৃক্ষগুলি যখন ধীরে ধীরে আলোর দিকে মাথা তুলে ধরছিল, তখনও নূতন যুগের কোনোই সংবাদ এসে পৃথিবীতে পৌঁছোয় নি। অজ্ঞাতসারেই আশ্রমের ঋষি এই যুগের জন্য আশ্রমের রচনাকার্যে নিযুক্ত ছিলেন; তখনও বিশ্বমন্দিরের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হয় নি, শঙ্খ ধ্বনিত হয়ে ওঠে নি। বিংশ শতাব্দীর জন্য বিশ্ব-দেবতা গোপনে গোপনে কি যে এক বিপুল আয়োজন করছিলেন, তার লেশমাত্রও আমরা জানতুম না। আজ সহসা মন্দিরের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হল—আমাদের কী পরম সৌভাগ্য। আজ বিশ্বদেবতাকে দর্শন করতেই হবে, অন্ধ হয়ে ফিরে গেলে কিছুতেই চলবে না। আজ প্রকাণ্ড উৎসব; এই উৎসব একদিনের নয়, দু দিনের নয়—শতাব্দী-ব্যাপী উৎসব। এই উৎসব কোনো বিশেষ স্থানের নয় কোনো বিশেষ জাতির নয়। এই উৎসব সমগ্র মানব-জাতির জগৎ-জোড়া উৎসব। এস আমরা সকলে একত্র হই, বাহির হয়ে পড়ি। দেশে কোনো রাজার যখন আগমন হয় তাঁকে দেখবার জন্য যখন পথে বাহির হয়ে আসি তখন মলিন জীর্ণ বস্ত্রকে ত্যাগ করতে হয়, তখন নবীন বস্ত্রে দেহকে সজ্জিত করি। আজ দেশের রাজা নন সমগ্র জগতের রাজা এসে সম্মুখে দাঁড়িয়েছেন। নত করো উদ্ধত মস্তক। দূর করো সমস্ত বর্ষের সঞ্চিত আবর্জনা। মনকে শুভ্র করে তোলো। শান্ত হও, পবিত্র হও। তাঁর চরণে প্রণাম করে গৃহে ফেরো। তিনি তোমাদের শিরে আশীর্বাদ ঢেলে দিন—মঙ্গল করুন, মঙ্গল করুন, মঙ্গল করুন।

১০

ভক্ত

কবির কাব্যের মধ্যে যেমন কবির পরিচয় থাকে তেমনি এই যে শান্তিনিকেতন আশ্রমটি তৈরি হয়ে উঠেছে, উঠেছে কেন, প্রতিদিনই তৈরি হয়ে উঠছে এর মধ্যে একটি জীবনের পরিচয় আছে।

সেই জীবন কী চেয়েছিল এবং কী পেয়েছিল তা এই আশ্রমের মধ্যে যেমন করে লিখে গিয়েছে এমন আর কোথাও লিখে যেতে পারে নি। অনেক বড়ো বড়ো রাজা তাম্রশাসনে, শিলালিপিতে তাঁদের জয়লব্ধ রাজ্যের কথা ক্ষোদিত করে রেখে যান। কিন্তু এমন লিপি কোথায় পাওয়া যায়। এমন অবাধ মাঠে, এমন উদার আকাশে, এমন জীবনময় অক্ষর, এমন ঋতুতে ঋতুতে পরিবর্তনশীল নব নব বর্ণের লিপি!

মহর্ষি তাঁর জীবনে অনেক সভা স্থাপন করেছেন, অনেক ব্রাহ্মসমাজগৃহের প্রতিষ্ঠা করেছেন, অনেক উপদেশ দিয়েছেন, অনেক গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন, কিন্তু সে-সমস্ত কাজের সঙ্গে তাঁর এই আশ্রমের একটি পার্থক্য আছে। যেমন গাছের ডাল থেকে খুঁটি হতে পারে, তাকে চিরে তার থেকে নানা প্রকার জিনিস তৈরি হতে পারে, কিন্তু সেই গাছে যে ফুলটি ফোটে যে ফলটি ধরে, সে এই সমস্ত জিনিস থেকেই পৃথক, তেমনি মহর্ষির জীবনের অন্যান্য সমস্ত কর্মের থেকে এই আশ্রমের একটি বিশিষ্টতা আছে। এর জন্যে তাঁকে চিন্তা করতে হয় নি, চেষ্টা করতে হয় নি, বাইরের লোকের সঙ্গে মিলতে হয় নি, চারিদিকের সঙ্গে কোনো ঘাত প্রতিঘাত সহ্য করতে হয় নি। এ তাঁর জীবনের মধ্যে থেকে একটি মূর্তি ধরে আপনাআপনি উদ্ভিন্ন হয়ে উঠেছে। এই জন্যেই এর মধ্যে এমন একটি সৌন্দর্য, এমন একটি সম্পূর্ণতা রয়ে গেছে। এই জন্যেই এর মধ্যে এমন একটি সুধাগন্ধ, এমন একটি মধুসঞ্চয়। এই জন্যেই এর মধ্যে তাঁর আত্মপ্রকাশ যেমন সহজ যেমন গভীর এমন আর কোথাও নেই।

এই আশ্রমে আছে কী? মাঠ এবং আকাশ এবং ছায়াগাছগুলি, চারিদিকে একটি বিপুল অবকাশ এবং নির্মলতা। এখানকার আকাশে মেঘের বিচিত্র লীলা এবং চন্দ্রসূর্য-গ্রহতারার আবর্তন কিছুতে আচ্ছন্ন হয়ে নেই। এখানে প্রান্তরের মাঝখানে ছোটো বনটিতে ঋতুগুলি নিজের মেঘ আলো বর্ণগন্ধ ফুল ফল নিজের সমস্ত বিচিত্র

আয়োজন নিয়ে সম্পূর্ণ মূর্তিতে আবির্ভূত হয়। কোনো বাধার মধ্যে তাদের খর্ব হয়ে থাকতে হয় না। চারিদিকে বিশ্বপ্রকৃতির এই অবাধ প্রকাশ এবং তার মাঝখানটিতে শান্তং শিবমদ্বৈতম্-এর দুই সন্ধ্যা নিত্য আরাধনা—আর কিছুই নয়। গায়ত্রীমন্ত্র উচ্চারিত হচ্ছে, উপনিষদের মন্ত্র পঠিত হচ্ছে, স্তবগান ধ্বনিত হচ্ছে, দিনের পর দিন, বৎসরের পর বৎসর, সেই নিভৃতে সেই নির্জনে, সেই বনের মর্মরে, সেই পাখির কূজনে, সেই উদার আলোকে, সেই নিবিড় ছায়ায়।

এই আশ্রমের মধ্যে থেকে দুটি সুর উঠেছে—একটি বিশ্বপ্রকৃতির সুর, একটি মানবাত্মার সুর। এই দুটি সুরধারার সংগমের মুখেই এই তীর্থটি স্থাপিত। এই দুটি সুরই অতি পুরাতন এবং চিরদিনই নূতন। এই আকাশ নিরন্তর যে নীরব মন্ত্র জপ করছে সে আমাদের পিতামহেরা আর্যাবর্তের সমতল প্রান্তরের উপরে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে কত শতাব্দী পূর্বেও চিত্তের গভীরতার মধ্যে গ্রহণ করেছেন। এই যে বনটির পল্লবঘন নিস্তব্ধতার মধ্যে নিবিষ্ট হয়ে ছায়া এবং আলো দুই ভাই-বোনে মিলে পৃথিবীর উপরে নামাবলীর উত্তরীয় রচনা করছে, সেই পবিত্র শিল্পচাতুরী আমাদের বনবাসী আদি পুরুষেরা সেদিনও দেখেছেন যেদিন তাঁরা সরস্বতীর কূলে প্রথম কুটির নির্মাণ করতে আরম্ভ করেছেন। এ সেই আকাশ, এ সেই ছায়ালোক, এ সেই অনির্বচনীয় একটি প্রকাশের ব্যাকুলতা, যার দ্বারা সমস্ত শূন্যকে ক্রন্দিত করে শুনেছিলেন বলেই ঋষি-পিতামহেরা এই অন্তরীক্ষকে ক্রন্দসী নাম দিয়েছিলেন।

আবার এখানে মানবের কণ্ঠ থেকে যে মন্ত্র উচ্চারিত হচ্ছে সেও কত যুগের প্রাচীন বাণী। পিতা নোঽসি, পিতা নোবোধি, নমস্তেঽস্তু—এই কথাটি কত সরল, কত পরিপূর্ণ এবং কত পুরাতন। যে-ভাষায় এ বাণীটি প্রথম ব্যক্ত হয়েছিল সে ভাষা আজ প্রচলিত নেই কিন্তু এই বাক্যটি আজও বিশ্বাসে ভক্তিতে নির্ভরে ব্যগ্রতায় এবং বিনতিতে পরিপূর্ণ হয়ে রয়েছে। এই কটি মাত্র কথায় মানবের চিরদিনের আশা এবং আশ্বাস এবং প্রার্থনা ঘনীভূত হয়ে রয়ে গেছে।

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম, এই অত্যন্ত ছোটো অথচ অত্যন্ত বড়ো কথাটি কোন্ সুদূর কালের! আধুনিক যুগের সভ্যতা তখন বর্বরতার গর্ভের মধ্যে গুপ্ত ছিল, সে ভূমিষ্ঠও হয় নি। কিন্তু অন্তরের উপলব্ধি আজও এই বাণীকে নিঃশেষ করতে পারে নি।

অসতোমা সদ্গময়, তমসোমা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মামৃতংগময়—এত বড়ো প্রার্থনা যেদিন নরকণ্ঠ হতে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল সেদিনকার ছবি ইতিহাসের দূরবীক্ষণ দ্বারাও আজ স্পষ্টরূপে গোচর হয়ে ওঠে না। অথচ এই পুরাতন প্রার্থনাটির মধ্যে মানবাত্মার সমস্ত প্রার্থনা পর্যাপ্ত হয়ে রয়েছে।

একদিকে এই পুরাতন আকাশ, পুরাতন আলোক এবং তরুলতার মধ্যে পুরাতন জীবনবিকাশের নিত্য নূতনতা, আর-একদিকে মানবচিত্তের মৃত্যুহীন পুরাতন বাণী, এই দুইকে এক করে নিয়ে এই শান্তিনিকেতনের আশ্রম।

বিশ্বপ্রকৃতি এবং মানবচিত্ত, এই দুইকে এক করে মিলিয়ে আছেন যিনি তাঁকে এই দুয়েরই মধ্যে একরূপে জানবার যে ধ্যানমন্ত্র, সেই মন্ত্রটিকেই ভারতবর্ষ তার সমস্ত পবিত্র শাস্ত্রের সার মন্ত্র বলে বরণ করেছে। সেই মন্ত্রটিই গায়ত্রী, ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি, ধিয়োযোনঃ প্রচোদয়াৎ।

একদিকে ভূলোক অন্তরীক্ষ জ্যোতিষ্কলোক, আর একদিকে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি, আমাদের চেতনা—এই দুইকেই যাঁর এক শক্তি বিকীর্ণ করছে, এক দুইকেই যাঁর এক আনন্দ যুক্ত করছে—তাঁকে, তাঁর এই শক্তিকে বিশ্বের মধ্যে এবং আপনার বুদ্ধির মধ্যে ধ্যান করে উপলব্ধি করবার মন্ত্র হচ্ছে এই গায়ত্রী।

যাঁরা মহর্ষির আত্মজীবনী পড়েছেন তাঁরা সকলেই জানেন তিনি তাঁর দীক্ষার দিনে এই গায়ত্রীমন্ত্রকেই বিশেষ করে তাঁর উপাসনার মন্ত্ররূপে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর এই দীক্ষার মন্ত্রটিই শান্তিনিকেতনের আশ্রমকে আকার দান করছে—এই নিভৃতে মানুষের চিত্তকে প্রকৃতির প্রকাশের সঙ্গে যুক্ত করে, বরেণ্যং ভর্গঃ, সেই বরণীয় তেজকে ধ্যানগম্য করে তুলছে।

এই গায়ত্রী মন্ত্রটি আমাদের দেশের অনেকেরই জপের মন্ত্র—কিন্তু এই মন্ত্রটি মহর্ষির ছিল জীবনের মন্ত্র। এই মন্ত্রটিকে তিনি তাঁর জীবনের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন এবং তাঁর সমস্ত জীবনের ভিতর থেকে প্রকাশ করেছিলেন।

এই মন্ত্রটিকে তিনি যে গ্রহণ করেছিলেন এবং রক্ষা করেছিলেন লোকাচারের অনুসরণ তার কারণ নয়। হাঁস যেমন স্বভাবতই জলকে আশ্রয় করে তিনি তেমনি স্বভাবতই এই মন্ত্রটিকে অবলম্বন করেছিলেন।

শিশু যেমন মাতৃস্তন্যের জন্য কেঁদে ওঠে, তখন তাকে আর কিছু দিয়েই থামিয়ে রাখা যায় না। তেমনি মহর্ষির হৃদয় একদিন তাঁর যৌবনারম্ভে কী অসহ্য ব্যাকুলতায় ক্রন্দন করে উঠেছিল সে-কথা আপনারা সকলেই জানেন।

সে ক্রন্দন কিসের? চারদিকে তিনি কোন্ জিনিসটি কোনোমতেই খুঁজে পাচ্ছিলেন না? যখন আকাশের আলো তাঁর চোখে কালো হয়ে উঠেছিল, যখন তাঁর পিতৃগৃহের অতুল ঐশ্বর্যের আয়োজন এবং মানসম্ভ্রমের গৌরব তাঁর মনকে কোনোমতেই শান্তি দিচ্ছিল না, তখন তাঁর যে কী প্রয়োজন, কী হলে তাঁর হৃদয়ের ক্ষুধা মেটে তা তিনি নিজেই বুঝতে পারছিলেন না।

ভোগবিলাসে তাঁর অরুচি জন্মে গিয়েছিল এবং তাঁর ভক্তিবৃত্তি নিজের চরিতার্থতা অন্বেষণ করছিল, কেবল এই কথাটুকুই সম্পূর্ণ সত্য নয়। কারণ ভক্তিবৃত্তিকে ভুলিয়ে রাখবার আয়োজন কি তাঁর ঘরের মধ্যেই ছিল না? যে দিদিমার সঙ্গে তিনি ছায়ার মতো সর্বদা ঘুরে বেড়াতেন তিনি জপতপ দানধ্যান পূজা-অর্চনা নিয়েই তো দিন কাটিয়েছেন, তাঁর সমস্ত ক্রিয়াকলাপেই শিশুকাল থেকেই মহর্ষি তাঁর সঙ্গের সঙ্গী ছিলেন। যখন বৈরাগ্য উপস্থিত হল, যখন ধর্মের জন্ত তাঁর ব্যাকুলতা জন্মাল তখন এই অভ্যস্ত পথেই তাঁর সমস্ত মন কেন ছুটে গেল না? ভক্তিবৃত্তিকে ব্যাপৃত করে রাখবার উপকরণ তো তাঁর খুব নিকটেই ছিল।

তাঁর ভক্তিকে যে এইদিকে তিনি কখনো নিয়োজিত করেন নি তা নয়। তিনি যখন বিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিতে যেতেন পথিমধ্যে দেবীমন্দিরে ভক্তিভরে প্রণাম করতে ভুলতেন না; তিনি একবার এত সমারোহে সরস্বতীর পূজা করেছিলেন যে সেবার পূজার দিনে শহরে গাঁদাফুল দুর্লভ হয়ে উঠেছিল। কিন্তু যেদিন শ্মশানঘাটে পূর্ণিমার রাতে তাঁর চিত্ত জাগ্রত হয়ে উঠল সেদিন এই সকল চিরাভ্যস্ত পথকে তিনি পথ বলেই লক্ষ্য করলেন না। তাঁর তৃষ্ণার জল যে এদিকে নেই তা বুঝতে তাঁকে চিন্তামাত্র করতে হয় নি।

তাই বলছিলুম, ভক্তিকে বাইরের দিকে নিয়োজিত করে তিনি নিজেকে ফাঁকি দিতে পারেন নি। অন্তঃপুরে তাঁর ডাক পড়েছিল। তিনি জগতের মধ্যেই জগদীশ্বরকে, অন্তরাত্মার মধ্যেই পরমাত্মাকে দর্শন করতে চেয়েছিলেন। তাঁকে আর কিছুতে ভুলিয়ে রাখে কার সাধ্য! যারা নানা ক্রিয়াকর্মে আপনাকে ব্যাপৃত রাখতে চায় তাদের নানা উপায় আছে, যারা ভক্তির মধুর রসকে আস্বাদন করতে চায় তাদেরও অনেক উপলক্ষ্য মেলে। কিন্তু যারা একেবারে তাঁকেই চেয়ে বসে, তাদের তো ওই একটি বই আর দ্বিতীয় কোনো পন্থা নেই। তারা কি আর বাইরে ঘুরে বেড়াতে পারে? তাদের সামনে কোনো রঙিন জিনিস সাজিয়ে তাদের কি কোনোমতেই ভুলিয়ে রাখা যায়? নিখিলের মধ্যে এবং আত্মার মধ্যে তাদের প্রবেশ করতেই হবে।

কিন্তু এই অধ্যাত্মলোকের এই বিশ্বলোকের মন্দিরের পথ তাঁর চারদিকে যে লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। অন্তরের ধনকে দূরে সন্ধান করবার প্রণালীই যে সমাজে চারিদিকে প্রচলিত ছিল, এই নির্বাসনের মধ্যে থেকেই তো তাঁর সমস্ত প্রাণ কেঁদে উঠেছিল। তাঁর আত্মা যে-আশ্রয় চাচ্ছিল, সে আশ্রয় বাইরের খণ্ডতার রাজ্যে সে কোথায় খুঁজে পাবে?

আত্মার মধ্যেই পরমাত্মাকে, জগতের মধ্যেই জগদীশ্বরকে দেখতে হবে, এই

কথাটি এতই অত্যন্ত সহজ যে হঠাৎ মনে হয় এ নিয়ে এত খোঁজাখুঁজি কেন, এত কান্নাকাটি কিসের জন্যে ? কিন্তু বরাবর মানুষের ইতিহাসে এই ঘটনাটি ঘটে এসেছে। মানুষের প্রবৃত্তি কিনা বাইরের দিকে ছোটবার জন্যে সহজেই প্রবণ, এই কারণে সেই ঝোঁকের মাথায় সে মূল কেন্দ্রের আকর্ষণ এড়িয়ে শেষে কোথায় গিয়ে পৌঁছোয় তার ঠিকানা পাওয়া যায় না। সে বাহ্যিকতাকেই দিনে দিনে এমনি বৃহৎ ও জটিল করে দাঁড় করায় যে অবশেষে একদিন আসে, যখন যা তার আন্তরিক, যা তার স্বাভাবিক তাকেই খুঁজে বের করা তার পক্ষে সকলের চেয়ে কঠিন হয়ে ওঠে। এত কঠিন হয় যে তাকে সে আর খোঁজেই না, তার কথা সে ভুলেই যায়, তাকে আর সত্য বলে উপলব্ধিই করে না; বাহ্যিকতাকেই একমাত্র জিনিস বলে জানে, আর কিছুকে বিশ্বাসই করতে পারে না।

মেলার দিনে ছোটো ছেলে মার হাত ধরে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু তার মন কিনা চারিদিকে এইজন্যে মুঠো কখন সে ছেড়ে দেয়, তার পর থেকেই ভিড়ের মধ্যে গোলমালের মধ্যে কেবলই সে বাইরে থেকে বাইরে দূরে থেকে দূরে চলে যেতে থাকে। ক্রমে মার কথা তার আর মনেই থাকে না, বাইরের যে-সমস্ত সামগ্রী সে দেখে সেইগুলিই তার সমস্ত হৃদয়কে অধিকার করে বড়ো হয়ে ওঠে। যে মা তার সব চেয়ে আপন, তিনিই তার কাছে সব চেয়ে ছায়াময় সব চেয়ে দূর হয়ে ওঠেন। শেষকালে এমন হয় যে অন্য সমস্ত জিনিসের মধ্যেই সে আহত প্রতিহত হয়ে বেড়ায়, কেবল নিজের মাকে খুঁজে পাওয়াই সন্তানের পক্ষে সব চেয়ে কঠিন হয়ে ওঠে। আমাদের সেই দশা ঘটে।

এমন সময়ে এক-একজন মহাপুরুষ জন্মান যাঁরা সেই অনেক দিনকার হারিয়ে যাওয়া স্বাভাবিকের জন্যে আপনি ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। যার জন্যে চারিদিকের কারও কিছুমাত্র দরদ নেই তারই জন্যে তাঁদের কান্না কোনোমতেই থামতে চায় না। তাঁরা একমুহূর্তে বুঝতে পারেন আসল জিনিসটি আছে অথচ কোথাও তাকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। সেইটিই একমাত্র প্রয়োজনীয় জিনিস অথচ কেউ তার কোনো খোঁজ করছে না। জিজ্ঞাসা করলে, হয় হেসে উড়িয়ে দিচ্ছে, নয় ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে আঘাত করতে আসছে।

এমনি করে যেটি সহজ, যেটি স্বাভাবিক, যেটি সত্য যেটি না হলে নয়, পৃথিবীতে এক-একজন লোক আসেন সেটিকেই খুঁজে বের করতে। ঈশ্বরের এই এক লীলা, যেটি সব চেয়ে সহজ, তাকে তিনি শক্ত করে তুলতে দেন। যা নিতান্তই কাছের তাকে তিনি হারিয়ে ফেলতে দেন, পাছে সহজ বলেই তাকে না দেখতে পাওয়া যায়, পাছে

খুঁজে বের করতে না হলে তার সমস্ত তাৎপর্যটি আমরা না পাই। যিনি আমাদের অন্তরতর তাঁর মতো এত সহজ আর কী আছে। তিনি আমাদের নিশ্বাসপ্রশ্বাসের চেয়ে সহজ, তবু তাঁকে আমরা হারাই, সে কেবল তাঁকে আমরা খুঁজে বের করব বলেই। হঠাৎ যখন তিনি ধরা পড়েন, হঠাৎ যখন কেউ হাততালি দিয়ে বলে ওঠে, এই যে এইখানেই। আমরা ছুটে এসে জিজ্ঞাসা করি, কই কোথায় ? এই যে হৃদয়ের হৃদয়ে, এই যে আত্মার আত্মায়। যেখানে তাঁকে পাওয়ার বড়োই দরকার, সেইখানেই তিনি বরাবর বসে আছেন, কেবল আমরাই দূরে দূরে ছুটোছুটি করে মরছিলুম, এই সহজ কথাটি বোঝার জন্যেই, এই যিনি অত্যন্তই কাছে আছেন তাঁকেই খুঁজে পাবার জন্যে এক-একজন লোকের এত কান্নার দরকার। এই কান্না মিটিয়ে দেবার জন্যে যখনই তিনি সাড়া দেন তখনই ধরা পড়ে যান। তখনই সহজ আবার সহজ হয়ে আসে।

নিজের রচিত জটিল জাল ছেদন করে চিরন্তন আকাশ চিরন্তন আলোকের অধিকার আবার ফিরে পাবার জন্য মানুষকে চিরকালই এইরকম মহাপুরুষদের মুখ তাকাতে হয়েছে। কেউ বা ধর্মের ক্ষেত্রে কেউ বা জ্ঞানের ক্ষেত্রে কেউ বা কর্মের ক্ষেত্রে এই কাজে প্রবৃত্ত হয়েছেন। যা চিরদিনের জিনিস তাকে তাঁরা ক্ষণিকের আবরণ থেকে মুক্ত করবার জন্যে পৃথিবীতে আসেন। বিশেষ স্থানে গিয়ে, বিশেষ মন্ত্র পড়ে, বিশেষ অনুষ্ঠান করে মুক্তি লাভ করা যায় এই বিশ্বাসের অরণ্যে যখন মানুষ পথ হারিয়েছিল তখন বুদ্ধদেব এই অত্যন্ত সহজ কথাটি আবিষ্কার ও প্রচার করবার জন্যে এসেছিলেন যে, স্বার্থত্যাগ করে, সর্বভূতে দয়া বিস্তার করে, অন্তর থেকে বাসনাকে ক্ষয় করে ফেললে তবেই মুক্তি হয়। কোনো স্থানে গেলে, বা জলে স্নান করলে, বা অগ্নিতে আহুতি দিলে বা মন্ত্র উচ্চারণ করলে হয় না। এই কথাটি শুনতে নিতান্তই সরল, কিন্তু এই কথাটির জন্যে একটি রাজপুত্রকে রাজ্যত্যাগ করে বনে বনে পথে পথে ফিরতে হয়েছে, মানুষের হাতে এটি এতই কঠিন হয়ে উঠেছিল। য়িহুদিদের মধ্যে ফ্যারিসি সম্প্রদায়ের অনুশাসনে যখন বাহ্য নিয়মপালনই ধর্ম বলে গণ্য হয়ে উঠেছিল, যখন তারা নিজের গণ্ডির বাইরে অন্য জাতি, অন্য ধর্মপন্থীদের ঘৃণা করে তাদের সঙ্গে একত্রে আহার বিহার বন্ধ করাকেই ঈশ্বরের বিশেষ অভিপ্রায় বলে স্থির করেছিল, যখন য়িহুদির ধর্মানুষ্ঠান য়িহুদি জাতিরই নিজস্ব স্বতন্ত্র সামগ্রী হয়ে উঠেছিল তখন যিশু এই অত্যন্ত সহজ কথাটি বলবার জন্যেই এসেছিলেন যে, ধর্ম অন্তরের সামগ্রী, ভগবান অন্তরের ধন, পাপপুণ্য বাহিরের কৃত্রিম বিধি-নিষেধের অনুগত নয় ; সকল মানুষই ঈশ্বরের সন্তান, মানুষের প্রতি ঘৃণাহীন প্রেম ও পরমেশ্বরের প্রতি বিশ্বাসপূর্ণ ভক্তির দ্বারাই ধর্মসাধনা হয় ; বাহ্যিকতা মৃত্যুর নিদান, অন্তরের সার পদার্থেই প্রাণ পাওয়া যায়। কথাটি এতই

অত্যন্ত সরল যে শোনবামাত্রই সকলকেই বলতে হয় যে, হাঁ, কিন্তু তবুও এই কথাটিকেই সকল দেশেই মানুষ এতই কঠিন করে তুলেছে যে, এর জন্যে যিশুকে মরু-প্রান্তরে গিয়ে তপস্যা করতে এবং ক্রুসের উপরে অপমানিত মৃত্যুদণ্ডকে গ্রহণ করতে হয়েছে।

মহম্মদকেও সেই কাজ করতে হয়েছিল। মানুষের ধর্মবুদ্ধি খণ্ড খণ্ড হয়ে বাহিরে ছড়িয়ে পড়েছিল তাকে তিনি অন্তরের দিকে অখণ্ডের দিকে অনন্তের দিকে নিয়ে গিয়েছেন। সহজে পারেন নি, এর জন্যে সমস্ত জীবন তাঁকে মৃত্যুসংকুল দুর্গম পথ মাড়িয়ে চলতে হয়েছে, চারিদিকে শত্রুতা ঝড়ের সমুদ্রের মতো ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে তাঁকে নিরন্তর আক্রমণ করেছে। মানুষের পক্ষে যা যথার্থ স্বাভাবিক, যা সরল সত্য, তাকেই স্পষ্ট অনুভব করতে ও উদ্ধার করতে, মানুষের মধ্যে যাঁরা সর্বোচ্চশক্তিসম্পন্ন তাঁদেরই প্রয়োজন হয়।

মানুষের ধর্মরাজ্যে যে তিনজন মহাপুরুষ সর্বোচ্চ চূড়ায় অধিরোহণ করেছেন এবং ধর্মকে দেশগত জাতিগত লোকাচারগত সংকীর্ণ সীমা থেকে মুক্ত করে দিয়ে তাকে সূর্যের আলোকের মতো, মেঘের বারিবর্ষণের মতো সর্বদেশ ও সর্বকালের মানবের জন্য বাধাহীন আকাশে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন তাঁদের নাম করেছি। ধর্মের প্রকৃতি যে বিশ্বজনীন, তাকে যে কোনো বিশেষ দেশের প্রচলিত মূর্তি বা আচার বা শাস্ত্র কৃত্রিম বন্ধনে আবদ্ধ করে রাখতে পারে না এই কথাটি তাঁরা সর্বমানবের ইতিহাসের মধ্যে নিজের জীবন দিয়ে লিখে দিয়ে গেছেন। দেশে দেশে কালে কালে সত্যের দুর্গম পথে কারা যে ঈশ্বরের আদেশে আমাদের পথ দেখাবার জন্যে নিজের জীবন-প্রদীপকে জ্বালিয়ে তুলেছেন সে আজ আমরা আর ভুল করতে পারব না, তাঁদের আদর্শ থেকেই স্পষ্ট বুঝতে পারব। সে-প্রদীপটি কারও বা ছোটো হতে পারে কারও বা বড়ো হতে পারে—সেই প্রদীপের আলো কারও বা দিগ্‌দিগন্তরে ছড়িয়ে পড়ে কারও বা নিকটের পথিকদেরই পদক্ষেপের সহায়তা করে, কিন্তু সেই শিখাটিকে আর চেনা শক্ত নয়।

তাই বলছিলুম মহর্ষি যে অত্যন্ত একটি সহজকে পাবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন তাঁর চারদিকে তার কোনো সহায়তা ছিল না। সকলেই তাকে হারিয়ে বসেছিল, সে-পথের চিহ্ন কোথাও দেখা যাচ্ছিল না। সেই জন্যে যেখানে সকলেই নিশ্চিন্তমনে বিচরণ করছিল সেখানে তিনি যেন মরুভূমির পথিকের মতো ব্যাকুল হয়ে লক্ষ্য স্থির করবার জন্যে চারিদিকে তাকাচ্ছিলেন, মধ্যাহ্নের আলোকও তাঁর চক্ষে কালিমাময় হয়ে উঠেছিল এবং ঐশ্বর্যের ভোগায়োজন তাঁকে মৃগতৃষ্ণিকার মতো পরিহাস করছিল। তাঁর হৃদয় এই অত্যন্ত সহজ প্রার্থনাটি নিয়ে দিকে দিকে ঘুরে

বেড়াচ্ছিল যে, পরমাত্মাকে আমি আত্মার মধ্যেই পাব, জগদীশ্বরকে আমি জগতের মধ্যেই দেখব, আর কোথাও নয়, দূরে নয়, বাইরে নয়, নিজের কল্পনার মধ্যে নয়, অন্য দশজনের চিরাভ্যস্ত জড়তার মধ্যে নয়। এই সহজ প্রার্থনার পথটিই চারিদিকে এত বাধাগ্রস্ত এত কঠিন হয়ে উঠেছিল বলেই তাঁকে এত খোঁজ খুঁজতে হয়েছে এত কান্না কাঁদতে হয়েছে।

এ-কান্না যে সমস্ত দেশের কান্না। দেশ আপনার চিরদিনের যে-জিনিসটি মনের ভুলে হারিয়ে বসেছিল, তার জন্যে কোনোখানেই বেদনা বোধ না হলে সে দেশ বাঁচবে কী করে! চারদিকেই যখন অসাড়তা তখন এমন একটি হৃদয়ের আবশ্যক যার সহজ-চেতনাকে সমাজের কোনো সংক্রামক জড়তা আক্রম করতে পারে না। এই চেতনাকে অতি কঠিন বেদনা ভোগ করতে হয়, সমস্ত দেশের হয়ে বেদনা। যেখানে সকলে সংজ্ঞাহীন হয়ে আছে সেখানে একলা তাকে হাহাকার বহন করে আনতে হয়, সমস্ত দেশের স্বাস্থ্যকে ফিরে পাবার জন্যে একলা তাঁকে কান্না জাগিয়ে তুলতে হয়, বোধহীনতার জন্যেই চারিদিকের জনসমাজ যে সকল কৃত্রিম জিনিস নিয়ে অনায়াসে ভুলে থাকে অসহ্য ক্ষুধাতুরতা দিয়ে তাকে জানাতে হয় প্রাণের খাদ্য তার মধ্যে নেই। যে-দেশ কাঁদতে ভুলে গেছে, খোঁজবার কথা যার মনেও নেই তার হয়ে একলা কাঁদা, একলা খোঁজা এই হচ্ছে মহত্ত্বের একটি অধিকার। অসাড় দেশকে জাগাবার জন্যে যখন বিধাতার আঘাত এসে পড়তে থাকে তখন যেখানে চৈতন্য আছে সেইখানেই সমস্ত আঘাত বাজতে থাকে, সেইখানকার বেদনা দিয়েই দেশের উদ্বোধন আরম্ভ হয়।

আমরা যাঁর কথা বলছি তাঁর সেই সহজচেতনা কিছুতেই লুপ্ত হয় নি, সেই তাঁর চেতনা চেতনাকেই খুঁজছিল, স্বভাবতই কেবল সেই দিকেই সে হাত বাড়াচ্ছিল, চারদিকে যে সকল স্থূল জড়ত্বের উপকরণ ছিল তাকে সে প্রাণপণ বলে ঠেলে ফেলে দিচ্ছিল, চৈতন্য না হলে চৈতন্য আশ্রয় পায় না যে।

এমন সময় এই অত্যন্ত ব্যাকুলতার মধ্যে তাঁর সামনে উপনিষদের একখানি ছিন্ন পত্র উড়ে এসে পড়ল। মরুভূমির মধ্যে পথিক যখন হতাশ হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে তখন অকস্মাৎ জলচর পাখিকে আকাশে উড়ে যেতে দেখে সে যেমন জানতে পারে তার তৃষ্ণার জল যেখানে সেখানকার পথ কোন্ দিকে, এই ছিন্ন পত্রটিও তেমনি তাঁকে একটি পথ দেখিয়ে দিলে। সেই পথটি সকলের চেয়ে প্রশস্ত এবং সকলের চেয়ে সরল, যৎ কিঞ্চ জগত্যাংজগৎ, জগতে যেখানে যা কিছু আছে সমস্তর ভিতর দিয়েই সে পথ চলে গিয়েছে, এবং সমস্তর ভিতর দিয়েই সেই পরম চৈতন্যস্বরূপের কাছে গিয়ে পৌচেছে যিনি সমস্তকেই আচ্ছন্ন করে রয়েছেন।

তার পর থেকে তিনি নদীপর্বত সমুদ্রপ্রান্তরে যেখানেই ঘুরে বেড়িয়েছেন কোথাও আর তাঁর প্রিয়তমকে হারান নি,—কেননা তিনি যে সর্বত্রই, আর তিনি যে আত্মার মাঝখানেই। যিনি আত্মার ভিতরেই তাঁকেই আবার দেশে দেশে দিকে দিকে সর্বত্রই ব্যাপক ভাবে দেখতে পাবার কত সুখ, যিনি বিশাল বিশ্বের সমস্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে রূপরস গীতগন্ধের নব নব রহস্যকে নিত্য নিত্য জাগিয়ে তুলে সমস্তকে আচ্ছন্ন করে রয়েছেন তাঁকেই আত্মার অন্তরতম নিভৃতে নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করবার কত আনন্দ।

এই উপলব্ধি করার মন্ত্রই হচ্ছে গায়ত্রী। অন্তরকে এবং বাহিরকে, বিশ্বকে এবং আত্মাকে একের মধ্যে যোগযুক্ত করে জানাই হচ্ছে এই মন্ত্রের সাধনা এবং এই সাধনাই ছিল মহর্ষির জীবনের সাধনা।

জীবনের এই সাধনাটিকে তিনি তাঁর উপদেশ ও বক্তৃতার মধ্যে ভাষার দ্বারা প্রকাশ করেছেন কিন্তু সকলের চেয়ে সম্পূর্ণ সৌন্দর্যে প্রকাশ পেয়েছে শান্তিনিকেতন আশ্রমটির মধ্যে। কারণ, এই প্রকাশের ভার তিনি একলা নেন নি। এই প্রকাশের কাজে একদিকে তাঁর ভগবৎ-পূজায় উৎসর্গকরা সমস্ত জীবনটি রয়ে গেছে, আর-একদিকে আছে সেই প্রান্তর, সেই আকাশ, সেই তরুশ্রেণী,—এই দুই এখানে মিলিত হয়েছে, ভূর্ভুবঃ স্বঃ এবং ধিয়ঃ। এমনি করে গায়ত্রীমন্ত্র যেখানেই প্রত্যক্ষরূপ ধারণ করেছে, যেখানেই সাধকের মঙ্গলপূর্ণ চিত্তের সঙ্গে প্রকৃতির শান্তিপূর্ণ সৌন্দর্য মিলিত হয়ে গেছে সেইখানেই পুণ্যতীর্থ।

আমরা যারা এই আশ্রমে বাস করছি, হে শান্তিনিকেতনের অধিদেবতা, আজ উৎসবের শুভদিনে তোমার কাছে আমাদের এই প্রার্থনা, তুমি আমাদের সেই চেতনাটি সর্বদা জাগিয়ে রেখে দাও যাতে আমরা যথার্থ তীর্থবাসী হয়ে উঠতে পারি। গ্রন্থের মধ্যে কীট যেমন তীক্ষ্ণ ক্ষুধার দংশনে গ্রন্থকে কেবল নষ্টই করে তার সত্যকে লেশমাত্রও লাভ করে না, আমরাও যেন তেমনি করে নিজেদের অসংযত প্রবৃত্তিসকল নিয়ে এই আশ্রমের মধ্যে কেবল ছিদ্র বিস্তার করতে না থাকি, আমরা এর ভিতরকার আনন্দময় সত্যটিকে যেন প্রতিদিন জীবনের মধ্যে গ্রহণ করবার জন্যে প্রস্তুত হতে পারি। আমরা যে সুযোগ যে-অধিকার পেয়েছি অচেতন হয়ে কেবলই যেন তাকে নষ্ট করতে না থাকি। এখানে যে সাধকের চিত্তটি রয়েছে সে যেন আমাদের চিত্তকে উদ্বোধিত করে তোলে, যে-মন্ত্রটি রয়েছে সে যেন আমাদের মননের মধ্যে ধ্বনিত হয়ে ওঠে; আমরাও যেন আমাদের জীবনটিকে এই আশ্রমের সঙ্গে এমনভাবে মিলিয়ে যেতে পারি যে, সেটি এখানকার পক্ষে চিরদিনের দানস্বরূপ হয়। হে আশ্রমদেব, দেওয়া এবং পাওয়া যে

একই কথা। আমরা যদি নিজেকে না দিতে পারি তাহলে আমরা পাবও না, আমরা যদি এখান থেকে কিছু পেয়ে যাই এমন ভাগ্য আমাদের হয় তাহলে আমরা দিয়েও যাব—তাহলে আমাদের জীবনটি আশ্রমের তরুপল্লবের মর্মরধ্বনির মধ্যে চিরকাল মর্মরিত হতে থাকবে। এখানকার আকাশের নির্মল নীলিমার মধ্যে আমরা মিলব, এখানকার প্রান্তরের উদার বিস্তারের মধ্যে আমরা বিস্তীর্ণ হব, আমাদের আনন্দ এখানকার পথিকদের স্পর্শ করবে, এখানকার অতিথিদের অভ্যর্থনা করবে। এখানে যে সৃষ্টিকার্যটি নিঃশব্দে চিরদিনই চলছে তারই মধ্যে আমরাও চিরকালের মতো ধরা পড়ে যাব। বৎসরের পর বৎসর যেমন আসবে, ঋতুর পর ঋতু যেমন ফিরবে, তেমনি এখানকার শালবনে ফুল ফোটার মধ্যে, পূর্বদিগন্তে মেঘ ওঠার মধ্যে এই কথাটি চিরদিন ফিরে ফিরে আসবে ঘুরে ঘুরে বেড়াবে যে, হে আনন্দময় তোমার মধ্যে আনন্দ পেয়েছি, হে সুন্দর তোমার পানে চেয়ে মুগ্ধ হয়েছি, হে পবিত্র তোমার শুভ্র হস্ত আমার হৃদয়কে স্পর্শ করেছে; হে অন্তরের ধন তোমাকে বাহিরে পেয়েছি, হে বাহিরের ঈশ্বর তোমাকে অন্তরের মধ্যে লাভ করেছি।

হে ভক্তের হৃদয়ানন্দ, আমরা যে তোমাকে সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে ভক্তি করতে পারি নে তার একটিমাত্র কারণ এই, আমরা তোমার মতো হতে পারি নি। তুমি আত্মদা, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তুমি আপনাকে অজস্র দান করছ। আমরা স্বার্থ নিয়েই আছি, আমাদের ভিক্ষুকতা কিছুতেই ঘোচে না। আমাদের কর্ম, আমাদের ত্যাগ, স্বত-উচ্ছ্বসিত আনন্দের মধ্য থেকে উজ্জ্বল হয়ে উঠছে না। সেইজন্যে তোমার সঙ্গে আমাদের মিল হচ্ছে না। আনন্দের টানে আপনি আমরা আনন্দস্বরূপের মধ্যে গিয়ে পৌঁছোতে পারছি নে, আমাদের ভক্তি তাই সহজ ভক্তি হয়ে উঠছে না। তোমার যাঁরা ভক্ত তাঁরাই আমাদের এই অনৈক্যের সেতুস্বরূপ হয়ে তোমার সঙ্গে আমাদের মিলিয়ে রেখে দেন, আমরা তোমার ভক্তদের ভিতর দিয়ে তোমাকে দেখতে পাই, তোমারই স্বরূপকে মানুষের ভিতর দিয়ে ঘরের মধ্যে লাভ করি। দেখি যে তাঁরা কিছু চান না কেবল আপনাকে দান করেন, সে-দান মঙ্গলের উৎস থেকে আপনিই উৎসারিত হয়, আনন্দের নির্ঝর থেকে আপনিই ঝরে পড়ে, তাঁদের জীবন চারিদিকে মঙ্গললোক সৃষ্টি করতে থাকে, সেই সৃষ্টি আনন্দের সৃষ্টি। এমনি করে তাঁরা তোমার সঙ্গে মিলেছেন। তাঁদের জীবনে ক্লান্তি নেই, ভয় নেই, ক্ষতি নেই, কেবলই প্রাচুর্য, কেবলই পূর্ণতা। দুঃখ যখন তাঁদের আঘাত করে তখনও তাঁরা দান করেন, সুখ যখন তাঁদের ঘিরে থাকে তখনও তাঁরা বর্ষণ করেন। তাঁদের মধ্যে মঙ্গলের এই রূপ যখন দেখতে পাই, আনন্দের এই প্রকাশ যখন উপলব্ধি করি তখন, হে পরম মঙ্গল পরমানন্দ,

তোমাকে আমরা কাছে পাই; তখন তোমাকে নিঃসংশয় সত্যরূপে বিশ্বাস করা আমাদের পক্ষে তেমন অসাধ্য হয় না। ভক্তের হৃদয়ের ভিতর দিয়ে তোমার যে মধুময় প্রকাশ ভক্তের জীবনের উপর দিয়ে তোমার প্রসন্ন মুখের যে প্রতিফলিত স্নিগ্ধ রশ্মি, সেও তোমার জগদ্ব্যাপী বিচিত্র আত্মদানের একটি বিশেষ ধারা; ফুলের মধ্যে যেমন তোমার গন্ধ, ফলের মধ্যে যেমন তোমার রস, ভক্তের ভিতর দিয়েও তোমার আত্মদানকে আমরা যেন তেমনি আনন্দের সঙ্গে ভোগ করতে পারি। পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে এই ভক্তিসুধা-সরস তোমার অতি মধুর লাবণ্য যেন আমরা না দেখে চলে না যাই। তোমার এই সৌন্দর্য তোমার কত ভক্তের জীবন থেকে কত রং নিয়ে যে মানবলোকের আনন্দকানন সাজিয়ে তুলেছে তা যে দেখেছে সেই মুগ্ধ হয়েছে। অহংকারের অন্ধতা থেকে যেন এই দেবদুর্লভ দৃশ্য হতে বঞ্চিত না হই। যেখানে তোমার একজন ভক্তের হৃদয়ের প্রেমস্রোতে তোমার আনন্দধারা একদিন মিলেছিল আমরা সেই পুণ্যসংগমের তীরে নিভৃত বনচ্ছায়ার আশ্রয় নিয়েছি, মিলন-সংগীত এখনও সেখানকার সূর্যোদয়ে সূর্যাস্তে সেখানকার নিশীথরাত্রের নিস্তব্ধতায় বেজে উঠছে। থাকতে থাকতে শুনতে শুনতে সেই সংগীতে আমরাও যেন কিছু সুর মিলিয়ে যেতে পারি এই আশীর্বাদ করো। কেননা জগতে যত সুর বাজে তার মধ্যে এই সুরই সবচেয়ে গভীর সব চেয়ে মিষ্ট। মিলনের আনন্দে মানুষের আত্মার এই গান, ভক্তিবীণায় এই তোমার অঙ্গুলির স্পর্শ, এই সোনার তারের মূর্ছনা।

৭ই পৌষ, রাত্রি, ১৩১৬

চিরনবীনতা

প্রভাত এসে প্রতিদিনই একটি রহস্যকে উদ্‌ঘাটিত করে দেয়, প্রতিদিনই সে একটি চিরন্তন কথা বলে অথচ প্রতিদিন মনে হয় সে-কথাটি নূতন। আমরা চিন্তা করতে করতে, কাজ করতে করতে, লড়াই করতে করতে প্রতিদিনই মনে করি, বহুকালের এই জগৎটা ক্লান্তিতে অবসন্ন, ভাবনায় ভারাক্রান্ত এবং ধুলায় মলিন হয়ে পড়েছে। এমন সময় প্রত্যূষে প্রভাত এসে পূর্ব আকাশের প্রান্তে দাঁড়িয়ে স্মিতহাস্যে জাদুকরের মতো জগতের উপর থেকে অন্ধকারের ঢাকাটি আস্তে আস্তে খুলে দেয়। দেখি সমস্তই নবীন, যেন সৃজনকর্তা এই মুহূর্তেই জগৎকে প্রথম সৃষ্টি করলেন। এই যে প্রথমকালের এবং চিরকালের নবীনতা এ আর কিছুতেই শেষ হচ্ছে না, প্রভাত এই কথাই বলছে।

আজ এই যে দিনটি দেখা দিল এ কি আজকের ? এ যে কোন্ যুগারম্ভে জ্যোতির্বাষ্পের আবরণ ছিন্ন করে যাত্রা আরম্ভ করেছিল সে কি কেউ গণনায় আনতে পারে ? এই দিনের নিমেষহীন দৃষ্টির সামনে তরল পৃথিবী কঠিন হয়ে উঠেছে, কঠিন পৃথিবীতে জীবনের নাট্য আরম্ভ হয়েছে এবং সেই নাট্যে অঙ্কের পর অঙ্কে কত নূতন নূতন প্রাণী তাদের জীবলীলা আরম্ভ করে সমাধা করে দিয়েছে ; এই দিন মানুষের ইতিহাসের কত বিস্মৃত শতাব্দীকে আলোক দান করেছে, এবং কোথাও বা সিন্ধুতীরে কোথাও মরুপ্রান্তরে কোথাও অরণ্যচ্ছায়ায় কত বড়ো বড়ো সভ্যতার জন্ম এবং অভ্যুদয় এবং বিনাশ দেখে এসেছে, এ সেই অতিপুরাতন দিন যে এই পৃথিবীর প্রথম জন্মমুহূর্তেই তাকে নিজের শুভ্র আঁচল পেতে কোলে তুলে নিয়েছিল, সৌরজগতের সকল গণনাকেই যে একেবারে প্রথম সংখ্যা থেকেই আরম্ভ করে দিয়েছিল। সেই অতি প্রাচীন দিনই হাস্যমুখে আজ প্রভাতে আমাদের চোখের সামনে বীণাবাদক প্রিয়দর্শন বালকটির মতো এসে দাঁড়িয়েছে। এ একেবারে নবীনতার মূর্তি, সদ্যোজাত শিশুর মতোই নবীন। এ যাকে স্পর্শ করে সেই তখনই নবীন হয়ে ওঠে, এ আপনার গলার হারটিতে চিরযৌবনের স্পর্শমণি ঝুলিয়ে এসেছে।

এর মানে কী ? এর মানে হচ্ছে এই, চিরনবীনতাই জগতের অন্তরের ধন, জগতের নিজ্য সামগ্রী। পুরাতনতা জীর্ণতা তার উপর দিয়ে ছায়ার মতো আসছে যাচ্ছে, দেখা দিতে না দিতেই মিলিয়ে যাচ্ছে, একে কোনোমতেই আচ্ছন্ন করতে পারছে না। জরা মিথ্যা, মৃত্যু মিথ্যা, ক্ষয় মিথ্যা। তারা মরীচিকার মতো, জ্যোতির্ময় আকাশের উপরে তারা ছায়ার নৃত্য নাচে এবং নাচতে নাচতে তারা দিক্‌প্রান্তরের অন্তরালে বিলীন হয়ে যায়। সত্য কেবল নিঃশেষহীন নবীনতা, কোনো ক্ষতি তাকে স্পর্শ করে না, কোনো আঘাত তাতে চিহ্ন আঁকে না, প্রতিদিন প্রভাতে এই কথাটি প্রকাশ পায়।

এই যে পৃথিবীর অতিপুরাতন দিন, একে প্রত্যহ প্রভাতে নূতন করে জন্মলাভ করতে হয়। প্রত্যহই একবার করে তাকে আদিতে ফিরে আসতে হয়, নইলে তার মূল সুরটি হারিয়ে যায়। প্রভাত তাকে তার চিরকালের ধুয়োটি বারবার করে ধরিয়ে দেয়, কিছুতেই ভুলতে দেয় না। দিন ক্রমাগতই যদি একটানা চলে যেত, কোথাও যদি তার চোখে নিমেষ না পড়ত, ঘোরতর কর্মের ব্যস্ততা এবং শক্তির ঔদ্ধত্যের মাঝখানে একবার করে যদি অতলস্পর্শ অন্ধকারের মধ্যে সে নিজেকে ভুলে না যেত এবং তার পরে আবার সেই আদিম নবীনতার মধ্যে যদি তার নবজন্মলাভ না হত তাহলে ধুলার পর ধুলা আবর্জনার পর আবর্জনা কেবলই জমে উঠত। চেষ্টার

ক্ষোভে, অহংকারের তাপে, কর্মের ভারে তার চিরন্তন সত্যটি আচ্ছন্ন হয়ে থাকত। তাহলে কেবলই মধ্যাহ্নের প্রখরতা, প্রয়াসের প্রবলতা, কেবলই কাড়তে যাওয়া, কেবলই ধাক্কা খাওয়া, কেবলই অন্তহীন পথ, কেবলই লক্ষ্যহীন যাত্রা—এরই উন্মাদনার তপ্ত বাষ্প জমতে জমতে পৃথিবীকে যেন একদিন বুদ্‌বুদের মতো বিদীর্ণ করে ফেলত।

এখনও দিনের বিচিত্র সংগীত তার সমস্ত মূর্ছনার সঙ্গে বেজে ওঠে নি। কিন্তু এই দিন যতই অগ্রসর হবে, কর্মসংঘাত ততই বেড়ে উঠতে থাকবে, অনৈক্য এবং বিরোধের সুরগুলি ক্রমেই উগ্র হয়ে উঠতে চাইবে। দেখতে দেখতে পৃথিবী জুড়ে উদ্বেগ তীব্র, ক্ষুধাতৃষ্ণার ক্রন্দনস্বর প্রবল এবং প্রতিযোগিতার ক্ষুব্ধ গর্জন উন্মত্ত হয়ে উঠবে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও স্নিগ্ধ প্রভাত প্রতিদিনই দেবদূতের মতো এসে ছিন্ন তারগুলিকে সেরেসুরে নিয়ে যে মূল সুরটিকে বাজিয়ে তোলে সেটি যেমন সরল তেমনি উদার, যেমন শান্ত তেমনি গম্ভীর, তার মধ্যে দাহ নেই, সংঘর্ষ নেই, তার মধ্যে খণ্ডতা নেই, সংশয় নেই। সে একটি বৃহৎ সমগ্রতার সম্পূর্ণতার সুর। নিত্যরাগিণীর মূর্তিটি অতি সৌম্য-ভাবে তার মধ্যে থেকে প্রকাশ পেয়ে ওঠে।

এমনি করে প্রতিদিনই প্রভাতের মুখ থেকে আমরা ফিরে ফিরে এই একটি কথা শুনতে পাই যে, কোলাহল যতই বিষম হ'ক না কেন তবু সে চরম নয়, আসল জিনিসটি হচ্ছে শান্তম্। সেইটিই ভিতরে আছে, সেইটিই আদিতে আছে, সেইটিই শেষে আছে। সেইজন্যই দিনের সমস্ত উন্মত্ততার পরও প্রভাতে আবার যখন সেই শান্তকে দেখি তখন দেখি তাঁর মূর্তিতে একটু আঘাতের চিহ্ন নেই একটু ধূলির রেখা নেই। সে মূর্তি চিরস্নিগ্ধ, চিরশুভ্র, চিরপ্রশান্ত।

সমস্ত দিন সংসারের ক্ষেত্রে দুঃখ দৈন্য মৃত্যুর আলোড়ন চলেইছে কিন্তু রোজ সকাল-বেলায় একটি বাণী আমাদের এই কথাটিই বলে যায় যে, এই সমস্ত অকল্যাণই চরম নয়, চরম হচ্ছেন শিবম্। প্রভাতে তাঁর একটি নির্মল মূর্তিকে দেখতে পাই—চেয়ে দেখি সেখানে ক্ষতির বলিরেখা কোথায়? সমস্তই পূরণ হয়ে আছে। দেখি যে, বুদ্‌বুদ যখন কেটে যায় সমুদ্রের তখনও কণামাত্র ক্ষয় হয় না। আমাদের চোখের উপরে যতই উলটপালট হয়ে যাক না তবু দেখি যে সমস্তই ধ্রুব হয়ে আছে, কিছুই নড়ে নি। আদিতে শিবম্, অন্তে শিবম্ এবং অন্তরে শিবম্।

সমুদ্রের ঢেউ যখন চঞ্চল হয়ে ওঠে তখন সেই ঢেউদের কাণ্ড দেখে সমুদ্রকে আর মনে থাকে না। তারাই অসংখ্য, তারাই প্রকাণ্ড, তারাই প্রচণ্ড এই কথাই কেবল মনে হতে থাকে। তেমনি সংসারের অনৈক্যকে বিরোধকেই সব চেয়ে প্রবল বলে মনে হয়। তা ছাড়া আর যে কিছু আছে তা কল্পনাতেও আসে না। কিন্তু প্রভাতের

মুখে একটি মিলনের বার্তা আছে যদি তা কান পেতে শুনি তবে শুনতে পাব এই বিরোধ এই অনৈক্যই চরম নয়, চরম হচ্ছেন অদ্বৈতম্‌। আমরা চোখের সামনে দেখতে পাই হানাহানির সীমা নেই, কিন্তু তারপরে দেখি ছিন্নবিচ্ছিন্নতার চিহ্ন কোথায়? বিশ্বের মহাসেতু লেশমাত্রও টলে নি। গণনাহীন অনৈক্যকে একই বিপুল ব্রহ্মাণ্ডে বেঁধে চিরদিন বসে আছেন, সেই অদ্বৈতম্‌, সেই একমাত্র এক। আদিতে অদ্বৈতম্‌, অন্তে অদ্বৈতম্‌, অন্তরে অদ্বৈতম্‌।

মানুষ যুগে যুগে প্রতিদিন প্রাতঃকালে দিনের আরম্ভে প্রভাতের প্রথম জাগ্রত আকাশ থেকে এই মন্ত্রটি অন্তরে বাহিরে শুনতে পেয়েছে, শান্তম্‌ শিবম্‌ অদ্বৈতম্‌। একবার তার সমস্ত কর্মকে থামিয়ে দিয়ে তার সমস্ত প্রবৃত্তিকে শান্ত করে নবীন আলোকের এই আকাশব্যাপী বাণীটি তাকে গ্রহণ করতে হয়েছে, শান্তম্‌ শিবম্‌ অদ্বৈতম্‌—এমন হাজার হাজার বৎসর ধরে প্রতিদিনই এই একই বাণী, তার কর্মারম্ভের এই একই দীক্ষামন্ত্র।

আসল সত্য কথাটা হচ্ছে এই যে, যিনি প্রথম তিনি আজও প্রথম হয়েই আছেন। মুহূর্তে মুহূর্তেই তিনি সৃষ্টি করছেন, নিখিল জগৎ এইমাত্র প্রথম সৃষ্টি হল এ-কথা বললে মিথ্যা বলা হয় না। জগৎ একদিন আরম্ভ হয়েছে তার পরে তার প্রকাণ্ড ভার বহন করে তাকে কেবলই একটা সোজা পথে টেনে আনা হচ্ছে এ-কথা ঠিক নয়। জগৎকে কেউ বহন করছে না, জগৎকে কেবলই সৃষ্টি করা হচ্ছে। যিনি প্রথম, জগৎ তাঁর কাছ থেকে নিমেষে নিমেষেই আরম্ভ হচ্ছে। সেই প্রথমের সংস্রব কোনো মতেই ঘুচছে না। এইজন্যেই গোড়াতেও প্রথম, এখনও প্রথম, গোড়াতেও নবীন, এখনও নবীন। বিচৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ—বিশ্বের আরম্ভেও তিনি, অন্তেও তিনি, সেই প্রথম, সেই নবীন, সেই নির্বিকার।

এই সত্যটিকে আমাদের উপলব্ধি করতে হবে, আমাদের মুহূর্তে মুহূর্তে নবীন হতে হবে, আমাদের ফিরে ফিরে নিমেষে নিমেষে তাঁর মধ্যে জন্মলাভ করতে হবে। কবিতা যেমন প্রত্যেক মাত্রায় মাত্রায় আপনার ছন্দটিতে গিয়ে পৌঁছোয়, প্রত্যেক মাত্রায় মাত্রায় মূল ছন্দটিকে নূতন করে স্বীকার করে, এবং সেই জন্যেই সমগ্রের সঙ্গে তার প্রত্যেক অংশের যোগ সুন্দর হয়ে ওঠে। আমাদেরও তাই করা চাই। আমরা প্রবৃত্তির পথে স্বাতন্ত্র্যের পথে একেবারে একটানা চলে যাব তা হবে না, আমাদের চিত্ত বারংবার সেই মূলে ফিরে আসবে, সেই মূলে ফিরে এসে তাঁর মধ্যে সমস্ত চরাচরের সঙ্গে আপনার যে অখণ্ড যোগ সেইটিকে বারবার অনুভব করে নেবে, তবেই সে মঙ্গল হবে, তবেই সে সুন্দর হবে।

এ যদি না হয়, আমরা যদি মনে করি সকলের সঙ্গে যে-যোগে আমাদের মঙ্গল, আমাদের স্থিতি, আমাদের সামঞ্জস্য, যে-যোগ আমাদের অস্তিত্বের মূলে তাকে ছাড়িয়ে নিজে অত্যন্ত উন্নত হয়ে ওঠবার আয়োজন করব, নিজের স্বাতন্ত্র্যকেই একেবারে নিত্য এবং উৎকট করে তোলবার চেষ্টা করব, তবে তা কোনোমতেই সফল এবং স্থায়ী হতে পারবেই না। একটা মস্ত ভাঙাচোরার মধ্যে তার অবসান হতেই হবে।

জগতে যত কিছু বিপ্লব, সে এমনি করেই হয়েছে। যখনই প্রতাপ এক জায়গায় পুঞ্জিত হয়েছে, যখনই বর্ণের, কুলের, ধনের, ক্ষমতার ভাগ-বিভাগ ভেদ-বিভেদ পরস্পরের মধ্যে ব্যবধানকে একেবারে দুর্লঙ্ঘ্য করে তুলেছে তখনই সমাজে ঝড় উঠেছে। যিনি অদ্বৈতম্, যিনি নিখিল জগতের সমস্ত বৈচিত্র্যকে একের সীমা লঙ্ঘন করতে দেন না তাঁকে একাকী ছাড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে জয়ী হতে পারবে এত বড়ো শক্তি কোন্ রাজার বা রাজ্যের আছে। কেননা সেই অদ্বৈতের সঙ্গে যোগেই শক্তি, সেই যোগের উপলব্ধিকে শীর্ণ করলেই দুর্বলতা। এইজন্যেই অহংকারকে বলে বিনাশের মূল, এই জন্যেই ঐক্যহীনতাকেই বলে শক্তিহীনতার কারণ।

অদ্বৈতই যদি জগতের অন্তরতররূপে বিরাজ করেন এবং সকলের সঙ্গে যোগসাধনই যদি জগতের মূলতত্ত্ব হয় তবে স্বাতন্ত্র্য জিনিসটা আসে কোথা থেকে, এই প্রশ্ন মনে আসতে পারে। স্বাতন্ত্র্যও সেই অদ্বৈত থেকেই আসে, স্বাতন্ত্র্যও সেই অদ্বৈতেরই প্রকাশ।

জগতে এই সব স্বাতন্ত্র্যগুলি কেমন? না, গানের যেমন তান। তান যতদূর পর্যন্ত যাক না, গানটিকে অস্বীকার করতে পারে না, সেই গানের সঙ্গে তার মূলে যোগ থাকে। সেই যোগটিকে সে ফিরে ফিরে দেখিয়ে দেয়। গান থেকে তানটি যখন হঠাৎ ছুটে বেরিয়ে চলে তখন মনে হয় সে বুঝি বিক্ষিপ্ত হয়ে উধাও হয়ে চলে গেল বা, কিন্তু তার সেই ছুটে যাওয়া কেবল মূল গানটিতে আবার ফিরে আসবার জন্যেই, এবং সেই ফিরে আসার রসটিকেই নিবিড় করার জন্যে। বাপ যখন লীলাচ্ছলে দুই হাতে করে শিশুকে আকাশের দিকে তোলেন, তখন মনে হয় যেন তিনি তাকে দূরেই নিক্ষেপ করতে যাচ্ছেন,—শিশুর মনের ভিতরে ভিতরে তখন একটু ভয় ভয় করতে থাকে, কিন্তু একবার তাকে উৎক্ষিপ্ত করেই আবার পরমুহূর্তেই তাকে বুকের কাছে টেনে ধরেন। বাপের এই লীলার মধ্যে সত্য জিনিস কোন্‌টা? বুকের কাছে টেনে ধরাটাই, তাঁর কাছ থেকে ছুঁড়ে ফেলাটাই নয়। বিচ্ছেদের ভাবটি এবং ভয়টুকুকে সৃষ্টি করা এই জন্যে যে সত্যকার বিচ্ছেদ নেই সেই আনন্দকেই বারংবার পরিস্ফুট করে তুলতে হবে বলে।

অতএব গানের তানের মতো আমাদের স্বাতন্ত্র্যের সার্থকতা হচ্ছে সেই পর্যন্ত যে পর্যন্ত মূল ঐক্যকে সে লঙ্ঘন করে না, তাকেই আরও অধিক করে প্রকাশ করে; সমস্তের মূলে যে শান্তম্ শিবমদ্বৈতম্ আছে যতক্ষণ পর্যন্ত তার সঙ্গে সে নিজের যোগ স্বীকার করে—অর্থাৎ যে-স্বাতন্ত্র্য লীলারূপেই সুন্দর, তাকে বিদ্রোহরূপে বিকৃত না করে। বিদ্রোহ করে মানুষের পরিত্রাণই বা কোথায়? যতদূরই যাক না সে যাবে কোথায়? তাঁর মধ্যে ফেরবার সহজ পথটি যদি সে না রাখে, যদি সে প্রবৃত্তির বেগে একেবারে হাউইয়ের মতোই উধাও হয়ে চলে যেতে চায়, কোনোমতেই নিখিলের সেই মূলকে মানতে না চায় তবে তবু তাকে ফিরতেই হবে। কিন্তু সেই ফেরা প্রলয়ের দ্বারা পতনের দ্বারা ঘটবে, তাকে বিদীর্ণ হয়ে দগ্ধ হয়ে নিজের সমস্ত শক্তির অভিমানকে ভস্মসাৎ করেই ফিরতে হবে। এই কথাটিকেই খুব জোর করে সমস্ত প্রতিকূল সাক্ষ্যের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষ প্রচার করেছে,

অধর্মেণৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রাণি পশ্যতি,
ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি।

অধর্মের দ্বারা লোকে বৃদ্ধিপ্রাপ্তও হয়, তাতেই সে ইষ্টলাভ করে, তার দ্বারা সে শত্রুদের জয়ও করে থাকে কিন্তু একেবারে মূলের থেকে বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

কেননা সমস্তের মূলে যিনি আছেন তিনি শান্ত, তিনি মঙ্গল, তিনি এক—তাঁকে সম্পূর্ণ ছাড়িয়ে যাবার জো নেই। কেবল তাঁকে ততটুকুই ছাড়িয়ে চাওয়া চলে যাতে ফিরে আবার তাঁকেই নিবিড় করে পাওয়া যায়, যাতে বিচ্ছেদের দ্বারা তাঁর প্রকাশ প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে।

এইজন্যে ভারতবর্ষে জীবনের আরম্ভেই সেই মূল সুরে জীবনটিকে বেশ ভালো করে বেঁধে নেবার আয়োজন ছিল। আমাদের শিক্ষার উদ্দেশ্যই ছিল তাই। এই অনন্তের সুরে সুর মিলিয়ে নেওয়াই ছিল ব্রহ্মচর্য—খুব বিশুদ্ধ করে, নিখুঁত করে, সমস্ত তারগুলিকেই সেই আসল গানটির অনুগত করে বেশ টেনে বেঁধে দেওয়া, এই ছিল জীবনের গোড়াকার সাধনা।

এমনি করে বাঁধা হলে, মূল গানটি উপযুক্তমতো সাধা হলে, তার পরে গৃহস্থাশ্রমে ইচ্ছামতো তান খেলানো চলে, তাতে আর সুর-লয়ের স্খলন হয় না; সমাজের নানা সম্বন্ধের মধ্যে সেই একের সম্বন্ধকেই বিচিত্রভাবে প্রকাশ করা হয়।

সুরকে রক্ষা করে গান শিখতে মানুষকে কতদিন ধরে কত সাধনাই করতে হয়। তেমনি যারা সমস্ত মানবজীবনটিকেই অনন্তের রাগিণীতে বাঁধা একটি সংগীত বলে জেনেছিল তারাও সাধনায় শৈথিল্য করতে পারে নি। সুরটিকে চিনতে এবং

কণ্ঠটিকে সত্য করে তুলতে তারা উপযুক্ত গুরুর কাছে ব্রহ্মচর্য সংযম সাধন করতে প্রস্তুত হয়েছিল।

এই ব্রহ্মচর্য-আশ্রমটি প্রভাতের মতো সরল, নির্মল, স্নিগ্ধ। মুক্ত আকাশের তলে, বনের ছায়ায় নির্মল স্রোতস্বিনীর তীরে তার আশ্রয়। জননীর কোল এবং জননীর দুই বাহু বক্ষই যেমন নগ্ন শিশুর আবরণ, এই আশ্রমে তেমনি নগ্নভাবে অবারিত ভাবে সাধক বিরাটের দ্বারা বেষ্টিত হয়ে থাকেন, ভোগবিলাস ঐশ্বর্য-উপকরণ খ্যাতি-প্রতিপত্তির কোনো ব্যবধান থাকবে না। এ একেবারে সেই গোড়ায় গিয়ে শান্তের সঙ্গে মঙ্গলের সঙ্গে একের সঙ্গে গায়ে গায়ে সংলগ্ন হয়ে বসা—কোনো প্রমত্ততা, কোনো-বিকৃতি সেখান থেকে তাকে বিক্ষিপ্ত করতে না পারে এই হচ্ছে সাধনা।

তার পরে গৃহস্থাশ্রমের কত কাজকর্ম, অর্জন ব্যয়, লাভ ক্ষতি, কত বিচ্ছেদ ও মিলন। কিন্তু এই বিক্ষিপ্ততাই চরম নয়। এরই মধ্যে দিয়ে যতদূর যাবার গিয়ে আবার ফিরতে হবে। ঘর যখন ভরে গেছে, ভাণ্ডার যখন পূর্ণ, তখন তারই মধ্যে আবদ্ধ হয়ে বসলে চলবে না। আবার প্রশস্ত পথে বেরিয়ে পড়তে হবে—আবার সেই মুক্ত আকাশ, সেই বনের ছায়া, সেই ধনহীন উপকরণহীন জীবনযাত্রা। নাই আভরণ, নাই আবরণ, নাই কোনো বাহ্য আয়োজন। আবার সেই বিশুদ্ধ সুরটিতে পৌঁছোনো, সেই সমে এসে শান্ত হওয়া। যেখান থেকে আরম্ভ সেইখানেই প্রত্যাবর্তন—কিন্তু এই ফিরে আসাটি মাঝখানের কর্মের ভিতর দিয়ে বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়ে গভীরতা লাভ করে। যাত্রা করার সময়ে গ্রহণ করার সাধনা আর ফেরবার সময়ে আপনাকে দান করার সাধনা।

উপনিষৎ বলছেন আনন্দ হতেই সমস্ত জীবের জন্ম, আনন্দের মধ্যেই সকলের জীবন-যাত্রা এবং সেই আনন্দের মধ্যেই আবার সকলের প্রত্যাবর্তন। বিশ্বজগতে এই যে আনন্দসমুদ্রে কেবলই তরঙ্গলীলা চলছে প্রত্যেক মানুষের জীবনটিকে এরই ছন্দে মিলিয়ে নেওয়া হচ্ছে জীবনের সার্থকতা। প্রথমেই এই উপলব্ধি তাকে পেতে হবে যে সেই অনন্ত আনন্দ হতেই সে জেগে উঠছে, আনন্দ হতেই তার যাত্রারম্ভ, তার পরে কর্মের বেগে সে যতদূর পর্যন্তই উচ্ছৃত হয়ে উঠুক না এই অনুভূতিটিই যেন সে রক্ষা করে যে সেই অনন্ত আনন্দসমুদ্রেই তার লীলা চলছে—তার পরে কর্ম সমাধা করে আবার যেন সে অতি সহজেই নত হয়ে সেই আনন্দসমুদ্রের মধ্যেই আপনার সমস্ত বিক্ষেপকে প্রশান্ত করে দেয়। এই হচ্ছে যথার্থ জীবন। এই জীবনের সঙ্গেই সমস্ত জগতের মিল। সেই মিলেই শান্তি এবং মঙ্গল এবং সৌন্দর্য প্রকাশ পায়।

হে চিত্ত, এই মিলটিকেই চাও। প্রবৃত্তির বেগে সমস্তকে ছাড়িয়ে যাবার চেষ্টা

ক'রো না। সকলের চেয়ে বড়ো হব, সকলের চেয়ে কৃতকার্য হয়ে উঠব এইটেকেই তোমার জীবনের মূল তত্ত্ব বলে জেনো না। এ-পথে অনেকে অনেক পেয়েছে, অনেক সঞ্চয় করেছে, প্রতাপশালী হয়ে উঠেছে তা আমি জানি, তবু বলছি এ পথ তোমার না হ'ক। তুমি প্রেমে নত হতে চাও, নত হয়ে একেবারে সেইখানে গিয়ে তোমার মাথা ঠেকুক যেখানে জগতের ছোটো বড়ো সকলেই এসে মিলেছে। তুমি তোমার স্বাতন্ত্র্যকে প্রত্যহই তাঁর মধ্যে বিসর্জন করে তাকে সার্থক করো। যতই উঁচু হয়ে উঠবে ততই নত হয়ে তাঁর মধ্যে আত্মসমর্পণ করতে থাকবে, যতই বাড়বে ততই ত্যাগ করবে, এই তোমার সাধনা হ'ক। ফিরে এস, ফিরে এস, বারবার তাঁর মধ্যে ফিরে ফিরে এস—দিনের মধ্যে মাঝে মাঝে ফিরে এস সেই অনন্তে। তুমি ফিরে আসবে বলেই এমন করে সমস্ত সাজানো রয়েছে। কত কথা, কত গোলমাল, বাইরের দিকে কত টানাটানি, সব ভুল হয়ে যায়, কোনো কিছুর পরিমাণ ঠিক থাকে না এবং সেই অসত্যের ক্ষেত্রে প্রবৃত্তির মধ্যে বিকৃতি এসে পড়ে। প্রতিদিন মুহূর্তে মুহূর্তে এই রকম ঘটছে, তারই মাঝখানে সতর্ক হও, টেনে আনো আপনাকে, ফিরে এস, আবার ফিরে এস, সেই গোড়ায়, সেই শান্তের মধ্যে, মঙ্গলের মধ্যে, সেই একের মধ্যে। কাজ করতে করতে কাজের মধ্যে একেবারে হারিয়ে যেয়ো না, তারই মাঝে মাঝে ফিরে ফিরে এসো তাঁর কাছে; আমোদ করতে করতে আমোদের মধ্যে একেবারে নিরুদ্দেশ হয়ে যেয়ো না, তারই মাঝে মাঝে ফিরে ফিরে এসো যেখানে সেই তাঁর কিনারা। শিশু খেলতে খেলতে মার কাছে বারবার ফিরে আসে; সেই ফিরে আসার যোগ যদি একেবারেই বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তাহলে তার আনন্দের খেলা কি ভয়ংকর হয়ে ওঠে! তোমার সংসারের কর্ম সংসারের খেলা ভয়ংকর হয়ে উঠবে যদি তাঁর মধ্যে ফেরবার পথ বন্ধ হয়ে যায়, সে পথ যদি অপরিচিত হয়ে ওঠে। বারবার যাতায়াতের দ্বারা সেই পথটি এমনি সহজ করে রাখো যে অমাবস্যার রাতেও সেখানে তুমি অনায়াসে যেতে পার, দুর্যোগের দিনেও সেখানে তোমার পা পিছলে না পড়ে। দিনে দুপুরে বেলায় অবেলায় যখন তখন সেই পথ দিয়ে যাও আর আসো, তাতে যেন কাঁটাগাছ জন্মাবার অবকাশ না ঘটে।

সংসারে দুঃখ আছে শোক আছে, আঘাত আছে অপমান আছে, হার মেনে তাদের হাতে আপনাকে একেবারে সমর্পণ করে দিয়ো না, মনে ক'রো না তারা তোমাকে ভেঙে ফেলেছে, গ্রাস করেছে, জীর্ণ করেছে। আবার ফিরে এস তাঁর মধ্যে, একেবারে নবীন হয়ে নাও। দেখতে দেখতে তুমি সংস্কারে জড়িত হয়ে পড়, লোকাচার তোমার ধর্মের স্থান অধিকার করে, যা তোমার আন্তরিক ছিল তাই

বাহ্যিক হয়ে দাঁড়ায়, যা চিন্তার দ্বারা বিচারের দ্বারা সচেতন ছিল তাই অভ্যাসের দ্বারা অন্ধ হয়ে ওঠে, যেখানে তোমার দেবতা ছিলেন সেখানেই অলক্ষ্যে সাম্প্রদায়িকতা এসে তোমাকে বেষ্টন করে ধরে। বাঁধা প'ড়ো না এর মধ্যে। ফিরে এস তাঁর কাছে, বার বার ফিরে এস। জ্ঞান আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠবে, বুদ্ধি আবার নূতন হবে। জগতে যা কিছু তোমার জানবার বিষয় আছে, বিজ্ঞান বল, দর্শন বল, ইতিহাস বল, সমাজতত্ত্ব বল সমস্তকেই থেকে থেকে তাঁর মধ্যে নিয়ে যাও, তাঁর মধ্যে রেখে দেখো। তাহলেই তাদের উপরকার আবরণ খুলে যাবে, সমস্তই প্রশস্ত হয়ে সত্য হয়ে অর্থপূর্ণ হয়ে উঠবে। জগতের সমস্ত সংকোচ, সমস্ত আচ্ছাদন, সমস্ত পাপ, এমনি করে বারবার তাঁর মধ্যে গিয়ে লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। এমনি করে জগৎ যুগের পর যুগ সুস্থ হয়ে সহজ হয়ে আছে। তুমিও তাঁর মধ্যে তেমনি সুস্থ হও, সহজ হও; বারবার করে তাঁর মধ্যে দিয়ে পূর্ণ হয়ে এস, তোমার দৃষ্টিকে, তোমার চিত্তকে, তোমার হৃদয়কে, তোমার কর্মকে নির্মলরূপে সত্য করে তোলো।

একদিন এই পৃথিবীতে নগ্ন শিশু হয়ে প্রবেশ করেছিলুম—হে চিত্ত, তুমি যখন সেই অনন্ত নবীনতার একেবারে কোলের উপরে খেলা করতে। এইজন্যে সেদিন তোমার কাছে সমস্তই অপরূপ ছিল, ধুলাবালিতেও তখন তোমার আনন্দ ছিল; পৃথিবীর সমস্ত বর্ণগন্ধরস যা কিছু তোমার হাতের কাছে এসে পড়ত তাকেই তুমি লাভ বলে জানতে, দান বলে গ্রহণ করতে। এখন তুমি বলতে শিখেছ, এটা পুরানো, ওটা, সাধারণ, এর কোনো দাম নেই। এমনি করে জগতে তোমার অধিকার সংকীর্ণ হয়ে আসছে। জগৎ তেমনিই নবীন আছে, কেননা এ যে অনন্ত রসসমুদ্রে পদ্মের মতো ভাসছে; নীলাকাশের নির্মল ললাটে বার্ধক্যের চিহ্ন পড়ে নি; আমাদের শিশুকালের সেই চিরসুহৃদ্ চাঁদ আজও পূর্ণিমার পর পূর্ণিমায় জ্যোৎস্নার দানসাগর ব্রত পালন করছে; ছয় ঋতুর ফুলের সাজি আজও ঠিক তেমনি করে আপনাআপনি ভরে উঠছে; রজনীর নীলাম্বরের আঁচলা থেকে আজও একটি চুমকিও খসে নি; আজও প্রতিরাত্রির অবসানে প্রভাত তার সোনার ঝুলিটিতে আশাময় রহস্য বহন করে জগতের প্রত্যেক প্রাণীর মুখের দিকে চেয়ে হেসে বলছে, বলো দেখি আমি তোমার জন্যে কী এনেছি! তবে জগতে জরা কোথায়? জরা কেবল কুঁড়ির উপরকার পত্রপুটের মতো নিজেকে বিদীর্ণ করে খসিয়ে খসিয়ে ফেলছে, চিরনবীনতার পুষ্পই ভিতর থেকে কেবলই ফুটে ফুটে উঠছে। মৃত্যু কেবলই আপনাকে আপনি ধ্বংস করছে—সে যা-কিছুকে সরাচ্ছে তাতে কেবল আপনাকেই সরিয়ে ফেলছে, লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি বৎসর ধরে তার আক্রমণে এই জগৎপাত্রের অমৃতে একটি কণারও ক্ষয় হয় নি।

হে আমার চিত্ত, আজ এই উৎসবের দিনে তুমি একেবারে নবীন হও, এখনই তুমি নবীনতার মধ্যে জন্মগ্রহণ করো, জরাজীর্ণতার বাহ্য আবরণ তোমার চারদিক থেকে কুয়াশার মতো মিলিয়ে যাক, চিরনবীন চিরসুন্দরকে আজ ঠিক একেবারে তোমার সম্মুখেই চেয়ে দেখো—শৈশবের সত্যদৃষ্টি ফিরে আসুক, জলস্থল আকাশ রহস্যে পূর্ণ হয়ে উঠুক, মৃত্যুর আচ্ছাদন থেকে বেরিয়ে এসে নিজেকে চিরযৌবন দেবতার মতো করে একবার দেখো, সকলকে অমৃতের পুত্র বলে একবার বোধ করো। সংসারের সমস্ত আবরণকে ভেদ করে আজ একবার আত্মাকে দেখো—কত বড়ো একটি মিলনের মধ্যে সে নিমগ্ন হয়ে নিস্তব্ধ হয়ে রয়েছে, সে কী নিবিড়, কী নিগূঢ়, কী আনন্দময়! কোনো ক্লান্তি নেই, জরা নেই, ম্লানতা নেই। সেই মিলনেরই বাঁশি জগতের সমস্ত সংগীতে বেজে উঠছে, সেই মিলনেরই উৎসবসজ্জা সমস্ত আকাশে ব্যাপ্ত হয়েছে। এই জগৎজোড়া সৌন্দর্যের কেবল একটিমাত্র অর্থ আছে, তোমার সঙ্গে তাঁর মিলন হয়েছে সেই জন্যেই এত শোভা, এত আয়োজন। এই সৌন্দর্যের সীমা নেই, এই আয়োজনের ক্ষয় নেই, চিরযৌবন তুমি চিরযৌবন, চিরসুন্দরের বাহুপাশে তুমি চিরদিন বাঁধা, সংসারের সমস্ত পর্দা সরিয়ে ফেলে সমস্ত লোভ মোহ অহংকারের জঞ্জাল কাটিয়ে আজ একবার সেই চিরদিনের আনন্দের মধ্যে পরিপূর্ণ ভাবে প্রবেশ করো, সত্য হ'ক তোমার জীবন তোমার জগৎ, জ্যোতির্ময় হ'ক, অমৃতময় হ'ক।

দেখো, আজ দেখো, তোমার গলায় কে পারিজাতের মালা নিজের হাতে পরিয়েছেন—কার প্রেমে তুমি সুন্দর, কার প্রেমে তোমার মৃত্যু নেই, কার প্রেমের গৌরবে তোমার চারিদিক থেকে তুচ্ছতার আবরণ কেবলই কেটে কেটে যাচ্ছে—কিছুতেই তোমাকে চিরদিনের মতো আবৃত আবদ্ধ করতে পারছে না। বিশ্বে তোমার বরণ হয়ে গেছে—প্রিয়তমের অনন্তমহল বাড়ির মধ্যে তুমি প্রবেশ করেছ, চারিদিকে দিকেদিগন্তে দীপ জ্বলছে, সুরলোকের সপ্তঋষি এসেছেন তোমাকে আশীর্বাদ করতে। আজ তোমার কিসের সংকোচ। আজ তুমি নিজেকে জানো, সেই জানার মধ্যে প্রফুল্ল হয়ে ওঠো, পুলকিত হয়ে ওঠো। তোমারই আত্মার এই মহোৎসব-সভায় স্বপ্নাবিষ্টের মতো একধারে পড়ে থেকো না, যেখানে তোমার অধিকারের সীমা নেই সেখানে ভিক্ষুকের মতো উঞ্ছবৃত্তি ক'রো না।

হে অন্তরতর, আমাকে বড়ো করে জানাবার ইচ্ছা তুমি একেবারেই সব দিক থেকে ঘুচিয়ে দাও। তোমার সঙ্গে মিলিত করে আমার যে জানা সেই আমাকে জানাও। আমার মধ্যে তোমার যা প্রকাশ তাই কেবল সুন্দর, তাই কেবল মঙ্গল, তাই কেবল নিত্য। আর সমস্তের কেবল এইমাত্র মূল্য যে তারা সেই প্রকাশের উপকরণ। কিন্তু

তা না হয়ে যদি তারা বাধা হয় তবে নির্মমভাবে তাদের চূর্ণ করে দাও। আমার ধন যদি তোমার ধন না হয় তবে দারিদ্র্যের দ্বারা আমাকে তোমার বুকের কাছে টেনে নাও, আমার বুদ্ধি যদি তোমার শুভবুদ্ধি না হয় তবে অপমানে তার গর্ব চূর্ণ করে তাকে সেই ধুলায় নত করে দাও যে-ধুলার কোলে তোমার বিশ্বের সকল জীব বিশ্রাম লাভ করে। আমার মনে যেন এই আশা সর্বদাই জেগে থাকে যে, একেবারে দূরে তুমি আমাকে কখনোই যেতে দেবে না, ফিরে ফিরে তোমার মধ্যে আসতেই হবে, বারংবার তোমার মধ্যে নিজেকে নবীন করে নিতেই হবে। দাহ বেড়ে চলে, বোঝা ভারি হয়, ধুলো জমে ওঠে, কিন্তু এমন করে বরাবর চলে না, দিনের শেষে জননীর হাতে পড়তেই হয়, অনন্ত সুধাসমুদ্রে অবগাহন করতেই হয়, সমস্ত জুড়িয়ে যায়, সমস্ত হালকা হয়, ধুলার চিহ্ন থাকে না; একেবারে তোমারই যা সেই গোড়াটুকুতেই গিয়ে পৌঁছোতে হয়, যা কিছু আমার সে সমস্ত জঞ্জাল ঘুচে যায়। মৃত্যুর আঁচলের মধ্যে ঢেকে তুমি একেবারে তোমার অবারিত হৃদয়ের উপরে আমাদের টেনে নাও। তখন কোনো ব্যবধান রাখ না। তার পরে বিরাম-রাত্রির শেষে হাতে পাথেয় দিয়ে মুখচুম্বন করে হাসিমুখে জীবনের স্বাতন্ত্র্যের পথে আবার পাঠিয়ে দাও। নির্মল প্রভাতে প্রাণের আনন্দ উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে, গান করতে করতে বেরিয়ে পড়ি, মনে গর্ব হয়, বুঝি নিজের শক্তিতে নিজের সাহসে, নিজের পথেই দূরে চলে যাচ্ছি। কিন্তু প্রেমের টান তো ছিন্ন হয় না, শুষ্ক গর্ব নিয়ে তো আত্মার ক্ষুধা মেটে না। শেষকালে নিজের শক্তির গৌরবে ধিক্‌কার জন্মে, সম্পূর্ণ বুঝতে পারি এই শক্তিকে যতক্ষণ তোমার মধ্যে না নিয়ে যাই ততক্ষণ এ কেবল দুর্বলতা। তখন গর্বকে বিসর্জন দিয়ে নিখিলের সমান ক্ষেত্রে এসে দাঁড়াতে চাই। তখনই তোমাকে সকলের মাঝখানে পাই কোথাও আর কোনো বাধা থাকে না। সেইখানে এসে সকলের সঙ্গে একত্রে বসে যাই যেখানে—মধ্যে বামনমাসীনং বিশ্বে দেবা উপাসতে। শান্তম্ শিবমদ্বৈতম্ এই মন্ত্র গভীর সুরে বাজুক, সমস্ত মনের তারে, সমস্ত কর্মের ঝংকারে। বাজতে বাজতে একেবারে নীরব হয়ে যাক। শান্তের মধ্যে, শিবের মধ্যে, একের মধ্যে, তোমার মধ্যে নীরব হয়ে যাক। পবিত্র হয়ে পরিপূর্ণ হয়ে সুধাময় হয়ে নীরব হয়ে যাক। সুখদুঃখ পূর্ণ হয়ে উঠুক, জীবনমৃত্যু পূর্ণ হয়ে উঠুক, অন্তর-বাহির পূর্ণ হয়ে উঠুক, ভূর্ভুবঃস্বঃ পূর্ণ হয়ে উঠুক। বিরাজ করুন অনন্ত দয়া, অনন্ত প্রেম, অনন্ত আনন্দ। বিরাজ করুন শান্তম্ শিবমদ্বৈতম্।

বিশ্ববোধ

প্রত্যেক জাতিই আপনার সভ্যতার ভিতর দিয়ে আপনার শ্রেষ্ঠ মানুষটিকে প্রার্থনা করছে। গাছের শিকড় থেকে আর ডালপালা পর্যন্ত সমস্তেরই যেমন একমাত্র চেষ্টা এই যে, যেন তার ফলের মধ্যে তার সকলের চেয়ে ভালো বীজটি জন্মায়; অর্থাৎ তার শক্তির যতদূর পরিণতি হওয়া সম্ভব তার বীজে যেন তারই আবির্ভাব হয়। তেমনি মানুষের সমাজও এমন মানুষকে চাচ্ছে যার মধ্যে সে আপনার শক্তির চরম পরিণতিকে প্রত্যক্ষ করতে পারে।

এই শক্তির চরম পরিণতিটি যে কী, সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ বলতে যে কাকে বোঝায় তার কল্পনা প্রত্যেক জাতির বিশেষ ক্ষমতা অনুসারে উজ্জ্বল অথবা অপরিস্ফুট। কেউ বা বাহুবলকে, কেউ বুদ্ধিচাতুরীকে, কেউ চারিত্রনীতিকেই মানুষের শ্রেষ্ঠতার মুখ্য উপাদান বলে গণ্য করেছে এবং সেই দিকেই অগ্রসর হবার জন্যে নিজের সমস্ত শিক্ষা দীক্ষা শাস্ত্রশাসনকে নিযুক্ত করছে।

ভারতবর্ষও একদিন মানুষের পূর্ণ শক্তিকে উপলব্ধি করবার জন্যে সাধনা করেছিল। ভারতবর্ষ মনের মধ্যে আপনার শ্রেষ্ঠ মানুষের ছবিটি দেখেছিল। সে শুধু মনের মধ্যেই কি? বাইরে যদি মানুষের আদর্শ একেবারেই দেখা না যায় তাহলে মনের মধ্যেও তার প্রতিষ্ঠা হতে পারে না।

ভারতবর্ষ আপনার সমস্ত গুণী জ্ঞানী শূর বীর রাজা মহারাজার মধ্যে এমন কোন মানুষদের দেখেছিল যাঁদের নরশ্রেষ্ঠ বলে বরণ করে নিয়েছিল? তাঁরা কে?

সংপ্রাপ্যৈনম্ ঋষয়ো জ্ঞানতৃপ্তাঃ
কৃতাত্মানো বীতরাগাঃ প্রশান্তাঃ
তে সর্বগং সর্বতঃ প্রাপ্য ধীরা
যুক্তাত্মানঃ সর্বমেবাবিশন্তি।

তাঁরা ঋষি। সেই ঋষি কারা? না, যাঁরা পরমাত্মাকে জ্ঞানের মধ্যে পেয়ে জ্ঞানতৃপ্ত, আত্মার মধ্যে মিলিত দেখে কৃতাত্মা, হৃদয়ের মধ্যে উপলব্ধি করে বীতরাগ, সংসারের কর্মক্ষেত্রে দর্শন করে প্রশান্ত। সেই ঋষি তাঁরা যাঁরা পরমাত্মাকে সর্বত্র হতেই প্রাপ্ত হয়ে ধীর হয়েছেন, সকলের সঙ্গেই যুক্ত হয়েছেন, সকলের মধ্যেই প্রবেশ করেছেন।

ভারতবর্ষ আপনার সমস্ত সাধনার দ্বারা এই ঋষিদের চেয়েছিল। এই ঋষিরা ধনী নন, ভোগী নন, প্রতাপশালী নন, তাঁরা ধীর, তাঁরা যুক্তাত্মা।

এর থেকেই দেখা যাচ্ছে পরমাত্মার যোগে সকলের সঙ্গেই যোগ উপলব্ধি করা, সকলের মধ্যেই প্রবেশ লাভ করা, এইটেকেই ভারতবর্ষ মনুষ্যত্বের চরম সার্থকতা বলে গণ্য করেছিল। ধনী হয়ে, প্রবল হয়ে, নিজের স্বাতন্ত্র্যকেই চারিদিকের সকলের চেয়ে উচ্চে খাড়া করে তোলাকেই ভারতবর্ষ সকলের চেয়ে গৌরবের বিষয় বলে মনে করে নি।

মানুষ বিনাশ করতে পারে, কেড়ে নিতে পারে, অর্জন করতে পারে, সঞ্চয় করতে পারে, আবিষ্কার করতে পারে, কিন্তু এই জন্যেই যে মানুষ বড়ো তা নয়। মানুষের মহত্ত্ব হচ্ছে মানুষ সকলকেই আপন করতে পারে। মানুষের জ্ঞান সব জায়গায় পৌঁছোয় না, তার শক্তি সব জায়গায় নাগাল পায় না, কেবল তার আত্মার অধিকারের সীমা নেই। মানুষের মধ্যে যাঁরা শ্রেষ্ঠ তাঁরা পরিপূর্ণ বোধশক্তির দ্বারা এই কথা বলতে পেরেছেন যে, ছোট হ'ক বড়ো হ'ক, উচ্চ হ'ক নীচ হ'ক, শত্রু হ'ক মিত্র হ'ক সকলেই আমার আপন।

মানুষের মধ্যে যাঁরা শ্রেষ্ঠ তাঁরা এমন জায়গায় সকলের সঙ্গে সমান হয়ে দাঁড়ান যেখানে সর্বব্যাপীর সঙ্গে তাঁদের আত্মার যোগস্থাপন হয়। যেখানে মানুষ সকলকে ঠেলেঠুলে নিজে বড়ো হয়ে উঠতে চায় সেখানেই তাঁর সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটে। সেই জন্যেই যাঁরা মানবজন্মের সফলতা লাভ করেছেন উপনিষৎ তাঁদের ধীর বলেছেন, যুক্তাত্মা বলেছেন। অর্থাৎ তাঁরা সকলের সঙ্গে মিলে আছেন বলেই শান্ত, তাঁরা সকলের সঙ্গে মিলে আছেন বলেই সেই পরম একের সঙ্গে তাঁদের বিচ্ছেদ নেই, তাঁরা যুক্তাত্মা।

খ্রীস্টের উপদেশ-বাণীর মধ্যেও এই কথাটির আভাস আছে। তিনি বলেছেন সূচির ছিদ্রের ভিতর দিয়ে যেমন উট প্রবেশ করতে পারে না, ধনীর পক্ষে মুক্তিলাভও তেমনি দুঃসাধ্য।

তার মানে হচ্ছে এই যে, ধন বল, মান বল যা কিছু আমরা জমিয়ে তুলি তার দ্বারা আমরা স্বতন্ত্র হয়ে উঠি, তার দ্বারা সকলের সঙ্গে আমাদের যোগ নষ্ট হয়। তাকেই বিশেষভাবে আগলাতে সামলাতে গিয়ে সকলকে দূরে ঠেকিয়ে রাখি। সঞ্চয় যতই বাড়তে থাকে ততই সকলের চেয়ে নিজেকে স্বতন্ত্র বলে গর্ব হয়। সেই গর্বের টানে এই স্বাতন্ত্র্যকে কেবলই বাড়িয়ে নিয়ে চলতে চেষ্টা হয়। এর আর সীমা নেই— আরও বড়ো, আরও বড়ো, আরও বেশি, আরও বেশি। এমনি করে মানুষ সকলের সঙ্গে যোগ হারাবার দিকেই চলতে থাকে, তার সর্বত্র প্রবেশের অধিকার কেবল নষ্ট হয়। উট যেমন সূচির ছিদ্রের মধ্যে দিয়ে গলতে পারে না সেও তেমনি কেবলই স্থূল হয়ে উঠে নিখিলের কোনো পথ দিয়েই গলতে পারে না, সে আপনার বড়োত্বের মধ্যেই

বন্দী। সে-ব্যক্তি মুক্তস্বরূপকে কেমন করে পাবে যিনি এমন প্রশস্ততম জায়গায় থাকেন যেখানে জগতের ছোটোবড়ো সকলেরই সমান স্থান।

সেই জন্যে আমাদের দেশে এই একটি অত্যন্ত বড়ো কথা বলা হয়েছে যে, তাঁকে পেতে হলে সকলকেই পেতে হবে। সমস্তকে ত্যাগ করাই তাঁকে পাওয়ার পন্থা নয়।

য়ুরোপের কোনো কোনো আধুনিক তত্ত্বজ্ঞানী, যাঁরা পরোক্ষে বা প্রত্যক্ষে উপনিষদের কাছেই বিশেষভাবে ঋণী, তাঁরা সেই ঋণকে অস্বীকার করেই বলে থাকেন, ভারতবর্ষের ব্রহ্ম একটি অবচ্ছিন্ন (abstract) পদার্থ। অর্থাৎ জগতে যেখানে যা কিছু আছে সমস্তকে ত্যাগ করে বাদ দিয়েই সেই অনন্ত স্বরূপ—অর্থাৎ এক কথায় তিনি কোনোখানেই নেই, আছেন কেবল তত্ত্বজ্ঞানে।

এ রকম কোনো দার্শনিক মতবাদ ভারতবর্ষে আছে কিনা সে-কথা আলোচনা করতে চাই নে কিন্তু এটি ভারতবর্ষের আসল কথা নয়। বিশ্বজগতের সমস্ত পদার্থের মধ্যেই অনন্ত স্বরূপকে উপলব্ধি করার সাধনা ভারতবর্ষে এতদূরে গেছে যে অন্য দেশের তত্ত্বজ্ঞানীরা সাহস করে ততদূরে যেতে পারেন না।

ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ—জগতে যেখানে যা কিছু আছে সমস্তকেই ঈশ্বরকে দিয়ে আচ্ছন্ন করে দেখবে এই তো আমাদের প্রতি উপদেশ।

যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্‌সু
যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ
য ওষধিষু যো বনস্পতিষু
তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ।

একেই কি বলে বিশ্ব থেকে বাদ দিয়ে তাঁকে দেখা? তিনি যেমন অগ্নিতেও আছেন তেমনি জলেও আছেন, অগ্নি ও জলের কোনো বিরোধ তাঁর মধ্যে নেই। ধান, গম, যব প্রভৃতি যে সমস্ত ওষধি কেবল কয়েক মাসের মতো পৃথিবীর উপর এসে আবার স্বপ্নের মতো মিলিয়ে যায় তার মধ্যেও সেই নিত্য সত্য যেমন আছেন, আবার যে বনস্পতি অমরতার প্রতিমাস্বরূপ সহস্র বৎসর ধরে পৃথিবীকে ফল ও ছায়া দান করছে তার মধ্যেও তিনি তেমনিই আছেন। শুধু আছেন এইটুকুকে জানা নয়, নমোনমঃ; তাঁকে নমস্কার, তাঁকে নমস্কার; সর্বত্রই তাঁকে নমস্কার।

আবার আমাদের ধ্যানের মন্ত্রেরও সেই একই লক্ষ্য—তাঁকে সমস্তর সঙ্গে মিলিয়ে দেখা, ভূলোকের সঙ্গে নক্ষত্রলোকের, বাহিরের সঙ্গে অন্তরের।

আমাদের দেশে বুদ্ধ এসেও বলে গিয়েছেন যা কিছু ঊর্ধ্বে আছে অধোতে

আছে, দূরে আছে নিকটে আছে, গোচরে আছে অগোচরে আছে সমস্তের প্রতিই বাধাহীন হিংসাহীন শত্রুতাহীন অপরিমিত মানস এবং মৈত্রী রক্ষা করবে। যখন দাঁড়িয়ে আছ বা চলছ, বসে আছ বা শুয়ে আছ, যে পর্যন্ত না নিদ্রা আসে সে পর্যন্ত এই প্রকার স্মৃতিতে অধিষ্ঠিত হয়ে থাকাকেই বলে ব্রহ্মবিহার।

অর্থাৎ ব্রহ্মের যে ভাব সেই ভাবটির মধ্যে প্রবেশ করাই হচ্ছে ব্রহ্মবিহার। ব্রহ্মের সেই ভাবটি কী?

যশ্চায়মস্মিন্নাকাশে তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্বানুভূঃ, যে তেজোময় অমৃতময় পুরুষ সর্বানুভূ হয়ে আছেন তিনিই ব্রহ্ম। সর্বানুভূ, অর্থাৎ সমস্তই তিনি অনুভব করছেন এই তাঁর ভাব। তিনি যে কেবল সমস্তর মধ্যে ব্যাপ্ত তা নয়, সমস্তই তাঁর অনুভূতির মধ্যে। শিশুকে মা যে বেষ্টন করে থাকেন সে কেবল তাঁর বাহু দিয়ে তাঁর শরীর দিয়ে নয় তাঁর অনুভূতি দিয়ে। সেইটিই হচ্ছে মাতার ভাব, সেই তাঁর মাতৃত্ব। শিশুকে মা আদ্যোপান্ত অত্যন্ত প্রগাঢ়রূপে অনুভব করেন। তেমনি সেই অমৃতময় পুরুষের অনুভূতি সমস্ত আকাশকে পূর্ণ করে সমস্ত জগৎকে সর্বত্র নিরতিশয় আচ্ছন্ন করে আছে। সমস্ত শরীরে মনে আমরা তাঁর অনুভূতির মধ্যে মগ্ন হয়ে রয়েছি। অনুভূতি, অনুভূতি—তাঁর অনুভূতির ভিতর দিয়ে বহু যোজন ক্রোশ দূর হতে সূর্য পৃথিবীকে টানছে, তাঁরই অনুভূতির মধ্য দিয়ে আলোকতরঙ্গ লোক হতে লোকান্তরে তরঙ্গিত হয়ে চলেছে। আকাশে কোথাও তার বিচ্ছেদ নেই, কালে কোথাও তার বিরাম নেই।

শুধু আকাশে নয়—যশ্চায়মস্মিন্নাত্মনি তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্বানুভূঃ—এই আত্মাতেও তিনি সর্বানুভূ। যে আকাশ ব্যাপ্তির রাজ্য সেখানেও তিনি সর্বানুভূ, যে আত্মা সমাপ্তির রাজ্য সেখানেও তিনি সর্বানুভূ।

তাহলেই দেখা যাচ্ছে যদি সেই সর্বানুভূকে পেতে চাই তাহলে অনুভূতির সঙ্গে অনুভূতি মেলাতে হবে। বস্তুত মানুষের যতই উন্নতি হচ্ছে ততই তার এই অনুভূতির বিস্তার ঘটছে। তার কাব্য দর্শন বিজ্ঞান কলাবিদ্যা ধর্ম সমস্তই কেবল মানুষের অনুভূতিকে বৃহৎ হতে বৃহত্তর করে তুলছে। এমনি করে অনুভূ হয়েই মানুষ বড়ো হয়ে উঠছে প্রভু হয়ে নয়। মানুষ যতই অনুভূ হবে প্রভুত্বের বাসনা ততই তার খর্ব হতে থাকবে। জায়গা জুড়ে থেকে মানুষ অধিকার করে না, বাহিরের ব্যবহারের দ্বারাও মানুষের অধিকার নয়—যে পর্যন্ত মানুষের অনুভূতি সেই পর্যন্তই সে সত্য, সেই পর্যন্তই তার অধিকার।

ভারতবর্ষ এই সাধনার 'পরেই সকলের চেয়ে বেশি জোর দিয়েছিল এই বিশ্ববোধ,

সর্বানুভূতি। গায়ত্রীমন্ত্রে এই বোধকেই ভারতবর্ষ প্রত্যহ ধ্যানের দ্বারা চর্চা করেছে, এই বোধের উদ্‌বোধনের জন্যেই উপনিষৎ সর্বভূতকে আত্মায় ও আত্মাকে সর্বভূতে উপলব্ধি করে ঘৃণা পরিহারের উপদেশ দিয়েছেন এবং বুদ্ধদেব এই বোধকেই সম্পূর্ণ করবার জন্যে সেই প্রণালী অবলম্বন করতে বলেছেন যাতে মানুষের মন অহিংসা থেকে দয়ায়, দয়া থেকে মৈত্রীতে সর্বত্র প্রসারিত হয়ে যায়।

এই যে সমস্তকে পাওয়া, সমস্তকে অনুভব করা, এর একটি মূল্য দিতে হয়। কিছু না দিয়ে পাওয়া যায় না। এই সকলের চেয়ে বড়ো পাওয়ার মূল্য কী? আপনাকে দেওয়া। আপনাকে দিলে তবে সমস্তকে পাওয়া যায়। আপনার গৌরবই তাই— আপনাকে ত্যাগ করলে সমস্তকে লাভ করা যায়, এইটেই তার মূল্য, এইজন্যই সে আছে।

তাই উপনিষদে একটি সংকেত আছে—ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ, ত্যাগের দ্বারাই লাভ করো, ভোগ করো। মা গৃধঃ, লোভ ক'রো না।

বুদ্ধদেবের যে শিক্ষা সেও বাসনাবর্জনের শিক্ষা; গীতাতেও বলছে, ফলের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে নিরাসক্ত হয়ে কাজ করবে। এইসকল উপদেশ হতেই অনেকে মনে করেন ভারতবর্ষ জগৎকে মিথ্যা বলে কল্পনা করে বলেই এই প্রকার উদাসীনতার প্রচার করেছে। কিন্তু কথাটা ঠিক এর উলটো।

যে-লোক আপনাকেই বড়ো করে চায় সে আর-সমস্তকেই খাটো করে। যার মনে বাসনা আছে সে কেবল সেই বাসনার বিষয়েই বদ্ধ, বাকি সমস্তের প্রতিই উদাসীন। উদাসীন শুধু নয়, হয়তো নিষ্ঠুর। এর কারণ এই, প্রকৃতপক্ষে কেবল তারই রুচি যে-ব্যক্তি সমগ্রের চেয়ে আপনাকেই সত্যতম ব'লে জানে, বাসনার বিষয়ে তারই রুচি যার কাছে সেই বিষয়টি সত্য আর সমস্তই মায়া। এই সকল লোকেরা হচ্ছে যথার্থ মায়াবাদী।

মানুষ নিজেকে যতই ব্যাপ্ত করতে থাকে ততই তার অহংকার এবং বাসনার বন্ধন কেটে যায়। মানুষ যখন নিজেকে একেবারে একলা বলে না জানে, যখন সে বাপ মা ভাই বন্ধুদের সঙ্গে নিজেকে এক বলে উপলব্ধি করে তখনই সে সভ্যতার প্রথম সোপানে পা ফেলে, তখনই সে বড়ো হতে শুরু করে। কিন্তু সেই বড়ো হবার মূল্যটি কী? নিজের প্রবৃত্তিকে বাসনাকে অহংকারকে খর্ব করা। এ না হলে পরিবারের মধ্যে তার আত্মোপলব্ধি সম্ভবপর হয় না। গৃহের সকলেরই কাছে আপনাকে ত্যাগ করলে তবেই যথার্থ গৃহী হতে পারা যায়।

এমনি করে গৃহী হবার জন্যে, সামাজিক হবার জন্যে, স্বাদেশিক হবার জন্যে

মানুষকে শিশুকাল থেকে কী সাধনাই না করতে হয়। তার যে-সকল প্রবৃত্তি নিজেকে বড়ো ক'রে পরকে আঘাত করে তাকে কেবলই খর্ব করতে হয়। তার যে-সকল হৃদয়বৃত্তি সকলের সঙ্গে নিজেকে মেলাতে চায় তাকেই উৎসাহ দ্বারা এবং চর্চার দ্বারা কেবল বাড়িয়ে তুলতে হয়। পরিবারবোধের চেয়ে সমাজবোধে, সমাজবোধের চেয়ে স্বদেশবোধে মানুষ একদিকে যতই বড়ো হয় অন্যদিকে ততই তাকে আত্মবিলোপ সাধন করতে হয়। ততই তার শিক্ষা কঠিন হয়ে ওঠে, ততই তাকে বৃহৎ ত্যাগের জন্যে প্রস্তুত হতে হয়। একেই তো বলে বীতরাগ হওয়া। এই জন্যেই মহত্ত্বের সাধনা মাত্রই মানুষকে বলে, ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ। বলে, মা গৃধঃ। এইরূপে নিজের ঐক্যবোধের ক্ষেত্রকে ক্রমশ বড়ো করে তোলবার চেষ্টা, এই হচ্ছে মনুষ্যত্বের চেষ্টা। আমরা আজ দেখতে পাচ্ছি পাশ্চাত্যদেশে এই চেষ্টা সাম্রাজ্যিকতাবোধে গিয়ে পৌচেছে। এক জাতির সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন দেশে যে-সমস্ত রাজ্য আছে তাদের সমস্তকে এক সাম্রাজ্যসূত্রে গেঁথে বৃহৎভাবে প্রবল হয়ে ওঠবার একটা ইচ্ছা সেখানে জাগ্রত হয়েছে। এই বোধকে সাধারণের মধ্যে উজ্জ্বল করে তোলবার জন্যে বহুতর অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের স্থাপনা হচ্ছে। বিদ্যালয়ে নাট্যশালায় গানে কাব্যে উপন্যাসে ভূগোলে ইতিহাসে সর্বত্রই এই সাধনা ফুটে উঠেছে।

সাম্রাজ্যিকতা-বোধকে য়ুরোপ যেমন পরম মঙ্গল বলে মনে করছে এবং সে জন্যে বিচিত্রভাবে সচেষ্ট হয়ে উঠেছে—বিশ্ববোধকেই ভারতবর্ষ মানবাত্মার পক্ষে তেমনি চরম পদার্থ বলে জ্ঞান করেছিল এবং এইটিকে উদ্বোধিত করবার জন্যে নানা দিকেই তার চেষ্টাকে চালনা করেছে। শিক্ষায় দীক্ষায় আহারে বিহারে সকল দিকেই সে তার এই অভিপ্রায় বিস্তার করেছে। এই হচ্ছে সাত্ত্বিকতার অর্থাৎ চৈতন্যময়তার সাধনা। তুচ্ছ বৃহৎ সকল ব্যাপারেই প্রবৃত্তিকে খর্ব করে সংযমের দ্বারা চৈতন্যকে নির্মল উজ্জ্বল করে তোলার সাধনা। কেবল জীবের প্রতি অহিংসামাত্র নয়, নানা উপলক্ষ্যে পশুপক্ষী, এমন কি, গাছপালার প্রতিও সেবাধর্মের চর্চা করা—অন্নজল নদী পর্বতের প্রতিও হৃদয়ের একটি সম্বন্ধ-সূত্র প্রসারিত করা; ধর্মের যোগ যে সকলের সঙ্গেই এই সত্যটিকে নানা ধ্যানের দ্বারা, স্মরণের দ্বারা, কর্মের দ্বারা মনের মধ্যে বদ্ধমূল করে দেওয়া। বিশ্ববোধ ব্যাপারটি যত বড়ো তার চৈতন্যও তত বড়ো হওয়া চাই, এই জন্যই গৃহীর ভোগে এবং যোগীর ত্যাগে সর্বত্রই এমনতরো সাত্ত্বিক সাধনা।

ভারতবর্ষের কাছে অনন্ত সকল ব্যবহারের অতীত শূন্য পদার্থ নয়, কেবল তত্ত্বকথা নয়, অনন্ত তার কাছে করতলন্যস্ত আমলকের মতো স্পষ্ট বলেই তো জলে স্থলে আকাশে অন্নে পানে বাক্যে মনে সর্বত্র সর্বদাই এই অনন্তকে সর্বসাধারণের প্রত্যক্ষ

বোধের মধ্যে সুপরিস্ফুট করে তোলবার জন্যে ভারতবর্ষ এত বিচিত্র ব্যবস্থা করেছে এবং এই জন্যেই ভারতবর্ষ ঐশ্বর্য বা স্বদেশ বা স্বাজাতিকতার মধ্যেই মানুষের বোধশক্তিকে আবদ্ধ করে তাকেই একান্ত ও অত্যুগ্র করে তোলবার দিকে লক্ষ্য করে নি।

এই যে বাধাহীন চৈতন্যময় বিশ্ববোধটি ভারতবর্ষে অত্যন্ত সত্য হয়ে উঠেছিল এই কথাটি আজ আমরা যেন সম্পূর্ণ গৌরবের সঙ্গে আনন্দের সঙ্গে স্মরণ করি। এই কথাটি স্মরণ করে আমাদের বক্ষ যেন প্রশস্ত হয়, আমাদের চিত্ত যেন আশান্বিত হয়ে ওঠে। যে-বোধ সকলের চেয়ে বড়ো সেই বিশ্ববোধ, যে-লাভ সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ সেই ব্রহ্মলাভ কাল্পনিকতা নয়, তারই সাধনা প্রচার করবার জন্যে এদেশে মহাপুরুষেরা জন্মগ্রহণ করেছেন এবং ব্রহ্মকেই সমস্তের মধ্যে উপলব্ধি করাটাকে তাঁরা এমন একটি অত্যন্ত নিশ্চিত পদার্থ বলে জেনেছেন যে জোরের সঙ্গে এই কথা বলেছেন—

ইহ চেৎ অবেদীৎ অথ সত্যমস্তি,
ন চেৎ ইহ অবেদীৎ মহতী বিনষ্টিঃ,
ভূতেষু ভূতেষু বিচিন্ত্য ধীরাঃ
প্রেত্যাস্মাল্লোকাৎ অমৃতা ভবন্তি।

এঁকে যদি জানা গেল তবেই সত্য হওয়া গেল—এঁকে যদি না জানা গেল তবেই মহাবিনাশ; ভূতে ভূতে সকলের মধ্যেই তাঁকে চিন্তা করে ধীরেরা অমৃতত্ব লাভ করেন।

ভারতবর্ষের এই মহৎ সাধনার উত্তরাধিকার যা আমরা লাভ করেছি তাকে আমরা অন্য দেশের শিক্ষা ও দৃষ্টান্তে ছোটো করে মিথ্যা করে তুলতে পারব না। এই মহৎ সত্যটিকেই নানাদিক দিয়ে উজ্জ্বল করে তোলবার ভার আমাদের দেশের উপরেই আছে। আমাদের দেশের এই তপস্যাটিকেই বড়ো রকম করে সার্থক করবার দিন আজ আমাদের এসেছে। জিগীষা নয়, জিঘাংসা নয়, প্রভুত্ব নয়, প্রবলতা নয়, বর্ণের সঙ্গে বর্ণের, ধর্মের সঙ্গে ধর্মের, সমাজের সঙ্গে সমাজের, স্বদেশের সঙ্গে বিদেশের ভেদ বিরোধ বিচ্ছেদ নয়; ছোটো বড়ো আত্মপর সকলের মধ্যেই উদারভাবে প্রবেশের যে সাধনা, সেই সাধনাকেই আমরা আনন্দের সঙ্গে বরণ করব। আজ আমাদের দেশে কত ভিন্ন জাতি, কত ভিন্ন ধর্ম, কত ভিন্ন সম্প্রদায় তা কে গণনা করবে? এখানে মানুষের সঙ্গে মানুষের কথায় কথায় পদে পদে যে ভেদ, এবং আহারে বিহারে সর্ব বিষয়েই মানুষের প্রতি মানুষের ব্যবহারে যে নিষ্ঠুর অবজ্ঞা ও ঘৃণা প্রকাশ পায় জগতের অন্য কোথাও তার আর তুলনা পাওয়া যায় না। এতে করে আমরা হারাচ্ছি তাঁকে যিনি সকলকে নিয়েই এক হয়ে আছেন; যিনি তাঁর প্রকাশকে বিচিত্র করেছেন

কিন্তু বিরুদ্ধ করেন নি। তাঁকে হারানো মানেই হচ্ছে মঙ্গলকে হারানো, শক্তিকে হারানো, সামঞ্জস্যকে হারানো এবং সত্যকে হারানো। তাই আজ আমাদের মধ্যে দুর্গতির সীমা পরিসীমা নেই, যা ভালো তা কেবলই বাধা পায়, পদেপদেই খণ্ডিত হতে থাকে, তার ক্রিয়া সর্বত্র ছড়াতে পায় না। সদনুষ্ঠান একজন মানুষের আশ্রয়ে মাথা তোলে এবং তার সঙ্গে সঙ্গেই বিলুপ্ত হয়, কালে কালে পুরুষে পুরুষে তার অনুবৃত্তি থাকে না। দেশে যেটুকু কল্যাণের উদ্ভব হয় তা কেবলই পদ্মপত্রে শিশির বিন্দুর মতো টলমল করতে থাকে। তার কারণ আর কিছুই নয় আমরা খাওয়া শোওয়া ওঠা বসায় যে সাত্ত্বিকতার সাধনা বিস্তার করেছিলুম তাই আজ লক্ষ্যহীন প্রাণহীন হয়ে বিকৃত হয়ে উঠেছে। তার যা উদ্দেশ্য ছিল ঠিক তারই বিপরীত কাজ করছে। যে-বিশ্ববোধকে সে অবারিত করবে তাকেই সে সকলের চেয়ে আবরিত করছে। দুই পা অন্তর এক-একটি প্রভেদকে সে সৃষ্টি করে তুলছে এবং মানব-ঘৃণার কাঁটাগাছ দিয়ে অতি নিবিড় করে তার বেড়া নির্মাণ করছে। এমনি করেই ভূমাকে আমরা হারালুম, মনুষ্যত্বকে তার বৃহৎক্ষেত্রে দাঁড় করাতে আর পারলুম না, নিরর্থক কতকগুলি আচার মেনে চলাই আমাদের কর্ম হয়ে দাঁড়াল শক্তিকে বিচিত্র পথে উদারভাবে প্রসারিত করা হল না, চিত্তের গতিবিধির পথ সংকীর্ণ হয়ে এল, আমাদের আশা ছোটো হয়ে গেল, ভরসা রইল না, পরস্পরের পাশে এসে দাঁড়াবার কোনো টান নেই, কেবলই তফাতে তফাতে সরে যাবার দিকেই তাড়না, কেবলই টুকরো টুকরো করে দেওয়া, কেবলই ভেঙে ভেঙে পড়া—শ্রদ্ধা নেই, সাধনা নেই, শক্তি নেই, আনন্দ নেই; যে-মাছ সমুদ্রের সে যদি অন্ধকার গুহার ক্ষুদ্র বদ্ধ জলের মধ্যে গিয়ে পড়ে তবে সে যেমন ক্রমে অন্ধ হয়ে ক্ষীণ হয়ে আসে, তেমনি আমাদের যে আত্মার স্বাভাবিক বিহারক্ষেত্র হচ্ছে বিশ্ব, আনন্দলোক হচ্ছেন ভূমা, তাকে এই সমস্ত শত-খণ্ডিত খাওয়া-ছোঁওয়ার ছোটো ছোটো গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ করে প্রতিদিন তার বুদ্ধিকে অন্ধ, হৃদয়কে বন্দী এবং শক্তিকে পঙ্গু করে ফেলা হচ্ছে। নিতান্ত প্রত্যক্ষ এই মহতী বিনষ্টি হতে কে আমাদের বাঁচাবে? আমাদের সত্য করে তুলবে কিসে? এর যে যথার্থ উত্তর সে আমাদের দেশেই আছে। ইহ চেৎ অবেদীৎ অথ সত্যমস্তি, নচেৎ ইহ অবেদীৎ মহতী বিনষ্টিঃ। ইহাকে যদি জানা গেল তবেই সত্য হওয়া গেল, ইহাকে যদি না জানা গেল তবেই মহাবিনাশ। এঁকে কেমন করে জানতে হবে? না, ভূতেষু ভূতেষু বিচিন্ত্য—প্রত্যেকের মধ্যে সকলেরই মধ্যে তাঁকে চিন্তা করে তাঁকে দর্শন করে। গৃহেই বল, সমাজেই বল, রাষ্ট্রেই বল, যে-পরিমাণে সকলের মধ্যে আমরা সেই সর্বানুভূকে উপলব্ধি করি সেই পরিমাণেই সত্য হই; যে-পরিমাণে না করি সেই

পরিমাণেই আমাদের বিনাশ। এইজন্য সকল দেশেই সর্বত্রই মানুষ জেনে এবং না জেনে এই সাধনাই করছে, সে বিশ্বানুভূতির মধ্যেই আত্মার সত্য উপলব্ধি খুঁজছে, সকলের মধ্যে দিয়ে সেই এককেই সে চাচ্ছে, কেননা সেই একই অমৃত, সেই একের থেকে বিচ্ছিন্নতাই মৃত্যু।

কিন্তু আমার মনে কোনো নৈরাশ্য নেই। আমি জানি অভাব যেখানে অত্যন্ত সুস্পষ্ট হয়ে মূর্তি ধারণ করে সেখানেই তার প্রতিকারের শক্তি সম্পূর্ণ বেগে প্রবল হয়ে ওঠে। আজ যে-সকল দেশ স্বজাতি স্বরাজ্য সাম্রাজ্য প্রভৃতি নিয়ে অত্যন্ত ব্যাপৃত হয়ে আছে তারাও বিশ্বের ভিতর দিয়ে সেই পরম একের সন্ধানে সজ্ঞানে প্রবৃত্ত নেই, তারাও সেই একের বোধকে এক জায়গায় এসে আঘাত করছে কিন্তু তবু তারা বৃহত্তের অভিমুখে আছে—একটা বিশেষ সীমার মধ্যে ঐক্যবোধকে তারা প্রশস্ত করে নিয়েছে। সেইজন্যে জ্ঞানে ভাবে কর্মে এখনও তারা ব্যাপ্ত হচ্ছে, তাদের শক্তি এখনও কোথাও তেমন করে অভিহত হয় নি। তারা চলেছে তারা বদ্ধ হয় নি। কিন্তু সেই জন্যেই তাদের পক্ষে সুস্পষ্ট করে বোঝা শক্ত পরম পাওয়াটি কী? তারা মনে করছে তারা যা নিয়ে আছে তাই বুঝি চরম, এর পরে বুঝি আর কিছু নেই, যদি থাকে মানুষের তাতে প্রয়োজন নেই। তারা মনে করে মানুষের যা কিছু প্রয়োজন তা বুঝি ভোট দেবার অধিকারের উপর নির্ভর করছে, আজকালকার দিনে উন্নতি বলতে লোকে যা বোঝে তাই বুঝি মানুষের চরম অবলম্বন।

কিন্তু বিধাতা এই ভারতবর্ষেই সমস্যাকে সব চেয়ে ঘনীভূত করে তুলেছেন, সেই জন্যে আমাদেরই এই সমস্যার আসল উত্তরটি দিতে হবে, এবং এর উত্তর আমাদের দেশের বাণীতে যেমন অত্যন্ত স্পষ্ট করে ব্যক্ত হয়েছে এমন আর কোথাও হয় নি।

যস্তু সর্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি,
সর্বভূতেষু চাত্মানং ন ততো বিজুগুপ্সতে।

যিনি সমস্ত ভূতকে পরমাত্মার মধ্যেই দেখেন এবং পরমাত্মাকে সর্বভূতের মধ্যে দেখেন তিনি আর কাউকেই ঘৃণা করেন না।

সর্বব্যাপী স ভগবান তস্মাৎ সর্বগতঃ শিবঃ। সেই ভগবান সর্বব্যাপী এইজন্যে তিনিই হচ্ছেন সর্বগত মঙ্গল। বিভাগের দ্বারা, বিরোধের দ্বারা যতই তাঁকে খণ্ডিত করে জানব ততই সেই সর্বগত মঙ্গলকে বাধা দেব।

একদিন ভারতবর্ষের বাণীতে মানুষের সকলের চেয়ে বড়ো সমস্যার যে উত্তর দেওয়া হয়েছে, আজ ইতিহাসের মধ্যে আমাদের সেই উত্তরটি দিতে হবে। আজ

আমাদের দেশে নানা জাতি এসেছে, বিপরীত দিক থেকে নানা বিরুদ্ধ শক্তি এসে পড়েছে, মতের অনৈক্য, আচারের পার্থক্য, স্বার্থের সংঘাত ঘনীভূত হয়ে উঠেছে। আমাদের সমস্ত শক্তি দিয়ে ভারতবর্ষের বাণীকে আজই সত্য করে তোলবার সময় এসেছে। যতক্ষণ তা না করব ততক্ষণ বারবার কেবলই আঘাত পেতে থাকব,—কেবলই অপমান কেবলই ব্যর্থতা ঘটতে থাকবে, বিধাতা একদিনের জন্যেও আমাদের আরামে বিশ্রাম করতে দেবেন না।

আমরা মানুষের সমস্ত বিচ্ছিন্নতা মিটিয়ে দিয়ে তাকে যে এক করে জানবার সাধনা করব তার কারণ এ নয় যে, সেই উপায়ে আমরা প্রবল হব, আমাদের বাণিজ্য ছড়িয়ে পড়বে, আমাদের স্বজাতি সকল জাতির চেয়ে বড়ো হয়ে উঠবে কিন্তু তার একটি মাত্র কারণ এই যে, সকল মানুষের ভিতর দিয়ে আমাদের আত্মা সেই ভূমার মধ্যে সত্য হয়ে উঠবে যিনি "সর্বগতঃ শিবঃ," যিনি "সর্বভূতগুহাশয়ঃ" যিনি "সর্বানুভূঃ"। তাঁকেই চাই, তিনিই আরম্ভে, তিনিই শেষে। যদি বল এমন করে দেখলে আমাদের উন্নতি হবে না তাহলে আমি বলব আমাদের বিনতিই ভাল। যদি বল এই সাধনায় আমাদের স্বজাতীয়তা দৃঢ় হয়ে উঠবে না, তাহলে আমি বলব স্বজাতি-অভিমানের অতি নিষ্ঠুর মোহ কাটিয়ে ওঠাই যে মানুষের পক্ষে শ্রেয় এই শিক্ষা দেবার জন্যেই ভারতবর্ষ চিরদিন প্রস্তুত হয়েছে। ভারতবর্ষ এই কথাই বলেছে যেনাহং নামৃতাস্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্—সমস্ত উদ্ধত সভ্যতার সভাদ্বারে দাঁড়িয়ে আবার একবার ভারতবর্ষকে বলতে হবে, যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্। প্রবলরা দুর্বল বলে অবজ্ঞা করবে, ধনীরা তাকে দরিদ্র বলে উপহাস করবে কিন্তু তবু তাকে এই কথা বলতে হবে, যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্। এই কথা বলবার শক্তি আমাদের কণ্ঠে তিনিই দিন, য একঃ, যিনি এক ; অবর্ণঃ, যাঁর বর্ণ নেই ; বিচৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ, যিনি সমস্তের আরম্ভে এবং সমস্তের শেষে—সনোবুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু, তিনি আমাদের শুভবুদ্ধির সঙ্গে যুক্ত করুন, শুভবুদ্ধির দ্বারা দূর নিকট আত্মপর সকলের সঙ্গে যুক্ত করুন।

হে সর্বানুভূ, তোমার যে অমৃতময় অনন্ত অনুভূতির দ্বারা বিশ্বচরাচরের যা কিছু সমস্তকেই তুমি নিবিড় করে বেষ্টন করে ধরেছ, সেই তোমার অনুভূতিকে এই ভারতবর্ষের উজ্জ্বল আকাশের তলে দাঁড়িয়ে একদিন এখানকার ঋষি তাঁর নিজের নির্মল চেতনার মধ্যে যে কী আশ্চর্য গভীররূপে উপলব্ধি করেছেন তা মনে করলে আমার হৃদয় পুলকিত হয়। মনে হয় যেন তাঁদের সেই উপলব্ধি এদেশের এই বাধাহীন নীলাকাশে এই কুহেলিকাহীন উদার আলোকে আজও সঞ্চারিত হচ্ছে। মনে হয় যেন

এই আকাশের মধ্যে আজও হৃদয়কে উদ্‌ঘাটিত করে নিস্তব্ধ করে ধরলে তাঁদের সেই বৈদ্যুতময় চেতনার অভিঘাত আমাদের চিত্তকে বিশ্বস্পন্দনের সমান ছন্দে তরঙ্গিত করে তুলবে। কী আশ্চর্য পরিপূর্ণতার মূর্তিতে তুমি তাঁদের কাছে দেখা দিয়েছিলে—এমন পূর্ণতা যে কিছুতে তাঁদের লোভ ছিল না। যতই তাঁরা ত্যাগ করেছেন ততই তুমি পূর্ণ করেছ এইজন্যে ত্যাগকেই তাঁরা ভোগ বলেছেন। তাঁদের দৃষ্টি এমন চৈতন্যময় হয়ে উঠেছিল যে, লেশমাত্র শূন্যকে কোথাও তাঁরা দেখতে পান নি, মৃত্যুকেও বিচ্ছেদরূপে তাঁরা স্বীকার করেন নি। এইজন্যে অমৃতকে যেমন তাঁরা তোমার ছায়া বলেছেন তেমনি মৃত্যুকেও তাঁরা তোমার ছায়া বলেছেন, যস্য ছায়ামৃতং যস্য মৃত্যুঃ। এইজন্যে তাঁরা বলেছেন, প্রাণো মৃত্যুঃ প্রাণ স্তক্মা—প্রাণই মৃত্যু, প্রাণই বেদনা। এইজন্যেই তাঁরা ভক্তির সঙ্গে আনন্দের সঙ্গে বলেছেন—নমস্তে অস্তু আয়তে, নমো অস্তু পরায়তে—যে প্রাণ আসছ তোমাকে নমস্কার, যে প্রাণ চলে যাচ্ছ তোমাকে নমস্কার। প্রাণে হ ভূতং ভব্যং চ—যা চলে গেছে তা প্রাণেই আছে, যা ভবিষ্যতে আসবে তাও প্রাণের মধ্যেই রয়েছে। তাঁরা অতি সহজেই এই কথাটি বুঝেছিলেন যে, যোগের বিচ্ছেদ কোনোখানেই নেই। প্রাণের যোগ যদি জগতের কোনো এক জায়গাতেও বিচ্ছিন্ন হয় তাহলে জগতে কোথাও একটি প্রাণীও বাঁচতে পারে না। সেই বিরাট প্রাণ-সমুদ্রই তুমি। যদিদং কিঞ্চ প্রাণ এজতি নিঃসৃতং—এই যা কিছু সমস্তই সেই প্রাণ হতে নিঃসৃত হচ্ছে এবং প্রাণের মধ্যেই কম্পিত হচ্ছে। নিজের প্রাণকে তাঁরা অনন্তের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন করে দেখেন নি সেই জন্যেই প্রাণকে তাঁরা সমস্ত আকাশে ব্যাপ্ত দেখে বলেছেন প্রাণো বিরাট্‌। সেই প্রাণকেই তাঁরা সূর্যচন্দ্রের মধ্যে অনুসরণ করে বলেছেন, প্রাণো হ সূর্যশ্চন্দ্রমা। নমস্তে প্রাণ ক্রন্দায়, নমস্তে স্তনয়িত্নবে—যে প্রাণ ক্রন্দন করছ সেই তোমাকে নমস্কার, যে প্রাণ গর্জন করছ সেই তোমাকে নমস্কার। নমস্তে প্রাণ বিদ্যুতে, নমস্তে প্রাণ বর্ষতে—যে প্রাণ বিদ্যুতে জলে উঠছ সেই তোমাকে নমস্কার, যে প্রাণ বর্ষণে গলে পড়ছ সেই তোমাকে নমস্কার। প্রাণ, প্রাণ, প্রাণ, সমস্ত প্রাণময়—কোথাও তার রন্ধ্র নেই, অন্ত নেই। এমনতরো অখণ্ড অনবচ্ছিন্ন উপলব্ধির মধ্যে তোমার যে সাধকেরা একদিন বাস করেছেন তাঁরা এই ভারতবর্ষেই বিচরণ করেছেন। তাঁরা এই আকাশের দিকেই চোখ তুলে একদিন এমন নিঃসংশয় প্রত্যয়ের সঙ্গে বলে উঠেছিলেন, কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ—কেই বা শরীর-চেষ্টা করত কেই বা জীবনধারণ করত যদি এই আকাশে আনন্দ না থাকতেন। যাঁরা নিজের বোধের মধ্যে সমস্ত আকাশকেই আনন্দময় বলে জেনেছিলেন তাঁদের পদধূলি এই ভারতবর্ষের মাটির

মধ্যে রয়েছে। সেই পবিত্র ধূলিকে মাথায় নিয়ে, হে সর্বব্যাপী পরমানন্দ, তোমাকে সর্বত্র স্বীকার করবার শক্তি আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত হ'ক। যাক সমস্ত বাধাবন্ধ ভেঙে যাক। দেশের মধ্যে এই আনন্দবোধের বন্যা এসে পড়ুক। সেই আনন্দের বেগে মানুষের সমস্ত ঘরগড়া ব্যবধান চূর্ণ হয়ে যাক, শত্রু মিত্র মিলে যাক, স্বদেশ বিদেশ এক হ'ক। হে আনন্দময় আমরা দীন নই, দরিদ্র নই। তোমার অমৃতময় অনুভূতি দ্বারা আমরা আকাশে এবং আত্মায়, অন্তরে বাহিরে পরিবেষ্টিত এই অনুভূতি আমাদের দিনে দিনে জাগ্রত হয়ে উঠুক। তাহলেই আমাদের ত্যাগই ভোগ হবে, অভাবও ঐশ্বর্যময় হবে, দিন পূর্ণ হবে, রাত পূর্ণ হবে, নিকট পূর্ণ হবে, দূর পূর্ণ হবে, পৃথিবীর ধূলি পূর্ণ হবে, আকাশের নক্ষত্রলোক পূর্ণ হবে। যাঁরা তোমাকে নিখিল আকাশে পরিপূর্ণভাবে দেখেছেন তাঁরা তো কেবল তোমাকে জ্ঞানময় বলে দেখেন নি। কোন প্রেমের সুগন্ধ বসন্তবাতাসে তাঁদের হৃদয়ের মধ্যে এই বার্তা সঞ্চারিত করেছে যে, তোমার যে বিশ্বব্যাপী অনুভূতি তা রসময় অনুভূতি। বলেছেন রসো বৈ সঃ—সেই জন্যেই জগৎ জুড়ে এত রূপ, এত রং, এত গন্ধ, এত গান, এত সখ্য, এত স্নেহ, এত প্রেম। এতস্যৈবানন্দস্যান্যানিভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি—তোমার এই অখণ্ড পরমানন্দ রসকেই আমরা সমস্ত জীবজন্তু দিকে দিকে মুহূর্তে মুহূর্তে মাত্রায় মাত্রায় কণায় কণায় পাচ্ছি—দিনে রাত্রে, ঋতুতে ঋতুতে, অন্নে জলে, ফুলে ফলে, দেহে মনে, অন্তরে বাহিরে বিচিত্র করে ভোগ করছি। হে অনির্বচনীয় অনন্ত, তোমাকে রসময় বলে দেখলে সমস্ত চিত্ত একেবারে সকলের নিচে নত হয়ে পড়ে। বলে, দাও দাও, আমাকে তোমার ধূলার মধ্যে তৃণের মধ্যে ছড়িয়ে দাও। দাও আমাকে রিক্ত করে কাঙাল করে, তার পরে দাও আমাকে রসে ভরে দাও। চাই না ধন, চাই না মান, চাই না কারও চেয়ে কিছুমাত্র বড়ো হতে। তোমার যে রস হাটবাজারে কেনবার নয়, রাজভাণ্ডারে কুলুপ দিয়ে রাখবার নয়, যা আপনার অন্তহীন প্রাচুর্যে আপনাকে আর ধরে রাখতে পারছে না, চারিদিকে ছড়াছড়ি যাচ্ছে, তোমার যে-রসে মাটির উপর ঘাস সবুজ হয়ে আছে, বনের মধ্যে ফুল সুন্দর হয়ে আছে, যে-রসে সকল দুঃখ, সকল বিরোধ, সকল কাড়াকাড়ির মধ্যেও আজও মানুষের ঘরে ঘরে ভালোবাসার অজস্র অমৃতধারা কিছুতেই শুকিয়ে যাচ্ছে না ফুরিয়ে যাচ্ছে না—মুহূর্তে মুহূর্তে নবীন হয়ে উঠে পিতায় মাতায়, স্বামী-স্ত্রীতে, পুত্রে কন্যায়, বন্ধুবান্ধবে নানাদিকে নানা শাখায় বয়ে যাচ্ছে, সেই তোমার নিখিল রসের নিবিড় সমষ্টিরূপ যে-অমৃত তারই একটু কণা আমার হৃদয়ের মাঝখানটিতে একবার ছুঁইয়ে দাও। তার পর থেকে আমি দিনরাত্রি তোমার সবুজ ঘাসপাতার সঙ্গে আমার প্রাণকে সরস করে

মিলিয়ে দিয়ে তোমার পায়ের সঙ্গে সংলগ্ন হয়ে থাকি। যারা তোমারই সেই তোমার-সকলের মাঝখানেই গরিব হয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে খুশি হয়ে যে-জায়গাটিতে কারও লোভ নেই সেইখানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে তোমার প্রেমমুখশ্রীর চিরপ্রসন্ন আলোকে পরিপূর্ণ হয়ে থাকি। হে প্রভু, কবে তুমি আমাকে সম্পূর্ণ করে সত্য করে জানিয়ে দেবে যে, রিক্ততার প্রার্থনাই তোমার কাছে চরম প্রার্থনা। আমার সমস্তই নাও, সমস্তই ঘুচিয়ে দাও, তাহলেই তোমার সমস্তই পাব, মানবজীবনে সকলের এই শেষ কথাটি ততক্ষণ বলবার সাহস হবে না যতক্ষণ অন্তরের ভিতর থেকে বলতে না পারব, রসো বৈ সঃ, রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি—তিনিই রস, যা কিছু আনন্দ সে এই রসকে পেয়েই।

গ্রন্থ-পরিচয়

[রচনাবলীর বর্তমান খণ্ডে মুদ্রিত গ্রন্থগুলির প্রথম প্রকাশের তারিখ ও গ্রন্থসংক্রান্ত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য গ্রন্থপরিচয়ে সংকলিত হইল। এই খণ্ডে মুদ্রিত কোনো কোনো রচনা সম্বন্ধে কবির নিজের মন্তব্যও মুদ্রিত হইল। পূর্ণতর তথ্যসংগ্রহ সর্বশেষ খণ্ডে একটি পঞ্জীতে প্রকাশিত হইবে।]

পূরবী

পূরবী ১৩৩২ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

গ্রন্থখানি দুই অংশে বিভক্ত, 'পূরবী' ও 'পথিক'[১]। ১৩২৪-১৩৩০ সালে রচিত কবিতা 'পূরবী' অংশে ও ১৩৩১ সালে য়ুরোপ ও দক্ষিণ-আমেরিকা ভ্রমণকালে লিখিত কবিতা 'পথিক' অংশে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। পথিক অংশের অনেক কবিতার ইতিহাস 'যাত্রী' গ্রন্থের 'পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি' অংশে সন্নিবদ্ধ আছে।

পথিক অংশের প্রথম কবিতা 'সাবিত্রী' (২৬ সেপ্টেম্বর ১৯২৪) প্রসঙ্গে 'পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি'র এই অংশগুলি দ্রষ্টব্য :

হারুনা-মারু জাহাজ
২৪ সেপ্টেম্বর ১৯২৪

সকাল আটটা। আকাশে ঘন মেঘ, দিগন্ত বৃষ্টিতে ঝাপসা, বাদলার হাওয়া খুঁতখুঁতে ছেলের মতো কিছুতেই শান্ত হতে চাচ্ছে না। বন্দরের শান-বাঁধানো বাঁধের ওপারে দুরন্ত সমুদ্র লাফিয়ে লাফিয়ে গর্জে উঠছে, কাকে যেন ঝুঁটি ধরে পেড়ে ফেলতে চায়, নাগাল পায় না।…

২৫ সেপ্টেম্বর

কাল সমস্তদিন জাহাজ মাল বোঝাই করছিল। রাত্রে যখন ছাড়ল তখন বাতাসের আক্ষেপ কিছু শান্ত কিন্তু তখনো মেঘগুলো দল পাকিয়ে বুক ফুলিয়ে বেড়াচ্ছে। আজ সকালে একখানা ভিজে অন্ধকারে আকাশ ঢাকা। এবার আলোকের অভিনন্দন পেলুম না।…

---

[১] পূরবীর প্রথম মুদ্রণে তৃতীয় একটি অংশ ছিল "সঞ্চিতা"—পুরাতন যে-সব কবিতা অন্য কোনো বইতে গ্রথিত হয় নাই সেগুলি এই বিভাগে মুদ্রিত হইয়াছিল। দ্বিতীয় সংস্করণে এই বিভাগটি পরিত্যক্ত হয়, রচনাবলীতেও বর্জিত হইল। এই বিভাগে মুদ্রিত কয়েকটি কবিতা রবীন্দ্র-রচনাবলীর দশম খণ্ডের সংযোজনে মুদ্রিত হইয়াছে।

২৬ সেপ্টেম্বর

আজ ক্ষণে ক্ষণে রৌদ্র উঁকি মারছে, কিন্তু সে যেন তার গারদের গরাদের ভিতর থেকে। তার সংকোচ এখনো ঘুচল না। বাদল-রাজের কালো-উর্দিপরা মেঘগুলো দিকে দিকে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে।

আচ্ছন্ন সূর্যের আলোয় আমার চৈতন্যের স্রোতস্বিনীতে যেন ভাঁটা পড়ে গেছে। জোয়ার আসবে রৌদ্রের সঙ্গে।

পশ্চিমে, বিশেষত আমেরিকায়, দেখেছি বাপমায়ের সঙ্গে অধিকাংশ বয়স্ক ছেলেমেয়ের নাড়ীর টান ঘুচে গেছে। আমাদের দেশে শেষ পর্যন্তই সেটা থাকে। তেমনিই দেখেছি সূর্যের সঙ্গে মানুষের প্রাণের যোগ সেদেশে তেমন যেন অন্তরঙ্গভাবে অনুভব করে না। সেই বিরলরৌদ্রের দেশে তারা ঘরে সূর্যের আলো ঠেকিয়ে রাখবার জন্যে যখন পর্দা কখনো বা অর্ধেক কখনো বা সম্পূর্ণ নামিয়ে দেয়, তখন সেটাকে আমি ঔদ্ধত্য বলে মনে করি।

প্রাণের যোগ নয় তো কী। সূর্যের আলোর ধারা তো আমাদের নাড়ীতে নাড়ীতে বইছে। আমাদের প্রাণমন আমাদের রূপরস সবই তো উৎসরূপে রয়েছে ওই মহা জ্যোতিষ্কের মধ্যে। সৌরজগতের সমস্ত ভাবীকাল একদিন তো পরিকীর্ণ হয়ে ছিল ওরই বহ্নিবাষ্পের মধ্যে। আমার দেহের কোষে কোষে ওই তেজই তো শরীরী, আমার ভাবনার তরঙ্গে তরঙ্গে ওই আলোই তো প্রবহমান। বাহিরে ওই আলোরই বর্ণচ্ছটায় মেঘে মেঘে পত্রে পুষ্পে পৃথিবীর রূপ বিচিত্র, অন্তরে ওই তেজই মানসভাব ধারণ ক'রে আমাদের চিন্তায় ভাবনায় বেদনায় রাগে অনুরাগে রঞ্জিত। সেই এক জ্যোতিরই এত রং এত রূপ এত ভাব এত রস। ওই যে-জ্যোতি আঙুরের গুচ্ছে গুচ্ছে এক-এক চুমুক মদ হয়ে সঞ্চিত, সেই জ্যোতিই তো আমার গানে গানে সুর হয়ে পুঞ্জিত হল। এখনি আমার চিত্ত হতে এই যে চিন্তা ভাষার ধারায় প্রবাহিত হয়ে চলেছে সে কি সেই জ্যোতিরই একটি চঞ্চল চিন্ময়স্বরূপ নয়, যে-জ্যোতি বনস্পতির শাখায় শাখায় স্তব্ধ ওংকার-ধ্বনির মতো সংহত হয়ে আছে ?

হে সূর্য, তোমারই তেজের উৎসের কাছে পৃথিবীর অন্তর্গূঢ় প্রার্থনা ঘাস হয়ে গাছ হয়ে আকাশে উঠছে, বলছে, জয় হোক। বলছে, অপাবৃণু, ঢাকা খুলে দাও। এই ঢাকা খোলাই তার প্রাণের লীলা, এই ঢাকা খোলাই তার ফুলফলের বিকাশ। অপাবৃণু, এই প্রার্থনারই নির্ঝরধারা আদিম জীবাণু থেকে যাত্রা করে আজ মানুষের মধ্যে এসে উপস্থিত, প্রাণের ঘাট পেরিয়ে চিত্তের ঘাটে পাড়ি দিয়ে চলল। আমি তোমার দিকে বাহু তুলে বলছি, হে পূষণ, হে পরিপূর্ণ, অপাবৃণু, তোমার হিরণ্ময় পাত্রের আবরণ

খোলো, আমার মধ্যে যে গুহাহিত সত্য তোমার মধ্যে তার অবারিত জ্যোতিঃস্বরূপ দেখে নিই। আমার পরিচয় আলোকে আলোকে উদ্‌ঘাটিত হোক।

২৬ সেপ্টেম্বর

কাল অপরাহ্ণে আচ্ছন্ন সূর্যের উদ্দেশে একটা কবিতা শুরু করেছি, আজ সকালে শেষ হল।

ঘন অশ্রুবাষ্পে ঘেরা মেঘের দুর্যোগে খড়্গ হানি
ফেলো, ফেলো টুটি।…

"লিপি" (৪ অক্টোবর ১৯২৪) কবিতা-প্রসঙ্গে 'পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি'র এই অংশ পঠনীয় :

৩ অক্টোবর, ১৯২৪
হারুনা-মারু জাহাজ

এখনো সূর্য ওঠে নি। আলোকের অবতরণিকা পূর্ব-আকাশে। জল স্থির হয়ে আছে সিংহবাহিনীর পায়ের তলাকার সিংহের মতো। সূর্যোদয়ের এই আগমনীর মধ্যে মজে গিয়ে আমার মুখে হঠাৎ ছন্দে-গাঁথা এই কথাটা আপনিই ভেসে উঠল :

হে ধরণী, কেন প্রতিদিন
তৃপ্তিহীন
একই লিপি পড় বারে বারে ?

বুঝতে পারলুম, আমার কোনো একটি আগন্তুক কবিতা মনের মধ্যে এসে পৌঁছবার আগেই তার ধুয়োটা এসে পৌঁচেছে। এইরকমের ধুয়ো অনেক সময়ে উড়ো বীজের মতো মনে এসে পড়ে, কিন্তু সব সময়ে তাকে এমন স্পষ্ট করে দেখতে পাওয়া যায় না।

সমুদ্রের দূরতীরে যে-ধরণী আপনার নানা-রঙা আঁচলখানি বিছিয়ে দিয়ে পুবের দিকে মুখ করে একলা বসে আছে, ছবির মতো দেখতে পেলুম তার কোলের উপর একখানি চিঠি পড়ল খসে কোন্ উপরের থেকে। সেই চিঠিখানি বুকের কাছে তুলে ধরে সে একমনে পড়তে বসে গেল; তাল-তমালের নিবিড় বনচ্ছায়া পিছনে রইল এলিয়ে, নুয়ে-পড়া মাথার থেকে ছড়িয়ে পড়া এলোচুল।

আমার কবিতার ধুয়ো বলছে, প্রতিদিন সেই একই চিঠি, সেই একখানির বেশি আর দরকার নেই; সে-ই ওর যথেষ্ট। সে এত বড়ো, তাই সে এত সরল। সেই একখানিতেই সব-আকাশ এমন সহজে ভরে গেছে।

ধরণী পাঠ করছে কত যুগ থেকে। সেই পাঠ-করাটা আমি মনে মনে চেয়ে দেখছি। সুরলোকের বাণী পৃথিবীর বুকের ভিতর দিয়ে কণ্ঠের ভিতর দিয়ে রূপে রূপে বিচিত্র হয়ে উঠল। বনে বনে হল গাছ, ফুলে ফুলে হল গন্ধ, প্রাণে প্রাণে হল নিঃশ্বসিত, একটি চিঠির সেই একটিমাত্র কথা,—সেই আলো, সেই সুন্দর, সেই ভীষণ; সেই হাসির ঝিলিকে ঝিকিমিকি, সেই কান্নার কাঁপনে ছলছল।

এই চিঠি-পড়াটাই সৃষ্টির স্রোত,—যে দিচ্ছে আর যে পাচ্ছে, সেই দুজনের কথা এতে মিলেছে, সেই মিলনেই রূপের ঢেউ। সেই মিলনের জায়গাটা হচ্ছে বিচ্ছেদ। কেননা দূর-নিকটের ভেদ না ঘটলে স্রোত বয় না, চিঠি চলে না। সৃষ্টি-উৎসের মুখে কী একটা কাণ্ড আছে, সে এক ধারাকে দুই ধারায় ভাগ করে। বীজ ছিল নিতান্ত এক, তাকে দ্বিধা করে দিয়ে দুখানি কচি পাতা বেরল, তখনি সেই বীজ পেল তার বাণী; নইলে সে বোবা, নইলে সে কৃপণ, আপন ঐশ্বর্য আপনি ভোগ করতে জানে না। বীজ ছিল একা, বিদীর্ণ হয়ে স্ত্রী-পুরুষে সে দুই হয়ে গেল। তখনি তার সেই বিভাগের ফাঁকের মধ্যে বসল তার ডাক-বিভাগ। ডাকের পর ডাক, তার অন্ত নেই। বিচ্ছেদের এই ফাঁক একটা বড়ো সম্পদ, এ নইলে সব চুপ সব বন্ধ। এই ফাঁকটার বুকের ভিতর দিয়ে একটা অপেক্ষার ব্যথা একটা আকাঙ্ক্ষার টান টনটন করে উঠল, দিতে-চাওয়ার আর পেতে-চাওয়ার উত্তর-প্রত্যুত্তর এপারে-ওপারে চালাচালি হতে লাগল। এতেই দুলে উঠল সৃষ্টিতরঙ্গ, বিচলিত হল ঋতুপর্যায়; কখনো বা গ্রীষ্মের তপস্যা, কখনো বর্ষার প্লাবন, কখনো বা শীতের সংকোচ, কখনো বা বসন্তের দাক্ষিণ্য। একে যদি মায়া বল তো দোষ নেই, কেননা এই চিঠি লিখনের অক্ষরে আবছায়া, ভাষায় ইশারা;—এর আবির্ভাব-তিরোভাবের পুরো মানে সব সময়ে বোঝা যায় না। যাকে চোখে দেখা যায় না, সেই উত্তাপ কখন আকাশ-পথ থেকে মাটির আড়ালে চলে যায়; মনে ভাবি একেবারেই গেল বুঝি। কিছুকাল যায়, একদিন দেখি মাটির পর্দা ফাঁক করে দিয়ে একটি অঙ্কুর উপরের দিকে কোন্-এক আর-জন্মের চেনা-মুখ খুঁজছে। যে-উত্তাপটা ফেরার হয়েছে বলে সেদিন রব উঠল, সেই তো মাটির তলায় অন্ধকারে সেঁধিয়ে কোন্ ঘুমিয়ে-পড়া বীজের দরজায় বসে বসে ঘা দিচ্ছিল। এমনি করেই কত অদৃশ্য ইশারার উত্তাপ এক হৃদয়ের থেকে আর-এক হৃদয়ের ফাঁকে ফাঁকে কোন্ চোরকোঠায় গিয়ে ঢোকে, সেখানে কার সঙ্গে কী কানাকানি করে জানি নে, তার পরে কিছুদিন বাদে একটি নবীন বাণী পর্দার বাইরে এসে বলে, "এসেছি।"

আমার সহযাত্রী বন্ধু আমার ডায়ারি পড়ে বললেন—তুমি ধরণীর চিঠি পড়ায় আর মানুষের চিঠি পড়ায় মিশিয়ে দিয়ে একটা যেন কী গোল পাকিয়েছ। কালিদাসের মেঘদূতে

বিরহী-বিরহিণীর বেদনাটা বেশ স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। তোমার এই লেখায় কোন্‌খানে রূপক কোন্‌খানে সাদা কথা বোঝা শক্ত হয়ে উঠেছে। আমি বললুম—কালিদাস যে মেঘদূত কাব্য লিখেছেন সেটাও বিশ্বের কথা। নইলে তার একপ্রান্তে নির্বাসিত যক্ষ রামগিরিতে, আর-একপ্রান্তে বিরহিণী কেন অলকাপুরীতে? স্বর্গ-মর্তের এই বিরহই তো সকল সৃষ্টিতে। এই মন্দাক্রান্তা-ছন্দেই তো বিশ্বের গান বেজে উঠছে। বিচ্ছেদের ফাঁকের ভিতর দিয়ে অণু-পরমাণু নিত্যই যে অদৃশ্য চিঠি চালাচালি করে, সেই চিঠিই সৃষ্টির বাণী। স্ত্রী-পুরুষের মাঝখানেও, চোখে-চোখেই হোক, কানে-কানেই হোক, মনে-মনেই হোক, আর কাগজে-পত্রেই হোক, যে-চিঠি চলে সেও ওই বিশ্ব-চিঠিরই একটি বিশেষ রূপ।

"পূরবী" কবিতাটির পূর্ব পাঠ পলাতকায় "শেষ গান" নামে মুদ্রিত হইয়াছে। "পূরবী" ও "বিজয়ী" ১৩২৪ সালে সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল, রচনা-তারিখ পাওয়া যায় নাই।

১৩২৯ সালে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের পরলোকগমনে কলিকাতায় যে শোকসভা অনুষ্ঠিত হয় রবীন্দ্রনাথ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কবিতাটি তথায় পাঠ করেন। ঐ কবিতাটির 'দিয়ে গেলে তোমার সংগীত' (পৃ. ১৩) স্থলে 'দিয়েছ সংগীত তব' এবং 'রেখে গেলে' স্থলে 'রেখে গেছ' পরিবর্তন কবি করিয়াছিলেন ; পূরবীর কোনো সংস্করণে এই সংশোধনটি সন্নিবিষ্ট হয় নাই ; এই সংশোধন করিয়া কবিতাটি পড়িতে হইবে। কবিকৃত এইরূপ আর-একটি সংশোধন, "আনমনা" কবিতার (পৃ ৬৪) দ্বিতীয় ছত্রে 'মালাখানি' স্থলে 'মাল্যখানি'। "বেঠিক পথের পথিক" কবিতাটি প্রবাসীতে প্রকাশিত হইবার সময় এই পাঠনির্দেশ মুদ্রিত ছিল : "এই কবিতাটির অকারান্ত সমস্ত শব্দকে হসন্তরূপে গণ্য করিতে হইবে ও কবিতাটি দাদরা তালে পড়িতে হইবে।" অকারান্ত সব শব্দ হসন্তযোগে মুদ্রিত ছিল।

"তৃতীয়া" ও "বিরহিণী" কবিতা দুইটি কবির পৌত্রী শ্রীমতী নন্দিনীর উদ্দেশে রচিত ; রচনাবলীর বর্তমান খণ্ডের প্রারম্ভে নন্দিনীর চিত্র মুদ্রিত হইয়াছে।

রবীন্দ্র-ভবনে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি সাহায্যে কোনো কোনো কবিতার তারিখ ও পাঠ সংশোধিত হইয়াছে। পাণ্ডুলিপির কোনো কোনো অংশ গ্রন্থপ্রকাশকালে বর্জিত হইয়াছে, নিচে সেগুলি উদ্ধৃত হইল।

"সাবিত্রী", ষষ্ঠ স্তবক 'চিহ্ন নাহি রাখে'র পর

তোমার উৎসবধারা আসা-যাওয়া দু-কূল ধ্বনিয়া
নিত্য ছুটে যায়।

তোমার নর্তকীদল বিরহমিলন ঝঞ্ঝনিয়া
খঞ্জনী বাজায়।
স্মৃতি-বিস্মৃতির ছন্দ-আন্দোলনে উত্তালছন্দিত
মুক্তি আর বন্ধ দোঁহে নৃত্য করে নূপুর-মন্দ্রিত,
দুঃখ আর সুখ।
বিশ্বের হৃৎপিণ্ড সেই দ্বন্দ্ববেগে ব্যথিত স্পন্দিত,
করে ধুকধুক।

এই ভালো, এই মন্দ, এই দ্বন্দ্ব আঘাতে সংঘাতে
নিক মোরে টেনে।
আলো-আঁধারের দোলে পুনঃপুনঃ আশা-আশঙ্কাতে
যাক মোরে হেনে।
সেই তরঙ্গের ঊর্ধ্বে দিক দেখা, হে রুদ্র নিষ্ঠুর,
জ্যোতিঃশতদল তব স্থির দীপ্ত আসন বিস্ফুর,
অম্লান-মহিমা।
সব দ্বন্দ্ব মগ্ন করে গন্ধ তার আনন্দের সুর
নাহি তার সীমা।

"মুক্তি", প্রথম স্তবক 'সেথা মোর চিরন্তন শেষ'-এর পর

পথে যেতে যদি কভু সাথি বলে চিনি বিশ্বপতি,
তোমারে কোথাও ;—
প্রভু, যদি কভু তব প্রভুত্বের দাবি মোর প্রতি
ছেড়ে দিতে চাও !
তাহলে আসুক সন্ধ্যা বিরামের মহাসিন্ধুতটে,
শান্তিবারি পূর্ণ হোক গোধূলির স্বর্ণময় ঘটে ;
শিশুর মতন তুমি এঁকে দাও আকাশের পটে
আনমনে যাহা-তাহা ছবি।
শিশুর মতন বসি একাসনে তোমা সনে কবি।

"দুঃখসম্পদ", 'চিরদিন গোপনে বিরাজে'র পর

যখনি কুঁড়ির বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া দেয় তাপে,
তখনি তো জানি, ফুল চিরদিন ছিল তারি চাপে।

দুঃখ চেয়ে আরো বড়ো না থাকিত কিছু
জীবনের প্রতিদিন হত মাথা নিচু,
তবে জীবনের অবসান
মৃত্যুর বিদ্রূপহাস্যে আনিত চরম অসম্মান।

"কিশোর প্রেম", তৃতীয় স্তবক 'অজানা কোন্ ভাষা'র পর

তার পরে সেই তীরে বসে কত কাঁদন কাঁদা।
ওপার পানে যাবার লাগি
আঁধার রাতে ছিলাম জাগি,
কে জানিত তটচ্ছায়ায় তরী ছিল বাঁধা,
মিছে কত কাঁদন কাঁদা।

"আনমনা" ও "বদল" কবিতা দুইটির গীত-রূপ প্রথম সংস্করণ তৃতীয় খণ্ড গীতবিতানে দ্রষ্টব্য। গান দুইটির প্রথম ছত্র যথাক্রমে "আনমনা, আনমনা" ও "তার হাতে ছিল হাসির ফুলের ভার"।

লেখন

লেখন ১৩৩৪ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

এই গ্রন্থ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ প্রবাসীতে (কার্তিক ১৩৩৫) যে প্রবন্ধ প্রকাশ করেন তাহা নিচে মুদ্রিত হইল।

লেখন

যখন চীনে জাপানে গিয়েছিলেম প্রায় প্রতিদিনই স্বাক্ষরলিপির দাবি মেটাতে হত। কাগজে, রেশমের কাপড়ে, পাখায় অনেক লিখতে হয়েছে। সেখানে তারা আমার বাংলা লেখাই চেয়েছিল, কারণ বাংলাতে একদিকে আমার, আবার আর-এক দিকে সমস্ত বাঙালী জাতিরই স্বাক্ষর। এমনি করে যখন-তখন পথে-ঘাটে যেখানে-সেখানে দু-চার লাইন কবিতা লেখা আমার অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। এই লেখাতে আমি আনন্দও পেতুম। দু-চারটি বাক্যের মধ্যে এক-একটি ভাবকে নিবিষ্ট করে দিয়ে তার যে একটি বাহুল্যবর্জিত রূপ প্রকাশ পেত তা আমার কাছে বড়ো লেখার চেয়ে অনেক সময় আরো বেশি আদর পেয়েছে। আমার নিজের বিশ্বাস বড়ো বড়ো কবিতা পড়া আমাদের অভ্যাস বলেই কবিতার আয়তন কম হলে তাকে কবিতা বলে উপলব্ধি

করতে আমাদের বাধে। অতিভোজনে যারা অভ্যস্ত, জঠরের সমস্ত জায়গাটা বোঝাই না হলে আহারের আনন্দ তাদের অসম্পূর্ণ থাকে; আহার্যের শ্রেষ্ঠতা তাদের কাছে খাটো হয়ে যায় আহারের পরিমাণ পরিমিত হওয়াতেই। আমাদের দেশে পাঠকদের মধ্যে আয়তনের উপাসক অনেক আছে—সাহিত্য সম্বন্ধেও তারা বলে, নায়ে সুখমস্তি—নাট্য সম্বন্ধেও তারা রাত্রি তিনটে পর্যন্ত অভিনয় দেখার দ্বারা টিকিট কেনার সার্থকতা বিচার করে।

জাপানে ছোটো কাব্যের অমর্যাদা একেবারেই নেই। ছোটোর মধ্যে বড়োকে দেখতে পাওয়ার সাধনা তাদের—কেননা তারা জাত-আর্টিস্ট। সৌন্দর্য-বস্তুকে তারা গজের মাপে বা সেরের ওজনে হিসাব করবার কথা মনেই করতে পারে না। সেইজন্যে জাপানে যখন আমার কাছে কেউ কবিতা দাবি করেছে, দুটি-চারটি লাইন দিতে আমি কুণ্ঠিত হই নি। তার কিছুকাল পূর্বেই আমি যখন বাংলাদেশে গীতাঞ্জলি প্রভৃতি গান লিখছিলুম, তখন আমার অনেক পাঠকই লাইন গণনা করে আমার শক্তির কার্পণ্যে হতাশ হয়েছিলেন—এখনো সে-দলের লোকের অভাব নেই।

এইরকম ছোটো ছোটো লেখায় একবার আমার কলম যখন রস পেতে লাগল তখন আমি অনুরোধনিরপেক্ষ হয়েও খাতা টেনে নিয়ে আপন মনে যা-তা লিখেছি এবং সেই সঙ্গে পাঠকদের মন ঠাণ্ডা করবার জন্যে বিনয় করে বলেছি :

আমার লিখন ফুটে পথধারে
ক্ষণিক কালের ফুলে,
চলিতে চলিতে দেখে যারা তারে
চলিতে চলিতে ভুলে।

কিন্তু ভেবে দেখতে গেলে এটা ক্ষণিক কালের ফুলের দোষ নয়, চলতে চলতে দেখারই দোষ। যে-জিনিসটা বহরে বড়ো নয় তাকে আমরা দাঁড়িয়ে দেখি নে, যদি দেখতুম তবে মেঠো ফুল দেখে খুশি হলেও লজ্জার কারণ থাকত না। তার চেয়ে কুমড়োফুল যে রূপে শ্রেষ্ঠ তা নাও হতে পারে।

গেলবারে যখন ইটালিতে গিয়েছিলুম, তখন স্বাক্ষরলিপির খাতায় অনেক লিখতে হয়েছিল। লেখা যাঁরা চেয়েছিলেন তাঁদের অনেকেরই ছিল ইংরেজি লেখারই দাবি। এবারেও লিখতে লিখতে কতক তাঁদের খাতায় কতক আমার নিজের খাতায় অনেকগুলি ওইরকম ছোটো ছোটো লেখা জমা হয়ে উঠল। এইরকম অনেক সময়ই অনুরোধের খাতিরে লেখা শুরু হয়, তার পরে ঝোঁক চেপে গেলে আর অনুরোধের দরকার থাকে না।

জার্মানিতে গিয়ে দেখা গেল, এক উপায় বেরিয়েছে তাতে হাতের অক্ষর থেকেই ছাপানো চলে। বিশেষ কালি দিয়ে লিখতে হয় এল্যুমিনিয়মের পাতের উপরে, তার থেকে বিশেষ ছাপার যন্ত্রে ছাপিয়ে নিলেই কম্পোজিটারের শরণাপন্ন হবার দরকার হয় না।

তখন ভাবলেম, ছোটো লেখাকে যাঁরা সাহিত্য হিসাবে অনাদর করেন তাঁরা কবির স্বাক্ষর হিসাবে হয়তো সেগুলোকে গ্রহণ করতেও পারেন। তখন শরীর যথেষ্ট অসুস্থ, সেই কারণে সময় যথেষ্ট হাতে ছিল, সেই সুযোগে ইংরেজি বাংলা এই ছুটকো লেখাগুলি এল্যুমিনিয়ম পাতের উপর লিপিবদ্ধ করতে বসলুম।

ইতিমধ্যে ঘটনাক্রমে আমার কোনো তরুণ বন্ধু বললেন, "আপনার কিছুকাল পূর্বেকার লেখা কয়েকটি ছোটো ছোটো কবিতা আছে। সেইগুলিকে এই উপলক্ষে যাতে রক্ষা করা হয় এই আমার একান্ত অনুরোধ।"

আমার ভোলবার শক্তি অসামান্য এবং নিজের পূর্বের লেখার প্রতি প্রায়ই আমার মনে একটা অহেতুক বিরাগ জন্মায়। এইজন্যই তরুণ লেখকরা সাহিত্যিক-পদবী থেকে আমাকে যখন বরখাস্ত করবার জন্যে কানাকানি করতে থাকেন তখন আমার মন আমাকে পরামর্শ দেয় যে, "আগেভাগে নিজেই তুমি মানে মানে রেজিগনেশন-পত্র পাঠিয়ে যৎসামান্য কিছু পেনসনের দাবি রেখে দাও।" এটা যে সম্ভব হয় তার কারণ আমার পূর্বেকার লেখাগুলো আমি যে-পরিমাণে ভুলি সেই পরিমাণেই মনে হয় তারা ভোলবারই যোগ্য।

তাই প্রস্তুত হয়েছিলেম, আমার বন্ধু পুরোনো ইতিহাসের ক্ষেত্র থেকে উঞ্ছস্বরূপ যা-কিছু সংগ্রহ করে আনবেন আবার তাদেরকে পুরোনোর তমিস্রলোকে বৈতরণী পার করে ফেরত পাঠাব।

গুটিপাঁচেক ছোটো কবিতা তিনি আমার সম্মুখে উপস্থিত করলেন। আমি বললেম, "কিছুতেই মনে পড়বে না এগুলি আমার লেখা," তিনি জোর করেই বললেন, "কোনো সংশয় নেই।"

আমার রচনা-সম্বন্ধে আমার নিজের সাক্ষ্যকে সর্বদাই অবজ্ঞা করা হয়। আমার গানে আমি সুর দিয়ে থাকি। যাকে হাতের কাছে পাই তাকে সেই সদ্যোজাত সুর শিখিয়ে দিই। তখন থেকে সে-গানের সুরগুলি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ দায়িত্ব আমার ছাত্রের। তার পর আমি যদি গাইতে যাই তারা এ-কথা বলতে সংকোচমাত্র করে না যে, আমি ভুল করছি। এ-সম্বন্ধে তাদের শাসন আমাকে বারবার স্বীকার করে নিতে হয়।

কবিতা কয়টি যে আমারই সেও আমি স্বীকার করে নিলেম। পড়ে বিশেষ তৃপ্তি

বোধ হল—মনে হল ভালোই লিখেছি। বিস্মরণশক্তির প্রবলতাবশত নিজের কবিতা থেকে নিজের মন যখন দূরে সরে যায় তখন সেই কবিতাকে অপর সাধারণ পাঠকের মতোই নিরাসক্তভাবে আমি প্রশংসা এবং নিন্দাও করে থাকি। নিজের পুরোনো লেখা নিয়ে বিস্ময় বোধ করতে বা স্বীকার করতে আমার সংকোচ হয় না—কেননা তার সম্বন্ধে আমার অহমিকার ধার ক্ষয় হয়ে যায়। পড়ে দেখলাম :

তোমারে ভুলিতে মোর হল না যে মতি,
এ জগতে কারো তাহে নাই কোনো ক্ষতি।
আমি তাহে দীন নহি, তুমি নহ ধনী,
দেবতার অংশ তাও পাইবেন তিনি।

নিজের লেখা জেনেও আমাকে স্বীকার করতে হল যে, ছোটোর মধ্যে এই কবিতাটি সম্পূর্ণ ভরে উঠেছে। পেটুকচিত্ত পাঠকের পেট ভরাবার জন্যে একে পঁচিশ-ত্রিশ লাইন পর্যন্ত বাড়িয়ে তোলা যেতে পারত—এমন কি, একে বড়ো আকারে লেখাই এর চেয়ে হত সহজ। কিন্তু লোভে পড়ে একে বাড়াতে গেলেই একে কমানো হত। তাই নিজের অলুব্ধ কবিবুদ্ধির প্রশংসাই করলেম।

তার পরে আর-একটা কবিতা :

ভোর হতে নীলাকাশ ঢাকে কালো মেঘে,
ভিজে ভিজে এলোমেলো বায়ু বহে বেগে।
কিছুই নাহি যে হায় এ বুকের কাছে—
যা কিছু আকাশে আর বাতাসেতে আছে।

আবার বললেম, শাবাশ। হৃদয়ের ভিতরকার শূন্যতা বাইরের আকাশ-বাতাস পরিপূর্ণ করে হাহাকার করে উঠছে এ-কথাটা এত সহজে এমন সম্পূর্ণ করে বাংলা সাহিত্যে আর কে বলেছে? ওর উপরে আর একটি কথাও যোগ করবার জো নেই। ক্ষীণদৃষ্টি পাঠক এতটুকু ছোটো কবিতার সৌন্দর্য দেখতে পাবে না জেনেও আমি যে নিজের লেখনীকে সংযত করেছিলেম এজন্যে নিজেকে মনে মনে বলতে হল ধন্য।

তার পরে আর-একটি কবিতা :

আকাশে গহন মেঘে গভীর গর্জন,
শ্রাবণের ধারাপাতে প্লাবিত ভুবন।
কেন এতটুকু নামে সোহাগের ভরে
ডাকিলে আমারে তুমি? পূর্ণ নাম ধরে

আজি ডাকিবার দিন, এ হেন সময়
শরম সোহাগ হাসি কৌতুকের নয়।
আঁধার অম্বর পৃথ্বী পথচিহ্নহীন,
এল চিরজীবনের পরিচয়-দিন।

'মানসী' লেখবার যুগে—সে আজকের কথা নয়—এই ভাবের দুই-একটা কবিতা লিখেছিলেম বলে মনে পড়ে। কিন্তু কোন্ অণিমাসিদ্ধি দ্বারা ভাবটি তনু আকারেই সম্পূর্ণ হয়ে প্রকাশ পেয়েছে।

আর-একটি ছোটো কবিতা :

প্রভু, তুমি দিয়েছ যে-ভার
যদি তাহা মাথা হতে এই জীবনের পথে
নামাইয়া রাখি বার বার
জেনো তা বিদ্রোহ নয়, ক্ষীণ শ্রান্ত এ হৃদয়,
বলহীন পরান আমার।

লেখাটি একেবারেই নিরাভরণ বলেই এর ভিতরকার বেদনা যেন বৃষ্টিক্লান্ত জুঁইফুলটির মতো ফুটে উঠেছে।

আমি বিশেষ তৃপ্তি এবং গর্বের সঙ্গেই এই কবিতা কয়টি এল্যুমিনিয়মের পাতের উপর স্বহস্তে নকল করে নিলেম। যথাসময়ে আমার অন্যান্য কবিতিকার সঙ্গে এ-কয়টিও আমার লেখন নামধারী গ্রন্থে প্রকাশিত হয়ে গেল।

আজ প্রায় মাসখানেক পূর্বে কল্যাণীয়া শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবীর কাছে 'লেখন' এক-খণ্ড পাঠিয়ে দিয়েছিলেম। তিনি যে-পত্র লিখেছেন সেটা উদ্ধৃত করে দিই :

লেখন পড়লাম। এর কতকগুলি ছোটো ছোটো কবিতা বড়ো চমৎকার—দু-চার ছত্রে সম্পূর্ণ। কিন্তু যেন এক-একটি সু-সংস্কৃত মণি, আলো ঠিকরে পড়ছে। লেখনে দেখলাম ২৩এর পৃষ্ঠায় আমার চারটি কবিতা সম্পূর্ণ গেছে, আর একটির প্রথম দু লাইন। যথা

১। তোমারে ভুলিতে মোর হল নাকো মতি
২। ভোর হতে নীলাকাশ ঢাকা ঘন মেঘে
৩। আকাশে গহন মেঘে গভীর গর্জন
৪। প্রভু তুমি দিয়েছ যে ভার
৫। শুধু এইটুকু সুখ অতি সুকুমার (প্রথম দু লাইন।)[১]

[১] এই পাঁচটি কবিতাই রবীন্দ্র-রচনাবলীতে বর্জিত হইয়াছে। পঞ্চম কবিতাটির অবশিষ্ট দুই ছত্র :

স্থির হয়ে সহ্য করো পরিপূর্ণ ক্ষতি,
শেষটুকু দিয়ে যাক নিঠুর নিয়তি।

সবগুলিই 'পত্রলেখা'য় ছাপা হয়ে গিয়েছে, ১৯০৮ সালে। তবে এ নিয়ে আর কাউকে যেন কিছু বলবেন না।

তখন আমার মনে পড়ল যখন 'পত্রলেখা'র পাণ্ডুলিপি প্রথম আমি পড়ে দেখি তখন প্রিয়ম্বদার বিরলভূষণ বাহুল্যবর্জিত কবিতায় আমি যথেষ্ট সাধুবাদ দিয়েছি। বোধ করি, সেই কারণেই কবিতাগুলি যথোচিত সম্মান লাভ করে নি। অন্তত 'পত্রলেখা'র কয়েকটি কবিতা সম্বন্ধে আমার ভ্রান্তিকে নিজের হাতের অক্ষরে আমার আপন রচনার মধ্যে স্থান দিয়ে তাঁর কবিতার প্রতি সমাদর প্রকাশ করতে পেরেছি বলে খুশি হলেম।

এই প্রসঙ্গে এ-কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে যে "এই লেখনগুলি শুরু" "চীনে জাপানে" হয় নাই, চীনে জাপানে যাইবার পূর্বেও কবিকে "স্বাক্ষরলিপির দাবি" মিটাইতে হইয়াছে, এবং লেখনের সব কবিতাই এইরূপ দাবি মিটাইবার জন্য রচিত নহে; ১৮০ পৃষ্ঠার 'একা একা শূন্য মাত্র নাহি অবলম্ব' হইতে ১৮২ পৃষ্ঠা পর্যন্ত অধিকাংশ কবিতা ১৯১২-১৩ সালে বিদেশভ্রমণের সময় জাহাজ, আরোগ্যশালা প্রভৃতি নানাস্থানে রচিত। এই কবিতাগুচ্ছ 'দ্বিপদী' নামে ১৩২০ সালের প্রবাসীতে মুদ্রিত হয়।

লেখন আদ্যোপান্ত কবির হস্তাক্ষরের প্রতিলিপিরূপে মুদ্রিত হইয়াছিল। তাহার নিদর্শনমাত্রস্বরূপ প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্র, ভূমিকা, প্রথম পৃষ্ঠা, ও শেষ পৃষ্ঠার প্রতিলিপি রচনাবলী সংস্করণে মুদ্রিত হইল। লেখনে ইংরেজি কবিতাও মুদ্রিত হইয়াছিল, রচনাবলী-সংস্করণে লেখনের প্রথম পৃষ্ঠায় তাহার নিদর্শন রহিয়াছে।

মুক্তধারা

মুক্তধারা ১৩২৯ সালের বৈশাখে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। ঐ মাসের প্রবাসীতে নাটকটি সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছিল।

শ্রীকালিদাস নাগকে লিখিত একটি চিঠিতে (২১ বৈশাখ, ১৩২৯) রবীন্দ্রনাথ মুক্তধারা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

আমি 'মুক্তধারা' বলে একটি ছোটো নাটক লিখেছি এতদিনে প্রবাসীতে সেটা পড়ে থাকবে। তার ইংরেজি অনুবাদ মডার্ন রিভিউতে বেরিয়েছে। তোমার চিঠিতে তুমি machine সম্বন্ধে যে আলোচনার কথা লিখেছ সেই machine এই নাটকের

একটা অংশ। এই যন্ত্র প্রাণকে আঘাত করছে, অতএব প্রাণ দিয়েই সেই যন্ত্রকে অভিজিৎ ভেঙেছে, যন্ত্র দিয়ে নয়। যন্ত্র দিয়ে যারা মানুষকে আঘাত করে তাদের একটা বিষম শোচনীয়তা আছে—কেননা যে-মনুষ্যত্বকে তারা মারে সেই মনুষ্যত্ব যে তাদের নিজের মধ্যেও আছে—তাদের যন্ত্রই তাদের নিজের ভিতরকার মানুষকে মারছে আমার নাটকের অভিজিৎ হচ্ছে সেই মারনেওয়ালার ভিতরকার পীড়িত মানুষ নিজের যন্ত্রের হাত থেকে নিজে মুক্ত হবার জন্যে সে প্রাণ দিয়েছে। আর ধনঞ্জয় হচ্ছে যন্ত্রের হাতে মারখানেওয়ালার ভিতরকার মানুষ। সে বলছে, "আমি মারের উপরে; মার আমাতে এসে পৌঁছয় না—আমি মারকে না-লাগা দিয়ে জিতব, আমি মারকে না-মার দিয়ে ঠেকাব।" যাকে আঘাত করা হচ্ছে সে সেই আঘাতের দ্বারাই আঘাতের অতীত হয়ে উঠতে পারে, কিন্তু যে-মানুষ আঘাত করছে আত্মার ট্র্যাজেডি তারই—মুক্তির সাধনা তাকেই করতে হবে, যন্ত্রকে প্রাণ দিয়ে ভাঙবার ভার তারই হাতে। পৃথিবীতে যন্ত্রী বলছে "মার লাগিয়ে জয়ী হব।" পৃথিবীতে মন্ত্রী বলছে, "হে মন, মারকে ছাড়িয়ে উঠে জয়ী হও।" আর নিজের যন্ত্রে নিজে বন্দী মানুষটি বলছে, "প্রাণের দ্বারা যন্ত্রের হাত থেকে মুক্তি পেতে হবে মুক্তি দিতে হবে।" যন্ত্রী হচ্ছে বিভূতি, মন্ত্রী হচ্ছে ধনঞ্জয়, আর মানুষ হচ্ছে অভিজিৎ।···

'মুক্তধারা'র পূর্বকল্পিত নাম ছিল 'পথ'; শ্রীমতী রানু অধিকারীকে একটি চিঠিতে (৪ মাঘ ১৩২৮) রবীন্দ্রনাথ লিখিতেছেন—

আমি সমস্ত সপ্তাহ ধরে একটা নাটক লিখছিলুম—শেষ হয়ে গেছে তাই আজ আমার ছুটি। এ নাটকটা 'প্রায়শ্চিত্ত' নয়, এর নাম 'পথ'। এতে কেবল প্রায়শ্চিত্ত নাটকের সেই ধনঞ্জয় বৈরাগী আছে, আর কেউ নেই—সে গল্পের কিছু এতে নেই, সুরমাকে এতে পাবে না।[১]

গল্পগুচ্ছ

রচনাবলীর বর্তমান খণ্ড হইতে গল্পগুচ্ছ, সাময়িক পত্রে প্রকাশকালের অনুক্রম যতদূর জানা যায়, তদনুসারে, মুদ্রণ আরম্ভ হইল।

বর্তমান খণ্ডে প্রকাশিত গল্পগুলি সাময়িক পত্রে প্রকাশের নির্দেশ দেওয়া গেল:

ঘাটের কথা	কার্তিক ১২৯১, ভারতী
রাজপথের কথা	অগ্রহায়ণ ১২৯১, নবজীবন
মুকুট	বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ১২৯২, বালক

---

[১] 'ভানুসিংহের পত্রাবলী', পত্র ৪৩

"ঘাটের কথা" ও "রাজপথের কথা" সর্বপ্রথম 'ছোট গল্প' (১৫ ফাল্গুন ১৩০০) পুস্তকে সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। "মুকুট" 'ছুটির পড়া' পুস্তকে প্রকাশিত হয়। মুকুটের নাট্যরূপ রবীন্দ্র-রচনাবলী অষ্টম খণ্ডে মুদ্রিত হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের ছোটো গল্প বিভিন্ন সময়ে নিম্নলিখিত গ্রন্থসমূহে সংকলিত হয় :

ছোট গল্প। ১৫ ফাল্গুন ১৩০০
বিচিত্র গল্প, প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ। ১৩০১
কথা-চতুষ্টয়। ১৩০১
গল্প-দশক। ১৩০২
গল্পগুচ্ছ ১ম খণ্ড।[1] ১৩০৭
গল্প (গল্পগুচ্ছ) ২য় খণ্ড। ১৩০৭
কর্মফল। ১৩১০
রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী।[2] হিতবাদীর উপহার। ১৩১১
আটটি গল্প[3] [২০ নবেম্বর ১৯১১]
গল্প চারিটি [১৮ মার্চ ১৯১২]
গল্পসপ্তক [১৩২৩]
পয়লা নম্বর। ১৩২৭
তিন সঙ্গী। পৌষ ১৩৪৭

এই সংগ্রহের কোনোটিতেই রবীন্দ্রনাথের সমস্ত ছোটো গল্প সংগৃহীত হয় নাই। বিশ্বভারতী কর্তৃক প্রকাশিত তিন খণ্ডে সমাপ্ত গল্পগুচ্ছেই সর্বাপেক্ষা অধিক গল্প আছে। তৃতীয় খণ্ডের শেষ সংস্করণে 'গল্পসপ্তকে'র পরবর্তী এবং 'তিন সঙ্গী'র পূর্ববর্তী গল্প, যেগুলি স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয় নাই, সেগুলিও সংকলিত হইয়াছে; 'তিন সঙ্গী' প্রকাশিত হইবার পর ইহার নূতন সংস্করণ হয় নাই। 'তিন সঙ্গী' প্রকাশের পরে রবীন্দ্রনাথ যে-সকল গল্প বা গল্পের খসড়া লিখিয়াছিলেন সেগুলি এখনো কোনো গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হয় নাই। রবীন্দ্র-রচনাবলীতে গল্পগুচ্ছ পর্যায়ে এই সব গল্পই ক্রমশ প্রকাশিত হইবে।

---

[1] ১৯০৮-৯ সালে ইণ্ডিয়ান প্রেস ছোট গল্পের সংগ্রহ গল্পগুচ্ছ পাঁচ ভাগে প্রকাশ করেন। ১৯২৬ সালে তিন ভাগে বিশ্বভারতী-সংস্করণ গল্পগুচ্ছ প্রকাশিত হয়।

[2] এই গ্রন্থাবলীর 'সংসার চিত্র', 'সমাজ চিত্র', 'রঙ্গচিত্র' ও 'বিচিত্র চিত্র' বিভাগে ছোট গল্পগুলি প্রকাশিত হইয়াছিল।

[3] বালকপাঠ্য গল্পের সংকলন।

১২৮৪ সালের শ্রাবণ-ভাদ্রের ভারতীতে প্রকাশিত "ভিখারিণী" গল্প সাময়িক পত্রে মুদ্রিত রবীন্দ্রনাথের প্রথম ছোটো গল্প বলিয়া অনুমিত। কোনো পুস্তকে এই গল্পটি রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করেন নাই; এই জন্য রবীন্দ্র-রচনাবলীতে গল্পগুচ্ছের মূল পর্যায় হইতে এটি পরিত্যক্ত হইল। অন্যান্য বর্জিত রচনার সহিত এটি মুদ্রিত হইবে।

উপরে যে-সকল গল্পসংগ্রহের তালিকা দেওয়া হইয়াছে, তাহা ছাড়া, নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলিতে রবীন্দ্রনাথের বিচিত্ররূপের গল্প স্থান পাইয়াছে; এগুলি রচনাবলীতে 'উপন্যাস ও গল্প' বিভাগে প্রকাশিত হইবে, কিন্তু 'গল্পগুচ্ছ' পর্যায়ে নহে।

লিপিকা। ১৯২২
সে। বৈশাখ ১৩৪৪
গল্পসল্প। বৈশাখ ১৩৪৮

স্বরচিত ছোটো গল্প সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন প্রসঙ্গে যে-সকল উল্লেখ ও মন্তব্য করিয়াছেন নিচে তাহা উদ্ধৃত হইল।

১৭ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৯

বর্ষার সমান সুরে   অন্তর বাহির পুরে
সংগীতের মুষলধারায়,
পরানের বহুদূর   কূলে কূলে ভরপুর,
বিদেশী কাব্যে সে কোথা হায়।
তখন সে পুঁথি ফেলি   দুয়ারে আসন মেলি
বসি গিয়ে আপনার মনে,
কিছু করিবার নাই   চেয়ে চেয়ে ভাবি তাই
দীর্ঘদিন কাটিবে কেমনে।
মাথাটি করিয়া নিচু   বসে বসে রচি কিছু
বহুযত্নে সারাদিন ধরে,—
ইচ্ছা করে অবিরত   আপনার মনোমত
গল্প লিখি একেকটি করে।
ছোটো প্রাণ, ছোটো ব্যথা,   ছোটো ছোটো দুঃখকথা
নিতান্তই সহজ সরল,
সহস্র বিস্মৃতিরাশি   প্রত্যহ যেতেছে ভাসি,
তারি দু-চারিটি অশ্রুজল।

নাহি বর্ণনার ছটা, ঘটনার ঘনঘটা,
নাহি তত্ত্ব নাহি উপদেশ।
অন্তরে অতৃপ্তি রবে সাঙ্গ করি মনে হবে
শেষ হয়ে হইল না শেষ।
জগতের শত শত অসমাপ্ত কথা যত,
অকালের বিচ্ছিন্ন মুকুল,
অজ্ঞাত জীবনগুলা, অখ্যাত কীর্তির ধুলা
কত ভাব, কত ভয় ভুল
সংসারের দশদিশি ঝরিতেছে অহর্নিশি
ঝরঝর বরষার মতো—
ক্ষণ-অশ্রু ক্ষণ-হাসি পড়িতেছে রাশি রাশি
শব্দ তার শুনি অবিরত।
সেই সব হেলাফেলা, নিমেষের লীলাখেলা
চারিদিকে করি স্তূপাকার,
তাই দিয়ে করি সৃষ্টি একটি বিস্মৃতি বৃষ্টি
জীবনের শ্রাবণ-নিশার।

—"বর্ষাযাপন", 'সোনার তরী'

সাজাদপুর ৩০ আষাঢ় ১৮৯৩

…আমি বাস্তবিক ভেবে পাই নে কোন্‌টা আমার আসল কাজ। এক-একসময় মনে হয় আমি ছোটো ছোটো গল্প অনেক লিখতে পারি এবং মন্দ লিখতে পারি নে— লেখবার সময় সুখও পাওয়া যায়। মদগর্বিতা যুবতী যেমন তার অনেকগুলি প্রণয়ীকে নিয়ে কোনোটিকেই হাতছাড়া করতে চায় না, আমার কতকটা যেন সেই দশা হয়েছে। 'মিউজ'দের মধ্যে আমি কোনোটিকেই নিরাশ করতে চাইনে—কিন্তু তাতে কাজ অত্যন্ত বেড়ে যায়…

—ছিন্নপত্র

শিলাইদা ২৭ জুন ১৮৯৪

কাল থেকে হঠাৎ আমার মাথায় একটা হ্যাপ থট এসেছে। আমি চিন্তা করে দেখলুম পৃথিবীর উপকার করব ইচ্ছা থাকলেও কৃতকার্য হওয়া যায় না; কিন্তু তার বদলে যেটা করতে পারি সেইটে করে ফেললে অনেক সময় আপনিই পৃথিবীর উপকার হয়, নিদেন যাহোক একটা কাজ সম্পন্ন হয়ে যায়। আজকাল মনে হচ্ছে, যদি আমি

আর কিছুই না করে ছোটো ছোটো গল্প লিখতে বসি তাহলে কতকটা মনের সুখে থাকি এবং কৃতকার্য হতে পারলে হয়তো পাঁচজন পাঠকেরও মনের সুখের কারণ হওয়া যায়। গল্প লেখবার একটা সুখ এই, যাদের কথা লিখব তারা আমার দিনরাত্রির সমস্ত অবসর একেবারে ভরে রেখে দেবে, আমার একলা মনের সঙ্গী হবে, বর্ষার সময় আমার বদ্ধঘরের সংকীর্ণতা দূর করবে এবং রৌদ্রের সময় পদ্মাতীরের উজ্জ্বল দৃশ্যের মধ্যে আমার চোখের পরে বেড়িয়ে বেড়াবে। আজ সকালবেলায় তাই গিরিবালা নাম্নী উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ একটি ছোটো অভিমানী মেয়েকে আমার কল্পনারাজ্যে অবতারণ করা গেছে। সবেমাত্র পাঁচটি লাইন লিখেছি এবং সে পাঁচ লাইনে কেবল এই কথা বলেছি যে, কাল বৃষ্টি হয়ে গেছে, আজ বর্ষণ-অন্তে চঞ্চল মেঘ এবং চঞ্চল রৌদ্রের পরস্পর শিকার চলছে, হেনকালে পূর্বসঞ্চিত বিন্দু বিন্দু বারিশীকরবর্ষী তরুতলে গ্রামপথে উক্ত গিরিবালার আসা উচিত ছিল, তা না হয়ে আমার বোটে আমলাবর্গের সমাগম হল—তাতে করে সম্প্রতি গিরিবালাকে কিছুক্ষণের জন্য অপেক্ষা করতে হল। তা হোক তবু সে মনের মধ্যে আছে।...আমি ভাবলুম এই তো আমি কোনো উপকরণ না নিয়ে কেবল গল্প লিখে—নিজেকে নিজে সুখী করতে পারি।... —ছিন্নপত্র

বোলপুর ২৮ ভাদ্র ১৩১৭

...সাধনা পত্রিকায় অধিকাংশ লেখা আমাকে লিখিতে হইত এবং অন্য লেখকদের রচনাতেও আমার হাত ভূরিপরিমাণে ছিল।

এই সময়েই বিষয়কর্মের ভার আমার প্রতি অর্পিত হওয়াতে সর্বদাই আমাকে জলপথে ও স্থলপথে পল্লীগ্রামে ভ্রমণ করিতে হইত—কতকটা সেই অভিজ্ঞতার উৎসাহে আমাকে ছোটো গল্প রচনায় প্রবৃত্ত করিয়াছিল।

সাধনা বাহির হইবার পূর্বেই হিতবাদী কাগজের জন্ম হয়।...সেই পত্রে প্রতি সপ্তাহেই আমি ছোটো গল্প সমালোচনা ও সাহিত্যপ্রবন্ধ লিখিতাম। আমার ছোটো গল্প লেখার সূত্রপাত ওইখানেই। ছয় সপ্তাহকাল লিখিয়াছিলাম।

সাধনা চারি বৎসর চলিয়াছিল। বন্ধ হওয়ার কিছুদিন পরে এক বৎসর ভারতীর সম্পাদক ছিলাম, এই উপলক্ষ্যেও গল্প ও অন্যান্য প্রবন্ধ কতকগুলি লিখিতে হয়।...

—শ্রীপদ্মিনীমোহন নিয়োগীকে লিখিত পত্র[১]

[চৈত্র ১৩৪৭]

...আমার রচনায় যাঁরা মধ্যবিত্ততার সন্ধান করে পান নি বলে নালিশ করেন

---

[১] দ্রষ্টব্য : রবীন্দ্রনাথ, 'আত্মপরিচয়', পরিশিষ্ট

তাঁদের কাছে আমার একটা কৈফিয়ত দেবার সময় এল।…একসময়ে মাসের পর মাস আমি পল্লীজীবনের গল্প রচনা করে এসেছি। আমার বিশ্বাস এর পূর্বে বাংলা সাহিত্যে পল্লীজীবনের চিত্র এমন ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ হয় নি। তখন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লেখকের অভাব ছিল না। তাঁরা প্রায় সকলেই প্রতাপসিংহ বা প্রতাপাদিত্যের ধ্যানে নিবিষ্ট ছিলেন। আমার আশঙ্কা হয় একসময় গল্পগুচ্ছ বুর্জোয়া লেখকের সংসর্গদোষে অসাহিত্য বলে অস্পৃশ্য হবে। এখনি যখন আমার লেখার শ্রেণীনির্ণয় করা হয় তখন এই লেখাগুলির উল্লেখমাত্র হয় না, যেন ওগুলির অস্তিত্বই নেই। জাতে ঠেলাঠেলি আমাদের রক্তের মধ্যে আছে তাই ভয় হয় এই আগাছাটাকে উপড়ে ফেলা শক্ত হবে।… —শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্তকে লিখিত পত্র[১]

মে ১৯৪১]

…অসংখ্য ছোটো ছোটো লীরিক লিখেছি—বোধ হয় পৃথিবীর অন্য কোনো কবি এত লেখেন নি—কিন্তু আমার অবাক লাগে তোমরা যখন বল যে আমার গল্পগুচ্ছ গীতধর্মী। একসময়ে ঘুরে বেড়িয়েছি বাংলার নদীতে নদীতে, দেখেছি বাংলার পল্লীর বিচিত্র জীবনযাত্রা। একটি মেয়ে নৌকো করে শ্বশুরবাড়ি চলে গেল, তার বন্ধুরা ঘাটে নাইতে-নাইতে বলাবলি করতে লাগল, আহা, যে পাগলাটে মেয়ে, শ্বশুরবাড়ি গিয়ে ওর কি না জানি দশা হবে। কিংবা ধরো একটা খ্যাপাটে ছেলে সারা গ্রাম দুষ্টুমির চোটে মাতিয়ে বেড়ায়, তাকে হঠাৎ একদিন চলে যেতে হল শহরে তার মামার কাছে। এইটুকু চোখে দেখেছি, বাকিটা নিয়েছি কল্পনা করে। একে কি তোমরা গানজাতীয় পদার্থ বলবে? আমি বলব আমার গল্পে বাস্তবের অভাব কখনো ঘটে নি। যা-কিছু লিখেছি নিজে দেখেছি, মর্মে অনুভব করেছি, সে আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। গল্পে যা লিখেছি তার মূলে আছে আমার অভিজ্ঞতা, আমার নিজের দেখা। তাকে গীতধর্মী বললে ভুল করবে। 'কঙ্কাল' কি 'ক্ষুধিত পাষাণ'কে হয়তো খানিকটা বলতে পার, কারণ সেখানে কল্পনার প্রাধান্য, কিন্তু তাও পুরোপুরি নয়। তোমরা আমার ভাষার কথা বল, বল যে গদ্যেও আমি কবি। আমার ভাষা যদি কখনো আমার গল্পাংশকে অতিক্রম করে স্বতন্ত্র মূল্য পায়, সেজন্য আমাকে দোষ দিতে পার না। এর কারণ, বাংলা গদ্য আমার নিজেকেই গড়তে হয়েছে। ভাষা ছিল না, পর্বে পর্বে স্তরে স্তরে তৈরি করতে হয়েছে আমাকে। আমার প্রথম দিককার গদ্যে, যেমন "কাব্যের উপেক্ষিতা", "কেকাধ্বনি", এ-সব প্রবন্ধে, পদ্যের ঝোঁক খুব

---

[১] দ্রষ্টব্য : রবীন্দ্রনাথ, 'সাহিত্যের স্বরূপ', "সাহিত্যবিচার" ; 'কবিতা', আষাঢ় ১৩৪৮

বেশি ছিল, ও-সব যেন অনেকটা গুল্ম-পত্র গোছের। গল্পের ভাষা গড়তে হয়েছে আমার গল্পপ্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে। মোপাসাঁর মতো যে-সব বিদেশী লেখকের কথা তোমরা প্রায়ই বল, তাঁরা তৈরি ভাষা পেয়েছিলেন। লিখতে লিখতে ভাষা গড়তে হলে তাঁদের কী দশা হত জানি নে।

ভেবে দেখলে বুঝতে পারবে আমি যে ছোটো ছোটো গল্পগুলো লিখেছি, বাঙালি সমাজের বাস্তবজীবনের ছবি তাতেই প্রথম ধরা পড়ে। বঙ্কিম যে 'দুর্গেশনন্দিনী', 'কপালকুণ্ডলা' লিখেছিলেন, সে-সব কি সত্যি ছিল? সে-সব romantic situation কি তখন ঘটতে পারত? সত্যি হচ্ছে এই যে, তিনি পড়েছিলেন ইংরেজি রোমান্স, পড়ে ভালো লেগেছিল। তৃপ্তির একটা ক্ষেত্র তো চাই। বঙ্কিম পেয়েছিলেন সে ক্ষেত্র, আমাদের দিয়েছিলেন। আমি তাই বলি, বঙ্কিমের রচনায় আমরা যা পাই তা সামন্ত-তন্ত্র নয়। তাকে নতুন একটা পিপাসা বলতে পার, যা মেটাবার রস তিনি যেখান থেকে হোক সংগ্রহ করেছিলেন। তাঁর বইগুলোতে যে-সব কাণ্ডকারখানা আছে, সেগুলো তাঁর স্মৃতির মধ্যেও ছিল না। আর মজা এই, আমাদের তা ভালোও লেগেছে, কারণ এ স্বাদ আমরা আগে কখনো পাই নি। নিন্দে করতে পারব না বঙ্কিমকে, নিশ্চয়ই বলব তিনি ও-রসের জোগান দিয়েছিলেন বলেই বেঁচে গিয়েছিলুম। কী dull সমাজ ছিল তখন। তারই মধ্যে বিদেশ থেকে আমদানি এ-সব রাজার লড়াই ইত্যাদি আমাদের গরিবের মনে একটা উন্মাদনা এনে দিয়েছিল। বিদেশ থেকে আমদানি ব'লে একে আমি ছোটো করছি না। এতে সন্দেহ নেই যে, ইংরেজ ওদের যে-সাহিত্য আমাদের দেশে আনলে, তা আমাদের চিত্তবৃত্তিতে বিপ্লব ঘটিয়েছে। তবে এও সত্য যে, বাংলাদেশে ক্ষেত্রও প্রস্তুত ছিল,—আমাদের মনটাই সাহিত্যিক। য়ুরোপীয় কালচার ঠিক জায়গা পেয়েছিল আমাদের মধ্যে। সোনার ফসল ফলল ইংরেজ আসার দরুন নয়, আমরা ওদের সাহিত্য পেয়েছিলুম ব'লে। ইংরেজ না হয়ে ফরাসি যদি হত আজ আমরা সব মোপাসাঁ হয়ে উঠতুম। আমরা ব্যাকুল হয়ে ছিলুম, তাই পাওয়ামাত্র আগ্রহভরে নিয়েছি।

বঙ্কিমের গল্প এখন হয়তো তোমাদের কাছে আজগুবি ঠেকে, কিন্তু আমরা তাতে যে নতুন রস পেয়েছিলুম, তা ভুলতে পারি নে। এখন তোমরা বল তোমাদের সমাজেই সব আছে, গল্পের সব উপাদানই পাও তা থেকে। কিন্তু এখনকার সুখ দুঃখ ভালোবাসা কি তখন ছিল না? তখনও ছিল, চোখে পড়ে নি। আবরণ রচনা করেছিল বিদেশী রোমান্স।… —শ্রীবুদ্ধদেব বসুর সহিত আলোচনার অনুলিপি[1]

---

[1] দ্রষ্টব্য : "সাহিত্য, গান, ছবি", প্রবাসী, আষাঢ় ১৩৪৮

[২৪ মে ১৯৪১]

…আমি একদা যখন বাংলাদেশের নদী বেয়ে তার প্রাণের লীলা অনুভব করেছিলুম তখন আমার অন্তরাত্মা আপন আনন্দে সেই সকল সুখদুঃখের বিচিত্র আভাস অন্তঃকরণের মধ্যে সংগ্রহ করে মাসের পর মাস বাংলার যে পল্লীচিত্র রচনা করেছিল তার পূর্বে আর কেউ করে নি। কারণ সৃষ্টিকর্তা তাঁর রচনাশালায় একলা কাজ করেন। সে বিশ্বকর্মারই মতন আপনাকে দিয়ে রচনা করে। সেদিন কবি যে পল্লীচিত্র দেখেছিল নিঃসন্দেহ তাঁর মধ্যে রাষ্ট্রিক ইতিহাসের আঘাতপ্রতিঘাত ছিল। কিন্তু তাঁর সৃষ্টিতে মানবজীবনের সেই সুখদুঃখের ইতিহাস, যা সকল ইতিহাসকে অতিক্রম ক'রে বরাবর চলে এসেছে কৃষিক্ষেত্রে পল্লীপার্বণে আপন প্রাত্যহিক সুখদুঃখ নিয়ে। কখনো বা মোগল রাজত্বে কখনো বা ইংরেজ রাজত্বে তার অতিসরল মানবত্ব প্রকাশ নিত্য চলেছে, সেইটেই প্রতিবিম্বিত হয়েছিল গল্পগুচ্ছে, কোনো সামন্ততন্ত্র নয় কোনো রাষ্ট্রতন্ত্র নয়।… —শ্রীবুদ্ধদেব বসুকে লিখিত পত্র [1]

উত্তরায়ণ, ৯ জুন ১৯৪১

আমার বয়স তখন অল্প ছিল। বাংলাদেশের পল্লীতে ঘাটে ঘাটে ভ্রমণ করে ফিরেছি। সেই আনন্দের পূর্ণতায় গল্পগুলি লেখা। চিরদিন এই গল্পগুলি আমার অত্যন্ত প্রিয় অথচ আমাদের দেশ গল্পগুলিকে যথেষ্ট অভ্যর্থনা করে নেয় নি, এই দুঃখ আমার মনে ছিল। এবার তোমাদের 'পরিচয়ে'[2] এতদিন পরে আমি যথোচিত পুরস্কার পেয়েছি। তার মধ্যে কোনো দ্বিধা নেই, পুরোপুরি সম্ভোগের কথা। এই কৃতজ্ঞতা তোমাকে না জানিয়ে পারলুম না।…—শ্রীহিরণকুমার সান্যালকে লিখিত পত্র

শান্তিনিকেতন

বর্তমান খণ্ডে শান্তিনিকেতন ৪-১০ খণ্ড প্রকাশিত হইল। রচনাবলী পঞ্চদশ খণ্ডে শান্তিনিকেতন ১১-১২ এবং ষোড়শ খণ্ডে ১৩-১৭ প্রকাশিত হইবে ও শান্তিনিকেতন গ্রন্থপর্যায় সমাপ্ত হইবে।

---

১ দ্রষ্টব্য : রবীন্দ্রনাথ, 'সাহিত্যের স্বরূপ', "সাহিত্যে ঐতিহাসিকতা" ; 'কবিতা', আশ্বিন ১৩৪৮

২ দ্রষ্টব্য : পরিচয়, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৮, শ্রীহরপ্রসাদ মিত্র, "গল্পগুচ্ছের রবীন্দ্রনাথ"

বর্ণানুক্রমিক সূচী

অকালে যখন বসন্ত আসে ১৬৯
অখণ্ড পাওয়া ৪০৮
অজানা ফুলের গন্ধের মতো ১৭২
অতল আঁধার নিশা-পারাবার ১৬০
অতিথি ১০৫
অতীত কাল ৯৮
অদেখা ১২২
অনন্তকালের ভালে ১৭১
অনন্তের ইচ্ছা ৪৩৬
অনেকদিনের কথা সে যে ১০১
অন্তর বাহির ৩২৪
অন্তর্হিতা ১০৬
অন্ধ কেবিন আলোয় আঁধার গোলা ৭৭
অন্ধকার ১৪৮
অপরিচিতা ৬২
অবকাশ কর্মে খেলে ১৮২
অবসান ৮৯
অভ্যাস ৩৪৬
অমৃত যে সত্য তার নাহি পরিমাণ ১৮২
অসীম আকাশ শূন্য প্রসারি রাখে ১৬৮
অস্তরবির আলো-শতদল ১৭৫
অহং ৩৭৭
আকন্দ ১২৭
আকর্ষণগুণে প্রেম এক করে তোলে ১৬৮
আকাশ কভু পাতে না ফাঁদ ১৮০
আকাশ ধরারে বাহুতে বেড়িয়া রাখে ১৬১

আকাশভরা তারার মাঝে ৯০
আকাশে উঠিল বাতাস ১৬৩
আকাশে তো আমি রাখি নাই ১৬৬
আকাশে মন কেন তাকায় ১৭১
আকাশের তারায় তারায় ১৬৬
আকাশের নীল ১৬৩
আগমনী ২৮
আগুন আমার ভাই ২২৫
আগে খোঁড়া করে দিয়ে ১৮১
আজিকার দিন না ফুরাতে ১১০
আত্মপ্রত্যয় ৪১৪
আত্মসমর্পণ ৪১০
আত্মার প্রকাশ ৩৮২
আদেশ ৩৮৫
আঁধার সে যেন বিরহিণী বধূ ১৬৩
আঁধার একেরে দেখে একাকার করে ১৮১
আঁধারে প্রচ্ছন্ন ঘন বনে ৮১
আনমনা ৬৪
আনমনা গো আনমনা ৬৪
আপন অসীম নিষ্ফলতার পাকে ১৭০
আপনি আপনা চেয়ে ১৮২
আমাকে যে বাঁধবে ধরে ২১১
আমার প্রাণের গানের পাখির দল ১৬৯
আমার প্রেম রবি-কিরণ হেন ১৬০
আমার বাণীর পতঙ্গ গুহাচর ১৬১
আমার লিখন ফুটে পথধারে ১৫৯
আমারে পাড়ায় পাড়ায় খেপিয়ে বেড়ায় ২১৫
আমারে যে ডাক দেবে ৪৮
আমি জানি মোর ফুলগুলি ১৬৭
আমি পথ দূরে দূরে দেশে দেশে . . . ১৪৪

আমি মায়ের সাগর পাড়ি দেব ২০৬
আরো আরো প্রভু আরো আরো ২০৮
আলো যবে ভালোবেসে মালা দেয় ১৬৪
আলোকের সাথে মেলে ১৭১
আলোকের স্মৃতি ছায়া ১৬৪
আলোহীন বাহিরের ১৭৫
আশঙ্কা ১০৯
আশা ৬৭
আশ্রম ৪৪৯
আশ্বিনের রাত্রিশেষে ঝরে-পড়া ১৯
আসিবে সে আছি সেই আশাতে ১২২
আহ্বান ৪৮
ইটালিয়া ১৫৩
উৎসবের দিন ৩১
উত্তল সাগরের অধীর ক্রন্দন ১৭৮
উদয়াস্ত দুই তটে ১৪৮
ঊষা একা একা আঁধারের দ্বারে ১৭০
একটি পুষ্পকলি ১৬৬
একদিন ফুল দিয়েছিলে হায় ১৬৭
একা এক শূন্যমাত্র নাই অবলম্ব ১৮০
এবারের মতো করো শেষ ৯৬
ঋ ৪০৩
ও তো আর ফিরবে না রে ২০৫
ও যে চেরিফুল তব বন-বিহারিণী ১৭৭
ওই শুন বনে বনে ১৭৪
ওগো অনন্ত কালো ১৬১
ওগো বৈতরণী ১১৬
ওগো মোর না-পাওয়া গো ১৩৭
ওগো হংসের পাঁতি ১৭৬
ওরে আকাশ জুড়ে মোহন সুরে ২১৫

কঙ্কাল ১৩০
কর্ম ২৯০
কর্ম আপন দিনের মজুরি ১৭১
কহিলাম ওগো রানী ১৫৩
কাঁকনজোড়া এনে দিলেম যবে ৯৫
কাছে থাকার আড়ালখানা ১৭৪
কাছের থেকে দেয় না ধরা ১২০
কাজ সে তো মানুষের এই কথা ঠিক ১৮১
কাঁটাতে আমার অপরাধ আছে ১৭৭
কানন কুসুম উপহার দেয় চাঁদে ১৮০
কিশোর প্রেম ১০১
কীটেরে দয়া করিয়ো ফুল ১৬৩
কুন্দকলি ক্ষুদ্র বলি ১৬৮
কুয়াশা যদি বা ফেলে পরাভবে ঘিরি ১৬৬
কৃতজ্ঞ ৯২
ক্ষণিকা ৫৭
ক্ষমা ক'রো যদি গর্বভরে ৯৭
ক্ষুব্ধ চিহ্ন এঁকে দিয়ে ৫৩
খুঁজতে যখন এলাম সেদিন ৮৪
খেলা ৫৯
খেলার খেয়ালবশে কাগজের তরী ১৭৪
খোলো খোলো হে আকাশ ৫৭
গগনে গগনে নব নব দেশে রবি ১৬৫
গানগুলি বেদনার খেলা যে আমার ৯৯
গানের কাঙাল এ বীণার তার ১৬৪
গানের সাজি ৩৩
গানের সাজি এনেছি আজি ৩৩
গিরি যে তুষার ১৭৪
গিরির দুরাশা উড়িবারে ১৭৮
গুণীর লাগিয়া বাঁশি চাহে পথপানে ১৬৭

গোঁয়ার কেবল গায়ের জোরেই … … ১৬৯
গোলাপ বলে, ওগো বাতাস … … ৭০
ঘন অশ্রুবাষ্পে ভরা মেঘের দুর্যোগে … … ৪৩
ঘাটের কথা … … ২৪৫
ঘুমের আঁধার কোটরের তলে … … ১৬০
চঞ্চল … … ১২৪
চপল ভ্রমর হে কালো কাজল আঁখি … … ১১৮
চলিতে চলিতে খেলার পুতুল … … ১৬৩
চাঁদ কহে শোন্ … … ১৭৮
চান ভগবান প্রেম দিয়ে তাঁর … … ১৬২
চাবি … … ১১৫
চাহিয়া প্রভাত রবির নয়নে … … ১৬৬
চিঠি … … ১৩২
চিরনবীনতা … … ৪৯৬
চেয়ে দেখি হোথা তব … … ১৭৭
ছন্দে লেখা একটি চিঠি … … ১৬
ছবি … … ৫৩
ছুটির পর … … ৪৮০
জগতে মুক্তি … … ২৯৬
জন্ম মোদের রাতের আঁধার … … ১৬৯
জন্ম হয়েছিল তোর সকলের কোলে … … ৯৪
জয় ভৈরব জয় শংকর … … ১৮৭, ১৯৪
জানি আমি মোর কাব্য … … ১৩৯
জীবন-খাতার অনেক পাতাই … … ১৭৫
জীর্ণ জয়-তোরণ-ধূলি 'পর … … ১৬৪
জীবন-মরণের স্রোতের ধারা … … ১৪৬
জোনাকি সে ধূলি খুঁজে সারা … … ১৬৫
ঝরে-পড়া ফুল আপনার মনে বলে … … ১৭৬
ঝড় … … ৭৭
ঝড়ের মুখে ভাসল তরী … … ২০৫

তখন তারা দৃপ্ত-বেগের ৪
তপোবন ৪৫৭
তপোভঙ্গ ২১
তরী বোঝাই ৩৭৫
তারা ৯০
তারার দীপ জ্বালেন যিনি ১৬২
তিন বছরের বিরহিণী জানলাখানি ধরে ১৩৬
তিনতলা ৩৩৮
তীর্থ ৩২৭
তৃতীয়া ১২০
তোমায় আমি দেখি নাকো ৭১
তোমার বনে ফুটেছে শ্বেত করবী ১৬১
তোমারে প্রিয়ে হৃদয় দিয়ে ১৭৯
তোর শিকল আমায় বিকল করবে না ২১৯
দখিন হতে আনিলে বায়ু ১৭৬
দর্পণে যাহারে দেখি ১৮২
দশের ইচ্ছা ৪৩১
দাঁড়ায়ে গিরি শির ১৬১
দান ৯৫
দিন দেয় তার সোনার বীণা ১৭২
দিন হয়ে গেল গত ১৬৪
দিনান্তের ললাট লেপি ১৭৭
দিনে দিনে মোর কর্ম ১৭১
দিনের আলোক যবে রাত্রির অতলে ১৭৪
দিনের কর্মে মোর প্রেম যেন ১৭৩
দিনের রৌদ্রে আবৃত বেদনা ১৬৪
দিবসের অপরাধ ১৬৮
দিবসের দীপে শুধু থাকে তেল ১৭৪
দিবসে যাহারে করিয়াছিলাম হেলা ১৭৬
দুই ৩০৬

দুই তীরে তার বিরহ ঘটায়ে … … ১৬২
দুঃখ তব যন্ত্রণায় … … ৯৩
দুঃখ-সম্পদ … … ৯৩
দুঃখের আগুন কোন্ জ্যোতির্ময় … … ১৭০
দুঃখেরে যখন প্রেম করে শিরোমণি … … ১৮২
দুয়ার-বাহিরে যেমনি চাহি রে … … ৩৫
দুর্গম দূর শৈলশিরের … … ১২৬
দূর এসেছিল কাছে … … ১৬১
দূর প্রবাসে সন্ধ্যাবেলায় … … ১৩২
দূর হতে যারে পেয়েছি পাশে … … ১৭৮
দেবতা যে চায় পরিতে গলায় … … ১৭৫
দেবতার সৃষ্টি বিশ্ব … … ১৭০
দেবমন্দির-আঙিনাতলে … … ১৬১
দোসর … … ৮৭
দোসর আমার দোসর ওগো … … ৮৭
দ্রষ্টা … … ৩৩২
ধনীর প্রাসাদ বিকট ক্ষুধিত রাহু … … ১৭৮
ধরণীর যজ্ঞ-অগ্নি … … ১৭০
ধরায় যেদিন প্রথম জাগিল … … ১৬৮
ধরার মাটির তলে বন্দী হয়ে … … ১৭৪
ধীর যুক্তাত্মা … … ৪১৫
ধুলায় মারিলে লাথি … … ১৮১
নটরাজ নৃত্য করে নব নব … … ১৭২
নদী ও কূল … … ৩৮০
নবযুগের উৎসব … … ৩১৩
নমস্তেঽস্তু … … ৪২০
নমো যন্ত্র নমো যন্ত্র … … ১৯১
নব-জনমের পুরা দাম দিব যেই … … ১৬৯
না-পাওয়া … … ১৩৭
নানা রঙের ফুলের মতো … … ১৬৩

নিত্যধাম ৩৩৩
নিভৃত প্রাণের নিবিড় ছায়ায় ১৬৪
নিমেষকালের অতিথি যাহারা ১৭৯
নিমেষকালের খেয়ালের লীলাভরে ১৬৯
নিয়ম ও মুক্তি ৪২৯
নির্বিশেষ ৩০৩
নিষ্ঠা ৩৫৭
নিষ্ঠার কাজ ৩৫৮
নীড়ের শিক্ষা ৩৯৭
নীরব যিনি তাঁহার বাণী ১৭৭
নূতন প্রেম সে ঘুরে ঘুরে মরে ১৭০
পঁচিশে বৈশাখ ৯
পদধ্বনি ৮১
পথ ১৪৪
পথ বাকি আর নাই তো আমার ৬২
পথে হল দেরি ঝরে গেল চেরি ১৬৫
পথের প্রান্তে আমার তীর্থ নয় ১৬৮
পরশরতন ৩৪৪
পরিণয় ৩৩৪
পর্বতমালা আকাশের পানে ১৬৬
পশুর কঙ্কাল ওই ১৩০
পাওয়া ২৮৫
পাওয়া ও না-পাওয়া ৪৩৮
পারের ঘাটা পাঠাল তরী ৮৯
পারের তরীর পালের হাওয়ার ১৭২
পুণ্যলোভীর নাই হল ভিড় ২৬
পুঁথি-কাটা ওই পোকা ১৭১
পুরানো মাঝে যা কিছু ছিল ১৭৩
পূরবী ৩
পূর্ণতা ৪৬

পূর্ণতা ৩৯৫
পূর্ণতার সাধনায় বনস্পতি চাহে ১৪২
পৌরপথের বিরহী তরুর কানে ১৭৭
প্রকাশ ৮৪
প্রজাপতি পায় অবকাশ ১৭১
প্রজাপতি সে তো বরষ না গণে ১৫৯
প্রতিদিন নদীস্রোতে পুষ্পপত্র করি ১৫১
প্রদীপ যখন নিবেছিল ১০৬
প্রবাসের দিন মোর পরিপূর্ণ করি ১০৫
প্রবাহিণী ১২৬
প্রভাত ১০৩
প্রভাত-আলোরে বিদ্রূপ করে ১৮০
প্রভাতী ১১৮
প্রভেদেরে মান যদি ঐক্য পাবে তবে ১৮১
প্রাণ ২৯৪
প্রাণ ও প্রেম ৪২৪
প্রাণগঙ্গা ১৫১
প্রাণেরে মৃত্যুর ছাপ ১৮২
প্রার্থনা ৩৪৮
প্রেমেরে যে করিয়াছে ব্যবসার অঙ্গ ১৮২
ফল ৩৬৭
ফাগুন শিশুর মতো ১৬১
ফুরাইলে দিবসের পালা ১৭০
ফুল দেখিবার যোগ্য চক্ষু যার রহে ১৮১
ফুলগুলি যেন কথা ১৬৮
ফুলে ফুলে যবে ১৬৪
ফুলের লাগি তাকায়ে ছিলি শীত ১৭৯
ফেলে যবে যাও একা থুয়ে ১৭০
ফেলে রাখলেই কি পড়ে রবে ২২৯
বকুল-বনের পাখি ৪০
বদল ১৫২
বনস্পতি ১৪২
বর্তমান যুগ ৪৮৩
বর্ষশেষ ৪৩৪
বর্ষার নবীন মেঘ ১২
বলেছিনু ভুলিব না ৯২
বসন্ত তুমি এসেছ হেথায় ১৬৬

বসন্ত সে কুঁড়ি ফুলের দল ১৬০
বসন্তবায়ু কুসুমকেশর ১৭৬
বহুদিন মনে ছিল আশা ৬৭
বহ্নি যবে বাঁধা থাকে ১৮০
বাজে রে বাজে ডমরু বাজে ২৩৮
বাতাস ৭০
বাসনা, ইচ্ছা, মঙ্গল ৩৪০
বিজয়ী ৪
বিদেশী ফুল ১০৪
বিদেশে অচেনা ফুল ১৭১
বিধাতা যেদিন মোর মন ১১৫
বিপাশা ১১২
বিভাগ ৩২৯
বিমুখতা ৩৬০
বিরহপ্রদীপে জলুক দিবসরাতি ১৬৭
বিরহিণী ১৩৬
বিলম্বে উঠেছ তুমি কৃষ্ণপক্ষ শশী ১৬৩
বিশ্ববোধ ৫০৭
বিশ্বব্যাপী ৩০৯
বিশ্বাস ৩৫৩
বিস্মরণ ৬৫
বীণা-হারা ১৪০
বুদ্বুদ সে তো বদ্ধ আপন ঘেরে ১৬৭
বৃক্ষ সে তো আধুনিক ১৭০
বেঠিক পথের পথিক ৩৯
বেঠিক পথের পথিক আমার ৩৯
বেদনার লীলা ৯৯
বৈতরণী ১১৬
বৈরাগ্য ৩৫০
ব্রহ্মবিহার ৩৮৯
ভক্ত ৪৮৬
ভক্তি ভোরের পাখি ১৭২
ভয় ও আনন্দ ৪২৬
ভয় নিত্য জেগে আছে ৩১
ভাঙা মন্দির ২৬
ভাবীকাল ৯৭
ভাবুকতা ও পবিত্রতা ৩২২

ভাবী কাজের বোঝাই ভরী ১৬০
ভালো করিবারে যার বিষম ব্যস্ততা ১৮১
ভালো যে করিতে পারে ১৮১
ভালোবাসার মূল্য আমায় ১০৯
ভাসিয়ে দিয়ে মেঘের ভেলা ১৬২
ভিক্ষুবেশে দ্বারে তার ১৬৭
ভীরু মোর দান ভরসা না পায় ১৬০
ভুলে যাই থেকে থেকে ২১০
ভূমা ৩৯৯
ভেবেছিনু গনি গনি লব সব তারা ১৭৯
ভোরের ফুল গিয়েছে যারা ১৭৩
মত্ত ৩০১
মধু ১১৯
মনে আছে কার দেওয়া সেই ফুল ৬৫
মন্ত্রের বাঁধন ৪২৬
মন্দ যাহা নিন্দা তার ১৮০
মরণ ৩৬৩
মস্ত যে-সব কাণ্ড করি ৬৭
মহাতরু বহে ১৬৮
মাঘের বুকে সকৌতুকে কে আজি এল ২৮
মাটির ডাক ৫
মাটির প্রদীপ সারা দিবসের ১৬৩
মাটির সুপ্তিবন্ধন হতে ১৬০
মায়াজাল দিয়া কুয়াশা জড়ায় ১৭১
মায়ামৃগী নাই বা তুমি ১১২
মিলন ১৪৬
মিলননিশীথে ধরণী ভাবিছে ১৭৩
মুক্তি ৭৫
মুক্তি ৪৪৪
মুক্তি নানা মূর্তি ধরি ৭৫
মুক্তির পথ ৪৪৬
মৃতের যতই বাড়াই মিথ্যা মূল্য ১৭২
মুকুট ২৫৯
মৃত্যু ও অমৃত ৩৭২
মৃত্যুর আহ্বান ৯৪
মৃত্যুর ধর্মই এক প্রাণধর্ম নানা ১৮১
মৃত্যুর প্রকাশ ৩১১

মেঘ সে বাষ্পগিরি ১৬২
মেঘের দল বিলাপ করে ১৬৭
মোর কাগজের খেলার নৌকা ১৬৯
মোর গানে গানে প্রভু ১৬২
মৌমাছির মতো আমি চাহি না ১১৯
যখন পথিক এলেম কুসুমবনে ১৬৫
যবে এসে নাড়া দিলে দ্বার ১৪০
যবে কাজ করি ১৬৫
যাত্রা ১৯
যাবার যা সে যাবেই তারে ১৭৩
যারা আমার সাঁঝ-সকালের ৩
যে-তারা মহেন্দ্রক্ষণে প্রত্যূষবেলায় ৩৮
যেদিন প্রথম কবি-গান ১২৮
যৌবনবেদনা-রসে উচ্ছল আমার দিনগুলি ২১
রইল বলে রাখলে কারে ২১৬
রঙের খেয়ালে আপনা খোয়ালে ১৬৪
রস যেথা নাই সেথা ১৮২
রাজপথের কথা ২৫৫
রাত্রি হল ভোর ৯
লাজুক ছায়া বনের তলে ১৬৬
লিপি ৫৪
লিলি তোমারে গেঁথেছি হারে ১৭৯
লীলাসঙ্গিনী ৩৫
লেখনী জানে না কোন্ অঙ্গুলি লিখিছে ১৮০
শক্ত ও সহজ ৪১৮
শক্তি ২৯২
শালবনের ঐ আঁচল ব্যেপে ৫
শিখারে কহিল ১৬২
শিশির রবিরে শুধু জানে ১৭০
শিলঙের চিঠি ১৬
শিশির-সিক্ত বনমর্মর ১৭৭
শিশিরের মালাগাঁথা শরতের ১৭৬
শীত ৯৯
শীতের হাওয়া হঠাৎ ছুটে এল ৯৯
শুধু কি তার বেঁধেই তোর ২২৮
শুকতারা মনে করে ১৭২
শেষ ৮৬

শেষ অর্ঘ্য ৩৮
শেষ বসন্ত ১১০
শোনো শোনো ওগো, বকুলবনের পাখি ৪০
সংগীতে যখন সত্য ১৬৭
সংহরণ ৩৫৫
সকল চাঁপাই দেয় মোর প্রাণে ১৭০
সত্যকে দেখা ৩৭০
সত্য তার সীমা ভালোবাসে ১৭২
সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ১২
সন্ধ্যা-আলোর সোনার খেয়া ১২৭
সন্ধ্যাবেলায় এ কোন্ খেলায় ৫৯
সন্ধ্যার দিনের পাত্র ১৭২
সন্ধ্যার প্রদীপ মোর ১৭৫
সমগ্র ২৮৭
সমগ্র এক ৪১১
সমস্ত আকাশভরা আলোর মহিমা ১৮০
সমাজে মুক্তি ২৯৯
সমাপন ৯৬
সমুদ্র ৭৩
সাগরের কানে জোয়ার-বেলায় ১৭৩
সাধন ৩৮৬
সাবিত্রী ৪৩
সুন্দরী ছায়ার পানে ১৬০
সুপ্তির জড়িমাঘোরে ৭৮
সূর্যপানে চেয়ে ভাবে মল্লিকা-মুকুল ১৭৫
সূর্যাস্তের রঙে রাঙা ১৭১
সৃষ্টি ৩৭১
সৃষ্টিকর্তা ১৩৯
সেই ভালো, প্রতি যুগ আনে না ৯৮
সোনার মুকুট ভাসাইয়া দাও ১৭৫
স্খলিত পালক ধুলায় জীর্ণ ১৬৫
স্তব্ধ অতল শব্দবিহীন ১৬৯
স্তব্ধ রাতে একদিন ৪৬
স্তব্ধ হয়ে কেন্দ্র আছে ১৭৪
স্ফুলিঙ্গ তার পাখায় পেল ১৬০
স্বপ্ন ৭১
স্বপ্ন আমার জোনাকি ১২৯

স্বপ্নসম পরবাসে এলি পাশে ১৩৪
স্বভাবকে লাভ ৩৭৫
স্বভাবলাভ ৪০৬
স্বর্ণসুধা-ঢালা এই প্রভাতের বুকে ১০৩
স্বপ্ন সেও স্বপ্ন নয় ১৬৭
স্বাভাবিকী ক্রিয়া ৩৪২
হওয়া ৪৪২
হতভাগা মেঘ পায় প্রভাতের সোনা ১৭৯
হয় কাজ আছে তব ১৮১
হায় রে তোরে রাখব ধরে ১২৪
হাসির কুসুম আনিল সে ডালি ভরি ১৫২
হিতৈষীর স্বার্থহীন অত্যাচার যত ১৬৮
হে অচেনা তব আঁখিতে আমার ১৭৬
হে অশেষ, তব হাতে শেষ ৮৬
হে আমার ফুল ভোগী মূর্খের মালে ১৬৩
হে ধরণী কেন প্রতিদিন ৫৪
হে প্রেম যখন ক্ষমা কর তুমি ১৬৯
হে বন্ধু জেনো মোর ভালোবাসা ১৬৭
হে বিদেশী ফুল ১০৪
হে মহাসাগর বিপদের লোভ দিয়া ১৬৫
হে সমুদ্র স্তব্ধচিত্তে শুনেছিনু ৭৩

রবীন্দ্র রচনাবলী

পঞ্চদশ খণ্ড

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্র-রচনাবলী

পঞ্চদশ খণ্ড

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী
৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা

প্রকাশ চৈত্র ১৩৪৯
সংস্করণ চৈত্র ১৩৫০
পুনর্মুদ্রণ আশ্বিন ১৩৬০
ফাল্গুন ১৩৭০ : ১৮৮৫ শক

মূল্য : কাগজের-মলাট দশ টাকা
রেক্সিন-বাঁধাই তেরো টাকা

© বিশ্বভারতী ১৯৬৪

প্রকাশক শ্রীকানাই সামন্ত
বিশ্বভারতী। ৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭

মুদ্রক শ্রীসূর্যনারায়ণ ভট্টাচার্য
তাপসী প্রেস। ৩০ বিধান সরণী। কলিকাতা ৬

সূচী

চিত্রসূচী ।৶০

কবিতা ও গান

মহুয়া ১
বনবাণী ১১১
পরিশেষ ১৫৫
সংযোজন ২৮৭

নাটক ও প্রহসন

বসন্ত ৩১৭
রক্তকরবী ৩৪১

উপন্যাস ও গল্প

গল্পগুচ্ছ ৪০৩

প্রবন্ধ

শান্তিনিকেতন ১১-১২ ৪৪১
গ্রন্থপরিচয় ৫১৭
বর্ণানুক্রমিক সূচী ৫৫৩

চিত্রসূচী

রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক অঙ্কিত মহুয়ার নামপত্র ১

শুধায়ো না কবে কোন্ গান

কবির হস্তাক্ষরে মুদ্রিত মহুয়ার উৎসর্গপত্র ৩

তেহেরান, ২৫ বৈশাখ ১৩৩৯

পারস্যে জন্মদিনে ৭

শান্তিনিকেতন-শালবীথিকায় রবীন্দ্রনাথ ১৩০

কবিতা ও গান

শুধায়োনা, কবে কোন্ গান
কাহারে করিয়াছিনু দান।
পথের ধুলার পরে
পড়ে আছে তারি তরে
যে তাহারে দিতে পারে মান।

তুমি কি শুনেছ মোর বাণী,
হৃদয়ে নিয়েছ তারে টানি'?
জানিনা তোমার নাম,
তোমারেই সঁপিলাম
আমার ধ্যানের ধনখানি॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

উজ্জীবন

ভস্ম-অপমানশয্যা ছাড়ো পুষ্পধনু,
রুদ্রবহ্নি হতে লহ জ্বলদর্চি তনু।
যাহা মরণীয় যাক মরে,
জাগো অবিস্মরণীয় ধ্যানমূর্তি ধরে।
যাহা রূঢ়, যাহা মূঢ় তব,
যাহা স্থূল, দগ্ধ হোক, হও নিত্য নব
মৃত্যু হতে জাগো পুষ্পধনু,
হে অতনু, বীরের তনুতে লহো তনু

মৃত্যুঞ্জয় তব শিরে মৃত্যু দিলা হানি ;
অমৃত সে-মৃত্যু হতে দাও তুমি আনি।
সেই দিব্য দীপ্যমান দাহ
উন্মুক্ত করুক অগ্নি-উৎসের প্রবাহ।
মিলনেরে করুক প্রখর,
বিচ্ছেদেরে করে দিক দুঃসহ সুন্দর।
মৃত্যু হতে জাগো পুষ্পধনু,
হে অতনু, বীরের তনুতে লহো তনু।

দুঃখে সুখে বেদনায় বন্ধুর যে-পথ
সে দুর্গমে চলুক প্রেমের জয়রথ।
তিমিরতোরণে রজনীর
মন্দ্রিবে সে রথচক্রনির্ঘোষ গম্ভীর।
উল্লঙ্ঘিয়া তুচ্ছ লজ্জা ত্রাস
উচ্ছলিবে আত্মহারা উদ্‌বেল উল্লাস।
মৃত্যু হতে ওঠো পুষ্পধনু,
হে অতনু, বীরের তনুতে লহো তনু।

[ভাদ্র ?] ১৩৩৬
[শান্তিনিকেতন]

পারস্যে জন্মদিনে

তেহেরান। ২৫ বৈশাখ ১৩৩৯

পৃ ২০১

মহুয়া

বোধন

মাঘের সূর্য উত্তরায়ণে
পার হয়ে এল চলি,
তার পানে হায় শেষ চাওয়া চায়
করুণ কুন্দকলি।
উত্তর বায় একতারা তার
তীব্র নিখাদে দিল ঝংকার,
শিথিল যা ছিল তারে ঝরাইল—
গেল তারে দলি দলি।

শীতের রথের ঘূর্ণিধূলিতে
গোধূলিরে করে ম্লান’।
তাহারি আড়ালে নবীন কালের
কে আসিছে সে কি জান’।
বনে বনে তাই আশ্বাসবাণী
করে কানাকানি ‘কে আসে কী জানি’,
বলে মর্মরে ‘অতিথির তরে
অর্ঘ্য সাজায়ে আনো’।

নির্মম শীত তারি আয়োজনে
এসেছিল বনপারে।
মার্জিয়া দিল শ্রান্তি ক্লান্তি,
মার্জনা নাহি কারে।

ম্লান চেতনার আবর্জনায়
পান্থের পথে বিঘ্ন ঘনায়,
নবযৌবনদূতরূপী শীত
দূর করি দিল তারে।

ভরা পাত্রটি শূন্য করে সে
ভরিতে নূতন করি।
অপব্যয়ের ভয় নাহি তার
পূর্ণের দান স্মরি।
অলস ভোগের গ্লানি সে ঘুচায়,
মৃত্যুর স্নানে কালিমা মুছায়,
চিরপুরাতনে করে উজ্জ্বল
নূতন চেতনা ভরি।

নিত্যকালের মায়াবী আসিছে
নব পরিচয় দিতে।
নবীন রূপের অপরূপ জাদু
আনিবে সে ধরণীতে।
লক্ষ্মীর দান নিমেষে উজাড়ি
নির্ভয় মনে দূরে দেয় পাড়ি,
নব বর সেজে চাহে লক্ষ্মীরে
ফিরে জয় করে নিতে।

বাঁধন ছেঁড়ার সাধন তাহার,
সৃষ্টি তাহার খেলা।
দস্যুর মতো ভেঙেচুরে দেয়
চিরাভ্যাসের মেলা।
মূল্যহীনেরে সোনা করিবার
পরশপাথর হাতে আছে তার,

তাই তো প্রাচীন সঞ্চিত ধনে
উদ্ধত অবহেলা।

বলো 'জয় জয়', বলো 'নাহি ভয়' ;—
কালের প্রয়াণপথে
আসে নির্দয় নবযৌবন
ভাঙনের মহারথে।
চিরন্তনের চঞ্চলতায়
কাঁপন লাগুক লতায় লতায়,
থরথর করি উঠুক পরান
প্রান্তরে পর্বতে।

বার্তা ব্যাপিল পাতায় পাতায়,—
'করো ত্বরা, করো ত্বরা।
সাজাক পলাশ আরতিপাত্র
রক্তপ্রদীপে ভরা।
দাড়িম্ববন প্রচুর পরাগে
হোক প্রগল্‌ভ রক্তিমরাগে,
মাধবিকা হোক সুরভিসোহাগে
মধুপের মনোহরা।'

কে বাঁধে শিথিল বীণার তন্ত্র
কঠোর যতন ভরে,—
ঝংকারি উঠে অপরিচিতার
জয়সংগীতস্বরে।
নগ্ন শিমুলে কার ভাণ্ডার
রক্ত দুকূল দিল উপহার,
দ্বিধা না রহিল বকুলের আর
রিক্ত হবার তরে।

দেখিতে দেখিতে কী হতে কী হল
শূন্য কে দিল ভরি।
প্রাণবন্যায় উঠিল ফেনায়ে
মাধুরীর মঞ্জরি।
ফাগুনের আলো সোনার কাঠিতে
কী মায়া লাগালো, তাই তো মাটিতে
নবজীবনের বিপুল ব্যথায়
জাগে শ্যামাসুন্দরী।

দোলপূর্ণিমা [২২ ফাল্গুন] ১৩৩৪
[শান্তিনিকেতন]

বসন্ত

ওগো বসন্ত, হে ভুবনজয়ী,
বাজে বাণী তব 'মাভৈঃ মাভৈঃ',
বন্দীরা পেল ছাড়া।
দিগন্ত হতে শুনি' তব সুর
মাটি ভেদ করি উঠে অঙ্কুর,
কারাগারে দিল নাড়া।
জীবনের রণে নব অভিযানে
ছুটিতে হবে-যে নবীনেরা জানে,
দলে দলে আসে আমের মুকুল
বনে বনে দেয় সাড়া।

কিশলয়দল হল চঞ্চল,
উতল প্রাণের কলকোলাহল
শাখায় শাখায় উঠে

মুক্তির গানে কাঁপে চারিধার,
কানা দানবের মানা-দেওয়া দ্বার
আজ গেল সব টুটে।
মরুযাত্রার পাথেয়-অমৃতে
পাত্র ভরিয়া আসে চারিভিতে
অগণিত ফুল, গুঞ্জনগীতে
জাগে মৌমাছিপাড়া।

ওগো বসন্ত, হে ভুবনজয়ী,
দুর্গ কোথায়, অস্ত্র বা কই,
কেন সুকুমার বেশ।
মৃত্যুদমন শৌর্য আপন
কী মায়ামন্ত্রে করিলে গোপন,
তূণ তব নিঃশেষ।
বর্ম তোমার পল্লবদলে,
আগ্নেয়বাণ বনশাখাতলে
জ্বলিছে শ্যামল শীতল অনলে
সকল তেজের বাড়া।

জড়দৈত্যের সাথে অনিবার
চিরসংগ্রামঘোষণা তোমার
লিখিছ ধূলির পটে—
মনোহর রঙে লিপি ভূমিতলে
যুদ্ধের বাণী বিস্তারি চলে
সিন্ধুর তটে তটে।
হে অজেয়, তব রণভূমি-’পরে
সুন্দর তার উৎসব করে,
দক্ষিণবায়ু মর্মর স্বরে
বাজায় কাড়া-নাকাড়া।

দোলপূর্ণিমা [২২ ফাল্গুন] ১৩৩৪
[শান্তিনিকেতন]

বরযাত্রা

পবন দিগন্তের দুয়ার নাড়ে
চকিত অরণ্যের সুপ্তি কাড়ে।
যেন কোন্ দুর্দম
বিপুল বিহঙ্গম
গগনে মুহুর্মুহু পক্ষ ঝাড়ে।

পথপাশে মল্লিকা দাঁড়ালো আসি,
বাতাসে সুগন্ধের বাজালো বাঁশি।
ধরার স্বয়ম্বরে
উদার আড়ম্বরে
আসে বর অম্বরে ছড়ায়ে হাসি।

অশোক রোমাঞ্চিত মঞ্জরিয়া
দিল তার সঞ্চয় অঞ্জলিয়া।
মধুকরগুঞ্জিত
কিশলয়পুঞ্জিত
উঠিল বনাঞ্চল চঞ্চলিয়া।

কিংশুককুঙ্কুমে বসিল সেজে,
ধরণীর কিঙ্কিণী উঠিল বেজে।
ইঙ্গিতে সংগীতে
নৃত্যের ভঙ্গীতে
নিখিল তরঙ্গিত উৎসবে যে।

দোলপূর্ণিমা [২২ ফাল্গুন] ১৩৩৪
[শান্তিনিকেতন]

মাধবী

বসন্তের জয়রবে
দিগন্ত কাঁপিল যবে
মাধবী করিল তার সজ্জা।
মুকুলের বন্ধ টুটে
বাহিরে আসিল ছুটে,
ছুটিল সকল তার লজ্জা।
অজানা পান্থের লাগি
নিশি নিশি ছিল জাগি
দিনে দিনে ভরেছিল অর্ঘ্য
কাননের একভিতে
নিভৃত পরানটিতে
রেখেছিল মাধুরীর স্বর্গ।
ফাল্গুন পবনরথে
যখন বনের পথে
জাগাল মর্মর-কলছন্দ,
মাধবী সহসা তার
সঁপি দিল উপহার,
রূপ তার, মধু তার, গন্ধ।

দোলপূর্ণিমা ১৩৩৪
[শান্তিনিকেতন]

বিজয়ী

বিবশ দিন, বিরস কাজ,
কে কোথা ছিনু দোঁহে,
সহসা প্রেম আসিলে আজ
কী মহা সমারোহে।
নীরবে রয় অলস মন,
আঁধারময় ভবনকোণ,

ভাঙিলে দ্বার কোন্ সে ক্ষণ
অপরাজিত ওহে।
সহসা প্রেম আসিলে আজ
বিপুল বিদ্রোহে।

কানন-'পর ছায়া বুলায়,
ঘনায় ঘনঘটা।
গঙ্গা যেন হেসে দুলায়
ধূর্জটির জটা।
যে যেথা রয় ছাড়িল পথ,
ছুটালে ঐ বিজয়রথ,
আঁখি তোমার তড়িৎবৎ
ঘন ঘুমের মোহে।
সহসা প্রেম আসিলে আজ
বেদনাদান বহে।

বৈশাখ ১৩৩৩ ?

প্রত্যাশা

প্রাঙ্গণে মোর শিরীষশাখায় ফাগুন মাসে
কী উচ্ছ্বাসে
ক্লান্তিবিহীন ফুল-ফোটানোর খেলা।
ক্ষান্তকূজন শান্ত বিজন সন্ধ্যাবেলা
প্রত্যহ সেই ফুল্ল শিরীষ প্রশ্ন শুধায় আমায় দেখি,
'এসেছে কি।'

আর বছরেই এমনি দিনেই ফাগুন মাসে
কী উল্লাসে
নাচের মাতন লাগল শিরীষ ডালে,
স্বর্গপুরের কোন্ নূপুরের তালে!

প্রত্যহ সেই চঞ্চল প্রাণ শুধিয়েছিল, ‘শুনাও দেখি,
আসে নি কি।’

আবার কখন্ এমনি দিনেই ফাগুন মাসে
কী বিশ্বাসে
ডালগুলি তার রইবে শ্রবণ পেতে
অলখ জনের চরণশব্দে মেতে।
প্রত্যহ তার মর্মরস্বর বলবে আমায় দীর্ঘশ্বাসে,
‘সে কি আসে।’

প্রশ্ন জানাই পুষ্পবিভোর ফাগুন মাসে
কী আশ্বাসে,
হায় গো আমার ভাগ্যরাতের তারা,
নিমেষগণন হয় না কি মোর সারা।
প্রত্যহ বয় প্রাঙ্গণময় বনের বাতাস এলোমেলো,
‘সে কি এল।’

২৩ শ্রাবণ ১৩৩৫
চৌরঙ্গি [কলিকাতা]

অর্ঘ্য

সূর্যমুখীর বর্ণে বসন
লই রাঙায়ে
অরুণ আলোর ঝংকার মোর
লাগল গায়ে।
অঞ্চলে মোর কদমফুলের ভাষা
বক্ষে জড়ায় আসন্ন কোন্ আশা,
কৃষ্ণকলির হেমাঙ্গলির
চঞ্চলতা
কঞ্চুলিকার স্বর্ণলিখায়
মিলায় কথা।

আজ যেন পায় নয়ন আপন
নতুন জাগা।
আজ আসে দিন প্রথম দেখার
দোলন-লাগা।
এই ভুবনের একটি অসীম কোণ,
যুগলপ্রাণের গোপন পদ্মাসন,
সেথায় আমায় ডাক দিয়ে যায়
নাই জানা কে,
সাগরপারের পান্থপাখির
ডানার ডাকে।

চলব ডালায় আলোকমালায়
প্রদীপ জেলে,
ঝিল্লিঝনন অশোকতলায়
চমক মেলে।
আমার প্রকাশ নতুন বচন ধ'রে
আপনাকে আজ নতুন রচন ক'রে,
ফাগুনবনের গুপ্ত ধনের
আভাস-ভরা,
রক্তদীপন প্রাণের আভায়
রঙিন-করা।

চক্ষে আমার জ্বলবে আদিম
অগ্নিশিখা,
প্রথম ধরায় সেই যে পরায়
আলোর টিকা।
নীরব হাসির সোনার বাঁশির ধ্বনি
করবে ঘোষণ প্রেমের উদ্বোধনী,

প্রাণদেবতার মন্দিরদ্বার
যাক রে খুলে,
অঙ্গ আমার অর্ঘ্যের থাল
অরূপ ফুলে।

২৩ শ্রাবণ ১৩৩৫
[কলিকাতা]

দ্বৈত

আমি যেন গোধূলিগগন
ধেয়ানে মগন,
স্তব্ধ হয়ে ধরা-পানে চাই ;
কোথা কিছু নাই,
শুধু শূন্য বিরাট প্রান্তরভূমি।
তারি প্রান্তে নিরালা পিয়ালতরু তুমি
বক্ষে মোর বাহু প্রসারিয়া।
স্তব্ধ হিয়া
শ্যামল স্পর্শনে আত্মহারা,
বিস্মরিল আপনার সূর্যচন্দ্রতারা।

তোমার মঞ্জরি
কভু ফোটে, কভু পড়ে ঝরি ;
তোমার পল্লবদল
কভু স্তব্ধ, কভু বা চঞ্চল।
একেলার খেলা তব
আমার একেলা বক্ষে নিত্যনব।
কিশলয়গুলি
কম্পমান করুণ অঙ্গুলি

চায় সন্ধ্যারক্তরাগ,
আলোর সোহাগ ;
চায় নক্ষত্রের কথা,—
চায় বুঝি মোর নিঃসীমতা।

২৩ শ্রাবণ ১৩৩৫
[কলিকাতা]

সন্ধান

আমার নয়ন তব নয়নের নিবিড় ছায়ায়
মনের কথার কুসুমকোরক খোঁজে।
সেথায় কখন্ অগম গোপন গহন মায়ায়
পথ হারাইল ও-যে।
আতুর দিঠিতে শুধায় সে নীরবেরে,—
নিভৃত বাণীর সন্ধান নাই যে রে ;
অজানার মাঝে অবুঝের মতো ফেরে
অশ্রুধারায় ম'জে।

আমার হৃদয়ে যে-কথা লুকানো, তার আভাষণ
ফেলে কভু ছায়া তোমার হৃদয়তলে ?
দুয়ারে এঁকেছি রক্ত রেখায় পদ্ম-আসন,
সে তোমারে কিছু বলে ?
তব কুঞ্জের পথ দিয়ে যেতে যেতে
বাতাসে বাতাসে ব্যথা দিই মোর পেতে,
বাঁশি কী আশায় ভাষা দেয় আকাশেতে
সে কি কেহ নাহি বোঝে।

শ্রাবণ ১৩৩৫ ?

উপহার

মণিমালা হাতে নিয়ে
দ্বারে গিয়ে
এসেছিনু ফিরে
নতশিরে।
ক্ষণতরে বুঝি
বাহিরে ফিরেছি খুঁজি
হায় রে বৃথাই
বাহিরে যা নাই।
ভীরু মন চেয়েছিল ভুলায়ে জিনিতে,
হীরা দিয়ে হৃদয় কিনিতে।

এই পণ মোর,
সমস্ত জীবন-ভোর
দিনে দিনে দিব তার হাতে তুলি
স্বর্গের দাক্ষিণ্য হতে আসিবে যে শ্রেষ্ঠ ক্ষণগুলি ;
কণ্ঠহারে
গেঁথে দিব তা'রে
যে দুর্লভ রাত্রি মম
বিকশিবে ইন্দ্রাণীর পারিজাতসম
পায়ে দিব তার
যে এক-মুহূর্ত আনে প্রাণের অনন্ত উপহার।

২৩ শ্রাবণ ১৩৩৫
[কলিকাতা]

শুভযোগ

যে-সন্ধ্যায় প্রসন্ন লগনে
পূর্ণচন্দ্রে হেরিল গগনে
উৎসুক ধরণী,

সর্বাঙ্গ বেষ্টিয়া তার তরঙ্গের ধন্য ধন্য ধ্বনি
মন্দ্রিয়া উঠিল কূলে কূলে ;
নদীর গদ্‌গদ বাণী অশ্রুবেগে উঠে ফুলে' ফুলে'
কোটালের বানে,
কী চেয়েছে কী বলেছে আপনি না জানে ;
সে-সন্ধ্যায় প্রসন্ন লগনে
তোমারে প্রথম দেখা দেখেছি জীবনে।

যে-বসন্তে উৎকণ্ঠিত দিনে
সাড়া এল চঞ্চল দক্ষিণে ;
পলাশের কুঁড়ি
একরাত্রে বর্ণবহ্নি জ্বালিল সমস্ত বন জুড়ি ;
শিমুল পাগল হয়ে মাতে,
অজস্র ঐশ্বর্যভার ভরে তার দরিদ্র শাখাতে,
পাত্র করি পুরা
আকাশে আকাশে ঢালে রক্তফেন সুরা।
উচ্ছ্বসিত সে-এক নিমেষে
যা-কিছু বলার ছিল বলেছি নিঃশেষে।

২৪ শ্রাবণ ১৩৩৫
চৌরঙ্গি [কলিকাতা]

মায়া

চিত্তকোণে ছন্দে তব
বাণীরূপে
সংগোপনে আসন লব
চুপে চুপে।

সেইখানেতেই আমার অভিসার,
যেথায় অন্ধকার
ঘনিয়ে আছে চেতন-বনের
ছায়াতলে,
যেথায় শুধু ক্ষীণ জোনাকির
আলো জ্বলে।

সেথায় নিয়ে যাব আমার
দীপশিখা,
গাঁথব আলো-আঁধার দিয়ে
মরীচিকা।
মাথা থেকে খোঁপার মালা খুলে
পরিয়ে দেব চুলে,—
গন্ধ দিবে সিন্ধুপারের
কুঞ্জবীথির,
আনবে ছবি কোন্ বিদেশের
কী বিস্মৃতির।

পরশ মম লাগবে তোমার
কেশে বেশে,
অঙ্গে তোমার রূপ নিয়ে গান
উঠবে ভেসে।
ভৈরবীতে উচ্ছল গান্ধার,
বসন্তবাহার,
পুরবী কি ভীমপলাশি
রক্তে দোলে—
রাগরাগিণী দুঃখে সুখে
যায়-যে গলে।

হাওয়ায় ছায়ায় আলোয় গানে
আমরা দোঁহে
আপন মনে রচব ভুবন
ভাবের মোহে।
রূপের রেখায় মিলবে রসের রেখা,
মায়ার চিত্রলেখা,—
বস্তু হতে সেই মায়া তো
সত্যতর,
তুমি আমায় আপনি র'চে
আপন কর।

২৪ শ্রাবণ ১৩৩৪
[কলিকাতা]

নির্ঝরিণী

ঝর্না, তোমার স্ফটিকজলের
স্বচ্ছ ধারা,
তাহারি মাঝারে দেখে আপনারে
সূর্যতারা।
তারি একধারে আমার ছায়ারে
আনি মাঝে মাঝে, দুলায়ো তাহারে,
তারি সাথে তুমি হাসিয়া মিলায়ো
কলধ্বনি,—
দিয়ো তা'রে বাণী যে-বাণী তোমার
চিরন্তনী।

আমার ছায়াতে তোমার হাসিতে
মিলিত ছবি,
তাই নিয়ে আজি পরানে আমার
মেতেছে কবি।

পদে পদে তব আলোর ঝলকে
ভাষা আনে প্রাণে পলকে পলকে,
মোর বাণীরূপ দেখিলাম আজি
নির্ঝরিণী।
তোমার প্রবাহে মনেরে জাগায়,
নিজেরে চিনি।

আষাঢ় ১৩৩৫
[বাঙ্গালোর]

শুকতারা

সুন্দরী তুমি শুকতারা
সুদূর শৈলশিখরান্তে,
শর্বরী যবে হবে সারা
দর্শন দিয়ো দিক্‌ভ্রান্তে।

ধরা যেথা অম্বরে মেশে
আমি আধো-জাগ্রত চন্দ্র,
আঁধারের বক্ষের 'পরে
আধেক আলোকরেখারন্ধ্র।

আমার আসন রাখে পেতে
নিদ্রাগহন মহাশূন্য,
তন্ত্রী বাজাই স্বপনেতে
তন্দ্রা ঈষৎ করি ক্ষুণ্ণ।

মন্দ চরণে চলি পারে,
যাত্রা হয়েছে মোর সাঙ্গ।
সুর থেমে আসে বারে বারে,
ক্লান্তিতে আমি অবশাঙ্গ।

সুন্দরী ওগো শুকতারা,
রাত্রি না যেতে এসো তূর্ণ।
স্বপ্নে যে-বাণী হল হারা
জাগরণে করো তারে পূর্ণ।

নিশীথের তল হতে তুলি
লহো তারে প্রভাতের জন্য।
আঁধারে নিজেরে ছিল ভুলি,
আলোকে তাহারে করো ধন্য।

যেখানে সুপ্তি হল লীনা,
যেথা বিশ্বের মহামন্ত্র,
অর্পিনু সেথা মোর বীণা
আমি আধো-জাগ্রত চন্দ্র।

২৩ জুন ১৯২৮
Ballabrooie
বাঙ্গালোর

প্রকাশ

আচ্ছাদন হতে
ডেকে লহো মোরে তব চক্ষুর আলোতে।
অজ্ঞাত ছিলাম এতদিন
পরিচয়হীন,—
সেই অগোচরদুঃখভার
বহিয়া চলেছি পথে; শুধু আমি অংশ জনতার।
উদ্ধার করিয়া আনো,
আমারে সম্পূর্ণ করি জানো।
যেথা আমি একা
সেথায় নামুক তব দেখা।

সে-মহানির্জন
যে-গহনে অন্তর্যামী পাতেন আসন,
সেইখানে আনো আলো,
দেখো মোর সব মন্দ ভালো,
যাক লজ্জা ভয়,
আমার সমস্ত হ'ক তব দৃষ্টিময়।

ছায়া আমি সবা-কাছে, অস্ফুট আমি-যে,
তাই আমি নিজে
তাহাদের মাঝে
নিজেরে খুঁজিয়া পাই না-যে।
তারা মোর নাম জানে, নাহি জানে মান,
তারা মোর কর্ম জানে, নাহি জানে মর্মগত প্রাণ
সত্য যদি হই তোমা-কাছে
তবে মোর মূল্য বাঁচে,—
তোমার মাঝারে
বিধির স্বতন্ত্র সৃষ্টি জানিব আমারে।
প্রেম তব ঘোষিবে তখন
অসংখ্য যুগের আমি একান্ত সাধন।
তুমি মোরে করো আবিষ্কার,
পূর্ণ ফল দেহো মোরে আমার আজন্ম প্রতীক্ষার
বহিতেছি অজ্ঞাতির বন্ধন সদাই,
মুক্তি চাই
তোমার জানার মাঝে
সত্য তব যেথায় বিরাজে।

২৪ শ্রাবণ ১৩৩৫
[কলিকাতা]

বরণডালা

আজি এ নিরালা কুঞ্জে, আমার
অঙ্গ-মাঝে
বরণের ডালা সেজেছে আলোক-
মালার সাজে।
নব বসন্তে লতায় লতায়
পাতায় ফুলে
বাণীহিল্লোল উঠে প্রভাতের
স্বর্ণকূলে,
আমার দেহের বাণীতে সে-দোল
উঠিছে দুলে,—
এ বরণ-গান নাহি পেলে মান
মরিব লাজে,
ওহে প্রিয়তম, দেহে মনে মম
ছন্দ বাজে।

অর্ঘ্য তোমার আনি নি ভরিয়া
বাহির হতে,
ভেসে আসে পূজা পূর্ণ প্রাণের
আপন স্রোতে।
মোর তনুময় উছলে হৃদয়
বাঁধনহারা,
অধীরতা তারি মিলনে তোমারি
হ'ক না সারা।
ঘন যামিনীর আঁধারে যেমন
ঝলিছে তারা,

দেহ ঘেরি মম প্রাণের চমক
তেমনি রাজে।
সচকিত আলো নেচে ওঠে মোর
সকল কাজে।

২৫ শ্রাবণ ১৩৩৫

মুক্তি

ভোরের পাখি নবীন আঁখি দুটি
পুরানো মোর স্বপনডোর
ছিঁড়িল কুটিকুটি।
রুদ্ধ মন গগনে গেল খুলি,
বিজুলি হানি দৈববাণী
বক্ষে উঠে দুলি।
ঘাসের ছোঁওয়া তৃণশয়নছায়ে
মাটির যেন মর্মকথা বুলায়ে দিল গায়ে ;
আমের বোল, ঝাউয়ের দোল,
ঢেউয়ের লুটোপুটি
মিলি সকলে কী কোলাহলে
বক্ষে এল জুটি।

ভোরের পাখি নবীন আঁখি দুটি
গুহাবিহারী ভাবনা যত
নিমেষে নিল লুটি।
কী ইঙ্গিতে আচম্বিতে
ডাকিল লীলাভরে
দুয়ারখোলা পুরানো খেলাঘরে,
যেখানে ব'সে সবার কাছাকাছি
অজানা ভাবে অবুঝ গান
একদা গাহিয়াছি।

প্রাণের মাঝে ছুটে-চলার
খেপামি এল ছুটি,
লাভের লোভ, ক্ষতির ক্ষোভ
সকলি গেল টুটি।

ভোরের পাখি নবীন আঁখি দুটি
শুকতারাকে যেমনি ডাকে
প্রাণে সে উঠে ফুটি।
অরুণরাঙা চেতনা জাগে চিতে—
ঝুমকোলতা জানায় কথা
রঙিন রাগিণীতে।
মনের ’পরে খেলায় বায়ুবেগে
কত-যে মায়া রঙের ছায়া
খেয়ালে-পাওয়া মেঘে ;
বুলায় বুকে ম্যাগ্‌নোলিয়া
কৌতূহলী মুঠি,
অতি বিপুল ব্যাকুলতায়
নিখিলে জেগে উঠি।

২৭ শ্রাবণ ১৩৩৫

উদ্‌ঘাত

অজানা জীবন বাহিনু,
রহিনু আপন মনে,
গোপন করিতে চাহিনু—
ধরা দিনু দুনয়নে।
কী বলিতে পাছে কী বলি
তাই দূরে ছিনু কেবলি,
তুমি কেন এসে সহসা
দেখে গেলে আঁখিকোণে
কী আছে আমার মনে।

গভীর তিমিরগহনে
আছিনু নীরব বিরহে,
হাসির তড়িৎ-দহনে
লুকানো সে আর কি রহে।
দিন কেটেছিল বিজনে
ধেয়ানের ছবি সৃজনে,
আনমনে যেই গেয়েছি
শুনে গেছ সেইখনে
কী আছে আমার মনে।

প্রবেশিলে মোর নিভৃতে,
দেখে নিলে মোরে কী ভাবে,
যে-দীপ জ্বেলেছি নিশীথে
সে-দীপ কি তুমি নিভাবে।
ছিল ভরি মোর থালিকা,
ছিঁড়িব কি সেই মালিকা।
শরম দিবে কি তাহারে
অকথিত নিবেদনে
যা আছে আমার মনে।

২৭ শ্রাবণ ১৩৩৫

অসমাপ্ত

বোলো তারে, বোলো,
এতদিনে তারে দেখা হল।
তখন বর্ষণশেষে
ছুঁয়েছিল রৌদ্র এসে
উন্মীলিত গুল্‌মোরের থোলো

বনের মন্দির-মাঝে
তরুর তম্বুরা বাজে,
অনন্তের উঠে স্তবগান,
চক্ষে জল বহে যায়,
নম্র হল বন্দনায়
আমার বিস্মিত মনপ্রাণ।

দেবতার বর
কত জন্ম কত জন্মান্তর
অব্যক্ত ভাগ্যের রাতে
লিখেছে আকাশ-পাতে
এ-দেখার আশ্বাস-অক্ষর।
অস্তিত্বের পারে পারে
এ-দেখার বারতারে
বহিয়াছি রক্তের প্রবাহে।
দূর শূন্যে দৃষ্টি রাখি'
আমার উন্মনা আঁখি
এ-দেখার গূঢ় গান গাহে।

বোলো আজি তারে,—
'চিনিলাম তোমারে আমারে।
হে অতিথি, চুপে চুপে
বারম্বার ছায়ারূপে
এসেছ কম্পিত মোর দ্বারে।
কত রাত্রে চৈত্রমাসে,
প্রচ্ছন্ন পুষ্পের বাসে
কাছে-আসা নিশ্বাস তোমার
স্পন্দিত করেছে জানি
আমার গুণ্ঠনখানি,
কাঁদায়েছে সেতারের তার।'

বোলো তারে আজ,—
'অন্তরে পেয়েছি বড়ো লাজ।
কিছু হয় নাই বলা,
বেধে গিয়েছিল গলা,
ছিল না দিনের যোগ্য সাজ।
আমার বক্ষের কাছে
পূর্ণিমা লুকানো আছে,
সেদিন দেখেছ শুধু অমা।
দিনে দিনে অর্ঘ্য মম
পূর্ণ হবে, প্রিয়তম,
আজি মোর দৈন্য করো ক্ষমা।'

২৭ শ্রাবণ ১৩৩৫

নিবেদন

অজানা খনির নূতন মণির
গেঁথেছি হার,
ক্লান্তিবিহীনা নবীনা বীণায়
বেঁধেছি তার।
যেমন নূতন বনের দুকূল,
যেমন নূতন আমের মুকুল,
মাঘের অরুণে খোলে স্বর্গের
নূতন দ্বার—
তেমনি আমার নবীন রাগের
নবযৌবনে নব সোহাগের
রাগিণী রচিয়া উঠিল নাচিয়া
বীণার তার।

যে-বাণী আমার কখনো কারেও
হয় নি বলা
তাই দিয়ে গানে রচিব নূতন
নৃত্যকলা।
আজি অকারণ মুখর বাতাসে
যুগান্তরের সুর ভেসে আসে,
মর্মরস্বরে বনের ঘুচিল
মনের ভার,—
যেমনি ভাঙিল বাণীর বন্ধ
উচ্ছ্বসি উঠে নূতন ছন্দ,
সুরের সাহসে আপনি চকিত
বীণার তার।

২৭ শ্রাবণ ১৩৩৫

অচেনা

রে অচেনা, মোর মুষ্টি ছাড়াবি কী ক'রে
যতক্ষণ চিনি নাই তোরে?
কোন অন্ধক্ষণে
বিজড়িত তন্দ্রাজাগরণে
রাত্রি যবে সবে হয় ভোর
মুখ দেখিলাম তোর।
চক্ষু 'পরে চক্ষু রাখি শুধালেম, 'কোথা সংগোপনে
আছ আত্মবিস্মৃতির কোণে?'

তোর সাথে চেনা
সহজে হবে না,
কানে-কানে মৃদু কণ্ঠে নয়।
করে নেব জয়
সংশয়কুণ্ঠিত তোর বাণী;

দৃপ্ত বলে লব টানি
শঙ্কা হতে, লজ্জা হতে, দ্বিধাদ্বন্দ্ব হতে
নির্দয় আলোতে।
জাগিয়া উঠিবি অশ্রুধারে,
মুহূর্তে চিনিবি আপনারে ;
ছিন্ন হবে ডোর,
তোমার মুক্তিতে তবে মুক্তি হবে মোর।

হে অচেনা,
দিন যায়, সন্ধ্যা হয়, সময় র'বে না ;
মহা আকস্মিক
বাধাবন্ধ ছিন্ন করি দিক্,
তোমারে চেনার অগ্নি দীপ্তশিখা উঠুক উজ্জ্বলি,
দিব তাহে জীবন অঞ্জলি।

আষাঢ় ১৩৩৫
[বাঙ্গালোর]

অপরাজিত

ফিরাবে তুমি মুখ,
ভেবেছ মনে আমারে দিবে দুখ ?
আমি কি করি ভয়।
জীবন দিয়ে তোমারে প্রিয়ে, করিব আমি
বিঘ্ন-ভাঙা যৌবনের ভাষা,
অসীম তার আশা,
বিপুল তার বল,
তোমার আঁখি-বিজুলিঘাতে হবে না নিষ্ফল।

বিমুখ মেঘ ফিরিয়া যায় বৈশাখের দিনে,
অরণ্যেরে যেন সে নাহি চিনে,

ধরে না কুঁড়ি কানন জুড়ি, ফোটে না বটে ফুল,
মাটির তলে তৃষিত তরুমূল ;
ঝরিয়া পড়ে পাতা,
বনস্পতি তবুও তুলি' মাথা
নিঠুর তপে মন্ত্র জপে নীরব অনিমেষে
দহনজয়ী সন্ন্যাসীর বেশে।
দিনের পরে যায় রে দিন, রাতের পরে রাতি,
শ্রবণ রহে পাতি।
কঠিনতর যবে সে-পণ দারুণ উপবাসে
এমনকালে হঠাৎ কবে আসে
উদার অকৃপণ
আষাঢ় মাসে সজল শুভখন ;
পূর্বগিরি-আড়াল হতে বাড়ায় তার পাণি,
করিয়ো ক্ষমা, করিয়ো ক্ষমা, গুমরি উঠে বাণী,
নমিয়া পড়ে নিবিড় মেঘরাশি,
অশ্রুবারিবন্যা নামে ধরণী যায় ভাসি।

ফিরালে মোরে মুখ !
এ শুধু মোরে ভাগ্য করে ক্ষণিক কৌতুক।
তোমার প্রেমে আমার অধিকার
অতীত যুগ হতে সে জেনো লিখন বিধাতার।
অচল গিরিশিখর-'পরে সাগর করে দাবি,
ঝর্না পড়ে নাবি ;
সুদূর দিক্‌রেখার পানে চায়,
অকূল অজানায়
শঙ্কাভরে তরল স্বরে কহে,
নহে গো, নহে নহে ;
এড়ায়ে যাবে বলি
কত-না আঁকাবাঁকার পথে চলে সে ছলছলি ;

বিপুলতর হয় সে-ধারা, গভীরতর সুরে,
যতই আসে দূরে ;
উদারহাসি সাগর সহে অবুঝ অবহেলা,—
একদা শেষে পলাতকার খেলা
বক্ষে তার মিলায় কবে, মিলনে হয় সারা—
পূর্ণ হয় নিবেদনের ধারা।

২৮ শ্রাবণ ১৩৩৫

নির্ভয়

আমরা দুজনা স্বর্গ-খেলনা
গড়িব না ধরণীতে,
মুগ্ধ ললিত অশ্রুগলিত গীতে।
পঞ্চশরের বেদনামাধুরী দিয়ে
বাসররাত্রি রচিব না মোরা প্রিয়ে ;
ভাগ্যের পায়ে দুর্বলপ্রাণে
ভিক্ষা না যেন যাচি।
কিছু নাই ভয়, জানি নিশ্চয়
তুমি আছ, আমি আছি।

উড়াব ঊর্ধ্বে প্রেমের নিশান
দুর্গম পথ-মাঝে
দুর্দম বেগে, দুঃসহতম কাজে।
রুক্ষ দিনের দুঃখ পাই তো পাব,
চাই না শান্তি, সান্ত্বনা নাহি চাব।
পাড়ি দিতে নদী হাল ভাঙে যদি,
ছিন্ন পালের কাছি,
মৃত্যুর মুখে দাঁড়ায়ে জানিব
তুমি আছ, আমি আছি।

দুজনের চোখে দেখেছি জগৎ,
দোঁহারে দেখেছি দোঁহে,—
মরুপথতাপ দুজনে নিয়েছি সহে।
ছুটি নি মোহন মরীচিকা-পিছে-পিছে,
ভুলাই নি মন সত্যেরে করি মিছে—
এই গৌরবে চলিব এ ভবে
যতদিন দোঁহে বাঁচি।
এ-বাণী প্রেয়সী, হোক মহীয়সী—
তুমি আছ, আমি আছি।

৩১ শ্রাবণ ১৩৩৫

পথের বাঁধন

পথ বেঁধে দিল বন্ধনহীন গ্রন্থি,
আমরা দুজন চলতি হাওয়ার পন্থী।
রঙিন নিমেষ ধুলার দুলাল
পরানে ছড়ায় আবীর গুলাল,
ওড়না ওড়ায় বর্ষার মেঘে
দিগঙ্গনার নৃত্য,
হঠাৎ-আলোর ঝলকানি লেগে
ঝলমল করে চিত্ত।

নাই আমাদের কনকচাঁপার কুঞ্জ,
বনবীথিকায় কীর্ণ বকুলপুঞ্জ।
হঠাৎ কখন্ সন্ধ্যাবেলায়
নামহারা ফুল গন্ধ এলায়,
প্রভাতবেলায় হেলাভরে করে
অরুণকিরণে তুচ্ছ
উদ্ধত যত শাখার শিখরে
রডোডেনড্রন্ গুচ্ছ।

নাই আমাদের সঞ্চিত ধনরত্ন,
নাই রে ঘরের লালনললিত যত্ন।
পথপাশে পাখি পুচ্ছ নাচায়,
বন্ধন তারে করি না খাঁচায়,
ডানা-মেলে-দেওয়া মুক্তিপ্রিয়ের
কূজনে দুজনে তৃপ্ত।
আমরা চকিত অভাবনীয়ের
ক্বচিৎ কিরণে দীপ্ত।

[আষাঢ় ১৩৩৫
বাঙ্গালোর]

দূত

ছিনু আমি বিষাদে মগনা
অন্যমনা
তোমার বিচ্ছেদ-অন্ধকারে।
হেনকালে নির্জন কুটিরদ্বারে
অকস্মাৎ
কে করিল করাঘাত,
কহিল গম্ভীর কণ্ঠে, অতিথি এসেছি, দ্বার খোলো।

মনে হল
ঐ যেন তোমারি স্বর শুনি,
ঐ যেন দক্ষিণবায়ু দূরে ফেলি মদির ফাল্‌গুনী
দিগন্তে আসিল পূর্বদ্বারে,
পাঠাল নির্ঘোষ তার বজ্রধ্বনিমন্দ্রিত মল্লারে।
কেঁপেছিল বক্ষতল
বিলম্ব করি নি তবু অর্ধ পল।

মুহূর্তে মুছিনু অশ্রুবারি,
বিরহিণী নারী,

ছাড়িনু ধেয়ান তব তোমারি সম্মানে,
ছুটে গেনু দ্বার-পানে।
শুধালেম, তুমি দূত কার।
সে কহিল, আমি তো সবার।
যে-ঘরে তোমার শয্যা একদিন পেতেছি আদরে
ডাকিলাম তারে সেই ঘরে।
আনিলাম অর্ঘ্যথালি,
দীপ দিনু জ্বালি।
দেখিলাম বাঁধা তারি ভালে
যে-মালা পরায়েছিনু তোমারেই বিদায়ের কালে।

২০ অগস্ট ১৯২৮
[কলিকাতা]

পরিচয়

তখন বর্ষণহীন অপরাহ্নমেঘে
শঙ্কা ছিল জেগে;
ক্ষণে ক্ষণে তীক্ষ্ণ ভর্ৎসনায়
বায়ু হেঁকে যায়;
শূন্যে যেন মেঘচ্ছিন্ন রৌদ্ররাগে পিঙ্গল জটায়
দুর্বাসা হানিছে ক্রোধ রক্তচক্ষু-কটাক্ষচ্ছটায়

সে-দুর্যোগে এনেছিনু তোমার বৈকালী,
কদম্বের ডালি।
বাদলের বিষণ্ণ ছায়াতে
গীতহারা প্রাতে
নৈরাশ্যজয়ী সে-ফুল রেখেছিল কাজল প্রহরে
রৌদ্রের স্বপনছবি রোমাঞ্চিত কেশরে কেশরে।

মন্থর মেঘেরে যবে দিগন্তে ধাওয়ায়
পুবন হাওয়ায়,
কাঁদে বন শ্রাবণের রাতে
প্লাবনের ঘাতে,
তখনো নির্ভীক নীপ গন্ধ দিল পাখির কুলায়ে,
বৃন্ত ছিল ক্লান্তিহীন, তখনো সে পড়ে নি ধুলায়।
সেই ফুলে দৃঢ় প্রত্যাশার
দিনু উপহার।

সজল সন্ধ্যায় তুমি এনেছিলে সখী,
একটি কেতকী।
তখনো হয় নি দীপ জ্বালা,
ছিলাম নিরালা।
সারিদেওয়া সুপারির আন্দোলিত সঘন সবুজে
জোনাকি ফিরিতেছিল অবিশ্রান্ত কারে খুঁজে খুঁজে

দাঁড়াইলে দুয়ারের বাহিরে আসিয়া,
গোপনে হাসিয়া।
শুধালেম আমি কৌতূহলী
‘কী এনেছ’ বলি’।
পাতায় পাতায় বাজে ক্ষণে ক্ষণে বারিবিন্দুপাত,
গন্ধঘন প্রদোষের অন্ধকারে বাড়াইনু হাত।

ঝংকারি উঠিল মোর অঙ্গ আচম্বিতে
কাঁটার সংগীতে
চমকিনু কী তীব্র হরষে
পরুষ পরশে।

সহজ-সাধন-লব্ধ নহে সে মুগ্ধের নিবেদন,
অন্তরে ঐশ্বর্যরাশি, আচ্ছাদনে কঠোর বেদন।
নিষেধে নিরুদ্ধ যে-সম্মান
তাই তব দান।

২০ অগস্ট ১৯২৮
চৌরঙ্গি [কলিকাতা]

দায়মোচন

চিরকাল রবে মোর প্রেমের কাঙাল,—
এ কথা বলিতে চাও বোলো।
এই ক্ষণটুকু হ'ক সেই চিরকাল ;
তার পরে যদি তুমি ভোলো
মনে করাব না আমি শপথ তোমার,
আসা যাওয়া দুদিকেই খোলা রবে দ্বার,
যাবার সময় হলে যেয়ো সহজেই,
আবার আসিতে হয় এসো।
সংশয় যদি রয় তাহে ক্ষতি নেই,
তবু ভালোবাসো যদি বেসো।

বন্ধু, তোমার পথ সম্মুখে জানি,
পশ্চাতে আমি আছি বাঁধা
অশ্রুনয়নে বৃথা শিরে কর হানি
যাত্রায় নাহি দিব বাধা।
আমি তব জীবনের লক্ষ্য তো নহি,
ভুলিতে ভুলিতে যাবে হে চিরবিরহী ;
তোমার যা দান তাহা রহিবে নবীন
আমার স্মৃতির আঁখিজলে,
আমার যা দান সেও জেনো চিরদিন
রবে তব বিস্মৃতিতলে।

দূরে চলে যেতে যেতে দ্বিধা করি মনে
যদি কভু চেয়ে দেখ ফিরে
হয়তো দেখিবে আমি শূন্য শয়নে
নয়ন সিক্ত আঁখিনীরে।
মার্জনা করো যদি পাব তবে বল,
করুণা করিলে নাহি ঘোচে আঁখিজল,
সত্য যা দিয়েছিলে থাক্ মোর তাই,
দিবে লাজ তার বেশি দিলে।
দুঃখ বাঁচাতে যদি কোনোমতে চাই
দুঃখের মূল্য না মিলে।

দুর্বল ম্লান করে নিজ অধিকার
বরমাল্যের অপমানে।
যে পারে সহজে নিতে যোগ্য সে তার,
চেয়ে নিতে সে কভু না জানে
প্রেমেরে বাড়াতে গিয়ে মিশাব না ফাঁকি,
সীমারে মানিয়া তার মর্যাদা রাখি,
যা পেয়েছি সেই মোর অক্ষয় ধন,
যা পাই নি বড়ো সেই নয়।
চিত্ত ভরিয়া রবে ক্ষণিক মিলন
চিরবিচ্ছেদ করি জয়।

২৩ অগস্ট ১৯২৮

সবলা

নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার
কেন নাহি দিবে অধিকার
হে বিধাতা ?
নত করি' মাথা
পথপ্রান্তে কেন রব জাগি
ক্লান্তধৈর্য প্রত্যাশার পূরণের লাগি
দৈবাগত দিনে।

শুধু শূন্যে চেয়ে রব ? কেন নিজে নাহি লব চিনে
সার্থকের পথ।
কেন না ছুটাব তেজে সন্ধানের রথ
দুর্ধর্ষ অশ্বেরে বাঁধি দৃঢ় বল্‌গাপাশে।
দুর্জয় আশ্বাসে
দুর্গমের দুর্গ হতে সাধনার ধন
কেন নাহি করি আহরণ
প্রাণ করি' পণ।

যাব না বাসরকক্ষে বধূবেশে বাজায়ে কিঙ্কিণী,—
আমারে প্রেমের বীর্যে করো অশঙ্কিনী।
বীরহস্তে বরমাল্য লব একদিন
সে-লগ্ন কি একান্তে বিলীন
ক্ষীণদীপ্তি গোধূলিতে।
কভু তারে দিব না ভুলিতে
মোর দৃপ্ত কঠিনতা।
বিনম্র দীনতা
সম্মানের যোগ্য নহে তার,—
ফেলে দেবো আচ্ছাদন দুর্বল লজ্জার।

দেখা হবে ক্ষুব্ধ সিন্ধুতীরে ;
তরঙ্গগর্জনোচ্ছ্বাস মিলনের বিজয়ধ্বনিরে
দিগন্তের বক্ষে নিক্ষেপিবে।
মাথার গুণ্ঠন খুলি কব তারে, মর্ত্যে বা ত্রিদিবে
একমাত্র তুমিই আমার।
সমুদ্র-পাখির পক্ষে সেইক্ষণে উঠিবে হুংকার
পশ্চিম পবন হানি
সপ্তর্ষি-আলোকে যবে যাবে তারা পন্থা অনুমানি।

হে বিধাতা, আমারে রেখো না বাক্যহীনা,
রক্তে মোর জাগে রুদ্র বীণা।

উত্তরিয়া জীবনের সর্বোন্নত মুহূর্তের 'পরে
জীবনের সর্বোত্তম বাণী যেন ঝরে
কণ্ঠ হতে
নির্বারিত স্রোতে।
যাহা মোর অনির্বচনীয়
তারে যেন চিত্ত-মাঝে পায় মোর প্রিয়।
সময় ফুরায় যদি, তবে তার পরে
শান্ত হ'ক সে-নির্ঝর নৈঃশব্দ্যের নিস্তব্ধ সাগরে।

২৩ অগস্ট ১৯২৮

প্রতীক্ষা

তোমার প্রত্যাশা লয়ে আছি প্রিয়তমে,
চিত্ত মোর তোমারে প্রণমে।
অয়ি অনাগতা, অয়ি নিত্য প্রত্যাশিতা,
হে সৌভাগ্যদায়িনী দয়িতা।
সেবাকক্ষে করি না আহ্বান ;—
শুনাও তাহারি জয়গান
যে-বীর্য বাহিরে ব্যর্থ, যে-ঐশ্বর্য ফিরে অবাঞ্ছিত,
চাটুলুব্ধ জনতায় যে-তপস্যা নির্মম লাঞ্ছিত।

দীর্ঘ এ দুর্গম পথ মধ্যাহ্নতাপিত,
অনিদ্রায় রজনী যাপিত।
শুষ্কবাক্যবালুকার ঘূর্ণিপাক-ঝড়ে
পথিক ধুলায় শুয়ে পড়ে।
নাহি চাহি মধুর শুশ্রূষা,
হে কল্যাণী, তুমি নিষ্কলুষা,
তোমার প্রবল প্রেম প্রাণভরা সৃষ্টির নিশ্বাস,
উদ্দীপ্ত করুক চিত্তে ঊর্ধ্বশিখা বিপুল বিশ্বাস।

ধূসর প্রদোষে আজি অস্তপথ জুড়ে
নিশাচর মিথ্যা চলে উড়ে।
আলো-আঁধারের পাকে না মিলে কিনারা,
দীর্ঘ যে দেখায় হ্রস্ব যারা।
যাচে দেশ মোহের দীক্ষারে,
কাঁদে দিক বিধির ধিক্কারে,
ভাগ্যের ভিক্ষুক চাহে কুটিল সিদ্ধির আশীর্বাদ,
ধূলিতে-খুঁটিয়া-তোলা বহুজন-উচ্ছিষ্ট প্রসাদ।

কুৎসায় বিস্তারি দেয় পঙ্কে-ক্লিন্ন গ্লানি,
কলহেরে শৌর্য ব'লে জানি,
ভাবি, দুর্যোগের সিন্ধু তরিব হেলায়
বঞ্চনার ভঙ্গুর ভেলায়।
বাহিরে মুক্তিরে ব্যর্থ খুঁজি,
অন্তরে বন্ধন করি পুঁজি,
অশক্তি মজ্জায় রক্তে, শক্তি বলি জানি ছলনাকে,
মর্মগত খর্বতায় সর্বকালে খর্ব করি রাখে।

হে বাণীরূপিণী, বাণী জাগাও অভয়,
কুজ্ঝটিকা চির সত্য নয়।
চিত্তেরে তুলুক ঊর্ধ্বে মহত্ত্বের পানে
উদাত্ত তোমার আত্মদানে।
হে নারী, হে আত্মার সঙ্গিনী,
অবসাদ হতে লহো জিনি,—
স্পর্ধিত কুশ্রীতা নিত্য যতই করুক সিংহনাদ,
হে সতী সুন্দরী, আনো তাহার নিঃশব্দ প্রতিবাদ

১৭ অগস্ট ১৯২৮

লগ্ন

প্রথম মিলনদিন, সে কি হবে নিবিড় আষাঢ়ে,
যেদিন গৈরিক বস্ত্র ছাড়ে
আসন্নের আশ্বাসে সুন্দরা
বসুন্ধরা ?
প্রাঙ্গণের চারিধার ঢাকিয়া সজল আচ্ছাদনে
যেদিন সে বসে প্রসাধনে
ছায়ার আসন মেলি ;
পরি লয় নূতন সবুজরঙা চেলি,
চক্ষুপাতে লাগায় অঞ্জন,
বক্ষে করে কদম্বের কেশর রঞ্জন ।
দিগন্তের অভিষেকে
বাতাস অরণ্যে ফিরি নিমন্ত্রণ যায় হেঁকে হেঁকে ।
যেদিন প্রণয়ী বক্ষতলে
মিলনের পাত্রখানি ভরে অকারণ অশ্রুজলে,
কবির সংগীত বাজে গভীর বিরহে,—
নহে নহে, সেদিন তো নহে ।

সে কি তবে ফাল্গুনের দিনে,
যেদিন বাতাস ফিরে গন্ধ চিনে চিনে
সবিস্ময়ে বনে বনে,
শুধায় সে মল্লিকারে কাঞ্চন-রঙ্গনে,
তুমি কবে এলে ।
নাগকেশরের কুঞ্জ কেশর ধুলায় দেয় ফেলে
ঐশ্বর্যগৌরবে ।
কলরবে
অজস্র মিশায় বিহঙ্গম
ফুলের বর্ণের রঙ্গে ধ্বনির সংগম ;

অরণ্যের শাখায় শাখায়
প্রজাপতিসংঘ আনে পাখায় পাখায়
চিত্রলিপি, কুসুমেরি বিচিত্র অক্ষরে ;
ধরণী যৌবনগর্বভরে
আকাশেরে নিমন্ত্রণ করে যবে
উদ্দাম উৎসবে ;
কবির বীণার তন্ত্র যে-বসন্তে ছিঁড়ে যেতে চাহে
প্রমত্ত উৎসাহে।
আকাশে বাতাসে
বর্ণের গন্ধের উচ্ছহাসে
ধৈর্য নাহি রহে,—
নহে নহে, সেদিন তো নহে।

যেদিন আশ্বিনে শুভক্ষণে
আকাশের সমারোহ ধরণীতে পূর্ণ হয় ধনে।
প্রাচুর্যপ্রশান্ত তট পেয়েছে সঙ্গিনী
তরঙ্গিণী—
তপস্বিনী সে-যে, তার গম্ভীর প্রবাহে—
সমুদ্রবন্দনা গান গাহে।
মুছিয়াছে নীলাম্বর বাষ্পসিক্ত চোখ,
বন্ধমুক্ত নির্মল আলোক।
বনলক্ষ্মী শুভব্রতা
শুভ্রের ধেয়ানে তার মেলিয়াছে অম্লান শুভ্রতা
আকাশে আকাশে
শেফালি মালতী কুন্দে কাশে।
অপ্রগল্‌ভা ধরিত্রী-সে প্রণামে লুণ্ঠিত,
পূজারিনী নিরবগুণ্ঠিত,
আলোকের আশীর্বাদে শিশিরের স্নানে
দাহহীন শান্তি তার প্রাণে।

দিগন্তের পথ বাহি
শূন্যে চাহি
রিক্তবিত্ত শুভ্র মেঘ সন্ন্যাসী উদাসী
গৌরীশঙ্করের তীর্থে চলিয়াছে ভাসি।
সেই স্নিগ্ধক্ষণে, সেই স্বচ্ছ সূর্যকরে,
পূর্ণতায় গম্ভীর অম্বরে
মুক্তির শান্তির মাঝখানে
তাহারে দেখিব যারে চিত্ত চাহে, চক্ষু নাহি জানে।

১৯ অগস্ট ১৯২৮

সাগরিকা

সাগরজলে সিনান করি সজল এলোচুলে
বসিয়াছিলে উপল-উপকূলে।
শিথিল পীতবাস
মাটির 'পরে কুটিলরেখা লুটিল চারি পাশ।
নিরাবরণ বক্ষে তব, নিরাভরণ দেহে
চিকন সোনা-লিখন উষা আঁকিয়া দিল স্নেহে।
মকরচূড় মুকুটখানি পরি ললাট-'পরে
ধনুকবাণ ধরি দখিন করে,
দাঁড়ানু রাজবেশী,—
কহিনু, "আমি এসেছি পরদেশী"।

চমকি ত্রাসে দাঁড়ালে উঠি শিলা-আসন ফেলে,
শুধালে, "কেন এলে"।
কহিনু আমি, "রেখো না ভয় মনে,
পূজার ফুল তুলিতে চাহি তোমার ফুলবনে"।
চলিলে সাথে, হাসিলে অনুকূল,
তুলিনু যূথী, তুলিনু জাতী, তুলিনু চাঁপাফুল।

দুজনে মিলি সাজায়ে ডালি বসিনু একাসনে,
নটরাজেরে পূজিনু একমনে।
কুহেলি গেল, আকাশে আলো দিল-যে পরকাশি
ধূর্জটির মুখের পানে পার্বতীর হাসি।

সন্ধ্যাতারা উঠিল যবে গিরিশিখর-'পরে,
একেলা ছিলে ঘরে।
কটিতে ছিল নীল দুকূল, মালতীমালা মাথে,
কাঁকন দুটি ছিল দুখানি হাতে।
চলিতে পথে বাজায়ে দিনু বাঁশি,
"অতিথি আমি", কহিনু দ্বারে আসি।
তরাসভরে চকিতকরে প্রদীপখানি জ্বেলে
চাহিলে মুখে, কহিলে, "কেন এলে"।
কহিনু আমি, "রেখো না ভয় মনে,
তনু দেহটি সাজাব তব আমার আভরণে"।
চাহিলে হাসিমুখে,
আধোচাঁদের কনকমালা দোলানু তব বুকে
মকরচূড় মুকুটখানি কবরী তব ঘিরে
পরায়ে দিনু শিরে।
জ্বালায়ে বাতি মাতিল সখীদল,
তোমার দেহে রতনসাজ করিল ঝলমল।
মধুর হল বিধুর হল মাধবী নিশীথিনী,
আমার তালে তোমার নাচে মিলিল রিনিঝিনি।
পূর্ণ-চাঁদ হাসে আকাশ-কোলে,
আলোক-ছায়া শিব-শিবানী সাগরজলে দোলে।

ফুরাল দিন কখন্ নাহি জানি,
সন্ধ্যাবেলা ভাসিল জলে আবার তরীখানি।
সহসা বায়ু বহিল প্রতিকূলে,
প্রলয় এল সাগরতলে দারুণ ঢেউ তুলে।

লবণজলে ভরি
আঁধার রাতে ডুবাল মোর রতনভরা তরী।
আবার ভাঙা ভাগ্য নিয়ে দাঁড়ানু দ্বারে এসে
ভূষণহীন মলিন দীন বেশে।
দেখিনু আমি নটরাজের দেউলদ্বার খুলি
তেমনি করে রয়েছে ভরে ডালিতে ফুলগুলি।
হেরিনু রাতে, উতল উৎসবে
তরল কলরবে
আলোর নাচ নাচায় চাঁদ সাগরজলে যবে,
নীরব তব নম্র নত মুখে
আমারি আঁকা পত্রলেখা, আমারি মালা বুকে।
দেখিনু চুপে-চুপে
আমারি বাঁধা মৃদঙ্গের ছন্দ রূপে রূপে
অঙ্গে তব হিল্লোলিয়া দোলে
ললিতগীতকলিতকল্লোলে।

মিনতি মম শুন হে সুন্দরী,
আরেক বার সমুখে এসো প্রদীপখানি ধরি।
এবার মোর মকরচূড় মুকুট নাহি মাথে,
ধনুকবাণ নাহি আমার হাতে;
এবার আমি আনি নি ডালি দখিন সমীরণে
সাগরকূলে তোমার ফুলবনে।
এনেছি শুধু বীণা,
দেখো তো চেয়ে আমারে তুমি চিনিতে পার কি না।

১ অক্টোবর ১৯২৭
মায়ার জাহাজ

বরণ

পুরাণে বলেছে
একদিন নিয়েছিল বেছে
স্বয়ম্বরসভাঙ্গনে দময়ন্তী সতী
নল-নরপতি
ছদ্মবেশী দেবতার মাঝে।
অর্ঘ্যহারা দেবতারা চলে গেল লাজে।
দেবমূর্তি চিনেছে সেদিন,
তারা যে ফেলে না ছায়া, তারা অমলিন।
সেদিন স্বর্গের ধৈর্য গেল টুটি,
ইন্দ্রলোক করিল ভ্রূকুটি।

তাই শুনে কত দিন একা বসে বসে
ভেবেছিনু বালিকাবয়সে,
আমি হব স্বয়ম্বরা বিশ্বসভাতলে,—
দেবতারি গলে
দিব মালা তপস্বিনী,
মানবের মাঝখানে একদিন লব তারে চিনি।
তারি লাগি সর্ব দেহে মনে
দিনে দিনে বরমাল্য গাঁথিব যতনে।

কঠিন সে পণ,
ভাবি নি কেমনে তারে করিব সাধন।
মানুষ-যে দেশে দেশে
কত ফেরে দেবতার ছদ্মবেশে;
ললাটে তিলক কারো লেখা,
দেখিতে দেখিতে ওঠে কালো হয়ে তার স্বর্ণরেখা।
কারো বা কটিতে বাঁধা শরশূন্য তূণ,
কেহ করে বজ্রধ্বনি, নাহি তাহে বজ্রের আগুন।

বাতায়নে বসে থাকি,
কতদিন কী দেখিয়া আশ্বাসে চমকি উঠে আঁখি ;
চেয়ে চেয়ে দ্বিধা লাগে শেষে
বৃষ্টি হতে হতে দেখি শিলা পড়ে এসে।

একদিন রৌদ্রের বেলায়
মধ্যাহ্নের জনতার মুখর মেলায়
রাজপথ-পাশে
দাঁড়াইনু,—দেখিলাম যারা যায় আসে
তাহাদের কায়া
সম্মুখে ফেলিয়া চলে দীর্ঘতর ছায়া।
শুনিলাম স্পর্ধাতীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর
ছিন্ন করে দিতে চাহে দেবতার অখণ্ড অম্বর।
উজ্জ্বল সজ্জায়
দীন অঙ্গ সমাচ্ছন্ন ধনের লজ্জায়।
ছুটে চলে অশ্বরথ,
তার চেয়ে আড়ম্বরে সঙ্গে ওড়ে ধূলির পর্বত।

যখন সেদিন সেই ঊর্ধ্বশ্বাস লুব্ধ ঠেলাঠেলি
নানাশব্দে উঠিছে উদ্বেলি
তুমি দেখি পথপ্রান্তে একা হাস্যমুখে
নিঃশব্দ কৌতুকে
চেয়ে আছ,—হৃদয় আছিল জনস্রোতে,
মন ছিল দূরে সবা হতে।
তুমি যেন মহাকালসমুদ্রের তটে
নিত্যের নিশ্চল চিত্তপটে
দেখেছিলে চঞ্চলের চলমান ছবি,
শুনেছিলে ভৈরবের ধ্যান-মাঝে উমার ভৈরবী।
বহে গেল জনতার ঢেউ,—
কে-যে তুমি কোথা আছ দেখে নাই কেউ।

একা আমি দেখেছি তোমারে—
তুমিই ফেল নি ছায়া ছায়ার মাঝারে।
মালা হাতে গেনু ধেয়ে,
হাসিলে আমার পানে চেয়ে।
মোর স্বয়ম্বরে
সেদিন মর্ত্যের মুখ ভ্রূকুটিল অবজ্ঞার ভরে

২৬ অগস্ট ১৯২৮

পথবর্তী

দূর মন্দিরে সিন্ধুকিনারে
পথে চলিয়াছ তুমি।
আমি তরু মোর ছায়া দিয়ে তারে
মৃত্তিকা তার চুমি।
হে তীর্থগামী, তব সাধনার
অংশ কিছু-বা রহিল আমার,
পথপাশে আমি তব যাত্রার
রহিব সাক্ষীরূপে।
তোমার পূজায় মোর কিছু যায়
ফুলের গন্ধধূপে।

তব আহ্বানে বরণ করিয়া
নিয়েছি দুর্গমেরে।
ক্লান্তি কিছু-বা নিলাম হরিয়া
মোর অঞ্চল-ঘেরে।
যা ছিল কঠোর, যাহা নিষ্ঠুর
তার সাথে কিছু মিলাই মধুর,
যা ছিল অজানা, যাহা ছিল দূর
আমি তারি মাঝে থেকে

দিনু পথ-'পরে শ্যাম অক্ষরে
জানার চিহ্ন এঁকে।

মোর পরিচয়ে তোমার পথের
কিছু রহে পরিচয়।
তব রচনায় তব ভকতের
কিছু বাণী মিশে রয়
তোমার মধ্যদিবসের তাপে
আমার স্নিগ্ধ কিশলয় কাঁপে,
মোর পল্লব সে-মন্ত্র জাপে
গভীর যা তব মনে,
মোর ফলভার মিলানু তোমার
সাধনফলের সনে।

বেলা চলে যাবে, একদা যখন
ফুরাবে যাত্রা তব,
শেষ হবে যবে মোর প্রয়োজন
হেথাই দাঁড়ায়ে রব।
এই পথখানি রবে মোর প্রিয়,
এই হবে মোর চিরবরণীয়,
তোমারি স্মরণে রব স্মরণীয়,
না মানিব পরাভব।
তব উদ্দেশে অর্পিব হেসে
যা-কিছু আমার সব

২৭ অগস্ট ১৯২৮

মুক্তরূপ

তোমারে আপন কোণে স্তব্ধ করি যবে
পূর্ণরূপে দেখি না তোমায়,
মোর রক্ততরঙ্গের মত্ত কলরবে
বাণী তব মিশে ভেসে যায়।

তোমার পাখারে আমি রুদ্ধ করি বুঝি,
সে-বন্ধনে তোমারেই পাই না তো খুঁজি,
তুমি তো ছায়ার নহ, প্রভাতবিলাসী,
আলোতেই তোমার প্রকাশ,
তোমার ডানার ছন্দে তব উচ্চ হাসি
যাক চলে ভেদিয়া আকাশ।

জানি, যদি লুব্ধ মনে কৃপণতা করি,
ঐশ্বর্যেও দৈন্য না ঘুচায়,
ব্যর্থ ভাণ্ডারের তবে রহিব প্রহরী,
বঞ্চনা করিব আপনায়।
আত্মা যেথা লুপ্ত থাকে সেথা উপচ্ছায়া
মুগ্ধ চেতনার 'পরে রচে তার মায়া,
তাই নিয়ে ভুলাব কি আমার জীবন।
গাঁথিব কি বুদ্বুদের হার।
তোমারে আড়াল ক'রে তোমার স্বপন
মিটাবে কি আকাঙ্ক্ষা আমার।

বিরাজে মানবশৌর্যে সূর্যের মহিমা,
মর্ত্যে সে তিমিরজয়ী প্রভু,
অজেয় আত্মার রশ্মি, তারে দিবে সীমা
প্রেমের সে ধর্ম নহে কভু।
যাও চলি রণক্ষেত্রে, লও শঙ্খ তুলি,
পশ্চাতে উড়ুক তব রথচক্রধূলি,
নির্দয় সংগ্রাম-অন্তে মৃত্যু যদি আসি
দেয় ভালে অমৃতের টিকা,
জানি যেন সে-তিলকে উঠিল প্রকাশি
আমারো জীবনজয়লিখা।

আমার প্রাণের শক্তি প্রাণে তব লহো,
মোর দুঃখযজ্ঞের শিখায়

জ্বালিবে মশাল তব, আতঙ্কদুঃসহ
রাত্রিরে দহি সে যেন যায়।
তোমারে করিনু দান শ্রদ্ধার পাথেয়,
যাত্রা তব ধন্য হ'ক, যাহা কিছু হেয়
ধূলিতলে হ'ক ধূলি, দ্বিধা যাক মরি,
চরিতার্থ হ'ক ব্যর্থতাও,
তোমার বিজয়মাল্য হতে ছিন্ন করি
আমারে একটি পুষ্প দাও।

২৯ অগস্ট ১৯২৮

স্পর্ধা

শ্লথপ্রাণ দুর্বলের স্পর্ধা আমি কভু সহিব না।
লোলুপ সে লালায়িত, প্রেমেরে সে করে বিড়ম্বনা
ক্লেদঘন চাটুবাক্যে, বাষ্পে বিজড়িত দৃষ্টি তার
কলুষকুণ্ঠিত অঙ্গে লিপ্ত করে গ্লানি লালসার,
আবেশে মন্থর কণ্ঠে গদ্‌গদ সে প্রার্থনা জানায়,
আলোকবঞ্চিত তার অন্তরের কানায় কানায়
দুষ্ট ফেন উঠে বুদ্‌বুদিয়া,— ফেটে যায়, দেয় খুলি
রুদ্ধ বিষবায়ু। গলিত মাংসের যেন ক্রিমিগুলি
কল্পনাবিকার তার, শিথিল চিন্তার তলে তলে
আকুলিতে থাকে কিলিবিলি।— যেন প্রাণপণ বলে
মন তারে করে কষাঘাত। জীর্ণমজ্জা কাপুরুষে
নারী যদি গ্রাহ্য করে, লজ্জিত দেবতা তারে দুষে
অসহ্য সে অপমানে। নারী সে-যে মহেন্দ্রের দান,
এসেছে ধরিত্রীতলে পুরুষেরে সঁপিতে সম্মান।

৩০ অগস্ট ১৯২৮
জোড়াসাঁকো

রাখিপূর্ণিমা

কাহারে পরাব রাখি যৌবনের রাখিপূর্ণিমায়,
হে মোর ভাগ্যের দেব। লগ্ন যেন বহে নাহি যায়।
মেঘে আজি আবিষ্ট অম্বর, ঘন বৃষ্টি-আচ্ছাদনে
অস্পষ্ট আলোর মন্ত্র আকাশ নিবিষ্ট হয়ে শোনে,
বুঝিতে পারে না ভালো। আমি ভাবিতেছি একা বসে
আমার বাঞ্ছিত কবে বাহিরিল প্রচ্ছন্ন প্রদোষে
চিহ্নহীন পথে। এসেছিল দ্বারের সম্মুখে মোর
ক্ষণতরে। তখনো রজনী মম হয় নাই ভোর,
হৃদয় অস্ফুট ছিল অর্ধ জাগরণে। ডাকে নি সে
নাম ধরে, দুয়ারে করে নি করাঘাত, গেছে মিশে
সমুদ্রতরঙ্গরবে তাহার অশ্বের হ্রেষাধ্বনি।
হে বীর অপরিচিত, শেষ হল আমার রজনী,
জানা তো হল না কোন্ দুঃসাধ্যের সাধন লাগিয়া
অস্ত্র তব উঠিল ঝঞ্ঝনি। আমি রহিনু জাগিয়া।

৩১ অগস্ট ১৯২৮

আহ্বান

কোথা আছ? ডাকি আমি। শোনো শোনো, আছে প্রয়োজন
একান্ত আমারে তব। আমি নহি তোমার বন্ধন ;—
পথের সম্বল মোর প্রাণে। দুর্গমে চলেছ তুমি
নীরস নিষ্ঠুর পথে,— উপবাসহিংস্র সেই ভূমি
আতিথ্যবিহীন ; উদ্ধত নিষেধদণ্ড রাত্রিদিন
উদ্যত করিয়া আছে ঊর্ধ্ব-পানে। আমি ক্লান্তিহীন
সেই সঙ্গ দিতে পারি, প্রাণবেগে বহন যে করে
শুশ্রূষার পূর্ণশক্তি আপনার নিঃশঙ্ক অন্তরে,—
যথা রুক্ষ রিক্তবৃক্ষ শৈলবক্ষ ভেদি অহরহ
দুর্দাম নির্ঝরে ঢালে দুর্নিবার সেবার আগ্রহ,

শুকায় না রসবিন্দু প্রখর নির্দয় সূর্যতেজে,
নীরস প্রস্তরমুষ্টিতলে দৃঢ়বলে রাখে সে-যে
অক্ষয় সম্পদরাশি। সহাস্য উজ্জ্বল গতি তার
দুর্যোগে অপরাজিত, অবিচল বীর্যের আধার।

১ সেপ্টেম্বর ১৯২৮

বাপী

একদা বিজনে যুগল তরুর মূলে
তৃষ্ণার জল তুমি দিয়েছিলে তুলে।
আর কোনোখানে ছায়া নাহি দেখি,
শুধালেম, কাছে বসিতে দিবে কি।
সেদিন তোমার ঘরে ফিরিবার বেলা
বহে গেল বুঝি, কাজে হয়ে গেল হেলা।

অদূরে হোথায় ভাঙা দেউলের ধারে
পূর্ব যুগের পুজাহীন দেবতারে
প্রভাত-অরুণ প্রতিদিন খোঁজে,
শূন্য বেদির অর্থ না বোঝে,
দিন শেষ হলে সন্ধ্যাতারার আলো
যে-পুজারী নাই তারে বলে, দীপ জ্বালো।

একদিন বুঝি দূরে কোন্ রাজধানী
রচনা করেছে দীর্ঘ এ পথখানি।
আজি তার নাম নাই ইতিহাসে,
জীর্ণ হয়েছে বালুকার গ্রাসে,
প্রান্তরশেষে শীর্ণ বনের কোলে
জনপদবধূ জল নিয়ে যায় চলে।

লুপ্তকালের শুষ্ক সাগরধারে
বহু বিস্মৃতি যেথা রয় স্তূপাকারে,
অতি পুরাতন কাহিনী যেথায়
রুদ্ধ কণ্ঠে শূন্যে তাকায়,
হারানো ভাষার নিশার স্বপ্নছায়ে
হেরিনু তোমায়, আসিনু ক্লান্ত পায়ে।

শুধু দুটি তরু মরুর প্রাণের কথা,
লুকানো কী রসে বাঁচে তার শ্যামলতা।
সেদিন তাহারি মর্মর সনে
কী ব্যথা মিশানু, জানে দুইজনে ;
মাথার উপরে উড়ে গেল কোন্ পাখি
হতাশ পাখার হাহাকাররেখা আঁকি।

তপ্ত বালুরে ভর্ৎসিয়া মুহুমুহু
তাপিত বাতাস চিৎকারি উঠে হুহু ;
ধূলির ঘূর্ণি, যেন বেঁকে বেঁকে
শাপ-লাগা প্রেত নাচে থেকে থেকে ;
রূঢ় রুদ্র রিক্তের মাঝখানে
দুইটি প্রহর ভরেছিনু প্রাণে গানে।

দিন শেষ হল, চলে যেতে হল একা,
বলিনু তোমারে, আরবার হবে দেখা।
শুনে হেসেছিলে হাসিখানি ম্লান,
তরুণ হৃদয়ে যেন তুমি জান
অসীমের বুকে অনাদি বিষাদখানি
আছে সারাখন মুখে আবরণ টানি।

তার পরে কত দিন চলে গেল মিছে
একটি দিনেরে দলিয়া পায়ের নীচে।

বহু পরে যবে ফিরিলাম প্রিয়ে,
এ-পথে আসিতে দেখি চমকিয়ে
আছে সেই কূপ, আছে সে যুগলতরু।
তুমি নাই, আছে তৃষিত স্মৃতির মরু॥

এ কূপের তলে মোর যক্ষের ধন
একটি দিনের দুর্লভ সেইখন
চিরকাল ভরি' রহিল লুকানো,
ওগো অগোচরা জান নাহি জান;
আর কোনো দিনে অন্য যুগের প্রিয়া
তারে আর কারে দিবে কি উদ্ধারিয়া।

১ সেপ্টেম্বর ১৯২৮

মহুয়া

বিরক্ত আমার মন কিংশুকের এত গর্ব দেখি'।
নাহি ঘুচিবে কি
অশোকের অতিখ্যাতি, বকুলের মুখর সম্মান।
ক্লান্ত কি হবে না কবিগান
মালতীর মল্লিকার
অভ্যর্থনা রচি' বারম্বার?
রে মহুয়া, নামখানি গ্রাম্য তোর, লঘু ধ্বনি তার,
উচ্চশিরে তবু রাজকুলবনিতার
গৌরব রাখিস ঊর্ধ্বে ধরে।
আমি তো দেখেছি তোরে
বনস্পতিগোষ্ঠী-মাঝে অরণ্যসভায়
অকুণ্ঠিত মর্যাদায়
আছিস দাঁড়ায়ে;
শাখা যত আকাশে বাড়ায়ে

শাল তাল সপ্তপর্ণ অশ্বত্থের সাথে
প্রথম প্রভাতে
সূর্য-অভিনন্দনের তুলেছিস গম্ভীর বন্দন।
অপ্রসন্ন আকাশের ভ্রূভঙ্গে যখন
অরণ্য উদ্বিগ্ন করি তোলে,
সেই কালবৈশাখীর ক্রুদ্ধ কলরোলে
শাখাব্যূহে ঘিরে
আশ্বাস করিস দান শঙ্কিত বিহঙ্গ অতিথিরে।
অনাবৃষ্টিক্লিষ্ট দিনে,
বিশীর্ণ বিপিনে,
বন্যবুভুক্ষুর দল ফেরে রিক্ত পথে,
দুর্ভিক্ষের ভিক্ষাঞ্জলি ভরে তারা তোর সদাব্রতে

বহুদীর্ঘ সাধনায় সুদৃঢ় উন্নত
তপস্বীর মতো
বিলাসের চাঞ্চল্যবিহীন,
সুগম্ভীর সেই তোরে দেখিয়াছি অন্যদিন
অন্তরে অধীরা
ফাল্গুনের ফুলদোলে কোথা হতে জোগাস মদিরা
পুষ্পপুটে ;
বনে বনে মৌমাছিরা চঞ্চলিয়া উঠে।
তোর সুরাপাত্র হতে বন্যনারী
সম্বল সংগ্রহ করে পুর্ণিমার নৃত্যমত্ততারি।
রে অটল, রে কঠিন,
কেমনে গোপনে রাত্রিদিন
তরল যৌবনবহ্নি মজ্জায় রাখিয়াছিলি ভরে।
কানে কানে কহি তোরে
বধূরে যেদিন পাব, ডাকিব মহুয়া নাম ধরে।

৩ সেপ্টেম্বর ১৯২৮
[জোড়াসাঁকো]

দীনা

তোমারে সম্পূর্ণ জানি হেন মিথ্যা কখনো কহি নি,
প্রিয়তম, আমি বিরহিণী
পরিপূর্ণ মিলনের মাঝে।
মোর স্পর্শে বাজে
যে-তন্ত্রটি তোমার বীণায়,
তাহারি পঞ্চম স্বরে তোমারে কি নিঃশেষে চিনায়
তোমার বসন্ত রাগে,
নিদ্রাহীন রজনীর পরজে বেহাগে।
সে-তন্ত্র সোনার বটে,— বিভাসে ললিতে
যে কথা সে চেয়েছে বলিতে
তাইতে হয়েছে পূর্ণ এ আমার জীবন-অঞ্জলি।
তবু সত্য করে বলি,
ব্যথা লাগে বুকে
যখন সহসা আসি তোমার সম্মুখে
নিভৃত তোমার ঘরে
স্বপ্নভাঙা প্রথম প্রহরে,—
যখন জাগে নি পাখি, রক্তিম আকাশে
আসন্ন অরণ্যগাথা নব সূর্যোদয়-আশে
রয়েছে স্তম্ভিত,
পিঙ্গল আভায় দীপ্ত জটা বিলম্বিত
অরুণ সন্ন্যাসী
করজোড়ে আছে স্থির আলোকপ্রত্যাশী,—
তখন তোমার মুখ চেয়ে দেখিয়াছি ভয়ে ভয়ে,
জেনেছি হৃদয়ে
তুমিই অচেনা।
কোনো দিন ফুরাবে না
পরিচয় ; তোমারে বুঝিব আমি করি না সে আশা,
কথায় যা বল নাই, আমি-যে জানি না তার ভাষা।

ভয় হয় পাছে
যে-সম্পদ চেয়েছিলে মোর কাছে
সে-যে মোর নাই, তাই শেষে পড়ে ধরা,
দেখ দূর হতে এসে জলাশয়ে জল নাই ভরা।
তখন নিয়ো না যেন অপরাধ মোর,
হয়ো না কঠোর,
তুমি যদি মুগ্ধ মনে ভুলে থাক, তবু
গভীর দীনতা মোর গোপন করি নি আমি কভু।
মোর দ্বারে যবে এলে অন্যমনা
সে কি মোর কিছু নিয়ে পুরাতে কামনা।
নহে নহে, হে রাজন, তোমার অনেক ধন আছে,
তাই তুমি আস মোর কাছে
দেবার আনন্দ তব পূর্ণ করিবার লাগি;
যদি তাই পূর্ণ হয়, তবে আমি নহি তো অভাগী।

৪ সেপ্টেম্বর ১৯২৮

সৃষ্টিরহস্য

সৃষ্টির রহস্য আমি তোমাতে করেছি অনুভব,
নিখিলের অস্তিত্বগৌরব।
তুমি আছ, তুমি এলে,
এ বিস্ময় মোর পানে আপনারে নিত্য আছে মেলে
অলৌকিক পদ্মের মতন।
অন্তহীন কাল আর অসীম গগন
নিদ্রাহীন আলো
কী অনাদি মন্ত্রে তারা অঙ্গ ধরি তোমাতে মিলাল।
যুগে যুগে কী অক্লান্ত সাধনায়,
অগ্নিময়ী বেদনায়,
নিমেষে হয়েছে ধন্য শক্তির মহিমা
পেয়ে আপনার সীমা।

ওই মুখে, ওই চক্ষে, ওই হাসিটিতে।
সেই সৃষ্টিতপস্যার সার্থক আনন্দ মোর চিতে
স্পর্শ করে, যবে তব মুখে মেলি' আঁখি
সম্মুখে তোমার বসে থাকি।

২০ অগস্ট ১৯২৮

নাম্নী

শ্যামলী

সে যেন গ্রামের নদী
বহে নিরবধি
মৃদুমন্দ কলকলে ;
তরঙ্গের ভঙ্গী নাই, আবর্তের ঘূর্ণি নাই জলে ;
নুয়ে-পড়া তটতরু ঘনচ্ছায়া-ঘেরে
ছোটো করে রাখে আকাশেরে।
জগৎ সামান্য তার, তারি ধূলি-'পরে
বনফুল ফোটে অগোচরে,
মধু তার নিজ মূল্য নাহি জানে,
মধুকর তারে না বাখানে।
গৃহকোণে ছোটো দীপ জ্বালায় নেবায়,
দিন কাটে সহজ সেবায়।
স্নান সাজ করি এলোচুলে
অপরাজিতার ফুলে
প্রভাতে নীরব নিবেদনে
স্তব করে একমনে।
মধ্যদিনে বাতায়নতলে
চেয়ে দেখে নিয়ে দিঘিজলে
শৈবালের ঘনস্তর,
পতঙ্গের খেলা তারি 'পর।

আবছায়া কল্পনায়
ভাষাহীন ভাবনায়
মন তার ভরে
মধ্যাহ্নের অব্যক্ত মর্মরে।
সায়াহ্নের শান্তিখানি নিয়ে ঘোমটায়
নদীপথে যায়
ঘট কাঁখে
বেণুবীথিকার বাঁকে বাঁকে
ধীর পায়ে চলি',—
নাম কি শামলী।

কাজলী

প্রচ্ছন্ন দাক্ষিণ্যভারে চিত্ত তার নত
স্তম্ভিত মেঘের মতো,
তৃষ্ণাহরা
আষাঢ়ের আত্মদান-প্রত্যাশায় ভরা।
সে যেন গো তমালের ছায়াখানি,
অবগুণ্ঠনের তলে পথ-চাওয়া আতিথ্যের বাণী।
যে-পথিক একদিন আসিবে দুয়ারে
ক্লিষ্ট ক্লান্তিভারে,
সেই অজানার লাগি গৃহকোণে আনতনয়ন
বুনিছে শয়ন।
সে যেন গো কাকচক্ষু স্বচ্ছ দিঘিজল
অচঞ্চল,
কানায় কানায় ভরা,
শীতল অতল-মাঝে প্রসন্ন কিরণ দেয় ধরা।
কালো চক্ষুপল্লবের কাছে
থমকিয়া আছে

স্তব্ধ ছায়া পাতি'
হাসির খেলার সাথী
সুগভীর স্নিগ্ধ অশ্রুবারি ;
যেন তাহা দেবতারি
করুণা-অঞ্জলি,—
নাম কি কাজলী ।

হেঁয়ালী

যারে সে বেসেছে ভালো তারে সে কাঁদায় ।
নূতন ধাঁধায়
ক্ষণে ক্ষণে চমকিয়া দেয় তারে,
কেবলি আলো-আঁধারে
সংশয় বাধায় ;
ছল-করা অভিমানে বৃথা সে সাধায় ।
সে কি শরতের মায়া
উড়ো মেঘে নিয়ে আসে বৃষ্টিভরা ছায়া ।
অনুকূল চাহনির তলে
কী বিদ্যুৎ ঝলে ।
কেন দয়িতের মিনতিকে
অভাবিত উচ্চ হাস্যে উড়াইয়া দেয় দিকে দিকে ।
তার পরে আপনার নির্দয় লীলায়
আপনি সে ব্যথা পায়,
ফিরে যে গিয়েছে তারে ফিরায়ে ডাকিতে কাঁদে প্রাণ ;
আপনার অভিমানে করে খানখান ।
কেন তার চিত্তাকাশে সারা বেলা
পাগল হাওয়ার এই এলোমেলো খেলা ।
আপনি সে পারে না বুঝিতে
যেদিকে চলিতে চায় কেন তার চলে বিপরীতে ।
গভীর অন্তরে
যেন আপনার অগোচরে

আপনার সাথে তার কী আছে বিরোধ,
অন্যেরে আঘাত করে আত্মঘাতী ক্রোধ ;
মুহূর্তেই বিগলিত করুণায়
অপমানিতের পায়
প্রাণমন দেয় ঢালি,—
নাম কি হেঁয়ালী।

খেয়ালী

মধ্যাহ্নে বিজন বাতায়নে
সুদূর গগনে
কী দেখে সে ধানের খেতের পরপারে,—
নিরালা নদীর পথে দিগন্তে সবুজ অন্ধকারে
যেখানে কাঁঠাল জাম নারিকেল বেত
প্রসারিয়া চলেছে সংকেত
অজানা গ্রামের,
সুখ দুঃখ জন্ম মৃত্যু অখ্যাত নামের।
অপরাহ্ণে ছাদে বসি',
এলোচুল বুকে পড়ে খসি,
গ্রন্থ নিয়ে হাতে
উদাস হয়েছে মন সে-যে কোন্ কবিকল্পনাতে।
সুদূরের বেদনায়
অতীতের অশ্রুবাষ্প হৃদয়ে ঘনায়।
বীরের কাহিনী
না-দেখা জনের লাগি তারে যেন করে বিরহিণী।
পূর্ণিমানিশীথে
স্রোতে-ভাসা একা তরী যবে সকরুণ সারিগীতে
ছায়াঘন তীরে তীরে সুপ্তিতে স্বপ্নের ছবি আঁকে,
উৎসুক আকাঙ্ক্ষা জেগে থাকে

নিষুপ্ত প্রহরে,
অহৈতুক বারিবিন্দু ঝরে
আঁখিকোণে ;
যুগান্তরপার হতে কোন্ পুরাণের কথা শোনে।
ইচ্ছা করে সেই রাতে
লিপিখানি লেখে ভূর্জপাতে
লেখনীতে ভরি লয়ে দুঃখে-গলা কাজলের কালি,—
নাম কি খেয়ালী।

কাকলী

কলছন্দে পূর্ণ তার প্রাণ,—
নিত্য বহমান
ভাষার কল্লোলে
জাগাইয়া তোলে
চারিধারে
প্রত্যহের জড়তারে ;
সংগীতে তরঙ্গ তুলি,
হাসিতে ফেনিল তার ছোটো দিনগুলি
আঁখি তার কথা কয়, বাহুভঙ্গী কত কথা বলে,
চরণ যখন চলে
কথা কয়ে যায়—
যে-কথাটি অরণ্যের পাতায় পাতায়,
যে-কথাটি ঢেউ তোলে
আশ্বিনে ধানের খেতে— প্রান্ত হতে প্রান্তে যায় চলে,
যে-কথাটি নিশীথতিমিরে
তারায় তারায় কাঁপে অধীর ঝিমিরে,
যে-কথাটি মহুয়ার বনে
মধুপগুঞ্জনে
সারাবেলা উঠিছে চঞ্চলি,—
নাম কি কাকলী।

পিয়ালী

চাহনি তাহার, সব কোলাহল হ'লে সারা
সন্ধ্যার তিমিরে ভাসা তারা।
মৌনখানি সুমধুর মিনতিরে
লতায়ে লতায়ে যেন মনের চৌদিকে দেয় ঘিরে,
নির্বাক চাহিয়া থাকে নাহি পায় ভেবে
কেমন করিয়া কী-যে দেবে।
দুয়ার-বাহিরে
আসে ধীরে,
ক্ষণেক নীরব থেকে চলে যায় ফিরে।
নাও যদি কয় কথা
মনে যেন ভরি দেয় সুস্নিগ্ধ মমতা।
পায়ের চলায়
কিছু যেন দান করে ধূলির তলায়।
তারে কিছু করিলে জিজ্ঞাসা,
কিছু বলে, কিছু তবু বাকি থাকে ভাষা।
নিঃশব্দে খুলিয়া দ্বার
অঞ্চলে আড়াল করি সে যেন কাহার
আনিয়াছে সৌভাগ্যের থালি,—
নাম কি পিয়ালী।

দিয়ালী

জনতার মাঝে
দেখিতে পাই নে তারে, থাকে তুচ্ছ সাজে।
ললাটে ঘোমটা টানি
দিবসে লুকায়ে রাখে নয়নের বাণী।
রজনীর অন্ধকার
তুলে দেয় আবরণ তার।

রাজরানীবেশে
অনায়াসগৌরবের সিংহাসনে বসে মৃদু হেসে।
বক্ষে হার ঝলমলে,
সীমন্তে অলকে জ্বলে
মাণিক্যের সীঁথি।
কী যেন বিস্মৃতি
সহসা ঘুচিয়া যায়, টুটে দীনতার ছদ্মসীমা,
মনে পড়ে আপন মহিমা।
ভক্তেরে সে দেয় পুরস্কার
বরমাল্য তার
আপন সহস্র দীপ জ্বালি,—
নাম কি দিয়ালী।

নাগরী

ব্যঙ্গসুনিপুণা,
শ্লেষবাণসন্ধানদারুণা।
অনুগ্রহবর্ষণের মাঝে
বিদ্রূপবিদ্যুৎঘাত অকস্মাৎ মর্মে এসে বাজে।
সে যেন তুফান
যাহারে চঞ্চল করে সে-তরীকে করে খানখান
অট্টহাস্য আঘাতিয়া এপাশে ওপাশে ;
প্রশ্রয়ের বীথিকায় ঘাসে ঘাসে
রেখেছে সে কণ্টক-অঙ্কুর বুনে বুনে ;
অদৃশ্য আগুনে
কুঞ্জ তার বেড়িয়াছে ;
যারা আসে কাছে
সব থেকে তারা দূরে রয় ;

মোহমন্ত্রে যে-হৃদয়
করে জয়
তারি 'পরে অবজ্ঞায় দারুণ নির্দয়।
আপন তপস্যা লয়ে যে-পুরুষ নিশ্চল সদাই,
যে উহারে ফিরে চাহে নাই,
জানি সেই উদাসীন
একদিন
জিনিয়াছে ওরে,
জ্বালাময়ী তারি পায়ে দীপ্ত দীপ দিল অর্ঘ্য ভরে।
বিদুষী নিয়েছে বিদ্যা শুধু চিত্তে নয়,
আপন রূপের সাথে ছন্দ তারে দিল অঙ্গময়
বুদ্ধি তার ললাটিকা,
চক্ষুর তারায় বুদ্ধি জ্বলে দীপশিখা;
বিদ্যা দিয়ে রচে নাই পণ্ডিতের স্থূল অহংকার।
বিদ্যারে করেছে অলংকার।
প্রসাধনসাধনে চতুরা,
জানে সে ঢালিতে সুরা
ভূষণভঙ্গীতে,
অলক্তের আরক্ত ইঙ্গিতে।
জাদুকরী বচনে চলনে;
গোপন সে নাহি করে আপন ছলনে;
অকপট মিথ্যারে সে নানা রসে করিয়া মধুর
নিন্দা তার করি দেয় দূর;
জ্যোৎস্নার মতন
গোপনেও নহে সে গোপন।
আঁধার-আলোরি কোলে রয়েছে জাগরি,—
নাম কি নাগরী।

সাগরী

বাহিরে সে দুরন্ত আবেগে
উচ্ছলিয়া উঠে জেগে,—
উচ্চহাস্যতরঙ্গ সে হানে
সূর্যচন্দ্র-পানে।
পাঠায় অস্থির চোখ—
আলোকের উত্তরে আলোক।
কভু অন্ধকারপুঞ্জে দেখা দেয় ঝঞ্ঝার ভ্রূকুটি,
ক্ষণে ক্ষণে
আন্দোলনে
প্রচণ্ড অধৈর্যবেগে তটের মর্যাদা ফেলে টুটি।
গভীর অন্তর তার নিস্তব্ধ গম্ভীর,
কোথা তল, কোথা তীর;
অগাধ তপস্যা যেন রেখেছে সঞ্চিত করি,—
নাম কি সাগরী।

জয়ন্তী

যেন তার চক্ষু-মাঝে
উদ্যত বিরাজে
মহেশের তপোবনে নন্দীর তর্জনী।
ইন্দ্রের অশনি
মৌনে তার ঢাকা;
প্রাণ তার অরুণের পাখা
মেলিল দিনের বক্ষে তীব্র অতৃপ্তিতে
দুঃসহ দীপ্তিতে।
সাধক দাঁড়ায় তার কাছে—
সহসা সংশয় লাগে যোগ্যতা কি আছে;
দুঃসাধ্যসাধন-তরে
পথ খুঁজে মরে।

তুচ্ছতারে দাহে তার অবজ্ঞাদহন ;
এনেছে সে করিয়া বহন
ইন্দ্রাণীর গাঁথা মাল্য ; দিবে কণ্ঠে তার
কার্মুকে যে দিয়েছে টংকার,
কাপট্যেরে হানিয়াছে সত্যে যার ঋণী বসুমতী,—
নাম কি জয়ন্তী।

ঝামরী

সে যেন খসিয়া-পড়া তারা,
মর্ত্যের প্রদীপে নিল মৃত্তিকার কারা।
নগরে জনতামরু,
সে যেন তাহারি মাঝে পথপ্রান্তে সঙ্গিহীন তরু,
তারে ঢেকে আছে নিতি
অরণ্যের সুগভীর স্মৃতি।
সে যেন অকালে-ফোটা কুবলয়,
শিশিরে কুণ্ঠিত হয়ে রয়।
মন পাখা মেলিবারে চায়
চারিদিকে ঠেকে যায়,
জানে না কিসের বাধা তার ;
অদৃষ্টের মায়াদুর্গদ্বার
কোন্ রাজপুত্র এসে
মন্ত্রবলে ভেঙে দেবে শেষে।
আকাশে আলোতে
নিমন্ত্রণ আসে যেন কোথা হতে,
পথ রুদ্ধ চারিধারে,
মুখ ফুটে বলিতে না পারে
অলক্ষ্য কী আচ্ছাদনে কেন সে আবৃতা।
সে যেন অশোকবনে সীতা,

চারিদিকে যারা আছে কেহ তার নহেক স্বকীয় ;
কে তারে পাঠাবে অঙ্গুরীয়
বিচ্ছেদের অতল সমুদ্রপারে ;
আঁখি তুলে তাই বারে বারে
চেয়ে দেখে নিরুত্তর নিঃশব্দ গগনে।

কোন্ দেব নিত্যনির্বাসনে
পাঠাল তাহারে।
স্বর্গের বীণার তারে
সংগীতে কি করেছিল ভুল।
মহেন্দ্রের-দেওয়া ফুল
নৃত্যকালে খসে গেলে অন্যমনে দলেছিল কভু ?
আজো তবু
মন্দারের গন্ধ যেন আছে তার বিষাদে জড়ানো,
অধরে রয়েছে তার ম্লান—
সন্ধ্যার গোলাপসম—
মাঝখানে-ভেঙে-যাওয়া অমরার গীতি অনুপম।
অদৃশ্য যে-অশ্রুধারা
আবিষ্ট করেছে তার চক্ষুতারা,
তাহা দিব্য বেদনার করুণানির্ঝরী,—
নাম কি ঝামরী।

মুরতি

যে-শক্তির নিত্যলীলা নানা বর্ণে আঁকা,
যে-গুণী প্রজাপতির পাখা
যুগ যুগ ধ্যান করি একদা কী খনে
রচিল অপূর্ব চিত্রে বিচিত্র লিখনে,
এই নারী
রচনা তাহারি।

এ শুধু কালের খেলা
এর দেহ কী আলস্যে বিধাতা একেলা
রচিলেন সন্ধ্যাকালে
আপনার অর্থহীন ক্ষণিক খেয়ালে—
যে-লগনে
কর্মহীন ক্লান্তক্ষণে
মেঘের মহিমামায়া মুহূর্তেই মুগ্ধ করি আঁখি
অন্ধরাত্রে বিনা ক্ষোভে যায় মুখ ঢাকি।
শরতে নদীর জলে যে-ভঙ্গিমা,
বৈশাখে দাড়িম্ববনে যে-রাগরঙ্গিমা
যৌবনের দাপে
অবজ্ঞাকটাক্ষ হানে মধ্যাহ্নের তাপে,
শ্রাবণের বন্যাতলে হারা
ভেসে-যাওয়া শৈবালের যে-নৃত্যের ধারা,
মাঘশেষে অশ্বত্থের কচি পাতাগুলি
যে-চাঞ্চল্যে উঠে দুলি,
হেমন্তের প্রভাতবাতাসে
শিশিরে যে-ঝিলিমিলি ঘাসে ঘাসে,
প্রথম আষাঢ়দিনে গুরু গুরু রবে
ময়ূরের পুচ্ছপুঞ্জ উল্লসিয়া উঠে যে-গৌরবে
তাই দিয়ে রচিত সুন্দরী ;—
লতা যেন নারী হয়ে দিল চক্ষু ভরি।

রঙিন বুদ্‌বুদ সে কি, ইন্দ্রধনু বুঝি,
অন্তর না পাই খুঁজি—
সকলি বাহির,
চিত্ত অগভীর।
কারো পথ চেয়ে নাহি থাকে,
কারে-না-পাওয়ার দুঃখ মনে নাহি রাখে

মুগ্ধ প্রাণ-উপহার
অনায়াসে নেয়, আর অনায়াসে ভোলে দায় তার।
ভুবনে যেখানে যত নয়নের আনন্দলহরী
তাই দেখা দিতে এল নারীমূর্তি ধরি।
সরস্বতী রচিলেন মন তার কোন্ অবসরে
রাগহীন বাণীহীন গুঞ্জনের স্বরে;
অমৃতে মাটিতে মেশা সৃজনের এ কোন্ সুরতি,—
নাম কি মুরতি।

মালিনী

হাসিমুখ নিয়ে যায় ঘরে ঘরে,
সখীদের অবকাশ মধু দিয়ে ভরে।
প্রসন্নতা তার অন্তহীন
রাত্রিদিন
গভীর কী উৎস হতে
উচ্ছলিছে আলোঝলা কথাবলা স্রোতে।
মর্ত্যের ম্লানতা তারে
পারে নি তো স্পর্শ করিবারে।
প্রভাতে সে দেখা দিলে মনে হয় যেন সূর্যমুখী
রক্তারুণ উল্লাসে কৌতুকী।
মধ্যাহ্নের স্থলপদ্ম অমলিন রাগে
প্রফুল্ল সে সূর্যের সোহাগে,
সায়াহ্নের জুঁই সে-যে,
গন্ধে যার প্রদোষের শূন্যতায় বাঁশি ওঠে বেজে।
মৈত্রীসুধাময় চোখে
মাধুরী মিশায়ে দেয় সন্ধ্যাদীপালোকে।
রজনীগন্ধা সে রাতে, দেয় পরকাশি
আনন্দহিল্লোল রাশি রাশি;
সঙ্গহীন আঁধারের নৈরাশ্যক্ষালিনী,—
নাম কি মালিনী।

করুণী

তরুলতা
যে-ভাষায় কয় কথা
সে-ভাষা সে জানে,—
তৃণ তার পদক্ষেপ দয়া বলি মানে।
পুষ্পপল্লবের 'পরে তার আঁখি
অদৃশ্য প্রাণের হর্ষ দিয়ে যায় রাখি।
স্নেহ তার আকাশের আলোর মতন
কাননের অন্তরবেদন
দূর করিবার লাগি
নিত্য আছে জাগি।
শিশু হতে শিশুতর
গাছগুলি বোবা প্রাণে ভর-ভর;
বাতাসে বৃষ্টিতে
চঞ্চলিয়া জাগে তারা অর্থহীন গীতে,
ধরণীর যে-গভীরে চিররসধারা
সেইখানে তারা
কাঙাল প্রসারি ধরে তৃষিত অঞ্জলি,
বিশ্বের করুণারাশি শাখায় শাখায় উঠে ফলি;—
সে-তরুলতারি মতো স্নিগ্ধ প্রাণ তার;
শ্যামল উদার
সেবা যত্ন সরল শান্তিতে
ঘনচ্ছায়া বিস্তারিয়া আছে চারিভিতে;
তাহার মমতা
সকল প্রাণীর 'পরে বিছায়েছে স্নেহের সমতা;
পশু পাখি তার আপনার;
জীববৎসলার
স্নেহ ঝরে শিশু-'পরে, বনে যেন নত মেঘভার
ঢালে বারিধার।

তরুণ প্রাণের 'পরে করুণায় নিত্য সে তরুণী,—
নাম কি করুণী।

প্রতিমা

চতুর্দশী এল নেমে
পূর্ণিমার প্রান্তে এসে গেল থেমে।
অপূর্ণের ঈষৎ আভাসে
আপন বলিতে তারে মর্ত্যভূমি শঙ্কা নাহি বাসে।
এ ধরার নির্বাসনে
কুণ্ঠার গুণ্ঠন নাই, ভীরুতা নাইক তার মনে,
সংসারজনতা মাঝে
আপনাতে আপনি বিরাজে।
দুঃখে শোকে অবিচল, ধৈর্য তার প্রফুল্লতা-ভরা,
সকল উদ্বেগভারহরা।
রোগ যদি আসে রুখে
সকরুণ শান্ত হাসি লেগে থাকে গ্লানিহীন মুখে।
দুর্যোগ মেঘের মতো
নীচে দিয়ে বহে যায় কত
বারে বারে,
প্রভা তার মুছিতে না পারে।
তবু তার মহিমায় কিছু আছে বাকি,
সেইখানে রাখে ঢাকি
অশ্রুজল
বিষাদ-ইঙ্গিতে-ছোঁওয়া ঈষৎ বিহ্বল।
কণামাত্র সে-ক্ষীণতা
নাহি কহে কথা,
কেহ না দেখিতে পায়
নিত্য যারা ঘিরে আছে তায়।

অমরার অসীমতা মাটিতে নিয়েছে সীমা,—
নাম কি প্রতিমা।

নন্দিনী

প্রথম সৃষ্টির ছন্দখানি
অঙ্গে তার নক্ষত্রের নৃত্য দিল আনি।
বর্ষা-অন্তে ইন্দ্রধনু
মর্ত্যে নিল তনু।
দিগ্বধূর মায়াবী অঙ্গুলি
চঞ্চল চিন্তায় তার বুলায়েছে বর্ণ-আঁকা তুলি।
সরল তাহার হাসি, সুকুমার মুঠি
যেন শুভ্র কমলকলিকা ;
আঁখিদুটি
যেন কালো আলোকের সচকিত শিখা।
অবসাদবন্ধভাঙা মুক্তির সে ছবি,
সে আনিয়া দেয় চিত্তে
কলনৃত্যে
দুস্তর-প্রস্তর-ঠেলা ফেনোচ্ছল আনন্দজাহ্নবী।
বীণার তন্ত্রের মতো গতি তার সংগীতস্পন্দিনী,—
নাম কি নন্দিনী।

২৮ শ্রাবণ ১৩৩৫

উষসী

ভোরের আগের যে-প্রহরে
স্তব্ধ অন্ধকার-'পরে
সুপ্তি-অন্তরাল হতে দূর সূর্যোদয়
বনময়

পাঠায় নূতন জাগরণী,
অতি মৃদু শিহরণী
বাতাসের গায়ে ;
পাখির কুলায়ে
অস্পষ্ট কাকলি ওঠে আধোজাগা স্বরে,
স্তম্ভিত আগ্রহভরে
অব্যক্ত বিরাট আশা ধ্যানে মগ্ন দিকে দিগন্তরে,—
ও কোন্ তরুণ প্রাণে করিয়াছে ভর,
অন্তর্গূঢ় সে-প্রহর
আত্ম-অগোচর।
চিত্ত তার আপনার গভীর অন্তরে
নিঃশব্দে প্রতীক্ষা করে
পরিপূর্ণ সার্থকতা লাগি।
সুপ্তি-মাঝে প্রতীক্ষিয়া আছে জাগি
নির্মল নির্ভয়
কোন্ দিব্য অভ্যুদয়।
কোন্ সে পরমা মুক্তি, কোন্ সেই আপনার
দীপ্যমান মহা আবিষ্কার।
প্রভাতমহিমা ওর সম্বৃত রয়েছে নিশ্চেতনে,
তাহারি আভাস পাই মনে।
আমি ওই রথশব্দ শুনি,
সোনার বীণার তারে সংগীত আনিছে কোন্ গুণী।
জাগিবে হৃদয়,
ভুবন তাহার হবে বাণীময় ;
মানসকমল একমনা
নবোদিত তপনের করিবে প্রথম অভ্যর্থনা।
জাগিবে নূতন দিবা উজ্জ্বল উল্লাসে
বর্ণে গন্ধে গানে প্রাণে মহোৎসবে তার চারিপাশে।
নিরুদ্ধ চেতনা হতে হবে চ্যুত
লালসা-আবেশে জড়ীভূত
স্বপ্নের শৃঙ্খলপাশ।

বিলুপ্ত করিবে দূরে উন্মুক্ত বাতাস
দুর্বল দীপের গাঢ় বিষতপ্ত কলুষনিশ্বাস।
আলোকের জয়ধ্বনি উঠিবে উচ্ছ্বসি,—
নাম কি উষসী।

[শ্রাবণ ?-আশ্বিন ১৩৩৫]

ছায়ালোক

যেথায় তুমি গুণী জ্ঞানী, যেথায় তুমি মানী,
যেথায় তুমি তত্ত্ববিদের সেরা,
আমি সেথায় লুকিয়ে যেতে পথ পাব না জানি,
সেথায় তুমি লোকের ভিড়ে ঘেরা।
সেথায় তোমার বুদ্ধি সদাই জাগে,
চক্ষে তোমার আবেশ নাহি লাগে,
আমার ভীরু হৃদয় ছায়া মাগে,
তোমার সেথায় আলোক খরতর,
যখন সেথা চাহ আমার বাগে
সংকোচে প্রাণ কাঁপে থর থর।

মোহভাঙা দৃষ্টি তোমার যখন আঘাত হানে,
যায় নিখিলের রহস্যদ্বার টুটে,
এক নিমেষে অপরূপের রূপের মধ্যখানে
অস্ত্র যন্ত্র প্রকাশ পেয়ে উঠে।
বসুন্ধরার শ্যামল প্রাণের ঢাকা
রূঢ় পাথর গোপন ক'রে রাখা,
ভিতরে তার কতই আঁকাবাঁকা
কতকালের দাহন-ইতিহাসে,
ফাটলধরা কত-যে দাগ আঁকা
তোমার চোখে বাহির হয়ে আসে।

তেমনি করে যখন কভু আমার পানে চাবে
মর্ম্মভেদী কৌতূহলের আঁখি,
বিধাতা যা লুকান লাজে দেখতে-যে তাই পাবে
মোর রচনায় যা আছে তাঁর বাকি।
আমার মাঝে তোমার অগোচরে
আদিম যুগের গোপন গভীর স্তরে
অপূর্ণতা রয়েছে অন্তরে,
সৃষ্টি আমার অসমাপ্ত আছে,
সামনে এলে মরি-যে সেই ডরে
ভাঙাচোরা চক্ষে পড়ে পাছে।

তোমার প্রাণে কোনোখানে নাই কি মায়ার ঠাঁই
মত্ততাহীন তত্ত্বপরপারে,
যেথায় তীক্ষ্ণ চোখের কোনো প্রশ্ন জেগে নাই
অসতর্ক মুক্ত হৃদয়দ্বারে ?
যেথায় তুমি দৃষ্টিকর্ত্তা নহ,
সৃষ্টিকর্ত্তা সৃষ্টি লয়ে রহ,
যেথা নানা বর্ণের সংগ্রহ,
যেথা নানা মুর্ত্তিতে মন মাতে,
যেথা তোমার অতৃপ্ত আগ্রহ
আপনভোলা রসের রচনাতে।

সেথায় আমি যাব যখন চৈত্ররজনীতে
বনের বাণী হাওয়ায় নিরুদ্দেশা,
চাঁদের আলোয় ঘুম-হারানো পাখির কলগীতে
পথ-হারানো ফুলের রেণু মেশা।
দেখবে আমায় স্বপন-দেখা চোখে,
চমকে উঠে বলবে তুমি, ‘ও কে,

কোন্ দেবতার ছিল মানসলোকে,
এল আমার গানের ডাকে ডাকা'।
সে-রূপ আমার দেখবে ছায়ালোকে
যে-রূপ তোমার পরান দিয়ে আঁকা

৯ আশ্বিন ১৩৩৫

প্রচ্ছন্ন

বিদেশে ঐ সৌধশিখর-'পরে
ক্ষণকালের তরে
পথ হতে-যে দেখেছিলেম, ওগো আধেক-দেখা,
মনে হল তুমি অসীম একা
দাঁড়িয়েছিলে যেন আমার একটি বিজন বনে
আর কিছু নাই সেথায় ত্রিভুবনে।
সামনে তোমার মুক্ত আকাশ, অরণ্যতল নীচে,
ক্ষণে ক্ষণে ঝাউয়ের শাখা প্রলাপ মর্মরিছে।
মুখ দেখা না যায়,
পিঠের 'পরে বেণীটি লুটায়।
থামের পাশে হেলান-দেওয়া ঈষৎ দেখি আধখানি ঐ দেহ,
অসম্পূর্ণ কয়টি রেখায় কী যেন সন্দেহ।
বন্দিনী কি ভোগের কারাগারে,
ভাবনা তোমার উড়ে চলে দূর দিগন্তপারে?
সোনার বরন শস্যখেতে, কোন্-সে নদীতীরে
পুজারীদের চলার পথে, উচ্চচূড়া দেবতামন্দিরে
তোমার চিরপরিচিত প্রভাত-আলোখানি,
তারি স্মৃতি চক্ষে তোমার জল কি দিল আনি।

কিম্বা তুমি রাজেন্দ্রসোহাগী,
সেই বহুবল্লভের প্রেমে দ্বিধার দুঃখ হৃদয়ে রয় জাগি,

প্রশ্ন কি তাই শুধাও নক্ষত্রেরে
সপ্তঋষির কাছে তোমার প্রণামখানি সেরে।
হয়তো বৃথাই সাজ,
তৃপ্তিবিহীন চিত্ততলে তৃষ্ণা-অনল দহন করে আজো ;
তাই কি শূন্য আকাশ-পানে চাও,
উপেক্ষিত যৌবনেরি ধিক্কার জানাও ?

কিম্বা আছ চেয়ে
আসবে সে কোন্ দুঃসাহসী গোপন পন্থা বেয়ে,
বক্ষ তোমার দোলে,
রক্ত নাচে ত্রাসের উতরোলে।
স্তব্ধ আছে তরুশ্রেণী মরণছায়া-ঢাকা,
শূন্যে ওড়ে অদৃশ্য কোন্ পাখা।
আমি পথিক যাব-যে কোন্ দূরে ;
তুমি রাজার পুরে
মাঝে-মাঝে কাজের অবসরে
বাহির হয়ে আসবে হোথায় ঐ অলিন্দ-'পরে,
দেখবে চেয়ে অকারণে স্তব্ধ নেত্রপাতে
গোধূলিবেলাতে
বনের সবুজ তরঙ্গ পারায়ে
নদীর প্রান্তরেখায় যে-পথ গিয়েছে হারায়ে।
তোমার ইচ্ছা চলবে কল্পনাতে
সুদূর পথে আভাসরূপী সেই অজানার সাথে
পান্থ যে-জন নিত্য চলে যায়।
আমি পথিক হায়,
পিছন-পানে এই বিদেশের সুদূর সৌধশিরে
ইচ্ছা আমার পাঠাই ফিরে ফিরে
ছায়ায়-ঢাকা আধেক-দেখা তোমার বাতায়নে,
যে-মুখ তোমার লুকিয়ে ছিল সে-মুখ আঁকি মনে।

১০ আশ্বিন ১৩৩৫

দর্পণ

দর্পণ লইয়া তারে কী প্রশ্ন শুধাও একমনে
হে সুন্দরী, কী সংশয় জাগে তব উদ্বিগ্ন নয়নে।
নিজেরে দেখিতে চাও বাহিরে রাখিয়া আপনারে
যেন আর কারো চোখে ; আর কারো জীবনের দ্বারে
খুঁজিছ আপন স্থান। প্রেমের অর্ঘ্যের কোনো ত্রুটি
দেখ কি মুখের কোনোখানে। তাই তব আঁখিদুটি
নিজেরে কি করিছে ভর্ৎসনা। সাজায়ে লইয়া সর্বদেহে
স্বর্গের গর্বের ধন, তবে যেতে চাও তার গেহে ?
জান না কি হে রমণী, দর্পণে যা দেখিছ তা ছায়া,
পার না রচিতে কভু তাই দিয়ে চিরস্থায়ী মায়া।
তিলোত্তমা অনুপমা সুরেন্দ্রের প্রমোদপ্রাঙ্গণে
কঙ্কণঝংকারে আর নৃত্যলোল নূপুরনিক্বণে
নাচিয়া বাহিরে চলে যায়। লয়ে আত্মনিবেদন
গৌরবে জিনিলা শচী ইন্দ্রলোকে নন্দন-আসন।

১৫ আশ্বিন ১৩৩৫

ভাবিনী

ভাবিছ যে-ভাবনা একা-একা
দুয়ারে বসি চুপে চুপে,
সে যদি সম্মুখে দিত দেখা
মূর্তি ধরি কোনো রূপে—
হয়তো দেখিতাম শুকতারা
দিবস পার হয়ে দিশাহারা
এসেছে সন্ধ্যার কিনারাতে
সাঁঝের তারাদের দলে,
উদাস স্মৃতিভরা আঁখিপাতে
উষার হিমকণা জ্বলে।

হয়তো দেখিতাম বাদলে যে
শ্রাবণে এনেছিল বাণী
শরতে জলভার এল ত্যেজে
শুভ্র সেই মেঘখানি।
চলে সে সন্ন্যাসী দিশে দিশে
রবির আলোকের পিয়াসী সে,
আকাশ আপনারি লিপি লিখে
পড়িতে দিল যেন তারে,
সে তাই চেয়ে চেয়ে অনিমিখে
বুঝিতে বুঝি নাহি পারে।

হয়তো দেখিতাম রজনীতে
সে যেন সুরহারা বীণা
বিজন দীপহীন দেহলিতে
মৌন-মাঝে আছে লীনা।
একদা বেজেছিল যে-রাগিণী
তারে সে ফিরে যেন নিল চিনি
তারার কিরণের কম্পনে
নীরব আকাশের মাঝে,
সুদূর সুরসভা-অঙ্গনে
সুরের স্মৃতি যেথা বাজে।

১৫ আশ্বিন ১৩৩৫

একাকী

চন্দ্রমা আকাশতলে পরম একাকী,—
আপন নিঃশব্দ গানে আপনারি শূন্য দিল ঢাকি।
অয়ি একাকিনী,
অলিন্দে নিশীথরাত্রে শুনিছ সে জ্যোৎস্নার রাগিণী
চেয়ে শূন্যপানে,

যে-রাগিণী অসীমের উৎস হতে আনে
অনাদি বিরহরস, তাই দিয়ে ভরিয়া আঁধার
কোন্ বিশ্ববেদনার মহেশ্বরে দেয় উপহার।
তারি সাথে মিলায়েছ তব দৃষ্টিখানি,
চোখে অনির্বচনীয় বাণী,
মিলায়েছ যেন তব জন্মান্তর হতে নিয়ে আসা
দীর্ঘনিশ্বাসের ভাষা।
মিলায়েছ, সুগম্ভীর দুঃখের মাঝারে
যে-মুক্তি রয়েছে লীন বন্ধহীন শান্ত অন্ধকারে।
অরণ্যে অরণ্যে আজি সাগরে সাগরে,
জনশূন্য তুষারশিখরে
কোন্ মহাশ্বেতা, কোন্ তপস্বিনী বিছাল অঞ্চল,
স্তব্ধ অচঞ্চল,
অনন্তেরে সম্বোধিয়া কহিল সে ঊর্ধ্বে তুলি আঁখি,—
তুমিও একাকী।

১৮ আশ্বিন ১৩৩৫

আশীর্বাদ

জ্বলিল অরুণরশ্মি আজি ওই তরুণ প্রভাতে
হে নবীনা, নবরাগরক্তিম শোভাতে
সীমন্তে সিন্দুরবিন্দু তব
জ্যোতি আজি পেল অভিনব,
চেলাঞ্চলে উদ্ভাসিল অন্তরের দীপ্যমান প্রভা,
শরমের বৃন্তে তুমি আনন্দের বিকশিত জবা।

সাহানা রাগিণীরসে জড়িত আজি এ পুণ্যতিথি,
তোমার ভুবনে আসে পরম অতিথি।
আনো আনো মাঙ্গল্যের ভার,
দাও বধূ, খুলে দাও দ্বার,

তোমার অঙ্গনে হেরো সগৌরবে ওই রথ আসে,
সেই বার্তা আজি বুঝি উদ্ঘোষিল আকাশে বাতাসে।

নবীন জীবনে তব নববিশ্ব রচনার ভাষা
আজি বুঝি পূর্ণ হল লয়ে নব আশা।
সৃষ্টির সে আনন্দ-উৎসবে
তব শ্রেষ্ঠধন দিতে হবে,
সেই সৃষ্টিসাধনায় আপনি করিবে আবিষ্কার
তোমার আপনা-মাঝে লুকানো যে ঐশ্বর্যভাণ্ডার।

পথ কে দেখাল এই পথিকেরে তাহা আমি জানি,
ওই চক্ষুতারা তারে দ্বারে দিল আনি।
যে-সুর নিভৃতে ছিল প্রাণে
কেমনে তা শুনেছিল কানে,
তোমার হৃদয়কুঞ্জে যে-ফুল ছায়ায় ছিল ফুটে
তাহার অমৃতগন্ধ গিয়েছিল বন্ধ তার টুটে।

যদি পারিতাম আজি অলকার দ্বারীরে ভুলায়ে
হরিয়া অমূল্য মণি অলকেতে দিতাম দুলায়ে।
তবু মোর মন মোরে কহে
সে-দান তোমার যোগ্য নহে,
তোমার কমলবনে দিব আনি রবির প্রসাদ,
তোমার মিলনক্ষণে সঁপিব কবির আশীর্বাদ।

আশ্বিন ? ১৩৩৫

নববধূ

চলেছে উজান ঠেলি তরণী তোমার,
দিক্‌প্রান্তে নামে অন্ধকার।
কোন্ গ্রামে যাবে তুমি, কোন্ ঘাটে হে বধূবেশিনী,
ওগো বিদেশিনী।
উৎসবের বাঁশিখানি কেন-যে কে জানে
ভরেছে দিনান্তবেলা ম্লান মূলতানে,
তোমারে পরাল সাজ মিলি সখীদল
গোপনে মুছিয়া চক্ষুজল।

মৃদুস্রোত নদীখানি ক্ষীণ কলকলে
স্তিমিত বাতাসে যেন বলে—
'কত বধূ গিয়েছিল কতকাল এই স্রোত বাহি
তীরপানে চাহি।
ভাগ্যের বিধাতা কোনো কহেন নি কথা,
নিস্তব্ধ ছিলেন চেয়ে লজ্জাভয়ে নতা
তরুণী কন্যার পানে, তরী 'পরে ছিলেন গোপনে
তরণীর কাণ্ডারীর সনে।'

কোন্ টানে জানা হতে অজানায় চলে
আধো হাসি আধো অশ্রুজলে!
ঘর ছেড়ে দিয়ে তবে ঘরখানি পেতে হয় তারে
অচেনার ধারে।
ওপারের গ্রাম দেখো আছে ঐ চেয়ে,
বেলা ফুরাবার আগে চলো তরী বেয়ে,
ওই ঘাটে কত বধূ কত শত বর্ষ বর্ষ ধরি
ভিড়ায়েছে ভাগ্যভীরু তরী

জনে জনে রচি গেল কালের কাহিনী,
অনিত্যের নিত্যপ্রবাহিনী।
জীবনের ইতিবৃত্তে নামহীন কর্ম-উপহার
রেখে গেল তার।
আপনার প্রাণসূত্রে যুগ যুগান্তর
গেঁথে গেঁথে চলে গেল না রাখি স্বাক্ষর,
ব্যথা যদি পেয়ে থাকে না রহিল কোনো তার ক্ষত,
লভিল মৃত্যুর সদাব্রত।

তাই আজি গোধূলির নিস্তব্ধ আকাশ
পথে তব বিছাল আশ্বাস।
কহিল সে কানে কানে, প্রাণ দিয়ে ভরা যার বুক
সেই তার সুখ।
রয়েছে কঠোর দুঃখ রয়েছে বিচ্ছেদ,
তবু দিন পূর্ণ হবে, রহিবে না খেদ
যদি বলে যাও বধূ, 'আলো দিয়ে জ্বেলেছিনু আলো,
সব দিয়ে বেসেছিনু ভালো।'

১৯ আশ্বিন ১৩৩৫

পরিণয়

শুভখন আসে সহসা আলোক জ্বেলে,
মিলনের সুধা পরম ভাগ্যে মেলে।
একার ভিতরে একের দেখা না পাই,
দুজনার যোগে পরম একের ঠাঁই,
সে-একের মাঝে আপনারে খুঁজে পেলে।

আপনারে দান সেই তো চরম দান,
আকাশে আকাশে তারি লাগি আহ্বান।

ফুলবনে তাই রূপের তুফান লাগে,
নিশীথে তারায় আলোর ধেয়ান জাগে,
উদয়সূর্য গাহে জাগরণী গান।

নীরবে গোপনে মর্ত্যভুবন-'পরে
অমরাবতীর সুরসুরধুনী ঝরে।
যখনি হৃদয়ে পশিল তাহার ধারা
নিজেরে জানিলে সীমার বাঁধন হারা,
স্বর্গের দীপ জ্বলিল মাটির ঘরে।

আজি বসন্ত চিরবসন্ত হ'ক
চিরসুন্দরে মজুক তোমার চোখ।
প্রেমের শান্তি চিরশান্তির বাণী
জীবনের ব্রতে দিনে রাতে দিক আনি,
সংসারে তব নামুক অমৃতলোক।

আশ্বিন ? ১৩৩৫

মিলন

সৃষ্টির প্রাঙ্গণে দেখি বসন্তে অরণ্যে ফুলে ফুলে
দুটিরে মিলানো নিয়ে খেলা।
রেণুলিপি বহি বায়ু প্রশ্ন করে মুকুলে মুকুলে
কবে হবে ফুটিবার বেলা।
তাই নিয়ে বর্ণচ্ছটা, চঞ্চলতা শাখায় শাখায়,
সুন্দরের ছন্দ বহে প্রজাপতি পাখায় পাখায়,
পাখির সংগীত সাথে বন হতে বনান্তরে ধায়
উচ্ছ্বসিত উৎসবের মেলা।

সৃষ্টির সে-রঙ্গ আজি দেখি মানবের লোকালয়ে
দুজনায় গ্রন্থির বাঁধন।
অপূর্ব জীবন তাহে জাগিবে বিচিত্র রূপ লয়ে
বিধাতার আপন সাধন।
ছেড়েছে সকল কাজ, রঙিন বসনে ওরা সেজে
চলেছে প্রান্তর বেয়ে, পথে পথে বাঁশি চলে বেজে,
পুরানো সংসার হতে জীর্ণতার সব চিহ্ন মেজে
রচিল নবীন আচ্ছাদন।

যাহা সবচেয়ে সত্য সবচেয়ে খেলা যেন তাই,
যেন সে ফাল্গুনকলোল্লাস।
যেন তাহা নিঃসংশয়, মর্তের ম্লানতা যেন নাই,
দেবতার যেন সে উচ্ছ্বাস।
সহজে মিশেছে তাই আত্মভোলা মানুষের সনে
আকাশের আলো আজি গোধূলির রক্তিম লগনে,
বিশ্বের রহস্যলীলা মানুষের উৎসবপ্রাঙ্গণে
লভিয়াছে আপন প্রকাশ।

বাজা তোরা বাজা বাঁশি, মৃদঙ্গ উঠুক তালে মেতে
দুরন্ত নাচের নেশা পাওয়া।
নদীপ্রান্তে তরুগুলি ঐ দেখ্‌ আছে কান পেতে,
ঐ সূর্য চাহে শেষ চাওয়া।
নিবি তোরা তীর্থবারি সে-অনাদি উৎসের প্রবাহে
অনন্তকালের বক্ষ নিমগ্ন করিতে যাহা চাহে
বর্ণে গন্ধে রূপে রসে, তরঙ্গিত সংগীত উৎসাহে
জাগায় প্রাণের মত্ত হাওয়া।

সহস্র দিনের মাঝে আজিকার এই দিনখানি
হয়েছে স্বতন্ত্র চিরন্তন।
তুচ্ছতার বেড়া হতে মুক্তি তারে কে দিয়েছে আনি
প্রত্যহের ছিঁড়েছে বন্ধন।
প্রাণদেবতার হাতে জয়টিকা পরেছে সে ভালে,
সূর্যতারকার সাথে স্থান সে পেয়েছে সমকালে,
সৃষ্টির প্রথম বাণী যে-প্রত্যাশা আকাশে জাগালে
তাই এল করিয়া বহন।

২০ আশ্বিন ১৩৩৫

বন্দিনী

তুমি বনের পুব পবনের সাথী,
বাদল মেঘের পথে তোমার ডানার মাতামাতি।
ওগো পাখি, বাঁধনহারা পাখি,
খাঁচার কোণে এই বিজনে আপন মনে থাকি।
হায় অজানা, জানি না সে
উধাও তুমি কোন্ আকাশে,
কোন্ তমালের কাননতলে মধ্যদিনের তাপে
বনচ্ছায়ার শিরায় শিরায় তোমারি সুর কাঁপে।

কোন্ রঙনে রঙিন তোমার পাখা?
তোমার সোনার বরনখানি ভাবনাতে মোর আঁকা।
ওগো পাখি, বাঁধনহারা পাখি,
মুক্তরূপের ধ্যানের ছায়ায় মগ্ন আমার আঁখি।
বন্দী মনের বদ্ধ ডানা,
চতুর্দিকে কঠোর মানা,
তোমার সাথে উড়ে চলার মিলন মাগি মনে,—
শূন্যে সদাই গান ফেরে তাই অসীম অন্বেষণে।

গান গাওয়া মোর সেই মিলনের খেলা,
তোমার গানের ছন্দে আমার স্বপন পাখা মেলা।
ওগো পাখি, বাঁধনহারা পাখি,
মনে মনে তোমায় পরাই গানের গাঁথন রাখি।
আজি আমার সুরের মাঝে
দূরের ডানার শব্দ বাজে,
মেঘের পথিক গানে আমার এল প্রাণের কূলে,
বিরহেরি আকাশতলে নিল আমায় তুলে।

গানের হাওয়ায় নিকট মিলায় দূরে—
দূর আসে সেই হাওয়ায় প্রাণের নিকট অন্তঃপুরে।
ওগো পাখি, বাঁধনহারা পাখি,
তোমার গানের মরীচিকায় শূন্য যে দাও ঢাকি।
বাঁধনে তাই জাদু লাগে,
বীণার তারে মূর্তি জাগে,
রাগিণীতে মুক্তি সে দেয়, ওগো আমার দূর,
তোমার দেওয়া না-শোনা গান বাঁধে যে তার সুর।

৫ কার্তিক ১৩৩৫

গুপ্তধন

আরো কিছুখন না-হয় বসিয়ো পাশে,
আরো যদি কিছু কথা থাকে তাই বলো।
শরৎ-আকাশ হেরো ম্লান হয়ে আসে,
বাষ্প-আভাসে দিগন্ত ছলোছলো।
জানি তুমি কিছু চেয়েছিলে দেখিবারে,
তাই তো প্রভাতে এসেছিলে মোর দ্বারে,

দিন না ফুরাতে দেখিতে পেলে কি তারে
হে পথিক বলো বলো,—
সে মোর অগম অন্তর-পারাবারে
রক্তকমল তরঙ্গে টলোমলো।

দ্বিধাভরে আজো প্রবেশ কর নি ঘরে,
বাহির-আঙনে করিলে সুরের খেলা,
জানি না কী নিয়ে যাবে-যে দেশান্তরে,
হে অতিথি, আজি শেষবিদায়ের বেলা।
প্রথম প্রভাতে সব কাজ তব ফেলে
যে-গভীর বাণী শুনিবারে কাছে এলে,
কোনোখানে কিছু ইশারা কি তার পেলে
হে পথিক, বলো বলো,—
সে-বাণী আপন গোপন প্রদীপ জ্বেলে
রক্ত-আগুনে প্রাণে মোর জ্বলোজ্বলো।

১৪ কার্তিক ১৩৩৫

প্রত্যাগত

দূরে গিয়েছিলে চলি ; বসন্তের আনন্দভাণ্ডার
তখনো হয় নি নিঃস্ব ; আমার বরণপুষ্পহার
তখনো অম্লান ছিল ললাটে তোমার। হে অধীর,
কোন্ অলিখিত লিপি দক্ষিণের উদ্ভ্রান্ত সমীর
এনেছিল চিত্তে তব। তুমি গেলে বাঁশি লয়ে হাতে,
ফিরে দেখ নাই চেয়ে আমি বসে আপন বীণাতে
বাঁধিতেছিলাম সুর গুঞ্জরিয়া বসন্তপঞ্চমে ;
আমার অঙ্গনতলে আলো আর ছায়ার সংগমে
কম্পমান আম্রতরু করেছিল চাঞ্চল্য বিস্তার
সৌরভবিহ্বল শুক্লরাতে। সেই কুঞ্জগৃহদ্বার

এতকাল মুক্ত ছিল। প্রতিদিন মোর দেহলিতে
আঁকিয়াছি আলিপনা। প্রতিসন্ধ্যা বরণডালিতে
গন্ধতৈলে জ্বালায়েছি দীপ। আজি কতকাল পরে
যাত্রা তব হল অবসান। হেথা ফিরিবার তরে
হেথা হতে গিয়েছিলে। হে পথিক, ছিল এ-লিখন—
আমারে আড়াল করে আমারে করিবে অন্বেষণ;
সুদূরের পথ দিয়ে নিকটেরে লাভ করিবারে
আহ্বান লভিয়াছিলে সখা। আমার প্রাঙ্গণদ্বারে
যে-পথ করিলে শুরু সে-পথের এখানেই শেষ।
হে বন্ধু, কোরো না লজ্জা, মোর মনে নাই ক্ষোভলেশ,
নাই অভিমানতাপ। করিব না ভর্ৎসনা তোমায়;
গভীর বিচ্ছেদ আজি ভরিয়াছি অসীম ক্ষমায়।
আমি আজি নবতর বধূ; আজি শুভদৃষ্টি তব
বিরহগুণ্ঠনতলে দেখে যেন মোরে অভিনব
অপূর্ব আনন্দরূপে, আজি যেন সকল সন্ধান
প্রভাতে নক্ষত্রসম শুভ্রতায় লভে অবসান।
আজি বাজিবে না বাঁশি, জ্বলিবে না প্রদীপের মালা,
পরিব না রক্তাম্বর; আজিকার উৎসব নিরালা
সর্ব-আভরণহীন। আকাশেতে প্রতিপদ-চাঁদ
কৃষ্ণপক্ষ পার হয়ে পূর্ণতার প্রথম প্রসাদ
লভিয়াছে। দিক্‌প্রান্তে তারি ওই ক্ষীণ নম্র কলা
নীরবে বলুক আজি আমাদের সব কথা-বলা।

২৭ পৌষ ১৩৩৫

পুরাতন

যে-গান গাহিয়াছিনু কবেকার দক্ষিণ বাতাসে
সে-গান আমার কাছে কেন আজ ফিরে ফিরে আসে
শরতের অবসানে। সেদিনের সাহানার সুর
আজি অসময়ে এসে অকারণে করিছে বিধুর
মধ্যাহ্নের আকাশেরে; দিগন্তের অরণ্যরেখায়
দূর অতীতের বাণী লিপ্ত আছে অস্পষ্ট লেখায়,
তাহারে ফুটাতে চাহে। পথভ্রান্ত করুণ গুঞ্জনে
মধু আহরিতে ফিরে, সেদিনের অকৃপণ বনে
যে-চামেলিবল্লী ছিল তারি শূন্য দানসত্র হতে।
ছায়াতে যা লীন হল তারে খোঁজে নিষ্ঠুর আলোতে।
শীতরিক্ত শাখা ছেড়ে পাখি গেছে সিন্ধুপারে চলি,
তারি কুলায়ের কাছে সে-কালের বিস্মৃত কাকলি
বৃথাই জাগাতে আসে। যে-তারকা অস্তে গেল দূরে
তাহারি স্পন্দন ও-যে ধরিয়া এনেছে নিজ সুরে।

পৌষ ? ১৩৩৫

ছায়া

আঁখি চাহে তব মুখ-পানে,
তোমারে জেনেও নাহি জানে।
কিসের নিবিড় ছায়া
নিয়েছে স্বপনকায়া
তোমার মর্মের মাঝখানে।

হাসি কাঁপে অধরের শেষে
দূরতর অশ্রুর আবেশে।

বসন্তকূজিত রাতে
তোমার বাণীর সাথে
অশ্রুত কাহার বাণী মেশে।

মনে তব গুপ্ত কোন্ নীড়ে
অব্যক্ত ভাবনা এসে ভিড়ে।
বসন্তপঞ্চম রাগে
বিচ্ছেদের ব্যথা লাগে
সুগভীর ভৈরবীর মীড়ে।

তোমার শ্রাবণপূর্ণিমাতে
বাদল রয়েছে সাথে সাথে।
হে করুণ ইন্দ্রধনু,
তোমার মানসী তনু
জন্ম নিল আলোতে ছায়াতে।

অদৃশ্যের বরণের ডালা,
প্রচ্ছন্ন প্রদীপ তাহে জ্বালা।
মিলন নিকুঞ্জতলে
দিয়েছ আমার গলে
বিরহের সূত্রে গাঁথা মালা।

তব দানে ওগো আনমনা,
দিয়ো মোরে তোমার বেদনা।
যে-বন কুয়াশাছাওয়া
ঝরা ফুল সেথা পাওয়া,
থাক্ তাহে শিশিরের কণা।

৫ ভাদ্র ১৩৩৬

বাসরঘর

তোমারে ছাড়িয়া যেতে হবে
রাত্রি যবে
উঠিবে উন্মনা হয়ে প্রভাতের রথচক্ররবে।
হায় রে বাসরঘর,
বিরাট বাহির সে যে বিচ্ছেদের দস্যু ভয়ংকর।
তবু সে যতই ভাঙেচোরে
মালাবদলের হার যত দেয় ছিন্ন ছিন্ন করে,
তুমি আছ ক্ষয়হীন
অনুদিন ;
তোমার উৎসব
বিচ্ছিন্ন না হয় কভু, না হয় নীরব।
কে বলে তোমারে ছেড়ে গিয়েছে যুগল
শূন্য করি তব শয্যাতল।
যায় নাই, যায় নাই,
নব নব যাত্রীমাঝে ফিরে ফিরে আসিছে তারাই
তোমার আহ্বানে
উদার তোমার দ্বার-পানে।
হে বাসরঘর,
বিশ্বে প্রেম মৃত্যুহীন, তুমিও অমর।

[আষাঢ় ১৩৩৫
বাঙ্গালোর]

বিচ্ছেদ

রাত্রি যবে সাঙ্গ হল, দূরে চলিবারে
দাঁড়াইলে দ্বারে।
আমার কণ্ঠের যত গান
করিলাম দান।

তুমি হাসি
মোর হাতে দিলে তব বিরহের বাঁশি।
তার পরদিন হতে
বসন্তে শরতে
আকাশে বাতাসে উঠে খেদ,
কেঁদে কেঁদে ফিরে বিশ্বে বাঁশি আর গানের বিচ্ছেদ

আষাঢ় ১৩৩৫
বাঙ্গালোর

বিদায়

কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও।
তারি রথ নিত্যই উধাও
জাগাইছে অন্তরীক্ষে হৃদয়স্পন্দন,
চক্রে-পিষ্ট আঁধারের বক্ষ-ফাটা তারার ক্রন্দন

ওগো বন্ধু, সেই ধাবমান কাল
জড়ায়ে ধরিল মোরে ফেলি তার জাল,—
তুলে নিল দ্রুতরথে
দুঃসাহসী ভ্রমণের পথে
তোমা হতে বহুদূরে।
মনে হয় অজস্র মৃত্যুরে
পার হয়ে আসিলাম
আজি নবপ্রভাতের শিখরচূড়ায়,
রথের চঞ্চল বেগ হাওয়ায় উড়ায়
আমার পুরানো নাম।

ফিরিবার পথ নাহি ;
দূর হতে যদি দেখ চাহি
পারিবে না চিনিতে আমায়।
হে বন্ধু, বিদায়।

কোনোদিন কর্মহীন পূর্ণ অবকাশে,
বসন্তবাতাসে
অতীতের তীর হতে যে-রাত্রে বহিবে দীর্ঘশ্বাস,
ঝরা বকুলের কান্না ব্যথিবে আকাশ,
সেইক্ষণে খুঁজে দেখো, কিছু মোর পিছে রহিল সে
তোমার প্রাণের প্রান্তে ; বিস্মৃতপ্রদোষে
হয়তো দিবে সে জ্যোতি,
হয়তো ধরিবে কভু নামহারা স্বপ্নের মুরতি।
তবু সে তো স্বপ্ন নয়,
সব-চেয়ে সত্য মোর, সেই মৃত্যুঞ্জয়,
সে আমার প্রেম।
তারে আমি রাখিয়া এলেম
অপরিবর্তন অর্ঘ্য তোমার উদ্দেশে
পরিবর্তনের স্রোতে আমি যাই ভেসে
কালের যাত্রায়।
হে বন্ধু, বিদায়।

তোমার হয় নি কোনো ক্ষতি
মর্ত্যের মৃত্তিকা মোর, তাই দিয়ে অমৃত-মুরতি
যদি সৃষ্টি করে থাক, তাহারি আরতি
হ'ক তব সন্ধ্যাবেলা।
পূজার সে-খেলা
ব্যাঘাত পাবে না মোর প্রত্যহের ম্লানস্পর্শ লেগে ;
তৃষার্ত আবেগবেগে
ভ্রষ্ট নাহি হবে তার কোনো ফুল নৈবেদ্যের থালে।

তোমার মানসভোজে সযত্নে সাজালে
যে ভাবরসের পাত্র বাণীর তৃষায়,
তার সাথে দিব না মিশায়ে
যা মোর ধূলির ধন, যা মোর চক্ষের জলে ভিজে
আজো তুমি নিজে
হয়তো বা করিবে রচন
মোর স্মৃতিটুকু দিয়ে স্বপ্নাবিষ্ট তোমার বচন।
ভার তার না রহিবে, না রহিবে দায়।
হে বন্ধু, বিদায়।

মোর লাগি করিয়ো না শোক,
আমার রয়েছে কর্ম, আমার রয়েছে বিশ্বলোক।
মোর পাত্র রিক্ত হয় নাই,
শূন্যেরে করিব পূর্ণ, এই ব্রত বহিব সদাই।
উৎকণ্ঠ আমার লাগি কেহ যদি প্রতীক্ষিয়া থাকে
সে-ই ধন্য করিবে আমাকে।
শুক্লপক্ষ হতে আনি
রজনীগন্ধার বৃন্তখানি
যে পারে সাজাতে
অর্ঘ্যথালা কৃষ্ণপক্ষ রাতে,
যে আমারে দেখিবারে পায়
অসীম ক্ষমায়
ভালোমন্দ মিলায়ে সকলি,
এবার পূজায় তারি আপনারে দিতে চাই বলি।
তোমারে যা দিয়েছিনু, তার
পেয়েছ নিঃশেষ অধিকার।
হেথা মোর তিলে তিলে দান,
করুণ মুহূর্তগুলি গণ্ডূষ ভরিয়া করে পান
হৃদয়-অঞ্জলি হতে মম।

ওগো তুমি নিরুপম,
হে ঐশ্বর্যবান,
তোমারে যা দিয়েছিনু সে তোমারি দান ;
গ্রহণ করেছ যত ঋণী তত করেছ আমায়।
হে বন্ধু, বিদায়।

২৫ জুন ১৯২৮
ব্যালাক্রয়ি। বাঙ্গালোর

প্রণতি

কত ধৈর্য ধরি
ছিলে কাছে দিবসশর্বরী।
তব পদ-অঙ্কনগুলিরে
কতবার দিয়ে গেছ মোর ভাগ্যপথের ধূলিরে।
আজ যবে
দূরে যেতে হবে
তোমারে করিয়া যাব দান
তব জয়গান।

কতবার ব্যর্থ আয়োজনে
এ জীবনে
হোমাগ্নি উঠে নি জ্বলি,
শূন্যে গেছে চলি
হতাশ্বাস ধূমের কুণ্ডলী।
কতবার ক্ষণিকের শিখা
আঁকিয়াছে ক্ষীণ টিকা
নিশ্চেতন নিশীথের ভালে।
লুপ্ত হয়ে গেছে তাহা চিহ্নহীন কালে।

এবার তোমার আগমন
হোমহুতাশন
জ্বেলেছে গৌরবে।
যজ্ঞ মোর ধন্য হবে।
আমার আহুতি দিনশেষে
করিলাম সমর্পণ তোমার উদ্দেশে।

লহো এ প্রণাম—
জীবনের পূর্ণ পরিণাম।
এ প্রণতি-'পরে
স্পর্শ রাখো স্নেহভরে।
তোমার ঐশ্বর্য-মাঝে
সিংহাসন যেথায় বিরাজে,
করিয়ো আহ্বান,
সেথা এ প্রণতি মোর পায় যেন স্থান

[আষাঢ় ১৩৩৫
বাঙ্গালোর]

নৈবেদ্য

তোমারে দিই নি সুখ, মুক্তির নৈবেদ্য গেনু রাখি
রজনীর শুভ্র অবসানে; কিছু আর নাহি বাকি,
নাইকো প্রার্থনা, নাই প্রতি মুহূর্তের দৈন্যরাশি,
নাই অভিমান, নাই দীনকান্না, নাই গর্বহাসি,
নাই পিছে ফিরে দেখা। শুধু সে মুক্তির ডালিখানি
ভরিয়া দিলাম আজি আমার মহৎ মৃত্যু আনি।

[আষাঢ় ১৩৩৫
বাঙ্গালোর]

অশ্রু

সুন্দর, তুমি চক্ষু ভরিয়া
এনেছ অশ্রুজল।
এনেছ তোমার বক্ষে ধরিয়া
দুঃসহ হোমানল।
দুঃখ যে তাই উজ্জ্বল হয়ে উঠে,
মুগ্ধ প্রাণের আবেশবন্ধ টুটে,
এ তাপে শ্বসিয়া উঠে বিকশিয়া
বিচ্ছেদশতদল।

[আষাঢ় ১৩৩৫
বাঙ্গালোর]

অন্তর্ধান

তব অন্তর্ধানপটে হেরি তব রূপ চিরন্তন।
অন্তরে অলক্ষ্যলোকে তোমার পরম-আগমন।
লভিলাম চিরস্পর্শমণি ;
তোমার শূন্যতা তুমি পরিপূর্ণ করেছ আপনি।

জীবন আঁধার হল, সেইক্ষণে পাইনু সন্ধান
সন্ধ্যার দেউলদীপ, অন্তরে রাখিয়া গেছ দান।
বিচ্ছেদেরি হোমবহ্নি হতে
পূজামূর্তি ধরে প্রেম, দেখা দেয় দুঃখের আলোতে

২৬ আষাঢ় ১৩৩৫
[শান্তিনিকেতন]

বিরহ

শঙ্কিত আলোক নিয়ে দিগন্তে উদিল শীর্ণ শশী,
অরণ্যে শিরীষশাখে অকস্মাৎ উঠিল উচ্ছ্বসি
বসন্তের হাওয়ার খেয়াল,
ব্যথায় নিবিড় হল শেষ বাক্য বলিবার কাল।

গোধূলির গীতিশূন্য স্তম্ভিত প্রহরখানি বেয়ে
শান্ত হল শেষ দেখা,— নির্নিমেষ রহিলাম চেয়ে।
ধীরে ধীরে বনান্তে মিলাল
প্রান্তরের প্রান্ততটে অস্তশেষ ক্ষীণ পাংশু আলো।

যে-দ্বার খুলিয়া গেলে রুদ্ধ সে হবে না কোনোমতে।
কান পাতি রবে তব ফিরিবার প্রত্যাশার পথে,—
তোমার অমূর্ত আসা-যাওয়া
যে-পথে চঞ্চল করে দিগ্‌বালার অঞ্চলের হাওয়া।

বসন্তে মাঘের অন্তে আম্রবনে মুকুলমত্ততা
মধুপগুঞ্জনে মিশি আনে কোন্ কানে-কানে কথা।
মোর নাম তব কণ্ঠে ডাকা
শান্ত আজি তাপক্লান্ত দিনান্তের মৌন দিয়ে ঢাকা।

সঙ্গহীন স্তব্ধতার সুগম্ভীর নিবিড় নিভৃতে
বাক্যহারা চিত্তে মোর এতদিনে পাইনু শুনিতে
তুমি কবে মর্মমাঝে পশি
আপন মহিমা হতে রেখে গেলে বাণী মহীয়সী।

২৬ আষাঢ় ১৩৩৫
[শান্তিনিকেতন]

বিদায়সম্বল

যাবার দিকের পথিকের 'পরে
ক্ষণিকার স্নেহখানি
শেষ উপহার করুণ অধরে
দিল কানে কানে আনি।
ভুলিব না কভু, রবে মনে মনে—
এই মিছে আশা দেয় খনে খনে,
ছলছল ছায়া নবীন নয়নে
বাধোবাধো মৃদু বাণী।

যাবার দিকের পথিক সে-কথা
ভরি লয় তার প্রাণে।
পিছনের এই শেষ আকুলতা
পাথেয় বলি সে জানে।
যখন আঁধারে ভরিবে সরণী,
ভুলে-ভরা ঘুমে নীরব ধরণী,
ভুলিব না কভু, এই ক্ষীণধ্বনি
তখনো বাজিবে কানে।

যাবার দিকের পথিক সে বোঝে—
যে যায় সে যায় চ'লে,
যারা থাকে তারা এ উহারে খোঁজে,
যে যায় তাহারে ভোলে।
তবুও নিজেরে ছলিতে ছলিতে
বাঁশি বাজে মনে চলিতে চলিতে
'ভুলিব না কভু' বিভাসে ললিতে
এই কথা বুকে দোলে।

১৯ অগস্ট ১৯২৭
সিঙাপুর

দিনান্তে

বাহিরে তুমি নিলে না মোরে, দিবস গেল বয়ে,
তাহাতে মোর যা হয় হ'ক ক্ষতি,
অন্তরে যা দিবার ছিল মিলিছে এক হয়ে,
চরণে তব গোপনে তার গতি।
লুকায়ে ছিল ছায়াতে ফুল, ভরিল তব ডালি,
গন্ধভরা বন্দনাতে দিয়েছি ধূপ জ্বালি,
প্রদীপ ছিল মলিনশিখা, ধোঁয়াতে ছিল কালি,
দীপ্ত হয়ে উঠিছে তার জ্যোতি।
বাহির হতে না যদি লও পূজার এই ডালি
চরণে তব গোপনে তার গতি।

না-হয় তুমি ওপারে থাকো, এপারে আমি থাকি
নীরব এই নীরস মরুতীরে,
অন্ধকারে সন্ধ্যাতারা নয়নে দেয় আঁকি
সুদূর তব উদার আঁখিটিরে।
ব্যথায় মম তোমারি ছায়া পড়িছে মোর প্রাণে,
বিরহ হানি তোমারি বাণী মিলিছে মোর গানে,
অলখ স্রোতে ভাবনা ধায় তোমার তটপানে
এপার হতে বহিয়া মোর নতি
যে-বীণা তব মন্দিরেতে বাজে নি তানে তানে
চরণে তব নীরবে তার গতি।

১ শ্রাবণ ১৩৩৪
আম্বোয়াজ জাহাজ

অবশেষ

বাহির পথে বিবাগী হিয়া
কিসের খোঁজে গেলি,
আয় রে ফিরে আয়।
পুরানো ঘরে দুয়ার দিয়া
ছেঁড়া আসন মেলি
বসিবি নিরালায়।
সারাটা বেলা সাগর-ধারে
কুড়ালি যত নুড়ি,
নানারঙের শামুক-ভারে
বোঝাই হল ঝুড়ি,
লবণ-পারাবারের পারে
প্রখর তাপে পুড়ি
মরিলি পিপাসায়;
ঢেউয়ের দোল তুলিল রোল
অকুলতল জুড়ি,
কহিল বাণী কী জানি কী ভাষায়।
আয় রে ফিরে আয়।

বিরাম হল আরামহীন
যদি রে তোর ঘরে,
না যদি রয় সাথী,
সন্ধ্যা যদি তন্দ্রালীন
মৌন অনাদরে,
না যদি জ্বালে বাতি;
তবু তো আছে আঁধার কোণে
ধ্যানের ধনগুলি,
একেলা বসি আপনমনে
মুছিবি তার ধূলি,

গাঁথিবি তারে রতনহারে
বুকেতে নিবি তুলি
মধুর বেদনায়।
কাননবীথি ফুলের রীতি
না-হয় গেছে ভুলি,
তারকা আছে গগন-কিনারায়।
আয় রে ফিরে আয়।

২৯ চৈত্র ১৩৩৪
[শান্তিনিকেতন]

শেষ মধু

বসন্তবায় সন্ন্যাসী হায়
চৈৎ-ফসলের শূন্য খেতে,
মৌমাছিদের ডাক দিয়ে যায়
বিদায় নিয়ে যেতে যেতে,—
আয় রে, ওরে মৌমাছি, আয়,
চৈত্র যে যায় পত্রঝরা,
গাছের তলায় আঁচল বিছায়
ক্লান্তি-অলস বসুন্ধরা।

সজনে ঝুলায় ফুলের বেণী,
আমের মুকুল সব ঝরে নি,
কুঞ্জবনের প্রান্ত-ধারে
আকন্দ রয় আসন পেতে।
আয় রে তোরা মৌমাছি, আয়,
আসবে কখন্ শুকনো খরা,
প্রেতের নাচন নাচবে তখন
রিক্ত নিশায় শীর্ণ জরা।

শুনি যেন কাননশাখায়
বেলাশেষের বাজায় বেণু ;
মাখিয়ে নে আজ পাখায় পাখায়
স্মরণভরা গন্ধরেণু ।
কাল যে-কুসুম পড়বে ঝরে
তাদের কাছে নিস গো ভরে
ওই বছরের শেষের মধু
এই বছরের মৌচাকেতে ।
নূতন দিনের মৌমাছি, আয়,
নাই রে দেরি, করিস ত্বরা,
শেষের দানে ঐ রে সাজায়
বিদায়দিনের দানের ভরা ।

চৈত্রমাসের হাওয়ায় কাঁপা
দোলনচাঁপার কুঁড়িখানি
প্রলয়দাহের রৌদ্রতাপে
বৈশাখে আজ ফুটবে জানি ।
যা-কিছু তার আছে দেবার
শেষ করে সব নিবি এবার,
যাবার বেলায় যাক চলে যাক
বিলিয়ে দেবার নেশায় মেতে ।
আয় রে, ওরে মৌমাছি, আয়,
আয় রে গোপনমধু-হরা,
চরম দেওয়া সঁপিতে চায়
ঐ মরণের স্বয়ম্বরা ।

১২ চৈত্র ১৩৩৩
[শান্তিনিকেতন]

বনবাণী

ভূমিকা

আমার ঘরের আশেপাশে যে-সব আমার বোবা-বন্ধু আলোর প্রেমে মত্ত হয়ে আকাশের দিকে হাত বাড়িয়ে আছে তাদের ডাক আমার মনের মধ্যে পৌঁছল। তাদের ভাষা হচ্ছে জীবজগতের আদিভাষা, তার ইশারা গিয়ে পৌঁছয় প্রাণের প্রথমতম স্তরে; হাজার হাজার বৎসরের ভুলে-যাওয়া ইতিহাসকে নাড়া দেয়; মনের মধ্যে যে-সাড়া ওঠে সেও ওই গাছের ভাষায়,— তার কোনো স্পষ্ট মানে নেই, অথচ তার মধ্যে বহু যুগযুগান্তর গুনগুনিয়ে ওঠে।

ওই গাছগুলো বিশ্ববাউলের একতারা, ওদের মজ্জায় মজ্জায় সরল সুরের কাঁপন, ওদের ডালে ডালে পাতায় পাতায় একতালা ছন্দের নাচন। যদি নিস্তব্ধ হয়ে প্রাণ দিয়ে শুনি তাহলে অন্তরের মধ্যে মুক্তির বাণী এসে লাগে। মুক্তি সেই বিরাট প্রাণসমুদ্রের কূলে, যে-সমুদ্রের উপরের তলায় সুন্দরের লীলা রঙে রঙে তরঙ্গিত, আর গভীরতলে 'শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্'। সেই সুন্দরের লীলায় লালসা নেই, আবেশ নেই, জড়তা নেই, কেবল পরমা শক্তির নিঃশেষ আনন্দের আন্দোলন। 'এতস্যৈবানন্দস্য মাত্রাণি' দেখি ফুলে ফলে পল্লবে; তাতেই মুক্তির স্বাদ পাই, বিশ্বব্যাপী প্রাণের সঙ্গে প্রাণের নির্মল অবাধ মিলনের বাণী শুনি।

বোষ্টমী একদিন জিজ্ঞাসা করেছিল, কবে আমাদের মিলন হবে গাছতলায়। তার মানে গাছের মধ্যে প্রাণের বিশুদ্ধ সুর, সেই সুরটি যদি প্রাণ পেতে নিতে পারি তাহলে আমাদের মিলনসংগীতে বদ্-সুর লাগে না। বুদ্ধদেব যে-বোধিদ্রুমের তলায় মুক্তিতত্ত্ব পেয়েছিলেন, তাঁর বাণীর সঙ্গে সঙ্গে সেই বোধিদ্রুমের বাণীও শুনি যেন— দুই-এ মিশে আছে। আরণ্যক ঋষি শুনতে পেয়েছিলেন গাছের বাণী, 'বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ'; শুনেছিলেন, 'যদিদং কিঞ্চ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্'।

তাঁরা গাছে গাছে চিরযুগের এই প্রশ্নটি পেয়েছিলেন, 'কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতিযুক্তঃ'— প্রথম-প্রাণ তার বেগ নিয়ে কোথা থেকে এসেছে এই বিশ্বে। সেই প্রৈতি সেই বেগ থামতে চায় না, রূপের ঝরনা অহরহ ঝরতে লাগল, তার কত রেখা, কত ভঙ্গী কত ভাষা, কত বেদনা। সেই প্রথম প্রাণপ্রৈতির নবনবোন্মেষশালিনী সৃষ্টির চিরপ্রবাহকে নিজের মধ্যে গভীরভাবে বিশুদ্ধভাবে অনুভব করার মহামুক্তি আর কোথায় আছে।

এখানে ভোরে উঠে হোটেলের জানালার কাছে বসে কত দিন মনে করেছি শান্তিনিকেতনের প্রান্তরে আমার সেই ঘরের দ্বারে প্রাণের আনন্দ-রূপ আমি দেখব আমার সেই লতার শাখায় শাখায়; প্রথম-প্রৈতির বন্ধবিহীন প্রকাশরূপ দেখব সেই নাগকেশরের ফুলে ফুলে। মুক্তির জন্যে প্রতিদিন যখন প্রাণ ব্যথিত ব্যাকুল হয়ে ওঠে, তখন সকলের চেয়ে মনে পড়ে আমার দরজার কাছের সেই গাছগুলিকে। তারা ধরণীর ধ্যানমন্ত্রের ধ্বনি। প্রতিদিন অরুণোদয়ে, প্রতি নিস্তব্ধরাত্রে তারার আলোয় তাদের ওঙ্কারের সঙ্গে আমার ধ্যানের সুর মেলাতে চাই। এখানে আমি রাত্রি প্রায় তিনটের সময়— তখন একে রাতের অন্ধকার, তাতে মেঘের আবরণ— অন্তরে অন্তরে একটা অসহ্য চঞ্চলতা অনুভব করি নিজের কাছ থেকেই উদ্দামবেগে পালিয়ে যাবার জন্যে। পালাব কোথায়। কোলাহল থেকে সংগীতে। এই আমার অন্তর্গূঢ় বেদনার দিনে শান্তিনিকেতনের চিঠি যখন পেলুম তখন মনে পড়ে গেল, সেই সংগীত তার সরল বিশুদ্ধ সুরে বাজছে আমার উত্তরায়ণের গাছগুলির মধ্যে,— তাদের কাছে চুপ করে বসতে পারলেই সেই সুরের নির্মল ঝরনা আমার অন্তরাত্মাকে প্রতিদিন স্নান করিয়ে দিতে পারবে। এই স্নানের দ্বারা ধৌত হয়ে স্নিগ্ধ হয়ে তবেই আনন্দলোকে প্রবেশের অধিকার আমরা পাই। পরমসুন্দরের মুক্তরূপে প্রকাশের মধ্যেই পরিত্রাণ,— আনন্দময় সুগভীর বৈরাগ্যই হচ্ছে সেই সুন্দরের চরম দান।

২৩ অক্টোবর ১৯২৬
[হোটেল ইম্‌পীরিয়ল]
ভিয়েনা

বনবাণী

বৃক্ষবন্দনা

অন্ধ ভূমিগর্ভ হতে শুনেছিলে সূর্যের আহ্বান
প্রাণের প্রথম জাগরণে, তুমি বৃক্ষ, আদিপ্রাণ,
উর্ধ্বশীর্ষে উচ্চারিলে আলোকের প্রথম বন্দনা
ছন্দোহীন পাষাণের বক্ষ-'পরে ; আনিলে বেদনা
নিঃসাড় নিষ্ঠুর মরুস্থলে।
সেদিন অম্বর-মাঝে
শ্যামে নীলে মিশ্রমন্ত্রে স্বর্গলোকে জ্যোতিষ্কসমাজে
মর্ত্যের মাহাত্ম্যগান করিলে ঘোষণা। যে-জীবন
মরণতোরণদ্বার বারম্বার করি উত্তরণ
যাত্রা করে যুগে যুগে অনন্তকালের তীর্থপথে
নব নব পান্থশালে বিচিত্র নূতন দেহরথে,
তাহারি বিজয়ধ্বজা উড়াইলে নিঃশঙ্ক গৌরবে
অজ্ঞাতের সম্মুখে দাঁড়ায়ে। তোমার নিঃশব্দ রবে
প্রথম ভেঙেছে স্বপ্ন ধরিত্রীর, চমকি উল্লসি
নিজেরে পড়েছে তার মনে,— দেবকন্যা দুঃসাহসী
কবে যাত্রা করেছিল জ্যোতিঃস্বর্গ ছাড়ি দীনবেশে
পাংশুম্লান গৈরিকবসন-পরা, খণ্ড কালে দেশে
অমরার আনন্দেরে খণ্ড খণ্ড ভোগ করিবারে,
দুঃখের সংঘাতে তারে বিদীর্ণ করিয়া বারে বারে
নিবিড় করিয়া পেতে।

মৃত্তিকার হে বীর সন্তান,
সংগ্রাম ঘোষিলে তুমি মৃত্তিকারে দিতে মুক্তিদান
মরুর দারুণ দুর্গ হতে ; যুদ্ধ চলে ফিরে ফিরে ;
সন্তরি সমুদ্র-ঊর্মি দুর্গম দ্বীপের শূন্য তীরে
শ্যামলের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিলে অদম্য নিষ্ঠায়,
দুস্তর শৈলের বক্ষে প্রস্তরের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায়
বিজয়-আখ্যানলিপি লিখি দিলে পল্লব-অক্ষরে
ধূলিরে করিয়া মুগ্ধ, চিহ্নহীন প্রান্তরে প্রান্তরে
ব্যাপিলে আপন পন্থা।

বাণীশূন্য ছিল একদিন
জলস্থল শূন্যতল, ঋতুর উৎসবমন্ত্রহীন,—
শাখায় রচিলে তব সংগীতের আদিম আশ্রয়,
যে-গানে চঞ্চল বায়ু নিজের লভিল পরিচয়,
সুরের বিচিত্র বর্ণে আপনার দৃশ্যহীন তনু
রঞ্জিত করিয়া নিল, অঙ্কিল গানের ইন্দ্রধনু
উত্তরীর প্রান্তে প্রান্তে। সুন্দরের প্রাণমূর্তিখানি
মৃত্তিকার মর্ত্যপটে দিলে তুমি প্রথম বাখানি
টানিয়া আপন প্রাণে রূপশক্তি সূর্যলোক হতে,
আলোকের গুপ্তধন বর্ণে বর্ণে বর্ণিলে আলোতে।
ইন্দ্রের অপ্সরী আসি মেঘে মেঘে হানিয়া কঙ্কণ
বাষ্পপাত্র চূর্ণ করি লীলানৃত্যে করেছে বর্ষণ
যৌবন-অমৃতরস, তুমি তাই নিলে ভরি ভরি
আপনার পত্রপুষ্পপুটে, অনন্তযৌবনা করি
সাজাইলে বসুন্ধরা।

হে নিস্তব্ধ, হে মহাগম্ভীর,
বীর্যেরে বাঁধিয়া ধৈর্যে শান্তিরূপ দেখালে শক্তির ;
তাই আসি তোমার আশ্রয়ে শান্তিদীক্ষা লভিবারে
শুনিতে মৌনের মহাবাণী ;— দুশ্চিন্তার গুরুভারে

নতশীর্ষ বিলুণ্ঠিতে শ্যামসৌম্যচ্ছায়াতলে তব,—
প্রাণের উদার রূপ, রসরূপ নিত্য নব নব,
বিশ্বজয়ী বীররূপ, ধরণীর বাণীরূপ তার
লভিতে আপন প্রাণে। ধ্যানবলে তোমার মাঝার
গেছি আমি, জেনেছি, সূর্যের বক্ষে জ্বলে বহ্নিরূপে
সৃষ্টিযজ্ঞে যেই হোম, তোমার সত্তায় চুপে চুপে
ধরে তাই শ্যাম স্নিগ্ধরূপ; ওগো সূর্যরশ্মিপায়ী,
শত শত শতাব্দীর দিনধেনু দুহিয়া সদাই
যে-তেজে ভরিলে মজ্জা, মানবেরে তাই করি দান
করেছ জগৎজয়ী; দিলে তারে পরম সম্মান;
হয়েছে সে দেবতার প্রতিস্পর্ধী,— সে-অগ্নিচ্ছটায়
প্রদীপ্ত তাহার শক্তি বিশ্বতলে বিস্ময় ঘটায়
ভেদিয়া দুঃসাধ্য বিঘ্নবাধা। তব প্রাণে প্রাণবান,
তব স্নেহচ্ছায়ায় শীতল, তব তেজে তেজীয়ান,
সজ্জিত তোমার মাল্যে যে-মানব, তারি দূত হয়ে
ওগো মানবের বন্ধু, আজি এই কাব্য-অর্ঘ্য ল'য়ে
শ্যামের বাঁশির তানে মুগ্ধ কবি আমি
অর্পিলাম তোমায় প্রণামী।

৯ চৈত্র ১৩৩৩
[শান্তিনিকেতন]

জগদীশচন্দ্র

শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু
প্রিয়করকমলে

বন্ধু

যেদিন ধরণী ছিল ব্যথাহীন বাণীহীন মরু,
প্রাণের আনন্দ নিয়ে, শঙ্কা নিয়ে, দুঃখ নিয়ে, তরু
দেখা দিল দারুণ নির্জনে। কত যুগ-যুগান্তরে
কান পেতে ছিল স্তব্ধ মানুষের পদশব্দ তরে
নিবিড় গহনতলে। যবে এল মানব অতিথি,
দিল তারে ফুল ফল, বিস্তারিয়া দিল ছায়াবীথি।
প্রাণের আদিমভাষা গূঢ় ছিল তাহার অন্তরে,
সম্পূর্ণ হয় নি ব্যক্ত আন্দোলনে ইঙ্গিতে মর্মরে।
তার দিনরজনীর জীবযাত্রা বিশ্বধরাতলে
চলেছিল নানা পথে শব্দহীন নিত্যকোলাহলে
সীমাহীন ভবিষ্যতে ; আলোকের আঘাতে তনুতে
প্রতিদিন উঠিয়াছে চঞ্চলিত অণুতে অণুতে
স্পন্দবেগে নিঃশব্দ ঝংকারগীতি ; নীরব স্তবনে
সূর্যের বন্দনাগান গাহিয়াছে প্রভাতপবনে।
প্রাণের প্রথমবাণী এইমতো জাগে চারিভিতে
তৃণে তৃণে বনে বনে, তবু তাহা রয়েছে নিভৃতে,—
কাছে থেকে শুনি নাই ;— হে তপস্বী, তুমি একমনা
নিঃশব্দেরে বাক্য দিলে ; অরণ্যের অন্তরবেদনা
শুনেছ একান্তে বসি ; মূক জীবনের যে-ক্রন্দন
ধরণীর মাতৃবক্ষে নিরন্তর জাগাল স্পন্দন
অঙ্কুরে অঙ্কুরে উঠি, প্রসারিয়া শত ব্যগ্র শাখা,
পত্রে পত্রে চঞ্চলিয়া, শিকড়ে শিকড়ে আঁকাবাঁকা
জন্মমরণের দ্বন্দ্বে, তাহার রহস্য তব কাছে
বিচিত্র অক্ষররূপে সহসা প্রকাশ লভিয়াছে।

প্রাণের আগ্রহবার্তা নির্বাকের অন্তঃপুর হতে
অন্ধকার পার করি আনি দিলে দৃষ্টির আলোতে।
তোমার প্রতিভাদীপ্ত চিত্তমাঝে কহে আজি কথা
তরুর মর্মর সাথে মানব-মর্মের আত্মীয়তা;
প্রাচীন আদিমতম সম্বন্ধের দেয় পরিচয়।
হে সাধকশ্রেষ্ঠ, তব দুঃসাধ্য সাধন লভে জয়;—
সতর্ক দেবতা যেথা গুপ্তবাণী রেখেছেন ঢাকি
সেথা তুমি দীপ্তহস্তে অন্ধকারে পশিলে একাকী,
জাগ্রত করিলে তারে। দেবতা আপন পরাভবে
যেদিন প্রসন্ন হন, সেদিন উদার জয়রবে
ধ্বনিত অমরাবতী আনন্দে রচিয়া দেয় বেদি
বীর বিজয়ীর তরে, যশের পতাকা অভ্রভেদী
মর্ত্যের চূড়ায় উড়ে।

মনে আছে একদা যেদিন
আসন প্রচ্ছন্ন তব, অশ্রদ্ধার অন্ধকারে লীন,
ঈর্ষাকণ্টকিত পথে চলেছিলে ব্যথিত চরণে,
ক্ষুদ্র শত্রুতার সাথে প্রতিক্ষণে অকারণ রণে
হয়েছ পীড়িত শ্রান্ত। সে দুঃখই তোমার পাথেয়,
সে অগ্নি জ্বেলেছে যাত্রাদীপ, অবজ্ঞা দিয়েছে শ্রেয়,
পেয়েছ সম্বল তব আপনার গভীর অন্তরে।
তোমার খ্যাতির শঙ্খ আজি বাজে দিকে দিগন্তরে
সমুদ্রের এ-কূলে ও-কূলে; আপন দীপ্তিতে আজি
বন্ধু, তুমি দীপ্যমান; উচ্ছ্বসি উঠিছে বাজি
বিপুল কীর্তির মন্ত্র তোমার আপন কর্মমাঝে।
জ্যোতিষ্কসভার তলে যেথা তব আসন বিরাজে
সেথায় সহস্রদীপ জ্বলে আজি দীপালি-উৎসবে।
আমারো একটি দীপ তারি সাথে মিলাইনু যবে
চেয়ে দেখো তার পানে, এ দীপ বন্ধুর হাতে জ্বালা;
তোমার তপস্যাক্ষেত্র ছিল যবে নিভৃত নিরালা

বাধায় বেষ্টিত রুদ্ধ, সেদিন সংশয়সন্ধ্যাকালে
কবি-হাতে বরমাল্য সে-বন্ধু পরায়েছিল ভালে ;
অপেক্ষা করে নি সে তো জনতার সমর্থন তরে,
দুর্দিনে জ্বেলেছে দীপ রিক্ত তব অর্ঘ্যথালি-'পরে।
আজি সহস্রের সাথে ঘোষিল সে, 'ধন্য ধন্য তুমি,
ধন্য তব বন্ধুজন, ধন্য তব পুণ্য জন্মভূমি।'

১৪ অগ্রহায়ণ ১৩৩৫
শান্তিনিকেতন

দেবদারু

আমি তখন ছিলেম শিলঙ পাহাড়ে, রূপভাবক নন্দলাল ছিলেন কার্সিয়ঙে। তাঁর কাছ থেকে ছোটো একটি পত্রপট পাওয়া গেল, তাতে পাহাড়ের উপর দেওদার গাছের ছবি আঁকা। চেয়ে চেয়ে মনে হল, ওই একটি দেবদারুর মধ্যে যে-শ্যামল শক্তির প্রকাশ, সমস্ত পর্বতের চেয়ে তা বড়ো, ওই দেবদারুকে দেখা গেল হিমালয়ের তপস্যার সিদ্ধিরূপে। মহাকালের চরণপাতে হিমালয়ের প্রতিদিন ক্ষয় হচ্ছে, কিন্তু দেবদারুর মধ্যে যে-প্রাণ, নব নব তরুদেহের মধ্যে দিয়ে যুগে যুগে তা এগিয়ে চলবে। শিল্পীর পত্রপটের প্রত্যুত্তরে আমি এই কাব্যলিপি পাঠিয়ে দিলেম।

তপোমগ্ন হিমাদ্রির ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করি চুপে
বিপুল প্রাণের শিখা উচ্ছ্বসিল দেবদারুরূপে।
সূর্যের যে-জ্যোতির্মন্ত্র তপস্বীর নিত্য-উচ্চারণ
অন্তরের অন্ধকারে, পারিল না করিতে ধারণ
সেই দীপ্ত রুদ্রবাণী,— তপস্যার সৃষ্টিশক্তিবলে
সে-বাণী ধরিল শ্যামকায়া ; সবিতার সভাতলে
করিল সাবিত্রীগান ; স্পন্দমান ছন্দের মর্মরে
ধরিত্রীর সামগাথা বিস্তারিল অনন্ত অম্বরে।

ঋজু দীর্ঘ দেবদারু—গিরি এরে শ্রেষ্ঠ করে জ্ঞান
আপন মহিমা চেয়ে ; অন্তরে ছিল যে তার ধ্যান
বাহিরে তা সত্য হল ; ঊর্ধ্ব হতে পেয়েছিল ঋণ,
ঊর্ধ্বপানে অর্ঘ্যরূপে শোধ করি দিল একদিন।
আপন দানের পুণ্যে স্বর্গ তার রহিল না দূর,
সূর্যের সংগীতে মেশে মৃত্তিকার মুরলীর সুর।

২৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪
শিলঙ

আম্রবন

সে-বৎসর শান্তিনিকেতন আম্রবীথিকায় বসন্ত-উৎসব হয়েছিল। কেউবা চিত্রে কেউবা কারুশিল্পে কেউবা কাব্যে আপন অর্ঘ্য এনেছিলেন। আমি ঋতুরাজকে নিবেদন করেছিলেম কয়েকটি কবিতা, তার মধ্যে নিম্নলিখিত একটি। সে-দিন উৎসবে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, এই আম্রবনের সঙ্গে আমার পরিচয় তাঁদের সকলের চেয়ে পুরাতন,— সেই আমার বালককালের আত্মীয়তা এই কবিতার মধ্যে আমার জীবনের পরাহ্নে প্রকাশ করে গেলেম। এই আম্রবনের যে-নিমন্ত্রণ বালকের চিরবিস্মিত হৃদয়ে এসে পৌচেছিল আজ মনে হয় সেই নিমন্ত্রণ যেন আবার আসছে মাটির মেঠো সুর নিয়ে, রৌদ্রতপ্ত ঘাসের গন্ধ নিয়ে, উত্তেজিত শালিখগুলির কাকলিবিক্ষুব্ধ অপরাহ্নের অবকাশ নিয়ে।

তব পথচ্ছায়া বাহি বাঁশরিতে যে বাজাল আজি
মর্মে তব অশ্রুত রাগিণী,
ওগো আম্রবন,
তারি স্পর্শে রহি রহি আমারো হৃদয় উঠে বাজি,—
চিনি তারে কিম্বা নাহি চিনি,
কে জানে কেমন।

অন্তরে অন্তরে তব যে-চঞ্চল রসের ব্যগ্রতা
আপন অন্তরে তাহা বুঝি,
ওগো আম্রবন।
তোমার প্রচ্ছন্ন মন আমারি মতন চাহে কথা—
মঞ্জরিতে মুখরিয়া আনন্দের ঘনগূঢ় ব্যথা;
অজানারে খুঁজি'
আমারি মতন আন্দোলন।

সচকিয়া চিকনিয়া কাঁপে তব কিশলয়রাজি
সর্ব অঙ্গে নিমেষে নিমেষে,
ওগো আম্রবন।
আমিও তো আপনার বিকশিত কল্পনায় সাজি
অন্তর্লীন আনন্দ-আবেশে
অমনি নূতন।
প্রাণে মোর অমনি তো দোলা দেয় সন্ধ্যায় উষায়
অদৃশ্যের নিশ্বসিত ধ্বনি,
ওগো আম্রবন।
আমার যে পুষ্পশোভা সে কেবল বাণীর ভূষায়,
নূতন চেতনে চিত্ত আপনারে পরাইতে চায়
সুরের গাঁথনি—
গীতঝংকারের আবরণ।

যে অজস্র ভাষা তব উচ্ছ্বসিয়া উঠেছে কুসুমি
ভূতলের চিরন্তনী কথা,
ওগো আম্রবন,
তাই বহে নিয়ে যাও, আকাশের অন্তরঙ্গ তুমি,
ধরণীর বিরহবারতা
গভীর গোপন।
সে-ভাষা সহজে মিশে বাতাসের নিশ্বাসে নিশ্বাসে,

মৌমাছির গুঞ্জনে গুঞ্জনে,
ওগো আম্রবন।
আমার নিভৃত চিত্তে সে-ভাষা সহজে চলে আসে,
মিশে যায় সংগোপনে অন্তরের আভাসে আশ্বাসে
স্বপনে বেদনে,
ধ্যানে মোর করে সঞ্চরণ।

সুদূর জন্মের যেন ভুলে-যাওয়া প্রিয়কণ্ঠস্বর
গন্ধে তব রয়েছে সঞ্চিত,
ওগো আম্রবন।
যেন নাম ধ'রে কোন্ কানে-কানে গোপন মর্মর
তাই মোরে করে রোমাঞ্চিত
আজি ক্ষণে ক্ষণ।
আমার ভাবনা আজি প্রসারিত তব গন্ধ সনে
জনমমরণপরপার,
ওগো আম্রবন,
যেথায় অমরাপুরে সুন্দরের দেউলপ্রাঙ্গণে
জীবনের নিত্য-আশা সন্ন্যাসিনী, সন্ধ্যারতিক্ষণে
দীপ জ্বালি তার
পূর্ণেরে করিছে সমর্পণ।

বহুকাল চলিয়াছে বসন্তের রসের সঞ্চার
ওই তব মজ্জায় মজ্জায়,
ওগো আম্রবন।
বহুকাল যৌবনের মদোৎফুল্ল পল্লীললনায়
আকুলিত অলক সজ্জায়
জোগালে ভূষণ।
শিকড়ের মুষ্টি দিয়া আঁকড়িয়া যে-বক্ষ পৃথ্বীর
প্রাণরস কর তুমি পান,
ওগো আম্রবন,

সেথা আমি গেঁথে আছি দুদিনের কুটির মৃত্তির ;-
তোমার উৎসবে আমি আজি গাব এক রজনীর
পথ-চলা গান,
কালি তার হবে সমাপন।

৫ ফাল্গুন ১৩৩৪
[শান্তিনিকেতন]

নীলমণিলতা

শান্তিনিকেতন উত্তরায়ণের একটি কোণের বাড়িতে আমার বাসা ছিল। এই বাসার অঙ্গনে আমার পরলোকগত বন্ধু পিয়র্সন একটি বিদেশী গাছের চারা রোপণ করেছিলেন। অনেককাল অপেক্ষার পরে নীলফুলের স্তবকে স্তবকে একদিন সে আপনার অজস্র পরিচয় অবারিত করলে। নীল রঙে আমার গভীর আনন্দ, তাই এই ফুলের বাণী আমার যাতায়াতের পথে প্রতিদিন আমাকে ডাক দিয়ে বারে বারে স্তব্ধ করেছে। আমার দিক থেকে কবিরও কিছু বলবার ইচ্ছে হত কিন্তু নাম না পেলে সম্ভাষণ করা চলে না। তাই লতাটির নাম দিয়েছি নীলমণিলতা। উপযুক্ত অনুষ্ঠানের দ্বারা সেই নামকরণটি পাকা করবার জন্যে এই কবিতা। নীলমণি ফুল যেখানে চোখের সামনে ফোটে সেখানে নামের দরকার হয় নি, কিন্তু একদা অবসানপ্রায় বসন্তের দিনে দূরে ছিলুম, সে-দিন রূপের স্মৃতি নামের দাবি করলে। ভক্ত ১০১ নামে দেবতাকে ডাকে সে শুধু বিরহের আকাশকে পরিপূর্ণ করবার জন্যে।

ফাল্গুনমাধুরী তার চরণের মঞ্জীরে মঞ্জীরে
নীলমণিমঞ্জরির গুঞ্জন বাজায়ে দিল কি রে।
আকাশ যে মৌনভার
বহিতে পারে না আর,
নীলিমাবন্যায় শূন্যে উচ্ছলে অনন্ত ব্যাকুলতা,
তারি ধারা পুষ্পপাত্রে ভরি নিল নীলমণিলতা

পৃথ্বীর গভীর মৌন দূর শৈলে ফেলে নীল ছায়া,
মধ্যাহ্নমরীচিকায় দিগন্তে খোঁজে সে স্বপ্নকায়া।
যে-মৌন নিজেরে চায়
সমুদ্রের নীলিমায়,
অন্তহীন সেই মৌন উচ্ছ্বসিল নীলগুচ্ছ ফুলে,
দুর্গম রহস্য তার উঠিল সহজ ছন্দে দুলে।

আসন্ন মিলনাশ্বাসে বধূর কম্পিত তনুখানি
নীলাম্বর-অঞ্চলের গুণ্ঠনে সঞ্চিত করে বাণী।
মর্মের নির্বাক কথা
পায় তার নিঃসীমতা
নিবিড় নির্মল নীলে; আনন্দের সেই নীল দ্যুতি
নীলমণিমঞ্জরির পুঞ্জে পুঞ্জে প্রকাশে আকুতি।

অজানা পান্থের মতো ডাক দিলে অতিথির ডাকে,
অপরূপ পুষ্পোচ্ছ্বাসে হে লতা, চিনালে আপনাকে।
বেল জুঁই শেফালিরে
জানি আমি ফিরে ফিরে,
কত ফাল্গুনের, কত শ্রাবণের, আশ্বিনের ভাষা
তারা তো এনেছে চিত্তে, রঙিন করেছে ভালোবাসা।

চাঁপার কাঞ্চন-আভা সে-যে কার কণ্ঠস্বরে সাধা,
নাগকেশরের গন্ধ সে-যে কোন্‌ বেণীবন্ধে বাঁধা।
বাদলের চামেলি-যে
কালো আঁখিজলে ভিজে,
করবীর রাঙা রঙ কঙ্কণঝংকারসুরে মাখা,
কদম্বকেশরগুলি নিদ্রাহীন বেদনায় আঁকা।

তুমি সুদূরের দূতী, নূতন এসেছ নীলমণি,
স্বচ্ছ নীলাম্বরসম নির্মল তোমার কণ্ঠধ্বনি।
যেন ইতিহাসজালে
বাঁধা নহ দেশে কালে,
যেন তুমি দৈববাণী বিচিত্র বিশ্বের মাঝখানে,
পরিচয়হীন তব আবির্ভাব, কেন এ কে জানে

'কেন এ কে জানে'— এই মন্ত্র আজি মোর মনে জাগে ;
তাই তো ছন্দের মালা গাঁথি অকারণ অনুরাগে।
বসন্তের নানা ফুলে
গন্ধ তরঙ্গিয়া তুলে,
আম্রবনে ছায়া কাঁপে মৌমাছির গুঞ্জরণগানে ;
মেলে অপরূপ ডানা প্রজাপতি; কেন এ কে জানে।

কেন এ কে জানে এত বর্ণগন্ধরসের উল্লাস,
প্রাণের মহিমাছবি রূপের গৌরবে পরকাশ।
যেদিন বিতানচ্ছায়ে
মধ্যাহ্নের মন্দবায়ে
ময়ূর আশ্রয় নিল, তোমারে তাহারে একখানে
দেখিলাম চেয়ে চেয়ে, কহিলাম, 'কেন এ কে জানে'

অভ্যাসের সীমা-টানা চৈতন্যের সংকীর্ণ সংকোচে
ঔদাস্যের ধুলা ওড়ে, আঁখির বিস্ময়রস ঘোচে।
মন জড়তায় ঠেকে,
নিখিলেরে জীর্ণ দেখে,
হেনকালে হে নবীন, তুমি এসে কী বলিলে কানে ;
বিশ্বপানে চাহিলাম, কহিলাম, 'কেন এ কে জানে'।

আমি আজ কোথা আছি, প্রবাসে অতিথিশালা মাঝে।
তব নীললাবণ্যের বংশীধ্বনি দূর শূন্যে বাজে।
আসে বৎসরের শেষ,
চৈত্র ধরে ম্লান বেশ,
হয়তো বা রিক্ত তুমি ফুল ফোটাবার অবসানে,
তবু, হে অপূর্ব রূপ, দেখা দিলে কেন যে কে জানে।

১৭ চৈত্র ১৩৩৩
ভরতপুর

কুরচি

অনেককাল পূর্বে শিলাইদহ থেকে কলকাতায় আসছিলেম। কুষ্টিয়া স্টেশনঘরের পিছনের দেয়ালঘেঁষা এক কুরচিগাছ চোখে পড়ল। সমস্ত গাছটি ফুলের ঐশ্বর্যে মহিমান্বিত। চারিদিকে হাটবাজার; একদিকে রেলের লাইন, অন্যদিকে গোরুর গাড়ির ভিড়, বাতাস ধুলোয় নিবিড়। এমন অজায়গায় পি. ডব্লু. ডি-র স্বরচিত প্রাচীরের গায়ে ঠেস দিয়ে এই একটি কুরচিগাছ তার সমস্ত শক্তিতে বসন্তের জয়ঘোষণা করছে— উপেক্ষিত বসন্তের প্রতি তার অভিবাদন সমস্ত হট্টগোলের উপরে যাতে ছাড়িয়ে ওঠে এই যেন তার প্রাণপণ চেষ্টা। কুরচির সঙ্গে এই আমার প্রথম পরিচয়।

ভ্রমর একদা ছিল পদ্মবনপ্রিয়
ছিল প্রীতি কুমুদিনী পানে।
সহসা বিদেশে আসি হায়, আজ কি ও
কুটজেও বহু বলি' মানে!

—সংস্কৃত উদ্ভট শ্লোকের অনুবাদ

কুরচি, তোমার লাগি পদ্মেরে ভুলেছে অন্যমনা
যে-ভ্রমর, শুনি নাকি তারে কবি করেছে ভর্ৎসনা।
আমি সেই ভ্রমরের দলে। তুমি আভিজাত্যহীনা,
নামের গৌরবহারা; শ্বেতভুজা ভারতীর বীণা

তোমারে করে নি অভ্যর্থনা অলংকারঝংকারিত
কাব্যের মন্দিরে। তবু সেথা তব স্থান অবারিত,
বিশ্বলক্ষ্মী করেছেন আমন্ত্রণ যে-প্রাঙ্গণতলে
প্রসাদচিহ্নিত তাঁর নিত্যকার অতিথির দলে।
আমি কবি লজ্জা পাই কবির অন্যায় অবিচারে
হে সুন্দরী। শাস্ত্রদৃষ্টি দিয়ে তারা দেখেছে তোমারে,
রসদৃষ্টি দিয়ে নহে ; শুভদৃষ্টি কোনো সুলগনে
ঘটিতে পারে নি তাই, ঔদাস্যের মোহ-আবরণে
রহিলে কুণ্ঠিত হয়ে।

তোমারে দেখেছি সেই কবে
নগরে হাটের ধারে, জনতার নিত্যকলরবে,
ইঁটকাঠপাথরের শাসনের সংকীর্ণ আড়ালে,
প্রাচীরের বহিঃপ্রান্তে।— সূর্যপানে চাহিয়া দাঁড়ালে
সকরুণ অভিমানে ;— সহসা পড়েছে যেন মনে
একদিন ছিলে যবে মহেন্দ্রের নন্দনকাননে
পারিজাতমঞ্জরির লীলায় সঙ্গিনীরূপ ধরি
চিরবসন্তের স্বর্গে, ইন্দ্রাণীর সাজাতে কবরী ;
অপ্সরীর নৃত্যলোল মণিবন্ধে কঙ্কণবন্ধনে
পেতে দোল তালে তালে ; পূর্ণিমার অমল চন্দনে
মাখা হয়ে নিশ্বসিতে চন্দ্রমার বক্ষোহার-'পরে।
অদূরে কঙ্কররুক্ষ লৌহপথে কঠোর ঘর্ঘরে
চলেছে আগ্নেয়রথ, পণ্যভারে কম্পিত ধরায়
ঔদ্ধত্য বিস্তারি বেগে ; কটাক্ষে কেহ না ফিরে চায়
অর্থমূল্যহীন তোমাপানে, হে তুমি দেবের প্রিয়া,
স্বর্গের দুলালী। যবে নাটমন্দিরের পথ দিয়া
বেসুর অসুর চলে, সেইক্ষণে তুমি একাকিনী
দক্ষিণবায়ুর ছন্দে বাজায়েছ সুগন্ধ-কিঙ্কিণী
বসন্তবন্দনানৃত্যে,— অবজ্ঞিয়া অন্ধ অবজ্ঞারে,

ঐশ্বর্যের ছদ্মবেশী ধূলির দুঃসহ অহংকারে
হানিয়া মধুর হাস্য ; শাখায় শাখায় উচ্ছ্বসিত
ক্লান্তিহীন সৌন্দর্যের আত্মহারা অজস্র অমৃত
করেছ নিঃশব্দ নিবেদন।

মোর মুগ্ধ চিত্তময়
সেইদিন অকস্মাৎ আমার প্রথম পরিচয়
তোমা-সাথে। অনাদৃত বসন্তেরে আবাহন গীতে
প্রণমিয়া উপেক্ষিতা, শুভক্ষণে কৃতজ্ঞ এ চিতে
পদার্পিলে অক্ষয় গৌরবে। সেইক্ষণে জানিলাম,
হে আত্মবিস্মৃত তুমি, ধরাতলে সত্য তব নাম
সকলেই ভুলে গেছে, সে-নাম প্রকাশ নাহি পায়
চিকিৎসাশাস্ত্রের গ্রন্থে পণ্ডিতের পুঁথির পাতায় ;
গ্রামের গাথার ছন্দে সে-নাম হয় নি আজো লেখা,
গানে পায় নাই সুর। সে-নাম কেবল জানে একা
আকাশের সূর্যদেব, তিনি তাঁর আলোকবীণায়
সে-নামে ঝংকার দেন, সেই সুর ধূলিরে চিনায়
অপূর্ব ঐশ্বর্য তার ; সে-সুরে গোপন বার্তা জানি'
সন্ধানী বসন্ত হাসে। স্বর্গ হতে চুরি করে আনি'
এ ধরা, বেদের মেয়ে, তোরে রাখে কুটির-কানাচে
কটুনামে লুকাইয়া, হঠাৎ পড়িস ধরা পাছে।
পণ্যের কর্কশধ্বনি এ নামে কদর্য আবরণ
রচিয়াছে ; তাই তোরে দেবী ভারতীর পদ্মবন
মানে নি স্বজাতি বলে, ছন্দ তোরে করে পরিহার,—
তা বলে হবে কি ক্ষুণ্ন কিছুমাত্র তোর শুচিতার।
সূর্যের আলোর ভাষা আমি কবি কিছু কিছু চিনি,
কুর্চি, পড়েছ ধরা, তুমিই রবির আদরিণী।

১০ বৈশাখ ১৩৩৩
শান্তিনিকেতন

শাল

প্রায় ত্রিশ বছর হল শান্তিনিকেতনের শালবীথিকায় আমার সে-দিনকার এক কিশোর কবিবন্ধুকে পাশে নিয়ে অনেক দিন অনেক সায়াহ্নে পায়চারি করেছি। তাকে অন্তরের গভীর কথা বলা বড়ো সহজ ছিল। সেই আমাদের যত আলাপগুঞ্জরিত রাত্রি, আশ্রমবাসের ইতিহাসে আমার চিরন্তন স্মৃতিগুলির সঙ্গেই গ্রথিত হয়ে আছে। সে কবি আজ ইহলোকে নেই। পৃথিবীতে মানুষের প্রিয়সঙ্গের কত ধারা কত নিভৃত পথ দিয়ে চলেছে। এই স্তব্ধ তরুশ্রেণীর প্রাচীন ছায়ায় সেই ধারা তেমন করে আরো অনেক বয়ে গেছে, আরো অনেক বইবে। আমরা চলে যাব কিন্তু কালে কালে বারে বারে বন্ধুসংগমের জন্য এই ছায়াতল রয়ে গেল। যেমন অতীতের কথা ভাবছি— তেমনি ওই শালশ্রেণীর দিকে চেয়ে বহুদূর ভবিষ্যতের ছবিও মনে আসছে।

বাহিরে যখন ক্ষুব্ধ দক্ষিণের মদির পবন
অরণ্যে বিস্তারে অধীরতা ; যবে কিংশুকের বন
উচ্ছৃঙ্খল রক্তরাগে স্পর্ধায় উদ্যত ; দিশিদিশি
শিমুল ছড়ায় ফাগ ; কোকিলের গান অহর্নিশি
জানে না সংযম, যবে বকুল অজস্র সর্বনাশে
স্খলিত দলিত বনপথে, তখন তোমার পাশে
আসি আমি হে তপস্বী শাল, যেথায় মহিমারাশি
পুঞ্জিত করেছ অভ্রভেদী, যেথা রয়েছ বিকাশি
দিগন্তে গম্ভীর শান্তি। অন্তরের নিগূঢ় গভীরে
ফুল ফুটাবার ধ্যানে নিবিষ্ট রয়েছ ঊর্ধ্বশিরে ;
চৌদিকের চঞ্চলতা পশে না সেথায়। অন্ধকারে
নিঃশব্দ সৃষ্টির মন্ত্র নাড়ি বেয়ে শাখায় সঞ্চারে ;
সে অমৃত মন্ত্রতেজ নিলে ধরি সূর্যলোক হতে
নিভৃত মর্মের মাঝে ; স্নান করি আলোকের স্রোতে
শুনি নিলে নীল আকাশের শান্তিবাণী ; তার পরে
আত্মসমাহিত তুমি, স্তব্ধ তুমি,— বৎসরে বৎসরে
বিশ্বের প্রকাশযজ্ঞে বারম্বার করিতেছ দান
নিপুণ সুন্দর তব কমণ্ডলু হতে অফুরান

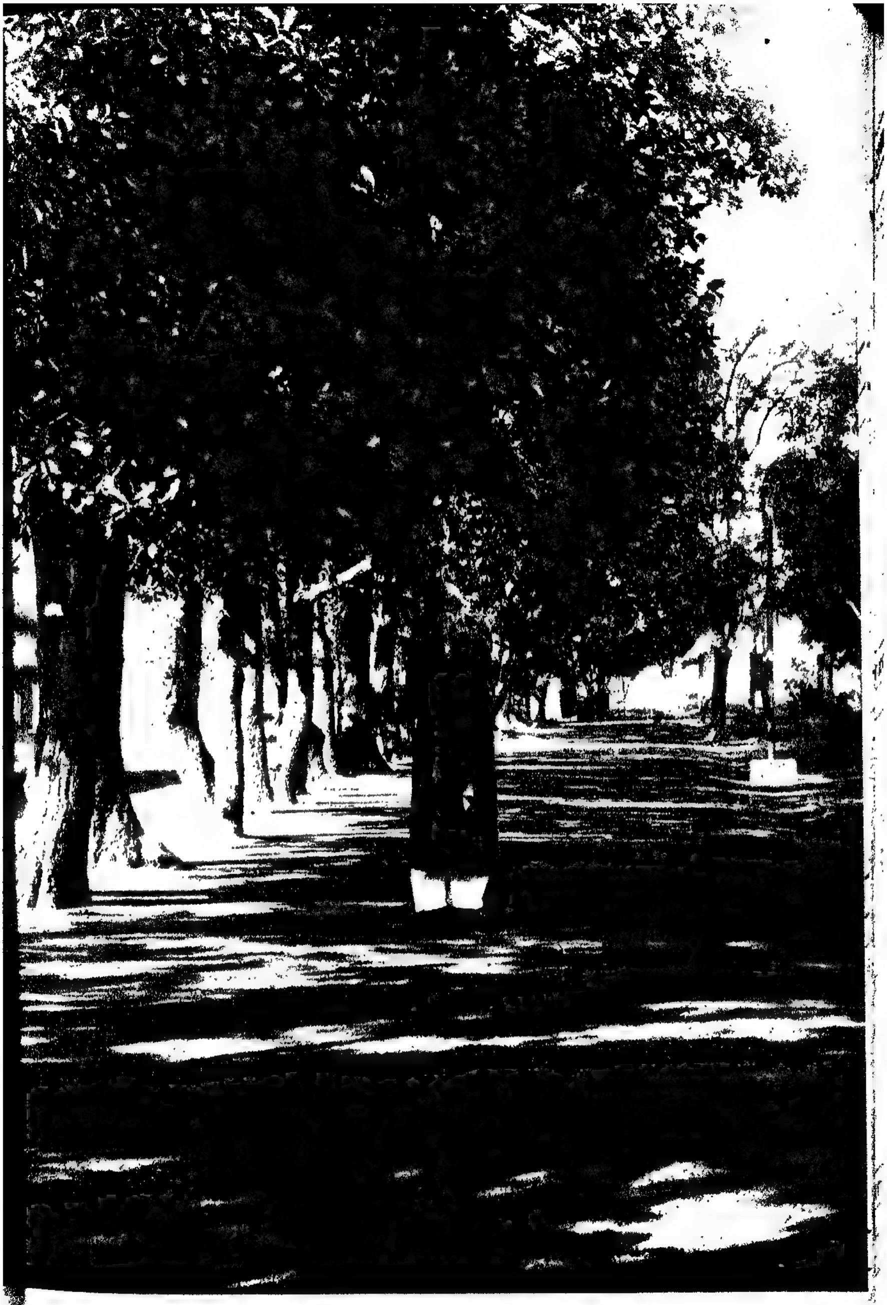

শান্তিনিকেতন শালবীথিকায় রবীন্দ্রনাথ

শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংগ্রহ হইতে

পুণ্যগন্ধী প্রাণধারা ; সে ধারা চলেছে ধীরে ধীরে
দিগন্তে শ্যামল ঊর্মি উচ্ছ্বাসিয়া, দূর শতাব্দীরে
শুনাতে মর্মর আশীর্বাণী। রাজার সাম্রাজ্য কতশত
কালের বন্যায় ভাসে, ফেটে যায় বুদ্‌বুদের মতো,
মানুষের ইতিবৃত্ত সুদুর্গম গৌরবের পথে
কিছুদূর যায়, আর বারম্বার ভগ্নচূর্ণ রথে
কীর্ণ করে ধূলি। তারি মাঝে উদার তোমার স্থিতি,
ওগো মহা শাল, তুমি সুবিশাল কালের অতিথি ;
আকাশেরে দাও সঙ্গ বর্ণরঙ্গে শাখার ভঙ্গিতে,
বাতাসেরে দাও মৈত্রী পল্লবের মর্মরসংগীতে,
মঞ্জরির গন্ধের গণ্ডূষে। যুগে যুগে কত কাল
পথিক এসেছে তব ছায়াতলে, বসেছে রাখাল,
শাখায় বেঁধেছে নীড় পাখি ; যায় তারা পথ বাহি
আসন্ন বিস্মৃতি পানে, উদাসীন তুমি আছ চাহি।
নিত্যের মালার সূত্রে অনিত্যের যত অক্ষগুটি
অস্তিত্বের আবর্তনে দ্রুতবেগে চলে তারা ছুটি ;
মর্ত্যপ্রাণ তাহাদের ক্ষণেক পরশ করে যেই
পায় তারা জপনাম, তার পরে আর তারা নেই,
নেমে যায় অসংখ্যের তলে। সেই চলে-যাওয়া দল
রেখে দিয়ে গেছে যেন ক্ষণিকের কলকোলাহল
দক্ষিণহাওয়ায় কাঁপা ওই তব পত্রের কল্লোলে,
শাখার দোলায়। ওই ধ্বনি স্মরণে জাগায়ে তোলে
কিশোর বন্ধুরে মোর। কতদিন এই পাতাঝরা
বীথিকায়, পুষ্পগন্ধে বসন্তের আগমনী-ভরা
সায়াহ্নে দুজনে মোরা ছায়াতে অঙ্কিত চন্দ্রালোকে
ফিরেছি গুঞ্জিত আলাপনে। তার সেই মুগ্ধ চোখে
বিশ্ব দেখা দিয়েছিল নন্দনমন্দার রঙে রাঙা ;
যৌবন-তুফান-লাগা সেদিনের কত নিদ্রাভাঙা
জ্যোৎস্নামুগ্ধ রজনীর সৌহার্দ্যের সুধারসধারা
তোমার ছায়ার মাঝে দেখা দিল, হয়ে গেল সারা।

গভীর আনন্দক্ষণ কতদিন তব মঞ্জরিতে
একান্ত মিশিয়াছিল একখানি অখণ্ড সংগীতে
আলোকে আলাপে হাস্যে, বনের চঞ্চল আন্দোলনে,
বাতাসের উদাস নিশ্বাসে।

প্রীতিমিলনের ক্ষণে
সেদিনের প্রিয় সে কোথায়, বর্ষে বর্ষে দোলা দিত
যাহার প্রাণের বেগ উৎসব করিয়া তরঙ্গিত।
তোমার বীথিকাতলে তার মুক্ত জীবনপ্রবাহ
আনন্দচঞ্চল গতি মিলায়েছে আপন উৎসাহ
পুষ্পিত উৎসাহে তব। হায়, আজি তব পত্রদোলে
সেদিনের স্পর্শ নাই। তাই এই বসন্তকল্লোলে,
পূর্ণিমার পূর্ণতায়, দেবতার অমৃতের দানে
মর্ত্যের বেদনা মেশে।

চাহি' আজ দূর পানে
স্বপ্নচ্ছবি চোখে ভাসে,— ভাবী কোন্ ফাল্গুনের রাতে
দোলপূর্ণিমায়, সাজাতে আসিছে কারা পদ্মপাতে
পলাশ বকুল চাঁপা, আলিম্পনলেখা এঁকে দিতে
তব ছায়াবেদিকায়, বসন্তের আবাহন গীতে
প্রসন্ন করিতে তব পুষ্পবরিষন। সে-উৎসবে
আজিকার এই দিন পথপ্রান্তে লুণ্ঠিত নীরবে।
কোলে তার পড়ে আছে এ-রাত্রির উৎসবের ডালা।
আজিকার অর্ঘ্যে আছে যতগুলি সুরে-গাঁথা মালা,
কিছু তার শুকায়েছে, কিছু তার আছে অমলিন ;
দুয়েকটি তুলে নিল যাত্রীদল ; সে-দিন এ-দিন
দোঁহে দোঁহা মুখ চেয়ে বদল করিয়া নিল মালা,—
নূতনে ও পুরাতনে পূর্ণ হল বসন্তের পালা।

৮ ফাল্গুন ১৩৩৪

[শান্তিনিকেতন]

মধুমঞ্জরি

এ লতার কোনো-একটা বিদেশী নাম নিশ্চয় আছে— জানি নে, জানার দরকারও নেই। আমাদের দেশের মন্দিরে এই লতার ফুলের ব্যবহার চলে না, কিন্তু মন্দিরের বাহিরের যে-দেবতা মুক্তস্বরূপে আছেন তাঁর প্রচুর প্রসন্নতা এর মধ্যে বিকশিত। কাব্যসরস্বতী কোনো মন্দিরের বন্দিনী দেবতা নন, তাঁর ব্যবহারে এই ফুলকে লাগাব ঠিক করেছি, তাই নতুন করে নাম দিতে হল। রূপে রসে এর মধ্যে বিদেশী কিছুই নেই, এদেশের হাওয়ায় মাটিতে এর একটুও বিতৃষ্ণা দেখা যায় না, তাই দিশী নামে একে আপন করে নিলেম।

প্রত্যাশী হয়ে ছিনু এতকাল ধরি,
বসন্তে আজ দুয়ারে, আ মরি মরি,
ফুলমাধুরীর অঞ্জলি দিল ভরি
মধুমঞ্জরিলতা।
কতদিন আমি দেখিতে এসেছি প্রাতে
কচি ডালগুলি ভরি নিয়ে কচি পাতে
আপন ভাষায় যেন আলোকের সাথে
কহিতে চেয়েছে কথা।

কতদিন আমি দেখেছি গোধূলিকালে
সোনালি ছায়ার পরশ লেগেছে ডালে,
সন্ধ্যাবায়ুর মৃদু-কাঁপনের তালে
কী যেন ছন্দ শোনে।
গহন নিশীথে ঝিল্লি যখন ডাকে,
দেখেছি চাহিয়া জড়িত ডালের ফাঁকে
কালপুরুষের ইঙ্গিত যেন কাকে
দূর দিগন্তকোণে।

শ্রাবণে সঘন ধারা ঝরে ঝরঝর
পাতায় পাতায় কেঁপে ওঠে থরথর,

মনে হয় ওর হিয়া যেন ভর-ভর
বিশ্বের বেদনাতে।
কতবার ওর মর্মে গিয়েছি চলি,
বুঝিতে পেরেছি কেন উঠে চঞ্চলি,
শরৎশিশিরে যখন সে ঝলমলি
শিহরায় পাতে পাতে।

ভুবনে ভুবনে যে-প্রাণ সীমানাহারা
গগনে গগনে সিঞ্চিল গ্রহতারা
পল্লবপুটে ধরি লয় তারি ধারা,
মজ্জায় লহে ভরি।
কী নিবিড় যোগ এই বাতাসের সনে,
যেন সে পরশ পায় জননীর স্তনে,
সে পুলকখানি কত-যে, সে মোর মনে
বুঝিব কেমন করি।

বাতাসে আকাশে আলোকের মাঝখানে—
ঋতুর হাতের মায়ামন্ত্রের টানে
কী-যে বাণী আছে প্রাণে প্রাণে ও-ই জানে,
মন তা জানিবে কিসে।
যে-ইন্দ্রজাল দ্যুলোকে ভূলোকে ছাওয়া,
বুকের ভিতর লাগে ওর তারি হাওয়া,—
বুঝিতে যে চাই কেমন সে ওর পাওয়া,
চেয়ে থাকি অনিমিষে।

ফুলের গুচ্ছে আজি ও উচ্ছ্বসিত,
নিখিলবাণীর রসের পরশামৃত
গোপনে গোপনে পেয়েছে অপরিমিত
ধরিতে না পারে তারে।

ছন্দে গন্ধে রূপ-আনন্দে ভরা,
ধরণীর ধন গগনের মন-হরা,
শ্যামলের বীণা বাজিল মধুস্বরা
ঝংকারে ঝংকারে।

আমার দুয়ারে এসেছিল নাম ভুলি
পাতা-ঝলমল অঙ্কুরখানি তুলি
মোর আঁখিপানে চেয়েছিল দুলি দুলি
করুণ প্রশ্নরতা।
তারপরে কবে দাঁড়াল যেদিন ভোরে
ফুলে ফুলে তার পরিচয়লিপি ধরে
নাম দিয়ে আমি নিলাম আপন করে
মধুমঞ্জরিলতা।

তারপরে যবে চলে যাব অবশেষে
সকল ঋতুর অতীত নীরব দেশে,
তখনো জাগাবে বসন্ত ফিরে এসে
ফুল-ফোটাবার ব্যথা।
বরষে বরষে সেদিনো তো বারে বারে
এমনি করিয়া শূন্য ঘরের দ্বারে
এই লতা মোর আনিবে কুসুমভারে
ফাগুনের আকুলতা।

তব পানে মোর ছিল যে প্রাণের প্রীতি
ওর কিশলয়ে রূপ নেবে সেই স্মৃতি,
মধুর গন্ধে আভাসিবে নিতি নিতি
সে মোর গোপন কথা।

অনেক কাহিনী যাবে যে সেদিন ভুলে,
স্মরণচিহ্ন কত যাবে উন্মূলে ;
মোর দেওয়া নাম লেখা থাক্ ওর ফুলে
মধুমঞ্জরিলতা।

[চৈত্র ১৩৩৬
শান্তিনিকেতন]

নারিকেল

সমুদ্রের ধারে জমিতেই নারিকেলের সহজ আবাস। আমাদের আশ্রমের মাঠ সেই সমুদ্রকূল থেকে বহুদূরে। এখানে অনেক যত্নে একটি নারিকেলকে পালন করে তোলা হয়েছে— সে নিঃসঙ্গ নিষ্ফল নিস্তেজ। তাকে দেখে মনে হয় সে যেন প্রাণপণে ঋজু হয়ে দাঁড়িয়ে দিগন্ত অতিক্রম করে কোনো-এক আকাঙ্ক্ষার ধনকে দেখবার চেষ্টা করছে। নির্বাসিত তরুর মজ্জার মধ্যে সেই আকাঙ্ক্ষা। এখানে আলোনা মাটিতে সমুদ্রের স্পর্শমাত্র নেই, গাছের শিকড় তার বাঞ্ছিত রস এখানে সন্ধান করছে, পাচ্ছে না ; সে উপবাসী, ধরণীর কাছে তার কান্নার সাড়া মিলছে না। আকাশে উদ্যত হয়ে উঠে তার যে-সন্ধানদৃষ্টিকে সে দিগন্তপারে পাঠাচ্ছে দিনান্তে সন্ধ্যাবেলায় সেই তার সন্ধানেরই সজীব মূর্তির মতো পাখি তার দোদুল্যমান শাখায় প্রতিদিন ফিরে ফিরে আসে।

আজ বসন্তে প্রথম কোকিল ডেকে উঠল। দক্ষিণ হাওয়ায় আজ কি সমুদ্রের বাণী এসে পৌঁছল, যে-বাণী সমুদ্রের কূলে কূলে বধির মাটির সুপ্তিকে নিয়তই অশান্ত তরঙ্গমন্ত্রে আন্দোলিত করে তুলছে। তাই কি আজ সেই দক্ষিণসমুদ্র থেকে তার তাণ্ডবনৃত্যের স্পর্শ এই গাছের শাখায় শাখায় চঞ্চল। সমুদ্রের রুদ্রডমরুর জাগরণী কি এরই পল্লবমর্মরে তার ক্ষীণ প্রতিধ্বনি জাগিয়েছে। বিরহী তরু কি আজ আপন অন্তরে সেই সুদূরবন্ধুর বার্তা পেল, যে-বন্ধুর মহাগানে অভিনন্দিত হয়ে কোন্ অতীত যুগে একদিন কোনো প্রথম নারিকেল প্রাণযাত্রীরূপে জীবলোকে যাত্রা শুরু করেছিল ? সেই যুগারম্ভপ্রভাতের আদিম উৎসবে মহাপ্রাণের যে-স্পর্শপুলক জেগেছিল তাই আজ

ফিরে পেয়ে কি ওই গাছটির সংবৎসরের অবসাদ আজ বসন্তে ঘুচল। তার জীবনের জয়পতাকা আবার আজ কি ওই নব-উৎসাহে নীলাম্বরে আন্দোলিত। যেন একটা আচ্ছাদন উঠে গেল, তার মজ্জার মধ্যে প্রাণশক্তির যে-আশ্বাসবাণী প্রচ্ছন্ন হয়েছিল তাকেই আজ কি ফিরে পেলে, যে-বাণী বলছে—'চলো প্রাণতীর্থে, জয় করো মৃত্যুকে।'

সমুদ্রের কূল হতে বহুদূরে শব্দহীন মাঠে
নিঃসঙ্গ প্রবাস তব নারিকেল,— দিনরাত্রি কাটে
যে-প্রচ্ছন্ন আকাঙ্ক্ষায় বুঝিতে পার না তাহা নিজে।
দিগন্তেরে অতিক্রমি দেখিতে চাহিছ তুমি কী-যে
দীর্ঘ করি দেহ তব, মজ্জায় রয়েছে তার স্মৃতি
গূঢ় হয়ে। মাটির গভীরে যে-রস খুঁজিছ নিতি
কী স্বাদ পাও না তাহে, অন্নে তার কী অভাব আছে,
তাই তো শিকড় উপবাসী কাঁদে ধরণীর কাছে।
আকাশে রয়েছ চেয়ে রাত্রিদিন কিসের প্রত্যাশে
বাক্যহারা! বারবার শূন্য হতে ফিরে ফিরে আসে
তোমারি সন্ধানরূপী সন্ধ্যাবেলাকার শ্রান্ত পাখি
লম্বিত শাখায় তব।
                          ঐ শুন উঠিয়াছে ডাকি
বসন্তের প্রথম কোকিল। সে বাণী কি এল প্রাণে
দক্ষিণপবন হতে যে-বাণী সমুদ্র শুধু জানে;
পৃথিবীর কূলে কূলে যে-বাণী গম্ভীর আন্দোলনে
বধির মাটির সুপ্তি কাঁপায়ে তুলিছে প্রতিক্ষণে
অশান্ততরঙ্গমন্দ্রে, দক্ষিণসাগর হতে একি
তাণ্ডবনৃত্যের স্পর্শ শাখার হিল্লোলে তব দেখি
মুহুর্মুহু চঞ্চলিত।
                          রুদ্রডমরুর জাগরণী
পল্লবমর্মরে তব পেয়েছে কি ক্ষীণ প্রতিধ্বনি।
কান পেতে ছিলে তুমি,— হে বিরহী, বসন্তে কি আজি
সুদূরবন্ধুর বার্তা অন্তরে উঠিল তব বাজি,—

যে-বন্ধুর মহাগানে একদিন সূর্যের আলোতে
রোমাঞ্চিয়া বাহিরিলে প্রাণযাত্রী, অন্ধকার হতে ?
আজি কি পেয়েছ ফিরে প্রাণের পরশহর্ষ সেই
যুগারম্ভপ্রভাতের আদি-উৎসবের।— নিমেষেই
অবসাদ দূরে গেল, জীবনের বিজয়পতাকা
আবার চঞ্চল হল নীলাম্বরে, খুলে গেল ঢাকা,
খুঁজে পেলে যে-আশ্বাস অন্তরে কহিছে রাত্রিদিন—
'প্রাণতীর্থে চলো, মৃত্যু করো জয়, শ্রান্তিক্লান্তিহীন।'

[১৬ ফাল্গুন ১৩৩৪
শান্তিনিকেতন]

চামেলি-বিতান

চামেলি-বিতানের নিচের ছায়ায় আমি বসতুম— ময়ূর এসে বসত উপরে, লতার আশ্রয়বেষ্টনী থেকে পুচ্ছ ঝুলিয়ে। জানি সে আমাকে কিছুমাত্র সম্মান করত না, কিন্তু সৌন্দর্যের যে-অর্ঘ্যভার সে বহন করে বেড়াত, তার অজ্ঞাতে আমি নিজেই সেটি প্রতিদিন গ্রহণ করেছি। এমন অসংকোচে সে যে দেখা দিয়ে যায় এতে আমি কৃতজ্ঞ ছিলুম, সে যে আমাকে ভয় করে নি এ আমার সৌভাগ্য। আরও তার কয়েকটি সঙ্গী সঙ্গিনী ছিল কিন্তু দূরের দুরাশায় ওদের কোথায় টেনে নিয়ে গেল, আমিও চলে এসেছি সেই চামেলির সুগন্ধি ছায়ার আশ্রয় থেকে অন্য জায়গায়। বাইরে থেকে এই পরিবর্তনগুলি বেশি কিছু নয়, তবু অন্তরের মধ্যে ভাঙাচোরার দাগ কিছু কিছু থেকে যায়। শুনেছিলুম আমাদের প্রদেশে কোনো-এক নদীগর্ভজাত দ্বীপ ময়ূরের আশ্রয়। ময়ূর হিন্দুর অবধ্য। মৃগয়াবিলাসী ইংরেজ এই দ্বীপের নিষেধকে উপেক্ষা করতে পারে নি অথচ গুলি করে ময়ূর মারবার প্রবল আনন্দ থেকে বঞ্চিত হওয়া তার পক্ষে অসম্ভব

হওয়াতে পার্শ্ববর্তী দ্বীপে খাদ্যের প্রলোভন বিস্তার করে ভুলিয়ে নিয়ে এসে ময়ূর মারত। বাল্মীকির শাপকে এ-যুগের কবি পুনরায় প্রচার না করে থাকতে পারল না।

মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বং
অগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।

ময়ূর কর নি মোরে ভয়,
সেই গর্ব, সেই মোর জয়।
বাহিরেতে আমলকী
করিতেছে ঝকমকি,
বটের উঠেছে কচি পাতা,
হোথায় দুয়ার থেকে
আমারে গিয়েছ দেখে,
খুলিয়া বসেছি মোটা খাতা।
লিখিতেছি নিজ মনে,—
হেরি' তাই আঁখিকোণে
অবজ্ঞায় ফিরে যাও চলি,
বোঝ না, লেখনী ধরি
কী যে এত খুঁটে মরি,
আমারে জেনেছ মূঢ় বলি।

সেই ভালো জান যদি তাই,
তাহে মোর কোন খেদ নাই।
তবু আমি খুশী আছি,
আস তুমি কাছাকাছি,
মোরে দেখে নাহি কর ত্রাস
যদিও মানব, তবু
আমারে কর না কভু
দানব বলিয়া অবিশ্বাস।

সুন্দরের দূত তুমি,
এ-ধূলির মর্ত্যভূমি,
স্বর্গের প্রসাদ হেথা আন,
তবুও বধি না তোরে,
বাঁধি না পিঞ্জরে ধরে,
এও কি আশ্চর্য নাহি মান

কাননের এই এক কোণা,—
হেথায় তোমার আনাগোনা।
চামেলিবিতানতল
মোর বসিবার স্থল,
দিন যবে অবসান হয়।
হেথা আস কী যে ভাবি',
মোর চেয়ে তোর দাবি
বেশি বই কম কিছু নয়।
জ্যোৎস্না ডালের ফাঁকে
হেথা আল্‌পনা আঁকে,
এ নিকুঞ্জ জানে আপনার।
কচি পাতা যে-বিশ্বাসে
দ্বিধাহীন হেথা আসে,
তোমার তেমনি অধিকার।

বর্ণহীন রিক্ত মোর সাজ,
তারি লাগি পাছে পাই লাজ,
বর্ণে বর্ণে আমি তাই
ছন্দ রচিবারে চাই,
সুরে সুরে গীতচিত্র করি।
আকাশেরে বাসি ভালো,
সকাল-সন্ধ্যার আলো
আমার প্রাণের বর্ণে ভরি।

ধরায় যেখানে তাই,
তোমার গৌরব-ঠাঁই
সেথায় আমারো ঠাঁই হয়।
সুন্দরের অনুরাগে
তাই মোর গর্ব লাগে,
মোরে তুমি কর নাই ভয়।

তোমার আমার তরে জানি
মধুরের এই রাজধানী।
তোর নাচ, মোর গীতি,
রূপ তোর, মোর প্রীতি,
তোর বর্ণ, আমার বর্ণনা,—
শোভনের নিমন্ত্রণে
চলি মোরা দুইজনে,
তাই তুই আমার আপনা।
সহজ রঙ্গের রঙ্গী
ওই যে গ্রীবার ভঙ্গী,
বিস্ময়ের নাহি পাই পার।
তুমি-যে শঙ্কা না পাও,
নিঃসংশয়ে আস যাও,
এই মোর নিত্য পুরস্কার।

নাশ করে যে-আগ্নেয় বাণ
মুহূর্তে অমুল্য তোর প্রাণ—
তার লাগি বসুন্ধরা
হয় নি সবুজে ভরা,
তার লাগি ফুল নাহি ধরে।
যে-বসন্তে প্রাণে প্রাণে
বেদনার সুধা আনে
সে-বসন্ত নহে তার তরে।

ছন্দ ভেঙে দেয় সে যে,
অকস্মাৎ উঠে বেজে
অর্থহীন চকিত চীৎকার,
ধূমাচ্ছন্ন অবিশ্বাস
বিশ্ববক্ষে হানে ত্রাস,
কুটিল সংশয় কদাকার।

সৃষ্টিছাড়া এই-যে উৎপাত
হানে দানবের পদাঘাত
পুণ্য পৃথিবীর শিরে,—
তার লজ্জা তুই কি রে
আনিতে পারিবি তোর মনে।
অকৃতজ্ঞ নিষ্ঠুরতা
সৌন্দর্যেরে দেয় ব্যথা
কেন যে তা বুঝিবি কেমনে।
কেন যে কদর্য ভাষা
বিধাতার ভালোবাসা
বিদ্রূপে করিছে ছারখার,
যে-হস্ত দানেরি তরে
তারি রক্তপাত করে,
সেই লজ্জা নিখিলজনার।

[বৈশাখ ১৩৩৪
শান্তিনিকেতন]

পরদেশী

পিয়র্সন্ কয়েক জোড়া সবুজরঙের বিদেশী পাখি আশ্রমে ছেড়ে দিয়েছিলেন। অনেক দিন তারা এখানে বাসা বেঁধে ছিল। আজকাল আর দেখতে পাই নে। আশা করি কোনো নালিশ নিয়ে তারা চলে যায় নি, কিম্বা এখানকার অন্য আশ্রমিক পশুপাখির সঙ্গে বর্ণভেদ বা স্বরের পার্থক্য নিয়ে তাদের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা ঘটে নি।

এসেছে কবে বিদেশী সখা
বিদেশী পাখি আমার বনে,
সকাল-সাঁঝে কুঞ্জমাঝে
উঠিছে ডাকি সহজ মনে।
অজানা এই সাগরপারে
হল না তার গানের ক্ষতি।
সবুজ তার ডানার আভা,
চপল তার নাচের গতি।
আমার দেশে যে-মেঘ এসে
নীপবনের মরমে মেশে
বিদেশী পাখি গীতালি দিয়ে
মিতালি করে তাহার সনে।

বটের ফলে আরতি তার,
রয়েছে লোভ নিমের তরে,
বনজামেরে চঞ্চু তার
অচেনা ব'লে দোষী না করে
শরতে যবে শিশির বায়ে
উচ্ছ্বসিত শিউলিবীথি,
বাণীরে তার করে না ম্লান
কুহেলিঘন পুরানো স্মৃতি।

শালের ফুল-ফোটার বেলা
মধুকাঙালী লোভীর মেলা,
চিরমধুর বঁধুর মতো
সে-ফুল তার হৃদয় হরে।

বেণুবনের আগের ডালে
চটুল ফিঙা যখন নাচে
পরদেশী এ পাখির সাথে
পরানে তার ভেদ কি আছে।
উষার ছোঁওয়া জাগায় ওরে
ছাতিমশাখে পাতার কোলে,
চোখের আগে যে-ছবি জাগে
মানে না তারে প্রবাস ব’লে।
আলোতে সোনা, আকাশে নীলা,
সেথা যে চিরজানারি লীলা,
মায়ের ভাষা শোনে সেখানে
শ্যামল ভাষা যেখানে গাছে।

৮ বৈশাখ ১৩৩৪
[শান্তিনিকেতন]

কুটিরবাসী

তরুবিলাসী আমাদের এক তরুণ বন্ধু এই আশ্রমের এক কোণে পথের ধারে একখানি গোলাকার কুটির রচনা করেছেন। সেটি আছে একটি পুরাতন তালগাছের চরণ বেষ্টন ক’রে। তাই তার নাম হয়েছে তালধ্বজ। এটি যেন মৌচাকের মতো, নিভৃতবাসের মধু দিয়ে ভরা। লোভনীয় বলেই মনে করি, সেই সঙ্গে এও মনে হয়

বাসস্থান সম্বন্ধে অধিকারভেদ আছে ; যেখানে আশ্রয় নেবার ইচ্ছা থাকে সেখানে হয়তো আশ্রয় নেবার যোগ্যতা থাকে না।

তোমার কুটিরের
সমুখবাটে
পল্লিরমণীরা
চলেছে হাটে।
উড়েছে রাঙা ধূলি,
উঠেছে হাসি,—
উদাসী বিবাগীর
চলার বাঁশি
আঁধারে আলোকেতে
সকালে সাঁঝে
পথের বাতাসের
বুকেতে বাজে।

যা-কিছু আসে যায়
মাটির 'পরে
পরশ লাগে তারি
তোমার ঘরে।
ঘাসের কাঁপা লাগে,
পাতার দোলা,
শরতে কাশবনে
তুফান তোলা,
প্রভাতে মধুপের
গুনগুনানি,
নিশীথে ঝিঁঝিঁরবে
জালবুনানি।
দেখেছি ভোরবেলা
ফিরিছ একা,

পথের ধারে পাও
কিসের দেখা।
সহজে সুখী তুমি
জানে তা কেবা,
ফুলের গাছে তব
স্নেহের সেবা ;
এ কথা কারো মনে
রবে কি কালি,
মাটির 'পরে গেলে
হৃদয় ঢালি।

দিনের পরে দিন
যে-দান আনে
তোমার মন তারে
দেখিতে জানে।
নম্র তুমি, তাই
সরলচিতে
সবার কাছে কিছু
পেয়েছ নিতে,
উচ্চ-পানে সদা
মেলিয়া আঁখি
নিজেরে পলে পলে
দাও নি ফাঁকি।

চাও নি জিনে নিতে
হৃদয় কারো,
নিজের মন তাই
দিতে যে পার।
তোমার ঘরে আসে
পথিকজন,

চাহে না জ্ঞান তারা,
চাহে না ধন,
এটুকু বুঝে যায়
কেমনধারা
তোমারি আসনের
শরিক তারা।

তোমার কুটিরের
পুকুর পাড়ে
ফুলের চারাগুলি
যতনে বাড়ে।
তোমারো কথা নাই,
তারাও বোবা,
কোমল কিশলয়ে
সরল শোভা।
শ্রদ্ধা দাও, তবু
মুখ না খোলে,
সহজে বোঝা যায়
নীরব ব'লে।

তোমারি মতো তব
কুটিরখানি,
স্নিগ্ধ ছায়া তার
বলে না বাণী।
তাহার শিয়রেতে
তালের গাছে
বিরল পাতাকটি
আলোয় নাচে,
সমুখে খোলা মাঠ
করিছে ধূ ধূ,

দাঁড়ায়ে দূরে দূরে
খেজুর শুধু।

তোমার বাসাখানি
আঁটিয়া মুঠি
চাহে না আঁকড়িতে
কালের ঝুঁটি।
দেখি যে পথিকের
মতোই তাকে,
থাকা ও না-থাকার
সীমায় থাকে।
ফুলের মতো ও যে,
পাতার মতো,
যখন যাবে, রেখে
যাবে না ক্ষত।

নাইকো রেষারেষি
পথে ও ঘরে,
তাহারা মেশামেশি
সহজে করে।
কীর্তিজালে ঘেরা
আমি তো ভাবি,
তোমার ঘরে ছিল
আমারো দাবি ;
হারায়ে ফেলেছি সে
ঘূর্ণিবায়ে,
অনেক কাজে আর
অনেক দায়ে।

[চৈত্র ১৩৩৩
শান্তিনিকেতন]

হাসির পাথেয়

তখন আমার অল্প বয়স। পিতা আমাকে সঙ্গে করে হিমালয়ে চলেছেন ড্যালহৌসি পাহাড়ে। সকালবেলায় ডাণ্ডি চ'ড়ে বেরতুম, অপরাহ্ণে ডাকবাংলায় বিশ্রাম হত। আজো মনে আছে এক জায়গায় পথের ধারে ডাণ্ডিওয়ালারা ডাণ্ডি নামিয়েছিল। সেখানে শ্যাওলায় শ্যামল পাথরগুলোর উপর দিয়ে গুহার ভিতর থেকে ঝরনা নেমে উপত্যকায় কলশব্দে ঝরে পড়ছে। সেই প্রথম দেখা ঝরনার রহস্য আমার মনকে প্রবল করে টেনেছিল। এদিকে ডানপাশে পাহাড়ের ঢালু গায়ে স্তরে স্তরে শস্যখেত হলদে ফুলে ছাওয়া, দেখে দেখে তৃপ্তির শেষ হয় না,— কেবলি ভাবি এইগুলো ভ্রমণের লক্ষ্য কেন না হবে, কেবল ক্ষণিক উপলক্ষ কেন হয়। সেই ঝরনা কোন্ নদীর সঙ্গে মিলে কোথায় গেছে জানি নে কিন্তু সেই মুহূর্তকালের প্রথম পরিচয়টুকু কখনো ভুলব না।

হিমালয় গিরিপথে চলেছিনু কবে বাল্যকালে
মনে পড়ে। ধূর্জটির তাণ্ডবের ডম্বরুর তালে
যেন গিরি-পিছে গিরি উঠিছে নামিছে বারেবারে
তমোঘন অরণ্যের তল হতে মেঘের মাঝারে
ধরার ইঙ্গিত যেথা স্তব্ধ রহে শূন্যে অবলীন,
তুষারনিরুদ্ধ বাণী, বর্ণহীন বর্ণনাবিহীন।
সেদিন বৈশাখমাস, খণ্ড খণ্ড শস্যক্ষেত্রস্তরে
রৌদ্রবর্ণ ফুল ;— মেঘের কোমল ছায়া তারি 'পরে
যেন স্নিগ্ধ আকাশের ক্ষণে ক্ষণে নীচে নেমে এসে
ধরণীর কানে কানে প্রশংসার বাক্য ভালোবেসে।

সেইদিন দেখেছিনু নিবিড় বিস্ময়মুগ্ধ চোখে
চঞ্চল নির্ঝরধারা গুহা হতে বাহিরি আলোকে

আপনাতে আপনি চকিত, যেন কবি বাল্মীকির
উচ্ছ্বসিত অনুষ্টুভ। স্বর্গে যেন সুরসুন্দরীর
প্রথম যৌবনোল্লাস, নূপুরের প্রথম ঝংকার,
আপনার পরিচয়ে নিঃসীম বিস্ময় আপনার,
আপনারি রহস্যের পিছে পিছে উৎসুক চরণে
অশ্রান্ত সন্ধান। সেই ছবিখানি রহিল স্মরণে
চিরদিন মনোমাঝে।

সেদিনের যাত্রাপথ হতে
আসিয়াছি বহুদূরে ; আজি ক্লান্ত জীবনের স্রোতে
নেমেছে সন্ধ্যার নীরবতা। মনে উঠিতেছে ভাসি
শৈলশিখরের দূর নির্মল শুভ্রতা রাশি রাশি
বিগলিত হয়ে আসে দেবতার আনন্দের মতো
প্রত্যাশী ধরণী যেথা প্রণামে ললাট অবনত।
সেই নিরন্তর হাসি অবলীল গতিচ্ছন্দে বাজে
কঠিন বাধায় কীর্ণ শঙ্কায় সংকুল পথমাঝে
দুর্গমেরে করি অবহেলা। সে-হাসি দেখেছি বসি
শস্যভরা তটচ্ছায়ে কলস্বরে চলেছে উচ্ছ্বসি
পূর্ণবেগে। দেখেছি অম্লান তারে তীব্র রৌদ্রদাহে
শুষ্ক শীর্ণ দৈন্যদিনে বহি যায় অক্লান্ত প্রবাহে
সৈকতিনী, রক্তচক্ষু বৈশাখেরে নিঃশঙ্ক কৌতুকে
কটাক্ষিয়া— অফুরান হাস্যধারা মৃত্যুর সম্মুখে।

হে হিমাদ্রি, সুগম্ভীর, কঠিন তপস্যা তব গলি
ধরিত্রীরে করে দান যে-অমৃতবাণীর অঞ্জলি
এই সে হাসির মন্ত্র, গতিপথে নিঃশেষ পাথেয়,
নিঃসীম সাহসবেগ, উল্লসিত অশ্রান্ত অজেয়।

১ বৈশাখ ১৩৩৪
শান্তিনিকেতন

বৃক্ষরোপণ উৎসব

গান

১

মরুবিজয়ের কেতন উড়াও শূন্যে,
হে প্রবল প্রাণ।
ধূলিরে ধন্য করো করুণার পুণ্যে,
হে কোমল প্রাণ।
মৌনী মাটির মর্মের গান কবে
উঠিবে ধ্বনিয়া মর্মর তব রবে,
মাধুরী ভরিবে ফুলে ফলে পল্লবে,
হে মোহন প্রাণ।

পথিকবন্ধু, ছায়ার আসন পাতি'
এসো শ্যাম সুন্দর,
এসো বাতাসের অধীর খেলার সাথী,
মাতাও নীলাম্বর।
উষায় জাগাও শাখায় গানের আশা,
সন্ধ্যায় আনো বিরামগভীর ভাষা,
রচি দাও রাতে সুপ্তগীতের বাসা,
হে উদার প্রাণ।

২

আয় আমাদের অঙ্গনে,
অতিথি বালক তরুদল,
মানবের স্নেহসঙ্গ নে,
চল্, আমাদের ঘরে চল্।

শ্যামবঙ্কিম ভঙ্গীতে
চঞ্চল কলসংগীতে
দ্বারে নিয়ে আয় শাখায় শাখায়
প্রাণ-আনন্দ কোলাহল।

তোদের নবীন পল্লবে
নাচুক আলোক সবিতার,
দে পবনে বনবল্লভে
মর্মর গীত উপহার।
আজি শ্রাবণের বর্ষণে
আশীর্বাদের স্পর্শ নে,
পড়ুক মাথায় পাতায় পাতায়
অমরাবতীর ধারাজল।

ক্ষিতি

বক্ষের ধন হে ধরণী, ধরো
ফিরে নিয়ে তব বক্ষে।
শুভদিনে এরে দীক্ষিত করো
আমাদের চিরসখ্যে।
অন্তরে পাক কঠিন শক্তি,
কোমলতা ফুলে পত্রে,
পক্ষিসমাজে পাঠাক পত্রী
তোমার অন্নসত্রে।

অপ

হে মেঘ, ইন্দ্রের ভেরি বাজাও গম্ভীর মন্দ্রস্বনে
মেদুর অম্বরতলে। আনন্দিত প্রাণের স্পন্দনে
জাগুক এ শিশুবৃক্ষ। মহোৎসবে লহো এরে ডেকে।
বনের সৌভাগ্যদিনে ধরণীর বর্ষা অভিষেকে।

তেজ

স্বষ্টির প্রথম বাণী তুমি, হে আলোক ;
এ নব তরুতে তব শুভদৃষ্টি হ'ক।
একদা প্রচুর পুষ্পে হবে সার্থকতা
উহার প্রচ্ছন্ন প্রাণে রাখো সেই কথা।
স্নিগ্ধ পল্লবের তলে তব তেজ ভরি'
হ'ক তব জয়ধ্বনি শতবর্ষ ধরি।

মরুৎ

হে পবন কর নাই গৌণ,
আষাঢ়ে বেজেছে তব বংশী।
তাপিত নিকুঞ্জের মৌন
নিশ্বাসে দিলে তুমি ধ্বংসি।
এ তরু খেলিবে তব সঙ্গে,
সংগীত দিয়ো এরে ভিক্ষা।
দিয়ো তব ছন্দের রঙ্গে
পল্লবহিল্লোল শিক্ষা।

ব্যোম

আকাশ, তোমার সহাস উদার দৃষ্টি
মাটির গভীরে জাগায় রূপের স্বষ্টি।
তব আহ্বানে এই তো শ্যামলমূর্তি
আলোক-অমৃতে খুঁজিছে প্রাণের পূর্তি।
দিয়েছ সাহস, তাই তব নীলবর্ণে
বর্ণ মিলায় আপন হরিৎপর্ণে।
তরুতরুণেরে করুণায় করো ধন্য,
দেবতার স্নেহ পায় যেন এই বন্য।

মাঙ্গলিক

প্রাণের পাথেয় তব পূর্ণ হ'ক হে শিশু চিরায়ু,
বিশ্বের প্রসাদস্পর্শে শক্তি দিক সুধাসিক্ত বায়ু।
হে বালকবৃক্ষ, তব উজ্জ্বল কোমল কিশলয়
আলোক করিয়া পান ভাণ্ডারেতে করুক সঞ্চয়
প্রচ্ছন্ন প্রশান্ত তেজ। লয়ে তব কল্যাণকামনা
শ্রাবণবর্ষণযজ্ঞে তোমারে করিনু অভ্যর্থনা।—
থাকো প্রতিবেশী হয়ে, আমাদের বন্ধু হয়ে থাকো।
মোদের প্রাঙ্গণে ফেলো ছায়া, পথের কঙ্কর ঢাকো
কুসুমবর্ষণে; আমাদের বৈতালিক বিহঙ্গমে
শাখায় আশ্রয় দিয়ো; বর্ষে বর্ষে পুষ্পিত উদ্যমে
অভিনন্দনের গন্ধ মিলাইয়ো বর্ষাগীতিকায়,
সন্ধ্যাবন্দনার গানে। মোদের নিকুঞ্জবীথিকায়
মঞ্জুল মর্মরে তব ধরিত্রীর অন্তঃপুর হতে
প্রাণমাতৃকার মন্ত্র উচ্ছ্বসিবে সূর্যের আলোতে।
শত বর্ষ হবে গত, রেখে যাব আমাদের প্রীতি
শ্যামল লাবণ্যে তব। সে যুগের নূতন অতিথি
বসিবে তোমার ছায়ে। সেদিন বর্ষণমহোৎসবে
আমাদের নিমন্ত্রণ পাঠাইয়ো তোমার সৌরভে
দিকে দিকে বিশ্বজনে। আজি এই আনন্দের দিন
তোমার পল্লবপুঞ্জে পুষ্পে তব হ'ক মৃত্যুহীন।
রবীন্দ্রের কণ্ঠ হতে এ সংগীত তোমার মঙ্গলে
মিলিল মেঘের মন্দ্রে, মিলিল কদম্বপরিমলে।

১৩ জুলাই ১৯২৮
[শান্তিনিকেতন]

পরিশেষ

আশীর্বাদ

শ্রীমান অতুলপ্রসাদ সেন
করকমলে—

বঙ্গের দিগন্ত ছেয়ে বাণীর বাদল
বহে যায় শতস্রোতে রসবন্যাবেগে ;
কভু বজ্রবহ্নি কভু স্নিগ্ধ অশ্রুজল
ধ্বনিছে সংগীতে ছন্দে তারি পুঞ্জমেঘে ;
বঙ্কিম শশাঙ্ককলা তারি মেঘজটা
চুম্বিয়া মঙ্গলমন্ত্রে রচে স্তরে স্তরে
সুন্দরের ইন্দ্রজাল ; কত রশ্মিচ্ছটা
প্রত্যুষে দিনের অন্তে রাখে তারি 'পরে
আলোকের স্পর্শমণি । আজি পূর্ববায়ে
বঙ্গের অম্বর হতে দিকে দিগন্তরে
সহর্ষ বর্ষণধারা গিয়েছে ছড়ায়ে
প্রাণের আনন্দবেগে পশ্চিমে উত্তরে ;
দিল বঙ্গবীণাপাণি অতুলপ্রসাদ,
তব জাগরণী গানে নিত্য আশীর্বাদ ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পরিশেষ

প্রণাম

অর্থ কিছু বুঝি নাই, কুড়ায়ে পেয়েছি কবে জানি
নানা বর্ণে চিত্র-করা বিচিত্রের নর্মবাঁশিখানি
যাত্রাপথে। সে-প্রত্যুষে প্রদোষের আলো অন্ধকার
প্রথম মিলনক্ষণে লভিল পুলক দোঁহাকার
রক্ত-অবগুণ্ঠনচ্ছায়ায়। মহামৌন-পারাবারে
প্রভাতের বাণীবন্যা চঞ্চলি মিলিল শতধারে
তুলিল হিল্লোলদোল। কত যাত্রী গেল কত পথে
দুর্লভ ধনের লাগি অভ্রভেদী দুর্গম পর্বতে
দুস্তর সাগর উত্তরিয়া। শুধু মোর রাত্রিদিন,
শুধু মোর আনমনে পথ-চলা হল অর্থহীন।
গভীরের স্পর্শ চেয়ে ফিরিয়াছি, তার বেশি কিছু
হয় নি সঞ্চয় করা, অধরার গেছি পিছু পিছু।
আমি শুধু বাঁশরিতে ভরিয়াছি প্রাণের নিশ্বাস,
বিচিত্রের সুরগুলি গ্রন্থিবারে করেছি প্রয়াস
আপনার বীণার তন্তুতে। ফুল ফোটাবার আগে
ফাল্গুনে তরুর মর্মে বেদনার যে-স্পন্দন জাগে
আমন্ত্রণ করেছিনু তারে মোর মুগ্ধ রাগিণীতে
উৎকণ্ঠাকম্পিত মূর্ছনায়। ছিন্ন পত্র মোর গীতে
ফেলে গেছে শেষ দীর্ঘশ্বাস। ধরণীর অন্তঃপুরে
রবিরশ্মি নামে যবে, তৃণে তৃণে অঙ্কুরে অঙ্কুরে
যে-নিঃশব্দ হুলুধ্বনি দূরে দূরে যায় বিস্তারিয়া
ধূসর যবনি-অন্তরালে, তারে দিনু উৎসারিয়া

এ বাঁশির রন্ধ্রে রন্ধ্রে ; যে-বিরাট গূঢ় অনুভবে
রজনীর অঙ্গুলিতে অক্ষমালা ফিরিছে নীরবে
আলোকবন্দনামন্ত্র জপে— আমার বাঁশিরে রাখি
আপন বক্ষের 'পরে, তারে আমি পেয়েছি একাকী
হৃদয়কম্পনে মম ; যে বন্দী গোপন গন্ধখানি
কিশোরকোরক মাঝে স্বপ্নস্বর্গে ফিরিছে সন্ধানি
পূজার নৈবেদ্যডালি, সংশয়িত তাহার বেদনা
সংগ্রহ করেছে গানে আমার বাঁশরি কলস্বনা।
চেতনাসিন্ধুর ক্ষুব্ধ তরঙ্গের মৃদঙ্গগর্জনে
নটরাজ করে নৃত্য, উন্মুখর অট্টহাস্যসনে
অতল অশ্রুর লীলা মিলে গিয়ে কলরলরোলে
উঠিতেছে রণি রণি, ছায়ারৌদ্র সে-দোলায় দোলে
অশ্রান্ত উল্লোলে। আমি তীরে বসি তারি রুদ্রতালে
গান বেঁধে লভিয়াছি আপন ছন্দের অন্তরালে
অনন্তের আনন্দবেদনা। নিখিলের অনুভূতি
সংগীতসাধনা মাঝে রচিয়াছে অসংখ্য আকুতি।
এই গীতিপথপ্রান্তে হে মানব, তোমার মন্দিরে
দিনান্তে এসেছি আমি নিশীথের নৈঃশব্দ্যের তীরে
আরতির সান্ধ্যক্ষণে ; একের চরণে রাখিলাম
বিচিত্রের নর্মবাঁশি,— এই মোর রহিল প্রণাম।

৬ এপ্রিল ১৯৩১
শান্তিনিকেতন

বিচিত্রা

ছিলাম যবে মায়ের কোলে,
বাঁশি বাজানো শিখাবে ব'লে
চোরাই করে এনেছ মোরে তুমি,
বিচিত্রা হে, বিচিত্রা,
যেখানে তব রঙের রঙ্গভূমি।
আকাশতলে এলায়ে কেশ
বাজালে বাঁশি চুপে,
সে মায়াসুরে স্বপ্নছবি
জাগিল কত রূপে ;
লক্ষ্যহারা মিলিল তারা
রূপকথার বাটে,
পারায়ে গেল ধূলির সীমা
তেপান্তরী মাঠে।

নারিকেলের ডালের আগে
দুপুরবেলা কাঁপন লাগে,
ইশারা তারি লাগিত মোর প্রাণে,
বিচিত্রা, হে বিচিত্রা,
কী বলে তারা কে বলো তাহা জানে।
অর্থহারা সুরের দেশে
ফিরালে দিনে দিনে,
ঝলিত মনে অবাক বাণী,
শিশির যেন তৃণে।
প্রভাত-আলো উঠিত কেঁপে
পুলকে কাঁপা বুকে,
বারণহীন নাচিত হিয়া
কারণহীন সুখে।

জীবনধারা অকূলে ছোটে,
দুঃখে সুখে তুফান ওঠে,
আমারে নিয়ে দিয়েছ তাহে খেয়া,
বিচিত্রা হে, বিচিত্রা,
কালো গগনে ডেকেছে ঘন দেয়া।
প্রাণের সেই ঢেউয়ের তালে
বাজালে তুমি বীণ,
ব্যথায় মোর জাগায়ে নিয়ে
তারের রিনিরিন।
পালের 'পরে দিয়েছ বেগে
সুরের হাওয়া তুলে,
সহসা বেয়ে নিয়েছ তরী
অপূর্বেরি কূলে।

চৈত্রমাসে শুক্ল নিশা
জুঁহিবেলির গন্ধে মিশা ;
জলের ধ্বনি তটের কোলে কোলে
বিচিত্রা হে, বিচিত্রা,
অনিদ্রারে আকুল করি তোলে।
যৌবনে সে উতল রাতে
করুণ কার চোখে
মোহিনী রাগে মিলাতে মিড়
চাঁদের ক্ষীণালোকে।
কাহার ভীরু হাসির 'পরে
মধুর দ্বিধা ভরি
শরমে-ছোঁওয়া নয়নজল
কাঁপাতে থরথরি।

হঠাৎ কভু জাগিয়া উঠি
ছিন্ন করি ফেলেছ টুটি

নিশীথিনীর মৌন যবনিকা,
বিচিত্রা হে, বিচিত্রা,
হেনেছ তারে বজ্রানলশিখা।
গভীর রবে হাঁকিয়া গেছ
'অলস থেকো না গো।'
নিবিড় রাতে দিয়েছ নাড়া,
বলেছ 'জাগো জাগো।'
বাসরঘরে নিবালে দীপ,
ঘুচালে ফুলহার,
ধূলি-আঁচল তুলায়ে ধরা
করিল হাহাকার।

বুকের শিরা ছিন্ন করে
ভীষণ পূজা করেছি তোরে,
কখনো পূজা শোভন শতদলে,—
বিচিত্রা হে, বিচিত্রা,
হাসিতে কভু, কখনো আঁখিজলে।
ফসল যত উঠেছে ফলি
বক্ষ বিভেদিয়া
কণাকণায় তোমারি পায়
দিয়েছি নিবেদিয়া।
তবুও কেন এনেছ ডালি
দিনের অবসানে;
নিঃশেষিয়া নিবে কি ভরি
নিঃস্ব-করা দানে।

৭ বৈশাখ ১৩৩৪
[শান্তিনিকেতন]

জন্মদিন

রবিপ্রদক্ষিণপথে জন্মদিবসের আবর্তন
হয়ে আসে সমাপন।
আমার রুদ্রের
মালা রুদ্রাক্ষের
অন্তিম গ্রন্থিতে এসে ঠেকে
রৌদ্রদগ্ধ দিনগুলি গেঁথে একে একে।
হে তপস্বী, প্রসারিত করো তব পাণি
লহো মালাখানি।

উগ্র তব তপের আসন,
সেথায় তোমারে সম্ভাষণ
করেছিনু দিনে দিনে কঠিন স্তবনে
কখনো মধ্যাহ্নরৌদ্রে কখনো-বা ঝঞ্ঝার পবনে।
এবার তপস্যা হতে নেমে এসো তুমি—
দেখা দাও যেথা তব বনভূমি
ছায়াঘন, যেথা তব আকাশ অরুণ
আষাঢ়ের আভাসে করুণ।
অপরাহ্ণ যেথা তার ক্লান্ত অবকাশে
মেলে শূন্য আকাশে আকাশে
বিচিত্র বর্ণের মায়া ; যেথা সন্ধ্যাতারা
বাক্যহারা
বাণীবহ্নি জ্বালি'
নিভৃতে সাজায় ব'সে অনন্তের আরতির ডালি।
শ্যামল দাক্ষিণ্যে ভরা
সহজ আতিথ্যে বসুন্ধরা
যেথা স্নিগ্ধ শান্তিময় ;
যেথা তার অফুরান মাধুর্যসঞ্চয়
প্রাণে প্রাণে
বিচিত্র বিলাস আনে রূপে রসে গানে

বিশ্বের প্রাঙ্গণে আজি ছুটি হ'ক মোর,
ছিন্ন করে দাও কর্মডোর।
আমি আজ ফিরিব কুড়ায়ে
উচ্ছৃঙ্খল সমীরণ যে-কুসুম এনেছে উড়ায়ে
সহজে ধুলায়,
পাখির কুলায়
দিনে দিনে ভরি উঠে যে-সহজ গানে,
আলোকের ছোঁওয়া লেগে সবুজের তম্বুরার তানে।
এই বিশ্বসত্তার পরশ,
স্থলে জলে তলে তলে এই গূঢ় প্রাণের হরষ
তুলি লব অন্তরে অন্তরে,
সর্বদেহে, রক্তস্রোতে, চোখের দৃষ্টিতে, কণ্ঠস্বরে,
জাগরণে, ধেয়ানে, তন্দ্রায়,
বিরামসমুদ্রতটে জীবনের পরমসন্ধ্যায়।
এ জন্মের গোধূলির ধূসর প্রহরে
বিশ্বরস-সরোবরে
শেষবার ভরিব হৃদয় মন দেহ
দূর করি সব কর্ম, সব তর্ক, সকল সন্দেহ,
সব খ্যাতি, সকল দুরাশা,
বলে যাব, 'আমি যাই, রেখে যাই, মোর ভালোবাসা।'

২৩ বৈশাখ ১৩৩৮
[শান্তিনিকেতন]

পান্থ

শুধায়ো না মোরে তুমি মুক্তি কোথা, মুক্তি কারে কই,
আমি তো সাধক নই, আমি গুরু নই।
আমি কবি, আছি
ধরণীর অতি কাছাকাছি,
এ পারের খেয়ার ঘাটায়।
সম্মুখে প্রাণের নদী জোয়ার-ভাঁটায়
নিত্য বহে নিয়ে ছায়া আলো,
মন্দ ভালো,
ভেসে-যাওয়া কত কী যে, ভুলে-যাওয়া কত রাশি রাশি
লাভক্ষতি কান্নাহাসি,—
এক তীর গড়ি তোলে অন্য তীর ভাঙিয়া ভাঙিয়া ;
সেই প্রবাহের 'পরে ঊষা ওঠে রাঙিয়া রাঙিয়া,
পড়ে চন্দ্রালোকরেখা জননীর অঙ্গুলির মতো ;
কৃষ্ণরাতে তারা যত
জপ করে ধ্যানমন্ত্র ; অস্তসূর্য রক্তিম উত্তরী
বুলাইয়া চলে যায়, সে-তরঙ্গে মাধবীমঞ্জরি
ভাসায় মাধুরীডালি,
পাখি তার গান দেয় ঢালি।
সে তরঙ্গনৃত্যছন্দে বিচিত্র ভঙ্গীতে
চিত্ত যবে নৃত্য করে আপন সংগীতে
এ বিশ্বপ্রবাহে,
সে-ছন্দে বন্ধন মোর, মুক্তি মোর তাহে।
রাখিতে চাহি না কিছু, আঁকড়িয়া চাহি না রহিতে,
ভাসিয়া চলিতে চাই সবার সহিতে
বিরহমিলনগ্রন্থি খুলিয়া খুলিয়া,
তরণীর পালখানি পলাতকা বাতাসে তুলিয়া।

হে মহাপথিক,
অবারিত তব দশদিক।

তোমার মন্দির নাই, নাই স্বর্গধাম,
নাইকো চরম পরিণাম ;
তীর্থ তব পদে পদে ;
চলিয়া তোমার সাথে মুক্তি পাই চলার সম্পদে,
চঞ্চলের নৃত্যে আর চঞ্চলের গানে,
চঞ্চলের সর্বভোলা দানে—
আঁধারে আলোকে,
সৃজনের পর্বে পর্বে, প্রলয়ের পলকে পলকে ।

২৪ বৈশাখ ১৩৩৮
[শান্তিনিকেতন]

অপূর্ণ

যে-ক্ষুধা চক্ষের মাঝে, যেই ক্ষুধা কানে,
স্পর্শের যে-ক্ষুধা ফিরে দিকে দিকে বিশ্বের আহ্বানে
উপকরণের ক্ষুধা কাঙাল প্রাণের,
ব্রত তার বস্তু সন্ধানের,
মনের যে-ক্ষুধা চাহে ভাষা,
সঙ্গের যে-ক্ষুধা নিত্য পথ চেয়ে করে কার আশা,
যে-ক্ষুধা উদ্দেশহীন অজানার লাগি
অন্তরে গোপনে রয় জাগি—
সবে তারা মিলি নিতি নিতি
নানা আকর্ষণবেগে গড়ি তোলে মানস-আকৃতি ।
কত সত্য, কত মিথ্যা, কত আশা, কত অভিলাষ,
কত-না সংশয় তর্ক, কত না বিশ্বাস,
আপন রচিত ভয়ে আপনারে পীড়ন কত-না,
কত রূপে কল্পিত সান্ত্বনা,—

মনগড়া দেবতারে নিয়ে কাটে বেলা,
পরদিনে ভেঙে করে ঢেলা,
অতীতের বোঝা হতে আবর্জনা কত
জটিল অভ্যাসে পরিণত,
বাতাসে বাতাসে ভাসা বাক্যহীন কত-না আদেশ
দেহহীন তর্জনীনির্দেশ,
হৃদয়ের গূঢ় অভিরুচি
কত স্বপ্নমূর্তি আঁকে দেয় পুনঃ মুছি,
কত প্রেম, কত ত্যাগ, অসম্ভব তরে
কত-না আকাশযাত্রা কল্পপক্ষভরে,
কত মহিমার পূজা, অযোগ্যের কত আরাধনা,
সার্থক সাধনা কত, কত ব্যর্থ আত্মবিড়ম্বনা,
কত জয় কত পরাভব—
ঐক্যবন্ধে বাঁধি এই সব
ভালো মন্দ সাদায় কালোয়
বস্তু ও ছায়ায় গড়া মূর্তি তুমি দাঁড়ালে আলোয়।

জন্মদিনে জন্মদিনে গাঁথনির কর্ম হবে শেষ,
সুখ দুঃখ ভয় লজ্জা ক্লেশ,
আরব্ধ ও অনারব্ধ সমাপ্ত ও অসমাপ্ত কাজ,
তৃপ্ত ইচ্ছা, ভগ্ন জীর্ণ সাজ
তুমি-রূপে পুঞ্জ হয়ে, শেষে
কয়দিন পূর্ণ করি কোথা গিয়ে মেশে।
যে-চৈতন্যধারা
সহসা উদ্ভূত হয়ে অকস্মাৎ হবে গতিহারা,
সে কিসের লাগি,—
নিদ্রায় আবিল কভু, কখনো-বা জাগি
বাস্তবে ও কল্পনায় আপনার রচি দিল সীমা,
গড়িল প্রতিমা।

অসংখ্য এ রচনায় উদ্ঘাটিছে মহা ইতিহাস,—
যুগান্তে ও যুগান্তরে এ কার বিলাস।

জন্মদিন মৃত্যুদিন, মাঝে তারি ভরি' প্রাণভূমি
কে গো তুমি।
কোথা আছে তোমার ঠিকানা,
কার কাছে তুমি আছ অন্তরঙ্গ সত্য করে জানা।
আছ আর নাই মিলে অসম্পূর্ণ তব সত্তাখানি
আপন গদ্গদ বাণী
পারে না করিতে ব্যক্ত, অশক্তির নিষ্ঠুর বিদ্রোহে
বাধা পায় প্রকাশ আগ্রহে,
মাঝখানে থেমে যায় মৃত্যুর শাসনে।
তোমার যে-সম্ভাষণে
জানাইতে চেয়েছিলে নিখিলেরে নিজ পরিচয়
হঠাৎ কি তাহার বিলয়,
কোথাও কি নাই তার শেষ সার্থকতা।
তবে কেন পঙ্গু সৃষ্টি, খণ্ডিত এ অস্তিত্বের ব্যথা।
অপূর্ণতা আপনার বেদনায়
পূর্ণের আশ্বাস যদি নাহি পায়,
তবে রাত্রিদিন হেন
আপনার সাথে তার এত দ্বন্দ্ব কেন।
ক্ষুদ্র বীজ মৃত্তিকার সাথে যুঝি
অঙ্কুরি উঠিতে চাহে আলোকের মাঝে মুক্তি খুঁজি।
সে-মুক্তি না যদি সত্য হয়
অন্ধ মূক দুঃখে তার হবে কি অনন্ত পরাজয়।

দার্জিলিং
অগ্রহায়ণ ? ১৩৩৮

আমি

আজ ভাবি মনে-মনে, তাহারে কি জানি
যাহার বলায় মোর বাণী,
যাহার চলায় মোর চলা,
আমার ছবিতে যার কলা,
যার সুর বেজে ওঠে মোর গানে গানে,
সুখে দুঃখে দিনে দিনে বিচিত্র যে আমার পরানে।
ভেবেছিনু আমাতে সে বাঁধা
এ প্রাণের যত হাসা কাঁদা
গণ্ডি দিয়ে মোর মাঝে
ঘিরেছে তাহারে মোর সকল খেলায় সব কাজে।
ভেবেছিনু সে আমারি আমি
আমার জনম বেয়ে আমার মরণে যাবে থামি।

তবে কেন পড়ে মনে, নিবিড় হরষে
প্রেয়সীর দরশে পরশে
বারে বারে
পেয়েছিনু তারে
অতল মাধুরীসিন্ধুতীরে
আমার অতীত সে-আমিরে।
জানি তাই, সে-আমি তো বন্দী নহে আমার সীমায়,
পুরাণে বীরের মহিমায়
আপনা হারায়ে
তারে পাই আপনাতে দেশকাল নিমেষে পারায়ে।
যে-আমি ছায়ার আবরণে
লুপ্ত হয়ে থাকে মোর কোণে
সাধকের ইতিহাসে তারি জ্যোতির্ময়
পাই পরিচয়।

যুগে যুগে কবির বাণীতে
সেই আমি আপনারে পেরেছে জানিতে।

দিগন্তে বাদলবায়ুবেগে
নীল মেঘে
বর্ষা আসে নাবি।
বসে বসে ভাবি
এই আমি যুগে যুগান্তরে
কত মূর্তি ধরে,
কত নামে কত জন্ম কত মৃত্যু করে পারাপার
কত বারম্বার।
ভূত ভবিষ্যৎ লয়ে যে বিরাট অখণ্ড বিরাজে
সে মানব-মাঝে
নিভৃতে দেখিব আজি এ আমিরে,
সর্বত্রগামীরে।

১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৩১

তুমি

সূর্য যখন উড়াল কেতন
অন্ধকারের প্রান্তে,
তুমি আমি তার রথের চাকার
ধ্বনি পেয়েছিনু জানতে
সেই ধ্বনি ধায় বকুলশাখায়
প্রভাতবায়ুর ব্যাকুল পাখায়,
সুপ্ত কুলায়ে জাগায়ে সে যায়
আকাশপথের পান্থে।

অরুণরথের সে-ধ্বনি পথের
মন্ত্র শুনায়ে দিলে
তাই পায়ে-পায় দোঁহার চলায়
ছন্দ গিয়েছে মিলে।

তিমিরভেদন আলোর বেদন
লাগিল বনের বক্ষে,
নবজাগরণ পরশরতন
আকাশে এল অলক্ষ্যে।
কিশলয়দল হল চঞ্চল,
শিশিরে শিহরি করে ঝলমল,
সুরলক্ষ্মীর স্বর্ণকমল
দুলে বিশ্বের চক্ষে।
রক্তরঙের উঠে কোলাহল
পলাশকুঞ্জময়,
তুমি আমি দোঁহে কণ্ঠ মিলায়ে
গাহিনু আলোর জয়।

সংগীতে ভরি এ প্রাণের তরী
অসীমে ভাসিল রঙ্গে,
চিনি নাহি চিনি চিরসঙ্গিনী
চলিলে আমার সঙ্গে।
চক্ষে তোমার উদিত রবির
বন্দনবাণী নীরব গভীর,
অস্তাচলের করুণ কবির
ছন্দ বসনভঙ্গে।
উষারুণ হতে রাঙা গোধূলির
দূরদিগন্তপানে
বিভাসের গান হল অবসান
বিধুর পুরবীতানে।

আমার নয়নে তব অঞ্জনে
ফুটেছে বিশ্বচিত্র,
তোমার মন্ত্রে এ বীণাতন্ত্রে
উদ্‌গাথা সুপবিত্র।
অতল তোমার চিত্তগহন,
মোর দিনগুলি সফেন নাচন,
তুমি সনাতনী আমিই নূতন,
অনিত্য আমি নিত্য।
মোর ফাল্গুন হারায় যখন
আশ্বিনে ফিরে লহ।
তব অপরূপে মোর নবরূপ
দুলাইছ অহরহ।

আসিছে রাত্রি স্বপনধাত্রী,
বনবাণী হল শান্ত।
জলভরা ঘটে চলে নদীতটে
বধূর চরণ ক্লান্ত।
নিখিলে ঘনাল দিবসের শোক,
বাহির-আকাশে ঘুচিল আলোক,
উজ্জ্বল করি অন্তরলোক
হৃদয়ে এলে একান্ত।
লুকানো আলোয় তব কালো চোখ
সন্ধ্যাতারার দেশে
ইঙ্গিত তার গোপনে পাঠাল
জানি না কী উদ্দেশে।

দেখেছি তোমার আঁখি সুকুমার
নবজাগরিত বিশ্বে।
দেখিনু হিরণ হাসির কিরণ
প্রভাতোজ্জ্বল দৃশ্যে।

হয়ে আসে যবে যাত্রাবসান
বিমল আঁধারে ধুয়ে দিলে প্রাণ,
দেখিনু মেলেছ তোমার নয়ান
অসীম দূর ভবিষ্যে।
অজানা তারায় বাজে তব গান
হারায় গগনতলে।
বক্ষ আমার কাঁপে দুরু দুরু,
চক্ষু ভাসিল জলে।

প্রেমের দিয়ালি দিয়েছিল জ্বালি
তোমারি দীপের দীপ্তি
মোর সংগীতে তুমিই সঁপিতে
তোমার নীরব তৃপ্তি।
আমারে লুকায়ে তুমি দিতে আনি
আমার ভাষায় সুগভীর বাণী,
চিত্রলিখায় জানি আমি জানি
তব আলিপনলিপ্তি।
হৃৎশতদলে তুমি বীণাপাণি
সুরের আসন পাতি
দিনের প্রহর করেছ মুখর,
এখন এল যে রাতি।

চেনা মুখখানি আর নাহি জানি।
আঁধারে হতেছে গুপ্ত,
তব বাণীরূপ কেন আজি চুপ,
কোথায় সে হায় সুপ্ত।
অবগুণ্ঠিত তব চারিধার,
মহামৌনের নাহি পাই পার,
হাসিকান্নার ছন্দ তোমার
গহনে হল যে লুপ্ত।

শুধু ঝিল্লির ঘন ঝংকার
নীরবের বুকে বাজে।
কাছে আছ তবু গিয়েছ হারায়ে
দিশাহারা নিশামাঝে।

এ জীবনময় তব পরিচয়
এখানে কি হবে শূন্য।
তুমি যে-বীণার বেঁধেছিলে তার
এখনি কি হবে ক্ষুণ্ণ।
যে-পথে আমার ছিলে তুমি সাথী
সে পথে তোমার নিবায়ো না বাতি,
আরতির দীপে আমার এ রাতি
এখনো করিয়ো পুণ্য।
আজো জ্বলে তব নয়নের ভাতি
আমার নয়নময়,
মরণসভায় তোমায় আমায়
গাব আলোকের জয়।

৭ নবেম্বর ১৯৩০
আল্‌গন্‌ কুয়িন্‌। ন্যুয়র্ক

আছি

বৈশাখেতে তপ্ত বাতাস মাতে
কুয়োর ধারে কলাগাছের দীর্ণ পাতে পাতে ;
গ্রামের পথে ক্ষণে ক্ষণে ধুলা উড়ায়,
ডাক দিয়ে যায় পথের ধারে কৃষ্ণচূড়ায় ;

আশুক্লান্ত বেলগুলি সব শীর্ণ হয়ে আসে,
ম্লান গন্ধ কুড়িয়ে তারি ছড়িয়ে বেড়ায় সুদীর্ঘ নিশ্বাসে ;
শুকনো টগর উড়িয়ে ফেলে,
চিকন কচি অশথ পাতায় যা খুশি তাই খেলে ;
বাঁশের গাছে কী নিয়ে তার কাড়াকাড়ি,
খেজুর গাছের শাখায় শাখায় নাড়ানাড়ি ;
বটের শাখে ঘনসবুজ ছায়ানিবিড় পাখির পাড়ায়
হুহু করে ধেয়ে এসে ঘুঘু দুটির নিদ্রা ছাড়ায় ;
রুক্ষ কঠিন রক্তমাটি ঢেউ খেলিয়ে মিলিয়ে গেছে দূরে
তার মাঝে ওর থেকে থেকে নাচন ঘুরে ঘুরে ;
খেপে উঠে হঠাৎ ছোটে তালের বনে উত্তরে দিক্‌সীমায়
অস্ফুট ঐ বাষ্পনীলিমায় ;
টেলিগ্রাফের তারে তারে
সুর সেধে নেয় পরিহাসের ঝংকারে ঝংকারে ;
এমনি করে বেলা বহে যায়,
এই হাওয়াতে চুপ করে রই একলা জানালায়।
ঐ যে ছাতিম গাছের মতোই আছি
সহজ প্রাণের আবেগ নিয়ে মাটির কাছাকাছি,
ওর যেমন এই পাতার কাঁপন, যেমন শ্যামলতা,
তেমনি জাগে ছন্দে আমার আজকে দিনের সামান্য এই কথা।
না থাক্‌ খ্যাতি, না থাক্‌ কীর্তিভার,
পুঞ্জীভূত অনেক বোঝা অনেক দুরাশার,—
আজ আমি যে বেঁচেছিলেম সবার মাঝে মিলে সবার প্রাণে
সেই বারতা রইল আমার গানে।

১৯ বৈশাখ ১৩৩৮
[শান্তিনিকেতন]

বালক

বালক বয়স ছিল যখন, ছাদের কোণের ঘরে
নিঝুম দুইপহরে
দ্বারের 'পরে হেলিয়ে মাথা
মেঝে মাদুর পাতা,
একা একা কাটত রোদের বেলা,—
না মেনেছি পড়ার শাসন, না করেছি খেলা।
দূর আকাশে ডেকে যেত চিল,
সিসুগাছের ডালপালা সব বাতাসে ঝিলমিল।
তপ্ত তৃষায় চঞ্চু করি ফাঁক
প্রাচীর-'পরে ক্ষণে ক্ষণে বসত এসে কাক।
চড়ুই পাখির আনাগোনা মুখর কলভাষা,
ঘরের মধ্যে কড়ির কোণে ছিল তাদের বাসা।
ফেরিওয়ালার ডাক শোনা যায় গলির ওপার থেকে—
দূরের ছাদে ঘুড়ি ওড়ায় সে কে।
কখন্ মাঝে-মাঝে
ঘড়িওয়ালা কোন্ বাড়িতে ঘণ্টাধ্বনি বাজে।
সামনে বিরাট অজানিত, সামনে দৃষ্টি-পেরিয়ে-যাওয়া দূর
বাজাত কোন্ ঘর-ভোলানো সুর।
কিসের পরিচয়ের লাগি
আকাশ-পাওয়া উদাসী মন সদাই ছিল জাগি।
অকারণের ভালোলাগা
অকারণের ব্যথায় মিলে গাঁথত স্বপন নাইক গোড়া আগা।
সাথীহীনের সাথী
মনে হত দেখতে পেতেম দিগন্তে নীল আসন ছিল পাতি।

সত্তরে আজ পা দিয়েছি আয়ুশেষের কূলে
অন্তরে আজ জানলা দিলেম খুলে।

তেমনি আবার বালকদিনের মতো
চোখ মেলে মোর সুদূর-পানে বিনা কাজে প্রহর হল গত।
প্রখর তাপের কাল,
ঝরঝরিয়ে কেঁপে ওঠে শিরীষগাছের ডাল;
কুয়োর ধারে তেঁতুলতলায় ঢুকে
পাড়ার কুকুর ঘুমিয়ে পড়ে ভিজে মাটির স্নিগ্ধ পরশসুখে;
গাড়ির গোরু ক্ষণকালের মুক্তি পেয়ে ক্লান্ত আছে শুয়ে
জামের ছায়ায় তৃণবিহীন ভুঁয়ে।
কাঁকর-পথের পারে
শুকনো পাতার দৈন্য জমে গন্ধরাজের সারে।
চেয়ে আছি দু-চোখ দিয়ে সব-কিছুরে ছুঁয়ে,
ভাবনা আমার সবার মাঝে থুয়ে।
বালক যেমন নগ্ন-আবরণ,
তেমনি আমার মন
ঐ কাননের সবুজ ছায়ায় এই আকাশের নীলে
বিনা বাধায় এক হয়ে যায় মিলে।
সকল জানার মাঝে
চিরকালের না-জানা কার শঙ্খধ্বনি বাজে।
এই ধরণীর সকল সীমায় সীমাহারার গোপন আনাগোনা
সেই আমারে করেছে আন্‌মনা।

২১ বৈশাখ ১৩৩৮
[শান্তিনিকেতন]

বর্ষশেষ

যাত্রা হয়ে আসে সারা,— আয়ুর পশ্চিমপথশেষে
ঘনায় মৃত্যুর ছায়া এসে।
অস্তসূর্য আপনার দাক্ষিণ্যের শেষ বন্ধ টুটি
ছড়ায় ঐশ্বর্য তার ভরি দুই মুঠি।

বর্ণসমারোহে দীপ্ত মরণের দিগন্তের সীমা,
জীবনের হেরিনু মহিমা।

এই শেষ কথা নিয়ে নিশ্বাস আমার যাবে থামি,—
কত ভালোবেসেছিনু আমি।
অনন্ত রহস্য তারি উচ্ছলি আপন চারিধার
জীবন মৃত্যুরে দিল করি একাকার ;
বেদনার পাত্র মোর বারম্বার দিবসে নিশীথে
ভরি দিল অপূর্ব অমৃতে।

দুঃখের দুর্গম পথে তীর্থযাত্রা করেছি একাকী,
হানিয়াছে দারুণ বৈশাখী।
কত দিন সঙ্গীহীন, কত রাত্রি দীপালোকহারা,
তারি মাঝে অন্তরেতে পেয়েছি ইশারা।
নিন্দার কণ্টকমাল্যে বক্ষ বিঁধিয়াছে বারে বারে,
বরমাল্য জানিয়াছি তারে।

আলোকিত ভুবনের মুখপানে চেয়ে নির্নিমেষ
বিস্ময়ের পাই নাই শেষ।
যে-লক্ষ্মী আছেন নিত্য মাধুরীর পদ্ম-উপবনে,
পেয়েছি তাঁহার স্পর্শ সর্ব অঙ্গে-মনে।
যে-নিশ্বাস তরঙ্গিত নিখিলের অশ্রুতে হাসিতে,
তারে আমি ধরেছি বাঁশিতে।

যাঁহারা মানুষরূপে দৈববাণী অনির্বচনীয়
তাঁহাদের জেনেছি আত্মীয়।
কতবার পরাভব, কতবার কত লজ্জা ভয়,
তবু কণ্ঠে ধ্বনিয়াছে অসীমের জয়।
অসম্পূর্ণ সাধনায় ক্ষণে ক্ষণে ক্রন্দিত আত্মার
খুলে গেছে অবরুদ্ধ দ্বার।

লভিয়াছি জীবলোকে মানবজন্মের অধিকার,
ধন্য এই সৌভাগ্য আমার।
যেথা যে-অমৃতধারা উৎসারিল যুগে যুগান্তরে
জ্ঞানে কর্মে ভাবে, জানি সে আমারি তরে।
পূর্ণের যে-কোনো ছবি মোর প্রাণে উঠেছে উজ্জ্বলি
জানি তাহা সকলের বলি।

ধূলির আসনে বসি ভূমারে দেখেছি ধ্যানচোখে
আলোকের অতীত আলোকে।
অণু হতে অণীয়ান মহৎ হইতে মহীয়ান,
ইন্দ্রিয়ের পারে তার পেয়েছি সন্ধান।
ক্ষণে ক্ষণে দেখিয়াছি দেহের ভেদিয়া যবনিকা
অনির্বাণ দীপ্তিময়ী শিখা।

যেখানেই যে-তপস্বী করেছে দুষ্কর যজ্ঞযাগ,
আমি তার লভিয়াছি ভাগ।
মোহবন্ধমুক্ত যিনি আপনারে করেছেন জয়,
তাঁর মাঝে পেয়েছি আমার পরিচয়।
যেখানে নিঃশঙ্ক বীর মৃত্যুরে লঙ্ঘিল অনায়াসে,
স্থান মোর সেই ইতিহাসে।

শ্রেষ্ঠ হতে শ্রেষ্ঠ যিনি, যতবার তুলি কেন নাম,
তবু তাঁরে করেছি প্রণাম।
অন্তরে লেগেছে মোর স্তব্ধ আকাশের আশীর্বাদ ;
উষালোকে আনন্দের পেয়েছি প্রসাদ।
এ আশ্চর্য বিশ্বলোকে জীবনের বিচিত্র গৌরবে
মৃত্যু মোর পরিপূর্ণ হবে।

আজি এই বৎসরের বিদায়ের শেষ আয়োজন,
মৃত্যু, তুমি ঘুচাও গুণ্ঠন।
কত কী গিয়েছে ঝরে, জানি জানি কত স্নেহ প্রীতি
নিবায়ে গিয়েছে দীপ রাখে নাই স্মৃতি।
মৃত্যু, তব হাত পূর্ণ জীবনের মৃত্যুহীন ক্ষণে,
ওগো শেষ অশেষের ধনে।

৩০ চৈত্র ১৩৩৩
[শান্তিনিকেতন]

মুক্তি

১

আমারে সাহস দাও, দাও শক্তি, হে চিরসুন্দর,
দাও স্বচ্ছ তৃপ্তির আকাশ, দাও মুক্তি নিরন্তর
প্রত্যহের ধূলিলিপ্ত চরণপতনপীড়া হতে,
দিয়ো না ডুলিতে মোরে তরঙ্গিত মুহূর্তের স্রোতে,
ক্ষোভের বিক্ষেপবেগে। শ্রাবণসন্ধ্যার পুষ্পবনে
গ্লানিহীন যে-সাহস সুকুমার যূথীর জীবনে—
নির্মম বর্ষণঘাতে শঙ্কাশূন্য প্রসন্ন মধুর,
মুহূর্তের প্রাণটিতে ভরি তোলে অনন্তের সুর,
সরল আনন্দহাস্যে ঝরি পড়ে তৃণশয্যা-'পরে,
পূর্ণতার মূর্তিখানি আপনার বিনম্র অন্তরে
সুগন্ধে রচিয়া তোলে; দাও সেই অক্ষুব্ধ সাহস,
সে আত্মবিস্মৃত শক্তি, অব্যাকুল, সহজে স্ববশ
আপনার সুন্দর সীমায়;— দ্বিধাশূন্য সরলতা
গাঁথুক শান্তির ছন্দে সব চিন্তা, মোর সব কথা।

১ জুলাই ১৯২৭

২

আপনার কাছ হতে বহুদূরে পালাবার লাগি
হে সুন্দর, হে অলক্ষ্য, তোমার প্রসাদ আমি মাগি,
তোমার আহ্বানবাণী। আজ তব বাজুক বাঁশরি,
চিত্তভরা শ্রাবণপ্লাবনরাগে,— যেন গো পাসরি
নিকটের তাপতপ্ত ঘূর্ণিবায়ে ক্ষুব্ধ কোলাহল,
ধূলির নিবিড় টান পদতলে। রয়েছি নিশ্চল
সারাদিন পথপার্শ্বে; বেলা হয়ে এল অবসান,
ঘন হয়ে আসে ছায়া, শ্রান্ত সূর্য করিছে সন্ধান
দিগন্তে অন্তিম শান্তি। দিবা যথা চলেছে নির্ভীক
চিহ্নহীন সঙ্গহীন অন্ধকার পথের পথিক
আপনার কাছ হতে অন্তহীন অজানার পানে
অসীমের সংগীতে উদাসী,— সেইমতো আত্মদানে
আমারে বাহির করো, শূন্যে শূন্যে পূর্ণ হ'ক স্বর,
নিয়ে যাক পথে পথে হে অলক্ষ্য, হে মহাসুদূর।

২ জুলাই ১৯২৭

আহ্বান

আমার তরে পথের 'পরে কোথায় তুমি থাক
সে-কথা আমি শুধাই বারে বারে।
কোথায় জানি আসনখানি সাজিয়ে তুমি রাখ
আমার লাগি নিভৃতে একধারে।
বাতাস বেয়ে ইশারা পেয়ে গেছি মিলন-আশে
শিশিরধোয়া আলোতে-ছোঁয়া শিউলিছাওয়া ঘাসে,
খুঁজেছি দিশা বিলোল জল-কাকলিকলভাষে
অধীরধারা নদীর পারে পারে।

আকাশকোণে মেঘের রঙে মায়ার যেথা মেলা,
তটের তলে স্বচ্ছ জলে ছায়ার যেথা খেলা,
অশথশাখে কপোত ডাকে, সেথায় সারাবেলা
তোমার বাঁশি শুনেছি বারে বারে।

কেমনে বুঝি আমারে খুঁজি কোথায় তুমি ডাক,
বাজিয়া উঠে ভীষণ তব ভেরি।
শরম লাগে, মন না জাগে, ছুটিয়া চলি নাকো,
দ্বিধার ভরে দুয়ারে করি দেরি।
ডেকেছ তুমি মানুষ যেথা পীড়িত অপমানে,
আলোক যেথা নিবিয়া আসে শঙ্কাতুর প্রাণে,
আমারে চাহি ডঙ্কা তব বেজেছে সেইখানে
বন্দী যেথা কাঁদিছে কারাগারে।
পাষাণ ভিত টলিছে যেথা ক্ষিতির বুক ফাটি
ধুলায়-চাপা অনলশিখা কাঁপায়ে তোলে মাটি,
নিমেষ আসি বহুযুগের বাঁধন ফেলে কাটি,
সেথায় ভেরি বাজাও বারে বারে।

৪ শ্রাবণ ১৩৩৪
সিঙাপুর বন্দর

দুয়ার

হে দুয়ার, তুমি আছ মুক্ত অনুক্ষণ,
রুদ্ধ শুধু অন্ধের নয়ন।
অন্তরে কী আছে তাহা বোঝে না সে, তাই
প্রবেশিতে সংশয় সদাই।

হে দুয়ার, নিত্য জাগে রাত্রিদিনমান
সুগম্ভীর তোমার আহ্বান।
সূর্যের উদয়-মাঝে খোল আপনারে।
তারকায় খোল অন্ধকারে।

হে দুয়ার, বীজ হতে অঙ্কুরের দলে
খোল পথ, ফুল হতে ফলে।
যুগ হতে যুগান্তর কর অবারিত,
মৃত্যু হতে পরম অমৃত।

হে দুয়ার, জীবলোক তোরণে তোরণে
করে যাত্রা মরণে মরণে।
মুক্তিসাধনার পথে তোমার ইঙ্গিতে
'মাভৈঃ' বাজে নৈরাশ্যনিশীথে।

[১৩৩৪]

দীপিকা

প্রতি সন্ধ্যায় নব অধ্যায়,
জ্বাল তব নব দীপিকা।
প্রত্যুষপটে প্রতিদিন লেখ
আলোকের নব লিপিকা।
অন্ধকারের সাথে দুর্বার
সংগ্রাম তব হয় বারবার,
দিনে দিনে হয় কত পরাজয়,
দিনে দিনে জয়সাধনা।
পথ ভুলে ভুলে পথ খুঁজে লও,
সেই উৎসাহে পথদুখ বও,

দেববিদ্রোহে বাঁধা পড় মোহে
তবে হয় দেবারাধনা।

খেলাঘর ভেঙে বাঁধ খেলাঘর,
খেল ভেঙে ভেঙে খেলেনা।
বাসা বেঁধে বেঁধে বাসা ভাঙে মন
কোথাও আসন মেলে না।
জানি পথশেষে আছে পারাবার,
প্রতিখনে সেথা মেশে বারিধার,
নিমেষে নিমেষে তবু নিঃশেষে
ছুটিছে পথিক তটিনী।
ছেড়ে দিয়ে দিয়ে এক ধ্রুব গান
ফিরে ফিরে আসে নব নব তান,
মরণে মরণে চকিত চরণে
ছুটে চলে প্রাণনটিনী।

২৫ ফাল্গুন [১৩৩৩]

লেখা

সব লেখা লুপ্ত হয়, বারম্বার লিখিবার তরে
নূতন কালের বর্ণে। জীর্ণ তোর অক্ষরে অক্ষরে
কেন পট রেখেছিস পূর্ণ করি। হয়েছে সময়
নবীনের তুলিকারে পথ ছেড়ে দিতে। হ’ক লয়
সমাপ্তির রেখাদুর্গ। নব লেখা আসি দর্পভরে
তার ভগ্নস্তূপরাশি বিকীর্ণ করিয়া দূরান্তরে
উন্মুক্ত করুক পথ, স্থাবরের সীমা করি জয়,
নবীনের রথযাত্রা লাগি। অজ্ঞাতের পরিচয়
অনভিজ্ঞ নিক জিনে। কালের মন্দিরে পূজাঘরে
যুগবিজয়ার দিনে পূজার্চনা সাঙ্গ হলে পরে

যায় প্রতিমার দিন। ধুলা তারে ডাক দিয়ে কয়,—
"ফিরে ফিরে মোর মাঝে ক্ষয়ে ক্ষয়ে হবি রে অক্ষয়,
তোর মাটি দিয়ে শিল্পী বিরচিবে নূতন প্রতিমা,
প্রকাশিবে অসীমের নব নব অন্তহীন সীমা।"

১১ চৈত্র ১৩৩৩

নূতন শ্রোতা

১

শেষ লেখাটার খাতা
পড়ে শোনাই পাতার পরে পাতা,
অমিয়নাথ স্তব্ধ হয়ে দোলায় মুগ্ধ মাথা।
উচ্ছ্বসি কয়, "তোমার অমর কাব্যখানি
নিত্যকালের ছন্দে লেখা সত্যভাষার বাণী।"

দড়িবাঁধা কাঠের গাড়িটারে
নন্দগোপাল ঘটর ঘটর টেনে বেড়ায় সভাঘরের দ্বারে।
আমি বলি, "থাম্ রে বাপু, থাম্,
দুষ্টুমি এর নাম,—
পড়ার সময় কেউ কি অমন বেড়ায় গাড়ি ঠেলে।
দেখ্ দেখি তোর অমিকাকা কেমন লক্ষ্মীছেলে।"

অনেক কষ্টে ভালোমানুষ-বেশে
বসল নন্দ অমিকাকার কোলের কাছে ঘেঁষে।
দুরন্ত সেই ছেলে
আমার মুখে ডাগর নয়ন মেলে

চুপ করে রয় মিনিট কয়েক, অমিরে কয় ঠেলে,
“শোনো অমিকাকা,
গাড়ির ভাঙা চাকা
সারিয়ে দেবে বলেছিলে, দাও এঁটে ইস্কুপ।”
অমি বললে কানে-কানে, “চুপ চুপ চুপ।”
আবার খানিক শান্ত হয়ে শুনল বসে নন্দ
কবিবরের অমর ভাষার ছন্দ।

একটু পরে উস্‌খুসিয়ে গাড়ির থেকে দশবারোটা কড়ি
মেজের ’পরে করলে ছড়াছড়ি।
ঝম্‌ঝমিয়ে কড়িগুলো গুন্‌গুনিয়ে আউড়ে চলে ছড়া,—
এর পরে আর হয় না কাব্য পড়া।
তার ছড়া আর আমার ছড়ায় আর কতখন চলবে রেষারেষি,
হার মানতে হবেই শেষাশেষি।

অমি বললে, “দুষ্টু ছেলে।” নন্দ বললে, “তোমার সঙ্গে আড়ি,—
নিয়ে যাব গাড়ি,
দিন্‌দাদাকে ডাকব ছাতে ইস্টিশনের খেলায়,
গড়গড়িয়ে যাবে গাড়ি বদ্দিবাটির মেলায়।”
এই বলে সে ছল্‌ছলানি চোখে
গাড়ি নিয়ে দৌড়ে গেল কোন্‌ দিকে কোন্‌ ঝোঁকে।

আমি বললেম, যাও অমিয়, আজকে পড়া থাক্‌,
নন্দগোপাল এনেছে তার নতুনকালের ডাক।
আমার ছন্দে কান দিল না ও যে
কী মানে তার আমিই বুঝি আর যারা নাই বোঝে।
যে-কবির ও শুনবে পড়া সেও তো আজ খেলার গাড়ি ঠেলে,
ইস্টিশনের খেলাই সেও খেলে।
আমার মেলা ভাঙবে যখন দেব খেয়ায় পাড়ি,
তার মেলাতে পৌঁছবে তার গাড়ি,

আমার পড়ার মাঝে
তারি আসার ঘণ্টা যদি বাজে
সহজ মনে পারি যেন আসর ছেড়ে দিতে
নতুন কালের বাঁশিটিরে নতুন প্রাণের গীতে।
ভরেছিলেম এই ফাগুনের ডালা
তা নিয়ে কেউ নাই-বা গাঁথুক আর-ফাগুনের মালা।

১৯ অগস্ট ১৯২৭
প্লানসিউস জাহাজ

২

বছর বিশেক চলে গেল সাঙ্গ তখন ঠেলাগাড়ির খেলা ;
নন্দ বললে, "দাদামশায়, কী লিখেছ শোনাও তো এইবেলা !"
পড়তে গেলেম ভরসাতে বুক বেঁধে,
কণ্ঠ যে যায় বেধে ;
টেনে টেনে বাহির করি এ খাতা ওই খাতা,
উলটে মরি এ পাতা ওই পাতা।
ভয়ের চোখে যতই দেখি লেখা,
মনে হয় যে রস কিছু নেই, রেখার পরে রেখা।
গোপনে তার মুখের পানে চাহি,
বুদ্ধি সেথায় পাহারা দেয় একটু ক্ষমা নাহি।
নতুনকালের শানদেওয়া তার ললাটখানি খরখড়্গ-সম,
শীর্ণ যাহা, জীর্ণ যাহা তার প্রতি নির্মম।
তীক্ষ্ণ সজাগ আঁখি,
কটাক্ষে তার ধরা পড়ে কোথা যে কার ফাঁকি।
সংসারেতে গর্তগুহা যেখানে-যা সবখানে দেয় উঁকি,
অমিশ্র বাস্তবের সাথে নিত্য মুখোমুখি।

তীব্র তাহার হাস্য
বিশ্বকাজের মোহমুক্ত ভাষ্য।

একটু কেশে পড়া করলেম শুরু
যৌবনে যা শিখিয়েছিলেন অন্তর্যামী আমার কবিগুরু,—
প্রথম প্রেমের কথা,
আপ্‌নাকে সেই জানে না যেই গভীর ব্যাকুলতা,
সেই যে বিধুর তীব্রমধুর তরাসদোদুল বক্ষ দুরু দুরু,—
উড়ো পাখির ডানার মতো যুগল কালো ভুরু,
নীরব চোখের ভাষা,
এক নিমেষে উচ্ছলি দেয় চিরদিনের আশা,
তাহারি সেই দ্বিধার ঘায়ে ব্যথায় কম্পমান
দুটি-একটি গান।
এড়িয়ে-চলা জলধারার হাস্যমুখর কলকলোচ্ছ্বাস,
পূজায়-স্তব্ধ শরৎপ্রাতের প্রশান্ত নিশ্বাস,
বৈরাগিণী ধূসর সন্ধ্যা অস্তসাগরপারে,
তন্দ্রাবিহীন চিরন্তনের শান্তিবাণী নিশীথ-অন্ধকারে,—
ফাগুনরাতির স্পর্শমায়ায় অরণ্যতল পুষ্পরোমাঞ্চিত,
কোন্ অদৃশ্য সুচিরবাঞ্ছিত
বনবীথির ছায়াটিরে
কাঁপিয়ে দিয়ে বেড়ায় ফিরে ফিরে,
তারি চঞ্চলতা
মর্মরিয়া কইল যে-সব কথা,
তারি প্রতিধ্বনিভরা
দু-একটা চৌপদী আমার সসংকোচে পড়ে গেলেম ত্বরা।

পড়া আমার শেষ হল যেই, ক্ষণেক নীরব থেকে
নন্দগোপাল উৎসাহেতে বলল হঠাৎ ঝোঁকে,—

"দাদামশায়, শাবাশ।
তোমার কালের মনের গতি, পেলেম তারি ইতিহাসের আভাস।"
খাতা নিতে হাত বাড়াল, চাদরেতে দিলেম তাহা ঢাকা,
কইনু তারে, "দেখ্ তো ভায়া, কোথায় আছে তোর অমিয়কাকা।"

২৭ অক্টোবর [১৯২৭]
আবা-মারু জাহাজ। গঙ্গা

আশীর্বাদ

তরুণ আশীর্বাদপ্রার্থীর প্রতি প্রাচীন কবির নিবেদন
শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায়ের উদ্দেশে—

নিম্নে সরোবর স্তব্ধ হিমাদ্রির উপত্যকাতলে।
ঊর্ধ্বে গিরিশৃঙ্গ হতে শ্রান্তিহীন সাধনার বলে
তরুণ নির্ঝর ধায় সিন্ধুসনে মিলনের লাগি
অরুণোদয়ের পথে। সে কহিল, "আশীর্বাদ মাগি
হে প্রাচীন সরোবর।" সরোবর কহিল হাসিয়া,
"আশিস তোমারি তরে নীলাম্বরে উঠে উদ্ভাসিয়া
প্রভাতসূর্যের করে; ধ্যানমগ্ন গিরিতপস্বীর
বিগলিত করুণার প্রবাহিত আশীর্বাদনীর
তোমারে দিতেছে প্রাণধারা। আমি বনচ্ছায়া হতে,
নির্জনে একান্তে বসি, দেখি নির্বারিত স্রোতে
সংগীত-উদ্বেল নৃত্যে প্রতিক্ষণে করিতেছ জয়
মসীকৃষ্ণ বিঘ্নপুঞ্জ, পথরোধী পাষাণসঞ্চয়,
গূঢ় জড় শত্রুদল। এই তব যাত্রার প্রবাহ
আপনার গতিবেগে আপনার জাগায় উৎসাহ।"

১৪ পৌষ ১৩৩৫

মোহানা

ইরাবতীর মোহানামুখে কেন আপনভোলা
সাগর তব বরন কেন ঘোলা।
কোথা সে তব বিমল নীল স্বচ্ছ চোখে চাওয়া,
রবির পানে গভীর গান গাওয়া ?
নদীর জলে ধরণী তার পাঠাল এ কী চিঠি,
কিসের ঘোরে আবিল হল দিঠি।
আকাশ-সাথে মিলায়ে রঙ আছিলে তুমি সাজি,
ধরার রঙে বিলাস কেন আজি।
রাতের তারা আলোকে আজ পরশ করে যবে
পায় না সাড়া তোমার অনুভবে ;
প্রভাত চাহে স্বচ্ছ জলে নিজেরে দেখিবারে,
বিফল করি ফিরায়ে দাও তারে।

নিয়েছ তুমি ইচ্ছা করি আপন পরাজয়,
মানিতে হার নাহি তোমার ভয়।
বরন তব ধূসর কর, বাঁধন নিয়ে খেল,
হেলায় হিয়া হারায়ে তুমি ফেল।
এ-লীলা তব প্রান্তে শুধু তটের সাথে মেশা,
একটুখানি মাটির লাগে নেশা।
বিপুল তব বক্ষ-'পরে অসীম নীলাকাশ,
কোথায় সেথা ধরার বাহুপাশ।
ধুলারে তুমি নিয়েছ মানি, তবুও অমলিন,
বাঁধন পরি স্বাধীন চিরদিন।
কালীরে রহে বক্ষে ধরি শুভ্র মহাকাল,
বাঁধে না তাঁরে আলো কলুষজাল।

৭ কার্তিক ১৩৩৪। কালীপূজা
[ইরাবতীসংগম। বঙ্গসাগর]

বক্সাদুর্গস্থ রাজবন্দীদের প্রতি

নিশীথেরে লজ্জা দিল অন্ধকারে রবির বন্দন।
পিঞ্জরে বিহঙ্গ বাঁধা, সংগীত না মানিল বন্ধন।
ফোয়ারার রন্ধ্র হতে
উন্মুখর ঊর্ধ্বস্রোতে
বন্দীবারি উচ্চারিল আলোকের কী অভিনন্দন।

মৃত্তিকার ভিত্তি ভেদি অঙ্কুর আকাশে দিল আনি
স্বসমুখ শক্তিবলে গভীর মুক্তির মন্ত্রবাণী।
মহাক্ষণে রুদ্রাণীর
কী বর লভিল বীর,
মৃত্যু দিয়ে বিরচিল অমর্ত্য নরের রাজধানী।

'অমৃতের পুত্র মোরা'— কাহারা শুনাল বিশ্বময়।
আত্মবিসর্জন করি আত্মারে কে জানিল অক্ষয়।
ভৈরবের আনন্দেরে
দুঃখেতে জিনিল কে রে,
বন্দীর শৃঙ্খলচ্ছন্দে মুক্তের কে দিল পরিচয়।

১৯ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৮
দার্জিলিং

দুর্দিনে

দুর্যোগ আসি টানে যবে ফাঁসি
কর্মে জড়ায় গ্রন্থি,
মন্থর দিন পাথেয়বিহীন
দীর্ঘ পথের পন্থী ;

নির্দয়তম নিন্দার হাস,
নির্মমতম দৈব,
শূন্যে শূন্যে হতাশ বাতাস
ফুকারে 'নৈব নৈব'—
হঠাৎ তখন কহে মোরে মন,
'মিথ্যে, এ সব মিথ্যে,
প্রাণে যদি রয় গান অক্ষয়
সুর যদি রয় চিত্তে।'

চৌদিক করে যুদ্ধঘোষণ,
দুর্গম হয় পন্থা,
চিন্তায় করে রক্ত শোষণ
প্রখর-নখরদন্তা,
নিরানন্দের ঘিরি রহে ঘের,
নাই জীবনের সঙ্গী,
দৈন্য কুরূপ করে বিদ্রূপ
ব্যঙ্গের মুখভঙ্গী—
মন বলে, 'নাই ভাবনা কিছুই
মিথ্যে, এ সব মিথ্যে,
অন্তর-মাঝে চিরধনী তুই
অন্তবিহীন বিত্তে।'

ভাষাহীন দিন কুয়াশাবিলীন—
মলিন উষার স্বর্ণ,
কল্পনা যত বাদুড়ের মতো
রাতে ওড়ে কালো বর্ণ;
আবর্জনার অচলপুঞ্জে
যাত্রার পথ রুদ্ধ,
রিক্তকুসুম শুষ্ক কুঞ্জে
বৈশাখ রহে ক্রুদ্ধ—

মন মোরে কয়, 'এ কিছুই নয়,
মিথ্যে, এ সব মিথ্যে,
আপনায় ভুলে গাও প্রাণ খুলে,
নাচো নিখিলের নৃত্যে।'

বদ্ধদুয়ার বিশ্ব বিরাজে,
নিবেছে ঘরের দীপ্তি,
চির-উপবাসী আপনার মাঝে
আপনি না পাই তৃপ্তি,
পদে পদে রয় সংশয় ভয়,
পদে পদে প্রেম ক্ষুণ্ণ,
বৃথা আহ্বান, বৃথা অনুনয়,
সবার আসন শূন্য—
মন বলি উঠে, 'ডুবে যা গভীরে,
মিথ্যে, এ সব মিথ্যে,
নিবিড় ধেয়ানে নিখিল লভি রে
আপনারি একাকিত্বে।'

২৬ অক্টোবর ১৯২৭
আবা-মারু। বঙ্গসাগর

প্রশ্ন

ভগবান, তুমি যুগে যুগে দূত, পাঠায়েছ বারে বারে
দয়াহীন সংসারে,
তারা বলে গেল 'ক্ষমা করো সবে', বলে গেল 'ভালোবাসো—
অন্তর হতে বিদ্বেষবিষ নাশো'।
বরণীয় তারা, স্মরণীয় তারা, তবুও বাহির-দ্বারে
আজি দুর্দিনে ফিরানু তাদের ব্যর্থ নমস্কারে।

আমি-যে দেখেছি গোপন হিংসা কপট রাত্রিছায়ে
হেনেছে নিঃসহায়ে,
আমি-যে দেখেছি প্রতিকারহীন শক্তের অপরাধে
বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে।
আমি-যে দেখিনু তরুণ বালক উন্মাদ হয়ে ছুটে
কী যন্ত্রণায় মরেছে পাথরে নিষ্ফল মাথা কুটে।

কণ্ঠ আমার রুদ্ধ আজিকে, বাঁশি সংগীতহারা,
অমাবস্যার কারা
লুপ্ত করেছে আমার ভুবন দুঃস্বপনের তলে,
তাই তো তোমায় শুধাই অশ্রুজলে—
যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো,
তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছ ভালো।

পৌষ ১৩৩৮

ভিক্ষু

হায় রে ভিক্ষু, হায় রে,
নিঃস্বতা তোর মিথ্যা সে ঘোর,
নিঃশেষে দে বিদায় রে।
ভিক্ষাতে শুভলগ্নের ক্ষয়
কোন্ ভুলে তুই ভুলিলি,
ভাণ্ডার তোর পণ্ড-যে হয়,
অর্গল নাহি খুলিলি।
আপনারে নিয়ে আবরণ দিয়ে
এ কী কুৎসিত ছলনা;
জীর্ণ এ চীর ছদ্মবেশীর,
নিজেরে সে কথা বল না।

হায় রে ভিক্ষু, হায় রে,
মিথ্যা মায়ার ছায়া ঘুচাবার
মন্ত্র কে নিবি আয় রে

কাঙাল যে জন পায় না সে ধন,
পায় সে কেবল ভিক্ষা।
চির-উপবাসী মিছা-সন্ন্যাসী
দিয়েছে তাহারে দীক্ষা।
তোর সাধনায় রত্নমানিক
পথে পথে যাস ছড়ায়ে,
ভিক্ষার ঝুলি, ধিক্ তারে ধিক্,
বহিস নে শিরে চড়ায়ে।
হায় রে ভিক্ষু, হায় রে,
নিঃস্বজনের দুঃস্বপনের
বন্ধ, ছিঁড়িস তায় রে।

অঞ্চলে রাতি ভিক্ষার কণা
সঞ্চয় করে তারাতে,
নিয়ে সে পারানি তবু পারিল না
তিমিরসিন্ধু পারাতে।
পূর্বগগন আপনার সোনা
ছড়াল যখন দ্যুলোকে,
পূর্ণের দানে পূর্ণ কামনা
প্রভাত পুরিল পুলকে।
হায় রে ভিক্ষু, হায় রে,
আপনা-মাঝারে গোপন রাজারে
মন যেন তোর পায় রে।

২৩ জুন ১৯২৮
বাঙ্গালোর

আশীর্বাদী

কল্যাণীয়া অমলিনার প্রথম বার্ষিক জন্মদিনে

তোমারে জননী ধরা
দিল রূপে রসে ভরা
প্রাণের প্রথম পাত্রখানি,
তাই নিয়ে তোলাপাড়া
ফেলাছড়া নাড়াচাড়া
অর্থ তার কিছুই না জানি।
কোন্ মহারঙ্গশালে
নৃত্য চলে তালে তালে,
ছন্দ তারি লাগে রক্তে তব।
অকারণ কলরোলে
তাই তব অঙ্গ দোলে,
ভঙ্গী তার নিত্য নব নব।
চিন্তা-আবরণহীন
নগ্নচিত্ত সারাদিন
লুটাইছে বিশ্বের প্রাঙ্গণে,
ভাষাহীন ইশারায়
ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলে যায়
যাহা-কিছু দেখে আর শোনে।
অস্ফুট ভাবনা যত
অশথপাতার মতো
কেবলি আলোয় ঝিলিমিলি।
কী হাসি বাতাসে ভেসে
তোমারে লাগিছে এসে,
হাসি বেজে ওঠে খিলিখিলি।
গ্রহ তারা শশী রবি
সমুখে ধরেছে ছবি
আপন বিপুল পরিচয়।

কচি কচি দুই হাতে
খেলিছ তাহারি সাথে,
নাই প্রশ্ন, নাই কোনো ভয়।
তুমি সর্ব দেহে মনে
ভরি লহ প্রতিক্ষণে
যে সহজ আনন্দের রস,
যাহা তুমি অনায়াসে
ছড়াইছ চারিপাশে
পুলকিত দরশ পরশ,
আমি কবি তারি লাগি
আপনার মনে জাগি,
বসে থাকি জানালার ধারে।
অমরার দূতীগুলি
অলক্ষ্য দুয়ার খুলি
আসে যায় আকাশের পারে।
দিগন্তে নীলিম ছায়া
রচে দুরান্তের মায়া,
বাজে সেথা কী অশ্রুত বেণু।
মধ্যদিন তন্দ্রাতুর
শুনিছে রৌদ্রের সুর,
মাঠে শুয়ে আছে ক্লান্ত ধেনু।
চোখের দেখাটি দিয়ে
দেহ মোর পায় কী এ,
মন মোর বোবা হয়ে থাকে।
সব আছে আমি আছি,
দুইয়ে মিলে কাছাকাছি
আমার সকল-কিছু ঢাকে।
যে-আশ্বাসে মর্ত্যভূমি
হে শিশু, জাগাও তুমি,
যে নির্মল যে সহজ প্রাণে,

কবির জীবনে তাই
যেন বাজাইয়া যাই
তারি বাণী মোর যত গানে।
ক্লান্তিহীন নব আশা
সেই তো শিশুর ভাষা,
সেই ভাষা প্রাণদেবতার,
জরার জড়ত্ব ত্যেজে
নব নব জন্মে সে যে
নব প্রাণ পায় বারম্বার।
নৈরাশ্যের কুহেলিকা
উষার আলোকটিকা
ক্ষণে ক্ষণে মুছে দিতে চায়,
বাধার পশ্চাতে কবি
দেখে চিরন্তন-রবি
সেই দেখা শিশুচক্ষে ভায়।
শিশুর সম্পদ বয়ে
এসেছ এ-লোকালয়ে,
সে-সম্পদ থাক্ অমলিনা।
যে-বিশ্বাস দ্বিধাহীন
তারি স্বরে চিরদিন
বাজে যেন জীবনের বীণা।

৮ কার্তিক ১৩৩৮
দার্জিলিং

অবুঝ মন

অবুঝ শিশুর আবছায়া এই নয়নবাতায়নের ধারে
আপনাভোলা মনখানি তার অধীর হয়ে উঁকি মারে।
বিনাভাষার ভাবনা নিয়ে কেমন আঁকুবাঁকুর খেলা,—
হঠাৎ ধরা, হঠাৎ ছড়িয়ে ফেলা,

হঠাৎ অকারণ
কী উৎসাহে বাহু নেড়ে উদ্দাম গর্জন।
হঠাৎ দুলে দুলে ওঠে,
অর্থবিহীন কোন্ দিকে তার লক্ষ ছোটে।
বাহির-ভুবন হতে
আলোর লীলায় ধ্বনির স্রোতে
যে-বাণী তার আসে প্রাণে
তারি জবাব দিতে গিয়ে কী-যে জানায় কেই তা জানে

এই যে অবুঝ এই যে বোবা মন
প্রাণের 'পরে ঢেউ জাগিয়ে কৌতুকে যে অধীর অনুক্ষণ,
সর্ব দিকেই সর্বদা উন্মুখ,
আপনারি চাঞ্চল্য নিয়ে আপ্‌নি সমুৎসুক,—
নয় বিধাতার নবীন রচনা এ,
ইহার যাত্রা আদিম যুগের নায়ে।
বিশ্বকবির মানস-সরোবরে
প্রাতঃস্নানের পরে
প্রাণের সঙ্গে বাহির হল, তখন অন্ধকার,
নিয়ে এল ক্ষীণ আলোটি তার।
তারি প্রথম ভাষাবিহীন কূজনকাকলি যে
বনে বনে শাখায় পাতায় পুষ্পে ফলে বীজে
অঙ্কুরে অঙ্কুরে
উঠল জেগে ছন্দে সুরে সুরে।
সূর্য-পানে অবাক আঁখি মেলি
মুখরিত উচ্ছল তার কেলি।

নানারূপের খেলনা যে তার নানা বর্ণে আঁকে,
বারেক খোলে, বারেক তারে ঢাকে।

রোদবাদলে করুণ কান্না হাসি
সদাই ওঠে আভাসি উচ্ছ্বাসি।

ওই যে শিশুর অবুঝ ভোলা মন
তরীর কোণে বসে বসে দেখছি তারি আকুল আন্দোলন।
মাঝে-মাঝে সাগর-পানে তাকিয়ে দেখি যত
মনে ভাবি, ও যেন এই শিশু-আঁখির মতো,
আকাশ-পানে আবছায়া ওর চাওয়া
কোন্ স্বপনে-পাওয়া,
অন্তরে ওর যেন সে কোন্ অবুঝ ভোলা মন
এ-তীর হতে ও-তীর পানে দুলছে অনুক্ষণ।
কেমন কলভাষে
প্রলয়কাঁদন কাঁদে ও যে প্রবল হাসি হাসে
আপ্‌নিও তার অর্থ আছে ভুলে,—
ক্ষণে ক্ষণে শুধুই ফুলে ফুলে
অকারণে গর্জি উঠে শূন্যে শূন্যে মূঢ় বাহু তুলে।

বিরাট অবুঝ এই সে আদিম মন,
মানব-ইতিহাসের মাঝে আপ্‌নারে তার অধীর অন্বেষণ।
ঘর হতে ধায় আগুন-পানে, আগুন হতে পথে,
পথ হতে ধায় তেপান্তরের বিঘ্নবিষম অরণ্যে পর্বতে;
এই সে গড়ে, এই সে ভাঙে, এই সে কী আক্ষেপে
পায়ের তলায় ধরণীরে আঘাত করে ধুলায় আকাশ ব্যেপে;
হঠাৎ খেপে উঠে
রুদ্ধ পাষাণভিত্তি-'পরে বেড়ায় মাথা কুটে।
অনাসৃষ্টি সৃষ্টি আপনগড়া
তাই নিয়ে সে লড়াই করে, তাই নিয়ে তার কেবল ওঠাপড়া
হঠাৎ উঠে ঝেঁকে
যায় সে ছুটে কী রাঙা রঙ দেখে
অদৃশ্য কোন্ দূর দিগন্ত-পানে;

আবছায়া কোন্ সন্ধ্যা-আলোয় শিশুর মতো তাকায় অনুমানে,
তাহার ব্যাকুলতা
স্বপ্নে সত্যে মিশিয়ে রচে বিচিত্র রূপকথা।

২০ অক্টোবর ১৯২৭
আবা-মার জাহাজ

পরিণয়

সুরমা ও সুরেন্দ্রনাথ কর -এর বিবাহ উপলক্ষে

ছিল চিত্রকল্পনায়, এতকাল ছিল গানে গানে,
সেই অপরূপ এল রূপ ধরি তোমাদের প্রাণে।
আনন্দের দিব্যমূর্তি সে-যে,
দীপ্ত বীরতেজে
উত্তরিয়া বিঘ্ন যত দূর করি ভীতি
তোমাদের প্রাঙ্গণেতে হাঁক দিল, 'এসেছি অতিথি'।

জ্বালো গো মঙ্গলদীপ করো অর্ঘ্য দান
তনু মনপ্রাণ।
ও যে সুরভবনের রমার কমলবনবাসী,
মর্ত্যে নেমে বাজাইল সাহানায় নন্দনের বাঁশি।
ধরার ধূলির 'পরে
মিশাইল কী আদরে
পারিজাতরেণু।
মানবগৃহের দৈন্যে অমরাবতীর কল্পধেনু
অলক্ষ্য অমৃতরস দান করে
অন্তরে অন্তরে।
এল প্রেম চিরন্তন, দিল দোঁহে আনি
রবিকরদীপ্ত আশীর্বাণী।

২৫ বৈশাখ ১৩৩৮
[শান্তিনিকেতন]

চিরন্তন

এই বিদেশের রাস্তা দিয়ে ধুলোয় আকাশ ঢেকে
গাড়ি আমার চলতেছিল হেঁকে।
হেনকালে নেবুর ডালে স্নিগ্ধ ছায়ায় উঠল কোকিল ডেকে
পথকোণের ঘন বনের থেকে।

এই পাখিটির স্বরে
চিরদিনের সুর যেন এই একটি দিনের 'পরে
বিন্দু বিন্দু ঝরে।
ছেলেবেলায় গঙ্গাতীরে আপন-মনে চেয়ে জলের পানে
শুনেছিলেম পল্লীতলে, এই কোকিলের গানে
অসীমকালের অনির্বচনীয়
প্রাণে আমার শুনিয়েছিল, "তুমি আমার প্রিয়।"

সেই ধ্বনিটি কানন ব্যেপে পল্লবে পল্লবে
জলের কলরবে
ওপার-পানে মিলিয়ে যেত সুদূর নীলাকাশে।
আজ এই পরবাসে
সেই ধ্বনিটি ক্ষুদ্র পথের পাশে
গোপন শাখার ফুলগুলিরে দিল আপন বাণী।
বনচ্ছায়ার শীতল শান্তিখানি
প্রভাত-আলোর সঙ্গে করে নিবিড় কানাকানি
ওই বাণীটির বিমল স্বরে গভীর রমণীয়,—
"তুমি আমার প্রিয়।"

এরি পাশেই নিত্য হানাহানি;
প্রতারণার ছুরি
পাঁজর কেটে করে চুরি

সরল বিশ্বাস ;
কুটিল হাসি ঘটিয়ে তোলে জটিল সর্বনাশ।
নিরাশ দুঃখে চেয়ে দেখি পৃথ্বীব্যাপী মানববিভীষিকা
জ্বালায় মানবলোকালয়ে প্রলয়বহ্নিশিখা,
লোভের জালে বিশ্বজগৎ ঘেরে,
ভেবে না পাই কে বাঁচাবে আপনহানা অন্ধ মানুষেরে।

হেনকালে স্নিগ্ধ ছায়ায় হঠাৎ কোকিল ডাকে
ফুল্ল অশোকশাখে ;
পরশ করে প্রাণে
যে-শান্তিটি সব-প্রথমে, যে-শান্তিটি সবার অবসানে,
যে-শান্তিতে জানায় আমায় অসীম কালের অনির্বচনীয়,—
"তুমি আমার প্রিয়।"

১৮ অক্টোবর ১৯২৭
পিনাঙ

কণ্টিকারি

শিলঙে এক গিরির খোপে পাথর আছে খসে,—
তারি উপর লুকিয়ে ব'সে
রোজ সকালে গেঁথেছিলেম ভোরের সুরে গানের মালা।
প্রথম সূর্যোদয়ের সঙ্গে ছিল আমার মুখোমুখির পালা।

ডানদিকেতে অফলা এক পিচের শাখা ভরে
ফুল ফোটে আর ফুল প'ড়ে যায় ঝরে।
কালো ডানায় হলদে আভাস কোন্ পাখি সেই অকারণের গানে
ক্লান্তি নাহি জানে,—

তেমনিতরো গোলাপলতা লতাবিতান ঢেকে
অজস্র তার ফুলের ভাষায় অন্ত না পায় উদ্দেশহীন ডেকে।
পাইনবনের প্রাচীন তরু তাকায় মেঘের মুখে,
ডালগুলি তার সবুজ ঝরনা ধরার পানে ঝুঁকে
মন্ত্রে যেন থমক-লেগে আছে।
দুটি দালিম গাছে
ঘনসবুজ পাতার কোলে কোলে
ঘনরাঙা ফুলের গুচ্ছ দোলে।

পায়ের কাছে একটি কণ্টিকারি—
অন্তরঙ্গ কাছের সঙ্গ তারি,
দূরের শূন্যে আপনাকে সে প্রচার নাহি করে।
মাটির কাছে নত হলে পরে
স্নিগ্ধ সাড়া দেয় সে ধীরে ধূলিশয়ন থেকে
নীলবরনের ফুলের বুকে একটুখানি সোনার বিন্দু এঁকে।

সেদিন যত রচেছিলাম গান
কণ্টিকারির দান
তাদের সুরে স্বীকার করা আছে।
আজকে যখন হৃদয় আমার ক্ষণিক শান্তি যাচে
দুঃখদিনের দুর্ভাবনার প্রচণ্ড পীড়নে,
হঠাৎ কেন জাগল আমার মনে,
সেই সকালের টুকরো একটুখানি—
মাটির কাছে কণ্টিকারির নীল-সোনালির বাণী।

৫ আষাঢ় ১৩৩৯

আরেক দিন

স্পষ্ট মনে জাগে,
তিরিশ বছর আগে
তখন আমার বয়স পঁচিশ— কিছুকালের তরে
এই দেশেতেই এসেছিলেম, এই বাগানের ঘরে।
সূর্য যখন নেমে যেত নীচে
দিনের শেষে ওই পাহাড়ে পাইনশাখার পিছে,
নীল শিখরের আগায় মেঘে মেঘে
আগুনবরন কিরণ রইত লেগে,
দীর্ঘ ছায়া বনে বনে এলিয়ে যেত পর্বতে পর্বতে ;—
সামনেতে ঐ কাঁকরঢালা পথে
দিনের পরে দিনে
ডাকপিয়নের পায়ের ধ্বনি নিত্য নিতেম চিনে।
মাসের পরে মাস গিয়েছে, তবু
একবারো তার হয় নি কামাই কভু।

আজো তেমনি সূর্য ডোবে সেইখানেতেই এসে
পাইনবনের শেষে,
সুদূর শৈলতলে
সন্ধ্যাছায়ার ছন্দ বাজে ঝরনাধারার জলে,
সেই সেকেলের মতোই তেমনিধারা
তারার পরে তারা
আলোর মন্ত্র চুপি চুপি শুনায় কানে পর্বতে পর্বতে ;
শুধু আমার কাঁকরঢালা পথে
বহুকালের চেনা
ডাকপিয়নের পায়ের ধ্বনি একদিনো বাজবে না।

আজকে তবু কী প্রত্যাশা জাগল আমার মনে,—
চলতে চলতে গেলেম অকারণে

ডাকঘরে সেই মাইলতিনেক দূরে।
দ্বিধা ভরে মিনিটকুড়িক এদিক ওদিক ঘুরে
ডাকবাবুদের কাছে
শুধাই এসে, "আমার নামে চিঠিপত্তর আছে ?"
জবাব পেলেম, "কই, কিছু তো নেই।"
শুনে তখন নতশিরে আপন-মনেতেই
অন্ধকারে ধীরে ধীরে
আসছি যখন শূন্য আমার ঘরের দিকে ফিরে,
শুনতে পেলেম পিছন দিকে
করুণ গলায় কে অজানা বললে হঠাৎ কোন্ পথিকে,—
"মাথা খেয়ো, কাল কোরো না দেরি।"
ইতিহাসের বাকিটুকু আঁধার দিল ঘেরি।
বক্ষে আমার বাজিয়ে দিল গভীর বেদনা সে
পঁচিশবছর বয়সকালের ভুবনখানির একটি দীর্ঘশ্বাসে,
যে-ভুবনে সন্ধ্যাতারা শিউরে যেত ওই পাহাড়ের দূরে
কাঁকরঢালা পথের 'পরে ডাকপিয়নের পদধ্বনির সুরে।

২৩ অগস্ট ১৯২৭
রঙ্কিউস্ জাহাজ

তে হি নো দিবসাঃ

এই অজানা সাগরজলে বিকেলবেলার আলো
লাগল আমার ভালো।
কেউ দেখে কেউ নাই-বা দেখে, রাখবে না কেউ মনে,
এমনতরো ফেলাছড়ার হিসাব কি কেউ গোনে।

এই দেখে মোর ভরল বুকের কোণ ;
কোথা থেকে নামল রে সেই খেপা দিনের মন,
যেদিন অকারণ

হঠাৎ হাওয়ায় যৌবনেরি ঢেউ
ছল্‌ছলিয়ে উঠত প্রাণে জানত না তা কেউ।
লাগত আমায় আপন গানের নেশা
অনাগত ফাগুনদিনের বেদন দিয়ে মেশা।

সে গান যারা শুনত তারা আড়াল থেকে এসে
আড়ালেতে লুকিয়ে যেত হেসে।
হয়তো তাদের দেবার ছিল কিছু,
আভাসে কেউ জানায় নি তা নয়ন করে নিচু।
হয়তো তাদের সারাদিনের মাঝে
পড়ত বাধা একবেলাকার কাজে।
চমকলাগা নিমেষগুলি সেই
হয়তো বা কার মনে আছে, হয়তো মনে নেই।
জ্যোৎস্নারাতে একলা ছাদের 'পরে
উদার অনাদরে
কাটত প্রহর লক্ষ্যবিহীন প্রাণে,
মূল্যবিহীন গানে।

মোর জীবনে বিশ্বজনের অজানা সেই দিন,
বাজত তাহার বুকের মাঝে খামখেয়ালী বীন,—
যেমনতরো এই সাগরে নিত্য সোনায় নীলে
রূপহারানো রাধাশ্যামের দোলন দোঁহায় মিলে,
যেমনতরো ছুটির দিনে এমনি বিকেলবেলা
দেওয়া-নেওয়ার নাই কোনো দায়, শুধু হওয়ার খেলা,
অজানাতে ভাসিয়ে দেওয়া আলোছায়ার ভেলা।

২ অক্টোবর ১৯২৭
মারুর জাহাজ

দীপশিল্পী

হে সুন্দরী, হে শিখা মহতী,
তোমার অরূপ জ্যোতি
রূপ লবে আমার জীবনে,
তারি লাগি একমনে
রচিলাম এই দীপখানি,
মূর্তিমতী এই মোর অভ্যর্থনাবাণী।

এসো এসো করো অধিষ্ঠান,
মোর দীর্ঘ জীবনেরে করো গো চরম বরদান।
হয় নাই যোগ্য তব,
কতবার ভাঙিয়াছি আবার গড়েছি অভিনব,—
মোর শক্তি আপনারে দিয়েছে ধিক্কার।
সময় নাহি যে আর,
নিদ্রাহারা প্রহর-যে একে একে হয় অপগত,
তাই আজ সমাপিনু ব্রত।
গ্রহণ করো এ মোর চিরজীবনের রচনারে
ক্ষণকাল স্পর্শ করো তারে।
তারপরে রেখে যাব এ জন্মের এক-সার্থকতা,
চিরন্তন সুখ মোর, এই মোর চিরন্তন ব্যথা।

ফাল্গুন ? ১৩৩৮

মানী

উচ্চপ্রাচীরে রুদ্ধ তোমার
ক্ষুদ্র ভুবনখানি,
হে মানী, হে অভিমানী।
মন্দিরবাসী দেবতার মতো

সম্মানশৃঙ্খলে
বন্দী রয়েছ পূজার আসনতলে।
সাধারণজন-পরশ এড়ায়ে
নিজেরে পৃথক করি
আছ দিনরাত গৌরবগুরু
কঠিন মূর্তি ধরি।
সবার যেখানে ঠাঁই
বিপুল তোমার মর্যাদা নিয়ে
সেথায় প্রবেশ নাই।
অনেক উপাধি তব,
মানুষ-উপাধি হারায়েছ শুধু
সে ক্ষতি কাহারে কব।

ভক্তেরা মন্দিরে
পূজারির কৃপা বহু-দামে কিনে
পূজা দিয়ে যায় ফিরে
ঝিল্লিমুখর বেণুবীথিকার ছায়ে
আপন নিভৃত গাঁয়ে।
তখন একাকী বৃথা বিচিত্র
পাষাণভিত্তি-মাঝে
দেবতার বুকে জান সে কী ব্যথা বাজে।
বেদির বাঁধন করি ধূলিসাৎ
অচলেরে দিয়ে নাড়া
মানুষের মাঝে সে-যে পেতে চায় ছাড়া।

হে রাজা, তোমার পূজাঘেরা মন
আপনারে নাহি জানে।
প্রাণহীন সম্মানে
উজ্জ্বল রঙে রঙকরা তুমি ঢেলা,—
তোমার জীবন সাজানো পুতুল

স্থূল মিথ্যার খেলা।
আপনি রয়েছ আড়ষ্ট হয়ে
আপনার অভিশাপে,
নিশ্চল তুমি নিজ গর্বের চাপে।
সহজ প্রাণের মান নিয়ে যারা
মুক্ত ভুবনে ফিরে
মরিবার আগে তাদের পরশ
লাগুক তোমার শিরে।

ফাল্গুন ? ১৩৩৮

রাজপুত্র

রূপকথা-স্বপ্নলোকবাসী
রাজপুত্র কোথা হতে আসি
শুভক্ষণে দেখা দেয় রূপে
চুপে-চুপে,
জানি বলে জেনেছিনু যারে
তারি মাঝে। আমার সংসারে,
বক্ষে মোর আগমনী পদধ্বনি বাজে
যেন বহুদূর হতে আসা।
তার ভাষা
প্রাণে দেয় আনি
সমুদ্রপারের কোন্ অভিনব যৌবনের বাণী।
সেদিন বুঝিতে পারে মন
ছিল সে-যে নিশ্চেতন
তুচ্ছতার অন্তরালে
এতকাল মায়ানিদ্রাজালে।
তার দৃষ্টিপাতে মোরে নূতন সৃষ্টির ছোঁওয়া লাগে,
চিত্ত জাগে।—

বলি তার পদযুগ চুমি,
"রাজপুত্র তুমি।"
এতদিন
আত্মপরিচয়হীন
জড়তার পাষাণপ্রাচীর দিয়ে ঘেরা
দুর্গ-মাঝে রেখেছিল প্রত্যহের প্রথার দৈত্যেরা।
কোন্ মন্ত্রগুণে
সে দুর্ভেদ বাধা যেন দাহিলে আগুনে,
বন্দিনীরে করিলে উদ্ধার,
করি নিলে আপনার,
নিয়ে গেলে মুক্তির আলোকে।
আজিকে তোমারে দেখি কী নূতন চোখে।
কুঁড়ি আজ উঠেছে কুসুমি,
বারবার মন বলে, "রাজপুত্র তুমি।"

২৮ ফাল্গুন ১৩৩৮

অগ্রদূত

হে পথিক, তুমি একা।
আপনার মনে জানি না কেমনে
অদেখার পেলে দেখা।
যে-পথে পড়ে নি পায়ের চিহ্ন
সে-পথে চলিলে রাতে,
আকাশে দেখেছ কোন্ সংকেত,
কারেও নিলে না সাথে।
তুঙ্গগিরির উঠিছ শিখরে
যেখানে ভোরের তারা
অসীম আলোকে করিছে আপন
আলোর যাত্রা সারা।

প্রথম যেদিন ফাল্গুনতাপে
নবনির্ঝর জাগে,
মহাসুদূরের অপরূপ রূপ
দেখিতে সে পায় আগে।
আছে আছে আছে, এই বাণী তার
এক নিমেষেই ফুটে,
অচেনা পথের আহ্বান শুনে
অজানার পানে ছুটে।
সেইমতো এক অকথিত ভাষা
ধ্বনিল তোমার মাঝে,
আছে আছে আছে, এ মহামন্ত্র
প্রতি নিশ্বাসে বাজে।

রোধিয়াছে পথ বন্ধুর করি
অচল শিলার স্তূপ।
নহে নহে নহে, এ নিষেধবাণী
পাষাণে ধরেছে রূপ।
জড়ের সে নীতি করে গর্জন
ভীরুজন মরে ভুলে,
জনহীন পথে সংশয়মোহ
রহে তর্জনী তুলে।
অলস মনের আপনারি ছায়া
শঙ্কিল কায়া ধরে,
অতি নিরাপদ বিনাশের তলে
বাঁচিতে চেয়ে সে মরে।

নবজীবনের সংকটপথে
হে তুমি অগ্রগামী,
তোমার যাত্রা সীমা মানিবে না
কোথাও যাবে না থামি।

শিখরে শিখরে কেতন তোমার
রেখে যাবে নব নব,
দুর্গম-মাঝে পথ করি দিবে,—
জীবনের ব্রত তব।
যত আগে যাবে দ্বিধা সন্দেহ
ঘুচে যাবে পাছে পাছে,
পায়ে পায়ে তব ধ্বনিয়া উঠিবে
মহাবাণী— 'আছে আছে'

১২ চৈত্র ১৩৩৮

প্রতীক্ষা

তোমার স্বপ্নের দ্বারে আমি আছি বসে
তোমার সুপ্তির প্রান্তে, নিভৃত প্রদোষে
প্রথম প্রভাততারা যবে বাতায়নে
দেখা দিল। চেয়ে আমি থাকি একমনে
তোমার মুখের 'পরে। স্তম্ভিত সমীরে
রাত্রির প্রহরশেষে সমুদ্রের তীরে
সন্ন্যাসী যেমন থাকে ধ্যানাবিষ্ট চোখে
চেয়ে পূর্বতট-পানে, প্রথম আলোকে
স্পর্শস্নান হবে তার, এই আশা ধরি
অনিদ্র আনন্দে কাটে দীর্ঘ বিভাবরী।
তব নবজাগরণী প্রথম যে-হাসি
কনকচাঁপার মতো উঠিবে বিকাশি
আধোখোলা অধরেতে, নয়নের কোণে,
চয়ন করিব তাই, এই আছে মনে।

২৫ ফাল্গুন ১৩৩৮

নির্বাক্

মনে তো ছিল তোমারে বলি কিছু
যে-কথা আমি বলি নি আর-কারে,
সেদিন বনে মাধবীশাখা নিচু
ফুলের ভারে ভারে।
বাঁশিতে লই মনের কথা তুলি
বিরহব্যথাবৃন্ত হতে ভাঙা,—
গোপন রাতে উঠেছে তারা দুলি
সুরের রঙে রাঙা।

শিরীষবন নতুনপাতা-ছাওয়া
মর্মরিয়া কহিল, 'গাহো গাহো।'
মধুমালতীগন্ধে-ভরা হাওয়া
দিয়েছে উৎসাহ।
পূর্ণিমাতে জোয়ারে উছলিয়া
নদীর জল ছলছলিয়া উঠে।
কামিনী ঝরে বাতাসে বিচলিয়া
ঘাসের 'পরে লুটে।

সে মধুরাতে আকাশে ধরাতলে
কোথাও কিছু ছিল না কৃপণতা।
চাঁদের আলো সবার হয়ে বলে
যত মনের কথা।
মনে হল যে, নীরবে কৃপা যাচে
যা-কিছু আছে তোমার চারিদিকে।
সাহস ধরি গেলেম তব কাছে
চাহিনু অনিমিখে।

সহসা মন উঠিল চমকিয়া
বাঁশিতে আর বাজিল না তো বাণী।
গহনছায়ে দাঁড়ানু থমকিয়া
হেরিনু মুখখানি।

সাগরশেষে দেখেছি একদিন
মিলিছে সেথা বহু নদীর ধারা—
ফেনিল জল দিক্‌সীমায় লীন
অপারে দিশাহারা।
তরণী মোর নানা স্রোতের টানে
অবোধসম কাঁপিছে থরথরি,
ভেবে না পাই কেমনে কোন্‌খানে
বাঁধিব মোর তরী।

তেমনি আজি তোমার মুখে চাহি
নয়ন যেন কূল না পায় খুঁজি,
অভাবনীয় ভাবেতে অবগাহি
তোমারে নাহি বুঝি।
মুখেতে তব শ্রান্ত এ কী আশা,
শান্তি এ কী, গোপন এ কী প্রীতি,
বাণীবিহীন এ কী ধ্যানের ভাষা,
এ কী সুদূর স্মৃতি।
নিবিড় হয়ে নামিল মোর মনে
স্তব্ধ তব নীরব গভীরতা—
রহিনু বসি লতাবিতান-কোণে,
কহি নি কোনো কথা।

মাঘ ১৩৩৮

প্রণাম

তোমার প্রণাম এ যে তারি আভরণ
যারে তুমি করেছ বরণ।
তুমি মূল্য দিলে তারে
দুর্লভ পূজার অলংকারে।
ভক্তিসমুজ্জ্বল চোখে
তাহারে হেরিলে তুমি যে-শুভ্র আলোকে
সে আলো করালো তারে স্নান ;
দীপ্যমান মহিমার দান
পরাইল ললাটের ’পর।
হ’ক সে দেবতা কিম্বা নর,
তোমারি হৃদয় হতে বিচ্ছুরিত রশ্মির ছটায়
দিব্য আবির্ভাবে তার প্রকাশ ঘটায়।
তার পরিচয়খানি
তোমাতেই লভিয়াছে জয়বাণী।
রচিয়া দিয়াছে তার সত্য স্বর্গপুরী
তোমারি এ প্রীতির মাধুরী
যে-অমৃত করে পান
ঢালে তাহা তোমারি এ উচ্ছ্বসিত প্রাণ।
তব শির নত
দিক্‌রেখায় অরুণের মতো,
তারি ’পরে দেবতার অভ্যুদয়
রূপ লভে সুপ্রসন্ন পুণ্য জ্যোতির্ময়।

১৭ চৈত্র ১৩৩৮

শূন্যঘর

গোধূলি-অন্ধকারে
পুরীর প্রান্তে অতিথি আসিনু দ্বারে।
ডাকিনু, ‘আছ কি কেহ,
সাড়া দেহো, সাড়া দেহো।’
ঘরভরা এক নিরাকার শূন্যতা
না কহিল কোনো কথা।

বাহিরে বাগানে পুষ্পিত শাখা
গন্ধের আহ্বানে
সংকেত করে কাহারে তাহা কে জানে।
হতভাগা এক কোকিল ডাকিছে খালি,
জনশূন্যতা নিবিড় করিয়া
নীরবে দাঁড়ায়ে মালী।
সিঁড়িটা নির্বিকার
বলে, ‘এস আর নাই যদি এস
সমান অর্থ তার।’

ঘরগুলো বলে ফিলজফারের গলায়,
‘ডুব দিয়ে দেখো সত্তাসাগর-তলায়
বুঝিতে পারিবে, থাকা নাই থাকা
আসা আর দূরে যাওয়া
সবই এক কথা, খেয়ালের ফাঁকা হাওয়া।’
কেদারা এগিয়ে দিতে কারো নেই তাড়া,
প্রবীণ ভৃত্য ছুটি নিয়ে ঘরছাড়া।
মেয়াদ যখন ফুরোয় কপালে,
হায়রে তখন সেবা
কারেই বা করে কেবা।

মনেতে লাগিল বৈরাগ্যের ছোঁওয়া,
সকলি দেখিনু ধোঁওয়া।
ভাবিলাম এই ভাগ্যের তরী
বুঝি তার হাল নেই,
এলোমেলো স্রোতে আজ আছে কাল নেই।
নলিনীর দলে জলের বিন্দু
চপলম্‌ অতিশয়,
এই কথা জেনে সওয়ালেই ক্ষতি সয়।
অতএব— আরে অতএবখানা থাক্‌
আপাতত ফেরা যাক।

ব্যর্থ আশায় ভারাতুর সেই ক্ষণে
ফিরালেম রথ, ফিরিবার পথ
দূরতর হল মনে।
যাবার বেলায় শুষ্ক পথের
আকাশভরানো ধূলি
সহজে ছিলাম ভুলি।
ফিরিবার বেলা মুখেতে রুমাল,
ধোঁয়াটে চশমা চোখে,
মনে হল যত মাইক্রোব-দল
নাকে মুখে সব ঢোকে।
তাই বুঝিলাম, সহজ তো নয়
ফিলজফারের বুদ্ধি।
দরকার করে বহুৎ চিত্তশুদ্ধি।

মোটর চলিল জোরে,
একটু পরেই হাসিলাম হো হো করে।
সংশয়হীন আশার সামনে
হঠাৎ দরজা বন্ধ,
নেহাত এটার ঠাট্টার মতো ছন্দ।

বোকার মতন গম্ভীর মুখটারে
অট্টহাস্যে সহজ করিনু,
ফিরিনু আপন দ্বারে।

ঘরে কেহ আজ ছিল না যে, তাই
না-থাকার ফিলজাফি
মনটাকে ধরে চাপি।
থাকাটা আকস্মিক,
না-থাকাই সে তো দেশকাল ছেয়ে
চেয়ে আছে অনিমিখ।
সন্ধেবেলায় আলোটা নিবিয়ে
বসে বসে গৃহকোণে
না-থাকার এক বিরাট স্বরূপ
আঁকিতেছি মনে-মনে।
কালের প্রান্তে চাই,
ওই বাড়িটার আগাগোড়া কিছু নাই।
ফুলের বাগান, কোথা তার উদ্দেশ,
বসিবার সেই আরামকেদারা
পুরোপুরি নিঃশেষ।
মাসমাহিনার খাতাটারে নিয়ে পিছে
দুই দুই মালী একেবারে সব মিছে।
ক্রেসান্থেমাম্ কার্নেশনের
কেয়ারি সমেত তারা
নাই গহ্বরে হারা।

চেয়ে দেখি দূর-পানে
সেই ভাবীকালে যাহা আছে যেইখানে
উপস্থিতের ছোটো সীমানায়
সামান্য তাহা অতি—
হেথায় সেথায় বুদ্‌বুদ্‌সংহতি।

যাহা নাই তাই বিরাট বিপুল মহা।
অনাদি অতীত যুগের প্রবাহ-বহা
অসংখ্য ধন, কণামাত্রও তার
নাই নাই হায়, নাই সে কোথাও আর

'দূর করো ছাই' এই বলে শেষে
যেমনি জ্বালিনু আলো
ফিলজফিটার কুয়াশা কোথা মিলাল।
স্পষ্ট বুঝিনু যা-কিছু সমুখে আছে,
চক্ষের 'পরে যাহা বক্ষের কাছে
সেই তো অন্তহীন
প্রতিপল প্রতিদিন
যা আছে তাহারি মাঝে
যাহা নাই তাই গভীর গোপনে
সত্য হইয়া রাজে।
অতীতকালের যে ছিলেম আমি
আজিকার আমি সেই
প্রত্যেক নিমেষেই।
বাঁধিয়া রেখেছে এই মুহূর্তজাল
সমস্ত ভাবীকাল।

অতএব সেই কেদারাটা যেই
জানালায় লব টানি,
বসিব আরামে, সে-মুহূর্তেরে
চিরদিবসের জানি।
অতএব জেনো সন্ন্যাসী হব নাকো,
আরবার যদি ডাক
আবার সে ওই মাইক্রোব-ওড়া পথে
চলিব মোটর-রথে।
ঘরে যদি কেহ রয়

নাই ব'লে তারে ফিলজফারের
হবে নাকো সংশয়।
দুয়ার ঠেলিয়া চক্ষু মেলিয়া
দেখি যদি কোনো মিত্রম্
কবি তবে কবে, 'এই সংসার
অতীব বটে বিচিত্রম্।'

চৈত্র ? ১৩৩৮

দিনাবসান

বাঁশি যখন থামবে ঘরে,
নিববে দীপের শিখা,
এই জনমের লীলার 'পরে
পড়বে যবনিকা,
সেদিন যেন কবির তরে
ভিড় না জমে সভার ঘরে,
হয় না যেন উচ্চস্বরে
শোকের সমারোহ;
সভাপতি থাকুন বাসায়,
কাটান বেলা তাসে পাশায়,
নাই বা হল নানা ভাষায়
আহা উহু ওহো।
নাই ঘনাল দল-বেদলের
কোলাহলের মোহ।

আমি জানি মনে-মনে,
সেঁউতি যূথী জবা
আনবে ডেকে ক্ষণে ক্ষণে
কবির স্মৃতিসভা।

বর্ষা-শরৎ-বসন্তেরি
প্রাঙ্গণেতে আমায় ঘেরি
যেথায় বীণা যেথায় ভেরি
বেজেছে উৎসবে,
সেথায় আমার আসন-'পরে
স্নিগ্ধশ্যামল সমাদরে
আলিপনায় স্তরে স্তরে
আঁকন আঁকা হবে।
আমার মৌন করবে পূর্ণ
পাখির কলরবে।

জানি আমি এই বারতা
রইবে অরণ্যেতে—
ওদের সুরে কবির কথা
দিয়েছিলেম গেঁথে।
ফাগুনহাওয়ায় শ্রাবণধারে
এই বারতাই বারে বারে
দিক্‌বালাদের দ্বারে দ্বারে
উঠবে হঠাৎ বাজি ;
কভু করুণ সন্ধ্যামেঘে,
কভু অরুণ আলোক লেগে,
এই বারতা উঠবে জেগে
রঙিন বেশে সাজি।
স্মরণসভার আসন আমার
সোনায় দেবে মাজি।

আমার স্মৃতি থাক্‌ না গাঁথা
আমার গীতি-মাঝে
যেখানে ওই ঝাউয়ের পাতা
মর্মরিয়া বাজে।

যেখানে ওই শিউলিতলে
ক্ষণহাসির শিশির জ্বলে,
ছায়া যেথায় ঘুমে ঢলে
কিরণকণামালী ;
যেথায় আমার কাজের বেলা
কাজের বেশে করে খেলা,
যেথায় কাজের অবহেলা
নিভৃতে দীপ জ্বালি'
নানা রঙের স্বপন দিয়ে
ভরে রূপের ডালি ।

২৫ বৈশাখ ১৩৩৩
শান্তিনিকেতন

পথসঙ্গী

শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

ছিলে-যে পথের সাথি,
দিবসে এনেছ পিপাসার জল
রাত্রে জ্বেলেছ বাতি ।
আমার জীবনে সন্ধ্যা ঘনায়,
পথ হয় অবসান,
তোমার লাগিয়া রেখে যাই মোর
শুভকামনার দান ।
সংসারপথ হ'ক বাধাহীন,
নিয়ে যাক কল্যাণে,
নব নব ঐশ্বর্য আহুক
জ্ঞানে কর্মে ও ধ্যানে ।
মোর স্মৃতি যদি মনে রাখ কভু
এই বলে রেখো মনে—

ফুল ফুটায়েছি, ফল যদিও-বা
ধরে নাই এ জীবনে।

শ্রীযুক্ত অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী

বাহিরে তোমার যা পেয়েছি সেবা
অন্তরে তাহা রাখি,
কর্মে তাহার শেষ নাহি হয়
প্রেমে তাহা থাকে বাকি।
আমার আলোর ক্লান্তি ঘুচাতে
দীপে তেল ভরি দিলে।
তোমার হৃদয় আমার হৃদয়ে
সে-আলোকে যায় মিলে।

৬ মে ১৯৩২
তেহেরান

অন্তর্হিতা

তুমি যে তারে দেখ নি চেয়ে
জানিত সে তা মনে,—
ব্যথার ছায়া পড়িত ছেয়ে
কালো চোখের কোণে
জীবনশিখা নিবিল তার,
ডুবিল তারি সাথে
অবমানিত দুঃখভার
অবহেলার রাতে।
দীপাবলীর থালাতে নাই
তাহার ম্লান হিয়া,
তারায় তারি আলোক তাই
উঠিল উজলিয়া।

স্বাগতবাণী ছিল সে মেলি
ভাষাবিহীন মুখে,
বহুজনের বাণীরে ঠেলি
বাজে কি তব বুকে।
নিকটে তব এসেছিল যে,
সে কথা বুঝাবারে
অসীম দূরে গিয়েছে ও-যে
শূন্যে খুঁজাবারে।
সেখানে গিয়ে করেছে চুপ,
ভিক্ষা গেল থামি,
তাই কি তার সত্যরূপ
হৃদয়ে এল নামি।

১ আষাঢ় ১৩৩৯
উদয়ন [শান্তিনিকেতন]

আশ্রমবালিকা

শ্রীমতী মমতা সেনের বিবাহ-উপলক্ষে

আশ্রমের হে বালিকা,
আশ্বিনের শেফালিকা
ফাল্গুনের শালের মঞ্জরি
শিশুকাল হতে তব
দেহে মনে নব নব
যে-মাধুর্য দিয়েছিল ভরি,
মাঘের বিদায়ক্ষণে
মুকুলিত আম্রবনে
বসন্তের যে-নবদূতিকা,
আষাঢ়ের রাশি রাশি
শুভ্র মালতীর হাসি,
শ্রাবণের যে-সিক্তযূথিকা,

ছিল ঘিরে রাত্রিদিন
তোমারে বিচ্ছেদহীন
　　প্রান্তরের যে-শান্তি উদার,
প্রত্যুষের জাগরণে
পেয়েছ বিস্মিত মনে
　　যে-আস্বাদ আলোকসুধার,
আষাঢ়ের পুঞ্জমেঘে
যখন উঠিত জেগে
　　আকাশের নিবিড় ক্রন্দন,
মর্মরিত গীতিকায়
সপ্তপর্ণবীথিকায়
　　দেখেছিলে যে-প্রাণস্পন্দন,
বৈশাখের দিনশেষে
গোধূলিতে রুদ্রবেশে
　　কালবৈশাখীর উন্মত্ততা—
সে-ঝড়ের কলোল্লাসে
বিদ্যুতের অট্টহাসে
　　শুনেছিলে যে-মুক্তিবারতা,
পউষের মহোৎসবে
অনাহত বীণারবে
　　লোকে লোকে আলোকের গান
তোমার হৃদয়দ্বারে
আনিয়াছে বারে বারে
　　নবজীবনের যে-আহ্বান,
নববরষের রবি
যে উজ্জ্বল পুণ্যছবি
　　এঁকেছিল নির্মল গগনে,
চিরনূতনের জয়
বেজেছিল শূন্যময়
　　বেজেছিল অন্তর-অঙ্গনে,

কত গান কত খেলা,
কত-না বন্ধুর মেলা,
প্রভাতে সন্ধ্যায় আরাধনা,
বিহঙ্গকূজন-সাথে
গাছের তলায় প্রাতে
তোমাদের দিনের সাধনা,
তারি স্মৃতি শুভক্ষণে
সমস্ত জীবনে মনে
পূর্ণ করি নিয়ে যাও চলে,
চিত্ত করি ভরপুর
নিত্য তারা দিক সুর
জনতার কঠোর কল্লোলে।
নবীন সংসারখানি
রচিতে হবে-যে জানি
মাধুরীতে মিশায়ে কল্যাণ,
প্রেম দিয়ে প্রাণ দিয়ে
কাজ দিয়ে গান দিয়ে
ধৈর্য দিয়ে, দিয়ে তব ধ্যান,—
সে তব রচনা-মাঝে
সব ভাবনায় কাজে
তারা যেন উঠে রূপ ধরি,
তারা যেন দেয় আনি
তোমার বাণীতে বাণী
তোমার প্রাণেতে প্রাণ ভরি।
সুখী হও, সুখী রহো
পূর্ণ করো অহরহ
শুভকর্মে জীবনের ডালা,
পুণ্যসূত্রে দিনগুলি
প্রতিদিন গেঁথে তুলি
রচি লহো নৈবেদ্যের মালা।

সমুদ্রের পার হতে
পূর্বপবনের স্রোতে
ছন্দের তরণীখানি ভ'রে
এ-প্রভাতে আজি তোরি
পূর্ণতার দিন স্মরি
আশীর্বাদ পাঠাইনু তোরে।

১৩ জ্যৈষ্ঠ [১৩৩৩]
রোহিতসাগর

বধূ

শ্রীমতী অমিতা সেনের পরিণয় উপলক্ষে

মানুষের ইতিহাসে ফেনোচ্ছল উদ্বেল উদ্যম
গর্জি উঠে ; অতীত তিমিরগর্ভ হতে তুরঙ্গম
তরঙ্গ ছুটিছে শূন্যে ; উন্মেষিছে মহাভবিষ্যৎ।
বর্তমান কালতটে অগ্নিগর্ভ অপূর্ব পর্বত
সদ্যোজাত মহিমায় উজাড় উজ্জ্বল উত্তরীয়
নব সূর্যোদয়-পানে। যে-অদৃষ্ট, যে-অভাবনীয়
মানুষের ভাগ্যলিপি লিখিতেছে অজ্ঞাত অক্ষরে
দৃপ্ত বীরমূর্তি ধরি, দেখিয়াছি ; তার কণ্ঠস্বরে
শুনেছি দীপকরাগে সৃষ্টিবাণী মরণবিজয়ী
প্রাণমন্ত্রে।
এই ক্ষুব্ধ যুগান্তর-মাঝে বৎসে অয়ি,
তোমারে হেরিনু বধূবেশে, নির্ঝরিণী নৃত্যশীলা,
সহসা মিলিছ সরোবরে, চটুল চঞ্চল লীলা
গভীরে করিছ মগ্ন ; নির্ভয়ে নিখিল করি পণ
নবজীবনের সৃষ্টি-রহস্য করিছ উন্মোচন।
ইতিহাসবিধাতার ইন্দ্রজাল বিশ্বদুঃখসুখে

দেশে দেশে যে-বিস্ময় বিস্তারিছে বিরাট কৌতুকে
যুগে যুগে, নরনারীহৃদয়ের আকাশে আকাশে
এও সেই সৃষ্টিলীলা জ্যোতির্ময় বিশ্ব-ইতিহাসে।

৩ আষাঢ় ১৩৩৯
[শান্তিনিকেতন]

মিলন

শ্রীমতী ইন্দিরা মৈত্রের বিবাহ-উপলক্ষে

সেদিন উষার নববীণাঝংকারে
মেঘে মেঘে ঝরে সোনার সুরের কণা।
ধেয়ে চলেছিলে কৈশোরপরপারে
পাখিদুটি উন্মনা।
দখিন বাতাসে উধাও ওড়ার বেগে
অজানার মায়া রক্তে উঠিল জেগে
স্বপ্নের ছায়া ঢাকা।
সুরভবনের মিলনমন্ত্র লেগে
কবে দুজনের পাখায় ঠেকিল পাখা।

কেটেছিল দিন আকাশে হৃদয় পাতি
মেঘের রঙেতে রাঙায়ে দোঁহার ডানা।
আছিলে দুজনে অপারে ওড়ার সাথি,
কোথাও ছিল না মানা।
দূর হতে এই ধরণীর ছবিখানি
দোঁহার নয়নে অমৃত দিয়েছে আনি—
পুষ্পিত শ্যামলতা।
চারিদিক হতে বিরাটের মহাবাণী
শুনাল দোঁহারে ভাষার-অতীত কথা।

মেঘলোকে সেই নীরব সম্মিলনী
বেদনা আনিল কী অনির্বচনীয়।
দোঁহার চিত্তে উচ্ছ্বসি উঠে ধ্বনি—
'প্রিয়, ওগো মোর প্রিয়।'
পাখার মিলন অসীমে দিয়েছে পাড়ি,
সুরের মিলনে সীমারূপ এল তারি,
এলে নামি ধরা-পানে।
কুলায়ে বসিলে অকূল শূন্য ছাড়ি,
পরানে পরানে গান মিলাইলে গানে

১৭ কার্তিক ১৩৩৮
দার্জিলিং

স্পাই

শক্ত হল রোগ,
হপ্তা-পাঁচেক ছিল আমার ভোগ।
একটুকু যেই সুস্থ হলেম পরে
লোক ধরে না ঘরে,
ব্যামোর চেয়ে অনেক বেশি ঘটাল দুর্যোগ।
এল ভবেশ, এল পালিত, এল বন্ধু ঈশান,
এল পোলিটিশান,
এল গোকুল সংবাদপত্রের,
খবর রাখে সকল পাড়ার নাড়ীনক্ষত্রের।
কেউ-বা বলে 'বদল করো হাওয়া',
কেউ-বা বলে 'ভালো ক'রে করবে খাওয়াদাওয়া'।
কেউ-বা বলে, 'মহেন্দ্র ডাক্তার
এই ব্যামোতে তার মতো কেউ ওস্তাদ নেই আর

দেয়াল ঘেঁষে ওই যে সবার পাছে
সতীশ বসে আছে।
থাকে সে এই পাড়ায়,
চুলগুলো তার উর্ধ্বে তোলা পাঁচ আঙুলের নাড়ায়।
চোখে চশমা আঁটা,
এক কোণে তার ফেটে গেছে বাঁয়ের পরকলাটা।
গলার বোতাম খোলা,
প্রশান্ত তার চাউনি ভাবে-ভোলা।
সর্বদা তার হাতে থাকে বাঁধানো এক খাতা,
হঠাৎ খুলে পাতা
লুকিয়ে লুকিয়ে কী-যে লেখে, হয়তো বা সে কবি,
কিম্বা আঁকে ছবি।
নবীন আমায় শোনায় কানে-কানে,
ওই ছেলেটার গোপন খবর নিশ্চিত সেই জানে—
যাকে বলে ‘স্পাই’,
সন্দেহ তার নাই।
আমি বলি, হবেও বা, ভক্তিনম্র নিরীহ ওই মুখে
খাতার কোণে রিপোর্ট করার খোরাক নিচ্ছে টুকে।
ও মানুষটা সত্যি যদি তেমনি হেয় হয়,
ঘৃণা করব,— কেন করব ভয়।

এই বছরে বছরখানেক বেড়িয়ে নিলেম পাঞ্জাবে কাশ্মীরে।
এলেম যখন ফিরে ;
এল গণেশ, পলটু এল, এল নবীন পাল,
এল মাখনলাল।
হাতে একটা মোড়ক নিয়ে প্রণাম করলে পাঁচু,
মুখটা কাঁচুমাচু।
‘মনিব কোথায়’ শুধাই আমি তারে,
‘সতীশ কোথায় হাঁ রে।’

নবীন বললে, 'খবর পান নি তবে—
দিন-পনেরো হবে
উপোস করে মারা গেল সোনার টুকরো ছেলে
নন্‌-ভায়োলেন্‌স্‌ প্রচার করে গেল যখন আলিপুরের জেলে।'
পাঁচু আমার হাতে দিল খাতা,
খুলে দেখি পাতার পরে পাতা—
দেশের কথা কী বলেছি তাই লিখেছে গভীর অনুরাগে,
পাঠিয়ে দিল জেলে যাবার আগে।
আজকে বসে বসে ভাবি, মুখের কথাগুলো
ঝরা পাতার মতোই তারা ধুলোয় হ'ত ধুলো।
সেইগুলোকে সত্য করে বাঁচিয়ে রাখবে কি এ
মৃত্যুসুধার নিত্যপরশ দিয়ে।

৩ আষাঢ় ১৩৩৯
শান্তিনিকেতন

ধাবমান

'যেয়ো না, যেয়ো না' বলি কারে ডাকে ব্যর্থ এ ক্রন্দন।
কোথা সে বন্ধন
অসীম যা করিবে সীমারে।
সংসার যাবারই বন্যা, তীব্রবেগে চলে পরপারে
এ পারের সব-কিছু রাশি রাশি নিঃশেষে ভাসায়ে,
কাঁদায়ে হাসায়ে
অস্থির সত্তার রূপ ফুটে আর টুটে;
'নয় নয়' এই বাণী ফেনাইয়া মুখরিয়া উঠে
মহাকাল সমুদ্রের 'পরে।
সেই স্বরে
রুদ্রের ডম্বরুধ্বনি বাজে
অসীম অম্বর-মাঝে—

'নয় নয় নয়'।
ওরে মন, ছাড়ো লোভ, ছাড়ো শোক, ছাড়ো ভয়।
সৃষ্টি নদী, ধারা তারি নিরন্তর প্রলয়।

যাবে সব যাবে চলে তবু ভালোবাসি,—
চমকে বিনাশ-মাঝে অস্তিত্বের হাসি
আনন্দের বেগে।
মরণের বীণাতারে উঠে জেগে
জীবনের গান;
নিরন্তর ধাবমান
চঞ্চল মাধুরী।
ক্ষণে ক্ষণে উঠে স্ফুরি
শাশ্বতের দীপশিখা
উজ্জলিয়া মুহূর্তের মরীচিকা।
অতল কান্নার স্রোত মাতার করুণ স্নেহ বয়,
প্রিয়ের হৃদয়বিনিময়।
বিলোপের রঙ্গভূমে বীরের বিপুল বীর্যমদ
ধরণীর সৌন্দর্যসম্পদ।

অসীমের দান
ক্ষণিকের করপুটে, তার পরিমাণ
সময়ের মাপে নহে।
কাল ব্যাপি রহে নাই রহে
তবু সে মহান;
যতক্ষণ আছে তারে মূল্য দাও পণ করি প্রাণ।
ধায় যবে বিদায়ের রথ
জয়ধ্বনি করি তারে ছেড়ে দাও পথ
আপনারে ভুলি।
যতটুকু ধূলি

আছ তুমি করি অধিকার
তার মাঝে কী রহে না, তুচ্ছ সে বিচার।
বিরাটের মাঝে
এক রূপে নাই হয়ে অন্য রূপে তাহাই বিরাজে।
ছেড়ে এসো আপনার অন্ধকূপ,
মুক্তাকাশে দেখো চেয়ে প্রলয়ের আনন্দস্বরূপ।
ওরে শোকাতুর, শেষে
শোকের বুদ্‌বুদ্‌ তোর অশোক-সমুদ্রে যাবে ভেসে।

৬ আষাঢ় ১৩৩৯

ভীরু

তাকিয়ে দেখি পিছে
সেদিন ভালোবেসেছিলেম,
দিন না যেতেই হয়ে গেল মিছে।
বলার কথা পাই নি আমি খুঁজে,
আপনা হতে নেয় নি কেন বুঝে,
দেবার মতন এনেছিলেম কিছু,
ডালির থেকে পড়ে গেল নীচে।

ভরসা ছিল না যে,
তাই তো ভেবে দেখি নি হায়
কী ছিল তার হাসির দ্বিধা-মাঝে
গোপন বীণা সুরেই ছিল বাঁধা,
ঝংকার তায় দিয়েছিল আধা,
সংশয়ে আজ তলিয়ে গেল কোথা,
পাব কি তায় দুঃখসাগর সিঁচে।

হায় রে গরবিনী,
বারেক তব করুণ চাহনিতে
ভীরুতা মোর লও নি কেন জিনি।
যে-মণিটি ছিল বুকের হারে
ফেলে দিলে কোন্ খেদে হায় তারে,
ব্যর্থ রাতের অশ্রুফোঁটার মালা
আজ তোমার ওই বক্ষে ঝলকিছে।

৯ আষাঢ় ১৩৩৯

বিচার

বিচার করিয়ো না।
যেখানে তুমি রয়েছ, সে তো
জগতে এক কোণা।
যেটুকু তব দৃষ্টি যায়
সেটুকু কতখানি,
যেটুকু শোন তাহার সাথে
মিশাও নিজবাণী।
মন্দ-ভালো সাদা ও কালো
রাখিছ ভাগে ভাগে।
সীমানা মিছে আঁকিয়া তোল
আপন-রচা দাগে।

সুরের বাঁশি যদি তোমার
মনের মাঝে থাকে,
চলিতে পথে আপন-মনে
জাগায়ে দাও তাকে।

গানের মাঝে তর্ক নাই,
কাজের নাই তাড়া।
যাহার খুশি চলিয়া যাবে,
যে খুশি দিবে সাড়া।
হ'ক-না তারা কেহ-বা ভালো
কেহ-বা ভালো-নয়,
এক পথেরি পথিক তারা
লহো এ পরিচয়।

বিচার করিয়ো না।
হায় রে হায়, সময় যায়,
বৃথা এ আলোচনা।
ফুলের বনে বেড়ার কোণে
হেরো অপরাজিতা
আকাশ হতে এনেছে বাণী,
মাটির সে যে মিতা।
ওই তো ঘাসে আষাঢ়মাসে
সবুজে লাগে বান,—
সকল ধরা ভরিয়া দিল
সহজ তার দান।
আপনা ভুলি সহজ সুখে
ভরুক তব হিয়া,
পথিক, তব পথের ধন
পথেরে যাও দিয়া।

১০ আষাঢ় ১৩৩৯
উদয়ন [শান্তিনিকেতন]

পুরানো বই

আমি জানি
পুরাতন এই বইখানি।—
অপঠিত, তবু মোর ঘরে
আছে সমাদরে।
এর ছিন্ন পাতে পাতে তার
বাষ্পাকুল করুণার
স্পর্শ যেন রয়েছে বিলীন;
সে-যে আজ হল কতদিন।

সরল দুখানি আঁখি ঢলোঢলো,
বেদনার আভাসেই করে ছলোছলো;
কালোপাড় শাড়িখানি মাথার উপর দিয়ে ফেরা,
দুটি হাত কঙ্কণে ও সান্ত্বনায় ঘেরা।
জনহীন দ্বিপ্রহরে
এলোচুল মেলে দিয়ে বালিশের 'পরে,
এই বই তুলে নিয়ে বুকে
একমনে স্নিগ্ধমুখে
বিচ্ছেদকাহিনী যায় পড়ে।
জানালা বাহিরে শূন্যে ওড়ে
পায়রার ঝাঁক,
গলি হতে দিয়ে যায় ডাক
ফেরিওলা,
পাপোশের 'পরে ভোলা
ভক্ত সে কুকুর
ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্নে ছাড়ে আর্তস্বর।
সময়ের হয়ে যায় ভুল;
গলির ওপারে স্কুল,
সেথা হতে বাজে যবে
কাংস্যরবে

ছুটির ঘণ্টার ধ্বনি,
দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া তখনি
তাড়াতাড়ি
ওঠে সে শয়ন ছাড়ি,
গৃহকার্যে চলে যায় সচকিতে
বইখানি রেখে কুলুঙ্গিতে।
অন্তঃপুর হতে অন্তঃপুরে
এই বই ফিরিয়াছে দূর হতে দূরে।
ঘরে ঘরে গ্রামে গ্রামে
খ্যাতি এর ব্যাপিয়াছে দক্ষিণে ও বামে।

তার পরে গেল সেই কাল,
ছিঁড়ে দিয়ে চলে গেল আপন সৃষ্টির মায়াজাল।
এ লজ্জিত বই
কোনো ঘরে স্থান এর কই।
নবীন পাঠক আজ বসি কেদারায়
ভেবে নাহি পায়
এ লেখাও কোন্ মন্ত্রে করেছিল জয়
সেদিনের অসংখ্য হৃদয়।

জানালা-বাহিরে নীচে ট্রাম যায় চলি।
প্রশস্ত হয়েছে গলি।
চলে গেছে ফেরিওলা, সে-পসরা তার
বিকায় না আর।
ডাক তার ক্লান্ত সুরে
দূর হতে মিলাইল দূরে।
বেলা চলে গেল কোন্ ক্ষণে,
বাজিল ছুটির ঘণ্টা ও-পাড়ার সুদূর প্রাঙ্গণে।

১১ আষাঢ় ১৩৩৯
কোণার্ক [শান্তিনিকেতন]

বিস্ময়

আবার জাগিনু আমি। রাত্রি হল ক্ষয়।
পাপড়ি মেলিল বিশ্ব। এই তো বিস্ময়
অন্তহীন।

ডুবে গেছে কত মহাদেশ,
নিবে গেছে কত তারা, হয়েছে নিঃশেষ
কত যুগ যুগান্তর। বিশ্বজয়ী বীর
নিজেরে বিলুপ্ত করি শুধু কাহিনীর
বাক্যপ্রান্তে আছে ছায়াপ্রায়। কত জাতি
কীর্তিস্তম্ভ রক্তপঙ্কে তুলেছিল গাঁথি
মিটাতে ধূলির মহাক্ষুধা। সে-বিরাট
ধ্বংসধারা-মাঝে আজি আমার ললাট
পেল অরুণের টিকা আরো একদিন
নিদ্রাশেষে, এই তো বিস্ময় অন্তহীন।

আজ আমি নিখিলের জ্যোতিষ্কসভাতে
রয়েছি দাঁড়ায়ে। আছি হিমাদ্রির সাথে
আছি সপ্তর্ষির সাথে, আছি যেথা সমুদ্রের
তরঙ্গে ভঙ্গিয়া উঠে উন্মত্ত রুদ্রের
অট্টহাস্যে নাট্যলীলা। এ বনস্পতির
বল্কলে স্বাক্ষর আছে বহু শতাব্দীর,
কত রাজমুকুটেরে দেখিল খসিতে।
তারি ছায়াতলে আমি পেয়েছি বসিতে
আরো একদিন—

জানি এ দিনের মাঝে
কালের অদৃশ্য চক্র শব্দহীন বাজে।

১২ আষাঢ় ১৩৩৯
কোণার্ক [শান্তিনিকেতন]

অগোচর

হাটের ভিড়ের দিকে চেয়ে দেখি,
হাজার হাজার মুখ হাজার হাজার ইতিহাস
ঢাকা দিয়ে আসে যায় দিনের আলোয়
রাতের আঁধারে।
সব কথা তার
কোনো কালে জানবে না কেউ,
নিজেও জানে না কোনো লোক।
মুখর আলাপ তার, উচ্চস্বরে কত আলোচনা,
তারি অন্তস্তলে
বিচিত্র বিপুল
স্মৃতিবিস্মৃতির সৃষ্টিরাশি।
সেখানে তো শব্দ নেই, আলো নেই,
বাইরের দৃষ্টি নেই,
প্রবেশের পথ নেই কারো।
সংখ্যাহীন মানুষের
এই যে প্রচ্ছন্ন বাণী, অশ্রুত কাহিনী
কোন্ আদিকাল হতে
অন্তঃশীল অগণ্য ধারায়
আঁধার মৃত্যুর মাঝে মেশে রাত্রিদিন,
কী হল তাদের,
কী এদের কাজ।

হে প্রিয়, তোমার যতটুকু
দেখেছি শুনেছি
জেনেছি, পেয়েছি স্পর্শ করি'—
তার বহুশতগুণ অদৃশ্য অশ্রুত
রহস্য কিসের জন্য বদ্ধ হয়ে আছে,
কার অপেক্ষায়।

সে নিরালা ভবনের
কুলুপ তোমার কাছে নেই।
কার কাছে আছে তবে।
কে মহা-অপরিচিত যার অগোচর সভাতলে
হে চেনা-অপরিচিত, তোমার আসন ?
সেই কি সবার চেয়ে জানে
আমাদের অন্তরের অজানারে।
সবার চেয়ে কি বড়ো তার ভালোবাসা
যার শুভদৃষ্টি-কাছে
অব্যক্ত করেছে অবগুণ্ঠন মোচন।

১৪ আষাঢ় ১৩৩৯

সান্ত্বনা

যে বোবা দুঃখের ভার
ওরে দুঃখী, বহিতেছ, তার কোনো নেই প্রতিকার।
সহায় কোথাও নাই, ব্যর্থ প্রার্থনায়
চিত্তদৈন্য শুধু বেড়ে যায়।

ওরে বোবা মাটি,
বক্ষ তোর যায় না তো ফাটি
বহিয়া বিশ্বের বোঝা দুঃখবেদনার
বক্ষে আপনার
বহু যুগ ধরে।
বোবা গাছ ওরে,
সহজে বহিস শিরে বৈশাখের নির্দয় দাহন,—
তুই সর্বসহিষ্ণু বাহন
শ্রাবণের
বিশ্বব্যাপী প্লাবনের।

তাই মনে ভাবি
যাবে নাবি
সর্ব দুঃখ সন্তাপ নিঃশেষে
উদার মাটির বক্ষোদেশে,
গভীর শীতল
যার স্তব্ধ অন্ধকারতল
কালের মথিত বিষ নিরন্তর নিতেছে সংহরি।
সেই বিলুপ্তির 'পরে দিবাবিভাবরী
তুলিছে শ্যামল তৃণস্তর
নিঃশব্দ সুন্দর।
শতাব্দীর সব ক্ষতি সব মৃত্যুক্ষত
যেখানে একান্ত অপগত
সেইখানে বনস্পতি প্রশান্ত গম্ভীর
সূর্যোদয়-পানে তোলে শির,
পুষ্প তার পত্রপুটে
শোভা পায় ধরিত্রীর মহিমামুকুটে।

বোবা মাটি, বোবা তরুদল,
ধৈর্যহারা মানুষের বিশ্বের দুঃসহ কোলাহল
স্তব্ধতায় মিলাইছ প্রতি মুহূর্তেই,—
নির্বাক সান্ত্বনা সেই
তোমাদের শান্তরূপে দেখিলাম,
করিনু প্রণাম।
দেখিলাম সব ব্যথা প্রতিক্ষণে লইতেছে জিনি
সুন্দরের ভৈরবী রাগিণী
সর্ব অবসানে
শব্দহীন গানে।

১৫ আষাঢ় ১৩৩৯

ছোটো প্রাণ

ছিলাম নিদ্রাগত,
সহসা আর্তবিলাপে কাঁদিল
রজনী ঝঞ্ঝাহত।
জাগিয়া দেখিনু পাশে
কচি মুখখানি সুখনিদ্রায়
ঘুমায়ে ঘুমায়ে হাসে।
সংসার-'পরে এই বিশ্বাস
দৃঢ় বাঁধা স্নেহডোরে
বজ্র-আঘাতে ভাঙে তা কেমন ক'রে

সৈন্যবাহিনী বিজয়কাহিনী
লিখে ইতিহাস জুড়ে।
শক্তিদম্ভ জয়স্তম্ভ
তুলিছে আকাশ ফুঁড়ে।
সম্পদসমারোহ
গগনে গগনে ব্যাপিয়া চলেছে
স্বর্ণমরীচিমোহ।
সেথায় আঘাতসংঘাতবেগে
ভাঙাচোরা যত হ'ক
তার লাগি বৃথা শোক।

কিন্তু হেথায় কিছু তো চাহে নি এরা।
এদের বাসাটি ধরণীর কোণে
ছোটো-ইচ্ছায় ঘেরা।
যেমন সহজে পাখির কুলায়
মৃদুকণ্ঠের গীতে
নিভৃত ছায়ায় ভরা থাকে মাধুরীতে।

হে রুদ্র, কেন তারো 'পরে বাণ হান,
কেন তুমি নাহি জান
নির্ভয়ে ওরা তোমারে বেসেছে ভালো,
বিস্মিত চোখে তোমারি ভুবনে
দেখেছে তোমার আলো।

১৬ আষাঢ় ১৩৩৯

নিরাবৃত

যবনিকা-অন্তরালে মর্ত্য পৃথিবীতে
ঢাকাপড়া এই মন। আভাসে ইঙ্গিতে
প্রমাণে ও অনুমানে আলোতে আঁধারে
ভাঙা খণ্ড জুড়ে সে-যে দেখেছে আমারে
মিলায়ে তাহার সাথে নিজ অভিরুচি
আশা তৃষা। বারবার ফেলেছিল মুছি
রেখা তার ; মাঝে-মাঝে করিয়া সংস্কার
দেখেছে নূতন করে মোরে। কতবার
ঘটেছে সংশয়। এই যে সত্যে ও ভুলে
রচিত আমার মূর্তি, সংসারের কূলে
এ নিয়ে সে এতদিন কাটায়েছে বেলা।
এরে ভালোবেসেছিল, এরে নিয়ে খেলা
সাঙ্গ করে চলে গেছে।

বসে একা ঘরে
মনে-মনে ভাবিতেছি আজ,— লোকান্তরে
যদি তার দিব্য আঁখি মায়ামুক্ত হয়
অকস্মাৎ, পাবে যার নব পরিচয়
সে কি আমি। স্পষ্ট তারে জানুক যতই
তবু যে অস্পষ্ট ছিল তাহারি মতোই

এরে কি আপনি রচি বাসিবে সে ভালো।
হায় রে মানুষ এ যে। পরিপূর্ণ আলো
সে তো প্রলয়ের তরে, সৃষ্টির চাতুরী
ছায়াতে আলোতে নিত্য করে লুকোচুরি।
সে-মায়াতে বেঁধেছিনু মর্ত্যে মোরা দোঁহে
আমাদের খেলাঘর, অপূর্ণের মোহে
মুগ্ধ ছিনু, মর্ত্যপাত্রে পেয়েছি অমৃত।
পূর্ণতা নির্মম সে যে স্তব্ধ অনাবৃত।

১৭ আষাঢ় ১৩৩৯

দূর হতে ভেবেছিনু মনে
দুর্জয় নির্দয় তুমি, কাঁপে পৃথ্বী তোমার শাসনে।
তুমি বিভীষিকা,
দুঃখীর বিদীর্ণ বক্ষে জ্বলে তব লেলিহান শিখা।
দক্ষিণ হাতের শেল উঠেছে ঝড়ের মেঘ-পানে,
সেথা হতে বজ্র টেনে আনে।
ভয়ে ভয়ে এসেছিনু দুরুদুরু বুকে
তোমার সম্মুখে।
তোমার ভ্রূকুটিভঙ্গে তরঙ্গিল আসন্ন উৎপাত,—
নামিল আঘাত।
পাঁজর উঠিল কেঁপে,
বক্ষে হাত চেপে
শুধালেম, ‘আরো কিছু আছে না কি,
আছে বাকি
শেষ বজ্রপাত?’
নামিল আঘাত।

এইমাত্র ? আর কিছু নয় ?
ভেঙে গেল ভয়।
যখন উদ্যত ছিল তোমার অশনি
তোমারে আমার চেয়ে বড়ো ব'লে নিয়েছিনু গনি।
তোমার আঘাত সাথে নেমে এলে তুমি
যেথা মোর আপনার ভূমি।
ছোটো হয়ে গেছ আজ।
আমার টুটিল সব লাজ।
যত বড়ো হও,
তুমি তো মৃত্যুর চেয়ে বড়ো নও।
আমি মৃত্যু-চেয়ে বড়ো এই শেষ কথা ব'লে
যাব আমি চলে।

১৭ আষাঢ় ১৩৩৯

অবাধ

সরে যা, ছেড়ে দে পথ,
দুর্ভর সংশয়ে ভারী তোর মন পাথরের পারা।
হালকা প্রাণের ধারা
দিকে দিকে ওই ছুটে চলে
কলকোলাহলে
দুরন্ত আনন্দভরে।
ওরাই যে লঘু করে
অতীতের পুরাতন বোঝা।
ওরাই তো করে দেয় সোজা
সংসারের বক্র ভঙ্গী চঞ্চল সংঘাতে।
ওদের চরণপাতে
জটিল জালের গ্রন্থি যত
হয় অপগত।

মলিনতা দেয় মেজে,
শ্রান্তি দূর করে ওরা ক্লান্তিহীন তেজে।

ওরা সব মেঘের মতন
প্রভাতকিরণপায়ী,— সিন্ধুর তরঙ্গ অগণন,
ওরা যেন দিশাহারা হাওয়ার উৎসাহ,
মাটির হৃদয়জয়ী নিরন্তর তরুর প্রবাহ;
প্রাচীন রজনীপ্রান্তে ওরা সবে প্রথম-আলোক।
ওরা শিশু, বালিকা বালক,
ওরা নারী তারুণ্যে উচ্ছল।
ওরা যে নির্ভীক বীরদল
যৌবনের দুঃসাহসে বিপদের দুর্গ হানে,
সম্পদেরে উদ্ধারিয়া আনে।
পায়ের শৃঙ্খল ওরা চলে ঝংকারিয়া
অন্তরে প্রবল মুক্তি নিয়া।
আগামী কালের লাগি নাই চিন্তা, নাই মনে ভয়,
আগামী কালেরে করে জয়।

চলেছে চলেছে ওরা চারিদিক হতে
আঁধারে আলোতে,
সম্মুখের পানে
অজ্ঞাতের টানে।
তুই সরে যা রে
ওরে ভীরু, ভারাতুর সংশয়ের ভারে

১৮ আষাঢ় ১৩৩৯

যাত্রী

যে-কাল হরিয়া লয় ধন
সেই কাল করিছে হরণ
সে ধনের ক্ষতি।
তাই বসুমতী
নিত্য আছে বসুন্ধরা।
একে একে পাখি যায়, গানের পসরা
কোথাও না হয় শূন্য,
আঘাতের অন্ত নেই, তবুও অক্ষুন্ন
বিপুল সংসার।
দুঃখ শুধু তোমার, আমার,
নিমেষের বেড়াঘেরা এখানে ওখানে।
সে-বেড়া পারায়ে তাহা পৌঁছায় না নিখিলের পানে।
ওরে তুমি, ওরে আমি,
যেখানে তোদের যাত্রা একদিন যাবে থামি
সেখানে দেখিতে পাবি ধন আর ক্ষতি
তরঙ্গের ওঠা নামা, একই খেলা, একই তার গতি।
কান্না আর হাসি
এক বীণাতন্ত্রীতারে একই গানে উঠিছে উচ্ছ্বাসি,
একই শমে এসে
মহামৌনে মিলে যায় শেষে।
তোমার হৃদয়তাপ
তোমার বিলাপ
চাপা থাক্ আপনার ক্ষুদ্রতার তলে।
যেইখানে লোকযাত্রা চলে
সেখানে সবার সাথে নির্বিকার চলো একসারে,
দেখা দাও শান্তিসৌম্য আপনারে—
যে-শান্তি মৃত্যুর প্রান্তে বৈরাগ্যে নিভৃত,
আত্মসমাহিত;

দিবসের যত
ধূলিচিহ্ন, যত কিছু ক্ষত
লুপ্ত হল যে শান্তির অন্তিম তিমিরে ;
সংসারের শেষ তীরে
সপ্তর্ষির ধ্যানপুণ্য রাতে
হারায় যে-শান্তিসিন্ধু আপনারি অন্ত আপনাতে ;
যে-শান্তি নিবিড় প্রেমে
স্তব্ধ আছে থেমে,
যে-প্রেম শরীরমন অতিক্রম করিয়া সুদূরে
একান্ত মধুরে
লভিয়াছে আপনার চরম বিস্মৃতি।
সে পরম শান্তি-মাঝে হ'ক তব অচঞ্চল স্থিতি।

১৮ আষাঢ় ১৩৩৯

মিলন

তোমারে দিব না দোষ। জানি মোর ভাগ্যের ভ্রূকুটি;
ক্ষুদ্র এই সংসারের যত ক্ষত, যত তার ত্রুটি,
যত ব্যথা আঘাত করিছে তব পরম সত্তারে
অহরহ। জানি যে তুমি তো নাই ছাড়ায়ে আমারে
নির্লিপ্ত সুদূর স্বর্গে। আমি মোর তোমাতে বিরাজে ;
দেওয়ানেওয়া নিরন্তর প্রবাহিত তুমি-আমি-মাঝে
দুর্গম বাধারে অতিক্রমি। আমার সকল ভার
রাত্রিদিন রয়েছে তোমারি 'পরে, আমার সংসার
সে শুধু আমারি নহে। তাই ভাবি এই ভার মোর
যেন লঘু করি নিজবলে, জটিল বন্ধনডোর

একে একে ছিন্ন করি যেন, মিলিয়া সহজ মিলে
দ্বন্দ্বহীন বন্ধহীন বিচরণ করি এ নিখিলে
না চেয়ে আপনা-পানে। অশান্তিরে করি দিলে দূর
তোমাতে আমাতে মিলি ধ্বনিয়া উঠিবে এক সুর।

১৯ আষাঢ় ১৩৩৯

আগন্তুক

এসেছি সুদূর কাল থেকে।
তোমাদের কালে
পৌঁছলেম যে-সময়ে
তখন আমার সঙ্গী নেই।
ঘাটে ঘাটে কে কোথায় নেবে গেছে।
ছোটো ছোটো চেনা সুখ যত,
প্রাণের উপকরণ,
দিনের রাতের মুষ্টিদান
এসেছি নিঃশেষ করে বহুদূর পারে।
এ জীবনে পা দিয়েছি প্রথম যে-কালে
সে কালের 'পরে অধিকার
দৃঢ় হয়েছিল দিনে দিনে
ভাবে ও ভাষায়,
কাজে ও ইঙ্গিতে,
প্রণয়ের প্রাত্যহিক দেনাপাওনায়।
হেসে খেলে কোনোমতে সকলের সঙ্গে বেঁচে থাকা,
লোকযাত্রারথে
কিছু কিছু গতিবেগ দেওয়া,
শুধু উপস্থিত থেকে প্রাণের আসরে

ভিড় জমা করা,
এই তো যথেষ্ট ছিল

আজ তোমাদের কালে
প্রবাসী অপরিচিত আমি।
আমাদের ভাষার ইশারা
নিয়েছে নূতন অর্থ তোমাদের মুখে।
ঋতুর বদল হয়ে গেছে,—
বাতাসের উলটো-পালটা ঘ'টে
প্রকৃতির হল বর্ণভেদ।
ছোটো ছোটো বৈষম্যের দল
দেয় ঠেলা,
করে হাসাহাসি।
রুচি আশা অভিলাষ
যা মিশিয়ে জীবনের স্বাদ,
তার হল রসবিপর্যয়।

আমাদের সেকালকে যে-সঙ্গ দিয়েছি
যতই সামান্য হ'ক মূল্য তার
তবু সেই সঙ্গসূত্রে গাঁথা হয়ে মানুষে মানুষে
রচেছিল যুগের স্বরূপ,—
আমার সে-সঙ্গ আজ
মেলে না যে তোমাদের প্রত্যহের মাপে।
কালের নৈবেদ্যে লাগে যে সকল আধুনিক ফুল
আমার বাগানে ফোটে না সে।
তোমাদের যে-বাসার কোণে থাকি
তার খাজনার কড়ি হাতে নেই।
তাই তো আমাকে দিতে হবে
বড়ো কিছু দান
দানের একান্ত দুঃসাহসে।

উপস্থিত কালের যা দাবি
মিটাবার জন্যে সে তো নয়,
তাই যদি সেই দান তোমাদের রুচিতে না লাগে,
তবে তার বিচার সে পরে হবে।
তবু যা সম্বল আছে তাই দিয়ে
একালের ঋণ শোধ ক'রে অবশেষে
ঋণী তারে রেখে যাই যেন।
যা আমার লাভক্ষতি হতে বড়ো,
যা আমার সুখদুঃখ হতে বেশি—
তাই যেন শেষ করে দিয়ে চলে যাই
স্তুতি নিন্দা হিসাবের অপেক্ষা না রেখে।

১১ জুলাই ১৯৩২

জরতী

হে জরতী,
অন্তরে আমার
দেখেছি তোমার ছবি।
অবসানরজনীতে দীপবর্তিকার
স্থিরশিখা আলোকের আভা
অধরে ললাটে— শুভ্র কেশে।
দিগন্তে প্রণামনত শান্ত-আলো প্রত্যুষের তারা
মুক্ত বাতায়ন থেকে
পড়েছে নিমেষহীন নয়নে তোমার।
সন্ধ্যাবেলা
মল্লিকার মালা ছিল গলে
গন্ধ তার ক্ষীণ হয়ে
বাতাসকে করুণ করেছে—

উৎসবশেষের যেন অবসন্ন অঙ্গুলির
বীণাগুঞ্জরণ।
শিশিরমন্থর বায়ু,
অশথের শাখা অকম্পিত।
অদূরে নদীর শীর্ণ স্বচ্ছ ধারা কলশব্দহীন,
বালুতটপ্রান্তে চলে ধীরে
শূন্যগৃহ-পানে
ক্লান্তগতি বিরহিণী বধূর মতন।

হে জরতী মহাশ্বেতা,
দেখেছি তোমাকে
জীবনের শারদ অম্বরে
বৃষ্টিরিক্ত শুচিশুভ্র লঘু স্বচ্ছ মেঘে।
নিম্নে শস্যে ভরা খেত দিকে দিকে,
নদী ভরা কূলে কূলে,
পূর্ণতার স্তব্ধতায় বসুন্ধরা স্নিগ্ধ সুগম্ভীর

হে জরতী, দেখেছি তোমাকে
সত্তার অন্তিম তটে,
যেখানে কালের কোলাহল
প্রতিক্ষণে ডুবিছে অতলে।
নিস্তরঙ্গ সেই সিন্ধুনীরে
তীর্থস্নান করি'
রাত্রির নিকষকৃষ্ণ শিলাবেদিমূলে
এলোচুলে করিছ প্রণাম
পরিপূর্ণ সমাপ্তিরে।
চঞ্চলের অন্তরালে অচঞ্চল যে শান্ত মহিমা
চিরন্তন,
চরম প্রসাদ তার

নামিল তোমার নম্র শিরে
মানসসরোবরের অগাধ সলিলে
অস্তগত তপনের সর্বশেষ আলোর মতন।

১৩ জুলাই ১৯৩২

প্রাণ

বহু লক্ষ বর্ষ ধরে জ্বলে তারা,
ধাবমান অন্ধকার কালস্রোতে
অগ্নির আবর্ত ঘুরে ওঠে।
সেই স্রোতে এ ধরণী মাটির বুদ্‌বুদ ;
তারি মধ্যে এই প্রাণ
অণুতম কালে
কণাতম শিখা লয়ে
অসীমের করে সে আরতি।
সে না হলে বিরাটের নিখিলমন্দিরে
উঠত না শঙ্খধ্বনি,
মিলত না যাত্রী কোনোজন,
আলোকের সামমন্ত্র ভাষাহীন হয়ে
রইত নীরব।

১৪ জুলাই ১৯৩২

সাথী

তখন বয়স সাত।
মুখচোরা ছেলে,
একা একা আপনারি সঙ্গে হত কথা।
মেঝে বসে

ঘরের গরাদেখানা ধরে
বাইরের দিকে চেয়ে চেয়ে
বয়ে যেত বেলা।
দূরে থেকে মাঝে-মাঝে ঢঙ ঢঙ করে
বাজত ঘণ্টার ধ্বনি,
শোনা যেত রাস্তা থেকে সইসের হাঁক।
হাঁসগুলো কলরবে ছুটে এসে নামত পুকুরে।
ও-পাড়ার তেলকলে বাঁশি ডাক দিত।
গলির মোড়ের কাছে দত্তদের বাড়ি,
কাকাতুয়া মাঝে-মাঝে উঠত চীৎকার করে ডেকে
একটা বাতাবিলেবু, একটা অশথ,
একটা কয়েতবেল, একজোড়া নারকেলগাছ,
তারাই আমার ছিল সাথী।
আকাশে তাদের ছুটি অহরহ,
মনে-মনে সে ছুটি আমার।
আপনারি ছায়া নিয়ে
আপনার সঙ্গে যে-খেলাতে
তাদের কাটত দিন
সে আমারি খেলা।
তারা চিরশিশু
আমার সমবয়সী।
আষাঢ়ে বৃষ্টির ছাঁটে, বাদলহাওয়ায়,
দীর্ঘ দিন অকারণে
তারা যা করেছে কলরব
আমার বালকভাষা
হো হা শব্দ করে
করেছিল তারি অনুবাদ।

তারপরে একদিন যখন আমার
বয়স পঁচিশ হবে,

বিরহের ছায়াম্লান বৈকালেতে
ওই জানালায়
বিজনে কেটেছে বেলা।
অশথের কম্পমান পাতায় পাতায়
যৌবনের চঞ্চল প্রত্যাশা
পেয়েছে আপন সাড়া।
সকরুণ মুলতানে গুন্ গুন্ গেয়েছি যে-গান
রৌদ্রে-ঝিলিমিলি সেই নারকেলডালে
কেঁপেছিল তারি সুর।
বাতাবিফুলের গন্ধ ঘুমভাঙা সাথীহারা রাতে
এনেছে আমার প্রাণে
দূর শয্যাতল থেকে
সিক্ত আঁখি আর কার উৎকণ্ঠিত বেদনার বাণী।
সেদিন সে গাছগুলি
বিচ্ছেদে মিলনে ছিল যৌবনের বয়স্য আমার।

তারপরে অনেক বৎসর গেল
আরবার একা আমি।
সেদিনের সঙ্গী যারা
কখন্ চিরদিনের অন্তরালে তারা গেছে সরে।
আবার আরেকবার জানলাতে
বসে আছি আকাশে তাকিয়ে।
আজ দেখি সে অশ্বত্থ, সেই নারকেল
সনাতন তপস্বীর মতো।
আদিম প্রাণের
যে-বাণী প্রাচীনতম
তাই উচ্চারিত রাত্রিদিন
উচ্ছ্বসিত পল্লবে পল্লবে।
সকল পথের আরম্ভেতে
সকল পথের শেষে

পুরাতন যে নিঃশব্দ মহাশান্তি স্তব্ধ হয়ে আছে,
নিরাসক্ত নির্বিচল সেই শান্তি-সাধনার
মন্ত্র ওরা প্রতিক্ষণে দিয়েছে আমার কানে-কানে

১৩ জুলাই ১৯৩২

বোবার বাণী

আমার ঘরের সম্মুখেই
পাকে পাকে জড়িয়ে শিমুলগাছে
উঠেছে মালতীলতা।
আষাঢ়ের রসস্পর্শ
লেগেছে অন্তরে তার।
সবুজ তরঙ্গগুলি হয়েছে উচ্ছল
পল্লবের চিক্কণ হিল্লোলে।
বাদলের ফাঁকে ফাঁকে মেঘচ্যুত রৌদ্র এসে
ছোঁয়ায় সোনার-কাঠি অঙ্গে তার,
মজ্জায় কাঁপন লাগে,
শিকড়ে শিকড়ে বাজে আগমনী।
যেন কত-কী-যে কথা নীরবে উৎসুক হয়ে থাকে
শাখাপ্রশাখায়।
এই মৌনমুখরতা
সারারাত্রি অন্ধকারে
ফুলের বাণীতে হয় উচ্ছ্বসিত,
ভোরের বাতাসে উড়ে পড়ে।

আমি একা বসে বসে ভাবি
সকালের কচি আলো দিয়ে রাঙা
ভাঙা ভাঙা মেঘের সমুখে ;

বৃষ্টিধোওয়া মধ্যাহ্নের
গোরুচরা মাঠের উপরে আঁখি রেখে ;
নিবিড় বর্ষণে আর্ত
শ্রাবণের আর্দ্র অন্ধকার রাতে ;
নানা কথা ভিড় করে আসে
গহন মনের পথে,
বিবিধ রঙের সাজ,
বিবিধ ভঙ্গীতে আসাযাওয়া,—
অন্তরে আমার যেন
ছুটির দিনের কোলাহলে
কথাগুলো মেতেছে খেলায়।

তবুও যখন তুমি আমার আঙিনা দিয়ে যাও
ডেকে আনি, কথা পাই নে তো।
কখনো যদি বা ভুলে কাছে আস
বোবা হয়ে থাকি।
অবারিত সহজ আলাপে
সহজ হাসিতে
হল না তোমার অভ্যর্থনা।
অবশেষে ব্যর্থতার লজ্জায় হৃদয় ভরে দিয়ে
তুমি চলে যাও,
তখন নির্জন অন্ধকারে
ফুটে ওঠে ছন্দে-গাঁথা সুরে-ভরা বাণী—
পথে তারা উড়ে পড়ে,
যার খুশি সাজি ভরে নিয়ে চলে যায়।

৩ শ্রাবণ ১৩৩৯

আঘাত

সোঁদালের ডালের ডগায়
মাঝে মাঝে পোকাধরা পাতাগুলি
কুঁকড়ে গিয়েছে ;
বিলিতি নিমের
বাকলে লেগেছে উই ;
কুরচির গুঁড়িটাতে পড়েছে ছুরির ক্ষত,
কে নিয়েছে ছাল কেটে ;
চারা অশোকের
নিচেকার দুয়েকটা ডালে
শুকিয়ে পাতার আগা কালো হয়ে গেছে।
কত ক্ষত, কত ছোটো মলিন লাঞ্ছনা,
তারি মাঝে অরণ্যের অক্ষুণ্ণ মর্যাদা
শ্যামল সম্পদে
তুলেছে আকাশ-পানে পরিপূর্ণ পূজার অঞ্জলি
কদর্যের কদাঘাতে
দিয়ে যায় কালিমার মসীরেখা,
সে-সকলি অধঃসাৎ ক'রে
শান্ত প্রসন্নতা
ধরণীরে ধন্য করে পূর্ণের প্রকাশে।
ফুটিয়েছে ফুল সে যে,
ফলিয়েছে ফলভার,
বিছিয়েছে ছায়া-আস্তরণ,
পাখিরে দিয়েছে বাসা,
মৌমাছিরে জুগিয়েছে মধু,
বাজিয়েছে পল্লবমর্মর।
পেয়েছে সে প্রভাতের পুণ্য আলো,
শ্রাবণের অভিষেক,
বসন্তের বাতাসের আনন্দমিতালি,—

পেয়েছে সে ধরণীর প্রাণরস,
সুগভীর সুবিপুল আয়ু,.
পেয়েছে সে আকাশের নিত্য আশীর্বাদ।
পেয়েছে সে কীটের দংশন।

১৯ জুলাই ১৯৩২

শান্ত

বিদ্রূপবাণ উদ্যত করি
এসেছিল সংসার,
নাগাল পেল না তার।
আপনার মাঝে আছে সে অনেক দূরে।
শান্ত মনের স্তব্ধ গহনে
ধ্যানের বীণার সুরে
রেখেছে তাহারে ঘিরি।
হৃদয়ে তাহার উচ্চ উদয়গিরি।
সেথা অন্তরলোকে
সিন্ধুপারের প্রভাত-আলোক
জ্বলিছে তাহার চোখে।
সে আলোকে এই বিশ্বের রূপ
অপরূপ হয়ে জাগে।
তার দৃষ্টির আগে
বিরূপ বিকল খণ্ডিত যত-কিছু
বিদ্রোহ ছেড়ে বিরাটের পায়ে
করে এসে মাথা নিচু।

সিন্ধুতীরের শৈলতটের 'পরে
হিংসামুখর তরঙ্গদল
যতই আঘাত করে,

কঠোর বিরোধ রচি তুলে তত
অতলের মহালীলা,
ফেনিল নৃত্যে দামামা বাজায় শিলা।
হে শান্ত, তুমি অশান্তিরেই
মহিমা করিছ দান,
গর্জন এসে তোমার মাঝারে
হল ভৈরব গান।
তোমার চোখের গভীর আলোকে
অপমান হল গত
সন্ধ্যামেঘের তিমিররন্ধ্রে
দীপ্ত রবির মতো।

১৪ চৈত্র ১৩৩৮

জলপাত্র

প্রভু, তুমি পূজনীয়। আমার কী জাত,
জান তাহা হে জীবননাথ।
তবুও সবার দ্বার ঠেলে
কেন এলে
কোন্ দুখে
আমার সম্মুখে।
ভরা ঘট লয়ে কাঁখে
মাঠের পথের বাঁকে বাঁকে
তীব্র দ্বিপ্রহরে
আসিতেছিলাম ধেয়ে আপনার ঘরে।
চাহিলে তৃষ্ণার বারি,
আমি হীন নারী

তোমারে করিব হেয়,
সে কি মোর শ্রেয়।
ঘটখানি নামাইয়া চরণে প্রণাম ক'রে
কহিলাম, "অপরাধী করিয়ো না মোরে।"
শুনিয়া আমার মুখে তুলিলে নয়ন বিশ্বজয়ী,
হাসিয়া কহিলে, "হে মৃন্ময়ী,
পুণ্য যথা মৃত্তিকার এই বসুন্ধরা
শ্যামল কান্তিতে ভরা,
সেইমতো তুমি
লক্ষ্মীর আসন, তাঁর কমলচরণ আছ চুমি।
সুন্দরের কোনো জাত নাই,
মুক্ত সে সদাই।
তাহারে অরুণরাঙা উষা
পরায় আপন ভূষা;
তারাময়ী রাতি
দেয় তার বরমাল্য গাঁথি।
মোর কথা শোনো,
শতদল পঙ্কজের জাতি নেই কোনো।
যার মাঝে প্রকাশিল স্বর্গের নির্মল অভিরুচি
সেও কি অশুচি।
বিধাতা প্রসন্ন যেথা আপনার হাতের সৃষ্টিতে
নিত্য তার অভিষেক নিখিলের আশিসবৃষ্টিতে।"
জলভরা মেঘস্বরে এই কথা ব'লে
তুমি গেলে চলে।

তার পর হতে
এ ভঙ্গুর পাত্রখানি প্রতিদিন উষার আলোতে
নানা বর্ণে আঁকি,
নানা চিত্ররেখা দিয়ে মাটি তার ঢাকি।

হে মহান, নেমে এসে তুমি যারে করেছ গ্রহণ,
সৌন্দর্যের অর্ঘ্য তার তোমা-পানে করুক বহন।

২৪ জুলাই ১৯৩২

আতঙ্ক

বটের জটায় বাঁধা ছায়াতলে
গোধূলিবেলায়
বাগানের জীর্ণ পাঁচিলেতে
সাদাকালো দাগগুলো
দেখা দিত ভয়ংকর মূর্তি ধরে
ওইখানে দৈত্যপুরী,
অদৃশ্য কুঠরি থেকে তার
মনে-মনে শোনা যেত হাঁউমাউখাঁউ।
লাঠি হাতে কুঁজোপিঠ
খিলিখিলি হাসত ডাইনিবুড়ী।
কাশীরাম দাস
পয়ারে যা লিখেছিল হিড়িম্বার কথা
ইট-বের-করা সেই পাঁচিলের 'পরে
ছিল তারি প্রত্যক্ষ কাহিনী।
তারি সঙ্গে সেইখানে নাককাটা শূর্পণখা
কালো কালো দাগে
করেছিল কুটুম্বিতা।

সতেরো বৎসর পরে
গিয়েছি সে সাবেক বাড়িতে।
দাগ বেড়ে গেছে,
মুগ্ধ নতুনের তুলি পুরোনোকে দিয়েছে প্রশ্রয়।

ইঁটগুলো মাঝে-মাঝে খসে গিয়ে
পড়ে আছে রাশকরা।
গায়ে গায়ে লেগেছে অনন্তমূল,
কালমেঘ লতা,
বিছুটির ঝাড় ;
ভাঁটিগাছে হয়েছে জঙ্গল।
পুরোনো বটের পাশে
উঠেছে ভেরেণ্ডাগাছ মস্তবড়ো হয়ে।
বাইরেতে স্বর্পণখা-হিড়িম্বার চিহ্নগুলো আছে,
মনে তারা কোনোখানে নেই।

স্টেশনে গেলেম ফিরে একবার খুব হেসে নিয়ে।
জীবনের ভিত্তিটার গায়ে
পড়েছে বিস্তর কালো দাগ
মূঢ় অতীতের মসীলেখা ;
ভাঙা গাঁথুনিতে
ভীরু কল্পনার যত জটিল কুটিল চিহ্নগুলো।
মাঝে-মাঝে
যেদিন বিকেলবেলা
বাদলের ছায়া নামে
সারি সারি তালগাছে
দিঘির পাড়িতে,
দূরের আকাশে
স্নিগ্ধ সুগম্ভীর
মেঘের গর্জন ওঠে গুরুগুরু,
ঝিঁঝিঁ ডাকে বুনো খেজুরের ঝোপে,
তখন দেশের দিকে চেয়ে
বাঁকাচোরা আলোহীন পথে
ভেঙেপড়া দেউলের মূর্তি দেখি ;
দীর্ণ ছাদে, তার জীর্ণ ভিতে

নামহীন অবসাদ,—
অনির্দিষ্ট শঙ্কাগুলো নিদ্রাহীন পেঁচা,
নৈরাশ্যের অলীক অত্যুক্তি যত,
দুর্বলের স্বরচিত শত্রুর চেহারা।
ধিক্ রে ভাঙনলাগা মন,
চিন্তায় চিন্তায় তোর কত মিথ্যা আঁচড় কেটেছে
দুষ্টগ্রহ সেজে ভয়
কালোচিহ্নে মুখভঙ্গী করে।
কাঁটা-আগাছার মতো
অমঙ্গল নাম নিয়ে
আতঙ্কের জঙ্গল উঠেছে।
চারিদিকে সারি সারি জীর্ণ ভিতে
ভেঙেপড়া অতীতের বিরূপ বিকৃতি
কাপুরুষে করিছে বিদ্রূপ।

২৩ জুলাই ১৯৩২

আলেখ্য

তোরে আমি রচিয়াছি রেখায় রেখায়
লেখনীর নটনলেখায়।
নির্বাকের গুহা হতে আনিয়াছি
নিখিলের কাছাকাছি,
যে-সংসারে হতেছে বিচার
নিন্দাপ্রশংসার।
এই আস্পর্ধার তরে
আছে কি নালিশ তোর রচয়িতা আমার উপরে।
অব্যক্ত আছিলি যবে
বিশ্বের বিচিত্ররূপ চলেছিল নানা কলরবে

নানা ছন্দে লয়ে
সৃজনে প্রলয়ে।
অপেক্ষা করিয়া ছিলি শূন্যে শূন্যে, কবে কোন্ গুণী
নিঃশব্দ ক্রন্দন তোর শুনি'
সীমায় বাঁধিবে তোরে সাদায় কালোয়
আঁধারে আলোয়।
পথে আমি চলেছিনু। তোর আবেদন
করিল ভেদন
নাস্তিত্বের মহা-অন্তরাল,
পরশিল মোর ভাল
চুপে-চুপে
অর্ধস্ফুট স্বপ্নমূর্তিরূপে।
অমূর্ত সাগরতীরে রেখার আলেখ্যলোকে
আনিয়াছি তোকে।
ব্যথা কি কোথাও বাজে
মূর্তির মর্মের মাঝে।
সুষমার অন্যথায়
ছন্দ কি লজ্জিত হল অস্তিত্বের সত্য মর্যাদায়।
যদিও তাই-বা হয়
নাই ভয়,
প্রকাশের ভ্রম কোনো
চিরদিন রবে না কখনো।
রূপের মরণত্রুটি
আপনিই যাবে টুটি
আপনারি ভারে,
আরবার মুক্ত হবি দেহহীন অব্যক্তের পারে।

২৪ জুলাই ১৯৩২

সান্ত্বনা

সকালের আলো এই বাদলবাতাসে
মেঘে রুদ্ধ হয়ে আসে
ভাঙা কণ্ঠে কথার মতন।
মোর মন
এ অস্ফুট প্রভাতের মতো
কী কথা বলিতে চায়, থাকে বাক্যহত।
মানুষের জীবনের মজ্জায় মজ্জায়
যে-দুঃখ নিহিত আছে অপমানে শঙ্কায় লজ্জায়,
কোনো কালে যার অন্ত নাই,
আজি তাই
নির্যাতন করে মোরে। আপনার দুর্গমের মাঝে
সান্ত্বনার চির-উৎস কোথায় বিরাজে,
যে-উৎসের গূঢ় ধারা বিশ্বচিত্ত-অন্তঃস্তরে
উন্মুক্ত পথের তরে
নিত্য ফিরে যুঝে,
আমি তারে মরি খুঁজে।
আপন বাণীতে
কী পুণ্যে বা পারিব আনিতে
সেই সুগম্ভীর শান্তি, নৈরাশ্যের তীব্র বেদনারে
স্তব্ধ যা করিতে পারে।
হায় রে ব্যথিত,
নিখিল-আত্মার কেন্দ্রে বাজে অকথিত
আরোগ্যের মহামন্ত্র, যার গুণে
সৃজনের হোমের আগুনে
নিজেরে আহুতি দিয়া নিত্য সে নবীন হয়ে উঠে,—
প্রাণেরে ভরিয়া তুলে নিত্যই মৃত্যুর করপুটে।
সেই মন্ত্র শান্ত মৌনতলে
শুনা যায় আত্মহারা তপস্যার বলে।

মাঝে-মাঝে পরম বৈরাগী
সে-মন্ত্র চেয়েছে দিতে সর্বজন লাগি।
কে পারে তা করিতে বহন,
মুক্ত হয়ে কে পারে তা করিতে গ্রহণ।
গতিহীন আর্ত অক্ষমের তরে
কোন্ করুণার স্বর্গে মন মোর দয়া ভিক্ষা করে
ঊর্ধ্বে বাহু তুলি।
কে বন্ধু রয়েছ কোথা, দাও দাও খুলি
পাষাণকারার দ্বার—
যেথায় পুঞ্জিত হল নিষ্ঠুরের অত্যাচার,
বঞ্চনা লোভীর,
যেথায় গভীর
মর্মে উঠে বিষাইয়া সত্যের বিকার।
আমিত্ববিমুগ্ধ মন যে দুর্বহ ভার
আপনার আসক্তিতে জমায়েছে আপনার 'পরে,
নির্মম বর্জনশক্তি দাও তার অন্তরে অন্তরে।
আমার বাণীতে দাও সেই সুধা
যাহাতে মিটিতে পারে আত্মার গভীরতম ক্ষুধা।

হেনকালে সহসা আসিল কানে
কোন্ দূর তরুশাখে শ্রান্তিহীন গানে
অদৃশ্য কে পাখি
বারবার উঠিতেছে ডাকি।
কহিলাম তারে, 'ওগো, তোমার কণ্ঠেতে আছে আলো,
অবসাদ-আঁধার ঘুচাল।
তোমার সহজ এই প্রাণের প্রোল্লাস
সহজেই পেতেছে প্রকাশ।
আদিম আনন্দ যাহা এ বিশ্বের মাঝে,
যে-আনন্দ অস্তিত্বে বিরাজে,

যে পরম আনন্দলহরী
যত দুঃখ যত সুখ নিয়েছে আপনা-মাঝে হরি,
আমারে দেখালে পথ তুমি তারি পানে
এই তব অকারণ গানে।

২৭ জুলাই ১৯৩২

শ্রীবিজয়লক্ষ্মী

তোমায় আমায় মিল হয়েছে কোন্ যুগে এইখানে।
ভাষায় ভাষায় গাঁঠ পড়েছে, প্রাণের সঙ্গে প্রাণে।
ডাক পাঠালে আকাশপথে কোন্ সে পুবেন বায়ে
দূর সাগরের উপকূলে নারিকেলের ছায়ে।
গঙ্গাতীরের মন্দিরেতে সেদিন শঙ্খ বাজে,
তোমার বাণী এপার হতে মিলল তারি মাঝে।
বিষ্ণু আমায় কইল কানে, বললে দশভুজা,
"অজানা ওই সিন্ধুতীরে নেব আমার পুজা।"
মন্দাকিনীর কলধারা সেদিন ছলোছলো
পুব সাগরে হাত বাড়িয়ে বললে, "চলো, চলো।"
রামায়ণের কবি আমায় কইল আকাশ হতে,
"আমার বাণী পার করে দাও দূর সাগরের স্রোতে।"
তোমার ডাকে উতল হল বেদব্যাসের ভাষা—
বললে, "আমি ওই পারেতে বাঁধব নূতন বাসা।"
আমার দেশের হৃদয় সেদিন কইল আমার কানে,
"আমায় বয়ে যাও গো লয়ে সুদূর দেশের পানে।"

সেদিন প্রাতে সুনীল জলে ভাসল আমার তরী,—
শুভ্র পালে গর্ব জাগায় শুভ হাওয়ায় ভরি।
তোমার ঘাটে লাগল এসে, জাগল সেথায় সাড়া,
কূলে কূলে কাননলক্ষ্মী দিল আঁচল নাড়া।
প্রথম দেখা আবছায়াতে আঁধার তখন ধরা,
সেদিন সন্ধ্যা সপ্তঋষির আশীর্বাদে ভরা।
প্রাতে মোদের মিলনপথে উষা ছড়ায় সোনা,
সে-পথ বেয়ে লাগল দোঁহার প্রাণের আনাগোনা।

দুইজনেতে বাঁধনু বাসা পাথর দিয়ে গেঁথে,
দুইজনেতে বসনু সেথায় একটি আসন পেতে।

বিরহরাত ঘনিয়ে এল কোন্ বরষের থেকে,
কালের রথের ধুলা উড়ে দিল আসন ঢেকে।
বিস্মরণের ভাঁটা বেয়ে কবে এলেম ফিরে
ক্লান্তহাতে রিক্তমনে একা আপন তীরে।
বঙ্গসাগর বহুবরষ বলে নি মোর কানে
সে যে কভু সেই মিলনের গোপন কথা জানে।
জাহ্নবীও আমার কাছে গাইল না সেই গান
সুদূর পারের কোথায় যে তার আছে নাড়ীর টান।

এবার আবার ডাক শুনেছি, হৃদয় আমার নাচে,
হাজার বছর পার হয়ে আজ আসি তোমার কাছে
মুখের পানে চেয়ে তোমার আবার পড়ে মনে
আরেক দিনের প্রথম দেখা তোমার শ্যামল বনে।
হয়েছিল রাখিবাঁধন সেদিন শুভ প্রাতে,
সেই রাখি যে আজো দেখি তোমার দখিন হাতে।
এই সে-পথে হয়েছিল মোদের যাওয়া-আসা
আজো সেথায় ছড়িয়ে আছে আমার ছিন্ন ভাষা।
সে চিহ্ন আজ বেয়ে বেয়ে এলেম শুভক্ষণে
সেই সেদিনের প্রদীপজ্বালা প্রাণের নিকেতনে।
আমি তোমায় চিনেছি আজ, তুমি আমায় চেনো,
নূতনপাওয়া পুরানোকে আপন ব'লে জেনো।

৪ ভাদ্র ১৩৩৪
[বাটাভিয়া] যবদ্বীপ

বোরোবুদুর

সেদিন প্রভাতে সূর্য এইমতো উঠেছে অম্বরে
অরণ্যের বন্দনমর্মরে ;
নীলিম বাষ্পের স্পর্শ লভি'
শৈলশ্রেণী দেখা দেয় যেন ধরণীর স্বপ্নচ্ছবি।

নারিকেল-বনপ্রান্তে নরপতি বসিল একাকী
ধ্যানমগ্ন-আঁখি।
উচ্চে উচ্ছ্বসিল প্রাণ অন্তহীন আকাঙ্ক্ষাতে,
কী সাহসে চাহিল পাঠাতে
আপন পূজার মন্ত্র যুগযুগান্তরে।
অপরূপ অমৃত অক্ষরে
লিখিল বিচিত্র লেখা ; সাধকের ভক্তির পিপাসা
রচিল আপন মহাভাষা—
সর্বকাল সর্বজন
আনন্দে পড়িতে পারে যে-ভাষার লিপির লিখন।

সে-লিপি ধরিল দ্বীপ আপন বক্ষের মাঝখানে,
সে লিপি তুলিল গিরি আকাশের পানে
সে-লিপির বাণী সনাতন
করেছে গ্রহণ
প্রথম-উদিত সূর্য শতাব্দীর প্রত্যহ প্রভাতে।
অদূরে নদীর কিনারাতে
আলবাঁধা মাঠে
কত যুগ ধরে চাষী ধান বোনে আর ধান কাটে ;—
আঁধারে আলোয়
প্রত্যহের প্রাণলীলা সাদায় কালোয়
ছায়ানাট্যে ক্ষণিকের নৃত্যচ্ছবি যায় লিখে লিখে,
লুপ্ত হয় নিমিখে নিমিখে।

কালের সে-লুকাচুরি, তারি মাঝে সংকল্প সে কার
প্রতিদিন করে মন্ত্রোচ্চার,
বলে অবিশ্রাম,—
'বুদ্ধের শরণ লইলাম।'
প্রাণ যার দুদিনের, নাম যার মিলাল নিঃশেষে
সংখ্যাতীত বিস্মৃতের দেশে,
পাষাণের ছন্দে ছন্দে বাঁধিয়া গেছে সে
আপনার অক্ষয় প্রণাম,—
'বুদ্ধের শরণ লইলাম।'

কত যাত্রী কতকাল ধরে
নম্রশিরে দাঁড়ায়েছে হেথা করজোড়ে।
পূজার গম্ভীর ভাষা খুঁজিতে এসেছে কত দিন,
তাদের আপনকণ্ঠ ক্ষীণ।
ইঙ্গিতপুঞ্জিত তুঙ্গ পাষাণের সংগীতের তানে
আকাশের পানে
উঠেছে তাদের নাম,
জেগেছে অনন্ত ধ্বনি,—'বুদ্ধের শরণ লইলাম।'

অর্থ আজ হারায়েছে সে-যুগের লিখা,
নেমেছে বিস্মৃতিকুহেলিকা।
অর্ঘ্যশূন্য কৌতূহলে দেখে যায় দলে দলে আসি
ভ্রমণবিলাসী,—
বোধশূন্য দৃষ্টি তার নিরর্থক দৃশ্য চলে গ্রাসি।
চিত্ত আজি শান্তিহীন লোভের বিকারে,
হৃদয় নীরস অহংকারে।
ক্ষিপ্রগতি বাসনার তাড়নায় তৃপ্তিহীন ত্বরা,
কম্পমান ধরা;
বেগ শুধু বেড়ে চলে ঊর্ধ্বশ্বাসে মৃগয়া-উদ্দেশে,
লক্ষ্য ছোটে পথে পথে, কোথাও পৌঁছে না পরিশেষে;

অন্তহারা সঞ্চয়ের আহুতি মাগিয়া
সর্বগ্রাসী ক্ষুধানল উঠেছে জাগিয়া ;
তাই আসিয়াছে দিন,
পীড়িত মানুষ মুক্তিহীন,
আবার তাহারে
আসিতে হবে যে তীর্থদ্বারে
শুনিবারে
পাষাণের মৌনতটে যে-বাণী রয়েছে চিরস্থির—
কোলাহল ভেদ করি শত শতাব্দীর
আকাশে উঠিছে অবিরাম
অমেয় প্রেমের মন্ত্র,—'বুদ্ধের শরণ লইলাম।'

২৩ সেপ্টেম্বর ১৯২৭
বোরোবুদুর [যবদ্বীপ]

সিয়াম

প্রথম দর্শনে

ত্রিশরণ মহামন্ত্র যবে
বজ্রমন্দ্ররবে
আকাশে ধ্বনিতেছিল পশ্চিমে পুরবে,
মরুপারে, শৈলতটে, সমুদ্রের কূলে উপকূলে,
দেশে দেশে চিত্তদ্বার দিল যবে খুলে
আনন্দমুখর উদ্বোধন,—
উদ্দাম ভাবের ভার ধরিতে নারিল যবে মন,
বেগ তার ব্যাপ্ত হল চারিভিতে,
দুঃসাধ্য কীর্তিতে, কর্মে, চিত্রপটে মন্দিরে মূর্তিতে,
আত্মদানসাধনস্ফূর্তিতে
উচ্ছ্বসিত উদার উক্তিতে,—
স্বার্থঘন দীনতার বন্ধনমুক্তিতে,—

সে-মন্ত্র অমৃতবাণী হে সিয়াম, তব কানে
কবে এল কেহ নাহি জানে
অভাবিত অলক্ষিত আপনাবিস্মৃত শুভক্ষণে
দূরাগত পান্থসমীরণে।

সে-মন্ত্র তোমার প্রাণে লভি প্রাণ
বহুশাখাপ্রসারিত কল্যাণে করেছে ছায়াদান।
সে-মন্ত্রভারতী
দিল অস্খলিত গতি
কত শত শতাব্দীর সংসারযাত্রারে—
শুভ আকর্ষণে বাঁধি তারে
এক ধ্রুব কেন্দ্র-সাথে
চরম মুক্তির সাধনাতে ;—
সর্বজনগণে তব এক করি একাগ্র ভক্তিতে,
এক ধর্ম, এক সঙ্ঘ, এক মহাগুরুর শক্তিতে
সে-বাণীর সৃষ্টিক্রিয়া নাহি জানে শেষ,
নবযুগ-যাত্রাপথে দিবে নিত্য নূতন উদ্দেশ ;
সে-বাণীর ধ্যান
দীপ্যমান করি দিবে নব নব জ্ঞান
দীপ্তির ছটায় আপনার,
এক সূত্রে গাঁথি দিবে তোমার মানসরত্নহার।
হৃদয়ে হৃদয়ে মিল করি
বহু যুগ ধরি
রচিয়া তুলেছ তুমি সুমহৎ জীবনমন্দির,—
পদ্মাসন আছে স্থির,
ভগবান বুদ্ধ সেথা সমাসীন
চিরদিন—
মৌন যাঁর শান্তি অন্তহারা,
বাণী যাঁর সকরুণ সান্ত্বনার ধারা।

আমি সেথা হতে এনু যেথা ভগ্নস্তূপে
বুদ্ধের বচন রুদ্ধ দীর্ণকীর্ণ মূক শিলারূপে,—
ছিল যেথা সমাচ্ছন্ন করি
বহু যুগ ধরি
বিস্মৃতিকুয়াশা
ভক্তির বিজয়স্তম্ভে সমুৎকীর্ণ অর্চনার ভাষা।
সে-অর্চনা সেই বাণী
আপন সজীব মূর্তিখানি
রাখিয়াছে ধ্রুব করি শ্যামল সরস বক্ষে তব,—
আজি আমি তারে দেখি লব,—
ভারতের যে-মহিমা
ত্যাগ করি আসিয়াছে আপন অঙ্গনসীমা
অর্ঘ্য দিব তারে
ভারত-বাহিরে তব দ্বারে।
স্নিগ্ধ করি প্রাণ
তীর্থজলে করি যাব স্নান
তোমার জীবনধারাস্রোতে,
যে-নদী এসেছে বহি ভারতের পুণ্যযুগ হতে—
যে-যুগের গিরিশৃঙ্গ-'পর
একদা উদিয়াছিল প্রেমের মঙ্গলদিনকর।

11 October 1927
Phya Thai Palace Hotel
[Bangkok]

সিয়াম

বিদায়কালে

কোন্‌ সে সুদূর মৈত্রী আপন প্রচ্ছন্ন অভিজ্ঞানে
আমার গোপন ধ্যানে
চিহ্নিত করেছে তব নাম,
হে সিয়াম,
বহু পূর্বে যুগান্তরে মিলনের দিনে।
মুহূর্তে লয়েছি তাই চিনে
তোমারে আপন বলি,
তাই আজ ভরিয়াছি ক্ষণিকের পথিক-অঞ্জলি
পুরাতন প্রণয়ের স্মরণের দানে,
সপ্তাহ হয়েছে পূর্ণ শতাব্দীর শব্দহীন গানে।
চিরন্তন আত্মীয়জনারে
দেখিয়াছি বারে বারে
তোমার ভাষায়,
তোমার ভক্তিতে, তব মুক্তির আশায়,
সুন্দরের তপস্যাতে
যে-অর্ঘ্য রচিলে তব সুনিপুণ হাতে
তাহারি শোভন রূপে—
পূজার প্রদীপে তব, প্রজ্বলিত ধূপে।

আজি বিদায়ের ক্ষণে
চাহিলাম স্নিগ্ধ তব উদার নয়নে,
দাঁড়ানু ক্ষণিক তব অঙ্গনের তলে,
পরাইনু গলে
বরমাল্য পূর্ণ অনুরাগে—
অম্লান কুসুম যার ফুটেছিল বহুযুগ আগে।

৩০ আশ্বিন ১৩৩৪
ইণ্টর্‌ন্যাশনাল রেলোয়ে [সিয়াম]

বুদ্ধদেবের প্রতি

সারনাথে মূলগন্ধকুটি বিহার প্রতিষ্ঠা-উপলক্ষে রচিত

ওই নামে একদিন ধন্য হল দেশে দেশান্তরে
তব জন্মভূমি।
সেই নাম আরবার এ দেশের নগরে প্রান্তরে
দান করো তুমি।
বোধিদ্রুমতলে তব সেদিনের মহাজাগরণ
আবার সার্থক হ'ক, মুক্ত হ'ক মোহ-আবরণ,
বিস্মৃতির রাত্রিশেষে এ ভারতে তোমারে স্মরণ
নবপ্রাতে উঠুক কুসুমি।

চিত্ত হেথা মৃতপ্রায়, অমিতাভ, তুমি অমিতায়ু,
আয়ু করো দান।
তোমার বোধনমন্ত্রে হেথাকার তন্দ্রালস বায়ু
হ'ক প্রাণবান।
খুলে যাক রুদ্ধদ্বার, চৌদিকে ঘোষুক শঙ্খধ্বনি
ভারত অঙ্গনতলে আজি তব নব আগমনী,
অমেয় প্রেমের বার্তা শতকণ্ঠে উঠুক নিঃস্বনি—
এনে দিক অজেয় আহ্বান।

24. 10. 31.
Darjeeling

পারস্যে জন্মদিনে

ইরান, তোমার যত বুলবুল
তোমার কাননে যত আছে ফুল
বিদেশী কবির জন্মদিনেরে মানি
শুনাল তাহারে অভিনন্দনবাণী।

ইরান, তোমার বীর সন্তান,
প্রণয়-অর্ঘ্য করিয়াছে দান
আজি এ বিদেশী কবির জন্মদিনে,
আপনার বলি নিয়েছে তাহারে চিনে।

ইরান, তোমার সম্মানমালে
নব গৌরব বহি নিজ ভালে
সার্থক হল কবির জন্মদিন।
চিরকাল তারি স্বীকার করিয়া ঋণ
তোমার ললাটে পরানু এ মোর শ্লোক,—
ইরানের জয় হ'ক।

২৫ বৈশাখ ১৩৩৯
[তেহেরান]

ধর্মমোহ

ধর্মের বেশে মোহ যারে এসে ধরে
অন্ধ সে-জন মারে আর শুধু মরে।
নাস্তিক সেও পায় বিধাতার বর,
ধার্মিকতার করে না আড়ম্বর।
শ্রদ্ধা করিয়া জ্বালে বুদ্ধির আলো,
শাস্ত্রে মানে না, মানে মানুষের ভালো।

বিধর্ম বলি মারে পরধর্মেরে,
নিজ ধর্মের অপমান করি ফেরে,
পিতার নামেতে হানে তাঁর সন্তানে,
আচার লইয়া বিচার নাহিক জানে,
পূজাগৃহে তোলে রক্তমাখানো ধ্বজা,—
দেবতার নামে এ যে শয়তান ভজা।

অনেক যুগের লজ্জা ও লাঞ্ছনা,
বর্বরতার বিকারবিড়ম্বনা,
ধর্মের মাঝে আশ্রয় দিল যারা
আবর্জনায় রচে তারা নিজ কারা।—
প্রলয়ের ওই শুনি শৃঙ্গধ্বনি,
মহাকাল আসে লয়ে সম্মার্জনী।

যে দেবে মুক্তি তারে খুঁটিরূপে গাড়া,
যে মিলাবে তারে করিল ভেদের খাঁড়া,
যে আনিবে প্রেম অমৃত-উৎস হতে
তারি নামে ধরা ভাসায় বিষের স্রোতে,
তরী ফুটা করি পার হতে গিয়ে ডোবে,—
তবু এরা কারে অপবাদ দেয় ক্ষোভে।

হে ধর্মরাজ, ধর্মবিকার নাশি
ধর্মমূঢ়জনেরে বাঁচাও আসি।
যে-পূজার বেদি রক্তে গিয়েছে ভেসে
ভাঙো ভাঙো, আজি ভাঙো তারে নিঃশেষে,—
ধর্মকারার প্রাচীরে বজ্র হানো,
এ অভাগা দেশে জ্ঞানের আলোক আনো।

৩১ বৈশাখ ১৩৩৩
রেলপথ

সংযোজন

প্রাচী

জাগো হে প্রাচীন প্রাচী !
ঢেকেছে তোমারে নিবিড় তিমির
যুগযুগব্যাপী অমারজনীর ;
মিলেছে তোমার সুপ্তির তীর
লুপ্তির কাছাকাছি ।
জাগো হে প্রাচীন প্রাচী !

জীবনের যত বিচিত্র গান
ঝিল্লিমন্ত্রে হল অবসান ;
কবে আলোকের শুভ আহ্বান
নাড়ীতে উঠিবে নাচি ।
জাগো হে প্রাচীন প্রাচী !

সঁপিবে তোমারে নবীন বাণী কে ।
নবপ্রভাতের পরশমানিকে
সোনা করি দিবে ভুবনখানিকে,
তারি লাগি বসি' আছি ।
জাগো হে প্রাচীন প্রাচী !

জরার জড়িমা-আবরণ টুটে
নবীন রবির জ্যোতির মুকুটে
নব রূপ তব উঠুক-না ফুটে,
করপুটে এই যাচি।
জাগো হে প্রাচীন প্রাচী!

'খোলো খোলো দ্বার, ঘুচুক আঁধার',
নবযুগ আসি ডাকে বারবার—
দুঃখ-আঘাতে দীপ্তি তোমার
সহসা উঠুক বাঁচি।
জাগো হে প্রাচীন প্রাচী!

ভৈরবরাগে উঠিয়াছে তান,
ঈশানের বুঝি বাজিল বিষাণ,
নবীনের হাতে লহো তব দান
জ্বালাময় মালাগাছি
জাগো হে প্রাচীন প্রাচী

[জ্যৈষ্ঠ ? ১৩৩০
শিলঙ]

আশীর্বাদ

শ্রীমতী লীলা দেবী কল্যাণীয়াসু

বিশ্ব-পানে বাহির হবে
আপন কারা টুটি—
এই সাধনায় কুঁড়ি ওঠে
কুসুম হয়ে ফুটি।
বীজ আপনার বাঁধন ছিঁড়ে
ফলেরে দেয় সাড়া।
সূর্যতারা আঁধার চিরে
জ্যোতিরে দেয় ছাড়া।
এই সাধনায় যোগযুক্ত
সাধু তাপসবর
মৃত্যু হতে করেন মুক্ত
অমৃতনির্ঝর।
এই সাধনায় বিশ্বকবির
আনন্দবীন বাজে,—
আপ্‌নারে দেয় উৎস্রাবিয়া
আপন সৃষ্টি-মাঝে।
সেই ফল পাও প্রেমের যোগে
পুণ্য মিলনব্রতে ;
আপ্‌নারে দাও ছুটি তুমি
আপন বন্ধ হতে।
আত্মভোলা দুইটি প্রাণে
মিলবে একাকার,
সেই মিলনে বিকাশ হবে
নূতন সংসার।

১১ আষাঢ় ১৩৩০

আশীর্বাদ

শ্রীমতী কল্পনা দেবীর প্রতি

সুন্দর ভক্তির ফুল অলক্ষ্যে নিভৃত তব মনে
যদি ফুটে থাকে মোর কাব্যের দক্ষিণ সমীরণে,
হে শোভনে, আজি এই নির্মল কোমল গন্ধ তার
দিয়েছ দক্ষিণা মোরে, কবির গভীর পুরস্কার।

লহো আশীর্বাদ বৎসে, আপন গোপন অন্তঃপুরে
ছন্দের নন্দনবন সৃষ্টি করো সুধাস্নিগ্ধ সুরে,—
বঙ্গের নন্দিনী তুমি, প্রিয়জনে করো আনন্দিত,
প্রেমের অমৃত তব ঢেলে দিক গানের অমৃত।

২২ ভাদ্র ১৩৩০
শান্তিনিকেতন

লক্ষ্যশূন্য

রথীরে কহিল গৃহী উৎকণ্ঠায় উর্ধ্বস্বরে ডাকি,—
“থামো থামো, কোথা তুমি রুদ্রবেগে রথ যাও হাঁকি,
সম্মুখে আমার গৃহ।” রথী কহে, “ওই মোর পথ,
ঘুরে গেলে দেরি হবে, বাধা ভেঙে সিধা যাবে রথ।”
গৃহী কহে, “নিদারুণ ত্বরা দেখে মোর ডর লাগে,
কোথা যেতে হবে বলো।” রথী কহে, “যেতে হবে আগে।”
“কোন্‌খানে” শুধাইল। রথী বলে, “কোনোখানে নহে,—
শুধু আগে।” “কোন্ তীর্থে, কোন্ সে মন্দিরে” গৃহী কহে।
“কোথাও না, শুধু আগে।” “কোন্ বন্ধু-সাথে হবে দেখা।”
“কারো সাথে নহে, যাব সব-আগে আমি মাত্র একা।”
ঘর্ঘরিত রথবেগে গৃহভিত্তি করি দিল গ্রাস ;
হাহাকারে, অভিশাপে, ধূলিজালে ক্ষুভিল বাতাস

সন্ধ্যার আকাশে। আঁধারের দীপ্ত সিংহদ্বার-বাগে
রক্তবর্ণ অস্তপথে ছোটে রথ লক্ষ্যশূন্য আগে।

৭ ফেব্রুয়ারি ১৯২৫
ক্রাকোভিয়া জাহাজ

প্রবাসী

পরবাসী চলে এসো ঘরে
অনুকূল সমীরণভরে।
বারে বারে শুভদিন
ফিরে গেল অর্থহীন,
চেয়ে আছে সবে তোমা-তরে,
ফিরে এসো ঘরে।

আকাশে আকাশে আয়োজন,
বাতাসে বাতাসে আমন্ত্রণ।
বন ভরা ফুলে ফুলে,
এসো এসো, লহো তুলে,
উঠে ডাক মর্মরে মর্মরে।

ফসলে ঢাকিয়া যায় মাটি,
তুমি কি লবে না তাহা কাটি।
ওই দেখো কতবার
হল খেয়া পারাপার,
সারিগান উঠিল অম্বরে।

কোথা যাবে সে কি জানা নেই।
যেথা আছ ঘর সেখানেই।

মন যে দিল না সাড়া,
তাই তুমি গৃহছাড়া,
পরবাসী বাহিরে অন্তরে।

আঙিনায় আঁকা আলিপনা,
আঁখি তব চেয়ে দেখিল না।
মিলনঘরের বাতি
জ্বলে অনিমেষভাতি
সারারাতি জানালার 'পরে

বাঁশি পড়ে আছে তরুমূলে,
আজ তুমি আছ তারে ভুলে।
কোনোখানে সুর নাই,
আপন ভুবনে তাই
কাছে থেকে আছ দূরান্তরে

এসো এসো মাটির উৎসবে,
দক্ষিণবায়ুর বেণুরবে।
পাখির প্রভাতীগানে,
এসো এসো পুণ্যস্নানে
আলোকের অমৃতনির্ঝরে।

ফিরে এসো তুমি উদাসীন,
ফিরে এসো তুমি দিশাহীন।
প্রিয়েরে বরিতে হবে,
বরমাল্য আনো তবে,
দক্ষিণা দক্ষিণ তব করে।

দুঃখ আছে অপেক্ষিয়া দ্বারে,
বীর তুমি বক্ষে লহো তারে।

পথের কণ্টক দলি
ক্ষতপদে এসো চলি
ঝটিকার মেঘমন্দ্রস্বরে।

বেদনার অর্ঘ্য দিয়ে, তবে
ঘর তব আপনার হবে।
তুফান তুলিবে কুলে,
কাঁটাও ভরিবে ফুলে,
উৎসধারা ঝরিবে প্রস্তরে।

[চৈত্র ১৩৩২]

বুদ্ধজন্মোৎসব

সংস্কৃত ছন্দের নিয়ম-অনুসারে পঠনীয়

হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বি,
নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্ব,
ঘোর কুটিল পন্থ তার,
লোভজটিল বন্ধ।
নূতন তব জন্ম লাগি কাতর যত প্রাণী,
কর ত্রাণ মহাপ্রাণ, আন অমৃতবাণী,
বিকশিত কর প্রেমপদ্ম
চিরমধুনিষ্যন্দ।

শান্ত হে, মুক্ত হে, হে অনন্তপুণ্য,
করুণাঘন, ধরণীতল কর কলঙ্কশূন্য

এস দানবীর, দাও
ত্যাগকঠিন দীক্ষা,
মহাভিক্ষু, লও সবার
অহংকার ভিক্ষা।

লোক লোক ভুলুক শোক, খণ্ডন কর মোহ,
উজ্জ্বল কর জ্ঞানসূর্য-উদয়-সমারোহ,
প্রাণ লভুক সকল ভুবন,
নয়ন লভুক অন্ধ।

শান্ত হে, মুক্ত হে, হে অনন্তপুণ্য,
করুণাঘন, ধরণীতল কর কলঙ্কশূন্য।

ক্রন্দনময় নিখিলহৃদয়
তাপদহনদীপ্ত।
বিষয়বিষ-বিকারজীর্ণ
খিন্ন অপরিতৃপ্ত।
দেশ দেশ পরিল তিলক রক্তকলুষগ্লানি,
তব মঙ্গলশঙ্খ আন, তব দক্ষিণ পাণি,
তব শুভ সংগীতরাগ,
তব সুন্দর ছন্দ।

শান্ত হে, মুক্ত হে, হে অনন্তপুণ্য,
করুণাঘন, ধরণীতল কর কলঙ্কশূন্য।

১৩৩৩

প্রথম পাতায়

লিখতে যখন বল আমায়
তোমার খাতার প্রথম পাতে
তখন জানি, কাঁচা কলম
নাচবে আজো আমার হাতে,—
সেই কলমে আছে মিশে
ভাদ্রমাসের কাশের হাসি,

সেই কলমে সাঁঝের মেঘে
লুকিয়ে বাজে ভোরের বাঁশি।
সেই কলমে শিশু দোয়েল
শিস দিয়ে তার বেড়ায় উড়ি।
পারুলদিদির বাসায় দোলে
কনকচাঁপার কচি কুঁড়ি।
খেলার পুতুল আজো আছে
সেই কলমের খেলাঘরে ;
সেই কলমে পথ কেটে দেয়
পথহারানো তেপান্তরে।
নতুন চিকন অশথপাতা
সেই কলমে আপনি নাচে।
সেই কলমে মোর বয়সে
তোমার বয়স বাঁধা আছে।

৮ বৈশাখ ১৩৩৪

নূতন

আমরা খেলা খেলেছিলেম,
আমরাও গান গেয়েছি ;
আমরাও পাল মেলেছিলেম,
আমরা তরী বেয়েছি।
হারায় নি তা হারায় নি,
বৈতরণী তা পারায় নি,
নবীন আঁখির চপল আলোয়
সে কাল ফিরে পেয়েছি।

দূর রজনীর স্বপন লাগে
আজ নূতনের হাসিতে।

দূর ফাগুনের বেদন জাগে
　　আজ ফাগুনের বাঁশিতে।
হায় রে সেকাল, হায় রে
কখন্ চলে যায় রে
আজ একালের মরীচিকায়
　　নতুন মায়ায় ভাসিতে।

যে-মহাকাল দিন ফুরালে
　　আমার কুসুম ঝরাল,
সেই তোমারি তরুণ ভালে
　　ফুলের মালা পরাল।
কইল শেষের কথা সে,
কাঁদিয়ে গেল হতাশে,
তোমার মাঝে নতুন সাজে
　　শূন্য আবার ভরাল।

আনলে ডেকে পথিক মোরে
　　তোমার প্রেমের আগুনে।
শুকনো ঝোরা দিল ভ'রে
　　এক পসলায় শাগুনে।
সন্ধ্যামেঘের কোনাতে
রক্তরাগের সোনাতে
শেষ নিমেষের বোঝাই দিয়ে
　　ভাসিয়ে দিলে ভাগুনে।

৩০ বৈশাখ ১৩৩৪
শিলঙ

শুকসারী

শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসুর পাহাড়-আঁকা চিত্রপত্রিকার উত্তরে

শুক বলে, গিরিরাজের জগতে প্রাধান্য ;
সারী বলে, মেঘমালা, সেই বা কী সামান্য,—
গিরির মাথায় থাকে।
শুক বলে, গিরিরাজের দৃঢ় অচল শিলা ;
সারী বলে, মেঘমালার আদি-অন্তই লীলা,—
বাঁধবে কে-বা তাকে ?

শুক বলে, নদীর জলে গিরি ঢালেন প্রাণ ;
সারী বলে, তার পিছনে মেঘমালার দান,—
তাই তো নদী আছে।
শুক বলে, গিরীশ থাকেন গিরিতে দিনরাত্র ;
সারী বলে, অন্নপূর্ণা ভরেন ভিক্ষাপাত্র,—
সে তো মেঘের কাছে।

শুক বলে, হিমাদ্রি যে ভারত করে ধন্য ;
সারী বলে, মেঘমালা বিশ্বেরে দেয় স্তন্য,—
বাঁচে সকল জন।
শুক বলে, সমাধিতে স্তব্ধ গিরির দৃষ্টি,—
সারী বলে, মেঘমালার নিত্যনূতন সৃষ্টি ;
তাই সে চিরন্তন।

৩১ বৈশাখ ১৩৩৪
শিলঙ

সুসময়

বৈশাখী ঝড় যতই আঘাত হানে
সন্ধ্যাসোনার ভাণ্ডারদ্বার-পানে,
দস্যুর বেশে যতই করে সে দাবি
কুণ্ঠিত মেঘ হারায় সোনার চাবি,
গগন সঘন অবগুণ্ঠন টানে।

'খোলো খোলো মুখ' বনলক্ষ্মীরে ডাকে,
নিবিড় ধুলায় আপনি তাহারে ঢাকে।
'আলো দাও' হাঁকে, পায় না কাহারো সাড়া,
আঁধার বাড়ায়ে বেড়ায় লক্ষ্মীছাড়া,
পথ সে হারায় আপন ঘূর্ণিপাকে।

তারপরে যবে শিউলিফুলের বাসে
শরৎলক্ষ্মী শুভ্র আলোয় ভাসে,
নদীর ধারায় নাই মিছে মত্ততা,
কুন্দকলির স্নিগ্ধশীতল কথা,
মৃদু উচ্ছ্বাস মর্মরে ঘাসে ঘাসে,—

শিশির যখন বেণুর পাতার আগে
রবির প্রসাদ নীরব চাওয়ায় মাগে,
সবুজ খেতের নবীনধানের শিষে
ঢেউ খেলে যায় আলোকছায়ায় মিশে,
গগনসীমায় কাশের কাঁপন লাগে,—

হঠাৎ তখন সূর্যডোবার কালে
দীপ্তি লাগায় দিক্‌ললনার ভালে;
মেঘ ছেঁড়ে তার পর্দা আঁধার-কালো,
কোথায় সে পায় স্বর্গলোকের আলো,
চরম খনের পরম প্রদীপ জ্বালে।

১৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪

নূতন কাল

নন্দগোপাল বুক ফুলিয়ে এসে
বললে আমায় হেসে,—
"আমার সঙ্গে লড়াই ক'রে কখ্‌খনো কি পার,
বারে বারেই হার।"
আমি বললেম, "তাই বই কি! মিথ্যে তোমার বড়াই,
হ'ক দেখি তো লড়াই।"
"আচ্ছা তবে দেখাই তোমায়" এই ব'লে সে যেমনি টানলে হাত
দাদামশাই তখ্‌খনি চিৎপাত।
সবাইকে সে আনলে ডেকে, চেঁচিয়ে নন্দ করলে বাড়ি মাত।

বারে বারে শুধায় আমায়, "বলো তোমার হার হয়েছে না কি।"
আমি কইলেম, "বলতে হবে তা কি।
ধুলোর যখন নিলেম শরণ প্রমাণ তখন রইল কি আর বাকি।
এই কথা কি জান—
আমার কাছে নন্দগোপাল যখনি হার মান
আমারি সেই হার,
লজ্জা সে আমার।
ধুলোয় যেদিন পড়ব যেন এই জানি নিশ্চিত,
তোমারি শেষ জিত।"

২৩ অগস্ট [১৯২৭]
রুম্‌ফিউস জাহাজ

পরিণয়মঙ্গল

হৈমন্তী দেবী ও অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তীর পরিণয়-উপলক্ষে

উত্তরে তুষাররুদ্ধ হিমানীর কারাদুর্গতলে
প্রাণের উৎসবলক্ষ্মী বন্দী ছিল তন্দ্রার শৃঙ্খলে।
যে নীহারবিন্দু ফুল ছিঁড়ি তার স্বপ্নমন্ত্রপাশ
কঠিনের মরুবক্ষে মাধুরীর আনিল আশ্বাস,

হৈমন্তী নিঃশব্দে কবে গেঁথেছে তাহারি শুভ্রমালা
নিভৃত গোপন চিত্তে ; সেই অর্ঘ্যে পূর্ণ করি ডালা
লাবণ্যনৈবেদ্যখানি, দক্ষিণসমুদ্র-উপকূলে
এনেছে অরণ্যচ্ছায়ে, যেথায় অগণ্য ফুলে ফুলে
রবির সোহাগগর্ব বর্ণগন্ধমধুরসধারে
বৎসরের ঋতুপাত্র উচ্ছলিয়া দেয় বারে বারে।
বিস্ময়ে ভরিল মন, এ কী এ প্রেমের ইন্দ্রজাল,
কোথা করে অন্তর্ধান মুহূর্তে দুস্তর অন্তরাল—
দক্ষিণপবনসখা উৎকণ্ঠিত বসন্ত কেমনে
হৈমন্তীর কণ্ঠ হতে বরমাল্য নিল শুভক্ষণে।

১ পৌষ ১৩৩৪
শান্তিনিকেতন

জীবনমরণ

জীবনমরণের বাজায়ে খঞ্জনি
নাচিয়া ফাল্গুন গাহিছে।
অধীরা হল ধরা মাটির বন্দিনী
বাতাসে উড়ে যেতে চাহিছে।
আজিকে আলো ছায়া করিছে কোলাকুলি,
আজিকে এক দোলে দুজনে দোলাদুলি
শুকানো পাতা আর মুকুলে।
আজিকে শিরীষের মুখর উপবনে
জড়িত পাশাপাশি নূতনে পুরাতনে
চিকন শ্যামলের দুকূলে।

বিরহে টানে মিড় মিলন-বীণাতারে,
সুখের বুকে বাজে বেদনা

কপোত কাকলিতে করুণা সঞ্চারে,
কাননদেবী হল বিমনা।
আমারো প্রাণে বুঝি বহেছে ওই হাওয়া,
কিছু-বা কাছে আসা, কিছু-বা চলে যাওয়া,
কিছু-বা স্মরি কিছু পাসরি।
যে আছে যে-বা নাই আজিকে দোঁহে মিলি
আমার ভাবনাতে ভ্রমিছে নিরিবিলি
বাজায়ে ফাগুনের বাঁশরি।

[ফাল্গুন ১৩৩৪]

গৃহলক্ষ্মী

নবজাগরণ-লগনে গগনে বাজে কল্যাণশঙ্খ—
এসো তুমি উষা ওগো অকলুষা, আনো দিন নিঃশঙ্ক
দ্যুলোকভাসানো আলোকসুধায়
অভিষেক তুমি করো বসুধায়,
নবীন দৃষ্টি নয়নে তাহার এনে দাও অকলঙ্ক।

সম্মুখ-পানে নবযুগ আজি মেলুক উদার চিত্র।
অমৃতলোকের দ্বার খুলে দিন্‌ চিরজীবনের মিত্র।
বিশ্বের পথে আসিয়াছে ডাক,
যাত্রীরা সবে যাক ধেয়ে যাক,
দেহমন হতে হ'ক অপগত অবসাদ অপবিত্র।

মৌন যে ছিল বক্ষে তাহার বাজুক বীণার তন্ত্র,
নব বিশ্বাসে আশ্বাসহীন শুনুক বিজয়মন্ত্র।
এসো আনন্দ, দুঃখহরণ,
দুঃখেরে দাও করিতে বরণ,
মরণতোরণ পার হয়ে পাই অমর প্রাণের পন্থ।

কল্যাণী, তব অঙ্গনে আজি হবে মঙ্গলকর্ম,—
শুভসংগ্রামে যে যাবে তাহারে পরাও বীরের বর্ম।
বলো সবে ডাকি "ছাড়ো সংশয়",
বলো যাত্রীরে "হয়েছে সময়",
বলো "নাহি ভয়", বলো "জয় জয়, জয়ী যেন হয় ধর্ম"।

পশ্চাৎ-পানে ফিরায়ে ডেকো না, মনে জাগায়ো না দ্বন্দ্ব,
দুর্বল শোকে অশ্রুসলিলে নয়ন কোরো না অন্ধ।
সংকট-মাঝে ছুটিবার কালে
বাঁধিয়া রেখো না আবেশের জালে,
যে-চরণ বাধা লঙ্ঘিবে, তাহে জড়ায়ো না মোহবন্ধ।

? বৈশাখ ১৩৩৪

রঙিন

ভিড় করেছে রঙমশালীর দলে।
কেউ-বা জলে কেউ-বা তারা স্থলে।
অজানা দেশ, রাত্রিদিনে
পায়ের কাছের পথটি চিনে
দুঃসাহসে এগিয়ে তারা চলে।

কোন্ মহারাজ রথের 'পরে একা,
ভালো করে যায় না তাঁরে দেখা
সূর্যতারা অন্ধকারে
ডাইনে বাঁয়ে উঁকি মারে,
আপন আলোয় দৃষ্টি তাদের ঠেকা।

আমার মশাল সামনে ধরি না যে,
তাই তো আলো চক্ষে নাহি বাজে।

অন্তরে মোর রঙের শিখা
চিত্তকে দেয় আপন টিকা,
রঙিনকে তাই দেখি মনের মাঝে।

পাখিরা রঙ ওড়ায় আকাশতলে,
মাছেরা রঙ খেলায় গভীর জলে ;
রঙ জেগেছে বনসভায়
গোলাপ চাঁপা রঙন জবায়,
মেঘেরা রঙ ফোটায় পলে পলে।

নীরব ডাকে রঙমহালের রাজা
হুকুম করেন, 'রঙের আসর সাজা।'—
অমনি ফাগুন কোথা হতে
ভেসে আসে হাওয়ার স্রোতে,
পুরানোকে রাঙিয়ে করে তাজা।

তাদের আসর বাহির-ভুবনেতে,
ফেরে সেথায় রঙের নেশায় মেতে।
আমার এ রঙ গোপন প্রাণে,
আমার এ রঙ গভীর গানে,
রঙের আসন ধেয়ানে দিই পেতে।

২৬ ভাদ্র ১৩৩৫

আশীর্বাদী

কল্যাণীয় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগচীর সংবর্ধনা উপলক্ষে

আমরা তো আজ পুরাতনের কোঠায়,
নবীন বটে ছিলেম কোনো কালে।
বসন্তে আজ কত নূতন বোঁটায়
ধরল কুঁড়ি বাণীবনের ডালে।

কত ফুলের যৌবন যায় চুকে
একবেলাকার মৌমাছিদের প্রেমে।
মধুর পালা রেণুকণার মুখে
ঝরা পাতায় ক্ষণিকে যায় থেমে।

ফাগুনফুলে ভরেছিলে সাজি,
শ্রাবণমাসে আনো ফলের ভিড়।
সেতারেতে ইমন উঠে বাজি
সুরবাহারে দিক কানাড়ার মিড়।

২ ভাদ্র ১৩৩৮

বসন্ত-উৎসব

এ-বৎসর দোলপূর্ণিমা ফাল্গুন পার হয়ে চৈত্রে পৌঁছল। আমের মুকুল নিঃশেষিত, আমবাগানে মৌমাছির ভিড় নেই, পলাশ-ফোটার পালা ফুরল, গাছের তলায় শুকনো শিমুল তার শেষমধু পিঁপড়েদের বিলিয়ে দিয়ে বিদায় নিয়েছে। কাঞ্চনশাখা প্রায় দেউলে, ঐশ্বর্যের অল্প কিছু বাকি। কেবল শালের বীথিকা ভরে উঠেছে মঞ্জরিতে। উৎসব-প্রভাতে আশ্রমকন্যারা ঋতুরাজের সিংহাসন প্রদক্ষিণ করলে এই পুষ্পিত শালের বনে, তার বল্কলে আবির মাখিয়ে দিলে, তার ছায়ায় রাখলে মাল্যপ্রদীপের অর্ঘ্য। চতুর্দশীর চাঁদ যখন অস্তদিগন্তে, প্রভাতের ললাটে যখন অরুণ-আবিরের তিলকরেখা ফুটে উঠল, তখন আমি এই ছন্দের নৈবেদ্য বসন্ত-উৎসবের বেদির জন্য রচনা করেছি।

আশ্রমসখা হে শাল, বনস্পতি,
লহো আমাদের নতি।
তুমি এসেছিলে মোদের সবার আগে
প্রাণের পতাকা রাঙায়ে হরিৎরাগে,
সংগ্রাম তব কত ঝঞ্ঝার সাথে,
কত দুর্দিনে কত দুর্যোগরাতে
জয়গৌরবে ঊর্ধ্বে তুলিলে শির
হে বীর, হে গম্ভীর।

তোমার প্রথম অতিথি বনের পাখি,
শাখায় শাখায় নিলে তাহাদের ডাকি,
স্নিগ্ধ আদরে গানেরে দিয়েছ বাসা,
মৌন তোমার পেয়েছে আপন ভাষা,
স্বরে কিশলয়ে মিলন ঘটালে তুমি—
মুখরিত হল তোমার জন্মভূমি।

আমরা যেদিন আসন নিলেম আসি
কহিল স্বাগত তব পল্লবরাশি,
তার পর হতে পরিচয় নব নব
দিবসরাত্রি ছায়াবীথিতলে তব
মিলিল আসিয়া নানা দিগ্‌দেশ হতে
তরুণ জীবনস্রোতে।

বৈশাখতাপ শান্ত শীতল করো,
নববর্ষারে করি দাও ঘনতর,
শুভ্র শরতে জ্যোৎস্নার রেখাগুলি
ছায়ায় মিলায়ে সাজাও বনের ধূলি,
মধুলক্ষ্মীরে আনিয়াছে আহ্বানি
মঞ্জরিভরা সুন্দর তব বাণী।

নীরব বন্ধু, লহো আমাদের প্রীতি,
আজি বসন্তে লহো এ কবির গীতি,
কোকিলকাকলি শিশুদের কলরবে
মিলেছে আজি এ তব জয়-উৎসবে,
তোমার গন্ধে মোর আনন্দে আজি
এ পুণ্যদিনে অর্ঘ্য উঠিল সাজি

গম্ভীর তুমি, সুন্দর তুমি, উদার তোমার দান,
লহো আমাদের গান।

দোলপূর্ণিমা ১৩৩৮
শান্তিনিকেতন

আশীর্বাদ

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিনে

অভাগা যখন বেঁধেছিল তার বাসা
কোণে কোণে তারি পুঞ্জিত হল জীবনের ভাঙা আশা
ঘরের মধ্যে বুকের কাঁদনগুলা
উড়িয়ে বেড়ায় ধুলা।
হুষিয়া রুষিয়া উঠে নিরুদ্ধ বায়ু,
শোষণ করিছে আয়ু।
যেখানে-সেখানে মলিনের লাগে ছোঁওয়া,
দীপ নিভে যায়, তীব্রগন্ধ ধোঁওয়া
রোধ করে নিশ্বাস,
কঠোর ভাগ্য হানে নিষ্ঠুর ভাষ।

ওরে দরিদ্র, চেয়ে দেখ্ তোর ভাঙা ভিত্তির ধারে,
অসীম আকাশ, কে তারে রোধিতে পারে।
সেথা নাই বন্ধন,
প্রভাত-আলোকে প্রতিদিন আসে তব অভিনন্দন।
সন্ধ্যার তারা তোমারি মুখেতে চাহে,
তোমারি মুক্তি গাহে।
তব সত্তার মহিমা ঘোষিছে সব সত্তার মাঝে,
হে মানব, তুমি কোথায় লুকাও লাজে।
যেখানে ক্ষুদ্র সেখানে পীড়িত তুমি,
কর্কশ হাসি হাসিছে যেথায় দৈন্যের মরুভূমি

তাহার বাহিরে তোমার উদার স্থান,
বিশ্ব তোমারে বক্ষ মেলিয়া করিতেছে আহ্বান।

১৮ আশ্বিন
শুক্ল পঞ্চমী ১৩৩৯

আশীর্বাদ

শ্রীমান দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিবসে

প্রথম পঞ্চাশ বর্ষ রচি দিক প্রথম সোপান,
দ্বিতীয় পঞ্চাশ তাহে গৌরবে করুক অভ্যুত্থান।

২ পৌষ
১৩৩৯

তোমার মুখর দিন হে দিনেন্দ্র, লইয়াছে তুলি
আপনার দিগ্ দিগন্তে রবির সংগীতরশ্মিগুলি
প্রহর করিয়া পূর্ণ। মেঘে মেঘে তারি লিপি লিখে
বিরহমিলনবাণী পাঠাইলে বহু দূর দিকে
উদার তোমার দান। রবিকর করি মর্মগত
বনস্পতি আপনার পত্রপুষ্পে করে পরিণত,
তাহারি নৈবেদ্য দিয়ে বসন্তের রচে আরাধনা
নিত্যোৎসব-সমারোহে। সেইমতো তোমার সাধনা।
রবির সম্পদ হ'ত নিরর্থক, তুমি যদি তারে
না লইতে আপনার করি, যদি না দিতে সবারে।
সুরে সুরে রূপ নিল তোমা-'পরে স্নেহ সুগভীর
রবির সংগীতগুলি আশীর্বাদ রহিল রবির।

২ পৌষ
১৩৩৯

উত্তিষ্ঠত নিবোধত

কল্যাণীয়া শ্রীমতী রমা দেবী

আজি তব জন্মদিনে এই কথা করাব স্মরণ—
জয় করে নিতে হয় আপনার জীবন মরণ
আপন অক্লান্ত বলে দিনে দিনে ; যা পেয়েছ দান
তার মূল্য দিতে হবে, দিতে হবে তাহারে সম্মান
নিত্য তব নির্মল নিষ্ঠায়। নহে ভোগ, নহে খেলা
এ জীবন, নহে ইহা কালস্রোতে ভাসাইতে ভেলা
খেয়ালের পাল তুলে। আপনারে দীপ করি জ্বালো,
দুর্গম সংসারপথে অন্ধকারে দিতে হবে আলো,
সত্যলক্ষ্যে যেতে হবে অসত্যের বিঘ্ন করি দূর,
জীবনের বীণাতন্ত্রে বেসুরে আনিতে হবে সুর—
দুঃখেরে স্বীকার করি ; অনিত্যের যত আবর্জনা
পূজার প্রাঙ্গণ হতে নিরালস্যে করিবে মার্জনা
প্রতিক্ষণে সাবধানে, এই মন্ত্র বাজুক নিয়ত
চিন্তায় বচনে কর্মে তব— উত্তিষ্ঠত নিবোধত।

১৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪০
গ্লেন্ এডেন, দার্জিলিঙ

প্রার্থনা

কামনায় কামনায় দেশে দেশে যুগে যুগান্তরে
নিরন্তর নিদারুণ দ্বন্দ্ব যবে দেখি ঘরে ঘরে
প্রহরে প্রহরে ; দেখি অন্ধ মোহ দুরন্ত প্রয়াসে
বুভুক্ষার বহ্নি দিয়ে ভস্মীভূত করে অনায়াসে
নিঃসহায় দুর্ভাগার সকরুণ সকল প্রত্যাশা,
জীবনের সকল সম্বল ; দুঃখীর আশ্রয়বাসা

নিশ্চিন্তে ভাঙিয়া আনে দুর্দাম দুরাশাহোমানলে
আহুতি-ইন্ধন জোগাইতে; নিঃসংকোচ গর্বে বলে,
আত্মতৃপ্তি ধর্ম হতে বড়ো; দেখি আত্মম্ভরী প্রাণ
তুচ্ছ করিবারে পারে মানুষের গভীর সম্মান
গৌরবের মৃগতৃষ্ণিকায়; সিদ্ধির স্পর্ধার তরে
দীনের সর্বস্ব সার্থকতা দলি দেয় ধূলি-'পরে
জয়যাত্রাপথে;— দেখি' ধিক্কারে ভরিয়া উঠে মন,
আত্মজাতি-মাংসলুব্ধ মানুষের প্রাণনিকেতন
উন্মীলিছে নখে দন্তে হিংস্র বিভীষিকা;— চিত্ত মম
নিষ্কৃতিসন্ধানে ফিরে পিঞ্জরিত বিহঙ্গমসম,
মুহূর্তে মুহূর্তে বাজে শৃঙ্খলবন্ধন-অপমান
সংসারের। হেনকালে জ্বলি উঠে বজ্রাগ্নি-সমান
চিত্তে তাঁর দিব্যমূর্তি, সেই বীর রাজার কুমার
বাসনারে বলি দিয়া বিসর্জিয়া সর্ব আপনার
বর্তমানকাল হতে নিষ্ক্রমিলা নিত্যকাল-মাঝে
অনন্ত তপস্যা বহি মানুষের উদ্ধারের কাজে
অহমিকা-বন্দীশালা হতে।— ভগবান বুদ্ধ তুমি,
নির্দয় এ লোকালয়, এ ক্ষেত্রই তব জন্মভূমি।
ভরসা হারাল যারা, যাহাদের ভেঙেছে বিশ্বাস,
তোমারি করুণাবিত্তে ভরুক তাদের সর্বনাশ,—
আপনারে ভুলে তারা ভুলুক দুর্গতি।— আর যারা
ক্ষীণের নির্ভর ধ্বংস করে, রচে দুর্ভাগ্যের কারা
দুর্বলের মুক্তি রুধি', বোসো তাহাদেরি দুর্গদ্বারে
তপের আসন পাতি'; প্রমাদবিহ্বল অহংকারে
পড়ুক সত্যের দৃষ্টি; তাদের নিঃসীম অসম্মান
তব পুণ্য আলোকেতে লভুক নিঃশেষ অবসান।

২৯ জুলাই ১৯৩৩

অতুলপ্রসাদ সেন

বন্ধু, তুমি বন্ধুতার অজস্র অমৃতে
পূর্ণপাত্র এনেছিলে মর্ত্য ধরণীতে।
ছিল তব অবিরত
হৃদয়ের সদাব্রত,
বঞ্চিত কর নি কভু কারে
তোমার উদার মুক্ত দ্বারে।

মৈত্রী তব সমুচ্ছল ছিল গানে গানে
অমরাবতীর সেই সুধাঝরা দানে।
সুরে-ভরা সঙ্গ তব
বারে বারে নব নব
মাধুরীর আতিথ্য বিলাল,
রসতৈলে জ্বেলেছিল আলো।

দিন পরে গেছে দিন, মাস পরে মাস;
তোমা হতে দূরে ছিল আমার আবাস।
'হবে হবে, দেখা হবে'—
এ-কথা নীরব রবে
ধ্বনিত হয়েছে ক্ষণে ক্ষণে
অকথিত তব আমন্ত্রণে।

আমারো যাবার কাল এল শেষে আজি,
'হবে হবে, দেখা হবে' মনে ওঠে বাজি।
সেখানেও হাসিমুখে
বাহু মেলি লবে বুকে
নবজ্যোতির্দীপ্ত অনুরাগে,
সেই ছবি মনে-মনে জাগে।

এখানে গোপন চোর ধরার ধুলায়
করে সে বিষম চুরি যখন ভুলায়।
যদি ব্যথাহীন কাল
বিনাশের ফেলে জাল,
বিরহের স্মৃতি লয় হরি,
সব-চেয়ে সে-ক্ষতিরে ডরি।

তাই বলি, দীর্ঘ আয়ু দীর্ঘ অভিশাপ,
বিচ্ছেদের তাপ নাশে সেই বড়ো তাপ।
অনেক হারাতে হয়,
তারেও করিনে ভয়;
যতদিন ব্যথা রহে বাকি,
তার বেশি যেন নাহি থাকি।

১৯ ভাদ্র ১৩৪১
শান্তিনিকেতন

নাটক ও প্রহসন

বসন্ত

উৎসর্গ

শ্রীমান কবি নজ্‌রুল ইস্‌লাম
স্নেহভাজনেষু

১০ ফাল্গুন
১৩২৯

বসন্ত

রাজা। কবি!

কবি। কী মহারাজ।

রাজা। আমি মন্ত্রণাসভা থেকে পালিয়ে এসেছি।

কবি। সৎকার্য করেছেন। কিন্তু মহারাজের এমন সুমতি হল কেন।

রাজা। বৎসর শেষ হয়ে এল, রাজকোষ শূন্যপ্রায়। মন্ত্রণাসভায় বসলেই সচিবরা আসেন তাঁদের নিজ বিভাগের জন্যে টাকা দাবি করতে। কাজেই পলায়ন ছাড়া গতি নেই।

কবি। এতে উপকার হবে।

রাজা। কার উপকার হবে।

কবি। রাজ্যের।

রাজা। সে-কি কথা।

কবি। রাজা মাঝে-মাঝে সরে দাঁড়ালে প্রজারা রাজত্ব করবার অবকাশ পায়।

রাজা। তার অর্থ কী হল।

কবি। রাজার অর্থ যখন শূন্যে এসে ঠেকে প্রজা তখন নিজের অর্থ খুঁজে বের করে, তাতেই তার রক্ষা।

রাজা। কবি, তোমার কথাগুলো বাঁকা ঠেকছে। মন্ত্রণাসভা ছেড়ে এসেছি, আবার তোমার সঙ্গও ছাড়তে হবে নাকি।

কবি। না, তার দরকার হবে না। আপনি যখন পলাতক তখন তো আমাদেরই দলে এসে পড়েছেন।

রাজা। তোমার দলে?

কবি। হাঁ মহারাজ, আমি জন্মপলাতক।

গান

আমরা বাস্তুছাড়ার দল,
ভবের পদ্মপত্রে জল।
আমরা করছি টলমল।
মোদের আসাযাওয়া শূন্য হাওয়া
নাইকো ফলাফল।

রাজা। তুমি আমাকে দলে টানতে চাও? অতদূর এগোতে পারব না। আমাকে মন্ত্রীরা মিলে সভাছাড়া করেছে, তাই বলে কি কবির দলে ভিড়ে শেষে—

কবি। শুধু আমাকে দেখে ভয় পাবেন না, এ দলে আপনি রাজসঙ্গীও পাবেন।

রাজা। রাজসঙ্গী? কে বলো তো।

কবি। ঋতুরাজ।

রাজা। ঋতুরাজ? বসন্ত?

কবি। হাঁ মহারাজ। তিনি চিরপলাতক। আমারই মতো। পৃথ্বী তাঁকে সিংহাসনে বসিয়ে পৃথ্বীপতি করতে চেয়েছিল কিন্তু তিনি—

রাজা। বুঝেছি, বোধ করি রাজকোষের অবস্থা দেখে পালাতে ইচ্ছে করছেন।

কবি। পৃথিবীর রাজকোষ পূর্ণ করে দিয়ে তিনি পালান।

রাজা। কী দুঃখে।

কবি। দুঃখে নয়, আনন্দে।

রাজা। কবি, তোমার হেঁয়ালি রাখো; আমার অধ্যাপকের দল তোমার হেঁয়ালি শুনে রাগ করে, বলে ওগুলোর কোনো অর্থ নেই। আজ বসন্ত-উৎসবে কী পালা তৈরি করেছ সেইটে বলো।

কবি। আজ সেই পলাতকার পালা।

রাজা। বেশ বেশ। বুঝতে পারব তো?

কবি। বোঝাবার চেষ্টা করি নি।

রাজা। তাতে ক্ষতি নেই। কিন্তু না-বোঝাবার চেষ্টা কর নি তো?

কবি। না মহারাজ, এতে মূলেই অর্থ নেই, বোঝা না-বোঝার কোনো বালাই নেই, কেবল এতে সুর আছে।

রাজা। আচ্ছা বেশ, শুরু হ'ক। কিন্তু ওদিকে মন্ত্রণাসভার কাজ চলছে, আওয়াজ শুনে মন্ত্রীরা তো—

কবি। হাঁ মহারাজ, তাঁরাসুদ্ধ হয়তো পলাতকার দলে যোগ দিতে পারেন। তাতে দোষ কী হয়েছে। ফাল্গুন-যে পড়েছে।

রাজা। সর্বনাশ! এখানে এসে যদি আবার—

কবি। ভয় নেই। শূন্যকোষের কথাটা স্মরণ করিয়ে দেবার ভারই মন্ত্রীদের বটে, কিন্তু শূন্যকোষের কথা ভুলিয়ে দেবার ভারই তো কবির উপরে।

রাজা। তাহলে ভালো কথা। তাহলে আর দেরি নয়। ভোলবার অত্যন্ত দরকার হয়েছে। দলবল সব প্রস্তুত তো? আমাদের নাট্যাচার্য দিনপতি—

কবি। ওই তো তিনি ভারতীর কমলবনের মধুগন্ধে বিহ্বল হয়ে বসে আছেন।

রাজা। দেখে মনে হচ্ছে বটে শূন্য রাজকোষের কথায় ওঁর কিছুমাত্র খেয়াল নেই।

কবি। উনি আমাদের উৎসবের বন্ধু, দুর্ভিক্ষের দিনে ওঁকে না হলে চলে না। কারণ উনি ক্ষুধার কথা সুধা দিয়ে ভোলান।

রাজা। সাধু! আমার মন্ত্রীদের সঙ্গে ওঁর পরিচয় করিয়ে দিতে হবে। বিশেষত আমার অর্থসচিবের সঙ্গে। তিনি অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে আছেন। তাঁর মনে যদি পুলক সঞ্চার করতে পারেন তাহলে—

কবি। ফস করে বেশি আশা দিয়ে ফেলবেন না— রাজকোষের অবস্থা যে রকম—

রাজা। হাঁ হাঁ, বটে বটে।—আচ্ছা, তবে তোমার পালা আরম্ভ হবে কী দিয়ে।

কবি। ঋতুরাজ আসবেন, প্রস্তুত হবার জন্যে আকাশে একটা ডাক পড়েছে।

রাজা। বলছে কী।

কবি। বলছে, সব দিয়ে ফেলতে হবে।

রাজা। নিজেকে একেবারে শূন্য ক'রে? সর্বনাশ!

কবি। না, নিজেকে পূর্ণ ক'রে। নইলে দেওয়া তো ফাঁকি দেওয়া।

রাজা। মানে কী হ'ল।

কবি। যে-দেওয়া সত্যি, সে দেওয়াতে ভরতি করে। বসন্ত-উৎসবে দানের দ্বারাই ধরণী ধনী হয়ে উঠবে।

রাজা। তাহলে ধরণীর সঙ্গে ধরণীপতির ওইখানে অমিল দেখতে পাচ্ছি। আমি তো দান করতে গিয়ে প্রায়ই বিপদে পড়ি— অর্থসচিবের মুখ অত্যন্ত গম্ভীর হতে থাকে।

কবি। যে-দান সত্য তার দ্বারা বাইরের ধন বিনাশ পায়, অন্তরের ধন বিকাশ পেতে থাকে।

রাজা। ও আবার কী। এটা উপদেশের মতো শোনাচ্ছে, কবি।

কবি। তাহলে আর দেরি নয়, গান শুরু হ'ক।

বসন্তের পরিচরগণ

সব দিবি কে, সব দিবি পায়,
আয় আয় আয়।
ডাক পড়েছে ওই শোনা যায়,
আয় আয় আয়।
আসবে-যে সে স্বর্ণরথে,
জাগবি কারা রিক্ত পথে
পৌষরজনী তাহার আশায়।
আয় আয় আয়।
ক্ষণেক কেবল তাহার খেলা,
হায় হায় হায়।
তার পরে তার যাবার বেলা,
হায় হায় হায়।
চলে গেলে জাগবি যবে
ধনরতন বোঝা হবে,
বহন করা হবে-যে দায়।
হায় হায় হায়।

রাজা। দাবি তো কম নয়।

কবি। দাবি বড়ো হলেই দান সহজ হয়; ছোটো হলেই কৃপণতা জাগায়

রাজা। তা এরা সব রাজী আছে?

কবি। ওদের মুখেই শুনে নিন।

বনভূমি

বাকি আমি রাখব না কিছুই।
তোমার চলার পথে পথে
ছেয়ে দেব ভুঁই।

ওগো মোহন, তোমার উত্তরীয়
গন্ধে আমার ভরে নিয়ো,
উজাড় করে দেব পায়ে
বকুল বেলা জুঁই।
দখিনসাগর পার হয়ে-যে
এলে পথিক তুমি।
আমার সকল দেব অতিথিরে
আমি বনভূমি।
আমার কুলায়ভরা রয়েছে গান,
সব তোমারেই করেছি দান,
দেবার কাঙাল করে আমায়
চরণ যখন ছুঁই।

আম্রকুঞ্জ

ফল ফলাবার আশা আমি মনেই রাখি নি রে।
আজ আমি তাই মুকুল ঝরাই দক্ষিণসমীরে।
বসন্তগান পাখিরা গায়,
বাতাসে তার সুর ঝরে যায়,
মুকুল ঝরার ব্যাকুল খেলা
আমারি সেই রাগিণী রে।
জানি নে ভাই, ভাবি নে তাই কী হবে মোর দশা
যখন আমার সারা হবে সকল ঝরা খসা।
এই কথা মোর শূন্য ডালে
বাজবে সেদিন তালে তালে,
'চরম দেওয়ায় সব দিয়েছি
মধুর মধুযামিনীরে।'

রাজা। ভাবখানা বুঝেছি কবি।

কবি। কী বুঝলেন।

রাজা। 'ফল ফলাব' বলে কোমর বেঁধে বসলে ফল ফলে না। মনের আনন্দে

'ফল চাই নে' বলতে পারলে, ফল আপনি ফলে ওঠে। আম্রকুঞ্জ মুকুল ঝরাতে ভরসা পায় বলেই তার ফল ধরে।

কবি। মহারাজ, এটা যেন উপদেশের মতো শোনাচ্ছে।

রাজা। ঠিক কথা। তাহলে গান ধরো।

করবী

যদি তারে নাই চিনি গো
সে কি আমায় নেবে চিনে
এই নব ফাল্গুনের দিনে।
(জানি নে জানি নে)
সে কি আমার কুঁড়ির কানে
ক'বে কথা গানে গানে,
পরান তাহার নেবে কিনে
এই নব ফাল্গুনের দিনে?
(জানি নে জানি নে)
সে কি আপন রঙে ফুল রাঙাবে।
সে কি মর্মে এসে ঘুম ভাঙাবে।
ঘোমটা আমার নতুন পাতার
হঠাৎ দোলা পাবে কি তার।
গোপন কথা নেবে জিনে
এই নব ফাল্গুনের দিনে?
(জানি নে জানি নে)

রাজা। ওদিকে ও কিসের গোলমাল শুনতে পাই।

কবি। দখিনহাওয়া-যে এল।

রাজা। তা হয়েছে কী।

কবি। বাইরের বেণুবন উতলা হয়ে উঠেছে, কিন্তু ঘরের কোণের দীপশিখাটি নববধূর মতো শঙ্কিত।

বেণুবন

দখিনহাওয়া, জাগো জাগো
জাগাও আমার সুপ্ত এ প্রাণ।
আমি বেণু, আমার শাখায়
নীরব-যে হায় কত-না গান।
(জাগো জাগো)

দীপশিখা

ধীরে ধীরে ধীরে বও
ওগো উতল হাওয়া।
নিশীথরাতের বাঁশি বাজে,
শান্ত হও গো, শান্ত হও

বেণুবন

পথের ধারে আমার কারা
ওগো পথিক বাঁধনহারা,
নৃত্য তোমার চিত্তে আমার
মুক্তিদোলা করে যে দান।

দীপশিখা

আমি প্রদীপশিখা তোমার লাগি
ভয়ে ভয়ে একা জাগি,
মনের কথা কানে-কানে
মৃদু মৃদু কও।

বেণুবন

গানের পাখা যখন খুলি
বাধাবেদন তখন ভুলি।

দীপশিখা

তোমার দূরের গাথা বনের বাণী
ঘরের কোণে দেয়-যে আনি।

বেণুবন

যখন আমার বুকের মাঝে
তোমার পথের বাঁশি বাজে,
বন্ধভাঙার ছন্দে আমার
মৌন কাঁদন হয় অবসান।
দখিনহাওয়া, জাগো জাগো,
জাগাও আমার সুপ্ত এ প্রাণ

দীপশিখা

আমার কিছু কথা আছে
ভোরের বেলার তারার কাছে,
সেই কথাটি তোমার কানে
চুপি চুপি লও।
ধীরে ধীরে বও
ওগো উতল হাওয়া।

ঋতুরাজের পরিচরবর্গ

সহসা ডালপালা তোর উতলা-যে!
(ও চাঁপা, ও করবী)
কারে তুই দেখতে পেলি
আকাশ-মাঝে
জানি না যে।
কোন্ সুরের মাতন হাওয়ায় এসে
বেড়ায় ভেসে,
(ও চাঁপা, ও করবী)

কার নাচনের নূপুর বাজে
জানি না যে।
তোরে ক্ষণে ক্ষণে চমক লাগে।
কোন্ অজানার ধেয়ান যে তোর
মনে জাগে।
কোন্ রঙের মাতন উঠল দুলে
ফুলে ফুলে,
(ও চাঁপা, ও করবী)
কে সাজালে রঙিন সাজে
জানি না যে।

কবি। ঋতুরাজের দূতেরা ভাবছে কেউ খবর পায় নি— পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে না। কিন্তু পায়ের শব্দ যে হৃৎকম্পনের মধ্যে ধরা পড়ে।

মাধবী

সে কি ভাবে গোপন রবে
লুকিয়ে হৃদয় কাড়া।
তাহার আসা হাওয়ায় ঢাকা,
সে যে সৃষ্টিছাড়া।
হিয়ায় হিয়ায় জাগল বাণী,
পাতায় পাতায় কানাকানি,
'ওই এল যে', 'ওই এল যে'
পরান দিল সাড়া।
এই তো আমার আপনারি এই
ফুল ফোটানোর মাঝে
তারে দেখি নয়ন ভ'রে
নানা রঙের সাজে।
এই-যে পাখির গানে গানে
চরণধ্বনি বয়ে আনে,
বিশ্ববীণার তারে তারে
এই তো দিল নাড়া।

রাজা। কবি, ওই তো পূর্ণচন্দ্র উঠেছে দেখছি।

কবি। দখিনহাওয়ায় যেন কোন্ দেবতার স্বপ্ন ভেসে এল।

রাজা। শুধু দখিনহাওয়ায় ওকে ভাসালে চলবে না কবি, তোমার গানের সুরও চাই। জগতে কেবল যে দেবতাই আছেন তা তো নয়।

শালবীথিকা

ভাঙল হাসির বাঁধ।
অধীর হয়ে মাতল কেন
পূর্ণিমার ওই চাঁদ।
উতল হাওয়া ক্ষণে ক্ষণে
মুকুলছাওয়া বকুলবনে
দোল দিয়ে যায়, পাতায় পাতায়
ঘটায় পরমাদ।
ঘুমের আঁচল আকুল হল
কী উল্লাসের ভরে।
স্বপন যত ছড়িয়ে প'ল
দিকে দিগন্তরে।
আজ রাতের এই পাগলামিরে
বাঁধবে ব'লে কে ওই ফিরে,
শালবীথিকায় ছায়া গেঁথে
তাই পেতেছে ফাঁদ।

বকুল

ও আমার চাঁদের আলো,
আজ ফাগুনের সন্ধ্যাকালে
ধরা দিয়েছ যে আমার
পাতায় পাতায় ডালে ডালে।
যে-গান তোমার সুরের ধারায়
বন্যা জাগায় তারায় তারায়,

মোর আঙিনায় বাজল সে-সুর
আমার প্রাণের তালে তালে।
সব কুঁড়ি মোর ফুটে ওঠে
তোমার হাসির ইশারাতে।
দখিনহাওয়া দিশাহারা
আমার ফুলের গন্ধে মাতে।
শুভ্র, তুমি করলে বিলোল
আমার প্রাণে রঙের হিল্লোল,
মর্মরিত মর্ম আমার
জড়ায় তোমার হাসির জালে।

রাজা। সব তো বুঝলুম। আকাশ থেকে চাঁদ দেখছি পৃথিবীর হৃদয়কে দোলা লাগিয়েছে। কিন্তু ওঁকে পৃথিবীতে নামিয়ে এনে কষে দোলা না দিতে পারলে তো জবাব দেওয়া হয় না। তার কী করলে।

কবি। তার তো ব্যবস্থা হয়েছে মহারাজ। আমাদের নদীর ঢেউ আছে তো, সেদিকে চেয়ে দেখো না। চাঁদ টলোমলো।

নদী

কে দেবে চাঁদ তোমায় দোলা।
আপন আলোর স্বপন-মাঝে বিভোল ভোলা।
কেবল তোমার চোখের চাওয়ায়
দোলা দিলে হাওয়ায় হাওয়ায়,
বনে বনে দোল জাগাল
ওই চাহনি তুফানতোলা।
আজ মানসের সরোবরে
কোন্ মাধুরীর কমলকানন
দোলাও তুমি ঢেউয়ের 'পরে।
তোমার হাসির আভাস লেগে
বিশ্বদোলন দোলার বেগে
উঠল জেগে আমার গানের
কল্লোলিনী কলরোলা।

রাজা। এবার ওই কে আসে।

কবি। বলব না। চিনতে পারেন কিনা দেখতে চাই

দখিনহাওয়া

শুকনো পাতা কে যে ছড়ায় ওই দূরে
উদাসকরা কোন্ সুরে।
ঘরছাড়া ওই কে বৈরাগী
জানি না যে কাহার লাগি
ক্ষণে ক্ষণে শূন্য বনে যায় ঘুরে।
চিনি চিনি হেন ওরে হয় মনে,
ফিরে ফিরে যেন দেখা ওর সনে।
ছদ্মবেশে কেন খেল,
জীর্ণ এ বাস ফেলো ফেলো,
প্রকাশ করো চিরনূতন বন্ধুরে।

রাজা। ওহে কবি, তোমার এ পালাটা কী রকম করে তুলেছ। বরযাত্রীরই ভিড়, বর কোথায়। তোমার ঋতুরাজ কই।

কবি। ওই যে, এই খানিক আগে দেখলেন।

রাজা। ওই জীর্ণ বসন প'রে শুকনো পাতা ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে? ওতে তো নবীনের রূপ দেখলুম না। ও তো মূর্তিমান পুরাতন।

কবি। তবে তো চিনতে পারেন নি, ঠকেছেন। আমাদের ঋতুরাজের যে গায়ের কাপড়খানা আছে, তার এক পিঠে নূতন, এক পিঠে পুরাতন। যখন উলটে পরেন তখন দেখি শুকনো পাতা, ঝরা ফুল; আবার যখন পালটে নেন তখন সকালবেলার মল্লিকা, সন্ধ্যাবেলার মালতী,— তখন ফাল্গুনের আম্রমঞ্জরি, চৈত্রের কনকচাঁপা। উনি একই মানুষ নূতনপুরাতনের মধ্যে লুকোচুরি করে বেড়াচ্ছেন।

রাজা। তাহলে নবীন মূর্তিটা একবার দেখিয়ে দাও। আর দেরি কেন।

কবি। ওই-যে এসেছেন। পথিকবেশে, নূতনপুরাতনের মাঝখানকার নিত্যযাতায়াতের পথে।

রাজা। তোমার পলাতকা বুঝি পথে-পথেই থাকেন?

কবি। হাঁ, উনি বাস্তুছাড়ার দলপতি, আমি ওঁরই গানের তলপি বয়ে বেড়াই।

গান

গানগুলি মোর শৈবালেরি দল—
ওরা বন্যাধারায় পথ যে হারায়
উদ্দাম চঞ্চল।
ওরা কেনই আসে যায় বা চ'লে,
অকারণের হাওয়ায় দোলে,
চিহ্ন কিছুই যায় না রেখে,
পায় না কোনো ফল।
ওদের সাধন তো নাই—
কিছু সাধন তো নাই;
ওদের বাঁধন তো নাই—
কোনো বাঁধন তো নাই।
উদাস ওরা উদাস করে
গৃহহারা পথের স্বরে,
ভুলে-যাওয়ার স্রোতের 'পরে
করে টলমল।

রাজা। আর দেরি নয়, কবি। ওই দেখো, মন্ত্রণাসভা থেকে অর্থসচিব এসেছে। রাজকোষের কথা পাড়বার পূর্বেই ঋতুরাজের আসর জমাও।

মাধবী মালতী ইত্যাদি

তোমার বাস কোথা-যে পথিক ওগো,
দেশে কি বিদেশে।
তুমি হৃদয়-পূর্ণ-করা, ওগো
তুমিই সর্বনেশে।

ঋতুরাজ

আমার বাস কোথা-যে জান নাকি,
শুধাতে হয় সে কথা কি,
ও মাধবী, ও মালতী।

মাধবী মালতী ইত্যাদি

হয়তো জানি, হয়তো জানি, হয়তো জানি নে,
মোদের বলে দেবে কে সে।
মনে করি আমার তুমি,
বুঝি নও আমার।
বলো বলো বলো পথিক,
বলো তুমি কার।

ঋতুরাজ

আমি তারি যে আমারে
যেমনি দেখে চিনতে পারে
ও মাধবী, ও মালতী।

মাধবী মালতী ইত্যাদি

হয়তো চিনি, হয়তো চিনি, হয়তো চিনি নে,
মোদের বলে দেবে কে সে।

বনপথ

আজ দখিনবাতাসে
নাম-না-জানা কোন্ বনফুল
ফুটল বনের ঘাসে।

ঋতুরাজ

ও মোর পথের সাথী, পথে পথে
গোপনে যায় আসে।

বনপথ

কৃষ্ণচূড়া চূড়ায় সাজে,
বকুল তোমার মালার মাঝে,

শিরীষ তোমার ভরবে সাজি—
ফুটেছে সেই আশে।

ঋতুরাজ

এ মোর পথের বাঁশির সুরে সুরে
লুকিয়ে কাঁদে হাসে।

বনপথ

ওরে দেখ বা নাই দেখ, ওরে
যাও বা না-যাও ভুলে।
ওরে নাই-বা দিলে দোলা, ওরে
নাই-বা নিলে তুলে।
সভায় তোমার ও কেহ নয়,
ওর সাথে নেই ঘরের প্রণয়,
যাওয়া-আসার আভাস নিয়ে
রয়েছে একপাশে।

ঋতুরাজ

ওগো ওর সাথে মোর প্রাণের কথা
নিশ্বাসে নিশ্বাসে।

রাজা। খুব জমেছে, কবি। সুরের দোলায় চাঁদকে দুলিয়েছ। ওই দেখো-না, আমার অর্থসচিবসুদ্ধ দুলছে।

কবি। এবার সময় হয়েছে।

রাজা। কিসের সময়।

কবি। ঋতুরাজের যাবার সময়।

রাজা। আমাদের অর্থসচিবকে চোখে পড়েছে নাকি।

কবি। বলেইছি তো, পূর্ণ থেকে রিক্ত, রিক্ত থেকে পূর্ণ, এরই মধ্যে ওঁর আনাগোনা। বাঁধন পরা, বাঁধন খোলা, এও যেমন এক খেলা, ওও তেমনি এক খেলা।

রাজা। আমি কিন্তু ওই পূর্ণ হওয়ার খেলাটাই পছন্দ করি।

কবি। যথার্থ পূর্ণ হয়ে উঠলে রিক্ত হওয়ার খেলায় ভয় থাকে না।
রাজা। বোধ হচ্ছে যেন এখনি উপদেশ দিতে শুরু করবে।
কবি। আচ্ছা তাহলে আবার গান শুরু হ'ক।

ঋতুরাজ

এখন আমার সময় হল,
যাবার দুয়ার খোলো খোলো।
হল দেখা, হল মেলা,
আলোছায়ায় হল খেলা,
স্বপন-যে সে ভোলো ভোলো।
আকাশ ভরে দূরের গানে,
অলখ দেশে হৃদয় টানে।
ওগো সুদূর, ওগো মধুর,
পথ বলে দাও পরানবঁধুর,
সব আবরণ তোলো তোলো।

মাধবী

বিদায় যখন চাইবে তুমি দক্ষিণসমীরে,
তোমায় ডাকব না তো ফিরে।
করব তোমায় কী সম্ভাষণ।
কোথায় তোমার পাতব আসন
পাতাঝরা কুসুমঝরা নিকুঞ্জকুটিরে।
তুমি আপ্‌নি যখন আস তখন
আপ্‌নি কর ঠাঁই,
আপ্‌নি কুসুম ফোটাও, মোরা
তাই দিয়ে সাজাই।
তুমি যখন যাও, চলে যাও,
সব আয়োজন হয়-যে উধাও,
গান ঘুচে যায়, রং মুছে যায়,
তাকাই অশ্রুনীরে।

ঋতুরাজ

এবেলা ডাক পড়েছে কোন্‌খানে
ফাগুনের ক্লান্ত ক্ষণের শেষ গানে।
সেখানে স্তব্ধ বীণার তারে তারে,
সুরের খেলা ডুবসাঁতারে,
সেখানে চোখ মেলে যার পাই নে দেখা
তাহারে মন জানে গো, মন জানে।
এবেলা মন যেতে চায় কোন্‌খানে
নিরালায় লুপ্ত পথের সন্ধানে।
সেখানে মিলনদিনের ভোলা হাসি
লুকিয়ে বাজায় করুণ বাঁশি,
সেখানে যে-কথাটি হয় না বলা
সে কথা রয় কানে গো, রয় কানে।

ঝুমকোলতা

না, যেয়ো না, যেয়ো নাকো।
মিলনপিয়াসী মোরা,
কথা রাখো, কথা রাখো।
আজো বকুল আপনহারা, হায় রে,
ফুল ফোটানো হয় নি সারা,
সাজি ভরে নি,
পথিক ওগো, থাকো থাকো।
চাঁদের চোখে জাগে নেশা,
তার আলো— গানে গন্ধে মেশা।
দেখো চেয়ে কোন্‌ বেদনায় হায় রে,
মল্লিকা ওই যায় চলে যায়
অভিমানিনী।
পথিক, তারে ডাকো ডাকো।

আকন্দ

এবার বিদায়বেলার সুর ধরো ধরো,
(ও চাঁপা, ও করবী)
তোমার শেষ ফুলে আজ সাজি ভরো।
যাবার পথে আকাশতলে
মেঘ রাঙা হল চোখের জলে,
ঝরে পাতা ঝর ঝর।
হেরো হেরো ওই রুদ্র রবি
স্বপ্ন ভাঙায় রক্তছবি।
খেয়াতরীর রাঙা পালে
আজ লাগল হাওয়া ঝড়ের তালে,
বেণুবনের ব্যাকুল শাখা থর থর।

ধুতুরা

আজ খেলাভাঙার খেলা খেলবি আয়।
সুখের বাসা ভেঙে ফেলবি আয়।
মিলনমালার আজ বাঁধন তো টুটবে,
ফাগুনদিনের আজ স্বপন তো ছুটবে,
উধাও মনের পাখা মেলবি আয়।
অস্তগিরির ওই শিখরচূড়ে
ঝড়ের মেঘের আজ ধ্বজা উড়ে।
কালবৈশাখীর হবে-যে নাচন,
সাথে নাচুক তোর মরণবাঁচন,
হাসিকাঁদন পায়ে ঠেলবি আয়।

জবা

ভয় করব না রে
বিদায়বেদনারে।

আপন সুধা দিয়ে
ভরে দেব তারে।
চোখের জলে সে-যে নবীন র'বে,
ধ্যানের মণিমালায় গাঁথা হবে,
পরব বুকের হারে।
নয়ন হতে তুমি আসবে প্রাণে,
মিলবে তোমার বাণী আমার গানে।
বিরহব্যথায় বিধুর দিনে
দুখের আলোয় তোমায় নেব চিনে,
এ মোর সাধনা রে।

সকলে

ওরে পথিক, ওরে প্রেমিক,
বিচ্ছেদে তোর খণ্ডমিলন পূর্ণ হবে।
আয় রে সবে
প্রলয়গানের মহোৎসবে।
তাণ্ডবে ওই তপ্ত হাওয়ায় ঘূর্ণি লাগায়,
মত্ত ঈশান বাজায় বিষাণ শঙ্কা জাগায়,
ঝংকারিয়া উঠল আকাশ ঝঞ্ঝারবে।
আয় রে সবে
প্রলয়গানের মহোৎসবে।

রাজা। আমার মন্ত্রণাসভার দশা করলে কী। সব মন্ত্রী-যে এখানে এসে জুটেছে। ওই দেখো, আমার অর্থসচিবসুদ্ধ-যে নাচতে শুরু করে দিলে। বড়ো লঘু হয়ে পড়ছেন না?

কবি। ওঁর-যে থলি শূন্য হয়ে গেছে, তাই নাচে টেনেছে। বোঝা ভারি থাকলে গৌরবে নড়তে পারতেন না। আজ আমাদের অগৌরবের উৎসব।

রাজা। রাজগৌরব?

কবি। সেও টিঁকল না। তাই তো ঋতুরাজ আজ রাজবেশ খসিয়ে দিয়ে বৈরাগী হয়ে বেরিয়ে চলেছেন। এবার ধরণীতে তপস্যার দিন এসেছে, অর্থসচিবদের হাতে কাজ থাকবে না।

ভাঙনধরার ছিন্ন-করার রুদ্র নাটে
যখন সকল ছন্দ বিকল, বন্ধ কাটে,
মুক্তিপাগল বৈরাগীদের চিত্ততলে
প্রেমসাধনার হোমহুতাশন জ্বলবে তবে।
ওরে পথিক, ওরে প্রেমিক,
সব আশাজাল যায় রে যখন উড়ে পুড়ে
আশার অতীত দাঁড়ায় তখন ভুবন জুড়ে,
স্তব্ধ বাণী নীরব স্বরে কথা কবে।
আয় রে সবে
প্রলয়গানের মহোৎসবে।

রক্তকরবী

নাট্যপরিচয়

এই নাটকটি সত্যমূলক। এর ঘটনাটি কোথাও ঘটেছে কিনা ঐতিহাসিকের 'পরে তার প্রমাণসংগ্রহের ভার দিলে পাঠকদের বঞ্চিত হতে হবে। এইটুকু বললেই যথেষ্ট যে কবির জ্ঞানবিশ্বাস-মতে এটি সম্পূর্ণ সত্য।

ঘটনাস্থানটির প্রকৃত নামটি কী সে-সম্বন্ধে ভৌগোলিকদের মতভেদ থাকা সম্ভব। কিন্তু সকলেই জানেন এর ডাকনাম যক্ষপুরী। পণ্ডিতরা বলেন, পৌরাণিক যক্ষপুরীতে ধনদেবতা কুবেরের স্বর্ণসিংহাসন। কিন্তু এ-নাটকটি একেবারেই পৌরাণিক কালের নয়, একে রূপকও বলা যায় না। যে-জায়গাটার কথা হচ্ছে সেখানে মাটির নীচে যক্ষের ধন পোঁতা আছে। তাই সন্ধান পেয়ে পাতালে সুড়ঙ্গ-খোদাই চলছে, এইজন্যেই লোকে আদর ক'রে একে যক্ষপুরী নাম দিয়েছে। এই নাটকে এখানকার সুড়ঙ্গ-খোদাইকরদের সঙ্গে যথাকালে আমাদের পরিচয় হবে।

যক্ষপুরীর রাজার প্রকৃত নাম সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতের ঐক্য কেউ প্রত্যাশা করে না। এইটুকু জানি যে, এর একটি ডাকনাম আছে— মকররাজ। যথাসময়ে লোকমুখে এই নামকরণের কারণ বোঝা যাবে।

রাজমহলের বাহির-দেয়ালে একটি জালের জানলা আছে। সেই জালের আড়াল থেকে মকররাজ তাঁর ইচ্ছামতো পরিমাণে মানুষের সঙ্গে দেখাশোনা করে থাকেন। কেন তাঁর এমনতরো অদ্ভুত ব্যবহার তা নিয়ে নাটকের পাত্রগণ যেটুকু আলাপ আলোচনা করেছেন তার বেশি আমরা কিছু জানি নে।

এই রাজ্যের যাঁরা সর্দার তাঁরা যোগ্য লোক এবং যাকে বলে বহুদর্শী। রাজার তাঁরা অন্তরঙ্গ পার্ষদ। তাঁদের সতর্ক ব্যবস্থাগুণে খোদাইকরদের কাজের মধ্যে ফাঁক পড়তে পায় না এবং যক্ষপুরীর নিরন্তর উন্নতি হতে থাকে। এখানকার মোড়লরা একসময়ে খোদাইকর ছিল, নিজগুণে

তাদের পদবৃদ্ধি এবং উপাধিলাভ ঘটেছে। কর্মনিষ্ঠতায় তারা অনেক বিষয়ে সর্দারদের ছাড়িয়ে যায়। যক্ষপুরীর বিধিবিধানকে যদি কবির ভাষায় পূর্ণচন্দ্র বলা যায়, তবে তার কলঙ্কবিভাগের ভারটাই প্রধানত মোড়লদের 'পরে।

এছাড়া একজন গোঁসাইজি আছেন, তিনি নামগ্রহণ করেন ভগবানের কিন্তু অন্নগ্রহণ করেন সর্দারের। তাঁর দ্বারা যক্ষপুরীর অনেক উপকার ঘটে।

জেলেদের জালে দৈবাৎ মাঝে-মাঝে অখাদ্যজাতের জলচর জীব আটকা পড়ে। তাদের দ্বারা পেটভরা বা ট্যাঁকভরার কাজ তো হয়ই না, মাঝের থেকে তারা জাল ছিঁড়ে দিয়ে যায়। এই নাট্যের ঘটনাজালের মধ্যে নন্দিনী নামক একটি কন্যা তেমনিভাবে এসে পড়েছে। মকররাজ যে-বেড়ার আড়ালে থাকেন, সেইটেকে এই মেয়ে টিঁকতে দেয় না বুঝি।

নাটকের আরম্ভেই রাজার জালের জানলার বাহির-বারান্দায় এই কন্যাটির সঙ্গে দেখা হবে। জানলাটি যে কি-রকম তা সুস্পষ্ট করে বর্ণনা করা অসম্ভব। যারা তার কারিগর তারাই তার কলাকৌশল বোঝে।

নাট্যঘটনার যতটুকু আমরা দেখতে পাচ্ছি, তার সমস্তটাই এই রাজমহলের জালের জানলার বাহির-বারান্দায়। ভিতরে কী হচ্ছে, তার অতি অল্পই আমরা জানতে পাই।

রক্তকরবী

এই নাট্যব্যাপার যে-নগরকে আশ্রয় করিয়া আছে তাহার নাম যক্ষপুরী। এখানকার শ্রমিকদল মাটির তলা হইতে সোনা তুলিবার কাজে নিযুক্ত। এখানকার রাজা একটা অত্যন্ত জটিল আবরণের আড়ালে বাস করে। প্রাসাদের সেই জালের আবরণ এই নাটকের একটিমাত্র দৃশ্য। সেই আবরণের বহির্ভাগে সমস্ত ঘটনা

নন্দিনী ও কিশোর, সুড়ঙ্গ-খোদাইকর বালক

কিশোর। নন্দিনী, নন্দিনী, নন্দিনী!

নন্দিনী। আমাকে এত করে ডাকিস কেন, কিশোর। আমি কি শুনতে পাই নে।

কিশোর। শুনতে পাস জানি, কিন্তু আমার-যে ডাকতে ভালো লাগে। আর ফুল চাই তোমার? তাহলে আনতে যাই।

নন্দিনী। যা যা, এখনি কাজে ফিরে যা, দেরি করিস নে।

কিশোর। সমস্তদিন তো কেবল সোনার তাল খুঁড়ে আনি, তার মধ্যে একটু সময় চুরি করে তোর জন্যে ফুল খুঁজে আনতে পারলে বেঁচে যাই।

নন্দিনী। ওরে কিশোর, জানতে পারলে-যে ওরা শাস্তি দেবে।

কিশোর। তুমি-যে বলেছিলে, রক্তকরবী তোমার চাই-ই চাই। আমার আনন্দ এই যে, রক্তকরবী এখানে সহজে মেলে না। অনেক খুঁজেপেতে একজায়গায় জঞ্জালের পিছনে একটিমাত্র গাছ পেয়েছি।

নন্দিনী। আমাকে দেখিয়ে দে, আমি নিজে গিয়ে ফুল তুলে আনব।

কিশোর। অমন কথা বোলো না। নন্দিনী, নিষ্ঠুর হয়ো না। ওই গাছটি থাক্ আমার একটিমাত্র গোপন কথার মতো। বিশু তোমাকে গান শোনায়, সে তার নিজের গান। এখন থেকে তোমাকে আমি ফুল জোগাব, এ আমারই নিজের ফুল।

নন্দিনী। কিন্তু এখানকার জানোয়াররা তোকে শাস্তি দেয়, আমার-যে বুক ফেটে যায়।

কিশোর। সেই ব্যথায় আমার ফুল আরো বেশি করে আমারই হয়ে ফোটে। ওরা হয় আমার দুঃখের ধন।

নন্দিনী। কিন্তু তোদের এ দুঃখ আমি সইব কী করে।

কিশোর। কিসের দুঃখ। একদিন তোর জন্যে প্রাণ দেব নন্দিনী, এই কথা কতবার মনে-মনে ভাবি।

নন্দিনী। তুই তো আমাকে এত দিলি, তোকে আমি কী ফিরিয়ে দেব বল্‌ তো, কিশোর।

কিশোর। এই সত্যটি কর্‌ নন্দিনী, আমার হাত থেকেই রোজ সকালে ফুল নিবি।

নন্দিনী। আচ্ছা, তাই সই। কিন্তু তুই একটু সামলে চলিস।

কিশোর। না, আমি সামলে চলব না, চলব না। ওদের মারের মুখের উপর দিয়েই রোজ তোমাকে ফুল এনে দেব। [প্রস্থান

অধ্যাপকের প্রবেশ

অধ্যাপক। নন্দিনী! যেয়ো না, ফিরে চাও।

নন্দিনী। কী অধ্যাপক।

অধ্যাপক। ক্ষণে ক্ষণে অমন চমক লাগিয়ে দিয়ে চলে যাও কেন। যখন মনটাকে নাড়া দিয়েই যাও তখন না-হয় সাড়া দিয়েই বা গেলে। একটু দাঁড়াও, দুটো কথা বলি।

নন্দিনী। আমাকে তোমার কিসের দরকার।

অধ্যাপক। দরকারের কথা যদি বললে, ওই চেয়ে দেখো। আমাদের খোদাইকরের দল পৃথিবীর বুক চিরে দরকারের-বোঝা-মাথায় কীটের মতো সুড়ঙ্গর ভিতর থেকে উপরে উঠে আসছে। এই যক্ষপুরে আমাদের যা-কিছু ধন সব ওই ধুলোর নাড়ির ধন— সোনা। কিন্তু সুন্দরী, তুমি যে-সোনা সে তো ধুলোর নয়, সে-যে আলোর। দরকারের বাঁধনে তাকে কে বাঁধবে।

নন্দিনী। বারে বারে ওই একই কথা বল। আমাকে দেখে তোমার এত বিস্ময় কিসের অধ্যাপক।

অধ্যাপক। সকালে ফুলের বনে যে আলো আসে তাতে বিস্ময় নেই, কিন্তু পাকা দেয়ালের ফাটল দিয়ে যে আলো আসে সে আর-এক কথা। যক্ষপুরে তুমি সেই আচমকা আলো। তুমিই বা এখানকার কথা কী ভাবছ বলো দেখি।

নন্দিনী। অবাক হয়ে দেখছি, সমস্ত শহর মাটির তলাটার মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে দিয়ে অন্ধকার হাতড়ে বেড়াচ্ছে। পাতালে সুড়ঙ্গ খুদে তোমরা যক্ষের ধন বের করে করে আনছ। সে যে অনেক যুগের মরা ধন, পৃথিবী তাকে কবর দিয়ে রেখেছিল।

অধ্যাপক। আমরা-যে সেই মরা ধনের শবসাধনা করি। তার প্রেতকে বশ করতে চাই। সোনার তালের তালবেতালকে বাঁধতে পারলে পৃথিবীকে পাব মুঠোর মধ্যে।

নন্দিনী। তার পরে আবার, তোমাদের রাজাকে এই একটা অদ্ভুত জালের দেয়ালের আড়ালে ঢাকা দিয়ে রেখেছ, সে-যে মানুষ পাছে সে-কথা ধরা পড়ে। তোমাদের ওই সুড়ঙ্গের অন্ধকার ডালাটা খুলে ফেলে তার মধ্যে আলো ঢেলে দিতে ইচ্ছে করে, তেমনি ইচ্ছে করে ওই বিশ্রী জালটাকে ছিঁড়ে ফেলে মানুষটাকে উদ্ধার করি।

অধ্যাপক। আমাদের মরা ধনের প্রেতের যেমন ভয়ংকর শক্তি, আমাদের মানুষ-ছাঁকা রাজারও তেমনি ভয়ংকর প্রতাপ।

নন্দিনী। এ-সব তোমাদের বানিয়ে-তোলা কথা।

অধ্যাপক। বানিয়ে-তোলাই তো। উলঙ্গের কোনো পরিচয় নেই, বানিয়ে-তোলা কাপড়েই কেউ-বা রাজা, কেউ-বা ভিখিরী। এসো আমার ঘরে। তোমাকে তত্ত্বকথা বুঝিয়ে দিতে বড়ো আনন্দ হয়।

নন্দিনী। তোমাদের খোদাইকর যেমন খনি খুদে খুদে মাটির মধ্যে তলিয়ে চলেছে, তুমিও তো তেমনি দিনরাত পুঁথির মধ্যে গর্ত খুঁড়েই চলেছ। আমাকে নিয়ে সময়ের বাজে খরচ করবে কেন।

অধ্যাপক। আমরা নিরেট নিরবকাশ-গর্তের পতঙ্গ, ঘন কাজের মধ্যে সেঁধিয়ে আছি; তুমি ফাঁকা সময়ের আকাশে সন্ধ্যাতারাটি, তোমাকে দেখে আমাদের ডানা চঞ্চল হয়ে ওঠে। এসো আমার ঘরে, তোমাকে নিয়ে একটু সময় নষ্ট করতে দাও।

নন্দিনী। না না, এখন না। আমি এসেছি তোমাদের রাজাকে তার ঘরের মধ্যে গিয়ে দেখব।

অধ্যাপক। সে থাকে জালের আড়ালে, ঘরের মধ্যে ঢুকতে দেবে না।

নন্দিনী। আমি জালের বাধা মানি নে, আমি এসেছি ঘরের মধ্যে ঢুকতে।

অধ্যাপক। জান নন্দিনী, আমিও আছি একটা জালের পিছনে? মানুষের অনেকখানি বাদ দিয়ে পণ্ডিতটুকু জেগে আছে। আমাদের রাজা যেমন ভয়ংকর, আমিও তেমনি ভয়ংকর পণ্ডিত।

নন্দিনী। আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছ তুমি। তোমাকে তো ভয়ংকর ঠেকে না। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, এরা আমাকে এখানে নিয়ে এল, রঞ্জনকে সঙ্গে আনলে না কেন।

অধ্যাপক। সব জিনিসকে টুকরো করে আনাই এদের পদ্ধতি। কিন্তু তাও বলি, এখানকার মরা ধনের মাঝখানে তোমার প্রাণের ধনকে কেন আনতে চাও।

নন্দিনী। আমার রঞ্জনকে এখানে আনলে এদের মরা পাঁজরের ভিতর প্রাণ নেচে উঠবে।

অধ্যাপক। একা নন্দিনীকে নিয়েই যক্ষপুরীর সর্দাররা হতবুদ্ধি হয়ে গেছে, রঞ্জনকে আনলে তাদের হবে কী।

নন্দিনী। ওরা জানে না ওরা কী অদ্ভুত। ওদের মাঝখানে বিধাতা যদি খুব একটা হাসি হেসে ওঠেন, তাহলেই ওদের চটকা ভেঙে যেতে পারে। রঞ্জন বিধাতার সেই হাসি।

অধ্যাপক। দেবতার হাসি সূর্যের আলো, তাতে বরফ গলে, কিন্তু পাথর টলে না। আমাদের সর্দারদের টলাতে গেলে গায়ের জোর চাই।

নন্দিনী। আমার রঞ্জনের জোর তোমাদের শঙ্খিনীনদীর মতো। ওই নদীর মতোই সে যেমন হাসতেও পারে তেমনি ভাঙতেও পারে। অধ্যাপক, তোমাকে আমার আজকের দিনের একটি গোপন খবর দিই। আজ রঞ্জনের সঙ্গে আমার দেখা হবে।

অধ্যাপক। জানলে কী করে।

নন্দিনী। হবে হবে, দেখা হবে। খবর এসেছে।

অধ্যাপক। সর্দারের চোখ এড়িয়ে কোন্ পথ দিয়ে খবর আসবে।

নন্দিনী। যে-পথে বসন্ত আসবার খবর আসে সেই পথ দিয়ে। তাতে লেগে আছে আকাশের রঙ, বাতাসের লীলা।

অধ্যাপক। তার মানে, আকাশের রঙে বাতাসের লীলায় উড়ো খবর এসেছে।

নন্দিনী। যখন রঞ্জন আসবে তখন দেখিয়ে দেব উড়ো খবর কেমন করে মাটিতে এসে পৌঁছল।

অধ্যাপক। রঞ্জনের কথা উঠলে নন্দিনীর মুখ আর থামতে চায় না। থাক্‌গে,

আমার তো আছে বস্তুতত্ত্ববিদ্যা, তার গহ্বরের মধ্যে ঢুকে পড়িগে, আর সাহস হচ্ছে না। (খানিকটা গিয়ে ফিরে এসে) নন্দিনী, একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, যক্ষপুরীকে তোমার ভয় করছে না ?

নন্দিনী। ভয় করবে কেন।

অধ্যাপক। গ্রহণের সূর্যকে জন্তুরা ভয় করে, পূর্ণ সূর্যকে ভয় করে না। যক্ষপুরী গ্রহণলাগা পুরী। সোনার গর্তের রাহুতে ওকে খাবলে খেয়েছে। ও নিজে আস্ত নয়, কাউকে আস্ত রাখতে চায় না। আমি তোমাকে বলছি, এখানে থেকো না। তুমি চলে গেলে ওই গর্তগুলো আমাদের সামনে আরো হাঁ করে উঠবে; তবু বলছি, পালাও। যেখানকার লোকে দস্যুবৃত্তি ক'রে মা বসুন্ধরার আঁচলকে টুকরো টুকরো করে ছেঁড়ে না, সেইখানে রঞ্জনকে নিয়ে সুখে থাকোগে। (কিছুদূর গিয়ে ফিরে এসে) নন্দিনী, তোমার ডান হাতে ওই যে রক্তকরবীর কঙ্কণ, ওর থেকে একটি ফুল খসিয়ে দেবে ?

নন্দিনী। কেন, কী করবে তুমি।

অধ্যাপক। কতবার ভেবেছি, তুমি যে রক্তকরবীর আভরণ পর, তার একটা কিছু মানে আছে।

নন্দিনী। আমি তো জানি নে কী মানে।

অধ্যাপক। হয়তো তোমার ভাগ্যপুরুষ জানে। এই রক্ত-আভায় একটা ভয়-লাগানো রহস্য আছে, শুধু মাধুর্য নয়।

নন্দিনী। আমার মধ্যে ভয় ?

অধ্যাপক। সুন্দরের হাতে রক্তের তুলি দিয়েছে বিধাতা। জানি নে, রাঙা রঙে তুমি কী লিখন লিখতে এসেছ। মালতী ছিল, মল্লিকা ছিল, ছিল চামেলি; সব বাদ দিয়ে এ-ফুল কেন বেছে নিলে। জান, মানুষ না জেনে অমনি করে নিজের ভাগ্য বেছে নেয় ?

নন্দিনী। রঞ্জন আমাকে কখনো কখনো আদর ক'রে বলে রক্তকরবী। জানি নে আমার কেমন মনে হয়, আমার রঞ্জনের ভালোবাসার রঙ রাঙা, সেই রঙ গলায় পরেছি, বুকে পরেছি, হাতে পরেছি।

অধ্যাপক। তা আমাকে ওর একটি ফুল দাও, শুধু ক্ষণকালের দান, ওর রঙের তত্ত্বটি বোঝবার চেষ্টা করি।

নন্দিনী। এই নাও। আজ রঞ্জন আসবে, সেই আনন্দে এই ফুলটি তোমাকে দিলুম। [অধ্যাপকের প্রস্থান

সুড়ঙ্গ-খোদাইকর গোকুলের প্রবেশ

গোকুল। একবার মুখ ফেরাও তো দেখি।— তোমাকে বুঝতেই পারলুম না। তুমি কে।

নন্দিনী। আমাকে যা দেখছ তা ছাড়া আমি কিছুই না। বোঝবার তোমার দরকার কী।

গোকুল। না বুঝলে ভালো ঠেকে না। এখানে তোমাকে রাজা কোন্ কাজের প্রয়োজনে এনেছে।

নন্দিনী। অকাজের প্রয়োজনে।

গোকুল। একটা কী মন্তর তোমার আছে। ফাঁদে ফেলেছ সবাইকে। সর্বনাশী তুমি। তোমার ওই সুন্দর মুখ দেখে যারা ভুলবে তারা মরবে। দেখি দেখি, সিঁথিতে তোমার ওই কী ঝুলছে।

নন্দিনী। রক্তকরবীর মঞ্জরি।

গোকুল। ওর মানে কী।

নন্দিনী। ওর কোনো মানেই নেই।

গোকুল। আমি কিচ্ছু তোমাকে বিশ্বাস করি নে। একটা কী ফন্দি করেছ। আজ দিন না যেতেই একটা-কিছু বিপদ ঘটাবে। তাই এত সাজ। ভয়ংকরী, ওরে ভয়ংকরী।

নন্দিনী। আমাকে দেখে তোমার এমন ভয়ংকর মনে হচ্ছে কেন।

গোকুল। দেখে মনে হচ্ছে, তুমি রাঙা আলোর মশাল। যাই, নির্বোধদের বুঝিয়ে বলিগে, 'সাবধান, সাবধান, সাবধান।' [প্রস্থান

নন্দিনী। (জালের দরজায় ঘা দিয়ে) শুনতে পাচ্ছ?

নেপথ্যে। নন্দা, শুনতে পাচ্ছি। কিন্তু বারে বারে ডেকো না, আমার সময় নেই, একটুও না।

নন্দিনী। আজ খুশিতে আমার মন ভরে আছে। সেই খুশি নিয়ে তোমার ঘরের মধ্যে যেতে চাই।

নেপথ্যে। না, ঘরের মধ্যে না, যা বলতে হয় বাইরে থেকে বলো।

নন্দিনী। কুঁদফুলের মালা গেঁথে পদ্মপাতায় ঢেকে এনেছি।

নেপথ্যে। নিজে পরো।

নন্দিনী। আমাকে মানায় না, আমার মালা রক্তকরবীর।

নেপথ্যে। আমি পর্বতের চূড়ার মতো, শূন্যতাই আমার শোভা।

নন্দিনী। সেই চূড়ার বুকেও ঝরনা ঝরে, তোমার গলাতেও মালা দুলবে। জাল খুলে দাও, ভিতরে যাব।

নেপথ্যে। আসতে দেব না, কী বলবে শীঘ্র বলো। সময় নেই।

নন্দিনী। দূর থেকে ওই গান শুনতে পাচ্ছ?

নেপথ্যে। কিসের গান।

নন্দিনী। পৌষের গান। ফসল পেকেছে, কাটতে হবে, তারি ডাক।

গান

পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে— আয় রে চলে,
আয় আয় আয়।
ডালা-যে তার ভরেছে আজ পাকা ফসলে,
মরি, হায় হায় হায়।

দেখছ না, পৌষের রোদ্দুর পাকা ধানের লাবণ্য আকাশে মেলে দিচ্ছে?

হাওয়ার নেশায় উঠল মেতে
দিগ্‌বধূরা ধানের খেতে,
রোদের সোনা ছড়িয়ে পড়ে মাটির আঁচলে—
মরি, হায় হায় হায়।

তুমিও বেরিয়ে এসো রাজা, তোমাকে মাঠে নিয়ে যাই।

মাঠের বাঁশি শুনে শুনে আকাশ খুশী হল,—
ঘরেতে আজ কে রবে গো। খোলো দুয়ার খোলো।

নেপথ্যে। আমি মাঠে যাব? কোন্‌ কাজে লাগব।

নন্দিনী। মাঠের কাজ তোমার যক্ষপুরীর কাজের চেয়ে অনেক সহজ।

নেপথ্যে। সহজ কাজটাই আমার কাছে শক্ত। সরোবর কি ফেনার-নূপুর-পরা ঝরনার মতো নাচতে পারে। যাও যাও, আর কথা কয়ো না, সময় নেই।

নন্দিনী। অদ্ভুত তোমার শক্তি। যেদিন আমাকে তোমার ভাণ্ডারে ঢুকতে দিয়েছিলে, তোমার সোনার তাল দেখে কিছু আশ্চর্য হই নি, কিন্তু যে বিপুল শক্তি দিয়ে অনায়াসে সেইগুলোকে নিয়ে চুড়ো করে সাজাচ্ছিলে, তাই দেখে মুগ্ধ হয়েছিলুম।

তবু বলি, সোনার পিণ্ড কি তোমার ওই হাতের আশ্চর্য ছন্দে সাড়া দেয়, যেমন সাড়া দিতে পারে ধানের খেত। আচ্ছা রাজা, বলো তো, পৃথিবীর এই মরা ধন দিনরাত নাড়াচাড়া করতে তোমার ভয় হয় না ?

নেপথ্যে। কেন, ভয় কিসের।

নন্দিনী। পৃথিবী আপনার প্রাণের জিনিস আপনি খুশী হয়ে দেয়। কিন্তু যখন তার বুক চিরে মরা হাড়গুলোকে ঐশ্বর্য ব'লে ছিনিয়ে নিয়ে আস, তখন অন্ধকার থেকে একটা কানা রাক্ষসের অভিসম্পাত নিয়ে আস। দেখছ না, এখানে সবাই যেন কেমন রেগে আছে, কিম্বা সন্দেহ করছে, কিম্বা ভয় পাচ্ছে ?

নেপথ্যে। অভিসম্পাত ?

নন্দিনী। হাঁ, খুনোখুনি কাড়াকাড়ির অভিসম্পাত।

নেপথ্যে। শাপের কথা জানি নে। এ জানি যে আমরা শক্তি নিয়ে আসি। আমার শক্তিতে তুমি খুশী হও, নন্দিন ?

নন্দিনী। ভারি খুশি লাগে। তাই তো বলছি আলোতে বেরিয়ে এসো, মাটির উপর পা দাও, পৃথিবী খুশী হয়ে উঠুক।

আলোর খুশি উঠল জেগে
ধানের শিষে শিশির লেগে,
ধরার খুশি ধরে না গো, ওই-যে উথলে,
মরি, হায় হায় হায়।

নেপথ্যে। নন্দিনী, তুমি কি জান, বিধাতা তোমাকেও রূপের মায়ার আড়ালে অপরূপ ক'রে রেখেছেন ? তার মধ্যে থেকে ছিনিয়ে তোমাকে আমার মুঠোর ভিতর পেতে চাচ্ছি, কিছুতেই ধরতে পারছি নে। আমি তোমাকে উলটিয়ে পালটিয়ে দেখতে চাই, না পারি তো ভেঙেচুরে ফেলতে চাই।

নন্দিনী। ও কী বলছ তুমি।

নেপথ্যে। তোমার ওই রক্তকরবীর আভাটুকু ছেঁকে নিয়ে আমার চোখে অঞ্জন ক'রে পরতে পারি নে কেন। সামান্য পাপড়িক'টা আঁচল চাপা দিয়ে বাধা দিয়েছে। তেমনি বাধা তোমার মধ্যে— কোমল ব'লেই কঠিন। আচ্ছা নন্দিনী, আমাকে কী মনে কর, খুলে বলো তো।

নন্দিনী। সে আরেক দিন বলব। আজ তো তোমার সময় নেই, আজ যাই।

নেপথ্যে। না না, যেয়ো না, বলে যাও; আমাকে কী মনে কর বলো।

নন্দিনী। কতবার বলেছি, তোমাকে মনে করি আশ্চর্য। প্রকাণ্ড হাতে প্রচণ্ড জোর ফুলে ফুলে উঠেছে, ঝড়ের আগেকার মেঘের মতো— দেখে আমার মন নাচে।

নেপথ্যে। রঞ্জনকে দেখে তোমার মন-যে নাচে, সেও কি—

নন্দিনী। সে কথা থাক্, তোমার তো সময় নেই।

নেপথ্যে। আছে সময়, শুধু এই কথাটি বলে যাও।

নন্দিনী। সে-নাচের তাল আলাদা, তুমি বুঝবে না।

নেপথ্যে। বুঝব। বুঝতে চাই।

নন্দিনী। সব কথা ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারি নে, আমি যাই।

নেপথ্যে। যেয়ো না, বলো আমাকে তোমার ভালো লাগে কিনা।

নন্দিনী। হাঁ, ভালো লাগে।

নেপথ্যে। রঞ্জনের মতোই ?

নন্দিনী। ঘুরে-ফিরে একই কথা। এ-সব কথা তুমি বোঝ না।

নেপথ্যে। কিছু কিছু বুঝি। আমি জানি রঞ্জনের সঙ্গে আমার তফাতটা কী। আমার মধ্যে কেবল জোরই আছে, রঞ্জনের মধ্যে আছে জাদু।

নন্দিনী। জাদু বলছ কাকে।

নেপথ্যে। বুঝিয়ে বলব ? পৃথিবীর নিচের তলায় পিণ্ড পিণ্ড পাথর লোহা সোনা, সেইখানে রয়েছে জোরের মূর্তি। উপরের তলায় একটুখানি কাঁচা মাটিতে ঘাস উঠছে, ফুল ফুটছে— সেইখানে রয়েছে জাদুর খেলা। দুর্গমের থেকে হীরে আনি, মানিক আনি ; সহজের থেকে ওই প্রাণের জাদুটুকু কেড়ে আনতে পারি নে।

নন্দিনী। তোমার এত আছে, তবু কেবলই অমন লোভীর মতো কথা বল কেন।

নেপথ্যে। আমার যা আছে সব বোঝা হয়ে আছে। সোনাকে জমিয়ে তুলে তো পরশমণি হয় না,— শক্তি যতই বাড়াই যৌবনে পৌঁছল না। তাই পাহারা বসিয়ে তোমাকে বাঁধতে চাই ; রঞ্জনের মতো যৌবন থাকলে ছাড়া রেখেই তোমাকে বাঁধতে পারতুম। এমনি ক'রে বাঁধনের রশিতে গাঁট দিতে দিতেই সময় গেল। হায় রে, আর-সব বাঁধা পড়ে, কেবল আনন্দ বাঁধা পড়ে না।

নন্দিনী। তুমি তো নিজেকেই জালে বেঁধেছ, তার পরে কেন এমন ছটফট করছ বুঝতে পারি নে।

নেপথ্যে। বুঝতে পারবে না। আমি প্রকাণ্ড মরুভূমি— তোমার মতো একটি

ছোট্ট ঘাসের দিকে হাত বাঁড়িয়ে বলছি, আমি তপ্ত, আমি রিক্ত, আমি ক্লান্ত। তৃষ্ণার দাহে এই মরুটা কত উর্বরা ভূমিকে লেহন করে নিয়েছে, তাতে মরুর পরিসরই বাড়ছে, ওই একটুখানি দুর্বল ঘাসের মধ্যে যে-প্রাণ আছে তাকে আপন করতে পারছে না।

নন্দিনী। তুমি-যে এত ক্লান্ত তোমাকে দেখে তো তা মনেই হয় না। আমি তো তোমার মস্ত জোরটাই দেখতে পাচ্ছি।

নেপথ্যে। নন্দিন, একদিন দূরদেশে আমারই মতো একটা ক্লান্ত পাহাড় দেখেছিলুম। বাইরে থেকে বুঝতেই পারি নি তার সমস্ত পাথর ভিতরে ভিতরে ব্যথিয়ে উঠেছে। একদিন গভীর রাতে ভীষণ শব্দ শুনলুম, যেন কোন্ দৈত্যের দুঃস্বপ্ন গুমরে গুমরে হঠাৎ ভেঙে গেল। সকালে দেখি পাহাড়টা ভূমিকম্পের টানে মাটির নিচে তলিয়ে গেছে। শক্তির ভার নিজের অগোচরে কেমন ক'রে নিজেকে পিষে ফেলে, সেই পাহাড়টাকে দেখে তাই বুঝেছিলুম। আর, তোমার মধ্যে একটা জিনিস দেখছি —সে এর উলটো।

নন্দিনী। আমার মধ্যে কী দেখছ।

নেপথ্যে। বিশ্বের বাঁশিতে নাচের যে-ছন্দ বাজে সেই ছন্দ।

নন্দিনী। বুঝতে পারলুম না।

নেপথ্যে। সেই ছন্দে বস্তুর বিপুল ভার হালকা হয়ে যায়। সেই ছন্দে গ্রহনক্ষত্রের দল ভিখারী নটবালকের মতো আকাশে আকাশে নেচে বেড়াচ্ছে। সেই নাচের ছন্দেই নন্দিনী, তুমি এমন সহজ হয়েছ, এমন সুন্দর। আমার তুলনায় তুমি কতটুকু, তবু তোমাকে ঈর্ষা করি।

নন্দিনী। তুমি নিজেকে সবার থেকে হরণ করে রেখে বঞ্চিত করেছ; সহজ হয়ে ধরা দাও না কেন।

নেপথ্যে। নিজেকে গুপ্ত রেখে বিশ্বের বড়ো বড়ো মালখানার মোটা মোটা জিনিস চুরি করতে বসেছি। কিন্তু যে-দান বিধাতার হাতের মুঠির মধ্যে ঢাকা, সেখানে তোমার চাঁপার কলির মতো আঙুলটি যতটুকু পৌঁছয়, আমার সমস্ত দেহের জোর তার কাছ দিয়ে যায় না। বিধাতার সেই বদ্ধ মুঠো আমাকে খুলতেই হবে।

নন্দিনী। তোমার এ-সব কথা আমি ভালো বুঝতে পরি নে, আমি যাই।

নেপথ্যে। আচ্ছা যেয়ো,— কিন্তু জানলার বাইরে এই হাত বাড়িয়ে দিচ্ছি, তোমার হাতখানি একবার এর উপর রাখো।

নন্দিনী। না না, তোমার সবখানা বাদ দিয়ে হঠাৎ একখানা হাত বেরিয়ে এলে আমার ভয় করে।

নেপথ্যে। কেবল একখানা হাত দিয়ে ধরতে চাই বলেই সবাই আমার কাছ থেকে পালিয়ে যায়। কিন্তু সব দিয়ে যদি তোমাকে ধরতে চাই, ধরা দেবে কি, নন্দিন।

নন্দিনী। তুমি তো আমাকে ঘরে যেতে দিলে না, তবে কেন এ-সব বলছ।

নেপথ্যে। আমার অনবকাশের উজান ঠেলে তোমাকে ঘরে আনতে চাই নে। যেদিন পালের হাওয়ায় তুমি অনায়াসে আসবে সেই দিন আগমনীর লগ্ন লাগবে। সে-হাওয়া যদি ঝড়ের হাওয়া হয় সেও ভালো। এখনো সময় হয় নি।

নন্দিনী। আমি তোমাকে বলছি রাজা, সেই পালের হাওয়া আনবে রঞ্জন। সে যেখানে যায় ছুটি সঙ্গে নিয়ে আসে।

নেপথ্যে। তোমার রঞ্জন যে-ছুটি বয়ে নিয়ে বেড়ায় সেই ছুটিকে রক্তকরবীর মধু দিয়ে ভরে রাখে কে, আমি কি জানি নে। নন্দিন, তুমি তো আমাকে ফাঁকা ছুটির খবর দিলে, মধু কোথায় পাব।

নন্দিনী। আজ আমি তবে যাই।

নেপথ্যে। না, এই কথাটার জবাব দিয়ে যাও।

নন্দিনী। ছুটি কী ক'রে মধুতে ভরে, তার জবাব রঞ্জনকে চোখে দেখলেই পাবে। সে বড়ো সুন্দর।

নেপথ্যে। সুন্দরের জবাব সুন্দরই পায়। অসুন্দর যখন জবাব ছিনিয়ে নিতে চায়, বীণার তার বাজে না, ছিঁড়ে যায়। আর নয়, যাও তুমি চলে যাও— নইলে বিপদ ঘটবে।

নন্দিনী। যাচ্ছি, কিন্তু বলে গেলুম, আজ আমার রঞ্জন আসবে, আসবে, আসবে,— কিছুতে তাকে ঠেকাতে পারবে না। [প্রস্থান

ফাগুলাল খোদাইকর ও তার স্ত্রী চন্দ্রার প্রবেশ

ফাগুলাল। আমার মদ কোথায় লুকিয়েছ চন্দ্রা, বের করো।

চন্দ্রা। ওকি কথা। সকাল থেকেই মদ ?

ফাগুলাল। আজ ছুটির দিন। কাল ওদের মারণচণ্ডীর ব্রত গেছে। আজ ধ্বজাপুজা, সেই সঙ্গে অস্ত্রপুজা।

চন্দ্রা। বল-কি। ওরা কি ঠাকুরদেবতা মানে।

ফাগুলাল। দেখ নি ওদের মদের ভাঁড়ার, অস্ত্রশালা আর মন্দির একেবারে গায়ে গায়ে ?

চন্দ্রা। তা ছুটি পেয়েছ বলেই মদ ? গাঁয়ে থাকতে পার্বণের ছুটিতে তো—

ফাগুলাল। বনের মধ্যে পাখি ছুটি পেলে উড়তে পায়, খাঁচার মধ্যে তাকে ছুটি দিলে মাথা ঠুকে মরে। যক্ষপুরে কাজের চেয়ে ছুটি বিষম বালাই।

চন্দ্রা। কাজ ছেড়ে দাও-না, চলো-না ঘরে ফিরে।

ফাগুলাল। ঘরের রাস্তা বন্ধ, জান না বুঝি ?

চন্দ্রা। কেন বন্ধ।

ফাগুলাল। আমাদের ঘর নিয়ে ওদের কোনো মুনফা নেই।

চন্দ্রা। আমরা কি ওদের দরকারের গায়ে আঁট ক'রে লাগানো, যেন ধানের গায়ে তুঁষ ? ফালতো কিছুই নেই ?

ফাগুলাল। আমাদের বিশুপাগল বলে, আস্ত হয়ে থাকাটা কেবল পাঁঠার নিজের পক্ষেই দরকার ; যারা তাকে খায়, তার হাড়গোড় খুরলেজ বাদ দিয়েই খায়। এমন-কি, হাড়কাঠের সামনে তারা যে ভ্যাঁ করে ডাকে, সেটাকেও বাহুল্য বলে আপত্তি করে। ওই-যে বিশুপাগল গান গাইতে গাইতে আসছে।

চন্দ্রা। কিছুদিন থেকে হঠাৎ ওর গান খুলে গেছে।

ফাগুলাল। তাই তো দেখছি।

চন্দ্রা। ওকে নন্দিনীতে পেয়েছে, সে ওর প্রাণ টেনেছে, গানও টেনেছে।

ফাগুলাল। তাতে আর আশ্চর্যটা কী।

চন্দ্রা। না, আশ্চর্য কিছুই নেই। ওগো সাবধান থেকো, কোন্ দিন তোমারও গলা থেকে গান বের করবে— সেদিন পাড়ার লোকের কী দশা হবে। মায়াবিনী মায়া জানে। বিপদ ঘটাবে।

ফাগুলাল। বিশুর বিপদ আজ ঘটে নি, এখানে আসবার অনেক আগে থাকতেই ও নন্দিনীকে জানে।

চন্দ্রা। বিশুবেয়াই, শুনে যাও, শুনে যাও। যাও কোথায়। গান শোনাবার লোক এখানেও এক-আধজন মিলতে পারে, নিতান্ত লোকসান হবে না।

বিশুর প্রবেশ ও গান

মোর স্বপনতরীর কে তুই নেয়ে।
লাগল পালে নেশার হাওয়া,

পাগল পরান চলে গেয়ে।
আমায় ভুলিয়ে দিয়ে যা
তোর দুলিয়ে দিয়ে না,
তোর সুদূর ঘাটে চল্ রে বেয়ে।

চন্দ্রা। তবে তো আশা নেই, আমরা-যে বড়ো কাছে।

বিশু।
আমার ভাবনা তো সব মিছে,
আমার সব পড়ে থাক্ পিছে।
তোমার ঘোমটা খুলে দাও,
তোমার নয়ন তুলে চাও,
দাও হাসিতে মোর পরান ছেয়ে

চন্দ্রা। তোমার স্বপনতরীর নেয়েটি কে সে আমি জানি।

বিশু। বাইরে থেকে কেমন করে জানবে। আমার তরীর মাঝখান থেকে তাকে তো দেখ নি।

চন্দ্রা। তরী ডোবাবে একদিন বলে দিলুম, তোমার সেই সাধের নন্দিনী।

গোকুল খোদাইকরের প্রবেশ

গোকুল। দেখো বিশু, তোমার ওই নন্দিনীকে ভালো ঠেকছে না।

বিশু। কেন, কী করেছে।

গোকুল। কিছুই করে না, তাই তো খটকা লাগে। এখানকার রাজা খামকা ওকে আনালে কেন। ওর রকমসকম কিছুই বুঝি নে।

চন্দ্রা। বেয়াই, এ আমাদের দুঃখের জায়গা, ও-যে এখানে অষ্টপ্রহর কেবল সুন্দরিপনা করে বেড়ায়, এ আমরা দেখতে পারি নে।

গোকুল। আমরা বিশ্বাস করি সাদা মোটাগোছের চেহারা, বেশ ওজনে ভারী।

বিশু। যক্ষপুরীর হাওয়ায় সুন্দরের 'পরে অবজ্ঞা ঘটিয়ে দেয়, এইটেই সর্বনেশে। নরকেও সুন্দর আছে, কিন্তু সুন্দরকে কেউ সেখানে বুঝতেই পারে না, নরকবাসীর সব চেয়ে বড়ো সাজা তাই।

চন্দ্রা। আচ্ছা বেশ, আমরাই যেন মুর্খু, কিন্তু এখানকার সর্দার পর্যন্ত ওকে দুচক্ষে দেখতে পারে না, তা জান?

বিশু। দেখো দেখো চন্দ্রা, সর্দারের দুচক্ষুর ছোঁয়াচ যেন তোমাকে না লাগে, তাহলে আমাদের দেখেও তোমার চক্ষু লাল হয়ে উঠবে।— আচ্ছা, তুই কী বলিস ফাগুলাল।

ফাগুলাল। সত্যি কথা বলি দাদা, নন্দিনীকে যখন দেখি, নিজের দিকে তাকিয়ে লজ্জা করে। ওর সামনে কথা কইতে পারি নে।

গোকুল। বিশুভাই, ওই মেয়েকে দেখে তোমার মন ভুলেছে সেইজন্যে দেখতে পাচ্ছ না ও কী অলক্ষণ নিয়ে এসেছে। বুঝতে বেশি দেরি হবে না, বলে রাখলুম।

ফাগুলাল। বিশুভাই, তোমার বেয়ান জানতে চায় আমরা মদ খাই কেন।

বিশু। স্বয়ং বিধির কৃপায় মদের বরাদ্দ জগতের চারদিকেই, এমন-কি, তোমাদের ওই চোখের কটাক্ষে। আমাদের এই বাহুতে আমরা কাজ জোগাই, তোমাদের বাহুর বন্ধনে তোমরা মদ জোগাও। জীবলোকে মজুরি করতে হয়, আবার মজুরি ভুলতেও হয়। মদ না হলে ভোলাবে কিসে।

চন্দ্রা। তাই বই কি। তোমাদের মতো জন্মমাতালের জন্যে বিধাতার দয়ার অন্ত নেই। মদের ভাণ্ড উপুড় করে দিয়েছেন।

বিশু। একদিকে ক্ষুধা মারছে চাবুক, তৃষ্ণা মারছে চাবুক; তারা জ্বালা ধরিয়েছে,— বলছে, কাজ করো। অন্য দিকে বনের সবুজ মেলেছে মায়া রোদের সোনা মেলেছে মায়া, ওরা নেশা ধরিয়েছে,— বলছে, ছুটি ছুটি।

চন্দ্রা। এইগুলোকে মদ বলে নাকি।

বিশু। প্রাণের মদ, নেশা ফিকে, কিন্তু দিনরাত লেগে আছে। প্রমাণ দেখো। এ রাজ্যে এলুম, পাতালে সিঁধকাটার কাজে লাগলুম, সহজ মদের বরাদ্দ বন্ধ হয়ে গেল। অন্তরাত্মা তাই তো হাটের মদ নিয়ে মাতামাতি করছে। সহজ নিশ্বাসে যখন বাধা পড়ে, তখনই মানুষ হাঁপিয়ে নিশ্বাস টানে।

গান

তোর প্রাণের রস তো শুকিয়ে গেল ওরে,
তবে মরণরসে নে পেয়ালা ভরে।
সে-যে চিতার আগুন গালিয়ে ঢালা,
সব জ্বলনের মেটায় জ্বালা,
সব শূন্যকে সে অট্ট হেসে দেয়-যে রঙিন করে।

চন্দ্রা। এসো-না বেয়াই, পালাই আমরা।

বিশু। সেই নীল চাঁদোয়ার নিচে, খোলা মদের আড্ডায়! রাস্তা বন্ধ। তাই তো এই কয়েদখানার চোরাই মদের ওপর এমন ভয়ংকর টান। আমাদের না আছে আকাশ, না আছে অবকাশ; তাই বারো ঘণ্টার সমস্ত হাসি গান সূর্যের আলো কড়া করে চুঁইয়ে নিয়েছি একচুমুকের তরল আগুনে। যেমন ঠাস দাসত্ব তেমনি নিবিড় ছুটি।

তোর সূর্য ছিল গহন মেঘের মাঝে,
তোর দিন মরেছে অকাজেরি কাজে,
তবে আসুক-না সেই তিমিররাতি,
লুপ্তিনেশার চরম সাথী,
তোর ক্লান্ত আঁখি দিক্ সে ঢাকি দিকভোলাবার ঘোরে।

চন্দ্রা। যাই বল বিশুবেয়াই, যক্ষপুরীতে এসে তোমরাই মজেছ। আমাদের মেয়েদের তো কিছু বদল হয় নি।

বিশু। হয় নি তো কী। তোমাদের ফুল গেছে শুকিয়ে, এখন 'সোনা সোনা' করে প্রাণটা খাবি খাচ্ছে।

চন্দ্রা। কখ্খনো না।

বিশু। আমি বলছি 'হাঁ'। ওই যে ফাগু হতভাগা বারো ঘণ্টার পরে আরো চার ঘণ্টা যোগ ক'রে খেটে মরে, তার কারণটা ফাগুও জানে না, তুমিও জান না। অন্তর্যামী জানেন। তোমার সোনার স্বপ্ন ভিতরে-ভিতরে ওকে চাবুক মারে, সে চাবুক সর্দারের চাবুকের চেয়েও কড়া।

চন্দ্রা। আচ্ছা বেশ, তা চলো-না কেন, এখান থেকে দেশে ফিরে যাই।

বিশু। সর্দার কেবল-যে ফেরবার পথ বন্ধ করেছে তা নয়, ইচ্ছেটা সুদ্ধ আটকেছে। আজ যদি-বা দেশে যাও টিঁকতে পারবে না, কালই সোনার নেশায় ছুটে ফিরে আসবে, আফিমখোর পাখি যেমন ছাড়া পেলেও খাঁচায় ফেরে।

ফাগুলাল। আচ্ছা ভাই বিশু, তুমি তো একদিন পুঁথি পড়ে পড়ে চোখ খোয়াতে বসেছিলে, তোমাকে আমাদের মতো মুর্খদের সঙ্গে কোদাল ধরালে কেন।

চন্দ্রা। এতদিন আছি, এই কথাটির জবাব বেয়াই-এর কাছ থেকে কিছুতেই আদায় করা গেল না।

ফাগুলাল। অথচ কথাটা সবাই জানে।

বিশু। কী বলো দেখি।

ফাগুলাল। আমাদের খবর নেবার জন্যে ওরা তোমাকে চর রেখেছিল।

বিশু। সবাই জানতিস যদি তো আমাকে জ্যান্ত রাখলি কেন।

ফাগুলাল। এও জানি এ কাজ তোমার দ্বারা হল না।

চন্দ্রা। এমন আরামের কাজেও টিঁকতে পারলে না, বেয়াই ?

বিশু। আরামের কাজ ? একটা সজীব দেহ, তার পিছনে পৃষ্ঠব্রণ হয়ে লেগে থাকা ! বললুম, 'দেশে যাব, শরীর বড়ো খারাপ।' সর্দার বললেন, 'আহা, এত খারাপ শরীর নিয়ে দেশে যাবেই বা কেমন করে। তবু চেষ্টা দেখো।' চেষ্টা দেখলুম। শেষে দেখি যক্ষপুরীর কবলের মধ্যে ঢুকলে তার হাঁ বন্ধ হয়ে যায়, এখন তার জঠরের মধ্যে যাবার একটি পথ ছাড়া আর পথই নেই। আজ তার সেই আশাহীন আলোহীন জঠরের মধ্যে তলিয়ে গেছি। এখন তোতে-আমাতে তফাত এই যে, সর্দার তোকে যতটা অবজ্ঞা করে আমাকে তার চেয়েও বেশী। ছেঁড়া কলাপাতার চেয়ে ভাঙা ভাঁড়ের প্রতি মানুষের হেলা।

ফাগুলাল। দুঃখ কী, বিশুদাদা। আমরা তো তোমাকে মাথায় করে রেখেছি।

বিশু। প্রকাশ পেলেই মারা যাব। তোদের আদর পড়ে যেখানে সর্দারের দৃষ্টি পড়ে সেখানেই, সোনাব্যাঙ যতই মক্‌মক্ শব্দে কোলাব্যাঙের অভ্যর্থনা করে, সেটা কানে গিয়ে পৌঁছয় বোড়াসাপের।

চন্দ্রা। কতদিনে তোমাদের কাজ ফুরবে ?

বিশু। পাঁজিতে তো দিনের শেষ লেখে না। এক দিনের পর দু দিন, দু দিনের পর তিন দিন ; সুড়ঙ্গ কেটেই চলেছি, এক হাতের পর দু হাত, দু হাতের পর তিন হাত। তাল তাল সোনা তুলে আনছি, এক তালের পর দু তাল, দু তালের পর তিন তাল। যক্ষপুরে অঙ্কের পর অঙ্ক সার বেঁধে চলেছে, কোনো অর্থে পৌঁছয় না। তাই ওদের কাছে আমরা মানুষ নই, কেবল সংখ্যা। ফাগুভাই, তুমি কোন্ সংখ্যা।

ফাগুলাল। পিঠের কাপড়ে দাগা আছে, আমি ৪৭ ফ।

বিশু। আমি ৬৯ ঙ। গাঁয়ে ছিলুম মানুষ, এখানে হয়েছি দশপঁচিশের ছক। বুকের উপর দিয়ে জুয়োখেলা চলছে।

চন্দ্রা। বেয়াই, ওদের সোনা তো অনেক জমল, আরো কি দরকার।

বিশু। দরকার বলে পদার্থের শেষ আছে। খাওয়ার দরকার আছে, পেট ভরিয়ে তার শেষ পাওয়া যায় ; নেশার দরকার নেই, তার শেষও নেই। ওই সোনার তালগুলো-যে মদ, আমাদের যক্ষরাজের নিরেট মদ। বুঝতে পারলে না ?

চন্দ্রা। না।

বিশু। মদের পেয়ালা নিয়ে ভুলে যাই ভাগ্যের গণ্ডির মধ্যে আমরা বাঁধা। মনে করি আমাদের অবাধ ছুটি। সোনার তাল হাতে নিয়ে এখানকার কর্তার সেই মোহ লাগে। সে ভাবে সর্বসাধারণের মাটির টান ওতে পৌঁছয় না, অসাধারণের আসমানে ও উড়ছে।

চন্দ্রা। নবান্নের সময় এল ব'লে, গ্রামে গ্রামে তার জোগাড় চলছে। পায়ে পড়ি, ঘরে চলো। একবার সর্দারকে গিয়ে আমরা যদি—

বিশু। স্ত্রীবুদ্ধিতে সর্দারকে এখনো চেন নি বুঝি?

চন্দ্রা। কেন, ওকে দেখে তো আমার বেশ—

বিশু। হাঁ, বেশ ঝক্‌ঝকে। মকরের দাঁত, খাঁজে খাঁজে বড়ো পরিপাটি করে কামড়ে ধরে। মকররাজ স্বয়ং ইচ্ছে করলেও আলগা করতে পারে না।

চন্দ্রা। ওই-যে সর্দার।

বিশু। তবেই হয়েছে। আমাদের কথা নিশ্চয়ই শুনেছে।

চন্দ্রা। কেন, এমন তো কিছু বলি নি যাতে—

বিশু। বেয়ান, কথা আমরা বলি, মানে-যে করে ওরা। কাজেই কোন্ কথার টিকে কোন্ চালে আগুন লাগায় কেউ জানে না।

সর্দারের প্রবেশ

চন্দ্রা। সর্দারদাদা!

সর্দার। কী নাতনী, খবর ভালো তো?

চন্দ্রা। একবার বাড়ি যেতে ছুটি দাও।

সর্দার। কেন। যে-বাসা দিয়েছি সে তো খাসা, বাড়ির চেয়ে অনেক ভালো। সরকারী খরচে চৌকিদার পর্যন্ত রাখা গেছে। কী হে ৬৯ ঙ, তোমাকে এদের মধ্যে দেখলে মনে হয় সারস এসেছেন বকের দলকে নাচ শেখাতে।

বিশু। সর্দারজি, তোমার ঠাট্টা শুনে আমোদ লাগছে না। নাচাবার মতো পায়ের জোর থাকলে এখান থেকে টেনে দৌড় মারতুম। তোমাদের এলাকায় নাচানো ব্যবসা কত সাংঘাতিক তার মোটা মোটা দৃষ্টান্ত দেখেছি, এমন হয়েছে সাদা চালে চলতেও পা কাঁপে।

সর্দার। নাতনী, একটা সুখবর আছে। এদের ভালোকথা শোনাবার জন্যে

কেনারাম গোঁসাইকে আনিয়ে রেখেছি। এদের কাছ থেকে প্রণামী আদায় করে খরচটা উঠে যাবে। গোঁসাইজির কাছ থেকে রোজ সন্ধেবেলায় এরা—

ফাগুলাল। না না, সে হবে না, সর্দারজি। এখন সন্ধেবেলায় মদ খেয়ে বড়োজোর মাতলামি করি, উপদেশ শোনাতে এলে নরহত্যা ঘটবে।

বিশু। চুপ চুপ, ফাগুলাল।

গোঁসাইয়ের প্রবেশ

সর্দার। এই-যে বলতে বলতেই উপস্থিত। প্রভু, প্রণাম। আমাদের এই কারিগরদের দুর্বল মন, মাঝে-মাঝে অশান্ত হয়ে ওঠে। এদের কানে একটু শান্তিমন্ত্র দেবেন— ভারি দরকার।

গোঁসাই। এই এদের কথা বলছ? আহা, এরা তো স্বয়ং কূর্ম-অবতার। বোঝার নিচে নিজেকে চাপা দিয়েছে বলেই সংসারটা টিঁকে আছে। ভাবলে শরীর পুলকিত হয়। বাবা ৪৭ ফ, একবার ঠাউরে দেখো, যে-মুখে নাম কীর্তন করি সেই মুখে অন্ন জোগাও তোমরা; শরীর পবিত্র হল যে-নামাবলিখানা গায়ে দিয়ে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সেখানা বানিয়েছ তোমরাই। একি কম কথা। আশীর্বাদ করি সর্বদাই অবিচলিত থাকো, তাহলেই ঠাকুরের দয়াও তোমাদের 'পরে অবিচলিত থাকবে। বাবা, একবার কণ্ঠ খুলে বলো 'হরি হরি'। তোমাদের সব বোঝা হালকা হয়ে যাক। হরিনাম আদাবন্তে চ মধ্যে চ।

চন্দ্রা। আহা, কী মধুর। বাবা, অনেকদিন এমন কথা শুনি নি। দাও দাও, আমাকে একটু পায়ের ধুলো দাও।

ফাগুলাল। এতক্ষণ অবিচলিত ছিলুম, কিন্তু আর তো পারি নে। সর্দার, এত বড়ো অপব্যয় কিসের জন্যে। প্রণামী আদায় করতে চাও রাজী আছি, কিন্তু ভণ্ডামি সইব না।

বিশু। ফাগুলাল খেপলে আর রক্ষে নেই, চুপ চুপ।

চন্দ্রা। ইহকাল পরকাল তুমি দু-ই খোয়াতে বসেছ? তোমার গতি হবে কী। এমন মতি তোমার আগে ছিল না, আমি বেশ দেখতে পাচ্ছি, তোমাদের উপরে ওই নন্দিনীর হাওয়া লেগেছে।

গোঁসাই। যাই বল সর্দার, কী সরলতা। পেটে-মুখে এক, এদের আমরা শেখাব কি এরাই আমাদের শিক্ষা দেবে। বুঝেছ?

সর্দার। বুঝেছি বই-কি। এও বুঝেছি উৎপাত বেধেছে কোথা থেকে। এদের

ভার আমাকেই নিতে হচ্ছে। প্রভুপাদ বরঞ্চ ওপাড়ায় নাম শুনিয়ে আসুন, সেখানে করাতীরা যেন একটু খিটখিট শুরু করছে।

গোঁসাই। কোন্ পাড়া বললে, সর্দারবাবা।

সর্দার। ওই-যে ট ঠ পাড়ায়। সেখানে ৭১ ট হচ্ছে মোড়ল। মুর্ধন্য-ণয়ের ৬৫ যেখানে থাকে তার বাঁয়ে ওই পাড়ার শেষ।

গোঁসাই। বাবা, দন্ত্য-ন পাড়া যদিও এখনো নড়্‌নড় করছে, মুর্ধন্য-ণরা ইদানীং অনেকটা মধুর রসে মজেছে। মন্ত্র নেবার মতো কান তৈরি হল ব'লে। তবু আরো ক'টা মাস পাড়ায় ফৌজ রাখা ভালো। কেননা, নাহংকারাৎ পরো রিপুঃ। ফৌজের চাপে অহংকারটার দমন হয়, তার পরে আমাদের পালা। তবে আসি।

চন্দ্রা। প্রভু, আশীর্বাদ করো, এই এদের যেন সুমতি হয়। অপরাধ নিয়ো না।

গোঁসাই। ভয় নেই মা-লক্ষ্মী, এরা সম্পূর্ণ ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। [প্রস্থান

সর্দার। ওহে ৬৯ ঙ, তোমাদের ওপাড়ার মেজাজটা যেন কেমন দেখছি!

বিশু। তা হতে পারে। গোঁসাইজি এদের কূর্ম-অবতার বললেন, কিন্তু শাস্ত্রমতে অবতারের বদল হয়। কূর্ম হঠাৎ বরাহ হয়ে ওঠে, বর্মের বদলে বেরিয়ে পড়ে দন্ত, ধৈর্যের বদলে গোঁ।

চন্দ্রা। বিশুবেয়াই, একটু থামো। সর্দারদাদা, আমার দরবারটা ভুলো না।

সর্দার। কিছুতেই না। শুনে রাখলুম, মনেও রাখব। [প্রস্থান

চন্দ্রা। আহা দেখলে? সর্দার লোকটি কী সরেস। সবার সঙ্গেই হেসে কথা।

বিশু। মকরের দাঁতের শুরুতে হাসি, অন্তিমে কামড়।

চন্দ্রা। কামড়টা এর মধ্যে কোথায়!

বিশু। জান না, ওরা ঠিক করেছে এবার থেকে এখানে কারিগরের সঙ্গে তাদের স্ত্রীরা আসতে পারবে না?

চন্দ্রা। কেন।

বিশু। সংখ্যারূপে ওদের হিসাবের খাতায় আমরা জায়গা পাই, কিন্তু সংখ্যার অঙ্কের সঙ্গে নারীর অঙ্ক গণিতশাস্ত্রের যোগে মেলে না।

চন্দ্রা। ওমা! ওদের নিজের ঘরে কি স্ত্রী নেই। তারা কী বলে।

বিশু। তারাও সোনার তালের মদে বেহুঁশ। নেশায় স্বামীদের ছাড়িয়ে যায়। আমরা তাদের চোখেই পড়ি নে।

চন্দ্রা। বিশুবেয়াই, তোমার ঘরে তো স্ত্রী ছিল, তার হল কী। অনেকদিন খবর পাই নি।

বিশু। যতদিন চরের উচ্চপদে ভরতি ছিলুম, সর্দারনীদের কোঠাবাড়িতে তার তাসখেলার ডাক পড়ত। যখন ফাগুলালদের দলে যোগ দিলুম, ওপাড়ায় তার নেমন্তন্ন বন্ধ হয়ে গেল। সেই ধিক্কারে আমাকে ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে।

চন্দ্রা। ছি, এমন পাপও করে।

বিশু। এ পাপের শাস্তিতে আর-জন্মে সে সর্দারনী হয়ে জন্মাবে।

চন্দ্রা। বিশুবেয়াই, দেখো দেখো, ওই কারা ধুম করে চলেছে। সারে সারে ময়ূরপঙ্খি, হাতির হাওদায় ঝালর দেখেছ। ঝলমল করছে। কী চমৎকার ঘোড়-সওয়ার। বর্শার ডগায় যেন এক-এক টুকরো সূর্যের আলো বিঁধে নিয়ে চলেছে।

বিশু। ওই তো সর্দারনীরা ধ্বজাপুজার ভোজে যাত্রা করেছে।

চন্দ্রা। আহা, কী সাজের ধুম। কী চেহারা। আচ্ছা বেয়াই, যদি কাজ ছেড়ে না দিতে, তুমিও ওদের দলে অমনি ধুম করে বেরতে? আর তোমার সেই স্ত্রী—

বিশু। হাঁ, আমাদেরো ওই দশা ঘটত।

চন্দ্রা। এখন আর ফেরবার পথ নেই? একেবারে না?

বিশু। আছে, নর্দমার ভিতর দিয়ে।

নেপথ্যে। পাগলভাই!

বিশু। কী পাগলী।

ফাগুলাল। ওই তোমার নন্দিনীর ডাক পড়ল। আজকের মতো বিশুদাদাকে আর পাওয়া যাবে না।

চন্দ্রা। তোমার বিশুদাদার আশা আর রেখো না। কোন্ সুখে ও তোমাকে ভুলিয়েছে বলো দেখি, বেয়াই।

বিশু। ভুলিয়েছে দুঃখে।

চন্দ্রা। বেয়াই অমন উলটিয়ে কথা কও কেন।

বিশু। তোরা বুঝবি নে। এমন দুঃখ আছে যাকে ভোলার মতো দুঃখ আর নেই।

ফাগুলাল। বিশুদাদা, পস্ট করে কথা বলো, নইলে রাগ ধরে।

বিশু। বলছি শোন্, কাছের পাওনাকে নিয়ে বাসনার যে-দুঃখ তাই পশুর, দূরের পাওনাকে নিয়ে আকাঙ্ক্ষার যে-দুঃখ তাই মানুষের। আমার সেই চিরদুঃখের দূরের আলোটি নন্দিনীর মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে।

চন্দ্রা। এ-সব কথা বুঝি নে বেয়াই, একটা কথা বুঝি যে, যে-মেয়েকে তোমরা যত কম বোঝ সেই তোমাদের তত বেশী টানে। আমরা সাদাসিধে, আমাদের দর

কম, তবু যা হ'ক তোমাদের সোজা পথে নিয়ে চলি। কিন্তু আজ বলে রাখলুম, ওই মেয়েটা ওর রক্তকরবীর মালার ফাঁসে তোমাকে সর্বনাশের পথে টেনে আনবে।

[চন্দ্রা ও ফাগুলালের প্রস্থান

নন্দিনীর প্রবেশ

নন্দিনী। পাগলভাই, দূরের রাস্তা দিয়ে আজ সকালে ওরা পৌষের গান গেয়ে মাঠে যাচ্ছিল, শুনেছিলে ?

বিশু। আমার সকাল কি তোর সকালের মতো যে, গান শুনতে পাব। এ-যে ক্লান্ত রাত্তিরটারই ঝেঁটিয়ে-ফেলা উচ্ছিষ্ট।

নন্দিনী। আজ মনের খুশিতে ভাবলুম, এখানকার প্রাকারের উপর চড়ে ওদের গানে যোগ দেব। কোথাও পথ পেলুম না, তাই তোমার কাছে এসেছি।

বিশু। আমি তো প্রাকার নই।

নন্দিনী। তুমিই আমার প্রাকার। তোমার কাছে এসে উঁচুতে উঠে বাহিরকে দেখতে পাই।

বিশু। তোমার মুখে এ কথা শুনে আশ্চর্য লাগে।

নন্দিনী। কেন।

বিশু। যক্ষপুরীতে ঢুকে অবধি এতকাল মনে হত, জীবন হতে আমার আকাশখানা হারিয়ে ফেলেছি। মনে হত, এখানকার টুকরো মানুষদের সঙ্গে আমাকে এক ঢেঁকিতে কুটে একটা পিণ্ড পাকিয়ে তুলেছে। তার মধ্যে ফাঁক নেই। এমন-সময় তুমি এসে আমার মুখের দিকে এমন করে চাইলে, আমি বুঝতে পারলুম আমার মধ্যে এখনো আলো দেখা যাচ্ছে।

নন্দিনী। পাগলভাই, এই বন্ধ গড়ের ভিতরে কেবল তোমার-আমার মাঝখানটাতেই একখানা আকাশ বেঁচে আছে। বাকি আর-সব বোজা।

বিশু। সেই আকাশটা আছে বলেই তোমাকে গান শোনাতে পারি।

গান

তোমায় গান শোনাব তাইতো আমায় জাগিয়ে রাখ,
ওগো ঘুমভাঙানিয়া।
বুকে চমক দিয়ে তাই তো ডাক,
ওগো দুখজাগানিয়া।

এল আঁধার ঘিরে,
পাখি এল নীড়ে,
তরী এল তীরে,
শুধু আমার হিয়া বিরাম পায় নাকো,
ওগো দুখজাগানিয়া।

নন্দিনী। বিশুপাগল, তুমি আমাকে বলছ 'দুখজাগানিয়া' ?

বিশু। তুমি আমার সমুদ্রের অগম পারের দূতী। যেদিন এলে যক্ষপুরীতে, আমার হৃদয়ে লোনা জলের হাওয়ায় এসে ধাক্কা দিলে।

আমার কাজের মাঝে মাঝে
কান্নাধারার দোলা তুমি থামতে দিলে না-যে।
আমায় পরশ ক'রে
প্রাণ সুধায় ভ'রে
তুমি যাও যে সরে,
বুঝি আমার ব্যথার আড়ালেতে দাঁড়িয়ে থাক,
ওগো দুখজাগানিয়া।

নন্দিনী। তোমাকে একটা কথা বলি, পাগল। যে-দুঃখটির গান তুমি গাও, আগে আমি তার খবর পাই নি।

বিশু। কেন, রঞ্জনের কাছে ?

নন্দিনী। না, দুই হাতে দুই দাঁড় ধরে সে আমাকে তুফানের নদী পার করে দেয় ; বুনো ঘোড়ার কেশর ধরে আমাকে বনের ভিতর দিয়ে ছুটিয়ে নিয়ে যায় ; লাফ-দেওয়া বাঘের দুই ভুরুর মাঝখানে তীর মেরে সে আমার ভয়কে উড়িয়ে দিয়ে হা হা করে হাসে। আমাদের নাগাই নদীতে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে স্রোতটাকে যেমন সে তোলপাড় করে, আমাকে নিয়ে তেমনি সে তোলপাড় করতে থাকে। প্রাণ নিয়ে সর্বস্ব পণ করে সে হারজিতের খেলা খেলে। সেই খেলাতেই আমাকে জিতে নিয়েছে। একদিন তুমিও তো তার মধ্যে ছিলে, কিন্তু কী মনে করে বাজিখেলার ভিড় থেকে একলা বেরিয়ে গেলে। যাবার সময় কেমন করে আমার মুখের দিকে তাকালে বুঝতে পারলুম না— তার পরে কতকাল খোঁজ পাইনি। কোথায় তুমি গেলে বলো তো।

বিশু। গান

ও চাঁদ, চোখের জলের লাগল জোয়ার দুখের পারাবারে,
হল কানায় কানায় কানাকানি এই পারে ওই পারে।
আমার তরী ছিল চেনার কূলে, বাঁধন তাহার গেল খুলে,
তারে হাওয়ায় হাওয়ায় নিয়ে গেল কোন্ অচেনার ধারে।

নন্দিনী। সেই অচেনার ধার থেকে এখানে যক্ষপুরীর সুড়ঙ্গ খোদার কাজে কে তোমাকে আবার টেনে আনলে।

বিশু। একজন মেয়ে। হঠাৎ তীর পেয়ে উড়ন্ত পাখি যেমন মাটিতে পড়ে যায়, সে আমাকে তেমনি করে এই ধুলোর মধ্যে এনে ফেলেছে; আমি নিজেকে ভুলে ছিলুম।

নন্দিনী। তোমাকে সে কেমন করে ছুঁতে পারলে।

বিশু। তৃষ্ণার জল যখন আশার অতীত হয়, মরীচিকা তখন সহজে ভোলায়। তার পরে দিকহারা নিজেকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না। একদিন পশ্চিমের জানলা দিয়ে আমি দেখছিলুম মেঘের স্বর্ণপুরী, সে দেখছিল সর্দারের সোনার চূড়া। আমাকে কটাক্ষে বললে, 'ওইখানে আমাকে নিয়ে যাও, দেখি কত বড়ো তোমার সামর্থ্য।' আমি স্পর্ধা করে বললুম, 'যাব নিয়ে।' আনলুম তাকে সোনার চূড়ার নিচে। তখন আমার ঘোর ভাঙল।

নন্দিনী। আমি এসেছি এখান থেকে তোমাকে বের করে নিয়ে যাব। সোনার শিকল ভাঙব।

বিশু। তুমি যখন এখানকার রাজাকে পর্যন্ত টলিয়েছ, তখন তোমাকে ঠেকাবে কিসে। আচ্ছা, তোমার ওকে ভয় করে না?

নন্দিনী। এই জালের বাইরে থেকে ভয় করে। কিন্তু আমি-যে ভিতরে গিয়ে দেখেছি।

বিশু। কী রকম দেখলে।

নন্দিনী। দেখলুম মানুষ, কিন্তু প্রকাণ্ড। কপালখানা যেন সাতমহলা বাড়ির সিংহদ্বার। বাহুদুটো কোন্ দুর্গম দুর্গের লোহার অর্গল। মনে হল যেন রামায়ণ-মহাভারত থেকে নেমে এসেছে কেউ।

বিশু। ঘরে ঢুকে কী দেখলে।

নন্দিনী। ওর বাঁ হাতের উপর বাজপাখি বসে ছিল; তাকে দাঁড়ের উপর

বসিয়ে ও আমার মুখে চেয়ে রইল। তার পরে, যেমন বাজপাখির পাখার মধ্যে আঙুল চালাচ্ছিল তেমনি করে আমার হাত নিয়ে আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। একটু পরে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলে, 'আমাকে ভয় করে না?' আমি বললুম, 'একটুও না।' তখন আমার খোলা চুলের মধ্যে দুই হাত ভরে দিয়ে কতক্ষণ চোখ বুজে বসে রইল।

বিশু। তোমার কেমন লাগল।

নন্দিনী। ভালো লাগল। কি-রকম বলব? ও যেন হাজার বছরের বটগাছ, আমি যেন ছোট্ট পাখি। ওর ডালের একটি ডগায় কখনো যদি একটু দোল খেয়ে যাই, নিশ্চয় ওর মজ্জার মধ্যে খুশি লাগে। ওই একলা প্রাণকে সেই খুশিটুকু দিতে ইচ্ছে করে।

বিশু। তার পরে ও কী বললে।

নন্দিনী। একসময় ঝোঁকে উঠে ওর বর্শাফলার মতো দৃষ্টি আমার মুখের উপর রেখে হঠাৎ বলে উঠল, 'আমি তোমাকে জানতে চাই।' আমার কেমন গা শিউরে উঠল। বললুম, 'জানবার কী আছে। আমি কি তোমার পুঁথি।' সে বললে, 'পুঁথিতে যা আছে সব জানি, তোমাকে জানি নে।' তার পরে কি-রকম ব্যগ্র হয়ে উঠে বললে, 'রঞ্জনের কথা আমাকে বলো। তাকে কি-রকম ভালোবাস।' আমি বললুম, 'জলের ভিতরকার হাল যেমন আকাশের উপরকার পালকে ভালোবাসে— পালে লাগে বাতাসের গান, আর হালে জাগে ঢেউয়ের নাচ।' মস্ত একটা লোভী ছেলের মতো একদৃষ্টে তাকিয়ে চুপ করে শুনলে। হঠাৎ চমকিয়ে দিয়ে বলে উঠল, 'ওর জন্যে প্রাণ দিতে পার?' আমি বললুম, 'এখ্‌খনি।' ও যেন রেগে গর্জন করে বললে, 'কখ্‌খনো না।' আমি বললুম, 'হাঁ পারি।' 'তাতে তোমার লাভ কী।' বললুম, 'জানি নে।' তখন ছটফট করে বলে উঠল, 'যাও, আমার ঘর থেকে যাও, যাও, কাজ নষ্ট করো না।' মানে বুঝতে পারলুম না।

বিশু। সব কথার পস্ট মানে ও জানতে চায়। যেটা ও বুঝতে পারে না, সেটাতে ওর মন ব্যাকুল করে দেয়, তাতেই ও রেগে ওঠে।

নন্দিনী। পাগলভাই, ওর উপর দয়া হয় না তোমার?

বিশু। যেদিন ওর 'পরে বিধাতার দয়া হবে, সেদিন ও মরবে।

নন্দিনী। না না, তুমি জান না, বেঁচে থাকবার জন্যে ও কি-রকম মরিয়া হয়ে আছে।

বিশু। ওর বাঁচা বলতে কী বোঝায়, সে তুমি আজই দেখতে পাবে; জানিনে সইতে পারবে কিনা।

নন্দিনী। ওই দেখো পাগলভাই, ওই ছায়া। নিশ্চয় সর্দার আমাদের কথা লুকিয়ে শুনেছে।

বিশু। এখানে তো চারদিকেই সর্দারের ছায়া, এড়িয়ে চলবার জো কী।— সর্দারকে কেমন লাগে?

নন্দিনী। ওর মতো মরা জিনিস দেখিনি। যেন বেতবন থেকে কেটে আনা বেত। পাতা নেই, শিকড় নেই, মজ্জায় রস নেই, শুকিয়ে লিকলিক করছে।

বিশু। প্রাণকে শাসন করবার জন্যেই প্রাণ দিয়েছে দুর্ভাগা।

নন্দিনী। চুপ করো, শুনতে পাবে।

বিশু। চুপ করাটাকেও যে শুনতে পায়, তাতে আপদ আরো বাড়ে। যখন খোদাইকরদের সঙ্গে থাকি, তখন কথায়বার্তায় সর্দারকে সামলে চলি। তাই ওরা আমাকে অপদার্থ বলে অশ্রদ্ধা করেই বাঁচিয়ে রেখেছে। ওদের দণ্ডটা দিয়েও আমাকে ছোঁয় না। কিন্তু পাগলী, তোর সামনে মনটা স্পর্ধিত হয়ে ওঠে, সাবধান হতে ঘৃণা বোধ হয়।

নন্দিনী। না না, বিপদকে তুমি ডেকে এনো না। ওই-যে সর্দার এসে পড়েছে।

সর্দারের প্রবেশ

সর্দার। কিগো ৬৯ ঙ, সকলেরই সঙ্গে তোমার প্রণয়, বাছবিচার নেই?

বিশু। এমন কি, তোমার সঙ্গেও শুরু হয়েছিল, বাছবিচার করতে গিয়েই বেধে গেল।

সর্দার। কী নিয়ে আলাপ চলছে।

বিশু। তোমাদের দুর্গ থেকে কী করে বেরিয়ে আসা যায় পরামর্শ করছি।

সর্দার। বল-কি, এত সাহস? কবুল করতেও ভয় নেই?

বিশু। সর্দার, মনে-মনে তো সব জানই। খাঁচার পাখি শলাগুলোকে ঠোকরায়, সে তো আদর করে নয়। এ কথা কবুল করলেই কী, না-করলেই কী।

সর্দার। আদর করে না, সে জানা আছে; কিন্তু কবুল করতে ভয় করে না, সেটা এই কয়েক দিন থেকে জানান দিচ্ছে।

নন্দিনী। সর্দারজি, তুমি-যে বলেছিলে, আজ রঞ্জনকে এনে দেবে। কই কথা রাখলে না?

সর্দার। আজই তাকে দেখতে পাবে।

নন্দিনী। সে আমি জানতুম। তবু আশা দিলে যখন, জয় হ'ক তোমার সর্দার, এই নাও কুন্দফুলের মালা।

বিশু। ছি ছি, মালাটা নষ্ট করলে। রঞ্জনের জন্যে রাখলে না কেন।

নন্দিনী। তার জন্যে মালা আছে।

সর্দার। আছে বই-কি, ওই বুঝি গলায় দুলছে? জয়মালা এই কুন্দফুলের, এ-যে হাতের দান,—আর বরণমালা ওই রক্তকরবীর, এ হৃদয়ের দান। ভালো ভালো, হাতের দান হাতে-হাতেই চুকিয়ে দাও, নইলে শুকিয়ে যাবে; হৃদয়ের দান, যত অপেক্ষা করবে তত তার দাম বাড়বে। [প্রস্থান

নন্দিনী। (জানলার কাছে) শুনতে পাচ্ছ?

নেপথ্যে। কী বলতে চাও বলো।

নন্দিনী। একবার জানলার কাছে এসে দাঁড়াও।

নেপথ্যে। এই এসেছি।

নন্দিনী। ঘরের মধ্যে যেতে দাও, অনেক কথা বলবার আছে।

নেপথ্যে। বারবার কেন মিছে অনুরোধ করছ। এখনো সময় হয় নি। ও কে তোমার সঙ্গে। রঞ্জনের জুড়ি নাকি।

বিশু। না রাজা, আমি রঞ্জনের ওপিঠ, যে-পিঠে আলো পড়ে না— আমি অমাবস্যা।

নেপথ্যে। তোমাকে নন্দিনীর কিসের দরকার। নন্দিনী, এ লোকটা তোমার কে।

নন্দিনী। ও আমার সাথী, ও আমাকে গান শেখায়। ওই তো শিখিয়েছে—

গান

'ভালোবাসি ভালোবাসি'
এই সুরে কাছে দূরে জলে-স্থলে বাজায় বাঁশি।

নেপথ্যে। ওই তোমার সাথী? ওকে এখনি যদি তোমার সঙ্গছাড়া করি তা-হলে কী হয়।

নন্দিনী। তোমার গলার সুর ও কি-রকম হয়ে উঠল। থামো তুমি। তোমার কেউ সঙ্গী নেই নাকি।

নেপথ্যে। আমার সঙ্গী? মধ্যাহ্নসূর্যের কেউ সঙ্গী আছে?

নন্দিনী। আচ্ছা, থাক্ ও-কথা। মা গো, তোমার হাতে ওটা কী।

নেপথ্যে। একটা মরা ব্যাঙ।

নন্দিনী। কী করবে ওকে নিয়ে।

নেপথ্যে। এই ব্যাঙ একদিন একটা পাথরের কোটরের মধ্যে ঢুকেছিল। তারি আড়ালে তিন হাজার বছর ছিল টি঳কে। এইভাবে কী করে টি঳কে থাকতে হয় তারি রহস্য ওর কাছ থেকে শিখছিলুম ; কী করে বেঁচে থাকতে হয় তা ও জানে না। আজ আর ভালো লাগল না, পাথরের আড়াল ভেঙে ফেললুম, নিরন্তর টি঳কে-থাকার থেকে ওকে দিলুম মুক্তি। ভালো খবর নয় ?

নন্দিনী। আমারো চারিদিক থেকে তোমার পাথরের দুর্গ আজ খুলে যাবে। আমি জানি, আজ রঞ্জনের সঙ্গে দেখা হবে।

নেপথ্যে। তোমাদের দুজনকে তখন একসঙ্গে দেখতে চাই।

নন্দিনী। জালের আড়ালে তোমার চশমার ভিতর দিয়ে দেখতে পাবে না।

নেপথ্যে। ঘরের ভিতরে বসিয়ে দেখব।

নন্দিনী। তাতে কী হবে।

নেপথ্যে। আমি জানতে চাই।

নন্দিনী। তুমি যখন জানবার কথা বল, কেমন ভয় করে।

নেপথ্যে। কেন।

নন্দিনী। মনে হয়, যে-জিনিসটাকে মন দিয়ে জানা যায় না, প্রাণ দিয়ে বোঝা যায়, তার 'পরে তোমার দরদ নেই।

নেপথ্যে। তাকে বিশ্বাস করতে সাহস হয় না, পাছে ঠকি। যাও তুমি, সময় নষ্ট কোরো না।— না না, একটু রোসো। তোমার অলকের থেকে ওই যে রক্তকরবীর গুচ্ছ গালের কাছে নেমে পড়েছে, আমাকে দাও।

নন্দিনী। এ নিয়ে কী হবে।

নেপথ্যে। ওই ফুলের গুচ্ছ দেখি আর মনে হয়, ওই যেন আমারি রক্ত আলোর শনিগ্রহ ফুলের রূপ ধরে এসেছে। কখনো ইচ্ছে করছে, তোমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে ছিঁড়ে ফেলি, আবার ভাবছি, নন্দিনী যদি কোনোদিন নিজের হাতে ওই মঞ্জরি আমার মাথায় পরিয়ে দেয়, তা হলে—

নন্দিনী। তা-হলে কী হবে।

নেপথ্যে। তা-হলে হয়তো আমি সহজে মরতে পারব।

নন্দিনী। একজন মানুষ রক্তকরবী ভালোবাসে, আমি তাকে মনে করে ওই ফুলে আমার কানের দুল করেছি।

নেপথ্যে। তা হলে বলে দিচ্ছি, ও আমারো শনিগ্রহ তারো শনিগ্রহ।

নন্দিনী। ছি ছি, ওকি কথা বলছ। আমি যাই।

নেপথ্যে। কোথায় যাবে।

নন্দিনী। তোমার দুর্গদুয়ারের কাছে বসে থাকব।

নেপথ্যে। কেন।

নন্দিনী। রঞ্জন যখন সেই পথ দিয়ে আসবে, দেখতে পাবে আমি তারি জন্যে অপেক্ষা করে আছি।

নেপথ্যে। রঞ্জনকে যদি দ'লে ধুলোর সঙ্গে মিলিয়ে দিই, আর তাকে একটুও চেনা না যায়।

নন্দিনী। আজ তোমার কী হয়েছে। আমাকে মিছিমিছি ভয় দেখাচ্ছ কেন।

নেপথ্যে। মিছিমিছি ভয়? জান না, আমি ভয়ংকর?

নন্দিনী। হঠাৎ তোমার একি ভাব। লোকে তোমাকে ভয় করে, এইটেই দেখতে ভালোবাস? আমাদের গাঁয়ের শ্রীকণ্ঠ যাত্রায় রাক্ষস সাজে— সে যখন আসরে নামে তখন ছেলেরা আঁতকে উঠলে সে ভারি খুশী হয়। তোমারো-যে সেই দশা। আমার কী মনে হয় সত্যি বলব? রাগ করবে না?

নেপথ্যে। কী বলো দেখি।

নন্দিনী। ভয় দেখাবার ব্যবসা এখানকার মানুষের। তোমাকে তাই তারা জাল দিয়ে ঘিরে অদ্ভুত সাজিয়ে রেখেছে। এই জুজুর পুতুল সেজে থাকতে লজ্জা করে না?

নেপথ্যে। কী বলছ, নন্দিনী।

নন্দিনী। এতদিন যাদের ভয় দেখিয়ে এসেছ তারা ভয় পেতে একদিন লজ্জা করবে। আমার রঞ্জন এখানে যদি থাকত, তোমার মুখের উপর তুড়ি মেরে সে মরত তবু ভয় পেত না।

নেপথ্যে। তোমার স্পর্ধা তো কম নয়। এতদিন যা-কিছু ভেঙে চুরমার করেছি তারি রাশকরা পাহাড়ের চূড়ার উপরে তোমাকে দাঁড় করিয়ে দেখাতে ইচ্ছে করছে। তার পরে—

নন্দিনী। তার পরে কী।

নেপথ্যে। তার পরে আমার শেষ ভাঙাটা ভেঙে ফেলি। দাড়িমের দানা ফাটিয়ে দশ আঙুলের ফাঁকে ফাঁকে যেমন তার রস বের করে, তেমনি তোমাকে আমার এই দুটো হাতে— যাও যাও, এখনি পালিয়ে যাও, এখনি।

নন্দিনী। এই রইলুম দাঁড়িয়ে! কী করতে পার করো। অমন বিশ্রী করে গর্জন করছ কেন।

নেপথ্যে। আমি যে কী অদ্ভুত নিষ্ঠুর, তার সমস্ত প্রমাণ তোমার কাছে প্রত্যক্ষ দেখিয়ে দিতে ইচ্ছে করছে। আমার ঘরের ভিতর থেকে কখনো আর্তনাদ শোন নি?

নন্দিনী। শুনেছি, সে কিসের আর্তনাদ।

নেপথ্যে। সৃষ্টিকর্তার চাতুরী আমি ভাঙি। বিশ্বের মর্মস্থানে যা লুকোনো আছে তা ছিনিয়ে নিতে চাই, সেই সব ছিন্ন প্রাণের কান্না। গাছের থেকে আগুন চুরি করতে হলে তাকে পোড়াতে হয়। নন্দিনী, তোমার ভিতরেও আছে আগুন, রাঙা আগুন। একদিন দাহন করে তাকে বের করব, তার আগে নিষ্কৃতি নেই।

নন্দিনী। কেন তুমি নিষ্ঠুর।

নেপথ্যে। আমি হয় পাব, নয় নষ্ট করব। যাকে পাই নে তাকে দয়া করতে পারি নে। তাকে ভেঙে ফেলাও খুব একরকম করে পাওয়া।

নন্দিনী। ওকি, অমন মুঠো পাকিয়ে হাত বের করছ কেন।

নেপথ্যে। আচ্ছা, হাত সরিয়ে নিচ্ছি, পালাও তুমি, পায়রা যেমন পালায় বাজপাখির ছায়া দেখে।

নন্দিনী। আচ্ছা যাই, আর তোমাকে রাগাব না।

নেপথ্যে। শোনো শোনো, ফিরে এস তুমি। নন্দিনী! নন্দিনী!

নন্দিনী। কী বলো।

নেপথ্যে। সামনে তোমার মুখে-চোখে প্রাণের লীলা, আর পিছনে তোমার কালো-চুলের ধারা মৃত্যুর নিস্তব্ধ ঝরনা। আমার এই হাতদুটো সেদিন তার মধ্যে ডুব দিয়ে মরবার আরাম পেয়েছিল। মরণের মাধুর্য আর-কখনো এমন করে ভাবি নি। সেই গুচ্ছগুচ্ছ কালোচুলের নিচে মুখ ঢেকে ঘুমোতে ভারি ইচ্ছে করছে। তুমি জান না, আমি কত শ্রান্ত।

নন্দিনী। তুমি কি কখনো ঘুমোও না।

নেপথ্যে। ঘুমোতে ভয় করে।

নন্দিনী। তোমাকে আমার গানটা শেষ করে শুনিয়ে দিই—

'ভালোবাসি ভালোবাসি'
এই সুরে কাছে দূরে জলে-স্থলে বাজায় বাঁশি।
আকাশে কার বুকের মাঝে
ব্যথা বাজে,
দিগন্তে কার কালো আঁখি আঁখির জলে যায় গো ভাসি।

নেপথ্যে। থাক্ থাক্ থামো তুমি, আর গেয়ো না।

নন্দিনী। সেই সুরে সাগরকূলে
বাঁধন খুলে
অতল রোদন উঠে দুলে
সেই সুরে বাজে মনে
অকারণে
ভুলে-যাওয়া গানের বাণী, ভোলা দিনের কাঁদনহাসি।

পাগলভাই, ওই-যে মরা ব্যাঙটা ফেলে রেখে দিয়ে কখন্ পালিয়েছে। গান শুনতে ও ভয় পায়।

বিশু। ওর বুকের মধ্যে যে বুড়ো ব্যাঙটা সকলকরম সুরের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে আছে, গান শুনলে তার মরতে ইচ্ছে করে। তাই ওর ভয় লাগে।— পাগলী, আজ তোর মুখে একটা দীপ্তি দেখছি, মনের মধ্যে কোন্ ভাবনার অরুণোদয় হয়েছে আমাকে বলবি নে?

নন্দিনী। মনের মধ্যে খবর এসে পৌঁচেছে, আজ নিশ্চয় রঞ্জন আসবে।

বিশু। নিশ্চয় খবর এল কোন্ দিক থেকে।

নন্দিনী। তবে শোনো বলি। আমার জানলার সামনে ডালিমের ডালে রোজ নীলকণ্ঠপাখি এসে বসে। আমি সন্ধে হলেই ধ্রুবতারাকে প্রণাম করে বলি, ওর ডানার একটি পালক আমার ঘরে এসে যদি উড়ে পড়ে তো জানব, আমার রঞ্জন আসবে। আজ সকালে জেগে উঠেই দেখি উত্তরে-হাওয়ায় পালক আমার বিছানায় এসে পড়ে আছে। এই দেখো আমার বুকের আঁচলে।

বিশু। তাই তো দেখছি, আর দেখছি কপালে আজ কুঙ্কুমের টিপ পরেছ।

নন্দিনী। দেখা হলে এই পালক আমি তার চুড়োয় পরিয়ে দেব।

বিশু। লোকে বলে নীলকণ্ঠের পাখায় জয়যাত্রার শুভচিহ্ন আছে।

নন্দিনী। রঞ্জনের জয়যাত্রা আমার হৃদয়ের মধ্যে দিয়ে।

বিশু। পাগলী, এখন আমি যাই আমার নিজের কাজে।

নন্দিনী। না, আজ তোমাকে কাজ করতে দেব না।

বিশু। কী করব বলো।

নন্দিনী। গান করো।

বিশু। কী গান করব।

নন্দিনী। পথচাওয়ার গান।

বিশু।

গান

যুগে যুগে বুঝি আমায় চেয়েছিল সে।
সেই বুঝি মোর পথের ধারে রয়েছে বসে।
আজ কেন মোর পড়ে মনে, কখন্ তারে চোখের কোণে
দেখেছিলেম অফুট প্রদোষে,
সেই যেন মোর পথের ধারে রয়েছে বসে।
আজ ওই চাঁদের বরণ হবে আলোর সংগীতে,
রাতের মুখের আঁধারখানি খুলবে ইঙ্গিতে।
শুক্ল রাতে সেই আলোকে দেখা হবে, এক পলকে
সব আবরণ যাবে যে খসে।
সেই যেন মোর পথের ধারে রয়েছে বসে।

নন্দিনী। পাগল, যখন তুমি গান কর তখন কেবল আমার মনে হয়, অনেক তোমার পাওনা ছিল কিন্তু কিছু তোমাকে দিতে পারি নি।

বিশু। তোর সেই কিছু-না-দেওয়া আমি ললাটে পরে চলে যাব। অল্প-কিছু-দেওয়ার দামে আমার গান বিক্রি করব না।— এখন কোথায় যাবি।

নন্দিনী। পথের ধারে, যেখান দিয়ে রঞ্জন আসবে। সেইখানে বসে আবার তোমার গান শুনব। [উভয়ের প্রস্থান

সর্দার ও মোড়লের প্রবেশ

সর্দার। না, এপাড়ায় রঞ্জনকে কিছুতে আসতে দেওয়া চলবে না।

মোড়ল। ওকে দূরে রাখব বলেই বজ্রগড়ের সুড়ঙ্গে কাজ করাতে নিয়ে গিয়েছিলুম।

সর্দার। তা কি হল।

মোড়ল। কিছুতেই পারা গেল না। সে বললে, 'হুকুম মেনে কাজ করা আমার অভ্যেস নেই।'

সর্দার। অভ্যেস এখনি শুরু করাতে দোষ কী।

মোড়ল। সে-চেষ্টা করা গেল। বড়ো মোড়ল এল কোটালকে নিয়ে। মানুষটার ভয়ডর কিছুই নেই। গলায় একটু শাসনের সুর লেগেছে কি অমনি হো হো করে হেসে ওঠে। জিজ্ঞাসা করলে বলে, 'গাম্ভীর্য নির্বোধের মুখোশ, আমি তাই খসাতে এসেছি।'

সর্দার। ওকে সুড়ঙ্গের মধ্যে দলে ভিড়িয়ে দিলে না কেন।

মোড়ল। দিয়েছিলুম, ভাবলুম চাপে পড়ে বশ মানবে। উলটো হল, খোদাইকরদের উপর থেকেও যেন চাপ নেমে গেল। তাদের মাতিয়ে তুললে, বললে, 'আজ আমাদের খোদাইনৃত্য হবে।'

সর্দার। খোদাইনৃত্য ? তার মানে কী।

মোড়ল। রঞ্জন ধরলে গান, ওরা বললে, 'মাদল পাই কোথায়', ও বললে, 'মাদল না থাকে, কোদাল আছে।' তালে তালে কোদাল পড়তে লাগল ; সোনার পিণ্ড নিয়ে সে কী লোফালুফি। বড়ো মোড়ল স্বয়ং এসে বললে, 'এ কেমন তোমার কাজের ধারা।' রঞ্জন বললে, 'কাজের রশি খুলে দিয়েছি, তাকে টেনে চালাতে হবে না, নেচে চলবে।'

সর্দার। লোকটা পাগল দেখছি।

মোড়ল। ঘোর পাগল। বললুম, 'কোদাল ধরো।' ও বলে, 'তার চেয়ে বেশী কাজ হবে যদি একটা সারেঙ্গি এনে দাও।'

সর্দার। তোমরা ওকে বজ্রগড়ে নিয়ে গিয়েছিলে, সেখান থেকে কুবেরগড়ে এল কী করে।

মোড়ল। কী জানি, প্রভু। শিকল দিয়ে তো ওকে কষে বাঁধা গেল। খানিক বাদে দেখি, কেমন করে পিছলে বেরিয়ে এসেছে— ওর গায়ে কিছু চেপে ধরে না। আর, ও কথায়-কথায় সাজ বদল ক'রে চেহারা বদল করে। আশ্চর্য ওর ক্ষমতা। কিছুদিন ও এখানে থাকলে খোদাইকরগুলো পর্যন্ত বাঁধন মানবে না।

সর্দার। ওকি। ওই-না রঞ্জন, রাস্তা দিয়ে চলেছে গান গেয়ে ? একটা ভাঙা সারেঙ্গি জোগাড় করেছে। স্পর্ধা দেখো, একটু লুকোবারও চেষ্টা নেই।

মোড়ল। তাই তো। কখন্ গারদের ভিত কেটে বেরিয়ে এসেছে। ভেলকি জানে।

সর্দার। যাও, এই বেলা ধরোগে ওকে। এপাড়ায় নন্দিনীর সঙ্গে যেন কিছুতে মিলতে না পারে।

মোড়ল। দেখতে দেখতে ওর দল ভারী হয়ে উঠছে। কখন্ আমাদের সুদ্ধ নাচিয়ে তুলবে।

ছোটো সর্দারের প্রবেশ

সর্দার। কোথায় চলেছ।

ছোটো সর্দার। রঞ্জনকে বাঁধতে চলেছি।

সর্দার। তুমি কেন। মেজো সর্দার কোথায়।

ছোটো সর্দার। ওকে দেখে তাঁর এত মজা লেগেছে, তিনি ওর গায়ে হাত দিতেই চান না। বলেন, 'আমরা সর্দাররা কি-রকম অদ্ভুত হয়ে উঠেছি, সে ওর হাসি দেখলে বুঝতে পারি।'

সর্দার। শোনো, ওকে বাঁধতে হবে না, রাজার ঘরে পাঠিয়ে দাও।

ছোটো সর্দার। ও তো রাজার ডাক মানতেই চায় না।

সর্দার। ওকে বলোগে, রাজা ওর নন্দিনীকে সেবাদাসী করে রেখেছে।

ছোটো সর্দার। কিন্তু রাজা যদি—

সর্দার। কিছু ভাবতে হবে না। চলো, আমি নিজে যাচ্ছি। [সকলের প্রস্থান

অধ্যাপক ও পুরাণবাগীশের প্রবেশ

পুরাণবাগীশ। ভিতরে একি প্রলয়কাণ্ড হচ্ছে বলো তো। ভয়ংকর শব্দ-যে!

অধ্যাপক। রাজা বোধহয় নিজের উপর নিজে রেগেছে। তাই নিজের তৈরী একটা-কিছু চুরমার করে দিচ্ছে।

পুরাণবাগীশ। মনে হচ্ছে, বড়ো বড়ো থাম হুড়মুড় করে পড়ে যাচ্ছে।

অধ্যাপক। আমাদের ওই পাহাড়তলা জুড়ে একটা সরোবর ছিল, শঙ্খিনীনদীর জল এসে তাতে জমা হত। একদিন তাঁর বাঁ দিকের পাথরের স্তূপটা কাত হয়ে পড়ল, জমা জল পাগলের অট্টহাসির মতো খল্‌খল্ করে বেরিয়ে চলে গেল। কিছুদিন থেকে রাজাকে দেখে মনে হচ্ছে, ওর সঞ্চয়সরোবরের পাথরটাতে চাড় লেগেছে, তলাটা ভিতরে ভিতরে ক্ষয়ে এসেছে।

পুরাণবাগীশ। বস্তুবাগীশ, এ কোন্ জায়গায় আমাকে আনলে, আর কী করতেই বা আনলে।

অধ্যাপক। জগতে যা-কিছু জানবার আছে, সমস্তই জানার দ্বারা ও আত্মসাৎ করতে চায়। আমার বস্তুতত্ত্ববিদ্যা প্রায় উজাড় করে নিয়েছে, এখন থেকে থেকে

রেগে উঠে বলছে, 'তোমার বিদ্যে তো সিঁধকাঠি দিয়ে একটা দেয়াল ভেঙে তার পিছনে আরেকটা দেয়াল বের করেছে। কিন্তু প্রাণপুরুষের অন্দরমহল কোথায়।' ভাবলুম, এখন কিছুদিন ওকে পুরাণ-আলোচনায় ভুলিয়ে রাখা যাক— আমার থলে ঝাড়া হয়ে গেছে, এখন পুরাবৃত্তের গাঁঠকাটা চলুক। ওই দেখতে পাচ্ছ, কে যাচ্ছে ?

পুরাণবাগীশ। একটি মেয়ে ধানীরঙের-কাপড়-পরা।

অধ্যাপক। পৃথিবীর প্রাণভরা খুশিখানা নিজের সর্বাঙ্গে টেনে নিয়েছে, ওই আমাদের নন্দিনী। এই যক্ষপুরে সর্দার আছে, মোড়ল আছে, খোদাইকর আছে, আমার মতো পণ্ডিত আছে, কোতোয়াল আছে, জল্লাদ আছে, মুর্দফরাশ আছে, সব বেশ মিশ খেয়ে গেছে। কিন্তু ও একেবারে বেখাপ। চারদিকে হাটের চেঁচামেচি, ও হল সুরবাঁধা তম্বুরা। এক-একদিন ওর চলে-যাওয়ার হাওয়াতেই আমার বস্তুচর্চার জাল ছিঁড়ে যায়। ফাঁকের মধ্যে দিয়ে মনোযোগটা বুনোপাখির মতো হুশ ক'রে উড়ে পালায়।

পুরাণবাগীশ। বল-কি হে, তোমার পাকা হাড়ে এমন ঠোকাঠুকি বাধে নাকি।

অধ্যাপক। জানার টানের চেয়ে প্রাণের টান বেশী হলেই পাঠশালা-পালাবার ঝোঁক সামলানো যায় না।

পুরাণবাগীশ। এখন বলো তো, তোমাদের রাজার সঙ্গে দেখা হবে কোথায়।

অধ্যাপক। দেখার উপায় নেই, ওই জালটার আড়াল থেকে আলাপ হবে।

পুরাণবাগীশ। বল-কি হে। এই জালের আড়াল থেকে ?

অধ্যাপক। তা নয় তো কী। ঘোমটার আড়াল থেকে যেরকম রসালাপ হতে পারে সে ধরনের না, একেবারে ছাঁকা কথা। ওর গোয়ালের গোরু বোধহয় দুধ দিতে জানে না, একেবারেই মাখন দেয়।

পুরাণবাগীশ। বাজে কথা বাদ দিয়ে আসল কথা আদায় করাই তো পণ্ডিতের অভিপ্রায়।

অধ্যাপক। কিন্তু বিধাতার নয়। তিনি আসল জিনিস সৃষ্টি করেছেন বাজে জিনিসকে লালন করবার জন্যে। তিনি সম্মান দেন ফলের আঁঠিকে, ভালোবাসা দেন ফলের শাঁসকে।

পুরাণবাগীশ। আজকাল দেখছি তোমার বস্তুতত্ত্ব ধানীরঙের দিকে একটানা ছুটে চলেছে। কিন্তু অধ্যাপক, তোমাদের এই রাজাকে তুমি সহ্য কর কী করে।

অধ্যাপক। সত্যি কথা বলব ? আমি ওকে ভালোবাসি।

পুরাণবাগীশ। বল-কি হে।

অধ্যাপক। তুমি জান না, ও এত বড়ো যে, ওর দোষগুলোও ওকে নষ্ট করতে পারে না।

সর্দারের প্রবেশ

সর্দার। ওহে বস্তুবাগীশ, বেছে বেছে এই মানুষটিকে এনেছ বুঝি! ওঁর বিদ্যের বিবরণ শুনেই আমাদের রাজা খেপে উঠেছে।

অধ্যাপক। কি-রকম।

সর্দার। রাজা বলে, পুরাণ ব'লে কিছু নেই। বর্তমানকালটাই কেবল বেড়ে বেড়ে চলেছে।

পুরাণবাগীশ। পুরাণ যদি নেই তা-হলে কিছু আছে কী করে। পিছন যদি না থাকে তো সামনেটা কি থাকতে পারে।

সর্দার। রাজা বলেন, মহাকাল নবীনকে সম্মুখে প্রকাশ করে চলেছে, পণ্ডিত সেই কথাটাকে চাপা দিয়ে বলে, মহাকাল পুরাতনকে পিছনে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

অধ্যাপক। নন্দিনীর নিবিড় যৌবনের ছায়াবীথিকায় নবীনের মায়ামৃগীকে রাজা চকিতে চকিতে দেখতে পাচ্ছেন, ধরতে পারছেন না, রেগে উঠছেন আমার বস্তুতত্ত্বর উপর।

নন্দিনীর দ্রুত প্রবেশ

নন্দিনী। সর্দার, সর্দার, ওকি! ও কারা!

সর্দার। কিগো নন্দিনী, তোমার কুঁদফুলের মালা পরব যখন ঘোর রাত হবে। অন্ধকারে যখন আমার বারো-আনাই অস্পষ্ট হয়ে উঠবে, তখন হয়তো ফুলের মালায় আমাকেও মানাতে পারে।

নন্দিনী। চেয়ে দেখো, ও কী ভয়ানক দৃশ্য। প্রেতপুরীর দরজা খুলে গেছে নাকি। ওই কারা চলেছে প্রহরীদের সঙ্গে? ওই-যে বেরিয়ে আসছে রাজার মহলের খিড়কিদরজা দিয়ে?

সর্দার। ওদের আমরা বলি রাজার এঁটো।

নন্দিনী। মানে কী।

সর্দার। মানে একদিন তুমিও বুঝবে, আজ থাক্।

নন্দিনী। কিন্তু এ-সব কী চেহারা। ওরা কি মানুষ। ওদের মধ্যে মাংসমজ্জা মনপ্রাণ কিছু কি আছে।

সর্দার। হয়তো নেই।

নন্দিনী। কোনো দিন ছিল?

সর্দার। হয়তো ছিল।

নন্দিনী। এখন গেল কোথায়।

সর্দার। বস্তুবাগীশ, পার তো বুঝিয়ে দাও, আমি চললুম। [প্রস্থান

নন্দিনী। ওকি, ওই সব ছায়াদের মধ্যে যে চেনা মুখ দেখছি। ওই তো নিশ্চয় আমাদের অনুপ আর উপমন্যু। অধ্যাপক, ওরা আমাদের পাশের গাঁয়ের লোক। দুই ভাই মাথায় যেমন লম্বা, গায়ে তেমনি শক্ত, ওদের সবাই বলে তাল-তমাল। আষাঢ়চতুর্দশীতে আমাদের নদীতে বাচ খেলতে আসত। মরে যাই, ওদের এমন দশা কে করলে। ওই-যে দেখি শকলু, তলোয়ারখেলায় সব্বার আগে পেত মালা। অনু—প, শকলু—, এই দিকে চেয়ে দেখো, এই আমি, তোমাদের নন্দিন, ঈশানী-পাড়ার নন্দিন। মাথা তুলে দেখলে না, চিরদিনের মতো মাথা হেঁট হয়ে গেছে। ওকি, কঙ্কু যে! আহা, আহা, ওর মতো ছেলেকেও যেন আখের মতো চিবিয়ে ফেলে দিয়েছে। বড়ো লাজুক ছিল; যে-ঘাটে জল আনতে যেতুম, তারি কাছে ঢালু পাড়ির 'পরে বসে থাকত, ভাণ করত যেন তীর বানাবার জন্য শর ভাঙতে এসেছে। দুষ্টমি ক'রে ওকে কত দুঃখ দিয়েছি। ও কঙ্কু, ফিরে চা আমার দিকে। হায় রে, আমার ইশারাতে যার রক্ত নেচে উঠত, সে আমার ডাকে সাড়াই দিলে না। গেল গো, আমাদের গাঁয়ের সব আলো নিবে গেল। অধ্যাপক, লোহাটা ক্ষয়ে গেছে, কালো মরচেটাই বাকি! এমন কেন হল।

অধ্যাপক। নন্দিনী, যে-দিকটাতে ছাই, তোমার দৃষ্টি আজ সেই দিকটাতেই পড়েছে। একবার শিখার দিকে তাকাও, দেখবে তার জিহ্বা লকলক করছে।

নন্দিনী। তোমার কথা বুঝতে পারছি নে।

অধ্যাপক। রাজাকে তো দেখেছ? তার মূর্তি দেখে শুনছি নাকি তোমার মন মুগ্ধ হয়েছে?

নন্দিনী। হয়েছে বই-কি। সে-যে অদ্ভুত শক্তির চেহারা।

অধ্যাপক। সেই অদ্ভুতটি হল যার জমা, এই কিম্ভূতটি হল তার খরচ। ওই ছোটোগুলো হতে থাকে ছাই, আর ওই বড়োটা জ্বলতে থাকে শিখা। এই হচ্ছে বড়ো হবার তত্ত্ব।

নন্দিনী। ও তো রাক্ষসের তত্ত্ব।

অধ্যাপক। তত্ত্বর উপর রাগ করা মিছে। সে ভালোও নয়, মন্দও নয়। যেটা হয় সেটা হয়, তার বিরুদ্ধে যাও তো হওয়ারই বিরুদ্ধে যাবে।

নন্দিনী। এই যদি মানুষের হওয়ার রাস্তা হয়, তা-হলে চাই নে আমি হওয়া— আমি ওই ছায়াদের সঙ্গে চলে যাব, আমাকে রাস্তা দেখিয়ে দাও।

অধ্যাপক। রাস্তা দেখাবার দিন এলে এরাই দেখাবে, তার আগে রাস্তা ব'লে কোনো বালাই নেই। দেখো-না, পুরাণবাগীশ আস্তে আস্তে কখন্ সরে পড়েছেন, ভেবেছেন পালিয়ে বাঁচবেন। একটু এগোলেই বুঝবেন বেড়াজাল এখান থেকে শুরু করে বহু যোজন দূর পর্যন্ত খুঁটিতে খুঁটিতে বাঁধা। নন্দিনী, রাগ করছ তুমি। তোমার কপোলে রক্তকরবীর গুচ্ছ আজ প্রলয়গোধূলির মেঘের মতো দেখাচ্ছে।

নন্দিনী। (জানলা ঠেলে) শোনো, শোনো!

অধ্যাপক। কাকে ডাকছ তুমি।

নন্দিনী। জালের কুয়াশায় ঢাকা তোমাদের রাজাকে।

অধ্যাপক। ভিতরকার কপাট পড়ে গেছে, ডাক শুনতে পাবে না।

নন্দিনী। বিশুপাগল, পাগলভাই!

অধ্যাপক। তাকে ডাকছ কেন।

নন্দিনী। এখনো-যে সে ফিরল না। আমার ভয় করছে।

অধ্যাপক। একটু আগেই তোমার সঙ্গেই তো দেখেছি।

নন্দিনী। সর্দার বললে, রঞ্জনকে চিনিয়ে দেবার জন্যে তার ডাক পড়েছে। সঙ্গে যেতে চাইলুম, দিলে না।— ও কিসের আর্তনাদ।

অধ্যাপক। এ বোধ হচ্ছে সেই পালোয়ানের।

নন্দিনী। কে সে।

অধ্যাপক। সেই-যে জগদ্বিখ্যাত গজ্জু, যার ভাই ভজন স্পর্ধা করে রাজার সঙ্গে কুস্তি করতে এল, তার পরে তার লঙোটির একটা ছেঁড়া সুতো কোথাও দেখা গেল না। সেই রাগে গজ্জু এল তাল ঠুকে। ওকে গোড়াতেই বলেছিলুম, 'এ-রাজ্যে সুড়ঙ্গ খুদতে চাও তো এসো, মরতে-মরতেও কিছুদিন বেঁচে থাকবে। আর যদি পৌরুষ দেখাতে চাও তো একমুহূর্ত সইবে না। এ বড়ো কঠিন জায়গা।'

নন্দিনী। দিনরাত এই মানুষধরা ফাঁদের খবরদারি করে এরা একটুও কি ভালো থাকে।

অধ্যাপক। ভালোর কথাটা এর মধ্যে নেই, থাকার কথাটাই আছে। এদের সেই থাকাটা এত ভয়ংকর বেড়ে গেছে যে লাখো-লাখো মানুষের উপর চাপ না দিলে এদের ভার সামলাবে কে? জাল তাই বেড়েই চলেছে। ওদের যে থাকতেই হবে।

নন্দিনী। থাকতেই হবে? মানুষ হয়ে থাকবার জন্যে যদি মরতেই হয়, তাতেই বা দোষ কী।

অধ্যাপক। আবার সেই রাগ? সেই রক্তকরবীর ঝংকার? খুব মধুর, তবুও যা সত্য তা সত্য। থাকবার জন্যে মরতে হবে, এ কথা বলে সুখ পাও তো বলো। কিন্তু থাকবার জন্যে মারতে হবে, এ কথা যারা বলে তারাই থাকে। তোমরা বল এতে মনুষ্যত্বের ত্রুটি হয়, রাগের মাথায় ভুলে যাও এইটেই মনুষ্যত্ব। বাঘকে খেয়ে বাঘ বড়ো হয় না, কেবল মানুষই মানুষকে খেয়ে ফুলে ওঠে।

পালোয়ানের প্রবেশ

নন্দিনী। আহা, ওই দেখো, কি-রকম টলতে টলতে আসছে। পালোয়ান, এইখানে শুয়ে পড়ো। অধ্যাপক, দেখো-না কোথায় চোট লেগেছে।

অধ্যাপক। বাইরে থেকে চোটের দাগ দেখতেই পাবে না।

পালোয়ান। দয়াময় ভগবান, জীবনে যেন একবার জোর পাই, আর একদিনের জন্যেও।

অধ্যাপক। কেন হে।

পালোয়ান। কেবল ওই সর্দারটার ঘাড় মটকে দেবার জন্যে।

অধ্যাপক। সর্দার তোমার কী করেছে।

পালোয়ান। সমস্তই সেই তো ঘটিয়েছে। আমি তো লড়তে চাই নি। আজ বলে বেড়াচ্ছে, আমারি দোষ।

অধ্যাপক। কেন। ওর কী স্বার্থ।

পালোয়ান। সমস্ত পৃথিবীকে নিঃশক্তি করতে পারলে তবে ওরা নিশ্চিন্ত হয়। দয়াময় হরি, একদিন যেন ওর চোখদুটো উপড়ে ফেলতে পারি, যেন ওর জিভটা টেনে বের করি।

নন্দিনী। তোমার কি-রকম বোধ হচ্ছে, পালোয়ান।

পালোয়ান। বোধ হচ্ছে ভিতরটা ফাঁপা হয়ে গেছে। এরা কোথাকার দানব, জাদু জানে, শুধু জোর নয়, একেবারে ভরসা পর্যন্ত শুষে নেয়।— যদি কোনো উপায়ে একবার— হে কল্যাণময় হরি, আঃ যদি একবার— তোমার দয়া হলে কী না হতে পারে। সর্দারের বুকে যদি একবার দাঁত বসাতে পারি।

নন্দিনী। অধ্যাপক, ওকে ধরো তুমি, দুজনে মিলে আমাদের বাসায় নিয়ে যাই।

অধ্যাপক। সাহস করি নে, নন্দিনী। এখানকার নিয়মমতে তাতে অপরাধ হবে।

নন্দিনী। মানুষটাকে মরতে দিলে অপরাধ হবে না ?

অধ্যাপক। যে-অপরাধের শাস্তি দেবার কেউ নেই সেটা পাপ হতে পারে কিন্তু অপরাধ নয়। নন্দিনী, এ-সমস্ত থেকে তুমি একেবারে চলে এসো। শিকড়ের মুঠো মেলে গাছ মাটির নিচে হরণশোষণের কাজ করে, সেখানে তো ফুল ফোটায় না। ফুল ফোটে উপরের ডালে, আকাশের দিকে। ওগো রক্তকরবী, আমাদের মাটির তলাকার খবর নিতে এসো না, উপরের হাওয়ায় তোমার দোল দেখব বলে তাকিয়ে আছি।— ওই-যে সর্দার। আমি তবে সরি। তোমার সঙ্গে কথা কই এ ও সইতে পারে না।

নন্দিনী। আমার উপরে কেন এত রাগ।

অধ্যাপক। আন্দাজে বলতে পারি। তুমি ভিতরে-ভিতরে ওর মনের তারে টান লাগিয়েছ; যতই সুর মিলছে না, বেসুর ততই কড়া হয়ে চেঁচিয়ে উঠছে।

[প্রস্থান

সর্দারের প্রবেশ

নন্দিনী। সর্দার !

সর্দার। নন্দিনী, তোমার সেই কুঁদফুলের মালাগাছটি আমার ঘরে দেখে গোঁসাইজির দুই চক্ষু— এই-যে স্বয়ং এসেছেন। প্রণাম ! প্রভু, সেই মালাটি নন্দিনী আমাকে দিয়েছিল !

গোঁসাইয়ের প্রবেশ

গোঁসাই। আহা, শুভ্র প্রাণের দান, ভগবানের শুভ্র কুন্দফুল। বিষয়ী লোকের হাতে পড়েও তার শুভ্রতা ম্লান হল না। এতেই তো পুণ্যের শক্তি আর পাপীর ত্রাণের আশা দেখতে পাই।

নন্দিনী। গোঁসাইজি, এই লোকটির একটা ব্যবস্থা করো। এর জীবনের আর কতটুকুই বা বাকি।

গোঁসাই। সবদিক ভেবে যে-পরিমাণ বাঁচা দরকার, আমাদের সর্দার নিশ্চয় ওকে ততটুকু বাঁচিয়ে রাখবে। কিন্তু বৎসে, এ-সব আলোচনা তোমাদের মুখে শ্রুতিকটু লাগে, আমরা পছন্দ করি নে।

নন্দিনী। এ-রাজ্যে বাঁচিয়ে রাখার বুঝি পরিমাণবিচার আছে ?

গোঁসাই। আছে বই-কি। পার্থিব জীবনটা যে সীমাবদ্ধ। তাই হিসাব বুঝে তার ভাগবাঁটোয়ারা করতে হয়। আমাদের শ্রেণীর লোকের 'পরে ভগবান দুঃসহ দায়িত্ব চাপিয়েছেন, সেটা বহন করতে গেলে আমাদের ভাগে প্রাণের সারাংশ অনেকটা

বেশী পরিমাণে পড়া চাই। ওদের খুব কম বাঁচলেও চলে, কেননা ওদের ভার-লাঘবের জন্যে আমরাই বাঁচি। একি ওদের পক্ষে কম বাঁচোয়া।

নন্দিনী। গোঁসাইজি, ভগবান তোমার উপরে এদের কোন্ উপকারের বিষম ভার চাপিয়েছেন।

গোঁসাই। যে-প্রাণ সীমাবদ্ধ নয়, তার অংশভাগ নিয়ে কারো সঙ্গে কারো ঝগড়ার দরকারই হয় না, আমরা গোঁসাইরা সেই প্রাণেরই রাস্তা দেখাতে এসেছি। এতেই যদি ওরা সন্তুষ্ট থাকে তবেই আমরা ওদের বন্ধু।

নন্দিনী। তবে কি এ-লোকটা ওর সীমাবদ্ধ প্রাণ নিয়ে এই-রকম আধমরা হয়েই পড়ে থাকবে।

গোঁসাই। পড়েই বা থাকবে কেন। কী বল সর্দার।

সর্দার। সে তো ঠিক। পড়ে থাকতে দেব কেন। এখন থেকে নিজের জোরে চলবার ওর দরকারই হবে না। আমাদেরই জোরে চালিয়ে নিয়ে বেড়াব। ওরে গজ্জু।

পালোয়ান। কী প্রভু।

গোঁসাই। হরি হরি, এরি মধ্যে গলা বেশ-একটু মিহি হয়ে এসেছে, মনে হচ্ছে, আমাদের নামকীর্তনের দলে টেনে নিতে পারব।

সর্দার। হ-ক্ষ পাড়ার মোড়লের ঘরে তোর বাসা হয়েছে, চলে যা সেখানে।

নন্দিনী। ওকি কথা। চলতে পারবে কেন।

সর্দার। দেখো নন্দিনী, মানুষ-চালানোই আমাদের ব্যবসা। আমরা জানি, মানুষ যেখানটাতে এসে মুখ থুবড়ে পড়ে, জোরে ঠেলা দিলে আরো খানিকটা যেতে পারে। যাও গজ্জু।

পালোয়ান। যে আদেশ।

নন্দিনী। পালোয়ান, আমিও যাচ্ছি মোড়লের ঘরে। সেখানে তো তোমাকে দেখবার কেউ নেই।

পালোয়ান। না না, থাক্, সর্দার রাগ করবে।

নন্দিনী। আমি সর্দারের রাগকে ভয় করি নে।

পালোয়ান। আমি ভয় করি, দোহাই তোমার, আমার বিপদ বাড়িয়ো না।

[প্রস্থান

নন্দিনী। সর্দার, যেয়ো না, বলে যাও আমার বিশুপাগলকে কোথায় নিয়ে গেছ।

সর্দার। আমি নিয়ে যাবার কে। বাতাস নিয়ে যায় মেঘকে, সেটাকে যদি দোষ মনে কর, খবর নাও বাতাসকে কে দিয়েছে ঠেলা।

নন্দিনী। এ কোন্ সর্বনেশে দেশ গো। তোমরাও মানুষ নও, আর যাদের চালাও তারাও মানুষ নয়? তোমরা হাওয়া, তারা মেঘ? গোঁসাই, তুমি নিশ্চয় জান, কোথায় আমার বিশুপাগল আছে।

গোঁসাই। আমি নিশ্চয় জানি, সে যেখানে থাক্ সবই ভালোর জন্যে।

নন্দিনী। কার ভালোর জন্যে।

গোঁসাই। সে তুমি বুঝবে না— আঃ, ছাড়ো, ছাড়ো, ওটা আমার জপমালা। ওই গেল ছিঁড়ে। ওহে সর্দার, এই যে মেয়েটিকে তোমরা—

সর্দার। কে জানে ও কেমন করে এখানকার নিয়মের একটা ফাঁকের মধ্যে বাসা পেয়েছে। স্বয়ং আমাদের রাজা—

গোঁসাই। ওহে, এইবার আমার নামাবলিটা-সুদ্ধ ছিঁড়বে। বিপদ করলে। আমি চললুম। [প্রস্থান

নন্দিনী। সর্দার, বলতেই হবে কোথায় নিয়ে গিয়েছ বিশুপাগলকে।

সর্দার। তাকে বিচারশালায় ডেকেছে— এর বেশি বলবার নেই। ছাড়ো আমাকে, আমার কাজ আছে।

নন্দিনী। আমি নারী বলে আমাকে ভয় কর না? বিদ্যুৎশিখার হাত দিয়ে ইন্দ্র তাঁর বজ্র পাঠিয়ে দেন। আমি সেই বজ্র বয়ে এনেছি, ভাঙবে তোমার সর্দারির সোনার চূড়া।

সর্দার। তবে সত্য কথাটা তোমাকে বলে যাই। বিশুর বিপদ ঘটিয়েছ তুমিই।

নন্দিনী। আমি!

সর্দার। হাঁ, তুমিই। এতদিন কীটের মতো নিঃশব্দে মাটির নিচে গর্ত করে সে চলেছিল, তাকে মরবার পাখা মেলতে শিখিয়েছ তুমিই, ওগো ইন্দ্রদেবের আগুন। অনেককে টানবে, তারপরে শেষ বোঝাপড়া হবে তোমাতে-আমাতে। বেশি দেরি নেই।

নন্দিনী। তাই হ'ক, কিন্তু একটা কথা বলে যাও, রঞ্জনকে আমার সঙ্গে দেখা করতে দেবে কি।

সর্দার। কিছুতে না।

নন্দিনী। কিছুতেই না! দেখব তোমার সাধ্য কিসের। তার সঙ্গে আমার মিলন হবেই, হবেই, আজই হবে। এই তোমাকে বলে দিলুম। [সর্দারের প্রস্থান

নন্দিনী। (জানলায় ঘা দিয়ে) শোনো শোনো, রাজা। কোথায় তোমার বিচারশালা। তোমার জালের এই আড়াল ভাঙব আমি। ও কে ও! কিশোর যে! বল্ তো আমায়, জানিস কি কোথায় আমাদের বিশু।

কিশোরের প্রবেশ

কিশোর। হাঁ নন্দিনী, এখনি তার সঙ্গে দেখা হবে, মনটা ঠিক করে রাখো। জানি নে, প্রহরীদের কর্তা আমার মুখ দেখে কেন দয়া করলে। আমার অনুরোধে এই পথ দিয়ে বিশুকে নিয়ে যেতে রাজী হল।

নন্দিনী। প্রহরীদের কর্তা? তবে কি—

কিশোর। হাঁ, ওই-যে আসছে।

নন্দিনী। ওকি! তোমার হাতে হাতকড়ি! পাগলভাই, তোমাকে ওরা অমন করে কোথায় নিয়ে চলেছে।

বিশুকে নিয়ে প্রহরীর প্রবেশ

বিশু। ভয় নেই, কিছু ভয় করিস নে। পাগলী, এতদিন পরে আমার মুক্তি হল।

নন্দিনী। কী বলছ বুঝতে পারছি নে।

বিশু। যখন ভয়ে-ভয়ে পদে-পদে বিপদ সামলে চলতুম তখন ছাড়া ছিলুম। সেই ছাড়ার মতো বন্ধন আর নেই।

নন্দিনী। কি দোষ করেছ যে এরা তোমাকে বেঁধে নিয়ে চলেছে।

বিশু। এতদিন পরে আজ সত্যকথা বলেছিলুম।

নন্দিনী। তাতে দোষ কী হয়েছে।

বিশু। কিচ্ছু না।

নন্দিনী। তবে এমন করে বাঁধলে কেন।

বিশু। এতেই বা ক্ষতি কী হল। সত্যের মধ্যে মুক্তি পেয়েছি— এ-বন্ধন তারি সত্য সাক্ষী হয়ে রইল।

নন্দিনী। ওরা তোমাকে পশুর মতো রাস্তা দিয়ে বেঁধে নিয়ে চলেছে, ওদের নিজেরি লজ্জা করছে না? ছি ছি, ওরাও তো মানুষ।

বিশু। ভিতরে মস্ত একটা পশু রয়েছে-যে— মানুষের অপমানে ওদের মাথা হেঁট হয় না, ভিতরকার জানোয়ারটার লেজ ফুলতে থাকে, দুলতে থাকে।

নন্দিনী। আহা পাগলভাই, ওরা কি তোমাকে মেরেছে। এ কিসের চিহ্ন তোমার গায়ে।

বিশু। চাবুক মেরেছে, যে-চাবুক দিয়ে ওরা কুকুর মারে। যে-রশিতে এই

চাবুক তৈরী সেই রশির সুতো দিয়েই ওদের গোঁসাইয়ের জপমালা তৈরী। যখন ঠাকুরের নাম জপ করে তখন সে-কথা ওরা ভুলে যায়, কিন্তু ঠাকুর খবর রাখেন।

নন্দিনী। আমাকেও এমনি করে তোমার সঙ্গে বেঁধে নিয়ে যাক, ভাই আমার। তোমার এই মার আমিও যদি কিছু না পাই তবে আজ থেকে মুখে অন্ন রুচবে না।

কিশোর। বিশু, আমি যদি চেষ্টা করি নিশ্চয় ওরা তোমার বদলে আমাকে নিতে পারে। সেই অনুমতি করো তুমি।

বিশু। এ-যে তোর পাগলের মতো কথা।

কিশোর। শাস্তিতে তো আমাকে বাজবে না, আমার বয়স অল্প, আমি খুশী হয়ে সইতে পারব।

নন্দিনী। আহা, না কিশোর, ও-কথা বলিস নে।

কিশোর। নন্দিনী, আমি আজ কামাই করেছি, ওরা তা টের পেয়েছে। আমার পিছনে ডালকুত্তা লাগিয়েছে। তারা যে অপমান করবে, এই শাস্তি তার থেকে আমাকে বাঁচাবে।

বিশু। না কিশোর, এখনো ধরা পড়লে চলবে না। একটা বিপদের কাজ করবার আছে। রঞ্জন এখানে এসেছে, যেমন করে পারিস তাকে বের করতে হবে। সহজ নয়।

কিশোর। নন্দিনী, তা-হলে বিদায় নিলুম। রঞ্জনের সঙ্গে দেখা হলে তোমার কোন্ কথা তাকে জানাব।

নন্দিনী। কিছু না। তাকে এই রক্তকরবীর গুচ্ছ দিলেই আমার সব কথা জানানো হবে। [কিশোরের প্রস্থান

বিশু। এইবার রঞ্জনের সঙ্গে তোমার মিলন হ'ক।

নন্দিনী। মিলনে আমার আর সুখ হবে না। এ-কথা কোনোদিন ভুলতে পারব না যে, তোমাকে শূন্যহাতে বিদায় দিয়েছি। আর ওই-যে বালক কিশোর, ও আমার কাছ থেকে কী বা পেলে।

বিশু। মনে যে-আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছ, তাতে ওর অন্তরের ধন সব প্রকাশ পেয়েছে। আর কী চাই। মনে আছে, সেই নীলকণ্ঠের পালক রঞ্জনের চূড়ায় পরিয়ে দিতে হবে ?

নন্দিনী। এই-যে রয়েছে আমার বুকের আঁচলে।

বিশু। পাগলী, শুনতে পাচ্ছিস ওই ফসলকাটার গান ?

নন্দিনী। শুনতে পাচ্ছি, প্রাণ কেঁদে উঠছে।

বিশু। মাঠের লীলা শেষ হল, খেতের মালিক পাকা ফসল ঘরে নিয়ে চলল। চলো প্রহরী, আর দেরি নয়—

গান

শেষ ফলনের ফসল এবার কেটে লও, বাঁধো আঁটি,
বাকি যা নয় গো নেবার মাটিতে হ'ক তা মাটি।

[সকলের প্রস্থান

চিকিৎসক ও সর্দারের প্রবেশ

চিকিৎসক। দেখলুম। রাজা নিজের 'পরে নিজে বিরক্ত হয়ে উঠেছেন। এ-রোগ বাইরের নয়, মনের।

সর্দার। এর প্রতিকার কী।

চিকিৎসক। বড়ো-রকমের ধাক্কা। হয় অন্য রাজ্যের সঙ্গে, নয় নিজের প্রজাদের মধ্যে উৎপাত বাধিয়ে তোলা।

সর্দার। অর্থাৎ আর-কারো ক্ষতি করতে না দিলে, উনি নিজের ক্ষতি করবেন।

চিকিৎসক। ওরা বড়োলোক, বড়ো-শিশু, খেলা করে। একটা খেলায় যখন বিরক্ত হয়, তখন আরেকটা খেলা না জুগিয়ে দিলে নিজের খেলনা ভাঙে। কিন্তু প্রস্তুত থাকো সর্দার, আর বড়ো দেরি নেই।

সর্দার। লক্ষণ দেখে আমি আগেই সব প্রস্তুত রেখেছি। কিন্তু হায় হায়, কী দুঃখ। আমাদের স্বর্ণপুরী যে-রকম ঐশ্বর্যে ভরে উঠেছিল, এমন কোনোদিন হয় নি, ঠিক এই সময়টাতেই— আচ্ছা যাও, ভেবে দেখছি। [চিকিৎসকের প্রস্থান

মোড়লের প্রবেশ

মোড়ল। সর্দারমহারাজ, ডেকেছেন ? আমি এ পাড়ার মোড়ল।

সর্দার। তুমিই তো তিনশো একুশ ?

মোড়ল। প্রভুর কী স্মরণশক্তি। আমার মতো অভাজনকেও ভোলেন না।

সর্দার। দেশ থেকে আমার স্ত্রী আসছে। তোমাদের পাড়ার কাছে ডাক বদল হবে, শীঘ্র এখানে পৌঁছিয়ে দেওয়া চাই।

মোড়ল। পাড়ায় গোরুর মড়ক, গাড়ি টানবার মতো বলদের অভাব। তা হ'ক, খোদাইকরদের লাগিয়ে দেওয়া যাবে।

সর্দার। কোথায় যেতে হবে জান তো? বাগানবাড়িতে, যেখানে সর্দারদের ভোজ।

মোড়ল। যাচ্ছি, কিন্তু একটা কথা বলে দিয়ে যাই। একটু কান দেবেন। ওই-যে ৬৯ ঙ, লোকে যাকে বিশুপাগল বলে, ওর পাগলামিটাকে শোধন করবার সময় এসেছে।

সর্দার। কেন। তোমাদের 'পরে উৎপাত করে নাকি।

মোড়ল। মুখের কথায় নয়, ভাবে-ভঙ্গীতে।

সর্দার। আর ভাবনা নেই। বুঝেছ?

মোড়ল। তাই নাকি। তা-হলে ভালো। আরেকটা কথা, ওই-যে ৪৭ ফ, ৬৯ ঙর সঙ্গে ওর কিছু বেশী মেশামেশি।

সর্দার। সেটা লক্ষ্য করেছি।

মোড়ল। প্রভুর লক্ষ্য ঠিকই আছে। তবু নানান দিকে দৃষ্টি রাখতে হয় নাকি— দুই-একটা ফসকিয়ে যেতেও পারে। এই দেখুন-না, আমাদের ৯৫— গ্রামসম্পর্কে আমার পিসশ্বশুর— পাঁজরের হাড়ক'খানা দিয়ে সর্দারমহারাজের ঝাড়ুবর্দারের খড়ম বানিয়ে দিতে প্রস্তুত, প্রভুভক্তি দেখে স্বয়ং তার সহধর্মিণী লজ্জায় মাথা হেঁট করে, অথচ আজ পর্যন্ত—

সর্দার। তার নাম বড়ো-খাতায় উঠেছে।

মোড়ল। যাক, সার্থক হল এতকালের সেবা। খবরটা তাকে সাবধানে শোনাতে হবে, তার আবার মৃগীরোগ আছে, কী জানি হঠাৎ –

সর্দার। আচ্ছা, সে হবে, তুমি যাও শিগ্‌গির।

মোড়ল। আর একজন মানুষের কথা বলবার আছে— সে যদিচ আমার আপন শালা, তার মা মরে গেলে আমার স্ত্রী তাকে নিজের হাতে মানুষ করেছে, তবুও যখন মনিবের নিমক—

সর্দার। তার কথা কাল হবে, তুমি দৌড়ে চলে যাও।

মোড়ল। মেজো সর্দারবাহাদুর ওই আসছেন। ওঁকে আমার হয়ে দুটো কথা বলবেন। আমার উপর ওঁর ভালো নজর নেই। আমার বিশ্বাস প্রভুদের মহলে ৬৯ ঙর যখন যাওয়া-আসা ছিল, তখনি সে আমার নামে—

সর্দার। না না, কোনোদিন তোমার নাম করতেও তাকে শুনি নি।

মোড়ল। সেই তো ওর চালাকি। যে-মানুষ নামজাদা তার নাম চাপা দিয়েই তো তাকে মারতে হয়। কৌশলে ইশারায় লাগালাগি করা তো ভালো নয়। ওই রোগটি আছে আমাদের তেত্রিশের। তার তো দেখি আর-কোনো কাজ নেই, যখন-তখন প্রভুদের খাসমহলে যাওয়া-আসা চলছেই। ভয় হয়, কার নামে কী বানিয়ে বসে। অথচ ওঁর নিজের ঘরের খবরটি যদি—

সর্দার। আজ আর সময় নেই, শিগ্‌গির যাও।

মোড়ল। তবে প্রণাম হই। (ফিরে এসে) একটি কথা, ওপাড়ার অষ্ট-আশি সেদিন মাত্র তিরিশ তনখায় কাজে ঢুকল, দুটো বছর না যেতেই উপরিপাওনা ধরে ওর আয় আজ কিছু না হবে তো মাসে হাজার-দেড়হাজার তো হবেই। প্রভুদের সাদা মন, দেবতার মতো ফাঁকা স্তবেই ভোলেন। সাষ্টাঙ্গে প্রণামের ঘটা দেখেই—

সর্দার। আচ্ছা আচ্ছা, সে-কথা কাল হবে।

মোড়ল। আমার তো দয়াধর্ম আছে, আমি তার রুটি মারার কথা বলি নে; কিন্তু তাকে খাতাঞ্চিখানায় রাখাটা ভালো হচ্ছে কিনা ভেবে দেখবেন। আমাদের বিষ্ণুদত্ত তার নাড়ীনক্ষত্র জানে। তাকে ডাকিয়ে নিয়ে—

সর্দার। আজই ডাকাব, তুমি যাও।

মোড়ল। প্রভু, আমার সেজো ছেলে লায়েক হয়ে উঠেছে। প্রণাম করতে এসেছিল, তিন দিন হাঁটাহাঁটি করে দর্শন না পেয়ে ফিরে গেছে। বড়োই মনের দুঃখে আছে। প্রভুর ভোগের জন্যে আমার বধূমাতা নিজের হাতে তৈরী ছাঁচিকুমড়োর—

সর্দার। আচ্ছা, পরশু আসতে বোলো, দেখা মিলবে। [মোড়লের প্রস্থান

মেজো সর্দারের প্রবেশ

মেজো সর্দার। নাচওয়ালী আর বাজনদারদের বাগানে রওনা করে দিয়ে এলুম।

সর্দার। আর, রঞ্জনের সেটা কত দূর—

মেজো সর্দার। এ-সব কাজ আমার দ্বারা হয় না। ছোটো সর্দার নিজে পছন্দ করে ভার নিয়েছে। এতক্ষণে তার—

সর্দার। রাজা কি—

মেজো সর্দার। রাজা নিশ্চয় বুঝতে পারেন নি। দশজনের সঙ্গে মিশিয়ে তাকে —কিন্তু রাজাকে এরকম ঠকানো আমি তো কর্তব্য মনে করি নে।

সর্দার। রাজার প্রতি কর্তব্যের অনুরোধেই রাজাকে ঠকাতে হয়, রাজাকে ঠেকাতেও হয়। সে দায় আমার। এবার কিন্তু ওই মেয়েটাকে অবিলম্বে—

মেজো সর্দার। না না, এ-সব কথা আমার সঙ্গে নয়। যে-মোড়লের উপর ভার দেওয়া হয়েছে সে যোগ্য লোক, সে কোনোরকম নোংরামিকেই ভয় করে না।

সর্দার। কেনারাম গোঁসাই কি জানে রঞ্জনের কথা।

মেজো সর্দার। আন্দাজে সবই জানে, পস্ট জানতে চায় না।

সর্দার। কেন।

মেজো সর্দার। পাছে 'জানি নে' এই কথা বলবার পথ বন্ধ হয়ে যায়।

সর্দার। হলই বা।

মেজো সর্দার। বুঝছ না? আমাদের তো শুধু একটা চেহারা, সর্দারের চেহারা। কিন্তু ওর-যে এক পিঠে গোঁসাই, আরেক পিঠে সর্দার। নামাবলিটা একটু ফেঁসে গেলেই সেটা ফাঁস হয়ে পড়ে। তাই সর্দারিধর্মটা নিজের অগোচরে পালন করতে হয়, তা-হলে নামজপের বেলায় খুব বেশী বাধে না।

সর্দার। নামজপটা না-হয় ছেড়েই দিত।

মেজো সর্দার। কিন্তু এদিকে যে ওর মনটা ধর্মভীরু, রক্তটা যাই হ'ক। তাই স্পষ্টভাবে নামজপ আর অস্পষ্টভাবে সর্দারি করতে পারলে ও সুস্থ থাকে। ও আছে বলেই আমাদের দেবতা আরামে আছে, তার কলঙ্ক ঢাকা পড়েছে, নইলে চেহারাটা ভালো দেখাত না।

সর্দার। মেজো সর্দার, তোমারো দেখেছি রক্তের সঙ্গে সর্দারির রক্তের মিল হয় নি।

মেজো সর্দার। রক্ত শুকিয়ে এলেই বালাই থাকবে না, এখনো সে-আশা আছে। কিন্তু আজো তোমার ওই তিনশো-একুশকে সইতে পারি নে। যাকে দূর থেকে চিমটে দিয়ে ছুঁতেও ঘেন্না করে, তাকে যখন সভার মাঝখানে সুহৃদ ব'লে বুকে জড়িয়ে ধরতে হয়, তখন কোনো তীর্থজলে স্নান করে নিজেকে শুচি বোধ হয় না।— ওই-যে নন্দিনী আসছে।

সর্দার। চলে এসো, মেজো সর্দার।

মেজো সর্দার। কেন। ভয় কিসের।

সর্দার। তোমাকে বিশ্বাস করি নে; আমি জানি, তোমার চোখে নন্দিনীর ঘোর লেগেছে।

মেজো সর্দার। কিন্তু তুমি জানো না যে, তোমার চোখেও কর্তব্যের রঙের

সঙ্গে রক্তকরবীর রঙ কিছু যেন মিশেছে, তাতেই রক্তিমা এতটা ভয়ংকর হয়ে উঠল।

সর্দার। তা হবে, মনের কথা মন নিজেও জানে না। তুমি চলে এসো আমার সঙ্গে। [উভয়ের প্রস্থান

নন্দিনীর প্রবেশ

নন্দিনী। দেখতে দেখতে সিঁদুরে মেঘে আজকের গোধূলি রাঙা হয়ে উঠল। ওই-কি আমাদের মিলনের রঙ। আমার সিঁথের সিঁদুর যেন সমস্ত আকাশে ছড়িয়ে গেছে। (জানলায় ঘা দিয়ে) শোনো, শোনো, শোনো। দিনরাত এখানে পড়ে থাকব, যতক্ষণ না শোনো।

গোঁসাইয়ের প্রবেশ

গোঁসাই। ঠেলছ কাকে।

নন্দিনী। তোমাদের যে-অজগর আড়ালে থেকে মানুষ গেলে তাকে।

গোঁসাই। হরি হরি, ভগবান যখন ছোটোকে মারেন তখন তার ছোটোমুখে বড়োকথা দিয়েই মারেন। দেখো নন্দিনী, তুমি নিশ্চয় জেনো, আমি তোমার মঙ্গল চিন্তা করি।

নন্দিনী। তাতে আমার মঙ্গল হবে না।

গোঁসাই। এসো আমার ঠাকুরঘরে, তোমাকে নাম শোনাইগে।

নন্দিনী। শুধু নাম নিয়ে করব কী।

গোঁসাই। মনে শান্তি পাবে।

নন্দিনী। শান্তি যদি পাই তবে ধিক্‌ ধিক্‌ ধিক্‌ আমাকে। আমি এই দরজায় অপেক্ষা করে বসে থাকব।

গোঁসাই। দেবতার চেয়ে মানুষের 'পরে তোমার বিশ্বাস বেশী?

নন্দিনী। তোমাদের ওই ধ্বজদণ্ডের দেবতা, সে কোনো দিনই নরম হবে না। কিন্তু জালের আড়ালের মানুষ চিরদিনই কি জালে বাঁধা থাকবে। যাও যাও, যাও। মানুষের প্রাণ ছিঁড়ে নিয়ে তাকে নাম দিয়ে ভোলাবার ব্যবসা তোমার।

[গোঁসাইয়ের প্রস্থান

ফাগুলাল ও চন্দ্রার প্রবেশ

ফাগুলাল। বিশু তোমার সঙ্গে এল, সে এখন কোথায়। সত্য করে বলো।

নন্দিনী। তাকে বন্দী করে নিয়ে গেছে।

চন্দ্রা। রাক্ষসী, তুই তাকে ধরিয়ে দিয়েছিস। তুই ওদের চর।

নন্দিনী। কোন্ মুখে এমন কথা বলতে পারলে।

চন্দ্রা। নইলে এখানে তোর কী কাজ। কেবল সবার মন ভুলিয়ে ভুলিয়ে ঘুরে বেড়াস।

ফাগুলাল। এখানে সবাই সবাইকে সন্দেহ করে, কিন্তু তবু তোমাকে আমি বিশ্বাস করে এসেছি। মনে-মনে তোমাকে— সে-কথা থাক্। কিন্তু আজ কেমনতরো ঠেকছে যে।

নন্দিনী। হবে, তা হবে। আমার সঙ্গে এসেই বিপদে পড়েছে। তোমাদের কাছে নিরাপদে থাকত, সে-কথা নিজেই বললে।

চন্দ্রা। তবে কেন আনলি ওকে ভুলিয়ে! সর্বনাশী!

নন্দিনী। ও-যে বললে, ও মুক্তি চায়।

চন্দ্রা। ভালো মুক্তি দিয়েছিস ওকে।

নন্দিনী। আমি তো ওর সব কথা বুঝতে পারি নে, চন্দ্রা। ও কেন আমাকে বললে, বিপদের তলায় তলিয়ে গিয়ে তবে মুক্তি। ফাগুলাল, নিরাপদের মার থেকে মুক্তি চায় যে-মানুষ, আমি তাকে বাঁচাব কী করে।

চন্দ্রা। ও-সব কথা বুঝি নে। ওকে ফিরিয়ে যদি না আনতে পারিস মরবি, মরবি। তোর ওই সুন্দরপানা মুখখানা দেখে আমি ভুলি নে।

ফাগুলাল। চন্দ্রা, মিছে বকাবকি করে কী হবে। কারিগরপাড়া থেকে দলবল জুটিয়ে আনি। বন্দীশালা চুরমার করে ভাঙব।

নন্দিনী। আমি যাব তোমাদের সঙ্গে।

ফাগুলাল। কী করতে যাবে।

নন্দিনী। ভাঙতে যাব।

চন্দ্রা। ওগো, অনেক ভাঙন ভেঙেছ মায়াবিনী! আর কাজ নেই।

গোকুলের প্রবেশ

গোকুল। সবার আগে ওই ডাইনীকে পুড়িয়ে মারতে হবে।

চন্দ্রা। মারবে? তাতে ওর শাস্তি হবে না। যে-রূপ নিয়ে ও সর্বনাশ করে, সেই রূপটা দাও ঘুচিয়ে। খুরপো দিয়ে যেমন করে ঘাস নিড়োয়, তেমনি করে ওর রূপ দাও নিড়িয়ে।

গোকুল। তা পারি। একবার এই হাতুড়ির নাচনটা—

ফাগুলাল। খবরদার! ওর গায়ে হাত দাও যদি তা-হলে—

নন্দিনী। ফাগুলাল, তুমি থামো। ও ভীরু, আমাকে ভয় করে তাই আমাকে মারতে চায়। আমি ওর মারকে ভয় করিনে। কী করতে পারে করুক কাপুরুষ।

গোকুল। ফাগুলাল, এখনো তোমার চৈতন্য হয় নি! সর্দারকেই তুমি শত্রু বলে জান! তা হ'ক যে-শত্রু সহজ শত্রু তাকে শ্রদ্ধা করি, কিন্তু তোমাদের ওই মিষ্টিমুখী সুন্দরী—

নন্দিনী। সর্দারকে তোমার শ্রদ্ধা! পায়ের তলাটাকে পায়ের তলার কাদার শ্রদ্ধা যে-রকম। যে দাস সে কখনো শ্রদ্ধা করতে পারে?

ফাগুলাল। গোকুল, তোমার পৌরুষ দেখাবার সময় এসেছে। কিন্তু বালিকার কাছে নয়। চলো আমার সঙ্গে।

[ফাগুলাল চন্দ্রা ও গোকুলের প্রস্থান

একদল লোকের প্রবেশ

নন্দিনী। ওগো, কোথায় চলেছ তোমরা।

প্রথম। ধ্বজাপূজার নৈবেদ্য নিয়ে চলেছি।

নন্দিনী। রঞ্জনকে দেখেছ?

দ্বিতীয়। তাকে পাঁচদিন আগে একবার দেখেছিলুম, আর দেখি নি। ওই ওদের জিজ্ঞাসা করো, হয়তো বলতে পারবে।

নন্দিনী। ওরা কারা।

তৃতীয়। ওরা সর্দারের ভোজে মদ নিয়ে যাচ্ছে। [এই দলের প্রস্থান

অন্য দলের প্রবেশ

নন্দিনী। ওগো লালটুপিরা, রঞ্জনকে তোমরা দেখেছ?

প্রথম। সেদিন রাতে শম্ভুমোড়লের বাড়িতে দেখেছি।

নন্দিনী। এখন কোথায় আছে সে?

দ্বিতীয়। ওই-যে সর্দারনীদের ভোজে সাজ নিয়ে চলেছে, ওদের জিজ্ঞাসা করো, ওরা অনেক কথা শুনতে পায় যা আমাদের কানে পৌঁছয় না।

[এই দলের প্রস্থান

অন্য দলের প্রবেশ

নন্দিনী। ওগো, রঞ্জনকে এরা কোথায় রেখেছে তোমরা কি জান।

প্রথম। চুপ চুপ।

নন্দিনী। তোমরা নিশ্চয় জান, আমাকে বলতেই হবে।

দ্বিতীয়। আমাদের কান দিয়ে যা ঢোকে মুখ দিয়ে তা বেরোয় না, তাই টিঁকে আছি। ওই-যে অস্ত্রের ভার নিয়ে আসছে, ওদের জিজ্ঞাসা করো।

[এই দলের প্রস্থান

অন্য দলের প্রবেশ

নন্দিনী। ওগো, একটু থামো, বলে যাও রঞ্জন কোথায়।

প্রথম। শোনো বলি, লগ্ন হয়ে এসেছে। ধ্বজাপুজায় রাজাকে বেরোতেই হবে। তাঁকেই জিজ্ঞাসা করো। আমরা শুরুটা জানি, শেষটা জানি নে। [প্রস্থান

নন্দিনী। (জানলায় ঘা দিয়ে) সময় হয়েছে, দরজা খোলো।

নেপথ্যে। আবার এসেছ অসময়ে। এখনি যাও, যাও তুমি।

নন্দিনী। অপেক্ষা করবার সময় নেই, শুনতেই হবে আমার কথা!

নেপথ্যে। কী বলবার আছে বাইরে থেকে বলে চলে যাও।

নন্দিনী। বাইরে থেকে কথার সুর তোমার কানে পৌঁছয় না।

নেপথ্যে। আজ ধ্বজাপুজা, আমার মন বিক্ষিপ্ত কোরো না। পুজার ব্যাঘাত হবে। যাও, যাও! এখনি যাও।

নন্দিনী। আমার ভয় ঘুচে গেছে। অমন করে তাড়াতে পারবে না। মরি সেও ভালো, দরজা না খুলিয়ে নড়ব না।

নেপথ্যে। রঞ্জনকে চাও বুঝি? সর্দারকে বলে দিয়েছি, এখনি তাকে এনে দেবে। পুজোয় যাবার সময় দরজায় দাঁড়িয়ে থেকো না। বিপদ ঘটবে।

নন্দিনী। দেবতার সময়ের অভাব নেই, পুজোর জন্যে যুগযুগান্তর অপেক্ষা করতে পারেন। মানুষের দুঃখ মানুষের নাগাল চায় যে। তার সময় অল্প।

নেপথ্যে। আমি ক্লান্ত, ভারি ক্লান্ত। ধ্বজাপুজায় অবসাদ ঘুচিয়ে আসব। আমাকে দুর্বল কোরো না। এখন বাধা দিলে রথের চাকায় গুঁড়িয়ে যাবে।

নন্দিনী। বুকের উপর দিয়ে চাকা চলে যাক, নড়ব না।

নেপথ্যে। নন্দিনী, আমার কাছ থেকে তুমি প্রশ্রয় পেয়েছ, তাই ভয় কর না। আজ ভয় করতেই হবে।

নন্দিনী। আমি চাই, সবাইকে যেমন ভয় দেখিয়ে বেড়াও, আমাকেও তেমনি ভয় দেখাবে। তোমার প্রশ্রয়কে ঘৃণা করি।

নেপথ্যে। ঘৃণা কর? স্পর্ধা চূর্ণ করব। তোমাকে আমার পরিচয় দেবার সময় এসেছে।

নন্দিনী। পরিচয়ের অপেক্ষাতেই আছি, খোলো দ্বার। (দ্বার উদ্‌ঘাটন) ওকি! ওই কে প'ড়ে। রঞ্জনের মতো দেখছি যেন!

রাজা। কী বললে। রঞ্জন? কখনোই রঞ্জন নয়।

নন্দিনী। হাঁ গো, এই তো আমার রঞ্জন।

রাজা। ও কেন বললে না ওর নাম। কেন এমন স্পর্ধা করে এল।

নন্দিনী। জাগো রঞ্জন, আমি এসেছি তোমার সখী। রাজা, ও জাগে না কেন।

রাজা। ঠকিয়েছে। আমাকে ঠকিয়েছে এরা। সর্বনাশ! আমার নিজের যন্ত্র আমাকে মানছে না। ডাক্ তোরা, সর্দারকে ডেকে আন, বেঁধে নিয়ে আয় তাকে।

নন্দিনী। রাজা, রঞ্জনকে জাগিয়ে দাও, সবাই বলে তুমি জাদু জান, ওকে জাগিয়ে দাও।

রাজা। আমি যমের কাছে জাদু শিখেছি, জাগাতে পারি নে। জাগরণ ঘুচিয়ে দিতেই পারি।

নন্দিনী। তবে আমাকে ওই ঘুমেই ঘুম পাড়াও। আমি সইতে পারছি নে। কেন এমন সর্বনাশ করলে।

রাজা। আমি যৌবনকে মেরেছি— এতদিন ধরে আমি সমস্ত শক্তি নিয়ে কেবল যৌবনকে মেরেছি। মরা-যৌবনের অভিশাপ আমাকে লেগেছে।

নন্দিনী। ও কি আমার নাম বলে নি।

রাজা। এমন করে বলেছিল, সে আমি সইতে পারি নি। হঠাৎ আমার নাড়ীতে নাড়ীতে যেন আগুন জ্বলে উঠল।

নন্দিনী। (রঞ্জনের প্রতি) বীর আমার, নীলকণ্ঠপাখির পালক এই পরিয়ে দিলুম তোমার চূড়ায়। তোমার জয়যাত্রা আজ হতে শুরু হয়েছে। সেই যাত্রার বাহন আমি।— আহা, এই-যে ওর হাতে সেই আমার রক্তকরবীর মঞ্জরি। তবে তো কিশোর ওকে দেখেছিল। সে কোথায় গেল। রাজা, কোথায় সেই বালক।

রাজা। কোন্ বালক।

নন্দিনী। যে-বালক এই ফুলের মঞ্জরি রঞ্জনকে এনে দিয়েছিল।

রাজা। সে-যে অদ্ভুত ছেলে। বালিকার মতো তার কচি মুখ, কিন্তু উদ্ধত তার বাক্য। সে স্পর্ধা করে আমাকে আক্রমণ করতে এসেছিল।

নন্দিনী। তার পরে? কী হল তার। বলো কী হল। বলতেই হবে, চুপ করে থেকো না।

রাজা। বুদ্‌বুদের মতো সে লুপ্ত হয়ে গেছে।

নন্দিনী। রাজা, এইবার সময় হল।

রাজা। কিসের সময়।

নন্দিনী। আমার সমস্ত শক্তি নিয়ে তোমার সঙ্গে আমার লড়াই।

রাজা। আমার সঙ্গে লড়াই করবে তুমি! তোমাকে-যে এই মুহূর্তেই মেরে ফেলতে পারি।

নন্দিনী। তার পর থেকে মুহূর্তে মুহূর্তে আমার সেই মরা তোমাকে মারবে। আমার অস্ত্র নেই, আমার অস্ত্র মৃত্যু।

রাজা। তা-হলে কাছে এসো। সাহস আছে আমাকে বিশ্বাস করতে? চলো আমার সঙ্গে। আজ আমাকে তোমার সাথী করো, নন্দিন।

নন্দিনী। কোথায় যাব?

রাজা। আমার বিরুদ্ধে লড়াই করতে, কিন্তু আমারি হাতে হাত রেখে। বুঝতে পারছ না? সেই লড়াই শুরু হয়েছে। এই আমার ধ্বজা, আমি ভেঙে ফেলি ওর দণ্ড, তুমি ছিঁড়ে ফেলো ওর কেতন। আমারি হাতের মধ্যে তোমার হাত এসে আমাকে মারুক, মারুক, সম্পূর্ণ মারুক তাতেই আমার মুক্তি।

দলের লোক। মহারাজ, এ কী কাণ্ড। এ কী উন্মত্ততা। ধ্বজা ভাঙলেন! আমাদের দেবতার ধ্বজা, যার অজেয় শল্যের এক দিক পৃথিবীকে অন্য দিক স্বর্গকে বিদ্ধ করেছে, সেই আমাদের মহাপবিত্র ধ্বজদণ্ড! পুজার দিনে কী মহাপাতক। চল্, সর্দারদের খবর দিইগে। [প্রস্থান

রাজা। এখনো অনেক ভাঙা বাকি, তুমিও তো আমার সঙ্গে যাবে নন্দিনী, প্রলয়পথে আমার দীপশিখা?

নন্দিনী। যাব আমি।

ফাগুলালের প্রবেশ

ফাগুলাল। বিশুকে ওরা কিছুতেই ছেড়ে দেবে না। এ কে। এই বুঝি রাজা? ডাকিনী, ওর সঙ্গে পরামর্শ চলছে! বিশ্বাসঘাতিনী!

রাজা। কী হয়েছে তোমাদের। কী করতে বেরিয়েছ।

ফাগুলাল। বন্দীশালার দরজা ভাঙতে, মরি তবু ফিরব না।

রাজা। ফিরবে কেন। ভাঙার পথে আমিও চলেছি। ওই তার প্রথম চিহ্ন। আমার ভাঙা ধ্বজা, আমার শেষ কীর্তি।

ফাগুলাল। নন্দিন, ভালো বুঝতে পারছি নে। আমরা সরল মানুষ, দয়া করো, আমাদের ঠকিয়ো না। তুমি-যে আমাদেরই ঘরের মেয়ে।

নন্দিনী। ফাগুভাই, তোমরা তো মৃত্যুকেই পণ করেছ, ঠকবার তো কিছুই বাকি রাখলে না।

ফাগুলাল। নন্দিন, তুমিও তবে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলো।

নন্দিনী। আমি তো সেইজন্যেই বেঁচে আছি। ফাগুলাল, আমি চেয়েছিলুম রঞ্জনকে তোমাদের সকলের মধ্যে আনতে। ওই দেখো, এসেছে আমার বীর, মৃত্যুকে তুচ্ছ ক'রে।

ফাগুলাল। সর্বনাশ! ওই কি রঞ্জন! নিঃশব্দ পড়ে আছে!

নন্দিনী। নিঃশব্দ নয়। মৃত্যুর মধ্যে তার অপরাজিত কণ্ঠস্বর আমি-যে এই শুনতে পাচ্ছি। রঞ্জন বেঁচে উঠবে— ও কখনো মরতে পারে না।

ফাগুলাল। হায় রে নন্দিনী, সুন্দরী আমার! এইজন্যই কি তুমি এতদিন অপেক্ষা করে ছিলে আমাদের এই অন্ধ নরকে।

নন্দিনী। ও আসবে বলে অপেক্ষা করে ছিলুম, ও তো এল। ও আবার আসার জন্যে প্রস্তুত হব, ও আবার আসবে।— চন্দ্রা কোথায়, ফাগুলাল।

ফাগুলাল। সে গেছে গোকুলকে নিয়ে সর্দারের কাছে কাঁদাকাটি করতে। সর্দারের 'পরে তাদের অগাধ বিশ্বাস।— কিন্তু মহারাজ, ভুল বোঝ নি তো? আমরা তোমারি বন্দীশালা ভাঙতে বেরিয়েছি।

রাজা। হাঁ, আমারি বন্দীশালা। তোমাতে আমাতে দুজনে মিলে কাজ করতে হবে। একলা তোমার কাজ নয়।

ফাগুলাল। সর্দাররা খবর পেলেই ঠেকাতে আসবে।

রাজা। তাদের সঙ্গে আমার লড়াই।

ফাগুলাল। সৈন্যেরা তো তোমাকে মানবে না।

রাজা। একলা লড়ব, সঙ্গে তোমরা আছ।

ফাগুলাল। জিততে পারবে?

রাজা। মরতে তো পারব। এতদিনে মরবার অর্থ দেখতে পেয়েছি— বেঁচেছি।

ফাগুলাল। রাজা, শুনতে পাচ্ছ গর্জন?

রাজা। ওই-যে দেখছি, সর্দার সৈন্য নিয়ে আসছে। এত শিগ্‌গির কী করে সম্ভব হল। আগে থাকতেই প্রস্তুত ছিল, কেবল আমিই জানতে পারি নি। ঠকিয়েছে আমাকে। আমারি শক্তি দিয়ে আমাকে বেঁধেছে।

ফাগুলাল। আমার দলবল তো এখনো এসে পৌঁছল না।

রাজা। সর্দার নিশ্চয় তাদের ঠেকিয়ে রেখেছে। আর তারা পৌঁছবে না।

নন্দিনী। মনে ছিল, বিশুপাগলকে তারা আমার কাছে এনে দেবে। সে কি আর হবে না।

রাজা। উপায় নেই। পথঘাট আটক করতে সর্দারের মতো কাউকে দেখি নি।

ফাগুলাল। তা হলে চলো নন্দিনী, তোমাকে নিরাপদ জায়গায় রেখে এসে তার পরে যা হয় হবে। সর্দার তোমাকে দেখলে রক্ষা থাকবে না।

নন্দিনী। একা আমাকেই নিরাপদের নির্বাসনে পাঠাবে? ফাগুলাল, তোমাদের চেয়ে সর্দার ভালো, সেই আমার জয়যাত্রার পথ খুলে দিলে। সর্দার, সর্দার!— দেখো, ওর বর্শার আগে আমার কুন্দফুলের মালা দুলিয়েছে। ওই মালাকে আমার বুকের রক্তে রক্তকরবীর রঙ করে দিয়ে যাব।— সর্দার! আমাকে দেখতে পেয়েছে। জয় রঞ্জনের জয়। [দ্রুত প্রস্থান

রাজা। নন্দিনী। [প্রস্থান

অধ্যাপকের প্রবেশ

ফাগুলাল। কোথায় ছুটেছ, অধ্যাপক।

অধ্যাপক। কে-যে বললে, রাজা এতদিন পরে চরম প্রাণের সন্ধান পেয়ে বেরিয়েছে— পুঁথিপত্র ফেলে সঙ্গ নিতে এলুম।

ফাগুলাল। রাজা তো ওই গেল মরতে, সে নন্দিনীর ডাক শুনেছে।

অধ্যাপক। তার জাল ছিঁড়েছে। নন্দিনী কোথায়।

ফাগুলাল। সে গেছে সবার আগে। তাকে আর নাগাল পাওয়া যাবে না।

অধ্যাপক। এইবারই পাওয়া যাবে। আর এড়িয়ে যেতে পারবে না, তাকে ধরব। [প্রস্থান

বিশুর প্রবেশ

বিশু। ফাগুলাল, নন্দিনী কোথায়।

ফাগুলাল। তুমি কী করে এলে।

বিশু। আমাদের কারিগররা বন্দীশালা ভেঙে ফেলেছে। তারা ওই চলেছে লড়তে। আমি নন্দিনীকে খুঁজতে এলুম। সে কোথায়।

ফাগুলাল। সে গেছে সকলের আগে এগিয়ে।

বিশু। কোথায়।

ফাগুলাল। শেষ মুক্তিতে।—বিশু, দেখতে পাচ্ছ ওখানে কে শুয়ে আছে?

বিশু। ও-যে রঞ্জন!

ফাগুলাল। ধুলায় দেখছ ওই রক্তের রেখা?

বিশু। বুঝেছি, ওই তাদের পরমমিলনের রক্তরাখি। এবার আমার সময় এল একলা মহাযাত্রার। হয়তো গান শুনতে চাইবে। আমার পাগলী! আয় রে ভাই, এবার লড়াইয়ে চল্।

ফাগুলাল। নন্দিনীর জয়।

বিশু। নন্দিনীর জয়।

ফাগুলাল। আর, ওই দেখো, ধুলায় লুটচ্ছে তার রক্তকরবীর কঙ্কণ। ডানহাত থেকে কখন্ খসে পড়েছে। তার হাতখানি আজ সে রিক্ত করে দিয়ে চলে গেল।

বিশু। তাকে বলেছিলুম, তার হাত থেকে কিছু নেব না। এই নিতে হল, তার শেষ দান।

[প্রস্থান

দূরে গান

পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে, আয় রে চলে,
আয় আয় আয়।
ধুলার আঁচল ভরেছে আজ পাকা ফসলে,
মরি হায় হায় হায়।

উপন্যাস ও গল্প

গল্পগুচ্ছ

গল্পগুচ্ছ

দেনাপাওনা

পাঁচ ছেলের পর যখন এক কন্যা জন্মিল তখন বাপমায়ে অনেক আদর করিয়া তাহার নাম রাখিলেন নিরুপমা। এ-গোষ্ঠীতে এমন শৌখিন নাম ইতিপূর্বে কখনো শোনা যায় নাই। প্রায় ঠাকুরদেবতার নামই প্রচলিত ছিল— গণেশ, কার্তিক, পার্বতী, তাহার উদাহরণ।

এখন নিরুপমার বিবাহের প্রস্তাব চলিতেছে। তাহার পিতা রামসুন্দর মিত্র অনেক খোঁজ করেন কিন্তু পাত্র কিছুতেই মনের-মতন হয় না। অবশেষে মস্ত এক রায়বাহাদুরের ঘরের একমাত্র ছেলেকে সন্ধান করিয়া বাহির করিয়াছেন। উক্ত রায়বাহাদুরের পৈতৃক বিষয়-আশয় যদিও অনেক হ্রাস হইয়া আসিয়াছে কিন্তু বনেদি ঘর বটে।

বরপক্ষ হইতে দশ হাজার টাকা পণ এবং বহুল দানসামগ্রী চাহিয়া বসিল। রামসুন্দর কিছুমাত্র বিবেচনা না করিয়া তাহাতেই সম্মত হইলেন ; এমন পাত্র কোনোমতে হাতছাড়া করা যায় না।

কিছুতেই টাকার জোগাড় আর হয় না। বাঁধা দিয়া, বিক্রয় করিয়া, অনেক চেষ্টাতেও হাজার ছয়-সাত বাকি রহিল। এদিকে বিবাহের দিন নিকট হইয়া আসিয়াছে।

অবশেষে বিবাহের দিন উপস্থিত হইল। নিতান্ত অতিরিক্ত সুদে একজন বাকি টাকাটা ধার দিতে স্বীকার করিয়াছিল কিন্তু সময়কালে সে উপস্থিত হইল না। বিবাহসভায় একটা তুমুল গোলযোগ বাধিয়া গেল। রামসুন্দর আমাদের রায়বাহাদুরের হাতে-পায়ে ধরিয়া বলিলেন, “শুভকার্য সম্পন্ন হইয়া যাক, আমি নিশ্চয়ই টাকাটা শোধ করিয়া দিব।” রায়বাহাদুর বলিলেন, “টাকা হাতে না পাইলে বর সভাস্থ করা যাইবে না।”

এই দুর্ঘটনায় অন্তঃপুরে একটা কান্না পড়িয়া গেল। এই গুরুতর বিপদের যে মূল

কারণ সে চেলি পরিয়া, গহনা পরিয়া, কপালে চন্দন লেপিয়া, চুপ করিয়া বসিয়া আছে। ভাবী শ্বশুরকুলের প্রতি যে তাহার খুব একটা ভক্তি কিংবা অনুরাগ জন্মিতেছে, তাহা বলা যায় না।

ইতিমধ্যে একটা সুবিধা হইল। বর সহসা তাহার পিতৃদেবের অবাধ্য হইয়া উঠিল। সে বাপকে বলিয়া বসিল, "কেনাবেচা-দরদামের কথা আমি বুঝি না, বিবাহ করিতে আসিয়াছি বিবাহ করিয়া যাইব।"

বাপ যাহাকে দেখিল তাহাকেই বলিল, "দেখেছেন মহাশয়, আজকালকার ছেলেদের ব্যবহার।" দুই-একজন প্রবীণ লোক ছিল, তাহারা বলিল, "শাস্ত্রশিক্ষা নীতিশিক্ষা একেবারে নাই, কাজেই।"

বর্তমান শিক্ষার বিষময় ফল নিজের সন্তানের মধ্যে প্রত্যক্ষ করিয়া রায়বাহাদুর হতোদ্যম হইয়া বসিয়া রহিলেন। বিবাহ একপ্রকার বিষণ্ণ নিরানন্দভাবে সম্পন্ন হইয়া গেল।

শ্বশুরবাড়ি যাইবার সময় নিরুপমাকে বুকে টানিয়া লইয়া বাপ আর চোখের জল রাখিতে পারিলেন না। নিরু জিজ্ঞাসা করিল, "তারা কি আর আমাকে আসতে দেবে না, বাবা।" রামসুন্দর বলিলেন, "কেন আসতে দেবে না, মা। আমি তোমাকে নিয়ে আসব।"

রামসুন্দর প্রায়ই মেয়েকে দেখিতে যান কিন্তু বেহাইবাড়িতে তাঁর কোনো প্রতিপত্তি নাই। চাকরগুলো পর্যন্ত তাঁহাকে নিচু নজরে দেখে। অন্তঃপুরের বাহিরে একটা স্বতন্ত্র ঘরে পাঁচ মিনিটের জন্য কোনোদিন-বা মেয়েকে দেখিতে পান, কোনোদিন-বা দেখিতে পান না।

কুটুম্বগৃহে এমন করিয়া অপমান তো সহা যায় না। রামসুন্দর স্থির করিলেন যেমন করিয়া হউক টাকাটা শোধ করিয়া দিতে হইবে।

কিন্তু যে-ঋণভার কাঁধে চাপিয়াছে, তাহারি ভার সামলানো দুঃসাধ্য। খরচপত্রের অত্যন্ত টানাটানি পড়িয়াছে ; এবং পাওনাদারদের দৃষ্টিপথ এড়াইবার জন্য সর্বদাই নানারূপ হীন কৌশল অবলম্বন করিতে হইতেছে।

এদিকে শ্বশুরবাড়ি উঠিতে বসিতে মেয়েকে খোঁচা লাগাইতেছে। পিতৃগৃহের নিন্দা শুনিয়া ঘরে দ্বার দিয়া অশ্রুবিসর্জন তাহার নিত্যক্রিয়ার মধ্যে দাঁড়াইয়াছে।

বিশেষত শাশুড়ীর আক্রোশ আর কিছুতেই মেটে না। যদি কেহ বলে, "আহা, কী শ্রী। বউয়ের মুখখানি দেখিলে চোখ জুড়াইয়া যায়।" শাশুড়ী ঝংকার দিয়া উঠিয়া বলে, "শ্রী তো ভারি। যেমন ঘরের মেয়ে তেমনি শ্রী।"

এমন কি, বউয়ের খাওয়াপরারও যত্ন হয় না। যদি কোনো দয়াপরতন্ত্র প্রতিবেশিনী কোনো ত্রুটির উল্লেখ করে, শাশুড়ী বলে, "ওই ঢের হয়েছে।" অর্থাৎ বাপ যদি পুরা দাম দিত তো মেয়ে পুরা যত্ন পাইত। সকলেই এমন ভাব দেখায় যেন বধূর এখানে কোনো অধিকার নাই, ফাঁকি দিয়া প্রবেশ করিয়াছে।

বোধ হয় কন্যার এই-সকল অনাদর এবং অপমানের কথা বাপের কানে গিয়া থাকিবে। তাই রামসুন্দর অবশেষে বসতবাড়ি বিক্রয়ের চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

কিন্তু ছেলেদের যে গৃহহীন করিতে বসিয়াছেন সে-কথা তাহাদের নিকট হইতে গোপনে রাখিলেন। স্থির করিয়াছিলেন, বাড়ি বিক্রয় করিয়া সেই বাড়িই ভাড়া লইয়া বাস করিবেন; এমন কৌশলে চলিবেন যে, তাঁহার মৃত্যুর পূর্বে এ-কথা ছেলেরা জানিতে পারিবে না।

কিন্তু ছেলেরা জানিতে পারিল। সকলে আসিয়া কাঁদিয়া পড়িল। বিশেষত বড়ো তিনটি ছেলে বিবাহিত এবং তাহাদের কাহারো বা সন্তান আছে। তাহাদের আপত্তি অত্যন্ত গুরুতর হইয়া দাঁড়াইল, বাড়িবিক্রয় স্থগিত হইল।

তখন রামসুন্দর নানাস্থান হইতে বিস্তর সুদে অল্প অল্প করিয়া টাকা ধার করিতে লাগিলেন। এমন হইল যে, সংসারের খরচ আর চলে না।

নিরু বাপের মুখ দেখিয়া সব বুঝিতে পারিল। বৃদ্ধের পক্বকেশে শুষ্কমুখে এবং সদাসংকুচিত ভাবে দৈন্য এবং দুশ্চিন্তা প্রকাশ হইয়া পড়িল। মেয়ের কাছে যখন বাপ অপরাধী তখন সে অপরাধের অনুতাপ কি আর গোপন রাখা যায়। রামসুন্দর যখন বেহাইবাড়ির অনুমতিক্রমে ক্ষণকালের জন্য কন্যার সাক্ষাতলাভ করিতেন, তখন বাপের বুক যে কেমন করিয়া ফাটে, তাহা তাঁহার হাসি দেখিলেই টের পাওয়া যাইত।

সেই ব্যথিত পিতৃহৃদয়কে সান্ত্বনা দিবার উদ্দেশে দিনকতক বাপের বাড়ি যাইবার জন্য নিরু নিতান্ত অধীর হইয়া উঠিয়াছে। বাপের ম্লান মুখ দেখিয়া সে আর দূরে থাকিতে পারে না। একদিন রামসুন্দরকে কহিল, "বাবা, আমাকে একবার বাড়ি লইয়া যাও।" রামসুন্দর বলিলেন, "আচ্ছা।"

কিন্তু তাঁহার কোনো জোর নাই— নিজের কন্যার উপরে পিতার যে স্বাভাবিক অধিকার আছে, তাহা যেন পণের টাকার পরিবর্তে বন্ধক রাখিতে হইয়াছে। এমন কি কন্যার দর্শন, সেও অতি সসংকোচে ভিক্ষা চাহিতে হয় এবং সময়বিশেষে নিরাশ হইলে দ্বিতীয় কথাটি কহিবার মুখ থাকে না।

কিন্তু মেয়ে আপনি বাড়ি আসিতে চাহিলে বাপ তাকে না আনিয়া কেমন করিয়া থাকে। তাই, বেহাইয়ের নিকট সে-সম্বন্ধে দরখাস্ত পেশ করিবার পূর্বে রামসুন্দর কত

হীনতা, কত অপমান, কত ক্ষতি স্বীকার করিয়া যে তিনটি হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সে-ইতিহাস গোপন থাকাই ভালো।

নোটক'খানি রুমালে জড়াইয়া চাদরে বাঁধিয়া রামসুন্দর বেহাইয়ের নিকট গিয়া বসিলেন। প্রথমে হাস্যমুখে পাড়ার খবর পাড়িলেন। হরেকৃষ্ণের বাড়িতে একটা মস্ত চুরি হইয়া গিয়াছে, তাহার আদ্যোপান্ত বিবরণ বলিলেন। নবীনমাধব ও রাধামাধব দুই ভাইয়ের তুলনা করিয়া বিদ্যাবুদ্ধি ও স্বভাব সম্বন্ধে রাধামাধবের সুখ্যাতি এবং নবীনমাধবের নিন্দা করিলেন ; শহরে একটা নূতন ব্যামো আসিয়াছে, সে-সম্বন্ধে অনেক আজগুবি আলোচনা করিলেন ; অবশেষে হুঁকাটি নামাইয়া রাখিয়া কথায় কথায় বলিলেন, "হাঁ হাঁ, বেহাই সেই টাকাটা বাকি আছে বটে। রোজই মনে করি, যাচ্ছি অমনি হাতে করে কিছু নিয়ে যাই কিন্তু সময়কালে মনে থাকে না। আর ভাই, বুড়ো হয়ে পড়েছি।" এমনি এক দীর্ঘ ভূমিকা করিয়া পঞ্জরের তিনখানি অস্থির মতো সেই তিনখানি নোট যেন অতি সহজে অতি অবহেলে বাহির করিলেন। সবেমাত্র তিন হাজার টাকার নোট দেখিয়া রায়বাহাদুর অট্টহাস্য করিয়া উঠিলেন।

বলিলেন, "থাক্ বেহাই, ওতে আমার কাজ নেই।" একটা প্রচলিত বাংলা প্রবাদের উল্লেখ করিয়া বলিলেন, সামান্য কারণে হাতে দুর্গন্ধ করিতে তিনি চান না।

এই ঘটনার পরে মেয়েকে বাড়ি আনিবার প্রস্তাব কাহারো মুখে আসে না— কেবল রামসুন্দর ভাবিলেন, 'সে-সকল কুটুম্বিতার সংকোচ আমাকে আর শোভা পায় না।' মর্মাহতভাবে অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া অবশেষে মৃদুস্বরে কথাটা পাড়িলেন। রায়বাহাদুর কোনো কারণমাত্র উল্লেখ না করিয়া বলিলেন, "সে এখন হচ্ছে না।" এই বলিয়া কর্মোপলক্ষে স্থানান্তরে চলিয়া গেলেন।

রামসুন্দর মেয়ের কাছে মুখ না দেখাইয়া কম্পিতহস্তে কয়েকখানি নোট চাদরের প্রান্তে বাঁধিয়া বাড়ি ফিরিয়া গেলেন। মনে-মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, যতদিন না সমস্ত টাকা শোধ করিয়া দিয়া অসংকোচে কন্যার উপরে দাবি করিতে পারিবেন, ততদিন আর বেহাইবাড়ি যাইবেন না।

বহুদিন গেল। নিরুপমা লোকের উপর লোক পাঠায় কিন্তু বাপের দেখা পায় না। অবশেষে অভিমান করিয়া লোক পাঠানো বন্ধ করিল— তখন রামসুন্দরের মনে বড়ো আঘাত লাগিল, কিন্তু তবু গেলেন না।

আশ্বিন মাস আসিল। রামসুন্দর বলিলেন, 'এবার পুজার সময় মাকে ঘরে আনিবই, নহিলে আমি'— খুব একটা শক্ত রকম শপথ করিলেন।

পঞ্চমী কি ষষ্ঠীর দিনে আবার চাদরের প্রান্তে গুটিকতক নোট বাঁধিয়া রামসুন্দর

যাত্রার উদ্যোগ করিলেন। পাঁচ বৎসরের এক নাতি আসিয়া বলিল, "দাদা, আমার জন্যে গাড়ি কিনতে যাচ্ছিস ?" বহুদিন হইতে তাহার ঠেলাগাড়িতে চড়িয়া হাওয়া খাইবার শখ হইয়াছে, কিন্তু কিছুতেই তাহা মিটিবার উপায় হইতেছে না। ছয় বৎসরের এক নাতিনী আসিয়া সরোদনে কহিল, পুজার নিমন্ত্রণে যাইবার মতো তাহার একখানিও ভালো কাপড় নাই।

রামসুন্দর তাহা জানিতেন, এবং সে-সম্বন্ধে তামাক খাইতে খাইতে বৃদ্ধ অনেক চিন্তা করিয়াছেন। রায়বাহাদুরের বাড়ি যখন পুজার নিমন্ত্রণ হইবে তখন তাঁহার বধূগণকে অতি যৎসামান্য অলংকারে অনুগ্রহপাত্র দরিদ্রের মতো যাইতে হইবে, এ-কথা স্মরণ করিয়া তিনি অনেক দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়াছেন ; কিন্তু তাহাতে তাঁহার ললাটের বার্ধক্যরেখা গভীরতর অঙ্কিত হওয়া ছাড়া আর-কোনো ফল হয় নাই।

দৈন্যপীড়িত গৃহের ক্রন্দনধ্বনি কানে লইয়া বৃদ্ধ তাঁহার বেহাইবাড়িতে প্রবেশ করিলেন। আজ তাঁহার সে সংকোচভাব নাই ; দ্বাররক্ষী এবং ভৃত্যদের মুখের প্রতি সে চকিত সলজ্জ দৃষ্টিপাত দূর হইয়া গিয়াছে, যেন আপনার গৃহে প্রবেশ করিলেন। শুনিলেন, রায়বাহাদুর ঘরে নাই, কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইবে। মনের উচ্ছ্বাস সংবরণ করিতে না পারিয়া রামসুন্দর কন্যার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। আনন্দে দুই চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। বাপও কাঁদে মেয়েও কাঁদে ; দুইজনে কেহ আর কথা কহিতে পারে না। এমন করিয়া কিছুক্ষণ গেল। তারপরে রামসুন্দর কহিলেন, "এবার তোকে নিয়ে যাচ্ছি, মা। আর কোনো গোল নাই।"

এমন সময়ে রামসুন্দরের জ্যেষ্ঠপুত্র হরমোহন তার দুটি ছোটো ছেলে সঙ্গে লইয়া সহসা ঘরে প্রবেশ করিলেন। পিতাকে বলিলেন, "বাবা, আমাদের তবে এবার পথে ভাসালে ?"

রামসুন্দর সহসা অগ্নিমূর্তি হইয়া বলিলেন, "তোদের জন্য কি আমি নরকগামী হব। আমাকে তোরা আমার সত্য পালন করতে দিবি নে ?" রামসুন্দর বাড়ি বিক্রয় করিয়া বসিয়া আছেন ; ছেলেরা কিছুতে না জানিতে পায়, তাহার অনেক ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, কিন্তু তবু তাহারা জানিয়াছে দেখিয়া তাহাদের প্রতি হঠাৎ অত্যন্ত রুষ্ট ও বিরক্ত হইয়া উঠিলেন।

তাঁহার নাতি তাঁহার দুই হাঁটু সবলে জড়াইয়া ধরিয়া মুখ তুলিয়া কহিল, "দাদা, আমাকে গাড়ি কিনে দিলে না ?"

নতশির রামসুন্দরের কাছে বালক কোনো উত্তর না পাইয়া নিরুর কাছে গিয়া বলিল, "পিসিমা, আমাকে একখানা গাড়ি কিনে দেবে ?"

নিরুপমা সমস্ত ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া কহিল, "বাবা, তুমি যদি আর এক পয়সা আমার শ্বশুরকে দাও, তা-হলে আর তোমার মেয়েকে দেখতে পাবে না, এই তোমার গা ছুঁয়ে বললুম।"

রামসুন্দর বলিলেন, "ছি মা, অমন কথা বলতে নেই। আর এ-টাকাটা যদি আমি না দিতে পারি, তা-হলে তোর বাপের অপমান। আর তোরো অপমান।"

নিরু কহিল, "টাকা যদি দাও তবেই অপমান। তোমার মেয়ের কি কোনো মর্যাদা নেই। আমি কি কেবল একটা টাকার থলি, যতক্ষণ টাকা আছে ততক্ষণ আমার দাম। না বাবা, এ-টাকা দিয়ে তুমি আমাকে অপমান কোরো না। তা ছাড়া আমার স্বামী তো এ-টাকা চান না।"

রামসুন্দর কহিলেন, "তা-হলে তোমাকে যেতে দেবে না, মা।"

নিরুপমা কহিল, "না দেয় তো কী করবে বলো। তুমিও আর নিয়ে যেতে চেয়ো না।"

রামসুন্দর কম্পিত হস্তে নোটবাঁধা চাদরটি কাঁধে তুলিয়া আবার চোরের মতো সকলের দৃষ্টি এড়াইয়া বাড়ি ফিরিয়া গেলেন।

কিন্তু রামসুন্দর এই-যে টাকা আনিয়াছিলেন এবং কন্যার নিষেধে সে টাকা না দিয়াই চলিয়া গিয়াছেন, সে-কথা গোপন রহিল না। কোনো স্বভাবকৌতূহলী দ্বারলগ্নকর্ণ দাসী নিরুর শাশুড়ীকে এই খবর দিল। শুনিয়া তাঁহার আর আক্রোশের সীমা রহিল না।

নিরুপমার পক্ষে তাহার শ্বশুরবাড়ি শরশয্যা হইয়া উঠিল। এদিকে তাহার স্বামী বিবাহের অল্পদিন পরেই ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হইয়া দেশান্তরে চলিয়া গিয়াছে; এবং পাছে সংসর্গদোষে হীনতা শিক্ষা হয়, এই ওজরে সম্প্রতি বাপের বাড়ির আত্মীয়দের সহিত নিরুর সাক্ষাৎকার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হইয়াছে।

এই সময়ে নিরুর একটা গুরুতর পীড়া হইল। কিন্তু সেজন্য তাহার শাশুড়ীকে সম্পূর্ণ দোষ দেওয়া যায় না। শরীরের প্রতি সে অত্যন্ত অবহেলা করিত। কার্তিক-মাসের হিমের সময় সমস্তরাত মাথার দরজা খোলা, শীতের সময় গায়ে কাপড় নাই। আহারের নিয়ম নাই। দাসীরা যখন মাঝে-মাঝে খাবার আনিতে ভুলিয়া যাইত, তখন যে তাহাদের একবার মুখ খুলিয়া স্মরণ করাইয়া দেওয়া, তাহাও সে করিত না। সে-যে পরের ঘরের দাসদাসী এবং কর্তাগৃহিণীদের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া বাস করিতেছে, এই সংস্কার তাহার মনে বদ্ধমূল হইতেছিল। কিন্তু এরূপ ভাবটাও শাশুড়ীর সহ্য হইত না। যদি আহারের প্রতি বধূর কোনো অবহেলা দেখিতেন,

তবে শাশুড়ী বলিতেন, "নবাবের বাড়ির মেয়ে কিনা। গরিবের ঘরের অন্ন ওঁর মুখে রোচে না।" কখনো-বা বলিতেন, "দেখো-না, একবার ছিরি হচ্ছে দেখো-না, দিনে দিনে যেন পোড়াকাঠ হয়ে যাচ্ছে।"

রোগ যখন গুরুতর হইয়া উঠিল তখন শাশুড়ী বলিলেন, "ওঁর সমস্ত ন্যাকামি।" অবশেষে একদিন নিরু সবিনয়ে শাশুড়ীকে বলিল, "বাবাকে আর আমার ভাইদের একবার দেখব, মা।" শাশুড়ী বলিলেন, "কেবল বাপের বাড়ি যাইবার ছল।"

কেহ বলিলে বিশ্বাস করিবে না— যেদিন সন্ধ্যার সময় নিরুর শ্বাস উপস্থিত হইল, সেইদিন প্রথম ডাক্তার দেখিল, এবং সেইদিন ডাক্তারের দেখা শেষ হইল।

বাড়ির বড়োবউ মরিয়াছে, খুব ধুম করিয়া অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হইল। প্রতিমা-বিসর্জনের সমারোহ সম্বন্ধে জেলার মধ্যে রায়চৌধুরিদের যেমন লোকবিখ্যাত প্রতিপত্তি আছে, বড়োবউয়ের সৎকার সম্বন্ধে রায়বাহাদুরদের তেমনি একটা খ্যাতি রহিয়া গেল— এমন চন্দনকাষ্ঠের চিতা এ মুলুকে কেহ কখনো দেখে নাই। এমন ঘটা করিয়া শ্রাদ্ধও কেবল রায়বাহাদুরদের বাড়িতেই সম্ভব এবং শুনা যায়, ইহাতে তাঁহাদের কিঞ্চিৎ ঋণ হইয়াছিল।

রামসুন্দরকে সান্ত্বনা দিবার সময় তাহার মেয়ের যে কিরূপ মহাসমারোহে মৃত্যু হইয়াছে, সকলেই তাহার বহুল বর্ণনা করিল।

এদিকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চিঠি আসিল, "আমি এখানে সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছি, অতএব অবিলম্বে আমার স্ত্রীকে এখানে পাঠাইবে।" রায়বাহাদুরের মহিষী লিখিলেন, "বাবা, তোমার জন্যে আর-একটি মেয়ের সম্বন্ধ করিয়াছি, অতএব অবিলম্বে ছুটি লইয়া এখানে আসিবে।"

এবারে বিশ হাজার টাকা পণ এবং হাতে হাতে আদায়।

১২৯৮ ?

পোস্টমাস্টার

প্রথম কাজ আরম্ভ করিয়াই উলাপুর গ্রামে পোস্টমাস্টারকে আসিতে হয়। গ্রামটি অতি সামান্য। নিকটে একটি নীলকুঠি আছে, তাই কুঠির সাহেব অনেক জোগাড় করিয়া এই নূতন পোস্ট-আপিস স্থাপন করাইয়াছে।

আমাদের পোস্টমাস্টার কলিকাতার ছেলে। জলের মাছকে ডাঙায় তুলিলে যে-

রকম হয়, এই গণ্ডগ্রামের মধ্যে আসিয়া পোস্টমাস্টারেরও সেই দশা উপস্থিত হইয়াছে। একখানি অন্ধকার আটচালার মধ্যে তাঁহার আপিস ; অদূরে একটি পানাপুকুর এবং তাহার চারিপাড়ে জঙ্গল। কুঠির গোমস্তা প্রভৃতি যে-সকল কর্মচারী আছে তাহাদের ফুরসত প্রায় নাই এবং তাহারা ভদ্রলোকের সহিত মিশিবার উপযুক্ত নহে।

বিশেষত কলিকাতার ছেলে ভালো করিয়া মিশিতে জানে না। অপরিচিত স্থানে গেলে, হয় উদ্ধত নয় অপ্রতিভ হইয়া থাকে। এই কারণে স্থানীয় লোকের সহিত তাঁহার মেলামেশা হইয়া উঠে না। অথচ হাতে কাজ অধিক নাই। কখনো-কখনো দুটো-একটা কবিতা লিখিতে চেষ্টা করেন। তাহাতে এমন ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন যে, সমস্তদিন তরুপল্লবের কম্পন এবং আকাশের মেঘ দেখিয়া জীবন বড়ো সুখে কাটিয়া যায়— কিন্তু অন্তর্যামী জানেন, যদি আরব্য উপন্যাসের কোনো দৈত্য আসিয়া এক রাত্রের মধ্যে এই শাখাপল্লব-সমেত সমস্ত গাছগুলা কাটিয়া পাকা রাস্তা বানাইয়া দেয়, এবং সারি সারি অট্টালিকা আকাশের মেঘকে দৃষ্টিপথ হইতে রুদ্ধ করিয়া রাখে, তাহা হইলে এই আধমরা ভদ্রসন্তানটি পুনশ্চ নবজীবন লাভ করিতে পারে।

পোস্টমাস্টারের বেতন অতি সামান্য। নিজে রাঁধিয়া খাইতে হয় এবং গ্রামের একটি পিতৃমাতৃহীন অনাথা বালিকা তাঁহার কাজকর্ম করিয়া দেয়, চারিটি-চারিটি খাইতে পায়। মেয়েটির নাম রতন। বয়স বারো-তেরো। বিবাহের বিশেষ সম্ভাবনা দেখা যায় না।

সন্ধ্যার সময় যখন গ্রামের গোয়ালঘর হইতে ধূম কুণ্ডলায়িত হইয়া উঠিত, ঝোপে ঝোপে ঝিল্লি ডাকিত, দূরে গ্রামের নেশাখোর বাউলের দল খোলকরতাল বাজাইয়া উচ্চৈঃস্বরে গান জুড়িয়া দিত— যখন অন্ধকার দাওয়ায় একলা বসিয়া গাছের কম্পন দেখিলে কবিহৃদয়েও ঈষৎ হৃৎকম্প উপস্থিত হইত, তখন ঘরের কোণে একটি ক্ষীণশিখা প্রদীপ জ্বালিয়া পোস্টমাস্টার ডাকিতেন 'রতন'। রতন দ্বারে বসিয়া এই ডাকের জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিত কিন্তু এক ডাকে ঘরে আসিত না— বলিত, "কী গা বাবু, কেন ডাকছ।"

পোস্টমাস্টার। তুই কী করছিস।

রতন। এখনি চুলো ধরাতে যেতে হবে— হেঁশেলের—

পোস্টমাস্টার। তোর হেঁশেলের কাজ পরে হবে এখন— একবার তামাকটা সেজে দে তো।

অনতিবিলম্বে দুটি গাল ফুলাইয়া কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে রতনের প্রবেশ। হাত হইতে কলিকাটা লইয়া পোস্টমাস্টার ফস করিয়া জিজ্ঞাসা করেন, "আচ্ছা রতন, তোর

মাকে মনে পড়ে?" সে অনেক কথা; কতক মনে পড়ে, কতক মনে পড়ে না। মায়ের চেয়ে বাপ তাহাকে বেশী ভালোবাসিত, বাপকে অল্প অল্প মনে আছে। পরিশ্রম করিয়া বাপ সন্ধ্যাবেলায় ঘরে ফিরিয়া আসিত, তাহারি মধ্যে দৈবাৎ দুটি-একটি সন্ধ্যা তাহার মনে পরিষ্কার ছবির মতো অঙ্কিত আছে। এই কথা হইতে হইতে ক্রমে রতন পোস্টমাস্টারের পায়ের কাছে মাটির উপর বসিয়া পড়িত। মনে পড়িত, তাহার একটি ছোটোভাই ছিল— বহু পূর্বেকার বর্ষার দিনে একদিন একটা ডোবার ধারে দুইজনে মিলিয়া গাছের ভাঙা ডালকে ছিপ করিয়া মিছামিছি মাছধরা খেলা করিয়াছিল— অনেক গুরুতর ঘটনার চেয়ে সেই কথাটাই তাহার মনে বেশী উদয় হইত। এইরূপ কথাপ্রসঙ্গে মাঝে-মাঝে বেশী রাত হইয়া যাইত, তখন আলস্যক্রমে পোস্টমাস্টারের আর রাঁধিতে ইচ্ছা করিত না। সকালের বাসী ব্যঞ্জন থাকিত এবং রতন তাড়াতাড়ি উনুন ধরাইয়া খানকয়েক রুটি সেঁকিয়া আনিত— তাহাতেই উভয়ের রাত্রের আহার চলিয়া যাইত।

এক-একদিন সন্ধ্যাবেলায় সেই বৃহৎ আটচালার কোণে আপিসের কাঠের চৌকির উপর বসিয়া পোস্টমাস্টারও নিজের ঘরের কথা পাড়িতেন— ছোটোভাই, মা এবং দিদির কথা, প্রবাসে একলা ঘরে বসিয়া যাহাদের জন্য হৃদয় ব্যথিত হইয়া উঠিত তাহাদের কথা। যে-সকল কথা সর্বদাই মনে উদয় হয় অথচ নীলকুঠির গোমস্তাদের কাছে যাহা কোনোমতেই উত্থাপন করা যায় না, সেই কথা একটি অশিক্ষিতা ক্ষুদ্র বালিকাকে বলিয়া যাইতেন, কিছুমাত্র অসংগত মনে হইত না। অবশেষে এমন হইল, বালিকা কথোপকথনকালে তাঁহার ঘরের লোকদিগকে মা, দিদি, দাদা বলিয়া চিরপরিচিতের ন্যায় উল্লেখ করিত। এমন কি, তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়পটে বালিকা তাঁহাদের কাল্পনিক মূর্তিও চিত্রিত করিয়া লইয়াছিল।

একদিন বর্ষাকালের মেঘমুক্ত দ্বিপ্রহরে ঈষৎ-তপ্ত সুকোমল বাতাস দিতেছিল, রৌদ্রে ভিজা ঘাস এবং গাছপালা হইতে একপ্রকার গন্ধ উত্থিত হইতেছিল, মনে হইতেছিল যেন ক্লান্ত ধরণীর উষ্ণ নিশ্বাস গায়ের উপরে আসিয়া লাগিতেছে, এবং কোথাকার এক নাছোড়বান্দা পাখি তাহার একটা একটানা সুরের নালিশ সমস্ত দুপুরবেলা প্রকৃতির দরবারে অত্যন্ত করুণস্বরে বারবার আবৃত্তি করিতেছিল। পোস্টমাস্টারের হাতে কাজ ছিল না— সেদিনকার বৃষ্টিধৌত মসৃণ চিক্কণ তরুপল্লবের হিল্লোল এবং পরাভূত বর্ষার ভগ্নাবশিষ্ট রৌদ্রশুভ্র স্তূপাকার মেঘস্তর বাস্তবিকই দেখিবার বিষয় ছিল; পোস্টমাস্টার তাহা দেখিতেছিলেন এবং ভাবিতেছিলেন, এই সময়ে কাছে একটি-কেহ নিতান্ত আপনার লোক থাকিত— হৃদয়ের সহিত একান্তসংলগ্ন একটি

স্নেহপুত্তলি মানবমূর্তি। ক্রমে মনে হইতে লাগিল, সেই পাখি ওই কথাই বারবার বলিতেছে এবং এই জনহীন তরুচ্ছায়ানিমগ্ন মধ্যাহ্নের পল্লবমর্মরের অর্থও কতকটা ওইরূপ। কেহ বিশ্বাস করে না, এবং জানিতেও পায় না, কিন্তু ছোটো পল্লীর সামান্য বেতনের সাব-পোস্টমাস্টারের মনে গভীর নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে দীর্ঘ ছুটির দিনে এইরূপ একটা ভাবের উদয় হইয়া থাকে।

পোস্টমাস্টার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ডাকিলেন, 'রতন'। রতন তখন পেয়ারাতলায় পা ছড়াইয়া দিয়া কাঁচা পেয়ারা খাইতেছিল; প্রভুর কণ্ঠস্বর শুনিয়া অবিলম্বে ছুটিয়া আসিল— হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, "দাদাবাবু, ডাকছ?" পোস্টমাস্টার বলিলেন, "তোকে আমি একটু একটু করে পড়তে শেখাব।" বলিয়া সমস্ত দুপুরবেলা তাহাকে লইয়া 'স্বরে অ' 'স্বরে আ' করিলেন। এবং এইরূপে অল্পদিনেই যুক্ত-অক্ষর উত্তীর্ণ হইলেন।

শ্রাবণমাসে বর্ষণের আর অন্ত নাই। খাল বিল নালা জলে ভরিয়া উঠিল। অহর্নিশি ভেকের ডাক এবং বৃষ্টির শব্দ। গ্রামের রাস্তায় চলাচল প্রায় একপ্রকার বন্ধ— নৌকায় করিয়া হাটে যাইতে হয়।

একদিন প্রাতঃকাল হইতে খুব বাদলা করিয়াছে। পোস্টমাস্টারের ছাত্রীটি অনেকক্ষণ দ্বারের কাছে অপেক্ষা করিয়া বসিয়া ছিল, কিন্তু অন্যদিনের মতো যথাসাধ্য নিয়মিত ডাক শুনিতে না পাইয়া আপনি খুঙ্গিপুঁথি লইয়া ধীরে ধীরে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। দেখিল, পোস্টমাস্টার তাঁহার খাটিয়ার উপর শুইয়া আছেন— বিশ্রাম করিতেছেন মনে করিয়া অতি নিঃশব্দে পুনশ্চ ঘর হইতে বাহিরে যাইবার উপক্রম করিল। সহসা শুনিল 'রতন'। তাড়াতাড়ি ফিরিয়া গিয়া বলিল, "দাদাবাবু, ঘুমচ্ছিলে?" পোস্টমাস্টার কাতরস্বরে বলিলেন, "শরীরটা ভালো বোধ হচ্ছে না— দেখ্ তো আমার কপালে হাত দিয়ে।"

এই নিতান্ত নিঃসঙ্গ প্রবাসে ঘনবর্ষায় রোগকাতর শরীরে একটুখানি সেবা পাইতে ইচ্ছা করে। তপ্ত ললাটের উপর শাঁখাপরা কোমল হস্তের স্পর্শ মনে পড়ে। এই ঘোর প্রবাসে রোগযন্ত্রণায় স্নেহময়ী নারীরূপে জননী ও দিদি পাশে বসিয়া আছেন, এই কথা মনে করিতে ইচ্ছা করে। এবং এস্থলে প্রবাসীর মনের অভিলাষ ব্যর্থ হইল না। বালিকা রতন আর বালিকা রহিল না। সেই মুহূর্তেই সে জননীর পদ অধিকার করিয়া বসিল, বৈদ্য ডাকিয়া আনিল, যথাসময়ে বটিকা খাওয়াইল, সারারাত্রি শিয়রে জাগিয়া রহিল, আপনি পথ্য রাঁধিয়া দিল, এবং শতবার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁগো দাদাবাবু, একটুখানি ভালো বোধ হচ্ছে কি।"

বহুদিন পরে পোস্টমাস্টার ক্ষীণ শরীরে রোগশয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিলেন—মনে স্থির করিলেন, আর নয়, এখান হইতে কোনোমতে বদলি হইতে হইবে। স্থানীয় অস্বাস্থ্যের উল্লেখ করিয়া তৎক্ষণাৎ কলিকাতায় কর্তৃপক্ষদের নিকট বদলি হইবার জন্য দরখাস্ত করিলেন।

রোগসেবা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া রতন দ্বারের বাহিরে আবার তাহার স্বস্থান অধিকার করিল। কিন্তু পূর্ববৎ আর তাহাকে ডাক পড়ে না। মাঝে-মাঝে উঁকি মারিয়া দেখে, পোস্টমাস্টার অত্যন্ত অন্যমনস্কভাবে চৌকিতে বসিয়া অথবা খাটিয়ায় শুইয়া আছেন। রতন যখন আহ্বান প্রত্যাশা করিয়া বসিয়া আছে, তিনি তখন অধীরচিত্তে তাঁহার দরখাস্তের উত্তর প্রতীক্ষা করিতেছেন। বালিকা দ্বারের বাহিরে বসিয়া সহস্রবার করিয়া তাহার পুরানো পড়া পড়িল। পাছে যেদিন সহসা ডাক পড়িবে সেদিন তাহার যুক্ত-অক্ষর সমস্ত গোলমাল হইয়া যায়, এই তাহার একটা আশঙ্কা ছিল। অবশেষে সপ্তাহখানেক পরে একদিন সন্ধ্যাবেলায় ডাক পড়িল। উদ্বেলিতহৃদয়ে রতন গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিল, "দাদাবাবু, আমাকে ডাকছিলে ?"

পোস্টমাস্টার বলিলেন, "রতন, কালই আমি যাচ্ছি।"

রতন। কোথায় যাচ্ছ দাদাবাবু।

পোস্টমাস্টার। বাড়ি যাচ্ছি।

রতন। আবার কবে আসবে।

পোস্টমাস্টার। আর আসব না।

রতন আর-কোনো কথা জিজ্ঞাসা করিল না। পোস্টমাস্টার আপনিই তাহাকে বলিলেন, তিনি বদলির জন্য দরখাস্ত করিয়াছিলেন, দরখাস্ত নামঞ্জুর হইয়াছে ; তাই তিনি কাজে জবাব দিয়া বাড়ি যাইতেছেন। অনেকক্ষণ আর কেহ কোনো কথা কহিল না। মিটমিট করিয়া প্রদীপ জ্বলিতে লাগিল এবং একস্থানে ঘরের জীর্ণ চাল ভেদ করিয়া একটি মাটির সরার উপর টপটপ করিয়া বৃষ্টির জল পড়িতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে রতন আস্তে আস্তে উঠিয়া রান্নাঘরে রুটি গড়িতে গেল। অন্যদিনের মতো তেমন চটপট হইল না। বোধ করি মধ্যে-মধ্যে মাথায় অনেক ভাবনা উদয় হইয়াছিল। পোস্টমাস্টারের আহার সমাপ্ত হইলে পর বালিকা হঠাৎ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "দাদাবাবু, আমাকে তোমাদের বাড়ি নিয়ে যাবে ?"

পোস্টমাস্টার হাসিয়া কহিলেন, "সে কী করে হবে।" ব্যাপারটা যে কী কী কারণে অসম্ভব তাহা বালিকাকে বুঝানো আবশ্যক বোধ করিলেন না।

সমস্তরাত্রি স্বপ্নে এবং জাগরণে বালিকার কানে পোস্টমাস্টারের হাস্যধ্বনির কণ্ঠস্বর বাজিতে লাগিল, ‘সে কী করে হবে’।

ভোরে উঠিয়া পোস্টমাস্টার দেখিলেন, তাঁহার স্নানের জল ঠিক আছে; কলিকাতার অভ্যাস অনুসারে তিনি তোলা জলে স্নান করিতেন। কখন্ তিনি যাত্রা করিবেন সে-কথা বালিকা কী কারণে জিজ্ঞাসা করিতে পারে নাই; পাছে প্রাতঃকালে আবশ্যক হয় এইজন্য রতন তত রাত্রে নদী হইতে তাঁহার স্নানের জল তুলিয়া আনিয়াছিল। স্নান সমাপন হইলে রতনের ডাক পড়িল। রতন নিঃশব্দে গৃহে প্রবেশ করিল এবং আদেশপ্রতীক্ষায় একবার নীরবে প্রভুর মুখের দিকে চাহিল। প্রভু কহিলেন, “রতন, আমার জায়গায় যে-লোকটি আসবেন তাঁকে বলে দিয়ে যাব তিনি তোকে আমারি মতন যত্ন করবেন, আমি যাচ্ছি বলে তোকে কিছু ভাবতে হবে না।” এই কথাগুলি যে অত্যন্ত স্নেহগর্ভ এবং দয়ার্দ্র হৃদয় হইতে উত্থিত সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই, কিন্তু নারীহৃদয় কে বুঝিবে। রতন অনেকদিন প্রভুর অনেক তিরস্কার নীরবে সহ্য করিয়াছে কিন্তু এই নরম কথা সহিতে পারিল না। একেবারে উচ্ছ্বসিতহৃদয়ে কাঁদিয়া উঠিয়া কহিল, “না না, তোমার কাউকে কিছু বলতে হবে না, আমি থাকতে চাই নে।”

পোস্টমাস্টার রতনের এরূপ ব্যবহার কখনো দেখেন নাই, তাই অবাক হইয়া রহিলেন।

নূতন পোস্টমাস্টার আসিল। তাহাকে সমস্ত চার্জ বুঝাইয়া দিয়া পুরাতন পোস্টমাস্টার গমনোন্মুখ হইলেন যাইবার সময় রতনকে ডাকিয়া বলিলেন, “রতন, তোকে আমি কখনো কিছু দিতে পারি নি। আজ যাবার সময় তোকে কিছু দিয়ে গেলুম, এতে তোর দিনকয়েক চলবে।”

কিছু পথখরচা বাদে তাঁহার বেতনের যত টাকা পাইয়াছিলেন পকেট হইতে বাহির করিলেন। তখন রতন ধুলায় পড়িয়া তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, “দাদাবাবু, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমাকে কিছু দিতে হবে না; তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমার জন্যে কাউকে কিছু ভাবতে হবে না”— বলিয়া একদৌড়ে সেখান হইতে পলাইয়া গেল।

ভূতপূর্ব পোস্টমাস্টার নিশ্বাস ফেলিয়া, হাতে কার্পেটের ব্যাগ ঝুলাইয়া, কাঁধে ছাতা লইয়া, মুটের মাথায় নীল ও শ্বেত রেখায় চিত্রিত টিনের পেঁটরা তুলিয়া ধীরে ধীরে নৌকাভিমুখে চলিলেন।

যখন নৌকায় উঠিলেন এবং নৌকা ছাড়িয়া দিল, বর্ষাবিস্ফারিত নদী ধরণীর

উচ্ছলিত অশ্রুরাশির মতো চারিদিকে ছলছল করিতে লাগিল, তখন হৃদয়ের মধ্যে অত্যন্ত একটা বেদনা অনুভব করিতে লাগিলেন— একটি সামান্য গ্রাম্য বালিকার করুণ মুখচ্ছবি যেন এক বিশ্বব্যাপী বৃহৎ অব্যক্ত মর্মব্যথা প্রকাশ করিতে লাগিল। একবার নিতান্ত ইচ্ছা হইল, 'ফিরিয়া যাই, জগতের ক্রোড়বিচ্যুত সেই অনাথিনীকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসি'— কিন্তু তখন পালে বাতাস পাইয়াছে, বর্ষার স্রোত খরতর বেগে বহিতেছে, গ্রাম অতিক্রম করিয়া নদীকূলের শ্মশান দেখা দিয়াছে— এবং নদী-প্রবাহে ভাসমান পথিকের উদাস হৃদয়ে এই তত্ত্বের উদয় হইল, জীবনে এমন কত বিচ্ছেদ, কত মৃত্যু আছে, ফিরিয়া ফল কী। পৃথিবীতে কে কাহার।

কিন্তু রতনের মনে কোনো তত্ত্বের উদয় হইল না। সে সেই পোস্ট-আপিস গৃহের চারিদিকে কেবল অশ্রুজলে ভাসিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। বোধ করি তাহার মনে ক্ষীণ আশা জাগিতেছিল, দাদাবাবু যদি ফিরিয়া আসে— সেই বন্ধনে পড়িয়া কিছুতেই দূরে যাইতে পারিতেছিল না। হায় বুদ্ধিহীন মানবহৃদয়। ভ্রান্তি কিছুতেই ঘোচে না, যুক্তিশাস্ত্রের বিধান বহুবিলম্বে মাথায় প্রবেশ করে, প্রবল প্রমাণকেও অবিশ্বাস করিয়া মিথ্যা আশাকে দুই বাহুপাশে বাঁধিয়া বুকের ভিতরে প্রাণপণে জড়াইয়া ধরা যায়, অবশেষে একদিন সমস্ত নাড়ী কাটিয়া হৃদয়ের রক্ত শুষিয়া সে পলায়ন করে, তখন চেতনা হয় এবং দ্বিতীয় ভ্রান্তিপাশে পড়িবার জন্য চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠে।

১২৯৮ ?

গিন্নি

ছাত্রবৃত্তি ক্লাসের দুই-তিন শ্রেণী নিচে আমাদের পণ্ডিত ছিলেন শিবনাথ। তাঁহার গোঁফদাড়ি কামানো, চুল ছাঁটা এবং টিকিটি হ্রস্ব। তাঁহাকে দেখিলেই বালকদের অন্তরাত্মা শুকাইয়া যাইত।

প্রাণীদের মধ্যে দেখা যায়, যাহাদের হুল আছে তাহাদের দাঁত নাই। আমাদের পণ্ডিতমহাশয়ের দুই একত্রে ছিল। এদিকে কিল চড় চাপড় চারাগাছের বাগানের উপর শিলাবৃষ্টির মতো অজস্র বর্ষিত হইত, ওদিকে তীব্র বাক্যজ্বালায় প্রাণ বাহির হইয়া যাইত।

ইনি আক্ষেপ করিতেন, পুরাকালের মতো গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ এখন আর নাই;

ছাত্রেরা গুরুকে আর দেবতার মতো ভক্তি করে না ; এই বলিয়া আপনার উপেক্ষিত দেবমহিমা বালকদের মস্তকে সবেগে নিক্ষেপ করিতেন ; এবং মাঝে-মাঝে হুংকার দিয়া উঠিতেন, কিন্তু তাহার মধ্যে এত ইতর কথা মিশ্রিত থাকিত যে তাহাকে দেবতার বজ্রনাদের রূপান্তর বলিয়া কাহারো ভ্রম হইতে পারে না। বাপান্ত যদি বজ্রনাদ সাজিয়া তর্জনগর্জন করে, তাহার ক্ষুদ্র বাঙালীমূর্তি কি ধরা পড়ে না।

যাহা হউক, আমাদের স্কুলের এই তৃতীয়শ্রেণী দ্বিতীয়বিভাগের দেবতাটিকে ইন্দ্র চন্দ্র বরুণ অথবা কার্তিক বলিয়া কাহারো ভ্রম হইত না ; কেবল একটি দেবতার সহিত তাঁহার সাদৃশ্য উপলব্ধি করা যাইত, তাঁহার নাম যম ; এবং এতদিন পরে স্বীকার করিতে দোষ নাই এবং ভয়ও নাই, আমরা মনে মনে কামনা করিতাম, উক্ত দেবালয়ে গমন করিতে তিনি যেন আর অধিক বিলম্ব না করেন।

কিন্তু এটা বেশ বুঝা গিয়াছিল, নরদেবতার মতো বালাই আর নাই। সুরলোক-বাসী দেবতাদের উপদ্রব নাই। গাছ হইতে একটা ফুল পাড়িয়া দিলে খুশী হন, না দিলে তাগাদা করিতে আসেন না। আমাদের নরদেবগণ চান অনেক বেশী, এবং আমাদের তিলমাত্র ত্রুটি হইলে চক্ষুদুটো রক্তবর্ণ করিয়া তাড়া করিয়া আসেন, তখন তাঁহাদিগকে কিছুতেই দেবতার মতো দেখিতে হয় না।

বালকদের পীড়ন করিবার জন্য আমাদের শিবনাথপণ্ডিতের একটি অস্ত্র ছিল, সেটি শুনিতে যৎসামান্য কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অত্যন্ত নিদারুণ। তিনি ছেলেদের নূতন নামকরণ করিতেন। নাম জিনিসটা যদিচ শব্দ বই আর কিছুই নয় কিন্তু সাধারণত লোকে আপনার চেয়ে আপনার নামটা বেশী ভালোবাসে ; নিজের নাম রাষ্ট্র করিবার জন্য লোকে কী কষ্টই না স্বীকার করে, এমন কি, নামটিকে বাঁচাইবার জন্য লোকে আপনি মরিতে কুণ্ঠিত হয় না।

এমন নামপ্রিয় মানবের নাম বিকৃত করিয়া দিলে তাহার প্রাণের চেয়ে প্রিয়তর স্থানে আঘাত করা হয়। এমন কি, যাহার নাম ভূতনাথ তাহাকে নলিনীকান্ত বলিলে তাহার অসহ্য বোধ হয়।

ইহা হইতে এই তত্ত্ব পাওয়া যায়, মানুষ বস্তুর চেয়ে অবস্তুকে বেশী মূল্যবান জ্ঞান করে, সোনার চেয়ে বানি, প্রাণের চেয়ে মান এবং আপনার চেয়ে আপনার নামটাকে বড়ো মনে করে।

মানবস্বভাবের এই-সকল অন্তর্নিহিত নিগূঢ় নিয়মবশত পণ্ডিতমহাশয় যখন শশীশেখরকে ভেটকি নাম দিলেন তখন সে নিরতিশয় কাতর হইয়া পড়িল। বিশেষত উক্ত নামকরণে তাহার চেহারার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য করা হইতেছে জানিয়া তাহার

মর্মযন্ত্রণা আরো দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিল, অথচ একান্ত শান্তভাবে সমস্ত সহ্য করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে হইল।

আশুর নাম ছিল গিন্নি, কিন্তু তাহার সঙ্গে একটু ইতিহাস জড়িত আছে।

আশু ক্লাসের মধ্যে নিতান্ত বেচারা ভালোমানুষ ছিল। কাহাকেও কিছু বলিত না, বড়ো লাজুক; বোধহয় বয়সে সকলের চেয়ে ছোটো, সকল কথাতেই কেবল মৃদু মৃদু হাসিত; বেশ পড়া করিত; স্কুলের অনেক ছেলেই তাহার সঙ্গে ভাব করিবার জন্য উন্মুখ ছিল কিন্তু সে কোনো ছেলের সঙ্গে খেলা করিত না, এবং ছুটি হইবামাত্রই মুহূর্ত বিলম্ব না করিয়া বাড়ি চলিয়া যাইত।

পত্রপুটে গুটিকতক মিষ্টান্ন এবং ছোটো কাঁসার ঘটিতে জল লইয়া একটার সময় বাড়ি হইতে দাসী আসিত। আশু সেজন্য বড়ো অপ্রতিভ; দাসীটা কোনোমতে বাড়ি ফিরিলে সে যেন বাঁচে। সে-যে স্কুলের ছাত্রের অতিরিক্ত আর-কিছু, এটা সে স্কুলের ছেলেদের কাছে প্রকাশ করিতে যেন বড়ো অনিচ্ছুক। সে-যে বাড়ির কেহ, সে-যে বাপমায়ের ছেলে, ভাইবোনের ভাই, এটা যেন ভারি একটা গোপন কথা, এটা সঙ্গীদের কাছে কোনোমতে প্রকাশ না হয়, এই তাহার একান্ত চেষ্টা।

পড়াশুনা সম্বন্ধে তাহার আর-কোনো ত্রুটি ছিল না, কেবল এক-একদিন ক্লাসে আসিতে বিলম্ব হইত এবং শিবনাথপণ্ডিত তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে কোনো সদুত্তর দিতে পারিত না। সেজন্য মাঝে-মাঝে তাহার লাঞ্ছনার সীমা থাকিত না। পণ্ডিত তাহাকে হাঁটুর উপর হাত দিয়া পিঠ নীচু করিয়া দালানের সিঁড়ির কাছে দাঁড় করাইয়া রাখিতেন; চারিটা ক্লাসের ছেলে সেই লজ্জাকাতর হতভাগ্য বালককে এইরূপ অবস্থায় দেখিতে পাইত।

একদিন গ্রহণের ছুটি ছিল। তাহার পরদিন স্কুলে আসিয়া চৌকিতে বসিয়া পণ্ডিতমহাশয় দ্বারের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, একখানি শ্লেট ও মসীচিহ্নিত কাপড়ের থলির মধ্যে পড়িবার বইগুলি জড়াইয়া লইয়া অন্যদিনের চেয়ে সংকুচিতভাবে আশু ক্লাসে প্রবেশ করিতেছে।

শিবনাথপণ্ডিত শুষ্কহাস্য হাসিয়া কহিলেন, "এই-যে গিন্নি আসছে।"

তাহার পর পড়া শেষ হইলে ছুটির পূর্বে তিনি সকল ছাত্রদের সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "শোন্ তোরা সব শোন্।"

পৃথিবীর সমস্ত মাধ্যাকর্ষণশক্তি সবলে বালককে নিচের দিকে টানিতে লাগিল; কিন্তু ক্ষুদ্র আশু সেই বেঞ্চির উপর হইতে একখানি কোঁচা ও দুইখানি পা ঝুলাইয়া ক্লাসের সকল বালকের লক্ষ্যস্থল হইয়া বসিয়া রহিল। এতদিনে আশুর অনেক বয়স

হইয়া থাকিবে এবং তাহার জীবনে অনেক গুরুতর সুখদুঃখলজ্জার দিন আসিয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু সেইদিনকার বালকহৃদয়ের ইতিহাসের সহিত কোনোদিনের তুলনা হইতে পারে না।

কিন্তু ব্যাপারটা অতি ক্ষুদ্র এবং দুই কথায় শেষ হইয়া যায়।

আশুর একটি ছোটো বোন আছে; তাহার সমবয়স্ক সঙ্গিনী কিংবা ভগিনী আর-কেহ নাই, সুতরাং আশুর সঙ্গেই তাহার যত খেলা।

একটি গেটওয়ালা লোহার রেলিঙের মধ্যে আশুদের বাড়ির গাড়িবারান্দা। সেদিন মেঘ করিয়া খুব বৃষ্টি হইতেছিল। জুতা হাতে করিয়া, ছাতা মাথায় দিয়া যে দুইচারিজন পথিক পথ দিয়া চলিতেছিল, তাহাদের কোনো দিকে চাহিবার অবসর ছিল না। সেই মেঘের অন্ধকারে, সেই বৃষ্টিপতনের শব্দে, সেই সমস্তদিন ছুটিতে, গাড়িবারান্দার সিঁড়িতে বসিয়া আশু তাহার বোনের সঙ্গে খেলা করিতেছিল।

সেদিন তাহাদের পুতুলের বিয়ে। তাহারি আয়োজন সম্বন্ধে অত্যন্ত গম্ভীরভাবে ব্যস্ত হইয়া আশু তাহার ভগিনীকে উপদেশ দিতেছিল।

এখন তর্ক উঠিল, কাহাকে পুরোহিত করা যায়। বালিকা চট করিয়া ছুটিয়া একজনকে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ গা, তুমি আমাদের পুরুতঠাকুর হবে?"

আশু পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখে, শিবনাথপণ্ডিত ভিজা ছাতা মুড়িয়া অর্ধসিক্ত অবস্থায় তাহাদের গাড়িবারান্দায় দাঁড়াইয়া আছেন; পথ দিয়া যাইতেছিলেন, বৃষ্টির উপদ্রব হইতে সেখানে আশ্রয় লইয়াছেন। বালিকা তাঁহাকে পুতুলের পৌরোহিত্যে নিয়োগ করিবার প্রস্তাব করিতেছে।

পণ্ডিতমশায়কে দেখিয়াই আশু তাহার খেলা এবং ভগিনী সমস্ত ফেলিয়া এক-দৌড়ে গৃহের মধ্যে অন্তর্হিত হইল। তাহার ছুটির দিন সম্পূর্ণ মাটি হইয়া গেল।

পরদিন শিবনাথপণ্ডিত যখন শুষ্ক উপহাসের সহিত এই ঘটনাটি ভূমিকাস্বরূপে উল্লেখ করিয়া সাধারণসমক্ষে আশুর 'গিন্নি' নামকরণ করিলেন, তখন প্রথমে সে যেমন সকল কথাতেই মৃদুভাবে হাসিয়া থাকে তেমন করিয়া হাসিয়া চারিদিকের কৌতুকহাস্যে ঈষৎ যোগ দিতে চেষ্টা করিল; এমনসময় একটা ঘণ্টা বাজিল, অন্য-সকল ক্লাস ভাঙিয়া গেল, এবং শালপাতায় দুটি মিষ্টান্ন ও ঝকঝকে কাঁসার ঘটিতে জল লইয়া দাসী আসিয়া দ্বারের কাছে দাঁড়াইল।

তখন হাসিতে হাসিতে তাহার মুখকান টকটকে লাল হইয়া উঠিল, ব্যথিত কপালের শিরা ফুলিয়া উঠিল, এবং উচ্ছ্বসিত অশ্রুজল আর কিছুতেই বাধা মানিল না।

শিবনাথপণ্ডিত বিশ্রামগৃহে জলযোগ করিয়া নিশ্চিন্তমনে তামাক খাইতে লাগিলেন

—ছেলেরা পরমাহ্লাদে আশুকে ঘিরিয়া 'গিন্নি গিন্নি' করিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। সেই ছুটির দিনের ছোটোবোনের সহিত খেলা জীবনের একটি সর্বপ্রধান লজ্জাজনক ভ্রম বলিয়া আশুর কাছে বোধ হইতে লাগিল, পৃথিবীর লোক কোনোকালেও যে সেদিনের কথা ভুলিয়া যাইবে এ তাহার মনে বিশ্বাস হইল না।

১২৯৮ ?

রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা

যাহারা বলে গুরুচরণের মৃত্যুকালে তাঁহার দ্বিতীয় পক্ষের সংসারটি অন্তঃপুরে বসিয়া তাস খেলিতেছিলেন, তাহারা বিশ্বনিন্দুক, তাহারা তিলকে তাল করিয়া তোলে। আসলে গৃহিণী তখন এক পায়ের উপর বসিয়া দ্বিতীয় পায়ের হাঁটু চিবুক পর্যন্ত উত্থিত করিয়া কাঁচা তেঁতুল, কাঁচা লঙ্কা এবং চিংড়িমাছের ঝালচচ্চড়ি দিয়া অত্যন্ত মনোযোগের সহিত পান্তাভাত খাইতেছিলেন। বাহির হইতে যখন ডাক পড়িল, তখন স্তূপাকৃতি চর্বিত ডাঁটা এবং নিঃশেষিত অন্নপাত্রটি ফেলিয়া গম্ভীরমুখে কহিলেন, "দুটো পান্তাভাত-যে মুখে দেব, তারো সময় পাওয়া যায় না।"

এদিকে ডাক্তার যখন জবাব দিয়া গেল তখন গুরুচরণের ভাই রামকানাই রোগীর পার্শ্বে বসিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন, "দাদা, যদি তোমার উইল করিবার ইচ্ছা থাকে তো বলো।" গুরুচরণ ক্ষীণস্বরে বলিলেন, "আমি বলি, তুমি লিখিয়া লও।" রামকানাই কাগজকলম লইয়া প্রস্তুত হইলেন। গুরুচরণ বলিয়া গেলেন, "আমার স্থাবর অস্থাবর সমস্ত বিষয়সম্পত্তি আমার ধর্মপত্নী শ্রীমতী বরদাসুন্দরীকে দান করিলাম।" রামকানাই লিখিলেন— কিন্তু লিখিতে তাঁহার কলম সরিতেছিল না। তাঁহার বড়ো আশা ছিল, তাঁহার একমাত্র পুত্র নবদ্বীপ অপুত্রক জ্যাঠামহাশয়ের সমস্ত বিষয়সম্পত্তির অধিকারী হইবে। যদিও দুই ভাইয়ে পৃথগন্ন ছিলেন, তথাপি এই আশায় নবদ্বীপের মা নবদ্বীপকে কিছুতেই চাকরি করিতে দেন নাই— এবং সকাল-সকাল বিবাহ দিয়াছিলেন, এবং শত্রুর মুখে ভস্ম নিক্ষেপ করিয়া বিবাহ নিষ্ফল হয় নাই। কিন্তু তথাপি রামকানাই লিখিলেন এবং সই করিবার জন্য কলমটা দাদার হাতে দিলেন। গুরুচরণ নির্জীব হস্তে যাহা সই করিলেন, তাহা কতকগুলা কম্পিত বক্ররেখা কি তাঁহার নাম, বুঝা দুঃসাধ্য।

পান্তাভাত খাইয়া যখন স্ত্রী আসিলেন তখন গুরুচরণের বাক্‌রোধ হইয়াছে দেখিয়া

স্ত্রী কাঁদিতে লাগিলেন। যাহারা অনেক আশা করিয়া বিষয় হইতে বঞ্চিত হইয়াছে তাহারা বলিল ‘মায়াকান্না’। কিন্তু সেটা বিশ্বাসযোগ্য নহে।

উইলের বৃত্তান্ত শুনিয়া নবদ্বীপের মা ছুটিয়া আসিয়া বিষম গোল বাধাইয়া দিল— বলিল, “মরণকালে বুদ্ধিনাশ হয়। এমন সোনার-চাঁদ ভাইপো থাকিতে—”

রামকানাই যদিও স্ত্রীকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন— এত অধিক যে তাহাকে ভাষান্তরে ভয় বলা যাইতে পারে— কিন্তু তিনি থাকিতে পারিলেন না, ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন, “মেজোবউ, তোমার তো বুদ্ধিনাশের সময় হয় নাই, তবে তোমার এমন ব্যবহার কেন। দাদা গেলেন, এখন আমি তো রহিয়া গেলাম, তোমার যা-কিছু বক্তব্য আছে, অবসরমতো আমাকে বলিয়ো, এখন ঠিক সময় নয়।”

নবদ্বীপ সংবাদ পাইয়া যখন আসিল তখন তাহার জ্যাঠামহাশয়ের কাল হইয়াছে। নবদ্বীপ মৃত ব্যক্তিকে শাসাইয়া কহিল, “দেখিব মুখাগ্নি কে করে— এবং শ্রাদ্ধশান্তি যদি করি তো আমার নাম নবদ্বীপ নয়।” গুরুচরণ লোকটা কিছুই মানিত না। সে ডফ সাহেবের ছাত্র ছিল। শাস্ত্রমতে যেটা সর্বাপেক্ষা অখাদ্য সেইটাতে তার বিশেষ পরিতৃপ্তি ছিল। লোকে যদি তাহাকে ক্রিশ্চান বলিত, সে জিভ কাটিয়া বলিত, “রাম, আমি যদি ক্রিশ্চান হই তো গোমাংস খাই।” জীবিত অবস্থায় যাহার এই দশা, সদ্যমৃত অবস্থায় সে-যে পিণ্ডনাশ-আশঙ্কায় কিছুমাত্র বিচলিত হইবে, এমন সম্ভাবনা নাই। কিন্তু উপস্থিতমতো ইহা ছাড়া আর-কোনো প্রতিরোধের পথ ছিল না। নবদ্বীপ একটা সান্ত্বনা পাইল যে, লোকটা পরকালে গিয়া মরিয়া থাকিবে। যতদিন ইহলোকে থাকা যায় জ্যাঠামহাশয়ের বিষয় না পাইলেও কোনোক্রমে পেট চলিয়া যায়, কিন্তু জ্যাঠামহাশয় যে-লোকে গেলেন সেখানে ভিক্ষা করিয়া পিণ্ড মেলে না। বাঁচিয়া থাকিবার অনেক সুবিধা আছে।

রামকানাই বরদাসুন্দরীর নিকট গিয়া বলিলেন, “বউঠাকুরানী, দাদা তোমাকে সমস্ত বিষয় দিয়া গিয়াছেন। এই তাঁহার উইল। লোহার সিন্দুকে যত্নপূর্বক রাখিয়া দিয়ো।”

বিধবা তখন মুখে মুখে দীর্ঘপদ রচনা করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতেছিলেন, দুইচারিজন দাসীও তাঁহার সহিত স্বর মিলাইয়া মধ্যে-মধ্যে দুইচারিটা নূতন শব্দ যোজনাপূর্বক শোকসংগীতে সমস্ত পল্লীর নিদ্রা দূর করিতেছিল। মাঝে হইতে এই কাগজখণ্ড আসিয়া একপ্রকার লয়ভঙ্গ হইয়া গেল এবং ভাবেরও পূর্বাপর যোগ রহিল না। ব্যাপারটা নিম্নলিখিত-মতো অসংলগ্ন আকার ধারণ করিল।—

“ওগো, আমার কী সর্বনাশ হল গো, কী সর্বনাশ হল। আচ্ছা, ঠাকুরপো,

লেখাটা কার। তোমার বুঝি? ওগো, তেমন যত্ন ক'রে আমাকে আর কে দেখবে, আমার দিকে কে মুখ তুলে চাইবে গো।— তোরা একটুকু থাম্, মেলা চেঁচাস নে, কথাটা শুনতে দে। ওগো, আমি কেন আগে গেলুম না গো— আমি কেন বেঁচে রইলুম।" রামকানাই মনে-মনে নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "সে আমাদের কপালের দোষ।"

বাড়ি ফিরিয়া গিয়া নবদ্বীপের মা রামকানাইকে লইয়া পড়িলেন। বোঝাই গাড়ি সমেত খাদের মধ্যে পড়িয়া হতভাগ্য বলদ গাড়োয়ানের সহস্র গুঁতা খাইয়াও অনেকক্ষণ যেমন নিরুপায় নিশ্চল ভাবে দাঁড়াইয়া থাকে, রামকানাই তেমনি অনেকক্ষণ চুপ করিয়া সহ্য করিলেন,— অবশেষে কাতরস্বরে কহিলেন, "আমার অপরাধ কী। আমি তো দাদা নই।"

নবদ্বীপের মা ফোঁস করিয়া উঠিয়া বলিলেন, "না, তুমি বড়ো ভালো মানুষ, তুমি কিছু বোঝ না; দাদা বললেন 'লেখো', ভাই অমনি লিখে গেলেন। তোমরা সবাই সমান। তুমিও সময়কালে ওই কীর্তি করবে বলে বসে আছ। আমি মলেই কোন্ পোড়ারমুখী ডাইনীকে ঘরে আনবে— আর আমার সোনার-চাঁদ নবদ্বীপকে পাথারে ভাসাবে। কিন্তু সেজন্যে ভেবো না, আমি শিগগির মরছি নে।"

এইরূপে রামকানাইয়ের ভাবী অত্যাচারের আলোচনা করিয়া গৃহিণী উত্তরোত্তর অধিকতর অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতে লাগিলেন। রামকানাই নিশ্চয় জানিতেন, যদি এই-সকল উৎকট কাল্পনিক আশঙ্কা নিবারণ-উদ্দেশে ইহার তিলমাত্র প্রতিবাদ করেন, তবে হিতে বিপরীত হইবে। এই ভয়ে অপরাধীর মতো চুপ করিয়া রহিলেন, যেন কাজটা করিয়া ফেলিয়াছেন। যেন তিনি সোনার নবদ্বীপকে বিষয় হইতে বঞ্চিত করিয়া তাঁহার ভাবী দ্বিতীয়পক্ষকে সমস্ত লিখিয়া দিয়া মরিয়া বসিয়া আছেন, এখন অপরাধ স্বীকার না করিয়া কোনো গতি নাই।

ইতিমধ্যে নবদ্বীপ তাহার বুদ্ধিমান বন্ধুদের সহিত অনেক পরামর্শ করিয়া মাকে আসিয়া বলিল, "কোনো ভাবনা নাই। এ-বিষয় আমিই পাইব। কিছুদিনের মতো বাবাকে এখান হইতে স্থানান্তরিত করা চাই। তিনি থাকিলে সমস্ত ভণ্ডুল হইয়া যাইবে।" নবদ্বীপের বাবার বুদ্ধিসুদ্ধির প্রতি নবদ্বীপের মার কিছুমাত্র শ্রদ্ধা ছিল না; সুতরাং কথাটা তাঁরো যুক্তিযুক্ত মনে হইল। অবশেষে মার তাড়নায় এই নিতান্ত অনাবশ্যক নির্বোধ কর্মনাশা বাবা একটা যেমন-তেমন ছল করিয়া কিছুদিনের মতো কাশীতে গিয়া আশ্রয় লইলেন।

অল্পদিনের মধ্যেই বরদাসুন্দরী এবং নবদ্বীপচন্দ্র পরস্পরের নামে উইলজালের

অভিযোগ করিয়া আদালতে গিয়া উপস্থিত হইল। নবদ্বীপ তাহার নিজের নামে যে-উইলখানি বাহির করিয়াছে, তাহার নামসহি দেখিলে গুরুচরণের হস্তাক্ষর স্পষ্ট প্রমাণ হয়; উইলের দুই-একজন নিঃস্বার্থ সাক্ষীও পাওয়া গিয়াছে। বরদাসুন্দরীর পক্ষে নবদ্বীপের বাপ একমাত্র সাক্ষী এবং সহি কারো বুঝিবার সাধ্য নাই। তাঁহার গৃহপোষ্য একটি মামাতো ভাই ছিল, সে বলিল, "দিদি, তোমার ভাবনা নাই। আমি সাক্ষ্য দিব এবং আরো সাক্ষ্য জুটাইব।"

ব্যাপারটা যখন সম্পূর্ণ পাকিয়া উঠিল, তখন নবদ্বীপের মা নবদ্বীপের বাপকে কাশী হইতে ডাকিয়া পাঠাইলেন। অনুগত ভদ্রলোকটি ব্যাগ ও ছাতা হাতে যথাসময়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এমন কি, কিঞ্চিৎ রসালাপ করিবারও চেষ্টা করিলেন, জোড়হস্তে সহাস্যে বলিলেন, "গোলাম হাজির, এখন মহারানীর কী অনুমতি হয়।"

গৃহিণী মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "নেও নেও, আর রঙ্গ করতে হবে না। এতদিন ছুতো করে কাশীতে কাটিয়ে এলেন, একদিনের তরে তো মনে পড়ে নি। ইত্যাদি।

এইরূপে উভয় পক্ষে অনেকক্ষণ ধরিয়া পরস্পরের নামে আদরের অভিযোগ আনিতে লাগিলেন,— অবশেষে নালিশ ব্যক্তিকে ছাড়িয়া জাতিতে গিয়া পৌঁছিল— নবদ্বীপের মা পুরুষের ভালোবাসার সহিত মুসলমানের মুরগি-বাৎসল্যের তুলনা করিলেন। নবদ্বীপের বাপ বলিলেন, 'রমণীর মুখে মধু, হৃদয়ে ক্ষুর',— যদিও এই মৌখিক মধুরতার পরিচয় নবদ্বীপের বাপ কবে পাইলেন, বলা শক্ত।

ইতিমধ্যে রামকানাই সহসা আদালত হইতে এক সাক্ষীর সপিনা পাইলেন। অবাক হইয়া যখন তাহার মর্মগ্রহণের চেষ্টা করিতেছেন, তখন নবদ্বীপের মা আসিয়া কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিলেন। বলিলেন, "হাড়জ্বালানী ডাকিনী কেবল-যে বাছা নবদ্বীপকে তাহার স্নেহশীল জ্যাঠার ন্যায্য উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে চায় তাহা নহে, আবার সোনার ছেলেকে জেলে পাঠাইবার আয়োজন করিতেছে।"

অবশেষে ক্রমে ক্রমে সমস্ত ব্যাপারটা অনুমান করিয়া লইয়া রামকানাইয়ের চক্ষুস্থির হইয়া গেল। উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "তোরা একি সর্বনাশ করিয়াছিস।" গৃহিণী ক্রমে নিজমূর্তি ধারণ করিয়া বলিলেন, "কেন, এতে নবদ্বীপের দোষ হয়েছে কী। সে তার জ্যাঠার বিষয় নেবে না! অমনি এক কথায় ছেড়ে দেবে!"

কোথা হইতে এক চক্ষুখাদিকা, ভর্তার পরমায়ুহন্ত্রী, অষ্টকুষ্ঠীর পুত্রী উড়িয়া

আসিয়া জুড়িয়া বসিবে, ইহা কোন্ সৎকুলপ্রদীপ কনকচন্দ্র সন্তান সহ্য করিতে পারে। যদি-বা মরণকালে এবং ডাকিনীর মন্ত্রগুণে কোনো-এক মূঢ়মতি জ্যেষ্ঠতাতের বুদ্ধিভ্রম হইয়া থাকে, তবে সুবর্ণময় ভ্রাতুষ্পুত্র সে-ভ্রম নিজহস্তে সংশোধন করিয়া লইলে এমন কী অন্যায় কার্য হয়।

হতবুদ্ধি রামকানাই যখন দেখিলেন, তাঁহার স্ত্রী পুত্র উভয়ে মিলিয়া কখনো-বা তর্জনগর্জন কখনো-বা অশ্রুবিসর্জন করিতে লাগিলেন, তখন ললাটে করাঘাত করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন— আহার ত্যাগ করিলেন, জল পর্যন্ত স্পর্শ করিলেন না।

এইরূপে দুই দিন নীরবে অনাহারে কাটিয়া গেল, মকদ্দমার দিন উপস্থিত হইল। ইতিমধ্যে নবদ্বীপ বরদাসুন্দরীর মামাতো ভাইটিকে ভয় প্রলোভন দেখাইয়া এমনি বশ করিয়া লইয়াছে যে, সে অনায়াসে নবদ্বীপের পক্ষে সাক্ষ্য দিল। জয়শ্রী যখন বরদাসুন্দরীকে ত্যাগ করিয়া অন্য পক্ষে যাইবার আয়োজন করিতেছে, তখন রামকানাইকে ডাক পড়িল।

অনাহারে মৃতপ্রায় শুষ্কওষ্ঠ শুষ্করসনা বৃদ্ধ কম্পিত শীর্ণ অঙ্গুলি দিয়া সাক্ষ্যমঞ্চের কাঠগড়া চাপিয়া ধরিলেন। চতুর ব্যারিস্টার অত্যন্ত কৌশলে কথা বাহির করিয়া লইবার জন্য জেরা করিতে আরম্ভ করিলেন,— বহুদূর হইতে আরম্ভ করিয়া সাবধানে অতি ধীর বক্রগতিতে প্রসঙ্গের নিকটবর্তী হইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

তখন রামকানাই জজের দিকে ফিরিয়া জোড়হস্তে কহিলেন, “হুজুর, আমি বৃদ্ধ, অত্যন্ত দুর্বল। অধিক কথা কহিবার সামর্থ্য নাই। আমার যা বলিবার সংক্ষেপে বলিয়া লই। আমার দাদা স্বর্গীয় গুরুচরণ চক্রবর্তী মৃত্যুকালে সমস্ত বিষয়সম্পত্তি তাঁহার পত্নী শ্রীমতী বরদাসুন্দরীকে উইল করিয়া দিয়া যান। সে-উইল আমি নিজহস্তে লিখিয়াছি এবং দাদা নিজহস্তে স্বাক্ষর করিয়াছেন। আমার পুত্র নবদ্বীপচন্দ্র যে-উইল দাখিল করিয়াছেন তাহা মিথ্যা।” এই বলিয়া রামকানাই কাঁপিতে কাঁপিতে মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন।

চতুর ব্যারিস্টার সকৌতুকে পার্শ্ববর্তী অ্যাটর্নিকে বলিলেন, “বাই জোভ। লোকটাকে কেমন ঠেসে ধরেছিলুম।”

মামাতো ভাই ছুটিয়া গিয়া দিদিকে বলিল, “বুড়ো সমস্ত মাটি করিয়াছিল,— আমার সাক্ষ্যে মকদ্দমা রক্ষা পায়।”

দিদি বলিলেন, “বটে? লোক কে চিনতে পারে। আমি বুড়োকে ভালো বলে জানতুম।”

কারাবরুদ্ধ নবদ্বীপের বুদ্ধিমান বন্ধুরা অনেক ভাবিয়া স্থির করিল, নিশ্চয়ই বৃদ্ধ ভয়ে এই কাজ করিয়া ফেলিয়াছে ; সাক্ষীর বাক্সের মধ্যে উঠিয়া বুড়া বুদ্ধি ঠিক রাখিতে পারে নাই ; এমনতরো আস্ত নির্বোধ সমস্ত শহর খুঁজিলে মিলে না।

গৃহে ফিরিয়া আসিয়া রামকানাইয়ের কঠিন বিকার-জ্বর উপস্থিত হইল। প্রলাপে পুত্রের নাম উচ্চারণ করিতে করিতে এই নির্বোধ সর্বকর্মপণ্ডকারী নবদ্বীপের অনাবশ্যক বাপ পৃথিবী হইতে অপসৃত হইয়া গেল ; আত্মীয়দের মধ্যে কেহ কেহ কহিল, "আর কিছুদিন পূর্বে গেলেই ভালো হইত"— কিন্তু তাহাদের নাম করিতে চাহি না।

১২৯৮ ?

ব্যবধান

সম্পর্ক মিলাইয়া দেখিতে গেলে বনমালী এবং হিমাংশুমালী উভয়ে মামাতো পিসতুতো ভাই ; সেও অনেক হিসাব করিয়া দেখিলে তবে মেলে। কিন্তু ইহাদের দুই পরিবার বহুকাল হইতে প্রতিবেশী, মাঝে কেবল একটা বাগানের ব্যবধান, এইজন্য ইহাদের সম্পর্ক নিতান্ত নিকট না হইলেও ঘনিষ্ঠতার অভাব নাই।

বনমালী হিমাংশুর চেয়ে অনেক বড়ো। হিমাংশুর যখন দন্ত এবং বাক্যস্ফূর্তি হয় নাই, তখন বনমালী তাহাকে কোলে করিয়া এই বাগানে সকালে সন্ধ্যায় হাওয়া খাওয়াইয়াছে, খেলা করিয়াছে, কান্না থামাইয়াছে, ঘুম পাড়াইয়াছে এবং শিশুর মনোরঞ্জন করিবার জন্য পরিণতবুদ্ধি বয়স্ক লোকদিগকে সবেগে শিরশ্চালন, তারস্বরে প্রলাপভাষণ প্রভৃতি যে-সকল বয়সানুচিত চাপল্য এবং উৎকট উদ্যম প্রকাশ করিতে হয়, বনমালী তাহাও করিতে ত্রুটি করে নাই।

বনমালী লেখাপড়া বড়ো-একটা কিছু করে নাই। তাহার বাগানের শখ ছিল এবং এই দূরসম্পর্কের ছোটোভাইটি ছিল। ইহাকে খুব একটি দুর্লভ দুর্মূল্য লতার মতো বনমালী হৃদয়ের সমস্ত স্নেহসিঞ্চন করিয়া পালন করিতেছিল এবং সে যখন তাহার সমস্ত অন্তরবাহিরকে আচ্ছন্ন করিয়া লতাইয়া উঠিতে লাগিল, তখন বনমালী আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিল।

এমন সচরাচর দেখা যায় না কিন্তু এক-একটি স্বভাব আছে যে, একটি ছোটো খেয়াল কিংবা একটি ছোটো শিশু কিংবা একটি অকৃতজ্ঞ বন্ধুর নিকটে অতি সহজে আপনাকে

সম্পূর্ণ বিসর্জন করে; এই বিপুল পৃথিবীতে একটিমাত্র ছোটো স্নেহের কারবারে জীবনের সমস্ত মূলধন সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকে, তারপরে হয়তো সামান্য উপস্বত্বে পরম সন্তোষে জীবন কাটাইয়া দেয় কিংবা সহসা একদিন প্রভাতে সমস্ত ঘরবাড়ি বিক্রয় করিয়া কাঙাল হইয়া পথে গিয়া দাঁড়ায়।

হিমাংশুর বয়স যখন আর-একটু বাড়িল, তখন বয়স এবং সম্পর্কের বিস্তর তারতম্য-সত্ত্বেও বনমালীর সহিত তাহার যেন একটি বন্ধুত্বের বন্ধন স্থাপিত হইল। উভয়ের মধ্যে যেন ছোটোবড়ো কিছু ছিল না।

এইরূপ হইবার একটু কারণও ছিল। হিমাংশু লেখাপড়া করিত এবং স্বভাবতই তাহার জ্ঞানস্পৃহা অত্যন্ত প্রবল ছিল। বই পাইলেই পড়িতে বসিত, তাহাতে অনেক বাজে বই পড়া হইয়াছিল বটে কিন্তু যেমন করিয়াই হউক চারিদিকেই তাহার মনের একটি পরিণতিসাধন হইয়াছিল। বনমালী বিশেষ একটু শ্রদ্ধার সহিত তাহার কথা শুনিত, তাহার পরামর্শ লইত, তাহার সহিত ছোটোবড়ো সকল কথার আলোচনা করিত, কোনো বিষয়েই তাহাকে বালক বলিয়া অগ্রাহ্য করিত না। হৃদয়ের সর্বপ্রথম স্নেহরস দিয়া যাহাকে মানুষ করা গিয়াছে, বয়সকালে যদি সে বুদ্ধি, জ্ঞান এবং উন্নত স্বভাবের জন্য শ্রদ্ধার অধিকারী হয়, তবে তাহার মতো এমন পরমপ্রিয়বস্তু পৃথিবীতে আর পাওয়া যায় না।

বাগানের শখও হিমাংশুর ছিল। কিন্তু এ-বিষয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে প্রভেদ ছিল। বনমালীর ছিল হৃদয়ের শখ, হিমাংশুর ছিল বুদ্ধির শখ। পৃথিবীর এই কোমল গাছপালাগুলি, এই অচেতন জীবনরাশি, যাহারা যত্নের কোনো লালসা রাখে না অথচ যত্ন পাইলে ঘরের ছেলেগুলির মতো বাড়িয়া ওঠে, যাহারা মানুষের শিশুর চেয়েও শিশু, তাহাদিগকে সযত্নে মানুষ করিয়া তুলিবার জন্য বনমালীর একটি স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ছিল। কিন্তু হিমাংশুর গাছপালার প্রতি একটি কৌতূহলদৃষ্টি ছিল। অঙ্কুর গজাইয়া উঠে, কিশলয় দেখা দেয়, কুঁড়ি ধরে, ফুল ফুটিয়া উঠে, ইহাতে তাহার একান্ত মনোযোগ আকর্ষণ করিত।

গাছের বীজবপন, কলম করা, সার দেওয়া, চানকা তৈয়ারি প্রভৃতি সম্বন্ধে হিমাংশুর মাথায় বিবিধ পরামর্শের উদয় হইত এবং বনমালী অত্যন্ত আনন্দের সহিত তাহা গ্রহণ করিত। এই উদ্যানখণ্ডটুকু লইয়া আকৃতি প্রকৃতির যত প্রকার সংযোগ-বিয়োগ সম্ভব, তাহা উভয়ে মিলিয়া সাধন করিত।

দ্বারের সম্মুখে বাগানের উপরেই একটি বাঁধানো বেদির মতো ছিল। চারটে বাজিলেই একটি পাতলা জামা পরিয়া, একটি কোঁচানো চাদর কাঁধের উপর ফেলিয়া,

গুড়গুড়ি লইয়া, বনমালী সেইখানে ছায়ায় গিয়া বসিত। কোনো বন্ধুবান্ধব নাই, হাতে একখানি বই কিংবা খবরের কাগজ নাই। বসিয়া বসিয়া তামাক টানিত, এবং আড়চক্ষে উদাসীনভাবে কখনো-বা দক্ষিণে কখনো বামে দৃষ্টিপাত করিত। এমনি করিয়া সময় তাহার গুড়গুড়ির বাষ্পকুণ্ডলীর মতো ধীরে ধীরে অত্যন্ত লঘুভাবে উড়িয়া যাইত, ভাঙিয়া যাইত, মিলাইয়া যাইত, কোথাও কোনো চিহ্ন রাখিত না।

অবশেষে যখন হিমাংশু স্কুল হইতে ফিরিয়া, জল খাইয়া হাতমুখ ধুইয়া দেখা দিত, তখন তাড়াতাড়ি গুড়গুড়ির নল ফেলিয়া বনমালী উঠিয়া পড়িত। তখনি তাহার আগ্রহ দেখিয়া বুঝা যাইত, এতক্ষণ ধৈর্যসহকারে সে কাহার প্রত্যাশায় বসিয়া ছিল।

তাহার পরে দুইজনে বাগানে বেড়াইতে বেড়াইতে কথা। অন্ধকার হইয়া আসিলে দুইজনে বেঞ্চের উপর বসিত,— দক্ষিণের বাতাস গাছের পাতা মর্মরিত করিয়া বহিয়া যাইত; কোনোদিন-বা বাতাস বহিত না, গাছপালাগুলি ছবির মতো স্থির দাঁড়াইয়া রহিত, মাথার উপরে আকাশ ভরিয়া তারাগুলি জ্বলিতে থাকিত।

হিমাংশু কথা কহিত, বনমালী চুপ করিয়া শুনিত। যাহা বুঝিত না, তাহাও তাহার ভালো লাগিত; যে-সকল কথা আর-কাহারো নিকট হইতে অত্যন্ত বিরক্তিজনক লাগিতে পারিত, সেই কথাই হিমাংশুর মুখে বড়ো কৌতুকের মনে হইত। এমন শ্রদ্ধাবান বয়স্ক শ্রোতা পাইয়া হিমাংশুর বক্তৃতাশক্তি স্মৃতিশক্তি কল্পনাশক্তির সবিশেষ পরিতৃপ্তি লাভ হইত। সে কতক-বা পড়িয়া বলিত, কতক-বা ভাবিয়া বলিত, কতক-বা উপস্থিতমতো তাহার মাথায় জোগাইত এবং অনেক সময়ে কল্পনার সহায়তায় জ্ঞানের অভাব ঢাকা দিয়া লইত। অনেক ঠিক কথা বলিত, অনেক বেঠিক কথাও বলিত, কিন্তু বনমালী গম্ভীরভাবে শুনিত, মাঝে-মাঝে দুটো-একটা কথা বলিত, হিমাংশু তাহার প্রতিবাদ করিয়া যাহা বুঝাইত তাহাই বুঝিত, এবং তাহার পরদিন ছায়ায় বসিয়া গুড়গুড়ি টানিতে টানিতে সেই-সকল কথা অনেকক্ষণ ধরিয়া বিস্ময়ের সহিত চিন্তা করিত।

ইতিমধ্যে এক গোল বাধিল। বনমালীদের বাগান এবং হিমাংশুদের বাড়ির মাঝখানে জল যাইবার একটি নালা আছে। সেই নালার এক জায়গায় একটি পাতিলেবুর গাছ জন্মিয়াছে। সেই গাছে যখন ফল ধরে তখন বনমালীদের চাকর তাহা পাড়িতে চেষ্টা করে এবং হিমাংশুদের চাকর তাহা নিবারণ করে এবং উভয় পক্ষে যে-গালাগালি বর্ষিত হয়, তাহাতে যদি কিছুমাত্র বস্তু থাকিত তাহা হইলে সমস্ত নালা ভরাট হইয়া যাইত।

মাঝে হইতে বনমালীর বাপ হরচন্দ্র এবং হিমাংশুমালীর বাপ গোকুলচন্দ্রের মধ্যে

তাহাই লইয়া ঘোর বিবাদ বাধিয়া গেল। দুই পক্ষে নালার দখল লইয়া আদালতে হাজির।

উকিল-ব্যারিস্টারদের মধ্যে যতগুলি মহারথী ছিল, সকলেই অন্যতর পক্ষ অবলম্বন করিয়া সুদীর্ঘ বাক্‌যুদ্ধ আরম্ভ করিল। উভয় পক্ষের যে টাকাটা খরচ হইয়া গেল, ভাদ্রের প্লাবনেও উক্ত নালা দিয়া এত জল কখনো বহে নাই।

শেষকালে হরচন্দ্রের জিত হইল; প্রমাণ হইয়া গেল, নালা তাহারি এবং পাতিনেবুতে আর-কাহারো কোনো অধিকার নাই। আপিল হইল কিন্তু নালা এবং পাতিনেবু হরচন্দ্রেরই রহিল।

যতদিন মকদ্দমা চলিতেছিল, দুই ভাইয়ের বন্ধুত্বে কোনো ব্যাঘাত ঘটে নাই। এমন কি, পাছে বিবাদের ছায়া পরস্পরকে স্পর্শ করে, এই আশঙ্কায় কাতর হইয়া বনমালী দ্বিগুণ ঘনিষ্ঠভাবে হিমাংশুকে হৃদয়ের কাছে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে চেষ্টা করিত, এবং হিমাংশুও লেশমাত্র বিমুখভাব প্রকাশ করিত না।

যেদিন আদালতে হরচন্দ্রের জিত হইল, সেদিন বাড়িতে বিশেষত অন্তঃপুরে পরম উল্লাস পড়িয়া গেল, কেবল বনমালীর চক্ষে ঘুম রহিল না। তাহার পরদিন অপরাহ্ণে সে এমন ম্লানমুখে সেই বাগানের বেদিতে গিয়া বসিল, যেন পৃথিবীতে আর-কাহারো কিছু হয় নাই, কেবল তাহারি একটা মস্ত হার হইয়া গেছে।

সেদিন সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেল, ছয়টা বাজিয়া গেল, কিন্তু হিমাংশু আসিল না। বনমালী একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া হিমাংশুদের বাড়ির দিকে চাহিয়া দেখিল। খোলা জানালার ভিতর দিয়া দেখিতে পাইল, আলনার উপরে হিমাংশুর স্কুলের ছাড়া-কাপড় ঝুলিতেছে; অনেকগুলি চিরপরিচিত লক্ষণ মিলাইয়া দেখিল— হিমাংশু বাড়িতে আছে। গুড়গুড়ির নল ফেলিয়া দিয়া বিষণ্নমুখে বেড়াইতে লাগিল এবং সহস্রবার সেই বাতায়নের দিকে চাহিল, কিন্তু হিমাংশু বাগানে আসিল না।

সন্ধ্যার আলো জ্বলিলে বনমালী ধীরে ধীরে হিমাংশুর বাড়িতে গেল।

গোকুলচন্দ্র দ্বারের কাছে বসিয়া তপ্ত দেহে হাওয়া লাগাইতেছিলেন। তিনি বলিলেন, "কে ও।"

বনমালী চমকিয়া উঠিল। যেন সে চুরি করিতে আসিয়া ধরা পড়িয়াছে। কম্পিতকণ্ঠে বলিল, "মামা, আমি।"

মামা বলিলেন, "কাহাকে খুঁজিতে আসিয়াছ। বাড়িতে কেহ নাই।"

বনমালী আবার বাগানে ফিরিয়া আসিয়া চুপ করিয়া বসিল।

যত রাত হইতে লাগিল, দেখিল হিমাংশুদের বাড়ির জানলাগুলি একে একে বন্ধ

হইয়া গেল ; দরজার ফাঁক দিয়া যে-দীপালোকরেখা দেখা যাইতেছিল, তাহাও ক্রমে ক্রমে অনেকগুলি নিবিয়া গেল। অন্ধকার রাত্রে বনমালীর মনে হইল, হিমাংশুদের বাড়ির সমুদয় দ্বার তাহারি নিকট রুদ্ধ হইয়া গেল, সে কেবল বাহিরের অন্ধকারে একলা পড়িয়া রহিল।

আবার তাহার পরদিন বাগানে আসিয়া বসিল, মনে করিল, আজ হয়তো আসিতেও পারে। যে বহুকাল হইতে প্রতিদিন আসিত, সে-যে একদিনও আসিবে না, এ-কথা সে কিছুতেই মনে করিতে পারিল না। কখনো মনে করে নাই, এ বন্ধন কিছুতেই ছিঁড়িবে ; এমন নিশ্চিন্তমনে থাকিত যে, জীবনের সমস্ত সুখদুঃখ কখন্ সেই বন্ধনে ধরা দিয়াছে, তাহা সে জানিতেও পারে নাই। আজ সহসা জানিল সেই বন্ধন ছিঁড়িয়াছে, কিন্তু একমুহূর্তে-যে তাহার সর্বনাশ হইয়াছে তাহা সে কিছুতেই অন্তরের সহিত বিশ্বাস করিতে পারিল না।

প্রতিদিন যথাসময়ে বাগানে বসিত, যদি দৈবক্রমে আসে। কিন্তু এমনি দুর্ভাগ্য, যাহা নিয়মক্রমে প্রত্যহ ঘটিত, তাহা দৈবক্রমেও একদিন ঘটিল না।

রবিবারদিনে ভাবিল, পূর্বনিয়মমতো আজো হিমাংশু সকালে আমাদের এখানে খাইতে আসিবে। ঠিক-যে বিশ্বাস করিল তাহা নয় কিন্তু তবু আশা ছাড়িতে পারিল না। সকাল আসিল, সে আসিল না।

তখন বনমালী বলিল, 'তবে আহার করিয়া আসিবে।' আহার করিয়া আসিল না। বনমালী ভাবিল, 'আজ বোধ হয় আহার করিয়া ঘুমাইতেছে। ঘুম ভাঙিলেই আসিবে।' ঘুম কখন্ ভাঙিল জানি না, কিন্তু আসিল না।

আবার সেই সন্ধ্যা হইল, রাত্রি আসিল, হিমাংশুদের দ্বার একে একে রুদ্ধ হইল, আলোগুলি একে একে নিবিয়া গেল।

এমনি করিয়া সোমবার হইতে রবিবার পর্যন্ত সপ্তাহের সাতটা দিনই যখন দুরদৃষ্ট তাহার হাত হইতে কাড়িয়া লইল, আশাকে আশ্রয় দিবার জন্য যখন আর একটা দিনও বাকি রহিল না, তখন হিমাংশুদের রুদ্ধদ্বার অট্টালিকার দিকে তাহার অশ্রুপূর্ণ দুটি কাতর চক্ষু বড়ো-একটা মর্মভেদী অভিমানের নালিশ পাঠাইয়া দিল এবং জীবনের সমস্ত বেদনাকে একটিমাত্র আর্তস্বরের মধ্যে সংহত করিয়া বলিল, 'দয়াময়!'

১২৯৮ ?

তারাপ্রসন্নের কীর্তি

লেখকজাতির প্রকৃতি অনুসারে তারাপ্রসন্ন কিছু লাজুক এবং মুখচোরা ছিলেন। লোকের কাছে বাহির হইতে গেলে তাঁহার সর্বনাশ উপস্থিত হইত। ঘরে বসিয়া কলম চালাইয়া তাঁহার দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ, পিঠ একটু কুঁজা, সংসারের অভিজ্ঞতা অতি অল্প। লৌকিকতার বাঁধি বোলসকল সহজে তাঁহার মুখে আসিত না, এইজন্য গৃহদুর্গের বাহিরে তিনি আপনাকে কিছুতেই নিরাপদ মনে করিতেন না।

লোকেও তাঁহাকে একটা উজবুক রকমের মনে করিত এবং লোকেরো দোষ দেওয়া যায় না। মনে করো, প্রথম পরিচয়ে একটি পরম ভদ্রলোক উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে তারাপ্রসন্নকে বলিলেন, "মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ হয়ে যে কী পর্যন্ত আনন্দ লাভ করা গেল, তা একমুখে বলতে পারি নে"— তারাপ্রসন্ন নিরুত্তর হইয়া নিজের দক্ষিণ করতল বিশেষ মনোযোগপূর্বক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। হঠাৎ সে নীরবতার অর্থ এইরূপ মনে হয়, 'তা, তোমার আনন্দ হয়েছে সেটা খুব সম্ভব বটে, কিন্তু আমার-যে আনন্দ হয়েছে, এমন মিথ্যা কথাটা কী করে মুখে উচ্চারণ করব তাই ভাবছি।'

মধ্যাহ্নভোজে নিমন্ত্রণ করিয়া লক্ষপতি গৃহস্বামী যখন সায়াহ্নের প্রাক্কালে পরিবেশন করিতে আরম্ভ করেন এবং মধ্যে-মধ্যে বিনীত কাকুতিসহকারে ভোজ্যসামগ্রীর অকিঞ্চিৎকরত্ব সম্বন্ধে তারাপ্রসন্নকে সম্বোধনপূর্বক বলিতে থাকেন, "এ কিছুই না। অতি যৎসামান্য। দরিদ্রের খুদকুঁড়া, বিদুরের আয়োজন। মহাশয়কে কেবলি কষ্ট দেওয়া"— তারাপ্রসন্ন চুপ করিয়া থাকেন, যেন কথাটা এমনি প্রামাণিক যে তাহার আর উত্তর সম্ভবে না।

মধ্যে-মধ্যে এমনো হয়, কোনো সুশীল ব্যক্তি যখন তারাপ্রসন্নকে সংবাদ দেন যে, তাঁহার মতো অগাধ পাণ্ডিত্য বর্তমানকালে দুর্লভ এবং সরস্বতী নিজের পদ্মাসন পরিত্যাগপূর্বক তারাপ্রসন্নের কণ্ঠাগ্রে বাসস্থান গ্রহণ করিয়াছেন, তখন তারাপ্রসন্ন তাহার তিলমাত্র প্রতিবাদ করেন না, যেন সত্য-সত্যই সরস্বতী তাঁহার কণ্ঠরোধ করিয়া বসিয়া অছেন। তারাপ্রসন্নের এইটে জানা উচিত যে, মুখের সামনে যাহারা প্রশংসা করে এবং পরের কাছে যাহারা আত্মনিন্দায় প্রবৃত্ত হয়, তাহারা অন্যের নিকট হইতে প্রতিবাদ প্রত্যাশা করিয়াই অনেকটা অসংকোচে অত্যুক্তি করিয়া থাকে— অপর পক্ষ আগাগোড়া সমস্ত কথাটা যদি অম্লানবদনে গ্রহণ করে, তবে বক্তা আপনাকে প্রতারিত জ্ঞান করিয়া বিষম ক্ষুব্ধ হয়। এইরূপ স্থলে লোকে নিজের কথা মিথ্যা প্রতিপন্ন হইলে দুঃখিত হয় না।

ঘরের লোকের কাছে তারাপ্রসন্নের ভাব অন্যরূপ ; এমন কি, তাঁহার নিজের স্ত্রী দাক্ষায়ণীও তাঁহার সহিত কথায় আঁটিয়া উঠিতে পারেন না। গৃহিণী কথায় কথায় বলেন, "নেও নেও, আমি হার মানলুম। আমার এখন অন্য কাজ আছে।" বাগ্‌যুদ্ধে স্ত্রীকে আত্মমুখে পরাজয় স্বীকার করাইতে পারে, এমন ক্ষমতা এবং এমন সৌভাগ্য কয়জন স্বামীর আছে।

তারাপ্রসন্নের দিন বেশ কাটিয়া যাইতেছে। দাক্ষায়ণীর দৃঢ় বিশ্বাস, বিদ্যাবুদ্ধি-ক্ষমতায় তাঁহার স্বামীর সমতুল্য কেহ নাই এবং সে-কথা তিনি প্রকাশ করিয়া বলিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না ; শুনিয়া তারাপ্রসন্ন বলিতেন, "তোমার একটি বই স্বামী নাই, তুলনা কাহার সহিত করিবে।" শুনিয়া দাক্ষায়ণী ভারি রাগ করিতেন।

দাক্ষায়ণীর কেবল একটা এই মনস্তাপ ছিল যে, তাঁহার স্বামীর অসাধারণ ক্ষমতা বাহিরে প্রকাশ হয় না,— স্বামীর সে-সম্বন্ধে কিছুমাত্র চেষ্টা নাই। তারাপ্রসন্ন যাহা লিখিতেন তাহা ছাপাইতেন না।

অনুরোধ করিয়া দাক্ষায়ণী মাঝে-মাঝে স্বামীর লেখা শুনিতেন, যতই না বুঝিতেন ততই আশ্চর্য হইয়া যাইতেন। তিনি কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীদাসের মহাভারত, কবিকঙ্কণ-চণ্ডী পড়িয়াছেন এবং কথকতাও শুনিয়াছেন। সে-সমস্তই জলের মতো বুঝা যায়, নিরক্ষর লোকেও অনায়াসে বুঝিতে পারে, কিন্তু তাঁহার স্বামীর মতো এমন সম্পূর্ণ দুর্বোধ হইবার আশ্চর্য ক্ষমতা তিনি ইতিপূর্বে দেখেন নাই।

তিনি মনে-মনে কল্পনা করিতেন, এই বই যখন ছাপানো হইবে এবং কেহ এক অক্ষর বুঝিতে পারিবে না, তখন দেশসুদ্ধ লোক বিস্ময়ে কিরূপ অভিভূত হইয়া যাইবে। সহস্রবার করিয়া স্বামীকে বলিতেন, "এ-সব লেখা ছাপাও।"

স্বামী বলিতেন, "বই ছাপানো সম্বন্ধে ভগবান মনু স্বয়ং বলে গেছেন, প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা।"

তারাপ্রসন্নের চারিটি সন্তান, চারই কন্যা। দাক্ষায়ণী মনে করিতেন সেটা গর্ভধারিণীরই অক্ষমতা। এইজন্য তিনি আপনাকে প্রতিভাসম্পন্ন স্বামীর অত্যন্ত অযোগ্য স্ত্রী মনে করিতেন। যে-স্বামী কথায় কথায় এমন-সকল দুরূহ গ্রন্থ রচনা করেন, তাঁহার স্ত্রীর গর্ভে কন্যা বই আর সন্তান হয় না, স্ত্রীর পক্ষে এমন অপটুতার পরিচয় আর কী দিব।

প্রথম কন্যাটি যখন পিতার বক্ষের কাছ পর্যন্ত বাড়িয়া উঠিল, তখন তারাপ্রসন্নের নিশ্চিন্তভাব ঘুচিয়া গেল। তখন তাঁহার স্মরণ হইল, একে একে চারিটি কন্যারই

বিবাহ দিতে হইবে, এবং সেজন্য বিস্তর অর্থের প্রয়োজন। গৃহিণী অত্যন্ত নিশ্চিন্তমুখে বলিলেন, "তুমি যদি একবার একটুখানি মন দাও, তাহা হইলে ভাবনা কিছুই নাই।"

তারাপ্রসন্ন কিঞ্চিৎ ব্যগ্রভাবে বলিলেন, "সত্য নাকি। আচ্ছা, বলো দেখি কী করিতে হইবে।"

দাক্ষায়ণী সংশয়শূন্য নিরুদ্বিগ্নভাবে বলিলেন, "কলিকাতায় চলো, তোমার বইগুলা ছাপাও, পাঁচজন লোকে তোমাকে জানুক,— তার পরে দেখো দেখি, টাকা আপনি আসে কিনা।"

স্ত্রীর আশ্বাসে তারাপ্রসন্নও ক্রমে আশ্বাস লাভ করিতে লাগিলেন এবং মনে প্রত্যয় হইল, তিনি ইস্তক-নাগাদ বসিয়া বসিয়া যত লিখিয়াছেন তাহাতে পাড়াসুদ্ধ লোকের কন্যাদায় মোচন হইয়া যায়।

এখন, কলিকাতায় যাইবার সময় ভারি গোল পড়িয়া গেল। দাক্ষায়ণী তাঁহার নিরুপায় নিঃসহায় সযত্নপালিত স্বামীটিকে কিছুতেই একলা ছাড়িয়া দিতে পারেন না। তাঁহাকে খাওয়াইয়া পরাইয়া নিত্যনৈমিত্তিক কর্তব্য স্মরণ করাইয়া সংসারের বিবিধ উপদ্রব হইতে কে রক্ষা করিবে।

কিন্তু অনভিজ্ঞ স্বামীও অপরিচিত বিদেশে স্ত্রীকন্যা সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে অত্যন্ত ভীত ও অসম্মত। অবশেষে দাক্ষায়ণী পাড়ার একটি চতুর লোককে স্বামীর নিত্য-অভ্যাস সম্বন্ধে সহস্র উপদেশ দিয়া আপনার পদে নিযুক্ত করিয়া দিলেন। এবং স্বামীকে অনেক মাথার দিব্য ও অনেক মাদুলিতাগায় আচ্ছন্ন করিয়া বিদেশে রওনা করিয়া দিলেন। এবং ঘরে আছাড় খাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

কলিকাতায় আসিয়া তারাপ্রসন্ন তাঁহার চতুর সঙ্গীর সাহায্যে 'বেদান্তপ্রভাকর' প্রকাশ করিলেন। দাক্ষায়ণীর গহনা বন্ধক রাখিয়া যে-টাকা'টি পাইয়াছিলেন, তাহার অধিকাংশই খরচ হইয়া গেল।

বিক্রয়ের জন্য বহির দোকানে এবং সমালোচনার জন্য দেশের ছোটো বড়ো সমস্ত সম্পাদকের নিকট 'বেদান্তপ্রভাকর' পাঠাইয়া দিলেন। ডাকযোগে গৃহিণীকেও একখানা বই রেজেস্টারি করিয়া পাঠাইলেন। আশঙ্কা ছিল, পাছে ডাকওয়ালারা পথের মধ্য হইতে চুরি করিয়া লয়।

গৃহিণী যেদিন ছাপার বইয়ের উপরের পৃষ্ঠায় ছাপার অক্ষরে তাঁহার স্বামীর নাম দেখিলেন, সেদিন পাড়ার সকল মেয়েকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইলেন। যেখানে সকলে আসিয়া বসিবার কথা, সেইখানে বইটা ফেলিয়া রাখিলেন।

সকলে আসিয়া বসিলে উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "ওমা, বইটা ওখানে কে ফেলে রেখেছে। অন্নদা, বইটা দাও-না ভাই, তুলে রাখি।" উহাদের মধ্যে অন্নদা পড়িতে জানে। বইটা কুলঙ্গির উপর তুলিয়া রাখিলেন।

মুহূর্তপরে একটা জিনিস পাড়িতে গিয়া ফেলিয়া দিলেন,— তারপরে নিজের বড়োমেয়েকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "শশী, বাবার বই পড়তে ইচ্ছে হয়েছে বুঝি? তা নে-না মা, পড়্-না। তাতে লজ্জা কী।" বাবার বহির প্রতি শশীর কিছুমাত্র আগ্রহ ছিল না।

কিছুক্ষণ পরেই তাহাকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন, "ছি মা, বাবার বই অমন করে নষ্ট করতে নেই, তোমার কমলাদিদির হাতে দাও, উনি ওই আলমারির মাথায় তুলে রাখবেন।"

বহির যদি কিছুমাত্র চেতনা থাকিত, তাহা হইলে সেই একদিনের উৎপীড়নে বেদান্তের প্রাণান্তপরিচ্ছেদ হইত।

একে একে কাগজে সমালোচনা বাহির হইতে লাগিল। গৃহিণী যাহা ঠাহরাইয়াছিলেন, তাহা অনেকটা সত্য হইয়া দাঁড়াইল। গ্রন্থের এক অক্ষর বুঝিতে না পারিয়া দেশশুদ্ধ সমালোচক একেবারে বিহ্বল হইয়া উঠিল। সকলেই একবাক্যে কহিল, "এমন সারবান গ্রন্থ ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয় নাই।"

যে-সকল সমালোচক রেনল্‌ড্‌সের লণ্ডনরহস্যের বাংলা অনুবাদ ছাড়া আর-কোনো বই স্পর্শ করিতে পারে না, তাহারা অত্যন্ত উৎসাহের সহিত লিখিল, "দেশের ঝুড়ি ঝুড়ি নাটকনবেলের পরিবর্তে যদি এমন দুই-একখানি গ্রন্থ মধ্যে-মধ্যে বাহির হয়, তবে বঙ্গসাহিত্য বাস্তবিকই পাঠ্য হয়।"

যে-ব্যক্তি পুরুষানুক্রমে বেদান্তের নাম কখনো শুনে নাই সেই কেবল লিখিল, "তারাপ্রসন্নবাবুর সহিত সকল স্থানে আমাদের মতের মিল হয় নাই,— স্থানাভাববশত এস্থলে তাহার উল্লেখ করিলাম না। কিন্তু মোটের উপরে গ্রন্থকারের সহিত আমাদের মতের অনেক ঐক্যই লক্ষিত হয়।" কথাটা যদি সত্য হইত, তাহা হইলে মোটের উপর গ্রন্থখানি পুড়াইয়া ফেলা উচিত ছিল।

দেশের যেখানে যত লাইব্রেরি ছিল এবং ছিল না, তাহার সম্পাদকগণ মুদ্রার পরিবর্তে মুদ্রাঙ্কিত পত্রে তারাপ্রসন্নের গ্রন্থ ভিক্ষা চাহিয়া পাঠাইলেন। অনেকেই লিখিল, 'আপনার এই চিন্তাশীল গ্রন্থে দেশের একটি মহৎ অভাব দূর হইয়াছে।' চিন্তাশীল গ্রন্থ কাহাকে বলে, তারাপ্রসন্ন ঠিক বুঝিতে পারিলেন না কিন্তু পুলকিতচিত্তে ঘর হইতে মাশুল দিয়া প্রত্যেক লাইব্রেরিতে 'বেদান্তপ্রভাকর' পাঠাইয়া দিলেন।

এইরূপ অজস্র স্তুতিবাক্যে তারাপ্রসন্ন যখন অতিমাত্র উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছেন, এমন সময়ে পত্র পাইলেন দাক্ষায়ণীর পঞ্চম সন্তানসম্ভাবনা অতি নিকটবর্তী হইয়াছে। তখন রক্ষকটিকে সঙ্গে করিয়া অর্থসংগ্রহের জন্য দোকানে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

সকল দোকানদার একবাক্যে বলিল, একখানি বইও বিক্রয় হয় নাই। কেবল এক জায়গায় শুনিলেন, মফঃস্বল হইতে কে-একজন তাঁহার এক বই চাহিয়া পাঠাইয়াছিল এবং তাহাকে ভ্যালুপেবেলে পাঠানোও হইয়াছিল, কিন্তু বই ফেরত আসিয়াছে, কেহ গ্রহণ করে নাই। দোকানদারকে তাহার মাশুল দণ্ড দিতে হইয়াছে, সেইজন্য সে বিষম আক্রোশে গ্রন্থকারের সমস্ত বহি তখনি তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিতে উদ্যত হইল।

গ্রন্থকার বাসায় ফিরিয়া আসিয়া অনেক ভাবিলেন কিন্তু কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। তাঁহার চিন্তাশীল গ্রন্থ সম্বন্ধে যতই চিন্তা করিলেন, ততই অধিকতর উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিতে লাগিলেন। অবশেষে যে-কয়েকটি টাকা অবশিষ্ট ছিল, তাহাই অবলম্বন করিয়া অবিলম্বে গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

তারাপ্রসন্ন গৃহিণীর নিকট আসিয়া অত্যন্ত আড়ম্বরের সহিত প্রফুল্লতা প্রকাশ করিলেন। দাক্ষায়ণী শুভ সংবাদের জন্য সহাস্যমুখে প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন।

তখন তারাপ্রসন্ন একখানি 'গৌড়বার্তাবহ'আনিয়া গৃহিণীর ক্রোড়ে ফেলিয়া দিলেন। পাঠ করিয়া তিনি মনে-মনে সম্পাদকের অক্ষয় ধনপুত্র কামনা করিলেন ; এবং তাঁহার লেখনীর মুখে মানসিক পুষ্পচন্দন-অর্ঘ্য উপহার দিলেন। পাঠ সমাপন করিয়া আবার স্বামীর মুখের দিকে চাহিলেন।

স্বামী তখন 'নবপ্রভাত' আনিয়া খুলিয়া দিলেন। পাঠ করিয়া আনন্দবিহ্বলা দাক্ষায়ণী আবার স্বামীর মুখের প্রতি প্রত্যাশাপূর্ণ স্নিগ্ধনেত্র উত্থাপিত করিলেন।

তখন তারাপ্রসন্ন একখণ্ড 'যুগান্তর' বাহির করিলেন। তাহার পর? তাহার পর 'ভারতভাগ্যচক্র'। তাহার পর? তাহার পর 'শুভজাগরণ' তাহার পর 'অরুণালোক', তাহার পর 'সংবাদতরঙ্গভঙ্গ'। তাহার পর— আশা, আগমনী, উচ্ছ্বাস, পুষ্পমঞ্জরী, সহচরী, সীতা-গেজেট, অহল্যালাইব্রেরি-প্রকাশিকা, ললিত সমাচার, কোটাল, বিশ্ববিচারক, লাবণ্যলতিকা। হাসিতে হাসিতে গৃহিণীর আনন্দাশ্রু পড়িতে লাগিল।

চোখ মুছিয়া আর-একবার স্বামীর কীর্তিরশ্মিসমুজ্জ্বল মুখের দিকে চাহিলেন,—

স্বামী বলিলেন, "এখনো অনেক কাগজ বাকি আছে।"

দাক্ষায়ণী বলিলেন, "সে বিকালে দেখিব, এখন অন্য খবর কী বলো।"

তারাপ্রসন্ন বলিলেন, "এবার কলিকাতায় গিয়া শুনিয়া আসিলাম, লাটসাহেবের মেম একখানা বই বাহির করিয়াছে কিন্তু তাহাতে বেদান্তপ্রভাকরের কোনো উল্লেখ করে নাই।"

দাক্ষায়ণী বলিলেন, "আহা, ও-সব কথা নয়— আর কী আনলে বলো-না।"

তারাপ্রসন্ন বলিলেন, "কতকগুলো চিঠি আছে।"

তখন দাক্ষায়ণী স্পষ্ট করিয়া বলিলেন, "টাকা কত আনলে।" তারাপ্রসন্ন বলিলেন, "বিধুভূষণের কাছে পাঁচ টাকা হাওলাত করে এনেছি।"

অবশেষে দাক্ষায়ণী যখন সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিলেন, তখন পৃথিবীর সাধুতা সম্বন্ধে তাঁহার সমস্ত বিশ্বাস বিপর্যস্ত হইয়া গেল। নিশ্চয় দোকানদারেরা তাঁহার স্বামীকে ঠকাইয়াছে এবং বাংলাদেশের সমস্ত ক্রেতা ষড়যন্ত্র করিয়া দোকানদারদের ঠকাইয়াছে।

অবশেষে সহসা মনে হইল, যাহাকে নিজের প্রতিনিধি করিয়া স্বামীর সহিত পাঠাইয়াছিলেন সেই বিধুভূষণ দোকানদারদের সহিত তলে তলে যোগ দিয়াছে— এবং যত বেলা যাইতে লাগিল ততই তিনি পরিষ্কার বুঝিতে পারিলেন, ওপাড়ার বিশ্বম্ভর চাটুজ্যে তাঁহার স্বামীর পরম শত্রু, নিশ্চয়ই এ-সমস্ত তাঁহারি চক্রান্তে ঘটিয়াছে। তাই বটে, যেদিন তাঁহার স্বামী কলিকাতায় যাত্রা করেন, তাহার দুই দিন পরেই বিশ্বম্ভরকে বটতলায় দাঁড়াইয়া কানাই পালের সহিত কথা কহিতে দেখা গিয়াছিল— কিন্তু বিশ্বম্ভর মাঝে-মাঝে প্রায়ই কানাই পালের সহিত কথাবার্তা কয় না কি, এইজন্য তখন কিছু মনে হয় নাই, এখন সমস্ত জলের মতো বুঝা যাইতেছে।

এদিকে দাক্ষায়ণীর সাংসারিক দুর্ভাবনা ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। যখন অর্থসংগ্রহের এই একমাত্র সহজ উপায় নিষ্ফল হইল, তখন আপনার কন্যাপ্রসবের অপরাধ তাঁহাকে চতুর্গুণ দগ্ধ করিতে লাগিল। বিশ্বম্ভর, বিধুভূষণ অথবা বাংলাদেশের অধিবাসীদিগকে এই অপরাধের জন্য দায়িক করিতে পারিলেন না— সমস্তই একলা নিজের স্কন্ধে তুলিয়া লইতে হইল, কেবল যে-মেয়েরা জন্মিয়াছে এবং জন্মিবে তাহাদিগকেও কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অংশ দিলেন। অহোরাত্র মুহূর্তের জন্য তাঁহার মনে আর শান্তি রহিল না।

আসন্নপ্রসবকালে দাক্ষায়ণীর শারীরিক অবস্থা এমন হইল যে, সকলের বিশেষ আশঙ্কার কারণ হইয়া দাঁড়াইল। নিরুপায় তারাপ্রসন্ন পাগলের মতো হইয়া বিশ্বম্ভরের কাছে গিয়া বলিল, "দাদা, আমার এই খানপঞ্চাশেক বই বাঁধা রাখিয়া যদি কিছু টাকা দাও তো আমি শহর হইতে ভালো দাই আনাই।"

বিশ্বম্ভর বলিল, "ভাই, সেজন্য ভাবনা নাই, টাকা যাহা লাগে আমি দিব,

তুমি বই লইয়া যাও।” এই বলিয়া কানাই পালের সহিত অনেক বলাকহা করিয়া কিঞ্চিৎ টাকা সংগ্রহ করিয়া আনিল এবং বিধুভূষণ স্বয়ং গিয়া নিজে হইতে পাথেয় দিয়া কলিকাতা হইতে ধাত্রী আনিল।

দাক্ষায়ণী কী মনে করিয়া স্বামীকে ঘরে ডাকাইয়া আনিলেন এবং মাথার দিব্য দিয়া বলিলেন, “যখনি তোমার সেই বেদনার উপক্রম হইবে, স্বপ্নলব্ধ ঔষধটা খাইতে ভুলিয়ো না। আর, সেই সন্ন্যাসীর মাদুলিটা কখনোই খুলিয়া রাখিয়ো না।” আর এমন ছোটোখাটো সহস্র বিষয়ে স্বামীর দুটি হাতে ধরিয়া অঙ্গীকার করাইয়া লইলেন। আর বলিলেন, বিধুভূষণের উপর কিছুই বিশ্বাস নাই, সেই তাঁহার স্বামীর সর্বনাশ করিয়াছে। নতুবা ঔষধ মাদুলি এবং মাথার-দিব্য সমেত তাঁহার সমস্ত স্বামীটিকে তাহার হস্তে দিয়া যাইতেন।

তারপরে মহাদেবের মতো তাঁহার বিশ্বাসপ্রবণ ভোলানাথ স্বামীটিকে পৃথিবীর নির্মম কুটিলবুদ্ধি চক্রান্তকারীদের সম্বন্ধে বারবার সতর্ক করিয়া দিলেন। অবশেষে চুপি-চুপি বলিলেন, “দেখো, আমার যে-মেয়েটি হইবে, সে যদি বাঁচে তাহার নাম রাখিয়ো ‘বেদান্তপ্রভা’, তারপরে তাহাকে শুধু প্রভা বলিয়া ডাকিলেই চলিবে।”

এই বলিয়া স্বামীর পায়ের ধুলা মাথায় লইলেন। মনে-মনে কহিলেন, ‘কেবল কন্যা জন্ম দিবার জন্যই স্বামীর ঘরে আসিয়াছিলাম। এবার বোধ হয় সে আপদ ঘুচিল।’

ধাত্রী যখন বলিল, “মা, একবার দেখো, মেয়েটি কী সুন্দর হয়েছে”— মা একবার চাহিয়া নেত্র নিমীলন করিলেন, মৃদুস্বরে বলিলেন ‘বেদান্তপ্রভা’। তারপরে ইহসংসারে আর-একটি কথা বলিবারও অবসর পাইলেন না।

১২৯৮ ?

প্রবন্ধ

শান্তিনিকেতন

শান্তিনিকেতন

১১

রসের ধর্ম

আমাদের ধর্মসাধনার দুটো দিক আছে, একটা শক্তির দিক, একটা রসের দিক। পৃথিবী যেমন জলে স্থলে বিভক্ত, এও ঠিক তেমনি।

শক্তির দিক হচ্ছে বলিষ্ঠ বিশ্বাস। এ বিশ্বাস জ্ঞানের সামগ্রী নয়। ঈশ্বর আছেন, এইটুকু মাত্র বিশ্বাস করাকে বিশ্বাস বলি নে। আমি যার কথা বলছি, এই বিশ্বাস সমস্ত চিত্তের একটি অবস্থা; এ একটি অবিচলিত ভরসার ভাব। মন এতে ধ্রুব হয়ে অবস্থিতি করে— আপনাকে সে কোনো অবস্থায় নিরাশ্রয় নিঃসহায় মনে করে না।

এই বিশ্বাস জিনিসটি পৃথিবীর মতো দৃঢ়। এ একটি নিশ্চিত আধার। এর মধ্যে মস্ত একটি জোর আছে।

যার মধ্যে এই বিশ্বাসের বল নেই, অর্থাৎ যার চিত্তে এই ধ্রুব স্থিতিতত্ত্বটির অভাব আছে, সে ব্যক্তি সংসারে ক্ষণে ক্ষণে যা-কিছুকে হাতে পায়, তাকে অত্যন্ত প্রাণপণ চেষ্টায় আঁকড়ে ধরে। সে যেন অতল জলে পড়েছে— কোথাও সে পায়ের কাছে মাটি পায় না; এইজন্যে যে-সব জিনিস সংসারের জোয়ারে ভাঁটায় ভেসে আসে ভেসে চলে যায়, তাদেরি তাড়াতাড়ি দুই মুঠো দিয়ে চেপে ধরাকেই সে পরিত্রাণ বলে মনে করে। তার মধ্যে যা-কিছু হারায়, যা-কিছু তার মুঠো ছেড়ে চলে যায়, তার ক্ষতিকে এমনি সে একান্ত ক্ষতি বলে মনে করে যে, কোথাও সে সান্ত্বনা খুঁজে পায় না। কথায় কথায় কেবলি তার মনে হয়, সর্বনাশ হয়ে গেল। বাধাবিঘ্ন কেবলি তার মনে নৈরাশ্য ঘনীভূত করে তোলে। সেই-সমস্ত বিঘ্নকে পেরিয়ে সে কোথাও একটা চরম সফলতার নিঃসংশয় মূর্তি দেখতে পায় না। যে-লোক ডুবজলে সাঁতার দেয় যার কোথাও দাঁড়াবার উপায় নেই, সামান্য হাঁড়ি কলসি কলার ভেলা তার পরমধন— তার ভয় ভাবনা উদ্বেগের সীমা নেই। আর, যে-ব্যক্তির পায়ের নিচে সুদৃঢ় মাটি আছে, তারো হাঁড়িকলসির প্রয়োজন আছে, কিন্তু হাঁড়িকলসি তার জীবনের অবলম্বন নয়— এগুলো যদি কেউ কেড়ে নেয় তা-হলে তার যতই অভাব অসুবিধা হ'ক না, সে ডুবে মরবে না।

এইজন্যে দৃঢ়বিশ্বাসী লোকের কাজকর্মে জোর আছে, কিন্তু উদ্বেগ নেই। সে মনের মধ্যে নিশ্চয় অনুভব করে, তার একটা দাঁড়াবার জায়গা আছে, পৌঁছবার স্থান আছে। প্রত্যক্ষ ফল সে না দেখতে পেলেও সে মনে-মনে জানে, ফল থেকে সে বঞ্চিত হয় নি— বিরুদ্ধ ফল পেলেও সেই বিরুদ্ধতাকে সে একান্ত করে দেখে না, তার ভিতর থেকেও একটি সার্থকতার প্রত্যয় মনে থাকে। একটি অত্যন্ত বড়ো জায়গায় চিত্তের দৃঢ়নির্ভরতা, এই জায়গাটিকে ধ্রুবসত্য ব'লে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করা, এই হচ্ছে সেই বিশ্বাস যে-মাটির উপরে আমাদের ধর্মসাধনা প্রতিষ্ঠিত।

এই বিশ্বাসটির মূলে একটি উপলব্ধি আছে। সেটি হচ্ছে এই যে, ঈশ্বর সত্য।

কথাটি শুনতে সহজ, এবং শোনাবামাত্রই অনেকে হয়তো বলে উঠবেন যে, ঈশ্বর সত্য, এ কথা তো আমরা অস্বীকার করি নে।

পদে পদেই অস্বীকার করি। ঈশ্বর সত্য নন, এইভাবেই প্রতিদিন আমরা সংসারের কাজ করে থাকি। ঈশ্বর সত্য, এই উপলব্ধিটির উপরে আমরা ভর দিতে পারি নে। আমাদের মন সেই পর্যন্ত পৌঁছে সেখানে গিয়ে স্থিতি করতে পারে না।

আমার যাই ঘটুক না কেন, যিনি চরমসত্য পরমসত্য তিনি আছেন এবং তাঁর মধ্যেই আমি আছি, এই ভরসাটুকু সকল অবস্থাতেই যার মনের মধ্যে লেগেই আছে, সে ব্যক্তি যেমনভাবে জীবনের কাজ করে, আমরা কি তেমনভাবে করে থাকি।— আছেন, আছেন, তিনি আছেন, তিনি আমার হয়েই আছেন— সকল দেশে সকল কালেই তিনি আছেন এবং তিনি আমারি আছেন— জীবনে যত উলটপালটই হ'ক, এই সত্যটি থেকে কেউ আমাকে কিছুমাত্র বঞ্চিত করতে পারবে না, এমন জোর এমন ভরসা যার আছে সেই হচ্ছে বিশ্বাসী; তিনি আছেন, এই সত্যের উপরে সে বিশ্রাম করে এবং তিনি আছেন, এই সত্যের উপরেই সে কাজ করে।

কিন্তু ঈশ্বর-যে কেবল সত্যরূপে সকলকে দৃঢ় করে ধারণ করে রেখেছেন, সকলকে আশ্রয় দিয়েছেন, এই কথাটিই সম্পূর্ণ কথা নয়।

এই জীবধাত্রী পৃথিবী খুব শক্ত বটে— এর ভিত্তি অনেক পাথরের স্তর দিয়ে গড়া। এই কঠিন দৃঢ়তা না থাকলে এর উপরে আমরা এমন নিঃসংশয়ে ভর দিতে পারতুম না। কিন্তু এই কাঠিন্যই যদি পৃথিবীর চরমরূপ হত, তা-হলে তো এ একটি প্রস্তরময় ভয়ংকর মরুভূমি হয়ে থাকত।

এর সমস্ত কাঠিন্যের উপরে একটি রসের বিকাশ আছে— সেইটেই এর চরম পরিণতি। সেটি কোমল, সেটি সুন্দর, সেটি বিচিত্র। সেইখানেই নৃত্য, সেইখানেই গান, সেইখানেই সাজসজ্জা। পৃথিবীর সার্থকরূপটি এইখানেই প্রকাশ পেয়েছে।

অর্থাৎ নিত্যস্থিতির উপরে একটি নিত্যগতির লীলা না থাকলে তার সম্পূর্ণতা নেই। পৃথিবীর ধাতুপাথরের অচল ভিত্তির সর্বোচ্চ তলায় এই গতির প্রবাহ চলেছে, প্রাণের প্রবাহ, যৌবনের প্রবাহ, সৌন্দর্যের প্রবাহ— তার চলাফেরা আসাযাওয়া মেলামেশার আর অন্ত নেই।

রস জিনিসটি সচল ;— সে কঠিন নয় ব'লে, নম্র ব'লে, সর্বত্র তার একটি সঞ্চার আছে ; এইজন্যেই সে বৈচিত্র্যের মধ্যে হিল্লোলিত হয়ে উঠে জগৎকে পুলকিত করে তুলছে— এইজন্যেই কেবলই সে আপনার অপূর্বতা প্রকাশ করছে, এইজন্যেই তার নবীনতার অন্ত নেই।

এই রসটি যেখানে শুকিয়ে যায় সেখানে আবার সেই নিশ্চল কঠিনতা বেরিয়ে পড়ে, সেখানে প্রাণের ও যৌবনের নমনীয়তা কমনীয়তা চলে যায়, জরা ও মৃত্যুর যে-আড়ষ্টতা তাই উৎকট হয়ে ওঠে।

আমাদের ধর্মসাধনার মধ্যেও এই রসময় গতিতত্ত্বটি না রাখলে তার সম্পূর্ণতা নেই, এমন কি, তার যেটি চরম সার্থকতা সেইটিই নষ্ট হয়।

অনেকসময় ধর্মসাধনায় দেখা যায়, কঠিনতাই প্রবল হয়ে ওঠে— তার অবিচলিত দৃঢ়তা নিষ্ঠুর শুষ্কভাবেই আপনাকে প্রকাশ করে। সে আপনার সীমার মধ্যে অত্যন্ত উদ্ধত হয়ে বসে থাকে ; সে অন্যকে আঘাত করে ; তার মধ্যে কোনোপ্রকার নড়াচড়া নেই, এইটে নিয়েই সে গৌরব বোধ করে ; নিজের স্থানটি ছেড়ে চলে না ব'লে কেবল সে একটা দিক দিয়েই সমস্ত জগৎকে দেখে, এবং যারা অন্য দিকে আছে, তারা কিছুই দেখছে না এবং সমস্তই ভুল দেখছে ব'লে কল্পনা করে। নিজের সঙ্গে অন্যের কোনোপ্রকার অনৈক্যকে এই কাঠিন্য ক্ষমা করতে জানে না ; সবাইকে নিজের অচল পাথরের চারিভিতের মধ্যে জোর ক'রে টেনে আনতে চায়। এই কাঠিন্য মাধুর্যকে দুর্বলতা এবং বৈচিত্র্যকে মায়ার ইন্দ্রজাল ব'লে অবজ্ঞা করে এবং সমস্তকে সবলে একাকার করে দেওয়াকেই সমন্বয় সাধন ব'লে মনে করে।

কিন্তু কাঠিন্য ধর্মসাধনার অন্তরালদেশে থাকে। তার কাজ ধারণ করা, প্রকাশ করা নয়। অস্থিপঞ্জর মানবদেহের চরম পরিচয় নয়— সরস কোমল মাংসের দ্বারাই তার প্রকাশ পরিপূর্ণ হয়। সে-যে পিণ্ডাকারে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে না, সে-যে আঘাত সহ্য করেও ভেঙে যায় না, সে-যে আপনার মর্মস্থানগুলিকে সকলপ্রকার উপদ্রব থেকে রক্ষা করে, তার ভিতরকার কারণ হচ্ছে তার অস্থিকঙ্কাল। কিন্তু আপনার এই কঠোর শক্তিকে সে আচ্ছন্ন করেই রাখে এবং প্রকাশ করে আপনার রসময় প্রাণময় ভাবময় গতিভঙ্গীময় কোমল অথচ সতেজ সৌন্দর্যকে।

১৫॥২৯

ধর্মসাধনারও চরম পরিচয় যেখানে তার শ্রী প্রকাশ পায়। এই শ্রী জিনিসটি রসের জিনিস। তার মধ্যে অভাবনীয় বিচিত্রতা এবং অনির্বচনীয় মাধুর্য ও তার মধ্যে নিত্য-চলনশীল প্রাণের লীলা! শুষ্কতায় অনম্রতায় তার সৌন্দর্যকে লোপ করে, তার সচলতাকে রোধ করে, তার বেদনাবোধকে অসাড় করে দেয়। ধর্মসাধনার যেখানে উৎকর্ষ সেখানে গতির বাধাহীনতা, ভাবের বৈচিত্র্য এবং অক্ষুণ্ণ মাধুর্যের নিত্যবিকাশ।

নম্রতা নইলে এই জিনিসটিকে পাওয়া যায় না। কিন্তু নম্রতা মানে শিক্ষিত বিনয় নয়। অর্থাৎ কঠিন লোহাকে পুড়িয়ে-পিটিয়ে তাকে ইস্পাতরূপে যে খরধার নমনীয়তা দেওয়া যায়, এ সে জিনিস নয়। সরস সজীব তরুশাখার যে-নম্রতা— যে-নম্রতার মধ্যে ফুল ফুটে ওঠে, দক্ষিণের বাতাস নৃত্যের আন্দোলন বিস্তার করে, শ্রাবণের ধারা সংগীতে মুখরিত হয় এবং সূর্যের কিরণ ঝংকৃত সেতারের স্বরগুলির মতো উৎক্ষিপ্ত হতে থাকে ; চারিদিকের বিশ্বের নানা ছন্দ যে-নম্রতার মধ্যে আপনার স্পন্দনকে বিচিত্র করে তোলে ; যে-নম্রতা সহজভাবে সকলের সঙ্গে আপনার যোগ স্বীকার করে, সায় দেয়, সাড়া দেয়, আঘাতকে সংগীতে পরিণত করে, এবং স্বাতন্ত্র্যকে সৌন্দর্যের দ্বারা সকলের আপন করে তোলে।

এক কথায় বলতে গেলে এই নম্রতাটি রসের নম্রতা— শিক্ষার নম্রতা নয়। এই নম্রতা শুষ্ক সংযমের বোঝায় নত নয়, সরস প্রাচুর্যের দ্বারাই নত ; প্রেমে ভক্তিতে আনন্দে পরিপূর্ণতায় নত।

কঠোরতা যেমন স্বভাবতই আপনাকে স্বতন্ত্র রাখে, রস তেমনি স্বভাবতই অন্যের দিকে যায়। আনন্দ সহজেই নিজেকে দান করে— আনন্দের ধর্মই হচ্ছে সে আপনাকে অন্যের মধ্যে প্রসারিত করতে চায়। কিন্তু উদ্ধত হয়ে থাকলে কিছুতেই অন্যের সঙ্গে মিল হয় না— অন্যকে চাইতে গেলেই নিজেকে নত করতে হয়— এমন কি, যে-রাজা যথার্থ রাজা, প্রজার কাছে তাকে নম্র হতেই হবে। রসের ঐশ্বর্যে যে-লোক ধনী, নম্রতাই তার প্রাচুর্যের লক্ষণ।

বিশ্বজগতের মধ্যে জগদীশ্বর কোন্‌খানে আমাদের কাছে নত। যেখানে তিনি সুন্দর ; যেখানে রসোবৈ সঃ ; সেখানে আনন্দকে ভাগ না করে তাঁর চলে না ; সেখানে নিজের নিয়মের জোরের উপরে কড়া হয়ে তিনি দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন না ; সেখানে সকলের মাঝখানে নেমে এসে সকলকে তাঁর ডাক দিতে হয় ; সেই ডাকের মধ্যে কত করুণা, কত বেদনা, কত কোমলতা! স্নেহের আনন্দভারে দুর্বল ক্ষুদ্র শিশুর কাছে পিতামাতা যেমন নত হয়ে পড়েন, জগতের ঈশ্বর তেমনি করেই আমাদের দিকে নত হয়ে পড়েছেন। এইটেই হচ্ছে আমাদের কাছে সকলের চেয়ে বড়ো কথা ;—

তাঁর নিয়ম অটল, তাঁর শক্তি অসীম, তাঁর ঐশ্বর্য অনন্ত, এ-সব কথা আমাদের কাছে ওর চেয়ে ছোটো ; তিনি নত হয়ে সুন্দর হয়ে ভাবে ভঙ্গীতে হাসিতে গানে রসে গন্ধে রূপে আমাদের সকলের কাছে আপনাকে দান করতে এসেছেন এবং আপনার মধ্যে আমাদের সকলকে নিতে এসেছেন, এইটেই হচ্ছে আমাদের পক্ষে চরম কথা— তাঁর সকলের চেয়ে পরম পরিচয় হচ্ছে এইখানেই।

জগতে ঈশ্বরের এই-যে দুইটি পরিচয়— একটি অটল নিয়মে, আর একটি সুনম্র সৌন্দর্যে, এর মধ্যে নিয়মটি আছে গুপ্ত আর সৌন্দর্যটি আছে তাঁকে ঢেকে। নিয়মটি এমন প্রচ্ছন্ন যে, সে-যে আছে তা আবিষ্কার করতে মানুষের অনেকদিন লেগেছিল কিন্তু সৌন্দর্য চিরদিন আপনাকে ধরা দিয়েছে। সৌন্দর্য মিলবে ব'লেই, ধরা দেবে ব'লেই সুন্দর। এই সৌন্দর্যের মধ্যেই, রসের মধ্যেই মিলনের তত্ত্বটি রয়েছে।

ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে যখন কাঠিন্যই বড়ো হয়ে ওঠে তখন সে মানুষকে মেলায় না, মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে। এইজন্যে কৃচ্ছ্রসাধনকে যখন কোনো ধর্ম আপনার প্রধান অঙ্গ করে তোলে, যখন সে আচারবিচারকেই মুখ্য স্থান দেয়, তখন সে মানুষের মধ্যে ভেদ আনয়ন করে ; তখন তার নীরস কঠোরতা সকলের সঙ্গে তাকে মিলতে বাধা দেয়, সে আপনার নিয়মের মধ্যে নিজেকে অত্যন্ত স্বতন্ত্র ক'রে আবদ্ধ ক'রে রাখে ; সর্বদাই ভয়ে ভয়ে থাকে পাছে নিয়মের ত্রুটিতে অপরাধ ঘটে— এইজন্যেই সবাইকে সরিয়ে সরিয়ে নিজেকে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে চলতে হয়। শুধু তাই নয়, নিয়মপালনের একটা অহংকার মানুষকে শক্ত করে তোলে, নিয়মপালনের একটা লোভ তাকে পেয়ে বসে এবং এই-সকল নিয়মকে ধ্রুব ধর্ম ব'লে জানা তার সংস্কার হয়ে যায় ব'লেই যেখানে এই নিয়মের অভাব দেখতে পায় সেখানে তার অত্যন্ত একটা অবজ্ঞা জন্মে।

য়িহুদি এইজন্যে আপনার ধর্মনিয়মের জালের মধ্যে আপনাকে আপাদমস্তক বন্দী করে রেখেছে ; ধর্মের ক্ষেত্রে সমস্ত মানুষকে আহ্বান করা এবং সমস্ত মানুষের সঙ্গে মেলা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

বর্তমান হিন্দুসমাজও ধর্মের দ্বারা নিজেকে পৃথিবীর সকল মানুষের সঙ্গেই পৃথক করে রেখেছে। নিজের মধ্যেও তার বিভাগের অন্ত নেই। বস্তুত নিজেকে সকলের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন করবার জন্যেই সে নিয়মের বেড়া নির্মাণ করেছিল। বৌদ্ধধর্ম ভারত-বর্ষীয়কে সকলের সঙ্গে অবাধে মিলিয়ে দিচ্ছিল, বর্তমান হিন্দুধর্মের সমস্ত নিয়মসংযম প্রধানত তারি প্রতিকারের প্রবল চেষ্টা। সেই চেষ্টাটি আজ পর্যন্ত রয়ে গেছে। সে কেবলি দূর করছে, কেবলি ভাগ করছে, নিজেকে কেবলি সংকীর্ণ বদ্ধ ক'রে আড়াল করে রাখবার উদ্যোগ করছে। হিন্দুর ধর্ম যেখানে, সেখানে বাহিরের লোকের পক্ষে

সমস্ত জানলাদরজা বন্ধ এবং ঘরের লোকের পক্ষে কেবলি বেড়া এবং প্রাচীর।

অন্য দেশে অন্য জাতির মধ্যে স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্যে কোনো চেষ্টা নেই তা বলতে পারি নে। কারণ, স্বাতন্ত্র্যরক্ষার প্রয়োজন আছে, সে প্রয়োজনকে অস্বীকার করা কোনোমতেই চলে না। কিন্তু অন্যত্র এই স্বাতন্ত্র্যরক্ষার চেষ্টা রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিক অর্থাৎ এই চেষ্টাটা সেখানে নিজের নীচের তলায় বাস করে।

মিলনের বৃত্তিটি স্বাতন্ত্র্যচেষ্টার উপরের জিনিস। ক্রীতদাস রাজাকে খুন ক'রে সিংহাসনে চড়ে বসলে যেমন হয়, স্বাতন্ত্র্যচেষ্টা তেমনি মিলনধর্মকে একেবারে অভিভূত করে দিয়ে তার উপরে যদি আপনার স্থান দখল ক'রে বসে, তা হলে সেইরকমের অন্যায় ঘটে। এইজন্যেই পারিবারিক বা সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় স্বার্থবুদ্ধি মানুষকে স্বাতন্ত্র্যের দিকে টেনে থাকলেও, ধর্মবুদ্ধি তার উপরে দাঁড়িয়ে তাকে বিশ্বের দিকে— বিশ্বমানবের দিকে নিয়ত আহ্বান করে।

আমাদের দেশে বর্তমানকালে সেইখানেই ছিদ্র হয়েছে এবং সেই ছিদ্রপথেই এ দেশের শনি প্রবেশ করেছে। যে-ধর্ম মানুষের সঙ্গে মানুষকে মেলায়, সেই ধর্মের দোহাই দিয়েই আমরা মানুষকে পৃথক করেছি। আমরা বলেছি মানুষের স্পর্শে, তার সঙ্গে একাসনে আহারে, তার আহরিত অন্নজল গ্রহণে, মানুষ ধর্মে পতিত হয়। বন্ধনকে ছেদন করাই যার কাজ, তাকে দিয়েই আমরা বন্ধনকে পাকা করে নিয়েছি— তা হলে আজ আমাদের উদ্ধার করবে কে।

আশ্চর্য ব্যাপার এই, উদ্ধার করবার ভার আজ আমরা তারি হাতে দিতে চেষ্টা করছি, যে-জিনিসটা ধর্মের চেয়ে নিচেকার। আমরা স্বাজাত্যবুদ্ধির উপর বরাত দিয়েছি, ভারতবর্ষের অন্তর্গত মানুষের সঙ্গে মানুষকে মিলিয়ে দেবার জন্যে। আমরা বলছি, তা না-হলে আমরা বড়ো হব না, বলিষ্ঠ হব না, আমাদের প্রয়োজনসিদ্ধি হবে না।

আমরা ধর্মকে এমন জায়গায় এনে ফেলেছি যে, আমাদের জাতীয় স্বার্থবুদ্ধি প্রয়োজনবুদ্ধিও তার চেয়ে বড়ো হয়ে উঠেছে। এমন দশা হয়েছে যে, ধর্মে আমাদের উদ্ধার নেই, স্বাজাত্যের দ্বারা আমাদের উদ্ধার পেতে হবে! এমন হয়েছে যে, ধর্ম আমাদের পৃথক থাকতে বলছে, স্বাজাত্য আমাদের এক হবার জন্যে তাড়না করছে!

কিন্তু ধর্মবুদ্ধি যে-মিলনের ঘটক নয়, সে-মিলনের উপর আমি ভরসা রাখতে পারি নে। ধর্মমূলক মিলনতত্ত্বটিকে আমাদের দেশে যদি প্রতিষ্ঠিত করতে পারি, তবেই স্বভাবতই আমরা মিলনের দিকে যাব, কেবলি গণ্ডি আঁকবার এবং বেড়া তোলবার প্রবৃত্তি থেকে আমরা নিষ্কৃতি পাব। ধর্মের সিংহদ্বার খোলা থাকলে তবেই ছোটো বড়ো সকল যজ্ঞের নিমন্ত্রণেই মানুষকে আমরা আহ্বান করতে পারব ;— নতুবা কেবলমাত্র

প্রয়োজনের বা স্বাজাত্য-অভিমানের খিড়কির দরজাটুকু যদি খুলে রাখি, তবে ধর্মনিয়মের বাধা অতিক্রম করে সেই ফাঁকটুকুর মধ্য দিয়ে আমাদের দেশের এত প্রভেদপার্থক্য, এত বিরোধবিচ্ছেদ গলতে পারবে না— মিলতে পারবে না।

ধর্মান্দোলনের ইতিহাসে এইটি বরাবর দেখা গেছে, ধর্ম যখন আপনার রসের মূর্তি প্রকাশ করে তখনি সে বাঁধন ভাঙে এবং সকল মানুষকে এক করবার দিকে ধাবিত হয়। খ্রীষ্ট যে প্রেমভক্তিরসের বন্যাকে মুক্ত করে দিলেন, তা য়িহুদিধর্মের কঠিন শাস্ত্রবন্ধনের মধ্যে নিজেকে বদ্ধ রাখতে পারলে না এবং সেই ধর্ম আজ পর্যন্ত প্রবল জাতির স্বার্থের শৃঙ্খলকে শিথিল করবার জন্য নিয়ত চেষ্টা করছে, আজ পর্যন্ত সমস্ত সংস্কার এবং অভিমানের বাধা ভেদ করে মানুষের সঙ্গে মানুষকে মেলাবার দিকে তার আকর্ষণশক্তি প্রয়োগ করছে।

বৌদ্ধধর্মের মূলে একটি কঠোর তত্ত্বকথা আছে কিন্তু সেই তত্ত্বকথায় মানুষকে এক করে নি; তার মৈত্রী তার করুণা এবং বুদ্ধদেবের বিশ্বব্যাপী হৃদয়প্রসারই মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রভেদ ঘুচিয়ে দিয়েছে। নানক বল, রামানন্দ বল, কবীর বল, চৈতন্য বল, সকলেই রসের আঘাতে বাঁধন ভেঙে দিয়ে সকল মানুষকে এক জায়গায় ডাক দিয়েছেন।

তাই বলছিলুম, ধর্ম যখন আচারকে নিয়মকে শাসনকে আশ্রয় ক'রে কঠিন হয়ে ওঠে, তখন সে মানুষকে বিভক্ত করে দেয়, পরস্পরের মধ্যে গতিবিধির পথকে অবরুদ্ধ করে। ধর্মে যখন রসের বর্ষা নেবে আসে তখন যে-সকল গহ্বর পরস্পরের মধ্যে ব্যবধান রচনা করেছিল, তারা ভক্তির স্রোতে প্রেমের বন্যায় ভরে ওঠে এবং সেই পূর্ণতায় স্বাতন্ত্র্যের অচল সীমাগুলিই সচল হয়ে উঠে অগ্রসর হয়ে সকলকে মিলিয়ে দিতে চায়, বিপরীত পারকে এক করে দেয় এবং দুর্লঙ্ঘ্য দূরকে আনন্দবেগে নিকট করে আনে। মানুষ যখনি সত্যভাবে গভীরভাবে মিলেছে তখন কোনো-একটি বিপুল রসের আবির্ভাবেই মিলেছে, প্রয়োজনে মেলে নি, তত্ত্বজ্ঞানে মেলে নি, আচারের শুষ্ক শাসনে মেলে নি।

ধর্মের যখন চরম লক্ষ্যই হচ্ছে ঈশ্বরের সঙ্গে মিলনসাধন, তখন সাধককে এ-কথা মনে রাখতে হবে যে, কেবল বিধিবদ্ধ পূজার্চনা আচার অনুষ্ঠান শুচিতার দ্বারা তা হতেই পারে না। এমন কি, তাতে মনকে কঠোর করে ব্যাঘাত আনে এবং ধার্মিকতার অহংকার জাগ্রত হয়ে চিত্তকে সংকীর্ণ করে দেয়। হৃদয়ে রস থাকলে তবেই তাঁর সঙ্গে মিলন হয়, আর-কিছুতেই হয় না।

কিন্তু এই কথাটি মনে রাখতে হবে, ভক্তিরসের প্রেমরসের মধ্যে যে-দিকটি সম্ভোগের দিক, কেবল সেইটিকেই একান্ত করে তুললে দুর্বলতা এবং বিকার ঘটে। ওর মধ্যে একটি শক্তির দিক আছে, সেটি না থাকলে রসের দ্বারা মনুষ্যত্ব দুর্গতিপ্রাপ্ত হয়।

ভোগই প্রেমের একমাত্র লক্ষণ নয়। প্রেমের একটি প্রধান লক্ষণ হচ্ছে এই যে, প্রেম আনন্দে দুঃখকে স্বীকার করে নেয়। কেননা দুঃখের দ্বারা, ত্যাগের দ্বারাই তার পূর্ণ সার্থকতা। ভাবাবেশের মধ্যে নয়— সেবার মধ্যে, কর্মের মধ্যেই তার পূর্ণ পরিচয়। এই দুঃখের মধ্যে দিয়ে, কর্মের মধ্যে দিয়ে, তপস্যার মধ্যে দিয়ে যে-প্রেমের পরিপাক হয়েছে, সেই প্রেমই বিশুদ্ধ থাকে এবং সেই প্রেমই সর্বাঙ্গীণ হয়ে ওঠে।

এই দুঃখস্বীকারই প্রেমের মাথার মুকুট; এই তার গৌরব। ত্যাগের দ্বারাই সে আপনাকে লাভ করে; বেদনার দ্বারাই তার রসের মন্থন হয়; সাধ্বী সতীকে যেমন সংসারের কর্ম মলিন করে না, তাকে আরো দীপ্তিমতী করে তোলে, সংসারে মঙ্গলকর্ম যেমন তার সতীপ্রেমকে সার্থক করতে থাকে, তেমনি যে-সাধকের চিত্ত ভক্তিতে ভরে উঠেছে, কর্তব্যের শাসন তাঁর পক্ষে শৃঙ্খল নয়— সে তাঁর অলংকার; দুঃখে তাঁর জীবন নত হয় না, দুঃখেই তাঁর ভক্তি গৌরবান্বিত হয়ে ওঠে। এইজন্যে মানবসমাজে কর্মকাণ্ড যখন অত্যন্ত প্রবল হয়ে উঠে মনুষ্যত্বকে ভারাক্রান্ত করে তোলে, তখন একদল বিদ্রোহী জ্ঞানের সহায়তায় কর্মমাত্রেরই মূল উৎপাটন এবং দুঃখমাত্রকে একান্তভাবে নিরস্ত করে দেবার অধ্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু যাঁরা ভক্তির দ্বারা পূর্ণতার স্বাদ পেয়েছেন, তাঁরা কিছুকেই অস্বীকার করবার প্রয়োজন বোধ করেন না— তাঁরা অনায়াসেই কর্মকে শিরোধার্য এবং দুঃখকে বরণ করে নেন। নইলে-যে তাঁদের ভক্তির মাহাত্ম্যই থাকে না, নইলে-যে ভক্তিকে অপমান করা হয়; ভক্তি বাইরের সমস্ত অভাব ও আঘাতের দ্বারাই আপনার ভিতরকার পূর্ণতাকে আপনার কাছে সপ্রমাণ করতে চায়— দুঃখে নম্রতা ও কর্মে আনন্দই তার ঐশ্বর্যের পরিচয়। কর্মে মানুষকে জড়িত করে এবং দুঃখ তাকে পীড়া দেয়, রসের আবির্ভাবে মানুষের এই সমস্যাটি একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যায়, তখন কর্ম এবং দুঃখের মধ্যেই মানুষ যথার্থভাবে আপনার মুক্তি উপলব্ধি করে। বসন্তের উত্তাপে পর্বতশিখরের বরফ যখন রসে বিগলিত হয়, তখন চলাতেই তার মুক্তি, নিশ্চলতাই তার বন্ধন; তখন অক্লান্ত আনন্দে দেশদেশান্তরকে উর্বর ক'রে সে চলতে থাকে; তখন নুড়িপাথরের দ্বারা সে যতই প্রতিহত হয় ততই তার সংগীত জাগ্রত এবং নৃত্য উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে।

একটা বরফের পিণ্ড এবং ঝরনার মধ্যে তফাত কোন্‌খানে। না, বরফের পিণ্ডের নিজের মধ্যে গতিতত্ত্ব নেই। তাকে বেঁধে টেনে নিয়ে গেলে তবেই সে চলে। সুতরাং চলাটাই তার বন্ধনের পরিচয়। এইজন্যে বাইরে থেকে তাকে ঠেলা দিয়ে চালনা করে নিয়ে গেলে প্রত্যেক আঘাতেই সে ভেঙে যায়, তার ক্ষয় হতে থাকে— এইজন্য চলা ও আঘাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে স্থির নিশ্চল হয়ে থাকাই তার পক্ষে স্বাভাবিক অবস্থা।

কিন্তু ঝরনার যে-গতি সে তার নিজেরি গতি,— সেইজন্যে এই গতিতেই তার ব্যাপ্তি, মুক্তি, তার সৌন্দর্য। এইজন্য গতিপথে সে যত আঘাত পায় ততই তাকে বৈচিত্র্য দান করে। বাধায় তার ক্ষতি নেই, চলায় তার শ্রান্তি নেই।

মানুষের মধ্যেও যখন রসের আবির্ভাব না থাকে, তখনি সে জড়পিণ্ড। তখন ক্ষুধা তৃষ্ণা ভয় ভাবনাই তাকে ঠেলে ঠেলে কাজ করায়, সে-কাজে পদে পদেই তার ক্লান্তি। সেই নীরস অবস্থাতেই মানুষ অন্তরের নিশ্চলতা থেকে বাহিরেও কেবলি নিশ্চলতা বিস্তার করতে থাকে। তখনি তার যত খুঁটিনাটি, যত আচার বিচার, যত শাস্ত্র শাসন। তখনি মানুষের মন গতিহীন বলেই বাহিরেও সে আষ্টেপৃষ্ঠে বদ্ধ। তখনি তার ওঠাবসা খাওয়াপরা সকল দিকেই বাঁধাবাঁধি। তখনি সে সেই-সকল নিরর্থক কর্মকে স্বীকার করে যা তাকে সম্মুখের দিকে অগ্রসর করে না, যা তাকে অন্তহীন পুনরাবৃত্তির মধ্যে কেবলি একই জায়গায় ঘুরিয়ে মারে।

রসের আবির্ভাবে মানুষের জড়ত্ব ঘুচে যায়। সুতরাং তখন সচলতা তার পক্ষে অস্বাভাবিক নয়; তখন অগ্রগামী গতিশক্তির আনন্দেই সে কর্ম করে, সর্বজয়ী প্রাণশক্তির আনন্দেই সে দুঃখকে স্বীকার করে।

বস্তুত মানুষের প্রধান সমস্যা এ নয় যে, কোন্ শক্তি দ্বারা সে দুঃখকে একেবারে নিবৃত্ত করতে পারে।

তার সমস্যা হচ্ছে এই যে, কোন্ শক্তি দ্বারা সে দুঃখকে সহজেই স্বীকার করে নিতে পারে। দুঃখকে নিবৃত্ত করবার পর যাঁরা দেখাতে চান, তাঁরা অহংকেই সমস্ত অনর্থের হেতু বলে একেবারে তাকে বিলুপ্ত করতে বলেন; দুঃখকে স্বীকার করবার শক্তি যাঁরা দিতে চান, তাঁরা অহংকে প্রেমের দ্বারা পরিপূর্ণ করে তাকে সার্থক করে তুলতে বলেন। অর্থাৎ গাড়ি থেকে ঘোড়াকে খুলে ফেলাই যে গাড়িকে খানায় পড়া থেকে রক্ষা করবার সুকৌশল তা নয়, ঘোড়ার উপরে সারথিকে স্থাপন করাই হচ্ছে গাড়িকে বিপদ থেকে বাঁচানো এবং তাকে গম্যস্থানের অভিমুখে চালানোর যথোচিত উপায়। এইজন্যে মানুষের ধর্মসাধনার মধ্যে যখন ভক্তির আবির্ভাব হয়, তখনি সংসারে যেখানে যা-কিছু সমস্ত বজায় থেকেও মানুষের সকল সমস্যার মীমাংসা হয়ে যায়— তখন কর্মের মধ্যে সে আনন্দ ও দুঃখের মধ্যে সে গৌরব অনুভব করে; তখন কর্মই তাকে মুক্তি দেয় এবং দুঃখ তার ক্ষতির কারণ হয় না।

গুহাহিত

উপনিষৎ তাঁকে বলেছেন— গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং— অর্থাৎ তিনি গুপ্ত, তিনি গভীর। তাঁকে শুধু বাইরে দেখা যায় না, তিনি লুকানো আছেন। বাইরে যা-কিছু প্রকাশিত, তাকে জানবার জন্যে আমাদের ইন্দ্রিয় আছে— তেমনি যা গূঢ়, যা গভীর, তাকে উপলব্ধি করবার জন্যেই আমাদের গভীরতর অন্তরিন্দ্রিয় আছে। তা যদি না থাকত তা হলে সেদিকে আমরা ভুলেও মুখ ফিরাতুম না ; গহনকে পাবার জন্যে আমাদের তৃষ্ণার লেশও থাকত না।

এই অগোচরের সঙ্গে যোগের জন্যে আমাদের বিশেষ অন্তরিন্দ্রিয় আছে ব'লেই মানুষ এই জগতে জন্মলাভ ক'রে কেবল বাইরের জিনিসে সন্তুষ্ট থাকে নি। তাই সে চারিদিকে খুঁজে খুঁজে মরছে, দেশবিদেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাকে কিছুতে থামতে দিচ্ছে না। কোথা থেকে সে এই খুঁজে-বের-করবার পরোয়ানা নিয়ে সংসারে এসে উপস্থিত হল ? যা-কিছু পাচ্ছি, তার মধ্যে আমরা সম্পূর্ণকে পাচ্ছি নে— যা পাচ্ছি নে, তার মধ্যেই আমাদের আসল পাবার সামগ্রীটি আছে, এই একটি সৃষ্টিছাড়া প্রত্যয় মানুষের মনে কেমন করে জন্মাল ?

পশুদের মনে তো এই তাড়নাটি নেই। উপরে যা আছে তারি মধ্যে তাদের চেষ্টা ঘুরে বেড়াচ্ছে— মুহূর্তকালের জন্যেও তারা এমন কথা মনে করতে পারে না যে যাকে দেখা যায় না তাকেও খুঁজতে হবে, যাকে পাওয়া যায় না তাকেও লাভ করতে হবে। তাদের ইন্দ্রিয় এই বাইরে এসে থেমে গিয়েছে, তাকে অতিক্রম করতে পারছে না ব'লে তাদের মনে কিছুমাত্র বেদনা নেই।

কিন্তু এই একটি অত্যন্ত আশ্চর্য ব্যাপার, মানুষ প্রকাশ্যের চেয়ে গোপনকে কিছুমাত্র কম করে চায় না— এমন কি, বেশি করেই চায়। তার সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বিরুদ্ধ সাক্ষ্য সত্ত্বেও মানুষ বলেছে, 'দেখতে পাচ্ছি নে কিন্তু আরো আছে, শোনা যাচ্ছে না কিন্তু আরো আছে।'

জগতে অনেক গুপ্ত সামগ্রী আছে যার আচ্ছাদন তুলে ফেললেই তা প্রত্যক্ষগম্য হয়ে ওঠে, এ কিন্তু সে-রকম নয়— এ আচ্ছন্ন ব'লে গুপ্ত নয়, এ গভীর ব'লেই গুপ্ত, সুতরাং একে যখন আমরা জানতে পারি তখনো এ গভীর থাকে।

গোরু উপরের থেকে ঘাস ছিঁড়ে খায়, শূকর দাঁত দিয়ে মাটি চিরে সেই ঘাসের মুথা উপড়ে খেয়ে থাকে, কিন্তু এখানে উপরের ঘাসের সঙ্গে নিচেকার মুথার প্রকৃতিগত

কোনো প্রভেদ নেই, দুটিই স্পর্শগম্য এবং দুটিতেই সমান-রকমেই পেট ভরে। কিন্তু মানুষ গোপনের মধ্যে যা খুঁজে বের করে, প্রকাশ্যের সঙ্গে তার যোগ আছে— সাদৃশ্য নেই। তা খনির ভিতরকার খনিজের মতো তুলে এনে ভাণ্ডার বোঝাই করবার জিনিস নয়। অথচ মানুষ তাকে রত্নের চয়ে বেশি মূল্যবান রত্ন বলেই জানে।

তার মানে আর-কিছুই নয়, মানুষের একটি অন্তরতর ইন্দ্রিয় আছে— তার ক্ষুধাও অন্তরতর, তার খাদ্যও অন্তরতর, তার তৃপ্তিও অন্তরতর।

এইজন্যই চিরকাল মানুষ চোখের দেখাকে ভেদ করবার জন্যে একাগ্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে। এইজন্য মানুষ, আকাশে তারা আছে, কেবল এইটুকুমাত্র দেখেই মাটির দিকে চোখ ফেরায় নি— এইজন্যে কোন্ সুদূর অতীতকালে ক্যাল্‌ডিয়ার মরু-প্রান্তরে মেষপালক মেষ চরাতে চরাতে নিশীথরাত্রের আকাশপৃষ্ঠায় জ্যোতিষ্করহস্য পাঠ করে নেবার জন্যে রাত্রের পরে রাত্রে অনিমেষ-নিদ্রাহীন-নেত্রে যাপন করেছে ;— তাদের যে-মেষরা চরছিল তার মধ্যে কেহই একবারও সেদিকে তাকাবার প্রয়োজনমাত্র অনুভব করে নি।

কিন্তু মানুষ যা দেখে তার গুহাহিত দিকটাও দেখতে চায়, নইলে সে কিছুতেই স্থির হতে পারে না।

এই অগোচরের রাজ্য অন্বেষণ করতে করতে মানুষ-যে কেবল সত্যকেই উদ্‌ঘাটন করেছে, তা বলতে পারি নে। কত ভ্রমের মধ্যে দিয়ে গিয়েছে, তার সীমা নেই। গোচরের রাজ্যে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যেও সে প্রতিদিন এককে আর ব'লে দেখে, কত ভুলকেই তার কাটিয়ে উঠতে হয় তার সীমা নেই, কিন্তু তাই ব'লে প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রকে তো একেবারে মিথ্যা ব'লে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। তেমনি অগোচরের দেশেও যেখানে আমরা গোপনকে খুঁজে বেড়াই, সেখানে আমরা অনেক ভ্রমকে-যে সত্য ব'লে গ্রহণ করেছি তাতে সন্দেহ নেই। একদিন বিশ্বব্যাপারের মূলে আমরা কত ভূতপ্রেত কত অদ্ভুত কাল্পনিক মূর্তিকে দাঁড় করিয়েছি তার ঠিকানা নেই, কিন্তু তাই নিয়ে মানুষের এই মনোবৃত্তিটিকে উপহাস করবার কোনো কারণ দেখি নে। গভীর জলে জাল ফেলে যদি পাঁক ও গুগলি ওঠে, তার থেকেই জালফেলাকে বিচার করা চলে না। মানুষ তেমনি অগোচরের তলায় যে জাল ফেলছে, তার থেকে এ পর্যন্ত পাঁক বিস্তর উঠেছে— কিন্তু তবুও তাকে অশ্রদ্ধা করতে পারি নে। সকল দেখার চেয়ে বেশি দেখা, সকল পাওয়ার চেয়ে বেশি পাওয়ার দিকে মানুষের এই চেষ্টাকে নিয়ত প্রেরণ করা, এইটেই একটি আশ্চর্য ব্যাপার ;— আফ্রিকার বন্যবর্বরতার মধ্যেও যখন এই চেষ্টার পরিচয়

পাই, তখন তাদের অদ্ভুত বিশ্বাস এবং বিকৃত কদাকার দেবমূর্তি দেখেও মানুষের এই অন্তর্নিহিত শক্তির একটি বিশেষ গৌরব অনুভব না করে থাকা যায় না।

মানুষের এই শক্তিটি সত্য— এবং এই শক্তিটি সত্যকেই গোপনতা থেকে উদ্ধার করবার এবং মানুষের চিত্তকে গভীরতার নিকেতনে নিয়ে যাবার জন্যে।

এই শক্তিটি মানুষের এত সত্য যে, একে জয়যুক্ত করবার জন্যে মানুষ দুর্গমতার কোনো বাধাকেই মানতে চায় না। এখানে সমুদ্রপর্বতের নিষেধ মানুষের কাছে ব্যর্থ হয়, এখানে ভয় তাকে ঠেকাতে পারে না বারংবার নিষ্ফলতা তার গতিরোধ করতে পারে না ;— এই শক্তির প্রেরণায় মানুষ তার সমস্ত ত্যাগ করে এবং অনায়াসে প্রাণ বিসর্জন করতে পারে।

মানুষ-যে দ্বিজ ; তার জন্মক্ষেত্র দুই জায়গায়। এক জায়গায় সে প্রকাশ্য, আর-এক জায়গায় সে গুহাহিত, সে গভীর। এই বাইরের মানুষটি বেঁচে থাকবার জন্যে চেষ্টা করছে, সেজন্যে তাকে চতুর্দিকে কত সংগ্রহ কত সংগ্রাম করতে হয় তেমনি আবার ভিতরকার মানুষটিও বেঁচে থাকবার জন্যে লড়াই ক'রে মরে। তার যা অন্নজল তা বাইরের জীবন রক্ষার জন্য একান্ত আবশ্যক নয়, কিন্তু তবু মানুষ এই খাদ্য সংগ্রহ করতে আপনার বাইরের জীবনকে বিসর্জন করেছে। এই ভিতরকার জীবনটিকে মানুষ অনাদর করে নি— এমন কি, তাকেই বেশি আদর করেছে এবং তাই যারা করেছে তারাই সভ্যতার উচ্চশিখরে অধিরোহণ করেছে। মানুষ বাইরের জীবনটাকেই যখন একান্ত বড়ো করে তোলে তখন সব দিক থেকেই তার সুর নেবে যেতে থাকে। দুর্গমের দিকে, গোপনের দিকে, গভীরতার দিকে, মানুষের চেষ্টাকে যখন টানে তখনি মানুষ বড়ো হয়ে ওঠে,— ভূমার দিকে অগ্রসর হয়,— তখনি মানুষের চিত্ত সর্বতোভাবে জাগ্রত হতে থাকে। যা সুগম, যা প্রত্যক্ষ, তাতে মানুষের সমস্ত চেতনাকে উদ্যম দিতে পারে না, এইজন্য কেবলমাত্র সেই দিকে আমাদের মনুষ্যত্ব সম্পূর্ণতা লাভ করে না।

তা হলে দেখতে পাচ্ছি, মানুষের মধ্যেও একটি সত্তা আছে যেটি গুহাহিত ; সেই গভীর সত্তাটিই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যিনি গুহাহিত তাঁর সঙ্গেই কারবার করে— সেই তার আকাশ, তার বাতাস, তার আলোক ; সেইখানেই তার স্থিতি, তার গতি, সেই গুহালোকই তার লোক।

এইখান থেকে সে যা-কিছু পায় তাকে বৈষয়িক পাওয়ার সঙ্গে তুলনা করাই যায় না— তাকে মাপ ক'রে ওজন ক'রে দেখবার কোনো উপায়ই নেই— তাকে যদি কোনো স্থূলদৃষ্টি ব্যক্তি অস্বীকার করে বসে, যদি বলে, 'কী তুমি পেলে একবার দেখি'— তা হলে বিষম সংকটে পড়তে হয়। এমন কি, যা বৈজ্ঞানিক সত্য, প্রত্যক্ষ সত্যের ভিত্তিতেই

যার প্রতিষ্ঠা তার সম্বন্ধেও প্রত্যক্ষতার স্থূল আবদার চলে না। আমরা দেখাতে পারি, ভারি জিনিস হাত থেকে পড়ে যায় কিন্তু মহাকর্ষণকে দেখাতে পারি নে। অত্যন্ত মূঢ়ও যদি বলে, 'আমি সমুদ্র দেখব, আমি হিমালয় পর্বত দেখব', তবে তাকে এ-কথা বলতে হয় না যে, 'আগে তোমার চোখদুটোকে মস্ত-বড়ো করে তোলো তবে তোমাকে পর্বত সমুদ্র দেখিয়ে দিতে পারব'— কিন্তু সেই মূঢ়ই যখন ভূবিদ্যার কথা জিজ্ঞাসা করে তখন তাকে বলতেই হয়, 'একটু রোসো ; গোড়া থেকে শুরু করতে হবে ; আগে তোমার মনকে সংস্কারের আবরণ থেকে মুক্ত করো তবে এর মধ্যে তোমার অধিকার হবে। অর্থাৎ চোখ মেললেই চলবে না, কান খুললেই হবে না, তোমাকে গুহার মধ্যে প্রবেশ করতে হবে।' মূঢ় যদি বলে, 'না, আমি সাধনা করতে রাজী নই, আমাকে তুমি এ-সমস্তই চোখে-দেখা কানে-শোনার মতো সহজ করে দাও', তবে তাকে হয় মিথ্যা দিয়ে ভোলাতে হয়, নয় তার অনুরোধে কর্ণপাত করাও সময়ের বৃথা অপব্যয় বলে গণ্য করতে হয়।

তাই যদি হয় তবে উপনিষৎ যাঁকে গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং বলেছেন, যিনি গভীরতম, তাঁকে দেখাশোনার সামগ্রী করে বাইরে এনে ফেলবার অদ্ভুত আবদার আমাদের খাটতেই পারে না। এই আবদার মিটিয়ে দিতে পারেন এমন গুরুকে আমরা অনেক-সময় খুঁজে থাকি, কিন্তু যদি কোনো গুরু বলেন, 'আচ্ছা বেশ, তাঁকে খুব সহজে করে দিচ্ছি'— ব'লে সেই যিনি নিহিতং গুহায়াং তাঁকে আমাদের চোখের সমুখে যেমন-খুশি একরকম করে দাঁড় করিয়ে দেন, তা হলে বলতেই হবে, তিনি অসত্যের দ্বারা গোপনকে আরো গোপন করে দিলেন। এ-রকম স্থলে শিষ্যকে এই কথাটাই বলবার কথা যে, মানুষ যখন সেই গুহাহিতকে, সেই গভীরকে চায়, তখন তিনি গভীর ব'লেই তাঁকে চায়— সেই গভীর আনন্দ আর-কিছুতে মেটাতে পারে না ব'লেই তাঁকে চায়— চোখে-দেখা কানে-শোনার সামগ্রী জগতে যথেষ্ট আছে, তার জন্যে আমাদের বাইরের মানুষটা তো দিনরাত ঘুরে বেড়াচ্ছে কিন্তু আমাদের অন্তরতর গুহাহিত তপস্বী সে সমস্ত-কিছু চায় না ব'লেই একাগ্রমনে তাঁর দিকে চলেছে। তুমি যদি তাঁকে চাও তবে গুহার মধ্যে প্রবেশ করেই তাঁর সাধনা করো— এবং যখন তাঁকে পাবে, তোমার 'গুহাশয়' রূপেই তাঁকে পাবে ; অন্য রূপে যে তাঁকে চায় সে তাঁকেই চায় না ; সে কেবল বিষয়কেই অন্য একটা নাম দিয়ে চাচ্ছে। মানুষ সকল পাওয়ার চেয়ে যাঁকে চাচ্ছে, তিনি সহজ বলেই তাঁকে চাচ্ছে না— তিনি ভূমা বলেই তাঁকে চাচ্ছে। যিনি ভূমা, সর্বত্রই তিনি গুহাহিতং, কি সাহিত্যে কি ইতিহাসে, কি শিল্পে কি ধর্মে কি কর্মে।

এই যিনি সকলের চেয়ে বড়ো, সকলের চেয়ে গভীর, কেবলমাত্র তাঁকে চাওয়ার

মধ্যেই একটা সার্থকতা আছে। সেই ভূমাকে আকাঙ্ক্ষা করাই আত্মার মাহাত্ম্য— ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি, এই কথাটি-যে মানুষ বলতে পেরেছে, এতেই তার মনুষ্যত্ব। ছোটোতে তার সুখ নেই, সহজে তার সুখ নেই, এইজন্যেই সে গভীরকে চায়— তবু যদি তুমি বল, 'আমার হাতের তেলোর মধ্যে সহজকে এনে দাও', তবে তুমি আর-কিছুকে চাচ্ছ।

বস্তুত, যা সহজ, অর্থাৎ যাকে আমরা অনায়াসে দেখছি, অনায়াসে শুনছি, অনায়াসে বুঝছি, তার মতো কঠিন আবরণ আর নেই। যিনি গভীর তিনি এই অতিপ্রত্যক্ষগোচর সহজের দ্বারাই নিজেকে আবৃত করে রেখেছেন। বহুকালের বহু চেষ্টায় এই সহজদেখাশোনার আবরণ ভেদ করেই মানুষ বিজ্ঞানের সত্যকে, দর্শনের তত্ত্বকে দেখেছে, যা-কিছু পাওয়ার মতো পাওয়া তাকে লাভ করেছে।

শুধু তাই নয়, কর্মক্ষেত্রেও মানুষ বহু সাধনায় আপনার সহজ প্রবৃত্তিকে ভেদ ক'রে তবে কর্তব্যনীতিতে গিয়ে পৌচেছে। মানুষ আপনার সহজ ক্ষুধাতৃষ্ণাকেই বিনা বিচারে মেনে পশুর মতো সহজ জীবনকে স্বীকার করে নেয় নি; এইজন্যেই শিশুকাল থেকে প্রবৃত্তির উপরে জয়লাভ করবার শিক্ষা নিয়ে তাকে দুঃসাধ্য সংগ্রাম করতে হচ্ছে —বারংবার পরাস্ত হয়েও সে পরাভব স্বীকার করতে পারছে না। শুধু চরিত্রে এবং কর্মে নয়, হৃদয়ভাবের দিকেও মানুষ সহজকে অতিক্রম করবার পথে চলেছে; ভালোবাসাকে মানুষ নিজের থেকে পরিবারে, পরিবার থেকে দেশে, দেশ থেকে সমস্ত মানবসমাজে প্রসারিত করবার চেষ্টা করছে। এই দুঃসাধ্য সাধনায় সে যতই অকৃতকার্য হ'ক, একে সে কোনোমতেই অশ্রদ্ধা করতে পারে না; তাকে বলতেই হবে, 'যদিচ স্বার্থ আমার কাছে সুপ্রত্যক্ষ ও সহজ এবং পরার্থ গূঢ়নিহিত ও দুঃসাধ্য, তবু স্বার্থের চেয়ে পরার্থই সত্যতর এবং সেই দুঃসাধ্যসাধনার দ্বারাই মানুষের শক্তি সার্থক হয় সুতরাং সে গভীরতর আনন্দ পায়, অর্থাৎ এই কঠিন ব্রতই আমাদের গুহাহিত মানুষটির যথার্থ জীবন— কেননা, তার পক্ষে নাল্পে সুখমস্তি।'

জ্ঞানে ভাবে কর্মে মানুষের পক্ষে সর্বত্রই যদি এই কথাটি খাটে, জ্ঞানে ভাবে কর্মে সর্বত্রই যদি মানুষ সহজকে অতিক্রম ক'রে গভীরের দিকে যাত্রা করার দ্বারাই সমস্ত শ্রেয় লাভ করে থাকে, তবে কেবল কি পরমাত্মার সম্বন্ধেই মানুষ দীনভাবে সহজকে প্রার্থনা ক'রে আপনার মনুষ্যত্বকে ব্যর্থ করবে? মানুষ যখন টাকা চায় তখন সে এ-কথা বলে না, 'টাকাকে ঢেলা করে দাও, আমার পক্ষে পাওয়া সহজ হবে।'— টাকা দুর্লভ বলেই প্রার্থনীয়; টাকা ঢেলার মতো সুলভ হলেই মানুষ তাকে চাইবে না। তবে ঈশ্বরের সম্বন্ধেই কেন আমরা উলটা কথা বলতে যাব। কেন বলব, 'তাঁকে

আমরা সহজ করে অর্থাৎ সস্তা করে পেতে চাই।' কেন বলব, 'আমরা তাঁর সমস্ত অসীম মূল্য অপহরণ ক'রে তাঁকে হাতে হাতে চোখে চোখে ফিরিয়ে বেড়াব।'

না, কখনো তা আমরা চাই নে। তিনি আমাদের চিরজীবনের সাধনার ধন, সেই আমাদের আনন্দ। শেষ নেই, শেষ নেই, জীবন শেষ হয়ে আসে তবু শেষ নেই। শিশুকাল থেকে আজ পর্যন্ত কত নব নব জ্ঞানে ও রসে তাঁকে পেতে পেতে এসেছি, না জেনেও তাঁর আভাস পেয়েছি, জেনে তাঁর আস্বাদ পেয়েছি, এমনি করে সেই অনন্ত গোপনের মধ্যে নূতন নূতন বিস্ময়ের আঘাতে আমাদের চিত্তের পাপড়ি একটি একটি করে একটু একটু করে বিকশিত হয়ে উঠছে। হে গূঢ়, তুমি গূঢ়তম বলেই তোমার টান প্রতিদিন মানুষের জ্ঞানকে প্রেমকে কর্মকে গভীর হতে গভীরতরে আকর্ষণ করে নিয়ে যাচ্ছে। তোমার এই অনন্ত রহস্যময় গোপনতাই মানুষের সকলের চেয়ে প্রিয়; এই অতল গভীরতাই মানুষের বিষয়াসক্তি ভোলাচ্ছে, তার বন্ধন আলগা করে দিচ্ছে, তার জীবনমরণের তুচ্ছতা দূর করছে; তোমার এই পরম গোপনতা থেকেই তোমার বাঁশির মধুরতম গভীরতম সুর আমাদের প্রাণের মধ্যে প্রবাহিত হয়ে আসছে; মহত্ত্বের উচ্চতা, প্রেমের গাঢ়তা, সৌন্দর্যের চরমোৎকর্ষ, সমস্ত তোমার ওই অনির্বচনীয় গভীরতার দিকে টেনে নিয়ে আমাদের সুধায় ডুবিয়ে দিচ্ছে। মানবচিত্তের এই আকাঙ্ক্ষার আবেগ, এই আনন্দের বেদনাকে তুমি এমনি করে চিরকাল জাগিয়ে রেখে চিরকাল তৃপ্ত করে চলেছ। হে গুহাহিত, তোমার গোপনতার শেষ নেই বলেই জগতের যত প্রেমিক যত সাধক যত মহাপুরুষ তোমার গভীর আহ্বানে আপনাকে এমন নিঃশেষে ত্যাগ করতে পেরেছিলেন; এমন মধুর করে তাঁরা দুঃখকে অলংকার করে পরেছেন, মৃত্যুকে মাথায় করে বরণ করেছেন। তোমার সেই সুধাময় অতলস্পর্শ গভীরতাকে যারা নিজের মূঢ়তার দ্বারা আচ্ছন্ন ও সীমাবদ্ধ করেছে, তারাই পৃথিবীতে দুর্গতির পঙ্ককুণ্ডে লুটচ্ছে— তারা বল তেজ সম্পদ সমস্ত হারিয়েছে— তাদের চেষ্টা ও চিন্তা কেবলি ছোটো ও জগতে তাদের সমস্ত অধিকার কেবলি সংকীর্ণ হয়ে এসেছে। নিজেকে দুর্বল কল্পনা করে তোমাকে যারা সুলভ করতে চেয়েছে, তারা মনুষ্যত্বের সর্বোচ্চ গৌরবকে ধুলায় লুণ্ঠিত করে দিয়েছে।

হে গুহাহিত, আমার মধ্যে যে গোপন পুরুষ, যে নিভৃতবাসী তপস্বীটি রয়েছে, তুমি তারি চিরন্তন বন্ধু; প্রগাঢ় গভীরতার মধ্যেই তোমরা দুজনে পাশাপাশি গায়ে গায়ে সংলগ্ন হয়ে রয়েছ— সেই ছায়াগম্ভীর নিবিড় নিস্তব্ধতার মধ্যেই তোমরা দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া। তোমাদের সেই চিরকালের পরমাশ্চর্য গভীর সখ্যকে আমরা যেন আমাদের কোনো ক্ষুদ্রতার দ্বারা ছোটো করে না দেখি। তোমাদের ওই পরম

সত্যকে মানুষ দিনে দিনে যতই উপলব্ধি করছে, ততই তার কাব্য সংগীত ললিতকলা অনির্বচনীয় রসের আভাসে রহস্যময় হয়ে উঠছে, ততই তার জ্ঞান সংস্কারের দৃঢ় বন্ধনকে ছিন্ন করছে, তার কর্ম স্বার্থের দুর্লঙ্ঘ্য সীমা অতিক্রম করছে, তার জীবনের সকল ক্ষেত্রেই অনন্তের ব্যঞ্জনা প্রকাশ পেয়ে উঠছে।

তোমার সেই চিরন্তন পরম গোপনতার অভিমুখে আনন্দে যাত্রা করে চলব,— আমার সমস্ত যাত্রাসংগীত সেই নিগূঢ়তার নিবিড় সৌন্দর্যকেই যেন চিরদিন ঘোষণা করে,— পথের মাঝখানে কোনো কৃত্রিমকে, কোনো ছোটোকে, কোনো সহজকে নিয়ে যেন ভুলে না থাকে,— আমার আনন্দের আবেগধারা সমুদ্রে চিরকাল বহমান হবার সংকল্প ত্যাগ ক'রে যেন মরুবালুকার ছিদ্রপথে আপনাকে পথিমধ্যে পরিসমাপ্ত করে না দেয়।

২০ চৈত্র ১৩১৬

দুর্লভ

ঈশ্বরের মধ্যে মনকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারি নে, মন বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়, এই কথা অনেকের মুখে শোনা যায়।

'পারি নে' যখন বলি তার অর্থ এই, সহজে পারি নে ; যেমন করে নিশ্বাস গ্রহণ করছি, কোনো সাধনার প্রয়োজন হচ্ছে না, ঈশ্বরকে তেমন করে আমাদের চেতনার মধ্যে গ্রহণ করতে পারি নে।

কিন্তু গোড়া থেকেই মানুষের পক্ষে কিছুই সহজ নয় ; ইন্দ্রিয়বোধ থেকে আরম্ভ করে ধর্মবুদ্ধি পর্যন্ত সমস্তই মানুষকে এত সুদূর টেনে নিয়ে যেতে হয় যে মানুষ হয়ে ওঠা সকল দিকেই তার পক্ষে কঠিন সাধনার বিষয়। যেখানে সে বলবে 'আমি পারি নে' সেইখানেই তার মনুষ্যত্বের ভিত্তি ক্ষয় হয়ে যাবে, তার দুর্গতি আরম্ভ হবে ; সমস্তই তাকে পারতেই হবে।

পশুশাবককে দাঁড়াতে এবং চলতে শিখতে হয় নি। মানুষকে অনেকদিন ধরে বারবার উঠে পড়ে তবে চলা অভ্যাস করতে হয়েছে ; 'আমি পারি নে' বলে সে নিষ্কৃতি পায় নি। মাঝে-মাঝে এমন ঘটনা শোনা গেছে, পশুমাতা মানবশিশুকে হরণ করে বনে নিয়ে গিয়ে পালন করেছে। সেই-সব মানুষ জন্তুদের মতো হাতে পায়ে হাঁটে। বস্তুত তেমন করে হাঁটা সহজ। সেইজন্য শিশুদের পক্ষে হামাগুড়ি দেওয়া কঠিন নয়।

কিন্তু মানুষকে উপরের দিকে মাথা তুলে খাড়া হয়ে দাঁড়াতে হবে। এই খাড়

হয়ে দাঁড়ানো থেকেই মানুষের উন্নতির আরম্ভ। এই উপায়ে যখনি সে আপনার দুই হাতকে মুক্তিদান করতে পেরেছে তখনি পৃথিবীর উপরে সে কর্তৃত্বের অধিকার লাভ করেছে। কিন্তু শরীরটাকে সরল রেখায় খাড়া রেখে দুই পায়ের উপর চলা সহজ নয়। তবু জীবনযাত্রার আরম্ভেই এই কঠিন কাজকেই তার সহজ করে নিতে হয়েছে; যে মাধ্যাকর্ষণ তার সমস্ত শরীরের ভারকে নীচের দিকে টানছে, তার কাছে পরাভব স্বীকার না করবার শিক্ষাই তার প্রথম কঠিন শিক্ষা।

বহু চেষ্টায় এই সোজা হয়ে চলা যখন তার পক্ষে সহজ হয়ে দাঁড়াল, যখন সে আকাশের আলোকের মধ্যে অনায়াসে মাথা তুলতে পারল, তখন জ্যোতিষ্কবিরাজিত বৃহৎ বিশ্বজগতের সঙ্গে সে আপনার সম্বন্ধ উপলব্ধি করে আনন্দ ও গৌরব লাভ করলে।

এই যেমন জগতের মধ্যে চলা মানুষকে কষ্ট করে শিখতে হয়েছে, সমাজের মধ্যে চলাও তাকে বহু কষ্টে শিখতে হয়েছে। খাওয়া পরা, শোওয়া বসা, চলা বলা, এমন কিছুই নেই যা তাকে বিশেষ যত্নে অভ্যাস না করতে হয়েছে। কত রীতিনীতি নিয়ম-সংযম মানলে তবে চারদিকের মানুষের সঙ্গে তার আদানপ্রদান, তার প্রয়োজন ও আনন্দের সম্বন্ধ সম্পূর্ণ ও সহজ হতে পারে। যতদিন তা না হয় ততদিন তাকে পদে পদে দুঃখ ও অপমান স্বীকার করতে হয়— ততদিন তার যা দেবার ও তার যা নেবার উভয়ই বাধাগ্রস্ত হয়।

জ্ঞানরাজ্যে অধিকারলাভের চেষ্টাতেও মানুষকে অল্প ক্লেশ পেতে হয় না। যা চোখে দেখছি, কানে শুনছি, তাকেই আরামে স্বীকার করে গেলেই মানুষের চলে না। এইজন্যেই বিদ্যালয় বলে কত বড়ো একটা প্রকাণ্ড বোঝা মানুষের সমাজকে বহন করে বেড়াতে হয়— তার কত আয়োজন, কত ব্যবস্থা! জীবনের প্রথম কুঁড়িপঁচিশ বছর মানুষকে কেবল শিক্ষা সমাধা করতেই কাটিয়ে দিতে হয় এবং যাদের জ্ঞানলাভের আকাঙ্ক্ষা প্রবল, সমস্ত জীবনেও তাদের শিক্ষা শেষ হয় না।

এমনি সকল দিকেই দেখতে পাই, মানুষ মনুষ্যত্বলাভের সাধনায় তপস্যা করছে। আহারের জন্যে রৌদ্রবৃষ্টি মাথায় করে নিয়ে চাষ করাও তার তপস্যা, আর নক্ষত্রলোকের রহস্য ভেদ করবার জন্যে আকাশে দূরবীন তুলে জেগে থাকাও তার তপস্যা।

এমনি প্রাণের রাজ্যেই বল, জ্ঞানের রাজ্যেই বল, সামাজিকতার রাজ্যেই বল, সর্বত্রই আপনার পূর্ণ অধিকার লাভ করবার জন্যে মানুষকে প্রাণপণ করতে হয়েছে। যারা বলেছে 'পারি নে', তারাই নেবে গিয়েছে। যা সহজ না, তারি মধ্যে মানুষকে সহজ হতে হবে— সহজের প্রকাণ্ড মাধ্যাকর্ষণকে কাটিয়ে তাকে সর্বত্রই উপরে মাথা তুলে দাঁড়াতে হবে।

প্রথম থেকেই সহজের বিরুদ্ধে লড়াই করতে করতে এই প্রবৃত্তি মানুষের পক্ষে এমনি স্বাভাবিক হয়ে গেছে যে, অনাবশ্যক দুঃসাধ্যসাধনও তাকে আনন্দ দেয়। আর-কোনো প্রাণীর মধ্যেই এই অদ্ভুত জিনিসটা নেই। যেটা সহজ, যেটা আরামের, তার ব্যতিক্রম দেখলে অন্য কোনো প্রাণী সুখ বোধ করতে পারে না। অন্য প্রাণীরা যে লড়াই করে, সে কেবল প্রয়োজনসাধনের জন্যে, আত্মরক্ষার জন্যে, অর্থাৎ দায়ে পড়ে; সে লড়াই গায়ে পড়ে দুঃসাধ্যসাধনের জন্যে নয়। কিন্তু মানুষই কেবলমাত্র কঠিন কাজকে সম্পন্ন করাতেই বিশেষ আনন্দ পায়।

এইজন্যেই যে-ব্যায়ামকৌশলে কোনো প্রয়োজনই নেই, সেটা দেখা মানুষের একটা আমোদের অঙ্গ। যখন শুনতে পাই বারংবার পরাস্ত হয়েও মানুষ উত্তরমেরুর তুষার মরুক্ষেত্রের কেন্দ্রস্থলে আপনার জয়পতাকা পুঁতে এসেছে, তখন এই কার্যের লাভ সম্বন্ধে কোনো হিসাব না করেও আমাদের ভিতরকার তপস্বী মনুষ্যত্ব পুলক অনুভব করে। মানুষের প্রায় প্রত্যেক খেলার মধ্যেই শরীর বা মনের একটা-কিছু কষ্টের হেতু আছে— এমন একটা কিছু আছে যা সহজ নয় বলেই মানুষের পক্ষে সুখকর।

যখন কোনো ক্ষেত্রেই মানুষকে 'পারি নে' এ-কথাটা বলতে দেওয়া হয় নি, তখন ব্রহ্মের মধ্যে মানুষ সহজ হবে, সত্য হবে, এ সম্বন্ধেও 'পারি নে' বলা তার চলবে না। সকল শ্রেষ্ঠতাতেই চেষ্টা করে তাকে সফল হতে হয়েছে, আর যেটা সকলের চেয়ে পরম শ্রেষ্ঠতা সেইখানেই সে নিতান্ত সামান্য চেষ্টা করেই যদি ফল না পায়, তবেই এ-কথা বলা তার সাজবে না যে, 'আমার দ্বারা একেবারে সাধ্য নয়'।

যতই সহজ ও যতই আরামের হ'ক, তবু আমরা কেবল মাটির দিকেই মাথা করে পশুর মতো চলে বেড়াব না, মানুষের ভিতর এই একটি তাগিদ ছিল বলেই মানুষ যেমন বহু চেষ্টায় আকাশে মাথা তুলেছে— এবং সেই আকাশে মাথা তুলেছে ব'লে পৃথিবীর অধিকার থেকে সে বঞ্চিত হয় নি, বরঞ্চ পশুর থেকে তার অধিকার অনেক বৃহৎভাবে ব্যাপ্ত হয়েছে, তেমনই আমাদের মনের অন্তরতম দেশে আর-একটি গভীরতম উত্তেজনা আছে, আমরা কেবলই সংসারের দিকে মাথা রেখে সমস্ত জীবন ঘোর বিষয়ীর মতো ধুলা ঘ্রাণ করে করেই বেড়াতে পারব না— অনন্তের মধ্যে, অভয়ের মধ্যে, অশোকের মধ্যে মাথা তুলে আমরা সরল হয়ে উন্নত হয়ে সঞ্চরণ করব। যদি তাই করি, তবে সংসার থেকে আমরা ভ্রষ্ট হব না বরঞ্চ সংসারে আমাদের অধিকার বৃহৎ হবে, সত্য হবে, সার্থক হবে। তখন মুক্তভাবে আমরা সংসারে বিচরণ করতে পারব বলেই সংসারে আমাদের যথার্থ কর্তৃত্ব প্রশস্ত হবে।

জন্তু যেমন চার পায়ে চলে ব'লে হাতের ব্যবহার পায় না, তেমনি বিষয়ীলোক সংসারে চার পায়ে চলে ব'লে কেবল চলে মাত্র, সে ভালো করে কিছুই দিতে পারে না এবং নিতে পারে না। কিন্তু যাঁরা সাধনার জোরে ব্রহ্মের দিকে মাথা তুলে চলতে শিখেছেন, তাঁদের হাত পা উভয়ই মাটিতে বদ্ধ নয়— তাঁদের দুই হাত মুক্ত হয়েছে— তাঁদের নেবার শক্তি এবং দেবার শক্তি পূর্ণতালাভ করেছে— তাঁরা কেবলমাত্র চলেন তা নয়, তাঁরা কর্তা, তাঁরা সৃষ্টিকর্তা।

যে সৃষ্টিকর্তা সে আপনাকে সর্জন করে ; আপনাকে ত্যাগ করেই সে সৃষ্টি করে। এই ত্যাগের শক্তিই হচ্ছে সকলের চেয়ে বড়ো শক্তি। এই ত্যাগের শক্তির দ্বারাই মানুষ বড়ো হয়ে উঠেছে। যে-পরিমাণেই সে আপনাকে ত্যাগ করতে পেরেছে সেই পরিমাণেই সে লাভ করেছে। এই ত্যাগের শক্তিই সৃষ্টিশক্তি। এই সৃষ্টিশক্তিই ঈশ্বরের ঐশ্বর্য। তিনি বন্ধনহীন বলেই আনন্দে আপনাকে নিত্যকাল ত্যাগ করেন। এই ত্যাগই তাঁর সৃষ্টি। আমাদের চিত্ত যে-পরিমাণে স্বার্থবর্জিত হয়ে মুক্ত আনন্দে তাঁর সঙ্গে যোগ দেয়, সেই পরিমাণে সেও সৃষ্টি করে, সেই পরিমাণেই তার চিন্তা, তার কর্ম সৃষ্টি হয়ে ওঠে।

যাঁরা সংসার থেকে উচ্চ হয়ে উঠে ব্রহ্মের মধ্যে মাথা তুলে সঞ্চরণ করতে শিখেছেন, তাঁদের এই ত্যাগের শক্তিই মুক্তিলাভ করেছে। এই আসক্তিবন্ধনহীন আত্মত্যাগের অব্যাহত শক্তি দ্বারাই আধ্যাত্মিকলোকে তাঁরা শ্রেষ্ঠ অধিকার লাভ করেন। এই অধিকারের জোরে সর্বত্রই তাঁরা রাজা। এই অধিকারই মানুষের পরম অধিকার। এই অধিকারের মধ্যেই মানুষের চরম স্থিতি। এইখানে মানুষকে 'পারি নে' বললে চলবে না ;— চিরজীবন সাধনা করেও এই চরম গতি তাকে লাভ করতে হবে, নইলে সে যদি সমস্ত পৃথিবীরও সম্রাট হয় তবু তার মহতী বিনষ্টিঃ।

যে-ব্রহ্মের শক্তি আমার অন্তরে বাহিরে সর্বত্রই নিজেকে উৎসর্জন করছে, যিনি 'আত্মদা', আমি জলে-স্থলে-আকাশে সুখে-দুঃখে সর্বত্র সকল অবস্থায় তাঁর মধ্যেই আছি, এই চেতনাকে প্রতিদিনের চেষ্টায় সহজ করে তুলতে হবে। এই সাধনার ধ্যানই হচ্ছে গায়ত্রী। এই সাধনাই হচ্ছে তাঁর মধ্যে দাঁড়াতে এবং চলতে শেখা। অনেকবার টলতে হবে, বারবার পড়তে হবে, কিন্তু তাই বলে ভয় করলে হবে না 'তবে বুঝি পারব না'। পারবই, নিশ্চয়ই পারব। কেননা অন্তরের মধ্যে এই দিকেই মানুষের একটা প্রেরণা আছে,— এইজন্যে মানুষ দুঃসাধ্যতাকে ভয় করে না, তাকে বরণ করে নেয়,— এইজন্যেই মানুষ এতবড়ো একটা আশ্চর্য কথা ব'লে জগতের অন্য-সকল প্রাণীর চেয়ে বড়ো হয়ে উঠেছে, ভূমৈব সুখং, নাল্পে সুখমস্তি।

জন্মোৎসব

বক্তার জন্মদিনে বোলপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ের বালকদিগের নিকট কথিত

আজ আমার জন্মদিনে তোমরা উৎসব করে আমাকে আহ্বান করেছ,— এতে আমার অনেকদিনের স্মৃতিকে জাগিয়ে তুলেছে।

জন্মদিনে বিশেষভাবে নিজের জীবনের প্রতি দৃষ্টি করবার কথা অনেকদিন আমার মনে জাগে নি। কত ২৫শে বৈশাখ চলে গিয়েছে, তারা অন্য তারিখের চেয়ে নিজেকে কিছুমাত্র বড়ো করে আমার কাছে প্রকাশ করে নি।

বস্তুত, নিজের জন্মদিন বৎসরের অন্য ৩৬৪ দিনের চেয়ে নিজের কাছে কিছুমাত্র বড়ো নয়। যদি অন্যের কাছে তার মূল্য থাকে তবেই তার মূল্য।

যেদিন আমরা এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছিলুম, সেদিন নূতন অতিথিকে নিয়ে যে উৎসব হয়েছিল, সে আমাদের নিজের উৎসব নয়। অজ্ঞাত গোপনতার মধ্য থেকে আমাদের সদ্য আবির্ভাবকে যাঁরা একটি পরমলাভ বলে মনে করেছিলেন, উৎসব তাঁদেরি। আনন্দলোক থেকে একটি আনন্দ-উপহার পেয়ে তাঁরা আত্মার আত্মীয়তার ক্ষেত্রকে বড়ো করে উপলব্ধি করেছিলেন, তাই তাঁদের উৎসব।

এই উপলব্ধি চিরকাল সকলের কাছে সমান নবীন থাকে না। অতিথি ক্রমে পুরাতন হয়ে আসে,— সংসারে তার আবির্ভাব-যে পরমরহস্যময় এবং সে-যে চিরদিন এখানে থাকবে না, সে-কথা ভুলে যেতে হয়। বৎসরের পর বৎসর সমভাবেই প্রায় চলে যেতে থাকে— মনে হয়, তার ক্ষতিও নেই বৃদ্ধিও নেই, সে আছে তো আছেই— তার মধ্যে অন্তরের প্রকাশ আর আমরা দেখতে পাই নে। তখন যদি আমরা উৎসব করি, সে বাঁধা প্রথার উৎসব— সে এক-রকম দায়ে পড়ে করা।

যতক্ষণ মানুষের মধ্যে নব নব সম্ভাবনার পথ খোলা থাকে, ততক্ষণ তাকে আমরা নূতন করেই দেখি; তার সম্বন্ধে ততক্ষণ আমাদের আশার অন্ত থাকে না, সে আমাদের ঔৎসুক্যকে সমান জাগিয়ে রেখে দেয়।

জীবনে একটা বয়স আসে যখন মানুষের সম্বন্ধে আর নূতন প্রত্যাশা করবার কিছুই থাকে না; তখন সে যেন আমাদের কাছে এক-রকম ফুরিয়ে আসে। সে-রকম অবস্থায় তাকে দিয়ে আমাদের প্রতিদিনের ব্যবহার চলতে পারে কিন্তু উৎসব চলতে পারে না; কারণ, উৎসব জিনিসটাই হচ্ছে নবীনতার উপলব্ধি— তা আমাদের প্রতিদিনের অতীত। উৎসব হচ্ছে জীবনের কবিত্ব, যেখানে রস সেইখানেই তার প্রকাশ।

আজ আমি উনপঞ্চাশ বৎসর সম্পূর্ণ করে পঞ্চাশে পড়েছি। কিন্তু আমার সেই দিনের কথা মনে পড়ছে যখন আমার জন্মদিন নবীনতার উজ্জলতায় উৎসবের উপযুক্ত ছিল।

তখন আমার তরুণ বয়স। প্রভাত হতে না হতে প্রিয়জনেরা আমাকে কত আনন্দে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যে 'আজ তোমার জন্মদিন'। আজ তোমরা যেমন ফুল তুলেছ, ঘর সাজিয়েছ, সেই-রকম আয়োজনই তখন হয়েছে। আত্মীয়দের সেই আনন্দ-উৎসাহের মধ্যে মনুষ্যজন্মের একটি বিশেষ মুল্য সেদিন অনুভব করতুম। যেদিকে সংসারে আমি অসংখ্য বহুর মধ্যে একজনমাত্র, সেদিক থেকে আমার দৃষ্টি ফিরে গিয়ে যেখানে আমি আমিই, যেখানে আমি বিশেষভাবে একমাত্র, সেখানেই আমার দৃষ্টি পড়ত— নিজের গৌরবে সেদিন প্রাতঃকালে হৃদয় বিকশিত হয়ে উঠত।

এমনি করে আত্মীয়দের স্নেহদৃষ্টির পথ বেয়ে নিজের জীবনের দিকে যখন তাকাতুম, তখন আমার জীবনের দূরবিস্তৃত ভবিষ্যৎ তার অনাবিষ্কৃত রহস্যলোক থেকে এমন একটি বাঁশি বাজাত যাতে আমার সমস্ত চিত্ত দুলে উঠত। বস্তুত, জীবন তখন আমার সামনেই— পিছনে তার অতি অল্পই। জীবনে যেটুকু গোচর ছিল, তার চেয়ে অগোচরই ছিল অনেক বেশি। আমার তরুণ বয়সের অল্প কয়েকটি অতীত বৎসরকে গানের ধুয়াটির মতো অবলম্বন করে সমস্ত অনাগত ভবিষ্যৎ তার উপরে অনির্বচনীয়ের তান লাগাতে থাকত।

পথ তখন নির্দিষ্ট হয় নি। নানা দিকে তার শাখাপ্রশাখা। কোন্ দিক দিয়ে কোথায় যাব এবং কোথায় গেলে কী পাব, তার অধিকাংশই কল্পনার মধ্যে ছিল। এইজন্য প্রতিবৎসর জন্মদিনে জীবনের সেই অনির্দেশ্য অসীম প্রত্যাশায় চিত্ত বিশেষভাবে জাগ্রত হয়ে উঠত।

ঝরনা যখন প্রথম জেগে ওঠে, নদী যখন প্রথম চলতে আরম্ভ করে, তখন নিজের সুবিধার পথ বের করতে তাকে নানা দিকে নানা গতিপরিবর্তন করতে হয়। অবশেষে বাধার দ্বারা সীমাবদ্ধ হয়ে যখন তার পথ সুনির্দিষ্ট হয়, তখন নূতন পথের সন্ধান তার বন্ধ হয়ে যায়। তখন নিজের খনিত পথকে অতিক্রম করাই তার পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে।

আমারো জীবনের ধারা যখন ঘাতপ্রতিঘাতের মাঝখান দিয়ে আপনার পথটি তৈরি করে নিলে, তখন বর্ষার বন্যার বেগও সেই পথেই স্ফীত হয়ে বইতে লাগল এবং গ্রীষ্মের রিক্ততাও সেই পথেই সংকুচিত হয়ে চলতে থাকল। তখন নিজের জীবনকে

বারম্বার আর নূতন করে আলোচনা করবার দরকার রইল না। এইজন্যে তখন থেকে জন্মদিন আর-কোনো নূতন আশার সুরে বাজতে থাকল না। সেইজন্যে জন্মদিনের সংগীতটি যখন নিজের ও অন্যের কাছে বন্ধ হয়ে এল, তখন আস্তে আস্তে উৎসবের প্রদীপটিও নিবে এল। আমার বা আর-কারো কাছে এর আর-কোনো প্রয়োজনই ছিল না।

এমনসময় আজ তোমরা যখন আমাকে এই জন্মোৎসবের সভা সাজিয়ে তার মধ্যে আহ্বান করলে, তখন প্রথমটা আমার মনের মধ্যে সংকোচ উপস্থিত হয়েছিল। আমার মনে হল, জন্ম তো আমার অর্ধ শতাব্দীর প্রান্তে কোথায় পড়ে রয়েছে, সে-যে কবেকার পুরানো কথা তার আর ঠিক নেই— মৃত্যুদিনের মূর্তি তার চেয়ে অনেক বেশি কাছে এসেছে— এই জীর্ণ জন্মদিনকে নিয়ে উৎসব করবার বয়স কি আমার।

এমনসময় একটি কথা আমার মনে উদয় হল, এবং সেই কথাটাই তোমাদের সামনে আমি বলতে ইচ্ছা করি।

পূর্বেই আভাস দিয়েছি, জন্মোৎসবের ভিতরকার সার্থকতাটা কিসে। জগতে আমরা অনেক জিনিসকে চোখের দেখা করে দেখি, কানের শোনা করে শুনি, ব্যবহারের পাওয়া করে পাই ; কিন্তু অতি অল্প জিনিসকেই আপন করে পাই। আপন করে পাওয়াতেই আমাদের আনন্দ— তাতেই আমরা আপনাকে বহুগুণ করে পাই। পৃথিবীতে অসংখ্য লোক ; তারা আমাদের চারিদিকেই আছে কিন্তু তাদের আমরা পাই নি, তারা আমাদের আপন নয়, তাই তাদের মধ্যে আমাদের আনন্দ নেই।

তাই বলছিলুম, আপন করে পাওয়াই হচ্ছে একমাত্র লাভ, তার জন্যেই মানুষের যত-কিছু সাধনা। শিশু ঘরে জন্মগ্রহণ করবামাত্রই তার মা বাপ এবং ঘরের লোক এক মুহূর্তেই আপনার লোককে পায়,— পরিচয়ের আরম্ভকাল থেকেই সে যেন চিরন্তন। অল্পকাল পূর্বেই সে একেবারে কেউ ছিল না— না-জানার অনাদি অন্ধকার থেকে বাহির হয়েই সে আপন-করে-জানার মধ্যে অতি অনায়াসেই প্রবেশ করলে ; এজন্যে পরস্পরের মধ্যে কোনো সাধনার, কোনো দেখাসাক্ষাৎ আনাগোনার কোনো প্রয়োজন হয় নি।

যেখানেই এই আপন করে পাওয়া আছে সেইখানেই উৎসব। ঘর সাজিয়ে বাঁশি বাজিয়ে সেই পাওয়াটিকে মানুষ সুন্দর করে তুলে প্রকাশ করতে চায়। বিবাহেও পরকে যখন চিরদিনের মতো আপন করে পাওয়া যায়, তখনো এই সাজসজ্জা, এই গীতবাদ্য। 'তুমি আমার আপন' এই কথাটি মানুষ প্রতিদিনের সুরে বলতে পারে না— এতে সৌন্দর্যের সুর ঢেলে দিতে হয়।

শিশুর প্রথম জন্মে যেদিন তার আত্মীয়েরা আনন্দধ্বনিতে বলেছিল 'তোমাকে আমরা পেয়েছি'— সেইদিনে ফিরে ফিরে বৎসরে বৎসরে তারা ওই একই কথা আওড়াতে চায় যে, 'তোমাকে আমরা পেয়েছি। তোমাকে পাওয়ায় আমাদের সৌভাগ্য, তোমাকে পাওয়ায় আমাদের আনন্দ, কেননা তুমি-যে আমাদের আপন, তোমাকে পাওয়াতে আমরা আপনাকে অধিক করে পেয়েছি।'

আজ আমার জন্মদিনে তোমরা যে-উৎসব করছ, তার মধ্যে যদি সেই কথাটি থাকে, তোমরা যদি আমাকে আপন করে পেয়ে থাক, আজ প্রভাতে সেই পাওয়ার আনন্দকেই যদি তোমাদের প্রকাশ করবার ইচ্ছা হয়ে থাকে, তা হলেই এই উৎসব সার্থক। তোমাদের জীবনের সঙ্গে আমার জীবন যদি বিশেষভাবে মিলে থাকে, আমাদের পরস্পরের মধ্যে যদি কোনো গভীরতর সম্বন্ধ স্থাপিত হয়ে থাকে, তবেই যথার্থভাবে এই উৎসবের প্রয়োজন আছে, তার মূল্য আছে।

এই জীবনে মানুষের যে কেবল একবার জন্ম হয়, তা বলতে পারি নে। বীজকে মরে অঙ্কুর হতে হয়, অঙ্কুরকে মরে গাছ হতে হয়— তেমনি মানুষকে বারবার মরে নূতন জীবনে প্রবেশ করতে হয়।

একদিন আমি আমার পিতামাতার ঘরে জন্ম নিয়েছিলুম— কোন্ রহস্যধাম থেকে প্রকাশ পেয়েছিলুম, কে জানে। কিন্তু জীবনের পালা, প্রকাশের লীলা সেই ঘরের মধ্যেই সমাপ্ত হয়ে চুকে যায় নি।

সেখানকার সুখদুঃখ ও স্নেহপ্রেমের পরিবেষ্টন থেকে আজ জীবনের নূতন ক্ষেত্রে জন্মলাভ করেছি। বাপমায়ের ঘরে যখন জন্মেছিলুম তখন অকস্মাৎ কত নূতন লোক চিরদিনের মতো আমার আপনার হয়ে গিয়েছিল। আজ ঘরের বাইরে আর-একটি ঘরে আমার জীবন যে জন্মলাভ করেছে এখানেও একত্র কত লোকের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ বেঁধে গেছে। সেইজন্যেই আজকের এই আনন্দ।

আমার প্রথম বয়সে, সেই পূর্বজীবনের মধ্যে আজকের এই নবজন্মের সম্ভাবনা এতই সম্পূর্ণ গোপনে ছিল যে, তা কল্পনারও গোচর হতে পারত না। এই লোক আমার কাছে অজ্ঞাতলোক ছিল।

সেইজন্যে আমার এই পঞ্চাশ বৎসর বয়সেও আমাকে তোমরা নূতন করে পেয়েছ; আমার সঙ্গে তোমাদের সম্বন্ধের মধ্যে জরাজীর্ণতার লেশমাত্র লক্ষণ নেই। তাই আজ সকালে তোমাদের আনন্দ-উৎসবের মাঝখানে বসে আমার এই নবজন্মের নবীনতা অন্তরে বাহিরে উপলব্ধি করছি।

এই যেখানে তোমাদের সকলের সঙ্গে আমি আপন হয়ে বসেছি, এ আমার

সংসারলোক নয়, এ মঙ্গললোক। এখানে দৈহিক জন্মের সম্বন্ধ নয়, এখানে অহেতুক কল্যাণের সম্বন্ধ।

মানুষের মধ্যে দ্বিজত্ব আছে; মানুষ একবার জন্মায় গর্ভের মধ্যে, আবার জন্মায় মুক্ত পৃথিবীতে। তেমনি আর-একদিক দিয়ে মানুষের এক জন্ম আপনাকে নিয়ে, আর-এক জন্ম সকলকে নিয়ে।

পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হয়ে তবে মানুষের জন্মের সমাপ্তি, তেমনি স্বার্থের আবরণ থেকে মুক্ত হয়ে মঙ্গলের মধ্যে উত্তীর্ণ হওয়া মনুষ্যত্বের সমাপ্তি। জঠরের মধ্যে ভ্রূণই হচ্ছে কেন্দ্রবর্তী, সমস্ত জঠর তাকেই ধারণ করে এবং পোষণ করে, কিন্তু পৃথিবীতে জন্মমাত্র তার সেই নিজের একমাত্র কেন্দ্রত্ব ঘুচে যায়—এখানে সে অনেকের অন্তর্বর্তী। স্বার্থলোকেও আমিই হচ্ছি কেন্দ্র, অন্য-সমস্ত তার পরিধি,—মঙ্গললোকে আমিই কেন্দ্র নই, আমি সমগ্রের অন্তর্বর্তী; সুতরাং এই সমগ্রের প্রাণেই সেই আমির প্রাণ, সমগ্রের ভালোমন্দেই তার ভালোমন্দ।

পৃথিবীতে আমাদের দৈহিক জীবন একেবারেই পাকা হয় না। যদিও মুক্ত আকাশে আমরা জন্মগ্রহণ করি বটে, তবু শক্তির অভাবে আমরা মুক্তভাবে সঞ্চরণ করতে পারি নে; মায়ের কোলেই, ঘরের সীমার মধ্যেই আবদ্ধ হয়ে থাকি। তার পরে ক্রমশই পরিপুষ্টি ও সাধনা থেকে পৃথিবীলোকে আমাদের মুক্ত অধিকার বিস্তৃত হতে থাকে।

বাইরের দিক থেকে এ যেমন, অন্তরের দিক থেকেও আমাদের দ্বিতীয় জন্মের সেই-রকমের একটি ক্রমবিকাশ আছে। ঈশ্বর যখন স্বার্থের জীবন থেকে আমাদের মঙ্গলের জীবনে এনে উপস্থিত করেন, তখন আমরা একেবারেই পূর্ণ শক্তিতে সেই জীবনের অধিকার লাভ করতে পারি নে। ভ্রূণত্বের জড়তা আমরা একেবারেই কাটিয়ে উঠি নে। তখন আমরা চলতে চাই, কারণ চারিদিকে চলার ক্ষেত্র অবাধ-বিস্তৃত—কিন্তু চলতে পারি নে, কেননা আমাদের শক্তি অপরিণত। এই হচ্ছে দ্বন্দ্বের অবস্থা। শিশুর মতো চলতে গিয়ে বারবার পড়তে হয় এবং আঘাত পেতে হয়; যতটা চলি তার চেয়ে পড়ি অনেক বেশি। তবুও ওঠা ও পড়ার এই সুকঠোর বিরোধের মধ্য দিয়েই মঙ্গললোকে আমাদের মুক্তির অধিকার ক্রমশ প্রশস্ত হতে থাকে।

কিন্তু শিশু যখন মায়ের কোলে প্রায় অহোরাত্র শুয়ে-ঘুমিয়েই কাটাচ্ছে তখনো যেমন জানা যায়, সে এই চলা-ফেরা-জাগরণের পৃথিবীতেই জন্মগ্রহণ করেছে এবং তার সঙ্গে বয়স্কদের সাংসারিক সম্বন্ধ অনুভব করতে কোনো সংশয়মাত্র থাকে না, তেমনি যখন আমরা স্বার্থলোক থেকে মঙ্গললোকে প্রথম ভূমিষ্ঠ হই তখন পদে পদে আমাদের

জড়ত্ব ও অকৃতার্থতা সত্ত্বেও আমাদের জীবনের ক্ষেত্রপরিবর্তন হয়েছে, সে কথা এক-রকম করে বুঝতে পারা যায়। এমন কি, জড়তার সঙ্গে নবলব্ধ চেতনার বহুতরো বিরোধের দ্বারাই সেই খবরটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

বস্তুত, স্বার্থের জঠরের মধ্যে মানুষ যখন শয়ান থাকে, তখন সে দ্বিধাহীন আরামের মধ্যেই কালযাপন করে। এর থেকে যখন প্রথম মুক্তিলাভ করে, তখন অনেক দুঃখ-স্বীকার করতে হয়, তখন নিজের সঙ্গে অনেক সংগ্রাম করতে হয়।

তখন ত্যাগ তার পক্ষে সহজ হয় না কিন্তু তবু তাকে ত্যাগ করতেই হয়, কারণ এ লোকের জীবনই হচ্ছে ত্যাগ। তখন তার সমস্ত চেষ্টার মধ্যে সম্পূর্ণ আনন্দ থাকে না, তবু তাকে চেষ্টা করতেই হয়। তখন তার মন যা বলে, তার আচরণ তার প্রতিবাদ করে; তার অন্তরাত্মা যে-ডালকে আশ্রয় করে, তার ইন্দ্রিয় তাকেই কুঠারাঘাত করতে থাকে; যে-শ্রেয়কে আশ্রয় ক'রে সে অহংকারের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবে, অহংকার গোপনে সেই শ্রেয়কেই আশ্রয় ক'রে গভীরতররূপে আপনাকে পোষণ করতে থাকে। এমনি ক'রে প্রথম অবস্থায় বিরোধ-অসামঞ্জস্যের বিষম দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে তার আর দুঃখের অন্ত থাকে না।

আমি আজ তোমাদের মধ্যে যেখানে এসেছি, এখানে আমার পূর্বজীবনের অনুবৃত্তি নেই। বস্তুত, সে জীবনকে ভেদ করেই এখানে আমাকে ভূমিষ্ঠ হতে হয়েছে। এইজন্যেই আমার জীবনের উৎসব সেখানে বিলুপ্ত হয়ে এখানেই প্রকাশ পেয়েছে। দেশালাইয়ের কাঠির মুখে যে-আলো একটুখানি দেখা দিয়েছিল, সেই আলো আজ প্রদীপের বাতির মুখে ধ্রুবতর হয়ে জ্বলে উঠেছে।

কিন্তু এ-কথা তোমাদের কাছে নিঃসন্দেহই অগোচর নেই যে, এই নূতন জীবনকে আমি শিশুর মতো আশ্রয় করেছি মাত্র, বয়স্কের মতো একে আমি অধিকার করতে পারি নি। তবু আমার সমস্ত দ্বন্দ্ব এবং অপূর্ণতার বিচিত্র অসংগতির ভিতরেও আমি তোমাদের কাছে এসেছি, সেটা তোমরা উপলব্ধি করেছ— একটি মঙ্গললোকের সম্বন্ধে তোমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আমি তোমাদের আপন হয়েছি, সেইটে তোমরা হৃদয়ে জেনেছ— এবং সেইজন্যেই আজ তোমরা আমাকে নিয়ে এই উৎসবের আয়োজন করেছ, এ-কথা যদি সত্য হয়, তবেই আমি আপনাকে ধন্য বলে মনে করব; তোমাদের সকলের আনন্দের মধ্যে আমার নূতন জীবনকে সার্থক বলে জানব।

এইসঙ্গে একটি কথা তোমাদের মনে করতে হবে, যে-লোকের সিংহদ্বারে তোমরা সকলে আত্মীয় বলে আমাকে আজ অভ্যর্থনা করতে এসেছ, এ লোকে তোমাদের জীবনও প্রতিষ্ঠালাভ করেছে, নইলে আমাকে তোমরা আপনার বলে জানতে পারতে

না। এই আশ্রমটি তোমাদের দ্বিজত্বের জন্মস্থান। ঝরনাগুলি যেমন পরস্পরের অপরিচিত নানা সুদূর শিখর থেকে নিঃসৃত হয়ে, একটি বৃহৎ ধারায় সম্মিলিত হয়ে নদী-জন্ম লাভ করে— তোমাদের ছোটো ছোটো জীবনের ধারাগুলি তেমনি কত দূরদূরান্তর গৃহ থেকে বেরিয়ে এসেছে— তারা এই আশ্রমের মধ্যে এসে বিচ্ছিন্নতা পরিহার ক'রে একটি সম্মিলিত প্রশস্ত মঙ্গলের গতি প্রাপ্ত হয়েছে। ঘরের মধ্যে তোমরা কেবল ঘরের ছেলেটি বলে আপনাদের জানতে— সেই জানার সংকীর্ণতা ছিন্ন করে এখানে তোমরা সকলের মধ্যে নিজেকে দেখতে পাচ্ছ— এমনি করে নিজের মহত্তর সত্তাকে এখানে উপলব্ধি করতে আরম্ভ করেছ, এই হচ্ছে তোমাদের নবজন্মের পরিচয়। এই নবজন্মে বংশগৌরব নেই, আত্মাভিমান নেই, রক্তসম্বন্ধের গণ্ডি নেই, আত্মপরের কোনো সংকীর্ণ ব্যবধান নেই ; এখানে তিনিই পিতা হয়ে, প্রভু হয়ে আছেন— য একঃ, যিনি এক,— অবর্ণঃ, যাঁর জাতি নেই,— বর্ণান্ অনেকান্ নিহিতার্থো দধাতি, যিনি অনেক বর্ণের অনেক নিগূঢ়নিহিত প্রয়োজনসকল বিধান করছেন,— বিচৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ, বিশ্বের সমস্ত আরম্ভেও যিনি পরিণামেও যিনি,— স দেবঃ, সেই দেবতা। স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু। তিনি আমাদের সকলকে মঙ্গলবুদ্ধির দ্বারা সংযুক্ত করুন। এই মঙ্গললোকে স্বার্থবুদ্ধি নয়, বিষয়বুদ্ধি নয়, এখানে আমাদের পরস্পরের যে-যোগসম্বন্ধ সে কেবলমাত্র সেই একের বোধে অনুপ্রাণিত মঙ্গলবুদ্ধির দ্বারাই সম্ভব।

২৫ বৈশাখ ১৩১৭

শ্রাবণসন্ধ্যা

আজ শ্রাবণের অশ্রান্ত ধারাবর্ষণে জগতে আর-যত-কিছু কথা আছে, সমস্তকেই ডুবিয়ে ভাসিয়ে দিয়েছে। মাঠের মধ্যে অন্ধকার আজ নিবিড়— এবং যে কখনো একটি কথা কইতে জানে না, সেই মূক আজ কথায় ভরে উঠেছে।

অন্ধকারকে ঠিকমতো তার উপযুক্ত ভাষায় যদি কেউ কথা কওয়াতে পারে, তবে সে এই শ্রাবণের ধারাপতনধ্বনি। অন্ধকারের নিঃশব্দতার উপরে এই ঝর্ ঝর্ কলশব্দ যেন পর্দার উপরে পর্দা টেনে দেয়, তাকে আরো গভীর করে ঘনিয়ে তোলে, বিশ্বজগতের নিদ্রাকে নিবিড় করে আনে। বৃষ্টিপতনের এই অবিরাম শব্দ, এ যেন শব্দের অন্ধকার।

আজ এই কর্মহীন সন্ধ্যাবেলাকার অন্ধকার তার সেই জপের মন্ত্রটিকে খুঁজে

পেয়েছে। বারবার তাকে ধ্বনিত করে তুলছে— শিশু তার নূতনশেখা কথাটিকে নিয়ে যেমন অকারণে অপ্রয়োজনে ফিরে ফিরে উচ্চারণ করতে থাকে সেই-রকম— তার শ্রান্তি নেই, শেষ নেই, তার আর বৈচিত্র্য নেই।

আজ বোবা সন্ধ্যাপ্রকৃতির এই-যে হঠাৎ কণ্ঠ খুলে গিয়েছে এবং আশ্চর্য হয়ে স্তব্ধ হয়ে সে যেন ক্রমাগত নিজের কথা নিজের কানেই শুনছে, আমাদের মনেও এর একটা সাড়া জেগে উঠেছে— সেও কিছু-একটা বলতে চাচ্ছে।— ওই-রকম খুব বড়ো করেই বলতে চায়, ওই-রকম জল স্থল আকাশ একেবারে ভরে দিয়েই বলতে চায়,— কিন্তু সে তো কথা দিয়ে হবার জো নেই, তাই সে একটা সুরকে খুঁজছে। জলের কল্লোলে, বনের মর্মরে, বসন্তের উচ্ছ্বাসে, শরতের আলোকে, বিশাল প্রকৃতির যা-কিছু কথা সে তো স্পষ্ট কথায় নয়— সে কেবল আভাসে ইঙ্গিতে, কেবল ছবিতে গানে। এইজন্যে প্রকৃতি যখন আলাপ করতে থাকে, তখন সে আমাদের মুখের কথাকে নিরস্ত করে দেয়, আমাদের প্রাণের ভিতরে অনির্বচনীয়ের আভাসে ভরা গানকেই জাগিয়ে তোলে।

কথা জিনিসটা মানুষেরই, আর গানটা প্রকৃতির। কথা সুস্পষ্ট এবং বিশেষ প্রয়োজনের দ্বারা সীমাবদ্ধ, আর গান অস্পষ্ট এবং সীমাহীনের ব্যাকুলতায় উৎকণ্ঠিত। সেইজন্যে কথায় মানুষ মনুষ্যলোকের এবং গানে মানুষ বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মেলে। এইজন্যে কথার সঙ্গে মানুষ যখন সুরকে জুড়ে দেয়, তখন সেই কথা আপনার অর্থকে আপনি ছাড়িয়ে গিয়ে ব্যাপ্ত হয়ে যায়— সেই সুরে মানুষের সুখদুঃখকে সমস্ত আকাশের জিনিস করে তোলে, তার বেদনা প্রভাতসন্ধ্যার দিগন্তে আপনার রঙ মিলিয়ে দেয়, জগতের বিরাট অব্যক্তের সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি বৃহৎ অপরূপতা লাভ করে, মানুষের সংসারের প্রাত্যহিক সুপরিচিত সংকীর্ণতার সঙ্গে তার ঐকান্তিক ঐক্য আর থাকে না।

তাই নিজের প্রতিদিনের ভাষার সঙ্গে প্রকৃতির চিরদিনের ভাষাকে মিলিয়ে নেবার জন্যে মানুষের মন প্রথম থেকেই চেষ্টা করছে। প্রকৃতি হতে রঙ এবং রেখা নিয়ে নিজের চিন্তাকে মানুষ ছবি করে তুলছে, প্রকৃতি হতে সুর এবং ছন্দ নিয়ে নিজের ভাবকে মানুষ কাব্য করে তুলছে। এই উপায়ে চিন্তা অচিন্তনীয়ের দিকে ধাবিত হয়, ভাব অভাবনীয়ের মধ্যে এসে প্রবেশ করে। এই উপায়ে মানুষের মনের জিনিসগুলি বিশেষ প্রয়োজনের সংকোচ এবং নিত্যব্যবহারের মলিনতা ঘুচিয়ে দিয়ে চিরন্তনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এমন সরস নবীন এবং মহৎ মূর্তিতে দেখা দেয়।

আজ এই ঘনবর্ষার সন্ধ্যায় প্রকৃতির শ্রাবণ-অন্ধকারের ভাষা আমাদের ভাষার সঙ্গে মিলতে চাচ্ছে। অব্যক্ত আজ ব্যক্তের সঙ্গে লীলা করবে বলে আমাদের দ্বারে এসে

আঘাত করছে। আজ যুক্তি তর্ক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ খাটবে না। আজ গান ছাড়া আর কোনো কথা নেই।

তাই আমি বলছি, আমার কথা আজ থাক্‌। সংসারের কাজকর্মের সীমাকে, মনুষ্যলোকালয়ের বেড়াকে একটুখানি সরিয়ে দাও, আজ এই আকাশভরা শ্রাবণের ধারাবর্ষণকে অবারিত অন্তরের মধ্যে আহ্বান করে নেও।

প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের অন্তরের সম্বন্ধটি বড়ো বিচিত্র। বাহিরে তার কর্মক্ষেত্রে প্রকৃতি এক-রকমের, আবার আমাদের অন্তরের মধ্যে তার আর-এক মূর্তি।

একটা দৃষ্টান্ত দেখো— গাছের ফুল। তাকে দেখতে যতই শৌখিন হ'ক, সে নিতান্তই কাজের দায়ে এসেছে। তার সাজসজ্জা সমস্তই আপিসের সাজ। যেমন করে হ'ক, তাকে ফল ফলাতেই হবে, নইলে তরুবংশ পৃথিবীতে টিঁকবে না, সমস্ত মরুভূমি হয়ে যাবে। এইজন্যেই তার রঙ, এইজন্যেই তার গন্ধ। মৌমাছির পদরেণুপাতে যেমনি তার পুষ্পজন্ম সফলতালাভের উপক্রম করে, অমনি সে আপনার রঙিন পাতা খসিয়ে ফেলে, আপনার মধুগন্ধ নির্মমভাবে বিসর্জন দেয়; তার শৌখিনতার সময়মাত্র নেই, সে অত্যন্ত ব্যস্ত। প্রকৃতির বাহিরবাড়িতে কাজের কথা ছাড়া আর অন্য কথা নেই। সেখানে কুঁড়ি ফুলের দিকে, ফুল ফলের দিকে, ফল বীজের দিকে, বীজ গাছের দিকে হন্‌হন্‌ করে ছুটে চলেছে,— যেখানে একটু বাধা পায় সেখানে আর মাপ নেই, সেখানে কোনো কৈফিয়ৎ কেউ গ্রাহ্য করে না, সেখানেই তার কপালে ছাপ পড়ে যায় 'নামঞ্জুর', তখনি বিনা বিলম্বে খসে ঝরে শুকিয়ে সরে পড়তে হয়। প্রকৃতির প্রকাণ্ড আপিসে অগণ্য বিভাগ, অসংখ্য কাজ। সুকুমার ওই ফুলটিকে যে দেখছ, অত্যন্ত বাবুর মতো গায়ে গন্ধ মেখে রঙিন পোশাক পরে এসেছে, সেও সেখানে রৌদ্রে জলে মজুরি করবার জন্যে এসেছে, তাকে তার প্রতি মুহূর্তের হিসাব দিতে হয়, বিনা কারণে গায়ে হাওয়া লাগিয়ে যে একটু দোলা খাবে এমন এক পলকও তার সময় নেই।

কিন্তু এই ফুলটিই মানুষের অন্তরের মধ্যে যখন প্রবেশ করে, তখন তার কিছুমাত্র তাড়া নেই, তখন সে পরিপূর্ণ অবকাশ মুর্তিমান। এই একই জিনিস বাইরে প্রকৃতির মধ্যে কাজের অবতার, মানুষের অন্তরের মধ্যে শান্তি ও সৌন্দর্যের পুর্ণ প্রকাশ।

তখন বিজ্ঞান আমাদের বলে, 'তুমি ভুল বুঝছ— বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ফুলের একমাত্র উদ্দেশ্য কাজ করা; তার সঙ্গে সৌন্দর্যমাধুর্যের যে-অহেতুক সম্বন্ধ তুমি পাতিয়ে বসেছ, সে তোমার নিজের পাতানো।'

আমাদের হৃদয় উত্তর করে, 'কিছুমাত্র ভুল বুঝি নি। ওই ফুলটি কাজের পরিচয়পত্র নিয়ে প্রকৃতির মধ্যে প্রবেশ করে, আর সৌন্দর্যের পরিচয়পত্র নিয়ে আমার দ্বারে এসে

আঘাত করে— একদিকে আসে বন্দীর মতো, আর-একদিকে আসে মুক্তস্বরূপে— এর একটা পরিচয়ই যে সত্য আর অন্যটা সত্য নয়, এ-কথা কেমন করে মানব। ওই ফুলটি গাছপালার মধ্যে অনবচ্ছিন্ন কার্যকারণসূত্রে ফুটে উঠেছে, এ-কথাটাও সত্য কিন্তু সে তো বাহিরের সত্য,— আর অন্তরের সত্য হচ্ছে, আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে।'

ফুল মধুকরকে বলে, 'তোমার ও আমার প্রয়োজনের ক্ষেত্রে তোমাকে আহ্বান করে আনব বলে আম তোমার জন্যেই সেজেছি'— আবার মানুষের মনকে বলে, 'আনন্দের ক্ষেত্রে তোমাকে আহ্বান করে আনব বলে আমি তোমার জন্যেই সেজেছি।' মধুকর ফুলের কথা সম্পূর্ণ বিশ্বাস ক'রে কিছুমাত্র ঠকে নি, আর মানুষের মনও যখন বিশ্বাস ক'রে তাকে ধরা দেয় তখন দেখতে পায় ফুল তাকে মিথ্যা বলে নি।

ফুল-যে কেবল বনের মধ্যেই কাজ করছে তা নয়— মানুষের মনের মধ্যেও তার যেটুকু কাজ, তা সে বরাবর করে আসছে।

আমাদের কাছে তার কাজটা কী। প্রকৃতির দরজায় যে-ফুলকে যথাঋতুতে যথা-সময়ে মজুরের মতো হাজরি দিতে হয়, আমাদের হৃদয়ের দ্বারে সে রাজদূতের মতো উপস্থিত হয়ে থাকে।

সীতা যখন রাবণের ঘরে একা বসে কাঁদছিলেন তখন একদিন যে-দূত তাঁর কাছে এসে উপস্থিত হয়েছিল, সে রামচন্দ্রের আংটি সঙ্গে করে এনেছিল; এই আংটি দেখেই সীতা তখনি বুঝতে পেরেছিলেন, এই দূতই তাঁর প্রিয়তমের কাছ থেকে এসেছে,— তখনি তিনি বুঝলেন, রামচন্দ্র তাঁকে ভোলেন নি, তাঁকে উদ্ধার করে নেবেন বলেই তাঁর কাছে এসেছেন।

ফুলও আমাদের কাছে সেই প্রিয়তমের দূত হয়ে আসে। সংসারের সোনার লঙ্কায় রাজভোগের মধ্যে আমরা নির্বাসিত হয়ে আছি, রাক্ষস আমাদের কেবলি বলছে, 'আমিই তোমার পতি, আমাকেই ভজনা করো।'

কিন্তু সংসারের পারের খবর নিয়ে আসে ওই ফুল। সে চুপিচুপি আমাদের কানে কানে এসে বলে, 'আমি এসেছি, আমাকে তিনি পাঠিয়েছেন। আমি সেই সুন্দরের দূত, আমি সেই আনন্দময়ের খবর নিয়ে এসেছি। এই বিচ্ছিন্নতার দ্বীপের সঙ্গে তাঁর সেতু বাঁধা হয়ে গেছে, তিনি তোমাকে একমুহূর্তের জন্যে ভোলেন নি, তিনি তোমাকে উদ্ধার করবেন। তিনি তোমাকে টেনে নিয়ে আপন করে নেবেন। মোহ তোমাকে এমন করে চিরদিন বেঁধে রাখতে পারবে না।'

যদি তখন আমরা জেগে থাকি তো তাকে বলি, 'তুমি যে তাঁর দূত তা আমরা

জানব কী করে।' সে বলে, 'এই দেখো আমি সেই সুন্দরের আংটি নিয়ে এসেছি। এর কেমন রঙ, এর কেমন শোভা।'

তাই তো বটে। এ-যে তাঁরি আংটি, মিলনের আংটি। আর-সমস্ত ভুলিয়ে তখনি সেই আনন্দময়ের আনন্দস্পর্শ আমাদের চিত্তকে ব্যাকুল করে তোলে। তখনি আমরা বুঝিতে পারি, এই সোনার লঙ্কাপুরীই আমার সব নয়— এর বাইরে আমার মুক্তি আছে— সেইখানে আমার প্রেমের সাফল্য, আমার জীবনের চরিতার্থতা।

প্রকৃতির মধ্যে মধুকরের কাছে যা কেবলমাত্র রঙ, কেবলমাত্র গন্ধ, কেবলমাত্র ক্ষুধানিবৃত্তির পথ চেনবার উপায়চিহ্ন, মানুষের হৃদয়ের কাছে তাই সৌন্দর্য, তাই বিনা-প্রয়োজনের আনন্দ। মানুষের মনের মধ্যে সে রঙিন কালিতে লেখা প্রেমের চিঠি নিয়ে আসে।

তাই বলছিলুম, বাইরে প্রকৃতি যতই ভয়ানক ব্যস্ত, যতই একান্ত কেজো হ'ক-না, আমাদের হৃদয়ের মধ্যে তার একটি বিনা কাজের যাতায়াত আছে। সেখানে তার কামারশালার আগুন আমাদের উৎসবের দীপমালা হয়ে দেখা দেয়, তার কারখানা-ঘরের কলশব্দ সংগীত হয়ে ধ্বনিত হয়। বাইরে প্রকৃতির কার্যকারণের লোহার শৃঙ্খল ঝম্ ঝম্ করে, অন্তরে তার আনন্দের অহেতুকতা সোনার তারে বীণাধ্বনি বাজিয়ে তোলে।

আমার কাছে এইটেই বড়ো আশ্চর্য ঠেকে— একই কালে প্রকৃতির এই দুই চেহারা, বন্ধনের এবং মুক্তির— একই রূপ-রস-শব্দ-গন্ধের মধ্যে এই দুই সুর, প্রয়োজনের এবং আনন্দের— বাহিরের দিকে তার চঞ্চলতা, অন্তরের দিকে তার শান্তি— একই সময়ে একদিকে তার কর্ম, আর-একদিকে তার ছুটি; বাইরের দিকে তার তট, অন্তরের দিকে তার সমুদ্র।

এই-যে এই মুহূর্তেই শ্রাবণের ধারাপতনে সন্ধ্যার আকাশ মুখরিত হয়ে উঠেছে, এ আমাদের কাছে তার সমস্ত কাজের কথা গোপন করে গেছে। প্রত্যেক ঘাসটির এবং গাছের প্রত্যেক পাতাটির অন্নপানের ব্যবস্থা করে দেবার জন্য সে যে অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে আছে, এই অন্ধকারসভায় আমাদের কাছে এ-কথাটির কোনো আভাসমাত্র সে দিচ্ছে না। আমাদের অন্তরের সন্ধ্যাকাশেও এই শ্রাবণ অত্যন্ত ঘন হয়ে নেমেছে কিন্তু সেখানে তার আপিসের বেশ নেই, সেখানে কেবল গানের আসর জমাতে, কেবল লীলার আয়োজন করতে তার আগমন। সেখানে সে কবির দরবারে উপস্থিত। তাই ক্ষণে ক্ষণে মেঘমল্লারের সুরে কেবলি করুণ গান জেগে উঠছে—

তিমির দিগভরি ঘোর যামিনী,
অথির বিজুরিক পাঁতিয়া।
বিদ্যাপতি কহে, কৈসে গোঙায়বি
হরি বিনে দিনরাতিয়া।

প্রহরের পর প্রহর ধরে এই বার্তাই সে জানাচ্ছে, 'ওরে, তুই-যে বিরহিণী— তুই বেঁচে আছিস কী করে, তোর দিনরাত্রি কেমন করে কাটছে।'

সেই চিরদিনরাত্রির হরিকেই চাই, নইলে দিনরাত্রি অনাথ। সমস্ত আকাশকে কাঁদিয়ে তুলে এই কথাটা আজ আর নিঃশেষ হতে চাচ্ছে না।

আমরা যে তাঁরি বিরহে এমন করে কাটাচ্ছি, এ খবরটা আমাদের নিতান্তই জানা চাই। কেননা বিরহ মিলনেরই অঙ্গ। ধোঁয়া যেমন আগুন জ্বলার আরম্ভ, বিরহও তেমনি মিলনের আরম্ভ-উচ্ছ্বাস।

খবর আমাদের দেয় কে। ওই-যে তোমার বিজ্ঞান যাদের মনে করছে, তারা প্রকৃতির কারাগারের কয়েদী, তারা পায়ে শিকল দিয়ে একজনের সঙ্গে আর-একজন বাঁধা থেকে দিনরাত্রি কেবল বোবার মতো কাজ করে যাচ্ছে— তারাই। যেই তাদের শিকলের শব্দ আমাদের হৃদয়ের ভিতরে গিয়ে প্রবেশ করে অমনি দেখতে পাই, এ-যে বিরহের বেদনাগান, এ-যে মিলনের আহ্বানসংগীত। যে-সব খবরকে কোনো ভাষা দিয়ে বলা যায় না, সে-সব খবরকে এরাই তো চুপি চুপি বলে যায়— এবং মানুষ কবি সেই-সব খবরকেই গানের মধ্যে কতকটা কথায়, কতকটা সুরে, বেঁধে গাইতে থাকে :

ভরা বাদর, মাহ ভাদর,
শূন্য মন্দির মোর।

আজ কেবলি মনে হচ্ছে এই-যে বর্ষা, এ তো এক সন্ধ্যার বর্ষা নয়, এ যেন আমার সমস্ত জীবনের অবিরল শ্রাবণধারা। যতদূর চেয়ে দেখি, আমার সমস্ত জীবনের উপরে সঙ্গিহীন বিরহসন্ধ্যার নিবিড় অন্ধকার— তারি দিগ্‌দিগন্তরকে ঘিরে অশ্রান্ত শ্রাবণের বর্ষণে প্রহরের পর প্রহর কেটে যাচ্ছে; আমার সমস্ত আকাশ ঝর্ ঝর্ করে বলছে, 'কৈসে গোঙায়বি হরি বিনে দিনরাতিয়া।' কিন্তু তবু এই বেদনা, এই রোদন, এই বিরহ একেবারে শূন্য নয়;— এই অন্ধকারের, এই শ্রাবণের বুকের মধ্যে একটি নিবিড় রস অত্যন্ত গোপনে ভরা রয়েছে; একটি কোন্ বিকশিত বনের সজল গন্ধ আসছে, এমন একটি অনির্বচনীয় মাধুর্য— যা যখনি প্রাণকে ব্যথায় কাঁদিয়ে তুলছে, তখনি সেই বিদীর্ণ ব্যথার ভিতর থেকে অশ্রুসিক্ত আনন্দকে টেনে বের করে নিয়ে আসছে।

বিরহসন্ধ্যার অন্ধকারকে যদি শুধু এই বলে কাঁদতে হত যে, 'কেমন করে তোর দিনরাত্রি কাটবে', তা হলে সমস্ত রস শুকিয়ে যেত এবং আশার অঙ্কুর পর্যন্ত বাঁচত না;— কিন্তু শুধু কেমন করে কাটবে নয় তো, কেমন করে কাটবে **হরি বিনে** দিনরাতিয়া— সেইজন্যে ঐ 'হরি বিনে' কথাটাকে ঘিরে ঘিরে এত অবিরল অজস্র বর্ষণ। চিরদিনরাত্রি যাকে নিয়ে কেটে যাবে, এমন একটি চিরজীবনের ধন কেউ আছে —তাকে না পেয়েছি নাই পেয়েছি, তবু সে আছে, সে আছে— বিরহের সমস্ত বক্ষ ভরে দিয়ে সে আছে— সেই **হরি বিনে** কৈসে গোঙায়বি দিনরাতিয়া। এই জীবনব্যাপী বিরহের যেখানে আরম্ভ সেখানে যিনি, যেখানে অবসান সেখানে যিনি, এবং তারি মাঝখানে গভীরভাবে প্রচ্ছন্ন থেকে যিনি করুণ সুরের বাঁশি বাজাচ্ছেন, সেই **হরি বিনে** কৈসে গোঙায়বি দিনরাতিয়া।

দ্বিধা

দুইকে নিয়ে মানুষের কারবার। সে প্রকৃতির, আবার সে প্রকৃতির উপরের। একদিকে সে কায়া দিয়ে বেষ্টিত, আর-একদিকে সে কায়ার চেয়ে অনেক বেশি।

মানুষকে একই সঙ্গে দুটি ক্ষেত্রে বিচরণ করতে হয়। সেই দুটির মধ্যে এমন বৈপরীত্য আছে যে, তারি সামঞ্জস্যসংঘটনের দুরূহ সাধনায় মানুষকে চিরজীবন নিযুক্ত থাকতে হয়। সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি, ধর্মনীতির ভিতর দিয়ে মানুষের উন্নতির ইতিহাস হচ্ছে এই সামঞ্জস্যসাধনেরই ইতিহাস। যত-কিছু অনুষ্ঠানপ্রতিষ্ঠান শিক্ষা-দীক্ষা সাহিত্যশিল্প সমস্তই হচ্ছে মানুষের দ্বন্দ্বসমন্বয়চেষ্টার বিচিত্র ফল।

দ্বন্দ্বের মধ্যেই যত দুঃখ, এবং এই দুঃখই হচ্ছে উন্নতির মূলে। জন্তুদের ভাগ্যে পাকস্থলীর সঙ্গে তার খাবার জিনিসের বিচ্ছেদ ঘটে গেছে— এই দুটোকে এক করবার জন্যে বহু দুঃখে তার বুদ্ধিকে শক্তিকে সর্বদাই জাগিয়ে রেখেছে; গাছ নিজের খাবারের মধ্যেই দাঁড়িয়ে থাকে— ক্ষুধার সঙ্গে আহারের সামঞ্জস্যসাধনের জন্যে তাকে নিরন্তর দুঃখ পেতে হয় না। জন্তুদের মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষের বিচ্ছেদ ঘটে গেছে— এই বিচ্ছেদের সামঞ্জস্যসাধনের দুঃখ থেকে কত বীরত্ব ও কত সৌন্দর্যের সৃষ্টি হচ্ছে তার আর সীমা নেই; উদ্ভিদরাজ্যে যেখানে স্ত্রীপুরুষের ভেদ নেই অথবা যেখানে তার মিলনসাধনের জন্যে বাইরের উপায় কাজ করে, সেখানে কোনো দুঃখ নেই, সমস্ত সহজ।

মনুষ্যত্বের মূলে আর-একটি প্রকাণ্ড দ্বন্দ্ব আছে; তাকে বলা যেতে পারে প্রকৃতি

এবং আত্মার দ্বন্দ্ব। স্বার্থের দিক এবং পরমার্থের দিক, বন্ধনের দিক এবং মুক্তির দিক, সীমার দিক এবং অনন্তের দিক— এই দুইকে মিলিয়ে চলতে হবে মানুষকে।

যতদিন ভালো করে মেলাতে না পারা যায় ততদিনকার যে চেষ্টার দুঃখ, উত্থানপতনের দুঃখ, সে বড়ো বিষম দুঃখ। যে-ধর্মের মধ্যে মানুষের এই দ্বন্দ্বের সামঞ্জস্য ঘটতে পারে, সেই ধর্মের পথ মানুষের পক্ষে কত কঠিন পথ। এই ক্ষুরধারশাণিত দুর্গম পথেই মানুষের যাত্রা ;— এ-কথা তার বলবার জো নেই যে, 'এই দুঃখ আমি এড়িয়ে চলব।' এই দুঃখকে যে স্বীকার না করে তাকে দুর্গতির মধ্যে নেমে যেতে হয় ;— সেই দুর্গতি যে কী নিদারুণ, পশুরা তা কল্পনাও করতে পারে না। কেননা, পশুদের মধ্যে এই দ্বন্দ্বের দুঃখ নেই— তারা কেবলমাত্র পশু। তারা কেবলমাত্র শরীরধারণ এবং বংশবৃদ্ধি করে চলবে, এতে তাদের কোনো ধিক্কার নেই। তাই তাদের পশুজন্ম একেবারে নিঃসংকোচ।

মানবজন্মের মধ্যে পদে পদে সংকোচ। শিশুকাল থেকেই মানুষকে কত লজ্জা, কত পরিতাপ, কত আবরণ-আড়ালের মধ্যে দিয়েই চলতে হয়— তার আহার বিহার তার নিজের মধ্যেই কত বাধাগ্রস্ত— নিতান্ত স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলিকেও সম্পূর্ণ স্বীকার করা তার পক্ষে কত কঠিন, এমন কি, নিজের নিত্যসহচর শরীরকেও মানুষ লজ্জায় আচ্ছন্ন করে রাখে।

কারণ, মানুষ-যে পশু এবং মানুষ দুইই। একদিকে সে আপনার, আর-একদিকে সে বিশ্বের। একদিকে তার সুখ, আর-একদিকে তার মঙ্গল। সুখভোগের মধ্যে মানুষের সম্পূর্ণ অর্থ পাওয়া যায় না। গর্ভের মধ্যে ভ্রূণ আরামে থাকে এবং সেখানে তার কোনো অভাব থাকে না কিন্তু সেখানে তার সম্পূর্ণ তাৎপর্য পাওয়া যায় না। সেখানে তার হাত পা চোখ কান মুখ সমস্তই নিরর্থক। যদি জানতে পারি যে এই ভ্রূণ একদিন ভূমিষ্ঠ হবে, তা হলেই বুঝতে পারি, এ-সমস্ত ইন্দ্রিয় ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তার কেন আছে। এই-সকল আপাত-অনর্থক অঙ্গ হতেই অনুমান করা যায়, অন্ধকারবাসই এর চরম নয়, আলোকেই এর সমাপ্তি,— বন্ধন এর পক্ষে ক্ষণকালীন এবং মুক্তিই এর পরিণাম। তেমনি মনুষ্যত্বের মধ্যে এমন কতকগুলি লক্ষণ আছে কেবলমাত্র স্বার্থের মধ্যে, সুখভোগের মধ্যে যার পরিপূর্ণ অর্থই পাওয়া যায় না— উন্মুক্ত মঙ্গললোকেই যদি তার পরিণাম না হয়, তবে সেই সমস্ত স্বার্থবিরোধী প্রবৃত্তির কোনো অর্থই থাকে না। যে-সমস্ত প্রবৃত্তি মানুষকে নিজের দিক থেকে দুর্নিবারবেগে অন্যের দিকে নিয়ে যায়, সংগ্রহের দিক থেকে ত্যাগের দিকে নিয়ে যায়, এমন-কি, জীবনে আসক্তির দিক থেকে মৃত্যুকে বরণের দিকে নিয়ে যায়— যা মানুষকে বিনা প্রয়োজনে বৃহত্তর

জ্ঞান ও মহত্তর চেষ্টার দিকে অর্থাৎ ভূমার দিকে আকর্ষণ করে, যা মানুষকে বিনা কারণেই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে দুঃখকে স্বীকার করতে, সুখকে বিসর্জন করতে প্রবৃত্ত করে —তাতেই কেবল জানিয়ে দিতে থাকে, সুখে স্বার্থে মানুষের স্থিতি নেই— তার থেকে নিষ্ক্রান্ত হবার জন্যে মানুষকে বন্ধনের পর বন্ধন ছেদন করতে হবে— মঙ্গলের সম্বন্ধে বিশ্বের সঙ্গে যোগযুক্ত হয়ে মানুষকে মুক্তিলাভ করতে হবে।

এই স্বার্থের আবরণ থেকে নিষ্ক্রান্ত হওয়াই হচ্ছে স্বার্থ ও পরমার্থের সামঞ্জস্যসাধন। কারণ, স্বার্থের মধ্যে আবৃত থাকলেই তাকে সত্যরূপে পাওয়া যায় না। স্বার্থ থেকে যখন আমরা বহির্গত হই, তখনি আমরা পরিপূর্ণরূপে স্বার্থকে লাভ করি। তখনি আমরা আপনাকে পাই বলেই অন্য-সমস্তকেই পাই। গর্ভের শিশু নিজেকে জানে না বলেই তার মাকে জানে না— যখনি মাতার মধ্য হতে মুক্ত হয়ে সে নিজেকে জানে, তখনি সে মাকে জানে।

সেইজন্যে যতক্ষণ স্বার্থের নাড়ীর বন্ধন ছিন্ন করে মানুষ এই মঙ্গললোকের মধ্যে জন্মলাভ না করে, ততক্ষণ তার বেদনার অন্ত নেই। কারণ, যেখানে তার চরম স্থিতি নয়, যেখানে সে অসম্পূর্ণ, সেখানেই চিরদিন স্থিতির চেষ্টা করতে গেলেই তাকে কেবলি টানাটানির মধ্যে থাকতে হবে। সেখানে সে যা গড়ে তুলবে তা ভেঙে পড়বে, যা সংগ্রহ করবে তা হারাবে এবং যাকে সে সকলের চেয়ে লোভনীয় বলে কামনা করবে তাই তাকে আবদ্ধ করে ফেলবে।

তখন কেবল আঘাত, কেবল আঘাত। তখন পিতার কাছে আমাদের কামনা এই— মা মা হিংসীঃ— আমাকে আঘাত কোরো না, আমাকে আর আঘাত কোরো না। আমি এমন করে কেবলি দ্বিধার মধ্যে আর বাঁচি নে।

কিন্তু এ পিতারই হাতের আঘাত— এ মঙ্গললোকের আকর্ষণেরই বেদনা। নইলে পাপে দুঃখ থাকত না— পাপ বলেই কোনো পদার্থ থাকত না, মানুষ পশুদের মতো অপাপ হয়ে থাকত। কিন্তু, মানুষকে মানুষ হতে হবে বলেই এই দ্বন্দ্ব, এই বিদ্রোহ, বিরোধ, এই পাপ, এই পাপের বেদনা।

তাই-জন্যে মানুষ ছাড়া এ প্রার্থনা কেউ কোনোদিন করতে পারে না— বিশ্বানি দেব সবিতর্দুরিতানি পরাসুব— হে দেব, হে পিতা, আমার সমস্ত পাপ দূর করে দাও। এ ক্ষুধামোচনের প্রার্থনা নয়, এ প্রয়োজনসাধনের প্রার্থনা নয়— মানুষের প্রার্থনা হচ্ছে, ‘আমাকে পাপ হতে মুক্ত করো। তা না করলে আমার দ্বিধা ঘুচবে না— পূর্ণতার মধ্যে আমি ভূমিষ্ঠ হতে পারছি নে— হে অপাপবিদ্ধ নির্মল পুরুষ, তুমিই যে আমার পিতা, এই বোধ আমার সম্পূর্ণ হতে পারছে না— তোমাকে সত্যভাবে নমস্কার করতে পারছি নে।’

যদ্ভদ্রং তন্ন আসুব— যা ভালো তাই আমাদের দাও। মানুষের পক্ষে এ প্রার্থনা অত্যন্ত কঠিন প্রার্থনা। কেননা মানুষ যে দ্বন্দ্বের জীব— ভালো যে মানুষের পক্ষে সহজ নয়। তাই, যদ্ভদ্রং তন্ন আসুব, এ আমাদের ত্যাগের প্রার্থনা, দুঃখের প্রার্থনা— নাড়ীছেদনের প্রার্থনা। পিতার কাছে এই কঠোর প্রার্থনা মানুষ ছাড়া আর-কেউ করতে পারে না।

পিতানোঽসি, পিতা নো বোধি, নমস্তেঽস্তু— যজুর্বেদের এই মন্ত্রটি নমস্কারের প্রার্থনা। তুমি আমাদের পিতা, তোমাকে আমাদের পিতা ব'লে যেন বুঝি এবং তোমাতে আমাদের নমস্কার যেন সত্য হয়।

অর্থাৎ আমার দিকেই সমস্ত টানবার যে একটা প্রবৃত্তি আছে, সেটাকে নিরস্ত করে দিয়ে তোমার দিকেই সমস্ত যেন নত করে সমর্পণ করে দিতে পারি। তা হলেই যে দ্বন্দ্বের অবসান হয়ে যায়— আমার যেখানে সার্থকতা সেইখানেই পৌছতে পারি। সেখানে যে পৌচেছি সে কেবল তোমাকে নমস্কারের দ্বারাই চেনা যায়;— সেখানে কোনো অহংকার টিঁকতেই পারে না— ধনী সেখানে দরিদ্রের সঙ্গে তোমার পায়ের কাছে এসে মেলে, তত্ত্বজ্ঞানী সেখানে মূঢ়ের সঙ্গেই তোমার পায়ের কাছে এসে নত হয়;— মানুষের দ্বন্দ্বের যেখানে অবসান সেখানে তোমাকে পরিপূর্ণ নমস্কার, অহংকারের একান্ত বিসর্জন।

এই নমস্কারটি কেমন নমস্কার?—

নমঃ শম্ভবায় চ ময়োভবায় চ,
নমঃ শঙ্করায় চ ময়স্করায় চ,
নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ।

যিনি সুখকর তাঁকেও নমস্কার, যিনি মঙ্গলকর তাঁকেও নমস্কার; যিনি সুখের আকর তাঁকেও নমস্কার, যিনি মঙ্গলের আকর তাঁকেও নমস্কার; যিনি মঙ্গল তাঁকে নমস্কার, যিনি চরমমঙ্গল তাঁকে নমস্কার।

সংসারে পিতা ও মাতার ভেদ আছে কিন্তু বেদের মন্ত্রে যাঁকে পিতা ব'লে নমস্কার করছে, তাঁর মধ্যে পিতা ও মাতা দুইই এক হয়ে আছে। তাই তাঁকে কেবল পিতা বলেছে। সংস্কৃতসাহিত্যে দেখা গেছে, পিতরৌ বলতে পিতা ও মাতা উভয়কেই একত্রে বুঝিয়েছে।

মাতা পুত্রকে একান্ত করে দেখেন— তাঁর পুত্র তাঁর কাছে আর-সমস্তকে অতিক্রম করে থাকে। এইজন্যে তাকে দেখাশোনা, তাকে খাওয়ানো পরানো সাজানো নাচানো, তাকে সুখী করানোতেই মা মুখ্যভাবে নিযুক্ত থাকেন। গর্ভে সে যেমন

তাঁর নিজের মধ্যে একমাত্ররূপে পরিবেষ্টিত হয়ে ছিল, বাইরেও তিনি যেন তার জন্যে একটি বৃহত্তর গর্ভবাস তৈরি করে তুলে পুত্রের পুষ্টি ও তুষ্টির জন্যে সর্বপ্রকার আয়োজন করে থাকেন। মাতার এই একান্ত স্নেহে পুত্র স্বতন্ত্রভাবে নিজের একটি বিশেষ মূল্য যেন অনুভব করে।

কিন্তু পিতা পুত্রকে কেবলমাত্র তাঁর ঘরের ছেলে করে তাকে একটি সংকীর্ণ পরিধির কেন্দ্রস্থলে একমাত্র করে গড়ে তোলেন না। তাকে তিনি সকলের সামগ্রী, তাকে সমাজের মানুষ করে তোলবার জন্যেই চেষ্টা করেন। এইজন্যে তাকে সুখী করে তিনি স্থির থাকেন না, তাকে দুঃখ দিতে হয়। সে যদি একমাত্র হত, নিজেতেই নিজে সম্পূর্ণ হত, তা হলে সে যা চায় তাই তাকে দিলে ক্ষতি হত না; কিন্তু তাকে সকলের সঙ্গে মিলনের যোগ্য করতে হলে তাকে তার অনেক কামনার সামগ্রী থেকে বঞ্চিত করতে হয়— তাকে অনেক কাঁদাতে হয়। ছোটো হয়ে না থেকে বড়ো হয়ে ওঠবার যে-দুঃখ তা তাকে না দিলে চলে না। বড়ো হয়ে সকলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তবেই সে-যে সত্য হবে— তার সমস্ত শরীর ও মন, জ্ঞান, ভাব ও শক্তি সমগ্রভাবে সার্থক হবে এবং সেই সার্থকতাতেই সে যথার্থ মুক্তিলাভ করবে— এই কথা বুঝে কঠোর শিক্ষার ভিতর দিয়ে পুত্রকে মানুষ করে তোলাই পিতার কর্তব্য হয়ে ওঠে।

ঈশ্বরের মধ্যে এই মাতা পিতা এক হয়ে আছে। তাই দেখতে পাই, আমি সুখী হব বলে জগতে আয়োজনের অন্ত নেই। আকাশের নীলিমা এবং পৃথিবীর শ্যামলতায় আমাদের চোখ জুড়িয়ে যায়— যদি নাও যেত তবু এই জগতে আমাদের বাস অসম্ভব হত না। ফলে শস্যে আমাদের রসনার তৃপ্তি হয়— যদি নাও হত তবু প্রাণের দায়ে আমাদের পেট ভরাতেই হত। জীবনধারণে কেবল-যে আমাদের বা প্রকৃতির প্রয়োজন তা নয়, তাতে আমাদের আনন্দ; শরীরচালনা করতে আমাদের আনন্দ, চিন্তা করতে আমাদের আনন্দ, কাজ করতে আমাদের আনন্দ, প্রকাশ করতে আমাদের আনন্দ। আমাদের সমস্ত প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গে সৌন্দর্য এবং রসের যোগ আছে।

তাই দেখতে পাই, বিশ্বচেষ্টার বিচিত্র ব্যাপারের মধ্যে এ চেষ্টাও নিয়ত রয়েছে যে, জগৎ চলবে, জীবন চলবে এবং সেইসঙ্গে আমি পদে পদে খুশী হতে থাকব। নক্ষত্রলোকের যে-সমস্ত প্রয়োজন তা যতই প্রকাণ্ড প্রভূত ও আমার জীবনের পক্ষে যতই সুদূরবর্তী হ'ক-না কেন, তবুও নিশীথের আকাশে আমার কাছে মনোহর হয়ে ওঠাও তার একটা কাজ। সেইজন্য অতবড়ো অচিন্তনীয় বিরাট কাণ্ডও প্রয়োজন-বিহীন গৃহসজ্জার মতো হয়ে উঠে আমাদের ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ আকাশমণ্ডপটিকে চুমকির কাজে খচিত করে তুলেছে।

এমনি পদে পদে দেখতে পাচ্ছি, জগতের রাজা আমাকে খুশী করবার জন্য তাঁর বহুলক্ষ যোজনান্তরেরও অনুচরপরিচরদের হুকুম দিয়ে রেখেছেন ; তাদের সকল কাজের মধ্যে এটাও তারা ভুলতে পারে না। এ জগতে আমার মূল্য সামান্য নয়।

কিন্তু সুখের আয়োজনের মধ্যেই যখন নিঃশেষে প্রবেশ করতে চাই, তখন আবার কে আমাদের হাত চেপে ধরে, বলে যে, 'তোমাকে বদ্ধ হতে দেব না। এই-সমস্ত সুখের সামগ্রীর মধ্যে ত্যাগী হয়ে, মুক্ত হয়ে তোমাকে থাকতে হবে, তবেই এই আয়োজন সার্থক হবে। শিশু যেমন গর্ভ থেকে মুক্ত হয়ে তবেই যথার্থভাবে সম্পূর্ণভাবে সচেতনভাবে তার মাকে পায়, তেমনি এই-সমস্ত সুখের বন্ধন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যখন মঙ্গললোকে মুক্তিলোকে ভূমিষ্ঠ হবে, তখনি সমস্তকে পরিপূর্ণরূপে পাবে। যখনি আসক্তির পথে যাবে তখনি সমগ্রকে হারাবার পথেই যাবে— বস্তুকে যখনি চোখের উপরে টেনে আনবে, তখনি তাকে আর দেখতে পাবে না, তখনি চোখ অন্ধ হয়ে যাবে।

আমাদের পিতা সুখের মধ্যে আমাদের বদ্ধ হতে দেন না, কেননা সমগ্রের সঙ্গে আমাকে যুক্ত হতে হবে— এবং সেই যোগের মধ্য দিয়েই তাঁর সঙ্গে আমার সত্য যোগ।

এই সমগ্রের সঙ্গে যাতে আমাদের যোগসাধন করে তাকেই বলে মঙ্গল। এই মঙ্গলবোধই মানুষকে কিছুতেই সুখের মধ্যে স্থির থাকতে দিচ্ছে না— এই মঙ্গলবোধই পাপের বেদনায় মানুষকে এই কান্না কাঁদাচ্ছে— মা মা হিংসীঃ, বিশ্বানি দেব সবিতর্-দুরিতানি পরাসুব, যদ্‌ভদ্রং তন্ন আসুব। সমস্ত খাওয়াপরার কান্না ছাড়িয়ে এই কান্না উঠেছে, 'আমাকে দ্বন্দ্বের মধ্যে রেখে আর আঘাত কোরো না, আমাকে পাপ থেকে মুক্ত করো ; আমাকে সম্পূর্ণ তোমার মধ্যে আনন্দে নত করে দাও।'

তাই মানুষ এই বলে নমস্কারের সাধনা করছে, নমঃ শম্ভবায় চ ময়োভবায় চ— সেই সুখকর যে তাঁকেও নমস্কার, আর সেই কল্যাণকর যে তাঁকেও নমস্কার— একবার মাতারূপে তাঁকে নমস্কার, একবার পিতারূপে তাঁকে নমস্কার। মানবজীবনের দ্বন্দ্বের দোলার মধ্যে চড়ে যেদিকেই হেলি সেইদিকে তাঁকেই নমস্কার করতে শিখতে হবে। তাই বলি, নমঃ শঙ্করায় চ ময়স্করায় চ— সুখের আকর যিনি তাঁকেও নমস্কার, মঙ্গলের আকর যিনি তাঁকেও নমস্কার— মাতা যিনি সীমার মধ্যে বেঁধে ধারণ করছেন, পালন করছেন, তাঁকেও নমস্কার, আর পিতা যিনি বন্ধন ছেদন করে অসীমের মধ্যে আমাদের পদে পদে অগ্রসর করছেন, তাঁকেও নমস্কার। অবশেষে দ্বিধা অবসান হয় যখন সব নমস্কার একে এসে মেলে— তখন নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ— তখন সুখে মঙ্গলে আর ভেদ

নেই, বিরোধ নেই— তখন শিব, শিব, শিব, তখন শিব এবং শিবতর— তখন পিতা এবং মাতা একই— তখন একমাত্র পিতা ;—এবং দ্বিধাবিহীন নিস্তব্ধ প্রশান্ত মানবজীবনের একটিমাত্র চরম নমস্কার—

নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ ।

নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখার মতো ঊর্ধ্বগামী একাগ্র এই নমস্কার, অনুত্তরঙ্গ মহাসমুদ্রের মতো দশদিগন্তব্যাপী বিপুল এই নমস্কার—

নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ ।

১২

পূর্ণ

আমাদের এই আশ্রমবাসী আমার একজন তরুণ বন্ধু এসে বললেন, 'আজ আমার জন্মদিন ; আজ আমি আঠারো পেরিয়ে উনিশ বছরে পড়েছি।'

তাঁর সেই যৌবনকালের আরম্ভ, আর আমার এই প্রৌঢ়বয়সের প্রান্ত— এই দুই সীমার মাঝখানকার কালটিকে কত দীর্ঘ বলেই মনে হয়। আমি আজ যেখানে দাঁড়িয়ে তাঁর এই উনিশ বছরকে দেখছি, গণনা ও পরিমাপ করতে গেলে সে কত দূরে। তাঁর এবং আমার বয়সের মাঝখানে কত আবাদ, কত ফসল ফলা, কত ফসল কাটা, কত ফসল নষ্ট হওয়া, কত সুভিক্ষ এবং কত দুর্ভিক্ষ প্রতীক্ষা করে রয়েছে তার ঠিকানা নেই।

যে-ছাত্র তার কলেজ-শিক্ষার প্রায় শেষ সীমায় এসে পৌচেছে, সে যখন শিশুশিক্ষা এবং ধারাপাত হাতে কোনো ছেলেকে পাঠশালায় যেতে দেখে, তখন তাকে মনে-মনে কৃপাপাত্রই বলে জ্ঞান করে। কেননা কলেজের ছাত্র এ-কথা নিশ্চয় জানে যে, ওই ছেলে শিক্ষার যে আরম্ভভাগে আছে সেখানে পূর্ণতার এতই অভাব যে, সেই শিশুশিক্ষা-ধারাপাতের মধ্যে সে রসের লেশমাত্র পায় না— অনেক দুঃখ ক্লেশ তাড়নার কাঁটাপথ ভেঙে তবে সে এমন জায়গায় এসে পৌছবে যেখানে তার জ্ঞান নিজের জ্ঞাতব্য বিষয়ের মধ্যে আপনাকে আপনি উপলব্ধি করতে করতে আনন্দিত হতে থাকবে।

কিন্তু মানুষের জীবন ব'লে যে-শিক্ষালয়টি আছে তার আশ্চর্য রহস্য এই যে, এখানকার পাঠশালার ছোটো ছেলেকেও এখানকার এম. এ. ক্লাসের প্রবীণ ছাত্র কৃপাপাত্র বলে মনে করতে পারে না।

তাই আমার পরিণত বয়সের সমস্ত অভিজ্ঞতা ও চিত্তবিস্তার সত্ত্বেও আমি আমার উনিশ বছরের বন্ধুটিকে তাঁর তারুণ্য নিয়ে অবজ্ঞা করতে পারি নে। বস্তুত তাঁর এই বয়সে যত অভাব ও অপরিণতি আছে, তারাই সব চেয়ে বড়ো হয়ে আমার চোখে পড়ছে না ; এই বয়সের মধ্যে যে একটি সম্পূর্ণতা ও সৌন্দর্য আছে, সেইটেই আমার কাছে আজ উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিচ্ছে।

মানুষের কাজের সঙ্গে ঈশ্বরের কাজের এইখানে একটি প্রভেদ আছে। মানুষের ভারাবাঁধা অসমাপ্ত ইমারত সমাপ্ত ইমারতের কাছে লজ্জিত হয়ে থাকে। কিন্তু ঈশ্বরের চারাগাছটি প্রবীণ বনস্পতির কাছেও দৈন্য প্রকাশ করে না। সেও সম্পূর্ণ,

সেও সুন্দর। সে যদি চারা অবস্থাতেই মারা যায়, তবু তার কোথাও অসমাপ্তি ধরা পড়ে না। ঈশ্বরের কাজে কেবল যে অন্তেই সম্পূর্ণতা তা নয়, তার সোপানে সোপানেই সম্পূর্ণতা।

একদিন তো শিশু ছিলুম, সেদিনের কথা তো ভুলি নি। তখন জীবনের আয়োজন অতি যৎসামান্য ছিল। তখন শরীরের শক্তি, বুদ্ধি ও কল্পনা যেমন অল্প ছিল, তেমনি জীবনের ক্ষেত্র এবং উপকরণও নিতান্ত সংকীর্ণ ছিল। ঘরের মধ্যে যে-অংশ অধিকার করেছিলুম তা ব্যাপক নয়, এবং ধুলার ঘর আর মাটির পুতুলই দিন কাটাবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল।

অথচ আমার সেই বাল্যের জীবন আমার সেই বালক আমির কাছে একেবারে পরিপূর্ণ ছিল। সে-যে কোনো অংশেই অসমাপ্ত, তা আমার মনেই হতে পারত না। তার আশাভরসা হাসিকান্না লাভক্ষতি নিজের বাল্যগণ্ডির মধ্যেই পর্যাপ্ত হয়ে ছিল।

তখন যদি বড়োবয়সের কথা কল্পনা করতে যেতুম, তবে তাকে বৃহত্তর বাল্যজীবন বলেই মনে হত— অর্থাৎ রূপকথা খেলনা এবং লজঞ্জুসের পরিমাণকে বড়ো করে তোলা ছাড়া আর-কোনো বড়োকে স্বীকার করার কোনো প্রয়োজন বোধ করতুম না।

এ যেন ছবির তাসে ক খ শেখার মতো। কয়ে কাক, খয়ে খঞ্জন, গয়ে গাধা, ঘয়ে ঘোড়া। শুদ্ধমাত্র ক খ শেখার মতো অসম্পূর্ণ শেখা আর-কিছু হতেই পারে না। অক্ষরগুলোকে যোজনা করে যখন শব্দকে ও বাক্যকে পাওয়া যাবে, তখনি ক খ শেখার সার্থকতা হবে ; কিন্তু ইতিমধ্যে ক খ অক্ষর সেই কাকের ও খঞ্জনের ছবির মধ্যে সম্পূর্ণতা লাভ ক'রে শিশুর পক্ষে আনন্দকর হয়ে উঠে— সে ক খ অক্ষরের দৈন্য অনুভব করতেই পারে না।

তেমনি শিশুর জীবনে ঈশ্বর তাঁর জগতের পুঁথিতে যে-সমস্ত রঙচঙ-করা কখয়ের ছবির পাতা খুলে রাখেন, তাই বারবার উলটে-পালটে তার আর দিনরাত্রির জ্ঞান থাকে না। কোনো অর্থ, কোনো ব্যাখ্যা, কোনো বিজ্ঞান, কোনো তত্ত্বজ্ঞান তার দরকারই হয় না— সে ছবি দেখেই খুশী হয়ে থাকে ; মনে করে, এই ছবি দেখাই জীবনের চরম সার্থকতা।

তার পরে আঠারো বৎসর পেরিয়ে যেদিন উনিশে পা দিলুম, সেদিন খেলনা লজঞ্জুস ও রূপকথা একেবারে তুচ্ছ হয়ে গেল। সেদিন যে-ভাবরাজ্যের সিংহদ্বারের সমুখে এসে দাঁড়ালুম, সে একেবারে সোনার আভায় ঝল্‌মল্‌ করছে এবং ভিতর থেকে যে-একটি নহবতের আওয়াজ আসছে, তাতে প্রাণ উদাস করে দিচ্ছে। এতদিন ছিলুম বাইরে,

কিন্তু সাহিত্যের নিমন্ত্রণচিঠি পেয়ে মানুষের মানসলোকের রসভাণ্ডারে প্রবেশ করা গেল। মনে হল, এই যথেষ্ট, আর-কিছুরই প্রয়োজন নেই।

এমনি করে মধ্যযৌবনে যখন পৌঁছনো গেল তখন বাইরের দিকে আর-একটা দরজা খুলে গেল। তখন এই মানসলোকের বাহিরবাড়িতে ডাক পড়ল। মানুষ যেখানে বসে ভেবেছে, আলাপ করেছে, গান গেয়েছে, ছবি এঁকেছে সেখানে নয়— ভাব যেখানে কাজের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে, সেই মস্ত খোলা জায়গায়। মানুষ যেখানে লড়াই করেছে, প্রাণ দিয়েছে, যেখানে অসাধ্যসাধনের জয়পতাকা হাতে অশ্বমেধের ঘোড়া নিয়ে নদী পর্বত সমুদ্র উত্তীর্ণ হতে চলেছে সেইখানে। সেখানে সমাজ আহ্বান করছে, সেখানে দেশ হাত বাড়িয়ে আছে,— সেখানে উন্নতিতীর্থের দুর্গম শিখর মেঘের মধ্যে প্রচ্ছন্ন থেকে সুমহৎ ভবিষ্যতের দিকে তর্জনী তুলে রয়েছে। এই-বা কী বিরাট ক্ষেত্র! এই যেখানে যুগে যুগে সমস্ত মহাপুরুষ প্রাণ দিয়ে এসেছেন, এখানে প্রাণ আপনাকে নিঃশেষ করে দিতে পারলেই নিজেকে সার্থক বলে মনে করে।

কিন্তু এইখানে এসেই যে সমস্ত ফুরোয়, তা নয়। এর থেকেও বেরোবার দরজা আছে। সেই দরজা যখন খুলে যায় তখন দেখি আরো আছে, এবং তার মধ্যে শৈশব যৌবন বার্ধক্য সমস্তই অপূর্বভাবে সম্মিলিত। জীবন যখন ঝরনার মতো ঝরছিল তখন সে ঝরনারূপেই সুন্দর, যখন নদী হয়ে বেরোল তখন সে নদীরূপেই সার্থক, যখন তার সঙ্গে চারদিক থেকে নানা উপনদী ও জলধারা এসে মিলে তাকে শাখাপ্রশাখায় ব্যাপ্ত করে দিলে তখন মহানদরূপেই তার মহত্ত্ব— তার পরে সমুদ্রে এসে যখন সে সংগত হল তখন সেই সাগরসংগমেও তার মহিমা।

বাল্যজীবন যখন ইন্দ্রিয়বোধের বাইরের ক্ষেত্র ছিল তখনো সে সুন্দর, যৌবন যখন ভাববোধের মানসক্ষেত্রে গেল তখনো সে সুন্দর, প্রৌঢ় যখন বাহির ও অন্তরের সম্মিলনক্ষেত্রে গেল তখনো সে সুন্দর এবং বৃদ্ধ যখন বাহির ও অন্তরের অতীত ক্ষেত্রে গেল তখনো সে সুন্দর।

আমার তরুণ বন্ধুর জন্মদিনে এই কথাই আমি চিন্তা করছি। আমি দেখছি, তিনি একটি বয়ঃসন্ধিতে দাঁড়িয়েছেন— তাঁর সামনে একটি অভাবনীয় তাঁকে নব নব প্রত্যাশার পথে আহ্বান করছে।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, পঞ্চাশে পদার্পণ করে আমার সামনেও সেই অভাবনীয়কেই দেখছি। নূতন আর কিছুই নেই, শক্তির পাথেয় শেষ হয়ে গেছে, পথের সীমায় এসে ঠেকেছি, এ-কথা কোনোমতেই বলতে পারছি নে। আমি তো দেখছি, আমিও একটি বিপুল বয়ঃসন্ধিতে দাঁড়িয়েছি। বাল্যের জগৎ, যৌবনের জগৎ,

যা পার হয়ে এসেছি বলে মনে করেছিলুম, এখন দেখছি, তার শেষ হয় নি— তাকেই আবার আর-এক আলোকে আর-এক অর্থে আর-এক সুরে লাভ করতে হবে, মনের মধ্যে সেই একটি সংবাদ এসেছে।

এর মধ্যে অদ্ভুত ব্যাপারটা এই যে, যেখানে ছিলুম সেইখানেই আছি অথচ চলেওছি। শিশুকালের যে-পৃথিবী, যে-চন্দ্রসূর্যতারা, এখনো তাই— স্থানপরিবর্তন করতে হয় নি, অথচ সমস্তই বেড়ে উঠেছে। দাশুরায়ের পাঁচালি যে পড়বে তাকে যদি কোনোদিন কালিদাসের কাব্য পড়তে হয়, তবে তাকে স্বতন্ত্র পুঁথি খুলতে হয়। কিন্তু এ জগতে একই পুঁথি খোলা রয়েছে— সেই পুঁথিকে শিশু পড়ছে ছড়ার মতো, যুবা পড়ছে কাব্যের মতো এবং বৃদ্ধ তাতেই পড়ছে ভাগবত। কাউকে আর নড়ে বসতে হয় নি— কাউকে এমন কথা বলতে হয় নি যে, 'এ জগতে আমার চলবে না, আমি একে ছাড়িয়ে গেছি— আমার জন্যে নূতন জগতের দরকার।'

কিছুই দরকার হয় না এইজন্যে যে, যিনি এ পুঁথি পড়াচ্ছেন তিনি অনন্ত নূতন— তিনি আমাদের সঙ্গে-সঙ্গেই সমস্ত পাঠকে নূতন করে নিয়ে চলেছেন— মনে হচ্ছে না যে, কোনো পড়া সাঙ্গ হয়ে গেছে।

এইজন্যেই পড়ার প্রত্যেক অংশেই আমরা সম্পূর্ণতাকে দেখতে পাচ্ছি— মনে হচ্ছে, এই যথেষ্ট,— মনে হচ্ছে, আর দরকার নেই। ফুল যখন ফুটছে তখন সে এমনি করে ফুটছে যেন সেই চরম; তার মধ্যে ফলের আকাঙ্ক্ষা দৈন্যরূপে যেন নেই। তার কারণ হচ্ছে, পরিণত ফলের মধ্যে যাঁর আনন্দ, অপরিণত ফুলের মধ্যেও তাঁর আনন্দের অভাব নেই।

শৈশবে যখন ধুলোবালি নিয়ে, যখন নুড়ি শামুক ঝিনুক ঢেলা নিয়ে খেলা করেছি, তখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অনাদিকালের ভগবান শিশুভগবান হয়ে আমাদের সঙ্গে খেলা করেছেন। তিনি যদি আমাদের সঙ্গে শিশু না হতেন এবং তাঁর সমস্ত জগৎকে শিশুর খেলাঘর করে না তুলতেন, তা হলে তুচ্ছ ধুলোমাটি আমাদের কাছে এমন আনন্দময় হয়ে উঠত না। তিনি আমাদের সঙ্গে থেকে আমাদের মতো হয়ে আমাদের আনন্দ দিয়ে এসেছেন, এইজন্যে শিশুর জীবনে সেই পরিপূর্ণস্বরূপের লীলাই এমন সুন্দর হয়ে দেখা দেয়; কেউ তাকে ছোটো ব'লে, মূঢ় ব'লে, অক্ষম ব'লে অবজ্ঞা করতে পারে না— অনন্ত শিশু তার সখা হয়ে তাকে এমনি গৌরবান্বিত করে তুলেছেন যে, জগতের আদরের সিংহাসন সে অতি অনায়াসেই অধিকার করে বসেছে, কেউ তাকে বাধা দিতে সাহস করে না।

আবার সেইজন্যেই আমার উনিশ বৎসরের যুবাবন্ধুর তারুণ্যকে আমি অবজ্ঞা

করতে পারি নে। যিনি চিরযুবা তিনি তাকে যৌবনে মণ্ডিত জগতের মাঝখানে হাতে ধরে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। চিরকাল ধরে কত যুবাকেই যে তিনি যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করে এসেছেন, তার আর সীমা নেই। তাই যৌবনের মধ্যে চরমের আস্বাদ পেয়ে চিরদিন যুবারা যৌবনকে চরমরূপে পাবার আকাঙ্ক্ষা করেছে।

প্রবীণরা তাই দেখে হেসেছে। মনে করেছে যুবারা এই-সমস্ত নিয়ে ভুলে আছে কেমন করে। ত্যাগের মধ্যে রিক্ততার মধ্যে যে বাধাহীন পরিপূর্ণতা, সেই অমৃতের স্বাদ এরা পায় নি। তিনি চিরপুরাতন যিনি পরমানন্দে আপনাকে নিয়তই ত্যাগ করছেন, যিনি কিছুই চান না; তিনিই বৃদ্ধের বন্ধু হয়ে পূর্ণতার দ্বারস্বরূপ যে-ত্যাগ, অমৃতের দ্বারস্বরূপ যে-মৃত্যু, তারি অভিমুখে আপনি হাতে ধরে নিয়ে চলেছেন।

এমনি করে অনন্ত যদি পদে পদেই আমাদের কাছে না ধরা দিতেন, তবে অনন্তকে আমরা কোনো কালেই ধরতে পারতুম না। তবে তিনি আমাদের কাছে 'না' হয়েই থাকতেন। কিন্তু পদে পদে তিনিই আমাদের 'হাঁ'। বাল্যের মধ্যে যে হাঁ সে তিনিই, সেইখানেই বাল্যের সৌন্দর্য; যৌবনের মধ্যে যে হাঁ সেও তিনিই, সেইখানেই যৌবনের শক্তি সামর্থ্য; বার্ধক্যের মধ্যে যে হাঁ সেও তিনিই, সেইখানেই বার্ধক্যের চরিতার্থতা। খেলার মধ্যেও পূর্ণরূপে তিনি, সংগ্রহের মধ্যেও পূর্ণরূপে তিনি এবং ত্যাগের মধ্যেও পূর্ণরূপে তিনি।

এইজন্যেই পথও আমাদের কাছে এমন রমণীয়, এইজন্যে সংসারকে আমরা ত্যাগ করতে চাই নে। তিনি-যে পথে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলেছেন। পথের উপর আমাদের এই-যে ভালোবাসা, এ তাঁরি উপর ভালোবাসা। মরতে আমরা যে এত অনিচ্ছা করি, এর মধ্যে আমাদের মনের এই কথাটি আছে যে, 'হে প্রিয়, জীবনকে তুমি আমাদের কাছে প্রিয় করে রেখেছ।'— ভুলে যাই, যিনি প্রিয় করেছেন, মরণেও তিনিই আমাদের সঙ্গে চলেছেন।

আমাদের বলবার কথা এ নয় যে, এটা অপূর্ণ ওটা অপূর্ণ, অতএব এ সমস্তকে আমরা পরিত্যাগ করব। আমাদের বলবার কথা হচ্ছে এই যে, এরি মধ্যে যিনি পূর্ণ তাঁকে আমরা দেখব। ক্ষেত্রকে বড়ো করেই যে আমরা পূর্ণকে দেখি তা নয়, পূর্ণকে দেখলেই আমাদের ক্ষেত্র বড়ো হয়ে যায়। আমরা যেখানেই আছি, যে-অবস্থায় আছি, সকলের মধ্যেই যদি তাঁকে দেখবার অবকাশ না থাকত, তা হলে কেউ কোনো কালেই তাঁকে দেখবার আশা করতে পারতুম না। কারণ, আমরা যে যতদূরই অগ্রসর হই-না, অনন্ত যদি ধরা না দেন তবে কোনো কৌশলে কারো তাঁকে নাগাল পাবার সম্ভাবনা কিছুমাত্র থাকে না।

কিন্তু তিনি অনন্ত বলেই সর্বত্রই ধরা দিয়েই আছেন— এইজন্যে তাঁর আনন্দরূপের অমৃতরূপের প্রকাশ সকল দেশে, সকল কালে। তাঁর সেই প্রকাশ যদি আমাদের মানবজীবনের মধ্যে দেখে থাকি তবে মৃত্যুর পরেও তাঁকে নূতন করে দেখতে পাব, এই আশা আমাদের মধ্যে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। মানবজীবনে সে সুযোগ যদি না ঘটে থাকে, অর্থাৎ যদি না জেনে থাকি যে, যা কিছু প্রকাশ পাচ্ছে সে তাঁরি আনন্দ, তবে মৃত্যুর পরে যে আরো-কিছু বিশেষ সুযোগ আছে, এ-কথা কল্পনা করবার কোনো হেতু দেখি নে।

অনন্ত চিরদিনই সকল দেশে সকল কালে সকল অবস্থাতেই নিজেকে আমাদের কাছে প্রকাশ করবেন, এই তাঁর আনন্দের লীলা। কিন্তু তাঁর যে অন্ত নেই, এ-কথা তিনি আমাদের কেমন করে জানান ? নেতি নেতি করে জানান না, ইতি ইতি করেই জানান। অন্তহীন ইতি। সেই ইতিকে কোথাও সুস্পষ্ট উপলব্ধি করতে পারলেই এ কথা জানতে পারি, সর্বত্রই ইতি— সর্বত্রই সেই এষঃ। জীবনেও সেই এষঃ, জীবনের পরেও সেই এষঃ।— কিন্তু তিনি নাকি অন্তহীন, সেইজন্যে তিনি কোথাও কোনোদিন পুরাতন নন,— চিরদিনই তাঁকে নূতন করেই জানব, নূতন করেই পাব, তাঁতে নূতন করেই আনন্দলাভ করতে থাকব। একেবারেই সমস্ত পাওয়াকে মিটিয়ে দিয়ে চিরকালের মতো একভাবেই যদি তাঁকে পেতুম, তা হলে অনন্তকে পাওয়া হত না। অন্য সমস্ত পাওয়াকে শেষ করে দিয়ে তবে তাঁকে পাব, এ কখনো হতেই পারে না। কিন্তু সমস্ত পাওয়ার মধ্যেই কেবল নব নবতর রূপে তাঁকেই পেতে থাকব, সেই অন্তহীন এককে অন্তহীন বিচিত্রের মধ্যে চিরকাল ভোগ করে চলব, এই যদি না হয় তবে দেশকালের কোনো অর্থই নেই,— তবে বিশ্বরচনা উন্মত্ত প্রলাপ এবং আমাদের জন্মমৃত্যুর প্রবাহ মায়ামরীচিকামাত্র।

মাতৃশ্রাদ্ধ

আমি কোনো ইংরেজী বইয়ে পড়েছি যে, ঈশ্বরকে যে পিতা বলা হয়ে থাকে, সে একটা রূপকমাত্র। অর্থাৎ পৃথিবীতে পিতার সঙ্গে সন্তানের যে রক্ষণপালনের সম্বন্ধ, ঈশ্বরের সঙ্গে জীবের সেই সম্বন্ধ আছে বলেই এই সাদৃশ্য অবলম্বনে তাঁকে পিতা বলা হয়।

কিন্তু এ-কথা আমরা মানি নে। আমরা তাঁকে রূপকের ভাষায় পিতা বলি নে। আমরা বলি, পিতামাতার মধ্যে তিনিই সত্য পিতা মাতা। তিনিই আমাদের অনন্ত

পিতামাতা, সেইজন্যেই মানুষ তার পৃথিবীর পিতামাতাকে চিরকাল পেয়ে আসছে। মানুষ যে পিতৃহীন হয়ে মাতৃহীন হয়ে পৃথিবীতে আসে না তার একমাত্র কারণ, বিশ্বের অনন্ত পিতামাতা চিরদিন মানুষের পিতামাতার মধ্যে আপনাকে প্রকাশ করে আসছেন। পিতার মধ্যে পিতারূপে যে-সত্য সে তিনি, মাতার মধ্যে মাতারূপে যে-সত্য সে তিনি।

পিতামাতাকে যদি প্রাকৃতিক দিক থেকে দেখাই সত্য দেখা হত, অর্থাৎ আমাদের মর্ত্যজীবনের প্রাকৃতিক কারণমাত্র যদি তাঁরা হতেন, তা হলে এই পিতামাতা সম্ভাষণকে আমরা ভুলেও অনন্তের সঙ্গে জড়িত করতুম না। কিন্তু মানুষ পিতামাতার মধ্যে প্রাকৃতিক কারণের চেয়ে ঢের বড়ো জিনিসকে অনুভব করেছে— পিতামাতার মধ্যে এমন একটি পদার্থের পরিচয় পেয়েছে যা অন্তহীন, যা চিরন্তন, যা বিশেষ পিতামাতার সমস্ত ব্যক্তিগত সীমাকে ছাড়িয়ে গেছে; পিতামাতার মধ্যে এমন একটা-কিছু পেয়েছে যাতে দাঁড়িয়ে উঠে চন্দ্রসূর্যগ্রহতারাকে যিনি অনাদি-অনন্তকাল নিয়মিত করছেন, সেই পরম শক্তিকে সম্বোধন করে বলে উঠেছে, 'পিতা নোঽসি— তুমি আমাদের পিতা।' এ-কথা যে নিতান্তই হাস্যকর প্রলাপবাক্য এবং স্পর্ধার কথা হত যদি এ কেবলমাত্রই রূপক হত। কিন্তু মানুষ এক জায়গায় পিতামাতাকে বিশেষভাবে অনন্তের মধ্যে দেখেছে এবং অনন্তকে বিশেষভাবে পিতামাতার মধ্যে দেখেছে, সেইজন্যেই এমন দৃঢ়কণ্ঠে এতবড়ো অভিমানের সঙ্গে বলতে পেরেছে 'পিতা নোঽসি'।

মানুষ পিতামাতার মধ্য থেকে যে-অমৃতের ধারা লাভ করেছে সেইটেকে অনুসরণ করতে গিয়ে দেখেছে কোথাও তার সীমা নেই, দেখেছে যেখান থেকে সূর্যনক্ষত্র তাদের নিঃশেষহীন আলোক পাচ্ছে, জীবজন্তু যেখান থেকে অবসানহীন প্রাণের স্রোতে ভেসে চ'লে আজ পর্যন্ত কোনো শেষে গিয়ে পৌঁছল না, সেই জগতের অনাদি আদিপ্রস্রবণ হতেই ওই অমৃতধারা প্রবাহিত হয়ে আসছে; অনন্ত ওইখানে আমাদের কাছে যেমনি ধরা পড়ে গেছেন, অমনি আমরা সেই দিকেই মুখ তুলে বলে উঠেছি 'পিতা নোঽসি'— বলেছি, 'যাকেই পিতা বলে ডাকি-না কেন, তুমিই আমাদের পিতা।'

'তুমি যে আমাদেরি' অনন্তকে এমন কথা বলতে শিখলুম এইখান থেকেই। 'তোমার বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে অসংখ্য কারবার নিয়ে তুমি আছ, সে কথা ভাবতে গেলেও ভয়ে মরি— কিন্তু ধরা পড়ে গেছ এইখানেই— দেখেছি তোমাকে পিতার মধ্যে, দেখেছি তোমাকে মাতার মধ্যে— তাই তুমি যত বড়োই হও-না কেন, পৃথিবীর এই এক কোণে দাঁড়িয়ে বলেছি, তুমি আমাদের পিতা— পিতা নোঽসি। আমাদের তুমি আমাদের, আমার তুমি আমার।'

এমন করে যদি তাঁকে না পেতুম তবে তাঁকে খুঁজতে যেতুম কোন্ রাস্তায়? সে রাস্তার অন্ত পেতুম কবে এবং কোন্‌খানে? যত দূরেই যেতুম তিনি দূরেই থেকে যেতেন। কেবল তাঁকে অনির্বচনীয় বলতুম, অগম্য অপার বলতুম।

কিন্তু সেই অনির্বচনীয় অগম্য অপার তিনিই আমার পিতা, আমার মাতা, তিনিই আমার— মানুষকে এই একটি অদ্ভুত কথা তিনি বলিয়েছেন। অনধিগম্য, এক মুহূর্তে এত আশ্চর্য সহজ হয়েছেন।

একেবারে আমাদের মানবজন্মের প্রথম মুহূর্তেই। যার কোলে মানুষের জন্ম, এইটেই মানুষের মস্ত কথা এবং প্রথম কথা। জীবনের প্রথম মুহূর্তেই তার অধিকারের আর অন্ত নেই; তার জন্যে প্রাণ দিতে পারে এতবড়ো স্নেহ তার জন্যে অপেক্ষা করে আছে, জগতে এত তার মূল্য। এ মূল্য তাকে উপার্জন করতে হয় নি, এ মূল্য সে একেবারেই পেয়েছে।

মাতাই শিশুকে জানিয়ে দিলে, বিশাল বিশ্বজগৎ তার আত্মীয়, নইলে মাতা তার আপন হত না। মাতাই তাকে জানিয়ে দিলে, নিখিলের ভিতর দিয়ে যে যোগের সূত্র তাকে বেঁধেছে, সেটি কেবল প্রাকৃতিক কার্যকারণের সূত্র নয়, সে একটি আত্মীয়তার সূত্র। সেই চিরন্তন আত্মীয়তা পিতামাতার মধ্যে রূপগ্রহণ ক'রে জীবনের আরম্ভেই শিশুকে এই জগতে প্রথম অভ্যর্থনা করে নিলে। একেবারেই যে অপরিচিত, এক নিমেষেই তাকে সুপরিচিত বলে গ্রহণ করলে— সে কে। এমনটা পারে কে। এ শক্তি আছে কার। সেই অনন্ত প্রেম, যিনি সকলকেই চেনেন, এবং সকলকেই চিনিয়ে দেন।

এইজন্যে প্রেম যখন চিনিয়ে দেন, তখন জানাশুনা চেনাপরিচয়ের দীর্ঘ ভূমিকার কোনো দরকার হয় না, তখন রূপগুণ শক্তিসামর্থ্যের আসবাব-আয়োজনও বাহুল্য হয়ে ওঠে, তখন জ্ঞানের মতো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ওজন করে হিসেব করে চিনতে হয় না। চিরকাল তাঁর যে চেনাই রয়েছে সেইজন্যে তাঁর আলো যেখানে পড়ে সেখানে কেউ কাউকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে না।

শিশু মা-বাপের কোলেই জগৎকে যখন প্রথম দেখলে, তখন কেউ তাকে কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলে না— বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের থেকে একটি ধ্বনি এল, 'এসো, এসো।' সেই ধ্বনি মা-বাপের কণ্ঠের ভিতর দিয়ে এল কিন্তু সে কি মা-বাপেরই কথা। সেটি যাঁর কথা তাঁকেই মানুষ বলেছে 'পিতা নোঽসি'।

শিশু জন্মাল আনন্দের মধ্যে, কেবল কার্যকারণের মধ্যে নয়। তাকে নিয়ে মা-বাপের খুশি, মা-বাপকে নিয়ে তার খুশি। এই আনন্দের ভিতর দিয়ে জগতের সঙ্গে

তার সম্বন্ধ আরম্ভ হল। এই-যে আনন্দ, এ আনন্দ ছিল কোথায়, এ আনন্দ আসে কোথা থেকে। যে-পিতামাতার ভিতর দিয়ে শিশু একে পেয়েছে, সেই পিতামাতা একে পাবে কোথায়। এ কি তাদের নিজের সম্পত্তি। এই আনন্দ জীবনের প্রথম মুহূর্তেই যেখান থেকে এসে পৌছল, সেইখানে মানুষের চিত্ত গিয়ে যখন উত্তীর্ণ হয় তখনি এতবড়ো কথা সে অতি সহজেই বলে, 'পিতা নোঽসি— তুমিই আমার পিতা, আমার মাতা।'

আমাদের এই মন্দিরের একজন উপাসক আমাকে জানিয়েছেন, আজ তাঁর মাতার শ্রাদ্ধদিন। আমি তাঁকে বলছি, আজ তাঁর মাতাকে খুব বড়ো করে দেখবার দিন, বিশ্বমাতার সঙ্গে তাঁকে মিলিয়ে দেখবার দিন।

মা যখন ইন্দ্রিয়বোধের কাছে প্রত্যক্ষ ছিলেন, তখন তাঁকে এতবড়ো করে দেখবার অবকাশ ছিল না। তখন তিনি সংসারে আচ্ছন্ন হয়ে দেখা দিতেন। আজ তাঁর সমস্ত আবরণ ঘুচে গিয়েছে— যেখানে তিনি পরিপূর্ণ সত্য, সেইখানেই আজ তাঁকে দেখে নিতে হবে। যিনি জন্মদান করে নিজের মাতৃত্বের মধ্য দিয়ে বিশ্বমাতার পরিচয়সাধন করিয়েছেন, আজ তিনি মৃত্যুর পর্দা সরিয়ে দিয়ে সংসারের আচ্ছাদন ছিন্ন করে সেই বিশ্বজননীর মধ্যে নিজের মাতৃত্বের চিরন্তন মূর্তিটি সন্তানের চক্ষে প্রকাশ করে দিন।

শ্রাদ্ধদিনের ভিতরকার কথাটি— শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধা শব্দের অর্থ হচ্ছে বিশ্বাস।

আমাদের মধ্যে একটি মূঢ়তা আছে; আমরা চোখে-দেখা কানে-শোনাকেই সব চেয়ে বেশি বিশ্বাস করি। যা আমাদের ইন্দ্রিয়বোধের আড়ালে পড়ে যায়, মনে করি, সে বুঝি একেবারেই গেল। ইন্দ্রিয়ের বাইরে শ্রদ্ধাকে আমরা জাগিয়ে রাখতে পারি নে।

আমার চোখে-দেখা কানে-শোনা দিয়েই তো আমি জগৎকে সৃষ্টি করি নি যে, আমার দেখাশোনার বাইরে যা পড়বে তাই বিলুপ্ত হয়ে যাবে। যাকে চোখে দেখছি, যাকে সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে জানছি, সে যাঁর মধ্যে আছে, যখন তাকে চোখে দেখি নে, ইন্দ্রিয় দিয়ে জানি নে, তখনো তাঁরি মধ্যে আছে। আমার জানা আর তাঁর জানা তো ঠিক এক সীমায় সীমাবদ্ধ নয়। আমার যেখানে জানার শেষ সেখানে তিনি ফুরিয়ে যান নি। আমি যাকে দেখছি নে, তিনি তাকে দেখছেন— আর তাঁর সেই দেখায় নিমেষ পড়ছে না।

সেই অনিমেষ জাগ্রত পুরুষের দেখার মধ্যেই আজ মাকে দেখতে হবে। আজ এই শ্রদ্ধাটিকে হৃদয়ে জাগ্রত করে তুলতে হবে যে, মা আছেন, মা সত্যের মধ্যে

আছেন, শোকানলের আলোকেই এই শ্রদ্ধাকে উজ্জ্বল করে তুলতে হবে যে, মা আছেন, তিনি কখনোই হারাতে পারেন না। সত্যের মধ্যে মা চিরকাল ছিলেন বলেই তাঁকে একদিন পেয়েছি— নইলে একদিনো পেতুম না— এবং সত্যের মধ্যেই মা আছেন বলেই আজো তাঁর অবসান নেই।

সত্যের মধ্যেই, অমৃতের মধ্যেই সমস্ত আছে, এ-কথা আমরা পরমাত্মীয়ের মৃত্যুতেই যথার্থত উপলব্ধি করি। যাদের সঙ্গে আমাদের স্নেহপ্রেমের, আমাদের জীবনের গভীর যোগ নেই, তারা আছে কি নেই তাতে আমাদের কিছুই আসে যায় না— সুতরাং মৃত্যুতে তারা আমাদের কাছে একেবারেই বিলুপ্ত হয়ে যায়। এইখানেই মৃত্যুকে আমরা বিনাশ বলেই জানি।

কিন্তু এ মৃত্যুর অর্থ কী ভেবে দেখো। যে-মানুষকে আনন্দের মধ্যে দেখি নি, তাকে অমৃতের মধ্যেই দেখি নি— আমার পক্ষে সে কেবলমাত্র চোখে-দেখা কানে-শোনার অনিত্য লোকেই এতদিন ছিল ;— যেখানে তাকে সত্যরূপে বৃহৎরূপে অমররূপে দেখতে পেতুম, সেখানে সে আমাকে দেখা দেয় নি।

যেখানে আমার প্রেম সেইখানেই আমি নিত্যের স্বাদ পাই, অমৃতের পরিচয় পেয়ে থাকি। সেখানে মানুষের উপর থেকে তুচ্ছতার আবরণ চলে যায়, মানুষের মূল্যের সীমা থাকে না। সেই প্রেমের মধ্যে যে-মানুষকে দেখেছি, তাকেই আমি অমৃতের মধ্যে দেখেছি। সমস্ত সীমাকে অতিক্রম ক'রে তার মধ্যে অসীমকে দেখতে পাই এবং মৃত্যুতেও সে আমার কাছে মরে না।

যাকে আমরা ভালোবাসি মৃত্যুতে সে যে থাকবে না, এই কথাটা আমাদের সমস্ত চিত্ত অস্বীকার করে ;— প্রেম যে তাকে নিত্য বলেই জানে, সুতরাং মৃত্যু যখন তার প্রতিবাদ করে, তখন সেই প্রতিবাদকে মেনে নেওয়া তার পক্ষে এতই কঠিন হয়ে ওঠে। যে-মানুষকে আমরা অমৃতলোকের মধ্যে দেখেছি, তাকে মৃত্যুর মধ্যে দেখব কেমন করে।

মনের ভিতরে তখন একটি কথা এই ওঠে— প্রেম কি কেবল আমারি। কোনো বিশ্বব্যাপী প্রেমের যোগে কি আমার প্রেম সত্য নয়। যে-শক্তিকে অবলম্বন করে আমি ভালোবাসছি, আনন্দ পাচ্ছি, সেই শক্তিই কি সমস্ত বিশ্বে সকলের প্রতিই আনন্দিত হয়ে আছেন না। আমার প্রেমের মধ্যে এমন যে একটি অমৃত আছে, যে-অমৃতে আমার প্রেমাস্পদ আমার কাছে এমন চিরন্তন সত্য— সেই অমৃত কি সেই অনন্ত প্রেমের মধ্যে নেই। তাঁর সেই অনন্ত প্রেমের সুধায় আমরা কি অমর হয়ে উঠি নি। যেখানে তাঁর আনন্দ সেইখানেই কি অমৃত নেই।

প্রিয়জনের মৃত্যুর পরে প্রেমের আলোকে আমরা এই অনন্ত অমৃতলোককে আবিষ্কার করে থাকি। সেই তো আমাদের শ্রদ্ধার দিন— সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা, অমৃতের প্রতি শ্রদ্ধা। শ্রাদ্ধের দিনে আমরা মৃত্যুর সম্মুখে দাঁড়িয়ে অমৃতের প্রতি সেই শ্রদ্ধা নিবেদন করি; আমরা বলি, মাকে দেখছি নে কিন্তু মা আছেন। চোখে দেখে, হাতে ছুঁয়ে যখন বলি 'মা আছেন', তখন সে তো শ্রদ্ধা নয়— আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় যেখানে শূন্যতার সাক্ষ্য দিচ্ছে সেখানে যখন বলি 'মা আছেন', তখন তাকেই যথার্থ বলে শ্রদ্ধা। নিজে যতক্ষণ পাহারা দিচ্ছি ততক্ষণ যাকে বিশ্বাস করি, তাকে কি শ্রদ্ধা করি। গোচরে এবং অগোচরেও যার উপর আমার বিশ্বাস অটল, তারি উপর আমার শ্রদ্ধা। মৃত্যুর অন্ধকারময় অন্তরালেও যাকে আমার সমস্ত চিত্ত সত্য বলে উপলব্ধি করছে, তাকেই তো যথার্থ আমি সত্য বলে শ্রদ্ধা করি।

সেই শ্রদ্ধাই প্রকাশ করার দিন শ্রাদ্ধের দিন। মাতার জীবিতকালে যখন বলেছি, 'মা তুমি আছ'— তার চেয়ে ঢের পরিপূর্ণ করে বলা, আজকের বলা যে, 'মা তুমি আছ।' তার মধ্যে আর-একটি গভীরতর শ্রদ্ধার কথা আছে— 'পিতা নোঽসি। হে আমার অনন্ত পিতামাতা, তুমি আছ, তাই আমার মাকে কোনো দিন হারাবার জো নেই।'

যেদিন বিশ্বব্যাপী অমৃতের প্রতি এই শ্রদ্ধা সমুজ্জ্বল হয়ে ওঠবার দিন, সেই-দিনকারই আনন্দমন্ত্র হচ্ছে—

মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ
মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ।
মধু নক্তম্ উতোষসঃ মধুমৎ পার্থিবং রজঃ
মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা।
মধুমান্নো বনস্পতিঃ মধুমান্ অস্তু সূর্যঃ
মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ।

এই আনন্দমন্ত্রের দ্বারা পৃথিবীর ধূলি থেকে আকাশের সূর্য পর্যন্ত সমস্তকে অমৃতে অভিষিক্ত করে মধুময় করে দেখবার দিন এই শ্রাদ্ধের দিন। সত্যম্— তিনি সত্য, অতএব সমস্ত তাঁর মধ্যে সত্য, এই শ্রদ্ধা যেদিন পূর্ণভাবে বিকশিত হয়ে ওঠে, সেই দিনই আমরা বলতে পারি আনন্দম্— তিনি আনন্দ এবং তাঁর মধ্যেই সমস্ত আনন্দে পরিপূর্ণ।

শেষ

গানে সম আছে, ছন্দে যতি আছে এবং এই যে লেখা চলছে, এই লেখার অন্য-সকল অংশের চেয়ে দাঁড়ির প্রভুত্ব কিছুমাত্র কম নয়। এই দাঁড়িগুলোই লেখার হাল ধরে রয়েছে— একে একটানা নিরুদ্দেশের মধ্যে হু হু করে ভেসে যেতে দিচ্ছে না।

বস্তুত কবিতা যখন শেষ হয়ে যায়, তখন সেই শেষ হয়ে যাওয়াটাও কবিতার একটা বৃহৎ অঙ্গ। কেননা কোনো ভালো কবিতাই একেবারে শূন্যের মধ্যে শেষ হয় না— যেখানে শেষ হয় সেখানেও সে কথা বলে— এই নিঃশব্দে কথাগুলি বলবার অবকাশ তাকে দেওয়া চাই।

যেখানে কবিতা থেমে গেল সেখানেই যদি তার সমস্ত সুর সমস্ত কথা একেবারেই ফুরিয়ে যায়, তা হলে সে নিজের দীনতার জন্যে লজ্জিত হয়। কোনো-একটা বিশেষ উপলক্ষে প্রাণপণে ধুমধাম করে যে-ব্যক্তি একেবারে দেউলে হয়ে যায়, সেই ধুমধামের দ্বারা তার ঐশ্বর্য প্রকাশ পায় না, তার দারিদ্র্যই সমুজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

নদী যেখানে থামে সেখানে একটি সমুদ্র আছে বলেই থামে— তাই থেমে তার কোনো ক্ষতি নেই। বস্তুত এ কেবল এক দিক থেকে থামা, অন্য দিক থেকে থামা নয়।

মানুষের জীবনের মধ্যেও এই-রকম অনেক থামা আছে। কিন্তু প্রায় দেখা যায়, মানুষ থামতে লজ্জা বোধ করে। সেইজন্যেই আমরা ইংরেজের মুখে প্রায় শুনতে পাই যে, জিন্‌লাগাম-পরা অবস্থায় দৌড়তে দৌড়তে মুখ থুবড়ে মরাই গৌরবের মরণ। আমরাও এই কথাটা আজকাল ব্যবহার করতে অভ্যাস করছি।

কোনো-একটা জায়গায় পূর্ণতা আছে, এ-কথা মানুষ যখন অস্বীকার করে তখন চলাটাকেই মানুষ একমাত্র গৌরবের জিনিস ব'লে মনে করে। ভোগ বা দান যে জানে না, সঞ্চয়কেই সে একান্ত করে জানে।

কিন্তু ভোগের বা দানের মধ্যে সঞ্চয় যখন আপনাকে ক্ষয় করতে থাকে তখন এক আকারে সঞ্চয়ের অবসান হয় বটে, কিন্তু আর-এক আকারে তারি সার্থকতা হতে থাকে। যেখানে সঞ্চয়ের এই সার্থক অবসান নেই সেখানে লজ্জাজনক কৃপণতা।

জীবনকে যারা এই-রকম কৃপণের মতো দেখে, তারা কোথাও কোনোমতেই থামতে চায় না, তারা কেবলি বলে, 'চলো, চলো, চলো।' থামার দ্বারা তাদের চলা সম্পূর্ণ ও

গভীর হয়ে ওঠে না ; তারা চাবুক এবং লাগামকেই স্বীকার করে, বৃহৎ এবং সুন্দর শেষকে তারা মানে না।

তারা যৌবনকে যৌবন পেরিয়েও টানাটানি করে নিয়ে চলে ; সেই দুঃসাধ্য ব্যাপারে কাঠ খড় এবং চেষ্টার আর অবধি থাকে না— তা ছাড়া কত লজ্জা, কত ভাবনা, কত ভয়।

ফল যখন পাকে তখন শাখা ছেড়ে যাওয়াই তার গৌরব। কিন্তু শাখা ত্যাগ করাকে যদি দীনতা ব'লে মনে করে, তবে তার মতো কৃপাপাত্র আর কে আছে।

নিজের স্থানকে অধিকার করার সঙ্গে সঙ্গে এই কথাটি মনের মধ্যে রাখতে হবে যে, এই অধিকারকে সম্পূর্ণ করে তুলে এ'কে ত্যাগ করে যাব ; এই অধিকারকে যেমন করে পারি শেষ পর্যন্ত টানাহেঁচড়া করে রক্ষা করতেই হবে— তাতেই আমার সম্মান, আমার কৃতিত্ব, এই শিক্ষাই যারা শিশুকাল থেকে শিখে এসেছে, অপঘাত যতক্ষণ তাদের পেয়াদার মতো এসে জোর করে টেনে নিয়ে না যায় ততক্ষণ তারা দুই হাতে আসন আঁকড়ে পড়ে থাকে।

আমাদের দেশে অবসানকে স্বীকার করে, এইজন্যে তার মধ্যে অগৌরব দেখতে পায় না। এইজন্যে ত্যাগ করা তার পক্ষে ভঙ্গ দেওয়া নয়।

কেননা সেই ত্যাগ বলতে তো রিক্ততা বোঝায় না। পাকা ফলের ডাল ছেড়ে মাটিতে পড়াকে তো ব্যর্থতা বলতে পারি নে। মাটিতে তার চেষ্টার আকার এবং ক্ষেত্র -পরিবর্তন হয়— সেখানে সে নিশ্চেষ্টতার মধ্যে পলায়ন করে না। সেখানে বৃহত্তর জন্মের উদ্যোগপর্ব, সেখানে অজ্ঞাতবাসের পালা। সেখানে বাহির হতে ভিতরে প্রবেশ।

আমাদের দেশে বলে, পঞ্চাশোর্ধ্বং বনং ব্রজেৎ।

কিন্তু সে বন তো আলস্যের বন নয়, সে-যে তপোবন। সেখানে মানুষের এতকালের সঞ্চয়ের চেষ্টা, দানের চেষ্টার ক্ষেত্রে প্রবেশ করে।

করার আদর্শ মানুষের একমাত্র আদর্শ নয়, হওয়ার আদর্শই খুব বড়ো জিনিস। ধানের গাছ যখন রৌদ্রবৃষ্টির সঙ্গে সংগ্রাম করতে করতে বাড়ছিল সে খুব সুন্দর, কিন্তু ফসল ফ'লে যখন তার মাঠের দিন শেষ হয়ে ঘরের দিন আরম্ভ হয় তখন সেও সুন্দর। সেই ফসলের মধ্যে ধানখেতের সমস্ত রৌদ্রবৃষ্টির ইতিহাস নিবিড়ভাবে নিস্তব্ধ হয়ে আছে ব'লে কি তার কোনো অগৌরব আছে ?

মানুষের জীবনকেও কেবল তার খেতের মধ্যেই দেখব, তার ফসলের মধ্যে দেখব না, এমন পণ করলে সে জীবনকে নষ্টই করা হয়। তাই বলছি, মানুষের জীবনে

এমন একটি সময় আসে যখন তার থামার সময়। মানুষের কাজের সময়ে আমরা মানুষের কাছ থেকে যে-জিনিসটা আদায় করি, তার থামার সময়েও আমরা যদি সেই জিনিসটাই দাবি করি, তা হলে কেবল যে অন্যায় করা হয় তা নয়, নিজেকে বঞ্চিত করাই হয়।

থামার সময় মানুষের কাছে আমরা যেটা দাবি করতে পারি, সেটা করার আদর্শ নয়— সেটা হওয়ার আদর্শ। যখন সমস্তই কেবল চলছে, কেবলই ভাঙাগড়া এবং ওঠাপড়া, তখন সেই হওয়ার আদর্শটিকে সম্পূর্ণভাবে স্থিরভাবে আমরা দেখতে পাই নে— যখন চলা শেষ হয় তখন হওয়াকে আমরা দেখতে পাই। মানুষের এই সমাপ্ত ভাবটি, এই স্থিররূপটি দেখারও প্রয়োজন আছে। খেতের চারা এবং গোলার ধান আমাদের দুইই চাই।

কেজো লোকেরা কাজকেই একমাত্র লাভ বলে মনে করে— এইজন্য মানুষের কাছ থেকে তার অন্তিমকাল পর্যন্ত কেবল কাজ আদায় করবারই চেষ্টা করে।

যে-সমাজে যে-রকম দাবি সেই দাবি অনুসারেই মানুষের মূল্য। যেখানে সমাজ যুদ্ধ দাবি করে সেখানে যোদ্ধারই মূল্য বেশি, সুতরাং সকলেই আর-সমস্ত চেষ্টাকে সংহরণ ক'রে যোদ্ধা হবার জন্যেই প্রাণপণে চেষ্টা করে।

যেখানে কাজের দাবি অতিমাত্র, সেখানে অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত কেজো ভাবেই আপনাকে প্রচার করার দিকে মানুষের একান্ত প্রয়াস। সেখানে মানুষের দাঁড়ি নেই বললেই হয়, সেখানে কেবলই অসমাপিকা ক্রিয়া। সেখানে মানুষ যে-জায়গায় থামে সে-জায়গায় কিছুই পায় না, কেবল লজ্জা পায়; সেখানে কাজ একটা মদের মতো, ফুরোলেই অবসাদ; সেখানে স্তব্ধতার মধ্যে মানুষের কোনো বৃহৎ ব্যঞ্জনা নেই; সেখানে মৃত্যুর রূপ অত্যন্তই শূন্য এবং বিভীষিকাময় এবং জীবন সেখানে নিরন্তর মথিত, ক্ষুব্ধ, পীড়িত ও শতসহস্র কলের কৃত্রিম তাড়নায় গতিপ্রাপ্ত।

সামঞ্জস্য

এই বিশ্বচরাচরে আমরা বিশ্বকবির যে-লীলা চারিদিকেই দেখতে পাচ্ছি সে হচ্ছে সামঞ্জস্যের লীলা। সুর, সে যত কঠিন সুরই হ'ক, কোথাও ভ্রষ্ট হচ্ছে না; তাল, সে যত দুরূহ তালই হ'ক, কোনো জায়গায় তার স্খলনমাত্র নেই। চারিদিকেই গতি এবং স্ফূর্তি, স্পন্দন এবং নর্তন, অথচ সর্বত্রই অপ্রমত্ততা। পৃথিবী প্রতি মুহূর্তে

প্রবলবেগে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে, সূর্য প্রতি মুহূর্তে প্রবলবেগে কোনো-এক অপরিজ্ঞাত লক্ষ্যের অভিমুখে ছুটে চলেছে, কিন্তু আমাদের মনে ভাবনামাত্র নেই— আমরা সকালবেলায় নির্ভয়ে জেগে উঠে দিবসের তুচ্ছতম কাজটুকুও সম্পন্ন করবার জন্যে মনোযোগ করি এবং রাত্রে এ-কথা নিশ্চয় জেনে শুতে যাই যে, দিবসের আয়োজনটি যেখানে যেমনভাবে আজ ছিল, সমস্ত রাত্রির অন্ধকার ও অচেতনতার পরেও ঠিক তাকে সেই জায়গাতেই তেমনি করেই কাল পাওয়া যাবে। কেননা সর্বত্র সামঞ্জস্য আছে ; এই অতি-প্রকাণ্ড অপরিচিত জগৎকে আমরা এই বিশ্বাসেই প্রতি মুহূর্তে বিশ্বাস করি।

অথচ এই সামঞ্জস্য তো সহজ সামঞ্জস্য নয়— এ তো মেষে ছাগে সামঞ্জস্য নয়, এ যেন বাঘে গোরুতে এক ঘাটে জল খাওয়ানো। এই জগৎক্ষেত্রে যে-সব শক্তির লীলা, তাদের যেমন প্রচণ্ডতা তেমনি তাদের বিরুদ্ধতা— কেউ-বা পিছনের দিকে টানে, কেউ-বা সামনের দিকে ঠেলে, কেউ-বা গুটিয়ে আনে কেউ-বা ছড়িয়ে ফেলে, কেউ-বা বজ্রমুষ্টিতে সমস্তকে তাল পাকিয়ে নিরেট করে ফেলবার জন্যে চাপ দিচ্ছে, কেউ-বা তার চক্রযন্ত্রের প্রবল আবর্তে সমস্তকে গুঁড়িয়ে দিয়ে দিগ্বিদিকে উড়িয়ে ফেলবার জন্যে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই-সমস্ত শক্তি অসংখ্যবেশে এবং অসংখ্যতালে ক্রমাগতই আকাশময় ছুটে চলেছে— তার বেগ, তার বল, তার লক্ষ্য, তার বিচিত্রতা আমাদের ধারণাশক্তির অতীত ; কিন্তু এই-সমস্ত প্রবলতা, বিরুদ্ধতা, বিচিত্রতার উপরে অধিষ্ঠিত অবিচলিত অখণ্ড সামঞ্জস্য। আমরা যখন জগৎকে কেবল তার কোনো একটামাত্র দিক থেকে দেখি তখন গতি এবং আঘাত এবং বিনাশ দেখি, কিন্তু সমগ্রকে যখন দেখি তখন দেখতে পাই নিস্তব্ধ সামঞ্জস্য। এই সামঞ্জস্যই হচ্ছে তাঁর স্বরূপ যিনি শান্তংশিবমদ্বৈতম্। জগতের মধ্যে সামঞ্জস্য তিনি শান্তম্, সমাজের মধ্যে সামঞ্জস্য তিনি শিবম্, আত্মার মধ্যে সামঞ্জস্য তিনি অদ্বৈতম্।

আমাদের আত্মার যে-সত্যসাধনা তার লক্ষও এই দিকে, এই পরিপূর্ণতার দিকে— এই শান্ত শিব অদ্বৈতের দিকে, কখনোই প্রমত্ততার দিকে নয়। আমাদের যিনি ভগবান তিনি কখনোই প্রমত্ত নন ; নিরবচ্ছিন্ন সৃষ্টিপরম্পরার ভিতর দিয়ে অনন্ত দেশ ও অনন্ত কাল এই কথারই কেবল সাক্ষ্য দিচ্ছে। এষ সেতুর্বিধরণো লোকানামসম্ভেদায়।

এই অপ্রমত্ত পরিপূর্ণ শান্তিকে লাভ করবার অভিপ্রায় একদিন এই ভারতবর্ষের সাধনার মধ্যে ছিল। উপনিষদে ভগবদ্গীতায় আমরা এর পরিচয় যথেষ্ট পেয়েছি।

মাঝখানে ভারতবর্ষে বৌদ্ধযুগের যখন আধিপত্য হল, তখন আমাদের সেই সনাতন পরিপূর্ণতার সাধনা নির্বাণের সাধনার আকার ধারণ করলে। স্বয়ং বুদ্ধের মনে এই নির্বাণ শব্দটির অর্থ যে কী ছিল, তা এখানে আলোচনা করে কোনো ফল নেই, কিন্তু

দুঃখের হাত থেকে নিস্তার পাবার জন্যে শূন্যতার মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করাই যে চরম সিদ্ধি, এই ধারণা বৌদ্ধযুগের পর হতে নানা আকারে ন্যূনাধিক পরিমাণে সমস্ত ভারতবর্ষে ছড়িয়ে গিয়েছে।

এমনি করে পূর্ণতার শান্তি একদিন শূন্যতার শান্তি আকারে ভারতবর্ষের সাধনাক্ষেত্রে দেখা দিয়েছিল। সমস্ত বাসনাকে নিরস্ত ক'রে সমস্ত প্রবৃত্তির মূলোচ্ছেদ করে দিয়ে তবেই পরম শ্রেয়কে লাভ করা যায়, এই মত যেদিন থেকে ভারতবর্ষে তার সহস্র মূল বিস্তার করে দাঁড়ালো, সেইদিন থেকে ভারতবর্ষের সাধনায় সামঞ্জস্যের স্থলে রিক্ততা এসে দাঁড়ালো,— সেইদিন থেকে প্রাচীন তাপসাশ্রমের স্থলে আধুনিক কালের সন্ন্যাসাশ্রম প্রবল হয়ে উঠল এবং উপনিষদের পূর্ণস্বরূপ ব্রহ্ম শঙ্করাচার্যের শূন্যস্বরূপ ব্রহ্মরূপে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদে পরিণত হলেন।

কেবলমাত্র কঠোর চিন্তার জোরে মানুষ নিজের বাসনা ও প্রবৃত্তিকে মুছে ফেলে জগদ্‌ব্রহ্মাণ্ডকে বাদ দিয়ে শরীরের প্রাণক্রিয়াকে অবরুদ্ধ ক'রে একটি গুণলেশহীন অবচ্ছিন্ন (abstract) সত্তার ধ্যানে নিযুক্ত থাকতেও পারে, কিন্তু দেহমনহৃদয়বিশিষ্ট সমগ্র মানুষের পক্ষে এ-রকম অবস্থায় অবস্থিতি করা অসম্ভব এবং সে তার পক্ষে কখনোই প্রার্থনীয় হতে পারে না। এই কারণেই তখনকার জ্ঞানীরা যাকে মানুষের চরম শ্রেয় বলে মনে করতেন, তাকে সকল মানুষের সাধ্য বলে গণ্যই করতেন না। এই কারণে এই শ্রেয়ের পথে তাঁরা বিশ্বসাধারণকে আহ্বান করতেই পারতেন না— বরঞ্চ অধিকাংশকেই অনধিকারী বলে ঠেকিয়ে রাখতেন এবং এই সাধারণ লোকেরা মূঢ়ভাবে যে-কোনো বিশ্বাস ও সংস্কারকে আশ্রয় করত, তাকে তাঁরা সকরুণ অবজ্ঞাভরে প্রশ্রয় দিতেন। যেখানে যেটা যেমনভাবে আছে ও চলছে তাই নিয়েই সাধারণ মানুষ সন্তুষ্ট থাকুক এই তাঁদের কথা ছিল— কারণ, সত্য মানুষের পক্ষে এতই সুদূর, এতই দুরধিগম্য এবং সত্যকে পেতে গেলে নিজের স্বভাবকে মানুষের এমনি সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত করে দিতে হয়!

দেশের জ্ঞান এবং দেশের অজ্ঞানের মধ্যে, দেশের সাধনা এবং দেশের সংসারযাত্রার মধ্যে, এতবড়ো একটা বিচ্ছেদ কখনোই সুস্থভাবে স্থায়ী হতে পারে না। বিচ্ছেদ যেখানে একান্ত প্রবল, সেখানে বিপ্লব না এসে তার সমন্বয় হয় না— কি রাষ্ট্রতন্ত্রে, কি সমাজতন্ত্রে, কি ধর্মতন্ত্রে।

আমাদের দেশেও তাই হল। মানুষের সাধনাক্ষেত্র থেকে জ্ঞানী যে-হৃদয়পদার্থকে অত্যন্ত জোর করে একেবারে সম্পূর্ণ নির্বাসিত করে দিয়েছিল সেই হৃদয় অত্যন্ত জোরের সঙ্গেই অধিকার-অনধিকারের বেড়া চুরমার করে ভেঙে বন্যার বেগে দেখতে

দেখতে একেবারে চতুর্দিক প্লাবিত করে দিলে ; অনেকদিন পরে সাধনার ক্ষেত্রে মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলন খুব ভরপুর হয়ে উঠল।

এখন আবার সকলে একেবারে উলটো সুর এই ধরলে যে, হৃদয়বৃত্তির চরিতার্থতাই মানুষের সিদ্ধির চরম পরিচয়। হৃদয়বৃত্তির অত্যন্ত উত্তেজনার যে-সমস্ত দৈহিক ও মানসিক লক্ষণ আছে, সাধনায় সেইগুলির প্রকাশই মানুষের কাছে একান্ত শ্রদ্ধালাভ করতে লাগল।

এই অবস্থায় স্বভাবত মানুষ আপনার ভগবানকেও প্রমত্ত আকারে দেখতে লাগল। তাঁর আর-সমস্তকেই খর্ব করে কেবলমাত্র তাঁকে হৃদয়াবেগচাঞ্চল্যের মধ্যেই একান্ত করে উপলব্ধি করতে লাগল এবং সেই-রকম উপলব্ধি থেকে যে একটি নিরতিশয় ভাববিহ্বলতা জন্মায়, সেইটেকেই উপাসনার পরাকাষ্ঠা বলে গণ্য করে নিলে।

কিন্তু ভগবানকে এই-রকম করে দেখাও তাঁর সমগ্রতা থেকে তাঁকে অবচ্ছিন্ন করে দেখা। কারণ মানুষ কেবলমাত্র হৃদয়পুঞ্জ নয়, এবং নানাপ্রকার উপায়ে শরীরমনের সমস্ত শক্তিকে কেবলমাত্র হৃদয়াবেগের ধারায় প্রবাহিত করতে থাকলে কখনোই সর্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্বের যোগে ঈশ্বরের সঙ্গে যোগসাধন হতে পারে না।

হৃদয়াবেগকেই চরমরূপে যখন প্রাধান্য দেওয়া হয়, তখনি মানুষ এমন কথা অনায়াসে বলতে পারে যে, ভক্তিপূর্বক মানুষ যাকেই পূজা করুক-না কেন, তাতেই তার সফলতা। অর্থাৎ, যেন পূজার বিষয়টি ভক্তিকে জাগিয়ে তোলবার একটা উপায়মাত্র ; যার একটা উপায়ে ভক্তি না জন্মে, তাকে অন্য যা-হয় একটা উপায় জুগিয়ে দেওয়ায় যেন কোনো বাধা নেই। এই অবস্থায় উপলক্ষটা যাই হ'ক, ভক্তির প্রবলতা দেখলেই আমাদের মনে শ্রদ্ধার উদয় হয়— কারণ, প্রমত্ততাকেই আমরা সিদ্ধি বলে মনে করি।

এই-রকম হৃদয়াবেগের প্রমত্ততাকেই আমরা অসামান্য আধ্যাত্মিক শক্তির লক্ষণ বলে মনে করি, তার কারণ আছে। যেখানে সামঞ্জস্য নষ্ট হয়, সেখানে শক্তিপুঞ্জ একদিকে কাত হয়ে পড়ে বলেই তার প্রবলতা চোখে পড়ে। কিন্তু সে তো একদিক থেকে চুরি করে অন্যদিককে স্ফীত করা। যেদিক থেকে চুরি হয় সেদিক থেকে নালিশ ওঠে ; তার শোধ দিতেই হয় এবং তার শাস্তি না পেয়ে নিষ্কৃতি হয় না। সমস্ত চিত্তবৃত্তিকে কেবলমাত্র হৃদয়াবেগের মধ্যে প্রতিসংহরণের চর্চায় মানুষ কখনোই মনুষ্যত্বলাভ করে না এবং মনুষ্যত্বের যিনি চরম লক্ষ্য তাঁকেও লাভ করতে পারে না।

নিজের মনের ভক্তির চরিতার্থতাই যখন মানুষের প্রধান লক্ষ্য হয়ে উঠল, বস্তুত দেবতা যখন উপলক্ষ হয়ে উঠলেন এবং ভক্তিকে ভক্তি করাই যখন নেশার মতো ক্রমশই উগ্র হয়ে উঠতে লাগল, মানুষ যখন পূজা করবার আবেগটাকেই প্রার্থনা করলে, কাকে পূজা করতে হবে সেদিকে চিন্তামাত্র প্রয়োগ করলে না এবং এই কারণেই যখন তার

পুজার সামগ্রী দ্রুতবেগে যেখানে-সেখানে যেমন-তেমন ভাবে নানা আকার ও নানা নাম ধরে অজস্র অপরিমিত বেড়ে উঠল, এবং সেইগুলিকে অবলম্বন করে নানা সংস্কার নানা কাহিনী নানা আচারবিচার জড়িত বিজড়িত হয়ে উঠতে লাগল ;— জগদ্‌ব্যাপারের সর্বত্রই একটা জ্ঞানের ন্যায়ের নিয়মের অমোঘ ব্যবস্থা আছে এই ধারণা যখন চতুর্দিকে ধূলিসাৎ হতে চলল, তখন সেই অবস্থায় আমাদের দেশে সত্যের সঙ্গে রসের, জ্ঞানের সঙ্গে ভক্তির একান্ত বিচ্ছেদ ঘটে গেল।

একদা বৈদিক যুগে কর্মকাণ্ড যখন প্রবল হয়ে উঠেছিল, তখন নিরর্থক কর্মই মানুষকে চরমরূপে অধিকার করেছিল ; কেবল নানা জটিল নিয়মে বেদি সাজিয়ে, কেবল মন্ত্র প'ড়ে, কেবল আহুতি ও বলি দিয়ে মানুষ সিদ্ধিলাভ করতে পারে, এই ধারণাই একান্ত হয়ে উঠেছিল ; তখন মন্ত্র এবং অনুষ্ঠানই, দেবতা এবং মানুষের হৃদয়ের চেয়ে বড়ো হয়ে দাঁড়ালো। তার পরে জ্ঞানের সাধনার যখন প্রাদুর্ভাব হল, তখন মানুষের পক্ষে জ্ঞানই একমাত্র চরম হয়ে উঠল— কারণ, যাঁর সম্বন্ধে জ্ঞান তিনি নির্গুণ নিষ্ক্রিয়, সুতরাং তাঁর সঙ্গে আমাদের কোনোপ্রকার সম্বন্ধ হতেই পারে না ; এ অবস্থায় ব্রহ্মজ্ঞান-নামক পদার্থটাতে জ্ঞানই সমস্ত, ব্রহ্ম কিছুই নয় বললেই হয়। একদিন নিরর্থক কর্মই চূড়ান্ত ছিল ; জ্ঞান ও হৃদ্‌বৃত্তিকে সে লক্ষ্যই করে নি, তার পরে যখন জ্ঞান বড়ো হয়ে উঠল তখন সে আপনার অধিকার থেকে হৃদয় ও কর্ম উভয়কে নির্বাসিত করে দিয়ে নিরতিশয় বিশুদ্ধ হয়ে থাকবার চেষ্টা করলে। তার পরে ভক্তি যখন মাথা তুলে দাঁড়ালো তখন সে জ্ঞানকে পায়ের তলায় চেপে ও কর্মকে রসের স্রোতে ভাসিয়ে দিয়ে একমাত্র নিজেই মানুষের পরম স্থানটি সম্পূর্ণ জুড়ে বসল, দেবতাকেও সে আপনার চেয়ে ছোটো করে দিলে, এমন-কি, ভাবের আবেগকে মথিত করে তোলবার জন্যে বাহিরে কৃত্রিম উত্তেজনার বাহ্যিক উপকরণগুলিকেও আধ্যাত্মিক সাধনার অঙ্গ করে নিলে।

এইরূপ গুরুতর আত্মবিচ্ছেদের উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে মানুষ চিরদিন বাস করতে পারে না। এই অবস্থায় মানুষ কেবল কিছুকাল পর্যন্ত নিজের প্রকৃতির একাংশের তৃপ্তিসাধনের নেশায় বিহ্বল হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু তার সর্বাংশের ক্ষুধা একদিন না জেগে উঠে থাকতে পারে না।

সেই পূর্ণ মনুষ্যত্বের সর্বাঙ্গীণ আকাঙ্ক্ষাকে বহন করে এ দেশে রামমোহন রায়ের আবির্ভাব হয়েছিল। ভারতবর্ষে তিনি-যে কোনো নূতন ধর্মের সৃষ্টি করেছিলেন তা নয় ; ভারতবর্ষে যেখানে ধর্মের মধ্যে পরিপূর্ণতার রূপ চিরদিনই ছিল, যেখানে বৃহৎ সামঞ্জস্য, যেখানে শান্তংশিবমদ্বৈতম্, সেইখানকার সিংহদ্বার তিনি সর্বসাধারণের কাছে উদ্‌ঘাটিত করে দিয়েছিলেন।

সত্যের এই পরিপূর্ণতাকে, এই সামঞ্জস্যকে পাবার ক্ষুধা যে কি-রকম প্রবল, এবং তাকে আপনার মধ্যে কি-রকম করে গ্রহণ ও ব্যক্ত করতে হয়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সমস্ত জীবনে সেইটেই প্রকাশ হয়েছে।

তাঁর স্নেহময়ী দিদিমার মৃত্যুশোকের আঘাতে মহর্ষির ধর্মজীবন প্রথম জাগ্রত হয়ে উঠেই যে-ক্ষুধার কান্না কেঁদেছে, তার মধ্যে একটি বিস্ময়কর বিশেষত্ব আছে।

শিশু যখন খেলবার জন্যে কাঁদে তখন হাতের কাছে যে-কোনো একটা খেলনা পাওয়া যায় তাই দিয়েই তাকে ভুলিয়ে রাখা সহজ, কিন্তু সে যখন মাতৃস্তন্যের জন্যে কাঁদে তখন তাকে আর-কিছু দিয়েই ভোলাবার উপায় নেই। যে-লোক নিজের বিশেষ একটা হৃদয়াবেগকে কোনো-একটা কিছুতে প্রয়োগ করবার ক্ষেত্রমাত্র চায়, তাকে থামিয়ে রাখবার জিনিস জগতে অনেক আছে— কিন্তু কেবলমাত্র ভাবসম্ভোগ যার লক্ষ্য নয়, যে সত্য চায়, সে তো ভুলতে চায় না, সে পেতে চায়। কাজেই, সত্য কোথায় পাওয়া যাবে এই সন্ধানে তাকে সাধনার পথে বেরোতেই হবে— তাতে বাধা আছে, দুঃখ আছে, তাতে বিলম্ব ঘটে, তাতে আত্মীয়েরা বিরোধী হয়, সমাজের কাছ থেকে আঘাত বর্ষিত হতে থাকে— কিন্তু উপায় নেই, তাকে সমস্তই স্বীকার করতে হয়।

এই-যে সত্যকে পাবার ইচ্ছা এ কেবল জিজ্ঞাসামাত্র নয়, কেবল জ্ঞানে পাবার ইচ্ছা নয়, এর মধ্যে হৃদয়ের দুঃসহ ব্যাকুলতা আছে— তাঁর ছিল সত্যকে কেবল জ্ঞানরূপে নয়, আনন্দরূপে পাবার বেদনা। এইখানে তাঁর প্রকৃতি স্বভাবতই একটি সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যকে চাচ্ছিল। আমাদের দেশে এক সময়ে বলেছিল ব্রহ্মসাধনার ক্ষেত্রে ভক্তির স্থান নেই এবং ভক্তিসাধনার ক্ষেত্রে ব্রহ্মের স্থান নেই, কিন্তু মহর্ষি ব্রহ্মকে চেয়েছিলেন জ্ঞানে এবং ভক্তিতে, অর্থাৎ সমস্ত প্রকৃতি দিয়ে সম্পূর্ণ করে তাঁকে চেয়েছিলেন— এইজন্যে ক্রমাগত নানা কষ্ট নানা চেষ্টা নানা গ্রহণবর্জনের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে যতক্ষণ তাঁর চিত্ত তাঁর অমৃতময় ব্রহ্মে, তাঁর আনন্দের ব্রহ্মে গিয়ে না ঠেকেছিল ততক্ষণ একমুহূর্ত তিনি থামতে পারেন নি।

এই কারণে তাঁর জীবনে ব্রহ্মজ্ঞান একটি বিশেষত্ব লাভ করেছিল এই যে, সে জ্ঞানকে সর্বসাধারণের কাছে না ধরে তিনি ক্ষান্ত হন নি।

জ্ঞানীর ব্রহ্মজ্ঞান কেবল জ্ঞানীর গণ্ডির মধ্যেই বদ্ধ থাকে। সেইজন্যেই এ দেশের লোকে অনেক সময়েই বলে থাকে, ব্রহ্মজ্ঞানের আবার প্রচার কী।

কিন্তু ব্রহ্মকে যিনি হৃদয়ের দ্বারা উপলব্ধি করেছেন তিনি এ-কথা বুঝেছেন— ব্রহ্মকে

পাওয়া যায়, হৃদয়ের মধ্যে প্রত্যক্ষ পাওয়া যায়— শুধু জ্ঞানে জানা যায় তা নয়, রসে পাওয়া যায়, কেননা সমস্ত রসের সার তিনি— রসো বৈ সঃ। যিনি হৃদয় দিয়ে ব্রহ্মকে পেয়েছেন, তিনি উপনিষদের এই মহাবাক্যের অর্থ বুঝেছেন—

যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন।

জ্ঞান যখন তাঁকে পেতে চায় এবং বাক্য প্রকাশ করতে চায় তখন বারবার ফিরে ফিরে আসে, কিন্তু আনন্দ দিয়ে যখন সেই আনন্দের যোগ হয় তখন সেই প্রত্যক্ষ যোগে সমস্ত ভয় সমস্ত সংশয় দূর হয়ে যায়।

আনন্দের মধ্যে সমস্ত বোধের পরিপূর্ণতা— মন ও হৃদয়ের, জ্ঞান ও ভক্তির অখণ্ড যোগ।

আনন্দ যখন জাগে তখন সকলকে সে আহ্বান করে ; সে গণ্ডির মধ্যে আপনাকে নিয়ে আপনি রুদ্ধ হয়ে বসে থাকতে পারে না। সে এ-কথা কাউকে বলে না যে 'তুমি দুর্বল, তোমার সাধ্য নেই', কেননা আনন্দের কাছে কোনো কঠিনতাই কঠিন নয়— আনন্দ সেই আনন্দের ধনকে এতই একান্ত ক'রে এতই নিবিড় ক'রে দেখে যে, সে তাঁকে দুষ্প্রাপ্য ব'লে কোনো লোককেই বঞ্চিত করতে চায় না— পথ যত দীর্ঘ যত দুর্গম হ'ক-না, এই পরমলাভের কাছে সে কিছুই নয়।

এই কারণে পৃথিবীতে এ-পর্যন্ত যে-কোনো মহাত্মা আনন্দ দিয়ে তাঁকে লাভ করেছেন, তাঁরা অমৃতভাণ্ডারের দ্বার বিশ্বজনের কাছে খুলে দেবার জন্যেই দাঁড়িয়েছেন —আর যাঁরা কেবলমাত্র জ্ঞান বা কেবলমাত্র আচারের মধ্যে নিবিষ্ট, তাঁরাই পদে পদে ভেদবিভেদের দ্বারা মানুষের পরস্পর মিলনের উদার ক্ষেত্রকে একেবারে কণ্টকাকীর্ণ করে দেন। তাঁরা কেবল না-এর দিক থেকে সমস্ত দেখেন, হাঁ-এর দিক থেকে নয়— এইজন্যে তাঁদের ভরসা নেই, মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা নেই এবং ব্রহ্মকেও তাঁরা নিরতিশয় শূন্যতার মধ্যে নির্বাসিত করে রেখে দেন।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের চিত্তে যখন ধর্মের ব্যাকুলতা প্রবল হল তখন তিনি-যে অনন্ত নেতি নেতিকে নিয়ে পরিতৃপ্ত হতে পারেন নি সেটা আশ্চর্যের বিষয় নয়, কিন্তু তিনি-যে সেই ব্যাকুলতার বেগে সমাজের পরিবারের চিরসংস্কারগত অভ্যস্ত পথে তাঁর ব্যথিত হৃদয়কে সমর্পণ করে দিয়ে কোনোমতে তার কান্নাকে থামিয়ে রাখতে চেষ্টা করেন নি এইটেই বিস্ময়ের বিষয়। তিনি কাকে চাচ্ছেন তা ভালো করে জানবার পূর্বেই তাঁকেই চেয়েছিলেন— জ্ঞান যাঁকে চিরকালই জানতে চায় এবং প্রেম যাঁকে চিরকালই পেতে থাকে।

এইজন্য জীবনের মধ্যে তিনি সেই ব্রহ্মকে গ্রহণ করলেন— পরিমিত পদার্থের মতো করে যাঁকে পাওয়া যায় না এবং শূন্যপদার্থের মতো যাঁকে না-পাওয়া যায় না— যাঁকে পেতে গেলে একদিকে জ্ঞানকে খর্ব করতে হয় না, অন্যদিকে প্রেমকে উপবাসী করে মারতে হয় না— যিনি বস্তুবিশেষের দ্বারা নির্দিষ্ট নন অথবা বস্তুশূন্যতার দ্বারা অনির্দিষ্ট নন— যাঁর সম্বন্ধে উপনিষদ্ বলেছেন যে, যে তাঁকে বলে আমি জানি সেও তাঁকে জানে না, যে বলে আমি জানি নে সেও তাঁকে জানে। এক কথায় যাঁর সাধনা হচ্ছে পরিপূর্ণ সামঞ্জস্যের সাধনা।

যাঁরা মহর্ষির জীবনী পড়েছেন তাঁরা সকলেই দেখেছেন, ভগবৎপিপাসা যখন তাঁর প্রথম জাগ্রত হয়ে উঠেছিল তখন কি-রকম দুঃসহ বেদনার মধ্যে তাঁর হৃদয়কে তরঙ্গিত করে তুলেছিল। অথচ তিনি যখন ব্রহ্মানন্দের রসাস্বাদ করতে লাগলেন তখন তাঁকে উদ্দাম ভাবোন্মাদে আত্মবিস্মৃত করে দেয় নি। কারণ, তিনি যাঁকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তিনি শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্— তাঁর মধ্যে সমস্ত শক্তি, সমস্ত জ্ঞান, সমস্ত প্রেম অতলস্পর্শ পরিপূর্ণতায় পর্যাপ্ত হয়ে আছে। তাঁর মধ্যে বিশ্বচরাচর শক্তিতে ও সৌন্দর্যে নিত্যকাল তরঙ্গিত হচ্ছে— সে তরঙ্গ সমুদ্রকে ছাড়িয়ে চলে যায় না, এবং সমুদ্র সেই তরঙ্গের দ্বারা আপনাকে উদ্‌বেল করে তোলে না। তাঁর মধ্যে অনন্ত শক্তি বলেই শক্তির সংযম এমন অটল, অনন্ত রস বলেই রসের গাম্ভীর্য এমন অপরিমেয়।

এই শক্তির সংযমে এই রসের গাম্ভীর্যে মহর্ষি চিরদিন আপনাকে ধারণ করে রেখেছিলেন, কারণ, ভূমার মধ্যেই আত্মাকে উপলব্ধি করবার সাধনা তাঁর ছিল। যাঁরা আধ্যাত্মিক অসংযমকেই আধ্যাত্মিক শক্তির পরিচয় বলে মনে করেন তাঁরা এই অবিচলিত শান্তির অবস্থাকেই দারিদ্র্য বলে কল্পনা করেন, তাঁরা প্রমত্ততার মধ্যে বিপর্যস্ত হয়ে পড়াকেই ভক্তির চরম অবস্থা বলে জানেন। কিন্তু যাঁরা মহর্ষিকে কাছে থেকে দেখেছেন, বস্তুত যাঁরা কিছুমাত্র তাঁর পরিচয় পেয়েছেন, তাঁরা জানেন যে তাঁর প্রবল সংযম ও প্রশান্ত গাম্ভীর্য ভক্তিরসের দীনতাজনিত নয়। প্রাচীন ভারতের তপোবনের ঋষিরা যেমন তাঁর গুরু ছিলেন, তেমনি পারস্যের সৌন্দর্যকুঞ্জের বুলবুল হাফেজ তাঁর বন্ধু ছিলেন। তাঁর জীবনের আনন্দপ্রভাতে উপনিষদের শ্লোকগুলি ছিল প্রভাতের আলোক এবং হাফেজের কবিতাগুলি ছিল প্রভাতের গান। হাফেজের কবিতার মধ্যে যিনি আপনার রসোচ্ছ্বাসের সাড়া পেতেন, তিনি যে তাঁর জীবনেশ্বরকে কি-রকম নিবিড় রসবেদনাপূর্ণ মাধুর্যঘন প্রেমের সঙ্গে অন্তরে বাহিরে দেখেছিলেন, সে কথা অধিক করে বলাই বাহুল্য।

ঐকান্তিক জ্ঞানের সাধনা যেমন শুষ্ক বৈরাগ্য আনে, ঐকান্তিক রসের সাধনাও তেমনি ভাববিহ্বলতার বৈরাগ্য নিয়ে আসে। সে অবস্থায় কেবলই রসের নেশায় আবিষ্ট হয়ে থাকতে ইচ্ছা করে, আর-সমস্তের প্রতি একান্ত বিতৃষ্ণা জন্মে এবং কর্মের বন্ধনমাত্রকে অসহ্য বলে বোধ হয়। অর্থাৎ মনুষ্যত্বের কেবল একটিমাত্র দিক অত্যন্ত প্রবল হয়ে ওঠাতে অন্য সমস্ত দিক একেবারে রিক্ত হয়ে যায়, তখন আমরা ভগবানের উপাসনাকে কেবলই একটিমাত্র অংশে অত্যুগ্র করে তুলি, এবং অন্য-সকল দিক থেকেই তাকে শূন্য করে রাখি।

ভগবৎলাভের জন্য একান্ত ব্যাকুলতা সত্ত্বেও এই-রকম সামঞ্জস্যচ্যুত বৈরাগ্য মহর্ষির চিত্তকে কোনোদিন অধিকার করে নি। তিনি সংসারকে ত্যাগ করেন নি, সংসারের সুরকে ভগবানের ভক্তিতে বেঁধে তুলেছিলেন। ঈশ্বরের দ্বারা সমস্তকেই আচ্ছন্ন করে দেখবে, উপনিষদের এই উপদেশবাক্য অনুসারে তিনি তাঁর সংসারের বিচিত্র সম্বন্ধ ও বিচিত্র কর্মকে ঈশ্বরের দ্বারাই পরিব্যাপ্ত করে দেখবার তপস্যা করেছিলেন। কেবল নিজের পরিবার নয়, জনসমাজের মধ্যেও ব্রহ্মকে উপলব্ধি করবার সমস্ত বিঘ্ন দূর করতে তিনি চিরজীবন চেষ্টা করেছেন। এইজন্য এই শান্তিনিকেতনের বিশাল প্রান্তরের মধ্যেই হ'ক আর হিমালয়ের নিভৃত গিরিশিখরেই হ'ক, নির্জন সাধনায় তাঁকে বেঁধে রাখতে পারে নি। তাঁর ব্রহ্ম একলার ব্রহ্ম নয়— তাঁর ব্রহ্ম শুধু জ্ঞানীর ব্রহ্ম নয়, শুধু ভক্তের ব্রহ্মও নয়, তাঁর ব্রহ্ম নিখিলের ব্রহ্ম; নির্জনে তাঁর ধ্যান, সজনে তাঁর সেবা; অন্তরে তাঁর স্মরণ, বাহিরে তাঁর অনুসরণ; জ্ঞানের দ্বারা তাঁর তত্ত্ব-উপলব্ধি, হৃদয়ের দ্বারা তাঁর প্রতি প্রেম, চরিত্রের দ্বারা তাঁর প্রতি নিষ্ঠা এবং কর্মের দ্বারা তাঁর প্রতি আত্মনিবেদন। এই যে পরিপূর্ণস্বরূপ ব্রহ্ম, সর্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ উৎকর্ষের দ্বারাই আমরা যাঁর সঙ্গে যুক্ত হতে পারি— তাঁর যথার্থ সাধনাই হচ্ছে তাঁর যোগে সকলের সঙ্গে যুক্ত হওয়া এবং সকলের যোগে তাঁরই সঙ্গে যুক্ত হওয়া— দেহ মন হৃদয়ের সমস্ত শক্তি দ্বারাই তাঁকে উপলব্ধি করা এবং তাঁর উপলব্ধির দ্বারা দেহমন-হৃদয়ের সমস্ত শক্তিকে বলশালী করা— অর্থাৎ পরিপূর্ণ সামঞ্জস্যের পথকে গ্রহণ করা। মহর্ষি তাঁর ব্যাকুলতার দ্বারা এই সম্পূর্ণতাকেই চেয়েছিলেন এবং তাঁর জীবনের দ্বারা একেই নির্দেশ করেছিলেন।

ব্রহ্মের উপাসনা কাকে বলে সে সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য-সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব— তাঁতে প্রীতি করা এবং তাঁর প্রিয়কার্য সাধন করাই তাঁর উপাসনা। এ-কথা মনে রাখতে হবে, আমাদের দেশে ইতিপূর্বে তাঁর প্রতি প্রীতি এবং তাঁর প্রিয়কার্য-সাধন, এই উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে গিয়েছিল। অন্তত

প্রিয়কার্য শব্দের অর্থকে আমরা অত্যন্ত সংকীর্ণ করে এনেছিলুম; ব্যক্তিগত শুচিতা এবং কতকগুলি আচার পালনকেই আমরা ঈশ্বরের প্রিয়কার্য বলে স্থির করে রেখেছিলুম। কর্ম যেখানে দুঃসাধ্য, যেখানে কঠোর, কর্মে যেখানে যথার্থ বীর্যের প্রয়োজন, যেখানে বাধার সঙ্গে সংগ্রাম করতে হবে, যেখানে অমঙ্গলের কণ্টকতরুকে রক্তাক্ত হস্তে সমূলে উৎপাটন করতে হবে, যেখানে অপমান নিন্দা নির্যাতন স্বীকার ক'রে প্রাচীন অভ্যাসের স্থূল জড়ত্বকে কঠিন দুঃখে ভেদ ক'রে জনসমাজের মধ্যে কল্যাণের প্রতিষ্ঠা করতে হবে, সেইদিকে আমরা দেবতার উপাসনাকে স্বীকার করি নি। দুর্বলতাবশতই এই পূর্ণ উপাসনায় আমাদের অনাস্থা ছিল এবং অনাস্থা ছিল বলেই আমাদের দুর্বলতা এ-পর্যন্ত কেবলই বেড়ে এসেছে। ভগবানের প্রতি প্রীতি ও তাঁর প্রিয়কার্যসাধনের মাঝখানে আমাদের চরিত্রের মজ্জাগত দুর্বলতা যে-বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিয়েছিল সেই বিচ্ছেদ মিটিয়ে দেবার পথে একদিন মহর্ষি একলা দাঁড়িয়েছিলেন— তখন তাঁর মাথার উপরে বৈষয়িক বিপ্লবের প্রবল ঝড় বইতেছিল এবং চতুর্দিকে বিচ্ছিন্ন পরিবার ও বিরুদ্ধ সমাজের সর্বপ্রকার আঘাত এসে পড়ছিল, তারই মাঝখানে অবিচলিত শক্তিতে একাকী দাঁড়িয়ে তিনি তাঁর বাক্যে ও ব্যবহারে এই মন্ত্র ঘোষণা করেছিলেন— তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ভারতবর্ষ তার দুর্গতিদুর্গের যে রুদ্ধ দ্বারে শতাব্দীর পর শতাব্দী যাপন করেছে— আপনার ধর্মকে সমাজকে, আপনার আচারব্যবহারকে কেবলমাত্র আপনার কৃত্রিম গণ্ডির মধ্যে বেষ্টিত করে বসে রয়েছে, সেই দ্বার বাইরের পৃথিবীর প্রবল আঘাতে আজ ভেঙে গেছে; আজ আমরা সকলের কাছে প্রকাশিত হয়ে পড়েছি, সকলের সঙ্গে আজ আমাদের নানাপ্রকার ব্যবহারে আসতে হয়েছে। আজ আমাদের যেখানে চরিত্রের দীনতা, জ্ঞানের সংকীর্ণতা, হৃদয়ের সংকোচ, যেখানে যুক্তিহীন আচারের দ্বারা আমাদের শক্তিপ্রয়োগের পথ পদে পদে বাধাগ্রস্ত হয়ে উঠছে, যেখানেই লোকব্যবহারে ও দেবতার উপাসনায় মানুষের সঙ্গে মানুষের দুর্ভেদ্য ব্যবধানে আমাদের শতখণ্ড করে দিচ্ছে, সেইখানেই আমাদের আঘাতের পর আঘাত, লজ্জার পর লজ্জা পেতে হচ্ছে,— সেইখানেই অকৃতার্থতা বারম্বার আমাদের সমস্ত চেষ্টাকে ধূলিসাৎ করে দিচ্ছে এবং সেইখানেই প্রবলবেগে চলনশীল মানবস্রোতের অভিঘাত সহ্য করতে না পেরে আমরা মূর্ছিত হয়ে পড়ে যাচ্ছি— এই-রকম সময়েই যে-সকল মহাপুরুষ আমাদের দেশে মঙ্গলের জয়ধ্বজা বহন করে আবির্ভূত হবেন তাঁদের ব্রতই হবে জীবনের সাধনার ও সিদ্ধির মধ্যে সত্যের সেই বৃহৎ সামঞ্জস্যকে সমুজ্জ্বল করে তোলা যাতে ক'রে এখানকার

জনসমাজের সেই সাংঘাতিক বিশ্লিষ্টতা দূর হবে— যে-বিশ্লিষ্টতা এ দেশে অন্তরের সঙ্গে বাহিরের, আচারের সঙ্গে ধর্মের, জ্ঞানের সঙ্গে ভক্তির, বিচারশক্তির সঙ্গে বিশ্বাসের, মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রবল বিচ্ছেদ ঘটিয়ে আমাদের মনুষ্যত্বকে শতজীর্ণ করে ফেলছে।

ধনীগৃহের প্রচুর বিলাসের আয়োজনের মধ্যে জন্মগ্রহণ ক'রে এবং আচারনিষ্ঠ সমাজের কুলক্রমাগত প্রথার মধ্যে পরিবেষ্টিত হয়ে মহর্ষি নিজের বিচ্ছেদকাতর আত্মার মধ্যে এই সামঞ্জস্য-অমৃতের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন; নিজের জীবনে চিরদিন সমস্ত লাভক্ষতি সমস্ত সুখদুঃখের মধ্যে এই সামঞ্জস্যের সাধনাকে গ্রহণ করেছিলেন এবং বাহিরে সমস্ত বাধাবিরোধের মধ্যে 'শান্তংশিবমদ্বৈতম্' এই সামঞ্জস্যের মন্ত্রটি অকুণ্ঠিত কণ্ঠে প্রচার করেছিলেন। তাঁর জীবনের অবসান পর্যন্ত এই দেখা গেছে যে তাঁর চিত্ত কোনো বিষয়েই নিশ্চেষ্ট ছিল না— ঘরে বাইরে, শয়নে আসনে, আহারে ব্যবহারে, আচারে অনুষ্ঠানে, কিছুতেই তাঁর লেশমাত্র শৈথিল্য বা অমনোযোগ ছিল না। কি গৃহকর্মে কি বিষয়কর্মে, কি সামাজিক ব্যাপারে কি ধর্মানুষ্ঠানে, সুনিয়মিত ব্যবস্থার স্খলন তিনি কোনো কারণেই অল্পমাত্রও স্বীকার করতেন না; সমস্ত ব্যাপারকেই তিনি ধ্যানের মধ্যে সমগ্রভাবে দেখতেন এবং একেবারে সর্বাঙ্গীণভাবে সম্পন্ন করতেন— তুচ্ছ থেকে বৃহৎ পর্যন্ত যা-কিছুর সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল তার কোনো অংশেই তিনি নিয়মের ব্যভিচার ও সৌন্দর্যের বিকৃতি সহ্য করতে পারতেন না। ভাষায় বা ভাবে বা ব্যবহারে কিছুমাত্র ওজন নষ্ট হলে তৎক্ষণাৎ তাঁকে আঘাত করত। তাঁর মধ্যে যে-দৃষ্টি, যে-ইচ্ছা, যে আধ্যাত্মিক শক্তি ছিল তা ছোটোবড়ো এবং আন্তরিক বাহ্যিক কিছুকেই বাদ দিত না, সমস্তকেই ভাবের মধ্যে মিলিয়ে নিয়মের মধ্যে বেঁধে কাজের মধ্যে সম্পন্ন ক'রে তুলে তবে স্থির হতে পারত। তাঁর জীবনের অবসান-পর্যন্ত দেখা গেছে, তাঁর ব্রহ্মসাধনা প্রাকৃতিক ও মানবিক কোনো বিষয়কেই অবজ্ঞা করে নি— সর্বত্রই তাঁর ঔৎসুক্য অক্ষুণ্ণ ছিল। বাল্যকালে আমি যখন তাঁর সঙ্গে ড্যালহৌসি পর্বতে একবার গিয়েছিলুম তখন দেখেছিলুম একদিকে যেমন তিনি অন্ধকার রাত্রে শয্যাত্যাগ করে পার্বত্য গৃহের বারান্দায় একাকী উপাসনার আসনে বসতেন, ক্ষণে ক্ষণে উপনিষৎ ও ক্ষণে ক্ষণে হাফেজের গান গেয়ে উঠতেন, দিনের মধ্যে থেকে থেকে ধ্যানে নিমগ্ন হতেন, সন্ধ্যাকালে আমার বালককণ্ঠের ব্রহ্মসংগীত শ্রবণ করতেন— তেমনি আবার জ্ঞান-আলোচনার সহায়স্বরূপ তাঁর সঙ্গে প্রক্টরের তিনখানি জ্যোতিষ্ক সম্বন্ধীয় বই, কাণ্টের দর্শন ও গিবনের 'রোমের ইতিহাস' ছিল— তা ছাড়া এদেশের ও ইংলণ্ডের সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্র হতে তিনি জ্ঞানে ও কর্মে বিশ্বপৃথিবীতে মানুষের

যা-কিছু পরিণতি ঘটছে, সমস্তই মনে-মনে পর্যবেক্ষণ করতেন। তাঁর চিত্তের এই সর্বব্যাপী সামঞ্জস্যবোধ তাঁকে তাঁর সংসারযাত্রায় ও ধর্মকর্মে সর্বপ্রকার সীমালঙ্ঘন হতে নিয়ত রক্ষা করেছে ;— গুরুবাদ ও অবতারবাদের উচ্ছৃঙ্খলতা হতে তাঁকে নিবৃত্ত করেছে এবং এই সামঞ্জস্যবোধ চিরন্তন সঙ্গীরূপে তাঁকে একান্ত দ্বৈতবাদের মধ্যে পথভ্রষ্ট বা একান্ত অদ্বৈতবাদের কুহেলিকারাজ্যে নিরুদ্দেশ হতে দেয় নি। এই সীমালঙ্ঘনের আশঙ্কা তাঁর মনে সর্বদা কি-রকম জাগ্রত ছিল, তার একটি উদাহরণ দিয়ে আমি শেষ করব। তখন তিনি অসুস্থ শরীরে পার্ক্ স্ট্রীটে বাস করতেন— একদিন মধ্যাহ্নে আমাদের জোড়াসাঁকোর বাটি থেকে তিনি আমাকে পার্ক্ স্ট্রীটে ডাকিয়ে নিয়ে বললেন, "দেখো, আমার মৃত্যুর পরে আমার চিতাভস্ম নিয়ে শান্তিনিকেতনে সমাধি স্থাপনের একটি প্রস্তাব আমি শুনেছি ; কিন্তু তোমার কাছে আমি বিশেষ করে বলে যাচ্ছি, কদাচ সেখানে আমার সমাধিরচনা করতে দেবে না।"— আমি বেশ বুঝতে পারলুম, শান্তিনিকেতন আশ্রমের যে-ধ্যানমূর্তি তাঁর মনের মধ্যে বিরাজ করছিল, সেখানে তিনি যে শান্ত শিব অদ্বৈতের আবির্ভাবকে পরিপূর্ণ আনন্দরূপে দেখতে পাচ্ছিলেন, তার মধ্যে তাঁর নিজের সমাধিস্তম্ভের কল্পনা সমগ্রের পবিত্রতা ও সৌন্দর্যকে সূচিবিদ্ধ করছিল— সেখানে তাঁর নিজের কোনো স্মরণচিহ্ন আশ্রমদেবতার মর্যাদাকে কোনোদিন পাছে লেশমাত্র অতিক্রম করে, সেদিন মধ্যাহ্নে এই আশঙ্কা তাঁকে স্থির থাকতে দেয় নি।

এই সাধক যে অসীম শান্তিকে আশ্রয় ক'রে আপনার প্রশান্ত গভীরতার মধ্যে অন্তুত্তরঙ্গ সমুদ্রের ন্যায় জীবনান্তকাল পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, সেই শান্তি তুমি, হে শান্ত, হে শিব! ভক্তের জীবনের মধ্য হতে তোমার সেই শান্তস্বরূপ উজ্জ্বলভাবে আমাদের জীবনে আজ প্রতিফলিত হ'ক। তোমার সেই শান্তিই সমস্ত ভুবনের প্রতিষ্ঠা, সকল বলের আধার। অসংখ্য বহুধা শক্তি তোমার এই নিস্তব্ধ শান্তি হতে উচ্ছ্বসিত হয়ে অসীম আকাশে অনাদি অনন্ত কালে বিকীর্ণ পরিকীর্ণ হয়ে পড়ছে এবং এই অসংখ্যবহুধা শক্তি সীমাহীন দেশকালের মধ্য দিয়ে তোমার এই নিস্তব্ধ শান্তির মধ্যে এসে নিঃশব্দে প্রবেশ লাভ করছে। সকল শক্তি সকল কর্ম সকল প্রকাশের আধার তোমার এই প্রবল বিপুল শান্তি আমাদের এই নানা ক্ষুদ্রতায় চঞ্চল, বিরোধে বিচ্ছিন্ন, বিভীষিকায় ব্যাকুল দেশের উপরে নব নব ভক্তের বাণী ও সাধকের জীবনের ভিতর দিয়ে প্রত্যক্ষরূপে অবতীর্ণ হ'ক। কৃষক যেখানে অলস এবং দুর্বল, যেখানে সে পূর্ণ উদ্যমে তার ক্ষেত্র কর্ষণ করে না, সেইখানেই শস্যের পরিবর্তে আগাছায় দেখতে দেখতে চারিদিক ভরে যায়— সেইখানেই বেড়া ঠিক থাকে না, আল নষ্ট হয়ে যায়, সেইখানেই ঋণের বোঝা

ক্রমশই বেড়ে উঠে বিনাশের দিন দ্রুতবেগে এগিয়ে আসতে থাকে ;— আমাদের দেশেও তেমনি করে দুর্বলতার সমস্ত লক্ষণ ধর্মসাধনায় ও কর্মসাধনায় পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে— উচ্ছৃঙ্খল কাল্পনিকতা ও যুক্তিবিচারহীন আচারের দ্বারা আমাদের জ্ঞানের ও কর্মের ক্ষেত্র, আমাদের মঙ্গলের পথ, সর্বত্রই একান্ত বাধাগ্রস্ত হয়ে উঠেছে ; সকল-প্রকার অদ্ভুত অমূলক অসংগত বিশ্বাস অতি সহজেই আমাদের চিত্তকে জড়িয়ে জড়িয়ে ফেলছে ; নিজের দুর্বল বুদ্ধি ও দুর্বল চেষ্টায় আমরা নিজে যেমন ঘরে বাহিরে সকল-প্রকার অনুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠানে পদে পদেই নিয়মের স্খলন ও অব্যবস্থার বীভৎসতাকে জাগিয়ে তুলি তেমনি তোমার এই বিশাল বিশ্বব্যাপারেও আমরা সর্বত্রই নিয়মহীন অদ্ভুত যথেচ্ছাচারিতা কল্পনা করি— অসম্ভব বিভীষিকা সৃজন করি— সেইজন্যই কোনোপ্রকার অন্ধ সংস্কারে আমাদের কোথাও বাধা নেই— তোমার চরিতে ও অনুশাসনে আমরা উন্মত্ততম বুদ্ধিভ্রষ্টতার আরোপ করতে সংকোচমাত্র বোধ করি নে এবং আমাদের সর্বপ্রকার চিরপ্রচলিত আচারবিচারে মূঢ়তার এমন কোনো সীমা নেই যার থেকে কোনো যুক্তিতর্কে কোনো শুভবুদ্ধি দ্বারা আমাদের নিবৃত্ত করতে পারে। সেইজন্যে আমরা দুর্গতির ভয়সংকুল সুদীর্ঘ অমাবস্যার রাত্রিতে দুঃখদারিদ্র্য-অপমানের ভিতর দিয়ে পথভ্রষ্ট হয়ে কেবলই নিজের অন্ধতার চারিদিকে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি। হে শান্ত, হে মঙ্গল, আজ আমাদের পূর্বাকাশে তোমার অরুণরাগ দেখা দিয়েছে, আলোকবিকাশের পূর্বেই দুটি-একটি ক'রে ভক্তবিহঙ্গ জাগ্রত হয়ে সুনিশ্চিত পঞ্চমস্বরে আনন্দবার্তা ঘোষণা করছে, আজ আমরা দেশের নব উদ্‌বোধনের এই ব্রাহ্মমুহূর্তে মঙ্গল পরিণামের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসকে শিরোধার্য করে নিয়ে তোমার জ্যোতির্ময় কল্যাণসূর্যের অভ্যুদয়ের অভিমুখে নবীন প্রাণে নবীন আশায় তোমাকে আনন্দময় অভিবাদনে নমস্কার করি।

সন্ধ্যা। ৭ পৌষ ১৩১৭

জাগরণ

প্রতিদিন আমাদের যে-আশ্রমদেবতা আমাদের নানা কাজের আড়ালেই গোপনে থেকে যান, তাঁকে স্পষ্ট করে দেখা যায় না, তিনি আজ এই পুণ্যদিনের প্রথম ভোরের আলোতে উৎসবদেবতার উজ্জ্বল বেশ প'রে আমাদের সকলের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন— জাগো, আজ আশ্রমবাসী সকলে জাগো।

যখন আমাদের চোখে-দেখার সঙ্গে বিশ্বের আলোকের যোগ হয়, যখন আমাদের কানে-শোনার সঙ্গে বিশ্বের গানের মিলন ঘটে, যখন আমাদের স্পর্শস্নায়ুর তন্তুতে তন্তুতে

বিশ্বের কত হাজাররকম আঘাতের ঢেউ আমাদের চেতনার উপরে ঢেউ খেলিয়ে উঠতে থাকে, তখনি আমাদের জাগা— আমাদের শক্তির সঙ্গে যখন বিশ্বের শক্তির যোগ দুই দিক থেকেই সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে তখনি জাগা।

অতিথি যেমন নিদ্রিত ঘরের দ্বারে ঘা মারে, সমস্ত জগৎ অহরহ তেমনি করে আমাদের জীবনের দ্বারে ঘা মারছে, বলছে 'জাগো'। প্রত্যেক শক্তির উপরে বিরাট শক্তির স্পর্শ আসছে, বলছে 'জাগো'। যেখানে সেই বড়োর আহ্বানে আমাদের ছোটোটি তখনি সাড়া দিচ্ছে সেইখানেই প্রাণ, সেইখানেই বল, সেইখানেই আনন্দ। আমাদের হাজার তারের বীণার প্রত্যেক তারেই ওস্তাদের আঙুল পড়ছে, প্রত্যেক তারটিকেই বলছে 'জাগো'। যে তারটি জাগছে সেই তারেই সুর, সেই তারেই সংগীত। যে-তার শিথিল, যে-তার জাগছে না, সেই তারে আনন্দ নেই, সেই তারটিকে সেরে-তোলা বেঁধে-তোলার অনেক দুঃখের ভিতর দিয়ে তবে সেই সংগীতের সার্থকতার মধ্যে গিয়ে পৌছতে হয়।

এই-রকম আঘাতের পর আঘাত লেগে আমরা যে কত শত জাগার মধ্যে দিয়ে জাগতে জাগতে এসেছি, তা কি আমরা জানি। প্রত্যেক জাগার সম্মুখে কত নব নব অপূর্ব আনন্দ উদ্‌ঘাটিত হয়েছে, তা কি আমাদের স্মরণ আছে। জড় থেকে চৈতন্য, চৈতন্য থেকে আনন্দের মাঝখানে স্তরে স্তরে কত ঘুমের পর্দা একটি একটি করে খুলে গিয়েছে, তা অতীত যুগযুগান্তরের পাতায় পাতায় লেখা রয়েছে— মহাকালের দপ্তরের সেই বই কে আজ খুলে পড়তে পারবে। অনন্তের মধ্যে আমাদের এই-যে জাগরণ, এই-যে নানাদিকের জাগরণ— গভীর থেকে গভীরে, উদার থেকে উদারে জাগরণ, এই জাগরণের পালা তো এখনো শেষ হয় নি। সেই চিরজাগ্রত পুরুষ যিনি কালে কালে আমাদের চিরদিন জাগিয়ে এসেছেন— তিনি তাঁর হাজারমহল বিশ্বভবনের মধ্যে আজ এই মনুষ্যত্বের সিংহদ্বারটা খুলে আমাদের ডাক দিয়েছেন— এই মনুষ্যত্বের মুক্ত দ্বারে অনন্তের সঙ্গে মিলনের জাগরণ আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে— সেই জাগরণে এবার যার সম্পূর্ণ জাগা হল না, ঘুমের সকল আবরণগুলি খুলে যেতে-না-যেতে মানবজন্মের অবকাশ যার ফুরিয়ে গেল, স কৃপণঃ, সে কৃপাপাত্র।

মনুষ্যত্বের এই-যে জাগা, এও কি একটিমাত্র জাগরণ। গোড়াতেই তো আমাদের দেহশক্তির জাগা আছে— সেই জাগাটাই সম্পূর্ণ হওয়া কি কম কথা। আমাদের চোখকান আমাদের হাতপা তার সম্পূর্ণ শক্তিকে লাভ ক'রে সজাগভাবে শক্তির ক্ষেত্রে এসে দাঁড়িয়েছে, আমাদের মধ্যে এমন কয়জন আছে? তার পর মনের জাগা আছে, হৃদয়ের জাগা আছে, আত্মার জাগা আছে— বুদ্ধিতে জাগা, প্রেমেতে জাগা, ভূমানন্দে জাগা

আছে— এই বিচিত্র জাগায় মানুষকে ডাক পড়েছে— যেখানে সাড়া দিচ্ছে না সেইখানেই সে বঞ্চিত হচ্ছে— যেখানে সাড়া দিচ্ছে সেইখানেই ভূমার মধ্যে তার আত্ম-উপলব্ধি সম্পূর্ণ হচ্ছে, সেইখানেই তার চারিদিকে শ্রী সৌন্দর্য ঐশ্বর্য আনন্দ পরিপূর্ণ হয়ে উঠছে। মানুষের ইতিহাসে কোন্ স্মরণাতীত কাল থেকে জাতির পর জাতির উত্থানপতনের বজ্রনির্ঘোষে মনুষ্যত্বের প্রত্যেক দ্বারে-বাতায়নে এই মহা-উদ্‌বোধনের আহ্বানবাণী ধ্বনিত হয়ে এসেছে— বলছে, 'ভূমার মধ্যে জাগ্রত হও, আপনাকে বড়ো করে জানো।' বলছে, 'নিজের কৃত্রিম আচারের, কাল্পনিক বিশ্বাসের, অন্ধ সংস্কারের তমিস্র-আবরণে নিজেকে সমাচ্ছন্ন করে রেখো না— উজ্জ্বল সত্যের উন্মুক্ত আলোকের মধ্যে জাগ্রত হও— আত্মানং বিদ্ধি।'

এই-যে জাগরণ, যে-জাগরণে আমরা আপনাকে সত্যের মধ্যে দেখি, জ্যোতির মধ্যে দেখি, অমৃতের মধ্যে দেখি— যে-জাগরণে আমরা প্রতিদিনের স্বরচিত তুচ্ছতার সংকোচ বিদীর্ণ ক'রে আপনাকে পূর্ণতার মধ্যে বিকশিত করে দেখি, সেই জাগরণেই আমাদের উৎসব। তাই আমাদের উৎসবদেবতা প্রতিদিনের নিদ্রা থেকে আজ এই উৎসবের দিনে আমাদের জাগিয়ে তোলবার জন্যে দ্বারে এসে তাঁর ভৈরবরাগিণীর প্রভাতী গান ধরেছেন— আজ আমাদের উৎসব সার্থক হ'ক।

আমরা প্রত্যেকেই একদিকে অত্যন্ত ছোটো আর-একদিকে অত্যন্ত বড়ো। যে-দিকটাতে আমি কেবলমাত্রই আমি— সকল কথাতেই ঘুরে ফিরে কেবলই আমি— কেবল আমার সুখ দুঃখ, আমার আরাম, আমার আয়োজন, আমার প্রয়োজন, আমার ইচ্ছা – যেদিকটাতে আমি সবাইকে বাদ দিয়ে আপনাকে একান্ত করে দেখতে চাই, সেদিকটাতে আমি তো একটি বিন্দুমাত্র, সেদিকটাতে আমার মতো ছোটো আর কে আছে। আর যেদিকে আমার সঙ্গে সমস্তের যোগ, আমাকে নিয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পরিপূর্ণতা, যেদিকে সমস্ত জগৎ আমাকে প্রার্থনা করে, আমার সেবা করে, তার শতসহস্র তেজ ও আলোকের নাড়ীর সূত্রে আমার সঙ্গে বিচিত্র সম্বন্ধ স্থাপন করে,— আমার দিকে তাকিয়ে তার সমস্ত লোকলোকান্তর পরম আদরে এই কথা বলে যে, 'তুমি আমার যেমন এমনটি কোথাও আর-কেউ নেই, অনন্তের মধ্যে তুমিই কেবল তুমি', সেইখানে আমার চেয়ে বড়ো আর কে আছে। এই বড়োর দিকে যখন আমি জাগ্রত হই, সেই দিকে আমার যেমন শক্তি, যেমন প্রেম, যেমন আনন্দ, সেই দিকে আমার নিজের কাছে নিজের উপলব্ধি যেমন পরিপূর্ণ, এমন ছোটোর দিকে কখনোই নয়। সকল স্বার্থের সকল অহংকারের অতীত সেই আমার বড়ো-আমিকে সকলের-চেয়ে-বড়ো-আমির মধ্যে ধরে দেখবার দিনই হচ্ছে আমাদের বড়ো দিন।

জগতে আমাদের প্রত্যেকেরই একটি বিশেষ স্থান আছে। আমরা প্রত্যেকেই একটি বিশেষ আমি। সেই বিশেষত্ব একেবারে অটল অটুট; অনন্ত কালে অনন্ত বিশ্বে আমি যা আর-কেউ তা নয়।

তা হলে দেখা যাচ্ছে এই-যে আমিত্ব ব'লে একটি জিনিস, এর দ্বারাই জগতের অন্য সমস্ত-কিছু হতেই আমি স্বতন্ত্র। আমি জানছি যে আমি আছি, এই জানাটি যেখানে জাগছে সেখানে অস্তিত্বের সীমাহীন জনতার মধ্যে আমি একেবারে একমাত্র। আমিই হচ্ছি আমি, এই জানাটুকুর অতি তীক্ষ্ণ খড়্গের দ্বারা এই কণামাত্র আমি অবশিষ্ট ব্রহ্মাণ্ডকে নিজের থেকে একেবারে চিরবিচ্ছিন্ন করে নিয়েছে, নিখিল-চরাচরকে আমি এবং আমি-না এই দুই ভাগে বিভক্ত করে ফেলেছে।

কিন্তু এই-যে ঘর ভাঙাবার মূল আমি, মিলিয়ে দেবার মূলও হচ্ছেন উনি। পৃথক না হলে মিলনও হয় না; তাই দেখতে পাচ্ছি সমস্ত জগৎ জুড়ে বিচ্ছেদের শক্তি আর মিলনের শক্তি, বিকর্ষণ এবং আকর্ষণ, প্রত্যেক অণুপরমাণুর মধ্যে কেবলই পরস্পর বোঝাপড়া করছে। আমার আমির মধ্যেও সেই বিশ্বব্যাপী প্রকাণ্ড দুই শক্তির খেলা;— তার এক শক্তি প্রবল হাত দিয়ে ঠেলে ফেলছে, আর-এক শক্তি প্রবল হাত দিয়ে টেনে নিচ্ছে। এমনি করে আমি এবং আমি-না'র মধ্যে কেবলই আনাগোনার জোয়ারভাঁটা চলেছে। এমনি করে আমি আমাকে জানছি বলেই তার প্রতিঘাতে সকলকে জানছি এবং সকলকে জানছি বলেই তার প্রতিঘাতে আমাকে জানছি। বিশ্ব-আমির সঙ্গে আমার আমির এই নিত্যকালের ঢেউ-খেলাখেলি।

এই এক আমিকে অবলম্বন করে বিচ্ছেদ ও মিলন উভয় তত্ত্বই আছে ব'লে আমিটুকুর মধ্যে অনন্ত দ্বন্দ্ব। যেদিকে সে পৃথক সেইদিকে তার চিরদিনের দুঃখ, যেদিকে সে মিলিত সেইদিকে তার চিরকালের আনন্দ; যেদিকে সে পৃথক সেইদিকে তার স্বার্থ, সেইদিকে তার পাপ, যেদিকে সে মিলিত সেইদিকে তার ত্যাগ, সেদিকে তার পুণ্য; যেদিকে সে পৃথক সেইদিকেই তার কঠোর অহংকার, যেদিকে সে মিলিত সেইদিকেই তার সকল মাধুর্যের সার প্রেম। মানুষের এই আমির একদিকে ভেদ এবং আর-একদিকে অভেদ আছে বলেই মানুষের সকল প্রার্থনার সার প্রার্থনা হচ্ছে দ্বন্দ্বসমাধানের প্রার্থনা;— অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মামৃতং গময়।

সাধক কবি কবীর দুটিমাত্র ছত্রে আমি-রহস্যের এই তত্ত্বটি প্রকাশ করেছেন—

যব হম রহল রহা নহিঁ কোঈ,
হমরে মাহ রহল সব কোঈ।

অর্থাৎ, আমির মধ্যে কিছুই নেই কিন্তু আমার মধ্যে সমস্তই আছে। অর্থাৎ, এই আমি একদিকে সমস্ত হতে পৃথক হয়ে অন্যদিকে সমস্তকেই আমার করে নিচ্ছে।

এই আমার দ্বন্দ্বনিকেতন আমিকে আমার ভগবান নিজের মধ্যে লোপ করে ফেলতে চান না, একে নিজের মধ্যে গ্রহণ করতে চান। এই আমি তাঁর প্রেমের সামগ্রী ; একে তিনি অসীম বিচ্ছেদের দ্বারা চিরকাল পর করে অসীম প্রেমের দ্বারা চিরকাল আপন করে নিচ্ছেন।

এমন কত কোটি কোটি অন্তহীন আমির মধ্যে সেই এক পরম-আমির অনন্ত আনন্দ নিরন্তর ধ্বনিত তরঙ্গিত হয়ে উঠছে। অথচ এই অন্তহীন আমি-মণ্ডলীর প্রত্যেক আমির মধ্যেই তাঁর এমন একটি বিশেষ রস বিশেষ প্রকাশ যা জগতে আর কোনোখানেই নেই। সেইজন্যে আমি যত ক্ষুদ্রই হই, আমার মতো তাঁর আর দ্বিতীয় কিছুই নেই ; আমি যদি হারাই তবে লোকলোকান্তরের সমস্ত হিসাব গরমিল হয়ে যাবে। সেইজন্যেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আমাকে নইলে নয়, সেইজন্যেই সমস্ত জগতের ভগবান বিশেষরূপেই আমার ভগবান, সেইজন্যেই আমি আছি এবং অনন্ত প্রেমের বাঁধনে চিরকালই থাকব।

আমির এই চরম গৌরবের কথাটি প্রতিদিন আমাদের মনে থাকে না। তাই প্রতিদিন আমরা ছোটো হয়ে, সংসারী হয়ে, সম্প্রদায়বদ্ধ হয়ে থাকি।

কিন্তু মানুষ আমির এই বড়ো দিকের কথাটি দিনের পর দিন, বৎসরের পর বৎসর ভুলে থেকে বাঁচবে কী করে। তাই প্রতিদিনের মধ্যে-মধ্যে এক-একটি বড়োদিনের দরকার হয়। আগাগোড়া সমস্তই দেয়াল গেঁথে গৃহস্থ বাঁচে না, তার মাঝে-মাঝে জানলা দরজা বসিয়ে সে বাহিরকে ঘরের ও ঘরকে বাহিরের করে রাখতে চায়। বড়োদিনগুলি হচ্ছে সেই প্রতিদিনের দেয়ালের মধ্যে বড়ো দরজা। আমাদের প্রতিদিনের সূত্রে এই বড়োদিনগুলি সূর্যকান্তমণির মতো গাঁথা হয়ে যাচ্ছে ; জীবনের মালায় এই দিনগুলি যত বেশি, যত খাঁটি, যত বড়ো, আমাদের জীবনের মূল্য তত বেশি, আমাদের জীবনে সংসারের শোভা তত বেড়ে ওঠে।

তাই বলছিলুম, আজ আমাদের উৎসবের প্রাতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের দিকে আশ্রমের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হয়ে গেছে ; আজ নিখিল মানবের সঙ্গে আমাদের যে-যোগ, সেই যোগটি ঘোষণা করবার রোশনচৌকি এই প্রান্তরের আকাশ পূর্ণ করে বাজছে, কেবলই বাজছে, ভোর থেকে বাজছে। আজ আমাদের এই আশ্রমের ক্ষেত্র সকলেরই আনন্দক্ষেত্র। কেন। কেননা, আমাদের প্রত্যেকের জীবনের সাধনায় সমস্ত মানুষের সাধনা চলছে। এখানকার তপস্যায় সমস্ত পৃথিবীর লোকের ভাগ আছে। আশ্রমের

সেই বড়ো কথাটিকে আজ আমাদের হৃদয়মনের মধ্যে আমাদের জীবনের সমস্ত সংকল্পের মধ্যে পরিপূর্ণ করে নেব।

সকলের সঙ্গে আমাদের এই যোগের সংগীতটি আজ কে বাজাবেন। সেই মহাযোগী, জগতের অসংখ্য বীণাতন্ত্রী যাঁর কোলের উপরে অনন্তকাল ধরে স্পন্দিত হচ্ছে। তিনিই একের সঙ্গে অন্যের, অন্তরের সঙ্গে বাহিরের, জীবনের সঙ্গে মৃত্যুর, আলোর সঙ্গে অন্ধকারের, যুগের সঙ্গে যুগান্তরের, বিচ্ছেদ ঘটিয়ে ঘটিয়ে মিলন ঘটিয়ে তুলছেন; তাঁরই হাতের সেই বিচ্ছেদমিলনের ঝংকারে বৈচিত্র্যের শত শত তান কেবলই উৎসারিত হয়ে আকাশ পরিপূর্ণ করে ছড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ছে; একই ধুয়ো থেকে তানের পর তান ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছে, এবং একই ধুয়োতে তানের পর তান এসে পরিসমাপ্ত হচ্ছে।

বীণার তারগুলো যখন বাজে না তখন তারা পাশাপাশি পড়ে থাকে, তবুও তাদের মিলন হয় না, তখনো তারা কেউ কাউকে আপন বলে জানে না। যেই বেজে ওঠে অমনি সুরে সুরে তানে তানে তাদের মিলিয়ে দেয়— তাদের সমস্ত ফাঁকগুলো রাগরাগিণীর মাধুর্যে ভরে ভরে ওঠে। তখন তারা স্বতন্ত্র তবু এক,— কেউ-বা লোহার কেউ-বা পিতলের, তবু এক,— কেউ-বা সরু সুরের কেউ-বা মোটা সুরের, তবু এক— তখন তারা কেউ কাউকে আর ছাড়তে পারে না। তাদের প্রত্যেকের ভিতরের সত্য বাণীটি যেই প্রকাশ হয়ে পড়ে অমনি সত্যের সঙ্গে সত্যের, প্রকাশের সঙ্গে প্রকাশের অন্তরতর মিলটি সৌন্দর্যের উচ্ছ্বাসে ধরা পড়ে যায়— দেখা যায় আপনার মধ্যে সুর যতই স্বতন্ত্র হ'ক, গানের মধ্যে তারা এক।

আমাদের জীবনের বীণাতে, সংসারের বীণাতে প্রতিদিন তার বাঁধা চলছে, সুর বাঁধা এগোচ্ছে। সেই বাঁধবার মুখে কত কঠিন আঘাত, কত তীব্র বেসুর। তখন চেষ্টার মূর্তি, কষ্টের মূর্তিটাই বারবার করে দেখা যায়। সেই বেসুরকে সমগ্রের সুরে মিলিয়ে তুলতে এত টান পড়ে যে, এক-একসময় মনে হয় যেন তার আর সইতে পারল না, গেল বুঝি ছিঁড়ে।

এমনি করে চেয়ে দেখতে দেখতে শেষকালে মনে হয়, তবে বুঝি সার্থকতা কোথাও নেই— কেবলই বুঝি এই টানাটানি বাঁধাবাঁধি, দিনের পর দিন কেবলই খেটে মরা, কেবলই ওঠা পড়া, কেবলই অহংযন্ত্রটার অচল খোঁটার মধ্যে বাঁধা থেকে মোচড় খাওয়া —কোনো অর্থ নেই, কোনো পরিণাম নেই— কেবলই দিনযাপন মাত্র।

কিন্তু যিনি আমাদের বাজিয়ে, তিনি কেবলই কি কঠিন হাতে নিয়মের খোঁটায় চড়িয়ে পাক দিয়ে দিয়ে আমাদের সুরই বাঁধছেন। তা তো নয়। সঙ্গে-সঙ্গে মুহূর্তে

মুহূর্তে ঝংকারও দিচ্ছেন। কেবলই নিয়ম? তা তো নয়। তার সঙ্গে-সঙ্গেই আনন্দ। প্রতিদিন খেতে হচ্ছে বটে পেটের দায়ের অত্যন্ত কঠোর নিয়মে, কিন্তু তার সঙ্গে-সঙ্গেই মধুর স্বাদটুকুর রাগিণী রসনায় রসিত হয়ে উঠছে। আত্মরক্ষার বিষম চেষ্টায় প্রত্যেক মুহূর্তেই বিশ্বজগতের শতসহস্র নিয়মকে প্রাণপণে মানতে হচ্ছে বটে, কিন্তু সেই মেনে চলবার চেষ্টাতেই আমাদের শক্তির মধ্যে আনন্দের ঢেউ খেলিয়ে উঠছে। দায়ও যেমন কঠোর, খুশিও তেমনি প্রবল।

সেই আমাদের ওস্তাদের হাতে বাজবার সুবিধেই হচ্ছে ওই। তিনি সব সুরের রাগিণীই জানেন। যে-ক'টি তার বাঁধা হচ্ছে, তাতে যে-ক'টি সুর বাজে, কেবলমাত্র সেই ক'টি নিয়েই তিনি রাগিণী ফলিয়ে তুলতে পারেন। পাপী হ'ক, মূঢ় হ'ক; স্বার্থপর হ'ক, বিষয়ী হ'ক, যে হ'ক-না, বিশ্বের আনন্দের একটা সুরও বাজে না এমন চিত্ত কোথায়। তা হলেই হল; সেই সুযোগটুকু পেলেই তিনি আর ছাড়েন না। আমাদের অসাড়তমেরও হৃদয়ে প্রবল ঝন্‌ঝনার মাঝখানে হঠাৎ এমন একটা-কিছু সুর বেজে ওঠে যার যোগে ক্ষণকালের জন্যে নিজের চারদিককে ছাড়িয়ে গিয়ে চিরন্তনের সঙ্গে মিলে যাই। এমন একটা-কোনো সুর, নিজের প্রয়োজনের সঙ্গে অহংকারের সঙ্গে যার মিল নেই— যার মিল আছে আকাশের নীলিমার সঙ্গে, প্রভাতের আলোর সঙ্গে; যার মিল আছে ত্যাগীর ত্যাগের সঙ্গে, বীরের অভয়ের সঙ্গে, সাধুর প্রসন্নতার সঙ্গে; সেই সুরটি যখন বাজে তখন মায়ের কোলের অতিক্ষুদ্র শিশুটিও আমাদের সকল স্বার্থের উপরে চেপে বসে; সেই সুরেই আমরা ভাইকে চিনি, বন্ধুকে টানি, দেশের কাজে প্রাণ দিই; সেই সুরে সত্য আমাদের দুঃসাধ্য সাধনের দুর্গম পথে অনায়াসে আহ্বান করে; সেই সুর যখন বেজে ওঠে তখন আমরা জন্মদরিদ্রের এই চিরাভ্যস্ত কথাটা মুহূর্তেই ভুলে যাই যে, আমরা ক্ষুধাতৃষ্ণার জীব, আমরা জন্মমরণের অধীন, আমরা স্তুতিনিন্দায় আন্দোলিত; সেই সুরের স্পন্দনে আমাদের সমস্ত ক্ষুদ্র সীমা স্পন্দিত হয়ে উঠে আপনাকে লুকিয়ে অসীমকেই প্রকাশ করতে থাকে। সে সুর যখন বাজে না তখন আমরা ধূলির ধূলি, আমরা প্রকৃতির অতিভীষণ প্রকাণ্ড যন্ত্রটার মধ্যে আবদ্ধ একটা অত্যন্ত ক্ষুদ্র চাকা, কার্যকারণের শৃঙ্খলে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িত। তখন বিশ্বজগতের কল্পনাতীত বৃহত্ত্বের কাছে আমাদের ক্ষুদ্র আয়তন লজ্জিত, বিশ্বশক্তির অপরিমেয় প্রবলতার কাছে আমাদের ক্ষুদ্র শক্তি কুণ্ঠিত। তখন আমরা মাথা হেঁট করে দুই হাত জোড় করে অহোরাত্র ভয়ে ভয়ে বাতাসকে আলোকে সূর্যকে চন্দ্রকে পর্বতকে নদীকে নিজের চেয়ে বড়ো ব'লে দেবতা ব'লে যখন-তখন যেখানে-সেখানে প্রণাম করে করে বেড়াই। তখন আমাদের সংকল্প সংকীর্ণ, আমাদের আশা ছোটো,

আকাঙ্ক্ষা ছোটো, বিশ্বাস ছোটো, আমাদের আরাধ্য দেবতাও ছোটো। তখন কেবল 'খাও— পরো— সুখে থাকো— হেসে খেলে দিন কাটাও' এইটেই আমাদের জীবনের মন্ত্র। কিন্তু সেই ভূমার সুর যখনি বৃহৎ আনন্দের রাগিণীতে আমাদের আত্মার মধ্যে মন্ত্রিত হয়ে ওঠে, তখনি কার্যকারণের শৃঙ্খলে বাঁধা থেকেও আমরা তার থেকে মুক্ত হই, তখন আমরা প্রকৃতির অধীন থেকেও অধীন নই, প্রকৃতির অংশ হয়েও তার চেয়ে বড়ো; তখন আমরা জগৎসৌন্দর্যের দর্শক, জগৎঐশ্বর্যের অধিকারী, জগৎপতির আনন্দভাণ্ডারের অংশী— তখন আমরা প্রকৃতির বিচারক, প্রকৃতির স্বামী।

আজ বাজুক ভূমানন্দের সেই মেঘমন্দ্র সুন্দর ভীষণ সংগীত যাতে আমরা নিজেকে নিজে অতিক্রম করে অমৃতলোকে জাগ্রত হই। আজ আপনার অধিকারকে বিশ্বক্ষেত্রে প্রশস্ত করে দেখি, শক্তিকে বিশ্বশক্তির সহযোগী করে দেখি, মর্তজীবনকে অনন্ত-জীবনের মধ্যে বিধৃতরূপে ধ্যান করি।

বাজে বাজে জীবনবীণা বাজে! কেবল আমার একলার বীণা নয়— লোকে লোকে জীবনবীণা বাজে। কত জীব, তার কত রূপ, তার কত ভাষা, তার কত সুর, কত দেশে, কত কালে —সব মিলে অনন্ত আকাশে বাজে বাজে জীবনবীণা বাজে। রূপ-রস-শব্দ-গন্ধের নিরন্তর আন্দোলনে, সুখদুঃখের জন্মমৃত্যুর আলোক-অন্ধকারের নিরবচ্ছিন্ন আঘাত-অভিঘাতে, বাজে বাজে জীবনবীণা বাজে। ধন্য আমার প্রাণ যে, সেই অনন্ত আনন্দসংগীতের মধ্যে আমারও সুরটুকু জড়িত হয়ে আছে; এই আমি-টুকুর তান সকল-আমির গানে সুরের পর সুর জুগিয়ে মিড়ের পর মিড় টেনে চলেছে। এই আমিটুকুর তান কত সূর্যের আলোয় বাজছে, কত লোকে লোকে জন্মমরণের পর্যায়ের মধ্য দিয়ে বিস্তীর্ণ হচ্ছে, কত নব নব নিবিড় বেদনার মধ্য দিয়ে অভাবনীয় রূপে বিচিত্র হয়ে উঠছে; সকল-আমির বিশ্বব্যাপী বিরাট্‌বীণায় এই আমি এবং আমার মতো এমন কত আমির তার আকাশে আকাশে ঝংকৃত হয়ে উঠছে। কী সুন্দর আমি! কী মহৎ আমি! কী সার্থক আমি!

আজ আমাদের সাম্বৎসরিক উৎসবের দিনে আমাদের সমস্ত মনপ্রাণকে বিশ্বলোকের মাঝখানে উন্মুখ করে তুলে ধ'রে এই কথাটি স্বীকার করতে হবে যে, আমাদের আশ্রমের প্রতিদিনের সাধনার লক্ষ্যটি এই যে, বিশ্বের সকল স্পর্শে আমাদের জীবনের সকল তার বাজতে থাকবে অনন্তের আনন্দগানে। সংকোচ নেই; কোথাও সংকোচ নেই, কোথাও কিছুমাত্র সংকোচ নেই;— স্বার্থের সংকোচ, ক্ষুদ্র সংস্কারের সংকোচ, ঘৃণাবিদ্বেষের সংকোচ— কিছুমাত্র না। সমস্ত অত্যন্ত সহজ, অত্যন্ত পরিষ্কার, অত্যন্ত খোলা, সমস্তই আলোতে ঝল্‌মল্‌ করছে— তার উপর বিশ্বপতির

আঙুল যখন যেমনি এসে পড়ছে, অকুণ্ঠিত সুর তৎক্ষণাৎ ঠিকটি বেজে উঠছে। জড় পৃথিবীর জলস্থলের সঙ্গেও তার আনন্দ সাড়া দিচ্ছে, তরুলতার সঙ্গেও তার আনন্দ মর্মরিত হয়ে উঠছে, পশুপক্ষীর সঙ্গেও তার আনন্দের সুর মিলছে, মানুষের মধ্যেও তার আনন্দ কোনো জায়গায় প্রতিহত হচ্ছে না ; সকল জাতির মধ্যে, সকলের সেবার মধ্যে, সকল জ্ঞানে, সকল ধর্মে তার উদার আত্মবিস্মৃত আনন্দ সূর্যের সহস্র কিরণের মতো অনায়াসে পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়ছে। সর্বত্রই সে জাগ্রত, সে সচেতন, সে উন্মুক্ত ; প্রস্তুত তার দেহ মন, উন্মুক্ত তার দ্বার বাতায়ন, উচ্ছ্বসিত তার আহ্বানধ্বনি। সে সকলের, এবং সেই বিশ্বরাজপথ দিয়েই সে তাঁর যিনি সকলেরই।

হে অমৃত আনন্দময়, আমার এই ক্ষুদ্র আমিটুকুর মধ্যে তোমার অনন্ত অমৃত আনন্দরূপ দেখবার জন্যে অপেক্ষা করে আছি। কতকাল ধরে যে, তা আমি নিজেও জানি নে, কিন্তু অপেক্ষা করে আছি। যতদিন নিজেকে ক্ষুদ্র বলে জানছি, ছোটো চিন্তায় ছোটো বাসনায় মৃত্যুর বেষ্টনের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে আছি, ততদিন তোমার অমৃতরূপ আমার মধ্যে প্রত্যক্ষ হচ্ছে না। ততদিন আমার দেহে দীপ্তি নেই, মনে নিষ্ঠা নেই, কর্মে ব্যবস্থা নেই, চরিত্রে শক্তি নেই, চারি দিকে শ্রী নেই ; ততদিন তোমার জগদ্‌ব্যাপী নিয়মের সঙ্গে, শৃঙ্খলার সঙ্গে, সৌন্দর্যের সঙ্গে আমার মিল হচ্ছে না। যতদিন আমার এই আমিটুকুর মধ্যে তোমার অনন্ত অমৃতরূপ আনন্দরূপ না উপলব্ধি করছি, ততদিন আমার ভয়ের অন্ত নেই, শোকের অবসান নেই,— ততদিন মৃত্যুকেই চরম ভয় বলে মনে করি, ক্ষতিকেই চরম বিপদ ব'লে গণ্য করি,— ততদিন সত্যের জন্যে সংগ্রাম করতে পারি নে, মঙ্গলের জন্যে প্রাণ দিতে কুণ্ঠিত হই,— ততদিন আত্মাকে ক্ষুদ্র মনে করি বলেই কৃপণের মতো আপনাকে কেবলই পায়ে পায়ে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে চলতে চাই ; শ্রম বাঁচিয়ে চলি, কষ্ট বাঁচিয়ে চলি, নিন্দা বাঁচিয়ে চলি, কিন্তু সত্য বাঁচিয়ে চলি নে, ধর্ম বাঁচিয়ে চলি নে, আত্মার সম্মান বাঁচিয়ে চলি নে। যতদিন আমার এই আমিটুকুর মধ্যে তোমার অনন্ত অমৃতরূপ আনন্দরূপ না দেখি ততদিন চারিদিকের অনিয়ম, অস্বাস্থ্য, অজ্ঞান, অপূর্ণতা, অসৌন্দর্য, অপমান আমার জড়চিত্তকে আঘাতমাত্র করে না— চতুর্দিকের প্রতি আমার সুগভীর আলস্যবিজড়িত অনাদর দূর হয় না, নিখিলের প্রতি আমার আত্মা পরিপূর্ণ শক্তিতে প্রসারিত হতে পারে না ; ততদিন পাপকে বিমুগ্ধ বিহ্বলভাবে অন্তরের মধ্যে দিনের পর দিন কেবল লালন করেই চলি এবং পাপকে উদাসীন দুর্বলভাবে বাহিরে দিনের পর দিন কেবল প্রশ্রয় দিতেই থাকি— কঠিন এবং প্রবল সংকল্প নিয়ে অকল্যাণের সঙ্গে সংগ্রাম করবার জন্যে বদ্ধপরিকর হয়ে দাঁড়াতে পারি নে ;— কি অব্যবস্থাকে কি অন্যায়কে আঘাত করার জন্যে

প্রস্তুত হই নে, পাছে তার লেশমাত্র প্রতিঘাত নিজের উপরে এসে পড়ে। তোমার অনন্ত অমৃতরূপ আনন্দরূপ আমার এই আমিটুকুর মধ্যে বোধ করতে পারি নে বলেই ভীরুতার অধম ভীরুতা এবং দীনতার অধম দীনতার মধ্যে দিনে দিনে তলিয়ে যেতে থাকি, দেহে-মনে গৃহে-গ্রামে সমাজে-স্বদেশে সর্বত্রই নিদারুণ নৈষ্ফল্য মঙ্গলকে পুনঃ পুনঃ বাধা দিতে থাকে, এবং অতি বীভৎস অচল জড়ত্ব ব্যাধিরূপে দুর্ভিক্ষরূপে, অনাচার ও অন্ধ সংস্কাররূপে, শতসহস্র কাল্পনিক বিভীষিকারূপে, অকল্যাণ ও শ্রীহীনতাকে চারিদিকে স্তূপাকার করে তোলে।

হে ভূমা, আজকের এই উৎসবের দিন আমাদের জাগরণের দিন হ'ক— আজ তোমার এই আকাশে আলোকে বাতাসে উদ্‌বোধনের বিপুল বাণী উদ্‌গীত হতে থাক্‌, আমরা অতি দীর্ঘ দীনতার নিশাবসানে নেত্র উন্মীলন করে জ্যোতির্ময় লোকে নিজেকে অমৃতস্য পুত্রাঃ বলে অনুভব করি; আনন্দসংগীতের তালে তালে নির্ভয়ে যাত্রা করি সত্যের পথে, আলোকের পথে, অমৃতের পথে; আমাদের এই যাত্রার পথে আমাদের মুখে চক্ষে, আমাদের বাক্যে মনে, আমাদের সমস্ত কর্মচেষ্টায়, হে রুদ্র, তোমার প্রসন্নমুখের জ্যোতি উদ্ভাসিত হয়ে উঠুক। আমরা এখানে সকলে যাত্রীর দল— তোমার আশীর্বাদ লাভের জন্য দাঁড়িয়েছি; সম্মুখে আমাদের পথ, আকাশে নবীন সূর্যের আলোক, 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' আমাদের মন্ত্র; অন্তরে আমাদের আশার অন্ত নেই,— আমরা মানব না পরাভব, আমরা জানব না অবসাদ, আমরা করব না আত্মার অবমাননা, চলব দৃঢ়পদে অসংকুচিত চিত্তে— চলব সমস্ত সুখদুঃখের উপর দিয়ে, সমস্ত স্বার্থ এবং দৈন্য এবং জড়তাকে দলিত ক'রে— তোমার বিশ্বলোকে অনাহত তূরীতে জয়বাদ্য বাজতে থাকবে, চারিদিক থেকে আহ্বান আসতে থাকবে 'এসো, এসো, এসো'— আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে খুলে যাবে চির জীবনের সিংহদ্বার— কল্যাণ, কল্যাণ, কল্যাণ— অন্তরে বাহিরে কল্যাণ— আনন্দম্ আনন্দম্, পরিপূর্ণমানন্দম্।

গ্রন্থপরিচয়

[রচনাবলীর বর্তমান খণ্ডে মুদ্রিত গ্রন্থগুলির প্রথম প্রকাশের তারিখ ও গ্রন্থসংক্রান্ত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য গ্রন্থপরিচয়ে সংকলিত হইল। এই খণ্ডে মুদ্রিত কোনো কোনো রচনা সম্বন্ধে কবির নিজের মন্তব্যও এই বিভাগে মুদ্রিত হইল। পূর্ণতর তথ্যসংগ্রহ সর্বশেষ খণ্ডে একটি পঞ্জীতে প্রকাশিত হইবে।]

মহুয়া

মহুয়া ১৩৩৬ সালের আশ্বিন মাসে প্রকাশিত হয়।

বিশ্বভারতী রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত পাণ্ডুলিপির সাহায্যে মহুয়ার বর্তমান সংস্করণে অনেক কবিতার রচনাস্থান নির্দিষ্ট হইল, এবং রচনাতারিখ ও পাঠ পরিবর্তিত ও সংশোধিত হইল।

নির্ঝরিণী, শুকতারা, অচেনা, পথের বাঁধন, বাসরঘর, বিদায়, প্রণতি, নৈবেদ্য, অশ্রু, অন্তর্ধান— এই দশটি কবিতা শেষের কবিতা[1] উপন্যাসের জন্য লিখিত হইলেও 'ভাবানুষঙ্গবশত মহুয়াতেও মুদ্রিত হইয়াছে'। রচনাবলী-সংস্করণে মহুয়ার সেই রূপ অপরিবর্তিত রাখা হইল।

মহুয়ার প্রথম সংস্করণের পাঠপরিচয়ে পাদটীকায় জানানো হইয়াছে যে, 'বিচ্ছেদ' ও 'বিরহ' শেষের কবিতার জন্য লিখিত হইলেও ওই উপন্যাসে ব্যবহৃত হয় নাই।

পাণ্ডুলিপিতে প্রাপ্ত কয়েকটি কবিতার মূল বা স্বতন্ত্র পাঠ নিম্নে মুদ্রিত হইল :

৩ শুধায়ো না মোর গান
কারে করেছিনু দান
পথধুলা-'পরে আছে তারি তরে
যার কাছে পাবে মান।

২ যে সেই ধুলার ফুলে
হার গেঁথে লয় তুলে,—
হেলার সে-ধন হয়-যে ভূষণ
তাহারি মাথার চুলে।

---

[1] দ্রষ্টব্য : রবীন্দ্র-রচনাবলী দশম খণ্ড।

১ ফুল ছিঁড়ে লয় হাওয়া,
সে পাওয়া মিথ্যে পাওয়া—
আনমনে তার পুষ্পের ভার
ধুলায় ছড়িয়ে যাওয়া।

[১৯২৭]

উৎসর্গ-কবিতাটির পাণ্ডুলিপিতে প্রাপ্ত বর্জনচিহ্নিত প্রথম পাঠ ; পরে পার্শ্ববর্তী সংখ্যানুযায়ী শ্লোকগুলির ক্রম পরিবর্তিত হইয়াছিল।

উজ্জীবন

ভস্ম-অপমানশয্যা ছাড়ো, পুষ্পধনু,
রুদ্র অগ্নি হতে লহো জ্বলদর্চি তনু।
যাহা মরণীয় যাক ম'রে,
জাগো চিরস্মরণীয় ধ্যানমূর্তি ধ'রে।
যাহা স্থূল, যাহা ক্লান্ত তব,
অঙ্গ সাথে দগ্ধ হ'ক, হও নিত্যনব।
মৃত্যু হতে জাগো, পুষ্পধনু,
হে অতনু, বীরের তনুতে লহো তনু।

বন্ধু তব দৈত্যজয়ী দেব বজ্রপাণি,
পুষ্পচ্ছলে তাঁরি অগ্নি দাও তুমি আনি।
সেই দিব্য দীপ্যমান দাহ
অন্তরে করুক ক্ষুব্ধ দুঃখের প্রবাহ।
মিলনেরে করুক প্রখর,
বিচ্ছেদেরে ক'রে দিক দুঃসহ সুন্দর।
মৃত্যু হতে ওঠো, পুষ্পধনু,
হে অতনু, বীরের তনুতে লহো তনু।

সংকটবন্ধুর তব দীর্ঘ রাজপথ—
সে-দুর্গমে চলুক প্রেমের জয়রথ।

তিমিরতোরণ রজনীর
স্পন্দিবে আহ্বানে মোর নির্ঘোষগম্ভীর।
যাক দূরে দ্বিধা লজ্জা ত্রাস—
আয় বক্ষে সর্বনাশা প্রচণ্ড উল্লাস।
মৃত্যু হতে ওঠো, পুষ্পধনু,
হে অতনু, বীরের তনুতে লহো তনু।

তপতী নাটকের প্রথম সংস্করণে মুদ্রিত (পৃ. ৫২-৫৪) অনেকাংশে-পৃথক পাঠ।

উজ্জীবন

উত্তীর্ণ হয়েছ তুমি ধূর্জটির ক্রোধবহ্নিশিখা
হে মন্মথ, মনসিজ, হে মনের মায়ামরীচিকা,—
তৃষ্ণামরুবিহারে বিলাস,—
পুরাও পুরাও অভিলাষ।

দহনে দ্বিগুণ দীপ্তি লভিল দাহনশক্তি তব,
পুরাতনে ভস্ম করি বাহির হয়েছ নিত্যনব—
দুঃখে তব দুর্জয় বিকাশ—
পুরাও পুরাও অভিলাষ।

পুষ্পের প্রচ্ছন্ন তলে ইন্দ্রের যে বজ্র কর চুরি
মিলন করুক তীব্র, বিরহের দুঃসহ মাধুরী
শান্তি মোর করুক বিনাশ—
পুরাও পুরাও অভিলাষ।

নিন্দাকণ্টকিত পথে জয়যাত্রা অতন্দ্র অধীর
আনন্দে সার্থক করো— দাও মোরে বিশ্ববিস্মৃতির
সর্বনাশা প্রচণ্ড উল্লাস—
পুরাও পুরাও অভিলাষ।

'তপতা'র পাণ্ডুলিপিতে প্রাপ্ত সম্পূর্ণ-স্বতন্ত্র পাঠ। অসম্পূর্ণ?

বরণডালা

আজি এই মম সকল ব্যাকুল
অঙ্গ-মাঝে
ওহে নিরুপম, তোমার স্তবের
ছন্দ বাজে।

এই বসন্তে লতায় লতায়
পাতায় ফুলে
বাণীহিল্লোল মিলিছে তোমার
চরণমূলে।
আমার দেহের বাণীতে সে দোল
উঠিছে দুলে।
দিনু পূজা মম, নাহি যদি লও
মরিব লাজে।
ওহে নিরুপম, তোমার স্তবের
ছন্দ বাজে।

তরু হতে ফুল আনি নাই আমি
আনি নি ফল।
দেশ দেশ হতে আনি নি ভরিয়া
তীর্থজল।
আমার আপন তনুতে উছলে
অধরা ধারা,
অধীরতা তার তোমারি মাঝারে
হ'ক-না সারা।
ঘনযামিনীর আঁধারে যেমন
ঝলিছে তারা
দেহ ঘেরি মম প্রাণের চমক
তেমনি রাজে।

ওহে নিরুপম, তোমার স্তবের
ছন্দ বাজে।

বৈশাখ ১৩৩৩

সম্ভবতঃ ইহা পূর্বপাঠ। কবির 'বৈকালী' গ্রন্থে (৪২ পৃ.) প্রাপ্ত। নটীর পূজা নাটকের 'আমায় ক্ষমো হে ক্ষমো' গানটির সহিত সাদৃশ্য লক্ষণীয়।

বরণ

পুরাণে কাহিনী শুনিয়াছি
দময়ন্তী নিয়েছিল বাছি
মানবেরে, ছদ্মবেশী দেবতার মাঝে।
অর্ঘ্যহারা দেবতারা চলে গেল লাজে।
রাজকন্যা চিনেছে সেদিন
দেবমূর্তি, সে যে ছায়াহীন।

তাই শুনে একা বসে বসে
ভেবেছিনু বালিকাবয়সে—
আমি লব স্বয়ম্বরে বরি দেবতারে,
সর্বমানবের মাঝে চিনিব তাহারে;
তারি লাগি মোর দেহে মনে
বরমাল্য গাঁথিব যতনে।

বুঝি নি, কঠিন মোর পণ
কেমনে যে করিব সাধন।
কত-না মানুষ ফেরে দেবতার বেশে
লয়ে পূজারির দল দেশ হতে দেশে।
হেথা হোথা দিনে দিনে তাই
দ্বিধা লয়ে ফিরেছি সদাই।

খরতর রৌদ্রের বেলায়
জনতার মুখর মেলায়

দাঁড়ালেম একদিন রাজপথ-পাশে,
চেয়ে চেয়ে দেখিলাম যারা যায় আসে।
দেখিলাম যতটুকু কায়া
তার চেয়ে দীর্ঘতর ছায়া।

স্পর্ধাতীক্ষ্ণ কত কণ্ঠস্বর
শুনিলাম ভেদিছে অম্বর।
দেখিনু দীনের মূর্তি উজ্জ্বল সজ্জায়,
ধনসমারোহে তারে ঢাকিল লজ্জায়;
যতই ছুটায় অশ্বরথ
সঙ্গে ওড়ে ধূলির পর্বত।

সেদিন সবার ঠেলাঠেলি
নানা শব্দে উঠিল উদ্বেলি।
তুমি পথপ্রান্তে একা ছিলে হাস্যমুখে
নিঃশব্দে দেখিতেছিলে নিস্তব্ধ কৌতুকে;
হৃদয় আছিল জনস্রোতে,
মন ছিল দূরে সবা হতে।

বহে গেল জনতার ঢেউ।
তোমা-পানে চাহে নাই কেউ।
কেবল একেলা আমি দেখেছি তোমারে,
তুমিই ফেল নি ছায়া ছায়ার মাঝারে।
মালা হাতে কাছে গেনু ধেয়ে,
হাসিলে আমার মুখে চেয়ে।

২৫ অগস্ট, ১৯২৮
চৌরঙ্গি

পাণ্ডুলিপিতে-প্রাপ্ত স্বতন্ত্র পাঠ।

মহুয়া

রে মহুয়া, নামখানি গ্রাম্য তোর, লঘু ধ্বনি তার,
প্রাণ তোর উচ্চশির রহে রাজকুলবনিতার
মর্যাদা বহিয়া। হেরিয়াছি তোরে শালবীথিকায়
বনস্পতিসভা-মাঝে, সজ্জা তোর প্রচুর ছায়ায়
লুণ্ঠিত তৃণের 'পরে ; বিপুল পল্লবঘন স্তরে
আগন্তুক বিহঙ্গমে সংগীতগুণীর সমাদরে
ডেকে নিস উদার আশ্রয়ে। উঠে যবে হুহুংকার
ক্রুদ্ধ কালবৈশাখীর, গর্ব জাগে শাখাপ্রশাখার,
তর্জনে গর্জিয়া উঠে দৃপ্তবলে রাখে আশ্রিতেরে।
অনাবৃষ্টিশীর্ণ দিনে বনের প্রাঙ্গণ হতে ফেরে
বুভুক্ষু অতিথি যবে, বন্য নারী আসে তোর পথে,
দুর্ভিক্ষের ভিক্ষাঞ্জলি পূর্ণ করি দিস সদাব্রতে।
যে-বধূরে ভাবি মনে, কানে-কানে কহি আমি তোরে—
যদি তার দেখা পাই ডাকিব মহুয়া নাম ধ'রে।

২ সেপ্টেম্বর ১৯২৮

পাণ্ডুলিপিতে-প্রাপ্ত বর্জনচিহ্নাঙ্কিত প্রথম পাঠ।

বিরহ ও অন্তর্ধান

শঙ্কিত আলোক নিয়ে দিগন্তে উদিল শীর্ণ শশী,
অরণ্যে শিরীষশাখে অকস্মাৎ উঠিল উচ্ছ্বসি
বসন্তের হাওয়ার খেয়াল,—
ব্যথায় নিবিড় হল শেষ কথা কহিবার কাল।

গোধূলির গীতিশূন্য স্তম্ভিত প্রহরখানি বেয়ে
গেলে তুমি দূর পথে, নির্নিমেষ রহিলাম চেয়ে।
ধীরে ধীরে বনান্তে মিলালো
প্রান্তরের প্রান্ততটে অস্তশেষ ক্ষীণ পাংশু আলো।

তব অন্তর্ধানে তব হেরিলাম রূপ চিরন্তন,
অন্তরে অলক্ষ্যলোকে তোমার পরম আগমন।
লভিলাম চিরস্পর্শমণি ;
তোমার শূন্যতা তুমি পরিপূর্ণ করেছ আপনি।

যে-দ্বার খুলিয়া গেলে রুদ্ধ সে হবে না কোনোমতে,
কান পাতি রহে তব ফিরিবার প্রত্যাশার পথে—
তোমার অমূর্ত আসাযাওয়া
যে পথে চঞ্চল করে দিগ্‌বালার অঞ্চলের হাওয়া।

বসন্তে মাঘের অন্তে আম্রবনে মুকুলমত্ততা
মধুপগুঞ্জনে মিশি আনে কোন্ কানে-কানে কথা।
মোর নাম তব কণ্ঠে ডাকা
ক্ষান্ত আজি তাপক্লান্ত দিনান্তের মৌন দিয়ে ঢাকা।

বিরহের সঙ্গহীন স্তব্ধতার গভীর নিভৃতে
বাক্যহারা চিত্তে মোর এতদিনে পাইনু শুনিতে
তুমি কবে মর্ম-মাঝে পশি
দিলে অনির্বচনীয় ধ্যানমন্ত্রবাণী মহীয়সী।

অন্তরের অন্ধকারে এতদিনে পাইনু সন্ধান
সন্ধ্যার দেউলদীপ চিত্তে মোর তোমারি সে দান।
বিচ্ছেদের হোমবহ্নি হতে
পূজামূর্তি ধরি প্রেম দেখা দিল দুঃখের আলোতে।

২৬ আষাঢ় ১৩৩৫

'বিরহ' ও 'অন্তর্ধান' কবিতাদুটির পাণ্ডুলিপিতে প্রাপ্ত একীকৃত আকারের প্রাথমিক পাঠ।

'দায়মোচন' কবিতাটির প্রথম শ্লোকের পরে পাণ্ডুলিপিতে নিম্নোদ্ধৃত একটি সম্পূর্ণ নূতন শ্লোক আছে :

শ্রাবণের বর্ষণে যা দিয়েছে ঢালি,
দান সেই অল্প তো নয়।

ফাল্গুনে ধরণীর যৌবনডালি
ভরে সেই রসসঞ্চয়।
তার পরে আশ্বিনে মেঘ উদাসীন
শূন্য গগনতলে সম্বলহীন ;—
স্বচ্ছ প্রভাতে ধরা চাহে তার পানে,
বিদায়ঋতুরে নাহি ভরে।
আলোতে শিশিরে আর সৌরভে প্রাণে
গৌরবে বিচ্ছেদ ভরে।

'সাগরিকা' কবিতাটির মহুয়ায় প্রচলিত পাঠে নিম্নমুদ্রিত একটি সম্পূর্ণ স্তবক বর্জিত হইয়াছে। পাণ্ডুলিপি ও মাসিক পত্রে (প্রবাসী, ১৩৩৪ পৌষ) প্রাপ্ত এই স্তবকটির স্থান বর্তমান পাঠের চতুর্থ স্তবকের পরে :

পরের দিনে তরুণ উষা বেণুবনের আগে
জাগিল যবে নব অরুণরাগে,—
নীরবে আসি দাঁড়ানু তব আঙন-বাহিরেতে,
শুনিনু কান পেতে,
গভীর স্বরে জপিছ কোন্‌খানে
উদ্‌বোধনমন্ত্র যাহা নিয়েছ তব কানে,
একদা দোঁহে পড়েছি যেই মোহমোচন বাণী
মহাযোগীর চরণ স্মরি' যুগল করি' পাণি।

'বিদায়সম্বল' কবিতাটির প্রচলিত পাঠে বর্জিত শেষ শ্লোকটি পাণ্ডুলিপি ও বিচিত্রা (১৩৩৪ কার্তিক) হইতে নিম্নে সংকলিত হইল :

যাবার দিকের পথিক যখন
শেষ কাঁদা শেষ হাসা
মিটায়ে চলিছে, থাক্‌-না তখন
মিছে ওইটুকু আশা।
বিদায়ের আগে সজল আঁখিতে
উঠুক ঘনিয়া ক্ষণিকের গীতে
'ভুলিব না কভু' এই কথাটিতে
অন্তিম ভালোবাসা।

মহুয়ার কয়েকটি কবিতার পরিবর্তিত সংগীতরূপ প্রথম সংস্করণ গীতবিতানের তৃতীয় খণ্ডেই (শ্রাবণ ১৩৩৯) পাওয়া যায়।

কবিতা		গানের প্রথম পংক্তি	গী. বি. পৃষ্ঠা
বিজয়ী	-	বিরস দিন, বিরল কাজ	৮০৪
সন্ধান	-	আমার নয়ন তোমার নয়নতলে	৭৫৫
মুক্তি	-	চপল তব নবীন আঁখি দুটি	৭৯২
উদ্‌ঘাত	-	জানি তোমার অজানা নাহি গো	৭৯৪
নিবেদন	-	কাহার গলায় পরাবি গানের	৮৩৩
গুপ্তধন	-	আরো একটু বোসো তুমি	৮২৭
পুরাতন	-	অনেকদিনের আমার যে-গান	৭৬৬

প্রত্যাশা, সন্ধান, বরণডালা, নিবেদন, নির্ভয়, গুপ্তধন, অবশেষ — মহুয়ার এই সাতটি কবিতাতেও রবীন্দ্রনাথ সুর দিয়াছিলেন ; দ্বিতীয় সংস্করণ গীতবিতানের দ্বিতীয় খণ্ড দ্রষ্টব্য।

১৩৩৬ সালে গ্রন্থপ্রকাশের অব্যবহিত পূর্বে মহুয়া সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে-পত্র লিখিয়াছিলেন নিম্নে তাহা মুদ্রিত হইল :

লেখার বিষয়টা ছিল সংকল্প করা— প্রধানত প্রজাপতির উদ্দেশে— আর তাঁরই দালালি করেন যে-দেবতা তাঁকেও মনে রাখতে হয়েছিল। অতএব 'মহুয়া'র কবিতাকে ঠিক আমার হালের কবিতা বলে শ্রেণীবদ্ধ করা চলে না। ভেবে দেখতে গেলে এটা কোনো কালবিশেষের নয়, এটা আকস্মিক। আমার সত্যিকার আধুনিক কবিতার সঙ্গে যদি এদের এক পংক্তিতে বসাও তা হলে তাদের বর্ণভেদ অত্যন্ত পরিস্ফুট হয়ে উঠবে। কিন্তু আমার সন্দেহ হচ্ছে কিছু যেন অত্যুক্তি করা হল। ফরমাশ ব্যাপারটা মোটরগাড়ির স্টার্টারের মতো। চালনাটা শুরু করে দেয় কিন্তু তার পরে মোটরটা চলে আপন মোটরিক প্রকৃতির তাপে। প্রথম ধাক্কাটা একেবারেই ভুলে যায়। মহুয়ার কবিতাগুলিও লেখবার বেগে ফরমাশের ধাক্কা নিঃসন্দেহই সম্পূর্ণ ভুলেছে— কল্পনার আন্তরিক তড়িৎ-শক্তি আপন চিরন্তনী প্রেরণায় তাদের চালিয়ে নিয়ে গেছে। প্রথম হাতল ঘোরানো হতেও পারে বাইরের থেকে, কিন্তু সচলতা শুরু হবামাত্রই লেখবার আনন্দই সারথি হয়ে বসে। এইজন্য আমার বিশ্বাস, তোমরা এই লেখার মধ্যে নতুন কিছু পাবে, আকারে এবং প্রকারে। নতুন লেখার ঝোঁক যখন চিত্তের মধ্যে এসে

পড়ে তখন তারা পূর্বদলের পুরানো পরিত্যক্ত বাসায় আশ্রয় নিতে চায় না ; নতুন বাসা না বাঁধতে পারলে তাদের মানায় না, কুলোয় না। ক্ষণিকার বাসা আর বলাকার বাসা এক নয়।

আমি নিজে মহুয়ার কবিতার মধ্যে দুটো দল দেখতে পাই। একটি হচ্ছে নিছক গীতিকাব্য, ছন্দ ও ভাষার ভঙ্গীতেই তার লীলা। তাতে প্রণয়ের প্রসাধনকলা মুখ্য। আর-একটিতে ভাবের আবেগ প্রধান স্থান নিয়েছে, তাতে প্রণয়ের সাধনবেগই প্রবল।

মহুয়ার 'মায়া' নামক কবিতায় প্রণয়ের এই দুই ধারার পরিচয় দেওয়া হয়েছে। প্রেমের মধ্যে সৃষ্টিশক্তির ক্রিয়া প্রবল। প্রেম সাধারণ মানুষকে অসাধারণ ক'রে রচনা করে— নিজের ভিতরকার বর্ণে রসে রূপে। তার সঙ্গে যোগ দেয় বাইরের প্রকৃতি থেকে নানা গান গন্ধ, নানা আভাস। এমনি ক'রে অন্তর-বাহিরের মিলনে চিত্তের নিভৃত লোকে প্রেমের অপরূপ প্রসাধন নির্মিত হতে থাকে— সেখানে ভাবে ভঙ্গীতে সাজে সজ্জায় নূতন নূতন প্রকাশের জন্য ব্যাকুলতা, সেখানে অনির্বচনীয়ের নানা ছন্দ, নানা ব্যঞ্জনা। একদিকে এই প্রসাধনের বৈচিত্র্য, আর-একদিকে এই উপলব্ধির নিবিড়তা ও বিশেষত্ব। মহুয়ার কবিতা চিত্তের সেই মায়ালোকের কাব্য, তার কোনো অংশে ছন্দে ভাষায় ভঙ্গীতে এই প্রসাধনের আয়োজন, কোনো অংশে উপলব্ধির প্রকাশ।

এই দুয়ের মধ্যে নূতনের বাসন্তিক স্পর্শ নিশ্চয় আছে— নইলে লিখতে আমার উৎসাহ থাকত না। তুমি তো জানই কত অল্প সময়ের মধ্যে এগুলি সমাধা করেছি। তার কারণ প্রবর্তনার বেগ মনে সতেজ ছিল। তাই অন্যমনস্ক-ভাবে এই পত্রের পূর্বাংশে তোমাকে যা লিখেছি অপরাংশে তার প্রতিবাদ করতে হল। বলেছিলুম এ লেখাগুলি আকস্মিক। ভুলেছিলুম সব কবিতাই যখনি লেখা যায় তখনি আকস্মিক। সব কবিতা বললে হয়তো বেশি বলা হয়। এক-একটা সময়ে এক-একটা নতুন ঝোঁকের কবিতা। বারো মাসে পৃথিবীর ছয় ঋতু বাঁধা, তাদের পুনরাবর্তন ঘটে। কিন্তু আমার বিশ্বাস, একবার আমার মন থেকে যে-ঋতু যায়, সে আর-এক অপরিচিত ঋতুর জন্যে জায়গা ক'রে বিদায় গ্রহণ করে। পূর্বকালের সঙ্গে কিছু মেলে না, এ হতেই পারে না, কিন্তু সে যেন শরতের সঙ্গে শীতের মিলনের মতো। মনের যে-ঋতুতে মহুয়া লেখা সে আকস্মিক ঋতুই, ফর্মাসের ধাক্কায় আকস্মিক নয়, স্বভাবতই আকস্মিক। এগুলি যখন লিখছিলুম অপূর্বকুমার[১] প্রায় রোজ এসে শুনে যেত, সে যে-উত্তেজনা প্রকাশ করত সেটা

---

[১] শ্রীঅপূর্বকুমার চন্দ

অপূর্বতারই উত্তেজনা। রূপের দিকে বা ভাবের দিকে একটা-কিছু নতুন পাচ্ছে বলেই তার আগ্রহ— তখন সুধীন্দ্র দত্তও ছিল তার সঙ্গী। তার থেকে আমার বিশ্বাস আপনার এই সমর্থন পেত যে, মনের মধ্যে রচনার একটি বিশেষ ঋতুর সমাগম হয়েছে— তাকে পুরবীর ঋতু বা বলাকার ঋতু বললে চলবে না।

পুরবী ও মহুয়ার মাঝখানে আর-একদল কবিতা আছে— সেগুলি অন্য জাতের। তাদের মধ্যে নটরাজ ও ঋতুরঙ্গই প্রধান। নৃত্যাভিনয়ের উপলক্ষ নিয়ে এগুলি রচিত হয়েছিল কিন্তু এরাও স্বভাবতই উপলক্ষকে অতিক্রম করেছে। আর কোনোখানেই শান্তিনিকেতনের মতো ঋতুর লীলারঙ্গ দেখি নি— তারই সঙ্গে মানবভাষায় উত্তর প্রত্যুত্তর কিছুকাল থেকে আমার চলছে। তার রীতিমত শুরু হয়েছে শারদোৎসবে— তার পরে ঋতুগীতির প্রবাহ বেয়ে এসে পড়েছিল ঋতুরঙ্গে। বিষয় এক তবু প্রভেদ যথেষ্ট। সেই প্রভেদ যদি না থাকত তা হলে লেখবার উৎসাহই থাকত না। মহুয়ার কবিতা যখন পড়বে তখন আমার স্বভাবের এই কথাটা মনে রেখো। এই বইয়ের প্রথমে ও সব-শেষে যে-গুটিকয়েক কবিতা আছে সেগুলি মহুয়া পর্যায়ের নয়। সেগুলি ঋতু-উৎসব পর্যায়ের। দোলপূর্ণিমায় আবৃত্তির জন্যেই এদের রচনা করা হয়েছিল। কিন্তু নববসন্তের আবির্ভাবই মহুয়া কবিতার উপযুক্ত ভূমিকা ব'লে নকিবের কাজে ওদের এই গ্রন্থে আহ্বান করা হয়েছে।

মহুয়া নামটা নিয়ে তোমার মনে একটা দ্বিধা হয়েছিল জানি। কাব্যের বা কাব্যসংকলন-গ্রন্থের নামটাকে ব্যাখ্যামূলক করতে আমার প্রবৃত্তি হয় না। নামের দ্বারা আগেভাগে কবিতার পরিচয়কে সম্পূর্ণ বেঁধে দেওয়াকে আমি অত্যাচার মনে করি। কবিতার অতিনির্দিষ্ট সংজ্ঞা প্রায়ই দেওয়া চলে না। আমি ইচ্ছা করেই মহুয়া নামটি দিয়েছি, নাম পাছে ভাষ্যরূপে কর্তৃত্ব করে এই ভয়ে। অথচ কবিতাগুলির সঙ্গে মহুয়া নামের একটুখানি সংগতি আছে— মহুয়া বসন্তেরই অনুচর, আর ওর রসের মধ্যে প্রচ্ছন্ন আছে উন্মাদনা। যাই হ'ক, অর্থের অত্যন্ত বেশি সুসংগতি নেই বলেই কাব্যগ্রন্থের পক্ষে এ নামটি উপযুক্ত বলে আমি বিশ্বাস করি।"

কবির স্বহস্তাঙ্কিত নামপত্র এবং উৎসর্গকবিতাটি প্রচলিত সংস্করণের মতো রচনাবলী-সংস্করণ মহুয়াতেও মুদ্রিত হইল।

বনবাণী

বনবাণী ১৩৩৮ সালের আশ্বিন মাসে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। রচনাবলী-সংস্করণে গ্রন্থটির 'বনবাণী' এবং 'বৃক্ষরোপণ উৎসব' কেবল এই দুইটি কবিতা-অংশ

মুদ্রিত হইল। রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত পাণ্ডুলিপির সাহায্যে অনেক কবিতার রচনাকাল ও পাঠ সংশোধিত এবং রচনাস্থান নির্দিষ্ট হইল।

বনবাণীর ভূমিকাটি শ্রীতেজেশচন্দ্র সেনকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের একটি পত্রের[১] পরিমার্জিত রূপ। 'কুটিরবাসী' কবিতার ভূমিকায় ইনিই 'তরুবিলাসী তরুণবন্ধু' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন।

পাণ্ডুলিপিতে উক্ত কবিতাটির আরম্ভে নিম্নমুদ্রিত তিনটি অতিরিক্ত শ্লোক আছে :

বাসাটি বেঁধে আছ
মুক্তদ্বারে
বটের ছায়াটিতে
পথের ধারে।
সমুখ দিয়ে যাই ; মনেতে ভাবি
তোমার ঘরে ছিল আমারো দাবি,
হারায়ে ফেলেছি সে
ঘূর্ণিবায়ে
অনেক কাজে আর
অনেক দায়ে।

এখানে পথে-চলা
পথিক জনা
আপনি এসে বসে
অন্যমনা।
তাহার বসা সেও চলারই তালে,
তাহার আনাগোনা সহজ চালে,
আসন লঘু তার
অল্প বোঝা,
সোজা সে চলে আসে,
যায় সে সোজা।

আমি যে ফাঁদি ভিত
বিরাম ভুলি',

---

[১] দ্রষ্টব্য : 'গাছপালার প্রতি ভালোবাসা'— প্রবাসী, ১৩৩৪ বৈশাখ।

চূড়ার 'পরে চূড়া
আকাশে তুলি।
আমি যে ভাবনার জটিল জালে
বাঁধিয়া নিতে চাই সুদূর কালে,
সে-জালে আপনারে
জড়াই ঠেসে,
পথের অধিকার
হারাই শেষে।

'শাল' কবিতার ভূমিকায় 'কিশোর কবিবন্ধু' বলিয়া যাঁহার উল্লেখ আছে, তিনি পরলোকগত কবি সতীশচন্দ্র রায় (১২৮৮-১৩১০)[১]।

বৃক্ষরোপণ-উৎসব শান্তিনিকেতনে প্রথম অনুষ্ঠিত হয় ৩০ আষাঢ় ১৩৩৫ সালে (১৪ জুলাই ১৯২৮)। শ্রীপ্রতিমা ঠাকুরকে একটি পত্রে (৯ শ্রাবণ ১৩৩৫)[২] রবীন্দ্রনাথ প্রথমবারের উৎসবের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়াছেন :

…এখানে হল বৃক্ষরোপণ, শ্রীনিকেতনে হল হলচালন।… তোমার টবের বকুলগাছটাকে নিয়ে বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠানটা হল। পৃথিবীতে কোন গাছের এমন সৌভাগ্য কল্পনা করতে পার না। সুন্দরী বালিকারা সুপরিচ্ছন্ন হয়ে শাঁখ বাজাতে বাজাতে গান গাইতে গাইতে গাছের সঙ্গে সঙ্গে যজ্ঞক্ষেত্রে এল— শাস্ত্রীমশায় সংস্কৃত শ্লোক আওড়ালেন— আমি একে একে ছটা কবিতা পড়লুম— মালা দিয়ে চন্দন দিয়ে ধূপধুনো জ্বালিয়ে তার অভ্যর্থনা হল।… তার পরে বর্ষামঙ্গল গান হল— আমি এই উপলক্ষ্যে ছোটো একটি গল্প[৩] লিখেছিলুম, সেটা পড়লুম। আমার বেশভূষা দেখলে নিশ্চয় খুশী হতে। একটা কালো রেশমের ধুতি, গায়ে লাল আঙিয়া, মাথায় কালো টুপি, কাঁধে জরিদেওয়া কালো পাড়ের কোঁচানো লম্বা চাদর।…

পরিশেষ

পরিশেষ ১৩৩৯ সালের ভাদ্র মাসে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। খেলনার মুক্তি, পত্রলেখা, খ্যাতি, বাঁশি, উন্নতি, ভীরু —পরিশেষের এই ছয়টি কবিতা পুনশ্চ গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে গৃহীত হইয়াছে বলিয়া পরিশেষের বর্তমান সংস্করণে বর্জিত হইল। কবিতাগুলি রচনাবলী-সংস্করণে 'পুনশ্চ' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

---

[১] দ্রষ্টব্য : বিচিত্র প্রবন্ধ গ্রন্থে 'বন্ধুস্মৃতি'।

[২] দ্রষ্টব্য : চিঠিপত্র, তৃতীয় খণ্ড, পত্র নং ২৮।

[৩] বলাই : গল্পগুচ্ছ, তৃতীয় খণ্ড।

রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি হইতে অনেক কবিতার রচনাস্থান নির্দিষ্ট হইয়াছে, এবং তারিখ ও পাঠ সংশোধিত বা পরিবর্তিত হইয়াছে।

'বিচিত্রা' কবিতাটির একটি অপ্রকাশিত স্বতন্ত্র পাঠ নিম্নে মুদ্রিত হইল :

বিচিত্রা

চুরি করে নিয়ে গেলে মোর মন কোন্ শিশুকালে,
হে বিচিত্রা, বাঁধি মায়াজালে—
বস্তুর আড়ালে যেথা দিনরাত্রি সাজাইছ তুমি
তোমার রঙের রঙ্গভূমি।
আকাশে ছড়ায়ে কেশ বাঁশি বাজায়েছ চুপে চুপে,—
সেই সুরে মোর চক্ষে কত স্বপ্ন অপরূপ রূপে
করেছে বিচিত্র লীলা ধরণীর ধূলির সীমায়,
দিগন্তের দূর নীলিমায়।

নারিকেলপল্লবের আকম্পিত ইঙ্গিতমর্মরে
বৈশাখের খরসূর্যকরে
আকাশ নিশ্বসি উঠি মধ্যাহ্নের আতন্দ্র আলসে
ভরিয়াছে রহস্যের রসে।
তৃণাগ্রে শিশিরবিন্দু শরতের শুভ্রতার বাণী
বাতাস ঝলকি' দিত, মুক্তির আনন্দ দিত আনি,
কাঁপিত প্রভাত আলো বালকের পুলকিত বুকে
হে বিচিত্রা, চাহি তব মুখে।

চৈত্রে স্বচ্ছ পূর্ণিমায় যত্নে-গাঁথা মল্লিকার মালা
ভরে যবে রাত্রির নিরালা
মিলন-আশ্বাসগন্ধ, শ্রান্তিহীন পাপিয়ার গানে,
অনিদ্রা নিবিড় করি আনে,—
যৌবনের সেই রাত্রে, বিচিত্রা, কাহার কালো চোখে
মোহিনীর মিড়খানি মিলাইতে চাঁদের আলোকে,
মধুর সংশয়ে-ছোঁওয়া শরমের কুহেলিকা আনি
হাসির উপরে দিতে টানি।

লোকালয়ে ফিরায়েছ সুখদুঃখে নিজে হাত ধরি
পথে পথে দিবসশর্বরী।
প্রাণের বীণার তন্ত্রে মৃত্যুসুরে তুলেছ স্পন্দন,
বাঁধিয়াছ, ছিঁড়েছ বন্ধন।
মর্মের বেদনা মোর তোমার আপন রসধারে
পেয়েছে সুতীব্র বর্ণ, দিয়েছ গভীর অর্থ তারে,
মোর নৌকা খেয়া দিতে বারে বারে ঝঞ্ঝাবায়ু তুলে
নিয়ে গেছ অপূর্বের কূলে।

মনে হয় সম্ভবতঃ ইহাই প্রথম পাঠ।

কয়েকটি কবিতার পরিশেষ-গ্রন্থে-বর্জিত অনুচ্ছেদ পাণ্ডুলিপি বা সাময়িক পত্র হইতে নিম্নে উদ্ধৃত হইল :

সহসা জ্যৈষ্ঠের শেষরাতে
শুষ্ক গর্জনের সাথে
পূর্ববনান্তের শাখে মর্মরিয়া জাগে বায়ুবেগ,
ঘননীল মেঘ
দিগন্তের তটে আনে বর্ষণের নিবিড় আশ্বাস—
তৃষিত মাটির বক্ষে দৈন্যজীর্ণ ঘাস
উল্লাসে তখনি
করিয়া অশ্রুত জয়ধ্বনি
থরে থরে
ছোটো ছোটো অঙ্কুরে অঙ্কুরে
আকাশের স্তবগান ফুটাইয়া তুলে
তিনীল তিনাল ফুলে ফুলে।—
সে-পুলক নেব মোর সর্বদেহ ভরি'
রক্তের লহরী
উঠিবে উচ্ছলি।
বসন্তে কুঞ্জের গলি
সুগন্ধিচ্ছায়ায়,

'জন্মদিন' কবিতার পাণ্ডুলিপিতে বর্জনচিহ্নিত রচনাংশ—
বর্তমান রচনাবলীর ১৬৭ পৃষ্ঠার অষ্টম ও নবম পংক্তির মধ্যে।

কবি আমি কারো গুরু নই।
জানি না কী আছে হোথা কৈবল্যের পারে
বৈকুণ্ঠের ধারে।

'পান্থ' কবিতার প্রথম পংক্তির পরে পাণ্ডুলিপিতে প্রাপ্ত রচনাংশ।

তোমার প্রথম জন্মদিন
এনেছে মর্ত্যের ঘাটে যে-প্রাণ নবীন,
চিরন্তন মানবের মহাসত্তা-মাঝে
এল কোন্ কাজে?
এক আমি-কেন্দ্র ঘিরে
ফিরে ফিরে
মুহূর্তের দল অগণন
সৃষ্টির নিগূঢ় শক্তি করিয়া বহন
দিনরাতি
কী গাঁথনি তুলিতেছে গাঁথি
আলোয় ছায়ায়,
বিচিত্র বেদনাঘাতে ঝংকৃত কায়ায়,
রূপে রসে বর্ণে নৃত্যে গন্ধে গানে বেষ্টিত মায়ায়।

'অপূর্ণ' কবিতার বর্জিত প্রথম অনুচ্ছেদ[১]।

শুধু প্রাণরক্ষা আর বংশরক্ষা কাজে
তোমার চিত্তের শক্তি সাঙ্গ হয় নাই আত্ম-মাঝে,
যা রহিল বাকি
ধূলি তারে ফাঁকি দিবে নাকি।
সে চিত্ত অসীম-পানে বাতায়ন দিয়েছিল খুলি,
প্রত্যহের আপনারে ভুলি'
নিত্যের নৈবেদ্যথালে
আপনার শ্রেষ্ঠ দান ভরি দিয়াছিল কালে কালে।

---

[১] দ্রষ্টব্য: প্রবাসী, ১৩৩৮ পৌষ— 'জন্মদিন'।

অসীম প্রাণের বার্তা যবে এসেছিল কানে
মরপ্রাণ তুচ্ছ করেছিলে আত্মদানে,
অর্থ তার কোথাও কি হবে না সমাধা,
মৃত্যু তারে দিবে বাধা,
ধুলায় কি হবে ধূলি
মহাক্ষণগুলি।

জন্মদিন এই বাণী
দিক তব চিত্তে আনি,—
মর্ত্যের জরায়ু
আপনাতে বদ্ধ করি লুপ্ত করিবে না তব আয়ু,—
অসম্পূর্ণ ক্লিষ্ট প্রাণ—
এ গর্ভবন্ধনে তার হলে অবসান,—
আরবার নবজন্ম লবে
পূর্ণের উৎসবে।

'অপূর্ণ' কবিতার শেষদুটি বর্জিত অনুচ্ছেদ।

আঁধার তিথিতে তারকাবীথিতে তন্দ্রাজড়িত চন্দ্র।
যূথীকলিগুলি দিতেছে আকুলি হিমগদ্‌গদ গন্ধ।
ক্ষীণ জ্যোৎস্নায়, ঘন কুয়াশায়,
ঘুমে জাগরণে, কায়ায় মায়ায়,
তোমায় আমায় আলোয় ছায়ায়
যুগলে ঘটিল দ্বন্দ্ব।
জন্মমরণ-অতীত বেলায় স্মরণের পরপারে
তব ভাবনায় মোর চেতনায় এক হল একেবারে।

'তুমি' কবিতার বর্জিত প্রথম শ্লোক। দ্রষ্টব্য: প্রবাসী, ১৩৪৮ চৈত্র— 'প্রাণলক্ষ্মী'।

আমি বেসেছিলেম ভালো
সকল দেহে মনে
এই ধরণীর ছায়া আলো
আমার এ জীবনে।
সেই যে আমার ভালোবাসা
লয়ে আকুল অকুল আশা
ছড়িয়ে দিল আপন ভাষা
আকাশনীলিমাতে।
রইল গভীর সুখে দুখে,
রইল সে-যে কুঁড়ির বুকে
ফুল-ফোটানোর মুখে মুখে
ফাগুনচৈত্ররাতে।
রইল তারি রাখি বাঁধা
ভাবীকালের হাতে।

'দিনাবসান' কবিতার তৃতীয় অনুচ্ছেদের পরবর্তী বর্জিত অনুচ্ছেদ।
দ্রষ্টব্য প্রবাসী, ১৩৩৩ জ্যৈষ্ঠ— 'জন্মোৎসবের দিনে'।

পরিশেষের কয়েকটি কবিতা সাময়িক পত্রে গদ্যভূমিকা-সংবলিত আকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। নিম্নে গদ্যাংশগুলি মুদ্রিত হইল।

অবুঝ মন

জাহাজ চলছে, সমুদ্রের জল কেবলই ছল্‌ছল্‌ করে, আর লাফিয়ে লাফিয়ে ওঠে। একটি ছোটো শিশু; আমরা আছি আপন আপন কোণে একটিমাত্র কেদারা নিয়ে, কিন্তু সে আছে সমস্ত ডেক জুড়ে। তার অবুঝ মনখানি অসংলগ্ন অহৈতুক আগ্রহে ফ্যাল্‌ফেলে চোখের ভিতর দিয়ে বিশ্বের পরিচয় নিচ্ছে। আমার অঙ্কবিহারী সেই আটদশমাসের শিশুটির খেলা দেখে আমার অনেকটা সময় কাটে।

এটা বুঝতে পারছি যে, ওরই ওই মনটি আদিমকালের বহু পুরাতন। আমার যে-মন ওকে দেখছে আর ভাবছে, সেই হল নূতন; অনেক চেষ্টায় অনেক শিক্ষায় ও সাধনায় এই বিচারবুদ্ধিমান মন গড়ে উঠছে, এখনো সে অসমাপ্ত। ওরই অবচেতন মনটির সঙ্গে মেলে গাছপালার মধ্যে যে নির্বোধ মন জলের দিকে তার শিকড় চালাচ্ছে, সূর্যের দিকে যার আকুতি, যা স্বপ্নচালিতের মতো আপন ফুলের ভিতর দিয়ে আপন

ফলের উদ্দেশ্য সাধন করে। আমার নতুন মন গাছপালার মধ্যে ওই পুরাতন সহজ মন দেখে গভীর শান্তি পায়, আনন্দিত হয়। শিশুর মধ্যেও সেই আদিম মনটি দেখতে তার এত ভালো লাগে। মেয়েদের প্রকৃতিতেও মনের এই আদিমতার প্রাধান্য, তাদের সহজ বোধ সহজ প্রবৃত্তি বিচারবুদ্ধির চেয়ে অনেক প্রবল। আমরা অনেকদিন থেকে ওদের সরলা অবলা বলে আসছি, সে কথার মানেই ওই— যে-তর্কে দ্বিধা আনে ওদের স্বভাবে ভালো করে সেই তর্কবুদ্ধি দখল পায় নি। নতুন-বুদ্ধিওয়ালা পুরুষের মনের কাছে এই সহজ মনের সংস্পর্শ আরামের। নতুনবুদ্ধিওয়ালা মনটা ক্লান্ত করে, বিভ্রান্ত করে, সংশয়ে আন্দোলিত করে; এইজন্যে মানুষ অনেকসময় মদ খায়, এই উদগ্রবুদ্ধিমান মনটাকে বিহ্বল করে দিয়ে সেই আপন আদিম অবোধ মনের মধ্যে ছুটি নিতে চায় যেখানে অরাজকতা।

শিশুর মধ্যে যাকে দেখছি, সেই আদিম মনটাকে আর-এক জায়গায় দেখছি যেখানে গণসংঘ। সেই গণেশের হাতির মুণ্ড, তার যূথবুদ্ধির মাথা, সে বশ মানতেও যেমন মেতে উঠতেও তেমনি। তার প্রকাণ্ড শক্তির সঙ্গে তার নীরব বশ্যতার মিল পাই নে, তেমনি তার অকস্মাৎ দুর্দামতারও হিসেব পাওয়া যায় না। সেই অবুঝ মনটার সংস্কারগুলো, তার সমস্ত অন্ধ প্রবর্তনা গণসম্প্রদায়কে ঠেলে নিয়ে চলে। তারাই হল বাহন। নতুন মনটা সারথিগিরি করতে চেষ্টা করে, কিন্তু ঘোড়া প্রায়ই চার পা তুলে ছোটে। নইলে য়ুরোপে সেদিন যে যুদ্ধকাণ্ড হয়ে গেল, তা হতে পারত না। আদিম মনটা যখন বুদ্ধিওয়ালা মনটাকে একেবারেই মানতে চায় না, তখন মানুষ যাকে সভ্যতা বলে তার ঘটে দুর্গতি। প্রাচীন গ্রীস তার অসামান্য বুদ্ধি সত্ত্বেও যদি মরে থাকে, তার কারণটা ছিল অবচেতন মনের মধ্যে, যেখানে তার গুহাচর প্রবৃত্তির, তার গর্তবাসী সংস্কারের বাসা। আজকের দিনে য়ুরোপ কোনোমতেই স্থায়ী শান্তির কোনো ব্যবস্থা করতে পারছে না, তার কারণ সংস্কারগুলো লাগাম দাঁতে চেপে ধ'রে ছুটতে চায়।

সভ্যতা এর উলটো কারণেও মরে। নতুন মন যখন সনাতন সহজ মনের শক্তিকে আপন জটিল কর্মজালে সম্পূর্ণ চাপা দিতে চায়, আপন রথের চাকার তলায় তাকে খণ্ড খণ্ড করে, তখন তার শক্তির আদিম আশ্রয় জীর্ণ হয়ে যায়। আকাশগামী চূড়াটা ধুলোর আশ্রয় ছাড়িয়ে উঠতে চায়; ক্ষতি নেই, কিন্তু যখন সামঞ্জস্যের সীমা অতিক্রম করে তখনি ফিরে তাকে সেই ধুলোয় এসে পড়তে হয়। আদিম অবুঝ মনের সঙ্গে নতুনবুদ্ধিমান মনের পদে পদে রফা-নিষ্পত্তি করে চলাই পাকাচালে চলা। এই তো গেল আমার চিন্তার কথা। কিন্তু শিশুর মুখের দিকে যখন তাকিয়ে দেখতুম তখন যে-আনন্দ বোধ করতুম সেটা চিন্তার আনন্দ নয়; তখন আমি বিশ্বব্যাপী আদিম

প্রাণের বৃহৎ রঙ্গলীলা শিশুর দুটি চোখের বুদ্ধিবিহীন চঞ্চল ঔৎসুক্যের মধ্যে দেখতে পেতুম। শিশুর মধ্যে সেই বিশ্বশিশুকে দেখার আনন্দেই এই কবিতাটি লিখেছি।

— বিচিত্রা, ১৩৩৪ অগ্রহায়ণ

আরেক দিন

যখন বছর দুয়েক হল দক্ষিণ আমেরিকায় যাত্রা করেছিলুম তখন মনের মধ্যে কোনো ভার ছিল না। যাঁরা আমাকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন তাঁরা আমাকে ভরসা দিয়েছিলেন যে, তাঁরা আমার কাছ থেকে বক্তৃতা চান না, আমাকেই চান। দেশের দিক থেকেও কোনো অনুরোধ নিয়ে আসি নি, কেবল জাহাজে ওঠবার আগে একটি বাঙালী মেয়ের চিঠি পেয়েছিলুম, সে ইচ্ছে জানিয়েছিল আমি যেন ডায়ারি লিখি। তার পরে ভেসে পড়লুম সমুদ্রে। মন অনেকদিন এমন মুক্তি পায় নি। সামনে পিছনে কর্তব্যের তাগিদ নেই, আশেপাশেও তথৈবচ। বহুকাল পূর্বে, তখন বয়স অল্প, ঘরে কিম্বা বাইরে খাতির করবার লোক নেই,— লেখা আরম্ভ করেছি কিন্তু সে লেখা দূরে পৌঁছয় নি। আমার কাছে দেশের লোকের বা বিদেশের লোকের কোনো প্রত্যাশা ছিল না। পাঠক জমতে আরম্ভ করে নি তা বলা যায় না, কিন্তু পাঠকমণ্ডলী-নামক প্রকাণ্ড একটি শনিগ্রহ আমার জীবনকে তার উপগ্রহদলে ভরতি করবার জন্যে টান মারে নি। তখন মাসিকপত্র দুটি-চারটি, তার মধ্যে যারা প্রবলকণ্ঠশালী তারা ছিল আমার নিয়ত প্রতিকূল। সাপ্তাহিক যে-কয়টি ছিল তারা কেউ আমার প্রতি প্রসন্ন ছিল না। তাই আমার দায়িত্ব ছিল প্রধানত আমার নিজের কাছেই। তখন না ছিলেম অখ্যাত, না ছিলেম বিখ্যাত, ছিলেম প্রত্যাখ্যাত। তখন বাংলাদেশের নির্জন নদীর চরে ছিল আমার যাওয়া-আসা। সম্পূর্ণ নিজের মনেই লিখে যেতুম, শোনবার লোক কেউ ছিল না তা নয়, ছিল দুটি-চারিটি। আমার মন ছিল পাখি; তার না ছিল খাঁচা, না ছিল পায়ে শিকল,— না ছিল তার 'পরে শৌখিনের দাবি, না ছিল তার জন্যে প্রশংসার বাঁধা খোরাক। তার পর চল্লিশ বছর হয়ে গেল। এবার চলল সমুদ্রযাত্রা সুদীর্ঘ; পরিচিত সঙ্গী কেবলমাত্র একজন, এল্ম্‌হর্‌স্ট্‌, বাংলাভাষায় তার কান ছিল না। ডাঙার কোলাহল বহুদূরে। তার উপর শরীর হল অসুস্থ, তাতে ক'রেও সংসারের দায়িত্ব আরো অনেক দূরে দিলে সরিয়ে। বহুবৎসর পরে তাই ছুটি পাওয়া গেল, অল্পবয়সের হালকা জীবনের ছুটি। অমনি কলম আপনি ছুটল কবিতার চেনা রাস্তায়। ক্যাবিনে বসেও কবিতা লেখা চলে, এইবারে তার প্রথম আবিষ্কার। ক্যাবিনের খাঁচা বাইরের খাঁচা, সেটা ভুলতে বেশিক্ষণ লাগে না যদি

মনের মধ্যে পর্দা উঠে যায়, যদি ছুটির আকাশ থেকে হুহু করে হাওয়া ছুটে আসে। সেদিন শুধু কাব্য লিখি নি, গদ্যও লিখেছি ; সেই কবিতা আর গদ্য ছিল ভাইবোন, সগোত্র।

এইবারে সেই ছুটি ঠিক মিলল না। মন ডানা নড়াতে গিয়ে দেখে ডানার উপরে কর্তব্যের ফরমাশ গট হয়ে চেপে ব'সে ; মনের আপন খেয়ালের জায়গা খুব সংকীর্ণ। দূর হ'কগে— বোঝাটাকে নিয়ে দেশদেশান্তরে আর বয়ে বেড়াতে পারি নে। কাল ডেকের উপর কেদারায় বসে মনে-মনে বললুম, বিশ্বের কাছে আমার দায়িত্ব আছে, অন্তত কিছুক্ষণের জন্যে এই কথাটা ভুলব। তাই একটা ছোটো কালো খাতা নিয়ে ঝুঁকে পড়া গেল, গৌড়জনকে নিরবধি মধু খাওয়াব সংকল্প করে নয়, অদৃষ্টের কাছে আজো ছুটির পাওনা দাবি করতে পারি এইটি প্রমাণ করবার জন্যে।

তার পরে সন্ধে হয়ে এল। দূরে দেখা যায় তটরেখা, নীল পাহাড় ঝাপসা হয়ে এসেছে। হাওয়া উঠেছে, সমুদ্রে দিয়েছে ঢেউ। ডেকের উপর আলো জ্বলল। আবার একবার কলম হাতে খাতা খুললুম।

—বিচিত্রা, ১৩৩৪ মাঘ

তে হি নো দিবসাঃ

অপরাহ্নে আর-একটা কবিতা লিখে বসেছি। কর্তব্য হাতে না থাকলে অকাজের প্রাদুর্ভাব কি-রকম প্রবল হয় তারই এটা প্রমাণ। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ্ যখন কর্তব্য সম্বন্ধে ওড্ লিখেছিলেন তখন তাঁকে যদি মুলোর চাষ করতে হত, তা-হলে অতবড়ো দুর্ঘটনা ঘটত না। পোড়ো বাড়িতেই ভূতে বাসা করে।

—বিচিত্রা, ১৩৩৪ ফাল্গুন

প্রসঙ্গতঃ ইহা উল্লেখযোগ্য যে, পরিশেষের 'দুয়ার' কবিতাটির শ্লোকচারিটি বিশ্বভারতী বিদ্যাভবনে চারিটি দ্বারের উদ্দেশে রচিত হইয়া দ্বারগুলির শীর্ষফলকে অঙ্কিত হইয়াছে।

সংযোজন

পরিশেষ প্রকাশের বৎসরে (১৩৩৯) ও তৎপূর্বে রচিত রবীন্দ্রনাথের যে-সকল কবিতা বনবাণী বা পরিশেষে সংকলিত হইতে পারিত অথচ কোনো কবিতাগ্রন্থে প্রকাশিত হয় নাই, তাহাদের কতকগুলি পঞ্চদশখণ্ড রচনাবলীর সংযোজন-বিভাগে মুদ্রিত হইয়াছে। পরিশেষ গ্রন্থের কবিতাগুলির ভাবানুষঙ্গ বিচারে অব্যবহিত পরবর্তী কালের কয়েকটি রচনাও এই অংশে সংকলিত হইয়াছে। একই কারণে

‘পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি’ হইতে ‘লক্ষ্যশূন্য’ এবং ‘জাভাযাত্রীর পত্র’ হইতে ‘নূতন কাল’ কবিতাদুটিও মুদ্রিত হইল।

সাময়িক পত্র হইতে সংকলিত কবিতার তালিকা পত্রিকার নাম ও প্রকাশকাল সহ নিম্নে মুদ্রিত হইল :

প্রাচী - প্রাচী, ১৩৩০ আষাঢ়
আশীর্বাদ (পৃ. ২৯১) - প্রবাসী, ১৩৪৮ শ্রাবণ
আশীর্বাদ (পৃ. ২৯২) - বিচিত্রা, ১৩৩৫ শ্রাবণ
প্রবাসী[1] - প্রবাসী, ১৩৩৩ বৈশাখ
বুদ্ধজন্মোৎসব[2] - প্রবাসী, ১৩৩৪ বৈশাখ
প্রথম পাতায়[3] - প্রবাসী, ১৩৩৪ জ্যৈষ্ঠ, পৃ. ১৫৭
নূতন - কল্লোল, ১৩৩৫ বৈশাখ
শুকসারী - উত্তরা, ১৩৩৮ আশ্বিন
সুসময় - বিচিত্রা, ১৩৩৫ আষাঢ়
পরিণয়মঙ্গল - বিচিত্রা, ১৩৩৪ চৈত্র
গৃহলক্ষ্মী - বঙ্গলক্ষ্মী, ১৩৩৪ বৈশাখ
রঙিন - বিচিত্রা, ১৩৩৮ বৈশাখ
আশীর্বাদী - উপাসনা, ১৩৩৮ আশ্বিন
বসন্ত-উৎসব - বিচিত্রা, ১৩৩৯ বৈশাখ
আশীর্বাদ (পৃ. ৩০৮) - প্রবাসী, ১৩৩৯ অগ্রহায়ণ
আশীর্বাদ (পৃ. ৩০৯) - বিচিত্রা, ১৩৩৯ মাঘ
উত্তিষ্ঠত নিবোধত - প্রবাসী, ১৩৪৮ মাঘ
প্রার্থনা - বিচিত্রা, ১৩৪০ ভাদ্র
অতুলপ্রসাদ সেন - উত্তরা, ১৩৪১ আশ্বিন

‘জীবনমরণ’ কবিতাটি পাণ্ডুলিপি হইতে গৃহীত হইয়াছে ; ১৩৪৮, আশ্বিনের মেঘনা পত্রিকায় কবিতাটি ‘বসন্ত’ নামে প্রকাশিত হয়, সেখানে উহার তারিখ— দোলপূর্ণিমা ১৩৩৪। ‘জীবনমরণ’ ও ‘সুসময়’ কবিতাদুটির পাণ্ডুলিপিতে প্রাপ্ত পূর্ব পাঠ নিম্নে মুদ্রিত হইল :

জীবনমরণ

জীবনের মরণের বাজায়ে মন্দিরা
বসন্ত নাচিয়া চলে চরণ চঞ্চল।
মাটির বন্দিনী ধরা তাই তো অধীরা
সাথে চলে যেতে চায় ছিঁড়িয়া শৃঙ্খল।

---

[1] প্রবাসী পত্রিকার পঁচিশবৎসর-পূর্তি উপলক্ষে আশীর্বাণী।
[2] দ্রষ্টব্য : দ্বিতীয় সংস্করণ নটীর পূজা, পৃ. ৫৩।
[3] ‘ছোটো একটি মেয়েকে লেখা’ কয়েকটি পত্রের সহিত প্রকাশিত।

আজি হেরো করে কোলাকুলি
এক দোলে দোঁহে দোলাদুলি
জীর্ণ পাতা কিশলয় কচি,
আজি হেরো শিরীষের বনে
নূতনের সাথে পুরাতনে
উৎসবের ডালি দেয় রচি।

বিদায় টেনেছে মিড় মিলনের তারে,
আনন্দের সুরে লাগে মূর্ছিত মূর্ছনা।
যুগল কপোতকণ্ঠে করুণা সঞ্চারে
ছায়াতলে বনলক্ষ্মী উৎসুক উন্মনা।
মোর প্রাণে যাওয়া আর আসা
একসুরে খোঁজে দোঁহে ভাষা,
একতালে দোলে কান্নাহাসি।
যে আছে যে নাই দোঁহে মিলি
মোর ভাবনায় নিরিবিলি
বাজাইছে ফাল্গুনের বাঁশি।

৬ ফাল্গুন ১৩৩৪

সুসময়

'দাও লেখা দাও' দেয় কত জন তাড়া,
চারদিকে চাই, না পাই বাণীর সাড়া।
চায় যবে কেউ অমনি ধরাই পড়ে
নই তো সে-জন লেখন যে-জন গড়ে—
লক্ষ্মীছাড়ার মিথ্যে দুয়ার নাড়া।

চাবার মানুষ চায় না যখন কেহ
'তীখন কথার লিখন ভিক্ষা দেহো',
হাটের পথিক নাই যবে কেউ বাকি,
একলা শাখায় বউ-কথা-কও পাখি,
হরিণশিশুর নাই মনে সন্দেহ,—

ক্লান্ত সমীর শান্ত কোমল শ্বাসে
অস্ফুট সুর জাগায় যখন ঘাসে,—
তখন হঠাৎ আলগা দুয়ার খোলা,—
স্বপনমগন-নয়ন, আপন-ভোলা
লেখক যে-জন বাহির-ভুবনে আসে।

যখন-তখন লুকিয়ে তাহার আসা,
প্রদোষ-আলোয় পথহারা তার বাসা।
বক্ষে তাহার যে-পুষ্পহার দোলে
নাই জানা নাই কোথায় সে-ফুল তোলে,—
চক্ষে তাহার কোন্ ইশারার ভাষা।

বৈশাখী ঝড় যতই আঘাত হানে
সন্ধ্যাসোনার ভাণ্ডারদ্বার-পানে,
মেঘের উপর যতই দারুণ দাবি,
কুণ্ঠিত মেঘ হারায় সোনার চাবি,
গগন আপন অবগুণ্ঠন টানে।

তার পরে যেই শিউলিফুলের বাসে
শরৎলক্ষ্মী শুভ্র আলোয় ভাসে,
নদীর ধারায় নাই মিছে মত্ততা,
কুন্দকলির স্নিগ্ধ শীতল কথা,
আকাশ সে কোন্ স্বপন-আভায় হাসে,—

শিশির যখন বেণুর পাতার আগে
রবির প্রসাদ নীরব চাওয়ায় মাগে,
সবুজ খেতের নবীন ধানের শিষে
ঢেউ খেলে যায় আলোক ছায়ায় মিশে,
গগনসীমায় কাশের কাঁপন লাগে—

হঠাৎ তখন সূর্য-ডোবার কালে
দীপ্তি জাগায় দিক্‌ললনার ভালে।
মেঘ ছেঁড়ে তার পর্দা আঁধার কালো,
কোথায় সে পায় স্বর্গলোকের আলো,
পরম আশার চরম প্রদীপ জ্বালে।

১৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪

পূর্বোদ্ধৃত 'সুসময়' কবিতার প্রথম চারটি শ্লোকের পরিবর্তিত স্বতন্ত্ররূপ পাণ্ডুলিপির অন্যত্র স্বাধীন কবিতার আকারে পাওয়া গিয়াছে, নিম্নে মুদ্রিত হইল :

'লিখন দেহো, লিখন দেহো' ডাকে,
খুঁজে না পাই বাণী কোথায় থাকে।
চায় কেহ যেই তখন ধরা পড়ে
নই আমি সেই লেখা যে-জন গড়ে,
লেখনী মোর শরমে মুখ ঢাকে।

চাবার মানুষ নাইকো যখন কেহ,
বলে না কেউ 'লিখন দেহো দেহো',
তখন দেখি মনের দুয়ার খোলা,
স্বপন-লাগা নয়ন ভাবে ভোলা
লেখক আসে অভয় অসন্দেহ।

হঠাৎ তাহার গোপন যাওয়া আসা,—
কোন্‌ গভীরে অজানা তার বাসা।
বক্ষে তাহার যে-পুষ্পহার দোলে
কেউ জানে না কোথায় সে ফুল তোলে,
চক্ষে তাহার কোন্‌ ইশারার ভাষা।

'লক্ষ্যশূন্য' ও 'নূতনকাল' কবিতাদুটির সূচনাস্বরূপ রবীন্দ্রনাথ যাহা লিখিয়াছেন, 'যাত্রী'[১] গ্রন্থ হইতে তাহা যথাক্রমে অংশতঃ উদ্ধৃত হইল। পরপৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

---

[১] 'যাত্রী' গ্রন্থের অঙ্গীভূত 'পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি' ও 'জাভা-যাত্রীর পত্র'— রবীন্দ্রশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে 'বিশ্বযাত্রী রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থমালার স্বতন্ত্র দুইটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে।

লক্ষ্যশূন্য

সিদ্ধি, যাকে ইংরেজিতে বলে সাক্‌সেস, তার বাহন যত দৌড়ে চলে ততই ফল পায়। য়ুরোপের দেশে দেশে রাষ্ট্রনীতির যুদ্ধনীতির বাণিজ্যনীতির তুমুল ঘোড়দৌড় চলছে জলে স্থলে আকাশে। সেখানে বাহ্য প্রয়োজনের গরজ অত্যন্ত বেশি হয়ে উঠল, তাই মনুষ্যত্বের ডাক শুনে কেউ সবুর করতে পারছে না। বীভৎস সর্বভুক পেটুকতার উদ্যোগে পলিটিক্‌স্‌ নিয়ত ব্যস্ত। তার গাঁঠকাটা ব্যবসায়ের পরিধি পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়েছে। পূর্বকালে যুদ্ধবিগ্রহের পদ্ধতিতে ধর্মবুদ্ধি যেখানে মাঝে-মাঝে বাধা খাড়া করে রেখেছিল, ডিপ্লমাসি সেখানে আজ লাফমারা **hurdle race** খেলে চলেছে। সবুর সয় না যে। বিষবায়ুবাণ যুদ্ধের অস্ত্ররূপে যখন এক পক্ষ ব্যবহার করলে তখন অন্য পক্ষ ধর্মবুদ্ধির দোহাই পাড়লে। আজ সকল পক্ষই বিষের সন্ধানে উঠে পড়ে লেগেছে। যুদ্ধকালে নিরস্ত্র পুরবাসীদের প্রতি আকাশ থেকে অগ্নিবাণবর্ষণ নিয়ে প্রথমে শোনা গেল ধর্মবুদ্ধির নিন্দাবাণী। আজ দেখি ধার্মিকেরা স্বয়ং সামান্য কারণে পল্লিবাসীদের প্রতি কথায়-কথায় পাপবজ্র সন্ধান করছে। গত যুদ্ধের সময় শত্রুর সম্বন্ধে নানা উপায়ে সজ্ঞানে সচেষ্টভাবে সত্যগোপন ও মিথ্যাপ্রচারের শয়তানী অস্ত্র ব্যবহার প্রকাণ্ডভাবে চলল। যুদ্ধ থেমেছে কিন্তু সেই শয়তানি আজও থামে নি। এমন-কি, অক্ষম ভারতবর্ষকেও প্রবলের প্রপাগাণ্ডা রেয়াত করে না। এই-সব নীতি হচ্ছে সবুর-না-করা নীতি— এরা হল পাপের দ্রুত চাল,— এরা প্রতি পদেই বাহিরে জিতছে বটে কিন্তু সে জিত অন্তরের মানুষকে হারিয়ে দিয়ে। মানুষ আজ নিজের মাথা থেকে জয়মাল্য খুলে নিয়ে কলের গলায় পরিয়ে দিলে। রসাতল থেকে দানব বলছে 'বাহবা'।

—পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি। ৭ ফেব্রুয়ারি ১৯২৫

নূতন কাল

…আমরা যারা এখানে [বালীদ্বীপে] বাহির থেকে এসেছি, আমাদের একটা দুর্লভ সুবিধা ঘটেছে এই যে, আমরা অতীত কালকে বর্তমানভাবে দেখতে পাচ্ছি। সেই অতীত মহৎ, সেই অতীতের ছিল প্রতিভা, যাকে বলে নবনবোন্মেষশালিনী বুদ্ধি ; তার প্রাণশক্তির বিপুল উদ্যম আপন শিল্পসৃষ্টির মধ্যে প্রচুরভাবে আপন পরিচয় দিয়েছে। কিন্তু তবুও সে অতীত, তার উচিত ছিল বর্তমানের পিছনে পড়া, সামনে এসে দাঁড়িয়ে বর্তমানকে সে ঠেকিয়ে রাখল কেন। বর্তমান সেই অতীতের বাহনমাত্র হয়ে বলছে 'আমি হার মানলুম' ; সে দীনভাবে বলছে, 'এই অতীতকে প্রকাশ করে রাখাই আমার কাজ, নিজেকে লুপ্ত করে দিয়ে।' নিজের 'পরে বিশ্বাস করবার সাহস নেই। এই

হচ্ছে নিজের শক্তি সম্বন্ধে বৈরাগ্য, নিজের 'পরে দাবি যতদূর সম্ভব কমিয়ে দেওয়া। দাবি স্বীকার করায় দুঃখ আছে, বিপদ আছে, অতএব— বৈরাগ্যমেবাভয়ং, অর্থাৎ দৈন্যমেবাভয়ং।

…এখানে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় এত অসম্ভব-রকম ব্যয় হয় যে সুদীর্ঘকাল লাগে তার আয়োজনে— যম আপন কাজ সংক্ষেপে ও সস্তায় সারেন কিন্তু নিয়ম চলে অতি লম্বা ও দুর্মূল্য চালে। এখানে অতীতকালের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া চলেছে বহুকাল ধ'রে, বর্তমানকালকে আপন সর্বস্ব দিতে হচ্ছে তার ব্যয় বহন করবার জন্যে।

এখানে এসে বারবার আমার এই কথা মনে হয়েছে যে, অতীতকাল যত বড়ো কালই হ'ক নিজের সম্বন্ধে বর্তমান কালের একটা স্পর্ধা থাকা উচিত, মনে থাকা উচিত তার মধ্যে জয় করবার শক্তি আছে। এই ভাবটাকে আমি একটি ছোটো কবিতায় লিখেছি…

—জাভাযাত্রীর পত্র। ৩০ অগস্ট ১৯২৭

'উত্তিষ্ঠত নিবোধত' কবিতাটির ব্যাখ্যাস্বরূপ রবীন্দ্রনাথ শ্রীমতী রমা দেবীকে নিম্ন-মুদ্রিত পত্রটি (১৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪০) লিখিয়াছিলেন :

যে-আশীর্বাদ তোমাকে পাঠালুম এখনি তার সম্পূর্ণ অর্থ বুঝতে পারবে না, তাতে ক্ষতি নেই, রইল তোমার কাছে। এর মধ্যে যে-কথাটি আছে সংক্ষেপে তার অর্থ এই, ঈশ্বরের কাছ থেকে দানরূপে পেয়েছি আমাদের এই জীবন, একে যদি হেলা করে নষ্ট না করি, নিজের চেষ্টায় একে যদি ভালো করতে পারি, সুন্দর করতে পারি, তা হলেই এই দান সার্থক হবে— নইলে এত বড়ো ঐশ্বর্য পেয়েও হারানো হবে। 'উত্তিষ্ঠত নিবোধত' এই মন্ত্রের অর্থ এই— 'ওঠো, জাগো'। জীবনকে সত্য করে তুলতে হলে সচেতন থেকে তার সাধনা করতে হয়।

'প্রবাসী' কবিতাটিকে ভাঙিয়া পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ স্বতন্ত্র দুটি গান রচনা করিয়াছিলেন ; প্রথম সংস্করণ গীতবিতানের তৃতীয় খণ্ডে 'পরবাসী চলে এসো ঘরে' (পৃ. ৭৯০) এবং 'এসো এসো প্রাণের উৎসবে' (পৃ. ৮৪৪) গানদুটি দ্রষ্টব্য।

'নূতন' কবিতাটিরও একটি পরিবর্তিত সংগীতরূপ প্রথম সংস্করণ গীতবিতানে (পৃ. ৮৪৪) পাওয়া যায়। গানটির প্রথম ছত্র— 'দূর রজনীর স্বপন লাগে'।

উল্লিখিত গানগুলি অধুনাপ্রচলিত গীতবিতানের বিভিন্ন অংশে পাওয়া যাইবে।

বসন্ত

বসন্ত ১৩২৯ সালের (১৯২৩) ফাল্গুন মাসে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। পরে উহা 'ঋতু-উৎসব' গ্রন্থে (১৩৩৩) সংকলিত হইয়াছে।

'গানগুলি মোর শৈবালেরি দল' গানটি ঋতু-উৎসবের পাঠে বর্জিত হইয়া থাকিলেও ১৩২৯ সালের পাঠ অনুযায়ী রচনাবলী-সংস্করণ বসন্ত গ্রন্থে যথাস্থানে মুদ্রিত হইল। বলাকার ১৫ সংখ্যক[১] কবিতার সহিত গানটি তুলনীয়।

রক্তকরবী

রক্তকরবী ১৩৩৩ সালে [১৯২৬ ডিসেম্বর] গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। ১৩৩০ সালের গ্রীষ্মাবকাশে শিলঙ-বাসকালে রবীন্দ্রনাথ নাটকটি 'যক্ষপুরী' নামে প্রথম রচনা করেন। পাণ্ডুলিপি আকারেই পরে ইহার নাম দিয়াছিলেন 'নন্দিনী'। ১৩৩১ সালের আশ্বিন মাসের প্রবাসীতে সংশোধিত বর্তমান আকারে নাটকটি 'রক্তকরবী' নামে সম্পূর্ণ মুদ্রিত হইয়াছিল। কালানুক্রম অনুসারে রচনাবলীতে রক্তকরবী বসন্তের পরেই মুদ্রিত হইল।

বর্তমান সংস্করণের 'নাট্যপরিচয়' অংশ রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত রক্তকরবীর পাণ্ডুলিপি হইতে গৃহীত হইয়াছে। প্রচলিত সংস্করণ রক্তকরবীর 'প্রস্তাবনা' ১৩৩১ সালে লিখিত কবির একটি 'অভিভাষণ'।[২] নিম্নে উহা মুদ্রিত হইল :

"আজ আপনাদের বারোয়ারি-সভায় আমার 'নন্দিনী'র পালা অভিনয়। প্রায় কখনো ডাক পড়ে না, এবারে কৌতূহল হয়েছে। ভয় হচ্ছে, পালা সাঙ্গ হলে ভিখ মিলবে না, কুত্তা লেলিয়ে দেবেন। তারা পালাটাকে ছিঁড়ে কুটিকুটি করবার চেষ্টা করবে। এক ভরসা, কোথাও দন্তস্ফুট করতে পারবে না।

আপনারা প্রবীণ। চশমা বাগিয়ে পালাটার ভিতর থেকে একটা গূঢ় অর্থ খুঁটিয়ে বের করবার চেষ্টা করবেন। আমার নিবেদন, যেটা গূঢ় তাকে প্রকাশ্য করলেই তার সার্থকতা চলে যায়। হৃৎপিণ্ডটা পাঁজরের আড়ালে থেকেই কাজ করে। তাকে

---

[১] দ্রষ্টব্য : রবীন্দ্র-রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড পৃ ৩৪।

[২] দ্রষ্টব্য : প্রবাসী, ১৩৩২ বৈশাখ— 'রক্তকরবী'।

বের ক’রে তার কার্যপ্রণালী তদারক করতে গেলে কাজ বন্ধ হয়ে যাবে। দশমুণ্ড বিশহাতওয়ালা রাবণের স্বর্ণলঙ্কায় সামান্য একটা বন্য বানর লেজে ক’রে আগুন লাগায়, এই কাহিনীটি যদি কবিগুরু আজ আপনাদের এই সভায় উপস্থিত করতেন তা হলে তার গূঢ় অর্থ নিয়ে আপনাদের চণ্ডীমণ্ডপে একটা কলরব উঠত। সন্দেহ করতেন কোনো-একটা সুপ্রতিষ্ঠিত বিধিব্যবস্থাকে বুঝি বিদ্রূপ করা হচ্ছে। অথচ শত শত বছর ধরে স্বভাবসন্দিগ্ধ লোকেরাও রামায়ণের প্রকাশ্যে যে-রস আছে তাই ভোগ করে এলেন— গোপনে যে-অর্থ আছে তার ঝুঁটি ধরে টানাটানি করলেন না।

আমার পালায় একটি রাজা আছে। আধুনিক যুগে তার একটার বেশি মুণ্ড ও দুটোর বেশি হাত দিতে সাহস হল না। আদিকবির মতো ভরসা থাকলে দিতেম। বৈজ্ঞানিক শক্তিতে মানুষের হাত পা মুণ্ড অদৃশ্যভাবে বেড়ে গেছে। আমার পালার রাজা যে সেই শক্তিবাহুল্যের যোগেই গ্রহণ করেন, গ্রাস করেন, নাটকে এমন আভাস আছে। ত্রেতাযুগের বহুসংগ্রহী বহুগ্রাসী রাবণ বিদ্যুৎবজ্রধারী দেবতাদের আপন প্রাসাদদ্বারে শৃঙ্খলিত ক’রে তাদের দ্বারা কাজ আদায় করত। তার প্রতাপ চিরদিনই অক্ষুণ্ণ থাকতে পারত। কিন্তু তার দেবদ্রোহী সমৃদ্ধির মাঝখানে হঠাৎ একটি মানবকন্যা এসে দাঁড়ালেন, অমনি ধর্ম জেগে উঠলেন। মূঢ় নিরস্ত্র বানরকে দিয়ে তিনি রাক্ষসকে পরাস্ত করলেন। আমার নাটকে ঠিক এমনটি ঘটে নি কিন্তু এর মধ্যেও মানবকন্যার আবির্ভাব আছে। তা ছাড়া কলিযুগের রাক্ষসের সঙ্গে কলিযুগের বানরের যুদ্ধ ঘটবে, এমনও একটা সূচনা আছে।

আদিকবির সাতকাণ্ডে স্থানাভাব ছিল না, এই কারণে লঙ্কাপুরীতে তিনি রাবণ ও বিভীষণকে স্বতন্ত্র স্থান দিয়েছিলেন। কিন্তু আভাস দিয়েছিলেন যে তারা একই, তারা সহোদর ভাই। একই নীড়ে পাপ ও সেই পাপের মৃত্যুবাণ লালিত হয়েছে। আমার স্বল্পায়তন নাটকে রাবণের বর্তমান প্রতিনিধিটি এক দেহেই রাবণ ও বিভীষণ; সে আপনাকেই আপনি পরাস্ত করে।

বাল্মীকির রামায়ণকে ভক্ত পাঠকেরা সত্যমূলক ব’লে স্বীকার করেন। আমার পালাটিকে যাঁরা শ্রদ্ধা ক’রে শুনবেন তাঁরা জানবেন এটিও সত্যমূলক। ঐতিহাসিকের উপরে প্রমাণের ভার দিলে ঠকবেন। এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, কবির জ্ঞান-বিশ্বাস-মতে এটি সত্য।

ঘটনাস্থানটির প্রকৃত নাম নিয়ে ভৌগোলিকদের কাছে মতের ঐক্য প্রত্যাশা করা মিছে। স্বর্ণলঙ্কা-যে সিংহলে তা নিয়েও আজ কত কথাই উঠেছে। বস্তুত পৃথিবীর নানা স্থানে নানা স্তরেই স্বর্ণলঙ্কার চিহ্ন পাওয়া যায়। কবিগুরু যে সেই

অনির্দিষ্ট অথচ সুপরিনির্দিষ্ট স্বর্ণলঙ্কার সংবাদ পেয়েছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। কারণ সে-স্বর্ণলঙ্কা যদি খনিজ সোনাতেই বিশেষ একটা স্থানে প্রতিষ্ঠিত থাকত, তা হলে লেজের আগুনে ভস্ম না হয়ে আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠত।

স্বর্ণলঙ্কার মতোই আমার পালার ঘটনাস্থলের একটি ডাকনাম আছে। তাকে কবি যক্ষপুরী ব'লে জানে। তার কারণ এ নয় যে সেখানে পৌরাণিক কুবেরের স্বর্ণসিংহাসন। যক্ষের ধন মাটির নীচে পোঁতা আছে। এখানকার রাজা পাতালে সুড়ঙ্গ খোদাই করে সে ধন-হরণে নিযুক্ত। তাই আদর করে এই পুরীকে সমঝদার লোকেরা যক্ষপুরী বলে। লক্ষ্মীপুরী কেন বলে না? কারণ লক্ষ্মীর ভাণ্ডার বৈকুণ্ঠে, যক্ষের ভাণ্ডার পাতালে।

রামায়ণের গল্পের ধারার সঙ্গে এর যে-একটা মিল দেখছি, তার কারণ এ নয় যে, রামায়ণ থেকে গল্পটি আহরণ করা। আসল কারণ, কবিগুরুই আমার গল্পটিকে ধ্যানযোগে আগে থাকতে হরণ করেছেন। যদি বল প্রমাণ কী, প্রমাণ এই যে, স্বর্ণলঙ্কা তাঁর কালে এমন উচ্চ চূড়া নিয়ে প্রকাশমান ছিল, কেউ তা মানবে না। এটা-যে বর্তমান কালেরই, হাজার জায়গায় তার হাজার প্রমাণ প্রত্যক্ষ হয়ে আছে।

ধ্যানের সিঁধ কেটে মহাকবি ভাবীকালের সামগ্রীতে কিরকম কৌশলে হস্তক্ষেপ করতেন তার আর-একটি প্রমাণ দেব।

কর্ষণজীবী এবং আকর্ষণজীবী এই দুই-জাতীয় সভ্যতার মধ্যে একটা বিষম দ্বন্দ্ব আছে, এ সম্বন্ধে বন্ধুমহলে আমি প্রায়ই আলাপ করে থাকি। কৃষিকাজ থেকে হরণের কাজে মানুষকে টেনে নিয়ে কলিযুগ কৃষিপল্লীকে কেবলই উজাড় করে দিচ্ছে। তা-ছাড়া শোষণজীবী সভ্যতার ক্ষুধাতৃষ্ণা দ্বেষহিংসা বিলাসবিভ্রম সুশিক্ষিত রাক্ষসেরই মতো। আমার মুখের এই বচনটি কবি তাঁর রূপকের ঝুলিতে লুকিয়ে আত্মসাৎ করেছেন, সেটা প্রণিধান করলেই বোঝা যায়। নবদূর্বাদলশ্যাম রামচন্দ্রের বক্ষসংলগ্ন সীতাকে স্বর্ণপুরীর অধীশ্বর দশানন হরণ করে নিয়েছিল সেটা কি সেকালের কথা, না একালের? সেটা কি ত্রেতাযুগের ঋষির কথা, না আমার মতো কলিযুগের কবির কথা? তখনো কি সোনার খনির মালেকরা নবদূর্বাদলবিলাসী কৃষকদের ঝুঁটি ধ'রে টান দিয়েছিল?

আরও একটা কথা মনে রাখতে হবে। কৃষী-যে দানবীয় লোভের টানেই আত্মবিস্মৃত হচ্ছে, ত্রেতাযুগে তারই বৃত্তান্তটি গা-ঢাকা দিয়ে বলবার জন্যেই সোনার মায়ামৃগের বর্ণনা আছে। আজকের দিনের রাক্ষসের মায়ামৃগের লোভেই তো আজকের দিনের সীতা তার হাতে ধরা পড়ছে; নইলে গ্রামের পঞ্চবটচ্ছায়াশীতল

কুটির ছেড়ে চাষীরা টিটাগড়ের চটকলে মরতে আসবে কেন? বাল্মীকির পক্ষে এ-সমস্তই পরবর্তী কালের, অর্থাৎ পরস্ব।

বারোয়ারির প্রবীণমণ্ডলীর কাছে এ-কথা বলে ভালো করলেম না। সীতাচরিত প্রভৃতি পুণ্যকথাসম্বন্ধে তাঁরা আমাকে অশ্রদ্ধাবান বলেই সন্দেহ করেন। এটা আমার দোষ নয়, তাঁদেরও দোষ বলতে পারি নে, বিধাতা তাঁদের এই-রকমই বুদ্ধি দিয়েছেন। বোধ করি সেটা আমার সঙ্গে বারে বারে কৌতুক করবার জন্যেই। পুণ্যশ্লোক বাল্মীকির প্রতি কলঙ্ক আরোপ করলুম বলে পুনর্বার হয়তো তাঁরা আমাকে একঘরে করবার চেষ্টা করবেন। ভরসার কথা আমার দলের লোক আছেন, কৃত্তিবাস নামে আর-এক বাঙালী কবি।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে উঠল। আধুনিক সমস্যা বলে কোনো পদার্থ নেই, মানুষের সব গুরুতর সমস্যাই চিরকালের। রত্নাকরের গল্পটার মধ্যে তারই প্রমাণ পাই। রত্নাকর গোড়ায় ছিলেন দস্যু, তার পরে দস্যুবৃত্তি ছেড়ে ভক্ত হলেন রামের। অর্থাৎ ধর্ষণবিদ্যার প্রভাব এড়িয়ে কর্ষণবিদ্যায় যখন দীক্ষা নিলেন তখনি সুন্দরের আশীর্বাদে তাঁর বীণা বাজল। এই তত্ত্বটা তখনকার দিনেও লোকের মনে জেগেছে। এককালে যিনি দস্যু ছিলেন তিনিই যখন কবি হলেন, তখনি আরণ্যকদের হাতে স্বর্ণলঙ্কার পরাভবের বাণী তাঁর কণ্ঠে এমন জোরের সঙ্গে বেজেছিল।

হঠাৎ মনে হতে পারে রামায়ণটা রূপক কথা। বিশেষত যখন দেখি রাম রাবণ দুই নামের দুই বিপরীত অর্থ। রাম হল আরাম, শান্তি; রাবণ হল চীৎকার, অশান্তি। একটিতে নবাঙ্কুরের মাধুর্য, পল্লবের মর্মর, আর-একটিতে শানবাঁধানো রাস্তার উপর দিয়ে দৈত্যরথের বীভৎস শৃঙ্গধ্বনি। কিন্তু তৎসত্ত্বেও রামায়ণ রূপক নয়, আমার রক্তকরবীর পালাটিও রূপকনাট্য নয়। রামায়ণ মুখ্যত মানুষের সুখদুঃখ বিরহ-মিলন ভালোমন্দ নিয়ে বিরোধের কথা; মানবের মহিমা উজ্জ্বল করে ধরবার জন্যেই চিত্রপটে দানবের পটভূমিকা। এই বিরোধ এক দিকে ব্যক্তিগত মানুষের, আরেক দিকে শ্রেণীগত মানুষের; রাম ও রাবণ একদিকে দুই মানুষের ব্যক্তিগত রূপ, আরেক দিকে মানুষের দুই শ্রেণীগত রূপ। আমার নাটকও একই কালে ব্যক্তিগত মানুষের আর মানুষগত শ্রেণীর। শ্রোতারা যদি কবির পরামর্শ নিতে অবজ্ঞা না ক'রেন তা হলে আমি বলি শ্রেণীর কথাটা ভুলে যান। এইটি মনে রাখুন, রক্তকরবীর সমস্ত পালাটি 'নন্দিনী' ব'লে একটি মানবীর ছবি। চারিদিকের পীড়নের ভিতর দিয়ে তার আত্মপ্রকাশ। ফোয়ারা যেমন সংকীর্ণতার পীড়নে হাসিতে অশ্রুতে কলধ্বনিতে ঊর্ধ্বে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে, তেমনি। সেই ছবির দিকেই যদি সম্পূর্ণ ক'রে তাকিয়ে

দেখেন তা হলে হয়তো কিছু রস পেতে পারেন। নয়তো রক্তকরবীর পাপড়ির আড়ালে অর্থ খুঁজতে গিয়ে যদি অনর্থ ঘটে তা হলে তার দায় কবির নয়। নাটকের মধ্যেই কবি আভাস দিয়েছে যে, মাটি খুঁড়ে যে-পাতালে খনিজ ধন খোঁজা হয় নন্দিনী সেখানকার নয়,— মাটির উপরিতলে যেখানে প্রাণের যেখানে রূপের নৃত্য, যেখানে প্রেমের লীলা, নন্দিনী সেই সহজ সুখের, সেই সহজ সৌন্দর্যের।"

যাত্রী গ্রন্থে 'পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি' অংশে ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯২৪ তারিখে রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গত রক্তকরবী সম্বন্ধে যাহা আলোচনা করিয়াছেন নিম্নে উদ্ধৃত হইল :

"নারীর ভিতর দিয়ে বিচিত্র রসময় প্রাণের প্রবর্তনা যদি পুরুষের উদ্যমের মধ্যে সঞ্চারিত হবার বাধা পায়, তা হলেই তার সৃষ্টিতে যন্ত্রের প্রাধান্য ঘটে। তখন মানুষ আপনার সৃষ্ট যন্ত্রের আঘাতে কেবলই পীড়া দেয়, পীড়িত হয়।

এই ভাবটা আমার রক্তকরবী নাটকের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। যক্ষপুরে পুরুষের প্রবল শক্তি মাটির তলা থেকে সোনার সম্পদ ছিন্ন করে করে আনছে। নিষ্ঠুর সংগ্রহের লুব্ধ চেষ্টার তাড়নায় প্রাণের মাধুর্য সেখান থেকে নির্বাসিত। সেখানে জটিলতার জালে আপনাকে আপনি জড়িত করে মানুষ বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন। তাই সে ভুলেছে, সোনার চেয়ে আনন্দের দাম বেশি ; ভুলেছে, প্রতাপের মধ্যে পূর্ণতা নেই, প্রেমের মধ্যেই পূর্ণতা। সেখানে মানুষকে দাস করে রাখবার প্রকাণ্ড আয়োজনে মানুষ নিজেকেই নিজে বন্দী করেছে।

এমন সময়ে সেখানে নারী এল, নন্দিনী এল ; প্রাণের বেগ এসে পড়ল যন্ত্রের উপর, প্রেমের আবেগ আঘাত করতে লাগল লুব্ধ দুশ্চেষ্টার বন্ধনজালকে। তখন সেই নারীশক্তির নিগূঢ় প্রবর্তনায় কী করে পুরুষ নিজের রচিত কারাগারকে ভেঙে ফেলে প্রাণের প্রবাহকে বাধামুক্ত করবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হল, এই নাটকে তাই বর্ণিত আছে।"

গল্পগুচ্ছ

গল্পগুচ্ছ মজুমদার এজেন্সি হইতে গ্রন্থাকারে দুই খণ্ডে প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রথম খণ্ডের প্রকাশকাল ১ আশ্বিন ১৩০৭ ; দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে।

বর্তমান খণ্ড রচনাবলীতে প্রকাশিত 'গিন্নি' গল্পটি অন্যান্য কয়েকটি গল্পের সহিত প্রথম গল্পগুচ্ছে বাদ পড়ে, যদিও রবীন্দ্রনাথের প্রথম গল্পসংগ্রহ 'ছোট গল্প' (১৫ ফাল্গুন ১৩০০) বইটিতে উহা ইতিপূর্বেই মুদ্রিত হইয়াছিল। ১৯০৮-১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে

পাঁচ ভাগে প্রকাশিত ইণ্ডিয়ান প্রেসের গল্পগুচ্ছেও উহা বর্জিত ছিল। বিশ্বভারতী সংস্করণ গল্পগুচ্ছের (শ্রাবণ ১৩৩৩) প্রথম খণ্ডে গল্পটি পুনরায় সন্নিবিষ্ট হয়।

১৩১৭ সালের ২৮ ভাদ্র তারিখে পদ্মিনীমোহন নিয়োগীকে একটি পত্রে[১] রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন :

"সাধনা বাহির হইবার পূর্বেই হিতবাদী কাগজের জন্ম হয়।[২]··· সেই পত্রে প্রতি সপ্তাহেই আমি ছোটো গল্প, সমালোচনা ও সাহিত্যপ্রবন্ধ লিখিতাম। আমার ছোটো গল্প লেখার সূত্রপাত ওইখানেই। ছয় সপ্তাহকাল লিখিয়াছিলাম।"

বর্তমান খণ্ড রচনাবলীতে মুদ্রিত গল্প-ছয়টি হিতবাদীতে সম্ভবতঃ প্রথম ছয় সপ্তাহে বাহির হয়।

পোস্টমাস্টার গল্পটি সম্পর্কে সাজাদপুর হইতে ২৯ জুন ১৮৯২ তারিখে লেখা একটি পত্র 'ছিন্নপত্র' হইতে অংশতঃ উদ্ধৃত হইল :

"কালকের চিঠিতে লিখেছিলুম আজ অপরাহ্ণ সাতটার সময় কবি কালিদাসের সঙ্গে একটা এন্‌গেজ্‌মেণ্ট্ করা যাবে। বাতিটি জ্বালিয়ে টেবিলের কাছে কেদারাটি টেনে বইখানি হাতে যখন বেশ প্রস্তুত হয়ে বসেছি হেনকালে কবি কালিদাসের পরিবর্তে এখানকার পোস্টমাস্টার এসে উপস্থিত। এই লোকটির সঙ্গে আমার একটু বিশেষ যোগ আছে। যখন আমাদের এই কুঠিবাড়ির একতলাতেই পোস্ট অপিস ছিল এবং আমি এঁকে প্রতিদিন দেখতে পেতুম তখনি আমি একদিন দুপুরবেলায় এই দোতলায় বসে সেই পোস্টমাস্টারের গল্পটি লিখেছিলুম এবং সে গল্পটি যখন হিতবাদীতে বেরোল, তখন আমাদের পোস্টমাস্টারবাবু তার উল্লেখ ক'রে বিস্তর লজ্জামিশ্রিত হাস্য বিস্তার করেছিলেন। যাই হ'ক, এই লোকটিকে আমার বেশ লাগে। বেশ নানা-রকম গল্প করে যান, আমি চুপ করে বসে শুনি। ওরই মধ্যে ওঁর আবার বেশ-একটু হাস্যরসও আছে।"

এই প্রসঙ্গে ছিন্নপত্রের সাজাদপুর হইতে লেখা ফেব্রুয়ারি ১৮৯১ তারিখের চিঠিটিও দ্রষ্টব্য।

---

[১] দ্রষ্টব্য : প্রবাসী ১৩৪৮ কার্তিক।

[২] ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসের শেষ হইতে কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় 'হিতবাদী'-নামক সাপ্তাহিক পত্রের প্রকাশ আরম্ভ হয়।

'গিন্নি' গল্পের শিবনাথ পণ্ডিতের সহিত 'জীবনস্মৃতি'তে বর্ণিত 'নর্মাল স্কুল'এর জনৈক শিক্ষকের নিম্নোদ্ধৃত চিত্রটি তুলনীয় :

"ক্রমশ নর্মাল স্কুলের স্মৃতিটা যেখানে ঝাপসা অবস্থা পার হইয়া স্ফুটতর হইয়া উঠিয়াছে সেখানে কোনো অংশেই তাহা লেশমাত্র মধুর নহে।··· শিক্ষকদের মধ্যে একজনের কথা আমার মনে আছে, তিনি এমন কুৎসিত ভাষা ব্যবহার করিতেন যে, তাঁহার প্রতি অশ্রদ্ধাবশত তাঁহার কোনো প্রশ্নেরই উত্তর করিতাম না। সম্বৎসর তাঁহার ক্লাসে আমি সকল ছাত্রের শেষে নীরবে বসিয়া থাকিতাম। যখন পড়া চলিত তখন সেই অবকাশে পৃথিবীর অনেক দুরূহ সমস্যার মীমাংসাচেষ্টা করিতাম। একটা সমস্যার কথা মনে আছে। অস্ত্রহীন হইয়াও শত্রুকে কী করিলে যুদ্ধে হারানো যাইতে পারে, সেটা আমার গভীর চিন্তার বিষয় ছিল। ওই ক্লাসের পড়াশুনার গুঞ্জনধ্বনির মধ্যে বসিয়া ওই কথাটা মনে-মনে আলোচনা করিতাম, তাহা আজও আমার মনে আছে।"

হিতবাদী পত্রিকার দুষ্প্রাপ্যতা-বশতঃ রচনাবলীর বর্তমান খণ্ডে মুদ্রিত গল্পগুলির পাঠ প্রথম গল্পসংগ্রহ 'ছোট গল্প' ও গল্পগুচ্ছের পূর্বসংস্করণগুলির সাহায্যে সংশোধিত হইয়াছে।

শান্তিনিকেতন

শান্তিনিকেতন ১৯০৯ হইতে ১৯১৬ সালের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে ছোটো ছোটো পুস্তিকার আকারে সতেরো খণ্ডে প্রকাশিত হয়। ১৩১৫ সালের অগ্রহায়ণ হইতে ১৩২১ সালের মাঘ পর্যন্ত শান্তিনিকেতনের মন্দিরে ও অন্যত্র নানা অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ যে-সকল উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহার অধিকাংশই এই সতেরো খণ্ডে সংগৃহীত হইয়াছিল।

রবীন্দ্রনাথ কর্তৃত 'সংশোধিত ও নির্বাচিত' যে বিশ্বভারতীসংস্করণ শান্তিনিকেতন ১৩৪১-৪২ সালে দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়, তাহাতে অন্যান্য খণ্ডের কয়েকটি উপদেশের সহিত একাদশ ও দ্বাদশ খণ্ডের 'দুর্লভ', 'মাতৃশ্রাদ্ধ', 'সামঞ্জস্য'—এই তিনটি সম্পূর্ণ ব্যাখ্যান এবং 'জাগরণ'-এর শেষার্ধ বর্জিত হইয়াছে।

রবীন্দ্র-রচনাবলীর বর্তমান খণ্ডে একাদশ [অক্টোবর ১৯১০] ও দ্বাদশ [জানুয়ারি ১৯১১] খণ্ড শান্তিনিকেতন প্রথম সংস্করণ অনুসারে যথাক্রমে মুদ্রিত হইল।

সংযোজন : গ্রন্থপরিচয়, পঞ্চদশ খণ্ড

মহুয়ার প্রথম সংস্করণে ‘সবলা’ কবিতাটির চতুর্থ ছত্রটি বাদ পড়িয়াছিল। পরবর্তী কালে স্মৃতি হইতে সংশোধন করিবার সময় রবীন্দ্রনাথ শ্রীপুলিনবিহারী সেনকে ২৭ অক্টোবর ১৯৩৯ তারিখের একটি পত্রে সম্পূর্ণ এক নূতন পংক্তি লিখিয়া পাঠান :

মহুয়াতে ‘সবলা’ বলে যে কবিতাটি আছে, তাতে একটা লাইন ছুট হয়েছে—

নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার
কেন নাহি দিবে অধিকার
হে বিধাতঃ,
সংকোচের দৈন্যজাল কেন তুমি পাতো—

এই শেষের লাইনটা পড়ে গিয়েছে— এই লাইনটাকে উদ্ধার কোরো। পরের লাইনে আছে—

পথপ্রান্তে কেন র’ব জাগি—

পথপ্রান্তে শব্দের পর সেমিকোলন দেওয়া চলে কিনা ভেবে দেখো— তা হলে মানে হবে সংকোচের জালটা পাতা হচ্ছে চলবার পথে।

বর্ণানুক্রমিক সূচী

অগোচর … … ২৪৩
অগ্রদূত … … ২১৪
অচেনা … … ৩২
অজানা খনির নূতন মণির … … ৩১
অজানা জীবন বাহিনু … … ২৮
অতুলপ্রসাদ সেন … … ৩১২
অন্তর্ধান … … ১০৪
অন্তর্হিতা … … ২২৭
অন্ধ ভূমিগর্ভ হতে শুনেছিলে … … ১১৫
অপ্ … … ১৫২
অপরাজিত … … ৩৩
অপূর্ণ … … ১৬৯
অবশেষ … … ১০৮
অবাধ … … ২৪৯
অবুঝ মন … … ২০১
অবুঝ শিশুর আবছায়া এই … … ২০১
অভাগা যখন বেঁধেছিল তার বাসা … … ৩০৮
অর্ঘ্য … … ১৫
অর্থ কিছু বুঝি নাই, কুড়ায়ে পেয়েছি … … ১৬১
অশ্রু … … ১০৪
অসমাপ্ত … … ২৯
আকাশ, তোমার সহাস উদার দৃষ্টি … … ১৫৩
আঁখি চাহে তব মুখ-পানে … … ৯৬
আগন্তুক … … ২৫৩
আঘাত … … ২৬২
আচ্ছাদন হতে … … ২৪
আছি … … ১৭৭
আজ খেলাভাঙার খেলা খেলবি আয় .. … ৩৩৮

আজ দখিনাবাতাসে … … ৩৩৪
আজ ভাবি মনে-মনে তাহারে কি জানি … … ১৭২
আজি এই মম সকল ব্যাকুল … … ৫২০
আজি এ নিরালা কুঞ্জে, আমার … … ২৬
আজি তব জন্মদিনে এই কথা করাব স্মরণ … … ৩১০
আতঙ্ক … … ২৬৬
আপনার কাছ হতে বহুদূরে … … ১৮৪
আবার জাগিনু আমি … … ২৪২
আমরা খেলা খেলেছিলেম … … ২৯৭
আমরা তো আজ পুরাতনের কোঠায় … … ৩০৫
আমরা দুজনা স্বর্গ-খেলনা … .. ৩৫
আমরা বাস্তুছাড়ার দল … … ৩২২
আমার ঘরের সম্মুখেই … … ২৬০
আমার তরে পথের 'পরে কোথায় তুমি থাক … … ১৮৪
আমার নয়ন তব নয়নের … … ১৮
আমারে সাহস দাও, দাও শক্তি … … ১৮৩
আমি … … ১৭২
আমি জানি পুরাতন এই বইখানি … … ২৪০
আমি যেন গোধূলিগগন … … ১৭
আম্রবন … … ১২১
আয় আমাদের অঙ্গনে … … ১৫১
আরেক দিন … … ২০৮
আরো কিছুখন না হয় বসিয়ো পাশে … … ৯৩
আলেখ্য … … ২৬৮
আশীর্বাদ ৮৬, ১৯২, ২৯১, ২৯২, ৩০৮, ৩০৯
আশীর্বাদ : পরিশেষ … … ১৫৭
আশীর্বাদী … … ১৯৯, ৩০৫
আশ্রমবালিকা … … ২২৮
আশ্রমসখা হে শাল, বনস্পতি … … ৩০৬
আশ্রমের হে বালিকা … … ২২৮

আহ্বান ৫৬, ১৮৪
ইরান, তোমার যত বুলবুল ২৮৩
ইরাবতীর মোহানামুখে ১৯৩
উচ্চ প্রাচীরে রুদ্ধ তোমার ২১১
উজ্জীবন ... ৫, ৫১৮, ৫১৯
উত্তরে তুষাররুদ্ধ হিমানীর কারাদুর্গতলে ৩০১
উত্তিষ্ঠত নিবোধত ৩১০
উত্তীর্ণ হয়েছ তুমি ধূর্জটির ক্রোধবহ্নিশিখা ৫১৯
উৎসর্গ : মহুয়া ৩
উদ্‌ঘাত ২৮
উপহার ১৯
উষসী ৭৮
এই অজানা সাগরজলে ২০৯
এই বিদেশের রাস্তা দিয়ে ২০৫
একদা বিজনে যুগল তরুর মূলে ৫৭
একাকী ৮৫
এখন আমার সময় হল ৩৩৬
এনেছে কবে বিদেশী সখা ১৪৩
এবার বিদায়বেলার সুর ধরো ধরো ৩৩৮
এবেলা ডাক পড়েছে কোন্‌খানে ৩৩৫
এসেছি সুদূর কাল থেকে ২৫৩
ও আমার চাঁদের আলো ৩৩০
ওই নামে একদিন ধন্য হল দেশেদেশান্তরে ২৮৩
ওগো বসন্ত, হে ভুবনজয়ী ১০
ও চাঁদ, চোখের জলের লাগল জোয়ার ৩৬৭
ওরে পথিক, ওরে প্রেমিক ৩৩৯-৩৪০
কণ্টকারি ২০৬
কত ধৈর্য ধরি ১০২
করুণী ৭৬
কলছন্দে পূর্ণ তার প্রাণ ৬৭

কাকলী ৬৭
কাজলী ৬৪
কামনায় কামনায় দেশে দেশে যুগে যুগান্তরে ৩১০
কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও ৯৯
কাহারে পরাব রাখী ৫৬
কুটিরবাসী ১৪৪
কুরচি ১২৭
কুরচি, তোমার লাগি পদ্মেরে ভুলেছে অন্যমনা ১২৭
কে দেবে চাঁদ, তোমায় দোলা ৩৩১
কোথা আছ ? ডাকি আমি ৫৬
কোন্ সে সুদূর মৈত্রী ২৮২
ক্ষিতি ১৫২
খেয়ালি ৬৬
গানগুলি মোর শৈবালেরি দল ৩৩৩
গিন্নি ৪১৭
গুপ্তধন ৯৩
গুহাহিত ৪৫২
গৃহলক্ষ্মী ৩০৩
গোধূলি-অন্ধকারে পুরীর প্রান্তে ২২০
চতুর্দশী এল নেমে ৭৭
চন্দ্রমা আকাশতলে পরম একাকী ৮৫
চলেছে উজান ঠেলি তরণী তোমার ৮৮
চামেলি-বিতান ১৩৮
চাহনি তাহার, সব কোলাহল হ'লে সারা ৬৮
চিত্তকোণে ছন্দে তব ২০
চিরকাল রবে মোর প্রেমের কাঙাল ৪০
চিরন্তন ২০৫
চুরি করে নিয়ে গেলে মোর মন ৫৩১
ছায়া ৯৬
ছায়ালোক ৮০

ছিনু আমি বিষাদে মগনা ৩৭
ছিল চিত্রকল্পনায়, এতকাল ছিল গানে গানে ২০৪
ছিলাম নিদ্রাগত ২৪৬
ছিলাম যবে মায়ের কোলে ১৬৩
ছিলে-যে পথের সাথী ২২৬
ছোটো প্রাণ ২৪৬
জগদীশচন্দ্র ১১৮
জনতার মাঝে দেখিতে পাই নে তারে ৬৮
জন্মদিন ১৬৬
জন্মোৎসব ৪৬২
জয়ন্তী ৭১
জরতী ২৫৫
জলপাত্র ২৬৪
জাগরণ ৫০৬
জাগো হে প্রাচীন প্রাচী ২৮৯
জীবনমরণ ৩০২,৫৩৯
জীবনমরণের বাজায়ে খঞ্জনি ৩০২
জীবনের মরণের বাজায়ে মন্দিরা ৫৩৯
জ্বলিল অরুণরশ্মি ৮৬
ঝর্না, তোমার স্ফটিকজলের ২২
ঝামরী ৭২
তখন বয়স সাত ২৫৭
তখন বর্ষণহীন অপরাহ্ণমেঘে ৩৮
তপোমগ্ন হিমাদ্রির ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করি চুপে ১২০
তব অন্তর্ধানপটে হেরি তব রূপ চিরন্তন ১০৪
তব পথচ্ছায়া বাহি বাঁশরিতে যে বাজাল আজি ১২১
তরুলতা যে-ভাষায় কয় কথা ৭৬
তাকিয়ে দেখি পিছে ২৩৭
তারাপ্রসন্নের কীর্তি ৪৩১
তুমি ১৭৩

তুমি বনের পুব পবনের সাথী … … ৯২
তুমি যে তারে দেখনি চেয়ে … … ২২৭
তেজ … … ১৫৩
তে হি নো দিবসাঃ … … ২০৯
তোমায় আমায় মিল হয়েছে কোন্ যুগে এইখানে … … ২৭৫
তোমায় গান শোনাব তাই তো আমায় … … ৩৬৫
তোমার কুটিরের সমুখবাটে … … ১৪৫
তোমার প্রণাম এ যে তারি আভরণ … … ২১৯
তোমার প্রত্যাশা লয়ে আছি প্রিয়তমে … … ৪৩
তোমার বাস কোথা-যে পথিক ওগো … … ৩৩৩
তোমার মুখর দিন হে দিনেন্দ্র … … ৩০৯
তোমার স্বপ্নের দ্বারে আমি আছি বসে … … ২১৬
তোমারে আপন কোণে … … ৫৩
তোমারে ছাড়িয়া যেতে হবে … … ৯৮
তোমারে জননী ধরা … … ১৯৯
তোমারে দিই নি সুখ … … ১০৩
তোমারে দিব না দোষ … … ২৫২
তোমারে সম্পূর্ণ জানি … … ৬১
তোর প্রাণের রস তো শুকিয়ে গেল ওরে … … ৩৫৮
তোরে আমি রচিয়াছি রেখায় রেখায় … … ২৬৮
ত্রিশরণ মহামন্ত্র যবে … … ২৭৯
দখিনহাওয়া, জাগো জাগো … … ৩২৭-৩২৮
দর্পণ … … ৮৪
দর্পণ লইয়া তারে কী প্রশ্ন শুধাও … .. ৮৪
‘দাও লেখা দাও’ দেয় কতজন তাড়া … … ৫৪০
দায়মোচন … … ৪০
দিনান্তে … … ১০৭
দিনাবসান … … ২২৪
দিয়ালী … … ৬৮
দীনা … … ৬১

দীপশিল্পী ২১১
দীপিকা ১৮৬
দুয়ার ১৮৫
দুর্দিনে ১৯৪
দুর্যোগ আসি টানে যবে ফাঁসি ১৯৪
দুর্লভ ৪৫৮
দূত ৩৭
দূর মন্দিরে সিন্ধুকিনারে ৫২
দূর হতে ভেবেছিনু মনে ২৪৮
দূরে গিয়েছিলে চলি ৯৪
দেনাপাওনা ৪০৫
দেবদারু ১২০
দ্বিধা ৪৭৪
দ্বৈত ১৭
ধর্মমোহ ২৮৪
ধর্মের বেশে মোহ এসে যারে ধরে ২৮৪
ধাবমান ২৩৫
ধীরে ধীরে ধীরে বও ৩২৭-৩২৮
নন্দগোপাল বুক ফুলিয়ে এসে ৩০১
নন্দিনী ৭৮
নবজাগরণ-লগনে-গগনে ৩০৩
নববধূ ৮৮
নাগরী ৬৯
নাট্যপরিচয় : রক্তকরবী ৩৪৩
নাম্নী ৬৩-৮০
না, যেয়ো না, যেয়ো নাকো ৩৩৭
নারিকেল ১৩৬
নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার ৪১
নিবেদন ৩১
নিম্নে সরোবর স্তব্ধ হিমাদ্রির উপত্যকাতলে ১৯২

নিরাবৃত ২৪৭
নির্ঝরিণী ২২
নির্বাক্ ২১৭
নির্ভয় ৩৫
নিশীথেরে লজ্জা দিল অন্ধকারে রবির বন্দন ১৯৪
নীলমণিলতা ১২৪
নূতন ২৯৭
নূতন কাল ৩০১
নূতন শ্রোতা ১৮৮
নৈবেদ্য ১০৩
পথবর্তী ৫২
পথ বেঁধে দিল বন্ধনহীন গ্রন্থি ৩৬
পথসঙ্গী ২২৬
পথের বাঁধন ৩৬
পবন দিগন্তের দুয়ার নাড়ে ১২
পরদেশী ১৪৩
পরবাসী চলে এসো ঘরে ২৯৩
পরিচয় ৩৮
পরিণয় ৮৯, ২০৪
পরিণয়মঙ্গল ৩০১
পান্থ ১৬৮
পারস্যে জন্মদিনে ২৮৩
পিয়ালী ৬৮
পুরাণে কাহিনী শুনিয়াছি ৫২১
পুরাণে বলেছে ৫০
পুরাতন ৯৬
পুরানো বই ২৪০
পূর্ণ ৪৮১
পোস্টমাস্টার ৪১১
পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে ৩৫১-৩৫২

প্রকাশ ২৪
প্রচ্ছন্ন দাক্ষিণ্যভারে ৬৪
প্রচ্ছন্না ৮২
প্রণতি ১০২
প্রণাম ১৬১, ২১৯
প্রতিমা ৭৭
প্রতি সন্ধ্যায় নব অধ্যায় ১৮৬
প্রতীক্ষা ৪৩, ২১৬
প্রত্যাগত ৯৪
প্রত্যাশা ১৪
প্রত্যাশী হয়ে ছিনু এতকাল ধরি ১৩৩
প্রথম পঞ্চাশ বর্ষ রচি দিক ৩০৯
প্রথম পাতায় ২৯৬
প্রথম মিলনদিন, সে কি হবে নিবিড় আষাঢ়ে ৪৫
প্রথম সৃষ্টির ছন্দখানি ৭৮
প্রবাসী ২৯৩
প্রভু, তুমি পুজনীয়। আমার কী জাত ২৬৪
প্রশ্ন ১৯৬
প্রাঙ্গণে মোর শিরীষশাখায় ১৪
প্রাচী ২৮৯
প্রাণ ২৫৭
প্রাণের পাথেয় তব পূর্ণ হ'ক ১৫৪
প্রার্থনা ৩১০
ফল ফলাবার আশা আমি ৩২৫
ফাল্গুনমাধুরী তার চরণের মঞ্জীরে মঞ্জীরে ১২৪
ফিরাবে তুমি মুখ ৩৩
বক্ষের ধন হে ধরণী, ধরো ১৫২
বক্সাদুর্গস্থ রাজবন্দীদের প্রতি ১৯৪
বঙ্গের দিগন্ত ছেয়ে বাণীর বাদল ১৫৭
বটের জটায় বাঁধা ছায়াতলে ২৬৬

বধূ ২৩১
বন্দিনী ৯২
বন্ধু, তুমি বন্ধুতার অজস্র অমৃতে ৩১০
বরণ ৫০, ৫২১
বরণডালা ২৬, ৫২০
বরযাত্রা ১২
বর্ষশেষ ১৮০
বসন্ত ১০
বসন্ত-উৎসব ৩০৬
বসন্তবায় সন্ন্যাসী হায় ১০৯
বসন্তের জয়রবে ১৩
বহুলক্ষ বর্ষ ধরে জ্বলে তারা ২৫৭
বাকি আমি রাখব না কিছুই ৩২৪
বাপী ৫৭
বালক ১৭৯
বালক বয়স ছিল যখন ১৭৯
বাঁশি যখন থামবে ঘরে ২২৪
বাসরঘর ৯৮
বাহির পথে বিবাগী হিয়া ১০৮
বাহিরে তুমি নিলে না মোরে ১০৭
বাহিরে তোমার যা পেয়েছি সেবা ২২৭
বাহিরে যখন ক্ষুব্ধ দক্ষিণের মদির পবন ১৩০
বাহিরে সে দুরন্ত আবেগে ৭১
বিচার ২৩৮
বিচার করিয়ো না ২৩৮
বিচিত্রা ১৩৩, ৫৩১
বিচ্ছেদ ৯৮
বিজয়ী ১৩
বিদায় ৯৯
বিদায় যখন চাইবে তুমি ৩৩৬

বিদায়সম্বল ১০৬
বিদেশে ঐ সৌধশিখর-'পরে ৮২
বিদ্রূপবাণ উদ্যত করি ২৬৩
বিবশ দিন, বিরস কাজ ১৩
বিরক্ত আমার মন ৫৯
বিরহ ১০৫
বিরহ ও অন্তর্ধান ৫২৩
বিশ্বপানে বাহির হবে ২৯১
বিস্ময় ২৪২
বুদ্ধজন্মোৎসব ২৯৫
বুদ্ধদেবের প্রতি ২৮৩
বৃক্ষবন্দনা ১১৫
বৃক্ষরোপণ উৎসব ১৫১-১৫৪
বৈশাখী ঝড় যতই আঘাত হানে ৩০০
বৈশাখেতে তপ্ত বাতাস মাতে ১৭৭
বোধন ৭
বোবার বাণী ২৬০
বোরোবুদুর ২৭৭
বোলো তারে, বোলো ২৯
ব্যঙ্গসুনিপুণা, শ্লেষবাণসন্ধানদারুণা ৬৯
ব্যবধান ৪২৬
ব্যোম ১৫৩
ভগবান, তুমি যুগে যুগে দূত পাঠায়েছ ১৯৬
ভয় করব না রে বিদায়বেদনারে ৩৩৮
ভস্ম-অপমানশয্যা ছাড়ো, পুষ্পধনু ৫, ৫১৮
ভাঙল হাসির বাঁধ ৩৩০
ভাবিছ যে-ভাবনা একা-একা ৮৪
ভাবিনী ৮৪
'ভালোবাসি ভালোবাসি' ৩৭০-৩৭৪
ভিক্ষু ১৯৭

ভিড় করেছে রঙমশালীর দলে … … ৩০৪
ভীরু … … ২৩৭
ভূমিকা : বনবাণী … … ১১৩
ভোরের আগে যে-প্রহরে … … ৭৮
ভোরের পাখি নবীন আঁখি দুটি … … ২৭
মণিমালা হাতে নিয়ে … … ১৯
মধুমঞ্জরী … … ১৩৩
মধ্যাহ্নে বিজন বাতায়নে … … ৬৬
মনে তো ছিল তোমারে বলি কিছু … … ২১৭
ময়ূর, কর নি মোরে ভয় … … ১৩৯
মরুৎ … … ১৫৩
মরুবিজয়ের কেতন উড়াও শূন্যে … … ১৫১
মহুয়া … … ৫৯, ৫২৩
মাঘের সূর্য উত্তরায়ণে পার হয়ে এল চলি … … ৭
মাঙ্গলিক … … ১৫৪
মাতৃশ্রাদ্ধ … … ৪৮৬
মাধবী … … ১৩
মানী … … ২১১
মানুষের ইতিহাসে ফেনোচ্ছল উদ্বেল উদ্যম … … ২৩১
মায়া … … ২০
মালিনী … … ৭৫
মিলন … ৯০, ২৩২, ২৫২
মুক্তরূপ … … ৫৩
মুক্তি … … ২৭
মুক্তি—১, ২ … … ১৮৩, ১৮৪
মুরতি … … ৭৩
মৃত্যুঞ্জয় … … ২৪৮
মোর স্বপনতরীর কে তুই নেয়ে … … ৩৫৬
মোহানা … … ১৯৩
যদি তারে নাই চিনি গো … … ৩২৬

যবনিকা-অন্তরালে মর্ত্য পৃথিবীতে … … ২৪৭
যাত্রা হয়ে আসে সারা … … ১৮০
যাত্রী … … ২৫১
যাবার দিকের পথিকের ’পরে … … ১০৯
যারে সে বেসেছে ভালো … … ৩৫
যুগে যুগে বুঝি আমায় চেয়েছিল সে … … ৩৭৫
যে-কাল হরিয়া লয় ধন … … ২৫১
যে-ক্ষুধা চক্ষের মাঝে … … ১৬৯
যে-গান গাহিয়াছিনু … … ৯৬
যেথায় তুমি গুণী জ্ঞানী … … ৮০
যেদিন ধরণী ছিল ব্যথাহীন মরু … … ১১৮
যেন তার চক্ষু-মাঝে … … ৭১
যে বোবা দুঃখের ভার … … ২৪৪
‘যেয়ো না, যেয়ো না’ বলি কারে ডাকে … … ২৩৫
যে-শক্তির নিত্যলীলা নানা বর্ণে আঁকা … … ৭৩
যে-সন্ধ্যায় প্রসন্ন লগনে … … ১৯
রঙিন … … ৩০৪
রথীরে কহিল গৃহী উৎকণ্ঠায় … … ২৯২
রবিপ্রদক্ষিণপথে জন্মদিবসের আবর্তন … … ১৬৬
রসের ধর্ম … … ৪৪৩
রাখিপূর্ণিমা … … ৫৬
রাজপুত্র … … ২৬৩
রাত্রি যবে সাঙ্গ হল … … ৯৮
রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা … … ৪২১
রূপকথা-স্বপ্নলোকবাসী … … ২১৩
রে অচেনা, মোর মুষ্টি ছাড়াবি কী ক’রে … … ৩২
রে মহুয়া, নামখানি গ্রাম্য তোর … … ৫২৩
লক্ষ্যশূন্য … … ২৯২
লয় … … ৪৫
লিখতে যখন বল আমায় … … ২৯৬

'লিখন দেহো, লিখন দেহো' ডাকে … … ৫৪২
লেখা … … ১৮৭
শক্ত হল রোগ … … ২৩৩
শঙ্কিত আলোক নিয়ে দিগন্তে উদিল শীর্ণ শশী … … ১০৫, ৫২৩
শান্ত … … ২৬৩
শ্যামলী … … ৬৩
শাল … … ১৩০
শিলঙে এক গিরির খোপে … … ২০৬
শুকতারা … … ২৩
শুকনো পাতা কে যে ছড়ায় ওই দূরে … … ৩৩২
শুক বলে, গিরিরাজের জগতে প্রাধান্য … … ২৯৯
শুকসারী … … ২৯৯
শুধায়ো না, কবে কোন্ গান … … ৩
শুধায়ো না মোর গান … … ৫১৭
শুধায়ো না মোরে তুমি মুক্তি কোথা … … ১৬৮
শুভখন আসে সহসা আলোক জেলে … … ৮৯
শুভযোগ … … ১৯
শূন্যঘর … … ২২০
শেষ … … ৪৯২
শেষ ফলনের ফসল এবার … … ৩৮৮
শেষ মধু … … ১০৯
শেষ-লেখাটার খাতা … … ১৮৮
শ্রাবণসন্ধ্যা … … ৪৬৮
শ্রীবিজয়লক্ষ্মী … … ২৭৫
শ্লথপ্রাণ দুর্বলের স্পর্ধা আমি … … ৫৫
সকালের আলো এই বাদলবাতাসে … … ২৭০
সন্ধান … … ১৮
সব দিবি কে, সব দিবি পায় … … ৩২৪
সবলা … … ৪১
সব লেখা লুপ্ত হয় … … ১৮৭

সমুদ্রের কূল হতে বহুদূরে শব্দহীন মাঠে ১৩৭
সরে যা, ছেড়ে দে পথ ২৪৯
সহসা ডালপালা তোর উতলা-যে ৩২৮
সাগরজলে সিনান করি সজল এলোচুলে ৪৭
সাগরিকা ৪৭
সাগরী ৭১
সাথী ২৫৭
সান্ত্বনা ২৪৪, ২৭০
সামঞ্জস্য ৪৯৪
সিয়াম : প্রথম দর্শনে ২৭৯
সিয়াম : বিদায়কালে ২৮২
সুন্দর, তুমি চক্ষু ভরিয়া ১০৪
সুন্দর ভক্তির ফুল অলক্ষ্যে নিভৃত ২৯২
সুন্দরী তুমি শুকতারা ২৩
সুসময় ৩০০, ৫৪০
সূর্যমুখীর বর্ণে বসন লই রাঙায়ে ১৫
সূর্য যখন উড়াল কেতন ১৭৩
সৃষ্টির প্রথম বাণী তুমি হে আলোক ১৫৩
সৃষ্টির প্রাঙ্গণে দেখি বসন্তে অরণ্যে ফুলে ফুলে ৯০
সৃষ্টির রহস্য আমি তোমাতে করেছি অনুভব ৬২
সৃষ্টিরহস্য ৬২
সে কি ভাবে গোপন র'বে ৩২৯
সেদিন উষার নববীণাঝংকারে ২৩২
সেদিন প্রভাতে সূর্য এইমতো উঠেছে অম্বরে ২৭৭
সে যেন খসিয়া-পড়া তারা ৭২
সে যেন গ্রামের নদী ৬৩
সোঁদালের ডালের ডগায় ২৬২
স্পর্ধা ৫৫
স্পষ্ট মনে জাগে ২০৮
স্পাই ২৩৩

হাটের ভিড়ের দিকে চেয়ে দেখি … … ২৪৩
হায় রে ভিক্ষু, হায় রে … … ১৯৭
হাস্যমুখ নিয়ে যায় ঘরে ঘরে … … ৭৫
হাসির পাথেয় … … ১৪৯
হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী … … ২৯৫
হিমালয়-গিরিপথে চলেছিনু কবে বাল্যকালে … … ১৪৯
হে জয়তী, অন্তরে আমার … … ২৫৫
হে দুয়ার, তুমি আছ মুক্ত অনুক্ষণ … … ১৮৫
হে পথিক, তুমি একা … … ২১৪
হে পবন, কর নাই গৌণ … … ১৫৩
হে মেঘ, ইন্দ্রের ভেরী বাজাও গম্ভীর … … ১৫২
হেঁয়ালী … … ৬৫
হে সুন্দরী, হে শিখা মহতী … … ২১১

রবীন্দ্র রচনাবলী

ষোড়শ খণ্ড

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্র-রচনাবলী

ষোড়শ খণ্ড

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী
২ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট। কলিকাতা

প্রকাশ ২২ শ্রাবণ ১৩৫০
পুনর্মুদ্রণ মাঘ ১৩৬০

মূল্য ৮৲, ১১৲ ও ১২৲

প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন
বিশ্বভারতী। ৬৷৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা

মুদ্রাকর শ্রীসূর্যনারায়ণ ভট্টাচার্য
তাপসী প্রেস। ৩০ কর্নওআলিস স্ট্রীট। কলিকাতা

সূচী

চিত্রসূচী ।৶০

কবিতা ও গান

পুনশ্চ ১

নাটক ও প্রহসন

চিরকুমার-সভা ১৪৭

উপন্যাস ও গল্প

গল্পগুচ্ছ ২৯৩

প্রবন্ধ

শান্তিনিকেতন ১৩ - ১৭ ৩৪১

গ্রন্থপরিচয় ৫০৯

বর্ণানুক্রমিক সূচী ৫১৯

চিত্রসূচী

রবীন্দ্রনাথ ॥ ১৯৩০ খৃস্টাব্দ

কবিতা ও গান

পুনশ্চ

ভূমিকা

গীতাঞ্জলির গানগুলি ইংরেজি গদ্যে অনুবাদ করেছিলেম। এই অনুবাদ কাব্যশ্রেণীতে গণ্য হয়েছে। সেই অবধি আমার মনে এই প্রশ্ন ছিল যে পদ্যছন্দের সুস্পষ্ট ঝংকার না রেখে ইংরেজিরই মতো বাংলা গদ্যে কবিতার রস দেওয়া যায় কি না। মনে আছে সত্যেন্দ্রনাথকে অনুরোধ করেছিলেম, তিনি স্বীকার করেছিলেন। কিন্তু, চেষ্টা করেন নি। তখন আমি নিজেই পরীক্ষা করেছি, 'লিপিকা'র অল্প কয়েকটি লেখায় সেগুলি আছে। ছাপবার সময় বাক্যগুলিকে পদ্যের মতো খণ্ডিত করা হয় নি— বোধ করি ভীরুতাই তার কারণ।

তার পরে আমার অনুরোধক্রমে একবার অবনীন্দ্রনাথ এই চেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। আমার মত এই যে, তাঁর লেখাগুলি কাব্যের সীমার মধ্যে এসেছিল, কেবল ভাষাবাহুল্যের জন্যে তাতে পরিমাণ রক্ষা হয় নি। আর-একবার আমি সেই চেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়েছি।

এই উপলক্ষ্যে একটা কথা বলবার আছে। গদ্যকাব্যে অতিনিরূপিত ছন্দের বন্ধন ভাঙাই যথেষ্ট নয়, পদ্যকাব্যে ভাষায় ও প্রকাশরীতিতে যে একটি সসজ্জ সলজ্জ অবগুণ্ঠনপ্রথা আছে তাও দূর করলে তবেই গদ্যের স্বাধীনক্ষেত্রে তার সঞ্চরণ স্বাভাবিক হতে পারে। অসংকুচিত গদ্যরীতিতে কাব্যের অধিকারকে অনেক দূর বাড়িয়ে দেওয়া সম্ভব এই আমার বিশ্বাস এবং সেই দিকে লক্ষ রেখে এই গ্রন্থে প্রকাশিত কবিতাগুলি লিখেছি। এর মধ্যে কয়েকটি কবিতা আছে তাতে মিল নেই, পদ্যছন্দ আছে, কিন্তু পদ্যের বিশেষ ভাষারীতি ত্যাগ করবার চেষ্টা করেছি। যেমন 'তরে' 'সনে' 'মোর' প্রভৃতি যে-সকল শব্দ গদ্যে ব্যবহার হয় না সেগুলিকে এই-সকল কবিতায় স্থান দিই নি।

২ আশ্বিন ১৩৩৯

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

উৎসর্গ

নীতু

পুনশ্চ

কোপাই

পদ্মা কোথায় চলেছে দূর আকাশের তলায়,
মনে মনে দেখি তাকে।
এক পারে বালুর চর,
নির্ভীক কেননা নিঃস্ব, নিরাসক্ত—
অন্য পারে বাঁশবন, আমবন,
পুরোনো বট, পোড়ো ভিটে,
অনেক দিনের গুঁড়ি-মোটা কাঁঠালগাছ—
পুকুরের ধারে সর্ষেখেত,
পথের ধারে বেতের জঙ্গল,
দেড়শো বছর আগেকার নীলকুঠির ভাঙা ভিত,
তার বাগানে দীর্ঘ ঝাউগাছে দিনরাত মর্মরধ্বনি।
ঐখানে রাজবংশীদের পাড়া,
ফাটল-ধরা খেতে ওদের ছাগল চরে,
হাটের কাছে টিনের ছাদওয়ালা গঞ্জ—
সমস্ত গ্রাম নির্মম নদীর ভয়ে কম্পান্বিত।
পুরাণে প্রসিদ্ধ এই নদীর নাম,
মন্দাকিনীর প্রবাহ ওর নাড়ীতে।
ও স্বতন্ত্র। লোকালয়ের পাশ দিয়ে চলে যায়—
তাদের সহ্য করে, স্বীকার করে না।
বিশুদ্ধ তার আভিজাত্যিক ছন্দে
এক দিকে নির্জন পর্বতের স্মৃতি, আর-এক দিকে নিঃসঙ্গ সমুদ্রের আহ্বান

একদিন ছিলেম ওরই চরের ঘাটে,
নিভৃতে, সবার হতে বহুদূরে।
ভোরের শুকতারাকে দেখে জেগেছি,
ঘুমিয়েছি রাতে সপ্তর্ষির দৃষ্টির সম্মুখে
নৌকার ছাদের উপর।
আমার একলা দিন-রাতের নানা ভাবনার ধারে ধারে
চলে গেছে ওর উদাসীন ধারা—
পথিক যেমন চলে যায়
গৃহস্থের সুখদুঃখের পাশ দিয়ে, অথচ দূর দিয়ে।

তার পরে যৌবনের শেষে এসেছি
তরুবিরল এই মাঠের প্রান্তে।
ছায়াবৃত সাঁওতাল-পাড়ার পুঞ্জিত সবুজ দেখা যায় অদূরে।

এখানে আমার প্রতিবেশিনী কোপাই নদী।
প্রাচীন গোত্রের গরিমা নেই তার।
অনার্য তার নামখানি
কত কালের সাঁওতাল নারীর হাস্যমুখর
কলভাষার সঙ্গে জড়িত।
গ্রামের সঙ্গে তার গলাগলি,
স্থলের সঙ্গে জলের নেই বিরোধ।
তার এ পারের সঙ্গে ও পারের কথা চলে সহজে।
শণের খেতে ফুল ধরেছে একেবারে তার গায়ে গায়ে,
জেগে উঠেছে কচি কচি ধানের চারা।
রাস্তা যেখানে থেমেছে তীরে এসে
সেখানে ও পথিককে দেয় পথ ছেড়ে
কলকল স্ফটিকস্বচ্ছ স্রোতের উপর দিয়ে।
অদূরে তালগাছ উঠেছে মাঠের মধ্যে,
তীরে আম জাম আমলকীর ঘেঁষাঘেঁষি।

ওর ভাষা গৃহস্থপাড়ার ভাষা—
তাকে সাধুভাষা বলে না।
জল স্থল বাঁধা পড়েছে ওর ছন্দে,
রেষারেষি নেই তরলে শ্যামলে।
ছিপ্‌ছিপে ওর দেহটি
বেঁকে বেঁকে চলে ছায়ায় আলোয়
হাততালি দিয়ে সহজ নাচে।
বর্ষায় ওর অঙ্গে অঙ্গে লাগে মাৎলামি
মহুয়া-মাতাল গাঁয়ের মেয়ের মতো—
ভাঙে না, ডোবায় না,
ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আবর্তের ঘাঘরা
দুই তীরকে ঠেলা দিয়ে দিয়ে
উচ্চ হেসে ধেয়ে চলে।
শরতের শেষে স্বচ্ছ হয়ে আসে জল,
ক্ষীণ হয় তার ধারা,
তলার বালি চোখে পড়ে,
তখন শীর্ণ সমারোহের পাণ্ডুরতা
তাকে তো লজ্জা দিতে পারে না।
তার ধন নয় উদ্ধত, তার দৈন্য নয় মলিন;
এ দুইয়েই তার শোভা—
যেমন নটী যখন অলংকারের ঝংকার দিয়ে নাচে,
আর যখন সে নীরবে বসে থাকে ক্লান্ত হয়ে,
চোখের চাহনিতে আলস্য,
একটুখানি হাসির আভাস ঠোঁটের কোণে।

কোপাই আজ কবির ছন্দকে আপন সাথি করে নিলে,
সেই ছন্দের আপোস হয়ে গেল ভাষার স্থলে জলে,
যেখানে ভাষার গান আর যেখানে ভাষার গৃহস্থালি।
তার ভাঙা তালে হেঁটে চলে যাবে ধনুক হাতে সাঁওতাল ছেলে;
পার হয়ে যাবে গোরুর গাড়ি

আঁটি আঁটি খড় বোঝাই করে ;
হাটে যাবে কুমোর
বাঁকে করে হাঁড়ি নিয়ে ;
পিছন পিছন যাবে গাঁয়ের কুকুরটা ;
আর, মাসিক তিন টাকা মাইনের গুরু
ছেঁড়া ছাতি মাথায়।

১ ভাদ্র ১৩৩৯

নাটক

নাটক লিখেছি একটি।
বিষয়টা কী বলি।

অর্জুন গিয়েছেন স্বর্গে,
ইন্দ্রের অতিথি তিনি নন্দনবনে।
উর্বশী গেলেন মন্দারের মালা হাতে
তাঁকে বরণ করবেন ব'লে।
অর্জুন বললেন, দেবী, তুমি দেবলোকবাসিনী,
অতি সম্পূর্ণ তোমার মহিমা,
অনিন্দিত তোমার মাধুরী,
প্রণতি করি তোমাকে।
তোমার মালা দেবতার সেবার জন্যে।
উর্বশী বললেন, কোনো অভাব নেই দেবলোকের,
নেই তার পিপাসা।
সে জানেই না চাইতে,
তবে কেন আমি হলেম সুন্দর!
তার মধ্যে মন্দ নেই,
তবে ভালো হওয়া কার জন্যে!

আমার মালার মূল্য নেই তার গলায়।
মর্তকে প্রয়োজন আমার,
আমাকে প্রয়োজন মর্তের।
তাই এসেছি তোমার কাছে,
তোমার আকাঙ্ক্ষা দিয়ে করো আমাকে বরণ,
দেবলোকের দুর্লভ সেই আকাঙ্ক্ষা
মর্তের সেই অমৃত-অশ্রুর ধারা।

ভালো হয়েছে আমার লেখা।
'ভালো হয়েছে' কথাটা কেটে দেব কি চিঠি থেকে ?
কেন, দোষ হয়েছে কী ?
সত্য কথাই বেরিয়েছে কলমের মুখে।
আশ্চর্য হয়েছ আমার অবিনয়ে—
বলছ, ভালো যে হয়েইছে জানলে কী করে ?
আমার উত্তর এই, নিশ্চিত নাই বা জানলেম।
এক কালের ভালোটা
হয়তো হবে না অন্য কালের ভালো।
তাই তো এক নিশ্বাসে বলতে পারি
'ভালো হয়েছে'।
চিরকালের সত্য নিয়ে কথা হত যদি
চুপ করে থাকতেম ভয়ে।
কত লিখেছি কতদিন,
মনে মনে বলেছি 'খুব ভালো'।
আজ পরম শত্রুর নামে
পারতেম যদি সেগুলো চালাতে
খুশি হতেম তবে।
এ লেখারও একদিন হয়তো হবে সেই দশা—
সেইজন্যেই, দোহাই তোমার,
অসংকোচে বলতে দাও আজকের মতো
'এ লেখা হয়েছে ভালো'।

এইখানটায় একটুখানি তন্দ্রা এল।
হঠাৎ-বর্ষণে চারি দিক থেকে ঘোলা জলের ধারা
যেমন নেমে আসে, সেইরকমটা।
তবু ঝেঁকে ঝেঁকে উঠে টলমল করে কলম চলছে,
যেমনটা হয় মদ খেয়ে নাচতে গেলে।
তবু শেষ করব এ চিঠি,
কুয়াশার ভিতর দিয়েও জাহাজ যেমন চলে,
কল বন্ধ করে না।

বিষয়টা হচ্ছে আমার নাটক।
বন্ধুদের ফর্মাশ, ভাষা হওয়া চাই অমিত্রাক্ষর।
আমি লিখেছি গদ্যে।
পদ্য হল সমুদ্র,
সাহিত্যের আদিযুগের সৃষ্টি।
তার বৈচিত্র্য ছন্দতরঙ্গে,
কলকল্লোলে।
গদ্য এল অনেক পরে।
বাঁধা ছন্দের বাইরে জমালো আসর।
সুশ্রী-কুশ্রী ভালোমন্দ তার আঙিনায় এল
ঠেলাঠেলি করে।
ছেঁড়া কাঁথা আর শাল-দোশালা
এল জড়িয়ে মিশিয়ে,
সুরে বেসুরে ঝনাঝন ঝংকার লাগিয়ে দিল।
গর্জনে ও গানে, তাণ্ডবে ও তরল তালে
আকাশে উঠে পড়ল গদ্যবাণীর মহাদেশ।
কখনো ছাড়লে অগ্নিনিশ্বাস,
কখনো ঝরালে জলপ্রপাত।
কোথাও তার সমতল, কোথাও অসমতল;
কোথাও দুর্গম অরণ্য, কোথাও মরুভূমি।

একে অধিকার যে করবে তার চাই রাজপ্রতাপ ;
পতন বাঁচিয়ে শিখতে হবে
এর নানারকম গতি অবগতি।
বাইরে থেকে এ ভাসিয়ে দেয় না স্রোতের বেগে,
অন্তরে জাগাতে হয় ছন্দ
গুরু লঘু নানা ভঙ্গিতে।
সেই গদ্যে লিখেছি আমার নাটক,
এতে চিরকালের স্তব্ধতা আছে
আর চলতি কালের চাঞ্চল্য।

৯ ভাদ্র ১৩৩৯

নূতন কাল

আমাদের কালে গোষ্ঠে যখন সাঙ্গ হল
সকালবেলার প্রথম দোহন,
ভোরবেলাকার ব্যাপারীরা
চুকিয়ে দিয়ে গেল প্রথম কেনা-বেচা,
তখন কাঁচা রৌদ্রে বেরিয়েছি রাস্তায়,
ঝুড়ি হাতে হেঁকেছি আমার কাঁচা ফল নিয়ে—
—তাতে কিছু হয়তো ধরেছিল রঙ, পাক ধরে নি।
তার পর প্রহরে প্রহরে ফিরেছি পথে পথে ;
কত লোক কত বললে, কত নিলে, কত ফিরিয়ে দিলে,
ভোগ করলে দাম দিলে না সেও কত লোক—
সে কালের দিন হল সারা।

কাল আপন পায়ের চিহ্ন যায় মুছে মুছে,
স্মৃতির বোঝা আমরাই বা জমাই কেন,
এক দিনের দায় টানি কেন আর-এক দিনের 'পরে,
দেনা-পাওনা চুকিয়ে দিয়ে হাতে হাতে
ছুটি নিয়ে যাই না কেন সামনের দিকে চেয়ে!

সেদিনকার উদ্‌বৃত্ত নিয়ে নূতন কারবার জমবে না
তা নিলেম মেনে।
তাতে কী বা আসে যায়।
দিনের পর দিন পৃথিবীর বাসাভাড়া
দিতে হয় নগদ মিটিয়ে।
তার পর শেষ দিনে দখলের জোর জানিয়ে
তালা বন্ধ করবার ব্যর্থ প্রয়াস,
কেন সেই মূঢ়তা।

তাই প্রথম ঘণ্টা বাজল যেই
বেরিয়েছিলেম হিসেব চুকিয়ে দিয়ে।
দরজার কাছ পর্যন্ত এসে যখন ফিরে তাকাই,
তখন দেখি তুমি যে আছ
এ কালের আঙিনায় দাঁড়িয়ে।
তোমার সঙ্গীরা একদিন যখন হেঁকে বলবে
আর আমাকে নেই প্রয়োজন,
তখন ব্যথা লাগবে তোমারই মনে
এই আমার ছিল ভয়—
এই আমার ছিল আশা।
যাচাই করতে আস নি তুমি—
তুমি দিলে গ্রন্থি বেঁধে তোমার কালে আমার কালে হৃদয় দিয়ে।
দেখলেম ঐ বড়ো বড়ো চোখের দিকে তাকিয়ে,
করুণ প্রত্যাশা তো এখনো তার পাতায় আছে লেগে।

তাই ফিরে আসতে হল আর একবার।
দিনের শেষে নতুন পালা আবার করেছি শুরু
তোমারি মুখ চেয়ে,
ভালোবাসার দোহাই মেনে।
আমার বাণীকে দিলেম সাজ পরিয়ে
তোমাদের বাণীর অলংকারে—

তাকে রেখে দিয়ে গেলেম পথের ধারে পান্থশালায়,
পথিক বন্ধু, তোমারি কথা মনে ক'রে।
যেন সময় হলে একদিন বলতে পার
মিটল তোমাদেরও প্রয়োজন,
লাগল তোমাদেরও মনে।
দশ জনের খ্যাতির দিকে হাত বাড়াবার দিন নেই আমার।
কিন্তু তুমি আমাকে বিশ্বাস করেছিলে প্রাণের টানে—
সেই বিশ্বাসকে কিছু পাথেয় দিয়ে যাব
এই ইচ্ছা।

যেন গর্ব করে বলতে পার
আমি তোমাদেরও বটে,
এই বেদনা মনে নিয়ে নেমেছি এই কালে—
এমন সময় পিছন ফিরে দেখি তুমি নেই।
তুমি গেলে সেইখানেই
যেখানে আমার পুরোনো কাল অবগুণ্ঠিত মুখে চলে গেল,
যেখানে পুরাতনের গান রয়েছে চিরন্তন হয়ে।
আর, একলা আমি আজও এই নতুনের ভিড়ে বেড়াই ধাক্কা খেয়ে,
যেখানে আজ আছে কাল নেই।

২ ভাদ্র ১৩৩৯

খোয়াই

পশ্চিমে বাগান বন চষা-খেত
মিলে গেছে দূর বনান্তে বেগনি বাষ্পরেখায়;
মাঝে আম জাম তাল তেঁতুলে ঢাকা
সাঁওতালপাড়া;
পাশ দিয়ে ছায়াহীন দীর্ঘ পথ গেছে বেঁকে
রাঙা পাড় যেন সবুজ শাড়ির প্রান্তে কুটিল রেখায়।
হঠাৎ উঠেছে এক-একটা যূথভ্রষ্ট তালগাছ,
দিশাহারা অনির্দিষ্টকে যেন দিক দেখাবার ব্যাকুলতা।

পৃথিবীর একটানা সবুজ উত্তরীয়,
তারি এক ধারে ছেদ পড়েছে উত্তর দিকে,
মাটি গেছে ক্ষ'য়ে,
দেখা দিয়েছে
উর্মিল লাল কাঁকরের নিস্তব্ধ তোলপাড়—
মাঝে মাঝে মরচে-ধরা কালো মাটি
মহিষাসুরের মুণ্ড যেন।
পৃথিবী আপনার একটি কোণের প্রাঙ্গণে
বর্ষাধারার আঘাতে বানিয়েছে
ছোটো ছোটো অখ্যাত খেলার পাহাড়,
বয়ে চলেছে তার তলায় তলায় নামহীন খেলার নদী।

শরৎকালে পশ্চিম-আকাশে
সূর্যাস্তের ক্ষণিক সমারোহে
রঙের সঙ্গে রঙের ঠেলাঠেলি—
তখন পৃথিবীর এই ধূসর ছেলেমানুষির উপরে
দেখেছি সেই মহিমা
যা একদিন পড়েছে আমার চোখে
দুর্লভ দিনাবসানে
রোহিত সমুদ্রের তীরে তীরে
জনশূন্য তরুহীন পর্বতের রক্তবর্ণ শিখরশ্রেণীতে,
রুষ্টরুদ্রের প্রলয়ভ্রূকুঞ্চনের মতো।

এই পথে ধেয়ে এসেছে কালবৈশাখীর ঝড়
গেরুয়া পতাকা উড়িয়ে
ঘোড়সওয়ার বর্গি সৈন্যের মতো—
কাঁপিয়ে দিয়েছে শাল-সেগুনকে,
নুইয়ে দিয়েছে ঝাউয়ের মাথা,
হায়-হায় রব তুলেছে বাঁশের বনে,
কলাবাগানে করেছে দুঃশাসনের দৌরাত্ম্য।

ক্রন্দিত আকাশের নীচে ঐ ধূসর বন্ধুর
কাঁকরের স্তূপগুলো দেখে মনে হয়েছে
লাল সমুদ্রে তুফান উঠল,
ছিটকে পড়ছে তার শীকরবিন্দু।

এসেছিলেম বালককালে।
ওখানে গুহাগহ্বরে
ঝির্ ঝির্ ঝর্নার ধারায়
রচনা করেছি মন-গড়া রহস্যকথা,
খেলেছি নুড়ি সাজিয়ে
নির্জন দুপুর বেলায় আপন-মনে একলা।

তার পরে অনেক দিন হল,
পাথরের উপর নির্ঝরের মতো
আমার উপর দিয়ে
বয়ে গেল অনেক বৎসর।
রচনা করতে বসেছি একটা কাজের রূপ
ঐ আকাশের তলায় ভাঙামাটির ধারে,
ছেলেবেলায় যেমন রচনা করেছি
নুড়ির দুর্গ।
এই শালবন, এই একলা-মেজাজের তালগাছ,
ঐ সবুজ মাঠের সঙ্গে রাঙামাটির মিতালি,
এর পানে অনেক দিন যাদের সঙ্গে দৃষ্টি মিলিয়েছি,
যারা মন মিলিয়েছিল
এখানকার বাদল-দিনে আর আমার বাদল-গানে,
তারা কেউ আছে কেউ গেল চলে।

আমারও যখন শেষ হবে দিনের কাজ,
নিশীথরাত্রের তারা ডাক দেবে
আকাশের ও পার থেকে—

তার পরে ?
তার পরে রইবে উত্তর দিকে
ঐ বুক-ফাটা ধরণীর রক্তিমা,
দক্ষিণ দিকে চাষের খেত,
পুব দিকের মাঠে চরবে গোরু ।
রাঙামাটির রাস্তা বেয়ে
গ্রামের লোক যাবে হাট করতে ।
পশ্চিমের আকাশপ্রান্তে
আঁকা থাকবে একটি নীলাঞ্জনরেখা

৩০ শ্রাবণ ১৩৩৯

পত্র

তোমাকে পাঠালুম আমার লেখা
এক-বই-ভরা কবিতা ।
তারা সবাই ঘেঁষাঘেঁষি দেখা দিল
একই সঙ্গে এক খাঁচায় ।
কাজেই আর সমস্ত পাবে,
কেবল পাবে না তাদের মাঝখানের ফাঁকগুলোকে ।
যে অবকাশের নীল আকাশের আসরে
একদিন নামল এসে কবিতা
সেইটেই পড়ে রইল পিছনে ।
নিশীথ রাত্রের তারাগুলি ছিঁড়ে নিয়ে
যদি হার গাঁথা যায় ঠেসে,
বিশ্ব-বেনের দোকানে
হয়তো সেটা বিকোয় মোটা দামে ;
তবু রসিকেরা বুঝতে পারে, যেন কমতি হল কিসের ।
যেটা কম পড়ল সেটা ফাঁকা আকাশ,
তৌল করা যায় না তাকে,
কিন্তু সেটা দরদ দিয়ে ভরা ।

মনে করো একটি গান উঠল জেগে
নীরব সময়ের বুকের মাঝখানে
একটি মাত্র নীলকান্তমণি—
তাকে কি দেখতে হবে
গয়নার বাক্সের মধ্যে।
বিক্রমাদিত্যের সভায়
কবিতা শুনিয়েছেন কবি দিনে দিনে।
ছাপাখানার দৈত্য তখন
কবিতার সময়াকাশকে
দেয় নি লেপে কালী মাখিয়ে।
হাইড্রলিক জাঁতায় -পেষা কাব্যপিণ্ড
তলিয়ে যেত না গলায় এক-এক গ্রাসে,
উপভোগটা পুরো অবসরে উঠত রসিয়ে।

হায় রে, কানে শোনার কবিতাকে
পরানো হল চোখে দেখার শিকল,
কবিতার নির্বাসন হল লাইব্রেরি-লোকে;
নিত্যকালের আদরের ধন
পাব্লিশরের হাটে হল নাকাল।
উপায় নেই,
জটলা-পাকানোর যুগ এটা।
কবিতাকে পাঠকের অভিসারে যেতে হয়
পটল-ডাঙার অম্নিবাসে চড়ে।

মন বলছে নিশ্বাস ফেলে—
আমি যদি জন্ম নিতেম কালিদাসের কালে।
তুমি যদি হতে বিক্রমাদিত্য
আর আমি যদি হতেম— কী হবে ব'লে।
জন্মেছি ছাপার কালিদাস হয়ে।
তোমরা আধুনিক মালবিকা

কিনে পড় কবিতা
আরাম-কেদারায় ব'সে।
চোখ বুজে কান পেতে শোন না;
শোনা হলে
কবিকে পরিয়ে দাও না বেলফুলের মালা,
দোকানে পাঁচ সিকে দিয়েই খালাস

১০ ভাদ্র ১৩৩৯

পুকুর-ধারে

দোতলার জানলা থেকে চোখে পড়ে
পুকুরের একটি কোণা।
ভাদ্রমাসে কানায় কানায় জল।
জলে গাছের গভীর ছায়া টল্‌টল্‌ করছে
সবুজ রেশমের আভায়।
তীরে তীরে কলমি শাক আর হেলঞ্চ।
ঢালু পাড়িতে সুপারি গাছ ক'টা মুখোমুখি দাঁড়িয়ে।
এ ধারের ডাঙায় করবী, সাদা রঙন, একটি শিউলি;
দুটি অযত্নের রজনীগন্ধায় ফুল ধরেছে গরিবের মতো।
বাঁখারি-বাঁধা মেহেদির বেড়া,
তার ও পারে কলা পেয়ারা নারকেলের বাগান;
আরো দূরে গাছপালার মধ্যে একটা কোঠাবাড়ির ছাদ,
উপর থেকে শাড়ি ঝুলছে।
মাথায় ভিজে চাদর জড়ানো গা-খোলা মোটা মানুষটি
ছিপ ফেলে বসে আছে বাঁধা ঘাটের পৈঠাতে,
ঘণ্টার পর ঘণ্টা যায় কেটে।

বেলা পড়ে এল।
বৃষ্টি-ধোওয়া আকাশ,
বিকেলের প্রৌঢ় আলোয় বৈরাগ্যের ম্লানতা।

ধীরে ধীরে হাওয়া দিয়েছে,
টলমল করছে পুকুরের জল,
ঝিল্‌মিল্‌ করছে বাতাবি লেবুর পাতা।

চেয়ে দেখি আর মনে হয়
এ যেন আর কোনো-একটা দিনের আবছায়া ;
আধুনিকের বেড়ার ফাঁক দিয়ে
দূর কালের কার একটি ছবি নিয়ে এল মনে।
স্পর্শ তার করুণ, স্নিগ্ধ তার কণ্ঠ,
মুগ্ধ সরল তার কালো চোখের দৃষ্টি।
তার সাদা শাড়ির রাঙা চওড়া পাড়
দুটি পা ঘিরে ঢেকে পড়েছে ;
সে আঙিনাতে আসন বিছিয়ে দেয়,
সে আঁচল দিয়ে ধুলো দেয় মুছিয়ে ;
সে আম-কাঁঠালের ছায়ায় ছায়ায় জল তুলে আনে,
তখন দোয়েল ডাকে শজনের ডালে,
ফিঙে লেজ দুলিয়ে বেড়ায় খেজুরের ঝোপে।
যখন তার কাছে বিদায় নিয়ে চলে আসি
সে ভালো করে কিছুই বলতে পারে না ;
কপাট অল্প একটু ফাঁক করে পথের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে,
চোখ ঝাপসা হয়ে আসে।

২৫ শ্রাবণ ১৩৩৯

অপরাধী

তুমি বল তিনু প্রশ্রয় পায় আমার কাছে—
তাই রাগ কর তুমি।
ওকে ভালোবাসি,
তাই ওকে দুষ্টু ব'লে দেখি,
দোষী ব'লে দেখি নে—

রাগও করি ওর 'পরে
ভালোও লাগে ওকে,
এ কথাটা মিছে নয় হয়তো।

এক একজন মানুষ অমন থাকে
সে লোক নেহাত মন্দ নয়,
সেইজন্যেই সহজে তার মন্দটাই পড়ে ধরা।
সে হতভাগা রঙে মন্দ, কিন্তু মন্দ নয় রসে ;
তার দোষ স্তূপে বেশি,
ভারে বেশি নয়—
তাই দেখতে যতটা লাগে,
গায়ে লাগে না তত।
মনটা ওর হাল্কা ছিপ্‌ছিপে নৌকো,
হুহু করে চলে যায় ভেসে ;
ভালোই বল আর মন্দই বল
জমতে দেয় না বেশি ক্ষণ—
এ পারের বোঝা ও পারে চালান করে দেয়
দেখতে দেখতে ;
ওকে কিছুই চাপ দেয় না,
তেমনি ও দেয় না চাপ।

স্বভাব ওর আসর-জমানো,
কথা কয় বিস্তর,
তাই বিস্তর মিছে বলতে হয়—
নইলে ফাঁক পড়ে কথার ঠাস-বুনোনিতে।
মিছেটা নয় ওর মনে,
সে ওর ভাষায়।
ওর ব্যাকরণটা যার জানা
তার বুঝতে হয় না দেরি।
ওকে তুমি বল নিন্দুক— তা সত্য।

সত্যকে বাড়িয়ে তুলে বাঁকিয়ে দিয়ে ও নিন্দে বানায়-
যার নিন্দে করে তার মন্দ হবে ব'লে নয়,
যারা নিন্দে শোনে তাদের ভালো লাগবে ব'লে।
তারা আছে সমস্ত সংসার জুড়ে।
তারা নিন্দের নীহারিকা,
ও হল নিন্দের তারা,
ওর জ্যোতি তাদেরই কাছ থেকে পাওয়া।
আসল কথা ওর বুদ্ধি আছে, নেই বিবেচনা।
তাই ওর অপরাধ নিয়ে হাসি চলে।
যারা ভালোমন্দ বিবেচনা করে সূক্ষ্ম তৌলের মাপে
তাদের দেখে হাসি যায় বন্ধ হয়ে;
তাদের সঙ্গটা ওজনে হয় ভারী,
সয় না বেশিক্ষণ;
দৈবে তাদের ত্রুটি যদি হয় অসাবধানে
হাঁপ ছেড়ে বাঁচে লোকে।

বুঝিয়ে বলি কাকে বলে অবিবেচনা—
মাখন লক্ষ্মীছাড়াটা সংস্কৃতর ক্লাসে
চৌকিতে লাগিয়ে রেখেছিল ভুসো;
ছাপ লেগেছিল পণ্ডিতমশায়ের জামার পিঠে;
সে হেসেছিল, সবাই হেসেছিল
পণ্ডিতমশায় ছাড়া।
হেড্‌মাস্টার দিলেন ছেলেটাকে একেবারে তাড়িয়ে;
তিনি অত্যন্ত গম্ভীর, তিনি অত্যন্ত বিবেচক।
তাঁর ভাব-গতিক দেখে হাসি বন্ধ হয়ে যায়।

তিনু অপকার করে কিছু না ভেবে,
উপকার করে অনায়াসে,
কোনোটাই মনে রাখে না।
ও ধার নেয়, খেয়াল নেই শোধ করবার;

যারা ধার নেয় ওর কাছে
পাওনার তলব নেই তাদের দরজায়।
মোটের উপর ওরই লোকসান হয় বেশি।

তোমাকে আমি বলি, ওকে গাল দিয়ো যা খুশি,
আবার হেসো মনে মনে—
নইলে ভুল হবে।
আমি ওকে দেখি কাছের থেকে, মানুষ ব'লে,
ভালো মন্দ পেরিয়ে।
তুমি দেখ দূরে ব'সে, বিশেষণের কাঠগড়ায় ওকে খাড়া রেখে।
আমি ওকে লাঞ্ছনা দিই তোমার চেয়ে বেশি—
ক্ষমা করি তোমার চেয়ে বড়ো ক'রে।
সাজা দিই, নির্বাসন দিই নে।
ও আমার কাছেই রয়ে গেল,
রাগ কোরো না তাই নিয়ে।

৭ ভাদ্র ১৩৩৯

ফাঁক

আমার বয়সে
মনকে বলবার সময় এল,
কাজ নিয়ে কোরো না বাড়াবাড়ি,
ধীরে সুস্থে চলো,
যথোচিত পরিমাণে ভুলতে করো শুরু
যাতে ফাঁক পড়ে সময়ের মাঝে মাঝে।
বয়স যখন অল্প ছিল
কর্তব্যের বেড়ায় ফাঁক ছিল যেখানে সেখানে।
তখন যেমন-খুশির ব্রজধামে
ছিল বালগোপালের লীলা।
মথুরার পালা এল মাঝে,
কর্তব্যের রাজাসনে।

আজ আমার মন ফিরেছে
সেই কাজ-ভোলার অসাবধানে।
কী কী আছে দিনের দাবি
পাছে সেটা যাই এড়িয়ে
বন্ধু তার ফর্দ রেখে যায় টেবিলে।
ফর্দটাও দেখতে ভুলি,
টেবিলে এসেও বসা হয় না—
এমনিতরো ঢিলে অবস্থা।
গরম পড়েছে ফর্দে এটা না ধরলেও
মনে আনতে বাধে না।
পাখা কোথায়,
কোথায় দার্জিলিঙের টাইম-টেবিলটা,
এমনতরো হাঁপিয়ে ওঠবার ইশারা ছিল
থার্মোমিটারে।
তবু ছিলেম স্থির হয়ে।

বেলা দুপুর
আকাশ ঝাঁ ঝাঁ করছে,
ধূ ধূ করছে মাঠ,
তপ্ত বালু উড়ে যায় হুহু করে—
খেয়াল হয় না।
বনমালী ভাবে দরজা বন্ধ করাটা
ভদ্রঘরের কায়দা—
দিই তাকে এক ধমক।
পশ্চিমের সাশির ভিতর দিয়ে
রোদ ছড়িয়ে পড়ে পায়ের কাছে।
বেলা যখন চারটে
বেহারা এসে খবর নেয়, চিট্‌ঠি ?
হাত উলটিয়ে বলি, নাঃ।

ক্ষণকালের জন্য খটকা লাগে
চিঠি লেখা উচিত ছিল—
ক্ষণকালটা যায় পেরিয়ে,
ডাকের সময় যায় তার পিছন পিছন।
এ দিকে বাগানে পথের ধারে
টগর গন্ধরাজের পুঁজি ফুরোয় না,
এরা ঘাটে-জটলা-করা বউদের মতো,
পরস্পর হাসাহাসি ঠেলাঠেলিতে
মাতিয়ে তুলেছে কুঞ্জ আমার।
কোকিল ডেকে ডেকে সারা—
ইচ্ছে করে তাকে বুঝিয়ে বলি,
অত একান্ত জেদ কোরো না
বনান্তরের উদাসীনকে মনে রাখবার জন্যে।
মাঝে মাঝে ভুলো, মাঝে মাঝে ফাঁক বিছিয়ে রেখো জীবনে;
মনে রাখার মানহানি কোরো না
তাকে দুঃসহ ক'রে।
মনে আনবার অনেক দিন ক্ষণ আমারো আছে,
অনেক কথা, অনেক দুঃখ।
তার ফাঁকের ভিতর দিয়েই
নতুন বসন্তের হাওয়া আসে
রজনীগন্ধার গন্ধে বিষণ্ণ হয়ে;
তারি ফাঁকের মধ্যে দিয়ে
কাঁঠালতলার ঘন ছায়া
তপ্ত মাঠের ধারে
দূরের বাঁশি বাজায়
অশ্রুত মূলতানে।
তারি ফাঁকে ফাঁকে দেখি,
ছেলেটা স্কুল পালিয়ে খেলা করছে
হাঁসের বাচ্ছা বুকে চেপে ধ'রে
পুকুরের ধারে

ঘাটের উপর একলা ব'সে
সমস্ত বিকেল বেলাটা।
তারি ফাঁকের ভিতর দিয়ে দেখতে পাই
লিখছে চিঠি নূতন বধূ,
ফেলছে ছিঁড়ে, লিখছে আবার।
একটুখানি হাসি দেখা দেয় আমার মুখে,
আবার একটুখানি নিশ্বাসও পড়ে।

১১ ভাদ্র ১৩৩৯

বাসা

ময়ূরাক্ষী নদীর ধারে।
আমার পোষা হরিণে বাছুরে যেমন ভাব
তেমনি ভাব শালবনে আর মহুয়ায়।
ওদের পাতা ঝরছে গাছের তলায়,
উড়ে পড়ছে আমার জানলাতে।
তালগাছটা খাড়া দাঁড়িয়ে পুবের দিকে,
সকালবেলাকার বাঁকা রোদ্দুর
তারি চোরাই ছায়া ফেলে আমার দেয়ালে।
নদীর ধারে ধারে পায়ে-চলা পথ
রাঙা মাটির উপর দিয়ে,
কুড়চির ফুল ঝরে তার ধুলোয় ;
বাতাবি-লেবু-ফুলের গন্ধ
ঘনিয়ে ধরে বাতাসকে ;
জারুল পলাশ মাদারে চলেছে রেষারেষি ;
শজনে ফুলের ঝুরি দুলছে হাওয়ায় ;
চামেলি লতিয়ে গেছে বেড়ার গায়ে গায়ে,
ময়ূরাক্ষী নদীর ধারে।

নদীতে নেমেছে ছোটো একটি ঘাট
লাল পাথরে বাঁধানো।
তারি এক পাশে অনেক কালের চাঁপাগাছ,
মোটা তার গুঁড়ি।
নদীর উপরে বেঁধেছি একটি সাঁকো,
তার দুই পাশে কাঁচের টবে
জুঁই বেল রজনীগন্ধা শ্বেতকরবী।
গভীর জল মাঝে মাঝে,
নীচে দেখা যায় নুড়িগুলি।
সেইখানে ভাসে রাজহংস
আর ঢালুতটে চরে বেড়ায়
আমার পাটল রঙের গাই গোরুটি
আর মিশোল রঙের বাছুর,
ময়ূরাক্ষী নদীর ধারে।

ঘরের মেঝেতে ফিকে নীল রঙের জাজিম পাতা
খয়েরি-রঙের-ফুল-কাটা।
দেয়াল বসন্তী রঙের,
তাতে ঘন কালো রেখার পাড়।
একটুখানি বারান্দা পুবের দিকে,
সেইখানে বসি সূর্যোদয়ের আগেই।
একটি মানুষ পেয়েছি
তার গলায় সুর ওঠে ঝলক দিয়ে,
নটীর কঙ্কণে আলোর মতো।
পাশের কুটিরে সে থাকে,
তার চালে উঠেছে ঝুমকোলতা।
আপন মনে সে গায় যখন
তখনি পাই শুনতে—
গাইতে বলি নে তাকে।

স্বামীটি তার লোক ভালো—
আমার লেখা ভালোবাসে,
ঠাট্টা করলে যথাস্থানে যথোচিত হাসতে জানে,
খুব সাধারণ কথা সহজেই পারে কইতে,
আবার হঠাৎ কোনো-একদিন আলাপ করে
—লোকে যাকে চোখ টিপে বলে কবিত্ব—
রাত্রি এগারোটার সময় শালবনে
ময়ূরাক্ষী নদীর ধারে।

বাড়ির পিছন দিকটাতে
শাক-সবজির খেত।
বিঘে-দুয়েক জমিতে হয় ধান।
আর আছে আম-কাঁঠালের বাগিচা
আস্‌শেওড়ার-বেড়া-দেওয়া।
সকালবেলায় আমার প্রতিবেশিনী
গুন্ গুন্ গাইতে গাইতে মাখন তোলে দই থেকে,
তার স্বামী যায় দেখতে খেতের কাজ
লাল টাট্টু ঘোড়ায় চ'ড়ে।
নদীর ও পারে রাস্তা,
রাস্তা ছাড়িয়ে ঘন বন—
সে দিক থেকে শোনা যায় সাঁওতালের বাঁশি
আর শীতকালে সেখানে বেদেরা করে বাসা,
ময়ূরাক্ষী নদীর ধারে।

এই পর্যন্ত।
এ বাসা আমার হয় নি বাঁধা, হবেও না।
ময়ূরাক্ষী নদী দেখিও নি কোনো দিন।
ওর নামটা শুনি নে কান দিয়ে,
নামটা দেখি চোখের উপরে—

মনে হয় যেন ঘননীল মায়ার অঞ্জন
লাগে চোখের পাতায়।
আর মনে হয়,
আমার মন বসবে না আর কোথাও,
সব কিছু থেকে ছুটি নিয়ে
চলে যেতে চায় উদাস প্রাণ
ময়ূরাক্ষী নদীর ধারে।

৩ ভাদ্র ১৩৩৯

দেখা

মোটা মোটা কালো মেঘ
ক্লান্ত পালোয়ানের দল যেন,
সমস্ত রাত বর্ষণের পর
আকাশের এক পাশে এসে জমল
ঘেঁষাঘেঁষি ক'রে।
বাগানের দক্ষিণ সীমায় সেগুন গাছে
মঞ্জরীর ঢেউগুলোতে হঠাৎ পড়ল আলো,
চমকে উঠল বনের ছায়া।
শ্রাবণ মাসের রৌদ্র দেখা দিয়েছে
অনাহূত অতিথি,
হাসির কোলাহল উঠল
গাছে গাছে ডালে-পালায়।
রোদ-পোহানো ভাবনাগুলো
ভেসে ভেসে বেড়ালো মনের দূর গগনে।
বেলা গেল অকাজে।

বিকেলে হঠাৎ এল গুরু গুরু ধ্বনি,
কার যেন সংকেত।

এক মুহূর্তে মেঘের দল
বুক ফুলিয়ে হু হু করে ছুটে আসে
তাদের কোণ ছেড়ে।
বাঁধের জল হয়ে গেল কালো,
বটের তলায় নামল থম্‌থমে অন্ধকার।
দূর বনের পাতায় পাতায়
বেজে ওঠে ধারাপতনের ভূমিকা।
দেখতে দেখতে ঘনবৃষ্টিতে পাণ্ডুর হয়ে আসে
সমস্ত আকাশ,
মাঠ ভেসে যায় জলে।
বুড়ো বুড়ো গাছগুলো আলুথালু মাতামাতি করে
ছেলেমানুষের মতো ;
ধৈর্য থাকে না তালের পাতায়, বাঁশের ডালে।
একটু পরেই পালা হল শেষ—
আকাশ নিকিয়ে গেল কে।
কৃষ্ণপক্ষের কৃশ চাঁদ যেন রোগশয্যা ছেড়ে
ক্লান্ত হাসি নিয়ে অঙ্গনে বাহির হয়ে এল।

মন বলে, এই আমার যত দেখার টুকরো
চাই নে হারাতে।
আমার সত্তর বছরের খেয়ায়
কত চল্‌তি মুহূর্ত উঠে বসেছিল,
তারা পার হয়ে গেছে অদৃশ্যে।
তার মধ্যে দুটি-একটি কুঁড়েমির দিনকে
পিছনে রেখে যাব
ছন্দে গাঁথা কুঁড়েমির কারুকাজে,
তারা জানিয়ে দেবে আশ্চর্য কথাটি
একদিন আমি দেখেছিলেম এই সব-কিছু।

৪ ভাদ্র ১৩৩৯

সুন্দর

প্লাটিনমের আঙটির মাঝখানে যেন হীরে।
আকাশের সীমা ঘিরে মেঘ,
মাঝখানের ফাঁক দিয়ে রোদ্দুর আসছে মাঠের উপর।
হুহু করে বইছে হাওয়া,
পেঁপে গাছগুলোর যেন আতঙ্ক লেগেছে,
উত্তরের মাঠে নিমগাছে বেধেছে বিদ্রোহ,
তালগাছগুলোর মাথায় বিস্তর বকুনি।
বেলা এখন আড়াইটা।
ভিজে বনের ঝল্‌মলে মধ্যাহ্ন
উত্তর দক্ষিণের জানলা দিয়ে এসে
জুড়ে বসেছে আমার সমস্ত মন।
জানি নে কেন মনে হয়
এই দিন দূর কালের আর কোনো-একটা দিনের মতো।
এ-রকম দিন মানে না কোনো দায়কে,
এর কাছে কিছুই নেই জরুরি,
বর্তমানের নোঙর-ছেঁড়া ভেসে-যাওয়া এই দিন।
একে দেখছি যে অতীতের মরীচিকা বলে
সে অতীত কি ছিল কোনো কালে কোনোখানে,
সে কি চিরযুগেরই অতীত নয়।
প্রেয়সীকে মনে হয় সে আমার জন্মান্তরের জানা —
যে কালে স্বর্গ, যে কালে সত্যযুগ,
যে কাল সকল কালেরই ধরা-ছোঁওয়ার বাইরে।
তেমনি এই-যে সোনায় পান্নায় ছায়ায় আলোয় গাঁথা
অবকাশের নেশায় মন্থর আষাঢ়ের দিন
বিহ্বল হয়ে আছে মাঠের উপর ওড়না ছড়িয়ে দিয়ে,
এর মাধুরীকেও মনে হয় আছে তবু নেই,
এ আকাশবীণায় গৌড়সারঙের আলাপ,
সে আলাপ আসছে সর্বকালের নেপথ্য থেকে।

৭ ভাদ্র ১৩৩৯

শেষ দান

ছেলেদের খেলার প্রাঙ্গণ।
শুকনো ধুলো, একটি ঘাস উঠতে পায় না।
এক ধারে আছে কাঞ্চন গাছ,
আপন রঙের মিল পায় না সে কোথাও।
দেখে মনে পড়ে আমাদের কালো রিট্রিভার কুকুরটা,
সে বাঁধা থাকে কোঠাবাড়ির বারান্দায়।
দূরে রান্নাঘরের চার ধারে উঞ্ছবৃত্তির উৎসাহে
ঘুরে বেড়ায় দিশি কুকুরগুলো।
ঝগড়া করে, মার খায়, আর্তনাদ করে,
তবু আছে সুখে নিজেদের স্বভাবে।
আমাদের টেডি থেকে থেকে দাঁড়িয়ে ওঠে চঞ্চল হয়ে,
সমস্ত গা তার কাঁপতে থাকে,
ব্যগ্র চোখে চেয়ে দেখে দক্ষিণের দিকে,
ছুটে যেতে চায় ওদের মাঝখানে—
ঘেউ ঘেউ ডাকতে থাকে ব্যর্থ আগ্রহে।

তেমনি কাঞ্চন গাছ আছে একা দাঁড়িয়ে,
আপন শ্যামল পৃথিবীতে নয়,
মানুষের-পায়ে-দলা গরিব ধুলোর 'পরে।
চেয়ে থাকে দূরের দিকে
ঘাসের পটের উপর যেখানে বনের ছবি আঁকা।

সেবার বসন্ত এল।
কে জানবে, হাওয়ার থেকে
ওর মজ্জায় কেমন করে কী বেদনা আসে।
অদূরে শালবন আকাশে মাথা তুলে
মঞ্জরী-ভরা সংকেত জানালে
দক্ষিণসাগরতীরের নবীন আগন্তুককে।

সেই উচ্ছ্বসিত সবুজ কোলাহলের মধ্যে
কোন্ চরম দিনের অদৃশ্য দূত দিল ওর দ্বারে নাড়া,
কানে কানে গেল খবর দিয়ে এই—
একদিন নামে শেষ আলো,
নেচে যায় কচি পাতার শেষ ছেলেখেলার আসরে

দেরি করলে না।
তার হাসিমুখের বেদনা
ফুটে উঠল ভারে ভারে
ফিকে-বেগনি ফুলে।
পাতা গেল না দেখা—
যতই ঝরে ততই ফোটে,
হাতে রাখল না কিছুই।
তার সব দান এক বসন্তে দিল উজাড় ক'রে।
তার পরে বিদায় নিল
এই ধূসর ধূলির উদাসীনতার কাছে।

৫ ভাদ্র ১৩৩৯

কোমল গান্ধার

নাম রেখেছি কোমল গান্ধার,
মনে মনে।
যদি তার কানে যেত অবাক হয়ে থাকত বসে,
বলত হেসে 'মানে কী'।
মানে কিছুই যায় না বোঝা সেই মানেটাই খাঁটি।
কাজ আছে কর্ম আছে সংসারে,
ভালো মন্দ অনেক রকম আছে—
তাই নিয়ে তার মোটামুটি সবার সঙ্গে চেনাশোনা

পাশের থেকে আমি দেখি বসে বসে
কেমন একটি সুর দিয়েছে চার দিকে।
আপনাকে ও আপনি জানে না।
যেখানে ওর অন্তর্যামীর আসন পাতা,
সেইখানে তাঁর পায়ের কাছে
রয়েছে কোন্ ব্যথা-ধূপের পাত্রখানি।
সেখান থেকে ধোঁয়ার আভাস চোখের উপর পড়ে,
চাঁদের উপর মেঘের মতো—
হাসিকে দেয় একটুখানি ঢেকে।
গলার সুরে কী করুণা লাগে ঝাপসা হয়ে।
ওর জীবনের তানপুরা যে ওই সুরেতেই বাঁধা,
সেই কথাটি ও জানে না!
চলায় বসায় সব কাজেতেই ভৈরবী দেয় তান—
কেন যে তার পাই নে কিনারা।
তাই তো আমি নাম দিয়েছি কোমল-গান্ধার—
যায় না বোঝা যখন চক্ষু তোলে
বুকের মধ্যে অমন ক'রে
কেন লাগায় চোখের জলের মিড়।

১৩ ভাদ্র ১৩৩৯

আজ এই বাদলার দিন,
এ মেঘদূতের দিন নয়।
এ দিন অচলতায় বাঁধা।
মেঘ চলছে না, চলছে না হাওয়া,
টিপিটিপি বৃষ্টি
ঘোমটার মতো পড়ে আছে
দিনের মুখের উপর।

সময়ে যেন স্রোত নেই,
চার দিকে অবারিত আকাশ,
অচঞ্চল অবসর।

যেদিন মেঘদূত লিখেছেন কবি,
সেদিন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে নীল পাহাড়ের গায়ে।
দিগন্ত থেকে দিগন্তে ছুটেছে মেঘ,
পুবে হাওয়া বয়েছে শ্যামজম্বুবনান্তকে দুলিয়ে দিয়ে।
যক্ষনারী বলে উঠেছে,
মাগো, পাহাড়সুদ্ধ নিল বুঝি উড়িয়ে।
মেঘদূত উড়ে চলে যাওয়ার বিরহ,
দুঃখের ভার পড়ল না তার 'পরে—
সেই বিরহে ব্যথার উপর মুক্তি হয়েছে জয়ী।

সেদিনকার পৃথিবী জেগে উঠেছিল
উচ্ছল ঝরনায়, উদ্‌বেল নদীস্রোতে
মুখরিত বনহিল্লোলে,
তার সঙ্গে দুলে দুলে উঠেছে
মন্দাক্রান্তা ছন্দে বিরহীর বাণী।
একদা যখন মিলনে ছিল না বাধা
তখন ব্যবধান ছিল সমস্ত বিশ্বে,
বিচিত্র পৃথিবীর বেষ্টনী পড়ে থাকত
নিভৃত বাসরকক্ষের বাইরে।
যেদিন এল বিচ্ছেদ
সেদিন বাঁধন-ছাড়া দুঃখ বেরোল
নদী গিরি অরণ্যের উপর দিয়ে।
কোণের কান্না মিলিয়ে গেল পথের উল্লাসে।
অবশেষে ব্যথার রূপ দেখা গেল
যে কৈলাসে যাত্রা হল শেষ।

সেখানে অচল ঐশ্বর্যের মাঝখানে
প্রতীক্ষার নিশ্চল বেদনা।

অপূর্ণ যখন চলেছে পূর্ণের দিকে
তার বিচ্ছেদের যাত্রাপথে
আনন্দের নব নব পর্যায়।
পরিপূর্ণ অপেক্ষা করছে স্থির হয়ে ;
নিত্যপুষ্প, নিত্যচন্দ্রালোক,
নিত্যই সে একা— সেই তো একান্ত বিরহী।
যে অভিসারিকা তারই জয়,
আনন্দে সে চলেছে কাঁটা মাড়িয়ে।

ভুল বলা হল বুঝি।
সেও তো নেই স্থির হয়ে যে পরিপূর্ণ,
সে যে বাজায় বাঁশি, প্রতীক্ষার বাঁশি—
সুর তার এগিয়ে চলে অন্ধকার পথে।
বাঞ্ছিতের আহ্বান আর অভিসারিকার চলা
পদে পদে মিলছে একই তালে।
তাই নদী চলেছে যাত্রার ছন্দে,
সমুদ্র দুলেছে আহ্বানের সুরে।

৭ ভাদ্র ১৩৩৯

স্মৃতি

পশ্চিমে শহর।
তারি দূর কিনারায় নির্জনে
দিনের তাপ আগলে আছে একটা অনাদৃত বাড়ি,
চারি দিকে চাল পড়েছে ঝুঁকে।
ঘরগুলোর মধ্যে চিরকালের ছায়া উপুড় হয়ে পড়ে,
আর চিরবন্দী পুরাতনের একটা গন্ধ।
মেঝের উপর হলদে জাজিম,
ধারে ধারে ছাপ-দেওয়া বন্দুক-ধারী বাঘ-মারা শিকারির মূর্তি

উত্তর দিকে সিশুগাছের তলা দিয়ে
চলেছে সাদা মাটির রাস্তা, উড়ছে ধুলো
খররৌদ্রের গায়ে হাল্কা উড়নির মতো।
সামনের চরে গম অড়র ফুটি তর্‌মুজের খেত,
দূরে ঝক্‌মক্ করছে গঙ্গা,
তার মাঝে মাঝে গুণ-টানা নৌকো
কালীর আঁচড়ে আঁকা ছবি যেন।
বারান্দায় রুপোর-কাঁকন-পরা ভজিয়া
গম ভাঙছে জাঁতায়,
গান গাইছে একঘেয়ে সুরে,
গির্‌ধারী দারোয়ান অনেক খন ধরে তার পাশে বসে আছে
জানি না কিসের ওজরে।
বুড়ো নিমগাছের তলায় ইঁদারা,
গোরু দিয়ে জল টেনে তোলে মালী,
তার কাকুধ্বনিতে মধ্যাহ্ন সকরুণ,
তার জলধারায় চঞ্চল ভুট্টার খেত।
গরম হাওয়ায় ঝাপসা গন্ধ আসছে আমের বোলের,
খবর আসছে মহানিমের মঞ্জরীতে মৌমাছির বসেছে মেলা।

অপরাহ্ণে শহর থেকে আসে একটি পরবাসী মেয়ে,
তাপে কৃশ পাণ্ডুবর্ণ বিষণ্ণ তার মুখ,
মৃদুস্বরে পড়িয়ে যায় বিদেশী কবির কবিতা।
নীল রঙের জীর্ণ চিকের ছায়া-মিশানো অস্পষ্ট আলোয়
ভিজে খস্‌খসের গন্ধের মধ্যে
প্রবেশ করে সাগরপারের মানবহৃদয়ের ব্যথা।
আমার প্রথমযৌবন খুঁজে বেড়ায় বিদেশী ভাষার মধ্যে আপন ভাষা
প্রজাপতি যেমন ঘুরে বেড়ায়
বিলিতি মৌসুমি ফুলের কেয়ারিতে
নানা বর্ণের ভিড়ে।

৭ ভাদ্র ১৩৩৯

ছেলেটা

ছেলেটার বয়স হবে বছর দশেক—
পরের ঘরে মানুষ।
যেমন আগাছা বেড়ে ওঠে ভাঙা বেড়ার ধারে—
মালীর যত্ন নেই,
আছে আলোক-বাতাস বৃষ্টি
পোকামাকড় ধুলোবালি,
কখনো ছাগলে দেয় মুড়িয়ে
কখনো মাড়িয়ে দেয় গোরুতে—
তবু মরতে চায় না, শক্ত হয়ে ওঠে,
ডাঁটা হয় মোটা,
পাতা হয় চিকন সবুজ।

ছেলেটা কুল পাড়তে গিয়ে গাছের থেকে পড়ে,
হাড় ভাঙে,
বুনো বিষফল খেয়ে ওর ভির্মি লাগে,
রথ দেখতে গিয়ে কোথায় যেতে কোথায় যায়,
কিছুতেই কিছু হয় না—
আধমরা হয়েও বেঁচে ওঠে,
হারিয়ে গিয়ে ফিরে আসে
কাদা মেখে কাপড় ছিঁড়ে—
মার খায় দমাদম,
গাল খায় অজস্র—
ছাড়া পেলেই আবার দেয় দৌড়।

মরা নদীর বাঁকে দাম জমেছে বিস্তর,
বক দাঁড়িয়ে থাকে ধারে,
দাঁড়কাক বসেছে বৈঁচিগাছের ডালে,
আকাশে উড়ে বেড়ায় শঙ্খচিল,

বড়ো বড়ো বাঁশ পুঁতে জাল পেতেছে জেলে,
বাঁশের ডগায় বসে আছে মাছরাঙা,
পাতিহাঁস ডুবে ডুবে গুগলি তোলে।
বেলা দুপুর।
লোভ হয় জলের ঝিলিমিলি দেখে—
তলায় পাতা ছড়িয়ে শেওলাগুলো দুলতে থাকে,
মাছগুলো খেলা করে।
আরো তলায় আছে নাকি নাগকন্যা?
সোনার কাঁকই দিয়ে আঁচড়ায় লম্বা চুল,
আঁকাবাঁকা ছায়া তার জলের ঢেউয়ে।
ছেলেটার খেয়াল গেল ঐখানে ডুব দিতে—
ঐ সবুজ স্বচ্ছ জল,
সাপের চিকন দেহের মতো।
'কী আছে দেখিই-না' সব তাতে এই তার লোভ
দিল ডুব, দামে গেল জড়িয়ে—
চেঁচিয়ে উঠে, খাবি খেয়ে, তলিয়ে গেল কোথায়।
ডাঙায় রাখাল চরাচ্ছিল গোরু,
জেলেদের ডিঙি নিয়ে টানাটানি করে তুললে তাকে-
তখন সে নিঃসাড়।
তার পরে অনেক দিন ধরে মনে পড়েছে
চোখে কী করে সর্ষেফুল দেখে,
আঁধার হয়ে আসে,
যে মাকে কচি বেলায় হারিয়েছে
তার ছবি জাগে মনে,
জ্ঞান যায় মিলিয়ে।
ভারী মজা,
কী করে মরে সেই মস্ত কথাটা।
সাথিকে লোভ দেখিয়ে বলে,
'একবার দেখ্-না ডুবে, কোমরে দড়ি বেঁধে,
আবার তুলব টেনে।'

ভারী ইচ্ছা করে জানতে ওর কেমন লাগে।
সাথি রাজি হয় না ;
ও রেগে বলে, 'ভীতু, ভীতু, ভীতু কোথাকার।'

বক্সিদের ফলের বাগান, সেখানে লুকিয়ে যায় জন্তুর মতো।
মার খেয়েছে বিস্তর, জাম খেয়েছে আরো অনেক বেশি।
বাড়ির লোকে বলে, 'লজ্জা করে না বাঁদর ?'
কেন লজ্জা।
বক্সিদের খোঁড়া ছেলে তো ঠেঙিয়ে ঠেঙিয়ে ফল পাড়ে,
ঝুড়ি ভরে নিয়ে যায়,
গাছের ডাল যায় ভেঙে,
ফল যায় দ'লে—
লজ্জা করে না ?

একদিন পাকড়াশিদের মেজো ছেলে একটা কাঁচ-পরানো চোঙ নিয়ে
ওকে বললে, 'দেখ্-না ভিতর বাগে।'
দেখল নানা রঙ সাজানো,
নাড়া দিলেই নতুন হয়ে ওঠে।
বললে, 'দে-না ভাই, আমাকে।
তোকে দেব আমার ঘষা ঝিনুক,
কাঁচা আম ছাড়াবি মজা ক'রে—
আর দেব আমের কষির বাঁশি।'

দিল না ওকে।
কাজেই চুরি করে আনতে হল।
ওর লোভ নেই—
ও কিছু রাখতে চায় না, শুধু দেখতে চায়
কী আছে ভিতরে।
খোদন দাদা কানে মোচড় দিতে দিতে বললে,
'চুরি করলি কেন।'

লক্ষ্মীছাড়াটা জবাব করলে,
'ও কেন দিল না।'
যেন চুরির আসল দায় পাকড়াশিদের ছেলের।

ভয় নেই ঘৃণা নেই ওর দেহটাতে।
কোলাব্যাঙ তুলে ধরে খপ ক'রে,
বাগানে আছে খোঁটা পোঁতার এক গর্ত,
তার মধ্যে সেটা পোষে—
পোকামাকড় দেয় খেতে।
গুবরে পোকা কাগজের বাক্সোয় এনে রাখে,
খেতে দেয় গোবরের গুটি—
কেউ ফেলে দিতে গেলে অনর্থ বাধে।
ইস্কুলে যায় পকেটে নিয়ে কাঠবিড়ালি।
একদিন একটা হেলে সাপ রাখলে মাস্টারের ডেস্কে—
ভাবলে, 'দেখিই-না কী করে মাস্টারমশায়।'
ডেক্‌সো খুলেই ভদ্রলোক লাফিয়ে উঠে দিলেন দৌড়—
দেখবার মতো দৌড়টা।

একটা কুকুর ছিল ওর পোষা,
কুলীনজাতের নয়,
একেবারে বঙ্গজ।
চেহারা প্রায় মনিবেরই মতো,
ব্যবহারটাও।
অন্ন জুটত না সব সময়ে,
গতি ছিল না চুরি ছাড়া—
সেই অপকর্মের মুখে তার চতুর্থ পা হয়েছিল খোঁড়া।
আর, সেই সঙ্গেই কোন্ কার্যকারণের যোগে
শাসনকর্তাদের শসাখেতের বেড়া গিয়েছিল ভেঙে।
মনিবের বিছানা ছাড়া কুকুরটার ঘুম হত না রাতে,
তাকে নইলে মনিবেরও সেই দশা।

একদিন প্রতিবেশীর বাড়া ভাতে মুখ দিতে গিয়ে
তার দেহান্তর ঘটল।
মরণান্তিক দুঃখেও কোনো দিন জল বেরোয় নি যে ছেলের চোখে
দু দিন সে লুকিয়ে লুকিয়ে কেঁদে কেঁদে বেড়ালো,
মুখে অন্নজল রুচল না,
বক্সিদের বাগানে পেকেছে করমচা—
চুরি করতে উৎসাহ হল না।
সেই প্রতিবেশীদের ভাগ্নে ছিল সাত বছরের,
তার মাথার উপর চাপিয়ে দিয়ে এল এক ভাঙা হাঁড়ি।
হাঁড়ি-চাপা তার কান্না শোনালো যেন ঘানিকলের বাঁশি।

গেরস্তঘরে ঢুকলেই সবাই তাকে 'দূর দূর' করে,
কেবল তাকে ডেকে এনে দুধ খাওয়ায় সিধু গয়লানী।
তার ছেলেটি মরে গেছে সাত বছর হল,
বয়সে ওর সঙ্গে তিন দিনের তফাত।
ওরই মতো কালোকোলো,
নাকটা ওইরকম চ্যাপ্টা।
ছেলেটার নতুন নতুন দৌরাত্ম্যি এই গয়লানী মাসীর 'পরে।
তার বাঁধা গোরুর দড়ি দেয় কেটে,
তার ভাঁড় রাখে লুকিয়ে,
খয়েরের রঙ লাগিয়ে দেয় তার কাপড়ে।
'দেখি-না কী হয়' তারই বিবিধ-রকম পরীক্ষা।
তার উপদ্রবে গয়লানীর স্নেহ ওঠে ঢেউ খেলিয়ে।
তার হয়ে কেউ শাসন করতে এলে
সে পক্ষ নেয় ঐ ছেলেটারই।

অম্বিকে মাস্টার আমার কাছে দুঃখ ক'রে গেল,
'শিশুপাঠে আপনার লেখা কবিতাগুলো
পড়তে ওর মন লাগে না কিছুতেই,
এমন নিরেট বুদ্ধি।

পাতাগুলো দুষ্টুমি ক'রে কেটে রেখে দেয়,
বলে ইঁদুরে কেটেছে।
এতবড়ো বাঁদর।'
আমি বললুম, 'সে ত্রুটি আমারই,
থাকত ওর নিজের জগতের কবি
তা হলে গুবরে পোকা এত স্পষ্ট হত তার ছন্দে
ও ছাড়তে পারত না।
কোনো দিন ব্যাঙের খাঁটি কথাটি কি পেরেছি লিখতে,
আর সেই নেড়ি কুকুরের ট্রাজেডি।'

২৮ শ্রাবণ ১৩৩৯

সুশ্রী নয় এমন লোকের অভাব নেই জগতে—
এ মানুষটি তার চেয়েও বেশি, এ অদ্ভুত।
খাপছাড়া টাক সামনের মাথায়,
ফুর্‌ফুরে চুল কোথাও সাদা কোথাও কালো।
ছোটো ছোটো দুই চোখে নেই রোঁওয়া,
ভ্রূ কুঁচকিয়ে কী দেখে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে,
তার দেখাটা যেন চোখের উঞ্ছবৃত্তি।
যেমন উঁচু তেমনি চওড়া নাকটা,
সমস্ত মুখের সে বারো-আনি অংশীদার।
কপালটা মস্ত—
তার উত্তর দিগন্তে নেই চুল, দক্ষিণ দিগন্তে নেই ভুরু
দাড়ি-গোঁফ-কামানো মুখে
অনাবৃত হয়েছে বিধাতার শিল্পরচনার অবহেলা।

কোথায় অলক্ষ্যে পড়ে আছে আল্‌পিন টেবিলের কোণে,
তুলে নিয়ে সে বিঁধিয়ে রাখে জামায়—

তাই দেখে মুখ ফিরিয়ে মুচকে হাসে জাহাজের মেয়েরা ;
পার্সেল-বাঁধা টুকরো ফিতেটা সংগ্রহ করে মেঝের থেকে,
গুটিয়ে গুটিয়ে তাতে লাগায় গ্রন্থি ;
ফেলে-দেওয়া খবরের কাগজ ভাঁজ করে রাখে টেবিলে।
আহারে অত্যন্ত সাবধান—
পকেটে থাকে হজমি গুঁড়ো
খেতে বসেই সেটা খায় জলে মিশিয়ে,
খাওয়ার শেষে খায় হজমি বড়ি।

স্বল্পভাষী, কথা যায় বেধে—
যা বলে মনে হয় বোকার মতো।
ওর সঙ্গে যখন কেউ পলিটিক্‌স্‌ বলে
ও থাকে চুপচাপ, কিছু বুঝল কি না বোঝা যায় না।

চলেছি একসঙ্গে সাত দিন এক জাহাজে।
অকারণে সকলে বিরক্ত ওর 'পরে,
ওকে ব্যঙ্গ করে আঁকে ছবি,
হাসে তাই নিয়ে পরস্পর।
ওর নামে অত্যুক্তি বেড়ে চলেছে কেবলই,
ওকে দিনে দিনে মুখে মুখে রচনা করে তুলছে সবাই।
বিধির রচনায় ফাঁক থাকে,
থাকে কোথাও কোথাও অস্ফুটতা।
এরা ভরিয়ে তোলে এদের রচনা দৈনিক রাবিশ দিয়ে,
খাঁটি সত্যের মতো চেহারা হয়,
নিজেরা বিশ্বাস করে।
সবাই ঠিক করে রেখেছে ও দালাল,
কেউ বা বলে রবারের কুঠির মেজো ম্যানেজার ;
বাজি রাখা চলছে আন্দাজ নিয়ে।

সবাই ওকে পাশ কাটিয়ে চলে,
সেটা ওর সয়ে গেছে আগে থাকতেই।

চুরোট খাওয়ার ঘরে জুয়ো খেলে যাত্রীরা,
ও তাদের এড়িয়ে চলে যায়,
তারা ওকে গাল দেয় মনে মনে—
বলে কৃপণ, বলে ছোটোলোক।

ও মেশে চাটগাঁয়ের খালাসিদের সঙ্গে।
তারা কয় তাদের ভাষায়,
ও বলে কী ভাষা কে জানে—
বোধ করি ওলন্দাজি।
সকালে রবারের নল নিয়ে তারা ডেক ধোয়,
ও তাদের মধ্যে গিয়ে লাফালাফি করে,
তারা হাসে।
ওদের মধ্যে ছিল এক অল্প বয়সের ছেলে—
শামলা রঙ, কালো চোখ, ঝাঁকড়া চুল,
ছিপ্‌ছিপে গড়ন—
ও তাকে এনে দেয় আপেল কমলালেবু,
তাকে দেখায় ছবির বই।
যাত্রীরা রাগ করে য়ুরোপের অসম্মানে।

জাহাজ এল শিঙাপুরে।
খালাসিদের ডেকে ও তাদের দিল সিগারেট,
আর দশটা করে টাকার নোট
ছেলেটাকে দিলে একটা সোনা-বাঁধানো ছড়ি।
কাপ্তেনের কাছে বিদায় নিয়ে
তড়্‌বড়্‌ করে নেমে গেল ঘাটে।

তখন তার আসল নাম হয়ে গেল জানাজানি;
যারা চুরোট ফোঁকার ঘরে তাস খেলত
'হায় হায়' করে উঠল তাদের মন।

১ ভাদ্র ১৩৩৯

বিশ্বশোক

দুঃখের দিনে লেখনীকে বলি—
লজ্জা দিয়ো না।
সকলের নয় যে আঘাত
ধোরো না সবার চোখে।
ঢেকো না মুখ অন্ধকারে,
রেখো না দ্বারে আগল দিয়ে।
জ্বালো সকল রঙের উজ্জ্বল বাতি,
কৃপণ হোয়ো না।

অতি বৃহৎ বিশ্ব,
অম্লান তার মহিমা,
অক্ষুব্ধ তার প্রকৃতি।
মাথা তুলেছে দুর্দর্শ সূর্যলোকে,
অবিচলিত অকরুণ দৃষ্টি তার অনিমেষ,
অকম্পিত বক্ষ প্রসারিত
গিরি নদী প্রান্তরে।
আমার সে নয়,
সে অসংখ্যের।
বাজে তার ভেরী সকল দিকে,
জ্বলে অনিভৃত আলো,
দোলে পতাকা মহাকাশে।
তার সমুখে লজ্জা দিয়ো না—
আমার ক্ষতি আমার ব্যথা
তার সমুখে কণার কণা।

এই ব্যথাকে আমার বলে ভুলব যখনি
তখনি সে প্রকাশ পাবে বিশ্বরূপে।

দেখতে পাব বেদনার বন্যা নামে কালের বুকে
শাখাপ্রশাখায় ;
ধায় হৃদয়ের মহানদী
সব মানুষের জীবনস্রোতে ঘরে ঘরে।
অশ্রুধারার ব্রহ্মপুত্র
উঠছে ফুলে ফুলে
তরঙ্গে তরঙ্গে ;
সংসারের কূলে কূলে
চলে তার বিপুল ভাঙাগড়া
দেশে দেশান্তরে।
চিরকালের সেই বিরহতাপ,
চিরকালের সেই মানুষের শোক,
নামল হঠাৎ আমার বুকে ;
এক প্লাবনে থর্‌থরিয়ে কাঁপিয়ে দিল
পাঁজরগুলো—
সব ধরণীর কান্নার গর্জনে
মিলে গিয়ে চলে গেল অনন্তে,
কী উদ্দেশে কে তা জানে।

আজকে আমি ডেকে বলি লেখনীকে,
লজ্জা দিয়ো না।
কূল ছাপিয়ে উঠুক তোমার দান।
দাক্ষিণ্যে তোমার
ঢাকা পড়ুক অন্তরালে
আমার আপন ব্যথা।
ক্রন্দন তার হাজার তানে মিলিয়ে দিয়ো
বিশাল বিশ্বসুরে।

১১ ভাদ্র ১৩৩৯

শেষ চিঠি

মনে হচ্ছে শূন্য বাড়িটা অপ্রসন্ন,
অপরাধ হয়েছে আমার
তাই আছে মুখ ফিরিয়ে।
ঘরে ঘরে বেড়াই ঘুরে,
আমার জায়গা নেই—
হাঁপিয়ে বেরিয়ে চলে আসি।
এ বাড়ি ভাড়া দিয়ে চলে যাব দেরাদুনে।

অমলির ঘরে ঢুকতে পারি নি বহুদিন
মোচড় যেন দিত বুকে।
ভাড়াটে আসবে, ঘর দিতেই হবে সাফ ক'রে,
তাই খুললেম ঘরের তালা।
একজোড়া আগ্রার জুতো,
চুল বাঁধবার চিরুনি, তেল, এসেন্সের শিশি,
শেলফে তার পড়বার বই,
ছোটো হার্মোনিয়ম।
একটা অ্যালবাম,
ছবি কেটে কেটে জুড়েছে তার পাতায়।
আলনায় তোয়ালে, জামা, খদ্দরের শাড়ি।
ছোটো কাঁচের আলমারিতে নানা রকমের পুতুল,
শিশি, খালি পাউডারের কৌটো।

চুপ করে বসে রইলেম চৌকিতে
টেবিলের সামনে।
লাল চামড়ার বাক্স,
ইস্কুলে নিয়ে যেত সঙ্গে।
তার থেকে খাতাটি নিলেম তুলে,
আঁক কষবার খাতা।

ভিতর থেকে পড়ল একটি আখোলা চিঠি,
আমারি ঠিকানা লেখা
অমলির কাঁচা হাতের অক্ষরে।

শুনেছি ডুবে মরবার সময়
অতীত কালের সব ছবি
এক মুহূর্তে দেখা দেয় নিবিড় হয়ে—
চিঠিখানি হাতে নিয়ে তেমনি পড়ল মনে
অনেক কথা এক নিমেষে।

অমলার মা যখন গেলেন মারা
তখন ওর বয়স ছিল সাত বছর।
কেমন একটা ভয় লাগল মনে,
ও বুঝি বাঁচবে না বেশি দিন।
কেননা বড়ো করুণ ছিল ওর মুখ,
যেন অকালবিচ্ছেদের ছায়া
ভাবীকাল থেকে উল্টে এসে পড়েছিল
ওর বড়ো বড়ো কালো চোখের উপরে।
সাহস হ'ত না ওকে সঙ্গছাড়া করি।
কাজ করছি আপিসে বসে,
হঠাৎ হ'ত মনে
যদি কোনো আপদ ঘটে থাকে।

বাঁকিপুর থেকে মাসি এল ছুটিতে—
বললে, 'মেয়েটার পড়াশুনো হল মাটি।
মূর্খ মেয়ের বোঝা বইবে কে
আজকালকার দিনে।'
লজ্জা পেলেম কথা শুনে তার,
বললেম 'কালই দেব ভর্তি করে বেথুনে'

ইস্কুলে তো গেল,
কিন্তু ছুটির দিন বেড়ে যায় পড়ার দিনের চেয়ে।
কতদিন স্কুলের বাস্ অমনি যেত ফিরে।
সে চক্রান্তে বাপেরও ছিল যোগ।

ফিরে বছর মাসি এল ছুটিতে;
বললে, 'এমন করে চলবে না।
নিজে ওকে যাব নিয়ে,
বোর্ডিঙে দেব বেনারসের স্কুলে,
ওকে বাঁচানো চাই বাপের স্নেহ থেকে।'
মাসির সঙ্গে গেল চলে।
অশ্রুহীন অভিমান
নিয়ে গেল বুক ভরে
যেতে দিলেম বলে।

বেরিয়ে পড়লেম বদ্রিনাথের তীর্থযাত্রায়
নিজের কাছ থেকে পালাবার ঝোঁকে।
চার মাস খবর নেই।
মনে হল গ্রন্থি হয়েছে আলগা
গুরুর কৃপায়।
মেয়েকে মনে মনে সঁপে দিলেম দেবতার হাতে,
বুকের থেকে নেমে গেল বোঝা।

চার মাস পরে এলেম ফিরে।
ছুটেছিলেম অমলিকে দেখতে কাশীতে—
পথের মধ্যে পেলেম চিঠি—
কী আর বলব,
দেবতাই তাকে নিয়েছে।

যাক সে-সব কথা।
অমলার ঘরে বসে সেই আখোলা চিঠি খুলে দেখি,
তাতে লেখা—
'তোমাকে দেখতে বড্‌ডো ইচ্ছে করছে'।
আর কিছুই নেই।

৩১ শ্রাবণ ১৩৩৯

বালক

হিরণমাসির প্রধান প্রয়োজন রান্নাঘরে।
দুটি ঘড়া জল আনতে হয় দিঘি থেকে—
তার দিঘিটা ঐ দুই ঘড়ারই মাপে
রান্নাঘরের পিছনে বাঁধা দরকারের বাঁধনে।

এ দিকে তার মা-মরা বোনপো,
গায়ে যে রাখে না কাপড়,
মনে যে রাখে না সদুপদেশ,
প্রয়োজন যার নেই কোনো কিছুতেই,
সমস্ত দিঘির মালেক সেই লক্ষ্মীছাড়াটা।
যখন খুশি ঝাঁপ দিয়ে পড়ে জলে,
মুখে জল নিয়ে আকাশে ছিটোতে ছিটোতে সাঁতার কাটে,
ছিনিমিনি খেলে ঘাটে দাঁড়িয়ে,
কঞ্চি নিয়ে করে মাছ-ধরা খেলা,
ডাঙায় গাছে উঠে পাড়ে জামরুল—
খায় যত ছড়ায় তার বেশি।

দশ-আনির টাক-পড়া মোটা জমিদার,
লোকে বলে দিঘির স্বত্ব তারই—
বেলা দশটায় সে চাপড়ে চাপড়ে তেল মাখে বুকে পিঠে,
ঝপ্‌ করে দুটো ডুব দিয়ে নেয়,

বাঁশবনের তলা দিয়ে দুর্গা নাম করতে করতে চলে ঘরে—
সময় নেই, জরুরি মকর্দমা।
দিঘিটা আছে তার দলিলে, নেই তার জগতে।
আর ছেলেটার দরকার নেই কিছুতেই,
তাই সমস্ত বন-বাদাড় খাল-বিল তারই—
নদীর ধার, পোড়ো জমি, ডুবো নৌকো, ভাঙা মন্দির,
তেঁতুল গাছের সবার উঁচু ডালটা।
জামবাগানের তলায় চরে ধোবাদের গাধা,
ছেলেটা তার পিঠে চড়ে—
ছড়ি হাতে জমায় ঘোড়দৌড়।
ধোবাদের, গাধাটা আছে কাজের গরজে—
ছেলেটার নেই কোনো দরকার,
তাই জন্তুটা তার চার পা নিয়ে সমস্তটা তারই
যাই বলুন-না জজসাহেব।
বাপ মা চায় পড়ে শুনে হবে সে সদর-আলা;
সর্দার পোড়ো ওকে টেনে নামায় গাধার থেকে,
হেঁচড়ে আনে বাঁশবন দিয়ে,
হাজির করে পাঠশালায়।
মাঠে ঘাটে হাটে বাটে জলে স্থলে তার স্বরাজ—
হঠাৎ দেহটাকে ঘিরলে চার দেয়ালে,
মনটাকে আঠা দিয়ে এঁটে দিলে
পুঁথির পাতার গায়ে।

আমিও ছিলেম একদিন ছেলেমানুষ।
আমার জন্যেও বিধাতা রেখেছিলেন গড়ে
অকর্মণ্যের অপ্রয়োজনের জল স্থল আকাশ।
তবু ছেলেদের সেই মস্ত বড়ো জগতে
মেলল না আমার জায়গা।
আমার বাসা অনেক কালের পুরোনো বাড়ির

কোণের ঘরে—
বাইরে যাওয়া মানা।
সেখানে চাকর পান সাজে, দেয়ালে মোছে হাত,
গুন গুন ক'রে গায় মধুকানের গান ;
শান-বাঁধানো মেজে, খড়্‌খড়ে-দেওয়া জানলা।
নীচে ঘাট-বাঁধানো পুকুর, পাঁচিল ঘেঁষে নারকেল গাছ।
জটাধারী বুড়ো বট মোটা মোটা শিকড়ে
আঁকড়ে ধরেছে পুব ধারটা।
সকাল থেকে নাইতে আসে পাড়ার লোকে,
বিকেলের পড়ন্ত রোদে ঝিকিমিকি জলে
ভেসে বেড়ায় পাতিহাঁসগুলো,
পাখা সাফ করে ঠোঁট দিয়ে মেজে।
প্রহরের পর কাটে প্রহর।
আকাশে ওড়ে চিল,
থালা বাজিয়ে যায় পুরোনো কাপড়ওয়ালা,
বাঁধানো নালা দিয়ে গঙ্গার জল এসে পড়ে পুকুরে।

পৃথিবীতে ছেলেরা যে খোলা জগতের যুবরাজ
আমি সেখানে জন্মেছি গরিব হয়ে।
শুধু কেবল
আমার খেলা ছিল মনের ক্ষুধায়, চোখের দেখায়,
পুকুরের জলে, বটের শিকড়-জড়ানো ছায়ায়,
নারকেলের দোদুল ডালে, দূর বাড়ির রোদ-পোহানো ছাদে।
অশোকবনে এসেছিল হনুমান,
সেদিন সীতা পেয়েছিলেন নবদূর্বাদলশ্যাম রামচন্দ্রের খবর।
আমার হনুমান আসত বছরে বছরে আষাঢ় মাসে
আকাশ কালো করে
সজল নবনীল মেঘে।
আনত তার মেদুর কণ্ঠে দূরের বার্তা,
যে দূরের অধিকার থেকে আমি নির্বাসিত।

ইমারত-ঘেরা ক্লিষ্ট যে আকাশটুকু
তাকিয়ে থাকত একদৃষ্টে আমার মুখে,
বাদলের দিনে গুরুগুরু ক'রে তার বুক উঠত দুলে।
বট গাছের মাথা পেরিয়ে কেশর ফুলিয়ে দলে দলে
মেঘ জুটত ডানাওয়ালা কালো সিংহের মতো।
নারকেল-ডালের সবুজ হত নিবিড়,
পুকুরের জল উঠত শিউরে শিউরে।
যে চাঞ্চল্য শিশুর জীবনে রুদ্ধ ছিল
সেই চাঞ্চল্য বাতাসে বাতাসে, বনে বনে।
পুব দিকের ও পার থেকে বিরাট এক ছেলেমানুষ ছাড়া পেয়েছে আকাশে,
আমার সঙ্গে সে সাথি পাতালে।

বৃষ্টি পড়ে ঝমাঝম। একে একে
পুকুরের পৈঠা যায় জলে ডুবে।
আরো বৃষ্টি, আরো বৃষ্টি, আরো বৃষ্টি।
রাত্তির হয়ে আসে, শুতে যাই বিছানায়,
খোলা জানলা দিয়ে গন্ধ পাই ভিজে জঙ্গলের।
উঠোনে একহাঁটু জল,
ছাদের নালার মুখ থেকে জলে পড়ছে জল মোটা ধারায়।
ভোরবেলায় ছুটেছি দক্ষিণের জানলায়,
পুকুর গেছে ভেসে ;
জল বেরিয়ে চলেছে কল্‌কল্‌ করে বাগানের উপর দিয়ে,
জলের উপর বেলগাছগুলোর ঝাঁকড়া মাথা জেগে থাকে।
পাড়ার লোকে হৈ হৈ করে এসেছে
গামছা দিয়ে ধুতির কোঁচা দিয়ে মাছ ধরতে।
কাল পর্যন্ত পুকুরটা ছিল আমারি মতো বাঁধা,
এ বেলা ও বেলা তার উপরে পড়ত গাছের ছায়া,
উড়ো মেঘ জলে বুলিয়ে যেত ক্ষণিকের ছায়াতুলি,
বটের ডালের ভিতর দিয়ে যেন সোনার পিচকারিতে
ছিটকে পড়ত তার উপরে আলো—

পুকুরটা চেয়ে থাকত আকাশে ছল্‌ছলে দৃষ্টিতে।
আজ তার ছুটি, কোথায় সে চলল খ্যাপা
গেরুয়া-পরা বাউল যেন।

পুকুরের কোণে নৌকোটি
দাদারা চড়ে বসল ভাসিয়ে দিয়ে,
গেল পুকুর থেকে গলির মধ্যে,
গলির থেকে সদর রাস্তায়—
তার পরে কোথায় জানি নে। বসে বসে ভাবি।
বেলা বাড়ে।
দিনান্তের ছায়া মেশে মেঘের ছায়ায়,
তার সঙ্গে মেশে পুকুরের জলে বটের ছায়ার কালিমা।
সন্ধে হয়ে এল।
বাতি জ্বলল ঝাপসা আলোয় রাস্তার ধারে ধারে,
ঘরে জ্বলেছে কাঁচের সেজে মিট্‌মিটে শিখা,
ঘোর অন্ধকারে একটু একটু দেখা যায়
দুলছে নারকেলের ডাল,
ভূতের ইশারা যেন।
গলির পারে বড়ো বাড়িতে সব দরজা বন্ধ,
আলো মিট্‌ মিট্‌ করে দুই-একটা জানলা দিয়ে
চেয়ে-থাকা ঘুমন্ত চোখের মতো।
তার পরে কখন আসে ঘুম।
রাত দুটোর সময় স্বরূপ সর্দার নিষুত রাতে
বারান্দায় বারান্দায় হাঁক দিয়ে যায় চলে।

বাদলের দিনগুলো বছরে বছরে তোলপাড় করেছে আমার মন;
আজ তারা বছরে বছরে নাড়া দেয় আমার গানের সুরকে।
শালের পাতায় পাতায় কোলাহল,
তালের ডালে ডালে করতালি,
বাঁশের দোলাদুলি বনে বনে—

ছাতিম গাছের থেকে মালতীলতা
ঝরিয়ে দেয় ফুল।
আর সেদিনকার আমারি মতো অনেক ছেলে আছে ঘরে ঘরে,
লাঠাইয়ের সুতোয় মাখাচ্ছে আঠা,
তাদের মনের কথা তারাই জানে।

২ ভাদ্র ১৩৩৯

ছেঁড়া কাগজের ঝুড়ি

বাবা এসে শুধালেন,
'কী করছিস সুনি।
কাপড় কেন তুলিস বাক্সে, যাবি কোথায়?'

সুনৃতার ঘর তিনতলায়।
দক্ষিণ দিকে দুই জানলা,
সামনে পালঙ্ক,
বিছানা লক্ষ্ণৌ-ছিটে ঢাকা।
অন্য দেয়ালে লেখবার টেবিল,
তার কোণে মায়ের ফোটোগ্রাফ—
তিনি গেছেন মারা।
বাবার ছবি দেয়ালে,
ফ্রেমে জড়ানো ফুলের মালা।
মেঝেতে-লাল শতরঞ্চে
শাড়ি শেমিজ ব্লাউজ
মোজা রুমাল ছড়াছড়ি।
কুকুরটা কাছ ঘেঁষে লেজ নাড়ছে,
ঠেলা দিচ্ছে কোলে থাবা তুলে—
ভেবে পাচ্ছে না কিসের আয়োজন,
ভয় হচ্ছে পাছে ওকে ফেলে রেখে আবার যায় কোথাও

ছোটো বোন শমিতা বসে আছে হাঁটু উঁচু করে,
বাইরের দিকে মুখ ফিরিয়ে।
চুল বাঁধা হয় নি,
চোখ দুটি রাঙা কান্নার অবসানে।

চুপ করে রইল সুনৃতা,
মুখ নিচু করে সে কাপড় গোছায়—
হাত কাঁপে।
বাবা আবার বললেন,
'সুনি, কোথাও যাবি নাকি।'
সুনৃতা শক্ত করে বললে, 'তুমি তো বলেইছ,
এ বাড়িতে হতে পারবে না আমার বিয়ে,
আমি যাব অমুদের বাসায়।'
শমিতা বললে, 'ছি ছি, দিদি, কী বলছ।'
বাবা বললেন, 'ওরা যে মানে না আমাদের মত।'
'তবু ওদের মতই যে আমাকে মানতে হবে চিরদিন—'
এই বলে সুনি সেফটিপিন ভরে রাখলে লেফাফায়।
দৃঢ় ওর কণ্ঠস্বর, কঠিন ওর মুখের ভাব,
সংকল্প অবিচলিত।
বাবা বললেন, 'অনিলের বাপ জাত মানে,
সে কি রাজি হবে।'
সগর্বে বলে উঠল সুনৃতা,
'চেন না তুমি অনিলবাবুকে,
তাঁর জোর আছে পৌরুষের, তাঁর মত তাঁর নিজের।'
দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বাবা চলে গেলেন ঘর থেকে,
শমিতা উঠে তাঁকে জড়িয়ে ধরলে—
বেরিয়ে গেল তাঁর সঙ্গে।

বাজল দুপুরের ঘণ্টা।
সকাল থেকে খাওয়া নেই সুনৃতার।

শমিতা একবার এসেছিল ডাকতে—
ও বললে, খাবে বন্ধুর বাড়ি গিয়ে।
মা-মরা মেয়ে, বাপের আদুরে,
মিনতি করতে আসছিলেন তিনি ;
শমিতা পথ আগলিয়ে বললে,
'কক্‌খনো যেতে পারবে না বাবা,
ও না খায় তো নেই খেল।'

জানলা থেকে মুখ বাড়িয়ে
দেখলে সুনৃতা রাস্তার দিকে,
এসেছে অমুদের গাড়ি।
তাড়াতাড়ি চুলটা আঁচড়িয়ে
ব্রোচটা লাগাচ্ছে যখন কাঁধে,
শমি এসে বললে, 'এই নাও তাদের চিঠি।'
ব'লে ফেলে দিলে ছুঁড়ে ওর কোলে।
সুনৃতা পড়লে চিঠিখানা,
মুখ হয়ে গেল ফ্যাকাশে,
বসে পড়ল তোরঙ্গের উপর।
চিঠিতে আছে—
'বাবার মত করতে পারব নিশ্চিত ছিল মনে,
হল না কিছুতেই,
কাজেই—'

বাজল একটা।
সুনি চুপ করে ব'সে, চোখে জল নেই।
রামচরিত বললে এসে,
'মোটর দাঁড়িয়ে অনেক ক্ষণ।'
সুনি বললে, 'যেতে বলে দে।'
কুকুরটা কাছে এসে বসে রইল চুপ করে।

বাবা বুঝলেন,
প্রশ্ন করলেন না,
বললেন ওর মাথায় হাত বুলিয়ে,
'চল্‌ সুনি, হোসেঙ্গাবাদে তোর মামার ওখানে।'

কাল বিয়ের দিন।
অনিল জিদ করেছিল হবে না বিয়ে।
মা ব্যথিত হয়ে বলেছিল, 'থাক্‌-না।'
বাপ বললে, 'পাগল নাকি।'
ইলেক্‌ট্রিক বাতির মালা খাটানো হচ্ছে বাড়িতে,
সমস্ত দিন বাজছে সানাই।
হুহু করে উঠছে অনিলের মনটা।

তখন সন্ধ্যা সাতটা।
সুনিদের বউবাজারের বাড়ির এক তলায়
ডাবাহুঁকো বাঁ হাতে ধরে তামাক খাচ্ছে
কৈলেস সরকার,
আর তালপাতার পাখায় বাতাস চলছে ডান হাতে;
বেহারাকে ডেকেছে পা টিপে দেবে।
কালীমাখা ময়লা জাজিমে কাগজপত্র রাশ করা;
জ্বলছে একটা কেরোসিন লণ্ঠন।
হঠাৎ অনিল এসে উপস্থিত।
কৈলেস শশব্যস্ত উঠে দাঁড়ালো
শিথিল কাছাকোঁচা সামলিয়ে।
অনিল বললে
'পার্বণীটা ভুলেছিলেম গোলেমালে,
তাই এসেছি দিতে।'
তার পরে বাধো-বাধো গলায় বললে,
'অমনি দেখে যাব তোমাদের সুনিদিদির ঘরটা।'

গেল ঘরে।
খাটের উপর রইল বসে মাথায় হাত দিয়ে।
কিসের একটা অস্পষ্ট গন্ধ,
মূর্ছিতের নিশ্বাসের মতো।
সে গন্ধ চুলের না শুকনো ফুলের
না শূন্য ঘরে সঞ্চিত বিজড়িত স্মৃতির—
বিছানায়, চৌকিতে, পর্দায়।
সিগারেট ধরিয়ে টানল কিছুক্ষণ,
ছুঁড়ে ফেলে দিল জানলার বাইরে।
টেবিলের নীচে থেকে ছেঁড়া কাগজের ঝুড়িটা
নিল কোলে তুলে।
ধক্ করে উঠল বুকের মধ্যে ;
দেখলে ঝুড়ি-ভরা রাশি রাশি ছেঁড়া চিঠি,
ফিকে নীল রঙের কাগজে
অনিলেরই হাতে লেখা।
তার সঙ্গে টুকরো টুকরো ছেঁড়া একটা ফোটোগ্রাফ।
আর ছিল বছর চার আগেকার
দুটি ফুল, লাল ফিতেয় বাঁধা
মেডেন-হেয়ার পাতার সঙ্গে
শুকনো প্যান্সি আর ভায়োলেট।

২৮ শ্রাবণ ১৩৩৯

কীটের সংসার

এক দিকে কামিনীর ডালে
মাকড়সা শিশিরের ঝালর দুলিয়েছে,
আর-এক দিকে বাগানে রাস্তার ধারে
লাল-মাটির-কণা-ছড়ানো
পিঁপড়ের বাসা

যাই আসি, তারি মাঝখান দিয়ে
সকালে বিকালে।
আনমনে দেখি শিউলিগাছে কুঁড়ি ধরেছে,
টগর গেছে ফুলে ছেয়ে।
বিশ্বের মাঝে মানুষের সংসারটুকু
দেখতে ছোটো, তবু ছোটো তো নয়।
তেমনি ঐ কীটের সংসার।
ভালো করে চোখে পড়ে না,
তবু সমস্ত সৃষ্টির কেন্দ্রে আছে ওরা।
কত যুগ থেকে অনেক ভাবনা ওদের,
অনেক সমস্যা, অনেক প্রয়োজন—
অনেক দীর্ঘ ইতিহাস।
দিনের পর দিন, রাতের পর রাত
চলেছে প্রাণশক্তির দুর্বার আগ্রহ।
মাঝখান দিয়ে যাই আসি,
শব্দ শুনি নে ওদের চিরপ্রবাহিত
চৈতন্যধারার—
ওদের ক্ষুধাপিপাসা-জন্মমৃত্যুর।
গুন গুন সুরে আধখানা গানের
জোড় মেলাতে খুঁজে বেড়াই
বাকি আধখানা পদ,
এই অকারণ অদ্ভুত খোঁজের কোনো অর্থ নেই
ঐ মাকড়সার বিশ্বচরাচরে,
ঐ পিঁপড়ে-সমাজে।
ওদের নীরব নিখিলে এখনি উঠছে কি
স্পর্শে স্পর্শে সুর, ঘ্রাণে ঘ্রাণে সংগীত,
মুখে মুখে অশ্রুত আলাপ,
চলায় চলায় অব্যক্ত বেদনা

আমি মানুষ—
মনে জানি সমস্ত জগতে আমার প্রবেশ,
গ্রহনক্ষত্রে ধূমকেতুতে
আমার বাধা যায় খুলে খুলে।
কিন্তু ঐ মাকড়সার জগৎ বন্ধ রইল চিরকাল
আমার কাছে,
ঐ পিঁপড়ের অন্তরের যবনিকা
পড়ে রইল চিরদিন আমার সামনে
আমার সুখে দুঃখে ক্ষুব্ধ
সংসারের ধারেই।
ওদের ক্ষুদ্র অসীমের বাইরের পথে
আমি যাই সকালে বিকালে—
দেখি, শিউলিগাছে কুঁড়ি ধরছে,
টগর গেছে ফুলে চেয়ে।

২৪ ভাদ্র ১৩৩৯

ক্যামেলিয়া

নাম তার কমলা,
দেখেছি তার খাতার উপরে লেখা।
সে চলেছিল ট্রামে, তার ভাইকে নিয়ে কলেজের রাস্তায়
আমি ছিলেম পিছনের বেঞ্চিতে।
মুখের এক পাশের নিটোল রেখাটি দেখা যায়,
আর ঘাড়ের উপর কোমল চুলগুলি খোঁপার নীচে।
কোলে তার ছিল বই আর খাতা।
যেখানে আমার নামবার সেখানে নামা হল না।

এখন থেকে সময়ের হিসাব করে বেরোই—
সে হিসাব আমার কাজের সঙ্গে ঠিকটি মেলে না,

প্রায় ঠিক মেলে ওদের বেরোবার সময়ের সঙ্গে,
প্রায়ই হয় দেখা।
মনে মনে ভাবি, আর-কোনো সম্বন্ধ না থাক্
ও তো আমার সহযাত্রিণী।
নির্মল বুদ্ধির চেহারা
ঝক্‌ঝক্ করছে যেন।
সুকুমার কপাল থেকে চুল উপরে তোলা,
উজ্জ্বল চোখের দৃষ্টি নিঃসংকোচ।
মনে ভাবি একটা-কোনো সংকট দেখা দেয় না কেন,
উদ্ধার করে জন্ম সার্থক করি—
রাস্তার মধ্যে একটা কোনো উৎপাত,
কোনো-একজন গুণ্ডার স্পর্ধা।
এমন তো আজকাল ঘটেই থাকে।
কিন্তু আমার ভাগ্যটা যেন ঘোলা জলের ডোবা,
বড়ো রকম ইতিহাস ধরে না তার মধ্যে,
নিরীহ দিনগুলো ব্যাঙের মতো একঘেয়ে ডাকে-
না সেখানে হাঙর-কুমিরের নিমন্ত্রণ না রাজহাঁসের।

একদিন ছিল ঠেলাঠেলি ভিড়।
কমলার পাশে বসেছে একজন আধা-ইংরেজ।
ইচ্ছে করছিল, অকারণে টুপিটা উড়িয়ে দিই তার মাথা থেকে,
ঘাড়ে ধরে তাকে রাস্তায় দিই নামিয়ে।
কোনো ছুতো পাই নে, হাত নিশ্‌পিশ্‌ করে।
এমন সময়ে সে এক মোটা চুরোট ধরিয়ে
টানতে করলে শুরু।
কাছে এসে বললুম, 'ফেলো চুরোট।'
যেন পেলেই না শুনতে,
ধোঁওয়া ওড়াতে লাগল বেশ ঘোরালো করে।
মুখ থেকে টেনে ফেলে দিলেম চুরোট রাস্তায়।

হাতে মুঠো পাকিয়ে একবার তাকালো কট্‌মট্‌ ক'রে—
আর কিছু বললে না, এক লাফে নেমে গেল।
বোধ হয় আমাকে চেনে।
আমার নাম আছে ফুটবল খেলায়,
বেশ একটু চওড়া গোছের নাম।
লাল হয়ে উঠল মেয়েটির মুখ,
বই খুলে মাথা নিচু করে ভান করলে পড়বার।
হাত কাঁপতে লাগল,
কটাক্ষেও তাকালে না বীরপুরুষের দিকে।
আপিসের বাবুরা বললে, 'বেশ করেছেন মশায়।'
একটু পরেই মেয়েটি নেমে পড়ল অজায়গায়,
একটা ট্যাক্সি নিয়ে গেল চলে।

পরদিন তাকে দেখলুম না,
তার পরদিনও না,
তৃতীয় দিনে দেখি
একটা ঠেলাগাড়িতে চলেছে কলেজে।
বুঝলুম, ভুল করেছি গোঁয়ারের মতো।
ও মেয়ে নিজের দায় নিজেই পারে নিতে,
আমাকে কোনো দরকারই ছিল না।
আবার বললুম মনে মনে,
ভাগ্যটা ঘোলা জলের ডোবা—
বীরত্বের স্মৃতি মনের মধ্যে কেবলই আজ আওয়াজ করছে
কোলাব্যাঙের ঠাট্টার মতো।
ঠিক করলুম, ভুল শোধরাতে হবে।

খবর পেয়েছি গরমের ছুটিতে ওরা যায় দার্জিলিঙে।
সেবার আমারও হাওয়া বদলাবার জরুরি দরকার।
ওদের ছোট্ট বাসা, নাম দিয়েছে মতিয়া—
রাস্তা থেকে একটু নেমে এক কোণে

গাছের আড়ালে,
সামনে বরফের পাহাড়।
শোনা গেল আসবে না এবার।
ফিরব মনে করছি এমন সময়ে আমার এক ভক্তের সঙ্গে দেখা,
মোহনলাল—
রোগা মানুষটি, লম্বা, চোখে চশমা,
দুর্বল পাকযন্ত্র দার্জিলিঙের হাওয়ায় একটু উৎসাহ পায়।
সে বললে, 'তনুকা আমার বোন,
কিছুতে ছাড়বে না তোমার সঙ্গে দেখা না করে।'
মেয়েটি ছায়ার মতো,
দেহ যতটুকু না হলে নয় ততটুকু—
যতটা পড়াশোনায় ঝোঁক, আহারে ততটা নয়।
ফুটবলের সর্দারের 'পরে তাই এত অদ্ভুত ভক্তি—
মনে করলে, আলাপ করতে এসেছি সে আমার দুর্লভ দয়া।
হায় রে ভাগ্যের খেলা!

যেদিন নেমে আসব তার দু দিন আগে তনুকা বললে,
'একটি জিনিস দেব আপনাকে, যাতে মনে থাকবে আমাদের কথা—
একটি ফুলের গাছ।'
এ এক উৎপাত। চুপ করে রইলেম।
তনুকা বললে, 'দামি দুর্লভ গাছ,
এ দেশের মাটিতে অনেক যত্নে বাঁচে।'
জিগেস করলেম, 'নামটা কী?'
সে বললে 'ক্যামেলিয়া'।
চমক লাগল—
আর-একটা নাম ঝলক দিয়ে উঠল মনের অন্ধকারে।
হেসে বললেম, 'ক্যামেলিয়া,
সহজে বুঝি এর মন মেলে না।'
তনুকা কী বুঝলে জানি নে, হঠাৎ লজ্জা পেলে,
খুশিও হল।

চললেম টবসুদ্ধ গাছ নিয়ে।
দেখা গেল, পার্শ্ববর্তিনী হিসাবে সহযাত্রিণীটি সহজ নয়।
একটা দো-কামরা গাড়িতে
টবটাকে লুকোলেম নাবার ঘরে।
থাক্ এই ভ্রমণবৃত্তান্ত,
বাদ দেওয়া যাক আরো মাস কয়েকের তুচ্ছতা।

পুজোর ছুটিতে প্রহসনের যবনিকা উঠল
সাঁওতাল পরগনায়।
জায়গাটা ছোটো। নাম বলতে চাই নে—
বায়ুবদলের বায়ু-গ্রস্তদল এ জায়গার খবর জানে না।
কমলার মামা ছিলেন রেলের এঞ্জিনিয়র।
এইখানে বাসা বেঁধেছেন
শালবনের ছায়ায়, কাঠবিড়ালিদের পাড়ায়।
সেখানে নীল পাহাড় দেখা যায় দিগন্তে,
অদূরে জলধারা চলেছে বালির মধ্যে দিয়ে,
পলাশবনে তসরের গুটি ধরেছে,
মহিষ চরছে হর্তকি গাছের তলায়—
উলঙ্গ সাঁওতালের ছেলে পিঠের উপরে।
বাসাবাড়ি কোথাও নেই,
তাই তাঁবু পাতলেম নদীর ধারে।
সঙ্গী ছিল না কেউ,
কেবল ছিল টবে সেই ক্যামেলিয়া।

কমলা এসেছে মাকে নিয়ে।
রোদ ওঠবার আগে
হিমে-ছোঁওয়া স্নিগ্ধ হাওয়ায়
শাল-বাগানের ভিতর দিয়ে বেড়াতে যায় ছাতি হাতে।
মেঠো ফুলগুলো পায়ে এসে মাথা কোটে,
কিন্তু সে কি চেয়ে দেখে।

অল্পজল নদী পায়ে হেঁটে
পেরিয়ে যায় ও পারে,
সেখানে সিসুগাছের তলায় বই পড়ে।
আর আমাকে সে যে চিনেছে
তা জানলেম আমাকে লক্ষ্য করে না বলেই।

একদিন দেখি, নদীর ধারে বালির উপর চড়িভাতি করছে এরা।
ইচ্ছে হল গিয়ে বলি, আমাকে দরকার কি নেই কিছুতেই।
আমি পারি জল তুলে আনতে নদী থেকে—
পারি বন থেকে কাঠ আনতে কেটে,
আর, তা ছাড়া কাছাকাছি জঙ্গলের মধ্যে
একটা ভদ্রগোছের ভালুকও কি মেলে না।

দেখলেম দলের মধ্যে একজন যুবক—
শর্ট্-পরা, গায়ে রেশমের বিলিতি জামা,
কমলার পাশে পা ছড়িয়ে
হাভানা চুরোট খাচ্ছে।
আর, কমলা অন্যমনে টুকরো টুকরো করছে
একটা শ্বেতজবার পাপড়ি,
পাশে পড়ে আছে
বিলিতি মাসিক পত্র।

মুহূর্তে বুঝলেম এই সাঁওতাল পরগনার নির্জন কোণে
আমি অসহ্য অতিরিক্ত, ধরবে না কোথাও।
তখনি চলে যেতেম, কিন্তু বাকি আছে একটি কাজ।
আর দিন-কয়েকেই ক্যামেলিয়া ফুটবে,
পাঠিয়ে দিয়ে তবে ছুটি।
সমস্ত দিন বন্দুক ঘাড়ে শিকারে ফিরি বনে জঙ্গলে,
সন্ধ্যার আগে ফিরে এসে টবে দিই জল
আর দেখি কুঁড়ি এগোল কত দূর।

সময় হয়েছে আজ।
যে আনে আমার রান্নার কাঠ
ডেকেছি সেই সাঁওতাল মেয়েটিকে।
তার হাত দিয়ে পাঠাব
শালপাতার পাত্রে।
তাঁবুর মধ্যে বসে তখন পড়ছি ডিটেকটিভ গল্প।
বাইরে থেকে মিষ্টিস্বরে আওয়াজ এল, 'বাবু, ডেকেছিস কেনে।'
বেরিয়ে এসে দেখি ক্যামেলিয়া
সাঁওতাল মেয়ের কানে,
কালো গালের উপর আলো করেছে।
সে আবার জিগেস করলে, 'ডেকেছিস কেনে।'
আমি বললেম, 'এই জন্যেই।'
তার পরে ফিরে এলেম কলকাতায়।

২৭ শ্রাবণ ১৩৩৯

শালিখ

শালিখটার কী হল তাই ভাবি।
একলা কেন থাকে দলছাড়া।
প্রথম দিন দেখেছিলেম শিমুল গাছের তলায়,
আমার বাগানে,
মনে হল একটু যেন খুঁড়িয়ে চলে।
তার পরে ঐ রোজ সকালে দেখি—
সঙ্গীহারা, বেড়ায় পোকা শিকার ক'রে।
উঠে আসে আমার বারান্দায়—
নেচে নেচে করে সে পায়চারি,
আমার 'পরে একটুকু নেই ভয়।
কেন এমন দশা।

সমাজের কোন্ শাসনে নির্বাসনের পালা,
দলের কোন্ অবিচারে
জাগল অভিমান।
কিছু দূরেই শালিখগুলো
করছে বকাবকি,
ঘাসে ঘাসে তাদের লাফালাফি,
উড়ে বেড়ায় শিরীষ গাছের ডালে ডালে—
ওর দেখি তো খেয়াল কিছুই নেই।
জীবনে ওর কোন্খানে যে গাঁঠ পড়েছে
সেই কথাটাই ভাবি।
সকালবেলার রোদে যেন সহজ মনে
আহার খুঁটে খুঁটে
ঝরে-পড়া পাতার উপর
লাফিয়ে বেড়ায় সারাবেলা।
কারো উপর নালিশ আছে
মনে হয় না একটুও তা।
বৈরাগ্যের গর্ব তো নেই ওর চলনে,
কিম্বা দুটো আগুন-জ্বলা চোখ।

কিন্তু ওকে দেখি নি তো সন্ধেবেলায়—
একলা যখন যায় বাসাতে ডালের কোণে
ঝিল্লি যখন ঝিঁ ঝিঁ করে অন্ধকারে,
হাওয়ায় আসে বাঁশের পাতার ঝর্ঝরানি।
গাছের ফাঁকে তাকিয়ে থাকে
ঘুমভাঙানো
সঙ্গীবিহীন সন্ধ্যাতারা।

২১ ভাদ্র ১৩৩৯

সাধারণ মেয়ে

আমি অন্তঃপুরের মেয়ে,
চিনবে না আমাকে।
তোমার শেষ গল্পের বইটি পড়েছি, শরৎবাবু,
'বাসি ফুলের মালা'।
তোমার নায়িকা এলোকেশীর মরণ-দশা ধরেছিল
পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে।
পঁচিশ বছর বয়সের সঙ্গে ছিল তার রেষারেষি,
দেখলেম তুমি মহদাশয় বটে—
জিতিয়ে দিলে তাকে।

নিজের কথা বলি।
বয়স আমার অল্প।
একজনের মন ছুঁয়েছিল
আমার এই কাঁচা বয়সের মায়া।
তাই জেনে পুলক লাগত আমার দেহে—
ভুলে গিয়েছিলেম, অত্যন্ত সাধারণ মেয়ে আমি।
আমার মতো এমন আছে হাজার হাজার মেয়ে,
অল্পবয়সের মন্ত্র তাদের যৌবনে।

তোমাকে দোহাই দিই,
একটি সাধারণ মেয়ের গল্প লেখো তুমি।
বড়ো দুঃখ তার।
তারো স্বভাবের গভীরে
অসাধারণ যদি কিছু তলিয়ে থাকে কোথাও
কেমন করে প্রমাণ করবে সে,
এমন কজন মেলে যারা তা ধরতে পারে।

কাঁচা বয়সের জাদু লাগে ওদের চোখে,
মন যায় না সত্যের খোঁজে,
আমরা বিকিয়ে যাই মরীচিকার দামে।

কথাটা কেন উঠল তা বলি।
মনে করো তার নাম নরেশ।
সে বলেছিল কেউ তার চোখে পড়ে নি আমার মতো।
এতবড়ো কথাটা বিশ্বাস করব যে সাহস হয় না,
না করব যে এমন জোর কই।

একদিন সে গেল বিলেতে।
চিঠিপত্র পাই কখনো বা।
মনে মনে ভাবি, রাম রাম! এত মেয়েও আছে সে দেশে,
এত তাদের ঠেলাঠেলি ভিড়!
আর তারা কি সবাই অসামান্য—
এত বুদ্ধি, এত উজ্জ্বলতা।
আর তারা সবাই কি আবিষ্কার করেছে এক নরেশ সেনকে
স্বদেশে যার পরিচয় চাপা ছিল দশের মধ্যে।

গেল মেলের চিঠিতে লিখেছে
লিজির সঙ্গে গিয়েছিল সমুদ্রে নাইতে।
বাঙালি কবির কবিতা ক' লাইন দিয়েছে তুলে,
সেই যেখানে উর্বশী উঠছে সমুদ্র থেকে।
তার পরে বালির 'পরে বসল পাশাপাশি—
সামনে দুলছে নীল সমুদ্রের ঢেউ,
আকাশে ছড়ানো নির্মল সূর্যালোক।
লিজি তাকে খুব আস্তে আস্তে বললে,
'এই সেদিন তুমি এসেছ, দুদিন পরে যাবে চলে;
ঝিনুকের দুটি খোলা,
মাঝখানটুকু ভরা থাক্

একটি নিরেট অশ্রুবিন্দু দিয়ে—
দুর্লভ, মূল্যহীন।'
কথা বলবার কী অসামান্য ভঙ্গি।
সেই সঙ্গে নরেশ লিখেছে,
'কথাগুলি যদি বানানো হয় দোষ কী,
কিন্তু চমৎকার—
হীরে-বসানো সোনার ফুল কি সত্য, তবুও কি সত্য নয়।'
বুঝতেই পারছ,
একটা তুলনার সংকেত ওর চিঠিতে অদৃশ্য কাঁটার মতো
আমার বুকের কাছে বিঁধিয়ে দিয়ে জানায়—
আমি অত্যন্ত সাধারণ মেয়ে।
মূল্যবানকে পুরো মূল্য চুকিয়ে দিই
এমন ধন নেই আমার হাতে।
ওগো, নাহয় তাই হল,
নাহয় ঋণীই রইলেম চিরজীবন।

পায়ে পড়ি তোমার, একটা গল্প লেখো তুমি শরৎবাবু,
নিতান্তই সাধারণ মেয়ের গল্প—
যে দুর্ভাগিনীকে দূরের থেকে পাল্লা দিতে হয়
অন্তত পাঁচ-সাতজন অসামান্যার সঙ্গে—
অর্থাৎ, সপ্তরথিনীর মার।
বুঝে নিয়েছি আমার কপাল ভেঙেছে,
হার হয়েছে আমার।
কিন্তু তুমি যার কথা লিখবে
তাকে জিতিয়ে দিয়ো আমার হয়ে,
পড়তে পড়তে বুক যেন ওঠে ফুলে
ফুলচন্দন পড়ুক তোমার কলমের মুখে।

তাকে নাম দিয়ো মালতী।
ঐ নামটা আমার।

ধরা পড়বার ভয় নেই।
এমন অনেক মালতী আছে বাংলাদেশে,
তারা সবাই সামান্য মেয়ে।
তারা ফরাসি জর্মান জানে না,
কাঁদতে জানে।

কী করে জিতিয়ে দেবে।
উচ্চ তোমার মন, তোমার লেখনী মহীয়সী।
তুমি হয়তো ওকে নিয়ে যাবে ত্যাগের পথে,
দুঃখের চরমে, শকুন্তলার মতো।
দয়া কোরো আমাকে।
নেমে এসো আমার সমতলে।
বিছানায় শুয়ে শুয়ে রাত্রির অন্ধকারে
দেবতার কাছে যে অসম্ভব বর মাগি—
সে বর আমি পাব না,
কিন্তু পায় যেন তোমার নায়িকা।
রাখো-না কেন নরেশকে সাত বছর লণ্ডনে,
বারে বারে ফেল করুক তার পরীক্ষায়,
আদরে থাক্ আপন উপাসিকামণ্ডলীতে।
ইতিমধ্যে মালতী পাস করুক এম. এ.
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে,
গণিতে হোক প্রথম তোমার কলমের এক আঁচড়ে।
কিন্তু ঐখানেই যদি থাম
তোমার সাহিত্যসম্রাট নামে পড়বে কলঙ্ক।
আমার দশা যাই হোক
খাটো কোরো না তোমার কল্পনা।
তুমি তো কৃপণ নও বিধাতার মতো।
মেয়েটাকে দাও পাঠিয়ে য়ুরোপে।
সেখানে যারা জ্ঞানী, যারা বিদ্বান, যারা বীর,
যারা কবি, যারা শিল্পী, যারা রাজা

দল বেঁধে আসুক ওর চার দিকে।
জ্যোতির্বিদের মতো আবিষ্কার করুক ওকে—
শুধু বিদুষী ব'লে নয়, নারী ব'লে।
ওর মধ্যে যে বিশ্ববিজয়ী জাদু আছে
ধরা পড়ুক তার রহস্য, মূঢ়ের দেশে নয়—
যে দেশে আছে সমজদার, আছে দরদি,
আছে ইংরেজ জর্মান ফরাসি।
মালতীর সম্মানের জন্য সভা ডাকা হোক-না,
বড়ো বড়ো নামজাদার সভা।
মনে করা যাক সেখানে বর্ষণ হচ্ছে মুষলধারে চাটুবাক্য,
মাঝখান দিয়ে সে চলেছে অবহেলায়—
ঢেউয়ের উপর দিয়ে যেন পালের নৌকো।
ওর চোখ দেখে ওরা করছে কানাকানি,
সবাই বলছে ভারতবর্ষের সজল মেঘ আর উজ্জ্বল রৌদ্র
মিলেছে ওর মোহিনী দৃষ্টিতে।
(এইখানে জনান্তিকে বলে রাখি,
সৃষ্টিকর্তার প্রসাদ সত্যই আছে আমার চোখে
বলতে হল নিজের মুখেই,
এখনো কোনো য়ুরোপীয় রসজ্ঞের
সাক্ষাৎ ঘটে নি কপালে।)
নরেশ এসে দাঁড়াক সেই কোণে,
আর তার সেই অসামান্য মেয়ের দল।

আর তার পরে ?
তার পরে আমার নটেশাকটি মুড়োল,
স্বপ্ন আমার ফুরোল।
হায় রে সামান্য মেয়ে !
হায় রে বিধাতার শক্তির অপব্যয় !

২৯ শ্রাবণ ১৩৩৯

একজন লোক

আধবুড়ো হিন্দুস্থানি,
রোগা লম্বা মানুষ—
পাকা গোঁফ, দাড়ি-কামানো মুখ
শুকিয়ে-আসা ফলের মতো।
ছিটের মেরজাই গায়ে, মালকোঁচা ধুতি,
বাঁ কাঁধে ছাতি, ডান হাতে খাটো লাঠি,
পায়ে নাগরা— চলেছে শহরের দিকে।
ভাদ্রমাসের সকাল বেলা,
পাৎলা মেঘের ঝাপসা রোদ্দুর ;
কাল গিয়েছে কম্বল-চাপা হাঁপিয়ে-ওঠা রাত,
আজ সকালে কুয়াশা-ভিজে হাওয়া
দোমনা ক'রে বইছে আমলকীর কচি ডালে।

পথিকটিকে দেখা গেল
আমার বিশ্বের শেষরেখাতে
যেখানে বস্তুহারা ছায়াছবির চলাচল।
ওকে শুধু জানলুম, একজন লোক।
ওর নাম নেই, সংজ্ঞা নেই, বেদনা নেই,
কিছুতে নেই কোনো দরকার—
কেবল হাটে-চলার পথে
ভাদ্রমাসের সকালবেলায়
একজন লোক।

সেও আমায় গেছে দেখে
তার জগতের পোড়ো জমির শেষ সীমানায়,
যেখানকার নীল কুয়াশার মাঝে
কারো সঙ্গে সম্বন্ধ নেই কারো,
যেখানে আমি— একজন লোক

তার ঘরে তার বাছুর আছে,
ময়না আছে খাঁচায় ;
স্ত্রী আছে তার, জাঁতায় আটা ভাঙে,
পিতলের মোটা কাঁকন হাতে ;
আছে তার ধোবা প্রতিবেশী,
আছে মুদি দোকানদার
দেনা আছে কাবুলিদের কাছে ;
কোনোখানেই নেই
আমি— একজন লোক।

১৭ ভাদ্র ১৩৩৯

খেলনার মুক্তি

এক আছে মণিদিদি,
আর আছে তার ঘরে জাপানি পুতুল
নাম হানাসান।
পরেছে জাপানি পেশোয়াজ
ফিকে সবুজের 'পরে ফুলকাটা সোনালি রঙের।
বিলেতের হাট থেকে এল তার বর ;
সেকালের রাজপুত্র কোমরেতে তলোয়ার বাঁধা,
মাথার টুপিতে উঁচু পাখির পালখ—
কাল হবে অধিবাস, পরশু হবে বিয়ে।

সন্ধে হল।
পালঙ্কেতে শুয়ে হানাসান।
জ্বলে ইলেক্‌ট্রিক বাতি।
কোথা থেকে এল এক কালো চামচিকে,
উড়ে উড়ে ফেরে ঘুরে ঘুরে,
সঙ্গে তার ঘোরে ছায়া।

হানাসান ডেকে বলে,
'চামচিকে, লক্ষ্মী ভাই, আমাকে উড়িয়ে নিয়ে যাও
মেঘেদের দেশে।
জন্মেছি খেলনা হয়ে—
যেখানে খেলার স্বর্গ
সেইখানে হয় যেন গতি
ছুটির খেলায়।'

মণিদিদি এসে দেখে পালঙ্কে তো নেই হানাসান।
কোথা গেল! কোথা গেল!
বটগাছে আঙিনার পারে
বাসা ক'রে আছে ব্যাঙ্গমা;
সে বলে, 'আমি তো জানি,
চামচিকে ভায়া
তাকে নিয়ে উড়ে চলে গেছে।'
মণি বলে, 'হেই দাদা, হেই ব্যাঙ্গমা,
আমাকেও নিয়ে চলো,
ফিরিয়ে আনি গে।'

ব্যাঙ্গমা মেলে দিল পাখা,
মণিদিদি উড়ে চলে সারা রাত্রি ধ'রে।
ভোর হল, এল চিত্রকূটগিরি—
সেইখানে মেঘেদের পাড়া।
মণি ডাকে, 'হানাসান! কোথা হানাসান!
খেলা যে আমার প'ড়ে আছে।'

নীল মেঘ বলে এসে,
'মানুষ কি খেলা জানে?
খেলা দিয়ে শুধু বাঁধে যাকে নিয়ে খেলে।'

মণি বলে, 'তোমাদের খেলা কিরকম।'
কালো মেঘ ভেসে এল
হেসে চিকিমিকি,
ডেকে গুরুগুরু
বলে, 'ঐ চেয়ে দেখো, হানাহানি হল নানাখানা—
ওর ছুটি নানা রঙে
নানা চেহারায়,
নানা দিকে
বাতাসে বাতাসে
আলোতে আলোতে।'

মণি বলে, 'ব্যাঙ্গমা দাদা,
এ দিকে বিয়ে যে ঠিক—
বর এসে কী বলবে শেষে।'
ব্যাঙ্গমা হেসে বলে,
'আছে চামচিকে ভায়া,
বরকেও নিয়ে দেবে পাড়ি।
বিয়ের খেলাটা সেও
মিলে যাবে সূর্যাস্তের শূন্যে এসে
গোধূলির মেঘে।'

মণি কেঁদে বলে, 'তবে,
শুধু কি রইবে বাকি কান্নার খেলা।'
ব্যাঙ্গমা বলে, 'মণিদিদি,
রাত হয়ে যাবে শেষ,
কাল সকালের ফোটা বৃষ্টি-ধোওয়া মালতীর ফুলে
সে খেলাও চিনবে না কেউ।'

১৩ আষাঢ় ১৩৩৯

পত্রলেখা

দিলে তুমি সোনা-মোড়া ফাউন্টেন পেন,
কত মতো লেখার আসবাব।
ছোটো ডেস্‌কোখানি
আখরোট কাঠ দিয়ে গড়া।
ছাপ-মারা চিঠির কাগজ
নানা বহরের।
রুপোর কাগজ-কাটা, এনামেল-করা।
কাঁচি ছুরি গালা লাল-ফিতে।
কাঁচের কাগজ-চাপা,
লাল নীল সবুজ পেন্সিল।
বলে গিয়েছিলে তুমি চিঠি লেখা চাই
একদিন পরে পরে।

লিখতে বসেছি চিঠি,
সকালেই স্নান হয়ে গেছে।

লিখি যে কী কথা নিয়ে কিছুতেই ভেবে পাই নে তো।
একটি খবর আছে শুধু—
তুমি চলে গেছ।
সে খবর তোমারো তো জানা।
তবু মনে হয়,
ভালো করে তুমি সে জান না।
তাই ভাবি এ কথাটি জানাই তোমাকে—
তুমি চলে গেছ।
যতবার লেখা শুরু করি
ততবার ধরা পড়ে এ খবর সহজ তো নয়।
আমি নই কবি—

ভাষার ভিতরে আমি কণ্ঠস্বর পারি নে তো দিতে ;
না থাকে চোখের চাওয়া।
যত লিখি তত ছিঁড়ে ফেলি।

দশটা তো বেজে গেল।
তোমার ভাইপো বকু যাবে ইস্‌কুলে,
যাই তাকে খাইয়ে আসিগে।
শেষবার এই লিখে যাই—
তুমি চলে গেছ।
বাকি আর যতকিছু
হিজিবিজি আঁকাজোকা ব্লটিঙের ’পরে।

১৪ আষাঢ় ১৩৩৯

খ্যাতি

ভাই নিশি,
তখন উনিশ আমি, তুমি হবে বুঝি
পঁচিশের কাছাকাছি।
তোমার দুখানা বই ছাপা হয়ে গেছে—
‘ক্ষান্তপিসি’, তার পরে ‘পঞ্চুর মৌতাত’।
তা ছাড়া মাসিকপত্র কালচক্রে ক্রমে বের হল
‘রক্তের আঁচড়’।
হুলুস্থুল পড়ে গেল দেশে।
কলেজের সাহিত্যসভায়
সেদিন বলেছিলেম বঙ্কিমের চেয়ে তুমি বড়ো,
তাই নিয়ে মাথা-ফাটাফাটি।
আমাকে খ্যাপাত দাদা নিশি-পাওয়া ব’লে।
কলেজের পালা-শেষে
করেছি ডেপুটিগিরি,
ইস্তফা দিয়েছি কাজে স্বদেশীর দিনে।

তার পর থেকে, যা আমার
সৌভাগ্য অভাবনীয় তাই ঘটে গেল—
বন্ধুরূপে পেলেম তোমাকে।
কাছে পেয়ে কোনোদিন
তোমাকে করি নি খাটো—
ছোটো বড়ো নানা ত্রুটি সেও আমি হেসে ভালোবেসে
তোমার মহত্ত্বে সবই মিলিয়ে নিয়েছি।
এ ধৈর্য, এ পূর্ণদৃষ্টি, এও যে তোমারি কাছে শেখা।
দোষে ভরা অসামান্য প্রাণ,
সে চরিত্র-রচনায় সব চেয়ে ওস্তাদি তোমার
সে তো আমি জানি।

তার পরে কতবার অনুরোধ করেছ কেবলই,
বলেছিলে, 'লেখো, লেখো, গল্প লেখো।
লেখকের মঞ্চে ছিল পিঠ-উঁচু তোমারি চৌকিটা।
আত্ম-অবিশ্বাসে শুধু আটকে পড়েছ
পড়ুয়ার নীচের বেঞ্চিতে।'
শেষকালে বহু ইতস্তত ক'রে
লেখা করলেম শুরু।

বিষয়টা ঘটেছিল আমারি আমলে
পান্‌তিঘাটায়।
আসামি পোলিটিকাল,
সাতমাস পলাতকা।
মাকে দেখে যাবে বলে একদিন রাত্রে এসেছিল
প্রাণ হাতে ক'রে।
খুড়ো গেল পুলিশে খবর দিতে।
কিছুদিন নিল সে আশ্রয়
জেলেনীর ঘরে।

যখন পড়ল ধরা সত্য সাক্ষ্য দিল খুড়ো,
মিথ্যে সাক্ষ্য দিয়েছে জেলেনী।
জেলেনীকে দিতে হল জেলে,
খুড়ো হল সাব্‌রেজিস্ট্রার।

গল্পখানা পড়ে
বিস্তর বাহবা দিয়েছিলে।
খাতাখানা নিজে নিয়ে
শম্ভু সাণ্ডেলের ঘরে
বলে এলে, কালচক্রে অবিলম্বে বের হওয়া চাই।
বের হল মাসে মাসে—
শুক্‌নো কাশে আগুনের মতো
ছড়িয়ে পড়ল খ্যাতি নিমেষে নিমেষে।
বাঁশরি'তে লিখে দিল,
কোথা লাগে আশুবাবু এ নবীন লেখকের কাছে
শুনে হেসেছিলে তুমি।
পাঞ্চজন্যে লিখেছিল রতিকান্ত ঘোষ.
এত দিনে বাঙলা ভাষায়
সত্য লেখা পাওয়া গেল
ইত্যাদি ইত্যাদি।
এবার হাস নি তুমি।
তার পর থেকে
তোমার আমার মাঝখানে
খ্যাতির কাঁটার বেড়া ক্রমে ঘন হল।

এখন আমার কথা শোনো।
আমার এ খ্যাতি
আধুনিক মত্ততার ইক্ষিতুই পলিমাটি-'পরে
হঠাৎ-গজিয়ে-ওঠা।

স্টুপিড জানে না—
মূল এর বেশি দূর নয় ;
ফল এর কোনোখানে নেই,
কেবলই পাতার ঘটা।
তোমার যে পঞ্চু সে তো বাঙলার ডন্‌কুইক্সোট,
তার যা মৌতাত
সে যে জন্মখ্যাপাদের মগজে মগজে
দেশে দেশে দেখা দেয় চিরকাল।
আমার এ কুঞ্জলাল তুবড়ির মতো
জ্বলে আর নেবে—
বোকাদের চোখে লাগে ধাঁধা।
আমি জানি তুমি কতখানি বড়ো।
এ ফাঁকা খ্যাতির চোরা মেকি পয়সায়
বিকাব কি বন্ধুত্ব তোমার।
কাগজের মোড়কটা খুলে দেখো,
আমার লেখার দগ্ধশেষ।
আজ বাদে কাল হ'ত ধুলো,
আজ হোক ছাই।

২৪ আষাঢ় ১৩৩৯

বাঁশি

কিনু গোয়ালার গলি।
দোতলা বাড়ির
লোহার-গরাদে-দেওয়া একতলা ঘর
পথের ধারেই।
লোনা-ধরা দেওয়ালেতে মাঝে মাঝে ধসে গেছে বালি,
মাঝে মাঝে স্যাঁতা-পড়া দাগ।

মার্কিন থানের মার্কা একখানা ছবি
সিদ্ধিদাতা গণেশের
দরজার 'পরে আঁটা।
আমি ছাড়া ঘরে থাকে আরেকটা জীব
এক ভাড়াতেই,
সেটা টিকটিকি।
তফাত আমার সঙ্গে এই শুধু,
নেই তার অন্নের অভাব।

বেতন পঁচিশ টাকা,
সদাগরি আপিসের কনিষ্ঠ কেরানি।
খেতে পাই দত্তদের বাড়ি
ছেলেকে পড়িয়ে।
শেয়ালদা ইস্টিশনে যাই,
সন্ধেটা কাটিয়ে আসি,
আলো জ্বালাবার দায় বাঁচে।
এঞ্জিনের ধস্‌ ধস্‌,
বাঁশির আওয়াজ,
যাত্রীর ব্যস্ততা,
কুলি-হাঁকাহাঁকি।
সাড়ে দশ বেজে যায়,
তার পরে ঘরে এসে নিরালা নিঃঝুম অন্ধকার।

ধলেশ্বরীনদীতীরে পিসিদের গ্রাম।
তাঁর দেওরের মেয়ে,
অভাগার সাথে তার বিবাহের ছিল ঠিকঠাক।
লগ্ন শুভ, নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া গেল—
সেই লগ্নে এসেছি পালিয়ে।
মেয়েটা তো রক্ষে পেলে,
আমি তথৈবচ।

ঘরেতে এল না সে তো, মনে তার নিত্য আসাযাওয়া—
পরনে ঢাকাই শাড়ি, কপালে সিঁদুর।

বর্ষা ঘন ঘোর।
ট্রামের খরচা বাড়ে,
মাঝে মাঝে মাইনেও কাটা যায়।
গলিটার কোণে কোণে
জমে ওঠে পচে ওঠে
আমের খোসা ও আঁঠি, কাঁঠালের ভূতি,
মাছের কান্‌কা,
মরা বেড়ালের ছানা,
ছাইপাঁশ আরো কত কী যে!
ছাতার অবস্থাখানা জরিমানা-দেওয়া
মাইনের মতো,
বহু ছিদ্র তার।
আপিসের সাজ
গোপীকান্ত গোঁসাইয়ের মনটা যেমন,
সর্বদাই রসসিক্ত থাকে।
বাদলের কালো ছায়া
স্যাঁৎসেঁতে ঘরটাতে ঢুকে
কলে-পড়া জন্তুর মতন
মূর্ছায় অসাড়।
দিন-রাত মনে হয়, কোন্‌ আধমরা
জগতের সঙ্গে যেন আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা পড়ে আছি।

গলির মোড়েই থাকে কান্তবাবু,
যত্নে-পাট-করা লম্বা চুল,
বড়ো বড়ো চোখ,
শৌখিন মেজাজ

কর্নেট বাজানো তার শখ।
মাঝে মাঝে সুর জেগে ওঠে
এ গলির বীভৎস বাতাসে—
কখনো গভীর রাতে,
ভোরবেলা আধো অন্ধকারে,
কখনো বৈকালে
ঝিকিমিকি আলোয় ছায়ায়।
হঠাৎ সন্ধ্যায়
সিন্ধু-বারোয়াঁয় লাগে তান,
সমস্ত আকাশে বাজে
অনাদি কালের বিরহবেদনা।
তখনি মুহূর্তে ধরা পড়ে
এ গলিটা ঘোর মিছে,
দুর্বিষহ, মাতালের প্রলাপের মতো।
হঠাৎ খবর পাই মনে
আকবর বাদশার সঙ্গে
হরিপদ কেরানির কোনো ভেদ নেই।
বাঁশির করুণ ডাক বেয়ে
ছেঁড়া ছাতা রাজছত্র মিলে চলে গেছে
এক বৈকুণ্ঠের দিকে।
এ গান যেখানে সত্য
অনন্ত গোধূলিলগ্নে
সেইখানে
বহি চলে ধলেশ্বরী;
তীরে তমালের ঘন ছায়া;
আঙিনাতে
যে আছে অপেক্ষা ক'রে তার
পরনে ঢাকাই শাড়ি, কপালে সিঁদুর।

২৫ আষাঢ় ১৩৩৯

উন্নতি

উপরে যাবার সিঁড়ি,
তারি নীচে দক্ষিণের বারান্দায়
নীলমণি মাস্টারের কাছে
সকালে পড়তে হত ইংলিশ রীডার
ভাঙা পাঁচিলের কাছে ছিল মস্ত তেঁতুলের গাছ।
ফল পাকবার বেলা
ডালে ডালে ঝপাঝপ বাঁদরের হ'ত লাফালাফি।
ইংরেজি বানান ছেড়ে দুই চক্ষু ছুটে যেত
লেজ-দোলা বাঁদরের দিকে।
সেই উপলক্ষে—
আমার বুদ্ধির সঙ্গে রাঙামুখো বাঁদরের
নির্ভেদ নির্ণয় করে
মাস্টার দিতেন কানমলা।

ছুটি হলে পরে
শুরু হত আমার মাস্টারি
উদ্ভিদ-মহলে।
ফলসা চালতা ছিল, ছিল সার-বাঁধা
সুপুরির গাছ।
অনাহূত জন্মেছিল কী করে কুলের এক চারা
বাড়ির গা ঘেঁষে ;
সেটাই আমার ছাত্র ছিল।
ছড়ি দিয়ে মারতেম তাকে।
বলতেম 'দেখ্‌ দেখি বোকা,
উঁচু ফলসার গাছে ফল ধরে গেল,
কোথাকার বেঁটে কুল উন্নতির উৎসাহই নেই।'

শুনেছি বাবার মুখে যত উপদেশ
তার মধ্যে বার বার 'উন্নতি' কথাটা শোনা যেত।
ভাঙা বোতলের ঝুড়ি বেচে
শেষকালে কে হয়েছে লক্ষপতি ধনী
সেই গল্প শুনে শুনে
উন্নতি যে কাকে বলে দেখেছি সুস্পষ্ট তার ছবি।
বড়ো হওয়া চাই—
অর্থাৎ, নিতান্ত পক্ষে হতে হবে বাজিদপুরের
ভজু মল্লিকের জুড়ি।
ফলসার ফলে ভরা গাছ
বাগান-মহলে সেই ভজু মহাজন।
চারাটাকে রোজ বোঝাতেম,
ওরই মতো বড়ো হতে হবে।
কাঠি দিয়ে মাপি তাকে এবেলা ওবেলা—
আমারি কেবল রাগ বাড়ে,
আর কিছু বাড়ে না তো।
সেই কাঠি দিয়ে তাকে মারি শেষে সপাসপ্ জোরে—
একটু ফলে নি তাতে ফল।
কান-মলা যত দিই
পাতাগুলো ম'লে ম'লে
ততই উন্নতি তার কমে।

এ দিকে ছিলেন বাবা ইন্‌কম্-ট্যাক্সো-কালেক্টার,
বদলি হলেন
বর্ধমান ডিভিজনে।
উচ্চ ইংরেজির স্কুলে পড়া শুরু করে
উচ্চতার পূর্ণ পরিণতি
কোলকাতা গিয়ে।
বাবার মৃত্যুর পরে সেক্রেটারিয়েটে
উন্নতির ভিত্তি ফাঁদা গেল।

বহুকষ্টে বহু ঋণ করে
বোনের দিয়েছি বিয়ে।
নিজের বিবাহ প্রায় টার্মিনসে এল
আগামী ফাল্গুন মাসে নবমী তিথিতে।
নববসন্তের হাওয়া ভিতরে বাইরে
বইতে আরম্ভ হল যেই
এমন সময়ে, রিডাক্‌শান্‌।
পোকা-খাওয়া কাঁচা ফল
বাইরেতে দিব্যি টুপ্‌টুপে,
ঝুপ্‌ করে খসে পড়ে
বাতাসের এক দমকায়,
আমার সে দশা।
বসন্তের আয়োজনে যে একটু ত্রুটি হল
সে কেবল আমারই কপালে।
আপিসের লক্ষ্মী ফিরালেন মুখ,
ঘরের লক্ষ্মীও
স্বর্ণকমলের খোঁজে অন্যত্র হলেন নিরুদ্দেশ।
সার্টিফিকেটের তাড়া হাতে,
শুক্‌নো মুখ,
চোখ গেছে বসে,
তুবড়ে গিয়েছে পেট,
জুতোটার তলা ছেঁড়া,
দেহের বর্ণের সঙ্গে চাদরের
ঘুচে গেছে বর্ণভেদ—
ঘুরে মরি বড়োলোকদের দ্বারে।
এমন সময় চিঠি এল,
ভজু মহাজন
দেনায় দিয়েছে ক্রোক ভিটেবাড়িখানা।

বাড়ি গিয়ে উপরের ঘরে
জানলা খুলতে সেটা ডালে ঠেকে গেল।

রাগ হল মনে—
ঠেলাঠেলি করে দেখি,
আরে আরে ছাত্র যে আমার!
শেষকালে বড়োই তো হল,
উন্নতির প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিলে
ভজু মল্লিকেরই মতো আমার দুয়ারে দিয়ে হানা।

২৬ আষাঢ় ১৩৩৯

ভীরু

ম্যাট্রিকুলেশনে পড়ে
ব্যঙ্গসূচতুর
বটেকৃষ্ট, ভীরু ছেলেদের বিভীষিকা।
একদিন কী কারণে
সুনীতকে দিয়েছিল উপাধি 'পরমহংস' ব'লে।
ক্রমে সেটা হল 'পাতিহাঁস'।
শেষকালে হল 'হাঁসখালি'—
কোনো তার অর্থ নেই, সেই তার খোঁচা।

আঘাতকে ডেকে আনে
যে নিরীহ আঘাতকে করে ভয়।
নিষ্ঠুরের দল বাড়ে,
ছোঁয়াচ লাগায় অট্টহাসে।
ব্যঙ্গরসিকের যত অংশ-অবতার
নিষ্কাম বিদ্রূপসূচি বিঁধে
অহৈতুক বিদ্বেষেতে সুনীতকে করে জরজর

একদিন মুক্তি পেল সে বেচারা,
বেরোল ইস্কুল থেকে।

তার পরে গেল বহুদিন—
তবু যেন নাড়ীতে জড়িয়ে ছিল
সেদিনের সশঙ্ক সংকোচ।
জীবনে অন্যায় যত, হাস্যবক্র যত নির্দয়তা,
তারি কেন্দ্রস্থলে
বটেকৃষ্ট রেখে গেছে কালো স্থূল বিগ্রহ আপন।

সে কথা জানত বটু,
সুনীতের এই অন্ধ ভয়টাকে
মাঝে মাঝে নাড়া দিয়ে পেত সুখ
হিংস্র ক্ষমতার অহংকারে;
ডেকে যেত সেই পুরাতন নামে,
হেসে যেত খলখল হাসি।

বি এল. পরীক্ষা দিয়ে
সুনীত ধরেছে ওকালতি,
ওকালতি ধরল না তাকে।
কাজের অভাব ছিল, সময়ের অভাব ছিল না—
গান গেয়ে সেতার বাজিয়ে
ছুটি ভরে যেত।
নিয়ামৎ ওস্তাদের কাছে
হ'ত তার সুরের সাধনা।

ছোটো বোন সুধা,
ডায়োসিসনের বি-এ,
গণিতে সে এম-এ দিবে এই তার পণ।
দেহ তার ছিপ্‌ছিপে,
চলা তার চটুল চকিত,
চশমার নীচে
চোখে তার ঝলমল কৌতুকের ছটা—

দেহমন
কূলে কূলে ভরা তার হাসিতে খুশিতে
তারি এক ভক্ত সখী নাম উমারানী—
শান্ত কণ্ঠস্বর,
চোখে স্নিগ্ধ কালো ছায়া,
দুটি দুটি সরু চুড়ি সুকুমার দুটি তার হাতে।
পাঠ্য ছিল ফিলজফি,
সে কথা জানাতে তার বিষম সংকোচ।

দাদার গোপন কথাখানা
সুধার ছিল না অগোচর।
চেপে রেখেছিল হাসি,
পাছে হাসি তীব্র হয়ে বাজে তার মনে।
রবিবার
চা খেতে বন্ধুকে ডেকেছিল।
সেদিন বিষম বৃষ্টি,
রাস্তা গলি ভেসে যায় জলে,
একা জানালার পাশে সুনীত সেতারে
আলাপ করেছে শুরু সুরট-মল্লার।
মন জানে
উমা আছে পাশের ঘরেই।
সেই-যে নিবিড় জানাটুকু
বুকের স্পন্দনে মিলে সেতারের তারে তারে কাঁপে

হঠাৎ দাদার ঘরে ঢুকে
সেতারটা কেড়ে নিয়ে বলে সুধা,
‘উমার বিশেষ অনুরোধ
গান শোনাতেই হবে,
নইলে সে ছাড়ে না কিছুতে।’

লজ্জায় সখীর মুখ রাঙা,
এ মিথ্যা কথার
কী করে যে প্রতিবাদ করা যায়
ভেবে সে পেল না।

সন্ধ্যার আগেই
অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে ;
থেকে থেকে বাদল বাতাসে
দরজাটা ব্যস্ত হয়ে ওঠে,
বৃষ্টির ঝাপ্‌টা লাগে কাঁচের সাশিতে ;
বারান্দার টব থেকে মৃদুগন্ধ দেয় জুঁই ফুল ;
হাঁটুজল জমেছে রাস্তায়,
তারি 'পর দিয়ে
মাঝে মাঝে ছলো ছলো শব্দে চলে গাড়ি।
দীপালোকহীন ঘরে
সেতারের ঝংকারের সাথে
সুনীত ধরেছে গান
নটমল্লারের সুরে—
আওয়ে পিয়রওয়া,
রিমিঝিমি বরথন লাগে!
সুরের সুরেন্দ্রলোকে মন গেছে চলে,
নিখিলের সব ভাষা মিলে গেছে অখণ্ড সংগীতে
অন্তহীন কালসরোবরে
মাধুরীর শতদল—
তার 'পরে যে রয়েছে একা বসে
চেনা যেন তবু সে অচেনা।

সন্ধ্যা হল।
বৃষ্টি থেমে গেছে ;
জ্বলেছে পথের বাতি।

পাশের বাড়িতে
কোন্ ছেলে দুলে দুলে
চেঁচিয়ে ধরেছে তার পরীক্ষার পড়া।

এমন সময় সিঁড়ি থেকে
অট্টহাস্যে এল হাঁক,
'কোথা ওরে, কোথা গেল হাঁসখালি!'
মাংসলপৃথুলদেহ বটেকৃষ্ট স্ফীতরক্তচোখ
ঘরে এসে দেখে,
সুনীত দাঁড়িয়ে দ্বারে নিঃসংকোচ স্তব্ধ ঘৃণা নিয়ে
স্থূল বিদ্রূপের ঊর্ধ্বে
ইন্দ্রের উদ্যত বজ্র যেন।
জোর করে হেসে উঠে
কী কথা বলতে গেল বটু,
সুনীত হাঁকল 'চুপ'—
অকস্মাৎ বিদলিত ভেকের ডাকের মতো
হাসি গেল থেমে।

৫ শ্রাবণ ১৩৩৯

তীর্থযাত্রী

টি. এস. এলিয়ট'এর The Journey of the Magi -নামক কবিতার অনুবাদ

কন্‌কনে ঠাণ্ডায় আমাদের যাত্রা—
ভ্রমণটা বিষম দীর্ঘ, সময়টা সব চেয়ে খারাপ,
রাস্তা ঘোরালো, ধারালো বাতাসের চোট,
একেবারে দুর্জয় শীত।
ঘাড়ে ক্ষত, পায়ে ব্যথা, মেজাজ-চড়া উটগুলো
শুয়ে শুয়ে পড়ে গলা বরফে।

মাঝে মাঝে মন যায় বিগড়ে
যখন মনে পড়ে পাহাড়তলিতে বসন্তমঞ্জিল, তার চাতাল,
আর শর্বতের পেয়ালা হাতে রেশমি সাজে যুবতীর দল।
এ দিকে উটওয়ালারা গাল পাড়ে, গন্‌গন্‌ করে রাগে,
ছুটে পালায় মদ আর মেয়ের খোঁজে।
মশাল যায় নিভে, মাথা রাখবার জায়গা জোটে না।
নগরে যাই, সেখানে বৈরিতা ; নগরীতে সন্দেহ।
গ্রামগুলো নোংরা, তারা চড়া দাম হাঁকে।
কঠিন মুশকিল।
শেষে ঠাওরালেম চলব সারারাত,
মাঝে মাঝে নেব ঝিমিয়ে
আর কানে কানে কেউ বা গান গাবে—
এ সমস্তই পাগলামি।

ভোরের দিকে এলেম যেখানে মিঠে শীত সেই পাহাড়ের খদে ;
সেখানে বরফ-সীমার নীচেটা ভিজে-ভিজে, ঘন গাছ-গাছালির গন্ধ।
নদী চলেছে ছুটে, জলযন্ত্রের চাকা আঁধারকে মারছে চাপড়।
দিগন্তের গায়ে তিনটে গাছ দাঁড়িয়ে,
বুড়ো সাদা ঘোড়াটা মাঠ বেয়ে দৌড় দিয়েছে।
পৌঁছলেম শরাবখানায়, তার কপাটের মাথায় আঙুরলতা।
দুজন মানুষ খোলা দরোজার কাছে পাশা খেলছে টাকার লোভে,
পা দিয়ে ঠেলছে শূন্য মদের কুপো।
কোনো খবরই মিলল না সেখানে,
চললেম আরো আগে।
যেতে যেতে সন্ধে হল ;
সময়ে পেরিয়ে যায় যায়, তখন খুঁজে পেলেম জায়গাটা—
বলা যেতে পারে ব্যাপারটা তৃপ্তিজনক।

মনে পড়ে এ-সব ঘটেছে অনেক কাল আগে,
আবার ঘটে যেন এই ইচ্ছে, কিন্তু লিখে রাখো—

এই লিখে রাখো— এত দূরে যে আমাদের টেনে নিয়েছিল
সে কি জন্মের সন্ধানে না মৃত্যুর।
জন্ম একটা হয়েছিল বটে—
প্রমাণ পেয়েছি, সন্দেহ নেই।
এর আগে তো জন্মও দেখেছি, মৃত্যুও—
মনে ভাবতেম তারা এক নয়।
কিন্তু এই-যে জন্ম এ বড়ো কঠোর—
দারুণ এর যাতনা, মৃত্যুর মতো, আমাদের মৃত্যুর মতোই।
এলেম ফিরে আপন আপন দেশে, এই আমাদের রাজত্বগুলোয়।
আর কিন্তু স্বস্তি নেই সেই পুরানো বিধিবিধানে
যার মধ্যে আছে সব অনাত্মীয় আপন দেবদেবী আঁকড়ে ধ'রে।
আর-একবার মরতে পারলে আমি বাঁচি।

[১৩৩৯]

চিররূপের বাণী

প্রাঙ্গণে নামল অকালসন্ধ্যার ছায়া
সূর্যগ্রহণের কলিমার মতো।
উঠল ধ্বনি : খোলো দ্বার !
প্রাণপুরুষ ছিল ঘরের মধ্যে,
সে কেঁপে উঠল চমক খেয়ে।
দরজা ধরল চেপে,
আগলের উপর আগল লাগল।
কম্পিতকণ্ঠে বললে, কে তুমি।
মেঘমন্দ্র-ধ্বনি এল : আমি মাটি-রাজত্বের দূত,
সময় হয়েছে, এসেছি মাটির দেনা আদায় করতে।
ঝন্‌ঝন্‌ বেজে উঠল দ্বারের শিকল,
থরথর কাঁপল প্রাচীর,
হায়-হায় করে ঘরের হাওয়া।

নিশাচরের ডানার ঝাপট আকাশে আকাশে
নিশীথিনীর হৃৎকম্পনের মতো।
ধক্‌ধক্ ধক্‌ধক্ আঘাতে
খান্‌খান্ হল দ্বারের আগল, কপাট পড়ল ভেঙে।

কম্পমান কণ্ঠে প্রাণ বললে, হে মাটি, হে নিষ্ঠুর, কী চাও তুমি?
দূত বললে, আমি চাই দেহ।
দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে প্রাণ; বললে,
এতকাল আমার লীলা এই দেহে,
এর অণুতে অণুতে আমার নৃত্য,
নাড়ীতে নাড়ীতে ঝংকার,
মুহূর্তেই কি উৎসব দেবে ভেঙে—
দীর্ণ হয়ে যাবে বাঁশি,
চূর্ণ হয়ে যাবে মৃদঙ্গ,
ডুবে যাবে এর দিনগুলি
অতল রাত্রির অন্ধকারে?
দূত বললে, ঋণে বোঝাই তোমার এই দেহ,
শোধ করবার দিন এল—
মাটির ভাণ্ডারে ফিরবে তোমার দেহের মাটি।
প্রাণ বললে, মাটির ঋণ শোধ করে নিতে চাও, নাও—
কিন্তু তার চেয়ে বেশি চাও কেন?
দূত বিদ্রূপ করে বললে, এই তো তোমার নিঃস্ব দেহ,
কৃশ ক্লান্ত কৃষ্ণচতুর্দশীর চাঁদ—
এর মধ্যে বাহুল্য আছে কোথায়?
প্রাণ বললে, মাটিই তোমার, রূপ তো তোমার নয়।
অট্টহাস্যে হেসে উঠল দূত; বললে,
যদি পার দেহ থেকে রূপ নাও ছাড়িয়ে।
প্রাণ বললে, পারবই, এই পণ আমার।

প্রাণের মিতা মন। সে গেল আলোক-উৎসের তীর্থে।

বললে জোড়হাত করে :
হে মহাজ্যোতি, হে চিরপ্রকাশ, হে রূপের কল্পনির্ঝর,
স্থূল মাটির কাছে ঘটিয়ো না তোমার সত্যের অপলাপ
তোমার সৃষ্টির অপমান।
তোমার রূপকে লুপ্ত করে সে কোন্ অধিকারে।
আমাকে কাঁদায় কার অভিশাপে।
মন বসল তপস্যায়।
কেটে গেল হাজার বছর, লক্ষ বছর— প্রাণের কান্না থামে না।
পথে পথে বাটপাড়ি,
রূপ চুরি যায় নিমেষে নিমেষে।
সমস্ত জীবলোক থেকে প্রার্থনা ওঠে দিনরাত :
হে রূপকার, হে রূপরসিক,
যে দান করেছ নিজহাতে জড় দানব তাকে কেড়ে নিয়ে যায় যে।
ফিরিয়ে আনো তোমার আপন ধন।

যুগের পর যুগ গেল, নেমে এল আকাশবাণী :
মাটির জিনিস ফিরে যায় মাটিতে,
ধ্যানের রূপ রয়ে যায় আমার ধ্যানে।
বর দিলেম, হারা রূপ ধরা দেবে,
কায়ামুক্ত ছায়া আসবে আলোর বাহু ধরে
তোমার দৃষ্টির উৎসবে।
রূপ এল ফিরে দেহহীন ছবিতে, উঠল শঙ্খধ্বনি।
ছুটে এল চারি দিক থেকে রূপের প্রেমিক।

আবার দিন যায়, বৎসর যায়। প্রাণের কান্না থামে না।
আরো কী চাই।
প্রাণ জোড়হাত করে বলে,
মাটির দূত আসে, নির্মম হাতে কণ্ঠযন্ত্রে কুলুপ লাগায়—
বলে 'কণ্ঠনালী আমার'।

শুনে আমি বলি, মাটির বাঁশিখানি তোমার বটে,
কিন্তু বাণী তো তোমার নয়।
উপেক্ষা করে সে হাসে।
শোনো আমার ক্রন্দন, হে বিশ্ববাণী,
জয়ী হবে কি জড়মাটির অহংকার—
সেই অন্ধ সেই মূক তোমার বাণীর উপর কি চাপা দেবে চিরমূকত্ব,
যে বাণী অমৃতের বাহন তার বুকের উপর স্থাপন করবে জড়ের জয়স্তম্ভ ?

শোনা গেল আকাশ থেকে :
ভয় নেই।
বায়ুসমুদ্রে ঘুরে ঘুরে চলে অশ্রুতবাণীর চক্রলহরী,
কিছুই হারায় না।
আশীর্বাদ এই আমার, সার্থক হবে মনের সাধনা ;
জীর্ণকণ্ঠ মিশবে মাটিতে, চিরজীবী কণ্ঠস্বর বহন করবে বাণী।

মাটির দানব মাটির রথে যাকে হরণ করে চলেছিল
মনের রথ সেই নিরুদ্দেশ বাণীকে আনলে ফিরিয়ে কণ্ঠহীন গানে।
জয়ধ্বনি উঠল মর্তলোকে।
দেহমুক্ত রূপের সঙ্গে যুগলমিলন হল দেহমুক্ত বাণীর
প্রাণতরঙ্গিণীর তীরে, দেহনিকেতনের প্রাঙ্গণে।

[১৩৩৯]

শুচি

রামানন্দ পেলেন গুরুর পদ—
সারাদিন তাঁর কাটে জপে তপে,
সন্ধ্যাবেলায় ঠাকুরকে ভোজ্য করেন নিবেদন,
তার পরে ভাঙে তাঁর উপবাস
যখন অন্তরে পান ঠাকুরের প্রসাদ।

সেদিন মন্দিরে উৎসব—
রাজা এলেন, রানী এলেন,
এলেন পণ্ডিতেরা দূর দূর থেকে,
এলেন নানাচিহ্নধারী নানা সম্প্রদায়ের ভক্তদল।
সন্ধ্যাবেলায় স্নান শেষ করে
রামানন্দ নৈবেদ্য দিলেন ঠাকুরের পায়ে—
প্রসাদ নামল না তাঁর অন্তরে,
আহার হল না সেদিন।

এমনি যখন দুই সন্ধ্যা গেল কেটে,
হৃদয় রইল শুষ্ক হয়ে,
গুরু বললেন মাটিতে ঠেকিয়ে মাথা,
'ঠাকুর, কী অপরাধ করেছি।'
ঠাকুর বললেন, 'আমার বাস কি কেবল বৈকুণ্ঠে।
সেদিন আমার মন্দিরে যারা প্রবেশ পায় নি
আমার স্পর্শ যে তাদের সর্বাঙ্গে,
আমারই পাদোদক নিয়ে
প্রাণপ্রবাহিণী বইছে তাদের শিরায়।
তাদের অপমান আমাকে বেজেছে;
আজ তোমার হাতের নৈবেদ্য অশুচি।'

'লোকস্থিতি রক্ষা করতে হবে যে প্রভু'
ব'লে গুরু চেয়ে রইলেন ঠাকুরের মুখের দিকে।
ঠাকুরের চক্ষু দীপ্ত হয়ে উঠল; বললেন,
'যে লোকসৃষ্টি স্বয়ং আমার,
যার প্রাঙ্গণে সকল মানুষের নিমন্ত্রণ,
তার মধ্যে তোমার লোকস্থিতির বেড়া তুলে
আমার অধিকারে সীমা দিতে চাও
এতবড়ো স্পর্ধা!'

রামানন্দ বললেন, 'প্রভাতেই যাব এই সীমা ছেড়ে,
দেব আমার অহংকার দূর করে তোমার বিশ্বলোকে।'

তখন রাত্রি তিন প্রহর,
আকাশের তারাগুলি যেন ধ্যানমগ্ন।
গুরুর নিদ্রা গেল ভেঙে; শুনতে পেলেন,
'সময় হয়েছে, ওঠো, প্রতিজ্ঞা পালন করো।'
রামানন্দ হাতজোড় করে বললেন, 'এখনো রাত্রি গভীর,
পথ অন্ধকার, পাখিরা নীরব।
প্রভাতের অপেক্ষায় আছি।'
ঠাকুর বললেন, 'প্রভাত কি রাত্রির অবসানে।
যখনি চিত্ত জেগেছে, শুনেছ বাণী,
তখনি এসেছে প্রভাত।
যাও তোমার ব্রতপালনে।'

রামানন্দ বাহির হলেন পথে একাকী,
মাথার উপরে জাগে ধ্রুবতারা।
পার হয়ে গেলেন নগর, পার হয়ে গেলেন গ্রাম।
নদীতীরে শ্মশান, চণ্ডাল শবদাহে ব্যাপৃত।
রামানন্দ দুই হাত বাড়িয়ে তাকে নিলেন বক্ষে।
সে ভীত হয়ে বললে, 'প্রভু, আমি চণ্ডাল, নাভা আমার নাম,
হেয় আমার বৃত্তি,
অপরাধী করবেন না আমাকে।'
গুরু বললেন, 'অন্তরে আমি মৃত, অচেতন আমি,
তাই তোমাকে দেখতে পাই নি এতকাল,
তাই তোমাকেই আমার প্রয়োজন—
নইলে হবে না মৃতের সৎকার।'

চললেন গুরু আগিয়ে।
ভোরের পাখি উঠল ডেকে,

অরুণ-আলোয় শুকতারা গেল মিলিয়ে।
কবীর বসেছেন তাঁর প্রাঙ্গণে,
কাপড় বুনছেন আর গান গাইছেন গুন্ গুন্ স্বরে।
রামানন্দ বসলেন পাশে,
কণ্ঠ তাঁর ধরলেন জড়িয়ে।
কবীর ব্যস্ত হয়ে বললেন,
'প্রভু, জাতিতে আমি মুসলমান,
আমি জোলা, নীচ আমার বৃত্তি।'
রামানন্দ বললেন, 'এতদিন তোমার সঙ্গ পাই নি বন্ধু,
তাই অন্তরে আমি নগ্ন,
চিত্ত আমার ধুলায় মলিন,
আজ আমি পরব শুচিবস্ত্র তোমার হাতে—
আমার লজ্জা যাবে দূর হয়ে।'

শিষ্যেরা খুঁজতে খুঁজতে এল সেখানে,
ধিক্কার দিয়ে বললে, 'এ কী করলেন প্রভু!'
রামানন্দ বললেন, 'আমার ঠাকুরকে এতদিন যেখানে হারিয়েছিলুম
আজ তাঁকে সেখানে পেয়েছি খুঁজে।'
সূর্য উঠল আকাশে
আলো এসে পড়ল গুরুর আনন্দিত মুখে।

[অগ্রহায়ণ ১৩৩৯]

রঙরেজিনী

শঙ্করলাল দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিত।
শাণিত তাঁর বুদ্ধি
শ্যেনপাখির চঞ্চুর মতো,
বিপক্ষের যুক্তির উপর পড়ে বিদ্যুদ্‌বেগে—
তার পক্ষ দেয় ছিন্ন করে,
ফেলে তাকে ধুলোয়।

রাজবাড়িতে নৈয়ায়িক এসেছে দ্রাবিড় থেকে।
বিচারে যার জয় হবে সে পাবে রাজার জয়পত্রী।
আহ্বান স্বীকার করেছেন শঙ্কর,
এমন সময় চোখে পড়ল পাগড়ি তাঁর মলিন।
গেলেন রঙরেজির ঘরে।

কুসুমফুলের খেত, মেহেদিবেড়ায় ঘেরা।
প্রান্তে থাকে জসীম রঙরেজি।
মেয়ে তার আমিনা, বয়স তার সতেরো।
সে গান গায় আর রঙ বাঁটে,
রঙের সঙ্গে রঙ মেলায়।
বেণীতে তার লাল সুতোর ঝালর,
চোলি তার বাদামি রঙের,
শাড়ি তার আশমানি।
বাপ কাপড় রাঙায়,
রঙের বাটি জুগিয়ে দেয় আমিনা।

শঙ্কর বললেন, জসীম,
পাগড়ি রাঙিয়ে দাও জাফরানি রঙে,
রাজসভায় ডাক পড়েছে।

কুল্ কুল্ করে জল আসে নালা বেয়ে কুসুমফুলের খেতে;
আমিনা পাগড়ি ধুতে গেল নালার ধারে তুঁত গাছের ছায়ায় বসে
ফাগুনের রৌদ্র ঝলক দেয় জলে,
ঘুঘু ডাকে দূরের আমবাগানে।
ধোওয়ার কাজ হল, প্রহর গেল কেটে।
পাগড়ি যখন বিছিয়ে দিল ঘাসের 'পরে
রঙরেজিনী দেখল তারি কোণে
লেখা আছে একটি শ্লোকের একটি চরণ—
'তোমার শ্রীপদ মোর ললাটে বিরাজে'।

বসে বসে ভাবল অনেক ক্ষণ,
ঘুঘু ডাকতে লাগল আমের ডালে।
রঙিন সুতো ঘরের থেকে এনে
আরেক চরণ লিখে দিল—
'পরশ পাই নে তাই হৃদয়ের মাঝে'।

দুদিন গেল কেটে।
শঙ্কর এল রঙরেজির ঘরে।
শুধালো, পাগড়িতে কার হাতের লেখা?
জসীমের ভয় লাগল মনে।
সেলাম করে বললে, 'পণ্ডিতজি,
অবুঝ আমার মেয়ে,
মাপ করো ছেলেমানুষি।
চলে যাও রাজসভায়—
সেখানে এ লেখা কেউ দেখবে না, কেউ বুঝবে না।'
শঙ্কর আমিনার দিকে চেয়ে বললে,
'রংরেজিনী,
অহংকারের-পাকে-ঘেরা ললাট থেকে নামিয়ে এনেছ
শ্রীচরণের স্পর্শখানি হৃদয়তলে
তোমার হাতের রাঙা রেখার পথে।
রাজবাড়ির পথ আমার হারিয়ে গেল,
আর পাব না খুঁজে।'

২৫ অগ্রহায়ণ ১৩৩৯

মুক্তি

বাজিরাও পেশোয়ার অভিষেক হবে
কাল সকালে

কীর্তনী এসেছে গ্রামের থেকে,
মন্দিরে ছিল না তার স্থান।
সে বসেছে অঙ্গনের এক কোণে
পিপুল গাছের তলায়।
একতারা বাজায় আর কেবল সে ফিরে ফিরে বলে,
'ঠাকুর, তোমায় কে বসালো
কঠিন সোনার সিংহাসনে।'
রাত তখন দুই প্রহর,
শুক্লপক্ষের চাঁদ গেছে অস্তে।
দূরে রাজবাড়ির তোরণে
বাজছে শাঁখ শিঙে জগঝম্প,
জ্বলছে প্রদীপের মালা।

কীর্তনী গাইছে,
'তমালকুঞ্জে বনের পথে
শ্যামল ঘাসের কান্না এলেম শুনে,
ধুলোয় তারা ছিল যে কান পেতে,
পায়ের চিহ্ন বুকে পড়বে আঁকা
এই ছিল প্রত্যাশা।'

আরতি হয়ে গেছে সারা—
মন্দিরের দ্বার তখন বন্ধ,
ভিড়ের লোক গেছে রাজবাড়িতে।
কীর্তনী আপন মনে গাইছে,

'প্রাণের ঠাকুর,
এরা কি পাথর গেঁথে তোমায় রাখবে বেঁধে।
তুমি যে স্বর্গ ছেড়ে নামলে ধুলোয়
তোমার পরশ আমার পরশ
মিলবে ব'লে।'

সেই পিপুল-তলার অন্ধকারে
একা একা গাইছিল কীর্তনী,
আর শুনছিল আরেকজনা গোপনে—
বাজিরাও পেশোয়া।
শুনছিল সে—
'তুমি আমায় ডাক দিয়েছ আগল-দেওয়া ঘরের থেকে,
আমায় নিয়ে পথের পথিক হবে।
ঘুচবে তোমার নির্বাসনের ব্যথা,
ছাড়া পাবে হৃদয়-মাঝে।
থাক্‌ গে ওরা পাথরখানা নিয়ে
পাথরের বন্দীশালায়
অহংকারের-কাঁটার-বেড়া-ঘেরা।'

রাত্রি প্রভাত হল।
শুকতারা অরুণ-আলোয় উদাসী।
তোরণদ্বারে বাজল বাঁশি বিভাসে ললিতে।
অভিষেকের স্নান হবে,
পুরোহিত এল তীর্থবারি নিয়ে।

রাজবাড়ির ঠাকুরঘর শূন্য।
জ্বলছে দীপশিখা,
পূজার উপচার পড়ে আছে—
বাজিরাও পেশোয়া গেছে চলে
পথের পথিক হয়ে।

১৪ মাঘ ১৩৩৯

প্রেমের সোনা

রবিদাস চামার ঝাঁট দেয় ধুলো।
সজন রাজপথ বিজন তার কাছে,
পথিকেরা চলে তার স্পর্শ বাঁচিয়ে
গুরু রামানন্দ প্রাতঃস্নান সেরে
চলেছেন দেবালয়ের পথে,
দূর থেকে রবিদাস প্রণাম করল তাঁকে,
ধুলায় ঠেকালো মাথা।
রামানন্দ শুধালেন, ‘বন্ধু, কে তুমি।’
উত্তর পেলেন, ‘আমি শুক্‌নো ধুলো—
প্রভু, তুমি আকাশের মেঘ,
ঝরে যদি তোমার প্রেমের ধারা
গান গেয়ে উঠবে বোবা ধুলো
রঙবেরঙের ফুলে।’
রামানন্দ নিলেন তাকে বুকে,
দিলেন তাকে প্রেম।
রবিদাসের প্রাণের কুঞ্জবনে
লাগল যেন গীতবসন্তের হাওয়া

চিতোরের রানী, ঝালি তাঁর নাম।
গান পৌঁছল কানে,
তাঁর মন করে দিল উদাস।
ঘরের কাজে মাঝে মাঝে
দু চোখ দিয়ে জল পড়ে ঝ’রে।
মান গেল তাঁর কোথায় ভেসে।
রবিদাস চামারের কাছে
হরিপ্রেমের দীক্ষা নিলেন রাজরানী

স্মৃতিশিরোমণি
রাজকুলের বৃদ্ধ পুরোহিত,
বললে, 'ধিক্ মহারানী, ধিক্।
জাতিতে অন্ত্যজ রবিদাস,
ফেরে পথে পথে, ঝাঁট দেয় ধুলো,
তাকে তুমি প্রণাম করলে গুরু ব'লে—
ব্রাহ্মণের হেঁট হল মাথা
এ রাজ্যে তোমার।'

রানী বললেন, 'ঠাকুর, শোনো তবে,
আচারের হাজার গ্রন্থি
দিনরাত্রি বাঁধ কেবল শক্ত করে—
প্রেমের সোনা কখন পড়ল খসে
জানতে পার নি তা।
আমার ধুলোমাখা গুরু
ধুলোর থেকে কুড়িয়ে পেয়েছে।
অর্থহারা বাঁধনগুলোর গর্বে, ঠাকুর,
থাকো তুমি কঠিন হয়ে।
আমি সোনার কাঙালিনী
ধুলোর সে দান নিলেম মাথায় করে।

[মাঘ ১৩৩৯]

স্নান সমাপন

গুরু রামানন্দ স্তব্ধ দাঁড়িয়ে
গঙ্গার জলে পূর্বমুখে।
তখন জলে লেগেছে সোনার কাঠির ছোঁওয়া,
ভোরের হাওয়ায় স্রোত উঠছে ছল্‌ছল্ করে

রামানন্দ তাকিয়ে আছেন
জবাকুসুমসঙ্কাশ সূর্যোদয়ের দিকে।
মনে মনে বলছেন,
'হে দেব, তোমার যে কল্যাণতম রূপ
সে তো আমার অন্তরে প্রকাশ পেল না।
ঘোচাও তোমার আবরণ।'

সূর্য উঠল শালবনের মাথার উপর।
জেলেরা নৌকায় পাল দিলে তুলে,
বকের পাঁতি উড়ে চলেছে সোনার আকাশ বেয়ে
ও পারে জলার দিকে।
এখনো স্নান হল না সারা।
শিষ্য শুধালো, 'বিলম্ব কেন প্রভু,
পূজার সময় যায় বয়ে।'
রামানন্দ উত্তর করলেন,
'শুচি হয় নি তনু,
গঙ্গা রইলেন আমার হৃদয় থেকে দূরে।'
শিষ্য বসে ভাবে, এ কেমন কথা।

সর্ষেখেতে রৌদ্র ছড়িয়ে গেল।
মালিনী খুলেছে ফুলের পসরা পথের ধারে,
গোয়ালিনী যায় দুধের কলস মাথায় নিয়ে।
গুরুর কী হল মনে,
উঠলেন জল ছেড়ে।
চললেন বনঝাউ ভেঙে
গাঙশালিকের কোলাহলের মধ্য দিয়ে।
শিষ্য শুধালো, 'কোথায় যাও প্রভু,
ও দিকে তো নেই ভদ্রপাড়া।'
গুরু বললেন, 'চলেছি স্নানসমাপনের পথে।'

বালুচরের প্রান্তে গ্রাম।
গলির মধ্যে প্রবেশ করলেন গুরু।
সেখানে তেঁতুল গাছের ঘন ছায়া,
শাখায় শাখায় বানরদলের লাফালাফি।
গলি পৌঁছয় ভাজন মুচির ঘরে।
পশুর চামড়ার গন্ধ আসছে দূর থেকে।
আকাশে চিল উড়ছে পাক দিয়ে,
রোগা কুকুর হাড় চিবোচ্ছে পথের পাশে।
শিষ্য বললেন, 'রাম! রাম!'
ভ্রূকুটি করে দাঁড়িয়ে রইল গ্রামের বাইরে।

ভাজন লুটিয়ে পড়ে গুরুকে প্রণাম করলে
সাবধানে।
গুরু তাকে বুকে নিলেন তুলে।
ভাজন ব্যস্ত হয়ে উঠল,
'কী করলেন প্রভু,
অধমের ঘরে মলিনের গ্লানি লাগল পুণ্যদেহে।'
রামানন্দ বললেন,
'স্নানে গেলেম তোমার পাড়া দূরে রেখে,
তাই যিনি সবাইকে দেন ধৌত করে
তাঁর সঙ্গে মনের মিল হল না।
এতক্ষণে তোমার দেহে আমার দেহে
বইল সে বিশ্বপাবনধারা।
ভগবান সূর্যকে আজ প্রণাম করতে গিয়ে প্রণাম বেধে গেল।
বললেম, হে দেব, তোমার মধ্যে যে জ্যোতি আমার মধ্যেও তিনি,
তবু আজ দেখা হল না কেন।
এতক্ষণে মিলল তাঁর দর্শন
তোমার ললাটে আর আমার ললাটে—
মন্দিরে আর হবে না যেতে।'

১৫ ফাল্গুন ১৩৩৯

প্রথম পূজা

ত্রিলোকেশ্বরের মন্দির।
লোকে বলে স্বয়ং বিশ্বকর্মা তার ভিত-পত্তন করেছিলেন
কোন্ মান্ধাতার আমলে,
স্বয়ং হনুমান এনেছিলেন তার পাথর বহন করে।
ইতিহাসের পণ্ডিত বলেন, এ মন্দির কিরাত জাতের গড়া,
এ দেবতা কিরাতের।
একদা যখন ক্ষত্রিয় রাজা জয় করলেন দেশ
দেউলের আঙিনা পূজারিদের রক্তে গেল ভেসে,
দেবতা রক্ষা পেলেন নতুন নামে নতুন পূজাবিধির আড়ালে—
হাজার বৎসরের প্রাচীন ভক্তিধারার স্রোত গেল ফিরে।
কিরাত আজ অস্পৃশ্য, এ মন্দিরে তার প্রবেশপথ লুপ্ত।

কিরাত থাকে সমজের বাইরে,
নদীর পূর্বপারে তার পাড়া।
সে ভক্ত, আজ তার মন্দির নেই, তার গান আছে।
নিপুণ তার হাত, অভ্রান্ত তার দৃষ্টি।
সে জানে কী ক'রে পাথরের উপর পাথর বাঁধে,
কী করে পিতলের উপর রুপোর ফুল তোলা যায়—
কৃষ্ণশিলায় মূর্তি গড়বার ছন্দটা কী।
রাজশাসন তার নয় অস্ত্র তার নিয়েছে কেড়ে,
বেশে বাসে ব্যবহারে সম্মানের চিহ্ন হতে সে বর্জিত,
বঞ্চিত সে পুঁথির বিদ্যায়।
ত্রিলোকেশ্বর মন্দিরের স্বর্ণচূড়া পশ্চিম দিগন্তে যায় দেখা,
চিনতে পারে নিজেদেরই মনের আকল্প,
বহু দূরের থেকে প্রণাম করে।

কার্তিক পূর্ণিমা, পূজার উৎসব।

মঞ্চের উপরে বাজছে বাঁশি মৃদঙ্গ করতাল,
মাঠ জুড়ে কানাতের পর কানাত,
মাঝে মাঝে উঠেছে ধ্বজা।
পথের দুই ধারে ব্যাপারীদের পসরা—
তামার পাত্র, রুপোর অলংকার, দেবমূর্তির পট, রেশমের কাপড় ;
ছেলেদের খেলার জন্যে কাঠের ডমরু, মাটির পুতুল, পাতার বাঁশি ;
অর্ঘ্যের উপকরণ, ফল মালা ধূপ বাতি, ঘড়া ঘড়া তীর্থবারি।
বাজিকর তারস্বরে প্রলাপবাক্যে দেখাচ্ছে বাজি,
কথক পড়ছে রামায়ণকথা।
উজ্জ্বলবেশে সশস্ত্র প্রহরী ঘুরে বেড়ায় ঘোড়ায় চড়ে ;
রাজ-অমাত্য হাতির উপর হাওদায়,
সম্মুখে বেজে চলেছে শিঙা।
কিংখাবে ঢাকা পাল্কিতে ধনীঘরের গৃহিণী,
আগে পিছে কিংকরের দল।
সন্ন্যাসীর ভিড় পঞ্চবটের তলায়,
নগ্ন, জটাধারী, ছাইমাখা ;
মেয়েরা পায়ের কাছে ভোগ রেখে যায়—
ফল, দুধ, মিষ্টান্ন, ঘি, আতপ তণ্ডুল।

থেকে থেকে আকাশে উঠছে চীৎকারধ্বনি,
জয় ত্রিলোকেশ্বরের জয়।
কাল আসবে শুভলগ্নে রাজার প্রথম পূজা,
স্বয়ং আসবেন মহারাজা রাজহস্তীতে চড়ে।
তাঁর আগমন-পথের দুই ধারে
সারি সারি কলার গাছে ফুলের মালা,
মঙ্গলঘটে আম্রপল্লব।
আর ক্ষণে ক্ষণে পথের ধুলায় সেচন করছে গন্ধবারি।

শুক্লত্রয়োদশীর রাত।
মন্দিরে প্রথম প্রহরের শঙ্খ ঘণ্টা ভেরী পটহ থেমেছে।

আজ চাঁদের উপরে একটা ঘোলা আবরণ,
জ্যোৎস্না আজ ঝাপসা —
যেন মূর্ছার ঘোর লাগল।
বাতাস রুদ্ধ—
ধোঁয়া জমে আছে আকাশে,
গাছপালাগুলো যেন শঙ্কায় আড়ষ্ট।
কুকুর অকারণে আর্তনাদ করছে,
ঘোড়াগুলো কান খাড়া করে উঠছে ডেকে
কোন্ অলক্ষ্যের দিকে তাকিয়ে।
হঠাৎ গম্ভীর ভীষণ শব্দ শোনা গেল মাটির নীচে—
পাতালে দানবেরা যেন রণদামামা বাজিয়ে দিলে—
গুরু-গুরু গুরু-গুরু।
মন্দিরে শঙ্খ ঘণ্টা বাজতে লাগল প্রবল শব্দে।
হাতি বাঁধা ছিল,
তারা বন্ধন ছিঁড়ে গর্জন করতে করতে
ছুটল চার দিকে
যেন ঘূর্ণি-ঝড়ের মেঘ।
তুফান উঠল মাটিতে—
ছুটল উট মহিষ গরু ছাগল ভেড়া
ঊর্ধ্বশ্বাসে, পালে পালে।
হাজার হাজার দিশাহারা লোক
আর্তস্বরে ছুটে বেড়ায়—
চোখে তাদের ধাঁধা লাগে,
আত্মপরের ভেদ হারিয়ে কে কাকে দেয় দ’লে।
মাটি ফেটে ফেটে ওঠে ধোঁয়া. ওঠে গরম জল—
ভীম-সরোবরের দিঘি বালির নীচে গেল শুষে।
মন্দিরের চূড়ায় বাঁধা বড়ো ঘণ্টা দুলতে দুলতে
বাজতে লাগল ঢং ঢং।
আচম্‌কা ধ্বনি থামল একটা ভেঙে-পড়ার শব্দে।

পৃথিবী যখন স্তব্ধ হল
পূর্ণপ্রায় চাঁদ তখন হেলেছে পশ্চিমের দিকে।
আকাশে উঠছে জ্বলে-ওঠা কানাতগুলোর ধোঁয়ার কুণ্ডলী,
জ্যোৎস্নাকে যেন অজগর সাপে জড়িয়েছে।

পরদিন আত্মীয়দের বিলাপে দিগ্‌বিদিক যখন শোকার্ত
তখন রাজসৈনিকদল মন্দির ঘিরে দাঁড়ালো,
পাছে অশুচিতার কারণ ঘটে।
রাজমন্ত্রী এল, দৈবজ্ঞ এল, স্মার্ত পণ্ডিত এল।
দেখলে বাহিরের প্রাচীর ধূলিসাৎ।
দেবতার বেদির উপরের ছাদ পড়েছে ভেঙে।
পণ্ডিত বললে সংস্কার করা চাই আগামী পূর্ণিমার পূর্বেই,
নইলে দেবতা পরিহার করবেন তাঁর মূর্তিকে।
রাজা বললেন, 'সংস্কার করো।'
মন্ত্রী বললেন, 'ওই কিরাতরা ছাড়া কে করবে পাথরের কাজ।
ওদের দৃষ্টিকলুষ থেকে দেবতাকে রক্ষা করব কী উপায়ে,
কী হবে মন্দিরসংস্কারে যদি মলিন হয় দেবতার অঙ্গমহিমা।'
কিরাত-দলপতি মাধবকে রাজা আনলেন ডেকে।
বৃদ্ধ মাধব, শুক্লকেশের উপর নির্মল সাদা চাদর জড়ানো—
পরিধানে পীতধড়া, তাম্রবর্ণ দেহ কটি পর্যন্ত অনাবৃত,
দুই চক্ষু সকরুণ নম্রতায় পূর্ণ।
সাবধানে রাজার পায়ের কাছে রাখলে একমুঠো কুন্দফুল,
প্রণাম করলে স্পর্শ বাঁচিয়ে।
রাজা বললেন, 'তোমরা না হলে দেবালয়-সংস্কার হয় না।'
'আমাদের 'পরে দেবতার ঐ কৃপা'
এই ব'লে দেবতার উদ্দেশে মাধব প্রণাম জানালে।
নৃপতি নৃসিংহরায় বললেন, 'চোখ বেঁধে কাজ করা চাই,
দেবমূর্তির উপর দৃষ্টি না পড়ে। পারবে?'
মাধব বললে, 'অন্তরের দৃষ্টি দিয়ে কাজ করিয়ে নেবেন অন্তর্যামী।
যতক্ষণ কাজ চলবে, চোখ খুলব না।'

বাহিরের কাজ করে কিরাতের দল,
মন্দিরের ভিতরে কাজ করে মাধব,
তার দুই চক্ষু পাকে পাকে কালো কাপড়ে বাঁধা।
দিনরাত সে মন্দিরের বাহিরে যায় না—
ধ্যান করে, গান গায়, আর তার আঙুল চলতে থাকে।
মন্ত্রী এসে বলে, 'ত্বরা করো, ত্বরা করো—
তিথির পরে তিথি যায়, কবে লগ্ন হবে উত্তীর্ণ।'
মাধব জোড়হাতে বলে, 'যাঁর কাজ তাঁরই নিজের আছে ত্বরা,
আমি তো উপলক্ষ্য।'

অমাবস্যা পার হয়ে শুক্লপক্ষ এল আবার।
অন্ধ মাধব আঙুলের স্পর্শ দিয়ে পাথরের সঙ্গে কথা কয়,
পাথর তার সাড়া দিতে থাকে।
কাছে দাঁড়িয়ে থাকে প্রহরী
পাছে মাধব চোখের বাঁধন খোলে।
পণ্ডিত এসে বললে, 'একাদশীর রাত্রে প্রথম পূজার শুভক্ষণ।
কাজ কি শেষ হবে তার পূর্বে।'
মাধব প্রণাম করে বললে, 'আমি কে যে উত্তর দেব।
কৃপা যখন হবে সংবাদ পাঠাব যথাসময়ে,
তার আগে এলে ব্যাঘাত হবে, বিলম্ব ঘটবে।'

ষষ্ঠী গেল, সপ্তমী পেরোল—
মন্দিরের দ্বার দিয়ে চাঁদের আলো এসে পড়ে
মাধবের শুক্লকেশে।
সূর্য অস্ত গেল। পাণ্ডুর আকাশে একাদশীর চাঁদ।
মাধব দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে,
'যাও প্রহরী, সংবাদ দিয়ে এসো গে
মাধবের কাজ শেষ হল আজ।
লগ্ন যেন বয়ে না যায়।'

প্রহরী গেল।
মাধব খুলে ফেললে চোখের বন্ধন।
মুক্ত দ্বার দিয়ে পড়েছে একাদশী-চাঁদের পূর্ণ আলো
দেবমূর্তির উপরে।
মাধব হাঁটু গেড়ে বসল দুই হাত জোড় করে
একদৃষ্টে চেয়ে রইল দেবতার মুখে,
দুই চোখে বইল জলের ধারা।
আজ হাজার বছরের ক্ষুধিত দেখা দেবতার সঙ্গে ভক্তের।

রাজা প্রবেশ করলেন মন্দিরে।
তখন মাধবের মাথা নত বেদীমূলে।
রাজার তলোয়ারে মুহূর্তে ছিন্ন হল সেই মাথা।
দেবতার পায়ে এই প্রথম পূজা, এই শেষ প্রণাম।

শান্তিনিকেতন
২৮ শ্রাবণ ১৩৩৯

অস্থানে

একই লতাবিতান বেয়ে চামেলি আর মধুমঞ্জরী
দশটি বছর কাটিয়েছে গায়ে গায়ে,
রোজ সকালে সূর্য-আলোর ভোজে
পাতাগুলি মেলে বলেছে
‘এই তো এসেছি’।
অধিকারের দ্বন্দ্ব ছিল ডালে ডালে দুই শরিকে,
তবু তাদের প্রাণের আনন্দে
রেষারেষির দাগ পড়ে নি কিছু।

কখন যে কোন্ কুলগ্নে ঐ
সংশয়হীন অবোধ চামেলি

কোমল সবুজ ডাল মেলে দিল
বিজ্‌লিবাতির লোহার তারে তারে,
বুঝতে পারে নি যে ওরা জাত আলাদা।
শ্রাবণ মাসের অবসানে আকাশকোণে
সাদা মেঘের গুচ্ছগুলি
নেমে নেমে পড়েছিল শালের বনে,
সেই সময়ে সোনায় রাঙা স্বচ্ছ সকালে
চামেলি মেতেছিল অজস্র ফুলের গৌরবে।
কোথাও কিছু বিরোধ ছিল না,
মৌমাছিদের আনাগোনায়
উঠত কেঁপে শিউলিতলার ছায়া।
ঘুঘুর ডাকে দুই প্রহরে
বেলা হত আলস্যে শিথিল।

সেই ভরা শরতের দিনে সূর্য-ডোবার সময়
মেঘে মেঘে লাগল যখন নানা রঙের খেয়াল,
সেই বেলাতে কখন এল
বিজ্‌লিবাতির অনুচরের দল।
চোখ রাঙালো চামেলিটার স্পর্ধা দেখে—
শুষ্ক শূন্য আধুনিকের রূঢ় প্রয়োজনের 'পরে
নিত্যকালের লীলামধুর নিষ্প্রয়োজন অনধিকার
হাত বাড়ালো কেন।
তীক্ষ্ণ কুটিল আঁক্‌শি দিয়ে
টেনে টেনে ছিনিয়ে ছিঁড়ে নিল
কচি কচি ডালগুলি সব ফুলে-ভরা।
এত দিনে বুঝল হঠাৎ অবোধ চামেলিটা
মৃত্যু-আঘাত বক্ষে নিয়ে,
বিজ্‌লিবাতির তারগুলো ঐ জাত আলাদা।

২৩ ভাদ্র ১৩৩৯

ঘরছাড়া

এল সে জর্মনির থেকে
এই অচেনার মাঝখানে,
ঝড়ের মুখে নৌকো নোঙর-ছেঁড়া
ঠেকল এসে দেশান্তরে।
পকেটে নেই টাকা,
উদ্‌বেগ নেই মনে,
দিন চলে যায় দিনের কাজে
অল্পস্বল্প নিয়ে।
যেমন-তেমন থাকে
অন্য দেশের সহজ চালে।
নেই ন্যূনতা, গুমর কিছুই নেই—
মাথা-উঁচু
দ্রুত পায়ের চাল।
একটুও নেই অকিঞ্চনের অবসাদ।
দিনের প্রতি মুহূর্তকে
জয় করে সে আপন জোরে,
পথের মধ্যে ফেলে দিয়ে যায় সে চলে,
চায় না পিছন ফিরে—
রাখে না তার এক কণাও বাকি।
খেলাধুলা হাসিগল্প যা হয় যেখানে
তারি মধ্যে জায়গা সে নেয়
সহজ মানুষ।
কোথাও কিছু ঠেকে না তার
একটুকুও অনভ্যাসের বাধা।
একলা বটে তবুও তো
একলা সে নয়।
প্রবাসে তার দিনগুলো সব
হুহু করে কাটিয়ে দিচ্ছে হাল্কা মনে।

ওকে দেখে অবাক হয়ে থাকি,
সব মানুষের মধ্যে মানুষ
অভয় অসংকোচ—
তার বাড়া ওর নেই তো পরিচয়

দেশের মানুষ এসেছে তার আরেক জনা।
ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে সে
যা-খুশি তাই ছবি এঁকে এঁকে
যেখানে তার খুশি।
সে ছবি কেউ দেখে কিম্বা না'ই দেখে
ভালো বলে না'ই বলে—
খেয়াল কিছুই নেই।
দুইজনেতে পাশাপাশি
কাঁকর-ঢালা পথ দিয়ে ঐ
যাচ্ছে চলে
দুই টুকরো শরৎকালের মেঘ।
নয় ওরা তো শিকড়-বাঁধা গাছের মতো,
ওরা মানুষ—
ছুটি ওদের সকল দেশে সকল কালে
কর্ম ওদের সবখানে,
নিবাস ওদের সব মানুষের মাঝে।
মন যে ওদের স্রোতের মতো
সব কিছুরেই ভাসিয়ে চলে—
কোনোখানেই আটকা পড়ে না সে।
সব মানুষের ভিতর দিয়ে
আনাগোনার বড়ো রাস্তা তৈরি হবে,
এরাই আছে সেই রাস্তার কাজে
এই যত-সব ঘরছাড়াদের দল

১৭ ভাদ্র ১৩৩৯

ছুটির আয়োজন

কাছে এল পুজার ছুটি।
রোদ্দুরে লেগেছে চাঁপাফুলের রঙ।
হাওয়া উঠছে শিশিরে শিরশিরিয়ে,
শিউলির গন্ধ এসে লাগে
যেন কার ঠাণ্ডা হাতের কোমল সেবা।
আকাশের কোণে কোণে
সাদা মেঘের আলস্য,
দেখে মন লাগে না কাজে।

মাস্টারমশায় পড়িয়ে চলেন
পাথুরে কয়লার আদিম কথা,
ছেলেটা বেঞ্চিতে পা দোলায়,
ছবি দেখে আপন মনে—
কমলদিঘির ফাটল-ধরা ঘাট
আর ভঞ্জদের পাঁচিল-ঘেঁষা
আতাগাছের ফলে-ভরা ডাল।
আর দেখে সে মনে মনে তিসির খেতে
গোয়ালপাড়ার ভিতর দিয়ে
রাস্তা গেছে এঁকেবেঁকে হাটের পাশে
নদীর ধারে।

কলেজের ইকনমিক্স্-ক্লাসে
খাতায় ফর্দ নিচ্ছে টুকে
চশমা-চোখে মেডেল-পাওয়া ছাত্র—
হালের লেখা কোন্ উপন্যাস কিনতে হবে,
ধারে মিলবে কোন্ দোকানে
'মনে-রেখো' পাড়ের শাড়ি,
সোনায় জড়ানো শাঁখা,

দিল্লির-কাজ-করা লাল মখমলের চটি
আর চাই রেশমে-বাঁধাই-করা
অ্যান্টিক কাগজে ছাপা কবিতার বই,
এখনো তার নাম মনে পড়ছে না।

ভবানীপুরের তেতালা বাড়িতে
আলাপ চলছে সরু মোটা গলায়—
এবার আবু পাহাড় না মাতুরা
না ড্যাল্‌হৌসি কিম্বা পুরী
না সেই চিরকেলে চেনা লোকের দার্জিলিঙ।

আর দেখছি সামনে দিয়ে
স্টেশনে যাবার রাঙা রাস্তায়
শহরের-দাদন-দেওয়া দড়িবাঁধা ছাগল-ছানা
পাঁচটা ছটা ক'রে।
তাদের নিষ্ফল কান্নার স্বর ছড়িয়ে পড়ে
কাশের-ঝালর-দোলা শরতের শান্ত আকাশে।
কেমন ক'রে বুঝেছে তারা
এল তাদের পূজার ছুটির দিন।
১৭ ভাদ্র ১৩৩৯

মৃত্যু

মরণের ছবি মনে আনি।
ভেবে দেখি শেষ দিন ঠেকেছে শেষের শীর্ণক্ষণে।
আছে ব'লে যত কিছু
রয়েছে দেশে কালে—
যত বস্তু, যত জীব, যত ইচ্ছা, যত চেষ্টা,
যত আশানৈরাশ্যের ঘাতপ্রতিঘাত
দেশে দেশে ঘরে ঘরে চিত্তে চিত্তে,

যত গ্রহনক্ষত্রের
দূর হতে দূরতর ঘূর্ণ্যমান স্তরে স্তরে
অগণিত অজ্ঞাত শক্তির
আলোড়ন আবর্তন
মহাকালসমুদ্রের কূলহীন বক্ষতলে,
সমস্তই আমার এ চৈতন্যের
শেষ সূক্ষ্ম আকম্পিত রেখার এ ধারে।
এক পা তখনো আছে সে প্রান্তসীমায়,
অন্য পা আমার
বাড়িয়েছি রেখার ও ধারে,
সেখানে অপেক্ষা করে অলক্ষিত ভবিষ্যৎ
লয়ে দিনরজনীর অন্তহীন অক্ষমালা
আলো-অন্ধকারে-গাঁথা।
অসীমের অসংখ্য যা-কিছু
সত্তায় সত্তায় গাঁথা
প্রসারিত অতীতে ও অনাগতে।
নিবিড় সে সমস্তের মাঝে
অকস্মাৎ আমি নেই।
এ কি সত্য হতে পারে।
উদ্ধত এ নাস্তিত্ব যে পাবে স্থান
এমন কি অণুমাত্র ছিদ্র আছে কোনোখানে।
সে ছিদ্র কি এতদিনে
ডুবাতো না নিখিলতরণী
মৃত্যু যদি শূন্য হত,
যদি হত মহাসমগ্রের
রূঢ় প্রতিবাদ।

২৬ ভাদ্র ১৩৩৯

মানবপুত্র

মৃত্যুর পাত্রে খৃস্ট যেদিন মৃত্যুহীন প্রাণ উৎসর্গ করলেন
রবাহূত অনাহূতের জন্যে
তার পরে কেটে গেছে বহু শত বৎসর।
আজ তিনি একবার নেমে এলেন নিত্যধাম থেকে মর্তধামে।
চেয়ে দেখলেন,
সেকালেও মানুষ ক্ষতবিক্ষত হত যে-সমস্ত পাপের মারে—
যে উদ্ধত শেল ও শল্য, যে চতুর ছোরা ও ছুরি,
যে ক্রূর কুটিল তলোয়ারের আঘাতে—
বিদ্যুদ্‌বেগে আজ তাদের ফলায় শান দেওয়া হচ্ছে
হিস্‌হিস্‌ শব্দে স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে
বড়ো বড়ো মসীধূমকেতন কারখানাঘরে।

কিন্তু দারুণতম যে মৃত্যুবাণ নূতন তৈরি হল,
ঝক্‌ঝক্ করে উঠল নরঘাতকের হাতে,
পূজারি তাতে লাগিয়েছে তাঁরই নামের ছাপ
তীক্ষ্ণ নখে আঁচড় দিয়ে।
খৃস্ট বুকে হাত চেপে ধরলেন ;
বুঝলেন শেষ হয় নি তাঁর নিরবচ্ছিন্ন মৃত্যুর মুহূর্ত,
নূতন শূল তৈরি হচ্ছে বিজ্ঞানশালায়—
বিঁধছে তাঁর গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে।
সেদিন তাঁকে মেরেছিল যারা
ধর্মমন্দিরের ছায়ায় দাঁড়িয়ে,
তারাই আজ নূতন জন্ম নিল দলে দলে,
তারাই আজ ধর্মমন্দিরের বেদির সামনে থেকে
পূজামন্ত্রের সুরে ডাকছে ঘাতক সৈন্যকে—
বলছে 'মারো মারো'।
মানবপুত্র যন্ত্রণায় বলে উঠলেন ঊর্ধ্বে চেয়ে,
'হে ঈশ্বর, হে মানুষের ঈশ্বর,
কেন আমাকে ত্যাগ করলে।'

[শ্রাবণ ১৩৩৯]

শিশুতীর্থ

রাত কত হল ?
উত্তর মেলে না।
কেননা, অন্ধ কাল যুগ-যুগান্তরের গোলকধাঁধায় ঘোরে, পথ অজানা,
পথের শেষ কোথায় খেয়াল নেই।
পাহাড়তলিতে অন্ধকার মৃত রাক্ষসের চক্ষুকোটরের মতো ;
স্তূপে স্তূপে মেঘ আকাশের বুক চেপে ধরেছে ;
পুঞ্জ পুঞ্জ কালিমা গুহায় গর্তে সংলগ্ন,
মনে হয় নিশীথরাত্রের ছিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ;
দিগন্তে একটা আগ্নেয় উগ্রতা
ক্ষণে ক্ষণে জ্বলে আর নেভে—
ও কি কোনো অজানা দুষ্টগ্রহের চোখ-রাঙানি।
ও কি কোনো অনাদি ক্ষুধার লেলিহ লোল জিহ্বা।
বিক্ষিপ্ত বস্তুগুলো যেন বিকারের প্রলাপ,
অসম্পূর্ণ জীবলীলার ধূলিবিলীন উচ্ছিষ্ট ;
তারা অমিতাচারী দৃপ্ত প্রতাপের ভগ্ন তোরণ,
লুপ্ত নদীর বিস্মৃতিবিলগ্ন জীর্ণ সেতু,
দেবতাহীন দেউলের সর্পবিবরছিদ্রিত বেদি,
অসমাপ্ত দীর্ণ সোপানপংক্তি শূন্যতায় অবসিত।
অকস্মাৎ উচ্চণ্ড কলরব আকাশে আবর্তিত আলোড়িত হতে থাকে—
ও কি বন্দী বন্যাবারির গুহাবিদারণের রলরোল।
ও কি ঘূর্ণ্যতাণ্ডবী উন্মাদ সাধকের রুদ্রমন্ত্র-উচ্চারণ।
ও কি দাবাগ্নিবেষ্টিত মহারণ্যের আত্মঘাতী প্রলয়নিনাদ।
এই ভীষণ কোলাহলের তলে তলে একটা অস্ফুট ধ্বনিধারা বিসর্পিত—
যেন অগ্নিগিরিনিঃসৃত গদগদকলমুখর পঙ্কস্রোত ;
তাতে একত্রে মিলেছে পরশ্রীকাতরের কানাকানি, কুৎসিত জনশ্রুতি,
অবজ্ঞার কর্কশহাস্য।
সেখানে মানুষগুলো সব ইতিহাসের ছেঁড়া পাতার মতো
ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছে—

মশালের আলোয় ছায়ায় তাদের মুখে
বিভীষিকার উল্কি পরানো।
কোনো এক সময়ে অকারণ সন্দেহে কোনো-এক পাগল
তার প্রতিবেশীকে হঠাৎ মারে ;
দেখতে দেখতে নির্বিচার বিবাদ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে দিকে দিকে।
কোনো নারী আর্তস্বরে বিলাপ করে ;
বলে, হায়, হায়, আমাদের দিশাহারা সন্তান উচ্ছন্ন গেল।
কোনো কামিনী যৌবনমদবিলসিত নগ্ন দেহে অট্টহাস্য করে ;
বলে, কিছুতে কিছু আসে যায় না।

২

ঊর্ধ্বে গিরিচূড়ায় বসে আছে ভক্ত, তুষারশুভ্র নীরবতার মধ্যে ;
আকাশে তার নিদ্রাহীন চক্ষু খোঁজে আলোকের ইঙ্গিত।
মেঘ যখন ঘনীভূত, নিশাচর পাখি চীৎকারশব্দে যখন উড়ে যায়,
সে বলে, ভয় নেই ভাই, মানবকে মহান্ বলে জেনো।
ওরা শোনে না, বলে পশুশক্তিই আদ্যাশক্তি, বলে পশুই শাশ্বত ;
বলে সাধুতা তলে তলে আত্মপ্রবঞ্চক।
যখন ওরা আঘাত পায় বিলাপ ক'রে বলে, ভাই, তুমি কোথায়।
উত্তরে শুনতে পায়, আমি তোমার পাশেই।
অন্ধকারে দেখতে পায় না, তর্ক করে— এ বাণী ভয়ার্তের মায়াসৃষ্টি,
আত্মসান্ত্বনার বিড়ম্বনা।
বলে, মানুষ চিরদিন কেবল সংগ্রাম করবে
মরীচিকার অধিকার নিয়ে
হিংসাকণ্টকিত অন্তহীন মরুভূমির মধ্যে।

৩

মেঘ সরে গেল।
শুকতারা দেখা দিল পূর্বদিগন্তে,
পৃথিবীর বক্ষ থেকে উঠল আরামের দীর্ঘনিশ্বাস,
পল্লবমর্মর বনপথে-পথে হিল্লোলিত,
পাখি ডাক দিল শাখায়-শাখায়।

ভক্ত বললে, সময় এসেছে।
কিসের সময় ?
যাত্রার।
ওরা বসে ভাবলে।
অর্থ বুঝলে না, আপন আপন মনের মতো অর্থ বানিয়ে নিলে।
ভোরের স্পর্শ নামল মাটির গভীরে,
বিশ্বসত্তার শিকড়ে শিকড়ে কেঁপে উঠল প্রাণের চাঞ্চল্য।
কে জানে কোথা হতে একটি অতি সূক্ষ্মস্বর
সবার কানে কানে বললে,
চলো সার্থকতার তীর্থে।
এই বাণী জনতার কণ্ঠে কণ্ঠে
একটি মহৎ প্রেরণায় বেগবান হয়ে উঠল।
পুরুষেরা উপরের দিকে চোখ তুললে,
জোড় হাত মাথায় ঠেকালে মেয়েরা।
শিশুরা করতালি দিয়ে হেসে উঠল।
প্রভাতের প্রথম আলো ভক্তের মাথায় সোনার রঙের চন্দন পরালে ;
সবাই বলে উঠল, ভাই, আমরা তোমার বন্দনা করি।

৪

যাত্রীরা চারি দিক থেকে বেরিয়ে পড়ল—
সমুদ্র পেরিয়ে, পর্বত ডিঙিয়ে, পথহীন প্রান্তর উত্তীর্ণ হয়ে—
এল নীলনদীর দেশ থেকে, গঙ্গার তীর থেকে,
তিব্বতের হিমমজ্জিত অধিত্যকা থেকে,
প্রাকাররক্ষিত নগরের সিংহদ্বার দিয়ে,
লতাজালজটিল অরণ্যে পথ কেটে।
কেউ আসে পায়ে হেঁটে, কেউ উটে, কেউ ঘোড়ায়, কেউ হাতিতে,
কেউ রথে চীনাংশুকের পতাকা উড়িয়ে।
নানা ধর্মের পূজারি চলল ধূপ জ্বালিয়ে, মন্ত্র প’ড়ে।
রাজা চলল, অনুচরদের বর্শাফলক রৌদ্রে দীপ্যমান,
ভেরী বাজে গুরু গুরু মেঘমন্দ্রে।

ভিক্ষু আসে ছিন্ন কন্থা প'রে,
আর রাজ-অমাত্যের দল স্বর্ণলাঞ্ছনখচিত উজ্জ্বল বেশে।
জ্ঞানগরিমা ও বয়সের ভারে মন্থর অধ্যাপককে ঠেলে দিয়ে চলে
চটুলগতি বিদ্যার্থী যুবক।
মেয়েরা চলেছে কলহাস্যে, কত মাতা, কুমারী, কত বধূ;
থালায় তাদের শ্বেতচন্দন, ঝারিতে গন্ধসলিল।
বেশ্যাও চলেছে সেই সঙ্গে; তীক্ষ্ণ তাদের কণ্ঠস্বর,
অতিপ্রকট তাদের প্রসাধন।
চলেছে পঙ্গু, খঞ্জ, অন্ধ, আতুর,
আর সাধুবেশী ধর্মব্যবসায়ী—
দেবতাকে হাটে হাটে বিক্রয় করা যাদের জীবিকা।
সার্থকতা!
স্পষ্ট ক'রে কিছু বলে না— কেবল নিজের লোভকে
মহৎ নাম ও বৃহৎ মূল্য দিয়ে ওই শব্দটার ব্যাখ্যা করে,
আর শাস্তিশঙ্কাহীন চৌর্যবৃত্তির অনন্ত সুযোগ ও আপন মলিন
ক্লিন্ন দেহমাংসের অক্লান্ত লোলুপতা দিয়ে কল্পস্বর্গ রচনা করে।

৫

দয়াহীন দুর্গম পথ উপলখণ্ডে আকীর্ণ।
ভক্ত চলেছে, তার পশ্চাতে বলিষ্ঠ এবং শীর্ণ,
তরুণ এবং জরাজর্জর, পৃথিবী শাসন করে যারা
আর যারা অর্ধাশনের মূল্যে মাটি চাষ করে।
কেউ বা ক্লান্ত বিক্ষতচরণ, কারো মনে ক্রোধ, কারো মনে সন্দেহ
তারা প্রতি পদক্ষেপ গণনা করে আর শুধায়, কত পথ বাকি।
তার উত্তরে ভক্ত শুধু গান গায়।
শুনে তাদের ভ্রূ কুটিল হয়, কিন্তু ফিরতে পারে না,
চলমান জনপিণ্ডের বেগ এবং অনতিব্যক্ত আশার তাড়না
তাদের ঠেলে নিয়ে যায়।
ঘুম তাদের কমে এল, বিশ্রাম তারা সংক্ষিপ্ত করলে,
পরস্পরকে ছাড়িয়ে চলবার প্রতিযোগিতায় তারা ব্যগ্র,

ভয়— পাছে বিলম্ব ক'রে বঞ্চিত হয়।
দিনের পর দিন গেল।
দিগন্তের পর দিগন্ত আসে,
অজ্ঞাতের আমন্ত্রণ অদৃশ্য সংকেতে ইঙ্গিত করে।
ওদের মুখের ভাব ক্রমেই কঠিন
আর ওদের গঞ্জনা উগ্রতর হতে থাকে।

৬

রাত হয়েছে।
পথিকেরা বটতলায় আসন বিছিয়ে বসল।
একটা দমকা হাওয়ায় প্রদীপ গেল নিবে, অন্ধকার নিবিড়—
যেন নিদ্রা ঘনিয়ে উঠল মূর্ছায়।
জনতার মধ্য থেকে কে-একজন হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে
অধিনেতার দিকে আঙুল তুলে বললে,
মিথ্যাবাদী, আমাদের প্রবঞ্চনা করেছ।
ভর্ৎসনা এক কণ্ঠ থেকে আরেক কণ্ঠে উদগ্র হতে থাকল।
তীব্র হল মেয়েদের বিদ্বেষ, প্রবল হল পুরুষদের তর্জন।
অবশেষে একজন সাহসিক উঠে দাঁড়িয়ে হঠাৎ তাকে মারলে প্রচণ্ড বেগে।
অন্ধকারে তার মুখ দেখা গেল না।
একজনের পর একজন উঠল, আঘাতের পর আঘাত করলে,
তার প্রাণহীন দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।
রাত্রি নিস্তব্ধ।
ঝর্নার কলশব্দ দূর থেকে ক্ষীণ হয়ে আসছে।
বাতাসে যূথীর মৃদুগন্ধ।

৭

যাত্রীদের মন শঙ্কায় অভিভূত।
মেয়েরা কাঁদছে, পুরুষেরা উত্ত্যক্ত হয় ভর্ৎসনা করছে, চুপ করো
কুকুর ডেকে ওঠে, চাবুক খেয়ে আর্ত কাকুতিতে তার ডাক থেমে যায়।
রাত্রি পোহাতে চায় না।
অপরাধের অভিযোগ নিয়ে মেয়ে পুরুষে তর্ক তীব্র হতে থাকে

সবাই চীৎকার করে, গর্জন করে,
শেষে যখন খাপ থেকে ছুরি বেরোতে চায় এমন সময় অন্ধকার ক্ষীণ হল—
প্রভাতের আলো গিরিশৃঙ্গ ছাপিয়ে আকাশ ভরে দিলে।
হঠাৎ সকলে স্তব্ধ ;
সূর্যরশ্মির তর্জনী এসে স্পর্শ করল
রক্তাক্ত মৃত মানুষের শান্ত ললাট।
মেয়েরা ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠল, পুরুষেরা মুখ ঢাকল দুই হাতে।
কেউ বা অলক্ষিতে পালিয়ে যেতে চায়, পারে না ;
অপরাধের শৃঙ্খলে আপন বলির কাছে তারা বাঁধা।
পরস্পরকে তারা শুধায়, কে আমাদের পথ দেখাবে।
পূর্বদেশের বৃদ্ধ বললে,
আমরা যাকে মেরেছি সেই দেখাবে।
সবাই নিরুত্তর ও নতশির।
বৃদ্ধ আবার বললে, সংশয়ে তাকে আমরা অস্বীকার করেছি,
ক্রোধে তাকে আমরা হনন করেছি,
প্রেমে এখন আমরা তাকে গ্রহণ করব,
কেননা, মৃত্যুর দ্বারা সে আমাদের সকলের জীবনের মধ্যে সঞ্জীবিত,
সেই মহামৃত্যুঞ্জয়।
সকলে দাঁড়িয়ে উঠল, কণ্ঠ মিলিয়ে গান করলে,
জয় মৃত্যুঞ্জয়ের জয়।

৮

তরুণের দল ডাক দিল, চলো যাত্রা করি প্রেমের তীর্থে, শক্তির তীর্থে ;
হাজার কণ্ঠের ধ্বনিনির্ঝরে ঘোষিত হল—
আমরা ইহলোক জয় করব এবং লোকান্তর।
উদ্দেশ্য সকলের কাছে স্পষ্ট নয়, কেবল আগ্রহে সকলে এক ;
মৃত্যুবিপদকে তুচ্ছ করেছে সকলের সম্মিলিত সঞ্চলমান ইচ্ছার বেগ।
তারা আর পথ শুধায় না, তাদের মনে নেই সংশয়,
চরণে নেই ক্লান্তি।
মৃত অধিনেতার আত্মা তাদের অন্তরে বাহিরে—

সে যে মৃত্যুকে উত্তীর্ণ হয়েছে এবং জীবনের সীমাকে করেছে অতিক্রম।
তারা সেই ক্ষেত্র দিয়ে চলেছে যেখানে বীজ বোনা হল,
সেই ভাণ্ডারের পাশ দিয়ে যেখানে শস্য হয়েছে সঞ্চিত,
সেই অনুর্বর ভূমির উপর দিয়ে
যেখানে কঙ্কালসার দেহ বসে আছে প্রাণের কাঙাল;
তারা চলেছে প্রজাবহুল নগরের পথ দিয়ে,
চলেছে জনশূন্যতার মধ্যে দিয়ে
যেখানে বোবা অতীত তার ভাঙা কীর্তি কোলে নিয়ে নিস্তব্ধ;
চলেছে লক্ষ্মীছাড়াদের জীর্ণ বসতি বেয়ে
আশ্রয় যেখানে আশ্রিতকে বিদ্রূপ করে।
রৌদ্রদগ্ধ বৈশাখের দীর্ঘ প্রহর কাটল পথে পথে।
সন্ধ্যাবেলায় আলোক যখন ম্লান তখন তারা কালজ্ঞকে শুধায়,
ওই কি দেখা যায় আমাদের চরম আশার তোরণচূড়া।
সে বলে, না, ও যে সন্ধ্যাভ্রশিখরে অস্তগামী সূর্যের বিলীয়মান আভা।
তরুণ বলে, থেমো না বন্ধু, অন্ধতমিস্র রাত্রির মধ্য দিয়ে
আমাদের পৌঁছতে হবে মৃত্যুহীন জ্যোতির্লোকে।
অন্ধকারে তারা চলে।
পথ যেন নিজের অর্থ নিজে জানে,
পায়ের তলার ধূলিও যেন নীরব স্পর্শে দিক চিনিয়ে দেয়।
স্বর্গপথযাত্রী নক্ষত্রের দল মূক সংগীতে বলে, সাথি, অগ্রসর হও।
অধিনেতার আকাশবাণী কানে আসে, আর বিলম্ব নেই।

৯

প্রত্যূষের প্রথম আভা
অরণ্যের শিশিরবর্ষী পল্লবে পল্লবে ঝলমল করে উঠল।
নক্ষত্রসংকেতবিদ্ জ্যোতিষী বললে, বন্ধু, আমরা এসেছি।
পথের দুই ধারে দিক্‌প্রান্ত অবধি
পরিণত শস্যশীর্ষ স্নিগ্ধ বায়ুহিল্লোলে দোলায়মান—
আকাশের স্বর্ণলিপির উত্তরে ধরণীর আনন্দবাণী।
গিরিপদবর্তী গ্রাম থেকে নদীতলবর্তী গ্রাম পর্যন্ত
প্রতিদিনের লোকযাত্রা শান্ত গতিতে প্রবহমান—

কুমোরের চাকা ঘুরছে গুঞ্জনস্বরে,
কাঠুরিয়া হাটে আনছে কাঠের ভার,
রাখাল ধেনু নিয়ে চলেছে মাঠে,
বধূরা নদী থেকে ঘট ভ'রে যায় ছায়াপথ দিয়ে।
কিন্তু কোথায় রাজার দুর্গ, সোনার খনি,
মারণ-উচাটন-মন্ত্রের পুরাতন পুঁথি ?
জ্যোতিষী বললে, নক্ষত্রের ইঙ্গিতে ভুল হতে পারে না,
তাদের সংকেত এইখানেই এসে থেমেছে।
এই বলে ভক্তিনম্রশিরে পথপ্রান্তে একটি উৎসের কাছে গিয়ে সে দাঁড়ালো।
সেই উৎস থেকে জলস্রোত উঠছে যেন তরল আলোক,
প্রভাত যেন হাসি-অশ্রুর গলিত মিলিত গীতধারায় সমুচ্ছল।
নিকটে তালীকুঞ্জতলে একটি পর্ণকুটির
অনির্বচনীয় স্তব্ধতায় পরিবেষ্টিত।
দ্বারে অপরিচিত সিন্ধুতীরের কবি গান গেয়ে বলছে,
মাতা, দ্বার খোলো।

১০

প্রভাতের একটি রবিরশ্মি রুদ্ধদ্বারের নিম্নপ্রান্তে তির্যক হয়ে পড়েছে।
সম্মিলিত জনসংঘ আপন নাড়ীতে নাড়ীতে যেন শুনতে পেলে
সৃষ্টির সেই প্রথম পরমবাণী, মাতা, দ্বার খোলো।
দ্বার খুলে গেল।
মা বসে আছেন তৃণশয্যায়, কোলে তাঁর শিশু,
উষার কোলে যেন শুকতারা।
দ্বারপ্রান্তে প্রতীক্ষাপরায়ণ সূর্যরশ্মি শিশুর মাথায় এসে পড়ল।
কবি দিলে আপন বীণার তারে ঝংকার, গান উঠল আকাশে :
জয় হোক মানুষের, ওই নবজাতকের, ওই চিরজীবিতের।
সকলে জানু পেতে বসল, রাজা এবং ভিক্ষু, সাধু এবং পাপী, জ্ঞানী এবং মূঢ় ;
উচ্চস্বরে ঘোষণা করলে : জয় হোক মানুষের,
ওই নবজাতকের, ওই চিরজীবিতের।

[শ্রাবণ ১৩৩৮]

শাপমোচন

গন্ধর্ব সৌরসেন সুরলোকের সংগীতসভায়
কলানায়কদের অগ্রণী।
সেদিন তার প্রেয়সী মধুশ্রী গেছে সুমেরুশিখরে
সূর্যপ্রদক্ষিণে।
সৌরসেনের মন ছিল উদাসী।
অনবধানে তার মৃদঙ্গের তাল গেল কেটে,
উর্বশীর নাচে শমে পড়ল বাধা,
ইন্দ্রাণীর কপোল উঠল রাঙা হয়ে।
স্খলিতছন্দ সুরসভার অভিশাপে
গন্ধর্বের দেহশ্রী বিকৃত হয়ে গেল,
অরুণেশ্বর নাম নিয়ে তার জন্ম হল
গান্ধাররাজগৃহে।
মধুশ্রী ইন্দ্রাণীর পাদপীঠে মাথা রেখে পড়ে রইল;
বললে, 'বিচ্ছেদ ঘটিয়ো না,
একই লোকে আমাদের গতি হোক,
একই দুঃখভোগে, একই অবমাননায়।'
শচী সকরুণ দৃষ্টিতে ইন্দ্রের পানে তাকালেন।
ইন্দ্র বললেন, 'তথাস্তু, যাও মর্তে—
সেখানে দুঃখ পাবে, দুঃখ দেবে।
সেই দুঃখে ছন্দঃপাতন-অপরাধের ক্ষয়।'
মধুশ্রী জন্ম নিল মদ্ররাজকুলে, নাম নিল কমলিকা।

একদিন গান্ধারপতির চোখে পড়ল মদ্ররাজকন্যার ছবি।
সেই ছবি তার দিনের চিন্তা তার রাত্রের স্বপ্নের 'পরে
আপন ভূমিকা রচনা করলে।
গান্ধারের দূত এল মদ্ররাজধানীতে।
বিবাহপ্রস্তাব শুনে রাজা বললে,
'আমার কন্যার দুর্লভ ভাগ্য।'

ফাল্গুন মাসের পুণ্যতিথিতে শুভলগ্ন।
রাজহস্তীর পৃষ্ঠে রত্নাসনে মদ্ররাজসভায়
এসেছে মহারাজ অরুণেশ্বরের অঙ্কবিহারিণী বীণা।
স্তব্ধসংগীতে সেই রাজপ্রতিনিধির সঙ্গে কন্যার বিবাহ।
যথাকালে রাজবধূ এল পতিগৃহে।

নির্বাণদীপ অন্ধকার ঘরেই প্রতি রাত্রে স্বামীর কাছে বধূসমাগম।
কমলিকা বলে, 'প্রভু, তোমাকে দেখবার জন্যে
আমার দিন আমার রাত্রি উৎসুক। আমাকে দেখা দাও।'
রাজা বলে, 'আমার গানেই তুমি আমাকে দেখো।'
অন্ধকারে বীণা বাজে।
অন্ধকারে গান্ধর্বীকলার নৃত্যে বধূকে বর প্রদক্ষিণ করে।
সেই নৃত্যকলা নির্বাসনের সঙ্গিনী হয়ে এসেছে
তার মর্তদেহে।
নৃত্যের বেদনা রানীর বক্ষে এসে দুলে দুলে ওঠে,
নিশীথরাত্রে সমুদ্রে জোয়ার এলে
তার ঢেউ যেমন লাগে তটভূমিতে—
অশ্রুতে প্লাবিত করে দেয়।

একদিন রাত্রির তৃতীয় প্রহরের শেষে
যখন শুকতারা পূর্বগগনে,
কমলিকা তার সুগন্ধি এলো চুলে রাজার দুই পা ঢেকে দিলে;
বললে, 'আদেশ করো আজ উষার প্রথম আলোকে
তোমাকে প্রথম দেখব।'
রাজা বললে, 'প্রিয়ে, না-দেখার নিবিড় মিলনকে
নষ্ট কোরো না এই মিনতি।'
মহিষী বললে, 'প্রিয়প্রসাদ থেকে
আমার দুই চক্ষু কি চিরদিন বঞ্চিত থাকবে
অন্ধতার চেয়েও এ যে বড়ো অভিশাপ।'
অভিমানে মহিষী মুখ ফেরালে।

রাজা বললে, 'কাল চৈত্রসংক্রান্তি।
নাগকেশরের বনে নিভৃতে সখাদের সঙ্গে আমার নৃত্যের দিন।
প্রাসাদশিখর থেকে চেয়ে দেখো।'
মহিষীর দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল ;
বললে, 'চিনব কী করে।'
রাজা বললে, 'যেমন খুশি কল্পনা করে নিয়ো,
সেই কল্পনাই হবে সত্য।'

চৈত্রসংক্রান্তির রাত্রে আবার মিলন।
মহিষী বললে, 'দেখলাম নাচ। যেন মঞ্জরিত শালতরুশ্রেণীতে
বসন্তবাতাসের মত্ততা।
সকলেই সুন্দর,
যেন ওরা চন্দ্রলোকের শুক্লপক্ষের মানুষ।
কেবল একজন কুশ্রী কেন রসভঙ্গ করলে, ও যেন রাহুর অনুচর।
ওখানে কী গুণে সে পেল প্রবেশের অধিকার।'
রাজা স্তব্ধ হয়ে রইল।
কিছু পরে বললে, 'ওই কুশ্রীর পরম বেদনাতেই তো সুন্দরের আহ্বান।
কালো মেঘের লজ্জাকে সান্ত্বনা দিতেই সূর্যরশ্মি তার ললাটে পরায় ইন্দ্রধনু,
মরুনীরস কালো মর্তের অভিশাপের উপর স্বর্গের করুণা যখন রূপ ধরে
তখনই তো শ্যামলসুন্দরের আবির্ভাব।
প্রিয়তমে, সেই করুণাই কি তোমার হৃদয়কে কাল মধুর করে নি।'
'না মহারাজ, না' ব'লে মহিষী দুই হাতে মুখ ঢাকলে।
রাজার কণ্ঠের সুরে অশ্রুর ছোঁওয়া লাগল ;
বললে, 'যাকে দয়া করলে হৃদয় তোমার ভরে উঠত
তাকে ঘৃণা ক'রে মনকে কেন পাথর করলে।'
'রসবিকৃতির পীড়া সইতে পারি নে'
এই ব'লে মহিষী আসন থেকে উঠে পড়ল।
রাজা তার হাত ধরলে ;
বললে, 'একদিন সইতে পারবে আপনারই আন্তরিক রসের দাক্ষিণ্যে—
কুশ্রীর আত্মত্যাগে সুন্দরের সার্থকতা।'

ভ্রূ কুটিল করে মহিষী বললে,
'অসুন্দরের জন্যে তোমার এই অনুকম্পার অর্থ বুঝি নে।
ঐ শোনো, উষার প্রথম কোকিলের ডাক,
অন্ধকারের মধ্যে তার আলোকের অনুভূতি।
আজ সূর্যোদয়মুহূর্তে তোমারও প্রকাশ হবে
আমার দিনের মধ্যে, এই আশায় রইলাম।'
রাজা বললে, 'তাই হোক, ভীরুতা যাক কেটে।'
দেখা হল।
ট'লে উঠল যুগলের সংসার।
'কী অন্যায়— কী নিষ্ঠুর বঞ্চনা'
বলতে বলতে কমলিকা ঘর থেকে ছুটে পালিয়ে গেল।

গেল বহুদূরে
বনের মধ্যে মৃগয়ার জন্যে যে নির্জন রাজগৃহ আছে সেইখানে।
কুয়াশায় শুকতারার মতো লজ্জায় সে আচ্ছন্ন।
রাত্রি যখন দুই প্রহর তখন আধ-ঘুমে সে শুনতে পায়
এক বীণাধ্বনির আর্তরাগিণী।
স্বপ্নে বহুদূরের আভাস আসে,
মনে হয় এই সুর চিরদিনের চেনা।
রাতের পরে রাত গেল।
অন্ধকারে তরুতলে যে মানুষ ছায়ার মতো নাচে
তাকে চোখে দেখে না, তাকে হৃদয়ে দেখা যায়—
যেমন দেখা যায় জনশূন্য দেওদার বনের দোলায়িত শাখায়
দক্ষিণসমুদ্রের হাওয়ার হাহাকার-মূর্তি।

এ কী হল রাজমহিষীর।
কোন্ হতাশের বিরহ তার বিরহকে জাগিয়ে তোলে!
মাটির প্রদীপ-শিখায় সোনার প্রদীপ জ্বলে উঠল বুঝি।
রাতজাগা পাখি নিস্তব্ধ নীড়ের পাশ দিয়ে হুহু করে উড়ে যায়,
তার পাখার শব্দে ঘুমন্ত পাখির পাখা উৎসুক হয়ে ওঠে যে।

বীণায় বাজতে থাকে কেদারা বেহাগ, বাজে কালাংড়া।
আকাশে আকাশে তারাগুলি যেন তামসী তপস্বিনীর নীরব জপমন্ত্র।
রাজমহিষী বিছানার 'পরে উঠে বসে।
স্রস্ত তার বেণী, ত্রস্ত তার বক্ষ।
বীণার গুঞ্জরণ আকাশে মেলে দেয় এক অন্তহীন অভিসারের পথ।
রাগিণী-বিছানো সেই শূন্যপথে বেরিয়ে পড়ে তার মন।
কার দিকে। দেখার আগে যাকে চিনেছিল তারই দিকে।

একদিন নিম ফুলের গন্ধ অন্ধকার ঘরে অনির্বচনীয়ের আমন্ত্রণ নিয়ে এসেছে।
মহিষী বিছানা ছেড়ে বাতায়নের কাছে এসে দাঁড়ালো।
নীচে সেই ছায়ামূর্তির নৃত্য, বিরহের সেই উর্মি-দোলা।
মহিষীর সমস্ত দেহ কম্পিত।
ঝিল্লিঝংকৃত রাত, কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ দিগন্তে।
অস্পষ্ট আলোয় অরণ্য স্বপ্নে কথা কইছে।
সেই বোবা বনের ভাষাহীন বাণী লাগল রাজমহিষীর অঙ্গে অঙ্গে।
কখন নাচ আরম্ভ হল সে জানে না।
এ নাচ কোন্ জন্মান্তরের, কোন্ লোকান্তরের।

গেল আরো দুই রাত।
অভিসারের পথ একান্তই শেষ হয়ে আসছে এই জানলারই কাছে।
সেদিন বীণায় পরজের বিহ্বল মিড়।
কমলিকা আপন মনে নীরবে বলছে,
'ওগো কাতর, ওগো হতাশ, আর ডেকো না।
আমার আর দেরি নেই।'
কিন্তু যাবে কার কাছে।
চোখে না দেখেছিল যাকে তারই কাছে তো?
কেমন করে হবে।
দেখা-মানুষ আজ না-দেখা মানুষকে ছিনিয়ে নিয়ে
পাঠিয়ে দিলে সাত-সমুদ্র-পারে রূপকথার দেশে।
সেখানকার পথ কোন্ দিকে।

আরো এক রাত যায়।
কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ ডুবেছে অমাবস্যার তলায়।
আঁধারের ডাক কী গভীর।
পথ-না-জানা যত-সব গুহা-গহ্বর মনের মধ্যে প্রচ্ছন্ন
এই ডাক সেখানে গিয়ে প্রতিধ্বনি জাগায়।
সেই অস্ফুট আকাশবাণীর সঙ্গে মিলে ঐ যে বাজে বীণায় কানাড়া।
রাজমহিষী উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'আজ আমি যাব।
আমার চোখকে আমি আর ভয় করি নে।'
পথের শুকনো পাতা পায়ে পায়ে বাজিয়ে দিয়ে
সে গেল পুরাতন অশথ গাছের তলায়।
বীণা থামল।
মহিষী থমকে দাঁড়ালো।
রাজা বললে, 'ভয় কোরো না প্রিয়ে, ভয় কোরো না।'
তার গলার স্বর জলে-ভরা মেঘের দূর গুরু-গুরু ধ্বনির মতো।
'আমার কিছু ভয় নেই, তোমারই জয় হল।'
এই বলে মহিষী আঁচলের আড়াল থেকে প্রদীপ বের করলে,
ধীরে ধীরে তুললে রাজার মুখের কাছে।
কণ্ঠ দিয়ে কথা বেরোতে চায় না, পলক পড়ে না চোখে।
বলে উঠল, 'প্রভু আমার, প্রিয় আমার,
এ কী সুন্দর রূপ তোমার।'

পৌষ ১৩৩৮

ছুটি

দাও-না ছুটি,
কেমন করে বুঝিয়ে বলি
কোন্‌খানে।
যেখানে ঐ শিরীষ-বনের গন্ধপথে
মৌমাছিদের কাঁপছে ডানা সারাবেলা।
যেখানেতে মেঘ-ভাসা ঐ সুদূরতা,
জলের প্রলাপ যেখানে প্রাণ উদাস করে

সন্ধ্যাতারা ওঠার মুখে,
যেখানে সব প্রশ্ন গেছে থেমে—
শূন্য ঘরে অতীত স্মৃতি গুন্‌গুনিয়ে
ঘুম ভাঙিয়ে রাখে না আর
বাদলরাতে।
যেখানে এই মন
গোরুচরা মাঠের মধ্যে স্তব্ধ বটের মতো
গাঁয়ে-চলা পথের পাশে।
কেউ বা এসে প্রহর-খানেক
বসে তলায়,
পা ছড়িয়ে কেউ বা বাজায় বাঁশি,
নববধূর পাল্কিখানা নামিয়ে রাখে
ক্লান্ত দুই পহরে ;
কৃষ্ণ-একাদশীর রাতে
ছায়ার সঙ্গে ঝিল্লিরবে জড়িয়ে পড়ে
চাঁদের শীর্ণ আলো।
যাওয়া-আসার স্রোত বহে যায়
দিনে রাতে—
ধরে-রাখার নাই কোনো আগ্রহ,
দূরে-রাখার নাই তো অভিমান।
রাতের তারা স্বপ্নপ্রদীপখানি
ভোরের আলোয় ভাসিয়ে দিয়ে
যায় চলে, তার দেয় না ঠিকানা।

২১ ভাদ্র. ১৩৩৯

গানের বাসা

তোমরা দুটি পাখি,
মিলন-বেলায় গান কেন আজ
মুখে মুখে নীরব হল।

আতশবাজির বক্ষ থেকে
চতুর্দিকে স্ফুলিঙ্গ সব ছিটকে পড়ে—
তেমনি তোমাদের
বিরহতাপ ছড়িয়ে গিয়েছিল
সারারাত্রি সুরে সুরে বনের থেকে বনে।
গানের মূর্তি নিয়ে তারা পড়ল না তো ধরা—
বাতাস তাদের মিলিয়ে দিল
দিগন্তরের অরণ্যচ্ছায়ায়।

আমরা মানুষ, ভালোবাসার জন্যে বাসা বাঁধি,
চিরকালের ভিত গড়ি তার গানের সুরে;
খুঁজে আনি জরাবিহীন বাণী
সে মন্দিরের গাঁথন দিতে।
বিশ্বজনের সবার জন্যে সে গান থাকে
সব প্রেমিকের প্রাণের আসন মেলে দিয়ে।
বিপুল হয়ে উঠেছে সে
দেশে দেশে কালে কালে।
মাটির মধ্যখানে থেকে
মাটিকে সে অনেক দূরে ছাড়িয়ে তোলে মাথা
কল্পস্বর্গলোকে।

সহজ ছন্দে যায় আনন্দে জীবন তোমাদের
উধাও পাখার নাচের তালে।
দুরু দুরু কোমল বুকের প্রেমের বাসা
আপনি আছে বাঁধা
পাখির ভুবনে।
প্রাণের রসে শ্যামল মধুর,
মুখরিত গুঞ্জনে মর্মরে,
ঝলকিত চিকন পাতার দোলনে কম্পনে,
পুলকিত ফুলের উল্লাসে,

নব নব ঋতুর মায়া-তুলি
সাজায় তারে নবীন রঙে—
মনে-রাখা ভুলে-যাওয়া
যেন দুটি প্রজাপতির মতো
সেই নিভৃতে অনায়াসে হাল্কা পাথায়
আলোছায়ার সঙ্গে বেড়ায় খেলে।

আমরা কেবল বানিয়ে তুলি
আপন ব্যথার রঙে রসে
ধূলির থেকে পালিয়ে যাবার সৃষ্টিছাড়া ঠাঁই,
বেড়া দিয়ে আগলে রাখি
ভালোবাসার জন্যে দূরের বাসা—
সেই আমাদের গান।

৩১ ভাদ্র ১৩৩৯

পয়লা আশ্বিন

হিমের শিহর লেগেছে আজ মৃদু হাওয়ায়
আশ্বিনের এই প্রথম দিনে।
ভোরবেলাকার চাঁদের আলো
মিলিয়ে আসে শ্বেতকরবীর রঙে।
শিউলিফুলের নিশ্বাস বয়
ভিজে ঘাসের ’পরে,
তপস্বিনী উষার পরা পুজোর চেলির
গন্ধ যেন
আশ্বিনের এই প্রথম দিনে।

পুব আকাশে শুভ্র আলোর শঙ্খ বাজে—

বুকের মধ্যে শব্দ যে তার
রক্তে লাগায় দোলা।
কত যুগের কত দেশের বিশ্ববিজয়ী
মৃত্যুপথে ছুটেছিল
অমর প্রাণের অসাধ্য সন্ধানে।
তাদেরই সেই বিজয়শঙ্খ
রেখে গেছে অরব ধ্বনি
শিশির-ধোওয়া রোদে।
বাজল রে আজ বাজল রে তার
ঘর-ছাড়ানো ডাক
আশ্বিনের এই প্রথম দিনে।

ধনের বোঝা, খ্যাতির বোঝা, দুর্ভাবনার বোঝা
ধুলোয় ফেলে দিয়ে
নিরুদ্‌বেগে চলেছিল জটিল সংকটে।
ললাট তাদের লক্ষ্য ক'রে
পঙ্কপিণ্ড হেনেছিল
দুর্জনেরা মলিন হাতে;
নেমেছিল উল্কা আকাশ থেকে,
পায়ের তলায় নীরস নিঠুর পথ
তুলেছিল গুপ্ত ক্ষুদ্র কুটিল কাঁটা।
পায় নি আরাম, পায় নি বিরাম,
চায় নি পিছন ফিরে;
তাদেরই সেই শুভ্রকেতনগুলি
ঐ উড়েছে শরৎপ্রাতের মেঘে
আশ্বিনের এই প্রথম দিনে।

ভয় কোরো না, লোভ কোরো না, ক্ষোভ কোরো না,
জাগো আমার মন—
গান জাগিয়ে চলো সমুখ-পথে

যেখানে ঐ কাশের চামর দোলে
নবসূর্যোদয়ের দিকে ।
নৈরাশ্যের নখর হতে
রক্ত-ঝরা আপনাকে আজ ছিন্ন করে আনো,
আশার মোহ-শিকড়গুলো উপড়ে দিয়ে যাও—
লালসাকে দলো পায়ের তলায় ।
মৃত্যুতোরণ যখন হবে পার
পরাজয়ের গ্লানিভরে মাথা তোমার না হয় যেন নত ।
ইতিহাসের আত্মজয়ী বিশ্ববিজয়ী
তাদের মাভৈঃ বাণী বাজে নীরব নির্ঘোষণে
নির্মল এই শরৎ-রৌদ্রালোকে
আশ্বিনের এই প্রথম দিনে ।

১ আশ্বিন ১৩৩৯

নাটক ও প্রহসন

নাটকের পাত্রপাত্রীগণ

চন্দ্রমাধববাবু	কলিকাতার কোনো কলেজের অধ্যাপক চিরকুমার-সভার সভাপতি
শ্রীশ, বিপিন, পূর্ণ	চিরকুমার-সভার সভ্যগণ
অক্ষয়কুমার	জগত্তারিণীর বড়ো জামাতা
রসিকদাদা	জগত্তারিণীর দূরসম্পর্কীয় খুড়া
বনমালী	ঘটক
গুরুদাস	ওস্তাদ
দারুকেশ্বর, মৃত্যুঞ্জয়	কুলীন যুবকদ্বয়
জগত্তারিণী	বিধবা হিন্দু মহিলা
পুরবালা	জগত্তারিণীর জ্যেষ্ঠা কন্যা, অক্ষয়কুমারের স্ত্রী
শৈলবালা	জগত্তারিণীর বিধবা কন্যা
নৃপবালা, নীরবালা	জগত্তারিণীর দুই অবিবাহিতা কন্যা
নির্মলা	চন্দ্রমাধববাবুর অবিবাহিতা ভাগিনেয়ী

চিরকুমার-সভা

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

অক্ষয়ের বৈঠকখানা

অক্ষয় ও পুরবালা

পুরবালা। তোমার নিজের বোন হলে দেখতুম কেমন চুপ করে বসে থাকতে। এত দিনে এক-একটির তিনটি চারটি করে পাত্র জুটিয়ে আনতে। ওরা আমার বোন কিনা—

অক্ষয়। মানবচরিত্রের কিছুই তোমার কাছে লুকোনো নেই। নিজের বোনে এবং স্ত্রীর বোনে যে কত প্রভেদ তা এই কাঁচা বয়সেই বুঝে নিয়েছ। তা ভাই, শ্বশুরের কোনো কন্যাটিকেই পরের হাতে সমর্পণ করতে কিছুতেই মন সরে না— এ বিষয়ে আমার ঔদার্যের অভাব আছে তা স্বীকার করতে হবে।

পুরবালা। দেখো, তোমার সঙ্গে আমার একটা বন্দোবস্ত করতে হচ্ছে।

অক্ষয়। একটা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত তো মন্ত্র পড়ে বিবাহের দিনেই হয়ে গেছে, আবার আর একটা!

পুরবালা। ওগো, এটা তত ভয়ানক নয়। এটা হয়তো তেমন অসহ্য না হতেও পারে।

অক্ষয়। সখী, তবে খুলে বলো।

গান

কী জানি কী ভেবেছ মনে
খুলে বলো ললনে।
কী কথা হায় ভেসে যায় ঐ
ছলছল নয়নে।

পুরবালা। ওস্তাদজি, থামো। আমার প্রস্তাব এই-যে দিনের মধ্যে একটা সময় ঠিক করো যখন তোমার ঠাট্টা বন্ধ থাকবে, যখন তোমার সঙ্গে দুটো-একটা কাজের কথা হতে পারবে।

অক্ষয়। গরিবের ছেলে, স্ত্রীকে কথা বলতে দিতে ভরসা হয় না, পাছে খপ করে বাজুবন্দ চেয়ে বসে।

গান

পাছে চেয়ে বসে আমার মন
আমি তাই ভয়ে ভয়ে থাকি।
পাছে চোখে চোখে পড়ে বাঁধা
আমি তাই তো তুলি নে আঁখি।

পুরবালা। তবে যাও।

অক্ষয়। না না, রাগারাগি না। আচ্ছা, যা বল তাই শুনব। খাতায় নাম লিখিয়ে তোমার ঠাট্টানিবারণী সভার সভ্য হব। তোমার সামনে কোনো রকমের বেয়াদবি করব না। তা, কী কথা হচ্ছিল। শ্যালীদের বিবাহ। উত্তম প্রস্তাব।

পুরবালা। দেখো, এখন বাবা নেই। মা তোমারই মুখ চেয়ে আছেন। তোমারই কথা শুনে এখনও তিনি বেশি বয়স পর্যন্ত মেয়েদের লেখাপড়া শেখাচ্ছেন। এখন যদি সৎপাত্র না জুটিয়ে দিতে পার তা হলে কী অন্যায় হবে ভেবে দেখো দেখি।

অক্ষয়। আমি তো তোমাকে বলেইছি তোমরা কোনো ভাব্‌না কোরো না। আমার শ্যালীপতিরা গোকুলে বাড়ছেন।

পুরবালা। গোকুলটি কোথায়।

অক্ষয়। যেখান থেকে এই হতভাগ্যকে তোমার গোষ্ঠে ভর্তি করেছ। আমাদের সেই চিরকুমার-সভা।

পুরবালা। প্রজাপতির সঙ্গে তাদের যে লড়াই।

অক্ষয়। দেবতার সঙ্গে লড়াই করে পারবে কেন। তাঁকে কেবল চটিয়ে দেয় মাত্র। সেইজন্যে ভগবান প্রজাপতির বিশেষ ঝোঁক ওই সভাটার উপরেই। সরা-চাপা হাঁড়ির মধ্যে মাংস যেমন গুমে গুমে সিদ্ধ হতে থাকে প্রতিজ্ঞার মধ্যে চাপা থেকে সভ্যগুলিও একেবারে হাড়ের কাছ পর্যন্ত নরম হয়ে উঠেছেন, দিব্যি বিবাহযোগ্য হয়ে এসেছেন— এখন পাতে দিলেই হয়। আমিও তো এক কালে ওই সভার সভাপতি ছিলুম।

পুরবালা। তোমার কী রকম দশাটা হয়েছিল।

অক্ষয়। সে আর কী বলব। প্রতিজ্ঞা ছিল স্ত্রী শব্দ পর্যন্ত মুখে উচ্চারণ করব

না, কিন্তু শেষকালে এমনি হল যে মনে হ'ত শ্রীকৃষ্ণের ষোলো-শো গোপিনী যদি বা সম্প্রতি দুষ্প্রাপ্য হন অন্তত মহাকালীর চৌষট্টি হাজার যোগিনীর সন্ধান পেলেও একবার পেট ভরে প্রেমালাপটা করে নিই— ঠিক সেই সময়টাতেই তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হল আর-কি।

পুরবালা। চৌষট্টি হাজারের শখ মিটল ?

অক্ষয়। সে আর তোমার মুখের সামনে বলব না। জাঁক হবে। তবে ইশারায় বলতে পারি, মা কালী দয়া করেছেন বটে।

পুরবালা। তবে আমিও বলি, বাবা ভোলানাথের নন্দীভৃঙ্গীর অভাব ছিল না, আমাকে বুঝি তিনি দয়া করেছিলেন।

অক্ষয়। তা হতে পারে, সেইজন্যেই কার্তিকটি পেয়েছ।

পুরবালা। আবার ঠাট্টা শুরু হল ?

অক্ষয়। কার্তিকের কথাটা বুঝি ঠাট্টা? গা ছুঁয়ে বলছি, ওটা আমার অন্তরের বিশ্বাস।

শৈলবালার প্রবেশ

শৈলবালা। মুখুজ্জেমশায়, এইবার তোমার ছোটো দুটি শ্যালীকে রক্ষা করো।

অক্ষয়। যদি অরক্ষণীয়া হয়ে থাকেন তো আমি আছি। ব্যাপারটা কী।

শৈলবালা। মার কাছে তাড়া খেয়ে রসিকদাদা কোথা থেকে একজোড়া কুলীনের ছেলে এনে হাজির করেছেন, মা স্থির করেছেন তাদের সঙ্গেই তাঁর দুই মেয়ের বিবাহ দেবেন।

অক্ষয়। ওরে বাস রে। একেবারে বিয়ের এপিডেমিক। প্লেগের মতো। এক বাড়িতে একসঙ্গে দুই কন্যেকে আক্রমণ। ভয় হয় পাছে আমাকেও ধরে।

গান

বড়ো থাকি কাছাকাছি,
তাই ভয়ে ভয়ে আছি।
নয়ন বচন কোথায় কখন বাজিলে বাঁচি না-বাঁচি।

শৈলবালা। এই কি তোমার গান গাবার সময় হল।

অক্ষয়। কী করব ভাই। রোশনচৌকি বাজাতে শিখি নি, তা হলে ধরতুম। বল কী। শুভকর্ম! দুই শ্যালীর উদ্‌বাহবন্ধন! কিন্তু এত তাড়াতাড়ি কেন।

শৈলবালা। বৈশাখ মাসের পর আসছে বছরে অকাল পড়বে, আর বিয়ের দিন নেই।

পুরবালা। তোরা আগে থাকতে ভাবিস কেন শৈল, পাত্র আগে দেখা যাক তো।

জগত্তারিণীর প্রবেশ

জগত্তারিণী। বাবা অক্ষয়।

অক্ষয়। কী মা।

জগত্তারিণী। তোমার কথা শুনে আর তো মেয়েদের রাখতে পারি নে।

শৈলবালা। মেয়েদের রাখতে পার না ব'লেই কি মেয়েদের ফেলে দেবে মা।

জগত্তারিণী। ওই তো। তোদের কথা শুনলে গায়ে জ্বর আসে। বাবা অক্ষয়, শৈল বিধবা মেয়ে, ওকে এত পড়িয়ে, পাস করিয়ে, কী হবে বলো দেখি। ওর এত বিদ্যের দরকার কী।

অক্ষয়। মা, শাস্ত্রে লিখেছে, মেয়েমানুষের একটা না একটা কিছু উৎপাত থাকা চাই— হয় স্বামী, নয় বিদ্যে, নয় হিস্টিরিয়া। দেখো-না, লক্ষ্মীর আছেন বিষ্ণু, তাঁর আর বিদ্যের দরকার হয় নি, তাই স্বামীটিকে এবং পেঁচাটিকে নিয়েই আছেন; আর সরস্বতীর স্বামী নেই, কাজেই তাঁকে বিদ্যে নিয়ে থাকতে হয়।

জগত্তারিণী। তা, যা বল বাবা, আসছে বৈশাখে মেয়েদের বিয়ে দেবই।

পুরবালা। হাঁ মা, আমারও সেই মত। মেয়েমানুষের সকাল সকাল বিয়ে হওয়াই ভালো।

অক্ষয়। (জনান্তিকে) তা তো বটেই। বিশেষত যখন একাধিক স্বামী শাস্ত্রে নিষেধ তখন সকাল সকাল বিয়ে করে সময়ে পুষিয়ে নেওয়া চাই।

পুরবালা। আঃ কী বকছ। মা শুনতে পাবেন।

জগত্তারিণী। রসিককাকা আজ পাত্র দেখাতে আসবেন। তা, চল্‌ মা পুরি, তাদের জলখাবার ঠিক করে রাখিগে। [জগত্তারিণীর ও পুরবালার প্রস্থান

শৈলবালা। আর তো দেরি করা যায় না মুখুজ্জেমশায়। এইবার তোমার সেই চিরকুমার-সভার বিপিনবাবু শ্রীশবাবুকে বিশেষ একটু তাড়া না দিলে চলছে না। আহা, ছেলে দুটি চমৎকার। আমাদের নেপো আর নীরর সঙ্গে দিব্যি মানায়। তুমি তো চৈত্রমাস যেতে না-যেতে আপিস ঘাড়ে করে সিমলে যাবে, এবারে মাকে ঠেকিয়ে রাখা শক্ত হবে।

অক্ষয়। কিন্তু, তাই ব'লে সভাটিকে হঠাৎ অসময়ে তাড়া লাগালে যে চমকে যাবে। ডিমের খোলা ভেঙে ফেললেই কিছু পাখি বেরোয় না। যথোচিত তা দিতে হবে, তাতে সময় লাগে।

শৈলবালা। বেশ তো, তা দেবার ভার আমি নেব মুখুজ্জেমশায়।

অক্ষয়। আর-একটু খোলসা করে বলতে হচ্ছে।

শৈলবালা। ওই তো দশ নম্বরে ওদের সভা? আমাদের ছাদের উপর দিয়ে দেখন-হাসির বাড়ি পেরিয়ে ওখানে ঠিক যাওয়া যাবে। আমি পুরুষবেশে ওদের সভার সভ্য হব, তার পরে সভা কতদিন টেঁকে আমি দেখে নেব।

অক্ষয়। তা হলে জন্মটা বদলে নিয়ে আর-একবার সভ্য হব। একবার তোমার দিদির হাতে নাকাল হয়েছি, এবার তোমার হাতে। কুমার হবার সুখটাই ওই— কটাক্ষবাণগুলোকে লক্ষ্যভেদ করবার সুযোগ দেওয়া যায়।

শৈলবালা। ছি মুখুজ্জেমশায়, তুমি সেকেলে হয়ে যাচ্ছ। ওই-সব নয়নবাণ-টানগুলোর এখন কি আর চলন আছে। যুদ্ধবিদ্যার যে এখন অনেক বদল হয়ে গেছে।

নৃপবালা ও নীরবালার প্রবেশ

নৃপ শান্ত স্নিগ্ধ, নীর তাহার বিপরীত— কৌতুকে এবং চাঞ্চল্যে সে সর্বদাই আন্দোলিত

নীরবালা। (শৈলকে জড়াইয়া ধরিয়া) মেজদিদিভাই, আজ কারা আসবে বল্ তো।

নৃপবালা। মুখুজ্জেমশায়, আজ কি তোমার বন্ধুদের নিমন্ত্রণ আছে। জলখাবারের আয়োজন হচ্ছে কেন।

অক্ষয়। ওই তো! বই পড়ে পড়ে চোখ কানা করলে— পৃথিবীর আকর্ষণে উল্কাপাত কী করে ঘটে সে সমস্ত লাখ-দুলাখ ক্রোশের খবর রাখ, আর আজ ১৮ নম্বর মধুমিস্ত্রির গলিতে কার আকর্ষণে কে এসে পড়ছে সেটা অনুমান করতেও পারলে না?

নীরবালা। বুঝেছি ভাই সেজদিদি। তোর বর আসছে ভাই, তাই সকালবেলা আমার বাঁ চোখ নাচছিল।

নৃপবালা। তোর বাঁ চোখ নাচলে আমার বর আসবে কেন।

নীরবালা। তা ভাই, আমার বাঁ চোখটা নাহয় তোর বরের জন্যে নেচে নিলে, তাতে আমি দুঃখিত নই। কিন্তু মুখুজ্জেমশায়, জলখাবর তো দুটি লোকের জন্যে দেখলুম, সেজদিদি কি স্বয়ম্বরা হবে নাকি।

অক্ষয়। আমাদের ছোড়দিদিও বঞ্চিত হবেন না।

নীরবালা। আহা মুখুজ্জেমশায়, কী সুসংবাদ শোনালে। তোমাকে কী বকশিশ দেব। এই নাও আমার গলার হার, আমার দু হাতের বালা।

শৈলবালা। আঃ ছি, হাত খালি করিস নে।

নীরবালা। আজ আমাদের বরের অনারে পড়ার ছুটি দিতে হবে মুখুজ্জেমশায়।

নৃপবালা। আঃ, কী বর বর করছিস। দেখো তো ভাই মেজদিদি।

অক্ষয়। ওকে ওই জন্যেই তো বর্বরা নাম দিয়েছি। অয়ি বর্বরে, ভগবান তোমাদের কটি সহোদরাকে এই একটি অক্ষয় বর দিয়ে রেখেছেন, তবু তৃপ্তি নেই ?

নীরবালা। সেইজন্যেই তো লোভ বেড়ে গেছে।

নৃপ তাহাকে টানিয়া লইয়া চলিল

(চলিতে চলিতে) এলে খবর দিয়ো মুখুজ্জেমশায়, ফাঁকি দিয়ো না। দেখছ তো সেজদিদি কিরকম চঞ্চল হয়ে উঠেছে।—

গান

না ব'লে যায় পাছে সে
আঁখি মোর ঘুম না জানে।

অক্ষয়। ভয় নেই, ভয় নেই। একটা যায় তো আর-একটা আসবে। যে বিধাতা আগুন সৃষ্টি করেছেন পতঙ্গও তিনিই জুটিয়ে দেবেন। এখন গানটা চলুক।

নীরবালা।—
কাছে তার রই, তবুও
ব্যথা যে রয় পরানে।

অক্ষয়। নীরু, এটা তো আগন্তুকদের লক্ষ্য করে তৈরি হয় নি। কাছের মানুষটি কে বলো তো।

নীরবালা।—
যে পথিক পথের ভুলে
এল মোর প্রাণের কূলে
পাছে তার ভুল ভেঙে যায়
চলে যায় কোন্ উজানে,
আঁখি মোর ঘুম না জানে।

অক্ষয়। এ তো আমার সঙ্গে মিলছে। কিন্তু ভাই, জেনেশুনেই পথ ভুলেছি, সুতরাং সে ভুল ভাঙবার রাস্তা রাখি নি।

নীরবালা।—
এল যেই এল আমার আগল টুটে,
খোলা দ্বার দিয়ে আবার যাবে ছুটে।
খেয়ালের হাওয়া লেগে
যে খেপা ওঠে জেগে
সে কি আর সেই অবেলায়
মিনতির বাধা মানে।
আঁখি মোর ঘুম না জানে।

অক্ষয়।— গান

না, না গো, না
কোরো না ভাবনা—
যদি বা নিশি যায় যাব না, যাব না।
যখনি চলে যাই
আসিব বলে যাই,
আলো-ছায়ার পথে করি আনাগোনা।
দোলাতে দোলে মন মিলনে বিরহে।
বারে বারেই জানি তুমি তো চির হে।
ক্ষণিক আড়ালে
বারেক দাঁড়ালে
মরি ভয়ে ভয়ে পাব কি পাব না।

নীরবালা। বড়ো নিশ্চিন্ত হলুম। তা হলে ঘুমোতে পারি।

অক্ষয়। নির্ভয়ে। [নৃপবালা ও নীরবালার প্রস্থান

শৈলবালা। মুখুজ্জেমশায়, আমি ঠাট্টা করছি নে— আমি চিরকুমার-সভার সভ্য হব। কিন্তু আমার সঙ্গে পরিচিত একজন কাউকে চাই তো। তোমার বুঝি আর সভ্য হবার জো নেই ?

অক্ষয়। না, আমি পাপ করেছি। তোমার দিদি আমার তপস্যা ভঙ্গ করে আমাকে স্বর্গ হতে বঞ্চিত করেছেন।

শৈলবালা। তা হলে রসিকদাদাকে ধরতে হচ্ছে। তিনি তো কোনো সভার সভ্য না হয়েও চিরকুমার-ব্রত রক্ষা করেছেন।

অক্ষয়। সভ্য হলেই এই বুড়োবয়সে ব্রতটি খোয়াবেন। ইলিশমাছ অমনি দিব্যি থাকে, ধরলেই মারা যায় ; প্রতিজ্ঞাও ঠিক তাই, তাকে বাঁধলেই তার সর্বনাশ।

রসিকের প্রবেশ

রসিকদাদার সম্মুখের মাথায় টাক, গোঁফ পাকা, গৌরবর্ণ, দীর্ঘাকৃতি

অক্ষয়। ওরে পাষণ্ড, ভণ্ড, অকালকুষ্মাণ্ড।

রসিক। কেন হে মত্তমন্থর কুঞ্জকুঞ্জর পুঞ্জঅঞ্জনবর্ণ।

অক্ষয়। তুমি আমার শ্যালী-পুষ্পবনে দাবানল আনতে চাও ?

শৈলবালা। রসিকদাদা, তোমারই বা তাতে কী লাভ।

রসিক। ভাই, সইতে পারলুম না, কী করি। বছরে বছরেই তোর বোনদের বয়স বাড়ছে, বড়োমা আমারই দোষ দেন কেন। বলেন, দুবেলা বসে বসে কেবল খাচ্ছ, মেয়েদের জন্যে দুটো বর দেখে দিতে পার না। আচ্ছা ভাই, আমি না খেতে রাজি আছি, তা হলেই বর জুটবে না তোর বোনদের বয়স কমতে থাকবে? এ দিকে যে-দুটির বর জুটছে না তাঁরা তো দিব্যি খাচ্ছেন-দাচ্ছেন। শৈলভাই, কুমারসম্ভবে পড়েছিস, মনে আছে তো?—

স্বয়ং বিশীর্ণদ্রুমপর্ণবৃত্তিতা
পরা হি কাষ্ঠা তপসস্তয়া পুনঃ।
তদপ্যপাকীর্ণমতঃ প্রিয়ংবদাং
বদন্ত্যপর্ণেতি চ তাং পুরাবিদঃ।

তা ভাই, দুর্গা নিজের বর খুঁজতে খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে তপস্যা করেছিলেন; কিন্তু নাৎনীদের বর জুটছে না বলে আমি বুড়োমানুষ খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দেব, বড়োমার এ কী বিচার। আহা শৈল, ওটা মনে আছে তো? তদপ্যপাকীর্ণমতঃ প্রিয়ংবদাং—

শৈলবালা। মনে আছে দাদা, কিন্তু কালিদাস এখন ভালো লাগছে না।

রসিক। তা হলে তো অত্যন্ত দুঃসময় বলতে হবে।

শৈলবালা। তাই তোমার সঙ্গে পরামর্শ আছে।

রসিক। তা, রাজি আছি ভাই। যেরকম পরামর্শ চাও তাই দেব। যদি হাঁ বলাতে চাও হাঁ বলব, না বলাতে চাও না বলব। আমার এই গুণটি আছে। আমি সকলের মতের সঙ্গে মত দিয়ে যাই ব'লেই সবাই আমাকে প্রায় নিজের মতোই বুদ্ধিমান ভাবে।

অক্ষয়। তুমি অনেক কৌশলে তোমার পসার বাঁচিয়ে রেখেছ, তার মধ্যে তোমার এই টাক একটি।

রসিক। আর একটি হচ্ছে 'যাবৎ কিঞ্চিন্ন ভাষতে'— তা, আমি বাইরের লোকের কাছে বেশি কথা কই নে।

শৈলবালা। সেইটে বুঝি আমাদের কাছে পুষিয়ে নাও?

রসিক। তোদের কাছে যে ধরা পড়েছি।

শৈলবালা। ধরা যদি পড়ে থাক তো চলো, যা বলি তাই করতে হবে।

রসিক। ভয় নেই দিদি। এমন দুটি কুলীনের ছেলে জোগাড় করেছি কন্যাদায়ের দুঃখের চেয়েও যারা হাজারগুণ অসহ্য। তাদের দেখলে বড়োমা তাঁর মেয়েদের জন্য এ বাড়িতে চিরকুমারী-সভা স্থাপন করবেন। যাই, তিনি ডেকে পাঠিয়েছেন। [প্রস্থান

শৈলবালা। মুখুজ্জেমশায়।

অক্ষয়। আজ্ঞা করো।

শৈলবালা। কুলীনের ছেলে দুটোকে কোনো ফিকিরে তাড়াতে হবে।

অক্ষয়। তা তো হবেই।—

গান

দেখব কে তোর কাছে আসে—
তুই রবি একেশ্বরী, একলা আমি রইব পাশে।

শৈলবালা। (হাসিয়া) একেশ্বরী ?

অক্ষয়। নাহয় তোমরা চার ঈশ্বরীই হলে, শাস্ত্রে আছে : অধিকন্তু ন দোষায়।

শৈলবালা। আর, তুমিই একলা থাকবে ? ওখানে বুঝি অধিকন্তু খাটে না ?

অক্ষয়। ওখানে শাস্ত্রের আর-একটা পবিত্র বচন আছে : সর্বমত্যন্তগর্হিতং।

শৈলবালা। কিন্তু মুখুজ্জেমশায়, ও পবিত্র বচনটা তো বরাবর খাটবে না। আরও সঙ্গী জুটবে।

অক্ষয়। তোমাদের এই একটি শালার জায়গায় দশশালা বন্দোবস্ত হবে ? তখন আবার নূতন কার্যবিধি দেখা যাবে। ততদিন কুলীনের ছেলেটেলেগুলোকে ঘেঁষতে দিচ্ছি নে।

চাকরের প্রবেশ

চাকর। দুটি বাবু এসেছে। [প্রস্থান

শৈলবালা। ওই বুঝি তারা এল। দিদি আর মা-ভাঁড়ারে ব্যস্ত আছেন, তাঁদের অবকাশ হবার পূর্বেই ওদের কোনো মতে বিদায় করে দিয়ো।

অক্ষয়। কী বকশিশ মিলবে।

শৈলবালা। আমরা তোমার সব শালীরা মিলে তোমাকে 'শালীবাহন রাজা' খেতাব দেব।

অক্ষয়। শালীবাহন দি সেকেণ্ড্ ?

শৈলবালা। সেকেণ্ড্ হতে যাবে কেন। সে শালীবাহনের নাম ইতিহাস থেকে একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। তুমি হবে শালীবাহন দি গ্রেট।

অক্ষয়। বল কী। আমার রাজ্যকাল থেকে জগতে নূতন সাল প্রচলিত হবে ?

গান

তুমি আমায় করবে মস্ত লোক—
দেবে লিখে রাজার টিকে প্রসন্ন ঐ চোখ।

[শৈলবালার প্রস্থান

মৃত্যুঞ্জয় ও দারুকেশ্বরের প্রবেশ

একটি বিসদৃশ লম্বা, রোগা, বুট্‌জুতা-পরা, ধুতি প্রায় হাঁটুর কাছে উঠিয়াছে, চোখের নীচে কালী-পড়া, ম্যালেরিয়া রোগীর চেহারা, বয়স বাইশ হইতে বত্রিশ পর্যন্ত যেটা খুশি হইতে পারে। আর-একটি বেঁটে পাটো, অত্যন্ত দাড়ি-গোঁফ-সংকুল, নাকটি বটিকাকার, কপালটি ঢিবি, কালোকোলো, গোলগাল

অক্ষয়। (অত্যন্ত সৌহার্দ্য-সহকারে উঠিয়া প্রবলবেগে শেক্‌হ্যাণ্ড করিয়া) আসুন মিস্টার ন্যাথানিয়াল, আসুন মিস্টার জেরেমায়া, বসুন বসুন। ওরে বরফ-জল নিয়ে আয় রে, তামাক দে—

মৃত্যুঞ্জয়। (সহসা বিজাতীয় সম্ভাষণে সংকুচিত হইয়া মৃদুস্বরে) আজ্ঞে আমার নাম মৃত্যুঞ্জয় গাঙ্গুলি।

দারুকেশ্বর। আমার নাম শ্রীদারুকেশ্বর মুখোপাধ্যায়।

অক্ষয়। ছি মশায়। ও নামগুলো এখনও ব্যবহার করেন বুঝি? আপনাদের ক্রিশ্চান নাম? (আগন্তুকদিগকে হতবুদ্ধি নিরুত্তর দেখিয়া) এখনও বুঝি নামকরণ হয় নি? তা, তাতে বিশেষ কিছু আসে যায় না, ঢের সময় আছে।

অক্ষয়ের গুড়গুড়ির নল মৃত্যুঞ্জয়ের হাতে প্রদান। সে লোকটা ইতস্তত করিতেছে দেখিয়া

বিলক্ষণ! আমার সামনে আবার লজ্জা। সাত বছর বয়স থেকে লুকিয়ে তামাক খেয়ে পেকে উঠেছি। ধোঁয়া লেগে লেগে বুদ্ধিতে ঝুল পড়ে গেল। লজ্জা যদি করতে হয় তা হলে আমার তো আর ভদ্রসমাজে মুখ দেখাবার জো থাকে না।

তখন সাহস পাইয়া দারুকেশ্বর মৃত্যুঞ্জয়ের হাত হইতে ফস করিয়া নল কাড়িয়া লইয়া ফড়্ ফড়্ শব্দে টানিতে আরম্ভ করিল। অক্ষয় পকেট হইতে কড়া বর্মার চুরোট বাহির করিয়া মৃত্যুঞ্জয়ের হাতে দিলেন। যদিচ তাহার চুরোট অভ্যাস ছিল না, তবু সে সদ্যস্থাপিত ইয়ার্কির খাতিরে প্রাণের মায়া পরিত্যাগ করিয়া মৃদুমন্দ টান দিতে লাগিল এবং কোনো গতিকে কাশি চাপিয়া রাখিল

অক্ষয়। এখন কাজের কথাটা শুরু করা যাক। কী বলেন?

মৃত্যুঞ্জয় চুপ করিয়া রহিল

দারুকেশ্বর। তা নয় তো কী। শুভস্য শীঘ্রং।

অক্ষয়। (গম্ভীর হইয়া) মুর্গি না মটন?

মৃত্যুঞ্জয় অবাক হইয়া মাথা চুলকাইতে লাগিল
দারুকেশ্বর কিছু না বুঝিয়া অপরিমিত হাসিতে আরম্ভ করিল

আরে মশায়, নাম শুনেই হাসি। তা হলে তো গন্ধে অজ্ঞান এবং পাতে পড়লে মারাই

যাবেন। তা, যেটা হয় মনস্থির করে বলুন— মুর্গি হবে না মটন হবে।

তখন দুজনে বুঝিল আহারের কথা হইতেছে। ভীরু মৃত্যুঞ্জয় নিরুত্তর হইয়া ভাবিতে লাগিল
দারুকেশ্বর লালায়িত রসনায় একবার চারি দিকে চাহিয়া দেখিল

ভয় কিসের মশায়। নাচতে বসে ঘোমটা ?

দারুকেশ্বর। (দুই হাতে দুই পা চাপড়াইয়া, হাসিয়া) তা, মুর্গিই ভালো, কট্‌লেট, কী বলেন।

মৃত্যুঞ্জয়। (সাহস পাইয়া) মটনটাই বা মন্দ কী ভাই। চপ!

অক্ষয়। ভয় কী দাদা, দু'ই হবে। দোমনা করে খেয়ে সুখ হয় না। (চাকরকে ডাকিয়া) ওরে, মোড়ের মাথায় যে হোটেল আছে সেখান থেকে কলিমদ্দি খানসামাকে ডেকে আন্ দেখি। (বুড়ো আঙুল দিয়া মৃত্যুঞ্জয়ের গা টিপিয়া মৃদুস্বরে) বিয়ার না শেরি ?

মৃত্যুঞ্জয় লজ্জিত হইয়া মুখ বাঁকাইল

দারুকেশ্বর। হুইস্কির বন্দোবস্ত নেই বুঝি ?

অক্ষয় (পিঠ চাপড়াইয়া) নেই তো কী। বেঁচে আছি কী করে।

গান

অভয় দাও তো বলি আমার wish কী—
একটি ছটাক সোডার জলে পাকি তিন পোয়া হুইস্কি।

ক্ষীণপ্রকৃতি মৃত্যুঞ্জয়ও প্রাণপণে হাস্য করা কর্তব্য বোধ করিল
এবং দারুকেশ্বর ফস করিয়া একটা বই টানিয়া লইয়া টপাটপ বাজাইতে আরম্ভ করিল

দারুকেশ্বর। দাদা, ওটা শেষ করে ফেলো।

গান

অভয় দাও তো বলি আমার wish কী—

অক্ষয়। (মৃত্যুঞ্জয়কে ঠেলা দিয়া) ধরো না হে, তুমিও ধরো।

সলজ্জ মৃত্যুঞ্জয় নিজের প্রতিপত্তি রক্ষার জন্য মৃদুস্বরে যোগ দিল
অক্ষয় ডেস্ক চাপড়াইয়া বাজাইতে লাগিলেন— এক জায়গায় হঠাৎ থামিয়া, গম্ভীর হইয়া

হাঁ, হাঁ, আসল কথাটা জিজ্ঞাসা করা হয় নি। এ দিকে তো সব ঠিক, এখন আপনারা কী হলে রাজি হন।

দারুকেশ্বর। আমাদের বিলেতে পাঠাতে হবে।

অক্ষয়। সে তো হবেই। তার না কাটলে কি শ্যাম্পেনের ছিপি খোলে। দেশে আপনাদের মতো লোকের বিদ্যেবুদ্ধি চাপা থাকে, বাঁধন কাটলেই একেবারে নাকে মুখে চোখে উছলে উঠবে।

দারুকেশ্বর। (অত্যন্ত খুশি হইয়া অক্ষয়ের হাত চাপিয়া ধরিয়া) দাদা, এইটে তোমাকে করে দিতেই হচ্ছে। বুঝলে ?

অক্ষয়। সে কিছুই শক্ত নয়। কিন্তু ব্যাপ্টাইজ্‌ আজই তো হবেন ?

দারুকেশ্বর। (হাসিতে হাসিতে) সেটা কিরকম।

অক্ষয়। (কিঞ্চিৎ বিস্ময়ের ভাবে) কেন, কথাই তো আছে, রেভারেণ্ড্‌ বিশ্বাস আজ রাত্রেই আসছেন। ব্যাপটিজ্‌ম্‌ না হলে তো ক্রিশ্চান মতে বিবাহ হতে পারে না।

মৃত্যুঞ্জয়। (অত্যন্ত ভীত হইয়া) ক্রিশ্চান মতে কী মশায়।

অক্ষয়। আপনি যে আকাশ থেকে পড়লেন। সে হচ্ছে না— ব্যাপ্টাইজ্‌ যেমন করে হোক, আজ রাত্রেই সারতে হচ্ছে। কিছুতেই ছাড়ব না।

মৃত্যুঞ্জয়। আপনারা ক্রিশ্চান নাকি।

অক্ষয়। মশায়, ন্যাকামি রাখুন। যেন কিছুই জানেন না।

মৃত্যুঞ্জয়। (অত্যন্ত ভীতভাবে) মশায়, আমরা হিঁদু, ব্রাহ্মণের ছেলে, জাত খোয়াতে পারব না।

অক্ষয়। (হঠাৎ অত্যন্ত উদ্ধতস্বরে) জাত কিসের মশায়। এ দিকে কলিমদ্দির হাতে মুর্গি খাবেন, বিলেত যাবেন, আবার জাত ?

মৃত্যুঞ্জয়। (ব্যস্তসমস্ত হইয়া) চুপ, চুপ, চুপ করুন। কে কোথা থেকে শুনতে পাবে।

দারুকেশ্বর। ব্যস্ত হবেন না মশায়, একটু পরামর্শ করে দেখি।

(মৃত্যুঞ্জয়কে একটু অন্তরালে ডাকিয়া লইয়া) বিলেত থেকে ফিরে সেই তো একবার প্রায়শ্চিত্ত করতেই হবে— তখন ডবল প্রায়শ্চিত্ত করে একেবারে ধর্মে ওঠা যাবে। এ সুযোগটা ছাড়লে আর বিলেত যাওয়াটা ঘটে উঠবে না। দেখলি তো কোনো শ্বশুরই রাজি হল না। আর ভাই, ক্রিশ্চানের হুঁকোয় তামাকই যখন খেলুম তখন ক্রিশ্চান হতে আর বাকি কী রইল।

(অক্ষয়ের কাছে আসিয়া) বিলেত যাওয়াটা তো নিশ্চয় পাকা ? তা হলে ক্রিশ্চান হতে রাজি আছি।

মৃত্যুঞ্জয়। কিন্তু আজ রাতটা থাক্‌।

দারুকেশ্বর। হতে হয় তো চট্‌পট্‌ সেরে ফেলে পাড়ি দেওয়াই ভালো ; গোড়াতেই বলেছি, শুভস্য শীঘ্রং।

ইতিমধ্যে অন্তরালে রমণীগণের সমাগম

দুই-থালা ফল মিষ্টান্ন লুচি ও বরফ-জল লইয়া ভৃত্যের প্রবেশ

দারুকেশ্বর। কই মশায়, অভাগার অদৃষ্টে মুর্গি বেটা উড়েই গেল না কি। কট্‌লেট্‌ কোথায়।

অক্ষয়। (মৃদুস্বরে) আজকের মতো এইটেই চলুক।

দারুকেশ্বর। সে কি হয় মশায়। আশা দিয়ে নৈরাশ ? শ্বশুরবাড়ি এসে মটন চপ খেতে পাব না ? আর, এ-যে বরফ-জল মশায়, আমার আবার সর্দির ধাত, সাদা জল সহ্য হয় না। (গান জুড়িয়া) অভয় দাও তো বলি আমার wish কী—

অক্ষয়। (মৃত্যুঞ্জয়কে টিপিয়া) ধরো-না হে, তুমিও ধরো-না— চুপচাপ কেন। (গানের উচ্ছ্বাস থামিলে আহার-পাত্র দেখাইয়া) নিতান্তই কি এটা চলবে না।

দারুকেশ্বর। (ব্যস্ত হইয়া) না মশায়, ও-সব রোগীর পথ্যি চলবে না। মুর্গি না খেয়েই তো ভারতবর্ষ গেল।

অক্ষয়। (কানের কাছে আসিয়া)—

গান

কত কাল রবে বলো ভারত রে
শুধু ডাল ভাত জল পথ্য করে।

দারুকেশ্বর উৎসাহসহকারে গানটা ধরিল এবং মৃত্যুঞ্জয়ও অক্ষয়ের গোপন ঠেলা খাইয়া সলজ্জভাবে মৃদু মৃদু যোগ দিতে লাগিল

অক্ষয়। (আবার কানে কানে ধরাইয়া দিয়া)—

দেশে অন্নজলের হল ঘোর অনটন,
ধরো হুইস্কি সোডা আর মুর্গি-মটন।

দারুকেশ্বর মাতিয়া উঠিয়া উর্ধ্বস্বরে ওই পদটা ধরিল এবং অক্ষয়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের প্রবল উৎসাহে মৃত্যুঞ্জয়ও কোনো মতে সঙ্গে সঙ্গে যোগ দিয়া গেল

অক্ষয়। (মৃদুস্বরে)—

যাও ঠাকুর চৈতন চুটকি নিয়া,
এসো দাড়ি নাড়ি কলিমদ্দি মিঞা।

যতই উৎসাহ-সহকারে গান চলিল, দ্বারের পার্শ্ব হইতে উস্‌খুস্‌ শব্দ শোনা যাইতে লাগিল এবং অক্ষয় নিরীহ ভালোমানুষটির মতো মাঝে মাঝে সেই দিকে কটাক্ষপাত করিতে লাগিলেন

এমন সময় ময়লা ঝাড়ন হাতে কলিমদ্দি আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল

দারুকেশ্বর। (কলিমদ্দিকে) এই-যে চাচা। আজ রান্নাটা কী হয়েছে বলো দেখি। অক্ষয়বাবু, কারি না কট্‌লেট্‌।

অক্ষয়। (অন্তরালের দিকে কটাক্ষ করিয়া) সে আপনারা যা ভালো বোঝেন।

দারুকেশ্বর। আমার তো মত, ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ ব'লে সব-কটাকেই আদর করে নিই।

অক্ষয়। তা তো বটেই, ওরা সকলেই পূজ্য।

কলিমদ্দি সেলাম করিয়া চলিয়া গেল

অক্ষয়। (কিঞ্চিৎ গলা চড়াইয়া) মশায়রা কি তা হলে আজ রাত্রেই ক্রিশ্চান হতে চান।

দারুকেশ্বর। আমার তো কথাই আছে, শুভস্য শীঘ্রং। আজই ক্রিশ্চান হব, এখনই ক্রিশ্চান হব, ক্রিশ্চান হয়ে তবে অন্য কথা। মশায়, আর ওই পুঁইশাক কলাইয়ের ডাল খেয়ে প্রাণ বাঁচে না। আসুন আপনার পাদরি ডেকে।

উচ্চস্বরে গান

যাও ঠাকুর চৈতন চুট্‌কি নিয়া,
এসো দাড়ি নাড়ি কলিমদ্দি মিঞা।

ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। (অক্ষয়ের কানে কানে) মাঠাকরুন একবার ডাকছেন।

অক্ষয় উঠিয়া দ্বারের অন্তরালে গেলে

জগত্তারিণী। এ কী। কাণ্ডটা কী।

অক্ষয়। (গম্ভীরমুখে) মা সে-সব পরে হবে, এখন ওরা হুইস্কি চাচ্ছে, কী করি। তোমার পায়ে মালিশ করবার জন্যে সেই-যে ব্রাণ্ডি এসেছিল, তার কি কিছু বাকি আছে।

জগত্তারিণী। (হতবুদ্ধি হইয়া) বল কী বাছা। ব্রাণ্ডি খেতে দেবে?

অক্ষয়। কী করব মা, শুনেইছ তো, ওর মধ্যে একটি ছেলে আছে যার জল খেলেই সর্দি হয়, মদ না খেলে আর-একটির মুখে কথাই বের হয় না।

জগত্তারিণী। ক্রিশ্চান হবার কথা কী বলছে ওরা।

অক্ষয়। ওরা বলছে হিঁদু হয়ে খাওয়া-দাওয়ার বড়ো অসুবিধে, পুঁইশাক কলায়ের ডাল খেলে ওদের অসুখ করে।

জগত্তারিণী। (অবাক হইয়া) তাই বলে কি ওদের আজ রাতেই মুর্গি খাইয়ে ক্রিশ্চান করবে নাকি।

অক্ষয়। তা, মা, ওরা যদি রাগ করে চলে যায় তা হলে দুটি পাত্র এখনই হাতছাড়া

হবে। তাই ওরা যা বলছে তাই শুনতে হচ্ছে। (পুরবালার প্রতি) আমাকে-সুদ্ধ মদ ধরাবে দেখছি।

পুরবালা। বিদায় করো, বিদায় করো, এখনই বিদায় করো।

জগত্তারিণী। (ব্যস্ত হইয়া) বাবা, এখানে মুর্গি খাওয়া-টাওয়া হবে না, তুমি ওদের বিদায় করে দাও। আমার ঘাট হয়েছিল আমি রসিককাকাকে পাত্র সন্ধান করতে দিয়েছিলুম। তাঁর দ্বারা যদি কোনো কাজ পাওয়া যায়। [রমণীগণের প্রস্থান

অক্ষয় ঘরে আসিয়া দেখেন, মৃত্যুঞ্জয় পলায়নের উপক্রম করিতেছে
এবং দারুকেশ্বর হাত ধরিয়া তাহাকে টানাটানি করিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছে
অক্ষয়ের অবর্তমানে মৃত্যুঞ্জয় অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছে

মৃত্যুঞ্জয়। (অক্ষয়কে রাগের স্বরে) না মশায়, আমি ক্রিশ্চান হতে পারব না। আমার বিয়ে করে কাজ নেই।

অক্ষয়। তা মশায়, আপনাকে কে পায়ে ধরাধরি করছে।

দারুকেশ্বর। আমি রাজি আছি মশায়।

অক্ষয়। রাজি থাকেন তো গির্জেয় যান মশায়। আমার সাত পুরুষে ক্রিশ্চান করা ব্যাবসা নয়।

দারুকেশ্বর। ওই-যে কোন্ বিশ্বাসের কথা বললেন—

অক্ষয়। তিনি টেরিটির বাজারে থাকেন, তাঁর ঠিকানা লিখে দিচ্ছি।

দারুকেশ্বর। আর বিবাহটা ?

অক্ষয়। সেটা এ বংশে নয়।

দারুকেশ্বর। তা হলে এতক্ষণ পরিহাস করছিলেন মশায় ? খাওয়াটাও কি—

অক্ষয়। সেটাও এ ঘরে নয়।

দারুকেশ্বর। অন্তত হোটেলে ?

অক্ষয় সে কথা ভালো।

টাকার ব্যাগ হইতে গুটিকয়েক টাকা বাহির করিয়া দুটিকে বিদায় করিয়া দিলেন
নৃপর হাত ধরিয়া টানিয়া নীরবালা বসন্তকালের দম্‌কা হাওয়ার মতো ঘরের মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিল

নীরবালা। মুখুজ্জেমশায়, দিদি তো দুটির কোনোটিকেই বাদ দিতে চান না।

নৃপবালা। (নীরর কপোলে গুটি দুই-তিন অঙ্গুলির আঘাত করিয়া) ফের মিথ্যে কথা বলছিস !

অক্ষয়। ব্যস্ত হোস নে ভাই, সত্যমিথ্যের প্রভেদ আমি একটু-একটু বুঝতে পারি।

নীরবালা। আচ্ছা মুখুজ্জেমশায়, এ দুটি কি রসিকদাদার রসিকতা না আমাদের সেজদিদিরই ফাঁড়া?

অক্ষয়। বন্দুকের সকল গুলিই কি লক্ষ্যে গিয়ে লাগে। প্রজাপতি টার্গেট প্র্যাক্‌টিস করছিলেন, এ দুটো ফসকে গেল। প্রথম প্রথম এমন গোটাকতক হয়েই থাকে। এই হতভাগ্য ধরা পড়বার পূর্বে তোমার দিদির ছিপে অনেক জলচর ঠোকর দিয়ে গিয়েছিল, বঁড়শি বিঁধল কেবল আমারই কপালে। [কপালে চপেটাঘাত

নৃপবালা। এখন থেকে রোজই প্রজাপতির প্র্যাক্‌টিস চলবে নাকি মুখুজ্জেমশায়। তা হলে তো আর বাঁচা যায় না।

নীরবালা। কেন ভাই, দুঃখ করিস। রোজই কি ফসকাবে। একটা না একটা এসে ঠিক-মতন পৌঁছবে।

রসিকের প্রবেশ

নীরবালা। রসিকদাদা, এবার থেকে আমরাও তোমার জন্যে পাত্রী জোটাচ্ছি।

রসিক। সে তো সুখের বিষয়।

নীরবালা। হাঁ। সুখ দেখিয়ে দেব। তুমি থাক হোগলার ঘরে, আর পরের দালানে আগুন লাগাতে চাও? আমাদের হাতে টিকে নেই? আমাদের সঙ্গে যদি লাগ তা হলে তোমার দু-দুটো বিয়ে দিয়ে দেব; মাথায় যে-কটি চুল আছে সামলাতে পারবে না।

রসিক। দেখ্‌ দিদি, দুটো আস্ত জন্তু এনেছিলুম বলেই তো রক্ষে পেলি, যদি মধ্যম রকমের হত তা হলেই তো বিপদ ঘটত। যাকে জন্তু বলে চেনা যায় না সেই জন্তুই ভয়ানক।

অক্ষয়। সে কথা ঠিক। মনে মনে আমার ভয় ছিল, কিন্তু একটু পিঠে হাত বুলোবামাত্রই চট্‌পট্‌ শব্দে লেজ নড়ে উঠল। কিন্তু, মা বলছেন কী।

রসিক। সে যা বলছেন সে আর পাঁচজনকে ডেকে ডেকে শোনাবার মতো নয়। সে আমি অন্তরের মধ্যেই রেখে দিলুম। যা হোক, শেষে এই স্থির হয়েছে, তিনি কাশীতে তাঁর বোনপোর কাছে যাবেন, সেখানে পাত্রেরও সন্ধান পেয়েছেন, তীর্থদর্শনও হবে।

নীরবালা। বল কী রসিকদাদা। তা হলে এখানে আমাদের রোজ রোজ নতুন নতুন নমুনো দেখা বন্ধ?

নৃপবালা। তোর এখনও শখ আছে নাকি।

নীরবালা। এ কি শখের কথা হচ্ছে। এ হচ্ছে শিক্ষা। রোজ রোজ অনেকগুলি দৃষ্টান্ত দেখতে দেখতে জিনিসটা সহজ হয়ে আসবে; যেটিকে বিয়ে করবি সেই প্রাণীটিকে বুঝতে কষ্ট হবে না।

নৃপবালা। তোমার প্রাণীকে তুমি বুঝে নিয়ো, আমার জন্যে তোমার ভাবতে হবে না।

নীরবালা। সেই কথাই ভালো— তুইও নিজের জন্যে ভাবিস, আমিও নিজের জন্যে ভাবব, কিন্তু রসিকদাদাকে আমাদের জন্যে ভাবতে দেওয়া হবে না।

[নৃপ ও নীরর প্রস্থান

শৈলবালার প্রবেশ

শৈলবালা। রসিকদাদা, তোমার সঙ্গে আমার পরামর্শ আছে।

অক্ষয়। অ্যাঁ, শৈল, এই বুঝি! আজ রসিকদা হলেন রাজমন্ত্রী! আমাকে ফাঁকি!

শৈলবালা। (হাসিয়া) তোমার সঙ্গে আমার কি পরামর্শের সম্পর্ক মুখুজ্জেমশায়। পরামর্শ যে বুড়ো না হলে হয় না।

অক্ষয়। তবে রাজমন্ত্রীপদের জন্যে আমার দরবার উঠিয়ে নিলুম।

গান

আমি কেবল ফুল জোগাব
তোমার দুটি রাঙা হাতে,
বুদ্ধি আমার খেলে নাকো
পাহারা বা মন্ত্রণাতে।

শৈলবালা। রসিকদাদা, আমরা যে চিরকুমার-সভার সভ্য হব— তুমি আমার বাহন হবে।

রসিক। ভগবান হরি নারীছদ্মবেশে পুরুষকে ভুলিয়েছিলেন, তুই শৈল যদি পুরুষ-ছদ্মবেশে পুরুষকে ভোলাতে পারিস তা হলে হরিভক্তি উড়িয়ে দিয়ে তোর পুজোতেই শেষ বয়সটা কাটাব। কিন্তু, মা যদি টের পান?

শৈলবালা। তিন কন্যাকে কেবলমাত্র স্মরণ করেই মা মনে মনে এত অস্থির হয়ে ওঠেন যে, তিনি আমাদের আর খবর রাখতে পারেন না। তাঁর জন্যে ভেবো না।

রসিক। কিন্তু, সভায় কিরকম করে সভ্যতা করতে হয় সে আমি কিছুই জানি নে।

শৈলবালা। আচ্ছা, সে আমি চালিয়ে নেব। আবেদনপত্রের সঙ্গে প্রবেশিকার দশটা টাকা পাঠিয়ে দিয়ে বসে আছি। রসিকদা, তোমার তোমার সঙ্গে কাশী গেলে চলবে না।

অক্ষয়। মার সঙ্গে কাশী যাবার জন্যে আমি লোক ঠিক করে দেব এখন, সেজন্যে ভাব্‌না নেই।

শৈলবালা। মুখুজ্জেমশায়, তুমি তাদের কী বানর বানিয়েই ছেড়ে দিলে— শেষ কালে বেচারাদের জন্যে আমার মায়া করছিল।

অক্ষয়। বানর কেউ বানাতে পারে না শৈল, ওটা পরমা প্রকৃতি নিজেই বানিয়ে রাখেন। ভগবানের বিশেষ অনুগ্রহ থাকা চাই। যেমন কবি হওয়া আর-কি। লেজই বল কবিত্বই বল ভিতরে না থাকলে জোর করে টেনে বের করবার জো নেই।

পুরবালার প্রবেশ

পুরবালা। (কেরোসিন ল্যাম্প্‌টা লইয়া নাড়িয়া-চাড়িয়া) বেহারা কিরকম আলো দিয়ে গেছে, মিট্‌মিট্‌ করছে। ওকে ব'লে ব'লে পারা গেল না।

অক্ষয়। সে বেটা জানে কিনা অন্ধকারেই আমাকে বেশি মানায়।

পুরবালা। আলোতে মানায় না? বিনয় হচ্ছে নাকি। এটা তো নতুন দেখছি।

অক্ষয়। আমি বলছিলুম, বেহারা বেটা চাঁদ বলে আমাকে সন্দেহ করেছে।

পুরবালা। ওঃ, তাই ভালো। তা, ওর মাইনে বাড়িয়ে দাও।— কিন্তু রসিকদাদা, আজ কী কাণ্ডটাই করলে।

রসিক। ভাই, বর ঢের পাওয়া যায়, কিন্তু সবাই বিবাহযোগ্য হয় না, সেইটের একটা সামান্য উদাহরণ দিয়ে গেলুম।

পুরবালা। সে উদাহরণ না দেখিয়ে দুটো-একটা বিবাহযোগ্য বরের উদাহরণ দেখালেই তো ভাল হত।

শৈলবালা। সে ভার আমি নিয়েছি দিদি।

পুরবালা। তা আমি বুঝেছি। তুমি আর তোমার মুখুজ্জেমশায় মিলে ক দিন ধরে যেরকম পরামর্শ চলছে একটা কী কাণ্ড হবেই।

অক্ষয়। কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড তো আজ হয়ে গেল।

রসিক। লঙ্কাকাণ্ডের আয়োজনও হচ্ছে, চিরকুমার-সভার স্বর্ণলঙ্কায় আগুন লাগাতে চলেছি।

পুরবালা। শৈল তার মধ্যে কে।

রসিক। হনুমান তো নয়ই।

অক্ষয়। উনিই হচ্ছেন স্বয়ং আগুন।

রসিক। এক ব্যক্তি ওঁকে লেজে করে নিয়ে যাবেন।

পুরবালা। আমি কিছু বুঝতে পারছি নে। শৈল, তুই চিরকুমার-সভায় যাবি নাকি।

শৈলবালা। আমি যে সভ্য হব।

পুরবালা। কী বলিস তার ঠিক নেই। মেয়েমানুষ আবার সভ্য হবে কী।

শৈলবালা। আজকাল মেয়েরাও যে সভ্য হয়ে উঠেছে। তাই আমি শাড়ি ছেড়ে চাপকান ধরব ঠিক করেছি।

পুরবালা। বুঝেছি, ছদ্মবেশে সভ্য হতে যাচ্ছিস বুঝি। চুলটা তো কেটেইছিস, ওইটেই বাকি ছিল। তোমাদের যা খুশি করো, আমি এর মধ্যে নেই।

অক্ষয়। না না, তুমি এ দলে ভিড়ো না। আর যার খুশি পুরুষ হোক, আমার অদৃষ্টে তুমি চিরদিন মেয়েই থেকো— নইলে ব্রীচ অফ কন্‌ট্রাক্ট— সে বড়ো ভয়ানক মকদ্দমা—

গান

চির-পুরানো চাঁদ,
চিরদিবস এমনি থেকো আমার এই সাধ।
পুরানো হাসি পুরানো সুধা মিটায় মম পুরানো ক্ষুধা,
নূতন কোনো চকোর যেন পায় না পরসাদ।

[পুরবালার প্রস্থান

শৈলবালাকে আশ্বাস দিয়া

ভয় নেই! রাগটা হয়ে গেলেই মনটা পরিষ্কার হবে— একটু অনুতাপও হবে— সেইটেই সুযোগের সময়।

রসিক।— কোপো যত্র ভ্রূকুটিরচনা নিগ্রহো যত্র মৌনং
যত্রান্যোন্যস্মিতমনুনয়ো যত্র দৃষ্টিঃ প্রসাদঃ।

শৈলবালা। রসিকদাদা, তুমি তো দিব্যি শ্লোক আউড়ে চলেছ— কোপ জিনিসটা কী, তা মুখুজ্জেমশায় টের পাবেন।

রসিক। আরে ভাই, বদল করতে রাজি আছি। মুখুজ্জেমশায় যদি শ্লোক আওড়াতেন আর আমার উপরেই যদি কোপ পড়ত তা হলে এই পোড়া কপালকে সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে রাখতুম।

শৈলবালা। মুখুজ্জেমশায়।

অক্ষয়। (অত্যন্ত ত্রস্তভাবে) আবার মুখুজ্জেমশায়! এই বালখিল্য মুনিদের ধ্যানভঙ্গ ব্যাপারের মধ্যে আমি নেই।

শৈলবালা। ধ্যানভঙ্গ আমরা করব। কেবল মুনিকুমারগুলিকে এই বাড়িতে আনা চাই।

অক্ষয়। সভাসুদ্ধ এইখানে উৎপাটিত করে আনতে হবে? যত দুঃসাধ্য কাজ সব এই একটিমাত্র মুখুজ্জেমশায়কে দিয়ে?

শৈলবালা। (হাসিয়া) মহাবীর হবার ওই তো মুশকিল। যখন গন্ধমাদনের প্রয়োজন হয়েছিল তখন নল নীল অঙ্গদকে তো কেউ পোঁছেও নি।

অক্ষয়। ওরে পোড়ার-মুখী, ত্রেতাযুগের পোড়ার-মুখোকে ছাড়া আর কোনো উপমাও তোর মনে উদয় হল না? এত প্রেম!

শৈলবালা। হাঁ গো, এত প্রেম!

অক্ষয়।— গান

পোড়া মনে শুধু পোড়া মুখখানি জাগে রে।
এত আছে লোক, তবু পোড়া চোখে
আর কেহ নাহি লাগে রে।

অক্ষয়। আচ্ছা, তাই হবে। পঙ্গপাল ক'টাকে শিখার কাছে তাড়িয়ে নিয়ে আসব। তা হলে চট করে আমাকে একটা পান এনে দাও। তোমার স্বহস্তের রচনা।

শৈলবালা। কেন, দিদির হস্তের—

অক্ষয়। আরে, দিদির হস্ত তো জোগাড় করেইছি, নইলে পাণিগ্রহণ কী জন্যে। এখন অন্য পদ্মহস্তগুলির প্রতি দৃষ্টি দেবার অবকাশ পাওয়া গেছে।

শৈলবালা। আচ্ছা গো মশায়। পদ্মহস্ত তোমার পানে এমনি চুন মাখিয়ে দেবে যে, পোড়ার-মুখ আবার পুড়বে।

অক্ষয়।— গান

যারে মরণদশায় ধরে
সে যে শতবার করে মরে।
পোড়া পতঙ্গ যত পোড়ে তত
আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

শৈলবালা। মুখুজ্জেমশায়, ও কাগজের গোলাটা কিসের।

অক্ষয়। তোমাদের সেই সভ্য হবার আবেদনপত্র এবং প্রবেশিকার দশ টাকার নোট পকেটে ছিল, ধোবা বেটা কেচে এমনি পরিষ্কার করে দিয়েছে একটা অক্ষরও দেখতে পাচ্ছি নে। ও বেটা বোধ হয় স্ত্রীস্বাধীনতার ঘোরতর বিরোধী, তাই তোমার ওই পত্রটা একেবারে আগাগোড়া সংশোধন করে দিয়েছে।

শৈলবালা। এই বুঝি!

অক্ষয়। চারটিতে মিলে স্মরণশক্তি জুড়ে বসে আছ, আর কিছু কি মনে রাখতে দিলে?—

গান

সকলি ভুলেছে ভোলা মন,
ভোলে নি ভোলে নি শুধু ঐ চন্দ্রানন।

[শৈল ও রসিকের প্রস্থান

পুরবালার প্রবেশ

অক্ষয়। স্বামীই স্ত্রীর একমাত্র তীর্থ। মান কি না।

পুরবালা। আমি কি পণ্ডিতমশায়ের কাছে শাস্ত্রের বিধান নিতে এসেছি। আমি মার সঙ্গে আজ কাশী চলেছি এই খবরটি দিয়ে গেলুম।

অক্ষয়। খবরটি সুখবর নয়— শোনবামাত্র তোমাকে শাল-দোশালা বকশিশ দিয়ে ফেলতে ইচ্ছে করছে না।

পুরবালা। ইস, হৃদয় বিদীর্ণ হচ্ছে? না? সহ্য করতে পারছ না?

অক্ষয়। আমি কেবল উপস্থিত বিচ্ছেদটার কথা ভাবছি নে। এখন তুমি দু দিন না রইলে, আরও কজন রয়েছেন, এক রকম করে এই হতভাগ্যের চলে যাবে। কিন্তু এর পরে কী হবে। দেখো, ধর্মে-কর্মে স্বামীকে এগিয়ে যেয়ো না; স্বর্গে তুমি যখন ডবল প্রমোশন পেতে থাকবে আমি তখন পিছিয়ে থাকব— তোমাকে বিষ্ণুদূতে রথে চড়িয়ে নিয়ে যাবে, আর আমাকে যমদূতে কানে ধরে হাঁটিয়ে দৌড় করাবে।

গান

স্বর্গে তোমায় নিয়ে যাবে উড়িয়ে,
পিছে পিছে আমি চলব খুঁড়িয়ে,
ইচ্ছা হবে টিকির ডগা ধরে
বিষ্ণুদূতের মাথাটা দিই গুঁড়িয়ে।

পুরবালা। আচ্ছা আচ্ছা, থামো।

অক্ষয়। আমি থামব, কেবল তুমিই চলবে? উনবিংশ শতাব্দীর এই বন্দোবস্ত? নিতান্তই চললে?

পুরবালা। চললুম।

অক্ষয়। আমাকে কার হাতে সমর্পণ করে গেলে।

পুরবালা। রসিকদাদার হাতে।

অক্ষয়। মেয়েমানুষ, হস্তান্তর করবার আইন কিছুই জান না। সেইজন্যেই তো বিরহাবস্থায় উপযুক্ত হাত নিজেই খুঁজে নিয়ে আত্মসমর্পণ করতে হয়।

পুরবালা। তোমাকে তো বেশি খোঁজাখুঁজি করতে হবে না।

অক্ষয়। তা হবে না।—

গান

কার হাতে যে ধরা দেব প্রাণ
তাই ভাবতে বেলা অবসান।
ডান দিকেতে তাকাই যখন বাঁয়ের লাগি কাঁদে রে মন;
বাঁয়ের লাগি ফিরলে তখন দক্ষিণেতে পড়ে টান।

আচ্ছা, আমার যেন সান্ত্বনার গুটি দুই-তিন সদুপায় আছে, কিন্তু তুমি—

বিরহযামিনী কেমনে যাপিবে,
বিচ্ছেদতাপে যখন তাপিবে
এপাশ ওপাশ বিছানা মাপিবে,
মকরকেতনে কেবলি শাপিবে—

পুরবালা। রক্ষে করো, ও মিলটা ওইখানেই শেষ করো!

অক্ষয়। দুঃখের সময় আমি থামতে পারি নে, কাব্য আপনি বেরোতে থাকে। মিল ভালো না বাস অমিত্রাক্ষর আছে. তুমি যখন বিদেশে থাকবে আমি 'আর্তনাদ বদ কাব্য' বলে একটা কাব্য লিখব। সখী, তার আরম্ভটা শোনো—

(সাড়ম্বরে) বাষ্পীয় শকটে চড়ি নারীচূড়ামণি
পুরবালা চলি যবে গেলা কাশীধামে
বিকালে, কহ হে দেবী অমৃতভাষিণী
কোন্ বরাঙ্গনে বরি বরমাল্যদানে
যাপিলা বিচ্ছেদমাস শ্যালীত্রয়ীশালী
শ্রীঅক্ষয়!

পুরবালা। (সগর্বে) আমার মাথা খাও, ঠাট্টা নয়, তুমি একটা সত্যিকার কাব্য লেখো না।

অক্ষয়। মাথা খাওয়ার কথা যদি বললে, আমি নিজের মাথাটি খেয়ে অবধি বুঝেছি ওটা সুখাদ্যের মধ্যে গণ্য নয়। আর ওই কাব্য লেখা, ও কার্যটাও দুঃসাধ্য

বলে জ্ঞান করি নে। বুদ্ধিতে আমার এক জায়গায় ফুটো আছে, কাব্য জমতে পারে না— ফস্ ফস্ করে বেরিয়ে পড়ে।

তুমি জান আমার গাছে ফল কেন না ফলে—
যেমনি ফুলটি ফুটে ওঠে আনি চরণতলে।

কিন্তু, আমার প্রশ্নের তো কোনো উত্তর পেলুম না? কৌতূহলে মরে যাচ্ছি। কাশীতে যে চলেছ, উৎসাহটা কিসের জন্যে। আপাতত সেই বিষ্ণুদূতটাকে মনে মনে ক্ষমা করলুম, কিন্তু ভগবান ভূতনাথ ভবানীপতির অনুচরগুলোর উপর ভারী সন্দেহ হচ্ছে। শুনেছি নন্দী ও ভৃঙ্গী অনেক বিষয়ে আমাকেও জেতে, ফিরে এসে হয়তো এই ভৃত্যটিকে পছন্দ না হতেও পারে।

পুরবালা। আমি কাশী যাব না।

অক্ষয়। সে কী কথা। ভূতভাবনের যে ভৃত্যগুলি একবার মরে ভূত হয়েছে তারা যে দ্বিতীয়বার মরবে।

রসিকের প্রবেশ

পুরবালা। আজ যে রসিকদার মুখ ভারী প্রফুল্ল দেখাচ্ছে।

রসিক। ভাই, তোর রসিকদার মুখের ওই রোগটা কিছুতেই ঘুচল না। কথা নেই বার্তা নেই প্রফুল্ল হয়েই আছে— বিবাহিত লোকেরা দেখে মনে মনে রাগ করে।

পুরবালা। শুনলে তো বিবাহিত লোক? এর একটা উপযুক্ত জবাব দিয়ে যাও।

অক্ষয়। আমাদের প্রফুল্লতার খবর ও বৃদ্ধ কোথা থেকে জানবে? সে এত রহস্যময় যে তা উদ্ভেদ করতে আজ পর্যন্ত কেউ পারলে না, সে এত গভীর যে আমরাই হাৎড়ে খুঁজে পাই নে— হঠাৎ সন্দেহ হয় আছে কি না।

পুরবালা। এই বুঝি! [রাগ করিয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম

অক্ষয়। (তাহাকে ফিরাইয়া) দোহাই তোমার, এই লোকটির সামনে রাগারাগি কোরো না— তা হলে ওর আস্পর্ধা আরও বেড়ে যাবে। দেখো দাম্পত্যতত্ত্বানভিজ্ঞ বৃদ্ধ, আমরা যখন রাগ করি তখন স্বভাবত আমাদের কণ্ঠস্বর প্রবল হয়ে ওঠে, সেইটেই তোমাদের কর্ণগোচর হয়; আর অনুরাগে যখন আমাদের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে, কানের কাছে মুখ আনতে গিয়ে মুখ বারম্বার লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে পড়তে থাকে— তখন তো খবর পাও না।

পুরবালা। আঃ, চুপ করো।

অক্ষয়। যখন গয়নার ফর্দ হয় তখন বাড়ির সরকার থেকে সেক্‌রা পর্যন্ত সেটা কারও অবিদিত থাকে না, কিন্তু বসন্তনিশীথে যখন প্রেয়সী—

পুরবালা। আঃ, থামো।

অক্ষয়। বসন্তনিশীথে প্রেয়সী—

পুরবালা। আঃ, কী বকছ তার ঠিক নেই।

অক্ষয়। বসন্তনিশীথে যখন প্রেয়সী গর্জন করে বলেন 'আমি কালই বাপের বাড়ি চলে যাব, আমার একদণ্ড এখানে থাকতে ইচ্ছে নেই— আমার হাড় কালী হল— আমার—

পুরবালা। হাঁগো মশায়, কবে তোমার প্রেয়সী বাপের বাড়ি যাব ব'লে বসন্তনিশীথে গর্জন করেছে।

অক্ষয়। ইতিহাসের পরীক্ষা? কেবল ঘটনা রচনা করে নিষ্কৃতি নেই? আবার সন তারিখ -সুদ্ধ মুখে মুখে বানিয়ে দিতে হবে? আমি কি এতবড়ো প্রতিভাশালী।

রসিক। (পুরবালার প্রতি) বুঝেছ ভাই, সোজা করে ও তোমার কথা বলতে পারে না— ওর এত ক্ষমতাই নেই— তাই উল্টে বলে; আদরে না কুলোলে গাল দিয়ে আদর করতে হয়।

পুরবালা। আচ্ছা মল্লিনাথজি, তোমার আর ব্যাখ্যা করতে হবে না। মা যে শেষকালে তোমাকেই কাশী নিয়ে যাবেন স্থির করেছেন।

রসিক। তা, বেশ তো, এতে আর ভয়ের কথাটা কী। তীর্থে যাবার তো বয়সই হয়েছে। এখন তোমাদের লোলকটাক্ষে এ বৃদ্ধের কিছুই করতে পারবে না— এখন চিত্ত চন্দ্রচূড়ের চরণে—

মুগ্ধস্নিগ্ধবিদগ্ধলুব্ধমধুরৈর্লোলৈঃ কটাক্ষৈরলং
চেতঃ সম্প্রতি চন্দ্রচূড়চরণধ্যানামৃতে বর্ততে।

পুরবালা। সে তো খুব ভালো কথা, তোমার উপরে আর কটাক্ষের অপব্যয় করতে চাই নে, এখন চন্দ্রচূড়চরণে চলো— তা হলে মাকে ডাকি।

রসিক। (করজোড়ে) বড়দিদিভাই, তোমার মা আমাকে সংশোধনের বিস্তর চেষ্টা করেছেন, কিন্তু একটু অসময়ে সংস্কারকার্য আরম্ভ করেছেন— এখন তাঁর শাসনে কোনো ফল হবে না। বরঞ্চ এখনও নষ্ট হবার বয়স আছে, সে বয়সটা বিধাতার কৃপায় বরাবরই থাকে, লোল কটাক্ষটা শেষকাল পর্যন্ত খাটে, কিন্তু উদ্ধারের বয়স আর নেই। তিনি এখন কাশী যাচ্ছেন, কিছুদিন এই বৃদ্ধ শিশুর বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতিসাধনের দুরাশা পরিত্যাগ করে শান্তিতে থাকুন— কেন তোরা তাঁকে কষ্ট দিবি।

জগত্তারিণীর প্রবেশ

জগত্তারিণী। বাবা, তা হলে আসি।

অক্ষয়। চললে নাকি মা ? রসিকদাদা যে এতক্ষণ দুঃখ করছিলেন যে তুমি—

রসিক। (ব্যাকুলভাবে) দাদার সকল কথাতেই ঠাট্টা। মা, আমার কোনো দুঃখ নেই, আমি কেন দুঃখ করতে যাব।

অক্ষয়। বলছিলে না যে 'বড়োমা একলাই কাশী যাচ্ছেন, আমাকে সঙ্গে নিলেন না' ?

রসিক। হাঁ, সে তো ঠিক কথা। মনে তো লাগতেই পারে, তবে কিনা মা যদি নিতান্তই—

জগত্তারিণী। না বাপু, বিদেশে তোমার রসিকদাদাকে সামলাবে কে। ওঁকে নিয়ে পথ চলতে পারব না।

পুরবালা। কেন মা, রসিকদাদাকে নিয়ে গেলে উনি তোমাকে দেখতে-শুনতে পারতেন।

জগত্তারিণী। রক্ষে করো, আমাকে আর দেখে-শুনে কাজ নেই। তোমার রসিক দাদার বুদ্ধির পরিচয় ঢের পেয়েছি।

রসিক। (টাকে হাত বুলাইতে বুলাইতে) তা, মা, যেটুকু বুদ্ধি আছে তার পরিচয় সর্বদাই দিচ্ছি, ও তো চেপে রাখবার জো নেই— ধরা পড়তেই হবে। ভাঙা চাকাটাই সব চেয়ে খড়্‌খড়্‌ করে, তিনি যে ভাঙা সেটা পাড়াসুদ্ধ খবর পায়। সেইজন্যেই বড়োমা, চুপচাপ করে থাকতেই চাই, কিন্তু তুমি যে আবার চালাতেও ছাড় না।

জগত্তারিণী। আমি তা হলে হারানের বাড়ি চললুম, একেবারে তাদের সঙ্গে গাড়িতে উঠব ; এর পরে আর যাত্রার সময় নেই। পুরো, তোরা তো দিন ক্ষণ মানিস নে, ঠিক সময়ে ইস্টেশনে যাস।

পুরবালা। মা, আমি কাশী যাব না।

হঠাৎ তাহার অসম্মতিতে বিপন্ন হইয়া জগত্তারিণী তাঁহার জামাতার মুখের দিকে চাহিলেন

অক্ষয়। (শাশুড়ির মনের ভাব বুঝিয়া) সে কি হয়। তুমি মার সঙ্গে না গেলে ওঁর অসুবিধে হবে। আচ্ছা মা, তুমি এগোও, আমি ওকে ঠিক সময়ে স্টেশনে নিয়ে যাব।

জগত্তারিণী নিশ্চিন্ত হইয়া প্রস্থান করিলেন। রসিকদাদা টাকে হাত বুলাইতে বুলাইতে বিদায়কালীন বিমর্ষতা মুখে আনিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন

পুরুষবেশধারী শৈলের প্রবেশ

অক্ষয়। কে মশায়। আপনি কে ?

শৈলবালা। আজ্ঞে মশায়, আপনার সহধর্মিণীর সঙ্গে আমার বিশেষ সম্বন্ধ আছে। (অক্ষয়ের সঙ্গে শেক-হ্যাণ্ড্) মুখুজ্জেমশায়, চিনতে তো পারলে না ?

পুরবালা। অবাক করলি। লজ্জা করছে না ?

শৈলবালা। দিদি, লজ্জা যে স্ত্রীলোকের ভূষণ— পুরুষের বেশ ধরতে গেলেই সেটা পরিত্যাগ করতে হয়। তেমনি আবার মুখুজ্জেমশায় যদি মেয়ে সাজেন উনি লজ্জায় মুখ দেখাতে পারবেন না। রসিকদাদা, চুপ করে রইল যে ?

রসিক। আহা, শৈল যেন কিশোর কন্দর্প। যেন সাক্ষাৎ কুমার, ভবানীর কোল থেকে উঠে এল। ওকে বরাবর শৈল বলে দেখে আসছি, চোখের অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল ; ও সুন্দরী কি মাঝারি কি চলনসই সে কথা কখনো মনেও ওঠে নি—আজ ঐ বেশটি বদল করেছে বলেই তো ওর রূপখানি ধরা দিলে। পুরোদিদি, লজ্জার কথা কী বলছিস, আমার ইচ্ছে করছে ওকে টেনে নিয়ে ওর মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করি।

অক্ষয়। (স্নেহাভিষিক্ত গাম্ভীর্যের সহিত ছদ্মবেশিনীকে ক্ষণকাল নিরীক্ষণ করিয়া) সত্যি বলছি শৈল, তুমি যদি আমার শ্যালী না হয়ে আমার ছোটো ভাই হতে তা হলেও আমি আপত্তি করতুম না।

শৈলবালা। (ঈষৎ বিচলিত হইয়া) আমিও না মুখুজ্জেমশায়।

পুরবালা। (শৈলকে বুকের কাছে টানিয়া) এই বেশে তুই কুমার-সভার সভ্য হতে যাচ্ছিস ?

শৈলবালা। অন্য বেশে হতে গেলে যে ব্যাকরণের দোষ হয় দিদি। কী বল রসিকদাদা।

রসিক। তা তো বটেই, ব্যাকরণ বাঁচিয়ে তো চলতেই হবে। ভগবান পাণিনি বোপদেব এঁরা কী জন্যে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু ভাই, শ্রীমতী শৈলবালার উত্তর চাপকান প্রত্যয় করলেই কি ব্যাকরণ রক্ষে হয়।

অক্ষয়। নতুন মুগ্ধবোধে তাই লেখে। আমি লিখেপ'ড়ে দিতে পারি, চিরকুমার-সভার মুগ্ধদের কাছে শৈল যেমন প্রত্যয় করাবে তাঁরা তেমনি প্রত্যয় যাবেন। কুমারদের ধাতু আমি জানি কিনা।

পুরবালা। (একটুখানি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) তোর মুখুজ্জেমশায়কে আর এই বুড়ো সমবয়সীটিকে নিয়ে তোর খেলা তুই আরম্ভ কর্— আমি মার সঙ্গে কাশী চললুম।

পুরবালা জিনিসপত্র গুছাইতে গেল. এমন সময় নৃপবালা ও নীরবালা ঘরে প্রবেশ করিয়াই পলায়নোদ্যত হইল
নীর দরজার আড়াল হইতে আর-একবার ভালো করিয়া তাকাইয়া মেজদিদি বলিয়া ছুটিয়া আসিল

নীরবালা। মেজদিদি, তোমাকে ভাই জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু ওই চাপকানে বাধছে। মনে হচ্ছে তুমি যেন কোন্ রূপকথার রাজপুত্র, তেপান্তর মাঠ পেরিয়ে আমাদের উদ্ধার করতে এসেছ।

নীরর সমুচ্চ কণ্ঠস্বরে আশ্বস্ত হইয়া নৃপও ঘরে প্রবেশ করিয়া মুগ্ধনেত্রে চাহিয়া রহিল

নীরবালা। (তাহাকে টানিয়া লইয়া) অমন করে লোভীর মতো তাকিয়ে আছিস কেন। যা মনে করছিস তা নয়, ও তোর দুষ্মন্ত নয়— ও আমাদের মেজদিদি।

রসিক।— ইয়মধিকমনোজ্ঞা চাপকানেনাপি তন্বী
কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাম্।

অক্ষয়। মূঢ়ে, তোরা কেবল চাপকানটা দেখেই মুগ্ধ। গিল্‌টির এত আদর? এ দিকে যে খাঁটি সোনা দাঁড়িয়ে হাহাকার করছে।

নীরবালা। আজকাল খাঁটি সোনার দর যে বড়ো বেশি, আমাদের এই গিল্‌টিই ভালো। কী বল ভাই মেজদিদি।

শৈলর কৃত্রিম গোঁফটা একটু পাকাইয়া দিল

রসিক। (নিজেকে দেখাইয়া) এই খাঁটি সোনাটি খুব সস্তায় যাচ্ছে ভাই, এখনও কোনো ট্যাঁকশালে গিয়ে কোনো মহারানীর ছাপটি পর্যন্ত পড়ে নি।

নীরবালা। আচ্ছা বেশ, সেজদিদিকে দান করলুম। (রসিকদাদার হাত ধরিয়া নৃপর হাতে সমর্পণ করিল) রাজি আছিস তো ভাই?

নৃপবালা। তা আমি রাজি আছি।

রসিকদাদাকে একটা চৌকিতে বসাইয়া সে তাঁহার মাথার পাকা চুল তুলিয়া দিতে লাগিল
নীর শৈলর কৃত্রিম গোঁফে তা দিয়া পাকাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল

শৈলবালা। আঃ, কী করছিস, আমার গোঁফ পড়ে যাবে।

রসিক। কাজ কী, এ দিকে আয়-না ভাই, এ গোঁফ কিছুতেই পড়বে না।

নীরবালা। আবার! ফের! সেজদিদির হাতে সঁপে দিলুম কী করতে। আচ্ছা রসিকদাদা, তোমার মাথার দুটো-একটা চুল কাঁচা আছে, কিন্তু গোঁফ আগাগোড়া পাকালে কী করে।

রসিক। কারও কারও মাথা পাকবার আগে মুখটা পাকে।

অক্ষয়। তা হলে আমি একবার চিরকুমার-সভার মাথায় হাত বুলিয়ে আসি।

নীরবালা।— গান

জয়যাত্রায় যাও গো, ওঠো ওঠো জয়রথে তব।
মোরা জয়মালা গেঁথে আশা চেয়ে বসে রব।

আঁচল বিছায়ে রাখি   পথধুলা দিব ঢাকি—
ফিরে এলে হে বিজয়ী,   হৃদয়ে বরিয়া লব।

অক্ষয়। রথ প্রস্তুত, এখন কী আনব বলো।

নীরবালা।—

আঁকিয়ো হাসির রেখা   সজল আঁখির কোণে—
নববসন্তশোভা এনো এ শূন্যবনে।
সোনার প্রদীপে জ্বালো   আঁধার ঘরের আলো,
পরাও রাতের ভালে চাঁদের তিলক নব।

অক্ষয়। আর সব ভালো, কেবল তোমার ফর্দের মধ্যে সোনার প্রদীপটাই আক্কারা ঠেকছে। চেষ্টার ক্রটি হবে না।

নীরবালা। দিদিদের সভাটা কোন্ ঘরে বসবে মুখুজ্জেমশায়।

অক্ষয়। আমার বসবার ঘরে।

নীরবালা। তা হলে সে ঘরটা একটু সাজিয়ে-গুজিয়ে দিইগে।

অক্ষয়। যতদিন আমি সে ঘরটা ব্যবহার করছি একদিনও সাজাতে ইচ্ছে হয় নি বুঝি ?

নীরবালা। তোমার জন্যে ঝড়ু বেহারা আছে, তবু বুঝি আশ মিটল না ?

পুরবালার প্রবেশ

পুরবালা। কী হচ্ছে তোমাদের।

নীরবালা। মুখুজ্জেমশায়ের কাছে পড়া বলে নিতে এসেছি দিদি। তা, উনি বলছেন ওঁর বাইরের ঘরটা ভালো করে ঝেড়ে সাজিয়ে না দিলে উনি পড়াবেন না। তাই সেজদিদিতে আমাতে ওঁর ঘর সাজাতে যাচ্ছি। আয় ভাই।

নৃপবালা। তোর ইচ্ছে হয়েছে তুই ঘর সাজাতে যা-না— আমি যাব না।

নীরবালা। বাঃ, আমি একা খেটে মরব, আর তুমি-সুদ্ধ তার ফল পাবে সে হবে না।

নৃপকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া নীর চলিয়া গেল

পুরবালা। সব গুছিয়ে নিয়েছি। এখনও ট্রেন যাবার দেরি আছে বোধ হয়।

অক্ষয়। যদি মিস করতে চাও তা হলে ঢের দেরি আছে।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

চন্দ্রবাবুর বাড়ি। চিরকুমার-সভার ঘর

শ্রীশ ও বিপিন

শ্রীশ। তা, যাই বল, অক্ষয়বাবু যখন আমাদের সভায় ছিলেন তখন আমাদের চিরকুমার-সভা জমেছিল ভালো। আমাদের সভাপতি চন্দ্রবাবু কিছু কড়া।

বিপিন। তিনি থাকতে রস কিছু বেশি জমে উঠেছিল— চিরকৌমার্যব্রতের পক্ষে রসাধিক্যটা ভালো নয়, আমার তো এই মত।

শ্রীশ। আমার মত ঠিক উল্টো। আমাদের ব্রত কঠিন ব'লেই রসের দরকার বেশি। রুক্ষ মাটিতে ফসল ফলাতে গেলে কি জলসিঞ্চনের প্রয়োজন হয় না। চিরজীবন বিবাহ করব না এই প্রতিজ্ঞাই যথেষ্ট, তাই ব'লেই কি সব দিক থেকেই শুকিয়ে মরতে হবে।

বিপিন। যাই বল, হঠাৎ কুমার-সভা ছেড়ে দিয়ে বিবাহ করে অক্ষয়বাবু আমাদের সভাটাকে যেন আল্‌গা করে দিয়ে গেছেন। ভিতরে ভিতরে আমাদের সকলেরই প্রতিজ্ঞার জোর কমে গেছে।

শ্রীশ। কিছুমাত্র না। আমার নিজের কথা বলতে পারি, আমার প্রতিজ্ঞার বল আরও বেড়েছে। যে ব্রত সকলে অনায়াসেই রক্ষা করতে পারে তার উপরে শ্রদ্ধা থাকে না।

বিপিন। একটা সুখবর দিই শোনো।

শ্রীশ। তোমার বিবাহের সম্বন্ধ হয়েছে নাকি।

বিপিন। হয়েছে বৈকি— তোমার দৌহিত্রীর সঙ্গে। ঠাট্টা রাখো, পূর্ণ কাল কুমার-সভার সভ্য হয়েছে।

শ্রীশ। পূর্ণ! বল কী। তা হলে তো শিলা জলে ভাসল।

বিপিন। শিলা আপনি ভাসে না হে। তাকে আর-কিছুতে অকূলে ভাসিয়েছে।

শ্রীশ। ওহে বিপিন, পূর্ণ যে খামকা চিরকুমার-সভার সভ্য হল তার তো কোনো

কারণ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এ সভায় কৈশিকাকর্ষণ, মাধ্যাকর্ষণ, চুম্বকাকর্ষণ প্রভৃতি কোনো আকর্ষণের বালাই নেই।

বিপিন। কে বললে নেই। পর্দার আড়ালে আছে।

শ্রীশ। আর-একটু খোলসা করে বলো। তোমার বুদ্ধির দৌড়টা কিরকম শুনি।

বিপিন। পূর্ণ এ সভার সভ্য হবার পর থেকে আমি লক্ষ্য করে দেখেছি যে তার দুটি চক্ষু সর্বদা ওই দরজার দিকের পর্দাটার রহস্যভেদ করবার জন্যই নিবিষ্ট। কারণ খুঁজতে গিয়ে দেখি পর্দার নীচের ফাঁক দিয়ে দুখানি চরণ দেখা যাচ্ছে। দেখেই বোঝা গেল, সেই চরণের দিকে যার মন বিচরণ করে কুমার-ব্রত রক্ষা করতে গিয়ে সে বিব্রত হবে।

শ্রীশ। সেই চরণযুগলের চরম তত্ত্বটা ধরতে পারলে? যাকে একটু করে জানলে মন উতলা হয় অনেক সময় তাকে সম্পূর্ণ জানলে মন শান্তি পায়। চরণ দুটি কার শুনি।

বিপিন। তবে ইতিহাসটা বলি শোনো। জানই তো, পূর্ণ সন্ধ্যাবেলায় চন্দ্রবাবুর কাছে পড়ার নোট নিতে যায়। সেদিন আমি আর পূর্ণ একসঙ্গেই একটু সকাল সকাল চন্দ্রবাবুর বাসায় এসেছিলেম। তিনি একটা মিটিং থেকে সবে এসেছেন। বেহারা কেরোসিন জ্বেলে দিয়ে গেছে, পূর্ণ বইয়ের পাত ওল্টাচ্ছে, এমন সময়— কী আর বলব ভাই, সে যেন বঙ্কিমবাবুর কোন্ এক অলিখিত নভেলের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল এক কন্যে, পিঠে দুলছে বেণী—

শ্রীশ। বল কী, বল কী বিপিন।

বিপিন। শোনোই-না। এক হাতে থালায় করে চন্দ্রবাবুর জন্যে জলখাবার, আর-এক হাতে জলের গ্লাস নিয়ে হঠাৎ ঘরের মধ্যে এসে উপস্থিত। আমাদের দেখেই তো কুণ্ঠিত, সচকিত, লজ্জায় মুখ রক্তিমবর্ণ। হাত জোড়া, মাথায় কাপড় দেবার জো নেই। তাড়াতাড়ি টেবিলের উপর খাবার রেখেই ছুট। পূর্ণর মুখ দেখেই বোঝা গেল, তার মনটা দোদুল্যমান বেণীর পিছন পিছন ছুটেছে। ব্রাহ্ম বটে, কিন্তু তেত্রিশ কোটির সঙ্গে লজ্জাকে বিসর্জন দেয় নি এবং সত্য বলছি শ্রীকেও রক্ষা করেছে।

শ্রীশ। বল কী বিপিন, দেখতে ভালো বুঝি।

বিপিন। দিব্যি দেখতে। হঠাৎ যেন বিদ্যুতের মতো এসে পড়ে পড়াশুনোয় বজ্রাঘাত করে গেল।

শ্রীশ। আহা, কই, আমি তো একদিনও দেখি নি। মেয়েটি কে হে।

বিপিন। আমাদের সভাপতির ভাগ্নি, নাম নির্মলা।

শ্রীশ। ভাগ্নি? সর্বনাশ! এইখানেই থাকেন?

বিপিন। সন্দেহমাত্র নেই। সভাপতিমশায় নিজে নীরোগ, কিন্তু রোগের ছোঁয়াচ নিয়ে ফেরেন।

শ্রীশ। কিন্তু ভাগ্নেজামাই ব'লে বালাই নেই বুঝি?

বিপিন। সে বালাইটি অপরিণীত আকারে চিরকুমার-সভায় ঢুকে পড়েছে। পূর্ণ পরিণত আকারে যখন বেরিয়ে পড়বে তখন প্রজাপতি কুমার-সভার গুটি বিদীর্ণ করে দেবেন।

শ্রীশ। তিনি তবে কুমারী?

বিপিন। কুমারী বৈকি। কুমার-সভার মহামারী। এই ঘটনার ঠিক পরেই পূর্ণ হঠাৎ আমাদের কুমার-সভায় নাম লিখিয়েছে।

শ্রীশ। পূজারি সেজে ঠাকুর চুরি করবার মৎলব। আমাকেও তো ব্যাপারটা পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

বিপিন। নারীতত্ত্বের গবেষণা স্বাস্থ্যকর না হতে পারে।

শ্রীশ। তোমার স্বাস্থ্যের যদি ব্যাঘাত না হয়ে থাকে তা হলে আমারও—

বিপিন। আরম্ভেতে রোগের প্রবেশ ধরা পড়ে না। কিন্তু, কুমারের মার যখন ভিতর থেকে ফুটে উঠবে তখন অশ্বিনীকুমারেরও সাধ্য নেই রক্ষা করে। গোড়ায় সাবধান হওয়া ভালো।

একটি প্রৌঢ় ব্যক্তির প্রবেশ

বিপিন। কী মশায়, আপনি কে।

প্রৌঢ় ব্যক্তি। আজ্ঞে, আমার নাম শ্রীবনমালী ভট্টাচার্য, ঠাকুরের নাম ৺রামকমল ন্যায়চঞ্চু, নিবাস—

শ্রীশ। আর অধিক আমাদের ঔৎসুক্য নেই। এখন কী কাজে এসেছেন সেইটে—

বনমালী। কাজ কিছুই নয়। আপনারা ভদ্রলোক, আপনাদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়—

শ্রীশ। কাজ আপনার না থাকে আমাদের আছে। এখন, অন্য কোনো ভদ্রলোকের সঙ্গে যদি আলাপ-পরিচয় করতে যান তা হলে আমাদের একটু—

বনমালী। তবে কাজের কথাটা সেরে নিই।

শ্রীশ। সেই ভালো।

বনমালী। কুমারটুলির নীলমাধব চৌধুরি-মশায়ের দুটি পরমাসুন্দরী কন্যা আছে—তাঁদের বিবাহযোগ্য বয়স হয়েছে—

শ্রীশ। হয়েছে তো হয়েছে, আমাদের সঙ্গে তার সম্বন্ধটা কী।

বনমালী। সম্বন্ধ তো আপনারা একটু মনোযোগ করলেই হতে পারে। সে আর শক্ত কী। আমি সমস্তই ঠিক করে দেব।

বিপিন। আপনার এত দয়া অপাত্রে অপব্যয় করছেন।

বনমালী। অপাত্র! বিলক্ষণ! আপনাদের মতো সৎপাত্র পাব কোথায়। আপনাদের বিনয়গুণে আরও মুগ্ধ হলেম।

শ্রীশ। এই মুগ্ধভাব যদি রাখতে চান তা হলে এইবেলা সরে পড়ুন। বিনয়গুণে অধিক টান সয় না।

বনমালী। কন্যার বাপ যথেষ্ট টাকা দিতে রাজি আছেন।

শ্রীশ। শহরে ভিক্ষুকের তো অভাব নেই। ওহে বিপিন, তোমার আমোদ বোধ হচ্ছে, কিন্তু এ-রকম সদালাপ আমার ভালো লাগে না।

বিপিন। পালাই কোথায়। ভগবান এঁকেও যে লম্বা একজোড়া পা দিয়েছেন।

শ্রীশ। যদি পিছু ধরেন তা হলে ভগবানের সেই দান মানুষের হাতে প'ড়ে খোয়াতে হবে।

বনমালী। আমিই যাই। [প্রস্থান

চন্দ্রমাধববাবুর প্রবেশ

চন্দ্রবাবু। পূর্ণ।

শ্রীশ। আজ্ঞে, আমি শ্রীশ।

চন্দ্রবাবু। আমাদের এই সভার সভ্যসংখ্যা অল্প হওয়াতে কারও হতাশ্বাস হবার কোনো কারণ নেই—

শ্রীশ। হতাশ্বাস? সেই তো আমাদের সভার গৌরব। এ সভার মহৎ আদর্শ এবং কঠিন বিধান কি সর্বসাধারণের উপযুক্ত। আমাদের সভা অল্প লোকের সভা।

চন্দ্রবাবু। (কার্যবিবরণের খাতাটা চোখের কাছে তুলিয়া) কিন্তু আমাদের আদর্শ উন্নত এবং বিধান কঠিন বলেই আমাদের বিনয় রক্ষা করা কর্তব্য; সর্বদাই মনে রাখা উচিত আমরা আমাদের সংকল্পসাধনের যোগ্য না হতেও পারি। ভেবে দেখো পূর্বে আমাদের মধ্যে এমন অনেক সভ্য ছিলেন যাঁরা হয়তো আমাদের চেয়ে সর্বাংশে মহত্তর ছিলেন, কিন্তু তাঁরাও নিজের সুখ এবং সংসারের প্রবল আকর্ষণে একে একে লক্ষ্যভ্রষ্ট

হয়েছেন। আমাদের কয় জনের পথেও যে প্রলোভন কোথায় অপেক্ষা করছে তা কেউ বলতে পারে না। সেইজন্য আমরা দম্ভ পরিত্যাগ করব এবং কোনো রকম শপথেও বদ্ধ হতে চাই নে। আমাদের মত এই যে, কোনো কালে মহৎ চেষ্টাকে মনে স্থান না দেওয়ার চেয়ে চেষ্টা করে অকৃতকার্য হওয়া ভালো।

পাশের ঘরে ঈষৎ-মুক্ত দরজার অন্তরালে একটি শ্রোত্রী এই কথায় যে একটুখানি বিচলিত হইয়া উঠিল, তাহার অঞ্চলবদ্ধ চাবির গোছায় দুই-একটা চাবি যে একটু ঠুন শব্দ করিল তাহা পূর্ণ ছাড়া আর কেহ লক্ষ্য করিতে পারিল না

চন্দ্রবাবু। আমাদের সভাকে অনেকেই পরিহাস করেন; অনেকেই বলেন তোমরা দেশের কাজ করবার জন্য কৌমার্যব্রত গ্রহণ করছ, কিন্তু সকলেই যদি এই মহৎ প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হয় তা হলে পঞ্চাশ বৎসর পরে দেশে এমন মানুষ কে থাকবে যার জন্যে কোনো কাজ করা কারও দরকার হবে। আমি প্রায়ই নম্র নিরুত্তরে এই-সকল পরিহাস বহন করি; কিন্তু এর কি কোনো উত্তর নেই?

তিনি তাঁহার তিনটিমাত্র সভ্যের দিকে চাহিলেন

পূর্ণ। (নেপথ্যবাসিনীকে স্মরণ করিয়া সোৎসাহে) আছে বৈকি। সকল দেশেই একদল মানুষ আছে যারা সংসারী হবার জন্যে জন্মগ্রহণ করে নি, তাদের সংখ্যা অল্প। সেই কটিকে আকর্ষণ করে এক উদ্দেশ্য-বন্ধনে বাঁধবার জন্যে আমাদের এই সভা— সমস্ত জগতের লোককে কৌমার্যব্রতে দীক্ষিত করবার জন্যে নয়। আমাদের এই জাল অনেক লোককে ধরবে এবং অধিকাংশকেই পরিত্যাগ করবে, অবশেষে দীর্ঘকাল পরীক্ষার পর দুটি-চারটি লোক থেকে যাবে। যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে, তোমরাই কি সেই দুটি-চারটি লোক তবে স্পর্ধাপূর্বক কে নিশ্চয়রূপে বলতে পারে। হাঁ, আমরা জালে আকৃষ্ট হয়েছি এই পর্যন্ত, কিন্তু পরীক্ষায় শেষ পর্যন্ত টিঁকতে পারব কি না তা অন্তর্যামীই জানেন। কিন্তু আমরা টিঁকতে পারি বা না পারি, আমরা একে একে স্খলিত হই বা না হই, তাই বলে আমাদের এই সভাকে পরিহাস করবার অধিকার কারও নেই। কেবল যদি আমাদের সভাপতিমশায় একলামাত্র থাকেন, তবে আমাদের এই পরিত্যক্ত সভাক্ষেত্র সেই এক তপস্বীর তপঃপ্রভাবে পবিত্র উজ্জ্বল হয়ে থাকবে এবং তাঁর চিরজীবনের তপস্যার ফল দেশের পক্ষে কখনোই ব্যর্থ হবে না।

কুণ্ঠিত সভাপতি কার্যবিবরণের খাতাখানি পুনর্বার তাঁহার চোখের অত্যন্ত কাছে ধরিয়া অন্যমনস্কভাবে কী দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু পূর্ণর এই বক্তৃতা যথাস্থানে যথাবেগে গিয়া পৌঁছিল। চন্দ্রমাধববাবুর একাকী তপস্যার কথায় নির্মলার চক্ষু ছল ছল করিয়া আসিল এবং বিচলিত বালিকার চাবির গোছার ঝনক শব্দ উৎকর্ণ পূর্ণকে পুরস্কৃত করিল

বিপিন। আমরা এ সভার যোগ্য কি অযোগ্য কালেই তার পরিচয় হবে, কিন্তু কাজ করাও যদি আমাদের উদ্দেশ্য হয় তবে সেটা কোনো-এক সময়ে শুরু করা উচিত। আমার প্রশ্ন এই, কী করতে হবে।

চন্দ্রবাবু। (উৎসাহিত হইয়া) এই প্রশ্নের জন্য আমরা এতদিন অপেক্ষা করে ছিলাম, কী করতে হবে। এই প্রশ্ন যেন আমাদের প্রত্যেককে দংশন করে অধীর করে তোলে, কী করতে হবে। বন্ধুগণ, কাজই একমাত্র ঐক্যের বন্ধন। এক সঙ্গে যারা কাজ করে তারাই এক। এই সভায় আমরা যতক্ষণ সকলে মিলে একটা কাজে নিযুক্ত না হব ততক্ষণ আমরা যথার্থ এক হতে পারব না। অতএব বিপিনবাবু আজ এই-যে প্রশ্ন করছেন 'কী করতে হবে', এই প্রশ্নকে নিবতে দেওয়া হবে না। সভ্যমহাশয়গণ, আপনারা উত্তর করুন কী করতে হবে।

শ্রীশ। (অস্থির হইয়া) আমাকে যদি জিজ্ঞাসা করেন 'কী করতে হবে' আমি বলি আমাদের সকলকে সন্ন্যাসী হয়ে ভারতবর্ষের দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে দেশহিতব্রত নিয়ে বেড়াতে হবে, আমাদের দলকে পুষ্ট করে তুলতে হবে, আমাদের সভাটিকে সূক্ষ্ম সূত্র স্বরূপ করে সমস্ত ভারতবর্ষকে গেঁথে ফেলতে হবে।

বিপিন। (হাসিয়া) সে ঢের সময় আছে, যা কালই শুরু করা যেতে পারে এমন একটা-কিছু কাজ বলো। 'মারি তো গণ্ডার লুঠি তো ভাণ্ডার' যদি পণ ক'রে বস তবে গণ্ডারও বাঁচবে, ভাণ্ডারও বাঁচবে, তুমিও যেমন আরামে আছ তেমনি আরামে থাকবে। আমি প্রস্তাব করি, আমরা প্রত্যেকে দুটি করে বিদেশী ছাত্র পালন করব, তাদের পড়াশুনো এবং শরীরমনের সমস্ত চর্চার ভার আমাদের উপর থাকবে।

শ্রীশ। এই তোমার কাজ ! এর জন্যই আমরা সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করেছি ? শেষকালে ছেলে মানুষ করতে হবে ! তা হলে নিজের ছেলে কী অপরাধ করেছে।

বিপিন। (বিরক্ত হইয়া) তা যদি বল তা হলে সন্ন্যাসীর তো কর্মই নেই ; কর্মের মধ্যে ভিক্ষে আর ভ্রমণ আর ভণ্ডামি।

শ্রীশ। (রাগিয়া) আমি দেখছি আমাদের মধ্যে কেউ কেউ আছেন এ সভার মহৎ উদ্দেশ্যের প্রতি যাঁদের শ্রদ্ধামাত্র নেই, তাঁরা যত শীঘ্র এ সভা পরিত্যাগ করে সন্তান-পালনে প্রবৃত্ত হন ততই আমাদের মঙ্গল।

বিপিন। (আরক্তবর্ণ হইয়া) নিজের সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই নে, কিন্তু এ সভায় এমন কেউ কেউ আছেন যাঁরা সন্ন্যাসগ্রহণের কঠোরতা এবং সন্তানপালনের ত্যাগ-স্বীকার দুয়েরই অযোগ্য, তাঁদের—

চন্দ্রবাবু। (চোখের কাছ হইতে কার্যবিবরণের খাতা নামাইয়া) উত্থাপিত

প্রস্তাব সম্বন্ধে পূর্ণবাবুর অভিপ্রায় জানতে পারলে আমার মন্তব্য প্রকাশ করবার অবসর পাই।

পূর্ণ। অন্য বিশেষরূপে সভার ঐক্য-বিধানের জন্য একটা কাজ অবলম্বন করবার প্রস্তাব করা হয়েছে। কিন্তু কাজের প্রস্তাবে ঐক্যের লক্ষণ কিরকম পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে সে আর কাউকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখাবার দরকার নেই। ইতিমধ্যে আমি যদি আবার একটা তৃতীয় মত প্রকাশ করে বসি তা হলে বিরোধানলে তৃতীয় আহুতি দান করা হবে— অতএব আমার প্রস্তাব এই যে, সভাপতিমশায় আমাদের কাজ নির্দেশ করে দেবেন এবং আমরা তাই শিরোধার্য করে নিয়ে বিনা বিচারে পালন করে যাব, কার্যসাধন এবং ঐক্যসাধনের এই একমাত্র উপায় আছে।

পাশের ঘরে এক ব্যক্তি আবার একবার নড়িয়া-চড়িয়া বসিল
এবং তাহার চাবি ঝন্ করিয়া উঠিল

চন্দ্রবাবু। আমাদের প্রথম কর্তব্য ভারতবর্ষের দারিদ্র্যমোচন, এবং তার আশু উপায় বাণিজ্য। আমরা কয়জনে বড়ো বাণিজ্য চালাতে পারি নে, কিন্তু তার সূত্রপাত করতে পারি। মনে করো আমরা সকলেই যদি দিয়াশলাই সম্বন্ধে পরীক্ষা আরম্ভ করি। এমন যদি একটা কাঠি বের করতে পারি যা সহজে জ্বলে, শীঘ্র নেবে না এবং দেশের সর্বত্র প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, তা হলে দেশে সস্তা দেশালাই-নির্মাণের কোনো বাধা থাকে না। আমি বলছি শুধু ও জিনিসটা প্রস্তুত করার প্রণালী জানলেই তো হবে না। আমাদের দেশে যত রকম কাঠ মেলে তার মধ্যে কোন্ কাঠটা সব চেয়ে দাহ্য তার সন্ধান করা চাই।

বিপিন। দাহনতত্ত্ব সম্বন্ধে পূর্ণবাবুর কিছু অভিজ্ঞতা আছে বলে মনে হয়।

চন্দ্রবাবু। তাই না কি। কী পূর্ণ, তুমি কি দাহ্য পদার্থের পরীক্ষা করেছ নাকি।

পূর্ণ। আমার মনে হয় খ্যাংরা কাঠি জিনিসটা সস্তাও বটে অথচ—

বিপিন। হাঁ, অথচ ওটা সহজেই জ্বালা ধরিয়ে দেয়, কিন্তু কুমার-সভায় তার পরীক্ষা সহজ নয়।

চন্দ্রবাবু। কী বলছেন বিপিনবাবু। কথাটা শুনতে পেলুম না।

বিপিন। আমি বলছিলুম, আমাদের দেশে দাহ্য পদার্থ যথেষ্ট আছে, যাতে দাহন করে এমন জিনিসেরও অভাব নেই; কিন্তু পরীক্ষাটা খুব বিবেচনাপূর্বক করা চাই।

চন্দ্রবাবু। ঠিক কথা বলেছেন। অনেক কাঠ আছে, যেমন শীঘ্র জ্বলে ওঠে তেমনি শীঘ্র পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

বিপিন। আছে বৈকি।

চন্দ্রবাবু। শীঘ্র জ্বলবে, অল্প অল্প করে জ্বলবে, অনেক ক্ষণ ধরে শেষ পর্যন্ত জ্বলবে, এমন জিনিসটি চাই। খুঁজলে পাওয়া যাবে না কি?

শ্রীশ। খুব পাওয়া যাবে, হয়তো দেখবেন হাতের কাছেই আছে।

পূর্ণ। পাকাটি এবং খ্যাংরা কাঠি দিয়ে শীঘ্রই পরীক্ষা করে দেখব।

শ্রীশ মুখ ফিরাইয়া হাসিল

অক্ষয়ের প্রবেশ

অক্ষয়। মশায়, প্রবেশ করতে পারি?

ক্ষীণদৃষ্টি চন্দ্রমাধববাবু হঠাৎ চিনিতে না পারিয়া
ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলেন

অক্ষয়। মশায়, ভয় পাবেন না এবং অমন ভ্রূকুটি করে আমাকেও ভয় দেখাবেন না। আমি অভূতপূর্ব নই, এমনকি, আমি আপনাদেরই ভূতপূর্ব— আমার নাম—

চন্দ্রবাবু। আর নাম বলতে হবে না। আসুন, আসুন অক্ষয়বাবু—

তিন তরুণ সভ্য অক্ষয়কে নমস্কার করিল
বিপিন ও শ্রীশ দুই বন্ধু সদ্যোবিবাদের বিমর্ষতায় গম্ভীর হইয়া বসিয়া রহিল

পূর্ণ। মশায়, অভূতপূর্বের চেয়ে ভূতপূর্বকেই বেশি ভয় হয়।

অক্ষয়। পূর্ণবাবু বুদ্ধিমানের মতো কথাই বলেছেন। সংসারে ভূতের ভয়টাই প্রচলিত। নিজে যে ব্যক্তি ভূত অন্য লোকের জীবনসম্ভোগটা তার কাছে বাঞ্ছনীয় হতে পারেই না, এই মনে করে মানুষ ভূতকে ভয়ংকর কল্পনা করে। অতএব সভাপতিমশায়, চিরকুমার-সভার ভূতটিকে সভা থেকে ঝাড়াবেন না পূর্বসম্পর্কের মমতা-বশত একখানি চৌকি দেবেন— এই বেলা বলুন।

চন্দ্রবাবু। চৌকি দেওয়াই স্থির।

একখানি চেয়ার অগ্রসর করিয়া দিলেন

অক্ষয়। সর্বসম্মতিক্রমে আসন গ্রহণ করলুম। আপনারা আমাকে নিতান্ত ভদ্রতা করে বসতে বললেন বলেই যে আমি অভদ্রতা করে বসেই থাকব আমাকে এমন অসভ্য মনে করবেন না। বিশেষত পান তামাক এবং পত্নী আপনাদের সভার নিয়মবিরুদ্ধ, অথচ ওই তিনটে বদ্‌ অভ্যাসই আমাকে একেবারে মাটি করেছে, সুতরাং চটপট কাজের কথা সেরেই বাড়িমুখো হতে হবে।

চন্দ্রবাবু। (হাসিয়া) আপনি যখন সভ্য নন তখন আপনার সম্বন্ধে সভার নিয়ম

নাই খাটালেম ; পান-তামাকের বন্দোবস্ত বোধ হয় করে দিতে পারব, কিন্তু আপনার তৃতীয় নেশাই—

অক্ষয়। সেটি এখানে বহন করে আনবার চেষ্টা করবেন না, আমার সে নেশাটি প্রকাশ্য নয়।

চন্দ্রবাবু পান-তামাকের জন্য সনাতন চাকরকে ডাকিবার উপক্রম করিলেন
পূর্ণ 'আমি ডাকিয়া দিতেছি' বলিয়া উঠিল—
পাশের ঘরে চাবি এবং চুড়ি এবং সহসা পলায়নের শব্দ একসঙ্গে শোনা গেল

অক্ষয়। যস্মিন্ দেশে যদাচারঃ। যতক্ষণ আমি এখানে আছি ততক্ষণ আমি আপনাদের চিরকুমার, কোনো প্রভেদ নেই। এখন আমার প্রস্তাবটা শুনুন।

চন্দ্রবাবু টেবিলের উপর কার্যবিবরণের খাতাটির প্রতি অত্যন্ত ঝুঁকিয়া পড়িয়া মন দিয়া শুনিতে লাগিলেন

অক্ষয়। আমার কোনো মফস্বলের ধনী বন্ধু তাঁর একটি সন্তানকে আপনাদের কুমার-সভার সভ্য করতে ইচ্ছা করেছেন।

চন্দ্রবাবু। (বিস্মিত হইয়া) বাপ ছেলেটির বিবাহ দিতে চান না!

অক্ষয়। সে আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন— বিবাহ সে কোনোক্রমেই করবে না আমি তার জামিন রইলুম। তার দূর সম্পর্কের এক দাদা-সুদ্ধ সভ্য হবেন। তাঁর সম্বন্ধেও আপনারা নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। কারণ যদিচ তিনি আপনাদের মতো সুকুমার নন, কিন্তু আপনাদের সকলের চেয়ে বেশি কুমার, তাঁর বয়স ষাট পেরিয়ে গেছে— সুতরাং তাঁর সন্দেহের বয়সটা আর নেই, সৌভাগ্যক্রমে সেটা আপনাদের সকলেরই আছে।

চন্দ্রবাবু। সভ্যপদপ্রার্থীদের নাম ধাম বিবরণ—

অক্ষয়। অবশ্যই তাঁদের নাম ধাম বিবরণ একটা আছেই, সভাকে তার থেকে বঞ্চিত করতে পারা যাবে না— সভ্য যখন পাবেন তখন নাম ধাম বিবরণ -সুদ্ধই পাবেন। কিন্তু আপনাদের এই এক তলার স্যাঁৎসেঁতে ঘরটি স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল নয়; আপনাদের এই চিরকুমার-ক'টির চিরত্ব যাতে হ্রাস না হয় সে দিকে একটু দৃষ্টি রাখবেন।

চন্দ্র। (কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইয়া খাতাটি নাকের কাছে তুলিয়া লইয়া) অক্ষয়বাবু, আপনি জানেন তো আমাদের আয়—

অক্ষয়। আয়ের কথাটা আর প্রকাশ করবেন না, আমি জানি ও আলোচনাটা চিত্তপ্রফুল্লকর নয়। ভালো ঘরের বন্দোবস্ত করে রাখা হয়েছে, সেজন্যে আপনাদের ধনাধ্যক্ষকে স্মরণ করতে হবে না। চলুন-না, আজই সমস্ত দেখিয়ে শুনিয়ে আনি।

বিমর্ষ বিপিন-শ্রীশের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সভাপতিও প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়া চুলের মধ্য দিয়া বারবার আঙুল বুলাইতে বুলাইতে চুলগুলাকে অত্যন্ত অপরিষ্কার করিয়া তুলিলেন। কেবল পূর্ণ অত্যন্ত দমিয়া গেল

পূর্ণ। সভার স্থান-পরিবর্তনটা কিছু নয়।

অক্ষয়। কেন, এ বাড়ি থেকে ও বাড়ি করলেই কি আপনাদের চিরকৌমার্যের প্রদীপ হাওয়ায় নিবে যাবে।

পূর্ণ। এ ঘরটি তো আমাদের মন্দ বোধ হয় না।

অক্ষয়। মন্দ নয়। কিন্তু এর চেয়ে ভালো ঘর শহরে দুষ্প্রাপ্য হবে না।

পূর্ণ। আমার তো মনে হয় বিলাসিতার দিকে মন না দিয়ে খানিকটা কষ্টসহিষ্ণুতা অভ্যাস করা ভালো।

শ্রীশ। সেটা সভার অধিবেশনে না করে সভার বাইরে করা যাবে।

বিপিন। একটা কাজে প্রবৃত্ত হলেই এত ক্লেশ সহ্য করবার অবসর পাওয়া যায় যে, অকারণে বলক্ষয় করা মূঢ়তা।

অক্ষয়। বন্ধুগণ, আমার পরামর্শ শোনো, সভাঘরের অন্ধকার দিয়ে চিরকৌমার্য-ব্রতের অন্ধকার আর বাড়িয়ো না। আলোক এবং বাতাস স্ত্রীজাতীয় নয়, অতএব সভার মধ্যে ও দুটোকে প্রবেশ করতে বাধা দিয়ো না। আরও বিবেচনা করে দেখো, এ স্থানটি অত্যন্ত সরস, তোমাদের ব্রতটি তদুপযুক্ত নয়। বাতিকের চর্চা করছ করো, কিন্তু বাতের চর্চা তোমাদের প্রতিজ্ঞার মধ্যে নয়। কী বল শ্রীশবাবু। বিপিনবাবুর কী মত।

শ্রীশ ও বিপিন। ঠিক কথা। ঘরটা একবার দেখেই আসা যাক-না।

পূর্ণ বিমর্ষ হইয়া নিরুত্তর রহিল। পাশের ঘরেও চাবি একবার ঠুন করিল কিন্তু অত্যন্ত অপ্রসন্ন স্বরে

অক্ষয়। চন্দ্রবাবু, এখনই আসুন-না, দেখিয়ে আনি।

চন্দ্রবাবু। চলুন। [চন্দ্রবাবু ও অক্ষয়ের প্রস্থান

বিপিন। দেখো পূর্ণবাবু, সত্যি কথা বলছি তোমাকে, চিরকুমার-সভার ফ্রন্টিয়ার পলিসিতে আমরা পর্দা জিনিসটার অনুমোদন করি নে। ওইখান থেকেই শত্রুপ্রবেশের পথ।

পূর্ণ। মানে কী হল।

বিপিন। পর্দার মতো উড়ুক্ষু জিনিস, অল্প একটু হাওয়াতে চঞ্চল হয়ে ওঠে, কুমার-সভার সে যোগ্য নয়।

শ্রীশ। এখানকার সীমানা-রক্ষার জন্য পাকা ইঁটের দেওয়ালের মতো অচল পদার্থ চাই। ওই পর্দাটা ভালো ঠেকছে না।

পূর্ণ। তোমাদের কথাগুলো কিছু রহস্যময় শোনাচ্ছে।

বিপিন। সে কথা ঠিক। রহস্য পদার্থটাই সর্বনেশে। চিরকুমারদের সকলের চেয়ে যে বড়ো শত্রু পর্দা-বেষ্টনীর মধ্যেই তার বাস।

শ্রীশ। আমাদের ব্রত হচ্ছে পর্দাটাকে আক্রমণ করা, তাকে ছিন্ন করে ফেলা। পর্দার ছায়ায় ছায়ায় ফেরে যে মায়ামৃগী আলো ফেললেই মরীচিকার মতো সে মিলিয়ে যাবে।

পূর্ণ। শ্রীশবাবু, মরীচিকা মেলাতে পারে, কিন্তু তৃষ্ণা তো মেলায় না।

শ্রীশ। কেন মেলাবে। ওটা থাকা চাই। তৃষ্ণা না থাকলে আমাদের ছোটাবে কিসে। কেবল জানা দরকার কোন্ পথে ছুটলে ফল পাওয়া যাবে।

নেপথ্যে গান। ওগো, তোরা কে যাবি পারে।

বিপিন। একটু আস্তে। গান শুনতে পাচ্ছ না? খাসা গান বটে।

পূর্ণ। ওই গানটাও কি পর্দা নয়। ওর আড়ালে যে রহস্য গা ঢাকা দিয়ে রয়েছে পথে বিপথে ছোটাবার ক্ষমতা তারও আছে।

বিপিন। থাক্ ভাই। তত্ত্বকথাটা এখন থাক্। একটু শুনতে দাও। খুব কাছের বাড়ি থেকেই গানটা আসছে, শুনেছি অক্ষয়বাবুর বাসা ওইখানেই।

শ্রীশ। গানের কথাটা বেশ স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে।

নেপথ্যে গান

ওগো, তোরা কে যাবি পারে।
আমি তরী নিয়ে বসে আছি নদী-কিনারে।
ও পারেতে উপবনে কত খেলা কত জনে,
এ পারেতে ধু ধু মরু বারি বিনা রে।
এইবেলা বেলা আছে, আয় কে যাবি।
মিছে কেন কাটে কাল কত কী ভাবি।
সূর্য পাটে যাবে নেমে, সুবাতাস যাবে থেমে,
খেয়া বন্ধ হয়ে যাবে সন্ধ্যা-আঁধারে।

শ্রীশ। গানটা বোধ হচ্ছে যেন কুমার-সভাকেই ভয় দেখাবার গান। খেয়া বন্ধ হয়ে গেলেই তো মুশকিল।

বিপিন। ওই শুনলে না বললে— 'এ পারেতে ধূ ধূ মরু বারি বিনা রে' ?

পূর্ণ। তা হলে আর দেরি কেন। পারে যাবার জোগাড় করো।

শ্রীশ। গলাটা শুনে বোধ হচ্ছে পারে নিয়ে যাবে না, অতলে তলিয়ে দেবে।

[সকলের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

শ্রীশের বাসা

শ্রীশ তাহার বাসার দক্ষিণের বারান্দায় একখানা বড়ো হাতাওআলা কেদারার দুই হাতার উপর দুই পা তুলিয়া দিয়া শুক্লসন্ধ্যায় চুপচাপ বসিয়া সিগারেট ফুঁকিতেছিল। পাশে টিপায়ের উপর রেকাবিতে একটি গ্লাসে বরফ-দেওয়া লেমনেড ও স্তূপাকার কুন্দফুলের মালা।

বিপিনের প্রবেশ

বিপিন। কী গো সন্ন্যাসীঠাকুর।

শ্রীশ। (উঠিয়া বসিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া) এখনও বুঝি ঝগড়া ভুলতে পার নি ? আচ্ছা ভাই শিশুপালক, তুমি কি সত্যি মনে কর আমি সন্ন্যাসী হতে পারি নে।

বিপিন। কেন পারবে না। কিন্তু অনেকগুলি তল্পিদার চেলা সঙ্গে থাকা চাই।

শ্রীশ। তার তাৎপর্য এই যে, কেউ বা আমার বেলফুলের মালা গেঁথে দেবে, কেউ বা বাজার থেকে লেমনেড ও বরফ ভিক্ষে করে আনবে, এই তো ? তাতে ক্ষতিটা কী। যে সন্ন্যাসধর্মে বেলফুলের প্রতি বৈরাগ্য এবং ঠাণ্ডা লেমনেডের প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মায় সেটা কি খুব উঁচু দরের সন্ন্যাস।

বিপিন। সাধারণ ভাষায় তো সন্ন্যাসধর্ম বলতে সেই রকমটাই বোঝায়।

শ্রীশ। ওই শোনো, তুমি কি মনে কর ভাষায় একটা কথার একটা বৈ অর্থ নেই। একজনের কাছে সন্ন্যাসী কথাটার যে অর্থ আর-একজনের কাছেও যদি ঠিক সেই অর্থ ই হয়, তা হলে মন ব'লে একটা স্বাধীন পদার্থ আছে কী করতে।

বিপিন। তোমার মন সন্ন্যাসী কথাটার কী অর্থ করছেন আমার মন সেইটি শোনবার জন্য উৎসুক হয়েছেন।

শ্রীশ। আমার সন্ন্যাসীর সাজ এইরকম— গলায় ফুলের মালা, গায়ে চন্দন, কানে কুণ্ডল, মুখে হাস্য। আমার সন্ন্যাসীর কাজ মানুষের চিত্ত-আকর্ষণ। সুন্দর চেহারা, মিষ্টি গলা, বক্তৃতায় অধিকার, এ-সমস্ত না থাকলে সন্ন্যাসী হয়ে উপযুক্ত ফল পাওয়া

যায় না। রুচি বুদ্ধি কার্যক্ষমতা ও প্রফুল্লতা, সকল বিষয়েই আমার সন্ন্যাসীসম্প্রদায়কে গৃহস্থের আদর্শ হতে হবে।

বিপিন। অর্থাৎ, একদল কার্তিককে ময়ূরের উপর চড়ে রাস্তায় বেরোতে হবে।

শ্রীশ। ময়ূর না পাওয়া যায় ট্রাম আছে, পদব্রজেও নারাজ নই। কুমার-সভা মানেই তো কার্তিকের সভা। কিন্তু কার্তিক কি কেবল সুপুরুষ ছিলেন। তিনিই ছিলেন স্বর্গের সেনাপতি।

বিপিন। লড়াইয়ের জন্যে তাঁর দুটিমাত্র হাত, কিন্তু বক্তৃতা করবার জন্যে তাঁর তিন-জোড়া মুখ।

শ্রীশ। এর থেকে প্রমাণ হয় আমাদের আর্য পিতামহরা বাহুবল অপেক্ষা বাক্যবলকে তিনগুণ বেশি বলেই জানতেন। আমিও পালোয়ানিকে বীরত্বের আদর্শ বলে মানি নে।

বিপিন। ওটা বুঝি আমার উপর হল?

শ্রীশ। ওই দেখো। মানুষকে অহংকারে কী রকম মাটি করে। তুমি ঠিক করে রেখেছ, পালোয়ান বললেই তোমাকে বলা হল। তুমি কলিযুগের ভীমসেন। আচ্ছা, এসো, যুদ্ধং দেহি। একবার বীরত্বের পরীক্ষা হয়ে যাক।

এই বলিয়া দুই বন্ধু ক্ষণকালের জন্য লীলাচ্ছলে হাত-কাড়াকাড়ি করিতে লাগিল বিপিন হঠাৎ 'এইবার ভীমসেনের পতন' বলিয়া ধপ করিয়া শ্রীশের কেদারাটা অধিকার করিয়া তাহার উপরে দুই পা তুলিয়া দিল এবং 'উঃ অসহ্য তৃষ্ণা' বলিয়া লেমনেডের গ্লাসটি এক নিশ্বাসে খালি করিল তখন শ্রীশ তাড়াতাড়ি কুন্দফুলের মালাটি সংগ্রহ করিয়া 'কিন্তু বিজয়মাল্যটি আমার' বলিয়া সেটা মাথায় জড়াইল এবং বেতের মোড়াটার উপরে বসিয়া পড়িল

শ্রীশ। আচ্ছা ভাই, সত্যি বলো, একদল শিক্ষিত লোক যদি এই রকম সংসার পরিত্যাগ ক'রে পরিপাটি সজ্জায়, প্রফুল্ল প্রসন্ন মুখে, গানে এবং বক্তৃতায় ভারতবর্ষের চতুর্দিকে শিক্ষা বিস্তার করে বেড়ায় তাতে উপকার হয় কি না।

বিপিন। আইডিয়াটা ভালো বটে।

শ্রীশ। অর্থাৎ, শুনতে সুন্দর, কিন্তু করতে অসাধ্য। আমি বলছি অসাধ্য নয় এবং আমি দৃষ্টান্ত দ্বারা তার প্রমাণ করব। ভারতবর্ষে সন্ন্যাসধর্ম বলে একটা প্রকাণ্ড শক্তি আছে; তার ছাই ঝেড়ে, তার ঝুলিটা কেড়ে নিয়ে, তার জটা মুড়িয়ে, তাকে সৌন্দর্যে এবং কর্মনিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠিত করাই চিরকুমার-সভার একমাত্র উদ্দেশ্য। ছেলে পড়ানো এবং দেশলাইয়ের কাঠি তৈরি করবার জন্যে আমাদের মতো লোক চিরজীবনের ব্রত অবলম্বন করে নি। বলো বিপিন, তুমি আমার প্রস্তাবে রাজি আছ কি না।

বিপিন। তোমার সন্ন্যাসীর যেরকম চেহারা গলা এবং আসবাবের প্রয়োজন আমার তো তার কিছুই নেই। তবে তল্পিদার হয়ে পিছনে যেতে রাজি আছি। কানে যদি সোনার কুণ্ডল, অন্তত চোখে যদি সোনার চশমাটা প'রে যেখানে-সেখানে ঘুরে বেড়াও তা হলে-একটা প্রহরীর দরকার, সে কাজটা আমার দ্বারা কতকটা চলতে পারবে।

শ্রীশ। আবার ঠাট্টা।

বিপিন। না ভাই, ঠাট্টা নয়। আমি সত্যিই বলছি, তোমার প্রস্তাবটাকে যদি সম্ভবপর করে তুলতে পার তা হলে খুব ভালোই হয়। তবে এরকম একটা সম্প্রদায়ে সকলেরই কাজ সমান হতে পারে না, যার যেমন স্বাভাবিক ক্ষমতা সেই অনুসারে যোগ দিতে পারে।

শ্রীশ। সে তো ঠিক কথা। কেবল একটি বিষয়ে আমাদের খুব দৃঢ় হতে হবে, স্ত্রীজাতির কোনো সংস্রব রাখব না।

বিপিন। মাল্যচন্দন অঙ্গদকুণ্ডল সবই রাখতে চাও, কেবল ওই একটা বিষয়ে এত বেশি দৃঢ়তা কেন ?

শ্রীশ। ওইগুলো রাখছি ব'লেই দৃঢ়তা। যেজন্যে চৈতন্য তাঁর অনুচরদের স্ত্রীলোকের সঙ্গ থেকে কঠিন শাসনে দূরে রেখেছিলেন। তাঁর ধর্ম অনুরাগ এবং সৌন্দর্যের ধর্ম, সেজন্যেই তার পক্ষে প্রলোভনের ফাঁদ অনেক ছিল।

বিপিন। তা হলে ভয়টুকুও আছে।

শ্রীশ। আমার নিজের জন্যে লেশমাত্র নেই। আমি আমার মনকে পৃথিবীর বিচিত্র সৌন্দর্যে ব্যাপ্ত করে রেখে দিই, কোনো একটা ফাঁদে আমাকে ধরে কার সাধ্য ? কিন্তু তোমরা যে দিনরাত্রি ফুটবল টেনিস ক্রিকেট নিয়ে থাক, তোমরা একবার পড়লে ব্যাট্‌বল গুলিডাণ্ডা সবসুদ্ধ ঘাড়-মোড় ভেঙে পড়বে।

বিপিন। আচ্ছা ভাই, সময় উপস্থিত হলে দেখা যাবে।

শ্রীশ। ও কথা ভালো নয়। সময় উপস্থিত হবে না, সময় উপস্থিত হতে দেব না সময় তো রথে চড়ে আসেন না, আমরা তাঁকে ঘাড়ে করে নিয়ে আসি ; কিন্তু তুমি যে সময়টার কথা বলছ তাকে বাহন-অভাবে ফিরতেই হবে।

পূর্ণবাবুর প্রবেশ

উভয়ে। এসো পূর্ণবাবু।

বিপিন তাহাকে কেদারাটা ছাড়িয়া দিয়া একটা চৌকি টানিয়া লইয়া বসিল

পূর্ণ। তোমাদের এই বারান্দায় জ্যোৎস্নাটি তো মন্দ রচনা কর নি, মাঝে মাঝে থামের ছায়া ফেলে ফেলে সাজিয়েছ ভালো।

শ্রীশ। ছাদের উপর জ্যোৎস্না রচনা করা প্রভৃতি কতকগুলি অত্যাশ্চর্য ক্ষমতা জন্মাবার পূর্ব হতেই আমার আছে। কিন্তু দেখো পূর্ণবাবু, ওই দেশালাই করা-টরা ওগুলো আমার ভালো আসে না।

পূর্ণ। (ফুলের মালার দিকে চাহিয়া) সন্ন্যাসধর্মেই কি তোমার অসামান্য দখল আছে নাকি।

শ্রীশ। সেই কথাই তো হচ্ছিল। সন্ন্যাসধর্ম তুমি কাকে বল শুনি।

পূর্ণ। যে ধর্মে দর্জি ধোবা নাপিতের কোনো সহায়তা নিতে হয় না, তাঁতিকে একেবারেই অগ্রাহ্য করতে হয় পিয়ার্স্‌ সোপের বিজ্ঞাপনের দিকে দৃক্‌পাত করতে হয় না—

শ্রীশ। আরে ছিঃ, সে সন্ন্যাসধর্ম তো বুড়ো হয়ে মরে গেছে। এখন নবীন সন্ন্যাসী ব'লে একটা সম্প্রদায় গড়তে হবে—

পূর্ণ। বিদ্যাসুন্দরের যাত্রায় যে নবীন সন্ন্যাসী আছেন তিনি মন্দ দৃষ্টান্ত নন, কিন্তু তিনি তো চিরকুমার-সভার বিধানমতে চলেন নি।

শ্রীশ। যদি চলতেন তা হলে তিনিই ঠিক দৃষ্টান্ত হতে পারতেন। সাজে সজ্জায় বাক্যে আচরণে সুন্দর এবং সুনিপুণ হতে হবে—

পূর্ণ। কেবল রাজকন্যার দিক থেকে দৃষ্টি নামাতে হবে। এই তো? বিনি সুতার মালা গাঁথতে হবে, কিন্তু সে মালা পরাতে হবে কার গলায় হে।

শ্রীশ। স্বদেশের। কথাটা কিছু উচ্চ শ্রেণীর হয়ে পড়ল, কী করব বলো, মালিনী মাসি এবং রাজকুমারী একেবারেই নিষিদ্ধ— কিন্তু ঠাট্টা নয় পূর্ণবাবু—

পূর্ণ। ঠাট্টার মতো মোটেই শোনাচ্ছে না— ভয়ানক কড়া কথা, একেবারে খট্‌খটে শুকনো।

শ্রীশ। আমাদের চিরকুমার-সভা থেকে এমন একটি সন্ন্যাসীসম্প্রদায় গঠন করতে হবে যারা রুচি শিক্ষা ও কর্মে সকল গৃহস্থের আদর্শ হবে। যারা সংগীত প্রভৃতি কলাবিদ্যায় অদ্বিতীয় হবে, আবার লাঠি তলোয়ার -খেলা, ঘোড়ায় চড়া, বন্দুক লক্ষ্য করায় পারদর্শী হবে—

পূর্ণ। অর্থাৎ, মনোহরণ এবং প্রাণহরণ দুই কর্মেই মজবুত হবে। পুরুষ দেবী-চৌধুরানীর দল আর-কি।

শ্রীশ। বঙ্কিমবাবু আমার আইডিয়াটা পূর্বে হতেই চুরি করে রেখেছেন, কিন্তু ওটাকে কাজে লাগিয়ে আমাদের নিজের করে নিতে হবে।

পূর্ণ। সভাপতিমশায় কী বলেন।

শ্রীশ। তাঁকে ক দিন ধরে বুঝিয়ে বুঝিয়ে আমার দলে টেনে নিয়েছি। কিন্তু, তিনি তাঁর দেশালাইয়ের কাঠি ছাড়েন নি। তিনি বলেন, সন্ন্যাসীরা কৃষিতত্ত্ব বস্তুতত্ত্ব প্রভৃতি শিখে গ্রামে গ্রামে চাষাদের শিখিয়ে বেড়াবে, এক টাকা ক'রে শেয়ার নিয়ে একটা ব্যাঙ্ক্ খুলে বড়ো বড়ো পল্লীতে নূতন নিয়মে এক-একটা দোকান বসিয়ে আসবে— ভারতবর্ষের চারি দিকে বাণিজ্যের জাল বিস্তার করে দেবে। তিনি খুব মেতে উঠেছেন।

পূর্ণ। বিপিনবাবুর কী মত।

বিপিন। যদিচ আমি নিজেকে শ্রীশের নবীন সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের আদর্শ পুরুষ ব'লে জ্ঞান করি নে, কিন্তু দল যদি গড়ে ওঠে তো আমিও সন্ন্যাসী সাজতে রাজি আছি।

পূর্ণ। কিন্তু সাজতে খরচ আছে মশায়। কেবল কৌপীন নয় তো, অঙ্গদ কুণ্ডল আভরণ কুন্তলীন দেলখোশ—

শ্রীশ। পূর্ণবাবু, ঠাট্টাই কর আর যাই কর চিরকুমার-সভা সন্ন্যাসীসভা হবেই। আমরা এক দিকে কঠোর আত্মত্যাগ করব, অন্য দিকে মনুষ্যত্বের কোনো উপকরণ থেকে নিজেদের বঞ্চিত করব না। আমরা কঠিন শৌর্য এবং ললিত সৌন্দর্য উভয়কেই সমান আদরে বরণ করব, সেই দুরূহ সাধনায় ভারতবর্ষে নবযুগের আবির্ভাব হবে—

পূর্ণ। বুঝেছি শ্রীশবাবু— কিন্তু নারী কি মনুষ্যত্বের একটা সর্বপ্রধান উপকরণের মধ্যে গণ্য নয়। এবং তাঁকে উপেক্ষা করলে ললিত সৌন্দর্যের প্রতি কি সমাদর রক্ষা হবে। তার কী উপায় করলে।

শ্রীশ। নারীর একটা দোষ. নরজাতিকে তিনি লতার মতো বেষ্টন করে ধরেন। যদি তাঁর দ্বারা বিজড়িত হবার আশঙ্কা না থাকত, যদি তাঁকে রক্ষা করেও স্বাধীনতা রক্ষা করা যেত, তা হলে কোনো কথা ছিল না। কাজে যখন জীবন উৎসর্গ করতে হবে তখন কাজের সমস্ত বাধা দূর করতে চাই— পাণিগ্রহণ করে ফেললে নিজের পাণিকেও বন্ধ করে ফেলতে হবে, সে হলে চলবে না পূর্ণবাবু।

পূর্ণ। ব্যস্ত হোয়ো না ভাই, আমি আমার শুভবিবাহে তোমাদের নিমন্ত্রণ করতে আসি নি। কিন্তু ভেবে দেখো দেখি. মনুষ্যজন্ম আর পাব কি না সন্দেহ, অথচ হৃদয়কে চিরজীবন যে পিপাসার জল থেকে বঞ্চিত করতে যাচ্ছি তার পূরণস্বরূপ আর কোথাও আর কিছু জুটবে কি। মুসলমানের স্বর্গে হুরী আছে, হিন্দুর স্বর্গেও অপ্সরার অভাব নেই, চিরকুমার-সভার স্বর্গে সভাপতি এবং সভ্যমহাশয়দের চেয়ে মনোরম আর-কিছু পাওয়া যাবে কি।

শ্রীশ। পূর্ণবাবু বল কী। তুমি যে—

পূর্ণ। ভয় নেই ভাই, এখনও মরিয়া হয়ে উঠি নি। তোমার এই ছাদ-ভরা জ্যোৎস্না আর ওই ফুলের গন্ধ কি কৌমার্যব্রত-রক্ষার সহায়তা করবার জন্যে সৃষ্টি হয়েছে। মনের মধ্যে মাঝে মাঝে যে বাষ্প জমে আমি সেটাকে উচ্ছ্বসিত করে দেওয়াই ভালো বোধ করি; চেপে রেখে নিজেকে ভোলাতে গেলে কোন্‌দিন চিরকুমারব্রতের লোহার বয়লারখানা ফেটে যাবে। যাই হোক্, যদি সন্ন্যাসী হওয়াই স্থির কর তো আমিও যোগ দেব— কিন্তু আপাতত সভাটাকে তো রক্ষা করতে হবে।

শ্রীশ। কেন? কী হয়েছে?

পূর্ণ। অক্ষয়বাবু আমাদের সভাকে যে স্থানান্তর করবার ব্যবস্থা করছেন, এটা আমার ভালো ঠেকছে না।

শ্রীশ। সন্দেহ জিনিসটা নাস্তিকতার ছায়া। মন্দ হবে, ভেঙে যাবে, নষ্ট হবে, এ-সব ভাব আমি কোনো অবস্থাতেই মনে স্থান দিই নে। ভালোই হবে, যা হচ্ছে বেশ হচ্ছে, চিরকুমার-সভার উদার বিস্তীর্ণ ভবিষ্যৎ আমি চোখের সম্মুখে দেখতে পাচ্ছি— অক্ষয়বাবু সভাকে এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে তার কী অনিষ্ট করতে পারেন। কেবল গলির এক নম্বর থেকে আর-এক নম্বরে নয়, আমাদের যে পথে-পথে দেশে-দেশে সঞ্চরণ করে বেড়াতে হবে। সন্দেহ শঙ্কা উদ্‌বেগ এগুলো মন থেকে দূর করে দাও পূর্ণবাবু— বিশ্বাস এবং আনন্দ না হলে বড়ো কাজ হয় না।

বিপিন। দিনকতক দেখাই যাক-না। যদি কোনো অসুবিধার কারণ ঘটে তা হলে স্বস্থানে ফিরে আসা যাবে— আমাদের সেই অন্ধকার বিবরটি ফস্ করে কেউ কেড়ে নিচ্ছে না।

অকস্মাৎ চন্দ্রমাধববাবুর সবেগে প্রবেশ। তিনজনের সসম্ভ্রমে উত্থান

চন্দ্রবাবু। দেখো, আমি সেই কথাটা ভাবছিলুম—

শ্রীশ। বসুন।

চন্দ্রবাবু। না না, বসব না, আমি এখনই যাচ্ছি। আমি বলছিলুম, সন্ন্যাসব্রতের জন্যে আমাদের এখন থেকে প্রস্তুত হতে হবে। হঠাৎ একটা অপঘাত ঘটলে, কিম্বা সাধারণ জ্বরজ্বালায়, কিরকম চিকিৎসা সে আমাদের শিক্ষা করতে হবে— ডাক্তার রামরতনবাবু ফি রবিবারে আমাদের দু ঘণ্টা করে বক্তৃতা দেবেন বন্দোবস্ত করে এসেছি।

শ্রীশ। কিন্তু, তাতে অনেক বিলম্ব হবে না?

চন্দ্রবাবু। বিলম্ব তো হবেই, কাজটি তো সহজ নয়। কেবল তাই নয়— আমাদের কিছু কিছু আইন অধ্যয়নও দরকার। অবিচার অত্যাচার থেকে রক্ষা করা এবং কার কতদূর অধিকার সেটা চাষাভুষোদের বুঝিয়ে দেওয়া আমাদের কাজ।

শ্রীশ। চন্দ্রবাবু, বসুন—

চন্দ্রবাবু। না শ্রীশবাবু, বসতে পারছি নে; আমার একটু কাজ আছে। আর-একটি আমাদের করতে হচ্ছে— গোরুর গাড়ি, ঢেঁকি, তাঁত প্রভৃতি আমাদের দেশী অত্যাবশ্যক জিনিসগুলিকে একটু-আধটু সংশোধন করে যাতে কোনো অংশে তাদের সস্তা বা মজবুত বা বেশি উপযোগী করে তুলতে পারি সে চেষ্টা আমাদের করতে হবে। এবার গ্রীষ্মের অবকাশে কেদারবাবুদের কারখানায় গিয়ে প্রত্যহ আমাদের কতকগুলি পরীক্ষা করা চাই।

শ্রীশ। চন্দ্রবাবু, অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছেন—

চৌকি অগ্রসর-করণ

চন্দ্রবাবু। না না, আমি এখনই যাচ্ছি। দেখো, আমার মত এই যে, এই-সমস্ত গ্রামের ব্যবহার্য সামান্য জিনিসগুলির যদি আমরা কোনো উন্নতি করতে পারি তা হলে তাতে করে চাষাদের মনের মধ্যে যেরকম আন্দোলন হবে বড়ো বড়ো সংস্কারকার্যেও তেমন হবে না। তাদের সেই চিরকালের ঢেঁকি-ঘানির কিছু পরিবর্তন করতে পারলে তবে তাদের সমস্ত মন সজাগ হয়ে উঠবে, পৃথিবী যে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই এ তারা বুঝতে পারবে—

শ্রীশ। চন্দ্রবাবু, বসবেন না কি।

চন্দ্রবাবু। থাক্-না। একবার ভেবে দেখো, আমরা যে এতকাল ধরে শিক্ষা পেয়ে আসছি, উচিত ছিল আমাদের ঢেঁকি কুলো থেকে তার পরিচয় আরম্ভ হওয়া। বড়ো বড়ো কল-কারখানা তো দূরের কথা, ঘরের মধ্যেই আমাদের সজাগ দৃষ্টি পড়ল না। আমাদের হাতের কাছে যা আছে আমরা না তার দিকে ভালো করে চেয়ে দেখলুম, না তার সম্বন্ধে চিন্তা করলুম। যা ছিল তা তেমনিই রয়ে গেছে। মানুষ অগ্রসর হচ্ছে অথচ তার জিনিসপত্র পিছিয়ে থাকছে, এ কখনো হতেই পারে না। আমরা পড়েই আছি— ইংরেজ আমাদের কাঁধে করে বহন করছে, তাকে এগোনো বলে না। ছোটোখাটো সামান্য গ্রাম্য জীবনযাত্রা পল্লীগ্রামের পঙ্কিল পথের মধ্যে বদ্ধ হয়ে অচল হয়ে আছে, আমাদের সন্ন্যাসীসম্প্রদায়কে সেই গোরুর গাড়ির চাকা ঠেলতে হবে— কলের গাড়ির চালক হবার দুরাশা এখন থাক্।— ক'টা বাজল শ্রীশবাবু।

শ্রীশ। সাড়ে আটটা বেজে গেছে।

চন্দ্রবাবু। তা হলে আমি যাই। কিন্তু এই কথা রইল, আমাদের এখন অন্য-সমস্ত আলোচনা ছেড়ে নিয়মিত শিক্ষাকার্যে প্রবৃত্ত হতে হবে এবং—

পূর্ণ। আপনি যদি একটু বসেন চন্দ্রবাবু, তা হলে আমার দুই-একটা কথা বলবার আছে—

চন্দ্রবাবু। না, আজ আর সময় নেই—

পূর্ণ। বেশি কিছু নয়, আমি বলছিলুম আমাদের সভা—

চন্দ্রবাবু। সে কথা কাল হবে পূর্ণবাবু।

পূর্ণ। কিন্তু কালই তো সভা বসছে—

চন্দ্রবাবু। আচ্ছা, তা হলে পরশু। আমার সময় নেই—

পূর্ণ। দেখুন, অক্ষয়বাবু যে—

চন্দ্রবাবু। পূর্ণবাবু, আমাকে মাপ করতে হবে, আজ দেরি হয়ে গেছে।— কিন্তু দেখো, আমার একটা কথা মনে হচ্ছিল যে, চিরকুমার-সভা যদি ক্রমে বিস্তীর্ণ হয়ে পড়ে তা হলে আমাদের সকল সভ্যই কিছু সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে যেতে পারবেন না, অতএব ওর মধ্যে দুটি বিভাগ রাখা দরকার হবে -

পূর্ণ। স্থাবর এবং জঙ্গম।

চন্দ্রবাবু। তা সে যে নামই দাও। তা ছাড়া অক্ষয়বাবু সেদিন একটি কথা যা বললেন সেও আমার মন্দ লাগল না। তিনি বলেন, চিরকুমার-সভার সংস্রবে আর একটি সভা রাখা উচিত যাতে বিবাহিত এবং বিবাহ-সংকল্পিত লোকদের নেওয়া যেতে পারে। গৃহী লোকদেরও তো দেশের প্রতি কর্তব্য আছে। সকলেরই সাধ্যমতো কোনো না কোনো হিতকর কাজে নিযুক্ত থাকতে হবে— এইটে হচ্ছে সাধারণ ব্রত। আমাদের এক দল কুমারব্রত ধারণ করে দেশে দেশে বিচরণ করবেন, একদল কুমারব্রত ধারণ করে এক জায়গায় স্থায়ী হয়ে বসে কাজ করবেন, আর-এক দল গৃহী নিজ নিজ রুচি ও সাধ্য -অনুসারে একটা কোনো প্রয়োজনীয় কাজ অবলম্বন করে দেশের প্রতি কর্তব্য পালন করবেন। যাঁরা পর্যটক-সম্প্রদায়ভুক্ত হবেন তাঁদের ম্যাপ-প্রস্তুত, জরিপ, ভূতত্ত্ববিদ্যা, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, প্রাণীতত্ত্ব প্রভৃতি শিখতে হবে; তাঁরা যে দেশে যাবেন সেখানকার সমস্ত তথ্য তন্ন তন্ন করে সংগ্রহ করবেন— তা হলেই ভারতবর্ষীয়ের দ্বারা ভারতবর্ষের যথার্থ বিবরণ লিপিবদ্ধ হবার ভিত্তি স্থাপিত হতে পারবে, হণ্টার সাহেবের উপরেই নির্ভর করে কাটাতে হবে না—

পূর্ণ। চন্দ্রবাবু, যদি বসেন তা হলে একটা কথা—

চন্দ্রবাবু। না, আমি বলছিলুম, যেখানে যেখানে যাব সেখানকার ঐতিহাসিক জনশ্রুতি এবং পুরাতন পুঁথি সংগ্রহ করা আমাদের কাজ হবে; শিলালিপি তাম্রশাসন এগুলোও সন্ধান করতে হবে— অতএব প্রাচীন-লিপি-পরিচয়টাও আমাদের কিছুদিন অভ্যাস করা আবশ্যক।

পূর্ণ। সে-সব তো পরের কথা, আপাতত—

চন্দ্রবাবু। না না, আমি বলছি নে সকলকেই সব বিদ্যা শিখতে হবে, তা হলে কোনো কালে শেষ হবে না। অভিরুচি-অনুসারে ওর মধ্যে আমরা কেউ বা একটা কেউ বা দুটো-তিনটে শিক্ষা করব—

শ্রীশ। কিন্তু, তা হলেও—

চন্দ্রবাবু। ধরো, পাঁচ বছর। পাঁচ বছরে আমরা প্রস্তুত হয়ে বেরোতে পারব। যারা চিরজীবনের ব্রত গ্রহণ করবে, পাঁচ বছর তাদের পক্ষে কিছুই নয়। তা ছাড়া এই পাঁচ বছরেই আমাদের পরীক্ষা হয়ে যাবে; যাঁরা টিঁকে থাকতে পারবেন তাঁদের সম্বন্ধে আর কোনো সন্দেহ থাকবে না।

পূর্ণ। কিন্তু দেখুন, আমাদের সভাটা যে স্থানান্তর করা হচ্ছে—

চন্দ্রবাবু। না পূর্ণবাবু, আজ আর কিছুতেই না, আমার অত্যন্ত জরুরি কাজ আছে। পূর্ণবাবু, আমার কথাগুলো ভালো করে চিন্তা করে দেখো। আপাতত মনে হতে পারে অসাধ্য, কিন্তু তা নয়। দুঃসাধ্য বটে— তা, ভালো কাজ মাত্রই দুঃসাধ্য। আমরা যদি পাঁচটি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ লোক পাই তা হলে আমরা যা কাজ করব তা চিরকালের জন্য ভারতবর্ষকে আচ্ছন্ন করে দেবে।

শ্রীশ। কিন্তু, আপনি যে বলছিলেন গোরুর গাড়ির চাকা প্রভৃতি ছোটো ছোটো জিনিস—

চন্দ্রবাবু। ঠিক কথা, আমি তাকেও ছোটো মনে করে উপেক্ষা করি নে এবং বড়ো কাজকেও অসাধ্য জ্ঞান করে ভয় করি নে—

পূর্ণ। কিন্তু, সভার অধিবেশন সম্বন্ধেও—

চন্দ্রবাবু। সে-সব কথা কাল হবে পূর্ণবাবু। আজ তবে চললুম। [প্রস্থান

বিপিন। ভাই শ্রীশ, চুপচাপ যে। এক মাতালের মাৎলামি দেখে অন্য মাতালের নেশা ছুটে যায়। চন্দ্রবাবুর উৎসাহে তোমাকে সুদ্ধ দমিয়ে দিয়েছে।

শ্রীশ। না হে, অনেক ভাববার কথা আছে। উৎসাহ কি সব সময়ে কেবল বকাবকি করে। কখনো বা একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে থাকে, সেইটেই হল সাংঘাতিক অবস্থা।

বিপিন। পূর্ণবাবু, হঠাৎ পালাচ্ছ যে?

পূর্ণ। সভাপতিমশায়কে রাস্তায় ধরতে যাচ্ছি, পথে যেতে যেতে যদি দৈবাৎ আমার দুটো-একটা কথায় কর্ণপাত করেন।

বিপিন। ঠিক উল্টো হবে। তাঁর যে-ক'টা কথা বাকি আছে সেইগুলো তোমাকে শোনাতে শোনাতে কোথায় যাবার আছে সে কথা ভুলেই যাবেন।

বনমালীর প্রবেশ

বনমালী। ভালো আছেন শ্রীশবাবু? বিপিনবাবু ভালো তো? এই-যে পূর্ণবাবুও আছেন দেখছি। তা, বেশ হয়েছে। আমি অনেক ব'লে ক'য়ে সেই কুমারটুলির পাত্রী দুটিকে ঠেকিয়ে রেখেছি।

শ্রীশ। কিন্তু আমাদের আর ঠেকিয়ে রাখতে পারবেন না। আমরা একটা গুরুতর কিছু করে ফেলব।

পূর্ণ। আপনারা বসুন শ্রীশবাবু। আমার একটা কাজ আছে।

বিপিন। তার চেয়ে আপনি বসুন পূর্ণবাবু। আপনার কাজটা আমরা দুজনে মিলে সেরে দিয়ে আসছি।

পূর্ণ। তার চেয়ে তিন জনে মিলে সারাই তো ভালো।

বনমালী। আপনারা ব্যস্ত হচ্ছেন দেখছি। আচ্ছা, তা আর-এক সময় আসব।

তৃতীয় দৃশ্য

চন্দ্রবাবুর বাড়ি

চন্দ্রমাধববাবু, নির্মলা

চন্দ্রবাবু। নির্মল।

নির্মলা। কী মামা।

চন্দ্রবাবু। নির্মল, আমার গলার বোতামটা খুঁজে পাচ্ছি নে।

নির্মলা। বোধ হয় ওইখানেই কোথাও আছে।

চন্দ্রবাবু। (নিশ্চিন্তভাবে) একবার খুঁজে দেখো তো ফেনি।

নির্মলা। তুমি কোথায় কী ফেল আমি কি খুঁজে বের করতে পারি!

চন্দ্রবাবু। (মনে একটুখানি সন্দেহের সঞ্চার হওয়ায়, স্নিগ্ধকণ্ঠে) তুমিই তো পার নির্মল। আমার সমস্ত ত্রুটি সম্বন্ধে এত ধৈর্য আর কার আছে?

নির্মলার রুদ্ধ অভিমান চন্দ্রবাবুর স্নেহস্বরে অকস্মাৎ অশ্রুজলে বিগলিত হইবার উপক্রম করিল— নিঃশব্দে সম্বরণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহাকে নিরুত্তর দেখিয়া চন্দ্রমাধববাবু নির্মলার কাছে আসিলেন। নির্মলার মুখখানি দুই আঙুল দিয়া তুলিয়া ধরিয়া ক্ষণকাল দেখিলেন

(মৃদুহাস্যে) নির্মল আকাশে একটুখানি মালিন্য দেখছি যেন। কী হয়েছে বলো দেখি।

নির্মলা। (ক্ষুব্ধস্বরে) এতদিন পরে আমাকে তোমাদের চিরকুমার-সভা থেকে বিদায় দিচ্ছ কেন। আমি কী করেছি।

চন্দ্রবাবু। (আশ্চর্য হইয়া) চিরকুমার-সভা থেকে তোমাকে বিদায় ? তোমার সঙ্গে সে সভার যোগ কী।

নির্মলা। দরজার আড়ালে থাকলে বুঝি যোগ থাকে না ? অন্তত সেই যতটুকু যোগ তাই বা কেন যাবে।

চন্দ্রবাবু। নির্মল, তুমি তো এ সভার কাজ করবে না, যারা কাজ করবে তাদের সুবিধার প্রতি লক্ষ রেখেই—

নির্মলা। আমি কেন কাজ করব না। তোমার ভাগ্নে না হয়ে ভাগ্নী হয়ে জন্মেছি বলেই কি তোমাদের হিতকার্যে যোগ দিতে পারব না। তবে আমাকে এতদিন শিক্ষা দিলে কেন। নিজের হাতে আমার সমস্ত মন প্রাণ জাগিয়ে দিয়ে শেষকালে কাজের পথ রোধ করে দাও কী বলে।

চন্দ্রবাবু। নির্মল, এক সময়ে তো বিবাহ করে তোমাকে সংসারের কাজে প্রবৃত্ত হতে হবে, চিরকুমার-সভার কাজ—

নির্মলা। বিবাহ আমি করব না।

চন্দ্রবাবু। তবে কী করবে বলো।

নির্মলা। দেশের কাজে তোমার সাহায্য করব।

চন্দ্রবাবু। আমরা তো সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করতে প্রস্তুত হয়েছি।

নির্মলা। ভারতবর্ষে কি কেউ কখনো সন্ন্যাসিনী হয় নি।

চন্দ্রমাধববাবু নিরুত্তর হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন

মামা, যদি কোনো মেয়ে তোমাদের ব্রত-গ্রহণের জন্যে অন্তরের সঙ্গে প্রস্তুত হয় তবে প্রকাশ্যভাবে তোমাদের সভার মধ্যে কেন তাকে গ্রহণ করবে না। আমি তোমাদের কৌমার্যসভার কেন সভ্য না হব।

চন্দ্রবাবু। (দ্বিধাকুণ্ঠিতভাবে) অন্য যাঁরা সভ্য আছেন—

নির্মলা। যাঁরা সভ্য আছেন, যাঁরা ভারতবর্ষের হিতব্রত নেবেন, যাঁরা সন্ন্যাসী হতে যাচ্ছেন, তাঁরা কি একজন ব্রতধারিণী স্ত্রীলোককে অসংকোচে নিজের দলে গ্রহণ করতে পারবেন না। তা যদি হয় তা হলে তাঁরা গৃহী হয়ে ঘরে রুদ্ধ থাকুন, তাঁদের দ্বারা কোনো কাজ হবে না।

চন্দ্রমাধববাবু চুলগুলোর মধ্যে ঘন ঘন পাঁচ আঙুল চালাইয়া অত্যন্ত উস্কোখুস্কো করিয়া তুলিলেন এমন সময় হঠাৎ তাঁহার আস্তিনের ভিতর হইতে হারানো বোতামটা মাটিতে পড়িয়া গেল নির্মলা হাসিতে হাসিতে কুড়াইয়া লইয়া চন্দ্রমাধববাবুর কামিজের গলায় লাগাইয়া দিল— চন্দ্রমাধববাবু তাহার কোনো খবর লইলেন না— চুলের মধ্যে অঙ্গুলিচালনা করিতে করিতে মস্তিষ্ককুলায়ের চিন্তাগুলিকে বিব্রত করিতে লাগিলেন। নির্মলার প্রস্থান

পূর্ণবাবুর প্রবেশ

পূর্ণ। চন্দ্রবাবু, সে কথাটা কি ভেবে দেখলেন। আমাদের সভাটিকে স্থানান্তর করা আমার বিবেচনায় ভালো হচ্ছে না।

চন্দ্রবাবু। আজ আর-একটি কথা উঠেছে, সেটা পূর্ণবাবু তোমার সঙ্গে ভালো করে আলোচনা করতে ইচ্ছা করি। আমার একটি ভাগ্নী আছেন বোধ হয় জান?

পূর্ণ। (নিরীহভাবে) আপনার ভাগ্নী?

চন্দ্রবাবু। হাঁ, তাঁর নাম নির্মলা। আমাদের চিরকুমার-সভার সঙ্গে তাঁর হৃদয়ের খুব যোগ আছে।

পূর্ণ। (বিস্মিতভাবে) বলেন কী।

চন্দ্রবাবু। আমার বিশ্বাস, তার অনুরাগ এবং উৎসাহ আমাদের কারও চেয়ে কম নয়।

পূর্ণ। (উত্তেজিতভাবে) এ কথা শুনলে আমাদের উৎসাহ বেড়ে ওঠে। স্ত্রীলোক হয়ে তিনি—

চন্দ্রবাবু। আমিও সেই কথা ভাবছি, স্ত্রীলোকের সরল উৎসাহ পুরুষের উৎসাহে যেন নূতন প্রাণ সঞ্চার করতে পারে— আমি নিজেই সেটা আজ অনুভব করছি।

পূর্ণ। (আবেগপূর্ণভাবে) আমিও সেটা বেশ অনুমান করতে পারি।

চন্দ্রবাবু। পূর্ণবাবু, তোমারও কি ওই মত।

পূর্ণ। কী মত বলছেন?

চন্দ্রবাবু। অর্থাৎ, যথার্থ অনুরাগী স্ত্রীলোক আমাদের কঠিন কর্তব্যের বাধা না হয়ে যথার্থ সহায় হতে পারেন।

পূর্ণ। (নেপথ্যের প্রতি লক্ষ করিয়া উচ্চকণ্ঠে) সে বিষয়ে আমার লেশমাত্র সন্দেহ নেই। স্ত্রীজাতির অনুরাগ পুরুষের অনুরাগের একমাত্র সজীব নির্ভর, তাঁদের উৎসাহে আমাদের উদ্দীপনা। পুরুষের উৎসাহকে নবজাত শিশুটির মতো মানুষ করে তুলতে পারে কেবল স্ত্রীলোকের উৎসাহ।

শ্রীশ ও বিপিনের প্রবেশ

শ্রীশ। তা তো পারে পূর্ণবাবু, কিন্তু, সেই উৎসাহের অভাবেই কি আজ সভায় যেতে বিলম্ব হচ্ছে।

চন্দ্রবাবু। না না, দেরি হবার কারণ, আমার গলার বোতামটা কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছি নে।

শ্রীশ। গলায় তো একটা বোতাম লাগানো রয়েছে দেখতে পাচ্ছি, আরও কি প্রয়োজন আছে। যদি বা থাকে, আর ছিদ্র পাবেন কোথা।

চন্দ্রবাবু। (গলায় হাত দিয়া) তাই তো!— আমরা সকলেই তো উপস্থিত আছি এখন সেই কথাটার আলোচনা হয়ে যাওয়া ভালো, কী বল পূর্ণবাবু।

পূর্ণ। সে বেশ কথা, কিন্তু এ দিকে দেরি হয়ে যাচ্ছে না?

চন্দ্রবাবু। না, এখনও সময় আছে। শ্রীশবাবু, তোমরা একটু বোসো-না, কথাটা একটু স্থির হয়ে ভেবে দেখবার যোগ্য। আমার একটি ভাগ্নী আছেন, তাঁর নাম নির্মলা—

পূর্ণ হঠাৎ কাশিয়া লাল হইয়া উঠিল

আমাদের কুমারসভার সমস্ত উদ্দেশ্যের সঙ্গে তাঁর একান্ত মনের মিল।

শ্রীশ এবং বিপিন অবিচলিত নিরুৎসুকভাবে শুনিয়া যাইতে লাগিল

এ কথা আমি নিশ্চয় বলতে পারি, তাঁর উৎসাহ আমাদের কারও চেয়ে কম নয়।

শ্রীশ ও বিপিনের কাছ হইতে কিছুমাত্র সাড়া না পাইয়া
চন্দ্রবাবুও মনে মনে একটু উত্তেজিত হইতেছিলেন

এ কথা আমি ভালোরূপ বিবেচনা করে দেখে স্থির করেছি, স্ত্রীলোকের উৎসাহ পুরুষের সমস্ত বৃহৎ কার্যের মহৎ অবলম্বন। কী বল পূর্ণবাবু?

পূর্ণ। (নিস্তেজভাবে) তা তো বটেই।

চন্দ্রবাবু। (হঠাৎ সবেগে) নির্মলা যদি কুমার-সভার সভ্য হবার জন্য প্রার্থী থাকে, তা হলে তাকে আমরা সভ্য না করব কেন।

পূর্ণ। বলেন কী চন্দ্রবাবু।

শ্রীশ। আমরা কখনো কল্পনা করি নি যে, কোনো স্ত্রীলোক আমাদের সভার সভ্য হতে ইচ্ছা প্রকাশ করবেন, সুতরাং এ সম্বন্ধে আমাদের কোনো নিয়ম নেই—

বিপিন। নিষেধও নেই।

শ্রীশ। স্পষ্ট নিষেধ না থাকতে পারে কিন্তু আমাদের সভায় যে-সকল উদ্দেশ্য তা স্ত্রীলোকের দ্বারা সাধিত হবার নয়।

বিপিন। আমাদের সভার উদ্দেশ্য সংকীর্ণ নয়, এবং বৃহৎ উদ্দেশ্য সাধন করতে গেলে বিচিত্র শ্রেণীর ও বিচিত্র শক্তির লোকের বিচিত্র চেষ্টায় প্রবৃত্ত হওয়া চাই। স্বদেশের হিতসাধন একজন স্ত্রীলোক যেরকম পারবেন তুমি সেরকম পারবে না, এবং তুমি যেরকম পারবে একজন স্ত্রীলোক সেরকম পারবেন না— অতএব সভার উদ্দেশ্যকে সর্বাঙ্গসম্পূর্ণভাবে সাধন করতে গেলে তোমারও যেমন দরকার স্ত্রীসভ্যেরও তেমনি দরকার।

শ্রীশ। যারা কাজ করতে চায় না তারাই উদ্দেশ্যকে ফলাও করে তোলে। যথার্থ কাজ করতে গেলেই লক্ষ্যকে সীমাবদ্ধ করতে হয়। আমাদের সভার উদ্দেশ্যকে যত বৃহৎ মনে করে তুমি বেশ নিশ্চিন্ত আছ আমি তত বৃহৎ মনে করি নে।

বিপিন। আমাদের সভার কার্যক্ষেত্র অন্তত এতটা বৃহৎ যে তোমাকে গ্রহণ করেছে বলে আমাকে পরিত্যাগ করতে হয় নি এবং আমাকে গ্রহণ করেছে বলে তোমাকে পরিত্যাগ করতে হয় নি। তোমার আমার উভয়েরই যদি এখানে স্থান হয়ে থাকে, আমাদের দুজনেরই যদি এখানে উপযোগিতা ও আবশ্যকতা থাকে, তা হলে আরও একজন ভিন্ন প্রকৃতির লোকের এখানে স্থান হওয়া এমন কী কঠিন।

শ্রীশ। উদারতা অতি উত্তম জিনিস, সে আমি নীতিশাস্ত্রে পড়েছি। আমি তোমার সেই উদারতাকে নষ্ট করতে চাই নে, বিভক্ত করতে চাই মাত্র। স্ত্রীলোকেরা যে কাজ করতে পারেন তার জন্যে তাঁরা স্বতন্ত্র সভা করুন, আমরা তার সভ্য হবার প্রার্থী হব না, এবং আমাদের সভাও আমাদেরই থাক্‌। নইলে আমরা পরস্পরের কাজের বাধা হব মাত্র। মাথাটা চিন্তা করে মরুক, উদরটা পরিপাক করতে থাক্‌— পাকযন্ত্রটি মাথার মধ্যে এবং মস্তিষ্কটি পেটের মধ্যে প্রবেশচেষ্টা না করলেই বস্‌।

বিপিন। কিন্তু তাই বলে মাথাটা ছিন্ন করে এক জায়গায় এবং পাকযন্ত্রটাকে আর এক জায়গায় রাখলেও কাজের সুবিধা হয় না।

শ্রীশ। (অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া) উপমা তো আর যুক্তি নয় যে সেটাকে খণ্ডন করলেই আমার কথাটাকে খণ্ডন করা হল উপমা কেবল খানিক দূর পর্যন্ত খাটে—

বিপিন। অর্থাৎ, যতটুকু কেবল তোমার যুক্তির পক্ষে খাটে।

পূর্ণ। (অত্যন্ত বিমনা হইয়া) বিপিনবাবু, আমার মত এই যে, আমাদের এই-সকল কাজে মেয়েরা অগ্রসর হয়ে এলে তাতে তাঁদের মাধুর্য নষ্ট হয়।

চন্দ্রবাবু। (একখানা বই চক্ষের অত্যন্ত কাছে ধরিয়া) মহৎ কার্যে যে মাধুর্য নষ্ট হয় সে মাধুর্য সযত্নে রক্ষা করবার যোগ্য নয়।

শ্রীশ। না চন্দ্রবাবু, আমি ও-সব সৌন্দর্য-মাধুর্যের কথা আনছিই নে। সৈন্যদের

মতো এক চালে আমাদের চলতে হবে, অনভ্যাস বা স্বাভাবিক দুর্বলতা-বশত যাঁদের পিছিয়ে পড়বার সম্ভাবনা আছে তাঁদের নিয়ে ভারগ্রস্ত হলে আমাদের সমস্তই ব্যর্থ হবে।

এমন সময় নির্মলা অকুণ্ঠিত মর্যাদার সহিত গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া নমস্কার করিয়া দাঁড়াইল
হঠাৎ সকলেই স্তম্ভিত হইয়া গেল। অশ্রুপূর্ণ ক্ষোভে তাহার কণ্ঠস্বর আর্দ্র

নির্মলা। আপনাদের কী উদ্দেশ্য এবং আপনারা দেশের কাজে কত দূর পর্যন্ত যেতে প্রস্তুত আছেন তা আমি কিছুই জানি নে, কিন্তু আমি আমার মামাকে জানি— তিনি যে পথে যাত্রা করে চলেছেন আপনারা কেন আমাকে সে পথে তাঁর অনুসরণ করতে বাধা দিচ্ছেন।

শ্রীশ নিরুত্তর, পূর্ণ কুণ্ঠিত-অনুতপ্ত, বিপিন প্রশান্ত-গম্ভীর, চন্দ্রবাবু সুগম্ভীর চিন্তামগ্ন

নির্মলা। (পূর্ণ এবং শ্রীশের প্রতি অশ্রুজলস্নাত কটাক্ষপাত করিয়া) আমি যদি কাজ করতে চাই, যিনি আমার আশৈশবের গুরু মৃত্যু পর্যন্ত যদি সকল শুভচেষ্টায় তাঁর অনুবর্তিনী হতে ইচ্ছা করি, আপনারা কেবল তর্ক করে আমার অযোগ্যতা প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন কেন। আপনারা আমাকে কী জানেন।

শ্রীশ স্তব্ধ। পূর্ণ ঘর্মাক্ত

নির্মলা। আমি আপনাদের কুমারসভা বা অন্য কোনো সভা জানি নে, কিন্তু যাঁর শিক্ষায় আমি মানুষ হয়েছি তিনি যখন কুমারসভাকে অবলম্বন করেই তাঁর জীবনের সমস্ত উদ্দেশ্য-সাধনে প্রবৃত্ত হয়েছেন, তখন এই কুমারসভা থেকে আপনারা আমাকে দূরে রাখতে পারবেন না। (চন্দ্রবাবুর দিকে ফিরিয়া) তুমি যদি বল আমি তোমার কাজের যোগ্য নই তা হলে আমি বিদায় হব, কিন্তু এঁরা আমাকে কী জানেন। এঁরা কেন আমাকে তোমার অনুষ্ঠান থেকে বিচ্ছিন্ন করবার জন্যে সকলে মিলে তর্ক করছেন।

শ্রীশ। (বিনীত মৃদুস্বরে) মাপ করবেন, আমি আপনার সম্বন্ধে কোনো তর্ক করি নি, আমি সাধারণত স্ত্রীজাতি সম্বন্ধেই বলছিলুম।

নির্মলা। আমি স্ত্রীজাতি পুরুষজাতির প্রভেদ নিয়ে কোনো বিচার করতে চাই নে— আমি নিজের অন্তঃকরণ জানি এবং যাঁর উন্নত দৃষ্টান্তকে আশ্রয় করে রয়েছি তাঁর অন্তঃকরণ জানি, কাজে প্রবৃত্ত হতে এর বেশি আমার আর কিছু জানবার দরকার নেই।

চন্দ্রবাবু নিজের দক্ষিণ করতল চোখের অত্যন্ত কাছে লইয়া নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিলেন
পূর্ণ খুব চমৎকার করিয়া একটা কিছু বলিবার ইচ্ছা করিল—
কিন্তু তাহার মুখ দিয়া কোনো কথাই বাহির হইল না

পূর্ণ। (মনে মনে অনেক আবৃত্তি করিয়া) দেবী, এই পঙ্কিল পৃথিবীর কাজে কেন আপনার পবিত্র দুইখানি হস্ত প্রয়োগ করতে চাচ্ছেন।

কথাটা মনে যেমন লাগিতেছিল মুখে তেমন শোনাইল না, পূর্ণ বলিয়াই বুঝিতে পারিল কথাটা গদ্যের মধ্যে পদ্যের মতো কিছু যেন বাড়াবাড়ি হইয়া পড়িল—

লজ্জায় তাহার কান লাল হইয়া উঠিল

বিপিন। (স্বাভাবিক সুগম্ভীর শান্ত স্বরে) পৃথিবী যত বেশি পঙ্কিল পৃথিবীর সংশোধনকার্য তত বেশি পবিত্র।

শ্রীশ। সভার অধিবেশনে স্ত্রীসভ্য লওয়া সম্বন্ধে নিয়ম-মতো প্রস্তাব উত্থাপন করে যা স্থির হয় আপনাকে জানাব।

নির্মলা এক মুহূর্ত অপেক্ষা না করিয়া নিঃশব্দে চলিয়া যাইবার উপক্রম করিল

চন্দ্র। (হঠাৎ) ফেনি, আমার সেই গলার বোতামটা ?

নির্মলা। (সলজ্জ হাসিয়া মৃদুকণ্ঠে) গলাতেই আছে।

চন্দ্র। (গলায় হাত দিয়া) হাঁ হাঁ, আছে বটে।

তিন ছাত্রের দিকে চাহিয়া হাসিলেন

চতুর্থ দৃশ্য

অক্ষয়ের বাসা

নৃপবালা ও নীরবালা

নৃপবালা। আজকাল তুই মাঝে মাঝে কেন অমন গম্ভীর হচ্ছিস বল তো নীরু।

নীরবালা। আমাদের বাড়ির যত কিছু গাম্ভীর্য সব বুঝি তোর একলার ? আমার খুশি আমি গম্ভীর হব।

নৃপবালা। তুই কী ভাবছিস আমি বেশ জানি।

নীরবালা। তোর অত আন্দাজ করবার দরকার কী ভাই। এখন তোর নিজের ভাব্না ভাববার সময় হয়েছে।

নৃপবালা। (নীরর গলা জড়াইয়া) তুই ভাবছিস, মাগো মা, আমরা কী জঞ্জাল— আমাদের বিদায় করে দিতেও এত ভাবনা এত ঝঞ্ঝাট।

নীরবালা। তা, আমরা তো ভাই, ফেলে দেবার জিনিস নয় যে অমনি ছেড়ে দিলেই হল। আমাদের জন্যে যে এতটা হাঙ্গামা হচ্ছে সে তো গৌরবের কথা। কুমারসম্ভবে তো পড়েছিস গৌরীর বিয়ের জন্য একটি আস্ত দেবতা পুড়ে ছাই হয়ে গেল। যদি কোনো কবির কানে ওঠে তা হলে আমাদের বিবাহের একটা বর্ণনা বেরিয়ে যাবে।

নৃপবালা। না ভাই, আমার ভারী লজ্জা করছে।

নীরবালা। আর, আমার বুঝি লজ্জা করছে না? আমি বুঝি বেহায়া? কিন্তু কী করবি বল্‌। ইস্কুলে যেদিন প্রাইজ নিতে গিয়েছিলুম লজ্জা করেছিল, আবার তার পর-বছরেও প্রাইজ নেবার জন্যে রাত জেগে পড়া মুখস্থ করেছিলেম। লজ্জাও করে, প্রাইজও ছাড়ি নে, আমার এই স্বভাব।

নৃপবালা। আচ্ছা নীরু, এবারে যে প্রাইজটার কথা চলছে সেটার জন্যে তুই কি খুব ব্যস্ত হয়েছিস।

নীরবালা। কোন্‌টা বল্‌ দেখি। চিরকুমার সভার দুটো সভ্য।

নৃপবালা। যেই হোক-না কেন, তুই তো বুঝতে পারছিস।

নীরবালা। তা ভাই, সত্যি কথা বলব? (নৃপর গলা জড়াইয়া কানে কানে) শুনেছি কুমারসভার দুটি সভ্যের মধ্যে খুব ভাব, আমরা যদি দুজনে দুই বন্ধুর হাতে পড়ি তা হলে বিয়ে হয়েও আমাদের ছাড়াছাড়ি হবে না— নইলে আমরা কে কোথায় চলে যাব তার ঠিক নেই। তাই তো সেই যুগল দেবতার জন্যে এত পুজোর আয়োজন করছি ভাই। জোড়হস্তে মনে মনে বলছি, হে কুমারসভার অশ্বিনীকুমারযুগল, আমাদের দুটি বোনকে এক বোঁটার দুই ফুলের মতো তোমরা একসঙ্গে গ্রহণ করো।

বিরহসম্ভাবনার উল্লেখমাত্রে দুই ভগিনী পরস্পরকে জড়াইয়া ধরিল
এবং নৃপ কোনোমতে চোখের জল সামলাইতে পারিল না

নৃপবালা। আচ্ছা নীরু, মেজদিদিকে কেমন করে ছেড়ে যাবি বল্‌ দেখি। আমরা দুজনে গেলে ওঁর আর কে থাকবে।

নীরবালা। সে কথা অনেক ভেবেছি। থাকতে যদি দেন তা হলে কি ছেড়ে যাই। ভাই, ওঁর তো স্বামী নেই, আমাদেরও নাহয় স্বামী না রইল। মেজদিদির চেয়ে বেশি সুখে আমাদের দরকার কী।

পুরুষবেশধারিণী শৈলবালার প্রবেশ

নীরবালা। (টেবিলের উপরিস্থিত থালা হইতে একটি ফুলের মালা তুলিয়া লইয়া

শৈলবালার গলায় পরাইয়া) আমরা দুই স্বয়ম্বরা তোমাকে আমাদের পতিরূপে বরণ করলুম।

শৈলবালাকে প্রণাম করিল

শৈলবালা। ও আবার কী।

নীরবালা। ভয় নেই ভাই, আমরা দুই সতিনে তোমাকে নিয়ে ঝগড়া করব না। যদি করি সেজদিদি আমার সঙ্গে পারবে না— আমি একলাই মিটিয়ে নিতে পারব, তোমাকে কষ্ট পেতে হবে না। না, সত্যি বলছি মেজদিদি, তোমার কাছে আমরা যেমন আদরে আছি এমন আদর কি আর কোথাও পাব। কেন তবে আমাদের পরের গলায় দিতে চাস।

নৃপর দুই চক্ষু বাহিয়া ঝর্‌ ঝর্‌ করিয়া জল পড়িতে লাগিল

শৈলবালা। (তাহার চোখ মুছিয়া দিয়া) ও কী ও নৃপ, ছি। তোদের কিসে সুখ তা কি তোরা জানিস। আমাকে নিয়ে যদি তোদের জীবন সার্থক হত তা হলে কি আমি আর-কারও হাতে তোদের দিতে পারতুম।

রসিকের প্রবেশ

রসিক। ভাই, আমার মতো অসভ্যটাকে তোরা সভ্য করলি— আজ তো সভা এখানে বসবে, কিরকম করে চলব শিখিয়ে দে।

নীরবালা। ফের পুরোনো ঠাট্টা? তোমার ওই সভ্য-অসভ্যর কথাটা এই পরশু থেকে বলছ।

রসিক। যাকে জন্ম দেওয়া যায় তার প্রতি মমতা হয় না? ঠাট্টা একবার মুখ থেকে বের হলেই কি রাজপুতের কন্যার মতো তাকে গলা টিপে মেরে ফেলতে হবে। হয়েছে কী, যতদিন চিরকুমার-সভা টি'কে থাকবে এই ঠাট্টা তোদের দু বেলা শুনতে হবে।

নীরবালা। তবে ওটাকে তো একটু সকাল সকাল সেরে ফেলতে হচ্ছে। মেজদিদি ভাই, আর দয়ামায়া নয়— রসিকদাদার রসিকতাকে পুরোনো হতে দেব না, চিরকুমার-সভার চিরত্ব আমরা অচিরে ঘুচিয়ে দেব। তবেই তো আমাদের বিশ্ববিজয়িনী নারী নাম সার্থক হবে। কিরকম করে আক্রমণ করতে হবে একটা কিছু প্ল্যান ঠাউরেছিস?

শৈলবালা। কিছুই না। ক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে যখন যে রকম মাথায় আসে।

নীরবালা। আমাকে যখন দরকার হবে রণভেরী ধ্বনিত করলেই আমি হাজির হব। 'আমি কি ডরাই সখী কুমারসভারে। নাহি কি বল এ ভুজমৃণালে?'

অক্ষয়ের প্রবেশ

অক্ষয়। অদ্যকার সভায় বিদুষীমণ্ডলীকে একটি ঐতিহাসিক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা করি।

শৈলবালা। প্রস্তুত আছি।

অক্ষয়। বলো দেখি যে দুটি ডালে দাঁড়িয়েছিলেন সেই দুটি ডাল কাটতে চেয়েছিলেন কে।

নৃপবালা। আমি জানি মুখুজ্জেমশায়, কালিদাস।

অক্ষয়। না, আরও একজন বড়োলোক। শ্রীঅক্ষয়কুমার মুখোপাধ্যায়।

নীরবালা। ডাল দুটি কে।

অক্ষয়। (বামে নীরকে টানিয়া) এই একটি (দক্ষিণে নৃপকে টানিয়া আনিয়া) এই আর-একটি।

নীরবালা। আর, কুডুল বুঝি আজ আসছে ?

অক্ষয়। আসছে কেন, এসেছে বললেও অত্যুক্তি হয় না। ওই-যে সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে।

দৌড় দৌড়। শৈল পালাইবার সময় রসিকদাদাকে টানিয়া লইয়া গেল
চুড়িবালার ঝংকার এবং ত্রস্ত পদপল্লবকয়েকটির দ্রুতপতনশব্দ সম্পূর্ণ না মিলাইতেই

শ্রীশ ও বিপিনের প্রবেশ

অক্ষয়। পূর্ণবাবু এলেন না যে ?

শ্রীশ। চন্দ্রবাবুর বাসায় তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল, কিন্তু হঠাৎ তাঁর শরীরটা খারাপ হয়েছে বলে আজ আর আসতে পারলেন না।

অক্ষয়। (পথের দিকে চাহিয়া) একটু বসুন, আমি চন্দ্রবাবুর অপেক্ষায় দ্বারের কাছে গিয়ে দাঁড়াই। তিনি অন্ধ মানুষ, কোথায় যেতে কোথায় গিয়ে পড়বেন তার ঠিক নেই। কাছাকাছি এমন স্থানও আছে যেখানে কুমারসভার অধিবেশন কোনোমতেই প্রার্থনীয় নয়।

[অক্ষয়ের প্রস্থান

অক্ষয় চলিয়া গেলে ঘরটি শ্রীশ ভালো করিয়া দেখিয়া লইল। ঘরে দুটি দীপ জ্বলিতেছে
সেই দুটিকে বেষ্টন করিয়া ফিরোজ রঙের রেশমের অবগুণ্ঠন। সেই আবরণ ভেদ করিয়া ঘরের আলোটি
মৃদু এবং রঙিন হইয়া উঠিয়াছে। টেবিলের মাঝখানে ফুলদানিতে ফুল সাজানো

বিপিন। (ঈষৎ হাসিয়া) যা বল ভাই, এ ঘরটি চিরকুমার-সভার উপযুক্ত নয়।

শ্রীশ। (চকিত হইয়া) কেন নয়।

বিপিন। ঘরের সজ্জাগুলি তোমার নবীন সন্ন্যাসীদের পক্ষেও যেন বেশি বোধ হচ্ছে।

শ্রীশ। আমার সন্ন্যাসধর্মের পক্ষে বেশি কিছু হতে পারে না।

বিপিন। কেবল নারী ছাড়া।

শ্রীশ। হাঁ, ওই একটিমাত্র।

অন্য দিনের মতো কথাটায় তেমন জোর পৌঁছিল না

বিপিন। দেয়ালের ছবি এবং অন্যান্য পাঁচ রকমে এ ঘরটিতে সেই নারীজাতির অনেকগুলি পরিচয় পাওয়া যায় যেন।

শ্রীশ। সংসারে নারীজাতির পরিচয় তো সর্বত্রই আছে।

বিপিন। তা তো বটেই। কবিদের কথা যদি বিশ্বাস করা যায় তা হলে চাঁদে ফুলে লতায় পাতায় কোনোখানেই নারীজাতির পরিচয় থেকে হতভাগ্য পুরুষ-মানুষের নিষ্কৃতি পাবার জো নেই।

শ্রীশ। (হাসিয়া) কেবল ভেবেছিলুম, চন্দ্রবাবুর বাসার সেই এক তলার ঘরটিতে রমণীর কোনো সংস্রব ছিল না। আজ সে ভ্রমটা হঠাৎ ভেঙে গেল। নাঃ, ওরা পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়েছে।

বিপিন। বেচারা চিরকুমার ক'টির জন্যে একটা কোনো ফাঁক রাখে নি। সভা করবার জায়গা পাওয়াই দায়।

শ্রীশ। এই দেখো-না।

কোণের একটা টিপাই হইতে গোটাদুয়েক চুলের কাঁটা তুলিয়া দেখাইল

বিপিন। (কাঁটা দুটি লইয়া পর্যবেক্ষণ করিয়া) ওহে ভাই, এ স্থানটা তো কুমারদের পক্ষে নিষ্কণ্টক নয়।

শ্রীশ। ফুলও আছে, কাঁটাও আছে।

বিপিন। সেইটেই তো বিপদ। কেবল কাঁটা থাকলে এড়িয়ে চলা যায়।

শ্রীশ অপর কোণের ছোটো বইয়ের শেলফ হইতে বইগুলি তুলিয়া দেখিতে লাগিল— কতকগুলি নভেল কতকগুলি ইংরাজি কাব্যসংগ্রহ। প্যাল্‌গ্রেভের গীতিকাব্যের স্বর্ণভাণ্ডার খুলিয়া দেখিল মার্জিনে মেয়েলি অক্ষরে নোট লেখা— তখন গোড়ার পাতাটা উল্টাইয়া দেখিল দেখিয়া একটু নাড়িয়া-চাড়িয়া বিপিনের সম্মুখে ধরিল

বিপিন। নৃপবালা! আমার বিশ্বাস নামটি পুরুষ মানুষের নয়। কী বোধ কর।

শ্রীশ। আমারও সেই বিশ্বাস। এ নামটিও অন্যজাতীয় বলে ঠেকছে হে।

আর-একটা বই দেখাইল

বিপিন। নীরবালা! এ নামটি কাব্যগ্রন্থে চলে কিন্তু কুমারসভায়—

শ্রীশ। কুমারসভাতেও এই নামধারিণীরা যদি চলে আসেন তা হলে দ্বাররোধ করতে পারি এত বড়ো বলবান তো আমাদের মধ্যে কাউকে দেখি নে।

বিপিন। পূর্ণ তো একটি আঘাতেই আহত হয়ে পড়ল, রক্ষা পায় কি না সন্দেহ।

শ্রীশ। কিরকম।

বিপিন। লক্ষ্য করে দেখ নি বুঝি ?

শ্রীশ। না না, ও তোমার অনুমান।

বিপিন। হৃদয়টা তো অনুমানেরই জিনিস— না যায় দেখা, না যায় ধরা।

শ্রীশ। পূর্ণর অসুখটাও তা হলে বৈদ্যশাস্ত্রের অন্তর্গত নয় ?

বিপিন। না, এ-সকল ব্যাধি সম্বন্ধে মেডিকাল কলেজে কোনো লেক্‌চার চলে না।

শ্রীশ। এ বাড়ির দরজায় ঢুকতেই রসিক চক্রবর্তী বলে যে বৃদ্ধ যুবকটির সঙ্গে দেখা হল তাঁকে চিরকুমার-সভার দ্বারীর উপযুক্ত বলে বোধ হল না।

বিপিন। মনে হল শিবের তপোবন আগলাবার জন্য স্বয়ং পঞ্চশর নন্দীর ছদ্মবেশে এসেছেন, লোকটাকে বিশ্বাসযোগ্য ঠেকছে না।

চন্দ্রের প্রবেশ

চন্দ্রবাবু। আজকের তর্কবিতর্কের উত্তেজনায় পূর্ণবাবুর হঠাৎ শরীর খারাপ হল দেখে, আমি তাঁকে তাঁর বাড়ি পৌঁছে দেওয়া উচিত বোধ করলুম।

বিপিন। পূর্ণবাবুর যেরকম দুর্বল অবস্থা দেখছি পূর্ব হতেই তাঁর বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত ছিল।

চন্দ্রবাবু। পূর্ণবাবুকে তো বিশেষ অসাবধান বলে বোধ হয় না।

অক্ষয় ও রসিকের প্রবেশ

অক্ষয়। মাপ করবেন। এই নবীন সভ্যটিকে আপনাদের হাতে সমর্পণ করে দিয়েই আমি চলে যাচ্ছি।

রসিক। (হাসিয়া) আমার নবীনতা বাইরে থেকে বিশেষ প্রত্যক্ষগোচর নয়—

অক্ষয়। অত্যন্ত বিনয়বশত সেটা বাহ্য প্রাচীনতা দিয়ে ঢেকে রেখেছেন— ক্রমশ পরিচয় পাবেন। ইনিই হচ্ছেন সার্থকনামা শ্রীরসিক চক্রবর্তী।

রসিক। পিতা আমার রসবোধ সম্বন্ধে পরিচয় পাবার পূর্বেই রসিক নাম রেখেছিলেন, এখন পিতৃসত্যপালনের জন্য আমাকে রসিকতার চেষ্টা করতে হয়, তার পরে 'যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোঽত্র দোষঃ'। [অক্ষয়ের প্রস্থান

পুরুষবেশী শৈলের প্রবেশ

শৈল আসিয়া সকলকে নমস্কার করিল। ক্ষীণদৃষ্টি চন্দ্রমাধববাবু ঝাপসাভাবে তাহাকে দেখিলেন—

বিপিন ও শ্রীশ তাহার দিকে চাহিয়া রহিল

শৈলের পশ্চাতে দুইজন ভৃত্য কয়েকটি ভোজনপাত্র হাতে করিয়া উপস্থিত হইল

শৈল ছোটো ছোটো রুপার থালাগুলি লইয়া সাদা পাথরের টেবিলের উপর সাজাইতে লাগিল

রসিক। ইনি আপনাদের সভার আর একটি নবীন সভ্য। এঁর নবীনতা সম্বন্ধে কোনো তর্ক নেই। ঠিক আমার বিপরীত। ইনি বুদ্ধির প্রবীণতা বাহ্য নবীনতা দিয়ে গোপন করে রেখেছেন। আপনারা কিছু বিস্মিত হয়েছেন দেখছি— হবার কথা। এঁকে দেখে মনে হয় বালক, কিন্তু আমি আপনাদের কাছে জামিন রইলুম— ইনি বালক নন।

চন্দ্রবাবু। এঁর নাম?

রসিক। শ্রীঅবলাকান্ত চট্টোপাধ্যায়।

শ্রীশ। অবলাকান্ত?

রসিক। নামটি আমাদের সভায় চলতি হবার মতো নয় স্বীকার করি। নামটির প্রতি আমারও বিশেষ মমত্ব নেই— যদি পরিবর্তন করে বিক্রমসিংহ বা ভীমসেন বা অন্য কোনো উপযুক্ত নাম রাখেন তাতে উনি আপত্তি করবেন না। যদিচ শাস্ত্রে আছে বটে 'স্বনামা পুরুষো ধন্য'— কিন্তু উনি অবলাকান্ত নামটির দ্বারাই জগতে পৌরুষ অর্জন করতে ব্যাকুল নন।

শ্রীশ। বলেন কী মশায়। নাম তো আর গায়ের বস্ত্র নয় যে, বদল করলেই হল।

রসিক। ওটা আপনাদের একেলে সংস্কার শ্রীশবাবু, নামটাকে প্রাচীনেরা পোশাকের মধ্যেই গণ্য করতেন। দেখুন-না কেন, অর্জুনের পিতৃদত্ত নাম কী ঠিক করে বলা শক্ত — পার্থ, ধনঞ্জয়, সব্যসাচী, লোকের যখন যা মুখে আসত তাই বলেই ডাকত। দেখুন, নামটাকে আপনারা বেশি সত্য মনে করবেন না; ওঁকে যদি ভুলে আপনি অবলাকান্ত না'ও বলেন উনি লাইবেলের মকদ্দমা আনবেন না।

শ্রীশ। (হাসিয়া) আপনি যখন এতটা অভয় দিচ্ছেন তখন অত্যন্ত নিশ্চিন্ত

হলুম— কিন্তু ওঁর ক্ষমাগুণের পরিচয় নেবার দরকার হবে না, নাম ভুল করব না মশায়।

রসিক। আপনি না করতে পারেন, কিন্তু আমি করি মশায়। উনি আমার সম্পর্কে নাতি হন; সেই জন্যে ওঁর সম্বন্ধে আমার রসনা কিছু শিথিল, যদি কখনো এক বলতে আর বলি সেটা মাপ করবেন।

শ্রীশ। অবলাকান্তবাবু, আপনি এ-সমস্ত কী আয়োজন করেছেন। আমাদের সভার কার্যাবলীর মধ্যে মিষ্টান্নটা ছিল না।

রসিক। (উঠিয়া) সেই ত্রুটি যিনি সংশোধন করেছেন তাঁকে সভার হয়ে ধন্যবাদ দিই।

শৈল। (থালা সাজাইতে সাজাইতে) শ্রীশবাবু, আহারটাও কি আপনাদের নিয়ম-বিরুদ্ধ।

শ্রীশ। (বিপুলায়তন বিপিনকে টানিয়া আনিয়া) এই সভ্যটির আকৃতি নিরীক্ষণ করে দেখলেই ও সম্বন্ধে কোনো সংশয় থাকবে না।

বিপিন। নিয়মের কথা যদি বলেন অবলাকান্তবাবু, সংসারের শ্রেষ্ঠ জিনিস-মাত্রই নিজের নিয়ম নিজেই সৃষ্টি করে; ক্ষমতাশালী লেখক নিজের নিয়মে চলে, শ্রেষ্ঠ কাব্য সমালোচকের নিয়ম মানে না। যে মিষ্টান্নগুলি সংগ্রহ করেছেন এ সম্বন্ধেও কোনো সভার নিয়ম খাটতে পারে না; এর একমাত্র নিয়ম, বসে যাওয়া এবং নিঃশেষ করা। ইনি যতক্ষণ আছেন ততক্ষণ জগতের অন্য সমস্ত নিয়মকে দ্বারের কাছে অপেক্ষা করতে হবে।

শ্রীশ। তোমার হল কী বিপিন। তোমাকে খেতে দেখেছি বটে, কিন্তু এক নিশ্বাসে এত কথা কইতে শুনি নি তো।

বিপিন। রসনা উত্তেজিত হয়েছে, এখন সরস বাক্য বলা আমার পক্ষে অত্যন্ত সহজ হয়েছে। যিনি আমার জীবনবৃত্তান্ত লিখবেন, হায়, এ সময়ে তিনি কোথায়?

রসিক। (টাকে হাত বুলাইতে বুলাইতে) আমার দ্বারা সে কাজটা প্রত্যাশা করবেন না, আমি এত দীর্ঘকাল অপেক্ষা করতে পারব না।

নূতন ঘরের বিলাসসজ্জার মধ্যে আসিয়া চন্দ্রমাধববাবুর মনটা বিক্ষিপ্ত হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার উৎসাহস্রোত যথাপথে প্রবাহিত হইতেছিল না। তিনি ক্ষণে ক্ষণে কার্যবিবরণের খাতা ক্ষণে ক্ষণে নিজের করকোষ্ঠী অকারণে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতেছিলেন

শৈলবালা। (চন্দ্রবাবুর সম্মুখে গিয়া) সভার কার্যের যদি কিছু ব্যাঘাত করে থাকি তো মাপ করবেন চন্দ্রবাবু, কিছু জলযোগ—

চন্দ্রবাবু। এ-সমস্ত সামাজিকতায় সভার কার্যের ব্যাঘাত করে, তাতে সন্দেহ নেই।

রসিক। আচ্ছা, পরীক্ষা করে দেখুন, মিষ্টান্নে যদি সভার কার্য রোধ হয় তা হলে—

বিপিন। (মৃদুস্বরে) তা হলে ভবিষ্যতে নাহয় সভাটা বন্ধ রেখে মিষ্টান্নটা চালালেই হবে।

শ্রীশ। আসুন রসিকবাবু। আপনি উঠছেন না যে ?

রসিক। রোজ রোজ যেচে এবং মাঝে মাঝে কেড়ে খেয়ে থাকি, আজ চিরকুমার-সভার সভ্যরূপে আপনাদের সংসর্গগৌরবে কিঞ্চিৎ উপরোধের প্রত্যাশায় ছিলুম, কিন্তু—

শৈলবালা। 'কিন্তু' আবার কী রসিকদাদা। তুমি যে রবিবার করে থাক, আজ তুমি কিছু খাবে নাকি।

রসিক। দেখছেন মশায় ! নিয়ম আর-কারও বেলায় নয়,কেবল রসিকদাদার বেলায়। নাঃ, 'বলং বলং বাহুবলম্'। উপরোধ-অনুরোধের অপেক্ষা করা নয়।

বিপিন। (চারটিমাত্র ভোজনপাত্র দেখিয়া) আপনি আমাদের সঙ্গে বসবেন না ?

শৈলবালা। না, আমি পরিবেষণ করব।

শ্রীশ। সে কি হয়।

শৈলবালা। আমাকে পরিবেষণ করতে দিন, খাওয়ার চেয়ে তাতে আমি ঢের বেশি খুশি হব।

শ্রীশ। রসিকবাবু, এটা কি ঠিক হচ্ছে।

রসিক। ভিন্নরুচির্হি লোকঃ। উনি পরিবেষণ করতে ভালোবাসেন, আমরা আহার করতে ভালোবাসি, এরকম রুচিভেদে বোধ হয় পরস্পরের কিছু সুবিধা আছে।

সকলের আহার

শৈলবালা। চন্দ্রবাবু, ওটা মিষ্টি, ওটা আগে খাবেন না, এই দিকে তরকারি আছে। জলের গ্লাস খুঁজছেন ? এই-যে গ্লাস।

চন্দ্রবাবুর পাতে আম ছিল তিনি সেটাকে ভালোরূপ আয়ত্ত করিতে পারিতেছিলেন না— অনুতপ্ত শৈল তাড়াতাড়ি তাহা কাটিয়া সহজসাধ্য করিয়া দিল। যে সময়ে যেটি আবশ্যক আস্তে আস্তে হাতের কাছে জোগাইয়া দিয়া তাঁহার ভোজনব্যাপারটি নির্বিঘ্ন করিতে লাগিল

চন্দ্রবাবু। শ্রীশবাবু, স্ত্রীসভ্য নেওয়া সম্বন্ধে আপনি কিছু বিবেচনা করেছেন ?

শ্রীশ। ভেবে দেখতে গেলে ওতে আপত্তির কারণ বিশেষ নেই, কেবল সমাজের আপত্তির কথাটা আমি ভাবি।

বিপিন। সমাজকে অনেক সময় শিশুর মতো গণ্য করা উচিত। শিশুর সমস্ত আপত্তি মেনে চললে শিশুর উন্নতি হয় না, সমাজ সম্বন্ধেও ঠিক সেই কথা খাটে।

শ্রীশ। আমার বোধ হয় আমাদের দেশে যে এত সভাসমিতির আয়োজন অনুষ্ঠান অকালে ব্যর্থ হয় তার প্রধান কারণ, সে-সকল কার্যে স্ত্রীলোকদের যোগ নেই। রসিকবাবু কী বলেন।

রসিক। অবস্থাগতিকে যদিও স্ত্রীজাতির সঙ্গে আমার বিশেষ সম্বন্ধ নেই তবু এটুকু জেনেছি— স্ত্রীজাতি হয় যোগ দেন নয় বাধা দেন, হয় সৃষ্টি নয় প্রলয়। অতএব ওঁদের দলে টেনে অন্য সুবিধা যদি বা না'ও হয় তবু বাধার হাত এড়ানো যায়। বিবেচনা করে দেখুন, চিরকুমার-সভার মধ্যে যদি স্ত্রীজাতিকে আপনারা গ্রহণ করতেন তা হলে গোপনে এই সভাটিকে নষ্ট করবার জন্যে ওঁদের উৎসাহ থাকত না, কিন্তু বর্তমান অবস্থায়—

শৈলবালা। কুমারসভার উপর স্ত্রীজাতির আক্রোশের খবর রসিকদাদা কোথায় পেলে।

রসিক। বিপদের খবর না পেলে কি আর সাবধান করতে নেই। একচক্ষু হরিণ যে দিকে কানা ছিল সেই দিক থেকেই তো তীর খেয়েছিল— কুমারসভা যদি স্ত্রীজাতির প্রতিই কানা হন তা হলে সেই দিক থেকেই হঠাৎ ঘা খাবেন।

শ্রীশ। (বিপিনের প্রতি মৃদুস্বরে) একচক্ষু হরিণ তো আজ একটা তীর খেয়েছেন, একটি সভ্য ধূলিশায়ী।

চন্দ্রবাবু। কেবল পুরুষ নিয়ে যারা সমাজের ভালো করতে চায় তারা এক পায়ে চলতে চায়। সেইজন্যই খানিক দূর গিয়েই তাদের বসে পড়তে হয়। সমস্ত মহৎ চেষ্টা থেকে মেয়েদের দূরে রেখেছি বলেই আমাদের দেশের কাজে প্রাণসঞ্চার হচ্ছে না। আমাদের হৃদয়, আমাদের কাজ, আমাদের আশা বাইরে ও অন্তঃপুরে খণ্ডিত সেইজন্যে আমরা বাইরে গিয়ে বক্তৃতা দিই, ঘরে এসে ভুলি। দেখো অবলাকান্তবাবু, এখনও তোমার বয়স অল্প আছে, এই কথাটি ভালো করে মনে করে রেখো— স্ত্রীজাতিকে অবহেলা কোরো না। স্ত্রীজাতিকে যদি আমরা নিচু করে রাখি তা হলে তাঁরাও আমাদের নীচের দিকেই আকর্ষণ করেন; তা হলে তাঁদের ভারে আমাদের উন্নতির পথে চলা অসাধ্য হয়, দু পা চলেই আবার ঘরের কোণে এসেই আবদ্ধ হয়ে পড়ি। তাঁদের যদি আমরা উচ্চে রাখি তা হলে ঘরের মধ্যে এসে নিজের আদর্শকে খর্ব করতে লজ্জাবোধ হয়। আমাদের দেশে বাইরে লজ্জা আছে, কিন্তু ঘরের মধ্যে সেই লজ্জাটি নেই, সেইজন্যেই আমাদের সমস্ত উন্নতি কেবল বাহ্যাড়ম্বরে পরিণত হয়।

শৈলবালা। আশীর্বাদ করুন আপনার উপদেশ যেন ব্যর্থ না হয়, নিজেকে যেন আপনার আদর্শের উপযুক্ত করতে পারি।

চন্দ্রবাবু। আমার ভাগ্নী নির্মলাকে কুমারসভার সভ্যশ্রেণীতে ভুক্ত করতে আপনাদের কোনো আপত্তি নেই ?

রসিক। আর-কোনো আপত্তি নেই, কেবল একটু ব্যাকরণের আপত্তি। কুমার-সভায় কেউ যদি কুমারীবেশে আসেন তা হলে বোপদেবের অভিশাপ।

শৈলবালা। বোপদেবের অভিশাপ এ কালে খাটে না।

রসিক। আচ্ছা, অন্তত লোহারামকে তো বাঁচিয়ে চলতে হবে? আমি তো বোধ করি, স্ত্রীসভ্যরা যদি পুরুষসভ্যদের অজ্ঞাতসারে বেশ ও নাম পরিবর্তন করে আসেন তা হলে সহজে নিষ্পত্তি হয়।

শ্রীশ। তা হলে একটা কৌতুক এই হয় যে, কে স্ত্রী কে পুরুষ নিজেদের এই সন্দেহটা থেকে যায়—

বিপিন। আমি বোধ হয় সন্দেহ থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারি।

রসিক। আমাকেও বোধ হয় আমার নাৎনী বলে কারও হঠাৎ আশঙ্কা না হতে পারে।

শ্রীশ। কিন্তু অবলাকান্তবাবু সম্বন্ধে একটা সন্দেহ থেকে যায়।

শৈল অদূরবর্তী টিপাই হইতে মিষ্টান্নের থালা আনিতে প্রস্থান করিল

চন্দ্রবাবু। দেখুন রসিকবাবু, ভাষাতত্ত্বে দেখা যায়, ব্যবহার করতে করতে একটা শব্দের মূল অর্থ লোপ পেয়ে বিপরীত অর্থ ঘটে থাকে। স্ত্রীসভ্য গ্রহণ করলে চিরকুমার-সভার অর্থের যদি পরিবর্তন ঘটে তাতে ক্ষতি কী।

রসিক। কিছু না। আমি পরিবর্তনের বিরোধী নই— তা নামপরিবর্তন বা বেশ-পরিবর্তন যাই হোক-না কেন, যখন যা ঘটে আমি বিনা বিরোধে গ্রহণ করি বলেই আমার প্রাণটা নবীন আছে।

মিষ্টান্ন শেষ হইল এবং স্ত্রীসভ্য লওয়া সম্বন্ধে কাহারও আপত্তি হইল না

রসিক। আশা করি সভার কাজের কোনো ব্যাঘাত হয় নি।

শ্রীশ। কিছু না— অন্যদিন কেবল মুখেরই কাজ চলত, আজ দক্ষিণ হস্তও যোগ দিয়েছে।

বিপিন। তাতে আভ্যন্তরিক তৃপ্তিটা কিছু বেশি হয়েছে। আজ তা হলে এইখানেই সভা ভঙ্গ করা হোক, কারণ এর পরে আর কোনো আলোচনা চলবে না। এ দিকে দেরিও হয়ে গেছে। [সকলের প্রস্থান

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

অক্ষয়ের বাসা

অক্ষয়, নীর ও নৃপ

নীরর গান

যেতে দাও গেল যারা।
তুমি যেয়ো না, যেয়ো না—
আমার, বাদলের গান হয় নি সারা।
কুটিরে কুটিরে বন্ধ দ্বার,
নিভৃত রজনী অন্ধকার,
বনের অঞ্চল কাঁপে চঞ্চল—
অধীর সমীর তন্দ্রাহারা।

অক্ষয়। হল কী বলো দেখি। আমার যে ঘরটি এতকাল কেবল ঝড়ু বেহারার ঝাড়নের তাড়নে নির্মল ছিল, সেই ঘরের হাওয়া দুবেলা তোমাদের দুই বোনের অঞ্চল-বীজনে চঞ্চল হয়ে উঠছে যে।

নীরবালা। দিদি নেই, তুমি একলা পড়ে আছ ব'লে দয়া ক'রে মাঝে মাঝে দেখা দিয়ে যাই, তার উপরে আবার জবাবদিহি?

অক্ষয়। দয়াময়ী চোর, শূন্য হৃদয়টা চুরি করবার জন্যে শূন্য ঘরে উঁকিঝুঁকি? মৎলব কি বুঝি নে?

গান

ওগো দয়াময়ী চোর! এত দয়া মনে তোর!
বড়ো দয়া করে কণ্ঠে আমার জড়াও মায়ার ডোর!
বড়ো দয়া করে চুরি করে লও শূন্য হৃদয় মোর।

নীরবালা। আমাদের এমন বোকা চোর পাও নি। এখন হৃদয় আছে কোথায় যে চুরি করতে আসব।

অক্ষয়। ঠিক করে বলো দেখি হতভাগা হৃদয়টা গেছে কত দূরে।

নৃপবালা। আমি জানি মুখুজ্জেমশায়। বলব? ৪৭৫ মাইল।

নীরবালা। সেজদিদি অবাক করলি। তুই কি মুখুজ্জেমশায়ের হৃদয়ের পিছনে পিছনে মাইল গুনতে গুনতে ছুটেছিলি নাকি।

নৃপবালা। না ভাই, দিদি কাশী যাবার সময় টাইম্‌টেবিলে মাইলটা দেখেছিলুম।

অক্ষয়।— গান

চলেছে ছুটিয়া পলাতকা হিয়া,
বেগে বহে শিরা ধমনী।
হায় হায় হায় ধরিবারে তায়
পিছে পিছে ধায় রমণী।
বায়ুবেগভরে উড়ে অঞ্চল,
লটপট বেণী দুলে চঞ্চল—
এ কী রে রঙ্গ, আকুল-অঙ্গ
ছুটে কুরঙ্গগমনী।

নীরবালা। কবিবর, সাধু সাধু। কিন্তু, তোমার রচনায় কোনো কোনো আধুনিক কবির ছায়া দেখতে পাই যেন।

অক্ষয়। তার কারণ, আমিও অত্যন্ত আধুনিক। তোরা কি ভাবিস তোদের মুখুজ্জেমশায় কৃত্তিবাস ওঝার যমজ ভাই। ভূগোলের মাইল গুনে দিচ্ছিস, আর ইতিহাসের তারিখ ভুল? তা হলে আর বিদুষী শ্যালী থেকে ফল হল কী। এতবড়ো আধুনিকটাকে তোদের প্রাচীন বলে ভ্রম হয়?

নীরবালা। মুখুজ্জেমশায়, শিব যখন বিবাহসভায় গিয়েছিলেন তখন তাঁর শ্যালীরাও ওই রকম ভুল করেছিলেন, কিন্তু উমার চোখে তো অন্য রকম ঠেকেছিল। তোমার ভাব্‌না কিসের, দিদি তোমাকে আধুনিক বলেই জানেন।

অক্ষয়। মূঢ়ে, শিবের যদি শ্যালী থাকত তা হলে কি তাঁর ধ্যানভঙ্গ করবার জন্যে অনঙ্গদেবের দরকার হত। আমার সঙ্গে তাঁর তুলনা?

নৃপবালা। আচ্ছা মুখুজ্জেমশায়, এতক্ষণ তুমি এখানে বসে বসে কী করছিলে

অক্ষয়। তোদের গয়লাবাড়ির দুধের হিসেব লিখছিলুম।

নীরবালা। (ডেস্কের উপর হইতে অসমাপ্ত চিঠি তুলিয়া লইয়া) এই তোমার গয়লাবাড়ির হিসেব? হিসেবের মধ্যে ক্ষীর-নবনীর অংশটাই বেশি।

অক্ষয়। (ব্যস্তসমস্ত) না না, ওটা নিয়ে গোল করিস নে, আহা, দিয়ে যা—

নৃপবালা। নীরুভাই, জ্বালাস নে, চিঠিখানা ওঁকে ফিরিয়ে দে— ওখানে শ্যালীর

উপদ্রব সয় না। কিন্তু মুখুজ্জেমশায়, তুমি দিদিকে চিঠিতে কী বলে সম্বোধন কর বলো-না।

অক্ষয়। রোজ নূতন সম্বোধন করে থাকি—

নৃপবালা। আজ কী করেছ বলো দেখি।

অক্ষয়। শুনবে? তবে সখী, শোনো। চঞ্চলচকিতচিত্তচকোরচৌর চঞ্চুচুম্বিতচারু-চন্দ্রিকরুচিরুচির চিরচন্দ্রমা।

নীরবালা। চমৎকার চাটুচাতুর্য।

অক্ষয়। এর মধ্যে চৌর্যবৃত্তি নেই, চর্বিতচর্বণশূন্য।

নৃপবালা। (সবিস্ময়ে) আচ্ছা মুখুজ্জেমশায়, রোজ রোজ তুমি এই রকম লম্বা লম্বা সম্বোধন রচনা কর? তাই বুঝি দিদিকে চিঠি লিখতে এত দেরি হয়?

অক্ষয়। ওইজন্যেই তো নৃপর কাছে আমার মিথ্যে কথা চলে না। ভগবান যে আমাকে সদ্য সদ্য বানিয়ে বলবার এমন অসাধারণ ক্ষমতা দিয়েছেন সেটা দেখছি খাটাতে দিলে না। ভগ্নীপতির কথা বেদবাক্য ব'লে বিশ্বাস করতে কোন্ মনুসংহিতায় লিখেছে বলো দেখি।

নীরবালা। রাগ কোরো না, শান্ত হও মুখুজ্জেমশায়, শান্ত হও। সেজদিদির কথা ছেড়ে দাও, কিন্তু ভেবে দেখো আমি তোমার আধখানা কথা সিকি পয়সাও বিশ্বাস করি নে, এতেও তুমি সান্ত্বনা পাও না?

নৃপবালা। আচ্ছা মুখুজ্জেমশায়, সত্যি করে বলো, দিদির নামে তুমি কখনো কবিতা রচনা করেছ?

অক্ষয়। এবার তিনি যখন অত্যন্ত রাগ করেছিলেন তখন তাঁর স্তব রচনা করে গান করেছিলুম—

নৃপবালা। তার পরে?

অক্ষয়। তার পরে দেখলুম, তাতে উল্টো ফল হল, বাতাস পেয়ে যেমন আগুন বেড়ে ওঠে তেমনি হল— সেই অবধি স্তবরচনা ছেড়েই দিয়েছি।

নৃপবালা। ছেড়ে দিয়ে কেবল গয়লাবাড়ির হিসেব লিখছ? কী স্তব লিখেছিলে মুখুজ্জেমশায়, আমাদের শোনাও-না।

অক্ষয়। সাহস হয় না, শেষকালে আমার উপরওয়ালার কাছে রিপোর্ট্ করবি।

নৃপবালা। না, আমরা দিদিকে বলে দেব না।

অক্ষয়। তবে অবধান করো।

গান

মনোমন্দিরসুন্দরী।
স্খলদঞ্চলা চলচঞ্চলা
অয়ি মঞ্জুলা মঞ্জরী।
রোষারুণরাগরঞ্জিতা
গোপনহাস্য -কুটিল-আস্য-
কপটকলহগঞ্জিতা।
সংকোচনত-অঙ্গিনী।
চকিতচপল- নবকুরঙ্গ-
যৌবনবনরঙ্গিণী।
অয়ি খলছলগুণ্ঠিতা।
লুব্ধ-পবন -ক্ষুব্ধ লোভন
মল্লিকা অবলুণ্ঠিতা।
চুম্বনধনবঞ্চিনী।
রুদ্ধ-কোরক- সঞ্চিত-মধু-
কঠিনকনককঞ্চিনী।

কিন্তু আর নয়। এবারে মশায়রা বিদায় হোন।

নীরবালা। কেন, এত অপমান কেন। দিদির কাছে তাড়া খেয়ে আমাদের উপরে বুঝি তার ঝাল ঝাড়তে হবে?

অক্ষয়। এরা দেখছি পবিত্র জেনানা আর রাখতে দিলে না। আরে দুর্বৃত্তে, এখনই লোক আসবে।

নৃপবালা। তার চেয়ে বলো-না দিদির চিঠিখানা শেষ করতে হবে।

নীরবালা। তা, আমরা থাকলেমই বা, তুমি চিঠি লেখো-না, আমরা কি তোমার কলমের মুখ থেকে কথা কেড়ে নেব না কি।

অক্ষয়। তোমরা কাছাকাছি থাকলে মনটা এইখানেই মারা যায়, দূরে যিনি আছেন সে পর্যন্ত আর পৌঁছয় না। না, ঠাট্টা নয়, পালাও। এখনই লোক আসবে— ওই একটি বৈ দরজা খোলা নেই, তখন পালাবার পথ পাবে না।

নৃপবালা। এই সন্ধেবেলায় কে তোমার কাছে আসবে।

অক্ষয়। যাদের ধ্যান কর তারা নয় গো, তারা নয়।

নীরবালা। যার ধ্যান করা যায় সে সকল সময় আসে না তুমি আজকাল সেটা

বেশ বুঝতে পারছ, কী বল মুখুজ্জেমশায়। দেবতার ধ্যান কর আর উপদেবতার উপদ্রব হয়।—

গান

ও আমার ধ্যানেরই ধন,
তোমায় হৃদয়ে দোলায় যে হাসি রোদন।
আসে বসন্ত, ফোটে বকুল,
কুঞ্জে পূর্ণিমা-চাঁদ হেসে আকুল—
তারা তোমায় খুঁজে না পায়,
প্রাণের মাঝে আছ গোপন স্বপন।

অক্ষয়। সংগ্রহ হল কোথা থেকে।

নীরবালা। তোমারই শ্রীমুখ থেকে।

অক্ষয়। অবশেষে বিরহের দিনে আমারই শ্রীবক্ষে হানতে এসেছিস। আচ্ছা, তা হলে দয়া করিস নে, একেবারে শেষ করে দে।

নীরবালা।—

আঁখিরে ফাঁকি দাও একি ধারা—
অশ্রুজলে তারে কর সারা।
গন্ধ আসে, কেন দেখি নে মালা।
পায়ের ধ্বনি শুনি, পথ নিরালা।
বেলা যে যায়, ফুল যে শুকায়—
অনাথ হয়ে আছে আমার ভুবন।

নেপথ্যে। অবলাকান্তবাবু আছেন?

সহসা শ্রীশের প্রবেশ

'মাপ করবেন' বলিয়া পলায়নোদ্যম। নৃপ ও নীরর সবেগে প্রস্থান

অক্ষয়। এসো এসো শ্রীশবাবু।

শ্রীশ। (সলজ্জভাবে) মাপ করবেন।

অক্ষয়। রাজি আছি, কিন্তু অপরাধটা কী আগে বলো।

শ্রীশ। খবর না দিয়েই—

অক্ষয়। তোমার অভ্যর্থনার জন্য ম্যুনিসিপালিটির কাছ থেকে যখন বাজেট স্যাংশন করে নিতে হয় না তখন নাহয় খবর না দিয়েই এলে শ্রীশবাবু।

শ্রীশ। আপনি যদি বলেন এখানে আমার অসময়ে অনধিকার প্রবেশ হয় নি, তা হলেই হল।

অক্ষয়। তাই বললেম। তুমি যখনই আসবে তখনই সুসময়, এবং যেখানে পদার্পণ করবে সেইখানেই তোমার অধিকার। শ্রীশবাবু স্বয়ং বিধাতা সর্বত্র তোমাকে পাস্‌পোর্ট দিয়ে রেখেছেন। একটু বোসো, অবলাকান্তবাবুকে খবর পাঠিয়ে দিই। (স্বগত) না পলায়ন করলে চিঠি শেষ করতে পারব না। [প্রস্থান

শ্রীশ। চক্ষের সম্মুখ দিয়ে এক জোড়া মায়াস্বর্ণমৃগী ছুটে পালালো। ওরে নিরস্ত্র ব্যাধ, তোর ছোটবার ক্ষমতা নেই। নিকষের উপর সোনার রেখার মতো চকিত চোখের চাহনি দৃষ্টিপথের উপরে যেন আঁকা রয়ে গেল।

রসিকের প্রবেশ

শ্রীশ। সন্ধেবেলায় এসে আপনাদের তো বিরক্ত করি নি রসিকবাবু ?

রসিক। ভিক্ষুকক্ষে বিনিক্ষিপ্তঃ কিমিক্ষুর্নীরসো ভবেৎ ? শ্রীশবাবু, আপনাকে দেখে বিরক্ত হব আমি কি এতবড়ো হতভাগ্য।

শ্রীশ। অবলাকান্তবাবু বাড়ি আছেন তো ?

রসিক। আছেন বৈকি। এলেন ব'লে।

শ্রীশ। না না, যদি কাজে থাকেন তা হলে তাঁকে ব্যস্ত করে কাজ নেই— আমি কুঁড়ে লোক, বেকার মানুষের সন্ধানে ঘুরে বেড়াই।

রসিক। সংসারে সেরা লোকেরাই কুঁড়ে, এবং বেকার লোকেরাই ধন্য। উভয়ের সম্মিলন হলেই মণিকাঞ্চনযোগ। এই কুঁড়ে-বেকারের মিলনের জন্যেই তো সন্ধেবেলাটার সৃষ্টি হয়েছে। যোগীদের জন্যে সকালবেলা, রোগীদের জন্যে রাত্রি, কাজের লোকের জন্যে দশটা-চারটে। আর সন্ধেবেলাটা, সত্যি কথা বলছি, চিরকুমার-সভার অধিবেশনের জন্যে চতুর্মুখ সৃজন করেন নি। কী বলেন শ্রীশবাবু।

শ্রীশ। সে কথা মানতে হবে বৈকি। সন্ধ্যা চিরকুমার-সভার অনেক পূর্বেই সৃজন হয়েছে, সে আমাদের সভাপতি চন্দ্রবাবুর নিয়ম মানে না—

রসিক। সে যে চন্দ্রের নিয়ম মানে তার নিয়মই আলাদা। আপনার কাছে খুলে বলি, হাসবেন না শ্রীশবাবু, আমার এক তলার ঘরে কায়ক্লেশে একটি জানলা দিয়ে অল্প একটু জ্যোৎস্না আসে ; শুক্লসন্ধ্যায় সেই জ্যোৎস্নার শুভ্র রেখাটি যখন আমার বক্ষের উপর এসে পড়ে তখন মনে হয় কে আমার কাছে কী খবর পাঠালে গো। শুভ্র একটি হংসদূত কোন্ বিরহিণীর হয়ে এই চিরবিরহীর কানে কানে বলছে—

অলিন্দে কালিন্দীকমলসুরভৌ কুঞ্জবসতের্-
বসন্তীং বাসন্তীনবপরিমলোদ্গারচিকুরাং।

স্বহৃৎসঙ্গে লীনাং মদমুকুলিতাক্ষীং পুনরিমাং
কদাহং সেবিষ্যে কিসলয়কলাপব্যজনিনীম্ ॥

শ্রীশ। বেশ বেশ রসিকবাবু, চমৎকার। কিন্তু, ওর মানেটা বলে দিতে হবে। ছন্দের ভিতর দিয়ে ওর রসের গন্ধটা পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু অনুস্বার-বিসর্গ দিয়ে একেবারে এঁটে বন্ধ করে রেখেছে।

রসিক। বাংলায় একটা তর্জমাও করেছি ; পাছে সম্পাদকরা খবর পেয়ে হুড়াহুড়ি লাগিয়ে দেয়, তাই লুকিয়ে রেখেছি— শুনবেন শ্রীশবাবু ?—

কুঞ্জকুটিরের স্নিগ্ধ অলিন্দের 'পর
কালিন্দীকমলগন্ধ ছুটিবে সুন্দর—
লীনা রবে মদিরাক্ষী তব অঙ্কতলে,
বহিবে বাসন্তীবাস ব্যাকুল কুন্তলে।
তাঁহারে করিব সেবা, কবে হবে হায়,
কিশলয়পাখাখানি দোলাইব গায় ?

শ্রীশ। বা, বা, রসিকবাবু, আপনার মধ্যে এত আছে তা তো জানতুম না।

রসিক। কী করে জানবেন বলুন। কাব্যলক্ষ্মী যে তাঁর পদ্মবন থেকে মাঝে মাঝে এই টাকের উপরে খোলা হাওয়া খেতে আসেন এ কেউ সন্দেহ করে না। (হাত বুলাইয়া) কিন্তু, এমন ফাঁকা জায়গা আর নেই।

শ্রীশ। আহাহা রসিকবাবু, যমুনাতীরে সেই স্নিগ্ধ-অলিন্দ-ওয়ালা কুঞ্জকুটিরটি আমার ভারী মনে লেগে গেছে। যদি পায়োনিয়রে বিজ্ঞাপন দেখি সেটা দেনার দায়ে নিলেমে বিক্রি হচ্ছে তা হলে কিনে ফেলি।

রসিক। বলেন কী শ্রীশবাবু। শুধু অলিন্দ নিয়ে করবেন কী। সেই মদমুকুলিতাক্ষীর কথাটা ভেবে দেখবেন। সে নিলেমে পাওয়া শক্ত।

শ্রীশ। কার রুমাল এখানে পড়ে রয়েছে !

রসিক। দেখি দেখি। তাই তো। দুর্লভ জিনিস আপনার হাতে ঠেকে দেখছি। বাঃ, দিব্য গন্ধ। শ্লোকের লাইনটা বদলাতে হবে মশায়, ছন্দ ভঙ্গ হয় হোক গে— বাসন্তীনবপরিমলোদ্গাররুমালাং। শ্রীশবাবু, এ রুমালটাতে তো আমাদের কুমারসভার পতাকা নির্মাণ চলবে না। দেখেছেন কোণে একটি ছোট্ট 'ন' অক্ষর লেখা রয়েছে ?

শ্রীশ। কী নাম হতে পারে বলুন দেখি। নলিনী ? না, বড্ড চলিত নাম। নীলাম্বুজা ? ভয়ংকর মোটা। নীহারিকা ? বড়ো বাড়াবাড়ি। বলুন-না রসিকবাবু, আপনার কী মনে হয়।

রসিক। নাম মনে হয় না মশায়, আমার ভাব মনে আসে, অভিধানে যত 'ন' আছে সমস্ত মাথার মধ্যে রাশীকৃত হয়ে উঠতে চাচ্ছে, 'ন'য়ের মালা গেঁথে একটি নীলোৎপল-নয়নার গলায় পরিয়ে দিতে ইচ্ছে করছে— নির্মলনবনীনিন্দিতনবীন— বলুন-না শ্রীশবাবু, শেষ করে দিন-না—

শ্রীশ। নবমল্লিকা।

রসিক। বেশ বেশ— নির্মলনবনীনিন্দিতনবীননবমল্লিকা। গীতগোবিন্দ মাটি হল। আরও অনেকগুলো ভালো ভালো 'ন' মাথার মধ্যে হাহাকার করে বেড়াচ্ছে, মিলিয়ে দিতে পারছি নে— নিভৃত নিকুঞ্জনিলয়, নিপুণনূপুরনিক্বণ, নিবিড়নীরদনির্মুক্ত— অক্ষয়দাদা থাকলে ভাবতে হত না। মাস্টারমশায়কে দেখবামাত্র ছেলেগুলো যেমন বেঞ্চে নিজ নিজ স্থানে সার বেঁধে বসে তেমনি অক্ষয়দাদার সাড়া পাবামাত্র কথাগুলো দৌড়ে এসে জুড়ে দাঁড়ায়।— শ্রীশবাবু, বুড়ো মানুষকে বঞ্চনা করে রুমালখানা চুপি চুপি পকেটে পুরবেন না—

শ্রীশ। আবিষ্কারকর্তার অধিকার সকলের উপর—

রসিক। আমার ওই রুমালখানিতে একটু প্রয়োজন আছে শ্রীশবাবু। আপনাকে তো বলেছি আমার নির্জন ঘরের একটিমাত্র জানলা দিয়ে একটুমাত্র চাঁদের আলো আসে, আমার একটি কবিতা মনে পড়ে—

বীথীষু বীথীষু বিলাসিনীনাং
মুখানি সংবীক্ষ্য শুচিস্মিতানি
জালেষু জালেষু করং প্রসার্য
লাবণ্যভিক্ষামটতীব চন্দ্রঃ।

কুঞ্জ- পথে পথে চাঁদ উঁকি দেয় আসি,
দেখে বিলাসিনীদের মুখভরা হাসি।
কর প্রসারণ করি ফিরে সে জাগিয়া
বাতায়নে বাতায়নে লাবণ্য মাগিয়া।

হতভাগা ভিক্ষুক আমার বাতায়নটায় যখন আসে তখন তাকে কী দিয়ে ভোলাই বলুন তো। কাব্যশাস্ত্রের রসালো জায়গা যা-কিছু মনে আসে সমস্ত আউড়ে যাই, কিন্তু কথায় চিঁড়ে ভেজে না। সেই দুর্ভিক্ষের সময় ওই রুমালখানি বড়ো কাজে লাগবে। ওতে অনেকটা লাবণ্যের সংস্রব আছে।

শ্রীশ। সে লাবণ্য দৈবাৎ কখনো দেখেছেন রসিকবাবু?

রসিক। দেখেছি বৈকি, নইলে কি ওই রুমালখানার জন্যে এত লড়াই করি। আর ওই-যে 'ন' অক্ষরের কথাগুলো আমার মাথার মধ্যে এখনও এক ঝাঁক ভ্রমরের মতো গুঞ্জন করে বেড়াচ্ছে তাদের সামনে কি একটি কমলবনবিহারিণী মানসীমূর্তি নেই।

শ্রীশ। রসিকবাবু, আপনার ওই মগজটি একটি মৌচাক-বিশেষ, ওর ফুকোরে ফুকোরে কবিত্বের মধু। আমাকে সুদ্ধ মাতাল করে দেবেন দেখছি। [দীর্ঘনিশ্বাসপতন

পুরুষবেশী শৈলবালার প্রবেশ

শৈলবালা। আমার আসতে অনেক দেরি হয়ে গেল, মাপ করবেন শ্রীশবাবু।

শ্রীশ। আমি এই সন্ধেবেলায় উৎপাত করতে এলুম, আমাকেও মাপ করবেন অবলাকান্তবাবু।

শৈলবালা। রোজ সন্ধেবেলায় যদি এই রকম উৎপাত করেন তা হলে মাপ করব, নইলে নয়।

শ্রীশ। আচ্ছা রাজি, কিন্তু এর পরে যখন অনুতাপ উপস্থিত হবে তখন প্রতিজ্ঞা স্মরণ করবেন।

শৈলবালা। আমার জন্যে ভাববেন না, কিন্তু আপনার যদি অনুতাপ উপস্থিত হয় তা হলে আপনাকে নিষ্কৃতি দেব।

শ্রীশ। সেই ভরসায় যদি থাকেন তা হলে অনন্তকাল অপেক্ষা করতে হবে।

শৈলবালা। রসিকদাদা, তুমি শ্রীশবাবুর পকেটের দিকে হাত বাড়াচ্ছ কেন। বুড়ো বয়সে গাঁটকাটা ব্যাবসা ধরবে নাকি।

রসিক। না ভাই, সে ব্যাবসা তোদের বয়সেই শোভা পায়। একখানা রুমাল নিয়ে শ্রীশবাবুতে আমাতে তক্‌রার চলছে, তোকে তার মীমাংসা করে দিতে হবে।

শৈলবালা। কিরকম।

রসিক। প্রেমের বাজারে বড়ো মহাজনি করবার মূলধন আমার নেই। আমি খুচরো মালের কারবারী— রুমালটা, চুলের দড়িটা, ছেঁড়া কাগজে দু-চারটে হাতের অক্ষর, এই-সমস্ত কুড়িয়ে-বাড়িয়েই আমাকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। শ্রীশবাবুর যেরকম মূলধন আছে তাতে উনি বাজার-সুদ্ধ পাইকেরি দরে কিনে নিতে পারেন— রুমাল কেন, সমস্ত নীলাঞ্চলে অর্ধেক ভাগ বসাতে পারেন। আমরা যেখানে চুলের দড়ি গলায় জড়িয়ে মরতে ইচ্ছে করি উনি যে সেখানে আগুল্‌ফবিলম্বিত চিকুররাশির সুগন্ধ ঘনান্ধকারের মধ্যে সম্পূর্ণ অস্ত যেতে পারেন। উনি উঞ্ছবৃত্তি করতে আসেন কেন।

শ্রীশ। অবলাকান্তবাবু, আপনি তো নিরপেক্ষ ব্যক্তি, রুমালখানা এখন আপনার

হাতেই থাক্, উভয় পক্ষের বক্তৃতা শেষ হয়ে গেলে বিচারে যার প্রাপ্য হয় তাকেই দেবেন।

শৈলবালা। (রুমালখানি পকেটে পুরিয়া) আমাকে আপনি নিরপেক্ষ লোক মনে করছেন বুঝি? এই কোণে যেমন একটি 'ন' অক্ষর লাল সুতোয় সেলাই করা আছে আমার হৃদয়ের একটি কোণে খুঁজলে দেখতে পাবেন ওই অক্ষরটি রক্তের বর্ণে লেখা। এ রুমাল আমি আপনাদের কাউকেই দেব না।

শ্রীশ। রসিকবাবু, এ কী রকম জবর্দস্তি। আর, 'ন' অক্ষরটিও তো বড়ো ভয়ানক অক্ষর।

রসিক। শুনেছি বিলিতি শাস্ত্রে ন্যায়ধর্মও অন্ধ, ভালোবাসাও অন্ধ। এখন দুই অন্ধে লড়াই হোক, যার বল বেশি তারই জিত হবে।

শৈলবালা। শ্রীশবাবু, যার রুমাল আপনি তো তাকে দেখেন নি, তবে কেন কেবলমাত্র কল্পনার উপর নির্ভর করে ঝগড়া করছেন।

শ্রীশ। দেখি নি কে বললে।

শৈলবালা। দেখেছেন? কাকে দেখলেন। 'ন' তো দুটি আছে—

শ্রীশ। দুটিই দেখেছি— তা, এ রুমাল দুজনের যাঁরই হোক, দাবি আমি পরিত্যাগ করতে পারব না।

রসিক। শ্রীশবাবু, বৃদ্ধের পরামর্শ শুনুন, হৃদয়গগনে দুই চন্দ্রের আয়োজন করবেন না: একশ্চন্দ্রস্তমোহন্তি।

ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। (শ্রীশের প্রতি) চন্দ্রবাবুর চিঠি নিয়ে একটি লোক আপনার বাড়ি খুঁজে শেষকালে এখানে এসেছে।

শ্রীশ। (চিঠি পড়িয়া) একটু অপেক্ষা করবেন? চন্দ্রবাবুর বাড়ি কাছেই— আমি একবার চট করে দেখা করে আসব।

শৈলবালা। পালাবেন না তো?

শ্রীশ। না, আমার রুমাল বন্ধক রইল, ওখানা খালাস না করে যাচ্ছি নে। [প্রস্থান

রসিক। ভাই শৈল, কুমারসভার সভ্যগুলিকে যেরকম ভয়ংকর কুমার ঠাউরেছিলুম তার কিছুই নয়। এদের তপস্যা ভঙ্গ করতে মেনকা রম্ভা মদন বসন্ত কারও দরকার হয় না, এই বুড়ো রসিকই পারে।

শৈলবালা। তাই তো দেখছি।

রসিক। আসল কথাটা কী জান? যিনি দার্জিলিঙে থাকেন তিনি ম্যালেরিয়ার দেশে পা বাড়াবামাত্রই রোগে চেপে ধরে। এঁরা এতকাল চন্দ্রবাবুর বাসায় বড্ড নীরোগ জায়গায় ছিলেন, এই বাড়িটি যে রোগের বীজে ভরা এখানকার রুমালে বইয়ে চৌকিতে টেবিলে যেখানে স্পর্শ করছেন সেইখান থেকেই একেবারে নাকে মুখে রোগ ঢুকছে— আহা, শ্রীশবাবুটি গেল।

শৈলবালা। রসিকদাদা, তোমার বুঝি রোগের বীজ অভ্যেস হয়ে গেছে।

রসিক। আমার কথা ছেড়ে দাও। আমার পিলে যকৃৎ যা-কিছু হবার তা হয়ে গেছে।

নীরবালার প্রবেশ

নীরবালা। দিদি, আমরা পাশের ঘরেই ছিলুম।

রসিক। জেলেরা জাল টানাটানি করে মরছে, আর চিল বসে আছে ছোঁ মারবার জন্যে।

নীরবালা। সেজদিদির রুমালখানা নিয়ে শ্রীশবাবু কী কাণ্ডটাই করলে। সেজদিদি তো লজ্জায় লাল হয়ে পালিয়ে গেছে। আমি এমনি বোকা ভুলেও কিছু ফেলে যাই নি। বারোখানা রুমাল এনেছি, ভাবছি এবার ঘরের মধ্যে রুমালের হরির লুঠ দিয়ে যাব।

শৈলবালা। তোর হাতে ও কিসের খাতা নীর।

নীরবালা। যে গানগুলো আমার পছন্দ হয় ওতে লিখে রাখি দিদি।

রসিক। ছোড়্‌দিদি, আজকাল তোর কিরকম পারমার্থিক গান পছন্দ হচ্ছে তার এক-আধটা নমুনা দেখতে পারি কি।

নীরবালা।— দিন গেল রে, ডাক দিয়ে নে পারের খেয়া—
চুকিয়ে হিসেব মিটিয়ে দে তোর দেয়া-নেয়া।

রসিক। দিদি ভারী ব্যস্ত যে। পার করবার নেয়ে ডেকে দিচ্ছি ভাই। যা দেবে যা নেবে সেটা মোকাবিলায় ঠিক করে নিয়ো।

নীরবালা।— গান

জ্বলে নি আলো অন্ধকারে,
দাও না সাড়া কি তাই বারে বারে।
তোমার বাঁশি আমার বাজে বুকে
কঠিন দুখে, গভীর সুখে—
যে জানে না পথ কাঁদাও তারে।

চেয়ে রই রাতের আকাশ-পানে,
মন যে কী চায় তা মনই জানে!
আশা জাগে কেন অকারণে
আমার মনে ক্ষণে ক্ষণে—
ব্যথার টানে তোমায় আনবে দ্বারে।

নেপথ্যে। অবলাকান্তবাবু আছেন?

বিপিন ঘরে প্রবিষ্ট ও সচকিত হইয়া দণ্ডায়মান

নীরবালা মুহূর্ত হতবুদ্ধি হইয়া দ্রুতবেগে বহিষ্ক্রান্ত

শৈলবালা। আসুন বিপিনবাবু।

বিপিন। ঠিক করে বলুন, আসব কি। আমি আসার দরুন আপনাদের কোনোরকম লোকসান নেই?

রসিক। ঘর থেকে কিছু লোকসান না করলে লাভ হয় না বিপিনবাবু, ব্যাবসার এই রকম নিয়ম। যা গেল তা আবার দুনো হয়ে ফিরে আসতে পারে, কী বল অবলাকান্ত।

শৈলবালা। রসিকদাদার রসিকতা আজকাল একটু শক্ত হয়ে আসছে।

রসিক। গুড় জমে যেরকম শক্ত হয়ে আসে। কিন্তু, বিপিনবাবু কী ভাবছেন বলুন দেখি।

বিপিন। ভাবছি কী ছুতো করে বিদায় নিলে আমাকে বিদায় দিতে আপনাদের ভদ্রতায় বাধবে না।

শৈলবালা। বন্ধুত্বে যদি বাধে?

বিপিন। তা হলে ছুতো খোঁজবার কোনো দরকারই হয় না।

শৈলবালা। তবে সেই খোঁজটা পরিত্যাগ করুন, ভালো হয়ে বসুন।

রসিক। মুখখানা প্রসন্ন করুন বিপিনবাবু। আমাদের প্রতি ঈর্ষা করবেন না। আমি তো বৃদ্ধ, যুবকের ঈর্ষার যোগ্যই নই। আর, আমাদের সুকুমারমূর্তি অবলাকান্তবাবুকে কোনো স্ত্রীলোক পুরুষ বলে জ্ঞানই করে না। আপনাকে দেখে যদি কোনো সুন্দরী কিশোরী ত্রস্তহরিণীর মতো পলায়ন করে থাকেন তা হলে মনকে এই বলে সান্ত্বনা দেবেন যে, তিনি আপনাকে পুরুষ বলেই মস্ত খাতিরটা করেছেন। হায় রে হতভাগ্য রসিক, তোকে দেখে কোনো তরুণী লজ্জাতে পলায়নও করে না।

বিপিন। রসিকবাবু আপনাকেও যে দলে টানছেন অবলাকান্তবাবু। এ কিরকম হল।

শৈলবালা। কী জানি বিপিনবাবু, আমার এই অবলাকান্ত নামটাই মিথ্যে—কোনো অবলা তো এ পর্যন্ত আমাকে কান্ত বলে বরণ করে নি।

বিপিন। হতাশ হবেন না, এখনও সময় আছে।

শৈলবালা। সে আশা এবং সে সময় যদি থাকত তা হলে চিরকুমার-সভায় নাম লেখাতে যেতুম না।

বিপিন। (স্বগত) এঁর মনের মধ্যে একটা কী বেদনা রয়েছে, নইলে এত অল্প বয়সে এই কাঁচামুখে এমন স্নিগ্ধ কোমল করুণ ভাব থাকত না। এটা কিসের খাতা। গান লেখা দেখছি। 'নীরবালা দেবী'। (পাঠ)

শৈলবালা। কী পড়ছেন বিপিনবাবু।

বিপিন। কোনো একটি অপরিচিতার কাছে অপরাধ করছি, হয়তো তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবার সুযোগ পাব না এবং হয়তো তাঁর কাছে শাস্তি পাবারও সৌভাগ্য হবে না, কিন্তু এই গানগুলি মানিক এবং হাতের অক্ষরগুলি মুক্তো। যদি লোভে পড়ে চুরি করি তবে দণ্ডদাতা বিধাতা ক্ষমা করবেন।

শৈলবালা। বিধাতা মাপ করতে পারেন, কিন্তু আমি করব না। ও খাতাটির 'পরে আমার লোভ আছে বিপিনবাবু।

রসিক। আর, আমি বুঝি লোভ মোহ সমস্ত জয় করে বসে আছি? আহা, হাতের অক্ষরের মতো জিনিস আর আছে? মনের ভাব মূর্তি ধ'রে আঙুলের আগা দিয়ে বেরিয়ে আসে— অক্ষরগুলির উপর চোখ বুলিয়ে গেলে হৃদয়টি যেন চোখে এসে লাগে। অবলাকান্ত, এ খাতাখানি ছেড়ো না ভাই। তোমাদের চঞ্চলা নীরবালা দেবী কৌতুকের ঝরনার মতো দিনরাত ঝরে পড়ছে, তাকে তো ধরে রাখতে পার না, এই খাতাখানির পত্রপুটে তারই একটি গণ্ডূষ ভরে উঠেছে— এ জিনিসের দাম আছে। বিপিনবাবু, আপনি তো নীরবালাকে জানেন না, আপনি এ খাতাখানা নিয়ে কী করবেন।

বিপিন। আপনারা তো স্বয়ং তাঁকেই জানেন, খাতাখানিতে আপনাদের প্রয়োজন কী। এই খাতা থেকে আমি যেটুকু পরিচয় প্রত্যাশা করি তার প্রতি আপনারা দৃষ্টি দেন কেন।

শ্রীশের প্রবেশ

শ্রীশ। মনে পড়েছে মশায়। সেদিন এখানে একটা বইয়েতে নাম দেখেছিলেম, নৃপবালা, নীরবালা— এ কী, বিপিন যে! তুমি এখানে হঠাৎ?

বিপিন। তোমার সম্বন্ধেও ঠিক ওই প্রশ্নটা প্রয়োগ করা যেতে পারে।

শ্রীশ। আমি এসেছিলুম আমার সেই সন্ন্যাসীসম্প্রদায়ের কথাটা অবলাকান্তবাবুর সঙ্গে আলোচনা করতে। ওঁর যেরকম চেহারা, কণ্ঠস্বর, মুখের ভাব, উনি ঠিক আমার সন্ন্যাসীর আদর্শ হতে পারেন। উনি যদি ওঁর ওই চন্দ্রকলার মতো কপালটিতে চন্দন দিয়ে, গলায় মালা প'রে, হাতে একটি বীণা নিয়ে, সকালবেলায় একটি পল্লীর মধ্যে প্রবেশ করেন তা হলে কোন্‌ গৃহস্থের হৃদয় না গলাতে পারেন।

রসিক। বুঝতে পারছি নে মশায়, হৃদয় গলাবার কি খুব জরুরি দরকার হয়েছে।

শ্রীশ। চিরকুমার-সভা হৃদয় গলাবার সভা।

রসিক। বলেন কী। তবে আমার দ্বারা কী কাজ পাবেন।

শ্রীশ। আপনার মধ্যে যেরূপ উত্তাপ আছে আপনি উত্তরমেরুতে গেলে সেখানকার বরফ গলিয়ে বন্যা করে দিয়ে আসতে পারেন।— বিপিন, উঠছ নাকি।

বিপিন। যাই, আমাকে রাত্রে একটু পড়তে হবে।

রসিক। (জনান্তিকে) অবলাকান্ত জিজ্ঞাসা করছেন, পড়া হয়ে গেলে বইখানা কি ফেরত পাওয়া যাবে।

বিপিন। (জনান্তিকে) পড়া হয়ে গেলে সে আলোচনা পরে হবে, আজ থাক্‌।

শৈলবালা। (মৃদুস্বরে) শ্রীশবাবু ইতস্তত করছেন কেন, আপনার কিছু হারিয়েছে নাকি।

শ্রীশ। (মৃদুস্বরে) আজ থাক্‌, আর একদিন খুঁজে দেখব।

[শ্রীশ ও বিপিনের প্রস্থান

নীরবালা। (দ্রুত প্রবেশ করিয়া) এ কী রকমের ডাকাতি দিদি। আমার গানের খাতাখানা নিয়ে গেল! আমার ভয়ানক রাগ হচ্ছে।

রসিক। রাগ শব্দে নানা অর্থ অভিধানে কয়।

নীরবালা। আচ্ছা পণ্ডিতমশায়, তোমার অভিধান জাহির করতে হবে না— আমার খাতা ফিরিয়ে আনো।

রসিক। পুলিসে খবর দে ভাই, চোর ধরা আমার ব্যাবসা নয়।

নীরবালা। কেন দিদি, তুমি আমার খাতা নিয়ে যেতে দিলে।

শৈলবালা। এমন অমূল্য ধন তুই ফেলে রেখে যাস কেন।

নীরবালা। আমি বুঝি ইচ্ছে করে ফেলে রেখে গেছি।

রসিক। লোকে সেইরকম সন্দেহ করছে।

নীরবালা। না রসিকদাদা, তোমার ও ঠাট্টা আমার ভালো লাগে না।

রসিক। তা হলে ভয়ানক খারাপ অবস্থা। [নীরবালার সক্রোধে প্রস্থান

সলজ্জ নৃপবালার প্রবেশ

রসিক। কী নৃপ, হারাধন খুঁজে বেড়াচ্ছিস?

নৃপবালা। না, আমার কিছু হারায় নি।

রসিক। সে তো অতি সুখের সংবাদ। শৈলদিদি, তা হলে আর কেন, রুমালখানার মালিক যখন পাওয়া যাচ্ছে না তখন যে লোক কুড়িয়ে পেয়েছে তাকেই ফিরিয়ে দিস। (শৈলর হাত হইতে রুমাল লইয়া) এ জিনিসটা কার ভাই।

নৃপবালা। ও আমার নয়। [পলায়নোদ্যত

রসিক। (নৃপকে ধরিয়া) যে জিনিসটা খোওয়া গেছে নৃপ তার উপরে কোনো দাবিও রাখতে চায় না।

নৃপবালা। রসিকদাদা, ছাড়ো, আমার কাজ আছে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

গোলদিঘির পথ

শ্রীশ ও বিপিন

শ্রীশ। ওহে বিপিন, আজ মাঘের শেষে প্রথম বসন্তের বাতাস দিয়েছে, জ্যোৎস্নাও দিব্যি, আজ যদি এখনই ঘুমোতে কিম্বা পড়া মুখস্থ করতে যাওয়া যায় তা হলে দেবতারা ধিক্‌কার দেবেন।

বিপিন। তাঁদের ধিক্‌কার খুব সহজে সহ্য হয়, কিন্তু ব্যামোর ধাক্কা কিম্বা—

শ্রীশ। দেখো, ওইজন্যে তোমার সঙ্গে আমার ঝগড়া হয়। আমি বেশ জানি দক্ষিনে হাওয়ায় তোমারও প্রাণটা চঞ্চল হয়, কিন্তু পাছে কেউ তোমাকে কবিত্বের অপবাদ দেয় ব'লে মলয়-সমীরণটাকে একেবারেই আমল দিতে চাও না। এতে তোমার বাহাদুরিটা কী জিজ্ঞাসা করি। আমি তোমার কাছে আজ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করছি, আমার ফুল ভালো লাগে, জ্যোৎস্না ভালো লাগে—

বিপিন। এবং—

শ্রীশ। এবং যা-কিছু ভালো লাগবার মতো জিনিস সবই ভালো লাগে।

বিপিন। বিধাতা তো তোমাকে ভারী আশ্চর্য রকম ছাঁচে গড়েছেন দেখছি।

শ্রীশ। তোমার ছাঁচ আরও আশ্চর্য। তোমার লাগে ভালো, কিন্তু বল অন্যরকম— আমার সেই শোবার ঘরের ঘড়িটার মতো— সে চলে ঠিক, বাজে ভুল।

বিপিন। কিন্তু শ্রীশ, তোমার যদি সব মনোরম জিনিসই মনোহর লাগতে লাগল তা হলে তো আসন্ন বিপদ।

শ্রীশ। আমি তো কিছুই বিপদ বোধ করি নে।

বিপিন। সেই লক্ষণটাই তো সব চেয়ে খারাপ। রোগের যখন বেদনাবোধ চলে যায় তখন আর চিকিৎসার রাস্তা থাকে না। আমি ভাই, স্পষ্টই কবুল করছি, স্ত্রীজাতির একটা আকর্ষণ আছে— চিরকুমার-সভা যদি সেই আকর্ষণ এড়াতে চান তা হলে তাঁকে খুব তফাত দিয়ে যেতে হবে।

শ্রীশ। ভুল, ভুল, ভয়ানক ভুল। তুমি তফাতে থাকলে কী হবে, তাঁরা তো তফাতে থাকেন না। সংসাররক্ষার জন্যে বিধাতাকে এত নারী সৃষ্টি করতে হয়েছে যে তাঁদের এড়িয়ে চলা অসম্ভব। অতএব কৌমার্য যদি রক্ষা করতে চাও তা হলে নারীজাতিকে অল্পে অল্পে সইয়ে নিতে হবে। ওই-যে স্ত্রীসভ্য নেবার নিয়ম হয়েছে, এতদিন পরে কুমারসভা চিরস্থায়ী হবার উপায় অবলম্বন করেছে। কিন্তু, কেবল একটিমাত্র মহিলা হলে চলবে না বিপিন, অনেকগুলি স্ত্রীসভ্য চাই। বদ্ধ ঘরের একটি জানলা খুলে ঠাণ্ডা লাগালে সর্দি ধরে, খোলা হাওয়ায় থাকলে সে বিপদ নেই।

বিপিন। আমি তোমার ওই খোলা-হাওয়া বদ্ধ-হাওয়া বুঝি নে ভাই। যার সর্দির ধাত তাকে সর্দি থেকে রক্ষা করতে দেবতা মনুষ্য কেউ পারে না।

শ্রীশ। তোমার ধাত কী বলছে হে।

বিপিন। সে কথা খোলসা করে বললেই বুঝতে পারবে তোমার ধাতের সঙ্গে তার চমৎকার মিল আছে। নাড়িটা যে সব সময়ে ঠিক চিরকুমারের নাড়ির মতো চলে তা জাঁক করে বলতে পারব না।

শ্রীশ। ওইটে তোমার আর-একটা ভুল। চিরকুমারের নাড়ির উপরে উনপঞ্চাশ পবনের নৃত্য হতে দাও— কোনো ভয় নেই, বাঁধাবাঁধি চাপাচাপি কোরো না। আমাদের মতো ব্রত যাদের তারা কি হৃদয়টিকে তুলো দিয়ে মুড়ে রাখতে পারে। তাকে অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়ার মতো ছেড়ে দাও, যে তাকে বাঁধবে তার সঙ্গে লড়াই করো।

বিপিন। ও কে হে। পূর্ণ দেখছি। ও বেচারার এ গলি থেকে আর বেরোবার জো নেই। ওই বীরপুরুষের অশ্বমেধের ঘোড়াটি বেজায় খোঁড়াচ্ছে। ওকে একবার ডাক দেব?

শ্রীশ। ডাকো। ও কিন্তু আমাদেরই দুজনকে অন্বেষণ করে গলিতে গলিতে ঘুরছে বলে বোধ হচ্ছে না।

বিপিন। পূর্ণবাবু, খবর কী।

পূর্ণর প্রবেশ

পূর্ণ। অত্যন্ত পুরোনো। কাল-পরশু যে খবর চলছিল আজও তাই চলছে।

শ্রীশ। কাল-পরশু শীতের হাওয়া বচ্ছিল, আজ বসন্তের হাওয়া দিয়েছে— এতে দুটো-একটা নতুন খবরের আশা করা যেতে পারে।

পূর্ণ। দক্ষিণের হাওয়ায় যে-সব খবরের সৃষ্টি হয় কুমারসভার খবরের কাগজে তার স্থান নেই। তপোবনে একদিন অকালে বসন্তের হাওয়া দিয়েছিল, তাই নিয়ে কালিদাসের কুমারসম্ভব কাব্য রচনা হয়েছে— আমাদের কপালগুণে বসন্তের হাওয়ায় কুমার-অসম্ভব কাব্য হয়ে দাঁড়ায়।

বিপিন। হয় তো হোক-না পূর্ণবাবু— সে কাব্যে যে দেবতা দগ্ধ হয়েছিলেন এ কাব্যে তাঁকে পুনর্জীবন দেওয়া যাক।

পূর্ণ। এ কাব্যে চিরকুমার-সভা দগ্ধ হোক। যে দেবতা জ্বলেছিলেন তিনি জ্বালান। না, আমি ঠাট্টা করছি নে শ্রীশবাবু, আমাদের চিরকুমার-সভাটি একটি আস্ত জতুগৃহ-বিশেষ। আগুন লাগলে রক্ষে নেই। তার চেয়ে বিবাহিত সভা স্থাপন করো, স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে নিরাপদ থাকবে। যে ইঁট পাঁজায় পুড়েছে তা দিয়ে ঘর তৈরি করলে আর পোড়বার ভয় থাকে না হে।

শ্রীশ। যে-সে লোক বিবাহ ক'রে বিবাহ জিনিসটা মাটি হয়ে গেছে পূর্ণবাবু। সেই জন্যেই তো কুমারসভা। আমার যতদিন প্রাণ আছে ততদিন এ সভায় প্রজাপতির প্রবেশ নিষেধ।

বিপিন। পঞ্চশর?

শ্রীশ। আসুন তিনি। একবার তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়ে গেলে, বাস্‌, আর ভয় নেই।

পূর্ণ। দেখো শ্রীশবাবু—

শ্রীশ। দেখব আর কী। তাঁকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। এক চোট দীর্ঘনিশ্বাস ফেলব, কবিতা আওড়াব, কনকবলয়ভ্রংসরিক্তপ্রকোষ্ঠ হয়ে যাব, তবে রীতিমতো সন্ন্যাসী হতে পারব। আমাদের কবি লিখেছেন—

নিশি না পোহাতে জীবনপ্রদীপ
জ্বালাইয়া যাও প্রিয়া,
তোমার অনল দিয়া।
কবে যাবে তুমি সমুখের পথে
দীপ্ত শিখাটি বাহি
আছি তাই পথ চাহি।

পুড়িবে বলিয়া রয়েছে আশায়
আমার নীরব হিয়া
আপন আঁধার নিয়া।
নিশি না পোহাতে জীবনপ্রদীপ
জ্বালাইয়া যাও প্রিয়া।

পূর্ণ। ওহে শ্রীশবাবু, তোমার কবিটি তো মন্দ লেখে নি—

নিশি না পোহাতে জীবনপ্রদীপ
জ্বালাইয়া যাও প্রিয়া।

ঘরটি সাজানো রয়েছে— থালায় মালা, পালঙ্কে পুষ্পশয্যা, কেবল জীবনপ্রদীপটি জ্বলছে না, সন্ধ্যা ক্রমে রাত্রি হতে চলল। বাঃ, দিব্যি লিখেছে। কোন্ বইটাতে আছে বলো দেখি।

শ্রীশ। বইটার নাম 'আবাহন'।

পূর্ণ। নামটাও বেছে বেছে দিয়েছে ভালো। (আপন মনে)—

নিশি না পোহাতে জীবনপ্রদীপ
জ্বালাইয়া যাও প্রিয়া। (দীর্ঘনিশ্বাস)

তোমরা কি বাড়ির দিকে চলেছ।

শ্রীশ। বাড়ি কোন্ দিকে ভুলে গেছি ভাই।

পূর্ণ। আজ পথ ভোলবার মতোই রাতটা হয়েছে বটে। কী বল বিপিনবাবু।

শ্রীশ। বিপিনবাবু এ-সকল বিষয়ে কোনো কথাই কন না, পাছে ওঁর ভিতরকার কবিত্ব ধরা পড়ে। কৃপণ যে জিনিসটার বেশি আদর করে সেইটেকেই মাটির নীচে পুঁতে রাখে।

বিপিন। অস্থানে বাজে খরচ করতে চাই নে ভাই, স্থান খুঁজে বেড়াচ্ছি। মরতে হলে একেবারে গঙ্গার ঘাটে গিয়ে মরাই ভালো।

পূর্ণ। এ তো উত্তম কথা, শাস্ত্রসংগত কথা। বিপিনবাবু একেবারে অন্তিম কালের জন্যে কবিত্ব সঞ্চয় করে রাখছেন, যখন অন্যে বাক্য কবেন কিন্তু উনি রবেন নিরুত্তর। আশীর্বাদ করি অন্যের সেই বাক্যগুলি যেন মধুমাখা হয়—

শ্রীশ। এবং তার সঙ্গে যেন কিঞ্চিৎ ঝালের সম্পর্কও থাকে—

বিপিন। এবং বাক্যবর্ষণ করেই যেন মুখের সমস্ত কর্তব্য নিঃশেষ না হয়—

পূর্ণ। বাক্যের বিরামস্থলগুলি যেন বাক্যের চেয়ে মধুমত্তর হয়ে ওঠে—

শ্রীশ। সেদিন নিদ্রা যেন না আসে—

পূর্ণ। রাত্রি যেন না যায়—

বিপিন। চন্দ্র যেন পূর্ণচন্দ্র হয়—

পূর্ণ। বিপিন যেন বসন্তের ফুলে প্রফুল্ল হয়ে ওঠে—

শ্রীশ। এবং হতভাগ্য শ্রীশ যেন কুঞ্জদ্বারের কাছে এসে উঁকিঝুঁকি না মারে।

পূর্ণ। দূর হোক গে শ্রীশবাবু, তোমার সেই 'আবাহন' থেকে আর-একটা কিছু কবিতা আওড়াও। চমৎকার লিখেছে হে—

নিশি না পোহাতে জীবনপ্রদীপ
জ্বালাইয়া যাও প্রিয়া।

আহা! একটি জীবনপ্রদীপের শিখাটুকু আর-একটি জীবনপ্রদীপের মুখের কাছে কেবল একটু ঠেকিয়ে গেলেই হয়, বাস্, আর কিছুই নয়— দুটি কোমল অঙ্গুলি দিয়ে দীপখানি একটু হেলিয়ে একটু ছুঁইয়ে যাওয়া, তার পরেই চকিতের মধ্যে সমস্ত আলোকিত। (আপন মনে)—

নিশি না পোহাতে জীবনপ্রদীপ
জ্বালাইয়া যাও প্রিয়া।

শ্রীশ। পূর্ণবাবু, যাও কোথায়।

পূর্ণ। চন্দ্রবাবুর বাসায় একখানা বই ফেলে এসেছি, সেইটে খুঁজতে যাচ্ছি।

বিপিন। খুঁজলে পাবে তো? চন্দ্রবাবুর বাসা বড়ো এলোমেলো জায়গা— সেখানে যা হারায় সে আর পাওয়া যায় না। [পূর্ণের প্রস্থান

শ্রীশ। (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) পূর্ণ বেশ আছে ভাই বিপিন।

বিপিন। ভিতরকার বাষ্পের চাপে ওর মাথাটা সোডাওআটারের ছিপির মতো একেবারে টপ্ করে উড়ে না যায়।

শ্রীশ। যায় তো যাক-না। কোনোমতে লোহার তার এঁটে মাথাটাকে ঠিক জায়গায় ধরে রাখাই কি জীবনের চরম পুরুষার্থ। মাঝে মাঝে মাথার বেঠিক না হলে রাত দিন মুটের বোঝার মতো মাথাটাকে বয়ে বেড়াচ্ছি কেন। দাও ভাই, তার কেটে, একবার উড়ুক। সেদিন তোমাকে শোনাচ্ছিলুম—

ওরে সাবধানী পথিক, বারেক
পথ ভুলে মর্ ফিরে।
খোলা আঁখি দুটো অন্ধ করে দে
আকুল আঁখির নীরে।
সে ভোলা পথের প্রান্তে রয়েছে
হারানো হিয়ার কুঞ্জ—

ঝরে পড়ে আছে কাঁটাতরু-তলে
রক্তকুসুমপুঞ্জ,
সেথা দুই বেলা ভাঙা-গড়া খেলা
অকূলসিন্ধুতীরে।
ওরে সাবধানী পথিক, বারেক
পথ ভুলে মর্‌ ফিরে।

বিপিন। আজকাল তুমি খুব কবিতা পড়তে আরম্ভ করেছ, শীঘ্রই একটা মুশকিলে পড়বে দেখছি।

শ্রীশ। যে লোক ইচ্ছে করে মুশকিলের রাস্তা খুঁজে বেড়াচ্ছে তার জন্যে কেউ ভেবো না। মুশকিলকে এড়িয়ে চলতে গিয়ে হঠাৎ মুশকিলের মধ্যে পা ফেললেই বিপদ। আসুন আসুন রসিকবাবু, রাত্রে পথে বেরিয়েছেন যে!

রসিকের প্রবেশ

রসিক। আমার রাতই বা কী, আর দিনই বা কী—

বরমসৌ দিবসো ন পুনর্নিশা
ননু নিশৈব বরং ন পুনর্দিনম্‌।
উভয়মেতদুপৈত্বথবা ক্ষয়ং
প্রিয়জনেন ন যত্র সমাগমঃ।

শ্রীশ। অন্বার্থঃ?

রসিক। অন্বার্থ হচ্ছে—

আসে তো আসুক রাতি, আসুক বা দিবা,
যায় যদি যাক নিরবধি।
তাহাদের যাতায়াতে আসে যায় কিবা
প্রিয় মোর নাহি আসে যদি।

অনেকগুলো দিন রাত এ-পর্যন্ত এসেছে এবং গেছে, কিন্তু তিনি আজ পর্যন্ত এসে পৌঁছলেন না— তাই, দিনই বলুন আর রাতই বলুন, ও দুটোর 'পরে আমার আর কিছু-মাত্র শ্রদ্ধা নেই।

শ্রীশ। আচ্ছা রসিকবাবু, প্রিয়জন এখনই যদি হঠাৎ এসে পড়েন।

রসিক। তা হলে আমার দিকে তাকাবেন না, তোমাদের দুজনের মধ্যে একজনের ভাগেই পড়বেন।

শ্রীশ। তা হলে তদ্দণ্ডেই তিনি অরসিক বলে প্রমাণ হয়ে যাবেন।

রসিক। এবং পরদণ্ডেই পরমানন্দে কালযাপন করতে থাকবেন। তা, আমি ঈর্ষা করতে চাই নে শ্রীশবাবু। আমার ভাগ্যে যিনি আসতে বহু বিলম্ব করলেন আমি তাঁকে তোমাদের উদ্দেশেই উৎসর্গ করলুম। দেবী, তোমার বরমাল্য গেঁথে আনো। আজ বসন্তের শুক্লরজনী, আজ অভিসারে এসো।—

মন্দং নিধেহি চরণৌ পরিধেহি নীলং
বাসঃ পিধেহি বলয়াবলিমঞ্চলেন।
মা জল্প সাহসিনি শারদচন্দ্রকান্ত-
দন্তাংশবস্তব তমাংসি সমাপয়ন্তি।

ধীরে ধীরে চলো তন্বী, পরো নীলাম্বর,
অঞ্চলে বাঁধিয়া রাখো কঙ্কণ মুখর।
কথাটি কোয়ো না, তব দন্ত-অংশু-রুচি
পথের তিমিররাশি পাছে ফেলে মুছি।

শ্রীশ। রসিকবাবু, আপনার ঝুলি যে একেবারে ভরা। এমন কত তর্জমা করে রেখেছেন।

রসিক। বিস্তর। লক্ষ্মী তো এলেন না, কেবল বাণীকে নিয়েই দিন যাপন করছি।

শ্রীশ। ওহে বিপিন, অভিসার-ব্যাপারটা কল্পনা করতে বেশ লাগে।

বিপিন। ওটা পুনর্বার চালাবার জন্যে চিরকুমার-সভায় একটা প্রস্তাব এনে দেখো-না।

শ্রীশ। কতকগুলো জিনিস আছে যার আইডিয়াটা এত সুন্দর যে সংসারে সেটা চালাতে সাহস হয় না। যে রাস্তায় অভিসার হতে পারে, যেখানে কামিনীদের হার থেকে মুক্তো ছিঁড়ে ছড়িয়ে পড়ে, সে রাস্তা কি তোমার পটলডাঙা স্ট্রীট। সে রাস্তা জগতে কোথাও নেই। বিরহিণীর হৃদয় নীলাম্বরী পরে মনোরাজ্যের পথে ওই রকম করে বেরিয়ে থাকে— বক্ষের উপর থেকে মুক্তো ছিঁড়ে পড়ে, চেয়েও দেখে না— সত্যিকার মুক্তো হলে কুড়িয়ে নিত। কী বলেন রসিকবাবু।

রসিক। সে কথা মানতেই হয়— অভিসারটা মনে মনেই ভালো, গাড়িঘোড়ার রাস্তায় অত্যন্ত বেমানান। আশীর্বাদ করি শ্রীশবাবু, এই রকম বসন্তের জ্যোৎস্নারাত্রে কোনো-একটি জানলা থেকে কোনো-এক রমণীর ব্যাকুল হৃদয় তোমার বাসার দিকে যেন অভিসারে যাত্রা করে।

শ্রীশ। তা করবে রসিকবাবু, আপনার আশীর্বাদ ফলবে। আজকের হাওয়াতে

সেই খবরটা আমি মনে মনে পাচ্ছি। বিশে ডাকাত যেমন খবর দিয়ে ডাকাতি করত আমার অজানা অভিসারিকা তেমনি পূর্বে হতেই আমাকে অভিসারের খবর পাঠিয়েছে।

বিপিন। তোমার সেই ছাতের বারান্দাটা সাজিয়ে প্রস্তুত হয়ে থেকো।

শ্রীশ। তা, আমার সেই দক্ষিণের বারান্দায় একটি চৌকিতে আমি বসি, আর-একটি চৌকি সাজানো থাকে।

বিপিন। সেটাতে আমি এসে বসি।

শ্রীশ। মধ্বভাবে গুড়ং দদ্যাৎ, অভাবপক্ষে তোমাকে নিয়ে চলে।

বিপিন। মধুময়ী যখন আসবেন তখন হতভাগার ভাগ্যে লগুড়ং দদ্যাৎ।

রসিক। (জনান্তিকে) শ্রীশবাবু, আপনার সেই দক্ষিণের ছাতটিকে চিহ্নিত করে রাখবার জন্যে যে পতাকা ওড়ানো আবশ্যক সেটা যে ফেলে এলেন।

শ্রীশ। রুমালটা কি এখন চেষ্টা করলে পাওয়া যেতে পারবে?

রসিক। চেষ্টা করতে দোষ কী।

শ্রীশ। বিপিন, তুমি ভাই রসিকবাবুর সঙ্গে একটু কথাবার্তা কও, আমি চট্ করে আসছি। [প্রস্থান

বিপিন। আচ্ছা রসিকবাবু, রাগ করবেন না—

রসিক। যদি বা করি আপনার ভয় করবার কোনো কারণ নেই, আমি ভারী দুর্বল।

বিপিন। দু-একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করব, আপনি বিরক্ত হবেন না।

রসিক। আমার বয়স সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন নয় তো?

বিপিন। না।

রসিক। তবে জিজ্ঞাসা করুন, ঠিক উত্তর পাবেন।

বিপিন। সেদিন যে মহিলাটিকে দেখলুম, তিনি—

রসিক। তিনি আলোচনার যোগ্য, আপনি সংকোচ করবেন না বিপিনবাবু— তাঁর সম্বন্ধে যদি আপনি মাঝে মাঝে চিন্তা ও চর্চা করে থাকেন তবে তাতে আপনার অসাধারণত্ব প্রমাণ হয় না, আমরাও ঠিক ওই কাজ করে থাকি।

বিপিন। অবলাকান্তবাবু বুঝি—

রসিক। তাঁর কথা বলবেন না, তাঁর মুখে অন্য কথা নেই।

বিপিন। তিনি কি—

রসিক। হাঁ, তাই বটে। তবে হয়েছে কী, তিনি নৃপবালা নীরবালা দুজনের কাকে যে বেশি ভালোবাসেন স্থির করে উঠতে পারেন না— তিনি দুজনের মধ্যে সর্বদাই দোলায়মান।

বিপিন। কিন্তু, তাঁদের কেউ কি ওঁর প্রতি—

রসিক। না, এমন ভাব নয় যে ওঁকে বিবাহ করতে পারেন। সে হলে তো কোনো গোলই ছিল না।

বিপিন। তাই বুঝি অবলাকান্তবাবু কিছু—

রসিক। কিছু যেন চিন্তান্বিত।

বিপিন। শ্রীমতী নীরবালা বুঝি গান ভালোবাসেন ?

রসিক। বাসেন বটে, আপনার পকেটের মধ্যেই তো তার সাক্ষী আছে।

বিপিন। (পকেট হইতে গানের খাতা বাহির করিয়া) এখানা নিয়ে আসা আমার অত্যন্ত অভদ্রতা হয়েছে—

রসিক। সে অভদ্রতা আপনি না করলে আমরা কেউ-না-কেউ করতেম।

বিপিন। আপনারা করলে তিনি মার্জনা করতেন, কিন্তু আমি— বাস্তবিক অন্যায় হয়েছে, কিন্তু এখন ফিরিয়ে দিলেও তো—

রসিক। মূল অন্যায়টা অন্যায়ই থেকে যায়।

বিপিন। অতএব—

রসিক। যাঁহাতক বাহান্ন তাঁহাতক তিপ্পান্ন। হরণে যে দোষটুকু হয়েছে রক্ষণে নাহয় তাতে আর-একটু যোগ হল।

বিপিন। খাতাটা সম্বন্ধে তিনি কি আপনাদের কাছে কিছু বলেছেন।

রসিক। বলেছেন অল্পই, কিন্তু না বলেছেন অনেকটা।

বিপিন। কিরকম।

রসিক। লজ্জায় অনেকখানি লাল হয়ে উঠলেন।

বিপিন। ছি ছি, সে লজ্জা আমারই।

রসিক। আপনার লজ্জা তিনি ভাগ করে নিলেন, যেমন অরুণের লজ্জায় উষা রক্তিম।

বিপিন। আমাকে আর পাগল করবেন না রসিকবাবু।

রসিক। দলে টানছি মশায়।

বিপিন। (খাতা পুনর্বার পকেটে পুরিয়া) ইংরেজিতে বলে, দোষ করা মানবের ধর্ম, ক্ষমা করা দেবতার।

রসিক। আপনি তা হলে মানবধর্ম-পালনটাই সাব্যস্ত করলেন।

বিপিন। দেবীর ধর্মে যা বলে তিনি তাই করবেন।

শ্রীশের প্রবেশ

শ্রীশ। অবলাকান্তবাবুর সঙ্গে দেখা হল না।

বিপিন। তুমি রাতারাতিই তাঁকে সন্ন্যাসী করতে চাও নাকি।

শ্রীশ। যা হোক, অক্ষয়বাবুর কাছে বিদায় নিয়ে এলুম।

বিপিন। বটে বটে, তাঁকে বলে আসতে ভুলে গিয়েছিলেম— একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করে আসি গে।

রসিক। (জনান্তিকে) পুনর্বার কিছু সংগ্রহের চেষ্টায় আছেন বুঝি ? মানবধর্মটা ক্রমেই আপনাকে চেপে ধরছে। [বিপিনের প্রস্থান

শ্রীশ। রসিকবাবু, আপনার কাছে আমার একটা পরামর্শ আছে।

রসিক। পরামর্শ দেবার উপযুক্ত বয়স হয়েছে, বুদ্ধি না হতেও পারে।

শ্রীশ। আপনাদের ওখানে সেদিন যে দুটি মহিলাকে দেখেছিলেম তাঁদের দুজনকেই আমার সুন্দরী বলে বোধ হল।

রসিক। আপনার বোধশক্তির দোষ দেওয়া যায় না। সকলেই তো ওই এক কথাই বলে।

শ্রীশ। তাঁদের সম্বন্ধে যদি মাঝে মাঝে আপনার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করি তা হলে কি—

রসিক। তা হলে আমি খুশি হব, আপনারও সেটা ভালো লাগতে পারে, এবং তাঁদেরও বিশেষ ক্ষতি হবে না।

শ্রীশ। কিছুমাত্র না। ঝিল্লি যদি নক্ষত্র সম্বন্ধে জল্পনা করে—

রসিক। তাতে নক্ষত্রের নিদ্রার ব্যাঘাত হয় না।

শ্রীশ। ঝিল্লিরই অনিদ্রারোগ জন্মাতে পারে। কিন্তু তাতে আমার আপত্তি নেই।

রসিক। আজ তো তাই বোধ হচ্ছে।

শ্রীশ। যাঁর রুমাল কুড়িয়ে পেয়েছিলুম তাঁর নামটি বলতে হবে।

রসিক। তাঁর নাম নৃপবালা।

শ্রীশ। তিনি কোন্‌টি।

রসিক। আপনিই আন্দাজ করে বলুন দেখি।

শ্রীশ। যাঁর সেই লাল রঙের রেশমের শাড়ি পরা ছিল ?

রসিক। বলে যান।

শ্রীশ। যিনি লজ্জায় পালাতে চাচ্ছিলেন, অথচ পালাতেও লজ্জা বোধ করছিলেন— তাই মুহূর্তকালের জন্য হঠাৎ ত্রস্ত হরিণীর মতো থমকে দাঁড়িয়েছিলেন, সামনের দুই-এক

গুচ্ছ চুল প্রায় চোখের উপরে এসে পড়েছিল — চাবির-গোচ্ছা-বাঁধা চ্যুত অঞ্চলটি বাঁ হাতে তুলে ধরে যখন দ্রুতবেগে চলে গেলেন তখন তাঁর পিঠ-ভরা কালো চুল আমার দৃষ্টিপথের উপর দিয়ে একটি কালো জ্যোতিষ্কের মতো ছুটে নৃত্য করে চলে গেল।

রসিক। এ তো নৃপবালাই বটে। পা দুখানি লজ্জিত, হাত দুখানি কুণ্ঠিত, চোখ দুটি ত্রস্ত, চুলগুলি কুঞ্চিত, দুঃখের বিষয় হৃদয়টি দেখতে পান নি— সে যেন ফুলের ভিতরকার লুকোনো মধুটুকুর মতো মধুর, শিশিরটুকুর মতো করুণ।

শ্রীশ। রসিকবাবু, আপনার মধ্যে এত যে কবিত্বরস সঞ্চিত হয়ে রয়েছে তার উৎস কোথায় এবার টের পেয়েছি।

রসিক। ধরা পড়েছি শ্রীশবাবু—

কবীন্দ্রাণাং চেতঃ কমলবনমালাতপরুচিং
ভজন্তে যে সন্তঃ কতিচিদরুণামেব ভবতীং।
বিরিঞ্চিপ্রেয়স্যাস্তরুণতরশৃঙ্গারলহরীং
গভীরাভির্বাগ্‌ভির্বিদধতি সভারঞ্জনময়ীং।

কবীন্দ্রদের চিত্তকমলবনমালার কিরণলেখা যে তুমি, তোমাকে যারা লেশমাত্র ভজনা করে তারাই গভীর বাক্য দ্বারা সরস্বতীর সভারঞ্জনময়ী তরুণলীলালহরী প্রকাশ করতে পারে। আমি সেই কবিচিত্তকমলবনের কিরণলেখাটির পরিচয় পেয়েছি।

শ্রীশ। আমিও অল্প দিন হল একটু পরিচয় পেয়েছি, তার পর থেকে কবিত্ব আমার পক্ষে সহজ হয়ে এসেছে।

অক্ষয়ের প্রবেশ

অক্ষয়। (স্বগত) নাঃ, দুটি নবযুবকে মিলে আমাকে আর ঘরে তিষ্ঠতে দিলে না দেখছি। একটি তো গিয়ে চোরের মতো আমার ঘরের মধ্যে হাৎড়ে বেড়াচ্ছিলেন— ধরা পড়ে ভালোরকম জবাবদিহি করতে পারলে না, শেষকালে আমাকে নিয়ে পড়ল। তার খানিক বাদেই দেখি দ্বিতীয় ব্যক্তিটি গিয়ে ঘরের বইগুলি নিয়ে উল্টেপাল্টে নিরীক্ষণ করছে। তফাত থেকে দেখেই পালিয়ে এসেছি। বেশ মনের মতো করে চিঠিখানি যে লিখব এরা তা আর দিলে না।— আহা, চমৎকার জ্যোৎস্না হয়েছে।

শ্রীশ। এই-যে অক্ষয়বাবু।

অক্ষয়। ওই রে। একটা ডাকাত ঘরের মধ্যে, আর একটা ডাকাত পথের ধারে। হা প্রিয়ে, তোমার ধ্যান থেকে যারা আমার মনকে বিক্ষিপ্ত করছে তারা মেনকা উর্বশী রম্ভা হলে আমার কোনো খেদ ছিল না— মনের মতো ধ্যানভঙ্গও অক্ষয়ের অদৃষ্টে নেই, কলিকালে ইন্দ্রদেবের বয়স বেশি হয়ে বেরসিক হয়ে উঠেছে।

বিপিনের প্রবেশ

বিপিন। এই-যে অক্ষয়বাবু, আপনাকেই খুঁজছিলুম।

অক্ষয়। হায় হতভাগ্য, এমন রাত্রি কি আমাকে খোঁজ করে বেড়াবার জন্যই হয়েছিল।— In such a night as this,

When the sweet wind did gently kiss the trees
And they did make no noise, in such a night
Troilus methinks mounted the Trojan walls
And sighed his soul toward the Grecian tents,
Where Cressid lay that night

শ্রীশ। in such a night আপনি কী করতে বেরিয়েছেন অক্ষয়বাবু।

রসিক।— অপসরতি ন চক্ষুষো মৃগাক্ষী
রজনিরিয়ং চ ন যাতি নৈতি নিদ্রা।

চক্ষু-'পরে মৃগাক্ষীর চিত্রখানি ভাসে—
রজনীও নাহি যায়, নিদ্রাও না আসে।

অক্ষয়বাবুর অবস্থা আমি জানি মশায়।

অক্ষয়। তুমি কে হে।

রসিক। আমি রসিকচন্দ্র— দুই দিকে দুই যুবককে আশ্রয় করে যৌবনসাগরে ভাসমান।

অক্ষয়। এ বয়সে যৌবন সহ্য হবে না রসিকদাদা।

রসিক। যৌবনটা কোন্ বয়সে যে সহ্য হয় তা তো জানি নে, ওটা অসহ্য ব্যাপার। শ্রীশবাবু, আপনার কিরকম বোধ হচ্ছে।

শ্রীশ। এখনও সম্পূর্ণ বোধ করতে পারি নি।

রসিক। আমার মতো পরিণত বয়সের জন্যে অপেক্ষা করছেন বুঝি?— অক্ষয়দা, আজ তোমাকে বড়ো অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে।

অক্ষয়। তুমি তো অন্যমনস্ক দেখবেই, মনটা ঠিক তোমার দিকে নেই।— বিপিনবাবু, তুমি আমাকে খুঁজছিলে বললে বটে, কিন্তু খুব যে জরুরি দরকার আছে ব'লে বোধ হচ্ছে না, অতএব আমি এখন বিদায় হই— একটু বিশেষ কাজ আছে। [প্রস্থান

রসিক। বিরহী চিঠি লিখতে চলল।

শ্রীশ। অক্ষয়বাবু আছেন বেশ। রসিকবাবু, ওঁর স্ত্রীই বুঝি বড়ো বোন তাঁর নাম?

রসিক। পুরবালা।

বিপিন। (নিকটে আসিয়া) কী নাম বললেন।

রসিক। পুরবালা।

বিপিন। তিনিই বুঝি সব চেয়ে বড়ো?

রসিক। হাঁ।

বিপিন। সব-ছোটোটির নাম?

রসিক। নীরবালা।

শ্রীশ। আর নৃপবালা কোন্‌টি।

রসিক। তিনি নীরবালার বড়ো।

শ্রীশ। তা হলে নৃপবালাই হলেন মেজো।

বিপিন। আর নীরবালা ছোটো।

শ্রীশ। পুরবালার ছোটো নৃপবালা।

বিপিন। তাঁর ছোটো হচ্ছেন নীরবালা।

রসিক। (স্বগত) এরা তো নাম জপ করতে শুরু করলে। আমার মুশকিল। আর তো হিম সহ্য হবে না, পালাবার উপায় করা যাক।

বনমালীর প্রবেশ

বনমালী। এই-যে আপনারা এখানে। আমি আপনাদের বাড়ি গিয়েছিলুম।

শ্রীশ। এইবার আপনি এখানে থাকুন, আমরা বাড়ি যাই।

বনমালী। আপনারা সর্বদাই ব্যস্ত দেখতে পাই।

বিপিন। তা, আপনাকে দেখলে একটু বিশেষ ব্যস্ত হয়েই পড়ি।

বনমালী। পাঁচ মিনিট যদি দাঁড়ান—

শ্রীশ। রসিকবাবু, একটু ঠাণ্ডা বোধ হচ্ছে না?

রসিক। আপনাদের এত ক্ষণে বোধ হল, আমার অনেক ক্ষণ থেকেই বোধ হচ্ছে।

বনমালী। চলুন-না, ঘরেই চলুন-না।

শ্রীশ। মশায়, এত রাত্রে যদি আমার ঘরে ঢোকেন তা হলে কিন্তু—

বনমালী। যে আজ্ঞে, আপনারা কিছু ব্যস্ত আছেন দেখছি, তা হলে আর-এক সময় হবে।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

অক্ষয়ের বাসা

রসিক ও শৈলবালা

রসিক। ভাই শৈল।

শৈলবালা। কী রসিকদাদা।

রসিক। একি আমার কাজ। মহাদেবের তপোভঙ্গের জন্যে স্বয়ং কন্দর্পদেব ছিলেন আর আমি বৃদ্ধ—

শৈলবালা। তুমি তো বৃদ্ধ, তেমনি যুবক দুটিও তো যুগল মহাদেব নন।

রসিক। তা নন, সে আমি বেশ ঠাওর করেই দেখেছি। সেইজন্যেই তো নির্ভয়ে এসেছিলুম। কিন্তু, তাদের সঙ্গে রাস্তার মধ্যে হিমে দাঁড়িয়ে অর্ধেক রাত পর্যন্ত রসালাপ করবার মতো উত্তাপ আমার শরীরে তো নেই।

শৈলবালা। তাঁদের সংসর্গে উত্তাপ সঞ্চয় করে নেবে।

রসিক। সজীব গাছ যে সূর্যের তাপে প্রফুল্ল হয়ে ওঠে মরা কাঠ তাতেই ফেটে যায়, যৌবনের উত্তাপ বুড়ো মানুষের পক্ষে ঠিক উপযোগী বোধ হয় না।

শৈলবালা। কই, তোমাকে দেখে ফেটে যাবে বলে তো বোধ হচ্ছে না।

রসিক। হৃদয়টা দেখলে বুঝতে পারতিস ভাই।

শৈলবালা। কী বল রসিকদা। তোমারই তো এখন সব চেয়ে নিরাপদ বয়েস। যৌবনের দাহে তোমার কী করবে।

রসিক। শুষ্কেন্ধনে বহ্নিরুপৈতি বৃদ্ধিম্। যৌবনের দাহ বৃদ্ধকে পেলেই হুহুঃশব্দে জলে ওঠে— সেইজন্যেই তো 'বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা' বিপত্তির কারণ। কী আর বলব ভাই।

নীরবালার প্রবেশ

রসিক। আগচ্ছ বরদে দেবি। কিন্তু, বর তুমি আমাকে দেবে কি না জানি নে, আমি তোমাকে একটি বর দেবার জন্যে প্রাণপাত করে মরছি। শিব তো কিছুই করছেন না, তবু তোমাদের পুজো পাচ্ছেন; আর এই-যে বুড়ো খেটে মরছে এ কি কিছুই পাবে না।

নীরবালা। শিব পান ফুল, তুমি পাবে তার ফল— তোমাকেই বরমাল্য দেব রসিকদাদা।

রসিক। মাটির দেবতাকে নৈবেদ্য দেবার সুবিধা এই যে, সেটি সম্পূর্ণ ফিরে পাওয়া যায়— আমাকেও নির্ভয়ে বরমাল্য দিতে পারিস, যখনই দরকার হবে তখনই ফিরে পাবি। তার চেয়ে ভাই, আমাকে একটা গলাবন্ধ বুনে দিস, বরমাল্যের চেয়ে সেটা বুড়ো মানুষের কাজে লাগবে।

নীরবালা। তা দেব— একজোড়া পশমের জুতো বুনে রেখেছি সেও শ্রীচরণেষু হবে।

রসিক। আহা, কৃতজ্ঞতা একেই বলে। কিন্তু নীরু, আমার পক্ষে গলাবন্ধই যথেষ্ট— আপাদমস্তক নাই হল, সেজন্যে উপযুক্ত লোক পাওয়া যাবে, জুতোটা তাঁরই জন্যে রেখে দে।

নীরবালা। আচ্ছা, তোমার বক্তৃতাও তুমি রেখে দাও।

রসিক। দেখেছিস ভাই শৈল, আজকাল নীরুরও লজ্জা দেখা দিয়েছে— লক্ষণ খারাপ।

শৈলবালা। নীরু, তুই করছিস কী। আবার এ ঘরে এসেছিস ? আজ যে এখানে আমাদের সভা বসবে— এখনই কে এসে পড়বে, বিপদে পড়বি।

রসিক। সেই বিপদের স্বাদ ও একবার পেয়েছে, এখন বারবার বিপদে পড়বার জন্যে ছট্‌ফট্‌ করে বেড়াচ্ছে।

নীরবালা। দেখো রসিকদাদা, তুমি যদি আমাকে বিরক্ত কর তা হলে গলাবন্ধ পাবে না বলছি। দেখো দেখি দিদি, তুমিও যদি রসিকদার কথায় ওই রকম করে হাস, তা হলে ওঁর আস্পর্ধা আরও বেড়ে যাবে।

রসিক। দেখেছিস ভাই শৈল, নীরু আজকাল ঠাট্টাও সইতে পারছে না, মন এত দুর্বল হয়ে পড়েছে।—নীরুদিদি, কোনো কোনো সময় কোকিলের ডাক শ্রুতিকটু বলে ঠেকে এইরকম শাস্ত্রে আছে। তোর রসিকদাদার ঠাট্টাকেও কি তোর আজকাল কুহুতান বলে ভ্রম হতে লাগল।

নীরবালা। সেইজন্যেই তো তোমার গলায় গলাবন্ধ জড়িয়ে দিতে চাচ্ছি— তানটা যদি একটু কমে।

শৈলবালা। নীরু, আর ঝগড়া করিস নে— আয়, এখনই সবাই এসে পড়বে।

[নীর ও শৈলের প্রস্থান

পূর্ণর প্রবেশ

রসিক। আসুন পূর্ণবাবু।

পূর্ণ। এখনও আর কেউ আসেন নি?

রসিক। আপনি বুঝি কেবল এই বৃদ্ধটিকে দেখে হতাশ হয়ে পড়েছেন? আরও সকলে আসবেন পূর্ণবাবু।

পূর্ণ। হতাশ কেন হব রসিকবাবু।

রসিক। তা কেমন করে বলব বলুন। কিন্তু ঘরে যেই ঢুকলেন আপনার দুটি চক্ষু দেখে বোধ হল তারা যাকে ভিক্ষা করে বেড়াচ্ছে সে ব্যক্তি আমি নই।

পূর্ণ। চক্ষুতত্ত্বে আপনার এত দূর অধিকার হল কী করে।

রসিক। আমার পানে কেউ কোনোদিন তাকায় নি পূর্ণবাবু, তাই এই প্রাচীন বয়স পর্যন্ত পরের চক্ষু পর্যবেক্ষণের যথেষ্ট অবসর পেয়েছি। আপনাদের মতো শুভাদৃষ্ট হলে দৃষ্টিতত্ত্ব লাভ না করে অনেক দৃষ্টিলাভ করতে পারতুম। কিন্তু, যাই বলুন পূর্ণবাবু, চোখ দুটির মতো এমন আশ্চর্য সৃষ্টি আর-কিছু হয় নি— শরীরের মধ্যে মন যদি কোথাও প্রত্যক্ষ বাস করে সে ওই চোখের উপরে।

পূর্ণ। (সোৎসাহে) ঠিক বলেছেন রসিকবাবু। ক্ষুদ্র শরীরের মধ্যে যদি কোথাও অনন্ত আকাশ কিম্বা অনন্ত সমুদ্রের তুলনা থাকে সে ওই দুটি চোখে।

রসিক।— নিঃসীমশোভাসৌভাগ্যং নতাঙ্গ্যা নয়নদ্বয়ং
অন্যোঽন্যালোকনানন্দবিরহাদিব চঞ্চলং। —বুঝেছেন পূর্ণবাবু?

পূর্ণ। না, কিন্তু বোঝবার ইচ্ছা আছে।

রসিক।— আনতাঙ্গী বালিকার শোভাসৌভাগ্যের সার
নয়নযুগল
না দেখিয়ে পরস্পরে তাই কি বিরহভরে
হয়েছে চঞ্চল।

পূর্ণ। না রসিকবাবু, ও ঠিক হল না। ও কেবল বাক্‌চাতুরী। দুটো চোখ পরস্পরকে দেখতে চায় না।

রসিক। অন্য দুটো চোখকে দেখতে চায় তো? সেই রকম অর্থ করেই নিন-না। শেষ দুটো ছত্র বদলে দেওয়া যাক—

প্রিয়চক্ষু-দেখাদেখি যে আনন্দ তাই সে কি
খুঁজিছে চঞ্চল।

পূর্ণ। চমৎকার হয়েছে রসিকবাবু।—

প্রিয়চক্ষু-দেখাদেখি যে আনন্দ তাই সে কি
খুঁজিছে চঞ্চল।

অথচ সে বেচারা বন্দী— খাঁচার পাখির মতো কেবল এ পাশে ও পাশে ছট্‌ফট্‌ করে— প্রিয়চক্ষু যেখানে সেখানে পাখা মেলে উড়ে যেতে পারে না।

রসিক। আবার দেখাদেখির ব্যাপারখানাও যে কিরকম নিদারুণ তাও শাস্ত্রে লিখছে— হত্বা লোচনবিশিখৈর্গত্বা কতিচিৎ পদানি পদ্মাক্ষী

জীবতি যুবা ন বা কিং ভূয়ো ভূয়ো বিলোকয়তি।

বিঁধিয়া দিয়া আঁখিবাণে
যায় সে চলি গৃহপানে,
জনমে অনুশোচনা—
বাঁচিল কি না দেখিবারে
চায় সে ফিরে বারে বারে
কমলবরলোচনা।

পূর্ণ। রসিকবাবু, বারে বারে ফিরে চায় কেবল কাব্যে।

রসিক। তার কারণ, কাব্যে ফিরে চাবার কোনো অসুবিধে নেই। সংসারটা যদি ওই রকম ছন্দে তৈরি হত তা হলে এখানেও ফিরে ফিরে চাইত পূর্ণবাবু এখানে মন ফিরে চায়, চক্ষু ফেরে না।

পূর্ণ। (সনিশ্বাসে) বড়ো বিশ্রী জায়গা রসিকবাবু।— কিন্তু, ওটা আপনি বেশ বলেছেন— প্রিয়চক্ষু-দেখাদেখি যে আনন্দ তাই সে কি

খুঁজিছে চঞ্চল।

রসিক। আহা পূর্ণবাবু, নয়নের কথা যদি উঠল, ও আর শেষ করতে ইচ্ছা করে না—

লোচনে হরিণগর্বমোচনে
মা বিদূষয় নতাঙ্গি কজ্জলৈঃ।
সায়কঃ সপদি জীবহারকঃ
কিং পুনর্হি গরলেন লেপিতঃ।

হরিণগর্বমোচন লোচনে
কাজল দিয়ো না, সরলে।
এমনি তো বাণ নাশ করে প্রাণ
কী কাজ লেপিয়া গরলে।

পূর্ণ। থামুন রসিকবাবু। ওই বুঝি কারা আসছেন।

চন্দ্রবাবু ও নির্মলার প্রবেশ

চন্দ্র। এই-যে অক্ষয়বাবু।

রসিক। আমার সঙ্গে অক্ষয়বাবুর সাদৃশ্য আছে শুনলে তিনি এবং তাঁর আত্মীয়গণ বিমর্ষ হবেন। আমি রসিক।

চন্দ্র। মাপ করবেন রসিকবাবু, হঠাৎ ভ্রম হয়েছিল।

রসিক। মাপ করবার কী কারণ ঘটেছে মশায়। আমাকে অক্ষয়বাবু ভ্রম করে কিছুমাত্র অসম্মান করেন নি। মাপ তাঁর কাছে চাইবেন।— পূর্ণবাবুতে আমাতে এতক্ষণ বিজ্ঞানচর্চা করছিলুম চন্দ্রবাবু।

চন্দ্র। আমাদের কুমারসভায় আমরা মাসে একদিন করে বিজ্ঞান-আলোচনার জন্যে স্থির করব মনে করছিলুম। আজ কী বিষয় নিয়ে আলোচনা চলছিল পূর্ণবাবু।

পূর্ণ। না, সে কিছুই না চন্দ্রবাবু।

রসিক। চোখের দৃষ্টি সম্বন্ধে দু-চার কথা বলাবলি করা যাচ্ছিল।

চন্দ্র। দৃষ্টির রহস্য ভারী শক্ত রসিকবাবু।

রসিক। শক্ত বৈকি। পূর্ণবাবুরও সেই মত।

চন্দ্র। সমস্ত জিনিসের ছায়াই আমাদের দৃষ্টিপটে উল্টো হয়ে পড়ে, সেইটেকে যে কেমন করে আমরা সোজাভাবে দেখি সে সম্বন্ধে কোনো মতই আমার সন্তোষজনক বলে বোধ হয় না।

রসিক। সন্তোষজনক হবে কেমন করে। সোজা দেখা, বাঁকা দেখা, এই-সমস্ত নিয়ে মানুষের মাথা ঘুরে যায়। বিষয়টা বড়ো সংকটময়।

চন্দ্র। নির্মলার সঙ্গে রসিকবাবুর পরিচয় হয় নি। ইনিই আমাদের কুমারসভার প্রথম স্ত্রীসভ্য।

রসিক। (নমস্কার করিয়া) ইনি আমাদের সভার সভালক্ষ্মী। আপনাদের কল্যাণে আমাদের সভায় বুদ্ধিবিদ্যার অভাব ছিল না, ইনি আমাদের শ্রী দান করতে এসেছেন।

চন্দ্র। কেবল শ্রী নয়, শক্তি।

রসিক। একই কথা চন্দ্রবাবু। শক্তি যখন শ্রীরূপে আবির্ভূতা হন তখনই তাঁর শক্তির সীমা থাকে না। কী বলেন পূর্ণবাবু।

পুরুষবেশী শৈলবালার প্রবেশ

শৈলবালা। মাপ করবেন চন্দ্রবাবু, আমার কি আসতে দেরি হয়েছে।

চন্দ্র। (ঘড়ি দেখিয়া) না, এখনও সময় হয় নি। অবলাকান্তবাবু, আমার ভাগ্নী নির্মলা আজ আমাদের সভার সভ্য হয়েছেন।

শৈলবালা। (নির্মলার নিকট বসিয়া) দেখুন, পুরুষেরা স্বার্থপর, মেয়েদের কেবল নিজেদের সেবার জন্যেই বিশেষ করে বদ্ধ করে রাখতে চায়। চন্দ্রবাবু যে আপনাকে আমাদের সভার হিতের জন্যে দান করেছেন তাতে তাঁর মহত্ত্ব প্রকাশ পায়।

নির্মলা। আমার মামার কাছে দেশের কাজ এবং নিজের কাজ একই। আমি যদি আপনাদের সভার কোনো উপকার করতে পারি তাতে তাঁরই সেবা হবে।

শৈলবালা। আপনি যে সৌভাগ্যক্রমে চন্দ্রবাবুকে ভালো করে জানবার যোগ্যতা লাভ করেছেন এতে আপনি ধন্য।

নির্মলা। আমি ওঁকে জানব না তো কে জানবে।

শৈলবালা। আত্মীয় সব সময় আত্মীয়কে জানে না। আত্মীয়তায় ছোটোকে বড়ো করে তোলে বটে, তেমনি বড়োকেও ছোটো করে আনে। চন্দ্রবাবুকে যে আপনি যথার্থভাবে জেনেছেন তাতে আপনার ক্ষমতা প্রকাশ পায়।

নির্মলা। কিন্তু, আমার মামাকে যথার্থভাবে জানা খুব সহজ, ওঁর মধ্যে এমন একটি স্বচ্ছতা আছে!

শৈলবালা। দেখুন, সেইজন্যেই তো ওঁকে ঠিকমতো জানা শক্ত। দুর্যোধন স্ফটিকের দেয়ালকে দেয়াল বলে দেখতেই পান নি। সরল স্বচ্ছতার মহত্ত্ব কি সকলে বুঝতে পারে। তাকে অবহেলা করে। আড়ম্বরেই লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়।

নির্মলা। আপনি ঠিক কথা বলেছেন। বাইরের লোকে আমার মামাকে কেউ চেনেই না। বাইরের লোকের মধ্যে এত দিন পরে আপনার কাছে মামার কথা শুনে আমার যে কী আনন্দ হচ্ছে সে কী বলব।

শৈলবালা। আপনার ভক্তিও আমাকে ঠিক সেইরকম আনন্দ দিচ্ছে।

চন্দ্র। (উভয়ের নিকটে আসিয়া) অবলাকান্তবাবু, তোমাকে যে বইটি দিয়েছিলেম সেটা পড়েছ?

শৈলবালা। পড়েছি এবং তার থেকে সমস্ত নোট করে আপনার ব্যবহারের জন্যে প্রস্তুত করে রেখেছি।

চন্দ্র। আমার ভারী উপকার হবে, আমি বড়ো খুশি হলুম অবলাকান্তবাবু। পূর্ণ নিজে আমার কাছে ওই বইটি চেয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু, ওঁর শরীর ভালো ছিল না বলে কিছুই করে উঠতে পারেন নি। খাতাটি তোমার কাছে আছে?

শৈলবালা। এনে দিচ্ছি। [প্রস্থান

রসিক। পূর্ণবাবু, আপনাকে কেমন ম্লান দেখছি, অসুখ করেছে কি।

পূর্ণ। না, কিছুই না। রসিকবাবু, যিনি গেলেন এঁরই নাম অবলাকান্ত?

রসিক। হাঁ।

পূর্ণ। আমার কাছে ওঁর ব্যবহারটা তেমন ভালো ঠেকছে না।

রসিক। অল্পবয়স কিনা সেইজন্যে—

পূর্ণ। মহিলাদের সঙ্গে কিরকম আচরণ করা উচিত সে শিক্ষা ওঁর বিশেষ দরকার।

রসিক। আমিও সেটা লক্ষ্য করে দেখেছি। মেয়েদের সঙ্গে উনি ঠিক পুরুষোচিত ব্যবহার করতে জানেন না— কেমন যেন গায়ে-পড়া ভাব। ওটা হয়তো অল্প বয়সের ধর্ম।

পূর্ণ। আমাদেরও তো বয়স খুব প্রাচীন হয় নি, কিন্তু আমরা তো—

রসিক। তা তো দেখছি, আপনি খুব দূরে দূরেই থাকেন— কিন্তু উনি হয়তো সেটাকে ঠিক ভদ্রতা বলেই গ্রহণ করেন না। ওঁর হয়তো ভ্রম হচ্ছে আপনি ওঁকে অগ্রাহ্য করেন।

পূর্ণ। বলেন কী রসিকবাবু। কী করব বলুন তো। আমি তো ভেবেই পাই নে, কী কথা বলবার জন্যে আমি ওঁর কাছে অগ্রসর হতে পারি।

রসিক। ভাবতে গেলে ভেবে পাবেন না। না ভেবে অগ্রসর হবেন, তার পরে কথা আপনি বেরিয়ে যাবে।

পূর্ণ। না রসিকবাবু, আমার একটা কথাও বেরোয় না। কী বলব আপনিই বলুন-না।

রসিক। এমন কোনো কথাই বলবেন না যাতে জগতে যুগান্তর উপস্থিত হবে। গিয়ে বলুন, আজকাল হঠাৎ কিরকম গরম পড়েছে।

পূর্ণ। তিনি যদি বলেন 'হাঁ গরম পড়েছে' তার পরে কী বলব।

বিপিন ও শ্রীশের প্রবেশ

শ্রীশ। (চন্দ্রবাবুকে ও নির্মলাকে নমস্কার করিয়া, নির্মলার প্রতি) আপনাদের উৎসাহ ঘড়ির চেয়ে এগিয়ে চলছে। এই দেখুন, এখনও সাড়ে ছটা বাজে নি।

নির্মলা। আজ আপনাদের সভায় আমার প্রথম দিন, সেইজন্যে সভা বসবার পূর্বেই এসেছি— প্রথম সভ্য হবার সংকোচ ভাঙতে একটু সময় দরকার।

বিপিন। কিন্তু, আপনার কাছে নিবেদন এই যে, আমাদের কিছুমাত্র সংকোচ করে চলবেন না। আজ থেকে আপনি আমাদের ভার নিলেন; লক্ষ্মীছাড়া পুরুষ সভ্যগুলিকে অনুগ্রহ করে দেখবেন শুনবেন এবং হুকুম করে চালাবেন।

রসিক। যান পূর্ণবাবু, আপনিও একটা কথা বলুন গে।

পূর্ণ। কী বলব।

নির্মলা। চালাবার ক্ষমতা আমার নেই।

শ্রীশ। আপনি কি আমাদের এতই অচল বলে মনে করেন।

বিপিন। লোহার চেয়ে অচল আর কী আছে। কিন্তু, আগুন তো লোহাকে চালাচ্ছে— আমাদের মতো ভারী জিনিসগুলোকে চলনসই করে তুলতে আপনাদের মতো দীপ্তির দরকার।

রসিক। শুনছেন তো পূর্ণবাবু?

পূর্ণ। আমি কী বলব বলুন-না।

রসিক। বলুন, লোহাকে চালাতে চাইলেও আগুন চাই, গলাতে চাইলেও আগুন চাই।

বিপিন। কী পূর্ণবাবু, রসিকবাবুর সঙ্গে পরিচয় হয়েছে?

পূর্ণ। হাঁ।

বিপিন। আপনার শরীর আজ ভালো আছে তো?

পূর্ণ। হাঁ।

বিপিন। অনেক ক্ষণ এসেছেন নাকি।

পূর্ণ। না।

বিপিন। দেখেছেন এবারে শীতটা ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ার মতো সজোরে দৌড়ে মাঘের মাঝামাঝি একেবারে খপ্ করে থেমে গেল।

পূর্ণ। হাঁ।

শ্রীশ। এই-যে পূর্ণবাবু, গেল বারে আপনার শরীর খারাপ ছিল, এবারে বেশ ভালো বোধ হচ্ছে তো?

পূর্ণ। হাঁ।

শ্রীশ। এতদিন কুমারসভার যে কী একটা মহৎ অভাব ছিল আজ ঘরের মধ্যে ঢুকেই তা বুঝতে পেরেছি, সোনার মুকুটের মাঝখানটিতে কেবল একটি হীরে বসাবার অপেক্ষা ছিল— আজ সেইটি বসানো হয়েছে। কী বলেন পূর্ণবাবু।

পূর্ণ। আপনাদের মতো এমন রচনাশক্তি আমার নেই— আমি এত বানিয়ে বানিয়ে কথা বাঁটতে পারি নে, বিশেষত মহিলাদের সম্বন্ধে।

শ্রীশ। আপনার অক্ষমতার কথা শুনে দুঃখিত হলেম পূর্ণবাবু, আশা করি ক্রমে উন্নতি লাভ করতে পারবেন।

বিপিন। (রসিককে জনান্তিকে টানিয়া) দুই বীরপুরুষে যুদ্ধ চলুক, এখন আসুন রসিকবাবু, আপনার সঙ্গে দুই-একটা কথা আছে। দেখুন, সেই খাতা সম্বন্ধে আর কোনো কথা উঠেছিল ?

রসিক। অপরাধ করা মানবের ধর্ম আর ক্ষমা করা দেবীর— সে কথাটা আমি প্রসঙ্গ-ক্রমে তুলেছিলেম—

বিপিন। তাতে কী বললেন।

রসিক। কিছু না ব'লে বিদ্যুতের মতো চলে গেলেন।

বিপিন। চলে গেলেন !

রসিক। কিন্তু, সে বিদ্যুতে বজ্র ছিল না।

বিপিন। গর্জন ?

রসিক। তাও ছিল না।

বিপিন। তবে ?

রসিক। এক প্রান্তে কিম্বা অন্য প্রান্তে একটু হয়তো বর্ষণের আভাস ছিল।

বিপিন। সেটুকুর অর্থ ?

রসিক। কী জানি মশায়। অর্থও থাকতে পারে, অনর্থও থাকতে পারে।

বিপিন। রসিকবাবু, আপনি কী বলেন আমি কিছু বুঝতে পারি নে।

রসিক। কী করে বুঝবেন— ভারী শক্ত কথা।

শ্রীশ। (নিকটে আসিয়া) কী কথা শক্ত মশায়।

রসিক। এই বৃষ্টি-বজ্র-বিদ্যুতের কথা।

শ্রীশ। ওহে বিপিন, তার চেয়ে শক্ত কথা যদি শুনতে চাও তা হলে পূর্ণর কাছে যাও।

বিপিন। শক্ত কথা সম্বন্ধে আমার খুব বেশি শখ নেই ভাই।

শ্রীশ। যুদ্ধ করার চেয়ে সন্ধি করার বিদ্যেটা ঢের বেশি দুরূহ— সেটা তোমার আসে। দোহাই তোমার, পূর্ণকে একটু ঠাণ্ডা করে এসো গে। আমি বরঞ্চ ততক্ষণ রসিকবাবুর সঙ্গে বৃষ্টি-বজ্র-বিদ্যুতের আলোচনা করে নিই। [বিপিনের প্রস্থান

রসিকবাবু, ওই-যে সেদিন আপনি যাঁর নাম নৃপবালা বললেন তিনি—তিনি—তাঁর সম্বন্ধে বিস্তারিত করে কিছু বলুন। সেদিন চকিতের মধ্যে তাঁর মুখে এমন একটি স্নিগ্ধ-ভাব দেখেছি, তাঁর সম্বন্ধে কৌতূহল কিছুতেই থামাতে পারছি নে।

রসিক। বিস্তারিত করে বললে কৌতূহল আরও বেড়ে যাবে। এরকম কৌতূহল 'হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্ধতে'। আমি তো তাঁকে এতকাল ধরে জেনে আসছি,

কিন্তু সেই কোমল হৃদয়ের স্নিগ্ধ মধুর ভাবটি আমার কাছে 'ক্ষণে ক্ষণে তন্নবতামুপৈতি'।

শ্রীশ। আচ্ছা, তিনি— আমি সেই নৃপবালার কথা জিজ্ঞাসা করছি—

রসিক। সে আমি বেশ বুঝতেই পারছি।

শ্রীশ। তা, তিনি— কী আর প্রশ্ন করব। তাঁর সম্বন্ধে যা হয় কিছু বলুন-না— কাল কী বললেন, আজ সকালে কী করলেন, যত সামান্য হোক আপনি বলুন— আমি শুনি

রসিক। (শ্রীশের হাত ধরিয়া) বড়ো খুশি হলুম শ্রীশবাবু, আপনি যথার্থ ভাবুক বটেন— আপনি তাঁকে কেবল চকিতের মধ্যে দেখে এটুকু কী করে ধরতে পারলেন যে তাঁর সম্বন্ধে তুচ্ছ কিছুই নেই। তিনি যদি বলেন 'রসিকদা ওই কেরোসিনের বাতিটা একটুখানি উস্‌কে দাও' তো আমার মনে হয় যেন একটা নতুন কথা শুনলেম আদিকবির প্রথম অনুষ্টুপ ছন্দের মতো। কী বলব শ্রীশবাবু, আপনি শুনলে হয়তো হাসবেন, সেদিন ঘরে ঢুকে দেখি নৃপবালা ছুঁচের মুখে সুতো পরাচ্ছেন, কোলের উপর বালিশের ওয়াড় পড়ে রয়েছে— আমার মনে হল এক আশ্চর্য দৃশ্য। কতবার কত দর্জির দোকানের সামনে দিয়ে গেছি, কখনো মুখ তুলে দেখি নি, কিন্তু—

শ্রীশ। আচ্ছা রসিকবাবু, তিনি নিজের হাতে ঘরের সমস্ত কাজ করেন ?

শৈলবালার প্রবেশ

শৈলবালা। রসিকদার সঙ্গে কী পরামর্শ করছেন।

রসিক। কিছুই না, নিতান্ত সামান্য কথা নিয়ে আমাদের আলোচনা চলছে, যত দূর তুচ্ছ হতে পারে।

চন্দ্র। সভা অধিবেশনের সময় হয়েছে আর বিলম্ব করা উচিত হয় না। পূর্ণবাবু, কৃষিবিদ্যালয় সম্বন্ধে আজ তুমি যে প্রস্তাব উত্থাপন করবে বলেছিলে সেটা আরম্ভ করো।

পূর্ণ। (দণ্ডায়মান হইয়া ঘড়ির চেন নাড়িতে নাড়িতে) আজ— আজ— (কাশি)

রসিক। (পার্শ্বে বসিয়া মৃদুস্বরে) আজ এই সভা—

পূর্ণ। আজ এই সভা—

রসিক। যে নূতন সৌন্দর্য এবং গৌরব লাভ করিয়াছে—

পূর্ণ। যে নূতন সৌন্দর্য এবং গৌরব লাভ করিয়াছে—

রসিক। প্রথমে তাহারই জন্য অভিনন্দন প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না।

পূর্ণ। প্রথমে তাহারই জন্য অভিনন্দন প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না।

রসিক। (মৃদুস্বরে) বলে যান পূর্ণবাবু।

পূর্ণ। তাহারই জন্য অভিনন্দন প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না।

রসিক। ভয় কী পূর্ণবাবু, বলে যান।

পূর্ণ। যে নূতন সৌন্দর্য এবং গৌরব (কাশি)— যে নূতন সৌন্দর্য (পুনরায় কাশি) অভিনন্দন—

রসিক। (উঠিয়া) সভাপতিমশায়, আমার একটা নিবেদন আছে। আজ পূর্ণবাবু সকল সভ্যের পূর্বেই সভায় উপস্থিত হয়েছেন। উনি অত্যন্ত অসুস্থ, তথাপি উৎসাহ সম্বরণ করতে পারেন নি। আজ আমাদের সভায় প্রথম অরুণোদয়, তাই দেখবার জন্যে পাখি প্রত্যুষেই নীড় পরিত্যাগ করে বেরিয়েছে। কিন্তু দেহ রুগ্‌ণ, তাই পূর্ণহৃদয়ের আবেগ কণ্ঠে ব্যক্ত করবার শক্তি নেই, অতএব ওঁকে আজ আমাদের নিষ্কৃতি দান করতে হবে। এবং আজ নবপ্রভাতের যে অরুণচ্ছটার স্তবগান করতে উনি উঠেছিলেন তাঁর কাছেও এই অবরুদ্ধকণ্ঠ ভক্তের হয়ে আমি মার্জনা প্রার্থনা করি। পূর্ণবাবু, আজ বরঞ্চ আমাদের সভার কার্য বন্ধ থাকে সেও ভালো, তথাপি বর্তমান অবস্থায় আজ আপনাকে কোনো প্রস্তাব উত্থাপন করতে দিতে পারি নে। সভাপতিমশায় ক্ষমা করবেন এবং আমাদের সভাকে যিনি আপন প্রভা দ্বারা অদ্য সার্থকতা দান করতে এসেছেন ক্ষমা করা তাঁদের স্বজাতিসুলভ করুণ হৃদয়ের সহজ ধর্ম।

চন্দ্রবাবু। আমি জানি কিছুকাল থেকে পূর্ণবাবু ভালো নেই, এ অবস্থায় আমরা ওঁকে ক্লেশ দিতে পারি না। বিশেষত অবলাকান্তবাবু ঘরে বসে বসেই আমাদের সভার কাজ অনেক দূর অগ্রসর করে দিয়েছেন। এ-পর্যন্ত ভারতবর্ষীয় কৃষি সম্বন্ধে গবর্মেণ্ট্ থেকে যতগুলি রিপোর্ট্ বাহির হয়েছে সবগুলি আমি ওঁর কাছে দিয়েছিলেম, তার থেকে উনি জমিতে সার দেওয়া সম্বন্ধীয় অংশটুকু সংক্ষেপে সংকলন করে রেখেছেন— সেইটি অবলম্বন করে উনি সর্বসাধারণের সুবোধ্য বাংলা ভাষায় একটি পুস্তিকা প্রণয়ন করতেও প্রস্তুত হয়েছেন। ইনি যেরূপ উৎসাহ ও দক্ষতার সঙ্গে সভার কার্যে যোগদান করেছেন সেজন্য ওঁকে প্রচুর ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। বিপিনবাবু য়ুরোপীয় ছাত্রাগার-সকলের নিয়ম ও কার্যপ্রণালী -সংকলনের ভার নিয়েছিলেন। এবং শ্রীশবাবু স্বেচ্ছাকৃত দানের দ্বারা লণ্ডন নগরে কত বিচিত্র লোকহিতকর অনুষ্ঠান প্রবর্তিত হয়েছে তার তালিকা সংগ্রহ ও তৎসম্বন্ধে একটিপ্রবন্ধ-রচনায় প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন— বোধ হয় এখনও তা সমাধা করতে পারেন নি। আমি একটি পরীক্ষায় প্রবৃত্ত আছি— সকলেই জানেন আমাদের দেশের গোরুর গাড়ি এমন ভাবে নির্মিত যে তার পিছনে ভার পড়লেই

উঠে পড়ে এবং গোরুর গলায় ফাঁস লেগে যায়, আবার কোনো কারণে গোরু যদি পড়ে যায় তবে বোঝাই-সুদ্ধ গাড়ি তার ঘাড়ের উপর গিয়ে পড়ে— এরই প্রতিকার করবার জন্যে আমি উপায়-উদ্ভাবনে ব্যস্ত আছি, কৃতকার্য হব বলে আশা করি। আমরা মুখে গোজাতি সম্বন্ধে দয়া প্রকাশ করি, অথচ প্রত্যহ সেই গোরুর সহস্র অনাবশ্যক কষ্ট নিতান্ত উদাসীনভাবে নিরীক্ষণ করে থাকি— আমার কাছে এইরূপ মিথ্যা ও শূন্য ভাবুকতা অপেক্ষা লজ্জাকর ব্যাপার জগতে আর কিছুই নেই। আমাদের সভা থেকে যদি এর কোনো প্রতিকার করতে পারি তবে আমাদের সভা ধন্য হবে। আমি রাত্রে গাড়োয়ান-পল্লীতে গিয়ে গোরুর অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করেছি; গোরুর প্রতি অনর্থক অত্যাচার যে স্বার্থ ও ধর্ম উভয়ের বিরোধী হিন্দু গাড়োয়ানদের তা বোঝানো নিতান্ত কঠিন বলে বোধ হয় না। এ সম্বন্ধে আমি গাড়োয়ানদের মধ্যে একটা পঞ্চায়েত করবার চেষ্টায় আছি। শ্রীমতী নির্মলা আকস্মিক অপঘাতের আশু চিকিৎসা এবং রোগিচর্যা সম্বন্ধে রামরতন ডাক্তার-মহাশয়ের কাছ থেকে নিয়মিত উপদেশ লাভ করছেন— ভদ্রলোকদের মধ্যে সেই শিক্ষা ব্যাপ্ত করবার জন্যে তিনি দুই-একটি অন্তঃপুরে গিয়ে শিক্ষাদানে নিযুক্ত হয়েছেন। এইরূপে প্রত্যেক সভ্যের স্বতন্ত্র ও বিশেষ চেষ্টায় আমাদের এই ক্ষুদ্র কুমারসভা সাধারণের অজ্ঞাতসারে ক্রমশই বিচিত্র সফলতা লাভ করতে থাকবে এ বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই।

শ্রীশ। ওহে বিপিন, আমার কাজ তো আমি আরম্ভও করি নি।

বিপিন। আমারও ঠিক সেই অবস্থা।

শ্রীশ। কিন্তু, করতে হবে।

বিপিন। আমাকেও করতে হবে।

শ্রীশ। কিছুদিন অন্য সমস্ত আলোচনা ত্যাগ না করলে চলছে না।

বিপিন। আমিও তাই ভাবছি।

শ্রীশ। কিন্তু, অবলাকান্তবাবুকে ধন্য বলতে হবে— উনি যে কখন আপনার কাজটি করে যাচ্ছেন কিছু বোঝবার জো নেই।

বিপিন। তাই তো বড়ো আশ্চর্য। অথচ মনে হয় যেন ওঁর অন্যমনস্ক হবার বিশেষ কারণ আছে।

শ্রীশ। যাই, ওঁর সঙ্গে একবার আলোচনা করে আসি গে। [শৈলর নিকট গমন

পূর্ণ। রসিকবাবু, আপনাকে কী বলে ধন্যবাদ জানাব।

রসিক। কিছু বলবেন না, আমি এমনি বুঝে নেব। কিন্তু, সকলে আমার মতো নয় পূর্ণবাবু— আন্দাজে বুঝবে না, বলা-কওয়ার দরকার।

পূর্ণ। আপনি আমার অন্তরের কথা বুঝে নিয়েছেন রসিকবাবু— আপনাকে পেয়ে আমি বেঁচে গেছি। আমার যা কথা তা মুখে উচ্চারণ করতেও সংকোচ বোধ হয়। আপনি আমাকে পরামর্শ দিন কী করতে হবে।

রসিক। প্রথমে আপনি ওঁর কাছে গিয়ে যা হয় একটা কিছু কথা আরম্ভ করে দিন-না।

পূর্ণ। ওই দেখুন-না, অবলাকান্তবাবু আবার ওঁর কাছে গিয়ে বসেছেন—

রসিক। তা হোক-না,তিনি তো ওঁকে চারি দিকে ঘিরে দাঁড়ান নি। অবলাকান্তকে তো ব্যূহের মতো ভেদ করে যেতে হবে না। আপনিও এক পাশে গিয়ে দাঁড়ান-না।

পূর্ণ। আচ্ছা, আমি দেখি।

শৈলবালা। (নির্মলার প্রতি) আমাকে এত করে বলবেন না— আপনি আমার চেয়ে ঢের বেশি কাজ করছেন।— কিন্তু, বেচারা পূর্ণবাবুর জন্যে আমার বড়ো দুঃখ হয়। আপনি আসবেন বলেই উনি আজ বিশেষ উৎসাহ করে এসেছিলেন, অথচ সেটা ব্যক্ত করতে না পেরে উনি বোধ হয় অত্যন্ত বিমর্ষ হয়ে পড়েছেন। আপনি যদি ওঁকে—

নির্মলা। আপনাদের অন্যান্য সভ্যদের থেকে আমাকে একটু বিশেষভাবে পৃথক করে দেখছেন বলে আমি বড়ো সংকোচ বোধ করছি - আমাকে সভ্য বলে আপনাদের মধ্যে গণ্য করবেন, মহিলা বলে স্বতন্ত্র করবেন না।

শৈলবালা। আপনি যে মহিলা হয়ে জন্মেছেন সে সুবিধাটুকু আমাদের সভা ছাড়তে পারেন না। আপনি আমাদের সঙ্গে এক হয়ে গেলে যত কাজ হবে, আমাদের থেকে স্বতন্ত্র হলে তার চেয়ে বেশি কাজ হবে। যে লোক গুণের দ্বারা নৌকোকে অগ্রসর করে দেবে তাকে নৌকো থেকে কতকটা দূরে থাকতে হয়। চন্দ্রবাবু আমাদের নৌকোর হাল ধরে আছেন, তিনিও আমাদের থেকে কিছু দূরে এবং উচ্চে আছেন। আপনাকে গুণের দ্বারা আকর্ষণ করতে হবে, সুতরাং আপনাকে পৃথক থাকতে হবে। আমরা সব দাঁড়ির দলে বসে গেছি।

নির্মলা। আপনাকেও কর্মে এবং ভাবে এঁদের সকলের থেকে পৃথক বোধ হয়। একদিন মাত্র দেখেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস হচ্ছে, এ সভার মধ্যে আপনি আমার প্রধান সহায় হবেন।

শৈলবালা। সে তো আমার সৌভাগ্য। এই-যে আসুন পূর্ণবাবু। আমরা আপনার কথাই বলছিলেম। বসুন।

শ্রীশ। অবলাকান্তবাবু, আসুন, আপনার সঙ্গে অনেক কথা বলবার আছে। (জনান্তিকে লইয়া) আজ সভার পুরাতন সভ্য তিনটিকে আপনারা দুজনে লজ্জা দিয়েছেন। তা, ঠিক হয়েছে— পুরাতনের মধ্যে প্রাণসঞ্চার করবার জন্যেই নূতনের প্রয়োজন।

শৈলবালা। আবার নূতন চালা কাঠে আগুন জ্বালাবার জন্যে পুরাতন ধরা কাঠের দরকার।

শ্রীশ। আচ্ছা, সে বিচার পরে হবে। কিন্তু, আমার সেই রুমালটি? সেটি হরণ করে আমার পরকাল খুইয়েছি, আবার রুমালটিও খোওয়াতে পারি নে। (পকেট হইতে বাহির করিয়া) এই আমি এক ডজন রেশমের রুমাল এনেছি, এই বদল করে নিতে হবে। এ যে তার উচিত মূল্য তা বলতে পারি নে— তার উপযুক্ত মূল্য দিতে গেলে চীন জাপান উজাড় করে দিতে হয়।

শৈলবালা। মশায়, এ ছলনাটুকু বোঝবার মতো বুদ্ধি বিধাতা আমাকে দিয়েছেন। এ উপহার আমার জন্যে আসেও নি, যাঁর রুমাল হরণ করেছেন আমাকে উপলক্ষ্য করে এগুলি—

শ্রীশ। অবলাকান্তবাবু, ভগবান বুদ্ধি আপনাকে যথেষ্ট দিয়েছেন দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু দয়ার ভাগটা কিছু যেন কম বোধ হচ্ছে— হতভাগ্যকে রুমালটি ফিরিয়ে দিলেই সেই কলঙ্কটুকু একেবারে দূর হয়।

শৈলবালা। আচ্ছা, আমি দয়ার পরিচয় দিচ্ছি, কিন্তু আপনি সভার জন্য যে প্রবন্ধ লিখতে প্রতিশ্রুত সেটা লিখে দেওয়া চাই।

শ্রীশ। নিশ্চয় দেব— রুমালটা ফিরে দিলেই কাজে মন দিতে পারব, তখন অন্য সন্ধান ছেড়ে কেবল সত্যানুসন্ধান করতে থাকব।

ঘরের অন্যত্র

বিপিন। বুঝেছেন রসিকবাবু, আমি তাঁর গানের নির্বাচনচাতুরী দেখে আশ্চর্য হয়ে গেছি। গান যে তৈরি করেছে তার কবিত্ব থাকতে পারে, কিন্তু এই গানের নির্বাচনে যে কবিত্ব প্রকাশ পেয়েছে তার মধ্যে ভারী একটি সৌকুমার্য আছে।

রসিক। ঠিক বলেছেন, নির্বাচনের ক্ষমতাই ক্ষমতা। লতায় ফুল তো আপনি ফোটে, কিন্তু যে লোক মালা গাঁথে নৈপুণ্য এবং সুরুচি তো তারই।

বিপিন। আপনার ও গানটা মনে আছে?—

তরী আমার হঠাৎ ডুবে যায়
কোন্ পাথারে কোন্ পাষাণের ঘায়।

নবীন তরী নতুন চলে,
দিই নি পাড়ি অগাধ জলে,
বাহি তারে খেলার ছলে কিনার-কিনারায়।
তরী আমার হঠাৎ ডুবে যায়।
ভেসেছিল স্রোতের ভরে,
একা ছিলেম কর্ণ ধ'রে—
লেগেছিল পালের 'পরে মধুর মৃদু বায়।
সুখে ছিলেম আপন মনে,
মেঘ ছিল না গগনকোণে—
লাগবে তরী কুসুমবনে ছিলেম সে আশায়।
তরী আমার হঠাৎ ডুবে যায়।

রসিক। যাক ডুবে, কী বলেন বিপিনবাবু।

বিপিন। যাক গে, কিন্তু কোথায় ডুবল তার একটু ঠিকানা রাখা চাই। আচ্ছা রসিকবাবু, এ গানটা কেন তিনি খাতায় লিখে রাখলেন।

রসিক। স্ত্রীহৃদয়ের রহস্য বিধাতা বোঝেন না এই রকম একটা প্রবাদ আছে, রসিকবাবু তো তুচ্ছ।

শ্রীশ। (নিকটে আসিয়া) বিপিন, তুমি চন্দ্রবাবুর কাছে একবার যাও। বাস্তবিক, আমাদের কর্তব্যে আমরা ঢিল দিয়েছি— ওঁর সঙ্গে একটু আলোচনা করলে উনি খুশি হবেন।

বিপিন। আচ্ছা। [প্রস্থান

শ্রীশ। হাঁ, আপনি সেই-যে সেলাইয়ের কথা বলছিলেন— উনি বুঝি নিজের হাতে সমস্ত গৃহকর্ম করেন?

রসিক। সমস্তই।

শ্রীশ। আপনি বুঝি সেদিন গিয়ে দেখলেন তাঁর কোলে বালিশের ওয়াড়গুলো পড়ে রয়েছে আর তিনি—

রসিক। মাথা নিচু করে ছুঁচে সুতো পরাচ্ছিলেন।

শ্রীশ। ছুঁচে সুতো পরাচ্ছিলেন। তখন স্নান করে এসেছেন বুঝি?

রসিক। বেলা তখন তিনটে হবে।

শ্রীশ। বেলা তিনটে। তিনি বুঝি তাঁর খাটের উপর বসে—

রসিক। না, খাটে নয়, বারান্দার উপর মাদুর বিছিয়ে—

শ্রীশ। বারান্দায় মাদুর বিছিয়ে বসে ছুঁচে সুতো পরাচ্ছিলেন—

রসিক। হাঁ, ছুঁচে সুতো পরাচ্ছিলেন। (স্বগত) আর তো পারা যায় না।

শ্রীশ। আমি যেন ছবির মতো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি— পা দুটি ছড়ানো, মাথা নিচু, খোলা চুল মুখের উপর এসে পড়েছে, বিকেল বেলার আলো -

বিপিন। (নিকটে আসিয়া) চন্দ্রবাবু তোমার সঙ্গে তোমার সেই প্রবন্ধটা সম্বন্ধে কথা কইতে চান। [শ্রীশের প্রস্থান

রসিক। (স্বগত) আর কত বকব।

অন্য প্রান্তে

নির্মলা। (পূর্ণের প্রতি) আপনার শরীর আজ বুঝি তেমন ভালো নেই।

পূর্ণ। না, বেশ আছে— হাঁ, একটু ইয়ে হয়েছে বটে, বিশেষ কিছু নয়— তবু একটু ইয়ে বৈকি— তেমন বেশ (কাশি)— আপনার শরীর বেশ ভালো আছে ?

নির্মলা। হাঁ।

পূর্ণ। আপনি— জিজ্ঞাসা করছিলুম যে আপনি— আপনি— আপনার ইয়ে কিরকম বোধ হয়— ওই-যে— মিল্‌টনের আরিয়োপ্যাজিটিকা— ওটা কিনা আমাদের এম-এ কোর্সে আছে, ওটা আপনার বেশ ইয়ে বোধ হয় না ?

নির্মলা। আমি ওটা পড়ি নি।

পূর্ণ। পড়েন নি ? (নিস্তব্ধ) ইয়ে হয়েছে— আপনি— এবারে কিরকম গরম পড়ছে— আমি একবার রসিকবাবু— রসিকবাবুর সঙ্গে আমার একটু দরকার আছে। [নির্মলার নিকট হইতে প্রস্থান

ঘরের অন্যত্র

বিপিন। রসিকবাবু, আচ্ছা, আপনার কি মনে হয়, ও গানটা তিনি বিশেষ কিছু মনে করে লিখেছেন।

রসিক। হতেও পারে। আপনি আমাকে সুদ্ধ ধোঁকা লাগিয়ে দিলেন যে। পূর্বে ওটা ভাবি নি।

বিপিন।—
তরী আমার হঠাৎ ডুবে যায়
কোন্ পাথারে কোন্ পাষাণের ঘায়।

—আচ্ছা রসিকবাবু, এখানে তরী বলতে ঠিক কী বোঝাচ্ছে।

রসিক। হৃদয় বোঝাচ্ছে তার আর সন্দেহ নেই। তবে ওই পাথারটা কোথায় আর পাষাণটা কে সেইটেই ভাববার বিষয়।

পূর্ণ। (নিকটে আসিয়া) বিপিনবাবু, মাপ করবেন— রসিকবাবুর সঙ্গে আমার একটি কথা আছে— যদি—

বিপিন। বেশ, বলুন, আমি যাচ্ছি। [রসিকের নিকট হইতে প্রস্থান

পূর্ণ। আমার মতো নির্বোধ জগতে নেই রসিকবাবু।

রসিক। আপনার চেয়ে ঢের নির্বোধ আছে যারা নিজেকে বুদ্ধিমান বলে জানে— যথা আমি।

পূর্ণ। একটু নিরালা পাই যদি আপনার সঙ্গে অনেক কথা আছে, সভা ভেঙে গেলে আজ রাত্রে একটু অবসর করতে পারেন ?

রসিক। বেশ কথা।

পূর্ণ। আজ দিব্য জ্যোৎস্না আছে, গোলদিঘির ধারে— কী বলেন।

রসিক। (স্বগত) কী সর্বনাশ।

শ্রীশ। (নিকটে আসিয়া) ওঃ, পূর্ণবাবু কথা কচ্ছেন বুঝি ? আচ্ছা, এখন থাক্। রাত্রে আপনার অবসর হবে রসিকবাবু ?

রসিক। তা হতে পারে।

শ্রীশ। তা হলে কালকের মতো— কী বলেন। কাল দেখলেন তো ঘরের চেয়ে পথে জমে ভালো।

রসিক। জমে বৈকি। (স্বগত) সর্দি জমে, কাশি জমে, গলার স্বর দইয়ের মতো জমে যায়। [শ্রীশের প্রস্থান

পূর্ণ। আচ্ছা রসিকবাবু, আপনি হলে কী বলে কথা আরম্ভ করতেন।

রসিক। হয়তো বলতুম— সেদিন বেলুন উড়েছিল, আপনাদের বাড়ির ছাত থেকে দেখতে পেয়েছিলেন কি।

পূর্ণ। তিনি যদি বলতেন, হাঁ—

রসিক। আমি বলতুম, মনকে ওড়বার অধিকার দিয়েছেন বলেই ঈশ্বর মানুষের শরীরে পাখা দেন নি, শরীরকে বদ্ধ রেখে বিধাতা মনের আগ্রহ কেবল বাড়িয়ে দিয়েছেন—

পূর্ণ। বুঝেছি রসিকবাবু— চমৎকার— এর থেকে অনেক কথার সৃষ্টি হতে পারে।

বিপিন। (নিকটে আসিয়া) পূর্ণবাবুর সঙ্গে কথা হচ্ছে ? থাক্ তবে, আমাদের সেই যে একটা কথা ছিল সেটা আজ রাত্রে হবে, কী বলেন।

রসিক। সেই ভালো।

বিপিন। জ্যোৎস্নায় রাস্তায় বেড়াতে বেড়াতে দিব্যি আরামে— কী বলেন।

রসিক। খুব আরাম। (স্বগত) কিন্তু বেয়ারামটা তার পরে।

অন্যত্র

শৈলবালা। (নির্মলার প্রতি) তা বেশ, আপনি যদি ইচ্ছা করেন আমিও ওই বিষয়টার আলোচনা করে দেখব। ডাক্তারি আমি অল্প অল্প চর্চা করেছি— বেশি নয়— কিন্তু আমি যোগদান করলে আপনার যদি উৎসাহ হয় আমি প্রস্তুত আছি।

পূর্ণ। (নিকটে আসিয়া) সেদিন বেলুন উড়েছিল, আপনি কি ছাদের উপর থেকে দেখতে পেয়েছিলেন।

নির্মলা। বেলুন?

পূর্ণ। হাঁ, ওই বেলুন (সকলে নিরুত্তর)— রসিকবাবু বলছিলেন আপনি বোধ হয় দেখে থাকবেন, আমাকে মাপ করবেন— আপনাদের আলোচনায় আমি ভঙ্গ দিলুম— আমি অত্যন্ত হতভাগ্য।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

অক্ষয়ের বাসা

অক্ষয় ও পুরবালা

অক্ষয়। দেবী, যদি অভয় দাও তো একটি প্রশ্ন আছে।

পুরবালা। কী শুনি।

অক্ষয়। শ্রীঅঙ্গে কৃশতার তো কোনো লক্ষণ দেখছি নে!

পুরবালা। শ্রীঅঙ্গ তো কৃশ হবার জন্যে পশ্চিমে বেড়াতে যায় নি।

অক্ষয়। তবে কি বিরহবেদনা বলে জিনিসটা মহাকবি কালিদাসের সঙ্গে সহমরণে মরেছে।

পুরবালা। তার প্রমাণ তুমি। তোমারও তো স্বাস্থ্যের বিশেষ ব্যাঘাত হয় নি দেখছি।

অক্ষয়। হতে দিল কই। তোমার তিন ভগ্নী মিলে অহরহ আমার কৃশতা নিবারণ করে রেখেছিল— বিরহ যে কাকে বলে সেটা আর কোনোমতেই বুঝতে দিলে না।—

গান

বিরহে মরিব ব'লে ছিল মনে পণ—
কে তোরা বাহুতে বাঁধি করিলি বারণ।
ভেবেছিনু অশ্রুজলে ডুবিব অকূল-তলে
কাহার সোনার তরী করিল তারণ।

—প্রিয়ে, কাশীধামে বুঝিপঞ্চশর ত্রিলোচনের ভয়ে এগোতে পারেন না।

পুরবালা। তা হতে পারে, কিন্তু কলকাতায় তো তাঁর যাতায়াত আছে।

অক্ষয়। তা আছে— কোম্পানির শাসন তিনি মানেন না, আমি তার প্রমাণ পেয়েছি।

নৃপবালা ও নীরবালার প্রবেশ

নীরবালা। দিদি।

অক্ষয়। এখন দিদি বৈ আর কথা নেই, অকৃতজ্ঞ! দিদি যখন বিচ্ছেদদহনে উত্তরোত্তর তপ্তকাঞ্চনের মতো শ্রী ধারণ করছিলেন তখন তোমাদের ক'টিকে সুশীতল করে রেখেছিল কে।

নীরবালা। শুনছ দিদি। এমন মিথ্যে কথা! তুমি যতদিন ছিলে না আমাদের একবার ডেকেও জিজ্ঞাসা করেন নি, কেবল চিঠি লিখেছেন আর টেবিলের উপর দুই পা তুলে দিয়ে বই হাতে করে পড়েছেন। তুমি এসেছ, এখন আমাদের নিয়ে গান হবে, ঠাট্টা হবে, দেখাবেন যেন—

নৃপবালা। দিদি, তুমিও তো ভাই, এতদিন আমাদের একখানিও চিঠি লেখ নি।

পুরবালা। আমার কি সময় ছিল ভাই। মাকে নিয়ে দিন রাত ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল।

অক্ষয়। যদি বলতে 'তোদের ভগ্নীপতির ধ্যানে নিমগ্ন ছিলুম' তা হলে কি লোকে নিন্দে করত।

নীরবালা। তা হলে ভগ্নীপতির আস্পর্ধা আরও বেড়ে যেত। মুখুজ্জেমশায়, তুমি তোমার বাইরের ঘরে যাও-না। দিদি এতদিন পরে এসেছেন, আমরা কি ওঁকে নিয়ে একটু গল্প করতে পাব না।

অক্ষয়। নৃশংসে, বিরহদাবদগ্ধ তোর দিদিকে আবার বিরহে জ্বালাতে চাস? তোদের ভগ্নীপতিরূপ ঘনকৃষ্ণ মেঘ মিলনরূপ মুষলধারাবর্ষণ-দ্বারা প্রিয়ার চিত্তরূপ লতানিকুঞ্জে আনন্দরূপ কিসলয়োদ্‌গম ক'রে প্রেমরূপ বর্ষায় কটাক্ষরূপ বিদ্যুৎ—

নীরবালা। এবং বক্তৃনিরূপ ভেকের কলরব—

শৈলবালার প্রবেশ

অক্ষয়। এসো এসো— উত্তমাধমমধ্যমা এই তিন শ্যালী না হলে আমার—

নীরবালা। উত্তমমধ্যম হয় না।

শৈলবালা। (নৃপ ও নীরর প্রতি) তোরা ভাই, একটু যা তো, আমাদের কথা আছে।

অক্ষয়। কথাটা কী বুঝতে পারছিস তো নীরু ? হরিনাম-কথা নয়।

নীরবালা। আচ্ছা, তোমার আর বকতে হবে না। [নৃপ ও নীরর প্রস্থান

শৈলবালা। দিদি, নৃপ-নীরর জন্যে মা দুটি পাত্র তা হলে স্থির করেছেন ?

পুরবালা। হাঁ, কথা এক রকম ঠিক হয়ে গেছে। শুনেছি ছেলে দুটি মন্দ নয়—তারা মেয়ে দেখে পছন্দ করলেই পাকাপাকি হয়ে যাবে।

শৈলবালা। যদি পছন্দ না করে ?

পুরবালা। তা হলে তাদের অদৃষ্ট মন্দ।

অক্ষয়। এবং আমার শ্যালী দুটির অদৃষ্ট ভালো।

শৈলবালা। নৃপ নীরু যদি পছন্দ না করে ?

অক্ষয়। তা হলে ওদের রুচির প্রশংসা করব।

পুরবালা। পছন্দ আবার না করবে কী ? তোদের সব বাড়াবাড়ি, স্বয়ম্বরার দিন গেছে। মেয়েদের পছন্দ করবার দরকার হয় না স্বামী হলেই তাকে ভালোবাসতে পারে।

অক্ষয়। নইলে তোমার বর্তমান ভগ্নীপতির কী দুর্দশাই হত শৈল !

জগত্তারিণীর প্রবেশ

জগত্তারিণী। বাবা অক্ষয়, ছেলে দুটিকে তা হলে তো খবর দিতে হয়। তারা তো আমাদের বাড়ির ঠিকানা জানে না।

অক্ষয়। বেশ তো মা, রসিকদাদাকে পাঠিয়ে দেওয়া যাক।

জগত্তারিণী। পোড়া কপাল। তোমার রসিকদাদার যেরকম বুদ্ধি। তিনি কাকে আনতে কাকে আনবেন ঠিক নেই।

পুরবালা। তা মা, তুমি কিছু ভেবো না। ছেলে দুটিকে আনবার ব্যবস্থা করে দেব।

জগত্তারিণী। মা পুরী, তুই একটু মনোযোগ না করলে হবে না। আজকালকার ছেলে, তাদের সঙ্গে কিরকম ব্যাভার করতে হয় না-হয় আমি কিছুই বুঝি নে।

অক্ষয়। (জনান্তিকে) পুরীর হাতযশ আছে। পুরী তাঁর মার জন্যে যে জামাইটি জুটিয়েছেন, পসার খুব বেড়ে গেছে। আজকালকার ছেলে কী করে বশ করতে হয় সে বিদ্যে—

পুরবালা। (জনান্তিকে) মশায় বুঝি আজকালকার ছেলে।

জগত্তারিণী। মা, তোমরা পরামর্শ করো। কায়েৎদিদি এসে বসে আছেন, আমি তাঁকে বিদায় করে আসি।

শৈলবালা। মা, তুমি একটু বিবেচনা করে দেখো, ছেলে দুটিকে এখনও তোমরা কেউ দেখ নি, হঠাৎ—

জগত্তারিণী। বিবেচনা করতে করতে আমার জন্ম শেষ হয়ে এল, আর বিবেচনা করতে পারি নে—

অক্ষয়। বিবেচনা সময়-মতো এর পর করলেই হবে, এখন কাজটা আগে হয়ে যাক।

জগত্তারিণী। বলো তো বাবা, শৈলকে বুঝিয়ে বলো তো। [প্রস্থান

পুরবালা। মিথ্যে তুই ভাবছিস শৈল— মা যখন মনস্থির করেছেন ওঁকে আর কেউ টলাতে পারবে না। প্রজাপতির নির্বন্ধ আমি মানি ভাই। যার সঙ্গে যার হবার, হাজার বিবেচনা করে মলেও সে হবেই।

অক্ষয়। সে তো ঠিক কথা— নইলে যার সঙ্গে যার হয়ে থাকে তার সঙ্গে না হয়ে আর একজনের সঙ্গে হ'ত।

পুরবালা। কী যে তর্ক কর তোমার অর্ধেক কথা বোঝাই যায় না।

অক্ষয়। তার কারণ আমি নির্বোধ।

পুরবালা। যাও, এখন স্নান করতে যাও, মাথা ঠাণ্ডা করে এসো গে। [প্রস্থান

রসিকের প্রবেশ

শৈলবালা। রসিকদাদা, শুনেছ তো সব? মুশকিলে পড়া গেছে।

রসিক। মুশকিল কিসের। কুমারসভারও কৌমার্য রয়ে গেল, নৃপ-নীরুও পার পেলে, সব দিক রক্ষা হল।

শৈলবালা। কোনো দিক রক্ষা হয় নি।

রসিক। অন্তত এই বুড়োর দিকটা রক্ষা হয়েছে— দুটো অর্বাচীনের সঙ্গে মিশে আমাকে রাত্রে রাস্তায় দাঁড়িয়ে শ্লোক আওড়াতে হবে না।

শৈলবালা। মুখুজ্জেমশায়, তুমি না হলে রসিকদাদাকে কেউ শাসন করতে পারে না —উনি আমাদের কথা মানেন না।

অক্ষয়। যে বয়সে তোমাদের কথা বেদবাক্য বলে মানতেন সে বয়স পেরিয়েছে কিনা। তাই লোকটা বিদ্রোহ করতে সাহস করছে। আচ্ছা, আমি ঠিক করে দিচ্ছি। চলো তো রসিকদা, আমার বাইরের ঘরটাতে বসে তামাক নিয়ে পড়া যাক।

দ্বিতীয় দৃশ্য

বিপিনের বাসা

বিপিন ও গুরুদাস

তানপুরা হস্তে বিপিন অত্যন্ত বেসুরো গলায় সা রে গা মা সাধিতেছেন

বিপিন। ভাই গুরুদাস, তুমি তো ওস্তাদ মানুষ, আমার এই উপকারটি তোমার করে দিতেই হবে। এই খাতার সব গানগুলিই তোমাকে সুর বসিয়ে দিতে হবে। যেটা গাইলে ওটা খাসা হয়েছে। যদি কষ্ট না হয় তো আর একবার— আগে ওই গানের কথা দেখেই মজে গিয়েছিলুম, এখন দেখি কথাটি মানস-সরোবরের পদ্ম, আর তার উপরে গানটি বসেছে যেন বীণাপাণি স্বয়ং। ভাই আর-একবার—

গুরুদাস।— গান

তোমায় চেয়ে আছি বসে পথের ধারে সুন্দর হে।
জমল ধুলা প্রাণের বীণার তারে তারে সুন্দর হে।
নাই যে কুসুম, মালা গাঁথব কিসে। কান্নারই গান বীণায় এনেছি সে,
দূর হতে তাই শুনতে পাবে অন্ধকারে সুন্দর হে।
দিনের পরে দিন কেটে যায় সুন্দর হে।
মরে হৃদয় কোন্ পিপাসায় সুন্দর হে।
শূন্য ঘাটে আমি কী যে করি, রঙিন পালে কবে আসবে তরী—
পাড়ি দেব কবে সুধারসের পারাবারে সুন্দর হে।

ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। একটি বাবু এসেছেন।

বিপিন। বাবু? কিরকম বাবু রে।

ভৃত্য। বুড়ো লোকটি।

বিপিন। মাথায় টাক আছে?

ভৃত্য। আছে।

বিপিন। (তানপুরা রাখিয়া) নিয়ে আয়, এখনই নিয়ে আয়। ওরে ওরে, তামাক দিয়ে যা। বেহারাটা কোথায় গেল, পাখা টানতে বলে দে। আর দেখ্‌, চট করে গোটা-কতক মিঠে পানের দোনা কিনে আন্‌ তো রে। দেরি করিস নে, আর আধ সের বরফ নিয়ে আসিস— বুঝেছিস ? [ভৃত্যের প্রস্থান

(পদশব্দ শুনিয়া) রসিকবাবু, আসুন।

বনমালীর প্রবেশ

বিপিন। রসিকবাবু— এ যে সেই বনমালী!

বৃদ্ধ। আজ্ঞে হাঁ, আমার নাম শ্রীবনমালী ভট্টাচার্য।

বিপিন। সে পরিচয় অনাবশ্যক। আমি একটু বিশেষ কাজে আছি।

বনমালী। মেয়েদুটিকে আর রাখা যায় না— পাত্রও অনেক আসছে—

বিপিন। শুনে খুশি হলেম— দিয়ে ফেলুন, দিয়ে ফেলুন—

বনমালী। কিন্তু আপনাদেরই ঠিক উপযুক্ত হত—

বিপিন। দেখুন বনমালীবাবু, এখনও আপনি আমার সম্পূর্ণ পরিচয় পান নি— যদি একবার পান তা হলে আমার উপযুক্ততা সম্বন্ধে আপনার ভয়ানক সন্দেহ হবে।

বনমালী। তা হলে আমি উঠি, আপনি ব্যস্ত আছেন, আর-এক সময় আসব।

বিপিন। (তানপুরা তুলিয়া লইয়া) সারেগা রেগামা গামাপা—

শ্রীশের প্রবেশ

শ্রীশ। কী হে বিপিন, একি। কুস্তি ছেড়ে দিয়ে গান ধরেছ ? গুরুদাস যে ?

বিপিন। ওস্তাদজি, আজ ছুটি। কী করব বলো, গান না শিখলে তো আর তোমার সন্ন্যাসীদলে আমল পাওয়া যাবে না। গুরুদাসকে গুরু মেনেছি। ওর কাছে নবীন-সন্ন্যাস-ব্রতের দীক্ষা নিচ্ছি।

শ্রীশ। সে কিরকম।

বিপিন। রস ভরে উঠলে তবেই তো ত্যাগ সহজ হয়। মেঘ যখন জলে ভারী হয় তখনই জল বর্ষণ করে।

শ্রীশ। রাখো তোমার নতুন ফিলসফি, কুমারসভার সেই লেখাটায় হাত দিতে পেরেছ ?

বিপিন। না ভাই, সেটাতে এখনও হাত দিতে পারি নি। তোমার লেখাটি হয়ে গেছে নাকি।

শ্রীশ। না, আমিও হাত দিই নি। (কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া) না ভাই, ভারী অন্যায় হচ্ছে। ক্রমেই আমরা আমাদের সংকল্প থেকে যেন দূরে চলে যাচ্ছি।

বিপিন। অনেক সংকল্প ব্যাঙাচির লেজের মতো, পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে আপনি অন্তর্ধান করে। কিন্তু যদি লেজটুকুই থেকে যেত, আর ব্যাঙটা যেত শুকিয়ে, সে কি-রকম হত। এক সময়ে একটা সংকল্প করেছিলেম বলেই যে সেই সংকল্পের খাতিরে নিজেকে শুকিয়ে মারতে হবে আমি তো তার মানে বুঝি নে।

শ্রীশ। আমি বুঝি। অনেক সংকল্প আছে যার কাছে নিজেকে শুকিয়ে মারাও শ্রেয়। অফলা গাছের মতো আমাদের ডালে পালায় প্রতিদিন যেন অতিরিক্ত-পরিমাণ রস-সঞ্চার হচ্ছে এবং সফলতার আশা প্রতিদিন যেন দূর হয়ে যাচ্ছে। আমি ভুল করেছিলুম ভাই বিপিন— সব বড়ো কাজেই তপস্যা চাই, নিজেকে নানা ভোগ থেকে বঞ্চিত না করলে, নানা দিক থেকে প্রত্যাহার করে না আনতে পারলে, চিত্তকে কোনো মহৎ কাজে সম্পূর্ণভাবে নিযুক্ত করা যায় না। এবার থেকে রসচর্চা একেবারে পরিত্যাগ করে কঠিন কাজে হাত দেব, এইরকম প্রতিজ্ঞা করেছি।

বিপিন। তোমার কথা মানি। কিন্তু, সব তৃণেই তো ধান ফলে না— শুকোতে গেলে কেবল নাহক শুকিয়ে মরাই হবে, ফস ফলবে না। কিছুদিন থেকে আমার মনে হচ্ছে আমরা যে সংকল্প গ্রহণ করেছি সে সংকল্প আমাদের দ্বারা সফল হবে না— অতএব আমাদের স্বভাবসাধ্য অন্য কোনোরকম পথ অবলম্বন করাই শ্রেয়।

শ্রীশ। এ কোনো কাজের কথা নয়। বিপিন তোমার তম্বুরা ফেলো—

বিপিন। আচ্ছা, ফেললুম, তাতে পৃথিবীর কোনো ক্ষতি হবে না।

শ্রীশ। চন্দ্রবাবুর বাসায় আমাদের সভা তুলে নিয়ে যাওয়া যাক—

বিপিন। উত্তম কথা।

শ্রীশ। আমরা দুজনে মিলে রসিকবাবুকে একটু সংযত করে রাখব।

বিপিন। তিনি একলা আমাদের দুজনকে অসংযত করে না তোলেন।

গুরুদাস। সংযমচর্চা যদি আরম্ভ করেন তা হলে আমাকে আর দরকার নেই।

বিপিন। দরকার আরও বেশি। রৌদ্র যত প্রখর হবে, জলের প্রয়োজন ততই বাড়বে। এই দুঃসময়ে তুমি আমাকে ত্যাগ কোরো না— সকাল-সন্ধ্যায় যেন দর্শন পাই। সেই গানটা যদি এর মধ্যে তৈরি হয়ে যায় তো আজ সন্ধেবেলায়— কী বল ?

গুরুদাস। আচ্ছা, তাই হবে। [প্রস্থান

ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। একটি বুড়ো বাবু এসেছেন।

বিপিন। বুড়ো বাবু ? জ্বালালে দেখছি। বনমালী আবার এসেছে।

শ্রীশ। বনমালী ? সে যে এই খানিক ক্ষণ হল আমার কাছেও এসেছিল।

বিপিন। ওরে, বুড়োকে বিদায় করে দে।

শ্রীশ। তুমি বিদায় করলে আবার আমার ঘাড়ের উপর গিয়ে পড়বে। তার চেয়ে ডেকে আসুক, আমরা দুজনে মিলে বিদায় করে দিই। (ভৃত্যের প্রতি) বুড়োকে নিয়ে আয়। [ভৃত্যের প্রস্থান

রসিকের প্রবেশ

বিপিন। একি। এ তো বনমালী নয়, এ যে রসিকবাবু।

রসিক। আজ্ঞে হাঁ— আপনাদের আশ্চর্য চেনবার শক্তি— আমি বনমালী নই। 'ধীরসমীরে যমুনাতীরে বসতি বনে বনমালী—'

শ্রীশ। না রসিকবাবু, ও-সব নয়, রসালাপ আমরা বন্ধ করে দিয়েছি।

রসিক। আঃ, বাঁচিয়েছেন।

শ্রীশ। অন্য সকল-প্রকার আলোচনা পরিত্যাগ করে এখন থেকে আমরা একান্তমনে কুমারসভার কাজে লাগব।

রসিক। আমারও সেই ইচ্ছে।

শ্রীশ। বনমালী ব'লে একজন বুড়ো, কুমোরটুলির নীলমাধব চৌধুরির দুই কন্যার সঙ্গে আমাদের বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল, আমরা তাকে সংক্ষেপে বিদায় করে দিয়েছি— এ-সকল প্রসঙ্গও আমাদের কাছে অসংগত বোধ হয়।

রসিক। আমার কাছেও ঠিক তাই। বনমালী যদি দুই বা ততোধিক কন্যার বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে আমার কাছে উপস্থিত হতেন তবে বোধ হয় তাঁকে নিষ্ফল হয়ে ফিরতে হত।

বিপিন। রসিকবাবু, কিছু জলযোগ করে যেতে হবে।

রসিক। না মশায়, আজ থাক্। আপনাদের সঙ্গে দুটো-একটা বিশেষ কথা ছিল, কিন্তু কঠিন প্রতিজ্ঞার কথা শুনে সাহস হচ্ছে না।

বিপিন। (সাগ্রহে) না না, তাই ব'লে কথা থাকলে বলবেন না কেন।

শ্রীশ। আমাদের যতটা ঠাওরাচ্ছেন ততটা ভয়ংকর নই। কথাটা কি বিশেষ করে আমার সঙ্গে।

বিপিন। না, সেদিন যে রসিকবাবু বলছিলেন আমারই সঙ্গে ওঁর দুটো-একটা আলোচনার বিষয় আছে।

রসিক। কাজ নেই, থাক্।

শ্রীশ। বলেন তো আজ রাত্রে গোলদিঘির ধারে—

রসিক। না শ্রীশবাবু, মাপ করবেন।

শ্রীশ। বিপিন ভাই, তুমি একটু ও ঘরে যাও-না, বোধ হয় তোমার সাক্ষাতে রসিকবাবু—

রসিক। না না, দরকার কী—

বিপিন। তার চেয়ে রসিকবাবু, তেতালার ঘরে চলুন— শ্রীশ এখানে একটু অপেক্ষা করবেন এখন।

রসিক। না, আপনারা দুজনেই বসুন, আমি উঠি।

বিপিন। সে কি হয়। কিছু খেয়ে যেতে হবে।

শ্রীশ। না, আপনাকে কিছুতেই ছাড়ছি নে। সে হবে না।

রসিক। তবে কথাটা বলি। নৃপবালা নীরবালার কথা তো পূর্বেই আপনারা শুনেছেন—

শ্রীশ। শুনেছি বৈকি— তা নৃপবালার সম্বন্ধে যদি কিছু—

বিপিন। নীরবালার কোনো বিশেষ সংবাদ—

রসিক। তাঁদের দুজনের সম্বন্ধেই বিশেষ চিন্তার কারণ হয়ে পড়েছে।

উভয়ে। অসুখ নয় তো?

রসিক। তার চেয়ে বেশি। তাঁদের বিবাহের সম্বন্ধ —

শ্রীশ। বলেন কী রসিকবাবু। বিবাহের তো কোনো কথা শোনা যায় নি—

রসিক। কিছু না— হঠাৎ মা কাশী থেকে এসে দুটো অকালকুষ্মাণ্ডের সঙ্গে মেয়ে-দুটির বিবাহ স্থির করেছেন—

বিপিন। এ তো কিছুতেই হতে পারে না রসিকবাবু।

রসিক। মশায়, পৃথিবীতে যেটা অপ্রিয় সেইটেরই সম্ভাবনা বেশি। ফুলগাছের চেয়ে আগাছাই বেশি সম্ভবপর।

বিপিন। কিন্তু মশায়, আগাছা উৎপাটন করতে হবে—

শ্রীশ। ফুলগাছ রোপণ করতে হবে—

রসিক। তা তো বটেই, কিন্তু করে কে মশায়।

শ্রীশ। আমরা করব। কী বল বিপিন।

বিপিন। নিশ্চয়ই।

রসিক। কিন্তু, কী করবেন।

বিপিন। যদি বলেন তো সেই ছেলে-দুটোকে পথের মধ্যে—

রসিক। বুঝেছি, সেটা মনে করলেও শরীর পুলকিত হয়। কিন্তু, বিধাতার বরে অপাত্র জিনিসটা অমর— দুটো গেলে আবার দশটা আসবে।

বিপিন। এদের দুটোকে যদি ছলে বলে কিছুদিন ঠেকিয়ে রাখতে পারি তা হলে ভাববার সময় পাওয়া যাবে।

রসিক। ভাববার সময় সংকীর্ণ হয়ে এসেছে। এই শুক্রবারে তারা মেয়ে দেখতে আসবে।

বিপিন। এই শুক্রবারে ?

শ্রীশ। সে তো পরশু।

রসিক। আজ্ঞে, পরশুই তো বটে। শুক্রবারকে তো পথের মধ্যে ঠেকিয়ে রাখা যায় না।

শ্রীশ। আচ্ছা, আমার একটা প্ল্যান মাথায় এসেছে।

রসিক। কিরকম শুনি।

শ্রীশ। সেই ছেলেদুটোকে বাড়ির কেউ চেনে ?

রসিক। কেউ না।

শ্রীশ। তারা বাড়ি চেনে ?

রসিক। তাও না।

শ্রীশ। তা হলে বিপিন যদি সেদিন তাদের কোনো রকম করে আটকে রাখতে পারে তো আমি তাদের নাম নিয়ে নৃপবালাকে—

বিপিন। জানই তো ভাই, আমার কোনো রকম কৌশল মাথায় আসে না। তুমি ইচ্ছে করলে কৌশলে ছেলেদুটোকে ভুলিয়ে রাখতে পারবে— আমি বরঞ্চ নিজেকে তাদের নামে চালিয়ে দিয়ে নীরবালাকে—

রসিক। কিন্তু মশায়, এ স্থলে তো গৌরবে বহুবচন খাটবে না। দুটি ছেলে আসবার কথা আছে, আপনাদের একজনকে দুজন বলে চালানো আমার পক্ষে কঠিন হবে—

শ্রীশ। ও, তা বটে।

বিপিন। হাঁ, সে কথা ভুলেছিলেম।

শ্রীশ। তা হলে তো আমাদের দুজনকেই যেতে হয়। কিন্তু—

রসিক। সে দুটোকে ভুল রাস্তায় চালান করে দিতে আমিই পারব। কিন্তু, আপনারা—

বিপিন। আমাদের জন্যে ভাববেন না রসিকবাবু।

শ্রীশ। আমরা সব-তাতেই প্রস্তুত আছি।

রসিক। আপনারা মহৎ লোক, এরকম ত্যাগস্বীকার—

শ্রীশ। বিলক্ষণ! এর মধ্যে ত্যাগস্বীকার কিছুই নেই।

বিপিন। এ তো আনন্দের কথা।

রসিক। না না, তবু তো মনে আশঙ্কা হতে পারে যে, কী জানি নিজের ফাঁদে যদি নিজেই পড়তে হয়।

শ্রীশ। কিছু না মশায়, কোনো আশঙ্কায় ডরাই নে।

বিপিন। আমাদের যাই ঘটুক তাতেই আমরা সুখী হব।

রসিক। এ তো আপনাদের মহত্ত্বের কথা, কিন্তু আমার কর্তব্য আপনাদের রক্ষা করা। তা, আমি আপনাদের কথা দিচ্ছি— এই শুক্রবারের দিনটা আপনারা কোনো-মতে উদ্ধার করে দিন, তার পরে কখনো আপনাদের আর বিরক্ত করব না।

শ্রীশ। আমাদের বিরক্ত করবেন না এই কথা শুনে দুঃখিত হলেম রসিকবাবু।

রসিক। আচ্ছা, করব।

বিপিন। আমরা কি নিজের স্বাধীনতার জন্যেই কেবল ব্যস্ত। আমাদের এতই স্বার্থপর মনে করেন?

রসিক। মাপ করবেন— আমার ভুল ধারণা ছিল।

শ্রীশ। আপনি যাই বলুন, ফস্ করে ভালো পাত্র পাওয়া বড়ো শক্ত।

রসিক। সেইজন্যেই তো এত দিন অপেক্ষা করে শেষে এই বিপদ। বিবাহের প্রসঙ্গমাত্রই আপনাদের কাছে অপ্রিয়, তবু দেখুন আপনাদের স্কন্ধ—

বিপিন। সেজন্যে কিছু সংকোচ করবেন না—

শ্রীশ। আপনি যে আর-কারও কাছে না গিয়ে আমাদের কাছে এসেছেন, সেজন্যে অন্তরের সঙ্গে ধন্যবাদ দিচ্ছি।

রসিক। আমি আর আপনাদের ধন্যবাদ দেব না। সেই কন্যা দুটির চিরজীবনের ধন্যবাদ আপনাদের পুরস্কৃত করবে।

বিপিন। ওরে, পাখাটা টান্।

শ্রীশ। রসিকবাবুর জন্যে জলখাবার আনাবে বলেছিলে—

বিপিন। সে এল বলে। ততক্ষণ এক গ্লাস বরফ-দেওয়া জল খান—

শ্রীশ। জল কেন, লেমনেড আনিয়ে দাও-না। (পকেট হইতে টিনের বাক্স বাহির করিয়া) এই নিন রসিকবাবু, পান খান।

বিপিন। ও দিকে হাওয়া পাচ্ছেন? এই তাকিয়াটি নিন-না।

শ্রীশ। আচ্ছা রসিকবাবু, নৃপবালা বুঝি খুব বিষণ্ণ হয়ে পড়েছেন—

বিপিন। নীরবালাও অবশ্য খুব—

রসিক। সে আর বলতে।

শ্রীশ। নৃপবালা বুঝি কান্নাকাটি করছেন ?

বিপিন। আচ্ছা, নীরবালা তাঁর মাকে কেন একটু ভালো করে বুঝিয়ে বলেন না—

রসিক। (স্বগত) ওই রে, শুরু হল। আমার লেমনেডে কাজ নেই। (প্রকাশ্যে) মাপ করবেন, আমায় কিন্তু এখনই উঠতে হচ্ছে।

শ্রীশ। বলেন কী।

বিপিন। সে কি হয়।

রসিক। সেই ছেলেদুটোকে ভুল ঠিকানা দিয়ে আসতে হবে, নইলে—

শ্রীশ। বুঝেছি, তা হলে এখনই যান।

বিপিন। তা হলে আর দেরি করবেন না।

তৃতীয় দৃশ্য

চন্দ্রবাবুর বাড়ি

নির্মলা বাতায়নতলে আসীন। চন্দ্রবাবুর প্রবেশ

চন্দ্রবাবু। (স্বগত) বেচারা নির্মলা বড়ো কঠিন ব্রত গ্রহণ করেছে। আমি দেখছি ক দিন ধরে ও চিন্তায় নিমগ্ন হয়ে রয়েছে। স্ত্রীলোক, মনের উপর এতটা ভার কি সহ্য করতে পারবে। (প্রকাশ্যে) নির্মল।

নির্মলা। (চমকিয়া) কী মামা।

চন্দ্রবাবু। সেই লেখাটা নিয়ে বুঝি ভাবছ ? আমার বোধ হয় অধিক না ভেবে মনকে দুই-একদিন বিশ্রাম দিলে লেখার পক্ষে সুবিধা হতে পারে।

নির্মলা। (লজ্জিত হইয়া) আমি ঠিক ভাবছিলুম না মামা। আমার এতক্ষণ সেই লেখায় হাত দেওয়া উচিত ছিল, কিন্তু এই ক দিন থেকে গরম পড়ে দক্ষিনে হাওয়া দিতে আরম্ভ করেছে, কিছুতেই যেন মন বসাতে পারছি নে— ভারী অন্যায় হচ্ছে, আজ আমি যেমন করে হোক—

চন্দ্রবাবু। না না, জোর করে চেষ্টা কোরো না। আমার বোধ হয় নির্মল, বাড়িতে কেউ সঙ্গিনী নেই, নিতান্ত একলা কাজ করতে তোমার শ্রান্তি বোধ হয়। কাজে দুই-একজনের সঙ্গ এবং সহায়তা না হলে—

নির্মলা। অবলাকান্তবাবু আমাকে কতকটা সাহায্য করবেন বলেছেন— আমি তাঁকে রোগীশুশ্রূষা সম্বন্ধে সেই ইংরাজি বইটা দিয়েছি, তিনি একটা অধ্যায় আজ লিখে পাঠাবেন বলেছেন। বোধ হয় এখনই পাওয়া যাবে, তাই আমি অপেক্ষা করে বসে আছি।

চন্দ্রবাবু। ওই ছেলেটি বড়ো ভালো—

নির্মলা। খুব ভালো— চমৎকার—

চন্দ্রবাবু। এমন অধ্যবসায়, এমন কার্যতৎপরতা—

নির্মলা। আর, এমন সুন্দর নম্রস্বভাব—

চন্দ্রবাবু। ভালো প্রস্তাবমাত্রেই তাঁর উৎসাহ দেখে আমি আশ্চর্য হয়েছি।

নির্মলা। তা ছাড়া, তাঁকে দেখবামাত্র তাঁর মনের মাধুর্য মুখে এবং চেহারায় কেমন স্পষ্ট বোঝা যায়।

চন্দ্রবাবু। এত অল্প কালের মধ্যেই যে কারও প্রতি এত গভীর স্নেহ জন্মাতে পারে তা আমি কখনো মনে করি নি। আমার ইচ্ছা করে, ওই ছেলেটিকে নিজের কাছে রেখে ওর সকলপ্রকার লেখাপড়ায় এবং কাজে সহায়তা করি।

নির্মলা। তা হলে আমারও ভারী উপকার হয়, অনেক কাজ করতে পারি। আচ্ছা, এরকম প্রস্তাব করে একবার দেখোই-না।— ওই-যে বেহারা আসছে। বোধ হয় তিনি লেখাটা পাঠিয়ে দিয়েছেন। রামদীন, চিঠি আছে? এই দিকে নিয়ে আয়।

বেহারার প্রবেশ

ও চন্দ্রবাবুর হাতে চিঠি-প্রদান

মামা, সেই প্রবন্ধটা নিশ্চয় তিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, ওটা আমাকে দাও।

চন্দ্রবাবু। না ফেনি, এটা আমার চিঠি।

নির্মলা। তোমার চিঠি! অবলাকান্তবাবু বুঝি তোমাকেই লিখেছেন? কী লিখেছেন।

চন্দ্রবাবু। না, এটা পূর্ণর লেখা।

নির্মলা। পূর্ণবাবুর লেখা? ওঃ—

চন্দ্রবাবু। পূর্ণ লিখছেন— 'গুরুদেব, আপনার চরিত্র মহৎ, মনের বল অসামান্য; আপনার মতো বলিষ্ঠপ্রকৃতি লোকেই মানুষের দুর্বলতা ক্ষমার চক্ষে দেখিতে পারেন ইহাই মনে করিয়া অদ্য এই চিঠিখানি আপনাকে লিখিতে সাহসী হইতেছি।'

নির্মলা। হয়েছে কী। বোধ হয় পূর্ণবাবু চিরকুমার-সভা ছেড়ে দেবেন, তাই এত ভূমিকা করছেন। লক্ষ্য করে দেখেছ বোধ হয়, পূর্ণবাবু আজকাল কুমারসভার কোনো কাজই করে উঠতে পারেন না।

চন্দ্রবাবু। 'দেব, আপনি যে আদর্শ আমাদের সম্মুখে ধরিয়াছেন তাহা অত্যুচ্চ, যে উদ্দেশ্য আমাদের মস্তকে স্থাপন করিয়াছেন তাহা গুরুভার— সে আদর্শ এবং সেই উদ্দেশ্যের প্রতি এক মুহূর্তের জন্য ভক্তির অভাব হয় নাই, কিন্তু মাঝে মাঝে শক্তির দৈন্য অনুভব করিয়া থাকি তাহা চরণসমীপে সবিনয়ে স্বীকার করিতেছি।'

নির্মলা। আমার বোধ হয়, সকল বড়ো কাজেই মানুষ মাঝে মাঝে আপনার অক্ষমতা অনুভব করে হতাশ হয়ে পড়ে, শ্রান্ত মন এক-একবার বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়, কিন্তু সে কি বরাবর থাকে।

চন্দ্রবাবু। 'সভা হইতে গৃহে ফিরিয়া আসিয়া যখন কার্যে হাত দিতে যাই তখন সহসা নিজেকে একক মনে হয়, উৎসাহ যেন আশ্রয়হীন লতার মতো লুণ্ঠিত হইয়া পড়িতে চাহে।' —নির্মল, আমরা তো ঠিক এই কথাই বলছিলেম।

নির্মলা। পূর্ণবাবু যা লিখেছেন সেটা সত্য— মানুষের সঙ্গ না হলে কেবলমাত্র সংকল্প নিয়ে উৎসাহ জাগিয়ে রাখা শক্ত।

চন্দ্রবাবু। 'আমার ধৃষ্টতা মার্জনা করিবেন, কিন্তু অনেক চিন্তা করিয়া এ কথা স্থির বুঝিয়াছি, কুমারব্রত সাধারণ লোকের জন্য নহে— তাহাতে বল দান করে না, বল হরণ করে। স্ত্রী পুরুষ পরস্পরের দক্ষিণ হস্ত— তাহারা মিলিত থাকিলে তবেই সম্পূর্ণরূপে সংসারের সকল কাজের উপযোগী হইতে পারে।'

তোমার কী মনে হয় নির্মল। (নির্মলা নিরুত্তর) অক্ষয়বাবুও এই কথা নিয়ে সেদিন আমার সঙ্গে তর্ক করছিলেন— তাঁর অনেক কথার উত্তর দিতে পারি নি।

নির্মলা। তা, হতে পারে। বোধ হয় কথাটার মধ্যে অনেকটা সত্য আছে।

চন্দ্রবাবু। 'গৃহস্থসন্তানকে সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষিত না করিয়া গৃহাশ্রমকে উন্নত আদর্শে গঠিত করাই আমার মতে শ্রেষ্ঠ কর্তব্য।'

নির্মলা। এ কথাটা কিন্তু পূর্ণবাবু বেশ বলেছেন।

চন্দ্রবাবু। আমিও কিছুদিন থেকে মনে করছিলেম কুমারব্রত গ্রহণের নিয়ম উঠিয়ে দেব।

নির্মলা। আমারও বোধ হয় উঠিয়ে দিলে মন্দ হয় না। কী বল মামা। অন্য কেউ কি আপত্তি করবেন। অবলাকান্তবাবু, শ্রীশবাবু—

চন্দ্রবাবু। আপত্তির কোনো কারণ নেই।

নির্মলা। তবু একবার অবলাকান্তবাবুদের মত নিয়ে দেখা উচিত।

চন্দ্রবাবু। মত তো নিতেই হবে।

(পত্রপাঠ) ‘এ পর্যন্ত যাহা লিখিলাম সহজে লিখিয়াছি, এখন যাহা বলিতে চাহি তাহা লিখিতে কলম সরিতেছে না।’

নির্মলা। মামা, পূর্ণবাবু হয়তো কোনো গোপনীয় কথা লিখছেন, তুমি চেঁচিয়ে পড়ছ কেন।

চন্দ্রবাবু। ঠিক বলেছ ফেনি। (আপন মনে পাঠ) কী আশ্চর্য, আমি কি সকল বিষয়েই অন্ধ। এতদিন তো আমি কিছুই বুঝতে পারি নি। নির্মল, পূর্ণবাবুর কোনো ব্যবহার কি কখনো তোমার কাছে—

নির্মলা। হাঁ, পূর্ণবাবুর ব্যবহার আমার কাছে মাঝে মাঝে অত্যন্ত নির্বোধের মতো ঠেকেছিল।

চন্দ্রবাবু। অথচ পূর্ণবাবু খুব বুদ্ধিমান। তা হলে তোমাকে খুলে বলি— পূর্ণবাবু বিবাহের প্রস্তাব করে পাঠিয়েছেন—

নির্মলা। তুমি তো তাঁর অভিভাবক নও, তোমার কাছে প্রস্তাব—

চন্দ্রবাবু। আমি যে তোমার অভিভাবক, এই পড়ে দেখো—

নির্মলা। (পত্র পড়িয়া রক্তিমমুখে) এ হতেই পারে না।

চন্দ্রবাবু। আমি তাঁকে কী বলব।

নির্মলা। বোলো, কোনোমতে হতেই পারে না।

চন্দ্রবাবু। কেন নির্মল, তুমি তো বলছিলে কুমারব্রত-পালনের নিয়ম সভা হতে উঠিয়ে দিতে তোমার আপত্তি নেই।

নির্মলা। তাই বলেই কি যে প্রস্তাব করবে তাকেই—

চন্দ্রবাবু। পূর্ণবাবু তো যে-সে নয়, অমন ভালো ছেলে—

নির্মলা। মামা, তুমি এ-সব বিষয়ে কিছুই বোঝ না, তোমাকে বোঝাতে পারবও না— আমার কাজ আছে। [প্রস্থানোদ্যম

মামা, তোমার পকেটে ওটা কী উঁচু হয়ে আছে।

চন্দ্রবাবু। (চমকিয়া উঠিয়া) হাঁ হাঁ, ভুলে গিয়েছিলেম, বেহারা আজ সকালে তোমার নামে লেখা একটা কাগজ আমাকে দিয়ে গেছে—

নির্মলা। (তাড়াতাড়ি কাগজ লইয়া) দেখো দেখি মামা, কী অন্যায়, অবলাকান্তবাবুর লেখাটা সকালেই এসেছে, আমাকে দাও নি! আমি ভাবছিলেম তিনি হয়তো ভুলেই গেছেন। ভারী অন্যায়।

চন্দ্রবাবু। অন্যায় হয়েছে বটে। কিন্তু, এর চেয়ে ঢের বেশি অন্যায় ভুল আমি প্রতিদিনই করে থাকি ফেনি— তুমিই তো আমাকে প্রত্যেক বার মাপ করে প্রশ্রয় দিয়েছ।

নির্মলা। না, ঠিক অন্যায় নয়— আমিই অবলাকান্তবাবুর প্রতি মনে মনে অন্যায় করছিলেম, ভাবছিলেম— এই-যে, রসিকবাবু আসছেন। আসুন রসিকবাবু, মামা এই-খানেই আছেন।

রসিকের প্রবেশ

চন্দ্রবাবু। এই-যে, রসিকবাবু এসেছেন ভালোই হয়েছে।

রসিক। আমার আসাতেই যদি ভালো হয় চন্দ্রবাবু, তা হলে আপনাদের পক্ষে ভালো অত্যন্ত সুলভ। যখনই বলবেন তখনই আসব, না বললেও আসতে রাজি আছি।

চন্দ্রবাবু। আমরা মনে করছি আমাদের সভা থেকে চিরকুমারব্রতের নিয়মটা উঠিয়ে দেব— আপনি কী পরামর্শ দেন।

রসিক। আমি খুব নিঃস্বার্থভাবেই পরামর্শ দিতে পারব, কারণ, এ ব্রত রাখুন বা উঠিয়ে দিন আমার পক্ষে দু'ই সমান। আমার পরামর্শ এই যে, উঠিয়ে দিন, নইলে সে কোন্ দিন আপনিই উঠে যাবে। আমাদের পাড়ার রামহরি মাতাল রাস্তার মাঝখানে এসে সকলকে ডেকে বলেছিল, বাবাসকল, আমি স্থির করেছি এইখানটাতেই আমি পড়ব। স্থির না করলেও সে পড়ত, অতএব স্থির করাটাই তার পক্ষে ভালো হয়েছিল।

চন্দ্রবাবু। ঠিক বলেছেন রসিকবাবু, যে জিনিস বলপূর্বক আসবেই তাকে বলপ্রকাশ করতে না দিয়ে আসতে দেওয়াই ভালো। আসছে রবিবারের পূর্বেই এই প্রস্তাবটা সকলের কাছে একবার তুলতে চাই।

রসিক। আচ্ছা, শুক্রবারের সন্ধ্যাবেলায় আপনারা আমাদের ওখানে যাবেন, আমি সকলকে সংবাদ দিয়ে আনাব।

চন্দ্রবাবু। রসিকবাবু, আপনার যদি সময় থাকে তা হলে আমাদের দেশে গোজাতির উন্নতি সম্বন্ধে একটা প্রস্তাব আপনাকে—

রসিক। বিষয়টা শুনে খুব ঔৎসুক্য জন্মাচ্ছে, কিন্তু সময় খুব যে বেশি—

নির্মলা। না রসিকবাবু, আপনি ও ঘরে চলুন, আপনার সঙ্গে অনেক কথা কবার আছে। মামা, তোমার লেখাটা শেষ করো, আমরা থাকলে ব্যাঘাত হবে।

রসিক। তা হলে চলুন।

নির্মলা। (চলিতে চলিতে) অবলাকান্তবাবু আমাকে তাঁর সেই লেখাটা পাঠিয়ে দিয়েছেন— আমার অনুরোধ যে তিনি মনে করে রেখেছিলেন সেজন্যে আপনি তাঁকে আমার ধন্যবাদ জানাবেন।

রসিক। ধন্যবাদ না পেলেও আপনার অনুরোধ রক্ষা করেই তিনি কৃতার্থ।

চতুর্থ দৃশ্য

অক্ষয়ের বাসা

জগত্তারিণী, পুরবালা ও অক্ষয়

জগত্তারিণী। বাবা অক্ষয়, দেখো তো, মেয়েদের নিয়ে আমি কী করি। নেপো বসে বসে কাঁদছে; নীর রেগে অস্থির, সে বলে সে কোনোমতেই বেরোবে না। ভদ্রলোকের ছেলেরা আজ এখনই আসবে, তাদের এখন কী বলে ফেরাব। তুমিই বাপু, ওদের শিখিয়ে পড়িয়ে বিবি করে তুলেছ, এখন তুমিই ওদের সামলাও। [প্রস্থান

পুরবালা। সত্যি, আমি ওদের রকম দেখে অবাক হয়ে গেছি, ওরা কি মনে করেছে ওরা—

অক্ষয়। বোধ হয় আমাকে ছাড়া আর-কাউকে ওরা পছন্দ করছে না; তোমারই সহোদরা কিনা, রুচিটা তোমারই মতো।

পুরবালা। ঠাট্টা রাখো, এখন ঠাট্টার সময় নয়। তুমি ওদের একটু বুঝিয়ে বলবে কি-না বলো। তুমি না বললে ওরা শুনবে না।

অক্ষয়। এত অনুগত! একেই বলে ভগ্নীপতিব্রতা শ্যালী। আচ্ছা, আমার কাছে একবার পাঠিয়ে দাও— দেখি। [পুরবালার প্রস্থান

নৃপবালা ও নীরবালার প্রবেশ

নীরবালা। না, মুখুজ্জেমশায়, সে কোনোমতেই হবে না।

নৃপবালা। মুখুজ্জেমশায়, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমাদের যার-তার সামনে ও-রকম করে বের কোরো না।

অক্ষয়। ফাঁসির হুকুম হলে একজন বলেছিল আমাকে বেশি উঁচুতে চড়িয়ো না, আমার মাথা ঘোরা ব্যামো আছে। তোদের যে তাই হল। বিয়ে করতে যাচ্ছিস, এখন দেখা দিতে লজ্জা করলে চলবে কেন।

নীরবালা। কে বললে আমরা বিয়ে করতে যাচ্ছি।

অক্ষয়। অহো, শরীরে পুলক সঞ্চার হচ্ছে। কিন্তু হৃদয় দুর্বল এবং দৈব বলবান, যদি দৈবাৎ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করতে হয়—

নীরবালা। না, ভঙ্গ হবে না।

অক্ষয়। হবে না তো? তবে নির্ভয়ে এসো; যুবক-দুটোকে দেখা দিয়ে আধপোড়া করে ছেড়ে দাও— হতভাগারা বাসায় ফিরে গিয়ে মরে থাকুক।

নীরবালা। অকারণে প্রাণিহত্যা করবার জন্যে আমাদের এত উৎসাহ নেই।

অক্ষয়। জীবের প্রতি কী দয়া! কিন্তু, সামান্য ব্যাপার নিয়ে গৃহবিচ্ছেদ করবার দরকার কী। তোদের মা দিদি যখন ধরে পড়েছেন এবং ভদ্রলোক দুটি যখন গাড়িভাড়া করে আসছে তখন একবার মিনিট-পাঁচেকের মতো দেখা দিস, তার পরে আমি আছি— তোদের অনিচ্ছায় কোনোমতেই বিবাহ দিতে দেব না।

নীরবালা। কোনোমতেই না?

অক্ষয়। কোনোমতেই না।

পুরবালার প্রবেশ

পুরবালা। আয়, তোদের সাজিয়ে দিই গে।

নীরবালা। আমরা সাজব না।

পুরবালা। ভদ্রলোকদের সামনে এইরকম বেশেই বেরোবি! লজ্জা করবে না!

নীরবালা। লজ্জা করবে বৈকি দিদি, কিন্তু সেজে বেরোতে আরও বেশি লজ্জা করবে।

অক্ষয়। উমা তপস্বিনীবেশে মহাদেবের মনোহরণ করেছিলেন, শকুন্তলা যখন দুষ্মন্তের হৃদয় জয় করেছিল তখন তার গায়ে একখানি বাকল ছিল— কালিদাস বলেন, সেও কিছু আঁট হয়ে পড়েছিল— তোমার বোনেরা সেই-সব পড়ে সেয়ানা হয়ে উঠেছে, সাজতে চায় না।

পুরবালা। সে-সব হল সত্যযুগের কথা। কলিকালের দুষ্মন্ত মহারাজারা সাজ-সজ্জাতেই ভোলেন।

অক্ষয়। যথা—

পুরবালা। যথা তুমি। যেদিন তুমি দেখতে এলে, মা বুঝি আমাকে সাজিয়ে দেন নি?

অক্ষয়। আমি মনে মনে ভাবলেম, সাজেও যখন একে সেজেছে তখন সৌন্দর্যে না জানি কত শোভা হবে।

পুরবালা। আচ্ছা, তুমি থামো। নীরু, আয়।

নীরবালা। না ভাই দিদি—

পুরবালা। আচ্ছা, সাজ নাই করলি, চুল তো বাঁধতে হবে?

অক্ষয়।— গান

অলকে কুসুম না দিয়ো,
শুধু শিথিল কবরী বাঁধিয়ো।

কাজলবিহীন সজল নয়নে
হৃদয়দুয়ারে ঘা দিয়ো।
আকুল আঁচলে পথিকচরণে
মরণের ফাঁদ ফাঁদিয়ো।
না করিয়া বাদ মনে যাহা সাধ
নিদয়া নীরবে সাধিয়ো।

পুরবালা। তুমি আবার গান ধরলে! আমি কখন কী করি বলো দেখি। তাদের আসবার সময় হল— এখনো আমার খাবার তৈরি করা বাকি আছে।

[নৃপবালা ও নীরবালাকে লইয়া প্রস্থান

রসিকের প্রবেশ

অক্ষয়। পিতামহ ভীষ্ম, যুদ্ধের সমস্তই প্রস্তুত?

রসিক। সমস্তই। বীরপুরুষ দুটিও সমাগত।

অক্ষয়। এখন কেবল দিব্যাস্ত্র-দুটি সাজতে গেছেন। তুমি তা হলে সেনাপতির ভার গ্রহণ করো, আমি একটু অন্তরালে থাকতে ইচ্ছা করি।

রসিক। আমিও প্রথমটা একটু আড়াল হই। [রসিক ও অক্ষয়ের প্রস্থান

শ্রীশ ও বিপিনের প্রবেশ

শ্রীশ। বিপিন, তুমি তো আজকাল সংগীতবিদ্যার উপর চীৎকারশব্দে ডাকাতি আরম্ভ করেছ— কিছু আদায় করতে পারলে?

বিপিন। কিছু না। সংগীতবিদ্যার দ্বারে সপ্তস্বর অনবরত পাহারা দিচ্ছে, সেখানে কি আমার ঢোকবার জো আছে। কিন্তু এ প্রশ্ন কেন তোমার মনে উদয় হল।

শ্রীশ। আজকাল মাঝে মাঝে কবিতায় সুর বসাতে ইচ্ছে করে। সেদিন বইয়ে পড়ছিলুম—

কেন সারা দিন ধীরে ধীরে
বালু নিয়ে শুধু খেল তীরে।
চলে যায় বেলা, রেখে মিছে খেলা
ঝাঁপ দিয়ে পড়ো কালো নীরে।
অকূল ছানিয়ে যা পাস তা নিয়ে
হেসে কেঁদে চলো ঘরে ফিরে।

—মনে হচ্ছিল এর সুরটা যেন জানি, কিন্তু গাবার জো নেই।

বিপিন। জিনিসটা মন্দ নয় হে— তোমার কবি লেখে ভালো। ওহে, ওর পরে আর কিছু নেই? যদি শুরু করলে তবে শেষ করো।

শ্রীশ।—
নাহি জানি মনে কী বাসিয়া
পথে বসে আছে কে আসিয়া।
যে ফুলের বাসে অলস বাতাসে
হৃদয় দিতেছে উদাসিয়া
যেতে হয় যদি চলো নিরবধি
সেই ফুলবন তলাশিয়া।

বিপিন। বাঃ, বেশ! কিন্তু শ্রীশ, শেল্‌ফের কাছে তুমি কী খুঁজে বেড়াচ্ছ।

শ্রীশ। সেই-যে সেদিন যে বইটাতে নাম লেখা দেখেছিলাম সেইটে—

বিপিন। না ভাই, আজ ও-সব নয়।

শ্রীশ। কী-সব নয়।

বিপিন। তাঁদের কথা নিয়ে কোনো রকম—

শ্রীশ। কী আশ্চর্য বিপিন। তাঁদের কথা নিয়ে আমি কি এমন কোনো আলোচনা করতে পারি যাতে—

বিপিন। রাগ কোরো না ভাই— আমি নিজের সম্বন্ধেই বলছি, এই ঘরেই আমি অনেক সময় রসিকবাবুর সঙ্গে তাঁদের বিষয়ে যে ভাবে আলাপ করেছি, আজ সে ভাবে কোনো কথা উচ্চারণ করতেও সংকোচ বোধ হচ্ছে— বুঝছ না—

শ্রীশ। কেন বুঝব না। আমি কেবল একখানি বই খুলে দেখবার ইচ্ছে করেছিলুম মাত্র— একটি কথাও উচ্চারণ করতুম না—

বিপিন। না, আজ তাও না। আজ তাঁরা আমাদের সম্মুখে বেরোবেন, আজ আমরা যেন তার যোগ্য থাকতে পারি।

শ্রীশ। বিপিন, তোমার সঙ্গে—

বিপিন। না ভাই, আমার সঙ্গে তর্ক কোরো না, আমি হারলুম— কিন্তু বইটা রাখো।

রসিকের প্রবেশ

রসিক। এই-যে, আপনারা এসে একলা বসে আছেন— কিছু মনে করবেন না—

শ্রীশ। কিছু না। এই ঘরটি আমাদের সাদর সম্ভাষণ করে নিয়েছিল।

রসিক। আপনাদের কত কষ্টই দেওয়া গেল।

শ্রীশ। কষ্ট আর দিতে পারলেন কই। একটা কষ্টের মতো কষ্ট স্বীকার করবার সুযোগ পেলে কৃতার্থ হতুম।

রসিক। যা হোক, অল্পক্ষণের মধ্যে চুকে যাবে এই এক সুবিধে। তার পরেই আপনারা স্বাধীন। ভেবে দেখুন দেখি, যদি এটা সত্যকার ব্যাপার হত তা হলেই 'পরিণামে বন্ধনভয়ম্'। বিবাহ জিনিসটা মিষ্টান্ন দিয়েই শুরু হয়, কিন্তু সকল সময় মধুরেণ সমাপ্ত হয় না। আচ্ছা, আজ আপনারা দুঃখিতভাবে এরকম চুপচাপ করে বসে আছেন কেন বলুন দেখি। আমি বলছি, আপনাদের কোনো ভয় নেই। আপনারা বনের বিহঙ্গ, দুটিখানি সন্দেশ খেয়েই আবার বনে উড়ে যাবেন— কেউ আপনাদের বাঁধবে না। নাত্র ব্যাধশরাঃ পতন্তি পরিতো নৈবাত্র দাবানলঃ। দাবানলের পরিবর্তে ডাবের জল পাবেন।

শ্রীশ। আমাদের সে দুঃখ নয় রসিকবাবু, আমরা ভাবছি – আমাদের দ্বারা কতটুকু উপকারই বা হচ্ছে। ভবিষ্যতের সমস্ত আশঙ্কা তো দূর করতে পারছি নে।

রসিক। বিলক্ষণ! যা করছেন তাতে আপনারা দুটি অবলাকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করছেন— অথচ নিজেরা কোনোপ্রকার পাশেই বদ্ধ হচ্ছেন না।

জগত্তারিণী। (নেপথ্যে মৃদুস্বরে) আঃ, নেপো কী ছেলেমানুষি করছিস। শিগ্‌গির চোখের জল মুছে ঘরের মধ্যে যা, লক্ষ্মী মা আমার— কেঁদে চোখ লাল করলে কী রকম ছিরি হবে ভেবে দেখ্ দেখি।—নীরো, যা না। তোদের সঙ্গে আর পারি নে বাপু। ভদ্রলোকদের কতক্ষণ বসিয়ে রাখবি। কী মনে করবেন।

শ্রীশ। ওই শুনছেন রসিকবাবু? এ অসহ্য। এর চেয়ে রাজপুতদের কন্যাহত্যা ভালো।

বিপিন। রসিকবাবু, এঁদের এই সংকট থেকে সম্পূর্ণ রক্ষা করবার জন্যে আপনি আমাদের যা বলবেন আমরা তাতেই প্রস্তুত আছি।

রসিক। কিছু না, আপনাদের আর অধিক কষ্ট দেব না। কেবল আজকের দিনটা উত্তীর্ণ করে দিয়ে যান, তার পরে আপনাদের আর-কিছুই ভাবতে হবে না।

শ্রীশ। ভাবতে হবে না? কী বলেন রসিকবাবু। আমরা কি পাষাণ। আজ থেকেই আমরা বিশেষরূপে এঁদের জন্যে ভাববার অধিকার পাব।

বিপিন। এমন ঘটনার পর আমরা যদি এঁদের সম্বন্ধে উদাসীন হই তবে আমরা কাপুরুষ।

শ্রীশ। এখন থেকে এঁদের জন্যে ভাবা আমাদের পক্ষে গর্বের বিষয়— গৌরবের বিষয়।

রসিক। তা বেশ, ভাববেন, কিন্তু বোধ হয় ভাবা ছাড়া আর কোনো কষ্ট করতে হবে না।

শ্রীশ। আচ্ছা রসিকবাবু, আমাদের কষ্ট স্বীকার করতে দিতে আপনার এত আপত্তি হচ্ছে কেন।

বিপিন। এঁদের জন্যে যদিই আমাদের কোনো কষ্ট করতে হয় সেটা যে আমরা সম্মান বলে জ্ঞান করব।

শ্রীশ। দু দিন ধরে, রসিকবাবু, বেশি কষ্ট পেতে হবে না ব'লে আপনি ক্রমাগতই আমাদের আশ্বাস দিচ্ছেন— এতে আমরা বাস্তবিক দুঃখিত হয়েছি।

রসিক। আমাকে মাপ করবেন— আমি আর কখনো এমন অবিবেচনার কাজ করব না। আপনারা কষ্ট স্বীকার করবেন।

শ্রীশ। আপনি কি এখনও আমাদের চিনলেন না।

রসিক। চিনেছি বৈকি, সেজন্যে আপনারা কিছুমাত্র চিন্তিত হবেন না।

কুণ্ঠিত নৃপবালা ও নীরবালার প্রবেশ

শ্রীশ। (নমস্কার করিয়া) রসিকবাবু, আপনি এঁদের বলুন আমাদের যেন মার্জনা করেন।

বিপিন। আমরা যদি ভ্রমেও ওঁদের লজ্জা বা ভয়ের কারণ হই তবে তার চেয়ে দুঃখের বিষয় আমাদের পক্ষে আর কিছুই হতে পারে না, সেজন্যে যদি ক্ষমা না করেন তবে—

রসিক। বিলক্ষণ! ক্ষমা চেয়ে অপরাধিনীদের অপরাধ আরও বাড়াবেন না। এঁদের অল্প বয়স, মান্য অতিথিদের কিরকম সম্ভাষণ করা উচিত তা যদি এঁরা হঠাৎ ভুলে গিয়ে নতমুখে দাঁড়িয়ে থাকেন তা হলে আপনাদের প্রতি অসদ্ভাব কল্পনা করে এঁদের আরও লজ্জিত করবেন না। নৃপদিদি, নীরদিদি, কী বল ভাই। যদিও এখনও তোমাদের চোখের পাতা শুকোয় নি তবু এঁদের প্রতি তোমাদের মন যে বিমুখ নয় সে কথা কি জানাতে পারি।

নৃপ ও নিরু লজ্জিত নিরুত্তর

না, একটু আড়ালে জিজ্ঞাসা করা দরকার। (জনান্তিকে) ভদ্রলোকদের এখন কী বলি বলো তো ভাই। বলব কি, তোমরা যত শীঘ্র পার বিদায় হও।

নীরবালা। (মৃদুস্বরে) রসিকদাদা, কী বক তার ঠিক নেই, আমরা কি তাই বলেছি— আমরা কি জানতুম এঁরা এসেছেন।

রসিক। (শ্রীশ ও বিপিনের প্রতি) এঁরা বলছেন—

সখা, কী মোর করমে লেখি—
তাপন বলিয়া তপনে ডরিনু,
চাঁদের কিরণ দেখি।

—এর উপরে আপনাদের আর কিছু বলবার আছে?

নীরবালা। (জনান্তিকে) আঃ রসিকদাদা, কী বলছ তার ঠিক নেই। ও কথা আমরা কখন বললুম।

রসিক। (শ্রীশ ও বিপিনের প্রতি) এঁদের মনের ভাবটা আমি সম্পূর্ণ ব্যক্ত করতে পারি নি বলে এঁরা আমাকে ভর্ৎসনা করছেন। এঁরা বলতে চান চাঁদের কিরণ বললেও যথেষ্ট বলা হয় না— তার চেয়ে আরও যদি—

নীরবালা। (জনান্তিকে) তুমি অমন কর যদি তা হলে আমরা চলে যাব।

রসিক। সখি, ন যুক্তম্ অকৃতসংকারম্ অতিথিবিশেষম্ উজ্‌ঝিত্বা স্বচ্ছন্দতো গমনম্। (শ্রীশ ও বিপিনের প্রতি) এঁরা বলছেন এঁদের যথার্থ মনের ভাবটি যদি আপনাদের কাছে ব্যক্ত করে বলি, তা হলে এঁরা লজ্জায় এ ঘর থেকে চলে যাবেন।

[নীরবালা ও নৃপবালার প্রস্থানোদ্যম

শ্রীশ। রসিকবাবুর অপরাধে আপনারা নির্দোষদের সাজা দেবেন কেন। আমরা তো কোনোপ্রকার প্রগল্‌ভতা করি নি।

নৃপবালা ও নীরবালার 'ন যযৌ ন তস্থৌ' ভাব

বিপিন। (নীরকে লক্ষ্য করিয়া) পূর্বকৃত কোনো অপরাধ যদি থাকে তো ক্ষমা-প্রার্থনার অবকাশ কি দেবেন না।

রসিক। (জনান্তিকে) এই ক্ষমাটুকুর জন্যে বেচারা অনেক দিন থেকে সুযোগ প্রত্যাশা করছে।

নীরবালা। (জনান্তিকে) অপরাধ কী হয়েছে যে ক্ষমা করতে যাব।

রসিক। (বিপিনের প্রতি) ইনি বলছেন আপনার অপরাধ এমন মনোহর যে তাকে ইনি অপরাধ বলে লক্ষ্যই করেন নি। কিন্তু, আমি যদি সেই খাতাটি হরণ করতে সাহসী হতেম তবে সেটা অপরাধ হত— আইনের বিশেষ ধারায় এই রকম লিখছে।

বিপিন। ঈর্ষা করবেন না রসিকবাবু। আপনারা সর্বদাই অপরাধ করবার সুযোগ পান এবং সেজন্যে দণ্ডভোগ করে কৃতার্থ হন। আমি দৈবক্রমে একটা অপরাধ

করবার সুযোগ পেয়েছিলুম, কিন্তু এতই অধম যে দণ্ডনীয় বলেও গণ্য হলেম না, ক্ষমা পাবার যোগ্যতাও লাভ করলেম না।

রসিক। বিপিনবাবু, একেবারে হতাশ হবেন না। শাস্তি অনেক সময় বিলম্বে আসে, কিন্তু নিশ্চিত আসে। ফস্ করে মুক্তি না পেতেও পারেন।

ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। জলখাবার তৈরি। [নৃপবালা ও নীরবালার প্রস্থান

শ্রীশ। আমরা কি দুর্ভিক্ষের দেশ থেকে আসছি রসিকবাবু। জলখাবারের জন্যে এত তাড়া কেন।

রসিক। মধুরেণ সমাপয়েৎ।

শ্রীশ। (নিশ্বাস ফেলিয়া) কিন্তু সমাপনটা তো মধুর নয়। (জনান্তিকে বিপিনের প্রতি) কিন্তু বিপিন, এঁদের তো প্রতারণা করে যেতে পারব না।

বিপিন। (জনান্তিকে) তা যদি করি তবে আমরা পাষণ্ড।

শ্রীশ। (জনান্তিকে) এখন আমাদের কর্তব্য কী।

বিপিন। (জনান্তিকে) সে কি আর জিজ্ঞাসা করতে হবে।

রসিক। আপনারা দেখছি ভয় পেয়ে গেছেন। কোনো আশঙ্কা নেই, শেষকালে যেমন করেই হোক আমি আপনাদের উদ্ধার করবই।

শ্রীশ ও বিপিন আহারে প্রবৃত্ত হইল

ঘরের অন্য দিকে অক্ষয় ও জগত্তারিণীর প্রবেশ

জগত্তারিণী। দেখলে তো বাবা, কেমন ছেলে দুটি?

অক্ষয়। মা, তোমার পছন্দ ভালো, এ কথা তো আমি অস্বীকার করতে পারি নে।

জগত্তারিণী। মেয়েদের রকম দেখলে তো বাবা? এখন কান্নাকাটি কোথায় গেছে তার ঠিক নেই।

অক্ষয়। ওই তো ওদের দোষ। কিন্তু মা, তোমাকে নিজে গিয়ে আশীর্বাদ ক'রে ছেলেদুটিকে দেখতে হচ্ছে।

জগত্তারিণী। সে কি ভালো হবে অক্ষয়। ওরা কি পছন্দ জানিয়েছে।

অক্ষয়। খুব জানিয়েছে। এখন তুমি নিজে এসে আশীর্বাদ করে গেলেই চট্‌পট্ স্থির হয়ে যায়।

জগত্তারিণী। তা বেশ, তোমরা যদি বল, তা যাব, আমি ওদের মার বয়সী— আমার লজ্জা কিসের।

পুরবালার প্রবেশ

জগত্তারিণী। কী আর বলব পুরো, এমন সোনার চাঁদ ছেলে।

পুরবালা। তা জানতুম। নীর-নৃপর অদৃষ্টে কি খারাপ ছেলে হতে পারে।

অক্ষয়। তাদের বড়দিদির অদৃষ্টের আঁচ লেগেছে আর-কি।

পুরবালা। আচ্ছা, থামো। যাও দেখি, তাদের সঙ্গে একটু আলাপ করো গে; কিন্তু শৈল গেল কোথায়।

অক্ষয়। সে খুশি হয়ে দরজা বন্ধ করে পুজোয় বসেছে।

শ্রীশ ও বিপিনের নিকট আসিয়া

ব্যাপারটা কী। রসিকদা, আজকাল তো খুব খাওয়াচ্ছ দেখছি। প্রত্যহ যাকে দু বেলা দেখছ তাকে হঠাৎ ভুলে গেলে?

রসিক। এঁদের নূতন আদর, পাতে যা পড়ছে তাতেই খুশি হচ্ছেন। তোমার আদর পুরোনো হয়ে এল, তোমাকে নতুন করে খুশি করি এমন সাধ্য নেই ভাই।

অক্ষয়। কিন্তু শুনেছিলেম, আজকের সমস্ত মিষ্টান্ন এবং এ পরিবারের সমস্ত অনাস্বাদিত মধু উজাড় করে নেবার জন্যে দুটি অখ্যাতনামা যুবকের অভ্যুদয় হবে— এঁরা তাঁদেরই অংশে ভাগ বসাচ্ছেন নাকি। ওহে রসিকদা, ভুল কর নি তো?

রসিক। ভুলের জন্যেই তো আমি বিখ্যাত। বড়োমা জানেন তাঁর বুড়ো রসিককাকা যাতে হাত দেবেন তাতেই গলদ হবে।

অক্ষয়। বল কী রসিকদাদা। করেছ কী। সে দুটি ছেলেকে কোথায় পাঠালে?

রসিক। ভ্রমক্রমে তাঁদের ভুল ঠিকানা দিয়েছি।

অক্ষয়। সে বেচারাদের কী গতি হবে।

রসিক। বিশেষ অনিষ্ট হবে না। তাঁরা কুমারটুলিতে নীলমাধব চৌধুরির বাড়িতে এতক্ষণে জলযোগ সমাধা করেছেন। বনমালী ভট্টাচার্য তাঁদের তত্ত্বাবধানের ভার নিয়েছেন।

অক্ষয়। তা যেন বুঝলুম, মিষ্টান্ন সকলেরই পাতে পড়ল, কিন্তু তোমারই জলযোগটি কিছু কটু রকম হবে। এইবেলা ভ্রম সংশোধন করে নাও। শ্রীশবাবু, বিপিনবাবু, কিছু মনে কোরো না— এর মধ্যে একটু পারিবারিক রহস্য আছে।

শ্রীশ। সরলপ্রকৃতি রসিকবাবু সে রহস্য আমাদের নিকট ভেদ করেই দিয়েছেন। আমাদের ফাঁকি দিয়ে আনেন নি।

বিপিন। মিষ্টান্নের থালায় আমরা অনধিকার আক্রমণ করি নি, শেষ পর্যন্ত তার প্রমাণ দিতে প্রস্তুত আছি।

অক্ষয়। বল কী বিপিনবাবু। তা হলে চিরকুমার-সভাকে চিরজন্মের মতো কাঁদিয়ে

এসেছ ? জেনেশুনে, ইচ্ছাপূর্বক ?

রসিক। না না, তুমি ভুল করছ অক্ষয়।

অক্ষয়। আবার ভুল ? আজ কি সকলেরই ভুল করবার দিন হল নাকি।—

গান

ভুলে ভুলে আজ ভুলময়।
ভুলের লতায় বাতাসের ভুলে
ফুলে ফুলে হোক ফুলময়।
আনন্দ-ঢেউ ভুলের সাগরে উছলিয়া হোক কূলময়।

রসিক। এ কী, বড়োমা আসছেন যে !

অক্ষয়। আসবারই তো কথা। উনি তো কুমারটুলির ঠিকানায় যাবেন না।

জগত্তারিণীর প্রবেশ

শ্রীশ ও বিপিনের ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম

দুইজনকে দুই মোহর দিয়া জগত্তারিণীর আশীর্বাদ। জনান্তিকে অক্ষয়ের সহিত জগত্তারিণীর আলাপ

অক্ষয়। মা বলছেন, তোমাদের আজ ভালো করে খাওয়া হল না, সমস্তই পাতে পড়ে রইল।

শ্রীশ। আমরা দুবার চেয়ে নিয়ে খেয়েছি।

বিপিন। যেটা পাতে পড়ে আছে ওটা তৃতীয় কিস্তি।

শ্রীশ। ওটা না পড়ে থাকলে আমাদেরই পড়ে থাকতে হত।

জগত্তারিণী। (জনান্তিকে) তা হলে তোমরা ওঁদের বসিয়ে কথাবার্তা কও বাছা, আমি আসি। [প্রস্থান

রসিক। না, এ ভারী অন্যায় হল।

অক্ষয়। অন্যায়টা কী হল।

রসিক। আমি ওঁদের বার বার করে বলে এসেছি যে, ওঁরা কেবল আজ আহারটি করেই ছুটি পাবেন, কোনোরকম বধবন্ধনের আশঙ্কা নেই। কিন্তু—

শ্রীশ। ওর মধ্যে কিন্তুটা কোথায় রসিকবাবু। আপনি অত চিন্তিত হচ্ছেন কেন।

রসিক। বলেন কী শ্রীশবাবু, আপনাদের আমি কথা দিয়েছি যখন—

বিপিন। তা বেশ তো, এমনিই কী মহাবিপদে ফেলেছেন।

শ্রীশ। মা আমাদের যে আশীর্বাদ করে গেলেন আমরা যেন তার যোগ্য হই।

রসিক। না না, শ্রীশবাবু, সে কোনো কাজের কথা নয়। আপনারা যে দায়ে পড়ে ভদ্রতার খাতিরে—

বিপিন। রসিকবাবু, আমাদের প্রতি অবিচার করবেন না— দায়ে পড়ে—

রসিক। দায় নয় তো কী মশায়। সে কিছুতেই হবে না। আমি বরঞ্চ সেই ছেলেদুটোকে বনমালীর হাত ছাড়িয়ে কুমারটুলি থেকে এখনও ফিরিয়ে আনব, তবু—

শ্রীশ। আপনার কাছে কী অপরাধ করেছি রসিকবাবু।

রসিক। না না, এ তো অপরাধের কথা হচ্ছে না। আপনারা ভদ্রলোক, কৌমার্যব্রত অবলম্বন করেছেন— আমার অনুরোধে পড়ে পরের উপকার করতে এসে শেষকালে—

বিপিন। শেষকালে নিজের উপকার করে ফেলব এটুকু আপনি সহ্য করতে পারবেন না— এমনি হিতৈষী বন্ধু!

শ্রীশ। আমরা যেটাকে সৌভাগ্য বলে স্বীকার করছি। আপনি তার থেকে আমাদের বঞ্চিত করতে চেষ্টা করছেন কেন।

রসিক। শেষকালে আমাকে দোষ দেবেন না।

বিপিন। নিশ্চয় দেব, যদি না আপনি স্থির হয়ে শুভকর্মে সহায়তা করেন।

রসিক। আমি এখনও সাবধান করছি—

গতং তদ্গাম্ভীর্যং তটমপি চিতং জালিকশতৈঃ
সখে হংসোত্তিষ্ঠ ত্বরিতমমুতো গচ্ছ সরসঃ।

সে গাম্ভীর্য গেল কোথা, নদীতট হেরো হোথা
জালিকেরা জালে ফেলে ঘিরে—
সখে হংস, ওঠো ওঠো, সময় থাকিতে ছোটো
হেথা হতে মানসের তীরে।

শ্রীশ। কিছুতেই না। তা, আপনার সংস্কৃত শ্লোক ছুঁড়ে মারলেও সখা হংসরা কিছুতেই এখান থেকে নড়ছেন না।

রসিক। স্থান খারাপ বটে, নড়বার জো নেই। আমি তো অচল হয়ে বসে আছি— হায় হায়—

অয়ি কুরঙ্গ তপোবনবিভ্রমাৎ
উপগতাসি কিরাতপুরীমিমাম্।

ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। চন্দ্রবাবু এসেছেন।

অক্ষয়। এইখানেই ডেকে নিয়ে আয়। [ভৃত্যের প্রস্থান

রসিক। একেবারে দারোগার হাতে চোর-দুটিকে সমর্পণ করে দেওয়া হোক।

চন্দ্রবাবুর প্রবেশ

চন্দ্রবাবু। এই-যে, আপনারা এসেছেন। পূর্ণবাবুকেও দেখছি।

অক্ষয়। আজ্ঞে না, আমি পূর্ণ নই, তবু অক্ষয় বটে।

চন্দ্রবাবু। অক্ষয়বাবু। তা, বেশ হয়েছে, আপনাকেও দরকার ছিল।

অক্ষয়। আমার মতো অদরকারি লোককে যে দরকারে লাগাবেন তাতেই লাগতে পারি— বলুন কী করতে হবে।

চন্দ্রবাবু। আমি ভেবে দেখেছি, আমাদের সভা থেকে কুমারব্রতের নিয়ম না ওঠালে সভাকে অত্যন্ত সংকীর্ণ করে রাখা হচ্ছে। শ্রীশবাবু বিপিনবাবুকে এই কথাটা একটু ভালো করে বোঝাতে হবে।

অক্ষয়। ভারী কঠিন কাজ, আমার দ্বারা হবে কিনা সন্দেহ।

চন্দ্রবাবু। একবার একটা মতকে ভালো ব'লে গ্রহণ করেছি ব'লেই সেটাকে পরিত্যাগ করবার ক্ষমতা দূর করা উচিত নয়। মতের চেয়ে বিবেচনাশক্তি বড়ো। শ্রীশবাবু, বিপিনবাবু—

শ্রীশ। আমাদের অধিক বলা বাহুল্য—

চন্দ্রবাবু। কেন বাহুল্য। আপনারা যুক্তিতেও কর্ণপাত করবেন না?

বিপিন। আমরা আপনারই মতে—

চন্দ্রবাবু। আমার মত এক সময় ভ্রান্ত ছিল সে কথা স্বীকার করছি, আপনারা এখনও সেই মতেই—

রসিক। এই-যে পূর্ণবাবু আসছেন। আসুন আসুন।

পূর্ণর প্রবেশ

চন্দ্রবাবু। পূর্ণবাবু, তোমার প্রস্তাবমতে আমাদের সভা থেকে কুমারব্রত তুলে দেবার জন্যেই আজ আমরা এখানে মিলিত হয়েছি। কিন্তু, শ্রীশবাবু এবং বিপিনবাবু অত্যন্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, এখন ওঁদের বোঝাতে পারলেই—

রসিক। ওঁদের বোঝাতে আমি ত্রুটি করি নি চন্দ্রবাবু—

চন্দ্রবাবু। আপনার মতো বাগ্মী যদি ফল না পেয়ে থাকেন তা হলে—

রসিক। ফল যা পেয়েছি 'তা ফলেন পরিচীয়তে'।

চন্দ্রবাবু। কী বলছেন ভালো বুঝতে পারছি নে।

অক্ষয়। ওহে রসিকদা, চন্দ্রবাবুকে খুব স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার। আমি দুটি প্রত্যক্ষ প্রমাণ এখনই এনে উপস্থিত করছি।

শ্রীশ। পূর্ণবাবু, ভালো আছেন তো?

পূর্ণ। হাঁ।

বিপিন। আপনাকে একটু শুকনো দেখাচ্ছে।

পূর্ণ। না, কিছু না।

শ্রীশ। আপনাদের পরীক্ষার আর তো দেরি নেই।

পূর্ণ। না।

নৃপবালা ও নীরবালাকে লইয়া অক্ষয়ের প্রবেশ

অক্ষয়। (নৃপবালা ও নীরবালার প্রতি) ইনি চন্দ্রবাবু, ইনি তোমাদের গুরুজন, এঁকে প্রণাম করো। (নৃপ ও নীরর প্রণাম) চন্দ্রবাবু, নূতন নিয়মে আপনাদের সভায় এই দুটি সভ্য বাড়ল।

চন্দ্রবাবু। বড়ো খুশি হলেম। এঁরা কে।

অক্ষয়। আমার সঙ্গে এঁদের সম্বন্ধ খুব ঘনিষ্ঠ। এঁরা আমার দুটি শ্যালী। শ্রীশবাবু এবং বিপিনবাবুর সঙ্গে এঁদের সম্বন্ধ শুভলগ্নে আরও ঘনিষ্ঠতর হবে। এঁদের প্রাত দৃষ্টি করলেই বুঝবেন, রসিকবাবু এই যুবক-দুটির যে মতের পরিবর্তন করিয়েছেন সে কেবলমাত্র বাগ্মিতার দ্বারা নয়।

চন্দ্রবাবু। বড়ো আনন্দের কথা।

পূর্ণবাবু। শ্রীশবাবু, বড়ো খুশী হলুম। বিপিনবাবু, আপনাদের বড়ো সৌভাগ্য। আশা করি অবলাকান্তবাবুও বঞ্চিত হন নি, তাঁরও একটি—

নির্মলার প্রবেশ

চন্দ্রবাবু। নির্মলা, শুনে খুশি হবে, শ্রীশবাবু এবং বিপিনবাবুর সঙ্গে এঁদের বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হয়ে গেছে। তা হলে কুমারব্রত উঠিয়ে দেওয়া সম্বন্ধে প্রস্তাব উত্থাপন করাই বাহুল্য।

নির্মলা। কিন্তু অবলাকান্তবাবুর মত তো নেওয়া হয় নি— তাঁকে এখানে দেখছি নে—

চন্দ্রবাবু। ঠিক কথা, আমি সেটা ভুলেই গিয়েছিলুম— তিনি আজ এখনও এলেন না কেন।

রসিক। কিছু চিন্তা করবেন না, তাঁর পরিবর্তন দেখলে আপনারা আরও আশ্চর্য হবেন।

অক্ষয়। চন্দ্রবাবু, এবারে আমাকেও দলে নেবেন। সভাটি যেরকম লোভনীয় হয়ে উঠল এখন আমাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবেন না।

চন্দ্রবাবু। আপনাকে পাওয়া আমাদের সৌভাগ্য।

অক্ষয়। আমার সঙ্গে সঙ্গে আর-একটি সভ্যও পাবেন। আজকের সভায় তাঁকে কিছুতেই উপস্থিত করতে পারলেম না। এখন তিনি নিজেকে সুলভ করবেন না— বাসরঘরে ভূতপূর্ব কুমারসভাটিকে সাধ্যমতো পিণ্ডদান করে তার পরে যদি দেখা দেন। এইবার অবশিষ্ট সভ্যটি এলেই আমাদের চিরকুমার-সভা সম্পূর্ণ সমাপ্ত হয়।

শৈলবালার প্রবেশ

শৈলবালা। (চন্দ্রবাবুকে প্রণাম করিয়া) আমাকে ক্ষমা করবেন।

শ্রীশ। এ কী, অবলাকান্তবাবু—

অক্ষয়। আপনারা মত-পরিবর্তন করেছেন, ইনি বেশ-পরিবর্তন করেছেন মাত্র।

রসিক। শৈলজা ভবানী এতদিন কিরাতবেশ ধারণ করে ছিলেন, আজ ইনি আবার তপস্বিনীবেশ গ্রহণ করলেন।

চন্দ্রবাবু। নির্মলা, আমি কিছুই বুঝতে পারছি নে।

নির্মলা। অন্যায়! ভারী অন্যায়! অবলাকান্তবাবু—

অক্ষয়। নির্মলা দেবী ঠিক বলেছেন— অন্যায়। কিন্তু, সে বিধাতার অন্যায়। এঁর অবলাকান্ত হওয়াই উচিত ছিল, কিন্তু ভগবান এঁকে বিধবা শৈলবালা করে কী মঙ্গল সাধন করছেন সে রহস্য আমাদের অগোচর।

শৈলবালা। (নির্মলার প্রতি) আমি অন্যায় করেছি, সে অন্যায়ের প্রতিকার আমার দ্বারা কী হবে? আশা করি কালে সমস্ত সংশোধন হয়ে যাবে।

পূর্ণ। (নির্মলার নিকটে আসিয়া) এই অবকাশে আমি আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি, চন্দ্রবাবুর পত্রে আমি যে স্পর্ধা প্রকাশ করেছিলুম সে আমার পক্ষে অন্যায় হয়েছিল— আমার মতো অযোগ্য—

চন্দ্রবাবু। কিছু অন্যায় হয় নি পূর্ণবাবু, আপনার যোগ্যতা যদি নির্মলা না বুঝতে পারেন তো সে নির্মলারই বিবেচনার অভাব। [নির্মলার নতমুখে নিরুত্তরে প্রস্থান

রসিক। (পূর্ণের প্রতি জনান্তিকে) ভয় নেই পূর্ণবাবু, আপনার দরখাস্ত মঞ্জুর— প্রজাপতির আদালতে ডিক্রী পেয়েছেন— কাল প্রত্যুষেই জারি করতে বেরোবেন।

শ্রীশ। (শৈলবালার প্রতি) বড়ো ফাঁকি দিয়েছেন।

বিপিন। সম্বন্ধের পূর্বেই পরিহাসটা করে নিয়েছেন।

শৈলবালা। পরে তাই বলে নিষ্কৃতি পাবেন না।

বিপিন। নিষ্কৃতি চাই নে।

রসিক। এইবারে নাটক শেষ হল। এইখানে ভরতবাক্য উচ্চারণ করে দেওয়া যাক—

সর্বস্তরতু দুর্গাণি সর্বো ভদ্রাণি পশ্যতু।
সর্বঃ কামানবাপ্নোতু সর্বঃ সর্বত্র নন্দতু॥

উপন্যাস ও গল্প

গল্পগুচ্ছ

গল্পগুচ্ছ

খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাইচরণ যখন বাবুদের বাড়ি প্রথম চাকরি করিতে আসে তখন তাহার বয়স বারো। যশোহর জিলায় বাড়ি, লম্বা চুল, বড়ো বড়ো চোখ, শ্যামচিক্কণ ছিপ্‌ছিপে বালক। জাতিতে কায়স্থ। তাহার প্রভুরাও কায়স্থ। বাবুদের এক-বৎসর-বয়স্ক একটি শিশুর রক্ষণ ও পালন -কার্যে সহায়তা করা তাহার প্রধান কর্তব্য ছিল।

সেই শিশুটি কালক্রমে রাইচরণের কক্ষ ছাড়িয়া স্কুলে, স্কুল ছাড়িয়া কলেজে, অবশেষে কলেজ ছাড়িয়া মুন্‌সেফিতে প্রবেশ করিয়াছে। রাইচরণ এখনো তাঁহার ভৃত্য।

তাহার আর-একটি মনিব বাড়িয়াছে। মাঠাকুরানী ঘরে আসিয়াছেন; সুতরাং অনুকূলবাবুর উপর রাইচরণের পূর্বে যতটা অধিকার ছিল তাহার অধিকাংশই নূতন কর্ত্রীর হস্তগত হইয়াছে।

কিন্তু কর্ত্রী যেমন রাইচরণের পূর্বাধিকার কতকটা হ্রাস করিয়া লইয়াছেন তেমনি একটি নূতন অধিকার দিয়া অনেকটা পূরণ করিয়া দিয়াছেন। অনুকূলের একটি পুত্রসন্তান অল্পদিন হইল জন্মলাভ করিয়াছে, এবং রাইচরণ কেবল নিজের চেষ্টা ও অধ্যবসায়ে তাহাকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিয়া লইয়াছে।

তাহাকে এমনি উৎসাহের সহিত দোলাইতে আরম্ভ করিয়াছে, এমনি নিপুণতার সহিত তাহাকে দুই হাতে ধরিয়া আকাশে উৎক্ষিপ্ত করে, তাহার মুখের কাছে আসিয়া এমনি সশব্দে শিরশ্চালন করিতে থাকে, উত্তরের কোনো প্রত্যাশা না করিয়া এমন-সকল সম্পূর্ণ অর্থহীন অসংগত প্রশ্ন সুর করিয়া শিশুর প্রতি প্রয়োগ করিতে

থাকে যে, এই ক্ষুদ্র আনুকৌলবটি রাইচরণকে দেখিলে একেবারে পুলকিত হইয়া উঠে।

অবেশেষে ছেলেটি যখন হামাগুড়ি দিয়া অতি সাবধানে চৌকাঠ পার হইত এবং কেহ ধরিতে আসিলে খিল্ খিল্ হাস্যকলরব তুলিয়া দ্রুতবেগে নিরাপদ স্থানে লুকাইতে চেষ্টা করিত, তখন রাইচরণ তাহার অসাধারণ চাতুর্য ও বিচারশক্তি দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া যাইত। মার কাছে গিয়া সগর্ব সবিস্ময়ে বলিত, 'মা, তোমার ছেলে বড়ো হলে জজ হবে, পাঁচ হাজার টাকা রোজগার করবে।'

পৃথিবীতে আর-কোনো মানবসন্তান যে এই বয়সে চৌকাঠ-লঙ্ঘন প্রভৃতি অসম্ভব চাতুর্যের পরিচয় দিতে পারে তাহা রাইচরণের ধ্যানের অগম্য, কেবল ভবিষ্যৎ জজেদের পক্ষে কিছুই আশ্চর্য নহে।

অবশেষে শিশু যখন টল্‌মল্ করিয়া চলিতে আরম্ভ করিল সে এক আশ্চর্য ব্যাপার— এবং যখন মাকে মা, পিসিকে পিচি, এবং রাইচরণকে চন্ন বলিয়া সম্ভাষণ করিল, তখন রাইচরণ সেই প্রত্যয়াতীত সংবাদ যাহার-তাহার কাছে ঘোষণা করিতে লাগিল।

সব চেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এই যে 'মাকে মা বলে, পিসিকে পিসি বলে, কিন্তু আমাকে বলে চন্ন'। বাস্তবিক, শিশুটির মাথায় এ বুদ্ধি কী করিয়া জোগাইল বলা শক্ত। নিশ্চয়ই কোনো বয়স্ক লোক কখনোই এরূপ অলোকসামান্যতার পরিচয় দিত না, এবং দিলেও তাহার জজের পদপ্রাপ্তি-সম্ভাবনা সম্বন্ধে সাধারণের সন্দেহ উপস্থিত হইত।

কিছুদিন বাদে মুখে দড়ি দিয়া রাইচরণকে ঘোড়া সাজিতে হইল। এবং মল্ল সাজিয়া তাহাকে শিশুর সহিত কুস্তি করিতে হইত— আবার পরাভূত হইয়া ভূমিতে পড়িয়া না গেলে বিষম বিপ্লব বাধিত।

এই সময়ে অনুকূল পদ্মাতীরবর্তী এক জিলায় বদলি হইলেন। অনুকূল তাঁহার শিশুর জন্য কলিকাতা হইতে এক ঠেলাগাড়ি লইয়া গেলেন। সাটিনের জামা এবং মাথায় একটা জরির টুপি, হাতে সোনার বালা এবং পায়ে দুইগাছি মল পরাইয়া রাইচরণ নবকুমারকে দুইবেলা গাড়ি করিয়া হাওয়া খাওয়াইতে লইয়া যাইত।

বর্ষাকাল আসিল। ক্ষুধিত পদ্মা উদ্যান গ্রাম শস্যক্ষেত্র এক-এক গ্রাসে মুখে পুরিতে লাগিল। বালুকাচরের কাশবন এবং বনঝাউ জলে ডুবিয়া গেল। পাড় ভাঙার অবিশ্রাম ঝুপ্‌ঝাপ্ শব্দ এবং জলের গর্জনে দশ দিক মুখরিত হইয়া উঠিল, এবং দ্রুত বেগে ধাবমান ফেনরাশি নদীর তীব্র গতিকে প্রত্যক্ষগোচর করিয়া তুলিল।

অপরাহ্ণে মেঘ করিয়াছিল, কিন্তু বৃষ্টির কোনো সম্ভাবনা ছিল না। রাইচরণের খামখেয়ালী ক্ষুদ্র প্রভু কিছুতেই ঘরে থাকিতে চাহিল না। গাড়ির উপর চড়িয়া

বসিল। রাইচরণ ধীরে ধীরে গাড়ি ঠেলিয়া ধান্যক্ষেত্রের প্রান্তে নদীর তীরে আসিয়া উপস্থিত হইল। নদীতে একটিও নৌকা নাই, মাঠে একটিও লোক নাই— মেঘের ছিদ্র দিয়া দেখা গেল, পরপারে জনহীন বালুকাতীরে শব্দহীন দীপ্ত সমারোহের সহিত সূর্যাস্তের আয়োজন হইতেছে। সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে শিশু সহসা এক দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিল, 'চন্ন, ফু।'

অনতিদূরে সজল পঙ্কিল ভূমির উপর একটি বৃহৎ কদম্ববৃক্ষের উচ্চশাখায় গুটিকতক কদম্বফুল ফুটিয়াছিল, সেই দিকে শিশুর লুব্ধ দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল। দুই-চারি দিন হইল রাইচরণ কাঠি দিয়া বিদ্ধ করিয়া তাহাকে কদম্বফুলের গাড়ি বানাইয়া দিয়াছিল, তাহাতে দড়ি বাঁধিয়া টানিতে এত আনন্দ বোধ হইয়াছিল যে সেদিন রাইচরণকে আর লাগাম পরিতে হয় নাই; ঘোড়া হইতে সে একেবারেই সহিসের পদে উন্নীত হইয়াছিল।

কাদা ভাঙিয়া ফুল তুলিতে যাইতে চন্নর প্রবৃত্তি হইল না— তাড়াতাড়ি বিপরীত দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিল, 'দেখো দেখো ও—ই দেখো পাখি— ওই উড়ে—এ গেল। আয় রে পাখি আয় আয়।' এইরূপ অবিশ্রান্ত বিচিত্র কলরব করিতে করিতে সবেগে গাড়ি ঠেলিতে লাগিল।

কিন্তু যে ছেলের ভবিষ্যতে জজ হইবার কোনো সম্ভাবনা আছে তাহাকে এরূপ সামান্য উপায়ে ভুলাইবার প্রত্যাশা করা বৃথা— বিশেষত চারি দিকে দৃষ্টি-আকর্ষণের উপযোগী কিছুই ছিল না এবং কাল্পনিক পাখি লইয়া অধিক ক্ষণ কাজ চলে না।

রাইচরণ বলিল, 'তবে তুমি গাড়িতে বসে থাকো, আমি চট করে ফুল তুলে আনছি। খবরদার, জলের ধারে যেয়ো না।' বলিয়া হাঁটুর উপর কাপড় তুলিয়া কদম্ববৃক্ষের অভিমুখে চলিল।

কিন্তু, ওই-যে জলের ধারে যাইতে নিষেধ করিয়া গেল, তাহাতে শিশুর মন কদম্বফুল হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সেই মুহূর্তেই জলের দিকে ধাবিত হইল। দেখিল, জল খল্‌খল্ ছল্‌ছল্ করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে; যেন দুষ্টামি করিয়া কোন্‌-এক বৃহৎ রাইচরণের হাত এড়াইয়া এক লক্ষ শিশুপ্রবাহ সহাস্য কলস্বরে নিষিদ্ধ স্থানাভিমুখে দ্রুত বেগে পলায়ন করিতেছে।

তাহাদের সেই অসাধু দৃষ্টান্তে মানবশিশুর চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। গাড়ি হইতে আস্তে আস্তে নামিয়া জলের ধারে গেল, একটা দীর্ঘ তৃণ কুড়াইয়া লইয়া তাহাকে ছিপ কল্পনা করিয়া ঝুঁকিয়া মাছ ধরিতে লাগিল— দুরন্ত জলরাশি অস্ফুট কলভাষায় শিশুকে বার বার আপনাদের খেলাঘরে আহ্বান করিল।

একবার ঝপ্ করিয়া একটা শব্দ হইল, কিন্তু বর্ষার পদ্মাতীরে এমন শব্দ কত শোনা যায়। রাইচরণ আঁচল ভরিয়া কদম্বফুল তুলিল। গাছ হইতে নামিয়া সহাস্যমুখে গাড়ির কাছে আসিয়া দেখিল, কেহ নাই। চারি দিকে চাহিয়া দেখিল কোথাও কাহারও কোনো চিহ্ন নাই।

মুহূর্তে রাইচরণের শরীরের রক্ত হিম হইয়া গেল। সমস্ত জগৎসংসার মলিন বিবর্ণ ধোঁওয়ার মতো হইয়া আসিল। ভাঙা বুকের মধ্য হইতে একবার প্রাণপণ চীৎকার করিয়া ডাকিয়া উঠিল, 'বাবু খোকাবাবু— লক্ষ্মী দাদাবাবু আমার।'

কিন্তু চন্ন বলিয়া কেহ উত্তর দিল না, দুষ্টামি করিয়া কোনো শিশুর কণ্ঠ হাসিয়া উঠিল না; কেবল পদ্মা পূর্ববৎ ছল্‌ছল্ খল্‌খল্ করিয়া ছুটিয়া চলিতে লাগিল, যেন সে কিছুই জানে না এবং পৃথিবীর এই-সকল সামান্য ঘটনায় মনোযোগ দিতে তাহার যেন এক মুহূর্ত সময় নাই।

সন্ধ্যা হইয়া আসিলে উৎকণ্ঠিত জননী চারি দিকে লোক পাঠাইয়া দিলেন। লণ্ঠন হাতে নদীতীরে লোক আসিয়া দেখিল, রাইচরণ নিশীথের ঝোড়ো বাতাসের মতো সমস্ত ক্ষেত্রময় 'বাবু' 'খোকাবাবু' আমার' বলিয়া ভগ্নকণ্ঠে চীৎকার করিয়া বেড়াইতেছে। অবশেষে ঘরে ফিরিয়া রাইচরণ দড়াম করিয়া মাঠাকরুনের পায়ের কাছে আসিয়া আছাড় খাইয়া পড়িল। তাহাকে যত জিজ্ঞাসা করে সে কাঁদিয়া বলে, 'জানি নে মা।'

যদিও সকলেই মনে মনে বুঝিল পদ্মারই এই কাজ, তথাপি গ্রামের প্রান্তে যে এক দল বেদের সমাগম হইয়াছে তাহাদের প্রতিও সন্দেহ দূর হইল না। এবং মাঠাকুরানীর মনে এমন সন্দেহ উপস্থিত হইল যে রাইচরণই বা চুরি করিয়াছে; এমন-কি তাহাকে ডাকিয়া অত্যন্ত অনুনয়পূর্বক বলিলেন, 'তুই আমার বাছাকে ফিরিয়ে এনে দে— তুই যত টাকা চাস তোকে দেব।' শুনিয়া রাইচরণ কেবল কপালে করাঘাত করিল। গৃহিণী তাহাকে দূর করিয়া তাড়াইয়া দিলেন।

অনুকূলবাবু তাঁহার স্ত্রীর মন হইতে রাইচরণের প্রতি এই অন্যায় সন্দেহ দূর করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন রাইচরণ এমন জঘন্য কাজ কী উদ্দেশ্যে করিতে পারে। গৃহিণী বলিলেন, 'কেন। তাহার গায়ে সোনার গহনা ছিল।'

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাইচরণ দেশে ফিরিয়া গেল। এতকাল তাহার সন্তানাদি হয় নাই, হইবার বিশেষ আশাও ছিল না। কিন্তু দৈবক্রমে, বৎসর না যাইতেই, তাহার স্ত্রী অধিক বয়সে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিয়া লোকলীলা সম্বরণ করিল।

এই নবজাত শিশুটির প্রতি রাইচরণের অত্যন্ত বিদ্বেষ জন্মিল। মনে করিল, এ যেন ছল করিয়া খোকাবাবুর স্থান অধিকার করিতে আসিয়াছে। মনে করিল, প্রভুর একমাত্র ছেলেটি জলে ভাসাইয়া নিজে পুত্রসুখ উপভোগ করা যেন একটি মহাপাতক। রাইচরণের বিধবা ভগ্নী যদি না থাকিত তবে এ শিশুটি পৃথিবীর বায়ু বেশিদিন ভোগ করিতে পাইত না।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই ছেলেটিও কিছুদিন বাদে চৌকাঠ পার হইতে আরম্ভ করিল এবং সর্বপ্রকার নিষেধ লঙ্ঘন করিতে সকৌতুক চতুরতা প্রকাশ করিতে লাগিল। এমন-কি, ইহার কণ্ঠস্বর হাস্যক্রন্দনধ্বনি অনেকটা সেই শিশুরই মতো। এক-একদিন যখন ইহার কান্না শুনিত রাইচরণের বুকটা সহসা ধড়াস্ করিয়া উঠিত, মনে হইত দাদাবাবু রাইচরণকে হারাইয়া কোথায় কাঁদিতেছে।

ফেল্‌না— রাইচরণের ভগ্নী ইহার নাম রাখিয়াছিল ফেল্‌না— যথাসময়ে পিসিকে পিসি বলিয়া ডাকিল। সেই পরিচিত ডাক শুনিয়া একদিন হঠাৎ রাইচরণের মনে হইল, 'তবে তো খোকাবাবু আমার মায়া ছাড়িতে পারে নাই, সে তো আমার ঘরে আসিয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছে।'

এই বিশ্বাসের অনুকূলে কতকগুলি অকাট্য যুক্তি ছিল। প্রথমত, সে যাইবার অনতি-বিলম্বেই ইহার জন্ম। দ্বিতীয়ত, এতকাল পরে সহসা যে তাহার স্ত্রীর গর্ভে সন্তান জন্মে এ কখনোই স্ত্রীর নিজগুণে হইতে পারে না। তৃতীয়ত, এও হামাগুড়ি দেয়, টল্‌মল্ করিয়া চলে এবং পিসিকে পিসি বলে। যে-সকল লক্ষণ থাকিলে ভবিষ্যতে জজ হইবার কথা তাহার অনেকগুলি ইহাতে বর্তিয়াছে।

তখন মাঠাকরুনের সেই দারুণ সন্দেহের কথা হঠাৎ মনে পড়িল— আশ্চর্য হইয়া মনে মনে কহিল, 'আহা, মায়ের মন জানিতে পারিয়াছিল তাহার ছেলেকে কে চুরি করিয়াছে।' তখন, এতদিন শিশুকে যে অযত্ন করিয়াছে সেজন্য বড়ো অনুতাপ উপস্থিত হইল। শিশুর কাছে আবার ধরা দিল।

এখন হইতে ফেল্‌নাকে রাইচরণ এমন করিয়া মানুষ করিতে লাগিল যেন সে বড়ো ঘরের ছেলে। সাটিনের জামা কিনিয়া দিল। জরির টুপি আনিল। মৃত স্ত্রীর গহনা

গলাইয়া চুড়ি এবং বালা তৈয়ারি হইল। পাড়ার কোনো ছেলের সহিত তাহাকে খেলিতে দিত না; রাত্রিদিন নিজেই তাহার একমাত্র খেলার সঙ্গী হইল। পাড়ার ছেলেরা সুযোগ পাইলে তাহাকে নবাবপুত্র বলিয়া উপহাস করিত এবং দেশের লোক রাইচরণের এইরূপ উন্মত্তবৎ আচরণে আশ্চর্য হইয়া গেল।

ফেল্‌নার যখন বিদ্যাভ্যাসের বয়স হইল তখন রাইচরণ নিজের জোৎজমা সমস্ত বিক্রয় করিয়া ছেলেটিকে কলিকাতায় লইয়া গেল। সেখানে বহুকষ্টে একটি চাকরি যোগাড় করিয়া ফেল্‌নাকে বিদ্যালয়ে পাঠাইল। নিজে যেমন তেমন করিয়া থাকিয়া ছেলেকে ভালো খাওয়া, ভালো পরা, ভালো শিক্ষা দিতে ত্রুটি করিত না। মনে মনে বলিত, 'বৎস, ভালোবাসিয়া আমার ঘরে আসিয়াছ বলিয়া যে তোমার কোনো অযত্ন হইবে, তা হইবে না।'

এমনি করিয়া বারো বৎসর কাটিয়া গেল। ছেলে পড়ে শুনে ভালো এবং দেখিতে শুনিতেও বেশ, হৃষ্টপুষ্ট, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ— কেশবেশবিন্যাসের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি, মেজাজ কিছু সুখী এবং শৌখিন। বাপকে ঠিক বাপের মতো মনে করিতে পারিত না। কারণ, রাইচরণ স্নেহে বাপ এবং সেবায় ভৃত্য ছিল, এবং তাহার আর একটি দোষ ছিল সে যে ফেল্‌নার বাপ এ কথা সকলের কাছেই গোপন রাখিয়াছিল। যে ছাত্রনিবাসে ফেল্‌না বাস করিত সেখানকার ছাত্রগণ বাঙাল রাইচরণকে লইয়া সর্বদা কৌতুক করিত এবং পিতার অসাক্ষাতে ফেল্‌নাও যে সেই কৌতুকালাপে যোগ দিত না তাহা বলিতে পারি না। অথচ নিরীহ বৎসলস্বভাব রাইচরণকে সকল ছাত্রই বড়ো ভালোবাসিত, এবং ফেল্‌নাও ভালোবাসিত, কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি ঠিক বাপের মতো নহে— তাহাতে কিঞ্চিৎ অনুগ্রহ মিশ্রিত ছিল।

রাইচরণ বৃদ্ধ হইয়া আসিয়াছে। তাহার প্রভু কাজকর্মে সর্বদাই দোষ ধরে। বাস্তবিক তাহার শরীরও শিথিল হইয়া আসিয়াছে, কাজেও তেমন মন দিতে পারে না, কেবলই ভুলিয়া যায়— কিন্তু, যে ব্যক্তি পূরা বেতন দেয় বার্ধক্যের ওজর সে মানিতে চাহে না। এ দিকে রাইচরণ বিষয় বিক্রয় করিয়া যে নগদ টাকা সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল তাহাও নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে। ফেল্‌না আজকাল বসনভূষণের অভাব লইয়া সর্বদা খুঁৎখুঁৎ করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

একদিন রাইচরণ হঠাৎ কর্মে জবাব দিল এবং ফেল্‌নাকে কিছু টাকা দিয়া বলিল, 'আবশ্যক পড়িয়াছে, আমি কিছু দিনের মতো দেশে যাইতেছি।' এই বলিয়া বারাসতে গিয়া উপস্থিত হইল। অনুকূলবাবু তখন সেখানে মুন্সেফ ছিলেন।

অনুকূলের আর দ্বিতীয় সন্তান হয় নাই, গৃহিণী এখনো সেই পুত্রশোক বক্ষের মধ্যে লালন করিতেছিলেন।

একদিন সন্ধ্যার সময় বাবু কাছারি হইতে আসিয়া বিশ্রাম করিতেছেন এবং কর্ত্রী একটি সন্ন্যাসীর নিকট হইতে সন্তানকামনায় বহু মূল্যে একটি শিকড় ও আশীর্বাদ কিনিতেছেন, এমন সময়ে প্রাঙ্গণে শব্দ উঠিল 'জয় হোক মা'।

বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কে রে।'

রাইচরণ আসিয়া প্রণাম করিয়া বলিল, 'আমি রাইচরণ।'

বৃদ্ধকে দেখিয়া অনুকূলের হৃদয় আর্দ্র হইয়া উঠিল। তাহার বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে সহস্র প্রশ্ন এবং আবার তাহাকে কর্মে নিয়োগ করিবার প্রস্তাব করিলেন।

রাইচরণ ম্লান হাস্য করিয়া কহিল, 'মাঠাকরুনকে একবার প্রণাম করিতে চাই।'

অনুকূল তাহাকে সঙ্গে করিয়া অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন। মাঠাকরুন রাইচরণকে তেমন প্রসন্নভাবে সমাদর করিলেন না; রাইচরণ তৎপ্রতি লক্ষ না করিয়া জোড়হস্তে কহিল, 'প্রভু, মা, আমিই তোমাদের ছেলেকে চুরি করিয়া লইয়াছিলাম। পদ্মাও নয়, আর কেহও নয়, কৃতঘ্ন অধম এই আমি—'

অনুকূল বলিয়া উঠিলেন, 'বলিস কী রে। কোথায় সে।'

'আজ্ঞা, আমার কাছেই আছে, আমি পরশ্ব আনিয়া দিব।'

সেদিন রবিবার, কাছারি নাই। প্রাতঃকাল হইতে স্ত্রীপুরুষ দুইজনে উন্মুখভাবে পথ চাহিয়া বসিয়া আছেন। দশটার সময় ফেল্‌নাকে সঙ্গে লইয়া রাইচরণ আসিয়া উপস্থিত হইল।

অনুকূলের স্ত্রী কোনো প্রশ্ন কোনো বিচার না করিয়া, তাহাকে কোলে বসাইয়া, তাহাকে স্পর্শ করিয়া, তাহার আঘ্রাণ লইয়া, অতৃপ্তনয়নে তাহার মুখ নিরীক্ষণ করিয়া, কাঁদিয়া হাসিয়া ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। বাস্তবিক, ছেলেটি দেখিতে বেশ— বেশভূষা আকার প্রকারে দারিদ্র্যের কোনো লক্ষণ নাই। মুখে অত্যন্ত প্রিয়দর্শন বিনীত সলজ্জ ভাব। দেখিয়া অনুকূলের হৃদয়েও সহসা স্নেহ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

তথাপি তিনি অবিচলিত ভাব ধারণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কোনো প্রমাণ আছে?'

রাইচরণ কহিল, 'এমন কাজের প্রমাণ কী করিয়া, থাকিবে। আমি যে তোমার ছেলে চুরি করিয়াছিলাম সে কেবল ভগবান জানেন, পৃথিবীতে আর কেহ জানে না।'

অনুকূল ভাবিয়া স্থির করিলেন যে, ছেলেটিকে পাইবামাত্র তাঁহার স্ত্রী যেরূপ আগ্রহের সহিত তাহাকে আগলাইয়া ধরিয়াছেন এখন প্রমাণসংগ্রহের চেষ্টা করা সুযুক্তি নহে; যেমনই হউক, বিশ্বাস করাই ভালো। তা ছাড়া, রাইচরণ এমন ছেলেই বা কোথায় পাইবে। এবং বৃদ্ধ ভৃত্য তাঁহাকে অকারণে প্রতারণাই বা কেন করিবে।

ছেলেটির সহিতও কথোপকথন করিয়া জানিলেন যে সে শিশুকাল হইতে রাইচরণের সহিত আছে এবং রাইচরণকে সে পিতা বলিয়া জানিত, কিন্তু রাইচরণ কখনো তাহার প্রতি পিতার ন্যায় ব্যবহার করে নাই, অনেকটা ভৃত্যের ভাব ছিল।

অনুকূল মন হইতে সন্দেহ দূর করিয়া বলিলেন, 'কিন্তু রাইচরণ, তুই আর আমাদের ছায়া মাড়াইতে পাইবি না।'

রাইচরণ করজোড়ে গদ্‌গদ কণ্ঠে বলিল, 'প্রভু, বৃদ্ধবয়সে কোথায় যাইব।'

কর্ত্রী বলিলেন, 'আহা থাক্। আমার বাছার কল্যাণ হউক। ওকে আমি মাপ করিলাম।'

ন্যায়পরায়ণ অনুকূল কহিলেন, 'যে কাজ করিয়াছে উহাকে মাপ করা যায় না।'

রাইচরণ অনুকূলের পা জড়াইয়া কহিল, 'আমি করি নাই, ঈশ্বর করিয়াছেন।'

নিজের পাপ ঈশ্বরের স্কন্ধে চাপাইবার চেষ্টা দেখিয়া অনুকূল আরও বিরক্ত হইয়া কহিলেন, 'যে এমন বিশ্বাসঘাতকতার কাজ করিয়াছে তাহাকে আর বিশ্বাস করা কর্তব্য নয়।'

রাইচরণ প্রভুর পা ছাড়িয়া কহিল, 'সে আমি নয় প্রভু।'

'তবে কে।'

'আমার অদৃষ্ট।'

কিন্তু, এরূপ কৈফিয়তে কোনো শিক্ষিত লোকের সন্তোষ হইতে পারে না।

রাইচরণ বলিল, 'পৃথিবীতে আমার আর-কেহ নাই।'

ফেল্‌না যখন দেখিল সে মুন্সেফের সন্তান, রাইচরণ তাহাকে এত দিন চুরি করিয়া নিজের ছেলে বলিয়া অপমানিত করিয়াছে, তখন তাহার মনে মনে কিছু রাগ হইল। কিন্তু, তথাপি উদারভাবে পিতাকে বলিল, 'বাবা, উহাকে মাপ করো। বাড়িতে থাকিতে না দাও, উহার মাসিক কিছু টাকা বরাদ্দ করিয়া দাও।'

ইহার পর রাইচরণ কোনো কথা না বলিয়া একবার পুত্রের মুখ নিরীক্ষণ করিল, সকলকে প্রণাম করিল ; তাহার পর দ্বারের বাহির হইয়া পৃথিবীর অগণ্য লোকের মধ্যে মিশিয়া গেল। মাসান্তে অনুকূল যখন তাহার দেশের ঠিকানায় কিঞ্চিৎ বৃত্তি পাঠাইলেন তখন সে টাকা ফিরিয়া আসিল। সেখানে কোনো লোক নাই।

অগ্রহায়ণ ১২৯৮

সম্পত্তি-সমর্পণ

প্রথম পরিচ্ছেদ

বৃন্দাবন কুণ্ড মহা ক্রুদ্ধ হইয়া আসিয়া তাহার বাপকে কহিল, 'আমি এখনই চলিলাম।'

বাপ যজ্ঞনাথ কুণ্ড কহিলেন, 'বেটা অকৃতজ্ঞ, ছেলেবেলা হইতে তোকে খাওয়াইতে পরাইতে যে ব্যয় হইয়াছে তাহা পরিশোধ করিবার নাম নাই, আবার তেজ দেখো-না।'

যজ্ঞনাথের ঘরে যেরূপ অশনবসনের প্রথা তাহাতে খুব যে বেশি ব্যয় হইয়াছে তাহা নহে। প্রাচীন কালের ঋষিরা আহার এবং পরিচ্ছদ সম্বন্ধে অসম্ভব অল্প খরচে জীবন নির্বাহ করিতেন ; যজ্ঞনাথের ব্যবহারে প্রকাশ পাইত বেশভূষা-আহারবিহারে তাঁহারও সেইরূপ অত্যুচ্চ আদর্শ ছিল। সম্পূর্ণ সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন নাই ; সে কতকটা আধুনিক সমাজের দোষে এবং কতকটা শরীররক্ষা সম্বন্ধে প্রকৃতির কতকগুলি অন্যায় নিয়মের অনুরোধে।

ছেলে যতদিন অবিবাহিত ছিল সহিয়াছিল, কিন্তু বিবাহের পর হইতে খাওয়া পরা সম্বন্ধে বাপের অত্যন্ত বিশুদ্ধ আদর্শের সহিত ছেলের আদর্শের অনৈক্য হইতে লাগিল। দেখা গেল ছেলের আদর্শ ক্রমশই আধ্যাত্মিকের চেয়ে বেশি আধিভৌতিকের দিকে যাইতেছে। শীতগ্রীষ্ম-ক্ষুধাতৃষ্ণা-কাতর পার্থিব সমাজের অনুকরণে কাপড়ের বহর এবং আহারের পরিমাণ উত্তরোত্তর বাড়িয়া উঠিতেছে।

এ সম্বন্ধে পিতাপুত্রে প্রায় বচসা হইতে লাগিল। অবশেষে বৃন্দাবনের স্ত্রীর গুরুতর পীড়া-কালে কবিরাজ বহুব্যয়সাধ্য এক ঔষধের ব্যবস্থা করাতে যজ্ঞনাথ তাহাতেই কবিরাজের অনভিজ্ঞতার পরিচয় পাইয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে বিদায় করিয়া দিলেন।

বৃন্দাবন প্রথমে হাতে পায়ে ধরিল, তার পরে রাগারাগি করিল, কিন্তু কোনো ফল হইল না। পত্নীর মৃত্যু হইলে বাপকে স্ত্রীহত্যাকারী বলিয়া গালি দিল।

বাপ বলিলেন, 'কেন, ঔষধ খাইয়া কেহ মরে না? দামী ঔষধ খাইলেই যদি বাঁচিত তবে রাজা-বাদশারা মরে কোন্ দুঃখে। যেমন করিয়া তোর মা মরিয়াছে, তোর দিদিমা মরিয়াছে, তোর স্ত্রী তাহার চেয়ে কি বেশি ধুম করিয়া মরিবে।'

বাস্তবিক যদি শোকে অন্ধ না হইয়া বৃন্দাবন স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখিত তাহা হইলে এ কথায় অনেকটা সান্ত্বনা পাইত। তাহার মা দিদিমা কেহই মরিবার সময় ঔষধ খান নাই। এ বাড়ির এইরূপ সনাতন প্রথা। কিন্তু আধুনিক লোকেরা প্রাচীন নিয়মে মরিতেও চায় না। যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন এ দেশে ইংরেজের নূতন সমাগম হইয়াছে, কিন্তু সে সময়েও তখনকার সেকালের লোক তখনকার একালের লোকের ব্যবহার দেখিয়া হতবুদ্ধি হইয়া অধিক করিয়া তামাক টানিত।

যাহা হউক, তখনকার নব্য বৃন্দাবন তখনকার প্রাচীন যজ্ঞনাথের সহিত বিবাদ করিয়া কহিল, 'আমি চলিলাম।'

বাপ তাহাকে তৎক্ষণাৎ যাইতে অনুমতি করিয়া সর্বসমক্ষে কহিলেন, বৃন্দাবনকে যদি তিনি কখনো এক পয়সা দেন তবে তাহা গোরক্তপাতের সহিত গণ্য হইবে। বৃন্দাবনও সর্বসমক্ষে যজ্ঞনাথের ধন-গ্রহণ মাতৃরক্তপাতের তুল্য পাতক বলিয়া স্বীকার করিল। ইহার পর পিতাপুত্রে ছাড়াছাড়ি হইয়া গেল।

বহুকাল শান্তির পরে এইরূপ একটি ছোটোখাটো বিপ্লবে গ্রামের লোক বেশ একটু প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। বিশেষত, যজ্ঞনাথের ছেলে উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত হওয়ার পর সকলেই নিজ নিজ শক্তি অনুসারে যজ্ঞনাথের দুঃসহ পুত্রবিচ্ছেদদুঃখ দূর করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। সকলেই বলিল, সামান্য একটা বউয়ের জন্য বাপের সহিত বিবাদ করা কেবল এ কালেই সম্ভব।

বিশেষত তাহারা খুব একটা যুক্তি দেখাইল; বলিল, একটা বউ গেলে অনতিবিলম্বে আর-একটা বউ সংগ্রহ করা যায়, কিন্তু বাপ গেলে দ্বিতীয় বাপ মাথা খুঁড়িলেও পাওয়া যায় না। যুক্তি খুব পাকা সন্দেহ নাই; কিন্তু আমার বিশ্বাস, বৃন্দাবনের মতো ছেলে এ যুক্তি শুনিলে অনুতপ্ত না হইয়া বরং কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইত।

বৃন্দাবনের বিদায়কালে তাহার পিতা যে অধিক মনঃকষ্ট পাইয়াছিলেন তাহা বোধ হয় না। বৃন্দাবন যাওয়াতে এক তো ব্যয়সংক্ষেপ হইল, তাহার উপরে যজ্ঞনাথের একটা মহা ভয় দূর হইল, বৃন্দাবন কখন তাহাকে বিষ খাওয়াইয়া মারে এই আশঙ্কা তাঁহার সর্বদাই ছিল— যে অত্যল্প আহার ছিল তাহার সহিত বিষের কল্পনা সর্বদা লিপ্ত

হইয়া থাকিত। বধূর মৃত্যুর পর এ আশঙ্কা কিঞ্চিৎ কমিয়াছিল এবং পুত্রের বিদায়ের পর অনেকটা নিশ্চিন্ত বোধ হইল।

কেবল একটি বেদনা মনে বাজিয়াছিল। যজ্ঞনাথের চারি বৎসর -বয়স্ক নাতি গোকুলচন্দ্রকে বৃন্দাবন সঙ্গে লইয়া গিয়াছিল। গোকুলের খাওয়া-পরার খরচ অপেক্ষাকৃত কম, সুতারং তাহার প্রতি যজ্ঞনাথের স্নেহ অনেকটা নিষ্কণ্টক ছিল। তথাপি বৃন্দাবন যখন তাহাকে নিতান্তই লইয়া গেল তখন অকৃত্রিম শোকের মধ্যেও যজ্ঞনাথের মনে মুহূর্তের জন্য একটা জমাখরচের হিসাব উদয় হইয়াছিল ; উভয়ে চলিয়া গেলে মাসে কতটা খরচ কমে এবং বৎসরে কতটা দাঁড়ায়, এবং যে টাকাটা সাশ্রয় হয় তাহা কত টাকার সুদ।

কিন্তু তবু শূন্য গৃহে গোকুলচন্দ্রের উপদ্রব না থাকাতে গৃহে বাস করা কঠিন হইয়া উঠিল। আজকাল যজ্ঞনাথের এমনি মুশকিল হইয়াছে, পূজার সময়ে কেহ ব্যাঘাত করে না, খাওয়ার সময় কেহ কাড়িয়া খায় না, হিসাব লিখিবার সময় দোয়াত লইয়া পালায় এমন উপযুক্ত লোক কেহ নাই। নিরুপদ্রবে স্নানাহার সম্পন্ন করিয়া তাঁহার চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিতে লাগিল।

মনে হইল যেন মৃত্যুর পরেই লোকে এইরূপ উৎপাতহীন শূন্যতা লাভ করে ; বিশেষত বিছানার কাঁথায় তাঁহার নাতির কৃত ছিদ্র এবং বসিবার মাদুরে উক্ত শিল্পী-অঙ্কিত মসীচিহ্ন দেখিয়া তাঁহার হৃদয় আরও অশান্ত হইয়া উঠিত। সেই অমিতাচারী বালকটি দুই বৎসরের মধ্যেই পরিবার ধুতি সম্পূর্ণ অব্যবহার্য করিয়া তুলিয়াছিল বলিয়া পিতামহের নিকট বিস্তর তিরস্কার সহ্য করিয়াছিল ; এক্ষণে তাহার শয়নগৃহে সেই শত-গ্রন্থিবিশিষ্ট মলিন পরিত্যক্ত চীরখণ্ড দেখিয়া তাঁহার চক্ষু ছল্‌ছল্‌ করিয়া আসিল ; সেটি পলিতা-প্রস্তুত-করণ কিম্বা অন্য কোনো গার্হস্থ্য ব্যবহারে না লাগাইয়া যত্নপূর্বক সিন্দুকে তুলিয়া রাখিলেন এবং মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন যদি গোকুল ফিরিয়া আসে এবং এমন-কি বৎসরে একখানি করিয়া ধুতিও নষ্ট করে তথাপি তাহাকে তিরস্কার করিবেন না।

কিন্তু গোকুল ফিরিল না এবং যজ্ঞনাথের বয়স যেন পূর্বাপেক্ষা অনেক শীঘ্র শীঘ্র বাড়িয়া উঠিল এবং শূন্য গৃহ প্রতিদিন শূন্যতর হইতে লাগিল।

যজ্ঞনাথ আর ঘরে স্থির থাকিতে পারেন না। এমন-কি, মধ্যাহ্নে যখন সকল সম্ভ্রান্ত লোকই আহারান্তে নিদ্রাসুখ লাভ করে যজ্ঞনাথ হুঁকা-হস্তে পাড়ায় পাড়ায় ভ্রমণ করিয়া বেড়ান। তাঁহার এই নীরব মধ্যাহ্নভ্রমণের সময় পথের ছেলেরা খেলা পরিত্যাগপূর্বক নিরাপদ স্থানে পলায়ন করিয়া তাঁহার মিতব্যয়িতা সম্বন্ধে স্থানীয় কবি-রচিত বিবিধ-

ছন্দোবদ্ধ রচনা শ্রুতিগম্য উচ্চৈঃস্বরে আবৃত্তি করিত। পাছে আহারের ব্যাঘাত ঘটে বলিয়া তাঁহার পিতৃদত্ত নাম উচ্চারণ করিতে কেহ সাহস করিত না, এইজন্য সকলেই স্বেচ্ছামতে তাঁহার নূতন নামকরণ করিত। বুড়োরা তাঁহাকে 'যজ্ঞনাশ' বলিতেন, কিন্তু ছেলেরা কেন যে তাঁহাকে 'চামচিকে' বলিয়া ডাকিত তাহার স্পষ্ট কারণ পাওয়া যায় না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

একদিন এইরূপে আম্রতরুচ্ছায়াশীতল গ্রামের পথে যজ্ঞনাথ মধ্যাহ্নে বেড়াইতেছিলেন; দেখিলেন একজন অপরিচিত বালক গ্রামের ছেলেদের সর্দার হইয়া উঠিয়া একটা সম্পূর্ণ নূতন উপদ্রবের পন্থা নির্দেশ করিতেছে। অন্যান্য বালকেরা তাহার চরিত্রের বল এবং কল্পনার নূতনত্বে অভিভূত হইয়া কায়মনে তাহার বশ মানিয়াছে।

অন্য বালকেরা বৃদ্ধকে দেখিয়া যেরূপ খেলায় ভঙ্গ দিত এ তাহা না করিয়া চট্ করিয়া আসিয়া যজ্ঞনাথের গায়ের কাছে চাদর ঝাড়া দিল এবং একটা বন্ধনমুক্ত গিরগিটি চাদর হইতে লাফাইয়া পড়িয়া তাঁহার গা বাহিয়া অরণ্যাভিমুখে পলায়ন করিল— আকস্মিক ত্রাসে বৃদ্ধের সর্বশরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল। ছেলেদের মধ্যে ভারী একটা আনন্দের কলরব পড়িয়া গেল। আর কিছু দূর যাইতে না যাইতে যজ্ঞনাথের স্কন্ধ হইতে হঠাৎ তাঁহার গামছা অদৃশ্য হইয়া অপরিচিত বালকটির মাথায় পাগড়ির আকার ধারণ করিল।

এই অজ্ঞাত মানবকের নিকট হইতে এইপ্রকার নূতন প্রণালীর শিষ্টাচার প্রাপ্ত হইয়া যজ্ঞনাথ ভারী সন্তুষ্ট হইলেন। কোনো বালকের নিকট হইতে এরূপ অসংকোচ আত্মীয়তা তিনি বহুদিন পান নাই। বিস্তর ডাকাডাকি করিয়া এবং নানামতো আশ্বাস দিয়া যজ্ঞনাথ তাহাকে কতকটা আয়ত্ত করিয়া লইলেন।

জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমার নাম কী।'

সে বলিল, 'নিতাই পাল।'

'বাড়ি কোথায়।'

'বলিব না।'

'বাপের নাম কী।'

'বলিব না।'

'কেন বলিবে না।'

'আমি বাড়ি ছাড়িয়া পলাইয়া আসিয়াছি।'

'কেন।'

'আমার বাপ আমাকে পাঠশালায় দিতে চায়।'

এরূপ ছেলেকে পাঠশালায় দেওয়া যে একটা নিষ্ফল অপব্যয় এবং বাপের বিষয়বুদ্ধিহীনতার পরিচয় তাহা তৎক্ষণাৎ যজ্ঞনাথের মনে উদয় হইল।

যজ্ঞনাথ বলিলেন, 'আমার বাড়িতে আসিয়া থাকিবে?'

বালকটি কোনো আপত্তি না করিয়া এমনই নিঃসংকোচে সেখানে আশ্রয় গ্রহণ করিল যেন সে একটা পথপ্রান্তবর্তী তরুতল।

কেবল তাহাই নয়, খাওয়া পরা সম্বন্ধে এমনই অম্লানবদনে নিজের অভিপ্রায়মতো আদেশ প্রচার করিতে লাগিল যেন পূর্বাহ্ণেই তাহার পুরা দাম চুকাইয়া দিয়াছে। এবং ইহা লইয়া মাঝে মাঝে গৃহস্বামীর সহিত রীতিমতো ঝগড়া করিত। নিজের ছেলেকে পরাস্ত করা সহজ, কিন্তু পরের ছেলের কাছে যজ্ঞনাথকে হার মানিতে হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

যজ্ঞনাথের ঘরে নিতাই পালের এই অভাবনীয় সমাদর দেখিয়া গ্রামের লোক আশ্চর্য হইয়া গেল। বুঝিল, বৃদ্ধ আর বেশি দিন বাঁচিবে না এবং কোথাকার এই বিদেশী ছেলেটাকেই সমস্ত বিষয় দিয়া যাইবে।

বালকের উপর সকলেরই পরম ঈর্ষা উপস্থিত হইল এবং সকলেই তাহার অনিষ্ট করিবার জন্য কৃতসংকল্প হইল। কিন্তু বৃদ্ধ তাহাকে বুকের পাঁজরের মতো ঢাকিয়া বেড়াইত।

ছেলেটা মাঝে মাঝে চলিয়া যাইবে বলিয়া শাসাইত। যজ্ঞনাথ তাহাকে প্রলোভন দেখাইতেন, 'ভাই, তোকে আমি আমার সমস্ত বিষয়-আশয় দিয়া যাইব।' বালকের বয়স অল্প, কিন্তু এই আশ্বাসের মর্যাদা সে সম্পূর্ণ বুঝিতে পারিত।

তখন গ্রামের লোকেরা বালকের বাপের সন্ধানে প্রবৃত্ত হইল। তাহারা সকলেই বলিল, 'আহা বাপ-মা'র মনে না জানি কত কষ্টই হইতেছে। ছেলেটাও তো পাপিষ্ঠ কম নয়!'

বলিয়া ছেলেটার উদ্দেশে অকথ্য-উচ্চারণে গালি প্রয়োগ করিত। তাহার এতই বেশি ঝাঁজ যে, ন্যায়বুদ্ধির উত্তেজনা অপেক্ষা তাহাতে স্বার্থের গাত্রদাহ বেশি অনুভূত হইত।

বৃদ্ধ একদিন এক পথিকের কাছে শুনিতে পাইল, দামোদর পাল বলিয়া এক ব্যক্তি

তাহার নিরুদ্দিষ্ট পুত্রের সন্ধান করিয়া বেড়াইতেছে, অবশেষে এই গ্রামের অভিমুখেই আসিতেছে।

নিতাই এই সংবাদ শুনিয়া অস্থির হইয়া উঠিল; ভাবী বিষয়-আশয় সমস্ত ত্যাগ করিয়া পলায়নোদ্যত হইল।

যজ্ঞনাথ নিতাইকে বারম্বার আশ্বাস দিয়া কহিলেন, 'তোমাকে আমি এমন স্থানে লুকাইয়া রাখিব যে কেহই খুঁজিয়া পাইবে না। গ্রামের লোকেরাও না।'

বালকের ভারী কৌতূহল হইল; কহিল, 'কোথায় দেখাইয়া দাও-না।'

যজ্ঞনাথ কহিলেন, 'এখন দেখাইতে গেলে প্রকাশ হইয়া পড়িবে। রাত্রে দেখাইব।'

নিতাই এই নূতন রহস্য-আবিষ্কারের আশ্বাসে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। বাপ অকৃতকার্য হইয়া চলিয়া গেলেই বালকদের সঙ্গে বাজি রাখিয়া একটা লুকোচুরি খেলিতে হইবে এইরূপ মনে মনে সংকল্প করিল। কেহ খুঁজিয়া পাইবে না। ভারী মজা। বাপ আসিয়া সমস্ত দেশ খুঁজিয়া কোথাও তাহার সন্ধান পাইবে না, সেও খুব কৌতুক।

মধ্যাহ্নে যজ্ঞনাথ বালককে গৃহে রুদ্ধ করিয়া কোথায় বাহির হইয়া গেলেন। ফিরিয়া আসিলে নিতাই তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়া করিয়া অস্থির করিয়া তুলিল।

সন্ধ্যা হইতে না হইতে বলিল, 'চলো।'

যজ্ঞনাথ বলিলেন, 'এখনো রাত্রি হয় নাই।'

নিতাই আবার কহিল, 'রাত্রি হইয়াছে দাদা, চলো।'

যজ্ঞনাথ কহিলেন, 'এখনো পাড়ার লোক ঘুমায় নাই।'

নিতাই মুহূর্ত অপেক্ষা করিয়াই কহিল, 'এখন ঘুমাইয়াছে, চলো।'

রাত্রি বাড়িতে লাগিল। নিদ্রাতুর নিতাই বহুকষ্টে নিদ্রাসম্বরণের প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও বসিয়া বসিয়া ঢুলিতে আরম্ভ করিল। রাত্রি দুই প্রহর হইলে যজ্ঞনাথ নিতাইয়ের হাত ধরিয়া নিদ্রিত গ্রামের অন্ধকার পথে বাহির হইলেন। আর-কোনো শব্দ নাই, কেবল থাকিয়া থাকিয়া কুকুর ঘেউ ঘেউ করিয়া ডাকিয়া উঠিল এবং সেই শব্দে নিকটে এবং দূরে যতগুলা কুকুর ছিল সকলে তারস্বরে যোগ দিল। মাঝে মাঝে নিশাচর পক্ষী পদশব্দে ত্রস্ত হইয়া ঝট্‌পট্‌ করিয়া বনের মধ্য দিয়া উড়িয়া গেল। নিতাই ভয়ে যজ্ঞনাথের হাত দৃঢ় করিয়া ধরিল।

অনেক মাঠ ভাঙিয়া অবশেষে এক জঙ্গলের মধ্যে এক দেবতাহীন ভাঙা মন্দিরে উভয়ে গিয়া উপস্থিত হইল। নিতাই কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্নস্বরে কহিল, 'এইখানে?'

যেরূপ মনে করিয়াছিল সেরূপ কিছুই নয়। ইহার মধ্যে তেমন রহস্য নাই। পিতৃগৃহত্যাগের পর এমন পোড়ো মন্দিরে তাহাকে মাঝে মাঝে রাত্রিযাপন করিতে

হইয়াছে। স্থানটা যদিও লুকোচুরি খেলার পক্ষে মন্দ নয়, কিন্তু তবু এখান হইতে সন্ধান করিয়া বাহির করা নিতান্ত অসম্ভব নহে।

যজ্ঞনাথ মন্দিরের মধ্য হইতে একখণ্ড পাথর উঠাইয়া ফেলিলেন। বালক দেখিল, নিম্নে একটা ঘরের মতো এবং সেখানে প্রদীপ জ্বলিতেছে। দেখিয়া অত্যন্ত বিস্ময় এবং কৌতুহল হইল, সেই সঙ্গে ভয়ও করিতে লাগিল। একটি মই বাহিয়া যজ্ঞনাথ নামিয়া গেলেন, তাঁহার পশ্চাতে নিতাইও ভয়ে ভয়ে নামিল।

নীচে গিয়া দেখিল চারি দিকে পিতলের কলস। মধ্যে একটি আসন এবং তাহার সম্মুখে সিঁদুর, চন্দন, ফুলের মালা, পূজার উপকরণ। বালক কৌতুহল-নিবৃত্তি করিতে গিয়া দেখিল, ঘড়ায় কেবল টাকা এবং মোহর।

যজ্ঞনাথ কহিলেন, 'নিতাই, আমি বলিয়াছিলাম আমার সমস্ত টাকা তোমাকে দিব। আমার অধিক কিছু নাই, সবে এই ক'টি মাত্র ঘড়া আমার সম্বল। আজ আমি ইহার সমস্তই তোমার হাতে দিব।'

বালক লাফাইয়া উঠিয়া কহিল, 'সমস্তই! ইহার একটি টাকাও তুমি লইবে না?'

'যদি লই তবে আমার হাতে যেন কুষ্ঠ হয়। কিন্তু একটা কথা আছে। যদি কখনো আমার নিরুদ্দেশ নাতি গোকুলচন্দ্র কিম্বা তাহার ছেলে কিম্বা তাহার পৌত্র কিম্বা তাহার প্রপৌত্র কিম্বা তাহার বংশের কেহ আসে তবে তাহার কিম্বা তাহাদের হাতে এই-সমস্ত টাকা গনিয়া দিতে হইবে।'

বালক মনে করিল, যজ্ঞনাথ পাগল হইয়াছে। তৎক্ষণাৎ স্বীকার করিল, 'আচ্ছা।'

যজ্ঞনাথ কহিলেন, 'তবে এই আসনে বইস।'

'কেন।'

'তোমার পূজা হইবে।'

'কেন।'

'এইরূপ নিয়ম।'

বালক আসনে বসিল। যজ্ঞনাথ তাহার কপালে চন্দন দিলেন, সিঁদুরের টিপ দিয়া দিলেন, গলায় মালা দিলেন; সম্মুখে বসিয়া বিড়্ বিড়্ করিয়া মন্ত্র পড়িতে লাগিলেন।

দেবতা হইয়া বসিয়া মন্ত্র শুনিতে নিতাইয়ের ভয় করিতে লাগিল; ডাকিল, 'দাদা।'

যজ্ঞনাথ কোনো উত্তর না করিয়া মন্ত্র পড়িয়া গেলেন।

অবশেষে এক-একটি ঘড়া বহু কষ্টে টানিয়া বালকের সম্মুখে স্থাপিত করিয়া উৎসর্গ করিলেন এবং প্রত্যেকবার বলাইয়া লইলেন, 'যুধিষ্ঠির কুণ্ডের পুত্র গদাধর কুণ্ড তস্য পুত্র

প্রাণকৃষ্ণ কুণ্ড তস্য পুত্র পরমানন্দ কুণ্ড তস্য পুত্র যজ্ঞনাথ কুণ্ড তস্য পুত্র বৃন্দাবন কুণ্ড তস্য পুত্র গোকুলচন্দ্র কুণ্ডকে কিম্বা তাহার পুত্র অথবা পৌত্র অথবা প্রপৌত্রকে কিম্বা তাহার বংশের ন্যায্য উত্তরাধিকারীকে এই-সমস্ত টাকা গনিয়া দিব।'

এইরূপ বার বার আবৃত্তি করিতে করিতে ছেলেটা হতবুদ্ধির মতো হইয়া আসিল। তাহার জিহ্বা ক্রমে জড়াইয়া আসিল। যখন অনুষ্ঠান সমাপ্ত হইয়া গেল তখন দীপের ধূম ও উভয়ের নিশ্বাসবায়ুতে সেই ক্ষুদ্র গহ্বর বাষ্পাচ্ছন্ন হইয়া আসিল। বালকের তালু শুষ্ক হইয়া গেল, হাত-পা জ্বালা করিতে লাগিল, শ্বাস রোধ হইবার উপক্রম হইল।

প্রদীপ ম্লান হইয়া হঠাৎ নিবিয়া গেল। অন্ধকারে বালক অনুভব করিল যজ্ঞনাথ মই বাহিয়া উপরে উঠিতেছে।

ব্যাকুল হইয়া কহিল, 'দাদা, কোথায় যাও।'

যজ্ঞনাথ কহিলেন, 'আমি চলিলাম। তুই এখানে থাক্— তোকে আর কেহই খুঁজিয়া পাইবে না। কিন্তু মনে রাখিস, যজ্ঞনাথের পৌত্র বৃন্দাবনের পুত্র গোকুলচন্দ্র।'

বলিয়া উপরে উঠিয়াই মই তুলিয়া লইলেন। বালক রুদ্ধশ্বাস কণ্ঠ হইতে বহুকষ্টে বলিল, 'দাদা, আমি বাবার কাছে যাব।'

যজ্ঞনাথ ছিদ্রমুখে পাথর চাপা দিলেন এবং কান পাতিয়া শুনিলেন নিতাই আর একবার রুদ্ধকণ্ঠে ডাকিল, 'বাবা।'

তার পরে একটা পতনের শব্দ হইল, তার পরে আর কোনো শব্দ হইল না।

যজ্ঞনাথ এইরূপে যক্ষের হস্তে ধন সমর্পণ করিয়া সেই প্রস্তরখণ্ডের উপর মাটি চাপা দিতে লাগিলেন। তাহার উপরে ভাঙা মন্দিরের ইঁট বালি স্তূপাকার করিলেন। তাহার উপর ঘাসের চাপ্‌ড়া বসাইলেন. বনের গুল্ম রোপণ করিলেন। রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিল কিন্তু কিছুতেই সে স্থান হইতে নড়িতে পারিলেন না। থাকিয়া থাকিয়া কেবলই মাটিতে কান পাতিয়া শুনিতে লাগিলেন। মনে হইতে লাগিল, যেন অনেক দূর হইতে, পৃথিবীর অতলস্পর্শ হইতে একটা ক্রন্দনধ্বনি উঠিতেছে। মনে হইল যেন রাত্রির আকাশ সেই একমাত্র শব্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে, পৃথিবীর সমস্ত নিদ্রিত লোক যেন সেই শব্দে শয্যার উপরে জাগিয়া উঠিয়া কান পাতিয়া বসিয়া আছে।

বৃদ্ধ অস্থির হইয়া কেবলই মাটির উপরে মাটি চাপাইতেছে। যেন এমনি করিয়া কোনোমতে পৃথিবীর মুখ চাপা দিতে চাহে। ওই কে ডাকে 'বাবা'।

বৃদ্ধ মাটিতে আঘাত করিয়া বলে, 'চুপ কর্। সবাই শুনিতে পাইবে।'

আবার কে ডাকে 'বাবা'।

দেখিল রৌদ্র উঠিয়াছে। ভয়ে মন্দির ছাড়িয়া মাঠে বাহির হইয়া পড়িল।

সেখানেও কে ডাকিল, 'বাবা।' যজ্ঞনাথ সচকিত হইয়া পিছন ফিরিয়া দেখিলেন, বৃন্দাবন।

বৃন্দাবন কহিল, 'বাবা, সন্ধান পাইলাম আমার ছেলে তোমার ঘরে লুকাইয়া আছে, তাহাকে দাও।'

বৃদ্ধ চোখ মুখ বিকৃত করিয়া বৃন্দাবনের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিল, 'তোর ছেলে!'

বৃন্দাবন কহিল, 'হাঁ গোকুল— এখন তাহার নাম নিতাই পাল, আমার নাম দামোদর। কাছাকাছি সর্বত্রই তোমার খ্যাতি আছে, সেইজন্য আমরা লজ্জায় নাম পরিবর্তন করিয়াছি, নহিলে কেহ আমাদের নাম উচ্চারণ করিত না।'

বৃদ্ধ দশ অঙ্গুলি দ্বারা আকাশ হাৎড়াইতে হাৎড়াইতে যেন বাতাস আঁকড়িয়া ধরিবার চেষ্টা করিয়া ভূতলে পড়িয়া গেল।

চেতনা লাভ করিয়া যজ্ঞনাথ বৃন্দাবনকে মন্দিরে টানিয়া লইয়া গেল। কহিল, 'কান্না শুনিতে পাইতেছ?'

বৃন্দাবন কহিল, 'না।'

'কান পাতিয়া শোনো দেখি বাবা বলিয়া কেহ ডাকিতেছে?'

বৃন্দাবন কহিল, 'না।'

বৃদ্ধ তখন যেন ভারী নিশ্চিন্ত হইল।

তাহার পর হইতে বৃদ্ধ সকলকে জিজ্ঞাসা করিয়া বেড়ায়, 'কান্না শুনিতে পাইতেছ?' পাগলামির কথা শুনিয়া সকলেই হাসে।

অবশেষে বৎসর চারেক পরে বৃদ্ধের মৃত্যুর দিন উপস্থিত হইল। যখন চোখের উপর হইতে জগতের আলো নিবিয়া আসিল এবং শ্বাস রুদ্ধপ্রায় হইল তখন বিকারের বেগে সহসা উঠিয়া বসিল; একবার দুই হস্তে চারি দিক হাৎড়াইয়া মুমূর্ষু কহিল, 'নিতাই, আমার মইটা কে উঠিয়ে নিলে।'

সেই বায়ুহীন আলোকহীন মহাগহ্বর হইতে উঠিবার মই খুঁজিয়া না পাইয়া আবার সে ধুপ্ করিয়া বিছানায় পড়িয়া গেল। সংসারের লুকোচুরি খেলায় যেখানে কাহাকেও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না সেইখানে অন্তর্হিত হইল।

পৌষ ১২৯৮

দালিয়া

ভূমিকা

পরাজিত শা সুজা ঔরঙ্গজীবের ভয়ে পলায়ন করিয়া আরাকান-রাজের আতিথ্য গ্রহণ করেন। সঙ্গে তিন সুন্দরী কন্যা ছিল। আরাকান-রাজের ইচ্ছা হয়, রাজপুত্রদের সহিত তাহাদের বিবাহ দেন। সেই প্রস্তাবে শা সুজা নিতান্ত অসন্তোষ প্রকাশ করাতে, একদিন রাজার আদেশে তাঁহাকে ছলক্রমে নৌকাযোগে নদীমধ্যে লইয়া নৌকা ডুবাইয়া দিবার চেষ্টা করা হয়। সেই বিপদের সময় কনিষ্ঠা বালিকা আমিনাকে পিতা স্বয়ং নদীমধ্যে নিক্ষেপ করেন। জ্যেষ্ঠা কন্যা আত্মহত্যা করিয়া মরে। এবং সুজার একটি বিশ্বাসী কর্মচারী রহমত আলি জুলিখাকে লইয়া সাঁতার দিয়া পালায়, এবং সুজা যুদ্ধ করিতে করিতে মরেন।

আমিনা খরস্রোতে প্রবাহিত হইয়া দৈবক্রমে অনতিবিলম্বে এক ধীবরের জালে উদ্‌ধৃত হয় এবং তাহারই গৃহে পালিত হইয়া বড়ো হইয়া উঠে।

ইতিমধ্যে বৃদ্ধ রাজার মৃত্যু হইয়াছে এবং যুবরাজ রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছেন।

প্রথম পরিচ্ছেদ

একদিন সকালে বৃদ্ধ ধীবর আসিয়া আমিনাকে ভর্ৎসনা করিয়া কহিল, 'তিন্নি।' ধীবর আরাকান ভাষায় আমিনার নূতন নামকরণ করিয়াছিল— 'তিন্নি, আজ সকালে তোর হইল কী। কাজকর্মে যে একেবারে হাত লাগাস নাই। আমার নতুন জালে আঠা দেওয়া হয় নাই, আমার নৌকো—'

আমিনা ধীবরের কাছে আসিয়া আদর করিয়া কহিল, 'বুঢ়া, আজ আমার দিদি আসিয়াছেন, তাই আজ ছুটি।'

'তোর আবার দিদি কে রে তিন্নি।'

জুলিখা কোথা হইতে বাহির হইয়া আসিয়া কহিল, 'আমি।'

বৃদ্ধ অবাক হইয়া গেল। তার পর জুলিখার অনেক কাছে আসিয়া ভালো করিয়া তাহার মুখ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল।

খপ করিয়া জিজ্ঞাসা কারল, 'তুই কাজ-কাম কিছু জানিস?'

আমিনা কহিল 'বুঢ়া, দিদির হইয়া আমি কাজ করিয়া দিব। দিদি কাজ করিতে পারিবে না।'

বৃদ্ধ কিয়ৎক্ষণ ভাবিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'তুই থাকিবি কোথায়।'

জুলিখা বলিল, 'আমিনার কাছে।'

বৃদ্ধ ভাবিল, এও তো বিষম বিপদ। জিজ্ঞাসা করিল, 'খাইবি কী।'

জুলিখা বলিল 'তাহার উপায় আছে'— বলিয়া অবজ্ঞাভরে ধীবরের সম্মুখে একটা স্বর্ণমুদ্রা ফেলিয়া দিল।

আমিনা সেটা কুড়াইয়া ধীবরের হাতে তুলিয়া দিয়া চুপিচুপি কহিল, 'বুঢ়া, আর-কোনো কথা কহিস না। তুই কাজে যা, বেলা হইয়াছে।'

জুলিখা ছদ্মবেশে নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া অবশেষে আমিনার সন্ধান পাইয়া কী করিয়া ধীবরের কুটিরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে সে-সমস্ত কথা বলিতে গেলে দ্বিতীয় আর-একটি কাহিনী হইয়া পড়ে। তাহার রক্ষাকর্তা রহমত শেখ ছদ্মনামে আরাকান রাজসভায় কাজ করিতেছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ছোটো নদীটি বহিয়া যাইতেছিল এবং প্রথম গ্রীষ্মের শীতল প্রভাতবায়ুতে কৈলু গাছের রক্তবর্ণ পুষ্পমঞ্জরী হইতে ফুল ঝরিয়া পড়িতেছিল।

গাছের তলায় বসিয়া জুলিখা আমিনাকে কহিল, 'ঈশ্বর যে আমাদের দুই ভগ্নীকে মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিয়াছেন সে কেবল পিতার হত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য। নহিলে আর তো কোনো কারণ খুঁজিয়া পাই না।'

আমিনা নদীর পরপারে সর্বাপেক্ষা দূরবর্তী, সর্বাপেক্ষা ছায়াময়, বনশ্রেণীর দিকে দৃষ্টি মেলিয়া ধীরে ধীরে কহিল,'দিদি, আর ও-সব কথা বলিস নে ভাই। আমার এই পৃথিবীটা এক রকম বেশ লাগিতেছে। মরিতে চায় তো পুরুষগুলো কাটাকাটি করিয়া মরুক গে, আমার এখানে কোনো দুঃখ নাই।'

জুলিখা বলিল, 'ছি ছি আমিনা, তুই কি শাহজাদার ঘরের মেয়ে। কোথায় দিল্লির সিংহাসন আর কোথায় আরাকানের ধীবরের কুটির।'

আমিনা হাসিয়া কহিল, 'দিদি, দিল্লির সিংহাসনের চেয়ে আমার বুঢ়ার এই কুটির এবং এই কৈলু গাছের ছায়া যদি কোনো বালিকার বেশি ভালো লাগে তাহাতে দিল্লির সিংহাসন এক বিন্দু অশ্রুপাত করিবে না।'

জুলিখা কতকটা আনমনে কতকটা আমিনাকে কহিল, 'তা, তোকে দোষ দেওয়া যায় না, তুই তখন নিতান্ত ছোটো ছিলি।— কিন্তু একবার ভাবিয়া দেখ্, পিতা তোকে সব চেয়ে বেশি ভালবাসিতেন বলিয়া তোকেই স্বহস্তে জলে ফেলিয়া দিয়াছিলেন। সেই

পিতৃদত্ত মৃত্যুর চেয়ে এই জীবনকে বেশি প্রিয় জ্ঞান করিস না। তবে যদি প্রতিশোধ তুলিতে পারিস তবেই জীবনের অর্থ থাকে।'

আমিনা চুপ করিয়া দূরে চাহিয়া রহিল। কিন্তু বেশ বুঝা গেল, সকল কথা সত্ত্বেও বাহিরের এই বাতাস এবং গাছের ছায়া এবং আপনার নবযৌবন এবং কী-একটা সুখস্মৃতি তাহাকে নিমগ্ন করিয়া রাখিয়াছিল।

কিছুক্ষণ পরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, 'দিদি, তুমি একটু অপেক্ষা করো ভাই। আমার ঘরের কাজ বাকি আছে। আমি না রাঁধিয়া দিলে বুঢ়া খাইতে পাইবে না।'

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

জুলিখা আমিনার অবস্থা চিন্তা করিয়া ভারী বিমর্ষ হইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। এমন সময় হঠাৎ ধুপ্ করিয়া একটা লম্ফের শব্দ হইল এবং পশ্চাৎ হইতে কে একজন জুলিখার চোখ টিপিয়া ধরিল।

জুলিখা ত্রস্ত হইয়া কহিল, 'কেও।'

স্বর শুনিয়া যুবক চোখ ছাড়িয়া দিয়া সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল; জুলিখার মুখের দিকে চাহিয়া অম্লানবদনে কহিল, 'তুমি তো তিন্নি নও।' যেন জুলিখা বরাবর আপনাকে 'তিন্নি' বলিয়া চালাইবার চেষ্টা করিতেছিল, কেবল যুবকের অসামান্য তীক্ষ্ণবুদ্ধির কাছে সমস্ত চাতুরী প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে।

জুলিখা বসন সম্বরণ করিয়া দৃপ্তভাবে উঠিয়া দাঁড়াইয়া দুই চক্ষে অগ্নিবাণ নিক্ষেপ করিল। জিজ্ঞাসা করিল, 'কে তুমি।'

যুবক কহিল, 'তুমি আমাকে চেন না। তিন্নি জানে। তিন্নি কোথায়।'

তিন্নি গোলযোগ শুনিয়া বাহির হইয়া আসিল। জুলিখার রোষ এবং যুবকের হতবুদ্ধি বিস্মিতমুখ দেখিয়া আমিনা উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল।

কহিল, 'দিদি, ওর কথা তুমি কিছু মনে করিয়ো না। ও কি মানুষ, ও একটা বনের মৃগ। যদি কিছু বেয়াদপি করিয়া থাকে আমি উহাকে শাসন করিয়া দিব।— দালিয়া, তুমি কী করিয়াছিলে।'

যুবক তৎক্ষণাৎ কহিল, 'চোখ টিপিয়া ধরিয়াছিলাম। আমি মনে করিয়াছিলাম তিন্নি। কিন্তু ও তো তিন্নি নয়।'

তিন্নি সহসা দুঃসহ ক্রোধ প্রকাশ করিয়া উঠিয়া কহিল, 'ফের! ছোটো মুখে বড়ো কথা। কবে তুমি তিন্নির চোখ টিপিয়াছ। তোমার তো সাহস কম নয়।'

যুবক কহিল, 'চোখ টিপিতে তো খুব বেশি সাহসের দরকার করে না ; বিশেষত পূর্বের অভ্যাস থাকিলে। কিন্তু সত্য বলিতেছি তিন্নি, আজ একটু ভয় পাইয়া গিয়াছিলাম।'

বলিয়া গোপনে জুলিখার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া আমিনার মুখের দিকে চাহিয়া নিঃশব্দে হাসিতে লাগিল।

আমিনা কহিল, 'না, তুমি অতি বর্বর, শাহজাদীর সম্মুখে দাঁড়াইবার যোগ্য নও। তোমাকে সহবত শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। দেখো, এমনি করিয়া সেলাম করো।'

বলিয়া আমিনা তাহার যৌবনমঞ্জরিত তনুলতা অতি মধুর ভঙ্গীতে নত করিয়া জুলিখাকে সেলাম করিল। যুবক বহুকষ্টে তাহার নিতান্ত অসম্পূর্ণ অনুকরণ করিল।

বলিল, 'এমনি করিয়া তিন পা পিছু হঠিয়া আইস।' যুবক পিছু হঠিয়া আসিল।

'আবার সেলাম করো।' আবার সেলাম করিল।

এমনি করিয়া পিছু হঠাইয়া, সেলাম করাইয়া, আমিনা যুবককে কুটিরের দ্বারের কাছে লইয়া গেল

কহিল, 'ঘরে প্রবেশ করো।' যুবক ঘরে প্রবেশ করিল।

আমিনা বাহির হইতে ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়া কহিল, 'একটু ঘরের কাজ করো। আগুনটা জ্বালাইয়া রাখো।' বলিয়া দিদির পাশে আসিয়া বসিল।

কহিল, 'দিদি, রাগ করিস নে ভাই, এখানকার মানুষগুলো এই রকমের। হাড় জ্বালাতন হইয়া গেছে।'

কিন্তু আমিনার মুখে কিম্বা ব্যবহারে তাহার লক্ষণ কিছুই প্রকাশ পায় না। বরং অনেক বিষয়ে এখানকার মানুষের প্রতি তাহার কিছু অন্যায় পক্ষপাত দেখা যায়।

জুলিখা যথাসাধ্য রাগ প্রকাশ করিয়া কহিল, 'বাস্তবিক আমিনা, তোর ব্যবহারে আমি আশ্চর্য হইয়া গেছি। একজন বাহিরের যুবক আসিয়া তোকে স্পর্শ করিতে পারে এত বড়ো তাহার সাহস।'

আমিনা দিদির সহিত যোগ দিয়া কহিল, 'দেখ্ দেখি বোন। যদি কোনো বাদশাহ কিম্বা নবাবের ছেলে এমন ব্যবহার করিত, তবে তাহাকে অপমান করিয়া দূর করিয়া দিতাম।'

জুলিখার ভিতরের হাসি আর বাধা মানিল না ; হাসিয়া উঠিয়া কহিল, 'সত্য করিয়া বল্ দেখি আমিনা, তুই যে বলিতেছিলি পৃথিবীটা তোর বড়ো ভালো লাগিতেছে, সে কি ওই বর্বর যুবকটার জন্য।'

আমিনা কহিল, 'তা, সত্য কথা বলি দিদি, ও আমার অনেক উপকার করে।

ফুলটা ফলটা পাড়িয়া দেয়, শিকার করিয়া আনে, একটা-কিছু কাজ করিতে ডাকিলে ছুটিয়া আসে। অনেকবার মনে করি উহাকে শাসন করিব। কিন্তু সে চেষ্টা বৃথা। যদি খুব চোখ রাঙাইয়া বলি, দালিয়া, তোমার প্রতি আমি ভারী অসন্তুষ্ট হইয়াছি— দালিয়া মুখের দিকে চাহিয়া পরম কৌতুকে নিঃশব্দে হাসিতে থাকে। এদের দেশে পরিহাস বোধ করি এই রকম ; দু-ঘা মারিলে ভারী খুশি হইয়া উঠে, তাহাও পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। ওই দেখো-না, ঘরে পুরিয়া রাখিয়াছি— বড়ো আনন্দে আছে, দ্বার খুলিলেই দেখিতে পাইব মুখ চক্ষু লাল করিয়া মনের সুখে আগুনে ফুঁ দিতেছে। ইহাকে লইয়া কী করি বল্ তো বোন। আমি তো আর পারিয়া উঠি না।'

জুলিখা কহিল, 'আমি চেষ্টা দেখিতে পারি।'

আমিনা হাসিয়া মিনতি করিয়া বলিল, 'তোর দুটি পায়ে পড়ি বোন। ওকে আর তুই কিছু বলিস না।'

এমন করিয়া বলিল, যেন ওই যুবকটি আমিনার একটি বড়ো সাধের পোষা হরিণ, এখনো তাহার বন্য স্বভাব দূর হয় নাই— পাছে অন্য কোনো মানুষ দেখিলে ভয় পাইয়া নিরুদ্দেশ হয় এমন আশঙ্কা আছে।

এমন সময় ধীবর আসিয়া কহিল, 'আজ দালিয়া আসে নাই তিন্নি ?'

'আসিয়াছে।'

'কোথায় গেল।'

'সে বড়ো উপদ্রব করিতেছিল, তাই তাহাকে ওই ঘরে পুরিয়া রাখিয়াছি।'

বৃদ্ধ কিছু চিন্তান্বিত হইয়া কহিল, 'যদি বিরক্ত করে সহিয়া থাকিস। অল্প বয়সে অমন সকলেই দুরন্ত হইয়া থাকে। বেশি শাসন করিস না। দালিয়া কাল এক থলু দিয়া আমার কাছে তিনটি মাছ লইয়াছিল।' (থলু অর্থে স্বর্ণমুদ্রা)

আমিনা কহিল, 'ভাবনা নাই বুঢ়া, আজ আমি তাহার কাছে দুই থলু আদায় করিয়া দিব, একটিও মাছ দিতে হইবে না।'

বৃদ্ধ তাহার পালিত কন্যার এত অল্প বয়সে এমন চাতুরী এবং বিষয়বুদ্ধি দেখিয়া পরম প্রীত হইয়া তাহার মাথায় সস্নেহ হাত বুলাইয়া চলিয়া গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আশ্চর্য এই, দালিয়ার আসা যাওয়া সম্বন্ধে জুলিখার ক্রমে আর আপত্তি রহিল না। ভাবিয়া দেখিলে, ইহাতে আশ্চর্য নাই। কারণ, নদীর যেমন এক দিকে স্রোত এবং আর-এক দিকে কূল, রমণীর সেইরূপ হৃদয়াবেগ এবং লোকলজ্জা। কিন্তু, সভ্যসমাজের বাহিরে আরাকানের প্রান্তে এখানে লোক কোথায়।

এখানে কেবল ঋতুপর্যায়ে তরু মুঞ্জরিত হইতেছে; এবং সম্মুখের নীলা নদী বর্ষায় স্ফীত, শরতে স্বচ্ছ এবং গ্রীষ্মে ক্ষীণ হইতেছে; পাখির উচ্ছ্বসিত কণ্ঠস্বরে সমালোচনার লেশমাত্র নাই; এবং দক্ষিণবায়ু মাঝে মাঝে পরপারের গ্রাম হইতে মানবচক্রের গুঞ্জনধ্বনি বহিয়া আনে, কিন্তু কানাকানি আনে না।

পতিত অট্টালিকার উপরে ক্রমে যেমন অরণ্য জন্মে এখানে কিছু দিন থাকিলে সেইরূপ প্রকৃতির গোপন আক্রমণে লৌকিকতার মানবনির্মিত দৃঢ় ভিত্তি ক্রমে অলক্ষিতভাবে ভাঙিয়া যায় এবং চতুর্দিকে প্রাকৃতিক জগতের সহিত সমস্ত একাকার হইয়া আসে। দুটি সমযোগ্য নরনারীর মিলনদৃশ্য দেখিতে রমণীর যেমন সুন্দর লাগে এমন আর-কিছু নয়। এত রহস্য, এত সুখ, এত অতলস্পর্শ কৌতূহলের বিষয় তাহার পক্ষে আর-কিছুই হইতে পারে না। অতএব এই বর্বরকুটিরের মধ্যে নির্জন দারিদ্র্যের ছায়ায় যখন জুলিখার কুলগর্ব এবং লোকমর্যাদার ভাব আপনিই শিথিল হইয়া আসিল তখন পুষ্পিত কৈলুতরুচ্ছায়ে আমিনা এবং দালিয়ার মিলনের এই এক মনোহর খেলা দেখিতে তাহার বড়ো আনন্দ হইত।

বোধ করি তাহারও তরুণ হৃদয়ের একটা অপরিতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিত এবং তাহাকে সুখে দুঃখে চঞ্চল করিয়া তুলিত। অবশেষে এমন হইল, কোনোদিন যুবকের আসিতে বিলম্ব হইলে আমিনা যেমন উৎকণ্ঠিত হইয়া থাকিত জুলিখাও তেমনি আগ্রহের সহিত প্রতীক্ষা করিত এবং উভয়ে একত্র হইলে, চিত্রকর নিজের সদ্য-সমাপ্ত ছবি ঈষৎ দূর হইতে যেমন করিয়া দেখে তেমনি করিয়া সস্নেহে সহাস্যে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিত। কোনো কোনো দিন মৌখিক ঝগড়াও করিত, ছল করিয়া ভর্ৎসনা করিত, আমিনাকে গৃহে রুদ্ধ করিয়া যুবকের মিলনাবেগ প্রতিহত করিত।

সম্রাট এবং অরণ্যের মধ্যে একটা সাদৃশ্য আছে। উভয়ে স্বাধীন, উভয়েই স্বরাজ্যের একাধিপতি, উভয়কেই কাহারো নিয়ম মানিয়া চলিতে হয় না। উভয়ের মধ্যেই প্রকৃতির একটা স্বাভাবিক বৃহত্ত্ব এবং সরলতা আছে। যাহারা মাঝারি, যাহারা দিনরাত্রি লোকশাস্ত্রের অক্ষর মিলাইয়া জীবন যাপন করে, তাহারাই কিছু স্বতন্ত্র গোছের হয়। তাহারাই বড়োর কাছে দাস, ছোটোর কাছে প্রভু এবং অস্থানে নিতান্ত কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়ায়। বর্বর দালিয়া প্রকৃতি-সম্রাজ্ঞীর উচ্ছৃঙ্খল ছেলে, শাহজাদীর কাছে কোনো সংকোচ ছিল না, এবং শাহজাদীরাও তাহাকে সমকক্ষ লোক বলিয়া চিনিতে পারিত। সহাস্য, সরল, কৌতুকপ্রিয়, সকল অবস্থাতেই নির্ভীক, অসংকুচিত তাহার চরিত্রে দারিদ্র্যের কোনো লক্ষণই ছিল না।

কিন্তু এই-সকল খেলার মধ্যে এক-একবার জুলিখার হৃদয়টা হায়-হায় করিয়া উঠিত; ভাবিত, সম্রাটপুত্রীর জীবনের এই কি পরিণাম!

একদিন প্রাতে দালিয়া আসিবামাত্র জুলিখা তাহার হাত চাপিয়া কহিল, 'দালিয়া, এখানকার রাজাকে দেখাইয়া দিতে পার?'

'পারি। কেন বলো দেখি।'

'আমার একটা ছোরা আছে, তাহার বুকের মধ্যে বসাইতে চাহি।'

প্রথমে দালিয়া কিছু আশ্চর্য হইয়া গেল। তাহার পরে জুলিখার হিংসাপ্রখর মুখের দিকে চাহিয়া তাহার সমস্ত মুখ হাসিতে ভরিয়া গেল; যেন এতবড়ো মজার কথা সে ইতিপূর্বে কখনো শোনে নাই।— যদি পরিহাস বল তো এই বটে, রাজপুত্রীর উপযুক্ত। কোনো কথা নাই, বার্তা নাই, প্রথম আলাপেই একখানি ছোরার আধখানা একটা জীবন্ত রাজার বক্ষের মধ্যে চালনা করিয়া দিলে এইরূপ অত্যন্ত অন্তরঙ্গ ব্যবহারে রাজাটা হঠাৎ কিরূপ অবাক হইয়া যায়, সেই চিত্র ক্রমাগত তাহার মনে উদিত হইয়া তাহার নিঃশব্দ কৌতুকহাসি থাকিয়া থাকিয়া উচ্চহাস্যে পরিণত হইতে লাগিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

তাহার পরদিনই রহমত শেখ জুলিখাকে গোপনে পত্র লিখিল যে, 'আরাকানের নূতন রাজা ধীবরের কুটিরে দুই ভগ্নীর সন্ধান পাইয়াছেন এবং গোপনে আমিনাকে দেখিয়া অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়াছেন— তাহাকে বিবাহার্থে অবিলম্বে প্রাসাদে আনিবার আয়োজন করিতেছেন। প্রতিহিংসার এমন সুন্দর অবসর আর পাওয়া যাইবে না।'

তখন জুলিখা দৃঢ়ভাবে আমিনার হাত ধরিয়া কহিল, 'ঈশ্বরের ইচ্ছা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। আমিনা, এইবার তোর জীবনের কর্তব্য পালন করিবার সময় আসিয়াছে— এখন আর খেলা ভালো দেখায় না।'

দালিয়া উপস্থিত ছিল, আমিনা তাহার মুখের দিকে চাহিল; দেখিল সে সকৌতুকে হাসিতেছে।

আমিনা তাহার হাসি দেখিয়া মর্মাহত হইয়া কহিল, 'জান দালিয়া?—আমি রাজবধূ হইতে যাইতেছি।'

দালিয়া হাসিয়া বলিল, 'সে তো বেশি ক্ষণের জন্য নয়।'

আমিনা পীড়িত বিস্মিত চিত্তে মনে মনে ভাবিল, 'বাস্তবিকই এ বনের মৃগ, এর সঙ্গে মানুষের মতো ব্যবহার করা আমারই পাগলামি।'

আমিনা দালিয়াকে আর একটু সচেতন করিয়া তুলিবার জন্য কহিল, 'রাজাকে মারিয়া আর কি আমি ফিরিব।'

দালিয়া কথাটা সংগত জ্ঞান করিয়া কহিল, 'ফেরা কঠিন বটে।'

আমিনার সমস্ত অন্তরাত্মা একেবারে ম্লান হইয়া গেল।

জুলিখার দিকে ফিরিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, 'দিদি, আমি প্রস্তুত আছি।'

এবং দালিয়ার দিকে ফিরিয়া বিদ্ধ অন্তরে পরিহাসের ভান করিয়া কহিল, 'রানী হইয়াই আমি প্রথমে তোমাকে রাজার বিরুদ্ধে ষড়্‌যন্ত্রে যোগ দেওয়া অপরাধে শাস্তি দিব। তার পরে আর যাহা করিতে হয় করিব।'

শুনিয়া দালিয়া বিশেষ কৌতুক বোধ করিল, যেন প্রস্তাবটা কার্যে পরিণত হইলে তাহার মধ্যে অনেকটা আমোদের বিষয় আছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

অশ্বারোহী পদাতিক নিশান হস্তী বাদ্য এবং আলোকে ধীবরের ঘর-দুয়ার ভাঙিয়া পড়িবার জো হইল। রাজপ্রাসাদ হইতে স্বর্ণমণ্ডিত দুই শিবিকা আসিয়াছে।

আমিনা জুলিখার হাত হইতে ছুরিখানি লইল। তাহার হস্তিদন্তনির্মিত কারুকার্য অনেক ক্ষণ ধরিয়া দেখিল। তাহার পর বসন উদ্‌ঘাটন করিয়া নিজের বক্ষের উপর একবার ধার পরীক্ষা করিয়া দেখিল। জীবনমুকুলের বৃন্তের কাছে ছুরিটি একবার স্পর্শ করিল, আবার সেটি খাপের মধ্যে পুরিয়া বসনের মধ্যে লুকাইয়া রাখিল।

একান্ত ইচ্ছা ছিল, এই মরণযাত্রার পূর্বে একবার দালিয়ার সহিত দেখা হয়, কিন্তু কাল হইতে সে নিরুদ্দেশ। দালিয়া সেই-যে হাসিতেছিল তাহার ভিতরে কি অভিমানের জ্বালা প্রচ্ছন্ন ছিল।

শিবিকায় উঠিবার পূর্বে আমিনা তাহার বাল্যকালের আশ্রয়টি অশ্রুজলের ভিতর হইতে একবার দেখিল— তাহার সেই ঘরের গাছ, তাহার সেই ঘরের নদী। ধীবরের হাত ধরিয়া বাষ্পরুদ্ধ কম্পিত স্বরে কহিল, 'বুঢ়া, তবে চলিলাম। তিন্নি গেলে তোর ঘরকন্না কে দেখিবে।'

বুঢ়া একেবারে বালকের মতো কাঁদিয়া উঠিল।

আমিনা কহিল 'বুঢ়া, যদি দালিয়া আর এখানে আসে তাহাকে এই আঙটি দিয়ো। বলিয়ো, তিন্নি যাইবার সময় দিয়া গেছে।'

এই বলিয়াই দ্রুত শিবিকায় উঠিয়া পড়িল। মহাসমারোহে শিবিকা চলিয়া গেল। আমিনার কুটির, নদীতীর, কৈলুতরুতল অন্ধকার, নিস্তব্ধ, জনশূন্য হইয়া গেল।

যথাকালে শিবিকাদ্বয় তোরণদ্বার অতিক্রম করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। দুই ভগ্নী শিবিকা ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিল।

আমিনার মুখে হাসি নাই, চোখেও অশ্রুচিহ্ন নাই। জুলিখার মুখ বিবর্ণ। কর্তব্য যখন দূরে ছিল ততক্ষণ তাহার উৎসাহের তীব্রতা ছিল— এখন সে কম্পিতহৃদয়ে ব্যাকুল স্নেহে আমিনাকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিল। মনে মনে কহিল, 'নব প্রেমের বৃন্ত হইতে ছিন্ন করিয়া এই ফুটন্ত ফুলটিকে কোন্ রক্তস্রোতে ভাসাইতে যাইতেছি।'

কিন্তু তখন আর ভাবিবার সময় নাই। পরিচারিকাদের দ্বারা নীত হইয়া শত সহস্র প্রদীপের অনিমেষ তীব্র দৃষ্টির মধ্য দিয়া দুই ভগিনী স্বপ্নাহতের মতো চলিতে লাগিল, অবশেষে বাসরঘরের দ্বারের কাছে মুহূর্তের জন্য থামিয়া আমিনা জুলিখাকে কহিল, 'দিদি।'

জুলিখা আমিনাকে গাঢ় আলিঙ্গনে বাঁধিয়া চুম্বন করিল।

উভয়ে ধীরে ধীরে ঘরে প্রবেশ করিল।

রাজবেশ পরিয়া ঘরের মাঝখানে মছলন্দ-শয্যার উপর রাজা বসিয়া আছে। আমিনা সসংকোচে দ্বারের অনতিদূরে দাঁড়াইয়া রহিল।

জুলিখা অগ্রসর হইয়া রাজার নিকটবর্তী হইয়া দেখিল, রাজা নিঃশব্দে সকৌতুকে হাসিতেছেন।

জুলিখা বলিয়া উঠিল 'দালিয়া!'— আমিনা মূর্ছিত হইয়া পড়িল।

দালিয়া উঠিয়া তাহাকে আহত পাখিটির মতো কোলে করিয়া তুলিয়া শয্যায় লইয়া গেল। আমিনা সচেতন হইয়া বুকের মধ্য হইতে ছুরিটি বাহির করিয়া দিদির মুখের দিকে চাহিল, দিদি দালিয়ার মুখের দিকে চাহিল, দালিয়া চুপ করিয়া হাস্যমুখে উভয়ের প্রতি চাহিয়া রহিল— ছুরিও তাহার খাপের মধ্য হইতে একটুখানি মুখ বাহির করিয়া এই রঙ্গ দেখিয়া ঝিক্‌মিক্ করিয়া হাসিতে লাগিল।

মাঘ ১২৯৮

কঙ্কাল

আমরা তিন বাল্যসঙ্গী যে ঘরে শয়ন করিতাম তাহার পাশের ঘরের দেয়ালে একটি আস্ত নরকঙ্কাল ঝুলানো থাকিত। রাত্রে বাতাসে তাহার হাড়গুলা খট্‌খট্‌ শব্দ করিয়া নড়িত। দিনের বেলায় আমাদিগকে সেই হাড় নাড়িতে হইত। আমরা তখন পণ্ডিত-মহাশয়ের নিকট মেঘনাদবধ এবং ক্যাম্বেল স্কুলের এক ছাত্রের কাছে অস্থিবিদ্যা পড়িতাম। আমাদের অভিভাবকের ইচ্ছা ছিল আমাদিগকে সহসা সর্ববিদ্যায় পারদর্শী করিয়া তুলিবেন। তাঁহার অভিপ্রায় কতদূর সফল হইয়াছে যাঁহারা আমাদিগকে জানেন তাঁহাদের নিকট প্রকাশ করা বাহুল্য এবং যাঁহারা জানেন না তাঁহাদের নিকট গোপন করাই শ্রেয়।

তাহার পর বহুকাল অতীত হইয়াছে। ইতিমধ্যে সেই ঘর হইতে কঙ্কাল এবং আমাদের মাথা হইতে অস্থিবিদ্যা কোথায় স্থানান্তরিত হইয়াছে অন্বেষণ করিয়া জানা যায় না।

অল্পদিন হইল একদিন রাত্রে কোনো কারণে অন্যত্র স্থানাভাব হওয়াতে আমাকে সেই ঘরে শয়ন করিতে হয়।— অনভ্যাসবশত ঘুম হইতেছে না। এপাশ ওপাশ করিতে করিতে গির্জার ঘড়িতে বড়ো বড়ো ঘণ্টাগুলো প্রায় সব কটা বাজিয়া গেল। এমন সময়ে ঘরের কোণে যে তেলের সেজ জ্বলিতেছিল সেটা প্রায় মিনিট-পাঁচেক ধরিয়া খাবি খাইতে খাইতে একেবারে নিবিয়া গেল। ইতিপূর্বেই আমাদের বাড়িতে দুই-একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। তাই এই আলো নেবা হইতে সহজেই মৃত্যুর কথা মনে উদয় হইল। মনে হইল এই-যে রাত্রি দুই প্রহরে একটি দীপশিখা চিরান্ধকারে মিলাইয়া গেল, প্রকৃতির কাছে ইহাও যেমন আর মানুষের ছোটো ছোটো প্রাণশিখা কখনো দিনে কখনো রাত্রে হঠাৎ নিবিয়া বিস্মৃত হইয়া যায়, তাহাও তেমনি।

ক্রমে সেই কঙ্কালের কথা মনে পড়িল। তাহার জীবিতকালের বিষয় কল্পনা করিতে করিতে সহসা মনে হইল, একটি চেতন পদার্থ অন্ধকারে ঘরের দেয়াল হাৎড়াইয়া আমার মশারির চারি দিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তাহার ঘন ঘন নিশ্বাসের শব্দ শুনা যাইতেছে। সে যেন কী খুঁজিতেছে, পাইতেছে না এবং দ্রুততর বেগে ঘরময় প্রদক্ষিণ করিতেছে। নিশ্চয় বুঝিতে পারিলাম, সমস্তই আমার নিদ্রাহীন উষ্ণ মস্তিষ্কের কল্পনা এবং আমারই মাথার মধ্যে বোঁ বোঁ করিয়া যে রক্ত ছুটিতেছে তাহাই দ্রুত পদশব্দের মতো শুনাইতেছে। কিন্তু, তবু গা ছম্‌ছম্‌ করিতে লাগিল। জোর করিয়া এই অকারণ ভয় ভাঙিবার জন্য বলিয়া উঠিলাম, 'কেও।' পদশব্দ আমার মশারির কাছে

আসিয়া থামিয়া গেল এবং একটা উত্তর শুনিতে পাইলাম, ‘আমি। আমার সেই কঙ্কালটা কোথায় গেছে তাই খুঁজিতে আসিয়াছি।’

আমি ভাবিলাম, নিজের কাল্পনিক সৃষ্টির কাছে ভয় দেখানো কিছু নয়— পাশবালিশটা সবলে আঁকড়িয়া ধরিয়া চিরপরিচিতের মতো অতি সহজ সুরে বলিলাম, ‘এই দুপর রাত্রে বেশ কাজটি বাহির করিয়াছ। তা, সে কঙ্কালে এখন আর তোমার আবশ্যক?’

অন্ধকারে মশারির অত্যন্ত নিকট হইতে উত্তর আসিল, ‘বল কী। আমার বুকের হাড় যে তাহারই মধ্যে ছিল। আমার ছাব্বিশ বৎসরের যৌবন যে তাহার চারি দিকে বিকশিত হইয়াছিল— একবার দেখিতে ইচ্ছা করে না?”

আমি তৎক্ষণাৎ বলিলাম, ‘হাঁ, কথাটা সংগত বটে। তা, তুমি সন্ধান করো গে যাও। আমি একটু ঘুমাইবার চেষ্টা করি।’

সে বলিল, ‘তুমি একলা আছ বুঝি? তবে একটু বসি। একটু গল্প করা যাক। পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্বে আমিও মানুষের কাছে বসিয়া মানুষের সঙ্গে গল্প করিতাম। এই পঁয়ত্রিশটা বৎসর আমি কেবল শ্মশানের বাতাসে হুহু শব্দ করিয়া বেড়াইয়াছি। আজ তোমার কাছে বসিয়া আর-একবার মানুষের মতো করিয়া গল্প করি।’

অনুভব করিলাম, আমার মশারির কাছে কে বসিল। নিরুপায় দেখিয়া আমি বেশ একটু উৎসাহের সহিত বলিলাম, ‘সেই ভালো। যাহাতে মন বেশ প্রফুল্ল হইয়া উঠে এমন একটা-কিছু গল্প বলো।’

সে বলিল, ‘সব চেয়ে মজার কথা যদি শুনিতে চাও তো আমার জীবনের কথা বলি।’

গির্জার ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া দুটা বাজিল।—

‘যখন মানুষ ছিলাম এবং ছোটো ছিলাম তখন এক ব্যক্তিকে যমের মতো ভয় করিতাম। তিনি আমার স্বামী। মাছকে বঁড়শি দিয়া ধরিলে তাহার যেমন মনে হয় আমারও সেইরূপ মনে হইত। অর্থাৎ, কোন্‌-এক সম্পূর্ণ অপরিচিত জীব যেন বঁড়শিতে গাঁথিয়া আমাকে আমার স্নিগ্ধগভীর জন্মজলাশয় হইতে টান মারিয়া ছিনিয়া লইয়া যাইতেছে— কিছুতে তাহার হাত হইতে পরিত্রাণ নাই। বিবাহের দুই মাস পরেই আমার স্বামীর মৃত্যু হইল এবং আমার আত্মীয়স্বজনেরা আমার হইয়া অনেক বিলাপ-পরিতাপ করিলেন। আমার শ্বশুর অনেকগুলি লক্ষণ মিলাইয়া দেখিয়া শাশুড়িকে কহিলেন, শাস্ত্রে যাহাকে বলে বিষকন্যা এ মেয়েটি তাই। সে কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে।— শুনিতেছ? কেমন লাগিতেছে।’

আমি বলিলাম, 'বেশ। গল্পের আরম্ভটি বেশ মজার।'

'তবে শোনো। আনন্দে বাপের বাড়ি ফিরিয়া আসিলাম। ক্রমে বয়স বাড়িতে লাগিল। লোকে আমার কাছে লুকাইতে চেষ্টা করিত, কিন্তু আমি নিজে বেশ জানিতাম আমার মতো রূপসী এমন যেখানে-সেখানে পাওয়া যায় না। তোমার কী মনে হয়।'

'খুব সম্ভব। কিন্তু আমি তোমাকে কখনো দেখি নাই।'

'দেখ নাই ? কেন। আমার সেই কঙ্কাল। হি হি হি হি।— আমি ঠাট্টা করিতেছি। তোমার কাছে কী করিয়া প্রমাণ করিব যে, সেই দুটো শূন্য চক্ষুকোটরের মধ্যে বড়ো বড়ো টানা দুটি কালো চোখ ছিল এবং রাঙা ঠোঁটের উপরে যে মৃদু হাসিটুকু মাখানো ছিল এখনকার অনাবৃতদন্তসার বিকট হাস্যের সঙ্গে তার কোনো তুলনাই হয় না— এবং সেই কয়খানা দীর্ঘ শুষ্ক অস্থিখণ্ডের উপর এত লালিত্য, এত লাবণ্য, যৌবনের এত কঠিন-কোমল নিটোল পরিপূর্ণতা প্রতিদিন প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিতেছিল তোমাকে তাহা বলিতে গেলে হাসি পায় এবং রাগও ধরে। আমার সেই শরীর হইতে যে অস্থিবিদ্যা শেখা যাইতে পারে তাহা তখনকার বড়ো বড়ো ডাক্তারেরাও বিশ্বাস করিত না। আমি জানি, একজন ডাক্তার তাঁহার কোনো বিশেষ বন্ধুর কাছে আমাকে কনক-চাঁপা বলিয়াছিলেন। তাহার অর্থ এই, পৃথিবীর আর-সকল মনুষ্যই অস্থিবিদ্যা এবং শরীরতত্ত্বের দৃষ্টান্তস্থল ছিল, কেবল আমি সৌন্দর্যরূপী ফুলের মতো ছিলাম। কনক-চাঁপার মধ্যে কি একটা কঙ্কাল আছে ?

'আমি যখন চলিতাম তখন আপনি বুঝিতে পারিতাম যে, একখণ্ড হীরা নড়াইলে তাহার চারি দিক হইতে যেমন আলো ঝক্‌মক্ করিয়া উঠে, আমার দেহের প্রত্যেক গতিতে তেমনি সৌন্দর্যের ভঙ্গি নানা স্বাভাবিক হিল্লোলে চারি দিকে ভাঙিয়া পড়িত। আমি মাঝে মাঝে অনেক ক্ষণ ধরিয়া নিজের হাত দুখানি নিজে দেখিতাম— পৃথিবীর সমস্ত উদ্ধত পৌরুষের মুখে রাশ লাগাইয়া মধুরভাবে বাগাইয়া ধরিতে পারে এমন দুইখানি হাত। সুভদ্রা যখন অর্জুনকে লইয়া দৃপ্ত ভঙ্গিতে আপনার বিজয়রথ বিস্মিত তিন লোকের মধ্য দিয়া চালাইয়া লইয়া গিয়াছিলেন তাঁহার বোধ করি এইরূপ দুখানি অস্থূল সুডোল বাহু, আরক্ত করতল এবং লাবণ্যশিখার মতো অঙ্গুলি ছিল।

'কিন্তু আমার সেই নির্লজ্জ নিরাবরণ নিরাভরণ চিরবৃদ্ধ কঙ্কাল তোমার কাছে আমার নামে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছে। আমি তখন নিরুপায় নিরুত্তর ছিলাম। এই জন্য পৃথিবীর সব চেয়ে তোমার উপর আমার বেশি রাগ। ইচ্ছা করে, আমার সেই ষোলো বৎসরের

জীবন্ত, যৌবনতাপে উত্তপ্ত, আরক্তিম রূপখানি একবার তোমার চোখের সামনে দাঁড় করাই, বহুকালের মতো তোমার দুই চক্ষের নিদ্রা ছুটাইয়া দিই, তোমার অস্থিবিদ্যাকে অস্থির করিয়া দেশছাড়া করি।'

আমি বলিলাম, 'তোমার গা যদি থাকিত তো গা ছুঁইয়া বলিতাম, সে বিদ্যার লেশমাত্র আমার মাথায় নাই। আর তোমার সেই ভুবনমোহন পূর্ণযৌবনের রূপ রজনীর অন্ধকারপটের উপরে জাজ্বল্যমান হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। আর অধিক বলিতে হইবে না।'

'আমার কেহ সঙ্গিনী ছিল না। দাদা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, বিবাহ করিবেন না। অন্তঃপুরে আমি একা। বাগানের গাছতলায় আমি একা বসিয়া ভাবিতাম, সমস্ত পৃথিবী আমাকেই ভালোবাসিতেছে, সমস্ত তারা আমাকে নিরীক্ষণ করিতেছে, বাতাস ছল করিয়া বার বার দীর্ঘনিশ্বাসে পাশ দিয়া চলিয়া যাইতেছে এবং যে তৃণাসনে পা দুটি মেলিয়া বসিয়া আছি তাহার যদি চেতনা থাকিত তবে সে পুনর্বার অচেতন হইয়া যাইত। পৃথিবীর সমস্ত যুবাপুরুষ ওই তৃণপুঞ্জরূপে দল বাঁধিয়া নিস্তব্ধে আমার চরণবর্তী হইয়া দাঁড়াইয়াছে এইরূপ আমি কল্পনা করিতাম; হৃদয়ে অকারণে কেমন বেদনা অনুভব হইত।

'দাদার বন্ধু শশিশেখর যখন মেডিকাল কালেজ হইতে পাস হইয়া আসিলেন তখন তিনিই আমাদের বাড়ির ডাক্তার হইলেন। আমি তাঁহাকে পূর্বে আড়াল হইতে অনেকবার দেখিয়াছি। দাদা অত্যন্ত অদ্ভুত লোক ছিলেন— পৃথিবীটাকে যেন ভালো করিয়া চোখ মেলিয়া দেখিতেন না। সংসারটা যেন তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট ফাঁকা নয়— এই জন্য সরিয়া সরিয়া একেবারে প্রান্তে গিয়া আশ্রয় লইয়াছেন।

'তাঁহার বন্ধুর মধ্যে এক শশিশেখর। এই জন্য বাহিরের যুবকদের মধ্যে আমি এই শশিশেখরকেই সর্বদা দেখিতাম। এবং যখন আমি সন্ধ্যাকালে পুষ্পতরুতলে সম্রাজ্ঞীর আসন গ্রহণ করিতাম তখন পৃথিবীর সমস্ত পুরুষজাতি শশিশেখরের মূর্তি ধরিয়া আমার চরণাগত হইত।— শুনিতেছ? কী মনে হইতেছে।'

আমি সনিশ্বাসে বলিলাম, 'মনে হইতেছে, শশিশেখর হইয়া জন্মিলে বেশ হইত।'

'আগে সবটা শোনো। একদিন বাদলার দিনে আমার জ্বর হইয়াছে। ডাক্তার দেখিতে আসিয়াছেন। সেই প্রথম দেখা।

'আমি জানলার দিকে মুখ করিয়া ছিলাম, সন্ধ্যার লাল আভাটা পড়িয়া রুগ্‌ণ মুখের বিবর্ণতা যাহাতে দূর হয়। ডাক্তার যখন ঘরে ঢুকিয়াই আমার মুখের দিকে একবার চাহিলেন তখন আমি মনে মনে ডাক্তার হইয়া কল্পনায় নিজের মুখের দিকে চাহিলাম।

সেই সন্ধ্যালোকে কোমল বালিশের উপরে একটি ঈষৎক্লিষ্ট কুসুমপেলব মুখ ; অসংযমিত চূর্ণকুন্তল ললাটের উপর আসিয়া পড়িয়াছে এবং লজ্জায় আনমিত বড়ো বড়ো চোখের পল্লব কপোলের উপর ছায়া বিস্তার করিয়াছে।

'ডাক্তার নম্র মৃদুস্বরে দাদাকে বলিলেন, একবার হাতটা দেখিতে হইবে।

'আমি গাত্রাবরণের ভিতর হইতে ক্লান্ত সুগোল হাতখানি বাহির করিয়া দিলাম। একবার হাতের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, যদি নীলবর্ণ কাঁচের চুড়ি পরিতে পারিতাম তো আরো বেশ মানাইত। রোগীর হাত লইয়া নাড়ী দেখিতে ডাক্তারের এমন ইতস্তত ইতিপূর্বে কখনো দেখি নাই। অত্যন্ত অসংলগ্নভাবে কম্পিত অঙ্গুলিতে নাড়ী দেখিলেন। তিনি আমার জ্বরের উত্তাপ বুঝিলেন, আমিও তাঁহার অন্তরের নাড়ী কিরূপ চলিতেছে কতকটা আভাস পাইলাম। বিশ্বাস হইতেছে না ?'

আমি বলিলাম, 'অবিশ্বাসের কোনো কারণ দেখিতেছি না— মানুষের নাড়ী সকল অবস্থায় সমান চলে না।'

'কালক্রমে আরো দুই-চারিবার রোগ ও আরোগ্য হইবার পরে দেখিলাম আমার সেই সন্ধ্যাকালের মানস সভায় পৃথিবীর কোটি কোটি পুরুষ-সংখ্যা অত্যন্ত হ্রাস হইয়া ক্রমে একটিতে আসিয়া ঠেকিল, আমার পৃথিবী প্রায় জনশূন্য হইয়া আসিল। জগতে কেবল একটি ডাক্তার এবং একটি রোগী অবশিষ্ট রহিল।

'আমি গোপনে সন্ধ্যাবেলায় একটি বাসন্তী রঙের কাপড় পরিতাম, ভালো করিয়া খোঁপা বাঁধিয়া মাথায় একগাছি বেলফুলের মালা জড়াইতাম, একটি আয়না হাতে লইয়া বাগানে গিয়া বসিতাম।

'কেন। আপনাকে দেখিয়া কি আর পরিতৃপ্তি হয় না। বাস্তবিকই হয় না। কেননা, আমি তো আপনি আপনাকে দেখিতাম না। আমি তখন একলা বসিয়া দুইজন হইতাম। আমি তখন ডাক্তার হইয়া আপনাকে দেখিতাম, মুগ্ধ হইতাম এবং ভালোবাসিতাম এবং আদর করিতাম, অথচ প্রাণের ভিতরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস সন্ধ্যাবাতাসের মতো হু হু করিয়া উঠিত।

'সেই হইতে আমি আর একলা ছিলাম না ; যখন চলিতাম নত নেত্রে চাহিয়া দেখিতাম পায়ের অঙ্গুলিগুলি পৃথিবীর উপরে কেমন করিয়া পড়িতেছে এবং ভাবিতাম এই পদক্ষেপ আমাদের নূতন-পরীক্ষোত্তীর্ণ ডাক্তারের কেমন লাগে ; মধ্যাহ্নে জানলার বাহিরে ঝাঁ ঝাঁ করিত, কোথাও সাড়াশব্দ নাই, মাঝে মাঝে এক-একটা চিল অতিদূর আকাশে শব্দ করিয়া উড়িয়া যাইত ; এবং আমাদের উদ্যানপ্রাচীরের বাহিরে খেলেনা-ওয়ালা সুর ধরিয়া 'চাই খেলেনা চাই' 'চুড়ি চাই' করিয়া ডাকিয়া যাইত, আমি একখানি

ধব্‌ধবে চাদর পাতিয়া নিজের হাতে বিছানা করিয়া শয়ন করিতাম ; একখানি অনাবৃত বাহু কোমল বিছানার উপরে যেন অনাদরে মেলিয়া দিয়া ভাবিতাম, এই হাতখানি এমনি ভঙ্গিতে কে যেন দেখিতে পাইল, কে যেন দুইখানি হাত দিয়া তুলিয়া লইল, কে যেন ইহার আরক্ত করতলের উপর একটি চুম্বন রাখিয়া দিয়া আবার ধীরে ধীরে ফিরিয়া যাইতেছে।— মনে করো এইখানেই গল্পটা যদি শেষ হয় তাহা হইলে কেমন হয়।'

আমি বলিলাম, 'মন্দ হয় না। একটু অসম্পূর্ণ থাকে বটে, কিন্তু সেইটুকু আপন মনে পূরণ করিয়া লইতে বাকি রাতটুকু বেশ কাটিয়া যায়।'

'কিন্তু তাহা হইলে গল্পটা যে বড়ো গম্ভীর হইয়া পড়ে। ইহার উপহাসটুকু থাকে কোথায়। ইহার ভিতরকার কঙ্কালটা তাহার সমস্ত দাঁত ক'টি মেলিয়া দেখা দেয় কই।

'তার পরে শোনো। একটুখানি পসার হইতেই আমাদের বাড়ির এক তলায় ডাক্তার তাঁহার ডাক্তারখানা খুলিলেন। তখন আমি তাঁহাকে মাঝে মাঝে হাসিতে হাসিতে ঔষধের কথা, বিষের কথা, কী করিলে মানুষ সহজে মরে, এই-সকল কথা জিজ্ঞাসা করিতাম। ডাক্তারির কথায় ডাক্তারের মুখ খুলিয়া যাইত। শুনিয়া শুনিয়া মৃত্যু যেন পরিচিত ঘরের লোকের মতো হইয়া গেল। ভালোবাসা এবং মরণ কেবল এই দুটোকেই পৃথিবীময় দেখিলাম।

'আমার গল্প প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে— আর বড়ো বাকি নাই।'

আমি মৃদুস্বরে বলিলাম, 'রাত্রিও প্রায় শেষ হইয়া আসিল।'

'কিছুদিন হইতে দেখিলাম ডাক্তারবাবু বড়ো অন্যমনস্ক এবং আমার কাছে যেন ভারী অপ্রতিভ। একদিন দেখিলাম তিনি কিছু বেশিরকম সাজসজ্জা করিয়া দাদার কাছে তাঁহার জুড়ি ধার লইলেন, রাত্রে কোথায় যাইবেন।

'আমি আর থাকিতে পারিলাম না। দাদার কাছে গিয়া নানা কথার পর জিজ্ঞাসা করিলাম, হাঁ দাদা, ডাক্তারবাবু আজ জুড়ি লইয়া কোথায় যাইতেছেন।

'সংক্ষেপে দাদা বলিলেন, মরিতে।

'আমি বলিলাম, না, সত্য করিয়া বলো-না।

'তিনি পূর্বাপেক্ষা কিঞ্চিৎ খোলসা করিয়া বলিলেন, বিবাহ করিতে।

'আমি বলিলাম সত্য নাকি।— বলিয়া অনেক হাসিতে লাগিলাম।

'অল্পে অল্পে শুনিলাম এই বিবাহে ডাক্তার বারো হাজার টাকা পাইবেন।

'কিন্তু আমার কাছে এ সংবাদ গোপন করিয়া আমাকে অপমান করিবার তাৎপর্য কী। আমি কি তাঁহার পায়ে ধরিয়া বলিয়াছিলাম যে, এমন কাজ করিলে আমি বুক

ফাটিয়া মরিব। পুরুষদের বিশ্বাস করিবার জো নাই। পৃথিবীতে আমি একটিমাত্র পুরুষ দেখিয়াছি এবং এক মুহূর্তে সমস্ত জ্ঞান লাভ করিয়াছি।

'ডাক্তার রোগী দেখিয়া সন্ধ্যার পূর্বে ঘরে আসিলে আমি প্রচুর পরিমাণে হাসিতে হাসিতে বলিলাম, কী ডাক্তার মহাশয়। আজ নাকি আপনার বিবাহ?

'আমার প্রফুল্লতা দেখিয়া ডাক্তার যে কেবল অপ্রতিভ হইলেন তাহা নহে, ভারী বিমর্ষ হইয়া গেলেন।

'জিজ্ঞাসা করিলাম, বাজনা-বাদ্য কিছু নাই যে?

'শুনিয়া তিনি ঈষৎ একটু নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, বিবাহ ব্যাপারটা কি এতই আনন্দের।

'শুনিয়া আমি হাসিয়া অস্থির হইয়া গেলাম। এমন কথাও তো কখনো শুনি নাই। আমি বলিলাম, সে হইবে না, বাজনা চাই, আলো চাই।

'দাদাকে এমনি ব্যস্ত করিয়া তুলিলাম যে দাদা তখনই রীতিমতো উৎসবের আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন।

'আমি কেবলই গল্প করিতে লাগিলাম, বধূ ঘরে আসিলে কী হইবে, কী করিব। জিজ্ঞাসা করিলাম— আচ্ছা ডাক্তার মহাশয়, তখনো কি আপনি রোগীর নাড়ী টিপিয়া বেড়াইবেন। হি হি! হি হি! যদিও মানুষের, বিশেষত পুরুষের, মনটা দৃষ্টিগোচর নয়, তবু আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি কথাগুলি ডাক্তারের বুকে শেলের মতো বাজিতেছিল।

'অনেক রাত্রে লগ্ন। সন্ধ্যাবেলায় ডাক্তার ছাতের উপর বসিয়া দাদার সহিত দুই-এক পাত্র মদ খাইতেছিলেন। দুইজনেরই এই অভ্যাসটুকু ছিল। ক্রমে আকাশে চাঁদ উঠিল।

'আমি হাসিতে হাসিতে আসিয়া বলিলাম, ডাক্তারমশায় ভুলিয়া গেলেন নাকি। যাত্রার যে সময় হইয়াছে।

'এইখানে একটা সামান্য কথা বলা আবশ্যক। ইতিমধ্যে আমি গোপনে ডাক্তারখানায় গিয়া খানিকটা গুঁড়া সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলাম এবং সেই গুঁড়ার কিয়দংশ সুবিধামতো অলক্ষিতে ডাক্তারের গ্লাসে মিশাইয়া দিয়াছিলাম।

'কোন্ গুঁড়া খাইলে মানুষ মরে ডাক্তারের কাছে শিখিয়াছিলাম।

'ডাক্তার এক চুমুকে গ্লাসটি শেষ করিয়া কিঞ্চিৎ আর্দ্র গদ্গদ কণ্ঠে আমার মুখের দিকে মর্মান্তিক দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, তবে চলিলাম।

'বাঁশি বাজিতে লাগিল, আমি একটি বারাণসী শাড়ি পরিলাম, যতগুলি গহনা

সিন্দুকে তোলা ছিল সবগুলি বাহির করিয়া পরিলাম— সিঁথিতে বড়ো করিয়া সিঁদুর দিলাম। আমার সেই বকুলতলায় বিছানা পাতিলাম।

'বড়ো সুন্দর রাত্রি। ফুট্‌ফুটে জ্যোৎস্না। সুপ্ত জগতের ক্লান্তি হরণ করিয়া দক্ষিনে বাতাস বহিতেছে। জুঁই আর বেল ফুলের গন্ধে সমস্ত বাগান আমোদ করিয়াছে।

'বাঁশির শব্দ যখন ক্রমে দূরে চলিয়া গেল, জ্যোৎস্না যখন অন্ধকার হইয়া আসিতে লাগিল, এই তরুপল্লব এবং আকাশ এবং আজন্মকালের ঘর-দুয়ার লইয়া পৃথিবী যখন আমার চারি দিক হইতে মায়ার মতো মিলাইয়া যাইতে লাগিল তখন আমি নেত্র নিমীলন করিয়া হাসিলাম।

'ইচ্ছা ছিল যখন লোকে আসিয়া আমাকে দেখিবে তখন এই হাসিটুকু যেন রঙিন নেশার মতো আমার ঠোঁটের কাছে লাগিয়া থাকে। ইচ্ছা ছিল যখন আমার অনন্তরাত্রির বাসরঘরে ধীরে ধীরে প্রবেশ করিব তখন এই হাসিটুকু এখান হইতেই মুখে করিয়া লইয়া যাইব। কোথায় বাসরঘর। আমার সে বিবাহের বেশ কোথায়। নিজের ভিতর হইতে একটা খট্‌খট্‌ শব্দে জাগিয়া দেখিলাম, আমাকে লইয়া তিনটি বালক অস্থিবিদ্যা শিখিতেছে। বুকের যেখানে সুখদুঃখ ধুক্‌ধুক্‌ করিত এবং যৌবনের পাপড়ি প্রতিদিন একটি একটি করিয়া প্রস্ফুটিত হইত সেইখানে বেত্র নির্দেশ করিয়া কোন্‌ অস্থির কী নাম মাস্টার শিখাইতেছে। আর সেই-যে অন্তিম হাসিটুকু ওষ্ঠের কাছে ফুটাইয়া তুলিয়াছিলাম তাহার কোনো চিহ্ন দেখিতে পাইয়াছিলে কি।—

'গল্পটা কেমন লাগিল।'

আমি বলিলাম, 'গল্পটি বেশ প্রফুল্লকর।'

এমন সময় প্রথম কাক ডাকিল। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'এখনো আছ কি।'

কোনো উত্তর পাইলাম না।

ঘরের মধ্যে ভোরের আলো প্রবেশ করিল।

ফাল্গুন ১২৯৮

মুক্তির উপায়

১

ফকিরচাঁদ বাল্যকাল হইতেই গম্ভীরপ্রকৃতি। বৃদ্ধসমাজে তাহাকে কখনোই বেমানান দেখাইত না। ঠাণ্ডা জল, হিম, এবং হাস্যপরিহাস তাহার একেবারে সহ্য হইত না। একে গম্ভীর, তাহাতে বৎসরের মধ্যে অধিকাংশ সময়েই মুখমণ্ডলের চারি দিকে কালো পশমের গলাবন্ধ জড়াইয়া থাকাতে তাহাকে ভয়ংকর উঁচু দরের লোক বলিয়া বোধ হইত। ইহার উপরে, অতি অল্প বয়সেই তাহার ওষ্ঠাধর এবং গণ্ডস্থল প্রচুর গোঁফ-দাড়িতে আচ্ছন্ন হওয়াতে সমস্ত মুখের মধ্যে হাস্যবিকাশের স্থান আর তিলমাত্র অবশিষ্ট রহিল না।

স্ত্রী হৈমবতীর বয়স অল্প এবং তাহার মন পার্থিব বিষয়ে সম্পূর্ণ নিবিষ্ট। সে বঙ্কিমবাবুর নভেল পড়িতে চায় এবং স্বামীকে ঠিক দেবতার ভাবে পূজা করিয়া তাহার তৃপ্তি হয় না। সে একটুখানি হাসিখুশি ভালোবাসে, এবং বিকচোন্মুখ পুষ্প যেমন বায়ুর আন্দোলন এবং প্রভাতের আলোকের জন্য ব্যাকুল হয় সেও তেমনি এই নবযৌবনের সময় স্বামীর নিকট হইতে আদর এবং হাস্যামোদ যথাপরিমাণে প্রত্যাশা করিয়া থাকে। কিন্তু, স্বামী তাহাকে অবসর পাইলেই ভাগবত পড়ায়, সন্ধ্যাবেলায় ভগবদ্‌গীতা শুনায়, এবং তাহার আধ্যাত্মিক উন্নতির উদ্দেশে মাঝে মাঝে শারীরিক শাসন করিতেও ত্রুটি করে না। যেদিন হৈমবতীর বালিশের নীচে হইতে কৃষ্ণকান্তের উইল বাহির হয় সেদিন উক্ত লঘুপ্রকৃতি যুবতীকে সমস্ত রাত্রি অশ্রুপাত করাইয়া তবে ফকির ক্ষান্ত হয়। একে নভেল-পাঠ, তাহাতে আবার পতিদেবকে প্রতারণা। যাহা হউক, অবিশ্রান্ত আদেশ অনুদেশ উপদেশ ধর্মনীতি এবং দণ্ডনীতির দ্বারা অবশেষে হৈমবতীর মুখের হাসি, মনের সুখ এবং যৌবনের আবেগ একেবারে নিষ্কর্ষণ করিয়া ফেলিতে স্বামীদেবতা সম্পূর্ণ কৃতকার্য হইয়াছিলেন।

কিন্তু, অনাসক্ত লোকের পক্ষে সংসারে বিস্তর বিঘ্ন। পরে পরে ফকিরের এক ছেলে এক মেয়ে জন্মগ্রহণ করিয়া সংসারবন্ধন বাড়িয়া গেল। পিতার তাড়নায় এতবড়ো গম্ভীর-প্রকৃতি ফকিরকেও আপিসে আপিসে কর্মের উমেদারিতে বাহির হইতে হইল, কিন্তু কর্ম জুটিবার কোনো সম্ভাবনা দেখা গেল না।

তখন সে মনে করিল, 'বুদ্ধদেবের মতো আমি সংসার ত্যাগ করিব।' এই ভাবিয়া একদিন গভীর রাত্রে ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেল।

২

মধ্যে আর-একটি ইতিহাস বলা আবশ্যক।

নবগ্রামবাসী ষষ্ঠীচরণের এক ছেলে। নাম মাখনলাল। বিবাহের অনতিবিলম্বে সন্তানাদি না হওয়াতে পিতার অনুরোধে এবং নূতনত্বের প্রলোভনে আর-একটি বিবাহ করেন। এই বিবাহের পর হইতে যথাক্রমে তাঁহার উভয় স্ত্রীর গর্ভে সাতটি কন্যা এবং একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করিল।

মাখন লোকটা নিতান্ত শৌখিন এবং চপলপ্রকৃতি, কোনোপ্রকার গুরুতর কর্তব্যের দ্বারা আবদ্ধ হইতে নিতান্ত নারাজ। একে তো ছেলেপুলের ভার, তাহার পরে যখন দুই কর্ণধার দুই কর্ণে ঝিঁকা মারিতে লাগিল, তখন নিতান্ত অসহ্য হইয়া সেও একদিন গভীর রাত্রে ডুব মারিল।

বহুকাল তাহার আর সাক্ষাৎ নাই। কখনো কখনো শুনা যায়, এক বিবাহে কিরূপ সুখ তাহাই পরীক্ষা করিবার জন্য সে কাশীতে গিয়া গোপনে আর-একটি বিবাহ করিয়াছে; শুনা যায়, হতভাগ্য কথঞ্চিৎ শান্তি লাভ করিয়াছে। কেবল দেশের কাছাকাছি আসিবার জন্য মাঝে মাঝে তাহার মন উতলা হয়, ধরা পড়িবার ভয়ে আসিতে পারে না।

৩

কিছু-দিন ঘুরিতে ঘুরিতে উদাসীন ফকিরচাঁদ নবগ্রামে আসিয়া উপস্থিত। পথপার্শ্ববর্তী এক বটবৃক্ষ-তলে বসিয়া নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিল, 'আহা, বৈরাগ্যমেবাভয়ং। দারাপুত্র ধনজন কেউ কারো নয়। কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ।' বলিয়া এক গান জুড়িয়া দিল—

শোন্ রে শোন্, অবোধ মন,
শোন্ সাধুর উক্তি— কিসে মুক্তি
সেই সুযুক্তি কর্ গ্রহণ।
ভবের শুক্তি ভেঙে মুক্তি-মুক্তা কর্ অন্বেষণ।
ওরে ও ভোলা মন, ভোলা মন রে।

সহসা গান বন্ধ হইয়া গেল— 'ও কে ও। বাবা দেখছি! সন্ধান পেয়েছেন বুঝি! তবেই তো সর্বনাশ। আবার তো সংসারের অন্ধকূপে টেনে নিয়ে যাবেন। পালাতে হল।'

৪

ফকির তাড়াতাড়ি নিকটবর্তী এক গৃহে প্রবেশ করিল। বৃদ্ধ গৃহস্বামী চুপচাপ বসিয়া তামাক টানিতেছিল। ফকিরকে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কে হে তুমি।'

ফকির। বাবা, আমি সন্ন্যাসী।

বৃদ্ধ। সন্ন্যাসী! দেখি দেখি বাবা, আলোতে এসো দেখি।

এই বলিয়া আলোতে টানিয়া লইয়া ফকিরের মুখের 'পরে ঝুঁকিয়া বুড়ামানুষ বহুকষ্টে যেমন করিয়া পুঁথি পড়ে তেমনি করিয়া ফকিরের মুখ নিরীক্ষণ করিয়া বিড় বিড় করিয়া বকিতে লাগিল— 'এই তো আমার সেই মাখনলাল দেখছি। সেই নাক, সেই চোখ, কেবল কপালটা বদলেছে, আর সেই চাঁদমুখ গোঁফে দাড়িতে একেবারে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে।'

বলিয়া বৃদ্ধ সস্নেহে ফকিরের শ্মশ্রুল মুখে দুই-একবার হাত বুলাইয়া লইল এবং প্রকাশ্যে কহিল, 'বাবা মাখন।'

বলা বাহুল্য বৃদ্ধের নাম ষষ্ঠীচরণ।

ফকির। (সবিস্ময়ে) মাখন! আমার নাম তো মাখন নয়। পূর্বে আমার নাম যাই থাক্, এখন আমার নাম চিদানন্দস্বামী। ইচ্ছা হয় তো পরমানন্দও বলতে পারো।

ষষ্ঠী। বাবা, তা এখন আপনাকে চিঁড়েই বল্ আর পরমান্নই বল্, তুই যে আমার মাখন, বাবা, সে তো আমি ভুলতে পারব না।— বাবা, তুই কোন্ দুঃখে সংসার ছেড়ে গেলি। তোর কিসের অভাব। দুই স্ত্রী— বড়োটিকে না ভালোবাসিস, ছোটোটি আছে। ছেলেপিলের দুঃখও নেই। শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে সাতটি কন্যে, একটি ছেলে। আর আমি, বুড়ো বাপ, ক দিনই বা বাঁচব— তোর সংসার তোরই থাকবে।

ফকির একেবারে আঁৎকিয়া উঠিয়া কহিল, কী সর্বনাশ। শুনলেও যে ভয় হয়।

এতক্ষণে প্রকৃত ব্যাপারটা বোধগম্য হইল। ভাবিল, 'মন্দ কী, দিন-দুই বৃদ্ধের পুত্রভাবেই এখানে লুকাইয়া থাকা যাক, তাহার পরে সন্ধানে অকৃতকার্য হইয়া বাপ চলিয়া গেলেই এখান হইতে পলায়ন করিব।'

ফকিরকে নিরুত্তর দেখিয়া বৃদ্ধের মনে আর সংশয় রহিল না। কেষ্টা চাকরকে ডাকিয়া বলিল, 'ওরে ও কেষ্টা, তুই সকলকে খবর দিয়ে আয় গে, আমার মাখন ফিরে এসেছে।'

৫

দেখিতে দেখিতে লোকে লোকারণ্য। পাড়ার লোকে অধিকাংশই বলিল, সেই বটে। কেহ বা সন্দেহ প্রকাশ করিল। কিন্তু, বিশ্বাস করিবার জন্যই লোকে এত ব্যগ্র যে সন্দিগ্ধ লোকদের উপরে সকলে হাড়ে চটিয়া গেল। যেন তাহারা ইচ্ছাপূর্বক কেবল রসভঙ্গ করিতে আসিয়াছে; যেন তাহারা পাড়ার চৌদ্দ অক্ষরের পয়ারকে সতেরো অক্ষর করিয়া বসিয়া আছে, কোনোমতে তাহাদিগকে সংক্ষেপ করিতে পারিলেই তবে পাড়াসুদ্ধ লোক আরাম পায়— তাহারা ভূতও বিশ্বাস করে না, ওঝাও বিশ্বাস করে না, আশ্চর্য গল্প শুনিয়া যখন সকলের তাক লাগিয়া গিয়াছে তখন তাহারা প্রশ্ন উত্থাপন করে। একপ্রকার নাস্তিক বলিলেই হয়। কিন্তু, ভূত অবিশ্বাস করিলে ততটা ক্ষতি নাই, তাই বলিয়া বুড়া বাপের হারা ছেলেকে অবিশ্বাস করা যে নিতান্ত হৃদয়হীনতার কাজ। যাহা হউক, সকলের নিকট হইতে তাড়না খাইয়া সংশয়ীর দল থামিয়া গেল।

ফকিরের অতিভীষণ অটল গাম্ভীর্যের প্রতি ভ্রূপক্ষেপমাত্র না করিয়া পাড়ার লোকেরা তাহাকে ঘিরিয়া বসিয়া বলিতে লাগিল, 'আরে আরে, আমাদের সেই মাখন আজ ঋষি হয়েছেন, তপিস্বী হয়েছেন, চিরটা কাল ইয়ার্কি দিয়ে কাটালে, আজ হঠাৎ মহামুনি জামদগ্নি হয়ে বসেছেন।'

কথাটা উন্নতচেতা ফকিরের অত্যন্ত খারাপ লাগিল, কিন্তু নিরুপায়ে সহ্য করিতে হইল। একজন গায়ের উপর আসিয়া পড়িয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'ওরে মাখন, তুই কুচ্‌কুচে কালো ছিলি, রঙটা এমন ফর্শা করলি কী করে।'

ফকির উত্তর দিল, 'যোগ অভ্যাস ক'রে।'

সকলেই বলিল, 'যোগের কী আশ্চর্য প্রভাব।'

একজন উত্তর করিল, 'আশ্চর্য আর কী। শাস্ত্রে আছে, ভীম যখন হনুমানের লেজ ধরে তুলতে গেলেন, কিছুতেই তুলতে পারলেন না। সে কী ক'রে হল। সে তো যোগবলে।'

এ কথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইল।

হেনকালে ষষ্ঠীচরণ আসিয়া ফকিরকে বলিল, 'বাবা, একবার বাড়ির ভিতরে যেতে হচ্ছে।'

এ সম্ভাবনাটা ফকিরের মাথায় উদয় হয় নাই— হঠাৎ বজ্রাঘাতের মতো মস্তিষ্কে প্রবেশ করিল। অনেক ক্ষণ চুপ করিয়া, পাড়ার লোকের বিস্তর অন্যায় পরিহাস

পরিপাক করিয়া অবশেষে বলিল, 'বাবা, আমি সন্ন্যাসী হয়েছি, আমি অন্তঃপুরে ঢুকতে পারব না।'

ষষ্ঠীচরণ পাড়ার লোকদের সম্বোধন করিয়া বলিল, 'তা হলে আপনাদের একবার গা তুলতে হচ্ছে। বউমাদের এইখানেই নিয়ে আসি। তাঁরা বড়ো ব্যাকুল হয়ে আছেন।'

সকলে উঠিয়া গেল। ফকির ভাবিল, এইবেলা এখান হইতে এক দৌড় মারি। কিন্তু, রাস্তায় বাহির হইলেই পাড়ার লোক কুক্কুরের মতো তাহার পশ্চাতে ছুটিবে ইহাই কল্পনা করিয়া তাহাকে নিস্তব্ধভাবে বসিয়া থাকিতে হইল।

যেমনি মাখনলালের দুই স্ত্রী প্রবেশ করিল ফকির অমনি নতশিরে তাহাদিগকে প্রণাম করিয়া কহিল, 'মা, আমি তোমাদের সন্তান।'

অমনি ফকিরের নাকের সম্মুখে একটা বালা-পরা হাত খড়্‌গের মতো খেলিয়া গেল এবং একটি কাংস্যবিনিন্দিত কণ্ঠে বাজিয়া উঠিল, 'ওরে ও পোড়াকপালে মিন্সে, তুই মা বললি কাকে!'

অমনি আর-একটি কণ্ঠ আরো দুই সুর উচ্চে পাড়া কাঁপাইয়া ঝংকার দিয়া উঠিল, 'চোখের মাথা খেয়ে বসেছিস! তোর মরণ হয় না!'

নিজের স্ত্রীর নিকট হইতে এরূপ চলিত বাংলা শোনা অভ্যাস ছিল না; সুতরাং একান্ত কাতর হইয়া ফকির জোড়হস্তে কহিল, 'আপনারা ভুল বুঝছেন। আমি এই আলোতে দাঁড়াচ্ছি, আমাকে একটু ঠাউরে দেখুন।'

প্রথমা ও দ্বিতীয়া পরে পরে কহিল, 'ঢের দেখেছি। দেখে দেখে চোখ ক্ষয়ে গেছে। তুমি কচি খোকা নও, আজ নতুন জন্মাও নি। তোমার দুধের দাঁত অনেক দিন ভেঙেছে। তোমার কি বয়সের গাছ-পাথর আছে। তোমায় যম ভুলেছে বলে কি আমরা ভুলব।'

এরূপ এক-তরফা দাম্পত্য আলাপ কতক্ষণ চলিত বলা যায় না— কারণ, ফকির একেবারে বাক্‌শক্তিরহিত হইয়া নতশিরে দাঁড়াইয়া ছিল। এমন সময় অত্যন্ত কোলাহল শুনিয়া এবং পথে লোক জমিতে দেখিয়া ষষ্ঠীচরণ প্রবেশ করিল। বলিল, 'এতদিন আমার ঘর নিস্তব্ধ ছিল, একেবারে টুঁ শব্দ ছিল না। আজ মনে হচ্ছে বটে, আমার মাখন ফিরে এসেছে।'

ফকির করজোড়ে কহিল, 'মশায়, আপনার পুত্রবধূদের হাত থেকে আমাকে রক্ষে করুন।'

ষষ্ঠী। বাবা, অনেক দিন পরে এসেছ, তাই প্রথমটা একটু অসহ্য বোধ হচ্ছে। তা, মা,

তোমরা এখন যাও। বাবা মাখন তো এখন এখানেই রইলেন, ওঁকে আর কিছুতেই যেতে দিচ্ছি নে।

ললনাদ্বয় বিদায় হইলে ফকির ষষ্ঠীচরণকে বলিল, 'মশায়, আপনার পুত্র কেন যে সংসার ত্যাগ করে গেছেন তা আমি সম্পূর্ণ অনুভব করতে পারছি। মশায়, আমার প্রণাম জানবেন, আমি চললেম।'

বৃদ্ধ এম্‌নি উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন উত্থাপন করিল যে, পাড়ার লোক মনে করিল মাখন তাহার বাপকে মারিয়াছে। তাহারা হাঁ-হাঁ করিয়া ছুটিয়া আসিল। সকলে আসিয়া ফকিরকে জানাইয়া দিল, এমন ভণ্ডতপস্বীগিরি এখানে খাটিবে না। ভালোমানুষের ছেলের মতো কাল কাটাইতে হইবে। একজন বলিল, 'ইনি তো পরমহংস নন, পরম বক।'

গাম্ভীর্য গোঁফদাড়ি এবং গলাবন্ধের জোরে ফকিরকে এমন-সকল কুৎসিত কথা কখনো শুনিতে হয় নাই। যাহা হউক, লোকটা পাছে আবার পালায় পাড়ার লোকেরা অত্যন্ত সতর্ক রহিল। স্বয়ং জমিদার ষষ্ঠীচরণের পক্ষ অবলম্বন করিলেন।

৬

ফকির দেখিল এম্‌নি কড়া পাহারা যে, মৃত্যু না হইলে ইহারা ঘরের বাহির করিবে না। একাকী ঘরে বসিয়া গান গাহিতে লাগিল—

শোন্ সাধুর উক্তি, কিসে মুক্তি
সেই সুযুক্তি কর্ গ্রহণ।

বলা বাহুল্য গানটার আধ্যাত্মিক অর্থ অনেকটা ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে।

এমন করিয়াও কোনোমতে দিন কাটিত। কিন্তু, মাখনের আগমনসংবাদ পাইয়া দুই স্ত্রীর সম্পর্কের এক ঝাঁক শ্যালা ও শ্যালী আসিয়া উপস্থিত হইল।

তাহারা আসিয়াই প্রথমত ফকিরের গোঁফ দাড়ি ধরিয়া টানিতে লাগিল; তাহারা বলিল, এ তো সত্যকার গোঁফ দাড়ি নয়, ছদ্মবেশ করিবার জন্য আঠা দিয়া জুড়িয়া আসিয়াছে।

নাসিকার নিম্নবর্তী গুম্ফ ধরিয়া টানাটানি করিলে ফকিরের ন্যায় অত্যন্ত মহৎ লোকেরও মাহাত্ম্য রক্ষা করা দুষ্কর হইয়া উঠে। ইহা ছাড়া কানের উপর উপদ্রবও ছিল— প্রথমত মলিয়া, দ্বিতীয়ত এমন-সকল ভাষা প্রয়োগ করিয়া যাহাতে কান না মলিলেও কান লাল হইয়া উঠে।

ইহার পর ফকিরকে তাহারা এমন-সকল গান ফর্মায়েশ করিতে লাগিল, আধুনিক

বড়ো বড়ো নূতন পণ্ডিতেরা যাহার কোনোরূপ আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিতে হার মানেন। আবার নিদ্রাকালে তাহারা ফকিরের স্বল্পাবশিষ্ট গণ্ডস্থলে চুনকালি মাখাইয়া দিল; আহারকালে কেশুরের পরিবর্তে কচু, ডাবের জলের পরিবর্তে হুঁকার জল, দুধের পরিবর্তে পিঠালি-গোলার আয়োজন করিল; পিঁড়ার নীচে সুপারি রাখিয়া তাহাকে আছাড় খাওয়াইল; লেজ বানাইল এবং সহস্র প্রচলিত উপায়ে ফকিরের অভ্রভেদী গাম্ভীর্য ভূমিসাৎ করিয়া দিল।

ফকির রাগিয়া ফুলিয়া-ফাঁপিয়া ঝাঁকিয়া-হাঁকিয়া কিছুতেই উপদ্রবকারীদের মনে ভীতির সঞ্চার করিতে পারিল না। কেবল সর্বসাধারণের নিকট অধিকতর হাস্যাস্পদ হইতে লাগিল। ইহার উপরে আবার অন্তরাল হইতে একটি মিষ্ট কণ্ঠের উচ্চহাস্য মাঝে মাঝে কর্ণগোচর হইত; সেটা যেন পরিচিত বলিয়া ঠেকিত এবং মন দ্বিগুণ অধৈর্য হইয়া উঠিত।

পরিচিত কণ্ঠ পাঠকের অপরিচিত নহে। এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ষষ্ঠীচরণ কোনো-এক সম্পর্কে হৈমবতীর মামা। বিবাহের পর শাশুড়ির দ্বারা নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া পিতৃমাতৃহীনা হৈমবতী মাঝে মাঝে কোনো-না-কোনো কুটুম্ববাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করিত। অনেক দিন পরে সে মামার বাড়ি আসিয়া নেপথ্য হইতে এক পরমকৌতুকাবহ অভিনয় নিরীক্ষণ করিতেছে। তৎকালে হৈমবতীর স্বাভাবিক রঙ্গপ্রিয়তার সঙ্গে প্রতিহিংসাপ্রবৃত্তির উদ্রেক হইয়াছিল কি না চরিত্রতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা স্থির করিবেন, আমরা বলিতে অক্ষম।

ঠাট্টার সম্পর্কীয় লোকেরা মাঝে মাঝে বিশ্রাম করিত, কিন্তু স্নেহের সম্পর্কীয় লোকদের হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া কঠিন। সাত মেয়ে এবং এক ছেলে তাঁহাকে এক দণ্ড ছাড়ে না। বাপের স্নেহ অধিকার করিবার জন্য তাহাদের মা তাহাদিগকে অনুক্ষণ নিযুক্ত রাখিয়াছিল। দুই মাতার মধ্যে আবার রেষারেষি ছিল, উভয়েরই চেষ্টা যাহাতে নিজের সন্তানই অধিক আদর পায়। উভয়েই নিজ নিজ সন্তানদিগকে সর্বদাই উত্তেজিত করিতে লাগিল— দুই দলে মিলিয়া পিতার গলা জড়াইয়া ধরা, কোলে বসা, মুখচুম্বন করা প্রভৃতি প্রবল স্নেহব্যক্তিকার্যে পরস্পরকে জিতিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

বলা বাহুল্য, ফকির লোকটা অত্যন্ত নির্লিপ্তস্বভাব, নহিলে নিজের সন্তানদের অকাতরে ফেলিয়া আসিতে পারিত না। শিশুরা ভক্তি করিতে জানে না, তাহারা সাধুত্বের নিকট অভিভূত হইতে শিখে নাই, এইজন্য ফকির শিশুজাতির প্রতি তিলমাত্র অনুরক্ত ছিলেন না— তাহাদিগকে তিনি কীট-পতঙ্গের ন্যায় দেহ হইতে দূরে

রাখিতে ইচ্ছা করিতেন। সম্প্রতি তিনি অহরহ শিশু-পঙ্গপালে আচ্ছন্ন হইয়া বর্জইস অক্ষরের ছোটো বড়ো নোটের দ্বারা আদ্যোপান্ত সমাকীর্ণ ঐতিহাসিক প্রবন্ধের ন্যায় শোভমান হইলেন। তাহাদের মধ্যে বয়সের বিস্তর তারতম্য ছিল এবং তাহারা সকলেই কিছু তাঁহার সহিত বয়ঃপ্রাপ্ত সভ্যজনোচিত ব্যবহার করিত না; শুদ্ধশুচি ফকিরের চক্ষে অনেক সময় অশ্রুর সঞ্চার হইত এবং তাহা আনন্দাশ্রু নহে।

পরের ছেলেরা যখন নানা সুরে তাঁহাকে 'বাবা বাবা' করিয়া ডাকিয়া আদর করিত তখন তাঁহার সাংঘাতিক পাশব শক্তি প্রয়োগ করিবার একান্ত ইচ্ছা হইত, কিন্তু ভয়ে পারিতেন না। মুখ চক্ষু বিকৃত করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতেন।

অবশেষে ফকির মহা চেঁচামেচি করিয়া বলিতে লাগিল, 'আমি যাবই, দেখি আমাকে কে আটক করিতে পারে।'

তখন গ্রামের লোক এক উকিল আনিয়া উপস্থিত করিল। উকিল আসিয়া কহিল, 'জানেন আপনার দুই স্ত্রী?'

ফকির। আজ্ঞে, এখানে এসে প্রথম জানলুম।

উকিল। আর, আপনার সাত মেয়ে, এক ছেলে, তার মধ্যে দুটি মেয়ে বিবাহযোগ্যা।

ফকির। আজ্ঞে, আপনি আমার চেয়ে ঢের বেশি জানেন দেখতে পাচ্ছি।

উকিল। আপনার এই বৃহৎ পরিবারের ভরণপোষণের ভার আপনি যদি না নেন তবে আপনার অনাথিনী দুই স্ত্রী আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করবেন, পূর্বে হতে বলে রাখলুম।

ফকির সব চেয়ে আদালতকে ভয় করিত। তাহার জানা ছিল, উকিলেরা জেরা করিবার সময় মহাপুরুষদিগের মানমর্যাদা-গাম্ভীর্যকে খাতির করে না— প্রকাশ্যে অপমান করে এবং খবরের কাগজে তাহার রিপোর্ট্ বাহির হয়। ফকির অশ্রুসিক্তলোচনে উকিলকে বিস্তারিত আত্মপরিচয় দিতে চেষ্টা করিল; উকিল তাহার চাতুরীর, তাহার উপস্থিতবুদ্ধির, তাহার মিথ্যা-গল্প-রচনার অসাধারণ ক্ষমতার ভূয়োভূয়ঃ প্রশংসা করিতে লাগিল। শুনিয়া ফকিরের আপন হস্তপদ দংশন করিতে ইচ্ছা করিতে লাগিল।

ষষ্ঠীচরণ ফকিরকে পুনশ্চ পলায়নোদ্যত দেখিয়া শোকে অধীর হইয়া পড়িল। পাড়ার লোকে তাহাকে চারি দিকে ঘিরিয়া অজস্র গালি দিল এবং উকিল তাহাকে এমন শাসাইল যে তাহার মুখে আর কথা রহিল না।

ইহার উপর যখন আটজন বালক বালিকা গাঢ় স্নেহে তাহাকে চারি দিকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিয়া তাহার শ্বাসরোধ করিবার উপক্রম করিল, তখন অন্তরালস্থিত হৈমবতী হাসিবে কি কাঁদিবে ভাবিয়া পাইল না।

ফকির অন্য উপায় না দেখিয়া ইতিমধ্যে নিজের পিতাকে একখানা চিঠি লিখিয়া সমস্ত অবস্থা নিবেদন করিয়াছিল। সেই পত্র পাইয়া ফকিরের পিতা হরিচরণবাবু আসিয়া উপস্থিত। পাড়ার লোক, জমিদার এবং উকিল কিছুতেই দখল ছাড়ে না।

এ লোকটি যে ফকির নহে, মাখন, তাহারা তাহার সহস্র অকাট্য প্রমাণ প্রয়োগ করিল— এমন-কি, যে ধাত্রী মাখনকে মানুষ করিয়াছিল সেই বুড়িকে আনিয়া হাজির করিল। সে কম্পিত হস্তে ফকিরের চিবুক তুলিয়া ধরিয়া মুখ নিরীক্ষণ করিয়া তাহার দাড়ির উপরে দরবিগলিত ধারায় অশ্রুপাত করিতে লাগিল।

যখন দেখিল, তাহাতেও ফকির রাশ মানে না, তখন ঘোমটা টানিয়া দুই স্ত্রী আসিয়া উপস্থিত হইল। পাড়ার লোকেরা শশব্যস্ত হইয়া ঘরের বাহিরে চলিয়া গেল। কেবল দুই বাপ, ফকির এবং শিশুরা ঘরে রহিল।

দুই স্ত্রী হাত নাড়িয়া নাড়িয়া ফকিরকে জিজ্ঞাসা করিল, 'কোন্ চুলোয়, যমের কোন্ দুয়োরে যাবার ইচ্ছে হয়েছে।'

ফকির তাহা নির্দিষ্ট করিয়া বলিতে পারিল না, সুতরাং নিরুত্তর হইয়া রহিল। কিন্তু, ভাবে যেরূপ প্রকাশ পাইল তাহাতে যমের কোনো বিশেষ দ্বারের প্রতি তাহার যে বিশেষ পক্ষপাত আছে এরূপ বোধ হইল না; আপাতত যে-কোনো একটা দ্বার পাইলেই সে বাঁচে, কেবল একবার বাহির হইতে পারিলেই হয়।

তখন আর-একটি রমণীমূর্তি গৃহে প্রবেশ করিয়া ফকিরকে প্রণাম করিল। ফকির প্রথমে অবাক, তাহার পরে আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়া বলিল, 'এ যে হৈমবতী!'

নিজের অথবা পরের স্ত্রীকে দেখিয়া এত প্রেম তাহার চক্ষে ইতিপূর্বে কখনো প্রকাশ পায় নাই। মনে হইল, মূর্তিমতী মুক্তি স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত।

আর-একটি লোক মুখের উপর শাল মুড়ি দিয়া অন্তরাল হইতে দেখিতেছিল। তাহার নাম মাখনলাল। একটি অপরিচিত নিরীহ ব্যক্তিকে নিজপদে অভিষিক্ত দেখিয়া সে এতক্ষণ পরম সুখানুভব করিতেছিল; অবশেষে হৈমবতীকে উপস্থিত দেখিয়া বুঝিতে পারিল উক্ত নিরপরাধ ব্যক্তি তাহার নিজের ভগ্নীপতি; তখন দয়াপরতন্ত্র হইয়া ঘরে ঢুকিয়া বলিল, 'না, আপনার লোককে এমন বিপদে ফেলা মহাপাতক।'

দুই স্ত্রীর প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া কহিল, 'এ আমারই দড়ি, আমারই কলসী।'

মাখনলালের এই অসাধারণ মহত্ত্ব ও বীরত্বে পাড়ার লোক আশ্চর্য হইয়া গেল।

চৈত্র ১২৯৮

প্রবন্ধ

শান্তিনিকেতন

শান্তিনিকেতন

১৩

কর্মযোগ

জগতে আনন্দযজ্ঞে তাঁর যে নিমন্ত্রণ আমরা আমাদের জীবনের সঙ্গে সঙ্গেই পেয়েছি তাকে আমাদের কেউ কেউ স্বীকার করতে চাচ্ছে না। তারা বিজ্ঞানশাস্ত্র আলোচনা করে দেখেছে। তারা বিশ্বের সমস্ত রহস্য উদ্‌ঘাটন করে এমন একটা জায়গায় গিয়ে ঠেকেছে যেখানে সমস্তই কেবল নিয়ম। তারা বলছে ফাঁকি ধরা পড়ে গেছে— দেখছি যা-কিছু সব নিয়মেই চলেছে, এর মধ্যে আনন্দ কোথায়? তারা আমাদের উৎসবের আনন্দরব শুনে দূরে বসে মনে মনে হাসছে।

সূর্য চন্দ্র এমনি ঠিক নিয়মে উঠছে, অস্ত যাচ্ছে, যে, মনে হচ্ছে তারা যেন ভয়ে চলছে, পাছে এক পল-বিপলেরও ত্রুটি ঘটে। বাতাসকে বাইরে থেকে যতই স্বাধীন বলে মনে হয়, যারা ভিতরকার খবর রাখে তারা জানে, ওর মধ্যেও পাগলামি কিছুই নেই— সমস্তই নিয়মে বাঁধা। এমন-কি, পৃথিবীতে সব চেয়ে খামখেয়ালি বলে যাকে মনে হয় সেই মৃত্যু, যার আনাগোনার কোনো খবর পাই নে বলে যাকে হঠাৎ ঘরের দরজার সামনে দেখে আমরা চমকে উঠি, তাকেও জোড় হাতে নিয়ম পালন করে চলতে হয়— একটুও পদস্খলন হবার জো নেই।

মনে কোরো না এই গূঢ় খবরটা কেবল বৈজ্ঞানিকের কাছেই ধরা পড়েছে। তপোবনের ঋষি বলেছেন: ভীষাস্মাদ্‌বাতঃ পবতে। তাঁর ভয়ে, তাঁর নিয়মের অমোঘ শাসনে বাতাস বইছে; বাতাসও মুক্ত নয়। ভীষাস্মাদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ। তাঁর নিয়মের অমোঘ শাসনে কেবল যে অগ্নি চন্দ্র সূর্য চলছে তা নয়, স্বয়ং মৃত্যু, যে কেবল বন্ধন কাটবার জন্যেই আছে, যার নিজের কোনো বন্ধন আছে ব'লে মনেও হয় না, সেও অমোঘ নিয়মকে একান্ত ভয়ে পালন করে চলছে।

তবে তো দেখছি ভয়েই সমস্ত চলছে, কোথাও একটু ফাঁক নেই। তবে আর আনন্দের কথাটা কেন? যেখানে কারখানাঘরে আগাগোড়া কল চলছে সেখানে কোনো পাগল আনন্দের দরবার করতে যায় না।

বাঁশিতে তবু তো আজ আনন্দের সুর উঠেছে, এ কথা তো কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। মানুষকে তো মানুষ এমন করে ডাকে, বলে, চল্ ভাই, আনন্দ করবি চল্। এই নিয়মের রাজ্যে এমন কথাটা তার মুখ দিয়ে বের হয় কেন।

সে দেখতে পাচ্ছে, নিয়মের কঠিন দণ্ড একেবারে অটল হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে; কিন্তু তাকে জড়িয়ে জড়িয়ে তাকে আচ্ছন্ন ক'রে যে লতাটি উঠেছে তাতে কি আমরা কোনো ফুল ফুটতে দেখি নি? দেখি নি কি কোথাও শ্রী এবং শান্তি, সৌন্দর্য এবং ঐশ্বর্য? দেখছি নে কি প্রাণের লীলা, গতির নৃত্য, বৈচিত্র্যের অজস্রতা?

বিশ্বের নিয়ম সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে নিজেকেই চরম রূপে প্রচার করছে না— একটি অনির্বচনীয়ের পরিচয় তাকে চারি দিকে আচ্ছন্ন করে প্রকাশ পাচ্ছে। সেই জন্যেই যে উপনিষৎ একবার বলেছেন 'অমোঘ শাসনের ভয়ে যা-কিছু সমস্ত চলেছে' তিনিই আবার বলেছেন: আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দ থেকেই এই যা-কিছু সমস্ত জন্মাচ্ছে। যিনি আনন্দস্বরূপ, মুক্ত, তিনিই নিয়মের বন্ধনের মধ্য দিয়ে দেশকালে আপনাকে প্রকাশ করছেন।

কবির মুক্ত আনন্দ আপনাকে প্রকাশ করবার বেলায় ছন্দের বাঁধন মানে। কিন্তু, যে লোকের নিজের মনের মধ্যে ভাবের উদ্‌বোধন হয় নি সে বলে, এর মধ্যে আগাগোড়া কেবল ছন্দের ব্যায়ামই দেখছি। সে নিয়ম দেখে, নৈপুণ্য দেখে, কেননা সেইটেই চোখে দেখা যায়; কিন্তু যাকে অন্তর দিয়ে দেখা যায় সেই রসকে সে বোঝে না, সে বলে রস কিছুই নেই। সে মাথা নেড়ে বলছে, সমস্তই যন্ত্র, কেবল বৈজ্ঞানিক নিয়ম।

কিন্তু, ওই-যে কার উচ্ছ্বসিত কণ্ঠ এমন নিতান্ত সহজ সুরে বলে উঠেছে: রসো বৈ সঃ। কবির কাব্যে তিনি যে অনন্ত রস দেখতে পাচ্ছেন। জগতের নিয়ম তো তাঁর কাছে আপনার বন্ধনের রূপ দেখাচ্ছে না। তিনি যে একেবারে নিয়মের চরমকে দেখে আনন্দে বলে উঠেছেন: আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। জগতে তিনি ভয়কে দেখছেন না, আনন্দকেই দেখছেন। সেই জন্যেই বলছেন: আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন। ব্রহ্মের আনন্দকে যিনি সর্বত্র জানতে পেরেছেন তিনি আর কিছুতেই ভয় পান না। এমনি করে জগতে আনন্দকে দেখে প্রত্যক্ষ ভয়কে যিনি একেবারেই অস্বীকার করেছেন তিনিই বলেছেন: মহদ্ ভয়ং বজ্রমুদ্যতং য এতৎ বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি। এই মহদ্ ভয়কে, এই উদ্যত বজ্রকে যাঁরা জানেন তাঁদের আর মৃত্যুভয় থাকে না।

যারা জেনেছে, ভয়ের মধ্য দিয়েই অভয়, নিয়মের মধ্য দিয়েই আনন্দ আপনাকে

প্রকাশ করেন, তারাই নিয়মকে পার হয়ে চলে গেছে। নিয়মের বন্ধন তাদের পক্ষে নেই যে তা নয়, কিন্তু সে যে আনন্দেরই বন্ধন, সে যে প্রেমিকের পক্ষে প্রিয়তমের ভুজ-বন্ধনের মতো। তাতে দুঃখ নেই, কোনো দুঃখ নেই। সকল বন্ধনই সে যে খুশি হয়ে গ্রহণ করে, কোনোটাকেই এড়াতে চায় না। কেননা, সমস্ত বন্ধনের মধ্যেই সে যে আনন্দের নিবিড় স্পর্শ উপলব্ধি করতে থাকে। বস্তুত যেখানে নিয়ম নেই, যেখানে উচ্ছৃঙ্খল উন্মত্ততা, সেইখানেই তাকে বাঁধে, তাকে মারে— সেইখানেই অসীমের সঙ্গে বিচ্ছেদ, পাপের যন্ত্রণা। প্রবৃত্তির আকর্ষণে সত্যের সুদৃঢ় নিয়মবন্ধন থেকে যখন সে স্খলিত হয়ে পড়ে তখনই সে মাতার আলিঙ্গনভ্রষ্ট শিশুর মতো কেঁদে উঠে বলে : মা মা হিংসীঃ। আমাকে আঘাত কোরো না। সে বলে, বাঁধো, আমাকে বাঁধো, তোমার নিয়মে আমাকে বাঁধো, অন্তরে বাঁধো, বাহিরে বাঁধো— আমাকে আচ্ছন্ন ক'রে, আবৃত করে বেঁধে রাখো; কোথাও কিছু ফাঁক রেখো না, শক্ত করে ধরো; তোমারই নিয়মের বাহুপাশে বাঁধা পড়ে তোমার আনন্দের সঙ্গে জড়িত হয়ে থাকি। আমাকে পাপের মৃত্যুবন্ধন থেকে টেনে নিয়ে তুমি দৃঢ় করে রক্ষা করো।

নিয়মকে আনন্দের বিপরীত জ্ঞান করে কেউ কেউ যেমন মাৎলামিকেই আনন্দ বলে ভুল করে তেমনি আমাদের দেশে এমন লোক প্রায় দেখা যায় যাঁরা কর্মকে মুক্তির বিপরীত বলে কল্পনা করেন। তাঁরা মনে করেন কর্ম পদার্থটা স্থূল, ওটা আত্মার পক্ষে বন্ধন।

কিন্তু, এই কথা মনে রাখতে হবে, নিয়মেই যেমন আনন্দের প্রকাশ কর্মেই তেমনি আত্মার মুক্তি। আপনার ভিতরেই আপনার প্রকাশ হতে পারে না বলেই আনন্দ বাহিরের নিয়মকে ইচ্ছা করে, তেমনি আপনার ভিতরেই আপনার মুক্তি হতে পারে না বলেই আত্মা মুক্তির জন্যে বাহিরের কর্মকে চায়। মানুষের আত্মা কর্মেই আপনার ভিতর থেকে আপনাকে মুক্ত করছে; তাই যদি না হত তা হলে কখনোই সে ইচ্ছা করে কর্ম করত না।

মানুষ যতই কর্ম করছে ততই সে আপনার ভিতরকার অদৃশ্যকে দৃশ্য করে তুলছে, ততই সে আপনার সুদূরবর্তী অনাগতকে এগিয়ে নিয়ে আসছে। এই উপায়ে মানুষ আপনাকে কেবলই স্পষ্ট করে তুলছে— মানুষ আপনার নানা কর্মের মধ্যে, রাষ্ট্রের মধ্যে, সমাজের মধ্যে, আপনাকেই নানা দিক থেকে দেখতে পাচ্ছে।

এই দেখতে পাওয়াই মুক্তি। অন্ধকার মুক্তি নয়, অস্পষ্টতা মুক্তি নয়। অস্পষ্টতার মতো ভয়ংকর বন্ধন নেই। অস্পষ্টতাকে ভেদ করে উঠবার জন্যেই বীজের মধ্যে অঙ্কুরের চেষ্টা, কুঁড়ির মধ্যে ফুলের প্রয়াস। অস্পষ্টতার আবরণকে ভেদ করে সুপরিস্ফুট হবার জন্যেই আমাদের চিত্তের ভিতরকার ভাবরাশি বাইরে আকার-

গ্রহণের উপলক্ষ্য খুঁজে বেড়াচ্ছে। আমাদের আত্মাও অনির্দিষ্টতার কুহেলিকা থেকে আপনাকে মুক্ত করে বাইরে আনবার জন্যেই কেবলই কর্ম সৃষ্টি করছে। যে কর্মে তার কোনো প্রয়োজনই নেই, যা তার জীবনযাত্রার পক্ষে আবশ্যক নয়, তাকেও কেবলই সে তৈরি করে তুলছে। কেননা, সে মুক্তি চায়। সে আপনার অন্তরাচ্ছাদন থেকে মুক্তি চায়, সে আপনার অরূপের আবরণ থেকে মুক্তি চায়। সে আপনাকে দেখতে চায়, পেতে চায়। ঝোপঝাড় কেটে সে যখন বাগান তৈরি করে তখন কুরূপতার মধ্য থেকে সে যে সৌন্দর্যকে মুক্ত করে তোলে সে তার নিজেরই ভিতরকার সৌন্দর্য— বাইরে তাকে মুক্তি দিতে না পারলে অন্তরেও সে মুক্তি পায় না। সমাজের যথেচ্ছাচারের মধ্যে সুনিয়ম স্থাপন করে অকল্যাণের বাধার ভিতর থেকে যে কল্যাণকে সে মুক্তি দান করে সে তারই নিজের ভিতরকার কল্যাণ— বাইরে তাকে মুক্তি দিতে না পারলে অন্তরেও সে মুক্তিলাভ করে না। এমনি করে মানুষ নিজের শক্তিকে, সৌন্দর্যকে, মঙ্গলকে, নিজের আত্মাকে, নানাবিধ কর্মের ভিতরে কেবলই বন্ধনমুক্ত করে দিচ্ছে। যতই তাই করছে ততই আপনাকে মহৎ করে দেখতে পাচ্ছে; ততই তার আত্মপরিচয় বিস্তীর্ণ হয়ে যাচ্ছে।

উপনিষৎ বলেছেন: কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ। কর্ম করতে করতেই শত বৎসর বেঁচে থাকতে ইচ্ছা করবে। যাঁরা আত্মার আনন্দকে প্রচুররূপে উপলব্ধি করেছেন এ হচ্ছে তাঁদেরই বাণী। যাঁরা আত্মাকে পরিপূর্ণ করে জেনেছেন তাঁরা কোনোদিন দুর্বল মুহ্যমানভাবে বলেন না— জীবন দুঃখময় এবং কর্ম কেবলই বন্ধন। দুর্বল ফুল যেমন বোঁটাকে আল্‌গা করে ধরে এবং ফল ফলবার পূর্বেই খসে যায় তাঁরা তেমন নন। জীবনকে তাঁরা খুব শক্ত করে ধরেন এবং বলেন, আমি ফল না ফলিয়ে কিছুতেই ছাড়ছি নে। তাঁরা সংসারের মধ্যে কর্মের মধ্যে আনন্দে আপনাকে প্রবলভাবে প্রকাশ করবার জন্যে ইচ্ছা করেন। দুঃখ তাপ তাঁদের অবসন্ন করে না, নিজের হৃদয়ের ভারে তাঁরা ধূলিশায়ী হয়ে পড়েন না। সুখ দুঃখ সমস্তের মধ্য দিয়েই তাঁরা আত্মার মাহাত্ম্যকে উত্তরোত্তর উদ্‌ঘাটিত করে আপনাকে দেখেন এবং আপনাকে দেখিয়ে বিজয়ী বীরের মতো সংসারের ভিতর দিয়ে মাথা তুলে চলে যান। বিশ্বজগতে যে শক্তির আনন্দ নিরন্তর ভাঙাগড়ার মধ্যে লীলা করছে— তারই নৃত্যের ছন্দ তাঁদের জীবনের লীলার সঙ্গে তালে তালে মিলে যেতে থাকে; তাঁদের জীবনের আনন্দের সঙ্গে সূর্যালোকের আনন্দ, মুক্ত সমীরণের আনন্দ, সুর মিলিয়ে দিয়ে অন্তর-বাহিরকে সুধাময় করে তোলে। তাঁরাই বলেন: কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ। কাজ করতে করতেই শত বৎসর বেঁচে থাকতে ইচ্ছা করবে।

মানুষের মধ্যে এই-যে জীবনের আনন্দ, এই-যে কর্মের আনন্দ আছে, এ অত্যন্ত সত্য। এ কথা বলতে পারব না এ আমাদের মোহ, এ কথা বলতে পারব না যে একে ত্যাগ না করলে আমরা ধর্মসাধনার পথে প্রবেশ করতে পারব না। ধর্মসাধনার সঙ্গে মানুষের কর্মজগতের বিচ্ছেদ ঘটানো কখনোই মঙ্গল নয়। বিশ্বমানবের নিরন্তর কর্মচেষ্টাকে তার ইতিহাসের বিরাট ক্ষেত্রে একবার সত্যদৃষ্টিতে দেখো। যদি তা দেখ তা হলে কর্মকে কি কেবল দুঃখের রূপেই দেখা সম্ভব হবে। তা হলে আমরা দেখতে পাব কর্মের দুঃখকে মানুষ বহন করছে এ কথা তেমন সত্য নয় যেমন সত্য কর্মই মানুষের বহু দুঃখ বহন করছে, বহু ভার লাঘব করছে। কর্মের স্রোত প্রতিদিন আমাদের অনেক বিপদ ঠেলে ফেলছে, অনেক বিকৃতি ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এ কথা সত্য নয় যে মানুষ দায়ে পড়ে কর্ম করছে— তার এক দিকে দায় আছে, আর-এক দিকে সুখও আছে; কর্ম এক দিকে অভাবের তাড়নায়, আর-এক দিকে স্বভাবের পরিতৃপ্তিতে। এই জন্যেই মানুষ যতই সভ্যতার বিকাশ করছে ততই আপনার নূতন নূতন দায় কেবল বাড়িয়েই চলেছে, ততই নূতন নূতন কর্মকে সে ইচ্ছা করেই সৃষ্টি করছে। প্রকৃতি জোর করে আমাদের কতকগুলো কাজ করিয়ে সচেতন করে রেখেছে, নানা ক্ষুধাতৃষ্ণার তাড়নায় আমাদের যথেষ্ট খাটিয়ে মারছে। কিন্তু, আমাদের মনুষ্যত্বের তাতেও কুলিয়ে উঠল না। পশুপক্ষীর সঙ্গে সমান হয়ে প্রকৃতির ক্ষেত্রে তাকে যে কাজ করতে হচ্ছে তাতেই সে চুপ করে থাকতে পারলে না; কাজের ভিতর দিয়ে ইচ্ছা করেই সে সবাইকে ছাড়িয়ে যেতে চায়। মানুষের মতো কাজ কোনো জীবকে করতে হয় না। আপনার সমাজের একটি অতি বৃহৎ কাজের ক্ষেত্র তাকে নিজে তৈরি করতে হয়েছে। এখানে কত কাল থেকে সে কত ভাঙছে গড়ছে, কত নিয়ম বাঁধছে কত নিয়ম ছিন্ন করে দিচ্ছে, কত পাথর কাটছে কত পাথর গাঁথছে, কত ভাবছে কত খুঁজছে কত কাঁদছে। এই ক্ষেত্রেই তার সকলের চেয়ে বড়ো বড়ো লড়াই লড়া হয়ে গেছে। এইখানেই সে নব নব জীবন লাভ করেছে। এইখানেই তার মৃত্যু পরম গৌরবময়। এইখানে সে দুঃখকে এড়াতে চায় নি, নূতন নূতন দুঃখকে স্বীকার করেছে। এইখানেই মানুষ সেই মহৎতত্ত্বটি আবিষ্কার করেছে যে, উপস্থিত যা তার চারি দিকেই আছে সেই পিঞ্জরটার মধ্যেই মানুষ সম্পূর্ণ নয়, মানুষ আপনার বর্তমানের চেয়ে অনেক বড়ো— এই জন্যে কোনো-একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকলে তার আরাম হতে পারে, কিন্তু তার চরিতার্থতা তাতে একেবারে বিনষ্ট হয়। সেই মহতী বিনষ্টিকে মানুষ সহ্য করতে পারে না। এইজন্যই, তার বর্তমানকে ভেদ করে বড়ো হবার জন্যই, এখনও সে যা হয়ে ওঠে নি তাই হতে পারবার জন্যেই, মানুষকে কেবলই বারবার

দুঃখ পেতে হচ্ছে। সেই দুঃখের মধ্যেই মানুষের গৌরব। এই কথা মনে রেখে, মানুষ আপনার কর্মক্ষেত্রকে সংকুচিত করে নি, কেবলই তাকে প্রসারিত করেই চলেছে। অনেক সময় এত দূর পর্যন্ত গিয়ে পড়েছে যে কর্মের সার্থকতাকে বিস্মৃত হয়ে যাচ্ছে, কর্মের-স্রোতে-বাহিত আবর্জনার দ্বারা প্রতিহত হয়ে মানবচিত্ত এক-একটা কেন্দ্রের চার দিকে ভয়ংকর আবর্ত রচনা করছে— স্বার্থের আবর্ত, সাম্রাজ্যের আবর্ত, ক্ষমতাভিমানের আবর্ত। কিন্তু, তবু যতক্ষণ গতিবেগ আছে ততক্ষণ ভয় নেই; সংকীর্ণতার বাধা সেই গতির মুখে ক্রমশই কেটে যায়, কাজের বেগই কাজের ভুলকে সংশোধন করে। কারণ, চিত্ত অচল জড়তার মধ্যে নিদ্রিত হয়ে পড়লেই তার শত্রু প্রবল হয়ে ওঠে, বিনাশের সঙ্গে আর সে লড়াই করে উঠতে পারে না। বেঁচে থেকে কর্ম করতে হবে, কর্ম করে বেঁচে থাকতে হবে, এই অনুশাসন আমরা শুনেছি। কর্ম করা এবং বাঁচা, এই দুয়ের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য যোগ আছে।

প্রাণের লক্ষণই হচ্ছে এই যে, আপনার ভিতরটাতেই তার আপনার সীমা নেই, তাকে বাইরে আসতেই হবে। তার সত্য— অন্তর এবং বাহিরের যোগে। দেহকে বেঁচে থাকতে হয় বলেই বাইরের আলো, বাইরের বাতাস, বাইরের অন্নজলের সঙ্গে তাকে নানা যোগ রাখতে হয়। শুধু প্রাণশক্তিকে নেবার জন্যে নয়, তাকে দান করবার জন্যেও বাইরেকে দরকার। এই দেখো-না কেন, শরীরকে তো নিজের ভিতরের কাজ যথেষ্টই করতে হয়; এক নিমেষও তার হৃৎপিণ্ড থেমে থাকে না, তার মস্তিষ্ক তার পাকযন্ত্রের কাজের অন্ত নেই; তবু দেহটা নিজের ভিতরকার এই অসংখ্য প্রাণের কাজ করেও স্থির থাকতে পারে না— তার প্রাণই তাকে বাইরের নানা কাজে এবং নানা খেলায় ছুটিয়ে বেড়ায়। কেবলমাত্র ভিতরের রক্তচলাচলেই তার তৃপ্তি নেই, নানা প্রকারে বাইরের চলাচলে তার আনন্দ সম্পূর্ণ হয়।

আমাদের চিত্তেরও সেই দশা। কেবলমাত্র আপনার ভিতরের কল্পনা ভাবনা নিয়ে তার চলে না। বাইরের বিষয়কে সর্বদাই তার চাই— কেবল নিজের চেতনাকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে নয়, নিজেকে প্রয়োগ করবার জন্যে, দেবার জন্যে এবং নেবার জন্যে।

আসল কথা, যিনি সত্যস্বরূপ সেই ব্রহ্মকে ভাগ করতে গেলেই আমরা বাঁচি নে। তাঁকে অন্তরেও যেমন আশ্রয় করতে হবে বাইরেও তেমনি আশ্রয় করতে হবে। তাঁকে যে দিকে ত্যাগ করব সেই দিকে নিজেকেই বঞ্চিত করব। মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্যাং মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোৎ। ব্রহ্ম আমাকে ত্যাগ করেন নি, আমি যেন ব্রহ্মকে ত্যাগ না করি। তিনি আমাকে বাহিরে ধরে রেখেছেন। তিনি আমাকে অন্তরেও জাগিয়ে রেখেছেন।

আমরা যদি এমন কথা বলি যে, তাঁকে কেবল অন্তরের ধ্যানে পাব, বাইরের কর্ম থেকে তাঁকে বাদ দেব— কেবল হৃদয়ের প্রেমের দ্বারা তাঁকে ভোগ করব, বাইরের সেবার দ্বারা তাঁর পূজা করব না— কিম্বা একেবারে এর উল্টো কথাটাই বলি, এবং এই ব'লে জীবনের সাধনাকে যদি কেবল এক দিকেই ভারগ্রস্ত করে তুলি তা হলে প্রমত্ত হয়ে আমাদের পতন ঘটবে।

আমরা পশ্চিম মহাদেশে দেখছি সেখানে মানুষের চিত্ত প্রধানত বাহিরেই আপনাকে বিকীর্ণ করতে বসেছে। শক্তির ক্ষেত্রই তার ক্ষেত্র। ব্যাপ্তির রাজ্যেই সে একান্ত ঝুঁকে পড়েছে, মানুষের অন্তরের মধ্যে যেখানে সমাপ্তির রাজ্য সে জায়গাটাকে সে পরিত্যাগ করবার চেষ্টায় আছে, তাকে সে ভালো করে বিশ্বাসই করে না। এত দূর পর্যন্ত গেছে যে সমাপ্তির পূর্ণতাকে সে কোনো জায়গাতেই দেখতে পায় না। যেমন বিজ্ঞান বলছে বিশ্বজগৎ কেবলই পরিণতির অন্তহীন পথে চলেছে, তেমনি য়ুরোপ আজকাল বলতে আরম্ভ করেছে— জগতের ঈশ্বরও ক্রমশ পরিণত হয়ে উঠছেন। তিনি যে নিজে হয়ে আছেন এ তারা মানতে চায় না, তিনি নিজেকে করে তুলছেন এই তাদের কথা।

ব্রহ্মের এক দিকে ব্যাপ্তি, আর-এক দিকে সমাপ্তি ; এক দিকে পরিণতি, আর-এক দিকে পরিপূর্ণতা ; এক দিকে ভাব, আর-এক দিকে প্রকাশ— দুই একসঙ্গে গান এবং গান-গাওয়ার মতো অবিচ্ছিন্ন মিলিয়ে আছে এটা তারা দেখতে পাচ্ছে না। এ যেন গায়কের অন্তঃকরণকে স্বীকার না করে বলা যে 'গান কোনো জায়গাতেই নেই— কেবলমাত্র গেয়ে যাওয়াই আছে'। কেননা, আমরা যে গেয়ে যাওয়াটাকেই দেখছি, কোনো সময়েই তো সম্পূর্ণ গানটাকে একসঙ্গে দেখছি নে— কিন্তু, তাই বলে কি এটা জানি নে যে সম্পূর্ণ গান চিত্তের মধ্যে আছে ?

এমনি করে কেবলমাত্র ক'রে-যাওয়া চলে-যাওয়ার দিকটাতেই চিত্তকে ঝুঁকে পড়তে দেওয়াতে পাশ্চাত্ত্য জগতে আমরা একটা শক্তির উন্মত্ততা দেখতে পাই। তারা সমস্তকেই জোর করে কেড়ে নেবে, আঁকড়ে ধরবে, এই পণ করে বসে আছে। তারা কেবলই করবে, কোথাও এসে থামবে না, এই তাদের জিদ। জীবনের কোনো জায়গাতেই তারা মৃত্যুর সহজ স্থানটিকে স্বীকার করে না। সমাপ্তিকে তারা সুন্দর বলে দেখতে জানে না।

আমাদের দেশে ঠিক এর উল্টো দিকে বিপদ। আমরা চিত্তের ভিতরের দিকটাতেই ঝুঁকে পড়েছি। শক্তির দিককে, ব্যাপ্তির দিককে, আমরা গাল দিয়ে পরিত্যাগ করতে চাই। ব্রহ্মকে ধ্যানের মধ্যে কেবল পরিসমাপ্তির দিক দিয়েই

দেখব, তাঁকে বিশ্বব্যাপারে নিত্য পরিণতির দিক দিয়ে দেখব না, এই আমাদের পণ। এইজন্য আমাদের দেশে সাধকদের মধ্যে আধ্যাত্মিক উন্মত্ততার দুর্গতি প্রায়ই দেখতে পাই। আমাদের বিশ্বাস কোনো নিয়মকে মানে না, আমাদের কল্পনার কিছুতেই বাধা নেই, আমাদের আচারকে কোনোপ্রকার যুক্তির কাছে কিছুমাত্র জবাবদিহি করতে হয় না। আমাদের জ্ঞান বিশ্বপদার্থ থেকে ব্রহ্মকে অবচ্ছিন্ন করে দেখবার ব্যর্থ প্রয়াস করতে করতে শুকিয়ে পাথর হয়ে যায়, আমাদের হৃদয় কেবলমাত্র আপনার হৃদয়াবেগের মধ্যেই ভগবানকে অবরুদ্ধ করে ভোগ করবার চেষ্টায় রসোন্মত্ততায় মূর্ছিত হয়ে পড়তে থাকে। শক্তির ক্ষেত্রে আমাদের জ্ঞান বিশ্বনিয়মের সঙ্গে কোনো কারবার রাখতে চায় না, স্থাণু হয়ে বসে আপনাকে আপনিই নিরীক্ষণ করতে চায়; আমাদের হৃদয়াবেগ বিশ্বসেবার মধ্যে ভগবৎপ্রেমকে আকার দান করতে চায় না, কেবল অশ্রুজলে আপনার অঙ্গনে ধুলোয় লুটোপুটি করতে ইচ্ছা করে। এতে যে আমাদের মনুষ্যত্বের কত দূর বিকৃতি ও দুর্বলতা ঘটে তা ওজন করে দেখবার কোনো উপায়ও আমাদের ত্রিসীমানায় রাখি নি। আমাদের যে দাঁড়িপাল্লা অন্তর-বাহিরের সমস্ত সামঞ্জস্য হারিয়ে ফেলেছে তাই দিয়েই আমরা আমাদের ধর্মকর্ম ইতিহাস-পুরাণ সমাজ-সভ্যতা সমস্তকে ওজন করে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকি, আর-কোনো প্রকার ওজনের সঙ্গে মিলিয়ে নিখুঁতভাবে সত্য নির্ণয় করবার কোনো দরকারই দেখি নে। কিন্তু আধ্যাত্মিকতা অন্তর-বাহিরের যোগে অপ্রমত্ত। সত্যের এক দিকে নিয়ম, এক দিকে আনন্দ। তার এক দিকে ধ্বনিত হচ্ছে: ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি। আর-এক দিকে ধ্বনিত হচ্ছে: আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। এক দিকে বন্ধনকে না মানলে অন্য দিকে মুক্তিকে পাবার জো নেই। ব্রহ্ম এক দিকে আপনার সত্যের দ্বারা বদ্ধ, আর-এক দিকে আপনার আনন্দের দ্বারা মুক্ত। আমরাও সত্যের বন্ধনকে যখন সম্পূর্ণ স্বীকার করি তখনই মুক্তির আনন্দকে সম্পূর্ণ লাভ করি।

সে কেমনতরো? যেমন সেতারে তার বাঁধা। সেতারের তার যখন একেবারে ঠিক সত্য করে বাঁধা হয়, সেই বন্ধনে স্বরতত্ত্বের নিয়মের যখন লেশমাত্র স্খলন না হয়, তখন সেই তারে গান বাজে এবং সেই গানের সুরের মধ্যেই সেতারের তার আপনাকে আপনি ছাড়িয়ে যায়, সে মুক্তি লাভ করতে থাকে। এক দিকে সে নিয়মের মধ্যে অবিচলিতভাবে বাঁধা পড়েছে বলেই অন্য দিকে সে সংগীতের মধ্যে উদারভাবে উন্মুক্ত হতে পেরেছে। যতক্ষণ এই তার ঠিক সত্য হয়ে বাঁধা হয় নি ততক্ষণ সে কেবলমাত্রই বন্ধন, বন্ধন ছাড়া আর-কিছুই নয়। কিন্তু, তাই বলে এই তার খুলে ফেলাকেই মুক্তি বলে না। সাধনার কঠিন নিয়মে ক্রমশই তাকে সত্যে বেঁধে তুলতে

পারলেই সে বদ্ধ থেকেও এবং বদ্ধ থাকাতেই পরিপূর্ণ সার্থকতার মধ্যে মুক্তিলাভ করে।

আমাদের জীবনের বীণাতেও কর্মের সরু মোটা তারগুলি ততক্ষণ কেবলমাত্র বন্ধন যতক্ষণ তাদের সত্যের নিয়মে ধ্রুব করে না বেঁধে তুলতে পারি। কিন্তু, তাই বলে এই তারগুলিকে খুলে ফেলে দিয়ে শূন্যতার মধ্যে, ব্যর্থতার মধ্যে, নিষ্ক্রিয়তা-লাভকে মুক্তিলাভ বলে না।

তাই বলছিলুম কর্মকে ত্যাগ করা নয়, কিন্তু আমাদের প্রতিদিনের কর্মকেই চির-দিনের সুরে ক্রমশ বেঁধে তোলবার সাধনাই হচ্ছে সত্যের সাধনা, ধর্মের সাধনা। এই সাধনারই মন্ত্র হচ্ছে : যদ্‌যৎ কর্ম প্রকুর্বীত তদ্‌ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ। যে যে কর্ম করবে সমস্তই ব্রহ্মকে সমর্পণ করবে। অর্থাৎ, সমস্ত কর্মের দ্বারা আত্মা আপনাকে ব্রহ্মে নিবেদন করতে থাকবে। অনন্তের কাছে নিত্য এই নিবেদন করাই আত্মার গান, এই হচ্ছে আত্মার মুক্তি। তখন কী আনন্দ যখন সকল কর্মই ব্রহ্মের সঙ্গে যোগের পথ, কর্ম যখন আমাদের নিজের প্রবৃত্তির কাছেই ফিরে ফিরে না আসে, কর্মে যখন আমাদের আত্মসমর্পণ প্রতিদিন একান্ত হয়ে ওঠে— সেই পূর্ণতা, সেই মুক্তি, সেই স্বর্গ— তখন সংসারই তো আনন্দনিকেতন।

কর্মের মধ্যে মানুষের এই-যে বিরাট আত্মপ্রকাশ, অনন্তের কাছে তার এই-যে নিরন্তর আত্মনিবেদন, ঘরের কোণে বসে একে কে অবজ্ঞা করতে চায়! সমস্ত মানুষে মিলে রৌদ্রে বৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে কালে কালে মানবমাহাত্ম্যের যে অভ্রভেদী মন্দির রচনা করছে কে মনে করে সেই সুমহৎ সৃষ্টিব্যাপার থেকে সুদূরে পালিয়ে গিয়ে নিভৃতে বসে আপনার মনে কোনো-একটা ভাবরসসম্ভোগই মানুষের সঙ্গে ভগবানের মিলন, এবং সেই সাধনাই ধর্মের চরম সাধনা! ওরে উদাসীন, ওরে আপনার মাদকতায় বিভোর বিহ্বল সন্ন্যাসী, এখনই শুনতে কি পাচ্ছ না ইতিহাসের সুদূরপ্রসারিত ক্ষেত্রে মনুষ্যত্বের প্রশস্ত রাজপথে মানবাত্মা চলেছে, চলেছে মেঘমন্দ্রগর্জনে আপনার কর্মের বিজয়রথে, চলেছে বিশ্বের মধ্যে আপনার অধিকারকে বিস্তীর্ণ করতে। তার সেই আকাশে আন্দোলিত জয়পতাকার সম্মুখে পর্বতের প্রস্তররাশি বিদীর্ণ হয়ে গিয়ে পথ ছেড়ে দিচ্ছে; বন-জঙ্গলের ঘনছায়াচ্ছন্ন জটিল চক্রান্ত সূর্যালোকের আঘাতে কুহেলিকার মতো তার সম্মুখে দেখতে দেখতে কোথায় অন্তর্ধান করছে; অসুখ অস্বাস্থ্য অব্যবস্থা পদে পদে পিছিয়ে গিয়ে প্রতিদিন তাকে স্থান ছেড়ে দিচ্ছে; অজ্ঞতার বাধাকে সে পরাভূত করছে, অন্ধতার অন্ধকারকে সে বিদীর্ণ করে ফেলছে। তার চারি দিকে দেখতে দেখতে শ্রীসম্পদ কাব্যকলা জ্ঞানধর্মের আনন্দলোক উদ্‌ঘাটিত হয়ে যাচ্ছে।

বিপুল ইতিহাসের দুর্গম দুরত্যয় পথে মানবাত্মার এই-যে বিজয়রথ অহোরাত্র পৃথিবীকে কম্পান্বিত করে চলেছে তুমি কি অসাড় হয়ে চোখ বুজে বলতে চাও তার কেউ সারথি নেই? তাকে কেউ কোনো মহৎ সার্থকতার দিকে চালনা করে নিয়ে যাচ্ছে না? এইখানেই, এই মহৎ সুখদুঃখ বিপৎসম্পদের পথেই কি রথীর সঙ্গে সারথির যথার্থ মিলন ঘটছে না? রথ চলেছে, শ্রাবণের অমারাত্রির দুর্যোগও সেই সারথির অনিমেষ নেত্রকে আচ্ছন্ন করতে পারছে না, মধ্যাহ্নসূর্যের প্রখর আলোকেও তাঁর ধ্রুবদৃষ্টি প্রতিহত হচ্ছে না; আলোকে অন্ধকারে চলেছে রথ, আলোকে অন্ধকারে মিলন রথীর সঙ্গে সেই সারথির— চলতে চলতে মিলন, পথের মধ্যে মিলন, উঠবার সময় মিলন, নামবার সময় মিলন, রথীর সঙ্গে সারথির। ওরে, কে সেই নিত্য মিলনকে অগ্রাহ্য করতে চায়! তিনি যেখানে চালাতে চান কে সেখানে চলতে চায় না! কে বলতে চায় আমি মানুষের ইতিহাসের ক্ষেত্র থেকে সুদূরে পালিয়ে গিয়ে নিষ্ক্রিয়তার মধ্যে, নিশ্চেষ্টতার মধ্যে একলা পড়ে থেকে তাঁর সঙ্গে মিলব। কে বলতে চায় এই-সমস্তই মিথ্যা— এই বৃহৎ সংসার, এই নিত্যবিকাশমান মানুষের সভ্যতা, অন্তর-বাহিরের সমস্ত বাধাকে ভেদ করে আপনার সকল প্রকার শক্তিকে জয়যুক্ত করবার জন্যে মানুষের এই চিরদিনের চেষ্টা, এই পরমদুঃখের এবং পরমসুখের সাধনা। যে লোক এ-সমস্তকেই মিথ্যা বলে কত বড়ো মিথ্যা তার চিত্তকে আক্রমণ করেছে! এত বড়ো বৃহৎ সংসারকে এত বড়ো ফাঁকি বলে যে মনে করে সে কি সত্যস্বরূপ ঈশ্বরকে সত্যই বিশ্বাস করে! যে মনে করে পালিয়ে গিয়ে তাঁকে পাওয়া যায় সে কবে তাঁকে পাবে, কোথায় তাঁকে পাবে, পালিয়ে কত দূরে সে যাবে, পালাতে পালাতে একেবারে শূন্যতার মধ্যে গিয়ে পৌঁছবে এমন সাধ্য তার আছে কি! তা নয়— ভীরু যে, পালাতে যে চায়, সে কোথাও তাঁকে পায় না। সাহস করে বলতে হবে এই-যে তাঁকে পাচ্ছি, এই-যে এখনই, এই-যে এখানেই। বারবার বলতে হবে আমার প্রত্যেক কর্মের মধ্যে আমি যেমন আপনাকে পাচ্ছি তেমনি আমার আপনার মধ্যে যিনি আপনি তাঁকে পাচ্ছি। কর্মের মধ্যে আমার যা-কিছু বাধা, যা-কিছু বেসুর, যা-কিছু জড়তা, যা-কিছু অব্যবস্থা, সমস্তকেই আমার শক্তির দ্বারা সাধনার দ্বারা দূর করে দিয়ে এই কথাটি অসংকোচে বলবার অধিকারটি আমাদের লাভ করতে হবে যে, কর্মে আমার আনন্দ, সেই আনন্দেই আমার আনন্দময় বিরাজ করছেন।

উপনিষদে 'ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ' ব্রহ্মবিৎদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কাকে বলেছেন? আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবান্ এষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ। পরমাত্মায় যাঁর আনন্দ, পরমাত্মায় যাঁর ক্রীড়া এবং যিনি ক্রিয়াবান্ তিনিই ব্রহ্মবিৎদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আনন্দ আছে অথচ

সেই আনন্দের ক্রীড়া নেই, এ কখনো হতেই পারে না— সেই ক্রীড়া নিষ্ক্রিয় নয়— সেই ক্রীড়াই হচ্ছে কর্ম। ব্রহ্মে যাঁর আনন্দ তিনি কর্ম না হলে বাঁচবেন কী করে? কারণ, তাঁকে এমন কর্ম করতেই হবে যে কর্মে সেই ব্রহ্মের আনন্দ আকার ধারণ করে বাহিরে প্রকাশমান হয়ে ওঠে। এইজন্য যিনি ব্রহ্মবিৎ, অর্থাৎ জ্ঞানে যিনি ব্রহ্মকে জানেন, তিনি আত্মরতিঃ, পরমাত্মাতেই তাঁর আনন্দ, এবং তিনি আত্মক্রীড়ঃ, তাঁর সকল কাজই হচ্ছে পরমাত্মার মধ্যে— তাঁর খেলা, তাঁর স্নান-আহার, তাঁর জীবিকা-অর্জন, তাঁর পরহিতসাধন, সমস্তই হচ্ছে পরমাত্মার মধ্যে তাঁর বিহার। তিনি ক্রিয়াবান্, ব্রহ্মের যে আনন্দ তিনি ভোগ করেন তাকে কর্মে প্রকাশ না করে তিনি থাকতে পারেন না। কবির আনন্দ কাব্যে, শিল্পীর আনন্দ শিল্পে, বীরের আনন্দ শক্তির প্রতিষ্ঠায়, জ্ঞানীর আনন্দ তত্ত্বাবিষ্কারে যেমন আপনাকে কেবলই কর্ম আকারে প্রকাশ করতে যাচ্ছে ব্রহ্মবিদের আনন্দ তেমনি জীবনে ছোটো বড়ো সকল কাজেই সত্যের দ্বারা, সৌন্দর্যের দ্বারা, শৃঙ্খলার দ্বারা, মঙ্গলের দ্বারা, অসীমকেই প্রকাশ করতে চেষ্টা করে।

ব্রহ্মও তো আপনার আনন্দকে তেমনি করেই প্রকাশ করছেন; তিনি 'বহুধাশক্তিযোগাৎ বর্ণাননেকান্ নিহিতার্থো দধাতি'। তিনি আপনার বহুধা শক্তির যোগে নানা জাতির নানা অন্তর্নিহিত প্রয়োজন সাধন করছেন। সেই অন্তর্নিহিত প্রয়োজন তো তিনি নিজেই, তাই তিনি আপনাকে নানা শক্তির ধারায় কেবলই নানা আকারে দান করছেন। কাজ করছেন, তিনি কাজ করছেন— নইলে আপনাকে তিনি দিতে পারবেন কী করে। তাঁর আনন্দ আপনাকে কেবলই উৎসর্গ করছে, সেই তো তাঁর সৃষ্টি।

আমাদেরও সার্থকতা ওইখানে, ওইখানেই ব্রহ্মের সঙ্গে মিল আছে। বহুধাশক্তিযোগে আমাদেরও আপনাকে কেবলই দান করতে হবে। বেদে তাঁকে 'আত্মদা বলদা' বলেছে; তিনি যে কেবল আপনাকে দিচ্ছেন তা নয়, তিনি আমাদের সেই বল দিচ্ছেন যাতে করে আমরাও তাঁর মতো আপনাকে দিতে পারি। সেইজন্যে, বহুধা শক্তির যোগে যিনি আমাদের প্রয়োজন মেটাচ্ছেন ঋষি তাঁরই কাছে প্রার্থনা করছেন: স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু। তিনি যেন আমাদের সকলের চেয়ে বড়ো প্রয়োজনটা মেটান, আমাদের সঙ্গে শুভবুদ্ধির যোগ সাধন করেন। অর্থাৎ শুধু এ হলে চলবে না যে, তাঁর শক্তিযোগে তিনি কেবল আপনি কর্ম করে আমাদের অভাব মোচন করবেন; আমাদের শুভবুদ্ধি দিন, তা হলে আমরাও তাঁর সঙ্গে মিলে কাজ করতে দাঁড়াব, তা হলেই তাঁর সঙ্গে আমাদের যোগ সম্পূর্ণ হবে। শুভবুদ্ধি হচ্ছে সেই

বুদ্ধি যাতে সকলের স্বার্থকে আমারই নিহিতার্থ বলে জানি, সেই বুদ্ধি যাতে সকলের কর্মে আপন বহুধা শক্তি প্রয়োগ করাতেই আমার আনন্দ। এই শুভবুদ্ধিতে যখন আমরা কাজ করি তখন আমাদের কর্ম নিয়মবদ্ধ কর্ম, কিন্তু যন্ত্রচালিতের কর্ম নয়— আত্মার তৃপ্তিকর কর্ম, কিন্তু অভাবতাড়িতের কর্ম নয়— তখন আমাদের কর্ম দশের অন্ধ অনুকরণ নয়, লোকাচারের ভীরু অনুবর্তন নয়। তখন, যেমন আমরা দেখছি 'বিচৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ', বিশ্বের সমস্ত কর্ম তাঁতেই আরম্ভ হচ্ছে এবং তাঁতেই এসে সমাপ্ত হচ্ছে, তেমনি দেখতে পাব আমার সমস্ত কর্মের আরম্ভে তিনি এবং পরিণামেও তিনি— তাই আমার সকল কর্মই শান্তিময়, কল্যাণময়, আনন্দময়।

উপনিষৎ বলেন তাঁর 'স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ'। তাঁর জ্ঞান শক্তি এবং কর্ম স্বাভাবিক। তাঁর পরমা শক্তি আপন স্বভাবেই কাজ করছে। আনন্দই তাঁর কাজ, কাজই তাঁর আনন্দ। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অসংখ্য ক্রিয়াই তাঁর আনন্দের গতি।

কিন্তু সেই স্বাভাবিকতা আমাদের জন্মায় নি বলেই কাজের সঙ্গে আনন্দকে আমরা ভাগ করে ফেলেছি। কাজের দিন আমাদের আনন্দের দিন নয়, আনন্দ করতে যেদিন চাই সেদিন আমাদের ছুটি নিতে হয়। কেননা হতভাগ্য আমরা, কাজের ভিতরেই আমরা ছুটি পাই নে। প্রবাহিত হওয়ার মধ্যেই নদী ছুটি পায়, শিখারূপে জ্বলে ওঠার মধ্যেই আগুন ছুটি পায়, বাতাসে বিস্তীর্ণ হওয়ার মধ্যেই ফুলের গন্ধ ছুটি পায়— আপনার সমস্ত কর্মের মধ্যেই আমরা তেমন করে ছুটি পাই নে। কর্মের মধ্য দিয়ে আপনাকে ছেড়ে দিই নে ব'লে, দান করি নে ব'লে কর্ম আমাদের চেপে রাখে। কিন্তু, হে আত্মদা, বিশ্বের কর্মে তোমার আনন্দমূর্তি প্রত্যক্ষ করে কর্মের ভিতর দিয়ে আমাদের আত্মা আগুনের মতো তোমার দিকেই জ্বলে উঠুক, নদীর মতো তোমার অভিমুখেই প্রবাহিত হোক, ফুলের গন্ধের মতো তোমার মধ্যেই বিস্তীর্ণ হতে থাক্। জীবনকে তার সমস্ত সুখ-দুঃখ, সমস্ত ক্ষয়-পূরণ, সমস্ত উত্থান-পতনের মধ্য দিয়েও পরিপূর্ণ করে ভালোবাসতে পারি এমন বীর্য তুমি আমাদের মধ্যে দাও। তোমার এই বিশ্বকে পূর্ণশক্তিতে দেখি, পূর্ণশক্তিতে শুনি, পূর্ণশক্তিতে এখানে কাজ করি। জীবনে সুখ নেই ব'লে, হে জীবিতেশ্বর, তোমাকে অপবাদ দেব না। যে জীবন তুমি আমাকে দিয়েছ এই জীবনে পরিপূর্ণ করে আমি বাঁচব, বীরের মতো একে আমি গ্রহণ করব এবং দান করব, এই তোমার কাছে প্রার্থনা। দুর্বল চিত্তের সেই কল্পনাকে একেবারে দূর করে দিই যে কল্পনা সমস্ত কর্ম থেকে বিযুক্ত একটা আধারহীন আকারহীন বাস্তবতাহীন পদার্থকে ব্রহ্মানন্দ বলে মনে করে। কর্মক্ষেত্রে মধ্যাহ্নসূর্যালোকে তোমার আনন্দরূপকে প্রকাশমান দেখে হাটে ঘাটে মাঠে বাজারে সর্বত্র যেন তোমার

জয়ধ্বনি করতে পারি। মাঠের মধ্যে কঠোর পরিশ্রমে কঠিন মাটি ভেঙে যেখানে চাষা চাষ করছে সেইখানেই তোমার আনন্দ শ্যামল শস্যে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে; যেখানেই জলাজঙ্গল গর্তগাড়িকে সরিয়ে ফেলে মানুষ আপনার বাসভূমিকে পরিচ্ছন্ন করে তুলছে সেইখানেই পারিপাট্যের মধ্যে তোমার আনন্দ প্রকাশিত হয়ে পড়ছে; যেখানে স্বদেশের অভাব দূর করবার জন্যে মানুষ অশ্রান্ত কর্মের মধ্যে আপনাকে অজস্র দান করছে সেইখানেই শ্রীসম্পদে তোমার আনন্দ বিস্তীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। যেখানে মানুষের জীবনের আনন্দ চিত্তের আনন্দ কেবলই কর্মের রূপ ধারণ করতে চেষ্টা করছে সেখানে সে মহৎ, সেখানে সে প্রভু, সেখানে সে দুঃখকষ্টের ভয়ে দুর্বল ক্রন্দনের স্বরে নিজের অস্তিত্বকে কেবলই অভিশাপ দিচ্ছে না। যেখানেই জীবনে মানুষের আনন্দ নেই, কর্মে মানুষের অনাস্থা, সেইখানেই তোমার সৃষ্টিতত্ত্ব যেন বাধা পেয়ে প্রতিহত হয়ে যাচ্ছে, সেইখানেই নিখিলের প্রবেশদ্বার সংকীর্ণ। সেইখানেই যত সংকোচ, যত অন্ধ সংস্কার, যত অমূলক বিভীষিকা, যত আধিব্যাধি এবং পরস্পরবিচ্ছিন্নতা।

হে বিশ্বকর্মন্, আজ আমরা তোমার সিংহাসনের সম্মুখে দাঁড়িয়ে এই কথাটি জানাতে এসেছি, আমার এই সংসার আনন্দের, আমার এই জীবন আনন্দের। বেশ করেছ আমাকে ক্ষুধাতৃষ্ণার আঘাতে জাগিয়ে রেখেছ তোমার এই জগতে, তোমার এই বহুধা শক্তির অসীম লীলাক্ষেত্রে। বেশ করেছ তুমি আমাকে দুঃখ দিয়ে সম্মান দিয়েছ, বিশ্বসংসারে অসংখ্য জীবের চিত্তে দুঃখতাপের দাহে যে অগ্নিময়ী পরমা সৃষ্টি চলছে বেশ করেছ আমাকে তার সঙ্গে যুক্ত করে গৌরবান্বিত করেছ। সেই সঙ্গে প্রার্থনা করতে এসেছি, আজ তোমার বিশ্বশক্তির প্রবল বেগ বসন্তের উদ্দাম দক্ষিণ বাতাসের মতো ছুটে চলে আসুক, মানবের বিশাল ইতিহাসের মহাক্ষেত্রের উপর দিয়ে ধেয়ে আসুক— নিয়ে আসুক তার নানা ফুলের গন্ধকে, নানা বনের মর্মরধ্বনিকে বহন করে, আমাদের দেশের এই শব্দহীন প্রাণহীন শুষ্কপ্রায় চিত্ত-অরণ্যের সমস্ত শাখাপল্লবকে দুলিয়ে কাঁপিয়ে মুখরিত করে দিক— আমাদের অন্তরের নিদ্রোত্থিত শক্তি ফুলে ফলে কিশলয়ে অপর্যাপ্তরূপে সার্থক হবার জন্যে কেঁদে উঠুক। দেখতে দেখতে শতসহস্র কর্মচেষ্টার মধ্যে আমাদের দেশের ব্রহ্মোপাসনা আকার ধারণ করে তোমার অসীমতার অভিমুখে বাহু তুলে আপনাকে একবার দিগবিদিকে ঘোষণা করুক। মোহের আবরণকে উদ্‌ঘাটন করো, উদাসীনতার নিদ্রাকে অপসারিত করে দাও— এখনই এই মুহূর্তে অনন্ত দেশে কালে ধাবমান ঘূর্ণমান চিরচাঞ্চল্যের মধ্যে তোমার নিত্যবিলসিত আনন্দরূপকে দেখে নিই; তার পরে সমস্ত জীবন দিয়ে তোমাকে প্রণাম

করে সংসারে মানবাত্মার সৃষ্টিক্ষেত্রের মধ্যে প্রবেশ করি, যেখানে নানা দিক থেকে নানা অভাবের প্রার্থনা, দুঃখের ক্রন্দন, মিলনের আকাঙ্ক্ষা এবং সৌন্দর্যের নিমন্ত্রণ আমাকে আহ্বান করছে— যেখানে আমার নানাভিমুখী শক্তির একমাত্র সার্থকতা সুদীর্ঘ কাল ধরে প্রতীক্ষা করে বসে আছে এবং যেখানে বিশ্বমানবের মহাযজ্ঞে আনন্দের হোমহুতাশনে আমার জীবনের সমস্ত সুখদুঃখ লাভক্ষতিকে পুণ্য আহুতির মতো সমর্পণ করে দেবার জন্যে আমার অন্তরের মধ্যে কোন্ তপস্বিনী মহানিষ্ক্রমণের দ্বার খুঁজে বেড়াচ্ছে।

ফাল্গুন ১৩১৭

আত্মবোধ

কয়েক দিন হল পল্লীগ্রামে কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের দুইজন বাউলের সঙ্গে আমার দেখা হয়। আমি তাদের জিজ্ঞাসা করলুম, তোমাদের ধর্মের বিশেষত্বটি কী আমাকে বলতে পার? একজন বললে, 'বলা বড়ো কঠিন, ঠিক বলা যায় না।' আর-একজন বললে, 'বলা যায় বৈকি— কথাটা সহজ। আমরা বলি এই যে, গুরুর উপদেশে গোড়ায় আপনাকে জানতে হয়। যখন আপনাকে জানি তখন সেই আপনার মধ্যে তাঁকে পাওয়া যায়।' আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'তোমাদের এই ধর্মের কথা পৃথিবীর লোককে সবাইকে শোনাও না কেন।' সে বললে, 'যার পিপাসা হবে সে গঙ্গার কাছে আপনি আসবে।' আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'তাই কি দেখতে পাচ্ছ। কেউ কি আসছে।' সে লোকটি অত্যন্ত প্রশান্ত হাসি হেসে বললে, 'সবাই আসবে। সবাইকে আসতে হবে।'

আমি এই কথা ভাবলুম, বাংলাদেশের পল্লীগ্রামের শাস্ত্রশিক্ষাহীন এই বাউল, এ তো মিথ্যা বলে নি। আসছে, সমস্ত মানুষই আসছে। কেউ তো স্থির হয়ে নেই। আপনার পরিপূর্ণতার অভিমুখেই তো সবাইকে চলতে হচ্ছে, আর যাবে কোথায়। আমরা প্রসন্নমনে হাসতে পারি— পৃথিবী জুড়ে সবাই যাত্রা করেছে। আমরা কি মনে করছি সবাই কেবল নিজের উদর-পূরণের অন্ন খুঁজছে, নিজের প্রাত্যহিক প্রয়োজনের চারি দিকেই প্রতিদিন প্রদক্ষিণ করে জীবন কাটিয়ে দিচ্ছে? না, তা নয়। এই মুহূর্তেই পৃথিবীর সমস্ত মানুষ অন্নের জন্যে, বস্ত্রের জন্যে, নিজের ছোটো বড়ো কত শত দৈনিক আবশ্যকের জন্যে ছুটে বেড়াচ্ছে— কিন্তু, কেবল তার সেই আহ্নিক গতিতে নিজেকে প্রদক্ষিণ করা নয়, সেই সঙ্গে সঙ্গেই সে জেনে এবং না জেনে একটি

প্রকাণ্ড কক্ষে মহাকাশে আর-একটি কেন্দ্রের চার দিকে যাত্রা করে চলেছে— যে কেন্দ্রের সঙ্গে সে জ্যোতির্ময় নাড়ির আকর্ষণে বিধৃত হয়ে রয়েছে, যেখান থেকে সে আলোক পাচ্ছে, প্রাণ পাচ্ছে, যার সঙ্গে একটি অদৃশ্য অথচ অবিচ্ছেদ্য সূত্রে তার চিরদিনের মহাযোগ রয়েছে।

মানুষ অন্নবস্ত্রের চেয়ে গভীর প্রয়োজনের জন্যে পথে বেরিয়ে পড়েছে। কী সেই প্রয়োজন? তপোবনে ভারতবর্ষের ঋষি তার উত্তর দিয়েছেন। এবং বাংলাদেশের পল্লীগ্রামে বাউলও তার উত্তর দিচ্ছে। মানুষ আপনাকে পাবার জন্যে বেরিয়েছে; আপনাকে না পেলে, তার আপনার চেয়ে যিনি বড়ো আপন তাঁকে পাবার জো নেই। তাই এই আপনাকেই বিশুদ্ধ ক'রে, প্রবল ক'রে, পরিপূর্ণ ক'রে পাবার জন্যে মানুষ কত তপস্যা করছে। শিশুকাল থেকেই সে আপনার প্রবৃত্তিকে শিক্ষিত ও সংযত করছে, এক-একটি বড়ো বড়ো লক্ষ্যের চার দিকে সে আপনার ছোটো ছোটো সমস্ত বাসনাকে নিয়মিত করবার চেষ্টা করছে, এমন-সকল আচার-অনুষ্ঠানের সে সৃষ্টি করছে যাতে তাকে অহরহ স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যে, দৈনিক জীবনযাত্রার মধ্যে তার সমাপ্তি নেই, সমাজব্যবহারের মধ্যেও তার অবসান নেই। সে এমন একটি বৃহৎ আপনাকে চাচ্ছে যে আপনি তার বর্তমানকে, তার চার দিককে, তার প্রবৃত্তি ও বাসনাকে ছাড়িয়ে অনেক দূরে চলে গেছে।

আমাদের বৈরাগী বাংলাদেশের একটি ছোটো নদীর ধারে এক সামান্য কুটিরে বসে এই আপ্‌নি'র খোঁজ করছে এবং নিশ্চিন্ত হাস্যে বলছে, সবাইকেই আসতে হবে এই আপ্‌নির খোঁজ করতে। কেননা, এ তো কোনো বিশেষ মতের বিশেষ সম্প্রদায়ের ডাক নয়; সমস্ত মানবের মধ্যে যে চিরন্তন সত্য আছে এ যে তারই ডাক। কলরবের তো অন্ত নেই— কত কল-কারখানা, কত যুদ্ধবিগ্রহ, কত বাণিজ্য-ব্যবসায়ের কোলাহল আকাশকে মথিত করছে; কিন্তু, মানুষের ভিতর থেকে সেই সত্যের ডাককে কিছুতেই আচ্ছন্ন করতে পারছে না। মানুষের সমস্ত ক্ষুধাতৃষ্ণা সমস্ত অর্জন-বর্জনের মাঝখানে সে রয়েছে। কত ভাষায় সে কথা কইছে, কত কালে কত দেশে কত রূপে কত ভাবে সমস্ত আশুপ্রয়োজনের উপর সে জাগ্রত হয়ে আছে। কত তর্ক তাকে আঘাত করছে, কত সংশয় তাকে অস্বীকার করছে, কত বিকৃতি তাকে আক্রমণ করছে, কিন্তু সে বেঁচেই আছে। সে কেবলই বলছে, তোমার আপ্‌নিকে পাও : আত্মানং বিদ্ধি।

এই আপ্‌নিকে মানুষ সহজে আপন করে তুলতে পারছে না, সেইজন্যে মানুষ সূত্রচ্ছিন্ন মালার মতো কেবলই খসে যাচ্ছে, ধুলোয় ছড়িয়ে পড়ছে। কিন্তু, যে বিশ্ব-

জগতে সে নিশ্চিন্ত হয়ে বাস করছে সেই জগৎ তো মুহুর্মুহু এমন করে খসে পড়ছে না, ছড়িয়ে পড়ছে না।

অথচ এই জগৎটি তো সহজ জিনিস নয়। এর মধ্যে যে-সকল বিরাট শক্তি কাজ করছে তাদের নিতান্ত নিরীহ বলা যায় না। আমাদের এতটুকু একটুখানি রাসায়নিক পরীক্ষাশালায় যখন সামান্য একটা টেবিলের উপর দু-চার কণা গ্যাসকে অল্প একটু বন্ধনমুক্ত করে দিয়ে তাদের লীলা দেখতে যাই তখন শঙ্কিত হয়ে থাকতে হয়, তাদের গলাগলি জড়াজড়ি ঠেলাঠেলি মারামারি যে কী অদ্ভুত এবং কী প্রচণ্ড তা দেখে বিস্মিত হই। বিশ্ব জুড়ে আবিষ্কৃত এবং অনাবিষ্কৃত এমন কত শত বাষ্প-পদার্থ তাদের কত বিচিত্র প্রকৃতি নিয়ে কী কাণ্ড বাধিয়ে বেড়াচ্ছে তা আমরা কল্পনা করতেও পারি নে। তার উপরে জগতের মূল শক্তিগুলিও পরস্পরের বিরুদ্ধ। আকর্ষণের উল্টো শক্তি বিকর্ষণ, কেন্দ্রানুগের উল্টো শক্তি কেন্দ্রাতিগ। এই-সমস্ত বিরুদ্ধতা ও বৈচিত্র্যের প্রকাণ্ড লীলাভূমি এই-যে জগৎ এখানকার আলোতে আমরা অনায়াসে চোখ মেলেছি, এখানকার বাতাসে অনায়াসে নিশ্বাস নিচ্ছি, এর জলে স্থলে অনায়াসে সঞ্চরণ করছি। যেমন আমাদের শরীরের ভিতরটাতে কত রকমের কত কী কাজ চলছে তার ঠিকানা নেই, কিন্তু আমরা সমস্তটাকে জড়িয়ে একটি অখণ্ড স্বাস্থ্যের মধ্যে এক করে জানছি— দেহটাকে হৃৎপিণ্ড মস্তিষ্ক পাকযন্ত্র প্রভৃতির জোড়া-তাড়া ব্যাপার বলে জানছি নে।

জগতের রহস্যাগারের মধ্যে শক্তির ঘাত প্রতিঘাত যেমনি জটিল ও ভয়ংকর হোক-না কেন, আমাদের কাছে তা নিতান্তই সহজ হয়ে দেখা দিয়েছে। অথচ জগৎটা আসলে যে কী তা যখন সন্ধান করে বুঝে দেখবার চেষ্টা করি তখন কোথাও আর তল পাওয়া যায় না। সকলেই জানেন বস্তুতত্ত্ব সম্বন্ধে এক সময় বিজ্ঞান ঠিক করে রেখেছিল যে পরমাণুর পিছনে আর যাবার জো নেই— সেই-সকল সূক্ষ্মতম মূল-বস্তুর যোগ-বিয়োগেই জগৎ তৈরি হচ্ছে। কিন্তু, বিজ্ঞানের সেই মূল-বস্তুর দুর্গও আজ আর টেঁকে না। আদিকারণের মহাসমুদ্রের দিকে বিজ্ঞান যতই এক-এক পা এগোচ্ছে ততই বস্তুত্বের কূলকিনারা কোন্ দিগন্তরালে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে; সমস্ত বৈচিত্র্য সমস্ত আকার-আয়তন একটা বিরাট শক্তির মধ্যে একেবারে সীমা হারিয়ে আমাদের ধারণার সম্পূর্ণ অতীত হয়ে উঠছে।

কিন্তু, আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যা এক দিকে আমাদের ধারণার একেবারেই অতীত তাই আর-এক দিকে নিতান্ত সহজেই আমাদের ধারণাগম্য হয়ে আমাদের কাছে ধরা দিয়েছে। সেই হচ্ছে আমাদের এই জগৎ। এই জগতে শক্তিকে শক্তিরূপে

বিজ্ঞানের সাহায্যে আমাদের জানতে হচ্ছে না ; আমরা তাকে অত্যন্ত প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছি— জলস্থল, তরুলতা, পশুপক্ষী। জল মানে বাষ্পবিশেষের যোগবিয়োগ বা শক্তি-বিশেষের ক্রিয়ামাত্র নয়— জল মানে আমারই একটি আপন সামগ্রী, সে আমার চোখের জিনিস, স্পর্শের জিনিস ; সে আমার স্নানের জিনিস, পানের জিনিস ; সে বিবিধ প্রকারেই আমার আপন। বিশ্বজগৎ বলতেও তাই। স্বরূপত তার একটি বালুকণাও যে কী তা আমরা ধারণা করতে পারি নে, কিন্তু সম্বন্ধত সে বিচিত্রভাবে বিশেষভাবে আমার আপন।

যাকে ধরা যায় না সে আপনিই আমার আপন হয়ে ধরা দিয়েছে। এতই আপন হয়ে ধরা দিয়েছে যে দুর্বল উলঙ্গ শিশু এই অচিন্ত্য শক্তিকে নিশ্চিন্তমনে আপনার ধুলোখেলার ঘরের মতো ব্যবহার করছে, কোথাও কিছু বাধছে না।

জড়জগতে যেমন মানুষেও তেমনি। প্রাণশক্তি যে কী তা কেমন করে বলব। পর্দার উপর পর্দা যতই তুলব ততই অচিন্ত্য অনন্ত অনির্বচনীয়ে গিয়ে পড়ব। সেই প্রাণ এক দিকে যত বড়ো প্রকাণ্ড রহস্যই হোক-না কেন, আর-এক দিকে তাকে আমরা কী সহজেই বহন করছি— সে আমার আপন প্রাণ। পৃথিবীর সমস্ত লোকালয়কে ব্যাপ্ত করে প্রাণের ধারা এই মুহূর্তে অগণ্য জন্মমৃত্যুর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে, নূতন নূতন শাখাপ্রশাখায় ক্রমাগতই দুর্ভেদ্য নির্জনতাকে সজন করে তুলছে— এই প্রাণের প্রবাহের উপর লক্ষ লক্ষ মানুষের দেহের তরঙ্গ কতকাল ধরে অহোরাত্র অন্ধকার থেকে সূর্যালোকে উঠছে এবং সূর্যালোক থেকে অন্ধকার নেবে পড়ছে। এ কী তেজ, কী বেগ, কী নিশ্বাস মানুষের মধ্যে আপনাকে উচ্ছ্বসিত, আন্দোলিত, নব নব বৈচিত্র্যে বিস্তীর্ণ করে দিচ্ছে! যেখানে অতলস্পর্শ গভীরতার মধ্যে তার রহস্য চিরকাল প্রচ্ছন্ন হয়ে রক্ষিত সেখানে আমাদের প্রবেশ নেই ; আবার যেখানে দেশকালের মধ্যে তার প্রকাশ নিরন্তর গর্জিত উন্মথিত হয়ে উঠছে সেখানেও সে কেবল লেশমাত্র আমাদের গোচরে আছে, সমস্তটাকে এক সঙ্গে আমরা দেখতে পাচ্ছি নে। কিন্তু, এখানেই সে আছে, এখনই সে আছে, আমার হয়ে আছে। তার সমস্ত অতীতকে আকর্ষণ করে তার সমস্ত ভবিষ্যৎকে বহন করে সে আছে। সেই অদৃশ্য অথচ দৃশ্য, সেই এক অথচ বহু, সেই বদ্ধ অথচ মুক্ত, সেই বিরাট মানবপ্রাণ— তার পৃথিবীজোড়া ক্ষুধাতৃষ্ণা, নিশ্বাস-প্রশ্বাস, শীতগ্রীষ্ম, হৃৎপিণ্ডের উত্থানপতন, শিরা-উপশিরায় রক্তস্রোতের জোয়ার-ভাঁটা নিয়ে দেশে দেশান্তরে বংশে বংশান্তরে বিরাজ করছে। এই অনির্বচনীয় প্রাণশক্তি তার অপরিসীম রহস্য নিয়েও সদ্যোজাত শিশুর মধ্যে আপন হয়ে ধরা দিতে কুণ্ঠিত হয় নি।

তাই বলছিলুম, অসংখ্য বিরুদ্ধতা ও বৈচিত্র্যের মধ্যে মহাশক্তির যে অনির্বচনীয়

ক্রিয়া চলছে তাই আমাদের কাছে জগৎরূপে প্রাণরূপে নিতান্ত সহজ হয়ে আপন হয়ে ধরা দিয়েছে; তাই আমরা কেবল যে তাদের ব্যবহার করছি তা নয়, তাদের ভালোবাসছি, তাদের কোনো মতেই ছাড়তে চাই নে। তারা আমার এতই আপন যে তাদের যদি বাদ দিতে যাই তবে আমার আমিত্ব একেবারে বস্তুশূন্য হয়ে পড়ে।

জগৎ সম্বন্ধে তো এই রকম সমস্ত সহজ, কিন্তু যেখানে মানুষ আপনি সেখানে সে এমন সহজে সামঞ্জস্য ঘটিয়ে তুলতে পারছে না। মানুষ আপনাকে এমন অখণ্ডভাবে সমগ্র ক'রে আপন ক'রে লাভ করছে না। যাকে মাঝখানে নিয়ে সবাই মানুষের এত আপন তাকেই আপন করে তোলা মানুষের পক্ষে কী কঠিন হয়েছে!

অন্তরে বাহিরে মানুষ নানাখানা নিয়ে একেবারে উদ্‌ভ্রান্ত; তারই মাঝখানে সে আপনাকে ধরতে পারছে না, চারি দিকে সে কেবল টুকরো টুকরো হয়ে ছিটকে পড়ছে। কিন্তু, আপনাকেই তার সব চেয়ে দরকার; তার যত কিছু দুঃখ তার গোড়াতেই এই আপনাকে না-পাওয়া। যতক্ষণ এই আপনাকে পরিপূর্ণ করে না পাওয়া যায় ততক্ষণ কেবলই মনে হয় এটা পাই নি, ওটা পাই নি; ততক্ষণ যা-কিছু পাই তাতে তৃপ্তি হয় না। কেননা, যতক্ষণ আমরা আপনাকে না পাই ততক্ষণ নিত্যভাবে আমরা কোনো জিনিসকেই পাই নে; এমন কোনো আধার থাকে না যার মধ্যে কোনো-কিছুকে স্থিরভাবে ধরে রাখতে পারি। ততক্ষণ আমরা বলি সবই মায়া— সবই ছায়ার মতো চলে যাচ্ছে, মিলিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু, আত্মাকে যখনই পাই, নিজের মধ্যে ধ্রুব এককে যখনই নিশ্চিত করে ধরতে পারি, তখনই সেই কেন্দ্রকে অবলম্বন করে চারি দিকের সমস্ত বিধৃত হয়ে আনন্দময় হয়ে ওঠে। আপনাকে যখন পাই নি তখন যা-কিছু অসত্য ছিল আপনাকে পাবামাত্রই সেই-সমস্তই সত্য হয়ে ওঠে। আমার বাসনার কাছে প্রবৃত্তির কাছে যারা মরীচিকার মতো ধরা দিচ্ছে অথচ দিচ্ছে না, কেবলই এড়িয়ে এড়িয়ে চলে যাচ্ছে, তারাই আমার আত্মাকে সত্যভাবে বেষ্টন করে আত্মারই আপন হয়ে ওঠে। এইজন্যে যে লোক আত্মাকে পেয়েছে জলে স্থলে আকাশে তার আনন্দ, সকল অবস্থার মধ্যেই তার আনন্দ; কেননা, সে আপনার অমর সত্যের মধ্যে সমস্তকেই অমর সত্যরূপে পেয়েছে। সে কিছুকেই ছায়া বলে না, মায়া বলে না, কারণ তার কাছে জগতের সমস্ত পদার্থেরই সত্য ধরা দিয়েছে। সে নিজে সত্য হয়েছে, এইজন্য তার কাছে কোনো সত্যই বিশ্লিষ্ট বিচ্ছিন্ন স্খলিত নয়। এমনি করে আপনাকে পাওয়ার মধ্যে সমস্তকে পাওয়া, আপনার সত্যের দ্বারা সকল সত্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি সমগ্র হয়ে ওঠা, নিজেকে কেবল কতকগুলো বাসনা এবং কতকগুলো অনুভূতির স্তূপরূপে না জানা, নিজেকে কেবল বিচ্ছিন্ন কতকগুলো

বিষয়ের মধ্যে খুঁজে খুঁজে না বেড়ানো এই হচ্ছে আত্মবোধের আত্মোপলব্ধির লক্ষণ।

পৃথিবী একদিন বাষ্প ছিল, তখন তার পরমাণুগুলো আপনার তাপের বেগে বিশ্লিষ্ট হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে। তখন পৃথিবী আপনার আকার পায় নি, প্রাণ পায় নি, তখন পৃথিবী কিছুকেই জন্ম দিতে পারত না, কিছুকেই ধরে রাখতে পারত না— তখন তার সৌন্দর্য ছিল না, সার্থকতা ছিল না, কেবল ছিল তাপ আর বেগ। যখন সে সংহত হয়ে এক হল তখনই জগতের গ্রহনক্ষত্রমণ্ডলীর মধ্যে সেও একটি বিশেষ স্থান লাভ করে বিশ্বের মণিমালায় নূতন একটি মরকত মানিক গেঁথে দিলে। আমাদের চিত্তও সেইরকম প্রবৃত্তির তাপে ও বেগে চারি দিকে কেবল যখন ছড়িয়ে পড়ে তখন যথার্থভাবে কিছুই পাই নে, কিছুই দিই নে; যখনই সমস্তকে সংহত সংযত করে এক করে আত্মাকে পাই, যখনই আমি সত্য যে কী তা জানি, তখনই আমার সমস্ত বিচ্ছিন্ন জানা একটি প্রজ্ঞায় ঘনীভূত হয়, সমস্ত বিচ্ছিন্ন বাসনা একটি প্রেমে সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে এবং জীবনের ছোটো বড়ো সমস্তই নিবিড় আনন্দে সুন্দর হয়ে প্রকাশ পায়। তখন আমার সকল চিন্তা ও সকল কর্মের মধ্যেই একটি আত্মানন্দের অবিচ্ছিন্ন যোগ থাকে। তখনই আমি আধ্যাত্মিক ধ্রুবলোকে আপনার সত্যপ্রতিষ্ঠা উপলব্ধি করে সম্পূর্ণ নির্ভয় হই। তখন আমার সেই ভ্রম ঘুচে যায় যে আমি সংসারের অনিশ্চয়তার মধ্যে, মৃত্যুর আবর্তের মধ্যে ভ্রাম্যমান। তখন আত্মা অতি সহজেই জানে যে সে পরমাত্মার মধ্যে চিরসত্যে বিধৃত হয়ে আছে।

এই আমার সকলের চেয়ে সত্য আপনাটিকে নিজের ইচ্ছার জোরে আমাকে পেতে হবে— অসংখ্যের ভিড় ঠেলে টানাটানি কাটিয়ে এই আমার অত্যন্ত সহজ সমগ্রতাকে সহজ করে নিতে হবে। আমার ভিতরকার এই অখণ্ড সামঞ্জস্যটি কেবল জগতের নিয়মের দ্বারা ঘটবে না, আমার ইচ্ছার দ্বারা ঘটে উঠবে।

এইজন্যে মানুষের সামঞ্জস্য বিশ্বজগতের সামঞ্জস্যের মতো সহজ নয়। মানুষের চেতনা আছে, বেদনা আছে ব'লেই নিজের ভিতরকার সমস্ত বিরুদ্ধতাকে সে একেবারে গোড়া থেকেই অনুভব করে; বেদনার পীড়ায় সেইগুলোই তার কাছে অত্যন্ত বড়ো হয়ে ওঠে; নিজের ভিতরকার এই-সমস্ত বিরুদ্ধতার দুঃখ তার পক্ষে এত একান্ত যে এতেই তার চিত্ত প্রতিহত হয়— কোনো একটি বৃহৎ সত্যের মধ্যে তার এই-সকল বিরুদ্ধতার বৃহৎ সমাধান আছে, সমস্ত দুঃখবেদনার একটি আনন্দপরিণাম আছে, এটা সে সহজে দেখতে পায় না। আমরা একেবারে গোড়া থেকেই দেখতে পাচ্ছি যাতে আমার সুখ তাতেই আমার মঙ্গল নয়, যাকে আমি মঙ্গল বলে জানছি চার দিক

থেকে তার বাধা পাচ্ছি। আমার শরীর যা দাবি করে আমার মনের দাবি সকল সময় তার সঙ্গে মেলে না, আমি একলা যা দাবি করি আমার সমাজের দাবির সঙ্গে তার বিরোধ ঘটে, আমার বর্তমানের দাবি আমার ভবিষ্যতের দাবিকে অস্বীকার করতে চায়। অন্তরে বাহিরে এই-সমস্ত দুঃসহ বাধাবিরোধ ছিন্নবিচ্ছিন্নতা নিয়ে মানুষকে চলতে হচ্ছে। অন্তরে বাহিরে এই ঘোরতর অসামঞ্জস্যের দ্বারা আক্রান্ত হওয়াতেই মানুষ আপনার অন্তরতম ঐক্যশক্তিকে প্রাণপণে প্রার্থনা করছে। যাতে তার এই-সমস্ত বিক্ষিপ্ততাকে মিলিয়ে এক করে দেবে, সহজ করে দেবে, তার প্রতি সে আপনার বিশ্বাসকে ও লক্ষকে কেবলই স্থির রাখবার চেষ্টা করছে। মানুষ আপনার অন্তর-বাহিরের এই প্রভূত বিক্ষিপ্ততার মধ্যে বৃহৎ ঐক্যসাধনের চেষ্টা প্রতিদিনই করছে। সেই চেষ্টাই তার জ্ঞান বিজ্ঞান সমাজ সাহিত্য রাষ্ট্রনীতি। সেই চেষ্টাই তার ধর্মকর্ম পূজা-অর্চনা। সেই চেষ্টাই কেবল মানুষকে তার নিজের স্বভাব নিজের সত্য জানিয়ে দিচ্ছে। সেই চেষ্টা খানিকটা সফল হচ্ছে খানিকটা নিষ্ফল হচ্ছে, বার বার ভাঙছে বারবার গড়ছে— কিন্তু বারম্বার এই-সমস্ত ভাঙাগড়ার মধ্যে মানুষ আপনার এই স্বাভাবিক ঐক্যচেষ্টার দ্বারাতেই আপনার ভিতরকার সেই এককে ক্রমশ সুস্পষ্ট করে দেখছে এবং সেই সঙ্গে বিশ্বব্যাপারেও সেই মহৎ এক তার কাছে স্পষ্টতর হয়ে উঠছে। সেই এক যতই স্পষ্ট হচ্ছে ততই মানুষ স্বভাবতই জ্ঞানে প্রেমে ও কর্মে ক্ষুদ্র বিচ্ছিন্নতা পরিহার করে ভূমাকে আশ্রয় করছে।

তাই বলছিলুম, ঘুরে ফিরে মানুষ যা-কিছু করছে— কখনো বা ভুল করে কখনো বা ভুল ভেঙে— সমস্তর মূলে আছে এই আত্মবোধের সাধনা। সে যাকেই চাক-না সত্য করে চাচ্ছে এই আপনাকে, জেনে চাচ্ছে, না জেনে চাচ্ছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্তকে বিরাট ভাবে একটি জায়গায় মিলিয়ে জড়িয়ে নিয়ে মানুষ আত্মার একটি অখণ্ড উপলব্ধিকে পেতে চাচ্ছে। সে এক রকম করে বুঝতে পারছে কোনোখানেই বিরোধ সত্য নয়, বিচ্ছিন্নতা সত্য নয়, নিরন্তর অবিরোধের মধ্যে মিলে উঠে একটি বিশ্বসংগীতকে প্রকাশ করবার জন্যেই বিরোধের সার্থকতা— সেই সংগীতেই পরিপূর্ণ আনন্দ। নিজের ইতিহাসে মানুষ সেই তানটাকেই কেবল সাধছে, সুরের যতই স্খলন হোক তবু কিছুতেই নিরস্ত হচ্ছে না। উপনিষদের বাণীর দ্বারা সে কেবলই বলছে : তমেবৈকং জানীথ আত্মানম্‌। সেই এককে জানো, সেই আত্মাকে। অমৃতস্যৈষ সেতুঃ। ইহাই অমৃতের সেতু।

আপনার মধ্যে এই এককে পেয়ে মানুষ যখন ধীর হয়, যখন তার প্রবৃত্তি শান্ত

হয়, সংযত হয়, তখন তার বুঝতে বাকি থাকে না এই তার এক কাকে খুঁজছে। তার প্রবৃত্তি খুঁজে মরে নানা বিষয়কে— কেননা, নানা বিষয়কে নিয়েই সে বাঁচে, নানা বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত হওয়াই তার সার্থকতা। কিন্তু, যেটি হচ্ছে মানুষের এক, মানুষের আপ্‌নি, সে স্বভাবতই একটি অসীম এককে, একটি অসীম আপ্‌নিকে খুঁজছে— আপনার ঐক্যের মধ্যে অসীম ঐক্যকে অনুভব করলে তবেই তার সুখের স্পৃহা শান্তি লাভ করে। তাই উপনিষৎ বলেন— 'একং রূপং বহুধা যঃ করোতি' যিনি একরূপকে বিশ্বজগতে বহুধা করে প্রকাশ করেছেন, 'তম্ আত্মস্থং যে অনুপশ্যন্তি ধীরাঃ' তাঁকে যে ধীরেরা আত্মস্থ করে দেখেন, অর্থাৎ যাঁরা তাঁকে আপনার একের মধ্যে এক করে দেখেন, 'তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্' তাঁদেরই সুখ নিত্য, আর-কারও না।

আত্মার সঙ্গে এই পরমাত্মাকে দেখা এ অত্যন্ত একটি সহজ দৃষ্টি, এ একেবারেই যুক্তিতর্কের দৃষ্টি নয়। এ হচ্ছে 'দিবীব চক্ষুরাততং'। চক্ষু যেমন একেবারে সহজেই আকাশে বিস্তীর্ণ পদার্থকে দেখতে পায় এ সেই রকম দেখা। আমাদের চক্ষুর স্বভাবই হচ্ছে সে কোনো জিনিসকে ভেঙে ভেঙে দেখে না, একেবারে সমগ্র করে দেখে। সে স্পেক্‌ট্রস্কোপ যন্ত্র দিয়ে দেখার মতো করে দেখে না, সে আপনার মধ্যে সমস্তকে বেঁধে নিয়ে আপন করে দেখতে জানে। আমাদের আত্মবোধের দৃষ্টি যখন খুলে যায় তখন সেও তেমনি অত্যন্ত সহজেই আপনাকে এক ক'রে এবং পরম একের সঙ্গে আনন্দে সম্মিলিত করে দেখতে পায়। সেই রকম করে সমগ্র করে দেখাই তার সহজ ধর্ম। তিনি যে পরম আত্মা, আমাদের পরম আপ্‌নি। সেই পরম আপ্‌নিকে যদি আপন করেই না জানা যায়, তা হলে আর যেমন করেই জানা যাক্ তাঁকে জানাই হল না। জ্ঞানে জানাকে আপন করে জানা বলে না, ঠিক উল্টো— জ্ঞান সহজেই তফাৎ করে জানে, আপন করে জানবার শক্তি তার হাতে নেই।

উপনিষৎ বলছেন— 'এষ দেবো বিশ্বকর্মা' এই দেবতা বিশ্বকর্মা, বিশ্বের অসংখ্য কর্মে আপনাকে অসংখ্য আকারে ব্যক্ত করছেন, কিন্তু তিনিই 'মহাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ' মহান্ আপন-রূপে পরম এক-রূপে সর্বদাই মানুষের হৃদয়ের মধ্যে সন্নিবিষ্ট আছেন। 'হৃদা মনীষা মনসাভিক্লৃপ্তো য এতৎ' সেই হৃদয়ের যে জ্ঞান, যে জ্ঞান একেবারে সংশয়রহিত অব্যবহিত জ্ঞান, সেই জ্ঞানে যাঁরা এঁকে পেয়ে থাকেন 'অমৃতাস্তে ভবন্তি', তাঁরাই অমৃত হন।

আমাদের চোখ যেমন একেবারে দেখে আমাদের হৃদয় তেমনি স্বভাবত একেবারে অনুভব করে— মধুরকে তার মিষ্ট লাগে, রুদ্রকে তার ভীষণ বোধ হয়, সেই বোধের

জন্যে তাকে কিছুই চিন্তা করতে হয় না। সেই আমাদের হৃদয় যখন তার স্বাভাবিক সংশয়রহিত বোধশক্তির দ্বারাই পরম এককে বিশ্বের মধ্যে এবং আপনার মধ্যে প্রত্যক্ষ অনুভব করে তখন মানুষ চিরকালের জন্যে বেঁচে যায়। জোড়া দিয়ে দিয়ে অনন্ত কালেও আমরা এককে পেতে পারি নে, হৃদয়ের সহজ বোধে এক মুহূর্তেই তাঁকে একান্ত আপন করে পাওয়া যায়। তাই উপনিষৎ বলেছেন তিনি আমাদের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট, তাই একেবারেই রসরূপে আনন্দরূপে তাঁকে অব্যবহিত করে পাই, আর-কিছুতে পাবার জো নেই—

যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন।

বাক্যমন যাঁকে না পেয়ে ফিরে আসে সেই ব্রহ্মের আনন্দকে হৃদয় যখন বোধ করে তখন আর কিছুতেই ভয় থাকে না।

এই সহজ বোধটি হচ্ছে প্রকাশ— এ জানা নয়, সংগ্রহ করা নয়, জোড়া দেওয়া নয়, আলো যেমন একেবারে প্রকাশ হয় এ তেমনি প্রকাশ। প্রভাত যখন হয়েছে তখন আলোর খোঁজে হাটে বাজারে ছুটতে হবে না, জ্ঞানীর দ্বারে ঘা মারতে হবে না— যা-কিছু বাধা আছে সেইগুলো কেবল মোচন করতে হবে— দরজা খুলে দিতে হবে, তা হলেই আলো একেবারে অখণ্ড হয়ে প্রকাশ পাবে।

সেই জন্যেই এই প্রার্থনাই মানুষের গভীরতম প্রার্থনা : আবিরাবীর্ম এধি। হে আবিঃ, হে প্রকাশ, তুমি আমার মধ্যে প্রকাশিত হও। মানুষের যা দুঃখ সে অপ্রকাশের দুঃখ— যিনি প্রকাশস্বরূপ তিনি এখনও তার মধ্যে ব্যক্ত হচ্ছেন না; তার হৃদয়ের উপর অনেকগুলো আবরণ রয়ে গেছে; এখনও তার মধ্যে বাধা-বিরোধের সীমা নেই; এখনও সে আপনার প্রকৃতির নানা অংশের মধ্যে পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য স্থাপন করতে পারছে না; এখনও তার এক ভাগ অন্য ভাগের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছে, তার স্বার্থের সঙ্গে পরমার্থের মিল হচ্ছে না, এই উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে যিনি আবিঃ তাঁর আবির্ভাব পরিস্ফুট হয়ে উঠছে না; ভয় দুঃখ শোক অবসাদ অকৃতার্থতা এসে পড়ছে— যা গিয়েছে তার জন্যে বেদনা যা আসবে তার জন্য ভাবনা চিত্তকে মথিত করছে, আপনার অন্তর বাহির সমস্তকে নিয়ে জীবন প্রসন্ন হয়ে উঠছে না। এই জন্যেই মানুষের প্রার্থনা : রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্। হে রুদ্র, তোমার প্রসন্ন মুখের দ্বারা আমাকে নিয়ত রক্ষা করো। যেখানে সেই আবিঃ’র আবির্ভাব সম্পূর্ণ নয় সেখানে প্রসন্নতা নেই; যে দেশে সেই আবিঃ’র আবির্ভাব বাধাগ্রস্ত সেই দেশ থেকে প্রসন্নতা চলে গেছে; যে গৃহে তাঁর আবির্ভাব প্রতিহত সেখানে ধনধান্য

থাকলেও শ্রী নেই ; যে চিত্তে তাঁর প্রকাশ সমাচ্ছন্ন সে চিত্ত দীপ্তিহীন, প্রতিষ্ঠাহীন, সে কেবল স্রোতের শৈবালের মতো ভেসে বেড়াচ্ছে। এই জন্যে যে-কোনো প্রার্থনা নিয়েই মানুষ ঘুরে বেড়াক-না কেন তার আসল প্রার্থনাটি হচ্ছে : আবিরাবীর্ম এধি। হে প্রকাশ, আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ সম্পূর্ণ হোক। এই জন্যে মানুষের সকল কান্নার মধ্যে বড়ো কান্না পাপের কান্না। সে যে আপনার সমস্তটাকে নিয়ে সেই পরম একের সুরে মেলাতে পারছে না, সেই অমিলের বেসুর সেই পাপ তাকে আঘাত করছে। মানুষের নানা ভাগ নানা দিকে যখন বিক্ষিপ্ত হয়ে যাচ্ছে, তার একটা অংশ যখন তার অন্য সকল অংশকে ছাড়িয়ে গিয়ে উৎপাতের আকার ধারণ করছে, তখন সে নিজেকে সেই পরম একের শাসনে বিধৃত দেখতে পাচ্ছে না, তখন সেই বিচ্ছিন্নতার বেদনায় কেঁদে উঠে সে বলছে : মা মা হিংসীঃ। আমাকে আর আঘাত কোরো না, আঘাত কোরো না। বিশ্বানি দেব সবিতর্দুরিতানি পরাসুব। আমার সমস্ত পাপ দূর করো, তোমার সঙ্গে আমার সমগ্রকে মিলিয়ে দাও, তা হলেই আমার আপনার মধ্যে আমার মিল হবে, সকলের মধ্যে আমার মিল হবে, আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ পরিপূর্ণ হবে, জীবনের মধ্যে সমস্ত রুদ্রতা প্রসন্নতায় দীপ্যমান হয়ে উঠবে।

মানুষের নানা জাতি আজ নানা অবস্থার মধ্যে আছে, তাদের জ্ঞানবুদ্ধির বিকাশ এক রকমের নয়। তাদের ইতিহাস বিচিত্র, তাদের সভ্যতা ভিন্ন রকমের। কিন্তু, যে জাতি যেরকম পরিণতিই পাক-না কেন, সকলেই কোনো-না-কোনো আকারে আপনার চেয়ে বড়ো আপনাকে চাচ্ছে। এমন একটি বড়ো যা তার সমস্তকে আপনার মধ্যে অধিকার করে সমস্তকে বাঁধবে, জীবনকে অর্থদান করবে। যা সে পেয়েছে, যা তার প্রতিদিনের, যা নিয়ে তাকে ঘরকন্না করতে হচ্ছে, যা তার কেনা-বেচার সামগ্রী তা নিয়ে তো তাকে থাকতেই হয়। সেই সঙ্গে, যা তার সমস্তের অতীত, যা তার দেখাশোনা খাওয়াপরার চেয়ে বেশি, যা নিজেকে অতিক্রম করবার দিকে তাকে টানে, যা তাকে দুঃসাধ্যের দিকে আহ্বান করে, যা তাকে ত্যাগ করতে বলে, যা তার পূজা গ্রহণ করে, মানুষ তাকেই আপনার মধ্যে উপলব্ধি করতে চাচ্ছে। তাকেই আপনার সমস্ত সুখ-দুঃখের চেয়ে বড়ো বলে স্বীকার করছে। কেননা, মানুষ জানছে মনুষ্যত্বের প্রকাশ সেই দিকেই ; তার প্রতিদিনের খাওয়া-পরা আরাম-বিরামের দিকে নয়। সেই দিকেই চেয়ে মানুষ দু হাত তুলে বলছে : আবিরাবীর্ম এধি। হে প্রকাশ, তুমি আমার মধ্যে প্রকাশিত হও। সেই দিকে চেয়েই মানুষ বুঝতে পারছে যে, তার মনুষ্যত্ব তার প্রতিদিনের তুচ্ছতার মধ্যে আচ্ছন্ন হয়ে আছে, তার প্রবৃত্তির আকর্ষণে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে, তাকে মুক্ত করতে হবে ; তাকে যুক্ত করতে হবে। সেই দিকে চেয়েই মানুষ

এক দিকে আপনার দীনতা আর-এক দিকে আপনার সুমহৎ অধিকারকে প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছে এবং সেই দিকে চেয়েই মানুষের কণ্ঠ চিরদিন নানা ভাষায় ধ্বনিত হয়ে উঠছে : আবিরাবীর্ম এধি। হে প্রকাশ, তুমি আমার মধ্যে প্রকাশিত হও। প্রকাশ চায়, মানুষ প্রকাশ চায়; ভূমাকে আপনার মধ্যে দেখতে চায়; তার পরম আপনাকে আপনার মধ্যে পেতে চায়। এই প্রকাশ তার আহার-বিহারের চেয়ে বেশি, তার প্রাণের চেয়ে বেশি। এই প্রকাশই তার প্রাণের প্রাণ, তার মনের মন। এই প্রকাশই তার সমস্ত অস্তিত্বের পরমার্থ।

মানুষের জীবনে এই ভূমার উপলব্ধিকে পূর্ণতর করবার জন্যেই পৃথিবীতে মহাপুরুষদের আবির্ভাব। মানুষের মধ্যে ভূমার প্রকাশ যে কী সেটা তাঁরাই প্রকাশ করতে আসেন। এই প্রকাশ সর্বাঙ্গীণ রূপে কোনো ভক্তের মধ্যে ব্যক্ত হয়েছে এমন কথা বলতে পারি নে। কিন্তু, মানুষের মধ্যে এই প্রকাশকে উত্তরোত্তর পরিপূর্ণ করে তোলাই তাঁদের কাজ। অসীমের মধ্যে সকল দিক দিয়ে মানুষের আত্মোপলব্ধিকে তাঁরা অখণ্ড করে তোলবার পথ কেবলই সুগম করে দিচ্ছেন, সমস্ত গানটাকে তার সমস্ত তালে লয়ে জাগাতে না পারলেও তাঁরা মূল সুরটিকে কেবলই বিশুদ্ধ করে তুলছেন— সেই সুরটি তাঁরা ধরিয়ে দিচ্ছেন।

যিনি ভক্ত তিনি অসীমকে মানুষের মধ্যে ধরে মানুষের আপন সামগ্রী করে তোলেন। আমরা আকাশে সমুদ্রে পর্বতে জ্যোতিষ্কলোকে, বিশ্বব্যাপী অমোঘ নিয়মতন্ত্রের মধ্যে, অসীমকে দেখি; কিন্তু সেখানে আমরা অসীমকে আমার সমস্ত দিয়ে দেখতে পাই নে। মানুষের মধ্যে যখন অসীমের প্রকাশ দেখি তখন আমরা অসীমকে আমার সকল দিক দিয়েই দেখি এবং যে দেখা সকলের চেয়ে অন্তরতম সেই দেখা দিয়ে দেখি। সেই দেখা হচ্ছে ইচ্ছার মধ্যে ইচ্ছাকে দেখতে পাওয়া। জগতের নিয়মের মধ্যে আমরা শক্তিকে দেখতে পাই; কিন্তু ইচ্ছাশক্তিকে দেখতে গেলে ইচ্ছার মধ্যে ছাড়া আর কোথায় দেখব? ভক্তের ইচ্ছা যখন ভগবানের ইচ্ছাকে জ্ঞানে প্রেমে কর্মে প্রকাশ করতে থাকে তখন যে অপরূপ পদার্থ দেখি জগতে সে আর কোথায় দেখতে পাব? অগ্নি জল বায়ু সূর্য তারা যত উজ্জ্বল যত প্রবল যত বৃহৎ হোক এই প্রকাশকে সে তো দেখাতে পারে না। তারা শক্তিকে দেখায়, কিন্তু শক্তিকে দেখানোর মধ্যে একটা বন্ধন একটা পরাভব আছে। তারা নিয়মকে রেখামাত্র লঙ্ঘন করতে পারে না। তারা যা তাদের তাই হওয়া ছাড়া আর উপায় নেই, কেননা তাদের লেশমাত্র ইচ্ছা নেই। এমনতরো জড়যন্ত্রের মধ্যে ইচ্ছার আনন্দ পূর্ণভাবে প্রকাশ হতে পারে না।

মানুষের মধ্যে ঈশ্বর এই ইচ্ছার জায়গাটাতে আপনার সর্বশক্তিমত্তাকে সংহরণ করেছেন— এইখানে তাঁর থেকে তাকে কিছু পরিমাণ স্বতন্ত্র করে দিয়েছেন ; সেই স্বাতন্ত্র্যে তিনি তাঁর শক্তি প্রয়োগ করেন না। কেননা, সেই স্বাধীনতার ক্ষেত্রটুকুতে দাসের সঙ্গে প্রভুর সম্বন্ধ নয়, সেখানে প্রিয়ের সঙ্গে প্রিয়ের মিলন। সেইখানেই সকলের চেয়ে বড়ো প্রকাশ— ইচ্ছার প্রকাশ, প্রেমের প্রকাশ। সেখানে আমরা তাঁকে মানতেও পারি, না মানতেও পারি ; সেখানে আমরা তাঁকে আঘাত দিতে পারি। সেখানে আমরা ইচ্ছাপূর্বক তাঁর ইচ্ছাকে গ্রহণ করব, প্রীতির দ্বারা তাঁর প্রেমকে স্বীকার করব— সেই একটি মস্ত অপেক্ষা একটি মস্ত ফাঁক রয়ে গেছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে কেবলমাত্র এই ফাঁকটুকুতেই সর্বশক্তিমানের সিংহাসন পড়ে নি। কেননা, এইখানে প্রেমের আসন পাতা হবে।

এই যেখানে ফাঁক রয়ে গেছে এইখানেই যত অসত্য অন্যায় পাপ মলিনতার অবকাশ ঘটেছে ; কেননা, এইখান থেকেই তিনি ইচ্ছা করেই একটু সরে গিয়েছেন। এইখানে মানুষ এতদূর পর্যন্ত বীভৎস হয়ে উঠতে পারে যে আমরা সংশয়ে পীড়িত হয়ে বলে উঠি জগদীশ্বর যদি থাকতেন তবে এমনটি ঘটতে পারত না ; বস্তুত সে জায়গায় জগদীশ্বর আচ্ছন্নই আছেন, সে জায়গা তিনি মানুষেকেই ছেড়ে দিয়েছেন। সেখান থেকে তাঁর নিয়ম একেবারে চলে গেছে তা নয় ; কিন্তু মা যেমন শিশুকে স্বাধীনভাবে চলতে শেখাবার সময় তার কাছে থাকেন অথচ তাকে ধরে থাকেন না, তাকে খানিকটা পরিমাণে পড়ে যেতে এবং আঘাত পেতে অবকাশ দেন, এও সেই রকম। মানুষের ইচ্ছার ক্ষেত্রটুকুতে তিনি আছেন, অথচ নেই। এইজন্য সেই জায়গাটাতে আমরা এত আঘাত করছি, আঘাত পাচ্ছি, ধুলায় আমাদের সর্বাঙ্গ মলিন হয়ে উঠছে, সেখানে আমাদের দ্বিধাদ্বন্দ্বের আর অন্ত নেই, সেইখানেই আমাদের যত পাপ। সেইখান থেকেই মানুষের এই প্রার্থনা ধ্বনিত হয়ে উঠছে : আবিরাবীর্ম এধি। হে প্রকাশ, আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ পরিপূর্ণ হয়ে উঠুক। বৈদিক ঋষির ভাষার এই প্রার্থনাটাই এই বাংলাদেশে পথ চলতে চলতে শোনা যায় এমন গানে যে গান সাহিত্যে স্থান পায় নি, এমন লোকের কণ্ঠে যার কোনো অক্ষরবোধ হয় নি। সেই বাংলাদেশের নিতান্ত সরলচিত্তের সরল সুরের সারি গান : মাঝি, তোর বইঠা নে রে, আমি আর বাইতে পারলাম না! তোমার হাল তুমি ধরো, এই তোমার জায়গায় তুমি এসো, আমার ইচ্ছা নিয়ে আমি আর পেরে উঠলুম না। আমার মধ্যে যে বিচ্ছেদটুকু আছে সেখানে তুমি আমাকে একলা বসিয়ে রেখো না। হে প্রকাশ, সেখানে তোমার প্রকাশ পরিপূর্ণ হয়ে উঠুক

এত বাধা বিরোধ, এত অসত্য, এত জড়তা, এত পাপ কাটিয়ে উঠে তবে ভক্তের মধ্যে ভগবানের প্রকাশ সম্পূর্ণ হয়। জড়জগতে তাঁর প্রকাশের যে বাধা নেই তা নয়; কারণ, বাধা না হলে প্রকাশ হতেই পারে না। জড়জগতে তাঁর নিয়মই তাঁর শক্তিকে বাধা দিয়ে তাকে প্রকাশ করে তুলছে; এই নিয়মকে তিনি স্বীকার করেছেন। আমাদের চিত্তজগতে যেখানে তাঁর প্রেমের মিলনকে তিনি প্রকাশ করবেন সেখানে সেই প্রকাশের বাধাকে তিনি স্বীকার করেছেন, সে হচ্ছে আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা। এই বাধার ভিতর দিয়ে যখন প্রকাশ সম্পূর্ণ হয়— যখন ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছা, প্রেমের সঙ্গে প্রেম, আনন্দের সঙ্গে আনন্দ মিলে যায়, তখন ভক্তের মধ্যে ভগবানের এমন একটি আবির্ভাব হয় যা আর কোথাও হতে পারে না।

এইজন্যই আমাদের দেশে ভক্তের গৌরব এমন করে কীর্তন করেছে যা অন্য দেশে উচ্চারণ করতে লোকে সংকোচ বোধ করে। যিনি আনন্দময়, আপনাকে যিনি প্রকাশ করেন, সেই প্রকাশে যাঁর আনন্দ, তিনি তাঁর সেই আনন্দকে বিশুদ্ধ আনন্দরূপে প্রকাশ করেন ভক্তের জীবনে। এই প্রকাশের জন্যে তাঁকে ভক্তের ইচ্ছার অপেক্ষা করতে হয়; এখানে জোর খাটে না। রাজার পেয়াদা প্রেমের রাজ্যে পা বাড়াতে পারে না। প্রেম ছাড়া প্রেমের গতি নেই। এইজন্যে ভক্ত যে দিন আপনার অহংকারকে বিসর্জন দেয়, ইচ্ছা করে আপনার ইচ্ছাকে তাঁর ইচ্ছার সঙ্গে মিলিয়ে দেয়, সেই দিন মানুষের মধ্যে তাঁর আনন্দের প্রকাশ সম্পূর্ণ হয়। সেই প্রকাশ তিনি চাচ্ছেন। সেইজন্যই মানুষের হৃদয়ের দ্বারে নিত্য নিত্যই তাঁর সৌন্দর্যের লিপি এসে পৌঁচচ্ছে, তাঁর রসের আঘাত কত রকম করে আমাদের চিত্তে এসে পড়ছে— এবং ঘুম থেকে আমাদের সমস্ত প্রকৃতিকে জাগিয়ে তোলবার জন্যে বিপদ মৃত্যু দুঃখ শোক ক্ষণে ক্ষণে নাড়া দিয়ে যাচ্ছে। সেই প্রকাশ তিনি চাচ্ছেন, সেইজন্যেই আমাদের চিত্তও সকল বিস্মৃতি সকল অসাড়তার মধ্যেও গভীরতর ভাবে সেই প্রকাশকে চাচ্ছে। বলছে: আবিরাবীর্ম এধি।

আমাদের দেশের ভক্তিশাস্ত্রের এই স্পর্ধার কথা, অর্থাৎ অনন্তের ইচ্ছা আমাদের ইচ্ছার দ্বারে এসে দাঁড়িয়েছে এই কথা, আজকাল অন্য দেশের অন্য ভাষাতেও আভাস দিচ্ছে। সেদিন একজন ইংরেজ ভক্ত কবির কবিতায় এই কথাই দেখলুম। তিনি ভগবানকে ডেকে বলছেন—

Thou hast need of thy meanest creature;
thou hast need of what once was thine:
The thirst that consumes my spirit
is the thirst of thy heart for mine.

তিনি বলছেন, তোমার দীনতম জীবটিকেও তোমার প্রয়োজন আছে ; সে যে একদিন তোমাতেই ছিল, আবার তুমি তাকে তোমারই করে নিতে চাও ; আমার চিত্তকে যে তৃষায় দগ্ধ করছে সে যে তোমারই তৃষা, আমার জন্যে তোমার হৃদয়ের তৃষা।

পশ্চিম হিন্দুস্থানের পুরাকালের এক সাধক কবি, তাঁর নাম জ্ঞানদাস বঘেলি— তিনিও ঠিক এই কথাই বলেছেন। আমার এক বন্ধু তার বাংলা অনুবাদ করেছেন—

অসীম ক্ষুধায় অসীম তৃষায়
বহু প্রভু অসীম ভাষায়,
তাই দীননাথ, আমি ক্ষুধিত্ আমি তৃষিত্
তাই তো আমি দীন।

আমার জন্যে তাঁরই যে তৃষা তা'ই তাঁর জন্যে আমার তৃষার মধ্যে প্রকাশ পাচ্ছে। তাঁর অসীম তৃষাকে তিনি অসীম ভাষায় প্রকাশ করছেন। সেই ভাষাই তো উষার আলোকে, নিশীথের নক্ষত্রে, বসন্তের সৌরভে, শরতের স্বর্ণকিরণে। জগতে এই ভাষার তো আর কোনোই কাজ নেই, সে তো কেবলই হৃদয়ের প্রতি হৃদয়মহাসমুদ্রের ডাক। সে কবি বলরাম দাসের ভাষায় বলছে : তোমায় হিয়ার ভিতর হৈতে কে কৈল বাহির ! তুমি আমার হৃদয়ের ভিতরেই ছিলে, কিন্তু বিচ্ছেদ হয়েছে ; সেই বিচ্ছেদ মিটিয়ে আবার ফিরে এসো, সমস্ত দুঃখের পথটা মাড়িয়ে আবার আমাতে ফিরে এসো, হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়ের মিলন সম্পূর্ণ হোক।— এই একটি বিরহবেদনা অনন্তের মধ্যে রয়েছে, সেই জন্যেই আমার মধ্যেও আছে।

I have come from thee, why I know not ;
but thou art, O God ! what thou art ;
And the round of eternal being is
the pulse of thy beating heart.

আমি তোমার মধ্য থেকে এসেছি কেন যে তা জানি নে, কিন্তু হে ঈশ্বর, তুমি যেমন তেমনিই আছ ; এই-যে একবার তোমা থেকে বেরিয়ে আবার যুগযুগান্তের মধ্য দিয়ে তোমাতেই ফিরে আসা এই হচ্ছে তোমার অসীম হৃদয়ের এক-একটি হৃৎস্পন্দন।

অনন্তের মধ্যে এই-যে বিরহবেদনা সমস্ত বিশ্বকাব্যকে রচনা করে তুলছে, কবি জ্ঞানদাস তাঁর ভগবানকে বলছেন, এই বেদনা তোমাতে আমাতে ভাগ করে ভোগ

করব; এ বেদনা যেমন তোমার তেমনি আমার। তাই কবি বলছেন, আমি যে দুঃখ পাচ্ছি তাতে তুমি লজ্জা কোরো না প্রভু।—

প্রেমের পত্নী তোমার আমি,
আমার কাছে লাজ কী স্বামী!
তোমার সকল ব্যথার ব্যথী আমায়
করো নিশিদিন।
নিদ্রা নাহি চক্ষে তব,
আমিই কেন ঘুমিয়ে রব!
বিশ্ব তোমার বিরাট গেহ,
আমিও বিশ্বে লীন।

ভোগের সুখ তো আমি চাই নে— যারা দাসী তাদের সেই সুখের বেতন দিয়ো। আমি যে তোমার পত্নী; আমি তোমার বিশ্বের সমস্ত দুঃখের ভার তোমার সঙ্গে বহন করব। সেই দুঃখের ভিতর দিয়েই সেই দুঃখকে উত্তীর্ণ হব। আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ অখণ্ড মিলনে সম্পূর্ণ হবে। সেই জন্যেই, আমি বলছি নে আমাকে সুখ দাও, আমি বলছি: আবিরাবীর্ম এধি। হে প্রকাশ, আমার মধ্যে তুমি প্রকাশিত হও।

আমি তোমার ধর্মপত্নী,
ভোগের দাসী নহি।
আমার কাছে লাজ কি স্বামী,
নিষ্কপটে কহি—
আমায় প্রভু, দেখাইয়ো না
সুখের প্রলোভন,
তোমার সাথে দুঃখ বহি
সেই তো পরম ধন।
ভোগের দাসী তোমার নহি,
তাই তো ভুলাও নাকো,
মিথ্যা সুখে মিথ্যা মানে
দূরে ফেলাও নাকো।
পতিব্রতা সতী আমি,
তাই তো তোমার ঘরে

হে ভিখারি, সব দারিদ্র্য
আমার সেবা করে।
সুখের ভৃত্য নই তব, তাই
পাই না সুখের দান—
আমি তোমার প্রেমের পত্নী
এই তো আমার মান।

মানুষ যখন প্রকাশের সম্পূর্ণতাকে চাবার জন্যে সচেতন হয়ে জাগ্রত হয়ে ওঠে তখন সে সুখকে সুখই বলে না। তখন সে বলে : যো বৈ ভূমা তৎ সুখং। যা ভূমা তাই সুখ। আপনার মধ্যে যখন সে ভূমাকে চায় তখন আর আরামকে চাইলে চলবে না, স্বার্থকে চাইলে চলবে না, তখন আর কোণে লুকোবার জো নেই, তখন কেবল আপনার হৃদয়োচ্ছ্বাস নিয়ে আপনার আঙিনায় কেঁদে লুটিয়ে বেড়াবার দিন আর থাকে না। তখন নিজের চোখের জল মুছে ফেলে বিশ্বের দুঃখের ভার কাঁধে তুলে নেবার জন্যে প্রস্তুত হতে হবে। তখন কর্মের আর অন্ত নেই, ত্যাগের আর সীমা নেই। তখন ভক্ত বিশ্ববোধের মধ্যে, বিশ্বপ্রেমের মধ্যে, বিশ্বসেবার মধ্যে আপনাকে ভূমার প্রকাশে প্রকাশিত করতে থাকে।

ভক্তের জীবনের মধ্যে যখন সেই প্রকাশকে আমরা দেখি তখন কী দেখি? দেখি, সে তর্কবিতর্ক নয়, সে তত্ত্বজ্ঞানের টীকাভাষ্য বাদপ্রতিবাদ নয়, সে বিজ্ঞান নয়, দর্শন নয়— সে একটি একের সম্পূর্ণতা, অখণ্ডতার পরিব্যক্তি। যেমন জগৎকে প্রত্যক্ষ অনুভব করবার জন্যে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাশালায় যাবার দরকার হয় না, সেও তেমনি। ভক্তের সমস্ত জীবনটিকে এক করে মিলিয়ে নিয়ে অসীম সেখানে একেবারে সহজরূপে দেখা দেন। তখন ভক্তের জীবনের সমস্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে আর বিরুদ্ধতা দেখতে পাই নে। তার আগাগোড়াই সেই একের মধ্যে সুন্দর হয়ে, মহৎ হয়ে, শক্তিশালী হয়ে মেলে। জ্ঞান মেলে, ভক্তি মেলে, কর্ম মেলে। বাহির মেলে, অন্তর মেলে। কেবল যে সুখ মেলে তা নয়, দুঃখও মেলে। কেবল যে জীবন মেলে তা নয়, মৃত্যুও মেলে। কেবল যে বন্ধু মেলে তা নয়, শত্রুও মেলে। সমস্তই আনন্দে মিলে যায়, রাগিণীতে মিলে ওঠে। তখন জীবনের সমস্ত সুখদুঃখ বিপদ্‌সম্পদের পরিপূর্ণ সার্থকতা সুডোল হয়ে, নিটোল অবিচ্ছিন্ন হয়ে প্রকাশমান হয়। সেই প্রকাশেরই অনির্বচনীয় রূপ হচ্ছে প্রেমের রূপ। সেই প্রেমের রূপে সুখ এবং দুঃখ দুই'ই সুন্দর, ত্যাগ এবং ভোগ দুই'ই পবিত্র, ক্ষতি এবং লাভ দুই'ই সার্থক; এই প্রেমে সমস্ত বিরোধের আঘাত, বীণার তারে অঙ্গুলির আঘাতের মতো, মধুর সুরে বাজতে

থাকে। এই প্রেমের মৃদুতাও যেমন সুকুমার বীরত্বও তেমনি সুকঠিন। এই প্রেম দূরকে এবং নিকটকে, আত্মীয়কে এবং পরকে, জীবনসমুদ্রের এ পারকে এবং ও পারকে প্রবল মাধুর্যে এক করে দিয়ে, দিগ্‌দিগন্তরের ব্যবধানকে আপন বিপুল সুন্দর হাস্যের ছটায় পরাহত করে দিয়ে, উষার মতো উদিত হয়। অসীম তখন মানুষের নিতান্ত আপনার সামগ্রী হয়ে দেখা দেন পিতা হয়ে, বন্ধু হয়ে, স্বামী হয়ে, তার সুখদুঃখের ভাগী হয়ে, তার মনের মানুষ হয়ে। তখন অসীমে সসীমে যে প্রভেদ সেই প্রভেদ কেবলই অমৃতে ভরে ভরে উঠতে থাকে, সেই ফাঁকটুকুর ভিতর দিয়ে মিলনের পারিজাত আপনার পাপড়ি একটির পর একটি করে বিকশিত করতে থাকে। তখন জগতের সকল প্রকাশ, সকল আকাশের সকল তারা, সকল ঋতুর সকল ফুল, সেই প্রকাশের উৎসবে বাঁশি বাজাবার জন্যে ছুটে আসে। তখন হে রুদ্র, হে চিরদিনের পরম দুঃখ, হে চিরজীবনের বিচ্ছেদবেদনা, তোমার এ কী মূর্তি! এ কী দক্ষিণং মুখম্! তখন, তুমি নিত্য পরিত্রাণ করছ, সসীমতার নিত্য দুঃখ হতে নিত্য বিচ্ছেদ হতে তুমি নিত্যই পরিত্রাণ করে চলেছ— এই গূঢ় কথা আর গোপন থাকে না। তখন ভক্তের উদ্‌ঘাটিত হৃদয়ের ভিতর দিয়ে মানবলোকে তোমার সিংহদ্বার খুলে যায়। ছুটে আসে সমস্ত বালক বৃদ্ধ; যারা মূঢ় তারাও বাধা পায় না, যারা পতিত তারাও নিমন্ত্রণ পায়। লোকাচারের কৃত্রিম শাস্ত্রবিধি টলমল করতে থাকে এবং শ্রেণীভেদের নিষ্ঠুর পাষাণপ্রাচীর করুণায় বিগলিত হয়ে পড়ে। তোমার বিশ্বজগৎ আকাশে এই কথাটা বলে বেড়াচ্ছে যে 'আমি তোমার'। এই কথা বলে সে নতশিরে তোমার নিয়ম পালন করে চলছে। মানুষ তার চেয়ে ঢের বড়ো কথা বলবার জন্য অনন্ত আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। সে বলতে চায় 'তুমি আমার'। কেবল তোমার মধ্যে আমার স্থান তা নয়, আমার মধ্যেও তোমার স্থান। তুমি আমার প্রেমিক, আমি তোমার প্রেমিক। আমার ইচ্ছায় আমি তোমার ইচ্ছাকে স্থান দেব, আমার আনন্দে আমি তোমার আনন্দকে গ্রহণ করব— এই জন্যেই আমার এত দুঃখ, এত বেদনা, এত আয়োজন। এ দুঃখ তোমার জগতে আর-কারও নেই। নিজের অন্তর-বাহিরের সঙ্গে দিনরাত্রি লড়াই করতে করতে এ কথা আর-কেউ বলছে না 'আবিরাবীর্ম এধি'। তোমার বিচ্ছেদ-বেদনা বহন করে জগতে আর-কেউ এমন করে কাঁদছে না যে 'মা মা হিংসীঃ'। তোমার পশুপক্ষীরা বলছে, আমার ক্ষুধা দূর করো, আমার শীত দূর করো, আমার তাপ দূর করো। আমরাই বলছি : বিশ্বানি দেব সবিতর্দুরিতানি পরাসুব। আমার সমস্ত পাপ দূর করো। কেন বলছি। নইলে, হে প্রকাশ, আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ হয় না। সেই মিলন না হওয়ার যে দুঃখ সে দুঃখ কেবল আমার নয়, সে দুঃখ অনন্তের

মধ্যে ব্যাপ্ত হয়ে আছে। এইজন্যে, মানুষ যে দিকেই ঘুরুক, যাই করুক, তার সকল চেষ্টার মধ্যেই সে চিরদিন এই সাধনার মন্ত্রটি বহন করে নিয়ে চলেছে : আবিরাবীর্ম এধি। এ তার কিছুতেই ভোলবার নয়। আরাম-ঐশ্বর্যের পুষ্পশয্যার মধ্যে শুয়েও সে ভুলতে পারে না। দুঃখযন্ত্রণার অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে পড়েও সে ভুলতে পারে না। প্রকাশ, তুমি আমার মধ্যে প্রকাশিত হও, তুমি আমার হও, আমার সমস্তকে অধিকার করে তুমি আমার হও, আমার সমস্ত সুখদুঃখের উপরে দাঁড়িয়ে তুমি আমার হও, আমার সমস্ত পাপকে তোমার পায়ের তলায় ফেলে দিয়ে তুমি আমার হও। সমস্ত অসংখ্য লোকলোকান্তর যুগযুগান্তরের উপরে নিস্তব্ধ বিরাজমান যে পরম এক তুমি, সেই মহা এক তুমি, আমার মধ্যে আমার হও। সেই এক তুমি 'পিতা নোঽসি'— আমার পিতা। সেই এক তুমি 'পিতা নো বোধি'— আমার বোধের মধ্যে আমার পিতা হও, আমার প্রবৃত্তির মধ্যে প্রভু হও, আমার প্রেমের মধ্যে প্রিয়তম হও। এই প্রার্থনা জানাবার যে গৌরব মানুষ আপনার অন্তরাত্মার মধ্যে বহন করেছে, এই প্রার্থনা সফল করবার যে গৌরব আপন ভক্তপরম্পরার মধ্য দিয়ে কত কাল হতে লাভ করে এসেছে, মানুষের সেই শ্রেষ্ঠতম গভীরতম চিরন্তন গৌরবের উৎসব আজ এই সন্ধ্যাবেলায়, এই লোকালয়ের প্রান্তে, অন্ধকার পৃথিবীর নানা জন্মমৃত্যু হাসিকান্না কাজকর্ম বিশ্বাস-অবিশ্বাসের মধ্যে এই ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণটিতে। মানুষের সেই গৌরবের আনন্দধ্বনিকে আলোকে সংগীতে পুষ্পমালায় স্তবগানে উদ্‌ঘোষিত করবার এই উৎসব। বিশ্বের মধ্যে তুমি একমেবাদ্বিতীয়ম্‌, মানুষের ইতিহাসে তুমি একমেবাদ্বিতীয়ম্‌, আমার হৃদয়ের সত্যতম প্রেমে তুমি একমেবাদ্বিতীয়ম্‌— এই কথা জানতে এবং জানাতে আমরা এখানে এসেছি। তর্কের দ্বারা নয়, যুক্তির দ্বারা নয়। আনন্দের দ্বারা, শিশু যেমন সহজবোধে তার পিতামাতাকে জানে এবং জানায় সেই রকম পরিপূর্ণ প্রত্যয়ের দ্বারা। হে উৎসবের অধিদেবতা, আমাদের প্রত্যেকের কাছে এই উৎসবকে সফল করো, এই উৎসবের মধ্যে, হে আবিঃ, তুমি আবির্ভূত হও। আমাদের সকলের সম্মিলিত চিত্তাকাশে তোমার দক্ষিণমুখ প্রকাশিত হোক। প্রতিদিন আপনাকে অত্যন্ত ক্ষুদ্র জেনে যে দুঃখ পেয়েছি সেই বোধ হতে, সেই দুঃখ হতে, এখনই আমাদের পরিত্রাণ করো। সমস্ত লোভ-ক্ষোভের উর্ধ্বে ভূমার মধ্যে আত্মাকে উপলব্ধি করে বিশ্বমানবের বিরাট সাধনমন্দিরে আজ এখনই তোমাকে নত হয়ে নমস্কার করি। নমস্তেঽস্তু। তোমাতে আমাদের নমস্কার সত্য হোক, নমস্কার সত্য হোক।

ফাল্গুন ১৩১৭

ব্রাহ্মসমাজের সার্থকতা

একটি গান যখনই ধরা যায় তখনই তার রূপ প্রকাশ হয় না; তার একটা অংশ সম্পূর্ণ হয়ে যখন সমে ফিরে আসে তখন সমস্তটার রাগিণী কী এবং তার অন্তরাটা কোন্ দিকে গতি নেবে সে কথা চিন্তা করবার সময় আসে।

আমাদের দেশের ইতিহাসে ব্রাহ্মসমাজেরও ভূমিকা একটা শমে এসে দাঁড়িয়েছে; তার আরম্ভের দিকের কাজ একটা সমাপ্তির মধ্যে পৌঁচেছে। যে-সমস্ত প্রাণহীন অভ্যস্ত লোকাচারের জড় আবরণের মধ্যে আচ্ছন্ন হয়ে হিন্দুসমাজ আপনার চিরন্তন সত্য সম্বন্ধে চেতনা হারিয়ে বসেছিল ব্রাহ্মসমাজ তার সেই আবরণকে ছিন্ন করবার জন্যে তাকে আঘাত করতে প্রস্তুত হয়েছিল।

ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ থেকে এই-যে আঘাত দেবার কাজ এ একটা শমে এসে উত্তীর্ণ হয়েছে। হিন্দুসমাজ নিজের সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠেছে; হিন্দুসমাজ নানা দিক দিয়ে নিজের ভিতরকার নিত্যতম এবং মহত্তম সত্যকে উপলব্ধি করবার জন্যে চেষ্টা করতে প্রবৃত্ত হয়েছে।

এই চেষ্টা একেবারে সম্পূর্ণ হয়ে উঠতে পারে না, এই চেষ্টা নানা ঘাতপ্রতিঘাত ও সত্যমিথ্যার ভিতর দিয়ে ঘুরে নানা শাখা-প্রশাখার পথ খুঁজতে খুঁজতে আপন সার্থকতার দিকে অগ্রসর হবে। এই চেষ্টার অনেক রূপ দেখা যাচ্ছে যার মধ্যে সত্যের মূর্তি বিশুদ্ধভাবে প্রকাশ পাচ্ছে না; কিন্তু তবু যেটি প্রধান কাজ সেটি সম্পন্ন হয়েছে, হিন্দুসমাজের চিত্ত জেগে উঠেছে।

এই চিত্ত যখন জেগেছে তখন হিন্দুসমাজ আর তো অন্ধভাবে কালের স্রোতে ভেসে যেতে পারে না; তাকে এখন থেকে দিক্‌নির্ণয় করে চলতেই হবে, নিজের হালটা কোথায় তা তাকে খুঁজে নিতেই হবে। ভুল অনেক করবে, কিন্তু ভুল করবার শক্তি যার হয়েছে ভুল সংশোধন করবারও শক্তি তার জেগেছে।

তাই বলছিলুম, ব্রাহ্মসমাজের আরম্ভের কাজটা শমে এসে সমাপ্ত হয়েছে। সে নিদ্রিত সমাজকে জাগিয়েছে। কিন্তু, এইখানেই কি ব্রাহ্মসমাজের কাজ ফুরিয়েছে? যে পথিকরা পান্থশালায় ঘুমিয়ে পড়েছিল তাদের দ্বারে আঘাত করেই কি সে চলে যাবে। কিম্বা জাগরণের পরেও কি সেই দ্বারে আঘাত করার বিরক্তিকর অভ্যাস সে পরিত্যাগ করতে পারবে না। এবার কি পথে চলবার কাজে তাকে অগ্রসর হতে হবে না।

নিরুদ্ধ উৎসের বাধা দূর করবার জন্যে যতক্ষণ পর্যন্ত মাটি খোঁড়া যায় ততক্ষণ পর্যন্ত সে কাজটা বিশেষভাবে আমারই। সেই খনন-করা কূপটাকে আমার বলে অভিমান করতে পারি। কিন্তু, যখন খুঁড়তে খুঁড়তে উৎস বেরিয়ে পড়ে তখন কোদাল ফেলে দিয়ে সেই গর্ত ছেড়ে বাইরে উঠে পড়তে হয়। তখন যে ঝর্নাটা দেখা দেয় সে যে বিশ্বের জিনিস; তার উপরে আমারই সিলমোহরের ছাপ দিয়ে তাকে আর সংকীর্ণ অধিকারের মধ্যে ধরে রেখে দিতে পারি না। তখন সেই উৎস নিজের পথ নিজে প্রস্তুত করে নিয়ে বাইরের দিকে অগ্রসর হতে থাকে— তখন আমরাই তার অনুসরণ করতে প্রবৃত্ত হই।

আমাদের সাম্প্রদায়িক ইতিহাসেরও এই দুই রকম দুই অধ্যায় আছে। যতদিন বাধা দূর করবার পালা ততদিন আমাদের চেষ্টা, আমাদের কৃতিত্ব; ততদিন আমাদের কাজ চারি দিক থেকে অনেকটা বিচ্ছিন্ন, এমন-কি চারি দিকের বিরুদ্ধ; ততদিন সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িকতা অত্যন্ত তীব্র।

অবশেষে গভীর থেকে গভীরতরে যেতে যেতে এমন একটি জায়গায় গিয়ে পৌঁছনো যায় যেখানে বিশ্বের মর্মগত চিরন্তন সত্য-উৎস আর প্রচ্ছন্ন থাকে না। সে জিনিস সকলেরই জিনিস; সে যখন উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে তখন খন্তা কোদাল ফেলে দিয়ে, আঘাতের কাজ বন্ধ রেখে, নিজেকে তারই অনুবর্তী করে বিশ্বের ক্ষেত্রে সকলের সঙ্গে মিলনের পথে বেরিয়ে পড়তে হয়। সম্প্রদায় তখন কূপের কাজ ছেড়ে বাইরের কাজে আপনি ছড়িয়ে পড়তে থাকে। তখন তার লক্ষপরিবর্তন হয়, তখন তার বোধশক্তি নিখিলের বৃহৎ প্রতিষ্ঠাকে আশ্রয় করে— পদে পদে আপনাকেই তীব্রভাবে অনুভব করে না।

ব্রাহ্মসমাজ কি আজ আপনার সেই সার্থকতার সম্মুখে এসে পৌঁছে নিজের এতদিনকার সমস্ত ভাঙাগড়ার চেষ্টাকে সাম্প্রদায়িকতার বাইরে মুক্তক্ষেত্রের মধ্যে দেখবার অবকাশ পায় নি?

অবশ্য, ব্রাহ্মসমাজ ব্যক্তিগত দিক থেকে আমাদের একটা আশ্রয় দিয়েছে, সেটা অবহেলা করবার নয়। পূর্বে আমাদের ভক্তিবৃত্তি জ্ঞানবৃত্তি বহুদিনব্যাপী দুর্গতিপ্রাপ্ত দেশের নানা খণ্ডতা ও বিকৃতির মধ্যে যথার্থ পরিতৃপ্তি লাভ করতে পারছিল না। পৃথিবী যখন তার বৃহৎ ইতিহাস ও বিজ্ঞান নিয়ে আমাদের দেশবদ্ধ সংস্কারের বেড়া ভেঙে আমাদের সম্মুখে এসে আবির্ভূত হল তখন হঠাৎ বিশ্বপৃথিবীব্যাপী আদর্শের সঙ্গে আমাদের বিশ্বাস ও আচারকে মিলিয়ে দেখবার একটা সময় এসে পড়ল। সেই সংকটের সময়ে অনেকেই নিজের দেশের প্রতি এবং প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসের প্রতি

সম্পূর্ণ শ্রদ্ধাহীন হয়ে পড়েছিল। সেই বিপদের দিন থেকে আজ পর্যন্ত ব্রাহ্মসমাজ আমাদের বুদ্ধিকে ও ভক্তিকে আশ্রয় দিয়েছে, আমাদের ভেসে যেতে দেয় নি।

সাম্প্রদায়িক দিক থেকেও দেখা যেতে পারে, ব্রাহ্মসমাজ আঘাতের দ্বারা ও দৃষ্টান্তের দ্বারা সমাজের বহুতর কুরীতি ও কুসংস্কার দূর করেছে এবং বিশেষভাবে আমাদের দেশের স্ত্রীলোকদের শিক্ষা ও অবস্থার পরিবর্তন -সাধন করে তাদের মনুষ্যত্বের অধিকারকে প্রশস্ত করে দিয়েছে।

কিন্তু ব্রাহ্মসমাজকে আশ্রয় করে আমরা উপাসনা করে আনন্দ পাচ্ছি এবং সামাজিক কর্তব্যসাধন করে উপকার পাচ্ছি, এইটুকুমাত্র স্বীকার করেই থামতে পারি নে। ব্রাহ্মসমাজের উপলব্ধিকে এর চেয়ে অনেক বড়ো করে পেতে হবে।

এ কথা সত্য নয় যে ব্রাহ্মসমাজ কেবলমাত্র আধুনিক কালের হিন্দুসমাজকে সংস্কার করবার একটা চেষ্টা, অথবা ঈশ্বরোপাসকের মনে জ্ঞান ও ভক্তির একটা সমন্বয় -সাধনের বর্তমানকালীন প্রয়াস। ব্রাহ্মসমাজ চিরন্তন ভারতবর্ষের একটি আধুনিক আত্মপ্রকাশ।

ইতিহাসে দেখা গিয়েছে ভারতবর্ষ বারম্বার নব নব ধর্মমতের প্রবল আঘাত সহ্য করেছে। কিন্তু, চন্দনতরু যেমন আঘাত পেলে আপনার গন্ধকেই আরও অধিক করে প্রকাশ করে তেমনি ভারতবর্ষও যখনই প্রবল আঘাত পেয়েছে তখনই আপনার সকলের চেয়ে সত্যসাধনাকেই ব্রহ্মসাধনাকেই নূতন করে উন্মুক্ত করে দিয়েছে। তা যদি না করত তা হলে সে আত্মরক্ষা করতেই পারত না।

মুসলমানধর্ম প্রবল ধর্ম, এবং তা নিশ্চেষ্ট ধর্ম নয়। এই ধর্ম যেখানে গেছে সেখানেই আপনার বিরুদ্ধ ধর্মকে আঘাত করে ভূমিসাৎ করে তবে ক্ষান্ত হয়েছে। ভারতবর্ষের উপরেও এই প্রচণ্ড আঘাত এসে পড়েছিল এবং বহু শতাব্দী ধরে এই আঘাত নিরন্তর কাজ করেছে।

এই আঘাতবেগ যখন অত্যন্ত প্রবল তখনকার ধর্ম-ইতিহাস আমরা দেখতে পাই নে। কারণ, সে ইতিহাস সংকলিত ও লিপিবদ্ধ হয় নি। কিন্তু, সেই মুসলমান-অভ্যাগমের যুগে ভারতবর্ষে যে-সকল সাধক জাগ্রত হয়ে উঠেছিলেন তাঁদের বাণী আলোচনা করে দেখলে স্পষ্ট দেখা যায় ভারতবর্ষ আপন অন্তরতম সত্যকে উদ্‌ঘাটিত করে দিয়ে এই মুসলমানধর্মের আঘাতবেগকে সহজেই গ্রহণ করতে পেরেছিল।

সত্যের আঘাত কেবল সত্যই গ্রহণ করতে পারে। এইজন্য প্রবল আঘাতের মুখে প্রত্যেক জাতি হয় আপনার শ্রেষ্ঠ সত্যকে সমুজ্জ্বল করে প্রকাশ করে, নয় আপনার মিথ্যা সম্বলকে উড়িয়ে দিয়ে দেউলে হয়ে যায়। ভারতবর্ষেরও যখন আত্ম-

রক্ষার দিন উপস্থিত হয়েছিল তখন সাধকের পর সাধক এসে ভারতবর্ষের চিরসত্যকে প্রকাশ করে ধরেছিলেন। সেই যুগের নানক রবিদাস কবীর দাদু প্রভৃতি সাধুদের জীবন ও রচনা যাঁরা আলোচনা করছেন তাঁরা সেই সময়কার ধর্ম-ইতিহাসের যবনিকা অপসারিত করে যখন দেখাবেন তখন দেখতে পাব ভারতবর্ষ তখন আত্মসম্পদ সম্বন্ধে কিরকম সবলে সচেতন হয়ে উঠেছিল।

ভারতবর্ষ তখন দেখিয়েছিল, মুসলমানধর্মের যেটি সত্য সেটি ভারতবর্ষের সত্যের বিরোধী নয়। দেখিয়েছিল, ভারতবর্ষের মর্মস্থলে সত্যের এমন একটি বিপুল সাধনা সঞ্চিত হয়ে আছে যা সকল সত্যকে আত্মীয় বলে গ্রহণ করতে পারে। এইজন্যেই সত্যের আঘাত তার বাইরে এসে যতই ঠেকুক তার মর্মে গিয়ে কখনো বাজে না, তাকে বিনাশ করে না।

আজ আবার পাশ্চাত্যজগতের সত্য আপনার জয়ঘোষণা করে ভারতবর্ষের দুর্গ-দ্বারে আঘাত করেছে। এই আঘাত কি আত্মীয়ের আঘাত হবে না শত্রুর আঘাত হবে। প্রথম যেদিন সে শৃঙ্গধ্বনি করে এসেছিল সেদিন তো মনে করেছিলুম সে বুঝি মৃত্যুবাণ হানবে। আমাদের মধ্যে যারা ভীরু তারা মনে করেছিল ভারতবর্ষের সত্যসম্বল নেই, অতএব এইবার তাকে তার জীর্ণ আশ্রয় পরিত্যাগ করতে হল বুঝি।

কিন্তু, তা হয় নি। পৃথিবীর নব আগন্তুকের সাড়া পেয়ে ভারতবর্ষের নবীন সাধকেরা নির্ভয়ে তার বহু দিনের অবরুদ্ধ দুর্গের দ্বার খুলে দিলেন। ভারতবর্ষের সাধন-ভাণ্ডারে এবার পাশ্চাত্য অতিথিকে সমাদরে আহ্বান করা হয়েছে— ভয় নেই, কোনো অভাব নেই— এইবার যে ভোজ হবে সেই আনন্দভোজে পূর্ব পশ্চিম এক পংক্তিতে বসে যাবে।

ভারতবর্ষের সেই চিরন্তন সাধনার দ্বার-উদ্‌ঘাটনই ব্রাহ্মসমাজের ঐতিহাসিক তাৎপর্য। অনেক দিন দ্বার রুদ্ধ ছিল, তালায় মর্চে পড়েছিল, চাবি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। এইজন্যে গোড়ায় খোলবার সময় কঠিন ধাক্কা দিতে হয়েছে, সেটাকে যেন বিরোধের মতো বোধ হয়েছিল।

কিন্তু, বিরোধ নয়। বর্তমানকালের সংঘর্ষে ব্রাহ্মসমাজে ভারতবর্ষ আপনার সত্যরূপ প্রকাশের জন্য প্রস্তুত হয়েছে। চিরকালের ভারতবর্ষকে ব্রাহ্মসমাজ নবীন-কালের বিশ্বপৃথিবীর সভায় আহ্বান করেছে। বিশ্বপৃথিবীর পক্ষে এখনও এই ভারতবর্ষকে প্রয়োজন আছে। বিশ্বমানবের উত্তরোত্তর উদ্ভিদ্যমান সমস্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে বর্তমান যুগে ভারতবর্ষের সাধনাই সকল সমস্যার সকল জটিলতার যথার্থ সমাধান

করে দেবে এই একটা আশা ও আকাঙ্ক্ষা বিশ্বমানবের বিচিত্রকণ্ঠে আজ ফুটে উঠছে।

ব্রাহ্মসমাজকে, তার সাম্প্রদায়িকতার আবরণ ঘুচিয়ে দিয়ে, মানব-ইতিহাসের এই বিরাট ক্ষেত্রে বৃহৎ করে উপলব্ধি করবার দিন আজ উপস্থিত হয়েছে।

আমরা ব্রহ্মকে স্বীকার করেছি এই কথাটি যদি সত্য হয় তবে আমরা ভারতবর্ষকে স্বীকার করেছি এবং ভারতবর্ষের সাধনক্ষেত্রে সমুদয় পৃথিবীর সত্যসাধনাকে গ্রহণ করবার মহাযজ্ঞ আমরা আরম্ভ করেছি।

ব্রহ্মের উপলব্ধি বলতে যে কী বোঝায় উপনিষদের একটি মন্ত্রে তার আভাস আছে—

যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্‌সু
যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ
য ওষধিষু যো বনস্পতিষু
তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ।

যে দেবতা অগ্নিতে, যিনি জলে, যিনি নিখিল ভুবনে প্রবেশ করে আছেন, যিনি ওষধিতে, যিনি বনস্পতিতে, সেই দেবতাকে বার বার নমস্কার করি।

ঈশ্বর সর্বব্যাপী এই মোটা কথাটা বলে নিষ্কৃতি পাওয়া নয়। এটি কেবল জ্ঞানের কথামাত্র নয়; এ একটি পরিপূর্ণ বোধের কথা। অগ্নি জল তরুলতাকে আমরা ব্যবহারের সামগ্রী বলেই জানি, এইজন্য আমাদের চিত্ত তাদের নিতান্ত আংশিক ভাবেই গ্রহণ করে; আমাদের চৈতন্য সেখানে পরমচৈতন্যকে অনুভব করে না। উপনিষদের উল্লিখিত মন্ত্রে আমাদের সমস্ত চেতনাকে সেই বিশ্বব্যাপী চৈতন্যের মধ্যে আহ্বান করছে। জড়ে জীবে নিখিলভুবনে ব্রহ্মকে এই-যে উপলব্ধি করা এ কেবলমাত্র জ্ঞানের উপলব্ধি নয়, এ ভক্তির উপলব্ধি। ব্রহ্মকে সর্বত্র জানা নয়— সর্বত্র নমস্কার করা, বোধের সঙ্গে সঙ্গে নমস্কারকে বিশ্বভুবনে প্রসারিত করে দেওয়া। ভূমাকে যেখানে আমরা বোধ করি সেই বোধের রসই হচ্ছে ভক্তি। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোথাও এই রসের বিচ্ছেদ না রাখা, সমস্তকে ভক্তির দ্বারা চৈতন্যের মধ্যে উপলব্ধি করা, জীবনের এমন পরিপূর্ণতা জগদ্‌বাসের এমন সার্থকতা আর কী হতে পারে!

কালের বহুতর আবর্জনার মধ্যে এই ব্রহ্মসাধনা একদিন আমাদের দেশে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। সে জিনিস তো একেবারে হারিয়ে যাবার নয়। তাকে আমাদের খুঁজে পেতেই হবে। কেননা, এই ব্রহ্মসাধনা থেকে বাদ দিয়ে দেখলে মনুষ্যত্বের কোনো-একটা চরম তাৎপর্য থাকে না, সে একটা পুনঃপুন-আবর্তমান অন্তহীন ঘূর্ণার মতো প্রতিভাত হয়।

ভারতবর্ষ যে সত্যসম্পদ পেয়েছিল মাঝে তাকে হারাতে হয়েছে। কারণ, পুনর্বার তাকে বৃহত্তর করে পূর্ণতর করে পাবার প্রয়োজন আছে। হারাবার কারণের মধ্যে নিশ্চয়ই একটা অপূর্ণতা ছিল; সেইটিকে শোধন করে নেবার জন্যেই তাকে হারাতে হয়েছে। একবার তার কাছে থেকে দূরে না গেলে তাকে বিশুদ্ধ ক'রে সত্য ক'রে দেখবার অবকাশ পাওয়া যায় না।

হারিয়েছিলুম কেন। আমাদের সাধনার মধ্যে একটা অসামঞ্জস্য ঘটেছিল। আমাদের সাধনার মধ্যে অন্তর ও বাহির, আত্মার দিক ও বিষয়ের দিক, সমান ওজন রেখে চলতে পারে নি। আমরা ব্রহ্মসাধনায় যখন জ্ঞানের দিকে ঝোঁক দিয়েছিলুম তখন জ্ঞানকেই একান্ত করে তুলেছিলুম; তখন জ্ঞান যেন জ্ঞানের সমস্ত বিষয়কে পর্যন্ত একেবারে পরিহার করে কেবল আপনার মধ্যেই আপনাকে পর্যাপ্ত করে তুলতে চেয়েছিল। আমাদের সাধনা যখন ভক্তির পথ অবলম্বন করেছিল ভক্তি তখন বিচিত্র কর্মে ও সেবায় আপনাকে প্রবাহিত করে না দিয়ে নিজের মধ্যেই নিজে ক্রমাগত উচ্ছ্বসিত হয়ে একটা ফেনিল ভাবোন্মত্ততার আবর্ত সৃষ্টি করেছে।

যে জিনিস জড় নয় সে কেবলমাত্র আপনাকে নিয়ে টিকতে পারে না, আপনার বাইরে তাকে আপনার খাদ্য খুঁজতে হয়। জীব যখন খাদ্যাভাবে নিজের চর্বি ও শারীর উপকরণকে নিজে ভিতরে ভিতরে খেতে থাকে তখন সে কিছুদিন বেঁচে থাকে, কিন্তু ক্রমশই নীরস ও নির্জীব হয়ে মারা পড়ে।

আমাদের জ্ঞানবৃত্তি হৃদয়বৃত্তিও কেবল আপনাকে আপনি খেয়ে বাঁচতে পারে না— আপনাকে পোষণ করবার জন্যে, রক্ষা করবার জন্যে, আপনার বাইরে তাকে যেতেই হবে। কিন্তু, ভারতবর্ষে একদিন জ্ঞান অত্যন্ত বিশুদ্ধ অবস্থা পাবার প্রলোভনে সমস্তকে বর্জন করে নিজের কেন্দ্রের মধ্যে নিজের পরিধিকে বিলুপ্ত করবার চেষ্টা করেছিল এবং হৃদয় আপনার হৃদয়বৃত্তিতে নিজের মধ্যেই নিজের লক্ষ্য স্থাপন করে আপনাকে ব্যর্থ করে তুলেছিল।

পৃথিবীর পশ্চিম প্রদেশ তখন এর উল্টো দিকে চলছিল। সে বিষয়রাজ্যের বৈচিত্র্যের মধ্যে অহরহ ঘুরে ঘুরে বহুতর তথ্য সংগ্রহ করে সেগুলিকে স্তূপাকার করে তুলছিল— তার কোনো অন্ত ছিল না, কোনো ঐক্য ছিল না। তার ছিল কেবল সংগ্রহের লোভেই সংগ্রহ, কাজের উত্তেজনাতেই কাজ, ভোগের মত্ততাতেই ভোগ।

কিন্তু এই বিষয়ের বৈচিত্র্য-রাজ্যে য়ুরোপ গভীরতম চরম ঐক্যটি পায় নি বটে, তবু তার সর্বব্যাপী একটি বাহ্য শৃঙ্খলা সে দেখেছিল। সে দেখেছে সমস্তই অমোঘ নিয়মের শৃঙ্খলে পরস্পর অবিচ্ছিন্ন বাঁধা। কোথায় বাঁধা, কার হাতে বাঁধা— এই-

সমস্ত বন্ধন কোন্‌খানে একটি মুক্তিতে একটি আনন্দে পর্যবসিত য়ুরোপ তা দেখে নি।

এমন সময়েই রামমোহন রায় আমাদের দেশের প্রাচীন ব্রহ্মসাধনাকে নবীন যুগে উদ্‌ঘাটিত করে দিলেন। ব্রহ্মকে তিনি নিজের জীবনের মধ্যে গ্রহণ করে জীবনের সমস্ত শক্তিকে বৃহৎ করে বিশ্বব্যাপী করে প্রকাশ করে দিলেন। তাঁর সকল চিন্তা সকল চেষ্টা, মানুষের প্রতি তাঁর প্রেম, দেশের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা, কল্যাণের প্রতি তাঁর লক্ষ, সমস্তই ব্রহ্মসাধনাকে আশ্রয় করে উদার ঐক্য লাভ করেছিল। ব্রহ্মকে তিনি জীবন থেকে এবং ব্রহ্মাণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন করে কেবলমাত্র ধ্যানের বস্তু জ্ঞানের বস্তু করে নিভৃতে নির্বাসিত করে রাখেন নি। ব্রহ্মকে তিনি বিশ্ব-ইতিহাসে বিশ্বধর্মে বিশ্বকর্মে সর্বত্রই সত্য করে দেখবার সাধনা নিজের জীবনে এমন করে প্রকাশ করলেন যে সেই তাঁর সাধনার দ্বারা আমাদের দেশে সকল বিষয়েই তিনি নূতন যুগের প্রবর্তন করে দিলেন।

রামমোহন রায়ের মুখ দিয়ে ভারতবর্ষ আপন সত্যবাণী ঘোষণা করেছে। বিদেশের গুরু যখন এই ভারতবর্ষকে দীক্ষা দেবার জন্য উপস্থিত হয়েছিল এই বাণী তখনই উচ্চারিত হয়েছে।

অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ঘরে বাহিরে তখন এই ব্রহ্মসাধনার কথা চাপা ছিল। আমাদের দেশে তখন ব্রহ্মকে পরমজ্ঞানীর অতি দূর গহন জ্ঞানদুর্গের মধ্যে কারারুদ্ধ করে রেখেছিল; চারি দিকে রাজত্ব করছিল আচার বিচার বাহ্য-অনুষ্ঠান এবং ভক্তিরসমাদকতার বিচিত্র আয়োজন। সেদিন রামমোহন রায় যখন ব্রহ্মসাধনকে পুঁথির অন্ধকার-সমাধি থেকে মুক্ত করে জীবনের ক্ষেত্রে এনে দাঁড় করালেন তখন দেশের লোক সবাই ক্রুদ্ধ হয়ে বলে উঠল: এ আমাদের আপন জিনিস নয়, এ আমাদের বাপ-পিতামহের সামগ্রী নয়। বলে উঠল, এ খৃস্টানি, একে ঘরে ঢুকতে দেওয়া হবে না। শক্তি যখন বিলুপ্ত হয়, জীবন যখন সংকীর্ণ হয়ে আসে, জ্ঞান যখন গ্রাম্যগণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ হয়ে কাল্পনিকতাকে নিয়ে যথেচ্ছবিশ্বাসের অন্ধকার ঘরে স্বপ্ন দেখে আপনাকে বিফল করতে চায়, তখনই ব্রহ্ম সকলের চেয়ে সুদূর, এমন-কি সকলের চেয়ে বিরুদ্ধ হয়ে প্রতিভাত হন। এ দিকে য়ুরোপে মানবশক্তি তখন প্রবলভাবে জাগ্রত হয়ে বৃহৎভাবে আপনাকে প্রকাশ করছে। কিন্তু, সে তখন আপনাকেই প্রকাশ করতে চাচ্ছে— আপনার চেয়ে বড়োকে নয়, সকলের চেয়ে শ্রেয়কে নয়। তার জ্ঞানের ক্ষেত্র বিশ্বব্যাপী, তার কর্মের ক্ষেত্র পৃথিবী-জোড়া, এবং সেই উপলক্ষ্যে মানুষের সঙ্গে তার

সম্বন্ধ সুদূরবিস্তৃত। কিন্তু, তার ধ্বজপতাকায় লেখা ছিল 'আমি'। তার মন্ত্র ছিল 'জোর যার মুলুক তার'। সে যে অস্ত্রপাণি রক্তবসনা শক্তিদেবতাকে জগতে প্রচার করতে চলেছিল তার বাহন ছিল পণ্যসম্ভার, অন্তহীন উপকরণরাশি।

কিন্তু, এই বৃহৎ ব্যাপারকে কিসে ঐক্যদান করতে পারে। এই বিরাট যজ্ঞের যজ্ঞপতি কে। কেউ বা বলে স্বাজাত্য, কেউ বা বলে রাষ্ট্রব্যবস্থা, কেউ বা বলে অধিকাংশের সুখসাধন, কেউ বা বলে মানবদেবতা। কিন্তু, কিছুতেই বিরোধ মেটে না, কিছুতেই ঐক্যদান করতে পারে না। প্রতিকূলতা- পরস্পরের প্রতি ভ্রূকুটি করে পরস্পরকে শান্ত রাখতে চেষ্টা করে এবং যাকে গ্রহণ করতে দলবদ্ধ স্বার্থের কোনো-খানে বাধে তাকে একেবারে ধ্বংস করবার জন্যে সে উদ্যত হয়ে ওঠে। কেবল বিপ্লবের পর বিপ্লব আসছে, কেবল পরীক্ষার পর পরীক্ষা চলছে। কিন্তু, এ কথা একদিন জানতেই হবে, বাহিরে যেখানে বৃহৎ অনুষ্ঠান অন্তরে সেখানে ব্রহ্মকে উপলব্ধি না করলে কিছুতেই কিছুর সমন্বয় হতে পারবে না। প্রয়োজনবোধকে যত বড়ো নাম দেও, স্বার্থসিদ্ধিকে যত বড়ো সিংহাসনে বসাও, নিয়মকে যত পাকা করে তোল এবং শক্তিকে যত প্রবল করে দাঁড় করাও, সত্যপ্রতিষ্ঠা কিছুতেই নেই— শেষ পর্যন্ত কিছুই টিকতে এবং টেকাতে পারবে না। যা প্রবল অথচ প্রশান্ত, ব্যাপক অথচ গভীর, আত্মসমাহিত অথচ বিশ্বানুপ্রবিষ্ট, সেই আধ্যাত্মিক জীবনসূত্রের দ্বারা না বেঁধে তুলতে পারলে অন্য কোনো কৃত্রিম জোড়াতাড়ার দ্বারা জ্ঞানের সঙ্গে জ্ঞান, কর্মের সঙ্গে কর্ম, জাতির সঙ্গে জাতি যথার্থভাবে সম্মিলিত হতে পারবে না। সেই সম্মিলন যদি না ঘটে তবে আয়োজন যতই বিপুল হবে তার সংঘাতবেদনা ততই দুঃসহ হয়ে উঠতে থাকবে।

যে সাধনা সকলকে গ্রহণ করতে ও সকলকে মিলিয়ে তুলতে পারে, যার দ্বারা জীবন একটি সর্বগ্রাহী সমগ্রের মধ্যে সর্বতোভাবে সত্য হয়ে উঠতে পারে, সেই ব্রহ্মসাধনার পরিপূর্ণ মূর্তিকে ভারতবর্ষ বিশ্বজগতের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করবে এই হচ্ছে ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস। ভারতবর্ষে এই ইতিহাসের আরম্ভ হয়েছে কোন্ সুদূর দুর্গম গুহার মধ্যে। এই ইতিহাসের ধারা কখনো দুই কূল ভাসিয়ে প্রবাহিত হয়েছে, কখনো বালুকাস্তরের মধ্যে প্রচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছে, কিন্তু কখনোই শুষ্ক হয় নি। আজ আমরা ভারতবর্ষের মর্মোচ্ছ্বসিত সেই অমৃতধারাকে, বিধাতার সেই চিরপ্রবাহিত মঙ্গল-ইচ্ছার স্রোতস্বিনীকে আমাদের ঘরের সম্মুখে দেখতে পেয়েছি— কিন্তু, তাই ব'লে যেন তাকে আমরা ছোটো করে আমাদের সাম্প্রদায়িক গৃহস্থালির সামগ্রী করে না জানি। যেন বুঝতে পারি নিষ্কলঙ্কতুষারস্রুত এই পুণ্যস্রোত কোন্ গঙ্গোত্রীর নিভৃত

কন্দর থেকে বিগলিত হয়ে পড়ছে এবং ভবিষ্যতের দিক্‌প্রান্তে কোন্ মহাসমুদ্র তাকে অভ্যর্থনা করে জলদমন্দ্রে মঙ্গলবাণী উচ্চারণ করছে। ভস্মরাশির মধ্যে যে প্রাণ নিশ্চেতন হয়ে আছে সেই প্রাণকে সঞ্জীবিত করবার এই ধারা। অতীতের সঙ্গে অনাগতকে অবিচ্ছিন্ন কল্যাণের সূত্রে এক করে দেবার এই ধারা। এবং বিশ্বজগতে জ্ঞান ও ভক্তির দুই তীরকে সুগভীর সুপবিত্র জীবনযোগে সম্মিলিত করে দিয়ে কর্মের ক্ষেত্রকে বিচিত্র শস্যপর্যায়ে পরিপূর্ণরূপে সফল করে তোলবার জন্যেই ভারতের অমৃত-কলমন্দ্র-কল্লোলিত এই উদার স্রোতস্বতী।

বৈশাখ ১৩১৮

১৪

সুন্দর

পশ্চিম আকাশের পারে তখনও সূর্যাস্তের ধূসর আভা ছিল; আমাদের আশ্রমে শালবনের মাথার উপরে সন্ধ্যাবেলাকার নিস্তব্ধ শান্তি সমস্ত বাতাসকে গভীর করে তুলছিল। আমার হৃদয় একটি বৃহৎ সৌন্দর্যের আবির্ভাবে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। আমার কাছে বর্তমান মুহূর্ত তার সীমা হারিয়ে ফেলেছিল; আজকেকার এই সন্ধ্যা কত যুগের সুদূর অতীতকালের সন্ধ্যার মধ্যে প্রসারিত হয়ে গিয়েছিল। ভারতবর্ষের ইতিহাসে যেদিন ঋষিদের আশ্রম সত্য ছিল, যেদিন প্রত্যহ সূর্যের উদয় এ দেশে তপোবনের পর তপোবনে পাখির কাকলি এবং সামগানকে জাগিয়ে তুলত, এবং দিনের অবসানে পাটলবর্ণ নিঃশব্দ গোধূলি কত নদীর তীরে কত শৈলপদমূলে শ্রান্ত হোমধেনুগুলিকে তপোবনের গোষ্ঠগৃহে ফিরিয়ে আনত, ভারতবর্ষের সেই সরল জীবন এবং গভীর সাধনার দিন আজকের শান্ত সন্ধ্যার আকাশে অত্যন্ত সত্যরূপে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছিল।

আমার এই কথা মনে হচ্ছিল, আর্যাবর্তের দিগন্তপ্রসারিত সমতল ভূমিতে সূর্যোদয়ে ও সূর্যাস্তে যে আশ্চর্য সৌন্দর্যের মহিমা প্রতিদিন প্রকাশিত হয় আমাদের আর্যপিতামহেরা তাকে এক দিনও এক বেলাও উপেক্ষা করেন নি। প্রাতঃসন্ধ্যা ও সায়ংসন্ধ্যাকে তাঁরা অচেতনে বিদায় দিতে পারেন নি। প্রত্যেক যোগী এবং প্রত্যেক গৃহী তাকে হৃদয়ের মধ্যে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু, কেবল ভোগীর মতো নয়, ভাবুকের মতো নয়। সৌন্দর্যকে তাঁরা পূজার মন্দিরে অভ্যর্থনা করে নিয়েছেন। সৌন্দর্যের মধ্যে যে আনন্দ প্রকাশ পায় তাকে তাঁরা ভক্তির চক্ষে দেখেছেন; সমস্ত চাঞ্চল্য দমন করে মনকে স্থির শান্ত করে উষা ও সন্ধ্যাকে তাঁরা অনন্তের ধ্যানের সঙ্গে মিলিত করে নিয়েছেন। আমার মনে হল, নদীসংগমে সমুদ্রতীরে পর্বতশিখরে যেখানে তাঁরা প্রকৃতির সুন্দর প্রকাশকে বিশেষ করে দেখেছেন সেইখানে তাঁরা আপনার ভোগের উদ্যান রচনা করেন নি; সেখানে তাঁরা এমন একটি তীর্থস্থান স্থাপন করেছেন, এমন কোনো-একটি চিহ্ন রেখে দিয়েছেন, যাতে স্বভাবতই সেই সুন্দরের মধ্যে ভূমার সঙ্গে মানুষের মিলন হতে পারে।

এই সুন্দরের মহান রূপকে সহজ দৃষ্টিতে যেন প্রত্যক্ষ করতে পারি, এই প্রার্থনাটি আমার মনের মধ্যে সেই সন্ধ্যার আকাশে জেগে উঠছিল। জগতের মধ্যে সুন্দরকে

আপনার ভোগবৃত্তির দ্বারা অসত্য ও ছোটো না ক'রে, ভক্তিবৃত্তির দ্বারা সত্য ও মহৎ করে যেন জানতে পারি। অর্থাৎ, কেবলই তাকে নিজের করে নেবার ব্যর্থ বাসনা ত্যাগ করে আপনাকেই তার কাছে দান করবার ইচ্ছা যেন আমার মনে স্বাভাবিক হয়ে ওঠে।

তখন আমার এই কথাটি মনে হল, সত্যকে সুন্দর ও সুন্দরকে মহান বলে জানবার অনুভূতি সহজ নয়। আমরা অনেক জিনিসকে বাদ দিয়ে, অনেক অপ্রিয়কে দূরে রেখে, অনেক বিরোধকে চোখের আড়াল করে দিয়ে নিজের মনোমত একটা গণ্ডির মধ্যে সৌন্দর্যকে অত্যন্ত শৌখিন-রকম করে দেখতে চাই। তখন বিশ্বলক্ষ্মীকে আমাদের সেবাদাসী করতে চেষ্টা করি; সেই অপমানের দ্বারা আমরা তাঁকে হারাই এবং আমাদের কল্যাণকে সুদ্ধ হারিয়ে ফেলি।

মানবপ্রকৃতিকে বাদ দিয়ে দেখলে বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে জটিলতা নেই; এইজন্যে বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে সুন্দরকে দেখা ও ভূমাকে দেখা সহজ। ছোটো করে দেখতে গেলে তার মধ্যে যে-সমস্ত বিরোধ ও বিকৃতি চোখে পড়ে সেগুলিকে বড়োর মধ্যে মিলিয়ে দিয়ে একটি বৃহৎ সামঞ্জস্যকে দেখতে পাওয়া আমাদের মধ্যে তেমন কঠিন নয়।

কিন্তু, মানুষের সম্বন্ধে এটি আমরা পেরে উঠি নে। মানুষ আমাদের এত অত্যন্ত কাছে যে তার সমস্ত ছোটোকে আমরা বড়ো করে এবং স্বতন্ত্র করে দেখি। যা তার ক্ষণিক ও তুচ্ছ তাও আমাদের বেদনার মধ্যে অত্যন্ত গুরুতর হয়ে দেখা দেয়; কাজেই লোভে ক্ষোভে ভয়ে ভাবনায় আমরা সমগ্রকে গ্রহণ করতে পারি নে, আমরা একাংশের মধ্যে দোলায়িত হতে থাকি। এই জন্যে এই বিশাল সন্ধ্যাকাশের মধ্যে যেমন সহজে সুন্দরকে দেখতে পাচ্ছি মানবসংসারে তেমন সহজে দেখতে পাই নে।

আজ এই সন্ধ্যাবেলায় বিশ্বজগতের মূর্তিকে যে এমন সুন্দর করে দেখছি এর জন্যে আমাদের কোনো সাধনা নেই। যাঁর এই বিশ্ব তিনি নিজের হাতে এই সমগ্রকে সুন্দর করে আমাদের চোখের সামনে ধরেছেন। সমস্তটাকে বিশ্লেষণ করে যদি এর ভিতরে প্রবেশ করতে যাই তা হলে এর মধ্যে যে কত বিচিত্র ব্যাপার দেখতে পাব তার আর অন্ত নেই। এখনই অনন্ত আকাশ জুড়ে তারায় তারায় যে আগ্নেয় বাষ্পের ভীষণ ঝড় বইছে তার একটি সামান্য অংশও যদি আমরা সম্মুখে প্রত্যক্ষ করতে পারতুম তা হলে ভয়ে আমরা স্তম্ভিত মূর্ছিত হয়ে যেতুম। টুকরো টুকরো করে যদি দেখ তা হলে এর মধ্যে কত ঘাতসংঘাত কত বিরোধ ও বিকৃতি তার কি সংখ্যা আছে। এই-যে আমাদের চোখের সামনেই ওই গাছটি এই তারাখচিত আকাশের গায়ে সমগ্রভাবে সুন্দর হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, একে যদি আংশিকভাবে দেখতে যাই

তা হলে দেখতে পাব এর মধ্যে কত গ্রন্থি, কত বাঁকাচোরা, এর ত্বকের উপরে কত বলি পড়েছে, এর কত অংশ মরে শুকিয়ে কীটের আবাস হয়ে পচে যাচ্ছে। আজ এই সন্ধ্যার আকাশে দাঁড়িয়ে জগতের যতখানি দেখতে পাচ্ছি তার মধ্যে অসম্পূর্ণতা এবং বিকারের কিছু অভাব নেই; কিন্তু তার কিছুই বাদ না দিয়ে, সমস্তকে স্বীকার করে নিয়ে, যা-কিছু তুচ্ছ যা-কিছু ব্যর্থ যা-কিছু বিরূপ সবই অবিচ্ছেদে আত্মসাৎ করে এই বিশ্ব অকুণ্ঠিতভাবে আপনার সৌন্দর্য প্রকাশ করছে। সমস্তই যে সুন্দর, সৌন্দর্য যে কাটা-ছাঁটা বেড়া-দেওয়া গণ্ডী-কাটা জিনিস নয়, বিশ্ববিধাতা তাই আজ এই নিস্তব্ধ আকাশের মধ্যে অতি অনায়াসে দেখিয়ে দিচ্ছেন।

তিনি দেখিয়ে দিচ্ছেন, এত বড়ো বিশ্ব যে এত সহজে সুন্দর হয়ে আছে তার কারণ এর অণুতে পরমাণুতে একটা প্রকাণ্ড শক্তি কাজ করছে। সেই-যে শক্তিকে দেখতে পাই সে অতি ভীষণ। সে কাটছে ভাঙছে টানছে জুড়ছে; সে তাণ্ডবনৃত্যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক রেণুকে নিত্যনিয়ত কম্পান্বিত করে রেখেছে; তার প্রতি পদক্ষেপের সংঘাতে ক্রন্দসী রোদন করে উঠছে। ভয়াদিন্দ্রশ্চবায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি। যাকে কাছে এসে ভাগ করে দেখলে এমন ভয়ংকর তারই অখণ্ড সত্যরূপ কী পরমশান্তিময় সুন্দর। সেই ভীষণ যদি সর্বত্র কাজ না করত তা হলে এই রমণীয় সৌন্দর্য থাকত না। অবিশ্রাম অমোঘ শক্তির চেষ্টার উপরেই এই সৌন্দর্য প্রতিষ্ঠিত। সেই চেষ্টা কেবলই বিচ্ছিন্নতার মধ্য থেকে ব্যবস্থা, বৈষম্যের মধ্য থেকে সুষমাকে প্রবল বলে উদ্ভিন্ন করে তুলছে সেই চেষ্টাকে যখন কেবল তার গতির দিক থেকে দেখি তখন তাকে ভয়ংকর দেখি, তখনই তার মধ্যে বিরোধ ও বিকৃতি। কিন্তু, তার সঙ্গে সঙ্গেই তার স্থিতির রূপটিও রয়েছে, সেইখানেই শান্তি ও সৌন্দর্য। জগতে এই মুহূর্তেই যেমন আকাশ-জোড়া ভাঙাচোরার ঘর্ঘরধ্বনি এবং মৃত্যুবেদনার আর্তস্বর রয়েছে তেমনি তার সঙ্গে সঙ্গেই তার সমস্তকে নিয়ে পরিপূর্ণ সংগীত অবিরাম ধ্বনিত হচ্ছে; সেই কথাটি আজ সন্ধ্যাকাশে বিশ্বকবি নিজে পরিষ্কার করে বলে দিচ্ছেন। তাঁর ভয়ংকর শক্তি যে অগ্নিময় তারার মালা গেঁথে তুলছে সেই মালা তাঁর কণ্ঠে মণিমালা হয়ে শোভা পাচ্ছে, এখনই এ আমরা কত সহজে কী অনায়াসেই দেখতে পাচ্ছি— আমাদের মনে ভয় নেই, ভাবনা নেই, মন আনন্দে পূর্ণ হয়ে উঠেছে।

মানবসংসারেও তেমনি একটি ভীষণ শক্তির তেজ নিত্যনিয়ত কাজ করছে। আমরা তার ভিতরে আছি বলেই তার বাষ্পরাশির ভয়ংকর ঘাতসংঘাত সর্বদাই বড়ো করে প্রত্যক্ষ করছি। আধিব্যাধি দুর্ভিক্ষদারিদ্র্য হানাহানি-কাটাকাটির মন্থন কেবলই চারি দিকে চলছে। সেই ভীষণ যদি এর মধ্যে রুদ্ররূপে না থাকত তা হলে সমস্ত

শিথিল হয়ে বিশ্লিষ্ট হয়ে একটা আকার-আয়তন-হীন কদর্যতায় পরিণত হত। সংসারের মাঝখানে সেই ভীষণের রুদ্রলীলা চলছে বলেই তার দুঃসহ দীপ্ততেজে অভাব থেকে পূর্ণতা, অসাম্য থেকে সামঞ্জস্য, বর্বরতা থেকে সভ্যতা অনিবার্যবেগে উদ্ঘাত হয়ে উঠছে ; তারই ভয়ংকর পেষণ-ঘর্ষণে রাজ্যসাম্রাজ্য শিল্পসাহিত্য ধর্মকর্ম উত্তরোত্তর নব নব উৎকর্ষ লাভ করে জেগে উঠছে। এই সংসারের মাঝখানে মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং ; কিন্তু এই মহদ্ভয়কে যাঁরা সত্য করে দেখেন তাঁরা আর ভয়কে দেখেন না, তাঁরা মহাসৌন্দর্যকেই দেখেন। তাঁরা অমৃতকেই দেখেন যা এতদ্‌বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি।

অনেকে এমনভাবে বলেন, যেন প্রকৃতির আদর্শ মানুষের পক্ষে জড়ত্বের আদর্শ ; যেন যা আছে তাই নিয়েই প্রকৃতি ; প্রকৃতির মধ্যে উপরে ওঠবার কোনো বেগ নেই ; সেইজন্যেই মানবপ্রকৃতিকে বিশ্বপ্রকৃতি থেকে পৃথক্‌ করে দেখবার চেষ্টা হয়। কিন্তু, আমরা তো প্রকৃতির মধ্যে একটা তপস্যা দেখতে পাচ্ছি ; সে তো জড়যন্ত্রের মতো একই বাঁধা নিয়মের খোঁটাকে অনন্তকাল অন্ধভাবে প্রদক্ষিণ করছে না। এ পর্যন্ত তাকে তো তার পথের কোনো জায়গায় থেমে থাকতে দেখি নি। সে তার আকারহীন বিপুল বাষ্পসংঘাত থেকে চলতে চলতে আজ মানুষে এসে পৌচেছে, এবং এখানেই যে তার চলা শেষ হয়ে গেল এমন মনে করবার কোনো হেতু নেই। ইতিমধ্যে তার অবিরাম চেষ্টা কত গড়েছে এবং কত ভেঙে ফেলেছে, কত ঝড় কত প্লাবন কত ভূমিকম্প কত অগ্নি-উচ্ছ্বাসের বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে তার বিকাশ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। আতপ্ত পঙ্কের ভিতর দিয়ে একদিন কত মহারণ্যকে সে তখনকার ঘনমেঘাবৃত আকাশের দিকে জাগিয়ে তুলেছিল, আজ কেবল কয়লার খনির ভাণ্ডারে তাদের অস্পষ্ট ইতিহাস কালো অক্ষরে লিখিত রয়েছে। যখন তার পৃথিবীতে জলস্থলের সীমা ভালো করে নির্ণীত হয় নি তখন কত বৃহৎ সরীসৃপ কত অদ্ভুত পাখি কত আশ্চর্য জন্তু কোন্‌ নেপথ্যগৃহ থেকে এই সৃষ্টিরঙ্গভূমিতে এসে তাদের জীবলীলা সমাধা করেছে, আজ তারা অর্ধরাত্রির একটা অদ্ভুত স্বপ্নের মতো কোথায় মিলিয়ে গেছে। কিন্তু প্রকৃতির সেই উৎকর্ষের দিকে অভিব্যক্ত হবার অবিশ্রাম কঠোর চেষ্টা, সে থেমে তো যায় নি। থেমে যদি যেত তা হলে এখনই যা-কিছু সমস্তই বিশ্লিষ্ট হয়ে একটা আদি-অন্তহীন বিশৃঙ্খলতায় স্তূপাকার হয়ে উঠত। প্রকৃতির মধ্যে একটি অনিদ্র অভিপ্রায় কেবলই তাকে তার ভাবী উৎকর্ষের দিকে কঠিন বলে আকর্ষণ করে চলেছে ব'লেই তার বর্তমান এমন একটি অব্যর্থ শৃঙ্খলার মধ্যে আপনাকে প্রকাশ করতে পারছে। কেবলই তাকে সামঞ্জস্যের বন্ধন ছিন্ন ক'রে ক'রেই এগোতে হচ্ছে, কেবলই তাকে গর্ভাবরণ বিদীর্ণ করে নব নব জন্মে প্রবৃত্ত হতে হচ্ছে। এইজন্যেই এত দুঃখ, এত মৃত্যু। কিন্তু,

সামঞ্জস্যেরই একটি সুমহৎ নিত্য আদর্শ তাকে ছোটো ছোটো সামঞ্জস্যের বেষ্টনের মধ্যে কিছুতেই স্থির হয়ে থাকতে দিচ্ছে না, কেবলই ছিন্ন করে করে কেড়ে নিয়ে চলেছে। বিশ্বপ্রকৃতির বৃহৎ প্রকাশের মধ্যে এই দুটিকেই আমরা একসঙ্গে অবিচ্ছিন্ন দেখতে পাই। তার চেষ্টার মধ্যে যে দুঃখ, অথচ তার সেই চেষ্টার আদিতে ও অন্তে যে আনন্দ, দুই একত্র হয়ে প্রকৃতিতে দেখা দেয়। এইজন্যে প্রকৃতির মধ্যে যে শক্তি অনবরত অতিভীষণ ভাঙাগড়ায় প্রবৃত্ত তাকে এই মুহূর্তেই স্থির শান্ত নিস্তব্ধ দেখতে পাচ্ছি। এই সসীমের তপস্যার সঙ্গে অসীমের সিদ্ধিকে অবিচ্ছেদে মিলিয়ে দেখাই হচ্ছে সুন্দরকে দেখা— এর একটিকে বাদ দিতে গেলেই অন্যটি অর্থহীন সুতরাং শ্রীহীন হয়ে পড়ে।

মানবসংসারে কেন যে সব সময়ে আমরা এই দুটিকে এক করে মিলিয়ে দেখতে পারি নে তার কারণ পূর্বেই বলেছি। সংসারের সমস্ত বেদনা আমাদের অত্যন্ত কাছে এসে বাজে; যেখানে সামঞ্জস্য বিদীর্ণ হচ্ছে সেইখানেই আমাদের দৃষ্টি পড়ে, কিন্তু সেই-সমস্তকেই অনায়াসে আত্মসাৎ করে নিয়ে যেখানে অনন্ত সামঞ্জস্য বিরাজ করছে সেখানে সহজে আমাদের দৃষ্টি যায় না। এমনি করে আমরা সত্যকে অপূর্ণ করে দেখছি বলেই আমরা সত্যকে সুন্দর করে দেখছি নে; সেইজন্যেই আবিঃ আমাদের কাছে আবির্ভূত হচ্ছেন না, সেইজন্য রুদ্রের দক্ষিণ মুখ আমরা দেখতে পাচ্ছি নে।

কিন্তু, মানবসংসারের মধ্যেই সেই ভীষণকে সুন্দর করে দেখতে চাও? তা হলে নিজের স্বার্থপর ছয়-রিপু-চালিত ক্ষুদ্র জীবন থেকে দূরে এসো। মানবচরিতকে যেখানে বড়ো করে দেখতে পাওয়া যায় সেই মহাপুরুষদের সামনে এসে দাঁড়াও। ওই দেখো শাক্যরাজবংশের তপস্বী। তাঁর পুণ্যচরিত আজ কত ভক্তের কণ্ঠে কত কবির গাথায় উচ্চারিত হচ্ছে; তাঁর চরিত ধ্যান করে কত দীনচেতা ব্যক্তিরও মন আজ মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছে। কী তার দীপ্তি, কী তার সৌন্দর্য, কী তার পবিত্রতা। কিন্তু, সেই জীবনের প্রত্যেক দিনকে একবার স্মরণ করে দেখো। কী দুঃসহ। কত দুঃখের দারুণ দাহে ওই সোনার প্রতিমা তৈরি হয়ে উঠেছে। সেই দুঃখগুলিকে স্বতন্ত্র করে যদি পুঞ্জীভূত করে দেখানো যেত তা হলে সেই নিষ্ঠুর দৃশ্যে মানুষের মন একেবারে বিমুখ হয়ে যেত। কিন্তু, সমস্ত দুঃখের সঙ্গে সঙ্গেই তার আদিতে ও অন্তে যে ভূমানন্দ আছে তাকে আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি বলেই এই চরিত এত সুন্দর, মানুষ একে এত আদরে অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করছে।

ভগবান ঈশাকে দেখো। সেই একই কথা। কত আঘাত, কত বেদনা। সমস্তকে

নিয়ে তিনি কত সুন্দর। শুধু তাই নয়; তাঁর চারি দিকে মানুষের সমস্ত নিষ্ঠুরতা সংকীর্ণতা ও পাপ সেও তাঁর চরিতমূর্তির উপকরণ— পঙ্ককে পঙ্কজ যেমন সার্থক করে তেমনি মানবজীবনের সমস্ত অমঙ্গলকে তিনি আপনার আবির্ভাবের দ্বারা সার্থক করে দেখিয়েছেন।

ভীষণ শক্তির প্রচণ্ড লীলাকে আজ আমরা যেমন এই সন্ধ্যাকাশে শান্ত সুন্দর করে দেখতে পাচ্ছি, মহাপুরুষদের জীবনেও মহদ্‌দুঃখের ভীষণ লীলাকে সেই রকম বৃহৎ করে সুন্দর করে দেখতে পাই। কেননা, সেখানে আমরা দুঃখকে পরিপূর্ণ সত্যের মধ্যে দেখি, এইজন্য তাকে দুঃখরূপে দেখি নে, আনন্দরূপেই দেখি।

আমাদেরও জীবনের চরম সাধনা এই যে, রুদ্রের যে দক্ষিণ মুখ তাই আমরা দেখব; ভীষণকে সুন্দর বলে জানব; মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং যিনি তাঁকে ভয়ে নয়, আনন্দে অমৃত বলে গ্রহণ করব। প্রিয় অপ্রিয় সুখ দুঃখ সম্পদ বিপদ সমস্তকেই আমরা বীর্যের সঙ্গে গ্রহণ করব এবং সমস্তকেই আমরা ভূমার মধ্যে অখণ্ড ক'রে এক ক'রে সুন্দর করে দেখব। যিনি ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং তিনিই পরমসুন্দর এই কথা নিশ্চয় মনের মধ্যে উপলব্ধি করে এই সুখদুঃখবন্ধুর ভাঙাগড়ার সংসারে সেই রুদ্রের আনন্দ-লীলার নিত্যসহচর হবার জন্য প্রত্যহ প্রস্তুত হতে থাকব। নতুবা, ভোগেও জীবনের সার্থকতা নয়, বৈরাগ্যেও নয়। নইলে সমস্ত দুঃখ-কঠোরতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে আমরা সৌন্দর্যকে যখন আমাদের দুর্বল আরামের উপযোগী করে ভোগসুখের বেড়া দিয়ে বেষ্টন করব তখন সেই সৌন্দর্য ভূমাকে আঘাত করতে থাকবে, আপনার চারি দিকের সঙ্গে তার সহজ স্বাভাবিক যোগ নষ্ট হয়ে যাবে— তখন সেই সৌন্দর্য দেখতে দেখতে বিকৃত হয়ে কেবল উগ্রগন্ধ মাদকতার সৃষ্টি করবে, আমাদের শুভ বুদ্ধিকে স্খলিত করে তাকে ভূমিসাৎ করে দেবে। সেই সৌন্দর্য ভোগবিলাসের বেষ্টনে আমাদের সকল থেকে বিচ্ছিন্ন করে কলুষিত করবে, সকলের সঙ্গে সরল সামঞ্জস্যে যুক্ত করে আমাদের কল্যাণ করবে না। তাই বলছিলুম, সুন্দরকে জানার জন্যে কঠোর সাধনা ও সংযমের দরকার, প্রবৃত্তির মোহ যাকে সুন্দর বলে জানায় সে তো মরীচিকা। সত্যকে যখন আমরা সুন্দর করে জানি তখনই সুন্দরকে সত্য করে জানতে পারি। সত্যকে সুন্দর করে সেই জানে যার দৃষ্টি নির্মল, যার হৃদয় পবিত্র, বিশ্বের মধ্যে সর্বত্রই আনন্দকে প্রত্যক্ষ করতে তার আর কোথাও বাধা থাকে না। ১৫ চৈত্র ১৩১৭

আষাঢ় ১৩১৮

বর্ষশেষ

আজকের বর্ষশেষের দিবাবসানের এই-যে উপাসনা, এই উপাসনায় তোমরা কি সম্পূর্ণমনে যোগ দিতে পারবে? তোমাদের মধ্যে অনেকেই আছ বালক, তোমরা জীবনের আরম্ভমুখেই রয়েছ। শেষ বলতে যে কী বোঝায় তা তোমরা ঠিক উপলব্ধি করতে পারবে না; বৎসরের পর বৎসর এসে তোমাদের পূর্ণ করছে, আর আমাদের জীবনে প্রত্যেক বৎসর নূতন করে ক্ষয় করবার কাজই করছে। তোমরা এই-যে জীবনের ক্ষেত্রে বাস করছ এর জন্য তোমাদের এখনো খাজনা দেবার সময় আসে নি— তোমরা কেবল নিচ্ছ এবং খাচ্ছ। আর, আমরা যে এতকাল জীবনটাকে ভোগ করে আসছি তারই পুরো খাজনাটা চুকিয়ে যাবার বয়স আমাদের হয়েছে। বৎসরে বৎসরে কিছু কিছু করে খাজনা আমরা শোধ করছি; ঘরে যা সঞ্চয় করে বসে ছিলুম, মনে করেছিলুম কোনো কালে এ আর খরচ করতে হবে না, সেই সঞ্চয়ে টান পড়েছে। আজ কিছু যাচ্ছে, কাল কিছু যাচ্ছে; অবশেষে একদিন এই পার্থিব জীবনের পুরা তহবিল নিকাশ করে দিয়ে খাতাপত্র বন্ধ করে বিদায় নিতে হবে।

তোমরা পূর্বাচলের যাত্রী, সূর্যোদয়ের দিকেই তোমাদের মুখ; সেই দিকে যিনি তোমাদের অভ্যুদয়ের পথে আহ্বান করছেন তাঁকে তোমরা পূর্বমুখ করেই প্রণাম করো। আমরা পশ্চিম-অস্তাচলের দিকে জোড়হাত করে উপাসনা করি; সেই দিক থেকে আমাদের আহ্বান আসছে, সেই আহ্বানও সুন্দর সুগম্ভীর এবং শান্তিময় আনন্দরসে পরিপূর্ণ।

অথচ এই পূর্বপশ্চিমের মধ্যে ব্যবধান কোনোখানেই নেই। আজ যেখানে বর্ষশেষ কালই সেখানে বর্ষারম্ভ; একই পাতার এ পৃষ্ঠায় সমাপ্তি, ও পৃষ্ঠায় সমারম্ভ— কেউ কাউকে পরিত্যাগ করে থাকতে পারে না। পূর্ব এবং পশ্চিম একটি অখণ্ড মণ্ডলের মধ্যে পরিপূর্ণ হয়ে রয়েছে, তাদের মধ্যে ভেদ নেই বিবাদ নেই— এক দিকে যিনি শিশুর আর-এক দিকে তিনিই বৃদ্ধের। এক দিকে তাঁর বিচিত্র রূপের দিকে তিনি আমাদের আশীর্বাদ করে পাঠিয়ে দিচ্ছেন, আর-এক দিকে তাঁর একস্বরূপের দিকে আমাদের আশীর্বাদ করে আকর্ষণ করে নিচ্ছেন।

আজ পূর্ণিমার রাত্রিতে বৎসরের শেষদিন সমাপ্ত হয়েছে। কোনো শেষই যে শূন্যতার মধ্যে শেষ হয় না, ছন্দের যতির মধ্যেও ছন্দের সৌন্দর্য যে পূর্ণ হয়ে প্রকাশ পায়, বিরাম যে কেবল কর্মের অভাবমাত্র নয়, কর্ম বিরামের মধ্যেই আপনার মধুর

এবং গভীর সার্থকতাকে দেখতে পায়, এই কথাটি আজ এই চৈত্রপূর্ণিমার জ্যোৎস্নাকাশে যেন মূর্তিমান হয়ে প্রকাশ পাচ্ছে। স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি জগতে যা-কিছু চলে যায়, ক্ষয় হয়ে যায়, তার দ্বারাও সেই অক্ষয় পূর্ণতাই প্রকাশ পাচ্ছেন।

নিজের জীবনের দিকে তাকাতে গেলে এই কথাটাই মনে হয়। কিছু পূর্বেই আমি বলেছি, তোমাদের বয়সে তোমরা যেমন প্রতিদিন কেবল নূতন-নূতনকে পাচ্ছ আমাদের বয়সে আমরা তেমনি কেবল দিতেই আছি, আমাদের কেবল যাচ্ছেই। এ কথাটা যদি সম্পূর্ণ সত্য হত তা হলে কী জন্যে আজ উপাসনা করতে এসেছি, কোন্ ভয়ংকর শূন্যতাকে আজ প্রণাম করতে বসেছি? তা হলে বিষাদে আমাদের মুখ দিয়ে কথা বেরুত না, আতঙ্কে আমরা মরে যেতুম।

কিন্তু স্পষ্টই যে দেখতে পাচ্ছি, জীবনের সমস্ত যাওয়া কেবলই একটি পাওয়াতে এসে ঠেকছে; সমস্তই যেখানে ফুরিয়ে যাচ্ছে সেখানে দেখছি একটি অফুরন্ত আবির্ভাব।

এইটিই বড়ো একটি আশ্চর্য পাওয়া। অহরহ নূতন নূতন পাওয়ার মধ্যে যে পাওয়া তাতে পরিপূর্ণ পাওয়ার রূপটি দেখা যায় না। তাতে প্রত্যেক পাওয়ার মধ্যেই 'পাই নি পাই নি' কান্নাটা থেকে যায়— অন্তরের সে কান্নাটা সকল সময়ে শুনতে পাই নে, কেননা আশা তখন আমাদের টেনে ছুটিয়ে নিয়ে যায়, কোনো একটা জায়গায় ক্ষণকাল থেমে এই না-পাওয়ার কান্নাটাকে কান পেতে শুনতে দেয় না।

কিন্তু, একটু একটু করে রিক্ত হতে হতে অন্তরাত্মা যে পাওয়ার মধ্যে এসে পৌঁছে সেটি কী গভীর পাওয়া, কী বিশুদ্ধ পাওয়া! সেই পাওয়ার যথার্থ স্বাদ পাবা-মাত্র মৃত্যু-ভয় চলে যায়। তাতে এ ভয়টা আর থাকে না যে যা-কিছু যাচ্ছে তাতে আত্মার কেবল ক্ষতিই হচ্ছে। সমস্ত ক্ষতির শেষে যে অক্ষয়কে দেখতে পাওয়া যায় তাঁকে পাওয়াই আমাদের পাওয়া।

নদী আপন গতিপথে দুই কূলে দিনরাত্রি নূতন নূতন ক্ষেত্রকে পেতে পেতে চলে; সমুদ্রে যখন সে এসে পৌঁছয় তখন আর নূতন-নূতনকে পায় না, তখন তার দেবার পালা। তখন আপনাকে সে নিঃশেষ করে কেবল দিতেই থাকে। কিন্তু, আপনার সমস্তকে দিতে দিতে সে যে অন্তহীন পাওয়াকে পায় সেইটিই তো পরিপূর্ণ পাওয়া। তখন সে দেখে আপনাকে অহরহ রিক্ত করে দিয়েও কিছুতেই তার লোকসান আর হয় না। বস্তুত কেবলই আপনাকে ক্ষয় করে দেওয়াই অক্ষয়কে সত্যরূপে জানবার প্রধান উপায়। যখন আপনার নানা জিনিস থাকে তখন আমরা

মনে করি সেই থাকাতেই সমস্ত কিছু আছে, সে-সব ঘুচলেই একেবারে সব শূন্যময় হয়ে যাবে। সেইজন্যে আপনার দিকটা একেবারে উজাড় করে দিয়ে যখন তাঁকে পূর্ণ দেখা যায় তখন সেই দেখাই অভয় দেখা, সেই দেখাই সত্য দেখা।

এইজন্যেই সংসারে ক্ষয় আছে, মৃত্যু আছে। যদি না থাকত তবে অক্ষয়কে অমৃতকে কোন্ অবকাশ দিয়ে আমরা দেখতে পেতুম। তা হলে আমরা কেবল বস্তুর পর বস্তু, বিষয়ের পর বিষয়কেই একান্ত করে দেখতুম; সত্যকে দেখতুম না। কিন্তু বিষয় কেবলই মেঘের মতো সরে যাচ্ছে, কুয়াশার মতো মিলিয়ে যাচ্ছে ব'লেই যিনি সরে যাচ্ছেন না, মিলিয়ে যাচ্ছেন না, তাঁকে আমরা দেখতে পাচ্ছি।

তাই আমি বলছি, আজ বর্ষশেষের এই রাত্রিতে তোমার বদ্ধ ঘরের জানলা থেকে জগতের সেই যাওয়ার পথটার দিকেই মুখ বাড়িয়ে একবার তাকিয়ে দেখো। কিছুই থাকছে না, সবই চলেছে, এইটিই লক্ষ্য করো। মন শান্ত করে হৃদয় শুদ্ধ করে এই দিকে দেখতে দেখতেই দেখবে, এই-সমস্ত যাওয়া সার্থক হচ্ছে এমন একটি 'থাকা' স্থির হয়ে আছে। দেখতে পাবে—

বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ।

সেই এক যিনি, তিনি অন্তরীক্ষে বৃক্ষের মতো স্তব্ধ হয়ে আছেন।

জীবন যতই এগোচ্ছে ততই দেখতে পাচ্ছি, সেখানেও সেই এক যিনি তিনি সমস্ত যাওয়া-আসার মধ্যে স্তব্ধ হয়ে আছেন। নিমেষে নিমেষে যা সরে গেছে, ঝরে গেছে, যা দিতে হয়েছে, তার হিসাব রাখতে কে পারে। তা অনেক, তা অসংখ্য। কিন্তু এই-সমস্ত গিয়ে, সমস্ত দিয়ে, যাঁকে পাচ্ছি তিনি এক। 'গেছে গেছে' এ কথাটা যতই কেঁদে বলি-না কেন, তিনি আছেন, তিনি আছেন— এই কথাটাই সকল কান্না ছাপিয়ে জেগে উঠছে। সব গেছে এই শোক যেখানে জাগছে সেখানে ভালো করে তাকাও, তিনি আছেন এই অচল আনন্দ সেখানে বিরাজমান।

যেখানে যা-কিছু সমস্ত শেষ হয়ে যাচ্ছে সেই গভীর নিঃশেষতার মধ্যে আজ বর্ষশেষের দিনে মুখ তুলে তাকাও, দেখো : বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ। চিত্তকে নিস্তব্ধ করো, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত গতি নিস্তব্ধ হয়ে যাবে, আকাশের চন্দ্রতারা স্থির হয়ে দাঁড়াবে, অণুপরমাণুর অবিরাম নৃত্য একেবারে থেমে যাবে। দেখবে বিশ্বজোড়া ক্ষয়মৃত্যু এক জায়গায় সমাপ্ত হয়ে গেছে। কলশব্দ নেই, চাঞ্চল্য নেই, সেখানে জন্ম-মরণ এই নিঃশব্দ সংগীতে বিলীন হয়ে রয়েছে 'বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ'।

আজ আমি আমার জীবনের দেওয়া এবং পাওয়ার মাঝখানের আসনটিতে বসে তাঁর উপাসনা করতে এসেছি। এই জায়গাটিতে তিনি যে আজ আমাকে বসতে

দিয়েছেন এজন্যে আমি আমার মানবজীবনকে ধন্য মনে করছি। তাঁর যে বাহু গ্রহণ করে এবং তাঁর যে বাহু দান করে এই দুই বাহুর মাঝখানটিতে তাঁর যে বক্ষ যে কোল সেই বক্ষে সেই কোলে আমি আমার জীবনকে অনুভব করছি। এক দিকে অনেককে হারিয়েও আর-এক দিকে একককে পাওয়া যায় এই কথাটি জানবার সুযোগ তিনি ঘটিয়েছেন। জীবনে যা চেয়েছি এবং পাই নি, যা পেয়েছি এবং চাই নি, যা দিয়ে আবার নিয়েছেন, সমস্তকেই আজ জীবনের দিবাবসানের পরম মাধুর্যের মধ্যে যখন দেখতে পাচ্ছি তখন তাদের দুঃখবেদনার রূপ কোথায় চলে গেল! আমার সমস্ত হারানো আজ আনন্দে ভরে উঠছে; কেননা, আমি যে দেখতে পাচ্ছি তিনি রয়েছেন, তাঁকে ছাড়িয়ে কিছুই হয় নি—আমার যা-কিছু গেছে তাতে তাঁকে কিছুই কমিয়ে দিতে পারে নি, সমস্তই আপনাকে সরিয়ে তাঁকেই দেখাচ্ছে। সংসার আমার কিছুই নেয় নি, মৃত্যু আমার কিছুই নেয় নি, মহাশূন্য আমার কিছুই নেয় নি— একটি অণু না, একটি পরমাণু না। সমস্তকে নিয়ে তখন যিনি ছিলেন সমস্ত গিয়ে এখনও তিনিই আছেন, এমন আনন্দ আর কিছু নেই, এমন অভয় আর কী হতে পারে।

আজ আমার মন তাঁকে বলছে, বারে বারে খেলা শেষ হয়, কিন্তু, হে আমার জীবন-খেলার সাথি, তোমার তো শেষ হয় না। ধুলার ঘর ধুলায় মেশে, মাটির খেলনা একে একে সমস্ত ভেঙে যায়; কিন্তু যে তুমি আমাকে এই খেলা খেলিয়েছ, যে তুমি এই খেলা আমার কাছে প্রিয় করে তুলেছ, সেই তুমি খেলার আরম্ভেও যেমন ছিলে খেলার শেষেও তেমনি আছ। যখন খেলায় খুব করে মেতেছিলুম তখন খেলাই আমার কাছে খেলার সঙ্গীর চেয়ে বড়ো হয়ে উঠেছিল, তখন তোমাকে তেমন করে দেখা হয় নি। আজ যখন একটা খেলা শেষ হয়ে এল তখন তোমাকে ধরেছি, তোমাকে চিনেছি। তখন আমি তোমাকে বলতে পেরেছি, খেলা আমার হারিয়ে যায় নি, সমস্তই তোমার মধ্যে মিশেছে। দেখতে পাচ্ছি, ঘর অন্ধকার করে দিয়ে আবার তুমি গোপনে নূতন আয়োজন করছ, সেই আয়োজন অন্ধকারের মধ্যেও আমি অন্তরে অনুভব করছি।

এবারকার এ খেলার ঘরটাকে তা হলে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে দাও। ভাঙাচোরা আবর্জনার আঘাতে পদে পদে ধুলোর উপরে পড়তে হয়— এবার সে-সমস্ত নিঃশেষে চুকিয়ে দাও, কিছুই আর বাকি রেখো না। এই-সমস্ত ভাঙা খেলনার জোড়াতাড়া খেলা এ আর আমি পেরে উঠি নে। সব তুমি লও লও, সব কুড়িয়ে লও। যত বিঘ্ন দূর করো, যত ভগ্ন সরিয়ে দাও, যা-কিছু ক্ষয় হবার দিকে যাচ্ছে সব লয় করে দাও: হে পরিপূর্ণ আনন্দ, পরিপূর্ণ নূতনের জন্যে আমাকে প্রস্তুত করো। ১৩১৭

জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮

নববর্ষ

আজ নববর্ষের প্রাতঃসূর্য এখনো দিক্‌প্রান্তে মাথা ঠেকিয়ে বিশ্বেশ্বরকে প্রণাম করে নি— এই ব্রাহ্মমুহূর্তে আমরা আশ্রমবাসীরা আমাদের নূতন বৎসরের প্রথম প্রণামটিকে আমাদের অনন্তকালের প্রভুকে নিবেদন করবার জন্যে এখানে এসেছি। এই প্রণামটি সত্য প্রণাম হোক।

এই-যে নববর্ষ আজ জগতের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে, এ কি আমাদের হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করতে পেরেছে? আমাদের জীবনে কি আজ নববর্ষ আরম্ভ হল?

এই-যে বৈশাখের প্রথম প্রত্যূষটি আজ আকাশপ্রাঙ্গণে এসে দাঁড়ালো কোথাও দরজাটি খোলবারও কোনো শব্দ পাওয়া গেল না, আকাশ-ভরা অন্ধকার একেবারে নিঃশব্দে অপসারিত হয়ে গেল, কুঁড়ি যেমন করে ফোটে আলোক তেমনি করে বিকশিত হয়ে উঠল— তার জন্যে কোথাও কিছুমাত্র বেদনা বাজল না। নববৎসরের উষালোক কি এমন স্বভাবত এমন নিঃশব্দে আমাদের অন্তরে প্রকাশিত হয়?

নিত্যলোকের সিংহদ্বার বিশ্বপ্রকৃতির দিকে চিরকাল খোলাই রয়েছে; সেখান থেকে নিত্যনূতনের অমৃতধারা অবাধে সর্বত্র প্রবাহিত হচ্ছে। এইজন্যে কোটি কোটি বৎসরেও প্রকৃতি জরাজীর্ণ হয়ে যায় নি; আকাশের এই বিপুল নীলিমার মধ্যে কোথাও লেশমাত্র চিহ্ন পড়তে পায় নি। এইজন্যেই বসন্ত যেদিন সমস্ত বনস্থলীর মাথার উপরে দক্ষিনে বাতাসে নবীনতার আশিসমন্ত্র পড়ে দেয় সেদিন দেখতে দেখতে তখনই অনায়াসে শুকনো পাতা খসে গিয়ে কোথা থেকে নবীন কিশলয় পুলকিত হয়ে ওঠে, ফুলে ফলে পল্লবে বনশ্রীর শ্যামাঞ্চল একেবারে ভরে যায়— এই-যে পুরাতনের আবরণের ভিতর থেকে নূতনের মুক্তিলাভ এ কত অনায়াসেই সম্পন্ন হয়। কোথাও কোনো সংগ্রাম করতে হয় না।

কিন্তু, মানুষ তো পুরাতন আবরণের মধ্যে থেকে এত সহজে এমন হাসিমুখে নূতনতার মধ্যে বেরিয়ে আসতে পারে না। বাধাকে ছিন্ন করতে হয়, বিদীর্ণ করতে হয়— বিপ্লবের ঝড় বয়ে যায়। তার অন্ধকার রাত্রি এমন সহজে প্রভাত হয় না; তার সেই অন্ধকার বজ্রাহত দৈত্যের মতো আর্তস্বরে ক্রন্দন করে ওঠে, এবং তার সেই প্রভাতের আলোক দেবতার খরধার খড়্‌গের মতো দিকে দিগন্তে চকিত হতে থাকে।

মানুষ যদিচ এই সৃষ্টির বেশিদিনের সন্তান নয় তবু জগতের মধ্যে সে সকলের

চেয়ে যেন প্রাচীন। কেননা সে যে আপনার মনটি দিয়ে বেষ্টিত; যে বিশাল বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে চিরযৌবনের রস অবাধে সর্বত্র সঞ্চারিত হচ্ছে তার সঙ্গে সে একেবারে একাত্ম মিলে থাকতে পারছে না। সে আপনার শতসহস্র সংস্কারের দ্বারা অভ্যাসের দ্বারা নিজের মধ্যে আবদ্ধ। জগতের মাঝখানে তার নিজের একটি বিশেষ জগৎ আছে; সেই তার জগৎ আপনার রুচিবিশ্বাস-মতামতের দ্বারা সীমাবদ্ধ। এই সীমাটার মধ্যে আটকা পড়ে মানুষ দেখতে দেখতে অত্যন্ত পুরাতন হয়ে পড়ে। শতসহস্র বৎসরের মহারণ্যও অনায়াসে শ্যামল হয়ে থাকে, যুগযুগান্তরের প্রাচীন হিমালয়ের ললাটে তুষাররত্নমুকুট সহজেই অম্লান হয়ে বিরাজ করে, কিন্তু মানুষের রাজপ্রাসাদ দেখতে দেখতে জীর্ণ হয়ে যায় এবং তার লজ্জিত ভগ্নাবশেষ একদিন প্রকৃতির অঞ্চলের মধ্যেই আপনাকে প্রচ্ছন্ন করে ফেলতে চেষ্টা করে। মানুষের আপন জগৎটিও মানুষের সেই রাজপ্রাসাদের মতো। চারি দিকের জগৎ নূতন থাকে, আর মানুষের জগৎ তার মধ্যে পুরাতন হয়ে পড়তে থাকে। তার কারণ, বৃহৎ জগতের মধ্যে সে আপনার একটি ক্ষুদ্র স্বাতন্ত্র্যের সৃষ্টি করে তুলছে। এই স্বাতন্ত্র্য ক্রমে ক্রমে আপন ঔদ্ধত্যের বেগে চারি দিকের বিরাট প্রকৃতির থেকে অত্যন্ত বিচ্ছিন্ন হতে থাকলেই ক্রমশ বিকৃতিতে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। এমনি করে মানুষই এই চিরনবীন বিশ্বজগতের মধ্যে জরাজীর্ণ হয়ে বাস করে। যে পৃথিবীর ক্রোড়ে মানুষের জন্ম সেই পৃথিবীর চেয়ে মানুষ প্রাচীন— সে আপনাকে আপনি ঘিরে রাখে বলেই বৃদ্ধ হয়ে ওঠে। এই বেষ্টনের মধ্যে তার বহুকালের আবর্জনা সঞ্চিত হতে থাকে, প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে সেগুলি বৃহতের মধ্যে ক্ষয় হয়ে মিলিয়ে যায় না— অবশেষে সেই স্তূপের ভিতর থেকে নবীন আলোকে বাহির হয়ে আসা মানুষের পক্ষে প্রাণান্তিক ব্যাপার হয়ে পড়ে। অসীম জগতে চারি দিকে সমস্তই সহজ, কেবল সেই মানুষই সহজ নয়। তাকে যে অন্ধকার বিদীর্ণ করতে হয় সে তার স্বরচিত সযত্নপালিত অন্ধকার। সেইজন্যে এই অন্ধকারকে যখন বিধাতা একদিন আঘাত করেন সে আঘাত আমাদের মর্মস্থানে গিয়ে পড়ে; তখন তাঁকে দুই হাত জোড় করে বলি, প্রভু, তুমি আমাকেই মারছ। বলি, আমার এই পরম স্নেহের জঞ্জালকে তুমি রক্ষা করো। কিম্বা বিদ্রোহের রক্তপতাকা উড়িয়ে বলি, তোমার আঘাত আমি তোমাকে ফিরিয়ে দেব, এ আমি গ্রহণ করব না।

মানুষ সৃষ্টির শেষ সন্তান বলেই মানুষ সৃষ্টির মধ্যে সকলের চেয়ে প্রাচীন। সৃষ্টির যুগযুগান্তরের ইতিহাসের বিপুল ধারা আজ মানুষের মধ্যে এসে মিলেছে। মানুষ নিজের মনুষ্যত্বের মধ্যে জড়ের ইতিহাস, উদ্ভিদের ইতিহাস, পশুর ইতিহাস সমস্তই একত্র বহন করছে। প্রকৃতির কত লক্ষকোটি বৎসরের ধারাবাহিক সংস্কারের

ভার তাকে আজ আশ্রয় করেছে। এই-সমস্তকে যতক্ষণ সে একটি উদার ঐক্যের মধ্যে সুসংগত সুসংহত করে না তুলছে ততক্ষণ পর্যন্ত তার মনুষ্যত্বের উপকরণগুলিই তার মনুষ্যত্বের বাধা, ততক্ষণ তার যুদ্ধ-অস্ত্রের বাহুল্যই তার যুদ্ধজয়ের প্রধান অন্তরায়। একটি মহৎ অভিপ্রায়ের দ্বারা যতক্ষণ পর্যন্ত সে তার বৃহৎ আয়োজনকে সার্থকতার দিকে গেঁথে না তুলছে ততক্ষণ তারা এলোমেলো চার দিকে ছড়িয়ে পড়ে অহরহ জীর্ণ হয়ে যাচ্ছে এবং সুষমার পরিবর্তে কুশ্রীতার জঞ্জালে চারি দিককে অবরুদ্ধ করে দিচ্ছে।

সেইজন্যে বিশ্বজগতে যে নববর্ষ চিরপ্রবহমাণ নদীর মতো অবিশ্রাম চলেছে, এক দিনের জন্যও যে নববর্ষের নবীনত্ব ব্যাঘাত পায় না এবং সেইজন্যই প্রকৃতির মধ্যে নববর্ষের দিন বলে কোনো একটা বিশেষ দিন নেই, সেই নববর্ষকে মানুষ সহজে গ্রহণ করতে পারে না; তাকে চিন্তা করে গ্রহণ করতে হয়; বিশ্বের চিরনবীনতাকে একটি বিশেষ দিনে বিশেষ করে চিহ্নিত করে তবে তাকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করতে হয়। তাই মানুষের পক্ষে নববর্ষকে অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করা একটা কঠিন সাধনা, এ তার পক্ষে স্বাভাবিক ঘটনা নয়।

সেইজন্যে আমি বলছি, এই প্রত্যূষে আমাদের আশ্রমের বনের মধ্যে যে-একটি সুস্নিগ্ধ শান্তি প্রসারিত হয়েছে, এই-যে অরুণালোকের সহজ নির্মলতা, এই-যে পাখির কাকলির স্বাভাবিক মাধুর্য, এতে যেন আমাদের ভুলিয়ে না দেয়; যেন না মনে করি এই আমাদের নববর্ষ; যেন মনে না করি একে আমরা এমনি সুন্দর করে লাভ করলুম। আমাদের নববর্ষ এমন সহজ নয়, এমন কোমল নয়, শান্তিতে পরিপূর্ণ এমন শীতল মধুর নয়। মনে যেন না করি, এই আলোকের নির্মলতা আমারই নির্মলতা, এই আকাশের শান্তি আমারই শান্তি; মনে যেন না করি স্তব পাঠ ক'রে, নামগান ক'রে, কিছুক্ষণের জন্যে একটা ভাবের আনন্দ লাভ ক'রে, আমরা যথার্থরূপে নববর্ষকে আমাদের জীবনের মধ্যে আবাহন করতে পেরেছি।

জগতের মধ্যে এই মুহূর্তে যিনি নবপ্রভাতকে প্রেরণ করেছেন তিনি আজ নববর্ষকে আমাদের দ্বারে প্রেরণ করলেন, এই কথাটিকে সত্যরূপে মনের মধ্যে চিন্তা করো। একবার ধ্যান করে দেখো, আমাদের সেই নববর্ষের কী ভীষণ রূপ। তার অনিমেষ নেত্রের দৃষ্টির মধ্যে আগুন জ্বলছে। প্রভাতের এই শান্ত নিঃশব্দ সমীরণ সেই ভীষণের কঠোর আশীর্বাদকে অনুচ্চারিত বজ্রবাণীর মতো বহন করে এনেছে।

মানুষের নববর্ষ আরামের নববর্ষ নয়, সে এমন শান্তির নববর্ষ নয়, পাখির গান

তার গান নয়, অরুণের আলো তার আলো নয়। তার নববর্ষ সংগ্রাম ক'রে আপন অধিকার লাভ করে; আবরণের পর আবরণকে ছিন্ন বিদীর্ণ করে তবে তার অভ্যুদয় ঘটে।

বিশ্ববিধাতা সূর্যকে অগ্নিশিখার মুকুট পরিয়ে যেমন সৌরজগতের অধিরাজ করে দিয়েছেন, তেমনি মানুষকে যে তেজের মুকুট তিনি পরিয়েছেন দুঃসহ তার দাহ। সেই পরম দুঃখের দ্বারাই তিনি মানুষকে রাজগৌরব দিয়েছেন; তিনি তাকে সহজ জীবন দেন নি। সেইজন্যেই সাধন করে তবে মানুষকে মানুষ হতে হয়; তরুলতা সহজেই তরুলতা, পশুপক্ষী সহজেই পশুপক্ষী, কিন্তু মানুষ প্রাণপণ চেষ্টায় তবে মানুষ।

তাই বলছি আজ যদি তিনি আমাদের জীবনের মধ্যে নববর্ষ পাঠিয়ে থাকেন তবে আমাদের সমস্ত শক্তিকে জাগ্রত করে তুলে তাকে গ্রহণ করতে হবে। সে তো সহজ দান নয়, আজ যদি প্রণাম করে তাঁর সে দান গ্রহণ করি তবে মাথা তুলতে গিয়ে যেন কেঁদে না বলে উঠি 'তোমার এ ভার বহন করতে পারি নে প্রভু, মনুষ্যত্বের অতি-বিপুল দায় আমার পক্ষে দুর্ভর'।

প্রত্যেক মানুষের উপরে তিনি সমস্ত মানুষের সাধনা স্থাপিত করেছেন, তাই তো মানুষের ব্রত এত কঠোর ব্রত। নিজের প্রয়োজনটুকুর মধ্যে কোনোমতেই তার নিষ্কৃতি নেই। বিশ্বমানবের জ্ঞানের সাধনা প্রেমের সাধনা কর্মের সাধনা মানুষকে গ্রহণ করতে হয়েছে। সমস্ত মানুষ প্রত্যেক মানুষের মধ্যে আপনাকে চরিতার্থ করবে বলে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। এইজন্যেই তার উপরে এত দাবি। এইজন্যে নিজেকে তার পদে পদে এত খর্ব করে চলতে হয়; এত তার ত্যাগ, এত তার দুঃখ, এত তার আত্মসম্বরণ।

মানুষ যখনই মানুষের ঘরে জন্মগ্রহণ করেছে তখনই বিধাতা তাকে বলেছেন, তুমি বীর। তখনই তিনি তার ললাটে জয়তিলক এঁকে দিয়েছেন। পশুর মতো আর তো সেই ললাটকে সে মাটির কাছে অবনত করে সঞ্চরণ করতে পারবে না; তাকে বক্ষ প্রসারিত করে আকাশে মাথা তুলে চলতে হবে। তিনি মানুষকে আহ্বান করেছেন, হে বীর, জাগ্রত হও। একটি দরজার পর আর-একটি দরজা ভাঙো, একটি প্রাচীরের পর আর-একটি পাষাণপ্রাচীর বিদীর্ণ করো। তুমি মুক্ত হও, আপনার মধ্যে তুমি বদ্ধ থেকো না। ভূমার মধ্যে তোমার প্রকাশ হোক।

এই-যে যুদ্ধে তিনি আমাদের আহ্বান করেছেন তার অস্ত্র তিনি দিয়েছেন। সে তাঁর ব্রহ্মাস্ত্র; সে শক্তি আমাদের আত্মার মধ্যে রয়েছে। আমরা যখন দুর্বলকণ্ঠে

বলি 'আমার বল নেই' সেইটেই আমাদের মোহ। দুর্জয় বল আমার মধ্যে আছে। তিনি নিরস্ত্র সৈনিককে সংগ্রামক্ষেত্রে পাঠিয়ে দিয়ে পরিহাস করবার জন্যে তার পরাভবের প্রতীক্ষা করে নেই। আমার অন্তরের অস্ত্রশালায় তাঁর শানিত অস্ত্র সব ঝক্ ঝক্ করে জ্বলছে। সে-সব অস্ত্র যতক্ষণ নিজের মধ্যে রেখেছি ততক্ষণ কথায় কথায় ঘুরে ফিরে নিজেই তার উপরে গিয়ে পড়ছি, ততক্ষণ তারা অহরহ আমাকেই ক্ষতবিক্ষত করছে। এ-সমস্ত তো সঞ্চয় করে রাখবার জন্য নয়। আয়ুধকে ধরতে হবে দক্ষিণহস্তের দৃঢ় মুষ্টিতে; পথ কেটে বাধা ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে বাহির হতে হবে। এসো, এসো, দলে দলে বাহির হয়ে পড়ো— নববর্ষের প্রাতঃকালে পূর্বগগনে আজ জয়ভেরি বেজে উঠছে। সমস্ত অবসাদ কেটে যাক, সমস্ত দ্বিধা সমস্ত আত্ম-অবিশ্বাস পায়ের তলায় ধুলোয় লুটিয়ে পড়ে যাক— জয় হোক তোমার, জয় হোক তোমার প্রভুর।

না না, এ শান্তির নববর্ষ নয়। সম্বৎসরের ছিন্নভিন্ন বর্ম খুলে ফেলে দিয়ে আজ আবার নূতন বর্ম পরবার জন্যে এসেছি। আবার ছুটতে হবে। সামনে মহৎ কাজ রয়েছে, মনুষ্যত্বলাভের দুঃসাধ্য সাধনা। সেই কথা স্মরণ করে আনন্দিত হও। মানুষের জয়লক্ষ্মী তোমারই জন্যে প্রতীক্ষা করে আছে, এই কথা জেনে নিরলস উৎসাহে দুঃখব্রতকে আজ বীরের মতো গ্রহণ করো।

প্রভু, আজ তোমাকে কোনো জয়বার্তা জানাতে পারলুম না। কিন্তু, যুদ্ধ চলছে, এ যুদ্ধে ভঙ্গ দেব না। তুমি যখন সত্য, তোমার আদেশ যখন সত্য, তখন কোনো পরাভবকেই আমার চরম পরাভব বলে গণ্য করতে পারব না। আমি জয় করতেই এসেছি; তা যদি না আসতুম তবে তোমার সিংহাসনের সম্মুখে এক মুহূর্ত আমি দাঁড়াতে পারতুম না। তোমার পৃথিবী আমাকে ধারণ করেছে, তোমার সূর্য আমাকে জ্যোতি দিয়েছে, তোমার সমীরণ আমার মধ্যে প্রাণের সংগীত বাজিয়ে তুলেছে, তোমার মহামনুষ্যলোকে আমি অক্ষয় সম্পদের অধিকার লাভ করে জন্মগ্রহণ করেছি; তোমার এত দানকে এত আয়োজনকে আমার জীবনের ব্যর্থতার দ্বারা কখনোই উপহসিত করব না। আজ প্রভাতে আমি তোমার কাছে আরাম চাইতে শান্তি চাইতে দাঁড়াই নি। আজ আমি আমার গৌরব বিস্মৃত হব না। মানুষের যজ্ঞ-আয়োজনকে ফেলে রেখে দিয়ে প্রকৃতির স্নিগ্ধ বিশ্রামের মধ্যে লুকোবার চেষ্টা করব না। যতবার আমরা সেই চেষ্টা করি ততবার তুমি ফিরে ফিরে পাঠিয়ে দাও, আমাদের কাজ কেবল বাড়িয়েই দাও, তোমার আদেশ আরো তীব্র আরো কঠোর হয়ে ওঠে। কেননা, মানুষ আপনার মনুষ্যত্বের ক্ষেত্র থেকে পালিয়ে থাকবে তার

এ লজ্জা তুমি স্বীকার করতে পার না। দুঃখ দিয়ে ফেরাও— পাঠাও তোমার মৃত্যু-দূতকে, ক্ষতিদূতকে। জীবনটাকে নিয়ে যতই এলোমেলো করে ব্যবহার করেছি ততই তাতে সহস্র দুঃসাধ্য গ্রন্থি পড়ে গেছে— সে তো সহজে মোচন করা যাবে না, তাকে ছিন্ন করতে হবে। সেই বেদনা থেকে আলস্যে বা ভয়ে আমাকে লেশমাত্র নিরস্ত হতে দিয়ো না। কতবার নববর্ষ এসেছে, কত নববর্ষের দিনে তোমার কাছে মঙ্গল প্রার্থনা করেছি। কিন্তু, কত মিথ্যা আর বলব। বারে বারে কত মিথ্যা সংকল্প আর উচ্চারণ করব। বাক্যের ব্যর্থ অলংকারকে আর কত রাশীকৃত করে জমিয়ে তুলব। জীবন যদি সত্য হয়ে না থাকে তবে ব্যর্থ জীবনের বেদনা সত্য হয়ে উঠুক— সেই বেদনার বহ্নিশিখায় তুমি আমাকে পবিত্র করো। হে রুদ্র, বৈশাখের প্রথম দিনে আজ আমি তোমাকেই প্রণাম করি— তোমার প্রলয়লীলা আমার জীবনবীণার সমস্ত আলস্যসুপ্ত তারগুলোকে কঠিনবলে আঘাত করুক, তা হলেই আমার মধ্যে তোমার সৃষ্টিলীলার নব আনন্দসংগীত বিশুদ্ধ হয়ে বেজে উঠবে। তা হলেই তোমার প্রসন্নতাকে অবারিত দেখতে পাব, তা হলেই আমি রক্ষা পাব। রুদ্র, যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্। ১ বৈশাখ ১৩১৮

জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮

বৈশাখী ঝড়ের সন্ধ্যা

কর্ম করতে করতে কর্মসূত্রে এক-এক জায়গায় গ্রন্থি পড়ে; তখন তাই নিয়ে কাজ অনেক বেড়ে যায়। সেইটে ছিঁড়তে, খুলতে, সেরে নিতে, চার দিকে কত রকমের টানাটানি করতে হয়— তাতে মন উত্ত্যক্ত হয়ে ওঠে।

এখানকার কাজে ইতিমধ্যে সেই রকমের একটা গ্রন্থি পড়েছিল; তাই নিয়ে নানা দিকে একটা নাড়াচাড়া টানাছেঁড়া উপস্থিত হয়েছিল। তাই ভেবেছিলুম আজ মন্দিরে বসেও সেই জোড়াতাড়ার কাজ কতকটা বুঝি করতে হবে; এ সম্বন্ধে কিছু বলতে হবে, কিছু উপদেশ দিতে হবে। মনের মধ্যে এই নিয়ে কিছু চিন্তা কিছু চেষ্টার আঘাত ছিল। কী করলে জট ছাড়ানো হবে, জঞ্জাল দূর হবে, হিতবাক্য তোমরা অবহিতভাবে শুনতে পারবে, সেই কথা আমার মনকে ভিতরে ভিতরে তাড়না দিচ্ছিল।

এমন সময় দেখতে দেখতে উত্তর-পশ্চিমে ঘনঘোর মেঘ করে এসে সূর্যাস্তের রক্ত

আভাকে বিলুপ্ত করে দিলে। মাঠের পরপারে দেখা গেল যুদ্ধক্ষেত্রের অশ্বারোহী দূতের মতো ধুলায় ধ্বজা উড়িয়ে বাতাস উন্মত্তভাবে ছুটে আসছে।

আমাদের আশ্রমের শালতরুর শ্রেণী এবং তালবনের শিখরের উপর একটা কোলাহল জেগে উঠল, তার পরে দেখতে দেখতে আমবাগানের সমস্ত ডালে ডালে আন্দোলন পড়ে গেল, পাতায় পাতায় মাতামাতির কলমর্মরে আকাশ ভরে গেল— ঘনধারায় বৃষ্টি নেমে এল।

তার পর থেকে এই চকিত বিদ্যুতের সঙ্গে থেকে থেকে মেঘের গর্জন, বাতাসের বেগ এবং অবিরল বর্ষণ চলেছে। মেঘাচ্ছন্ন সন্ধ্যার অন্ধকার ক্রমে নিবিড় হয়ে এসেছে। আজ যে-সব কথা বলবার প্রয়োজন আছে মনে করে এসেছিলুম সে-সব কথা কোথায় যে চলে গিয়েছে তার ঠিকানা নেই।

দীর্ঘকাল অনাবৃষ্টির খরতাপে চারি দিকের মাঠ শুষ্ক হয়ে দগ্ধ হয়ে গিয়েছিল, জল আমাদের ইঁদারার তলায় এসে ঠেকেছিল, আশ্রমের ধেনুদল ব্যাকুল হয়ে উঠছিল। স্নান ও পানের জলের কিরকম ব্যবস্থা করা হবে সেজন্যে আমরা নানা ভাবনা ভাবছিলুম; মনে হচ্ছিল যেন এই কঠোর শুষ্কতার দিনের আর কোনোমতেই অবসান হবে না।

এমন সময় এক সন্ধ্যার মধ্যেই নীল স্নিগ্ধ মেঘ আকাশ ছেয়ে ছড়িয়ে পড়ল; দেখতে দেখতে জলে একেবারে চারি দিক ভেসে গেল। ক্রমে ক্রমে নয়, ক্ষণে ক্ষণে নয়, চিন্তা করে নয়, চেষ্টা করে নয়— পূর্ণতার আবির্ভাব একেবারে অবারিত দ্বার দিয়ে প্রবেশ করে অনায়াসে সমস্ত অধিকার করে নিলে।

গ্রীষ্মসন্ধ্যার এই অপর্যাপ্ত বর্ষণ, এই নিবিড় সুন্দর স্নিগ্ধতা, আমারও মন থেকে সমস্ত প্রয়াস সমস্ত ভাবনাকে একেবারে বিলুপ্ত করে দিয়েছে। পরিপূর্ণতা যে আমারই ক্ষুদ্র চেষ্টার উপর নির্ভর করে দীনভাবে বসে নেই, আমার সমস্ত অন্তঃকরণ যেন এই কথাটা এক মুহূর্তে অনুভব করলে। পরিপূর্ণতাকে শনৈঃ শনৈঃ ক'রে, একটুর সঙ্গে আর-একটুকে জুড়ে গেঁথে, কোনো কালে পাবার জো নেই। সে মৌচাকের মধু ভরা নয়, সে বসন্তের এক নিশ্বাসে বনে বনে লক্ষকোটি ফুলের নিগূঢ় মর্মকোষে মধু সঞ্চারিত করে দেওয়া। অত্যন্ত শুষ্কতা অত্যন্ত অভাবের মাঝখানেও পূর্ণস্বরূপের শক্তি আমাদের অগোচরে আপনিই কাজ করছে— যখন তাঁর সময় হয় তখন নৈরাশ্যের অপার মরুভূমিকেও সরসতায় অভিষিক্ত করে অকস্মাৎ সে কী আশ্চর্যরূপে দেখা দেয়। বহুদিনের মৃতপত্র তখন এক মুহূর্তে ঝেঁটিয়ে ফেলে, বহুকালের শুষ্ক ধূলিকে এক মুহূর্তে শ্যামল করে তোলে — তার আয়োজন যে কোথায় কেমন করে হচ্ছিল তা আমাদের দেখতেও দেয় না।

এই পরিপূর্ণতার প্রকাশ যে কেমন— সে যে কী বাধাহীন, কী প্রচুর, কী মধুর, কী গম্ভীর— সে আজ এই বৈশাখের দিবাবসানে সহসা দেখতে পেয়ে আমাদের সমস্ত মন আনন্দে গান গেয়ে উঠেছে। আজ অন্তরে বাহিরে এই পরিপূর্ণতারই সে অভ্যর্থনা করছে।

সেইজন্যে, আজ তোমাদের যে কিছু উপদেশের কথা বলব আমার সে মন নেই, কিছু বলবার যে দরকার আছে সেও আমার মন বলছে না ; কেবল ইচ্ছা করছে বিশ্বজগতের মধ্যে যে-একটি পরম গম্ভীর অন্তহীন আশা জেগে রয়েছে, কোনো দুঃখ-বিপত্তি-অভাবে যাকে পরাস্ত করতে পারছে না, গানের সুরে তার কাছে আমাদের আনন্দ আজ নিবেদন করে দিই। বলি, আমাদের ভয় নেই, আমাদের ভয় নেই— তোমার পরিপূর্ণ পাত্র নিয়ে যখন দেখা দেবে সে পাত্র উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়তে থাকবে, যে দীনতা কোনোদিন পূরণ হতে পারে এমন কেউ মনে করতেও পারে না সেও পূরণ হয়ে যাবে। নামবে তোমার বর্ষণ, একেবারে ঝর ঝর করে ঝরতে থাকবে তোমার প্রসাদধারা ; গহ্বর যত গভীর তা ভরবে তেমনি গভীর করে।

আজ আর কিছু নয়, আজ মনকে সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ করে পেতে দিই তাঁর কাছে। আজ অন্তরের অন্তরতম গভীরতার মধ্যে অনুভব করি সেখানটি ধীরে ধীরে ভরে উঠছে। বারিধারা ঝরছে ঝরছে— সমস্ত ধুয়ে যাচ্ছে, স্নিগ্ধ হয়ে যাচ্ছে ; সমস্ত নবীন হয়ে উঠছে, শ্যামল হয়ে উঠছে। বাইরে কেউ দেখতে পাচ্ছে না, বাইরে সমস্ত মেঘাবৃত, সমস্ত নিবিড় অন্ধকার, তারই মধ্যে নেমে আসছে তাঁর নিঃশব্দচরণ দূতগুলি, ভরে ভরে নিয়ে আসছে তাঁরই সুধাপাত্র।

আজ যদি এই মন্দিরের মধ্যে বসে সমস্ত মনটিকে প্রসারিত করে দিই, এই জনশূন্য মাঠের মাঝখানে, এই অন্ধকারে-ঘেরা আশ্রমের তরুশাখাগুলির মধ্যে, তবে প্রত্যেক ধূলিকণাটির মধ্যে কী গূঢ় গভীর পুলক অনুভব করব! সেই পুলকোচ্ছ্বাসের গন্ধে আকাশ ভরে গিয়েছে ; প্রত্যেক তৃণ প্রত্যেক পাতাটি আজ উৎফুল্ল হয়ে উঠেছে— তাদের সংখ্যা গণনা করতে কে পারে! পৃথিবীর এই একটি পরিব্যাপ্ত আনন্দ নিবিড় মেঘাচ্ছন্ন সন্ধ্যাকাশের মধ্যে আজ নিঃশব্দে রাশীকৃত হয়ে উঠেছে। চারি দিকের এই মূক অব্যক্ত প্রাণের খুশির সঙ্গে মানুষ তুমিও খুশি হও! এই সহসা-অভাবনীয়কে বুক ভরে পাবার যে খুশি, এই এক মুহূর্তে সমস্ত অভাবের দীনতাকে একেবারে ভাসিয়ে দেবার যে খুশি, সেই খুশির সঙ্গে মানুষ তোমার সমস্ত মন প্রাণ শরীর আজ খুশি হয়ে উঠুক। আজকের এই গগনব্যাপী ঘোর ঘনঘটাকে নিজের মধ্যে গ্রহণ করি। বহুদিনের কর্মক্ষোভ হতে উত্থিত ধূলির আবরণ ধুয়ে আজ ভেসে

যাক— পবিত্র হই, স্নিগ্ধ হই। এসো এসো, তুমি এসো— আমার দিক্‌দিগন্ত পূর্ণ করে তুমি এসো! হে গোপন, তুমি এসো! প্রান্তরের এই নির্জন অন্ধকারের মধ্য দিয়ে, আকাশের এই নিবিড় বৃষ্টিধারার মধ্য দিয়ে তুমি এসো! সমস্ত গাছের পাতা সমস্ত তৃণদলের সঙ্গে আজ পুলকিত হয়ে উঠি। হে নীরব, তুমি এসো, আজ বিনা সাধনের ধন হয়ে ধরা দাও— তোমার নিঃশব্দ চরণের স্পর্শলাভের জন্য আজ আমার সমস্ত হৃদয়কে তোমার সমস্ত আকাশের মধ্যে মেলে দিয়ে স্তব্ধ হয়ে বসি। ৬ বৈশাখ ১৩১৮

শ্রাবণ ১৩১৮

সত্যবোধ

আজকের এই প্রান্তরের উপর জ্যোৎস্নার আলোক দেখে আমার অনেক দিনের আরও কয়েকটি জ্যোৎস্নারাত্রির কথা মনে পড়ছে।

তখন আমি পদ্মানদীতে বাস করতুম। পদ্মার চরে নৌকা বাঁধা থাকত। শুক্লপক্ষের রাত্রিতে কতদিন আমি একলা সেই চরে বেড়িয়েছি। কোথাও ঘাস নেই, গাছ নেই, চাঁদের আলোর সঙ্গে বালুচরের প্রান্ত মিশিয়ে গেছে— সেই পরিব্যাপ্ত শুভ্রতার মধ্যে একটিমাত্র যে ছায়া সে কেবল আমার।

সেই আমার নির্জন সন্ধ্যায় আমার একজন সঙ্গী জুটল। তিনি আমাদের একজন কর্মচারী। তিনি আমার পাশে চলতে চলতে অনেক সময়েই দিনের কাজের আলোচনায় প্রবৃত্ত হতেন। সে সমস্তই দেনাপাওনার কথা, জমিদারির কথা, আমাদের প্রয়োজনের কথা।

সেই আমার কানের কাছে সেই একটিমাত্র মানুষের একটুখানি কণ্ঠের ধ্বনি এতবড়ো নক্ষত্রলোকের অখণ্ড নিস্তব্ধতাকে এক মুহূর্তে ভেঙে দিত এবং এতবড়ো একটি নিভৃত শুভ্রতার উপরেও যেন ঘোমটা পড়ে যেত, তাকে আর যেন আমি স্পষ্ট করে দেখতেই পেতুম না।

তার পরে তিনি চলে গেলে হঠাৎ দেখতে পেতুম আমি এতক্ষণ অত্যন্ত ছোটো হয়ে গিয়েছিলুম, সেইজন্যে চার দিকের বড়োকে আমি আর সত্য বলে জানতে পারছিলুম না; এতবড়ো শান্তিময় সৌন্দর্যময় আকাশ-ভরা প্রত্যক্ষ বর্তমানও আমার কাছে একেবারে কিছুই-না হয়ে গিয়েছিল।

এই নিয়ে কতদিন মনের মধ্যে আমি বিস্ময় অনুভব করেছি। এই কথা মনে

ভেবেছি, যতক্ষণ কেবল আমারই সংক্রান্ত কথা হচ্ছিল, আমারই বিষয়কর্ম, আমারই আয়োজন প্রয়োজন— আমার মনের মধ্যে আমিই যখন একমাত্র প্রধান ব্যক্তি হয়ে উঠেছিলুম— বস্তুত তখনই আমার বিশ্বের মধ্যে আমিই সকলের চেয়ে ছোটো হয়ে গিয়েছিলুম। ততক্ষণ চাঁদ আমার কাছ থেকে তার জ্যোৎস্না ফিরিয়ে নিয়েছিল। নদীর কলধ্বনি আমাকে একেবারে নগণ্য করে দিয়ে পাশে থেকেও আমাকে অস্পৃশ্যের মতো পরিহার করে চলে গিয়েছিল। এই দিগন্তব্যাপী শুভ্র আকাশের মধ্যে তখন আমি আর ছিলুম না, আমি নির্বাসিত হয়ে গিয়েছিলুম।

শুধু তাই নয়, তখন আমার মনের মধ্যে যে ভাব, যে ভাবনা, চারি দিকের বিশ্বজগতের সঙ্গে তার যেন কোনো সত্য যোগ নেই। নিখিলের মাঝখানে তাকে ধরে দেখলে দেখতে পাওয়া যায় সে একটা অদ্ভুত মিথ্যা। জমিজমা হিসাব-কিতাব মামলা-মকদ্দমা এ-সমস্ত শূন্যগর্ভ বুদ্‌বুদ বিশ্বসাগরের মধ্যে কোনো চিহ্নমাত্র না রেখে মুহূর্তে মুহূর্তে কত শতসহস্র বিদীর্ণ হয়ে বিলীন হয়ে যাচ্ছে।

তা হোক, তবু সমুদ্রের মধ্যে বুদ্‌বুদেরও স্থান আছে। সমুদ্রের সমগ্র সত্যটির সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে ওই বুদ্‌বুদেরও যেটুকু সত্য সেটুকুকে একেবারে অস্বীকার করবার দরকারই হয় না। কিন্তু, আমরা যখন এই বুদ্‌বুদের মধ্যে বেষ্টিত হয়ে সমুদ্রের দিকে আমাদের দৃষ্টি একেবারে হারাই তখনই আমাদের বিপদ ঘটে।

আমরা বড়োর মধ্যে আছি এই কথাটি যখন আমাদের মনের মধ্যে স্পষ্ট থাকে তখন ছোটোকে স্বীকার করে নিলে আমাদের কোনো ক্ষতি হয় না। বড়ো জগতে আমাদের বাস, বড়ো সত্যে আমাদের চির আশ্রয়, এই কথাটি যাতে ভুলিয়ে দেয় তাতেই আমাদের সর্বনাশ করে।

বাইরে থেকে দেখতে গেলে বড়োতে আমাদের প্রয়োজন অতি অল্প। ছোটোখাটোর মধ্যে সহজেই আমাদের চলে যায়। কিন্তু যাতে তার কেবলমাত্র চলে যায় মানুষকে তার মধ্যে তো মানুষ থাকতে দেয় নি। মানুষকে সকল দিকেই মানুষ তার থেকে বাইরে টেনে আনছে।

এই-যে তোমরা মানবশিশু, পৃথিবীতে তোমরা সকলের চেয়ে ছোটো; আজ তোমাদের আমরা এই মন্দিরে এনেছি, জগতে সকলের চেয়ে যিনি বড়ো তাঁকে প্রণাম করতে। বাহির থেকে দেখলে কারও হাসি পেতে পারে, মনে হতে পারে এর কী দরকার।

কিন্তু, মনকে একবার জিজ্ঞাসা কোরো, এতবড়ো আকাশ, এতবড়ো বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যেই বা আমাদের জন্মাবার কী দরকার ছিল। আমাদের চার দিকে যথোপযুক্ত

স্থানটুকু মেপে তার চার দিকে বেড়া তুলে দিলে কোনো অসুবিধা হত না; বরঞ্চ অনেক বিষয়ে হয়তো সুবিধা হত, অনেক কাজ হয়তো সহজ হতে পারত।

কিন্তু, ছোটোর পক্ষেও বড়োর একটি গভীরতম অন্তরতম দরকার আছে। সে এক দিকে অত্যন্ত ছোটো হয়েও আর-এক দিকে অত্যন্ত বড়োকে এক মুহূর্তের জন্যেও হারায় নি এই সত্যের মধ্যেই সে বেঁচে আছে। তার চার দিকে সমস্তই তাকে কেবল বড়োর কথাই বলছে। আকাশ কেবলই বলছে 'বড়ো', আলোক কেবলই বলছে 'বড়ো', বাতাস কেবলই বলছে 'বড়ো'। দিবসের পৃথিবী তাকে বলছে 'বড়ো', রাত্রের নক্ষত্রমণ্ডলী তাকে বলছে 'বড়ো'। গ্রহনক্ষত্র থেকে আরম্ভ করে নদী সমুদ্র প্রান্তর সকলেই তার কানের কাছে অহোরাত্র এই এক মন্ত্রই জপ করছে— 'বড়ো'। ছোটো মানুষটি বড়োর মধ্যেই দৃষ্টি মেলেছে, সে বড়োর মধ্যেই নিশ্বাস নিচ্ছে, সে বড়োর মধ্যেই সঞ্চরণ করছে।

এইজন্যে মানুষ ছোটো হয়েও কিছুতেই ছোটোতে সন্তুষ্ট হতে পারছে না। এমন-কি, ছোটোর মধ্যে যে সুখ আছে তাকে ফেলে দিয়ে বড়োর মধ্যে যে দুঃখ আছে তাকেও মানুষ ইচ্ছাপূর্বক প্রার্থনা করে। মানুষের জ্ঞান সূর্য চন্দ্র তারার মধ্যেও তত্ত্ব সন্ধান করে বেড়ায়; তার শক্তি কেবলমাত্র ঘরের মধ্যে আপনাকে আরামে আটকে রাখতে পারে না। এই বড়োর দিকেই মানুষের পথ, সেই দিকেই তার গতি, সেই দিকেই তার শক্তি, সেই দিকেই তার সত্য— এই সহজ কথাটি কখন সে ভুলতে থাকে? যখন সে আপন হাতের-গড়া বেড়া দিয়ে আপনার চার দিক ঘিরে তুলতে থাকে। তখন এই জগৎ থেকে যে বড়োর মন্ত্রটি দিনরাত্রি উঠছে সেটি তার মনের মধ্যে প্রবেশ করবার পথ খুঁজে পায় না। আমরা ছোটো হয়েও বড়ো, এই মস্ত কথাটি তখন দিনে দিনে ভুলে যেতে থাকি। এবং আমাদের সেই এক বড়ো দেবতার আসনটি ছোটো ছোটো শতসহস্র অপদেবতা এসে অধিকার করে বসে।

বড়োর মধ্যেই আমাদের বাস এই সত্যটি স্মরণ করবার জন্যেই আমাদের ধ্যানের মন্ত্রে আছে: ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ। এই কথাটা একেবারে ভুলে গিয়ে যখন আমরা নিশ্চয় করে মনে করে বসি ঘরের মধ্যেই আমাদের বাস, ধনের মধ্যেই আমাদের বাস, তখনই হৃদয়ের মধ্যে যত রাজ্যের উৎপাত জেগে ওঠে— যত কাম ক্রোধ লোভ মোহ। বদ্ধ জলে বদ্ধ বাতাসে যেমন কেবলই বিষ জমে, তেমনি যখনই মনে করি আমাদের সংসারক্ষেত্র আমাদের কর্মক্ষেত্রই আমাদের সত্য আশ্রয় তখনই বিরোধ বিদ্বেষ সংশয় অবিশ্বাস পদে পদে জেগে উঠতে থাকে; তখনই আপনাকে ভুলতে পারি নে এবং অন্যকে কেবলই আঘাত করি।

যেমন আপনার সংসারের মধ্যেই সমস্ত জগৎকে না দেখে জগতের মধ্যেই আপনার সংসারকে দেখলে তবে সত্য দেখা হয়, সেই সত্যকে আশ্রয় করে থাকলে নিজের প্রবৃত্তির বিকৃতি সহজে ঘটতে পারে না, তেমনি প্রত্যেক মানুষকেও আমাদের সত্য করে দেখা চাই।

আমরা মানুষকে সত্য করে কখন দেখি নে? কখন তাকে ছোটো করে দেখি? যখন আমার দিক থেকে তাকে দেখি, তার দিক থেকে তাকে দেখি নে। আমার পক্ষে সে কতখানি এইটে দিয়েই আমরা মানুষকে ওজন করি। আমার পক্ষে তার কী প্রয়োজন, আমি তার কাছ থেকে কতটা আশা করতে পারি, আমার সঙ্গে তার ব্যাবহারিক সম্বন্ধ কতখানি, এই বিচারের দ্বারাই মানুষকে সীমাবদ্ধ করে জানি। যেমন আমরা পৃথিবীতে অধিকাংশ সময়ে এই ভাবেই বাস করি যে, কেবল আমার বিষয়-সম্পত্তিকে আমার ঘরবাড়িকে ধারণ করবার জন্যই বিশ্বজগৎটা রয়েছে, তার স্বতন্ত্র অস্তিত্বের কোনো মূল্য নেই। তেমনি আমরা মনে করি, আমার প্রয়োজন এবং আমার ভালো-লাগা মন্দ-লাগার সম্বন্ধকে বহন করবার জন্যেই মানুষ আছে— আমাকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়েও সে যে কতখানি তা আমরা দেখি নে।

জগৎকে অহরহ ছোটো করে দেখলে যেমন নিজেকেই ছোটো করে ফেলা হয়, তেমনি মানুষকে কেবলই নিজের ব্যাবহারিক সম্বন্ধে ছোটো করে দেখলে নিজেকেই আমরা ছোটো করি। তাতে আমাদের শক্তি ছোটো হয়ে যায়, আমাদের প্রীতি ছোটো হয়ে যায়। জগতে যাঁরা মহাত্মা লোক তাঁরা মানুষকে মানুষ বলে দেখেছেন, নিজের সংস্কার বা নিজের প্রয়োজনের দ্বারা তাকে টুকরো করে দেখেন নি। এতে করে তাঁদের নিজেদের মনুষ্যত্বের মহত্ত্ব প্রকাশ পেয়েছে। মানুষকে তাঁরা দেখেছেন বলেই নিজেকে তাঁরা মানুষের জন্যে দান করতে পেরেছেন।

নিজের দিক থেকেই যখন আমরা অন্যকে দেখি তখন আমরা অতি অনায়াসেই অন্যকে নষ্ট করতে পারি। এমন গল্প শোনা গেছে, ডাকাত মানুষকে খুন করে ফেলে শেষকালে তার চাদরের গ্রন্থি থেকে এক পয়সা মাত্র পেয়েছে। নিজের প্রয়োজনের দিক থেকে দেখে মানুষের প্রাণকে সে এক পয়সার চেয়েও ছোটো করে ফেলেছে। নিজের ভোগপ্রবৃত্তি যখন প্রবল হয়ে ওঠে তখন মানুষকে আমরা ভোগের উপায় বলে দেখি, তাকে আমরা মানুষ বলে সম্মান করি নে— আমার লুব্ধ বাসনা দ্বারা অনায়াসেই আমরা মানুষকে খর্ব করতে পারি। বস্তুত মানুষের প্রতি অত্যাচার অবিচার ঈর্ষা ক্রোধ বিদ্বেষ এ-সমস্তেরই মূল কারণ হচ্ছে মানুষকে আমরা আমার দিক থেকে দেখার

দরুন তার মূল্য কমিয়ে দিই এবং তার প্রতি ক্ষুদ্র ব্যবহার করা আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক হয়ে ওঠে।

এর ফল হয় এই যে, এতে করে আমাদের নিজেদেরই মূল্য কমে যায়। অন্যকে নামিয়ে দিলেই আমরা নেমে যাই। কেননা, মানুষের যথার্থ আশ্রয় মানুষ, আমরা বড়ো হয়ে পরস্পরকে বড়ো করি। যেখানে শূদ্রকে ব্রাহ্মণ নামিয়েছে সেখানে ব্রাহ্মণকেও নীচে নামতে হয়েছে, তার কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। শূদ্র যদি বড়ো হত সে স্বতই ব্রাহ্মণকে বড়ো করে রাখত। রাজা যদি নিজের প্রয়োজন বা সুবিধা বুঝে প্রজাকে খর্ব করে রাখে তবে নিজেকে সে খর্ব করেই। কারণ, কোনো মানুষই বিচ্ছিন্ন নয়; প্রত্যেক মানুষ প্রত্যেক মানুষকে মূল্য দান করে। যেখানে মানুষ ভৃত্যকে ভৃত্যমাত্র মনে না ক'রে মানুষ বলে জ্ঞান করে সেখানে সে মনুষ্যত্বকে সম্মান দেয় ব'লেই যথার্থরূপে নিজেকেই সম্মানিত করে।

কিন্তু, আমাদের তামসিকতাবশত জগতেও যেমন আমরা সত্য করে বাস করি নে মানুষকেও তেমনি আমরা সত্য করে দেখতে পারি নে। সেইজন্যে জগৎকে কেবলই আমার সম্পত্তি করে তুলব এই কথাই আমার অহোরাত্রের ধ্যান হয় এবং সেইজন্যই অধিকাংশ জগৎই আমার কাছে থেকেও না-থাকার মতো হয়ে যায়, মানুষকেও তাই আমরা আমাদের নিজের সংস্কার স্বভাব ও প্রয়োজনের গণ্ডিটুকুর মধ্যেই দেখি; সেইজন্যে মানুষের যে দিকটা নিত্য সত্য, যে দিকটা মহৎ, সে দিকটা আমাদের চোখেই পড়ে না। সেইজন্যে ব্যবসায়ীর মতো আমরা কেবলমাত্র তার মজুরির দাম দিই, আত্মীয়ের মতো তার মনুষ্যত্বের কোনো দাম দিই নে। এইজন্যে যদিচ আমরা বড়োর মধ্যেই আছি তবু আমরা বড়োকে গ্রহণ করি নে, যদিচ সত্যই আমাদের আশ্রয় তবু সে আশ্রয় থেকে নিজেদের বঞ্চিত করি।

এইরকম অবস্থায় মানুষকে আমরা অতি অনায়াসেই আঘাত করি, অপমান করি। মানুষকে এরকম উপেক্ষা করে অবজ্ঞা করে আমাদের যে কোনো প্রয়োজনসিদ্ধি হয় তা নয়, এমন-কি অনেক সময় হয়তো প্রয়োজনের ব্যাঘাত ঘটে— কিন্তু, এ একটা বিকৃতি। বৃহৎ সত্য হতে বিচ্ছিন্ন হলে স্বভাবতই যে বিকৃতি দেখা দেয় এ সেই বিকৃতি। মানুষের মধ্যে এবং বিশ্বজগতের মধ্যে আমরা আমাদের পরিবেষ্টনকে সংকীর্ণ করে নিয়েছি বলেই আমাদের প্রবৃত্তিগুলো দূষিত হয়ে উঠতে থাকে; সেই দূষিত প্রবৃত্তিই মারীরূপে আমাদের নিজেকে এবং অন্যকে মারতে থাকে।

এই আশ্রমে আমাদের যে সাধনা সে হচ্ছে এই বিশ্বে এবং মানুষের মধ্যে সংকীর্ণতা থেকে মুক্তিলাভের সাধনা। সত্যকে আমরা সম্পূর্ণরূপে বোধ করতে চাই। এ সাধনা

সহজ নয়; কিন্তু কঠিন হলেও তবু সত্যের সাধনাই করতে হবে। এ আশ্রম আমাদের সাধনার ক্ষেত্র; সে কথা ভুলে গিয়ে যখনই একে আমরা কেবলমাত্র কর্মক্ষেত্র বলে মনে করি তখনই আমাদের আত্মার বোধশক্তি বিকৃত হতে থাকে, তখনই আমাদের আমিটাই বলবান হয়ে ওঠে। তখনই আমরা পরস্পরকে আঘাত করি, অবিচার করি। তখন আমাদের উক্তি অত্যুক্তি হয়, আমাদের আচার অত্যাচার হয়ে পড়ে।

কর্ম করতে করতে কর্মের সংকীর্ণতা আমাদের ঘিরে ফেলে; কিন্তু দিনের মধ্যে অন্তত একবার মনকে তার বাইরে নিয়ে গিয়ে উদার সত্যকে আমাদের প্রাত্যহিক কর্মপ্রয়োজনের অতীত ক্ষেত্রে দেখে নিতে হবে। সপ্তাহের মধ্যে অন্তত একদিন এমন-ভাবে যাপন করতে হবে যাতে বোঝা যায় যে আমরা সত্যকে মানি। আমাদের সত্য করে বাঁচতে হবে; সমস্ত মিথ্যার জাল, সমস্ত কৃত্রিমতার জঞ্জাল সরিয়ে ফেলতেই হবে— জগতে যিনি সকলের বড়ো তিনিই আমার জীবনের ঈশ্বর এ কথা আমাকে স্বীকার করতেই হবে। আমরা যে তাঁর মধ্যে বেঁচে আছি এ কথা কি জীবনে একদিনও অনুভব করে যেতে পারব না? এই নানা সংস্কারে আঁকা, নানা প্রয়োজনে আঁটা, আমির পর্দাটাকে মাঝে মাঝে সরিয়ে ফেলতে পারলেই তখনই চার দিকে দেখতে পাব জগৎ কী আশ্চর্য অপরূপ! মানুষ কী বিপুল রহস্যময়! তখন মনে হবে এই-সমস্ত পশুপক্ষী গাছপালাকে এই যেন আমি প্রথম সমস্ত মন দিয়ে দেখতে পাচ্ছি; আগে এরা আমার কাছে দেখা দেয় নি। সেইদিনই এই জ্যোৎস্নারাত্রি তার সমস্ত হৃদয় উদ্‌ঘাটন করে দেবে; এই আকাশে এই বাতাসে একটি চিরন্তন বাণী ধ্বনিত হয়ে উঠবে। সেইদিন আমাদের মানবসংসারের মধ্যে জগৎ-সৃষ্টির চরম অভিপ্রায়টিকে সুগভীরভাবে দেখতে পাব; এবং অতি সহজেই দূর হয়ে যাবে সমস্ত দাহ, সমস্ত বিক্ষোভ, এই অহমিকাবেষ্টিত ক্ষুদ্র জীবনের সমস্ত দুঃসহ বিকৃতি। ১৩১৯

ভাদ্র ১৩১৯

সত্য হওয়া

বিশ্বচরাচরকে যিনি সত্য করে বিরাজ করছেন তাঁকেই একেবারে সহজে জানব এই আকাঙ্ক্ষাটি মানুষের আত্মার মধ্যে গোচরে ও অগোচরে কাজ করছে এই কথাটি নিয়ে সেদিন আলোচনা করা গিয়েছিল।

কিন্তু, এই প্রশ্ন মনে উদয় হয়, যিনি সকলের চেয়ে সত্য, যাঁর মধ্যে আমরা আছি, তাঁকে নিতান্ত সহজেই কেন না বুঝি— তাঁকে জানবার জন্যে নিয়ত এত সাধনা এত ডাকাডাকি কেন?

যার মধ্যে আছি তার মধ্যেই সহজ হয়ে ওঠবার জন্যে যে কঠিন চেষ্টার প্রয়োজন হয় তার একটি দৃষ্টান্ত আমাদের সকলেরই জানা আছে; এখানে তারই উল্লেখ করব। মাতার গর্ভে ভ্রূণ অচেতন হয়ে থাকে। মাতার দেহ থেকে সে রস গ্রহণ করে, তাতে তাকে কোনো কষ্ট করতে হয় না। মায়ের স্বাস্থ্যেই তার স্বাস্থ্য, মায়ের পোষণেই তার পোষণ, মায়ের প্রাণেই তার প্রাণ।

যখন সে ভূমিষ্ঠ হয় তখন সে নিশ্চেষ্টতা থেকে একেবারে সচেষ্টতার ক্ষেত্রে এসে পড়ে। এখানে আলোক অজস্র, আকাশ উন্মুক্ত, এখানে সে কোনো আবরণের মধ্যে আবদ্ধ থাকে না। কিন্তু, তবু এই মুক্ত আকাশ প্রশস্ত পৃথিবীতে বাস করেও এই মুক্তির মধ্যে সঞ্চরণের সহজ অধিকার সে একেবারেই পায় না। অনেক দিন পর্যন্ত সে চলতে পারে না, বলতে পারে না। তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে তার হৃদয়ে মনে যে শক্তি আছে, যে-সমস্ত শক্তির দ্বারা সে এই পৃথিবীর মধ্যে সহজ হয়ে উঠবে, তাকে অক্লান্ত চালনা করে অনেক দিনে তবে সে মানুষ হয়ে ওঠে।

ভূমিষ্ঠ শিশু গর্ভবাস থেকে মুক্তি পেয়েছে বটে, তবু অনেক দিন পর্যন্ত গর্ভের সংস্কার তার ঘোচে না। সে চোখ বুজে নিশ্চল হয়ে পড়ে থাকে, নিদ্রিত অবস্থাতেই তার অধিকাংশ সময় কাটে।

কিন্তু, জড়ত্বের এই-সমস্ত লক্ষণ দেখেও তবু আমরা জানি সে চেতনার ক্ষেত্রে বাস করছে, জানি তার এই নিশ্চেষ্ট নিশ্চলতা চিরকাল সত্য নয়। এখনও যদিচ সে চোখ বুজে কাটায়, তবু সে যে আলোকের ক্ষেত্রে জন্মগ্রহণ করেছে এ কথা সত্য এবং এই সত্যটি ক্রমশই তার দৃষ্টিশক্তিকে পূর্ণতররূপে অধিকার করতে থাকবে।

তৎপূর্বে তার চেষ্টা অল্প নয়। বারবার সে পড়ে পড়ে যাচ্ছে, বারবার সে ব্যর্থ হচ্ছে। কিন্তু তার এই কষ্ট দেখে, এই অক্ষমতা দেখে আমরা কখনোই বলি নে যে,

তবে ওর আর কাজ নেই— ও থাক্ মায়ের কোলেই দিনরাত পড়ে থাক্। আমরা তাকে ধরে ধরে বারম্বার চলার চেষ্টাতেই প্রবৃত্ত করি। কেননা, আমরা নিশ্চয় জানি, এই মানবশিশু যেখানে জন্মেছে সেইখানে সঞ্চরণের শক্তিটা যদিও চোখে দেখতে পাচ্ছি নে তবু সেইটেই ওর পক্ষে সত্য, অক্ষমতাই যদিচ চোখে দেখতে পাচ্ছি তবু সেইটেই সত্য নয়। এই নিশ্চিত বিশ্বাসে ভর করে শিশুকে আমরা অভ্যাসে প্রবৃত্ত রাখি বলেই অবশেষে একদিন তার পক্ষে চলা বলা এমনি সহজ হয়ে যায় যে, তার জন্যে এক মুহূর্ত চেষ্টা করতে হয় না।

মানুষের মধ্যে আত্মা মুক্তির ক্ষেত্রে জন্মগ্রহণ করেছে। পশুর চিত্ত বিশ্বপ্রকৃতির গর্ভে আবৃত। সে প্রাকৃতিক সংস্কারের আবরণে আচ্ছন্ন হয়ে অনায়াসে কাজ করে যাচ্ছে। সমস্ত প্রকৃতির চেষ্টা তার মধ্যে চেষ্টারূপে কাজ করছে। ভ্রূণের মতো সে কেবল নিচ্ছে, কেবল বাড়ছে, আপনার প্রাণকে সে কেবল পোষণ করছে। এমনি করে বিশ্বের মধ্যে মিলিত হয়ে সে চলছে বলে ভ্রূণের মতো আপনাকে সে আপনি জানে না।

মানুষের আত্মা প্রকৃতির এই গর্ভ থেকে অধ্যাত্মলোকে জন্মেছে। সে প্রকৃতির সঙ্গে জড়িত হয়ে প্রকৃতির ভিতর থেকে কেবল অন্ধভাবে প্রবৃত্তির তাড়নায় সঞ্চয় করতে থাকবে, এ আর হতেই পারে না। এখন সে কর্তা— এখন সে সৃষ্টি করবে, আপনাকে দান করবে।

মানুষের আত্মা মুক্তিক্ষেত্রে জন্মেছে যদিচ এই কথাটাই সত্য, তবু একেবারেই এর সম্পূর্ণ প্রমাণ আমরা পাচ্ছি নে। প্রকৃতির গর্ভবাসের মধ্যে বদ্ধ অবস্থার যে সংস্কার তা সে এই মুক্তলোকের মধ্যে এসেও একেবারে কাটিয়ে উঠতে পারছে না। আত্মশক্তির সাধনার দ্বারাই সচেষ্টভাবে সে যে আপনাকে এবং জগৎকে অধিকার করবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে এসেছে, এ কথা এখনও তাকে দেখে স্পষ্ট অনুভব করা যায় না। এখনও সে যেন প্রবৃত্তির নাড়ির দ্বারা প্রকৃতি থেকে রস শোষণ করে কেবল জড়ভাবে আপনাকে পুষ্ট করতে থাকবে এমনি তার ভাব; আপনার মধ্যে তার আপনার যে একটি সত্য আশ্রয় আছে এখনও তার উপরে নির্ভর দৃঢ় হয় নি, এইজন্যে প্রকৃতিকেই সে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে আছে; এইজন্যেই শিশুর মতোই সে সব জিনিসকে মুঠোয় নিতে এবং মুখে পুরতে চায়— জানে না জ্ঞানের দ্বারা সকল জিনিসকে নির্লিপ্তভাবে অথচ পূর্ণতরভাবে গ্রহণ করবার দিন তার এসেছে। এখনও সে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করতে পারছে না যে, শক্তিকে মুক্ত করে দেওয়ার দ্বারাই সে আপনাকে পাবে, আপনাকে ত্যাগ করার দ্বারা দান করার দ্বারাই সে আপনাকে

পূর্ণভাবে সপ্রমাণ করবে; সত্যের মধ্যেই তার যথার্থ স্থিতি, সংসার ও বিষয়ের গর্তের মধ্যে নয়, সেই সত্যের মধ্যে তার ক্ষয় নেই, তার ভয় নেই— আপনাকে নিঃসংকোচে শেষ পর্যন্ত উৎসর্গ করে দিয়ে এই অমর সত্যকে প্রকাশ করবার পরম সুযোগ হচ্ছে মানবজন্ম এ কথাটাকে এখনও সে নিঃসংশয়ে গ্রহণ করতে পারছে না।

মানুষের মধ্যে এই দুর্বল দ্বিধা দেখেই একদল দীনচিত্ত লোক মানুষের মাহাত্ম্যকে অবিশ্বাস করে— মানুষের আত্মাকে তারা দেখতে পায় না; তারা ক্ষুধাতৃষ্ণানিদ্রাতুর অহংটাকেই চরম বলে জানে, অন্যটাকে কল্পনা বলে স্থির করে।

কিন্তু, শিশু যদিচ মায়ের কোলে ঘুমিয়ে রয়েছে এবং অচেতনপ্রায় ভাবে তার স্তনপান করছে, অর্থাৎ যদিচ তার ভাব দেখে মন হয় সে একান্তভাবে পরাশ্রিত, তবু যেমন সে কথা সম্পূর্ণ সত্য নয়, বস্তুত সে স্বাধীন কর্তৃত্বের ক্ষেত্রেই জন্মলাভ করেছে— তেমনি মানুষের আত্মা সম্বন্ধেও আমরা আপাতত যত বিরুদ্ধ প্রমাণই পাই নে কেন তবু এই কথাই নিশ্চিত সত্য যে, বিষয়রাজ্যের সে দীন প্রজা নয়, পরমাত্মার মধ্যেই তার সত্য প্রতিষ্ঠা। সে অন্য যে-কোনো জিনিসকেই মুখে প্রার্থনা করুক, অন্য যে-কোনো জিনিসের জন্যই শোক করুক, তার সকল প্রার্থনার অভ্যন্তরেই পরমাত্মার মধ্যে একান্ত সহজ হবার প্রার্থনাই সত্য এবং তাঁর মধ্যে প্রবুদ্ধ না হবার শোকই তার একমাত্র গভীরতম ও সত্যতম শোক।

শিশুকে সংসারে যে আমরা এত বেশি অক্ষম বলে দেখি তার কারণই হচ্ছে সে একান্ত অক্ষম নয়। তার মধ্যে যে সত্য ক্ষমতা ভবিষ্যৎকে আশ্রয় করে আছে তারই সঙ্গে তুলনা করেই তার বর্তমান অক্ষমতাকে এমন বড়ো দেখতে হয়। এই অক্ষমতাই যদি নিত্য সত্য হত তা হলে এ সম্বন্ধে আমাদের কোনো চিন্তারই উদয় হত না।

সূর্যগ্রহণের ছায়া যেমন সূর্যের চেয়ে সত্য নয়, তেমনি স্বার্থবদ্ধ মানবাত্মার দুর্বলতা মানবাত্মার চেয়ে বড়ো সত্য নয়। মানুষ অহংকে নিয়ে যতই নাড়াচাড়া করুক, তাই নিয়ে জগতে যত ভয়ানক আন্দোলন আলোড়ন যত উত্থান পতনই হোক-না কেন তবু সেটাই চরম সত্য কদাচ নয়। মানুষের আত্মাই তার সত্য বস্তু বলেই তার অহমের চাঞ্চল্য এত বেশি প্রবল করে আমাদের আঘাত করে। এই তার অন্তরতম সত্যের মধ্যে সম্পূর্ণ সত্য হয়ে ওঠার সাধনাই হচ্ছে মনুষ্যত্বের চরম সাধনা। এই সত্যের মধ্যে সত্য হতে গেলে বদ্ধভাবে জড়ভাবে হওয়া যায় না; বাধা কাটিয়ে তাকে লাভ না করলে লাভ করাই যায় না। সেইজন্য মানুষের আত্মা যে মুক্তিক্ষেত্রে জন্মগ্রহণ করেছে সেই ক্ষেত্রের সত্য অধিকার সে নিশ্চেষ্টভাবে পেতেই পারে না। এইজন্যেই তার এত বাধা, এবং তার এই-সকল বাধার দ্বারাই প্রমাণ হয় অসত্যপাশ হতে মুক্ত হওয়াই তার সত্য পরিণাম।

১৬।২৭

শিশু যখন চলতে গিয়ে পড়ছে তখন যেমন তাকে বারম্বার পতনসত্ত্বেও চলার অভ্যাস করতে দেওয়া হয়, কারণ সকলেই জানে পড়াটাই তার চরম নয়, সেইরকম প্রত্যহ সত্যলোকে ব্রহ্মলোকে চলার অভ্যাস মানুষকে করতেই হবে। কোনো আলস্য কোনো ক্লেশে নিরস্ত হলে চলবে না।

প্রত্যহ তাঁর কাছে যাওয়া, তাঁকে চিন্তা করা, স্মরণ করা, এইটেই হচ্ছে পন্থা। সংসারে যতই বাঁধা থাকি-না কেন তবু সমস্ত খণ্ডতা সমস্ত অনিত্যের মধ্যে সেই অনন্ত সত্যকে স্বীকার করার দ্বারা মানুষ আপনার আত্মাকে সম্মান করে। বিষয়ের দাসত্ব যতই করি তবু সেইটেই পরম সত্য নয়, প্রতিদিন এই কথা মানুষকে কোনো-এক সময় স্বীকার করতেই হবে। সত্য জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম এই কথাই সত্য, এবং এই সত্যেই আমি সত্য; ধনজনমানের দ্বারা আমি সত্য নই। আমি সত্যলোকে জ্ঞানলোকে বাস করি, আমি ব্রহ্মলোকে প্রতিষ্ঠিত। আমার প্রতিদিনের ব্যবহারে আমি এ কথার সম্পূর্ণ সমর্থন এখনও করতে পারছি নে; তবু মানুষকে এক দিকে আকাশে মাথা তুলে এবং এক দিকে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে বলতে হবে যে, সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম এই কথাই সত্য। এই সত্য, এই সত্য, এই সত্য— প্রতিদিন বলতে হবে; বিমুখ মনকেও বলাতে হবে; ক্ষীণ কণ্ঠকেও উচ্চারণ করাতে হবে। নিয়ত বলতে বলতে আমরা যে সত্যলোকে বাস করছি এই বোধটি ক্রমশই আমাদের কাছে সহজ হয়ে আসবে। তখন অর্ধচেতন অবস্থায় দিন কাটবে না, তখন বারবার ধুলোর উপর পড়ে পড়ে যাব না, তখন আলোর দিকে আকাশের দিকে মাথা তুলে চলতে শিখব; তখন বাইরের সমস্ত বস্তুকেই আমার আত্মার চেয়ে বড়ো করে জানব না, এবং প্রবৃত্তির প্রবল উত্তেজনাকেই প্রকৃত আত্মপরিচয় বলে মনে করব না।

ব্রহ্মকে সহজ করে জানবার শক্তিই আমাদের সত্যকার শক্তি; সেই শক্তি আমাদের আছে; জানতে পারছি নে বলে সে শক্তিকে কখনোই অস্বীকার করব না। বারবার তাঁকে ডাকতে হবে, বারবার তাঁকে বলতে হবে, এই তুমি, এই তুমি, এই তুমি। এই তুমি আমার সম্মুখেই, এই তুমি আমার অন্তরেই। এই তুমি আমার প্রতি মুহূর্তে, এই তুমি আমার অনন্ত কালে। বলতে বলতে তাঁর নামে আমার সমস্ত শরীর বাজতে থাকবে, আমার মন বাজতে থাকবে, আমার বাহির বাজতে থাকবে, আমার সংসার বাজতে থাকবে। আমার চিত্ত বলবে সত্যং, আমার বিশ্বচরাচর বলবে সত্যং। ক্রমে আমার প্রতি দিনের প্রত্যেক কর্ম বলতে থাকবে সত্যং। বেহালা যন্ত্র যতই পুরাতন হয় ততই তার মূল্য বেশি হয় তার কারণ, অনেক দিন থেকে সুর বাজতে বাজতে বেহালার কাষ্ঠফলকের পরমাণুগুলি সুরের ছন্দে ছন্দে সুবিন্যস্ত হয়ে ওঠে,

তখন সুরকে আর সে বাধা দেয় না। সেইরকম আমরা প্রতিদিন তাঁকে যতই ডাকতে থাকি ততই আমাদের শরীর মনের সমস্ত অণু পরমাণু তাঁর সত্য নামে এমন সত্য হয়ে উঠতে থাকে যে বাজতে আর দেরি হয় না, কোথাও কিছুমাত্র আর বাধা দেয় না।

এই সত্যনাম মানুষের সমস্ত শরীরে মনে, মানুষের সমস্ত সংসারে, সমস্ত কর্মে, একতান আশ্চর্য স্বরসম্মিলনে বিচিত্র হয়ে বেজে উঠবে বলে বিশ্বমহাসভার সমস্ত শ্রোতৃমণ্ডলী একাগ্রভাবে অপেক্ষা করে রয়েছে। সমস্ত গ্রহনক্ষত্র, সমস্ত উদ্ভিদ্ পশু পক্ষী মানুষের লোকালয়ের দিকে কান পেতে রয়েছে। আমরা মানুষ হয়ে জন্মে মানুষের চিত্ত দিয়ে তাঁর অমৃতরস আস্বাদন করে মানুষের কণ্ঠে তাঁকে সমস্ত আকাশে ঘোষণা করে দেব এরই জন্যে বিশ্বপ্রকৃতি যুগ যুগান্তর ধরে তার সভা রচনা করছে। বিশ্বের সমস্ত অণু পরমাণু এই সুরের স্পন্দনে পুলকিত হবার জন্যে অপেক্ষা করছে। এখনই তোমরা জেগে ওঠো, এখনই তোমরা তাঁকে ডাকো— এই বনের গাছপালার মধ্যে তার মাধুর্য শিউরে উঠতে থাকবে, এই তোমাদের সামনেকার পৃথিবীর মাটির মধ্যে আনন্দ সঞ্চারিত হতে থাকবে।

মানুষের আত্মা মুক্তিলোকে আনন্দলোকে জন্মগ্রহণ করবে বলে বিশ্বের সূতিকা-গৃহে অনেক দিন ধরে চন্দ্র সূর্য তারার মঙ্গলপ্রদীপ জ্বালানো রয়েছে। যেমনি নবজাত মুক্ত আত্মার প্রাণচেষ্টার ক্রন্দনধ্বনি সমস্ত ক্রন্দসীকে পরিপূর্ণ করে উচ্ছ্বসিত হবে অমনি লোকে লোকান্তরে আনন্দশঙ্খ বেজে উঠবে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সেই প্রত্যাশাকে পূরণ করবার জন্যই মানুষ। নিজের উদরপূরণ এবং স্বার্থসাধনের জন্য নয়। এই কথা প্রত্যহ মনে রেখে নিখিল জগতের সাধনাকে আমরা আপনার সাধনা করে নেব। আমরা সত্যকে প্রত্যক্ষ দেখব, জানব, সত্যে সঞ্চরণ করব এবং অসংকোচে ঘোষণা করব: তুমিই সত্য। ১৩১৯

পৌষ ১৩১৯

সত্যকে দেখা

এই জগতে কেবল আমরা যা চোখে দেখছি কানে শুনছি তাতেই আমাদের চরম তৃপ্তি হচ্ছে না। আমরা কাকে দেখতে চাচ্ছি একেবারে সমস্ত মন সমস্ত হৃদয় মেলে দিয়ে ? আমাদের মনে হচ্ছে যেন আমাদের সমগ্র প্রকৃতি দিয়ে, আমাদের যা-কিছু আছে তার সমস্তকে দিয়ে, যেন আমরা কাকে দেখতে পাব। আমাদের সেই সমস্তটিকে এখনও

মেলা হয় নি— আমাদের চক্ষু মন হৃদয় সমস্তকে একটি উন্মীলিত শতদলের মতো একেবারে এক করে খুলে দেওয়া হয় নি। সেইজন্যে হাজার হাজার বস্তুকে খণ্ড খণ্ড করে একটার পর আর-একটাকে দেখে চলেছি, কিন্তু যাকে নিয়ে এই সমস্ত বস্তুই বাস্তব সেই অখণ্ড সত্যকে আমরা প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছি নে।

কিন্তু, জগতে কেবল আমরা বস্তুকে দেখব না, সত্যকে দেখব, এই একটি নিগূঢ় আকাঙ্ক্ষা প্রত্যেক মানুষের অন্তরের মধ্যে গভীর করে জাগছে। এই যেমন মাটি জল আলো আমরা চোখ মেলে সহজে দেখছি তেমনি এই সমস্ত দেখার মধ্যে এমনি সহজেই সত্যকে দেখব, এই ইচ্ছা আমাদের সকল ইচ্ছার মূলে নিত্য নিয়ত রয়েছে।

শাবক পাখির যখন চোখ ফোটে নি, যখন আলো যে কী সে জানেও না, তখন তার প্রাণের মূলে সেই আলো দেখবার বাসনা নিহিত হয়ে কাজ করছে। যতক্ষণ সে আলো দেখে নি ততক্ষণ সে জগৎকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে একটু একটু করে জানছে; সমস্তকে এক মুহূর্তে এক আলোতে একযোগে জানা যে কাকে বলে তা সে বোঝেও না, কিন্তু তৎসত্ত্বেও সেই বিশ্বের জ্যোতিতেই যে তার চোখের জ্যোতির সার্থকতা এই তত্ত্বটি তার অন্ধতার অন্ধকারে তার মুদ্রিত চোখের মধ্যেও প্রচ্ছন্ন রয়েছে।

তেমনি আমার মধ্যে যে এক সত্য আছে যাকে অবলম্বন করে আমার জীবনের সমস্ত ঘটনা পরস্পর গ্রথিত হয়ে একটি অর্থ লাভ করে, সেই আমার মধ্যেকার সত্য বিশ্বের সত্যকে আপনার চরম সত্য বলে সর্বত্র অতি সহজে উপলব্ধি করবে, এই আকাঙ্ক্ষাটি তার মধ্যে অহরহ গূঢ়ভাবে রয়েছে। এই আকাঙ্ক্ষাটির গভীর ক্রিয়া-ফলে আমাদের আত্মার মুদ্রিত চোখ একদিন ফুটবে; সেদিন আমরা যে দিকে চাব কেবল খণ্ড বস্তুকে দেখব না, অখণ্ড সত্যকে দেখব।

যিনি সকলের চেয়ে সত্য তাঁকেই সকলের চেয়ে সহজে দেখা এই হচ্ছে আমাদের সকল দেখার চরম সাধনা। সেই দেখাটি খুলবে, সেই চোখটি ফুটবে, এইজন্যেই তো রোজ আমরা দুবেলা তাঁর নাম করছি, তাঁকে প্রণাম করছি। তাঁকে ডাকতে ডাকতে, তাঁর দিকে মুখ তুলতে তুলতে, ভিতরের সেই শক্তি ক্রমে জাগ্রত হবে, বাধা কেটে যেতে থাকবে, আত্মার চোখ খুলে যাবে। যেমনি খুলে যাবে অমনি আর তর্ক নয়, যুক্তি নয়, কিছু নয়— অমনি সহজে দেখা, অমনি আমার মনের আনন্দের সঙ্গে সেই আকাশ-ভরা আনন্দের একেবারে গায়ে গায়ে ঠেকা, অমনি আমার সমস্ত শরীরে তাঁর স্পর্শ, সমস্ত মনে তাঁর অনুভূতি। অমনি তখনই অতি সহজে উপলব্ধি যে, তাঁরই আনন্দে আলোক আমার চোখের তারায় আলো হয়ে

নাচছে, তাঁরই আনন্দে বাতাস আমার দেহের মধ্যে প্রাণ হয়ে বয়ে যাচ্ছে। অমনি জানতে পারা যায় যে, এই পৃথিবীর মাটি আমাকে ধরে আছে এ কথাটি সত্য নয়, তিনিই আমাকে ধরে আছেন; এই সংসার আমার আশ্রয় এ কথাটি সত্য নয়, তিনিই আমার আশ্রয়। তখন এ কথা বুঝতে কিছু বিলম্ব হবে না যে আলোক আছে বলে দেখছি তা নয়, তিনিই আমার অন্তরে ও বাইরে সত্য হয়ে আছেন বলেই সমস্ত জিনিসের সঙ্গে আমার দেখার যোগ হচ্ছে, তাঁর শক্তিতেই তাঁকে দেখছি; তাঁরই ধী দিয়ে তাঁকে ধ্যান করছি; তাঁরই সুরে আমার কণ্ঠ তাঁরই নাম করছে; তাঁরই আনন্দে আমি তাঁর স্মরণে আনন্দ পাচ্ছি।

তাই আমি তোমাদের বলছি, তোমরা জান বা না জান তোমাদের গভীর আত্মার পরম চাওয়ার ধন হচ্ছেন তিনি। আমাদের এই আমি সেই পরম আমির মুখোমুখি হয়ে না বসতে পারলে কখনোই তার প্রেম চরিতার্থ হবে না। আর-সমস্তকে সে ধরছে ছাড়ছে হারাচ্ছে; তাই সে এমন একটি আমিকে আপনার প্রত্যক্ষ বোধে চাচ্ছে যার মধ্যে সে চিরন্তনরূপে সম্পূর্ণরূপে আছে; অন্য জিনিসের মতো যাকে ধরতে হয় না, ছুঁতে হয় না, রাখতে হয় না। আমাদের এই ভিতরকার একলা আমি সেই-যে তার পরম সাথিকে সাক্ষাৎ করে জানতে চায় তার কান্না কি শুনতে পাচ্ছ না। তাকে আর তুমি পদে পদে ব্যর্থ কোরো না, তার কান্না থামাও। তোমার আপনকে তুমি আপনি সার্থক করবার জন্যে এসো এসো, প্রতিদিন সাধনায় বোসো। সকালে ঘুম ভেঙেই প্রথম কথা যেন মনে পড়ে তিনি আছেন, আমি তাঁর মধ্যে আছি। যদি অর্ধরাত্রে জেগে ওঠ তবে একবার চোখ চেয়ে দেখে মনকে এই কথাটি বলিয়ে নিয়ো যে, তিনি তাঁর সমস্ত লোকলোকান্তরকে নিয়ে অন্ধকারকে পরিপূর্ণ করে নিস্তব্ধ হয়ে আছেন, আমি তাঁর মধ্যেই আছি। মধ্যাহ্নে কাজ যখন অত্যন্ত উগ্র হয়ে উঠে তোমাকে প্রবল বেগে আকর্ষণ করে নিয়ে চলেছে তখন মুহূর্তকালের জন্যে আপনাকে থামিয়ে এই কথাটি বোলো, তুমি আছ, আমি তোমার মধ্যে আছি। এমনি করেই সকল সময়ে সকল দেখার মধ্যে সত্যকে দেখা সহজ হয়ে যাবে। প্রতিদিন উপাসনায় যখন তাঁর কাছে বসবে মনকে বিমুখ হতে দিয়ো না। তিনি আছেন, তাঁরই সামনে এসে বসেছি, এই সহজ কথাটি যেন এক মুহূর্তেই মন সহজ করে বলতে পারে; যেন এক নিমেষেই একেবারেই তোমার মাথা তাঁর পায়ের কাছে এসে ঠেকে। প্রথম কিছুদিন মন চঞ্চল হতে পারে; কিন্তু প্রতিদিন বসতে বসতে ক্রমেই বসা সত্য হয়ে উঠবে, ক্রমেই তাঁর কাছে পৌঁছতে আর দেরি হবে না। ১৩১৯

মাঘ ১৩১৯

শুচি

প্রসঙ্গক্রমে আজ দ্বিপ্রহরে আমার একটি পবিত্র বাল্যস্মৃতি মনের মধ্যে জাগ্রত হয়ে উঠেছে। বালক বয়সে যখন একটি খৃস্টান বিদ্যালয়ে আমি অধ্যয়ন করেছিলুম তখন একটি অধ্যাপককে দেখেছিলুম যাঁর সঙ্গে আমার সেই অল্পকালের সংসর্গ আমার কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে গেছে।

শুনেছিলুম তিনি স্পেনদেশের একটি সম্ভ্রান্ত ধনীবংশীয় লোক, ভোগৈশ্বর্য সমস্ত পরিত্যাগ করে ধর্মসাধনায় জীবন উৎসর্গ করেছেন। তাঁর পাণ্ডিত্যও অসাধারণ, কিন্তু তিনি তাঁর মণ্ডলীর আদেশক্রমে এই দূর প্রবাসে এক বিদ্যালয়ে নিতান্ত নিম্নশ্রেণীতে অধ্যাপনার কাজ করছেন।

আমাদের ক্লাসে অল্প সময়েরই জন্য তাঁকে দেখতুম। ইংরেজি উচ্চারণ তাঁর পক্ষে কষ্টসাধ্য ছিল, সেজন্যে ক্লাসের ছেলেরা তাঁর পড়ানোতে শ্রদ্ধাপূর্বক মন দিত না; বোধ করি সে তিনি বুঝতে পারতেন, কিন্তু তবু সেই পরম পণ্ডিত অবজ্ঞাপরায়ণ ছাত্রদের নিয়ে অবিচলিত শান্তির সঙ্গে প্রতিদিন তাঁর কর্তব্য সম্পন্ন করে যেতেন।

কিন্তু, নিশ্চয়ই তাঁর সেই শান্তি কর্তব্যপরায়ণতার কঠোর শান্তি নয়। তাঁর সেই শান্ত মুখশ্রীর মধ্যে আমি গভীর একটি মাধুর্য দেখতে পেতুম। যদিচ আমি তখন নিতান্তই বালক ছিলুম, এবং এই অধ্যাপকের সঙ্গে নিকট-পরিচয়ের কোনো সুযোগই আমার ছিল না, তবু এই সৌম্যমূর্তি মৃদুভাষী তাপসের প্রতি আমার ভক্তি অত্যন্ত প্রগাঢ় ছিল।

আমাদের এই অধ্যাপকটি সুশ্রী পুরুষ ছিলেন না, কিন্তু তাঁকে দেখলে বা তাঁকে স্মরণ করলে আমার মন আকৃষ্ট হত। আমি তাঁর মধ্যে কী দেখতে পেতুম সেই কথাটি আজ আমি আলোচনা করে দেখছিলুম।

তাঁর যে সৌন্দর্য সে একটি নম্রতা এবং শুচিতার সৌন্দর্য। আমি যেন তাঁর মুখের মধ্যে, তাঁর ধীর গতির মধ্যে, তাঁর শুচিশুভ্র চিত্তকে দেখতে পেতুম।

এ দেশে আমরা শুচিতার একটি মূর্তি প্রায়ই দেখতে পাই, সে অত্যন্ত সংকীর্ণ। সে যেন নিজের চতুর্দিককে কেবলই নিজের সংস্রব থেকে ধুলোর মতো ঝেড়ে ফেলতে থাকে। তার শুচিতা কৃপণের ধনের মতো কঠিন সতর্কতার সঙ্গে অন্যকে পরিহার করে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে চায়। এইরকম কঠোর আত্মপরায়ণ শুচিতা বিশ্বকে কাছে টানে না, তাকে দূরে ঠেকিয়ে রাখে।

কিন্তু, যথার্থ শুচিতার ছবি আমি আমার সেই অধ্যাপকের মধ্যে দেখেছিলুম। সেই শুচিতার প্রকৃতি কী, তার আশ্রয় কী?

আমরা শুচিতার বাহ্য লক্ষণ এই একটি দেখেছি, আহারে বিহারে পরিমিত ভাব রক্ষা করা। ভোগের প্রাচুর্য শুচিতার আদর্শকে যেন আঘাত করে। কেন করে। যা আমার ভালো লাগে তাকে প্রচুর পরিমাণে সঞ্চয় করা এবং ভোগ করার মধ্যে অপবিত্রতা কেন থাকবে। বিলাসের মধ্যে স্বভাবত দূষণীয় কী আছে। যে-সকল জিনিস আমাদের দৃষ্টি-শ্রুতি-স্পর্শবোধকে পরিতৃপ্ত করে তারা তো সুন্দর, তাদের তো নিন্দা করবার কিছু নেই। তবে নিন্দাটা কোন্‌খানে?

বস্তুত নিন্দাটা আমারই মধ্যে। যখন আমি সর্বপ্রযত্নে আমাকেই ভরণ করতে থাকি তখনই সেটা অশুচিকর হয়ে ওঠে। এই আমার দিকটার মধ্যে একটা অসত্য আছে যেজন্য এই দিকটা অপবিত্র। অন্নকে যদি গায়ে মাখি তবে সেটা অপবিত্র— কিন্তু, যদি খাই তাতে অশুচিতা নেই— কারণ, গায়ে মাখাটা অন্নের সত্য ব্যবহার নয়।

আমার দিকটা যখন একান্ত হয় তখন সে অসত্য হয় এইজন্যই সে অপবিত্র হয়ে ওঠে, কেননা কেবলমাত্র আমার মধ্যে আমি সত্য নই। সেইজন্য যখন কেবল আমার দিকেই আমি সমস্ত মনটাকে দিই তখন আত্মা অসতী হয়ে ওঠে, সে আপনার শুচিতা হারায়। আত্মা পতিব্রতা স্ত্রীর মতো; তার সমস্ত দেহ মন প্রাণ আপনার স্বামীকে নিয়েই সত্য হয়। তার স্বামীই তার প্রিয় আত্মা, তার সত্য আত্মা, তার পরম আত্মা। তার সেই স্বামিসম্বন্ধেই উপনিষদ বলেছেন এষাস্য পরমা গতিঃ, এষাস্য পরমা সম্পৎ, এষোঽস্য পরমোলোকঃ, এষোঽস্য পরমআনন্দঃ। ইনিই তার পরম গতি, ইনিই তার পরম সম্পদ, ইনিই তার পরম আশ্রয়, ইনিই তার পরম আনন্দ।

কিন্তু যখন আমি সমস্ত ভোগকে আমার দিকেই টানতে থাকি, যখন অহোরাত্রি সমস্ত জীবন আমি এমন করে চলতে থাকি যেন আমার স্বামী নেই, আমার স্বামীর সংসারকে কেবলই বঞ্চনা করে নিজের অংশকেই সকলের চেয়ে বড়ো করতে চাই, তখনই আমার জীবন আগাগোড়া কলঙ্কে লিপ্ত হতে থাকে, তখন আমি অসতী। তখন আমি সত্যের ধন হরণ করে অসত্যের পূরণ করবার চেষ্টা করি। সে চেষ্টা চিরকালের মতো সফল হতেই পারে না; যা-কিছু কেবল আমার দিকেই টানব তা নষ্ট হবেই, তার বৃহৎ সফলতা স্থায়ী সফলতা হতেই পারে না; তার জন্যে ভয় ভাবনা এবং শোকের অন্ত নেই। অসত্যের দ্বারা সত্যকে আঁকড়ে রাখা কোনোমতেই চলে না। ভোগের ফুলের মাঝখানে একটি কীট আছে, সেই কীট আমি এই অসত্য আমি; সে ফুলে ফল ধরে না। ভোগের তরণীর মাঝখানে একটি ছিদ্র আছে, সে ছিদ্র আমি এই অসত্য

আমি ; এ তরণী অতৃপ্তিদুঃখের সমুদ্র কখনোই পার হতে পারে না, পথের মধ্যেই সে ডুবিয়ে দেয়।

সেইজন্যে শুচিতার সাধনা যাঁরা করেন ভোগের আকাঙ্ক্ষাকে তাঁরা প্রশ্রয় দেন না। কেননা, এই স্বামিবিমুখ আমির উপকরণ যতই জোগাতে থাকি ততই সে উন্মত্ত হয়ে উঠতে থাকে, ততই তার অতৃপ্তিই তীক্ষ্ণ অঙ্কুশাঘাত করে তাকে প্রলয়ের পথে দৌড় করাতে থাকে। এইজন্যে পৃথিবীর সর্বত্রই উচ্চসাধনার একটা প্রধান অঙ্গ ভোগকে খর্ব করা, সুখের ইচ্ছাকে পরিমিত করা। অর্থাৎ, এমন করে চলা যাতে নিজের দিকেই সমস্ত বোঝা বাড়তে বাড়তে সামঞ্জস্য নষ্ট হয়ে সেই দিকটাতেই কাত হয়ে না পড়ি।

কিন্তু, আমি যাঁর কথা বলছি তিনি ধনমান ত্যাগ করে বৈরাগ্য অবলম্বন করেছেন বলেই যে আমার কাছে এমন মনোহর হয়ে উঠেছিলেন তা নয়। তাঁর মুখ দেখেই বোঝা যেত যেখানে তিনি সত্য সেইখানেই তাঁর মনটি প্রতিষ্ঠিত। তাঁর প্রভুর সঙ্গে মিলনের দ্বারা সর্বদা তিনি সম্পূর্ণ হয়ে আছেন। একটি অলক্ষ্য উপাসনার দ্বারা ভিতরে ভিতরে সর্বদাই তাঁকে স্নান করিয়ে দিচ্ছে; পরমপবিত্রস্বরূপ স্বামীকে তিনি তাঁর আত্মার মধ্যে বরণ করে নিয়েছেন, এইজন্য সুনির্মল শান্তিময় শুচিতায় তাঁর সমস্ত জীবন দীপ্যমান হয়ে উঠেছে। সত্য তাঁকে পবিত্র করে তুলেছে, বাইরের কোনো নিয়ম নয়।

আমরা যখন কেবল নিজেরটি নিয়ে থাকি তখন আমরা আমাদের বড়ো আত্মাটির প্রতি বিমুখ হই; তাতে কেবলই আমাদের সত্যহানি হতে থাকে বলেই তার দ্বারা আমাদের বিকৃতি ঘটে। তাই স্বার্থের জীবন ভোগের জীবন কেবলই মলিনতা দিয়ে আমাদের লিপ্ত করতে থাকে; এই গ্লানি থেকে ঈশ্বর আমাদের রক্ষা করুন, তিনি আমাদের বাঁচান। আমার নিজের সেবা আমার পক্ষে বড়ো লজ্জা, আমার স্বামীর সেবাতেই আমার গৌরব। আমার নিজের সুখের দিকেই যখন আমি নেমে পড়ি তখন আমার বড়ো আমিকে একেবারেই অস্বীকার করি বলেই ভয়ানক ছোটো হয়ে যেতে থাকি; সেই ছোটো আপনাকে ভরতে গিয়েই আপনাকে যথার্থ ভাবে হারাতে থাকি। মানুষ যে ছোটো নয়, মানুষ যে সেই বড়োর যোগে বড়ো। সেই তার বড়োর আনন্দেই সে আনন্দিত হোক; সেই তার বড়োর সম্বন্ধেই সে জগতের সকলকে আপনার করে নিক। সেই তার বড়ো আপনাকে হারিয়ে সে বাঁচবে কেমন করে? আর-কিছুতেই বাঁচতে পারবে না, ধন মান খ্যাতি কিছুতেই না। সত্য না হলে বাঁচব কী করে। আমি কি আপনাকে দিয়ে আপনাকে পূর্ণ করে তুলতে পারি। হে

আমার পরম সত্য, আমি আমার অন্তরে বাহিরে কেবল নিজেকেই আশ্রয় করতে চাচ্ছি বলে কেবল অসত্যের মধ্যে অশুচি হয়ে ডুবছি— আমার মধ্যে হে মহান্, হে পবিত্র, তোমার প্রকাশ হোক, তা হলেই আমি চিরদিনের মতো রক্ষা পাব। হে প্রভু, পাহি মাং নিত্যং, পাহি মাং নিত্যম্। ১৩১৯

আশ্বিন ১৩১৯

বিশেষত্ব ও বিশ্ব

আমার একটি পরম স্নেহাস্পদ ছাত্র আমাকে বলছিলেন : কাল সন্ধ্যাবেলা যখন আমরা ঝড়বৃষ্টিতে মাঠে বেড়াচ্ছিলুম তখন আমার মনে কেবল এই একটা চিন্তা উঠছিল যে, প্রকৃতির মধ্যে এই-যে এতবড়ো একটা আন্দোলন চলছে আমাকে এ যেন দৃক্‌পাতও করছে না, আমি যে একটা ব্যক্তি ও তার কোনো একটা খবরও রাখছে না।

আমি তাঁকে বললুম : সেইজন্যেই তো বিশ্বপ্রকৃতির উপরে পৃথিবীসুদ্ধ লোক এমন দৃঢ় করে নির্ভর করতে পারে। যে বিচারক কোনো বিশেষ লোকের উপর বিশেষ করে তাকায় না, তারই বিচারের উপর সর্বসাধারণে আস্থা রাখে।

এ উত্তরে আমার ছাত্রটি সন্তুষ্ট হলেন না। তাঁর মনের ভাব এই যে, বিচারকের সঙ্গে তো আমাদের প্রেমের সম্বন্ধ নয়, কাজের সম্বন্ধ। আমার মধ্যে যখন একটি বিশেষত্ব আছে, আমি যখন ব্যক্তিবিশেষ, তখন স্বভাবতই সেই বিশেষত্ব একটি বিশেষ সম্বন্ধকে প্রার্থনা করে। যখন সেই বিশেষ সম্বন্ধকে পায় না তখন সে দুঃখ বোধ করে; প্রকৃতির মধ্যে আমাদের সেই দুঃখ আছে। সে আমাকে বিশেষ ব্যক্তি বলে বিশেষ ভাবে মানে না। তার কাছে আমরা সকলেই সমান।

আমি তাঁকে এই কথাটি বোঝাবার চেষ্টা করছিলুম যে, মানুষের বিশেষত্ব তো একটি ঐকান্তিক পদার্থ নয়। মানুষের সত্তার সে একটা প্রান্তমাত্র। মানুষের এক প্রান্তে তার বিশ্ব, অন্য প্রান্তে তার বিশেষত্ব। এই দুই নিয়ে তবে তার সম্পূর্ণতা, তার আনন্দ। যদি আপনার সৃষ্টিছাড়া নিজত্বের মধ্যে মানুষের যথার্থ আনন্দ থাকত তা হলে নিজেরই একটি স্বতন্ত্র জগতের মধ্যে সে বাস করতে পারত, সেখানে তার নিজের সুবিধা অনুসারে সূর্য উঠত কিম্বা উঠত না। সেখানে তার যখন যেমন ইচ্ছা হত তখন তেমনি ঘটত; কোনো বাধা হত না, সুতরাং কোনো দুঃখ থাকত না। সেখানে তার কাউকে

জানবার দরকার হত না, কেননা সেখানে তার ইচ্ছামতোই সমস্ত ঘটছে। এই মুহূর্তেই তার প্রয়োজন-অনুসারে যেটা পাখি, পরমুহূর্তেই সেটা তার প্রয়োজনমতো তার মাথার পাগড়ি হতে পারে। কারণ, পাখি যদি চিরদিনই পাখি হয়, যদি তার পক্ষিত্বের কোনো নড়চড় হওয়া অসম্ভব হয়, তবে কোনো-না-কোনো অবস্থায় আমাদের বিশেষ ইচ্ছাকে সে বাধা দেবেই ; সব সময়েই আমার বিশেষ ইচ্ছার পক্ষে পাখির দরকার হতেই পারে না। আমার মনে আছে একদিন বর্ষার সময় আমার মাস্তুলতোলা বোট নিয়ে গোরাই সেতুর নীচে দিয়ে যাচ্ছিলুম ; মাস্তুল সেতুর গায়ে ঠেকে গেল। এ দিকে বর্ষানদীর প্রবল স্রোতে নৌকাকে বেগে ঠেলছে ; মাস্তুল মড়্‌মড়্‌ করে ভাঙবার উপক্রম করছে। লোহার সেতু যদি সেই সময় লোহার অটল ধর্ম ত্যাগ করে, যদি এক ফুট মাত্র উপরে ওঠে, কিম্বা মাস্তুল যদি কেবল এক সেকেণ্ড্‌মাত্র তার কাঠের ধর্মের ব্যত্যয় করে একটুমাত্র মাথা নিচু করে, কিম্বা নদী যদি বলে 'ক্ষণকালের জন্যে আমার নদীত্বকে একটু খাটো করে দিই, এই বেচারার নৌকোখানা নিরাপদে বেরিয়ে চলে যাক' তা হলেই আমার অনেক দুঃখ নিবারণ হয়। কিন্তু তা হবার জো নেই— লোহা সে লোহাই, কাঠ সে কাঠই, জলও সে জল! এইজন্যে লোহা-কাঠ-জলকে আমার জানা চাই এবং তারা ব্যক্তিবিশেষের প্রয়োজন অনুসারে আপনার ধর্মের কোনো ব্যতিক্রম করে না ব'লেই প্রত্যেক ব্যক্তি তাকে জানতে পারে। নিজের যথেচ্ছাঘটিত জগতের মধ্যে সমস্ত বাধা ও চেষ্টাকে সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়ে বাস করি নে বলেই বিজ্ঞান দর্শন শিল্পকলা ধর্মকর্ম যা-কিছু মানুষের সাধনের ধন সমস্ত সম্ভবপর হয়েছে।

একটা কথা ভেবে দেখো, আমাদের বিশেষ ব্যক্তিত্বের প্রধান সম্বল যে ইচ্ছা, সে ইচ্ছা কাকে চাচ্ছে? যদি আমাদের নিজের মনের মধ্যেই তার তৃপ্তি থাকত তা হলে মনের মধ্যে যা খুশি তাই বানিয়ে বানিয়ে তাকে স্থির করে রাখতে পারতুম। কিন্তু, ইচ্ছা তা চায় না। সে আপনার বাইরের সমস্ত কিছুকে চায়। তা হলে আপনার বাইরে একটা সত্য পদার্থ কিছু থাকা চাই। যদি কিছু থাকে তবে তার একটা সত্য নিয়ম থাকা দরকার, নইলে তাকে থাকাই বলে না। যদি সেই নিয়ম থাকে তবে নিশ্চয়ই আমার ব্যক্তিবিশেষের ইচ্ছাকে সে সব সময়ে খাতির করে চলতেই পারে না।

অতএব, দেখা যাচ্ছে যে বিশ্বকে নিয়ে আমার বিশেষত্ব আনন্দিত সেই বিশ্বের কাছে তাকে বাধা পেতেই হবে, আঘাত পেতেই হবে। নইলে সে বিশ্ব সত্য বিশ্ব হ'ত না, সত্য বিশ্ব না হলে তাকে আনন্দও দিত না। ইচ্ছা যদি আপনার নিয়মেই আপনি বাঁচত, সত্যের সঙ্গে সর্বদা যদি তার যোগ ঘটবার দরকার না হ'ত, তা হলে

ইচ্ছা বলে পদার্থের কোনো অর্থ ই থাকত না ; তা হলে ইচ্ছাই হ'ত না। সত্যকে চায় বলেই আমাদের ইচ্ছা। এমন-কি, আমাদের ইচ্ছা যখন অসম্ভবকে চায় তখনও তাকে সত্যরূপে পেতে চায়, অসম্ভব কল্পনার মধ্যে পেয়ে তার সুখ নেই।

তা হলে দেখতে পাচ্ছি, আমাদের বিশেষত্বের পক্ষে এমন একটি বিশ্বনিয়মের প্রয়োজন যে নিয়ম সত্য, অর্থাৎ যে নিয়ম আমার বিশেষত্বের উপর নির্ভর করে না।

বস্তুত আমি আমাকেই সার্থক করবার জন্যেই বিশ্বকে চাই। এই বিশ্ব যদি আমারই ইচ্ছাধীন একটা মায়া-পদার্থ হয় তা হলে আমাকেই ব্যর্থ করে। আমারই জ্ঞান সার্থক বিশ্বজ্ঞানে, আমারই শক্তি সার্থক বিশ্বশক্তিতে, আমারই প্রেম সার্থক বিশ্বপ্রেমে। তাই যখন দেখছি তখন এ কথা কেমন করে বলব 'বিশ্ব যদি বিশ্বরূপে সত্য না হত, সে যদি আমারই বিশেষ ইচ্ছানুগত হয়ে স্বপ্নের মতো হত তা হলে ভালো হত'? তা হলে সে যে আমারই পক্ষে অনর্থকর হত।

এইজন্যে আমরা দেখতে পাই, আমির মধ্যে যার আনন্দ প্রচুর সেই তার আমিকে বিশেষত্বের দিক থেকে বিশ্বের দিকে নিয়ে যায়। আপনার শক্তিতে যার আনন্দ সে কাজকে সংকীর্ণ করতে পারে না, সে বিশ্বের মধ্যে কাজ করতে চায়। তা করতে গেলেই বিশ্বের নিয়মকে তার মানতে হয়। বস্তুত এমন অবস্থায় বিশ্বের নিয়মকে মানার যে দুঃখ সেই দুঃখ সম্পূর্ণ স্বীকার করাতেই তার আনন্দ। সে কখনোই দুর্বলভাবে কান্নার সুরে বলতে পারে না 'বিশ্ব কেন আপনার নিয়মে আপনি এমনি স্থির হয়ে আছে, সে কেন আমার অনুগত হচ্ছে না'। বিশ্ব আপনার নিয়মে আপনি স্থির হয়ে আছে বলেই মানুষ বিশ্বক্ষেত্রে কাজ করতে পারছে। কবি যখন নিজের ভাবের আনন্দে ভোর হয়ে ওঠেন তখন তিনি সেই আনন্দকে বিশ্বের আনন্দ করতে চান। তা করতে গেলেই আর নিজের খেয়ালমতো চলতে পারেন না। তখন তাঁকে এমন ভাষা আশ্রয় করতে হয় যা সকলের ভাষা, যা তাঁর খেয়াল-মতো একেবারে উলটোপালটা হয়ে চলে না। তাঁকে এমন ছন্দ মানতেই হয় যে ছন্দে সকলের শ্রবণ পরিতৃপ্ত হয়, তিনি বলতে পারেন না 'আমার খুশি আমি ছন্দকে যেমন-তেমন করে চালাব'। ভাগ্যে এমন ভাষা আছে যা সকলের ভাষা, ভাগ্যে ছন্দের এমন নিয়ম আছে যাতে সকলের কানে মিষ্ট লাগে, সেইজন্যেই কবির বিশেষ আনন্দ আপনাকে বিশ্বের আনন্দ করে তুলতে পারে। এই বিশ্বের ভাষা বিশ্বের নিয়মকে মানতে গেলে দুঃখ আছে, কেননা সে তোমাকে খাতির করে চলে না; কিন্তু এই দুঃখকে কবি আনন্দে স্বীকার করে। সৌন্দর্যের যে নিয়ম বিশ্বনিয়ম তাকে সে নিজের রচনার মধ্যে কোথাও লেশমাত্র ক্ষুণ্ণ করতে চায় না; একটুও শৈথিল্য তার পক্ষে অসহ্য। কবি যতই বড়ো

হবে, অর্থাৎ তার বিশেষত্ব যতই মহৎ হবে, ততই বিশ্বনিয়মের সমস্ত শাসন সে স্বীকার করবে; কারণ, এই বিশ্বকে স্বীকার করার দ্বারাই তার বিশেষত্ব সার্থক হয়ে ওঠে।

মানুষের মহত্ত্বই হচ্ছে এইখানে; সে আপনার বিশেষত্বকে বিশ্বের সামগ্রী করে তুলতে পারে, এবং তাতেই তার সকলের চেয়ে বড়ো আনন্দ। মানুষের আমির সঙ্গে বিশ্বের সঙ্গে মেলবার পথ বড়ো রকম করে আছে বলেই মানুষের দুঃখ এবং তাতেই মানুষের আনন্দ। বিশ্বের সঙ্গে পশুর যোগ নিজের খাওয়া-শোওয়ার সম্বন্ধে; এই প্রয়োজনের তাড়নাতেই পশুকে আপনার বাইরে যেতে হয়, এই দুঃখের ভিতর দিয়েই সে সুখ লাভ করে। মানুষের সঙ্গে পশুর একটা মস্ত প্রভেদ হচ্ছে এই, মানুষ যেমন বিশ্বের কাছ থেকে নানা রকম করে নেয় তেমনি মানুষ আপনাকে বিশ্বের কাছে নানা রকম করে দেয়। তার সৌন্দর্যবোধ তার কল্যাণচেষ্টা কেবলই সৃষ্টি করতে চায়; তা না করতে পেলেই সে পঙ্গু হয়ে খর্ব হয়ে যায়। নিতে গেলেও তার নেবার ক্ষেত্র বিশ্ব, দিতে গেলেও তার দেবার ক্ষেত্র বিশ্ব। এ কথা যখন সত্য তখন তুমি যদি বল 'বিশ্বপ্রকৃতি আমার ব্যক্তিগত বিশেষত্বকে মেনে চলে না বলে আমার দুঃখবোধ হচ্ছে' তখন তোমাকে বুঝে দেখতে হবে— মেনে চলে না বলেই তোমার আনন্দ। বিশেষকে মানে না বলেই সে বিশ্ব এবং সে বিশ্ব বলেই বিশেষের তাতে প্রতিষ্ঠা। দুঃখের একান্ত অভাব যদি ঘটত, অর্থাৎ যদি কোথাও কোনো নিয়ম না থাকত, বাধা না থাকত, কেবল আমার ইচ্ছাই থাকত, তা হলে আমার ইচ্ছাও থাকত না; সে অবস্থায় কিছু থাকা না-থাকা একেবারে সমান। অতএব, তুমি যখন মাঠে বেড়াচ্ছিলে তখন ঝড়বৃষ্টি যে তোমাকে কিছুমাত্র মানে নি এ কথাকে যদি বড়ো করে দেখি তা হলে এর মধ্যে কোনো ক্ষোভের কারণ দেখি নে। তা হলে এইটেই দেখতে পাই: ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্যঃ ভয়াদিন্দ্রশ্চবায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ। তাঁরই অটল নিয়মে অগ্নি ও সূর্য তাপ দিচ্ছে, এবং মেঘ বায়ু ও মৃত্যু ধাবিত হচ্ছে। তারা সহস্রের ইচ্ছার দ্বারা তাড়িত নয়, একের শাসনে চালিত। এইজন্যেই তারা সত্য, তারা সুন্দর; এইজন্যেই তাদের মধ্যেই আমার মঙ্গল; এইজন্যেই তাদের সঙ্গে আমার যোগ সম্ভব; এইজন্যেই তাদের কাছ থেকে আমি পাই এবং তাদের মধ্যে আমি আপনাকে দিতে পারি। ১৩১৯

অগ্রহায়ণ ১৩১৯

১৫

পিতার বোধ

যা প্রাণের জিনিস তাকে প্রথার জিনিস করে তোলার যে কত বড়ো লোকসান সে কথা তো প্রতিদিন মনে পড়ে না। কিন্তু, আপনার ক্ষুধাতৃষ্ণাকে তো ফাঁকি দিয়ে সারি নে। অন্নজলকে তো সত্যকারই অন্নজলের মতো ব্যবহার করে থাকি। কেবল আমার ভিতরকার এই-যে মানুষটি ধনে যাকে ধনী করে না, খ্যাতি প্রতিপত্তি যার ললাটে কোনো চিহ্ন দিতে পারে না, সংসারের ছায়ারৌদ্রপাতে যার ক্ষতিবৃদ্ধি কিছুই নির্ভর করে না, সেই আমার অন্তরতম চিরকালের মানুষটিকে দিনের পর দিন বস্তু না দিয়ে কেবল নাম দিয়ে বঞ্চনা করি ; তাকে আমার মন না দিয়ে কেবল মন্ত্র দিয়েই কাজ চালাতে থাকি। সে যা চায় তা নাকি সকলের চেয়ে বড়ো ; এইজন্যে সকলের চেয়ে শূন্য দিয়ে তাকে থামিয়ে রেখে অন্য সমস্ত প্রয়োজন সারবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে বেড়াই।

আমাদের এই বাইরের মানুষের এই সংসারের মানুষের সঙ্গে সেই আমাদের অন্তরের মানুষের একটা মস্ত তফাত হচ্ছে এই যে, এই বাইরের লোকটাকে আমরা আদর করে বা অবজ্ঞা করে উপহারই দিই আর ভিক্ষাই দিই-না কেন সে সেটা পায়, আর সত্যকার ইচ্ছার সঙ্গে শ্রদ্ধার সঙ্গে যা না দিই সে আমার সেই অন্তরের মানুষটির কাছে গিয়েও পৌঁছে না।

সেইজন্যে দানের সম্বন্ধে শাস্ত্রে বলে 'শ্রদ্ধয়া দেয়ম্', শ্রদ্ধার সঙ্গে দান করবে। কেননা, মানুষের বাহিরে ভিতরে দুই বিভাগ আছে, একটা বিভাগে অর্থ এসে পড়ে, আর-একটা বিভাগে শ্রদ্ধা গিয়ে পৌঁছয়। এইজন্য শ্রদ্ধা যদি না দিই, শুধু টাকাই দিই, তা হলে মানুষের অন্তরাত্মাকে কিছুই দেওয়া হয় না, এমন-কি, তাকে অপমানই করা হয়। তেমন দান কখনোই সম্পূর্ণ দান নয় ; সুতরাং সে দান সংসারের দান হতে পারে, কিন্তু সে দান ধর্মের দান হতেই পারে না। দান যে আমরা কেবল পরকেই দিয়ে থাকি তা তো নয়।

বস্তুত, প্রতি মুহূর্তেই আমরা নিজেকে নিজের কাছে দান করছি ; সেই দানের দ্বারাই আমাদের প্রকাশ। সকলেই জানেন, প্রতি মুহূর্তেই আমরা আপনার মধ্যে আপনাকে দাহ করছি ; সেই দাহ করাটাই আমাদের প্রাণক্রিয়া। এমনি করে

আপনার কাছে আপনাকে সেই আহুতি-দান যখনই বন্ধ হয়ে যাবে তখনই প্রাণের আগুন আর জ্বলবে না, জীবনের প্রকাশ শেষ হয়ে যাবে। এইরকম মননক্রিয়াতেও নানাপ্রকার ক্ষয়ের মধ্যে দিয়েই চিন্তাকে জাগাতে হয়। এইজন্যে নিজের প্রকাশকে জাগ্রত রাখতে আমরা অহরহ আপনার মধ্যে আপনার একটি যজ্ঞ করে আপনাকে যত পারছি ততই দান করছি। সেই দানের সম্পূর্ণতার উপরেই আমাদের প্রকাশের সম্পূর্ণতা।

বাতি আপনাকে আপনি যে পরিমাণ দান করবে সেই পরিমাণে তার আলোক উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। যে পরিমাণে নিজের প্রতি তার দানের উপকরণ বিশুদ্ধ হবে সেই পরিমাণে তার শিখা ধূমশূন্য হতে থাকবে। নিজের প্রকাশযজ্ঞে আমাদের যে নিরন্তর দান সে সম্বন্ধেও ঠিক সেই কথাই খাটে।

সে দান তো আমাদের চলছেই ; কিন্তু কী দান করছি এবং সেটা পৌঁচচ্ছে কোন্‌খানে সে তো আমাদের দেখতে হবে। সারাদিন খেটেখুটে বাইরের জিনিস কুড়িয়ে-বাড়িয়ে যা কিছু পাচ্ছি সে আমরা কার হাতে এনে জমা করছি? সে তো সমস্তই দেখছি বাইরেই এসে জমছে। টাকাকড়ি ঘরবাড়ি সে তো এই বাইরের মানুষের।

কিন্তু, নিজেকে এই-যে আমরা দান করছি, এই-যে আমার চেষ্টা, এই-যে আমার সমস্তই, এ কি পূর্ণ দান হচ্ছে। শ্রদ্ধার দান হচ্ছে? ধর্মের দান হচ্ছে? এতে করে আমরা বাড়াচ্ছি, কিন্তু বড়ো হতে পারছি কি। এতে করে আমরা সুখ পাচ্ছি, কিন্তু আনন্দ পাচ্ছি নে ; এতে করে তো আমাদের প্রকাশ পরিপূর্ণ হতে পারছে না। মানুষ বললে যতখানি বোঝায় ততখানি তো ব্যক্ত হয়ে উঠছে না।

কেন এমন হচ্ছে। কেননা, এই দানে মস্ত একটা অশ্রদ্ধা আছে। এই দানের দ্বারা আমরা নিজেকে প্রতিদিন অশ্রদ্ধা করে চলেছি। আমরা নিজের কাছে যে অর্ঘ্য বহন করে আনছি তার দ্বারাই আমরা স্বীকার করছি যে, আমার মধ্যে বরণীয় কিছুই নেই। আমাদের যে আত্মপূজা সে একেবারেই দেবতার পূজা নয়, সে অপদেবতার পূজা, সে অত্যন্ত অবজ্ঞার পূজা। আমাদের যা অপবিত্র তাই দিয়েও আমরা নৈবেদ্যকে ভরিয়ে তুলছি।

নিজেকে যে লোক কেবলই ধনমান জোগাচ্ছে সে লোক নিজের সত্যকে কেবলই অবিশ্বাস করছে ; সে আপনার অন্তরের মানুষকে কেবলই অপমান করছে ; তাকে সে কিছুই দিচ্ছে না, কিছু দেবার যোগ্যই মনে করছে না। এমনি করে সে নিজেকে কেবল অর্থই দিচ্ছে, কিন্তু শ্রদ্ধা দিচ্ছে না— এবং 'শ্রদ্ধয়া দেয়ম্‌' এই উপদেশবাণীটিকে সকলের চেয়ে ব্যর্থ করছে নিজের বেলাতেই।

কিন্তু সত্যকে আমরা হাজার অস্বীকার করলেও সত্যকে তো আমরা বিনাশ করতে পারি নে। আমাদের অন্তরের সত্য মানুষটিকে আমরা যে চিরদিনই কেবল অভুক্ত রেখে দিচ্ছি, তার দুর্গতি তো কোনো আরামে কোনো আড়ম্বরে চাপা পড়ে না। আমরা যার সেবা করি সে তো আমাদের বাঁচায় না, আমরা যার ভোগের সামগ্রী জুগিয়ে চলি সে তো আমাদের এমন একটি কড়িও ফিরিয়ে দেয় না যাকে আমাদের চিরানন্দপথের সম্বল বলে বুকের কাছে যত্ন করে জমিয়ে রেখে দিতে পারি। আরামের পর্দা ছিন্ন করে ফেলে দুঃখের দিন তো বিনা আহ্বানে আমাদের সুসজ্জিত ঘরের মাঝখানে হঠাৎ এসে দাঁড়ায়, তখন তো বুকের রক্ত দিয়েও তার দাবি নিঃশেষে চুকিয়ে মিটিয়ে দিতে পারি নে; আর অকস্মাৎ বজ্রের মতো মৃত্যু এসে আমাদের সংসারের মর্মস্থানের মাঝখানটায় যখন মস্ত একটা ফাঁক রেখে দিয়ে যায় তখন রাশি রাশি ধনজনমান দিয়ে ফাঁক তো কিছুতে ভরিয়ে তুলতে পারি নে। যখন এক দিকে ভার চাপতে চাপতে জীবনের সামঞ্জস্য নষ্ট হয়ে যায়, যখন প্রবৃত্তির সঙ্গে প্রবৃত্তির ঠেকাঠেকি হতে থাকে, অবশেষে ভিতরে ভিতরে পাপের উত্তাপ বাড়তে বাড়তে একদিন যখন বিনাশের দাবানল দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে, তখন লোকজন সৈন্যসামন্ত কাকে ডাকব যে তার উপরে এক ঘড়াও জল ঢেলে দিতে পারে। মূঢ়, কাকে প্রবল করে তুমি বলী হলে, কাকে ধনদান করে তুমি ধনী হতে পারলে, কাকে প্রতিদিন রক্ষা করে করে তুমি চিরদিনের মতো বেঁচে গেলে?

আমাদের অন্তরের সত্য মানুষটি কোন্ আশ্রয়ের জন্যে পথ চেয়ে আছে? আমরা এতদিন ধরে তাকে কোন্ ভরসা দিয়ে এলুম? বাহিরের বৈঠকখানায় আমরা ঝাড়লন্ঠন খাটিয়ে দিলুম, কিন্তু অন্তরের ঘরের কোণটিতে আমরা সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বালালুম না। রাত্রি গভীর হল, অন্ধকার নিবিড় হয়ে এল, সেই তার একলা ঘরের নিবিড় অন্ধকারের মাঝখানে ধুলায় বসে সে যখন কেঁদে উঠল আমরা তখন প্রহরে প্রহরে কী বলে তাকে আশ্বাস দিলুম।

তার সেই মর্মভেদী রোদনে আমাদের নিশীথরাত্রির প্রমোদসভায় যখন ক্ষণে ক্ষণে আমাদের বড়োই ব্যাঘাত করতে লাগল, আমাদের মত্ততার মাঝখানে তার সেই গভীর ক্রন্দন আমাদের নেশাকে যখন ক্ষণে ক্ষণে ছুটিয়ে দেবার উপক্রম করলে, তখন আমরা তাকে কোনোমতে থামিয়ে রাখবার জন্যে তার দরজার বাহিরে দাঁড়িয়ে উচ্চ কণ্ঠে তাকে বলে এসেছি: ভয় নেই তোমার, আমি আছি। মনে করেছি, এই বুঝি তার সকলের চেয়ে বড়ো অভয়মন্ত্র যে 'আমি আছি'। নিজের সমস্ত ধনসম্পদ মানমর্যাদাকে একটা মমতার সূত্রে জপমালার মতো গেঁথে ফেলে তার হাতে

দিয়ে বলেছি: এইটেকেই তুমি দিনরাত্রি বারবার করে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কেবলই একমনে জপ করতে থাকো 'আমি আমি আমি'। আমি সত্য, আমি বড়ো, আমি প্রিয়।

তাই নিয়ে সে জপছে বটে: আমি আমি আমি। কিন্তু, তার চোখ দিয়ে জল পড়া আর কিছুতেই থামছে না। তার ভিতরকার এ কোন্ একটা মহাবিষাদ অশ্রুবিন্দুর গুটি ফিরিয়ে ফিরিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই জপে যাচ্ছে: না না না, নয় নয় নয়। কোন্ তাপসিনীর করুণবীণায় এমন উদাস-করা ভৈরবীর সুরে সমস্ত আকাশকে কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে তুলছে: ব্যর্থ হল, ব্যর্থ হল রে, সকালবেলাকার আলোক ব্যর্থ হল, রাত্রি-বেলাকার স্তব্ধতা ব্যর্থ হল; মায়াকে খুঁজলুম, ছায়াকে পেলুম, কোথাও কিছুই ধরা দিল না।

ওরে মত্ত, কোন্ মাভৈঃ বাণীটির জন্যে আমার এই অন্তরের একলা মানুষ এমন উৎকণ্ঠিত হয়ে কান পেতে রয়েছে? সে হচ্ছে চিরদিনের সেই সত্য বাণী: পিতা নোঽসি, পিতা তুমিই আছ।

তুমি আছ, পিতা, তুমি আছ, আমাদের পিতা তুমি আছ: এই বাণীতেই সমস্ত শূন্য ভরে গেল, সমস্ত ভার সরে গেল, কোনো ভয় আর কোথাও রইল না।

আর ওটা কী ভয়ানক মিথ্যা, ওই-যে 'আমি আছি'! কই আছ, তুমি আছ কোথায়! তুমি ভবসমুদ্রের কোন্ ফেনাগুলাকে আশ্রয় করে বলছ 'আমি আছি'। যে বুদ্‌বুদটি যখনই ফেটে যাচ্ছে তাতে তখনই তোমারই ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে। সংসারে দীর্ঘনিশ্বাসের যে লেশমাত্র তপ্ত হাওয়াটুকু তোমার গায়ে এসে লাগছে তাতে একেবারে তোমার সত্তাকেই গিয়ে ঘা দিচ্ছে। তুমি আছ কিসের উপরে। তুমি কে। অথচ আমার অন্তরের মানুষ যখন বলছে 'চাই' তখন তুমি অহংকার করে তাকে গিয়ে বলছ: আমি আছি, তুমি আমাকেই চাও, তুমি আমাকে নিয়েই খুশি থাকো। এ তোমার কেমন দান। তোমার প্রকাণ্ড বোঝা বইবে কে। এ যে বিষম ভার। এ যে কেবলই বস্তুর পরে বস্তু, কেবলই ক্ষুধার পরে ক্ষুধা, দুর্ভিক্ষের পরে দুর্ভিক্ষ। এ তো তোমাকে আশ্রয় করা নয়, এ যে তোমাকে বহন করা। তুমি যে পঙ্গু, তোমার যে পা নেই, তুমি যে কেবলই অন্যের উপরেই ভর দিয়ে সংসারে চলে বেড়াও। তোমার এ বোঝা যেখানকার সেইখানেই পড়ে পড়ে ধুলোর সঙ্গে ধুলো হয়ে যেতে থাক্! যে মানুষটি যাত্রী, যে পথের পথিক, অনন্তের অভিমুখে যার ডাক আছে, সে তোমার এই ভার টেনে টেনে বেড়াবে কেন। এই-সমস্ত বোঝার উপর দিনরাত্রি বুক দিয়ে চেপে পড়ে থাকবে সে

সময় তার কোথায়। এইজন্যে সে তাঁকেই চায় যাঁর উপরে সে ভর দিতে পারবে, যাঁর ভার তাকে বইতে হবে না। তুমি কি সেই নির্ভর নাকি। তবে কী ভরসা দেবার জন্যে তুমি তার কানের কাছে এসে মন্ত্র জপছ 'আমি আছি'!

পিতা নোঽসি: পিতা, তুমি আছ, তুমি আছ— এই আমার অন্তরের একমাত্র মন্ত্র। তুমি আছ এই দিয়েই আমার জীবনের এবং জগতের সমস্ত কিছু পূর্ণ। 'সত্যং' এই বলে ঋষিরা তোমাকে একমনে জপ করেছেন, সে কথাটির মানে হচ্ছে এই যে: পিতা নোঽসি, পিতা তুমি আছ। যা সত্য তা শুধুমাত্র সত্য নয়, তাই আমার পিতা।

কিন্তু, তুমি আছ এই বোধটিকে তো সমস্ত প্রাণমন দিয়ে পেতে হবে। তুমি আছ, এ তো শুধু একটা মন্ত্র নয়। তুমি আছ, এটা তো শুধু কেবল একটা জেনে রাখবার কথা নয়। তুমি আছ, এই বোধটিকে যদি আমি পূর্ণ করে না যেতে পারি তবে কিসের জন্যে এ জগতে এসেছিলুম, কেনই বা কিছুদিনের জন্য নানা জিনিস আঁকড়ে ধরে ধরে ভেসে বেড়ালুম— শেষকালে কেনই বা এই অসংলগ্ন নিরর্থকতার মধ্যে হঠাৎ দিন ফুরিয়ে গেল।

শক্ত হয়েছে এই যে, আমি আছি এই বোধটিকেই আমি দিবারাত্রি সকল রকম করেই অভ্যাস করে ফেলেছি। জীবনের সকল চেষ্টাতেই কেবল এই আমিকেই নানা রকম করে স্বীকার করে এসেছি, প্রতিদিনের সমস্ত খাজনা তারই হাতে শেষ কড়াটি পর্যন্ত জমা করে দিয়েছি। আমি-বোধটা একেবারে অস্থিমজ্জায় জড়িয়ে গেছে, সে যদি বড়ো দুঃখ দেয় তবু তাকে অন্যমনস্ক হয়েও চেপে ধরি, তাকে ভুলতে ইচ্ছা করলেও ভুলতে পারি নে।

সেইজন্যেই আমাদের প্রতিদিনের প্রার্থনা এই যে, পিতা নো বোধি: তুমি যে পিতা, তুমি যে আছ, এই সত্যের বোধে আমার সমস্ত জীবনকে পূর্ণ করে দাও। পিতা নো বোধি: পিতার বোধ দিয়ে আমার সমস্তকে সমস্তটা ভরে তোলো, কিছুই আর বাকি না থাক্; আমার প্রত্যেক নিশ্বাস প্রশ্বাস পিতার বোধ নিয়ে আমার সর্বশরীরে প্রাণের আনন্দ তরঙ্গিত করে তুলুক, আমার সর্বাঙ্গের স্পর্শচেতনা পিতার বোধে পুলকিত হয়ে উঠুক, পিতার বোধের আলোক আমার দুই চক্ষুকে অভিষিক্ত করে দিক। পিতা নো বোধি: আমার জীবনের সমস্ত সুখকে পিতার বোধে বিনম্র করে দিক, আমার জীবনের সমস্ত দুঃখকে পিতার বোধ করুণাবর্ষণে সফল করে তুলুক। আমার ব্যথা, আমার লজ্জা, আমার দৈন্য, সকলের সঙ্গে আমার সমস্ত বিরোধ, পিতার বোধের অসীমতার মধ্যে একেবারে ভাসিয়ে দিই। এই বোধ প্রতিদিন প্রসারিত হতে থাক্;

নিকট হতে দূরে, দূর হতে দূরান্তরে, আত্মীয় হতে পরে, মিত্র হতে শত্রুতে, সম্পদ হতে বিপদে, জীবন হতে মৃত্যুতে প্রসারিত হতে থাক্— প্রিয় হতে অপ্রিয়ে, লাভ হতে ত্যাগে, আমার ইচ্ছা হতে তোমার ইচ্ছায়।

প্রতিদিন মন্ত্র পড়ে গিয়েছি 'পিতা নো বোধি', কিন্তু একবারও মনেও আনি নি কত বড়ো চাওয়া চাচ্ছি; মনেও আনি নি এই প্রার্থনাকে যদি সত্য করে তুলতে চাই তবে জীবনের সাধনাকে কত বড়ো সাধনা করতে হবে। কত ত্যাগ, কত ক্ষমা, কত পাপের ক্ষালন, কত সংস্কারের আবরণ-মোচন, কত হৃদয়ের গ্রন্থি-ছেদন! জীবনকে সত্য করতে না পারলে সেই অনন্ত সত্যের বোধকে পাব কেমন করে। নিজের নিষ্ঠুর স্বার্থকে ত্যাগ করতে না পারলে সেই অনন্ত করুণার বোধকে গ্রহণ করব কেমন করে। সত্যে মঙ্গলে দয়ায় সৌন্দর্যে আনন্দে নির্মলতায় ভরে রয়েছে, সমস্ত ঘন হয়ে ভরে রয়েছে— সেই তো আমার পিতা, সর্বত্র আমার পিতা। পিতা নোঽসি, পিতা নোঽসি— এই মন্ত্রের অক্ষরই সমস্ত আকাশে, এই মন্ত্রের ধ্বনিই জ্যোতির্ময় স্বর-সপ্তকের বিশ্বসংগীত। পিতা তুমি আছ, এই মন্ত্রই কত অসংখ্য রূপ ধরে লোকলোকান্তরে সমস্ত জীবকে কোলে করে নিয়ে সুখদুঃখের অবিরাম বৈচিত্র্যে সৃষ্টিকে প্রাণপরিপূর্ণ করে রয়েছে। অসীম চেতনজগতের মধ্যে নিয়ত উদ্‌বেলিত তোমার যে পিতার আনন্দ, যে আনন্দে তুমি আপনাকেই আপন সন্তানের মধ্যে নিরীক্ষণ করে লীলা করছ, যে আনন্দে তুমি তোমার সন্তানের মধ্যে ছোটো হয়ে নত হয়ে আসছ এবং তোমার সন্তানকে তোমার মধ্যে বড়ো করে তুলে নিচ্ছ, সেই তোমার অপরিসীম পিতার আনন্দকেই সকলের চেয়ে সত্য ক'রে, আপনার সকলের চেয়ে পরম সম্পদ করে বোধ করতে চাচ্ছে আমার অন্তরাত্মা— তবু সেই জায়গায় আমি কেবলই তার কাছে এনে দিচ্ছি আমার অহংকে। সেই অহংকে কিছুতেই আমি তাড়াতে পারছি নে, তার কাছে আমার নিজের জোর আর কিছুতেই খাটে না, অনেক দিন হল তার হাতেই আমার সমস্ত কেল্লা আমি ছেড়ে দিয়ে বসে আছি। আমার সমস্ত অস্ত্র সেই নিয়েছে, আমার সমস্ত ধনের সেই অধিকারী। সেইজন্যেই তোমার কাছে আমার এই প্রার্থনা, পিতা নো বোধি। পিতা, এই বোধ তুমিই আমার মনে জাগাও। এই বোধটিকে একেবারে বাধাহীন করে লাভ করি যে আমার অস্তিত্ব এ কেবলমাত্রই সন্তানের অস্তিত্ব, আমি তো আর কারও নই, আর কিছুই নই, তোমার সন্তান এই আমার একটিমাত্র সত্য; এই সন্তানের অস্তিত্বকে ঘিরে ঘিরে অন্তরে বাহিরে যা-কিছু আছে, এ সমস্তই পিতার আনন্দ ছাড়া আর কিছুই নয়— এই জল-স্থল-আকাশ, এই জন্মমৃত্যুর জীবনকাব্য, এই সুখদুঃখের সংসারলীলা, এ

সমস্তই সন্তানের জীবনকে আলিঙ্গন করে ধরছে। এইবার কেবল আমার দিকের দরকার আমার সমস্ত প্রাণটা পিতা বলে সাড়া দিয়ে উঠুক। উপরের ডাকের সঙ্গে নীচের ডাকটি মিলে যাক, আমার দিক থেকে কেবল এইটেই বাকি আছে। তোমার দিক থেকে একেবারে জগৎ ভরে উঠল; তুমি আপনাকে দিয়ে আর শেষ করতে পারলে না— পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ একেবারে ছাপিয়ে পড়ে যাচ্ছে। কিন্তু, তোমার এই এতবড়ো আকাশ-ভরা আত্মদান আমরা দেখতেই পাচ্ছি নে,গ্রহণ করতেই পারছি নে কিসের জন্যে। ওই এতটুকু একটুখানি আমির জন্যে। সে যে সমস্ত অনন্তের দিকে পিঠ ফিরিয়ে বলছে 'আমি'! একবার একটুখানি থাম্! একবার আমার জীবনের সব চেয়ে সত্য বলাটা বলতে দে, একবার সন্তানজন্মের চরম ডাকটা ডাকতে দে: পিতা নোঽসি! পিতা পিতা পিতা, তুমি তুমি তুমি, কেবল এই কথাটা— অন্ধকারে আলোতে নির্ভয়ে গলা খুলে কেবল: আছ, আছ, আছ। 'আমি' তার সমস্ত বোঝাসুদ্ধ একেবারে তলিয়ে যাক সেই অতলস্পর্শ সত্যে যেখানে তুমি তোমার সন্তানকে আপনার পরিপূর্ণ আনন্দে আবৃত করে জানছ; তেমনি করে সন্তানকেও জানতে দাও তার পিতাকে। তোমার জানা এবং তার জানার মাঝখানকার বাধাটা একেবারে ঘুচে যাক; তুমি যেমন করে আপনাকে দান করেছ তেমনি করে আমাকে গ্রহণ করো।

নমস্তেঽস্তু, তোমাকে যেন নমস্কার করতে পারি। এই আমার পিতার বোধ যখন জাগে তখন নমস্কারের মধুর রসে সমস্ত জীবন একেবারে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। সর্বত্র যখন পিতাকে পাই তখন সর্বত্র হৃদয় আনন্দে অবনত হয়ে পড়ে। তখন শুনতে পাই জগৎ-ব্রহ্মাণ্ডের গভীরতম মর্মকুহর হতে একটিমাত্র ধ্বনি অনন্তের মধ্যে নিশ্বসিত হয়ে উঠছে: নমোনমঃ। লোকে লোকান্তরে: নমোনমঃ। সুমধুর সুগম্ভীর নমোনমঃ। তখন দেখতে পাই নমস্কারে নমস্কারে নক্ষত্রের সঙ্গে নক্ষত্র একটিমাত্র জায়গায় তাদের জ্যোতির্ময় ললাটকে মিলিত করেছে। সমস্ত বিশ্বের এই আশ্চর্য সুন্দর সামঞ্জস্য— যে সামঞ্জস্য কোথাও কিছুমাত্র ঔদ্ধত্যের দ্বারা সৃষ্টির বিচিত্র ছন্দকে একটুও আঘাত করছে না, আপনার অণুতে পরমাণুতে অনন্তের আনন্দকে সম্পূর্ণ মেনে নিচ্ছে। এই তো সেই নমস্কারের সংগীত, ঊর্ধ্বে অধোতে দিকে দিগন্তরে: নমোনমঃ। এই সমস্ত বিশ্বের নমস্কারের সঙ্গে আমার চিত্ত যখন তার নমস্কারটিকেও এক করে দেয়, সে যখন আর পৃথক থাকতে পারে না, তখন সে চিরকালের মতো ধন্য হয়; তখনই সে বুঝতে পারে, আমি বেঁচে গেলুম, আমি রক্ষা পেলুম। তখনই জগতের সমস্তের মধ্যেই সে আপনার পিতাকে পেলে; কোনো জায়গায় তার আর কোনো ভয় রইল না।

পিতা, নমস্তেঽস্তু। তোমাকে যেন নমস্কার করতে পারি। এই পারাই চরম পারা— এই পারাতেই জীবনের সকল পারা শেষ হয়ে যায়। যেন নমস্কার করতে পারি। সমস্ত যাত্রার অবসানে নদী যেমন আপনাকে দিয়ে সমুদ্রকে এসে নমস্কার করে, সেই নমস্কারটিতেই তার সমস্ত পথযাত্রা একেবারে নিঃশেষে সার্থক, হে পিতা, তেমনি করে একটি পরিপূর্ণ নমস্কারে তোমার মধ্যে আপনাকে যেন শেষ করে দিতে পারি। এই-যে আমার-বাহিরের মানুষটা, এই আমার সংসারের মানুষটা, জন্ম ও মৃত্যুর মাঝখানকার অতি ক্ষুদ্র এই মানুষটা, এ কেবল মাথাটাকে সকলের চেয়ে উঁচুতে তুলে বুক ফুলিয়ে বেড়াতে চায়। সকলের চেয়ে আমি তফাত থাকব, সকলের চেয়ে আমি বড়ো হব, এতেই তার সকলের চেয়ে সুখ। তার একমাত্র কারণ এই, আপনার মধ্যে তার আপনার স্থিতি নেই। বাইরের বিষয়ের উপরেই তার স্থিতি। যত জিনিস বাড়ে ততই সে বাড়ে; নিজের মধ্যে সে শূন্য; সেখানে তার কোনো সম্পদ নেই এইজন্য বাইরে ধন যত জমে ততই সে ধনী হয়। জিনিসপত্র নিয়েই যাকে বড়ো হতে হয় সে তো সকলের সঙ্গে মিলতে পারে না। জিনিসপত্র তো জ্ঞান নয়, প্রেম নয়; সকলকে দান করার দ্বারাই তো সে আরও বাড়ে না, ভাগ করার দ্বারাই তো সে আরও ঘনীভূত হয়ে উঠে না। তার থেকে যা যায় তা যায়, সে তো আরও দ্বিগুণ হয়ে ফিরে আসে না। তার যা আমার তা আমার, যা অন্যের তা অন্যেরই— এইজন্যে যে মানুষটা উপকরণ নিয়েই বড়ো হয় সকলের থেকে তফাত হয়েই সে বড়ো হয়। আপনার সম্পদকে সকলের সঙ্গে মেলাতে গেলেই তার ক্ষতি হতে থাকে। এইজন্যে যতই সে বড়ো হয় ততই তার আমিটাই উঁচু হয়ে উঠতে থাকে, ততই চারি দিকের সঙ্গে তার যোগ বিচ্ছিন্ন হতে থাকে এবং তার সমস্ত সুখই অহংকারের রূপ ধারণ করে অন্য সকলকে অবনত করতে চায়। এমনি করে বিশ্বের সঙ্গে বিরোধের দ্বারাই সে যে দুঃসহ তাপের সৃষ্টি করে সেইটেকেই সে আপনার প্রতাপ বলে গণ্য করে।

কিন্তু, আমার অন্তরের নিত্য মানুষটি তো দিনরাত্রি মাথা উঁচু করে বেড়াতে চায় নি, সে নমস্কার করতেই চেয়েছিল। তার সমস্ত আনন্দ নমস্কারের দ্বারা বিশ্বজগতে প্রবাহিত হয়ে যেতে চেয়েছে, নমস্কারের দ্বারা তার আত্মসমর্পণ পরিপূর্ণ হতে চায়। নমস্কারের দ্বারা সে আপনাকে সেই জায়গাতেই প্রসারিত করে যেখানে তুমি তোমার পা রেখেছ, যেখানে তোমার চরণাশ্রয় করে জগতের ছোটো বড়ো সকলেই এক জায়গায় এসে মিলেছে, যেখানে দরিদ্রকে ধনী দ্বারের বাইরে দাঁড় করাতে পারে না, শূদ্রকে ব্রাহ্মণ দূরে সরিয়ে রেখে দিতে পারে না। সেই তো সকলের চেয়ে নীচের জায়গা, সেই তো সকলের চেয়ে প্রশস্ত জায়গা, সেই তোমার অনন্তপ্রসারিত পাদপীঠ।

আমার অন্তরাত্মা পরিপূর্ণ নমস্কারের দ্বারা সেই সর্বজনভোগ্য মহাপুণ্যস্থানের অধিকারটি পেতে ব্যাকুল হয়ে আছে। যে স্থানটি নিয়ে রাজা তার কাছ থেকে খাজনা দাবি করবে না, পাশের মানুষ তার সঙ্গে লাঠালাঠি করতে আসবে না, সত্য নমস্কারটি যে স্থানের একমাত্র সত্য দলিল— সেই সম্পত্তিই আমার অন্তরাত্মার পৈতৃক সম্পত্তি।

জল যখন তাপের দ্বারা হালকা হয়ে যায় তখনই সে বাষ্প হয়ে উপরে চড়তে থাকে। তখনই সে পৃথিবীর সমস্ত জলরাশির সঙ্গে আপনার সম্বন্ধকে পৃথক করে ফেলে। তখনই সে ব্যর্থ হয়ে স্ফীত হয়ে উড়ে বেড়ায়, তখনই সে আলোককে আবৃত করে। কিন্তু, তৎসত্ত্বেও সকলেই জানে, জলের যথার্থ স্বধর্মই হচ্ছে সে আপনার সমতলতাকেই চায়। সেই সমতলতাকে চাওয়ার মধ্যেই তার নমস্কারের প্রার্থনা, সেই নমস্কারের দ্বারাই সে রসধারায় সকল দিকে প্রবাহিত হয়, পৃথিবীর মাটিকে সফলতায় অভিষিক্ত করে দেয়— তার সেই প্রণত সাষ্টাঙ্গ নমস্কারই সমস্ত পৃথিবীর কল্যাণ। যে লঘুবাষ্পরাশি পৃথক হয়ে উঁচুতে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, নিচেকার সঙ্গে আপনার কোনো আত্মীয়তা স্বীকার করতেই চায় না, তার গায়ে শুভক্ষণে যেই একটু রসের হাওয়া লাগে, যেই সে আপনার যথার্থ গৌরবে ভরে ওঠে, অমনি সে আপনাকে আর ধারণ করে রাখতে পারে না; নমস্কারে বিগলিত হয়ে সেই সর্বজনের নিম্নক্ষেত্রে, সেই সকলের মাঝখানে এসে লুটিয়ে পড়তে থাকে। তখনই জলের সঙ্গে জল মিশে যায়, তখনই মিলনের স্রোত চার দিকে ছুটে বইতে থাকে, বর্ষণের সংগীতে দশ দিক মুখরিত হয়ে ওঠে, প্রত্যেক জলবিন্দু তখনই আপনাকে সত্যরূপে লাভ করে, আপনার ধর্মে আপনি পূর্ণ হয়ে ওঠে।

তেমনি আমার অন্তরের মানুষটি অন্তরে অন্তরে আপনাকে বর্ষণ করতে, আপনাকে সমর্পণ করতে চাচ্ছে। এই তার যথার্থ ধর্ম। সে অহংকারের বাধা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করে দিয়ে নমস্কারের গৌরবকেই চাচ্ছে; পরিপূর্ণ প্রণতির দ্বারা নিখিলের সমস্তের সঙ্গে আপনার সুবৃহৎ সমতলতা লাভের জন্য চিরদিন সে উৎকণ্ঠিত হয়ে আছে। আপনার সেই অন্তরতম স্বধর্মটিকে যে পর্যন্ত সে না পাচ্ছে সেই পর্যন্তই তার যত-কিছু দুঃখ, যত-কিছু অপমান। এইজন্যেই সে প্রতিদিন জোড়হাত করে বলছে, নমস্তেঽস্তু— তোমাকে যেন নমস্কার করতে পারি।

তোমাকে নমস্কার করা, এ কথাটি সহজ কথা নয়। এ তো কেবল অভ্যস্তভাবে মাথা নিচু করা নয়। পিতা নোঽসি, তুমি আমাদের সকলেরই পিতা, এই কথাটিকে তো সহজে বলতে পারলুম না। যখন ভেবে দেখি এই কথাটি বলবার পথ প্রতিদিনই

সকল ব্যবহারেই কেমন করে অবরুদ্ধ করে ফেলছি তখন মনে ভয় হয়, মনে করি সন্তানের নমস্কার বুঝি এ জীবনের শেষদিন পর্যন্ত আর সম্পূর্ণ হতে পারল না; মানুষের জীবনে যে রস সকল রসের সার সেই পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণের মধুরতম রসটি হৃদয়ের মধ্যে বুঝি কণামাত্রও জায়গা পেল না। কেমন করেই বা পাবে। শুষ্ক যে সে আপনার শুষ্কতা নিয়েই গর্ব করে, ক্ষুদ্র যে সে যে আপনার ক্ষুদ্রতা নিয়েই উদ্ধত হয়ে ওঠে। স্বাতন্ত্র্যের সংকীর্ণতাকে ত্যাগ করতে গেলে সে যে কেবলই মনে করে আমি আমার আত্মাকে খর্ব করলুম। সে যে নমস্কার করতে চাচ্ছেই না। তার এমনই দুর্দশা যে উপাসনার সময় যখন সে তোমার কাছে আসে তখনও সে আপনার অহংটাকেই এগিয়ে নিয়ে আসে। সংসারক্ষেত্রে যেখানে সমস্তই আত্মপর ও উচ্চ-নীচের দ্বারাই আমরা সীমাচিহ্নিত করে রেখেছি সেখানে সর্বলোকপিতা যে তুমি তোমাকে নমস্কার করবার তো জায়গাই পাই নে, তোমাকে সত্যকার নমস্কার করতে গেলে সকল দিকেই নানা দেয়ালেই মাথা ঠেকে যায়, কিন্তু তোমার এই পূজার ক্ষেত্রে যেখানে কেবল ক্ষণকালের জন্যেই আমরা পরিচিত-অপরিচিত পণ্ডিত-মূর্খ ধনী-দরিদ্র তোমারই নামে একত্র সমবেত হই সেখানেও যে মুহূর্তেই আমরা মুখে উচ্চারণ করছি 'পিতা নোহসি', তুমি আমাদের সকলের পিতা, তুমিই আছ, তুমিই সত্য— সেই মুহূর্তেই আমরা মনে মনে লোকের জাতি বিচার করছি, বিদ্যা বিচার করছি, সম্প্রদায় বিচার করছি। যখনই বলছি নমস্তেঽস্তু তখনই নমস্কারকে অন্তরে কলুষিত করছি, সকলের পিতা বলে যে অসংকুচিত নমস্কার তোমাকেই দিতে এসেছি তার অধিকাংশই তোমার কাছ থেকে হরণ করে নিয়ে আমার সমাজটারই পায়ের কাছে স্থাপন করছি। সংসারে আমার অহং নিজের জোরে স্পষ্ট করেই প্রকাশ্যে বুক ফুলিয়ে বেড়ায়। সেখানে তার নিজের পূর্ণ অধিকার সম্বন্ধে নিজের কোনো সংশয় বা লজ্জা নেই। এখানে তোমার পূজার ক্ষেত্রে তার অনধিকারের বাধাকে এড়াবার জন্যে সে নিজেকে প্রচ্ছন্ন করে আসে; কিন্তু এখানে তার সকলের চেয়ে ভয়ংকর স্পর্ধা এই যে, ছদ্মবেশে তোমারই সে অংশী হতে চায়, তোমার নামের সঙ্গে সে নিজের নামকে জড়িত করে এবং তোমার পূজার মধ্যেও সে নিজের অপবিত্র হস্তকে প্রসারিত করতে কুণ্ঠিত হয় না।

এমনি করে কি চিরদিনই আমরা তোমার নমস্কারকেও সাম্প্রদায়িক সামাজিক প্রথার মধ্যে এবং ব্যক্তিগত অভ্যাসের মধ্যেই ঠেলে রেখে দেব। কিন্তু কেন। তার প্রয়োজন কী আছে। তোমাকে নমস্কার তো আমার টাকা নয়, কড়ি নয়, ঘর নয়, বাড়ি নয়। তোমাকে নমস্কার করে আমার বাইরের মানুষটি তো তার থলির মধ্যে

কিছুই ভরতে পারে না। রাজাকে নমস্কার করলে তার লাভ আছে, সমাজকে নমস্কার করলে তার সুবিধা আছে, প্রবলকে নমস্কার করলে তার সাংসারিক অনেক আপদ এড়ায় ; কিন্তু সে যদি দলের দিকে, সমাজের দিকে, অনিমেষ নেত্র মেলেই থাকে তবে তোমাকে নমস্কার করার কথা উচ্চারণ করবারই বা তার লেশমাত্র প্রয়োজন কী আছে।

প্রয়োজন যে একমাত্র তারই যে আমার ভিতরের মানুষ— সে যে নিত্য মানুষ, সে তো সংসারের মানুষ নয়, সে তো সমাজের কাছ থেকে ছোটো বড়ো কোনো উপাধি গ্রহণ করে সেই চিহ্নে আপনাকে চিহ্নিত করে না। তার চরম প্রয়োজন সকলের সঙ্গে আপনাকে এক করে জানা ; তা হলেই সে আপনাকে সত্য জানতে পারে ; সেই সত্য জানা থেকে বঞ্চিত হলেই সে মুহ্যমান হয়ে অপবিত্র হয়ে জগতে বাস করে। আপনাকে সত্যরূপে জানবার জন্যেই, সমাজসংস্কারের সংকীর্ণ জালের মধ্যে নিজেকে নিত্যকাল জড়িত করে রাখবার দীনতা হতে উদ্ধার পাবার জন্যেই সে ডাকছে তার পিতাকে, সে ডাকছে নিখিল মানুষের পিতাকে ; সেই তার পিতার বোধের মধ্যেই তার আপনার বোধ সত্য হবে, তার বিশ্বের সম্বন্ধ সম্পূর্ণ হবে। এ ডাক সমাজের ডাক নয়, সম্প্রদায়ের ডাক নয়, এ ডাক অন্তরাত্মার ডাক। এ ডাক কুলশীলের ডাক নয়, মানসম্ভ্রমের ডাক নয়, এ ডাক সন্তানের ডাক। এই একটিমাত্র ডাকেই সকল সন্তানের কণ্ঠ এক সুরে মেলে, এই 'পিতা নোঽসি'। তাই এ ডাকের সঙ্গে কোনো অহংকার কোনো সংস্কারকে মেলাতে গেলেই এই পরম সংগীতকে এক মুহূর্তেই বেসুরো করা হবে ; তাতে আত্মা পীড়িত হবে এবং হে পরমাত্মন্, তাতে তোমাকেই বেদনা দেওয়া হবে যে তুমি সকল সন্তানের ব্যথার ব্যথী।

তাই তোমার কাছে অন্তরের এই অন্তরতম প্রার্থনা, যেন নত হই, নত হই। সেই নতি দীনতার নতি নয়, সে যে পরম পরিপূর্ণতার প্রণতি। তোমার কাছে সেই একান্ত নমস্কার আত্মসমর্পণের পরমৈশ্বর্য। আমাদের সেই নমস্কার সত্য হোক, সত্য হোক ; অহং শান্ত হোক, অহংকার ক্ষয় হোক, ভেদবুদ্ধি দূর হোক, পিতার বোধ পূর্ণ হোক এবং বিশ্বভুবনে সন্তানের প্রণামের সঙ্গে পিতার বিগলিত আনন্দধারা সম্মিলিত হোক। নমস্তেঽস্তু।—

সকল দেহ লুটিয়ে পড়ুক তোমার এ সংসারে
একটি নমস্কারে প্রভু, একটি নমস্কারে।
ঘনশ্রাবণমেঘের মতো রসের ভারে নম্র নত
সমস্ত মন থাক্ পড়ে থাক্ তব ভবনদ্বারে
একটি নমস্কারে প্রভু, একটি নমস্কারে।

নানা সুরের আকুল ধারা মিলিয়ে দিয়ে আত্মহারা
সমস্ত গান সমাপ্ত হোক নীরব পারাবারে
একটি নমস্কারে প্রভু, একটি নমস্কারে।
হংস যেমন মানসযাত্রী তেমনি সারা দিবসরাত্রি
সমস্ত প্রাণ উড়ে চলুক মরণপরপারে
একটি নমস্কারে প্রভু, একটি নমস্কারে।

১১ মাঘ ১৩১৮

ফাল্গুন ১৩২০

সৃষ্টির অধিকার

দিন তো যাবেই ; এমনি করেই তো দিনের পর দিন গিয়েছে। কিন্তু, সব মানুষেরই ভিতরে এই একটি বেদনা রয়েছে যে যেটা হবার সেটা হয় নি। দিন তো যাবে, কিন্তু মানুষ কেবলই বলেছে : হবে, আমার যা হবার তা আমাকে হতেই হবে, এখনও তার কিছুই হয় নি। তাই যদি না হয়ে থাকে তবে মানুষ আর কিসের মানুষ, পশুর সঙ্গে তার পার্থক্য কোথায়! পশু তার প্রাত্যহিক জীবনে তার যে-সমস্ত প্রবৃত্তি রয়েছে তাদের চরিতার্থতা সাধন করে যাচ্ছে, তার মধ্যে তো কোনো বেদনা নেই। এখনও যা হয়ে ওঠবার তা হয় নি, এ কথা তো তার কথা নয়। কিন্তু মানুষের জীবনের সমস্ত কর্মের ভিতরে ভিতরে এই বেদনাটি রয়েছে— হয় নি, যা হবার তা হয় নি। কী হয় নি। আমি যা হব বলে পৃথিবীতে এলুম তাই যে হলুম না, সেই হবার সংকল্প যে জোর করে নিতে পারলুম না। আমার পথ আমি নেব, আমার যা হবার আমি তাই হব, এই কথাটি জোর করে বলতে পারলুম না বলেই এই বেদনা জেগে উঠছে যে হয় নি, হয় নি, দিন আমার বৃথাই বয়ে যাচ্ছে। গাছকে পশুপক্ষীকে তো এ সংকল্প করতে হয় না, মানুষকেই এই কথা বলতে হয়েছে যে আমি হব। যতক্ষণ পর্যন্ত এ সংকল্পকে সে দৃঢ়ভাবে ধরতে পারছে না, এই কথা সে জোর করে বলতে পারছে না, ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষ পশুপক্ষী-তরুলতার সঙ্গে সমান। কিন্তু, ভগবান তাকে তাদের সঙ্গে সমান হতে দেবেন না ; তিনি চান যে তাঁর বিশ্বের মধ্যে কেবল মানুষই আপনাকে গড়ে তুলবে, আপনার ভিতরকার মনুষ্যত্বটিকে অবাধে প্রকাশ করবে। সেইজন্যে তিনি মানুষের শিশুকে সকলের চেয়ে অসহায় করে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন, তাকে উলঙ্গ ক'রে দুর্বল ক'রে পাঠিয়েছেন। আর-সকলেরই জীবনরক্ষার জন্যে যে-সকল উপকরণের দরকার তা তিনি দিয়েছেন ; বাঘকে

তীক্ষ্ণ নখদন্ত দিয়ে সাজিয়ে পাঠিয়েছেন। কিন্তু, এ কী তাঁর আশ্চর্য লীলা যে মানুষের শিশুকে তিনি সকলের চেয়ে দুর্বল অক্ষম ও অসহায় করে দিয়েছেন; কারণ, এরই ভিতর থেকে তিনি তাঁর পরমা শক্তিকে দেখাবেন। যেখানে তাঁর শক্তি সকলের চেয়ে বেশি থেকেও সকলের চেয়ে প্রচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে সেইখানেই তো তাঁর আনন্দের লীলা। এই দুর্বল মনুষ্যশরীরের ভিতর দিয়ে যে একটি পরমা শক্তি প্রকাশিত হবে এই তাঁর আহ্বান।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আর-সব তৈরি, চন্দ্রসূর্য তরুলতা সমস্তই তৈরি; কেবল মানুষকেই তিনি অসম্পূর্ণ করে পাঠিয়েছেন। সকলের চেয়ে অসহায় করে মায়ের কোলে যাকে পাঠালেন সেই যে সকলের চেয়ে শক্তিশালী ও সম্পূর্ণ হবার অধিকারী, এই লীলাই তো তিনি দেখাবেন। কিন্তু, আমরা কী তাঁর এই ইচ্ছাকে ব্যর্থ করব। তিনি বাইরে আমাদের যে দুর্বলতার বেশ পরিয়ে পাঠিয়েছেন তারই মধ্যে আমরা আবৃত থাকব, এ হলে আর কী হল। এ পৃথিবীতে তো কোথাও দুর্বলতা নেই। এই পৃথিবীর ভূমি কী নিশ্চল অটল, সূর্যচন্দ্র গ্রহনক্ষত্র আপন আপন কক্ষপথে কী স্থিরভাবে প্রতিষ্ঠিত! এখানে একটি অণুপরমাণুরও নড়চড় হবার জো নেই; সমস্তই তাঁর অটল শাসনে তাঁর স্থির নিয়মে বিধৃত হয়ে নিজ নিজ কাজ করে যাচ্ছে। কেবল মানুষকেই তিনি অসম্পূর্ণ করে রেখেছেন। তিনি ময়ূরকে নানা বিচিত্র রঙে রঙিয়ে দিয়েছেন; মানুষকে দেন নি, তার ভিতরে রঙের একটি বাটি দিয়ে বলেছেন, তোমাকে তোমার নিজের রঙে সাজতে হবে। তিনি বলেছেন, তোমার মধ্যে সবই দিলুম, কিন্তু তোমাকে সেই-সব উপকরণ দিয়ে নিজেকে কঠিন করে সুন্দর করে আশ্চর্য করে তৈরি করে তুলতে হবে, আমি তোমাকে তৈরি করে দেব না। আমরা তা না করে যদি যেমন জন্মাই তেমনিই মরি, তবে তাঁর এই লীলা কি ব্যর্থ হবে না।

কী নিয়ে আমাদের দিনের পর দিন যাচ্ছে। প্রতিদিনের আবর্তনে কী জন্যে যে ঘুরে মরছি তার কোনো ঠিকানাই নেই। আজ যা হচ্ছে কালও তাই হচ্ছে, এক দিনের পর কেবল আর-এক দিনের পুনরাবৃত্তি চলছে; ঘানিতে জোতা হয়ে আছি, ঘুরে বেড়াচ্ছি একই জায়গায়। এর মধ্যে এমন কোনো নতুন আঘাত পাচ্ছি না যাতে মনে পড়ে আমি মানুষ। এই সাংসারিক জীবনযাত্রার প্রাত্যহিক অভ্যস্ত কর্মে আমরা কী পাচ্ছি। আমরা কী জড়ো করছি। এই-সব জীর্ণ বোঝার মধ্যে একদিন কি এমনি ভাবেই জীবন পরিসমাপ্ত হবে। অভ্যাস, অভ্যাস— তারই জড় স্তূপের নীচে তলিয়ে যাচ্ছি; তারই উপরে যে আমাদের একদিন ঠেলে উঠতে হবে সেই কথাটিই ভুলে যাচ্ছি। মলিনতার উপর কেবলই মলিনতা জমা হচ্ছে; অভ্যাসকে

কেবলই বেড়ে যেতে দেওয়া হচ্ছে, এমনি করে নিজের কৃত্রিমতার বেড়ার মধ্যে সংকীর্ণ জায়গায় আমরা আবদ্ধ হয়ে রয়েছি, বিশ্বভুবনের আশ্চর্য লীলাকে দেখতে পাচ্ছি না। দেখবার বেলা দেখি উপকরণ, আসবাব, বাঁধা নিয়মে জীবনযন্ত্রের চাকা চালানো। তাঁর আলো আর ভিতরে আসতে পথ পায় না; ওই-সব জিনিসগুলো আড়াল হয়ে দাঁড়ায়। তিনি আমাদের কাছে আসবেন বলে বলে দিয়েছেন, তুমি তোমার আসনখানি তৈরি করে দাও, আমি সেই আসনে বসব, তোমার ঘরে গিয়ে বসব। অথচ আমরা যা-কিছু আয়োজন করছি সে-সব নিজের জন্যে, তাঁকে বাদ দিয়ে বসেছি। জগৎ জুড়ে শ্যামল পৃথিবীর সকল সৌন্দর্যের মধ্যে তিনি আপনাকে বিকীর্ণ করে রয়েছেন, কেবল একটুখানি কালো জায়গা, আমাদের হৃদয়ের সেই কালো-কলঙ্কে-মলিন ধূলিতে-আচ্ছন্ন সেই একটুমাত্র কালো জায়গাতে তাঁর স্থান হয় নি, সেইখানে তাঁকে আসতে নিষেধ করে দিয়েছি। সেই জায়গাটুকু আমার, সেখানে আমার টাকা রাখব, আসবাব জমাব, ছেলের জন্য বাড়ির ভিত কাটব। সেখানে তাঁকে বলি, তোমাকে ওখানে যেতে দিতে পারব না, তোমাকে ওখান থেকে নির্বাসিত করে দিলুম। তাই এই এক আশ্চর্য ব্যাপার দেখছি যে, যে মানুষ সকলের চেয়ে বড়ো, যার মধ্যে ভূমার প্রকাশ, সেই মানুষেরই কি সকলের চেয়ে অকৃতার্থ হবার শক্তি হল। আমাদের যে সেই শক্তি তিনিই দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, আর-সব জায়গায় আমি রয়েছি, কিন্তু তোমার ঘরে নিমন্ত্রণ না করলে আমি যাব না। তিনি বলেছেন, তোমরা কি আমাকে ডাকবে না। তোমরা যা ভোগ করছ আমাকে তার একটু অংশ দেবে না? যারা কেড়ে নেবার লোক তারা কেড়ে নেয়, তারা অনাদর সইতে পারে না। আর যিনি দ্বারের বাইরে প্রতীক্ষা করে দাঁড়িয়ে রয়েছেন তাঁকেই বলেছি, তোমাকে দিতে পারব না। দিনের পর দিন কি এই কথা বলে আমরা সব ব্যর্থ করি নি। একদিন আমাদের এ সংকল্প নিতেই হবে, বলতে হবে, আমার ধন জন মান, আমার সমস্ত খ্যাতিপ্রতিপত্তি জীবনযৌবন তোমারই জন্যে। প্রতিদিন যদি বা ভুলে থাকি আজ একদিন অন্তত বলি, তোমারই জন্য আমার এই জীবন হে স্বামী! তোমাকে না দিয়ে কি আমি আমাকে ব্যর্থ করলেম না তোমাকেই ব্যর্থ করলেম? তুমি যে বলেছিলে আমরা অমৃতস্য পুত্রাঃ, আমরা অমৃতের পুত্র। তুমি যে বলেছিলে, তুমি বড়ো, তোমার জীবন সংসারের সুখের মধ্যে জড়িয়ে পড়ে থাকবে না। সেই পিতৃসত্য যে আমাদের পালন করতেই হবে, তাকে ব্যর্থ করলে যে তোমার সত্যকেই ব্যর্থ করা হবে।

সেইজন্যে, সেই সত্যকে স্বীকার করবে বলে এক-একটা দিনকে মানুষ পৃথক করে রাখে। সে বলে, রোজ তো ঘানি টেনেছি, আর পারি নে; একটা দিন অন্তত বুঝি যে আনন্দলোকে অমৃতলোকেই আমি জন্মগ্রহণ করেছি, কারাগারের মধ্যে নয়। সেই দিন উৎসবের দিন, সেই দিন মানুষের আপনার সত্যকে জানবার দিন। সেই দিনকে প্রতিদিনকার দিন করতে হবে। প্রতিদিন নিজেকে কত অসত্য করে দেখেছি, কত অসত্য করে জেনেছি; একদিন আপনাকে অনন্তের মধ্যে দেখে নিতে হবে। বিশ্বের বিধাতা হয়েও তুমি আমার পিতা, পিতা নোঽসি, এতবড়ো কথা একদিন সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মাঝখানে দাঁড়িয়ে জানাতেই হবে। আজ ধনমান খ্যাতিপ্রতিপত্তির কাছে প্রণাম নয়, প্রতিদিন সেইখানে মাথা লুটিয়েছি এবং সেই ধূলিজঞ্জালের নীচে কোন্ তলায় তলিয়ে গিয়েছি। আজ সমস্ত জঞ্জাল দূর করে দিয়ে যিনি আমার দরজায় যুগ যুগ ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন তাঁকে ডাকব: পিতা নোঽসি। তুমি আমার পিতা। যেদিন তাঁকে ডাকব, তাঁকে ঘরে নিয়ে আসব, সেদিন সব ধনমান সার্থক হবে, সেদিন কোনো অভাবই আর অভাব থাকবে না।

মানুষ একদিন ভেবেছিল সে স্বর্গে যাবে, সেই চিন্তায় সে তীর্থে তীর্থে ঘুরেছে, সে ব্রাহ্মণের পদধূলি নিয়েছে, সে কত ব্রত অনুষ্ঠান করেছে; কী করলে সে স্বর্গলোকের অধিকারী হতে পারে এই কথাই তার মনে জেগেছে। কিন্তু, স্বর্গ তো কোথাও নেই। তিনি তো স্বর্গ কোথাও রাখেন নি। তিনি মানুষকে বলেছেন, তোমাকে স্বর্গ তৈরি করতে হবে। এই সংসারকেই তোমায় স্বর্গ করতে হবে। সংসারে তাঁকে আনলেই যে সংসার স্বর্গ হয়। এতদিন মানুষ এ কোন্ শূন্যতার ধ্যান করেছে। সে সংসারকে ত্যাগ করে কেবলই দূরে দূরে গিয়ে নিষ্ফল আচারবিচারের মধ্যে এ কোন্ স্বর্গকে চেয়েছে। তার ঘর-ভরা শিশু তার মা-বাপ ভাই-বন্ধু, আত্মীয়-প্রতিবেশী— এদের সকলকে নিয়ে নিজের সমস্ত জীবনখানি দিয়ে যে তাকে স্বর্গ তৈরি করতে হবে। কিন্তু সে সৃষ্টি কি একলা হবে। না, তিনি বলেছেন, তোমাতে আমাতে মিলে স্বর্গ করব, আর-সব আমি একলা করেছি, কিন্তু তোমার জন্যেই আমার স্বর্গসৃষ্টি অসমাপ্ত রয়ে গেছে। তোমার ভক্তি তোমার আত্মনিবেদনের অপেক্ষায় এতবড়ো একটা চরমসৃষ্টি হতে পারে নি। সর্বশক্তিমান এই জায়গায় তাঁর শক্তিকে খর্ব করেছেন, এক জায়গায় তিনি হার মেনেছেন। যতক্ষণ পর্যন্ত না তাঁর সকলের চেয়ে দুর্বল সন্তান তার সব উপকরণ হাতে করে নিয়ে আসবে, ততক্ষণ পর্যন্ত স্বর্গরচনাই অসম্পূর্ণ রইল। এইজন্যে

যে তিনি যুগ যুগান্ত ধরে অপেক্ষা করছেন। তিনি কি এই পৃথিবীর জন্যেই কত কাল ধরে অপেক্ষা করেন নি। আজ যে এই পৃথিবী এমন সুন্দরী এমন শস্যশ্যামলা হয়েছে, কত বাষ্পদহনের ভিতর দিয়ে ক্রমশ শীতল হয়ে তরল হয়ে তার পরে ক্রমে ক্রমে এই পৃথিবী কঠিন হয়ে উঠেছে। তখন তার বক্ষে এমন আশ্চর্য শ্যামলতা দেখা দিয়েছে। পৃথিবী যুগ যুগ ধরে তৈরি হয়েছে, কিন্তু স্বর্গ এখনও বাকি। বাষ্প-আকারে যখন পৃথিবী ছিল তখন তো এমন সৌন্দর্য ফোটে নি। আজ নীলাকাশের নীচে পৃথিবীর কী অপরূপ সৌন্দর্য দেখা দিয়েছে। ঠিক তেমনি স্বর্গলোক বাষ্প-আকারে আমাদের হৃদয়ের ভিতরে ভিতরে রয়েছে, তা আজও দানা বেঁধে ওঠে নি। তাঁর সেই রচনাকার্যে তিনি আমাদের সঙ্গে বসে গিয়েছেন; কিন্তু আমরা কেবল খাব, পরব, সঞ্চয় করব, এই বলে বলে সমস্ত ভুলে বসে রইলুম। তবু এ ভুল তো ভাঙবে; মরবার আগে একদিন তো বলতে হবে, এই পৃথিবীতে এই জীবনে আমি স্বর্গের একটুখানি আভাস রেখে গেলেম। কিছু মঙ্গল রেখে গেলেম। অনেক অপরাধ স্তূপাকার হয়েছে, অনেক সময় ব্যর্থ করেছি, তবু ক্ষণে ক্ষণে একটু সৌন্দর্য ফুটেছিল। জগৎসংসারকে কি একেবারেই বঞ্চিত করে গেলেম, অভাবকে তো কিছু পূরণ করেছি, কিছু অজ্ঞান দূর করেছি। এই কথাটি তো বলে যেতে হবে। এ দিন যাবে। এই আলো চোখের উপর মিলিয়ে যাবে। সংসার তার দরজা বন্ধ করে দেবে, তার বাইরে পড়ে থাকব। তার আগে কি বলে যেতে পারব না 'কিছু দিতে পেরেছি'।

আমাদের সৃষ্টি করবার ভার যে স্বয়ং তিনি দিয়েছেন। তিনি যে নিজে সুন্দর হয়ে জগৎকে সুন্দর করে সাজিয়েছেন, এ নিয়ে তো মানুষ খুশি হয়ে চুপ করে থাকতে পারল না। সে বললে, আমি ওই সৃষ্টিতে আরও কিছু সৃষ্টি করব। শিল্পী কী করে। সে কেন শিল্প রচনা করে। বিধাতা বলেছেন, আমি এই-যে উৎসবের লন্ঠন সব আকাশে ঝুলিয়ে দিয়েছি, তুমি কি আল্পনা আঁকবে না। আমার রোশনচৌকি তো বাজছেই, তোমার তম্বুরা, কি একতারাই না হয়, তুমি বাজাবে না? সে বললে, হাঁ, বাজাব বৈকি। গায়কের গানে আর বিশ্বের প্রাণে যেমনি মিলল অমনি ঠিক গানটি হল। আমি গান সৃষ্টি করব বলে সেই গান তিনি শোনবার জন্যে আপনি এসেছেন। তিনি খুশি হয়েছেন; মানুষের মধ্যে তিনি যে আনন্দ দিয়েছেন, প্রেম দিয়েছেন, তা যে মিলল তাঁর সব আনন্দের সঙ্গে— এই দেখে তিনি খুশি। শিল্পী আমাদের মানুষের সভায় কি তার শিল্প দেখাতে এসেছে। সে যে তাঁরই সভায় তার শিল্প দেখাচ্ছে, তার গান শোনাচ্ছে।

তিনি বললেন, বাঃ, এ যে দেখছি আমার সুর শিখেছে, তাতে আবার আধো আধো বাণী জুড়ে দিয়েছে— সেই বাণীর আধখানা ফোটে আধখানা ফোটে না। তাঁর সুরে সেই আধফোটা সুর মিলিয়েছি শুনে তিনি বললেন, খুশি হয়েছি। এই-যে তাঁর মুখের খুশি— না দেখতে পেলে সে শিল্পী নয়, সে কবি নয়, সে গায়ক নয়। যে মানুষের সভায় দাঁড়িয়ে মানুষ কবে জয়মাল্য দেবে এই অপেক্ষায় বসে আছে সে কিছুই নয়। কিন্তু, শিল্পী কেবলমাত্র রেখার সৌন্দর্য নিল, কবি সুর নিল, রস নিল। এরা কেউই সব নিতে পারল না। সব নিতে পারা যায় একমাত্র সমস্ত জীবন দিয়ে। তাঁরই জিনিস তাঁর সঙ্গে মিলে নিতে হবে।

জীবনকে তাঁর অমৃতরসে কানায় কানায় পূর্ণ করে যেদিন নিবেদন করতে পারব সেদিন জীবন ধন্য হবে। তার চেয়ে বড়ো নিবেদন আর কী আছে। আমরা তো তা পারি না। তাঁর নৈবেদ্য থেকে সমস্ত চুরি করি; কৃপণতা করে বলি, নিজের জন্য সবই নেব কিন্তু তাঁকে দেবার বেলা উদ্‌বৃত্তমাত্র দিয়ে নিশ্চিন্ত হব। তাঁকে সমস্ত নিবেদন করে দিতে পারলে সব দরকার ভরে যায়, সব অভাব পূর্ণ হয়ে যায়। তাই বলছি, আজ সেই জীবনের পরিপূর্ণ নিবেদনের দিন। আজ বলবার দিন, তুমি আমাকে তোমার আসনের পাশে বসিয়েছিলে, কিন্তু আমি ভুলেছিলুম, আমি সব জুড়ে নিজেই বসেছিলুম— তোমার সঙ্গে বসব এ গৌরব ভুলে গেলুম— তোমাতে আমাতে মিলে বসবার যে অপরূপ সার্থকতা এ জীবনে কি তা হবে না। আজ এই কথা বলব, আমার আসন শূন্য রয়ে গেছে। তুমি এসো, তুমি এসো, তুমি এসে একে পূর্ণ করো। তুমি না এলে আমার এই গৌরবে কাজ কী, আমার ধুলোর মধ্যে ভিক্ষুকের মতো পড়ে থাকা যে ভালো। হায় হায়, ধুলোবালি নিয়ে বাস্তবিকই এই-যে খেলা করছি এই কি আমার সৃষ্টি। এই সৃষ্টির কাজের জন্যেই কি আমার জীবনের এত আয়োজন হয়েছিল। মাঝে মাঝে কি পরম দুঃখে পরম আঘাতে এগুলো ভেঙে যায় নি। খেলাঘর একটু নাড়া দিলেই পড়ে যায়। কিন্তু, তোমাতে আমাতে মিলে যে সৃষ্টি তা কি একটু ফুঁয়ে এমনি করে পড়ে যেতে পারে। খেলাঘর কত যত্ন করেই গড়ে তুলি; যেদিন আঘাত দিয়ে ভেঙে দেন সেদিন দেখিয়ে দেন যে তাঁকে বাদ দিয়ে একলা সৃষ্টি করবার কোনো সাধ্য আমাদের নেই। সেদিন কেঁদে উঠে আবার ভুলি, আবার ছিদ্র ঢাকবার চেষ্টা করি— এমনি করে সব ব্যর্থ হয়ে যায়।

সব কৃত্রিমতা দূর করে দিয়ে আজ একদিনের জন্য দরজা খুলে ডাকি— হে আমার চিরদিনের অধীশ্বর, তোমাকে একদিনের জন্যেই ডাকলুম। এই জীবনে

শেষ নয়, এই পৃথিবীতেও শেষ নয়, আমি যে তোমার দর্শনার্থে তীর্থযাত্রায় বেরিয়েছি। ঘুরেই চলেছি, দেখা মেলে নি। আজ সব রুদ্ধতার মধ্যে একটু ফাঁক করে দিলেম, দেখা দিয়ো। অপরাধ তুমি যদি ক্ষমা না কর, পরমানন্দের কণা একটিও যদি না দাও, তবু এ কথা বলতে পারব না 'ওগো আমি পারলুম না'। আমি ক্লান্ত, অক্ষম, দুর্বল, আমি জবাব দিলুম, আমার সব পড়ে রইল— এ কথা বলব না। তোমার জন্য দুঃখ পেলেম এই কথা জানাবার সুখ যে তুমিই দেবে। দুঃখ আমার নিজের জন্য পেলে খেদের অবসান থাকে না। হে বন্ধু, তোমার জন্য বড়ো দুঃখ পেয়েছি এ কথা বলবার অধিকার দাও। সমস্ত সংসারের দীর্ঘপথ দুঃখের বোঝা বয়ে এসেছি, আজ দিলুম তোমার পায়ে ফেলে। তুমি যে আনন্দ, তুমি যে অমৃত, এই কথাটি আজ স্মরণ করব। সেই স্মরণ করবার দিনই এই মহোৎসবের দিন।

অসতো মা সদ্‌গময়। অসত্যে জড়িয়ে আছি, তোমার সঙ্গে মিললে তবে সত্য হব। তোমার সঙ্গে সত্যে মিলন হবে, জ্ঞানের জ্যোতিতে মিলন হবে। মৃত্যুর পথ মাড়িয়ে অমৃতলোকে মিলন হবে। বিশ্বজগৎকে তোমার প্রকাশ যেমন প্রকাশিত করছে তেমনি আমার জীবনকে করবে। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ। ১১ মাঘ ১৩২০

ছোটো ও বড়ো

এগারোই মাঘ সায়ংকালে লেখক কর্তৃক পঠিত উপদেশ

এই সংসারের মাঝখানে থেকে সংসারের সমস্ত তাৎপর্য খুঁজে পাই আর নাই পাই, প্রতিদিনের তুচ্ছতার মধ্যে মানুষ ক্ষণকালের খেলা যেমন করেই খেলুক, মানুষ আপনাকে সৃষ্টির মাঝখানে একটা খাপছাড়া ব্যাপার বলে মনে করতে পারে না। মানুষের বুদ্ধি ভালোবাসা আশা আকাঙ্ক্ষা সমস্তের মধ্যেই মানুষের উপস্থিত প্রয়োজনের অতিরিক্ত এমন একটা প্রভূত বেগ আছে যে মানুষ নিজের জীবনের হিসাব করবার সময়, যা তার হাতে আছে তার চেয়ে অনেক বেশি জমা করে নেয়। মানুষ আপনার প্রতিদিনের হাত-খরচের খুচরো তহবিলকেই নিজের মূলধন বলে

গণ্য করে না। মানুষের সকল কিছুতেই যে-একটি চিরজীবনের উত্তম প্রকাশ পায় সে যে একটা অদ্ভুত বিড়ম্বনা, মরীচিকার মতো সে যে কেবল জলকে দেখায় অথচ তৃষ্ণাকে বহন করে, এ কথা সমস্ত মনের সঙ্গে সে বিশ্বাস করতে পারে না।

ভোগী ভোগের মধুপাত্রের মধ্যে আপনার দুই ডানা জড়িয়ে ফেলে বসে আছে, বুদ্ধি-অভিমানী জোনাক-পোকার মতো আপন পুচ্ছের আলোক-সীমার বাইরে আর সমস্তকেই অস্বীকার করছে, অলসচিত্ত উদাসীন তার নিমীলিত চক্ষুপল্লবের দ্বারা আপনার মধ্যে একটি চিররাত্রি রচনা করে পড়ে আছে, তবু সমস্ত মত্ততা অহংকার এবং জড়ত্বের ভিতর দিয়ে মানুষ নানা দেশে নানা ভাষায় নানা আকারে প্রকাশ করবার চেষ্টা করছে যে 'আমার সত্য প্রতিষ্ঠা আছে এবং সে প্রতিষ্ঠা এইটুকুর মধ্যে নয়'।

সেইজন্যে আমরা যাঁকে দেখলুম না, যাঁকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ করলুম না, যাঁকে সংসারবুদ্ধিটুকুর বেড়া দিয়ে ঘের দিয়ে রাখলুম না, তাঁর দিকে মুখ তুলে যাঁরা বললেন তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্বস্মাৎ, এই তিনি পুত্র হতে প্রিয়, বিত্ত হতেও প্রিয়, অন্য সব-কিছু হতেও প্রিয়— তাঁদের সেই বাণীকে আমাদের জীবনের ব্যবহারে সম্পূর্ণ গ্রহণ করতে না পেরেও আজ পর্যন্ত অগ্রাহ্য করতে পারলুম না। এইজন্যে যখন আমরা তাঁর ভক্তকে দেখলুম তিনি কোন্ অন্তহীনের প্রেমে জীবনের প্রতি মুহূর্তকে মধুময় করে বিকশিত করছেন, যখন তাঁর সেবককে দেখলুম তিনি বিশ্বের কল্যাণে প্রাণকে তুচ্ছ এবং দুঃখ-অপমানকে গলার হার করে তুলছেন, তখন তাঁদের প্রণাম করে আমরা বললুম এইবার মানুষকে দেখা গেল।

সমস্ত বৈষয়িকতা, সমস্ত দ্বেষবিদ্বেষ ভাগবিভাগের মাঝখানে এইটি ঘটছে; কিছুতেই এটিকে আর চাপা দিতে পারলে না। মানুষের মধ্যে এই-যে অনন্তের বিশ্বাস, এই-যে অমৃতের আশ্বাসটি বীজের মতো রয়েছে, বারম্বার দলিত বিদলিত হয়েও সে মরল না। এ যদি শুধু তর্কের সামগ্রী হত তবে তর্কের আঘাতে আঘাতে চূর্ণ হয়ে যেত; কিন্তু এ যে মর্মের জিনিস, মানুষের সমস্ত প্রাণের কেন্দ্রস্থল থেকে এ যে অনির্বচনীয়রূপে আপনাকে প্রকাশ করে।

তাই তো ইতিহাসে দেখা গেছে মানুষের চিত্তক্ষেত্রে এক-একবার শত বৎসরের অনাবৃষ্টি ঘটেছে, অবিশ্বাসের কঠিনতায় তার অনন্তের চেতনাকে আবৃত করে দিয়েছে, ভক্তির রসসঞ্চয় শুকিয়ে গেছে, যেখানে পূজার সংগীত বেজে উঠত সেখানে উপহাসের অট্টহাস্য জেগে উঠছে। শত বৎসরের পরে আবার বৃষ্টি নেমেছে, মানুষ বিস্মিত হয়ে দেখেছে সেই মৃত্যুহীন বীজ আবার নূতন তেজে অঙ্কুরিত হয়ে উঠেছে।

মাঝে মাঝে যে শুষ্কতার ঋতু আসে তারও প্রয়োজন আছে, কেননা বিশ্বাসের প্রচুর রস পেয়ে যখন বিস্তর আগাছা কাঁটাগাছ জন্মায়, যখন তারা আমাদের ফসলের সমস্ত জায়গাটি ঘন করে জুড়ে ব'সে আমাদের চলবার পথটি রোধ করে দেয়, যখন তারা কেবল আমাদের বাতাসকে বিষাক্ত করে কিন্তু আমাদের কোনো খাদ্য জোগায় না, তখন খররৌদ্রের দিনই শুভদিন ; তখন অবিশ্বাসের তাপে যা মরবার তা শুকিয়ে মরে যায়, কিন্তু যার প্রাণ আমাদের প্রাণের মধ্যে সে মরবে তখনই যখন আমরা মরব। যতদিন আমরা আছি ততদিন আমাদের আত্মার খাদ্য আমাদের সংগ্রহ করতেই হবে ; মানুষ আত্মহত্যা করবে না।

এই-যে মানুষের মধ্যে একটি অমৃতলোক আছে যেখানে তার চিরদিনের সমস্ত সংগীত বেজে উঠছে, আজ আমাদের উৎসব সেইখানকার। এই উৎসবের দিনটি কি আমাদের প্রতিদিন হতে স্বতন্ত্র। এই-যে অতিথি আজ গলায় মালা পরে মাথায় মুকুট নিয়ে এসেছে, এ কি আমাদের প্রতিদিনের আত্মীয় নয়।

আমাদের প্রতিদিনেরই পর্দার আড়ালে আমাদের উৎসবের দিনটি বাস করছে। আমাদের দৈনিক জীবনের মধ্যে অন্তঃসলিলা হয়ে একটি চিরজীবনের ধারা বয়ে চলেছে ; সে আমাদের প্রতিদিনকে অন্তরে অন্তরে রসদান করতে করতে সমুদ্রের দিকে প্রবাহিত হচ্ছে। সে ভিতর থেকে আমাদের সমস্ত চেষ্টাকে উদার করছে, সমস্ত ত্যাগকে সুন্দর করছে, সমস্ত প্রেমকে সার্থক করছে। আমাদের সেই প্রতিদিনের অন্তরের রসস্বরূপকে আজ আমরা প্রত্যক্ষরূপে বরণ করব বলেই এই উৎসব ; এ আমাদের জীবনের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন নয়। সম্বৎসরকাল গাছ আপনার পাতার ভার নিয়েই তো আছে। বসন্তের হাওয়ায় একদিন তার ফুল ফুটে ওঠে ; সেইদিন তার ফলের খবরটি প্রকাশ হয়ে পড়ে। সেইদিন বোঝা যায় এতদিনকার পাতা ধরা এবং পাতা ঝরার ভিতরে এই সফলতার প্রবাহটি বরাবর চলে আসছিল, সেই-জন্যেই ফুলের উৎসব দেখা দিল, গাছের অমরতার পরিচয় সুন্দর বেশে প্রচুর ঐশ্বর্যে আপনাকে প্রকাশ করল।

আমাদের হৃদয়ের মধ্যে সেই পরমোৎসবের ফুল কি আজ ধরেছে, তার গন্ধ কি আমরা অন্তরের মধ্যে আজ পেয়েছি। আজ কি অন্য সব ভাবনার আড়াল থেকে এই কথাটি আমাদের কাছে স্পষ্ট করে দেখা দিল যে জীবনটা কেবল প্রাত্যহিক প্রয়োজনের কর্মজাল বুনে বুনে চলা নয়, তার গভীরতার ভিতর থেকে একটি পরম সৌন্দর্য পরমকল্যাণ পূজার অঞ্জলির মতো ঊর্ধ্বমুখ হয়ে উঠছে ?

না, সে কথা তো আমরা সকলে মানি নে। আমাদের জীবনের মর্মনিহিত সেই

সত্যকে সুন্দরকে দেখবার দিন এখনও হয়তো আসে নি। আপনাকে একেবারে ভুলিয়ে দেয়, সমস্ত স্বার্থকে পরমার্থের মধ্যে মিলিয়ে তোলে, এমন বৃহৎ আনন্দের হিল্লোল অন্তরের মধ্যে জাগে নি। কিন্তু তবুও তিন শো পঁয়ষট্টি দিনের মধ্যে অন্তত একটি দিনকেও আমরা পৃথক করে রাখি, আমাদের সমস্ত অন্যমনস্কতার মাঝখানেই আমাদের পূজার প্রদীপটি জ্বালি, আসনটি পাতি, সকলকে ডাকি, যে যেমন ভাবে আসে আসুক, যে যেমন ভাবে ফিরে যায় ফিরে যাক।

কেননা, এ তো আমাদের কারও একলার সামগ্রী নয়; আজ আমাদের কণ্ঠ হতে যে স্তবসংগীত উঠবে সে তো কারও একলা কণ্ঠের বাণী নয়; জীবনের পথে সম্মুখের দিকে যাত্রা করতে করতে মানুষ নানা ভাষায় যাঁর নাম ডেকেছে, যে নাম তার সংসারের সমস্ত কলরবের উপরে উঠেছে আমরা সেই সকল মানুষের কণ্ঠের চিরদিনের নামটি উচ্চারণ করতে আজ এখানে একত্র হয়েছি— কোনো পুরস্কার পাবার আশায় নয়, কেবল এই কথাটি বলবার জন্যে যে তাঁকে আমরা আপনার ভাষায় ডাকতে শিখেছি। মানুষের এই একটি আশ্চর্য সৌভাগ্য। আমরা পশুরই মতো আহার-বিহারে রত, আপন আপন ভাগ নিয়ে আমাদের টানাটানি, তবু তারই মধ্যেই 'বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্', আমরা সেই মহান্ পুরুষকে জেনেছি— সমস্ত মানুষের হয়ে এই কথাটি স্বীকার করবার জন্যেই উৎসবের আয়োজন।

অথচ আমরা যে সুখসম্পদের কোলে বসে আরামে আছি, তাই আনন্দ করছি, তা নয়। দ্বারে মৃত্যু এসেছে, ঘরে দারিদ্র্য; বাইরে বিপদ, অন্তরে বেদনা; মানুষের চিত্ত সেই ঘন অন্ধকারের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বলেছে: বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ। আমি সেই মহান্ পুরুষকে জেনেছি যিনি অন্ধকারের পরপার হতে জ্যোতির্ময়রূপে প্রকাশ পাচ্ছেন। মনুষ্যত্বের তপস্যা সহজ তপস্যা হয় নি, সাধনার দুর্গম পথ দিয়ে রক্তমাখা পায়ে মানুষকে চলতে হয়েছে, তবু মানুষ আঘাতকে দুঃখকে আনন্দ বলে গ্রহণ করেছে; মৃত্যুকে অমৃত বলে বরণ করেছে; ভয়ের মধ্যে অভয়কে ঘোষণা করেছে— এবং 'রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং', হে রুদ্র, তোমার যে প্রসন্নমুখ সেই মুখ মানুষ দেখতে পেয়েছে। সে দেখা তো সহজ নয়; সমস্ত অভাবকে পরিপূর্ণ করে দেখা, সমস্ত সীমাকে অতিক্রম করে দেখা। মানুষ সেই দেখা দেখেছে বলেই তো তার সকল কান্নার অশ্রুজলের উপরে তার গৌরবের পদ্মটি ভেসে উঠেছে; তার দুঃখের হাটের মাঝখানে তার এই আনন্দসম্মিলন।

কিন্তু, বিমুখ চিত্তও আছে, এবং বিরুদ্ধ বাক্যও শোনা যায়। এমন কোন্ মহৎ

সম্পদ মানুষের কাছে এসেছে যার সম্মুখে বাধা তার পরিহাসকুটিল মুখ নিয়ে এসে দাঁড়ায় নি। তাই এমন কথা শুনি, অনন্তকে নিয়ে তো আমরা উৎসব করতে পারি নে, অনন্ত যে আমাদের কাছে তত্ত্বকথা মাত্র। বিশ্বের মধ্যে তাঁকে ব্যাপ্ত করে দেখব— কিন্তু, লক্ষ লক্ষ নক্ষত্রের মধ্যে যে বিশ্ব নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে, যে বিশ্বের নাড়ীতে নাড়ীতে আলোকধারার আবর্তন হয়ে কত শত শত বৎসর কেটে যায়, সে বিশ্ব আমার কাছে আছে কোথায়। তাই তো সেই অনন্ত পুরুষকে নিজের হাত দিয়ে নিজের মতো করে ছোটো করে নিই, নইলে তাঁকে নিয়ে আমাদের উৎসব করা চলে না।

এমনি করে তর্কের কথা এসে পড়ে। যখন উপভোগ করি নে, যখন সমস্ত প্রাণকে জাগিয়ে দিয়ে উপলব্ধি করি নে, তখনই কলহ করি। ফুলকে যদি প্রদীপের আলোয় ফুটতে হত তা হলেই তাকে প্রদীপ খুঁজে বেড়াতে হত; কিন্তু যে সূর্যের আলো আকাশময় ছড়িয়ে যায় ফুল যে সেই আলোয় ফোটে, এইজন্যে তার কাজ কেবল আকাশে আপনাকে মেলে ধরা। আপন ভিতরকার প্রাণের বিকাশবেগেই সে আপনার পাপড়ির অঞ্জলিটিকে আলোর দিকে পেতে দেয়, তর্ক করে পণ্ডিতের সঙ্গে পরামর্শ করে এ কাজ করতে গেলে দিন বয়ে যেত। হৃদয়কে একান্ত করে অনন্তের দিকে পেতে ধরা মানুষের মধ্যেও দেখেছি, সেইখানেই তো ওই বাণী উঠেছে: বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ। আমি সেই মহান্ পুরুষকে দেখেছি যিনি অন্ধকারের পরপার হতে জ্যোতির্ময়রূপে প্রকাশ পাচ্ছেন। এ তো তর্কযুক্তির কথা হল না; চোখ যেমন করে আপনার পাতা মেলে দেখে এ যে তেমনি করে জীবন মেলে দেখা।

সত্য হতে অবচ্ছিন্ন করে যেখানে তত্ত্বকথাকে বাক্যের মধ্যে বাঁধা হয় সেখানে তা নিয়ে কথা-কাটাকাটি করা সাজে, কিন্তু দ্রষ্টা যেখানে অনন্ত পুরুষকে সমস্ত সত্যেরই মাঝখানে দেখে বলেন 'এষঃ', এই-যে তিনি, সেখানে তো কোনো কথা বলা চলে না। 'সীমা' শব্দটার সঙ্গে একটা 'না' লাগিয়ে দিয়ে আমরা 'অসীম' শব্দটাকে রচনা করে সেই শব্দটাকে শূন্যাকার করে বৃথা ভাবতে চেষ্টা করি। কিন্তু অসীম তো 'না' নন, তিনি যে নিবিড় নিরবচ্ছিন্ন 'হাঁ'। তাই তো তাঁকে ওঁ বলে ধ্যান করা হয়। ওঁ যে হাঁ, ওঁ যে যা-কিছু আছে সমস্তকে নিয়ে অখণ্ড পরিপূর্ণতা। আমাদের মধ্যে প্রাণ জিনিসটি যেমন— কথা দিয়ে যদি তাকে ব্যাখ্যা করতে যাই তবে দেখি প্রতি মুহূর্তেই তার ধ্বংস হচ্ছে, সে যেন মৃত্যুর মালা; কিন্তু তর্ক না করে আপনার ভিতরকার সহজবোধ দিয়ে যদি দেখি তবে দেখতে পাই আমাদের প্রাণ তার প্রতি মুহূর্তের মৃত্যুকে অতিক্রম করে রয়েছে; মৃত্যুর 'না' দিয়ে তার পরিচয় হয় না, মৃত্যুর মধ্যে সেই প্রাণই হচ্ছে 'হাঁ'।

সীমার মধ্যে অসীম হচ্ছেন তেমনি ওঁ। তর্ক না করে উপলব্ধি করে দেখলেই দেখা যায় সমস্ত চলে যাচ্ছে, সমস্ত স্খলিত হচ্ছে বটে, কিন্তু একটি অখণ্ডতার বোধ আপনিই থেকে যাচ্ছে। সেই অখণ্ডতার বোধের মধ্যেই আমরা সমস্ত পরিবর্তন সমস্ত গতায়াতসত্ত্বেও বন্ধুকে বন্ধু বলে জানছি; নিরন্তর সমস্ত চলে-যাওয়াকে পেরিয়ে থেকে-যাওয়াটাই আমাদের বোধের মধ্যে বিরাজ করছে। বন্ধুকে বাইরের বোধের মধ্যে আমরা খণ্ড খণ্ড করে দেখছি; কখনো আজ কখনো পাঁচদিন পরে, কখনো এক ঘটনায় কখনো অন্য ঘটনায়। তাঁর সম্বন্ধে আমার বাইরের বোধটাকে জড়ো করে দেখলে তার পরিমাণ অতি অল্পই হয়, অথচ অন্তরের মধ্যে তার সম্বন্ধে যে একটি নিরবচ্ছিন্ন বোধের উদয় হয়েছে তার পরিমাণের আর অন্ত নেই, সে আমার সমস্ত প্রত্যক্ষ জানার কূল ছাপিয়ে কোথায় চলে গেছে। যে কাল গত সে কালও তাকে ধরে রাখে নি, যে কাল সমাগত সে কালও তাকে ঠেকিয়ে রাখে নি, এমন-কি, মৃত্যুও তাকে আবদ্ধ করে নি। বরঞ্চ আমার বন্ধুকে ক্ষণে ক্ষণে ঘটনায় ঘটনায় যে ফাঁক ফাঁক করে দেখেছি সেই সীমাবচ্ছিন্ন দেখাগুলিকে সুনির্দিষ্টভাবে মনে আনতে চাইলে মন হার মানে— কিন্তু, সমস্ত খণ্ড জানার সীমাকে সকল দিকে পেরিয়ে গিয়ে আমার বন্ধুর যে একটি পরম অনুভূতি অসীমের মধ্যে নিরন্তরভাবে উপলব্ধ হয়েছে সেইটেই সহজ; কেবল সহজ নয়, সেইটেই আনন্দময়। আমাদের প্রিয়জনের সমস্ত অনিত্যতার সীমা পূরণ করে তুলেছে এমন একটি চিরন্তনকে যেমন অনায়াসে যেমন আনন্দে আমরা দেখি তেমনি করেই যাঁরা আপনার সহজ বিপুল বোধের দ্বারা সংসারের সমস্ত চলার ভিতরকার অসীম থাকাটিকে একান্ত অনুভব করেছেন তাঁরাই বলেছেন: এষাস্য পরমা গতিঃ, এষাস্য পরমা সম্পৎ, এষোঽস্য পরমোলোকঃ, এষোঽস্য পরমআনন্দঃ। এ তো জ্ঞানীর তত্ত্বকথা নয়, এ যে আনন্দের নিবিড় উপলব্ধি। এষঃ, এই-যে ইনি, এই-যে অত্যন্ত নিকটের ইনি, ইনিই জীবের পরমা গতি, পরম ধন, পরম আশ্রয়, পরম আনন্দ। তিনি এক দিকে যেমন গতি আর-এক দিকে তেমনি আশ্রয়, এক দিকে যেমন সাধনার ধন আর-এক দিকে তেমনি সিদ্ধির আনন্দ।

কিন্তু, আমাদের লৌকিক বন্ধুকে আমরা অসীমতার মধ্যে উপলব্ধি করছি বটে, তবু সীমার মধ্যেই তার প্রকাশ; নইলে তার সঙ্গে আমার কোনো সম্বন্ধই থাকত না। অতএব, অসীম ব্রহ্মকে আমাদের নিজের উপকরণ দিয়ে নিজের কল্পনা দিয়ে আগে নিজের মতো গড়ে নিতে হবে, তার পরে তাঁর সঙ্গে আমাদের ব্যবহার চলতে পারে— এমন কথা বলা হয়ে থাকে।

কিন্তু, আমার বন্ধুকে যেমন আমার নিজের হাতে গড়তে হয় নি এবং যদি গড়তে

হত তা হলে কখনো তার সঙ্গে আমার সত্য বন্ধুত্ব হত না— বন্ধুর বাহিরের প্রকাশটি আমার চেষ্টা আমার কল্পনার নিরপেক্ষ— তেমনি অনন্তস্বরূপের প্রকাশও তো আমার সংগ্রহ-করা উপকরণের অপেক্ষা করে নি; তিনি অনন্ত বলেই আপনার স্বাভাবিক শক্তিতেই আপনাকে প্রকাশ করছেন। যখনই তিনি আমাদের মানুষ করে সৃষ্টি করেছেন তখনই তিনি আপনাকে আমাদের অন্তরে বাহিরে মানুষের ধন করে ধরা দিয়েছেন, তাঁকে রচনা করবার বরাত তিনি আমাদের উপরে দেন নি। প্রভাতের অরুণ-আভা তো আমারই, বনের শ্যামল শোভা তো আমারই— ফুল যে ফুটেছে সে কার কাছে ফুটেছে। ধরণীর বীণাযন্ত্রে যে নানা সুরের সংগীত উঠেছে সে সংগীত কার জন্যে। আর, এই তো রয়েছে মায়ের কোলের শিশু, বন্ধুর-দক্ষিণ-হস্ত-ধরা বন্ধু, এই তো ঘরে বাহিরে যাদের ভালোবেসেছি সেই আমার প্রিয়জন; এদের মধ্যে যে অনির্বচনীয় আনন্দ প্রসারিত হচ্ছে এই আনন্দ যে আমার আনন্দময়ের নিজের হাতের পাতা আসন। এই আকাশের নীল চাঁদোয়ার নীচে, এই জননী পৃথিবীর বিচিত্র আল্‌পনা-আঁকা বরণবেদিটির উপরে আমার সমস্ত আপন লোকের মাঝখানে সেই সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম আনন্দরূপে অমৃতরূপে বিরাজ করছেন।

এই সমস্ত থেকে, এই তাঁর আপনার আত্মদান থেকে, অবচ্ছিন্ন করে নিয়ে কোন্ কল্পনা দিয়ে গড়ে কোন্ দেয়ালের মধ্যে তাঁকে স্বতন্ত্র করে ধরে রেখে দেব। সেই কি হবে আমাদের কাছে সত্য, আর যিনি অন্তর বাহির ভরে দিয়ে নিত্য নবীন শোভায় চিরসুন্দর হয়ে বসে রয়েছেন তিনিই হবেন তত্ত্বকথা? তাঁরই এই আপন আনন্দ-নিকেতনের প্রাঙ্গণে আমরা তাঁকে ঘিরে বসে অহোরাত্র খেলা করলুম, তবু এইখানে এই সমস্তর মাঝখানে আমাদের হৃদয় যদি জাগল না, আমরা তাঁকে যদি ভালোবাসতে না পারলুম, তবে জগৎজোড়া এই আয়োজনের দরকার কী ছিল। তবে কেন এই আকাশের নীলিমা, অমারাত্রির অবগুণ্ঠনের উপরে কেন এই-সমস্ত তারার চুমকি বসানো, তবে কেন বসন্তের উত্তরীয় উড়ে এসে ফুলের গন্ধে দক্ষিনে হাওয়াকে উতলা করে তোলে। তবে তো বলতে হয় সৃষ্টি বৃথা হয়েছে, অনন্ত যেখানে নিজে দেখা দিচ্ছেন সেখানে তাঁর সঙ্গে মিলন হবার কোনো উপায় নেই। বলতে হয় যেখানে তাঁর সদাব্রত সেখানে আমাদের উপবাস ঘোচে না; মা যে অন্ন স্বহস্তে প্রস্তুত করে নিয়ে বসে আছেন সন্তানের তাতে তৃপ্তি নেই, আর ধুলোবালি নিয়ে খেলার অন্ন যা সে নিজে রচনা করেছে তাইতে তার পেট ভরবে।

না, এ কেবল সেই-সকল দুর্বল উদাসীনদের কথা যারা পথে চলবে না এবং দূরে বসে বসে বলবে পথে চলাই যায় না। একটি ছেলে নিতান্ত একটি সহজ কবিতা

আবৃত্তি করে পড়ছিল। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলুম, তুমি যে কবিতাটি পড়লে তাতে কী বলেছে, তার থেকে তুমি কী বুঝলে। সে বললে, সে কথা তো আমাদের মাস্টারমশায় বলে দেয় নি। ক্লাসে পড়া মুখস্থ করে তার একটা ধারণা হয়ে গেছে যে কবিতা থেকে নিজের মন দিয়ে বোঝবার কিছুই নেই। মাস্টারমশায় তাকে ব্যাকরণ অভিধান সমস্ত বুঝিয়েছে, কেবল এই কথাটি বোঝায় নি যে, রসকে নিজের হৃদয় দিয়েই বুঝতে হয়, মাস্টারের বোঝা দিয়ে বুঝতে হয় না। সে মনে করেছে বুঝতে পারার মানে একটা কথার জায়গায় আর-একটা কথা বসানো, 'সুশীতল' শব্দের জায়গায় 'সুস্নিগ্ধ' শব্দ প্রয়োগ করা। এপর্যন্ত মাস্টার তাকে ভরসা দেয় নি, তার মনের স্বাধীনতা সম্পূর্ণ অপহরণ করেছে। যেখানে বোঝা তার পক্ষে নিতান্ত সহজ সেখানেও বুঝতে পারে বলে তার ধারণাই হয় নি। এইজন্যে ভয়ে ভয়ে সে আপনার স্বাভাবিক শক্তিকে খাটায় না। সেও বলে আমি বুঝি নে, আমরাও বলি সে বোঝে না। এলাহাবাদ শহরে যেখানে গঙ্গা যমুনা দুই নদী একত্র মিলিত হয়েছে সেখানে ভূগোলের ক্লাসে যখন একটি ছেলেকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল 'নদী জিনিসটা কী— তুমি কখনো কি দেখেছ' সে বললে, না। ভূগোলের নদী জিনিসটার সংজ্ঞা সে অনেক মার খেয়ে শিখেছে ; এ কথা মনে করতে তার সাহসই হয় নি যে, যে নদী দুইবেলা সে চক্ষে দেখেছে, যার মধ্যে সে আনন্দে স্নান করেছে, সেই নদীই তার ভূগোলবিবরণের নদী, তার বহু দুঃখের এক্‌জামিন-পাসের নদী।

তেমনি করেই আমাদের ক্ষুদ্র পাঠশালার মাস্টারমশায়রা কোনোমতেই এ কথা আমাদের জানতে দেয় না যে, অনন্তকে একান্তভাবে আপনার মধ্যে এবং সমস্তের মধ্যে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করা যায়। এইজন্যে অনন্তস্বরূপ যেখানে আমাদের ঘর ভরে পৃথিবী জুড়ে আপনি দেখা দিলেন সেখানে আমরা বলে বসলুম, বুঝতে পারি নে, দেখতে পেলুম না। ওরে, বোঝবার আছে কী? এই-যে এষঃ, এই-যে এই। এই-যে চোখ জুড়িয়ে গেল, প্রাণ ভরে গেল, এই-যে বর্ণে গন্ধে গীতে নিরন্তর আমাদের ইন্দ্রিয়বীণায় তাঁর হাত পড়ছে, এই-যে স্নেহে প্রেমে সখ্যে আমাদের হৃদয়ে কত রঙ ধরে উঠেছে, কত মধু ভরে উঠছে ; এই-যে দুঃখরূপ ধরে অন্ধকারের পথ দিয়ে পরম কল্যাণ আমাদের জীবনের সিংহদ্বারে এসে আঘাত করছেন, আমাদের সমস্ত প্রাণ কেঁপে উঠছে, বেদনায় পাষাণ বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে ; আর ওই-যে তাঁর বহু অশ্বের রথ, মানুষের ইতিহাসের রথ, কত অন্ধকারময় নিস্তব্ধ রাত্রি এবং কত কোলাহলময় দিনের ভিতর দিয়ে বন্ধুর পন্থায় যাত্রা করেছে, তাঁর বিদ্যুৎশিখাময়ী কষা মাঝে মাঝে আকাশে ঝল্‌কে ঝল্‌কে উঠছে— এই তো এষঃ, এই তো এই। সেই এইকে সমস্ত

জীবন মন দিয়ে আপন করে জানি, প্রত্যহ প্রতি দিনের ঘটনার মধ্যে স্বীকার করি এবং উৎসবের দিনে বিশ্বের বাণীকে বিজয়কণ্ঠে নিয়ে তাঁকে ঘোষণা করি— সেই সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম, সেই শান্তং শিবমদ্বৈতং, সেই কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূঃ, সেই-যে এক অনেকের প্রয়োজন গভীরভাবে পূর্ণ করছেন, সেই-যে অন্তহীন জগতের আদি-অন্তে পরিব্যাপ্ত সেই-যে মহাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ যাঁর সঙ্গে শুভযোগে আমাদের বুদ্ধি শুভবুদ্ধি হয়ে ওঠে।

নিখিলের মাঝখানে যেখানে মানুষ তাঁকে মানুষের সম্বন্ধে ডাকতে পারে— পিতা মাতা বন্ধু— সেখান থেকে সমস্ত চিত্তকে প্রত্যাখ্যান করে যখন আমরা অনন্তকে ছোটো করে আপন হাতে আপনার মতো ক'রে গড়েছি তখন কী যে করেছি তা কি ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে স্পষ্ট করে একবার দেখব না। যখন আমরা বলেছি 'আমাদের পরমধনকে সহজ করবার জন্যে ছোটো করব' তখনই আমাদের পরমার্থকে নষ্ট করেছি। তখন টুকরো কেবলই হাজার টুকরো হবার দিকে গেছে, কোথাও সে আর থামতে চায় নি; কল্পনা কোনো বাধা না পেয়ে উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠেছে; কৃত্রিম বিভীষিকায় সংসারকে কণ্টকিত করে তুলেছে; বীভৎস প্রথা ও নিষ্ঠুর আচার সহজেই ধর্মসাধনা ও সমাজব্যবস্থার মধ্যে আপনার স্থান করে নিয়েছে। আমাদের বুদ্ধি অন্তঃপুরচারিণী ভীরু রমণীর মতো স্বাধীন বিচারের প্রশস্ত রাজপথে বেরোতে কেবলই ভয় পেয়েছে। এই কথাটি আমাদের বুঝতে হবে যে অসীমের অভিমুখে আমাদের চলবার পন্থাটি মুক্ত না রাখলে নয়। থামার সীমাই হচ্ছে আমাদের মৃত্যু; আরোর পরে আরোই হচ্ছে আমাদের প্রাণ— সেই আমাদের ভূমার দিকটি জড়তার দিক নয়, সহজের দিক নয়, সে দিক অন্ধ অনুসরণের দিক নয়, সেই দিক নিয়তসাধনার দিক। সেই মুক্তির দিককে মানুষ যদি আপন কল্পনার বেড়া দিয়ে ঘিরে ফেলে, আপনার দুর্বলতাকেই লালন করে ও শক্তিকে অবমানিত করে, তবে তার বিনাশের দিন উপস্থিত হয়।

এমনি করে মানুষ যখন সহজ করবার জন্যে আপনার পূজাকে ছোটো করতে গিয়ে পূজনীয়কে একপ্রকার বাদ দিয়ে বসে তখন পুনশ্চ সে এই দুর্গতি থেকে আপনাকে বাঁচাবার ব্যগ্রতায় অনেক সময় আর-এক বিপদে গিয়ে পড়ে— আপন পূজনীয়কে এতই দূরে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে রাখে সেখানে আমাদের পূজা পৌঁছতে পারে না, অথবা পৌঁছতে গিয়ে তার সমস্ত রস শুকিয়ে যায়। এ কথা তখন মানুষ ভুলে যায় যে অসীমকে কেবলমাত্র ছোটো করলেও যেমন তাঁকে মিথ্যা করা হয় তেমনি তাঁকে কেবলমাত্র বড়ো করলেও তাঁকে মিথ্যা করা হয়; তাঁকে শুধু ছোটো করে আমাদের বিকৃতি, তাঁকে শুধু বড়ো করে আমাদের শুষ্কতা।

অনন্তং ব্রহ্ম, অনন্ত বলেই ছোটো হয়েও বড়ো এবং বড়ো হয়েও ছোটো। তিনি অনন্ত বলেই সমস্তকে ছাড়িয়ে আছেন এবং অনন্ত বলেই সমস্তকে নিয়ে আছেন। এইজন্যে মানুষ যেখানে মানুষ সেখানে তো তিনি মানুষকে ত্যাগ করে নেই। তিনি পিতামাতার হৃদয়ের পাত্র দিয়ে আপনিই আমাদের স্নেহ দিয়েছেন, তিনি মানুষের প্রীতির আকর্ষণ দিয়ে আপনি আমাদের হৃদয়ের গ্রন্থি মোচন করেছেন; এই পৃথিবীর আকাশেই তাঁর যে বীণা বাজে তারই সঙ্গে আমাদের হৃদয়ের তার এক সুরে বাঁধা; মানুষের মধ্য দিয়েই তিনি আমাদের সমস্ত সেবা গ্রহণ করছেন, আমাদের কথা শুনছেন এবং শোনাচ্ছেন; এইখানেই সেই পুণ্যলোক সেই স্বর্গলোক যেখানে জ্ঞানে প্রেমে কর্মে সর্বতোভাবে তাঁর সঙ্গে আমাদের মিলন ঘটতে পারে। অতএব মানুষ যদি অনন্তকে সমস্ত মানবসম্বন্ধ হতে বিচ্যুত করে জানাই সত্য মনে করে তবে সে শূন্যতাকেই সত্য মনে করবে। আমরা মানুষ হয়ে জন্মেছি যখনই এ কথা সত্য হয়েছে তখনই এ কথাও সত্য— অনন্তের সঙ্গে আমাদের সমস্ত ব্যবহার এই মানুষের ক্ষেত্রেই, মানুষের বুদ্ধি, মানুষের প্রেম, মানুষের শক্তি নিয়েই। এইজন্যে ভূমার আরাধনায় মানুষকে দুটি দিক বাঁচিয়ে চলতে হয়। এক দিকে নিজের মধ্যেই সেই ভূমার আরাধনা হওয়া চাই, আর-এক দিকে অন্য আকারে সে যেন নিজেরই আরাধনা না হয়; এক দিকে নিজের শক্তি নিজের হৃদয়বৃত্তিগুলি দিয়েই তাঁর সেবা হবে, আর-এক দিকে নিজেরই রিপুগুলিকে ধর্মের রসে সিক্ত করে সেবা করবার উপায় করা যেন না হয়।

অনন্তের মধ্যে দূরের দিক এবং নিকটের দিক দুইই আছে; মানুষ সেই দূর ও নিকটের সামঞ্জস্যকে যে পরিমাণে নষ্ট করেছে সেই পরিমাণে ধর্ম যে কেবল তার পক্ষে অসম্পূর্ণ হয়েছে তা নয়, তা অকল্যাণ হয়েছে। এইজন্যেই মানুষ ধর্মের দোহাই দিয়ে সংসারে যত দারুণ বিভীষিকার সৃষ্টি করেছে এমন সংসারবুদ্ধির দোহাই দিয়ে নয়। আজ পর্যন্ত ধর্মের নামে কত নরবলি হয়েছে এবং কত নরবলি হচ্ছে তার আর সীমাসংখ্যা নেই; সে বলি কেবলমাত্র মানুষের প্রাণের বলি নয়— বুদ্ধির বলি, দয়ার বলি, প্রেমের বলি। আজ পর্যন্ত কত দেবমন্দিরে মানুষ আপনার সত্যকে ত্যাগ করেছে, আপনার মঙ্গলকে ত্যাগ করেছে এবং কুৎসিতকে বরণ করেছে। মানুষ ধর্মের নাম করেই নিজেদের কৃত্রিম গণ্ডির বাইরের মানুষকে ঘৃণা করবার নিত্য অধিকার দাবি করেছে। মানুষ যখন হিংসাকে, আপনার প্রকৃতির রক্তপায়ী কুকুরটাকে, একেবারে সম্পূর্ণ শিকল কেটে ছেড়ে দিয়েছে তখন নির্লজ্জভাবে ধর্মকে আপন সহায় বলে আহ্বান করেছে। মানুষ যখন বড়ো বড়ো দস্যুবৃত্তি করে পৃথিবীকে সন্ত্রস্ত করেছে

তখন আপনার দেবতাকে পূজার লোভ দেখিয়ে দলপতির পদে নিয়োগ করেছে বলে কল্পনা করেছে। কৃপণ যেমন করে আপনার টাকার থলি লুকিয়ে রাখে তেমনি করে আজও আমরা আমাদের ভগবানকে আপনার সম্প্রদায়ের লোহার সিন্দুকে তালা বন্ধ করে রেখেছি বলে আরাম বোধ করি এ ং মনে করি যারা আমাদের দলের নামটুকু ধারণ না করেছে তারা ঈশ্বরের ত্যাজ্যপুত্ররূপে কল্যাণের অধিকার হতে বঞ্চিত। মানুষ ধর্মের দোহাই দিয়েই এই কথা বলেছে এই সংসার বিধাতার প্রবঞ্চনা, মানবজন্মটাই পাপ, আমরা ভারবাহী বলদের মতো হয় কোনো পূর্বপিতামহের নয় নিজের জন্মজন্মান্তরের পাপের বোঝা বহে নিয়ে অন্তহীন পথে চলেছি। ধর্মের নামেই অকারণ ভয়ে মানুষ পীড়িত হয়েছে এবং অদ্ভুত মূঢ়তায় আপনাকে ইচ্ছাপূর্বক অন্ধ করে রেখেছে।

কিন্তু, তবু এই-সমস্ত বিকৃতি ও ব্যর্থতার ভিতর দিয়েও ধর্মের সত্যরূপ নিত্যরূপ ব্যক্ত হয়ে উঠছে। বিদ্রোহী মানুষ সমূলে তাকে ছেদন করবার চেষ্টা করে কেবল তার বাধাগুলিকেই ছেদন করছে। অবশেষে এই কথা মানুষের উপলব্ধি করবার সময় এসেছে যে, অসীমের আরাধনা মনুষ্যত্বের কোনো অঙ্গের উচ্ছেদ-সাধন নয়, মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ পরিণতি। অনন্তকে একই কালে এক দিকে আনন্দের দ্বারা অন্য দিকে তপস্যার দ্বারা উপলব্ধি করতে হবে; কেবলই রসে মজে থাকতে হবে না— জ্ঞানে বুঝতে হবে, কর্মে পেতে হবে, তাঁকে আমার মধ্যে যেমন আনতে হবে তেমনি আমার শক্তিকে তাঁর মধ্যে প্রেরণ করতে হবে। সেই অনন্তস্বরূপের সম্বন্ধে মানুষ এক দিকে বলেছে আনন্দ হতেই তিনি যা-কিছু সমস্ত সৃষ্টি করছেন, আবার আর-এক দিকে বলেছে : স তপোঽতপ্যত, তিনি তপস্যাদ্বারা যা-কিছু সমস্ত সৃষ্টি করেছেন। এই দুইই একই কালে সত্য। তিনি আনন্দ হতে সৃষ্টিকে উৎসারিত করছেন, তিনি তপস্যাদ্বারা সৃষ্টিকে কালের ক্ষেত্রে প্রসারিত করে নিয়ে চলেছেন। একই কালে তাঁকে তাঁর সেই আনন্দ এবং তাঁর সেই প্রকাশের দিক থেকে গ্রহণ না করলে আমরা চাঁদ ধরছি কল্পনা করে কেবল আকাশ ধরবার চেষ্টা করব।

বহুকাল পূর্বে একবার বৈরাগীর মুখে গান শুনেছিলুম : আমি কোথায় পাব তারে, আমার মনের মানুষ যে রে! সে আরও গেয়েছিল : আমার মনের মানুষ যেখানে, আমি কোন্ সন্ধানে যাই সেখানে! তার এই গানের কথাগুলি আজ পর্যন্ত আমার মনের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। যখন শুনেছি তখন এই গানটিকে মনের মধ্যে কোনো স্পষ্ট ভাষায় ব্যাখ্যা করেছি তা নয়, কিম্বা এ কথা আমার জানবার প্রয়োজন বোধ হয় নি যে যারা গাচ্ছে তারা সাম্প্রদায়িক ভাবে এর ঠিক কী অর্থ বোঝে। কেননা,

অনেক সময়ে দেখা যায় মানুষ সত্যভাবে যে কথাটা বলে মিথ্যাভাবে সে কথাটা বোঝে। কিন্তু, এ কথা ঠিক যে এই গানের মধ্যে মানুষের একটি গভীর অন্তরের কথা প্রকাশ হয়ে পড়েছে। মানুষের মনের মানুষ তিনিই তো, নইলে মানুষ কার জোরে মানুষ হয়ে উঠছে। ইহুদিদের পুরাণে বলেছে, ঈশ্বর মানুষকে আপনার প্রতিরূপ করে গড়েছেন। স্থূল বাহ্য ভাবে এ কথার মানে যেমনই হোক, গভীর ভাবে এ কথা সত্য বৈকি। তিনি ভিতরে থেকে আপনাকে দিয়েই তো মানুষকে তৈরি করে তুলছেন। সেইজন্যে মানুষ আপনার সব-কিছুর মধ্যে আপনার চেয়ে বড়ো একটি কাকে অনুভব করছে। সেইজন্যেই ওই বাউলের দলই বলেছে: খাঁচার মধ্যে অচিন পাখি কমনে আসে যায়! আমার সমস্ত সীমার মধ্যে সীমার অতীত সেই অচেনাকে ক্ষণে ক্ষণে জানতে পারছি, সেই অসীমকেই আমার করতে পারবার জন্যে প্রাণের ব্যাকুলতা।—

আমি কোথায় পাব তারে
আমার মনের মানুষ যে রে!

অসীমের মধ্যে যে-একটি ছন্দ দূর ও নিকট-রূপে আন্দোলিত, যা বিরাট হৃৎস্পন্দনের মতো চৈতন্যধারাকে বিশ্বের সর্বত্র প্রেরণ ও সর্বত্র হতে অসীমের অভিমুখে আকর্ষণ করছে, এই গানের মধ্যে সেই ছন্দের দোলাটুকু রয়ে গেছে।

অনন্তস্বরূপ ব্রহ্ম অন্য জগতের অন্য জীবের সঙ্গে আপনাকে কী সম্বন্ধে বেঁধেছেন তা জানবার কোনো উপায় আমাদের নেই, কিন্তু এইটুকু মনের ভিতরে জেনেছি যে মানুষের তিনি মনের মানুষ; তিনিই মানুষকে পাগল করে পথে বের করে দিলেন, তাকে স্থির হয়ে ঘুমিয়ে থাকতে দিলেন না। কিন্তু, সেই মনের মানুষ তো আমার এই সামান্য মানুষটি নয়; তাঁকে তো কাপড় পরিয়ে, আহার করিয়ে, শয্যায় শুইয়ে, ভোগের সামগ্রী দিয়ে ভুলিয়ে রাখবার নয়। তিনি আমার মনের মানুষ বটে, কিন্তু তবু দুই হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলতে হচ্ছে: আমার মনের মানুষ কে রে! আমি কোথায় পাব তারে! সে যে কে তা তো আপনাকে কোনো সহজ অভ্যাসের মধ্যে স্থূল রকম করে ভুলিয়ে রাখলে জানতে পারব না। তাকে জ্ঞানের সাধনায় জানতে হবে; সে জানা কেবলই জানা, সে জানা কোনোখানে এসে বদ্ধ হবে না। কোথায় পাব তারে। কোনো বিশেষ নির্দিষ্ট স্থানে কোনো বিশেষ অনুষ্ঠানের মধ্যে তো পাওয়া যাবে না; স্বার্থবন্ধন মোচন করতে করতে মঙ্গলকে সাধন করতে করতেই তাকে পাওয়া, আপনাকে নিয়ত দানের দ্বারাই তাকে নিয়ত পাওয়া।

মানুষ এমনি করেই তো আপনার মনের মানুষের সন্ধান করছে। এমনি করেই তো তার সমস্ত দুঃসাধ্য সাধনার ভিতর দিয়েই যুগে যুগে সেই মনের মানুষ প্রত্যক্ষ হয়ে উঠছে। যতই তাকে পাচ্ছে ততই বলছে 'আমি কোথায় পাব তারে'। সেই মনের মানুষকে নিয়ে মানুষের মিলন বিচ্ছেদ একাধারেই; তাঁকে পাওয়ার মধ্যেই তাঁকে না-পাওয়া। সেই পাওয়া না-পাওয়ার নিত্য টানেই মানুষের নব নব ঐশ্বর্যলাভ, জ্ঞানের অধিকারের ব্যাপ্তি, কর্মক্ষেত্রের প্রসার— এক কথায়, পূর্ণতার মধ্যে অবিরত আপনাকে নব নব রূপে উপলব্ধি। অসীমের সঙ্গে মিলনের মাঝখানেই এই-যে একটি চিরবিরহ আছে এ বিরহ তো কেবল রসের বিরহ নয়, কেবল ভাবের দ্বারাই তো এর পূর্ণতা হতে পারে না, জ্ঞানে কর্মেও এই বিরহ মানুষকে ডাক দিয়েছে— ত্যাগের পথ দিয়ে মানুষ অভিসারে চলেছে। জ্ঞানের দিকে, শক্তির দিকে, প্রেমের দিকে, যে দিকেই মানুষ বলেছে 'আমি চিরকালের মতো পৌচেছি' 'আমি পেয়ে বসে আছি', এই বলে যেখানেই সে তার উপলব্ধিকে নিশ্চলতার বন্ধন দিয়ে বাঁধতে চেয়েছে, সেইখানেই সে কেবল বন্ধনকেই পেয়েছে, সম্পদকে হারিয়েছে, সে সোনা ফেলে আঁচলে গ্রন্থি দিয়েছে। এই-যে তার চিরকালের গান: আমি কোথায় পাব তারে আমার মনের মানুষ যে রে! এই প্রশ্ন যে তার চিরদিনের প্রশ্ন: মনের মানুষ যেখানে বলো কোন্ সন্ধানে যাই সেখানে! কেননা, সন্ধান এবং পেতে থাকা এক সঙ্গে; যখনই সন্ধানের অবসান তখনই উপলব্ধির বিকৃতি ও বিনাশ।

এই মনের মানুষের কথা বেদমন্ত্রে আর-এক রকম করে বলা হয়েছে। তাঁকে বলেছে 'পিতা নোঽসি', তুমি আমাদের পিতা হয়ে আছ। পিতা যে মানুষের সম্বন্ধ; কোনো অনন্ত তত্ত্বকে তো পিতা বলা যায় না। অসীমকে যখন পিতা বলে ডাকা হল তখন তাঁকে আপন ঘরের ডাকে ডাকা হল। এতে কি কোনো অপরাধ হল। এতে কি সত্যকে কোথাও খাটো করা হল। কিছুমাত্র না। কেননা, আমার ঘর ছেড়ে তিনি তো শূন্যতার মধ্যে লুকিয়ে নেই। আমার ঘরটিকে তিনি যে সকল রকম করেই ভরেছেন। মাকে যখন মা বলেছি তখন পরম মাতাকে ডাকবার ভাষাই যে অভ্যাস করেছি; মানুষের সকল সম্বন্ধের ভিতর দিয়েই যে তাঁর সঙ্গে আনাগোনার দরজা একটি একটি করে খোলা হয়েছে; মানুষের সকল সম্বন্ধের ভিতর দিয়েই যে আমরা এক-এক ভাবে অসীমের স্পর্শ নিয়েছি। আমার সেই ঘর-ভরা অসীমকে, আমার সেই জীবন-ভরা অসীমকে, আমার ঘরের ডাক দিয়েই ডাকতে হবে— আমার জীবনের ডাক দিয়েই ডাকতে হবে। সেইটেই আমার চরম ডাক, সেইজন্যেই আমার ঘর। সেইজন্যেই আমি মানুষ হয়ে জন্মেছি; সেইজন্যেই আমার জীবনের যত-কিছু জানা, যত-

কিছু পাওয়া। তাই তো মানুষ এমন সাহসে সেই অনন্ত জগতের বিধাতাকে ডেকেছে 'পিতা নোঽসি', তুমি আমারই পিতা, তুমি আমারই ঘরের। এ ডাক সত্য ডাক; কিন্তু, এই ডাকই মানুষ একেবারে মিথ্যা করে তোলে যখন এই ছোটো অনন্তের সঙ্গে সঙ্গেই বড়ো অনন্তকে ডাক না দেয়। তখন তাঁকে আমরা মা ব'লে পিতা ব'লে কেবলমাত্র আবদার করি, আর সাধনা করবার কিছু থাকে না; যেটুকু সাধনা সেও কৃত্রিম সাধনা হয়। তখন তাঁকে পিতা বলে আমরা যুদ্ধে জয়লাভ করতে চাই, মকদ্দমায় ফল লাভ করতে চাই, অন্যায় করে তার শাস্তি থেকে নিষ্কৃতি পেতে চাই। কিন্তু, এ তো কেবলমাত্র নিজের সাধনাকে সহজ করবার জন্য, ফাঁকি দিয়ে আপন দুর্বলতাকে লালন করবার জন্যে, তাঁকে পিতা বলা নয়। সেইজন্যেই বলা হয়েছে: পিতা নোঽসি পিতা নো বোধি। তুমি যে পিতা এই বোধকে আমার উদ্‌বোধিত করতে থাকো। এ বোধ তো সহজ বোধ নয়, ঘরের কোণে এ বোধকে বেঁধে রেখে তো চুপ করে পড়ে থাকবার নয়। আমাদের বোধের বন্ধন মোচন করতে করতে এই পিতার বোধটিকে ঘর থেকে ঘরে, দেশ থেকে দেশে, সমস্ত মানুষের মধ্যে নিত্য প্রসারিত করে দিতে হবে। আমাদের জ্ঞান প্রেম কর্মকে বিস্তীর্ণ করে দিয়ে ডাকতে হবে 'পিতা'— সে ডাক সমস্ত অন্যায়ের উপরে বেজে উঠবে, সে ডাক মঙ্গলের দুর্গম পথে বিপদের মুখে আমাদের আহ্বান করে ধ্বনিত হবে। পিতা নো বোধি! নমস্তেঽস্তু! পিতার বোধকে উদ্‌বোধিত করো— যেন আমাদের নমস্কারকে সত্য করতে পারি, যেন আমাদের প্রতিদিনের পূজায়, আমাদের ব্যবসায়ে, সমাজের কাজে, আমাদের পিতার বোধ জাগ্রত হয়ে পিতাকে নমস্কার সত্য হয়ে ওঠে। মানুষের যে পরম নমস্কারটি তার যাত্রাপথের দুই ধারে তার নানা কল্যাণকীর্তির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে চলেছে, সেই সমগ্র মানবের সমস্ত কালের চিরসাধনার নমস্কারটিকে আজ আমাদের উৎসবদেবতার চরণে নিবেদন করতে এসেছি। সে নমস্কার পরমানন্দের নমস্কার, সে নমস্কার পরম দুঃখের নমস্কার। নমঃ শম্ভবায় চ ময়োভবায় চ, নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ। তুমি সুখরূপে আনন্দকর, তোমাকে নমস্কার! তুমি দুঃখরূপে কল্যাণকর, তোমাকে নমস্কার! তুমি কল্যাণ, তোমাকে নমস্কার! তুমি নব নবতর কল্যাণ, তোমাকে নমস্কার। ১১ মাঘ ১৩২০

ফাল্গুন ১৩২০

১৬

সৌন্দর্যের সকরুণতা

প্রভাতের পূর্বগগনে আলোকের প্রথম বিকাশ যেমন মধুর, মানুষের জীবনের প্রথম প্রত্যুষের অরুণরেখা যেদিন জেগে ওঠে সেদিন শিশুর কণ্ঠে তার সংগীত তেমনি মধুর, তেমনি নির্মল। সমস্ত মানুষের জীবনের আরম্ভে এই মধুর স্বরের উদ্‌বোধন লোকালয়ে ঘরে ঘরে দেখতে পাই। জীবনের সেই নির্মল সৌন্দর্যের ভূমিকাটি কেমন সুন্দর! জগৎসংসারে তাই যত মলিনতা থাক্, জরার দ্বারা মানুষ যেমনই আচ্ছন্ন হোক-না কেন, ঘরে ঘরে মনুষ্যত্ব নতুন হয়ে জন্মগ্রহণ করছে। আজ শিশুদের কণ্ঠে জীবনের সেই উদ্‌বোধনসংগীতের প্রথম কলকাকলি শুনতে পাচ্ছি— এ উদ্‌বোধন কে প্রেরণ করলেন। যিনি জীবনের অধীশ্বর তিনিই ঘরে ঘরে এই জাগরণের গীত পাঠিয়েছেন। আজ চিত্ত সেই গানে জাগ্রত হোক।

কিন্তু, এই উৎসবের সংগীতের মধ্যে একটি করুণ সুর, একটি কান্না রয়েছে; সকালের প্রভাতী রাগিণীর সেই কান্না বুকের মধ্যে শিরা নিংড়ে নিংড়ে বাজছে। আনন্দের সুরের মধ্যে করুণার কোমল নিখাদ বাজছে। সে কিসের করুণা। পিতা ডাক দিয়েছেন, কিন্তু সকলের সময় হয়ে ওঠে নি। জাগে নি সবাই। অনন্ত শূন্যে প্রভাত-আলোকের ভৈরবী সুর করুণা বিস্তার করে যুগ হতে যুগে ধ্বনিত হচ্ছে, তিনি উৎসব-ক্ষেত্রে ডেকেছেন। অনাদিকালের সেই আহ্বান ধ্বনিত হচ্ছে; কিন্তু, তাঁর ছেলে-মেয়েদের ঘুম ভাঙে নি। তারা কেউ বা উদাসীন, কারও বা কাজ আছে, কেউ বা উপহাস করছে, কাউকে বা অভ্যাসের আবরণ কঠিন করে ঘিরে আছে। তারা সংসারের কোলাহল শুনেছে, স্বার্থের আহ্বান শুনেছে, প্রতিদিনের প্রয়োজনের ডাক শুনেছে, কিন্তু আকাশের আলোকের ভিতরে আনন্দময়ের আনন্দভবনে উৎসবের আমন্ত্রণের আহ্বান শুনতে পায় নি।

প্রেমিকের ডাক প্রেমাস্পদের কাছে আসছে, মাঝখানে কত ব্যবধান! কত অবিশ্বাস, কত কলুষ, কত মোহ, কত বাধা! উৎসবের নহবত প্রভাতে প্রভাতে বাজছে, তারায় তারায় অন্ধকারের হৃদয় ভেদ করে বাজছে— সেই উৎসবালোকে ফুল ফুটছে, পাখি গান করছে, শ্যামল তৃণের আস্তরণ পাতা হয়েছে, তাঁর মালীরা ফুলের মালা গেঁথে ঝুলিয়ে রেখেছে। কিন্তু, এতই ব্যবধান, সেখানকার সংগীতকে এখানে

আমাদের কাছে পৌঁছতে দিচ্ছে না। সেইজন্যই তিনি যে সৌন্দর্যের সংগীত বাজাচ্ছেন তার মধ্যে অমন কান্না রয়েছে। পৌঁছল না, সবাই এসে জুটল না, আনন্দসভা শূন্য পড়ে রইল। জগতের সৌন্দর্যের বুকের মধ্যে এই কান্না বাজছে। ফুল ফুটতে ফুটতে ঝরতে ঝরতে কত কান্নাই কাঁদল। সে বললে, যে প্রেমলিপি আমি আনলুম সে লিপিখানি কেউ পড়ল না।

নদীর কলস্রোতে নির্জন পর্বতশিখর থেকে যে সংগীতকে বহন করে সমুদ্রের দিকে চলেছে সেই সুরে কান্না রয়েছে: আমি যে নির্জন থেকে নির্জনের দিকে চলেছি সেই নির্জনের সুর গ্রামে গ্রামে লোকালয়ে ঘোষণা করেছি, কারও সময় হল না সে আহ্বান শুনবার। আকাশের সমস্ত তারা এমন ডাক ডাকল, কাননের সমস্ত ফুল এমন ডাক ডাকল— দরজা রুদ্ধ— কেউ শুনল না। এমন সুন্দর জগতে জন্মালুম, এমন সুন্দর আলোকে চোখ মেললুম, সেখানে কি কেবল কাজ! কাজ! কেবল প্রবৃত্তির কোলাহল! কেবল এই কলহ মাৎসর্য বিরোধ! সেখানে এরাই কি সকলের চেয়ে প্রধান! এই সুরেই কি সূর্য চন্দ্র সুর মেলাচ্ছে! এই সুরেই কি সুর ধরিয়েছিলেন যেদিন জননী শিশুকে প্রথম মুখচুম্বন করলেন! এত বড়ো আকাশ, তার এমন নির্মল নীলিমা! একে মানব না? পৃথিবীর এমন আশ্চর্য প্রাণবান গীতিকাব্য, একে মানব না! সেইজন্যই জগতের সৌন্দর্যের মধ্যে এমন একটি চিরবিরহের করুণা। প্রেমিকের সঙ্গে প্রেমাস্পদের বিচ্ছেদ হয়েছে, মাঝখানে স্বার্থের মরুভূমি। সেই মরুভূমি পার হয়ে ডাক আসছে 'এসো এসো'— সেই ডাকের কান্নায় আকাশ ভরে গেল, আলোক ফেটে পড়ল।

কিন্তু, যিনি উৎসবের দেবতা তিনি অপেক্ষা করতে জানেন। এই মরুভূমির ভিতর দিয়ে তিনিই পার করছেন, পথহারাদের ক্রমে ক্রমে পথে টেনে আনছেন। দুঃখের অশ্রুতে তাঁর মিলনের শতদল বিকশিত হচ্ছে। তিনি জানেন যে বধির সেও শুনবে, চিরযুগের রুদ্ধদ্বার একদিন খুলবে, পাষাণ একদিন গলবে। এই বাধা-বিরোধের ভিতর থেকে তিনি টেনে নেবেন।

মানুষের জাগরণ সহজ নয় বলেই তার মূল্য যে বেশি। এই জাগরণের জন্য যুগ যুগ যে অপেক্ষা করতে হয়। যেদিন জাগবে মানুষ সেদিন পাখির গানের চেয়ে তার গানের মূল্য অনেক বেশি হবে, ফুলের সৌন্দর্যের চেয়ে তার সৌন্দর্য অনেক বেশি হবে। মানুষ আজ বিদ্রোহ করছে; কিন্তু ঝড়ের মেঘ যেমন শ্রাবণের ধারায় বিগলিত হয়ে তার বজ্রবিদ্যুৎকে নিঃশেষ করে মাটিতে লুটিয়ে গড়িয়ে পড়ে যায়, তেমনি বিদ্রোহী মানুষ যেদিন ঝোড়ো মেঘের মতো কেঁদে ঝরে পড়বে সেদিন মরুভূমিতে বিকশিত হবে ফুল—

তার মূল্য যে অনেক বেশি। সেইজন্য যুগ যুগ রাত্রিদিন তিনি জেগে রইলেন, অপেক্ষা করে রইলেন, পাপীর পাপের মলিনতা ধৌত হয়ে কবে তার হৃদয় ফুলের মতো নির্মল হয়ে ফুটে উঠবে। বৎসরে বৎসরে উৎসব ব্যর্থ হয়; দিনের পর দিন আলোকদূত ফিরে ফিরে যায়; অন্ধকার নিশীথিনীর তারকারা রাত্রির পর রাত্রি একই আহ্বানের পুনরাবৃত্তি করতে থাকে, ক্ষান্ত হয় না, ক্লান্তি আসে না— কারণ, এই আশা যে জেগে রয়েছে যে যেদিন মানুষ ডাক শুনবে সেদিন সমস্ত সার্থক হবে।

আজ উৎসবের প্রাঙ্গণে আমরা এসেছি; এ দিন সকলের উৎসবের দিন কি না তা জানি না। সম্বৎসর তিনি ফুল ফুটিয়েছেন, প্রতিদিনই আমাদের ডেকেছেন। আজ কি আমরা নিজের হাতের তৈরি এই উৎসবক্ষেত্রে তাঁর সেই প্রতি নিমেষের সাড়া দিচ্ছি। হে উৎসবের দেবতা, তোমার উৎসবের ক্ষেত্র ব্যর্থ হবে না। তুমি সাজিয়েছ, আমরা এসেছি। আমরা বললুম 'পিতা নোহসি'; তুমি পিতা এই কথা স্বীকার করলুম। বললুম নমস্তেহস্তু, নমস্কার সত্য হোক। নমস্কার তো সত্য হয় নি। সংসারের মধ্যে নমস্কার সত্য হয় নি। তোমাকে বঞ্চনা করেছি। ক্ষমতার পায়ে,ধনের পায়ে নমস্কার করেছি। হে আমার উৎসবদেবতা, আজ একটুখানি নমস্কার বাঁচিয়ে এনেছি— আজ আসবার সময় ধনমানের কাছ থেকে কুড়িয়ে-বাড়িয়ে একটু নমস্কার আনতে পেরেছি— সে না হতে পারে প্রতিদিনের নমস্কার, না হতে পারে সমস্ত জীবনের নমস্কার, কিন্তু এই ক্ষণকালের নমস্কার তুমি নাও, সমস্ত জীবনের অসাড়তা অচৈতন্য দূর হোক, তুমি নিজের হাতে জাগাও—

তুমি আপনি জাগাও মোরে তব সুধাপরশে।

১১ মাঘ ১৩২১

অমৃতের পুত্র

অমৃত-উৎসের ধারে মানুষকে একবার করে আসতে হবে এবং আপনাকে নতুন করে নিতে হবে। জীবনের তত্ত্বই হচ্ছে মরণের ভিতর দিয়ে নতুনকে কেবলই প্রকাশ করা। সংসারের মধ্যে জরা সব জীর্ণ করছে, যা-কিছু নতুন তার উপর সে তার তপ্ত হাতের কালিমা বোলাচ্ছে, তাই দেখতে দেখতে নির্মল ললাটে বলির রেখা পড়ে— সকল কর্মে ক্লান্তি ও অবসাদ কেবলই জমে ওঠে। এই জরার আক্রমণে আমরা

প্রতিদিন পুরাতন হয়ে যাচ্ছি। সেইজন্য মানুষ নানা উপলক্ষ্য করে একটি জিনিসকে কেবলই প্রকাশ করতে চায়। সে জিনিসটি তার চিরযৌবন। জরাদৈত্য যে তার সব রক্ত শোষণ করেছে সে এ কথা মানতে চায় না। সে জানে যে তার অন্তরের চিরনবীন চিরযৌবনের ভাণ্ডারে অমৃত পরিপূর্ণ। সেই কথাটি ঘোষণা করবার জন্যই মানুষের উৎসব।

মানুষ দেখতে পেয়েছে যে সংসারের সঞ্চয় প্রতিদিন ক্ষয় হয়ে যায়। যতই ভয় ভাবনা করি, যতই আগলে আগলে রাখি, কাল সমস্তই নষ্ট করবে— নবীন সৌন্দর্য কোথাও রাখবে না। সংসার যে বৃদ্ধকে তৈরি করছে ; সে আরম্ভ করে নবীন শিশুকে নিয়ে, তার পরে একদিন বৃদ্ধ করে তাকে ছেড়ে দেয়। প্রভাতের শুভ্র নির্মলতা নিয়ে সে আরম্ভ করে, তার পরে তার উপর কালের প্রলেপ দিতে দিতে তাকে নিশীথ রাত্রের কালিমায় হারিয়ে ফেলে।

অথচ এই জরার হাত থেকে মানুষকে তো রক্ষা পেতে হবে। কেমন করে পাবে, কোথায় পাবে। যেখানে চিরপ্রাণ সেইখানে পাবে। সে প্রাণের লীলার ধারা তো একসূত্রের ধারা নয়। দেখো-না কেন, রাত্রির পরে দিন নতুন নতুন পুষ্পে পুষ্পিত হয়ে প্রকাশ পাচ্ছে। দিনান্তে নিশীথের তারা নতুন করেই আপনার দীপ জ্বালাচ্ছে। মৃত্যুর সূত্রে প্রাণের মালাকর অমনি করে জীবনের ফুলকে নবীন করে গেঁথে তুলছেন। কিন্তু, সংসার একটানা মৃত্যুকে ধরে রেখেছে, সে সব জিনিসকে কেবলই ক্ষয় করতে করতে সেই অতল গহ্বরে নিয়ে গিয়ে ফেলে। কিন্তু, এই একটানা মৃত্যুর ধারা যদি চরম সত্য হত তবে তো কিছুই নতুন হয়ে উঠত না, তবে তো এত দিনে পৃথিবী পচে উঠত, তবে জরার মূর্তিই সব জায়গায় প্রকাশ পেত। সেইজন্য মানুষ উৎসবের দিনে বলে, আমি এই মৃত্যুর ধারাকে মানব না, আমি অমৃতকে চাই। এ কথাও মানুষ বলেছে, অমৃতকে আমি দেখেছি, আমি পেয়েছি, সমস্তই বেঁচে আছে অমৃতে।

মৃত্যুর সাক্ষ্য চারি দিকে, অথচ মানুষ বলে উঠেছে : ওগো শোনো, তোমরা অমৃতের পুত্র, তোমরা মৃত্যুর পুত্র নও।—

শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ
আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং।

আমি তাঁকে জেনেছি এই বার্তা যাঁরা বলেছেন তাঁরা সে কথা বলবার আরম্ভে সম্বোধনেই আমাদের কী আশ্বাস দিয়ে বলেছেন 'তোমরা দিব্যধামবাসী অমৃতের পুত্র— তোমরা সংসারবাসী মৃত্যুর পুত্র নও'! জগতের মৃত্যুর বাঁশির ভিতর দিয়ে এই অমৃতের সংগীত

যে প্রচারিত হচ্ছে এ সংগীত তো পশুরা শুনতে পায় না। তারা খেয়েদেয়ে ধুলোয় কাদায় লুটিয়ে দিন কাটিয়ে দিচ্ছে। অমৃতের সংগীত যে তোমরাই শোনবার অধিকারী। কেন। তোমরা যে মৃত্যুর অধীন নও, তোমরা মৃত্যুর একটানা পথেই চলছ না—'

শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ
আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ।

তোমরা যে ধামে রয়েছ, যে লোকে বাস করছ, সে কোন্ লোক। তোমরা কি এই পৃথিবীর ধুলোমাটিতেই রয়েছ যেখানে সমস্ত জীর্ণ হয়ে ঝরে ঝরে পড়ছে। না, তোমরা দিব্যলোকে বাস করছ, অমৃতলোকে বাস করছ। এই কথা মৃত্যুর মাঝখানে দাঁড়িয়ে মানুষ বলছে, সমস্ত সাক্ষ্যকে অস্বীকার করে মানুষ বলছে। এ কথা সে মরতে মরতে বলছে। এই মাটির উপর মাটির জীবের সঙ্গে বাস করে বলছে : তোমরা এই মাটিতে বাস করছ না, তোমরা দিব্যধামে বাস করছ।

সেই দিব্যধামের আলো কোথা থেকে আসে। তমসঃ পরস্তাৎ। তমসার পরপার থেকে আসে। এই মৃত্যুর অন্ধকার সত্য নয়, সত্য সেই জ্যোতি যা যুগে যুগে মোহের অন্ধকারকে বিদীর্ণ করে আসছে। যুগে যুগে মানুষ অজ্ঞানের ভিতর থেকে জ্ঞানকে পাচ্ছে, যুগে যুগে মানুষ পাপকে মলিনতাকে বিদীর্ণ করে পুণ্যকে আহরণ করছে। বিরোধের ভিতর দিয়ে সত্যকে পাচ্ছে, এ ছাড়া সত্যকে পাবার আর-কোনো উপায় মানুষের নেই। যারা মনে করছে এই জ্যোতিই অসত্য, এই দিব্যধামের কথা কল্পনা মাত্র, তাদের কথা যদি সত্য হত তবে মাটিতে মানুষ একদিন যেমন জন্মেছিল ঠিক তেমনিই থাকত, তার আর কোনো বিকাশ হত না। মানুষের মধ্যে অমৃত রয়েছে বলেই না মৃত্যুকে ভেদ করে সেই অমৃতের প্রকাশ হচ্ছে। ফোয়ারা যেমন তার ছোটো একটুখানি ছিদ্রকে ভেদ করে ঊর্ধ্বে আপনার ধারাকে উৎক্ষিপ্ত করে তেমনি এই মৃত্যুর সংকীর্ণ ছিদ্রের ভিতর দিয়ে অমৃতের উৎস উঠছে। যাঁরা এটা দেখতে পেয়েছেন তাঁরা ডাক দিয়ে বলেছেন : ভয় কোরো না, অন্ধকার সত্য নয়, মৃত্যু সত্য নয়, তোমাদের অমৃতের অধিকার। মৃত্যুর কাছে দাসখত লিখে দিয়ো না ; যদি প্রবৃত্তির হাতে আত্মসমর্পণ কর তবে এই অমৃতত্বের অধিকারকে যে অপমানিত করবে। কীট যেমন করে ফুলকে খায় তেমনি করে প্রবৃত্তি যে একে খেতে থাকবে। তিনি নিজে বলেছেন : তোরা অমৃতের পুত্র, আমার মতন তোরা। আর আমরা সে কথা প্রতিদিন মিথ্যা করব ?

ভেবে দেখো, মানুষকে কি অমৃতের পুত্র করে তোলা সহজ। মানুষের বিকাশে

যত বাধা ফুলের বিকাশে তত বাধা নেই। সে যে খোলা আকাশে থাকে; সমস্ত আলোকের ধারা বাতাসের ধারা নিয়ত সেই আকাশ ধুয়ে দিচ্ছে— সে বাতাসে তো দূষিত বাষ্প জমা হয়ে তাকে বিষাক্ত করছে না, মুহূর্তে মুহূর্তে আকাশ-ভরা প্রাণ সেই বিষকে ক্ষালন করে দিচ্ছে, তাকে কোথাও জমতে দিচ্ছে না। মানুষের মুশকিল হয়েছে, সে আপনার সংস্কার দিয়ে আপনার চারি দিকে একটা আবরণ উঠিয়েছে; কত যুগের কত আবর্জনাকে সে জমিয়ে জমিয়ে তুলেছে। সে বলে, আকাশের আলোকে আমি বিশ্বাস করব না, আমার ঘরের মাটির দীপকে আমি বিশ্বাস করব; আলোক নতুন, কিন্তু আমার ওই দীপ সনাতন। তার শয়নগৃহে বিষাক্ত বাতাস জমা হয়ে রয়েছে; সেইটেতেই সে পড়ে থাকতে চায়, কেননা, সে যে হল তার সঞ্চিত বাতাস, সে নতুন বাতাস নয়। ঈশ্বরের আলো ঈশ্বরের বাতাস কেবলই যে নতুনকে আনে সেই নতুনকে সে বিশ্বাস করছে না। ঘরের কোণের অন্ধকারটা পুরাতন, তাকেই সে পূজা করে।

এইজন্য ঈশ্বরকে ইতিহাসের বেড়া যুগে যুগে ভাঙতে হয়। তাঁর আলোককে তাঁর আকাশকে যা নিষেধ করে দাঁড়ায় তারই উপরে একদিন তাঁর বজ্র এসে পড়ে, সেইখানে একদিন তাঁর ঝড় বয়। তবে মুক্তি। স্তূপাকার সংস্কার যা জমা হয়ে উঠে সমস্ত চলবার পথকে আটকে বসে আছে সেইখানে রক্তস্রোত বয়ে যায়। তবে মুক্তি। স্বার্থের সঞ্চয় যখন অভ্রভেদী হয়ে ওঠে তখন কামানের গোলা দিয়ে তাকে ভাঙতে হয়। তবে মুক্তি। তখন কান্নায় আকাশ ছেয়ে যায়, কিন্তু সেই কান্নার ধারা নইলে উত্তাপ দূর হবে কেমন করে।

চিরদিন এমনি করে সত্যের সঙ্গে লড়াই করে এসেছে মানুষ। মানুষের নিজের হাতের গড়া জিনিসের উপর মানুষের বড়ো মোহ; সেইজন্য মানুষ নিজের হাতেই নিজে মার খায়। মানুষ নিজের হাতে নিজেকে মারবার গদা তৈরি করে। সেইজন্য আজ সেই নিজের হাতের গড়া গদার আঘাতে রাজ্য-সাম্রাজ্যের সমস্ত সীমা চূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। মানুষের স্বার্থবুদ্ধি আজ বলছে, ধর্মবুদ্ধির কোনো কথা আমি শুনতে চাই না, আমি গায়ের জোরে সব কেড়েকুড়ে নেব। সংসারের পোষ্যপুত্র যারা তারা সংসারের ধর্ম গ্রহণ করে; সে ধর্ম, যে সবল সে দুর্বলের উপর প্রভুত্ব করবে। কিন্তু, মানুষ যে সংসারের পুত্র নয়, সে যে অমৃতের পুত্র; সেইজন্য তাকে নিজের গদা দিয়ে স্বার্থের ধর্ম, যা তার পরধর্ম, তাকে ধূলিসাৎ করতে হবে। এ সংগ্রাম মানুষকে করতেই হবে। যা জমিয়েছে তাকে চিরকালই আঁকড়ে ধরে রাখবে এ কেমন মমতা। যেমন দেহের প্রতি আমাদের মমতা। আমরা কি হাজার চেষ্টা করলেও দেহকে রাখতে

পারি। যতই কেঁদে মরি-না কেন, যতই বলি-না কেন যে তার সঙ্গে অনেক দিন ধরে আমার সম্বন্ধ— তাকে রাখতে পারব না, কারণ তাকে রক্ষা মানেই মৃত্যুকে ধরে রাখা। আমাদের যে দেহকে ত্যাগ করে মৃত্যুকেই মারতে হয়। তেমনি বাপ-পিতামহ থেকে যা চলে আসছে, যা জমে রয়েছে, তাকে চিরকাল ধরে রাখবার ইচ্ছাও মৃত্যুকে ধরে রাখবার ইচ্ছামাত্র। দেহকে রাখতে পারলুম না, পুরাতনকেও রাখতে পারব না।

ইতিহাসবিধাতা তাই বললেন নতুন হতে হবে। কামানের গর্জনে আজ সেই বাণীই শুনতে পাচ্ছি, নতুন হতে হবে। জাতীয়তার আদর্শকে নিয়ে য়ুরোপ এতকাল ধরে তার প্রতাপকে অভ্রভেদী তরে তুলেছে। ছোটো জাহাজ ছিল, তার পর বড়ো জাহাজ, তার পর বড়ো জাহাজ থেকে আরও বড়ো জাহাজ। কামান ছোটো ছিল, তা থেকে আরও বড়ো কামান গড়ে তুলে য়ুরোপ তার মারণ-অস্ত্র সব এতকাল বসে শানিয়েছে। জলে স্থলে এই-সব ব্যাপার করে তুলে তার তৃপ্তি হল না; আকাশে পর্যন্ত মারবার যন্ত্র তাকে তৈরি করতে হল। নিজের প্রতাপকে এমনি করে অভ্রভেদী করে সে দুর্বলকে টিপে তার রক্ত পান করবে, এমন কথা কি সে বলতে পারে। মানুষ মানুষকে খেয়ে বাঁচবে, এই হবে? ইতিহাসবিধাতা তাই হতে দেবেন? না। তিনি কামানের গর্জনের ধ্বনির ভিতর দিয়ে বলেছেন, নতুন হতে হবে। য়ুরোপে নতুন হবার সেই ডাক উঠেছে।

সেই আহ্বান আমাদের মধ্যে নেই? আমরাই জরাজীর্ণ হয়ে থাকব? ইতিহাস-বিধাতা কি আমাদেরই আশা ত্যাগ করেছেন। দুর্গতির পর দুর্গতি, দুঃখের পর দুঃখ দিয়ে তিনি আমাদের দেশকে বলছেন: না হয় নি, তোমাদেরও হয় নি, নতুনকে লাভ অমৃতকে লাভ হয় নি। তুমি যে আবর্জনাস্তূপ জমিয়েছ তা তোমাকে আশ্রয় দিতে পারে নি। আমি অনন্ত প্রাণ, আমায় বিশ্বাস করো। বীর পুত্র, দুঃসাহসিক পুত্র সব, বেরিয়ে পড়ো।— এই বাণী কি আসে নি। এ কথা তিনি শোনান নি?—

শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ
আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ।

শোনো, তোমরা অমৃতের পুত্র, তোমরা দিব্যধামবাসী। তোমাদের এই অন্ধকারের মধ্যে সেই পরপার থেকে আলোক আসছে। সেইখান থেকে যে আলোক আসছে তাতে জাগ্রত হও; বসে বসে চকমকি ঠুকলে দিনকে সৃষ্টি করতে পারবে না। সেই আলোকে যে নব নব দিন অমৃতের বার্তা নিয়ে আসছে। নব নব লীলায় সব নূতন

নূতন হয়ে উঠছে। দুঃখের ভিতর দিয়ে আনন্দ আসছে, রক্তস্রোতের উপর জীবনের শ্বেত শতদল ভেসে উঠছে।

সেই অমৃতের মধ্যে ডুব দাও, তবেই হে বৃদ্ধ, কাননে যে ফুল এইমাত্র ফুটেছে তুমি তার সমবয়সী হবে; আজ ভোরে পূর্বাশার কোলে যে তরুণ সূর্যের জন্ম হয়েছে, হে প্রবীণ, তোমার বয়স তার সঙ্গে মিলবে। বেরিয়ে এসো সেই আনন্দলোকে, সেই মুক্তির ক্ষেত্রে। ভেঙে ফেলো বাধাবিপত্তিকে, নিত্যনূতনের অমৃতলোকে বেরিয়ে এসো। সেই অমৃতসাগরের তীরে এসে অকূলের হাওয়া নিই, সত্যকে দেখি। সত্যকে নিরমুক্ত আলোকের মধ্যে দেখি। সেই সত্য যা নিশীথের সমস্ত তারকার প্রদীপমালা সাজিয়ে আরতি করছে, সেই সত্য যা সূর্যের উদয় থেকে অস্ত পর্যন্ত সাক্ষীর মতো সমস্ত দেখছে। নব নব নবীনতার সেই জ্ঞানময় সত্য যার মধ্যে প্রাণের বিরাম নেই, জড়তার লেশ নেই, যার মধ্যে সমস্ত চৈতন্য পরিপূর্ণ।

ওরে সংকীর্ণ ঘরের অধিবাসী, ঘরের দরজা ভেঙেচুরে ফেলে দাও। আমরা উৎসবের দেবতাকে দর্শন করে মনুষ্যত্বের জয়তিলক এঁকে নেব, আমরা নূতন বর্ম পরিধান করব। আমাদের সংগ্রাম মৃত্যুর সঙ্গে। নিন্দা-অবমাননাকে তুচ্ছ করে অসত্যের সঙ্গে অন্যায়ের সঙ্গে সেই যুদ্ধ করবার অধিকার তিনি দিয়েছেন। এই অভয় বাণী আমরা পেয়েছি—

শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ
আ যে দিব্যানি ধামানি তস্থুঃ।

এই কথা বলবার দিন আজ এই ভারতবর্ষেরই এসেছে। আজ প্রতাপে মদোন্মত্ত হয়ে তাঁর বিরুদ্ধে মানুষ বিদ্রোহের ধ্বজা তুলেছে— আমরা যত ছোটো হই সেই বল সংগ্রহ করব যাতে তার সম্মুখে দাঁড়িয়ে বলতে পারি, না, এ নয়, তোমরা দিব্যধামবাসী অমৃতের পুত্র, তোমরা মৃত্যুর পুত্র নও।

যে ধনমান পায় নি সেই জোরের সঙ্গে বলতে পারে: আমি সত্যকে পেয়েছি; আমার ঐশ্বর্য নেই, গৌরব নেই, আমার দারিদ্র্য-অবমাননার সীমা নেই, কিন্তু আমার এমন অধিকার রয়েছে যার থেকে আমায় কেউ বঞ্চিত করতে পারে না। আমাদের আর-কিছু নেই বলেই এ কথা আমাদের মুখে যেমন শোনাবে এমন আর কারও মুখে নয়। পৃথিবীর মধ্যে লাঞ্ছিত আমরা, আমরা বলব আমরা অমৃতের পুত্র— এবং আমরাই বলছি যে তোমরাও অমৃতের পুত্র। আজ উৎসবের দিনে এই সুরটি আমাদের কানে নিয়ে যেতে হবে। আমাদের দেশের অপমান দারিদ্র্য অত্যন্ত স্বচ্ছ, সেইজন্যই সত্য আমাদের কাছে প্রকাশ পেতে বাধা পাবে না, সে একেবারে নগ্ন হয়ে দেখা দেবে। পাথরের হর্ম্য

গড়ে তুলে আমরাও আকাশের আলোককে নিরুদ্ধ করব না, আমাদের নিরাশ্রয় দীনের কণ্ঠে বড়ো মধুর সুরে বাজবে—

শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ
আ যে দিব্যানি ধামানি তস্থুঃ।

১০ মাঘ ১৩২১, প্রাতঃকাল

যাত্রীর উৎসব

এই প্রাঙ্গণের বাইরে বিশ্বের যে মন্দিরে সন্ধ্যাকাশের তারা জ্বলে উঠেছে, যেখানে অনন্ত আকাশের প্রাঙ্গণে সন্ধ্যার শান্তি পরিব্যাপ্ত, সেই মন্দিরের দ্বারে গিয়ে প্রণাম করতে তো মন কোনো বাধা পায় না। বিশ্বভুবনে ফুলের যে রঙ সহজে পুষ্পকাননে প্রকাশ পেয়েছে, নক্ষত্রলোকে যে আলো সহজে জ্বলেছে, এখানে তো সে রঙ লাগা সহজ হয় নি, এখানে সম্মিলিত চিত্তের আলো তো সহজে জ্বলে নি। এই মুহূর্তে সন্ধ্যাকালের গন্ধগহন কুসুমের সভায়, নিবিড় তারারাজির দীপালোকিত প্রাঙ্গণে, বিশ্বের নমস্কার কী সৌন্দর্যে কী একান্ত নম্রতায় নত হয়ে রয়েছে! কিন্তু, যেখানে দশজন মানুষ এসেছে সেখানে বাধার অন্ত নেই; সেখানে চিত্তবিক্ষেপ কত ঢেউ তুলেছে— কত সংশয়, কত বিরোধ, কত পরিহাস, কত অস্বীকার, কত ঔদ্ধত্য! সেখানে লোক কত কথাই বলে: এ কোন্ দলের লোক, কোন্ সমাজের, এর কী ভাষা! এ কী ভাবে, এর চরিত্রে কোথায় কী দরিদ্রতা আছে, তাই নিয়ে এত তর্ক! এত প্রশ্ন এত বিরুদ্ধতার মাঝখানে কেমন করে নিয়ে যাব সেই প্রদীপখানি একটু বাতাস যার সয় না, সেই ফুলের অর্ঘ্য কেমন করে পৌঁছে দেব একটু স্পর্শেই যা ম্লান হয়। সেই শক্তি তো আমার নেই যার দ্বারা সমস্ত বিরুদ্ধতা নিরস্ত হবে, সব বিক্ষোভের তরঙ্গ শান্ত হবে। জনতার মাঝখানে যেখানে তাঁর উৎসব সেখানে আমি ভয় পাই, এত বিরুদ্ধতাকে ঠেলে চলতে আমি কুণ্ঠিত।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রাজরাজেশ্বর যেখানে তাঁর সিংহাসনে আসীন সেখানে তাঁর চরণে উপবেশন করতে আমি ভয় করি নি। সেখানে গিয়ে বলতে পারি, হে রাজন্, তোমার সিংহাসনের এক পাশে আমায় স্থান দাও। তুমি তো কেবল বিশ্বের রাজা নও, আমার সঙ্গে যে তোমার অনন্ত কালের সম্বন্ধ। এ কথা বলতে কণ্ঠ কম্পিত হয় না, হৃদয় দ্বিধান্বিত হয় না। কিন্তু, ভিড়ের মধ্যে তোমাকে আমার বলে স্বীকার করতে কণ্ঠ যদি কম্পিত হয় তবে মাপ কোরো হে হৃদয়েশ্বর। ভিড়ের মধ্যে যখন ডাক দাও তখন

কোন্ ভাষায় সাড়া দেব। তোমার চরণে হৃদয়ের যে ভাষা সে তো নীরব ভাষা, যে স্তবগান তোমার সে তো অশ্রুত গান। সে যে হৃদয়বীণার তন্ত্রে তন্ত্রে গুঞ্জিত হয়ে ওঠে, সেই বীণা যে তোমার বুকের কাছে তুমি ধরে রেখেছ। যতই ক্ষীণ সুরে সে বাজুক সে তোমার বুকের কাছেই বাজে। কিন্তু, তোমার আমার মাঝখানে যেখানে জনতার ব্যবধান, নীরবে হোক সরবে হোক অন্তরে অন্তরে যেখানে কোলাহল তরঙ্গিত, সেই ব্যবধান ভেদ করে আমার এই ক্ষীণ কণ্ঠের সংগীত যে জাগবে, আমার পূজার দীপালোক যে অনির্বাণ হয়ে থাকবে— এ বড়ো কঠিন, বড়ো কঠিন।

মানুষ গোড়াতেই যে প্রশ্ন করে, কে হে, তুমি কোন্ দলের। এ যে উৎসব— এ তো কোনো এক দল নয়, এ যে শতদল। এ কাদের উৎসব আমি কেমন করে তার নাম দেব। এক-একজন করে কত লোকের নাম বলব। হৃদয়ের ভক্তির প্রদীপ জ্বালিয়ে সমস্ত কোলাহল পার হয়ে স্তব্ধ শান্ত হয়ে যাঁরা এসেছেন আমি তো তাঁদের নাম জানি না। যাঁরা যুগে যুগে এই উৎসবের দীপ জ্বালিয়ে গেছেন এবং যাঁরা অনাগত যুগে এই দীপ জ্বালাবেন তাঁদের কত নাম করব আর কেমন করেই বা করব। আমি এই জানি, যে সম্প্রদায় আপনার বাইরে আসতে চায় না সে নিজের ছাপ মেরে তবে আত্মীয়তা করতে চায়। তাঁর দক্ষিণ মুখের যে অম্লান জ্যোতি অনন্ত আকাশে প্রকাশমান, যে জ্যোতি মনুষ্যত্বের ইতিহাসের প্রবাহে ভাসমান, সম্প্রদায় সেই জ্যোতিকেই নিজের প্রাচীরের মধ্যে অবরুদ্ধ করতে চায়।

উৎসব তো ভক্তির, উৎসব তো ভক্তেরই। সে তো মতের নয়, প্রথার নয়, অনুষ্ঠানের নয়। এ চিরদিনের উৎসব, এ লোকলোকান্তরের উৎসব। সেই অনন্তকালের নিত্য-উৎসবের আলো থেকে যে একটুখানি স্ফুলিঙ্গ এখানে এসে পড়ছে যদি কেউ হৃদয়ের দীপমুখে সেটুকু গ্রহণ করে তবেই সে শিখা জ্বলবে, তবেই উৎসব হবে। যদি তা না হয়, যদি কেবল দস্তুর রক্ষা করা হয়, এ যদি কেবল পঞ্জিকার জিনিস হয়, তবে সমস্ত অন্ধকার ; এখানে একটি দীপও তবে জ্বলে নি। সেইজন্য বলছি এ দলের উৎসব নয়, এ হৃদয়ের ভিতরকার ভক্তির উৎসব। আমরা লোক ডেকে আলো জ্বালাতে পারি, কিন্তু লোক ডেকে তো সুধারসের উৎসকে উৎসারিত করতে পারি না। যদি আজ কোনো জায়গায় ভক্তের কোনো একটি আসন পাতা হয়ে থাকে, এ সভার প্রান্তে যদি ভক্তের হৃদয় জেগে থাকে, তবেই সার্থক হয়েছে এই প্রদীপ জ্বালা, সার্থক হয়েছে এই সংগীতের ধ্বনি, এই-সমস্ত উৎসবের আয়োজন।

এই উৎসব যাত্রীর উৎসব। আমরা বিশ্বযাত্রী, পথের ধারের কোনো পান্থশালাতে আমরা বদ্ধ নই। কোনো বাঁধা মতামতের মধ্যে জড়িয়ে পড়ে দাঁড়িয়ে থেকে উৎসব

হয় না— চলার পথে উৎসব, চলতে চলতে উৎসব। এ উৎসব কবে আরম্ভ হয়েছে। যেদিন এই পৃথিবীতে মায়ের কোলে জন্মগ্রহণ করেছি সেই দিন থেকে এই আনন্দ-উৎসবের আমন্ত্রণ পৌঁচেছে; সেই আহ্বানে সেই দিন থেকে পথে বেরিয়েছি। সেই যাত্রীর সঙ্গে সেই দিন থেকে তুমি যে সহযাত্রী, তাই তো যাত্রীর উৎসব জমেছে। মনে হয়েছিল যে পথে চলেছি সে সংসারের পথ— তার মাঝে সংসার, তার শেষে সংসার; তার লক্ষ্য ধনমান, তার অবসান মৃত্যুতে! কিন্তু না, পথ তো কোথাও ঠেকে না, সমস্তকেই যে ছাড়িয়ে যায়। তুমি সহযাত্রী তার দক্ষিণ-হাত ধরে কত সংকটের মধ্য দিয়ে, সংশয়ের মধ্য দিয়ে, সংগ্রামের ভিতর দিয়ে, তাকে পাশে নিয়ে চলেইছ; কোনো-কিছুতে এসে থামতে দাও নি। সে বিদ্রূপ করেছে, বিরুদ্ধতা করেছে, কিন্তু তুমি তার দক্ষিণ হাত ছাড় নি। তুমি সঙ্গে সঙ্গে চলেছ; তুমি তাকে উত্তীর্ণ করে দিয়েছ সেই অনন্ত মনুষ্যত্বের বিরাট রাজপথে, সেখানে সমস্ত যাত্রীর দল চিরজীবনের তীর্থে চলেছে। ইতিহাসের সেই প্রশস্ত রাজপথে কী আনন্দকোলাহল, কী জয়ধ্বনি! সেই তো উৎসবের আনন্দধ্বনি! তুমি বদ্ধ কর নি, তুমি বদ্ধ হতে দেবে না, তুমি কোনো মতের মধ্যে প্রথার মধ্যে মানুষকে নজরবন্দী করে রাখবে না। তুমি বলেছ, মাভৈঃ, যাত্রীর দল বেরিয়ে পড়ো। কেন ভয় নেই। কিসে নির্ভয়। তুমি যে সঙ্গে সঙ্গে চলছ। তাই তো যে চলছে সে কেবলই তোমাকে পাচ্ছে। যে চলছে না সে আপনাকেই পাচ্ছে, আপনার সম্প্রদায়কেই পাচ্ছে।

অনন্তকাল যিনি আকাশে পথ দেখিয়ে চলেছেন তিনি কবে চলবে ব'লে কারও জন্যে অপেক্ষা করবেন না। যে বসে রয়েছে সে কি দেখতে পাচ্ছে না তার বন্ধন। সে কি জানে না যে এই বন্ধন না খুলে ফেললে সে মুক্ত হবে না, সে সত্যকে পাবে না। সত্যকে বেঁধেছি, সত্যকে সম্প্রদায়ের কারাগারে বন্দী করেছি এমন কথা কে বলে! অনন্ত সত্যকে বন্দী করবে? তুমি যত বড়ো মুগ্ধ হও-না কেন, তোমার মোহ-অন্ধকারের জাল বুনিয়ে বুনিয়ে অনন্ত সত্যকে ঘিরে ফেলবে এত বড়ো স্পর্ধার কথা কোন্ সম্প্রদায় উচ্চারণ করতে পারে!

সত্যকে হাজার হাজার বৎসর ধরে বেঁধে অচল করে রেখে দিয়েছি, এই বলে আমরা গৌরব করে থাকি। সত্যকে পথ চলতে বাধা দিয়েছি— তাকে বলেছি, তোমার আসন এইটুকুর মধ্যে, এর বাহিরে নয়, তুমি গণ্ডি ডিঙিয়ো না, তুমি সমুদ্র পেরিয়ো না। সত্যের অভিভাবক আমি, আমি তাকে মিথ্যার বেড়ার মধ্যে খাড়া দাঁড় করিয়ে রাখব— মুগ্ধদের জন্য সত্যের সঙ্গে মিথ্যাকে যে পরিমাণে মেশানো দরকার সেই মেশানোর ভার আমার উপর— এমন সব স্পর্ধাবাক্য আমরা এতদিন

বলে এসেছি। ইতিহাসবিধাতা সেই স্পর্ধা চূর্ণ করবেন না? মানুষ অন্ধ জড়প্রথার কারাপ্রাচীর যেখানে অভ্রভেদী করে তুলবে এবং সত্যের জ্যোতিকে প্রতিহত করবে সেখানে তাঁর বজ্র পড়বে না? তিনি এ কেমন করে সহ্য করবেন। তিনি কি বলতে পারেন যে তিনি বন্দী। তিনি এ কথা বললে সংসারকে কে বাঁচাবে। তিনি বলেছেন: সত্য মুক্ত, আমি মুক্ত, সত্যের পথিক তোমরা মুক্ত। এই উদ্‌বোধনের মন্ত্র মুক্তির মন্ত্র এখনই নক্ষত্রমণ্ডলীর মধ্যে ধ্বনিত হচ্ছে; অনন্তকাল জাগ্রত থেকে তারা সেই জ্যোতির্ময় মন্ত্র উচ্চারণ করছে। জপ করছে এই মন্ত্র সেই চিরজাগ্রত তপস্বীরা: জাগ্রত হও, জাগ্রত হও; প্রাচীর দিয়ে বাঁধিয়ে সত্যকে বন্দী করে রাখবার চেষ্টা কোরো না। সত্য তা হলে নিদারুণ হয়ে উঠবে; যে লোহার শৃঙ্খল তার হাতকে বাঁধবে সেই শৃঙ্খল দিয়ে তোমার মস্তকে সে করাঘাত করবে।

রুদ্ধ সত্যের সেই করাঘাত কি ভারতবর্ষের ললাটে এসে পড়ে নি। সত্যকে ফাঁসি পরাতে চেয়েছে যে দেশ সে দেশ কি সত্যের আঘাতে মূর্ছিত হয় নি। অপমানে মাথা হেঁট হয় নি? সইবে না বন্ধন; বড়ো দুঃখে ভাঙবে, বড়ো অপমানে ভাঙবে। সেই উদ্‌বোধনের প্রলয়মন্ত্র পৃথিবীতে জেগেছে, সেই ভাঙবার মন্ত্র জেগেছে। বসে থাকবার নয়, কোণের মধ্যে তামসিকতায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে থাকবার নয় — চলবার, ভাঙবার ডাক আজ এসেছে। আজকের সেই উৎসব, সেই সত্যের মধ্যে উদ্‌বোধিত হবার উৎসব।

আমরা সেই মুক্তির মন্ত্র পেয়েছি। কালের স্রোতে ডুবল না 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম', অন্তহীন সত্য, অন্তহীন ব্রহ্মের মন্ত্র। কবে ভারতবর্ষের তপোবনে কোন্ সুদূর প্রাচীন কালে এই মন্ত্র উচ্চারিত হয়েছিল— অন্ত নেই তার অন্ত নেই। অন্তহীন যাত্রাপথে সত্যকে পেতে হবে, জ্ঞানকে পেতে হবে। সমস্ত সম্প্রদায়ের বাইরে দাঁড়িয়ে মুক্ত নীলাকাশের তলে একদিন আমাদের পিতামহ এই মুক্তির মন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন। সেই-যে মুক্তির আনন্দঘোষণার উৎসব সে কি এই ঘরের কোণে বসে আমরা কজনে সম্পন্ন করব, এই কলকাতা শহরের এক প্রান্তে। ভারতবর্ষের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত এই মুক্তির উৎসবের আনন্দধ্বনি বেজে উঠবে না? এই মুক্তির বাণীকে আমাদের পিতামহ কোথা থেকে পেয়েছিলেন। এই অনন্ত আকাশের জ্যোতির ভিতর থেকে একে তিনি পেয়েছেন, বিশ্বের মর্মকুহর থেকে এই মুক্তিমন্ত্রের ধ্বনি শুনতে পেয়েছেন। এই-যে মুক্তির মন্ত্র আগুনের ভাষায় আকাশে গীত হচ্ছে, সেই আগুনকে তাঁরা এই ক'টি সহজ বাণীর মধ্যে প্রস্ফুটিত করেছেন। সেই বাণী আমরা ভুলব? আর বলব সত্য পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে ইতিহাসের

জীর্ণ দেয়ালে ভাঙা-ঘড়ির কাঁটার মতো চিরদিনের জন্য থেমে গেছে ? গৌরব করে বলব 'আমাদেরই দেশে সচল সত্য অচল পাথর হয়ে গেছে— বুকের উপরে সেই জগদ্দল পাথরের ভার আমরা বইছি' ? না, কখনোই না। উদ্‌বোধনের মন্ত্র আজ জগৎ জুড়ে বাজছে: যাত্রী, বেরিয়ে এসো, বেরিয়ে এসো। ভেঙে ফেলো তোমার নিজের হাতের রচিত কারাগার। সেই যাত্রীদের সঙ্গে চলো যারা চন্দ্র-সূর্য-তারার সঙ্গে এক তালে পা ফেলে ফেলে চলছে। ১১ মাঘ ১৩২১, সন্ধ্যার উদ্‌বোধন

মাধুর্যের পরিচয়

আমাদের মন্ত্রে আছে : পিতা নোঽসি পিতা নো বোধি। তুমি আমাদের পিতা, তুমি পিতা আমাদের এই বোধ দাও। এই পিতার বোধ আমাদের অন্তঃকরণে সজাগ নেই বলে আমাদের যেমনই ক্ষতি হোক, পিতার সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধের দিক দিয়ে তাঁর কাজ সমানই চলেছে। আমাদের বোধের অসম্পূর্ণতাতে তাঁর কোনো ব্যাঘাত হয় নি। তিনি তাঁর সমস্ত সন্তানের মধ্যে চৈতন্য ও প্রাণ প্রেরণ করেছেন, তাঁর পিতৃত্ব মানবসমাজে কাজ করেই চলেছে।

কিন্তু, এক জায়গায় তিনি সুপ্ত হয়ে আছেন; তিনি যেখানে আমাদের প্রিয়তম সেখানে তিনি জাগেন নি। যতক্ষণ পর্যন্ত না আমার প্রেম উদ্‌বোধিত হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আত্মার গভীর অন্ধকার নির্জনতার মধ্যে সেই প্রিয়তম সুপ্ত হয়ে আছেন। সংসারের সকল রসের ভিতরে যে তাঁর রস, সকল মাধুর্য সকল প্রীতির মূলে যে তাঁর প্রীতি— এ কথা আমি জানলুম না। আমার প্রেম জাগল না। অথচ তিনি যে সত্যই প্রিয়তম এ কথা সত্য। এ বললে স্বতোবিরুদ্ধতা দোষ ঘটে ? কারণ, তিনি যদি প্রিয়তম তবে তাঁকে ভালোবাসি না কেন। কিন্তু, তা বললে কী হবে, তিনি আমার প্রিয়তম না হলে এত বেদনা আমি পাব কেন। কত মানুষের ভিতরে জীবনের তৃপ্তির সন্ধান করা গেল, ধনমানের পিছনে পিছনে মরীচিকার সন্ধানে ফেরা গেল; মন ভরল না, সে কেঁদে বলল, 'জীবন ব্যর্থ হল— এমন একটি এককে পেলুম না যার কাছে সমস্ত প্রীতিকে নিঃশেষে নিবেদন করে দিতে পারি, দ্বিধা-সংশয়ের হাত থেকে একেবারে নিষ্কৃতি পেতে পারি।' ক্ষণে ক্ষণে এ মানুষকে ও মানুষকে আশ্রয় করলুম; কিন্তু, জীবনের সেই-সব প্রেমের বিচ্ছিন্ন মুহূর্তগুলিকে ভরে তুলবে কেমন করে। কোন্ মাধুর্যের প্লাবনে ছেদগুলো সব ভরে যাবে। এমন একের কাছে আপনাকে নিবেদন করি নি বলেই এত বেদনা পাচ্ছি।

তিনি যে আমার প্রিয়তম এই কথাটা জানলুম না বলেই এত দুঃখ আমার। তিনি সত্যই প্রিয়তম বলেই যা পাচ্ছি তারই মধ্যে দুঃখ রয়ে যাচ্ছে; তাতে প্রেম চরিতার্থ হচ্ছে কই। আমরা সব সন্ধানের মধ্যে এককেই খুঁজছি, এমন কিছুকে খুঁজছি যা সব বিচ্ছিন্নতাকে জোড়া দেবে। জ্ঞান কি জোড়া দিতে পারে। জ্ঞান একটা বস্তুর সঙ্গে অন্য বস্তুকে একবার মিলিয়ে দেখে, একবার বিশ্লেষ করে দেখে। বিরোধটাকে মেটাতে পারে প্রেম, বৈচিত্র্যের সামঞ্জস্য ঘটাতে পারে প্রেম। বৈচিত্র্যের এই মরুভূমির মধ্যে আমাদের তৃষ্ণা কেবলই বেড়ে উঠতে থাকে; জ্ঞান সেই বৈচিত্র্যের অন্তহীন সূত্রকে টেনে নিয়ে ঘুরিয়ে মারবে— সে তৃষ্ণা মেটাবে কেমন করে। সেই প্রেম না জাগা পর্যন্ত কী ঘোরাটাই ঘুরতে হয়! একবার ভাবি ধনী হই, ধনে বিচ্ছিন্নতা ভরে দেবে, সোনায় রুপোয় সব পূর্ণ হয়ে যাবে। কিন্তু, সোনায় রুপোয় সে ফাঁক কি ভরতে পারে। খ্যাতি-প্রতিপত্তি, মানুষের উপরে প্রভাববিস্তার, কিছু দিয়েই সেই ফাঁক ভরে না। প্রেমে সব ফাঁক ভরে যায়, সব বৈচিত্র্য মিলে যায়। মানুষ যে তার সমস্ত চেষ্টার ভিতর দিয়ে কেবলই সেই প্রেমকে খুঁজে বেড়াচ্ছে— সত্যই যে তার প্রিয়তম। সত্য যদি প্রিয়তম না হবেন তবে তাঁর বিরহে মানুষ কি এমন করে লুটিয়ে পড়ত। যাকে সত্য বলে আঁকড়ে ধরতে যায় সে যখন শূন্য হয়ে যায় তখন মানুষের সেই বেদনার মতো বেদনা আর কী আছে। মানুষ তাই একান্তমনে এই কামনাই করছে: আমার সকল প্রেমের মধ্যে সেই একের প্রেমরস বর্ষিত হোক,আমার সব রন্ধ্র পূর্ণ হয়ে যাক। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধকে পাত্রের মতো করে তাঁর প্রেমের অমৃতে পূর্ণ করে মানুষ পান করতে চায়। অন্তরাত্মার এই কামনা, এই সাধনা, এই ক্রন্দন। কিন্তু অহমের কোলাহলে এ কান্না তার নিজের কানেই পৌঁচচ্ছে না। প্রতিবারেই সে মনে করছে, বড্ড ঠকেছি, আর ঠকা নয়, এবার যা চাচ্ছি তাতেই আমার সব অভাব ভরে যাবে। হায় রে, সে অভাব কি আর-কিছুতে ভরে! এমন মোহান্ধ কেউ নেই যার আত্মা পরম বিরহে এই বলে কাঁদছে না 'প্রিয়তম জাগলেন না'। ফুলের মালা টাঙানো হয়েছে, বাতি জ্বালানো হয়েছে, সব আয়োজন পূর্ণ, শুধু তাঁকে ডাকলুম না— তাঁকে জাগালুম না।

যেখানে তিনি পিতামাতা সেখানে তিনি অন্নপান দিচ্ছেন, প্রাণকে বাঁচিয়ে রাখছেন। মায়ের ভাণ্ডার তো খোলা রয়েছে; ধরণীর ভোজে মা পরিবেশন করছেন, পর্যাপ্ত পরিমাণে সব দিচ্ছেন। সেখানে কোনো বাধা নেই। কিন্তু, যখন জগতের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করি এত সৌন্দর্য কেন, এত ফুল ফুটল কেন, আকাশে এত তারার প্রদীপ জ্বলল কেন, জীবনে মাঝে মাঝে বসন্তের দক্ষিনে হাওয়া যৌবনের মর্মরধ্বনি

জাগিয়ে তোলে কেন, তখন বুঝি যে প্রিয়তম জাগলেন না— তাঁরই জাগার অপেক্ষায় যে এত আয়োজন।

তাই আমি আমার অন্তরাত্মাকে যা-কিছু এনে দিচ্ছি সে সব পরিহার করছে। সে বলছে, এ নয়, এ নয়, এ নয়— আমি আমার প্রিয়তমকে চাই। আমি তাঁকে না পেয়েই তো পাপে লুটোচ্ছি, আমি ক্ষুধাতৃষ্ণার এই দাহ সহ্য করছি, আমি চারি দিকে আমার অশান্ত প্রবৃত্তি নিয়ে দস্যুবৃত্তি করে বেড়াচ্ছি। যাঁকে পেলে সব মিলবে তাঁকে পাওয়া হয় নি বলেই এত আঘাত দিচ্ছি। যদি তাঁকে পেতুম বলতুম, 'আমার হয়ে গেছে। আমার দিনের পর দিন, জীবনের পর জীবন ভরে গেল।'

সমস্ত সৌন্দর্যের মাঝখানে যেদিন সেই সুন্দরকে দেখলুম, সমস্ত মাধুর্যের ভিতরে যেদিন সেই মধুরকে পেলুম, সেদিন আমার মাধুর্যের পরিচয় দেব কিসে। মাধুর্যে বিগলিত হয়ে কি পরিচয় দেব। না। মাধুর্যের পরিচয় মাধুর্যে নয়, মাধুর্যের পরিচয় বীর্যে। সেদিন মৃত্যুকে স্বীকার করে পরিচয় দেব। বলব, প্রিয়তম হে, মরব তোমার জন্য। আমার আর শোক নেই, ক্ষুদ্রতা নেই, ক্ষতি নেই। প্রাণের মায়া আর আমার রইল না— বলো-না তুমি, প্রাণকে তোমার কোন্ কাজে দিতে হবে। তোমাকে পেলে ধুলোয় লুটিয়ে কেঁদে বেড়াব তা নয়, কেবল মধুর রসের গান করব তা নয় গো। যেদিন বলতে পারব 'যিনি মধুর পরম মধুর, যিনি সুন্দর পরম সুন্দর, তিনি আমার প্রিয়তম, তিনি আমায় স্পর্শ করেছেন' সেদিন আনন্দে দুর্গম পথে সমস্ত কণ্টককে পায়ে দলে চলে যাব। সেদিন জানব যে কর্মে কোনো ক্লান্তি থাকবে না, ত্যাগে কোথাও কৃপণতা থাকবে না। কোনো বাধাকে বাধা বলে মানব না। মৃত্যু সেদিন সামনে দাঁড়ালে তাকে বিদ্রূপ করে চলে যাব। সেদিন বুঝব তাঁর সঙ্গে আমার মিলন হয়েছে। মানুষকে সেই মিলন পেতেই হবে। দেখতে হবে দুঃখকে মৃত্যুকে সে ভয় করে না। স্পর্ধা করে বীরত্ব করলে সে বীরত্ব টেঁকে না— জগৎ-ভরা আনন্দ যেদিন অন্তরে সুধাস্রোতে বয়ে যাবে সেদিন মানুষের সমস্ত মনুষ্যত্ব সরল হবে, তার কর্ম সহজ হবে, তার ত্যাগ সহজ হবে। সেদিন মানুষ বীর। সেদিন ইচ্ছা করে সে বিপদকে বরণ করবে।

প্রিয়তম যে জাগবেন সে খবর পাব কেমন করে। গান যে বেজে উঠবে। কী গান বাজবে। সে তো সহজ গান নয়, সে যে রুদ্রবীণার গান। সেই গান শুনে মানুষ বলে উঠবে, সৌন্দর্যে অভিভূত হব বলে এ পৃথিবীতে জন্মাই নি, সৌন্দর্যের সুধারসে পেয়ালা ভরে তাকে নিঃশেষে পান করে মৃত্যুকে উপেক্ষা করে চলে যাব। মাধুর্যের প্রকাশ কেবল ললিতকলায় নয়। এই সৌন্দর্যসুধার মধ্যে বীর্যের আগুন রয়েছে; মানুষ যেদিন এই সৌন্দর্যসুধা পান করবে সেদিন দুঃখের মাথার উপরে সে দাঁড়াবে, আগুনে

ঝাঁপ দিয়ে পড়বে। মানুষ বিষয়বিষরসের মত্ততায় বিহ্বল হয়ে সেই আনন্দরসকে পান করল না। সেই আনন্দের মধ্যে বীর্যের অগ্নি রয়েছে, সেই অগ্নিতেই সমস্ত গ্রহচন্দ্রলোক দীপ্যমান হয়ে উঠেছে— সেই বীর্যের অগ্নি মানুষের মনুষ্যত্বকে জাগিয়ে তুলল না। অথচ মানুষের অন্তরাত্মা জানে যে জগতের সুধাপাত্র পরিপূর্ণ আছে বলেই মৃত্যু এখানে কেবলই মরছে এবং জীবনের ধারাকে প্রবাহিত করছে - প্রাণের কোথাও বিরাম নেই। অন্তরাত্মা জানে যে সেই সুধার ধারা জীবন থেকে জীবনান্তরে, লোক থেকে লোকান্তরে ধয়েই চলেছে। কত যোগী, কত প্রেমী, কত মহাপুরুষ সেই সুধার ধারায় সমস্ত জীবনকে ডুবিয়ে অমৃতত্বের সাক্ষ্য দিয়েছেন। তাঁরা মানুষকে ডাক দিয়ে বলেছেন : তোমরা অমৃতের পুত্র, মৃত্যুর পুত্র নও।

কিন্তু, সে কথায় মানুষের বিশ্বাস হয় না। সে যে বিষয়ের দাসত্ব করছে সেইটেই তার কাছে বাস্তব, আর এ-সব কথা তার কাছে শূন্য ভাবুকতামাত্র। সে তাই এ-সব কথাকে বিদ্রূপ করে, আঘাত করে, অবিশ্বাস করে। যাঁরা অমৃতের বাণী এনেছেন মানুষ তাই তাঁদের মেরেছে। তাঁরা যেমন মানুষের হাতে মার খেয়েছেন এমন আর কেউ নয়, অথচ তাঁরা তো মলেন না। তাঁদের প্রাণই শত সহস্র বৎসর ধরে সজীব হয়ে রইল। কারণ, তাঁরাই যে মার খেতে পারেন; তাঁরা যে অমৃতের সন্ধান পেয়েছেন। মৃত্যুর দ্বারা তাঁরা অমৃতের প্রমাণ করেন। মানুষের দরজায় এসে দাঁড়ালে মানুষ তাঁদের আতিথ্য দেয় নি, আতিথ্য দেবে না; মানুষ তাঁদের শত্রু বলে জেনেছে। কারণ, আমরা আমাদের যত-কিছু মত বিশ্বাস সমস্ত পাথরে বাঁধিয়ে রেখে দিয়েছি, ওই-সব পাগলকে ঘরে ঢোকালে সে-সমস্ত যে বিপর্যস্ত হয়ে যাবে এই মানুষের মস্ত ভয়। মৃত্যুকে কৌটার মধ্যে পুরে লোহার সিন্দুকে লুকিয়ে রেখে দিয়েছি, ওরা ঘরে এলে কি আর রক্ষা আছে! লোহার সিন্দুক ভেঙে যে মৃত্যুকে এরা বার করবে।

সেই মৃত্যুকেই তাঁরা মারতে আসেন। তাঁরা মরে প্রমাণ করেন আছে সুধা সমস্ত বিশ্বকে পূর্ণ করে। নিঃশেষে পরম আনন্দে সেই সুধার পাত্র থেকে তাঁরা পান করেন। তাঁরা প্রিয়তমকে জেনেছেন, প্রিয়তম তাঁদের জীবনে জেগেছেন।

আমাদের গানে তাই আমরা ডাকছি : প্রিয়তম হে, জাগো, জাগো, জাগো। কেন না, প্রিয়তম হে, তুমি জাগ নি বলেই মনুষ্যত্ব বিকাশ হল না, পৌরুষ পরাহত হয়ে রইল। তোমার কণ্ঠের বিজয়মাল্য দাও পরিয়ে তুমি আমাদের কণ্ঠে, জয়ী করো সংগ্রামে। সংসারের যুদ্ধে পরাভূত হতে দিয়ো না। বাঁচাও, তোমার অমৃতপাত্র আমার মুখে এনে দাও। অপমানের মধ্যে পরাভবের মধ্যে তোমাকে ডাকছি : জাগো, জাগো, জাগো। জাগরণের আলোকে সমস্ত দেশ উজ্জ্বল হয়ে উঠুক। ১১ মাঘ ১৩২১, সন্ধ্যার উপদেশ

একটি মন্ত্র

মানুষের পক্ষে সব চেয়ে ভয়ংকর হচ্ছে অসংখ্য। এই অসংখ্যের সঙ্গে একলা মানুষ পেরে উঠবে কেন। সে কত জায়গায় হাতজোড় করে দাঁড়াবে। সে কত পূজার অর্ঘ্য কত বলির পশু সংগ্রহ করে মরবে। তাই মানুষ অসংখ্যের ভয়ে ব্যাকুল হয়ে কত ওঝা ডেকেছে কত জাদুমন্ত্র পড়েছে তার ঠিক নেই।

একদিন সাধক দেখতে পেলেন, যা-কিছু টুকরো টুকরো হয়ে দেখা দিচ্ছে তাদের সমস্তকে অধিকার করে এবং সমস্তকে পেরিয়ে আছে সত্যং। অর্থাৎ, যা-কিছু দেখছি তাকে সম্ভব করে আছে একটি না-দেখা পদার্থ।

কেন, তাকে দেখি নে কেন। কেননা, সে যে কিছুর সঙ্গে স্বতন্ত্র হয়ে দেখা দেবার নয়। সমস্ত স্বতন্ত্রকে আপনার মধ্যে ধারণ করে সে যে এক হয়ে আছে। সে যদি হত 'একটি' তা হলে তাকে নানা বস্তুর এক প্রান্তে কোনো একটা জায়গায় দেখতে পেতুম। কিন্তু সে যে হল 'এক', তাই তাকে অনেকের অংশ করে বিশেষ করে দেখবার জো রইল না।

এত বড়ো আবিষ্কার মানুষ আর কোনো দিন করে নি। এটি কোনো বিশেষ সামগ্রীর আবিষ্কার নয়, এ হল মন্ত্রের আবিষ্কার। মন্ত্রের আবিষ্কারটি কী। বিজ্ঞানে যেমন অভিব্যক্তিবাদ— তাতে বলছে জগতে কোনো জিনিস একেবারেই সম্পূর্ণ হয়ে শুরু হয় নি, সমস্তই ক্রমে ক্রমে ফুটে উঠছে। এই বৈজ্ঞানিক মন্ত্রটিকে মানুষ যতই সাধন ও মনন করছে ততই তার বিশ্ব-উপলব্ধি নানা দিকে বেড়ে চলেছে।

মানুষের অনেক কথা আছে যাকে জানবামাত্রই তার জানার প্রয়োজনটি ফুরিয়ে যায়, তার পরে সে আর মনকে কোনো খোরাক দেয় না। রাত পোহালে সকাল হয় এ কথা বার বার চিন্তা করে কোনো লাভ নেই। কিন্তু, যেগুলি মানুষের অমৃতবাণী সেইগুলিই হল তার মন্ত্র। যতই সেগুলি ব্যবহার করা যায় ততই তাদের প্রয়োজন আরও বেড়ে চলে। মানুষের সেইরকম একটি অমৃতমন্ত্র কোনো-এক শুভক্ষণে উচ্চারিত হয়েছিল : সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।

কিন্তু, মানুষ সত্যকে কোথায় বা অনুভব করলে। কোথাও কিছুই তো স্থির হয়ে নেই, দেখতে দেখতে এক আর হয়ে উঠছে। আজ আছে বীজ, কাল হল অঙ্কুর, অঙ্কুর থেকে হল গাছ, গাছ থেকে অরণ্য। আবার সেই সমস্ত অরণ্য স্লেটের উপর ছেলের হাতে আঁকা হিজিবিজির মতো কতবার মাটির উপর থেকে মুছে মুছে

যাচ্ছে। পাহাড়-পর্বতকে আমরা বলি ধ্রুব ; কিন্তু সেও যেন রঙ্গমঞ্চের পট, এক-এক অঙ্কের পর তাকে কোন্ নেপথ্যের মানুষ কোথায় যে গুটিয়ে তোলে দেখা যায় না। চন্দ্র সূর্য তারাও যেন আলোকের বুদ্‌বুদের মতো অন্ধকারসমুদ্রের উপর ফুটে ফুটে ওঠে, আবার মিলিয়ে মিলিয়ে যায়। এইজন্যেই তো সমস্তকে বলি সংসার, আর সংসারকে বলি স্বপ্ন, বলি মায়া। সত্য তবে কোন্‌খানে।

সত্যের তো প্রকাশ এমনি করেই, এই চিরচঞ্চলতায়। নৃত্যের কোনো একটি ভঙ্গিও স্থির হয়ে থাকে না, কেবলই তা নানাখানা হয়ে উঠছে। তবু যে দেখছে সে আনন্দিত হয়ে বলছে 'আমি নাচ দেখছি'। নাচের সমস্ত অনিত্য ভঙ্গিই তালে মানে বাঁধা একটি নিরবচ্ছিন্ন সত্যকে প্রকাশ করছে। আমরা নাচের নানা ভঙ্গিকেই মুখ্য করে দেখছি নে; আমরা দেখছি তার সেই সত্যটিকে, তাই খুশি হয়ে উঠছি। যে ভাঙা গাড়িটা রাস্তার ধারে অচল হয়ে পড়ে আছে সে আপনার জড়ত্বের গুণেই পড়ে থাকে ; কিন্তু যে গাড়ি চলছে তার সারথি, তার বাহন, তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, তার চলবার পথ, সমস্তেরই পরস্পরের মধ্যে একটি নিয়তপ্রবৃত্ত সামঞ্জস্য থাকা চাই, তবেই সে চলে। অর্থাৎ, তার দেশকালগত সমস্ত অংশপ্রত্যংশকে অধিকার ক'রে, তাদের যুক্ত ক'রে, তাদের অতিক্রম করে যদি সত্য না থাকে তবে সে গাড়ি চলে না।

যে ব্যক্তি বিশ্বসংসারে এই কেবলই বদল হওয়ার দিকেই নজর রেখেছে সেই মানুষই হয় বলছে 'সমস্তই স্বপ্ন' নয় বলছে 'সমস্তই বিনাশের প্রতিরূপ— অতি ভীষণ'। সে হয় বিশ্বকে ত্যাগ করবার জন্যে ব্যগ্র হয়েছে নয় ভীষণ বিশ্বের-দেবতাকে দারুণ উপচারে খুশি করবার আয়োজন করছে। কিন্তু, যে লোক সমস্ত তরঙ্গের ভিতরকার ধারাটি, সমস্ত ভঙ্গির ভিতরকার নাচটি, সমস্ত সুরের ভিতরকার সংগীতটি দেখতে শুনতে পাচ্ছে সেই তো আনন্দের সঙ্গে বলে উঠছে সত্যং। সেই জানে, বৃহৎ ব্যাবসা যখন চলে তখনই বুঝি সেটা সত্য, মিথ্যা হলেই সে দেউলে হয়ে অচল হয়। মহাজনের মূলধনের যদি সত্য পরিচয় পেতে হয় তবে যখন তা খাটে তখনই তা সম্ভব। সংসারের সমস্ত-কিছু চলছে বলেই সমস্ত মিথ্যা, এটা হল একেবারেই উল্‌টো কথা। আসল কথা সত্য বলেই সমস্ত চলছে। তাই আমরা চারি দিকেই দেখছি সত্তা আপনাকে স্থির রাখতে পারছে না, সে আপনার কূল ছাপিয়ে দিয়ে অসীম বিকাশের পথে এগিয়ে চলেছে।

এই সত্য পদার্থটি, যা সমস্তকে গ্রহণ করে অথচ সমস্তকে পেরিয়ে চলে, তাকে মানুষ বুঝতে পারলে কেমন করে। এ তো তর্ক করে বোঝবার জো ছিল না; এ আমরা নিজের প্রাণের মধ্যেই যে একেবারে নিঃসংশয় করে দেখেছি। সত্যের রহস্য সব চেয়ে স্পষ্ট করে ধরা পড়ে গেছে তরুলতায় পশুপাখিতে। সত্য যে প্রাণস্বরূপ তা এই

পৃথিবীর রোমাঞ্চরূপী ঘাসের পত্রে পত্রে লেখা হয়ে বেরিয়েছে। নিখিলের মধ্যে যদি একটি বিরাট প্রাণ না থাকত তবে এই জগৎজোড়া লুকোচুরি খেলায় সে তো একটি ঘাসের মধ্যেও ধরা পড়ত না।

এই ঘাসটুকুর মধ্যে আমরা কী দেখছি। যেমন গানের মধ্যে আমরা তান দেখে থাকি। বৃহৎ অঙ্গের ধ্রুপদ গান চলছে; চৌতালের বিলম্বিত লয়ে তার ধীর মন্দ গতি; যে ওস্তাদের মনে সমগ্র গানের রূপটি বিরাজ করছে মাঝে মাঝে সে লীলাচ্ছলে এক-একটি ছোটো ছোটো তানে সেই সমগ্রের রূপটিকে ক্ষণেকের মধ্যে দেখিয়ে দেয়। মাটির তলে জলের ধারা রহস্যে ঢাকা আছে, ছিদ্রটি পেলে সে উৎস হয়ে ছুটে বেরিয়ে আপনাকে অল্পের মধ্যে দেখিয়ে দেয়। তেমনি উদ্ভিদে পশুপাখিতে প্রাণের যে চঞ্চল লীলা ফোয়ারার মতো ছুটে ছুটে বেরোয় সে হচ্ছে অল্পপরিসরে নিখিল সত্যের প্রাণময় রূপের পরিচয়।

এই প্রাণের তত্ত্বটি কী তা যদি কেউ আমাদের জিজ্ঞাসা করে তবে কোনো সংজ্ঞার দ্বারা তাকে আটেঘাটে বেঁধে স্পষ্ট বুঝিয়ে দিতে পারি এমন সাধ্য আমাদের নেই। পৃথিবীতে তাকেই বোঝানো সব চেয়ে শক্ত যাকে আমরা সব চেয়ে সহজে বুঝেছি। প্রাণকে বুঝতে আমাদের বুদ্ধির দরকার হয় নি, সেইজন্যে তাকে বোঝাতে গেলে বিপদে পড়তে হয়। আমাদের প্রাণের মধ্যে আমরা দুটি বিরোধকে অনায়াসে মিলিয়ে দেখতে পাই। এক দিকে দেখি আমাদের প্রাণ নিয়ত চঞ্চল; আর-এক দিকে দেখি সমস্ত চাঞ্চল্যকে ছাপিয়ে, অতীতকে পেরিয়ে, বর্তমানকে অতিক্রম করে প্রাণ বিস্তীর্ণ হয়ে বর্তে আছে। বস্তুত সেই বর্তে থাকার দিকেই দৃষ্টি রেখে আমরা বলি আমরা বেঁচে আছি। এই একই কালে বর্তে না থাকা এবং বর্তে থাকা, এই নিত্য চাঞ্চল্য এবং নিত্য স্থিতির মধ্যে ন্যায়শাস্ত্রের যদি কোনো বিরোধ থাকে তবে তা ন্যায়শাস্ত্রেই আছে— আমাদের প্রাণের মধ্যে নেই।

যখন আমরা বেঁচে থাকতে চাই তখন আমরা এইটেই তো চাই। আমরা আমাদের স্থিতিকে চাঞ্চল্যের মধ্যে মুক্তি দান করে এগিয়ে চলতে চাই। যদি আমাদের কেউ অহল্যার মতো পাথর করে স্থির করে রাখে তবে বুঝি যে সেটা আমাদের অভিশাপ। আবার যদি আমাদের প্রাণের মুহূর্তগুলিকে কেউ চকমকি-ঠোকা স্ফুলিঙ্গের মতো বর্ষণ করতে থাকে তা হলে সে প্রাণকে আমরা একখানা করে পাই নে বলে তাকে পাওয়াই হয় না।

এমনি করে প্রাণময় সত্যের এমন একটি পরিচয় নিজের মধ্যে অনায়াসে পেয়েছি যা অনির্বচনীয় অথচ সুনিশ্চিত, যা আপনাকে আপনি কেবল ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে চলেছে,

যা অসীমকে সীমায় আকারবদ্ধ করতে করতে এবং সীমাকে অসীমের মধ্যে মুক্তি দিতে দিতে প্রবাহিত হচ্ছে। এর থেকেই নিখিল সত্যকে আমরা নিখিলের প্রাণরূপে জানতে পারছি। বুঝতে পারছি এই সত্য সকলের মধ্যে থেকেই সকলকে অতিক্রম করে আছে বলে বিশ্বসংসার কেবলই চলার দ্বারাই সত্য হয়ে উঠছে। এইজন্য জগতে স্থিরত্বই হচ্ছে বিনাশ, কেননা স্থিরত্বই হচ্ছে সীমায় ঠেকে যাওয়া। এইজন্যেই বলা হয়েছে : যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতং। এই যা-কিছু সমস্তই প্রাণ হতে নিঃসৃত হয়ে প্রাণেই কম্পিত হচ্ছে।

তবে কি সমস্তই প্রাণ। আর, অপ্রাণ কোথাও নেই? অপ্রাণ আছে, কেননা দ্বন্দ্ব ছাড়া সৃষ্টি হয় না। কিন্তু, সেই অপ্রাণের দ্বারা সৃষ্টির পরিচয় নয়। প্রাণটাই হল মুখ্য, অপ্রাণটা গৌণ।

আমরা চলবার সময় যখন পা ফেলি তখন প্রত্যেক পা ফেলা একটা বাধায় ঠেকে। কিন্তু চলার পরিচয় সেই বাধায় ঠেকে যাওয়ার দ্বারা নয়, বাধা পেরিয়ে যাওয়ার দ্বারা। নিখিল সত্যেরও এক দিকে বাধা, আর-এক দিকে বাধামোচন। সেই বাধামোচনের দিকেই তার পরিচয় ; সেই দিকেই সে প্রাণস্বরূপ ; সেই দিকেই সে সমস্তকে মেলাচ্ছে এবং চালাচ্ছে।

যেদিন এই কথাটি আমরা ঠিকমতো উপলব্ধি করতে পেরেছি সেদিন আমাদের ভয়ের দিন নয়, ভিক্ষার দিন নয় ; সেদিন কোনো উচ্ছৃঙ্খল দেবতাকে অদ্ভুত উপায়ে বশ করবার দিন নয়। সেদিন বিশ্বের সত্যকে আমারও সত্য বলে আনন্দিত হবার দিন।

সেদিন পূজারও দিন বটে। কিন্তু, সত্যের পূজা তো কথার পূজা নয়। কথায় ভুলিয়ে সত্যের কাছে তো বর পাবার জো নেই। সত্য প্রাণময়, তাই প্রাণের মধ্যেই সত্যের পূজা। আমরা প্রত্যক্ষ দেখেছি মানুষ সত্যের বর পাচ্ছে, তার দৈন্য দূর হচ্ছে, তার তেজ বেড়ে উঠছে। কোথায় দেখেছি। যেখানে মানুষের চিত্ত অচল নয়, যেখানে তার নব নব উদ্‌যোগ, যেখানে সামনের দিকে মানুষের গতি, যেখানে অতীতের খোঁটায় সে আপনাকে আপাদমস্তক বেঁধেছেঁদে স্থির হয়ে বসে নেই, যেখানে আপনার এগোবার পথকে সকল দিকে মুক্ত রাখবার জন্যে মানুষ সর্বদাই সচেতন। জ্বালানি কাঠ যখন পূর্ণতেজে জ্বলে না তখন সে ধোঁয়ায় কিম্বা ছাইয়ে ঢাকা পড়ে। তেমনি দেখা গেছে, যে জাতি আপনার প্রাণকে চলতে না দিয়ে কেবলই বাঁধতে চেয়েছে তার সত্য সকল দিক থেকেই ম্লান হয়ে এসে তাকে নির্জীব করে ; কেননা সত্যের ধর্ম জড়ধর্ম নয়, প্রাণধর্ম— চলার দ্বারাই তার প্রকাশ।

নিজের ভিতরকার বেগবান প্রাণের আনন্দে মানুষ যখন অক্লান্ত সন্ধানের পথে সত্যের পূজা বহন করে তখনই বিশ্বসৃষ্টির সঙ্গে তারও সৃষ্টি চারি দিকে বিচিত্র হয়ে ওঠে ; তখন তার রথ পর্বত লঙ্ঘন করে, তার তরণী সমুদ্র পার হয়ে যায়, তখন কোথাও তার আর নিষেধ থাকে না। তখন সে নূতন নূতন সংকটের মধ্যে ঘা পেতে থাকে বটে, কিন্তু নুড়ির ঘা খেয়ে ঝর্নার কলগান যেমন আরও জেগে ওঠে তেমনি ব্যাঘাতের দ্বারাই বেগবান প্রাণের মুখে নূতন নূতন ভাষার সৃষ্টি হয়। আর, যারা মনে করে স্থির হয়ে থাকাই সত্যের সেবা, চলাই সনাতন সত্যের বিরুদ্ধে অপরাধ, তাদের অচলতার তলায় ব্যাধি দারিদ্র্য অপমান অব্যবস্থা কেবলই জমে ওঠে, নিজের সমাজ তাদের কাছে নিষেধের কাঁটাখেত, দূরের লোকালয় তাদের কাছে দুর্গম। নিজের দুর্গতির জন্যে তারা পরকে অপরাধী করতে চায়, এ কথা ভুলে যায় যে যে-সব দড়িদড়া দিয়ে তারা সত্যকে বন্দী করতে চেয়েছিল সেইগুলো দিয়ে তারা আপনাকে বেঁধে আড়ষ্ট হয়ে পড়ে আছে।

যদি জানতে চাই মানুষের বুদ্ধিশক্তিটা কী তবে কোন্‌খানে তার সন্ধান করব। যেখানে মানুষের গণনাশক্তি চিরদিন ধরে পাঁচের বেশি আর এগোতে পারলে না সেইখানে? যদি জানতে চাই মানুষের ধর্ম কী তবে কোথায় যাব। যেখানে সে ভূতপ্রেতের পূজা করে, কাষ্ঠলোষ্ট্রের কাছে নরবলি দেয় সেইখানে? না, সেখানে নয়। কেননা, সেখানে মানুষ বাঁধা পড়ে আছে। সেখানে তার বিশ্বাসে তার আচরণে সম্মুখীন গতি নেই। চলার দ্বারাই মানুষ আপনাকে জানতে থাকে, কেননা চলাই সত্যের ধর্ম। যেখানে মানুষ চলার মুখে, সেইখানেই আমরা মানুষকে স্পষ্ট করে দেখতে পাই— কেননা মানুষ সেখানে আপনাকে বড়ো করে দেখায়— যেখানে আজও সে পৌঁছোয় নি সেখানটিকেও সে আপনার গতিবেগের দ্বারা নির্দেশ করে দেয়। তার ভিতরকার সত্য তাকে চলার দ্বারাই জানাচ্ছে যে, সে যা তার চেয়ে সে অনেক বেশি।

তবেই দেখতে পাচ্ছি সত্যের সঙ্গে সঙ্গে একটি জানা লেগে আছে। আমাদের যে বিকাশ সে কেবল হওয়ার বিকাশ নয়, সে জানার বিকাশ। হতে থাকার দ্বারা চলতে থাকার দ্বারাই আপনাকে আমরা জানতে থাকি।

সত্যের সঙ্গে সঙ্গেই এই জ্ঞান লেগে রয়েছে, সেইজন্যেই মন্ত্রে আছে : সত্যং জ্ঞানং। অর্থাৎ, সত্য যার বাহিরের বিকাশ জ্ঞান তার অন্তরের প্রকাশ। যে সত্য কেবলই হয়ে উঠছে মাত্র অথচ সেই হয়ে-ওঠা আপনাকেও জানছে না, কাউকে কিছু জানাচ্ছেও না, তাকে আছে বলাই যায় না। আমার মধ্যে জ্ঞানের আলোটি যেমনি জ্বলে অমনি

যা-কিছু আছে সমস্ত আমার মধ্যে সার্থক হয়। এই সার্থকতাটি বৃহৎভাবে বিশ্বের মধ্যে নেই, অথচ খণ্ডভাবে আমার মধ্যে আছে, এমন কথা মনে করতে পারে নি বলেই মানুষ বলেছে : সত্যং জ্ঞানং। সত্য সর্বত্র, জ্ঞানও সর্বত্র। সত্য কেবলই জ্ঞানকে ফল দান করছে, জ্ঞান কেবলই সত্যকে সার্থক করছে— এর আর অবধি নেই। এ যদি না হয় তবে অন্ধ সৃষ্টির কোনো অর্থই নেই।

উপনিষদে ব্রহ্ম সম্বন্ধে বলেছে তাঁর 'স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ'। অর্থাৎ, তাঁর জ্ঞান বল ও ক্রিয়া স্বাভাবিক। তাঁর বল আর ক্রিয়া এই তো হল যা-কিছু; এই তো হল জগৎ। চার দিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি বল কাজ করছে; স্বাভাবিক এই কাজ। অর্থাৎ, আপনার জোরেই আপনার এই কাজ চলছে; এই স্বাভাবিক বল ও ক্রিয়া যে কী জিনিস তা আমরা আমাদের প্রাণের মধ্যে স্পষ্ট করে বুঝতে পারি। এই বল ও ক্রিয়া হল বাহিরের সত্য। তারই সঙ্গে সঙ্গে একটি অন্তরের প্রকাশ আছে, সেইটি হল জ্ঞান। আমরা বুদ্ধিতে বোঝবার চেষ্টায় দুটিকে স্বতন্ত্র করে দেখছি, কিন্তু বিরাটের মধ্যে এ একেবারে এক হয়ে আছে। সর্বত্র জ্ঞানের চালনাতেই বল ও ক্রিয়া চলছে এবং বল ও ক্রিয়ার প্রকাশেই জ্ঞান আপনাকে উপলব্ধি করছে। 'স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ' মানুষ এমন কথা বলতেই পারত না, যদি সে নিজের মধ্যে স্বাভাবিক জ্ঞান ও প্রাণ এবং উভয়ের যোগ একান্ত অনুভব না করত। এইজন্যই গায়ত্রীমন্ত্রে এক দিকে বাহিরের ভূর্ভুবঃ স্বঃ এবং অন্য দিকে অন্তরের ধী উভয়কেই একই পরমশক্তির প্রকাশরূপে ধ্যান করবার উপদেশ আছে।

যেমন প্রদীপের মুখের ছোটো শিখাটি বিশ্বব্যাপী উত্তাপেরই অঙ্গ তেমনি আমার প্রাণ বিশ্বের প্রাণের অঙ্গ, তেমনি আমার জানাও বিচ্ছিন্ন ব্যাপার নয়।

মানুষ পৃথিবীর এক কোণে বসে যুক্তির দাঁড়িপাল্লায় সূর্যকে ওজন করছে এবং বলছে, আমার জ্ঞানের জোরেই বিশ্বের রহস্য প্রকাশ হচ্ছে। কিন্তু, এ জ্ঞান যদি তারই জ্ঞান হত তবে এটা জ্ঞানই হত না; বিরাট জ্ঞানের যোগেই সে যা-কিছু জানতে পারছে। মানুষ অহংকার করে বলে 'আমার শক্তিতেই আমি কলের গাড়ি চালিয়ে দূরত্বের বাধা কাটাচ্ছি'; কিন্তু তার এই শক্তি যদি বিশ্বশক্তির সঙ্গে না মিলত তা হলে সে এক পাও চলতে পারত না।

সেইজন্যে যেদিন মানুষ বললে সত্যং সেইদিনই একই প্রাণময় শক্তিকে আপনার মধ্যে এবং আপনার বাহিরে সর্বত্র দেখতে পেলে। যেদিন বললে জ্ঞানং সেইদিন সে বুঝলে যে সে যা-কিছু জানছে এবং যা-কিছু ক্রমে জানবে সমস্তই একটি বৃহৎ জানার মধ্যে জাগ্রত রয়েছে। এইজন্যই আজ তার এই বিপুল ভরসা জন্মেছে যে তার শক্তির

এবং জ্ঞানের ক্ষেত্র কেবলই বেড়ে চলবে, কোথাও সে থেমে যাবে না। এখন সে আপনারই মধ্যে অসীমের পথ পেয়েছে, এখন তাকে আর যাগযজ্ঞ জাদুমন্ত্র পৌরোহিত্যের শরণ নিতে হবে না। এখন তার প্রার্থনা এই—

অসতো মা সদ্‌গময়
তমসো মা জ্যোতির্গময়।

অসত্যের জড়তা থেকে চিরবিকাশমান সত্যের মধ্যে আমাকে নিয়ত চালনা করো, অন্ধকার হতে আমার জ্ঞানের আলোক উন্মীলিত হতে থাক্।

আমাদের মন্ত্রের শেষ বাক্যটি হচ্ছে : অনন্তং ব্রহ্ম। মানুষ আপনার সত্যের অনুভবে সত্যকে সর্বত্র দেখছে, আপনার জ্ঞানের আলোকে জ্ঞানকে সর্বত্র জানছে, তেমনি আপনার আনন্দের মধ্যে মানুষ অনন্তের যে পরিচয় পেয়েছে তারই থেকে বলছে 'অনন্তং ব্রহ্ম'।

কোথায় সেই পরিচয়। আমাদের মধ্যে অনন্ত সেখানেই যেখানে আমরা আপনাকে দান করে আনন্দ পাই। দানের দ্বারা যেখানে আমাদের কেবলমাত্র ক্ষতি সেইখানেই আমাদের দারিদ্র্য, আমাদের সীমা, সেখানে আমরা কৃপণ। কিন্তু, দানই যেখানে আমাদের লাভ, ত্যাগই যেখানে আমাদের পুরস্কার, সেখানেই আমরা আমাদের ঐশ্বর্যকে জানি, আমাদের অনন্তকে পাই। যখন আমাদের সীমারূপী অহংকেই আমরা চরম বলে জানি তখন কিছুই আমরা ছাড়তে চাই নে, সমস্ত উপকরণকে তখন দু হাতে আঁকড়ে ধরি— মনে করি বস্তুপুঞ্জের যোগেই আমরা সত্য হব, বড়ো হব। আর, যখনই কোনো বৃহৎ প্রেম বৃহৎ ভাবের আনন্দ আমাদের মধ্যে জেগে ওঠে তখনই আমাদের কৃপণতা কোথায় চলে যায়! তখন আমরা রিক্ত হয়ে পূর্ণ হয়ে উঠি, মৃত্যুর দ্বারা অমৃতের আস্বাদ পাই। এইজন্য মানুষের প্রধান ঐশ্বর্যের পরিচয় বৈরাগ্যে, আসক্তিতে নয়, আমাদের সমস্ত নিত্যকীর্তি বৈরাগ্যের ভিত্তিতে স্থাপিত। তাই মানুষ বলেছে : ভূমৈব সুখং, ভূমাই আমার সুখ ; ভূমাত্বের বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ, ভূমাকেই আমার জানতে হবে ; নাল্পে সুখমস্তি, অল্পে আমার সুখ নেই।

এই ভূমাকে মা যখন সন্তানের মধ্যে দেখে তখন তার আর আত্মসুখের লালসা থাকে না। এই ভূমাকে মানুষ যখন স্বদেশের মধ্যে দেখে তখন তার আর আত্মপ্রাণের মমতা থাকে না। যে সমাজনীতিতে মানুষকে অবজ্ঞা করা ধর্ম বলে শেখায় সে সমাজের ভিতর থেকে মানুষ আপনার অনন্তকে পায় না ; এইজন্যই সে সমাজে কেবল শাসনের পীড়া আছে, কিন্তু ত্যাগের আনন্দ নেই। মানুষকে আমরা মানুষ বলেই জানি নে যখন তাকে আমরা ছোটো করে জানি। মানুষ সম্বন্ধে যেখানে আমাদের জ্ঞান কৃত্রিম সংস্কারের

ধূলিজালে আবৃত সেইখানেই মানুষের মধ্যে ভূমা আমাদের কাছে আচ্ছন্ন। সেখানে কৃপণ মানুষ আপনাকে ক্ষুদ্র বলতে, অক্ষম বলতে, লজ্জা বোধ করে না। 'সত্যকে মতে মানি, কাজে করতে পারি নে' এ কথা স্বীকার করতে সেখানে সংকোচ ঘটে না। সেখানে মঙ্গল-অনুষ্ঠানও বাহ্য-আচার-গত হয়ে ওঠে। কিন্তু, মানুষের মধ্যে ভূমা যে আছে, এই জন্যই ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ, ভূমাকে না জানলে সত্য জানা হয় না। সমাজের মধ্যে যখন সেই জানা সকল দিকে জেগে উঠবে তখন মানুষ 'আনন্দরূপমমৃতং' আপনার আনন্দরূপকে অমৃতরূপকে সর্বত্র সৃষ্টি করতে থাকবে। প্রদীপের শিখার মতো আত্মদানেই মানুষের আত্ম-উপলব্ধি। এই কথাটি আপনার মধ্যে নানা আকারে প্রত্যক্ষ করে মানুষ অনন্তস্বরূপকে বলেছে 'আত্মদা', তিনি আপনাকে দান করছেন, সেই দানেই তাঁর পরিচয়।

এইবার আমাদের সমস্ত মন্ত্রটি একবার দেখে নিই : সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।

অনন্ত ব্রহ্মের সীমারূপটি হচ্ছে সত্য। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সত্যনিয়মের সীমার মধ্য দিয়েই অনন্ত আপনাকে উৎসর্গ করছেন। প্রশ্ন এই যে, সত্য যখন সীমায় বদ্ধ তখন অসীমকে প্রকাশ করে কেমন করে। তার উত্তর এই যে, সত্যের সীমা আছে, কিন্তু সত্য সীমার দ্বারা বদ্ধ নয়। এইজন্যই সত্য গতিমান্। সত্য আপনার গতির দ্বারা কেবলই আপনার সীমাকে পেরিয়ে পেরিয়ে চলতে থাকে, কোনো সীমায় এসে একেবারে ঠেকে যায় না। সত্যের এই নিরন্তর প্রকাশের মধ্যে আত্মদান করে অনন্ত আপনাকেই জানছেন, এই জন্যই মন্ত্রের একপ্রান্তে সত্যং আর-এক প্রান্তে অনন্তং ব্রহ্ম— তারই মাঝখানে জ্ঞানং।

এই কথাটিকে বাক্যে বলতে গেলেই স্বতোবিরোধ এসে পড়ে। কিন্তু, সে বিরোধ কেবল বাক্যেরই। আমরা যাকে ভাষায় বলি সীমা সেই সীমা ঐকান্তিকরূপে কোথাও নেই, তাই সীমা কেবলই অসীমে মিলিয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে। আমরা যাকে ভাষায় বলি অসীম সেই অসীমও ঐকান্তিক ভাবে কোথাও নেই, তাই অসীম কেবলই সীমায় রূপগ্রহণ করে প্রকাশিত হচ্ছেন। সত্যও অসীমকে বর্জন করে সীমায় নিশ্চল হয়ে নেই, অসীমও সত্যকে বর্জন করে শূন্য হয়ে বিরাজ করছেন না। এইজন্য ব্রহ্ম সীমা এবং সীমাহীনতা দুইয়েরই অতীত, তাঁর মধ্যে রূপ এবং অপরূপ দুইই সংগত হয়েছে।

তাঁকে বলা হয়েছে 'বলদা', তাঁর বল তাঁর শক্তি বিশ্বসত্যরূপে প্রকাশিত হচ্ছে; আবার আত্মদা, সেই সত্যের সঙ্গে সেই শক্তির সঙ্গে তাঁর আপনার বিচ্ছেদ ঘটে নি— সেই শক্তির যোগেই তিনি আপনাকে দিচ্ছেন। এমনি করেই সসীম অসীমের, অরূপ সরূপের, অপরূপ মিলন ঘটে গেছে। সত্যং এবং অনন্তং অনির্বচনীয়রূপে পরস্পরের যোগে একই কালে প্রকাশমান হচ্ছে। তাই অসীমের আনন্দ সসীমের অভিমুখে,

সসীমের আনন্দ অসীমের অভিমুখে। তাই ভক্ত ও ভগবানের আনন্দমিলনের মধ্যে আমরা সসীম ও অসীমের এই বিশ্বব্যাপী প্রেমলীলার চিররহস্যটিকে ছোটোর মধ্যে দেখতে পাই। এই রহস্যটি রবিচন্দ্রতারার পর্দার আড়ালে নিত্যকাল চলেছে; এই রহস্যটিকে বুকের ভিতরে নিয়ে বিশ্বচরাচর রসবৈচিত্র্যে বিচিত্র হয়ে উঠেছে। সত্যের সঙ্গে অনন্তের এই নিত্যযোগ লোকস্থিতির শান্তিতে, সমাজস্থিতির মঙ্গলে ও জীবাত্মা-পরমাত্মার একাত্ম মিলনে শান্তং শিবমদ্বৈতম্ রূপে প্রকাশমান হয়ে উঠছে। এই শান্তি জড়ত্বের নিশ্চল শান্তি নয়, সমস্ত চাঞ্চল্যের মর্ম-নিহিত শান্তি; এই মঙ্গল দ্বন্দ্ববিহীন নির্জীব মঙ্গল নয়, সমস্ত দ্বন্দ্বমন্থনের আলোড়ন-জাত মঙ্গল; এই অদ্বৈত একাকারত্বের অদ্বৈত নয়, সমস্ত বিরোধবিচ্ছেদের সমাধান-কারী অদ্বৈত। কেননা, তিনি 'বলদা আত্মদা'; সত্যের ক্ষেত্রে শক্তির মধ্য দিয়েই তিনি কেবলই আপনাকে দান করছেন।

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম— এই মন্ত্রটি তো কেবলমাত্র ধ্যানের বিষয় নয়, এটিকে প্রতিদিনের সাধনায় জীবনের মধ্যে গ্রহণ করতে হবে।

সেই সাধনাটি কী। আমাদের জীবনে সত্যের সঙ্গে অনন্তের যে বাধা ঘটিয়ে বসেছি, যে বাধা-বশত আমাদের জ্ঞানের বিকার ঘটছে, সেইটে দূর করে দিতে থাকা।

এই বাধা ঘটিয়েছে আমাদের অহং। এই অহং আপনার রাগদ্বেষের লাগাম এবং চাবুক নিয়ে আমাদের জীবনটাকে নিজের সুখদুঃখের সংকীর্ণ পথেই চালাতে চায়। তখন আমাদের কর্মের মধ্যে শান্তকে পাই নে, আমাদের সম্বন্ধের মধ্যে শিবের অভাব ঘটে এবং আত্মার মধ্যে অদ্বৈতের আনন্দ থাকে না। কেননা, সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম; অনন্তের সঙ্গে যোগে তবেই সত্য জ্ঞানময় হয়ে ওঠে। তবেই আমাদের জ্ঞানবলক্রিয়া স্বাভাবিক হয়। যাদের জীবন বেগে চলছে, অথচ কেবলমাত্র আপনাকেই কেন্দ্র করে প্রদক্ষিণ করছে, তাদের সেই চলা সেই বলক্রিয়া কলুর বলদের চলার মতো; তা স্বাভাবিক নয়, তা জ্ঞানময় নয়।

আবার, যারা জীবনের সত্যের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন করে অনন্তকে কর্মহীন সন্ন্যাসের মধ্যে উপলব্ধি করতে কিম্বা ভাবরসের মাদকতায় উপভোগ করতে চায় তাদেরও এই ধ্যানের কিম্বা রসের সাধনা বন্ধ্যা। তাদের চেষ্টা হয় শূন্যকেই দোহন করতে থাকে নয় নিজের কল্পনাকেই সফলতা বলে মনে করে। যাদের জীবন সত্যের চিরবিকাশ-পথে চলছে না, কেবল শূন্যতাকে বা রসভোগবিহ্বল নিজের মনটাকেই বারে বারে প্রদক্ষিণ করছে, তাদের সেই অন্ধ সাধনা হয় জড়ত্ব নয় প্রমত্ততা।

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম এই মন্ত্রটিকে যদি গ্রহণ করি তবে আমাদের মনকে প্রবৃত্তির চাঞ্চল্য ও অহংকারের ঔদ্ধত্য থেকে নির্মুক্ত করবার জন্যে একান্ত চেষ্টা করতে হবে—

তা না হলে আমাদের কর্মের কলুষ এবং জ্ঞানের বিকার কিছুতেই ঘুচবে না। আমাদের যে অহং আজ মাথা উঁচু করে আমাদের সত্য এবং অনন্তের মধ্যে ব্যবধান জাগিয়ে অজ্ঞানের ছায়া ফেলে দাঁড়িয়ে আছে সে যখন প্রেমে বিনম্র হয়ে তার মাথা নত করতে পারবে তখন আমাদের জীবনে সেই অহংই হবে সসীম ও অসীমের মিলনের সেতু ; তখন আমাদের জীবনে তারই সেই নম্রতার উপরে প্রতিষ্ঠিত হবে সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। যখন সুখদুঃখের চাঞ্চল্য আমাদের অভিভূত করবে তখন এই শান্তিমন্ত্র স্মরণ করতে হবে : সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। যখন মান অপমান তরঙ্গদোলায় আমাদের ক্ষুব্ধ করতে থাকে তখন এই মঙ্গলমন্ত্র স্মরণ করতে হবে : সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। যখন কল্যাণের আহ্বানে দুর্গম পথে প্রবৃত্ত হবার সময় আসবে তখন এই অভয়মন্ত্র স্মরণ করতে হবে : সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। যখন বাধা প্রবল হয়ে উঠে সেই পথ রুদ্ধ করে দাঁড়াবে তখন এই শক্তিমন্ত্র স্মরণ করতে হবে : সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। যখন মৃত্যু এসে প্রিয়বিচ্ছেদের ছায়ায় আমাদের জীবনযাত্রার পথকে অন্ধকারময় করে তুলবে তখন এই অমৃতমন্ত্র স্মরণ করতে হবে : সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। আমাদের জীবনগত সত্যের সঙ্গে আনন্দময় ব্রহ্মের যোগ পূর্ণ হতে থাক্ ; তা হলেই আমাদের জ্ঞান নির্মল হয়ে আমাদের সমস্ত ক্ষোভ হতে, মত্ততা হতে, অবসাদ হতে রক্ষা করবে। নদী যখন চলতে থাকে তখন তার চলার সঙ্গে সঙ্গেই যেমন একটি কলসংগীত বাজে আমাদের জীবন তেমনি প্রতি ক্ষণেই মুক্তির পথে সত্য হয়ে চলুক ; যাতে তার চলার সঙ্গে সঙ্গেই এই অমৃতবাণীটি সংগীতের মতো বাজতে থাকে : সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। যিনি বিশ্বরূপে আপনাকে দান করছেন তাঁকে প্রতিদানরূপে আত্মনিবেদন করব, সেই নিত্য মালা-বদলের আনন্দমন্ত্রটি হোক : সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। আর আমাদের জীবনের প্রার্থনা হোক—

অসতো মা সদ্গময় তমসো মা জ্যোতির্গময় মৃত্যোর্মামৃতংগময়।

জড়তা হতে আমাদের সত্যে নিয়ে যাও, মূঢ়তা হতে আমাদের জ্ঞানে নিয়ে যাও, মৃত্যুর খণ্ডতা হতে আমাদের অমৃতে নিয়ে যাও।

অবিরাম হোক সেই তোমার নিয়ে যাওয়া, সেই আমাদের চিরজীবনের গতি। কেননা, তুমি আবিঃ, প্রকাশই তোমার স্বভাব ; বিনাশের মধ্যে তোমার আনন্দ আপনাকে বিলুপ্ত করে না, বিকাশের মধ্যে দিয়ে তোমার আনন্দ আপনাকে বিস্তার করে। তোমার সেই পরমানন্দের বিকাশ আমাদের জীবনে জ্ঞানে প্রেমে কর্মে, আমাদের গৃহে সমাজে দেশে, বাধামুক্ত হয়ে প্রসারিত হোক, জয় হোক তোমার!

১৫ মাঘ ১৩২০। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ-গৃহে পঠিত

চৈত্র ১৩২০

১৭

উদ্‌বোধন

আজ আমাদের আশ্রমের এই বিশেষ দিনে আমাদের চিত্ত জাগ্রত হোক। সংসারের মধ্যে আমাদের যে উৎসবের দিন আসে সে দিন অন্য দিন থেকে স্বতন্ত্র, প্রতিদিনের সঙ্গে তার সুর মেলে না। কিন্তু, আমাদের এই উৎসবের দিনের সঙ্গে প্রতিদিনের যোগ আছে, এ যেন মোতির হারের মাঝখানে হীরার দোলক। যোগ আছে, আবার বিশেষত্বও আছে। কেননা, ওই বিশেষত্বের জন্যে মানুষের একটু আকাঙ্ক্ষা আছে। মানুষ এক-একদিন প্রতিদিনের জীবন থেকে একটু সরে এসে তার আনন্দের আস্বাদ পেতে চায়। যেজন্যে আমরা ঘরের অন্নকে একটু দূরে নিয়ে খাবার জন্যে বনভোজনে যাই। প্রত্যহের সামগ্রীকেই তার অভ্যাস থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে একটু নূতন করে পেতে চাই। তাই আজ আমরা আমাদের আশ্রমের অন্নকে একটু সরে এসে একটু বিশেষ করে ভোগ করবার জন্যে আয়োজন করেছি।

কিন্তু, বনভোজনের আয়োজনে যখন খাদ্যসামগ্রী দূরে এবং একটু বড়ো করে বয়ে নিয়ে যেতে হয় তখন আমাদের ভাঁড়ারের হিসাবটা মুহূর্তের মধ্যে চোখে পড়ে যায়। যদি প্রতিদিন অপব্যয় হয়ে থাকে তা হলে সেদিন দেখব টানাটানি পড়ে গেছে।

আজ আমাদের অমৃত-অন্নের বনভোজনের আয়োজনে হয়তো অভাব দেখতে পাব। যদি পাই, তবে সেই অন্তরের অভাবকে বাইরের কী দিয়েই বা ঢাকা দেব। যারা শহরে থাকে তাদের সাজসরঞ্জামের অভাব নেই, তাই দিয়েই তারা তাদের উৎসবের মানরক্ষা করতে পারে। আমাদের এখানে সে-সমস্ত উদ্‌যোগের পথ বন্ধ। কিন্তু, ভয় নেই। প্রতিদিনই আমাদের আশ্রমের উৎসবের বায়না দেওয়া গেছে। এখানকার শালবনে পাখির বাসায়, এখানকার প্রান্তরের আকাশে বাতাসের খেলার প্রাঙ্গণে, প্রতিদিনই আমাদের উৎসবের সুর কিছু-না-কিছু জমেছে। কিন্তু প্রতিদিনের অন্যমনস্কতায় সেই রোশনচৌকি ভালো করে প্রাণে পৌঁছয় নি। আজ আমাদের অভ্যাসের জড়তাকে ঠেলে দিয়ে একবার মন দিতে পারলেই হয়, আর-কিছু বাইরে থেকে সংগ্রহ করতে হবে না। চিত্তকে শান্ত করে বসি, অঞ্জলি করে হাত পাতি, তা হলে মধুবনের মধুফল আপনিই হাতে এসে পড়বে। যে আয়োজন চারি দিকে আপনিই হয়ে আছে তাকেই ভোগ করাই যে আমাদের উৎসব। প্রতিদিন ডাকি নি বলেই যাঁকে দেখি নি আজ মনের সঙ্গে ডাক দিলেই যে তাঁকে দেখতে পাব। বাইরের উত্তেজনায়

ধাক্কা দিয়ে মনকে চেতিয়ে তোলা, তাতে আমাদের দরকার নেই। কেননা, তাতে লাভ নেই, বরঞ্চ শক্তির ক্ষয় হয়। গাছের ভিতরের রসে যখন বসন্তের নাড়া পায় তখনই ফুল ফোটে; সেই ফুলই সত্য। বাইরের উত্তেজনায় যে ক্ষণিক মোহ আনে সে কেবল মরীচিকা; তাতে যেন না ভুলি। আমাদের ভিতরকার শক্তিকে উদ্‌বোধিত করি। ক্ষণকালের জন্যেও যদি তার সাড়া পাই তখন তার সার্থকতা চিরদিনের। যদি মুহূর্তের জন্যও আমরা সত্য হতে পারি তবে সে সত্য কোনোদিন মরবে না; সেই অমৃতবীজ চিরকালের মতো আমাদের চিরজীবনের ক্ষেত্রে বোনা হয়ে যাবে। যে পুণ্য হোমাগ্নি বিশ্বের যজ্ঞশালায় চিরদিন জ্বলছে তাতে যদি ঠিকমতো করে একবার আমাদের চিত্ত-প্রদীপের মুখটুকু ঠেকিয়ে দিতে পারি তা হলে সেই মুহূর্তেই আমাদের শিখাটুকু ধরে উঠতে পারে।

সত্যের মধ্যে আজ আমাদের জাগরণ সম্পূর্ণ হোক, এই প্রভাতের আলোক আজ আমাদের আবরণ না হোক, আজ চিরজ্যোতি প্রকাশিত হোন, ধরণীর শ্যামল যবনিকা আজ যেন কিছু গোপন না করে— আজ চিরসুন্দর দেখা দিন। শিশু যেমন মাকে সম্পূর্ণরূপে আলিঙ্গন করে তেমনি করেই আজ সেই পরম চৈতন্যের সঙ্গে আমাদের চৈতন্যের মিলন হোক। যেমন কবির কাব্য পাঠ করবার সময় তাঁর ছন্দ ও ভাষার ভিতর দিয়ে কবির আনন্দের মধ্যে গিয়ে আমাদের চিত্ত উপনীত হয় তেমনি করে আজ এই শিশিরস্নানে স্নিগ্ধ নির্মল বিশ্বশোভার অন্তরে সেই বিশ্বের আনন্দকে যেন সমস্ত হৃদয় মন দিয়ে প্রত্যক্ষ অনুভব করি। ৭ পৌষ ১৩২০

মাঘ ১৩২০

মুক্তির দীক্ষা

আমাদের আশ্রমের উৎসবের ভিতরকার তত্ত্বটি কী তাই আজ আমাদের বিশেষ করে জানবার দিন। যে মহাত্মা এই আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন আজ তাঁরই দীক্ষা-দিনের সাম্বৎসরিক। আজকের এই উৎসবটি তাঁর জন্মদিনের বা মৃত্যুদিনের উৎসব নয়, তাঁর দীক্ষাদিনের উৎসব। তাঁর এই দীক্ষার কথাই এই আশ্রমের ভিতরকার কথা।

সকলেই জানেন যে এক সময়ে যখন তিনি যৌবনবয়সে বিলাসের মধ্যে ঐশ্বর্যের মধ্যে লালিত পালিত হয়েছিলেন তখন হঠাৎ তাঁর পিতামহীর মৃত্যু হওয়াতে তাঁর অন্তরে অত্যন্ত বেদনা উপস্থিত হল। সেই বেদনার আঘাতে চারি দিক থেকে আবরণ উন্মোচিত হয়ে গেল। যে সত্যের জন্যে তাঁর হৃদয় লালায়িত হল তাকে তিনি কোথায় পাবেন, তাকে কেমন করে পাবেন, এই ভেবে তিনি ব্যাকুল হয়ে উঠলেন।

যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ তার চারি দিকে যে-সকল অভ্যাস রয়েছে, যে-সব প্রথা চিরকাল চলে আসছে, তারই মধ্যে বেশ আরামে থাকে— যতক্ষণ পর্যন্ত ভিতরে যে সত্য রয়েছে তা তার অন্তরে জাগ্রত না হয়— ততক্ষণ তার এই বেদনাবোধ থাকে না। যেমন, যখন আমরা ঘুমিয়ে থাকি তখন ছোটো খাঁচায় ঘুমোলেও কষ্ট হয় না, কিন্তু জেগে উঠলে আর সেই খাঁচার মধ্যে থাকতে পারি না। তখন সংকীর্ণ জায়গাতে আর আমাদের কুলোয় না। ধনমান যখন আমাদের বেষ্টন করে থাকে তখন তো আমাদের কোনো অভাব বোধ হয় না। আমরা সংসারে বেশ আরামে আছি এই মনে করেই নিশ্চিন্ত থাকি। শুধু ধনমান কেন, পুরুষানুক্রমে যে-সব বিধিব্যবস্থা আচারবিচার চলে আসছে তার মধ্যেও নিবিষ্ট থাকলে মনে হয়— এ বেশ, আর নতুন করে কোনো চিন্তা বা চেষ্টা করবার দরকার নেই। কিন্তু, একবার যথার্থ সত্যের পিপাসা জাগ্রত হলে দেখতে পাই যে সংসারই মানুষের শেষ জায়গা নয়। আমরা যে ধুলোয় জন্মে ধুলোয় মিশব তা নয়। জীবন-মৃত্যুর চেয়ে অনেক বড়ো আমাদের আত্মা। সেই আত্মা উদ্‌বোধিত হলে বলে ওঠে : কী হবে আমার এই চিরকালের অভ্যাস নিয়ে, আচার নিয়ে! এ তো আমার নয়। এতে আরাম আছে, এতে কোনো ভাবনাচিন্তা নেই, এতেই সংসার চলে যাচ্ছে, তা জানি। কিন্তু, এ আমার নয়!— সংসারের পনেরো-আনা লোক যেমন ধনমানে বেষ্টিত হয়ে সন্তুষ্ট হয়ে আছে তেমনি যে-সমস্ত আচারবিচার চলে আসছে তারও মধ্যে তারা আরামে রয়েছে। কিন্তু, একবার যদি কোনো আঘাতে এই আবরণ ছিন্ন হয়ে যায় অমনি মনে হয়, এ কী কারাগার! এ আবরণ তো আশ্রয় নয়।

এক-একজন লোক সংসারে আসেন যাঁদের কোনো আবরণে আবদ্ধ করতে পারে না। তাঁদের জীবনেই বড়ো বড়ো আঘাত এসে পৌঁছোয় আবরণ ভাঙবার জন্যে, এবং তাঁরা সংসারে যাকে অভ্যস্ত আরাম বলে লোকে অবলম্বন করে নিশ্চিন্ত থাকে তাকে কারাগার বলেই নির্দেশ করেন। আজ যাঁর কথা বলছি তাঁর জীবনে সেই ঘটনা ঘটেছিল। তাঁর পরিবারে ধনমানের অভাব ছিল না, চিরাগত প্রথা সেখানে আচরিত হত। কিন্তু, এক মুহূর্তেই মৃত্যুর আঘাতে তিনি যেমনি জাগলেন অমনি বুঝলেন যে এর মধ্যে শান্তি নেই। তিনি বললেন : আমার পিতাকে আমি জানতে চাই — দশজনের মতো করে তাঁকে জানতে চাই না, তাঁকে জানতে পারি না। সত্যকে তিনি জীবনে প্রত্যক্ষভাবে জানতে চেয়েছিলেন; দশজনের মুখের কথায় শাস্ত্রবাক্যে আচারে-বিচারে তাঁকে জানবার চেষ্টাকে তিনি পরিহার করেছিলেন। সেই যে তাঁর উদ্‌বোধন, সে প্রত্যক্ষ সত্যের মধ্যে উদ্‌বোধন; সেই প্রথমযৌবনের প্রারম্ভে যে তাঁর দীক্ষা-গ্রহণ সে মুক্তির দীক্ষা-গ্রহণ। যেদিন পক্ষীশাবকের পাখা

ওঠে সেইদিনই পক্ষীমাতা তাকে উড়তে শেখায়। তেমনি তারই দীক্ষার দরকার যার মুক্তির দরকার। চারি দিকের জড় সংস্কারের আবরণ থেকে তিনি মুক্তি চেয়েছিলেন।

তাঁর কাছে সেই মুক্তির দীক্ষা নেব বলেই আমরা আশ্রমে এসেছি। ঈশ্বরের সঙ্গে যে আমাদের স্বাধীন মুক্ত যোগ সেইটে আমরা এখানে উপলব্ধি করব; যে-সব কাল্পনিক কৃত্রিম ব্যবধান তাঁর সঙ্গে আমাদের যোগ হতে দিচ্ছে না তার থেকে আমরা মুক্তি লাভ করব। যেটা কারাগার তার পিঞ্জরের প্রত্যেক শলাকাটি যদি সোনার শলাকা হয় তবু সে কারাগার, তার মধ্যে মুক্তি নেই। এখানে আমাদের সকল কৃত্রিম বন্ধন থেকে মুক্তি পেতে হবে। এখানে মুক্তির সেই দীক্ষা নেবার জন্য আমাদের প্রস্তুত হতে হবে। সেই দীক্ষাটিই যে তিনি আমাদের জন্য রেখে গেছেন।

তাই আমি বলছি যে, এ আশ্রম— এখানে কোনো দল নেই, সম্প্রদায় নেই। মানস-সরোবরে যেমন পদ্ম বিকশিত হয় তেমনি এই প্রান্তরের আকাশে এই আশ্রমটি জেগে উঠেছে; একে কোনো সম্প্রদায়ের বলতে পারবে না। সত্যকে লাভ করবার দ্বারা আমরা তো কোনো নামকে পাই না। কতবার কত মহাপুরুষ এসেছেন— তাঁরা মানুষকে এই সব কৃত্রিম সংস্কারের বন্ধন থেকেই মুক্তি দিতে চেয়েছেন। কিন্তু, আমরা সে কথা ভুলে গিয়ে সেই বন্ধনে জড়াই, সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করি। যে সত্যের আঘাতে কারাগারের প্রাচীর ভাঙি তাই দিয়ে তাকে নতুন নাম দিয়ে পুনরায় প্রাচীর গড়ি এবং সেই নামের পুজো শুরু করে দিই। বলি, আমার বিশেষ সম্প্রদায়-ভুক্ত সমাজ-ভুক্ত যে-সকল মানুষ তারাই আমার ধর্মবন্ধু, তারাই আমার আপন। না, এখানে এ আশ্রমে আমাদের এ কথা বলবার কথা নয়। এখানে এই পাখিরাই আমাদের ধর্মবন্ধু, যে সাঁওতাল বালকেরা আমাদের শুভবুদ্ধিকে নিয়ত জাগ্রত করছে তারাই আমাদের ধর্মবন্ধু। আমাদের এই আশ্রম থেকে কেউ নাম নিয়ে যাবে না। স্বাস্থ্যলাভ করলে, বিদ্যালাভ করলে, মানুষের নাম যেমন বদলায় না তেমনি ধর্মকে লাভ করলে নাম বদলাবার দরকার নেই। এখানে আমরা যে ধর্মের দীক্ষা পাব সে দীক্ষা মানুষের সমস্ত মনুষ্যত্বের দীক্ষা।

বাইরের ক্ষেত্রে মহর্ষি আমাদের সবাইকে কোন্‌ বড় জিনিস দিয়ে গিয়েছেন। কোনো সম্প্রদায় নয়, এই আশ্রম। এখানে আমরা নামের পুজো থেকে, দলের পুজো থেকে, আপনাদের রক্ষা করে সকলেই আশ্রয় পাব— এইজন্যেই তো আশ্রম। যে-কোনো দেশ থেকে যে-কোনো সমাজ থেকে যেই আসুক-না কেন, তাঁর পুণ্যজীবনের জ্যোতিতে পরিবৃত হয়ে আমরা সকলকেই এই মুক্তির ক্ষেত্রে আহ্বান করব। দেশ-দেশান্তর দূর-দূরান্তর থেকে যে কোনো ধর্মবিশ্বাসকে অবলম্বন করে যিনিই এখানে আশ্রয় চাইবেন, আমরা যেন কাউকে গ্রহণ করতে কোনো সংস্কারের বাধা বোধ না

করি। কোনো সম্প্রদায়ের লিপিবদ্ধ বিশ্বাসের দ্বারা আমাদের মন যেন সংকুচিত না হয়।

যে মুক্তির বাণী তিনি তাঁর জীবন দিয়ে প্রচার করে গিয়েছিলেন তাকেই আমরা গ্রহণ করব; সেই তাঁর দীক্ষামন্ত্রটি: ঈশাবাস্যমিদং সর্বং। ঈশ্বরের মধ্যে সমস্তকে দেখো। সেই মন্ত্রে তাঁর মন উতলা হয়েছিল। সর্বত্র সকল অবস্থায় আমরা যেন দেখতে পাই তিনি সত্য, জগতের বিচিত্র ব্যাপারের মধ্যে তিনি সত্যকেই প্রকাশ করছেন। কোনো সম্প্রদায় বলতে পারবে না যে সে সত্যকে শেষ করে পেয়েছে। কালে কালে সত্যের নব নব প্রকাশ। এখানে দিনে দিনে আমাদের জীবন সেই সত্যের মধ্যে নূতন নূতন বিকাশ লাভ করবে, এই আমাদের আশা। আমরা এই মুক্তির সরোবরে স্নান করে আনন্দিত হই, সমস্ত সম্প্রদায়ের বন্ধন থেকে নিষ্কৃতি লাভ করে আনন্দিত হই। ৭ পৌষ ১৩২০

মাঘ ১৩২০

প্রতীক্ষা

কতদিন নিভৃতে এখানে তাঁর নাম শুনেছি। আজ এই জনকোলাহলে তাঁরই নাম ধ্বনিত হচ্ছে, অস্ফুট কলোচ্ছ্বাসে এই নিঃশব্দ নিস্তব্ধ সন্ধ্যাকাশকে মুখরিত করে তুলছে। এই কোলাহলের ধ্বনি তাঁকে চারি দিকে বেষ্টন করে উঠেছে। আজ অন্তরে অন্তরে জাগ্রত হয়ে অন্তর্যামীকে বিরলে স্মরণ করবার দিন নয়; সংসারতরণীর কর্ণধার হয়ে যিনি সবাইকে নিয়ে চলেছেন আজ তাঁকে দেখবার দিন। অন্যদিন আকাশের গ্রহ-তারাকে বল্‌গার দ্বারা সংযত করে বিচিত্র বিশ্বরথকে একাকী সেই সারথি নিয়ে গেছেন —রথচক্রের শব্দ ওঠে নি, রাত্রির বিরামের কিছুমাত্র ব্যাঘাত করে নি। আজ নিদ্রা দূর হয়েছে, পাখিরা কুলায়ে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে। এই কোলাহলে যিনি 'শান্তং শিবমদ্বৈতম্' তিনি স্থিরপ্রতিষ্ঠ হয়ে রয়েছেন। কোলাহলের মর্মে যেখানে নিস্তব্ধ তাঁর আসন আজ আমরা সেইখানেই তাঁকে প্রণাম করবার জন্য চিত্তকে উদ্‌বোধিত করি।

আমাদের উৎসবদেবতা কোলাহল নিরস্ত করেন নি, তিনি মানা করেন নি। তাঁর পূজা তিনি সব-শেষে ঠেলে রেখেছেন। যখন রাজা আসেন তখন কত আয়োজন করে আসেন, কত সৈন্যসামন্ত নিয়ে ধ্বজা উড়িয়ে আসেন, যাতে লোকে তাঁকে না মেনে থাকতে না পারে। কিন্তু, যিনি রাজার রাজা তাঁর কোনো আয়োজন নেই। তাঁকে

যে ভুলে থাকে সে থাকুক ; তাঁর কোনো তাগিদই নেই। যার মনে পড়ে, যখন মনে পড়ে, সেই তাঁর পূজা করুক— এইটুকু মাত্র তাঁর পাওনা। কেননা, তাঁর কাছে কোনো ভয় নেই। বিশ্বের আর-সব নিয়ম ভয়ে ভয়ে মানতে হয়। আগুনে হাত দিতে ভয় পাই, কেননা জানি যে হাত পুড়বেই। কিন্তু, কেবল তাঁর সঙ্গে ব্যবহারে কোনো ভয় নেই। তিনি বলেছেন, আমাকে ভয় না করলেও তোমার কোনো ক্ষতি নেই। এই-যে আজ এত লোকসমাগম হয়েছে, কে তার চিত্তকে স্থির করেছে। তিনি কি দেখছেন না আমাদের চিত্ত কত বিক্ষিপ্ত। কিন্তু, তাঁর শাসন নেই। যাঁদের পদমর্যাদা আছে, রাজপুরুষদের কাছে সম্মান আছে, এমন লোক আজ এখানে এসেছেন। যাঁরা জ্ঞানের অভিমানে মত্ত হয়ে তাঁকে বিশ্বাস করেন না এমন লোক এখানে উপস্থিত আছেন। কিন্তু, তাঁর বসুন্ধরার ধৈর্য তাঁদের ধারণ করে রয়েছে, আকাশের জ্যোতির এক কণাও তাঁদের জন্য কমে নি— সব ঠিক সমান রয়েছে। তাঁর এই ইচ্ছা যে তিনি আমাদের কাছ থেকে জোর করে কিছু নেবেন না। তাঁর প্রহরীদের কত ঘুষ দিচ্ছি, তারা কত শাসন করছে, কিন্তু বিশ্বমন্দিরের সেই দেবতা একটি কথাও বলেন না। মৃত্যুর দিন ঘনিয়ে আসছে, আর আমাদের মনে ভয় জেগে উঠছে যে পরকালে গিয়ে বুঝি এখানকার কাজের হিসাব দিতে হবে। না, সে ভয় একেবারেই সত্য নয়। তিনি যে কোনোদিন আমাদের শাস্তি দেবেন তা নয়। তিনি এমনি করে অপেক্ষা করে থাকবেন। তিনি কুঁড়ির দিকে চোখ মেলে থাকবেন কবে সেই কুঁড়ি ফুটবে। যতক্ষণ কুঁড়ি না ফুটছে ততক্ষণ তাঁর পূজার অর্ঘ্য ভরছে না তারই জন্য তিনি যুগ যুগান্তর ধরে অপেক্ষা করে রয়েছেন। এমনি নির্ভয়ে যে মানুষ তাঁকে দেখতে না পেয়ে গোল করছে, এতেও তিনি ধৈর্য ধরে বসে আছেন। এতে তাঁর কোনোই ক্ষতি নেই।

কিন্তু, এতে কার ক্ষতি হচ্ছে। ক্ষতি হচ্ছে মানবাত্মার। আমরা জানি না আমাদের অন্তরে এক উপবাসী পুরুষ সমস্ত পদমর্যাদার মধ্যে ক্ষুধিত হয়ে রয়েছে। বিষয়ী লোকের, জ্ঞানাভিমানী লোকের কোনো ক্ষতি হচ্ছে না, কিন্তু ক্ষতি হচ্ছে তার। কবে শুভদিন হবে, কবে মোহরাত্রির অবসান হবে, কবে আনন্দে বিহঙ্গেরা গান ধরবে, কবে অর্ঘ্য ভরে উঠবে। এই-যে বিশাল বসুন্ধরায় আমরা জন্মলাভ করেছি, সমস্ত চৈতন্য নিয়ে, জ্ঞান নিয়ে, কবে এই জন্মলাভকে সার্থক করে যেতে পারব! সেই সার্থকতার জন্যই যে তৃষিত হয়ে অন্তরাত্মা বসে আছে। কিন্তু, ভয় নেই, কোথাও কোনো ভয় নেই। কারণ, যদি ভয়ের কারণ থাকত তবে তিনি উদ্‌বোধিত করতেন। তিনি বলছেন : আমি তো জোর করে চাই নে, যে ভুলে আছে তার ভুল একদিন ভাঙবে। ইচ্ছা করে তাঁর কাছে আসতে হবে, এইজন্যে তিনি তাকিয়ে আছেন। তাঁর ইচ্ছার

সঙ্গে ইচ্ছাকে মেলাতে হবে। আমাদের অনেক দিনের সঞ্চিত ক্ষুধা নিয়ে একদিন তাঁকে গিয়ে বলব : আমার হল না, আমার হৃদয় ভরল না। যেদিন সত্য করে চাইব সেদিন জননী কোলে তুলে নেবেন।

কিন্তু, এ ভুল তবে রয়েছে কেন। আমাদের এই ভুলের মধ্যেই যে তাঁর উপাসনা হচ্ছে। এরই মধ্যে যিনি সাধক তিনি তাঁর সাধনা নিয়ে রয়েছেন। যাঁদের উপরে তাঁর ডাক গিয়ে পৌঁচেছে সেই-সকল ভক্ত তাঁর অঙ্গনের কোণে বসে তাঁকে ধ্যান করছেন, তাঁকে ছাড়া তাঁদের সুখ নেই। এ যদি সত্য না হ'ত তা হলে কি পৃথিবীতে তাঁর নাম থাকত। তা হলে অন্য কথাই সকলের মনের মধ্যে জাগত, তারই কোলাহলে সমস্ত সংসার উত্ত্যক্ত হয়ে উঠত। ভক্তের হৃদয়ের আনন্দজ্যোতির সঙ্গে প্রত্যেক মানুষের নিয়ত যোগ হচ্ছেই। এই জনপ্রবাহের ধ্বনির মাঝখানে, এই-সমস্ত ক্ষণস্থায়ী কল্লোলের মধ্য থেকে, মানবাত্মার অমর বাণী জাগ্রত হয়ে উঠছে। মানুষের চিরদিনের সাধনার প্রবাহকে সেই বাণী প্রবাহিত করে দিচ্ছে; অতল পঙ্কের মধ্য থেকে পদ্ম বিকশিত হয়ে উঠছে; কোথা থেকে হঠাৎ বসন্তসমীরণ আসে, যখন এসে হৃদয়ের মধ্যে বয় তখন আমাদের অন্তরে পূজার পুষ্প ফুটব-ফুটব করে ওঠে। তাই দেখছি যে যদিচ এত অবহেলা, এত দ্বেষবিদ্বেষ, চারি দিকে এত উন্মত্ততা, তথাপি মানবাত্মা জাগ্রত আছে। কারণ, মানবের ধর্মই তাঁকে চিন্তা করা। মানবের ধর্ম যে তার চৈতন্যকে কেবল সংসারে বিলুপ্ত করে দেবে তা নয়। সে যে কেবলই জেগে জেগে উঠছে। যারা নিদ্রিত ছিল তারা হঠাৎ জেগে দেখছে যে এই অনন্ত আকাশে তাঁর আরতির দীপ জ্বলেছে, সমস্ত বিশ্ব তাঁর বন্দনাগান করছে। এতেও কি মানুষের দুটি হাত জোড় হবে না। তোমার না হতে পারে, কিন্তু সমস্ত মানবের অন্তরের মধ্যে তপস্বীদের কণ্ঠে স্তবগান উঠছে। অনন্তদেবের প্রাঙ্গণে সেই স্তবগান ধ্বনিত হচ্ছে, শোনো একবার শোনো; সমস্ত মানবের ভিতরে, মানবের নিভৃত কন্দরে, যেখানে ভক্ত বসে রয়েছেন সেইখানে তাঁর কী বন্দনাধ্বনি উঠছে শোনো। এই অর্থহীন নিখিল মানবের কলোচ্ছ্বাসের মধ্যে সেই একটি চিরন্তন বাণী কালে কালে যুগে যুগে জাগ্রত। তাকে বহন করবার জন্য বরপুত্রগণ আগে আগে চলেছেন, পথ দেখিয়ে দেখিয়ে চলেছেন। সে আজ নয়। আমরা অনন্ত পথের পথিক, আমরা যে কত যুগ ধরে চলেছি! যাঁরা গাচ্ছেন তাঁদের গান আমাদের কানে পৌঁচচ্ছে। তাই যদি না পৌঁছয় তবে কী নিয়ে আমরা থাকব। দিনের পর দিন কি এমনি করেই চলে যাবে। এই কাড়াকাড়ি মারামারি উঞ্ছবৃত্তির মধ্যে কি জীবন কাটবে। এইজন্যেই কি জন্মেছিলুম। জীবনের পথে কি এইজন্যেই আমাদের চলতে বলা

হয়েছে। এই-যে সংসারে জন্মেছি, চলেছি, এখানে কত প্রেম কত আনন্দ যে ছড়িয়ে রয়েছে তা কি আমরা দেখছি না। কেবলই কি দেখব পদমর্যাদা, টাকাকড়ি, বিষয়-বিভব, আর-কিছুই নয়। যিনি সকল মানবের বিধাতা একবার তাঁর কাছে দাঁড়াবার কি ক্ষণমাত্র অবকাশ হবে না। পৃথিবীর এই মহাতীর্থে সেই জনগণের অধিনায়ককে কি প্রণাম নিবেদন করে যাব না।

কিন্তু, ভয় নেই, ভয় নেই। তাঁর তো শাসন নেই। তাই একবার হৃদয়ের সমস্ত প্রীতিকে জাগ্রত করি। একবার সব নিয়ে আমাদের জীবনের একটি পরম প্রণাম রেখে দিয়ে যাব। জানি, অন্যমনস্ক হয়ে আছি, তবু বলা যায় না— শুভক্ষণ যে কখন আসে তা বলা যায় না। তাই তো এখানে আসি। কী জানি যদি মন ফিরে যায়। তিনি যে ডাক ডাকছেন, তাঁর প্রেমের ডাক, যদি শুভক্ষণ আসে— যদি শুনতে পাই। সমস্ত কোলাহলের মাঝখানে তাই কান খাড়া করে রয়েছি। এই মুহূর্তেই হয়তো তাঁর ডাক আসতে পারে। এই মুহূর্তেই আমার জীবনপ্রদীপের যে শিখাটি জ্বলে নি সেই শিখাটি জ্বলে উঠতে পারে। আমাদের সত্য প্রার্থনা, যা চিরদিন অন্তরের এক প্রান্তে অপেক্ষা করে রয়েছে, সেই প্রার্থনা আজ জাগুক। অসতো মা সদ্‌গময়। সত্যকে চাই। সমস্ত মিথ্যাজাল ছিন্ন করে দাও। এই প্রার্থনা জগতে যত মানব জন্মগ্রহণ করেছে সকলের চিরকালের প্রার্থনা। এই প্রার্থনাই মানুষের সমাজ গড়েছে, সাম্রাজ্য রচনা করেছে, শিল্পসাহিত্যের সৃষ্টি করেছে। আজ এই প্রার্থনা আমাদের জীবনে ধ্বনিত হয়ে উঠুক। ৭ পৌষ ১৩২০, রাত্রি

মাঘ ১৩২০

অগ্রসর হওয়ার আহ্বান

স্টপ্‌ফোর্ড্‌ ব্রুকের সঙ্গে যখন আমার আলাপ হয়েছিল তখন তিনি আমাকে বললেন যে, কোনো-একটা বিশেষ সাম্প্রদায়িক দলের কথা বা বিশেষ দেশের বা কালের প্রচলিত রূপক ধর্মমত বা বিশ্বাসের সঙ্গে আমার কবিতা জড়িত নয় বলে আমার কবিতা পড়ে তাঁদের আনন্দ ও উপকার হয়েছে। তার কারণ, খৃস্টধর্ম যে কাঠামোর ভিতর দিয়ে এসে যে রূপটি পেয়েছে তার সঙ্গে বর্তমান জ্ঞানবিজ্ঞানের অনেক জায়গাতেই অনৈক্য হচ্ছে। তাতে করে পুরোনো ধর্মবিশ্বাস একেবারে গোড়া ঘেঁষে উন্মূলিত করে দেওয়া হচ্ছে। প্রতিদিন যা বিশ্বাস করি বলে মানুষকে স্বীকার করতে হয় তা স্বীকার করা সে দেশের অধিকাংশ শিক্ষিত লোকের পক্ষে অসম্ভব। অনেকের পক্ষে চর্চে যাওয়া অসাধ্য

হয়েছে। ধর্ম মানুষের জীবনের বাইরে পড়ে রয়েছে; লোকের মনকে তা আর আশ্রয় দিতে পারছে না। সেইজন্য ফরাসীস্ বিদ্রোহ থেকে আরম্ভ করে দেখা গিয়েছে যে, ধর্মকে আঘাত দেবার উদ্যম সেখানকার বুদ্ধিমান লোকদের পেয়ে বসেছে। অথচ ধর্মকে আঘাতমাত্র দিয়ে মানুষ আশ্রয় পাবে কেমন করে! তাতে কিছুদিনের মতো মানুষ প্রবৃত্ত থাকতে পারে, কিন্তু তাতে ধর্ম সম্বন্ধে মানুষের অন্তরে যে স্বাভাবিক পিপাসা রয়েছে তার কোনোই তৃপ্তি হয় না।

এখনকার কালে সেই পিপাসার দাবি জেগে উঠেছে। তার নানা লক্ষণ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। নাস্তিকতা নিয়ে যেদিন জ্ঞানী লোকেরা দম্ভ করতেন সেদিন চলে গিয়েছে। ধর্মকে আবৃত করে অন্ধ সংস্কারগুলা যখন প্রবল হয়ে ওঠে তখন সেগুলিকে ঝেঁটিয়ে ফেলার একটা দরকার হয়; নাস্তিকতা ও সংশয়বাদের সেই কারণে প্রয়োজন হয়। যেমন ধরো, আমাদের দেশে চার্বাক প্রভৃতির সময়ে একটা আন্দোলন জেগেছিল। কিন্তু, এখন লড়াই করবার প্রবৃত্তিই যে মানুষের নেই। এখন অন্ধ সংস্কারগুলি প্রায়ই পরাভূত হয়ে গিয়েছে। কাজেই লড়াই নিয়ে আর মানুষের মন ব্যাপৃত থাকতে পারছে না। বিশ্বাসের যে একটা মূল চাই, সংসারে যা-কিছু ঘটছে তাকে বিচ্ছিন্নভাবে নিলে চলে না— এ প্রয়োজনবোধ মানুষের ভিতরে জেগেছে। ইউরোপের লোকেরা ধর্মবিশ্বাসের একটা প্রত্যক্ষগম্য প্রমাণের অনুসন্ধান করছে; যেমন ভূতের বিশ্বাস, টেলিপ্যাথি প্রভৃতি কতগুলো অতীন্দ্রিয় রাজ্যের ব্যাপার নিয়ে তারা উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। তাতে ও দেশের লোকেরা মনে করছে যে ওই-সব প্রমাণ সংগৃহীত হলে ধর্মবিশ্বাস তার ভিত্তি পাবে। ওই-সব ভুতুড়ে কাণ্ডের মধ্যে ধর্মের সত্যকে তারা খুঁজছে। এ নিয়ে আমার সঙ্গে অনেকের কথাবার্তা হয়েছে। আমি এই কথাই বলেছি যে, বিশ্বব্যাপারে তোমরা যদি বিশ্বাসের মূল না পাও তবে অন্য-কিছুতে এমনই কী ভিত্তি পাবে। নূতন জিনিস কিছু পেলেই মনকে তা আলোড়িত করে। একজন ইংরেজ কবি একদিন আমাকে বললেন যে তাঁর ধর্মবিশ্বাস অত্যন্ত শিথিল হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু রেডিয়মের আবিষ্কারে তাঁর বিশ্বাসকে ফিরিয়েছে। তার মানে, ওরা বাইরের দিক থেকে ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তিকে পাকা করবার চেষ্টা করে। সেইজন্য ওরা যদি কখনো দেখে যে মানুষের ভক্তির গভীরতার মধ্যেই একটা প্রমাণ রয়েছে, যেমন চোখ দিয়ে বাহ্য ব্যাপারকে দেখছি বলে তার প্রমাণ পাচ্ছি তেমনি একটা অধ্যাত্মদৃষ্টির দ্বারা আধ্যাত্মিক সত্যকে প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করা যায়— তা হলে ওরা একটা ভরসা পায়। প্রফেসর জেম্স্ প্রভৃতি দেখিয়েছেন যে মিস্টিক বলে যারা গণ্য তাঁরা তাঁদের ধর্মবিশ্বাসকে কেমন করে প্রকাশ করেছেন। তাঁদের সব জীবনের সাক্ষ্য থেকে তিনি দেখিয়েছেন যে, তাঁরা সবাই

একই কথা বলেছেন ; তাঁদের সকলেরই অভিজ্ঞতা একই পথ দিয়ে গিয়েছে। বিভিন্ন দেশে নানা অবস্থার নানা লোক একই বাণী নানা কালে ব্যক্ত করেছেন। এ বড়ো আশ্চর্য।

এই প্রসঙ্গের উপলক্ষে স্টপ্‌ফোর্ড্‌ ব্রুক বলেছিলেন যে, ধর্মকে এমন স্থানে দাঁড় করানো দরকার যেখান থেকে সকল দেশের সকল লোকই তাকে আপনার বলে গ্রহণ করতে পারে। অর্থাৎ, কোনো-একটা বিশেষ স্থানিক বা সাময়িক ধর্মবিশ্বাস বিশেষ দেশের লোকের কাছেই আদর পেতে পারে, কিন্তু সর্বদেশের সর্বকালের লোককে আকর্ষণ করতে পারে না। আমাদের ধর্মের কোনো 'ডগ্‌মা' নেই শুনে তিনি ভারি খুশি হলেন। বললেন, তোমরা খুব বেঁচে গেছ। ডগ্‌মার কোনো অংশ না টিঁকলে সমস্ত ধর্মবিশ্বাসকে পরিহার করবার চেষ্টা দেখতে পাওয়া যায়। সে বড়ো বিপদ। আমাদের উপনিষদের বাণীতে কোনো বিশেষ দেশকালের ছাপ নেই ; তার মধ্যে এমন কিছুই নেই যাতে কোনো দেশের কোনো লোকের কোথাও বাধতে পারে। তাই সেই উপনিষদের প্রেরণায় আমাদের যা-কিছু কাব্য বা ধর্মচিন্তা হয়েছে সেগুলো পশ্চিমদেশের লোকের ভালো লাগবার প্রধান কারণই হচ্ছে, তার মধ্যে বিশেষ দেশের কোনো সংকীর্ণ বিশেষত্বের ছাপ নেই।

পূর্বে যাতায়াতের তেমন সুযোগ ছিল না বলে মানুষ নিজ নিজ জাতিগত ইতিহাসকে একান্ত করে গড়ে তোলবার চেষ্টা করেছিল। সেইজন্য খৃস্টান অত্যন্ত খৃস্টান হয়েছে, হিন্দু অত্যন্ত হিন্দু হয়েছে। এক-এক জাতি নিজের ধর্মকে আয়্‌রন্‌চেস্টে সিলমোহর দিয়ে রেখেছে। কিন্তু, মানুষ মানুষের কাছে আজ যতই আসছে ততই সার্বভৌমিক ধর্মবোধের প্রয়োজন মানুষ বেশি করে অনুভব করছে। জ্ঞান যেমন সকলের জিনিস হচ্ছে সাহিত্যও তেমনি সকলের উপভোগ্য হবার উপক্রম করছে। সবরকম সাহিত্যরস সবাই নিজের বলে ভোগ করবে এইটি হয়ে উঠছে। এবং সকলের চেয়ে যেটি পরম ধন, ধর্ম, সেখানেও যে-সব সংস্কার তাকে ঘিরে রেখেছে, ধর্মের মধ্যে প্রবেশের সিংহদ্বারকে রোধ করে রেখেছে, বিশেষ পরিচয়পত্র না দেখাতে পারলে কাউকে সেখানে প্রবেশ করতে দিচ্ছে না, সেই-সব সংস্কার দূর করবার আয়োজন হচ্ছে। পশ্চিমদেশে যাঁরা মনীষী তাঁরা নিজের ধর্মসংস্কারের সংকীর্ণতায় পীড়া পাচ্ছেন এবং ইচ্ছা করছেন যে, ধর্মের পথ উদার এবং প্রশস্ত হয়ে যাক। সেই যাঁরা পীড়া পাচ্ছেন এবং সংস্কার কাটিয়ে ধর্মকে তার বিশুদ্ধ মূর্তিতে দেখবার চেষ্টা করছেন তাঁদের মধ্যে স্টপ্‌ফোর্ড্‌ ব্রুকও একজন। খৃস্টধর্ম যেখানে সংকীর্ণ সেখানে ব্রুক তাকে মানেন নি। তাঁর 'অন্‌ওঅর্ড্‌ ক্রাই' -নামক নূতন বইটির প্রথম উপদেশটি পাঠ করলেই সেটা বোঝা যাবে। আজকের ৭ই পৌষের উৎসবের সঙ্গে সেই উপদেশের যোগ আছে।

তিনি Revelationএর চতুর্থ অধ্যায় থেকে এই শ্লোকটি তাঁর উপদেশের বিষয় করে নিয়েছেন—

After this I looked, and, behold, a door was opened in heaven ; and the first voice I heard was as it were a trumpet talking with me ; which said, come up hither and I will show thee things that shall be hereafter.

তাঁর উপদেশের ভিতরকার কথা হচ্ছে এই : বরাবর এই কথা আছে 'তুমি এসো আরও কিছু দেখাবার আছে' ; এই বাণী বরাবর মানুষ শুনে আসছে। আমাদের কোনো জায়গায় ঈশ্বর বদ্ধ থাকতে দেবেন না। জ্ঞানে ভাবে কর্মে সমাজে সকল দিকে স্বর্গ থেকে, উপর থেকে, ডাক আসছে : তোমরা চলে এসো, তোমরা বসে থাকতে পারবে না। ইহলোকের মধ্যেই সেই hereafter, সেই পরে যা হবে, তার ডাক মানুষ শুনেছে বলেই তার সমাজে উন্নতি হচ্ছে, তার জ্ঞান প্রসার লাভ করছে। পশু এ ডাক শোনে না, তাকে কেউ বলে না যে 'তুমি যা দেখছ যা পাচ্ছ তাই শুধু নয়— আরও অনেক বাকি আছে'। মানুষেরই এই একটি বিশেষ গৌরবের জিনিস যে মানুষকে ঈশ্বর স্থির নিশ্চল হয়ে বসে থাকতে দিলেন না। যেখানে তার বদ্ধতা, তার সংকীর্ণতা, সেখানে ক্রমাগতই আহ্বান আসছে : আরও কিছু আছে, আরও আছে। যা হয়েছে তা হয়েছে এ বলে যদি দাঁড়াই, যদি সেই 'আরও আছে'র ডাককে অমান্য করি; তা হলে মানুষের ধর্মের পতন। যদি তাকে জ্ঞানে অমান্য করি তা হলে মানুষের মূঢ়তায় পতন। যদি সমাজে অমান্য করি তা হলে জড়তায় পতন। কালে কালে মহাপুরুষেরা কী দেখান। তাঁরা দেখান যে, তোমরা যাকে ধর্ম বলে ধরে রয়েছ ধর্ম তার মধ্যে পর্যাপ্ত নন। মানুষকে মহাপুরুষেরা মুক্তির পথ দেখিয়ে দেন ; তাঁরা বলেন, চলতে হবে। কিন্তু, মানুষ তাঁদেরই আশ্রয় করে খুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে যায়, আর চলতে চায় না। মহাপুরুষেরা যে পর্যন্ত গিয়েছেন তারও বেশি তাঁদের অনুপন্থীরা যাবেন, এই তো তাঁদের ইচ্ছা। কিন্তু, তারা তাঁদের বাক্য গলায় বেঁধে আত্মহত্যা সাধন করে। মহাপুরুষদের পথ হচ্ছে পথ, কেবলমাত্র পথ। তাঁরা সেই পথে চলেছিলেন এইটেই সত্য। সুতরাং পথে বসলে গম্যস্থানকে পাব না, পথে চললেই পাব। উপরের থেকে সেই চলবার ডাকটিই আসছে। সেই বাণীই বলছে : তুমি বসে থেকে কিছু পাবে না ; চলো, আরও চলো ; আরও আছে, আরও আছে। মানুষের ধর্ম চলছে তা আমরা দেখতে পাচ্ছি। ধর্ম আমাদের কোনো সীমাবদ্ধ জিনিসের পরিচয় দিচ্ছে না, ধর্ম অসীমের পরিচয় দিচ্ছে। পাখি যেমন আকাশে ওড়ে এবং উড়তে উড়তে আকাশের শেষ পায় না তেমনি আমরা অনন্তের

মধ্যে যে অবাধ গতি রয়েছে তাতেই চলতে থাকব। পাখি পিঞ্জরের মধ্যে ছট্‌ফট্‌ করে তার কারণ এ নয় যে, সে তার প্রয়োজন সেখানে পাচ্ছে না, কিন্তু তার প্রয়োজনের চেয়ে বেশিকেই পাচ্ছে না। মানুষেরও তাই চাই। প্রয়োজনের চেয়ে বেশিতেই মানুষের আনন্দ। মানুষের ধর্ম হচ্ছে অনন্তে বিহার, অনন্তের আনন্দকে পাওয়া। মানুষ যেখানে ধর্মকে বিশেষ দেশকালে আবদ্ধ করেছে সেখানে যে ধর্ম তাকে মুক্তি দেবে সেই ধর্মই তার বন্ধন হয়েছে। য়ুরোপে ধর্ম যেখানে তাকে বেঁধেছে সেইখানেই মুক্তির জন্য য়ুরোপ ক্রন্দন করছে। onward cry মানুষের cry।

আজকে যাঁর দীক্ষার সাম্বৎসরিকে আমরা এসেছি তিনি onward cry শুনতে পেয়েছিলেন। যে সময়ে আমাদের দেশে ধর্মকে সমাজকে চারি দিক থেকে নানা আচার ও প্রথার বন্ধনে বেঁধেছিল, তাকে সংকীর্ণ করে রুদ্ধ করে রেখেছিল, সেই সময়ে তিনি এই আহ্বান শুনে জেগে উঠলেন। চারি দিকের এই রুদ্ধতা, এই বেড়াগুলো, তাঁকে অত্যন্ত বেদনা দিয়েছিল। তিনি যখন আকাশে উড়তে চেয়েছিলেন তখন পিঞ্জরের প্রত্যেকটি শলাকা তাঁকে আঘাত করেছিল। তিনি জীবনকে প্রতিদিন অগ্রসর করবেন, প্রতিদিন অনন্তের আস্বাদ আপনার ভিতর থেকে পাবেন, তাঁর এই আকাঙ্ক্ষা সেদিনকার সমাজে বড়োই দুর্লভ ছিল। সকলেই নিজ নিজ প্রচলিত অভ্যাসে তৃপ্ত ছিল। এই সাতই পৌষের দিন তিনি তাঁর দীক্ষার আহ্বান শুনেছিলেন, সে আহ্বান এই মন্ত্রটি: ঈশাবাস্যমিদং সর্বং। দেখো, তাঁর মধ্যে সব দেখো। এই আহ্বান, এই দীক্ষামন্ত্রই তো এই আশ্রমের মধ্যে রয়েছে। উপনিষদের এই মন্ত্র, এ কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের নয়, এ কোনো বিশেষ সম্প্রদায়কে সৃষ্টি করে না। এ বাণী দেশে দেশান্তরে নির্ঝরধারার মতো যুগে যুগে প্রবাহিত হয়ে চলতে থাকবে: দেখো, তাঁর মধ্যে সব দেখো।

সেইজন্য আজ আমাদের বিশেষভাবে চিন্তা করে দেখতে হবে যে, মহর্ষির জীবনের শ্রেষ্ঠ বিকাশ সমাজে হয় নি, তা এই আশ্রমে হয়েছিল। বিশেষ সমাজের সঙ্গে তিনি দীর্ঘকাল সংযুক্ত ছিলেন বটে, কিন্তু সেইখানেই তাঁর চিরজীবনের সাধনা তার বিশেষ সার্থকতা লাভ করে নি; এই আশ্রমের মধ্যেই তার সার্থকতা সম্পূর্ণ হয়েছিল। 'আরো'র দিকে চলো: সেই ডাক তিনি শুনে বেরিয়েছিলেন, সেই মন্ত্রে তিনি দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন এবং সেই ডাকটি সেই মন্ত্রটি তিনি আমাদের মধ্যে রেখে গিয়েছেন। তিনি বলেছেন: এসো, এসো আরও পাবে। অনন্তস্বরূপের ভাণ্ডার যদি উন্মুক্ত হয় তবে তার আর সীমা কোথায়! তাই আমাদের দেখতে হবে যে, আমরা যেন সেই পথে তাঁর অনুসরণ করি যে পথ দিয়ে তিনি চলে গিয়েছেন। জ্ঞানে প্রেমে ধর্মে সকল দিকে যেন মুক্তির পথেই ক্রমাগত অগ্রসর হতে থাকি। এ কথা ভুলবার নয় যে, এ আশ্রম

সম্প্রদায়ের স্থান নয়, এখানে সমস্ত বিশ্বের আমরা পরিচয় পাব। এখানে সকল জাতির সকল দেশের লোক সমাগত হবে। তাঁর এই দীক্ষার মন্ত্রকে, সমস্তকে ঈশ্বরের মধ্যে দেখার মন্ত্রকে, আমরা কোথাও সংকোচ করব না। আমাদের অগ্রসরের পথ যেন কোনোমতেই বদ্ধ না হয়। ৭ পৌষ ১৩২০

মাঘ ১৩২০

মা মা হিংসীঃ

মানুষের সকল প্রার্থনার মধ্যে এই-যে একটি প্রার্থনা দেশে দেশে কালে কালে চলে এসেছে 'মা মা হিংসীঃ : আমাকে বিনাশ কোরো না, আমাকে মৃত্যু থেকে রক্ষা করো'— এ এক আশ্চর্য ব্যাপার। যে শারীরিক মৃত্যু তার নিশ্চিত ঘটবে তার থেকে রক্ষা পাবার জন্য মানুষ প্রার্থনা করতে পারে না, কারণ এমন অনর্থক প্রার্থনা করে তার কোনো লাভ নেই। সে জানে মৃত্যুর চেয়ে সুনিশ্চিত সত্য আর নেই, দৈহিক জীবনের বিনাশ একদিন না একদিন ঘটবেই। এ বিষয়ে তার মনে কোনো সন্দেহ নেই।

কিন্তু, সে যখন বলেছে 'আমাকে বিনাশ কোরো না' তখন সে যে কী বলতে চেয়েছে তা তার অন্তরের দিকে চেয়ে দেখলেই বেশ বোঝা যায়। এমন যদি হত যে তার শরীর চিরকাল বাঁচত, তা হলেও সেই বিনাশ থেকে তাকে কেউ রক্ষা করতে পারত না। কারণ, সে যে প্রতি মুহূর্তের বিনাশ। সে যে কত রকমের মৃত্যু একটার পর একটা আমাদের জীবনের উপরে আসছে। ক্ষুদ্র কালে বদ্ধ হয়ে বাইরের সুখদুঃখের আঘাতে ক্রমাগত খণ্ডিত বিক্ষিপ্ত হয়ে যে জীবন আমরা বহন করছি এতে যে প্রতিদিনই আমরা মরছি। যে গণ্ডি দিয়ে আমরা জীবনকে ঘিরে রাখতে চেষ্টা করি তারই মধ্যে জীবন কত মরা মরছে, কত প্রেম কত বন্ধুত্ব মরছে, কত ইচ্ছা কত আশা মরছে— এই ক্রমাগত মৃত্যুর আঘাতে সমস্ত জীবন ব্যথিত হয়ে উঠেছে।

জীবনের মধ্যে এই মৃত্যুর ব্যথা যে আমাদের ভোগ করতে হয় তার কারণ হচ্ছে, আমরা দুই জায়গায় আছি। আমরা তাঁর মধ্যেও আছি, সংসারের মধ্যেও আছি। আমাদের এক দিকে অনন্ত, অন্য দিকে সান্ত। সেইজন্য মানুষ এই কথাই ভাবছে, কী করলে এই দুই দিককেই সে সত্য করতে পারে। আমাদের এই সংসারের পিতা, যিনি এই পার্থিব জীবনের সূত্রপাত করে দিয়েছেন, তাঁকে শুধু পিতা বলে আমাদের অন্তরের তৃপ্তি নেই। কারণ আমরা যে জানি যে, এই শারীরিক জীবন একদিন ফুরিয়ে যাবে।

আমরা তাই সেই আর-একজন পিতাকে ডাকছি যিনি কেবলমাত্র পার্থিব জীবনের নয়, কিন্তু চিরজীবনের পিতা। তাঁর কাছে গেলে মৃত্যুর মধ্যে বাস করেও আমরা অমৃতলোকে প্রবেশ করতে পারি, এই আশ্বাস কেমন করে যেন আমরা আমাদের ভিতর থেকেই পেয়েছি। এইজন্যই পথ চলতে চলতে মানুষ ক্ষণে ক্ষণে উপরের দিকে তাকায়। এইজন্যই সংসারের সুখভোগের মধ্যে থাকতে থাকতে তার অন্তরের মধ্যে বেদনা জেগে ওঠে এবং তখন ইচ্ছাপূর্বক সে পরম দুঃখকে বহন করবার জন্য প্রস্তুত হয়। কেন। কারণ, সে বুঝতে পারে মানুষের মধ্যে কতবড়ো সত্য রয়েছে, কতবড়ো চেতনা রয়েছে, কতবড়ো শক্তি রয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ ক্ষুদ্র বিষয় নিয়ে মরছে ততক্ষণ পর্যন্ত দুঃখের পর দুঃখ, আঘাতের পর আঘাত, তার উপর আসবেই আসবে— কে তাকে রক্ষা করবে। কিন্তু, যেমনি সে তার সমস্ত দুঃখ-আঘাতের মধ্যে সেই অমৃতলোকের আশ্বাস পায় অমনি তার এই প্রার্থনা আর-সকল প্রার্থনাকে ছাড়িয়ে ওঠে: মা মা হিংসীঃ। আমাকে বাঁচাও বাঁচাও প্রতিদিনের হাত থেকে, ছোটোর হাতের মার থেকে আমাকে বাঁচাও। আমি বড়ো আমাকে মৃত্যুর হাত থেকে, স্বার্থের হাত থেকে, অহমিকার হাত থেকে নিয়ে যাও। তোমার সেই পরিপূর্ণ প্রেমের মধ্যে আমার জীবন যেতে চাচ্ছে। আপনাকে খণ্ড খণ্ড করে প্রতিদিন আপনার অহমিকার মধ্যে ঘুরে ঘুরে আমার কোনো আনন্দ নেই। মা মা হিংসীঃ। আমাকে বিনাশ থেকে বাঁচাও।

যে প্রেমের মধ্যে সমস্ত জগতে মানুষ আপনার সত্য স্থানটিকে পায়, সমস্ত মানুষের সঙ্গে তার সত্য সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, সেই পরম প্রেমটিকে না পেলে মানুষকে কে বেদনা ও আঘাত থেকে রক্ষা করতে পারে। তখন তার উপর আঘাত নানা দিক থেকে ক্রমাগতই আসবে, পাপের দহন তাকে দগ্ধ করে মারবে। এইজন্যই সংসারের ডাকের উপর আর-একটি ডাক জেগে আছে: তোমার ভিতর দিয়ে সমস্ত সংসারের সঙ্গে যে আমার নিত্য সম্বন্ধ সেই সম্বন্ধে আমায় বাঁধো, তা হলেই মৃত্যুর ভিতর থেকে আমি অমৃতে উত্তীর্ণ হতে পারব।

পিতা নো বোধি। পিতা, তুমি বোধ দাও। তোমাকে স্মরণ করে মনকে আমরা নম্র করি। প্রতিদিনের ক্ষুদ্রতা আমাদের ঔদ্ধত্যে নিয়ে যায়, তোমার চরণতলে আপনাকে একবার সম্পূর্ণ ভুলি। এই ক্ষুদ্র আমার সীমায় আমি বড়ো হয়ে উঠছি এবং পদে পদে অন্যকে আঘাত করছি; আমাকে পরাভূত করো তোমার প্রেমে। এই মৃত্যুর মধ্যে আমাকে রেখো না, হে পরম লোকের পিতা, প্রেমেতে ভক্তিতে অবনত হয়ে তোমাকে নমস্কার করি এবং সেই নমস্কারের দ্বারা রক্ষা পাই। তা না হলে দুঃখ পেতেই হবে, বাসনার অভিঘাত সহ্য করতেই হবে, অহংকারের পীড়ন প্রতিদিন

জীবনকে ভারগ্রস্ত করে তুলবেই তুলবে। যতদিন পর্যন্ত ক্ষুদ্রতার সীমার মধ্যে বদ্ধ হয়ে আছি ততদিন পাপ পুঞ্জীভূত হয়ে উঠে বিকটমূর্তি ধারণ করে চতুর্দিককে বিভীষিকাময় করে তুলবেই তুলবে।

সমস্ত য়ুরোপে আজ এক মহাযুদ্ধের ঝড় উঠেছে। কতদিন ধরে গোপনে গোপনে এই ঝড়ের আয়োজন চলছিল! অনেক দিন থেকে আপনার মধ্যে আপনাকে যে মানুষ কঠিন করে বদ্ধ করেছে, আপনার জাতীয় অহমিকাকে প্রচণ্ড করে তুলেছে, তার সেই অবরুদ্ধতা আপনাকেই আপনি একদিন বিদীর্ণ করবেই করবে। এক-এক জাতি নিজ নিজ গৌরবে উদ্ধত হয়ে সকলের চেয়ে বলীয়ান হয়ে ওঠবার জন্য চেষ্টা করেছে। বর্মে চর্মে অস্ত্রে শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে অন্যের চেয়ে নিজে বেশি শক্তিশালী হবার জন্য তারা ক্রমাগতই তলোয়ারে শান দিয়েছে। peace conference, শান্তিস্থাপনের উদ্‌যোগ চলেছে; সেখানে কেবলই নানা উপায় উদ্ভাবন করে নানা কৌশলে এই মারকে ঠেকিয়ে রাখবার জন্য চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু, কোনো রাজনৈতিক কৌশলে কি এর প্রতিরোধ হতে পারে। এ যে সমস্ত মানুষের পাপ পুঞ্জীভূত আকার ধারণ করেছে; সেই পাপই যে মারবে এবং মেরে আপনার পরিচয় দেবে। সে মার থেকে রক্ষা পেতে গেলে বলতেই হবে: মা মা হিংসীঃ। পিতা, তোমার বোধ না দিলে এ মার থেকে আমাদের কেউ রক্ষা করতে পারবে না। কখনো এটা সত্য হতে পারে না যে, মানুষ কেবলমাত্র আপনার ভিতরেই আপনার সার্থকতাকে পাবে। তুমি আমাদের পিতা, তুমি সকলের পিতা, এই কথা বলতেই হবে। এই কথা বলার উপরেই মানুষের পরিত্রাণ। মানুষের পাপের আগুন এই পিতার বোধের দ্বারা নিববে; নইলে সে কখনোই নিববে না, দাবানলের মতো সে ক্রমশ ব্যাপ্ত হতে হতে সমস্ত ছারখার করে দেবে। কোনো রাজমন্ত্রী কূটকৌশলজাল বিস্তার করে যে সে আগুন নেবাতে পারবে তা নয়; মার খেতে হবে, মানুষকে মার খেতেই হবে।

মানুষের এই-যে প্রচণ্ড শক্তি এ বিধাতার দান। তিনি মানুষকে ব্রহ্মাস্ত্র দিয়েছেন এবং দিয়ে বলে দিয়েছেন, যদি তুমি একে কল্যাণের পক্ষে ব্যবহার কর তবেই ভালো, আর যদি পাপের পক্ষে ব্যবহার কর তবে এ ব্রহ্মাস্ত্র তোমার নিজের বুকেই বাজবে। আজ মানুষ মানুষকে পীড়ন করবার জন্য নিজের এই অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্রকে ব্যবহার করেছে; তাই সে ব্রহ্মাস্ত্র আজ তারই বুকে বেজেছে। মানুষের বক্ষ বিদীর্ণ করে আজ রক্তের ধারা পৃথিবীতে প্রবাহিত হয়ে চলবে— আজ কে মানুষকে বাঁচাবে! এই পাপ এই হিংসা মানুষকে আজ কী প্রচণ্ড মার মারবে— তাকে এর মার থেকে কে বাঁচাবে!

আমরা আজ এই পাপের মূর্তি যে কী প্রকাণ্ড তা কি দেখব না। এই পাপ যে সমস্ত মানুষের মধ্যে রয়েছে এবং আজ তাই এক জায়গায় পুঞ্জীভূত হয়ে বিরাট আকার নিয়ে দেখা দিয়েছে, এ কথা কি আমরা বুঝব না। আমরা এ দেশে প্রতিদিন পরস্পরকে আঘাত করছি, মানুষকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করছি, স্বার্থকে একান্ত করে তুলছি। এ পাপ কতদিন ধরে জমছে, কত যুগ ধরে জমছে। প্রতিদিনই কি আমরা তারই মার খাচ্ছি নে। বহু শতাব্দী থেকে আমরা কি কেবলই মরছি নে। সেইজন্যই তো এই প্রার্থনা : মা মা হিংসীঃ। বাঁচাও বাঁচাও, এই বিনাশের হাত থেকে বাঁচাও। এই সমস্ত দুঃখশোকের উপরে যে অশোক লোক রয়েছে, অনন্ত-অন্তের সম্মিলনে যে অমৃতলোক সৃষ্ট হয়েছে, সেইখানে নিয়ে যাও। সেইখানে মরণের উপরে জয়ী হয়ে আমরা বাঁচব ; ত্যাগের দ্বারা, দুঃখের দ্বারা বাঁচব। সেইখানে আমাদের মুক্তি দাও।

আজ অপ্রেমঝঞ্ঝার মধ্যে, রক্তস্রোতের মধ্যে, এই বাণী সমস্ত মানুষের ক্রন্দনধ্বনির মধ্যে জেগে উঠেছে। এই বাণী হাহাকার করতে করতে আকাশকে বিদীর্ণ করে বয়ে চলেছে। সমস্ত মানবজাতিকে বাঁচাও। আমাকে বাঁচাও। এই বাণী যুদ্ধের গর্জনের মধ্যে মুখরিত হয়ে আকাশকে বিদীর্ণ করে দিয়েছে।

স্বার্থের বন্ধনে জর্জর হয়ে, রিপুর আঘাতে আহত হয়ে, এই-যে আমরা প্রত্যেকে পাশের লোককে আঘাত করছি ও আঘাত পাচ্ছি— সেই প্রত্যেক আমির ক্রন্দনধ্বনি একটা ভয়ানক বিশ্বযজ্ঞের মধ্যে সকল মানুষের প্রার্থনারূপে রক্তস্রোতে গর্জিত হয়ে উঠেছে : মা মা হিংসীঃ। মরছে মানুষ, বাঁচাও তাকে। কে বাঁচাবে। পিতা নোঽসি। তুমি যে আমাদের সকলের পিতা, তুমি বাঁচাও। তোমার বোধের দ্বারা বাঁচাও। তোমাকে সকল মানুষ মিলে যেদিন নমস্কার করব সেই দিন নমস্কার সত্য হবে। নইলে ভূলুণ্ঠিত হয়ে মৃত্যুর মধ্যে যে নমস্কার করতে হয় সেই মৃত্যু থেকে বাঁচাও। দেশদেশান্তরে তোমার যত যত সন্তান আছে, হে পিতা, তুমি প্রেমে ভক্তিতে কল্যাণে সকলকে একত্র করো তোমার চরণতলে। নমস্কার সর্বত্র ব্যাপ্ত হোক। দেশ থেকে দেশান্তরে জাতি থেকে জাতিতে ব্যাপ্ত হোক। বিশ্বানি দুরিতানি পরাসুব। বিশ্বপাপের যে মূর্তি আজ রক্তবর্ণে দেখা দিয়েছে সেই বিশ্বপাপকে দূর করো। মা মা হিংসীঃ। বিনাশ থেকে রক্ষা করো। ২০ শ্রাবণ ১৩২১

আশ্বিন-কার্তিক ১৩২১

পাপের মার্জনা

আমাদের প্রার্থনা সকল সময়ে সত্য হয় না, অনেক সময়ে মুখের কথা হয়; কারণ, চারি দিকে অসত্যের দ্বারা পরিবৃত হয়ে থাকি বলে আমাদের বাণীতে সত্যের তেজ পৌঁছোয় না। কিন্তু, ইতিহাসের মধ্যে, জীবনের মধ্যে, এমন এক-একটি দিন আসে যখন সমস্ত মিথ্যা এক মুহূর্তে দগ্ধ হয়ে গিয়ে এমনি একটি আলোক জেগে ওঠে যার সামনে সত্যকে অস্বীকার করবার উপায় থাকে না। তখনই এই কথাটি বারবার জাগ্রত হয়: বিশ্বানি দেব সবিতর্দুরিতানি পরাসুব। হে দেব, হে পিতা, বিশ্বপাপ মার্জনা করো।

আমরা তাঁর কাছে এ প্রার্থনা করতে পারি না 'আমাদের পাপ ক্ষমা করো'; কারণ, তিনি ক্ষমা করেন না, তিনি সহ্য করেন না। তাঁর কাছে এই প্রার্থনাই সত্য প্রার্থনা: তুমি মার্জনা করো। যেখানে যত কিছু পাপ আছে, অকল্যাণ আছে, বারম্বার রক্তস্রোতের দ্বারা, অগ্নিবৃষ্টির দ্বারা, সেখানে তিনি মার্জনা করেন। যে প্রার্থনা ক্ষমা চায় সে দুর্বলের ভীরুর প্রার্থনা, সে প্রার্থনা তাঁর দ্বারে গিয়ে পৌঁছোবে না।

আজ এই-যে যুদ্ধের আগুন জ্বলেছে এর ভিতরে সমস্ত মানুষের প্রার্থনাই কেঁদে উঠেছে: বিশ্বানি দুরিতানি পরাসুব। বিশ্বপাপ মার্জনা করো। আজ যে রক্তস্রোত প্রবাহিত হয়েছে সে যেন ব্যর্থ না হয়। রক্তের বন্যায় যেন পুঞ্জীভূত পাপ ভাসিয়ে নিয়ে যায়। যখনই পৃথিবীর পাপ স্তূপাকার হয়ে উঠে তখনই তো তাঁর মার্জনার দিন আসে। আজ সমস্ত পৃথিবী জুড়ে যে দহনযজ্ঞ হচ্ছে তার রুদ্র আলোকে এই প্রার্থনা সত্য হোক: বিশ্বানি দুরিতানি পরাসুব। আমাদের প্রত্যেকের জীবনের মধ্যে আজ এই প্রার্থনা সত্য হয়ে উঠুক।

আমরা প্রতিদিন সংবাদপত্রে টেলিগ্রাফে যে একটু-আধটু খবর পাই তার পশ্চাতে কী অসহ্য সব দুঃখ রয়েছে আমরা কি তা চিন্তা করে দেখি। যে হানাহানি হচ্ছে তার সমস্ত বেদনা কোন্‌খানে গিয়ে লাগছে। ভেবে দেখো কত পিতামাতা তাদের একমাত্র ধনকে হারাচ্ছে, কত স্ত্রী স্বামীকে হারাচ্ছে, কত ভাই ভাইকে হারাচ্ছে। এই-জন্যই তো পাপের আঘাত এত নিষ্ঠুর; কারণ, যেখানে বেদনাবোধ সব চেয়ে বেশি, যেখানে প্রীতি সব চেয়ে গভীর, পাপের আঘাত সেইখানেই যে গিয়ে বাজে। যার হৃদয় কঠিন সে তো বেদনা অনুভব করে না। কারণ, সে যদি বেদনা পেত তবে পাপ এমন নিদারুণ হতেই পারত না। যার হৃদয় কোমল, যার প্রেম গভীর, তাকেই সমস্ত

বেদনা বইতে হবে। এইজন্য যুদ্ধক্ষেত্রে বীরের রক্তপাত কঠিন নয়, রাজনৈতিকদের দুশ্চিন্তা কঠিন নয়; কিন্তু ঘরের কোণে যে রমণী অশ্রুবিসর্জন করছে তারই আঘাত সব চেয়ে কঠিন।

সেইজন্য এক-একসময় মন এই কথা জিজ্ঞাসা করে: যেখানে পাপ সেখানে কেন শাস্তি হয় না। সমস্ত বিশ্বে কেন পাপের বেদনা কম্পিত হয়ে ওঠে। কিন্তু এই কথা জেনো যে, মানুষের মধ্যে কোনো বিচ্ছেদ নেই, সমস্ত মানুষ যে এক। সেইজন্য পিতার পাপ পুত্রকে বহন করতে হয়, বন্ধুর পাপের জন্য বন্ধুকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়, প্রবলের উৎপীড়ন দুর্বলকে সহ্য করতে হয়। মানুষের সমাজে একজনের পাপের ফলভোগ সকলকেই ভাগ করে নিতে হয়; কারণ, অতীতে ভবিষ্যতে দূরে দূরান্তে হৃদয়ে হৃদয়ে মানুষ যে পরস্পরে গাঁথা হয়ে আছে।

মানুষের এই ঐক্যবোধের মধ্যে যে গৌরব আছে তাকে ভুললে চলবে না। এইজন্যই আমাদের সকলকে দুঃখভোগ করবার জন্য প্রস্তুত হতে হবে। তা না হলে প্রায়শ্চিত্ত হয় না; সমস্ত মানুষের পাপের প্রায়শ্চিত্ত সকলকেই করতে হবে। যে হৃদয় প্রীতিতে কোমল দুঃখের আগুন তাকেই আগে দগ্ধ করবে। তার চক্ষে নিদ্রা থাকবে না। সে চেয়ে দেখবে দুর্যোগের রাত্রে দূর দিগন্তে মশাল জ্বলে উঠছে, বেদনায় মেদিনী কম্পিত করে রুদ্র আসছেন; সেই বেদনার আঘাতে তার হৃদয়ের সমস্ত নাড়ী ছিন্ন হয়ে যাবে। যার চিত্ততন্ত্রীতে আঘাত করলে সব চেয়ে বেশি বাজে পৃথিবীর সমস্ত বেদনা তাকেই সব চেয়ে বেশি করে বাজবে।

তাই বলছি যে, সমস্ত মানুষের সুখদুঃখকে এক করে যে-একটি পরম বেদনা পরম প্রেম আছেন তিনি যদি শূন্য কথার কথা মাত্র হতেন তবে বেদনার এই গতি কখনোই এমন বেগবান হতে পারত না। ধনী-দরিদ্র জ্ঞানী-অজ্ঞানী সকলকে নিয়ে সেই এক পরম প্রেম চিরজাগ্রত আছেন বলেই এক জায়গার বেদনা সকল জায়গায় কেঁপে উঠছে। এই কথাটি আজ বিশেষভাবে অনুভব করো।

তাই এ কথা আজ বলবার কথা নয় যে 'অন্যের কর্মের ফল আমি কেন ভোগ করব'। 'হাঁ, আমিই ভোগ করব, আমি নিজে একাকী ভোগ করব' এই কথা বলে প্রস্তুত হও। নিজের জীবনকে শুচি করো, তপস্যা করো, দুঃখকে গ্রহণ করো। তোমাকে যে নিজের পাপের সঙ্গে ভীষণ যুদ্ধ করতে হবে, নিজের রক্তপাত করতে হবে, দুঃখে দগ্ধ হয়ে হয়তো মরতে হবে। কারণ, তোমার নিজের জীবনকে যদি পরিপূর্ণরূপে উৎসর্গ না কর তবে পৃথিবীর জীবনের ধারা নির্মল থাকবে কেমন করে, প্রাণবান হয়ে উঠবে কেমন করে। ওরে তপস্বী, তপস্যায় প্রবৃত্ত হতে হবে: সমস্ত জীবনকে আহুতি দিতে হবে, তবেই

'যদ্‌ভদ্রং তৎ' যা ভদ্র তাই আসবে। ওরে তপস্বী, দুঃসহ দুর্ভর দুঃখভারে তোমার হৃদয় একেবারে নত হয়ে যাক, তাঁর চরণে গিয়ে পৌঁছোক! নমস্তেঽস্তু। বলো, পিতা, তুমি যে আছ সে কথা এমনি আঘাতের মধ্য দিয়ে প্রচার করো। তোমার প্রেম নিষ্ঠুর, সেই নিষ্ঠুর প্রেম তোমার জাগ্রত হয়ে সব অপরাধ লন করুক। পিতা নো বোধি। আজই তো সেই উদ্‌বোধনের দিন। আজ পৃথিবীর প্রলয়দাহের রুদ্র আলোকে, পিতা, তুমি দাঁড়িয়ে আছ। প্রলয়হাহাকারের ঊর্ধ্বে স্তূপাকার পাপকে দগ্ধ করে সেই দহনদীপ্তিতে তুমি প্রকাশ পাচ্ছ, তুমি জেগে রয়েছ। তুমি আজ ঘুমোতে দেবে না; তুমি আঘাত করছ প্রত্যেকের জীবনে কঠিন আঘাত। যেখানে প্রেম আছে জাগুক, যেখানে কল্যাণের বোধ আছে জাগুক; সকলে আজ তোমার বোধে উদ্‌বোধিত হয়ে উঠুক। এই এক প্রচণ্ড আঘাতের দ্বারা তুমি সকল আঘাতকে নিরস্ত করো। সমস্ত বিশ্বের পাপ হৃদয়ে হৃদয়ে ঘরে ঘরে দেশে দেশে পুঞ্জীভূত; তুমি আজ সেই পাপ মার্জনা করো। দুঃখের দ্বারা মার্জনা করো, রক্তস্রোতের দ্বারা মার্জনা করো, অগ্নিবৃষ্টির দ্বারা মার্জনা করো।

এই প্রার্থনা, সমস্ত মানবচিত্তের এই প্রার্থনা, আজ আমাদের প্রত্যেকের হৃদয়ে জাগ্রত হোক: বিশ্বানি দুরিতানি পরাসুব। বিশ্বপাপ মার্জনা করো। এই প্রার্থনাকে সত্য করতে হবে; শুচি হতে হবে, সমস্ত হৃদয়কে মার্জনা করতে হবে। আজ সেই তপস্যার আসনে পূজার আসনে উপবিষ্ট হও। যে পিতা সমস্ত মানবসন্তানের দুঃখ গ্রহণ করছেন, যাঁর বেদনার অন্ত নেই, প্রেমের অন্ত নেই, যাঁর প্রেমের বেদনা উদ্‌বেল হয়ে উঠেছে, তাঁর সম্মুখে উপবিষ্ট হয়ে সেই তাঁর প্রেমের বেদনাকে আমরা সকলে মিলে গ্রহণ করি। ৯ ভাদ্র ১৩২১

আশ্বিন-কার্তিক ১৩২১

সৃষ্টির ক্রিয়া

অবকাশের পর আবার আমরা শান্তিনিকেতনে ফিরে এসেছি। আর-একবার আমাদের চিন্তা করবার সময় হয়েছে। এখানকার সত্য আহ্বানকে অন্তরের মধ্যে সুস্পষ্ট করে উপলব্ধি করবার জন্য এবং মনের মধ্যে যেখানে গ্রন্থি রয়েছে, দীনতা রয়েছে, তাকে মোচন করবার জন্য আবার আমাদের ভালো করে প্রস্তুত হতে হবে।

এই শান্তিনিকেতনে যেখানে আমরা সকলে আশ্রয় লাভ করেছি এবং সম্মিলিত হয়েছি, এখানে এই সম্মিলনের ব্যাপারকে কোনো-একটা আকস্মিক ঘটনা বলে মনে

করতে পারি নে। বিশ্বের মধ্যে আমাদের জীবনের অন্যান্য যে-সকল সম্ভাবনা ছিল তাদের এড়িয়ে এই এখানে যে আমরা আশ্রয় পেয়েছি এর মধ্যে একটা গভীর অভিপ্রায় রয়েছে। এখানে একটি সৃষ্টি হচ্ছে ; এখানে যারা এসেছে তারা কিছু দিচ্ছে, কিছু নিয়ে যাচ্ছে, এমনি করে ক্রমশ এখানে একটি জীবনের সঞ্চার হচ্ছে। এর মধ্যে নানা ভাঙা-গড়ার কাণ্ড চলেছে ; কেউ বা এখানে স্থায়ী, কেউ অস্থায়ী। সুতরাং এই আশ্রমকে বাহির থেকে দেখলে মনে হওয়া কিছু আশ্চর্য নয় যে, এ ভাঙাগড়া বুঝি দৈবক্রমে ঘটছে। একটা ঘর তৈরি হবার সময় কত চুন সুর্কি মাল মসলার অপব্যয় হয়, চার দিকে এলোমেলো হয়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে সেগুলো পড়ে থাকে। কিন্তু, সমস্ত ঘরটি যখন তৈরি হয়ে ওঠে তখন আদ্যোপান্ত হিসাব পাওয়া যায়। তখন কী অপব্যয় হয়েছিল তাকে কেউ গণনার মধ্যেই আনে না। তেমনি এই আশ্রমের প্রত্যেক মানুষের জীবনের ইতিহাসের হিসাব নিলে দেখা যায় যে, তাদের মধ্যে কেউ বা কিছু পাচ্ছে, কেউ বা কিছুই পায় নি। সে হিসাবে এখানকার সমগ্র সৃষ্টির চেহারা দেখা যায় না। এই-যে এখানে চারি দিক থেকে প্রাণের প্রবাহ আসছে, এ ব্যাপারটাকে আমাদের খুব সত্য ক'রে, খুব বড়ো করে অন্তরের মধ্যে দেখবার শক্তি লাভ করতে হবে। এ একটা বিশ্বের ব্যাপার। কত দিক থেকে প্রাণের ধারা এখানে আসছে এবং কত দিকে দিগন্তরে এখান থেকে পুনরায় বয়ে চলবে —একে আকস্মিক ঘটনা মনে করবার কোনো কারণ নেই।

বিশ্বের কোনো ব্যাপারকেই যে আমরা দেখতে পাই নে তার কারণ, আমরা সমস্ত মন দিয়ে দেখি নে। চোখ দিয়ে দেখতে পাই নে, কারণ এ তো চোখ দিয়ে দেখবার জিনিস নয়। একে যে চরিত্র দিয়ে দেখতে হয়। স্বভাব দিয়ে দেখতে হয়। স্বভাবের ভিতর দিয়ে দেখতে হয় বলেই স্বভাবকে বিশুদ্ধ করা দরকার হয়। আমরা এই আশ্রমে যতই উপদেশ দিই এবং যতই উপদেশ পাই-না কেন, এই আশ্রমের ভিতরে যে অমৃত-উৎসটি উঠছে তাকে দেখবার, তার কাছে যাবার শক্তি যে আমাদের সকলের রয়েছে তা নয়। সেই দেখতে পাই না বলেই উপদেশে কিছু হয় না, কথারচনা ব্যর্থ হয়। সেই আনন্দ-স্বরূপকে দেখলেই আনন্দ যে ভরে উঠবে। সেই আনন্দে যে সমস্ত ত্যাগ সহজ হয়ে যাবে, বিরোধ দূর হবে, সব নির্মল হবে, সকল বাধা কেটে যাবে। আনন্দের লক্ষণ দেখলেই চেনা যায়। যখন দেখি যে আমাদের ভিতরে দুশ্চিন্তা ও দুশ্চেষ্টা থামছে না, অন্যায় ক্ষুদ্রতা মিথ্যা কত কী আমাদের ঘিরে রয়েছে, তখন বুঝতে পারছি যে সেই আনন্দকে দেখবার শক্তি আমাদের হয় নি। তার লক্ষণ আমাদের মধ্যে ফুটছে না।

আপনাকে এবং জগৎকে সত্য করে জানবার ও দেখবার জন্যই মানুষ এই জগতে এসেছে। মানুষও যে-সমস্ত অনুষ্ঠান রচনা করেছে, তার বিদ্যালয়, তার রাজ্যসাম্রাজ্য,

নীতিধর্ম, সমস্তেরই মূল কথা এই যে, মানুষ যে যথার্থ কী সেটা মানুষকে প্রকাশ করতে হচ্ছে। মানুষের অনুষ্ঠানে মানুষই বিরাট রূপ ধরে প্রকাশ পাচ্ছে। সেইজন্য সমস্ত অনুষ্ঠানের ভিতরকার আদর্শ হচ্ছে মানুষকে মুক্তি দেওয়া। মানুষ নিজেকে যে ছোটো বলে জানছে মানুষের ধর্ম কর্ম তারই প্রতিবাদ করে তাকে বলছে: তুমি ছোটো নও, তুমি আপনার মধ্যে আপনি বদ্ধ নও, তুমি সমস্ত জগতের, তুমি বড়ো, বড়ো, বড়ো।

কিন্তু, মানুষের এই বড়ো বড়ো অনুষ্ঠানের মধ্যে মানুষের ভিতরে যে শয়তান রয়েছে সে প্রবেশ করছে। মানুষের ধর্ম তাকে ভূমার সঙ্গে বড়োর সঙ্গে যোগযুক্ত করবে, সকলকে এক করবে, এই তো তার উদ্দেশ্য। কিন্তু, সেই ধর্মের মধ্যে শয়তান প্রবেশ করে মানুষের ঐক্যকে খণ্ড খণ্ড করে দিচ্ছে; কত অন্যায়, কত অসত্য, কত সংকীর্ণতা সৃষ্টি করছে। মানুষের জাতীয়তা, ইংরেজিতে যাকে nationality বলে, ক্রমশ উদ্‌ভিন্ন হয়ে উঠেছে এইজন্য যে তার মধ্যে মানুষের সাধনা মিলিত হয়ে মানুষের এক বৃহৎরূপকে ব্যক্ত করবে, ক্ষুদ্র স্বার্থ থেকে প্রত্যেক মানুষকে মুক্ত করে বৃহৎমঙ্গলের মধ্যে সকলকে সম্মিলিত করবে। কিন্তু, সেই তপস্যা ভঙ্গ করবার জন্যে শয়তান সেই জাতীয়তাকেই অবলম্বন করে কত বিরোধ কত আঘাত কত ক্ষুদ্রতাকে দিন দিন তার মধ্যে জাগিয়ে তুলছে। মানুষের তপস্যা এক দিকে, অন্য দিকে তপস্যা ভঙ্গ করবার আয়োজন— এ দুইই পাশাপাশি রয়েছে।

শান্তিনিকেতন-আশ্রমেও সেই তপস্যা রয়েছে; ধর্ম যে কত বড়ো, বিশ্ব যে কত সত্য, মানুষ যে কত বড়ো, এই আশ্রম সে কথা নিয়তই স্মরণ করিয়ে দেবে। এইখানে আমরা মানুষের সমস্ত ভেদ জাতিভেদ ভুলব। আমাদের দেশে চারি দিকে ধর্মের নামে যে অধর্ম চলছে, মানুষকে কত ক্ষুদ্র ক'রে সংকীর্ণ ক'রে তার মানবধর্মকে নষ্ট করবার আয়োজন চলছে, আমরা এই আশ্রমেই সেই বন্ধন থেকে মুক্ত হব। এত বড়ো আমাদের কাজ। কিন্তু, আমরা একে কেউ বা স্কুলের মতো করে দেখছি। কেউ বা আপনার আপনার ছোটোখাটো চিন্তার মধ্যে বদ্ধ হয়ে রয়েছি। একে আমরা উপলব্ধি করছি নে বলে গোলমাল করতে করতে চলেছি। আপনার সত্য পরিচয় পাচ্ছি নে, এরও যথার্থ পরিচয় পাচ্ছি নে। এই আশ্রমের চারি দিকে যে একটি অনন্তত্ব রয়েছে তাকেই নষ্ট করছি। কেবলই আবর্জনা ফেলছি, আমাদের ছোটো ছোটো প্রকৃতির দুর্বলতা কত আবর্জনাকে কেবলই বর্ষণ করছে। এমনি করে এখানকার স্থান সংকীর্ণ হয়ে উঠছে। প্রত্যেকের রাগদ্বেষ-মোহমলিনতার দ্বারা এখানকার বাতাস কলুষিত হচ্ছে, আকাশ অবরুদ্ধ হচ্ছে।

আমি অধিক কথা বলতে চাই না। বাক্যের দ্বারা ক্ষণিক উত্তেজনা ও উৎসাহ

সঞ্চার করার উপর আমার কোনো বিশ্বাস নেই। আমি জানি প্রত্যেকের জীবন নিজের ভিতর থেকে নিজের শক্তিকে উপলব্ধি করতে না পারলে বক্তৃতা বা উপদেশে কোনো ফললাভ হয় না। প্রতি দিনের সাধনায় শক্তিকে জাগ্রত করে তবে আমরা মুক্তি পাব। আমি বৃথা এ আক্ষেপও রাখতে চাই না যে কিছু হচ্ছে না। শান্তভাবে গম্ভীরভাবে স্তব্ধ হয়ে আমাদের আপনার ভিতরে দেখতে হবে যে 'শান্তং শিবং অদ্বৈতং' রয়েছেন ; তিনি সত্য, তিনি আমার ভিতরে সত্য, তিনি জগতে সত্য। দেখি কোন্‌খানে বাধছে, কোন্‌খানে জগতের মধ্যে যিনি 'শান্তং শিবং অদ্বৈতং' তাঁর শান্তিতে আমি ব্যাঘাত করছি। এ প্রত্যেককে আলাদা করে নিজের ভিতরে দেখতে হবে। কারণ, প্রত্যেকের জীবনের সমস্যা স্বতন্ত্র। কার কোন্‌খানে দীনতা ও কৃপণতা তা তো আমরা জানি না। এই মন্দিরে আমাদের যেমন সম্মিলিত উপাসনা হচ্ছে তেমনি আমাদের প্রত্যেকের স্বতন্ত্র সাধনা এইখানেই জেগে উঠুক। একবার আমাদের চিত্তকে চিন্তাকে গভীর করে অন্তরের মধ্যে নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন। আমরা একবার দেখবার চেষ্টা করি এই আশ্রমের মধ্যে যে সত্যসাধনা রয়েছে সেটি কী। আর-একবার মনকে দিয়ে বলিয়ে নিই : পিতা নোঽসি। পিতা নো বোধি। এ যে কত বড়ো বোধ। সেই বোধের দ্বারা আমাদের দৃষ্টির কলুষ, আমাদের বুদ্ধির জড়তা, আমাদের চৈতন্যের সংকীর্ণতা দূর হয়ে যাক। এ তো কোনো উপদেশের দ্বারা হবার জো নেই। যেমন করে ছোটো অঙ্গার থেকে বৃহৎ অগ্নি জ্বলে উঠতে পারে তেমনি করে এই ছোটো কথাটি থেকে বোধের অগ্নি জ্বলে উঠুক ; দগ্ধ হোক সকল মলিনতা ও সংকীর্ণতা। যদি সমস্ত ইচ্ছাকে জাগ্রত করে আমরা এই সত্যকে গ্রহণ করি তবেই এই বোধ উদ্‌বোধিত হবে, যদি না করি তবে হবে না। মিথ্যার মধ্যে জড়িয়ে আছি, যদি বলি তাই নিয়েই কাটবে, কাটাও, কেউ কোনো বাধা দেবে না। সংসারে কেউ তার থেকে উদ্ধার করতে পারবে না। কোনো উপদেশ কোনো উত্তেজনায় ফল হবে না।

মানুষের কণ্ঠে নয়, এই স্তবমন্ত্রের বাণী বিশ্বের কণ্ঠে জেগে উঠুক। এই বাণী জগতে শক্তি প্রয়োগ করুক, বাতাসে শক্তি প্রয়োগ করুক, আলোকে শক্তি প্রয়োগ করুক। বাধা বিস্তর, আবরণ সুকঠিন জানি। কিন্তু এও জানি যে, মানুষের শক্তির সীমা নেই। দেশে কালে মানুষ অনন্ত, তার সেই অনন্ত মহত্ত্বকে কোনো আবরণ প্রচ্ছন্ন করে রাখতে পারে না। আমি সত্য, আমি সত্য, এই কথা জানবার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বিশ্বের সঙ্গে আমাদের যোগ হোক। জাতীয়তার আবরণ, বিশেষ ধর্মের গণ্ডি, সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা, এ-সমস্ত থেকে মুক্তিলাভ করি। সেই

মুক্তির জন্যই যে এই স্থানটি তৈরি হয়েছে আজ সেই কথা স্মরণ করি। আজ স্থির হয়ে ভাবি যে, প্রতিদিনের জীবনে কোন্‌খানে ব্যাঘাত রয়েছে। অভ্যস্ত বলেই তো সেই ব্যাঘাতকে দেখতে পাই নে। সমস্ত জীবনের সঙ্গে সে একাত্ম হয়ে গিয়েছে। যেমন বাতাসে এত ধুলো রয়েছে, অথচ দরজার ভিতর দিয়ে সূর্যরশ্মি এলে তবেই সেটা দেখা যায়, তেমনি অন্তরে যে কী দীনতা রয়েছে তা এমনি দেখা যায় না— শান্তিনিকেতনের সাধনার জ্যোতির ভিতর দিয়ে তাকে দেখে তার থেকে মুক্তিলাভের ব্রতকে গ্রহণ করি। বোধ আবির্ভূত হোক। বোধ পরিপূর্ণ হোক। কার্তিক ১৩২১

দীক্ষার দিন

আশ্রমকে যেদিন সত্য করে দেখতে হবে সেদিন আনন্দের সংগীত বেজে উঠবে, ফুলের মালা দুলবে, সূর্যের কিরণ উজ্জ্বলতর হয়ে উঠবে। কারণ, আনন্দের মধ্য দিয়েই সত্যকে দেখা সম্ভব হয়, আর-কোনো উপায়ে নয়। আমাদের একান্ত আসক্তি দিয়ে সব জিনিসকে বাইরের দিক থেকে আঁকড়ে থাকি; সেইজন্যই সেই আসক্তি থেকে ছাড়িয়ে ভিতরকার আনন্দরূপকে দেখবার এক-এক দিন আসে।

আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা মহর্ষি কোন্ দিনটিকে আশ্রমের এই সত্যরূপকে দেখবার উৎসবের দিন করেছেন? সে তাঁর দীক্ষার দিন। দীক্ষা সেই দিন যেদিন মানুষ আপনার মধ্যে যেটি বড়ো, আপনার মধ্যে যে অমর জীবন, তাকে স্বীকার করে। সংসারের ক্ষেত্রে মানুষ যে জন্মায় তাতে তার কোনো চেষ্টা নেই; সেখানকার আয়োজন তার আসবার অনেক পূর্বে থেকেই প্রস্তুত হয়ে আছে। কিন্তু, মানুষ আপনাকে আপনি অতিক্রম করে যেদিন একেবারে সূর্যের আলোর কাছে, নিখিল আকাশের কাছে, পুণ্য সমীরণের কাছে, বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের দক্ষিণ হস্তের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করে— যেদিন এই কথা বলে যে আমি অনন্তকালের অমৃতজীবনের মানুষ, আমারই মধ্যে সেই বৃহৎ সেই বিরাট সেই ভূমার প্রকাশ— সেদিন সমস্ত মানুষের উৎসবের দিন। সেইরকম একটি দীক্ষার দিন যেদিন মহর্ষি বিশ্বের মধ্যে অনন্তকে প্রণাম করেছেন, যেদিন আপনার মধ্যে অমৃতজীবনকে অনুভব করে তাকে অর্ঘ্যরূপে তাঁর কাছে নিবেদন করে দিয়েছেন, সেই দিনটি যে বাস্তবিকই উৎসবের দিন এই কথা অনুভব করে তিনি তাকে আমাদের জন্যে দান করে গিয়েছেন। মহর্ষির সেই দীক্ষাকে আশ্রয় করেই এখানে আমরা আছি। এই

আশ্রম তাঁর সেই দীক্ষাদিনটিরই বাইরের রূপ। কারণ, এখানে কর্মে দীক্ষা, শিক্ষায় দীক্ষা, শিক্ষকতায় দীক্ষা— সেই অমরজীবনের দীক্ষা। সেই পরমদীক্ষার মন্ত্রটি এই আশ্রমের মধ্যে রয়ে গেছে। প্রতিদিন সে কথা যদি ভুলে গিয়ে থাকি অন্তত আজ উৎসবের আনন্দালোকে আশ্রমের সেই অমৃতরূপকে সুস্পষ্ট উপলব্ধি করবার জন্য প্রস্তুত হও। আজ উদ্‌বোধিত হও, সত্যকে দেখো। আজ বাতাসের মধ্যে সেই দীক্ষার মন্ত্র শ্রবণ করো—

ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্‌ধনম্‌।

যে পরম ইচ্ছায় সমস্ত জগৎ বিধৃত ও চালিত, যে পরম ইচ্ছায় সূর্য চন্দ্র তারা নিয়মিত এবং আকাশের অনন্ত আরতিদীপের কোনোদিন নির্বাণ নেই, সেই পরম ইচ্ছার দ্বারা সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যে আচ্ছন্ন তা উপলব্ধি করো। সব স্পন্দিত তাঁর ইচ্ছার কম্পনে, তাঁর আনন্দের বিদ্যুতে। সেই আনন্দকে দেখো। তিনি ত্যাগ করছেন তাই ভোগ করছি। তিনি ত্যাগ করছেন তাই জীবনের উৎস দশ দিকে প্রবাহিত হচ্ছে ; আনন্দের নদী শাখায় প্রশাখায় বয়ে যাচ্ছে ; ঘরে ঘরে স্বামীস্ত্রীর পবিত্র প্রীতিতে, পিতামাতার গভীর স্নেহে, মাধুর্যধারার অবসান নেই। অজস্র ধারায় সেই জীবন, সেই আনন্দ, সেই প্রেম প্রবাহিত ; ভোগ করো, আনন্দে ভোগ করো। আকাশের নীলিমায়, কাননের শ্যামলিমায়, জ্ঞানে প্রেমে আনন্দে ভোগ করো, পরিপূর্ণরূপে ভোগ করো। মা গৃধঃ। মনের ভিতরে কোনো কলুষ কোনো লোভ না আসুক, পাপের লোভের সকল বন্ধন মুক্ত হোক। এই তাঁর দীক্ষার মন্ত্র।

এই মন্ত্র আশ্রমকে সৃষ্টি করেছে, এই মন্ত্র এই আশ্রমকে রক্ষা করেছে। এই আশ্রমের আকাশে, পুণ্য সমীরণে, নির্মল আলোকে, উদার প্রান্তরে, এই আমাদের সম্মিলিত জীবনের মধ্যে এই মন্ত্রকে দেখবার, শ্রবণ করবার, গ্রহণ করবার জন্য অদ্য এই উৎসব। চিত্ত জাগ্রত হোক, আশ্রমদেবতা প্রত্যক্ষ হোন, তিনি তাঁর মন্দিরের দ্বার উদ্‌ঘাটন করুন। এই ফুলের মতো সুকুমার তরুণজীবনগুলির উপর তাঁর স্নেহাশীর্বাদ পড়ুক ; বিকশিত হোক এরা পুণ্যে প্রেমে পবিত্রতায় ; স্মরণ করুক এই শুভদিন, গ্রহণ করুক এই মন্ত্র, এই চিরজীবনের পাথেয়। এদের সম্মুখে সমস্ত জীবনের পথ রয়েছে, অমৃত আশীর্বাদ এরা গ্রহণ করে যাত্রা করুক ; চিরজীবনের দীক্ষাকে লাভ করে এরা অগ্রসর হয়ে যাক। পথের সমস্ত বাধা বিপত্তি সংকটকে অতিক্রম করে যাবার জন্যে এই দীক্ষার মন্ত্র তাদের সহায় হোক। উদ্‌বোধিত হও, জীবনকে উদ্‌বোধিত করো। ৭ পৌষ ১৩২১

আরো

আরো চাই, আরো চাই— এই গান উৎসবের গান। আমরা সেই ভাণ্ডারে এসেছি যেখানে আরো পাব। পৃথিবী ধনে ধান্যে পরিপূর্ণ, মানুষের ঘর স্নেহে প্রেমে পরিপূর্ণ। লক্ষ্মীর কোলে মানুষ জন্মেছে। সেখানে আমাদের প্রয়োজন মিটিয়ে দিন কেটে যাচ্ছে। এক-একদিন তার বাইরে এসে 'আরো'র ভাণ্ডারের প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে মানুষের উৎসব।

একদিন মানুষ পৃথিবীতে দেবতাকে বড়ো ভয় করেছিল। কে যে প্রসন্ন হলে জীবন সুখে স্বচ্ছন্দে কাটে, কে যে অপ্রসন্ন হলে দুর্যোগ উপস্থিত হয়, তা মানুষ কোনোমতেই সেদিন ভেবে পায় নি। যে শক্তির সঙ্গে আত্মার যোগ নেই তাকে প্রসন্ন রাখবার জন্য বলির পশু নিয়ে তখন ভয়াতুর মানুষ একত্র মিলেছে। তখনকার সেই ভয়ের পূজা তো উৎসব নয়। ডাকাতের হাতে পড়লে যেমন ভীরু বলে ওঠে 'আমার যা আছে সব দিচ্ছি কিন্তু আমায় প্রাণে মেরো না' তেমনি পৃথিবীর মধ্যে অদৃশ্য শক্তিকে খুশি রাখবার জন্য সেদিন মানুষ বলেছিল : আমি তোমাকে সব দেব, তুমি আমায় সংকটে ফেলো না। কিন্তু, সে তো আনন্দের দান নয়। আনন্দের দেবতাকে উপলব্ধি করলে আর ভয় নেই। কারণ, এই আনন্দের দেবতাই যে 'আরো', এই তো সকলকে ছাড়িয়ে যায়। যা-কিছু পেয়েছি বুঝেছি তার চেয়ে তিনি আরো; যা পাই নি, হারিয়েছি, তার চেয়েও তিনি আরো। তিনি ধনের চেয়ে আরো, মানের চেয়ে আরো, আরামের চেয়ে আরো। তাই তো সেই আরো'র পূজায়, আরো'র উৎসবে মানুষ আনন্দে বলেছে : আমার ধন নাও, প্রাণ নাও, সম্মান নাও। অন্তরে এবং বাহিরে মানুষের এই-যে আরো'কে জানা এ বড়ো আরামের জানা নয়। যেদিন মানুষ জেনেছে যে সে পশু নয়, তার দেবতা পাশব নয়, সে বড়ো, তার দেবতা বড়ো, সেদিন সে যে পরম দুঃখকে স্বীকার করে নিয়েছে। সেদিন মানুষ যে বিজয়ী, মানুষ যে বীর, তাই সেই বিজয়লাভের জয়োৎসব সেদিন হবে না? পাখি যেমন অন্ধকারের প্রান্তে জ্যোতির স্পর্শমাত্রে অকারণ আনন্দে গেয়ে ওঠে তেমনি যেদিন পরম জ্যোতি তাকে স্পর্শ করেন সেদিন মানুষও গেয়ে ওঠে। সেদিন সে বলে : আমি অমৃতের পুত্র। সে বলে : বেদাহমেতং, আমি পেয়েছি। সেই পাওয়ার জোরে নিজের মধ্যে সেই অমৃতকে অনুভব করে ভয়কে সে আর ভয় করে না, মৃত্যুকে গ্রাহ্য করে না, বিপদের সামনে দাঁড়িয়ে সে বলে : আমার পথ সামনে, আমি পিছু হটব না, আমার পরাজয় নেই— রুদ্র তোমার প্রসন্নতা অন্তহীন।

একবার ভেবে দেখো দেখি, এই মুহূর্তে যখন এখানে আমরা আনন্দোৎসব করছি তখন সমুদ্রের পারে মানুষের সঙ্গে মানুষের কী নিদারুণ যুদ্ধ চলেছে! সেখানে আজ এই প্রভাতের আলোক কী দেখছে, কী প্রলয়ের বিভীষিকা! সেখানে এই বিভীষিকার উপরে দাঁড়িয়ে মানুষ তার মনুষ্যত্বকে প্রচার করছে। সেখানে ইতিহাসের ডাক এসেছে, সেই ডাক শুনে সবাই বেরিয়ে পড়েছে। কে ভুল করেছে, কে ভুল করে নি, এ যুদ্ধে কোন্ পক্ষ কী পরিমাণ দায়ী, সে কথা দূরের কথা। কিন্তু, ইতিহাসের ডাক পড়েছে; সে ডাক জার্মান শুনেছে, ইংরাজ শুনেছে, ফরাসি শুনেছে, বেলজিয়ান শুনেছে, অস্ট্রিয়ান শুনেছে, রাশিয়ান শুনেছে। ইতিহাসের ভিতর দিয়ে ইতিহাসের দেবতা তাঁর পূজা গ্রহণ করবেন; এ যুদ্ধের মধ্যে তাঁর সেই উৎসব। কোনো জাতি তার জাতীয় স্বার্থকে পুঞ্জীভূত করে তার জাতীয়তাকে সংকীর্ণ করে তুলবে তা হবে না, ইতিহাসবিধাতার এই আদেশ। মানুষ সেই জাতীয় স্বার্থদানবের পায়ে এত দিন ধরে নরবলির উদ্‌যোগ করেছে, আজ তাই সেই অপদেবতার মন্দির ভাঙবার হুকুম হয়েছে। ইতিহাসবিধাতা বলেছেন, এ জাতীয় স্বার্থদানবের মন্দিরের প্রাচীর তোমাদের সবাইকে চূর্ণ করে ধুলোয় লুটিয়ে দিতে হবে, এ নরবলি আর চলবে না। যেমনি এই হুকুম পৌঁচেছে অমনি কামানের গোলা দুই পক্ষ থেকে সেই প্রাচীরের উপর এসে পড়েছে। বীরের দল ইতিহাসবিধাতার পূজায় তাদের রক্তপদ্মের অর্ঘ্য নিয়ে চলেছে। যারা আরামে ছিল তারা আরামকে ধিক্কার দিয়ে বলে উঠেছে, প্রাণকে আঁকড়ে থাকব না, প্রাণের চেয়ে মানুষের মধ্যে আরো আরো বেশি আছে। কামানের গর্জনে মনুষ্যত্বের জয়সংগীত বেজে উঠেছে। মা কেঁদে উঠেছে, স্ত্রীপুত্র অনাথ হয়ে বক্ষে করাঘাত করছে। সেই কান্নার উপরে দাঁড়িয়ে সেখানে উৎসব হচ্ছে; বাণিজ্য ব্যবসায় চলছিল, ঘরে টাকা বোঝাই হচ্ছিল, রাজ্যসাম্রাজ্য জুড়ে প্রতাপ ব্যাপ্ত হয়ে পড়ছিল— ডাক পড়ল বেরিয়ে আসতে হবে। মহেশ্বর যখন তাঁর পিণাকে রুদ্র নিশ্বাস ভরেছেন তখন মাকে কেঁদে বলতে হয়েছে 'যাও'। স্ত্রীকে কেঁদে নিজের হাতে স্বামীকে বর্ম পরিয়ে দিতে হয়েছে। সমুদ্রপারে আজ মরণযজ্ঞে সেই প্রাণের মহোৎসব।

সেই উৎসবের ধ্বনি আমাদের উৎসবের মধ্যে কি আজ এসে পৌঁছোয় নি। ভীত মানুষ, আরামের জন্য লালায়িত মানুষ, যে প্রতিদিন তুচ্ছ স্বার্থটুকু নিয়ে কাড়াকাড়ি মারামারি করে মরেছে, কে তার কানে এই মন্ত্র দিলে 'সব ফেলে দাও— বেরিয়ে এসো'! যাঁর হাতে আরো'র ভাণ্ডার তিনিই বললেন, যাও মৃত্যুকে অবহেলা করে বেরোও দেখি! বিরাট বীর মানুষের সেই পরিচয়, যে মানুষ আরো'র অমৃত-পানে উন্মত্ত হয়েছে সেই মানুষের পরিচয়, আজ কি আমরা পাব না। আমরা কি এ দেশে অজ্ঞানদেবতা

উপদেবতার মন্দির তৈরি করে যোড়শোপচারে তার পূজা করি নি। তার কাছে মানুষের বুদ্ধিকে শক্তিকে বলি দিই নি? যে অজ্ঞানমোহে মানুষ মানুষকে ঘৃণা করে দূরে পরিহার করে সেই মোহের মন্দির, সেই মূঢ়তার মন্দির কি আমাদের ভাঙতে হবে না। আমাদের সামনে সেই লড়াই নেই ? আমাদের মার খেতে হবে আত্মীয়স্বজনের। আমরা দুঃখকে স্বীকার করব, আমরা অপমান নিন্দা বিদ্রূপের আঘাত পাব, তাতে আমরা ভয় করব না।

আমাদের শান্তিনিকেতনে ইতিহাসবিধাতা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন, কোন্ অমৃতমন্ত্রে সেই শক্তিকে আমরা পাব। ঈশাবাস্যমিদং সর্বং। ভয় নেই ; সমস্তই পরিপূর্ণতার দ্বারা আবৃত। মৃত্যুর উপরে সেই অমৃত। ঈশের দ্বারা আচ্ছন্ন করে দেখো —সর্বত্র সেই আনন্দলোক উদ্‌ঘাটিত হবে, ভয় চলে যাবে। দূর করো সব জালজঞ্জাল, বেরিয়ে এসো।

ভোগসুখ মোহকলুষ আমাদের পায়ে পায়ে জড়িয়ে ধরেছে, নির্ভয়ে সব ফেলে দিয়ে বীরত্বের অভিষেকস্নানে শুচি হয়ে বেরিয়ে এসো। আজ জগৎ জুড়ে যে ক্রন্দন বেজেছে তার মধ্যে ভয়ের সুর নেই ; তার ভিতর দিয়ে ইতিহাস তৈরি হচ্ছে, তারই মধ্যে ইতিহাসবিধাতার আনন্দ। সে ক্রন্দন তাঁর মধ্যে শান্ত। সেই শান্তং শিবং অদ্বৈতমের মধ্যে মৃত্যু মরেছে। তিনি নিজের হাতে মানুষের ললাটে জয়তিলক পরিয়েছেন। তিনি বিচ্ছেদবিরোধের মাঝখানে দাঁড়িয়েছেন। যাত্রীরা যেখানে যাত্রা করেছে, মৃত্যুর ঝংকার যেখানে প্রতিধ্বনিত, সেইখানে দেখো সেই শান্তং শিবং অদ্বৈতং। আজ সেই রুদ্রের দক্ষিণ হস্তের আশীর্বাদ গ্রহণ করো। রুদ্রের প্রসন্ন হাসি তখনই দেখা যায় যখন তিনি দেখতে পান যে তাঁর বীর সন্তানেরা দুঃখকে অগ্রাহ্য করেছে। তখনই তাঁর সেই প্রসন্ন মুখের হাস্যচ্ছটা বিকীর্ণ হয়ে সত্যজ্যোতিতে অভিষিক্ত করে দেয়। রুদ্রের সেই প্রসন্নতা আজ উৎসবের দিনে আমাদের জীবনের উপরে বিকীর্ণ হোক। ৭ পৌষ প্রাতে, ১৩২১

মাঘ ১৩২১

আবির্ভাব

তুমি যে এসেছ মোর ভবনে
রব উঠেছে ভুবনে।

আশ্চর্য কথা এই যে আমরা এই গানে বলছি যে, তুমি আমার ভবনে অতিথি হয়ে এসেছ। এই একটি কথা বলবার অধিকার তিনি আমাদের দিয়েছেন। যিনি বিশ্বভুবনের সব জায়গা জুড়ে বসে আছেন, তাঁকেই আমরা বলছি, তুমি আমার ভবনে

অতিথি। কারণ, আমার ভবনে তাঁকে ডাকবার এবং না ডাকবার অধিকার তিনিই আমাকে দিয়েছেন। তাই সেই সর্বব্যাপী ঈশ্বরকে ইচ্ছা করলে ভবনের দ্বারে দাঁড় করিয়ে রাখতে পারি।

জীবনে কত অল্প দিন আমরা সেই বন্ধুকে ঘরে ডেকে আনি। তাঁকে আমার ভবনে ডাকব এমন দিন তো আসে না। তিনি এই ঘরের প্রান্তেই মুখ আবৃত করে বসে থাকেন; অপেক্ষা করেন, দেখি আমায় ডাক দেয় কি না! তিনি আমার ঘরের সামান্য আসবাবটি পর্যন্ত প্রকাশ করছেন, তিনি সর্বঘরে সর্ববিষয়ের মধ্যে প্রকাশ পাচ্ছেন, অথচ তিনিই ঘরে নেই। প্রত্যেক নিশ্বাসের ওঠানামায় তাঁর শক্তি কাজ করছে, চক্ষের প্রত্যেক পলক তাঁর ইচ্ছায় পড়ছে, রক্তের প্রত্যেক কণা নিরন্তর ধাবিত হচ্ছে, অথচ আমাদের এতবড়ো আস্পর্ধা তিনি দিলেন যে, আমরা না ডাকলে তিনি ঘরে প্রবেশ করবেন না।

সেইজন্যে যেদিন তিনি আসেন সমস্ত হৃদয় খুলে দিয়ে সেদিন প্রেমের ডাকে তাঁকে ডাকি, সেদিন বিশ্বভুবনে রব ওঠে: তিনি এসেছেন। সূর্যের তরুণ আলোকে সেই বাণী প্রকাশ হয়, নক্ষত্র হতে নক্ষত্রে সেই বার্তা ধাবিত হয়, বিকশিত পুষ্পের পাপড়িতে পাপড়িতে লেখা থাকে: তিনি এসেছেন। তিনি অপেক্ষা করে ছিলেন আলোকের পর্দার ও পারে, জীবনের সুখদুঃখের ও দিকে; ডাক যেই পড়ল অমনি যিনি অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সূর্যচন্দ্রতারার জ্যোতির্ময় সিংহাসনে বসে ছিলেন তিনি একটি কীটের গহ্বরের মতো ক্ষুদ্র ঘরে স্থান পেলেন। অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তাঁর স্থান ছিল, স্থান ছিল না এই ছোটো ঘরটিতে। এই ঘরটি ধনজনমানে ভর্তি ছিল, তাই তাঁর জন্য এখানে জায়গা হয় নি। কিন্তু, যেদিন এলেন সেদিন তড়িৎবেগে সমস্ত বিশ্বে এই বার্তা গোপনে গোপনে প্রচারিত হয়ে গেল: তিনি এসেছেন। ফুলের সৌন্দর্যে, আকাশের নীলিমায় এই বার্তা ব্যাপ্ত হয়ে গেল।

পুত্র কখনো কখনো পিতার জন্মোৎসব করে থাকে, সংসারে এমন ঘটনা ঘটে। সেদিন পুত্র মনে ভাবে যে তার পিতা একদিন শিশু হয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সেদিন যেন তার ঘরে সে নূতন করে তার পিতার জন্মব্যাপারকে অনুভব করে। পিতাকে সে যেন নিজের পুত্রের মতো লাভ করে। এ যেমন আশ্চর্য তেমনি আশ্চর্য বিশ্বপিতা যেদিন জন্মগ্রহণ করেন আমাদের ঘরে। যিনি অনন্ত ভুবনের পিতা তিনি একদিন আমার অন্তরের ভিতরে চৈতন্যের মধ্যে জন্মলাভ করবেন; তিনি আসবেন। পিতা নোহসি। পিতা তুমি পিতা হয়ে আছ, আমার জীবনকে তোমার মহাজীবনে আলিঙ্গন করে আছ, যুগ হতে যুগে লোক হতে লোকান্তরে আমায় বহন করে এনেছ। পিতা নো

বোধি। কিন্তু, আমার বোধের মধ্যে তো তোমার আবির্ভাব হয় নি। সেই বোধের অপেক্ষায়, আমার উদ্‌বোধনের অপেক্ষায় যে তাঁকে থাকতে হয়। যেদিন আমার বোধের মধ্যে পিতারূপে তাঁর আবির্ভাব হবে সেদিন পৃথিবীতে শঙ্খধ্বনি বেজে উঠবে। ভক্তের চৈতন্যে সেদিন যে তাঁর নবজন্মলাভ।

সংসারের সুখে দুঃখে যখন তরঙ্গায়িত হচ্ছি চৈতন্যের মধ্যে তখন আমরা পিতৃহারা। জীবধাত্রী বসুন্ধরা পিতার সিংহাসন বহন করছে; প্রাণের ভাণ্ডার, অন্নের ভাণ্ডার সেখানে পরিপূর্ণ। কিন্তু, অন্তরে যে দুর্ভিক্ষ, সেখানে যে পিতা নেই। সে বড়ো দৈন্য, সে পরম দারিদ্র্য। যিনি রয়েছেন সর্বত্রই, তাঁকে আমি পাই না। পাই না, কারণ ভক্তি নেই। যুক্তি খুঁজে পাওয়া সহজ, কিন্তু ভক্তি খুঁজে পাওয়া যায় না। আনন্দ সহজ না হলে পাওয়া যায় না। উপনিষদে বলে, মন বাক্য তাঁকে না পেয়ে ফিরে ফিরে আসে, কিন্তু তাঁর আনন্দ যে পেয়েছে তার আর ভয় নেই। তাঁকে দেখা উৎসবের মধ্যে দেখা; জ্ঞানে নয়, তর্কের মধ্যে নয়। আনন্দের ভিতর দিয়ে ছাড়া কিছুই পাবার উপায় নেই।

এই-যে উৎসবের আলোক জ্বলছে একে কি তর্ক করে কোনোমতেই পাওয়া যেত। চোখের মধ্যে আলো পাবার আনন্দ আছে, তাই তো চোখ আলো পায়; চোখ যে আলোর জন্য লালায়িত। এক সময়ে জীবের তো চক্ষু ছিল না; চক্ষু কেমন করে ক্রমে জীবের অভিব্যক্তিতে ফুটল? জীবের মধ্যে আলোককে পাবার তৃষ্ণা ছিল, দেহীর দেহের পর্দার আড়ালে বিরহীর মতো সেই তৃষ্ণা জেগে ছিল; তার সেই দীর্ঘ বিরহের তপস্যা সহসা একদিন চক্ষুবাতায়নের ভিতরে সার্থক হল। আলোকের আনন্দদূত তার চোখের বাতায়নে এল। আলোককে পাবার আনন্দের জন্য তপস্যা ছিল; সেই তপস্যা অন্ধ জীবের অন্ধকার দেহের মধ্যে চক্ষুকে বিকশিত করে স্বর্গের আলোকের সঙ্গে যুক্ত করে দিয়েছে। সেই একই সাধনা অন্ধ চৈতন্যের মধ্যে রয়েছে; আত্মা কাঁদছে সেখানে। যতদিন পর্যন্ত অন্ধ জীব চক্ষু পায় নি সে জানত না তার ভিতরে আলোকবিরহী কাঁদছিল; সে না জানলেও সেই কান্না ছিল বলেই চোখ খুলেছে। অন্তরের মধ্যে চৈতন্যগুহায় অন্ধকারে পরমজ্যোতির জন্য মানুষের তপস্যা চলেছে। এ কথা কখনোই সত্য নয় যে কোনো মানুষের আত্মা ধনজনের জন্য লালায়িত। মগ্নচৈতন্যের অন্ধকারময় রুদ্ধ বাতায়নে বিরহী আত্মা কাঁদছে; সেই কান্না সমস্ত কোলাহলের আবরণ ভেদ করে নক্ষত্রলোক পর্যন্ত উঠেছে। আনন্দ যেদিন আসবে সেদিন চোখ মেলে দেখব সেই জ্যোতির্ময়কে। সেদিন তিনি আমার ভবনে আসবেন এবং বিশ্বভুবনে তার সাড়া পড়ে যাবে। ৭ পৌষ ১৩২১

মাঘ ১৩২১

অন্তরতর শান্তি

তুমি যে   চেয়ে আছ আকাশ ভরে,
নিশিদিন   অনিমেষে দেখছ মোরে!

তিনি যে চেয়ে রয়েছেন আমার মুখের দিকে, আমার অন্তরের মাঝখানে, এ কি উপলব্ধি করব এইখানে। এ-সব কথা কি এই কোলাহলে বলবার কথা। তারার আলোকে, স্নিগ্ধ অন্ধকারে, ভক্তের অন্তরের নিস্তব্ধলোকে, যখন অনন্ত আকাশ থেকে একটি অনিমেষ নেত্রের দৃষ্টি পড়ে তখন সেই নিঃশব্দ বিরলতার মধ্যেই এই পরম আনন্দের গভীর বাণী জেগে উঠতে পারে— এই কথাই মনে হয়। কিন্তু তা নয়, সেই বিরলতার মধ্যেই যে সাধকের উৎসব সম্পূর্ণ হয় তা কখনোই সত্য নয়। মানুষের এই কোলাহলময় হাটে যেখানে কেনাবেচার বিচিত্র লীলা চলেছে, এরই মধ্যে, এই মুখর কোলাহলের মধ্যেই, তাঁর পূজার গীত উঠছে— এর থেকে দূরে সরে গিয়ে কখনোই তাঁর উৎসব নয়। আকাশের তারায় তারায় যে সংগীত উঠছে যুগ যুগান্তর ধরে সে সংগীতের কেবলই পুনরাবৃত্তি চলছে। সেখানে কোনো কোলাহল নেই, ভিড় নেই, ঠেলাঠেলি নেই; নক্ষত্রলোকে যেন বিশ্বরূপ বাউল তার একতারার একটি সুর ফিরে ফিরে বাজাচ্ছে। কিন্তু মানুষের জগতে যে গান উঠছে সে কি একটি-তারের সংগীত। কত যুদ্ধবিগ্রহ বিরোধ-সংগ্রামের কত বিচিত্র তার সেখানে ঝংকৃত হচ্ছে, তার বৈচিত্র্যের সীমা নেই। কিন্তু এই-সমস্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে, বিরোধের মধ্যে, শান্তির সুর বাজছে। মানুষের চারি দিকে ষড়্‌রিপুর হানাহানি, তাণ্ডবলীলা চলেছে; কিন্তু এত বেসুর এসে কই এই একটি সুরকে তো লুপ্ত করতে পারলে না! সকল বিরোধ, সকল বিপ্লব, সকল যুদ্ধবিগ্রহের ভিতর দিয়ে এই সুর বেজে উঠল : শান্তং শিবং অদ্বৈতং।

মানুষের ইতিহাসে এই-যে উৎসব চলছে তারই কি একটি প্রতিরূপ আজকের এই মেলার মধ্যে দেখতে পাচ্ছি না। এখানে কেউ বাজার করছে, কেউ খেলা করছে, কেউ যাত্রা শুনছে, কিন্তু নিষেধ তো করা হয় নি, বলা হয় নি 'এখানে উপাসনা হচ্ছে— তোমরা সাধু হয়ে চুপ করে বসে থাকো'। সমস্ত পৃথিবী জুড়ে মানুষের জগতে যে-একটা প্রচণ্ড কোলাহল চলছে শান্তিনিকেতনের নিভৃত শান্তিকে তা আবিল করুক। মানুষই কোলাহল করে, আর তো কেউ করে না। কিন্তু মানুষের কোলাহল আজ পর্যন্ত কি মানুষের সংগীতকে থামাতে পারল। ঈশ্বর যে খনির ভিতর থেকে রত্নকে উদ্ধার করতে চান, তিনি যে বিরোধের এই কোলাহলের মধ্য থেকেই তাঁর পূজাকে

উদ্ধার করবেন। কারণ, এই কোলাহলের জীব মানুষ যখন শান্তিকে পায় তখন সেই গভীরতম শান্তির তুলনা কোথায়। সে শান্তি জনহীন সমুদ্রে নেই, মরুভূমির স্তব্ধতায় নেই, পর্বতের দুর্গম শিখরে নেই। আত্মার মধ্যে সেই গভীর শান্তি। চারি দিকের কোলাহল তাকে আক্রমণ করতে গিয়ে পরাস্ত হয়; কোলাহলের ভিতরে নিবিড়রূপে সুরক্ষিত সেই শান্তি। হাট বসে গিয়েছে, বেচা-কেনার রব উঠেছে; তারই মধ্যে প্রত্যেক মানুষ তার আপনার আত্মার ভিতরে একটি যোগাসনকে বহন করছে। হে যোগী, জাগো। তোমার যোগাসন প্রস্তুত, তোমার আসন তুমি গ্রহণ করো; এই কোলাহলে, ষড়্‌রিপুর ক্ষোভ-বিক্ষোভ-বিরোধের মাঝখানে অক্ষতশান্তি, সেইখানে বোসো। সেখানে তোমার উৎসবপ্রদীপ জ্বালো, কোনো অশান্ত বাতাস তাকে নেবাতে পারবে না। তুমি কোলাহল দেখে ভীত হোয়ো না; ফলের গর্ভে শস্য যেমন তিক্ত আবরণের ভিতরে থেকে রক্ষা পায়; সেইরূপ কোলাহলের দ্বারাই বেষ্টিত হয়ে চিরকাল মানুষের শান্তি রক্ষা পেয়ে এসেছে। মানুষ তার বৈষয়িকতার বুকের উপর তার ইষ্টদেবতাকে সর্বত্রই তো প্রতিষ্ঠিত করেছে। যেখানে তার আসক্তি জীবনের সব সূত্রগুলিকে জড়িয়ে রেখেছে তারই মাঝখানে তার মন্দিরের চূড়া দেবলোকের দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

আমাদের চিত্ত আজ অনুকূল হয় নি, ক্ষতি নেই। যাক যার মন যেখানে খুশি যাক, কোনো নিষেধ নেই। তবু এই অসীম স্বাধীনতার ভিতরে মানুষের পূজার ক্ষেত্র সাবধানে রক্ষিত হয়ে এসেছে। সেই কথাটি আজ উপলব্ধি করবার জন্য কোলাহলের মধ্যে এসেছি। যার ভক্তি আছে, যার ভক্তি নেই, বিষয়ী ব্যবসায়ী পাপী, সকলেরই মধ্যে তাঁর পূজা হচ্ছে। এইখানেই এই মেলার মধ্যেই তাঁর পূজা হয়েছে, এই কোলাহলের মধ্যেই তাঁর স্তব উঠেছে। এইখানেই সেই শান্তং শিবং অদ্বৈতমের পদধ্বনি শুনছি; এই হাটের রাস্তায় তাঁর পদচিহ্ন পড়েছে। মানুষের এই আনাগোনার হাটেই তাঁর আনাগোনা; তিনি এইখানেই দেখা দিচ্ছেন। ৭ পৌষ রাত্রি, ১৩২১

মাঘ ১৩২১

গ্রন্থপরিচয়

রচনাবলীর বর্তমান খণ্ডে মুদ্রিত গ্রন্থগুলির প্রথম প্রকাশের তারিখ ও গ্রন্থ-সংক্রান্ত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য গ্রন্থপরিচয়ে সংকলিত হইল। এই খণ্ডে মুদ্রিত কোনো কোনো রচনা সম্বন্ধে কবির নিজের মন্তব্যও উদ্ধৃত হইল।

পুনশ্চ

পুনশ্চ ১৩৩৯ সালের আশ্বিন মাসে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। ১৩৪০ সালের ফাল্গুন মাসে প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণে, পরিশেষ গ্রন্থ হইতে খেলনার মুক্তি, পত্রলেখা, খ্যাতি, বাঁশি, উন্নতি, ভীরু এবং নূতন-লিখিত তীর্থযাত্রী, চিরজপের বাণী, শুচি, রঙরেজিনী, মুক্তি, প্রেমের সোনা ও স্নানসমাপন এই তেরোটি কবিতা সংযোজিত হয়। রবীন্দ্র-রচনাবলীর এই খণ্ডে উক্ত দ্বিতীয় সংস্করণই পুনর্মুদ্রিত হইল।

শ্রীযুক্ত ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে লিখিত একটি পত্রে রবীন্দ্রনাথ পুনশ্চ কাব্যের রচনারীতি সম্বন্ধে যে আলোচনা করেন নিম্নে তাহা মুদ্রিত হইল—

গানের আলাপের সঙ্গে পুনশ্চ কাব্যগ্রন্থের গদ্যিকারীতির যে তুলনা করেছ সেটা মন্দ হয় নি। কেননা, আলাপের মধ্যে তালটা বাঁধনছাড়া হয়েও আত্মবিস্মৃত হয় না। অর্থাৎ, বাইরে থাকে না মৃদঙ্গের বোল, কিন্তু নিজের অঙ্গের মধ্যেই থাকে চলবার একটা ওজন।

কিন্তু সংগীতের সঙ্গে কাব্যের একটা জায়গায় মিল নেই। সংগীতের সমস্তটাই অনির্বচনীয়। কাব্যে বচনীয়তা আছে সে কথা বলা বাহুল্য। অনির্বচনীয়তা সেইটেকেই বেষ্টন করে হিল্লোলিত হতে থাকে, পৃথিবীর চার দিকে বায়ুমণ্ডলের মতো। এ-পর্যন্ত বচনের সঙ্গে অনির্বচনের, বিষয়ের সঙ্গে রসের গাঁঠ বেঁধে দিয়েছে ছন্দ। পরস্পরকে বলিয়ে নিয়েছে 'যদেতৎ হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব'। বাক্ এবং অবাক্ বাঁধা পড়েছে ছন্দের মাল্যবন্ধনে। এই বাক্ এবং অবাকের একান্ত মিলনেই কাব্য। বিবাহিত জীবনে যেমন কাব্যেও তেমনি মাঝে মাঝে বিরোধ বাধে, উভয়ের মাঝখানে ফাঁক পড়ে যায়, ছন্দও তখন জোড় মেলাতে পারে না। সেটাকেই বলি আক্ষেপের বিষয়। বাসরঘরে এক শয্যায় দুই পক্ষ দুই দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকার মতোই সেটা শোচনীয়। তার চেয়ে আরো শোচনীয় যখন 'এক

কষ্টে না খেয়ে বাপের বাড়ি যান'। যথাপরিমিত খাদ্যবস্তুর প্রয়োজন আছে এ কথা অজীর্ণরোগীকেও স্বীকার করতে হয়। কোনো কোনো কাব্যে বাগ্‌দেবী স্থূলখাদ্যাভাবে ছায়ার মতো হয়ে পড়েন। সেটাকে আধ্যাত্মিকতার লক্ষণ বলে উল্লাস না করে আধিভৌতিকতার অভাব বলে বিমর্ষ হওয়াই উচিত।

পুনশ্চ কাব্যগ্রন্থে আধিভৌতককে সমাদর করে ভোজে বসানো হয়েছে। যেন জামাইষষ্ঠী। এ মানুষটা পুরুষ। একে সোনার ঘড়ির চেন পরালেও অলংকৃত করা হয় না। তা হোক, পাশেই আছেন কাঁকন-পরা অর্ধাবগুণ্ঠিতা মাধুরী, তিনি তাঁর শিল্পসমৃদ্ধ ব্যজনিকার আন্দোলনে এই ভোজের মধ্যে অমরাবতীর মৃদুমন্দ হাওয়ার আভাস এনে দিচ্ছেন। নিজের রচনা নিয়ে অহংকার করছি মনে করে আমাকে হঠাৎ সদুপদেশ দিতে বোসো না। আমি যে কীর্তিটা করেছি তার মূল্য নিয়ে কথা হচ্ছে না; তার যেটি আদর্শ এই চিঠিতে তারই আলোচনা চলছে। বক্ষ্যমান কাব্যে গদ্যটি মাংসপেশল পুরুষ বলেই কিছু প্রাধান্য যদি নিয়ে থাকে তবু তার কলাবতী বধূ দরজার আধখোলা অবকাশ দিয়ে উঁকি মারছে, তার সেই ছায়াবৃত কটাক্ষ-সহযোগে সমস্ত দৃশ্যটি রসিকদের উপভোগ্য হবে বলেই ভরসা করেছিলুম। এর মধ্যে ছন্দ নেই বললে অত্যুক্তি হবে, ছন্দ আছে বললেও সেটাকে বলব স্পর্ধা। তবে কী বললে ঠিক হবে ব্যাখ্যা করি। ব্যাখ্যা করব কাব্যরস দিয়েই।

বিবাহসভায় চন্দনচর্চিত বর-ক'নে টোপর মাথায় আল্পনা-আঁকা পিঁড়ির উপর বসেছে। পুরুত পড়ে চলেছে মন্ত্র, ও দিকে আকাশ থেকে আসছে শাহানা রাগিণীতে শানাইয়ের সংগীত। এমন অবস্থায় উভয়ের যে বিবাহ চলেছে সেটা নিঃসন্দিগ্ধ সুস্পষ্ট। নিশ্চিত-ছন্দ-ওয়ালা কাব্যে সেই শানাই-বাজনা সেই মন্ত্র-পড়া লেগেই আছে। তার সঙ্গে আছে লাল চেলি, বেনারসির জোড়, ফুলের মালা, ঝাড়-লন্ঠনের রোশনাই। সাধারণত যাকে কাব্য বলি সেটা হচ্ছে বচন-অনির্বচনের সদ্যোমিলনের পরিভূষিত উৎসব। অনুষ্ঠানে যা যা দরকার সযত্নে তা সংগ্রহ করা হয়েছে। কিন্তু, তার পরে? অনুষ্ঠান তো বারো মাস চলবে না। তাই বলেই তো নীরবিত শাহানা সংগীতের সঙ্গে সঙ্গেই বরবধূর মহাশূন্যে অন্তর্ধান কেউ প্রত্যাশা করে না। বিবাহ-অনুষ্ঠানটা সমাপ্ত হল, কিন্তু বিবাহটা তো রইল, যদি না কোনো মানসিক বা সামাজিক উপনিপাত ঘটে। এখন থেকে শাহানা রাগিণীটা অশ্রুত বাজবে। এমন-কি মাঝে মাঝে তার সঙ্গে বেসুরো নিখাদে অত্যন্তশ্রুত কড়া সুরও না মেশা অস্বাভাবিক, সুতরাং একেবারে না মেশা প্রার্থনীয় নয়। চেলি বেনারসিটা তোলা রইল, আবার কোনো অনুষ্ঠানের দিনে কাজে লাগবে। সপ্তপদীর বা

চতুর্দশপদীর পদক্ষেপটা প্রতিদিন মানায় না। তাই বলেই প্রাত্যহিক পদক্ষেপটা অস্থানে পড়ে বিপদজনক হবেই এমন আশঙ্কা করি নে। এমন-কি বাম দিক থেকে রুমুঝুমু মলের আওয়াজ গোলমালের মধ্যেও কানে আসে। তবু মোটের উপর বেশভূষাটা হল আটপৌরে। অনুষ্ঠানের বাঁধা রীতি থেকে ছাড়া পেয়ে একটা সুবিধে হল এই যে, উভয়ের মিলনের মধ্যে দিয়ে সংসারযাত্রার বৈচিত্র্য সহজ রূপ নিয়ে স্থূল সূক্ষ্ম নানা ভাবে দেখা দিতে লাগল। যুগলমিলন নেই, অথচ সংসারযাত্রা আছে, এমনও ঘটে। কিন্তু, সেটা লক্ষ্মীছাড়া। যেন খবুরে-কাগজি সাহিত্য। কিন্তু, যে সংসারটা প্রতিদিনের অথচ সেই প্রতিদিনকেই লক্ষ্মীশ্রী চিরদিনের করে তুলছে, যাকে চিরন্তনের পরিচয় দেবার জন্যে বিশেষ বৈঠকখানায় অলংকৃত আয়োজন করতে হয় না, তাকে কাব্যশ্রেণীতেই গণ্য করি। অথচ চেহারায় সে গদ্যের মতো হতেও পারে। তার মধ্যে বেসুর আছে, প্রতিবাদ আছে, নানাপ্রকার বিমিশ্রতা আছে, সেইজন্যেই চারিত্রশক্তি আছে। যেমন কর্ণের চারিত্রশক্তি যুধিষ্ঠিরের চেয়ে অনেক বড়ো। অথচ একরকম শিশুমতি আছে যারা ধর্মরাজের কাহিনী শুনে অশ্রুবিগলিত হয়। রামচন্দ্র নামটার উল্লেখ করলুম না, সে কেবল লোকভয়ে। কিন্তু, আমার দৃঢ় বিশ্বাস আদিকবি বাল্মীকি রামচন্দ্রকে ভূমিকাপত্তন-স্বরূপে খাড়া করেছিলেন তার অসবর্ণতায় লক্ষ্মণের চরিত্রকে উজ্জ্বল করে আঁকবার জন্যেই, এমন-কি, হনুমানের চরিত্রকেও বাদ্ দেওয়া চলবে না। কিন্তু, সেই একঘেয়ে ভূমিকাটা অত্যন্ত বেশি রঙফলানো চওড়া বলেই লোকে ওইটের দিকে তাকিয়ে হায়-হায় করে। ভবভূতি তা করেন নি। তিনি রামচন্দ্রের চরিত্রকে অশ্রদ্ধেয় করবার জন্যেই কবিজনোচিত কৌশলে উত্তররামচরিত রচনা করেছিলেন। তিনি সীতাকে দাঁড় করিয়েছেন রামভদ্রের প্রতি প্রবল গঞ্জনারূপে।

ওই দেখো, কী কথা বলতে কী কথা এসে পড়ল। আমার বক্তব্য ছিল এই, কাব্যকে বেড়াভাঙা গদ্যের ক্ষেত্রে স্ত্রীস্বাধীনতা দেওয়া যায় যদি তা হলে সাহিত্যসংসারের আলংকারিক অংশটা হাল্কা হয়ে তার বৈচিত্র্যের দিক, তার চরিত্রের দিক, অনেকটা খোলা যায়গা পায়; কাব্য জোরে পা ফেলে চলতে পারে। সেটা সযত্নে নেচে চলার চেয়ে সব সময়ে যে নিন্দনীয় তা নয়। নাচের আসরের বাইরে আছে এই উঁচুনিচু বিচিত্র বৃহৎ জগৎ, রূঢ় অথচ মনোহর; সেখানে জোরে চলাটাই মানায় ভালো, কখনো ঘাসের উপর, কখনো কাঁকরের উপর দিয়ে।

রোসো। নাচের কথাটা যখন উঠল ওটাকে সেরে নেওয়া যাক। নাচের জন্য বিশেষ সময় বিশেষ কায়দা চাই। চারি দিক বেষ্টন করে আলোটা মালাটা দিয়ে

তার চালচিত্র খাড়া না করলে মানানসই হয় না। কিন্তু, এমন মেয়ে দেখা যায় যার সহজ চলনের মধ্যেই বিনা ছন্দের ছন্দ আছে। কবিরা সেই অনায়াসের চলন দেখেই নানা উপমা খুঁজে বেড়ায়। সে মেয়ের চলনটাই কাব্য, তাতে নাচের তাল নাই বা লাগল ; তার সঙ্গে মৃদঙ্গের বোল দিতে গেলে বিপত্তি ঘটবে। তখন মৃদঙ্গকে দোষ দেব না তার চলনকে ? সেই চলন নদীর ঘাট থেকে আরম্ভ করে রান্নাঘর বাসরঘর পর্যন্ত। তার জন্যে মাল-মসলা বাছাই করে বিশেষ ঠাট বানাতে হয় না। গদ্যকাব্যেরও এই দশা। সে নাচে না, সে চলে। সে সহজে চলে ব'লেই তার গতি সর্বত্র। সেই গতিভঙ্গী আবাঁধা। ভিড়ের ছোঁওয়া বাঁচিয়ে পোশাকি-শাড়ির-প্রান্ত-তুলে-ধরা আধ-ঘোমটা-টানা সাবধান চাল তার নয়।

এই গেল আমার পুনশ্চ কাব্যগ্রন্থের কৈফিয়ত। আরো-একটা পুনশ্চ-নাচের আসরে নাট্যাচার্য হয়ে বসব না এমন পণ করি নি। কেবলমাত্র কাব্যের অধিকারকে বাড়াব মনে করেই একটা দিকের বেড়ায় গেট বসিয়েছি। এবারকার মতো আমার কাজ ওই পর্যন্ত। সময় তো বেশি নেই। এর পরে আবার কোন্ খেয়াল আসবে বলতে পারি নে। যাঁরা দৈবদুর্যোগে মনে করবেন গদ্যে কাব্যরচনা সহজ তাঁরা এই খোলা দরজাটার কাছে ভিড় করবেন সন্দেহ নেই। তা নিয়ে ফৌজদারি বাধলে আমাকে স্বদলের লোক বলে স্বপক্ষে সাক্ষী মেনে বসবেন। সেই দুর্দিনের পূর্বেই নিরুদ্দেশ হওয়া ভালো। এর পরে মদ্‌রচিত আরো একখানা কাব্যগ্রন্থ বেরবে, তার নাম বিচিত্রিতা। সেটা দেখে ভদ্রলোকে এই মনে করে আশ্বস্ত হবে যে আমি পুনশ্চ প্রকৃতিস্থ হয়েছি।···
খড়দহ, দেওয়ালি, ১৩৩৯

—পরিচয়। বৈশাখ ১৩৪০

'বাসা' (১৯ অগস্ট ১৯৩২) কবিতা রচনার দুই বৎসর পূর্বে কবি বর্লিন হইতে শ্রীমতী প্রতিমা দেবীকে একখানি চিঠি লেখেন। এই চিঠিখানি উক্ত কবিতার প্রাথমিক খসড়া বলা যাইতে পারে—

এখানকার ন্যাশন্যাল গ্যালারিতে আমার পাঁচখানা ছবি নিয়েছে, শুনেছ। তার মানে, তারা পৌঁচেছে ছবির অমরাবতীতে। ওরা দামের জন্যে ভাবছিল; টাকা নেই, কী করবে। আমি লিখে দিয়েছি যে, আমি জর্মানিকে দান করলুম, দাম চাই নে। ভারি খুশি হয়েছে। আরো অনেক জায়গা থেকে এক্‌জিবিশনের জন্যে আবেদন আসছে। একটা এসেছে স্পেন থেকে, তারা চায় নবেম্বরে। ভিয়েনা চায় ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি যে পোটো সেই নামটাই ছড়িয়ে পড়ছে কবি নামকে ছাপিয়ে। থেকে-থেকে মনে আসছে তোমার সেই স্টুডিয়োর কথাটা। ময়ূরাক্ষী নদীর ধারে,

শালবনের ছায়ায়, খোলা জানলার কাছে। বাইরে একটা তালগাছ খাড়া দাঁড়িয়ে ; তারই পাতাগুলোর কম্পমান ছায়া সঙ্গে নিয়ে রোদ্দুর এসে পড়েছে আমার দেয়ালের উপর ; জামের ডালে বসে ঘুঘু ডাকছে সমস্ত দুপুরবেলা ; নদীর ধার দিয়ে একটা ছায়াবীথি চলে গেছে ; কুড়চি ফুলে ছেয়ে গেছে গাছ ; বাতাবি নেবুর ফুলের গন্ধে বাতাস ঘন হয়ে উঠেছে ; জারুল পলাশ মাদারে চলেছে প্রতিযোগিতা ; সজনে ফুলের ঝুরি দুলছে হাওয়ায় ; অশথগাছের পাতাগুলো ঝিল্‌মিল্ ঝিল্‌মিল্ করছে— আমার জানলার কাছ পর্যন্ত উঠেছে চামেলি লতা। নদীতে নেবেছে একটি ছোটো ঘাট, লাল পাথরে বাঁধানো, তারই এক পাশে একটি চাঁপার গাছ। একটির বেশি ঘর নেই। শোবার খাট দেয়ালের গহ্বরের মধ্যে ঠেলে দেওয়া যায়। ঘরে একটিমাত্র আছে আরাম-কেদারা ; মেঝেতে ঘন লাল রঙের জাজিম পাতা ; দেয়াল বসন্তী রঙের, তাতে ঘোর কালো রেখার পাড় আঁকা। ঘরের পুব দিকে একটুখানি বারান্দা ; সূর্যোদয়ের আগেই সেইখানে চুপ করে গিয়ে বসব, আর খাবার সময় হলে লীলমনি সেইখানে খাবার এনে দেবে। একজন কেউ থাকবে যার গলা খুব মিষ্টি, যে আপন-মনে গান গাইতে ভালোবাসে। পাশের কুটিরে তার বাসা ; যখন খুশি সে গান করবে, আমার ঘরের থেকে শুনতে পাব। তার স্বামী ভালোমানুষ এবং বুদ্ধিমান ; আমার চিঠিপত্র লিখে দেয়, অবকাশকালে সাহিত্য-আলোচনা করে, এবং ঠাট্টা করলে ঠাট্টা বুঝতে পারে এবং যথোচিত হাসে। নদীর উপরে দুটি সাঁকো থাকবে, নাম দিতে পারব জোড়াসাঁকো ; সেই সাঁকোর দুই প্রান্ত বেয়ে জুঁই বেল রজনীগন্ধা রক্তকরবী। নদীর মাঝে-মাঝে গভীর জল, সেইখানে ভাসছে রাজহাঁস ; আর ঢালু নদীতটে চ'রে বেড়াচ্ছে আমার পাটল রঙের গাইগোরু তার বাছুর নিয়ে। শাক-সব্জির খেত আছে, বিঘে-দুইয়েক জমিতে ধানও কিছু হয়। খাওয়াদাওয়া নিরামিষ, ঘরে তোলা মাখন দই ছানা ক্ষীর ; কুকারে যা রাঁধা যেতে পারে তাই যথেষ্ট, রান্নাঘর নেই। থাক্ এই পর্যন্ত। বাইরের দিকে চেয়ে মনে পড়ছে আছি বর্লিনে বড়োলোক সেজে, বড়ো কথা বলতে হবে ; বড়ো খ্যাতির বোঝা বয়ে চলতে হবে দিনের পর দিন ; জগৎ-জোড়া সব সমস্যা রয়েছে তর্জনী তুলে, তার জবাব চাই। ও দিকে ভারতসাগরের তীরে অপেক্ষা করে আছে বিশ্বভারতী ; তার অনেক দাবি, অনেক দায় ; ভিক্ষা করতে হবে দেশে দেশান্তরে। অতএব থাক্ আমার স্টুডিয়ো। কতদিনই বা বাঁচব ! ইতিমধ্যে কর্তব্য করতে করতে ঘোরা যাক রেলে চ'ড়ে, মোটরে চ'ড়ে, জাহাজে চ'ড়ে, ব্যোমযানে চ'ড়ে, সভ্যভব্য হয়ে। অতএব আর সময় নেই। ইতি ১৮ অগস্ট ১৯৩০

—পত্রসংখ্যা ৩৬। চিঠিপত্র ৩

'বিশ্বশোক' কবিতাটি কবির দৌহিত্র নীতীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের মৃত্যুশোকে লিখিত বলিয়া অনুমিত। 'চিররূপের বাণী' রূপবাণী প্রেক্ষাগৃহের দ্বারোদ্‌ঘাটন উপলক্ষ্যে লিখিত। 'শাপমোচন' নৃত্যনাট্যরূপে অভিনীত হইয়া থাকে; 'শিশুতীর্থ'ও কবির আবৃত্তি-সহযোগে নৃত্যে রূপায়িত হইয়াছে।

চিরকুমার-সভা

চিরকুমার-সভা উপন্যাস আকারে ভারতী পত্রে (১৩০৭ বৈশাখ - ১৩০৮ জ্যৈষ্ঠ) ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়। পরে ইহা ১৩১১ সালে প্রকাশিত রবীন্দ্র-গ্রন্থাবলীর (হিতবাদীর উপহার) 'রঙ্গচিত্র' বিভাগের অন্তর্গত হয়, এবং 'প্রজাপতির নির্বন্ধ' নাম লইয়া ১৩১৪ সালে স্বতন্ত্র পুস্তকরূপে (গদ্যগ্রন্থাবলী ৮) প্রকাশিত হয়। 'প্রজাপতির নির্বন্ধ' রবীন্দ্র-রচনাবলীর চতুর্থ খণ্ডে 'উপন্যাস ও গল্প' বিভাগে প্রকাশিত হইয়াছে।

গ্রন্থখানির কোনো কোনো অংশ পরিবর্তন করিয়া এবং কিছু নূতন-লিখিত অংশ যোগ করিয়া রবীন্দ্রনাথ ১৩৩১ সালের চৈত্র মাসে বা ১৩৩২ সালের বৈশাখ মাসে একখানি নাটক রচনা করেন; অনেকগুলি নূতন গানও ইহাতে যোগ করেন। নাটকটি 'চিরকুমার-সভা' নামে ১৩৩২ সালের চৈত্র মাসে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। ইহাই বর্তমান খণ্ডে মুদ্রিত হইল। 'প্রজাপতির নির্বন্ধ' উপন্যাসটি আর প্রচলিত না থাকায়, 'প্রজাপতির নির্বন্ধ' হইতে বর্ণনাংশও অনেকখানি এই নাটকে সংকলিত হয়। রবীন্দ্র-রচনাবলীতে 'প্রজাপতির নির্বন্ধ' ইতিপূর্বেই প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া, রচনাবলী-সংস্করণে চিরকুমার-সভা হইতে উক্ত বর্ণনাংশ বর্জিত হইয়াছে; শুধু যে-সকল অংশ অভিনয়-নির্দেশক সেগুলি রক্ষিত হইল।

চিরকুমার-সভা সম্বন্ধে প্রিয়নাথ সেনকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি পত্রাংশ নিম্নে সংকলিত হইল—

আমি নানাপ্রকার ছুতোয় নানাপ্রকার কুঁড়েমি করে অবশেষে কাল বৈকালে চিরকুমার-সভায় হস্তক্ষেপ করেছি। আজ বৈকালে সমাধা করার আশা করছি। অবশ্য চিরসমাধা নয়— কেবল আশ্বিনের কিস্তি।… ২৮শে শ্রাবণ [১৩০৭]

—প্রিয়-পুষ্পাঞ্জলি। পৃ ২৮৮

চন্দ্রমাধববাবুর চরিত্রে অনেক মিশল আছে, তার মধ্যে কতক মেজদাদা কতক রাজনারান বাবু এবং কতক আমার কল্পনা আছে। নির্মলাও তথৈবচ, এর মধ্যে সরলার অংশ অনেকটা আছে বটে। কিন্তু, কোনো রিয়াল মানুষ প্রত্যহ আমাদের

কাছে যেরকম প্রতীয়মান সেরকম ভাবে কাব্যে স্থান পাবার যোগ্য নয়। কারণ, রিয়াল মানুষকে যথার্থ ও সম্পূর্ণরূপে জানবার শক্তি আমাদের না থাকাতে আমরা তাকে প্রতিদিন খণ্ডিত বিক্ষিপ্ত এবং অনেক সময় পূর্বাপরবিরোধী -ভাবে না দেখে উপায় পাই নে; কাজেই তাকে নিয়ে কাব্যে কাজ চলে না। সুতরাং, কাব্যে যদিচ কোনো কোনো রিয়াল লোকের আভাসমাত্র থাকে তবু তাকে সম্পূর্ণ করতে অন্তর বাহির নানা দিক থেকে নানা উপকরণ আহরণ করতে হয়। চন্দ্রমাধবে মেজদাদার শিশুবৎ স্বচ্ছ সারল্যের ছায়া আছে এবং নির্মলায় সরলার কল্পনাপ্রবণ উদ্দীপ্ত কর্মোৎসাহ আছে, কিন্তু উভয় চরিত্রেই অনেক জিনিস আছে যা তাঁদের কারোই নয়। [আশ্বিন ১৩০৭]

— বিশ্বভারতী পত্রিকা। বৈশাখ ১৩৫০

কাল চিরকুমার-সভা শেষ করিয়া ফেলিয়া হাড়ে বাতাস লাগাইতেছি··· ১১ চৈত্র ১৩০৭।

— প্রিয়-পুষ্পাঞ্জলি। পৃ ২৯১

চিরকুমার-সভার শেষ দিকটায় একেবারে full steam লাগানো গিয়েছিল।··· যেমন করে হোক শেষ করে দিয়ে অঋণী হবার জন্যে মনটা নিতান্তই ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। তার পরে যখন তোমার কাছে শুনলুম শেষ দিকটা ক্রমেই ঢিলে হয়ে আসছে, তখন কলমের পশ্চাতে খুব একট কড়া চাবুক লাগিয়ে এক দমে শেষ করে দেওয়া গেছে। সকল সময়ে কি মেজাজ ঠিক থাকে। চৈত্রের কুমার-সভা সম্বন্ধে তুমি যা লিখেছ সেটা ঠিক। তোমার পরামর্শ-মতে ভবিষ্যতে ওটা পরিবর্তন করে দেবার চেষ্টা করব। বৈশাখে কুমার-সভার উপসংহারটা পড়ে তোমাদের কিরকম লাগে জানবার খুব কৌতূহল আছে। যথেষ্ট আশঙ্কাও আছে। নিতান্ত অনিচ্ছা এবং নিরুদ্যমের মধ্যে কেবলমাত্র প্রতিজ্ঞার জোরে ওটা শেষ করেছি; মনের সে অবস্থায় কখনো রসনিঃসারণ হয় না। যেখানে থামা উচিত এবং যেরকম ভাবে থামা উচিত তা হয়েছে কিনা নিজে বুঝতে পারছি নে। একবার সমস্ত জিনিসটা একসঙ্গে ধরে দেখতে পারলে তবে ওর পরিমাণ-সামঞ্জস্য বিচার করা যায়। সেইজন্যে বৈশাখের ভারতীর অপেক্ষায় আছি। যখন বই বেরোবে তখন অনেকটা বদল হয়ে বেরোবে। [? চৈত্র, ১৩০৭]

— প্রিয়-পুষ্পাঞ্জলি। পৃ ২৮৯

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় রবীন্দ্রনাথকে চিরকুমার-সভা ইংরেজি করার বিষয় লিখিলে, রবীন্দ্রনাথ তদুত্তরে তাঁহাকে লেখেন—

আমার মনে হয় চিরকুমার-সভার ইংরেজি করা অসম্ভব। তার ব্যঙ্গ, তার শ্লেষ, তার সামাজিক ভূমিকা অত্যন্ত বেশি বাঙালি। বাংলাদেশে শ্যালী-ভগ্নীপতির সম্বন্ধ অনন্ত-

সাধারণ, এমন-কি, ভারতের অন্যত্রও নেই। অন্য প্রদেশের পাঠক এই ব্যাপারকে আপত্তিজনক বলে মনে করতে পারে।··· হয়তো এ সম্বন্ধে একটু ভূমিকা করে দিলে জিনিসটা কৌতুকাবহ হতেও পারে। আমাদের দেশের একজন সাহিত্য-অধ্যাপক প্রমাণ করে দিয়েছেন আমার লেখায় যথার্থ হাস্যরস নেই, দৃষ্টান্তস্থলে চিরকুমার-সভারও উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে গীতিকাব্যলেখকদের কলম হাসতে ও হাসাতে পারে না। অতএব, সাবধান হবেন। ইতি ১০ অক্টোবর ১৯৩৫

—প্রবাসী। ভাদ্র ১৩৪৮

গল্পগুচ্ছ

রচনাবলীর এই খণ্ডে সংকলিত পাঁচটি গল্প ১২৯৮ সালের অগ্রহায়ণ—চৈত্র এই পাঁচ মাসে সাধনা মাসিকপত্রে প্রথম প্রকাশলাভ করে। বর্তমান গ্রন্থে প্রত্যেক রচনার শেষে সাধনায় প্রকাশের কাল মুদ্রিত হইয়াছে।

খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন, সম্পত্তি-সমর্পণ ও কঙ্কাল 'বিচিত্র গল্প' প্রথম ভাগে (১৩০১) এবং দালিয়া ও মুক্তির উপায় 'বিচিত্র গল্প' দ্বিতীয় ভাগে (১৩০১) সংকলিত হয়; গ্রন্থমধ্যে সেই উহাদের প্রথম প্রচার।

'মুক্তির উপায়' গল্প অবলম্বনে লিখিত ওই নামের নাটক 'অলকা' (আশ্বিন ১৩৪৫) মাসিক পত্রে মুদ্রিত হইয়াছিল, অধুনা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে।

শান্তিনিকেতন

বর্তমান খণ্ডে শান্তিনিকেতন গ্রন্থের ১৩শ-১৭শ খণ্ড মুদ্রণের ফলে এই রচনাপর্যায় সমাপ্ত হইল। রচনাগুলির অধিকাংশই শান্তিনিকেতন-আশ্রমের উপাসনামন্দিরে উক্ত হইয়াছিল; কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভাষণের তারিখও মুদ্রিত আছে। রচনাগুলির সাময়িক পত্রে প্রকাশের কাল সব সময়ে পাওয়া যায় না; যে-সকল ক্ষেত্রে পাওয়া গিয়াছে (প্রবাসী, ভারতী অথবা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় পাওয়া যায়) উহা রচনাশেষে স্বতন্ত্র অনুচ্ছেদরূপে সংকলিত হইল।

শান্তিনিকেতন ত্রয়োদশ খণ্ডে প্রকাশিত 'আত্মবোধ' সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ শ্রীযুক্ত নির্মলচন্দ্র দে'কে একটি চিঠিতে লিখিয়াছেন—

আত্মবোধ প্রবন্ধটা এখানে আমার সম্মুখে নাই, এইজন্য আপনারা যে বিশেষ অংশটির কথা উত্থাপন করিয়াছেন তাহার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা করিতে পারিলাম না। আত্মবোধের শেষভাগে আমি এই কথা বলিয়াছি যে, ব্রহ্মের প্রকাশ সর্বত্রই পরিপূর্ণ—

কেবল মানবের ইচ্ছার মধ্যে তিনি আপনাকে সম্পূর্ণ করেন নাই, কারণ তাহা হইলে ইচ্ছার ধর্মই লোপ হইত। 'হাঁ' ও 'না' দুই না থাকিলে ইচ্ছা থাকিতেই পারে না। যেখানে 'না' বলিবার সম্ভাবনামাত্র নাই, একেবারেই 'হাঁ', সেখানে অন্ধ শাসন ; সেখানে প্রেম নাই, ইচ্ছা নাই। যেমন জড় প্রকৃতি— সেখানে যাহা না ঘটিলে নয় তাহাই ঘটিতেছে ; অতএব সেখানে ঈশ্বরের নিয়ম প্রকাশ পাইতেছে, প্রেম প্রকাশ পাইতেছে না। প্রেম প্রেমকে চায়, ইচ্ছা ইচ্ছাকে চায়। আমাদের ইচ্ছার মধ্যে 'না'কে বিপর্যস্ত করিয়া দিয়া যখন তিনি 'হাঁ'কে জয় করেন তখনই আমাদের ইচ্ছার মধ্যে তাঁহার ইচ্ছা প্রকাশ পায়। আমরা নিজে ইচ্ছা করিয়া যখন তাঁহার ইচ্ছাকে স্বীকার করি তখনই ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছার মিলন হয়। সুতরাং ইহার জন্য তাঁহাকে অপেক্ষা করিতে হয়। একসময় আমাদের যে প্রেম তাঁহাকে চায় নাই, কেবল বিষয়ের রাজ্যে ঘুরিয়াছিল, সেই প্রেম যখন তাঁহাকে চায় তখন তাঁহার চাওয়ার সঙ্গে আমার চাওয়ার মিলন হয় ; তখনই আমার প্রেম তাঁহার প্রেমকে উপলব্ধি করে এবং চতুর্দিকে প্রকাশ করে। অতএব মানবাত্মার ইচ্ছার মধ্যে পরমাত্মার ইচ্ছার পূর্ণ প্রকাশ জগতে আর কোথাও দেখিতে পাই না, কেবল ভক্তের জীবনে দেখি। এ পর্যন্ত মানব-ইতিহাসে জ্ঞানে প্রেমে ও কর্মে পরিপূর্ণমাত্রায় পরমাত্মার ইচ্ছার সঙ্গে জীবাত্মার ইচ্ছার একান্ত যোগ দেখা যায় নাই ; কোথাও বা জ্ঞান প্রবল, কর্ম প্রবল নহে— কোথাও বা অন্যরূপ। কিন্তু, এই আদর্শ যে অসম্ভব তাহা নহে। বিশ্বমানবের চিত্তে এই ইচ্ছাই গূঢ়ভাবে নিয়ত কাজ করিতেছে— সে তাঁহাকে আপনার সকল দিয়া উপলব্ধি করিবে ইহাই তাহার সাধনা। মানুষ আপনার বুদ্ধি প্রীতি ও শক্তি এই তিন পাত্র পূর্ণ করিয়া ভরিয়া তাঁহার অমৃত পান করিবে, এই পরম ইচ্ছাটি জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়ের মধ্যেই আছে ; ক্রমশ এই ইচ্ছা পূর্ণ হইয়া উঠাই প্রেমের লীলা, এই লীলা কখনোই শেষ হইয়া যাইতে পারে না কিন্তু, তাই বলিয়া এমন কথা বলা যায় না যে এই লীলা কোনো কালে আরম্ভ হইতেও পারে না, অনন্তকাল উহা দূরেই থাকিয়া যাইবে। বাধা-ব্যবধানের ভিতর দিয়া দুই মহাপ্রেমিকের মধ্যে ইচ্ছার লীলা চলিতেছে ; তাহারই মহা আনন্দের রূপ আমরা ভক্তের জীবনের মধ্যে দেখিতে পাই। ইতি ১৯ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮, শিলাইদা, নদিয়া

শুদ্ধপাঠ-নির্দেশ

পৃ ১২ নিম্ন হইতে ছত্র ৪ অগ্নিনিশ্মাস স্থলে অগ্নিনিশ্বাস

পৃ ২৭৫ ছত্র ১১ নিঃত্রার্থ স্থলে নিঃস্বার্থ

পৃ ৪০২ নিম্ন হইতে ছত্র ১১ তাতহৈ স্থলে তাতেই

বর্ণানুক্রমিক সূচী

অগ্রসর হওয়ার আহ্বান ৪৮৫
অন্তরতর শান্তি ৫০৭
অপরাধী ২১
অভয় দাও তো বলি আমার ১৬১
অমৃতের পুত্র ৪৫৪
অলকে কুসুম না দিয়ো ২৭৭
অস্থানে ১১৭
আঁখিরে ফাঁকি দাও একি ধারা ২২০
আজ এই বাদলার দিন ৩৫
আত্মবোধ ৩৫৬
আনতাঙ্গী বালিকার ২৪৫
আবির্ভাব ৫০৪
আমাদের কালে গোষ্ঠে যখন ১৩
আমার বয়সে মনকে বলবার ২৪
আমি অন্তঃপুরের মেয়ে ৭১
আমি কেবল ফুল জোগাব ১৬৭
আরো ৫০২
আসে তো আসুক রাতি ২৩৫
উদ্‌বোধন ৪৭৮
উন্নতি ৮৮
উপরে যাবার সিঁড়ি ৮৮
এক আছে মণিদিদি ৭৭
একই লতাবিতান বেয়ে ১১৭
একজন লোক ৭৬
একটি মন্ত্র ৪৬৮
এক দিকে কামিনীর ডালে ৬১
এল সে জর্মনির থেকে ১১৯
ও আমার ধ্যানেরই ধন ২২০
ওগো, তোরা কে যাবি পারে ১৮৯

ওগো দয়াময়ী চোর ২১৬
ওরে সাবধানী পথিক, বারেক ২৩৪
কঙ্কাল ৩২১
কতকাল রবে বলো ভারত রে ১৬৩
কন্‌কনে ঠাণ্ডায় আমাদের যাত্রা ৯৫
কর্মযোগ ৩৪৩
কাছে এল পুজোর ছুটি ১২১
কার হাতে যে ধরা দেব প্রাণ ১৭২
কিনু গোয়ালার গলি ৮৪
কী জানি কী ভেবেছ মনে ১৫১
কীটের সংসার ৬১
কুঞ্জকুটিরের স্নিগ্ধ অলিন্দের 'পর ২২২
কুঞ্জ-পথে-পথে চাঁদ ২২৩
কেন সারা দিন ধীরে ধীরে ২৭৮
কোপাই ৭
কোমল গান্ধার ৩৪
ক্যামেলিয়া ৬৩
খেলনার মুক্তি ৭৭
খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন ২৯৫
খোয়াই ১৫
খ্যাতি ৮১
গন্ধর্ব সৌরসেন সুরলোকের সংগীতসভায় ১৩৩
গানের বাসা ১৩৯
গুরু রামানন্দ স্তব্ধ দাঁড়িয়ে ১০৯
ঘরছাড়া ১১৯
চক্ষু -'পরে মৃগাক্ষীর ২৪১
চলেছে ছুটিয়া পলাতকা হিয়া ২১৭
চির-পুরানো চাঁদ ১৬৯
চিররূপের বাণী ৯৭
ছুটি ১৩৮

ছুটির আয়োজন ১২১
ছেঁড়া কাগজের ঝুড়ি ৫৭
ছেলেটা ৩৯
ছেলেটার বয়স হবে ৩৯
ছেলেদের খেলার প্রাঙ্গণ ৩৩
ছোটো ও বড়ো ৪৩৮
জয়যাত্রায় যাও গো ১৭৭
জ্বলে নি আলো অন্ধকারে ২২৬
তরী আমার হঠাৎ ডুবে যায় ২৫৬
তীর্থযাত্রী ৯৫
তুমি আমায় করবে মস্তলোক ১৫৯
তুমি বল তিনু প্রশ্রয় পায় ২১
তোমরা দুটি পাখি ১৩৯
তোমাকে পাঠালুম আমার লেখা ১৮
তোমায় চেয়ে বসে আছি ২৬৪
ত্রিলোকেশ্বরের মন্দির ১১২
দাও-না ছুটি ১৩৮
দালিয়া ৩১২
দিলে তুমি সোনা-মোড়া ফাউণ্টেন পেন ৮০
দীক্ষার দিন ৫০০
দুঃখের দিনে লেখনীকে বলি ৪৭
দেখা ৬০
দোতলার জানলা থেকে ২০
ধীরে ধীরে চলো তন্বী ২৩৬
নববর্ষ ৩৯৩
নাটক ১০
নাটক লিখেছি একটি ১০
না, না গো, না ১৫৭
না ব'লে যায় পাছে সে ১৫৬
নাম তার কমলা ৬৩

নাম রেখেছি কোমলগান্ধার ৩৪
নিশি না পোহাতে জীবনপ্রদীপ ২৩২
নূতন কাল ১৩
পত্র ১৮
পত্রলেখা ৮০
পদ্মা কোথায় চলেছে দূর ৭
পয়লা আশ্বিন ১৪১
পশ্চিমে বাগান বন চষা-খেত ১৫
পশ্চিমে শহর ৩৭
পাছে চেয়ে বসে আমার মন ১৫২
পাপের মার্জনা ৪৯৪
পিতার বোধ ৪২১
পুকুর-ধারে ২০
পোড়া মনে শুধু পোড়া মুখখানি ১৭০
প্রতীক্ষা ৪৮২
প্রথম পূজা ১১২
প্রাঙ্গণে নামল অকাল সন্ধ্যার ছায়া ৯৭
প্রেমের সোনা ১০৮
প্লাটিনমের আঙটির মাঝখানে ৩২
ফাঁক ২৪
বড়ো থাকি কাছাকাছি ১৫৩
বর্ষশেষ ৩৮৯
বাজিরাও পেশোয়ার ১০৬
বাবা এসে শুধালেন ৫৭
বালক ৫২
বাঁশি ৮৪
বাসা ২৭
বিচ্ছেদ ৩৫
বিঁধিয়া দিয়া আঁখিবাণে ২৪৬
বিরহে মরিব বলে ২৬১

বিশেষত্ব ও বিশ্ব ৪১১
বিশ্বশোক ৪৭
বৈশাখী ঝড়ের সন্ধ্যা ৩৯৮
ব্রাহ্মসমাজের সার্থকতা ৩৭৪
ভাই নিশি ৮১
ভুলে ভুলে আজ ভুলময় ২৮৫
ভীরু ৯১
মনে হচ্ছে শূন্য বাড়িটা ৪৯
মনোমন্দিরসুন্দরী ২১৯
ময়ূরাক্ষী নদীর ধারে ২৭
মরণের ছবি মনে আনি ১২২
মাধুর্যের পরিচয় ৪৬৪
মানবপুত্র ১২৪
মা মা হিংসীঃ ৪৯০
মুক্তি ১০৬
মুক্তির উপায় ৩২৯
মুক্তির দীক্ষা ৪৭৯
মৃত্যু ১২২
মৃত্যুর পাত্রে খৃস্ট যেদিন ১২৪
মোটা মোটা কালো মেঘ ৩০
ম্যাট্রিকুলেশনে পড়ে ৯১
যাত্রীর উৎসব ৪৬০
যারে মরণদশায় ধরে ১৭০
যেতে দাও গেল যারা ২১৬
রবিদাস চামার ঝাঁট দেয় ধুলো ১০৮
রঙরেজিনী ১০৩
রাত কত হল ১২৫
রামানন্দ পেলেন গুরুর পদ ১০০
শঙ্করলাল দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত ১০৩
শাপমোচন ১৩৩

শালিখ … … ৬৯
শালিখটার কী হল … … ৬৯
শিশুতীর্থ … … ১২৫
শুচি … … ১০০
শুচি … … ৪১৪
শেষ চিঠি … … ৪৯
শেষ দান … … ৩৩
সত্যকে দেখা … … ৪১১
সত্যবোধ … … ৪০১
সত্য হওয়া … … ৪০৭
সম্পত্তি-সমর্পণ … … ৬০৩
সহযাত্রী … … ৪৪
সাধারণ মেয়ে … … ৭১
সুন্দর … … ৩৮৩
সুন্দর … … ৬২
সুশ্রী নয় এমন লোকের … … ৪৪
সৃষ্টির ক্রিয়া … … ৪৯৬
সৃষ্টির অধিকার … … ৪৩২
সৌন্দর্যের সকরুণতা … … ৪৫৪
স্নান-সমাপন … … ১০৯
স্মৃতি … … ৩৭
স্বর্গে তোমায় নিয়ে যাবে উড়িয়ে … … ১৭১
হরিণগর্বমোচন লোচনে … … ২৪৬
হিমের শিহর লেগেছে আজ … … ১৪১
হিরণমাসির প্রধান প্রয়োজন … … ৫২

রবীন্দ্র রচনাবলী

সপ্তদশ খণ্ড

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্র-রচনাবলী

সপ্তদশ খণ্ড

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রথম প্রকাশ মাঘ ১৪০৭
পুনর্মুদ্রণ পৌষ ১৪১০

© বিশ্বভারতী

ISBN-81-7522-288-3 (V.17)
ISBN-81-7522-289-1 (Set)

প্রকাশক অধ্যাপক সুধেন্দু মণ্ডল
বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ। ৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড। কলকাতা ১৭

মুদ্রক প্রিন্টিং সেন্টার
১ ছিদাম মুদি লেন। কলকাতা ৬

প্রকাশকের নিবেদন

রবীন্দ্র-রচনাবলীর অষ্টাবিংশ খণ্ডের (বর্তমান সুলভ ষোড়শ খণ্ড) নিবেদন-এ বলা হইয়াছিল : ‘পূর্বপ্রকাশিত রচনাবলীর অন্তর্ভুক্ত কোনো কোনো গ্রন্থের উদ্‌বৃত্ত রচনা এবং কিছু অগ্রন্থিত রচনা বর্তমান খণ্ডে যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট করা হইল। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় মুদ্রিত বিবিধ রচনা সংগ্রহের কাজ চলিতেছে এবং তাহা খণ্ডশ প্রকাশের আয়োজনও হইতেছে।’

অগ্রন্থিত রচনাগুলি প্রকাশ করিবার সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী ঊনত্রিংশ এবং ত্রিংশ খণ্ড (বর্তমান সপ্তদশ খণ্ড) সংকলিত হইল। এই খণ্ডে ঊনবিংশ শতাব্দীতে রচিত বা সাময়িক পত্রে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের অগ্রন্থিত রচনাসমূহ পাওয়া যাইবে। বর্তমান খণ্ডে ওই দুই খণ্ডের প্রবন্ধগুলিকে বিষয় অনুযায়ী বিন্যস্ত করা হইয়াছে; এবং পরিশিষ্ট অংশের রচনাগুলিও যুক্ত হইল।

সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশের বিবরণ এবং অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য গ্রন্থপরিচয় অংশে সংকলিত হইয়াছে।

১৪০২

বিষয়সূচী

চিত্রসূচী [১৬
প্রকাশকের নিবেদন [৫

কবিতা

অভিলাষ ৩
হোক ভারতের জয় ৮
হিন্দুমেলায় উপহার ১১
প্রকৃতির খেদ (দ্বিতীয় পাঠ) ১৪
প্রকৃতির খেদ (প্রথম পাঠ) ১৭
'জ্বল্ জ্বল্ চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ' ২৪
প্রলাপ ১ ২৫
প্রলাপ ২ ৩০
প্রলাপ ৩ ৩২
দিল্লি দরবার ৩৫
ভারতী ৩৬
হিমালয় ৩৭
আগমনী ৩৯
আকুল আহ্বান ৪২
অবসাদ ৪৪
মেঘ্লা শ্রাবণের বাদ্লা রাতি ৪৫
শারদা ৪৬

মালতী পুঁথি -ধৃত

হা বিধাতা ছেলেবেলা হতেই এমন ৪৭
এসো আজি সখা ৪৯
পার কি বলিতে কেহ ৫১
ছেলেবেলাকার আহা, ঘুমঘোরে দেখেছিনু ৫১
আমার এ মনোজ্বালা ৫২
উপহার-গীতি ৫৩
পাষাণ-হৃদয়ে কেন সঁপিনু হৃদয় ৫৪
ভেবেছি কাহারো সাথে ৫৪
হা রে বিধি কী দারুণ অদৃষ্ট আমার ৫৫
ও কথা বোলো না সখি ৫৫
কী হবে বলো গো সখি ৫৫
এ হতভাগারে ভালো কে বাসিতে চায় ৫৬
জানি সখা অভাগীরে ভালো তুমি বাস না ৫৬

সংযোজন

সন্ধ্যাসংগীত

সন্ধ্যা ৫৯
কেন গান গাই ৬১
কেন গান শুনাই ৬৩
বিষ ও সুধা ৬৪

প্রভাতসংগীত

স্নেহ উপহার ৭৫
শরতে প্রকৃতি ৭৬

ছবি ও গান

বিরহ ৭৮

ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী

সখি রে— পিরীত বুঝবে কে? ৭৯
হম সখি দারিদ নারী! ৮০

কড়ি ও কোমল

শরতের শুকতারা ৮১
পত্র (মাগো আমার লক্ষ্মী) ৮৩
পত্র (বসে বসে লিখলেম চিঠি) ৮৫
জন্মতিথির উপহার ৮৬
চিঠি (চিঠি লিখব কথা ছিল) ৮৭
পত্র (দামু বোস আর চামু বোসে) ৯১

অনুবাদ-কবিতা

ম্যাক্‌বেথ্ ৯৭
বিচ্ছেদ ১০০
বিদায়-চুম্বন ১০০
কষ্টের জীবন ১০১
জীবন উৎসর্গ ১০১
ললিত-নলিনী ১০২
বিদায় ১০৪
সংগীত ১০৪
গভীর গভীরতম হৃদয়প্রদেশে ১০৫
যাও তবে প্রিয়তম সুদূর সেথায় ১০৬
আবার আবার কেন রে আমার ১০৭
বৃদ্ধ কবি ১০৯
জাগি রহে চাঁদ ১১০
পাতায় পাতায় দুলিছে শিশির ১১০
বলো গো বালা, আমারি তুমি ১১১

গিয়াছে সে দিন, যে দিন হৃদয় ১১২
রূপসী আমার, প্রেয়সী আমার ১১৩
সুশীলা আমার, জানালার 'পরে ১১৪
কোরো না ছলনা, কোরো না ছলনা ১১৪
চপলারে আমি অনেক ভাবিয়া ১১৫
প্রেমতত্ত্ব ১১৬
নলিনী ১১৬
দিন রাত্রি নাহি মানি ১১৭
দামিনীর আঁখি কিবা ১১৮
অদৃষ্টের হাতে লেখা ১২০
ভুজ-পাশ-বদ্ধ অ্যান্টনি ১২০
সুখী প্রাণ ১২২
জীবন মরণ ১২২
স্বপ্ন দেখেছিনু প্রেমাগ্নিজ্বালার ১২৩
আঁখি পানে যবে আঁখি তুলি ১২৪
প্রথমে আশাহত হয়েছিনু ১২৪
নীল বায়লেট নয়ন দুটি করিতেছে ঢলঢল ১২৪
গানগুলি মোর বিষে ঢালা ১২৪
তুমি একটি ফুলের মতো মণি ১২৫
রানী, তোর ঠোঁট দুটি মিঠি ১২৫
বারেক ভালোবেসে যে জন মজে ১২৫
বিশ্বামিত্র, বিচিত্র এই লীলা! ১২৬
ভালোবাসে যারে তার চিতাভস্ম-পানে ১২৬

প্রবন্ধ

সাহিত্য

ভুবনমোহিনী প্রতিভা, অবসরসরোজিনী ও দুঃখসঙ্গিনী ১২৯
মেঘনাদবধ কাব্য ১৩১
স্যাক্‌সন জাতি ও অ্যাংলো স্যাক্‌সন সাহিত্য ১৬৪
বিয়াত্রিচে, দান্তে ও তাঁহার কাব্য ১৭৪
পিত্রার্কা ও লরা ১৮৫
গেটে ও তাঁহার প্রণয়িনীগণ ১৯২
নর্ম্যান জাতি ও অ্যাংলো-নর্ম্যান সাহিত্য [প্রথম প্রস্তাব] ১৯৮
[নর্ম্যান জাতি ও অ্যাংলো-নর্ম্যান সাহিত্য] দ্বিতীয় প্রস্তাব ২০৪
চ্যাটার্টন— বালক-কবি ২১৪
বাঙালি কবি নয় ২১৯
বাঙালি কবি নয় কেন ২২৭

'দেশজ প্রাচীন কবি ও আধুনিক কবি'/ (প্রত্যুত্তর) ২৪১
কাব্য : স্পষ্ট এবং অস্পষ্ট ২৪৪
সাহিত্যের উদ্দেশ্য ২৪৭
সাহিত্য ও সভ্যতা ২৪৯
আলস্য ও সাহিত্য ২৫২
কবিতার উপাদান রহস্য (Mystery) ২৫৬
সৌন্দর্য ২৫৬
Dialogue/Literature ২৫৭
সাহিত্য ২৫৯
বাংলায় লেখা ২৬০
অপরিচিত ভাষা ও অপরিচিত সংগীত ২৬১
সৌন্দর্য সম্বন্ধে গুটিকতক ভাব ২৬২
বাংলা সাহিত্যের প্রতি অবজ্ঞা [শেষাংশ] ২৬৪
[কাব্য] ২৬৫
একটি পত্র ২৬৭
বাংলা লেখক ২৬৯
'সাহিত্য'-পাঠকদের প্রতি ২৭২
রবীন্দ্রবাবুর পত্র ২৭২
স্যাহিত্যের গৌরব ২৭৪
মেয়েলি ব্রত ২৭৮
সাহিত্যের সৌন্দর্য ২৭৯

সংগীত

সংগীত ও ভাব ২৮৫
সংগীতের উৎপত্তি ও উপযোগিতা/হর্বার্ট স্পেন্সরের মত ২৯০

শিল্প

[মন্দিরপথবর্তিনী] ২৯৭
মন্দিরাভিমুখে ৩০০

ধর্ম/দর্শন

সাকার ও নিরাকার উপাসনা ৩০৭
নববর্ষ উপলক্ষে গাজিপুরে ব্রহ্মোপাসনা/উদ্‌বোধন ৩১৩
ধর্ম ও ধর্মনীতির অভিব্যক্তি (Evolution) ৩১৫
চন্দ্রনাথবাবুর স্বরচিত লয়তত্ত্ব ৩১৫
নব্য লয়তত্ত্ব ৩১৮
[সুখ না দুঃখ] উক্ত প্রবন্ধ সম্বন্ধে বক্তব্য ৩২১
বেদান্তের বিদেশীয় ব্যাখ্যা ৩২২
রামমোহন রায় ৩৩০

শিক্ষা

ছাত্রদের নীতিশিক্ষা ৩৪১
ছাত্রবৃত্তির পাঠ্যপুস্তক ৩৪৪
মুসলমান ছাত্রের বাংলা শিক্ষা ৩৫০

সমাজ

বাঙালির আশা ও নৈরাশ্য ৩৫৫
ইংরাজদিগের আদব-কায়দা ৩৫৯
নিন্দা-তত্ত্ব ৩৬২
পারিবারিক দাসত্ব ৩৬৯
জুতা-ব্যবস্থা/(১৮৯০ খৃস্টাব্দে লিখিত) ৩৭৬
চীনে মরণের ব্যবসায় ৩৭৯
নিমন্ত্রণ-সভা ৩৮৪
চেঁচিয়ে বলা ৩৮৮
জিহ্বা আস্ফালন ৩৯২
জিজ্ঞাসা ও উত্তর ৩৯৬
সমাজ সংস্কার ও কুসংস্কার ৩৯৮
ন্যাশনল ফন্ড ৪০২
টৌন্‌হলের তামাশা ৪০৭
অকাল কুষ্মাণ্ড ৪০৯
হাতে কলমে ৪২০
একটি পুরাতন কথা ৪২৮
কৈফিয়ত ৪৩৫
[দুর্ভিক্ষ] ৪৪১
লাঠির উপর লাঠি ৪৪২
সত্য ৪৪৫
আপনি বড়ো ৪৫২
হিন্দুদিগের জাতীয় চরিত্র ও স্বাধীনতা ৪৫৫
স্ত্রী ও পুরুষের প্রেমে বিশেষত্ব ৪৫৮
আমাদের সভ্যতায় বাহ্যিক ও মানসিকের অসামঞ্জস্য ৪৬১
সমাজে স্ত্রী-পুরুষের প্রেমের প্রভাব ৪৬২
আমাদের প্রাচীন কাব্যে ও সমাজে স্ত্রী-পুরুষ প্রেমের অভাব ৪৬৪
Chivalry ৪৬৫
নব্যবঙ্গের আন্দোলন ৪৬৬

ইতিহাস

ঝান্‌সীর রানী ৪৭৩
কাজের লোক কে ৪৭৭
গুটিকত গল্প ৪৮০

আকবর শাহের উদারতা ৪৮৩
ন্যায় ধর্ম ৪৮৩
বীর গুরু ৪৮৪
শিখ-স্বাধীনতা ৪৮৮
গ্রন্থসমালোচনা : ভারতবর্ষের ইতিহাস, মুর্শিদাবাদ কাহিনী ৪৯০, ৪৯১
ঐতিহাসিক চিত্র/সূচনা ৪৯২

বিজ্ঞান

সামুদ্রিক জীব/প্রথম প্রস্তাব/কীটাণু ৪৯৭
দেবতায় মনুষ্যত্ব আরোপ ৫০২
বৈজ্ঞানিক সংবাদ ৫০৮
বৈজ্ঞানিক সংবাদ : গতি নির্ণয়ের ইন্দ্রিয়, ইচ্ছামৃত্যু, মাকড়সা-সমাজে স্ত্রীজাতির গৌরব, উটপক্ষীর লাথি ৫১১-৫১২
বৈজ্ঞানিক সংবাদ : জীবনের শক্তি, ভূতের গল্পের প্রামাণিকতা, মানব শরীর ৫১৩-৫১৪
রোগশত্রু ও দেহরক্ষক সৈন্য ৫১৫
উদয়াস্তের চন্দ্রসূর্য, অভ্যাসজনিত পরিবর্তন, ওলাউঠার বিস্তার, ঈশ্বর ৫১৭-৫২১
ভূগর্ভস্থ জল ও বায়ুপ্রবাহ ৫২২

বিবিধ

সান্ত্বনা ৫২৯
নিঃস্বার্থ প্রেম ৫৩০
যথার্থ দোসর ৫৩৪
গোলাম-চোর ৫৪০
চর্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় ৫৪২
দরোয়ান ৫৪৫
জীবন ও বর্ণমালা ৫৪৮
রেল গাড়ি ৫৫০
লেখা কুমারী ও ছাপা সুন্দরী ৫৫৩
গোঁফ এবং ডিম ৫৫৫
সত্যং শিবং সুন্দরম্ ৫৫৯
ভানুসিংহ ঠাকুরের জীবনী ৫৫৯
পুষ্পাঞ্জলি ৫৬৩
বিবিধ প্রসঙ্গ ১ ৫৬৯
বিবিধ প্রসঙ্গ ২ ৫৭৪
বর্ষার চিঠি ৫৭৭
বরফ পড়া ৫৭৯
শিউলিফুলের গাছ ৫৮২

বানরের শ্রেষ্ঠত্ব ৫৮৪
কার্যাধ্যক্ষের নিবেদন ৫৮৫
সৌন্দর্য ও বল ৫৮৫
আবশ্যকের মধ্যে অধীনতার ভাব ৫৮৬
শরৎকাল ৫৮৬
ছেলেবেলাকার শরৎকাল ৫৮৮
ইন্দুর-রহস্য ৫৮৮
কাজ ও খেলা ৫৮৯
[ঘানির বলদ] ৫৯১
[জীবনের বুদ্‌বুদ] ৫৯১
বাগান ৫৯১
ঠাকুরঘর ৫৯২
নিষ্ফল চেষ্টা ৫৯৩
সফলতার দৃষ্টান্ত ৫৯৪
[লেখক-জন্ম] ৫৯৬
সম্পাদকের বিদায় গ্রহণ ৫৯৬

গ্রন্থসমালোচনা

রাবণ-বধ দৃশ্য কাব্য, অভিমন্যু-বধ দৃশ্য কাব্য, অভিমন্যু সম্ভব কাব্য
The Indian Homœopathic Review ৬০১-৬০৩
আনন্দ রহো, সীতার বনবাস দৃশ্যকাব্য, লক্ষ্মণ-বর্জন দৃশ্যকাব্য, মুক্তি ও সাধন সম্বন্ধে হিন্দু-শাস্ত্রের উপদেশ, কুসুম-কানন, সরলা, প্রায়শ্চিত্ত, আদর, উর্মিলা-কাব্য, নির্ঝরিণী (গীতিকাব্য), রাজ-উদাসীন ৬০৩-৬০৬
জন স্টুয়ার্ট মিলের জীবনবৃত্ত, ইতালির ইতিবৃত্ত-সম্বলিত ম্যাটসিনির জীবনবৃত্ত, হৃদয়োচ্ছ্বাস, স্যামুয়েল হানিমানের জীবনবৃত্ত, যেমন রোগ তেমনি রোজা, গার্হস্থ্য চিকিৎসাবিদ্যা, শার্ঙ্গধর, যাবনিক পরাক্রম, স্বপন-সংগীত, ঊষাহরণ বা অপূর্ব মিলন, মেয়েতে বিজ্ঞী বা হরিশ্চন্দ্র ৬০৬-৬০৯
বনবালা, হরবিলাপ, কমলে কামিনী বা ফুলেশ্বরী, কল্পনা-কুসুম, কবিতাবলী, কুসুমারিন্দম ৬০৯
সমালোচক কাব্য, তৃণপুঞ্জ, শান্তি-কুসুম, সুরসভা, কৈলাস-কুসুম, মণি মন্দির, পার্থ প্রসাদন, প্রমীলার পরী, ষড়ঋতু বর্ণন কাব্য ৬১০-৬১১
সিন্ধু দূত, রামধনু, ঝংকার, উচ্ছ্বাস ৬১১-৬১৩
সংগীত সংগ্রহ। (বাউলের গাথা), স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক আপত্তি খণ্ডন, ভাষাশিক্ষা ৬১৩-৬১৫
লালা গোলকচাঁদ, দেহাত্মিক-তত্ত্ব ৬১৫
সংগ্রহ, লীলা, রায়মহাশয়, প্রবাসের পত্র, অপরিচিতের পত্র, প্রকৃতির শিক্ষা, দ্বারকানাথ মিত্রের জীবনী ৬১৫-৬১৮

অশোকচরিত, পঞ্চামৃত ৬১৮
কঙ্কাবতী : ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় ৬১৮-৬২০
ভক্তচরিতামৃত, রঘুনাথ দাস গোস্বামীর জীবনচরিত, চরিত রত্নাবলী, অর্থই অনর্থ, ঠগী কাহিনী ৬২০-৬২১
উপনিষদঃ ৬২১-৬২৩
হাসি ও খেলা, সাধন সপ্তকম্, নীতিশতক ৬২৩-৬২৫
দেওয়ান গোবিন্দরাম, মনোরমা, ৬২৫-৬২৬
নূরজাহান, শুভপরিণয়ে ৬২৬-৬২৭
রঘুবংশ, ফুলের তোড়া, নীহার-বিন্দু ৬২৭-৬২৮
নির্ঝরিণী ৬২৮
বঙ্গসাহিত্যে বঙ্কিম ৬২৮-৬২৯
কবি বিদ্যাপতি, প্রসঙ্গমালা, মনোহর পাঠ, ন্যায় দর্শন, কাতন্ত্রব্যাকরণম্ ৬২৯-৬৩১
সাহিত্য চিন্তা, বামা সুন্দরী বা আদর্শনারী, শুশ্রূষা, বাসনা, পুষ্পাঞ্জলি ৬৩১-৬৩৩
চিন্তালহরী, ভূমিকম্প ৬৩৩-৬৩৪
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ৬৩৪

সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা

ভারতী, নব্যভারত, সাহিত্য ৬৩৭-৬৪০
নব্যভারত, সাহিত্য ৬৪০-৬৪২
নব্যভারত, সাহিত্য, সাহিত্য ও বিজ্ঞান ৬৪৩-৬৪৪
সাহিত্য ৬৪৪-৬৪৭
নব্যভারত, সাহিত্য ৬৪৭-৬৪৯
নব্যভারত, সাহিত্য ৬৪৯-৬৫১
নব্যভারত, সাহিত্য ৬৫১-৬৫৩
সাহিত্য ৬৫৩-৬৫৪
নব্যভারত, সাহিত্য ৬৫৪-৬৫৬
সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ৬৫৬-৬৫৭
প্রদীপ, উৎসাহ ৬৫৭-৬৫৮
নব্যভারত, প্রদীপ, উৎসাহ, নির্মাল্য ৬৫৮-৬৬১
নব্যভারত, সাহিত্য, পূর্ণিমা, প্রদীপ, অঞ্জলি ৬৬১-৬৬৫
সাহিত্য, প্রদীপ, অঞ্জলি ৬৬৫-৬৬৬
সাহিত্য, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, প্রদীপ, উৎসাহ, অঞ্জলি ৬৬৬-৬৬৮
সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, প্রদীপ ৬৬৮-৬৭০

সাময়িক সারসংগ্রহ

মণিপুরের বর্ণনা, আমেরিকার সমাজচিত্র, পৌরাণিক মহাপ্লাবন, মুসলমান মহিলা, প্রাচ্য সভ্যতার প্রাচীনত্ব ৬৭৩-৬৭৬

ক্ষিপ্ত রমণীসম্প্রদায়, সীমান্ত প্রদেশ ও আশ্রিতরাজ্য, ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ ৬৭৬-৬৭৯
স্ত্রী-মজুর, প্রাচীন-পুঁথি উদ্ধার, ক্যাথলিক সোশ্যালিজ্‌ম্‌ ৬৭৯-৬৮২
আমেরিকানের রক্তপিপাসা ৬৮২
উন্নতি, সুখ দুঃখ ৬৮৪-৬৮৫
সোশ্যালিজ্‌ম ৬৮৬
প্রাচীন শূন্যবাদ ৬৮৮
পরিবারাশ্রম ৬৮৯
মানুষসৃষ্টি, জিব্রল্টার বর্জন ৬৯১-৬৯৩
পলিটিক্স, কন্‌গ্রেসে বিদ্রোহ, ভারত কৌন্সিলের স্বাধীনতা, পুলিস রেগুলেশন বিল, ভারতবর্ষীয় প্রকৃতি, ধর্মপ্রচার ৬৯৪-৭০৩
ইন্ডিয়ান রিলিফ সোসাইটি, উদ্দেশ্য সংক্ষেপ ও কর্তব্যবিচার, হিন্দু ও মুসলমান, কন্‌গ্রেসে বিদ্রোহ, রাষ্ট্রীয় ব্যাপার ৭০৩-৭০৮
ফেরোজ শা মেটা, বেয়াদব, কথামালার একটি গল্প ৭০৮-৭১১
চাবুক-পরিপাক, জাতীয় আদর্শ, অপূর্ব দেশহিতৈষিতা, কুকুরের প্রতি মুগুর ৭১১-৭১৩
ইংলন্ডে ও ভারতবর্ষে সমকালীন সিভিল সর্বিস পরীক্ষা, মতের আশ্চর্য ঐক্য, ইংরাজি ভাষা শিক্ষা, জাতীয় সাহিত্য ৭১৩-৭১৬
ভ্রম স্বীকার, চিত্রল-অধিকার, ইংরাজের লোকপ্রিয়তা, ইংরাজের স্বদোষ-বাৎসল্য, ইংরাজের লোকলজ্জা, প্রাচী ও প্রতীচী ৭১৬-৭১৯
নূতন সংস্করণ, জাতিভেদ, বিবাহে পণগ্রহণ, ইংরাজের কাপুরুষতা ৭১৯-৭২২

পরিশিষ্ট

সারস্বত সমাজ ১ ৭২৫
সারস্বত সমাজ ২ ৭২৬
বিশেষ বিজ্ঞাপন/ ত্রৈমাসিক সাধনা ৭২৭
প্রাদেশিক সভার উদ্‌বোধন ৭২৮
শারদ জ্যোৎস্নায় ভগ্নহৃদয়ের গীতোচ্ছ্বাস ৭৩২
গ্রহগণ জীবের আবাসভূমি ৭৩৫
বঙ্গে সমাজ-বিপ্লব ৭৩৬
বিজন চিন্তা : কল্পনা ৭৩৮
কবিতা-পুস্তক ৭৪০
আবদারের আইন ৭৪৬
সংযোজন ৭৫৮
গ্রন্থপরিচয় ৭৬৩
বর্ণানুক্রমিক সূচী ৮২১

চিত্রসূচী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রবেশক
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর -অঙ্কিত : ১৮৮৩

পাণ্ডুলিপিচিত্র

“অবসাদ”। মালতী পুঁথি ৪৪
“জীবণ মরণ”। ভিক্টোর হুগোর কবিতার অনুবাদ ১২২
পুষ্পাঞ্জলি ৫৬৮
“ তোমার ফুলবাগানে যখন চারি দিকেই ফুল ফুটিতেছে...”

কবিতা

অভিলাষ

১

জনমনোমুগ্ধকর উচ্চ অভিলাষ!
তোমার বন্ধুর পথ অনন্ত অপার।
অতিক্রম করা যায় যত পান্থশালা,
তত যেন অগ্রসর হতে ইচ্ছা হয়।

২

তোমার বাঁশরি স্বরে বিমোহিত মন—
মানবেরা, ওই স্বর লক্ষ্য করি হায়,
যত অগ্রসর হয় ততই যেমন
কোথায় বাজিছে তাহা বুঝিতে না পারে।

৩

চলিল মানব দেখো বিমোহিত হয়ে,
পর্বতের অত্যুন্নত শিখর লঙ্ঘিয়া,
তুচ্ছ করি সাগরের তরঙ্গ ভীষণ,
মরুর পথের ক্লেশ সহি অনায়াসে।

৪

হিমক্ষেত্র, জনশূন্য কানন, প্রান্তর,
চলিল সকল বাধা করি অতিক্রম।
কোথায় যে লক্ষ্যস্থান খুঁজিয়া না পায়,
বুঝিতে না পারে কোথা বাজিছে বাঁশরি।

৫

ওই দেখো ছুটিয়াছে আর-এক দল,
লোকারণ্য পথমাঝে সুখ্যাতি কিনিতে;
রণক্ষেত্রে মৃত্যুর বিকট মূর্তি মাঝে,
শমনের দ্বার সম কামানের মুখে।

৬

ওই দেখো পুস্তকের প্রাচীর মাঝারে
দিন রাত্রি আর স্বাস্থ্য করিতেছে ব্যয়।
পহুঁছিতে তোমার ও দ্বারের সম্মুখে
লেখনীরে করিয়াছে সোপান সমান।

৭

কোথায় তোমার অন্ত রে দুরভিলাষ
'স্বর্ণঅট্টালিকা মাঝে?' তা নয় তা নয়।
'সুবর্ণখনির মাঝে অন্ত কি তোমার?'
তা নয়, যমের দ্বারে অন্ত আছে তব।

৮

তোমার পথের মাঝে, দুষ্ট অভিলাষ,
ছুটিয়াছে মানবেরা সন্তোষ লভিতে।
নাহি জানে তারা ইহা নাহি জানে তারা,
তোমার পথের মাঝে সন্তোষ থাকে না!

৯

নাহি জানে তারা হায় নাহি জানে তারা
দরিদ্র কুটির মাঝে বিরাজে সন্তোষ।
নিরজন তপোবনে বিরাজে সন্তোষ।
পবিত্র ধর্মের দ্বারে সন্তোষ আসন।

১০

নাহি জানে তারা ইহা নাহি জানে তারা
তোমার কুটিল আর বঙ্কুর পথেতে
সন্তোষ নাহিকো পারে পাতিতে আসন।
নাহি পশে সূর্যকর আঁধার নরকে।

১১

তোমার পথেতে ধায় সুখের আশয়ে
নির্বোধ মানবগণ সুখের আশয়ে;
নাহি জানে তারা ইহা নাহি জানে তারা
কটাক্ষও নাহি করে সুখ তোমা পানে।

১২

সন্দেহ ভাবনা চিন্তা আশঙ্কা ও পাপ
এরাই তোমার পথে ছড়ানো কেবল
এরা কি হইতে পারে সুখের আসন
এ-সব জঞ্জালে সুখ তিষ্ঠিতে কি পারে।

১৩

নাহি জানে তারা ইহা নাহি জানে তারা
নির্বোধ মানবগণ নাহি জানে ইহা
পবিত্র ধর্মের দ্বারে চিরস্থায়ী সুখ
পাতিয়াছে আপনার পবিত্র আসন।

১৪

ওই দেখো ছুটিয়াছে মানবের দল
তোমার পথের মাঝে দুষ্ট অভিলাষ
হত্যা অনুতাপ শোক বহিয়া মাথায়
ছুটেছে তোমার পথে সন্দিগ্ধ হৃদয়ে।

১৫

প্রতারণা প্রবঞ্চনা অত্যাচারচয়
পথের সম্বল করি চলে দ্রুতপদে
তোমার মোহন জালে পড়িবার তরে।
ব্যাধের বাঁশিতে যথা মৃগ পড়ে ফাঁদে।

১৬

দেখো দেখো বোধহীন মানবের দল
তোমার ও মোহময়ী বাঁশরির স্বরে
এবং তোমার সঙ্গী আশা উত্তেজনে
পাপের সাগরে ডুবে মুক্তার আশয়ে।

১৭

রৌদ্রের প্রখর তাপে দরিদ্র কৃষক
ঘর্মসিক্ত কলেবরে করিছে কর্ষণ
দেখিতেছে চারি ধারে আনন্দিত মনে
সমস্ত বর্ষের তার শ্রমের যে ফল।

১৮

দূরাকাঙ্ক্ষা হায় তব প্রলোভনে পড়ি
কর্ষিতে কর্ষিতে সেই দরিদ্র কৃষক
তোমার পথের শোভা মনোময় পটে
চিত্রিতে লাগিল হায় বিমুগ্ধ হৃদয়ে।

১৯

ওই দেখো আঁকিয়াছে হৃদয়ে তাহার
শোভাময় মনোহর অট্টালিকারাজি
হীরক মাণিক্য পূর্ণ ধনের ভাণ্ডার
নানা শিল্পে পরিপূর্ণ শোভন আপণ।

২০

মনোহর কুঞ্জবন সুখের আগার
শিল্প-পারিপাট্যযুক্ত প্রমোদভবন
গঙ্গা সমীরণ স্নিগ্ধ পল্লীর কানন
প্রজাপূর্ণ লোভনীয় বৃহৎ প্রদেশ।

২১

ভাবিল মুহূর্ত-তরে ভাবিল কৃষক
সকলই এসেছে যেন তারি অধিকারে
তারি ওই বাড়ি ঘর তারি ও ভাণ্ডার
তারি অধিকারে ওই শোভন প্রদেশ।

২২

মুহূর্তেক পরে তার মুহূর্তেক পরে
লীন হল চিত্রচয় চিত্তপট হতে
ভাবিল চমকি উঠি ভাবিল তখন
'আছে কি এমন সুখ আমার কপালে?'

২৩

'আমাদের হায় যত দুরাকাঙ্ক্ষাচয়
মানসে উদয় হয় মুহূর্তের তরে
কার্যে তাহা পরিণত না হতে না হতে
হৃদয়ের ছবি হায় হৃদয়ে মিশায়।'

২৪

ওই দেখো ছুটিয়াছে তোমার ও পথে
রক্তমাখা হাতে এক মানবের দল
সিংহাসন রাজদণ্ড ঐশ্বর্য মুকুট
প্রভুত্ব রাজত্ব আর গৌরবের তরে।

২৫

ওই দেখো গুপ্তহত্যা করিয়া বহন
চলিতেছে অঙ্গুলির 'পরে ভর দিয়া
চুপি চুপি ধীরে ধীরে অলক্ষিত ভাবে
তলবার হাতে করি চলিয়াছে দেখো।

২৬

হত্যা করিতেছে দেখো নিদ্রিত মানবে
সুখের আশয়ে বৃথা সুখের আশয়ে
ওই দেখো ওই দেখো রক্তমাখা হাতে
ধরিয়াছে রাজদণ্ড সিংহাসনে বসি।

২৭

কিন্তু হায় সুখলেশ পাবে কি কখন?
সুখ কি তাহারে করিবেক আলিঙ্গন?
সুখ কি তাহার হৃদে পাতিবে আসন?
সুখ কভু তারে কি গো কটাক্ষ করিবে?

২৮

নরহত্যা করিয়াছে যে সুখের তরে
যে সুখের তরে পাপে ধর্ম ভাবিয়াছে
বৃষ্টি বজ্র সহ্য করি যে সুখের তরে
ছুটিয়াছে আপনার অভীষ্ট সাধনে?

২৯

কখনোই নয় তাহা কখনোই নয়
পাপের কী ফল কভু সুখ হতে পারে
পাপের কী শাস্তি হয় আনন্দ ও সুখ
কখনোই নয় তাহা কখনোই নয়।

৩০

প্রজ্বলিত অনুতাপ হুতাশন কাছে
বিমল সুখের হায় স্নিগ্ধ সমীরণ
হুতাশনসম তপ্ত হয়ে উঠে যেন
তখন কি সুখ কভু ভালো লাগে আর।

৩১

নরহত্যা করিয়াছে যে সুখের তরে
যে সুখের তরে পাপে ধর্ম ভাবিয়াছে
ছুটেছে না মানি বাধা অভীষ্ট সাধনে
মনস্তাপে পরিণত হয়ে উঠে শেষে।

৩২

হৃদয়ের উচ্চাসনে বসি অভিলাষ
মানবদিগকে লয়ে ক্রীড়া কর তুমি
কাহারে বা তুলে দাও সিদ্ধির সোপানে
কারে ফেল নৈরাশ্যের নিষ্ঠুর কবলে।

৩৩

কৈকেয়ী হৃদয়ে চাপি দুষ্ট অভিলাষ!
চতুর্দশ বর্ষ রামে দিলে বনবাস,
কাড়িয়া লইলে দশরথের জীবন,
কাঁদালে সীতায় হায় অশোক-কাননে।

৩৪

রাবণের সুখময় সংসারের মাঝে
শান্তির কলস এক ছিল সুরক্ষিত
ভাঙিল হঠাৎ তাহা ভাঙিল হঠাৎ
তুমিই তাহার হও প্রধান কারণ।

৩৫

দুর্যোধন-চিত্ত হায় অধিকার করি
অবশেষে তাহারেই করিলে বিনাশ
পাণ্ডুপুত্রগণে তুমি দিলে বনবাস
পাণ্ডবদিগের হৃদে ক্রোধ জ্বালি দিলে।

৩৬

নিহত করিলে তুমি ভীষ্ম আদি বীরে
কুরুক্ষেত্র রক্তময় করে দিলে তুমি
কাঁপাইলে ভারতের সমস্ত প্রদেশ
পাণ্ডবে ফিরায়ে দিলে শূন্য সিংহাসন।

৩৭

বলি না হে অভিলাষ তোমার ও পথ
পাপেতেই পরিপূর্ণ পাপেই নির্মিত
তোমার কতকগুলি আছয়ে সোপান
কেহ কেহ উপকারী কেহ অপকারী।

৩৮

উচ্চ অভিলাষ! তুমি যদি নাহি কভু
বিস্তারিতে নিজ পথ পৃথিবীমণ্ডলে
তাহা হলে উন্নতি কি আপনার জ্যোতি
বিস্তার করিত এই ধরাতল-মাঝে?

৩৯

সকলেই যদি নিজ নিজ অবস্থায়
সন্তুষ্ট থাকিত নিজ বিদ্যা বুদ্ধিতেই
তাহা হলে উন্নতি কি আপনার জ্যোতি
বিস্তার করিত এই ধরাতল-মাঝে?

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা
অগ্রহায়ণ ১৭৯৬ শক
নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৮৭৪

হোক ভারতের জয়!

এসো এসো ভ্রাতৃগণ! সরল অন্তরে
সরল প্রীতির ভরে
সবে মিলি পরস্পরে
আলিঙ্গন করি আজ বহুদিন পরে।

এসেছে জাতীয় মেলা ভারতভূষণ,
ভারত সমাজে তবে
হৃদয় খুলিয়া সবে
এসো এসো এসো করি প্রিয়সম্ভাষণ।
দূর করো আত্মভেদ বিপদ-অঙ্কুর,
দূর করো মলিনতা
বিলাসিতা অলসতা,
হীনতা ক্ষীণতা দোষ করো সবে দূর।
ভীরুতা বঙ্গীয়জন-কলঙ্ক-প্রধান—
সে-কলঙ্ক দূর করো,
সাহসিক তেজ ধরো,
স্বকার্যকুশল হও হয়ে একতান।
হল না কিছুই করা যা করিতে এলে—
এই দেখো হিন্দুমেলা,
তবে কেন কর হেলা?
কী হবে কী হবে আর তুচ্ছ খেলা খেলে?
সাগরের স্রোতসম যাইছে সময়।
তুচ্ছ কাজে কেন রও,
স্বদেশহিতৈষী হও—
স্বদেশের জনগণে দাও রে অভয়।
নাহি আর জননীর পূর্বসুতগণ—
হরিশ্চন্দ্র যুধিষ্ঠির
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ বীর,
অনন্তজলধিতলে হয়েছে মগন।
নাহি সেই রাম আদি সম্রাট প্রাচীন,
বিক্রম-আদিত্যরাজ,
কালিদাস কবিরাজ,
পরাশর পারাশর পণ্ডিত প্রবীণ।
সকলেই জল বায়ু তেজ মৃত্তিকায়
মিশাইয়া নিজদেহ
অনন্ত ব্রহ্মের গেহ
পশেছে কীর্তিরে শুধু রাখিয়ে ধরায়।
আদরে সে প্রিয় সখী আচ্ছাদি গগনে
সে লোকবিশ্রুত নাম
সে বিশ্ববিজয়ী ধাম
নির্ঘোষে ঘুষিছে সদা অখিল ভুবনে।
যবনের রাজ্যকালে কীর্তির আধার
চিতোর-নগর নাম
অতুলবীরত্বধাম,
কেমন ছিল রে মনে ভাবো একবার।

এইরূপ কত শত নগর প্রাচীন
সুকীর্তি-তপন-করে
ভারত উজ্জ্বল ক'রে
অনন্ত কালের গর্ভে হয়েছে বিলীন।
নাহি সেই ভারতের একতা-বিভব,
পাষাণ বাঁধিয়া গলে
সকলের পদতলে
লুটাইছে আর্যগণ হইয়া নীরব।
গেল, হায়, সব সুখ অভাগী মাতার—
ছিল যত মনোআশা
নিল কাল সর্বনাশা,
প্রসন্ন বদন হল বিষণ্ণ তাঁহার।
কী আর হইবে মাতা খুলিয়া বদন।
দীপ্তভানু অস্ত গেল,
এবে কালরাত্রি এল,
বসনে আবরি মুখ কাঁদো সর্বক্ষণ।
বিশাল অপার সিন্ধু, গভীর নিস্বনে
যেখানে যেখানে যাও
কাঁদিতে কাঁদিতে গাও—
ডুবিল ভারতরবি অনন্ত জীবনে।
সুবিখ্যাত গৌড় যেই বঙ্গের রতন—
তার কীর্তিপ্রতিভায়
খ্যাতাপন্ন এ ধরায়
হয়েছিল একদিন বঙ্গবাসিগণ।
গেল সে বঙ্গের জ্যোতিঃ কিছুকাল পরে—
কোনো চিহ্ন নাহি তার,
পরিয়া হীনতাহার,
ডুবিয়াছে এবে বঙ্গ কলঙ্কসাগরে।
হিন্দুজনভ্রাতৃগণ! করি হে বিনয়—
একতা উৎসাহ ধরো,
জাতীয় উন্নতি করো,
ঘুষুক ভুবনে সবে ভারতের জয়।
জগদীশ! তুমি, নাথ, নিত্য-নিরাময়
করো কৃপা বিতরণ,
অধিবাসিজনগণ,
করুক উন্নতি— হোক্ ভারতের জয়!

বান্ধব
মাঘ ১২৮১

হিন্দুমেলায় উপহার

১

হিমাদ্রি শিখরে শিলাসন-'পরি,
গান ব্যাসঋষি বীণা হাতে করি—
কাঁপায়ে পর্বত শিখর কানন,
কাঁপায়ে নীহারশীতল বায়।

২

স্তব্ধ শিখর স্তব্ধ তরুলতা,
স্তব্ধ মহীরুহ নড়েনাকো পাতা।
বিহগ নিচয় নিস্তব্ধ অচল;
নীরবে নির্ঝর বহিয়া যায়।

৩

পূরণিমা রাত— চাঁদের কিরণ—
রজতধারায় শিখর, কানন,
সাগর-উরমি, হরিত-প্রান্তর,
প্লাবিত করিয়া গড়ায়ে যায়।

৪

ঝংকারিয়া বীণা কবিবর গায়,
'কেন রে ভারত কেন তুই, হায়,
আবার হাসিস্! হাসিবার দিন
আছে কি এখনো এ ঘোর দুঃখে।

৫

দেখিতাম যবে যমুনার তীরে,
পূর্ণিমা নিশীথে নিদাঘ সমীরে,
বিশ্রামের তরে রাজা যুধিষ্ঠির,
কাটাতেন সুখে নিদাঘ-নিশি।

৬

তখন ও-হাসি লেগেছিল ভালো,
তখন ও-বেশ লেগেছিল ভালো,
শ্মশান লাগিত স্বরগ সমান,
মরু উরবরা ক্ষেতের মতো।

৭

তখন পূর্ণিমা বিতরিত সুখ,
মধুর উষার হাস্য দিত সুখ,
প্রকৃতির শোভা সুখ বিতরিত
পাখির কূজন লাগিত ভালো।

৮

এখন তা নয়, এখন তা নয়,
এখন গেছে সে সুখের সময়।
বিষাদ আঁধার ঘেরেছে এখন,
হাসি খুশি আর লাগে না ভালো।

৯

অমার আঁধার আসুক এখন,
মরু হয়ে যাক ভারত-কানন,
চন্দ্র সূর্য হোক মেঘে নিমগন
প্রকৃতি-শৃঙ্খলা ছিঁড়িয়া যাক।

১০

যাক ভাগীরথী অগ্নিকুণ্ড হয়ে,
প্রলয়ে উপাড়ি পাড়ি হিমালয়ে,
ডুবাক ভারতে সাগরের জলে,
ভাঙিয়া চুরিয়া ভাসিয়া যাক।

১১

চাই না দেখিতে ভারতেরে আর,
চাই না দেখিতে ভারতেরে আর,
সুখ-জন্মভূমি চির বাসস্থান,
ভাঙিয়া চুরিয়া ভাসিয়া যাক।

১২

দেখেছি সে-দিন যবে পৃথ্বীরাজ,
সমরে সাধিয়া ক্ষত্রিয়ের কাজ,
সমরে সাধিয়া পুরুষের কাজ,
আশ্রয় নিলেন কৃতান্ত-কোলে।

১৩

দেখেছি সে-দিন দুর্গাবতী যবে,
বীরপত্নীসম মরিল আহবে
বীরবালাদের চিতার আগুন,
দেখেছি বিস্ময়ে পুলকে শোকে।

১৪

তাদের স্মরিলে বিদরে হৃদয়,
স্তব্ধ করি দেয় অন্তরে বিস্ময়;
যদিও তাদের চিতাভস্মরাশি,
মাটির সহিত মিশায়ে গেছে!

১৫

আবার সে-দিন(ও) দেখিয়াছি আমি,
স্বাধীন যখন এ-ভারতভূমি
কী সুখের দিন! কী সুখের দিন!
আর কি সে-দিন আসিবে ফিরে?

১৬

রাজা যুধিষ্ঠির (দেখেছি নয়নে)
স্বাধীন নৃপতি আর্য-সিংহাসনে,
কবিতার শ্লোকে বীণার তারেতে,
সে-সব কেবল রয়েছে গাঁথা!

১৭

শুনেছি আবার, শুনেছি আবার,
রাম রঘুপতি লয়ে রাজ্যভার,
শাসিতেন হায় এ-ভারতভূমি,
আর কি সে-দিন আসিবে ফিরে!

১৮

ভারত-কঙ্কাল আর কি এখন,
পাইবে হায় রে নূতন জীবন;
ভারতের ভস্মে আগুন জ্বলিয়া,
আর কি কখনো দিবে রে জ্যোতি।

১৯

তা যদি না হয় তবে আর কেন,
হাসিবি ভারত! হাসিবি রে পুনঃ,
সে-দিনের কথা জাগি স্মৃতিপটে,
ভাসে না নয়ন বিষাদজলে?

২০

অমার আঁধার আসুক এখন,
মরু হয়ে যাক ভারত-কানন,
চন্দ্র সূর্য হোক মেঘে নিমগন,
প্রকৃতি-শৃঙ্খলা ছিঁড়িয়া যাক।

২১

যাক ভাগীরথী অগ্নিকুণ্ড হয়ে,
প্রলয়ে উপাড়ি পাড়ি হিমালয়ে,
ডুবাক ভারতে সাগরের জলে,
ভাঙিয়া চুরিয়া ভাসিয়া যাক।

২২

মুছে যাক মোর স্মৃতির অক্ষর,
শূন্যে হোক লয় এ শূন্য অন্তর,
ডুবুক আমার অমর জীবন,
অনন্ত গভীর কালের জলে।'

অমৃতবাজার পত্রিকা
২৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৫

প্রকৃতির খেদ

[দ্বিতীয় পাঠ]

বিস্তারিয়া উর্মিমালা, সুকুমারী শৈলবালা
অমল সলিলা গঙ্গা অই বহি যায় রে।
প্রদীপ্ত তুষাররাশি, শুভ্র বিভা পরকাশি
ঘুমাইছে স্তব্ধভাবে গোমুখীর শিখরে।
ফুটিয়াছে কমলিনী অরুণের কিরণে।
নির্ঝরের এক ধারে, দুলিছে তরঙ্গ-ভরে
ঢুলে ঢুলে পড়ে জলে প্রভাত পবনে।
হেলিয়া নলিনী-দলে প্রকৃতি কৌতুকে দোলে
গঙ্গার প্রবাহ ধায় ধুইয়া চরণ।
ধীরে ধীরে বায়ু আসি দুলায়ে অলকরাশি
কবরী কুসুমগন্ধ করিছে হরণ।
বিজনে খুলিয়া প্রাণ, সপ্তমে চড়ায়ে তান,
শোভনা প্রকৃতিদেবী গা'ন ধীরে ধীরে।
নলিনী-নয়নদ্বয়, প্রশান্ত বিষাদময়
মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাস বহিল গভীরে।—
'অভাগী ভারত হায় জানিতাম যদি—
বিধবা হইবি শেষে, তা হলে কি এত ক্লেশে
তোর তরে অলংকার করি নিরমাণ।
তা হলে কি হিমালয়, গর্বে-ভরা হিমালয়,
দাঁড়াইয়া তোর পাশে, পৃথিবীরে উপহাসে,
তুষারমুকুট শিরে করি পরিধান।
তা হলে কি শতদলে তোর সরোবরজলে
হাসিত অমন শোভা করিয়া বিকাশ,
কাননে কুসুমরাশি, বিকাশি মধুর হাসি,
প্রদান করিত কি লো অমন সুবাস।
তা হলে ভারত তোরে, সৃজিতাম মরু করে
তরুলতা-জন-শূন্য প্রান্তর ভীষণ।
প্রজ্বলন্ত দিবাকর বর্ষিত জ্বলন্ত কর
মরীচিকা পান্থগণে করিত ছলনা।'

থামিল প্রকৃতি করি অশ্রু বরিষন
গলিল তুষারমালা, তরুণী সরসী-বালা
ফেলিল নীহারবিন্দু নির্ঝরিণীজলে।
কাঁপিল পাদপদল, উথলে গঙ্গার জল
তরুস্কন্ধ ছাড়ি লতা লুটায় ভূতলে।
ঈষৎ আঁধাররাশি, গোমুখী শিখর গ্রাসি
আটক করিল নব অরুণের কর।
মেঘরাশি উপজিয়া, আঁধারে প্রশ্রয় দিয়া,
ঢাকিয়া ফেলিল ক্রমে পর্বতশিখর।
আবার গাইল ধীরে প্রকৃতিসুন্দরী।—
'কাঁদ্ কাঁদ্ আরো কাঁদ্ অভাগী ভারত।
হায় দুখনিশা তোর, হল না হল না ভোর,
হাসিবার দিন তোর হল না আগত।
লজ্জাহীনা! কেন আর! ফেলে দে-না অলংকার
প্রশান্ত গভীর অই সাগরের তলে।
পূতধারা মন্দাকিনী ছাড়িয়া মরতভূমি
আবদ্ধ হউক পুন ব্রহ্ম-কমণ্ডলে।
উচ্চশির হিমালয়, প্রলয়ে পাউক লয়,
চিরকাল দেখেছে যে ভারতের গতি।
কাঁদ্ তুই তার পরে, অসহ্য বিষাদভরে
অতীত কালের চিত্র দেখাউক স্মৃতি।
দেখ্ আর্য-সিংহাসনে, স্বাধীন নৃপতিগণে
স্মৃতির আলেখ্যপটে রয়েছে চিত্রিত।
দেখ্ দেখি তপোবনে, ঋষিরা স্বাধীন মনে,
কেমন ঈশ্বর ধ্যানে রয়েছে ব্যাপৃত।
কেমন স্বাধীন মনে, গাইছে বিহঙ্গগণে,
স্বাধীন শোভায় শোভে কুসুম নিকর।
সূর্য উঠি প্রাতঃকালে, তাড়ায় আঁধারজালে
কেমন স্বাধীনভাবে বিস্তারিয়া কর।
তখন কি মনে পড়ে, ভারতী মানস-সরে
কেমন মধুর স্বরে বীণা ঝংকারিত।
শুনিয়া ভারত পাখি, গাইত শাখায় থাকি,
আকাশ পাতাল পৃথ্বী করিয়া মোহিত।
সে-সব স্মরণ করে কাঁদ্ লো আবার!
আয় রে প্রলয় ঝড়, গিরিশৃঙ্গ চূর্ণ কর্,
ধূর্জটি! সংহার-শিঙ্গা বাজাও তোমার।
প্রভঞ্জন ভীমবল, খুলে দেও বায়ুদল,
ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাক ভারতের বেশ।
ভারত-সাগর রুষি, উগরো বালুকারাশি,
মরুভূমি হয়ে থাক্ সমস্ত প্রদেশ।'
বলিতে নারিল আর প্রকৃতিসুন্দরী,

ধ্বনিয়া আকাশ ভূমি, গরজিল প্রতিধ্বনি,
কাঁপিয়া উঠিল বেগে ক্ষুব্ধ হিমগিরি।
জাহ্নবী উন্মত্তপারা, নির্ঝর চঞ্চল ধারা,
বহিল প্রচণ্ড বেগে ভেদিয়া প্রস্তর।
প্রবল তরঙ্গভরে, পদ্ম কাঁপে থরে থরে,
টলিল প্রকৃতি-সতী আসন-উপর।
সুচঞ্চল সমীরণে, উড়াইল মেঘগণে,
সুতীব্র রবির ছটা হল বিকীরিত।
আবার প্রকৃতি-সতী আরম্ভিল গীত।—
'দেখিয়াছি তোর আমি সেই এক বেশ।
অজ্ঞাত আছিলি যবে মানব নয়নে।
নিবিড় অরণ্য ছিল এ বিস্তৃত দেশ।
বিজন ছায়ায় নিদ্রা যেত পশুগণে।
কুমারী অবস্থা তোর সে কি পড়ে মনে?
সম্পদ বিপদ সুখ, হরষ বিষাদ দুখ
কিছুই না জানিতিস সে কি পড়ে মনে?
সে-এক সুখের দিন হয়ে গেছে শেষ—
যখন মানবগণ, করে নাই নিরীক্ষণ,
তোর সেই সুদুর্গম অরণ্য প্রদেশ।
না বিতরি গন্ধ হায়, মানবের নাসিকায়
বিজনে অরণ্যফুল যাইত শুকায়ে—
তপনকিরণ-তপ্ত, মধ্যাহ্নের বায়ে।
সে-এক সুখের দিন হয়ে গেছে শেষ।
সেইরূপ রহিলি না কেন চিরকাল।
না দেখি মনুষ্যমুখ, না জানিয়া দুঃখ সুখ,
না করিয়া অনুভব মান অপমান।
অজ্ঞান শিশুর মতো, আনন্দে দিবস যেত,
সংসারের গোলমালে থাকিয়া অজ্ঞান।
তা হলে তো ঘটিত না এ-সব জঞ্জাল।
সেইরূপ রহিলি না কেন চিরকাল।
সৌভাগ্যে হানিয়া বাজ, তা হলে তো তোরে আজ
অনাথা ভিখারীবেশে কাঁদিতে হত না।
পদাঘাতে উপহাসে, তা হলে তো কারাবাসে
সহিতে হত না শেষে এ ঘোর যাতনা।
অরণ্যেতে নিরিবিলি, সে যে তুই ভালো ছিলি,
কী কুক্ষণে করিলি রে সুখের কামনা।
দেখি মরীচিকা হায়, আনন্দে বিহ্বলপ্রায়
না জানি নৈরাশ্য শেষে করিবে তাড়না।
আর্যরা আইল শেষে, তোর এ বিজন দেশে,
নগরেতে পরিণত হল তোর বন।

হরষে প্রফুল্ল মুখে হাসিলি সরলা সুখে,
আশার দর্পণে মুখ দেখিলি আপন।
ঋষিগণ সমস্বরে অই সামগান করে
চমকি উঠিছে আহা হিমালয় গিরি।
ওদিকে ধনুর ধ্বনি, কাঁপায় অরণ্যভূমি
নিদ্রাগত মৃগগণে চমকিত করি।
সরস্বতী নদীকূলে, কবিরা হৃদয় খুলে
গাইছে হরষে আহা সুমধুর গীত।
বীণাপাণি কুতূহলে, মানসের শতদলে,
গাহেন সরসী-বারি করি উথলিত।
সেই-এক অভিনব, মধুর সৌন্দর্য তব,
আজিও অঙ্কিত তাহা রয়েছে মানসে।
আঁধার সাগরতলে একটি রতন জ্বলে
একটি নক্ষত্র শোভে মেঘান্ধ আকাশে।
সুবিস্তৃত অন্ধকূপে, একটি প্রদীপ-রূপে
জ্বলিতিস তুই আহা, নাহি পড়ে মনে?
কে নিভালে সেই ভাতি ভারতে আঁধার রাতি
হাতড়ি বেড়ায় আজি সেই হিন্দুগণে?
এই অমানিশা তোর, আর কি হবে না ভোর
কাঁদিবি কি চিরকাল ঘোর অন্ধকূপে।
অনন্তকালের মতো, সুখসূর্য অস্তগত
ভাগ্য কি অনন্তকাল রবে এই রূপে।
তোর ভাগ্যচক্র শেষে থামিল কি হেতা এসে,
বিধাতার নিয়মের করি ব্যভিচার।
আয় রে প্রলয় ঝড়, গিরিশৃঙ্গ চূর্ণ কর,
ধূর্জটি। সংহার-শিঙ্গা বাজাও তোমার।
প্রভঞ্জন ভীমবল, খুলে দেও বায়ুদল,
ছিন্নভিন্ন করে দিক ভারতের বেশ।
ভারতসাগর রুষি, উগরো বালুকারাশি
মরুভূমি হয়ে যাক সমস্ত প্রদেশ।'

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা
৭৯৭ আষাঢ় শক। জুন-জুলাই ১৮৭৫

প্রকৃতির খেদ

[প্রথম পাঠ]

১

বিস্তারিয়া ঊর্মিমালা,
বিধির মানস-বালা,
মানস-সরসী ওই নাচিছে হরষে।

প্রদীপ্ত তুষাররাশি,
শুভ্র বিভা পরকাশি,
ঘুমাইছে স্তব্ধভাবে হিমাদ্রি উরসে।

২

অদূরেতে দেখা যায়,
উজ্জ্বল রজত কায়,
গোমুখী হইতে গঙ্গা ওই বহে যায়।
ঢালিয়া পবিত্র ধারা,
ভূমি করি উরবরা,
চঞ্চল চরণে সতী সিন্ধুপানে ধায়।

৩

ফুটেছে কনকপদ্ম অরুণ কিরণে॥
অমল সরসী-'পরে,
কমল, তরঙ্গভরে,
ঢুলে ঢুলে পড়ে জলে প্রভাত পবনে।

৪

হেলিয়া নলিনীদলে,
প্রকৃতি কৌতুকে দোলে,
সরসী-লহরী ধায় ধুইয়া চরণ।
ধীরে ধীরে বায়ু আসি,
দুলায়ে অলকরাশি,
কবরী-কুসুম-গন্ধ করিছে হরণ।

৫

বিজনে খুলিয়া প্রাণ,
নিখাদে চড়ায়ে তান,
শোভনা প্রকৃতিদেবী গান ধীরে ধীরে।
নলিন নয়নদ্বয়,
প্রশান্ত বিষাদময়
ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস বহিল গভীরে।

৬

'অভাগী ভারত! হায়, জানিতাম যদি,
বিধবা হইবি শেষে,
তা হলে কি এত ক্লেশে,
তোর তরে অলংকার করি নিরমাণ?
তা হলে কি পূতধারা মন্দাকিনী নদী
তোর উপত্যকা-'পরে হত বহমান?

তা হলে কি হিমালয়,
গর্ব্বে ভরা হিমালয়
দাঁড়াইয়া তোর পাশে
পৃথিবীরে উপহাসে,
তুষারমুকুট শিরে করি পরিধান।

৭

তা হলে কি শতদলে,
তোর সরোবরজলে,
হাসিত অমন শোভা করিয়া বিকাশ?
কাননে কুসুমরাশি,
বিকাশি মধুর হাসি,
প্রদান করিত কি লো অমন সুবাস?

৮

তা হলে ভারত! তোরে,
সৃজিতাম মরু করে,
তরুলতা-জন-শূন্য প্রান্তর ভীষণ;
প্রজ্বলন্ত দিবাকর,
বর্ষিত জ্বলন্ত কর,
মরীচিকা পান্থদের করিত ছলন!'
থামিল প্রকৃতি করি অশ্রু বরিষন।

৯

গলিল তুষারমালা,
তরুণী সরসী বালা,
ফেনিল নীহার-নীর সরসীর জলে।
কাঁপিল পাদপদল;
উথলে গঙ্গার জল,
তরুস্কন্ধ ছাড়ি লতা লুটিল ভূতলে।

১০

ঈষৎ আঁধাররাশি,
গোমুখী শিখর গ্রাসি,
আটক করিয়া দিল অরুণের কর।
মেঘরাশি উপজিয়া,
আঁধারে প্রশ্রয় দিয়া,
ঢাকিয়া ফেলিল ক্রমে পর্বতশিখর।

১১

আবার ধরিয়া ধীরে সুমধুর তান।
প্রকৃতি বিষাদে দুঃখে আরম্ভিল গান।

'কাঁদ্! কাঁদ্! আরো কাঁদ্ অভাগী ভারত
হায়! দুঃখ-নিশা তোর,
হল না হল না ভোর,
হাসিবার দিন তোর হল না আগত?

১২

লজ্জাহীনা! কেন আর,
ফেলে দে-না অলংকার,
প্রশান্ত গভীর ওই সাগরের তলে?
পূতধারা মন্দাকিনী,
ছাড়িয়া মর্তভূমি
আবদ্ধ হউক পুনঃ ব্রহ্ম-কমণ্ডলে।

১৩

উচ্চশির হিমালয়,
প্রলয়ে পাউক লয়,
চিরকাল দেখেছে যে ভারতের গতি।
কাঁদ্ তুই তার পরে,
অসহ্য বিষাদভরে,
অতীত কালের চিত্র দেখাউক স্মৃতি।

১৪

দেখ্, আর্য সিংহাসনে,
স্বাধীন নৃপতিগণে,
স্মৃতির আলেখ্যপটে রয়েছে চিত্রিত।
দেখ্ দেখি তপোবনে,
ঋষিরা স্বাধীন মনে,
কেমন ঈশ্বরধ্যানে রয়েছে ব্যাপৃত।

১৫

কেমন স্বাধীন মনে,
গাহিছে বিহঙ্গগণে,
স্বাধীন শোভায় শোভে প্রসূননিকর।
সূর্য উঠি প্রাতঃকালে,
তাড়ায় আঁধারজালে,
কেমন স্বাধীনভাবে বিস্তারিয়া কর!

১৬

তখন কি মনে পড়ে—
ভারতী-মানস-সরে,
কেমন মধুর স্বরে বীণা ঝংকারিত।
শুনিয়ে ভারত-পাখি

গাহিত শাখায় থাকি
আকাশ পাতাল পৃথ্বী করিয়া মোহিত?

১৭

সে-সব স্মরণ করে, কাঁদ লো আবার।
'আয় রে প্রলয় ঝড়
গিরিশৃঙ্গ চূর্ণ কর
ধূর্জটি! সংহার-শিঙ্গা বাজাও তোমার!
স্বর্গমর্ত্য রসাতল হোক একাকার।

১৮

প্রভঞ্জন ভীম-বল!
খুলে দাও, বায়ুদল!
ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাক ভারতের বেশ।
ভারতসাগর রুষি
উগরো বালুকারাশি
মরুভূমি হয়ে যাক সমস্ত প্রদেশ।

১৯

বলিতে নারিল আর প্রকৃতি-সুন্দরী।
ধ্বনিয়া আকাশভূমি,
গরজিল প্রতিধ্বনি,
কাঁপিয়া উঠিল বেগে ক্ষুব্ধ হিমগিরি।

২০

জাহ্নবী উন্মত্তপারা,
নির্ঝর চঞ্চল ধারা,
বহিল প্রচণ্ডবেগে ভেদিয়া প্রস্তর।
মানস সরস-'পরে,
পদ্ম কাঁপে থরে থরে
দুলিল প্রকৃতি সতী আসন-উপর।

২১

সুচঞ্চল সমীরণে,
উড়াইল মেঘগণে,
সুতীব্র রবির ছটা হল বিকীরিত
আবার প্রকৃতি সতী আরম্ভিল গীত।

২২

'দেখিয়াছি তোর আমি সেই এক বেশ,
অজ্ঞাত আছিল যবে মানবনয়নে।
নিবিড় অরণ্য ছিল এ বিস্তৃত দেশ,

বিজন ছায়ায় নিদ্রা যেত পশুগণে,
কুমারী অবস্থা তোর সে কি পড়ে মনে?
সম্পদ বিপদ সুখ,
হরষ বিষাদ দুখ,
কিছুই না জানিতিস্ সে কি পড়ে মনে?
সে-এক সুখের দিন হয়ে গেছে শেষ,
যখন মানবগণ,
করে নাই নিরীক্ষণ,
তোর সেই সুদুর্গম অরণ্যপ্রদেশ।
না বিতরি গন্ধ হায়,
মানবের নাসিকায়
বিজনে অরণ্যফুল, যাইত শুকায়ে
তপনকিরণ-তপ্ত মধ্যাহ্নের বায়ে।
সে-এক সুখের দিন হয়ে গেছে শেষ।

২৩

সেইরূপ রহিল না কেন চিরকাল!
না দেখি মনুষ্যমুখ
না জানিয়া দুঃখসুখ
না করিয়া অনুভব মান অপমান।
অজ্ঞান শিশুর মতো
আনন্দে দিবস যেত,
সংসারের গোলমালে থাকিয়া অজ্ঞান।

তা হলে তো ঘটিত না এ-সব জঞ্জাল!
সেইরূপ রহিলি না কেন চিরকাল?
সৌভাগ্যে হানিল বাজ,
তা হলে তো তোরে আজ
অনাথা ভিখারীবেশে কাঁদিতে হত না?
পদাঘাতে উপহাসে,
তা হলে তো কারাবাসে
সহিতে হত না শেষে এ ঘোর যাতনা।

২৪

অরণ্যেতে নিরিবিলি,
সে যে তুই ভালো ছিলি,
কী কুক্ষণে করিলি রে সুখের কামনা।
দেখি মরীচিকা হায়!
আনন্দে বিহ্বলপ্রায়!
না জানি নৈরাশ্য শেষে করিবে তাড়না।

২৫

আইল হিন্দুরা শেষে,
তোর এ বিজন দেশে,
নগরেতে পরিণত হল তোর বন।
হরিষে প্রফুল্লমুখে,
হাসিলি সরলা! সুখে,
আশার দর্পণে মুখ দেখিলি আপন।

২৬

ঋষিগণ সমস্বরে
অই সামগান করে
চমকি উঠিছে আহা! হিমালয় গিরি।
ওদিকে ধনুর ধ্বনি,
কাঁপায় অরণ্যভূমি
নিদ্রাগত মৃগগণে চমকিত করি।
সরস্বতী-নদীকূলে,
কবিরা হৃদয় খুলে
গাইছে হরষে আহা সুমধুর গীত।
বীণাপাণি কুতূহলে,
মানসের শতদলে
গাহেন সরসী বারি করি উথলিত।

২৭

সেই এক অভিনব
মধুর সৌন্দর্য তব,
আজিও অঙ্কিত তাহা রয়েছে মানসে।
আঁধার সাগরতলে
একটি রতন জ্বলে
একটি নক্ষত্র শোভে মেঘান্ধ আকাশে।
সুবিস্তৃত অন্ধকূপে,
একটি প্রদীপ-রূপে
জ্বলিতিস তুই আহা,
নাহি পড়ে মনে?
কে নিভালে সেই ভাতি ভারতে আঁধার রাতি
হাতড়ি বেড়ায় আজি সেই হিন্দুগণে।
সেই অমানিশা তোর,
আর কি হবে না ভোর
কাঁদিবি কি চিরকাল ঘোর অন্ধকূপে।
অনন্ত কালের মতো,
সুখসূর্য অস্তগত,
ভাগ্য কি অনন্ত কাল রবে এই রূপে।

তোর ভাগ্যচক্র শেষে,
থামিল কি হেথা এসে,
বিধাতার নিয়মের করি ব্যভিচার
আয় রে প্রলয় ঝড়,
গিরিশৃঙ্গ চূর্ণ কর
ধূর্জটি! সংহার-শিঙ্গা বাজাও তোমার।
প্রভঞ্জন ভীমবল,
খুলে দেও বায়ুদল,
ছিন্ন ভিন্ন করে দিক ভারতের বেশ।
ভারতসাগর রুষি,
উগরো বালুকারাশি
মরুভূমি হয়ে যাক সমস্ত প্রদেশ।'

প্রতিবিম্ব
বৈশাখ ১২৮২

'জ্বল জ্বল চিতা! দ্বিগুণ, দ্বিগুণ'

জ্বল্ জ্বল্ চিতা! দ্বিগুণ, দ্বিগুণ,
পরান সঁপিবে বিধবা-বালা।
জ্বলুক্ জ্বলুক্ চিতার আগুন,
জুড়াবে এখনি প্রাণের জ্বালা॥
শোন্ রে যবন!— শোন্ রে তোরা,
যে জ্বালা হৃদয়ে জ্বালালি সবে,
সাক্ষী র'লেন দেবতা তার
এর প্রতিফল ভুগিতে হবে॥
ওই যে সবাই পশিল চিতায়,
একে একে একে অনলশিখায়,
আমরাও আয় আছি যে কজন,
পৃথিবীর কাছে বিদায় লই।
সতীত্ব রাখিব করি প্রাণপণ,
চিতানলে আজ সঁপিব জীবন—
ওই যবনের শোন্ কোলাহল,
আয় লো চিতায় আয় লো সই!
জ্বল্ জ্বল্ চিতা! দ্বিগুণ, দ্বিগুণ,
অনলে আহুতি দিব এ প্রাণ।
জ্বলুক্ জ্বলুক্ চিতার আগুন,
পশিব চিতায় রাখিতে মান।
দেখ্ রে যবন! দেখ্ রে তোরা!
কেমনে এড়াই কলঙ্ক-ফাঁসি;

জ্বলন্ত অনলে হইব ছাই,
তবু না হইব তোদের দাসী॥
আয় আয় বোন! আয় সখি আয়!
জ্বলন্ত অনলে সঁপিবারে কায়,
সতীত্ব লুকাতে জ্বলন্ত চিতায়,
জ্বলন্ত চিতায় সঁপিতে প্রাণ।
দেখ্ রে জগৎ, মেলিয়ে নয়ন,
দেখ্ রে চন্দ্রমা দেখ্ রে গগন!
স্বর্গ হতে সব দেখ্ দেবগণ,
জলদ-অক্ষরে রাখ্ গো লিখে।
স্পর্ধিত যবন, তোরাও দেখ্ রে,
সতীত্ব-রতন, করিতে রক্ষণ,
রাজপুত সতী আজিকে কেমন,
সঁপিছে পরান অনল-শিখে॥

[নভেম্বর ১৮৭৫]

প্রলাপ ১

১

গিরির উরসে নবীন নিঝর,
ছুটে ছুটে অই হতেছে সারা।
তলে তলে তলে নেচে নেচে চলে,
পাগল তটিনী পাগলপারা।

২

হৃদি প্রাণ খুলে ফুলে ফুলে ফুলে,
মলয় কত কী করিছে গান।
হেতা হোতা ছুটি ফুল-বাস লুটি,
হেসে হেসে হেসে আকুল প্রাণ।

৩

কামিনী পাপড়ি ছিঁড়ি ছিঁড়ি ছিঁড়ি,
উড়িয়ে উড়িয়ে ছিঁড়িয়ে ফেলে।
চুপি চুপি গিয়ে ঠেলে ঠেলে দিয়ে,
জাগায়ে তুলিছে তটিনীজলে।

৪

ফিরে ফিরে ফিরে ধীরে ধীরে ধীরে,
হরষে মাতিয়া, খুলিয়া বুক।
নলিনীর কোলে পড়ে ঢ'লে ঢ'লে,
নলিনী সলিলে লুকায় মুখ।

৫

হাসিয়া হাসিয়া কুসুমে আসিয়া,
ঠেলিয়া উড়ায় মধুপ দলে।
গুন্ গুন্ গুন্ রাগিয়া আগুন,
অভিশাপ দিয়া কত কী বলে।

৬

তপন কিরণ— সোনার ছটায়,
লুটায় খেলায় নদীর কোলে।
ভাসি ভাসি ভাসি স্বর্ণ ফুলরাশি
হাসি হাসি হাসি সলিলে দোলে।

৭

প্রজাপতিগুলি পাখা দুটি তুলি
উড়িয়া উড়িয়া বেড়ায় দলে।
প্রসারিয়া ডানা করিতেছে মানা
কিরণে পশিতে কুসুমদলে।

৮

মাতিয়াছে গানে সুললিত তানে
পাপিয়া ছড়ায় সুধার ধার।
দিকে দিকে ছুটে বন জাগি উঠে
কোকিল উতর দিতেছে তার।

৯

তুই কে লো বালা। বন করি আলা,
পাপিয়ার সাথে মিশায়ে তান।
হৃদয়ে হৃদয়ে লহরী তুলিয়া,
অমৃত ললিত করিস গান।

১০

স্বর্গ ছায় গানে বিমানে বিমানে
ছুটিয়া বেড়ায় মধুর তান।
মধুর নিশায় ছাইয়া পরান,
হৃদয় ছাপিয়া উঠেছে গান।

১১

নীরব প্রকৃতি নীরব ধরা।
নীরবে তটিনী বহিয়া যায়।
তরুণী ছড়ায় অমৃতধারা,
ভূধর, কানন, জগত ছায়।

১২

মাতাল করিয়া হৃদয় প্রাণ,
মাতাল করিয়া পাতাল ধরা।
হৃদয়ের তল অমৃতে ডুবায়ে,
ছড়ায় তরুণী অমৃতধারা।

১৩

কে লো তুই বালা! বন করি আলা,
ঘুমাইছে বীণা কোলের 'পরে।
জ্যোতির্ময়ী ছায়া স্বরগীয় মায়া,
ঢল ঢল ঢল প্রমোদ-ভরে।

১৪

বিভোর নয়নে বিভোর পরানে—
চারি দিক্ পানে চাহিস্ হেসে!
হাসি উঠে দিক্! ডাকি উঠে পিক্!
নদী ঢলে পড়ে পুলিন দেশে!!

১৫

চারি দিক্ চেয়ে কে লো তুই মেয়ে,
হাসি রাশি রাশি ছড়িয়ে দিস্?
আঁধার ছুটিয়া জোছনা ফুটিয়া
কিরণে উজলি উঠিছে দিশ্!

১৬

কমলে কমলে এ ফুলে ও ফুলে,
ছুটিয়া খেলিয়া বেড়াস্ বালা!
ছুটে ছুটে ছুটে খেলায় যেমন
মেঘে মেঘে মেঘে দামিনী-মালা।

১৭

নয়নে করুণা অধরে হাসি,
উছলি উছলি পড়িছে ছাপি।
মাথায় গলায় কুসুমরাশি
বাম করতলে কপোল চাপি।

১৮

এতকাল তোরে দেখিনু সেবিনু—
হৃদয়-আসনে দেবতা বলি।
নয়নে নয়নে, পরানে পরানে,
হৃদয়ে হৃদয়ে রাখিনু তুলি।

১৯

তবুও তবুও পূরিল না আশ,
তবুও হৃদয় রহেছে খালি।
তোরে প্রাণ মন করিয়া অর্পণ
ভিখারি হইয়া যাইব চলি।

২০

আয় কল্পনা মিলিয়া দুজনা,
ভূধরে কাননে বেড়াব ছুটি।
সরসী হইতে তুলিয়া কমল
লতিকা হইতে কুসুম লুটি।

২১

দেখিব উষার পুরব গগনে,
মেঘের কোলেতে সোনার ছটা।
তুষার-দর্পণে দেখিছে আনন
সাঁজের লোহিত জলদ-ঘটা।

২২

কনক-সোপানে উঠিছে তপন
ধীরে ধীরে ধীরে উদয়াচলে।
ছড়িয়ে ছড়িয়ে সোনার বরন,
তুষারে শিশিরে নদীর জলে।

২৩

শিলার আসনে দেখিব বসিয়ে,
প্রদোষে যখন দেবের বালা
পাহাড়ে লুকায়ে সোনার গোলা
আঁখি মেলি মেলি করিবে খেলা।

২৪

ঝর ঝর ঝর নদী যায় চলে,
ঝুরু ঝুরু ঝুরু বহিছে বায়।
চপল নিঝর ঠেলিয়া পাথর
ছুটিয়া— নাচিয়া— বহিয়া যায়।

২৫

বসিব দুজনে— গাইব দুজনে,
হৃদয় খুলিয়া, হৃদয়ব্যথা;
তটিনী শুনিবে, ভূধর শুনিবে
জগত শুনিবে সে-সব কথা।

২৬

যেথায় যাইবি তুই কলপনা,
আমিও সেথায় যাইব চলি।
শ্মশানে, শ্মশানে— মরু বালুকায়,
মরীচিকা যথা বেড়ায় ছলি।

২৭

আয় কলপনা আয় লো দুজনা,
আকাশে আকাশে বেড়াই ছুটি।
বাতাসে বাতাসে আকাশে আকাশে
নবীন সুনীল নীরদে উঠি।

২৮

বাজাইব বীণা আকাশ ভরিয়া,
প্রমোদের গান হরষে গাহি,
যাইব দুজনে উড়িয়া উড়িয়া,
অবাক জগত রহিবে চাহি!

২৯

জলধররাশি উঠিবে কাঁপিয়া,
নব নীলিমায় আকাশ ছেয়ে।
যাইব দুজনে উড়িয়া উড়িয়া,
দেবতারা সব রহিবে চেয়ে।

৩০

সুর-সুরধুনী আলোকময়ী,
উজলি কনক বালুকারাশি।
আলোকে আলোকে লহরী তুলিয়া,
বহিয়া বহিয়া যাইছে হাসি।

৩১

প্রদোষ তারায় বসিয়া বসিয়া,
দেখিব তাহার লহরীলীলা।
সোনার বালুকা করি রাশ রাশ,
সুর-বালিকারা করিবে খেলা।

৩২

আকাশ হইতে দেখিব পৃথিবী।
অসীম গগনে কোথায় পড়ে।
কোথায় একটি বালুকার রেণু
বাতাসে আকাশে আকাশে ঘোরে।

৩৩

কোথায় ভূধর কোথায় শিখর
অসীম সাগর কোথায় পড়ে।
কোথায় একটি বালুকার রেণু,
বাতাসে আকাশে আকাশে ঘোরে।

৩৪

আয় কল্পনা আয় লো দুজনা,
এক সাথে সাথে বেড়াব মাতি।
পৃথিবী ফিরিয়া জগত ফিরিয়া,
হরষে পুলকে দিবস রাতি।

জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব
অগ্রহায়ণ ১২৮২

প্রলাপ ২

ঢাল্! ঢাল্ চাঁদ! আরো আরো ঢাল্!
সুনীল আকাশে রজতধারা।
হৃদয় আজিকে উঠেছে মাতিয়া
পরান হয়েছে পাগলপারা!
গাইব রে আজ হৃদয় খুলিয়া
জাগিয়া উঠিবে নীরব রাতি!
দেখাব জগতে হৃদয় খুলিয়া
পরান আজিকে উঠেছে মাতি!
হাসুক পৃথিবী, হাসুক জগৎ,
হাসুক হাসুক চাঁদিমা তারা!
হৃদয় খুলিয়া করিব রে গান
হৃদয় হয়েছে পাগলপারা!
আধ ফুটো-ফুটো গোলাপ-কলিকা
ঘাড়খানি আহা করিয়া হেঁট
মলয় পবনে লাজুক বালিকা
সউরভ রাশি দিতেছে ভেট।
আয় লো প্রমদা! আয় লো হেথায়
মানস আকাশে চাঁদের ধারা!
গোলাপ তুলিয়া পর্ লো মাথায়
সাঁঝের গগনে ফুটিবে তারা।
হেসে ঢল্ ঢল্ পূর্ণ শতদল
ছড়িয়ে ছড়িয়ে সুরভিরাশি

নয়নে নয়নে, অধরে অধরে
জ্যোছনা উছলি পড়িছে হাসি!
চুল হতে ফুল খুলিয়ে খুলিয়ে
ঝরিয়ে ঝরিয়ে পড়িছে ভূমে!
খসিয়া খসিয়া পড়িছে আঁচল
কোলের উপর কমল থুয়ে!
আয় লো তরুণী! আয় লো হেথায়!
সেতার ওই যে লুটায় ভূমে
বাজা লো ললনে! বাজা একবার
হৃদয় ভরিয়ে মধুর ঘুমে!
নাচিয়া নাচিয়া ছুটিবে আঙুল!
নাচিয়া নাচিয়া ছুটিবে তান!
অবাক্ হইয়া মুখপানে তোর
চাহিয়া রহিব বিভল প্রাণ!
গলার উপরে সঁপি হাতখানি
বুকের উপরে রাখিয়া মুখ
আদরে অস্ফুটে কত কী যে কথা
কহিবি পরানে ঢালিয়া সুখ!
ওই রে আমার সুকুমার ফুল
বাতাসে বাতাসে পড়িছে দুলে
হৃদয়েতে তোরে রাখিব লুকায়ে
নয়নে নয়নে রাখিব তুলে।
আকাশ হইতে খুঁজিবে তপন
তারকা খুঁজিবে আকাশ ছেয়ে!
খুঁজিয়া বেড়াবে দিক্‌বধূগণ
কোথায় লুকাল মোহিনী মেয়ে?
আয় লো ললনে! আয় লো আবার
সেতারে জাগায়ে দে-না লো বালা!
দুলায়ে দুলায়ে ঘাড়টি নামায়ে
কপোলেতে চুল করিবে খেলা।
কী-যে ও মুরতি শিশুর মতন!
আধ ফুটো-ফুটো ফুলের কলি!
নীরব নয়নে কী-যে কথা কয়
এ জনমে আর যাব না ভুলি!
কী-যে ঘুমঘোরে ছায় প্রাণমন
লাজে ভরা ওই মধুর হাসি!
পাগলিনী বালা গলাটি কেমন
ধরিস্ জড়িয়ে ছুটিয়ে আসি!
ভুলেছি পৃথিবী ভুলেছি জগৎ
ভুলেছি, সকল বিষয় মানে!

হেসেছে পৃথিবী— হেসেছে জগৎ
কটাক্ষ করিলি কাহারো পানে!
আয়! আয় বালা! তোরে সাথে লয়ে
পৃথিবী ছাড়িয়া যাই লো চলে!
চাঁদের কিরণে আকাশে আকাশে
খেলায়ে বেড়াব মেঘের কোলে!
চল্ যাই মোরা আরেক জগতে
দুজনে কেবল বেড়াব মাতি
কাননে কাননে, খেলাব দুজনে
বনদেবীকোলে যাপিব রাতি!
যেখানে কাননে শুকায় না ফুল!
সুরভি-পূরিত কুসুমকলি!
মধুর প্রেমেরে দোষে না যেথায়
সেথায় দুজনে যাইব চলি!

জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব
ফাল্গুন ১২৮২

প্রলাপ ৩

আয় লো প্রমদা! নিঠুর ললনে
বার বার বল্ কী আর বলি!
মরমের তলে লেগেছে আঘাত
হৃদয় পরান উঠেছে জ্বলি!
আর বলিব না এই শেষবার
এই শেষবার বলিয়া লই
মরমের তলে জ্বলেছে আগুন
হৃদয় ভাঙিয়া গিয়াছে সই!
পাষাণে গঠিত সুকুমার ফুল!
হুতাশনময়ী দামিনী বালা!
অবারিত করি মরমের তল
কহিব তোরে লো মরম জ্বালা!
কতবার তোরে কহেছি ললনে!
দেখায়েছি খুলে হৃদয় প্রাণ!
মরমের ব্যথা, হৃদয়ের কথা,
সে-সব কথায় দিস্ নি কান!
কতবার সখি বিজনে বিজনে
শুনায়েছি তোরে প্রেমের গান,
প্রেমের আলাপ— প্রেমের প্রলাপ
সে-সব প্রলাপে দিস্ নি কান!

কতবার সখি! নয়নের জল
করেছি বর্ষণ চরণতলে!
প্রতিশোধ তুই দিস্ নিকো তার
শুধু এক ফোঁটা নয়নজলে!
শুধা ওলো বালা! নিশার আঁধারে
শুধা ওলো সখি! আমার রেতে
আঁখিজল কত করেছে গোপন
মর্ত্ত্য পৃথিবীর নয়ন হতে!
শুধা ওলো বালা নিশার বাতাসে
লুটিতে আসিয়া ফুলের বাস
হৃদয়ে বহন করেছে কিনা সে—
নিরাশ প্রেমীর মরম শ্বাস!
সাক্ষী আছ ওগো তারকা চন্দ্রমা!
কেঁদেছি যখন মরম শোকে—
হেসেছে পৃথিবী, হেসেছে জগৎ
কটাক্ষ করিয়া হেসেছে লোকে!
সহেছি সে-সব তোর তরে সখি!
মরমে মরমে জ্বলন্ত জ্বালা!
তুচ্ছ করিবারে পৃথিবী জগতে
তোমারি তরে লো শিখেছি বালা!
মানুষের হাসি তীব্র বিষমাখা
হৃদয় শোণিত করেছে ক্ষয়।
তোমারি তরে লো সহেছি সে-সব
ঘৃণা উপহাস করেছি জয়!
কিনিতে হৃদয় দিয়েছি হৃদয়
নিরাশ হইয়া এসেছি ফিরে;
অশ্রু মাগিবারে দিয়া অশ্রুজল
উপেক্ষিত হয়ে এয়েছি ফিরে।
কিছুই চাহি নি পৃথিবীর কাছে—
প্রেম চেয়েছিনু ব্যাকুল মনে।
সে বাসনা যবে হল না পূরণ
চলিয়া যাইব বিজন বনে!
তোর কাছে বালা এই শেষবার
ফেলিল সলিল ব্যাকুল হিয়া;
ভিখারি হইয়া যাইব লো চলে
প্রেমের আশায় বিদায় দিয়া।
সেদিন যখন ধন, যশ, মান,
অরির চরণে দিলাম ঢালি
সেইদিন আমি ভেবেছিনু মনে
উদাস হইয়া যাইব চলি।

তখনো হায় রে একটি বাঁধনে
আবদ্ধ আছিল পরান দেহ।
সে দৃঢ় বাঁধন ভেবেছিনু মনে
পারিবে না আহা ছিঁড়িতে কেহ!
আজ ছিঁড়িয়াছে, আজ ভাঙিয়াছে,
আজ সে স্বপন গিয়াছে চলি।
প্রেম ব্রত আজ করি উদ্‌যাপন
ভিখারি হইয়া যাইব চলি!
পাষাণের পটে ও মুরতিখানি
আঁকিয়া হৃদয়ে রেখেছি তুলি
গরবিনি! তোর ওই মুখখানি
এ জনমে আর যাব না ভুলি!
মুছিতে নারিব এ জনমে আর
নয়ন হইতে নয়নবারি
যতকাল ওই ছবিখানি তোর
হৃদয়ে রহিবে হৃদয় ভরি।
কী করিব বালা মরণের জলে
ওই ছবিখানি মুছিতে হবে!
পৃথিবীর লীলা ফুরাইবে আজ,
আজিকে ছাড়িয়া যাইব ভবে!
এ ভাঙা হৃদয় কত সবে আর!
জীর্ণ প্রাণ কত সহিবে জ্বালা!
মরণের জল ঢালিয়া অনলে
হৃদয় পরান জুড়াল বালা!
তোরে সখি এত বাসিতাম ভালো
খুলিয়া দেছিনু হৃদয়তল
সে-সব ভাবিয়া ফেলিবি না বালা
শুধু এক ফোঁটা নয়ন জল?
আকাশ হইতে দেখি যদি বালা
নিঠুর ললনে! আমার তরে
এক ফোঁটা আহা নয়নের জল
ফেলিস্‌ কখনো বিষাদভরে!
সেই নেত্রজলে— এক বিন্দু জলে
নিভায়ে ফেলিব হৃদয় জ্বালা!
প্রদোষে বসিয়া প্রদোষ তারায়
প্রেম গান সুখে করিব বালা!

জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব
বৈশাখ ১২৮৩

দিল্লি দরবার

দেখিছ না অয়ি ভারত-সাগর, অয়ি গো হিমাদ্রি দেখিছ চেয়ে,
প্রলয়-কালের নিবিড় আঁধার, ভারতের ভাল ফেলেছে ছেয়ে।
অনন্ত সমুদ্র তোমারই বুকে, সমুচ্চ হিমাদ্রি তোমারি সম্মুখে,
নিবিড় আঁধারে, এ ঘোর দুর্দিনে, ভারত কাঁপিছে হরষ-রবে!
শুনিতেছি নাকি শত কোটি দাস, মুছি অশ্রুজল, নিবারিয়া শ্বাস,
সোনার শৃঙ্খল পরিতে গলায় হরষে মাতিয়া উঠেছে সবে?
শুধাই তোমারে হিমালয়-গিরি, ভারতে আজি কি সুখের দিন?
তুমি শুনিয়াছ হে গিরি-অমর, অর্জুনের ঘোর কোদণ্ডের স্বর,
তুমি দেখিয়াছ সুবর্ণ আসনে, যুধিষ্ঠির-রাজা ভারত শাসনে,
তুমি শুনিয়াছ সরস্বতী-কূলে, আর্য-কবি গায় মন প্রাণ খুলে,
তোমারে শুধাই হিমালয়-গিরি, ভারতে আজি কি সুখের দিন?
তুমি শুনিতেছ ওগো হিমালয়, ভারত গাইছে ব্রিটিশের জয়,
বিষণ্ণ নয়নে দেখিতেছ তুমি— কোথাকার এক শূন্য মরুভূমি—
সেথা হতে আসি ভারত-আসন লয়েছে কাড়িয়া, করিছে শাসন,
তোমারে শুধাই হিমালয়-গিরি, ভারতে আজি কি সুখের দিন?
তবে এই-সব দাসের দাসেরা, কিসের হরষে গাইছে গান?
পৃথিবী কাঁপায়ে অযুত উচ্ছ্বাসে কিসের তরে গো উঠায় তান?
কিসের তরে গো ভারতের আজি, সহস্র হৃদয় উঠেছে বাজি?
যত দিন বিষ করিয়াছে পান, কিছুতে জাগে নি এ মহাশ্মশান,
বন্ধন শৃঙ্খলে করিতে সম্মান
ভারত জাগিয়া উঠেছে আজি?
কুমারিকা হতে হিমালয়-গিরি
এক তারে কভু ছিল না গাঁথা,
আজিকে একটি চরণ-আঘাতে, সমস্ত ভারত তুলেছে মাথা!
এসেছিল যবে মহম্মদ ঘোরি, স্বর্গ রসাতল জয়নাদে ভরি
রোপিতে ভারতে বিজয়ধ্বজা,
তখনো একত্রে ভারত জাগে নি, তখনো একত্রে ভারত মেলে নি,
আজ জাগিয়াছে, আজ মিলিয়াছে—
বন্ধনশৃঙ্খলে করিতে পূজা!
ব্রিটিশ-রাজের মহিমা গাহিয়া
ভূপগণ ওই আসিছে ধাইয়া
রতনে রতনে মুকুট ছাইয়া ব্রিটিশ-চরণে লোটাতে শির—
ওই আসিতেছে জয়পুররাজ, ওই যোধপুর আসিতেছে আজ
ছাড়ি অভিমান তেয়াগিয়া লাজ, আসিছে ছুটিয়া অযুত বীর!
হা রে হতভাগ্য ভারতভূমি,
কণ্ঠে এই ঘোর কলঙ্কের হার
পরিবারে আজি করি অলংকার
গৌরবে মাতিয়া উঠেছে সবে?

তাই কাঁপিতেছে তোর বক্ষ আজি
ব্রিটিশ-রাজের বিজয়রবে?
ব্রিটিশ-বিজয় করিয়া ঘোষণা, যে গায় গাক্‌ আমরা গাব না
আমরা গাব না হরষ গান,
এসো গো আমরা যে ক'জন আছি, আমরা ধরিব আরেক তান।

১৮৭৭

ভারতী

শুধাই অয়ি গো ভারতী তোমায়
তোমার ও বীণা নীরব কেন?
কবির বিজন মরমে লুকায়ে
নীরবে কেন গো কাঁদিছ হেন?
অযতনে, আহা, সাধের বীণাটি
ঘুমায়ে রয়েছে কোলের কাছে,
অযতনে, আহা, এলোথেলো চুল
এদিকে-ওদিকে ছড়িয়ে আছে।
কেন গো আজিকে এ-ভাব তোমার
কমলবাসিনী ভারতী রানী—
মলিন মলিন বসন ভূষণ
মলিন বদনে নাহিকো বাণী।
তবে কি জননি অমৃতভাষিণি
তোমার ও বীণা নীরব হবে?
ভারতের এই গগন ভরিয়া
ও বীণা আর না বাজিবে তবে?
দেখো তবে মাতা দেখো গো চাহিয়া
তোমার ভারত শ্মশান-পারা,
ঘুমায়ে দেখিছে সুখের স্বপন
নরনারী সব চেতনহারা।
যাহা-কিছু ছিল সকলি গিয়াছে,
সে-দিনের আর কিছুই নাই,
বিশাল ভারত গভীর নীরব,
গভীর আঁধার যে-দিকে চাই।
তোমারো কি বীণা ভারতী জননি,
তোমারো কি বীণা নীরব হবে?
ভারতের এই গগন ভরিয়া
ও-বীণা আর না বাজিবে তবে?
না না গো, ভারতী, নিবেদি চরণে
কোলে তুলে লও মোহিনী বীণা।

বিলাপের ধ্বনি উঠাও জননি,
দেখিব ভারত জাগিবে কি না।
অযুত অযুত ভারতনিবাসী
কাঁদিয়া উঠিবে দারুণ শোকে,
সে রোদনধ্বনি পৃথিবী ভরিয়া
উঠিবে, জননি, দেবতালোকে।
তা যদি না হয় তা হলে, ভারতি,
তুলিয়া লও গো বিজয়ভেরী,
বাজাও জলদগভীর গরজে
অসীম আকাশ ধ্বনিত করি।
গাও গো হুতাশ-পূরিত গান,
জ্বলিয়া উঠুক অযুত প্রাণ,
উথলি উঠুক ভারত-জলধি—
কাঁপিয়া উঠুক অচলা ধরা।
দেখিব তখন প্রতিভাহীনা
এ ভারতভূমি জাগিবে কি না,
ঢাকিয়া বয়ান আছে যে শয়ান
শরমে হইয়া মরমে-মরা!
এই ভারতের আসনে বসিয়া
তুমিই ভারতী গেয়েছ গান,
ছেয়েছে ধরার আঁধার গগন
তোমারি বীণার মোহন তান।
আজও তুমি, মাতা, বীণাটি লইয়া
মরম বিঁধিয়া গাও গো গান—
হীনবল সেও হইবে সবল,
মৃতদেহ সেও পাইবে প্রাণ।

ভারতী
শ্রাবণ ১২৮৪

হিমালয়

যেখানে জ্বলিছে সূর্য, উঠিছে সহস্র তারা,
প্রজ্বলিত ধূমকেতু বেড়াইছে ছুটিয়া।
অসংখ্য জগৎযন্ত্র, ঘুরিছে নিয়মচক্রে
অসংখ্য উজ্জ্বল গ্রহ রহিয়াছে ফুটিয়া।
গম্ভীর অচল তুমি, দাঁড়ায়ে দিগন্ত ব্যাপি,
সেই আকাশের মাঝে শুভ্র শির তুলিয়া।
নির্ঝর ছুটিছে বক্ষে, জলদ ভ্রমিছে শৃঙ্গে,
চরণে লুটিছে নদী শিলারাশি ঠেলিয়া।
তোমার বিশাল ক্রোড়ে লভিতে বিশ্রাম-সুখ
ক্ষুদ্র নর আমি এই আসিয়াছি ছুটিয়া।

পৃথিবীর কোলাহল,   পারি না সহিতে আর,
পৃথিবীর সুখ দুখ গেছে সব মিটিয়া।
সারাদিন, সারারাত,   সমুচ্চ শিখরে বসি,
চন্দ্র-সূর্য-গ্রহময় শূন্যপানে চাহিয়া।
জীবনের সন্ধ্যাকাল   কাটাইব ধীরে ধীরে,
নিরালয় মরমের গানগুলি গাহিয়া।
গভীর নীরব গিরি,   জোছনা ঢালিবে চন্দ্র,
দূরশৈলমালাগুলি চিত্রসম শোভিবে।
ধীরে ধরে ঝুরু ঝুরু,   কাঁপিবেক গাছপালা
একে একে ছোটো ছোটো তারাগুলি নিভিবে।
তখন বিজনে বসি,   নীরবে নয়ন মুদি,
স্মৃতির বিষণ্ণ ছবি আঁকিব এ মানসে।
শুনিব সুদূর শৈলে,   একতানে নির্ঝরিণী,
ঝর ঝর ঝর ঝর মৃদুধ্বনি বরষে।
ক্রমে ক্রমে আসিবেক   জীবনের শেষ দিন,
তুষার শয্যার 'পরে রহিব গো শুইয়া।
মর মর মর মর   দুলিবে গাছের পাতা
মাথার উপরে হুহু— বায়ু যাবে বহিয়া।
চোখের সামনে ক্রমে,   নিভিবে রবির আলো
বনগিরি নির্ঝরিণী অন্ধকারে মিশিবে।
তটিনীর মৃদুধ্বনি,   নিঝরের ঝর ঝর
ক্রমে মৃদুতর হয়ে কানে গিয়া পশিবে।
এতকাল যার বুকে,   কাটিয়া গিয়াছে দিন,
দেখিতে সে ধরাতল শেষ বার চাহিব।
সারাদিন কেঁদে কেঁদে—   ক্লান্ত শিশুটির মতো
অনন্তের কোলে গিয়া ঘুমাইয়া পড়িব।
সে ঘুম ভাঙিবে যবে,   নূতন জীবন ল'য়ে,
নূতন প্রেমের রাজ্যে পুন আঁখি মেলিব।
যত কিছু পৃথিবীর   দুখ, জ্বালা, কোলাহল,
ডুবায়ে বিস্মৃতি-জলে মুছে সব ফেলিব।
ওই যে অসংখ্য তারা,   ব্যাপিয়া অনন্ত শূন্য
নীরবে পৃথিবী-পানে রহিয়াছে চাহিয়া।
ওই জগতের মাঝে,   দাঁড়াইব এক দিন,
হৃদয় বিস্ময়-গান উঠিবেক গাহিয়া।
রবি শশি গ্রহ তারা,   ধূমকেতু শত শত
আঁধার আকাশ ঘেরি নিঃশবদে ছুটিছে।
বিস্ময়ে শুনিব ধীরে,   মহাস্তব্ধ প্রকৃতির
অভ্যন্তর হতে এক গীতধ্বনি উঠিছে।
গভীর আনন্দ-ভরে,   বিস্ফারিত হবে মন
হৃদয়ের ক্ষুদ্র ভাব যাবে সব ছিঁড়িয়া।

তখন অনন্ত কাল,   অনন্ত জগত-মাঝে
ভুঞ্জিব অনন্ত প্রেম মনঃপ্রাণ ভরিয়া।

ভারতী
ভাদ্র ১২৮৪

আগমনী

সুধীরে নিশার আঁধার ভেদিয়া
ফুটিল প্রভাততারা।
হেথা হোথা হতে পাখিরা গাহিল
ঢালিয়া সুধার ধারা।
মৃদুল প্রভাতসমীর পরশে
কমল নয়ন খুলিল হরষে,
হিমালয় শিরে অমল আভায়
শোভিল ধবল তুষারজটা।
খুলি গেল ধীরে পূরবদ্বার,
ঝরিল কনককিরণধার,
শিখরে শিখরে জ্বলিয়া উঠিল,
রবির বিমল কিরণছটা।
গিরিগ্রাম আজি কিসের তরে,
উঠেছে নাচিয়া হরষভরে,
অচল গিরিও হয়েছে যেমন
অধীর পাগল-পারা।
তটিনী চলেছে নাচিয়া ছুটিয়া,
কল্লরব উঠে আকাশে ফুটিয়া,
ঝর ঝর ঝর করিয়া ধ্বনি
ঝরিছে নিঝরধারা।
তুলিয়া কুসুম গাঁথিয়া মালা,
চলিয়াছে গিরিবাসিনী বালা,
অধর ভরিয়া সুখের হাসিতে
মাতিয়া সুখের গানে।
মুখে একটিও নাহিকো বাণী
শবদচকিতা মেনকারানী
তৃষিত নয়নে আকুল হৃদয়ে,
চাহিয়া পথের পানে।
আজ মেনকার আদরিণী উমা
আসিবে বরষ-পরে।
তাইতে আজিকে হরষের ধ্বনি
উঠিয়াছে ঘরে ঘরে।
অধীর হৃদয়ে রানী আসে যায়,

কভু বা প্রাসাদশিখরে দাঁড়ায়,
কভু বসে ওঠে, বাহিরেতে ছোটে
এখনো উমা মা এল না কেন?
হাসি হাসি মুখে পুরবাসীগণে
অধীরে হাসিয়া ভূধরভবনে,
'কই উমা কই' বলে 'উমা কই',
তিলেক বেয়াজ সহে না যেন!
বরষের পরে আসিবেন উমা
রানীর নয়নতারা,
ছেলেবেলাকার সহচরী যত
হরষে পাগল-পারা।
ভাবিছে সকলে আজিকে উমায়
দেখিবে নয়ন ভ'রে,
আজিকে আবার সাজাব তাহায়
বালিকা উমাটি ক'রে।
তেমনি মৃণালবলয়-যুগলে,
তেমনি চিকন-চিকন বাকলে,
তেমনি করিয়া পরাব গলায়
বনফুল তুলি গাঁথিয়া মালা।
তেমনি করিয়া পরায়ে বেশ
তেমনি করিয়া এলায়ে কেশ,
জননীর কাছে বলিব গিয়ে
'এই নে মা তোর তাপসী বালা'।
লাজ-হাসি-মাখা মেয়ের মুখ
হেরি উথলিবে মায়ের সুখ,
হরষে জননী নয়নের জলে
চুমিবে উমার সে মুখখানি।
হরষে ভূধর অধীর-পারা
হরষে ছুটিবে তটিনীধারা,
হরষে নিঝর উঠিবে উছসি,
উঠিবে উছসি মেনকারানী।
কোথা তবে তোরা পুরবাসী মেয়ে
যেথা যে আছিস আয় তোরা ধেয়ে
বনে বনে বনে ফিরিবি বালা,
তুলিবি কুসুম, গাঁথিবি মালা,
পরাবি উমার বিনোদ-গলে।
তারকা-খচিত গগন-মাঝে
শারদ চাঁদিমা যেমন সাজে
তেমনি শারদা অবনী শশী
শোভিবে কেমন অবনীতলে।

ওই বুঝি উমা, ওই বুঝি আসে,
দেখো চেয়ে গিরিরানী।
আলুলিত কেশ, এলোথেলো বেশ,
হাসি-হাসি মুখখানি।
বালিকারা সব আসিল ছুটিয়া
দাঁড়াল উমারে ঘিরি।
শিথিল চিকুরে অমল মালিকা
পরাইয়া দিল ধীরি।
হাসিয়া হাসিয়া কহিল সবাই
উমার চিবুক ধ'রে,
'বলি গো স্বজনী, বিদেশে বিজনে
আছিলি কেমন করে?
আমরা তো সখি সারাটি বরষ
রহিয়াছি পথ চেয়ে—
কবে আসিবেক আমাদের সেই
মেনকারানীর মেয়ে!
এই নে, স্বজনী, ফুলের ভূষণ
এই নে, মৃণাল-বালা,
হাসিমুখখানি কেমন সাজিবে
পরিলে কুসুম-মালা।'
কেহ বা কহিল, 'এবার স্বজনি,
দিব না তোমায় ছেড়ে
ভিখারি ভবের সরবস ধন
আমরা লইব কেড়ে।
বলো তো, স্বজনী, এ কেমন-ধারা
এয়েছ বরষ-পরে,
কেমনে নিদয়া রহিবে কেবল
তিনটি দিনের তরে।'
কেহ বা কহিল, 'বলো দেখি, সখী,
মনে পড়ে ছেলেবেলা?
সকলে মিলিয়া এ গিরিভবনে
কত-না করেছি খেলা!
সেই মনে পড়ে যেদিন স্বজনী
গেলে তপোবন-মাঝে—
নয়নের জলে আমরা সকলে
সাজানু তাপসী-সাজে।
কোমল শরীরে বাকল পরিয়া
এলায়ে নিবিড় কেশ,
লভিবারে পতি মনের মতন
কত-না সহিলে ক্লেশ।

ছেলেবেলাকার সখীদের সব
এখনো তো মনে আছে,
ভয় হয় বড়ো পতির সোহাগে
ভুলিস তাদের পাছে।'
কত কী কহিয়া হরষে বিষাদে
চলিল আলয়-মুখে,
কাঁদিয়া বালিকা পড়িল ঝাঁপায়ে
আকুল মায়ের বুকে।
হাসিয়া কাঁদিয়া কহিল রানী,
চুমিয়া উমার অধরখানি,
'আয় মা জননি আয় মা কোলে,
আজ বরষের পরে।
দুখিনী মাতার নয়নের জল
তুই যদি, মা গো, না মুছাবি বল্‌
তবে উমা আর, কে আছে আমার
এ শূন্য আঁধার ঘরে?
সারাটি বরষ যে দুখে গিয়াছে
কী হবে শুনে সে ব্যথা,
বল্‌ দেখি, উমা, পতির ঘরের
সকল কুশল-কথা।'
এত বলি রানী হরষে আদরে
উমারে কোলেতে লয়ে,
হরষের ধারা বরষি নয়নে
পশিল গিরি-আলয়ে।
আজিকে গিরির প্রাসাদে কুটিরে
উঠিল হরষ-ধ্বনি,
কত দিন পরে মেনকা-মহিষী
পেয়েছে নয়নমণি।

ভারতী
আশ্বিন ১২৮৪

আকুল আহ্বান

অভিমান ক'রে কোথায় গেলি,
আয় মা ফিরে, আয় মা ফিরে আয়।
দিন রাত কেঁদে কেঁদে ডাকি
আয় মা ফিরে, আয় মা ফিরে আয়।
সন্ধে হল, গৃহ অন্ধকার,
মা গো, হেথায় প্রদীপ জ্বলে না।
একে একে সবাই ঘরে এল,
আমায় যে মা, 'মা' কেউ বলে না।

সময় হল বেঁধে দেব চুল,
পরিয়ে দেব রাঙা কাপড়খানি।
সাঁজের তারা সাঁজের গগনে—
কোথায় গেল, রানী আমার রানী!

ও মা, রাত হল, আঁধার করে আসে,
ঘরে ঘরে প্রদীপ নিবে যায়।
আমার ঘরে ঘুম নেইকো শুধু—
শূন্য শেজ শূন্যপানে চায়।
কোথায় দুটি নয়ন ঘুমে ভরা,
সেই নেতিয়ে-পড়া ঘুমিয়ে-পড়া মেয়ে।
শ্রান্ত দেহ ঢুলে ঢুলে পড়ে,
তবু মায়ের তরে আছে বুঝি চেয়ে।

আঁধার রাতে চলে গেলি তুই,
আঁধার রাতে চুপি চুপি আয়।
কেউ তো তোরে দেখতে পাবে না,
তারা শুধু তারার পানে চায়।
পথে কোথাও জনপ্রাণী নেই,
ঘরে ঘরে সবাই ঘুমিয়ে আছে।
মা তোর শুধু একলা দ্বারে বসে,
চুপি চুপি আয় মা, মায়ের কাছে।
আমি তোরে নুকিয়ে রেখে দেব,
রেখে দেব বুকের মধ্যে করে—
থাক্, মা, সে তার পাষাণ হৃদি নিয়ে
অনাদর যে করেছে তোরে।
মলিন মুখে গেলি তাদের কাছে—
তবু তারা নিলে না মা কোলে?
বড়ো বড়ো আঁখি দুখানি
রইলি তাদের মুখের পানে তুলে?
এ জগৎ কঠিন— কঠিন—
কঠিন, শুধু মায়ের প্রাণ ছাড়া।
সেইখানে তুই আয় মা ফিরে আয়—
এত ডাকি দিবি নে কি সাড়া?

হে ধরণী, জীবের জননী,
শুনেছি যে মা তোমায় বলে।
তবে কেন তোর কোলে সবে
কেঁদে আসে কেঁদে যায় চলে।
তবে কেন তোর কোলে এসে
সন্তানের মেটে না পিপাসা।

কেন চায়— কেন কাঁদে সবে,
কেন কেঁদে পায় না ভালোবাসা।
কেন হেথা পাষাণ পরান
কেন সবে নীরস নিষ্ঠুর!
কেঁদে কেঁদে দুয়ারে যে আসে
কেন তারে করে দেয় দূর!
কেঁদে যে-জন ফিরে চলে যায়,
তার তরে কাঁদিস নে কেহ—
এই কি মা জননীর প্রাণ!
এই কি মা জননীর স্নেহ!

ফুলের দিনে সে যে চলে গেল,
ফুল ফোটা সে দেখে গেল না।
ফুলে ফুলে ভরে গেল বন,
একটি সে তো পরতে পেল না।
ফুল ফোটে, ফুল ঝরে যায়—
ফুল নিয়ে আর সবাই পরে।
ফিরে এসে সে যদি দাঁড়ায়,
একটিও রবে না তার তরে!
তার তরে মা কেবল আছে,
আছে শুধু জননীর স্নেহ,
আছে শুধু মা'র অশ্রুজল—
কিছু নাই, নাই আর কেহ।
খেলত যারা তারা খেলতে গেছে,
হাসত যারা তারা আজও হাসে,
তার তরে কেহ ব'সে নেই,
মা শুধু রয়েছে তারি আশে!

হায়, বিধি, এ কি ব্যর্থ হবে!
ব্যর্থ হবে মা'র ভালোবাসা!
কত জনের কত আশা পুরে,
ব্যর্থ হবে মার প্রাণের আশা।

বালক
আশ্বিন-কার্তিক ১২৯২

অবসাদ

দয়াময়ি, বাণি, বীণাপাণি,
জাগাও— জাগাও, দেবি, উঠাও আমারে দীন হীন।
ঢালো এ হৃদয়মাঝে জ্বলন্ত অনলময় বল।
দিনে দিনে অবসাদে হইতেছি অবশ মলিন;

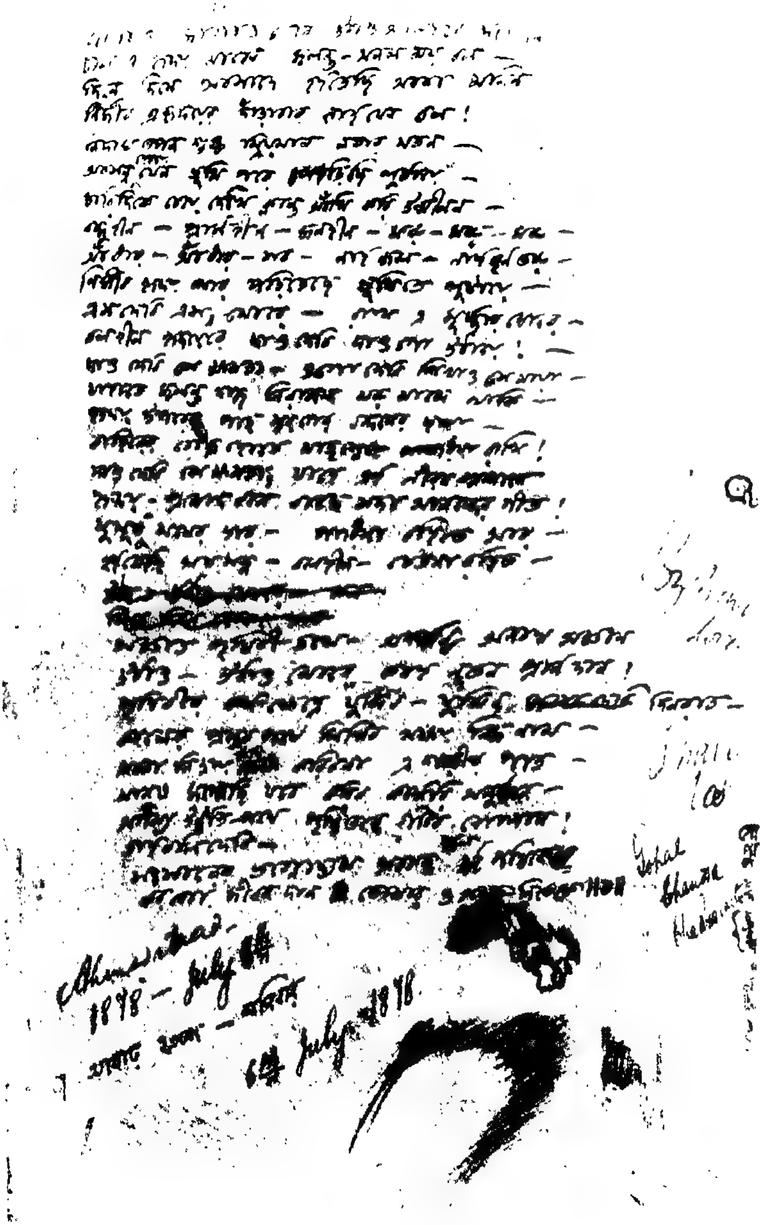

'অবসাদ' কবিতার পাণ্ডুলিপিচিত্র

মালতীপুঁথি

নির্জীব এ হৃদয়ের দাঁড়াবার নাই যেন বল।
নিদাঘ-তপন-শুষ্ক ম্রিয়মাণ লতার মতন
ক্রমে অবসন্ন হয়ে পড়িতেছি ভূমিতে লুটায়ে,
চারিদিকে চেয়ে দেখি শ্রান্ত আঁখি করি উন্মীলন—
বন্ধুহীন-প্রাণহীন-জনহীন মরু মরু মরু—
আঁধার— আঁধার সব— নাই জল নাই তৃণ তরু,
নির্জীব হৃদয় মোর ভূমিতলে পড়িছে লুটায়ে;
এসো দেবি, এসো, মোরে
রাখো এ মূর্ছার ঘোরে;
বলহীন হৃদয়েরে দাও দেবি, দাও গো উঠায়ে।
দাও দেবি সে ক্ষমতা, ওগো দেবি, শিখাও সে মায়া—
যাহাতে জ্বলন্ত, দগ্ধ, নিরানন্দ মরুমাঝে থাকি
হৃদয় উপরে পড়ে স্বরগের নন্দনের ছায়া—
শুনি সুহৃদের স্বর থাকিলেও বিজনে একাকী।
দাও দেবি সে ক্ষমতা, যাহে এই নীরব শ্মশানে,
হৃদয়-প্রমোদ-বনে বাজে সদা আনন্দের গীত।
মুমূর্ষু মনের ভার—
পারি না বহিতে আর—
হইতেছি অবসন্ন— বলহীন— চেতনা-রহিত—
অজ্ঞাত পৃথিবীতলে— অকর্মণ্য-অনাথ-অজ্ঞান—
উঠাও— উঠাও মোরে— করহ নূতন প্রাণ দান।
পৃথিবীর কর্মক্ষেত্রে যুঝিব— যুঝিব দিবারাত—
কালের প্রস্তরপটে লিখিব অক্ষয় নিজ নাম।
অবশ নিদ্রায় পড়ি করিব না এ শরীর পাত,
মানুষ জন্মেছি যবে করিব কর্মের অনুষ্ঠান।
দুর্গম উন্নতিপথে পৃথ্বীতরে গঠিব সোপান,
তাই বলি দেবি—
সংসারের ভগ্নোদ্যম, অবসন্ন, দুর্বল পথিকে
করো গো জীবন দান তোমার ও অমৃত-নিষেকে।

বালক
চৈত্র ১২৯২
রচনা : আমেদাবাদ
৬ জুলাই ১৮৭৮

মেঘ্‌লা শ্রাবণের বাদ্‌লা রাতি

মেঘ্‌লা শ্রাবণের বাদ্‌লা রাতি,
বাহিরে ঝড় বাতাস,
জান্‌লা রুধি ঘরে জ্বালায়ে বাতি
বন্ধু মিলি খেলে তাস।

বন্ধু পাঁচ জনে   বসিয়া গৃহকোণে
চিত্ত বড়োই উদাস,
কর্ম হাতে নাই,   কভু বা উঠে হাই
কভু বা করে হা-হুতাশ।
বিরস ম্লান-মুখো,   মেজাজ বড়ো রুখো,
শেষে বা বাধে হাতাহাতি!
আকাশ ঢাকা মেঘে,   বাতাস রেগেমেগে
বাহিরে করে মাতামাতি।

অবন বলে ভাই   তর্কে কাজ নাই
প্রমারা হোক এক বাজি—
সমর মুদি চোখ   বলিল তাই হোক
সত্য কহে আছি রাজি।
বজ্র দিক জুড়ি   করিছে হুড়োমুড়ি
হরিশ ভয়ে হত-বুলি,
গগন এক ধারে   কিছু না বলি কারে
পলকে ছবি নিল তুলি।

শারদা

ওই শুনি শূন্যপথে রথচক্রধ্বনি,
ও নহে শারদমেঘে লঘু গরজন।
কাহার আসার আশে নীরবে অবনী
আকুল শিশিরজলে ভাসায় নয়ন।
কার কণ্ঠহার হ'তে সোনার ছটায়
চারি দিকে ঝলমল শারদ-কিরণ!
প্রফুল্ল মালতী বনে প্রভাতে লুটায়
কাহার অমল শুভ্র অঞ্চল-বসন!
কাহার মঞ্জুল হাসি, সুগন্ধ নিশ্বাস
নিকুঞ্জে ফুটায়ে তুলে শেফালি কামিনী।
ওকি রাজহংসরব, ওই কলভাষ?
নহে গো, বাজিছে অঙ্গে কঙ্কণ কিঙ্কিনী।
ছাড়িয়া অনন্তধাম সৌন্দর্য-কৈলাস,
আসিছেন এ বঙ্গের আনন্দ-রূপিণী।

মালতী পুঁথি

হা বিধাতা— ছেলেবেলা হতেই এমন

প্রথম সর্গ

হা বিধাতা— ছেলেবেলা হতেই এমন
দুর্বল হৃদয় লয়ে লভেছি জনম,
আশ্রয় না পেলে কিছু, হৃদয় আমার
অবসন্ন হয়ে পড়ে লতিকার মতো।
স্নেহ-আলিঙ্গন-পাশে বদ্ধ না হইলে
কাঁদে ভূমিতলে পড়ে হয়ে ম্রিয়মাণ।
তবে হে ঈশ্বর! তুমি কেন গো আমারে।
ঐশ্বর্যের আড়ম্বরে করিলে নিক্ষেপ;
যেখানে সবারি হৃদি যন্ত্রের মতন;
স্নেহ প্রেম হৃদয়ের বৃত্তি সমুদয়
কঠোর নিয়মে যেথা হয় নিয়মিত।
কেন আমি হলেম না কৃষক-বালক,
ভায়ে ভায়ে মিলে মিলে করিতাম খেলা,
গ্রামপ্রান্তে প্রান্তরের পর্ণের কুটিরে
পিতামাতা ভাইবোন সকলে মিলিয়া
স্বাভাবিক হৃদয়ের সরল উচ্ছ্বাসে,
মুক্ত ওই প্রান্তরের বায়ুর মতন
হৃদয়ের স্বাধীনতা করিতাম ভোগ।
শ্রান্ত হলে খেলা-সুখে সন্ধ্যার সময়ে
কুটিরে ফিরিয়া আসি ভালোবাসি যারে
তার স্নেহময় কোলে রাখিতাম মাথা,
তা হইলে দ্বেষ ঘৃণা মিথ্যা অপবাদ
মুহূর্তে মুহূর্তে আর হত না সহিতে।
হৃদয়বিহীন প্রাসাদের আড়ম্বর
গর্বিত এ নগরের ঘোর কোলাহল
কৃত্রিম এ ভদ্রতার কঠোর নিয়ম
ভদ্রতার কাষ্ঠ হাসি, নহে মোর তরে।
দরিদ্র গ্রামের সেই ভাঙাচোরা পথ,
গৃহস্থের ছোটোখাটো নিভৃত কুটির
যেখানে কোথা বা আছে, তৃণ রাশি রাশি,
কোথা বা গাছের তলে বাঁধা আছে গাভী
অযত্নে চিবায় কভু গাছের পল্লব
কভু বা দেখিছে চাহি বাৎসল্য-নয়নে
ক্রীড়াশীল কুটিরের শিশুদের দিকে।
কুটিরের বধূগণ উঠিয়া প্রভাতে
আপনার আপনার কাজে আছে রত।

সে ক্ষুদ্র কুটির আর ভাঙাচোরা পথ,
দিগন্তের পদতলে বিশাল প্রান্তর
... যৌবনময় হৃদয়ে যাহার
... তৃণফুল শুকায় নিভৃতে
ছবি দেখে কল্পনার স্বপ্নের মতন
তা হইলে মধুময় কবিতার মতো
কেমন আরামে যেত জীবন কাটিয়া।

এমন হৃদয়হীন উপেক্ষার মাঝে
একজন ছিল মোর প্রেমের প্রতিমা,
অমিয়া, সে বালিকারে কত ভালোবাসি।
দিগন্তের দূর প্রান্তে ঘুমন্ত চন্দ্রমা,
ধবল জলদ জালে, আধো আধো ঢাকা—
বালিকা তেমনি আহা মধুর কোমল।
সেই বালা দয়া করি হৃদয় আমার
রেখেছিল জুড়াইয়া স্নেহের ছায়ায়।
অনন্ত-প্রণয়ময়ী রমণী তোমরা
পৃথিবীর মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী।
তোমাদের স্নেহধারা যদি না বর্ষিত
হৃদয় হইত তবে মরুভূমিসম
স্নেহ দয়া প্রেম ভক্তি যাইত শুকায়ে।
তোমরাই পৃথিবীর সংগীত, কবিতা,
স্বর্গ, সে তো তোমাদের হৃদয়ে বিরাজে
সে হৃদয়ে স্নেহছায়ে দিলে গো আশ্রয়
পাষাণ-হৃদয় সেও যায় গো গলিয়া!
কেহই আশ্রয় যবে ছিল না অমিয়া।
জননী, ভগ্নীর মতো বেসেছিলে ভালো
সে কি আর এ জনমে পারিব ভুলিতে?
বিষণ্ণ কাতর এক বালকের 'পরে
সে যে কী স্নেহের ধারা করেছ বর্ষণ
চিরকাল হৃদয়ে তা রহিবে মুদ্রিত।
ওই স্নেহময় কোলে রাখি শ্রান্ত মাথা
কাতর হইয়া কত করেছি রোদন
কত-না ব্যথিত হয়ে আদরে যতনে
অঞ্চলে সে অশ্রুজল দিয়াছ মুছায়ে।
কবিতা লিখিলে ছুটে ওই কোলে গিয়া
ওই গলা ধরে তাহা শুনাতাম কত
বাল্যহৃদয়ের মোর যত ছিল কথা
তোমার কাছেতে কিছু করি নি গোপন।
ওই স্নেহময় কোল ছিল স্বর্গ মোর

সেইখানে একবার মুখ লুকাইলে
সব শ্রান্তি সব জ্বালা যেত দূর হয়ে।
শ্রান্ত শিশুটির মতো ওই কোলে যবে
নীরবে নিষ্পন্দ হয়ে রহিতাম শুয়ে
অনন্ত স্নেহেতে পূর্ণ আনত নয়নে
কেমন মুখের পানে চাহিয়া রহিতে
তখন কী হর্ষে হৃদি যাইত ফাটিয়া!
কতবার করিয়াছি কত অভিমান,
আদরেতে উচ্ছ্বসিয়া কেঁদেছি কতই।

এসো আজি সখা

এসো আজি সখা বিজন পুলিনে
বলিব মনের কথা;
মরমের তলে যা-কিছু রয়েছে
লুকানো মরম-ব্যথা।
সুচারু রজনী, মেঘের আঁচল
চাপিয়া অধরে হাসিছে শশি,
বিমল জোছনা সলিলে মজিয়া
আঁধার মুছিয়া ফেলেছে নিশি,
কুসুম কাননে বিনত আননে
মুচকিয়া হাসে গোলাপবালা,
বিষাদে মলিনা, শরমে নিলীনা,
সলিলে দুলিছে কমলিনী বধূ
স্নানরূপে করি সরসী আলা!
আজি, খুলিয়া ফেলিব প্রাণ
আজি, গাইব কত কী গান,
আজি, নীরব নিশীথে, চাঁদের হাসিতে
মিশাব অফুট তান!
দুই হৃদয়ের যত আছে গান
এক সাথে আজি গাইব,
দুই হৃদয়ের যত আছে কথা
দুইজনে আজি কহিব;
কতদিন সখা, এমন নিশীথে
এমন পুলিনে বসি,
মানসের গীত গাহিয়া গাহিয়া
কাটাতে পাই নি নিশি।
স্বপনের মতো সেই ছেলেবেলা
সেইদিন সখা মনে কি হয়?
হৃদয় ছিল গো কবিতা মাখানো
প্রকৃতি আছিল কবিতাময়,

কী সুখে কাটিত পূরণিমা রাত
এই নদীতীরে আসি,
[কু]সুমের মালা গাঁথিয়া গাঁথিয়া
গনিয়া তারকারাশি।
যমুনা সুমুখে যাইত বহিয়া
সে যে কী সুখের গাইত গান,
ঘুম ঘুম আঁখি আসিত মুদিয়া
বিভল হইয়া যাইত প্রাণ!
[কত] যে সুখের কল্পনা আহা
আঁকিতাম মনে মনে
[সা]রাটি জীবন কাটাইব যেন

...

তখন কি সখা জানিতাম মনে
পৃথিবী কবির নহে
কল্পনা যার যতই প্রবল
ততই সে দুখ সহে!

এমন পৃথিবী, শোভার আকর
পাখি হেথা করে গান
কাননে কাননে কুসুম ফুটিয়া
পরিমল করে দান।

আকাশে হেথায় উঠে গো তারকা
উঠে সুধাকর, রবি,
বরন বরন জলদ দেখিছে
নদীজলে মুখছবি,
এমন পৃথিবী এও কারাগার
কবির মনের কাছে!
যে দিকে নয়ন ফিরাইতে যায়
সীমায় আটক আছে!
তাই [যে] গো সখা মনে মনে আমি
গড়েছি একটি বন,
সারাদিন সেথা ফুটে আছে ফুল,
গাইছে বিহগগণ।
আপনার ভাবে হইয়া পাগল
রাতদিন সুখে আছি গো সেথা
বিজন কাননে পাখির মতন
বিজনে গাইয়া মনের ব্যথা!
কতদিন পরে পেয়েছি তোমারে,
ভুলেছি মরমজ্বালা;

দুজনে মিলিয়া সুখের কাননে
গাঁথিব কুসুমমালা।
দুজনে মিলিয়া পূরণিমা রাতে
গাইব সুখের গান
যমুনা পুলিনে করিব দুজনে
সুখ নিশা অবসান,
আমার এ মন সঁপিয়া তোমারে
লইব তোমার মন
হৃদয়ের খেলা খেলিয়া খেলিয়া
কাটাইব সারাক্ষণ।
এইরূপে সখা কবিতার কোলে
পোহায়ে যাইবে প্রাণ
সুখের স্বপন দেখিয়া দেখিয়া
গাহিয়া সুখের গান।

পার কি বলিতে কেহ

পার কি বলিতে কেহ কী হল এ বুকে
যখনি শুনি গো ধীর সংগীতের ধ্বনি
যখনি দেখি গো ধীর প্রশান্ত রজনী
কত কী যে কথা আর কত কী যে ভাব
উচ্ছ্বসিয়া উথলিয়া আলোড়িয়া উঠে!
দূরাগত রাখালের বাঁশরির মতো
আধভোলা কালিকার স্বপ্নের মতন—
কী যে কথা কী যে ভাব ধরি ধরি করি
তবুও কেমন ধারা পারি না ধরিতে!
কী করি পাই না খুঁজি পাই না ভাবিয়া,
ইচ্ছা করে ভেঙেচুরে প্রাণের ভিতর
যা-কিছু যুঝিছে হৃদে খুলে ফেলি তাহা।

ছেলেবেলাকার আহা, ঘুমঘোরে দেখেছিনু

ছেলেবেলাকার আহা, ঘুমঘোরে দেখেছিনু
মূরতি দেবতাসম অপরূপ স্বজনি,
ভেবেছিনু মনে মনে, প্রণয়ের চন্দ্রলোকে
খেলিব দুজনে মিলি দিবস ও রজনী,
আজ সখি একেবারে, ভেঙেছে সে ঘুমঘোর
ভেঙেছে সাধের ভুল মাখানো যা মরমে,
দেবতা ভাবিনু যারে, তার কলঙ্কের কথা
শুনিয়া মলিন মুখ ঢাকিয়াছি শরমে।

তাই ভাবিয়াছি সখি, এই হৃদয়ের পটে
এঁকেছি যে ছবিখানি অতিশয় যতনে,
অশ্রুজলে অশ্রুজলে, মুছিয়া ফেলিব তাহা,
আর না আনিব মনে, এই পোড়া জনমে।—
কিন্তু হা— বৃথা এ আশা, মরমের মরমে যা।
আঁকিয়াছি সযতনে শোণিতের আখরে,
এ জনমে তাহা আর, মুছিবে না, মুছিবে না,
আমরণ রবে তাহা হৃদয়ের ভিতরে!
আমরণ কেঁদে কেঁদে, কাটিয়া যাইবে দিন,
নীরব আগুনে মন পুড়ে হবে ছাই লো!
মনের এ কথাগুলি গোপনে লুকায়ে রেখে
কতদিন বেঁচে রব ভাবিতেছি তাই লো!

আমার এ মনোজ্বালা

আমার এ মনোজ্বালা কে বুঝিবে সরলে
কেন যে এমন করে, ম্রিয়মাণ হয়ে থাকি
কেন যে নীরবে হেন বসে থাকি বিরলে।
এ যাতনা কেহ যদি বুঝিতে পারিত দেবি,
তবে কি সে আর কভু পারিত গো হাসিতে?
হৃদয় আছয়ে যার সঁপিতে পারে সে প্রাণ
এ জ্বলন্ত যন্ত্রণার এক তিল নাশিতে!
হে সখী হে সখাগণ, আমার মর্মের জ্বালা
কেহই তোমরা যদি না পার গো বুঝিতে,
কী আগুন জ্বলে তার নিভৃত গভীর তলে
কী ঘোর ঝটিকা সনে হয় তারে যুঝিতে।
তবে গো তোমরা মোরে শুধায়ো না শুধায়ো না
কেন যে এমন করে রহিয়াছি বসিয়া
বিরলে আমারে হেথা, একলা থাকিতে দাও,
[আমা]র মনের কথা বুঝিবে কী করিয়া?
[ম্রিয়]মাণ মুখে, এই শূন্যপ্রায় নেত্রে
[ক]লঙ্ক সঁপি গো আমি তোমাদের হরষে;
পূর্ণিমা যামিনী যথা মলিন হইয়া যায়
ক্ষুদ্র এক অন্ধকার জলদের পরশে।
কিন্তু কী করিব বলো, কী চাও কী দিব আমি
তোমাদের আমোদ গো এক তিল বাড়াতে
হৃদয়ে এমন জ্বালা, কী করে হাসিব বলো
কিছুতে বিষণ্ণভাব পারি না যে তাড়াতে।
বিরক্ত হোয়ো না সখি, অমন বিরক্ত নেত্রে
আমার মুখের পানে রহিয়ো না চাহিয়া,
কী আঘাত লাগে প্রাণে, দেখি ও বিরক্ত মুখ

কেমনে সখি গো তাহা বুঝাইব কহিয়া?
ব্যথায় পাইয়া ব্যথা, যদি গো শুধাতে কথা
অশ্রুজলে মিশাইতে যদি অশ্রুজল
আদরে স্নেহের স্বরে, একটি কহিতে কথা,
অনেক নিভিত তবু এ হৃদি-অনল
জানিতাম ওগো সখি, কাঁদিলে মমতা পাব,
কাঁদিলে বিরক্ত হবে এ কী নিদারুণ?
চরণে ধরি গো সখি, একটু করিয়ো দয়া
নহিলে নিভিবে কিসে বুকের আগুন।

…

উপহার-গীতি

ছেলেবেলা হতে বালা, যত গাঁথিয়াছি মালা
যত বনফুল আমি তুলেছি যতনে
ছুটিয়া তোমারি কোলে, ধরিয়া তোমারি গলে
পরায়ে দিয়াছি সখি তোমারি চরণে।
আজো গাঁথিয়াছি মালা, তুলিয়া বনের ফুল
তোমারি চরণে সখি দিব গো পরায়ে—
না-হয় ঘৃণার ভরে, দলিয়ো চরণতলে
হৃদয় যেমন করে দলেছ দুপায়ে।
পৃথিবীর নিন্দাযশে, কটাক্ষ করি না বালা
তুমি যদি সোহাগেতে করহ গ্রহণ
আমার সর্বস্বধন, কবিতার মালাগুলি
পৃথিবীর তরে আমি করি নি গ্রন্থন।
আমি যে-সকল গান গাই গো মনের সুখে
সপ্তসুরে পূর্ণ করি এ শূন্য আকাশ
পৃথিবীর আর কেহ, শুনুক বা না শুনুক
তুমি যেন শুন বালা, এই অভিলাষ।
তোমার লাগিবে ভালো, তুমি গো বলিবে ভালো,
গলাবে তোমারি মন এ সংগীত 'ধ্বনি
আমার মর্মের কথা, তুমিই বুঝিবে সখি
আর কেহ না বুঝুক খেদ নাহি গণি
একদিন মনে পড়ে, যাহা তাহা গাইতাম
সকলি তোমার সখি লাগিত গো ভালো
নীরবে শুনিতে তুমি, সমুখে বহিত নদী
মাথায় ঢালিত চাঁদ পূর্ণিমার আলো।
সুখের স্বপনসম, সেদিন গেল গো চলি
অভাগা অদৃষ্টে হায় এ জন্মের তরে
আমার মনের গান মর্মের রোদনধ্বনি
স্পর্শও করে না আজ তোমার অন্তরে।

তবুও— তবুও সখি তোমারেই শুনাইব
তোমারেই দিব সখি যা আছে আমার।
দিনু যা মনের সাথে, তুলিয়া লও তা হাতে
ভগ্ন হৃদয়ের এই প্রীতি-উপহার।

বাড়িতে ১লা কার্তিক মঙ্গলবার

পাষাণ-হৃদয়ে কেন সঁপিনু হৃদয়

পাষাণ-হৃদয়ে কেন সঁপিনু হৃদয়?
মর্মভেদী যন্ত্রণায়, ফিরেও যে নাহি চায়
বুক ফেটে গেলেও যে কথা নাহি কয়
প্রাণ দিয়ে সাধিলেও, পায়ে ধরে কাঁদিলেও
এক তিল এক বিন্দু দয়া নাহি হয়
হেরিলে গো অশ্রুরাশি, বরষে ঘৃণার হাসি,
বিরক্তির তিরস্কার তীব্র বিষময়।
এত যদি ছিল মনে, তবে বলো কী কারণে
একদিন তুলেছিল স্বর্গের আলয়
একদিন স্নেহভরে, মাথা রাখি কোল-'পরে
কেন নিয়েছিল হরে পরান হৃদয়
ভগ্নবুকে কেন আর, বজ্র হানে বার বার
মনখানা নিয়ে যেন করে ছেলেখেলা—
গিয়াছে যা ভেঙেচুরে, আর কেন তার পরে
মিছামিছি বিঁধে আহা বাণ বিষময়!

ভেবেছি কাহারো সাথে

ভেবেছি কাহারো সাথে মিশিব না আর
কারো কাছে বর্ষিব না অশ্রুবারিধার।
মানুষ পরের দুখে, করে শুধু উপহাস
জেনেছি, দেখেছি তাহা শত শত বার
যাহাদের মুখ আহা একটু মলিন হলে
যন্ত্রণায় ফেটে যায় হৃদয় আমার
তারাই— তারাই যদি এত গো নিষ্ঠুর হল
তবে আমি হতভাগ্য কী করিব আর!
সত্য তুমি হও সাক্ষী, ধর্ম তুমি জেনো ইহা
ঈশ্বর! তুমিই শুন প্রতিজ্ঞা আমার।
যার তরে কেঁদে মরি, সেই যদি উপহাসে
তবে মানুষের সাথে মিশিব না আর।

হা রে বিধি কী দারুণ অদৃষ্ট আমার

হারে বিধি কী দারুণ অদৃষ্ট আমার
যারে যত ভালোবাসি, যার তরে কাঁদে প্রাণ
হৃদয়ে আঘাত দেয় সেই বারে বার—
যারে আমি বন্ধু বলি, করিয়াছি আলিঙ্গন
সেই এ হৃদয় করিয়াছে চুরমার
যারেই বেসেছি ভালো, সেই চিরকাল-তরে
পৃথিবীর কাছে দুঃখ পেয়েছে অপার।
হান বিধি হান বজ্র, আমার এ ভগ্নহৃদে
তিলেক বাঁচিতে নাই বাসনা আমার
প্রস্তরে গঠিত এই, হৃদয়বিহীন ধরা
হেথা কত কাল বলো বেঁচে রব আর।

ও কথা বোলো না সখি

ও কথা বোলো না সখি— প্রাণে লাগে ব্যথা—
আমি ভালোবাসি নাকো এ কিরূপ কথা।
কী জানি কী মোর দশা কহিব কেমনে
প্রকাশ করিতে নারি রয়েছে যা মনে—
পৃথিবী আমারে সখি চিনিল না তাই—
পৃথিবী না চিনে মোরে তাহে ক্ষতি নাই—
তুমিও কি বুঝিলে না এ মর্মকাহিনী
তুমিও কি চিনিলে না আমারে স্বজনি?

কী হবে বলো গো সখি

কী হবে বলো গো সখি ভালোবাসি অভাগারে
যদি ভালোবেসে থাক ভুলে যাও একেবারে—
একদিন এ হৃদয়— আছিল কুসুমময়
চরাচর পূর্ণ ছিল সুখের অমৃতধারে
সেদিন গিয়েছে সখি আর কিছু নাই
ভেঙে পুড়ে সব যেন হয়ে গেছে ছাই
হৃদয়-কবরে শুধু মৃত ঘটনার
...[র]য়েছে পড়ে স্মৃতি নাম যার।

এ হতভাগারে ভালো কে বাসিতে চায়

এ হতভাগারে ভালো কে বাসিতে চায়?
সুখ-আশা থাকে যদি বেসো না আমায়!
এ জীবন, অভাগার— নয়ন সলিলধার
বলো সখি কে সহিতে পারিবে তা হায়!
এ ভগ্ন প্রাণের অতি বিষাদের গান
বলো সখি কে শুনিতে পারে সারা প্রাণ
গেছি ভুলে ভালোবাসা— ছাড়িয়াছি সুখ-আশা
ভালোবেসে কাজ নাই স্বজনি আমায়!

জানি সখা অভাগীরে ভালো তুমি বাস না

জানি সখা অভাগীরে ভালো তুমি বাস না
ছেড়েছি ছেড়েছি নাথ তব প্রেম-কামনা—
এক ভিক্ষা মাগি হায়— নিরাশ কোরো না তায়
শেষ ভিক্ষা শেষ আশা— অন্তিম বাসনা—
এ জন্মের তরে সখা— আর তো হবে না দেখা
তুমি সুখে থেকো নাথ কী কহিব আর
একবার বোসো হেথা ভালো করে কও কথা
যে নামে ডাকিতে সখা ডাকো একবার—
ওকি সখা কেঁদোনাকো— দুখিনীর কথা রাখো
আমি গেলে বলো নাথ— কী ক্ষতি তাহার?
যাই সখা যাই তবে— ছাড়ি তোমাদের সবে—
সময় আসিছে কাছে বিদায় বিদায়—

রচনাকাল : ১৮৭৪-১৮৮২ খৃস্টাব্দ

সংযোজন

সন্ধ্যা

ব্যথা বড়ো বাজিয়াছে প্রাণে,
সন্ধ্যা তুই ধীরে ধীরে আয়!
কাছে আয়—আরো কাছে আয়—
সঙ্গীহারা হৃদয় আমার
তোর বুকে লুকাইতে চায়।
আমার ব্যথার তুই ব্যথী,
তুই মোর একমাত্র সাথী,
সন্ধ্যা তুই আমার আলয়,
তোরে আমি বড়ো ভালোবাসি—
সারাদিন ঘুরে ঘুরে ঘুরে
তোর কোলে ঘুমাইতে আসি,
তোর কাছে ফেলি রে নিশ্বাস,
তোর কাছে কহি মনোকথা,
তোর কাছে করি প্রসারিত
প্রাণের নিভৃত নীরবতা।
তোর গান শুনিতে শুনিতে
তোর তারা গুনিতে গুনিতে,
নয়ন মুদিয়া আসে মোর,
হৃদয় হইয়া আসে ভোর—
স্বপন-গোধূলিময় প্রাণ
হারায় প্রাণের মাঝে তোর!
একটি কথাও নাই মুখে,
চেয়ে শুধু রোস মুখপানে
অনিমেষ আনত নয়ানে।
ধীরে শুধু ফেলিস নিশ্বাস,
ধীরে শুধু কানে কানে গাস
ঘুম-পাড়াবার মৃদু গান,
কোমল কমল কর দিয়ে
ঢেকে শুধু দিস দুনয়ান,
ভুলে যাই সকল যাতনা
জুড়াইয়া আসে মোর প্রাণ!
তাই তোরে ডাকি একবার
সঙ্গীহারা হৃদয় আমার,
তোর বুকে লুকাইয়া মাথা
তোর কোলে ঘুমাইতে চায়,
সন্ধ্যা তুই ধীরে ধীরে আয়।

আঁধার আঁচল দিয়ে তোর
আমার দুখেরে ঢেকে রাখ,
বল তারে ঘুমাইতে বল
কপালেতে হাতখানি রাখ,
জগতেরে ক'রে দে আড়াল,
কোলাহল করিয়া দে দূর—
দুখেরে কোলেতে করে নিয়ে
র'চে দে নিভৃত অন্তঃপুর।
তা হলে সে কাঁদিবে বসিয়া,
কল্পনার খেলেনা গড়িবে,
খেলিয়া আপন মনে কাঁদিয়া কাঁদিয়া, শেষে
আপনি সে ঘুমায়ে পড়িবে।

আয় সন্ধ্যা ধীরে ধীরে আয়,
হাতে লয়ে স্বপনের ডালা
গুন্ গুন্ মন্ত্র পড়ি পড়ি
গাঁথিয়া দে স্বপনের মালা,
জড়ায়ে দে আমার মাথায়,
স্নেহ-হস্ত বুলায়ে দে গায়!
স্রোতস্বিনী ঘুমঘোরে, গাবে কুলু কুলু করে
ঘুমেতে জড়িত আধো গান,
ঝিল্লিরা ধরিবে একতান,
দিনশ্রমে শ্রান্ত বায়ু গৃহমুখে যেতে যেতে
গান গাবে অতি মৃদু স্বরে,
পদশব্দ শুনি তার তন্দ্রা ভাঙি লতা পাতা
ভর্ৎসনা করিবে মরমরে।
ভাঙা ভাঙা গানগুলি মিলিয়া হৃদয়-মাঝে
মিশে যাবে স্বপনের সাথে,
নানাবিধ রূপ ধরি ভ্রমিয়া বেড়াবে তারা,
হৃদয়ের গুহাতে গুহাতে।

আয় সন্ধ্যা ধীরে ধীরে আয়,
আন তোর স্বর্ণ মেঘজাল,
পশ্চিমের সুবর্ণ প্রাঙ্গণে
খেলিবি মেঘের ইন্দ্রজাল।
ওই তোর ভাঙা মেঘগুলি,
হৃদয়ের খেলেনা আমার,
ওইগুলি কোলে করে নিয়ে
সাধ যায় খেলি অনিবার।
ওই তোর জলদের 'পর
বাঁধি আমি কত শত ঘর!
সাধ যায় হোথায় লুটাই,

অস্তগামী রবির মতন,
লুটায়ে লুটায়ে পড়ি শেষে
সাগরের ওই প্রান্তদেশে
তরল কনক নিকেতন!
ছোটো ছোটো ওই তারাগুলি,
ডাকে মোরে আঁখি-পাতা খুলি।
স্নেহময় আঁখিগুলি যেন
আছে শুধু মোর পথ চেয়ে,
সন্ধ্যার আঁধারে বসি বসি
কহে যেন গান গেয়ে গেয়ে,
'কবে তুমি আসিবে হেথায়
অন্ধকার নিভৃত-নিলয়ে,
জগতের অতি প্রান্তদেশে
প্রদীপটি রেখেছি জ্বালায়ে!
বিজনেতে রয়েছি বসিয়া
কবে তুমি আসিবে হেথায়!'
সন্ধ্যা হলে মোর মুখ চেয়ে
তারাগুলি এই গান গায়!
আয় সন্ধ্যা ধীরে ধীরে আয়,
জগতের নয়ন ঢেকে দে—
আঁধার আঁচল পেতে দিয়ে
কোলেতে মাথাটি রেখে দে!

প্রকাশকাল : ১২৮৯

কেন গান গাই

গুরুভার মন লয়ে কত বা বেড়াবি ব'য়ে?
এমন কি কেহ তোর নাই,
যাহার হৃদয়-'পরে মিলিবে মুহূর্ত তরে
হৃদয়টি রাখিবার ঠাঁই?
'কেহ না, কেহ না!'

সংসারে যে দিকে ফিরে চাই
এমন কি কেহ তোর নাই—
তোর দিন শেষ হলে, স্মৃতিখানি লয়ে কোলে,
শোয়াইয়া বিষাদের কোমল শয়নে,
বিমল শিশির-মাখা প্রেম-ফুলে দিয়ে ঢাকা
চেয়ে রবে আনত নয়নে?
হৃদয়েতে রেখে দিবে তুলে,
প্রতিদিন ঢেকে দিবে ফুলে,

মনোমাঝে প্রবেশিয়ে বিন্দু বিন্দু অশ্রু দিয়ে
বৃন্ত-ছিন্ন প্রেম-ফুলগুলি
রাখিবেক জিয়াইয়া তুলি?
এমনকি কি কেহ তোর নাই?
'কেহ না, কেহ না!'

প্রাণ তুই খুলে দিলি ভালোবাসা বিলাইলি
কেহ তাহা তুলে না লইল,
ভূমিতলে পড়িয়া রহিল;
ভালোবাসা কেন দিলি তবে
কেহ যদি কুড়ায়ে না লবে?
কেন সখা কেন?
'জানি না, জানি না!'

বিজনে বনের মাঝে ফুল এক আছে ফুটে
শুধাইতে গেনু তার কাছে,
'ফুল, তুই এ আঁধারে পরিমল দিস কারে,
এ কাননে কে বা তোর আছে!
যখন পড়িবি তুই ঝরে,
শুকাইয়া দলগুলি ধূলিতে হইবে ধূলি,
মনে কি করিবে কেহ তোরে!
তবে কেন পরিমল ঢেলে দিস অবিরল
ছোটো মনখানি ভ'রে ভ'রে?
কেন, ফুল, কেন?
সেও বলে, 'জানি না, জানি না!'

সখা, তুমি গান গাও কেন?
কেহ যদি শুনিতে না চায়?
ওই দেখো পথমাঝে যে যাহার নিজ কাজে
আপনার মনে চলে যায়।
কেহ যদি শুনিতে না চায়
কেন তবে, কেন গাও গান,
আকাশে ঢালিয়া দাও প্রাণ?
গান তব ফুরাইবে যবে,
রাগিণী কারো কি মনে রবে?
বাতাসেতে স্বরধার খেলিয়াছে অনিবার,
বাতাসে সমাধি তার হবে।
কাহারো মনেও নাহি রবে,
কেন সখা গান গাও তবে?
কেন, সখা, কেন?
'জানি না, জানি না!'

বিজন তরুর শাখে একাকি পাখিটি ডাকে,
শুধাইতে গেনু তার কাছে,
'পাখি তুই এ আঁধারে গান শুনাইবি কারে?
এ কাননে কে বা তোর আছে!
যখনি ফুরাবে তোর প্রাণ,
যখনি থামিবে তোর গান,
বন ছিল যেমন নীরবে,
তেমনি নীরব পুন হবে।
যেমনি থামিবে গীত, অমনি সে সচকিত
প্রতিধ্বনি আকাশে মিলাবে,
তোর গান তোরি সাথে যাবে!
আকাশে ঢালিয়া দিয়া প্রাণ,
তবে, পাখি, কেন গাস গান?
কেন, পাখি, কেন?
সেও বলে, 'জানি না, জানি না!'

প্রকাশকাল : ১২৮৯

কেন গান শুনাই

এসো সখি, এসো মোর কাছে,
কথা এক শুধাবার আছে!
চেয়ে তব মুখপানে ব'সে এই ঠাঁই—
প্রতিদিন যত গান তোমারে শুনাই,
বুঝিতে কি পার সখি কেন যে তা গাই?
শুধু কি তা পশে কানে? কথাগুলি তার
কোথা হতে উঠিতেছে ভাবো একবার?
বুঝ না কি হৃদয়ের
কোন্‌খানে শেল ফুটে
তবে প্রতি কথাগুলি
আর্তনাদ করি উঠে!
যখন নয়নে উঠে বিন্দু অশ্রুজল,
তখন কি তাই তুই দেখিস কেবল?
দেখ না কি কী সমুদ্র হৃদয়েতে উথলিছে,
শুধু কণামাত্র তার আঁখিপ্রান্তে বিগলিছে!
যখন একটি শুধু উঠে রে নিশ্বাস,
তখন কি তাই শুধু শুনিবারে পাস?
শুনিস না কী ঝটিকা হৃদয়ে বেড়ায় ছুটে
একটি উচ্ছ্বাস শুধু বাহিরেতে ফুটে!
যে কথাটি বলি আমি শোনো শুধু তাই?
শোনো না কি যত কথা বলা হইল না?
যত কথা বলিবারে চাই?

আমি কি শুনাই গান
ভালো মন্দ করিতে বিচার?
যবে এ নয়ন হতে বহে অশ্রুধার—
শুধু কি রে দেখিবি তখন
সে অশ্রু উজ্জ্বল কি না হীরার মতন?
আমার এ গান তোরে যখন শুনাই
নিন্দা বা প্রশংসা আমি কিছু নাহি চাই—
যে হৃদি দিয়েছি তোরে
তাই তোরে দেখাবারে চাই,
তারি ভাষা বুঝাবারে চাই,
তারি ব্যথা জানাবারে চাই,
আর কিবা চাই?
সেই হৃদি দেখিলি যখন,
তারি ভাষা বুঝিলি যখন,
তারি ব্যথা জানিলি যখন
তখন একটি বিন্দু অশ্রুবারি চাই!
(আর কিবা চাই!)

আয় সখি কাছে মোর আয়,
কথা এক শুধাব তোমায়—
এত গান শুনালেম এত অনুরাগে
কথা তার বুকে কি লো লাগে?
একটি নিশ্বাস কি লো জাগে?
কথা শুধু শুনিয়া কি যাস?
ভালো মন্দ বুঝিস কেবল?
প্রাণের ভিতর হতে
উঠে না একটি অশ্রুজল?

প্রকাশকাল : ১২৮৮

বিষ ও সুধা

অস্ত গেল দিনমণি। সন্ধ্যা আসি ধীরে
দিবসের অন্ধকার সমাধির 'পরে
তারকার ফুলরাশি দিল ছড়াইয়া।
সাবধানে অতি ধীরে নায়ক যেমন
ঘুমন্ত প্রিয়ার মুখ করয়ে চুম্বন,
দিন-পরিশ্রমে ক্লান্ত পৃথিবীর দেহ
অতি ধীরে পরশিল সায়াহ্নের বায়ু।
দুরন্ত তরঙ্গগুলি যমুনার কোলে
সারাদিন খেলা করি পড়েছে ঘুমায়ে।

ভগ্ন দেবালয়খানি যমুনার ধারে,
শিকড়ে শিকড়ে তার ছায়ি জীর্ণ দেহ
বট অশথের গাছ জড়াজড়ি করি
আঁধারিয়া রাখিয়াছে ভগন হৃদয়,
দুয়েকটি বায়ূচ্ছ্বাস পথ ভুলি গিয়া
আঁধার আলয়ে তার হয়েছে আটক,
অধীর হইয়া তারা হেথায় হোথায়
হু হু করি বেড়াইছে পথ খুঁজি খুঁজি।
শুন সন্ধ্যে! আবার এসেছি আমি হেথা,
নীরব আঁধারে তব বসিয়া বসিয়া
তটিনীর কলধ্বনি শুনিতে এয়েছি।
হে তটিনী, ও কি গান গাইতেছ তুমি!
দিন নাই, রাত্রি নাই, এক তানে শুধু
এক সুরে এক গান গাইছ সতত—
এত মৃদুস্বরে ধীরে, যেন ভয় করি
সন্ধ্যার প্রশান্ত স্বপ্ন ভেঙে যায় পাছে!
এ নীরব সন্ধ্যাকালে তব মৃদু গান
একতান ধ্বনি তব শুনে মনে হয়
এ হৃদি-গানেরি যেন শুনি প্রতিধ্বনি!
মনে হয় যেন তুমি আমারি মতন
কী এক প্রাণের ধন ফেলেছ হারায়ে।
এসো স্মৃতি, এসো তুমি এ ভগ্ন হৃদয়ে—
সায়াহ্ন-রবির মৃদু শেষ রশ্মিরেখা
যেমন পড়েছে ওই অন্ধকার মেঘে
তেমনি ঢালো এ হৃদে অতীত-স্বপন!
কাঁদিতে হয়েছে সাধ বিরলে বসিয়া,
কাঁদি একবার, দাও সে ক্ষমতা মোরে!
যাহা কিছু মনে পড়ে ছেলেবেলাকার
সমস্ত মালতীময়— মালতী কেবল
শৈশবকালের মোর স্মৃতির প্রতিমা।
দুই ভাই বোনে মোরা আছিনু কেমন!
আমি ছিনু ধীর শান্ত গম্ভীর-প্রকৃতি,
মালতী প্রফুল্ল অতি সদা হাসি হাসি।
ছিল না সে উচ্ছ্বসিনী নির্ঝরিণী সম
শৈশব-তরঙ্গবেগে চঞ্চলা সুন্দরী,
ছিল না সে লজ্জাবতী লতাটির মতো
শরম-সৌন্দর্যভরে ম্রিয়মাণ-পারা।
আছিল সে প্রভাতের ফুলের মতন,
প্রশান্ত হরষে সদা মাখানো মুখানি;
সে হাসি গাহিত শুধু উষার সংগীত—
সকলি নবীন আর সকলি বিমল।

মালতীর শান্ত সেই হাসিটির সাথে
হৃদয়ে জাগিত যেন প্রভাত পবন,
নূতন জীবন যেন সঞ্চরিত মনে।
ছেলেবেলাকার যত কবিতা আমার
সে হাসির কিরণেতে উঠেছিল ফুটি।
মালতী ছুঁইত মোর হৃদয়ের তার,
তাইতে শৈশব-গান উঠিত বাজিয়া।
এমনি আসিত সন্ধ্যা; শ্রান্ত জগতেরে
স্নেহময় কোলে তার ঘুম পাড়াইতে।
সুবর্ণ-সলিলসিক্ত সায়াহ্ন-অম্বরে
গোধূলির অন্ধকার নিঃশব্দ চরণে
ছোটো ছোটো তারাগুলি দিত ফুটাইয়া,
নন্দনবনের যেন চাঁপা ফুল দিয়ে
ফুলশয্যা সাজাইত সুরবালাদের।
মালতীরে লয়ে পাশে আসিতাম হেথা;
সন্ধ্যার সংগীতস্বরে মিলাইয়া স্বর
মৃদুস্বরে শুনাতেম শৈশব-কবিতা।
হর্ষময় গর্বে তার আঁখি উজলিত—
অবাক ভক্তির ভাবে ধরি মোর হাত
একদৃষ্টে মুখপানে রহিত চাহিয়া।
তার সে হরষ হেরি আমারো হৃদয়ে
কেমন মধুর গর্ব উঠিত উথলি!
ক্ষুদ্র এক কুটির আছিল আমাদের,
নিস্তব্ধ-মধ্যাহ্নে আর নীরব সন্ধ্যায়
দূর হতে তটিনীর কলস্বর আসি
শান্ত কুটিরের প্রাণে প্রবেশিয়া ধীরে
করিত সে কুটিরের স্বপন রচনা।
দুই জনে ছিনু মোরা কল্পনার শিশু—
বনে ভ্রমিতাম যবে, সুদূর নির্ঝরে
বনশ্রীর পদধ্বনি পেতাম শুনিতে।
যাহা কিছু দেখিতাম সকলেরি মাঝে
জীবন্ত প্রতিমা যেন পেতেম দেখিতে।
কত জোছনার রাত্রে মিলি দুই জনে
ভ্রমিতাম যমুনার পুলিনে পুলিনে,
মনে হত এ রজনী পোহাতে চাবে না,
সহসা কোকিল-রব শুনিয়া উষায়,
সহসা যখনি শ্যামা গাহিয়া উঠিত,
চমকিয়া উঠিতাম, কহিতাম মোরা,
'এ কী হল। এরি মধ্যে পোহাল রজনী!'
দেখিতাম পূর্ব দিকে উঠেছে ফুটিয়া
শুকতারা, রজনীর বিদায়ের পথে,

প্রভাতের বায়ু ধীরে উঠিছে জাগিয়া,
আসিছে মলিন হয়ে আঁধারের মুখ।
তখন আলয়ে দোঁহে আসিতাম ফিরি,
আসিতে আসিতে পথে শুনিতাম মোরা
গাইছে বিজনকুঞ্জে বউ-কথা-কও।
ক্রমশ বালককাল হল অবসান,
নীরদের প্রেমদৃষ্টে পড়িল মালতী,
নীরদের সাথে তার হইল বিবাহ।
মাঝে মাঝে যাইতাম তাদের আলয়ে;
দেখিতাম মালতীর শান্ত সে হাসিতে
কুটিরেতে রাখিয়াছে প্রভাত ফুটায়ে!

সঙ্গীহারা হয়ে আমি ভ্রমিতাম একা,
নিরাশ্রয় এ-হৃদয় অশান্ত হইয়া
কাঁদিয়া উঠিত যেন অধীর উচ্ছ্বাসে।
কোথাও পেত না যেন আরাম বিশ্রাম।
অন্যমনে আছি যবে, হৃদয় আমার
সহসা স্বপন ভাঙি উঠিত চমকি।
সহসা পেত না ভেবে, পেত না খুঁজিয়া
আগে কী ছিল রে যেন এখন তা নাই।
প্রকৃতির কি যেন কী গিয়াছে হারায়ে
মনে তাহা পড়িছে না। ছেলেবেলা হতে
প্রকৃতির যেই ছন্দ এসেছি শুনিয়া
সেই ছন্দোভঙ্গ যেন হয়েছে তাহার,
সেই ছন্দে কী কথার পড়েছে অভাব—
কানেতে সহসা তাই উঠিত বাজিয়া,
হৃদয় সহসা তাই উঠিত চমকি।
জানি না কিসের তরে, কী মনের দুখে
দুয়েকটি দীর্ঘশ্বাস উঠিত উচ্ছ্বসি।
শিখর হতে শিখরে, বন হতে বনে,
অন্যমনে একেলাই বেড়াতাম ভ্রমি—
সহসা চেতন পেয়ে উঠিয়া চমকি
সবিস্ময়ে ভাবিতাম, কেন ভ্রমিতেছি,
কেন ভ্রমিতেছি তাহা পেতেম না ভাবি!

একদিন নবীন বসন্ত-সমীরণে
বউ-কথা-কও যবে খুলেছে হৃদয়,
বিষাদে সুখেতে মাখা প্রশান্ত কী ভাব
প্রাণের ভিতরে যবে রয়েছে ঘুমায়ে,
দেখিনু বালিকা এক, নির্ঝরের ধারে
বনফুল তুলিতেছে আঁচল ভরিয়া।

দুপাশে কুন্তলজাল পড়েছে এলায়ে,
মুখেতে পড়েছে তার উষার কিরণ।
কাছেতে গেলাম তার, কাঁটা বাছি ফেলি
কানন-গোলাপ তারে দিলাম তুলিয়া।
প্রতিদিন সেইখানে আসিত দামিনী
তুলিয়া দিতাম ফুল, শুনাতেম গান,
কহিতাম বালিকারে কত কী কাহিনী,
শুনি সে হাসিত কভু, শুনিত না কভু,
আমি ফুল তুলে দিলে ফেলিত ছিঁড়িয়া।
ভর্ৎসনার অভিনয়ে কহিত কত কী।
কভু বা ভ্রূকুটি করি রহিত বসিয়া,
হাসিতে হাসিতে কভু যাইত পলায়ে,
অলীক শরমে কভু হইত অধীর।
কিন্তু তার ভ্রূকুটিতে, শরমে, সংকোচে,
লুকানো প্রেমেরি কথা করিত প্রকাশ।
এইরূপে প্রতি উষা যাইত কাটিয়া।
একদিন সে-বালিকা না আসিত যদি
হৃদয় কেমন যেন হইত বিকল—
প্রভাত কেমন যেন যেত না কাটিয়া—
দিন যেত অতি ধীরে নিরাশ-চরণে।
বর্ষচক্র আর বার আসিল ফিরিয়া,
নূতন বসন্তে পুনঃ হাসিল ধরণী,
প্রভাতে অলসভাবে, বসি তরুতলে,
দামিনীরে শুধালেম কথায় কথায়
'দামিনী, তুমি কি মোরে ভালোবাস বালা?'
অলীক-শরম-রোষে ভ্রূকুটি করিয়া
ছুটে সে পলায়ে গেল দূর বনান্তরে—
জানি না কী ভাবি পুনঃ ছুটিয়া আসিয়া
'ভালোবাসি— ভালোবাসি—' কহিয়া অমনি
শরমে-মাখানো মুখ লুকালো এ বুকে।
এইরূপে দিন যেত স্বপ্ন খেলা খেলি।
কত ক্ষুদ্র অভিমানে কাঁদিত বালিকা,
কত ক্ষুদ্র কথা লয়ে হাসিত হরষে—
কিন্তু জানিতাম কি রে এই ভালোবাসা
দুদিনের ছেলেখেলা, আর কিছু নয়?
কে জানিত প্রভাতের নবীন কিরণে
এমন শতেক ফুল উঠে রে ফুটিয়া
প্রভাতের বায়ু সনে খেলা সাঙ্গ হলে
আপনি শুকায়ে শেষে ঝরে পড়ে যায়—
ওই ফুলে থুয়েছিনু হৃদয়ের আশা,
ওই কুসুমের সাথে খসে পড়ে গেল।

আর কিছুকাল পরে এই দামিনীরে
যে কথা বলিয়াছিনু আজো মনে আছে।
'দামিনী, মনে কি পড়ে সে দিনের কথা?
বলো দেখি কত দিন ওই মুখখানি
দেখি নি তোমার? তাই দেখিতে এয়েছি!
জোছনার রাত্রে যবে বসেছি কাননে,
দুয়েকটি তারা কভু পড়িছে খসিয়া,
হতবুদ্ধি দুয়েকটি পথহারা মেঘ
অনন্ত আকাশ-রাজ্যে ভ্রমিছে কেবল,
সে নিস্তব্ধ রজনীতে হৃদয়ে যেমন
একে একে সব কথা উঠে গো জাগিয়া,
তেমনি দেখিনু যেই ওই মুখখানি
স্মৃতি-জাগরণকারী রাগিণীর মতো
ওই মুখখানি তব দেখিনু যেমনি
একে একে পুরাতন সব স্মৃতিগুলি
জীবন্ত হইয়া যেন জাগিল হৃদয়ে।
মনে আছে সেই সখি আর-এক দিন
এমনি গম্ভীর সন্ধ্যা, এই নদীতীর,
এইখানে এই হাত ধরিয়া তোমার
কাতরে কহেছি আমি নয়নের জলে,
'বিদায় দাও গো এবে চলিনু বিদেশে,
দেখো সখি এত দিন বাসিয়াছ ভালো,
দুদিন না দেখে যেন যেয়ো না ভুলিয়া!
সংসারের কর্ম হতে অবসর লয়ে
আবার ফিরিয়া যবে আসিব দামিনী,
নব-অতিথির মতো ভেবো না আমারে
সম্ভ্রমের অভিনয় কোরো না বালিকা।'
কিছুই উত্তর তার দিলে না তখন,
শুধু মুখপানে চেয়ে কাতর নয়নে
ভর্ৎসনার অশ্রুজল করিলে বর্ষণ।
যেন এই নিদারুণ সন্দেহের মোর
অশ্রুজল ছাড়া আর নাইকো উত্তর!
আবার কহিনু আমি ওই মুখ চেয়ে,
'কে জানে মনের মধ্যে কী হয়েছে মোর
আশঙ্কা হতেছে যেন হৃদয়ে আমার
ওই স্নেহ-সুধামাখা মুখখানি তোর
এ জনমে আর বুঝি পাব না দেখিতে।'
নীরব গম্ভীর সেই সন্ধ্যার আঁধারে
সমস্ত জগৎ যেন দিল প্রতিধ্বনি
'এ জনমে আর বুঝি পাব না দেখিতে।'
গম্ভীর নিশীথে যথা আধো ঘুমঘোরে

সুদূর শ্মশান হতে মরণের রব
শুনিলে হৃদয় উঠে কাঁপিয়া কেমন,
তেমনি বিজন সেই তটিনীর তীরে
একাকী আঁধারে যেন শুনিনু কী কথা,
সমস্ত হৃদয় যেন উঠিল শিহরি!
আর বার কহিলাম, 'বিদায়—ভুলো না।'
তখন কি জানিতাম এই নদীতীরে
এই সন্ধ্যাকালে আর তোমারি সমুখে
এমনি মনের দুখে হইবে কাঁদিতে?
তখনো আমার এই বাল্যজীবনের
প্রভাত-নীরদ হতে নব-রক্তরাগ
যায় নি মিলায়ে সখি, তখনো হৃদয়
মরীচিকা দেখিতেছিল দূর শূন্যপটে।
নামিনু সংসারক্ষেত্রে যুঝিনু একাকী,
যাহা কিছু চাহিলাম পাইনু সকলি।
তখন ভাবিনু যাই প্রেমের ছায়ায়
এতদিনকার শ্রান্তি যাবে দূর হয়ে।
সন্ধ্যাকালে মরুভূমে পথিক যেমন
নিরখিয়া দেখে যবে সম্মুখে পশ্চাতে
সুদূরে দেখিতে পায় প্রান্ত দিগন্তের
সুবর্ণ জলদজালে মণ্ডিত কেমন,
সে-দিকে তারকাগুলি চুম্বিছে প্রান্তর,
সায়াহ্নবালার সেথা পূর্ণতম শোভা,
কিন্তু পদতলে তার অসীম বালুকা
সারাদিন জ্বলি জ্বলি তপন-কিরণে
ফেলিছে সায়াহ্নকালে জ্বলন্ত নিশ্বাস।
তেমনি এ সংসারের পথিক যাহারা
ভবিষ্যৎ অতীতের দিগন্তের পানে
চাহি দেখে স্বর্গ সেথা হাসিছে কেবল
পদতলে বর্তমান মরুভূমি সম।
স্মৃতি আর আশা ছাড়া সত্যকার সুখ
মানুষের ভাগ্যে সখি ঘটে নাকো বুঝি!
বিদেশ হইতে যবে আইসে ফিরিয়া
অতি হতভাগা যেও সেও ভাবে মনে
যারে যারে ভালোবাসে সকলেই বুঝি
রহিয়াছে তার তরে আকুল-হৃদয়ে!
তেমনি কতই সখি করেছিনু আশা,
মনে মনে ভেবেছিনু কত-না হরষে
দামিনী আমার বুঝি তৃষিতনয়নে
পথপানে চেয়ে আছে আমারি আশায়।
আমি গিয়ে কব তারে হরষে কাঁদিয়া,

'মুছ অশ্রুজল সখি, বহু দিন পরে
এসেছে বিদেশ হতে ললিত তোমার'।
অমনি দামিনী বুঝি আহ্লাদে উথলি
নীরব অশ্রুর জলে কবে কত কথা।
ফিরিয়া আসিনু যবে—এ কী হল জ্বালা!
কিছুতে নয়নজল নারি সামালিতে।
ফেরো ফেরো চাহিয়ো না এ আঁখির পানে,
প্রাণে বাজে অশ্রুজল দেখাতে তোমায়!
জেনো গো রমণি, জেনো, এত দিন পরে
কাঁদিয়া প্রণয় ভিক্ষা করিতে আসি নি,
এ অশ্রু দুঃখের অশ্রু— এ নহে ভিক্ষার!
কখনো কখনো সখি অন্য মনে যবে
সুবিজন বাতায়নে রয়েছ বসিয়া
সম্মুখে যেতেছে দেখা বিজন প্রান্তর
হেথা হোথা দুয়েকটি বিচ্ছিন্ন কুটির,
হু হু করি বহিতেছে যমুনার বায়ু—
তখন কি সে-দিনের দুয়েকটি কথা
সহসা মনের মধ্যে উঠে না জাগিয়া?
কখন যে জাগি উঠে পার না জানিতে!
দূরতম রাখালের বাঁশিস্বর সম
কভু কভু দুয়েকটি ভাঙা-ভাঙা সুর
অতি মৃদু পশিতেছে শ্রবণবিবরে;
আধো জেগে আধো ঘুমে স্বপ্ন আধো-ভোলা—
তেমনি কি সে-দিনের দুয়েকটি কথা
সহসা মনের মধ্যে উঠে না জাগিয়া?
স্মৃতির নির্ঝর হতে অলক্ষ্যে গোপনে,
পথহারা দুয়েকটি অশ্রুবারিধারা
সহসা পড়ে না ঝরি নেত্রপ্রান্ত হতে,
পড়িছে কি না পড়িছে পার না জানিতে!
একাকী বিজনে কভু অন্যমনে যবে
বসে থাকি, কত কী যে আইসে ভাবনা,
সহসা মুহূর্ত-পরে লভিয়া চেতন
কী কথা ভাবিতেছিনু নাহি পড়ে মনে
অথচ মনের মধ্যে বিষণ্ণ কী ভাব
কেমন আঁধার করি রহে যেন চাপি,
হৃদয়ের সেই ভাবে কখনো কি সখি
সে-দিনের কোনো ছায়া পড়ে না স্মরণে?
ছেলেবেলাকার কোনো বন্ধুর মরণ
স্মরিলে যেমন লাগে হৃদয়ে আঘাত,
তেমনি কি সখি কভু মনে নাহি হয়
সে-সকল দিন কেন গেল গো চলিয়া

যে দিন এ-জন্মে আর আসিবে না ফিরি!
পুরাতন বন্ধু তারা, কত কাল আহা
খেলা করিয়াছি মোরা তাহাদের সাথে,
কত সুখে হাসিয়াছি দুঃখে কাঁদিয়াছি,
সে-সকল সুখ দুঃখ হাসি কান্না লয়ে
মিশাইয়া গেল তারা আঁধার অতীতে!

চলিনু দামিনী পুনঃ চলিনু বিদেশে—
ভাবিলাম একবার দেখিব মুখানি,
একবার শুনাইব মরমের ব্যথা,
তাই আসিয়াছি সখি, এ জনমে আর
আসিব না দিতে তব শান্তিতে ব্যাঘাত,
এ জন্মের তরে সখি কহো একবার
একটি স্নেহের বাণী অভাগার 'পরে,
ভ্রমিয়া বেড়াব যবে সুদূর বিদেশে
সে-কথার প্রতিধ্বনি বাজিবে হৃদয়ে!'

থামো স্মৃতি—থামো তুমি, থামো এইখানে,
সম্মুখে তোমার ও কি দৃশ্য মর্মভেদী?
মালতী আমার সেই প্রাণের ভগিনী,
শৈশবকালের মোর খেলাবার সাথী
যৌবনকালের মোর আশ্রয়ের ছায়া,
প্রতি দুঃখ প্রতি সুখ প্রতি মনোভাব
যার কাছে না বলিলে বুক যেত ফেটে,
সেই সে মালতী মোর হয়েছে বিধবা!
আপনার দুঃখে মগ্ন স্বার্থপর আমি
ভালো করে পারিনু না করিতে সান্ত্বনা!
নিজের চোখের জলে অন্ধ এ নয়নে
পরের চোখের জল পেনু না দেখিতে!
ছেলেবেলাকার সেই পুরানো কুটিরে
হাসিতে হাসিতে এল মালতী আমার,
সে-হাসির চেয়ে ভালো তীব্র অশ্রুজল!
কে জানিত সে-হাসির অন্তরে অন্তরে
কালরাত্রি অন্ধকার রয়েছে লুকায়ে!
একদিনো বলে নি সে কোনো দুঃখ-কথা,
একদিনো কাঁদে নি সে সমুখে আমার!
জানি জানি মালতী সে স্বর্গের দেবতা!
নিজের প্রাণের বহ্নি করিয়া গোপন,
পরের চোখের জল দিত সে মুছায়ে!

ছেলেবেলাকার সেই হাসিটি তাহার
সমস্ত আনন তার রাখিত উজ্জ্বলি,
কত-না করিত যত্ন করিত সান্ত্বনা।
হাসিতে হাসিতে কত করিত আদর।
কিন্তু হা, শ্মশানে যথা চাঁদের জোছনা
শ্মশানের ভীষণতা বাড়ায় দ্বিগুণ—
মালতীর সেই হাসি দেখিয়া তেমনি
নিজের এ হৃদয়ের ভগ্ন-অবশেষ
দ্বিগুণ পড়িত যেন নয়নে আমার।
তাহার আদর পেয়ে ভুলিনু যাতনা,
কিন্তু হায়, দেখি নাই, বিজন-শয্যায়
কত দিন কাঁদিয়াছে মালতী গোপনে।
সে যখন দেখিত, তাহার বাল্যসখা
দিনে দিনে অবসাদে হইছে মলিন,
দিনে দিনে মন তার যেতেছে ভাঙিয়া,
তখন আকুলা বালা রাত্রে একাকিনী
কাঁদিয়া দেবতা কাছে করেছে প্রার্থনা—
বালিকার অশ্রুময় সে প্রার্থনাগুলি
আর কেহ শুনে নাই অন্তর্যামী ছাড়া।
দেখি নাই কত রাত্রি একাকিনী গিয়া
যমুনার তীরে বসি কাঁদিত বিরলে।
একাকিনী কেঁদে কেঁদে হইত প্রভাত,
এলোথেলো কেশপাশে পড়িত শিশির,
চাহিয়া রহিত উষা ম্লান মুখপানে।
বিষময়, বহ্নিময়, বজ্রময় প্রেম,
এ স্নেহের কাছে তুই ঢাক মুখ ঢাক।
তুই মরণের কীট, জীবনের রাহু,
সৌন্দর্য-কুসুম-বনে তুই দাবানল,
হৃদয়ের রোগ তুই, প্রাণের মাঝারে
সতত রাখিস তুই পিপাসা পুষিয়া,
ভুজঙ্গ বাহুর পাকে মর্ম জড়াইয়া
কেবলি ফেলিস তুই বিষাক্ত নিশ্বাস,
আগ্নেয় নিশ্বাসে তোর জ্বলিয়া জ্বলিয়া
হৃদয়ে ফুটিতে থাকে তপ্ত রক্তস্রোত।
জরজর কলেবর, আবেশে অসাড়,
শিথিল শিরার গ্রন্থি, অচেতন প্রাণ,
স্খলিত জড়িত বাণী, অবশ নয়ন,
আশা ও নিরাশা-পাকে ঘুরিছে হৃদয়,
ঘুরিছে চোখের 'পরে জগতসংসার।
এই প্রেম, এই বিষ, বজ্র-হুতাশন
কবে রে পৃথিবী হতে যাবে দূর হয়ে।

আয় স্নেহ, আয় তোর স্নিগ্ধসুধা ঢালি
এ জ্বলন্ত বহ্নিরাশি দে রে নিবাইয়া।
অগ্নিময় বৃশ্চিকের আলিঙ্গন হতে,
সুধাসিক্ত কোলে তোর তুলে নে তুলে নে।
প্রেম-ধূমকেতু ওই উঠেছে আকাশে,
ঝলসি দিতেছে, হায়, যৌবনের আঁখি,
কোথা তুমি ধ্রুবতারা ওঠো একবার,
ঢালো এ জ্বলন্ত নেত্রে স্নিগ্ধ মৃদু জ্যোতি।
তুমি সুধা, তুমি ছায়া, তুমি জ্যোৎস্নাধারা,
তুমি স্রোতস্বিনী, তুমি উষার বাতাস,
তুমি হাসি, তুমি আশা, মৃদু অশ্রুজল,
এসো তুমি এ প্রেমেরে দাও নিভাইয়া।
একটি মালতী যার আছে এ সংসারে
সহস্র দামিনী তার ধূলিমুষ্টি নয়!

ক্রমশ হৃদয় মোর এল শান্ত হয়ে
যন্ত্রণা বিষাদে আসি হল পরিণত।
নিস্তরঙ্গ সরসীর প্রশান্ত হৃদয়ে
নিশীথের শান্ত বায়ু ভ্রমে গো যখন,
এত শান্ত এত মৃদু পদক্ষেপ তার
একটি চরণচিহ্ন পড়ে না সরসে,
তেমনি প্রশান্ত হৃদে প্রশান্ত বিষাদ
ফেলিতে লাগিল ধীরে মৃদুল নিশ্বাস।
নিরখিয়া নিদারুণ ঝটিকার মাঝে
হাসিময় শান্ত সেই মালতী কুসুমে
ক্রমশ হৃদয় মোর এল শান্ত হয়ে।
কিন্তু হায় কে জানিত সেই হাসিময়
সুকুমার ফুলটির মর্মের মাঝারে
মরণের কীট পশি করিতেছে ক্ষয়!
হইল প্রফুল্লতর মুখখানি তার,
হইল প্রশান্ততর হাসিটি তাহার,
দিবা যবে যায় যায়, হাসিময় মেঘে
দূর আঁধারের মুখ করয়ে উজ্জ্বল—
এ হাসি তেমনি হাসি কে জানিত তাহা!
একদা পূর্ণিমারাত্রে নিস্তব্ধ গভীর
মুখপানে চেয়ে বালা, হাত ধরি মোর
কহিল মৃদুলস্বরে—'যাই তবে ভাই!'
কোথা গেলি—কোথা গেলি মালতী আমার
অভাগা ভ্রাতারে তোর রাখিয়া হেথায়!
দুঃখের কণ্টকময় সংসারের পথে
মালতী, কে লয়ে যাবে হাত ধরি মোর?

সংসারের ধ্রুবতারা ডুবিল আমার।
তেমন পূর্ণিমা রাত্রি দেখি নি কখনো,
পৃথিবী ঘুমাইতেছে শান্ত জোছনায়;
কহিনু পাগল হয়ে— 'রাক্ষসী পৃথিবী
এত রূপ তোরে কভু সাজে না সাজে না!'

মালতী শুকায়ে গেল, সুবাস তাহার
এখনো রয়েছে কিন্তু ভরিয়া কুটির।
তাহার মনের ছায়া এখনো যেন রে
সে কুটিরে শান্তিরসে রেখেছে ডুবায়ে!
সে শান্ত প্রতিমা মম মনের মন্দির
রেখেছে পবিত্র করি রেখেছে উজ্জ্বলি!

রকাশকাল : ১২৮৯

রভাতসংগীত

স্নেহ উপহার

শ্রীমতী ইন্দিরা প্রাণাধিকাসু।

বাব্‌লা।

আয় রে বাছা কোলে বসে চা' মোর মুখ-পানে,
হাসিখুশি প্রাণখানি তোর প্রভাত ডেকে আনে।
আমায় দেখে আসিস ছুটে, আমায় বাসিস ভালো,
কোথা হতে পড়লি প্রাণে তুই রে উষার আলো!

দেখ্‌ রে প্রাণে স্নেহের মতো সাদা সাদা জুঁই ফুটেছে।
দেখ্‌ রে, আমার গানের সাথে ফুলের গন্ধ জড়িয়ে গেছে।
গেথেছি রে গানের মালা, ভোরের বেলা বনে এসে
মনে বড়ো সাধ হয়েছে পরাব তোর এলোকেশে!
গানের সাথে ফুলের সাথে মুখখানি মানাবে ভালো,
আয় রে তবে আয় রে মেয়ে দেখ্‌ রে চেয়ে রাত পোহালো!
কচিমুখটি ঘিরে দেব ললিতরাগিণী দিয়ে,
বাপের কাছে মায়ের কাছে দেখিয়ে আসবি ছুটে গিয়ে!

চাঁদনি রাতে বেড়াই ছাতে মুখখানি তোর মনে পড়ে,
তোর কথাটাই কিলিবিলি মনের মধ্যে নড়েচড়ে!
হাসি হাসি মুখখানি তোর ভেসে ভেসে বেড়ায় কাছে,
হাসি যেন এগিয়ে এল, মুখটি যেন পিছিয়ে আছে!
কচি প্রাণের আনন্দ তোর ভাঙা বুকে দে ছড়িয়ে,
ছোটো দুটি হাত দিয়ে তোর গলাটি মোর ধর জড়িয়ে!

বিজন প্রাণের দ্বারে বসে করবি রে তুই ছেলেখেলা,
চুপ করে তাই বসে বসে দেখব আমি সন্ধেবেলা।
কোথায় আছিস, সাড়া দে রে, বুকের কাছে আয় রে তবে,
তোর মুখেতে গানগুলি মোর কেমন শোনায় শুনতে হবে!

আমি যেন দাঁড়িয়ে আছি একটা বাবলা গাছের মতো
বড়ো বড়ো কাঁটার ভয়ে তফাত থাকে লতা যত।
সকাল হলে মনের সুখে ডালে ডালে ডাকে পাখি,
আমার কাঁটা-ডালে কেউ ডাকে না চুপ করে তাই দাঁড়িয়ে থাকি!
নেই বা লতা এল কাছে, নেই বা পাখি বসল শাখে,
যদি আমার বুকের কাছে বাবলা ফুলটি ফুটে থাকে!
বাতাসেতে দুলে দুলে ছড়িয়ে দেয় রে মিষ্টি হাসি,
কাঁটা-জন্ম ভুলে গিয়ে তাই দেখে হরষে ভাসি!
দূর কর ছাই, ঝোঁকের মাথায় বলে ফেললেম কত কী যে?
কথাগুলো ঠেকছে যেন চোখের জলে ভিজে ভিজে!

রবি কাকা।

প্রকাশকাল : ১২৯০

শরতে প্রকৃতি

কই গো প্রকৃতি রানী, দেখি দেখি মুখখানি,
কেন গো বিষাদচ্ছায়া রয়েছে অধর ছুঁয়ে
মুখানি মলিন কেন গো?
এই যে মুহূর্ত আগে হাসিতে ছিলে গো দেখি
পলক না পালটিতে সহসা নেহারি এ কি—
মরমে বিলীন যেন গো!
কেন তনুখানি ঢাকা শুভ্র কুহেলিকা বাসে
মৃদু বিষাদের ভারে সুধীরে মুদিয়া আসে
নয়ন-নলিন হেন গো?

ওই দেখো চেয়ে দেখো— একবার চেয়ে দেখো—
চাঁদের অধর দুটি হাসিতে ভাসিয়া যায়!
নিশীথের প্রাণে গিয়া সে হাসি মিশিয়া যায়।
সে হাসির কোলে বসি কানন-গোলাপগুলি
আধো আধো কথা কহে সোহাগেতে দুলি দুলি!
সে হাসির পায়ে পড়ি নদীর লহরীগণ
যার যত কথা আছে বলিতে আকুল মন।
সে-হাসির শিশুদুটি লতিকামণ্ডপে গিয়া
আঁধারে ভাবিয়া সারা বাহিরিবে কোথা দিয়া।
সে-হাসি অলসে ঢলি দিগন্তে পড়িয়া নুয়ে,
মেঘের অধরপ্রান্ত একটু রয়েছে ছুঁয়ে।

বলো তুমি কেন তবে
এমন মলিন রবে?
বিষাদ-স্বপন দেখে হাসির কোলেতে শুয়ে।

ঘোমটাটি খোলো খোলো
মুখখানি তোলো তোলো
চাঁদের মুখের পানে চাও একবার!
বলো দেখি কারে হেরি এত হাসি তার!
নিলাজ বসন্ত যবে কুসুমে কুসুমময়
মাতিয়া নিজের রূপে হাসিয়া আকুল হয়,
মলয় মরমে মরি,
ফিরে হাহাকার করি—
বনের হৃদয় হতে সৌরভ-উচ্ছ্বাস বয়!
তারে হেরি হয় না সে এমন হরষে ভোর;
কী চোখে দেখেছে চাঁদ ওই মুখখানি তোর!
তুই তবু কেন কেন
দারুণ বিরাগে যেন
চাস নে চাঁদের হাসি চাঁদের আদর!
নাই তোর ফুলবাস,
নাইক প্রেমের হাস,
পাপিয়া আড়ালে বসি শুনায় না প্রেমগান!
কী দুখেতে উদাসিনী
যৌবনেতে সন্ন্যাসিনী!
কাহার ধেয়ানে মগ্ন শুভ্র বস্ত্র পরিধান?

এক-কালে ছিল তোর কুসুমিত মধুমাস—
হৃদয়ে ফুটিত তোর অজস্র ফুলের রাশ;
যৌবন-উচ্ছ্বাসে ভোর
প্রাণের সুরভি তোর
পথিক সমীরে সব দিলি তুই বিলাইয়া!
শেষে গ্রীষ্মতাপে জ্বলি
শুকাইল ফুল-কলি,
সর্বস্ব যাহারে দিলি সেও গেল পলাইয়া!
চেতনা পাইয়া শেষে হইয়া সর্বস্ব-হারা
সারাটি বরষা তুই কাঁদিয়া হইলি সারা!
এত দিন পরে বুঝি শুকাইল অশ্রুধারা!
আজ বুঝি মনে মনে করিলি দারুণ পণ
যোগিনী হইবি তুই পাষাণে বাঁধিবি মন।
বসন্তের ছেলেখেলা ভালো নাহি লাগে আর—
চপল চঞ্চল হাসি ফুলময় অলংকার!
এখন যে হাসি হাসো আজি বিরাগের দিন,
শুভ্র শান্ত সুবিমল বাসনা-লালসাহীন।

এত যে করিলি পণ
তবুও তো ক্ষণে ক্ষণ
সে দিনের স্মৃতিছায়া হৃদয়ে বেড়ায় ভাসি।
প্রশান্ত মুখের 'পরে
কুহেলিকা ছায়া পড়ে—
ভাবনার মেঘ উঠে সহসা আলোক নাশি—
মুহূর্তে কিসের লাগি
আবার উঠিস জাগি
আবার অধরে ফুটে সেই সে পুরানো হাসি!

ঘুমায়ে পড়িস যবে বিহ্বল রজনীশেষে,
অতি মৃদু পা টিপিয়া উষা আসে হেসে হেসে,
অতিশয় সাবধানে দুইটি আঙুল দিয়া
কুয়াশা-ঘোমটা তোর দেয় ধীরে সরাইয়া!
অমনি তরুণ রবি পাশে আসি মৃদুগতি
মুদ্রিত নয়ন তোর চুমে ধীরে ধীরে অতি!
শিহরিয়া কাঁপি উঠি
মেলিস নয়ন দুটি,
রাঙা হয়ে ওঠে তোর কপোল-কুসুমদল
শরমে আকুল ঝরে শিশির-নয়নজল!

সুদূর আলয় হতে তাড়াতাড়ি খেলা ভুলি
মাঝে মাঝে ছুটে আসে দুদণ্ডের মেঘগুলি।
চমকি দাঁড়ায়ে থাকে, ওই মুখপানে চায়,
কাঁদিয়া কাঁদিয়া শেষে কাঁদিয়া মরিয়া যায়!
কিসের বিরাগ এত, কী তপে আছিস ভোর!
এত করে সেধে সেধে
এত করে কেঁদে কেঁদে
যোগিনী, কিছুতে তবু ভাঙিবে না পণ তোর?
যোগিনী, কিছুতে কি রে ফিরিবে না মন তোর?

ভারতী
আশ্বিন ১২৮৭

ছবি ও গান

বিরহ

ধীরে ধীরে প্রভাত হল, আঁধার মিলায়ে গেল
উষা হাসে কনকবরণী,
বকুল গাছের তলে কুসুম রাশির পরে
বসিয়া পড়িল সে রমণী,

আঁখি দিয়ে ঝরঝরে অশ্রুবারি ঝ'রে পড়ে
ভেঙে যেতে চায় যেন বুক,
রাঙা রাঙা অধর দুটি কেঁপে কেঁপে ওঠে কতো,
করতলে সকরুণ মুখ।
অরুণ আঁখির 'পরে, অরুণের আভা পড়ে,
কেশপাশে অরুণ লুকায়,
দুই হাতে মুখ ঢাকে কার নাম ধরে ডাকে
কেন তার সাড়া নাহি পায়।
বহিছে প্রভাত-বায় আঁচল লুটিয়ে যায়,
মাথায় ঝরিয়ে পড়ে ফুল,
ডালপালা দোলে ধীরে কাননে সরসীতীরে
ফুটে ওঠে মল্লিকা মুকুল।
পা দুখানি ছড়াইয়া পুরবের পানে চেয়ে
ললিতে প্রাণের গান গায়
গাহিতে গাহিতে গান, সব যেন অবসান
যেন সব-কিছু ভুলে যায়।
প্রাণ যেন গানে মিশে, অনন্ত আকাশ-মাঝে
উদাসী হইয়ে চ'লে যায়,
ব'সে ব'সে শুধু গান গায়।

কাল : ১২৯০

সিংহ ঠাকুরের পদাবলী

১

সখিরে— পিরীত বুঝবে কে?
আঁধার হৃদয়ক দুঃখ কাহিনী
বোলব, শুনবে কে?
রাধিকার অতি অন্তর বেদন
কে বুঝবে অয়ি সজনী
কে বুঝবে সখি রোয়ত রাধা
কোন দুখে দিন রজনী?
কলঙ্ক রটায়ব জনি সখি রটাও
কলঙ্ক নাহিক মানি,
সকল তয়াগব লভিতে শ্যামক
একঠো আদর বাণী।
মিনতি করিলো সখি শত শত বার, তু
শ্যামক না দিহ গারি,
শীল মান কুল, অপনি সজনি হম
চরণে দেয়নু ডারি।

সখিলো—
বৃন্দাবনকো দুরজন মানুখ
পিরীত নাহিক জানে,
বৃথাই নিন্দা কাহ রটায়ত
হমার শ্যামক নামে?
কলঙ্কিনী হম রাধা, সখিলো
ঘৃণা করহ জনি মনমে
ন আসিও তব্ কবহুঁ সজনিলো
হমার আঁধা ভবনমে।
কহে ভানু অব— বুঝবে না সখি
কোহি মরমকো বাত,
বিরলে শ্যামক কহিও বেদন
বৃক্ষে রাখয়ি মাথ।

ভারতী
ফাল্গুন ১২৮৪

২

হম সখি দারিদ নারী!
জনম অবধি হম পীরিতি করনু
মোচনু লোচন-বারি।
রূপ নাহি মম, কছুই নাহি গুণ
দুখিনী আহির জাতি,
নাহি জানি কছু বিলাস-ভঙ্গিম
যৌবন গরবে মাতি।
অবলা রমণী, ক্ষুদ্র হৃদয় ভরি
পীরিত করনে জানি;
এক নিমিখ পল, নিরখি শ্যাম জনি
সোই বহুত করি মানি।
কুঞ্জ পথে যব নিরখি সজনি হম,
শ্যামক চরণক চীনা,
শত শত বেরি ধূলি চুম্বি সখি,
রতন পাই জনু দীনা।
নিঠুর বিধাতা, এ দুখ-জনমে
মাঙব কি তুয়া পাশ!
জনম অভাগী, উপেখিতা হম,
বহুত নাহি করি আশ,—
দূর থাকি হম রূপ হেরইব,
দূরে শুনইব বাঁশি।
দূর দূর রহি সুখে নিরীখিব
শ্যামক মোহন হাসি।
শ্যাম-প্রেয়সি রাধা! সখিলো!
থাক' সুখে চিরদিন!

তুয়া সুখে হম রোয়ব না সখি
অভাগিনী গুণ হীন।
অপন দুখে সখি, হম রোয়ব লো
নিভৃতে মুছইব বারি।
কোহি ন জানব, কোন বিষাদে
তন-মন দহে হমারি।
ভানু সিংহ ভনয়ে, শুন কালা
দুখিনী অবলা বালা—
উপেখার অতি তিখিনী বাণে
না দিহ না দিহ জ্বালা।

ভারতী
মাঘ ১২৮৪

কড়ি ও কোমল

শরতের শুকতারা

একাদশী রজনী
পোহায় ধীরে ধীরে—
রাঙা মেঘ দাঁড়ায়
উষারে ঘিরে ঘিরে।
ক্ষীণ চাঁদ নভের
আড়ালে যেতে চায়,
মাঝখানে দাঁড়ায়ে
কিনারা নাহি পায়।
বড়ো ম্লান হয়েছে
চাঁদের মুখখানি,
আপনাতে আপনি
মিশাবে অনুমানি।
হেরো দেখো কে ওই
এসেছে তার কাছে,
শুকতারা চাঁদের
মুখেতে চেয়ে আছে।
মরি মরি কে তুমি
একটুখানি প্রাণ,
কী না জানি এনেছ
করিতে ওরে দান।
চেয়ে দেখো আকাশে
আর তো কেহ নাই,
তারা যত গিয়েছে
যে যার নিজ ঠাঁই।

সাথীহারা চন্দ্রমা
হেরিছে চারি ধার,
শূন্য আহা নিশির
বাসর-ঘর তার!
শরতের প্রভাতে
বিমল মুখ নিয়ে
তুমি শুধু রয়েছ
শিয়রে দাঁড়াইয়ে।
ও হয়তো দেখিতে
পেলে না মুখ তোর!
ও হয়তো তারার
খেলার গান গায়,
ও হয়তো বিরাগে
উদাসী হতে চায়!
ও কেবল নিশির
হাসির অবশেষ!
ও কেবল অতীত
সুখের স্মৃতিলেশ!
দ্রুতপদে তাহার।
কোথায় চলে গেছে—
সাথে যেতে পারে নি
পিছনে পড়ে আছে!
কত দিন উঠেছ
নিশির শেষাশেষি,
দেখিয়াছ চাঁদেতে
তারাতে মেশামেশি!
দুই দণ্ড চাহিয়া
আবার চলে যেতে,
মুখখানি লুকাতে
উষার আঁচলেতে।
পুরবের একান্তে
একটু দিয়ে দেখা,
কী ভাবিয়া তখনি
ফিরিতে একা একা।
আজ তুমি দেখেছ
চাঁদের কেহ নাই,
স্নেহময়ি, আপনি
এসেছ তুমি তাই!
দেহখানি মিলায়
মিলায় বুঝি তার!

হাসিটুকু রহে না
রহে না বুঝি আর!
দুই দণ্ড পরে তো
রবে না কিছু হায়!
কোথা তুমি, কোথায়
চাঁদের ক্ষীণকায়!
কোলাহল তুলিয়া
গরবে আসে দিন,
দুটি ছোটো প্রাণের
লিখন হবে লীন।
সুখশ্রমে মলিন
চাঁদের একসনে
নবপ্রেম মিলাবে
কাহার রবে মনে!

ভারতী
অগ্রহায়ণ ১২৯১

পত্র

শ্রীমতী ইন্দিরা প্রাণাধিকাসু

স্টীমার। খুলনা

মাগো আমার লক্ষ্মী,
মনিষ্যি না পক্ষী!
এই ছিলেম তরীতে,
কোথায় এনু ত্বরিতে!
কাল ছিলেম খুলনায়,
তাতে তো আর ভুল নাই,
কলকাতায় এসেছি সদ্য,
বসে বসে লিখছি পদ্য।

তোদের ফেলে সারাটা দিন
আছি অমনি এক রকম,
খোপে বসে পায়রা যেন
করছি কেবল বক্‌বকম!
বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর
মেঘ করেছে আকাশে,
উষার রাঙা মুখখানি গো
কেমন যেন ফ্যাকাশে!
বাড়িতে যে কেউ কোথা নেই
দুয়োরগুলো ভেজানো,

ঘরে ঘরে খুঁজে বেড়াই
ঘরে আছে কে যেন।
পক্ষীটি সেই ঝুপসি হয়ে
ঝিমচ্ছে রে খাঁচাতে,
ভুলে গেছে নেচে নেচে
পুচ্ছটি তার নাচাতে।
ঘরের কোণে আপন মনে
শূন্য পড়ে বিছেনা,
কাহার তরে কেঁদে মরে
সে কথাটা মিছে না।
বইগুলো সব ছড়িয়ে প'ড়ে
নাম লেখা তায় কার গো।
এমনি তারা রবে কি রে
খুলবে না কেউ আর গো।
এটা আছে সেটা আছে
অভাব কিছু নেই তো,
স্মরণ করে দেয় রে যারে
থাকে নাকো সেই তো।
বাগানে ওই দুটো গাছে
ফুল ফুটেছে রাশি রাশি,
ফুলের গন্ধে মনে পড়ে
ফুল কে আমায় দিত মেলা,
বিছেনায় কার মুখটি দেখে
সকাল হত সকালবেলা।
জল থেকে তুই আসবি কবে
মাটির লক্ষ্মী মাটিতে
ঠাকুরবাবুর ছয় নম্বর
জোড়াসাঁকোর বাটিতে।

ইস্টিম ওই রে ফুরিয়ে এল
নোঙর তবে ফেলি অদ্য।
অবিদিত নেই তো তোমার
রবিকাকা কুঁড়ের হদ্দ।
আজকে নাকি মেঘ করেছে
ঢেকেছে কেমন ঝাঁকা-ঝাঁকা,
তাই খানিকটা ফোঁসফোঁসিয়ে
বিদায় হল—
রবিকাকা।

কলিকাতা
প্রকাশকাল : ১২৯৩

পত্র

শ্রীমতী ইন্দিরা প্রাণাধিকাসু

স্টীমার। খুলনা

বসে বসে লিখলেম চিঠি
পুরিয়ে দিলাম চারটি পিঠই,
পেলেম না তার জবাবই
এমনি তোমার নবাবী!

দুটো ছত্র লিখবি পত্র
একলা তোমার 'রব্-কা' যে!
পোড়ারমুখী তাও হবে না
আলিস্যি তোর সব কাজে!
ঝগড়াটে নয় স্বভাব আমার
নইলে দেখতে কারখানা,
গলার চোটে আকাশ ফেটে
হয়ে যেত চারখানা,
বাছা আমার দেখতে পেতে
এই কলমের ধারখানা!

তোমার মতো এমনি মা তো
দেখি নি এ বঙ্গে গো,
মায়া দয়া যা-কিছু সে
যদিন থাকে সঙ্গে গো!
চোখের আড়াল প্রাণের আড়াল
কেমনতরো ঢঙ এ গো!
তোমার প্রাণ যে পাষাণ-সম
জানি সেটা long ago!

সংসারে যে সবি মায়া
সেটা নেহাত গল্প না!
বাইরেতে এক ভিতরে এক
এ যেন কার খল-পনা!
সত্যি বলে যেটা দেখি
সেটা আমার কল্পনা!
ভেবে একবার দেখো বাছা
ফিলজফি অল্প না!

মস্ত একটা বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ
কে রেখেছে সাজিয়ে
যা করি তা কেবল 'থোড়া
জমির বাস্তে কাজিয়ে!'

বৃষ্টি পড়ে চিঠি না পাই,
মনটা নিয়ে ততই হাঁপাই,
শূন্যে চেয়ে ততই ভাবি
সকলি ভোজ-বাজি এ!
ফিলজফি মনের মধ্যে
ততই ওঠে গাঁজিয়ে!

দূর হোক গে, এত কথা
কেনই বলি তোমাকে!
ভরা নায়ে পা দিয়েছ,
আছ তুমি দেমাকে!

...

তোমার সঙ্গে আর কথা না,
তুমি এখন লোকটা মস্ত,
কাজ কি বাপু, এইখেনেতেই
রবীন্দ্রনাথ হলেন অস্ত।

জন্মতিথির উপহার

একটি কাঠের বাক্স
শ্রীমতী ইন্দিরা প্রাণাধিকাসু

স্নেহ-উপহার এনেছি রে দিতে
লিখেও এনেছি দু-তিন ছত্তর।
দিতে কত কী যে সাধ যায় তোরে
দেবার মতো নেই জিনিস-পত্তর!
টাকাকড়িগুলো ট্যাকশালে আছে
ব্যাঙ্কে আছে সব জমা,
ট্যাঁকে আছে খালি গোটা দুত্তিন,
এবার করো বাছা ক্ষমা!
হীরে জহরাৎ যত ছিল মোর
পোঁতা ছিল সব মাটিতে,
জহরী যে যেত সন্ধান পেয়ে
নে গেছে যে যার বাটীতে!
দুনিয়া শহর জমিদারি মোর,
পাঁচ ভূতে করে কাড়াকাড়ি,
হাতের কাছেতে যা-কিছু পেলুম,
নিয়ে এনু তাই তাড়াতাড়ি!
স্নেহ যদি কাছে রেখে যাওয়া যেত
চোখে যদি দেখা যেত রে,

বাজারে-জিনিস কিনে নিয়ে এসে
বল্ দেখি দিত কে তোরে!
জিনিসটা অতি যৎসামান্য
রাখিস ঘরের কোণে,
বাক্সখানি ভরে স্নেহ দিনু তোরে
এইটে থাকে যেন মনে!
বড়োসড়ো হবি ফাঁকি দিয়ে যাবি,
কোন্‌খেনে রবি নুকিয়ে,
কাকা-ফাকা সব ধুয়ে-মুছে ফেলে
দিবি একেবারে চুকিয়ে।
তখন যদি রে এই কাঠখানা
মনে একটুকু তোলে ঢেউ—
একবার যদি মনে পড়ে তোর
'বুজি' বলে বুঝি ছিল কেউ!
এই-যে সংসারে আছি মোরা সবে
এ বড়ো বিষম দেশটা!
ফাঁকিফুঁকি দিয়ে দূরে চলে যেতে
ভুলে যেতে সবার চেষ্টা!
ভয়ে ভয়ে তাই সবারে সবাই
কত কী যে এনে দিচ্ছে,
এটা-ওটা দিয়ে স্মরণ জাগিয়ে
বেঁধে রাখিবার ইচ্ছে!
মনে রাখতে যে মেলাই কাঠ-খড় চাই,
ভুলে যাবার ভারি সুবিধে,
ভালোবাস যারে কাছে রাখ তারে
যাহা পাস তারে খুবি দে!
বুঝে কাজ নেই এত শত কথা,
ফিলজফি হোক ছাই!
বেঁচে থাকো তুমি সুখে থাকো বাছা
বালাই নিয়ে মরে যাই!

প্রকাশকাল : ১২৯৩

চিঠি

শ্রীমতী ইন্দিরা প্রাণাধিকাসু

স্টীমার 'রাজহংস'। গঙ্গা

চিঠি লিখব কথা ছিল,
দেখছি সেটা ভারি শক্ত।
তেমন যদি খবর থাকে
লিখতে পারি তক্ত তক্ত।

খবর বয়ে বেড়ায় ঘুরে
খবরওয়ালা ঝাঁকা-মুটে।
আমি বাপু ভাবের ভক্ত
বেড়াই নাকো খবর খুঁটে।
এত ধুলো, এত খবর
কলকাতাটার গলিতে।
নাকে ঢোকে খবর ঢোকে
দু-চার কদম চলিতে।
এত খবর সয় না আমার
মরি আমি হাঁপোষে।
ঘরে এসেই খবরগুলো
মুছে ফেলি পাপোষে।
আমাকে তো জানই বাছা!
আমি একজন খেয়ালি।
কথাগুলো যা বলি, তার
অধিকাংশই হেঁয়ালি।
আমার যত খবর আসে
ভোরের বেলা পুব দিয়ে।
পেটের কথা তুলি আমি
পেটের মধ্যে ডুব দিয়ে।
আকাশ ঘিরে জাল ফেলে
তারা ধরাই ব্যাবসা।
থাক্ গে তোমার পাটের হাটে
মথুর কুণ্ডু শিবু সা।
কল্পতরুর তলায় থাকি
নই গো আমি খবুরে।
হাঁ করিয়ে চেয়ে আছি
মেওয়া ফলে সবুরে।
তবে যদি নেহাত কর
খবর নিয়ে টানাটানি।
আমি বাপু একটি কেবল
দুষ্টু মেয়ের খবর জানি।
দুষ্টুমি তার শোন যদি
অবাক হবে সত্যি।
এত বড়ো বড়ো কথা তার
মুখখানি একরত্তি।
মনে মনে জানেন তিনি
ভারি মস্ত লোকটা।
লোকের সঙ্গে না-হক কেবল
ঝগড়া করবার ঝোঁকটা।

আমার সঙ্গেই যত বিবাদ
কথায় কথায় আড়ি।
এর নাম কি ভদ্র ব্যাভার!
বড্ড বাড়াবাড়ি।
মনে করেছি তার সঙ্গে
কথাবার্তা বন্ধ করি।
প্রতিজ্ঞা থাকে না পাছে
সেইটে ভারি সন্দ করি।
সে না হলে সকাল বেলায়
চামেলি কি ফুটবে!
সে নইলে কি সন্ধে বেলায়
সন্ধেতারা উঠবে।
সে না হলে দিনটা ফাঁকি
আগাগোড়াই মস্কারা।
পোড়ারমুখী জানে সেটা
তাই এত তার আস্কারা।
চুড়ি-পরা হাত দুখানি
কতই জানে ফন্দি।
কোনোমতে তার সাথে তাই
করে আছি সন্ধি।

নাম যদি তার জিগেস কর
নামটি বলা হবে না।
কী জানি সে শোনে যদি
প্রাণটি আমার রবে না।
নামের খবর কে রাখে তার
ডাকি তারে যা খুশি।
দুষ্টু বলো, দস্যি বলো,
পোড়ারমুখী, রাক্ষুসী।
বাপ মায়ে যে নাম দিয়েছে
বাপ মায়েরি থাক্ সে।
ছিষ্টি খুঁজে মিষ্টি নামটি
তুলে রাখুন বাক্সে!
এক জনেতে নাম রাখবে
অন্নপ্রাশনে।
বিশ্বসুদ্ধ সে নাম নেবে
বিষম শাসন এ!
নিজের মনের মতো সবাই
করুক নামকরণ।
বাবা ডাকুন 'চন্দ্রকুমার'
খুড়ো 'রামচরণ'।

ধার-করা নাম নেব আমি
হবে না তো সিটি।
জানই আমার সকল কাজে
Originality।
ঘরের মেয়ে তার কি সাজে
সঙস্কৃত নাম।
এতে কেবল বেড়ে ওঠে
অভিধানের দাম।
আমি বাপু ডেকে বসি
যেটা মুখে আসে,
যারে ডাকি সেই তা বোঝে
আর সকলে হাসে!
দুষ্টু মেয়ের দুষ্টুমি— তায়
কোথায় দেব দাঁড়ি!
অকূল পাথার দেখে শেষে
কলমের হাল ছাড়ি!
শোনো বাছা, সত্যি কথা
বলি তোমার কাছে—
ত্রিজগতে তেমন মেয়ে
একটি কেবল আছে।
বর্ণিমেটা কারো সঙ্গে
মিলে পাছে যায়—
তুমুল ব্যাপার উঠবে বেধে
হবে বিষম দায়!
হপ্তাখানেক বকাবকি
ঝগড়াঝাটির পালা,
একটু চিঠি লিখে, শেষে
প্রাণটা ঝালাফালা।
আমি বাপু ভালোমানুষ
মুখে নেইকো রা।
ঘরের কোণে বসে বসে
গোঁফে দিচ্ছি তা।
আমি যত গোলে পড়ি
শুনি নানান বাক্যি।
খোঁড়ার পা যে খানায় পড়ে
আমিই তাহার সাক্ষী।
আমি কারো নাম করি নি
তবু ভয়ে মরি।
তুই পাছে নিস গায়ে পেতে
সেইটো বড়ো ডরি।

কথা একটা উঠলে মনে
ভারি তোরা জ্বালাস।
আমি বাপু আগে থাকতে
বলে হলুম খালাস!

বালক
ফাল্গুন ১২৯২

পত্র

শ্রীমান্ দামু বসু এবং চামু বসু
সম্পাদক সমীপেষু।
দামু বোস আর চামু বোসে
কাগজ বেনিয়েছে
বিদ্যেখানা বড্ড ফেনিয়েছে!
(আমার দামু আমার চামু!)
কোথায় গেল বাবা তোমার
মা জননী কই!
সাত-রাজার-ধন মানিক ছেলের
মুখে ফুটছে খই!
(আমার দামু আমার চামু!)
দামু ছিল একরত্তি
চামু তথৈবচ,
কোথা থেকে এল শিখে
এতই খচমচ!
(আমার দামু আমার চামু!)
দামু বলেন 'দাদা আমার'
চামু বলেন 'ভাই',
আমাদের দোঁহাকার মতো
ত্রিভুবনে নাই!
(আমার দামু আমার চামু!)
গায়ে পড়ে গাল পাড়ছে
বাজার সরগরম,
মেছুনি-সংহিতায় ব্যাখ্যা
হিঁদুর ধরম!
(দামু আমার চামু!)
দামুচন্দ্র অতি হিঁদু
আরো হিঁদু চামু
সঙ্গে সঙ্গে গজায় হিঁদু
রামু বামু শামু
(দামু আমার চামু!)

রব উঠেছে ভারতভূমে
হিঁদু মেলা ভার,
দামু চামু দেখা দিয়েছেন
ভয় নেইকো আর।
(ওরে দামু, ওরে চামু!)
নাই বটে গোতম অত্রি
যে যার গেছে সরে,
হিঁদু দামু চামু এলেন
কাগজ হাতে করে।
(আহা দামু আহা চামু!)
লিখছে দোঁহে হিঁদুশাস্ত্র
এডিটোরিয়াল,
দামু বলছে মিথ্যে কথা
চামু দিচ্ছে গাল।
(হায় দামু হায় চামু!)
এমন হিঁদু মিলবে না রে
সকল হিঁদুর সেরা,
বোস বংশ আর্যবংশ
সেই বংশের এঁরা।
(বোস দামু বোস চামু!)
কলির শেষে প্রজাপতি
তুলেছিলেন হাই,
সুড়সুড়িয়ে বেরিয়ে এলেন
আর্য দুটি ভাই ;
(আর্য দামু চামু!)
দম্ভ দিয়ে খুঁড়ে তুলছে
হিঁদু শাস্ত্রের মূল,
মেলাই কচুর আমদানিতে
বাজার হুলুস্থুল।
(দামু চামু অবতার!)
মনু বলেন ‘ম'নু আমি’
বেদের হল ভেদ,
দামু চামু শাস্ত্র ছাড়ে,
রইল মনে খেদ!
(ওরে দামু ওরে চামু!)
মেড়ার মতো লড়াই করে
লেজের দিকটা মোটা,
দাপে কাঁপে থরথর
হিঁদুয়ানির খোঁটা।
(আমার হিঁদু দামু চামু!)

দামু চামু কেঁদে আকুল
কোথায় হিঁদুয়ানি!
ট্যাকে আছে গোঁজ' যেথায়
সিকি দুয়ানি।
(থলের মধ্যে হিঁদুয়ানি!)
দামু চামু ফুলে উঠল
হিঁদুয়ানি বেচে,
হামাগুড়ি ছেড়ে এখন
বেড়ায় নেচে নেচে।
(বেটের বাছা দামু চামু!)
আদর পেয়ে নাদুস নুদুস
আহার করছে কসে,
তরিবৎটা শিখলে নাকো
বাপের শিক্ষাদোষে!
(ওরে দামু চামু!)
এসো বাপু কানটি নিয়ে,
শিখবে সদাচার,
কানের যদি অভাব থাকে
তবেই নাচার!
(হায় দামু হায় চামু!)
পড়াশুনো করো, ছাড়ো
শাস্ত্র আষাঢ়ে,
মেজে ঘষে তোল্ রে বাপু
স্বভাব চাষাড়ে।
(ও দামু ও চামু!)
ভদ্রলোকের মান রেখে চল্
ভদ্র বলবে তোকে,
মুখ ছুটোলে কুলশীলটা
জেনে ফেলবে লোকে!
(হায় দামু হায় চামু!)
পয়সা চাও তো পয়সা দেব
থাকো সাধুপথে,
তাবচ্চ শোভতে কেউ কেউ
যাবৎ ন ভাষতে!
(হে দামু হে চামু!)

সঞ্জীবনী
১ চৈত্র ১২৯২

অনুবাদ-কবিতা

ম্যাক্‌বেথ্‌

(ডাকিনী। ম্যাক্‌বেথ্‌)

দৃশ্য : বিজন প্রান্তর। বজ্র বিদ্যুৎ। তিনজন ডাকিনী।

১ম ডা — ঝড় বাদলে আবার কখন
মিল্‌ব মোরা তিনটি জনে।
২য় ডা — ঝগড়া ঝাঁটি থামবে যখন,
হার জিত সব মিট্‌বে রণে।
৩য় ডা — সাঁঝের আগেই হবে সে ত;
১ম ডা — মিল্‌ব কোথায় বোলে দে ত।
২য় ডা — কাঁটা খোঁচা মাঠের মাঝ।
৩য় ডা — ম্যাকেথ সেথা আস্‌চে আজ।
১ম ডা — কটা বেড়াল! যাচ্ছি ওরে!
২য় ডা — ঐ বুঝি ব্যাং ডাক্‌চে মোরে!
৩য় ডা — চল্‌ তবে চল্‌ ত্বরা কোরে!
সকলে — মোদের কাছে ভালই মন্দ,
মন্দ যাহা ভাল যে তাই,
অন্ধকারে কোয়াশাতে
ঘুরে ঘুরে ঘুরে বেড়াই!

প্রস্থান।

দৃশ্য : এক প্রান্তর। বজ্র। তিনজন ডাকিনী।

১ম ডা — এতক্ষণ বোন কোথায় ছিলি?
২য় ডা — মারতে ছিলুম শুয়োরগুলি।
৩য় ডা — তুই ছিলি বোন, কোথায় গিয়ে?
১ম ডা — দেখ্‌, একটা মাঝির মেয়ে
গোটাকতক বাদাম নিয়ে
খাচ্ছিল সে কচ্‌মচিয়ে
কচ্‌মচিয়ে
কচ্‌মচিয়ে—
চাইলুম তার কাছে গিয়ে,
পোড়ারমুখী বোল্লে রেগে
'ডাইনি মাগী যা' তুই ভেগে।'
আলাপোয় তার স্বামী গেছে,
আমি যাব পাছে পাছে।
বেঁড়ে একটা ইঁদুর হোয়ে
চালুনীতে যাব বোয়ে—
যা বোলেছি কোর্‌ব আমি
কোর্‌ব আমি—

নইক আমি এমন মেয়ে!
২য় ডা — আমি দেব বাতাস একটি।
১ম ডা — তুমি ভাই বেশ লোকটি!
৩য় ডা — একটি পাবি আমার কাছে।
১ম ডা — বাকি সব আমারি আছে।

* * *

খড়ের মত একেবারে
শুকিয়ে আমি ফেল্‌ব তারে।
কিবা দিনে কিবা রাতে
ঘুম রবে না চোকের পাতে।
মিশ্‌বে না কেউ তাহার সাথে।
একাশি বার সাত দিন
শুকিয়ে শুকিয়ে হবে ক্ষীণ।
জাহাজ যদি না যায় মারা
ঝড়ের মুখে সবে সারা।
বল্‌ দেখি বোন্‌, এইটে কি!
২য় ডা — কই, কই, কই, দেখি, দেখি।
১ম ডা — একটা মাঝির বুড় আঙুল
রোয়েচে লো বোন, আমার কাছে,
বাড়িমুখো জাহাজ তাহার
পথের মধ্যে মারা গেছে।
৩য় ডা — ঐ শোন্‌ শোন্‌ বাজ্‌ল ভেরী
আসে ম্যাকেথ, নাইক দেরী!

দৃশ্য : গুহা। মধ্যে ফুটন্ত কটাহ। বজ্র। তিনজন ডাকিনী

১ম ডা — কালো বেড়াল তিনবার
করেছিল চীৎকার।
২য় ডা — তিনবার আর একবার
সজারুটা ডেকেছিল।
৩য় ডা — হার্পি বলে আকাশ তলে
'সময় হোল' 'সময় হোল!'
১ম ডা — আয় রে কড়া ঘিরে ঘিরে
বেড়াই মোরা ফিরে ফিরে।
বিষমাখা ওই নাড়ি ভুঁড়ি
কড়ার মধ্যে ফেল্‌ রে ছুঁড়ি।
ব্যাং একটা ঠাণ্ডা ভুঁয়ে
একত্রিশ দিন ছিল শুয়ে,
হোয়েছে সে বিষে পোরা
কড়ার মধ্যে ফেল্‌ব মোরা।
সকলে — দ্বিগুণ দ্বিগুণ দ্বিগুণ খেটে

কাজ সাধি আয় সবাই জুটে।
দ্বিগুণ দ্বিগুণ জ্বল্‌রে আগুন
ওঠরে কড়া দ্বিগুণ ফুটে।
২য় ডা — জলার সাপের মাংস নিয়ে
সিদ্ধ কর কড়ায় দিয়ে।
গিগিটি-চোক ব্যাঙের পা,
টিকটিকি-ঠ্যাং পেঁচার ছা।
কুত্তোর জিব, বাদুড় রোঁয়া,
সাপের জিব আর শুওর শোঁয়া।
শক্ত ওষুধ কোরতে হবে
টগ্‌বগিয়ে ফোটাই তবে।
সকলে — দ্বিগুণ দ্বিগুণ দ্বিগুণ খেটে
কাজ সাধি আয় সবাই জুটে।
দ্বিগুণ দ্বিগুণ জ্বলরে আগুন
ওঠ্‌রে কড়া দ্বিগুণ ফুটে।
৩য় ডা — মকরের আঁশ, বাঘের দাঁত,
ডাইনি-মড়া, হাঙ্গর ব্যাং,
ইষের শিকড় তুলেছি রাতে,
নেড়ের পিলে মেশাই তাতে,
পাঁঠার পিত্তি, শেওড়া ডাল
গেরণ-কালে কেটেছি কাল,
তাতারের ঠোঁট, তুর্কি নাক,
তাহার সাথে মিশিয়ে রাখ।
আন্‌গে রে সেই ভ্রূণ-মরা,
খানায় ফেলে খুন-করা,
তারি একটি আঙুল নিয়ে
সিদ্ধ কর কড়ায় দিয়ে।
বাঘের নাড়ি ফেলে তাতে
ঘন কর আগুন-তাতে।
সকলে — দ্বিগুণ দ্বিগুণ দ্বিগুণ খেটে
কাজ সাধি আয় সবাই জুটে।
দ্বিগুণ দ্বিগুণ জ্বল্‌রে আগুন
ওঠরে কড়া দ্বিগুণ ফুটে।
২য় ডা — বাঁদর ছানার রক্তে তবে
ওষুধ ঠাণ্ডা কোরতে হবে—
তবেই ওষুধ শক্ত হবে।

ভারতী
আশ্বিন ১২৮৭

বিচ্ছেদ

প্রতিকূল বায়ুভরে, উর্মিময় সিন্ধু-'পরে
  তরীখানি যেতেছিল ধীরি,
কম্পমান কেতু তার, চেয়েছিল কতবার
  সে দ্বীপের পানে ফিরি ফিরি।
যারে আহা ভালোবাসি, তারে যবে ছেড়ে আসি
  যত যাই দূর দেশে চলি,
সেইদিক পানে হায়, হৃদয় ফিরিয়া চায়
  যেখানে এসেছি তারে ফেলি।
বিদেশেতে দেখি যদি, উপত্যকা, দ্বীপ, নদী,
  অতিশয় মনোহর ঠাঁই,
সুরভি কুসুমে যার, শোভিত সকল ধার
  শুধু হৃদয়ের ধন নাই,
বড়ো সাধ হয় প্রাণে, থাকিতাম এইখানে,
  হেথা যদি কাটিত জীবন,
রয়েছে যে দূরবাসে, সে যদি থাকিত পাশে
  কী যে সুখ হইত তখন।
পূর্বদিক সন্ধ্যাকালে, গ্রাসে অন্ধকার জালে
  ভীত পান্থ চায় ফিরে ফিরে,
দেখিতে সে শেষজ্যোতি, সূক্ষ্মতর হয়ে অতি
  এখনো যা জ্বলিতেছে ধীরে,
তেমনি সুখের কাল, গ্রাসে গো আঁধার-জাল
  অদৃষ্টের সায়াহ্নে যখন,
ফিরে চাই বারে বারে, শেষবার দেখিবারে
  সুখের সে মুমূর্ষু কিরণ।

Thomas Moore

Moore's Irish Melodies

বিদায়-চুম্বন

একটি চুম্বন দাও প্রমদা আমার
  জনমের মতো দেখা হবে না কো আর।
মর্মভেদী অশ্রু দিয়ে, পূজিব তোমারে প্রিয়ে
  দুখের নিশ্বাস আমি দিব উপহার।
সে তো তবু আছে ভালো, একটু আশার আলো
  জ্বলিতেছে অদৃষ্টের আকাশে যাহার।
কিন্তু মোর আশা নাই, যে দিকে ফিরিয়া চাই
  সেই দিকে নিরাশার দারুণ আঁধার।

ভালো যে বেসেছি তারে দোষ কী আমার?
উপায় কী আছে বলো উপায় কী তার?
দেখামাত্র সেই জনে, ভালোবাসা আসে মনে
ভালো বাসিলেই ভুলা নাহি যায় আর।
নাহি বাসিতাম যদি এত ভালো তারে
অন্ধ হয়ে প্রেমে তার মজিতাম না রে
যদি নাহি দেখিতাম, বিচ্ছেদ না জানিতাম
তা হলে হৃদয় ভেঙে যেত না আমার।
আমারে বিদায় দাও যাই গো সুন্দরী,
যাই তবে হৃদয়ের প্রিয় অধীশ্বরী,
থাকো তুমি থাকো সুখে, বিমল শান্তির বুকে
সুখ, প্রেম, যশ, আশা থাকুক তোমার
একটি চুম্বন দাও প্রমদা আমার।

Robert Burns

কষ্টের জীবন

মানুষ কাঁদিয়া হাসে,
পুনরায় কাঁদে গো হাসিয়া।
পাদপ শুকায়ে গেলে,
তবুও সে না হয় পতিত,
তরণী ভাঙিয়া গেলে
তবু ধীরে যায় সে ভাসিয়া,
ছাদ যদি পড়ে যায়,
দাঁড়াইয়া রহে তবু ভিত।
বন্দী চলে যায় বটে,
তবুও তো রহে কারাগার,
মেঘে ঢাকিলেও সূর্য
কোনোমতে দিন অস্ত হয়,
তেমনি হৃদয় যদি
ভেঙেচুরে হয় চুরমার,
কোনোক্রমে বেঁচে থাকে
তবুও সে ভগন হৃদয়।
ভগন দর্পণ যথা,
ক্রমশ যতই ভগ্ন হয়,
ততই সে শত শত,
প্রতিবিম্ব করয়ে ধারণ,
তেমনি হৃদয় হতে,
কিছুই গো যাইবার নয়।
হোক না শীতল স্তব্ধ,
শত খণ্ডে ভগ্ন চূর্ণ মন,

হউক-না রক্তহীন,
হীনতেজ তবুও তাহারে,
বিনিদ্র জ্বলন্ত জ্বালা,
ক্রমাগত করিবে দাহন,
শুকায়ে শুকায়ে যাবে,
অন্তর বিষম শোকভারে,
অথচ বাহিরে তার,
চিহ্নমাত্র না পাবে দর্শন।

George Gordon Byron

জীবন উৎসর্গ

এসো এসো এই বুকে নিবাসে তোমার,
যূথভ্রষ্ট বাণবিদ্ধ হরিণী আমার,
এইখানে বিরাজিছে সেই চির হাসি,
আঁধারিতে পারিবে না তাহা মেঘরাশি।
এই হস্ত এ হৃদয় চিরকাল মতো
তোমার, তোমারি কাজে রহিবে গো রত!
কিসের সে চিরস্থায়ী ভালোবাসা তবে,
গৌরবে কলঙ্কে যাহা সমান না রবে?
জানি না, জানিতে আমি চাহি না, চাহি না,
ও হৃদয়ে এক তিল দোষ আছে কিনা,
ভালোবাসি তোমারেই এই শুধু জানি,
তাই হলে হল, আর কিছু নাহি মানি।
দেবতা সুখের দিনে বলেছ আমায়,
বিপদে দেবতা সম রক্ষিব তোমায়,
অগ্নিময় পথ দিয়া যাব তব সাথে,
রক্ষিব, মরিব কিংবা তোমারি পশ্চাতে।

Thomas Moore

Moore's Irish Melodies

ললিত-নলিনী

(কৃষকের প্রেমালাপ।)

ললিত

হা নলিনী গেছে আহা কী সুখের দিন,
দোঁহে যবে এক সাথে, বেড়াতেম হাতে হাতে
নবীন হৃদয় চুরি করিলি নলিন।
হা নলিনী কত সুখে গেছে সেই দিন।

নলিনী

কত ভালোবাসি সেই বনেরে ললিত,
প্রথমে বলিনু যেথা, মনের লুকানো কথা,
স্বর্গ-সাক্ষী করি যেথা হয়ে হরষিত
বলিলে, আমারি তুমি হইবে ললিত।

ললিত

বসন্ত-বিহগ যথা সুললিত ভাষী,
যত শুনি তত তার, ভালো লাগে গীতধার,
যত দিন যায় তত তোরে ভালোবাসি,
যত দিন যায় তব বাড়ে রূপরাশি।

নলিনী

কোমল গোলাপকলি থাকে যথা গাছে,
দিন দিন ফুটে যত, পরিমল বাড়ে তত,
এ হৃদয় ভলোবাসা আলো করি আছে
সঁপেছি সে ভালোবাসা তোমারি গো কাছে।

ললিত

মৃদুতর রবিকর সুনীল আকাশ
হেরিলে শস্যের আশে, হৃদয় হরষে ভাসে
তার চেয়ে এ হৃদয়ে বাড়ে গো উল্লাস
হেরিলে নলিনী তোর মৃদু মধু হাস।

নলিনী

মধু আগমন বার্তা করিতে কূজিত
কোকিল যখন ডাকে, হৃদয় নাচিতে থাকে
কিন্তু তার চেয়ে হৃদি হয় উথলিত,
মিলিলে তোমার সাথে প্রাণের ললিত।

ললিত

কুসুমের মধুময় অধর যখন
ভ্রমর প্রণয়ভরে, হরষে চুম্বন করে
সে কি এত সুখ পায় আমার মতন
যবে ও অধরখানি করি গো চুম্বন?

নলিনী

শিশিরাক্ত পত্রকোলে মল্লিকা হসিত,
বিজন সন্ধ্যার ছায়ে, ফুটে সে মলয়বায়ে,
সে অমন নহে মিষ্ট নহে সুবাসিত
তোমার চুম্বন আহা যেমন ললিত।

ললিত

ঘুরুক অদৃষ্টচক্র সুখ দুখ দিয়া
কভু দিক্ রসাতলে, কভু বা স্বরগে তুলে
রহিবে একটি চিন্তা হৃদয়ে জাগিয়া
সে চিন্তা তোমারি তরে জানি ওগো প্রিয়া।

নলিনী

ধন রত্ন কনকের নাহি ধার ধারি
পদতলে বিলাসীর, নত করিব না শির
প্রণয়ধনের আমি দরিদ্র ভিখারি,
সে প্রণয়, ললিত গো তোমারি তোমারি।

Robert Burns

বিদায়

যাও তবে প্রিয়তম সুদূর প্রবাসে
নব বন্ধু নব হর্ষ নব সুখ আশে।
সুন্দরী রমণী কত, দেখিবে গো শত শত
ফেলে গেলে যারে তারে পড়িবে কি মনে?
তব প্রেম প্রিয়তম, অদৃষ্টে নাইকো মম
সে-সব দুরাশা সখা করি না স্বপনে
কাতর হৃদয় শুধু এই ভিক্ষা চায়
ভুলো না আমায় সখা ভুলো না আমায়।
স্মরিলে এ অভাগীর যাতনার কথা,
যদিও হৃদয়ে লাগে তিলমাত্র ব্যথা,
মরমের আশা এই, থাক্ রুদ্ধ মরমেই
কাজ নাই দুখিনীরে মনে করে আর।
কিন্তু দুঃখ যদি সখা, কখনো গো দেয় দেখা
মরমে জনমে যদি যাতনার ভার,
ও হৃদয় সান্ত্বনার বন্ধু যদি চায়
ভুলো না আমায় সখা ভুলো না আমায়।

Mrs. Amelia Opie

সংগীত

কেমন সুন্দর আহা ঘুমায়ে রয়েছে
চাঁদের জোছনা এই সমুদ্রবেলায়।
এসো প্রিয়ে এইখানে বসি কিছুকাল;
গীতস্বর মৃদু মৃদু পশুক শ্রবণে।
সুকুমার নিস্তব্ধতা আর নিশীথিনী—
সাজে ভালো মর্ম-ছোঁয়া সুধা-সংগীতেরে।
বইস জেসিকা, দেখো, গগন-প্রাঙ্গণ
জ্বলৎ কাঞ্চন-পাতে খচিত কেমন।
এমন একটি নাই তারকামণ্ডল
দিব্য গীত যে না গায় প্রতি পদক্ষেপে।

অমর আত্মাতে হয় এমনি সংগীত।
কিন্তু ধূলিময় এই মর্ত্য-আবরণ
যতদিন রাখে তারে আচ্ছন্ন করিয়া
ততদিন সে সংগীত পাই না শুনিতে।

William Shakespeare

ভারতী
মাঘ ১২৮৪

গভীর গভীরতম হৃদয়প্রদেশে

১

গভীর গভীরতম হৃদয়প্রদেশে,
নিভৃত নিরালা ঠাঁই, লেশমাত্র আলো নাই,
লুকানো এ প্রেমসাধ গোপনে নিবসে,
শুদ্ধ যবে ভালোবাসা নয়নে তোমার,
ঈষৎ প্রদীপ্ত হয়, উচ্ছ্বসয়ে এ-হৃদয়,
ভয়ে ভয়ে জড়সড় তখনি আবার।

২

শূন্য এই মরমের সমাধি-গহ্বরে,
জ্বলিছে এ প্রেমশিখা চিরকাল-তরে,
কেহ না দেখিতে পায়, থেকেও না থাকা প্রায়,
নিভিবারও নাম নাই নিরাশার ঘোরে।

৩

যা হবার হইয়াছে— কিন্তু প্রাণনাথ!
নিতান্ত হইবে যবে এ শরীরপাত,
আমার সমাধি-স্থানে কোরো নাথ কোরো মনে,
রয়েছে এ কে দুঃখিনী হয়ে ধরাসাৎ।

৪

যতই যাতনা আছে দলুক আমায়,
সহজে সহিতে নাথ সব পারা যায়,
কিন্তু হে তুমি-যে মোরে, ভুলে যাবে একেবারে
সে কথা করিতে মনে হৃদি ফেটে যায়।

৫

রেখো তবে এই মাত্র কথাটি আমার,
এই কথা শেষ কথা, কথা নাহি আর,
(এ দেহ হইলে পাত, যদি তুমি প্রাণনাথ,

প্রকাশো আমার তরে তিলমাত্র শোক,
ধর্মত হবে না দোষী দোষিবে না লোক—
কাতরে বিনয়ে তাই, এই মাত্র ভিক্ষা চাই,
কখনো চাহি নে আরো কোনো ভিক্ষা আর)
যবে আমি যাব ম'রে, চির এ দুঃখিনী তরে,
বিন্দুমাত্র অশ্রুজল ফেলো একবার—
আজন্ম এত যে ভালোবেসেছি তোমায়,
সে প্রেমের প্রতিদান একমাত্র প্রতিদান,
তা বই কিছুই আর দিয়ো না আমায়।

George Gordon Byron

যাও তবে প্রিয়তম সুদূর সেথায়

১

যাও তবে প্রিয়তম সুদূর সেথায়,
লভিবে সুযশ কীর্তি গৌরব যেথায়,
কিন্তু গো একটি কথা, কহিতেও লাগে ব্যথা,
উঠিবে যশের যবে সমুচ্চ সীমায়,
তখন স্মরিয়ো নাথ স্মরিয়ো আমায়—
সুখ্যাতি অমৃত রবে, উৎফুল্ল হইবে যবে,
তখন স্মরিয়ো নাথ স্মরিয়ো আমায়।

২

কত যে মমতা-মাখা, আলিঙ্গন পাবে সখা,
পাবে প্রিয় বান্ধবের প্রণয় যতন,
এ হতে গভীরতর, কতই উল্লাসকর,
কতই আমোদে দিন করিবে যাপন,
কিন্তু গো অভাগী আজি এই ভিক্ষা চায়,
যখন বান্ধব-সাথ, আমোদে মাতিবে নাথ,
তখন অভাগী বলে স্মরিয়ো আমায়।

৩

সুচারু সায়াহ্নে যবে ভ্রমিতে ভ্রমিতে,
তোমার সে মনোহরা, সুদীপ্ত সাঁজের তারা,
সেখানে সখা গো তুমি পাইবে দেখিতে—
মনে কি পড়িবে নাথ, এক দিন আমা সাথ,
বনভ্রমি ফিরে যবে আসিতে ভবনে—
ওই সেই সন্ধ্যাতারা, দুজনে দেখেছি মোরা,
আরো যেন জ্বল জ্বল জ্বলিত গগনে।

৪

নিদাঘের শেষাশেষি, মলিনা গোলাপরাশি,
নিরখি বা কত সুখী হইতে অন্তরে,
দেখি কি স্মরিবে তায়, যেই অভাগিনী হায়
গাঁথিত যতনে তার মালা তোমা তরে।
যে-হস্ত গ্রথিত বলে তোমার নয়নে
হত তা সৌন্দর্য-মাখা, ক্রমেতে শিখিলে সখা
গোলাপে বাসিতে ভালো যাহারি কারণে—
তখন সে দুঃখিনীকে কোরো নাথ মনে।

৫

বিষণ্ণ হেমন্তে যবে, বৃক্ষের পল্লব সবে
শুকায়ে পড়িবে খসে খসে চারি ধারে,
তখন স্মরিয়ো নাথ স্মরিয়ো আমারে।
নিদারুণ শীত কালে, সুখদ আগুন জ্বেলে,
নিশীথে বসিবে যবে অনলের ধারে,
তখন স্মরিয়ো নাথ স্মরিয়ো আমারে।
সেই সে কল্পনাময়ী সুখের নিশায়,
বিমল সংগীত তান, তোমার হৃদয় প্রাণ।
নীরবে সুধীরে ধীরে যদি গো জাগায়—
আলোড়ি হৃদয়-তল, এক বিন্দু অশ্রুজল,
যদি আঁখি হতে পড়ে সে তান শুনিলে,
তখন করিয়ো মনে, এক দিন তোমা সনে,
যে যে গান গাহিয়াছি হৃদি প্রাণ খুলে,
তখন স্মরিয়ো হায় অভাগিনী বলে।

Thomas Moore

Moore's Irish Melodies

আবার আবার কেন রে আমার

আবার আবার কেন রে আমার
সেই ছেলেবেলা আসে না ফিরে,
হরষে কেমন আবার তা হলে,
সাঁতারিয়ে ভাসি সাগরের জলে,
খেলিয়ে বেড়াই শিখরী শিরে!
স্বাধীন হৃদয়ে ভালো নাহি লাগে,
ঘোরঘটাময় সমাজধারা,
না, না, আমি রে যাব সেই স্থানে,
ভীষণ ভূধর বিরাজে যেখানে,
তরঙ্গ মাতিছে পাগল পারা!
অয়ি লক্ষ্মী, তুমি লহো লহো ফিরে,

ধন ধান্য তুমি যা দেছ মোরে,
জাঁকালো উপাধি নাহি আমি চাই,
ক্রীতদাসে মম কোনো সুখ নাই,
সেবকের দল যাক-না সোরে!
তুলে দাও মোরে সেই শৈল-'পরে,
গরজি ওঠে যা সাগর-নাদে,
অন্য সাধ নাই, এই মাত্র চাই,
ভ্রমিব সেথায় স্বাধীন হৃদে।
অধিক বয়স হয় নে তো মম,
এখনি বুঝিতে পেরেছি হায়,
এ ধরা নহে তো আমার কারণে,
আর মম সুখ নাহি এ জীবনে,
কবে রে এড়াব এ দেহ দায়।
একদা স্বপনে হেরেছিনু আমি,
সুবিমল এক সুখের স্থান,
কেন রে আমার সে ঘুম ভাঙিল
কেন রে আমার নয়ন মেলিল,
দেখিতে নীরস এ ধরা খান!
এক কালে আমি বেসেছিনু ভালো,
ভালোবাসা-ধন কোথায় এবে,
বাল্যসখা সব কোথায় এখন—
হায় কী বিষাদে ডুবেছে এ মন,
আশারও আলোক গিয়েছে নিবে!
আমোদ-আসরে আমোদ-সাথীরা,
মাতায় ক্ষণেক আমোদ রসে,
কিন্তু এ হৃদয়, আমোদের নয়,
বিরলে কাঁদি যে একেলা বসে।
উঃ কী কঠোর, বিষম কঠোর,
সেই সকলের আমোদ-রব,
শত্রু কিম্বা সখা নহে যারা মনে,
অথচ পদ বা বিভব কারণে,
আমোদ-আসরে মিশেছে সব।
দাও ফিরে মোরে সেই সখাগুলি,
বয়সে হৃদয়ে সমান যারা,
এখনি যে আমি ত্যেজিব তা হলে,
গভীর নিশীথ-আমোদীর দলে,
হৃদয়ের ধার কি ধারে তারা।
সর্বস্ব রতন, প্রিয়তমা ওরে,
তোরেও শুধাই একটি কথা,
বল দেখি কিসে আর মম সুখ,
হেরিয়েও যবে তোর হাসি-মুখ,

কমে না হৃদয়ে একটি ব্যথা!
যাক তবে সব, দুঃখ নাহি তায়,
শোকের সমাজ নাহিকো চাই,
গভীর বিজনে মনের বিরাগে,
স্বাধীন হৃদয়ে ভালো যাহা লাগে,
সুখে উপভোগ করিব তাই!
মানব-মণ্ডলী ছেড়ে যাব যাব,
বিরাগে কেবল, ঘৃণাতে নয়,
অন্ধকারময় নিবিড় কাননে,
থাকিব তবুও নিশ্চিন্ত মনে,
আমারও হৃদয় আঁধারময়!
কেন রে কেন রে হল না আমার,
কপোতের মতো বায়ুর পাখা,
তা হলে ত্যেজিয়ে মানব-সমাজ,
গগনের ছাদ ভেদ করি আজ,
থাকিতাম সুখে জলদে ঢাকা!

George Gordon Byron

ভারতী
আষাঢ় ১২৮৫

বৃদ্ধ কবি

মন হতে প্রেম যেতেছে শুকায়ে
    জীবন হতেছে শেষ,
শিথিল কপোল মলিন নয়ন
    তুষার-ধবল কেশ!
পাশেতে আমার নীরবে পড়িয়া
    অযতনে বীণাখানি,
বাজাবার বল নাইকো এ হাতে
    জড়িমা জড়িত বাণী!
গীতিময়ী মোর সহচরী বীণা!
    হইল বিদায় নিতে;
আর কি পারিবি ঢালিবারে তুই
    অমৃত আমার চিতে?
তবু একবার   আর-একবার
    ত্যজিবার আগে প্রাণ,
মরিতে মরিতে গাহিয়া লইব
    সাধের সে-সব গান!
দুলিবে আমার সমাধি-উপরে
    তরুগণ শাখা তুলি,

বনদেবতারা গাইবে তখন
মরণের গানগুলি!

ভারতী
কার্তিক ১২৮৬

জাগি রহে চাঁদ

বেহাগ
জাগি রহে চাঁদ আকাশে যখন
সারাটি রজনী!
শ্রান্ত জগত ঘুমে অচেতন
সারাটি রজনী!
অতি ধীরে ধীরে হৃদে কী লাগিয়া
মধুময় ভাব উঠে গো জাগিয়া
সারাটি রজনী!
ঘুমায়ে তোমারি দেখি গো স্বপন
সারাটি রজনী!
জাগিয়া তোমারি দেখি গো বদন
সারাটি রজনী!
ত্যজিবে যখন দেহ ধূলিময়
তখন কি সখি তোমার হৃদয়।
আমার ঘুমের শয়ন-'পরে
ভ্রমিয়া বেড়াবে প্রণয়-ভরে।
সারাটি রজনী!

পাতায় পাতায় দুলিছে শিশির

পূরবী
পাতায় পাতায় দুলিছে শিশির
গাহিছে বিহগগণ,
ফুলবন হতে সুরভি হরিয়া
বহিতেছে সমীরণ
সাঁঝের আকাশ মাঝারে এখনো
মৃদুল কিরণ জ্বলে।
নলিনীর সাথে বসিয়া তখন
কত-না হরষে কাটাইনু ক্ষণ,
কে জানিত তবে বালিকা নিদয়
রেখেছিল ঢাকি কপট-হৃদয়
সরল হাসির তলে।

এই তো সেথায় ভ্রমি, গো, যেথায়
থাকিত সে মোর কাছে,
প্রকৃতি জানে না পরিবরতন
সকলি তেমনি আছে!
তেমনি গোলাপ ম্লান-হাসি-ময়
জ্বলিছে শিশির-ভরে,
যে হাসি-কিরণে আছিল প্রকৃতি
দ্বিগুণ দ্বিগুণ মধুর আকৃতি,
সে হাসি নাইকো আর!

Irish Song

বলো গো বালা, আমারি তুমি

পিলু

বলো গো বালা, আমারি তুমি
হইবে চিরকাল!
অনিয়া দিব চরণতলে
যা-কিছু আছে সাগরজলে
পৃথিবী-'পরে আকাশতলে
অমূল মণি জাল!
শুনি আশার মোহন-রব
যা-কিছু ভালো লাগিবে তব
আনিয়া দিব, হও গো, যদি
আমারি চিরকাল!
যেথায় মোরা বেড়াব দুটি,
কুসুমগুলি উঠিবে ফুটি,
নদীর জলে শুনিতে পাব
দেবতাদের বাণী।
তারকাগুলি দেখাবে যেন
প্রেমিকদেরি জগতহেন,
মধুর এক স্বপন সম
দেখাবে ধরাখানি!
আকাশ-ভেদী শিখর হতে
পতনশীল নিঝর-স্রোতে
নাহিয়া যথা কানন-ভূমি
হরিত-বাসে সাজে,
চির-প্রবাহী সুখের ধারে
দোঁহার হৃদি হাসিবে হারে—
যেই সুখের মুল লুকানো
কলপনার মাঝে!

প্রেম দেবের কুহক জালে
হৃদয়ে যার অমৃত ঢালে,
সেই সে জনে করেন প্রেম
কত না সুখ-দান।
ভবন তাঁর স্বরগ-'পরে,
যেথায় তাঁর চরণ পড়ে
ধরার মাঝে স্বরগ শোভা
ধরে, গো, সেইখান।

Thomas Moore

Moore's Irish Melodies

গিয়াছে সে দিন, যে দিন হৃদয়

গিয়াছে সে দিন, যে দিন হৃদয়
রূপের মোহনে আছিল মাতি,
প্রাণের স্বপন আছিল যখন
প্রেম প্রেম শুধু দিবস রাতি!
শান্ত আশা এ হৃদয়ে আমার
এখন ফুটিতে পারে,
সুবিমলতর দিবস আমার
এখন উঠিতে পারে।
বালক কালের প্রেমের স্বপন—
মধুর যেমন উজল যেমন
তেমন কিছুই আসিবে না,
তেমন কিছুই আসিবে না।
সে দেবীপ্রতিমা নারিব ভুলিতে
প্রথম প্রণয় আঁকিল যাহা,
স্মৃতি-মরু মোর উজল করিয়া
এখনো হৃদয়ে বিরাজে তাহা!
সে প্রতিমা সেই পরিমল সম
পলকে যা লয় পায়,
প্রভাতকালের স্বপন যেমন
পলকে মিশায়ে যায়।
অলস প্রবাহ জীবনে আমার
সে কিরণ কভু ভাসিবে না আর
সে কিরণ কভু ভাসিবে না,
সে কিরণ কভু ভাসিবে না!

Thomas Moore

Moore's Irish Melodies

রূপসী আমার, প্রেয়সী আমার

রূপসী আমার, প্রেয়সী আমার,
যাইবি কি তুই যাইবি কি তুই,
রূপসী আমার যাইবি কি তুই,
ভ্রমিবারে গিরি-কাননে?
পাদপের ছায়া মাথার 'পরে,
পাখিরা গাইছে মধুর স্বরে
অথবা উড়িছে পাখা বিছায়ে
হরষে সে গিরি-কাননে।
রূপসী আমার প্রেয়সী আমার
যাইবি কি তুই যাইবি কি তুই,
রূপসী আমার, যাইবি কি তুই
ভ্রমিবারে গিরি-কাননে?
শিখর উঠেছে আকাশ-'পরি,
ফেনময় স্রোত পড়িছে মরি,
সুরভি-কুঞ্জ ছায়া বিছায়ে
শোভিছে সে গিরি-কাননে!
রূপসী আমার, প্রেয়সী আমার,
যাইবি কি তুই যাইবি কি তুই,
রূপসী আমার, যাইবি কি তুই।
ভ্রমিবারে গিরি-কাননে!
ধবল শিখর কুসুমে ভরা
সরসে ঝরিছে নিঝর-ধারা
উছসে উঠিয়া সলিল-কণা
শীতলিছে গিরি-কাননে!
রূপসী আমার, প্রেয়সী আমার,
যাইবি কি তুই যাইবি কি তুই,
রূপসী আমার, যাইবি কি তুই
ভ্রমিবারে গিরি-কাননে!
সুখ দুখ যাহা দিলেন, বিধি,
কিছুই মানিতে চায় না হৃদি,
তোমারে ও প্রেমে লইয়া পাশে
ভ্রমি যদি গিরি-কাননে!

Robert Burns

সুশীলা আমার, জানালার 'পরে

সুশীলা আমার, জানালার 'পরে
দাঁড়াও একটিবার।
একবার আমি দেখিয়া লইব
মধুর হাসি তোমার।
কত দুখ-জ্বালা সহি অকাতরে
ভ্রমি, গো, দূর প্রবাসে
যদি লভি মোর হৃদয়-রতন—
সুশীলারে মোর পাশে।
কালিকে যখন নাচ গান কত
হতেছিল সভা-'পরে,
কিছুই শুনি নি, আছিনু মগন
তোমারি ভাবনা-ভরে
আছিল কত-না বালিকা, রমণী,
রূপসী প্রমোদ-হিয়া,
বিষাদে কহিনু 'তোমরা তো নহ
সুশীলা, আমার প্রিয়া।'
সুশীলে, কেমনে ভাঙ তার মন
হরষে মরিতে পারে যেই জন
তোমারি তোমারি তরে।
সুশীলে, কেমনে ভাঙ হিয়া তার
কিছু যে করে নি, এক দোষ যার
ভালোবাসে শুধু তোরে।
প্রণয়ে প্রণয় না যদি মিশাও
দয়া কোরো মোর প্রতি,
সুশীলার মন নহে তো কখনো
নিরদয় এক রতি।

Robert Burns

কোরো না ছলনা, কোরো না ছলনা

'কোরো না ছলনা কোরো না ছলনা
যেয়ো না ফেলিয়া মোরে।
এতই যাতনা দুখিনী আমারে
দিতেছ কেমন করে?
গাঁথিয়া রেখেছি পরাতে মালিকা
তোমার গলার-'পরে,
কোরো না, ছলনা কোরো না ছলনা,

যেয়ো না ফেলিয়া মোরে।
এতই যাতনা দুখিনী-বালারে
দিতেছ কেমন করে?
যে শপথ তুমি বলেছ আমারে
মনে করে দেখো তবে,
মনে করো সেই কুঞ্জ যেথায়
কহিলে আমারি হবে।
কোরো না ছলনা— কোরো না ছলনা
যেয়ো না ফেলিয়া মোরে,
এতই যাতনা দুখিনী-বালারে
দিতেছ কেমন করে?'
এত বলি এক কাঁদিছে ললনা
ভাসিছে লোচন-লোরে
'কোরো না ছলনা— কোরো না ছলনা
যেয়ো না ফেলিয়া মোরে।
এতই যাতনা দুখিনী-বালারে
দিতেছ কেমন করে?'

William Chappel

চপলারে আমি অনেক ভাবিয়া

চপলারে আমি অনেক ভাবিয়া
দূরেতে রাখিয়া এলেম তারে,
রূপ-ফাঁদ হতে পালাইতে তার,
প্রণয়ে ডুবাতে মদিরা-ধারে।
এত দূরে এসে বুঝিনু এখন
এখনো ঘুচে নি প্রণয়-ঘোর,
মাথায় যদিও চড়েছে মদিরা
প্রণয় রয়েছে হৃদয়ে মোর?
যুবতীর শেষে লইনু শরণ
মাগিনু সহায় তার,
অনেক ভাবি সে কহিল তখন
'চপলা নারীর সার।'
আমি কহিলাম 'সে কথা তোমার
কহিতে হবে না মোরে—
দোষ যদি কিছু বলিবারে পারো
শুনি প্রণিধান করে।'
যুবতি কহিল 'তাও কভু হয়?
যদি বলি দোষ আছে—
নামের আমার কুযশ হইবে

কহিনু তোমার কাছে।'
এখন তো আর নাই কোনো আশা
হইয়াছি অসহায়—
চপলা আমার মরমে মরমে
বাণ বিঁধিতেছে, হায়।
দলে মিশি তার ইন্দ্রিয় আমার
বিরোধী হয়েছে মোর,
যুবতী আমার— বলিছে আমারে
রূপের অধীন ঘোর।

Lord Cantalupe

প্রেমতত্ত্ব

নির্ঝর মিশিছে তটিনীর সাথে
তটিনী মিশিছে সাগর-'পরে,
পবনের সাথে মিশিছে পবন
চির-সুমধুর প্রণয়-ভরে।
জগতে কেহই নাইকো একেলা,
সকলি বিধির নিয়ম-গুণে,
একের সহিত মিশিছে অপরে
আমি বা কেননা তোমার সনে?
দেখো, গিরি ওই চুমিছে আকাশে,
ঢেউ-'পরে ঢেউ পড়িছে ঢলি,
সে কুলবালারে কে বা না দোষিবে,
ভাইটিরে যদি যায় সে ভুলি।
রবি-কর দেখো চুমিছে ধরণী,
শশি-কর চুমে সাগর জল,
তুমি যদি মোরে না চুম', ললনা,
এ-সব চুম্বনে কী তবে ফল?

P. B. Shelley

নলিনী

লীলাময়ী নলিনী,
চপলিনী নলিনী,
শুধালে আদর করে
ভালো সে কি বাসে মোরে,
কচি দুটি হাত দিয়ে
ধরে গলা জড়াইয়ে,

হেসে হেসে একেবারে
ঢলে পড়ে পাগলিনী।
ভালো বাসে কি না, তবু
বলিতে চাহে না কভু
নিরদয়া নলিনী।
যবে হৃদি তার কাছে,
প্রেমের নিশ্বাস যাচে
চায় সে এমন করে
বিপাকে ফেলিতে মোরে,
হাসে কত, কথা তবু কয় না।
এমন নির্দোষ ধূর্ত
চতুর সরল,
ঘোমটা তুলিয়া চায়
চাহনি চপল
উজ্জ্বল অসিত-তারা-নয়না!
অমনি চকিত এক হাসির ছটায়
ললিত কপোলে তার গোলাপ ফুটায়,
তখনি পলায় আর রয় না!

Alfred Tennyson

ভারতী
কার্তিক ১২৮৬

দিন রাত্রি নাহি মানি

দিন রাত্রি নাহি মানি, আয় তোরা আয় রে,
চির সুখ-রসে রত আমরা হেথায় রে।
বসন্তে মলয় বায় একটি মিলায়ে যায়,
আরেকটি আসে পুনঃ মধুময় তেমনি,
প্রেমের স্বপন হায়
একটি যেমনি যায়
আরেকটি সুস্বপন জাগি উঠে অমনি।
নন্দন কানন যদি এ মরতে চাই রে
তবে তা ইহাই রে!
তবে তা ইহাই রে।

প্রেমের নিশ্বাস হেথা ফেলিতেছি বালিকা,
সুরভি নিশ্বাস যথা ফেলে ফুল-কলিকা,
তাহাদের আঁখিজল
এমন সে সুবিমল

এমন সে সমুজ্জল মুকুতার পারা রে,
তাদের চুম্বন হাসি
দিবে কত সুধারাশি
যাদের মধুর এত নয়নের ধারা রে।
নন্দনকানন যদি এ মরতে চাই রে
তবে তা ইহাই রে।
তবে তা ইহাই রে।
থাকুক ও-সব সুখ চাই না, গো চাই না,
যে সুখ-ভিখারী আমি তাহা যে গো পাই না।
দুই হৃদি এক ঠাঁই
প্রণয়ে মিলিতে চাই
সুখে দুখে যে প্রেমের নাহি হবে শেষ রে।
প্রেমে উদাসীন হৃদি
শত যুগ যাপে যদি,
তার চেয়ে কত ভালো এ সুখ নিমেষ রে।
নন্দনকানন যদি এ মরতে চাই রে
তবে তা ইহাই রে
তবে তা ইহাই রে।

Thomas Moore

দামিনীর আঁখি কিবা

দামিনীর আঁখি কিবা
ধরে জ্বল' জ্বল' বিভা
কার তরে জ্বলিতেছে কেবা তাহা জানিবে?
চারি দিকে খর ধার
বাণ ছুটিতেছে তার
কার-'পরে লক্ষ্য তার কেবা অনুমানিবে?
তার চেয়ে নলিনীর আঁখিপানে চাহিতে
কত ভালো লাগে তাহা কে পারিবে কহিতে?
সদা তার আঁখি দুটি
নিচু পানে আছে ফুটি,
সে আঁখি দেখে নি কেহ উঁচু পানে তুলিতে!
যদি বা সে ভুলে কভু চায় কারো আননে,
সহসা লাগিয়া জ্যোতি
সে-জন বিস্ময়ে অতি
চমকিয়া উঠে যেন স্বরগের কিরণে!
ও আমার নলিনী লো, লাজমাখা নলিনী,
অনেকেরি আঁখি-'পরে
সৌন্দর্য বিরাজ করে,

তোর আঁখি-'পরে প্রেম নলিনী লো নলিনী!
দামিনীর দেহে রয়
বসন কনকময়
সে বসন অপসরী সৃজিয়াছে যতনে,
যে গঠন যেই স্থান
প্রকৃতি করেছে দান
সে-সকল ফেলিয়াছে ঢাকিয়া সে বসনে।
নলিনী বসন পানে দেখ দেখি চাহিয়া
তার চেয়ে কত ভালো কে পারিবে কহিয়া?
শিথিল অঞ্চল তার
ওই দেখো চারি ধার
স্বাধীন বায়ুর মতো উড়িতেছে বিমানে,
যেথা যে গঠন আছে
পূর্ণ ভাবে বিকাশিছে
যেখানে যা উঁচু নিচু প্রকৃতির বিধানে!
ও আমার নলিনী লো, সুকোমলা নলিনী
মধুর রূপের ভাস
তাই প্রকৃতির বাস,
সেই বাস তোর দেহে নলিনী লো নলিনী!
দামিনীর মুখ-আগে
সদা রসিকতা জাগে,
চারি ধারে জ্বলিতেছে খরধার বাণ সে,
কিন্তু কে বলিতে পারে
শুধু সে কি ধাঁধিবারে,
নহে তা কি খর ধারে বিঁধিবারে মানসে?
কিন্তু নলিনীর মনে
মাথা রাখি সঙ্গোপনে
ঘুমায়ে রয়েছে কিবা প্রণয়ের দেবতা।
সুকোমল সে শয্যার
অতি বা কঠিন ধার
দলিত গোলাপ তাও আর কিছু নহে তা।
ও আমার নলিনী লো, বিনয়িনী নলিনী
রসিকতা তীব্র অতি
নাই তার এত জ্যোতি
তোমার নয়নে যত নলিনী লো নলিনী।

Thomas Moore

ভারতী
আষাঢ় ১২৮৮

অদৃষ্টের হাতে লেখা

অদৃষ্টের হাতে লেখা সূক্ষ্ম এক রেখা,
সেই পথ বয়ে সবে হয় অগ্রসর।
কত শত ভাগ্যহীন ঘুরে মরে সারাদিন
প্রেম পাইবার আগে মৃত্যু দেয় দেখা,
এত দূরে আছে তার প্রাণের দোসর।

কখন বা তার চেয়ে ভাগ্য নিরদয়,
প্রণয়ী মিলিল যদি— অতি অসময়!
'হৃদয়টি?' 'দিয়াছি তা।' কাঁদিয়া সে কহে,
'হাতখানি প্রিয়তম?' 'নহে, নহে, নহে!'

Matthew Arnold

ভুজ-পাশ-বদ্ধ অ্যান্টনি

এই তো আমরা দোঁহে বসে আছি কাছে কাছে!
একটি ভুজঙ্গ-ভুজে আমারে জড়ায়ে আছে;
আরেকটি শ্যাম-বাহু, শতেক মুকুতা ঝুলে,
সোনার মদিরা পাত্র আকাশে রয়েছে তুলে।
অলকের মেঘ মাঝে জ্বলিতেছে মুখখানি,
রূপের মদিরা পিয়া
আবেশে অবশ হিয়া,
পড়েছে মাতাল হয়ে, কখন্ কিছু না জানি।
রাখিয়া বক্ষের পরে অবশ চিবুক মোর,
হাসিতেছি তার পানে, হৃদয়ে আঁধার ঘোর।
বাতায়ন-যবনিকা, বাতাস, সরায়ে ধীরে
বীজন করিছে আসি এ মোর তাপিত শিরে।
সম্মুখেতে দেখা যায়
পীতবর্ণ বালুকায়
অস্তগামী রবিকর অদূর 'নীলের' তীরে।
চেয়ে আছি, দেখিতেছি, নদীর সুদূর পারে,
(কী জানি কিসের দুখ!)
পশ্চিম দিকের মুখ
বিষণ্ণ হইয়া আসে সন্ধ্যার আঁধার ভারে।
প্রদোষ তারার মুখে হাসি আসি উঁকি মারে।
রোমীয় স্বপন এক জাগিছে সম্মুখে মোর,
ঘুরিছে মাথার মাঝে, মাথায় লেগেছে ঘোর।
রোমীয় সমর-অস্ত্র ঝঞ্ঝনিয়া উঠে বাজি,

বিস্ফারিত নাসা চাহে রণ-ধূম পিতে আজি।
কিন্তু হায়! অমনি সে মুখ্ পানে হেসে চায়,
কী জানি কী হয় মতি,
হীন প্রমোদের প্রতি।
বীরের ভ্রূকুটিগুলি তখনি মিলায়ে যায়।
গরবিত, শূন্য হিয়া, জর্জর আবেশ-বাণে,
যে প্রমোদে ঘৃণা করি হেসে চাই তারি পানে।

অনাহূত হর্ষ এক জাগ্রতে স্বপনে আসি,
শৌর্যের সমাধি-পরে ঢালে রবি-কর রাশি।
কতবার ঘৃণি তারে! রমণী সে অবহেলে
পৌরুষ নিতেছে কাড়ি বিলাসের জালে ফেলে!
কিন্তু সে অধর হতে
অমনি অজস্র স্রোতে
ঝরে পড়ে মৃদু হাসি, চুম্বন অমৃত-মাখা
আমারে করিয়া তুলে, ভাঙাঘর ফুলে ঢাকা।
বীরত্বের মুখ খানি একবার মনে আনি,
তার পরে ওই মুখে ফিরাই নয়ন মম,
ওই মুখ! একখানি উজ্জ্বল কলঙ্ক সম!
ওই তার শ্যাম বাহু আমারে ধরেছে হায়!
অঙ্গুলির মৃদু স্পর্শে বল মোর চলে যায়!
মুখ ফিরাইয়া লই— রমণী যেমনি ধীরি
মৃদু কণ্ঠে মৃদু কহে, অমনি আবার ফিরি।
রোমের আঁধার মেঘ দেখে যেই মুখ-'পরে,
অমনি দু বাহু দিয়ে কণ্ঠ জড়াইয়া ধরে,
বরষে নয়নবারি আমার বুকের মাঝ,
চুমিয়া সে অশ্রুবারি শুকানো বীজের কাজ।
তার পরে ত্যজি মোরে চরণ পড়িছে টলে,
থর থর কেঁপে বলে— 'যাও, যাও, যাও চলে!'
ঢুলু ঢুলু আঁখিপাতা পুরে অশ্রু-মুকুতায়,
শ্যামল সৌন্দর্য তার হিম-শ্বেত হয়ে যায়!
জীবনের লক্ষ্য, আশা, ইচ্ছা, হারাইয়া ফেলি,
চেয়ে থাকি তার পানে কাতর নয়ন মেলি।
আবার ফিরাই মুখ, কটাক্ষেতে চেয়ে রই,
কলঙ্কে প্রমোদে মাতি তাহারে টানিয়া লই!
আরেকটি বার রোম, হইব সন্তান তোর
একটি বাসনা এই বন্দী এ হৃদয়ে মোর।
গৌরবে সম্মানে মরি এই এক আছে আশ,
চাহি না করিতে ব্যয় চুম্বনে অন্তিম শ্বাস!
বুঝি হায় সে আশাও পুরিবে না কোনো কালে
রোমীয় মৃত্যুও বুঝি ঘটিবে না এ কপালে!

রোমীয় সমাধি চাই
তাও বুঝি ভাগ্যে নাই,
ওই বুকে মরে যাব, বুঝি মরণের কালে।

Robert Buchanan

ভারতী
আশ্বিন-কার্তিক ১২৮৮

সুখী প্রাণ

জান না তো নির্ঝরিণী, আসিয়াছ কোথা হতে
কোথায় যে করিছ প্রয়াণ,
মাতিয়া চলেছ তবু আপন আনন্দে পূর্ণ,
আনন্দ করিছ সবে দান।
বিজন-অরণ্য-ভূমি দেখিছে তোমার খেলা
জুড়াইছে তাহার নয়ান।
মেষ-শাবকের মতো তরুদের ছায়ে ছায়ে
রচিয়াছ খেলিবার স্থান।
গভীর ভাবনা কিছু আসে না তোমার কাছে,
দিনরাত্রি গাও শুধু গান।
বুঝি নরনারী মাঝে এমনি বিমল হিয়া
আছে কেহ তোমারি সমান।
চাহে না চাহে না তারা ধরণীর আড়ম্বর,
সন্তোষে কাটাতে চায় প্রাণ,
নিজের আনন্দ হতে আনন্দ বিতরে তারা
গায় তারা বিশ্বের কল্যাণ।

Robert Buchanan

'আলোচনা' পত্রিকা
ভাদ্র ১২৯১

জীবন মরণ

ওরা যায়, এরা করে বাস;
অন্ধকার উত্তর বাতাস
বহিয়া কত-না হা-হুতাশ
ধূলি আর মানুষের প্রাণ
উড়াইয়া করিছে প্রয়াণ।
আঁধারেতে রয়েছি বসিয়া;
একই বায়ু যেতেছে শ্বসিয়া

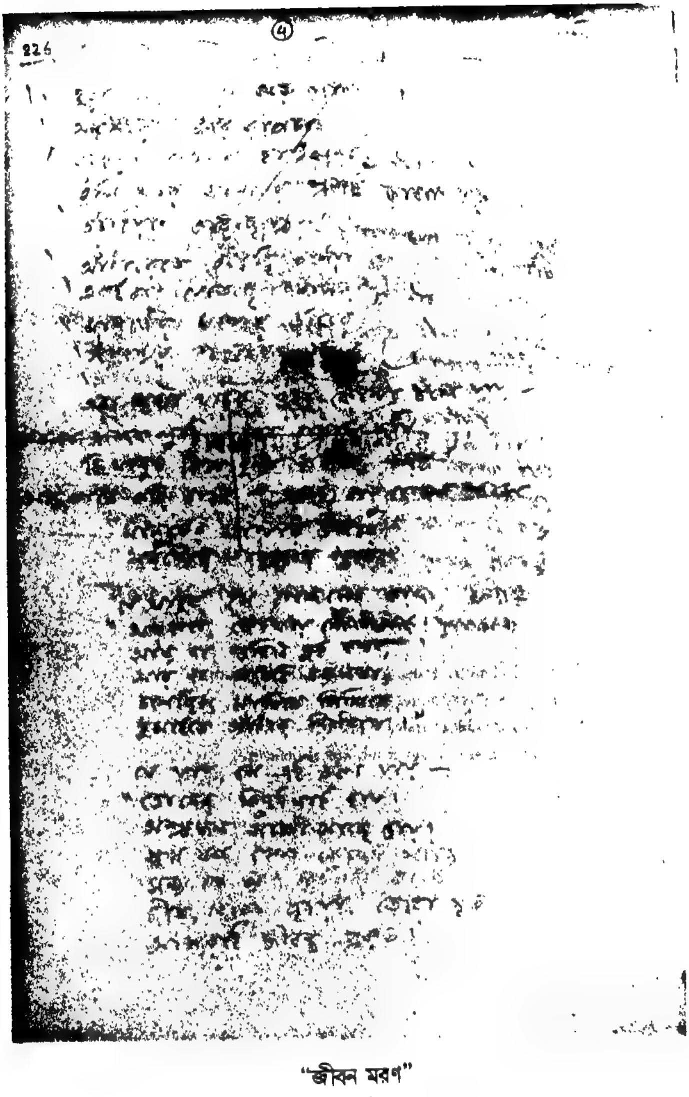

"জীবন মরণ"

ভিক্টর হুগোর কবিতার অনুবাদ

রবীন্দ্রপাণ্ডুলিপিচিত্র

মানুষের মাথার উপরে,
অরণ্যের পল্লবের স্তরে।

যে থাকে সে গেলদের কয়,
'অভাগা, কোথায় পেলি লয়।
আর না শুনিবি তুই কথা,
আর হেরিবি তরুলতা,
চলেছিস মাটিতে মিশিতে,
ঘুমাইতে আঁধার নিশীথে।'

যে যায় সে এই বলে যায়,
'তোদের কিছুই নাই হায়,
অশ্রুজল সাক্ষী আছে তায়।
সুখ যশ হেথা কোথা আছে
সত্য যা তা মৃতদেরি কাছে।
জীব, তোরা ছায়া, তোরা মৃত,
আমরাই জীবন্ত প্রকৃত।'

Victor Hugo

'আলোচনা' পত্রিকা
কার্তিক ১২৯১

স্বপ্ন দেখেছিনু প্রেমাগ্নিজ্বালার

স্বপ্ন দেখেছিনু প্রেমাগ্নিজ্বালার
সুন্দর চুলের, সুগন্ধি মালার,
তিক্ত বচনের, মিষ্ট অধরের,
বিমুগ্ধ গানের, বিষণ্ণ স্বরের।
সে-সব মিলায়ে গেছে বহুদিন,
সে স্বপ্নপ্রতিমা কোথায় বিলীন।
শুধু সে অনন্ত জ্বলন্ত হুতাশ
ছন্দে বদ্ধ হয়ে করিতেছে বাস।

তুমিও গো যাও, হে অনাথ গান,
সে স্বপ্নছবিরে করগে সন্ধান।
দিলাম পাঠায়ে, করিতে মেলানী,
ছায়া-প্রতিমারে বায়ুময়ী বাণী।

Heinrich Heine

আঁখি পানে যবে আঁখি তুলি

আঁখি পানে যবে আঁখি তুলি
দুখ জ্বালা সব যাই ভুলি।
অধরে অধর পরশিয়া
প্রাণমন উঠে হরষিয়া।
মাথা রাখি যবে ওই বুকে
ডুবে যাই আমি মহা সুখে।
যবে বল তুমি, ‘ভালবাসি’,
শুনে শুধু আঁখিজলে ভাসি।

Heinrich Heine

প্রথমে আশাহত হয়েছিনু

প্রথমে আশাহত হয়েছিনু
ভেবেছিনু সবে না এ বেদনা;
তবু তো কোনোমতে সয়েছিনু,
কী করে যে সে কথা শুধায়ো না।

Heinrich Heine

নীল বায়লেট নয়ন দুটি করিতেছে ঢলঢল

নীল বায়লেট নয়ন দুটি করিতেছে ঢলঢল
রাঙা গোলাপ গাল দুখানি, সুধায় মাখা সুকোমল।
শুভ্র বিমল করকমল ফুটে আছে চিরদিন।
হৃদয়টুকু শুষ্ক শুধু পাষাণসম সুকঠিন।

Heinrich Heine

গানগুলি মোর বিষে ঢালা

গানগুলি মোর বিষে ঢালা
কী হবে আর তাহা বই?
ফুটন্ত এ প্রাণের মাঝে
বিষ ঢেলেছে বিষময়ী!

গানগুলি মোর বিষে ঢালা,
কী হবে আর তাহা বই?

বুকের মধ্যে সর্প আছে,
তুমিও সেথা আছ অয়ি।

Heinrich Heine

তুমি একটি ফুলের মতো মণি

তুমি একটি ফুলের মতো মণি
এম্‌নি মিষ্টি, এম্‌নি সুন্দর।
মুখের পানে তাকাই যখনি
ব্যথায় কেন কাঁদায় অন্তর।

শিরে তোমার হস্ত দুটি রাখি
পড়ি এই আশীষ মন্তর,
বিধি তোরে রাখুন চিরকাল
এমনি মিষ্টি, এম্‌নি সুন্দর।

Heinrich Heine

রানী, তোর ঠোঁট দুটি মিঠি

রানী, তোর ঠোঁট দুটি মিঠি
রানী, তোর মধুমাখা দিঠি
রানী, তুই মণি তুই ধন,
তোর কথা ভাবি সারাক্ষণ।
দীর্ঘ সন্ধ্যা কাটে কী করিয়া?
সাধ যায় তোর কাছে গিয়া
চুপিচাপি বসি এক ভিতে
ছোটোছোটো সেই ঘরটিতে।
ছোটো হাতখানি হাতে করে
অধরেতে রেখে দিই ধরে।
ভিজাই ফেলিয়া আঁখিজল
ছোট সে কোমল করতল।

Heinrich Heine

বারেক ভালোবেসে যে জন মজে

বারেক ভালোবেসে যে জন মজে
দেবতাসম সেই ধন্য,
দ্বিতীয়বার পুন প্রেমে যে পড়ে
মূর্খের অগ্রগণ্য।

আমিও সে দলের মূর্খরাজ
দুবার প্রেমপাশে পড়ি;

তপন শশী তারা হাসিয়া মরে,
আমিও হাসি— আর মরি।

Heinrich Heine

বিশ্বামিত্র, বিচিত্র এ লীলা!

বিশ্বামিত্র, বিচিত্র এ লীলা।
দিবেরাত্রি আহার নিদ্রে ছেড়ে,
তপিস্যে আর লড়াই করে শেষে
বশিষ্ঠের গাইটি নিলে কেড়ে।

বিশ্বামিত্র তোমার মতো গোরু
দুটি এমন দেখি নি বিশ্বে!
নইলে একটি গাভী পাবার তরে
এত যুদ্ধ এত তপিস্যে!

Heinrich Heine

সাধনা
বৈশাখ ১২৯৯

ভালোবাসে যারে তার চিতাভস্ম-পানে

ভালোবাসে যারে তার চিতাভস্ম-পানে
প্রেমিক যেমন চায় কাতর নয়ানে
তেমনি যে তোমা-পানে নাহি চায় গ্রীস্
তাহার হৃদয় মন পাষাণ কুলিশ
ইংরাজেরা ভাঙিয়াছে প্রাচীর তোমার
দেবতাপ্রতিমা লয়ে গেছে [সিন্ধুপার]
এ দেখে কার না হবে হবে ...

[ধূম]কেতু সম তারা কী কুক্ষণে হায়
[ছা]ড়িয়া সে ক্ষুদ্র দ্বীপ আইল হেথায়
[অ]সহায় বক্ষ তব রক্তময় করি
দেবতা প্রতিমাগুলি লয়ে গেল হরি।

George Gordon Byron

মালতী পুঁথি

প্রবন্ধ

সাহিত্য

ভুবনমোহিনীপ্রতিভা, অবসরসরোজিনী ও দুঃখসঙ্গিনী

মনুষ্যহৃদয়ের স্বভাব এই যে, যখনই সে সুখ দুঃখ শোক প্রভৃতির দ্বারা আক্রান্ত হয়, তখন সে ভাব বাহ্যে প্রকাশ না করিলে সে সুস্থ হয় না। যখন কোনো সঙ্গী পাই, তখন তাহার নিকট মনোভাব ব্যক্ত করি, নহিলে সেই ভাব সংগীতাদির দ্বারা প্রকাশ করি। এইরূপে গীতিকাব্যের উৎপত্তি। আর কোনো মহাবীর শত্রুহস্ত বা কোনো অপকার হইতে দেশকে মুক্ত করিলে তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতাসূচক যে গীতি রচিত ও গীত হয় তাহা হইতেই মহাকাব্যের জন্ম। সুতরাং মহাকাব্য যেমন পরের হৃদয় চিত্র করিতে উৎপন্ন হয়, তেমনি গীতিকাব্য নিজের হৃদয় চিত্র করিতে উৎপন্ন হয়। মহাকাব্য আমরা পরের জন্য রচনা করি এবং গীতিকাব্য আমরা নিজের জন্য রচনা করি। যখন প্রেম করুণা ভক্তি প্রভৃতি বৃত্তি-সকল হৃদয়ের গূঢ় উৎস হইতে উৎসারিত হয় তখন আমরা হৃদয়ের ভার লাঘব করিয়া তাহা গীতিকাব্যরূপ স্রোতে ঢালিয়া দিই এবং আমাদের হৃদয়ের পবিত্র প্রস্রবণজাত সেই স্রোত হয়তো শত শত মনোভূমি উর্বরা করিয়া পৃথিবীতে চিরকাল বর্তমান থাকিবে। ইহা মরুভূমির দগ্ধ বালুকাও আর্দ্র করিতে পারে, ইহা শৈলক্ষেত্রের শিলারাশিও উর্বরা করিতে পারে। কিংবা যখন অগ্নিশৈলের ন্যায় আমাদের হৃদয় ফাটিয়া অগ্নিরাশি উদ্‌গীরিত হইতে থাকে, তখন সেই অগ্নি আর্দ্র কাষ্ঠও জ্বালাইয়া দেয়, সুতরাং গীতিকাব্যের ক্ষমতা বড়ো অল্প নহে। ঋষিদিগের ভক্তির উৎস হইতে যে-সকল গীত উত্থিত হইয়াছিল তাহাতে হিন্দুধর্ম গঠিত হইয়াছে, এবং এমন দৃঢ়রূপে গঠিত হইয়াছে যে, বিদেশীয়রা সহস্র বৎসরের অত্যাচারেও তাহা ভগ্ন করিতে পারে নাই। এই গীতিকাব্যই যুদ্ধের সময় সৈনিকদের উন্মত্ত করিয়া তুলে, বিরহের সময় বিরহীর মনোভাব লাঘব করে, মিলনের সময় প্রেমিকের সুখে আহুতি প্রদান করে, দেবপূজার সময় সাধকের ভক্তির উৎস উন্মুক্ত করিয়া দেয়। এই গীতিকাব্যই ফরাসি বিদ্রোহের উত্তেজনা করিয়াছে, এই গীতিকাব্যই চৈতন্যের ধর্ম বঙ্গদেশে বদ্ধমূল করিয়া দিয়াছে, এবং এই গীতিকাব্যই বাঙালির নির্জীব হৃদয়ে আজকাল অল্প অল্প জীবন সঞ্চার করিয়াছে। মহাকাব্য সংগ্রহ করিতে হয়, গঠিত করিতে হয়; গীতিকাব্যের উপকরণ-সকল গঠিত আছে, প্রকাশ করিলেই হইল। নিজের মনোভাব প্রকাশ করা বড়ো সামান্য ক্ষমতা নহে। শেক্সপিয়র পরের হৃদয় চিত্র করিয়া দৃশ্যকাব্যে অসাধারণ হইয়াছেন, কিন্তু নিজের হৃদয়চিত্রে অক্ষম হইয়া গীতিকাব্যে উন্নতি লাভ করিতে পারেন নাই। তেমনি বাইরন নিজ হৃদয়চিত্রে অসাধারণ; কিন্তু পরের হৃদয়চিত্রে অক্ষম। গীতিকাব্য অকৃত্রিম, কেননা তাহা আমাদের নিজের হৃদয়কাননের পুষ্প; আর মহাকাব্য শিল্প, কেননা তাহা পর-হৃদয়ের অনুকরণ মাত্র। এই নিমিত্ত আমরা বাল্মীকি, ব্যাস, হোমর, ভার্জিল প্রভৃতি প্রাচীন কালের কবিদিগের ন্যায় মহাকাব্য লিখিতে পারিব না; কেননা সেই প্রাচীনকালে লোকে সভ্যতার আচ্ছাদনে হৃদয় গোপন করিতে জানিত না, সুতরাং কবি হৃদয় প্রত্যক্ষ করিয়া সেই অনাবৃত হৃদয়-সকল সহজেই চিত্র করিতে পারিতেন। গীতিকাব্য যেমন প্রাচীনকালের তেমনি এখনকার, বরং সভ্যতার সঙ্গে তাহা উন্নতি লাভ করিবে, কেননা সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে যেমন হৃদয় উন্নত হইবে, তেমনি হৃদয়ের চিত্রও উন্নতি লাভ করিবে। নিজের হৃদয় চিত্র করিতে গীতিকাব্যের উৎপত্তি বটে; কিন্তু কেবলমাত্র নিজের হৃদয় চিত্র করা গীতিকাব্যের কার্য নহে; এখন নিজের ও পরের উভয়ের মনোচিত্রের নিমিত্ত গীতিকাব্য ব্যাপৃত আছে, নহিলে গীতিকাব্যের মধ্যে বৈচিত্র্য থাকিত না। ইংরাজিতে যাহাকে Lyric Poetry

কহে, আমরা তাহাকে খণ্ডকাব্য কহি। মেঘদূত খণ্ডকাব্য, ঋতুসংহারও খণ্ডকাব্য এবং Lalla Rookh-ও Lyric Poetry, Irish Melodies-ও Lyric Poetry, কিন্তু আমরা গীতিকাব্য অর্থে মেঘদূতকে মনে করি নাই, ঋতুসংহারকে গীতিকাব্য কহিতেছি। আমাদের মতে Lalla Rookh গীতিকাব্য নয়, Irish Melodies গীতিকাব্য। ইংরাজিতে যাহাদিগকে Odes, Sonnets প্রভৃতি কহে তাহাদিগের সমষ্টিকেই আমরা গীতিকাব্য বলিতেছি। বাংলাদেশে মহাকাব্য অতি অল্প কেন? তাহার অনেক কারণ আছে। বাংলা ভাষার সৃষ্টি অবধি প্রায় বঙ্গদেশ বিদেশীয়দিগের অধীনে থাকিয়া নির্জীব হইয়া আছে, আবার বাংলার জলবায়ুর গুণে বাঙালিরা স্বভাবত নির্জীব, স্বপ্নময়, নিস্তেজ, শান্ত; মহাকাব্যের নায়কদিগের হৃদয় চিত্র করিবার আদর্শ হৃদয় পাইবে কোথা? অনেক দিন হইতে বঙ্গদেশ সুখে শান্তিতে নিদ্রিত; যুদ্ধবিগ্রহ স্বাধীনতার ভাব বাঙালির হৃদয়ে নাই; সুতরাং এই কোমল হৃদয়ে প্রেমের বৃক্ষ আষ্টেপৃষ্ঠে মূল বিস্তার করিয়াছে। এই নিমিত্ত জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাসের লেখনী হইতে প্রেমের অশ্রু নিঃসৃত হইয়া বঙ্গদেশ প্লাবিত করিয়াছে এবং এই নিমিত্তই প্রেমপ্রধান বৈষ্ণব ধর্ম বঙ্গদেশে আবির্ভূত হইয়াছে ও আধিপত্য লাভ করিয়াছে। আজকাল ইংরাজি শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বাঙালিরা স্বাধীনতা, অধীনতা, তেজস্বিতা, স্বদেশ-হিতৈষিতা প্রভৃতি অনেকগুলি কথার মর্মার্থ গ্রহণ করিয়াছেন এবং আজকাল মহাকাব্যের এত বাহুল্য হইয়াছে যে, যিনিই এখন কবি হইতে চান তিনিই একখানি গীতিকাব্য লিখিয়াই একখানি করিয়া মহাকাব্য বাহির করেন, কিন্তু তাঁহারা মহাকাব্যে উন্নতিলাভ করিতে পারিতেছেন না ও পারিবেন না। যদি বিদ্যাপতি-জয়দেবের সময় তাঁহাদের মনের এখনকার ন্যায় অবস্থা থাকিত তবে তাঁহারা হয়তো উৎকৃষ্ট মহাকাব্য লিখিতে পারিতেন। এখনকার মহাকাব্যের কবিরা রুদ্ধহৃদয়ে লোকদের হৃদয়ে উঁকি মারিতে গিয়া নিরাশ হইয়াছেন ও অবশেষে মিল্টন খুলিয়া ও কখনো কখনো রামায়ণ ও মহাভারত লইয়া অনুকরণের অনুকরণ করিয়াছেন, এই নিমিত্ত মেঘনাদবধে, বৃত্রসংহারে ওই-সকল কবিদিগের পদছায়া স্পষ্টরূপে লক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু বাংলার গীতিকাব্য আজকাল যে ক্রন্দন তুলিয়াছে তাহা বাংলার হৃদয় হইতে উত্থিত হইতেছে। ভারতবর্ষের দুরবস্থায় বাঙালিদের হৃদয় কাঁদিতেছে, সেই নিমিত্তই বাঙালিরা আপনার হৃদয় হইতে অশ্রুধারা লইয়া গীতিকাব্যে ঢালিয়া দিতেছে। 'মিলে সবে ভারতসন্তান' ভারতবর্ষের প্রথম জাতীয় সংগীত, স্বদেশের নিমিত্ত বাঙালির প্রথম অশ্রুজল। সেই অবধি আরম্ভ হইয়া আজি কালি বাংলা গীতিকাব্যের যে অংশে নেত্রপাত করি সেইখানেই ভারত। কোথাও বা দেশের নির্জীব রোদন, কোথাও বা উৎসাহের জ্বলন্ত অনল। 'মিলে সবে ভারতসন্তানে'র কবি যে ভারতের জয়গান করিতে অনুমতি দিয়াছেন, আজি কালি বালক পর্যন্ত, স্ত্রীলোক পর্যন্ত সেই জয়গান করিতেছে, বরং এখন এমন অতিরিক্ত হইয়া উঠিয়াছে যে তাহা সমূহ হাস্যজনক। সকল বিষয়েরই অতিরিক্ত হাস্যজনক, এবং এই অতিরিক্ততাই প্রহসনের মূল ভিত্তি। ভারতমাতা, যবন, উঠ, জাগো, ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি শুনিয়া শুনিয়া আমাদের হৃদয় এত অসাড় হইয়া পড়িয়াছে যে ও-সকল কথা আর আমাদের হৃদয় স্পর্শ করে না। ক্রমে যতই বালকগণ 'ভারত ভারত' চিৎকার বাড়াইবেন ততই আমাদের হাস্য সংবরণ করা দুঃসাধ্য হইবে। এই নিমিত্ত যাঁহারা ভারতবাসীদের দেশহিতৈষিতায় উত্তেজিত করিবার নিমিত্ত আর্যসংগীত লেখেন, তাঁহাদের ক্ষান্ত হইতে উপদেশ দিই, তাঁহাদের প্রয়াস দেশহিতৈষিতার প্রস্রবণ হইতে উঠিতেছে বটে কিন্তু তাঁহাদের সোপান হাস্যজনক। তাঁহারা বুঝেন না ঘুমন্ত মনুষ্যের কর্ণে ক্রমাগত একই রূপ শব্দ প্রবেশ করিলে ক্রমে তাহা এমন অভ্যস্ত হইয়া যায় যে তাহাতে আর তাহার ঘুমের ব্যাঘাত হয় না। তাঁহারা বুঝেন না যেমন ক্রন্দন করিলে ক্রমে শোক নষ্ট হইয়া যায় তেমনি সকল বিষয়েই। এই নিমিত্তই শেক্সপিয়র কহিয়াছেন 'Words to the heat of deed too cold breath give'. তোমার হৃদয় যখন উৎসাহে জ্বলিয়া উঠিবে তখন তুমি তাহা দমন করিবে নহিলে প্রকাশ করিলেই নিভিয়া যাইবে এবং যত দমন করিবে ততই জ্বলিয়া জ্বলিয়া উঠিবে।

ভুবনমোহিনীপ্রতিভা, অবসরসরোজিনী, দুঃখসঙ্গিনী এই তিনখানি গীতিকাব্য আমরা সমালোচনার জন্য প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহাদিগের মধ্যে ভুবনমোহিনীপ্রতিভা ও অবসরসরোজিনীর মধ্যে অনেকগুলি আর্যসংগীত আছে কেননা ইহাদিগের মধ্যে একজন স্ত্রীলোক, অপরটি বালক। ইহা প্রায় প্রত্যক্ষ যে দুর্বলদিগের যেমন শারীরিক বল অল্প তেমনি মানসিক তেজ অধিক; ঈশ্বর একটির অভাব অন্যটির দ্বারা পূর্ণ করেন। ভুবনমোহিনীপ্রতিভা ও অবসরসরোজিনী পড়িলে দেখিবে, ইঁহাদিগের মধ্যে একজনের প্রয়াস আছে, অধ্যবসায় আছে, শ্রমশীলতা আছে। একজন আপনার হৃদয়ের খনির মধ্যে যে রত্ন যে ধাতু পাইয়াছেন তাহাই পাঠকবর্গকে উপহার দিয়াছেন, সে রত্নে ধূলিকর্দম মিশ্রিত আছে কিনা, তাহা সুমার্জিত মসৃণ করিতে হইবে কিনা তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই। আর-একজন আপনার বিদ্যার ভাণ্ডারে যাহা-কিছু কুড়াইয়া পাইয়াছেন, তাহাই একটু মার্জিত করিয়া বা কোনো কোনো স্থলে তাহার সৌন্দর্য নষ্ট করিয়া পাঠককে আপনার বলিয়া দিতেছেন। একজন নিজের জন্য কবিতা লিখিয়াছেন, আর-একজন পাঠকদিগের জন্য কবিতা লিখিয়াছেন। ভুবনমোহিনী নিজের মন তৃপ্তির জন্য কবিতা লিখিয়াছেন, আর রাজকৃষ্ণবাবু যশপ্রাপ্তির জন্য কবিতা লিখিয়াছেন, নহিলে তিনি বিদেশীয় কবিতার ভাব সংগ্রহ করিয়া নিজের বলিয়া দিতেন না। ভুবনমোহিনী পৃথিবীর লোক, তাঁর কবিতার নিন্দা করিলেও গ্রাহ্য করিবেন না, কেননা তিনি পৃথিবীর লোকের নিমিত্ত কবিতা লেখেন নাই। আর রাজকৃষ্ণবাবু তাঁহার কবিতার নিন্দা শুনিলে মর্মান্তিক ক্ষুব্ধ হইবেন, কেননা যশেচ্ছাই তাঁহাকে কবি করিয়া তুলিয়াছে। একজন অশিক্ষিতা রমণীর প্রতিভায় ও একজন শিক্ষিত যুবকের প্রয়াসে এই প্রভেদ। কবিরা যেখানেই প্রায় পরের অনুকরণ করিতে যান সেইখানেই নষ্ট করেন ও যেখানে নিজের ভাব লেখেন সেইখানেই ভালো হয়, কেননা তাঁহাদের নিজের ভাবস্রোতের মধ্যে পরের ভাব ভালো করিয়া মিশে না। আর কুকবিরা প্রায় যেখানে পরের অনুকরণ বা অনুবাদ করেন সেইখানেই ভালো হয় ও নিজের ভাব জুড়িতে গেলেই নষ্ট করেন, কেননা হয় পরের মনোভাব-স্রোতের মধ্যে তাঁহাদের নিজের ভাব মিশে না কিংবা তাঁহার আশ্রয় উচ্চতর কবির কবিত্বের নিকট তাঁহার নিজের ভাব 'হংসমধ্যে বক যথা' হইয়া পড়ে! এই নিমিত্ত অবসরসরোজিনীর 'মধুমক্ষিকা-দংশন' ও 'প্রবাহি চলিয়া যাও অয়ি লো তটিনী' ইত্যাদি কবিতাগুলি মন্দ নাও লাগিতে পারে!

জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব
কার্তিক ১২৮৩

মেঘনাদবধ কাব্য

বঙ্গীয় পাঠকসমাজে যে-কোনো গ্রন্থকার অধিক প্রিয় হইয়া পড়েন, তাঁহার গ্রন্থ নিরপেক্ষভাবে সমালোচনা করিতে কিঞ্চিৎ সাহসের প্রয়োজন হয়। তাঁহার পুস্তক হইতে এক বিন্দু দোষ বাহির করিলেই, তাহা ন্যায্য হউক বা অন্যায্যই হউক, পাঠকেরা অমনি ফণা ধরিয়া উঠেন। ভীরু সমালোচকরা ইঁহাদের ভয়ে অনেক সময়ে আপনার মনের ভাব প্রকাশ করিতে সাহস করেন না। সাধারণ লোকদিগের প্রিয় মতের পোষকতা করিয়া লোকরঞ্জন করিতে আমাদের বড়ো একটা বাসনা নাই। আমাদের নিজের যাহা মত তাহা প্রকাশ্যভাবে বলিতে আমরা কিছুমাত্র সংকুচিত হইব না বা যদি কেহ আমাদের মতের দোষ দেখাইয়া দেন তবে তাহা প্রকাশ্যভাবে স্বীকার করিতে আমরা কিছুমাত্র লজ্জিত হইব না। এখনকার পাঠকদের স্বভাব এই যে, তাঁহারা ঘটনাক্রমে এক-একজন লেখকের অত্যন্ত অনুরক্ত হইয়া পড়েন, এরূপ অবস্থায় তাঁহারা সে লেখকের রচনায় কোনো দোষ দেখিতে পান না, অথবা কেহ যদি তাহার কোনো দোষ দেখাইয়া দেয় সে দোষ বোধগম্য ও যুক্তিযুক্ত হইলেও তাঁহারা সেগুলিকে গুণ বলিয়া বুঝাইতে ও বুঝিতে

প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া থাকেন। আবার এমন অনেক ভীরু-স্বভাব পাঠক আছেন, যাঁহারা খ্যাতনামা লেখকের রচনা পাঠকালে কোনো দোষ দেখিলে তাহাকে দোষ বলিয়া মনে করিতে ভয় পান, তাঁহারা মনে করেন এগুলি গুণই হইবে, আমি ইহার গভীর অর্থ বুঝিতে পারিতেছি না।

আমাদের পাঠকসমাজের রুচি ইংরাজি-শিক্ষার ফলে একাংশে যেমন উন্নত হইয়াছে অপরাংশে তেমনি বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে। ভ্রমর, কোকিল, বসন্ত লইয়া বিরহ বর্ণনা করিতে বসা তাঁহাদের ভালো না লাগুক, কবিতার অন্যসকল দোষ ইংরাজি গিল্‌টিতে আবৃত করিয়া তাঁহাদের চক্ষে ধরো তাঁহারা অন্ধ হইয়া যাইবেন। ইঁহারা ভাববিহীন মিষ্ট ছত্রের মিলনসমষ্টি বা শব্দাড়ম্বরের ঘনঘটাচ্ছন্ন শ্লোককে মুখে কবিতা বলিয়া স্বীকার করিতে লজ্জিত হন কিন্তু কার্যে তাহার বিপরীতাচরণ করেন। শব্দের মিষ্টতা অথবা আড়ম্বর তাঁহাদের মনকে এমন আকৃষ্ট করে যে ভাবের দোষ তাঁহাদের চক্ষে প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। কুশ্রী ব্যক্তিকে মণি-মাণিক্যজড়িত সুদৃশ্য পরিচ্ছদে আবৃত করিলে আমাদের চক্ষু পরিচ্ছদের দিকেই আকৃষ্ট হয়, ওই পরিচ্ছদ সেই কুশ্রী ব্যক্তির কদর্যতা কিয়ৎ পরিমাণে প্রচ্ছন্ন করিতেও পারে কিন্তু তাহা বলিয়া তাহাকে সৌন্দর্য অর্পণ করিতে পারে না।

আমরা এবারে যে মেঘনাদবধের একটি রীতিমতো সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহা পাঠ করিয়া অনেক পাঠক বিরক্ত হইয়া কহিবেন যে অত সূক্ষ্ম সমালোচনা করিয়া পুস্তকের দোষগুণ ধরা অনাবশ্যক, মোটের উপর পুস্তক ভালো লাগিলেই হইল। আমরা বলি এমন অনেক চিত্রকর আছেন, যাঁহারা বর্ণপ্রাচুর্যে তাঁহাদের চিত্র পূর্ণ করেন, সে চিত্র দূর হইতে সহসা নয়ন আকর্ষণ করিলেও প্রকৃত শিল্পরসজ্ঞ ব্যক্তি সে চিত্রকরেরও প্রশংসা করেন না, সে চিত্রেরও প্রশংসা করেন না, তাঁহারা বিশেষ বিশেষ করিয়া দেখেন যে, চিত্রে ভাব কেমন সংরক্ষিত হইয়াছে, এবং ভাবসূদ্ধ চিত্র দেখিলেই তাঁহারা তৃপ্ত হন। কাব্য সম্বন্ধেও ওইরূপ বলিতে পারা যায়। আমরা অধিক ভূমিকা করিতে অতিশয় অনিচ্ছুক, এখন যে সমালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া গিয়াছে তাহারই অবতারণা করা যাক।

লক্ষ্মণ, ইন্দ্রজিৎ, রাবণ, সীতা, প্রমীলা, ইন্দ্র, দুর্গা, মায়াদেবী, লক্ষ্মী ইঁহারাই মেঘনাদবধের প্রধান চরিত্র। ইহার মধ্যে কতকগুলি চরিত্র সুচিত্রিত হয় নাই, এবং কতকগুলি আমাদের মনের মতো হয় নাই। প্রথম, পুস্তক আরম্ভ করিতেই রাবণকে পাই। প্রথমে আমরা ভাবিলাম, কী একটি ভীষণ চিত্রই পাইব, গগনস্পর্শী বিশাল দশানন গম্ভীর, ভীষণ, অন্ধকারময় মূর্তিতে উচ্চ প্রকাণ্ড সভামণ্ডপে আসীন, কিন্তু তাহা নহে, তাহা খুঁজিয়া পাই না। পাঠক প্রথমে একটি স্ফটিকময় রত্নরাজিসমাকুল সভায় প্রবেশ করো; সেখানে বসন্তের বাতাস বহিতেছে, কুসুমের গন্ধ আসিতেছে, চন্দ্রাননা চারুলোচনা কিংকরী চামর ঢুলাইতেছে, মদনের প্রতিরূপ ছত্রধর ছত্র ধরিয়া আছে, যাহা এক ভীষণের মধ্যে আছে দৌবারিক, কিন্তু দৌবারিককে মনে করিতে গিয়া শিবের রুদ্রভাব কমাইতে হয়। কবি পাণ্ডবশিবির-দ্বারে শূলপাণি রুদ্রেশ্বরের সহিত দ্বারবানের তুলনা দিয়াছেন। পুষ্করিণীর সহিত সমুদ্রের তুলনা দিলে সমুদ্রকেই ছোটো বলিয়া মনে হয়। কেহ বলিবেন যে, রামায়ণের রাবণ রত্নরাজিসমাকুলিত সভাতেই থাকিত, সুতরাং মেঘনাদবধে অন্যরূপ কী করিয়া বর্ণিত হইবে? আমরা বলি রত্নরাজিসংকুল সভায় কি গাম্ভীর্য অর্পণ করা যায় না? বাল্মীকি রাবণের সভা বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন, 'রাবণের সভা তরঙ্গসংকুল, নক্রকুম্ভীর ভীষণ সমুদ্রের ন্যায় গম্ভীর।'[১] বাংলার একটি ক্ষুদ্র কাব্যের সহিত বাল্মীকির বিশাল কাব্যের তুলনা করিতে যাওয়াও যা, আর মহাদেবের সহিত একটা দ্বারবানের তুলনা করাও তা, কিন্তু কী করা যায়, কোনো কোনো পাঠকের চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া না দেখাইলে তাঁহারা বুঝিবেন না।

---

[১] হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য -কর্তৃক অনুবাদিত রামায়ণ। সুন্দর কাণ্ড।

ভূতলে অতুল সভা— ফটিকে গঠিত;
তাহে শোভে রত্নরাজি, মানসসরসে
সরস কমলকুল বিকশিত যথা।
শ্বেত, রক্ত, নীল, পীত স্তম্ভ সারি সারি
ধরে উচ্চ স্বর্ণ ছাদ, ফণীন্দ্র যেমতি,
বিস্তারি অযুত ফণা, ধরেন আদরে
ধরারে। ঝুলিছে ঝলি ঝালরে মুকুতা,
পদ্মরাগ, মরকত, হীরা, যথা ঝোলে
খচিত মুকুলে ফুলে পল্লবের মালা
ব্রতালয়ে। ইত্যাদি

ইহা কি রাবণের সভা? ইহা তো নাট্যশালার বর্ণনা!

কতকগুলি পাঠকের আবার পাত্রাপাত্র জ্ঞান নাই, তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিবেন রাবণের সভা মহান করিতেই হইবে তাহার অর্থ কী? না-হয় সুন্দরই হইল, ইঁহাদের কথার উত্তর দিতে আমাদের অবকাশ নাই এবং ইচ্ছাও নাই। এককথায় বলিয়া রাখি যে, কবি ব্রজাঙ্গনায় যথাসাধ্য কাকলি, বাঁশরি, স্বরলহরী, গোকুল, বিপিন প্রভৃতি ব্যবহার করিতে পারিতেন, কিন্তু মহাকাব্য রচনায়, বিশেষ রাবণের সভা-বর্ণনায় মিষ্টভাবের পরিবর্তে তাঁহার নিকট হইতে আমরা উচ্চ, প্রকাণ্ড, গম্ভীর ভাব প্রার্থনা করি। এই সভার বর্ণনা পাঠ করিয়া দেখি রাবণ কাঁদিতেছেন, রাবণের রোদনে পুস্তকের প্রারম্ভভাগ যে নষ্ট হইয়া গেল, তাহা আর সুরুচি পাঠকদের বুঝাইয়া দিতে হইবে না। ভালো, এ দোষ পরিহার করিয়া দেখা যাউক, রাবণ কী ভয়ানক শোকেই কাঁদিতেছেন ও সে রোদনই বা কী অসাধারণ; কিন্তু তাহার কিছুই নয়, বীরবাহুর শোকে রাবণ কাঁদিতেছেন। অনেকে কহিবেন, ইহা অপেক্ষা আর শোক কী আছে। কিন্তু তাঁহারা ভাবিয়া দেখুন, বীরবাহুর পূর্বে রাবণের কত পুত্র হত হইয়াছে, সকল ক্লেশের ন্যায় শোকও অভ্যস্ত হইয়া যায়, এখন দেখা যাউক রাবণের রোদন কী প্রকার। প্রকাণ্ড দশানন, কাঁদিতেছেন কিরূপে—

এ হেন সভায় বসে রক্ষঃকুলপতি,
বাক্যহীন পুত্রশোকে! ঝর ঝর ঝরে,
অবিরল অশ্রুধারা— তিতিয়া বসনে
ইত্যাদি

রানী মন্দোদরীকে কাঁদাইতে গেলে ইহা অপেক্ষা অধিক বাক্যব্যয় করিতে হইত না। ইহা পড়িলেই আমাদের মনে হয় গালে হাত দিয়া একটি বিধবা স্ত্রীলোক কাঁদিতেছেন। একজন সাধারণ নায়ক এরূপ কাঁদিতে বসিলে আমাদের গা জ্বলিয়া যায়, তাহাতে ইনি মহাকাব্যের নায়ক, যে-সে নায়ক নয়, যিনি বাহুবলে স্বর্গপুরী কাঁপাইয়াছিলেন, এবং যাঁহার এতদূর দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ছিল যে, তাঁহার চক্ষের উপরে একটি একটি করিয়া পুত্র, পৌত্র, ভ্রাতা নিহত হইল, ঐশ্বর্যশালী জনপূর্ণ কনকলঙ্কা ক্রমে ক্রমে শ্মশানভূমি হইয়া গেল, অবশেষে যিনি যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ পর্যন্ত পরিত্যাগ করিলেন তথাপি রামের নিকট নত হন নাই, তাঁহাকে এইরূপ বালিকাটির ন্যায় কাঁদাইতে বসানো অতি ক্ষুদ্র কবির উপযুক্ত। ভাবুক মাত্রেই স্বীকার করিবেন যে, মন্দোদরীই বিলাপ করিতে হইলে বলিতেন যে—

হা পুত্র, হা বীরবাহু, বীরচূড়ামণি!
কী পাপে হারানু আমি তোমা হেন ধনে?
কী পাপ দেখিয়া মোর, রে দারুণ বিধি,
হরিলি এ ধন তুই? হায় রে কেমনে
সহি এ যাতনা আমি? কে আর রাখিবে

এ বিপুল কুল-মান এ কালসমরে?
ইত্যাদি

রাবণের ক্রন্দন দেখিয়া 'সচিবশ্রেষ্ঠ বুধঃ সারণ' সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন,

এ ভবমণ্ডল
মায়াময়, বৃথা এর সুখ দুঃখ যত।

রাবণ কহিলেন, 'কিন্তু জেনে শুনে তবু কাঁদে এ-পরাণ অবোধ'। ইহার পর দূত যে বীরবাহুর যুদ্ধের বর্ণনা করিলেন তাহা মন্দ নহে, তাহাতে কবি কথাগুলি বেশ বাছিয়া বসাইয়াছেন। তাহার পরে দূত বীরবাহুর মৃত্যু স্মরণ করিয়া কাঁদিল— 'কাঁদে যথা বিলাপী স্মরিয়া পূর্ব দুঃখ'— এ কথাটি অতিশয় অযথা হইয়াছে। অমনি সভাসুদ্ধ কাঁদিল, রাবণ কাঁদিল, আমার মনে হইল আমি একরাশি স্ত্রীলোকের মধ্যে বসিয়া পড়িলাম।

অশ্রুময় আঁখি পুনঃ কহিলা রাবণ,
মন্দোদরী মনোহর,

একে তো অশ্রুময় আঁখি রাবণ, তাহাতে আবার 'মন্দোদরী মনোহর', আমরা বাল্মীকির রাবণকে হারাইয়া ফেলিলাম। বড়ো বড়ো কবিরা এক-একটি বিশেষণে তাঁহাদের বর্ণনীয় বিষয়ের স্বপক্ষে এক-এক আকাশ ভাব আনিয়া দেন। রোদনের সময় রাবণের 'মন্দোদরী মনোহর' বিশেষণ দিবার প্রয়োজন কী? যখন কবি রাবণের সৌন্দর্য বুঝাইবার জন্য কোনো বর্ণনা করিবেন তখন 'মন্দোদরী মনোহর' রাবণের বিশেষণ অর্থে ব্যবহৃত হইতে পারে। তৎপরে দূত তেজের সহিত বীরবাহুর মৃত্যু বর্ণনা করিলেন, তখন রাবণের বীরত্ব ফিরিয়া আসিল, কেননা ডমরুধ্বনি না শুনিলে ফণী কখনো উত্তেজিত হয় না। তাহার পরে শ্মশানে বীরবাহুর মৃতকায় দেখিয়া—

মহাশোকে শোকাকুল কহিলা রাবণ।
যে শয্যায় আজি তুমি শুয়েছ কুমার
প্রিয়তম, বীরকুলসাধ এ শয়নে
সদা! রিপুদল বলে দলিয়া সমরে
জন্মভূমি রক্ষাহেতু কে ডরে মরিতে?
যে ডরে ভীরু সে মূঢ় শত ধিক্ তারে।

এতদূর পড়িয়া আশা হয় যে এবার বুঝি রাবণের উপযুক্ত রোদনই হইবে কিন্তু তাহার পরেই আছে—

তবু বৎস যে হৃদয় মুগধ—
কোমল সে ফুলসম। এ বজ্র আঘাতে
কত যে কার সে, তা জানেন সে জন
অন্তর্যামী যিনি; আমি কহিতে অক্ষম।
হে বিধি, এ ভবভূমি তব লীলাস্থলী।
পরের যাতনা কিন্তু দেখি কি হে তুমি
হও সুখী? পিতা সদা পুত্র দুঃখে দুঃখী;
তুমি হে জগতপিতা, এ কী রীতি তব?
হা পুত্র! হা বীরবাহু! বীরেন্দ্র কেশরী
কেমনে ধরিব প্রাণ তোমার বিহনে?

সুরুচি পাঠকেরা কখনোই বলিবেন না যে, ইহা রাবণের উপযুক্ত রোদন হইয়াছে।

এইরূপে আক্ষেপিয়া রাক্ষস ঈশ্বর
রাবণ, ফিরায়ে আঁখি দেখিলেন দূরে
সাগর

ভাবিলাম মহাকবি সাগরের কী একটি মহান গম্ভীর চিত্রই করিবেন, অন্য কোনো কবি এ সুবিধা ছাড়িতেন না। সমুদ্রের গম্ভীর চিত্র দূরে থাক্, কবি কহিলেন—

বহিছে জলস্রোত কলরবে
স্রোতঃপথে জল যথা বরিষার কালে

যাঁহাদের কবি আখ্যা দিতে পারি তাঁহাদের মধ্যে কেহই এরূপ নীচ বর্ণনা করিতে পারেন না, তাঁহাদের মধ্যে কেহই বিশাল সমুদ্রের ভাব এত ক্ষুদ্র করিয়া ভাবিতে পারেন না। এই স্থলে পাঠকগণের কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য রামায়ণ হইতে একটি উৎকৃষ্ট সমুদ্র বর্ণনা উদ্‌ধৃত করিয়া দিলাম।[1]

"বিস্তীর্ণ মহাসমুদ্র প্রচণ্ড বায়ুবেগে নিরবচ্ছিন্ন আন্দোলিত হইতেছে। উহার কোথাও উদ্দেশ নাই, চতুর্দিক অবাধে প্রসারিত হইয়া আছে। উহা ঘোর জলজন্তুগণে পূর্ণ; প্রদোষকালে অনবরত ফেন বিকাশপূর্বক যেন হাস্য করিতেছে এবং তরঙ্গভঙ্গি প্রদর্শনপূর্বক যেন নৃত্য করিতেছে। তৎকালে চন্দ্র উদিত হওয়াতে মহাসমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস বর্ধিত হইয়াছে এবং প্রতিবিম্বিত চন্দ্র উহার বক্ষে ক্রীড়া করিতেছে। সমুদ্র পাতালের ন্যায় ঘোর গভীরদর্শন; উহার ইতস্ততঃ তিমি তিমিঙ্গিল প্রভৃতি জলজন্তুসকল প্রচণ্ডবেগে সঞ্চরণ করিতেছে। স্থানে স্থানে প্রকাণ্ড শৈল; উহা অতলস্পর্শ; ভীম অজগরগণ গর্ভে লীন রহিয়াছে। উহাদের দেহ জ্যোতির্ময়, সাগরবক্ষে যেন অগ্নিচূর্ণ প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। সমুদ্রের জলরাশি নিরবচ্ছিন্ন উঠিতেছে ও পড়িতেছে। সমুদ্র আকাশতুল্য এবং আকাশ সমুদ্রতুল্য; উভয়ের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য নাই; আকাশে তারকাবলী এবং সমুদ্রে মুক্তাস্তবক; আকাশে ঘনরাজি এবং সমুদ্রে তরঙ্গজাল; আকাশে সমুদ্র ও সমুদ্রে আকাশ মিশিয়াছে। প্রবল তরঙ্গের পরস্পর সংঘর্ষ নিবন্ধন মহাকাশে মহাভেরীর ন্যায় অনবরত ভীম রব শ্রুত হইতেছে। সমুদ্র যেন অতিমাত্র ক্রুদ্ধ; উহা রোষভরে যেন উঠিবার চেষ্টা করিতেছে এবং উহার ভীম গম্ভীর রব বায়ুতে মিশ্রিত হইতেছে।"

রাবণ সমুদ্রকে সম্বোধন করিয়া যাহা কহিলেন তাহা সুন্দর লাগিল। রাবণ পুনরায় সভায় আসিয়া,

শোকে মগ্ন বসিলা নীরবে
মহামতি, পাত্র, মিত্র, সভাসদ্ আদি
বসিলা চৌদিকে, আহা নীরব বিষাদে!

হেনকালে রোদনের 'মৃদু নিনাদ' ও কিঙ্কিণীর 'ঘোর রোল' তুলিয়া চিত্রাঙ্গদা আইলেন, কবি তখন একটি ঝড় বাধাইলেন, এই ঝড়ের রূপকটি অতিশয় হাস্যজনক।

সুরসুন্দরীর রূপে শোভিল চৌদিকে
বামাকুল; মুক্তকেশ মেঘমালা, ঘন
নিশ্বাস প্রলয় বায়ু; অশ্রুবারিধারা
আসার, জীমূত-মন্দ্র হাহাকার রব।

এই ঝড় উপস্থিত হইতেই অমনি নেত্রনীরসিক্তা কিংকরী দূরে চামর ফেলিয়া দিল এবং ছত্রধর ছত্র ফেলিয়া দিয়া কাঁদিতে বসিল, আর পাত্র-মিত্র সভাসদ আদি অধীর হইয়া 'ঘোর কোলাহলে' কাঁদিতে লাগিল। রাবণের সভায় এত কান্না তো আর সহ্য হয় না, পাত্র-মিত্র সভাসদ আদিকে এক-একটি খেলেনা দিয়া থামাইতে ইচ্ছা করে। একটু শোকে কিংকরী চামর ছুঁড়িয়া ফেলিল, একটু শোকে ছত্রধর ছত্র ফেলিয়া কাঁদিতে বসিল। একে তো ইহাতে রাজসভার এক অপূর্ব ভাব মনে আসে, দ্বিতীয়ত ক্রোধেই চামর আদি দূরে ফেলিয়া দিবার সম্ভাবনা, শোকে বরং হস্ত হইতে অজ্ঞাতে খসিয়া পড়িতে পারে। মহিষী রাবণকে যাহা কহিলেন তাহা ভালো লাগিল,

---

[1] হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য -কর্তৃক অনুবাদিত রামায়ণ। যুদ্ধকাণ্ড, চতুর্থ সর্গ।

রাবণ কহিলেন,

বরজে সজারু পশি বারুইর যথা
ছিন্নভিন্ন করে তারে, দশরথাত্মজ
মজাইছে লঙ্কা মোর।

এই উদাহরণটি অতিশয় সংকীর্ণ হইয়াছে; যদি সাহিত্যদর্পণকার জীবিত থাকিতেন তবে দোষ-পরিচ্ছেদে যেখানে সূর্যের সহিত কুপিত কপি কপোলের তুলনা উদ্‌ধৃত করিয়াছেন সেইখানে এইটি প্রযুক্ত হইতে পারিত। দূতের ডমরুধ্বনিতে, চিত্রাঙ্গদার শোকার্ত ভর্ৎসনায় রাবণ শোকে অভিমানে 'ত্যজি সুকনকাসন উঠিল গর্জিয়া'। সুকনকাসন, সুসিন্দুর, সুসমীরণ, সুআরাধনা, সুকবচ, সুউচ্চ, সুমনোহর কথাগুলি কাব্যের স্থানে স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে, এগুলি তেমন ভালো শুনায় না। ইহার পরে রাবণ সৈন্যদের সজ্জিত হইতে আদেশ করিলেন, রণসজ্জার বর্ণনা তেমন কিছু চিত্রিতবৎ হয় নাই, নহিলে উদ্‌ধৃত করিতাম।

যাহা হউক, প্রথম সর্গের এতখানি পড়িয়া যদি আমাদের রাবণের চরিত্র বুঝিতে হয় তো কী বুঝিব? রাবণকে কি মন্দোদরী বলিয়া আমাদের ভ্রম হইবে না? কোথায় রাবণ বীরবাহুর মৃত্যু শুনিয়া পদাহত সিংহের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিবেন, না সভাসুদ্ধ কাঁদাইয়া কাঁদিতে বসিলেন! কোথায় পুত্রশোক তাঁহার কৃপাণের শান-প্রস্তর হইবে, কোথায় প্রতিহিংসা তাঁহার শোকের ঔষধি হইবে, না তিনি স্ত্রীলোকের শোকাগ্নি নির্বাণের উপায় অশ্রুজলের আশ্রয় লইয়াছেন। কোথায় যখন দূত বীরবাহুর মৃত্যু স্মরণ করিয়া কাঁদিবে তখন তিনি বলিবেন যে, আমার বীরবাহুর মৃত্যু হয় নাই তো তিনি অমর হইয়াছেন, না সারণ তাঁহাকে বুঝাইবে যে, 'এ ভব মণ্ডল মায়াময়' আর তিনি উত্তর দিবেন, 'তাহা জানি তবু জেনে শুনে কাঁদে এ পরাণ অবোধ!' যখন রাবণ বীরবাহুর মৃতকায় দেখিয়া বলিতেছেন 'যে শয্যায় আজি তুমি শুয়েছ কুমার, বীরকুলসাধ এ শয়নে সদা' তখন মনে করিলাম, বুঝি এতক্ষণে মন্দোদরীর পরিবর্তে রাবণকে পাইলাম, কিন্তু তাহা নয়, আবার রাবণ কাঁদিয়া উঠিলেন। রাবণের সহিত যদি বৃত্রসংহারের বৃত্রের তুলনা করা যায় তবে স্বীকার করিতে হয় যে, রাবণের অপেক্ষা বৃত্রের মহান ভাব আছে। বৃত্র সভায় প্রবেশ করিবামাত্র কবি তাহার চিত্র আমাদের সম্মুখে ধরিলেন, তাহা দেখিয়াই বৃত্রকে প্রকাণ্ড দৈত্য বলিয়া চিনিতে পারিলাম।

নিবিড় দেহের বর্ণ মেঘের আভাস
পর্বতের চূড়া যেন সহসা প্রকাশ।
নিশান্তে গগনপথে ভানুর ছটায়
বৃত্রাসুর প্রবেশিল তেমতি সভায়।
ভ্রূকুটি করিয়া দর্পে ইন্দ্রাসন-'পরে
বসিল, কাঁপিল গৃহ দৈত্যপদভরে।

মেঘনাদবধের প্রথম সর্গের উপসংহার ভাগে যখন ইন্দ্রজিৎ রাবণের নিকট যুদ্ধে যাইবার প্রার্থনা করিলেন, তখন রাবণ কহিলেন, 'এ কাল সমরে নাহি চাহে প্রাণ মম পাঠাইতে তোমা বারংবার'। কিন্তু বৃত্রপুত্র রুদ্রপীড় যখন পিতার নিকট সেনাপতি হইবার প্রার্থনা করিলেন তখন বৃত্র কহিলেন,

রুদ্রপীড়! তব চিত্তে যত অভিলাষ,
পূর্ণ কর যশোরশ্মি বাঁধিয়া কিরীটে;
বাসনা আমার নাই করিতে হরণ
তোমার সে যশঃপ্রভা পুত্র যশোধর!
ত্রিলোকে হয়েছ ধন্য, আরও ধন্য হও
দৈত্যকুল উজ্জ্বলিয়া, দানবতিলক!
তবে যে বৃত্রের চিত্তে সমরের সাধ

অদ্যাপি প্রজ্বল এত, হেতু সে তাহার
যশোলিপ্সা নহে, পুত্র, অন্য সে লালসা,
নারি ব্যক্ত করিবারে বাক্যে বিন্যাসিয়া।
অনন্ত তরঙ্গময় সাগর গর্জ্জন,
বেলাগর্ভে দাঁড়াইলে, যথা সুখকর;
গভীর শর্বরীযোগে গাঢ় ঘনঘটা
বিদ্যুতে বিদীর্ণ হয়, দেখিলে যে সুখ;
কিংবা সে গঙ্গোত্রীপার্শ্বে একাকী দাঁড়ায়ে
নিরখি যখন অম্বুরাশি ঘোর-নাদে
পড়িছে পর্বতশৃঙ্গ স্রোতে বিলুণ্ঠিয়া,
ধরাধর ধরাতল করিয়া কম্পিত!
তখন অন্তরে যথা, শরীর পুলকি,
দুর্জ্জয় উৎসাহে হয় সুখ বিমিশ্রিত;
সমরতরঙ্গে পশি, খেলি যদি সদা,
সেই সুখ চিত্তে মম হয় রে উত্থিত।

ইহার মধ্যে ভয়ভাবনা কিছুই নাই, বীরোচিত তেজ। মেঘনাদবধ কাব্যে অনেকগুলি ‘প্রভঞ্জন’ ‘কলম্বকুল’ প্রভৃতি দীর্ঘপ্রস্থ কথায় সজ্জিত ছত্রসমূহ পাঠ করিয়া তোমার মন ভারগ্রস্ত হইয়া যাইবে, কিন্তু এমন ভাবপ্রধান বীরোচিত বাক্য অল্পই খুঁজিয়া পাইবে। অনেক পাঠকের স্বভাব আছে যে তাঁহারা চরিত্রে চিত্রে কী অভাব কী হীনতা আছে তাহা দেখিবেন না, কথার আড়ম্বরে তাঁহারা ভাসিয়া যান, কবিতার হৃদয় দেখেন না, কবিতার শরীর দেখেন। তাঁহারা রাবণের ক্রন্দন অশ্রু আকর্ষণ করিলেই তৃপ্ত হন, কিন্তু রাবণের ক্রন্দন করা উচিত কি না তাহা দেখিতে চান না, এইজন্যই বঙ্গ-দেশময় মেঘনাদবধের এত সুখ্যাতি। আমরা দেখিতেছি কোনো কোনো পাঠক ভাবিয়া ভাবিয়া মাথা ঘুরাইবেন যে, সমালোচক রাবণকে কেন তাহার কাঁদিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে চাহেন? একজন চিত্রকর একটি কালীর মূর্তি অঙ্কিত করিয়াছিল, আমি সেই মূর্তিটি দেখিয়াছিলাম; পাঠকেরা জানেন পুরাণে কালীর কীরূপ ভীষণ চিত্রই অঙ্কিত আছে, অমাবস্যার অন্ধকার নিশীথে যাঁহার পূজা হয়, আলুলিত কুন্তলে বিকট হাস্যে যিনি শ্মশানভূমিতে নৃত্য করেন, নরমুণ্ডমালা যাঁহার ভূষণ, ডাকিনী যোগিনীগণ যাঁহার সঙ্গিনী, এমন কালীর চিত্র আঁকিয়া চিত্রকর তাঁহাকে আপাদমস্তক স্বর্ণালংকারে বিভূষিত করিয়াছে, অনেক কৃতবিদ্য ব্যক্তি এই চিত্রটির বড়োই প্রশংসা করিয়াছিলেন, যাঁহারা সংহারশক্তিরূপিণী কালিকার স্বর্ণভূষণে কোনো দোষ দেখিতে পান না তাঁহারা রাবণের ক্রন্দনে কী দোষ আছে ভাবিয়া পাইবেন না, কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, তাঁহাদের জন্য এই সমালোচনা লিখিত হইতেছে না। মূল কথা এই, বঙ্গদেশে এখন এমনই সৃষ্টিছাড়া শিক্ষাপ্রণালী প্রচলিত হইয়াছে যে তাহাতে শিক্ষিতেরা বিজ্ঞান-দর্শনের কতকগুলি বুলি এবং ইতিহাসের সাল-ঘটনা ও রাজাদিগের নামাবলী মুখস্থ করিতে পারিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাতে তাঁহাদের রুচিরও উন্নতি করিতে পারেন নাই বা স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতেও শিখেন নাই। বাল্মীকির রামায়ণে শোকের সময় রাবণের কীরূপ অবস্থা বর্ণিত আছে, এ স্থলে তাহা অনুবাদ করিয়া পাঠকদের গোচরার্থে লিখিলাম, ইহাতে পাঠকেরা দেখিবেন বাল্মীকির রাবণ হইতে মেঘনাদবধের রাবণের কত বিভিন্নতা।

অনন্তর হনুমান-কর্তৃক অক্ষ নিহত হইলে রাক্ষসাধিপতি মনঃসমাধানপূর্বক শোক সংবরণ করিয়া ইন্দ্রজিৎকে রণে যাত্রা করিতে আদেশ করিলেন।[1] মনঃসমাধানপূর্বক শোক সংবরণ করার

---

১. সুন্দরকাণ্ড, ৪৩ অধ্যায়। ২. যুদ্ধকাণ্ড, ২৯ অধ্যায়। ৩. যুদ্ধকাণ্ড, ৩১ অধ্যায়।

মধ্যে রাবণের যে মহান ভাব প্রকাশিত হইতেছে, তাহা যদি ইংরাজি-পুথি-সর্বস্ব-পাঠকেরা দেশীয় কবি বাল্মীকি লিখিয়াছেন বলিয়া বুঝিতে না পারেন, এইজন্য ইংরাজি কবি মিলটন হইতে তাহার আংশিক সাদৃশ্য উদ্‌ধৃত করিয়া দিতেছি,

Thrice he essay'd and thrice, in spite of scorn,
Tears, such as angels weep, burst forth :—

ধূম্রাক্ষ নিহত হইয়াছেন শুনিয়া রাবণ ক্রোধে হতজ্ঞান হইয়া কৃতাঞ্জলিবদ্ধ সৈন্যাধ্যক্ষকে কহিলেন, অকম্পনকে সেনাপতি করিয়া শীঘ্র যুদ্ধবিশারদ ঘোরদর্শন দুর্ধর্ষ রাক্ষসগণ যুদ্ধার্থে নির্গত হউক।[1]

অতঃপর ক্রুদ্ধ রাবণ অকম্পন হত হইয়াছেন শুনিয়া কিঞ্চিৎ দীনভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন। রাক্ষসপতি মুহূর্তকাল মন্ত্রীদিগের সহিত চিন্তা করিয়া ক্রোধে উষ্ণ নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে গৃহ হইতে নির্গত হইলেন।[2]

অতিকায় নিহত হইলে তাহাদের বচন শুনিয়া শোকবিহ্বল, বন্ধুনাশবিচেতন, আকুল রাবণ কিছুই উত্তর দিলেন না। সেই রাক্ষসশ্রেষ্ঠকে শোকাভিপ্লুত দেখিয়া কেহই কিছু কহিলেন না; সকলেই চিন্তামগ্ন হইয়া রহিলেন।

নিকুম্ভ ও কুম্ভ হত হইয়াছেন শুনিয়া রাবণ ক্রোধে প্রজ্বলিত অনলের ন্যায় হইলেন।[1]

স্ববল ক্ষয় এবং বিরূপাক্ষবধ শ্রবণে রাক্ষসেশ্বর রাবণ দ্বিগুণ ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন।[2] এই-সকল বর্ণনায় শোকের অপেক্ষা ক্রোধের ভাব অধিক ব্যক্ত হইয়াছে।

ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধে যাইবার নিমিত্ত পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিলে রাবণ কহিলেন,

কুম্ভকর্ণ বলি
ভাই মম, তায় আমি জাগানু অকালে
ভয়ে; হায় দেহ তার, দেখো সিন্ধুতীরে
ভূপতিত, গিরিশৃঙ্গ কিংবা তরু যথা
বজ্রাঘাতে

বজ্রাঘাতে ভূপতিত গিরিশৃঙ্গসম, এই উদাহরণটি তো বেশ হইল, কিন্তু আবার 'কিংবা তরু' দিয়া কমাইবার কী প্রয়োজন ছিল, যেন কবি গিরিশৃঙ্গেও প্রকাণ্ডভাব বুঝাইতে না পারিয়া 'কিংবা তরু' দিয়া আরও উচ্চ করিয়াছেন।

তবে যদি একান্ত সমরে
ইচ্ছা তব, বৎস, আগে পূজ ইষ্টদেবে

প্রভৃতি বলিয়া রাবণ ইন্দ্রজিৎকে সেনাপতিপদে বরণ করিলেন, তখন বন্দীদের একটি গানের পর প্রথম সর্গ শেষ হইল।

সপ্তম সর্গে বর্ণিত আছে, মহাদেব রাবণকে ইন্দ্রজিতের নিধনবার্তা জানাইতে ও রুদ্রতেজে পূর্ণ করিতে বীরভদ্রকে রাবণসমীপে প্রেরণ করিলেন।

চলিলা আকাশপথে বীরভদ্র বলী
ভীমাকৃতি; ব্যোমচর নামিলা চৌদিকে
সভয়ে, সৌন্দর্যতেজে হীনতেজা রবি,
সুধাংশু নিরংশু যথা সে রবির তেজে।
ভয়ংকরী শূল ছায়া পড়িল ভূতলে।
গম্ভীর নিনাদে নাদি অম্বুরাশিপতি
পূজিলা ভৈরব দূতে। উত্তরিলা রথী
রক্ষঃপুরে; পদচাপে থর থর থরি

---

[1] যুদ্ধকাণ্ড, ৫৭ অধ্যায়। [2] যুদ্ধকাণ্ড, ৭৭ অধ্যায়।

কাঁপিল কনকলঙ্কা, বৃক্ষশাখা যথা
পক্ষীন্দ্র গরুড় বৃক্ষে পড়ে উড়ি যবে।

মেঘনাদবধ কাব্যে মহান ভাবোত্তেজক যে তিন-চারিটি মাত্র বর্ণনা আছে তন্মধ্যে ইহাও একটি। রাবণের সভায় গিয়া এই 'সন্দেশবহ' ইন্দ্রজিতের নিধনবার্তা নিবেদন করিল, অমনি রাবণ মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন; রুদ্রতেজে বীরভদ্রবলী রাবণের মূর্ছাভঙ্গ করিলেন। পরে বীরভদ্র যুদ্ধের বিবরণ বিস্তারিত রূপে বর্ণনা করিয়া কহিলেন,

প্রফুল্ল হায় কিংশুক যেমনি
ভূপতিত, বনমাঝে, প্রভঞ্জনবলে
মন্দিরে দেখিনু শূরে।

বায়ুবলচ্ছিন্ন কিংশুক ফুলটির মতো মৃত মহাবীর মেঘনাদ পড়িয়া আছেন, ইহা তো সমুচিত তুলনা হইল না। একটি মৃত বালিকার দেহ দেখিয়া তুমি ওইরূপ বলিতে পারিতে! নহিলে দূতের বাক্য মর্মস্পৃক্ হইয়াছে। পরে দূত উপরি-উক্ত কথাগুলি বলিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। এইবার রাবণ গর্জিয়া উঠিলেন—

এ কনক-পুরে,
ধনুর্ধর আছে যত সাজো শীঘ্র করি
চতুরঙ্গে! রণরঙ্গে ভুলিব এ জ্বালা
এ বিষম জ্বালা যদি পারিবে ভুলিতে!

পাঠকেরা বলিবেন এইবার তো হইয়াছে; এইবার তো রাবণ প্রতিহিংসাকে শোকের ঔষধি করিয়াছেন কিন্তু পাঠক হয়তো দেখেন নাই 'তেজস্বী আজি মহারুদ্র তেজে' রাবণ স্বভাবত তো এত তেজস্বী নন, তিনি মহারুদ্রতেজ পাইয়াছেন, সেইজন্য আজ উন্মত্ত। কবি বীরবাহুর শোকে রাবণকে স্ত্রীলোকের ন্যায় কাঁদাইয়াছেন, সুতরাং ভাবিলেন যে রাবণের যেরূপ স্বভাব, তিনি তাঁহার প্রিয়তম পুত্র ইন্দ্রজিতের নিধনবার্তা শুনিলে বাঁচিবেন কীরূপে? এই নিমিত্তই রুদ্রতেজাদির কল্পনা করেন। ইহাতেও রাবণ যে স্ত্রীলোক সেই স্ত্রীলোকই রহিলেন। এই নিমিত্ত ইহার পর রাবণ যে যে স্থলে তেজস্বিতা দেখাইয়াছেন তাহা তাঁহার স্বভাবগুণে নহে তাহা দেব-তেজের গুণে।

মেঘনাদবধ কাব্যে কবি যে ইচ্ছাপূর্বক রাক্ষসপতি রাবণকে ক্ষুদ্রতম মনুষ্য করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন, তাহা নয়। রাবণকে তিনি মহান চরিত্রের আদর্শ করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাকে স্ত্রীপ্রকৃতির প্রতিমা করিয়া তুলিয়াছেন; তিনি তাহাকে কঠোর হিমাদ্রিসদৃশ করিতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু 'কোমল সে ফুলসম' করিয়া গড়িয়াছেন। ইহা আমরা অনুমান করিয়া বলিতেছি না, মাইকেল আমাদের কোনো সম্ভ্রান্ত বন্ধুকে যে পত্র লিখেন তাহার নিম্নলিখিত অনুবাদটি পাঠ করিয়া দেখুন।

'এখানকার লোকেরা অসন্তোষের সহিত বলিয়া থাকে যে, মেঘনাদবধ কাব্যে কবির মনের টান রাক্ষসদিগের প্রতি! বাস্তবিক তাহাই বটে। আমি রাম এবং তাঁহার দলবলগুলাকে ঘৃণা করি, রাবণের ভাব মনে করিলে আমার কল্পনা প্রজ্বলিত ও উন্নত হইয়া উঠে। রাবণ লোকটা খুব জমকালো ছিল।'

মেঘনাদবধ কাব্যে রাবণের চরিত্র যেরূপ চিত্রিত হইয়াছে তাহাই যদি কবির কল্পনার চরম উন্নতি হইয়া থাকে তবে তিনি কাব্যের প্রারম্ভভাগে 'মধুকরী কল্পনা দেবীর' যে এত করিয়া আরাধনা করিয়াছিলেন তাহার ফল কী হইল? এইখানে আমরা রাবণকে অবসর দিলাম।

ভারতী
শ্রাবণ ১২৮৪

আমরা গতবারে যখন রাবণের চরিত্র সমালোচনা করিয়াছিলাম, তখন মনে করিলাম যে, রাবণের ক্রন্দন করা যে অস্বাভাবিক, ইহা বুঝাইতে বড়ো একটা অধিক প্রয়াস পাইতে হইবে না; কিন্তু এখন দেখিলাম বড়ো গোল বাধিয়াছে; কেহ কেহ বলিতেছেন 'রাবণ পুত্রশোকে কাঁদিয়াছে, তবেই তো তাহার বড়ো অপরাধ!' পুত্রশোকে বীরের কীরূপ অবস্থা হয়, তাঁহারা আপনা-আপনাকেই তাহার আদর্শস্বরূপ করিয়াছেন। ইঁহাদের একটু ভালো করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যক বোধ করিতেছি। পাঠকদের কেহ বা ইচ্ছা করিয়া বুঝিবেন না, তাঁহাদের সঙ্গে যোঝাযুঝি করা আমাদের কর্ম নহে, তবে যাঁহারা সত্য অপ্রিয় হইলেও গ্রহণের জন্য উন্মুখ আছেন তাঁহারা আর-একটু চিন্তা করিয়া দেখুন।

সেনাপতি সিউয়ার্ডের পুত্র যুদ্ধে হত হইলে রস্‌ আসিয়া তাঁহাকে নিধন সংবাদ দিলেন। সিউয়ার্ড জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সম্মুখভাগেই তো তিনি আহত হইয়াছিলেন?'

রস্‌।— হাঁ, সম্মুখেই আহত হইয়াছিলেন।

সিউয়ার্ড।— তবে আর কি! আমার যতগুলি কেশ আছে ততগুলি যদি পুত্র থাকিত, তবে তাহাদের জন্য ইহা অপেক্ষা উত্তম মৃত্যু প্রার্থনা করিতাম না।

ম্যাল্‌কম্‌।— তাঁহার জন্য আরও অধিক শোক করা উচিত।

সিউয়ার্ড।— না, তাঁহার জন্য আর অধিক শোক উপযুক্ত নহে। শুনিতেছি তিনি বীরের মতো মরিয়াছেন, ভালোই, তিনি তাঁহার ঋণ পরিশোধ করিয়াছেন, ঈশ্বর তাঁহার ভালো করুন।

—ম্যাক্‌বেথ

আমরা দেখিতেছি, মাইকেলের হস্তে যদি লেখনী থাকিত তবে এই স্থলে তিনি বলিতেন যে,

হা পুত্র, হা সিউয়ার্ড, বীরচূড়ামণি
কী পাপে হারানু আমি তোমা হেন ধনে!

অ্যাডিসন তাঁহার নাটকে পুত্রশোকে কেটোকে তো ক্ষুদ্র মনুষ্যের ন্যায় রোদন করান নাই!

স্পার্টার বীর-মাতারা পুত্রকে যুদ্ধে বিদায় দিবার সময় বলিতেন না, যে,

এ কাল সমরে,
নাহি চাহে প্রাণ মম পাঠাইতে
তোমা বারংবার!

তাঁহারা বলিতেন, 'হয় জয় নয় মৃত্যু তোমাকে আলিঙ্গন করুক!'

রাণা লক্ষ্মণসিংহ স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন যে, দ্বাদশ রাজপুত্র যুদ্ধে মরিলে জয়লাভ হইবে; তিনি তাঁহার দ্বাদশ পুত্রকেই যুদ্ধে মরিতে আদেশ করিয়াছিলেন। তিনি তো তখন রুদ্যমান পারিষদগণের দ্বারা বেষ্টিত হইয়া সভার মধ্যে

ঝর ঝর ঝরে
অবিরল অশ্রুধারা তিতিয়া বসনে,

কাঁদিতে বসেন নাই।

রাজস্থানের বীরদিগের সহিত, স্পার্টার বীর-মাতাদের সহিত তুলনা করিলে কল্পনা-চিত্রিত রাবণকে তো স্ত্রীলোকের অধম বলিয়া মনে হয়!

কেহ কেহ বলেন, 'অন্য কবি যাহা লিখিয়াছেন তাহাই যে মাইকেলকে লিখিতে হইবে এমন কি কিছু লেখাপড়া আছে?' আমরা তাহার উত্তর দিতে চাহি না, কেবল এই কথা বলিতে চাহি যে সকল বিষয়েই তো একটি উচ্চ আদর্শ আছে, কবির চিত্র সেই আদর্শের কত নিকটে পৌঁছিয়াছে এই দেখিয়াই তো আমাদের কাব্য আলোচনা করিতে হইবে। স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক এই দুইটি কথা লইয়া কতকগুলি পাঠক অতিশয় গণ্ডগোল করিতেছেন। তাঁহারা বলেন যাহা স্বাভাবিক তাহাই সুন্দর, তাহাই কবিতা; পুত্রশোকে রাবণকে না কাঁদাইলে অস্বাভাবিক হইত, সুতরাং কবিতার হানি হইত। দুঃখের বিষয়, তাঁহারা জানেন না যে, একজনের পক্ষে যাহা

স্বাভাবিক, আর-একজনের পক্ষে তাহাই অস্বাভাবিক। যদি ম্যাক্‌বেথের ডাকিনীরা কাহারও কষ্ট দেখিয়া মমতা প্রকাশ করিত তবে তাহাই অস্বাভাবিক হইত, যদিও সাধারণ মনুষ্যদের পক্ষে তাহা স্বাভাবিক। আমি তো বলিতেছি না যে, বীর কষ্ট পাইবেন না, দুঃখ পাইবেন না; সাধারণ লোক যতখানি দুঃখ-কষ্ট পায় বীর তেমনই পাইবেন অথবা তদপেক্ষা অধিক পাইতেও পারেন, কিন্তু তাঁহার এতখানি মনের বল থাকা আবশ্যক যে, পুরুষের মতো, বীরের মতো তাহা সহ্য করিতে পারেন; শরীরের বল লইয়াই তো বীরত্ব নহে। যে ঝড়ে বৃক্ষ ভাঙিয়া ফেলে সেই ঝড়ই হিমালয়ের শৃঙ্গে আঘাত করে, অথচ তাহা তিলমাত্র বিচলিত করিতে পারে না। কেহ কেহ বলেন 'ওইপ্রকার মত পূর্বেকার স্টোয়িকদিগেরই সাজিত, এখন উনবিংশ শতাব্দীতে ও কথা শোভা পায় না; স্টোয়িক দার্শনিক যে, অগ্নিতে হাত রাখিয়া স্থিরভাবে দহনজ্বালা সহ্য করিয়াছেন সে তাঁহাদের সময়েরই উপযুক্ত।' শিক্ষিত লোকেরা এরূপ অর্থহীন কথা যে কী করিয়া বলিতে পারেন তাহা আমরা অনেক ভাবিয়াও স্থির করিতে পারিলাম না। তাঁহারা কি বলিতে চাহেন যে, অগ্নিতে হাত রাখিয়া ক্রন্দন করাই বীরপুরুষের উপযুক্ত! তাঁহাদের যদি এরূপ মত হয় যে, উনবিংশ শতাব্দীতে এরূপ বীরত্বের প্রয়োজন নাই, তবে তাঁহাদের সহিত তর্ক করা এ প্রস্তাবে অপ্রাসঙ্গিক, কেবল তাঁহাদিগকে একটি সংবাদ দিতে ইচ্ছা করি যে, বাল্মীকির রামায়ণ পড়িয়া ও অন্যান্য নানাবিধ প্রমাণ পাইয়া আমরা তো এইরূপ ঠিক করিয়াছি যে রাবণ উনবিংশ শতাব্দীর লোক নহেন। স্টোয়িকদের ন্যায় সমস্ত মনোবৃত্তিকে নষ্ট করিয়া ফেলা যে বীরত্ব নয় তা কে অস্বীকার করিবে? যেমন বিশেষ বিশেষ রাগ-রাগিণীর বিশেষ বিশেষ বিসম্বাদী সুর আছে, সেই সেই সুর-সংযোগে সেই সেই রাগিণী নষ্ট হয় সেইরূপ এক-একটি স্বভাবের কতকগুলি বিরোধী গুণ আছে, সেই-সকল গুণ বিশেষ বিশেষ চরিত্র নষ্ট করে। বীরের পক্ষে শোকে আকুল হইয়া কাঁদিয়া গড়াগড়ি দেওয়াও সেইপ্রকার বিরোধী গুণ। যাক— এ-সকল কথা লইয়া অধিক আন্দোলন সময় নষ্ট করা মাত্র। এখন লক্ষ্মীর চরিত্র সমালোচনা করা যাউক।*

প্রথম সর্গের মধ্যভাগে লক্ষ্মী দেবীর অবতারণা করা হইয়াছে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, মেঘনাদবধে কতকগুলি চরিত্র সুচিত্রিত হয় নাই এবং কতকগুলি আমাদের মনের মতো হয় নাই। রাবণের চরিত্র যেমন আমাদের মনের মতো হয় নাই তেমনি লক্ষ্মীর চরিত্র সুচিত্রিত হয় নাই। লক্ষ্মীর চরিত্রচিত্রের দোষ এই যে, তাঁহার চরিত্র কীরূপ আমরা বলিতে পারি না। আমরা যেমন বলিতে পারি যে, মেঘনাদবধের রাবণ স্ত্রীলোকের ন্যায় কোমল-হৃদয়, অসাধারণ পুত্রবৎসল, তেমন কি লক্ষ্মীকে কিছু বিশেষণ দিতে পারি? সে বিষয় সমালোচনা করিয়াই দেখা যাউক।

মুরলা আসিয়া লক্ষ্মীকে যুদ্ধের বার্তা জিজ্ঞাসা করিলে, লক্ষ্মী কহিলেন,

—হায় লো স্বজনি!
দিন দিন হীন-বীর্য রাবণ দুর্মতি
যাদঃপতি রোধঃ যথা চলোর্মি আঘাতে!

শেষ ছত্রটিতে ভাবের অনুযায়ী কথা বসিয়াছে, ঠিক বোধ হইতেছে যেন তরঙ্গ বার বার আসিয়া তটভাগে আঘাত করিতেছে। মুরলা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ইন্দ্রজিৎ কোথায়?' লক্ষ্মীর তখন মনে পড়িল যে, ইন্দ্রজিৎ প্রমোদ উদ্যানে ভ্রমণ করিতেছেন, এবং মুরলাকে বিদায় করিয়া ইন্দ্রজিতের ধাত্রীবেশ ধরিয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন। সেখানে ইন্দ্রজিৎকে ভ্রাতার মৃত্যু সংবাদ দিয়া যুদ্ধে

---

* আমরা পূর্ব সংখ্যায় দেখাইয়াছি যে মৃত মেঘনাদের সহিত বায়ুবলচ্ছিন্ন কিংশুক ফুলের তুলনা অনুচিত হইয়াছে। কিন্তু ভাষাকে একটু মোচড়াইয়া 'কিংশুক' শব্দে কিংশুক বৃক্ষ অর্থ করিলে সে দোষ কাটিয়া যাইতে পারে। কিন্তু বাংলা ভাষায় কিংশুক বলিতে বৃক্ষ না বুঝাইয়া পুষ্পই বুঝায়, যেমন আম বলিলে ফলই বুঝায়, গোলাপ বলিলে গোলাপ ফুলই বুঝায়, ইত্যাদি।

উত্তেজিত করিয়া দিলেন। এতদূর পড়িয়া আমরা দেবীকে ভক্তবৎসলা বলিতে পারি। কিন্তু আবার পরক্ষণেই ইন্দ্রের নিকট গিয়া বলিতেছেন,

—বহুকালাবধি
আছি আমি সুরনিধি স্বর্ণ লঙ্কাধামে,
বহুবিধ রত্ন-দানে বহু যত্ন করি,
পূজে মোরে রক্ষোরাজ। হায় এত দিনে
বাম তার প্রতি বিধি! নিজ কর্ম-দোষে
মজিছে সবংশে পাপী; তবুও তাহারে
না পারি ছাড়িতে, দেব! বন্দী যে, দেবেন্দ্র,
কারাগার দ্বার নাহি খুলিলে কি কভু
পারে সে বাহির হতে? যতদিন বাঁচে
রাবণ, থাকিব আমি বাঁধা তার ঘরে।

আর-এক স্থলে— না হইলে নির্মূল সমূলে
রক্ষঃপতি, ভবতল রসাতলে যাবে!

অর্থাৎ তুমি কারাগারের দ্বার খুলিবার উপায় দেখো, রাবণকে বিনাশ করো, তাহা হইলেই আমি আস্তে আস্তে বাহির হইয়া আসিব। রাবণ পূজা করে বলিয়া মেঘনাদবধের লক্ষ্মীর তাহার প্রতি অত্যন্ত স্নেহ জন্মিয়াছে, এ নিমিত্ত সহজে তাহাকে ছাড়িয়া আসিতে পারেন না, ভাবিয়া ভাবিয়া একটি সহজ উপায় ঠাওরাইলেন, অর্থাৎ রাবণ সবংশে নিহত হইলেই তিনি মুক্তিলাভ করিবেন। আমাদের সহজ বুদ্ধিতে এইরূপ বোধ হয় যে, রাবণ যদি লক্ষ্মীর স্বভাবটা ভালো করিয়া বুঝিতেন ও ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারিতেন যে লক্ষ্মী অবশেষে এইরূপ নিমকহারামি করিবেন, তবে নিতান্ত নির্বোধ না হইলে কখনোই তাঁহাকে

বহুকালাবধি
বহুবিধ রত্নদানে বহু যত্ন করি

পূজা করিতেন না।

লক্ষ্মী ইন্দ্রকে কহিতেছেন,

মেঘনাদ নামে পুত্র, হে বৃত্রবিজয়ী,
রাবণের, বিলক্ষণ জান তুমি তারে।

ইহার মধ্যে যে একটু তীব্র উপহাস আছে; দেবী হইয়া লক্ষ্মী ইন্দ্রকে যে এরূপ সম্বোধন করেন, ইহা আমাদের কানে ভালো শুনায় না। ওই ছত্র দুটি পড়িলেই আমরা লক্ষ্মীর যে মৃদুহাস্য বিষমাখা একটি মর্মভেদী কটাক্ষ দেখিতে পাই, তাহাতে দেবভাবের মাহাত্ম্য অনেকটা হ্রাস হইয়া যায়। লক্ষ্মী ওইরূপ আর-এক স্থলে ইন্দ্রের কৈলাসে যাইবার সময় তাঁহাকে কহিয়াছিলেন,

বড়ো ভালো বিরূপাক্ষ বাসেন লক্ষ্মীরে।
কহিয়ো বৈকুণ্ঠপুরী বহুদিন ছাড়ি
আছয়ে সে লঙ্কাপুরে! কত যে বিরলে
ভাবয়ে সে অবিরল, একবার তিনি,
কী দোষ দেখিয়া, তারে না ভাবেন মনে?
কোন্‌ পিতা দুহিতারে পতিগৃহ হতে
রাখে দূরে— জিজ্ঞাসিয়ো, বিজ্ঞ জটাধরে।

এখানে 'বিজ্ঞ জটাধর' কথাটি পিতার প্রতি কন্যার প্রয়োগ অসহনীয়। ইহার পর ষষ্ঠ সর্গে আর-এক স্থলে লক্ষ্মীকে আনা হইয়াছে। এখানে মায়া আসিয়া লক্ষ্মীকে তেজ সংবরণ করিতে বলিলেন। লক্ষ্মী কহিলেন,

কার সাধ্য, বিশ্বধ্যেয়া অবহেলে তব
আজ্ঞা? কিন্তু প্রাণ মন কাঁদে গো স্মরিলে
এ-সকল কথা! হায় কত যে আদরে
পূজে মোর রক্ষঃশ্রেষ্ঠ, রানী মন্দোদরী,
কী আর কহিব তার?

ইহাতে লক্ষ্মীকে অত্যন্ত ভক্তবৎসলা বলিয়া মনে হয়, তবে যেন মায়ার আজ্ঞায় ভক্তগৃহ ছাড়িতে বাধ্য হইয়াছেন। আবার সপ্তম সর্গে তিনিই রাবণের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছেন। লক্ষ্মী যে কীরূপ দেবতা তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না এবং কখনো যে তাঁহাকে পূজা করিতে আমাদের সাহস হইবে, তাহারও কোনো সম্ভাবনা দেখিলাম না। মেঘনাদবধে দেবতা ও সাধারণ মনুষ্যের মধ্যে কিছুমাত্র বিভিন্নতা রক্ষিত হয় নাই। ইন্দ্রাদির চরিত্র সমালোচনা-কালে পাঠকেরা তাহার প্রমাণ পাইবেন।

ভারতী
ভাদ্র ১২৮৪

গত সংখ্যার সমালোচনা পড়িয়া কেহ কেহ কহিতেছেন, পুরাণে লক্ষ্মী চপলা বলিয়াই বর্ণিত আছেন। কবি যদি পুরাণেরই অনুসরণ করিয়া থাকেন তাহাতে হানি কী হইয়াছে? তাঁহাদের সহিত একবাক্য হইয়া আমরাও স্বীকার করি যে, লক্ষ্মী পুরাণে চপলারূপেই বর্ণিত হইয়াছেন; কিন্তু চপলা অর্থে কী বুঝায়? আজ আছেন, কাল নাই। পুরাণ লক্ষ্মীকে চপলা অর্থে পুরা এরূপ মনে করেন নাই, যে আমারই পূজা গ্রহণ করিবেন অথচ আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিবেন। এ লুকোচুরি, কেবল দেবতা নহে মানব চরিত্রের পক্ষেও কতখানি অসম্মানজনক তাহা কি পাঠকেরা বুঝিতে পারিতেছেন না? কপটতা ও চপলতা দুইটি কথার মধ্যে যে অর্থগত প্রভেদ আছে ইহা বোধ হয় আমাদের নূতন করিয়া বুঝাইতে হইবে না। মেঘনাদবধের লক্ষ্মীর চরিত্র-মধ্যে দুইটি দোষ আছে, প্রথম কপটতা, দ্বিতীয় পরস্পরবিরোধী ভাব। গুপ্তভাবে রাবণের শত্রুতাসাধন করাতে কপটতা এবং কখনো ভক্তবৎসলা দেখানো ও কখনো তাহার বিপরীতাচারণ করাতে পরস্পরবিরোধী ভাব প্রকাশ পাইতেছে। পাঠকেরা কেহ যদি লক্ষ্মীর পূর্বোক্তরূপ হীনচরিত্র পুরাণ হইতে বাহির করিতে পারেন তবে আমরা আমাদের ভ্রম স্বীকার করিব। কিন্তু যদিও বা পুরাণে ওইরূপ থাকে তথাপি কি রুচিবান কবির নিকট হইতে তাহা অপেক্ষা পরিমার্জিত চিত্র আশা করি না?

প্রথম সর্গে যখন ইন্দিরা ইন্দ্রজিৎকে তাঁহার ভ্রাতার নিধন সংবাদ শুনাইলেন তখন

ছিঁড়িলা কুসুমদাম রোষে মহাবলী
মেঘনাদ, ফেলাইলা কনক বলয়
দূরে, পদতলে পড়ি শোভিলা কুণ্ডল
যথা অশোকের ফুল অশোকের তলে
আভাময়! 'ধিক্ মোরে' কহিলা গম্ভীরে
কুমার, 'হা ধিক্ মোরে!' বৈরিদল বেড়ে
স্বর্ণলঙ্কা, হেথা আমি বামাদল মাঝে?
এই কি সাজে আমারে, দশাননাত্মজ
আমি ইন্দ্রজিৎ; আন রথ ত্বরা করি;
ঘুচাব এ অপবাদ বধি রিপুদলে।

ইন্দ্রজিতের তেজস্বিতা উত্তম বর্ণিত হইয়াছে। রাবণ যখন ইন্দ্রজিৎকে রণে পাঠাইতে কাতর হইতেছেন তখন

উত্তরিলা বীরদর্পে অসুরারি রিপু;
কি ছার সে নর, তারে ডরাও আপনি,
রাজেন্দ্র? থাকিতে দাস, যদি যাও রণে
তুমি, এ কলঙ্ক, পিতঃ, ঘুষিবে জগতে।
হাসিবে মেঘ বাহন, রুষিবেন দেব অগ্নি।

ইহাতেও ইন্দ্রজিতের তেজ প্রকাশিত হইতেছে, এইরূপে কবি ইন্দ্রজিতের বর্ণনা যেরূপ আরম্ভ করিয়াছেন, তাহা ভালো লাগিল।

সাজিলা রথীন্দ্রর্ষভ বীর আভরণে,

* * *

মেঘবর্ণ রথ, চক্র বিজলীর ছটা;
ধ্বজ ইন্দ্র চাপরূপী; তুরঙ্গম বেগে
আশুগতি।

পূর্বে কবি রোদনের সহিত ঝড়ের যেরূপ অদ্ভুত তুলনা ঘটাইয়াছিলেন এখানে সেইরূপ রথের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সহিত মেঘবিদ্যুৎ ইন্দ্রধনু বায়ুর তুলনা করিয়াছেন, কাব্যের মধ্যে এরূপ তুলনার অভাব নাই কিন্তু একটিও আমাদের ভালো লাগে না। বর্ণনীয় বিষয়কে অধিকতর পরিস্ফুট করাই তো তুলনার উদ্দেশ্য কিন্তু এই মেঘ বিজলী ইন্দ্রচাপে আমাদের রথের যে কী বিশেষ ভাবোদয় হইল বলিতে পারি না। মেঘনাদবধের অধিকাংশ রচনাই কৌশলময়, কিন্তু কবিতা যতই সরল হয় ততই উৎকৃষ্ট। রামায়ণ হোমার প্রভৃতি মহাকাব্যের অন্যান্য গুণের সহিত সমালোচকেরা তাহাদিগের সরলতারও ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন।

মানস সকাশে শোভে কৈলাশ-শিখরী
আভাময়, তার শিরে ভবের ভবন,
শিখি-পুচ্ছ চূড়া যেন মাধবের শিরে!
সুশ্যামাঙ্গ শৃঙ্গধর, স্বর্ণফুল শ্রেণী
শোভে তাহে, আহা মরি পীতধরা যেন!
নির্ঝর-ঝরিত বারিরাশি স্থানে স্থানে—
বিশদ চন্দনে যেন চর্চিত সে বপুঃ!

যে কৈলাস-শিখরী চূড়ায় বসিয়া মহাদেব ধ্যান করিতেছেন কোথায় তাহা উচ্চ হইতেও উচ্চ হইবে, কোথায় তাহার বর্ণনা শুনিলে আমাদের গাত্র রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিবে, নেত্র বিস্ফারিত হইবে, না 'শিখি-পুচ্ছ চূড়া যথা মাধবের শিরে।' মাইকেল ভালো এক মাধব শিখিয়াছেন, এক শিখিপুচ্ছ, পীতধরা, বংশীধ্বনি আর রাধাকৃষ্ণ কাব্যময় ছড়াইয়াছেন। কৈলাস-শিখরের ইহা অপেক্ষা আর নীচ বর্ণনা হইতে পারে না। কোনো কবি ইহা অপেক্ষা কৈলাস-শিখরের নীচ বর্ণনা করিতে পারেন না।

শরদিন্দু পুত্র, বধূ শারদ কৌমুদী;
তারা কিরীটিনী নিশি সদৃশী আপনি
রাক্ষস-কুল-ঈশ্বরী! অশ্রুবারিধারা
শিশির, কপোল পর্ণে পড়িয়া শোভিল।

এই-সকল টানিয়া বুনিয়া বর্ণনা আমাদের কর্ণে অসম-ভূমি-পথে বাধা-প্রাপ্ত রথচক্রের ঘর্ঘর শব্দের ন্যায় কর্কশ লাগে।

গজরাজ তেজঃ ভুজে; অশ্বগতি পদে;
স্বর্ণরথ শিরঃ চূড়া; অঞ্চল পতাকা
রত্নময়; ভেরী, তূরী, দুন্দুভি, দামামা
আদি বাক্য সিংহনাদ! শেল, শক্তি, জাটি,
তোমর, ভোমর, শূল, মুষল, মুদগর,
পট্টিশ, নারাচ, কৌন্ত— শোভে দন্তরূপে!
জনমিলা নয়নাগ্নি সাঁজোয়ার তেজে।

পাঠকেরা বলুন দেখি এরূপ বর্ণনা সময়ে সময়ে হাস্যজনক হইয়া পড়ে কি না।

যখন মেঘনাদ রথে উঠিতেছেন তখন প্রমীলা আসিয়া কাঁদিয়া কহিলেন,

কোথায় প্রাণ সখে,
রাখি এ দাসীরে, কহো, চলিলা আপনি?
কেমনে ধরিবে প্রাণ তোমার বিরহে
এ অভাগী? হায়, নাথ, গহন কাননে,
ব্রততী বাঁধিলে সাধে করি-পদ, যদি
তার রঙ্গরসে মনঃ না দিয়া মাতঙ্গ
যায় চলি, তবু তারে রাখে পদাশ্রমে
যূথনাথ। তবে কেন তুমি, গুণনিধি
ত্যজ কিঙ্করীরে আজি?

হৃদয় হইতে যে ভাব সহজে উৎসারিত উৎস-ধারার ন্যায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে তাহার মধ্যে কৃত্রিমতা বাক্য-কৌশল প্রভৃতি থাকে না। প্রমীলার এই 'রঙ্গরসের' কথার মধ্যে গুণপনা আছে, বাক্যচাতুরীও আছে বটে, কিন্তু হৃদয়ের উচ্ছ্বাস নাই।

ইহার সহিত একটি স্বভাব-কবি-রচিত সহজ হৃদয়ভাবের কবিতার তুলনা করিয়া দেখো, যখন অক্রূর কৃষ্ণকে রথে লইতেছেন, তখন রাধা বলিতেছেন,

রাধারে চরণে ত্যজিলে রাধানাথ,
কী দোষ রাধার পাইলে?
শ্যাম, ভেবে দেখো মনে, তোমারি কারণে
ব্রজাঙ্গনাগণে উদাসী।
নহি অন্য ভাব, শুন হে মাধব
তোমারি প্রেমের প্রয়াসী।
ঘোরতর নিশি, যথা বাজে বাঁশি,
তথা আসি গোপী সকলে,
দিয়ে বিসর্জন কুল শীলে।
এতেই হলাম দোষী, তাই তোমায় জিজ্ঞাসি
এই দোষে কি হে ত্যজিলে?
শ্যাম, যাও মধুপুরী, নিষেধ না করি
থাকো হরি যথা সুখ পাও।
একবার, সহাস্য বদনে বঙ্কিম নয়নে
ব্রজগোপীর পানে ফিরে চাও।
জনমের মতো, শ্রীচরণ দুটি,
হেরি হে নয়নে শ্রীহরি,
আর হেরিব আশা না করি।

হৃদয়ের ধন তুমি গোপিকার
হৃদে বজ্র হানি চলিলে?
—হরু ঠাকুর

ইহার মধ্যে বাক্‌চাতুরী নাই, কৃত্রিমতা নাই, ভাবিয়া চিন্তিয়া গড়িয়া পিটিয়া ঘর হইতে রাধা উপমা ভাবিয়া আইসেন নাই, সরল হৃদয়ের কথা নয়নের অশ্রুজলের ন্যায় এমন সহজে বাহির হইতেছে যে; কৃষ্ণকে তাহার অর্থ বুঝিতে কষ্ট পাইতে হয় নাই, আর মাতঙ্গ, ব্রততী, পদাশ্রম, রঙ্গরস প্রভৃতি কথা ও উপমার জড়ামড়িতে প্রমীলা হয়তো ক্ষণেকের জন্য ইন্দ্রজিৎকে ভাবাইয়া তুলিয়াছিলেন।

ইন্দ্রজিতের উত্তর সেইরূপ কৃত্রিমতাময়, কৌশলময়, ঠিক যেন প্রমীলা খুব এক কথা বলিয়া লইয়াছেন, তাহার তো একটা উপযুক্ত উত্তর দিতে হইবে, এইজন্য কহিতেছেন,

ইন্দ্রজিতে জিতি তুমি, সতি,
বেঁধেছ যে দৃঢ় বাঁধে, কে পারে খুলিতে
সে বাঁধে ইত্যাদি

সমস্ত মেঘনাদবধ কাব্যে হৃদয়ের উচ্ছ্বাসময় কথা অতি অল্পই আছে, প্রায় সকলগুলিই কৌশলময়। তৃতীয় সর্গে যখন প্রমীলা রামচন্দ্রের ফটক ভেদ করিয়া ইন্দ্রজিতের নিকট আইলেন তখন ইন্দ্রজিৎ কহিলেন,

রক্তবীজে বধি তুমি এবে বিধুমুখী,
আইলা কৈলাস ধামে ইত্যাদি

প্রমীলা কহিলেন,

ও পদ-প্রাসাদে, নাথ, ভববিজয়িনী
দাসী, কিন্তু মনমথে না পারি জিনিতে।
অবহেলি, শরানলে, বিরহ অনলে
(দুরূহ) ডরাই সদা; ইত্যাদি

যেন স্ত্রী-পুরুষে ছড়া-কাটাকাটি চলিতেছে। পঞ্চম সর্গের শেষভাগে পুনরায় ইন্দ্রজিতের অবতারণা করা হইয়াছে।

কুসুমশয়নে যথা সুবর্ণ মন্দিরে,
বিরাজে রাজেন্দ্র বলী ইন্দ্রজিৎ, তথা
পশিল কূজন ধ্বনি সে সুখ সদনে।
জাগিলা বীর কুঞ্জর কুঞ্জবন গীতে।
প্রমীলার করপদ্ম করপদ্মে ধরি
রথীন্দ্র, মধুর স্বরে, হায় রে, যেমতি
নলিনীর কানে অলি কহে গুঞ্জরিয়া
প্রেমের রহস্য কথা, কহিলা (আদরে
চুম্বি নিমীলিত আঁখি) ডাকিছে কূজনে,
হৈমবতী উষা তুমি, রূপসি, তোমারে
পাখিকুল! মিল প্রিয়ে, কমললোচন।
উঠ, চিরানন্দ মোর, সূর্যকান্ত মণি-
সম এ পরান কান্তা, তুমি রবিচ্ছবি;—
তেজোহীন আমি তুমি মুদিলে নয়ন।
ভাগ্যবৃক্ষে ফলোত্তম তুমি হে জগতে
আমার! নয়নতারা! মহার্ঘরতন।

উঠি দেখো শশিমুখি, কেমনে ফুটিছে,
চুরি করি কান্তি তব মঞ্জুকুঞ্জবনে
কুসুম। ইত্যাদি।

এই দৃশ্যে মেঘনাদের কোমলতা সুন্দর বর্ণিত হইয়াছে। প্রমীলার নিকট হইতে ইন্দ্রজিতের বিদায়টি সুন্দর হইয়াছে, তাহার মধ্যে বাক্‌চাতুরী কিছুমাত্র নাই। কিন্তু আবার একটি 'যথা' আসিয়াছে—

যথা যবে কুসুমেষু ইন্দ্রের আদেশে
রতিরে ছাড়িয়া শূর, চলিলা কুক্ষণে
ভাঙিতে শিবের ধ্যান; হায় রে, তেমতি
চলিলা কন্দর্পরূপী ইন্দ্রজিৎ বলী,
ছাড়িয়া রতি-প্রতিমা প্রমীলা সতীরে।
কুলগ্নে করিলা যাত্রা মদন; কুলগ্নে
করি যাত্রা গেলা চলি মেঘনাদ বলী—
বিলাপিলা যথা রতি প্রমীলা যুবতী। ইত্যাদি

বলপূর্বক ইন্দ্রজিৎকে মদন ও প্রমীলাকে রতি করিতেই হইবে। রতির ন্যায় প্রমীলাকে ছাড়িয়া মদনের ন্যায় ইন্দ্রজিৎ চলিলেন, মদন কুলগ্নে যাত্রা করিয়াছিলেন, ইন্দ্রজিৎও তাহাই করিলেন। তখন মদন ও ইন্দ্রজিৎ একই মিলিয়া গেল, আর রতিও কাঁদিয়াছিলেন, রতিরূপিণী প্রমীলাও কাঁদিলেন, তবে তো রতি আর প্রমীলার কিছুমাত্র ভিন্নতা রহিল না।

আবার আর-একটি কৃত্রিমতাময় রোদন আসিয়াছে, যখন ইন্দ্রজিৎ গজেন্দ্রগমনে যুদ্ধে যাইতেছেন তখন প্রমীলা তাঁহাকে দেখিতেছেন আর কহিতেছেন—

জানি আমি কেন তুই গহন কাননে
ভ্রমিস্‌ রে গজরাজ! দেখিয়া ও গতি—
কী লজ্জায় আর তুই মুখ দেখাইবি,
অভিমানী? সরু মাজা তোর রে কে বলে,
রাক্ষস-কুল-হর্য্যক্ষে হেরে যার আঁখি,
কেশরি? তুইও তেঁই সদা বনবাসী।
নাশিস্‌ বারণে তুই, এ বীর-কেশরী
ভীম প্রহরণে রণে বিমুখে বাসরে, ইত্যাদি

এই কি হৃদয়ের ভাষা? হৃদয়ের অশ্রুজল? হেমবাবু কহিয়াছেন 'বিদ্যাসুন্দর এবং অন্নদামঙ্গল ভারতচন্দ্র-রচিত সর্বোৎকৃষ্ট কাব্য, কিন্তু যাহাতে অন্তর্দাহ হয়, হৃৎকম্প হয়, তাদৃশ ভাব তাহাতে কই?' সত্য, ভারতচন্দ্রের ভাষা কৌশলময়, ভাবময় নহে, কিন্তু 'জানি আমি কেন তুই' ইত্যাদি পড়িয়া আমরা ভারতচন্দ্রকে মাইকেলের নিমিত্ত সিংহাসনচ্যুত করিতে পারি না। তাহার পরে প্রমীলা যে ভগবতীর কাছে প্রার্থনা করিয়াছেন তাহা সুন্দর হইয়াছে। ইন্দ্রজিতের মৃত্যুবর্ণনা, লক্ষ্মণের চরিত্র-সমালোচনাস্থলে আলোচিত হইবে।

মেঘনাদবধ কাব্যের মধ্যে এই ইন্দ্রজিতের চরিত্রই সর্বাপেক্ষা সুচিত্রিত হইয়াছে। তাহাতে একাধারে কোমলতা বীরত্ব উভয় মিশ্রিত হইয়াছে।

ইন্দ্রজিতের যুদ্ধযাত্রার সময় আমরা প্রথমে প্রমীলার দেখা পাই, কিন্তু তখন আমরা তাঁহাকে চিনিতে পারি নাই, তৃতীয় সর্গে আমরা প্রমীলার সহিত বিশেষরূপে পরিচিত হই। প্রমীলা পতিবিরহে রোদন করিতেছেন।

উতরিলা নিশাদেবী প্রমোদ উদ্যানে।
শিহরি প্রমীলা সতী, মৃদু কলস্বরে,

বাসন্তী নামেতে সখি বসন্ত সৌরভা,
তার গলা ধরি কাঁদি কহিতে লাগিলা;
'ওই দেখো আইল লো তিমির যামিনী,
কাল ভুজঙ্গিনীরূপে দংশিতে আমারে,
বাসন্তি! কোথায় সখি, রক্ষঃ কুলপতি,
অরিন্দম ইন্দ্রজিৎ, এ বিপত্তি কালে?' ইত্যাদি।

পূর্বে কি বলি নাই মেঘনাদবধে হৃদয়ের কবিতা নাই, ইহার বর্ণনা সুন্দর হইতে পারে, ইহার দুই-একটি ভাব নূতন হইতে পারে, কিন্তু কবিতার মধ্যে হৃদয়ের উচ্ছ্বাস অতি অল্প। আমরা অনেক সময়ে অনেক প্রকার ভাব অনুভব করি, কিন্তু তাহার ক্রমানুযায়ী শৃঙ্খলা খুঁজিয়া পাই না, অনুভব করি অথচ কেন হইল কী হইল কিছুই ভাবিয়া পাই না, কবির অণুবীক্ষণী কল্পনা তাহা আবিষ্কার করিয়া আমাদের দেখাইয়া দেয়। হৃদয়ের প্রত্যেক তরঙ্গ প্রতি-তরঙ্গ যাঁহার কল্পনার নেত্র এড়াইতে পারে না তাঁহাকেই কবি বলি। তাঁহার রচিত হৃদয়ের গীতি আমাদের হৃদয়ে চিরপরিচিত সঙ্গীর ন্যায় প্রবেশ করে। প্রমীলার বিরহ উচ্ছ্বাস আমাদের হৃদয়ের দুয়ারে তেমন আঘাত করে না তো, কালভুজঙ্গিনী-স্বরূপ তিমিরযামিনীর কাল, চন্দ্রমার অগ্নি-কিরণও মলয়ের বিষজ্বালাময় কবিতার সহিত অস্তমিত হইয়াছে।

প্রমীলা বাসন্তীকে কহিলেন—

চলো, সখি, লঙ্কাপুরে যাই মোরা সবে।

বাসন্তী কহিল—

কেমনে পশিবে
লঙ্কাপুরে আজি তুমি? অলঙ্ঘ্য সাগর-
সম রাঘবীয় চমূ বেড়িছে তাহায়?
রুষিলা দানববালা প্রমীলা রূপসী!
কী কহিলি, বাসন্তি? পর্বতগৃহ ছাড়ি
বাহিরায় যবে নদী সিন্ধুর উদ্দেশে,
কার হেন সাধ্য যে সে রোধে তার গতি?
দানবনন্দিনী আমি, রক্ষঃ কুলবধূ,
রাবণ শ্বশুর মম, মেঘনাদ স্বামী—
আমি কি ডরাই, সখি, ভিখারী রাঘবে?
পশিব লঙ্কায় আজি নিজ ভুজবলে,
দেখিব কেমনে মোরে নিবারে নৃমণি?

এখানটি অতি সুন্দর হইয়াছে, তেজস্বিনী প্রমীলা আমাদের চক্ষে অনলের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছেন।

তৎপরে প্রমীলার যুদ্ধযাত্রার উপকরণ সজ্জিত হইল। মেঘনাদবধের যুদ্ধসজ্জা বর্ণনা, সকলগুলিই প্রায় একই প্রকার। বর্ণনাগুলিতে বাক্যের ঘনঘটা আছে, কিন্তু 'বিদ্যুচ্ছটাকৃতি বিশ্বোজ্জ্বল' ভাবচ্ছটা কই? সকলগুলিতেই 'মন্দুরায় হ্রেষে অশ্ব' 'নাদে গজ বারী মাঝে' 'কাঞ্চন কঞ্চুক বিভা' ভিন্ন আর কিছুই নাই।

চড়িল ঘোড়া একশত চেড়ি
...
...হ্রেষিল অশ্ব মগন হরষে
দানব দলনী পদ্ম পদযুগ ধরি
বক্ষে, বিরূপাক্ষ সুখে নাদেন যেমতি!

শেষ দুই পঙ্‌ক্তিটি আমাদের বড়ো ভালো লাগিল না; এক তো কালিকার পদযুগ বক্ষে ধরিয়া বিরূপাক্ষ নাদেন এ কথা কোনো শাস্ত্রে পড়ি নাই। দ্বিতীয়ত, কালিকার পদযুগ বক্ষে ধরিয়া মহাদেব চিৎকার করিতে থাকেন এ ভাবটি অতিশয় হাস্যজনক। তৃতীয়ত 'নাদেন' শব্দটি আমাদের কানে ভালো লাগে না। প্রমীলা সখীবৃন্দকে সম্ভাষণ করিয়া বলিতেছেন—

লঙ্কাপুরে, শুন লো দানবী
অরিন্দম ইন্দ্রজিৎ বন্দীসম এবে।
কেন যে দাসীরে ভুলি বিলম্বেন তথা
প্রাণনাথ, কিছু আমি না পারি বুঝিতে?
যাইব তাঁহার পাশে, পশিব নগরে
বিকট কটক কাটি, জিনি ভুজবলে
রঘুশ্রেষ্ঠে;— এ প্রতিজ্ঞা, বীরাঙ্গনা, মম,
নতুবা মরিব রণে— যা থাকে কপালে!
দানব-কুল-সম্ভবা আমরা, দানবী;—
দানব কুলের বিধি বধিতে সমরে,
দ্বিষৎ শোণিত-নদে নতুবা ডুবিতে!
অধরে ধরিলা মধু গরল লোচনে
আমরা, নাহি কি বল এ ভুজ-মৃণালে?
চলো সবে রাঘবের হেরি বীর-পনা।
দেখিবে যে রূপ দেখি শূর্পণখা পিসি
মাতিল মদন মদে পঞ্চবটী বনে; ইত্যাদি

প্রমীলা লঙ্কায় যাউন-না কেন, বিকট কটক কাটিয়া রঘুশ্রেষ্ঠকে পরাজিত করুন-না কেন, তাহাতে তো আমাদের কোনো আপত্তি নাই, কিন্তু শূর্পণখা পিসির মদনদেবের কথা, নয়নের গরল, অধরের মধু লইয়া সখীদের সহিত ইয়ার্‌কি দেওয়াটা কেন? যখন কবি বলিয়াছেন—

কী কহিলে বাসন্তি? পর্বতগৃহ ছাড়ি
বাহিরায় যবে নদী সিন্ধুর উদ্দেশে,
কার হেন সাধ্য যে সে রোধে তার গতি?

যখন কবি বলিয়াছেন— 'রোষে লাজ ভয় ত্যজি, সাজে তেজস্বিনী প্রমীলা।' তখন আমরা যে প্রমীলার জ্বলন্ত অনলের ন্যায় তেজোময় গর্বিত উগ্র মূর্তি দেখিয়াছিলাম, এই হাস্য-পরিহাসের স্রোতে তাহা আমাদের মন হইতে অপসৃত হইয়া যায়। প্রমীলা এই যে চোক ঠারিয়া মুচকি হাসিয়া ঢল ঢল ভাবে রসিকতা করিতেছেন, আমাদের চক্ষে ইহা কোনোমতে ভালো লাগে না!

একেবারে শত শঙ্খ ধরি
ধ্বনিলা, টঙ্কারি রোষে শত ভীম ধনু
স্ত্রীবৃন্দ, কাঁপিল লঙ্কা আতঙ্কে, কাঁপিল
মাতঙ্গে নিষাদী, রথে রথী তুরঙ্গমে
সাদীবর; সিংহাসনে রাজা; অবরোধে
কুলবধূ; বিহঙ্গম কাঁপিল কুলায়ে;
পর্বত গহ্বরে সিংহ; বনহস্তী বনে;
ডুবিল অতল জলে জলচর যত।

সুন্দর হইয়াছে। পশ্চিম দুয়ারে যাইতেই হনু গর্জিয়া উঠিল। অমনি 'নৃমুণ্ড মালিনী সখি (উগ্রচণ্ডাধনী)' রোষে হুংকারিয়া সীতানাথকে সংবাদ দিতে কহিলেন। হনুমান অগ্রসর হইয়া সভয়ে প্রমীলাকে দেখিল, এবং মনে মনে কহিল—

অলঙ্ঘ্য সাগর লঙ্ঘি, উতরিনু যবে
লঙ্কাপুরে, ভয়ংকরী হেরিনু ভীমারে,
প্রচণ্ডা খর্পর খণ্ডা হাতে মুণ্ডমালী।
দানব নন্দিনী যত মন্দোদরী আদি
রাবণের প্রণয়িনী, দেখিনু তা সবে।
রক্ষঃ-কুল-বালা-দলে, রক্ষঃকুল-বধূ
(শশিকলা সমরূপে) ঘোর নিশাকালে,
দেখিনু সকলে একা ফিরি ঘরে ঘরে।
দেখিনু অশোক বনে (হায় শোকাকুলা)
রঘুকুল কমলেরে,— কিন্তু নাহি হেরি
এ হেন রূপ-মাধুরী কভু এ ভুবনে।

ভয়ংকরী ভীমা প্রচণ্ড খর্পর খণ্ডা হাতে মুণ্ডমালী এবং রক্ষঃকুলবালাদল শশিকলাসমরূপে, অশোক বনে শোকাকুল রঘুকুলকমল, পাশাপাশি বসিতে পারে না। কবির যদি প্রমীলাকে ভয়ংকরী করিবার অভিপ্রায় ছিল, তবে শশিকলাসম রূপবতী রক্ষঃকুলবালা এবং রঘুকুলকমলকে ত্যাগ করিলেই ভালো হইত। কিংবা যদি তাঁহাকে রূপমাধুরী-সম্পন্না করিবার ইচ্ছা ছিল তবে খর্পর খণ্ডা হস্তে মুণ্ডমালীকে পরিত্যাগ করাই উচিত ছিল।

প্রমীলা রামের নিকট নৃমুণ্ডমালিনী-আকৃতি নৃমুণ্ডমালিনীকে দূতী স্বরূপে প্রেরণ করিলেন,

চমকিলা বীরবৃন্দ হেরিয়া বামারে,
চমকে গৃহস্থ যথা ঘোর নিশাকালে
হেরি অগ্নিশিখা ঘরে! হাসিলা ভামিনী
মনে মনে। এক দৃষ্টে চাহে বীর যত
দড়ে রড়ে জড় সবে হয়ে স্থানে স্থানে।
বাজিল নূপুর পায়ে কাঞ্চি কটিদেশে।
ভীমাকার শূল করে, চলে নিতম্বিনী
জরজরি সর্ব জনে কটাক্ষের শরে
তীক্ষ্ণতর।

আমরা ভয়ে জড়সড় হইব, না কটাক্ষে জর-জর হইব এই এক সমস্যায় পড়িলাম।

নব মাতঙ্গিনী গতি চলিলা রঙ্গিণী,
আলো করি দশদিশ, কৌমুদী যেমতি,
কুমুদিনী সখী, ঝরেন বিমল সলিলে,
কিংবা উষা অংশুময়ী গিরিশৃঙ্গ মাঝে।

নৃমুণ্ডমালিনী আকৃতি উগ্রচণ্ডাধনীও বিমল কৌমুদী ও অংশুময়ী উষা হইয়া দাঁড়াইল! এবং এই অংশুময়ী উষা ও বিমল কৌমুদীকেই দেখিয়া প্রফুল্ল না হইয়া রামের বীর সকল দড়ে রড়ে জড়োসড়ো হইয়া গিয়াছিল।

হেন কালে হনু সহ উত্তরিলা দূতী
শিবিরে। প্রণমি বামা কৃতাঞ্জলি পুটে,
(ছত্রিশ রাগিণী যেন মিলি এক তানে)
কহিলা—

উগ্রচণ্ডাধনী কথা কহিলে ছত্রিশ রাগিণী বাজে, মন্দ নহে!

উত্তরিলা ভীমা-রূপী; বীর শ্রেষ্ঠ তুমি,

রক্ষোবধূ মাগে রণ, দেহো রণ তারে,
বীরেন্দ্র। রমণী শত মোরা যাহে চাহ,
যুঝিবে সে একাকিনী। ধনুর্বাণ ধরো,
ইচ্ছা যদি, নরবর, নহে চর্ম অসি,
কিংবা গদা, মল্লযুদ্ধে সদা মোরা রত।

এখানে মল্লযুদ্ধের প্রস্তাবটা আমাদের ভালো লাগিল না। রাম যুদ্ধ করিতে অস্বীকার করিলে প্রমীলা লঙ্কায় গিয়া ইন্দ্রজিতের সহিত মিলিত হইলেন ও তৃতীয় সর্গ শেষ হইল। এখন আর-একটি কথা আসিতেছে, মহাকাব্যে যে-সকল উপাখ্যান লিখিত হইবে, মূল আখ্যানের ন্যায় তাহার প্রাধান্য দেওয়া উচিত নহে এবং উপাখ্যানগুলি মূল আখ্যানের সহিত অসংলগ্ন না হয়। একটি সমগ্র সর্গ লইয়া প্রমীলার প্রমোদ উদ্যান হইতে নগর প্রবেশ করার বর্ণনা লিখিত হইয়াছে তাহার অর্থ কী? এই উপাখ্যানের সহিত মূল আখ্যানের কোনো সম্পর্ক নাই, অথচ একখানা শরতের মেঘের মতো যে অমনি ভাসিয়া গেল তাহার তাৎপর্য কী? এক সর্গ ব্যাপিয়া এমন আড়ম্বর করা হইয়াছে যে আমাদের মনে হইয়াছিল যে প্রমীলা না জানি কী একটা কারখানা বাধাইবেন, অনেক হাঙ্গাম হইল।

কাঁপিল লঙ্কা আতঙ্কে, কাঁপিল
মাতঙ্গে নিষাদী, রথে রথী, তুরঙ্গমে
সাদীবর; সিংহাসনে রাজা; অবরোধে
কুলবধূ; বিহঙ্গম কাঁপিল কুলায়ে
পর্বত গহ্বরে সিংহ; বনহস্তী বনে;

নৃমুণ্ডমালিনী সখী (উগ্রচণ্ডাধনী) আইলেন, বীর সকল দড়ে রড়ে জড় হইয়া গেল। কোদণ্ড টংকার, ঘোড়া দড়বড়ি, অসির ঝন্‌ঝনি, ক্ষিতি টলমলি ইত্যাদি অনেক গোলযোগের পর হইল কী? না প্রমীলা প্রমোদ উদ্যান হইতে নগরে প্রবেশ করিলেন, একটা সমগ্র সর্গ ফুরাইয়া গেল, সে রাত্রে আবার ভয়ে রামের ঘুম হইল না। আচ্ছা, পাঠক বলুন দেখি আমাদের স্বভাবত মনে হয় কিনা, যে, ইন্দ্রজিতের সহিত সাক্ষাৎ ব্যতীতও আরও কিছু প্রধান ঘটনা ঘটিবে। ইন্দ্রজিৎবধ নামক ঘটনার সহিত উপরি-উক্ত উপাখ্যানের কোনো সম্পর্ক নাই, অথচ মধ্য হইতে একটা বিষম গণ্ডগোল বাধিয়া গেল।

ভারতী
আশ্বিন ১২৮৪

লক্ষ্মী ইন্দ্রকে আসিয়া সংবাদ দিলেন যে, ইন্দ্রজিৎ নিকুম্ভিলা যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছেন।

কহিলেন স্বরীশ্বর, 'এ ঘোর বিপদে
বিশ্বনাথ বিনা, মাতঃ কে আর রাখিবে
রাঘবে? দুর্বার রণে রাবণ-নন্দন।
পন্নগ-অশনে নাগ নাহি ডরে যত,
ততোধিক ডরি তারে আমি।'

ইন্দ্র ইন্দ্রজিতের নিকট শতবার পরাজিত হইতে পারেন, কিন্তু তথাপি

পন্নগ-অশনে নাগ নাহি ডরে যত,
ততোধিক ডরি তারে আমি।

এ কথা তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইতে পারে না। ইন্দ্রজিৎকে বাড়াইবার জন্য ইন্দ্রকে নত করা

অন্যায় হইয়াছে; প্রতি-নায়ককে নত করিলেই যে নায়ককে উন্নত করা হয়, তাহা নহে; হিমালয়কে ভূমি অপেক্ষা উচ্চ বলিলে হিমালয়ের উচ্চত্ব প্রতিভাত হয় না, সকল পর্বত হইতে হিমালয়কে উচ্চ বলিলেই তাহাকে যথার্থ উন্নত বলিয়া বোধ হয়। একবার, দুইবার, তিনবার পরাজিত হইলে কাহার মন দমিয়া যায়? পৃথিবী বীরের। সহস্রবার অকৃতকার্য হইলেও কাহার উদ্যম টলে না? স্বর্গের দেবতার। ইন্দ্র ইন্দ্রজিতের অপেক্ষা দুর্বল হইতে পারেন, কিন্তু ভীরু কেন হইবেন? চিত্রের প্রারম্ভ ভাগেই কবি যে ইন্দ্রকে কাপুরুষ করিয়া আঁকিয়াছেন, তাহা বড়ো সুকবি-সংগত হয় নাই।

ইন্দ্র শচীর সহিত কৈলাস-শিখরে দুর্গার নিকটে গমন করিলেন এবং রাঘবকে রক্ষা করিতে অনুরোধ করিলেন। এক বিষয়ে আমরা ইন্দ্রের প্রতি বড়ো অসন্তুষ্ট হইলাম, পাঠকের মনে আছে যে, ইন্দ্রের কৈলাসে আসিবার সময় লক্ষ্মী প্রায় মাথার দিব্য দিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন যে,

বড়ো ভালো বিরূপাক্ষ বাসেন লক্ষ্মীরে।
কহিয়ো, বৈকুণ্ঠপুরী বহুদিন ছাড়ি
আছয়ে সে লঙ্কাপুরে! কত যে বিরলে
ভাবয়ে সে অবিরল; একবার তিনি,
কী দোষ দেখিয়া তারে না ভাবেন মনে?
কোন্ পিতা দুহিতারে পতিগৃহ হতে
রাখে দূরে জিজ্ঞাসিয়ো বিজ্ঞ জটাধরে!

পাছে শিবের সহিত দেখা না হয় ও তিনি শিবের বিজ্ঞত্বের উপর যে ভয়ানক কলঙ্ক আরোপ করিয়াছেন তাহা অনর্থক নষ্ট হয়, এই নিমিত্ত তিনি বিশেষ করিয়া বলিয়াছিলেন যে—

ত্র্যম্বকে না পাও যদি, অম্বিকার পদে
কহিয়ো এ-সব কথা।

লক্ষ্মীর এমন সাধের অনুরোধটি ইন্দ্র পালন করেন নাই।

মহাদেবের পরামর্শ মতে ইন্দ্র মায়াদেবীর মন্দিরে উপস্থিত হইলেন।

সৌর-খরতর-করজাল-সংকলিত—
আভাময় স্বর্ণাসনে বসি কুহকিনী
শক্তীশ্বরী।

আমাদের মতে মায়াদেবীর আসন সৌর-খরতর-করজাল-সংকলিত না হইয়া যদি অস্ফুট অন্ধকার-কুজ্ঝটিকা-মণ্ডিত জলদময় হইত, তবে ভালো হইত। মায়াদেবীর নিকট হইতে দেব-অস্ত্র লইয়া ইন্দ্র রাম-সমীপে প্রেরণ করিলেন।

পঞ্চম সর্গে ইন্দ্রজিতের ভাবনায় ইন্দ্রের ঘুম নাই;

—কুসুম শয্যা ত্যজি, মৌন-ভাবে
বসেন ত্রিদিব-পতি রত্ন-সিংহাসনে;—
সুবর্ণ মন্দিরে সুপ্ত আর দেব যত।

দেবতাদিগের ঘুমটা না থাকিলেই ভালো হইত, যদি বা ঘুম রহিল, তবে ইন্দ্রজিতের ভয়ে ইন্দ্রের রাতটা না জাগিলেই ভালো হইত।

শচী ইন্দ্রের ভয় ভাঙিবার জন্য নানাবিধ প্রবোধ দিতে লাগিলেন,

'পাইয়াছ অস্ত্র কান্ত', কহিলা পৌলমী
অনন্ত যৌবনা, 'যাহে বধিলা তারকে
মহাসুর তারকারি; তব ভাগ্য বলে
তব পক্ষ বিরূপাক্ষ; আপনি পার্বতী,
দাসীর সাধনে সাধ্বী কহিলা, সুসিদ্ধ

হবে মনোরথ কালি; মায়া দেবীশ্বরী
বধের বিধান কহি দিবেন আপনি;—
তবে এ ভাবনা নাথ কহো কী কারণে?’

কিন্তু ইন্দ্র কিছুতেই প্রবোধ মানিবার নহেন, দেব-অস্ত্র পাইয়াছেন তাহা সত্য, শিব তাঁহার পক্ষ তাহাও সত্য, কিন্তু তথাপি ইন্দ্রের বিশ্বাস হইতেছে না—

সত্য যা কহিলে,
দেবেন্দ্রাণি, প্রেরিয়াছি অস্ত্র লঙ্কাপুরে,
কিন্তু কী কৌশলে মায়া রক্ষিবে লক্ষ্মণে
রক্ষোযুদ্ধে, বিশালাক্ষি, না পারে বুঝিতে।
জানি আমি মহাবলী সুমিত্রা নন্দন;
কিন্তু দন্তী কবে, দেবি, আঁটে মৃগরাজে?
দম্ভোলী নির্ঘোষ আমি শুনি, সুবদনে;
মেঘের ঘর্ঘর ঘোর; দেখি ইরম্মদে,
বিমানে আমার সদা ঝলে সৌদামিনী;
তবু থর-থরি হিয়া কাঁপে, দেবি, যবে
নাদে রুষি মেঘনাদ,

পাঠক দেখিলেন তো, ইন্দ্র কোনোমতে শচীর সান্ত্বনা মানিলেন না।

বিষাদে নিশ্বাসি
নীরবিলা সুরনাথ; নিশ্বাসি বিষাদে
(পতিখেদে সতী প্রাণ কাঁদেরে সতত।)
বসিলা ত্রিদিব-দেবী দেবেন্দ্রের পাশে।

আহা, অসহায় শিশুর প্রতি আমাদের যেরূপ মমতা জন্মে, ভয় ও বিষাদে আকুল ইন্দ্র বেচারীর উপর আমাদের সেইরূপ জন্মিতেছে।

উর্বশী, মেনকা, রম্ভা, চিত্রলেখা প্রভৃতি অপ্সরারা বিষণ্ন ইন্দ্রকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল।

সরসে যেমতি
সুধাকর কররাশি বেড়ে নিশাকালে
নীরবে মুদিত পদ্মে।

বিষণ্ন-সৌন্দর্যের তুলনা এখানে সুন্দর হইয়াছে। কিন্তু মাইকেল যেখানেই ‘কিংবা’ আনেন, সেখানেই আমাদের বড়ো ভয় হয়,

কিংবা দীপাবলী—
অম্বিকার পীঠতলে শারদ পার্বণে
হর্ষে মগ্ন বঙ্গ যবে পাইয়া মায়েরে
চির বাঞ্ছা।

পূর্বকার তুলনাটির সহিত ইহা সম্পূর্ণ বিপরীত হইয়াছে, দীপাবলী, শারদপার্বণ, সমুদয়গুলিই উল্লাস-সূচক।

এমন সময়ে মায়াদেবী আসিয়া কহিলেন,

যাই, আদিতেয়,
লঙ্কাপুরে, মনোরথ তোমার পুরিব;
রক্ষঃকুলচূড়ামণি চূর্ণিব কৌশলে।

এতক্ষণে ইন্দ্র সান্ত্বনা পাইলেন, নিদ্রাতুরা শচী ও অপ্সরীরাও বাঁচিল, নহিলে হয়তো বেচারীদের সমস্ত রাত্রি জাগিতে হইত।

ইন্দ্রজিৎ হত হইয়াছেন। লক্ষ্মী ইন্দ্রালয়ে উপস্থিত হইবামাত্র ইন্দ্র আহ্লাদে উৎফুল্ল হইয়া কহিতেছেন,

দেহো পদধূলি,
জননি; নিঃশঙ্ক দাস তোমার প্রসাদে—
গত জীব রণে আজি দুরন্ত রাবণি!
ভুঞ্জিব স্বর্গের সুখ নিরাপদ এবে।

বড়ো বাড়াবাড়ি হইয়াছে; ইন্দ্রের ভীরুতা কিছু অতিরিক্ত হইয়াছে। এইবার সকলে কহিবেন যে, পুরাণে ইন্দ্রকে বড়ো সাহসী করে নাই, এক-একটি দৈত্য আসে, আর ইন্দ্র পাতালে পলায়ন করেন ও একবার ব্রহ্মা একবার মহাদেবকে সাধাসাধি করিয়া বেড়ান। তবে মাইকেলের কী অপরাধ? কিন্তু এ আপত্তি কোনো কার্যেরই নহে। মেঘনাদবধের যদি প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত পুরাণের কথা যথাযথরূপে রক্ষিত হইত, তবে তাঁহাদের কথা আমরা স্বীকার করিতাম। কত স্থানে তিনি অকারণে পুরাণ লঙ্ঘন করিয়াছেন, রাবণের মাতুল কালনেমীকে তিনি ইন্দ্রজিতের শ্বশুর করিলেন, প্রমীলার দ্বারা রামের নিকট তিনি মল্লযুদ্ধের প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন, বীর চূড়ামণি রাবণকে কাপুরুষ বানাইলেন; আর যেখানে পুরাণকে মার্জিত করিবার সর্বাপেক্ষা প্রয়োজন ছিল, সেখানেই পুরাণের অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন বলিয়া আমরা তাঁহাকে মার্জনা করিতে পারি না। ইন্দ্রের পর দুর্গার অবতারণা করা হইয়াছে।

ইন্দ্রজিতের বধোপায় অবধারিত করিবার জন্য ইন্দ্র দুর্গার নিকট উপস্থিত হইলেন। ইন্দ্রের অনুরোধে পার্বতী শিবের নিকট গমনোদ্যত হইলেন। রতিকে আহ্বান করিতেই রতি উপস্থিত হইলেন, এবং রতির পরামর্শে মোহিনী মূর্তি ধরিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

দুর্গা মদনকে আহ্বান করিলেন ও কহিলেন,

চলো মোর সাথে,
হে মন্মথ, যাব আমি যথা যোগিপতি
যোগে মগ্ন এবে, বাছা; চলো ত্বরা করি।

'বাছা' কহিলেন—

কেমনে মন্দির হতে, নগেন্দ্রনন্দিনি,
বাহিরিবা, কহো দাসে, এ মোহিনী বেশে,
মুহূর্তে মাতিবে, মাতঃ, জগত হেরিলে,
ও রূপ মাধুরী সত্য কহিনু তোমারে।
হিতে বিপরীত, দেবী, সত্বরে ঘটিবে।
সুরাসুর-বৃন্দ যবে মথি জলনাথে,
লভিলা অমৃত, দুষ্ট দিতিসুত যত
বিবাদিল দেব সহ সুধা-মধু হেতু।
মোহিনী মুরতি ধরি আইলা শ্রীপতি।
ছদ্মবেশী হৃষিকেশে ত্রিভুবন হেরি।
হারাইলা জ্ঞান সবে এ দাসের শরে!
অধর-অমৃত-আশে ভুলিলা অমৃত
দেব দৈত্য; নাগদল নম্রশিরঃ লাজে,
হেরি পৃষ্ঠদেশে বেণী, মন্দর আপনি
অচল হইল হেরি উচ্চ কুচ যুগে!
স্মরিলে সে কথা, সতি, হাসি আসে মুখে,
মলম্বা অম্বরে তাম্র এত শোভা যদি

ধরে, দেবি, ভাবি দেখো বিশুদ্ধ কাঞ্চন
কান্তি কত মনোহর!

'বাছা'র সহিত 'মাতা'র কী চমৎকার মিষ্টালাপ হইতেছে দেখিয়াছেন? মলম্বা অম্বরের (গিলটি) উদাহরণ দিয়া, মদন কথাটি আরও কেমন রসময় করিয়া তুলিয়াছে দেখিয়াছেন? মহাদেবের নিকট পার্বতী গমন করিলেন,

মোহিত মোহিনী রূপে; কহিলা হরষে
পশুপতি, 'কেন হেথা একাকিনী দেখি,
এ বিজন স্থলে তোমা, গণেন্দ্র জননি?
কোথায় মৃগেন্দ্র তব কিঙ্কর, শঙ্করি?
কোথায় বিজয়া, জয়া?' হাসি উত্তরিলা
সুচারু হাসিনী উমা; 'এ দাসীরে ভুলি,
হে যোগীন্দ্র বহু দিন আছ এ বিরলে
তেঁই আসিয়াছি নাথ, দরশন আশে
পা দুখানি। যে রমণী পতিপরায়ণা,
সহচরী সহ সে কি যায় পতিপাশে?'

পতিপরায়ণা নারীর সহচরীর সহিত পতিসমীপে যাইতে যে নিষেধ আছে, এমন কথা আমরা কোনো ধর্মশাস্ত্রে পড়ি নাই। পুনশ্চ মহাদেবের নিকট দাসীভাবে আত্মনিবেদন করা পার্বতীর পৌরাণিক চরিত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত। উচ্চ দেব-ভাবের সহিত দম্পতির একাত্মভাবে যেরূপ সংলগ্ন হয়, উচ্চ-নীচ ভাব সেরূপ নহে।

রাবণের সহিত যখন কার্তিকেয়ের যুদ্ধ হইতেছে, তখন দুর্গা কাতর হইয়া সখী বিজয়াকে কহিতেছেন—

যা লো সৌদামিনী গতি,
নিবার কুমারে, সই। বিদরিছে হিয়া
আমার, লো সহচরী, হেরি রক্তধারা
বাছার কোমল দেহে। ইত্যাদি।

অসুরমর্দিনী শক্তিরূপিণী ভগবতীকে 'বাছার কোমল দেহে রক্তধারা' দেখিয়া এরূপ অধীর করা বড়ো সুকল্পনা নহে; পৃথিবীতে এমন নারী আছেন, যাঁহারা পুত্রকে যুদ্ধ হইতে নিরত করিবার জন্য সহচরী প্রেরণ করেন না; তবে মহাদেবী; পার্বতীকে এত ক্ষুদ্র করা কতদূর অসংগত হইয়াছে, সুরুচি পাঠকদের তাহা বুঝিবার জন্য অধিক আড়ম্বর করিতে হইবে না।

ভারতী
কার্তিক ১২৮৪

বাল্মীকি রামের চরিত্র-বর্ণনাকালে বলিয়াছেন, 'যম ও ইন্দ্রের ন্যায় তাঁহার বল, বৃহস্পতির ন্যায় তাঁহার বুদ্ধি, পর্বতের ন্যায় তাঁহার ধৈর্য।*... ক্ষোভের কারণ উপস্থিত হলেও তিনি ক্ষুব্ধ হন না। যখন কৈকয়ী রামকে বনে যাত্রা করিতে আদেশ করিলেন, তখন 'মহানুভব রাম কৈকেয়ীর এইরূপ কঠোর বাক্য শুনিয়া কিছুমাত্র ব্যথিত ও শোকাবিষ্ট হইলেন না।... চন্দ্রের যেমন হ্রাস, সেইরূপ রাজ্যনাশ তাঁহার স্বাভাবিক শোভাকে কিছুমাত্র মলিন করিতে পারিল না! জীবন্মুক্ত যেমন সুখে দুঃখে একই ভাবে থাকেন, তিনি তদ্রূপই রহিলেন; ফলতঃ ঐ সময়ে তাঁহার চিত্ত-বিকার কাহারই অণুমাত্র লক্ষিত হইল না।... ঐ সময় দেবী কৌশল্যার অন্তঃপুরে অভিষেক-

---

* উদ্‌ধৃতিগুলি হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য -কৃত রামায়ণ হইতে।

মহোৎসব-প্রসঙ্গে নানাপ্রকার আমোদ প্রমোদ হইতেছিল। রাম তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়াও এই বিপদে ধৈর্যাবলম্বন করিয়া রহিলেন। জ্যোৎস্নাপূর্ণ শারদীয় শশধর যেমন আপনার নৈসর্গিক শোভা ত্যাগ করেন না; সেইরূপ তিনিও চিরপরিচিত হর্ষ পরিত্যাগ করিলেন না।' সাধারণ্যে রামের প্রজারঞ্জন, এবং বীরত্বের ন্যায় তাঁহার অটল ধৈর্যও প্রসিদ্ধ আছে। বাল্মীকি রামকে মনুষ্যচরিত্রের পূর্ণতা অর্পণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন; তিনি তাঁহাকে কোমলতা ও বীরত্ব, দয়া ও ন্যায়, সহৃদয়তা ও ধৈর্য প্রভৃতি সকল প্রকার গুণের সামঞ্জস্য-স্থল করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আমরা উপরি-উক্ত আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া মেঘনাদবধ কাব্যের রাম চরিত্র সমালোচনা করিব, অথবা যদি মাইকেল রাম-চরিত-চিত্রের আদিকবির অনুসরণ না করিয়া থাকেন, তবে তাহা কতদূর সংগত হইয়াছে আলোচনা করিয়া দেখিব।

যখন প্রমীলার দূতী নৃমুণ্ডমালিনী রামের নিকট অসি, গদা বা মল্লযুদ্ধের প্রস্তাব করিতে গেলেন, তখন রঘুপতি উত্তর দেন যে,

—শুন সুকেশিনী,
বিবাদ না করি আমি কভু অকারণে।
অরি মম রক্ষঃপতি, তোমরা সকলে
কুলবালা, কুলবধূ; কোন্ অপরাধে
বৈরিভাব আচরিব তোমাদের সাথে? ইত্যাদি।

তখন মনে করিলাম যে, রাম ভালোই করিয়াছেন, তিনি বীর, বীরের মর্যাদা বুঝেন; অবলা স্ত্রীলোকদের সহিত অনর্থক বিবাদ করিতেও তাঁহার ইচ্ছা নাই। তখন তো জানিতাম না যে, রাম ভয়ে যুদ্ধ করিতে সাহস করেন নাই।

দূতীর আকৃতি দেখি ডরিনু হৃদয়ে
রক্ষোবর! যুদ্ধসাধ ত্যজিনু তখনি।
মূঢ় যে ঘাঁটায় হেন বাঘিনীরে।

এ রাম যে কী বলিয়া যুদ্ধ করিতে আসিয়াছেন সেই এক সমস্যা!

প্রমীলা তো লঙ্কায় চলিয়া যাউন, কিন্তু রামের যে ভয় হইয়াছে তাহা আর কহিবার নয়। তিনি বিভীষণকে ডাকিয়া কহিতেছেন—

এবে কী করিব, কহো, রক্ষ-কুলমণি?
সিংহ সহ সিংহী আসি মিলিল বিপিনে,
কে রাখে এ মৃগ পালে?

রামের কাঁদো কাঁদো স্বর যেন আমরা স্পষ্ট শুনিতে পাইতেছি। লক্ষ্মণ, দাদাকে একটু প্রবোধ দিলেন; রাম বিভীষণকে কহিলেন—

কৃপা করি, রক্ষোবর, লক্ষ্মণেরে লয়ে,
দুয়ারে দুয়ারে সখে, দেখো সেনাগণে।
কোথায় কে জাগে আজি? মহাক্লান্ত সবে
বীরবাহু সহ রণে। ...
...এ পশ্চিম দ্বারে
আপনি জাগিব আমি ধনুর্বাণ হাতে!

লক্ষ্মণ ষষ্ঠ সর্গে রামকে কহিলেন—

মারি রাবণিরে, দেব দেহো আজ্ঞা দাসে!

রঘুনাথ উত্তর করিলেন—

হায় রে কেমনে—
যে কৃতান্ত দূতে দূরে হেরি, ঊর্ধ্বশ্বাসে

ভয়াকুল জীবকুল ধায় বায়ুবেগে
প্রাণ লয়ে; দেব-নর ভস্ম যার বিষে;
কেমনে পাঠাই তোরে সে সর্প বিবরে,
প্রাণাধিক? নাহি কাজ সীতায় উদ্ধারি।

ইত্যাদি

লক্ষ্মণ বুঝাইলেন যে, দেবতারা যখন আমাদের প্রতি সদয়, তখন কিসের ভয়। বিভীষণ কহিলেন যে, লঙ্কার রাজলক্ষ্মী তাঁহাকে স্বপ্নে কহিয়াছিলেন যে, তিনি শীঘ্রই প্রস্থান করিবেন, অতএব ভয় করিবার কোনো প্রয়োজন নাই। কিন্তু রাম কাঁদিয়া উঠিলেন—

উত্তরিলা সীতানাথ সজল নয়নে;
'স্মরিলে পূর্বের কথা রক্ষকুলোত্তম
আকুল পরান কাঁদে। কেমনে ফেলিব
এ ভ্রাতৃ-রতনে আমি এ অতল জলে?'

ইত্যাদি

কিছুতেই কিছু হইল না, রামের ভয় কিছুতেই ঘুচিল না, অবশেষে আকাশবাণী হইল।

উচিত কি তব, কহো হে বৈদেহীপতি,
সংশয়িতে দেববাক্য, দেবকুলপ্রিয়
তুমি?

অবশেষে আকাশে চাহিয়া দেখিলেন যে অজগরের সহিত একটা [illegible] যুদ্ধ করিতেছে, কিন্তু যুদ্ধে অজগর জয়ী ও ময়ূর নিহত হইল। এতক্ষণে রাম শান্ত হইলেন ও লক্ষ্মণকে যুদ্ধ-সজ্জায় সজ্জিত করিয়া দিলেন। লক্ষ্মণ যুদ্ধে যাইবার সময় রাম একবার দেবতার কাছে প্রার্থনা করিলেন, একবার বিভীষণকে কাতরভাবে কহিলেন,

সাবধানে যাও মিত্র। অমূল রতনে
রামের, ভিখারী রাম অর্পিছে তোমারে,
রথীবর!

বিভীষণ কহিলেন, কোনো ভয় নাই। ইন্দ্রজিৎ-শোকে অধীর হইয়া যখন রাবণ সৈন্য-সজ্জায় আদেশ দিলেন, তখন রাক্ষসসৈন্য-কোলাহল শুনিয়া রাম আপনার সৈন্যাধ্যক্ষগণকে ডাকাইয়া আনিলেন ও তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—

'পুত্রশোকে আজি
বিকল রাক্ষসপতি সাজিছে সত্বরে;

...

রাখো গো রাঘবে আজি এ ঘোর বিপদে।
স্ববন্ধু-বান্ধব-হীন বনবাসী আমি
ভাগ্য-দোষে; তোমরা হে রামের ভরসা
বিক্রম, প্রতাপ, রণে।...
কুল, মান, প্রাণ মোর রাখো হে উদ্ধারি
রঘুবন্ধু, রঘুবধূ বদ্ধা কারাগারে
রক্ষ-ছলে। স্নেহ-পণে কিনিয়াছ রামে
তোমরা বাঁধো হে আজি কৃতজ্ঞতাপাশে
রঘুবংশে, দাক্ষিণাত্য দাক্ষিণ্য প্রকাশি!'
নীরবিলা রঘুনাথ সজল নয়নে।

এরূপ দুগ্ধপোষ্য বালকের ন্যায় কথায় কথায় সজল নয়নে বিষম ভীরুস্বভাব রাম বনের

বানরগুলাকে লইয়া এতকাল লঙ্কায় তিষ্ঠিয়া আছে কীরূপে তাহাই ভাবিতেছি।

লক্ষ্মণের মৃত্যু হইলে রাম বিলাপ করিতে লাগিলেন, সে বিলাপ সম্বন্ধে আমরা অধিক কিছু বলিতে চাহি না, কেবল ইলিয়াড হইতে প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর বন্ধু পেট্রক্লসের মৃত্যুতে একিলিস যে বিলাপ করিয়াছিলেন তাহা উদ্‌ধৃত করিয়া দিলাম, পাঠকেরা বুঝিয়া লইবেন যে কীরূপ বিলাপ বীরের উপযুক্ত। একিলিস তাঁহার দেবীমাতা থেটিস্‌কে কহিতেছেন,

He, deeply groaning—"To this cureless grief.
Not even the Thunderer's favour brings relief.
Patroclus— Ah!— Say, goddess, can I boast
A pleasure now? revenge itself is lost;
Patroclus, loved of all my martial train,
Beyond mankind, beyond myself, is slain!
'Tis not in fate the alternate now to give;
Patroclus dead Achilles hates to live.
Let me revenge it on proud Hector's heart,
Let his last spirit smoke upon my dart;
On these conditions will I breathe; till then,
I blush to walk among the race of men."
A flood of tears at this the goddess shed:
"Ah then, I see thee dying, see thee dead!
When Hector falls, thou diest."—"Let Hector die,
And let me fall! (Achilles made reply)
Far lies Patroclus from his native plain!
He fell, and, falling, wish'd my aid in vain.
Ah then, since from this miserable day
I cast all hope of my return away;
Since unrevenged, a hundred ghosts demand
The fate of Hector from Achilles' hand;
Since here, for brutal courage far renown'd,
I live an idle burden to the ground,
(Others in council famed for nobler skill,-
More useful to preserve, than I to kill)
Let me— But oh! ye gracious powers above!
Wrath and revenge from men and gods remove;
Far, far too dear to every mortal breast,
Sweet to the soul, as honey to the taste:
Gathering like vapours of a noxious kind
Form fiery blood, and darkening all the mind.
Me Agamemnon urged to deadly hate;
'Tis past— I quell it; I resign to fate.
Yes— I will meet the murderer of my friend;
Or (if the gods ordain it) meet my end.

The stroke of fate the bravest cannot shun :
The great Alcides, Jore's unequal'd son,
To Juno's hate, at length resign'd his breath.
And sunk the victim of all-conquering death.
So shall Achilles fall! Stretch'd pale and dead,
No more the Grecian hope, or Trojan dread!
Let me, this instant, rush into the fields,
And reap what glory life's short harvest yields.
Shall I not force some widow'd dame to tear
With frantic hands her long dishevel'd hair ?
Shall I not force her breast to heave with sighs,
And the soft tears to trickle from her eyes ?
Yes, I shall give the fair those mournful charms—
In vain you hold me— Hence! my arms, my arms!—
Soon shall the sanguine torrent spread so wide,
That all shall know, Achilles swells the tide."

রাম লক্ষ্মণের ঔষধ আনিবার জন্য যমপুরীতে গমন করিলেন। সেখানে বালীর সহিত দেখা হইল, বালী কহিলেন—

—কী হেতু হেথা সশরীরে আজি
রঘুকুলচূড়ামণি? অন্যায় সমরে
সংহারিলে মোরে তুমি তুষিতে সুগ্রীবে;
কিন্তু দূর করো ভয়, এ কৃতান্ত পুরে
নাহি জানি ক্রোধ মোরা, জিতেন্দ্রিয় সবে।

পরে দশরথের নিকটে গেলেন;

হেরি দূরে পুত্রবরে রাজর্ষি, প্রসারি
বাহুযুগ, (বক্ষঃস্থল আর্দ্র অশ্রুজলে)

বালী যেমন দেহের সহিত ক্রোধ প্রভৃতি রিপু পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে সুখভোগ করিতেছেন, তেমনি দশরথ যদি পৃথিবীর অশ্রুজল পৃথিবীতেই রাখিয়া আসিতেন তো ভালো হইত। শরীর না থাকিলে অশ্রুজল থাকা অসম্ভব, আমরা তাহা কল্পনাও করিতে পারি না। এমন-কি, ইহার কিছু পরে রাম যখন দশরথের পদধূলি লইতে গেলেন, তখন তাঁহার পা-ই খুঁজিয়া পান নাই। এমন অশরীরী আত্মার বক্ষঃস্থল কীরূপে যে অশ্রুজলে আর্দ্র হইয়াছিল তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন। যাহা হউক রামের আর অধিক কিছুই নাই। রামের সম্বন্ধে আর-একটি কথা বলিবার আছে। রাম যে কথায় কথায় 'ভিখারী রাম' 'ভিখারী রাম' করিয়াছেন, সেগুলি আমাদের ভালো লাগে না; এইরূপে নিজের প্রতি পরের দয়া উদ্রেক করিবার চেষ্টা, অতিশয় হীনতা প্রকাশ করা মাত্র। একজন দরিদ্র বলিতে পারে 'আমি ভিক্ষুক আমাকে সাহায্য করো।' একজন নিস্তেজ দুর্বল বলিতে পারে, 'আমি দুর্বল, আমাকে রক্ষা করো।' কিন্তু তেজস্বী বীর সেরূপ বলিতে পারেন না; তাহাতে আবার রাম ভিখারীও নহেন, তিনি নির্বাসিত বনবাসী মাত্র।

"ভিখারী রাঘব, দূতি, বিদিত জগতে।"
"অমূল রতনে
রামের, ভিখারী রাম অর্পিছে তোমারে।"
"বাঁচাও করুণাময়, ভিখারী রাঘবে।" ইত্যাদি।

যাহা হউক, রামায়ণের নায়ক মহাবীর রাম, মেঘনাদবধ কাব্যের কবি তাঁহার এ-কী দুর্দশা করিয়াছেন। তাঁহার চরিত্রে তিলমাত্র উন্নত-ভাব অর্পিত হয় নাই, এরূপ পরমুখাপেক্ষী ভীরু কোনোকালে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয় নাই। বাল্যকাল হইতে রামের প্রতি আমাদের এরূপ মমতা আছে যে, প্রিয়ব্যক্তির মিথ্যা অপবাদ শুনিলে যেরূপ কষ্ট হয়, মেঘনাদবধ কাব্যে রামের কাহিনী পড়িলে সেইরূপ কষ্ট হয়।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, রামের চরিত্রে বীরত্ব ও কোমলত্ব সমানরূপে মিশ্রিত আছে। পৌরুষ এবং স্ত্রীত্ব উভয় একাধারে মিশ্রিত হইলে তবে পূর্ণ মনুষ্য সৃজিত হয়, বাল্মীকি রামকে সেইরূপ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। মেঘনাদবধে রামের কোমলতা অংশটুকু অপর্যাপ্তরূপে বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু পাঠক, এমন একটি কথাও কি পাইয়াছেন, যাহাতে তাঁহাকে বীর বলিয়া মনে হয়? প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত কেবল বিভীষণের সহিত পরামর্শ করিয়াছেন, কেবল লক্ষ্মণের জন্য রোদন করিয়াছেন। ইন্দ্রজিতের সহিত যুদ্ধে প্রেরণ করিবার সময় সংস্কৃত রামায়ণে রাম লক্ষ্মণকে কহিতেছেন—

বৎস, সেই ভয়াবহ দুরাত্মার (ইন্দ্রজিতের) সমস্ত মায়া অবগত আছি। সেই রাক্ষসাধম দিব্য অস্ত্রধারী, এবং সংগ্রামে ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবগণকেও বিসংজ্ঞ করিতে পারে। সে রথে আরোহণপূর্বক অন্তরীক্ষে বিচরণ করে, এবং মেঘাচ্ছন্ন সূর্যের ন্যায় তাহার গতি কেহ জ্ঞাত হইতে পারে না। হে সত্যপরাক্রম অরিন্দম, বাণ দ্বারা সেই মহাবীর রাক্ষসকে বধ করো।

হে বৎস, সংগ্রামে দুর্মদ যে বীর বজ্রহস্তকেও পরাজিত করিয়াছে, হনুমান, জাম্বুবান ও ঋক্ষসৈন্য দ্বারা পরিবৃত হইয়া যাও— তাহাকে বিনাশ করো। বিভীষণ তাহার অধিষ্ঠিত স্থানের সমস্ত অবগত আছেন, তিনিও তোমার অনুগমন করিবেন।

মূল রামায়ণে লক্ষ্মণের শক্তিশেল যেরূপে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা অনুবাদিত করিয়া নিম্নে উদ্‌ধৃত করা গেল—

ভুজগরাজের জিহ্বার ন্যায় প্রদীপ্ত শক্তি রাবণ দ্বারা নিক্ষিপ্ত হইয়া মহাবেগে লক্ষ্মণের বক্ষে নিপতিত হইল। লক্ষ্মণ এই দূরপ্রবিষ্ট শক্তি দ্বারা ভিন্নহৃদয় হইয়া ভূতলে মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। সন্নিহিত রাম তাঁহার এইরূপ অবস্থা দেখিয়া ভ্রাতৃস্নেহে বিষণ্ণ হইলেন ও মুহূর্তকাল সাশ্রুনেত্রে চিন্তা করিয়া ক্রোধে যুগান্তবহ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। ‘এখন বিষাদের সময় নয়’ বলিয়া রাম রাবণ-বধার্থ পুনর্বার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। ওই মহাবীর অনবরত শরবর্ষণপূর্বক রাবণকে ক্ষতবিক্ষত করিতে লাগিলেন। শর-জালে আকাশ পূর্ণ হইল এবং রাবণ মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন।

অনন্তর রাম দেখিলেন, লক্ষ্মণ শক্তিবিদ্ধ হইয়া শোণিত-লিপ্ত-দেহে সসর্প-পর্বতের ন্যায় রণস্থলে পতিত আছেন। সুগ্রীব, অঙ্গদ ও হনুমান প্রভৃতি মহাবীরগণ লক্ষ্মণের বক্ষঃস্থল হইতে বহু যত্নেও রাবণ-নিক্ষিপ্ত-শক্তি আকর্ষণ করিতে পারিলেন না। পরে রাম ক্রুদ্ধ হইয়া দুই হস্তে ওই ভয়াবহ শক্তি গ্রহণ ও উৎপাটন করিলেন, শক্তি উৎপাটন-কালে রাবণ তাঁহার প্রতি অনবরত শর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। কিন্তু মহাবীর রাম তাহা লক্ষ না করিয়া লক্ষ্মণকে উত্থাপনপূর্বক হনুমান ও সুগ্রীবকে কহিলেন, দেখো, তোমরা লক্ষ্মণকে পরিবেষ্টনপূর্বক এই স্থানে থাকো এবং ইহাকে অপ্রমাদে রক্ষা করো। ইহা চিরপ্রার্থিত পরাক্রম প্রকাশের অবসর। ওই সেই পাপাত্মা রাবণ, বর্ষার মেঘের ন্যায় গর্জনকরত আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে। হে সৈন্যগণ, আমার প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করো, আজ জগৎ অরাবণ বা অরাম হইবে। তোমরা কিছুতে ভীত হইয়ো না। আমি সত্যই কহিতেছি এই দুরাত্মাকে নিহত করিয়া রাজ্যনাশ, বনবাস, দণ্ডকারণ্যে পর্যটন ও জানকীবিয়োগ এই-সমস্ত ঘোরতর দুঃখ ও নরক-তুল্য-ক্লেশ নিশ্চয় বিস্মৃত হইব। আমি যাহার জন্য এই কপিসৈন্য আহরণ করিয়াছি, যাহার জন্য সুগ্রীবকে রাজা করিয়াছি, যাহার জন্য সমুদ্রে সেতুবন্ধন করিলাম, সেই পাপ আজ আমার দৃষ্টিপথে উপস্থিত, তাহাকে আজ আমি সংহার

করিব। এই পামর আজ দৃষ্টিবিষ ভীষণ সর্পের দৃষ্টিতে পড়িয়াছে, কিছুতেই ইহার নিস্তার নাই। সৈন্যগণ, এক্ষণে তোমরা শৈলশিখরে উপবিষ্ট হইয়া আমাদের এই তুমুল সংগ্রাম প্রত্যক্ষ করো। আমি আজ এমন ভীষণ কার্য করিব যে, অদ্যকার যুদ্ধে গন্ধর্বেরা, কিন্নরেরা, দেবরাজ ইন্দ্র, চরাচর সমস্ত লোক, স্বর্গের সমস্ত দেবতারা রামের রামত্ব প্রত্যক্ষ করিয়া যতকাল পৃথিবী রহিবে ততকাল তাহা ঘোষণা করিতে থাকিবে।

এই বলিয়া মহাবীর রাম মেঘ হইতে জলধারার ন্যায় শরাসন হইতে অনবরত শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। উভয়পক্ষের নিক্ষিপ্ত শর গতিপথে সংঘর্ষপ্রাপ্ত হওয়াতে একটি তুমুলশব্দ শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল।

এই তো রামায়ণ হইতে লক্ষ্মণের পতনদৃষ্টে রামের অবস্থা বর্ণনা উদ্‌ধৃত করা গেল। এক্ষণে রামায়ণের অনুকরণ করিলে ভালো হইত কিনা, আমরা তৎসম্বন্ধে কিছু বলিতে চাহি না, পাঠকেরা তাহা বিচার করিবেন।

ভারতী
পৌষ ১২৮৪

রামের নিকট বিদায় লইয়া লক্ষ্মণ এবার যুদ্ধ করিতে যাইতেছেন, মায়ার প্রসাদে অদৃশ্য হইয়া লক্ষ্মণ লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করিয়া—

হেরিলা সভয়ে বলী সর্বভুক্‌রূপী
বিরূপাক্ষ মহারক্ষঃ, প্রক্ষ্বেড়নধারী।   ইত্যাদি।

কবি কাব্যের স্থানে স্থানে অযত্ন সহকারে, নিশ্চিন্তভাবে দুই-একটি কথা ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু তাহার ফল বড়ো ভালো হয় নাই। ‘সভয়ে’ কথাটি এখানে না ব্যবহার করিয়াও তিনি সমস্ত বর্ণনাটি সর্বাঙ্গসুন্দররূপে শেষ করিতে পারিতেন।

প্রবল পবন-বলে বলীন্দ্র পাবনি
হনু, অগ্রসরি শূর, দেখিলা সভয়ে
বীরাঙ্গনা মাঝে রঙ্গে প্রমীলা দানবী।

হনুমানের প্রমীলাকে দেখিয়া এত ভয় কেন হইল তাহা জানেন? হনুমান রাবণের প্রণয়িনীদের দেখিয়াছেন, ‘রক্ষঃকুলবধূ ও রক্ষঃকুলবালাদের’ দেখিয়াছেন, শোকাকুলা রঘুকুলকমলকে দেখিয়াছেন, ‘কিন্তু এহেন রূপ-মাধুরী কভু এ ভুবনে’ দেখেন নাই বলিয়াই এত সভয়! ‘—কুম্ভকর্ণ বলী ভাই মম, তায় আমি জাগানু অকালে ভয়ে।’ যাহা হউক এরূপ সভয়ে, সত্রাসে, সজল নয়নে প্রভৃতি অনেক কথা কাব্যের অনেক স্থানে অযথারূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। এরূপ দুটি-একটি ক্ষুদ্র কথার ব্যবহার লইয়া এতটা আড়ম্বর করিতেছি কেন? তাহার অনেক কারণ আছে। তুলিকার একটি সামান্য স্পর্শ মাত্রেই চিত্রের অনেকটা এদিক-ওদিক হইয়া যায়। কবি লিখিবার সময় লক্ষ্মণের চিত্রটি সমগ্রভাবে মনের মধ্যে অঙ্কিত করিয়া লইতে পারেন নাই; নহিলে যে লক্ষ্মণ দর্শন-ভীষণ ‘মূর্তি’ মহাদেবকে দেখিয়া অস্ত্র উদ্যত করিয়াছিলেন, তিনি প্রক্ষ্বেড়নধারী বিরূপাক্ষ রাক্ষসের প্রতি সভয়ে দৃষ্টিপাত করিলেন কেন? ‘সভয়ে’ এই কথাটির ব্যবহারে আমরা লক্ষ্মণের ভয়গ্রস্ত মুখশ্রী স্পষ্ট দেখিতেছি, ইহাতে ‘রঘুজ-অজ-অঙ্গজ’ দশরথ-তনয় সৌমিত্রির প্রতি যে আমাদের ভক্তি বাড়িতেছে তাহা নহে।

ইহার পরে লক্ষ্মণের সহিত ইন্দ্রজিতের যে যুদ্ধবর্ণনা করা হইয়াছে, তাহাতে যে লক্ষ্মণের নীচতা, কাপুরুষতা, অক্ষত্রোচিত ব্যবহার স্পষ্ট প্রকাশ পাইয়াছে— তাহা কে অস্বীকার করিবেন? কবি তাহা ভ্রমক্রমে করেন নাই, ইচ্ছাপূর্বক করিয়াছেন, তিনি একস্থলে ইন্দ্রজিতের মুখ দিয়াই কহিয়াছেন,

ক্ষুদ্রমতি নর, শূর, লক্ষ্মণ; নহিলে
অস্ত্রহীন যোধে কি সে সম্বোধে সংগ্রামে?
কহো মহারথি, একি মহারথী প্রথা?
নাহি শিশু লঙ্কাপুরে, শুনি না হাসিবে
এ কথা!

যদি ইচ্ছাপূর্বক করিয়া থাকেন, তবে কেন করিলেন? এ মহাকাব্যে কি মহান চরিত্র যথেষ্ট আছে? রাবণকে কি স্ত্রীলোক করা হয় নাই? ইন্দ্রকে কি ভীরু মনুষ্যরূপে চিত্রিত করা হয় নাই? এ কাব্যের রাম কি একটি কৃপাপাত্র বালক নহেন? তবে এ মহাকাব্যে এমন কে মহান চরিত্র আছেন, যাঁহার কাহিনী শুনিতে শুনিতে আমাদের হৃদয় স্তম্ভিত হয়, শরীর কণ্টকিত হয়, মন বিস্ফারিত হইয়া যায়। ইহাতে শয়তানের ন্যায় ভীষণ দুর্দম্য মন, ভীষ্মের ন্যায় উদার বীরত্ব, রামায়ণের লক্ষ্মণের ন্যায় উগ্র জ্বলন্ত মূর্তি, যুধিষ্ঠিরের ন্যায় মহান শান্তভাব, চিত্রিত হয় নাই। ইহাতে রাবণ প্রথম হইতেই পুত্রশোকে কাঁদিতেছেন, ইন্দ্র ইন্দ্রজিতের ভয়ে কাঁপিতেছেন, রাম বিভীষণের নিকট গিয়া ত্রাহি ত্রাহি করিতেছেন, ইহা দেখিয়া যে কাহার হৃদয় মহান ভাবে বিস্ফারিত হইয়া যায়, জানি না।

যখন ইন্দ্রজিৎ লক্ষ্মণকে কহিলেন,

নিরস্ত্র যে অরি,
নহে রথীকুল প্রথা আঘাতিতে তারে।
এ বিধি, হে বীরবর, অবিদিত নহে,
ক্ষত্র তুমি, তব কাছে:— কী আর কহিব?

তখন

জলদপ্রতিমস্বনে কহিলা সৌমিত্রি,
'আনায় মাঝারে বাঘে পাইলে কি কভু
ছাড়ে রে কিরাত তারে? বধিব এখনি,
অবোধ তেমনি তোরে! জন্ম রক্ষঃকুলে
তোর, ক্ষত্রধর্ম, পাপি, কী হেতু পালিব,
তোর সঙ্গে? মারি অরি, পারি যে কৌশলে!'

এ কথা বলিবার জন্য জলদপ্রতিমস্বনের কোনো আবশ্যক ছিল না।

রামায়ণের লক্ষ্মণ একটি উদ্ধত উগ্র-যুবক, অন্যায় তাঁহার কোনোমতে সহ্য হয় না, তরবারির উপরে সর্বদাই তাঁহার হস্ত পড়িয়া আছে, মনে যাহা অন্যায় বুঝিবেন মুহূর্তে তাহার প্রতিবিধান করিতে প্রস্তুত আছেন, তাহার আর বিবেচনা করিবেন না, অগ্রপশ্চাৎ করিবেন না, তাহার ফল ভালো হইবে কি মন্দ হইবে তাহা জ্ঞান নাই, অন্যায় হইলে আর রক্ষা নাই। অল্পবয়স্ক বীরের উদ্ধত চঞ্চল হৃদয় রামায়ণে সুন্দররূপে চিত্রিত হইয়াছে। যখন দশরথ রামকে বনে যাত্রা করিতে আদেশ করিলেন ও রামও তাহাতে সম্মত হইলেন, তখন লক্ষ্মণ যাহা কহিতেছেন তাহার কিয়দংশ উদ্‌ধৃত করিয়া দিলাম, ইহাতে পাঠকেরা কিয়ৎপরিমাণে রামায়ণে বর্ণিত লক্ষ্মণচরিত্র বুঝিতে পারিবেন।[1]

'রাম এইরূপ কহিলে মহাবীর লক্ষ্মণ সহসা দুঃখ ও হর্ষের মধ্যগত হইয়া অবনতমুখে কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিলেন এবং ললাটপট্টে ভ্রূকুটি বন্ধনপূর্বক বিলমধ্যস্থ ভুজঙ্গের ন্যায় ক্রোধভরে ঘন ঘন নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহার বদনমণ্ডল নিতান্ত দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া উঠিল এবং কুপিত সিংহের মুখের ন্যায় অতি ভীষণ বোধ হইতে লাগিল। অনন্তর হস্তী যেমন

---

[1] ১. হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য -কৃত রামায়ণ হইতে উদ্‌ধৃত।

আপনার শুণ্ড বিক্ষেপ করিয়া থাকে, তদ্রূপ তিনি হস্তাগ্র বিক্ষিপ্ত এবং নানাপ্রকার গ্রীবাভঙ্গি করিয়া বক্রভাবে কটাক্ষ নিক্ষেপপূর্বক কহিতে লাগিলেন, আর্য! ধর্মদোষ পরিহার এবং স্বদৃষ্টান্তে লোকদিগকে মর্যাদায় স্থাপন এই দুই কারণে বনগমনে আপনার যে আবেগ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক।... আপনি অনায়াসেই দৈবকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন, তবে কি নিমিত্ত একান্ত শোচনীয় অকিঞ্চিৎকর দৈবের প্রশংসা করিতেছেন?... বীর! এই জঘন্য ব্যাপার আমার কিছুতেই সহ্য হইতেছে না! এক্ষণে আমি মনের দুঃখে যাহা কিছু কহিতেছি, আপনি ক্ষমা করিবেন। আরও আপনি যে ধর্মের মর্ম অনুধাবন করিয়া মুগ্ধ হইতেছেন, যাহার প্রভাবে আপনার মতদ্বৈধ উপস্থিত হইয়াছে আমি সেই ধর্মকেই দ্বেষ করি। আপনি কর্মক্ষম, তবে কি কারণে সেই স্ত্রৈণ রাজার ঘৃণিত অধর্মপূর্ণ বাক্যের বশীভূত হইবেন? এই যে রাজ্যাভিষেকের বিঘ্ন উপস্থিত হইল, বরদান ছলই ইহার কারণ; কিন্তু আপনি যে তাহা স্বীকার করিতেছেন না, ইহাই আমার দুঃখ; ফলতঃ আপনার এই ধর্মবুদ্ধি নিতান্তই নিন্দনীয় সন্দেহ নাই।... তাঁহারা আপনার রাজ্যাভিষেকে বিঘ্নাচরণ করিলেন, আপনিও তাহা দৈবকৃত বিবেচনা করিতেছেন, অনুরোধ করি, এখনই এইরূপ দুর্বুদ্ধি পরিত্যাগ করুন, এই প্রকার দৈব কিছুতেই আমার প্রীতিকর হইতেছে না। যে ব্যক্তি নিস্তেজ, নির্বীর্য, সেইই দৈবের অনুসরণ করে, কিন্তু যাঁহারা বীর, লোকে যাঁহাদিগের বল-বিক্রমের শ্লাঘা করিয়া থাকে, তাঁহারা কদাচই দৈবের মুখাপেক্ষা করেন না। যিনি স্বীয় পৌরুষপ্রভাবে দৈবকে নিরস্ত করিতে সমর্থ হন, দৈববলে তাঁহার স্বার্থহানি হইলেও অবসন্ন হন না। আর্য! আজ লোকে দৈববল এবং পুরুষের পৌরুষ উভয়ই প্রত্যক্ষ করিবে। অদ্য দৈব ও পুরুষকার উভয়েরই বলাবল পরীক্ষা হইবে। যাহারা আপনার রাজ্যাভিষেক দৈবপ্রভাবে প্রতিহত দেখিয়াছে, আজ তাহারাই আমার পৌরুষের হস্তে তাহাকে পরাস্ত দেখিবে। আজ আমি উচ্ছৃঙ্খল দুর্দান্ত মদস্রাবী মত্ত কুঞ্জরের ন্যায় দৈবকে স্বীয় পরাক্রমে প্রতিনিবৃত্ত করিব। পিতা দশরথের কথা দূরে থাকুক, সমস্ত লোকপাল, অধিক কি ত্রিজগতের সমস্ত লোকও আপনার রাজ্যাভিষেকে ব্যাঘাত দিতে পারিবে না। যাহারা পরস্পর একবাক্য হইয়া আপনার অরণ্যবাস সিদ্ধান্ত করিয়াছে, আজ তাহাদিগকেই চতুর্দশ বৎসরের নিমিত্ত নির্বাসিত হইতে হইবে। আপনার অনিষ্ট সাধন করিয়া ভরতকে রাজ্য দিবার নিমিত্ত রাজা ও কৈকেয়ীর যে আশা উপস্থিত হইয়াছে, আজ আমি তাহাই দগ্ধ করিব। যে আমার বিরোধী, আমার দুর্বিষহ পৌরুষ যেমন তাহার দুঃখের কারণ হইবে, তদ্রূপ দৈববল কদাচই সুখের নিমিত্ত হইবেক না।

...প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আমিই আপনকার রাজ্য রক্ষা করিব, নতুবা চরমে যেন আমার বীরলোক লাভ না হয়। তীরভূমি যেমন মহাসাগরকে রক্ষা করিতেছে, তদ্রূপ আমি আপনার রাজ্য রক্ষা করিব। এক্ষণে আপনি স্বয়ংই যত্নবান হইয়া মাঙ্গলিক দ্রব্যে অভিষিক্ত হউন। ভূপালগণ যদি কোনো প্রকার বিরোধাচরণ করেন, আমি একাকীই তাঁহাদিগকে নিবারণ করিতে সমর্থ হইব। আর্য! আমার যে এই ভুজদণ্ড দেখিতেছেন, ইহা কি শরীরের সৌন্দর্য সম্পাদনার্থ? যে কোদণ্ড দেখিতেছেন, ইহা কি কেবল শোভার্থ? এই খড়্গে কি কাষ্ঠবন্ধন, এই শরে কি কাষ্ঠভার অবতরণ করা হয়?— মনেও করিবেন না; এই চারিটি পদার্থ শত্রুবিনাশার্থই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এক্ষণে বজ্রধারী ইন্দ্রই কেন আমার প্রতিদ্বন্দ্বী হউন-না, বিদ্যুতের ন্যায় ভাস্বর তীক্ষ্ণধার অসি দ্বারা তাঁহাকেও খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিব। হস্তীর শুণ্ড অশ্বের উরুদেশ এবং পদাতিক মস্তক আমার খড়্গে চূর্ণ হইয়া সমরাঙ্গন একান্ত গহন ও দুরবগাহ করিয়া তুলিবে। অদ্য বিপক্ষেরা আমার অসিধারায় ছিন্নমস্তক হইয়া শোণিতলিপ্ত দেহে প্রদীপ্ত পাবকের ন্যায় বিদ্যুদ্দামশোভিত মেঘের ন্যায় রণক্ষেত্রে নিপতিত হইবে।... যে হস্ত চন্দন লেপন, অঙ্গদ ধারণ, ধন দান ও সুহৃদ্বর্গের প্রতিপালনের সম্যক উপযুক্ত, অদ্য সেই হস্ত আপনার অভিষেক-বিঘাতকদিগের নিবারণ বিষয়ে স্বীয় অনুরূপ কার্য সাধন করিবে। এক্ষণে আজ্ঞা করুন আপনার কোন্ শত্রুকে ধন প্রাণ ও সুহৃদ্গণ হইতে বিযুক্ত করিতে হইবে। আমি আপনার

চিরকিঙ্কর, আদেশ করুন, যেরূপে এই বসুমতী আপনার হস্তগত হয়, আমি তাহারই অনুষ্ঠান করিব।'

মূল রামায়ণে ইন্দ্রজিতের সহিত লক্ষ্মণের যেরূপ যুদ্ধবর্ণনা আছে তাহার কিয়দংশ আমরা পাঠকদিগের গোচরার্থে এইখানে অনুবাদ করিয়া দিতেছি।

'তুমি এই স্থানে বয়স কাটাইয়াছ, তুমি আমার পিতার সাক্ষাৎ ভ্রাতা, সুতরাং পিতৃব্য হইয়া কীরূপে আমার অনিষ্ট করিতেছ? জ্ঞাতিত্ব ভ্রাতৃত্ব, জাতি ও সৌহার্দ্যও তোমার নিকট কিছুই নয়। তুমি ধর্মকেও উপেক্ষা করিতেছ। নির্বোধ! তুমি যখন স্বজনকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যের দাসত্ব স্বীকার করিয়াছ তখন তুমি শোচনীয় এবং সাধুগণের নিন্দনীয়। আত্মীয়স্বজনের সহবাস ও অপর নীচ ব্যক্তির আশ্রয় এই দুইটির যে কত অন্তর তুমি বুদ্ধিশৈথিল্যে তাহা বুঝিতেছ না। পর যদি গুণবান হয় এবং স্বজন যদি নির্গুণও হয় তবুও নির্গুণ স্বজন শ্রেষ্ঠ, পর যে সে পরই। স্বজনের প্রতি তোমার যেরূপ নির্দয়তা, ইহাতে তুমি জনসমাজে প্রতিষ্ঠা ও সুখ কদাচই পাইবে না। আমার পিতা গৌরব বা প্রণয়বশতই হউক তোমাকে যেমন কঠোর ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন তেমনই তো আবার সান্ত্বনাও করিয়াছেন। গুরু লোক প্রীতিভরে অপ্রিয় কথা বলেন বটে কিন্তু অবিচারিত মনে আবার তো সমাদরও করিয়া থাকেন। দেখো, যে ব্যক্তি সুশীল মিত্রের বিনাশার্থ শত্রুর বৃদ্ধি কামনা করে ধান্যগুচ্ছের সন্নিহিত শ্যামাকের ন্যায় তাহাকে পরিত্যাগ করা উচিত।'

ইন্দ্রজিৎ বিভীষণকে এইরূপ ভর্ৎসনা করিয়া ক্রোধভরে লক্ষ্মণকে কটূক্তি করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর লক্ষ্মণ রোষাবিষ্ট হইয়া নির্ভয়ে কহিলেন, রে দুষ্ট। কথা মাত্রে কখনো কার্যের পারগামী হওয়া যায় না, যিনি কার্যত তাহা প্রদর্শন করিতে পারেন তিনিই বুদ্ধিমান। তুই নির্বোধ, কোন্ দুষ্কর কার্যে কতকগুলি নিরর্থক বাক্য ব্যয় করিয়া আপনাকে কৃতকার্য জ্ঞান করিতেছিস। তুই অন্তরালে থাকিয়া রণস্থলে আমাদিগকে ছলনা করিয়াছিস। কিন্তু দেখ, এই পথটি তস্করের, বীরের নয়। এক্ষণে আত্মশ্লাঘা করিয়া কী হইবে, যদি তুই সম্মুখযুদ্ধে তিষ্ঠিতে পারিস, তবেই আমরা তোর বলবীর্যের পরিচয় পাইব। আমি তোরে কঠোর কথা কহিব না, তিরস্কার কি আত্মশ্লাঘাও করিব না অথচ বধ করিব। দেখ, আমার কেমন বল বিক্রম। অগ্নি নীরবে সমস্ত দগ্ধ করিয়া থাকেন এবং সূর্য নীরবে উত্তাপ প্রদান করিয়া থাকেন। এই বলিয়া মহাবীর লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিতের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন।

ভারতী
ফাল্গুন ১২৮৪

স্যাক্‌সন জাতি ও অ্যাংলো স্যাক্‌সন সাহিত্য

এই প্রবন্ধে স্যাক্‌সন জাতির আচার ও ব্যবহার, ভাষা ও সাহিত্য বিস্তৃতরূপে বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। যে ভিত্তির উপর আধুনিক ইংরাজি মহা-সাহিত্য স্থাপিত আছে সেই অ্যাংলো স্যাক্‌সন ভাষা ও সাহিত্য পরীক্ষা করিয়া দেখিতে এবং যে ভিত্তির উপর সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বরস্বরূপ ইংরাজ জাতি আদৌ স্থাপিত, সেই স্যাক্‌সনদের রীতিনীতি সমালোচনা করিয়া দেখিতে আজ আমরা প্রবৃত্ত হইলাম। কিডমন, বিউল্ল্‌মাস, টেন প্রভৃতির সার সংগ্রহ করিয়া আজ আমরা পাঠকদিগকে উপহার দিতেছি।

রোমানেরা ব্রিটনে রাজ্য স্থাপন করিলে পর এক দল শেল্‌ট (celt) তাহাদের বশ্যতা স্বীকার না করিয়া ওয়েল্‌স ও হাইল্যান্ডের পার্বত্য প্রদেশে আশ্রয় লইল। যাহারা রোমকদের অধীন হইল তাহাদের মধ্যে রোমক সভ্যতা ক্রমে ক্রমে বিস্তৃত হইতে লাগিল। রোমকদের অধিকৃত দেশে

প্রশস্ত রাজপথ নির্মিত হইল, দৃঢ় প্রাচীরে নগরসমূহ বেষ্টিত হইল— বাণিজ্য ও কৃষির যথেষ্ট উন্নতি হইল— নর্দাম্বর্লণ্ডের লৌহ, সমার্সেটের শীষক, কর্নওয়ালের টিন-খনি আবিষ্কৃত হইল। কিন্তু বাহিরে সভ্যতার চাকচিক্য যেমন বাড়িতে লাগিল, ভিতরে ভিতরে ব্রিটনের শোণিত ক্ষয় হইয়া আসিতে লাগিল। রোমকেরা তাহাদের সকল বিষয়ের স্বাধীনতা অপহরণ করিল— তাহাদিগকে বিদ্যা শিখাইল— উন্নততর ধর্মে দীক্ষিত করিল— সভ্যতা ও অসভ্যতার প্রভেদ দেখাইয়া দিল— কিন্তু কী করিয়া স্বদেশ শাসন করিতে হয় তাহা শিখাইল না। সুশাসনে থাকাতে জেতৃজাতির উপর তাহারা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিল— কখনো যে বিপদে পড়িতে হইবে সে কথা ভুলিয়া গেল, সুতরাং আত্মরক্ষণের ভাব অন্তর্হিত ও পরপ্রত্যাশার ভাব তাহাদের চরিত্রে বদ্ধমূল হইল। এইরূপ অস্বাস্থ্যকর সভ্যতা সে জাতির সর্বনাশ করিল। রোমকদের কর-ভারে নিপীড়িত হইয়াও তাহাদের একটি কথা বলিবার জো ছিল না। এক দল জমিদারের দল উত্থিত হইল— ও সেইসঙ্গে কৃষক দলের অধঃপতন হইল— কৃষকেরা জমিদারদের দাস হইয়া কাল যাপন করিতে লাগিল। এইরূপে রোমকদিগের অধিকৃত ব্রিটনেরা ভিতরে ভিতরে অসার হইয়া আসিল। রোমক-পুঁথি পড়িতে ও রোমক-ভাষায় কথা কহিতে শিখিয়াই তাহারা মনে করিল ভারি সভ্য হইয়া উঠিয়াছি ও স্বাধীন শেল্‌ট ও পিক্টদিগকে অসভ্য বলিয়া মনে মনে মহা ঘৃণা করিতে লাগিল। প্রায় চারি শতাব্দী ইহাদের এইরূপ মোহময় সুখ-নিদ্রায় নিদ্রিত রাখিয়া সহসা একদিন রোমকেরা তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিল। গথেরা ইটালি আক্রমণ করিয়াছে, সুতরাং রোমকেরা নিজদেশ রক্ষা করিতে ব্রিটন ছাড়িয়া স্বদেশে চলিয়া গেল, আর ফিরিল না। অসভ্যতর শেল্‌ট, পিক্ট, স্কট প্রভৃতি সামুদ্রিক দস্যুগণ চারি দিক হইতে ঝাঁকিয়া পড়িল— তখন সেই অসহায় সভ্য জাতিগণ কাঁপিতে কাঁপিতে জর্মনি হইতে অর্থ দিয়া সৈন্য ভাড়া করিয়া আনিল। হেঞ্জেস্ট ও হর্সা তাহাদের সাহায্য করিতে সৈন্য লইয়া এবস্‌ফ্লিটে জাহাজ হইতে অবতীর্ণ হইল।

ইহারাই অ্যাঙ্গল্‌স্‌ (Angles)। ব্রিটনেরা এবং রোমকেরা ইহাদিগকে স্যাক্‌সন বলিত। ইহাদের ভাষার নাম Seo Englisce Spræc অর্থাৎ English Speech। হলান্ড হইতে ডেনমার্ক পর্যন্ত ওই যে সমুদ্র-সীমা দেখিতেছ, মেঘময়, কুজ্‌ঝটিকাচ্ছন্ন আর্দ্রভূমি বিস্তৃত রহিয়াছে— বহু শতাব্দী পূর্বে উহা নিবিড় অরণ্যে আবৃত ছিল, সেই আরণ্য ভূভাগ অ্যাঙ্গল্‌স্‌দের বাসস্থান ছিল। এমন কদর্য স্থান আর নাই। বৃষ্টি ঝটিকা মেঘে সেই দেশের মস্তকের উপর কী যেন অভিশাপের অন্ধকার বিস্তার করিয়া রাখিয়াছে। দিবারাত্রি উন্মত্ত জলধি তীরভূমি আক্রমণ করিতেছে— এই ক্ষুভিত সমুদ্রের মুখে কোনো জাহাজের সহজে নিস্তার নাই। এই সমুদ্রতীরে, তুষার কুজ্‌ঝটিকাচ্ছন্ন-ঝঞ্ঝাঝটিকা-ক্ষুব্ধ অন্ধকার অরণ্যে ও জলায় শোণিত-পিপাসু সামুদ্রিক দস্যুদল বাস করিত। এই মনুষ্যশিকারীরা জীবনকে তৃণ জ্ঞান করিত। সেই সময়কার রোমক কবি কহিয়াছেন, ‘তাহারা আমাদের শত্রু; সমুদয় শত্রু অপেক্ষা হিংস্র, এবং যেমন হিংস্র তেমনি ধূর্ত। সমুদ্র তাহাদের যুদ্ধ-শিক্ষালয়, ঝটিকা তাহাদের বন্ধু; এই সমুদ্র-ব্যাঘ্রেরা পৃথিবী লুণ্ঠন করিবার জন্যই আছে।’ তাহারা আপনারাই গাহিত, ‘ঝটিকা-বেগ আমাদের দাঁড়ের সহায়তা করে— আকাশের নিশ্বাসস্বরূপ বজ্রের গর্জন আমাদের হানি করিতে পারে না— ঝঞ্ঝা আমাদের ভৃত্য— আমরা যেখানে যাইতে ইচ্ছা করি সে আমাদের সেইখানেই বহন করিয়া লইয়া যায়।’ স্ত্রীলোক এবং দাসদের উপর ভূমি কর্ষণ ও পশুপালনের ভার দিয়া ইহারা সমুদ্র ভ্রমণ, যুদ্ধ ও দেশলুণ্ঠন করিতে যাইত। রক্তপাত করাই তাহারা মুক্ত স্বাধীন জাতির কার্য বলিয়া জানিত— স্বাধীনতা ও মুক্ত ভাবের ইহাই তাহাদের আদর্শ ছিল। নরহত্যা ও রক্তপাত তাহাদের ব্যবসায়, ব্যবসায় কেন, তাই তাহাদের আমোদ ছিল। Ragnar Lodbrog নামক গাথক গাহিতেছে—‘অসি দিয়া আমরা তাহাদিগকে কাটিয়া ফেলিলাম;— আমার সুন্দরী পত্নীকে যখন প্রথম আমার পার্শ্বে শয্যায় বসাইলাম তখন আমার যেরূপ আমোদ হইয়াছিল, সেই সময়েও কি আমার তেমনি আমোদ হয় নাই?’ যখন এজিল (Egil) ডেনমার্কবাসী জার্লের কন্যার পার্শ্বে উপবেশন করিল, তখন সেই

কন্যা তাঁহাকে 'তিনি কখনো নেকড়িয়া বাঘদিগকে গরম গরম মনুষ্য মাংস খাইতে দেন নাই ও সমস্ত শরৎকালের মধ্যে মৃতদেহের উপর কাক উড়িতে দেখেন নাই' বলিয়া ভর্ৎসনা করিয়া দূরে ঠেলিয়া দিল। তখন এজিল এই বলিয়া তাহাকে শান্ত করে 'আমি রক্তাক্ত অসি হস্তে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছি, নর-দেহ-লোলুপ কাকেরা আমার অনুসরণ করিয়াছে। দারুণ যুদ্ধ করিয়াছি এবং মনুষ্য আলয়ের উপর দিয়া অগ্নি চলিয়া গিয়াছে। যাহারা দ্বার রক্ষা করিতে নিযুক্ত ছিল, তাহাদিগকে রক্তের উপর ঘুম পাড়াইয়াছি।' তখনকার কুমারীদের সহিত এইরূপ কথোপকথন চলিত। ইহাদের গ্রামবাসীদের সম্বন্ধে ট্যাসিটস্ বলেন যে ইহারা সকলেই পৃথক পৃথক আপনার আপনার লইয়াই থাকে। এমন বিজনতা ও স্বাতন্ত্র্যপ্রিয় জাতি আর নাই। প্রত্যেক গ্রামবাসী যেমন আপনার ভূমিটুকু লইয়া স্বতন্ত্র থাকে তেমনি আবার প্রত্যেক গ্রাম অন্য গ্রামের সহিত স্বতন্ত্র থাকিতে চায়। প্রত্যেক গ্রাম চারি ধারে অরণ্য বা পোড়োভূমির দ্বারা ঘেরা থাকে— সে ভূমি কোনো বিশেষ ব্যক্তির অধিকারভুক্ত নহে— সেইখানে দোষী ব্যক্তির মৃত্যুদণ্ড হইত— এবং সেইখানে সকল-প্রকার উপদেবতার আবাস বলিয়া লোকের বিশ্বাস ছিল। যখন কোনো নূতন ব্যক্তি সেই অরণ্য বা পোড়োভূমির মধ্যে আসিত তখন তাহাকে শৃঙ্গ বাজাইয়া আসিতে হইত। নিঃশব্দে আসিলে শত্রুজ্ঞান করিয়া যার ইচ্ছা সেই বধ করিতে পারিত। ইহাদের সকলেরই প্রায় একটু একটু ভূমি থাকিত, এবং যাহাদের এইরূপ ভূমি থাকিত তাহাদের নাম কার্ল (churl) (মনুষ্য) ছিল। তাহাদিগকে Freenecked man (মুক্তস্কন্ধ মনুষ্য) কহিত— অর্থাৎ তাহাদের কোনো প্রভুর নিকট স্কন্ধ নত করিতে হইত না। তাহাদের আর-এক নাম ছিল 'শস্ত্রধারী' অর্থাৎ তাহাদেরই অস্ত্রবহন করিবার অধিকার ছিল। প্রথমে ইহাদের মধ্যে বিচারপ্রণালী ছিল না— প্রত্যেক মনুষ্য আপনার আপনার প্রতিহিংসা সাধন করিত। ক্রমে ন্যায় ও বিচার প্রচলিত হইল। তখনকার অপরিস্ফুট দণ্ডনীতি বলেন— চোখের বদলে চোখ, প্রাণের বদলে প্রাণ দাও, কিংবা তার উপযুক্ত মূল্য দাও। যাহার যে অঙ্গ তুমি নষ্ট করিবে, তোমার নিজের সেই অঙ্গ দান করিতে হইবে, কিংবা তাহার উপযুক্ত মূল্য দিতে হইবে। এ মূল্য যে দোষী ব্যক্তিই দিবে তাহা নহে, দোষী ব্যক্তির পরিবার আহত ব্যক্তির পরিবারকে দিবে। প্রত্যেক কুটুম্ব তাঁহার অন্য কুটুম্বের রক্ষক, একজনের জন্য সকলে দায়ী, ও একজনের উপর আর কেহ অন্যায়াচরণ করিলে সকলে তাহার প্রতিবিধান করিবেন। ইহাদের মধ্যে বিশেষ পুরোহিত কেহ ছিল না— প্রত্যেক ব্যক্তি আপনার আপনার পুরোহিত।

নিপীড়িত ব্রিটিশ জাতীয়েরা এই অ্যাঙ্গল্স্ সৈন্যদিগকে অর্থ দিয়া ভাড়া করিয়া আনিল। কিন্তু দেখিতে দেখিতে ঝাঁকে ঝাঁকে অ্যাঙ্গল্স্রা ব্রিটনে আসিয়া পড়িল। ব্রিটিশদিগের এত টাকা ও খাদ্য দিবার সামর্থ্য ছিল না, সুতরাং অবশেষে তাহাদেরই সহিত যুদ্ধ বাধিয়া গেল। দারুণ হত্যাকাণ্ড আরম্ভ হইল— ধনীগণ সমুদ্রপাড়ে পলায়ন করিল। দরিদ্র অধিবাসীরা পার্বত্য প্রদেশে লুকাইয়া রহিল, কিন্তু আহারাভাবে সেখানে অধিক দিন থাকিতে না পারিয়া বাহির হইয়া পড়িত, অমনি নিষ্ঠুর স্যাক্সনদের তরবারি-ধারে নিপতিত হইত। দরিদ্র কৃষকেরা গির্জায় গিয়া আশ্রয় লইত— কিন্তু গির্জার উপরেই স্যাক্সনদের সর্বাপেক্ষা অধিক ক্রোধ ছিল। গির্জায় আগুন ধরাইয়া দিয়া আচার্যদিগকে বধ করিয়া একাকার করিত, কৃষক বেচারীরা আগুন হইতে পলাইয়া আসিয়া স্যাক্সনদের তরবারিতে নিহত হইত। ফ্র্যাঙ্ক জাতিরা গল্ অধিকার করিলে ও লম্বর্ডিগণ ইটালি অধিকার করিলে জেতারাই সভ্যতর জিত জাতিদের মধ্যে লোপ পাইয়া যায়, কিন্তু ইংলন্ডে ঠিক তাহার বিপরীত হয়— স্যাক্সনেরা একেবারে ব্রিটন জাতিকে ধ্বংস করিয়া ফেলে। দুই শতাব্দী ক্রমাগত যুদ্ধ ও ক্রমাগত হত্যা করিয়া স্যাক্সনেরা ব্রিটনের আদিম অধিবাসীদের বিলোপ করিয়া দেয়। তখন ইংলন্ড তাহাদেরই দেশ হইল। অল্পস্বল্প দুই-একটি ব্রিটন যাহারা অবশিষ্ট ছিল তাহারা কেহ কেহ স্যাক্সন প্রভুর দাস হইয়া রহিল, কেহ কেহ বা ওয়েলস্ ও হাইলন্ডের দুর্গম প্রদেশে পলাইয়া গেল। এখনো শেল্টিক ভাষা-প্রসূত একপ্রকার ভাষা ওয়েল্সে

চলিত আছে।[১] ইংরাজি ভাষায় শেল্‌টিক উপাদান খুব অল্পই পাইবে। নবম হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত কেবল কেল্‌টিক বা শেল্‌টিক কথা ইংরাজি ভাষায় প্রচলিত ছিল।

রোমকেরা যখন ইংলন্ড বিজয় করিয়াছিলেন তখন অধিকৃত জাতিদিগের রাজভাষা লাটিন ছিল। কিন্তু অ্যাংলো স্যাক্‌সন ভাষায় তখনো লাটিনের কোনো চিহ্ন পড়ে নাই। ইংলন্ডের কতকগুলি দেশের নাম কেবল রোমীয় ধাতু হইতে উৎপন্ন হয়। তাহা ব্যতীত দু-একটি অন্য কথাও রোমীয় ধাতু হইতে প্রসূত হইয়াছিল, যেমন Cheese পনির কথা লাটিন Casens হইতে উৎপন্ন। স্যাক্‌সন munt (পর্বত) কথা বোধ হয় লাটিন mons হইতে গৃহীত হইয়াছে। পর্বত হইতে নৈসর্গিক পদার্থের নামও যে অন্য ভাষা হইতে গৃহীত হইবে, ইহা কতকটা অসম্ভব বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু জর্মান সমুদ্রের তীরে বা তাহার নিকটে একটিও পর্বত নাই, সুতরাং সে দেশবাসীরা যে পর্বতের নাম না জানিবে তাহাতে আশ্চর্য নাই।

জর্মান জাতিরা যখন স্পেন গল্‌ ও ইতালি জয় করিয়াছিল তখনো সে দেশের ধর্ম, সামাজিক আচার-ব্যবহার ও শাসনপ্রণালীর পরিবর্তন হয় নাই। কিন্তু জর্মান জাতিরা ব্রিটন দ্বীপ যেরূপ সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিতে পারিয়াছিল এমন আর কোনো দেশ পারে নাই। রোমীয় সভ্যতার ধ্বংসাবশেষের উপর সম্পূর্ণরূপে জর্মান সমাজ নির্মিত হইল। ব্রিটিশ আচার-ব্যবহার, ইতালির সভ্যতা, সমস্ত ধ্বংস হইয়া গেল, এবং এই সমতলীকৃত ভূমির উপর আর-একপ্রকার নূতনতর ও উন্নততর সভ্যতার বীজ রোপিত হইল।

যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে স্যাক্‌সনদের রাজার প্রয়োজন হইল। পূর্বে তাহাদের রাজা ছিল না। যখন কোথাও যুদ্ধ করিতে যাইত তখন একজনকে প্রধান বলিয়া লইয়া যাইত মাত্র। কিন্তু একটা দেশ অধিকার করিয়া রাখিতে হইলে ও ক্রমাগত তদ্দেশবাসীদের সহিত যুদ্ধবিগ্রহ বাধিলে রাজা নহিলে চলে না। হেঞ্জেস্টের উত্তরাধিকারীরা কেল্‌টের রাজা হইল। এই-সকল যুদ্ধে স্যাক্‌সন জাতিদের মধ্যে দাস-সংখ্যা বাড়িয়া উঠিল। যুদ্ধে বন্দী হইলে উচ্চ শ্রেণীস্থদিগকে দাস হইতে হইত, এবং মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পাইবার জন্যও দাসত্ব অনেকে আহ্লাদের সহিত গ্রহণ করিত। ঋণ শুধিতে না পারিয়া অনেককে উত্তমর্ণের দাস হইতে বাধ্য হইতে হইত। বিচারে অপরাধী ব্যক্তির পরিবারেরা জরিমানা দিতে না পারিলে সে দোষী ব্যক্তিকে দাসত্ব ভোগ করিতে হইত। এইরূপে স্যাক্‌সনদের মধ্যে একটা দাসজাতি উত্থিত হইল। দাসের পুত্র দাস হইত ইহা হইতেই এই ইংরাজি প্রবাদ উৎপন্ন হয় যে, আমার গোরুর বাছুর আমারই সম্পত্তি। দাস পলাইয়া গেলে পর ধরিতে পারিলে তাহাকে চাবুক মারিয়া খুন করিত বা স্ত্রীলোক হইলে তাহাকে দগ্ধ করিয়া মারিত। যখন ব্রিটনদের সহিত যুদ্ধ কতকটা ক্ষান্ত হইল, তখন তাহাদের আপনাদের মধ্যে যুদ্ধ বাধিল। নর্দাম্বরলন্ডের রাজা ইয়ল্‌ফ্রিথ্‌ অন্যান্য অনেক ইংলিশ রাজ্য জয় করিলেন। কেবল কেন্টের রাজা ইথল্‌বার্ট তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। ইয়ল্‌ফ্রিথের অকস্মাৎ মৃত্যুতে এই দুই রাজ্যের মধ্যে তেমন বিবাদ বাধিতে পারে নাই। এই সময়ে খৃস্টান ধর্ম ধীরে ধীরে ইংলন্ডে প্রবেশ করিল। প্যারিসের খৃস্টান রাজকন্যা বাক্‌টার সহিত ইথল্‌বার্টের বিবাহ হইল। রাজ্ঞীর সহিত একজন খৃস্টান পুরোহিত কেন্টের রাজধানীতে আসিল। এই বিবাহ-বার্তা শ্রবণে সাহস পাইয়া পোপ গ্রেগরি সেন্ট অগস্টিনকে ইংলন্ডে খৃস্টান ধর্ম প্রচার করিতে পাঠাইয়া দিলেন। কেন্টের অধিপতি তাহাদের ধর্মোপদেশ শ্রবণ করিলেন ও কহিলেন 'তোমাদের কথাগুলি বেশ, কিন্তু নূতন ও

---

[১] যে জাতিরা অ্যাংলো স্যাক্‌সন দলভুক্ত নয়, অথচ অ্যাংলো স্যাক্‌সনদের দেশের সীমায় বাস করিত, তাহাদিগকে স্যাক্‌সনেরা Wealhas বলিত, ইহা হইতে Wales নামের উৎপত্তি। এই কারণবশত ইটালির জর্মান নাম Welschland। ওই কারণেই আরও অনেক দেশকে জর্মনেরা Welsh, walloon, wallachia নামে অভিহিত করিয়া থাকে।

সন্দেহজনক।' তিনি নিজে স্বধর্ম পরিত্যাগ করিতে চাহিলেন না, কিন্তু খৃস্টানদিগকে আশ্রয় দিতে স্বীকার করিলেন। প্রচলিত ধর্মের সহিত অনেক যুঝাযুঝির পর খৃস্টান ধর্ম ইংলন্ডে স্থান পাইল।

ইংলন্ড-বিজেতাদের যে সকলেরই এক ভাষা ও এক জাতি ছিল তাহা নহে। এই খৃস্টান ধর্ম প্রবেশ করিয়া তাহাদের ভাষা ও জাতি অনেকটা এক করিয়া দিল। এই ভাষার ঐক্য সাহিত্যের অল্প উন্নতির কারণ নহে। খৃস্টধর্ম প্রবেশ করিবার পূর্বে অক্ষরে লিখা প্রচলিত ছিল না। খৃস্টধর্ম প্রবেশ করিলে পর স্যাক্সনেরা নব উদ্যমে উদ্দীপ্ত হইল ও তাহাদের হৃদয়ের উৎস উন্মুক্ত হইয়া সংগীত-স্রোতে অ্যাংলো স্যাক্সন সাহিত্য পূর্ণ করিল। খৃস্টধর্ম প্রচার হওয়াতে স্যাক্সনদের মধ্যে রোমীয় সাহিত্য চর্চার আরম্ভ হইল ও বাইবেলের কবিতার উচ্চ আদর্শ স্যাক্সনেরা প্রাপ্ত হইল। যুদ্ধোন্মাদে মত্ত থাকিয়া যে জাতি বিদ্যার দিকে মনোযোগ করিতে পারে নাই, খৃস্টীয় ধর্মের সহিত শান্তি ও ঐক্যে অভিষিক্ত হইয়া সম্মুখে যে ইতালীয় বিদ্যার খনি পাইল তাহাতেই তাহারা মনের সমুদয় উদ্যম নিয়োগ করিল। খৃস্টধর্ম প্রচারের সহায়তা করিবার জন্য তাহারা অ্যাংলো স্যাক্সন ভাষায় বাইবেল ও অন্যান্য লাটিন ধর্মপুস্তক অনুবাদ করিতে লাগিল। ইহাতে যে ভাষার ও সাহিত্যের যথেষ্ট উন্নতি হইবে তাহাতে আশ্চর্য কী? অ্যাংলো স্যাক্সন ভাষায় লিখিত অধিক প্রাচীন পুস্তক পাওয়া যায় না। অ্যালফ্রেডের সময়েই প্রকৃত প্রস্তাবে উক্ত ভাষা Bec ledene (Book language) অর্থাৎ লিখিত ভাষা হইল। প্রাচীনতর পুস্তক যাহা-কিছু পাওয়া যায়, তাহা খৃস্টান ধর্মপ্রচারের পরে অক্ষরে লিখিত হইয়াছে। প্রাচীনতম অ্যাংলো স্যাক্সন কাব্যের মধ্যে Lay of Beowulf প্রধান। ইহা কোন্ সময়ে যে রচিত হইয়াছিল তাহা নিশ্চিত বলা যায় না। অনেকে অনুমান করেন খৃস্টান ধর্ম প্রচলিত হইবার পূর্বে ইহা রচিত হইয়া থাকিবে। ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কবিতা অ্যাংলো স্যাক্সন ভাষায় পাওয়া দুষ্কর। কিন্তু ইহার ধরন, ভাব অন্যান্য অ্যাংলো স্যাক্সন কবিতার সহিত এত বিভিন্ন যে, এই গীতি সাধারণ স্যাক্সন প্রতিভা হইতে উৎপন্ন বলিয়া মনে হয় না। স্কান্দিনেবীয় পৌরাণিক কবিতার সহিত ইহার অনেক সাদৃশ্য আছে। গল্পটির সারমর্ম এই, ডহাম গ্রেন্ডেল বলিয়া এক রাক্ষস ছিল, সে নিকটস্থ জলার মধ্য হইতে বাহির হইয়া রাত্রে গুপ্তভাবে তথাকার রাজবাটির মধ্যে প্রবেশ করিত ও গৃহস্থিত ঘুমন্ত যোদ্ধাদের বিনষ্ট করিত; কেহ কেহ বলেন এই রাক্ষস জলার অস্বাস্থ্যজনক বাষ্পের রূপক মাত্র। বোউল্‌ফ নৃপতি তথায় গিয়া সেই রাক্ষসকে আহত ও নিহত করেন। তিনি ফেনগ্রীব (Foamy necked) জাহাজে চড়িয়া কিরূপে বিদেশীয় রাজসভায় আইলেন এবং তাঁহার অন্যান্য কীর্তি ইহাতে স্কান্দিনেবীয় সাগার ধরনে লিখিত। বোউল্‌ফ এক মহাবীর পুরুষ। 'তিনি উন্মুক্ত অসি দৃঢ় হস্তে ধরিয়া ঘোরতর তরঙ্গে ও শীতলতম ঝঞ্ঝায় সমুদ্র পর্যটন করিয়াছেন, ও তাঁহার চারি দিকে শীতের তীব্রতা সমুদ্রের ঊর্মির সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন।' কিন্তু তিনি তাহাদিগের কুঠারবিদ্ধ করিলেন। নয় জন সিন্ধুদৈত্য (NICOR) বিনাশ করিলেন। বৃদ্ধ রাজা হ্রথগার (Hrothgar)-কে গ্রেন্ডেল (Grendel) দৈত্যহস্ত হইতে নিস্তার করিবার জন্য অস্ত্রাদি কিছু না লইয়াই আসিলেন। আপনার শক্তির উপর নির্ভর করিয়া তিনি প্রাসাদে শুইয়া আছেন— 'নিশীথের অন্ধকার উত্থিত হইল, ওই গ্রেন্ডেল আসিতেছে, সকলে দ্বার খুলিয়া ফেলিল'— একজন ঘুমন্ত যোদ্ধাকে ধরিল, 'তাহার অজ্ঞাতসারে তাহাকে ছিঁড়িয়া ফেলিল, তাহাকে দংশন করিল, তাহার শিরা হইতে রক্তপান করিল, ও তাহাকে ক্রমাগত ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া খাইয়া ফেলিল।' এমন সময়ে বোউল্‌ফ উঠিলেন, দৈত্যকে আক্রমণ করিলেন। 'প্রাসাদ কম্পিত হইল ... উভয়েই উন্মত্ত। গৃহ ধ্বনিত হইল, আশ্চর্য এই যে, যে মদ্যশালা এই সংগ্রামশ্বাপদদিগকে বহন করিয়া ছিল, সে সুন্দর প্রাসাদ ভাঙিয়া পড়ে নাই। শব্দ উত্থিত হইল, তাহা নূতন প্রকারের। যখন নর্থ ডেনমার্কবাসীরা আপনাদের গৃহভিত্তির মধ্যে থাকিয়া শুনিল যে সেই ঈশ্বর-দ্বেষী আপন ভীষণ পরাজয়-সংগীত গাহিতেছে, আঘাত-যন্ত্রণায় আর্তনাদ করিতেছে, তখন একপ্রকার ভয়ে

তাহারা আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। ...সেই ঘৃণ্য হতভাগ্যের মৃত্যু-আঘাত পাইতে এখনো বাকি আছে— অবশেষে সে স্কন্ধে ভীষণ আঘাত পাইল— তাহার মাংসপেশীসমূহ বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল— অস্থির সন্ধিমূল বিভিন্ন হইল। সমরে বোউল্‌ফের জয় হইল।' বিচ্ছিন্ন হস্ত-পদ গ্রেন্ডেল হ্রদে গিয়া লুকাইল। 'সেই হ্রদের তরঙ্গ তাহার রক্তে ফুটিতে লাগিল। হ্রদের জল তাহার শোণিতের সহিত মিশিয়া উষ্ণ হইয়া উঠিল। রক্ত-বিবর্ণ জলে শোণিতের বুদ্‌বুদ উঠিতে লাগিল।' সেইখানেই তাহার মৃত্যু হইল। কিন্তু গ্রেন্ডেলের মাতা, তাহার পুত্রের মতো যাহার 'অতি শীতল সলিলের ভীষণ স্থানে বাস নির্দিষ্ট ছিল' সে একদিন রাত্রে আসিয়া আর-একজন যোদ্ধাকে বিনাশ করিল। বোউল্‌ফ্ পুনরায় তাহাকে বধ করিতে চলিলেন। একটি পর্বতের নিকট এক ভীষণ গহ্বর ছিল— সে গহ্বর নেকড়িয়া ব্যাঘ্রদের আবাস স্থান। পর্বতের অন্ধকারে ভূমির নিম্ন দিয়া এক নদী বহিয়া যাইতেছে। বৃক্ষসমূহ শিকড় দিয়া সেই নদী আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। রাত্রে সেখানে গেলে দেখা যায় সে স্রোতের উপর আগুন জ্বলিতেছে। সে অরণ্যে কেহ নেকড়িয়া ব্যাঘ্র দ্বারা আক্রান্ত হইলে বরং তীরে দাঁড়াইয়া মরিয়া যাইবে তবুও সে স্রোতে লুকাইতে সাহস পাইবে না। অদ্ভুতাকৃতি পিশাচ (Dragon) ও সর্পসমূহ সেই স্রোতে ভাসিতেছে। বোউল্‌ফ সেই তরঙ্গে ডুব দিলেন; বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া সেই রাক্ষসীর নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। সে তাঁহাকে মুষ্টিতে বদ্ধ করিয়া তাহার আবাস স্থানে লইয়া গেল। সেখানে এক বিবর্ণ আলোক জ্বলিতেছিল। সেই আলোকে সম্মুখাসম্মুখি দাঁড়াইয়া বীর সেই পাতালের বাঘিনী মহাশক্তি নাগিনীকে দেখিলেন। অবশেষে তাহাকে বধ করিলেন। তাঁহার মৃত্যু-ঘটনা নিম্নলিখিতরূপে কথিত আছে : পঞ্চাশ বৎসর তিনি রাজত্ব করিলে পর এক ড্র্যাগন (Dragon) আসিয়া 'অগ্নি-তরঙ্গে' মনুষ্য ও গৃহ নষ্ট করিতে লাগিল। বোউল্‌ফ এক লৌহ-চর্ম নির্মাণ করিলেন। এবং তাহাই পরিধান করিয়া একাকী যুদ্ধ করিতে গেলেন। 'নৃপতির এমন উদ্ধত গর্ব ছিল যে, সেই পক্ষবান রাক্ষসের সহিত যুদ্ধে অধিক সঙ্গী ও সৈন্য লইয়া যাইতে চাহিলেন না।' কিন্তু তথাপি কেমন বিষণ্ণ হইয়া অনিচ্ছার সহিত গেলেন, কেননা এইবার তাঁহার অদৃষ্টে মৃত্যু আছে। সেই রাক্ষস অগ্নি উদ্‌গার করিতে লাগিল। তাহার শরীরে অস্ত্র বিদ্ধ হইল না। রাজা সেই অগ্নির মধ্যে পতিত হইয়া অতিশয় যন্ত্রণা পাইতে লাগিলেন। উইগ্‌লাফ ব্যতীত তাঁহার অন্য সমস্ত সহচর বনে পলায়ন করিল। উইগ্‌লাফ অগ্নিমধ্যে প্রবেশ করিল, এবং তাহাদের উভয়ের খড়্গাঘাতে সেই ড্র্যাগন বিচ্ছিন্ন-শরীর ও বিনষ্ট হইল। কিন্তু রাজার ক্ষতস্থান ফুলিয়া উঠিল ও জ্বলিতে লাগিল, 'তিনি দেখিলেন তাঁহার বক্ষের মধ্যে বিষ ফুটিতেছে।' তিনি মৃত্যুকালে বলিলেন, 'পঞ্চাশ বৎসর আমি এই-সকল প্রজাদিগকে পালন করিয়াছি। এমন কোনো রাজা ছিল না যে আমাকে ভয় দেখাইতে বা আমার নিকট সৈন্য পাঠাইতে সাহস করিত। আমার যাহা-কিছু ছিল তাহা ভালোরূপ রক্ষা করিয়াছি, কোনো বিশ্বাসঘাতকতা করি নাই, অন্যায় শপথ করি নাই। যদিও আমি মৃত্যু-আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছি, এই-সকল কারণে তথাপি আমার আনন্দ হইতেছে। প্রিয় উইগ্‌লাফ! এখনি যাও, ওই শ্বেত-প্রস্তর-শালা (দৈত্যের আবাস) অনুসন্ধান করিয়া দেখো, গুপ্তধন পাইবে। আমার জীবন দিয়া ধনরাশি ক্রয় করিয়াছি, উহা আমার প্রজাদের অভাবের সময় কাজে লাগিবে। আমার মৃত্যুর পূর্বে আমার প্রজাদের জন্য এই যে ধন পাইয়াছি ইহার নিমিত্ত দেবতার নিকট ঋণী রহিলাম।' এই কাব্যের কবিতা যতই অসম্পূর্ণ হউক, ইহার নায়ক যে অতি মহান তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ইঁহার চরিত্রে প্রতিপদে পৌরুষ প্রকাশ পাইতেছে। পরের উপকারের জন্য নিজের প্রাণ দিতে ইনি কখনো সংকুচিত হন নাই। সেই সময়কার সমাজের অসভ্য অবস্থায় এরূপ চরিত্র যে চিত্রিত হইতে পারিবে ইহা একপ্রকার অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়।

অ্যাংলো স্যাক্‌সন কবিতা হৃদয়ের কথা মাত্র, আর কিছুই নহে। ইহাতে চিন্তার কোনো সংস্রব নাই। ইহার কবিতা কতকগুলি ভাঙা ভাঙা কথার সমষ্টিমাত্র— ছন্দও তেমনি ভাঙা ভাঙা, ঠিক যেন হৃদয়ের পূর্ণ উচ্ছ্বাসের সময় সকল কথা ভালো করিয়া বাহির হইতেছে না। 'সৈন্যদল

যাইতেছে, পাখিরা গাইতেছে, ঝিল্লিরব হইতেছে, যুদ্ধাস্ত্রের শব্দ উঠিতেছে— বর্মের উপর বর্শাঘাতের ধ্বনি হইতেছে। ওই উজ্জ্বল চন্দ্র আকাশের তলে ভ্রমণ করিতে লাগিল। ভয়ানক দৃশ্যসকল দৃষ্টিগোচর হইল।... প্রাঙ্গণে যুদ্ধ-কোলাহল উত্থিত হইল। তাহারা কাষ্ঠের ঢাল হস্তে ধারণ করিল। তাহারা মস্তকের অস্থিভেদ করিয়া অস্ত্র বিদ্ধ করিল। দুর্গের ছাদ প্রতিধ্বনিত হইল।... অন্ধকারবর্ণ অশুভদর্শন কাকেরা চারি দিকে উইলোপত্রের ন্যায় উড়িয়া বেড়াইতে লাগিল।'

অ্যাংলো স্যাক্সন কবিতায় প্রেমের কথা নাই বলিলেও হয়; কিন্তু বন্ধুত্ব ও প্রভুপ্রীতির সুন্দর বর্ণনা আছে। 'বৃদ্ধ রাজা তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ অনুচরকে আলিঙ্গন করিলেন— দুই হস্তে তাহার গলা জড়াইয়া ধরিলেন, বৃদ্ধ অধিপতির কপোল বাহিয়া অশ্রু প্রবাহিত হইল, সে বীর তাঁহার এত প্রিয় ছিল। তাঁহার হৃদয় হইতে যে অশ্রুধারা উত্থিত হইল তাহা নিবারণ করিলেন না। হৃদয়ে মর্মের গভীর তন্ত্রীতে তাঁহার প্রিয় বীরের জন্য গোপনে নিশ্বাস ফেলিলেন।'

কোনো দেশান্তরিত ব্যক্তি তাহার প্রভুকে স্বপ্নে দেখিতেছে— যেন তাঁহাকে আলিঙ্গন, চুম্বন করিতেছে, যেন তাঁহার ক্রোড়ে মাথা রাখিতেছে। অবশেষে যখন জাগিয়া উঠিল, যখন দেখিল সে একাকী, যখন দেখিল সম্মুখে জনশূন্য প্রদেশ বিস্তীর্ণ, সামুদ্রিক পক্ষীরা পক্ষবিস্তার করিয়া তরঙ্গে ডুব দিতেছে, বরফ পড়িতেছে, তুষার জমিতেছে, শিলাবৃষ্টি হইতেছে, তখন সে কহিয়া উঠিল—

'কতদিন আনন্দের সহিত আমরা মনে করিয়াছিলাম যে, মৃত্যু ভিন্ন আর কিছুতেই আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারিবে না, অবশেষে তাহা মিথ্যা হইল, যেন আমাদের মধ্যে কখনো বন্ধুত্ব ছিল না। কষ্ট দিবার জন্য মানুষেরা আমাকে এই অরণ্যে এক ওক্ বৃক্ষের তলে এই গহ্বরে বাস করিতে দিয়াছে। এই মৃত্তিকার নিবাস অতি শীতল, আমি শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি। গহ্বরসকল অন্ধকার, পর্বতসকল উচ্চ, কণ্টকময় শাখা-প্রশাখার নগর, এ কী নিরানন্দ আলয়!... আমার বন্ধুরা এখন ভূগর্ভে— যাহাদের ভালোবাসিতাম, এখন কবর তাহাদিগকে ধারণ করিতেছে। কবর তাহাদের রক্ষা করিতেছে— আর আমি একাকী ভ্রমিয়া বেড়াইতেছি। এই ওক্ বৃক্ষতলে এই গহ্বরে এই দীর্ঘ গ্রীষ্মকালে আমাকে বসিয়া থাকিতে হইবে।'

অ্যাংলো স্যাক্সন কবিতার ছন্দ বড়ো অদ্ভুত। ইহার মিল নাই বা অন্য কোনো নিয়ম নাই, কেবল প্রত্যেক দ্বিতীয় ছত্রে দুই-তিনটি এমন কথা থাকিবে যাহার প্রথম অক্ষর এক, যেমন—

Ne wæs her tha giet, nym the heolstirsceado
Wiht geworden ; ac thes wida grund
Stood deop and dim, drihtne fremde.
Idel and unnyt.

অ্যাংলো স্যাক্সন খৃস্টান কবিদিগের মধ্যে প্রধান ও প্রথম, কিডমন (Cædmon)। অনেক বয়স পর্যন্ত কিডমন কবিতা রচনা করিতে পারিতেন না। একদিন এক নিমন্ত্রণ সভায় সকলে বীণা লইয়া পর্যায়ক্রমে গান গাইতেছিল, কিডমন যেই দেখিলেন, তাঁহার কাছে বীণা আসিতেছে, অমনি আস্তে আস্তে সভা হইতে উঠিলেন এবং বাড়ি প্রস্থান করিলেন। একদিন রাত্রে এক অশ্বশালায় চৌকি দিতে দিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন, স্বপ্ন দেখিলেন একজন কে যেন আসিয়া তাঁহাকে কহিতেছে, 'কিডমন, আমাকে একটা গান শুনাও।' কিডমন কহিলেন, 'আমি যে গাইতে পারি না।' সে কহিল, 'তাহা হউক, তুমি গাহিতে পারিবে।' কিডমন কহিলেন, 'কী গান গাইব।' সে কহিল, 'সৃষ্টির আরম্ভ বিষয়ে।' ঘুম ভাঙিয়া গেলে কিডমন আবেস্ হিলডার নিকট গিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত কহিলেন; আবেস্ মনে করিলেন কিডমন দেবপ্রসাদ পাইয়াছেন, তিনি কিডমনকে তাঁহার দেবালয়ের সন্ন্যাসী-দলভুক্ত করিয়া লইলেন। কৃত্তিবাস যেমন কথকতা শুনিয়া রামায়ণ লিখিতেন, তেমনি একজন কিডমনকে বাইবেল অনুবাদ করিয়া শুনাইত আর তিনি তাহা ছন্দে

পরিণত করিতেন। আমাদের দেশের কবিদের সহিত, কিডমনের স্বপ্ন-আদেশের বিষয় কেমন মিলিয়া গিয়াছে।

সৃষ্টির বিষয়ে কিডমন এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন—

গুহা-অন্ধকার ছাড়া ছিল না কিছুই!
এ মহা অতলস্পর্শ আঁধার গভীর—
আছিল দাঁড়ায়ে শুধু শূন্য নিষ্ফল।
উন্নত ঈশ্বর তবে দেখিলা চাহিয়া
এই নিরানন্দস্থান! দেখিলা হেথায়
অন্ধকার, বিষণ্ণ ও শূন্য মেঘরাশি
রহিয়াছে চিরস্থির-নিশীথিনী ল'য়ে।
উত্থিত হইল সৃষ্টি ঈশ্বর-আজ্ঞায়।
মহান ক্ষমতাবলে অনন্ত ঈশ্বর
প্রথমে স্বর্গ ও পৃথ্বী করিলা সৃজন।
নির্মিলা আকাশ; আর এ বিস্তৃত ভূমি
সর্বশক্তিমান প্রভু করিলা স্থাপন।
পৃথিবী তরুণ তৃণে ছিল না হরিত,
সমুদ্র চিরান্ধকারে আছিল আবৃত,
পথ ছিল সুদূর-বিস্তৃত, অন্ধকার!
আদেশিলা মহাদেব জ্যোতিরে আসিতে
এ মহা আঁধার স্থানে। মুহূর্তে অমনি—
ইচ্ছা পূর্ণ হল তাঁর। পবিত্র আলোক
এই মরুময় স্থানে পাইল প্রকাশ।

কিডমন ইজিপ্টের ফ্যারাওর (Pharaoh) যুদ্ধে মৃত্যুবর্ণনা করিতেছেন—

ভয়ে তাহাদের হৃদি হইল আকুল!
মৃত্যু হেরি সমুদ্র করিল আর্তনাদ,
পর্বত-শিখর রক্তে হইল রঞ্জিত,
সিন্ধু রক্তময় ফেন করিল উদ্‌গার,
উঠিল মৃত্যু-আঁধার, গর্জিল তরঙ্গ,
পলা'ল ইজিপ্টবাসী ভয়ে কম্পান্বিত!

. . .

সমুদ্র তরঙ্গরাশি মেঘের মতন
ধাইয়া তাদের পানে, পড়িল ঝাঁপিয়া;
গৃহে আর কাহারেও হল না ফিরিতে
যেথা যায় সেখানেই উন্মত্ত জলধি—
বিনষ্ট হইয়া গেল তাহাদের বল,
উঠিল ঝটিকা ঘোর আকাশ ব্যাপিয়া,
করিল সে শত্রুদল দারুণ চীৎকার!
মৃত্যুর নিদানে বায়ু হল ঘনীভূত!

পাঠকেরা যদি মিলটনের শয়তানের সহিত কিডমনের শয়তানের তুলনা করিয়া দেখেন তবে অনেক সাদৃশ্য পাইবেন।

কেন বা সেবিব তাঁরে প্রসাদের তরে?
কেন তাঁর কাছে হব দাসত্বে বিনত?
তাঁর মতো আমিও বিধাতা হতে পারি।
তবে শুন— শুন সবে বীর-সঙ্গীগণ
তোমরা সকলে মোর করো সহায়তা,
তা হলে এ যুদ্ধে মোরা লভিব বিজয়।
সুবিখ্যাত, সুদৃঢ়-প্রকৃতি বীরগণ
আমারেই রাজা ব'লে করেছে গ্রহণ।
সুযুক্তি দিবার যোগ্য ইহারাই সবে,
যুঝিব ঈশ্বর সাথে ইহাদের লয়ে।

. . .

ইহাদেরি রাজা হয়ে শাসিব এ দেশ,
তবে কী কারণে হব তাঁহারি অধীন?
কখনো— কখনো তাঁর হইব না দাস।

আর-এক স্থলে—

উচ্চ স্বর্গধামে মোরে করিলেন দান—
ঈশ্বর যে সুখ-ভূমি, সে স্থানের সাথে
এ সংকীর্ণ আবাসের কী ঘোর প্রভেদ।
যদি কিছুক্ষণ তরে পাই গো ক্ষমতা—
এক শীত ঋতু তরে হই মুক্ত যদি
তাহা হলে সঙ্গীগণ ল'য়ে— কিন্তু হায়—
চারি দিকে রহিয়াছে লৌহের বাঁধন!
এই ঘোর নরকের দৃঢ়মুষ্টি মাঝে
কী দারুণরূপে আমি হয়েছি আবদ্ধ!
ঊর্ধ্বে, নিম্নে জ্বলিতেছে বিশাল অনল—
এমন জঘন্য দৃশ্য দেখি নি কখনো!

বীরের নৈরাশ্য সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে। অবশেষে শয়তান স্থির করিলেন যদি ঈশ্বর-সৃষ্ট মনুষ্যের কোনো অপকার করিতে পারেন তাহা হইলে তিনি 'এই শৃঙ্খলের মধ্যে থাকিয়াও সুখে ঘুমাইবেন'।

ইতিমধ্যে ডেনিসরা একবার ইংলন্ড আক্রমণ করিয়াছিল; কিন্তু অ্যালফ্রেড তাহাদিগকে দমন করেন। নবম শতাব্দীতে অ্যালফ্রেডের রাজত্বকালে অ্যাংলো স্যাক্সন ভাষা ও সাহিত্য চরম উন্নত সীমায় পৌঁছিয়াছিল। অ্যালফ্রেডের এই একমাত্র বাসনা ছিল যে, যাহাতে 'মৃত্যুর পর তিনি তাঁহার সৎকার্যের স্মরণচিহ্ন রাখিয়া যাইতে পারেন'। সে বিষয়ে তিনি কৃতকার্য হইয়াছিলেন। তিনি একজন বলবান যোদ্ধা ছিলেন, ও তখনকার ইংলন্ডের অন্যান্য রাজ্য অতিশয় বিশৃঙ্খল হইয়াছিল, ইচ্ছা করিলে হয়তো তিনি সমস্ত ইংলন্ড বশে আনিতে পারিতেন। কিন্তু সেদিকে তাঁহার অভিলাষ ধাবিত হয় নাই, শান্তিস্থাপনা, সুশাসন ও নিজ প্রজাদের মধ্যে সুশিক্ষা প্রচার করাই তাঁহার একমাত্র ব্রত ছিল। অ্যালফ্রেডের যে অসাধারণ প্রতিভা বা উদ্‌ভাবনী শক্তি ছিল তাহা নহে, তাঁহার সৎ ইচ্ছা ও মহান অধ্যবসায় ছিল। তিনি তাঁহার উচ্চ আশা ও স্বার্থ পরিতৃপ্ত করিতে কিছুমাত্র মন দেন নাই, প্রজাদের মঙ্গলই তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য ছিল। তিনি দুঃখ করিয়া বলেন যে, এমন একদিন ছিল যখন বিদেশ হইতে লোকে ইংলন্ডে বিদ্যা শিখিতে আসিত, কিন্তু এখন বিদ্যা শিখিতে গেলে বিদেশীদের নিকট শিখিতে হয়। এই অজ্ঞতা দূর করিবার জন্য তিনি দেশীয় ভাষায় নানা পুস্তক অনুবাদ করিতে লাগিলেন। অ্যালফ্রেড যদিও অনেক লাটিন

পুস্তক অনুবাদ করিয়াছিলেন তথাপি তাঁর লাটিন অতি অল্পই জানা ছিল; অতি প্রশংসনীয় সরলতার সহিত ইহা তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন : 'যদি আমার চেয়ে কেহ অধিক লাটিন জান, তবে আমায় কেহ দোষ দিয়ো না, কারণ প্রত্যেক মনুষ্য তাহার যে পর্যন্ত ক্ষমতা আছে, সেই অনুসারেই কথা কহিবে ও কাজ করিবে।' তাঁহার অনুবাদের মধ্যে স্থানে স্থানে লাটিনের অজ্ঞতা স্পষ্ট প্রকাশ পাইয়াছে। অ্যালফ্রেডই অ্যাংলো স্যাক্সন ভাষায় গদ্যের প্রথম সৃষ্টিকর্তা। তখনকার অজ্ঞলোকদের বুঝাইবার জন্য তাঁহার অনুবাদ যথাসাধ্য সহজ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, এক ছত্র ভাঙিতে গিয়া তাঁহাকে দশ ছত্র লিখিতে হইয়াছিল। ইঁহার সময় হইতেই ইংলন্ডের Chronicle অর্থাৎ ঐতিহাসিক বিবরণ লিখিত হয়। কিন্তু সে অতি শুষ্ক ও নীরস। তাহা ইতিহাসের কোনো উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারে নাই। তাহাতে তখনকার ব্যক্তিদিগের অবস্থার বিষয় কিছুই বর্ণিত হয় নাই, কেবল অমুক বৎসরে দুর্ভিক্ষ হইল, অমুক বৎসরে অমুক নগরে আগুন লাগিল, অমুক বৎসরে একটা ধূমকেতু উঠিল, ইত্যাদি কতকগুলি ঘটনার বিবরণ মাত্র লিখিত আছে।

আবার ডেনিসরা ইংলন্ড আক্রমণ করে; এবার ইংলন্ড তাহাদের হস্তগত হইল। ডেনিসদের সহিত স্যাক্সনদের ভাষা ও আচার-ব্যবহারের বিশেষ কিছুই প্রভেদ ছিল না। কান্যুট প্রজাদের কীরূপ প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন, তাহা সকলেই জানেন। যাহা হউক, অ্যাংলো স্যাক্সন রাজত্বের শেষভাগে অ্যাংলো স্যাক্সন সাহিত্যের যথেষ্ট অবনতি হইয়া আসিয়াছিল। ধর্মাচার্যগণ অলস বিলাসী অজ্ঞ, সাধারণ লোকেরা নীতিভ্রষ্ট ও ধূর্ত হইয়া আসিতেছিল। এই সময় ইংলন্ডে নর্মান সভ্যতা-স্রোত প্রবেশ করিয়া দেশের ও ভাষার যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছিল। যাহা হউক, ডেনিসরাজ্য শীঘ্রই বিলুপ্ত হইল।

খৃস্টীয় ধর্ম প্রবেশ করিলে পর ইংরাজি ভাষায় অনেক রোমীয় কথা প্রবেশ করে। কিন্তু নর্মান অধিকারের সময়েই অধিকাংশ লাটিন-ধাতুজাত কথা ইংরাজি ভাষায় প্রচলিত হয়। অনেক ডেনিস কথা ইংরাজিতে পাওয়া যায়।

যখন স্যাক্সনেরা তাহাদের আদিম দেশে ছিল তখন তাহাদের স্বভাব কীরূপ ছিল তাহা বর্ণনা করিয়াছি। যখন ইংলন্ডে আসিয়া তাহারা একটা স্থায়ী বাসস্থান পাইল, তখন তাহাদের বিলাসের দিকে দৃষ্টি পড়িল। কিন্তু সে কীরূপ বিলাস? মুসলমানেরা ভারতবর্ষে আসিয়া যেরূপ বিলাসে মগ্ন হইয়াছিল, ইহা সে বিলাস নহে। যে বিলাসের সহিত সুকুমার বিদ্যার সংস্রব আছে, ইহা সে বিলাস নহে। অ্যাংলো স্যাক্সনদের শিল্প দেখো, নাই বলিলেও হয়; তাহাদের কবিতা দেখো, কেবল রক্তময়। কবিতার যে অংশের সহিত শিল্পের যোগ আছে— ছন্দ, তাহা স্যাক্সন ভাষায় অতি বিশৃঙ্খল। লাটিন সাহিত্যের আদর্শ পাইয়াও তাহাদের কবিতার ও ছন্দের বিশেষ কিছুই উন্নতি হয় নাই। স্যাক্সনদের হৃদয়ে সুন্দর-ভাবের আদর্শ ছিল না বলিয়াই মনে হয়— তাহাদের বিলাস আর কী হইতে পারে? আহার ও পান। সমস্ত দিনরাত্রি পানভোজনেই মত্ত থাকিত। এড্‌গারের সময় ধর্মমন্দিরে অর্ধরাত্রি পর্যন্ত নাচ গান পান ভোজন চলিত। পৃথিবীর প্রথম যুগের অসহায় অবস্থার সহিত যুদ্ধ করিয়া একটু অবসর পাইলেই, আর্যেরা (আর্যেরা বলিলে যদি অতি বিস্তৃত অর্থ বুঝায় তবে হিন্দুরা) স্বভাবতই জ্ঞান উপার্জনের দিকে মনোযোগ দিতেন, কিন্তু স্যাক্সনেরা তাহাদের অবসরকাল অতিবাহিত করিবার জন্য অদ্ভুত উপায় বাহির করিয়াছিল; সে উপায়টি— দিনরাত্রি অজ্ঞান হইয়া থাকা। তাহারা উত্তেজনা চায়, তাহারা ঋষিদের মতো অমন বিজনে বসিয়া ভাবিতে পারে না— অসভ্য সংগীত উচ্চৈঃস্বরে গাইয়া, যুদ্ধের নৃশংস আমোদে উন্মত্ত থাকিয়া তাহারা দিন যাপন করিতে চায়। রক্তপাত ও লুটপাট ছাড়া আর কথা ছিল না। দাস ব্যবসায় যদিও আইনে বারণ ছিল, কিন্তু সে বারণে কোনো কাজ হয় নাই— নর্মান রাজত্ব সময়ে দাস ব্যবসায় উঠিয়া যায়। গর্ভবতী দাসীদিগের মূল্য অনেক বলিয়া তাহারা স্ত্রী দাসীদিগের প্রতি জঘন্য আচরণ করিত। তবুও খৃস্টধর্ম ইহাদের অনেকটা নরম করিয়া

আনিয়াছিল। স্যাক্‌সনদের বুদ্ধি তখন তীব্র নহে। তাহাদের মধ্যে প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি অতি অল্পই জন্মিয়াছে। তাহাদের কবিতার উপাখ্যানসমূহের ভালোরূপ ধারাবাহিক যোগ নাই, তাহাদের কবিদের ঔপন্যাসিক ক্ষমতা তেমন ছিল না। স্যাক্‌সনদের মধ্যে বিদ্যা-প্রচার করিবার জন্য অনেকবার চেষ্টা করা হইয়াছিল, কিন্তু সে বিষয়ে কেহই কৃতকার্য হয় নাই। স্যাক্‌সন ধর্মাচার্যদের মধ্যে যে বিদ্যাচর্চার আরম্ভ হয় তাহা কয়েক শতাব্দী মাত্র থাকে, তাহার পরেই আবার সমস্ত অন্তর্হিত হইয়া যায়। নর্মানরা আসিয়া স্যাক্‌সন খৃস্ট-পুরোহিতদিগের অজ্ঞতা দেখিয়া অতিশয় বিরক্ত হয়। অ্যাংলো স্যাক্‌সন সাহিত্য অতি সামান্য। অ্যালফ্রেডের গদ্যগ্রন্থ ও বোউল্‌ফ এবং অন্যান্য দুই-একটি কবিতা লইয়াই তাহাদের সাহিত্যের যথা-সর্বস্ব।

স্বাধীনতা-প্রিয়তা ও বীরত্ব স্যাক্‌সন জাতীয়দিগের প্রধান গুণ। তাহাদের সমস্ত স্বভাব পৌরুষেই গঠিত। সকলেই আপনার আপনার প্রভু। রাজার সহিত প্রজার তেমন প্রভেদ ছিল না— স্যাক্‌সন রাজ্যের শেষাশেষি সেই প্রভেদ জন্মে। জর্মনিতে ভীরুদিগকে পঙ্কে পুঁতিয়া বিনষ্ট করিত। স্যাক্‌সনেরা যাহাকে প্রধান বলিয়া মানে তাহার জন্য সকলই করিতে পারে। যে তাহার প্রধানকে না লইয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে প্রত্যাবর্তন করে, তাহার বড়ো অখ্যাতি। যে প্রধানের গৃহে তাহারা মদ্যপান করিয়াছে, যাহার নিকট হইতে বিশ্বাসের চিহ্ন তরবারি ও বর্ম পাইয়াছে তাহার জন্য প্রাণদান করিতে তাহারা কাতর নহে— এ ভাব তাহাদের কবিতার যেখানে-সেখানে প্রকাশ পাইয়াছে। স্যাক্‌সন জাতিদের কল্পনা ও সৌন্দর্য-প্রীতি ছিল না, তাহাদের চরিত্রে কার্যকরী বুদ্ধি ও পৌরুষ অতিমাত্র ছিল।

ভারতী
শ্রাবণ ১২৮৫

বিয়াত্রিচে, দান্তে ও তাঁহার কাব্য

ইতালিয়ার এই স্বপ্নময় কবির জীবন গ্রন্থের প্রথম অধ্যায় হইতে শেষ পর্যন্ত বিয়াত্রিচে (Beatrice)। বিয়াত্রিচেই তাঁহার সমুদয় কাব্যের নায়িকা, বিয়াত্রিচেই তাঁহার জীবন-কাব্যের নায়িকা। বিয়াত্রিচেকে বাদ দিয়া তাঁহার কাব্য পাঠ করা বৃথা, বিয়াত্রিচেকে বাদ দিলে তাঁহার জীবন-কাহিনী শূন্য হইয়া পড়ে। তাঁহার জীবনের দেবতা বিয়াত্রিচে, তাঁহার সমুদয় কাব্য বিয়াত্রিচের স্তোত্র। বিয়াত্রিচের প্রতি প্রেমই তাঁহার প্রথম কবিতার উৎস উৎসারিত করিয়া দেয়। তাঁহার প্রথম গীতিকাব্য 'ভিটা নুওভা'র (Vita Nuova) প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত বিয়াত্রিচেরই আরাধনা, ইহার কিয়দ্দূর লিখিয়াই তাঁহার বিরক্তি বোধ হইল— তাঁহার মনঃপূত হইল না; পাঠকের চক্ষে বিয়াত্রিচেকে দূর-স্বর্গের অলৌকিক দেবতার ন্যায় চিত্রিত করিয়াও তিনি পরিতৃপ্ত হইলেন না। এই কাব্যের শেষ ভাগে তিনি লিখিতেছেন—

'এই পর্যন্ত লিখিয়াই আমি এক অতিশয় আশ্চর্য স্বপ্ন দেখিলাম— সেই স্বপ্নে যাহা দেখিলাম তাহাতে এই স্থির করিলাম যে, আমি সেই প্রিয় দেবীর বিষয় যাহা লিখিতেছি তাহা তাঁহার যোগ্য নহে— যে পর্যন্ত ইহা অপেক্ষা যোগ্যতর কবিতা না লিখিতে পারিব সে পর্যন্ত আর লিখিব না। ইহা নিশ্চয়ই যে, তিনি (বিয়াত্রিচে) জানিতেছেন, আমি তাঁহার বিষয়ে যোগ্যতর কবিতা লিখিবার ক্ষমতা প্রাপ্তির জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছি। সমুদয় জীবের প্রাণদাতা ঈশ্বর-প্রসাদে আর কিছুদিন যদি বাঁচিয়া থাকি, তবে তাঁহার বিষয়ে এমন লিখিব, যাহা এ পর্যন্ত কোনো মহিলার সম্বন্ধে কেহ কখনো লেখে নাই।' এই স্থির করিয়াই তিনি তাঁহার মহাকাব্য 'ডিভাইনা কামেডিয়া' (*Divina Commedia*) লিখেন ও বিয়াত্রিচে সম্বন্ধে এমন কথা বলেন, যাহা কোনো মহিলা সম্বন্ধে কেহ কখনো বলে নাই।

দান্তে তাঁহার নয় বৎসর বয়স হইতেই বিয়াত্রিচেকে ভালোবাসিতে আরম্ভ করেন; কিন্তু তাঁহার প্রেম সাধারণ ভালোবাসা নামে অভিহিত হইতে পারে না। বিয়াত্রিচের সহিত তাঁহার প্রেমের আদান-প্রদান হয় নাই, নেত্রে নেত্রে নীরব প্রেমের উত্তর-প্রত্যুত্তর হয় নাই। অতিদূর সাক্ষাৎ— দূর আলাপ ভিন্ন বিয়াত্রিচের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ ও আলাপ হয় নাই। অতি দূরস্থ দেবীর ন্যায় তিনি দূর হইতে সসম্ভ্রমে বিয়াত্রিচেকে দেখিতেন, অতি দূর হইতে তাঁহার গ্রীবানমিত নমস্কারে আপনাকে দেবানুগৃহীত মনে করিতেন। যে সভায় বিয়াত্রিচে আছেন, সে সভায় গেলে তিনি কেমন অভিভূত হইয়া পড়িতেন, তিনি কথা কহিতে পারিতেন না, তাঁহার শরীর কাঁপিতে থাকিত! বিয়াত্রিচেকে তিনি তাঁহার প্রেমের কাহিনী বলেন নাই, বলিতে সাহস করেন নাই, বা বলিবার আবশ্যক বোধ করেন নাই। তিনি আপনার প্রেমের স্বপ্নেই আপনি মগ্ন থাকিতেন, তাঁহার প্রেম জাগ্রত রাখিবার জন্য বিয়াত্রিচের প্রতিদান আবশ্যক ছিল না। তাঁহার কাব্য পড়িলে বিয়াত্রিচেকে মানুষ হইতে উচ্চ-পদবী-গত মনে হয়, তাঁহার নিকট হইতে অনুগ্রহ ভিন্ন প্রেম-প্রত্যাশা করিবার ইচ্ছা মনে এক মুহূর্তও স্থান পায় না। যদিও 'ভিটা নুওভা' কাব্যের নায়িকাই বিয়াত্রিচে, কিন্তু পাঠকেরা বিয়াত্রিচের মুখ হইতে একটি কথাও শুনিতে পান নাই, বিয়াত্রিচে সর্বদাই তাঁহাদের নিকট হইতে দূরে রহিয়াছেন। রূপক প্রভৃতির দ্বারা বিয়াত্রিচেকে দান্তে এমন একটি মেঘময় অস্ফুট আবরণে আবৃত করিয়া রাখিয়াছেন যে, পাঠকের চক্ষে সেই অস্ফুট মূর্তি অতি পবিত্র বলিয়া প্রতিভাত হয়। দান্তে তাঁহার প্রেমার্দ্র হৃদয়ে মনে করিতেন, 'যে ব্যক্তিই বিয়াত্রিচের নিকট আসিত তাহারই হৃদয়ে এমন গভীর ভক্তির উদ্রেক হইত যে, তাহার মুখের দিকে নেত্র তুলিতে তাহার সাহস হইত না।' দান্তে বলেন, 'যখন মনুষ্যেরা তাঁহার দিকে চাহিত তখনি তাহারা কেবল একটি মাধুর্য ও মহত্ত্ব অনুভব করিত।' দান্তে ভক্তির চক্ষে দেখিতেন, সমস্ত পৃথিবী বিয়াত্রিচের পূজা করিতেছে, দেবতারা তাঁহাকে আপনাদের মধ্যে আনিবার জন্য প্রার্থনা করিতেছেন। দান্তের 'ডিভাইনা কামেডিয়া'র নরকের দ্বার-রক্ষকেরা বিয়াত্রিচের নাম শুনিয়াই অমনি সসম্ভ্রমে দ্বার খুলিয়া দিতেছে— দেবতারা বিয়াত্রিচের নাম শুনিয়া অমনি স্বর্গযাত্রীদ্বয়কে সহর্ষে আহ্বান করিতেছেন। বিয়াত্রিচের মৃত্যুর পর দান্তে অশ্রুপূর্ণ নয়নে দেখিলেন, যেন সমস্ত নগরীই রোদন করিতেছে। বিয়াত্রিচের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ বর্ণনাই 'ভিটা নুওভা'র আরম্ভ—

'যখন আমার জীবনের আরম্ভ হইতে নয় বার মাত্র সূর্য তাঁহার কক্ষ প্রদক্ষিণ করিয়াছে, এমন সময়ে আমার হৃদয়ের মহান মহিলা আমার চক্ষের সমক্ষে আবির্ভূত হইলেন।... তখন তাঁহার জীবনের আরম্ভ মাত্র এবং আমার বয়স নবম বৎসর অতিক্রম করিয়াছে। তাঁহার শরীরে সুন্দর লোহিত বর্ণের পরিচ্ছদ, একটি কটিবন্ধ ও বাল্যবয়সের উপযুক্ত কতকগুলি অলংকার। সত্য বলিতেছি তাঁহাকে দেখিয়া সেই মুহূর্তেই আমার হৃদয়ের অতি নিভৃত নিলয়স্থিত মর্ম পর্যন্ত কাঁপিয়া উঠিল, এবং তাহার প্রভাব আমার শরীরের শিরায় শিরায় প্রকাশিত হইল। সে (মর্ম) কাঁপিতে কাঁপিতে এই কথাগুলি বলিল ওই দেখো, আমা অপেক্ষা সরলতর দেবতা আমার উপর আধিপত্য করিতে আসিয়াছেন;... সেই সময় হইতে প্রেম আমার হৃদয়-রাজ্যের অধিপতি হইল।... দেবতাদিগের মধ্যে কনিষ্ঠ দেবতাটিকে (বিয়াত্রিচেকে) দেখিবার জন্য প্রেমের দ্বারা উত্তেজিত হইয়া বাল্যকালে কতবার তাহার অন্বেষণে ফিরিয়াছি। সে এমন প্রশংসনীয়; তাহার ব্যবহার এমন মহৎ যে কবি হোমারের উক্তি তাহার প্রতি প্রয়োগ করা যাইতে পারে— অর্থাৎ 'তাহাকে দেখিয়া মনে হয় সে দেবতাদের মধ্যে জন্মলাভ করিয়াছে, মানুষের মধ্যে নহে'। বিয়াত্রিচের পিতা একটি ভোজ দেন, সেই ভোজে দান্তের পিতা তাঁহার পুত্রকে সঙ্গে লইয়া যান; সেই সভাতেই দান্তের সহিত বিয়াত্রিচের উক্ত প্রথম সাক্ষাৎ হয়। দ্বিতীয় সাক্ষাৎ এইরূপে বর্ণিত হয় : 'উপরি-উক্ত মহান মহিলার সহিত সাক্ষাতের পর নয় বৎসর পূর্ণ হইয়াছে. এমন সময়ে নিষ্কলঙ্ক-শুভ্র-বসনা, সখীদ্বয়-পরিবেষ্টিতা সেই বিস্ময়জনক মহিলা আর-একবার আমার সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। তিনি রাজপথ দিয়া যাইবার সময় আমি যেখানে সসম্ভ্রমে স্তম্ভিত হইয়া

দাঁড়াইয়া ছিলাম, সেই দিকে নেত্র ফিরাইলেন, এবং তাঁহার সেই অনির্বচনীয় নম্রতার সহিত এমন শ্রীপূর্ণ নমস্কার করিলেন যে, আমি সেই মুহূর্তেই সৌন্দর্যের সর্বাঙ্গ যেন দেখিতে পাইলাম।... এইবার প্রথম তাঁহার কথা শুনিতে পাইলাম, শুনিয়া এমন আহ্লাদ হইল যে, সুরামত্তের ন্যায় আমার সঙ্গীদের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া ছুটিয়া আসিলাম। আমার নির্জন গৃহে আসিয়া সেই অতিশয় ভদ্রমহিলার বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলাম। ভাবিতে ভাবিতে নিদ্রা আসিল ও এক আশ্চর্য স্বপ্ন দেখিলাম। সেই স্বপ্নের বিষয় সেই-সময়কার প্রধান প্রধান কবিদের জানাইব স্থির করিলাম। যাঁহারা যাঁহারা প্রেমের অধীন আছেন তাঁহাদের বন্দনা করিয়া ও তাঁহাদের এই স্বপ্নের প্রকৃত অর্থ-ব্যাখ্যা করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিয়া এই স্বপ্নের বিষয়ে একটি কবিতা লিখিব স্থির করিলাম। সেই কবিতাটি (Sonnet) এই—

প্রেম-বন্দী হৃদি যাঁরা, সুকোমল মন,
যাঁরা পড়িবেন এই সংগীত আমার,
তাঁরা মোর অনুনয় করুন শ্রবণ,
বুঝায়ে দিউন্‌ মোরে অর্থ কী ইহার?
যে কালে উজ্জ্বল তারা উজলে আকাশ,
নিশার চতুর্থ ভাগ হয়ে গেছে শেষ,
প্রেম মোর নেত্রে আসি হলেন প্রকাশ,
স্মরিলে এখনো কাঁপে হৃদয় প্রদেশ!
দেখে মনে হল যেন প্রফুল্ল আনন;
মোর হৃদ্‌পিণ্ড রহে করতলে তাঁর;
বাহু-'পরে শান্ত ভাবে করিয়া শয়ন
ঘুমাইয়া রয়েছেন মহিলা আমার—
অবশেষে জাগি উঠি, প্রেমের আদেশে
সভয়ে জ্বলন্ত-হৃদি করিলা আহার!
তার পরে চলি গেলা প্রেম অন্য দেশে
কাঁদিতে কাঁদিতে অতি বিষণ্ণ-আকার!

এই স্বপ্নের পর হইতে সেই অতি শ্রীমতী মহিলার চিন্তাতেই ব্যাপৃত ছিলাম। ক্রমে ক্রমে আমার স্বাস্থ্য এমন নষ্ট হইয়া আসিল যে, আমার আকার দেখিয়া বন্ধুরা অতিশয় চিন্তিত হইলেন; আবার যে গূঢ় কথা সকল-কথা অপেক্ষা আমি লুকাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়াছি, কেহ কেহ অসদভিপ্রায়ে তাহাই জানিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। আমি তাঁহাদের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া যুক্তি ও প্রেমের পরামর্শে উত্তর দিলাম যে, প্রেমের দ্বারাই আমার এই অবস্থা হইয়াছে। আমার আকারে প্রেমের চিহ্ন এমন স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছিল যে, সে গোপন করা বৃথা। কিন্তু যখন তাহারা জিজ্ঞাসা করিল— 'কাহার প্রেমে বিচলিত হইয়াছ?' আমি তাহাদের দিকে চাহিলাম, হাসিলাম, আর উত্তর দিলাম না।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, বিয়াত্রিচে দান্তেকে অভিবাদন করিলে দান্তে কী আনন্দ অনুভব করিতেন! কিন্তু একবার দান্তের নামে এক অতি মিথ্যা নিন্দা উঠে, সেই নিন্দা 'সেই অতি কোমলা, পাপের বিনাশয়িতা, পুণ্যের রাজ্ঞী-স্বরূপার' কানে গেল। দান্তে কহিতেছেন, 'এবার যখন তিনি আমার সম্মুখ দিয়া গেলেন তখন আমার সুখের একমাত্র কারণ সেই সুন্দর নমস্কার হইতে বঞ্চিত করিলেন। যেখানে যখন তাঁহাকে দেখিয়াছি তাঁহার সেই অমূল্য নমস্কারের আশায় আমি পৃথিবীর শত্রুতা ভুলিয়াছি, আমার হৃদয়ে এমন একটি উদারতা জন্মিত যে, পৃথিবীতে যে আমার যাহা-কিছু দোষ করিয়াছে সমুদায় মার্জনা করিতাম।' এ নমস্কার হইতে, তাঁহার সেই প্রেমের একমাত্র পুরস্কার হইতে যখন তিনি বঞ্চিত হইলেন, তখন তিনি অত্যন্ত যন্ত্রণা পাইলেন,

জনকোলাহল ভেদ করিয়া যেখানে একটি নির্জন স্থান পাইলেন সেইখানেই তীব্রতম অশ্রুজলে রোদন করিতে লাগিলেন। এইরূপে প্রথম উচ্ছ্বাস-বেগ নিবৃত্ত হইলে তাঁহার নির্জন গৃহে গিয়া 'কাতর শিশুর' ন্যায় কাঁদিতে কাঁদিতে ঘুমাইয়া পড়িলেন।

একবার কোনো বন্ধুর বিবাহ-সভায় তিনি আহূত হন। তাঁহার বন্ধুকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য নব বধূর প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিবেন স্থির করিতেছেন, এমন সময়ে সহসা তাঁহার শরীর কাঁপিতে লাগিল, তিনি দেখিলেন তাঁহার অতি নিকটেই বিয়াত্রিচে। তিনি এমন একপ্রকার অভিভূত হইয়া পড়িলেন যে, মহিলারা তাঁহার আকার দেখিয়া বিয়াত্রিচের সহিত চুপে চুপে কথা কহিতে লাগিলেন ও তাঁহাকে উপহাস করিতে আরম্ভ করিলেন! তিনি তাঁহাদের নিকট হইতে বিদায় লইয়া, নিজ গৃহে আসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন— 'যদি এই মহিলা (বিয়াত্রিচে) আমার অবস্থা জানিতেন, তবে আমার আকার দেখিয়া কখনো তিনি এরূপ উপহাস করিতেন না, বরং তাঁহার দয়া হইত!'

দান্তে তাঁহার সেই অভিলষিত নমস্কার আর এ পর্যন্ত পান নাই। একবার কতকগুলি মহিলা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'যাঁহাকে তুমি ভালোবাস, তাঁহার দর্শন মাত্রেই তুমি যদি অমন অভিভূত হইয়া পড়, তবে তোমার ভালোবাসিবার ফল কী?' তিনি উত্তর দিলেন, 'তাঁহার একটি নমস্কার পাওয়াই এ পর্যন্ত আমার ভালোবাসিবার একমাত্র লক্ষ্য ও ফল ছিল, তাঁহার নমস্কারই আমার ইচ্ছার একমাত্র গম্যস্থান ছিল— কিন্তু তিনি যখন তাহা না দিয়াই সন্তুষ্ট হইয়াছেন তখন তাহাই হউক— প্রেম আমাকে এমন আর-একটি সুখে নিবিষ্ট করিয়াছেন, যাহা কোনো কালেই শেষ হইবে না।' তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সে কোন্ সুখ?' দান্তে কহিলেন, 'আমার মহিলার প্রশংসা গান।' তাঁহার মহিলার প্রশংসার গান নিম্নে অনুবাদিত হইল—

রমণি! তোমরা বুঝ প্রেমের ব্যাপার—
মহিলার কথা মোর করহ শ্রবণ—
ব'লে ফুরায় না কভু প্রশংসা তাঁহার—
মন খুলে ব'লে তবু জুড়াইবে মন।
পৃথিবীতে যত কিছু আছে গো মহান—
তাহা হতে মহত্তর চরিত তাঁহার
হেন দীপিয়াছে প্রেমে এ মোর পরান,
চির বল অর্পিয়াছে বচনে আমার!
সাধ যায় করি তাঁর হেন যশোগান
সমস্ত পুরুষে তাঁর পদতলে আনি—
কিন্তু থাক্— গাব নাকো সে সমুচ্চ তান
গাহিতে ক্ষমতা যদি না থাকে কী জানি!
আমার এ ভালোবাসা অতি সুকোমল,
গাব তাই অতিশয় সুকোমল তানে—
সুকোমল হৃদি ওগো মহিলা সকল!
যে গান লাগিবে ভালো তোমাদের কানে!
স্বর্গের দেবতা এক কহিলা ঈশ্বরে—
'দেখো প্রভু, দেখো চেয়ে এই পৃথ্বীতলে—
মানব হইতে এক হেন জ্যোতি ক্ষরে,
নিম্ন দেশ পৃথিবীরে সে জ্যোতি উজলে!
স্বর্গের অভাব প্রভু নাই কিছু আর,
শুধু ওই জ্যোতি, ওই বিমল কিরণ।

তাই দেব অনুনয় শুন গো আমার,
দেবতার মাঝে তারে করো আনয়ন।'
আমাদের প্রতি দয়া হইল বিধির—
কহিলেন, 'ধৈর্য ধরো, আসুক সময়—
পৃথিবীতে এক জন আছে গো অধীর
কখন হারায় তারে সদা তার ভয়।'

...

প্রেম কহে তার পানে করি নিরীক্ষণ

...

ঈশ্বর নূতন সৃষ্টি করিলা সৃজন।
মুকুতার মতো পাণ্ডু বরন তাহার—
প্রকৃতির পূর্ণতম-শিল্প সেই জন,
কহি তারে পূর্ণতম আদর্শ শোভার!
সুন্দর নয়নে তার সদাই জাগ্রত
এমন প্রেমের জ্যোতি, এমন উজ্জ্বল
যে জ্যোতি দর্শক আঁখি করায় মুদিত—
সে জ্যোতি ঢালয়ে হৃদে আলোক বিমল।
হাসিতে চিত্রিত যেন প্রেমের আকার—
এক দৃষ্টে কে তাকাবে সে হাসি তাহার?
তোমারে কহি, হে গান, সন্তান প্রেমের,
তুমি তো যাইবে বহু মহিলার কাছে,
বিলম্ব কোরো না কভু, বলো তাঁহাদের—
'দেবীগণ, মোর শুধু এক কাজ আছে—
তাঁহার চরণে যাওয়া, যাঁর মহা যশে
ভাণ্ডার আমার এই পূর্ণ রহিয়াছে।'
যদিবা বিলম্ব তব হয় দৈববশে,
দেখো যেন রহিয়ো না তাহাদের কাছে—
অসাধু যাদের জ্ঞান, মন ভালো নয়—
কেবল রমণী আর প্রেমিকের কানে
খুলিয়ো হে গীত তুমি তোমার হৃদয়!
মহিলা আমার বসি আছেন সেখানে [যেখানে,]
সেখানে তোমারে তাঁরা যাবেন লইয়া—
তাঁরে মোর কথা তুমি দিয়ো বুঝাইয়া!

একবার দান্তে অত্যন্ত পীড়িত হন, পীড়ার সময় সহসা কেমন তাঁহার মনে হইল, বিয়াত্রিচের মৃত্যু হইবে। কল্পনা তাঁহাকে পাগলের মতো করিয়া তুলিল, কল্পনায় তিনি দেখিতে লাগিলেন, কেহ তাঁহাকে কহিতেছে, 'তোমার মৃত্যু হইবে।' কেহ বা কহিতেছে, 'তুমি মরিয়াছ।' তিনি দেখিলেন যেন সূর্য অন্ধকার, তারকারা রোদন করিতেছে, ভয়ানক ভূমিকম্প হইতেছে, তাঁহার চারি দিকে পাখিরা মরিতেছে ও পড়িতেছে— এই বিপ্লবের মধ্যে কে যেন তাঁহাকে কহিল, 'জান না তোমার অনুপম মহিলা পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়াছেন?' তিনি যেন বিয়াত্রিচের মৃত্যুকালীন

প্রশান্ত মুখ দেখিতে পাইলেন। সেই অজ্ঞান অবস্থায় এমন কাতর স্বরে মৃত্যুকে আহ্বান করিলেন যে, শয্যাপার্শ্বস্থ শুশ্রূষাকারিণী রমণী ভয়ে কাঁদিতে লাগিলেন। অবশেষে জাগ্রত হইয়া ইহা স্বপ্ন জানিতে পারিয়া সুস্থির হইলেন।

একদিন তিনি মনে করিলেন, এ পর্যন্ত তিনি তাঁহার মহিলার বিষয় যাহা-কিছু লিখিয়াছেন, সমুদয় অপূর্ণ হইয়াছে। ক্ষুদ্র গীতির মধ্যে ভাব প্রকাশ করিয়া পরিতৃপ্ত না হইয়া তিনি একটি বৃহৎ কবিতা লিখিতে আরম্ভ করিলেন—

কত কাল আছি আমি প্রেমের শাসনে,
এমন গিয়াছে স'য়ে অধীনতা তাঁর,
প্রথমে যা দুখ ব'লে করেছিনু মনে
এখন তা ধরিয়াছে সুখের আকার!
যদিও গো বলহীন হয়েছে পরান,
গেছে চলি তেজ যাহা ছিল এই চিতে,
তবু হেন সুখ প্রেম করেন গো দান
মৃত্যুমূল্য দিয়ে চাই সে সুখ কিনিতে!
প্রেমের প্রসাদে মোর হেন শক্তি আছে,
প্রত্যেক নিশ্বাস ধরি প্রার্থনা আকার—
অনুগ্রহ-ভিক্ষা চায় মহিলার কাছে—
অতি দীনভাবে অতি নম্রভাবে আর!
তাঁরে দেখিলেই আসে সে ভাব আমার।

এই কয় ছত্র লিখিয়াই সহসা গান থামিয়া গেল— সহসা ইহার নিম্নে লাটিন ভাষায় এই কথাগুলি লিখিত হইল 'যে নগরী লোকে পূর্ণ ছিল সে আজ কী নির্জন হইয়াছে! সমস্ত জাতির মধ্যে যে জাতি মহত্তম ছিল সে জাতি আজ কী বিধবার আকার ধারণ করিয়াছে!' বিয়াত্রিচের মৃত্যু হইয়াছে— এই সংবাদ শুনিয়াই সহসা যেন তাঁহার সংগীত থামিয়া গেল। এমন একটি মহান ঘটনা শুনিলেন যেন তাহা আর চলিত ভাষায় লিখা যায় না, গ্রাম্য ভাষায় লিখিলে তাহা যেন অতি লঘু হইয়া পড়ে। এই নিদারুণ দুঃখে তাঁহার আর কী সান্ত্বনা হইতে পারে? তিনি বিয়াত্রিচের মৃত্যু ও জন্মতিথি মিলাইয়া তখনকার জ্যোতিষ গণনার অনুসারে স্থির করিলেন— বিয়াত্রিচের মৃত্যুর সহিত নিশ্চয়ই খৃস্টীয় ত্রিমূর্তির (Holy Trinity) কোনো-না-কোনো যোগ আছে।— এই কল্পনাতেই তাঁহার কত সুখ হইল! তিনি নগরের প্রধান প্রধান লোকদিগকে পত্র লিখিলেন, তাহাতে বিয়াত্রিচের মৃত্যুতে নগরের কী দুর্দশা হইয়াছে তাহাই ব্যাখ্যা করিলেন— তাঁহার বিশ্বাস হইল, যেন বিয়াত্রিচের মৃত্যুতে সমস্ত নগরী অভাব অনুভব করিতেছে, অথবা যদি না করে, তবে প্রকৃতপক্ষে তাহাদের যে অভাব হইয়াছে, এ বিষয়ে তাহাদের চেতনা জন্মাইয়া দেওয়া তাঁহার কর্তব্য কর্ম।

ক্রমে ক্রমে দুঃখের অন্ধকার তাঁহার হৃদয়ে গাঢ়তর হইতে লাগিল— যখন অশ্রুজল শুকাইয়া গেল তখন স্থির করিলেন অশ্রুময় অক্ষরে তাঁহার মনের ভাব প্রকাশ করিবেন। এই ভাবিয়া, যাহারা তাঁহার দুঃখ বুঝিতে পারিবে, তাঁহার দুঃখে যাহারা সহজে মমতা করিতে পারিবে, সেই রমণীদের সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন—

এ নয়ন কাঁদিয়া কাঁদিয়া যন্ত্রণায়,
জীর্ণ হয়ে পড়িয়াছে গেছে শুকাইয়া—
নিভাতে এ জ্বালা যদি থাকে গো উপায়

(যেন জ্বালা অতি ধীরে যেতেছে লইয়া
ক্রমশ এ দেহ মোর কবরের পানে,)
তবে তাহা মৃত্যু, কিংবা প্রকাশি এ ব্যথা।
যখন মহিলা মোর আছিলা এখানে
আর কারে বলি নাই এ মর্মের কথা,
হে রমণি তোমাদের কোমল হৃদয়ে
মরমের কথা মোর ঢেলেছি কেবল।
যখন গেছেন তিনি স্বরগ আলয়ে—
রাখিয়া আমার তরে শোক-অশ্রুজল—
তখন যা-কিছু মোর বলিবার আছে
হে রমণি বলিব গো তোমাদেরি কাছে।

তিনি তাহাদিগকে কহিলেন— বিয়াত্রিচে উচ্চতম স্বর্গে গিয়াছেন, সেখানে যাইতে তাঁহার কিছুমাত্র কষ্ট পাইতে হয় নাই! ঈশ্বর তাঁহাকে আপনি ডাকিয়া লইলেন— ঈশ্বর দেখিলেন— এই যন্ত্রণাময় পৃথিবী এমন সুন্দর প্রাণীর বাসযোগ্য নহে। সংগীতটি এই বলিয়া সমাপ্ত করিলেন—

যাও তুমি, হে করুণ সংগীত আমার,
যাও সেথা যেইখানে রমণীরা আছে,
আগে তুমি যেতে সেথা বহি সুখভার,
কত সুখ পেতে, রহি তাহাদের কাছে!
এখনো তাদেরি কাছে করো গো প্রয়াণ,
বিষণ্ণ ও শূন্য তুমি শোকের সন্তান!

এইরূপে প্রথম বৎসর কাটিয়া গেলে পর একবার একটি স্থান দেখিয়া সহসা তাঁহার পূর্বস্মৃতি জাগ্রত হইয়া উঠিল। সেইখানে দাঁড়াইয়া তিনি অতি বিষণ্ণ বদনে পুরাতন কথা ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই বিষাদ আর কেহ দেখিতে পাইতেছে কিনা, তাহাই দেখিবার জন্য চারি দিকে নেত্রপাত করিলেন। সহসা দেখিতে পাইলেন— একটি বাতায়ন হইতে অতি সুন্দরী এক যুবতী তাঁহাকে এমন মমতার সহিত নিরীক্ষণ করিতেছেন যে, দয়া যেন তাঁহার নেত্রে স্পষ্ট প্রতিভাত হইয়াছে। এই মমতা পাইয়া দান্তের হৃদয় গলিয়া গেল, অশ্রু উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। এই মমতা পাইয়া কেবল কৃতজ্ঞতা নহে, ঈষৎ প্রেমের ছায়াও তাঁহার তরুণ হৃদয়ে পতিত হইল! সেদিন চলিয়া গেলেন— কিন্তু আবার তাহাকে দেখিতে কেমন বাসনা হইল, আর-একদিন সেইখানে গেলেন— আবার তাহাকে দেখিতে পাইলেন— দেখিলেন তাঁহার বিয়াত্রিচের ন্যায় তাহার মুখ পাণ্ডুবর্ণ। পাণ্ডুবর্ণকে দান্তে 'প্রেমের বর্ণ' নাম দিয়াছেন। দান্তে কহিলেন, 'আমার চক্ষু তাহাকে দেখিলে কেমন আনন্দ অনুভব করে।' পরক্ষণেই আবার চক্ষুকে তিরস্কার করিয়া কহিলেন, 'চক্ষু! তোর অশ্রুজল দেখিয়া কত লোকে অশ্রু ফেলিয়াছে, তুই আজ কি ভুলিয়া গেলি যে মহিলার (বিয়াত্রিচের) জন্য তুই রোদন করিতেছিস, সেই মহিলার কথা স্মরণ করিয়াই ওই রমণী তোর দিকে চাহিতেছেন?' কিন্তু ওই তিরস্কার বৃথা! আপনাকে ভর্ৎসনা করিলেন কিন্তু শোধন করিতে পারিলেন না। যেদিকে মন ধাবিত হয়, তাহার অনুকূলে কখনো যুক্তির অভাব হয় না।— অবশেষে স্থির করিলেন— প্রেম তাঁহাকে শাস্তি দিবার জন্যই উক্ত মহিলাকে তাঁহার চক্ষের সম্মুখে স্থাপিত করিয়াছেন— অতএব তাঁহার হৃদয়ের অভাব এই মমতাময়ী মহিলাই পূর্ণ করিবেন। এইরূপে নূতন-প্রেম যখন তাঁহার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইবার উপক্রম করিতেছিল, এমন সময়ে কল্পনার স্বপ্নে একদিন যেন প্রত্যক্ষ সেই লোহিত-বসনা বিয়াত্রিচেকে দেখিতে পাইলেন— ভস্মাচ্ছন্ন পুরাতন প্রেমের বহ্নি আবার জ্বলিয়া উঠিল ও নূতন প্রেম অঙ্কুরেই শুকাইল!

'ভিটা নুওভা' কাব্যে বিদেশীয় পথিকদিগকে সম্বোধন করিয়া নিম্নলিখিত গীতিটি লিখিত আছে—

ধীরে যাইতেছে চলি, ওগো যাত্রীদল
যেন কোন্ দূর বস্তু করি কল্পনা—
মোদের দহিছে যেই বিষাদ অনল
তোমাদের পরশে নি যেন সে যাতনা!
তোমাদের নিজদেশ এতই কি দূরে?
এ শোকার্ত নগরীর যাও মধ্য দিয়া
বোধ হয় তবু যেন জান না, এ পুরে
কী মহান শোকানল দহিতেছে হিয়া!
তবু যদি একবার দাঁড়াও হেথায়,
কিছুক্ষণ মোর কথা শোনো মন দিয়া—
তা হলে বিদায়কালে বিষম ব্যথায়
যাবে চলি উচ্চ স্বরে কাঁদিয়া কাঁদিয়া!
তিল মাত্র যার কথা করিলে বর্ণন,
তিল মাত্র যার কথা করিলে শ্রবণ,
মানুষ কাঁদিতে থাকে ব্যথিত অন্তর,
সেই বিয়াত্রিচে-হারা অভাগা নগর!

'ভিটা নুওভা' কাব্যে ইহার পরে আর-একটি মাত্র গীতি আছে। তাহাতে কবি কহিতেছেন, তাঁহার মন স্বর্গে গিয়াছিল, সেখানে দেখিলেন বিয়াত্রিচেকে দেবতারা পূজা করিতেছেন। সে বিয়াত্রিচেকে দেখিয়া কবি এমন বিস্মিত হইয়া গেলেন যে, ভাবিলেন, তাঁহাকে বর্ণনা করিতে গেলে এমন গভীর কথার প্রয়োজন হয় যে, সে কথার অর্থ তিনি নিজেই বুঝিতে পারেন না। তাহার পরেই বিয়াত্রিচে সম্বন্ধে যোগ্যতর কবিতা লিখিবেন স্থির করিয়া 'ভিটা নুওভা' কাব্য শেষ করিলেন।

বিয়াত্রিচে সম্বন্ধে যোগ্যতর কাব্য 'ডিভাইনা কমিডিয়া' (*Divina Commedia*)। 'ভিটা নুওভা' লেখা শেষ হইলে তাহার অনেক দিন পরে তাহা লিখিত হয়। এই কাব্য সম্বন্ধে কিছু বলিবার পূর্বে দান্তের কবিতার বহির্ভূক্ত জীবনের বিষয়ে দুই-এক কথা বলিয়া লই।

দান্তের প্রকৃত নাম দুরান্তে আলিঘিয়ারি (Durante Alighieri)। তাঁহার সময়ে দুই দল ছিল। গুয়েলফ ও ঘিবেলীন (Guelf and Ghibelline) শ্বেত ও কৃষ্ণ, অর্থাৎ কুলীন ও সাধারণ অধিবাসী; ইহাদের উভয় দলের মধ্যে প্রায়ই বিপ্লব চলিত, একদল ক্ষমতাশালী হইলে অপর দল নিপীড়িত হইত। দান্তে Guelf অর্থাৎ কুলীন দলভুক্ত ছিলেন। তাঁহার সময়ে গুয়েলফ দলই ক্ষমতাশালী ছিল। 'ভিটা নুওভা' কাব্যে দান্তের প্রেমের কাহিনী পড়িলে মনে হয় না, দান্তে বাহিরের কোনো বিষয়ে লিপ্ত ছিলেন— মনে হয় তাঁহার চক্ষে সমুদয় জগতের সমষ্টি বিয়াত্রিচে, এ সংসারে আর কিছু নাই কেবল বিয়াত্রিচে, এ সংসারে আর কিছু করিবার নাই— কেবল বিয়াত্রিচের আরাধনা! যখন তিনি বিয়াত্রিচের প্রতি-হাস্যে প্রতি-উপেক্ষায় শিশুর ন্যায় রোদন করিতেছিলেন, প্রতি ক্ষুদ্র নমস্কারে দরিদ্রের রত্ন পাইতেছিলেন, তখন তিনি রাজ্য-শাসন সম্বন্ধেও দারুণ লিপ্ত ছিলেন। ক্যাম্প্যাল্‌ডিনো (Campaldino) সমরে তিনি স্বয়ং যুদ্ধ করিয়াছেন, ক্যাপ্রোনার যুদ্ধে তিনি উপস্থিত ছিলেন। গুয়েলফ দলের মধ্যে যখন আত্মবিবাদ উপস্থিত হয় তখন তিনি বিশেষ উদ্যমের সহিত তাহাদের মধ্যে একদলের সহায়তা করিতেছিলেন। বিয়াত্রিচের মৃত্যুর পর শাসনকার্য ভিন্ন তাঁহার অন্য কোনো কার্য ছিল না। রাজকার্যে নগরীর মধ্যে তিনি একজন বিখ্যাত লোক হইয়া উঠিলেন। ক্রমে ক্রমে তিনি রাজ্যের প্রধান শাসকদলভুক্ত হইলেন।

কিন্তু এই পদে তিনি দুই মাস কাল মাত্র ছিলেন। ইতিমধ্যে রাজ্যে তাঁহার এত শত্রু হইয়াছিল যে শীঘ্রই তাঁহাকে তাঁহার জন্মভূমি ফ্লোরেন্স নগরী হইতে জন্মের মতো নির্বাসিত হইতে হইল। এই নগরে প্রবেশাধিকার পাইবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। অবশেষে যখন তাঁহার কবিত্বের খ্যাতি চারি দিকে ব্যাপ্ত হইল— তখন ফ্লোরেন্সবাসীরা তাঁহাকে অনুতপ্ত বেশে দোষ স্বীকার করিতে করিতে নগরে প্রবেশ করিতে অনুমতি দিয়াছিল, কিন্তু তিনি তাহাতে সম্মত হইলেন না। চিরজন্ম নির্বাসনে পরপ্রত্যাশী হইয়া তাঁহাকে কালযাপন করিতে হইয়াছিল। এইরূপে যখন বিয়াত্রিচেকে লইয়া হৃদয়ে তাঁহার ঝটিকা চলিতেছিল, তখন বাহিরের রাজ-বিপ্লব ঝটিকায় তিনি যে উদাসীন ছিলেন তাহা নহে। অনেক দিন রাজ্য সম্বন্ধে মগ্ন থাকিয়া বিয়াত্রিচের উদ্দেশে যোগ্যতর কবিতা লিখিতে পারেন নাই। কিন্তু কোনো বিশেষ সময়ে সহসা তাঁহার খ্যাতি মান যশের দুরাশা ছুটিয়া গেল ও মহাকাব্য এইরূপে আরম্ভ করিলেন—

জীবনের মধ্যপথে দেখিনু সহসা,
ভ্রমিতেছি ঘোর বনে পথ হারাইয়া—
সে যে কী ভীষণ অতি দারুণ গহন—
স্মৃতি তার ভয়ে মোরে করে অভিভূত।
সে ভয়ের চেয়ে মৃত্যু নহে ভয়ানক!

জীবনের মধ্য পথে, অর্থাৎ যখন তিনি তাঁহার পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সে পৌঁছিয়াছেন— তিনি এই কাব্য লিখিতে আরম্ভ করেন। ভীষণ অরণ্য আর কিছুই নহে— সে তাঁহার রাজ্য-শাসন-কার্য, খ্যাতি-প্রতিপত্তির নিমিত্ত সংগ্রাম। অর্ধ অজ্ঞানের মতো হইয়া যখন তিনি এই বনে ভ্রমণ করিতেছেন এমন সময়ে একটি চিতাবাঘ দেখিতে পাইলেন এবং এইরূপ পর্যায়ক্রমে একটি সিংহ ও ক্ষুধাতুরা এক নেকড়িয়া ব্যাঘ্রী দেখিতে পাইলেন। এ সমস্তই রূপক মাত্র, চিতাব্যাঘ্র সুখতৃষা, সিংহ দুরাশা ও নেকড়িয়া ব্যাঘ্রী লোভ। এইরূপে এই-সকল রিপুদিগের দ্বারা ভীত হইয়া অরণ্যে ভ্রমণ করিতেছিলেন,

হেনকালে সহসা দেখিনু এক জন
বহুদিন মৌন রহি ক্ষীণ স্বর তাঁর—
'জীবিত বা মৃত আত্মা যে হও-না কেন
দয়া করো মোরে' আমি সমুচ্চে কহিনু
সে অরণ্য মাঝে যবে হেরিনু তাঁহারে।

ইনি আর কেহ নহেন— কবি বর্জিলের প্রেতাত্মা। তিনি দান্তেকে স্বর্গ ও নরক প্রদর্শন করাইতে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবেন বলিয়া প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু দান্তে ভয় প্রকাশ করিলেন—

মহাছায়া কহিলেন 'মিথ্যা আশঙ্কায়
হৃদয় হয়েছে তব বৃথা অভিভূত—
পশু যথা ভয় পায় সন্ধ্যার আঁধারে
হেরিয়া অলীক ছায়া— তেমনি মানুষ
মহান সংকল্প হতে হয় গো বিরত
বৃথা ভয়ে। এ আশঙ্কা করিবারে দুর—
কহি তোরে কোথা হতে এলেম হেথায়—
প্রথমে কাহার কথা করিয়া শ্রবণ
তোরে দয়া হল মোর, কহি তোরে তাহা!
পরলোকে থাকে যারা সংশয় আঁধারে—

তাহাদের মধ্যে মোর নিবাস কহিনু।
একদা রমণী এক আহ্বানিলা মোরে—
হেন পুণ্যময় মূর্তি এমন সুন্দরী
দেখেই অমনি তাঁর মাগিনু আদেশ—
অতিশয় মৃদু আর অতি সুকোমল
দেবতার স্বরে সুর বাঁধি, কহিলেন—
'অয়ি উপছায়া! তুমি যাহার সুযশ
যদিন প্রকৃতি রবে, রহিবে বাঁচিয়া—
এই অনুনয় মোর করহ শ্রবণ।—
বন্ধু এক মোর (নহে বন্ধু সম্পদের)
মহারণ্যে নিদারুণ বাধা বিঘ্ন পেয়ে—
ভয়ে অভিভূত হয়ে পড়েছেন তিনি।
ভয় করি পাছে হন হেন পথহারা
আর তাঁরে একেবারে ফিরাতে না পারি!
উদ্দীপনা-বাক্যে তব, যে-কোনো উপায়ে,
ফিরাইয়া আনো, তবে লভিব বিরাম!
আসিয়াছি স্বর্গ হতে বিয়াত্রিচে আমি
প্রেম-উত্তেজনে আমি কৈনু অনুরোধ,

বর্জিল সেই বিয়াত্রিচের অনুরোধেই দান্তেকে ভ্রষ্ট-পথ হইতে ফিরাইতে আসিয়াছেন। দান্তে বর্জিলের সহিত নরক-দর্শন করিতে যাইতে আহ্লাদের সহিত সম্মত হইলেন। তৃতীয় স্বর্গে দান্তে নরকের তোরণে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তোরণে অস্ফুট অক্ষরে লিখা আছে—

মোর মধ্য দিয়া সবে যাও দুঃখদেশে;
মোর মধ্য দিয়া যাও চির-দুঃখভোগে—
চিরকাল তরে যারা হয়েছে পতিত,
মোর মধ্য দিয়া যাও তাহাদের কাছে!
ন্যায়ের আদেশে আমি হয়েছি নির্মিত—
অনন্ত জ্ঞান ও প্রেম স্বর্গীয় ক্ষমতা—
আমারে পোষণ করা কার্য তাহাদের!
মোর পূর্বে আর কিছু হয় নি সৃজিত—
অনন্ত-পদার্থ ছাড়া, তাই কহিতেছি
হেথায় অনন্ত কাল দহিতেছি আমি।
'হে প্রবেশি, ত্যজি স্পৃহা, প্রবেশ এ দেশে।'

কবি বর্জিল ভীত দান্তেকে সান্ত্বনা করিয়া এক স্থানে লইয়া গেলেন— সেখানে দীর্ঘশ্বাস, আর্তনাদ, ক্রন্দন, বিলাপ—

তারকা-অবিদ্ধ শূন্য করিছে ধ্বনিত,
শুনিয়া, প্রবেশি সেথা উঠিনু কাঁদিয়া।
নানাবিধ ভাষা আর ভয়ানক কথা,
যন্ত্রণার আর্তনাদ, ক্রোধের চীৎকার
করতালি— কঠোর ও ভগ্নকণ্ঠ-ধ্বনি—
নিরেট সে আঁধারের চার দিক ঘেরি
ঘূর্ণ-বায়ে রেণুসম ফিরিছে সতত!

এইরূপে আরম্ভ করিয়া কাব্যের প্রথম খণ্ড, অর্থাৎ ইনফর্নো, অর্থাৎ নরক— ক্রমাগত নরকের বর্ণনা; পরে পর্গেটরি— অর্থাৎ যাহাদের পরিত্রাণ পাইবার আশা আছে তাহাদের বাসভূমি— পরে স্বর্গ। ক্রমাগত একই পদার্থের বর্ণনার বিবরণ পাঠকদিগের নিদ্রাকর্ষক হইবে, এই নিমিত্ত তাহা হইতে বিরত হইলাম, পর্গেটরি কাব্যের শেষভাগে বিয়াত্রিচের সহিত কবির সাক্ষাৎ হইল।— বর্জিল ও দান্তে উভয়েই বিস্ময়ে দেখিলেন একটি আশ্চর্য রথে বিয়াত্রিচে আসিতেছেন। সুরবালারা তাঁহার চারি দিকে এমন পুষ্প-বৃষ্টি করিতেছেন যে, তাঁহার আকার অতি অস্ফুটভাবে দেখা যাইতেছে, দান্তে সে পুষ্পরাশির মধ্যে তাঁহাকে ভালো করিয়া দেখিতে পান নাই, চিনিতেও পারেন নাই— তিনি কহিতেছেন,

আঁখি মোর দেখে তাঁরে পারে নি চিনিতে,
তবু তাঁর দেহ হতে এমন একটি
বিকীরিত হতেছিল শুভ্র-পুণ্য-জ্যোতি,
তাহার পরশে যেন পুরাতন প্রেম
হৃদয়ে আমার পুন উঠিল জাগিয়া।
সেই পুরাতন স্বপ্ন কত শত দিন
যে স্বপ্নে হৃদয় মোর আছিল মগন—
যখনি উঠিল জাগি স্বর্গীয় কিরণে,
অমনি আকুল হয়ে ফিরিয়া ধাইনু।
কবি বর্জিলের পানে, শিশু সে যেমন
ভয় কিংবা শোক-ভারে হলে বিচলিত,
অমনি মায়ের বুকে যায় লুকাবারে!
ভাবিনু কাতর স্বরে কহিব তাঁহারে—
'প্রতি রক্তবিন্দু মোর কাঁপিছে শিরায়,
পুরানো সে অগ্নি পুন উঠিছে জ্বলিয়া।'
হা— বর্জিল কোথা— হয়েছেন অন্তর্ধান!
প্রিয়তম পিতা তুমি বর্জিল আমার!

দান্তেকে বর্জিলের এই সহসা অন্তর্ধানে ব্যথিত হইয়া কাঁদিতে দেখিয়া বিয়াত্রিচে কহিলেন যে 'দান্তে, কাঁদিয়ো না, ইহা অপেক্ষা তীক্ষ্ণতর ছুরিকা তোমার হৃদয়ে বিদ্ধ হইবে ও তাহার যন্ত্রণায় তোমাকে কাঁদিতে হইবে।' সুরবালারা পুষ্পবৃষ্টি স্থগিত করিলেন ও পুষ্প-মেঘ-মুক্ত সূর্য প্রকাশ পাইলেন। বিয়াত্রিচে সেই উচ্চ রথের উপরি হইতে কহিলেন, 'চাহিয়া দেখো, আমি বিয়াত্রিচে।' বিয়াত্রিচের সেই 'অটল মহিমায়' দান্তে 'জননীর সম্মুখে ভীত সন্তানের' ন্যায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন। বিয়াত্রিচে তখন তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিয়া কহিলেন, অল্পবয়সে দান্তের হৃদয় ধর্মে ভূষিত ছিল, বিয়াত্রিচে তাঁহার যৌবনময় চক্ষের আলোকে তাঁহাকে সর্বদাই সৎপথে লইয়া যাইতেন। কিন্তু তিনি যখন তাঁহার মর্ত্যদেহ পরিত্যাগ করিয়া অমর দেহ ধারণ করিলেন, যখন ধূলি-আবরণ হইতে মুক্ত হইয়া পুণ্য ও সৌন্দর্যে অধিকতর ভূষিত হইলেন, তখন তাঁহার প্রতি দান্তের সে ভালোবাসা কমিয়া গেল। বিয়াত্রিচের তীব্র ভর্ৎসনায় তিনি অতিশয় যন্ত্রণা পাইলেন। পরে অনুতাপ-অশ্রু বর্ষণ করিয়া ও স্বর্গের নদীতে স্নান করিয়া তিনি পাপ-বিমুক্ত হইলেন। তখন তিনি তাঁহার প্রিয়তমা সঙ্গিনীর সহিত স্বর্গ দর্শনে চলিলেন। যখন স্বর্গনরক পরিভ্রমণ করা শেষ হইল, তখন কবি কহিলেন—

জাগি উঠি স্বপ্ন যদি ভুলে যাই সব,
তবু তার ভাব যেমন থাকে মনে মনে,

তেমনি আমারো হল, স্বপ্ন গেল ছুটে
মাধুর্য তবুও তার রহিল হৃদয়ে।

ভারতী
ভাদ্র ১২৮৫

পিত্রার্কা ও লরা

এ কথা বোধ হয় বলাই বাহুল্য যে, দান্তের মতো পিত্রার্কাও একজন প্রখ্যাতনামা ইতালীয় কবি ছিলেন। দান্তে যেমন তাঁহার মহাকাব্যের মহান ভাব দ্বারা সমস্ত য়ুরোপমণ্ডল উত্তেজিত করিয়াছিলেন, পিত্রার্কাও তেমনি তাঁহার সুললিত গীতি ও গাথা দ্বারা সকলের মনোরঞ্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু দান্তে ও পিত্রার্কে আবার অনেক বিষয়ে এমন সৌসাদৃশ্য ছিল যে, সকল বিষয় উল্লেখ করিতে হইলে আমাদের এই প্রবন্ধটি অতি দীর্ঘকায় হইয়া পড়ে, সেইজন্য কেবল তাঁহাদের প্রণয়ের কথাই বর্ণনা করিতেছি।

দান্তের যেমন বিয়াত্রিচে, পিত্রার্কার তেমনি লরা। দান্তের ন্যায় তাঁহার লরাও অপ্রাপ্য, অনধিগম্য, দান্তের ন্যায় তিনিও দূর হইতে লরাকে দেখিয়াই আপনাকে কৃতার্থ মনে করিতেন। পিত্রার্কারও লরার সহিত তেমন ভালো করিয়া কথাবার্তা, আলাপ-পরিচয় হয় নাই। লরার ভবনে পিত্রার্কা কখনো যাইতে পান নাই, লরার নিকট হইতে তাঁহার প্রেমের কিছুমাত্র প্রত্যুপহার পান নাই। পিত্রার্কা কহিয়াছেন, লরা সংগীত ও কবিতার প্রতি উদাসীন। তাঁহার সমক্ষে তাহার মুখশ্রী সর্বদাই দৃঢ় ভাব প্রকাশ করিত। পিত্রার্কা তাঁহার অসংখ্য চিঠির মধ্যে একবার ভিন্ন কখনো লরার নামোল্লেখ করেন নাই, বোধ হয়, বন্ধুবর্গের প্রতি সাধারণ চিঠিপত্রে লরার নাম ব্যবহার করিতে তিনি কেমন সংকোচ বোধ করিতেন, বোধ হয় মনে করিতেন তাহাতে সে নামের গৌরব হানি হইবে। লরার যৌবনের অবসান, লরার মৃত্যু, তাঁহার প্রতি লরার ঔদাসীন্য কিছুই তাঁহার মহান প্রেমকে বিচলিত করিতে পারে নাই। বরঞ্চ লরার মৃত্যু তাঁহার প্রেমকে নূতন বল অর্পণ করে, কেননা এ পৃথিবীতে লরার সহিত তাঁহার সম্পর্ক অতি দূর ছিল, লরার প্রেম তাঁহার অপ্রাপ্য ও তাঁহার প্রেম লরার অগ্রাহ্য ছিল, কিন্তু লরা যখন দেহের সহিত সমাজ বন্ধন পরিত্যাগ করিয়া গেলেন, তখন পিত্রার্কা অসংকোচে লরার আত্মার চরণে তাঁহার প্রেম উপহার দিতেন ও লরা তাহা অসংকোচে গ্রহণ করিতেছেন কল্পনা করিয়া পরিতৃপ্ত হইতেন। পিত্রার্কা কহিতেছেন—

যে রাত্রে লরা এই পৃথিবীর দুঃখ যন্ত্রণা চিরকালের জন্য পরিত্যাগ করিলেন, তাহার পররাত্রে তিনি স্বর্গ হইতে এই শিশিরে (শিশিরাক্ত পৃথিবীতে) নামিয়া আসিলেন, তাঁহার অনুরক্ত প্রেমিকের নিকট আবির্ভূত হইলেন ও হাত বাড়াইয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন— 'সেই স্ত্রীলোক, যাহাকে দেখিয়া অবধি তোমার তরুণহৃদয় জন-কোলাহল হইতে বিভিন্ন পথে গিয়াছে, তাহাকে চেনো!' যখন আমার অশ্রুজল তাঁহার বিয়োগ-দুঃখ সূচনা করিল, তখন তিনি কহিলেন, 'যতদিন তুমি পৃথিবীর দাস হইয়া থাকিবে, ততদিন কিছুতেই সুখী হইতে পারিবে না। পবিত্র হৃদয়েরা জানেন, মৃত্যু অন্ধকার-কারাগার হইতে মুক্তি। যদি আমার আনন্দের এক-সহস্রাংশও তুমি জানিতে, তবে আমার মৃত্যুতে তুমি সুখ অনুভব করিতে।' এই বলিয়া তিনি কৃতজ্ঞতার সহিত স্বর্গের দিকে নেত্র ফিরাইলেন। তিনি নীরব হইলে আমি কহিলাম, 'ঘাতকদিগের দ্বারা প্রযুক্ত যন্ত্রণা ও বার্ধক্যের ভার কি সময়ে সময়ে মৃত্যু-যন্ত্রণাকে তীব্রতর করে না?' তিনি কহিলেন, 'স্বীকার করি, যন্ত্রণা ও সম্মুখস্থ অনন্তকালের আশঙ্কা মৃত্যুর পূর্বে অনুভব করা যায়, কিন্তু যদি আমরা ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর করি, তবে প্রাণত্যাগ নিশ্বাসের ন্যায় অতি সহজ হয়। আমার

বিকশিত যৌবনের সময় যখন তুমি আমাকে সর্বাপেক্ষা ভালোবাসিতে, তখন জীবনের প্রতি আমার অত্যন্ত মায়া ছিল, কিন্তু যখন আমি ইহা পরিত্যাগ করিলাম, তখন নির্বাসন হইতে স্বদেশে ফিরিয়া আসিবার আমোদ অনুভব করিতে লাগিলাম। তখন তোমার প্রতি দয়া ভিন্ন অন্য কষ্ট পাই নাই।' আমি বলিয়া উঠিলাম, 'সেই সত্যপ্রিয়তা যাহা তুমি পূর্বে জানিতে এবং সর্বান্তর্যামীর নিকট থাকিয়া এখন যাহা অধিকতর জান, সেই সত্যপ্রিয়তার নামে জিজ্ঞাসা করিতেছি, বলো, আমার প্রতি সেই দয়া কি প্রেমের দ্বারাই উত্তেজিত হয় নাই?' আমার এই কথা শেষ না হইতে হইতেই দেখিলাম, সেই স্বর্গীয় হাস্য, যাহা চিরকাল আমার দুঃখের উপর শান্তি বর্ষণ করিয়া আসিয়াছে, সেই হাস্যে তাঁহার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল— তিনি নিশ্বাস ফেলিলেন ও কহিলেন, 'চিরকাল তুমি আমার প্রেম পাইয়া আসিয়াছ ও চিরকালই তাহা পাইবে। কিন্তু তোমার প্রেম সংযত করিয়া রাখা আমার উচিত মনে করিতাম।' মাতা যখন তাহার পুত্রকে ভর্ৎসনা করেন, তখন যেমন তাঁহার ভালোবাসা প্রকাশ পায় এমন আর কখনো নয়। কতবার আমি মনে মনে করিয়াছি— 'উনি উন্মত্ত অনলে দগ্ধ হইতেছেন, অতএব উঁহাকে আমার হৃদয়ের কথা কখনো বলিব না। হায়, যখন আমরা ভালোবাসি অথচ শঙ্কায় ত্রস্ত থাকি, তখন এ-সব চেষ্টা কী নিষ্ফল কিন্তু আমাদের সম্ভ্রম বজায় রাখিবার ও ধর্মপথ হইতে ভ্রষ্ট না হইবার এই একমাত্র উপায় ছিল। কতবার আমি রাগের ভান করিয়াছি, কিন্তু তখন হয়তো আমার হৃদয়ে প্রেম যুঝিতেছিল। যখন দেখিতাম তুমি বিষাদের ভরে নত হইয়া পড়িতেছ, তখন হয়তো তোমার প্রতি সান্ত্বনার দৃষ্টি বর্ষণ করিতাম, হয়তো কথা কহিতাম! দুঃখ এবং ভয়েই নিশ্চয় আমার স্বর পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছিল, তুমি হয়তো তাহা দেখিয়াছ! যখন তুমি রোষে অভিভূত হইয়াছ তখন হয়তো আমি আমার একটি দৃঢ়-দৃষ্টির দ্বারা তোমাকে শাসন করিতাম। এই-সকল কৌশল, এই-সকল উপায়ই আমি অবলম্বন করিয়াছিলাম। এইরূপে কখনো অনুগ্রহ, কখনো দৃঢ়তার দ্বারা তোমাকে কখনো সুখী কখনো বা অসুখী করিয়াছি, যদিও তাহাতে শ্রান্ত হইয়াছিলে, কিন্তু এইরূপে তোমাকে সমুদয় বিপদের বাহিরে লইয়া গিয়াছিলাম, এইরূপে আমাদের উভয়কেই পতন হইতে পরিত্রাণ করিয়াছিলাম— এবং এই কথা মনে করিয়া আমি অধিকতর সুখ উপভোগ করি।' যখন তিনি কহিতে লাগিলেন, আমার নেত্র হইতে অশ্রু পড়িতে লাগিল— আমি কাঁপিতে কাঁপিতে উত্তর দিলাম— যদি আমি তাঁহার কথা স্পর্ধাপূর্বক বিশ্বাস করিতে পারি, তবে আমি আপনাকে যথার্থ পুরস্কৃত জ্ঞান করি।— আমাকে বাধা দিয়া তিনি কহিলেন, বলিতে বলিতে তাঁহার মুখ আরক্তিম হইয়া আসিল 'হা— অবিশ্বাসী, সংশয় করিতেছ কেন? যদিও আমার হৃদয়ে যেমন ভালোবাসা ছিল আমার নয়নে তেমন প্রকাশ পাইত কি না, সে কথা আমার রসনা কখনোই ব্যক্ত করিবে না, কিন্তু এই পর্যন্ত বলিতে পারি— তোমার ভালোবাসায়, বিশেষত তুমি আমার নামকে যে অমরত্ব দিয়াছ তাহাতে যেমন সন্তুষ্ট হইয়াছিলাম এমন আর কিছুতে না। আমার এই একমাত্র ইচ্ছা ছিল তোমার অতিরিক্ততা কিছু শমিত হয়। আমার কাছে তোমার হৃদয়ের গোপন-কাহিনী খুলিতে গিয়া তাহা সমস্ত পৃথিবীর নিকট খুলিয়াছ এই কারণেই তোমার উপরে আমার বাহ্য-ঔদাসীন্য জন্মে। তুমি যতই দয়ার নিমিত্ত উচ্চৈঃস্বরে ভিক্ষা করিয়াছ, আমি ততই লজ্জা ও ভয়ে নীরব হইয়া গিয়াছি। তোমার সহিত আমার এই প্রভেদ ছিল— তুমি প্রকাশ করিয়াছিলে, আমি গোপন করিয়াছিলাম— কিন্তু প্রকাশে যন্ত্রণা যে বর্ধিত হয় ও গোপনে তাহা হ্রাস হয় এমন নহে।' তাঁহার অনুরক্ত তখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তাঁহার সহিত যুক্ত হইবার আর কত বিলম্ব আছে? লরা এই বলিয়া চলিয়া গেলেন, 'যতদূর আমি জানি তাহাতে তুমি আমার বিয়োগ সহিয়া অনেক দিন পৃথিবীতে থাকিবে।' পিত্রার্কা লরার মৃত্যুর পর ছাব্বিশ বৎসর বাঁচিয়াছিলেন।

এইরূপে পিত্রার্কা লরার দৃঢ়তা, তাঁহার প্রতি উদাসীনতার মধ্য হইতেও তাঁহার আপনার ইচ্ছার অনুকূল অর্থ ব্যাখ্যা করিয়া লইয়াছিলেন। তিনি সহজেই মনে করিতে পারেন যে, লরার

তাঁহার প্রতিই এত বিশেষ উদাসীনতার কারণ কী, তিনি তো তাহার বিরক্তিজনক কোনো কাজ করেন নাই। অবশ্যই লরা তাঁহাকে ভালোবাসে। এই মীমাংসা অনেকে বুঝিতে না পারুন, কিন্তু ইহার মধ্যে অনেকটা সত্য প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। লরা যদি তাঁহাকে ভালো না বাসিত, তবে অন্য লোকের সহিত যেরূপ মুক্তভাবে কথাবার্তা করিত, তাঁহার সহিতও সেইরূপ করিত; এ কথাটার মধ্যে অনেকটা হৃদয়-তত্ত্বজ্ঞতা আছে, কিন্তু ইহা যে ঠিক সত্য, তাহা বলা যায় না, লরা যে তাঁহাকে ভালোবাসিত, তাহার কোনো প্রমাণ নাই। পিত্রার্কা যেরূপ প্রকাশ্যভাবে কবিতা দ্বারা তাঁহার প্রণয়িনীর আরাধনা করিতেন, তাহাতে লরা তাঁহার প্রতি ঔদাসীন্য দেখাইয়া বিবেচনার কাজ করিয়াছিল— পিত্রার্কার সহিত সামান্য কথোপকথনেও তাহার উপর লোকের সন্দিগ্ধচক্ষু পড়িত, সন্দেহ নাই। বিশেষত লরার স্বামী অতিশয় সন্দিগ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। যতদূর জানা গিয়াছে তাহাতে লরা অতিশয় সুগৃহিণী ছিল বলিয়াই তো স্থির হইয়াছে। যদি সত্য সত্যই লরা মনে মনে পিত্রার্কাকে ভালোবাসিতেন, তবে আমরা লরার একটি মহান মূর্তি দেখিতে পাই— ভালোবাসিয়াছেন অথচ প্রকাশ করেন নাই— পিত্রার্কার প্রেমে কিছুমাত্র উৎসাহ দেন নাই— বরং তাঁহার প্রেমের স্রোত ফিরাইতেই চেষ্টা করিয়াছিলেন— প্রেম তাঁহাকে তাঁহার কর্তব্যপথ হইতে কিছুমাত্র বিচলিত করিতে পারে নাই, বরং বোধ হয় তাঁহাকে কর্তব্যপথে অধিকতর নিয়োজিত করিয়াছিল।

জন-কোলাহল হইতে দূরে থাকিবার জন্য পিত্রার্কা ভোক্লুসের উপত্যকায় আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এই উপত্যকার দৃশ্য অতিশয় সুন্দর। এখানকার মোহিনী বিজনতার মধ্যে থাকিয়া, পিত্রার্কার হৃদয় হইতে যে প্রথম কবিতা উৎসারিত হয় তাহা লরার উদ্দেশে প্রেম-গীতি। প্রকৃতির প্রতি সৌন্দর্যের মধ্যে তিনি যেন লরার সত্তা অনুভব করিতেন।

প্রতি উচ্চ-শাখাময় সরল কানন,
প্রতি স্নিগ্ধ ছায়া মোর ভ্রমণের স্থান;
শৈলে শৈলে তাঁর সেই পবিত্র-আনন
দেখিবারে পায় মোর মানস-নয়ন।
সহসা ভাবনা হতে উঠি যবে জাগি,
প্রেমে মগ্ন মন মোর বলে গো আমায়
'কোথায় ভ্রমিছ ওগো, ভ্রমিছ কী লাগি?
কোথা হতে আসিয়াছ, এসেছ কোথায়?'
হৃদে মোর এইসব চঞ্চল-স্বপন
ক্রমে ক্রমে স্থির চিন্তা করে আনয়ন,
আপনারে একেবারে যাই যেন ভুলি
দহে গো আমারে শুধু তারি চিন্তাগুলি।
মনে হয় প্রিয়া যেন আসিয়াছে কাছে
সে ভুলে উজলি উঠে নয়ন আমার,
চারি দিকে লরা যেন দাঁড়াইয়া আছে
এ স্বপ্ন না ভাঙে যদি কী চাহি গো আর?
দেখি যেন (কেবা তাহা করিবে বিশ্বাস?)
বিমল সলিল কিংবা হরিত কানন
অথবা তুষার-শুভ্র উষার আকাশ
তাঁহারি জীবন্ত-ছবি করিছে বহন!

...

দুর্গম-সংসারে যত করি গো ভ্রমণ,
ঘোরতর মরু মাঝে যতদূর যাই,
কল্পনা ততই তার মুরতি মোহন
দিশে দিশে আঁকে, যেন দেখিবারে পাই।
অবশেষে আসে ধীরে সত্য সুকঠোর
ভাঙি দেয় যৌবনের সুখস্বপ্ন মোর!

কখনো বা সেই মনোহর শৈলের প্রতি নির্ঝর তটিনী বৃক্ষলতায়, তিনি তাঁহার বিষণ্ণ-মর্মের নিরাশা সংগীত গাহিয়া গাহিয়া বেড়াইতেন—

বিমল বাহিনী ওগো তরুণ-তটিনী।
উজ্জ্বল-তরঙ্গে তব, প্রেয়সী আমার—
ভক্ত হৃদয়ের মম একমাত্র দেবী
সৌন্দর্য তাঁহার যত করেছেন দান!
শুন গো পাদপ তুমি, তব দেহ-'পরে
ভর দিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন সে দেবী,
নত হয়ে পড়েছিল ফুল পত্রগুলি
বসনের তলে; বক্ষ সুবিমল তার
পরশিয়াছিলে তব সুধা আলিঙ্গনে।
তুমি বায়ু সেইখানে বহিতেছ সদা
যেইখানে প্রেম আসি দেখাইলা মোরে
প্রিয়ার নয়নে শোভে ভাণ্ডার তাহার!
শুন গো তোমরা সবে আর-একবার
এই ভগ্ন-হৃদয়ের শেষ দুঃখ-গান!
অবশ্য ফলিবে যদি ভাগ্যের লিখন।
অবশ্যই অবশেষে প্রেম যদি মোর
অশ্রুময় আঁখিদ্বয় করে গো মুদিত,
ভ্রমিবে যখন আত্মা স্বদেশ আকাশে
তখন দেখো গো যেন এই প্রিয়-স্থানে
অভাগার শেষ-চিহ্ন হয় গো নিহিত!
মরণের কঠোরতা হবে কত হ্রাস,
যদি এই প্রিয় আশা, সেই ভয়ানক
অনন্তের পথ করে পুষ্প-বিকীরিত!
এই কাননের মতো সুশীতল ছায়া
কোথা আছে পৃথিবীতে, শ্রান্ত আত্মা যেথা
এক মুহূর্তের তরে করিবে বিশ্রাম!
নাহিকো এমন শান্ত হরিত-কবর
যেখানে সংসার-শ্রমে পরিশ্রান্ত-দেহ
ঘুমাইবে পৃথিবীর দুখ শোক ভুলি!

বোধ হয় একদিন সে মোর প্রেয়সী
স্বর্গীয়-সুন্দরী সেই নিষ্ঠুর-দয়ালু—

একদিন এইখানে আসিবে কি ভাবি,
যেইখানে একদিন মুগ্ধ নেত্র মোর
উজ্জ্বল সে নেত্র-'পরে রহিত চাহিয়া!
হয়তো নয়ন তাঁর আপনা আপনি
খুঁজিয়া খুঁজিয়া মোরে চারি দিক পানে
আমার কবর সেই পাইবে দেখিতে!
হয়তো শিহরি তার উঠিবে অন্তর,
হয়তো একটি তার বিষাদ-নিশ্বাস
জাগাইবে মোর 'পরে স্বর্গের করুণা।

...

এখনো সে মনে পড়ে— যবে পুষ্প বন
বসন্তের সমীরণে হইয়া বিনত
সুরভিকুসুমরাশি করিত বর্ষণ,
তখন রক্তিম-মেঘে হইয়া আবৃত
বসিতেন প্রকৃতির উপহার মাঝে।
কভু বা বসনে তাঁর কভু বা কুন্তলে
প্রকৃতি কুসুম-গুচ্ছ দিত সাজাইয়া।
চারি দিকে তাঁর, কভু তটিনী-সলিলে—
কভু বা তৃণের 'পরে পড়িত ঝরিয়া
পুষ্প বন হতে কত পুষ্প রাশি রাশি!
চারি দিকে তরুলতা কহিত মর্মরি
'প্রেম হেথা করিয়াছে সাম্রাজ্য বিস্তার!'

পূর্বেই বলিয়াছি, পিত্রার্কার মনে মনে বিশ্বাস ছিল, বা এক-একবার বিশ্বাস হইত যে লরা তাঁহাকে ভালোবাসে। অনেক কবিতাতেই তাঁহার এই বিশ্বাস প্রকাশ পাইত। অনুরাগের নেত্র অনুরাগের কাহিনী যেমন পড়িতে পারে, যুক্তিকে তাহার নিকট অনেক সময় পরাস্ত মানিতে হয়। লরার দৃঢ় দৃষ্টির মধ্যে হয়তো পিত্রার্কা গুপ্তপ্রেমের আভা দেখিতে পাইয়াছিলেন, যুক্তি এখন তাহা অনুধাবন করিতে পারিতেছে না, হয়তো তখনো পারিত না। এক সময়ে পিত্রার্কা যখন দূর-দেশে ভ্রমণ করিবার জন্য যাইতেছিলেন, তখন লরাকে দেখিয়া তিনি কহিতেছেন—

সুকোমল ম্লান ভাব কপোলে তাঁহার
ঢাকিল সে হাসি তাঁর, ক্ষুদ্র মেঘ যথা!
প্রেম হেন উথলিল হৃদয়ে আমার
আঁখি কৈল প্রাণপণ কহিবারে কথা!
তখন জানিনু আমি স্বরগ-আলয়ে
কী করিয়া কথা হয় আত্মায় আত্মায়;
উজলি উঠিল তাঁর দয়া দিকচয়ে
আমি ছাড়া আর কেহ দেখে নি গো তায়!

...

সবিষাদে অবনত নয়ন তাঁহার
নীরবে আমারে যেন কহিল সে এসে,
'কে গো হায় বিশ্বাসী এ বন্ধুরে আমার
লইয়া যেতেছে ডাকি এত দূর-দেশে?'

শীতের পত্রহীন তরুশাখায় বসিয়া সন্ধ্যাকালে বিহঙ্গম বিষণ্ণ-সংগীত গাহিতেছিল, কবির হৃদয়ের স্বরে তাহার স্বর মিলিয়া গেল, তিনি গাহিয়া উঠিলেন—

হা রে হতভাগ্য বিহঙ্গম সঙ্গীহীন!
সুখ-ঋতু অবসানে গাহিছিস গীত!
ফুরাইছে গ্রীষ্ম ঋতু ফুরাইছে দিন
আসিছে রজনী ঘোর আসিতেছে শীত!
ওরে বিহঙ্গম, তুই দুখ-গান গাস
যদি জানিতিস কী যে দহিছে এ প্রাণ
তা হলে এ বক্ষে আসি করিতিস বাস,
এর সাথে মিশাতিস বিষাদের গান!
কিন্তু হা— জানি না তোর কিসের বিষাদ,
ভ্রমিস রে যার লাগি গাহিয়া গাহিয়া,
হয়তো সে বেঁচে আছে বিহঙ্গিনী প্রিয়া,
কিন্তু মৃত্যু এ কপালে সাধিয়াছে বাদ!
সুখ দুঃখ চিন্তা আশা যা-কিছু অতীত,
তাই নিয়ে আমি শুধু গাহিতেছি গীত!

যখন তাঁহার লরার বর্তমানে প্রকৃতির মুখশ্রী আরও উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিত, তখন তিনি গাহিতেন—

কী সৌন্দর্য-স্রোত হোথা পড়িছে ঝরিয়া!
স্বর্গ দিতেছেন ঢালি কী আলোক-রাশি!

…

চরণে হরিত-তৃণ উঠে অঙ্কুরিয়া
শত বর্ণময় ফুল উঠিছে বিকাশি!
হর্ষময় ভক্তিভরে সায়াহ্ন-বিমান
সমুদয় দীপ তার করেছে জ্বলিত,
প্রচারিতে দিশে দিশে তার যশোগান
পাইয়া যাহার শোভা হয়েছে শোভিত!

আবার কখনো বা সন্ধ্যাকালে একাকী বিজনে বসিয়া ভগ্নহৃদয়ে নিরাশার গীতি গাহিতেছেন।—

স্তব্ধ সন্ধ্যাকালে যবে পশ্চিম আকাশে
রবি অস্তাচলগামী পড়েছে ঢলিয়া,
বৃদ্ধ যাত্রী কোন্ এক অজ্ঞাত প্রবাসে
শ্রান্ত-পদক্ষেপে একা যেতেছে চলিয়া।
তবু যবে ফুরাইয়া যাবে শ্রম তার,
তখন গভীর ঘুমে মজিয়া বিজনে
ভুলে যাবে দিবসের বিষাদের ভার,
যত ক্লেশ সহিয়াছি সুদূর-ভ্রমণে!
কিন্তু হায় প্রভাতের কিরণের সনে
যে জ্বালা জাগিয়া উঠে হৃদয়ে আমার,
রবি যবে ঢলি পড়ে পশ্চিম গগনে,
দ্বিগুণ সে জ্বালা হৃদি করে ছারখার!

প্রজ্বলন্ত রথচক্র নিম্ন পানে যবে
লয়ে যান সূর্যদেব, অসহায় ভবে
রাখি রাত্রি-কোলে, যার দীর্ঘীকৃত ছায়া
প্রত্যেক গিরিশিখর সমুন্নত-কায়া
উপত্যকা-'পরে দেয় বিস্তারিত করি;
তখন কৃষক হল লয়ে স্কন্ধোপরি,
ধরি কোন্ গ্রাম্যগীত অশিক্ষিত স্বরে,
চিন্তা ঢালি দেয় তার বন্য-বায়ু-'পরে!

...

চিরকাল সুখে তারা করুক যাপন!
আমার আঁধার দিনে হর্ষের কিরণ
এক তিল অভাগারে দেয় নি আরাম,
এক মুহূর্তের তরে দেয় নি বিরাম!
যে গ্রহ উঠিয়া কেন উজলে বিমান
আমার যে দশা তাহা রহিল সমান!

দগ্ধ হয়ে মর্মভেদী মর্ম-যন্ত্রণায়
এ বিলাপ করিতেছি, দেখিতেছি হায়—
অতি ধীর পদক্ষেপে স্বাধীনতা সুখে
হল-যুগ-মুক্ত বৃষ ধায় গৃহ-মুখে!
আমি কি হব না মুক্ত এ বিষাদ হতে,
সদাই ভাসিবে আঁখি অশ্রু-জল-স্রোতে!
তার সেই মুখপানে চাহিল যখন
কী খুঁজিতেছিল মোর নয়ন তখন?
এক দৃষ্টে চাহিনু স্বর্গীয় মুখপানে
সৌন্দর্য অমনি তার বসি গেল প্রাণে
কিছুতে সে মুছিবে না যত দিনে আসি
মৃত্যু এই জীর্ণ-দেহ না ফেলে বিনাশি!

এই বলিয়া আমরা এই প্রবন্ধের উপসংহার করি যে, পিত্রার্কা তাঁহার সমসাময়িক লোকদিগের নিকট হইতে যেমন আদর পাইয়াছিলেন, এমন বোধ হয় আর কোনো কবি পান নাই। একদিনেই তিনি প্যারিস ও রোম হইতে লরেল-মুকুট গ্রহণ করিবার জন্য আহূত হন। তিনি নানা দেশে ভ্রমণ করেন, এবং যে দেশে গিয়াছিলেন সেইখানেই তিনি সমাদৃত হইয়াছিলেন। নৃপতিরা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করিতেন। তিনি যে রাজসভায় বাস করিতেন, কখনো তাঁহাকে অধীনভাবে বাস করিতে হয় নাই, তিনি যেন রাজ-পরিবারমধ্যে ভুক্ত হইয়া থাকিতেন। লরার নামকে তিনি অমরত্ব প্রদান করিলেন বলিয়া তিনি মনে মনে যে সন্তোষময় গর্ব অনুভব করিতেন, তাঁহার সে গর্ব সার্থক হইল। পাঁচশত বৎসরের কালস্রোত পৃথিবীর স্মৃতিপট হইতে লরার নাম মুছিয়া ফেলিতে পারে নাই। তাঁহার নামের সহিতই চিরকাল লরার নাম যুক্ত হইয়া থাকিবে; পিত্রার্কাকে স্মরণ করিলেই লরাকে মনে পড়িবে, লরাকে স্মরণ করিলেই পিত্রার্কাকে মনে পড়িবে।

ভারতী
আশ্বিন ১২৮৫

গেটে ও তাঁহার প্রণয়িনীগণ

গেটের বোধ হয় বিশেষ পরিচয় দিবার আবশ্যক নাই। যিনি জর্মান-সাহিত্যের অহংকার ও অলংকারস্বরূপ, যিনি 'ফস্ট' নামক নাটক লিখিয়া মানব হৃদয়ের সূক্ষ্মতম শিরা পর্যন্ত কাঁপাইয়া তুলিয়াছিলেন, যিনিই প্রথমে য়ুরোপমণ্ডলে আমাদের শকুন্তলার আদর বর্ধিত করিয়াছিলেন, তাঁর নূতন পরিচয় কী দিব?— কিন্তু তিনি অদ্বিতীয়রূপে সূক্ষ্মদর্শী ও বহুদর্শী হইয়াও জীবনে কতদূর দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলেন তাহা দেখাইবার জন্য পাঠকদের সম্মুখে তাঁহার প্রেম-কাহিনী আজ উদ্‌ঘাটিত করিতেছি—

গেটে তাঁহার পঞ্চদশ বৎসর বয়স হইতে মৃত্যুকাল পর্যন্ত ভালোবাসিয়া আসিয়াছেন, অথচ বিয়াত্রিচে বা লরার ন্যায় তাঁহার একটি প্রণয়িনীরও নাম করিতে পারিলাম না। দান্তে ও পিত্রার্কার প্রেম প্রেমের আদর্শ, আর গেটের প্রেম পার্থিব অর্থাৎ সাধারণ। শুদ্ধ যে গেটের দুর্বল প্রেম নিরাশা ও উপেক্ষা সহিয়াই স্থির থাকিতে পারে না এমন নহে, সে প্রেমের স্বভাব এই যে, তাহার আশা পূর্ণ হইলেই সে আর থাকিতে পারে না। গেটের প্রেম এক দ্বারে নিরাশ হইলে অমনি আর-এক দ্বারে যাইত, আবার আশা পূর্ণ হইলেও থাকিত না। গেটের পক্ষে আশাপূর্ণতা ও নৈরাশ্য উভয়ই সমান কার্য করিত; এ প্রেমের উপায় কী? গেটের জীবনে এক-একটি প্রেম-আখ্যান শেষ হইলে, অমনি তাহা লইয়া তিনি নাটক রচনা করিতেন, দান্তে বা পিত্রার্কার ন্যায় কবিতা লিখিতেন না। বাস্তব ঘটনাই নাটকের প্রাণ, আদর্শ জগৎই কবিতার বিলাসভূমি। যাহা হইয়া থাকে, নাটককারেরা তাহা লক্ষ করেন— যাহা হওয়া উচিত কবিদের চক্ষে তাহাই প্রতিভাত হয়। গেটে তাঁহার নিজের প্রেম নাটকে গ্রথিত করিতে পারিতেন, সাধারণ লোকেরা তাহাতে তাঁহার নিজ-হৃদয়ের আভাস পাইত। কিন্তু বিয়াত্রিচের প্রতি-অভিবাদনে, দান্তের হৃদয়ে যে ভাবতরঙ্গ উঠিত, তাহা তিনি কবিতাতেই প্রকাশ করিতে পারিতেন, তাহা দান্তে ভিন্ন আর কাহারও মুখে সাজিত না।

গেটে কহেন, বাল্যকালে তিনি ফুলের পাপড়ি ছিঁড়িয়া দেখিতেন তাহা কীরূপে সজ্জিত আছে— পাখির পালক ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া দেখিতেন তাহা ডানার উপর কীরূপে গ্রথিত আছে। বেটিনা তাঁহার প্রণয়িনীদের মধ্যে একজন। তিনি বলেন, রমণীর হৃদয় লইয়াও গেটে সেইরূপ করিয়া দেখিতেন। তিনি তাহাদের প্রেম উদ্রেক করিতেন— এবং প্রেম-কাহিনী সর্বাঙ্গসুন্দর করিবার জন্য কল্পনার সাহায্যে নিজেও কিয়ৎপরিমাণে প্রেম অনুভব করিতেন, কিন্তু সে প্রেম তাঁহার ইচ্ছাধীন, প্রয়োজন অতীত হইলেই সে প্রেম দূর করিতে তাঁহার বড়ো একটা কষ্ট পাইতে হয় নাই। গেটে নিজেই কহেন, যদি বা প্রেম লইয়া তাঁহার হৃদয়ে কখনো আঘাত লাগিত, সে বিষয়ে একটি নাটক লিখিলেই সমস্ত চুকিয়া যাইত।[১] যতখানি পর্যন্ত ভালোবাসিলে কোনো আশঙ্কার সম্ভাবনা নাই, গেটে ততখানি পর্যন্ত ভালোবাসিতেন, তাহার ঊর্ধ্বে আর নহে।

বাল্যকাল হইতেই গেটের সকল শ্রেণীর লোকদের রীতিনীতি পর্যবেক্ষণ করিয়া দেখিবার ভাব ছিল। এই কারণে তিনি এক-এক সময় অত্যন্ত নীচ শ্রেণীর লোকদের সহিত মিশিতেন। তিনি পঞ্চদশ বৎসর বয়সে একবার এইরূপ এক শ্রেণীর লোকদের মধ্যে একটি রাত্রিভোজে উপস্থিত ছিলেন। অভ্যাগতগণ বার বার মদ্য প্রার্থনা করিলে দাসীর পরিবর্তে একটি বালিকা

---

[১] ম্যানফ্রেডের সমালোচনায় গেটে লিখিয়াছেন যে, বাইরন ফ্লোরেন্সে এক বিবাহিতা মহিলার প্রেমে পড়েন, কিন্তু এই প্রেমবৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া স্বামী আপন স্ত্রীকে হত্যা করে, কিন্তু সেই রাত্রেই বিছানার উপরে তাহারও মৃতদেহ দৃষ্ট হয়, বাইরন সেই রাত্রেই ফ্লোরেন্স ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। ম্যানফ্রেডে যে রমণীর প্রেতাত্মার কথা বর্ণিত আছে সে পূর্বোক্ত মহিলা। গেটে লিখিয়াছেন বটে, কিন্তু এ গল্পটির কোনো মূল্য নাই, সম্পূর্ণ কাল্পনিক। গেটে নিজের সাদৃশ্য মনে করিয়াছিলেন, বাইরনও আপনার জীবনের ঘটনা হইতেই উক্ত নাটক লিখিয়া থাকিবেন।

আসিল। সে মৃদু হাস্যে নমস্কার করিয়া কহিল— 'দাসী অসুস্থ, শুইতে গিয়াছে, আপনাদের কী প্রয়োজন, আমাকে অনুমতি করুন।' এই রমণীকে দেখিয়া গেটের হৃদয় অতিশয় মুগ্ধ হইল— তিনি তাহাকে অতিশয় সুন্দরী দেখিলেন— তাহার বসন, ভূষণ, গঠন, তাহার টুপিটি পর্যন্ত তাঁহার বড়ো ভালো লাগিল। গেটে এই প্রথম প্রেমে পড়িলেন। গেটে তাহার বাড়িতে যাইবার কোনো ছুতা না পাইয়া গির্জায় গিয়া উপাসনার সময় তাহাকেই দেখিতেন। কিন্তু তথাপি উপাসনা ভঙ্গ হইলে পর তাহার সহিত কথা কহিতে বা তাহার সঙ্গ লইতে সাহস করিতেন না। এবং অন্য প্রেমিকদের ন্যায় দূর হইতে তাহার নমস্কার পাইয়াই পরিতৃপ্ত হইতেন— পরিতৃপ্ত না হউন সুখী হইতেন। এই রমণীর নাম গ্রেশেন। যে বাড়িতে তাহাকে প্রথমে দেখিয়াছিলেন সেই বাড়িতে কোনো উপায়ে পুনরায় তাহার সহিত একবার মিলন ধার্য করিয়া সাক্ষাৎ করিলেন। যেন একজন রমণী একজন যুবাকে লিখিতেছে, এইরূপ ভাবের একখানি প্রেমের পত্র তাহাকে পড়িয়া শুনাইলেন। সে শুনিয়া কহিল— 'সুন্দর হইয়াছে বটে। কিন্তু এমন সুন্দর চিঠি যদি সত্য সত্য লেখা হইত, তবে বেশ হইত।' গেটে কহিলেন, 'বাস্তবিক সে যুবা যদি এই চিঠিখানি পাইয়া থাকে আর যে মহিলাকে সে প্রাণাপেক্ষা ভালোবাসে সেও তাহাকে এইরূপ ভালোবাসে, তাহা হইলে সে কী সুখীই হইত।' গ্রেশেন কহিল, 'হাঁ কথাটা শুনিতে যেমনই হউক— নিতান্ত অসম্ভব নহে।' গেটে কহিলেন, 'আচ্ছা মনে করো, একজন যে তোমাকে চেনে, মাথায় করিয়া পূজা করে, ভালোবাসে, সে যদি তোমার সম্মুখে এই চিঠিখানি দেয়, তবে তুমি কী কর?' গ্রেশেন ঈষৎ হাসিয়া, একটু ভাবিয়া চিঠিটা লইল ও তাহার নীচে আপনার নাম সই করিয়া দিল। গেটে আনন্দে উন্মত্ত হইয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিতে গেলেন। সে কহিল— 'না— চুম্বন করিয়ো না— উহা তো সচরাচর হইয়া থাকে, ভালোবাসিতে হয় তো ভালোই বাসো।' প্রেমিকের এরূপ সাহসিকতা আমাদের কাছে কেমন কেমন লাগে বটে— কিন্তু য়ুরোপীয়দের চক্ষে এরূপ দৃশ্য ও তাহাদের কর্ণে এরূপ কথাবার্তা চিরাভ্যস্ত। গেটের জীবনচরিত পড়িবার সময় অবশ্য কতকটা তাঁহাদের দেশীয় আচার-ব্যবহারের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে হইবে। পরে গেটে সেই চিঠিটি লইয়া কহিলেন, 'এ চিঠি আমার কাছেই রহিল— সমস্ত গোল চুকিয়া গেল, তুমি আমাকে বাঁচাইয়াছ।' গ্রেশেন কহিল, 'আর কেহ না আসিতে আসিতে এই বেলা তুমি চলিয়া যাও।' গেটে কোনোমতে তাহাকে ছাড়িয়া যাইতে পারিলেন না। কিন্তু সে স্নেহের সহিত তাঁহার দুই হস্ত ধরিয়া এমন দয়ার্দ্রভাবে কহিল যে, গেটের চক্ষে জল আসিল, গেটে কল্পনায় দেখিলেন তাহারও চক্ষে যেন জল আসিয়াছে। অবশেষে তাহার হস্ত চুম্বন করিয়া চলিয়া আসিলেন। গেটে কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া প্রত্যহ তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন; নানাবিধ ভোজে, নানা প্রমোদ স্থানে তিনি তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতেন। গেটে একদিন গ্রেশেনদের বাড়িতে রাত্রি পর্যন্ত আছেন, সহসা তাঁহার মনে পড়িল তিনি তাঁহাদের দ্বারের চাবি আনিতে ভুলিয়া গিয়াছেন। কহিলেন— তাঁহার বাড়ি ফিরিয়া যাওয়া অনর্থক, অনেক গোলমাল না করিয়া বাড়িতে প্রবেশ করা অসম্ভব। তাহারা সকলে কহিল— 'বেশ তো— এসো, আমরা সকলে মিলিয়া আজ এইখানেই রাত্রি জাগরণ করিয়া কাটাইয়া দিই।' গেটের তাহাতে কোনো আপত্তি ছিল না। এমন-কি, আমাদের এক-এক বার সন্দেহ হয়, তিনি ইচ্ছা করিয়াই বা চাবি আনিতে ভুলিয়া গিয়াছেন। কাফি পান করিয়া সকলে রাত্রি জাগরণের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আস্তে আস্তে তাস খেলা বন্ধ হইল। গল্প ক্রমে ক্রমে থামিয়া আসিল, গৃহের কর্ত্রী তাঁহার চৌকির উপর ঘুমাইতে আরম্ভ করিলেন, অভ্যাগতগণ ঢুলিতে লাগিলেন। গেটে এবং গ্রেশেন জানালার এক ধারে বসিয়া অতি মৃদুস্বরে কথাবার্তা কহিতেছিলেন, ক্রমে গ্রেশেনেরও ঘুম আসিল, তাঁহার মস্তকটি সে ধীরে ধীরে গেটের কাঁধে রাখিল, ক্রমে ঘুমাইয়া পড়িল। গেটেও অল্পে অল্পে ঘুমাইয়া পড়িলেন। এইরূপে সে রাত্রি কাটিয়া গেল। কিন্তু তিনি যে এইরূপ নীচ শ্রেণীর লোকদিগের সহিত মিশেন ইহা তাঁহার পিতার কানে গেল। তিনি মহা ক্রুদ্ধ হইলেন এবং ওই বিষয়ের

অনুসন্ধান করিতে বলিলেন। এই মনোবেদনায় গেটে অত্যন্ত পীড়িত হইলেন, এমন-কি, তাঁহার মস্তিষ্কের পীড়া জন্মিবার উপক্রম হইয়াছিল। তিনি গ্রেশেন ও তাহার বন্ধুদের ভাবনায় অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। তিনি তাঁহার বন্ধুকে গ্রেশেনের বার্তা জিজ্ঞাসা করিলেন— বন্ধুটি ঘাড় নাড়িয়া ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন— 'সে বিষয়ে তোমার বড়ো একটা ভাবিতে হইবে না— সে কিছুমাত্র বিচলিত হয় নাই; সে দিব্য স্বচ্ছন্দে বাস করিতেছে।' সে স্পষ্টই স্বীকার করিল যে, 'হাঁ আমি তাঁহাকে অনেকবার দেখিয়াছি বটে, এবং দেখিয়া আনন্দ লাভ করিয়াছি— কিন্তু সর্বদাই বালকটির ন্যায় তাঁহার প্রতি আমি ব্যবহার করিতাম— আর আমার তাঁহার প্রতি ভগিনীর মতো ভালোবাসা ছিল।' এইরূপে অতি গম্ভীরা-গৃহিণী-ভাবে গ্রেশেন যাহা যাহা বলিয়াছিল, তাঁহার বন্ধু সমস্ত বলিয়া যাইতে লাগিলেন। কিন্তু শেষ কথাগুলি আর গেটে শুনিলেন না— গ্রেশেন যে তাঁহাকে ক্ষুদ্র বালকটি মনে করিত তাহাই তাঁহার প্রাণে বিঁধিয়া গেল। ও কথাটা তাঁহার বড়োই খারাপ লাগিল— তিনি মনে মনে স্থির করিলেন, গ্রেশেনের উপর হইতে তাঁহার সমস্ত ভালোবাসা চলিয়া গিয়াছে। তিনি তাঁহার বন্ধুকে স্পষ্টই বলিলেন, এখন হইতে সমস্তই চুকিয়া বুকিয়া গেল। গেটে গ্রেশেনের কোনো সম্পর্কে আর রহিলেন না— তাহার নামোল্লেখ পর্যন্ত করিতেন না। এমন-কি, পূর্বে তিনি তাহার মুখশ্রী যেরূপ চক্ষে দেখিতেন, এখন তাহা বিপরীতভাবে দেখিতে লাগিলেন— এতদিনে তাহার যথার্থ ভাব বুঝিতে পারিলেন— তাহার মমতাশূন্য নীরস মুখশ্রী তাঁহার চক্ষে পরিস্ফুট হইল। কিন্তু হৃদয়ের আঘাত যন্ত্রণা শীঘ্র নিবৃত্ত হইবার নহে। তিনি কহিলেন— 'যে-সকল বন্ধুদের ব্যবহারে স্পষ্টই বোধ হয়, তোমার চরিত্র তাহারা সংশোধন করিতে চাহিতেছে তাহাদের দ্বারা কোনো ফল জন্মে না— একজন স্ত্রীলোক যাহার ব্যবহারে সহসা মনে হইতে পারে সে তোমাকে নষ্ট করিতেছে সেই স্ত্রীলোকই অলক্ষিতভাবে তোমার চরিত্র সংশোধন করে।' তিনি তাঁহার লিখিত উপাখ্যানের এক স্থানে লিখিয়াছেন— 'কুমারীরা অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক বালকদের অপেক্ষা আপনাকে মহা বিজ্ঞ মনে করে— আর তাহাদিগকে প্রথমে যে বেচারী ভালোবাসা জানায়— তাহাদের নিকট তাহারা মহা দিদিমার চালে চলিতে থাকে।' এ কথাটা সত্য— এবং অনেক অশ্রুজলের মধ্য হইতে তিনি এ সত্যটি উপার্জন করিয়াছিলেন। গেটের প্রেম বহুদিন অলস ও নিষ্কর্মা হইয়া বসিয়া থাকে নাই— অ্যানসেন নামক আর-একটি সুশ্রী বালিকা তাঁহার হৃদয় অধিকার করিল। গেটের এইবারকার প্রেম-কাহিনীতে আমরা প্রেমের আর-এক মূর্তি দেখিতে পাইব।

অ্যানসেন অল্পবয়স্ক, সুন্দরী, প্রফুল্ল এবং প্রিয়দর্শন ছিল। গেটে স্বীয় মোহিনী শক্তির বলে তাহার প্রেম আকর্ষণ করিয়াছিলেন, এবং সে প্রেমকে যথেষ্ট প্রশ্রয় দিয়াছিলেন। কিন্তু তেমনি গেটে সে বালিকার প্রেমের উপর অত্যন্ত অন্যায় ব্যবহার করিতেন। তিনি নিজেই স্বীকার করেন— যে কারণেই হোক তাঁহার মন খারাপ হইলেই তিনি সেই বেচারীর উপরে আক্রোশ প্রকাশ করিতেন— কেন? না সে প্রাণপণে তাঁহাকে সন্তুষ্ট রাখিতে চেষ্টা করিত বলিয়া। তাঁহাকে সন্তুষ্ট রাখা তাহার ব্রত ছিল, এই সুমহৎ অপরাধে তিনি তাহার প্রতি ক্রমাগত অসন্তোষ প্রকাশ করিতেন! অনর্থক অসূয়া ও অকারণ সন্দেহে তিনি আপনাকে ও তাহাকে সর্বদাই অসুখী করিতেন। এই-সকল প্রণয়ের অত্যাচার অ্যানসেন অনেক দিন পর্যন্ত সহ্য করিয়াছিল, প্রশংসনীয় ধৈর্যের সহিত সহ্য করিয়াছিল; কিন্তু আর সহিল না। ক্রমাগত জ্বালাতন হইয়া, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আঘাতের পর আঘাত পাইয়া অবশেষে তাহার ধৈর্য টুটিয়া গেল। অন্যায় অত্যাচারে তাহার প্রেম ক্রমে ক্রমে বিনষ্ট হইয়া গেল। এদিকে গেটে তাহাকে সত্য সত্য মনের সহিত ভালোবাসিতেন। অ্যানসেন যখন বিমুখ হইয়া দাঁড়াইল তখন গেটের চৈতন্য জন্মিল। এতদিন অ্যানসেন তাঁহাকে সাধিয়া আসিতেছিল, এখন তাঁহার সাধিবার পালা পড়িল। তিনি তাহার প্রেম পুনর্জীবিত করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কিন্তু আর হয় না, অ্যানসেনের মন আর ফিরিবার নহে, একেবারে তাঁহার উপর হইতে তাহার প্রেম চলিয়া গিয়াছে। কিছুদিন পরে অ্যানসেনের বাসভূমি

লিপ্‌সিক্ হইতে তাঁর জন্মভূমি ফ্র্যাঙ্কফোর্টে তিনি ফিরিয়া আসিলেন, তখন অ্যানসেনের সহিত চিঠি লেখালেখি শুরু করিলেন— লিখিলেন— 'আমাকে মনে রাখিবার জন্য অনুরোধ করিবার বোধ হয় আবশ্যক নাই। যে ব্যক্তি সার্ধ দুই বৎসর প্রায় তোমাদের পরিবার মধ্যে ভুক্ত হইয়া বাস করিয়াছিল, যে ব্যক্তি অনেক সময় তোমার অসন্তোষের কারণ হইয়াছিল সত্য কিন্তু তথাপি তোমার প্রতি সর্বদাই অনুরক্ত ছিল, সহস্র ঘটনা বোধ হয় তাহাকে তোমার স্মৃতিপথে উদিত করিয়া দিবে— অন্তত তুমি তাহার অভাব অনুভব করিবে— তুমি না কর আমি অনেক সময় করিয়া থাকি।' দিন কতক গেটে তাহার সহিত চিঠি লেখালেখি করিয়াছিলেন— কিন্তু তাহার মন আর বিচলিত করিতে পারেন নাই। অবশেষে তাহার বিবাহবার্তা শুনিয়া কহিলেন—

'আমি তোমার লেখা আর দেখিতে চাহি না— তোমার কণ্ঠস্বর আর শুনিতে চাহি না— আমি যে স্বপ্নে মগ্ন রহিয়াছি তাহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। তুমি আমার আর-একটি মাত্র পত্র পাইবে, এ অঙ্গীকার আমি নিশ্চয় পালন করিব এবং এইরূপে আমার ঋণের এক অংশ মাত্র পরিশোধ দিব, অবশিষ্টটুকু আমাকে মার্জনা করিয়ো।' আর-একটি পত্র লিখিয়াছিলেন— তাহাতে কহিয়াছিলেন, 'আমার নিজের বিষয়ে বিশেষ কিছুই বক্তব্য নাই— আমি সবল সুস্থ শরীরে পরিশ্রম করিয়া অতি সুখশান্তিতে কাল যাপন করিতেছি— তাহার প্রধান কারণ— এখন আর আমাকে কোনো স্ত্রীলোকে পায় নি!' এইরূপে গেটে তাঁহার হৃদয়-জ্বালা শান্তি করিতে অ্যানসেনের দ্বারে নিরাশ হইয়া কল্পনার দ্বারে আশ্রয় লইলেন— একটা নাটক লিখিয়া ফেলিলেন। এই নাটকের নাম 'প্রেমিকের খেয়াল'। এরিডনকে (গ্রন্থের নায়ককে) তাঁহার প্রণয়িনীর সখী কহিলেন— 'অ্যামীন (নায়িকা) তোমাকে এত ভালোবাসে যে, কোনো স্ত্রীলোক তেমন ভালোবাসে নাই।' নায়িকাকে তাহার সখী কহিল, 'যে পর্যন্ত তাঁহার অসুখের সত্য কোনো কারণ না থাকিবে সে পর্যন্ত তিনি একটা-না-একটা কারণ কল্পনা করিয়া লইবেন; তিনি জানেন যে, তুমি তাঁহা অপেক্ষা আর অধিক কিছুই ভালোবাস না— তুমি তাঁহাকে সন্দেহের কোনো কারণ দাও না বলিয়াই তিনি তোমাকে সন্দেহ করেন, একবার তাঁহাকে দেখাও যে তাঁহাকে না হইলেও তোমার চলে। তাহা হইলে এখনকার একটি চুম্বন অপেক্ষা তখনকার একটি দৃষ্টিতে অধিকতর সন্তুষ্ট হইবেন।' এইখানে গেটের দ্বিতীয় প্রেমাভিনয়ের যবনিকা পড়িয়া গেল।

এক সময়ে গেটে গোল্ডস্মিথের 'বাইকার' নামক উপন্যাস পাঠে নিযুক্ত ছিলেন। এমন সময়ে তিনি শুনিলেন, স্ট্রাস্‌বর্গের নিকটে অবিকল প্রিম্‌রোস্ পরিবারের ন্যায় এক পাদ্রী পরিবার বাস করেন। তিনি কৌতূহলবশত তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ ও আলাপ করিলেন। দেখিলেন— পাদ্রীর কনিষ্ঠা কন্যা ফ্রেড্‌রিকার সহিত সোফিয়ার অনেক সাদৃশ্য আছে। সে পরিবারের মধ্যে গেটে দুই দিন বাস করিলেন— এবং সেখানে তাঁহার অতুল্য মোহিনী শক্তি প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। ফিরিয়া আসিবার সময় ফ্রেড্‌রিকার জন্য নিশ্বাস ফেলিয়া আসিলেন— বোধ হয় ফ্রেড্‌রিকাও তাঁহার জন্য নিশ্বাস ফেলিয়াছিল। কিছু দিন পরে আবার সহসা এক সন্ধ্যাকালে তাহাদের সেখানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। অলিভিয়া ও ফ্রেড্‌রিকা দুই বোনে দ্বারের কাছে বসিয়াছিল। আদরের সহিত তিনি সেখানে আহূত হইলেন। আলোতে আসিবামাত্র অলিভিয়া তাঁহাকে দেখিয়া হাসিয়া উঠিল— সে গেটের অদ্ভুত পরিচ্ছদ দেখিয়া হাস্য সংবরণ করিতে পারিল না। ফ্রেড্‌রিকা কহিল, 'কই— আমি তো হাসিবার মতো কিছুই দেখিতে পাই নাই'— কিন্তু ফ্রেড্‌রিকা দেখিতে পাইবে কেন?

এই কাহিনী শেষ করিবার পূর্বে ইহার অন্তর্ভুক্ত আর-একটি উপাখ্যান বলিয়া লই। গেটে ইতিপূর্বে এক ফরাসি শিক্ষকের নিকট নৃত্য শিখিতেন। তাঁহার শিক্ষকের দুই কন্যা ছিল, দুইজনই যুবতী ও রূপবতী— ইহাদের মধ্যে কনিষ্ঠাটি আর-এক জনের প্রেমাসক্তা। জ্যেষ্ঠা লুশিন্দা তাঁহার প্রেমে পড়িল, কিন্তু তিনি কনিষ্ঠা এমিলিয়ার প্রেমে পড়িলেন। এক সময়ে লুশিন্দা রোগশয্যায় শয়ান ছিল— তাহার ঘরের পার্শ্বে এমিলিয়া ও গেটে বসিয়াছিলেন। এমিলিয়া গেটের নিষ্ফল

প্রেম লইয়া কথোপকথন করিতেছিল। কিছুক্ষণ পরে এমিলিয়া গেটেকে কহিল— 'তোমাতে আমাতে তবে এই পর্যন্ত।' গেটেকে দ্বার পর্যন্ত লইয়া গিয়া এমিলিয়া কহিল, 'আমাদের এই শেষ দেখা। তোমাকে যাহা কখনো দিই নাই ও দিতাম না, আজ তাহা দিলাম,' এই বলিয়া গেটের গলা ধরিয়া তাঁহাকে চুম্বন করিল। উন্মত্ত গেটে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন— এমন সময়ে লুশিন্দা তাহার রোগশয্যা হইতে বিশৃঙ্খল-বসনে ছুটিয়া আসিয়া এমিলিয়াকে কহিল, 'তুমি একলা কেবল উঁহার নিকট হইতে বিদায় লইতে পারিবে না।' এমিলিয়া গেটেকে ছাড়িয়া দিল— লুশিন্দা গেটের বক্ষ জড়াইয়া ধরিল— ও তাহার স্বর্ণবর্ণ কেশপাশ দিয়া তাঁহার মুখ ঢাকিয়া ফেলিল। লুশিন্দা অনেকক্ষণ নীরবে এই অবস্থায় রহিল— গেটে তো কতকটা হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে লুশিন্দা গেটেকে ছাড়িয়া দিয়া ব্যাকুলনেত্রে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। আবার কিয়ৎক্ষণ পরে ছুটিয়া গিয়া চুম্বনে তাঁহাকে যেন প্লাবিত করিয়া দিল; পরিশেষে কহিল— 'এখন আমার অভিশাপ শুন— আমার 'পরে প্রথম যে তোমার ওই অধর চুম্বন করিবে— চিরকাল তাহার দুঃখের পর দুঃখ হউক! যদি সাহস হয় তবে পুনরায় চুম্বন করিয়ো— কিন্তু আমি নিশ্চয় জানি ঈশ্বর আমার প্রার্থনা শুনিয়াছেন। এখন তুমি বিদায় হও— যত শীঘ্র পার, বিদায় হও!' গেটে বিদায় হইতে কিছুমাত্র কালবিলম্ব করিলেন না।

এখন আমরা পুনরায় ফ্রেড়রিকার নিকট প্রত্যাবর্তন করি। পূর্বোক্ত দ্বিতীয় মিলনকালে গেটে ফ্রেড়রিকার সহিত গ্রামপথে ভ্রমণ করিতেছেন— দিনগুলি অতি শীঘ্র ও অতি সুখে চলিয়া যাইতেছে— কিন্তু এ পর্যন্ত সেই অভিশাপের ভয়ে গেটে কখনো ফ্রেড়রিকাকে চুম্বন করেন নাই। এইখানে পুনরায় পাঠকদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি যে, বৈদেশিকের জীবন চরিত্র পড়িবার সময় আপনাকে কতকটা তাহাদেরই রীতিনীতি প্রথা সহাইয়া লওয়া প্রয়োজনীয়। তাহাদের কার্য তাহাদেরই আচার-ব্যবহারের সহিত তুলনা করিয়া বিচার করা কর্তব্য। এক প্রকার তাস খেলা আছে, হারিলে চুম্বন দণ্ড দিতে হয়— গেটে এই চুম্বনের পরিবর্তে কবিতা উপহার দিতেন— কিন্তু যে মহিলার তাঁহার নিকট হইতে চুম্বন প্রাপ্য থাকিত তাঁহার যে মর্মে আঘাত লাগিত তাহা বলা বাহুল্য। কিন্তু গেটে অধিক দিন এরূপ সামলাইয়া চলিতে পারেন নাই। একটি নাচের উৎসবে গেটে ফ্রেড়রিকার সহিত নাচিয়াছিলেন— গেটের নাচ ফ্রেড়রিকার বড়ো ভালো লাগিয়াছিল। নাচ শেষ হইলে উভয়ে হাত ধরাধরি করিয়া নির্জনে গিয়া আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, উভয়ই উভয়কে মনের সহিত ভালোবাসেন। দিনে দিনে উভয়ের ভালোবাসা বর্ধিত হইতে লাগিল— অবশেষে গেটের বিদায় লইবার সময় আত্মীয়দের সম্মুখেই ফ্রেড়রিকা তাঁহাকে চুম্বন করিল। গেটে ফ্রেড়রিকার প্রেমকে বরাবর পালন করিয়া আসিয়াছিলেন— কিছুই বলা কহা হয় নাই, অথচ একপ্রকার স্থির হইয়া গিয়াছিল যেন তিনি বিবাহ করিবেন। কিন্তু গেটে জানিতেন তাঁহার বিবাহ করিবার কোনো সম্ভাবনা নাই। বিদায় হ'ব হ'ব সময়ে ওই কথা তাঁহার স্মরণ হইল। তখন ফ্রেড়রিকাকে দেখিলে তাঁহার মন কেমন অসুস্থ হইত— ফ্রেড়রিকা হইতে দূরে থাকিতে পারিলেই একটু শান্ত হইতেন। বিদায়কালে গেটে অশ্বে আরোহণ করিয়া হাত বাড়াইয়া দিলেন— ফ্রেড়রিকা তাঁহার হাত ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল।

মনে মনে বিবাহ করিব না জানিয়াও বালিকার প্রেমকে প্রশ্রয় দেওয়া যে অন্যায় হইয়াছিল, তাহা বলা বাহুল্য। কিন্তু ফ্রেড়রিকা তাঁহাকে কিছুমাত্র তিরস্কার বা তাঁহার নামে কোনো দোষারোপ তা সে করে নাই। গেটের হৃদয় হইতে প্রেম যেরূপ ধীরে ধীরে অপসৃত হইয়াছিল, ফ্রেড়রিকারও সেইরূপ হইয়াছিল কিনা বলিতে পারি না। যাহা হউক অবিবাহিত অবস্থাতেই তাহার মৃত্যু হয়। গেটে ফ্রেড়রিকা সম্বন্ধে কহেন—

'গ্রেশেন আমার নিকট হইতে দূরীকৃত হইয়াছিল— অ্যানসেন আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছিল— কিন্তু এই প্রথম আমি নিজে দোষী হইয়াছিলাম। আমি একটি অতি সুন্দর হৃদয়ের অতি গভীরতম স্থান পর্যন্ত আহত করিয়াছিলাম। অন্ধকারময় অনুতাপে সেই অতি আরামদায়ক

প্রেমের অবসানে কিছুকাল যন্ত্রণা পাইয়াছিলাম, এমন-কি, তাহা অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু মানুষকে তো বাঁচিয়া থাকিতে হইবে, কাজে কাজেই অন্য লোকের উপরে মনোনিবেশ করিতে হইল।'

এখন গেটে শারলোট্‌ নামক এক রমণীর প্রতি মনোনিবেশ করিলেন। কেজ্‌নার নামক যুবার সহিত শারলোটের বিবাহ স্থির হইয়া গিয়াছে। উভয়ই উভয়ের প্রেমে আসক্ত। কেজ্‌নারের প্রণয়ে অসূয়া বা সন্দেহ কিছুমাত্র ছিল না; যাহাকে সে ভালো মনে করিত তাহারই সহিত শারলোটের আলাপ করাইয়া দিত। এইরূপে গেটের সহিত শারলোটের প্রথম আলাপ হয়। প্রেমিক-যুগলের সহিত গেটের প্রণয়-সম্বন্ধ ক্রমেই পাকিয়া উঠিতে লাগিল। শারলোট্‌ ব্যতীত তিনি আর থাকিতে পারেন না। তাঁহারা উভয়ে মিলিয়া ওয়েট্‌ল্লারের উর্বর ক্ষেত্রে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। যদি কাজকর্ম হইতে অবসর পাইতেন তবে কেজ্‌নারও তাঁহাদের সহিত যোগ দিতেন। এইরূপ ধীরে ধীরে তাহারা পরস্পরের সহিত এমন মিলিত হইয়া গেল যে, একজনকে নহিলে যেন আর-একজনের চলিত না। যতখানি উপযুক্ত, অলক্ষিতভাবে গেটের তদপেক্ষা প্রেম জন্মিয়া গিয়াছিল। কিন্তু শারলোটের মন কেজ্‌নার হইতে গেটের প্রতি ধাবিত হয় নাই। ক্রমে ক্রমে তাহাদের বিবাহের সময় হইয়া আসিতেছে— গেটে দেখিলেন, তাঁহার হৃদয়েও প্রেম দিন দিন বদ্ধমূল হইয়া আসিতেছে— গেটে দেখিলেন এইবেলা হইতেই দূরে পলায়ন করা সৎপরামর্শ। দূরে প্রস্থান করিলেন ও এই বিষয় লইয়া তাঁহার বিখ্যাত উপাখ্যান 'যুবা ওরার্থরের যন্ত্রণা' লিখিয়া ফেলিলেন। লেখাও শেষ হইল আর তাঁহার প্রেমও শেষ হইল। এখন তিনি আবার নূতন পথে যাইবার বল পাইলেন।

নূতন পথে যাইতে তাঁহার বড়ো বিলম্ব হয় নাই। লিলি নামক এক ষোড়শবর্ষীয়া বালিকার (আমাদের দেশে যুবতী) সহিত তাঁহার প্রণয় জন্মিল। সে বালিকার অনেকগুলি অনুরাগী বা বিবাহাকাঙ্ক্ষী ছিল। তাহাদের সকলকেই তাহার প্রেমে বন্দী করিবার দিকে লিলির বিশেষ যত্ন ছিল, কিন্তু দৈবক্রমে আপনি গেটের প্রেমে জড়াইয়া পড়িল— এ কথা সে নিজেই গেটের কাছে স্বীকার করিল। দেখিতে দেখিতে তাঁহাদের প্রেম বাড়িয়া উঠিল ইহা বলা বাহুল্য। অবশেষে তাঁহাদের অবস্থা এমন হইয়া উঠিল যে, সুদূর বিচ্ছেদের কথা মনে করিতেও কষ্ট হইত; উভয়ের উভয়ের উপর এমন বিশ্বাস জন্মিয়া গেল যে, অবশেষে তাঁহারা বিবাহের বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিন্তু উভয়েরই কর্তৃপক্ষের তাহাতে অমত হইল। অবশেষে একজন রমণী মধ্যস্থা হইয়া উভয় পক্ষকেই সম্মত করাইল। যতদিন কর্তৃপক্ষীয়েরা সম্মত হন নাই ততদিন গেটে বড়োই যন্ত্রণা পাইয়াছিলেন। কিন্তু সম্মত হইলে পর তাঁহার মনের নূতন প্রকার পরিবর্তন হইল। তখন সমস্ত নূতনত্ব চলিয়া গেল। যখন লিলিকে হস্তপ্রাপ্য মনে করিলেন তখন লিলির উপর আর টান থাকিবে কেন? লিলির নিকট হইতে বিদায় না লইয়া তিনি আস্তে আস্তে ফ্র্যাঙ্কফোর্ট্‌ ত্যাগ করিয়া চলিলেন। তিনি বলেন, তিনি লিলিকে ভুলিতে পারেন কিনা— এবং লিলির উপর বাস্তবিক তাঁহার কতখানি প্রেম আছে, তাহাই পরীক্ষা করিবার জন্য তিনি বিদেশে যাইতেছেন। কিন্তু এই পরীক্ষার কথা যখনি তাঁহার মনে আসিয়াছে, তখনি বুঝা গিয়াছে বাস্তবিক তাঁহার প্রেম নাই। যদি তাঁহার প্রেমের তেমন গভীরতা থাকিত তবে কি পরীক্ষার কথা মনেই আসিত? কিছুদিন বিদেশে থাকিয়া আবার তিনি ফ্র্যাঙ্কফোর্টে ফিরিয়া আসিলেন। ইতিমধ্যে লিলির আত্মীয়বর্গ লিলির প্রেম বিনষ্ট করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছিল— কিন্তু লিলি কহিল, সে গেটের জন্য সমস্ত ত্যাগ করিতে পারে— এমন-কি, গেটে যদি সম্মত হন, তবে সে তাঁহার সঙ্গে আমেরিকায় যাইতে পারে। কী সর্বনাশ— গেটে তাঁহার বাড়ি ঘর ছাড়িয়া কোথা এক সাত সমুদ্র পার আমেরিকা— সেইখানে যাইবেন। তাও কি হয়? লিলি গেটের জন্য সমস্ত করিতে পারে, কিন্তু গেটে তাহার জন্য বড়ো একটা ত্যাগস্বীকার করিতে সম্মত নহেন। ত্যাগস্বীকার করা দূরে থাকুক, কোনো ত্যাগস্বীকার করিতে না হইলেও তিনি লিলিকে বিবাহ করেন কিনা সন্দেহ।

আবার গেটে আস্তে আস্তে পলাইবার চেষ্টা দেখিলেন। একবার লিলির ঘরের জানালার সম্মুখে দাঁড়াইলেন— দেখিলেন যেখানে পূর্বে প্রদীপ জ্বলিত, সেইখানেই জ্বলিতেছে— লিলি পিয়ানো বাজাইয়া তাঁহারই রচিত একটি গান গাহিতেছে— তাহার প্রথম ছত্র :

'হায়— কী সবলে মোরে করিয়াছে আকর্ষণ।'

এ গানটি কিছুকাল পূর্বে তিনিই লিলিকে উপহার দিয়াছিলেন। যাহা হউক— গেটে লিলির সবল আকর্ষণ তো ছিঁড়িলেন।

যে ব্যক্তি মৃত্যুকাল পর্যন্ত একজনের পর আর-একজনকে ভালোবাসিয়া আসিয়াছিলেন, ও ভালোবাসা পাইয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহার প্রেমের কথা আর কত বলিব। তাঁহার ছিয়াত্তর বৎসর বয়সের সময় মাডাম জিমানৌস্কা তাঁহার প্রেমে পড়েন।

গেটের এই প্রেম-কাহিনী সমুদয়ে পাঠকেরা যে মহাকবি গেটের হৃদয় জানিতে পারিবেন মাত্র তাহা নহে—প্রেমের বিচিত্র মূর্তিও দেখিতে পাইবেন।

ভারতী
কার্তিক ১২৮৫

নর্ম্যান জাতি ও অ্যাংলো-নর্ম্যান সাহিত্য

টিউটনিক জাতিরা রোমান রাজ্য অধিকার করুক কিন্তু রোমান জাতিদিগের সহিত না মিশিয়া থাকিতে পারে নাই। বিজিত জাতিদিগের সহিত তাহাদের আচার ব্যবহার ভাষা ধর্ম সমস্ত মিশিয়া গিয়াছিল। তাহারা রোমান রাজ্য শাসন করিত, কিন্তু রোমান শাসন-প্রণালী অনুসারে শাসন করিত। রোমান রাজ্যে তাহাদের আধিপত্য বিস্তার হইয়াছিল কিন্তু রোমান স্বভাব রোমান প্রথা তাহাদের জাতীয় স্বভাব, জাতীয় প্রথার উপর আধিপত্য লাভ করিয়াছিল। সেই টিউটনিক জাতি কেবল ইংলন্ডে আপনাদের জাতিত্ব রক্ষা করিতে পারিয়াছিল। যে কেল্টিক জাতিকে তাহারা প্রায় ধ্বংস করিয়াছিল তাহারা টিউটন অর্থাৎ স্যাক্সন জাতিদিগের অপেক্ষা সভ্য ছিল সন্দেহ নাই, সভ্য রোমানদের শাসনে থাকিয়া তাহারা ধর্ম ও আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে অনেক উন্নতি লাভ করিয়াছিল।

আবার দেখো, নর্ম্যানেরা যখন স্যাক্সন-অধিকৃত ইংলন্ডে আধিপত্য বিস্তার করিল, তখন তাহারা আর আপনাদের জাতিত্ব রক্ষা করিতে পারিল না— অল্প দিনেই স্যাক্সনদিগের সহিত মিশিয়া গেল, কিন্তু ইহার প্রচুর কারণ বিদ্যমান আছে। প্রথমত, যখন স্যাক্সনেরা ব্রিটন অধিকার করিতে আইসে, তখন তাহাদের অবস্থা পশুদের অপেক্ষা অল্পই উন্নত ছিল মাত্র, তখন তাহারা স্বার্থের জন্য নহে, রক্ত-পিপাসা-শান্তির জন্যই রক্তপাত করিত, ধ্বংসকার্যই তাহাদের দুর্দমনীয় উদ্যমের ক্রীড়া ছিল। রোমানদিগের অন্তঃক্ষয়কর শাসন-ভারে দুর্বল হতভাগ্য কেল্টজাতি যে তাহাদের ধ্বংসপ্রবৃত্তির সম্মুখে পড়িয়া বিনষ্ট হইবে তাহাতে আশ্চর্য নাই। কিন্তু সভ্যতর নর্ম্যান জাতিরা যখন ব্রিটনে পদার্পণ করিল তখন অকারণে রক্তপাত করা তাহাদের ব্যবসায় ছিল না, তখন তাহারা খৃস্টীয় ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছে ও অন্যায় কার্য করিতে হইলেও ন্যায়ের নামে করা তাহাদের প্রথা হইয়াছিল। দ্বিতীয়ত, স্যাক্সন জাতিরা আপনাদের অনুর্বর দেশ পরিত্যাগ করিয়া বাস করিবার নিমিত্ত দলে দলে ব্রিটনে ঝাঁকিয়া পড়িল, কেল্টদিগের উপর আধিপত্য করা তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল না, দেশের অধিবাসী হওয়াই তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল, এরূপ অবস্থায় দেশের প্রাচীন অধিবাসীদিগকে বিনষ্ট করিয়া তাহাদের স্থান অধিকার করাই তাহাদের স্বার্থ ছিল। কিন্তু নর্ম্যানেরা ব্রিটন শাসন করিতে আসিয়াছিল, ব্রিটনের অধিবাসী হওয়া তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল না, ব্রিটনের অধিপতি হওয়াই তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল। তৃতীয়ত, কেল্টদিগের সহিত

স্যাক্সনদিগের ধর্ম আচার ব্যবহার নীতি স্বভাব কোনো বিষয়েই ঐক্য ছিল না, কিন্তু স্যাক্সন ও নর্ম্যানদের মধ্যে অনেক ঐক্যস্থল ছিল। ভারতবর্ষ শাসন করিবার জন্য ও এখানে বাণিজ্য করিবার নিমিত্ত যে-সকল অল্প সংখ্যক ইংরাজ বাস করে তাহারা নিয়মিত সময় উত্তীর্ণ হইলেই আবার স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে, আবার নূতন দল এ দেশে আগমন করে, কিন্তু এরূপ না হইয়া যদি অল্প সংখ্যক শাসয়িতৃদল এ দেশে চিরকাল বাস করিত, তাহা হইলে সেই ক্ষুদ্র দল বিশেষ প্রতিবন্ধক না পাইলে খুব সম্ভবত ভারতবর্ষীয়দের সহিত মিশিয়া যাইত। নর্ম্যানদের সেই অবস্থা হইয়াছিল, নর্ম্যান্ডি হইতে একদল নর্ম্যান ব্রিটিশদিগকে অধীনে রাখিবার নিমিত্ত ব্রিটনে গিয়াছিল, কিন্তু তাহারা আর স্বদেশে ফিরিল না। ব্রিটন-বিজেতা যখন স্বয়ং ব্রিটনে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন তখন জেতা ও জিতদিগের মধ্যে মিলন না হওয়াই আশ্চর্য। হিন্দুজাতি যদি নিতান্ত স্বাতন্ত্র্য-প্রিয় না হইত, তাহা হইলে মুসলমান বিজেতাদিগের সহিত হয়তো মিলিয়া যাইত।

দূর পর্যন্ত দেখিতে গেলে যে জাতিই ইংলন্ড জয় করিয়াছে সকলেই টিউটনিক বংশভূত। স্যাক্সন, ডেনিস ও নর্ম্যান সকলেই এক জাতীয় লোক। টিউটনিক জাতিদিগের জাতিগত স্বভাব অনুসারে নর্ম্যান অর্থাৎ Northmanগণ দলে দলে তাহাদের জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া দেশে দেশে দস্যুতা করিয়া ফিরিত। এই মহা দুর্দান্ত সামুদ্রিক দস্যুগণের তরণী দূর হইতে দেখিলে সমস্ত য়ুরোপ কম্পিত হইত, ভূমধ্যস্থ সাগরে এই নর্ম্যান দস্যুদের জাহাজ দেখিয়া মহাবীর শার্লমেন একদিন অশ্রু বিসর্জন করিয়াছিলেন। ইহারা অসাধারণ সামুদ্রিক ছিল, ইহাদের রক্তে Blake এবং Nilson সৃষ্ট হইয়াছিল, ইহাদেরই নিকট হইতে ইংরাজেরা সুনাবিকতার বীজ প্রাপ্ত হইয়াছেন। সত্য মিথ্যা জানি না, প্রবাদ আছে, ইহারা কলম্বসের বহুপূর্বে আটলান্টিক পার হইয়াছে। পূর্বকালে ফিনিসীয়গণ সামুদ্রিক ছিল কিন্তু তাহারা বাণিজ্য করিবার নিমিত্ত দেশ-বিদেশ পর্যটন করিত, অর্থ উপার্জিত হইলে স্বদেশে ফিরিয়া যাইত, কিন্তু - নর্ম্যানগণ আপনাদের কুজ্ঝটিকাময় অন্ধকার অনুর্বর দেশ পরিত্যাগ করিয়া উজ্জ্বল, ধনধান্যশালী ইটালি, ফ্রান্স ও ইংলন্ড প্রভৃতি স্থানে চির-আশ্রয় গ্রহণ করে। আশ্চর্য এই যে, যেখানেই গিয়াছে সেইখানেই তাহাদের জাতিত্ব লোপ পাইয়াছে, এখন আর নর্ম্যান বলিয়া একটি জাতি নাই। যদিও নর্ম্যান জাতি স্যাক্সনদের সঙ্গে মিশিয়া গেল তথাপি ইংরাজ-ইতিহাসে তাহারা ঘোরতর পরিবর্তন বাধাইয়াছিল। নর্ম্যানেরা না মিশিলে ইংরাজেরা এ ইংরাজ হইত কি না সন্দেহস্থল। আমরা ফ্রান্সে নর্ম্যানদের উপনিবেশ হইতে আরম্ভ করিয়া ইংলন্ড পর্যন্ত তাহাদের অনুগমন করিব।

ফ্রান্সে এখন ক্লোভিস (Clovis)-বংশোদ্ভব রাজগণ সিংহাসনচ্যুত হইয়াছেন ও শার্লমেন-বংশীয় রাজগণের রাজপ্রভাব জীর্ণপ্রায় হইয়াছে, এমন সময়ে উত্তর দেশীয় ক্ষুধিত পঙ্গপাল ফ্রান্সের উর্বর ক্ষেত্রে ঝাঁকিয়া পড়িল। প্যারিস তখন ফ্রান্সের রাজধানী ছিল না। নর্ম্যানদিগের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ফ্রান্সের দুর্বল অধিপতি, Charles রবট্‌কে (Roborts the Strong) এক বৃহৎ জায়গীর দিয়া সীমান্ত রাজ্যে অধিষ্ঠিত করেন। রবটের পুত্র গুডোর সময়ে প্যারিস সেই রাজ্যের প্রধান নগরী হয়। ফরাসিরাজ তখন হয়তো সন্দেহ মাত্র করেন নাই যে, তিনি বহিঃশত্রু হইতে রাজ্যরক্ষা করিবার জন্য গৃহের মধ্যে শত্রু পোষণ করিতেছেন। যখন ফ্রান্স-অধিপতির রাজকীয় উপাধি ভিন্ন অন্য বড়ো একটা কিছু অবশিষ্ট ছিল না, তখন বলীয়ান প্যারিসের জায়গীরপতি তাঁহার সিংহাসনের প্রতি এক-একবার কটাক্ষপাত করিতেছিলেন, এমন সময়ে নর্ম্যানগণ প্রকৃত প্রস্তাবে ফ্রান্সের রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইল। তখন ফ্রান্সের বড়ো দুরবস্থা। বলিতে গেলে, তখন বর্তমান ফ্রান্স গঠিত হয় নাই, তখন পুরাতন ফ্রান্স জীর্ণ হইয়া পড়িতেছিল। ফ্রান্স তখন খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত হইয়াছিল। ভিন্ন লোক তোমার শত্রু না হইতে পারে, কিন্তু আপনার লোক ভিন্ন হইয়া গেলে সে তোমার শত্রু হইয়া দাঁড়ায়। ফ্রিমেন সাহেব অতি যথার্থ কথা বলিয়াছেন যে, 'ফ্রান্সের প্রতি বিভিন্ন খণ্ড যদি বিভিন্ন দেশ হইয়া যাইত, তাহাদের মধ্যে যদি কোনো যোগ না থাকিত, তবে সে বিভাগে ভয়ের কারণ থাকিত না। প্রত্যেক ক্ষুদ্র অধিরাজ্য-

স্বামীর ইচ্ছা তাঁহার সীমা বাড়াইয়া লন— বাহিরের শত্রু আক্রমণ করিলে জাতীয়ভাবে সকলে একত্রে মিলিত হইয়া তাহাকে বাধা দেওয়া দূরে থাকুক, সকলেই ভয় করিতে থাকে, পাছে তাহাদের মধ্যে আর কেহ শত্রুর সাহায্য লইয়া তাহার অধিকারে হস্তক্ষেপ করে, অতএব তাহা সহজেই মনে হইতে পারে যে, আগে হইতে আমিই যে কেন শত্রু-সাহায্যের সুবিধা ভোগ না করিয়া লই!'

তখন য়ুরোপের অবস্থা অতি শোচনীয় ছিল। চারি দিক হইতে মুমূর্ষু অথবা মৃত রোমীয় প্রভাবের উপর শকুনি ও গৃধিনীদল ঝাঁকিয়া পড়িতেছিল। তখন দারুণ অরাজকতার কাল। স্যারাসীনগণ সার্ডিনিয়া ও সিসিলি অধিকার করিয়া গ্রীস, ইটালি ও নিকটবর্তী দেশসমূহে উপদ্রব করিতেছিল। দুর্দান্ত সক্ল্যাভোনীয়গণ (Sclavonians) জর্মনির অধিকার হইতে বোহেমিয়া, পোল্যান্ড এবং প্যানোনিয়া (আধুনিক অস্ট্রিয়া) কাড়িয়া লইয়াছিলেন। তাতার জাতীয় দস্যুদল নিদারুণ উপপ্লবে সমস্ত ইটালি, জর্মানি ও দক্ষিণ ফ্রান্স কম্পিত করিয়া তুলিয়াছিল, কিন্তু সর্বাপেক্ষা এই উত্তর দেশীয় সামুদ্রিক দস্যুগণ এই নর্থম্যান নরশোণিত-পিপাসুগণ প্রচণ্ড ছিল। উপর্যুপরি ইংলন্ড এবং ফ্রান্স তাহারা বিপর্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। তাহারা যখন ইংলন্ড আক্রমণ করিত, তখন ফ্রান্স বিশ্রাম করিত, যখন ফ্রান্স আক্রমণ করিত তখন ইংলন্ড বিশ্রাম করিত। Charles the Bald-এর রাজত্বকালে ইহারা ফ্রান্সের অন্তঃপ্রদেশে প্রবেশ করিতে পারিয়াছিল। তখন চার্লস ও তাঁহার পরিবারের মধ্যে গৃহ-বিবাদ ঘটিয়া রক্তপাতে ফ্রান্স দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল। ক্ষুদ্র প্রাদেশিক রাজগণ অবাধ্য হইয়া উঠিয়াছিল।

নর্থম্যান দস্যুদল ফ্রান্সে এবং ইংলন্ডে নূতন প্রকার যুদ্ধের প্রথা অবলম্বন করিয়াছিল। নদী বাহিয়া তাহারা যে দ্বীপ পাইত, সেইখানেই দুর্গ নির্মাণ করিত। এই দুর্গসকল তাহাদের লোপ্ত্র দ্রব্যের ভাণ্ডার ছিল, তৎসমুদায় তাহাদের রমণী ও শিশুদিগের নিবাস-ভূমি ছিল ও পরাজয়কালে আশ্রয়স্থান ছিল। দুর্বল ফ্রান্স-অধিপতি অস্ত্রের বলে তাহাদের বাধা দিতে অক্ষম ছিলেন, সুতরাং অর্থ দিয়া তাহাদের অত্যাচার নিবারণ করিতে হইত মাত্র। অবশেষে Charles the Simple নর্ম্যান্ডি দেশ দান করিয়া তাহাদের নিকট শান্তি ক্রয় করিলেন। তাহাতে হানি হইল না, নর্ম্যান্ডি ফ্রান্স হইতে বিচ্ছিন্ন হইল না। নর্ম্যানদের ভাষা ফরাসি হইল, নর্ম্যানদের আচার-ব্যবহার ফরাসি হইল, নর্ম্যান জাতি ফরাসিস্ হইয়া দাঁড়াইল, নর্ম্যানদিগের অধিপতি রলফ (Hrolf) নর্ম্যান্ডির রাজা হইলেন।

ইহার এক শতাব্দী পরে নর্ম্যান্ডির রাজা উইলিয়ম ইংলন্ড আক্রমণ করিলেন। এক শতাব্দী পূর্বে যে জাতি অকারণে ও অন্যায়রূপে ফ্রান্সে পদার্পণ করিয়াছিল আজ তাহারাই পররাষ্ট্র ইংলন্ড আক্রমণ করিতে চলিল। কিন্তু ইতিমধ্যে সেই ডেনিস দস্যুদলের অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। অন্যায় কার্যের উপর একটা ন্যায়ের আবরণ না পরাইতে পারিলে তাহাদের লজ্জা বোধ হয়। ন্যায্যরূপে ইংলন্ডের সিংহাসন তাঁহার প্রাপ্য বলিয়া উইলিয়ম ইংলন্ডের দ্বারে গিয়া আঘাত দিলেন। ন্যায়কে বল দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করাই যেন তাঁহার উদ্দেশ্য, এমনি একটা ভান করিলেন। ইংলন্ড-জয়ের কাহিনী আজ আর নূতন করিয়া উল্লেখ করিতে হইবে না, সকলেই তাহা জানেন।

শতাব্দী-পূর্বে নর্ম্যানরা যখন ফ্রান্সে দস্যুতা করিত তখন লোকে তাহাদের দস্যু বলিত, শতাব্দী-পরে যখন তাহারা ইংলন্ডে দস্যুতা করিল, তখন লোকে তাহাদের বিজয়ী কহিল। কিন্তু এই এক শতাব্দীর মধ্যে নর্ম্যান জাতির কী পরিবর্তন হইয়াছে আলোচনা করিয়া দেখো, দেখিবে, তাহারা সেই দুর্দান্ত, বিপদ-অন্বেষী দস্যুই রহিয়াছে, কেবল ফরাসি কথা কহিতে ও ফরাসি জাতির আচার-ব্যবহার অনুকরণ করিতে শিখিয়াছে। যদিও তাহারা ফরাসিদের অন্তর্ভূত হইয়া গিয়াছিল, তথাপি নর্ম্যান জাতি বলিয়া তাহাদের একটি স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ছিল। সভ্য জাতির উপযোগী শিল্পে তাহাদের সুরুচি জন্মিয়াছে; নর্ম্যান অধিকারের পর হইতে শিল্প-সমাগম-শূন্য ইংলন্ডে শত শত সুশোভন গির্জা ও প্রাসাদ নির্মিত হইল। এক শতাব্দীর মধ্যে এই অসভ্য দস্যুদিগের হৃদয়ে

সৌন্দর্য-জ্ঞান উদ্‌বোধিত হইল। নর্ম্যান্ডির সমাজে বিদ্যা যথোচিত সমাদর প্রাপ্ত হইল। ল্যান্‌ফ্রেংকের (Lanfrenc) প্রতিষ্ঠিত বেকের বিদ্যালয় (School of Bec) তখনকার প্রধানতম বিদ্যালয়সমূহের মধ্যে গণ্য হইল। বিজেতা উইলিয়মের পুত্র হেনরির বিদ্বান বলিয়া খ্যাতি ছিল, উপাধি ছিল সুপণ্ডিত, Beanclirk অল্প দিনের মধ্যেই ইহাদের ফরাসি ভাষায় অমন ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছিল যে, এই হঠাৎ-সভ্য দস্যুরা ফরাসিদের মতোই কবিতা ও গদ্য লিখিতে পারিত। কিন্তু তথাপি তাহাদের অন্তরে অন্তরে সেই টিউটনিক ভাব জাজ্বল্যমান ছিল। সভ্যতার মূল তাহাদের হৃদয়ে গাঢ়ভাবে নিহিত হইতে পারে নাই। তাহাদের নিষ্ঠুরতার কাহিনী যদি পাঠ কর, তবে শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিবে। বিজিত ইংলন্ডে তাহারা লোকদের পা বাঁধিয়া ঝুলাইয়া রাখিত, ও সেই নিম্নশির ব্যক্তিদের ধূম সেবন করাইয়া যন্ত্রণা দিত। কখনো বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ, কখনো বা মুণ্ড বাঁধিয়া হতভাগ্যদের ঝুলাইয়া দিত ও তাহাদের পায়ে জ্বলন্ত বস্ত্র বাঁধিয়া দেওয়া হইত। মাথায় দড়ি বাঁধিয়া যতক্ষণ না তাহা মস্তিষ্ক ভেদ করিত, ততক্ষণ আকর্ষণ করিত। ভেক ও সরীসৃপসংকুল কারাগারে লোকদের কারাবদ্ধ করিত। ক্ষুদ্র, সংকীর্ণ, অগভীর ও তীক্ষ্ণ-প্রস্তর-পূর্ণ সিন্দুকে জোর করিয়া মানুষ পুরিত এবং এইরূপে তাহাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চূর্ণ করিত। অনেক ব্যারনদিগের দুর্গে rachetege নামে অতি ঘৃণ্য ও ভয়ংকর দ্রব্য থাকিত, সেই যন্ত্রণার যন্ত্র কড়িকাঠ হইতে ঝুলানো থাকিত, উহা কারারুদ্ধ ব্যক্তির স্কন্ধের উপর স্থাপিত হইত, তাহার চারি দিকে তীক্ষ্ণধার লৌহ, সুতরাং সেই হতভাগ্য ব্যক্তি বসিতে, শুইতে, ঘুমাইতে পারিত না, সর্বক্ষণ তাহাকে লৌহ-ভার বহন করিতে হইত। শত শত লোককে তাহারা অনাহারে যন্ত্রণা দিত। কেবলমাত্র মৃগয়া করিবার সুবিধার জন্য বিজেতা উইলিয়ম সমস্ত হ্যাম্পশিয়র অরণ্য করিয়া দিলেন, প্রতিহিংসা তুলিবার আশয়ে সমস্ত নর্দাম্বরল্যান্ড জনশূন্য করিয়া দিলেন। টাইন ও হাম্বারের মধ্যবর্তী ভূভাগে নয় বৎসর ধরিয়া একটি গ্রাম বা একটি জনপ্রাণী মাত্র ছিল না। নর্ম্যান অত্যাচারে দেশ কতখানি জনশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল, তাহা নর্ম্যান অধিকারের পূর্ব ও পরের অধিবাসী সংখ্যা তুলনা করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে। পূর্ব ইয়র্কে ১৬০৭ গৃহ ছিল, উইলিয়মের রাজত্বকালে ৯৬৭ অবশিষ্ট থাকে, অক্সফোর্ডে ৭২১ গৃহ ছিল, তাহার ২৪৩ মাত্র অবশিষ্ট থাকে, ডচেস্টরে ১৭২ গৃহের ৭২ মাত্র অবশিষ্ট থাকে, ডর্বিতে ২৪৩ গৃহের ১৪০ ধ্বংস হইয়া যায়, এমন আর কত কহিব? ইংলন্ডের নর্ম্যান রাজগণ, নিজে পাত্র নির্বাচিত করিয়া লইয়া তাঁহাদের অধীনস্থ ব্যক্তিদিগের দুহিতাদের বলপূর্বক বিবাহ দিয়া দিতেন। মনোমতো বিবাহ করিতে হইলে অর্থদণ্ড দিতে হইত। কাউন্টেস অফ অ্যালবেমালকে (Countess of Albimarle) একটি কোমরবন্ধ দিবার কথা মনে করাইয়া না দেওয়াতে রাজা জন উইঞ্চেস্টরের বিশপকে ১ টন মদিরা দণ্ড দিতে বাধ্য করান। এমন কত সামান্য সামান্য বিষয়ে দণ্ড দিতে হইত। বিশেষ ব্যক্তির নামে নালিশ করিতে বা বিশেষ আদালতে মকদ্দমা উত্থাপন করিতে বা বিচারে ন্যায্য ভূমিখণ্ড পাইলে তাহা দখল করিতে, টাকা দিতে হইত। পরাজয়ের সম্ভাবনা দেখিলে প্রত্যর্থী বিচারের বিলম্ব করাইতে, কখনো বা অন্যায় বিচারের সাহায্য করিতে রাজাকে টাকা দিত। সুবিচার ও শীঘ্র বিচার পাইবার জন্য ন্যায্য বিচারাকাঙ্ক্ষী অর্থীকে আবার অর্থ দিতে হইত। স্যাক্সন ক্রনিকল-লেখক বিলাপ করিয়া বলিতেছেন, 'ঈশ্বর জানেন, এই হতভাগ্য ব্যক্তিগণ কী অন্যায়রূপে পীড়িত হইতেছে। প্রথমে তাহাদের ধন-সম্পত্তি কাড়িয়া লওয়া হয়, পরে তাহাদিগকে মৃত্যুমুখে নিক্ষেপ করে। এ বৎসরে (১১২৪) অতি দুষ্কাল পড়িয়াছে। গুরুভার করে ও অন্যায় ডিক্রিতে সকলেই আপনার আপনার সম্পত্তি খোয়াইতেছে।' 'তাহারা (নর্ম্যানরা) করে করে গ্রামের সমস্ত ধন-সম্পত্তি শোষণ করিয়া লইয়া অগ্নি লাগাইয়া দেয়। ভ্রমণ করিতে বাহির হইলে দেখিতে পাইবে গ্রামে একটি লোক নাই, ভূমি আকৃষ্ট পড়িয়া রহিয়াছে। যদি দেখা যায় দুই-তিনটি মাত্র ব্যক্তি অশ্বারোহণে একত্রে চলিতেছে, অমনি গ্রামসুদ্ধ লোক তাহাদিগকে লুণ্ঠনকারী মনে করিয়া গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া যায়। লোকে প্রকাশ্যভাবে বলিত যে, ক্রাইস্ট ও তাঁহার Saintগণ ঘুমাইয়া

আছেন।' টিউটনিক স্যাক্সন বিজেতাগণ পরাজিত শেল্‌টদিগকে যেরূপ নিষ্পীড়িত করিয়াছিল, এই ফরাসি চাকচিক্য-প্রাপ্ত টিউটনিক জাতিও কি পরাজিত জাতির প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করিল না? বিজিতদের দেশে বিজেতার এরূপ অত্যাচার এরূপ অসভ্য ব্যবহার অনেক পরিমাণে স্বাভাবিক বলিয়া গণ্য হইতে পারে, কিন্তু তাহাদের নিজ দেশে, যেখানে চারি দিক হইতে খৃস্টধর্ম-দীক্ষিত সভ্য জাতির নেত্র পড়িয়া আছে, সেখানে তাহাদের কীরূপ ব্যবহার? বালক উইলিয়ম যখন নর্ম্যান্ডির সিংহাসনে আরোহণ করিলেন, তখন বালক-হস্ত-স্থিত রাজদণ্ডের দুর্বলতা প্রযুক্ত নর্ম্যান জাতির অন্তর্গত পশুত্ব কীরূপ প্রকাশ পাইয়া উঠিল একবার আলোচনা করিয়া দেখো। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূস্বামীগণের মধ্যে প্রকাশ্য যুদ্ধ-বিগ্রহের তো কথাই ছিল না, কিন্তু প্রকাশ্য যুদ্ধ-বিগ্রহ যতই অন্যায় হউক-না সচরাচর তাহা বীরত্বের মধ্যে গণ্য হইয়া থাকে, সুতরাং সে বিষয়ে আমরা কিছু বলিব না; কিন্তু গুপ্তহত্যা তখন এমন মুহুর্মুহু অনুষ্ঠিত হইত যে, লোকের চক্ষে তাহার ভীষণত্ব হ্রাস হইয়া গিয়াছিল। তখন ছুরিকা ও বিষ, রোগ বিপত্তি প্রভৃতি পৃথিবীর অনিবার্য আপদের মধ্যে গণ্য হইয়া গিয়াছিল। অনেক সময়ে অজ্ঞাত কারণে অসন্দিগ্ধ-চিত্ত নিরস্ত্র অতিথিকে ভোজের স্থলে হত্যা করা হইত। বেলেমের (Belesme) অধিস্বামী উইলিয়ম ট্যালভ্যাস তাঁহার স্ত্রীর ধর্মিষ্ঠতা ও সচ্চরিত্রতা হেতু বিরক্ত হইয়া গোপনে হত্যাকারী রাখিয়া গির্জায় যাইবার পথে তাহাকে বিনাশ করেন; বিনাশ করিবার এমন দারুণ কারণ শুনি নাই, এমন দারুণ সময় দেখি নাই! এই দুর্বৃত্ত তাহার দ্বিতীয়বার বিবাহকালে বিবাহ-সভাস্থ এক অসংশয়-চিত্ত অতিথির চক্ষু উৎপাটিত ও নাসা কর্ণ ছেদন করে। এইরূপ নীতির ঘোরতর ব্যভিচার দেখিয়া ধর্মযাজকগণ, নীতির সংস্কারের প্রতি মনোযোগ দিলেন। গুপ্ত যুদ্ধবিগ্রহ, অন্যায় মনুষ্যহত্যা নিবারণের জন্য তাঁহারা যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তাঁহাদের চেষ্টা সফল হইল না। অবশেষে হতাশ হইয়া তাঁহাদের সংস্কারের সীমা সংকীর্ণ করিলেন। কতকগুলি বিশেষ গুরুতর পাপকার্যের অনুষ্ঠান নিষেধ করিলেন, কতকগুলি বিশেষ ব্যক্তিদিগকে সম্মান করার নিয়ম করিলেন, এবং কতকগুলি বিশেষ পুণ্য মাসে বা সময়ে যুদ্ধবিগ্রহ বন্ধ রাখার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু নর্ম্যান্ডিতে এ চেষ্টা সফল হইল না। যাজকগণ বুধবার সন্ধ্যা হইতে সোমবার প্রভাত পর্যন্ত সকল প্রকার ভীষণ কার্যের অনুষ্ঠান রহিত করিতে আদেশ দিলেন; কিন্তু নর্ম্যান্ডিতে ছুরিকা এতক্ষণ বিশ্রাম করিতে পারিত না, নর্ম্যান হৃদয়ে নরকের জাগ্রত উপদেবতা এতকাল নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিলে আপনাকে দংশন করিতে থাকিত, সুতরাং ইহাও অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল। অবশেষে ক্যাম্‌ব্রের বিশপ জেরাড এই সিদ্ধান্ত করিলেন যে, ভূপালদিগের কার্য রক্তপাত করা ও যাজকদিগের কার্য প্রার্থনা করা। এক দল পাপ করিবে, আর-এক দল তাহাদের হইয়া দেবতার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবে। জেরাড অন্যান্য বিশপদিগকে ক্ষান্ত হইতে পরামর্শ দিলেন, তাহাদের কার্য প্রার্থনা করা, তাহাদের অনধিকার চর্চা করিবার আবশ্যক কী? তিনি কহিলেন, সংস্কারের নিয়ম প্রচারিত করিলে লোকের মধ্যে কপটতা প্রশ্রয় পাইবে মাত্র। কাটাকাটির মুখ হইতে নর্ম্যানদিগকে বঞ্চিত করিবার চেষ্টা করা নিতান্ত দুরাশা। নিদারুণ কার্য নহিলে তাহারা আমোদ পাইত না। সিংহ-হৃদয় রিচার্ডকে নর্ম্যান কবি কহিতেছেন, ইহা অপেক্ষা উত্তম নৃপতির কথা কখনো কাব্যে গীত হয় নাই। এই নৃপতি ক্রুসেড যুদ্ধকালে একবার শূকর-মাংস খাইবার অভিলাষ প্রকাশ করেন। পাচক শূকর না পাওয়াতে একজন স্যারাসীনকে কাটিয়া তাহার তাজা ও কোমল মাংস রন্ধন করিয়াছিল। সে মাংস রাজার বড়োই ভালো লাগিল, তিনি শূকরের মুণ্ড দেখিতে চাহিলেন। ভীত-হৃদয় পাচক সভয়ে নরমুণ্ড আনিয়া উপস্থিত করিল। রিচার্ডের বড়োই আমোদ বোধ হইল, তিনি হাসিয়া উঠিলেন, কহিলেন, 'খাদ্যের এমন সুবিধা থাকিলে দুর্ভিক্ষের ভয় থাকিবে না।' জেরুজিলাম বিজিত হইলে সত্তর হাজার (৭০,০০০) অধিবাসী হত হয়। দ্বিতীয় হেনরি একবার ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার বালক ভৃত্যের চক্ষু ছিঁড়িয়া ফেলিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। রিচার্ড নগর অধিকার করিলে পর স্যারাসীন-রাজ স্যারাসীন বন্দীদের মার্জনা প্রার্থনা করিয়া দূত প্রেরণ

করিলেন। রিচার্ড ত্রিশ জন স্যারাসীন বন্দীর মাথা কাটিয়া প্রত্যেক মাথায় হত ব্যক্তির নাম লিখিয়া, রন্ধন করিয়া প্রত্যেক দূতের সম্মুখে আহারার্থে রাখিতে অনুমতি দিলেন ও তাঁহার নিজের পাত্রে যে মুণ্ড ছিল তাহা অতি উপভোগ্য পদার্থের ন্যায় খাইতে লাগিলেন। যাট হাজার বন্দী ক্ষেত্রে আনীত হইলে নর্ম্যান কবি কহিতেছেন—

ক্ষেত্র পূরি দাঁড়াইল বন্দীগণ সবে,
দেবতারা স্বর্গ হতে কহিলেন তবে।
'মারো মারো কাহারেও ছেড়ো না, ছেড়ো না,
কাটো মুণ্ড, এক জনে কোরো না মার্জনা।'
শুনিলা রিচার্ড রাজা বাণী দেবতার,
ঈশে ও পবিত্র ক্রসে কৈলা নমস্কার।

এমন নিদারুণ আদেশ নর্ম্যানদের দেবতাদের মুখেই সাজে। এ ঘটনা সত্য না হইতেও পারে, কিন্তু নর্ম্যান কবি রিচার্ডের গৌরব-প্রচার-মানসেই ইহা কীর্তন করিয়াছেন, ইহাতে কি তখনকার লোকের মনোভাব প্রকাশ পাইতেছে না? কীরূপ ঘটনায় তখনকার লোকের হৃদয়ে ভক্তিমিশ্রিত বিস্ময় ও বিস্ময়-মিশ্রিত আনন্দের উদয় হইবে তখনকার কবি তাহা বিলক্ষণ বুঝিতেন। রিচার্ড কোনো নগর অধিকার করিলে সেখানকার শিশু ও অবলাদের পর্যন্ত হত্যা করিতেন। এই রিচার্ডই তখনকার লোকদের নিকট দেবতার স্বরূপ, কবিদের নিকট আদর্শ বীরের স্বরূপ বিখ্যাত ছিলেন। এমন-কি, এই 'উনবিংশ শতাব্দীর' ইংরাজি ঐতিহাসিকেরাও হয়তো তাঁহাকে তৈমুর বা জঙ্গিস্ খাঁর সহিত গণ্য করিতে সংকোচ বোধ করিবেন। সেনল্যাকের যুদ্ধক্ষেত্রে ইংরাজ-সৈন্যের পরাজয়ের পর যেখানে বাণ-বিদ্ধ হ্যারল্ড ভূপতিত হন, সেইখানে বসিয়া উইলিয়ম মৃত দেহরাশির মধ্যে পান ভোজন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

নর্ম্যানেরা যখন ইংলন্ড বিজয় করিতে আইসে, তখন তাহাদের এইরূপ অবস্থা। স্যাক্সনেরা তখন কী করিতেছে? 'স্যাক্সনেরা পরস্পর জেদাজেদি করিয়া সর্বদা মদ্যপানে রত আছে; দিবারাত্রি পান ভোজনেই তাহারা অর্থ ব্যয় করিতেছে, অথচ তাহাদের বাসস্থান অতি হীন। কিন্তু ফরাসি ও নর্ম্যানগণ অতি অল্প ব্যয়ে জীবন যাপন করে, অথচ দিব্য বৃহৎ গৃহে বাস করে, তাহাদের আহার্য উত্তম, বস্ত্র অতিশয় পরিপাটি' অর্থাৎ স্যাক্সনদের এখনো শিল্পে রুচি জন্মে নাই, উত্তেজনাময় হীন আমোদেই তাহাদের জীবন কাটিতেছে। যেদিন নর্ম্যানদের সহিত যুদ্ধ হইবে তাহার পূর্বরাত্রে 'তাহারা সমস্ত রাত পান ভোজনে মত্ত আছে। তুমি দেখিতে পাইবে তাহারা মহা যুঝাযুঝি লাফালাফি, অট্টহাস্য ও গান-বাজনায় রত হইয়াছে'। তখন স্যাক্সনরা এমন মূর্খ, অনক্ষর অসভ্য ছিল যে, নর্ম্যানেরা মূর্খ স্যাক্সন যাজকদিগকে ধর্মমঠ হইতে দূর করিয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিল। স্যাক্সনদের এইরূপ অতি হীন অবস্থার সময় অপেক্ষাকৃত সুরুচি ও সুসভ্য নর্ম্যানগণ ইংলন্ডে পদার্পণ করিল। এই উপলক্ষে ইংলন্ডে শুদ্ধ যে কেবল সুশোভন প্রাসাদ উত্থিত ও বিদ্যাধ্যাপনশীল যাজকগণের সমাগম হইল তাহা নহে, নর্ম্যানদের প্রবল প্রতাপে ডেনমার্ক ও নরোয়েবাসী দস্যুদের হস্ত হইতে ইংলন্ড পরিত্রাণ পাইল। নর্ম্যানদের আগমনে ইংলন্ডের আরও অনেক অলক্ষিত উপকার হইয়াছিল, কিন্তু বিজিত জাতি বিজেতাদের হস্ত হইতে ন্যায় ও সুবিচারের আশা করিতে পারে না, বিশেষত বিজিত জাতি যখন বিজেতাদের অপেক্ষা সভ্যতায় হীন, তখন ন্যায়ের আশা হতভাগ্যদের পক্ষে দুরাশা! সমযোগ্য ব্যক্তির প্রতিই ন্যায়াচরণ করাই প্রায় পৃথিবীর নিয়ম, নিকৃষ্টতরদিগকে পশুবৎ ব্যবহার করিতে লোকে অন্যায় মনে করে না; যদি তাহাদের প্রতি সদয় ব্যবহার করে তবে তাহা অনুগ্রহ মাত্র। পৃথিবীতে ন্যায়ের সীমাও এমন সংকীর্ণ। স্যাক্সনদের ধনসম্পত্তি লুণ্ঠিত হইল। যদি কোনো জেলায় একজন নর্ম্যান হত হইত, তাহা হইলে গ্রামবাসীদের হয় হত্যাকারীকে ধরাইয়া দিতে নয় প্রত্যেককে অর্থদণ্ড দিতে হইত, কিন্তু একজন স্যাক্সন হত হইলে বড়ো একটা গোলযোগ হইত না। নর্ম্যান ধর্মাচার্যগণ আসিয়া স্যাক্সন-রাজা ও তপস্বীদের

কবরস্থ অস্থিরাশি অমান্যের সহিত উৎখাত করিয়া ফেলিতেন, Ivo Taille-bois-এর নিকট তাঁহার প্রজারা যথানির্দিষ্ট বিনতি দেখাইতে প্রাণপণ করিত। এক হাঁটু গাড়িয়া তাঁহাকে সম্ভাষণ করিত। তাঁহাকে যতখানি মান্য ও কর দিবার কথা, তদপেক্ষা অধিক দিয়াও বেচারীরা নিষ্কৃতি পাইত না। তিনি তাহাদিগকে যন্ত্রণা দিতেন, কয়েদ করিতেন, তাহাদের পশুপালের পশ্চাতে কুক্কুর লাগাইয়া দিতেন, তাহাদের বাহনদিগের মেরুদণ্ড ও পা ভাঙিয়া দিতেন। এই তো অত্যাচারী, উদ্ধত, গর্বিত, সভ্যতাভিমানী, বিজেতা নর্ম্যান জাতি!

আমরা অ্যাংলো-নর্ম্যান সাহিত্য আলোচনা করিবার পূর্বে নর্ম্যান জাতি-চরিত্র ও তাহাদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লইয়া আন্দোলন করিলাম। কিন্তু ইহা যেন কেহ অনর্থক মনে না করেন। সাহিত্য মনুষ্য-হৃদয়ের ছায়ামাত্র; যে জাতির সাহিত্য আলোচনা করিবে তাহাদের চরিত্র আলোচনা যদি না কর তবে তাহা দারুণ অঙ্গহীন হইবে। এইখানে বলা কর্তব্য, আমরা যে অ্যাংলো-নর্ম্যান সাহিত্য আলোচনা করিতে বসিয়াছি, তাহার কারণ এমন নয় যে, অ্যাংলো-নর্ম্যান সাহিত্য অতি বিপুল, অ্যাংলো-নর্ম্যান সাহিত্য-ভাণ্ডার বহুমূল্য উজ্জ্বল মণিময়। কীরূপে ইংরাজি সাহিত্য গঠিত হইল তাহা জানিতে কাহার না ইচ্ছা হইবে? ইংরাজি সাহিত্যে ও ইংরাজি চরিত্রে নর্ম্যান প্রভাব স্পষ্ট লক্ষিত হয়— ইংরাজি সাহিত্যের ইতিবৃত্ত জানিবার নিমিত্তই আমরা নর্ম্যান সাহিত্য আলোচনা করিতেছি।

ভারতী
ফাল্গুন ১২৮৫

দ্বিতীয় প্রস্তাব

আমরা 'স্যাক্সন জাতি ও অ্যাংলো-স্যাক্সন সাহিত্য' নামক প্রবন্ধে বলিয়াছি যে, অ্যাংলো-স্যাক্সন রাজত্বের পতনের কিছু পূর্বে অ্যাংলো-স্যাক্সন জাতি ক্রমশই অবনতির গহ্বরে নামিতেছিল। মাহাত্মা অ্যালফ্রেড তাঁহার প্রজাদের মধ্যে বিদ্যাচর্চা বিষয়ে যে উদ্যম উদ্রেক করিয়া দিয়াছিলেন, তাঁহার মৃত্যুর পর তাহা ক্রমশ বিনষ্ট হইয়া গেল। অকর্মণ্যতা অজ্ঞতা ও আলস্যে সমস্ত জাতিই যেন জড়ীভূত ও অভিভূত হইয়া আসিতেছিল। টিউটনিক জাতির শিরায় শিরায় প্রধাবিত যে স্বাধীনতাপ্রিয়তার জ্বলন্ত-বহ্নি তাহাও যেন ক্রমশই নির্বাপিত ও শীতল হইয়া আসিতেছিল। স্যাক্সনগণ যখন দিগ্‌বিদিক লুণ্ঠন করিবার মানসে দলবদ্ধ হইয়া সমুদ্রবক্ষে বিচরণ করিত তখন তাহাদের দলপতি ছিল বটে কিন্তু রাজা ছিল না, তখন তাহারা সর্বতোমুখী প্রভুতার অধীনে গ্রীবা নত করিতে পারিত না, কিন্তু যখন তাহারা ইংলণ্ডে উপনিবেশ স্থাপন করিল তখন দলপতি ও দলস্থ ব্যক্তিদিগের মধ্যে ক্রমশ রাজা-প্রজার সম্বন্ধ স্থাপিত হইল, উভয়ের মধ্যে ঐক্যভাব ঘুচিয়া গেল ও সাধারণ ব্যক্তিদের অপেক্ষা দলপতি ক্রমে উচ্চতর আসনে অধিষ্ঠিত হইল। দলপতির পদোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আরও কতকগুলি উচ্চ পদের সৃষ্টি হইল, এইরূপে অধিবাসীগণ উচ্চ ও নীচ এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইল। যেখানেই উচ্চ ও নীচ শ্রেণীর বিভাগ আছে, সেইখানেই যে উচ্চ শ্রেণী নীচ শ্রেণীর উপর আধিপত্য বিস্তার করিবে তাহার আর কী কথা অছে; ডেনিস দস্যুদের অত্যাচারে নিবাসীদের ধন প্রাণ এমন সংকটাপন্ন হইয়াছিল যে অ্যালফ্রেডের সময় হইতে ইহা এক প্রকার স্থির হইয়া গিয়াছিল যে, সকলকেই একজন Thign-এর অর্থাৎ প্রভুর আশ্রয়ে থাকিতে হইবে; (Thign অর্থে ভৃত্য বুঝায় কিন্তু রাজার ভৃত্য হউক প্রজাদের প্রভু।) আশ্রয়দাতা ও আশ্রিতদের মধ্যে প্রভু-ভৃত্যের সম্বন্ধ স্থাপিত হইল, এইরূপে সকল অধিবাসীর সমান অধিকার ক্রমশ বিনষ্ট হইয়া গেল। বহিঃশত্রু, ডেনিস দস্যুদের দ্বারা স্যাক্সনেরা যথেষ্ট নিপীড়িত হইয়াছিল, কিন্তু তাহাই তাহাদের একমাত্র দুর্ভাগ্য নয়; তাহাদের আপনাদের মধ্যে ঐক্য ছিল না, ক্ষুদ্র ইংলন্ড তখন খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত হইয়াছিল, প্রত্যেক প্রদেশ-স্বামী অপরাপর প্রদেশের উপর আধিপত্য স্থাপনের নিমিত্ত প্রাণ পণ করিতেছিল। এইরূপ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন উপদ্রুত

শ্রান্ত দেশে সাহিত্যের যে যথেষ্ট অবনতি হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য কী? যাহা সমগ্র জাতির হৃদয়ের কথা প্রকাশ না করে, সমগ্র জাতির হৃদয়ে যাহা প্রতিধ্বনিত না হয় তাহাকে আর জাতীয় সাহিত্য বলিব কী করিয়া? যে বিদ্যা কেবল ধর্মাচার্যগণের অধিকারের মধ্যেই বদ্ধ ছিল ও যে সাহিত্য আশ্রম-গৃহের ধূলিময় গ্রন্থাধারের অন্ধকারের মধ্যেই আচ্ছন্ন ছিল, সে বিদ্যাকে সমগ্র জাতির উন্নতির চিহ্ন ও সে সাহিত্যকে সমস্ত জাতির হৃদয়ের কথা বলিতে পারি না। একে তো বিদ্যাচর্চা অতিশয় সংকীর্ণ শ্রেণীতেই বদ্ধ ছিল, তাহাতে তাহার সীমা আরও ক্রমশ সংকীর্ণতর হইয়া আসিতে লাগিল, ধর্মাচার্যদের মধ্যে ক্রমশ বিদ্যানুশীলন রহিত হইল। এইরূপে অজ্ঞতা-অন্ধকারাচ্ছন্ন ইংলন্ডে রক্তপাত ও অশান্তি রাজত্ব করিতে লাগিল।

এইরূপ অবস্থায় যখন নর্ম্যানেরা ইংলন্ডে আসিল তখন তাহারা সাহিত্যশূন্য নিষ্ফল স্যাক্সন ভাষা ও স্যাক্সনভাষীদের প্রাণপণে ঘৃণা করিতে লাগিল। সুতরাং স্বভাবতই ফরাসি তখনকার সাধুভাষা, রাজভাষা ও লিখিবার ভাষা হইয়া দাঁড়াইল। পাছে অসভ্য স্যাক্সনদের সহিত মিশিয়া তাহাদের ভাষা ও আচার-ব্যবহার কলুষিত হইয়া যায় এইজন্য নর্ম্যানেরা তাহাদের সন্তানদের ফ্রান্সে পাঠাইয়া দিত। পাঠশালে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে সকলকেই ফরাসি অথবা ল্যাটিন ভাষায় কথা কহিতে হইত। স্যাক্সন ইতর ভাষা হইয়া দাঁড়াইল। সে ভাষায় আর পুস্তক লিখা হয় না। তখন তো মুদ্রাযন্ত্র ছিল না, সুতরাং অতি অল্প লোকেরই পুস্তক প্রাপ্তি ও পাঠের সুবিধা ছিল, সাধারণ লোকদিগের পাঠ করিবার অবসর, সুবিধা ও ক্ষমতা ছিল না; যাহাদের পুস্তক পাঠ করিবার ক্ষমতা ছিল তাহারা সংগতিপন্ন উচ্চ শ্রেণীর লোক, তাহারা ফরাসি বা ল্যাটিন ছাড়িয়া গ্রাম্য স্যাক্সন পুস্তক পড়িতে স্বভাবতই সংকোচ ও অরুচি অনুভব করিত। আমাদের দেশে যখন নূতন ইংরাজি শিক্ষা প্রচলিত হয়, তখন আমাদের শিক্ষিত ব্যক্তিগণ দুইছত্র ইংরাজি লিখিতে পারিলে যেমন বিদ্যাশিক্ষা সফল হইল মনে করিতেন, নর্ম্যান অধিকারে স্যাক্সন যুবাদেরও সেই দশা ঘটিয়াছিল। শুদ্ধ তাহাই নহে, এরূপ অবস্থায় স্যাক্সন ভাষায় লিখিতে চেষ্টা করা হেয় কার্যের মধ্যে গণ্য হওয়াই স্বাভাবিক। স্যাক্সন ভাষায় পুস্তক লিখিতে গেলে পাছে কেহ মনে করে, তবে বুঝি লেখক ফরাসি জানে না, ইহা অপেক্ষা লজ্জার কথা কী আছে বলো। কোনো কোনো কবি কয়েক ছত্র ফরাসি ও কয়েক ছত্র স্যাক্সন লিখিতেন, কেননা, এরূপ করিলে ফরাসি ভাষায় অজ্ঞতার অপবাদ লেখকের নামে পৌঁছাইতে পারে না, তাহা হইলেই তিনি এক প্রকার নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন। নিম্নে একটি উদাহরণ উদ্‌ধৃত করিতেছি—

Len puet fere et defere,
Ceo fait-il trop sovent :
It nis nouther wel ne faire;
Therefore England is Shent.
Nostre prince de Englatere
Par le consail de sa gent
At Westministr after the feire
Made a gret parlement.

কেহ কেহ বা ল্যাটিন, ফরাসি ও চলিত ভাষা এই তিন মিশাইয়া কবিতা লিখিতেন—

When mon may mest do
Tunc ville suum manifestat
In donis also si vult tibi
prœmia prœstat.
Ingrato benefac, post

Hœc á peyne te verra;
Pur bon vin tibi lac non dat
Nec rem tibi rindra.

দুই-তিনটি বিভিন্ন ভাষার এরূপ ঘোরতর মিশ্রণের ফল হয় এই যে, উহাদের কোনোটা বিশুদ্ধ থাকিতে পারে না, সকলগুলাই বিকৃত হইয়া যায়। ফরাসির মধ্যে স্যাক্সন ভাব ও কথা, স্যাক্সনের মধ্যে ফরাসি ভাব ও কথা প্রবেশ করিয়া ফরাসি ও স্যাক্সন উভয়ই ভিন্ন মূর্তি ধারণ করে। ইংলন্ডে তাহাই হইয়াছিল। নর্ম্যান আমীর-ওমরাওগণ স্যাক্সনমিশ্রিত ফরাসি কহিতে লাগিল ও সাধারণ অধিবাসীগণ ফরাসিমিশ্রিত স্যাক্সন কহিতে লাগিল। নর্ম্যানেরা যে এত চেষ্টা করিয়াছিল, যাহাতে তাহাদের ভাষা বিশুদ্ধ থাকে, সে চেষ্টা সফল হইল না। যখন নর্ম্যান ও স্যাক্সনদের মধ্যে বিবাহের কোনো বাধা ছিল না, তখন স্যাক্সন ও ফ্রেঞ্চ দুই ভাষার মিশ্রণ নিবারণের কোনো উপায় ছিল না। এইরূপে যখন দুই ভাষা মিশিয়াছিল বা মিশিতেছিল, তখনকার সাহিত্য Semi-Saxon অর্থাৎ অর্ধ-স্যাক্সন সাহিত্য নামে অভিহিত হইয়াছে।

সেমি-স্যাক্সন সাহিত্য আর কিছুই নহে, তাহা ইংরাজি সাহিত্যের বাল্যাবস্থা— সংগ্রহ, অনুকরণ ও অনুবাদের অবস্থা। ফরাসি সাহিত্যই তাহার আদর্শ। এ সাহিত্যের মধ্যে প্রবেশ করিবার পূর্বে Chivalry-র বিষয় সংক্ষেপে অনুশীলন করা আবশ্যক।

'য়ুরোপীয় ক্ষাত্র ধর্ম' বলিলে Chivalry-র একপ্রকার বাংলা অনুবাদ করা হয়, কেবল আমাদের ক্ষাত্রধর্মে মহিলা-পূজা ছিল না, Chivalry-তে তাহা ছিল। যদি 'ক্ষতাৎ কিল ত্রায়ত ইত্যুদগ্রঃ, ক্ষত্রস্য শব্দো ভুবনেষু রূঢ়' হয়, তবে Chivalrous অর্থেও তাহাই বুঝায়। মধ্যযুগে য়ুরোপে যখন বলের নামই ন্যায়, ধর্ম, শক্তি ছিল, তখন সেই নির্দয় বলের হস্ত হইতে দুর্বলকে রক্ষা করাই Chivalry-র উদ্দেশ্য ছিল! যদিও ইহাই তাহার উদ্দেশ্য তথাপি ফলে Chivalry সেই উদ্দেশ্য হইতে অনেক দূরে পড়িয়া ছিল— প্রকৃতপক্ষে, যশের ইচ্ছা তৃপ্ত করিবার নিমিত্ত বিজয় সাধন করিয়া বেড়ানোই Chivalry-র কার্য হইয়াছিল। আপনার বলের উপর বিশ্বাস থাকিলে সেই বল পরীক্ষা ও অনুশীলন করিবার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী অন্বেষণের বাসনা হয়, এই নিমিত্ত মধ্যযুগের নাইটগণ (Knight) বিপদ অন্বেষণ ও দুঃসাহসিকতা অনুষ্ঠান করিয়া বেড়াইতেন। সমাজের আদিম অবস্থায় রক্তপিপাসা শান্তির নিমিত্তই লোকে রক্তপাত করিত, কিন্তু য়ুরোপের সমাজ যখন অধিকতর উন্নত হইল তখন যশ-ইচ্ছার নিমিত্ত রক্তপাত প্রচলিত হইল। সামাজিকতা বিষয়ে অনেক উন্নত না হইলে কখনো যশের ইচ্ছা জন্মিতে পারে না। সমাজে বিখ্যাত হইবার ইচ্ছাই সমাজের প্রতি অনেক পরিমাণে মমতা জন্মিবার চিহ্ন। Chivalry-র আর-এক ভাগ মহিলা-পূজা। এই মহিলা-পূজা এমন অপরিমিত সীমায় পৌঁছিয়াছিল যে, তাহা সমূহ গর্হিত ও হাস্যজনক। ঈশ্বর ও মহিলা -পূজা এক শ্রেণীর অন্তর্ভূত হইয়াছিল। বুর্বোঁর ডিউক Louis II তাঁহার নাইটদিগকে বলিয়াছিলেন যে, 'From them (ladies) after God comes all the honour that men can acquire.' অ্যারাগনের অধিপতি James II নিয়ম করিয়াছিলেন যে, মহিলার সঙ্গে থাকিলে হত্যা ভিন্ন যে-কোনো দোষে কেহ দোষী হউক-না কেন তাহাকে কেহ স্পর্শ করিতে পারিবে না। নর্ম্যানরা এই Chivalry ভাব ইংলন্ডে আনয়ন করিল। Chivalrous কবিতা ও সংগীত Semi-Saxon সাহিত্য পূর্ণ করিল। ইহার পূর্বে অ্যাংলো-স্যাক্সন সাহিত্যে রক্তপাত ও যুদ্ধের বর্ণনা অনেক ছিল, কিন্তু তাহার মধ্যে Chivalry ভাব কিছুমাত্র ছিল না। এখন বীরত্বের গৌরব কীর্তন, বিজয়-সংগীত ও রমণীদের স্তুতিবাদে ইংরাজি সাহিত্যক্ষেত্র ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। কিন্তু সকলগুলিই প্রায় অনুবাদ, ও তাহাদের মধ্যে কবিত্ব-উচ্ছ্বাস কিছুমাত্র নাই। অতি পরিষ্কারভাবে ছত্রের পর ছত্র আসিতেছে, গল্পের স্রোত অতি নির্বিবাদে চলিয়া যাইতেছে, তাহার মধ্যে ভাব নাই, তুলনা নাই, কবিত্বপূর্ণ বিশেষণ নাই, কতকগুলি কথা ও ঘটনা জোড়া-তাড়া দিয়া এক-একটা স্ফীতোদর পুস্তক রচিত হইয়াছে।

লেখক অতিশয় বিরক্তিজনক অনর্গল বক্তার মতো বকিয়া বকিয়া, গল্প টানিয়া বুনিয়া, কথা বিনাইয়া পাঠকের নিদ্রাকর্ষণ না করিয়া ক্ষান্ত নহেন। যত প্রকার অলীক অস্বাভাবিক, আশ্চর্যজনক কথা লেখকের কল্পনায় আসিতে পারে সকলই তিনি তাঁহার গল্পে গাঁথিয়া দিতে চাহেন। *Romance of Alexander* নামক কাব্যগ্রন্থ হইতে দুই-একটা নমুনা দিতেছি—

মকর নামেতে প্রাণী আশ্চর্য আকার
বলবান প্রাণী বটে, বড়ো জাঁক তার—
কুমীরের 'পরে যদি পড়ে তার চোখ,
তবে আর রক্ষে নেই, দেখে কেবা রোখ?
দুজনে লড়াই বাধে বড়ো ঘোরতর
প্রহারে দোঁহারে দোঁহে করে জর জর
মকর সেয়ানা বড়ো দোঁহার মাঝারে,
চুপি চুপি অমনি সে জলে ডুব মারে;
মুখে তার তীক্ষ্ণ অস্ত্র, কুমীরের পেটে
যেমন বিঁধিয়ে দেয়, মরে পেট ফেটে॥

একটি ypotame-এর বর্ণনা শুনুন—

জলহস্তী বড়োই আশ্চর্য জানোয়ার,
হাতিও তেমন নহে কী কহিব আর!
ঘোড়ার মতন তার ঘাড়, পিঠ, জানি,
লেজ তার বাঁকা আর খাটো শুঁড়খানি!
পিচের মতন তার রঙ বড়ো কালো
যত কিছু ফল খেতে বড়ো বাসে ভালো,
আপেল বাদাম আদি কিছু নাহি ছাড়ে,
কিন্তু সব চেয়ে তৃপ্তি মানুষের হাড়ে!

এই তো কবিতার শ্রী। এরূপ ধৈর্যনাশক শ্লোকসমূহ উদ্‌ধৃত করিতে আমরা ভয় করিতেছি, সুতরাং নিরস্ত হইতে হইল। কেবল তখনকার Romance নামক গ্রন্থসকলের ভাব বুঝাইবার জন্য *Geste of kyng Horn* নামক গ্রন্থের মর্ম পাঠকদের কহিতেছি। রাজা 'মারে' যুদ্ধে বিধর্মী স্যারাসীনদের দ্বারা হত হইলে পর তাঁহার পুত্র, গ্রন্থের নায়ক, হর্ন একটি ক্ষুদ্র নৌকায় কতকগুলি সঙ্গীর সহিত রাজা এমারের (Aylmer) দেশে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানকার রাজসভায় তিনি বিদ্যা শিক্ষা করেন। ক্রমে রাজা এমারের একমাত্র কন্যা রিমেন্‌হিল্‌ড় (Rimenhild) তাঁহার প্রেমে পড়িল। রাজকন্যা, হর্নকে একটি মায়াময় অঙ্গুরী উপহার দেন। সেই অঙ্গুরী লইয়া তিনি স্যারাসীনদের সহিত যুদ্ধ করিতে বহির্গত হন, ও অঙ্গুরী প্রভাবে তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া পুনরায় এমারের সভায় ফিরিয়া আসেন। কিন্তু রাজা এমার হর্নের সহিত তাঁহার কন্যার প্রেম বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া হর্নকে নির্বাসিত করিয়া দেন। হর্ন তাঁহার প্রণয়িনীর সহিত বিদায় লইবার সময় বলিয়া গেলেন যে, রাজকন্যা যেন সাত বৎসর তাঁহার জন্য অপেক্ষা করেন— ইতিমধ্যে তিনি যদি না ফিরিয়া আসেন, তবে রাজকুমারী আর কাহাকেও বিবাহ করিতে পারেন। ইতিমধ্যে রাজা মোডি রিমেন্‌হিল্‌ড়কে বিবাহ করিবার পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। রাজকুমার হর্ন ঘটনাচক্রের আবর্তনে অনেক বিপদ-আপদ সহিয়া রাজা মোডির মুষ্টি হইতে রাজকন্যাকে মুক্ত করিয়া বিবাহ করিলেন। বিবাহের পর তিনি যুদ্ধ করিয়া তাঁহার মাতৃভূমি সুদীন Suddine শত্রুহস্ত হইতে মুক্ত করেন। যখন তিনি যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন, তখন তাঁহার কপট বন্ধু ফাইক্‌নিল্‌ড (Fykenild) সুযোগ পাইয়া রিমেন্‌হিল্‌ড়কে বলপূর্বক বিবাহ করিতে চেষ্টা

করিতেছিল। যুদ্ধাবসানে হর্ন ফাইক্‌নিল্‌ডের দুর্গে বীণাবাদকের বেশে প্রবেশ করিয়া তাহাকে নিহত করিলেন ও তাঁহার প্রণয়িনীর সহিত মিলিত হইলেন। গল্প কিছু মন্দ নহে কিন্তু লেখক এমন খুঁটিনাটি লইয়া নাড়াচাড়া করিয়াছেন ও এমন সাদাসিধাভাবে লিখিয়া গিয়াছেন যে, ইহাকে কবিতা বলিতে পারি না।

সেমি-স্যাক্সন ভাষায় অনেক প্রেমের কবিতা আছে, কিন্তু এমন ভাববিহীন অসার কবিতা অনুবাদ করিতে গেলে তাহার আর রসকষ কিছুই অবশিষ্ট থাকে না, এরূপ কবিতা অনুবাদ করিলে পাঠকদের কিছু লাভ নাই, কেবল অনুবাদকের যন্ত্রণাভোগ। একটি অনুবাদ উদ্‌ধৃত করিতেছি—

কথা মোর রাখো দেখি, একবার দেও সখি
প্রেমের আশ্বাস।
চাহি নাকো আর কারে, যতদিন এ সংসারে
করিতেছি বাস।
নিশ্চয় জানিয়ো প্রিয়ে, এখনি জুড়াবে হিয়ে
তুমি মোরে ভালো বাস' যদি,
ওই অধরের শুধু— একটি চুম্বন মধু
হবে মোর দুখের ঔষধি।

দুই-একটা স্বভাব-বর্ণনা অনুবাদ-সমেত উদ্‌ধৃত করিয়া দিতেছি—

Mury hit is in sonne risying.
The rose openith and unspring;
Weyes fairith, the clay's clyng;
The maidenes flowrith, the foulis syng,
Damosele makith mournyng
Whan hire leof makith pertyng.

অনুবাদ

অতিশয় সুখকর সূর্য যবে ওঠে
গোলাপ ফুলের কুঁড়ি বাগানেতে ফোটে;
রাস্তা হয় পরিষ্কার কাদা যায় এঁটে;
পাখি গান গায়, ফুল ফোটে মাঠে মাঠে;
প্রণয়ীদিগের সাথে হইয়া বিচ্ছেদ
বিরহিণী রমণীরা করে কত খেদ।

আর-একটি—

Averil is meory, and lengith the day,
Ladies loven solas, and play;
Swaynes, justes; knyghtis, turnay;
Syngith the nyghtyngale, gredeth thes fay;
The hote sunne clyngeth the clay,
As ye will y-sun may.

অনুবাদ

এপ্রেল সুখের মাস, বেড়ে যায় বেলা;
মহিলারা ভালোবাসে আদর ও খেলা;

চাষারা খেলায় জুস্ট্, টুর্নি নাইটেরা;
বুল্‌বুল্ গান করে, চেঁচায় কাকেরা;
কাদা সব এঁটে যায় খর রৌদ্র বলে
দেখিতেই পাও তাহা, জান তো সকলে।

Chivalry-র সঙ্গে সঙ্গে নর্ম্যানেরা রাজসভার আড়ম্বর ও চাকচিক্য, য়ুরোপ হইতে আনয়ন করিয়াছিল। কপট যুদ্ধ, দ্বন্দ্ব যুদ্ধ, উৎসব আমোদ নর্ম্যান ব্যারনদিগের দুর্গে দুর্গে অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। প্রথম এডোয়ার্ডের রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে স্কট্‌লন্ড-অধিপতি শত সংখ্যক অশ্বারোহী নাইট সঙ্গে করিয়া লন্ডনে আসিয়াছিলেন, তাহারা প্রত্যেকে অশ্ব হইতে নামিয়া বহুমূল্য আভরণ-সমেত অশ্বগুলি অর্থীদিগকে দান করিয়া গেল। আর্চ্‌বিশপ এ. বেকেট যখন ফ্রান্সে যান, তাঁহার সঙ্গে বিচিত্র বসন -ভূষিত এক দল ভৃত্য, দুইশত নাইট, বহু সংখ্যক ব্যারন ও আমীর-ওমরাও ছিল, আড়াইশত বালক তাঁহার সম্মুখে জাতীয় সংগীত গাহিতে গাহিতে চলিতেছিল, তদ্‌ভিন্ন গাড়ি ঘোড়া, প্রত্যেক ঘোড়ার পৃষ্ঠে এক-একটি বানর ও মানুষ, অনুচর, সহচর, পুরোহিত, বন্ধুবান্ধবের আর অন্ত নাই। এইরূপ সকল বিষয়েই ধুমধাম। হাঙ্গারির অধিপতি তাঁহার বিরহবিধুরা দুহিতাকে এইরূপে সান্ত্বনা করিতেছেন—

গাড়ি করে নিয়ে যাব শিকারে তোমায়,
সে গাড়িটি মুড়ে দেব লাল মকমলে;
পদ্ম আঁকা সাটিন ও জরির চাঁদোয়া
ঝলমল করিবেক মাথার উপরে;
পরিবি সোনার হার, সুনীল বসন;
সাথে সাথে যাবে তোর স্পেনের ঘোটক,
মকমল দিয়ে তার পিঠ দিব ঢেকে;
গান বাদ্য হবে কত বিবিধ আমোদ।
নানা মদ্য আনাইব নানা দেশ হতে।[১]
পোড়া হরিণের মাস করিবি আহার,
যত ভালো মুর্গী পাই এনে দেব তোরে।
পাইবি কুকুর কত হরিণ হরিণী,
খেলা করিবি রে বাছা তাহাদের সাথে।
হরিণেরা এমনি মানিবে তোর পোষ,
ডাকিলেই আসিবেক মুঠির কাছেতে।

---

[১] এখানে এত প্রকার মদ্যের নাম লিখিত আছে যে, তাহা বাংলা পয়ারের মধ্যে দিলে ভালো শুনায় না—নিম্নে মূল উদ্‌ধৃত করিলাম— ইহার বানান আধুনিক করিয়া দেওয়া হইয়াছে :

Ye shall have Rumney and malespine
Both hippocras and varnage wine:
Montrese and wine of Greek,
Both Algrade and dispice eke,
Antioch and Bastarde,
Pyment also and garnarde.
Wine of Greek and Muscadel,
Both clare, pyment and Rochelle.
The reed your stomach to defy
And pots of osey sit you by.

শিকারের শিঙ্গাধ্বনি করিলে শ্রবণ
মন হতে রোগ তোর যাবে দূর হয়ে।
অবশেষে বাড়ি ফিরে আসিবি যখন
নাচ গান কত হবে নাই তার ঠিক,
ছোট ছোট ছেলে মিলে কোকিলের স্বরে
গান শুনাইবে তোরে সে বড়ো মধুর।
অবশেষে আসিবেক সন্ধ্যার ভোজন;
যাইবি হরিত কুঞ্জে তাঁবুটির নীচে,
চুনি হীরে কাজ করা বিচিত্র বসন,
মাটির উপরে পাতা, বসিবি সেথায়;
একশো নাইট মিলি বাজাবে বাজন।
সরোবরে দেখিবি মাছেরা খেলিতেছে,
মন তোর তুষ্ট হবে দেখিলে সে খেলা।
রয়েছে একটি সাঁকো সরসীর 'পরে,
আধেক পাথর তার আধেক কাঠের।
নৌকা এক আসিবেক চব্বিশটি দাঁড়
বাজিবে বাজনা কত ভিতরে তাহার,
চড়ি সে নৌকার 'পরে যাবি হেথা হোথা,
জ্বলিবে সাঁকোর 'পরে চল্লিশটি বাতি,
গৃহে তোর ফিরে যাবি চড়ি সে নৌকায়।
বিছানাটি হবে তোর হীরা মণি গাঁথা,
সে কোমল বিছানায় শুইবি যখন
সোনার প্রদীপাধারে জ্বলিবেক আলো।
তবু যদি ঘুম তোর নাহি হয় বাছা
গায়কেরা গাবে গান সারারাত জেগে।

অসভ্য, মদ্যপানরত, কোলাহলপর, অপরিষ্কার, শিল্পজ্ঞানশূন্য স্যাক্সনদের সাহিত্যে এরূপ কবিতা নাই ও থাকিতে পারে না। স্যাক্সনদের আমোদের সহিত নর্ম্যানদের আমোদের অনেক প্রভেদ। নর্ম্যানদের আমোদের মধ্যে বিলাসের ভাব অধিকতর পরিস্ফুট। ব্রিটন-অধিপতি ভটিজরন যখন স্যাক্সন দলপতি হেঞ্জিস্টের শিবিরে নিমন্ত্রিত হইয়া হেঞ্জিস্টের পরম রূপবতী কন্যা রোয়নকে দেখিলেন, একজন নর্ম্যান কবি তখনকার বর্ণনা করিতেছে—

হেঞ্জিস্ট করিল চেষ্টা প্রাণপণ করি
রাজা ও নাইটগণ সুখী হয় যাতে।
আমোদে উন্মত্ত হইল সকলে,
গৃহমধ্যে প্রবেশিলা রোয়েন সুন্দরী;
করে মদিরার পাত্র, সুচারুবসনা;
জানু পাতি বসিল সে রাজার সমুখে,
মদিরা করিল পান, চুম্বিলা রাজারে;
কেমন সুন্দর বপু, গৌর কান্তি তার,
কেমন সুন্দর ভূষা, নয়নরঞ্জন!
দেখিয়া উন্মত্ত হইল নৃপতির মন,

মদ্যপানে ভ্রংশ-বুদ্ধি, মাগিলা ভূপতি,
বিধর্মী সে রমণীরে বিবাহের তরে।

স্যাক্সনদের কঠোর লেখনী হইতে এরূপ মৃদু বিলাসময়ী কবিতা বাহির হইতে পারিত না।

কুমারী মেরীই মধ্যযুগের দেবতা ছিলেন। মহিলা-পূজার উৎকর্ষ তাঁহাতে গিয়াই পৌঁছিয়াছিল। প্রথমত তিনি খৃস্টের জননী ছিলেন, দ্বিতীয়ত সাধারণ মহিলাদের তিনিই পূর্ণ প্রতিমাস্বরূপ ছিলেন। তখনকার লোকের রমণী-ভক্তি হইতেই তাঁহার স্তব উত্থিত হইত। একটি মেরীর স্তব উদ্‌ধৃত করিতেছি—

দেবী, তব হোক জয়, স্বর্গীয় আনন্দময়,
স্বর্গের মধুর পুষ্প তুমি!
মৃদুতার তুমি জন্ম-ভূমি!
দেবী, তব হোক জয়, উজ্জ্বল সৌন্দর্যময়!
সব মম আশা তোমা-'পরি,
কিবা দিবা কিবা বিভাবরী!
নক্ষত্রের রানী তুমি উজ্জ্বল বরন,
দেখাও গো পথ মোরে দাও গো কিরণ,
দেবি, এই বসুন্ধরা মিথ্যা কপটতা ভরা
তুমিই আমারে হেথা করো গো চালন!

রমণী-ভক্তির চর্চা করিয়া করিয়া সে ভাব লোকের মনে সত্য সত্যই এমন বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল যে, এরূপ স্তব হৃদয় হইতে না বাহির হইয়া থাকিতে পারে না।

সেমি-স্যাক্সন সাহিত্যের উপদেশ অংশ হইতে উদাহরণস্বরূপ দুই-একটা উদ্‌ধৃত করিতেছি। মৃতদেহের প্রতি দেহমুক্ত আত্মার উক্তি—

একদা শীতের রাত্রে আছিনু নিদ্রিত;
দেখিনু আশ্চর্য দৃশ্য; ভূমির উপরে
গর্বিত ধনীর এক দেহ আছে পড়ি।
দেহ ছাড়ি আত্মা তার আসিল বাহিরে
ফিরিয়া দেখিল চাহি মৃত দেহ পানে।
কহিল সে, 'ধিক্ রক্ত মাংস কলুষিত!
হতভাগ্য দেহ, কেন এমন অসাড়,
আগে যে বড়োই ছিলি উন্মত্ত, অধীর!
অশ্বে চড়ি হেথা হোথা বেড়াতিস ছুটি;
ছিলি সুগঠন, যশ ছিল দেশব্যাপী!
কোথা গেল গর্ব তোর স্বর্গভেদী স্বর?
কেন পড়ি ভূমিতলে, বস্ত্র আচ্ছাদিত?
কোথা তোর দুর্গ, তোর গৃহ সুসজ্জিত?'
ইত্যাদি—

ইত্যাদি— পুরানো কথা লইয়া অনেক বকাবকি করা হইয়াছে। আন্‌ক্রেন রিউল নামক গদ্যগ্রন্থ হইতে কতকটা উপদেশ-দায়ক বিভীষিকা অনুবাদ করিয়া দিতেছি। ইহাতে পাঠকেরা সেমি-স্যাক্সন গদ্য রচনা ও তখনকার লোকের অজ্ঞান কু-সংস্কারের ভাব কতকটা বুঝিতে পারিবেন—

অলস ব্যক্তিরা ডেভিলের (devil) বুকে তাহার প্রিয় শিশুটির ন্যায় ঘুমাইতে থাকে এবং ডেভিল তাহার কানে মুখ দিয়া কথা কয় ও তাহার মনের বাসনা ব্যক্ত করে। যাহারা কোনো সৎকর্মে ব্যাপৃত না থাকে তাহাদের এইরূপ ঘটিয়া থাকে, ডেভিল ক্রমাগত কথা কহিতে থাকে,

এবং অলস ব্যক্তি অতিশয় ভালোবাসার সহিত তাহার নিকট হইতে শিক্ষা গ্রহণ করে। অলস ও নিশ্চিন্ত ব্যক্তিরা ডেভিলের বক্ষশায়ী bosom sleeper। ভুম্‌স্‌ডে দিবসে দেবদূতের ভেরীধ্বনিতে তাহারা সহসা চমকিত ও নরকের মধ্যে জাগ্রত হইয়া উঠিবে।

লোভী ব্যক্তি ডেভিলের ছাই-কুড়ুনে Ash-gatherer। সে ছাইয়ের উপর ক্রমাগত শুইয়া থাকে, ছাই রাশীকৃত করিতে মহা ব্যস্ত থাকে, ছাই রাশ করিয়া তাহাতে ফুঁ দিতে থাকে ও ছাই উড়িয়া তাহাকে অন্ধ করিয়া তুলে, ছাইয়েতে খোঁচা মারে ও তাহার উপরে জমা-খরচের আঁক পাড়িতে থাকে। এই মূর্খের ইহাতেই আমোদ, ডেভিল তাহার এই-সমস্ত খেলা দেখিতে থাকে এবং হাসিতে হাসিতে তাহার পেট ফাটিয়া যায়। বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা সহজেই বুঝিতে পারেন যে, সোনা রুপা ও অন্যান্য পার্থিব ধনসম্পত্তি ছাই আর ধুলার রাশি মাত্র, যে ব্যক্তি তাহাতে ফুঁ দিতে যায় সেই অন্ধ হইয়া যায়, এই ছাইভস্মের জন্য তাহাদের মনে শান্তি থাকে না, ইহাদেরই জন্য তাহারা গর্বিত হইয়া পড়ে, যাহা-কিছু সে রাশীকৃত ও সংগ্রহ করিতে থাকে এবং প্রয়োজনাতীত যাহা-কিছু সঞ্চিত করিয়া রাখে তাহা ছাই ভিন্ন আর কিছুই নয়, নরকে গিয়া সে সমুদয় তাহার কাছে সাপ ও ব্যাঙ হইয়া দাঁড়ায়। ঈশায়া বলেন, যে ব্যক্তি প্রার্থীদিগকে খাদ্য বস্ত্র না দেয় তাহার কাপড়-চোপড় পোকার দ্বারা নির্মিত হইবে।

লোভী পেটুক ডেভিলের খাদ্য জোগাইয়া থাকে এইজন্য তিনি সর্বদাই রান্নাঘর ও ভাঁড়ার ঘরে ঘুর ঘুর করিয়া বেড়ান। তাঁহার মন খাবার থালায়, তাঁহার সমুদয় চিন্তা টেবিলের চাদরে, তাঁহার প্রাণ হাঁড়িতে, তাঁহার আত্মা ঘড়ায় পড়িয়া থাকে। এক হাতে থালা, এক হাতে বাটি লইয়া কাদা-মাখা কালি-মাখা অবস্থায় সে ঈশ্বরের নিকট উপস্থিত হয়। সে কত কী এলোমেলো বকিতে থাকে, মাতালের মতো টলমল করিতে থাকে, আপনার ভুঁড়ির দিকে চাহিয়া থাকে, ও এই-সকল দেখিয়া ডেভিলের এমন হাসি পায় যে তাহার পেট ফাটিয়া যায়। ঈশ্বর ঈশায়ার মুখ দিয়া এরূপ লোকদের এই বলিয়া ভয় দেখাইয়াছেন যে, 'আমার ভৃত্যেরা আহার করিতে পাইবে, কিন্তু তোমাদের ক্ষুধা নিবৃত্তি হইবে না।' তোমরা ডেভিলের খাদ্যস্বরূপ হইবে। 'যে ব্যক্তি যত বিলাসে জীবন যাপন করিয়াছে তাহাকে তত যন্ত্রণা দেও।' 'গলানো তাঁবা তাহার গলায় ঢালিয়া দেও।' ইত্যাদি।

নর্ম্যান ও স্যাক্সন জাতিদ্বয়ের ভাব ও অবস্থা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তখনকার সাহিত্য কেমন পরিবর্তিত হইতেছিল। যখন নর্ম্যানগণ প্রথম ইংলন্ড অধিকার করিল, যখন স্যাক্সন উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণ অধঃকৃত হইল ও নবাগত বিজয়ীগণ তাহাদের ধনসম্পত্তি আত্মসাৎ করিল, যখন স্যাক্সন ধর্মাচার্যগণ ধর্ম-মন্দির হইতে বহিষ্কৃত হইল ও নর্ম্যান পুরোহিতগণ বেদী অধিকার করিল, তখন স্যাক্সন সাহিত্যও ম্রিয়মাণ হইয়া ক্রমশ বিনষ্ট হইয়া গেল ও ফরাসি সাহিত্য তাহার পদে প্রতিষ্ঠিত হইল। যে দুই-একজন লেখক প্রাচীন ভাষা পরিত্যাগ করিতে পারে নাই, নিম্নশ্রেণী লোকদের পাঠের নিমিত্ত কাব্য রচনা করিয়াই তাহাদের আশা তৃপ্ত থাকিত, তাহাদেরও আদর্শ ফরাসি; ফরাসি পুস্তক হইতে অনুবাদ করাই তাহাদের একমাত্র গতি। কবি লেয়ামন Layamon একটি ল্যাটিন কাব্যের ফরাসি অনুবাদ হইতে এক কাব্য-সংকলন করিয়াছিলেন, তাহার ভাষা বিকৃত ও তাহার ছন্দ রচনায় কোথাও প্রাচীন প্রথানুযায়ী যমক-পদ্ধতি, কোথাও বা ফরাসি-আদর্শ-অনুযায়ী মিলের নিয়ম। লেয়ামনের ভাষা বিকৃত স্যাক্সন বটে কিন্তু তাহাতে ফরাসি প্রবেশ করে নাই, অনভ্যাস ও অপ্রচলিত থাকা প্রযুক্ত তখন স্যাক্সন অনেক পরিমাণে বিকৃত হইয়াছিল কিন্তু তখনো ফরাসি এমন চলিত হইয়া যায় নাই যে, স্যাক্সনের মধ্যে স্থান পাইতে পারে। নর্ম্যানদের যখন নূতন প্রভুত্ব, তখন স্যাক্সন সাহিত্যের এই দশা। যখন নর্ম্যানেরা ইংলন্ডে কিছুদিন বাস করিল, যখন নর্ম্যান ও স্যাক্সনদের মধ্যে বিবাহ প্রচলিত হইল, যখন স্যাক্সন ভাষার সংস্পর্শে নর্ম্যান ফরাসি বিকৃত হইয়া গেল ও সাধারণ অনক্ষর নর্ম্যানগণ বিশুদ্ধ ফরাসি অনেক পরিমাণে ভুলিয়া গেল, শুদ্ধ তাহাই নহে, হয়তো স্যাক্সনদের সহবাসে স্যাক্সনই তাহাদের ভাষা হইল, তখন স্যাক্সন ও ফরাসি মিশিয়া একটা ভাষা জন্মিতে লাগিল, কিন্তু সেই ভাষায় যে কিছু

পুস্তক রচিত হইত, তাহার ভাব ফরাসি, তাহার রচনা-প্রণালী ফরাসি, শুদ্ধ তাহাই নহে, তাহা ফরাসি পুস্তকের অনুবাদ ও অনুকরণ! অবশেষে যখন স্যাক্সন ও নর্ম্যান জাতিদ্বয় সম্পূর্ণরূপে বা অনেক পরিমাণে মিশিয়া গেল, যখন জেতা ও জিত জাতির মধ্যে বিভিন্নতা রহিল না, তখন দেশে নূতন জাতীয় ভাবের সঞ্চার হইল। তখন সকলের ভাষাই অনেক পরিমাণে সমান হইল, তখনকার সাহিত্য সাধারণের সম্পত্তি হইল; তখন শ্রেণীবিশেষের জন্যই গ্রন্থ রচিত হইত না। তখন জাতির চক্ষুর সম্মুখ হইতে ফরাসি আদর্শ অনেক পরিমাণে দূরীভূত হইল, লেখকেরা নিজের বুদ্ধি হইতে ও নিজের হৃদয় হইতে অনেক পরিমাণে লিখিতে লাগিল। এমন-কি, একদল লেখক প্রাচীন অ্যাংলো-স্যাক্সন আদর্শে লিখিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কবি ল্যাংল্যান্ড (Langland) 'পিয়ার্স প্লৌম্যান' *(Piers Ploughman)* নামে এক কাব্য লিখিলেন, তাহাতে ছন্দ নাই, মিল নাই, কবি প্রাচীন স্যাক্সন-প্রণালী অনুযায়ী যমক-পদ্ধতি অনুসরণ করিয়াছেন। নূতন জাতীয় ভাবের সঞ্চার হইলে লোকের পুরাতন সাহিত্যের প্রতি টান পড়ে। 'পিয়ার্স প্লৌম্যান'-লেখক প্রাচীন অ্যাংলো-স্যাক্সন রচনা-প্রণালীর অনুকরণ করিতে লাগিলেন ও একদল লেখক উত্থিত হইল, তাহারা 'পিয়ার্স প্লৌম্যান'-লেখকের অনুকরণ করিতে লাগিল। কিন্তু ফরাসি অনুকরণে কাব্যরচনার মিল ও ছন্দের নিয়ম তখনকার সাহিত্যে এমন বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল যে, তাহার মধ্য হইতে বিজাতীয়ত্ব দূর হইয়া গিয়া তাহাই স্বাভাবিক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, এমন অবস্থায় পিছু হঠিয়া অসভ্য অ্যাংলো-স্যাক্সন রীতির অনুসরণ করিতে যাওয়া অনর্থক। ল্যাংল্যান্ডের অনুবর্তী একদল উত্থিত হইল, কিন্তু তাহাদের চেষ্টা সফল হইল না, প্রচলিত রীতি যদিও বিদেশীয় আদর্শ হইতে গৃহীত হইয়াছিল তথাপি তাহারই জয় হইল। ল্যাংল্যান্ডের কাব্য হইতে উদাহরণস্বরূপ দুই-এক শ্লোক উদ্‌ধৃত করিতেছি—

Hire robe was ful riche,
Of rud searlit engrenyned,
With ribanes of rud gold
And of riche stones

ইহাতে ছন্দ নাই, মিল নাই, কেবল robe, riche, rud, ribanes প্রভৃতি কথায় R অক্ষরের যমক আছে মাত্র।

য়ুরোপ হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়াতে ইংলন্ড দ্বীপের একটা বিশেষ উপকার হইয়াছিল। যখন রোমে পোপের আসন অধিকারের জন্য বিবাদ বিদ্বেষ চলিতেছিল, যখন পোপেরা অধর্মাচরণে রত ছিল, তখন ইংলন্ড অমিশ্রভাবে থাকিয়া দূর হইতে অপক্ষপাতের সহিত বিচার করিতে পারিত, পোপের নর-দেবত্ব ভাব তাহাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া যায় নাই। রোমীয় চর্চের চরণে তাহাদের রাশি রাশি মুদ্রা ঢালিতে হইত, তাহাতে তাহারা মনে মনে অসন্তুষ্ট ছিল। ধর্মাচার্যগণের অনেক পরিমাণে স্বাধীনতা থাকায় তাহারা অধর্মাচরণে দারুণ রত ছিল, এই-সকল কারণে তখনকার চর্চের প্রতি ইংরাজদের অভক্তি জন্মিয়াছিল এবং সাধারণ লোকের মুখপাত্র হইয়া ল্যাংল্যান্ড তাঁহার 'পিয়ার্স প্লৌম্যান' কাব্যে তখনকার চর্চ, ধর্মাচার্য ও তখনকার নানা প্রকার কুনীতির প্রতি বিদ্রূপ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাত্মা উইক্লিফ্ ইহার পরে যে ধর্ম-সংস্কার করেন, রোমীয় চর্চের শৃঙ্খল হইতে ইংলন্ডকে মুক্ত করেন, এইপ্রকার কবিতা তাহার পথ পরিষ্কার করিয়া রাখিয়াছিল। এইপ্রকার কবিতা যখন লিখিত হইয়াছিল তখন স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, তখনকার লোকের মনের ভাব এইরূপ ছিল, ল্যাংল্যান্ড তাহাই কেবল লিখিয়া প্রকাশ করিয়াছেন মাত্র। এই কারণেই এই কাব্য তখন এমন সমাদৃত হইয়াছিল।

'পিয়ার্স প্লৌম্যান' কাব্যই সেমি-স্যাক্সন সাহিত্যের শেষ সীমাচিহ্নস্বরূপ করা গেল। তাহার পরেই গাউয়ার (Gower) ও চসারের (Chaucer) কাল। তখন হইতে প্রকৃতপক্ষে ইংরাজি

সাহিত্য আরম্ভ হইল। এতকাল ইংরাজি ভাষা নির্মিত হইতেছিল, এতক্ষণে তাহা একপ্রকার সমাপ্ত হইল।

সাহিত্যপ্রিয় ব্যক্তিরা সেমি-স্যাক্সন সাহিত্য চর্চা করিয়া বড়ো আমোদ পাইবেন না। অনুবাদ অনুকরণ ভাবহীন কথার স্রোতেই এই সাহিত্যক্ষেত্র পূর্ণ। তবে ভাষা-তত্ত্ব-প্রিয় ব্যক্তি ইহা চর্চা করিলে তাঁহাদের পরিশ্রমের অনেক পুরস্কার পাইবেন। সেমি-স্যাক্সন সাহিত্য প্রকৃতপক্ষে একটা বিশেষ সাহিত্য নহে, তাহা ইংরাজি সাহিত্যের সূত্রপাত মাত্র। তখন ব্যাকরণ বানান ও ভাষার কিছুই স্থিরতা ছিল না, একটি পুস্তকেই এক কথার নানা প্রকার বানান আছে, তাহাতে বুঝিবার বড়ো গোল পড়ে। একটা স্থির আদর্শ না থাকাতে সকলেই নিজের ব্যাকরণে, নিজের বানানে, নিজের ভাষায় পুস্তক লিখিত। নর্ম্যান ও স্যাক্সন জাতিদ্বয়ের অবস্থা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তখনকার ভাষা ও সাহিত্য কেমন পরিবর্তিত হইতে লাগিল। অবশেষে কত প্রকার ঘাত-সংঘাতে ইংরাজি সাহিত্য ও ভাষা নির্মিত হইল। ১০৬৬ খৃস্টাব্দে নর্ম্যানেরা ইংলন্ডে প্রবেশ করে, তখন হইতে যদি ইংরাজি সাহিত্যের নির্মাণ-কালের আরম্ভ ধরা যায় ও ১৩৪৫ খৃস্টাব্দে চসার জন্মগ্রহণ করেন, তখন যদি তাহার শেষ ধরা যায় তবে ইংরাজি সাহিত্য ও ভাষা নির্মিত হইতে প্রায় তিন শত বৎসর লাগিয়াছে বলিতে হইবে।

ভারতী
জ্যৈষ্ঠ ১২৮৬

চ্যাটার্টন— বালক-কবি

'And we at sober eve would round thee throng,
Hanging, enraptured, on thy stately song;
And greet with smiles the young-eyed Poesy,
All deftly mashed, as near Antiquity.' --Coleridge

কবি যখন আপনার গুণ বুঝিতে পারিতেছেন ও জগৎ যখন তাঁহার গুণের সমাদর করিতেছে না, তখন তাঁহার কী কষ্ট! যখন তিনি মনে করিতেছেন পৃথিবীর নিকট হইতে যশ ও আদর তাঁহার প্রাপ্য, তাঁহার ন্যায্য অধিকার, তখন তিনি যদি ক্রমাগত উপেক্ষা সহ্য করিতে থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, কিন্তু কী উপায়ে সে প্রতিহিংসা সাধন করেন? আপনাকে বিনাশ করিয়া। তিনি বলেন, পৃথিবী যখন তাঁহাকে অনাদর করিল, তখন পৃথিবী তাঁহাকে পাইবার যোগ্য নহে, তিনি আপনাকে বিনষ্ট করেন ও মনে করেন পৃথিবী একদিন ইহার জন্য অনুতাপ করিবে। বালক কবি চ্যাটার্টন যখন যশ ও অর্থের নিমিত্ত লালায়িত হইয়া লন্ডনে গেলেন ও যখন নিরাশ হইয়া অনাহারে দিন যাপন করিতেছিলেন, তখন একজন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে, তিনি কেন তাঁহার লেখা ছাপাইয়া অর্থ উপার্জন করেন না, তখন কবি কহিলেন, পুরানো বস্ত্র কিনিবার জন্য ও গৃহ সাজাইবার জন্য তিনি কোনো কবিতা লেখেন নাই; পৃথিবী যদি ভালোরূপ ব্যবহার না করে তাহা হইলে সে পৃথিবী তাঁহার কবিতার একটি ছত্রও দেখিতে পাইবে না! আরও কিছুদিন অপেক্ষা করিলেন, দেখিলেন পৃথিবী ভালো ব্যবহার করিল না, তখন তিনি তাঁহার সমস্ত অপ্রকাশিত কবিতা দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন ও আপনার প্রাণও নষ্ট করিয়া ফেলিলেন; পৃথিবী আজ অনুতাপ করিতেছে। ১৭৭০ খৃস্টাব্দে যে পৃথিবী তাঁহার মৃত্যুর পর একটি অশ্রুজলও ফেলে নাই; ১৮৪০ খৃস্টাব্দে সেই পৃথিবী তাঁহার স্মরণার্থে প্রস্তরস্তম্ভ নির্মাণ করিয়া পূর্বকৃত অন্যায় ব্যবহারের যথাসাধ্য প্রতিকার করিবার চেষ্টা পাইল।

চ্যাটার্টন তাঁহার শৈশবকাল অবধি এমন সংসর্গে ছিলেন যে, তাঁহার প্রতিভা কিরূপে স্ফূর্তি পাইল ভাবিয়া পাওয়া যায় না। অনুকূল অবস্থায় অনেকের প্রতিভার বীজ অঙ্কুরিত হইতে দেখা যায়, কিন্তু প্রতিকূল অবস্থায় তাহা অতি অল্প লোকের ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে। অবস্থা বিশেষে অনুকূল না হইলে অসময়ে শৈশবে প্রতিভার পূর্ণস্ফূর্তি হওয়া এক প্রকার অসম্ভব। পিতার মৃত্যুর তিন মাস পরে ব্রিস্টল নগরে চ্যাটার্টনের জন্ম হয়। তাঁহার মাতা, তাঁহার ধর্ম মা Mrs Edkins ও তাঁহার অপেক্ষা দুই বৎসরের জ্যেষ্ঠা এক ভগিনী তাঁহার শৈশবের সঙ্গী ছিলেন। ইঁহারা কেহই চ্যাটার্টনকে প্রকৃত প্রস্তাবে চিনিতে পারেন নাই। তাঁহার মাতা চ্যাটার্টনকে পাগল মনে করিয়া অত্যন্ত চিন্তিত ছিলেন। প্রায় বালক মাঝে মাঝে অনেকক্ষণ ধরিয়া আপনার মনে বসিয়া বসিয়া কাঁদিত অথচ কেহ তাহার কোনো কারণ খুঁজিয়া পাইত না; একবার তাঁহার এইরূপ চিন্তিত বিষণ্ণ অবস্থায় Mrs Edkins বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিয়া কহিলেন, 'তোর বাপ যদি বাঁচিয়া থাকিতেন, তাহা হইলে তোকে সিধা করিতেন!' শুনিয়া বালক চমকিয়া উঠিয়া কহিল, 'আহা যদি তিনি বাঁচিয়া থাকিতেন।' বলিয়াই একটি গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া অনেকক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিল! কখনো কখনো অনেকক্ষণ কী কথা ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার কপোলে একটি একটি করিয়া অশ্রু বহিয়া পড়িত, তাহা দেখিয়া তাঁহার মাতা আসিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বালক যথার্থ কারণ বলিতে চাহিত না! আবার এক-এক সময় কতক্ষণ নিস্তব্ধ বসিয়া থাকিয়া হঠাৎ একটা কলম লইয়া অনর্গল লিখিতে আরম্ভ করিত, কিন্তু কী লিখিত সে বিষয়ে কাহারও কখনো কৌতূহল হয় নাই। এ-সকল যে অসাধারণ অস্ফূর্ত প্রতিভা-উদ্ভূত, তাহা তাঁহার মাতা কিরূপে বুঝিবেন বলো? স্কুলের শিক্ষক তাঁহাকে একটা গর্দভ মনে করিত, তাঁহার সহপাঠীরা তাঁহার ভাবগতিক বুঝিতে না পারিয়া অবাক হইত। বাল্যকালে তাঁহার পাঠে তেমন মন ছিল না— কিন্তু হঠাৎ এক সময়ে এমন তাঁহার পড়িতে মন বসিয়া গেল যে, শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়াই পড়িতে আরম্ভ করিতেন, ও ঘুমাইতে যাইবার সময়ে বহি বন্ধ করিতেন। যখন তিনি পাঠের গৃহে বসিয়া পাঠে মগ্ন থাকিতেন, তখন কিছুতেই আহার করিতে আসিতেন না, অবশেষে Mrs Edkins তাঁহার বাল্য-প্রিয়তমা Miss Sukey Will-এর নাম করিলে তিনি তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিতেন।

যখন এমন কেহ তাঁহার সঙ্গী ছিল না যে তাঁহাকে বুঝিতে পারিবে, তাঁহার সহিত সমানুভব করিবে, তখন ব্রিস্টলের এক অতি প্রাচীন গির্জা ও সেই গির্জার মধ্যস্থিত অতি প্রাচীন কালের লোকদের পাষাণ-মূর্তি সকলই তাঁহার সঙ্গী ছিল। শুনা যায়, প্রায় তিনি সেই গির্জায় যাইতেন ও ক্রীড়া-সহচরদিগের মধ্যে তাঁহার বিশেষ সুহৃদ্‌দিগকে কবিতা শুনাইতেন। শৈশবে কী বিষয় লইয়া তিনি কবিতা লিখিবেন? স্কুলের হেডমাস্টার তাঁহাকে প্রহার করিয়াছিলেন, তাহার নামে ঠাট্টা করিয়া একটা কবিতা লিখিলেন, দুষ্টামি করিয়া পাড়ার একটা দোকানদারের নামে কবিতা লিখিয়া খবরের কাগজে ছাপাইয়া দিলেন। লোকে বলে এগারো বৎসরের সময় তিনি কবিতা লিখিতে শুরু করেন, কিন্তু তাহারও পূর্বে দশ বৎসরের সময় তাঁহার একটি কবিতা পাওয়া গিয়াছে। কবিতাটি যিশুখৃস্টের পৃথিবীতে অবতরণ সম্বন্ধে। আসলে এ কবিতাটির মূল্য তেমন কিছুই নহে, এ সম্বন্ধে তিনি স্কুলে যাহা পড়িয়াছেন তাহাই ছন্দে গাঁথিয়াছেন মাত্র, তথাপি দশ বৎসরের বালকের কবিতার একটা নমুনা পাঠকদের হয়তো দেখিতে কৌতূহল হইবে। অনুবাদ অবিকল করিবার মানসে অমিত্রাক্ষরে লিখিলাম—

উপর হইতে দেখো আসিছেন মেঘে,
বিচারক, বিভূষিত মহিমা ও প্রেমে;
আলোকের রাজ্য দিয়া আনিবারে তাঁরে
দ্বিধা হয়ে গেল দেখো শূন্য একেবারে
বদন ঢাকিয়া তার ফেলিল তপন

যিশুর উজ্জ্বলতর হেরিয়া কিরণ
চন্দ্র তারা চেয়ে থাকে বিস্ময়ে মগন!
ভীষণ বিদ্যুৎ হানে, গরজে অশনি
কাঁপে জলধির তীর কাঁপিল অবনী!
স্বর্গের আদেশ— শৃঙ্গ বাজিল অমনি
জল স্থল ভেদি তার উচ্ছ্বাসিল ধ্বনি!
মৃতেরা শুনিতে পেলে আদেশের স্বর
পুণ্যবান হাসে, পাপী কাঁপে থর থর
ভীষণ সময় কাছে এসেছে এখন
উঠিবেক কবরের অধিবাসীগণ
অনন্ত আদেশ তাঁর করিতে গ্রহণ।

ব্রিস্টলের রেডক্লিফ্ গির্জায় (St Mary Redcliffe Church) একটি ঘর ছিল, সেখানে কতকগুলি কাঠের সিন্দুকে অনেকদিনকার পুরানো নানা প্রকার কাগজপত্র দলিল দস্তাবেজ থাকিত। সে-সকল পুরানো অক্ষরের পুরানো ভাষার কাগজপত্রের বড়ো যত্ন ছিল না। চ্যাটার্টনের পিতা যখন গির্জার কর্মচারী ছিলেন, তখন মাঝে মাঝে সেই-সকল সিন্দুক হইতে রাশি রাশি লিখিত পার্চমেন্ট লইয়া তাঁহার রান্নাঘরের জিনিসপত্র র‍্যাফ করিতেন ও অন্যান্য নানা গৃহকর্মে নিয়োগ করিতেন। যাহা-কিছু প্রাচীন তাহারই উপর চ্যাটার্টনের অসাধারণ ভক্তি ছিল। চ্যাটার্টন সেই-সকল কাগজপত্র তাঁহার পড়িবার ঘরে লইয়া গিয়া দরজা বন্ধ করিয়া প্রাচীন অক্ষর ও ভাষা পাঠ করিতে চেষ্টা করিতেন ও সেই-সকল অক্ষর অনুকরণ করিতে প্রয়াস পাইতেন। এইরূপে প্রাচীন ইংরাজি ভাষা তাঁহার দখল হয় ও তখন হইতে প্রাচীন কবিদের অনুকরণ করিয়া কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার সেই ক্ষুদ্র অন্ধকার পাঠগৃহে দরজা বন্ধ করিয়া কতকগুলা রঙ ও কয়লার গুঁড়া লইয়া স্তূপাকার প্রাচীন কাগজপত্রের মধ্যে চ্যাটার্টন কী করিতেন তাহা তাঁহার মাতা ভাবিয়া পাইতেন না। কিরূপ করিলে পার্চমেন্ট প্রাচীন আকার ধারণ করে তিনি তাহা নানাবিধ উপায়ে পরীক্ষা করিতেন। এই সময়ে চ্যাটার্টন প্রাচীন ভাষায় কবিতা লিখিতেন ও অতি যত্নে তাহা লুকাইয়া রাখিতেন ও যখন প্রকাশ করিতেন, কহিতেন রাউলি (Rowley) নামক একজন ব্রিস্টলের অতি প্রাচীন কবি এই-সকল কবিতা লিখিয়াছেন, তিনি অনেক অনুসন্ধান করিয়া সেই-সকল পুস্তক পাইয়াছেন। কেহ অবিশ্বাস করিত না, কে করিবে বলো? কে জানিবে যে, একজন পঞ্চদশবর্ষীয় বালক প্রাচীন কবিদের অনুকরণ করিয়া এই-সকল কবিতা লিখিয়াছে। তাঁহার সঙ্গীদের মধ্যেই বা এমন কে ছিল যে সেই-সকল প্রাচীন ইংরাজি ভালো করিয়া বুঝিবে? তাঁহার মাতা, তাঁহার ভগিনী, একটা অবৈতনিক বিদ্যালয়ের কতকগুলি মূর্খ বালক ও তাহাদের অপেক্ষা জ্ঞানে দুই-এক সোপান মাত্র উন্নত দুই-একটি অল্প বেতনের শিক্ষক প্রাচীন ইংরাজি সাহিত্যের অতি অল্পই ধার ধারিত।

Town and Country Magazine নামক এক পত্রিকায় চ্যাটার্টন রাউলির ছদ্মনাম ধারণ করিয়া 'Elinoure and Juga' (এলিনোর ও জুগা) নামকএকটি গাথা প্রকাশ করিলেন। রুড়্‌বোর্ন নদীতীরে বসিয়া এলিনোর ও জুগা তাহাদের যুদ্ধ-নিহত প্রণয়ীর জন্য শোক করিতেছে। জুগা কহিতেছে—

আয় বোন, করি মোরা হেথায় বিলাপ,
এই ফুলময় তীরে, বিষাদ যথায়
রয়েছে তাহার দুটি পাখা ছড়াইয়া
উষার শিশির আর সায়াহ্নের হিমে
এইখানে বসি বসি ভিজিব দুজনে!

বজ্র-দগ্ধ, শুষ্ক দুই পাদপ যেমন
উভয়ের 'পরে রহে উভয়ে ঝুঁকিয়া।
কিংবা জনশূন্য যথা ভগ্ন নাট্যশালা
হৃদয়ে পুষিয়া রাখে বিভীষিকা শত,
অমঙ্গল কাক যেথা ডাকে অবিরাম।
কাঁদিয়া কাঁদিয়া পেঁচা জাগায় নিশিরে।
বংশীরবে উষা আর উঠিবে না জাগি
নৃত্যগীত বাদ্য আদি হবে নাকো আর।

এলিনোর

ঘোটকের পদশব্দ শৃঙ্গের গর্জনে
অরণ্যে প্রাণীরা আর উঠিবে না কাঁপি!
সারা দীর্ঘ দিন আমি ভ্রমিব গহনে
সারা রাত্রি গোরস্থানে করিব যাপন
প্রেতাত্মারে কব যত দুখের কাহিনী।

যদিও চ্যাটার্টনের অহংকার অতি অল্পই প্রশ্রয় পাইয়াছিল ও তাঁহার যশ-লালসা তৃপ্ত হয় নাই তথাপি তাঁহার অহংকার ও যশের ইচ্ছা অতি বাল্যকাল হইতে অত্যন্ত বলবান ছিল। তাঁহার বাল্যকালে তাঁহার মাতার এক কুম্ভকার বন্ধু চ্যাটার্টনকে একটি মৃৎপাত্র উপহার দিবার মানস করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, সে পাত্রের উপর কী চিত্র আঁকিবে। চ্যাটার্টন কহিলেন, 'একটি দেবতা (angel) আঁকো, তাহার মুখে একটি শৃঙ্গ দেও, যেন সমস্ত পৃথিবীময় সে আমার যশঃকীর্তন করিতেছে।' তাঁহার এমন প্রশংসা-তৃষ্ণা ছিল যে, যতদিন তিনি ব্রিস্টলে ছিলেন, তিনি এমন একটি সামান্য কবিতা লিখেন নাই যাহা তাঁহার সহপাঠীদের শোনান নাই; অনেক সময়ে সে বেচারীরা বিরক্ত হইয়া উঠিত। সন্দিগ্ধ লোকের কহিত, যাঁহার যশ-লালসা এত প্রবল, তিনি কোন্ প্রাণে নিজে কবিতা লিখিয়া ছদ্মনামে প্রকাশ করিলেন? রাউলি-রচিত কবিতাগুলি চ্যাটার্টনের রচিত নয় বলিয়া সন্দেহ করিবার এই একটি প্রধান কারণ। মানুষের চরিত্রে এত প্রকার বিরোধী ভাব মিশ্রিত আছে যে, ওরূপ একদিক মাত্র দেখিয়া কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে গেলে ভ্রমে পড়িতে হয়। তাঁহার সহস্র অহংকার থাক্, তথাপি কত কারণবশত যে তিনি তাঁহার নিজের নাম প্রকাশ করেন নাই তাহা কে বলিতে পারে? তাঁহার চলিত ভাষায় লিখিত ছোটোখাটো কবিতাগুলিতে তাঁহার নিজের নাম প্রকাশ করিতেন ও তাহা লইয়া যথেষ্ট গর্ব অনুভব করিতেন, আর তাঁহার প্রাচীন ভাষায় রচিত কবিতাগুলি যদিও খুব গর্বের সহিত সকলকে শুনাইতেন, তথাপি তাহাতে নিজের নাম ব্যবহার করিতেন না, ইহার কারণ খুঁজিতে গেলে যে একেবারে নিরুপায় হইয়া পড়িতে হয় তাহা নহে। যতদূর জানা যায়, তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায়, তিনি তাঁহার নিজের লিখিত প্রাচীন ভাষার কবিতাগুলিকে অতিশয় ভক্তির চক্ষে দেখিতেন, যেরূপ ভক্তির সহিত লোকে অতি পুরাকালের গ্রন্থসমূহকে পূজা করে, তাঁহার নিজ-রচিত কবিতার প্রতি তাঁহার ভক্তি যে তদপেক্ষা ন্যূন ছিল, তাহা নহে; কল্পনার মোহিনী-মায়ায় মানুষ নিজহস্তগঠিত প্রতিমাকে দেবতার মতো পূজা করে ও সেই কল্পনার ইন্দ্রজালে চ্যাটার্টন সাধারণ লোকের অনধিগম্য পবিত্র মৃত ভাষায় যে কবিতা লিখিতেন তাহা এক প্রকার সম্ভ্রমের সহিত নিরীক্ষণ করিতেন। যেন সেগুলি তাঁহার নিজের সাধ্যায়ত্ত কবিতা নহে, যেন প্রাচীন যুগের কোনো মৃত কবির আত্মা তাঁহাতে আবির্ভূত হইয়া তাঁহার মুখ দিয়া সেই কবিতা বলাইয়াছেন মাত্র। সামান্য

সামান্য বিষয়মূলক— রাজনীতি বা বিদ্রূপসূচক কবিতা লইয়া তিনি খবরের কাগজে ছাপাইতেন, নাম দিতেন, সকলকে শুনাইতেন— অর্থাৎ সেগুলি লইয়া নাড়াচাড়া করিতে বড়ো সংকোচ অনুভব করিতেন না, কিন্তু ‘রাউলি কবিতা’ এক স্বতন্ত্র পদার্থ, তাহা অতি গোপনে লিখিতেন, গোপন রাখিতেন, যদি কখনো বাহিরে প্রকাশ করিতেন তবে সে প্রাচীনকালের ও অতি প্রাচীন লেখকের বলিয়া। দুই-একবার, তিনি নিজে লিখিয়াছেন বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন, কিন্তু লোকের মুখে সন্দিগ্ধ উপহাসের হাসি দেখিয়া তখনি আবার ঢাকিয়া লইতেন। তাঁহার ‘রাউলি কবিতা’ লইয়া ওরূপ সন্দেহ, উপহাস তিনি সহিতে পারেন না, লোকের ওই কবিতাগুলি ভালো লাগিলেই তিনি সন্তুষ্ট থাকেন। প্রথম প্রথম যখন তিনি প্রাচীন ভাষায় লিখিতে আরম্ভ করেন, তখন হয়তো বালকস্বভাববশত অনেককে ফাঁকি দিবেন ও মজা করিবেন মনে করিয়া ছদ্মনাম ব্যবহার করেন, অথবা হয়তো মনে করিয়াছিলেন যদি তিনি নিজের নাম প্রকাশ করেন তাহা হইলে কেহ বিশ্বাস করিবে না এই ভাবিয়া একটা মিথ্যা নামের আশ্রয় লইয়া থাকিতেন। কিন্তু ক্রমে তিনি যতই লিখিতে লাগিলেন, ততই কল্পনা-চিত্রিত প্রাচীন পুরোহিত কবি রাউলি তাঁহার হৃদয়ে জীবন্ত হইয়া উঠিতে লাগিল, যেন সত্যই রাউলি একজন কবি ছিলেন, রাউলিকে যেন দেখিতে পাইতেন, রাউলির কথা যেন শুনিতে পাইতেন। আর প্রথমে যে কারণবশতই এই-সকল কবিতা তাঁহার লুকাইয়া ও ঢাকিয়া ঢুকিয়া রাখিতে প্রবৃত্তি হোক-না কেন, ক্রমে ক্রমে তাঁহার নিজের চক্ষেও সেই-সকল কবিতার উপর একটা রহস্যের আবরণ পড়িয়া গেল, তাঁহার নিজের কাছেও সে-সকল কবিতা যেন কী একটি গোপনীয়, পবিত্র, প্রাচীন পদার্থ বলিয়া প্রতিভাত হইল। ইহা নূতন কথা নহে যে, অনেকে কোনো একটি বিষয়ে অন্যকে প্রতারণা করিতে গিয়া সেই বিষয়ে আপনাকেও প্রতারণা করে। তাহা ছাড়া তাঁহার চতুর্দিকে এমন সব সঙ্গী ছিল, যাহারা প্রতারিত হইতে চায়। একটি প্রাচীন ভাষায় রচিত ভালো কবিতা শুনিলে তাহারা বিশ্বাস করিতে চায় যে, তাহা কোনো প্রাচীন কবির রচিত। যদি তাহারা জানিতে পায় যে, সে-সকল কবিতা একটি আধুনিক বালকের লেখা, যে বালক তাহাদেরই ভাষায় কথা কয়, তাহাদেরই মতো কাপড় পরে— বাহিরের অনেক বিষয়েই তাহাদের সহিত সমান, তাহা হইলে তাহারা কি নিরাশ হয়! তাহা হইলে হয়তো তাহারা চটিয়া যায়, তাহারা সে কবিতাগুলির মধ্যে কোনো পদার্থ দেখিতে পায় না, নানা প্রকার খুঁটিনাটি ধরিতে আরম্ভ করে, যদি বা কেহ সে-সকল কবিতার প্রশংসা করিতে চায়, তবে সে নিজে একটি উচ্চতর আসনে বসিয়া বালকের মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে অতি গম্ভীর স্নেহের স্বরে বলিতে থাকে যে, হাঁ, কবিতাগুলি মন্দ হয় নাই, এবং বালককে আশা দিতে থাকে যে, বড়ো হইলে চেষ্টা করিলে সে একজন কবি হইতে পারিবে বটে। তাহাদের যদি বল, এ-সকল একটি প্রাচীন কবির লেখা, তাহারা অমনি লাফাইয়া উঠিবে, ভাবে গদগদ হইয়া বলিবে, এমন লেখা কখনো হয় নাই হইবে না; কাগজে পত্রে একটা হুলস্থূল পড়িয়া যাইবে— শত প্রকার সংস্করণে শত প্রকার টীকা ও ভাষ্য বাহির হইতে থাকিবে, এরূপ অবস্থায় একজন যশোলোলুপ কবি-বালক কী করিবে? সে আপনার নাম প্রকাশ করিয়া কতকগুলি বিজ্ঞতাভিমানী বৃদ্ধের নিকট হইতে দুই-চারিটি ওজর করা ছাঁটাছোঁটা মুরুব্বিয়ানা আদর-বাক্য শুনিতে চাহিবে, না, যে নামেই হউক-না কেন, নিজের রচিত কবিতার অজস্র অবারিত প্রশংসাধ্বনি শুনিয়া তৃপ্ত হইতে চাহিবে? যে যশোলালসার দোহাই দিয়া তুমি ‘রাউলি-কবিতা’গুলি বালকের লেখা বলিয়া অবিশ্বাস করিতে চাহ, সেই যশোলালসাই যে তাহাকে আত্মনাম গোপন করিতে প্রবৃত্তি দিবে, তাহার কী ভাবিলে বলো? লোকে যখন ‘রাউলি-কবিতা’ বিষয়ে সাধ করিয়া প্রতারিত হইতে চাহিত, তখন কবি তাহাদের প্রতারণা করিতেন। ব্যারেট নামক একজন লেখক ব্রিস্টলের বিস্তারিত ইতিহাস লিখিতেছিলেন। তাঁহার বন্ধুবর্গ সেই ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহে ব্যস্ত ছিলেন। একদিন ক্যাট্‌কট নামক তাঁহার এক বন্ধু আসিয়া তাঁহাকে সংবাদ দিলেন যে, চ্যাটার্টন নামক এক বালক অনুসন্ধান করিতে করিতে অনেকগুলি ব্রিস্টলের প্রাচীন কবিতা ও বিবরণ পাইয়াছে; ব্যারেট চ্যাটার্টনের নিকট হইতে তাঁহার ইতিহাসের

উপকরণ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। বালকের ভাণ্ডার অজস্র, তুমি যে বিষয় জানিতে চাও, সেই বিষয়েই সে একটা-না-একটা প্রাচীন ভাষায় লিখিত প্রমাণ আনিতে পারে— ঐতিহাসিকের তাঁহাকে সন্দেহ করিবার বড়ো একটা কারণ ছিল না। চ্যাটার্টন তাঁহাকে অনর্গল প্রমাণ রচনা করিয়া আনিয়া দিতে লাগিলেন, তাঁহার ইতিহাস লেখাও অবাধে অগ্রসর হইতে লাগিল। তিনি গর্বের সহিত লিখিলেন— 'এই নগরের (ব্রিস্টল) পুরাতত্ত্ব অনুসন্ধান করিবার উপযোগী প্রাচীন পুস্তকাদি আমি যেরূপে পাইয়াছি, এমন আর কাহারও ভাগ্যে কখনো ঘটে নাই।' তাহা সত্য বটে! ব্যারেট একবার 'রাউলি-রচিত' 'হেস্টিংসের যুদ্ধ' নামক এক অসম্পূর্ণ কবিতা আনিবার জন্য চ্যাটার্টনকে পীড়াপীড়ি করিতে আরম্ভ করেন, চ্যাটার্টন সমস্তটা লিখিয়া উঠিতে পারেন নাই; অনেক পীড়াপীড়ির পর তিনি স্বীকার করিলেন যে, সে কবিতাটি তাঁহার নিজের লেখা। সহস্র প্রমাণ পাইলেও ব্যারেট তখন বিশ্বাস করিতে চাহিবেন কেন? তাঁহার ইতিহাসের অমন সুন্দর উপকরণগুলি এক কথায় হাতছাড়া করিতে ইচ্ছা হইবে কেন? তিনি প্রতারিত হইতে চাহিলেন, চ্যাটার্টন তাঁহাকে প্রতারণা করিলেন। চ্যাটার্টন তাঁহার অসম্পূর্ণ 'হেস্টিংসের যুদ্ধ' সম্পূর্ণ করিয়া আনিয়া দিলেন।

ভারতী
আষাঢ়, ১২৮৬

বাঙালি কবি নয়

একটা কথা উঠিয়াছে, মানুষ মাত্রেই কবি। যাহার মনে ভাব আছে, যে দুঃখে কাঁদে, সুখে হাসে, সেই কবি। কথাটা খুব নূতনতর। সচরাচর লোকে কবি বলিতে এমন বুঝে না। সচরাচর লোকে যাহা বলে তাহার বিপরীত একটা কথা শুনিলে অনেক সময় আমাদের ভারি ভালো লাগিয়া যায়। যাহার মনোবৃত্তি আছে সেই কবি, এ কথাটা এখনকার যুবকদের মধ্যে অনেকেরই মুখে শুনা যায়। কবি শব্দের ওইরূপ অতি-বিস্তৃত অর্থ এখন একটা ফ্যাশান হইয়াছে বলিলে অধিক বলা হয় না। এমন-কি, নীরব-কবি বলিয়া একটি কথা বাহির হইয়া গিয়াছে, ও সে কথা দিনে দিনে খুব চলিত হইয়া আসিতেছে। এত দূর পর্যন্ত চলিত হইয়াছে যে, আজ যদি আমি এমন একটা পুরাতন কথা বলি যে, নীরব কবি বলিয়া একটা কোনো পদার্থই নাই, তাহা হইলে আমার কথাটাই লোকের নূতন বলিয়া ঠেকে। আমি বলি কী, যে নীরব সেই কবি নয়। দুর্ভাগ্যক্রমে, আমার যা মত অধিকাংশ লোকেরই আন্তরিক তাহাই মত। লোকে বলিবে "ও কথা তো সকলেই বলে, উহার উল্‌টাটা যদি কোনো প্রকারে প্রমাণ করাইয়া দিতে পার, তাহা হইলে বড়ো ভালো লাগে।" ভালো তো লাগে, কিন্তু বিষয়টা এমনতর যে, তাহাতে একটা বৈ দুইটা কথা উঠিতে পারে না। কবি কথাটা এমন একটা সমস্যা নয় যে তাহাতে বুদ্ধির মারপ্যাঁচ খেলানো যায়; "বীজ হইতে বৃক্ষ কি বৃক্ষ হইতে বীজ?" এমন একটা তর্কের খেলেনা নয়। ভাব প্রকাশের সুবিধা করিবার জন্য লোকসাধারণে একটি বিশেষ পদার্থের একটি বিশেষ নামকরণ করিয়াছে, সেই নামে তাহাকে সকলে ডাকিয়া থাকে ও অনেক দিন হইতে ডাকিয়া আসিতেছে, তাহা লইয়া আর তর্ক কী হইতে পারে? ভাব প্রকাশের সুবিধার জন্য লোকে পদতল হইতে আরম্ভ করিয়া কটিদেশ পর্যন্ত প্রসারিত অঙ্গকে পা বলিয়া থাকে, তুমি যদি আজ বল যে, পদতল হইতে আরম্ভ করিয়া স্কন্ধদেশ পর্যন্তকে পা বলা যায় তাহা হইলে কথাটা কেমন শোনায় বলো দেখি? পুণ্ডরীকাক্ষ নিয়োগী তাহার এক ছেলের নাম ধর্মদাস, আর-এক ছেলের নাম জন্মেজয়, ও তৃতীয় ছেলের নাম শ্যামসুন্দর রাখিয়াছে, তুমি যদি তর্ক করিতে চাও যে, পুণ্ডরীকাক্ষের তিন ছেলেরই নাম জন্মেজয় নিয়োগী, তাহা হইলে লোকে বলে যে, বৃদ্ধ পুণ্ডরীকাক্ষ তাহার তিন ছেলের যদি তিন স্বতন্ত্র নাম রাখিয়া থাকে, তুমি

বাপু কে যে, তাহাদের তিন জনকেই জন্মেজয় বলিতে চাও? লোকে কাহাকে কবি বলে? যে ব্যক্তি, বিশেষ শ্রেণীর ভাব সমূহ, (যাহাকে আমরা কবিতা বলি) ভাষায় প্রকাশ করে।* নীরব ও কবি দুইটি অন্যোন্য-বিরোধী কথা, তথাপি যদি তুমি বিশেষণ নীরবের সহিত বিশেষ্য কবির বিবাহ দিতে চাও, তবে এমন একটি পরস্পর-ধ্বংসী দম্পতির সৃষ্টি হয়, যে, শুভ দৃষ্টির সময় পরস্পর চোখাচোখি হইবামাত্রেই উভয়ে প্রাণ ত্যাগ করে। উভয়েই উভয়ের পক্ষে ভস্মলোচন। এমনতর চোখাচোখিকে কি অশুভ দৃষ্টি বলাই সংগত নয়, অতএব এমনতর বিবাহ কি না দিলেই নয়? এমন হয় বটে, যে, তুমি যাহাকে কবি বল, আমি তাহাকে কবি বলি না; এই যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া তুমি বলিতে পার বটে যে, "যখন বিভিন্ন ব্যক্তিকে বিভিন্ন লোকে কবি বলিয়া থাকে তখন কী করিয়া বলা যাইতে পারে যে, কবি বলিতে সকলেই এক অর্থ বুঝে?" আমি বলি কী, একই অর্থ বুঝে। যখন গদ্যপুণ্ডরীকের গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত রামবাবুকে তুমি কবি বলিতেছ, আমি কবি বলিতেছি না, ও কবিতা-চন্দ্রিকার গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত শ্যামবাবুকে আমি কবি বলিতেছি তুমি বলিতেছ না, তখন তোমাতে আমাতে এই তর্ক যে, "রামবাবু কি এমন কবি যে তাঁহাকে কবি বলা যাইতে পারে?" বা "শ্যামবাবু কি এমন কবি যে তাঁহাকে কবি বলা যাইতে পারে?" রামবাবু ও শ্যামবাবু এক স্কুলে পড়েন, তবে তাঁহাদের মধ্যে কে ফার্স্ট ক্লাসে পড়েন, কে লাস্ট ক্লাসে পড়েন তাহাই লইয়া কথা। রামবাবু ও শ্যামবাবু যে এক স্কুলে পড়েন, সে স্কুলটি কী? না প্রকাশ করা। তাঁহাদের মধ্যে সাদৃশ্য কোথায়? না প্রকাশ করা লইয়া। বৈসাদৃশ্য কোথায়? কিরূপে প্রকাশ করা হয়, তাহা লইয়া! তবে, ভালো কবিতাকেই আমরা কবিতা বলি, কবিতা খারাপ হইলে তাহাকে আমরা মন্দ কবিতা বলি, সুকবিতা হইতে আরও দূরে গেলে তাহাকে আমরা কবিতা না বলিয়া শ্লোক বলিতে পারি, ছড়া বলিতে পারি, যাহা ইচ্ছা, যথা, হরপ্রতি প্রিয় ভাবে কন হৈমবতী
বৎসরের ফলাফল কহ পশুপতি। ইত্যাদি।

পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জীবকে আমরা মানুষ বলি, তাহার কাছাকাছি যে আসে তাহাকে বনমানুষ বলি, মানুষ হইতে আরও তফাতে গেলে তাহাকে মানুষও বলি না, বনমানুষও বলি না, তাহাকে বানর বলি। এমন তর্ক কখনো শুনিয়াছ যে Wordsworth শ্রেষ্ঠ কবি না ভজহরি (যে ব্যক্তি লেখনীর আকার কিরূপ জানে না) শ্রেষ্ঠ কবি? অতএব এটা দেখিতেছ, কবিতা প্রকাশ না করিলে কাহাকেও কবি বলা যায় না। বিশ্বব্যাপী ঈথর-সমুদ্রে যথোপযুক্ত তরঙ্গ উঠিলে তবে আমাদের চক্ষে আলোক প্রকাশ পায়। তবে কেন অন্ধকারে বসিয়া আমরা বলি না যে, আমরা আলোকের মধ্যে বসিয়া আছি? সর্বত্রই তো ঈথর আছে ও ঈথরের মধ্যে তো আলোক প্রকাশের গুণ আছে, এমন-কি হয়তো আমাদের অপেক্ষা উন্নততর চক্ষুষ্মান জীব সেই অন্ধকারে আলোক দেখিতেছে। কেন বলি না শুনিবে? অতি সহজ উত্তর। বলি না বলিয়া। অর্থাৎ লোকে ভাব প্রকাশের সুবিধার জন্য বস্তু-প্রকাশক শক্তি বিশেষের নাম আলোক রাখিয়াছে। চক্ষে প্রকাশিত না হইলে তাহাকে আলোক বলিবে না, তা তুমি যাহাই বল আর যাহাই কর। ইহার উপর আর তর্ক আছে? তোমার মতে তো বিশ্বশুদ্ধ লোককে চিত্রকর বলা যাইতে পারে। এমন ব্যক্তি নাই, যাহার মনে অসংখ্য চিত্র অঙ্কিত না রহিয়াছে, তবে কেন মনুষ্যজাতির আর-এক নাম রাখ না চিত্রকর? আমার কথাটি অতি সহজ কথা। আমি বলি যে, যে ভাববিশেষ ভাষায় প্রকাশ হয় নাই তাহা কবিতা নহে, ও যে ব্যক্তি ভাববিশেষ ভাষায় প্রকাশ করে না, সেও কবি নহে। যাঁহারা নীরব কবি কথার সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহারা বিশ্বচরাচরকে কবিতা বলেন। এ-সকল কথা কবিতাতেই শোভা পায়। কিন্তু অলংকারশূন্য গদ্যে অথবা তর্কস্থলে বলিলে কি ভালো শোনায়?

---

* এ প্রবন্ধটির মধ্যে আড়ম্বর করিয়া কবিতা কথাটির একটি দুরূহ সংজ্ঞা নির্ণয় করিতে বসা সাজে না বলিয়া আমরা নিরস্ত হইলাম।

একটা নামকে এরূপ নানা অর্থে ব্যবহার করিলে দোষ হয় এই যে, তাহার দুইটা ডানা বাহির হয়, এক স্থানে ধরিয়া রাখা যায় না ও ক্রমে ক্রমে হাতছাড়া এবং সকল কাজের বাহির হইয়া বুনো হইয়া দাঁড়ায়, "আয়" বলিয়া ডাকিলেই আর খাঁচার মধ্যে আসিয়া বসে না। আমার কথাটা এই যে, আমার মনে আমার প্রেয়সীর ছবি আঁকা আছে বলিয়াই আমি কিছু চিত্রকর নই ও ক্ষমতা থাকিলে আমার প্রেয়সীকে আঁকা যাইতে পারিত বলিয়া আমার প্রেয়সী একটি চিত্র নহেন।

অনেকে বলেন, সমস্ত মনুষ্য জাতি সাধারণত কবি ও বালকেরা, অশিক্ষিত লোকেরা বিশেষরূপে কবি। এ মতের পূর্বোক্ত মতটির ন্যায় তেমন বহুল প্রচার হয় নাই। তথাপি তর্ককালে অনেকেরই মুখে এ কথা শুনা যায়। বালকেরা যে কবি নয়, তাহার প্রমাণ পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে। তাহারা কবিতাময় ভাষায় ভাব প্রকাশ করে না। অনেকে কবিত্ব অনুভব করেন, কবিত্ব উপভোগ করেন, যদি বা বলপূর্বক তুমি তাঁহাদিগকেও কবি বল, তথাপি বালকদিগকে কবি বলা যায় না। বালকেরা কবিত্ব অনুভব করে না, কবিত্ব উপভোগ করে না, অর্থাৎ বয়স্ক লোকদের মতো করে না। অনুভব তো সকলেই করিয়া থাকে; পশুরাও তো সুখ দুঃখ অনুভব করে। কিন্তু কবিত্ব অনুভব কয়জন লোকে করে? যথার্থ সুন্দর ও যথার্থ কুৎসিত কয়জন ব্যক্তি পরখ করিয়া, তফাত করিয়া দেখে ও বুঝে? অধিকাংশ লোক সুন্দর চিনিতে ও উপভোগ করিতেই জানে না। সুন্দর বস্তু কেন সুন্দর তাহা বুঝিতে পারা, অন্য সমস্ত সুন্দর বস্তুর সহিত তুলনা করিয়া তাহাকে তাহার যথাযোগ্য আসন দেওয়া, একটা সুন্দর বস্তু হইতে দশটা সুন্দর বস্তুর কথা মনে পড়া, অবস্থা বিভেদে একটি সুন্দর বস্তুর সৌন্দর্য বিভেদ কল্পনা করিতে পারা কি সকলের সাধ্য? সকল চক্ষুই কি শরীরী পদার্থের মধ্যে অশরীরী কী-একটি দেখিতে পায়? অল্পই হউক আর অধিক হউক কল্পনা তো সকলেরই আছে। উন্মাদগ্রস্ত ব্যক্তির অপেক্ষা কল্পনা কাহার আছে? কল্পনা প্রবল হইলেই কবি হয় না। সুমার্জিত, সুশিক্ষিত ও উচ্চ শ্রেণীর কল্পনা থাকা আবশ্যক। কল্পনাকে যথাপথে নিয়োগ করিবার নিমিত্ত বুদ্ধি ও রুচি থাকা আবশ্যক করে। পূর্ণ চন্দ্র যে হাসে, বা জ্যোৎস্না যে ঘুমায়, এ কয়জন বালকের কল্পনায় উদিত হয়? একজন বালক যদি অসাধারণ কাল্পনিক হয়, তবে পূর্ণ-চন্দ্রকে একটি আস্ত লুচি বা অর্ধচন্দ্রকে একটি ক্ষীর পুলি মনে করিতে পারে। তাহাদের কল্পনা সংলগ্ন নহে, কাহার সহিত কাহার যোগ হইতে পারে, কোন্ কোন্ দ্রব্যকে পাশাপাশি বসাইলে পরস্পর পরস্পরের আলোকে অধিকতর পরিস্ফুট হইতে পারে, কোন্ দ্রব্যকে কী ভাবে দেখিলে তাহার মর্ম, তাহার সৌন্দর্য চক্ষে বিকাশ পায়, এ-সকল জানা অনেক শিক্ষার কাজ। একটি দ্রব্য অনেক ভাবে দেখা যাইতে পারে। বৈজ্ঞানিকেরা এক ভাবে জগৎ দেখেন, দার্শনিকেরা এক ভাবে দেখেন ও কবিরা আর-এক ভাবে দেখেন। তিন জনে তিন প্রকার পদ্ধতিতে একই বস্তু দেখিতে পারেন। তুমি কী বল, উহার মধ্যে দুই প্রকার পদ্ধতি আয়ত্ত করিতে শিক্ষার আবশ্যক করে, আর তৃতীয়টিতে করে না? শুদ্ধ করে না তাহাই নয়, শিক্ষাতেই তাহার বিনাশ। কোন্ দ্রব্য কোন্ শ্রেণীর, কিসের সহিত তাহার ঐক্য ও কিসের সহিত তাহার অনৈক্য, তাহা সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম রূপে নির্ণয় করা দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক ও কবি তিন জনেরই কাজ। তবে, একটা দ্রব্যের তিনটি দিক আছে, তিন জন তিন বিভিন্ন দিকের ভার লইয়াছেন। তিন জনের মধ্যে এই মাত্র প্রভেদ, আর কিছু প্রভেদ আছে কি? অনেক ভালো ভালো কবি যে ভাবের পার্শ্বে যে ভাব বসানো উচিত, স্থানে স্থানে তাহার ব্যতিক্রম করিয়া শিক্ষার অসম্পূর্ণতা প্রকাশ করিয়াছেন। Marlowর "Come live with me and be my love" নামক সুবিখ্যাত কবিতাতে ইহা লক্ষিত হয়।

"হবি কি আমার প্রিয়া, রবি মোর সাথে?
অরণ্য, প্রান্তর, নদী, পর্বত, গুহাতে
যত কিছু, প্রিয়তমে, সুখ পাওয়া যায়,
দুজনে মিলিয়া তাহা ভোগ করি আয়!

শুনিব শিখরে বসি পাখি গায় গান,
তটিনী শবদ সাথে মিশাইয়া তান;
দেখিব চাহিয়া সেই তটিনীর তীরে
রাখাল গোরুর পাল চরাইয়া ফিরে।

রচি দিব গোলাপের শয্যা মনোমতো;
সুরভি ফুলের তোড়া দিব কত শত;
গড়িব ফুলের টুপি পরিবি মাথায়,
আঙিয়া রচিয়া দিব গাছের পাতায়।

লয়ে মেষ শিশুদের কোমল পশম
বসন বুনিয়া দিব অতি অনুপম;
সুন্দর পাদুকা এক করিয়া রচিত,
খাঁটি সোনা দিয়ে তাহা করিব খচিত।

কটি-বন্ধ গড়ি দিব গাঁথি তৃণ-জাল,
মাঝেতে বসায়ে দিব একটি প্রবাল।
এই-সব সুখ যদি তোর মনে ধরে
হ আমার প্রিয়তমা, আয় মোর ঘরে।

হস্তি-দন্তে গড়া এক আসনের 'পরে,
আহার আনিয়া দিবে দু জনের তরে,
দেবতার উপভোগ্য, মহার্ঘ এমন,
রজতের পাত্রে দোঁহে করিব ভোজন।

রাখাল-বালক যত মিলি একত্তরে
নাচিবে গাইবে তোর আমোদের তরে।
এই-সব সুখ যদি মনে ধরে তব,
হ আমার প্রিয়তমা, এক সাথে রব।

এ কবিতাতে একটি বিশেষ ভাবকে সমগ্র রাখা হয় নাই। মাঝখানে ভাঙিয়া পড়িয়াছে। যে বিশাল কল্পনায় একটি ভাব সমগ্র প্রতিবিম্বিত হয়, যাহাতে জোড়াতাড়া দিতে হয় না, সে কল্পনা ইহাতে প্রকাশিত হয় নাই। কিয়দ্দূর পর্যন্ত একটা ভাব সম্পূর্ণ রহিয়াছে, তাহার পরে আর-একটি ভাব গাঁথিয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু দুই ভাবের মধ্যে এমন অসামঞ্জস্য যে, উভয়ে পাশাপাশি ঘেঁসাঘেঁসি থাকিয়াও উভয়ের দিকে হাঁ করিয়া তাকাইয়া আছে, উভয়েই ভাবিতেছে, এ এখানে কেন? পরস্পরের মধ্যে গলাগলি ভাব নাই। অরণ্য, পর্বত, প্রান্তরে যত কিছু সুখ পাওয়া যায়, তাহাই যে রাখালের আয়ত্তাধীন, যে ব্যক্তি গোলাপের শয্যা ফুলের টুপি ও পাতায় আঙিয়া নির্মাণ করিয়া দিবার লোভ দেখাইতেছে সে স্বর্ণখচিত পাদুকা, রজতের পাত্র, হস্তি-দন্তের আসন পাইবে কোথায়? তৃণ-নির্মিত কটিবন্ধের মধ্যে কি প্রবাল শোভা পায়? আমাদের পাঠকদের মধ্যে যে কেহ কখনো কবিতা লিখিয়াছেন, সকলেই বলিয়া উঠিবেন, আমি হইলে এরূপ লিখিতাম না। সে কথা আমি বিশ্বাস করি। তাহার অর্থ আর কিছুই নহে, তাঁহারা শিক্ষা পাইয়াছেন। কবিতা রচনায় তাঁহারা হয়তো অমন একটা জাজ্জ্বল্যমান দোষ করেন না, কিন্তু ওই শ্রেণীর দোষ সচরাচর করিয়া থাকেন। যাঁহারা বাস্তবিক কবি, অন্তরে অন্তরে কবি, তাঁহারা এরূপ দোষ করেন না; কিসের সহিত কিসের ঐক্য অনৈক্য আছে তাহা তাঁহারা অতি সূক্ষ্মরূপে দেখিতে পান।

কবিকঙ্কণের কমলে-কামিনীতে একটি রূপসী ষোড়শী হস্তি গ্রাস ও উদ্গার করিতেছে, ইহাতে এমন পরিমাণ-সামঞ্জস্যের অভাব হইয়াছে, যে, আমাদের সৌন্দর্যজ্ঞানে অত্যন্ত আঘাত দেয়।* শিক্ষিত, সংযত, মার্জিত কল্পনায় একটি রূপসী যুবতীর সহিত গজাহার ও উদ্গীরণ কোনো মতেই একত্রে উদয় হইতে পারে না। ইহাতে কেহ না মনে করেন, আমি কবিকঙ্কণকে কবি বলি না। যে বিষয়ে তাঁহার শিক্ষার অভাব ছিল, সেই বিষয়ে তাঁহার পদস্খলন হইয়াছে; এই মাত্র। পরিমাণ-সামঞ্জস্য, যাহা সৌন্দর্যের সার, সে বিষয়ে তাঁহার শিক্ষার অসম্পূর্ণতা দেখিতেছি।

কল্পনারও শিক্ষা আবশ্যক করে। যাহাদের কল্পনা শিক্ষিত নহে, তাহারা অতিশয় অসম্ভব, অলৌকিক কল্পনা করিতে ভালোবাসে; বক্র দর্পণে মুখ দেখিলে নাসিকা পরিমাণাধিক বৃহৎ এবং কপাল ও চিবুক নিতান্ত হ্রস্ব দেখায়। তাহাদের কুগঠিত কল্পনা-দর্পণে স্বাভাবিক দ্রব্য যাহা-কিছু পড়ে তাহার পরিমাণ ঠিক থাকে না; তাহার নাসা বৃহৎ ও তাহার কপাল খর্ব হইয়া পড়ে। তাহারা অসংগত পদার্থের জোড়াতাড়া দিয়া এক-একটা বিকৃতাকার পদার্থ গড়িয়া তোলে। তাহারা শরীরী পদার্থের মধ্যে অশরীরী ভাব দেখিতে পায় না। তথাপি যদি বল বালকেরা কবি, অর্থাৎ বালকদের হৃদয়ে বয়স্কদের অপেক্ষা কবিতা আছে, তবে নিতান্ত বালকের মতো কথা বলা হয়। প্রাচীন কালে অনেক ভালো কবিতা রচিত হইয়া গিয়াছে বলিয়াই বোধ হয়, এই মতের সৃষ্টি হইয়া থাকিবে যে, অশিক্ষিত ব্যক্তিরা বিশেষ রূপে কবি। তুমি বলো দেখি, ওটাহিটি দ্বীপবাসী বা এস্কুইমোদের ভাষায় কয়টা পাঠ্য কবিতা আছে? এমন কোন্ জাতির মধ্যে ভালো কবিতা আছে, যে জাতি সভ্য হয় নাই? যখন রামায়ণ মহাভারত রচিত হইয়াছিল, তখন প্রাচীনকাল বটে, কিন্তু অশিক্ষিত কাল কি? রামায়ণ মহাভারত পাঠ করিয়া কাহারও মনে কি সে সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে? ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে মহা মহা কবিরা ইংলন্ডে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের কবিতায় কি ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রভাব লক্ষিত হয় না? Copleston কহেন "Never has there been a city of which its people might be more justly proud, whether they looked to its past or to its future than Athens in the days of Æschylus."

অনেকে যে কল্পনা করেন যে, অশিক্ষিত অবস্থায় কবিত্বের বিশেষ স্ফূর্তি হয়, তাহার একটি কারণ এই বোধ হয় যে, তাঁহারা মনে করেন যে, একটি বস্তুর যথার্থ স্বরূপ না জানিলে তাহাতে কল্পনার বিচরণের সহস্র পথ থাকে। সত্য একটি মাত্র, মিথ্যা অগণ্য। অতএব মিথ্যায় কল্পনার যেরূপ উদর পূর্তি হয়, সত্যে সেরূপ হয় না। পৃথিবীতে অখাদ্য যত আছে, তাহা অপেক্ষা খাদ্য বস্তু অত্যন্ত পরিমিত। একটি খাদ্য যদি থাকে তো সহস্র অখাদ্য আছে। অতএব এমন মত কি

---

* অনেকে তর্ক করেন যে, গণেশকে দুর্গা এক-একবার করিয়া চুম্বন করিতেছিলেন, তাহাই দূর হইতে দেখিয়া ধনপতি গজাহার ও উদ্গীরণ কল্পনা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা যথার্থ নহে। কারণ কবিকঙ্কণচণ্ডীতেই আছে, যে, চৌষট্টি যোগিনী পদ্মের দলরূপ ধারণ করিল, ও জয়া হস্তিনী রূপে রূপান্তরিত হইল। অতএব গণেশের সহিত ইহার কোনো সম্পর্কই নাই। কেহ বা তর্ক করেন যে, যখন কবির উদ্দেশ্য বিস্ময় ভাবের উদ্দীপন করা, তখন, বর্ণনা যাহাতে অদ্ভুত হয়, তাহারই প্রতি কবির লক্ষ্য। কিন্তু এ কথার কোনো অর্থ নাই। সুকল্পনার সহিত বিস্ময় রসের কোনো মনান্তর নাই।

যখন অগাধ সমুদ্রের মধ্যে মরালশোভিত কুমুদ কহ্লার পদ্মবনের মধ্যে এক রূপসী ষোড়শী প্রতিষ্ঠিত করিলেন; সমস্তই সুন্দর; নীল জল, সুকুমার পদ্ম, পুষ্পের সুগন্ধ, ভ্রমরের গুঞ্জন, ইত্যাদি ইত্যাদি তখন মধ্য হইতে এক গজাহার আনিয়া আমাদের কল্পনায় অমন একটা নিদারুণ আঘাত দিবার তাৎপর্য কী? সুন্দর পদার্থ যেমন কবিত্বপূর্ণ বিস্ময় উৎপন্ন করিতে পারে, এমন-কি, আর কিছুতে পারে? অপার সমুদ্রের মধ্যে পদ্মাসীনা ষোড়শী রমণীই কি যথেষ্ট বিস্ময়ের কারণ নহে? তাঁহার মস্তকের চারি দিকে ইন্দ্রধনুর মণ্ডল স্থাপন করো, তাঁহার করে তারকার বলয়, গলে তারকার হার বসাইয়া দেও দেখিয়া কে না আশ্চর্য হইবে?

কোনো পণ্ডিতের মুখে শুনিয়াছ যে, অখাদ্য বস্তু আহার না করিলে মনুষ্য বংশ ধ্বংস হইবার কথা?

প্রকৃত কথা এই যে, সত্যে যত কবিতা আছে, মিথ্যায় তেমন নাই। শত সহস্র মিথ্যার দ্বারে দ্বারে কল্পনা বিচরণ করিতে পারে, কিন্তু এক মুষ্টি কবিতা সঞ্চয় করিতে পারে কি না সন্দেহ, কিন্তু একটি সত্যের কাছে যাও, তাহার দশগুণ অধিক কবিতা পাও কি না দেখো দেখি? কেনই বা তাহার ব্যতিক্রম হইবে বলো? আমরা তো প্রকৃতির কাছেই কবিতা শিক্ষা করিয়াছি, প্রকৃতি কখনো মিথ্যা কহেন না। আমরা কি কখনো কল্পনা করিতে পারি যে, লোহিত বর্ণ ঘাসে আমাদের চক্ষু জুড়াইয়া যাইতেছে? বলো দেখি, পৃথিবী নিশ্চল রহিয়াছে ও আকাশে অগণ্য তারকারাজি নিশ্চল ভাবে খচিত রহিয়াছে, ইহাতে অধিক কবিত্ব, কি সমস্ত তারকা নিজের পরিবার লইয়া ভ্রমণ করিতেছে— তাহাতে অধিক কবিত্ব; এমনি তাহাদের তালে তালে পদক্ষেপ যে, এক জন জ্যোতির্বিদ্ বলিয়া দিতে পারেন, কাল যে গ্রহ অমুক স্থানে ছিল আজ সে কোথায় আসিবে? প্রথম কথা এই যে, আমাদের কল্পনা প্রকৃতি অপেক্ষা কবিত্বপূর্ণ বস্তু সৃজন করিতে অসমর্থ, দ্বিতীয় কথা এই যে, আমরা যে অবস্থার মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছি তাহার বহির্ভূত সৌন্দর্য অনুভব করিতে পারি না।

অনেক মিথ্যা, কবিতায় আমাদের মিষ্ট লাগে। তাহার কারণ এই যে, যখন সেগুলি প্রথম লিখিত হয় তখন তাহা সত্য মনে করিয়া লিখিত হয়, ও সেই অবধি বরাবর সত্য বলিয়া চলিয়া আসিতেছে। আজ তাহা আমি মিথ্যা বলিয়া জানিয়াছি, অর্থাৎ জ্ঞান হইতে তাহাকে দূর করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছি; কিন্তু হৃদয়ে সে এমনি শিকড় বসাইয়াছে যে, সেখানে হইতে তাহাকে উৎপাটন করিবার জো নাই। আমি কবি, যে, ভূত বিশ্বাস না করিয়াও ভূতের বর্ণনা করি, তাহার তাৎপর্য কী? তাহার অর্থ এই যে, ভূত বস্তুত সত্য না হইলেও আমাদের হৃদয়ে সে সত্য। ভূত আছে বলিয়া কল্পনা করিলে যে, আমাদের মনের কোন্‌খানে আঘাত লাগে, কত কথা জাগিয়া উঠে, অন্ধকার, বিজনতা, শ্মশান, এক অলৌকিক পদার্থের নিঃশব্দ অনুসরণ, ছেলেবেলাকার কত কথা মনে উঠে এ-সকল সত্য যদি কবি না দেখেন তো কে দেখিবে?

সত্য এক হইলেও যে, দশজন কবি সেই এক সত্যের মধ্যে দশ প্রকার বিভিন্ন কবিতা দেখিতে পাইবেন না তাহা তো নহে। এক সূর্যকিরণে পৃথিবীতে কত বিভিন্ন বস্তু বিভিন্ন বর্ণ ধারণ করিয়াছে দেখো দেখি! নদী যে বহিতেছে, এই সত্যটুকুই কবিতা নহে। কিন্তু এই বহমানা নদী দেখিয়া আমাদের হৃদয়ে যে ভাব বিশেষের জন্ম হয় সেই সত্যই যথার্থ কবিতা। এখন বলো দেখি, এক নদী দেখিয়া সময়ভেদে কত বিভিন্ন ভাবের উদ্রেক হয়, কখনো নদীর কণ্ঠ হইতে বিষণ্ণ গীতি শুনিতে পাই, কখনো বা তাহার উল্লাসের কলস্বর, তাহার শত তরঙ্গের নৃত্য আমাদের মনকে মাতাইয়া তোলে। জ্যোৎস্না কখনো সত্য সত্যই ঘুমায় না, অর্থাৎ সে, দুটি চক্ষু মুদিয়া পড়িয়া থাকে না, ও জ্যোৎস্নার নাসিকা-ধ্বনিও কেহ কখনো শুনে নাই। কিন্তু নিস্তব্ধ রাত্রে জ্যোৎস্না দেখিলে মনে হয় যে জ্যোৎস্না ঘুমাইতেছে ইহা সত্য। জ্যোৎস্নার বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব তন্ন তন্ন রূপে আবিষ্কৃত হউক; এমনও প্রমাণ হউক যে জ্যোৎস্না একটা পদার্থই নহে, তথাপি লোকে বলিবে জ্যোৎস্না ঘুমাইতেছে। তাহাকে কোন্ বৈজ্ঞানিক-চূড়ামণি মিথ্যা কথা বলিতে সাহস করিবে বলো দেখি?

কেহ কেহ যদি এমন করিয়া প্রমাণ করিতে বলেন যে, সমুদয় মনুষ্যই কবি, বাঙালি মনুষ্য, অতএব বাঙালি কবি; অশিক্ষিত লোকেরা বিশেষরূপে কবি, বাঙালি অশিক্ষিত, অতএব বাঙালি বিশেষরূপে কবি, তবে তাঁহাদের যুক্তিগুলি নিতান্ত অপ্রামাণ্য। তাহা ব্যতীত, তাঁহাদের প্রমাণ করিবার পদ্ধতিই বা কী রূপ? কবিত্ব কিছু একটা অদৃশ্য গুণ নহে, তাহা Algebraর x নহে যে, অমন অন্ধকারে হাতড়াইয়া বেড়াইতে হইবে। যদি, বাঙালি কবি কি না জানিতে চাও, তবে দেখো, বাঙালি কবিতা লিখিয়াছে কি না ও সে কবিতা অন্য অন্য জাতির কবিতার তুলনায় এত

ভালো কি না যে, বাঙালি জাতিকে বিশেষরূপে কবি জাতি বলা যাইতে পারে। তুমি জান যে, অতিরিক্ত মোটা মানুষেরা সহজে নড়িতে চড়িতে পারে না ও অল্প পরিশ্রমে হাঁপাইয়া পড়ে। দৃশ্যমান ব্যক্তি-বিশেষ মোটা কি না, জানিতে হইলে, তুমি কি প্রথমে দেখিবে সে ব্যক্তি সহজে নড়িতে চড়িতে পারে কি না ও অল্প পরিশ্রমে হাঁপাইয়া পড়ে কি না, ও তাহা হইতে মীমাংসা করিয়া লইবে সে ব্যক্তি মোটা? আমাকে যদি জিজ্ঞাসা কর তো আমি বলি, তাহা অপেক্ষা সহজ উপায় হইতেছে, তাহার প্রকাশমান শরীরের আয়তন দেখিয়া তাহাকে মোটা স্থির করা।

বাংলা ভাষায় কয়টিই বা কবিতা আছে? এমন কবিতাই বা কয়টি আছে, যাহা প্রথম শ্রেণীর কবিতা বলিয়া গণ্য হইতে পারে? কয়টি বাংলা কাব্যে এমন কল্পনা প্রকাশিত হইয়াছে, সমস্ত জগৎ যে কল্পনার ক্রীড়াস্থল। যে কল্পনা দুর্বল-পদ শিশুর মতো গৃহের প্রাঙ্গণ পার হইলেই টলিয়া পড়ে না? যে কল্পনা সূক্ষ্ম দ্রব্যেও যেমন অনুপ্রবিষ্ট, তেমনি অতি বিশাল দ্রব্যকেও মুষ্টির মধ্যে রাখে। যে কল্পনা বসন্ত বায়ুর অতি মৃদু স্পর্শে অচেতনের মতো এলাইয়া পড়ে, এবং শত ঝটিকার বলে হিমালয়ের মতো অটল শিখরকেও বিচলিত করিয়া তোলে। যে কল্পনা, যখন মৃদু তখন, জ্যোৎস্নার মতো, যখন প্রচণ্ড তখন ধূমকেতুর ন্যায়। কোনো বাংলা কাব্যে কি মনুষ্য চরিত্রের আদর্শ চিত্রিত দেখিয়াছ? নানাপ্রকার বিরোধী মনোবৃত্তির ঘোরতর সংগ্রাম বর্ণিত দেখিয়াছ? এমন মহান ঘটনা জীবন্তের মতো দেখিয়াছ যাহাতে তোমার নেত্র বিস্ফারিত ও সর্বাঙ্গ পুলকিত হইয়া উঠিয়াছে? কোনো বাংলা কাব্য পড়িতে পড়িতে তোমার হৃদয়ে এমন ঝটিকা বহিয়া গিয়াছে, যাহাতে তোমার হৃদয়ে পর্বতপ্রমাণ তরঙ্গ উঠিয়াছে, অথবা পুষ্প-বাস-স্নিগ্ধ এমন মৃদু বায়ু সেবন করিয়াছ যাহাতে তোমার হৃদয়ের সমস্ত তরঙ্গ শান্ত হইয়া গিয়াছে, নেত্র মুদিয়া আসিয়াছে ও হৃদয়কে জীবন্ত জ্যোৎস্নার মতো অশরীরী ও অতি প্রশান্ত আনন্দে মগ্ন মনে করিয়াছ?

প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে মহাকাব্যই নাই। কবিকঙ্কণচণ্ডীকে কি মহাকাব্য বল? তাহাকে উপাখ্যান বলা যাইতে পারে কিন্তু তাহা কি মহাকাব্য? কালকেতু নামে এক দুঃখী ব্যাধ কোনোদিন বা খাইতে পায় কোনোদিন বা খাইতে পায় না। যেদিন খাইতে পায়, সেদিন সে চারি হাঁড়ি ক্ষুদ, ছয় হাঁড়ি দাল ও ঝুড়ি দুই-তিন আলু-ওল পোড়া খায়। "ছোটো গ্রাস তোলে যেন তেআঁটিয়া তাল।" "ভোজন করিতে গলা ডাকে হড় হড়।" এই ব্যক্তি চণ্ডীর প্রসাদে রাজত্ব পায়। কিন্তু তাহার রাজসভায় ও একটি ছোটোখাটো জমিদারি কাছারিতে প্রভেদ কিছুই নাই। তাহার রাজত্বে "হানিফ গোপ" ক্ষেতে শস্য উৎপন্ন করে; ভাঁড়ু দত্ত বলিয়া এক মোড়ল আসিয়াছে, তাহার।

"ফোঁটা কাটা মহা দম্ভ, ছেঁড়া যোড়া কোঁচালম্ব
শ্রবণে কলম খরশাণ।"

ধনপতি নামে এক সদাগর আছে; সোনার পিঞ্জর গড়াইতে সে ব্যক্তি গৌড় দেশে যায়, তাহার দুই পত্নী ঘরে বসিয়া চুলাচুলি করে। দুর্বলা বলিয়া তাহাদের এক দাসী আছে, সে উভয়ের কাছে উভয়ের নিন্দা করে, ও দুই পক্ষেই আদর পায়। সমস্ত কাব্যই এইরূপ। গ্রন্থারম্ভে দেবদেবীদের কথা উত্থাপন করা হইয়াছে। কিন্তু কবিকঙ্কণের দেবদেবীরাও নিতান্ত মানুষ, কেবলমাত্র মানুষ নহে, কবিকঙ্কণের সময়কার বাঙালি। হরগৌরীর বিবাহ, মেনকার খেদ, নারীগণের পতিনিন্দা, হরগৌরীর কলহ পড়িয়া দেখো দেখি। কবিকঙ্কণ মহাকাব্য নহে। আয়তন বৃহৎ হইলেই কিছু তাহাকে মহাকাব্য বলা যায় না। ভারতচন্দ্রের কথা উল্লেখ করাই বাহুল্য। তাহার মালিনী মাসি, তাহার বিদ্যা, তাহার সুন্দর, তাহার রাজা ও কোটালকে মহাকাব্যের বা প্রথম শ্রেণীর কাব্যের পাত্র বলিয়া কাহারও ভ্রম হইবে না। বিদ্যাসুন্দর পড়িয়া কাহারও মনে কখনো মহানভাব বা যথার্থ সুন্দর ভাবের উদয় হয় নাই। কিন্তু এ গ্রন্থটি বাঙালি পাঠকদের রুচির এমন উপযোগী করিয়া রচিত হইয়াছে, যে, বঙ্গীয় আবালবৃদ্ধ বনিতার ইহা অতি উপাদেয়

হইয়াছে। বিদ্যাসুন্দর যত লোকে পড়িয়াছে, তত লোকে কি শ্রেষ্ঠতর কাব্য কবিকঙ্কণচণ্ডী পড়িয়াছে? বাঙালি জাতি কতখানি কবি, ইহা হইতেও কি তাহার একটা পরিমাণ পাওয়া যায় না? এই-সকল প্রাচীন বঙ্গীয় গ্রন্থে কল্পনা বঙ্গরমণীদের মতো অন্তঃপুরবদ্ধ। কখনো বা খুব প্রখরা, মুখরা, গাল ভরা পান খায়; হাতনাড়া ঘন ডাক, সতীনের "কেশ ধরি কিল লাথী মারে তার পিঠে" কখনো বা স্বামী আসিবে বলিয়া

"পরে দিব্য পাট শাড়ি, কনক রচিত চুড়ি
দুই করে কুলুপিয়া শঙ্খ।"

কখনো বা স্বামী প্রবাসে, সতীনের নিগ্রহে ভালো করিয়া খাইতে পায় না, ছিন্ন বস্ত্র পরিয়া থাকিতে হয়। কত অল্প আয়তন স্থানে কল্পনাকে বদ্ধ হইয়া থাকিতে হয়। ধনপতি একবার বঙ্গদেশ ছাড়িয়া সিংহলে গিয়াছিল বটে, কিন্তু হইলে হয় কি, স্বর্গে গেলেও যদি বাঙালি ইন্দ্র, বাঙালি ব্রহ্মা দেখা যায়, তবে সিংহলে নূতন কিছু দেখিবার প্রত্যাশা কিরূপে করা যায়? কবিকঙ্কণচণ্ডী অতি সরস কাব্য সন্দেহ নাই। বাঙালিরা এ কাব্য লইয়া গর্ব করিতে পারে, কিন্তু ইহা এমন কাব্য নহে, যাহা লইয়া সমস্ত পৃথিবী গর্ব করিতে পারে, অত আশায় কাজ কী, সমস্ত ভারতবর্ষ গর্ব করিতে পারে। তখনকার বঙ্গবাসীর গৃহ অতি সুচারুরূপে চিত্রিত হইয়াছে। কবিকঙ্কণের কল্পনা তখনকার হাটে, ঘাটে, মাঠে, জমিদারের কাছারিতে, চাষার ভাঙা কুঁড়েতে, মধ্যবিত্ত লোকের অন্তঃপুরে যথেষ্ট বিচরণ করিয়াছে। কোথায় ব্যাধের মেয়ে

"মাংস বেচি লয় কড়ি, চাল লয় ডালি বড়ি
শাক বাইগুণ কিনয়ে বেসাতি।"

কোথায় চাষার— "ভাঙ্গা কুঁড়িয়া, তালপাতার ছাউনি" আছে, যেখানে অল্প "বৃষ্টি হইলে কুঁড়ায় ভাসিয়া যায় বাণ।" কোথায় গাঁয়ের মণ্ডল ভাঁড়দত্ত হাটে আসিয়াছে—

"পসারী পসার লুকায় ভাঁড়ুর তরাসে।
পসার লুটিয়া ভাঁড়ু ভরয়ে চুপড়ি,
যত দ্রব্য লয় ভাঁড়ু নাহি দেয় কড়ি।"

তাহা সমস্ত তিনি ভালো করিয়া দেখিয়াছেন। কিন্তু এই হাট মাঠই কি কল্পনায় বিচরণের পক্ষে যথেষ্ট? কল্পনার, ইহা অপেক্ষা উপযুক্ততর ক্রীড়াস্থল আছে। যে কল্পনা রাম, সীতা, অর্জুন সৃষ্টি করে, তাহার পক্ষে কি কালকেতু, ভাঁড়ু দত্ত ও লহনা, খুল্লনাই যথেষ্ট? পর্বতে, সমুদ্রে, তারাময় আকাশে, জ্যোৎস্নায়, পুষ্পবনে যাহার লীলা, হাট, বাজার, জমিদারির কাছারিতে তাহাকে কি তেমন শোভা পায়? কবিকঙ্কণের কাব্য অতি সরস কাব্য। কিন্তু উহা লইয়াই আমরা বাঙালি জাতিকে কবি জাতি বলিতে পারি না। যাহাতে আদর্শ সৌন্দর্য, আদর্শ মনুষ্য চরিত্র চিত্রিত আছে, বৈচিত্র্যহীন বঙ্গসাহিত্যে এমন কবিতা কোথায়?

আধুনিক বাঙালি কবিতা লইয়া তেমন বিস্তারিত আলোচনা করা বড়ো সহজ ব্যাপার নহে। সাধারণ কথায় বলিতে হইলে বলা যায়, কবির সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে; সজনি, প্রিয়তমা, প্রণয়, বিরহ, মিলন লইয়া অনেক কবিতা রচিত হইয়া থাকে, তাহাতে নূতন খুব কম থাকে এবং গাঢ়তা আরও অল্প। আধুনিক বঙ্গ কবিতায় মনুষ্যের নানাবিধ মনোবৃত্তির ক্রীড়া দেখা যায় না। বিরোধী মনোবৃত্তির সংগ্রাম দেখা যায় না। মহান ভাব তো নাইই। হৃদয়ের কতকগুলি ভাসা-ভাসা ভাব লইয়া কবিতা। সামান্য নাড়া পাইলেই যে জল-বুদ্‌বুদগুলি হৃদয়ের উপরিভাগে ভাসিয়া উঠে তাহা লইয়াই তাঁহাদের কারবার। যে-সকল ভাব হৃদয়ের তলদেশে দিবানিশি গুপ্ত থাকে, নিদারুণ ঝটিকা উঠিলেই তবে যাহা উৎক্ষিপ্ত হইতে থাকে, সহস্র ফেনিল মস্তক লইয়া তীরের পর্বত চূর্ণ করিতে ছুটিয়া আসে সে-সকল আধুনিক বঙ্গকবিদের কবিতার বিষয় নহে। তথাপি কী করিয়া বলি বাঙালি কবি? হইতে পারে বাংলায় দুই-একটা ভালো কবিতা আছে, দুই-একটি

মিষ্ট গান আছে, কিন্তু সেইগুলি লইয়াই কি বাঙালি জাতি অন্যান্য জাতির মুখের কাছে হাত নাড়িয়া বলিতে পারে যে, বাঙালি কবি?

ভারতী
ভাদ্র ১২৮৭

বাঙালি কবি নয় কেন?

"বাঙালি কবি নয় কেন?" এ প্রশ্ন লইয়া গম্ভীর ভাবে আলোচনা করিতে বসিলে চিন্তাশীল ব্যক্তিদের হয়তো ঈষৎ হাস্যরসের উদ্রেক হয়। তাঁহারা বলিবেন, প্রথম প্রশ্ন হউক, "বাঙালি কী" পরে দ্বিতীয় প্রশ্ন হইবে, "বাঙালি কী নয়"! যদি জিজ্ঞাসাই করিতে হইল, তবে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করা যায় "বাঙালি দার্শনিক নয় কেন", "বাঙালি বৈজ্ঞানিক নয় কেন", "বাঙালি শিল্পী নয় কেন", "বাঙালি বণিক নয় কেন" ইত্যাদি ইত্যাদি। বাঙালি জাতির মতো এমন একটা অভাবাত্মক গুণসমষ্টির সম্বন্ধে যদি প্রশ্ন করা যায় যে বাঙালিতে অমুক বিশেষ গুণের অভাব দেখা যায় কেন, তাহা হইলে শ্রোতারা সকলে সমস্বরে হাসিয়া উঠিয়া কহিবেন বাঙালিতে কী গুণের ভাব দেখিতে পাইতেছ? এরূপ ঘটনায় আমাদের মনে আঘাত লাগিতে পারে কিন্তু ইহার বিরুদ্ধে কি আমাদের একটি কথা কহিবার আছে? "বাঙালি কী" ইহা অপেক্ষা দুরূহ সমস্যা কি আর কিছু হইতে পারে? ও বাঙালি কী নয় ইহা অপেক্ষা সহজ প্রশ্ন কি আর আছে?

তবে আজ, বাঙালি কবি নয় কেন, এ প্রশ্ন লইয়া আলোচনা করিতে বসিবার তাৎপর্য কী? তাহার তাৎপর্য এই যে, আজকাল শত সহস্র বঙ্গীয় বালক আধ পয়সা মূলধন লইয়া (বিদেশী মহাজনদিগের নিকট হইতে ধার করা) দিন রাত প্রাণপণপূর্বক বাংলা সাহিত্য-ক্ষেত্রে কবিত্ব চাষ করিতেছেন; আজ যখন দেখিলেন বাংলা সাহিত্য-ক্ষেত্র তাঁহাদের যত্নে কাঁটা গাছ ও গুল্মে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, তখন তাঁহারা কপালের ঘাম মুছিয়া হর্ষ-বিস্ফারিত নেত্রে দশ জন প্রতিবাসীকে ডাকিয়া কহিতেছেন, "আহা, জমি কী উর্বরা!" বঙ্গবাসীগণ স্বপ্নেও স্বজাতিকে দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক বলিয়া অহংকার করিয়া বেড়ান না, অতএব সে বিষয়ে তাঁহাদের আত্মবিস্মৃতি লক্ষিত হয় না; কিন্তু সম্প্রতি দেখিতেছি তাঁহারা রাশীকৃত অসার কবিত্বের খড় তাঁহাদের কাক-পুচ্ছে গুঁজিয়া দিন রাত্রি প্রাণপণে পেখম তুলিয়া থাকিতে চেষ্টা করেন, এমন-কি, ভালো ভালো কুলীন ময়ূরদের মুখের কাছে অম্লান বদনে পেখম নাড়িয়া আসেন; অতএব স্পষ্টই দেখা যাইতেছে ময়ূর বলিয়া তাঁহাদের মনে মনে অত্যন্ত অভিমান হইয়াছে। কিন্তু তাঁহাদিগকে দশ জন লোক নিযুক্ত রাখিতে হইয়াছে, যাহারা অগ্রে অগ্রে যাইয়া উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিতে থাকে, "আমাদের পশ্চাতে যাঁহাদের দেখিতেছ, তাঁহারা কাক নন, তাঁহারা ময়ূর!" আজকাল তো এইরূপ দেখিতেছি। বহু দিন হইতে ভাবিতেছি, বাঙালি কেন আপনাকে কবি বলিয়া এত অহংকার করে, জিজ্ঞাসা করিলে অনেকে বলে, "দেখিতেছ না, আজকাল বাংলার সকলেই কবিতা লেখে!" সকলেই মিত্রাক্ষর ও অমিত্রাক্ষর ছন্দে বাংলা বর্ণমালা কাগজে গাঁথিতেছে, তাহা দেখিয়াই যদি বাঙালি জাতিকে বিশেষ রূপে কবি জাতি আখ্যা দেও, হে চাষা, ক্ষেত্রে অগণ্য কাঁটা গাছ দেখিয়া ফসল ভ্রমে যদি তোমার মনে বড়ো আনন্দ হইয়া থাকে, তবে তোমার মঙ্গলের জন্যই তোমার সে ভ্রম ভাঙা আবশ্যক।

যদি এমন একটা কথা উঠে যে, ইংরাজ কবি কেন, তবে তাহা লইয়া দুই দণ্ড আলোচনা করিতে ইচ্ছা করে। ভাবিয়া দেখিলে কি আশ্চর্য বোধ হয় না যে, যে ইংরাজেরা এমন কাজের লোক, বাণিজ্যবৃত্তি যাহাদের ব্যবসায়, সময়কে যাহারা কান ধরিয়া খাটাইয়া লয়, একটি মিনিটকেও ফাঁকি দিতে দেয় না, জীবিকার জন্য যাহাদিগকে সংগ্রাম করিতে হয়, বাহ্য সুখসম্পদই

যাহাদের উপাস্য দেবতা, যাহারা রাজ্যতন্ত্রীয় মহাসাগরে দিনরাত মগ্ন থাকিয়া প্রত্যেকেই নিজ নিজ পুচ্ছ আস্ফালনে সেই সমুদ্রকে অবিরত ফেনিত প্রতিফেনিত করিতেছে, তাহারা এমন কবি হইল কিরূপে? ইংলন্ড দেশে, অমন একটা ঘোরতর কাজের ভিড়ের মধ্যে, হাটবাজারের দর-দামের মধ্যে, বড়ো রাস্তার ঠিক পাশেই— যেখানে আমদানি ও রপ্তানির বোঝাই করা গাড়ি দিনরাত আনাগোনা করিতেছে— সেখানে কী করিয়া কবিতার মতো অমন একটি সুকুমার পদার্থ নিজের সাধের নিকেতন বাঁধিল? আর আমরা যে, এই বঙ্গদেশে সূর্যাতপে বসিয়া ঘুমন্ত ঝিমন্ত স্বপ্নন্ত জীবন বহন করিতেছি, শত সহস্র অভাব আছে অথচ একটি অভাব অনুভব করি না, বাঁচিয়া থাকিলেই সন্তুষ্ট, অথচ ভালো করিয়া বাঁচিয়া থাকিবার আবশ্যক বিবেচনা করি না, আমরা কেন উচ্চ শ্রেণীর কবি হইলাম না? অনেক কারণ আছে।

আমাদের জাতীয় চরিত্রে উত্তেজনা নাই। উত্তেজনা নাই বলিতে বুঝায়, আমরা কিছুই তেমন গভীর রূপে, তেমন চূড়ান্ত রূপে অনুভব করিতে পারি না। ঘটনা ঘটে, আমাদের হৃদয়ের পদ্মপত্রের উপর পড়িয়া তাহা মুহূর্তকাল টলমল করে, আবার পিছলিয়া পড়িয়া যায়। এমন কিছুই ঘটিতে পারে না, যাহা আমাদের হৃদয়ের অতি মর্মস্থলে প্রবেশ করিয়া সেখানে একটা আন্দোলন উপস্থিত করিতে পারে। আমরা সন্তুষ্ট প্রকৃতির লোক। সন্তুষ্ট প্রকৃতির অর্থ আর কিছুই নহে। তাহার অর্থ এই যে, আমাদের অনুভাবকতা তেমন তীব্র নহে, আমরা সুখ ও দুঃখ তেমন প্রাণপণে অনুভব করিতে পারি না। সুখ যদি আমাদের চক্ষে তেমন স্পৃহনীয় ঠেকিত, দুঃখ যদি আমাদের নিকট তেমন ভীতিজনক দন্ত বিকাশ করিত, তাহা হইলে কি আমরা অদৃষ্ট নামে একটা বল্‌গা-রজ্জুহীন ছুটন্ত অন্ধ অশ্বের উপর চড়িয়া বসিয়া নিশ্চিন্ত ভাবে ঢুলিতে পারিতাম? আমাদের ঘৃণা নাই, আমাদের ক্রোধ নাই, অন্তর্দাহী জ্বলন্ত আগ্নেয় পদার্থের ন্যায় চিরস্থায়ী প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি নাই। একটা অন্যায় ব্যবহার শুনিলে ঘৃণায় আমাদের আপাদমস্তক জ্বলিতে থাকে না। একটা অন্যায়াচরণ পাইলে আমরা ক্রোধে আত্মহারা হই না, ও যতক্ষণ না তাহার প্রতিহিংসা সাধন করিতে পারি ততক্ষণ আমাদের হৃদয়ের মধ্যে রক্ত ফুটিতে থাকে না। আমাদের ক্ষীণ দুর্বল শরীরে অত উত্তেজনা সহিবেই বা কেন? আমাদের এই অল্প পরিসর বক্ষের মধ্যে, আমাদের এই জীর্ণ-জর্জর হাড় কখানির ভিতরে অত ঘৃণা, অত ক্রোধ যদি জ্বলিতে থাকে, সুখে ও দুঃখে যদি অত তরঙ্গ তুলিতে থাকে, তবে আমাদের পঞ্চাশ বৎসরের পরমায়ু কত সংক্ষিপ্ত হইয়া আসে! আমাদের মতো এমন একটি ভগ্নপ্রবণ এঞ্জিনে অত অগ্নি, অত বাষ্প সহিবে কেন? মুহূর্তে ফাটিয়া যাইবে। আমাদের হৃদয়ে বিস্ফারক মনোবৃত্তি সকল যেমন হীনপ্রভ, সংকোচক মনোবৃত্তি সকল তেমনি স্ফূর্তিমান। আমরা ভয়ে জড়োসড়ো হই, লজ্জায় মাটিতে মিশাইয়া যাই। সে লজ্জা আবার আত্মগ্লানি নহে, আত্মগ্লানির দাহকতা আছে; দোষ করিয়া নিজের নিকট নিজে লজ্জিত হওয়া তো পৌরুষিকতা। আমাদের লজ্জা, দশ জনের চোখের সুমুখে পড়িয়া জড়োসড়ো হইয়া যাওয়া, পরের নিন্দা-সূচক ঘৃণার দৃষ্টিপাতে মরোমরো হইয়া পড়া, একটা ঘোমটা থাকিলেই আর এ-সকল লজ্জা থাকিত না। যে-সকল মনোবৃত্তিতে উত্তেজিত করে ও একটা-কোনো কার্যে উদ্যত করে তাহা আমাদের নাই, কিন্তু যে-সকল মনোবৃত্তিতে আমাদের সংকুচিত করে ও সকল কার্য হইতে বিরত করে তাহা আমাদের আছে। আমাদের দেশে রাগারাগি হইয়া তৎক্ষণাৎ একটা খুনাখুনি হইয়া যায় না। বলবান জাতিদের মতো বিশেষ রাগ হইলেই অমনি ঘুষি আগেই লাফাইয়া উঠে না, রাগ হওয়া ও হাতাহাতি হওয়ার মধ্যে একটি দীর্ঘ ব্যবধান গালাগালিতেই কাটিয়া যায় এবং আমাদের দুর্বল-শরীর ক্রোধ সেই সময়ের মধ্যেই প্রায় প্রাণ ত্যাগ করে। কেবল রাগ নহে আমাদের সমস্ত মনোবৃত্তিই এত দুর্বল যে তাহারা তাহাদের ক্ষীণ হস্তে ধাক্কা মারিয়া আমাদের কোনো একটা কাজের মধ্যে ঠেলিয়া দিতে পারে না। যদি বা দেয় তো সে কাজ সমাপ্ত হইতে-না-হইতে সে নিজে পলায়ন করে; যদি বা লিখিতে বস তবে বড়োজোর কর্তা ও কর্ম পর্যন্ত লেখা হয়, কিন্তু ক্রিয়া কোনো কালে লেখা হয় না; যেমন, যদি লিখিতে চাও যে,

"বঙ্গনন্দন বাবু দেশলাই প্রস্তুত করিতেছেন" তবে বড়োজোর "বঙ্গনন্দন বাবু" ও 'দেশলাই" পর্যন্ত লেখা হয়, কিন্তু "প্রস্তুত করিতেছেন" পর্যন্ত আর লেখা হয় না। বলাই বাহুল্য যে, যাহার মনোবৃত্তি সকল অত্যন্ত দুর্বল, সে কখনো কবি হইতে পারে না। যে বিশেষরূপে অনুভব করে না সে বিশেষ রূপে প্রকাশ করিতে পারে না। বলা বাহুল্য যে, বাঙালির হৃদয়ে ভাবের অর্থাৎ অনুভাবকতার গভীরতা, বলবত্তা নাই, তাহা যদি থাকিত তবে কার্যের এত দরিদ্রদশা কেন থাকিবে? অতএব বাঙালি জাতি যদি না ভাবে তো সে প্রকাশ করিবে কীরূপে? কবি হইবে কীরূপে?

আমরা যে এত অনুভব কম করি কেবলমাত্র অনুভাবকতার অল্পতা তাহার কারণ নহে। তাহার কারণ আমাদের কল্পনার দৃষ্টি অতি সামান্য। যে ব্যক্তির কল্পনা অধিক, সে ব্যক্তির অনুভাবকতাও তেমনি তীক্ষ্ণ। কল্পনা আমাদের হৃদয়ে দর্পণের ন্যায় বর্তমান। যাহার কল্পনা মার্জিত ও মসৃণ তাহার হৃদয়ে প্রতিবিম্ব অতি সমগ্র ও সম্পূর্ণ হয়; প্রতিবিম্বও সত্য পদার্থের মতো প্রতিভাত হয়, কিন্তু মলিন কল্পনায় প্রতিবিম্ব অতি অস্পষ্ট হয়, ভালো করিয়া দেখা যায় না। একটা ঘটনা যদি হৃদয়ে ভালো করিয়া প্রতিবিম্বিতই না হইল, যদি তাহা ভালো করিয়া দেখিতেই না পাইলাম, তবে তজ্জনিত সুখ বা দুঃখ হইবে কেন? একজন কাল্পনিক ব্যক্তি যখন বহুদিন পরে বিদেশ হইতে দেশাভিমুখে যাত্রা করে, তখন দেশে আসিলে তাহার আত্মীয় বন্ধুদিগের নিকট কীরূপ সমাদর পাইবে, তাহার এমন একটি জাজ্বল্যমান চিত্র তাহার কল্পনাপটে অঙ্কিত হয় যে, সে আনন্দে অধীর হইয়া পড়ে। সে চক্ষু মুদিয়া স্পষ্ট অনুভব করিতে পারে, যেন সে তাহার সেই পুরাতন বাটির প্রাঙ্গণে গিয়া পৌঁছিয়াছে, সেই সম্মুখে আতা গাছটি রহিয়াছে, এক পাশে গাভীটি বাঁধা রহিয়াছে, ছোটো মেয়েটি দাওয়ায় বসিয়া খেলা করিতেছে, সে তাহাকে দেখিয়া কী বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, মা কী বলিয়া ছুটিয়া আসিলেন, বাড়িতে কিরূপ একটা কোলাহল পড়িয়া গেল, সমস্ত সে দেখিতে পায়; কে তাহাকে কী প্রশ্ন করিবে তাহা সে কল্পনা করিতে থাকে এবং সে তাহার কী উত্তর দিবে তাহা পর্যন্ত ঠিক করিয়া রাখে। কল্পনা যদি এমন জাজ্বল্যমান না হয়, তবে সে কখনো স্পষ্ট সুখ অনুভব করিতে পারে না। যখন একজন ভাবী দারিদ্র্য-দুঃখ ভাবিয়া আত্মহত্যা করে, তখন সে তাহার ভবিষ্যৎ দুঃখের দশা বর্তমানের মতো অতি স্পষ্ট ও জীবন্ত করিয়া দেখে, নহিলে আত্মহত্যা করিতে পারে না।

যে ব্যক্তির অনুভাবকতা অধিক সে ব্যক্তি কাজ করে, সে কখনো নিরুদ্যম থাকিতে পারে না। সুখ তাহাকে এত আনন্দ দেয় যে, সুখের জন্য সে প্রাণপণ করে, দুঃখ তাহাকে এত কষ্ট দেয় যে, দুঃখের হাত এড়াইতে সে বিধিমতে চেষ্টা করে। বাঙালিরা কাজ করিতে চাহে না, কেননা তাহারা জানে যে, কোনোরূপে দিনপাত হইয়া যাইবে। কষ্ট হউক দুঃখ হউক কোনো রূপে দিনপাত হইলেই সন্তুষ্ট। যাহাদের অনুভাবকতা অধিক, তাহাদের কি এরূপ ভাব? এমন হয় বটে, যে, অনেক সময় আমরা অনুভব করি কিন্তু শরীরের দৌর্বল্যবশত সে অনুভাবকতা আমাদের কাজে নিয়োগ করিতে পারে না। কিন্তু তেমন অবস্থায় ক্রমেই আমাদের অনুভাবকতা কমিয়া যায়। অনবরত যদি দুঃখের কারণ ঘটে, অথচ তাহার প্রতিকার করিতে না পারি; চুপচাপ বসিয়া দুঃখ সহিতেই হয়, জানি যে, কোনো চারা নাই, তাহা হইলে মন হইতে দুঃখবোধ কমিয়া যায় ও অদৃষ্টবাদ শাস্ত্রের উপর বিশ্বাস জন্মে। যেমন করিয়াই হউক অনুভাবকতার হ্রাস হয়ই!

বহুকাল হইতে একটা জনশ্রুতি চলিয়া আসিতেছে যে, কাজের সহিত কল্পনার মুখ-দেখাদেখি নাই। কল্পনা যদি এখানে থাকে তো কাজ ওখান দিয়া চলিয়া যায়। সচরাচর লোকে মানুষকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করে, কাজের লোক ও কল্পনাপ্রধান লোক। কাজের লোক যদি উত্তর মেরুতে থাকে তো কল্পনাপ্রধান লোক দক্ষিণ মেরুতে থাকিবে। কিন্তু ভাবনা ও প্রকাশের মধ্যে যেরূপ অকাট্য সম্বন্ধ কল্পনা ও কাজের মধ্যে কি ঠিক তেমনি নহে? তুমি একটি ছবি আঁকিতে চাও, আগে কল্পনায় সে ছবি না উঠিলে কীরূপে তাহা আঁকিবে? মাটির উপর তোমাকে একটি

বাড়ি গড়িতে হইবে কিন্তু তাহার আগে শূন্যের উপর সে বাড়ি না গড়িলে চলে কি? যদি কাজের বাড়ি গড়িবার পূর্বে কল্পনার বাড়ি গড়া নিতান্তই আবশ্যক, তবে কল্পনার বাড়ি যত পরিষ্কার ও ভালো করিয়া গড় কাজের বাড়িও তত ভালো হইবে সন্দেহ নাই। কল্পনার ভিত্তিতে বাড়ি যদি সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ না হয় তবে মাটির উপর গড়িতে তাহা পাঁচবার করিয়া ভাঙিতে হইবে।*

অতএব দেখা যাইতেছে যে, কল্পনা কাজের বাধাজনক নহে বরঞ্চ শ্রীবৃদ্ধিসাধক। তবে কেন কল্পনার নামে অনর্থক এরূপ একটা বদনাম হইল? বোধ হয় তাহার কারণ এই যে, যাহারা নিত্যনিয়মিত ধরাবাঁধা কাজ করে, যে কাজে একটা যন্ত্রের অপেক্ষা অধিক বুদ্ধি থাকিবার আবশ্যক করে না, কালও যাহা করিয়াছিলাম আজও তাহা করিতেছি, আর কালও তাহাই করিতে হইবে, তাহাদের কল্পনা খোরাক না পাইয়া অত্যন্ত ম্রিয়মাণ হইয়া পড়ে। এবং যাহাদের কল্পনা অধিক, তাহারা এরূপ কাজ করিতে সম্মত হয় না। তাহারা এমন কাজ করিতে চায় যাহাতে কিছু সৃষ্টি করিবার আছে, ভাবিবার আছে। একজন কাল্পনিক পুত্রকে যখন তাহার পিতা কহেন "ইহার কিছু হইবে না" তখন তাঁহার কথার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, এ হতভাগ্যের পুত্র কেরানি হইতে পারিবে না বা হিসাব রাখিবার সরকার হইতে পারিবে না। কিন্তু একটা মহান কাজ মাত্রেই কল্পনার আবশ্যক করে তাহা বলাই বাহুল্য। নিউটন বা নেপলিয়নের কল্পনা কি সাধারণ ছিল? ইংলন্ডের লোকেরা কাজের লোক! এ কথা সত্য বটে কাজের লোক বলিতে বুঝায় যে তাহার মধ্যে অধিকাংশই চিঠি কাপি করা হিসাব রাখা প্রভৃতি ধরাবাঁধা কাজে ব্যস্ত। কিন্তু তাহা হইতে কি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়? যে দেশে যন্ত্রের বাহুল্য সে দেশে যন্ত্রীর বাহুল্য। একজন বা দুই জন বা কতকগুলি লোকে মিলিয়া একটা প্রকাণ্ড কাজের সৃজন ও স্থাপন করে ও তাহাতেই দশ জনে মিলিয়া খাটে। অন্ধকারে যদি কেবল দেখিতে পাও যে, দুইটি হাত ভারি কাজে ব্যস্ত আছে, তৎক্ষণাৎ জানিবে কাছাকাছি একটা মস্তক আছে। যে শরীরের মাথা নাই, সে শরীরের হাতে কোনো কাজ থাকে না। ইংলন্ডে অত্যন্ত কাজের ভিড় পড়িয়াছে, তাহা হইতে প্রমাণ হইতেছে ইংলন্ডের মাথা আছে। যখন তুমি দেখ যে শরীরের অধিকাংশ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ না ভাবিয়া যন্ত্রের মতো কাজ করে, পা চলিতেছে কিন্তু পায়ের ভিতরে মস্তিষ্ক নাই, পা ভাবিয়া চিন্তিয়া চলে না, অন্যান্য প্রায় সকল অঙ্গই সেইরূপ, যখন তুমি মনে কর না যে সে শরীরটায় মস্তিষ্ক নাই। একজন ব্যক্তির কল্পনা আছে বলিয়া দশ জন অকাল্পনিক লোক কাজ পায়। ইংলন্ডে যে এত কাজ দেখিতেছি তাহার অর্থ ইংলন্ডে অনেক কাল্পনিক লোক আছে। একজন দরিদ্র ইংরাজ যে তাহার স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া অতি দূরদেশে গিয়া ধন সঞ্চয় করিয়া সম্পত্তিশালী হইয়া উঠে তাহার

---

* অনেকে ভুল বুঝিতে আশ্চর্যরূপে পটু। তাঁহাদের ধন্য বলিতে হইবে। তাঁহাদের যদি বলা যায় যে, কামানের গোলা লাগিলে মানুষ মরিয়া যায়, তাঁহারা তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠেন, "বিলক্ষণ। এই সেদিন দেখিলাম সাতকড়ি সার্বভৌম মহাশয়ের লোকান্তর প্রাপ্তি হইল, কিন্তু বিশ ক্রোশের মধ্যে একটি কামান ছিল না!" এত ক্রোধ যে, তোমাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া মারিতে উদ্যত। তাঁহাদের বলা গেল যে, কবি হইতে গেলে শিক্ষার আবশ্যক, তাঁহারা বলিলেন "কই, শিক্ষিত ব্যক্তিরা তো কবি হয় না।" তাঁহাদের প্রতি লেখকের এই নিবেদন যে, যখন তাঁহাদের বলা হয় যে, "আগুনের উপর না চড়াইলে পায়স প্রস্তুত হয় না" তখন তাঁহারা মনে না করিয়া বসেন যে, আগুনের উপর জল চড়াইলেও পায়স প্রস্তুত হয়। বক্তার এই বলা অভিপ্রায় যে, আগুনের উপর দুধ ও চাল চড়াইলেই তবে পায়স হয়। বক্তা জানিতেন যে, যাহাকে বলা হইতেছে সে জানে কী কী পদার্থে পায়স প্রস্তুত হয়, কেবল জানে না যে, আগুনের উপর চড়ানো পায়স প্রস্তুত করণের একটা অঙ্গ। যাহার কবিত্ব আছে শিক্ষায় সেই কবি হয়। বর্তমান লেখক যাঁহাদের জন্য এই প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, কবির কল্পনা থাকা নিতান্ত আবশ্যক, কেবল তাঁহারা অস্বীকার করেন যে, কবির প্রকাশক্ষমতা ও শিক্ষার আবশ্যক, এইজন্য কল্পনার বিষয়ে কিছুই বাহুল্য উল্লেখ করা হয় নি। যাহা হউক, উপরি-উক্ত শ্রেণীর পাঠকদিগের জন্য কি এমন একটি বাহুল্য কথা বলিতে হইবে যে, কল্পনা থাকিলেই যে, ভালো বাড়ি গড়া হয় তাহা নহে; দুই সমশ্রেণীর কারিগরের মধ্যে যাহার কল্পনা অধিক সেই অপরের অপেক্ষা ভালো বাড়ি গড়িবে!

কারণ তাহার কল্পনা আছে। এই কল্পনায় ইংরাজদের কোথায় না লইয়া গিয়াছে বলো দেখি। কোথায় আফ্রিকার রৌদ্রতপ্ত জ্বলন্ত হৃদয়, আর কোথায় উত্তর মেরুর তুষারময় জনশূন্য মরু প্রদেশ, কোথায় তাহারা না গিয়াছে? যাহা অনুপস্থিত, যাহা অনধিগম্য, যাহা দুষ্প্রাপ্য, যাহা কষ্টসাধ্য, অকাল্পনিক লোকেরা তাহার কাছ দিয়া ঘেঁসিবে না। যাহা উপস্থিত নাই অকাল্পনিক লোকদের কাছে তাহার অস্তিত্বই নাই। বর্তমানে যাহার মূল নিতান্ত স্পষ্ট প্রত্যক্ষ না হইতেছে, এমন কিছু তাহারা বিশ্বাস করিতে চাহে না, এমন-কি, অনুভব করিতে পারে না। এইজন্য অকাল্পনিক লোকেরা একটা কিছু সৃষ্টিছাড়া আশা করে না। সুতরাং কাল্পনিক লোকেরা যেমন অনেক বিষয়ে ঠকে, এক-একটা সৃষ্টিছাড়া খেয়ালে নিজের ও পরের সর্বনাশ করে, অকাল্পনিকদের তাহার কোনো সম্ভাবনা নাই। এইজন্যও বোধ করি কাল্পনিকদের একটা নাম খারাপ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু যে ব্যক্তি ঘরের মধ্যে বসিয়া থাকে সে ব্যক্তির ওই বাহিরের কূপটার মধ্যে পড়িয়া মরিবার কোনো সম্ভাবনা নাই কিন্তু সে ব্যক্তির ওই ফুলবাগানে বেড়াইবার বা বিদেশে গিয়া টাকা রোজগার করিবারও কোনো সম্ভাবনা নাই। একজন কাল্পনিক ব্যক্তির বুদ্ধি না থাকিলে সে অনেক হানিজনক কাজ করে, কিন্তু সে তাহার বুদ্ধির দোষ না কল্পনার দোষ? এক কথায় পৃথিবীতে যত বড়ো বড়ো কাজ হইয়াছে সকলই কল্পনার প্রসাদে। তবে কেন আজ, কাজ অমন মুখ ভার করিয়া কল্পনার প্রতি মহা অভিমান করিয়া বসিয়া আছে?

যে দেশে শেক্‌সপিয়র জন্মিয়াছে সেই দেশেই নিউটন জন্মিয়াছে, যে দেশে অত্যন্ত বিজ্ঞান-দর্শনের চর্চা, সেই দেশেই অত্যন্ত কাব্যের প্রাদুর্ভাব, ইহা হইতে প্রমাণ হইতেছে, কল্পনার কাজ কেবলমাত্র কবিতা সৃজন করা নয়। যে দেশে কাল্পনিক লোক বিস্তর আছে, সে দেশের লোকেরা কবি হয়, দার্শনিক হয়, বৈজ্ঞানিক হয়; সকলই হয়, বাঙালি বৈজ্ঞানিক নয়, বাঙালি দার্শনিক নয়, বাঙালি কবিও নয়।

লোকেরা যে মনে করে যে, অকেজো লোকেরা অত্যন্ত কাল্পনিক হয় তাহার একটি কারণ এই হইবে যে, যাহাদের হাতে কাজ নাই তাহারা কল্পনা না করিয়া আর কী করিবে? নানা লঘু অস্থায়ী ভাবনাখণ্ডের ছায়া মনের উপর পড়াকেই যদি কল্পনা বল, তবে তাহারা কাল্পনিক বটে। কিন্তু সেরূপ কল্পনার ফল কী বলো? সেরূপ কল্পনায় লোককে কবি করিতে পারে না। মনে করো এক ব্যক্তি যতক্ষণ বসিয়া থাকে ততক্ষণ সে নখ দিয়া ধীরে ধীরে মাটিতে আঁচড় কাটিতে থাকে, ইহাতে তাহার অতি ঈষৎ পদচালনা হয়; চলিতে আরম্ভ করিলে তাহার মাটিতে আঁচড় কাটিবার অবসর থাকে না কিন্তু তাহাই বলিয়া কি বলা যাইতে পারে যে, বসিয়া থাকিলেই তাহার যথার্থ পদচালনা হয়? কাজ করিতে যে কল্পনার আবশ্যক করে তাহাই পদচালনা, বসিয়া থাকিলে যে কল্পনা আপনা হইতে আসে তাহা মাটিতে আঁচড় কাটা। যদি কিছুতে সে পদের বলবৃদ্ধি করে, তবে সে চলাতেই। একটি কবিতা লিখিতে হইলে কল্পনাকে একটি নিয়মিত পথে চালন করিতে হয়, তখন তাহার একটি ক্রম থাকে, একটি পরিমাণ থাকে, শুদ্ধ তাহাই নহে, সে সময়ে কল্পনা অলস-কল্পনা অপেক্ষা অনেকটা গভীর ও বিশেষ শ্রেণীর হওয়া আবশ্যক করে। যাহার সর্বদা কবিতা লেখা অভ্যাস আছে, সে যখন কবিতা নাও লিখিতেছে, তখনও মাঝে মাঝে হয়তো সেই ক্রমানুযায়িক, পরিমিত, বিশেষ শ্রেণীর কল্পনা মনে মনে চালনা করিতে থাকে। সেরূপ চালনাতেও মনোনিবেশ আবশ্যক করে, পরিশ্রম বোধ হয়। অলস ব্যক্তি, ও যে কখনো কবিতা লেখে না, সে কখনো অবসর কাল এরূপ শ্রমসাধ্য কল্পনায় অতিবাহন করে না। স্বপ্ন ও সত্য ঘটনায় যত তফাত অলস ও কাজের কল্পনায় তাহা অপেক্ষা অল্প তফাত নয়। অতএব কাজের লোকের কল্পনা অলস লোকের কল্পনা অপেক্ষা অধিক জাগ্রত। যে জাতির মধ্যে বাণিজ্যের প্রাদুর্ভাব, বৈজ্ঞানিক সত্যের আবিষ্কার হয়, দর্শনের আলোচনা চলে, সে জাতির মধ্যে কল্পনার অত্যন্ত চর্চা হয় ও সবশুদ্ধ ধরিয়া কল্পনার ভাণ্ডার অত্যন্ত বাড়িতে থাকে; সুতরাং সে দেশে অলস দেশ অপেক্ষা কবি জন্মিবার অধিক সম্ভাবনা। বাঙালি কাজও করে না, বাঙালি কল্পনাও করে না।

স্বাভাবিক আলস্য, স্বাভাবিক নির্জীবভাব, সকল বিষয়ে বৈরাগ্য, ইহারাই বাঙালিকে মানুষ হইতে দিতেছে না। আমরা সকল দ্রব্যই অর্ধেক চক্ষু মুদিয়া দেখি। আমাদের কৌতূহল অত্যন্ত অল্প। হাতে একটা দ্রব্য পড়িলে তাহা উলটাইয়া পালটাইয়া দেখিতে ইচ্ছাই হয় না। কোনো স্থান দিয়া যখন যাই তখন দুই দিকে চাই না, মাটির দিকেই নেত্র। সত্য জানিবার জন্য কৌতূহল নাই। আমি জানি, ইংলন্ডে সামান্য শ্রমজীবীদিগের জন্য নানা সভা আছে। সেখানে সন্ধ্যাবেলা নানা বিষয়ে বক্তৃতা হয়। সমস্ত দিনের শ্রমের পর ৬ পেন্স খরচ করিয়া কত গরিব লোক শুনিতে আসে। একজন হয়তো ইজিপ্টের প্রাচীন দেবদেবীদের বিষয়ে বক্তৃতা দিবেন। একজন নিরক্ষর শ্রমজীবীর যে, সে বিষয় শুনিতে কৌতূহল হইবে ইহা আমাদের কাছে বড়োই আশ্চর্য বোধ হয়। সামান্য কৌতুকের বিষয় হইলে ছোটো বড়ো সকল লোকে একেবারে ঝাঁকিয়া পড়ে। য়ুরোপে যেখানে যাহা-কিছু দেখিবার আছে, সেইখানেই ইংরাজদের হোটেল নিশ্চয়ই আছে, এবং অন্যান্য বিদেশীয়দের মধ্যে ইংরাজদেরই আধিক্য। এটনার গর্ভের মধ্যে একজন ইংরাজই প্রথম অবতরণ করেন, এবং ইটালিয়নরা বলিয়াছিল এ ব্যক্তি হয় ইংরাজ নয় শয়তান হইবে। আমাদের সাধারণত কৌতূহলের অভাব। সেইজন্য আমরা যাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করি তাহার সমস্তটা আমাদের চক্ষে পড়ে না। সুতরাং সে দ্রব্যটা আমরা সম্পূর্ণরূপে উপভোগ করিতেই পারি না। ইংরাজেরা একটা ভালো দ্রব্যের প্রতি খুঁটিনাটি পর্যন্ত উপভোগ করে। সুইজর্লন্ডের দৃশ্য রমণীয় বলিয়া তাহারা অবসর পাইলেই সেখানে যায়। সেখানে আবার একটা বিশেষ পর্বত-শিখর হইতে সূর্যোদয় অতি সুন্দর দেখায়; সেই সূর্যোদয় দেখিবার জন্য তাড়াতাড়ি অর্ধরাত্রে উঠিয়া হয়তো সেখানে যাত্রা করে, ঠিক পাঁচটার সময় সেখানে গিয়া পৌঁছায়, সূর্যোদয়টুকু দেখিয়া আবার ফিরিয়া আসে। তাহারা সেই উদয়োন্মুখ সূর্যের চতুর্দিকস্থ প্রতি মেঘ খণ্ড আলোচনা করে। আমাদের. দেশে কত দিন রমণীয় সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত হয়। কিন্তু কয়জন একবার চাহিয়া দেখে? এমন সকল উদাসীন, বাহ্য বিষয়ে নির্লিপ্ত লোকদের জন্য কেন এমন সুন্দর দেশ সৃষ্ট হইয়াছিল? কয়জন বাঙালি কেবলমাত্র চক্ষু চরিতার্থ করিবার জন্য হিমালয়ে যায়? আমাদের পাঠকদের মধ্যে কয়জন ঘাটগিরি দেখিয়াছেন, ইলোরার গুহা দেখিয়াছেন? একটু কৌতূহল থাকিলে দেখিবার শত সহস্র অবসর ও উপায় পাইতেন। বাহ্য দৃশ্য আমরা উপভোগ করিতেই জানি না। একটি সামান্য গুল্মের পর্ণ যতই সুন্দর হউক-না-কেন, আমরা তাহা মাড়াইয়া যাই; কখনো একবার নত হইয়া দেখি? আর আমার পার্শ্বস্থ আমার ইংরাজ সহচরটি কেন তাড়াতাড়ি সেটি তুলিয়া লইয়া শুকাইয়া যত্নপূর্বক রাখিয়া দেয়? বাহ্য বিষয়ে ঔদাসীন্য বোধ করি আমাদের কুলক্রমাগত গুণ। সংসার অনিত্য, সংসার স্বপ্ন। একটা ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে, উহাতে অত মনোনিবেশ করিয়া কী দেখিতেছ? উহা তো দুদণ্ডেই শুকাইয়া পড়িবে। সকলই তুচ্ছ, কিছুই চক্ষু মেলিয়া দেখিবার নাই। যাহা-কিছু দেখিবার আছে, সকলই চক্ষু মুদিয়া। জীবনের কূট সমস্যা সকল মীমাংসা করো। কিন্তু ইহা কি বুঝিবে না, ঐ অস্থায়ী ফুল যাহা শিক্ষা দেয় তাহা চিরস্থায়ী। সুন্দর দ্রব্যের প্রতি ভালবাসার চর্চা, যেমন শিক্ষা তেমন শিক্ষা আর কী হইতে পারে? এই বাহ্য প্রকৃতির প্রতি ঔদাসীন্য আমাদের কবিতাতে স্পষ্টই লক্ষিত হয়। যে ভালো কবি অর্থাৎ যাহার মনে সৌন্দর্যজ্ঞান বিশেষ রূপে আছে, সে কি কখনো এমন সুন্দর জগতের বাহ্য মুখশ্রী দেখিয়া মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারে? আমাদের বাংলা কবিতাতে এমন কেন দেখা যায় যে, একজন কবি একটি কাননের যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, আর-এক জনও ঠিক সেইরূপ করিয়াছেন। তাহার কারণ এই যে, যখন আমরা একটি কানন দেখি তখন সে কাননের মুখের দিকে আমরা ভালো করিয়া চাহিয়া দেখি না; কাননের যে কী ভাব আছে তাহা আমরা বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন চোখে দেখি না। দেখিবার ইচ্ছাই নাই, দেখিবার ক্ষমতাই নাই। আমরা কেবল জানি যে, কানন অর্থে একটি ভূমিখণ্ড, যেখানে ফুলের গাছ আছে। আমরা জানি যে, মল্লিকা, মালতী প্রভৃতি ফুল দেখিতে ভালো এবং কবিতায় সে-সকল ফুলের নামোল্লেখ করিলে ভালো শুনাইবে; তাহা তুমিও

জান, তাহা আমিও জানি। কিন্তু কাননের মুখে এমন সকল ভাব বিকাশ পায়, যাহা ভাগ্যক্রমে তুমিই দেখিতে পাও, আমি দেখিতে পাই না, তুমিই জানিতে পার, আমি জানিতে পারি না, সে-সকল ভাব আমাদের চক্ষে পড়ে না। এইজন্যই বাংলা কাব্যে নিম্নলিখিত রূপে কানন বর্ণিত হয়—

মোহিনী মোহকর মহীরুহ রাজি
প্রকাশিল সুন্দর কিশলয় সাজি।
ধাবিল সমীরণ মলয় সুগন্ধি;
চুম্বনে ঘন ঘন কুসুম আনন্দি।
কাঁপিল ঝর ঝর তরুশিরে সাধে,
শিহরিত পল্লব মরমর নাদে।
হাসিল ফুলকুল মঞ্জুল মঞ্জুল,
মোদিত মৃদুবাসে উপবন ফুল্ল।
কোকিল হরষিল কুহরবে কুঞ্জ,
শোভিল সরোবরে সরোজিনী পুঞ্জ।
নাচিল চিত সুখে ময়ূর কুরঙ্গ;
গুঞ্জরে ঘন ঘন মধুপানে ভৃঙ্গ।
সুন্দর শতদল প্রিয়তর আভা
সূরয অরধ, অরধ শশি শোভা।
শোভিল সুতরুণ স্থল জল অঙ্গে;
বিরচিল হ্লাদিনী মায়াবন রঙ্গে।

ইহাতে না আছে কাননের শরীর না আছে কাননের প্রাণ। বীরবর সিংহের বর্ণনা করিতে গিয়া যদি তুমি বল যে, তাহার এক জোড়া হাত, এক জোড়া চোখ ও এক জোড়া কান আছে, তাহা হইলে শ্রীযুক্ত বীরবর সিংহের চিত্র আমাদের মনে যেরূপ উদিত হয়, উপরি-উদ্‌ধৃত বর্ণনায় কাননের চিত্র আমাদের হৃদয়ে তেমনি উঠিবার কথা। বীরবর সিংহের ওরূপ হাস্যজনক বর্ণনা করিলে বলা যায় যে, বর্ণনাকারী বীরবরের চেহারা একেবারে কল্পনাই করেন নাই। বাহ্য আকার বর্ণনা ছাড়া আর-এক প্রকারে বীরবরের বর্ণনা করা যাইতে পারে; বলা যাইতে পারে, বীরবরের দৃঢ়সংলগ্ন ওষ্ঠাধর তাহার স্থির প্রতিজ্ঞা প্রকাশ করিতেছে, তাহার জ্যোতির্ময় নেত্রের দৃষ্টিপাত মর্মভেদী, ও তাহার উন্নত ললাট ভাবনার ভরে যেন ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। এরূপ বর্ণনার গুণ এই যে, এক মুহূর্তে বীরবরের সহিত আমাদের আলাপ হইয়া যায়। ইহাতে বুঝায়, বর্ণনাকারী বীরবরের চেহারা বিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াছেন। Shelley-র কবিতা হইতে একটি দ্বীপের বর্ণনা উদ্‌ধৃত করিয়া দিতেছি, ইহার বাংলা অনুবাদ অসম্ভব।

'It is an isle under Ionian skies,
Beautiful as a wreck of paradise.

. . .

The light clear element which the isle wears
Is heavy with the scent of lemon flowers,
Which floats like mist laden with unseen showers;
And falls upon the eyelids like faint sleep;
And from the moss violets and jonquils peep,
And dart their arrowy odour through the brain

Till you might faint with that delicious pain.
And every motion, odour, beam, and tone,
With that deep music is in unison
Which is a soul within the soul :

. . .

The winged storms, chanting their thunder psalm
To other lands, leave azure chasms of calm
Over this isle, or weep themselves in dew,
From which its fields and woods ever renew
Their green and golden immortality.
And from the sea their rise, and from the sky
There fall, clear exhalations, soft and bright,
Veil after veil, each hiding some delight;
Which sun or moon or zephyr draw aside.
Till the isle's beauty like a naked bride
Glowing at once with love and loveliness,
Blushes and trembles at its own excess.

. . .

But the Chief marvel of the wilderness
Is a lone dwelling, built by whom or how
None of the rustic island people know.

. . .

And, day and night aloof from the high towers
And terraces, the earth and ocean seem
To sleep in one another's arms, and dream
Of waves, flowers, clouds, woods' rocks, all that we
Read in their smiles, and call reality.'

অত্যন্ত দীর্ঘ বলিয়া মাঝে মাঝে ছাড়িয়া দিতে হইল এজন্য ইহার অত্যন্ত রসহানি করা হইয়াছে। Shelley এমন করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন যে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, যে, ওই দ্বীপটি তিনি মনে মনে বিশেষ রূপে উপভোগ করিয়াছেন, বড়ো ভালো লাগিয়াছে তাই এত উচ্ছ্বাস। কেবলমাত্র কতকগুলি সত্যের উল্লেখ করিয়া যান নাই, প্রতি ছত্রে তাঁহার নিজের মনোভাব দীপ্তি পাইতেছে। যে দ্রব্য আমাদের ভালো লাগে, যে দ্রব্য আমরা প্রাণের সহিত উপভোগ করি, তাহা বর্ণনা করিতে হইলে আমরা নানা বস্তুর সহিত তাহার তুলনা করিতে চাই; তাহার নানা প্রকার নামকরণ করি। আমরা আমাদের ভালোবাসার লোককে, "নয়ন-অমৃত রাশি," "জীবন-জুড়ানো ধন," "হৃদি-ফুল হার" এবং এক নিশ্বাসে এমন শত প্রকার সম্বোধন করি কেন? সে যে, কতখানি আমাদের আনন্দদায়ক তাহা ঠিকটি প্রকাশ করিতে আমরা কথা হাতড়াইয়া বেড়াই, এটা একবার, ওটা একবার পরীক্ষা করিয়া দেখি কিছুতেই মনস্তুষ্টি হয় না। আমাদের কল্পনার ভাণ্ডারে তাহার সহিত ওজন করিবার উপযুক্ত বাটখারা খুঁজিয়া পাই না। মনের আগ্রহে ছটাক হইতে মণ পর্যন্ত যাহা-কিছু হাতে পাইতেছি সমস্তই তুলাদণ্ডে চড়াইতেছি, কিন্তু কিছুতেই সমান ওজন হইতেছে না। মনে হয়, আমাদের ভাষার ডানা এমন লৌহময়, যে, আমার ভালোবাসা যে উচ্চে

অবস্থিত সে পর্যন্ত সে উড়িতে পারে না, বার বার করিয়া চেষ্টা করে ও বার বার করিয়া পড়িয়া যায়। একটি Nightingale-এর গানের বিষয়ে Shelley কী লিখিতেছেন পাঠ করো। কেবলমাত্র যদি বলা যায় যে, কোকিল অতি মিষ্ট গান করিতেছে, তাহার এক কবিতা, আর নিম্নলিখিত বর্ণনার এক স্বতন্ত্র কবিতা।

A woodman whose rough heart was out of tune
Hated to hear, under the stars or moon,
One nightingale in an interfluous wood
Satiate the hungry dark with melody
And as a vale watered by a flood,
Or as the moonlight fills the open sky
Struggling with darkness— as a tube-rose
Peoples some Indian dell with scents which lie
Like clouds above the flowers from which they rose—
The singing of that happy nightingale
In this sweet forest, from the golden close
Of evening till the star of dawn may fail
Was interfused upon the silentness.
The folded roses and the violets pale
Heard her within their slumbers ; the abyss.
Of heaven with all its planets ; the dull ear
Of the night-cradled earth ; the loneliness
Of the circumfluous waters. Every sphere,
And every flower and beam and cloud and wave,
And every wind of the mute atmosphere,
And every beast stretched in its rugged cave
And every bird lulled on its mossy bough,
And every silver moth fresh from the grave
Which is its cradle . . . ,
. . . and every form
That worshipped in the temple of night.
Was awed into delight, and by the charm
Girt as with an interminable zone,
Whilst that sweet bird, whose music was a storm
Of sound, shook forth the dull oblivion
Out of their dreams. Harmony became love
In every soul but one.’’

মনে হয় না কি যে, গান শুনিতে শুনিতে কবির চক্ষু মুদিয়া আসিয়াছে, মনুষ্যহৃদয়ে যতদূর সম্ভব তত দূর পর্যন্ত উপভোগ করিতেছেন? এই মুহূর্তে আমার হস্তে অবকাশরঞ্জিনী দ্বিতীয় ভাগ রহিয়াছে। সমস্ত বহি খুঁজিয়া দুই-একটি মাত্র স্বভাব বর্ণনা দেখিলাম। তাহাও এমন নির্জীব ও নীরস, যে, পড়িয়া স্পষ্ট মনে হয়, কবি যাহা বর্ণনা করিতেছেন, প্রাণের সহিত তাহা উপভোগ

করেন নাই। লিখা আবশ্যক বিবেচনায় লিখিয়াছেন। একটি সন্ধ্যার বর্ণনা। মন্দগমনা, বিষণ্ণ সায়াহ্নের মুখ যাহার বিশেষ ভালো লাগে, সে কখনো এরূপ নির্জীব বর্ণনা করিতে পারে না। সূর্যের সহিত আলোকের অপসরণ, এই প্রাকৃতিক ঘটনা মাত্রকে সে সন্ধ্যা বলিয়া জানে না। তাহার হৃদয়ে সন্ধ্যার একটি স্বতন্ত্র জীবন্ত অস্তিত্ব আছে। সন্ধ্যা তাহার মনের ভিতরে বসিয়া কথা কহে।

"আইল গোধূলি সৌর রঙ্গ ভূমে,—
নামিল পশ্চিমে ধীরে যবনিকা,
ধূসর বরণা; ফুরাইল ক্রমে
দিনেশ দৈনিক গতি অভিনয়।
অষ্টমীর চন্দ্র— রজতের চাপ!
নভোমধ্যস্থলে বিষণ্ণ বদনে
ভাসিল; লভিতে যেন প্রিয় রবি
আলিঙ্গন, ভ্রমি' অলক্ষেতে শশি
অর্ধ সৌর রাজ্য বিরহেতে কৃশ,
নিরাশা মলিন।"

যখন তুমি বল, আমি অমুক স্থানে একটি মানুষকে দেখিলাম, তখন জানিলাম, তুমি খুব অল্পই দেখিয়াছ; যখন বল যে, হরিহরকে দেখিয়াছ, তখন জানিলাম, যে, হাঁ, একটু ভালো করিয়া দেখিয়াছ; আর যখন বল যে, হরিহরকে দেখিলাম তাহার চোখে ও অধরে ক্রোধ, ও সমস্ত মুখে একটি গুপ্ত সংকল্প প্রকাশ পাইতেছে, তখন বুঝিলাম যে, একটি মানুষকে যতদূর দেখিবার তাহা দেখিয়াছ। আমরা কবিতায় যেরূপ স্বভাব বর্ণনা করি, তাহাতে প্রকাশ পায় যে, আমরা সেই মানুষটিকে মাত্র দেখিয়াছি, হরিহরকে দেখি নাই। যদি বা হরিহরকে দেখিয়া থাকি, অর্থাৎ সেই মানুষটির নাক কান চোখ মুখ বিশেষরূপে দেখিয়া থাকি, তথাপি তাহার নাক কান চোখ মুখের মধ্যে আর কিছু দেখিতে পাই নাই। যখন আমরা একটি মানুষের ঠোঁটে, চোখে ও সমস্ত মুখে একটা কিছু বিশেষ ভাব দেখিতে পাই তখন আমরা কেবলমাত্র সেই মানুষকে জীবন্ত বলিয়া দেখি না; তখন তাহার ঠোঁট ও চোখকে আমরা জীবন্ত করিয়া দেখি। তখন আমরা তাহার ঠোঁটের ও চোখের একটি হৃদয়, একটি প্রাণ দেখিতে পাই। এই হৃদয়, এই প্রাণ দেখিতে পাওয়া দেখিতে পাওয়ার চূড়ান্ত ফল। বাংলা কবিতার স্বভাব বর্ণনায় প্রকৃতির এই হৃদয়, এই প্রাণ দেখিতে পাই না।

"সরোবরে সরোরুহ, কুমুদ কহ্লার সহ
শরতে সুন্দর হোয়ে শোভা দিয়ে ফুটেছে।"

ইহা লক্ষ্য করিয়া দেখিতে একরূপ চক্ষুর আবশ্যক, আর—

"Then the pied wind flowers and the tulip tall,
And narcissi, the fairest among them all,
Who gaze on their eyes in the stream's recess
Till they die of their own dear loveliness
And the rose, like a nymph to the bath addressed.
Which unveiled the depth of her glowing breast,
Till, fold after fold, to the fainting air
The soul of her beauty and love lay bare."

ইহা দেখিতে স্বতন্ত্র চক্ষুর আবশ্যক করে। একটি narcissus ফুল, যে স্রোতের পার্শ্বে ফুটিয়া দিন রাত্রি জলের মধ্যে নিজের মুখখানি, নিজের সৌন্দর্য দেখিতে দেখিতে শুকাইয়া মরিয়া যায়,

তাহার সে একটি মিষ্ট ভাব, অথবা একটি বিকাশোন্মুখ গোলাপের পাপড়িগুলি যখন একটি একটি করিয়া খুলিতে থাকে অবশেষে তাহার অতুল রূপ একেবারে অনাবৃত হইয়া পড়ে তখন তাহার সেই লাজুক সৌন্দর্য কয়জন লোক দেখিতে পায়? কিন্তু—

"মরাল আনন্দ মনে ছুটিল কমল বনে,
চঞ্চল মৃণাল দল ধীরে ধীরে দুলিল;
বক হংস জলচর ধৌত করি কলেবর
কেলি হেতু কলরবে জলাশয়ে নামিল।"

এ ঘটনাগুলি দেখিতে কতটুকুই বা কল্পনার আবশ্যক করে? ইহা হয়তো সকলেই স্বীকার করিবেন, যাহাকে আমরা বিশেষ ভালোবাসি, যাহাকে আমরা বিশেষ করিয়া নিরীক্ষণ করি, যাহাকে আমরা মুহূর্তকাল আমাদের চক্ষের আড়াল হইতে দিই না, তাহার নাক চোখ আমরা দেখিতে পাই না, অর্থাৎ দেখি না। তাহাকে যখন দেখি তখন তাহার মুখের ভাবটি মাত্র দেখি, আর কিছুই নয়। এইজন্যই সে মুখকে আমরা পদ্ম বলি বা চন্দ্র বলি। যখন আমরা মুখপদ্ম কথা ব্যবহার করি তখন তাহার অর্থ এমন নহে, যে, মুখ বিশেষে পদ্মের মতো পাপড়ি আছে, তখন তাহার অর্থ এই যে, পদ্মেরও যে ভাব সে মুখেরও সেই ভাব। আমার প্রেয়সীর মুখের গঠন বাস্তবিক ভালো কি মন্দ, তাহার নাক ঈষৎ চেপ্টা হওয়াতে ও তাহার ভুরু ঈষৎ বাঁকা হওয়াতে তাহাকে কতখানি খারাপ দেখিতে হইয়াছে, তাহাকে চব্বিশ ঘণ্টা নিরীক্ষণ করিয়াও তাহা আমি বলিতে পারি না, অথচ একজন অচেনা ব্যক্তি মুহূর্তকাল দেখিয়াই বলিয়া দিতে পারে আমার প্রেয়সীর গঠন বাস্তবিক কতখানি ভালো দেখিতে। তাহার কারণ, আমি তাহার মুখের ভাবটি ছাড়া আর কিছু দেখিতে পাই না। যে কবি প্রকৃতিকে যত অধিক ভালোবাসেন সেই কবি প্রকৃতির নাক মুখ চোখ তত অল্প দেখিতে পান। যে কবি গোলাপকে বিশেষরূপে দেখিয়াছেন ও বিশেষরূপে ভালোবাসেন, তিনি সেই গোলাপটিকে একটি আকারবিশিষ্ট ভাব মনে করেন, তাহাকে পাপড়ি ও বৃন্তের সমষ্টি মনে করেন না। এইজন্যই একটি লাজুক বালিকার সহিত একটি গোলাপের আকারগত সম্পূর্ণ বিভেদ থাকিলেও তিনি উভয়ের মধ্যে তুলনা দিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত নহেন। এইজন্য শেলী একটি nightingale-এর কণ্ঠস্বরের সহিত স্রোতের বন্যা, জ্যোৎস্নাধারা ও রজনীগন্ধার পরিমলের তুলনা করিয়াছেন। কোথায় পাখির গান, আর কোথায় বন্যা, জ্যোৎস্না ও ফুলের গন্ধ? জড়ই হউক আর জীবন্তই হউক, একটি আকারের মধ্যে একটি ভাব দেখিতে যে অতি সূক্ষ্ম কল্পনার আবশ্যক, তাহা বোধ করি আমাদের নাই। যদি থাকিত, তবে কেন আমাদের বাংলা কবিতার মধ্যে তাহার কোনো চিহ্ন পাওয়া যাইত না? বোধ করি অত সূক্ষ্ম ভাব আমরা ভালো করিয়া আয়ত্তই করিতে পারি না, আমাদের ভালোই লাগে না। আমাদের খুব খানিকটা রক্তমাংস চাই, যাহা আমরা ধরিতে পারি, যাহা দুই হাতে লইয়া আমরা নাড়াচাড়া করিতে পারি। আমাদের গণ্ডার-চর্ম মন অতি মৃদু সূক্ষ্ম স্পর্শে সুখ অনুভব করিতে পারে না। এইজন্য আমরা বাইরনের ভক্ত। শেলীর জ্যোৎস্নার মতো অতি অশরীরী কল্পনা খুব কম বাঙালির ভালো লাগে।

"দেখিয়াছি ভাগীরথী ভাদ্র মাসে ভরা,
পূর্ণ জোয়ারের জল মন্থর যখন;
দেখিয়াছি সুখস্বপ্নে নন্দনে অপ্সরা
কিন্তু হেন চারু চিত্র দেখি নি কখনো।
বিরহেতে গুরুতর উরসের ভারে
ঢলিয়া পড়েছে বামা কুসুমেষু শরে
কুসুম শয়নে; কিন্তু কুসুমে কি পারে

নিবাইতে যে অনল জ্বলিছে অন্তরে?
সুগোল সুবর্ণনিভ চারু ভুজোপরে
শোভে পূর্ণ বিকশিত বদন কমল,
(রূপের কমল মরি কাম সরোবরে),
ভানুর বিরহে কিন্তু নিমীলিত দল!
শোভিতেছে অন্য করে বাক্য মনোহর,
স্খলিত অলকারাশি, পয়োধর থর
বিশ্রামিছে অযতনে কাব্যের উপর,
পুণ্যবান কবি— কাব্য পুণ্যের আকর।
বিনোদ বদনচন্দ্র, বিনোদ নয়ন
পল্লবে আচ্ছন্ন, পাঠে স্থির সন্নিবেশ,
অতুল বিনোদতম, ত্রিদিব মোহন,
অঙ্গে অঙ্গে অনঙ্গের বিলাস আবেশ।
বিলাস বঙ্কিম রেখা, কুহকী যৌবন
চিত্রিয়াছে কী কৌশলে সর্ব অঙ্গে মরি
পূর্ণতার পূর্ণাবেশ— সুনীল বসন
বিকাশিছে তলে তলে কনক লহরী।"

এমনতর একটা স্থূল নধর মাংসপিণ্ড নহিলে বাঙালি হৃদয়ের অসাড়, অপূর্ণ স্নায়ুবিশিষ্ট, কর্কশ ত্বকে তাহার স্পর্শই অনুভব হয় না। আর নিম্নলিখিত কবিতাটি পড়িয়া দেখো—

Wherefore those dim looks of thine
Shadowy, dreaming Adeline.
Whence that aery bloom of thine
Like a lily which the sun
Looks thro' in his sad decline
And a rose-bush leans upon.
Thou that faintly smilest still,
As a Naiad in a well,
Looking at the set of day.

. . .

Wherefore those faint smile of thine
Spiritual Adeline?
Who talketh with thee, Adeline?
For sure thou art not all alone.
Do beating-hearts of salient springs
Keep measure with thine own?
Hast thou heard the butterflies
What they say betwixt their wings?
Or in stillest evenings
With what voice the violet woos
To his heart the silver dews?

Or when little airs arise
How the merry bluebell rings
To the moss underneath ?
Hast thou look'd upon the breath
Of the lilies at sunrise ?"

এমন জ্যোৎস্নাশরীরী প্রতিমাকে কি বাঙালিরা প্রাণের সহিত ভালোবাসিতে পারেন? না। কেননা, শুনিয়াছি নাকি যে, বাঙালি কবিকে যখন জিজ্ঞাসা করা হয় "কেন ভালোবাস" তখন তিনি উত্তর দেন—

"দেখিয়াছ তুমি সেই মার্জিত কুন্তল
সুকুন্তল কিরীটিনী, প্রেমের প্রতিমাখানি,
আচরণ বিলম্বিত দীর্ঘ কেশরাশি
দেখিয়াছ কহো তবে, কেন ভালোবাসি?"

"আচরণ বিলম্বিত দীর্ঘ কেশরাশি" দেখিলে, "কেশের আঁধারে সেইরূপ কহিনুর" দেখিলে তবে যাঁহাদের প্রেমের উদ্রেক হয়, তাঁহারা অমন একটি ভাবটিকে কিরূপে ভালোবাসিবেন? আর এদিকে চাহিয়া দেখো—

"একদিন দেব তরুণ তপন,
হেরিলেন সুরনদীর জলে,
অপরূপ এক কুমারী রতন
খেলা করে নীল নলিনীদলে।
বিকসিত নীল কমল আনন,
বিলোচন নীল কমল হাসে,
আলো করে নীল কমল বরন,
পুরেছে ভুবন কমল বাসে।
তুলি তুলি নীল কমল কলিকা,
ফুঁ দিয়া ফুটায় অফুট দলে;
হাসি হাসি নীল নলিনী বালিকা,
মালিকা গাঁথিয়া পরেছে গলে।
লহরী লীলায় নলিনী দোলায়
দোলে রে তাহায় সে নীলমণি;
চারি দিকে অলি উড়িয়ে বেড়ায়,
করি গুনু গুনু মধুর ধ্বনি।
চারি দিক দিয়ে দেবীরা আসিয়ে
কোলেতে লইতে বাড়ানু কোল;
যেন অপরূপ নলিনী হেরিয়ে,
কাড়াকাড়ি করি করেন গোল।
তুমিই সে নীল নলিনী সুন্দরী,
সুরবালা সুর-ফুলের মালা;
জননীর হৃদিকমল-উপরি,
হেসে হেসে বেশ করিতে খেলা।
হরিণীর শিশু হরষিত মনে,

জননীর পানে যেমন চায়;
তুমিও তেমনি বিকচ নয়নে,
চাহিয়ে দেখিতে আপন মায়।
শ্যামল বরন, বিমল আকাশ;
হৃদয় তোমার অমরাবতী;
নয়নে কমলা করেন নিবাস,
আননে কোমলা ভারতী সতী।
কথা কহে দূরে দাঁড়ায়ে যখন,
সুরপুরে যেন বাঁশরি বাজে;
আলুথালু চুলে করে বিচরণ
মরি গো তখন কেমন সাজে!
মুখে বেশি হাসি আসে যে সময়
করতল তুলি আনন ঢাকে;
হাসির প্রবাহ মনে মনে বয়,
কেমন সরেস দাঁড়ায়ে থাকে!"

ইহাতে নিবিড় কেশভার, ঘন কৃষ্ণ আঁখিতারা, সুগোল মৃণাল ভুজ নাই তাই বোধ করি ইহার কবি বঙ্গীয় পাঠক সমাজে অপরিচিত, তাঁহার কাব্য অপঠিত। আন বিষ, মার ছুরি, ঢাল মদ— এমনতর একটা প্রকাণ্ড কাণ্ড না হইলে বাঙালিদের হৃদয়ে তাহার একটা ফলই হয় না। এক প্রকার প্রশান্ত বিষাদ, প্রশান্ত ভাবনা আছে, যাহার অত ফেনা নাই, অত কোলাহল নাই অথচ উহা অপেক্ষা ঢের গভীর তাহা বাংলা কবিতায় প্রকাশ হয় না। উন্মত্ত আস্ফালন, অসম্বদ্ধ প্রলাপ, "আর বাঁচি না, আর সহে না, আর পারি না" ভাবের ছট্‌ফটানি, ইহাই তো বাংলা কবিতার প্রাণ। এমন সফরী অপেক্ষা রোহিত মৎস্যের মূল্য অধিক। বাঙালির কল্পনা চোখে দেখিতে পায় না, বাঙালির কল্পনা বিষম স্থূল। তথাপি বাঙালি কবি বলিয়া বড়ো গর্ব করে।

আর-একটি কথা বলিয়া শেষ করি। যেখানে নানাপ্রকার কাজকর্ম হইতে থাকে, সেইখানেই মানুষের সকল প্রকার মনোবৃত্তি বিশেষরূপে বিকশিত হইতে থাকে। সেইখানে রাগ, দ্বেষ, হিংসা, আশা, উদ্যম, আবেগ, আগ্রহ প্রভৃতি মানুষের মনোবৃত্তিগুলি ফুটিতে থাকে। সেখানে মানুষের অত্যাকাঙক্ষা উত্তেজিত হয়, (বাংলা ভাষায় ambition-এর একটা ভালো ও চলিত কথাই নাই) ও অবস্থার চক্রে পড়িয়া তাহার সমস্ত আশা নির্মূল হয়। সেখানে বিভিন্ন দিক হইতে বিভিন্ন স্রোত একত্র হইয়া মিশে, তুমুল সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, আশা নিরাশা, আগ্রহ, উদ্যম, স্রোতের উপরিভাগে ফেনাইয়া উঠে। এই অনবরত সমুদ্রমন্থনে মহা মহা ব্যক্তিদের উৎপত্তি হয়। আর আমাদের এই স্তব্ধ অন্ধকার ডোবার মধ্যে স্রোত নাই, তরঙ্গ নাই, জল পচিয়া পচিয়া উঠিতেছে, উপরে পানা পড়িয়াছে, গুপ্ত নিন্দা ও কানাকানির একটা বাষ্প উঠিতেছে। স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে ভালোবাসার একটা স্বাধীন আদানপ্রদান নাই, ঢাকাঢাকি, লুকোচুরি, কানাকানির মধ্যে ঢাকা পড়িয়া সূর্যের কিরণ ও বায়ুর অভাবে ভালোবাসা নির্মল থাকিতে পারে না, দূষিত হইয়া উঠে। আমাদের ভালোবাসা কখনো সদর দরজা দিয়া ঘরে ঢোকে না; খিড়কির সংকীর্ণ ও নত দরজা দিয়া আনাগোনা করিয়া করিয়া তাহার পিঠ কুঁজা হইয়া গিয়াছে, সে আর সোজা হইয়া চলিতে পারে না, কাহারো মুখের পানে স্পষ্ট অসংকোচে চাহিতে পারে না, নিজের পায়ের শব্দ শুনিলে চমকিয়া উঠে। এমনতর সংকুচিত কুব্জ ভালোবাসার হৃদয় কখনো তেমন প্রশস্ত হইতে পারে না। মনে করো, "পিরীতি" কথার অর্থ বস্তুত ভালো, কিন্তু বাঙালিদের হাতে পড়িয়া দুই দিনে এমন মাটি হইয়া গিয়াছে যে, আজ শিক্ষিত ব্যক্তিরা ও কথা মুখে আনিতে লজ্জা বোধ করেন। বাংলা প্রচলিত প্রণয়ের গানের মধ্যে এমন গান খুব অল্পই পাইবে, যাহাতে কলঙ্ক নাই, লোক-

লাজ নাই ও নব যৌবন নাই, যাহাতে প্রেম আছে, কেবলমাত্র প্রেম আছে, প্রেম ব্যতীত আর কিছুই নাই। আমাদের এ পোড়া দেশে কাজকর্ম নাই, অদৃষ্টের সহিত সংগ্রাম নাই, আলস্য তাহার স্থূল শরীর লইয়া স্থূলতর উপধানে হেলিয়া হাই তুলিতেছে, ইন্দ্রিয়পরতা ও বিলাস, ফুল মোজা, কালাপেড়ে ধুতি, ফিন্‌ফিনে জামা পরিয়া, বুকে চাদর বাঁধিয়া, পান খাইয়া ঠোঁট ও রাত্রি-জাগরণে চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া গুড়গুড়ি টানিতেছে, এই তো চারি দিকের অবস্থা! এমন দেশের কবিতায় চরিত্র-বৈচিত্র্যই বা কোথায় থাকিবে, মহান চরিত্র-চিত্রই বা কোথায় থাকিবে, আর বিবিধ মনোবৃত্তির খেলাই বা কীরূপে বর্ণিত হইবে? সম্প্রতি বাহির হইতে একটা নূতন স্রোত আসিয়া এই স্থির জলের মধ্যে একটা আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছে। ইহা হইতে শুভ ফল প্রত্যাশা করিতেছি, ইতস্তত তাহার চিহ্নও দেখা দিতেছে।

ভারতী
আষাঢ় ১২৮৭

'দেশজ প্রাচীন কবি ও আধুনিক কবি'

(প্রত্যুত্তর)

"দেশজ প্রাচীন কবি ও আধুনিক কবি" নামক সুরচিত প্রস্তাবে সুনিপুণ লেখক যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে আংশিক সত্য আছে— কিন্তু কথা এই, সত্যকে আংশিক ভাবে দেখিলে, অনেক সময়ে তাহা মিথ্যার রূপান্তর ধারণ করে। একপাশ হইতে একটা জিনিসকে দেখিয়া যাহা সহসা মনে হয়, তাহা একপেশে সত্য, তাহা বাস্তবিক সত্য না হইতেও পারে। আবার অপর পক্ষেও একটা বলিবার কথা আছে। সত্যকে সর্বতোভাবে দেখিতে গেলে প্রথমে তাহাকে আংশিক ভাবে দেখিতে হইবে, তাহা ব্যতীত আমাদের আর গতি নাই। ইহা আমাদের অসম্পূর্ণতার ফল। আমরা কিছু একেবারেই একটা চারি-কোনা দ্রব্যের সবটা দেখিতে পাই না— ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখিতে হয়। এই নিমিত্ত উচিত এই যে, যে যে-দিকটা দেখিয়াছে সে সেই দিকটাই সম্পূর্ণরূপে বর্ণনা করুক, অবশেষে সকলের কথা গাঁথিয়া একটা সম্পূর্ণ সত্য পাওয়া যাইবে। আমাদের এক-চোখো মন লইয়া সম্পূর্ণ সত্য জানিবার আর কোনো উপায় নাই। আমরা একদল অন্ধ, আর সত্য একটি হস্তী। স্পর্শ করিয়া করিয়া সকলেই হস্তীর এক-একটি অংশের অধিক জানিতে পারি না; এইজন্যই কিছু দিন ধরিয়া, আমরা হস্তীকে, কেহ বা স্তম্ভ, কেহ বা সর্প, কেহ বা কুলা বলিয়া ঘোরতর বিবাদ করিয়া থাকি, অবশেষে সকলের কথা মিলাইয়া বিবাদ মিটাইয়া লই। আমি যে ভূমিকাচ্ছলে এতটা কথা বলিলাম, তাহার কারণ এই— আমি জানাইতে চাই— একপেশে লেখার উপর আমার কিছুমাত্র বিরাগ নাই। এবং আমার মতে, যাহারা একেবারে সত্যের চারি দিক দেখাইতে চায়, তাহারা কোনো দিকই ভালো করিয়া দেখাইতে পারে না— তাহারা কতকগুলি কথা বলিয়া যায়, কিন্তু একটা ছবি দেখাইতে পারে না। একটা উদাহরণ দিলেই আমার কথা বেশ স্পষ্ট হইবে। একটা ছবি আঁকিতে হইলে, যথার্থত যে দ্রব্য যেরূপ, ঠিক সেরূপ আঁকা উচিত নহে। যখন চিত্রকর নিকটের গাছ বড়ো করিয়া আঁকে ও দূরের গাছ ছোটো করিয়া আঁকে, তখন তাহাতে এমন বুঝায় না যে বাস্তবিকই দূরের গাছগুলি আয়তনে ছোটো। একজন যদি কোনো ছবিতে সব গাছগুলি সম-আয়তনে আঁকে, তবে তাহাতে সত্য বজায় থাকে বটে, কিন্তু সে ছবি আমাদের সত্য বলিয়া মনে হয় না— অর্থাৎ তাহাতে সত্য আমাদের মনে অঙ্কিত হয় না। লেখার বিষয়েও তাহাই বলা যায়। আমি যে ভাবটা নিকটে দেখিতে পাই, সেই ভাবটাই যদি বড়ো করিয়া না আঁকি, ও তাহার বিপরীত দিকের সীমান্ত যদি অনেকটা ক্ষুদ্র, অনেকটা ছায়াময়, অনেকটা অদৃশ্য করিয়া না দিই,

তবে তাহাতে কোনো উদ্দেশ্যই ভালো করিয়া সাধিত হয় না; না সমস্তটার ভালো ছবি পাওয়া যায়, না এক অংশের ভালো ছবি পাওয়া যায়। এইজন্যই লেখক-চিত্রকরদিগকে পরামর্শ দেওয়া যায়, যে যে-ভাবটাকে কাছে দেখিতেছ, তাহাই বড়ো করিয়া আঁকো; ভাবিয়া চিন্তিয়া, বিচার করিয়া, সত্যের সহিত পরামর্শ করিয়া— ন্যায়কে বজায় রাখিবার জন্য তাহাকে খাটো করিবার কোনো আবশ্যক নাই।

“দেশজ প্রাচীন কবি ও আধুনিক কবি” নামক প্রবন্ধের লেখক এক দিক হইতে ছবি আঁকিয়া তাঁহার নিকটের দিকটাকেই বড়ো করিয়া দেখাইয়াছেন;— আবার বিপরীত দিকটাও দেখানো আবশ্যক।

কবিতায় কৃত্রিমতা দোষার্হ, এ বিষয়ে কাহারো দ্বিমত থাকিতে পারে না। কিন্তু যখন লেখক এই সাধারণ মত ব্যক্ত না করিয়া কতকগুলি বিশেষ মতের অবতারণা করিয়াছেন, তখনই তাঁহার সহিত আমাদের মতান্তর উপস্থিত হয়। যখন তিনি বলেন, দেশকালপাত্র-বহির্ভূত হইলে কবিতা কৃত্রিম হয় ও আধুনিক বঙ্গীয় কবিতা দেশকালপাত্র-বহির্ভূত হইতেছে, সুতরাং কৃত্রিম হইতেছে, তখনই তাঁহার সহিত আমরা সায় দিতে পারি না।

“দেশকালপাত্র” কথাটাই একটা প্রকাণ্ড ভাঙা কুলা— উহার উপর দিয়া অনেক ছাই ফেলা গিয়াছে। কোনো বিষয়ে কোনো পরিবর্তন দেখিয়া ব্যক্তি বিশেষের তাহা খারাপ লাগিলেই তৎক্ষণাৎ তিনি দেশকালপাত্রের দোহাই দিয়া তাহার নিন্দা করিয়া থাকেন। যখন কোনো যুক্তিই নাই, তখনো দেশকালপাত্র মাটি কামড়াইয়া আছে।

যাঁহারা দেশকালপাত্রের দোহাই দিয়া কোনো পরিবর্তনের সম্বন্ধে আপত্তি করিয়া থাকেন, তাঁহারাই হয়তো নিজের যুক্তিতে নিজে মারা পড়েন। দেশকালপাত্রের কিছু হাত-পা নাই— তাহাকে ধরিবার ছুঁইবার কোনো উপায় নাই। টলেমি দেশকালপাত্রের নাম করিয়া ঋতু পরিবর্তনের জন্য পৃথিবীকে অনায়াসেই ভর্ৎসনা করিতে পারেন, কিন্তু গ্যালিলিও বলিবেন যে আমরা এত ক্ষুদ্র ও পৃথিবী এত বৃহৎ, যে, পৃথিবী যে চলিতেছে, পৃথিবী যে একস্থানে দাঁড়াইয়া নাই ইহা আমরা জানিতেই পারি না; বাস্তবিকই যদি পৃথিবী না চলিত, তবে পৃথিবীতে ঋতু পরিবর্তন ঘটিবেই বা কেন? তেমনি সমাজ-সংস্কার-বিরোধীরা কোনো একটি পরিবর্তন দেখিয়া যখন অন্য কোনো যুক্তির অভাবে কেবলমাত্র দেশকালপাত্রের উল্লেখ করিয়া আর্তনাদ করিতে থাকেন, তখন তাঁহাদের বিরোধীপক্ষীয়েরা অনায়াসেই বলিতে পারেন যে, দেশকালপাত্রের যে পরিবর্তন হয় নাই, তাহা তোমাকে কে বলিল? তাহাই যদি না হইবে, তবে কি এ পরিবর্তন মূলেই ঘটিতে পারিত?

লেখক বলিতেছেন— আমাদের আধুনিক কবিরা দেশকালপাত্রের ব্যভিচার করিয়া কবিতা লেখেন। কী তাহার প্রমাণ? না আমাদের প্রাচীন কবিরা যেভাবে কবিতা লিখিতেন, এখনকার কবিরা সেভাবে কবিতা লেখেন না, কথাটা যদি সত্য হয় তবে তাহা হইতে কি ইহাই প্রমাণ হইতেছে না যে, বাস্তবিকই দেশকালপাত্রের পরিবর্তন হইয়াছে; নহিলে, কখনোই লেখার এরূপ পরিবর্তন ঘটিতেই পারিত না। অতএব লেখক যদি বলেন, যে, প্রাচীন কবিরা যেরূপ লিখিতেন, আমাদেরও সেইরূপ লেখা উচিত— তাহা হইলে আর-এক কথায় এই বলা হয় যে, দেশকালপাত্রের ব্যভিচার করিয়াই কবিতা লেখা উচিত।

ইংরাজি পড়িয়াই হউক, আর যেমন করিয়াই হউক, আমাদের মনের যে পরিবর্তন হইয়াছে সে নিশ্চয়ই। একবার লেখক বিবেচনা করিয়া দেখুন দেখি— তিনি যে প্রবন্ধটি লিখিয়াছেন, তাহার ভাষা-বিন্যাস, তাহার ভাব-ভঙ্গি, তাহার রচনা প্রণালী, পঞ্চাশ বৎসর পূর্বেকার বাংলা হইতে কত তফাত। তাঁহার প্রবন্ধটির অস্থিমজ্জায় ইংরাজি শিক্ষার ফল প্রকাশ পাইতেছে কি না, একবার মনোযোগ দিয়া দেখুন দেখি! অতএব, এই উপলক্ষে আমি কি বলিতে পারি যে, লেখক কষ্ট করিয়া মেহন্নত করিয়া একটি ইংরাজি আদর্শ অবিরাম চক্ষের সম্মুখে খাড়া রাখিয়া উল্লিখিত

প্রবন্ধটি লিখিয়াছেন— তাহা তাঁহার হৃদয়ের সহজ বিকাশ, তাঁহার ভাষার সহজ অভিব্যক্তি নহে?

"আমার হৃদয় আমারি হৃদয়,
বেচি নি তো তাহা কাহারো কাছে!
ভাঙাচোরা হোক, যা হোক, তা হোক,
আমার হৃদয় আমারি আছে!
চাহি নে কাহারো মমতার হাসি,
ভ্রূকুটির কারো ধারি নে ধার,
মায়াহাসিময় মিছে মমতায়
ছলনে কাহারো ভুলি নে আর!"
ইত্যাদি।

উপরি-উক্ত কবিতার ভাব আমাদের প্রাচীন বাংলা কবিতায় কখনো দেখা যায় না। এবং ওই শ্রেণীর কবিতা ইংরাজিতে দেখা যায়। শুদ্ধ এই কারণেই কি আমি বলিতে পারি যে, কবি হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করিয়া উক্ত কবিতা লেখেন নাই, ইংরাজরা ওই প্রকারের কবিতা লেখেন বলিয়া তিনিও কোমর বাঁধিয়া লিখিয়াছেন? আমি বলিব যে—"না, তিনি অনুভব করিয়াই লিখিয়াছেন।" তাহার পরে এই প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, প্রাচীন কবিরাই বা কেন এরূপ ভাব অনুভব করিতে পারিতেন না, এখনকার কবিরাই বা কেন করেন। সে একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রশ্ন, এবং ইতিহাস দেখিয়া তাহার বিচার হইতে পারে। ইহা যদি সিদ্ধান্ত হইল যে, প্রাচীন কবিরা অনেক বিষয়ে যাহা অনুভব করিতেন, এখনকার কবিরা তাহা করেন না (কারণ, করিলে নিশ্চয়ই তাহা লেখায় প্রকাশ পাইত,) এবং এখনকার কবিরা অনেক বিষয়ে যাহা অনুভব করেন, প্রাচীন কবিরা তাহা করিতেন না; তাহা হইলে কেমন করিয়া কবিদিগকে পরামর্শ দিব যে, যাহা তোমরা অনুভব কর না, তাহাই তোমাদিগকে লিখিতেই হইবে! বাস্তবিকই যখন ইংরাজি শিক্ষার প্রভাবে বাংলা দেশের বদ্ধ, স্থির, নিস্তরঙ্গ সমাজের মধ্যে সহসা এক তুমুল পরিবর্তনের স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে, সমাজের কোনো পাড় ভাঙিতেছে, কোনো পাড় গড়িতেছে, সমাজের কত শত বদ্ধমূল বিশ্বাসের গোড়া হইতে মাটি খসিয়া যাইতেছে, কত শত নূতন বিশ্বাস চারি দিকে মূল প্রসারিত করিতেছে, যখন আমাদের বাহিরে ওলট্‌পালট্‌, যখন আমাদের অন্তরে ওলট্‌পালট্‌, তখনো যে আমরা দেশকালপাত্র অতিক্রম করিয়া প্রাচীন কবিদের কবিতার আঁচল ধরিয়া থাকিব, আমাদের কবিতার মধ্যে এই দুর্দান্ত পরিবর্তনের কোনো প্রভাব লক্ষিত হইবে না— ইহা যে নিতান্তই অস্বাভাবিক! লেখক যে একটি কল্পনার জেলখানা নির্মাণ করিবার প্রস্তাব করিতে চাহেন, দিশি ইঁট দিয়া তাহার প্রাচীর নির্মিত হইবে বলিয়াই যে কবিরা তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে রাজি হইবেন, এমন তো বোধ হয় না।

আধুনিক কবিরা তাঁহাদের কবিতায় সমাজ-বিরুদ্ধ ভাবের অবতারণা করেন বলিয়া লেখক একস্থলে দুঃখ করিয়াছেন। তিনি বলেন "সমাজ-উচ্ছেদকারী, শাসন-বিরহিত আড়ম্বরময় ভালোবাসাবাসি কি আমাদের এই নিরীহ দেশ-প্রসূত ভাব? একটি অবিকৃত বঙ্গমহিলার হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করো, দেখিতে পাইবে যে, সে হৃদয় ভালোবাসায় পরিপ্লুত, সে হৃদয় ভাদ্রমাসের পদ্মানদীর মতো প্রেমে ভরপুর, প্রেমে উন্মত্ত, প্রেমে উচ্ছ্বসিত, কিন্তু প্রকৃত পদ্মার মতো সে প্রেমে কোনো কূলই সহসা ভাঙিয়া পড়ে না।... কিন্তু এই বঙ্গীয়-রমণী-হৃদয় আধুনিক লেখকদের হাতে কতদূর পর্যন্ত না কলঙ্কিত হইয়াছে!" সে কী কথা! আমি তো বলি, বঙ্গীয়-রমণী-হৃদয়-চিত্রের কলঙ্ক আধুনিক কবিদের দ্বারা অপসারিত হইয়াছে। আমাদের বৈষ্ণব কবিরা যে প্রেমের প্রবাহ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে কোন্ কূল অবশিষ্ট ছিল? "সমাজ-উচ্ছেদকারী শাসন-বিরহিত" প্রেম আর কাহাকে বলে? বিদ্যা এবং সুন্দরের যে প্রেম তাহাতে কলঙ্কের বাকি কী আছে! সচরাচর প্রচলিত আমাদের দেশীয় প্রেমের গানে "অবিকৃত বঙ্গ মহিলার" মনোবিকার কীরূপ মসীবর্ণে চিত্রিত হইয়াছে? এখনকার কবিতায় ও উপন্যাসে যদিও বা সমাজ-বিরুদ্ধ ভাব দেখিতে পাই

কিন্তু রুচি-বিরুদ্ধ বীভৎসভাব কয়টা দেখি? লেখক কি বলিবেন যে, প্রেমের সেই কানাকানি, ঢাকাঢাকি, লুকাচুরি, সেই শাশুড়ি-ননদী-ভীতিময় পিরীতি, সেই মলয়, কোকিল, ভ্রমরের বিভীষিকাপূর্ণ বিরহ, সেই সুমেরু-মেদিনীসংকুল ভৌগোলিক শরীর বর্ণনা, তাহাই আমাদের দেশজ সহজ হৃদয়ের ভাব, অতএব তাহাই কবিতায় প্রবর্তিত হউক— আর আজকালকার এই প্রকাশ্য, মুক্ত, নির্ভীক, অলংকারবাহুল্য-বিরহিত কালাপাহাড়ী ভাব, ইহা বিদেশীয়, ইহা আমাদের কবিতা হইতে দূর হউক! সমাজের যথার্থ হানি কিসে হয়; গোপনে গোপনে সমাজের শিরায় শিরায় বিষ সঞ্চারিত করিয়া দিয়া, না প্রকাশ্যভাবে সমাজের সহিত যুদ্ধ করিয়া?

প্রকৃত কথা এই যে, সমাজকে সমাজ বলিয়াই খাতির করা, এবং দেশকালপাত্রের অন্ধ অনুসরণ করিয়া চলা কবিরা পারিয়া উঠেন না। প্রবহমান সমাজের উপর যে-সকল ফেনা, যে-সকল তৃণখণ্ড ভাসে তাহা তো আজ আছে কাল নাই, কবিরা সেই ভাসমান খড়-কুটায় বাঁধিয়া তাঁহাদের কবিতাকে সমাজের স্রোতে ভাসান দিতে চান না। সেই স্রোতের বাহিরেই তাঁহারা ধ্রুব আশ্রয়ভূমি দেখিতে পান। সামাজিক নীতি ও সামাজিক নিয়ম প্রভৃতিরা সমাজের কাছে ঠিকা কাজে নিযুক্ত আছে— যতদিন তাহাদের আবশ্যক, ততদিন তাহারা মাহিয়ানা পায়, আবশ্যক ফুরাইলেই তাহাদের ছাড়াইয়া দেওয়া হয়— সমাজের সকল অবস্থায় তাহারা কাজ করিতে পারে না। সমাজের এই ঠিকা চাকরদের চাকরি করা কবিদের পোষায় না। এক কথায় বলিতে গেলে কবিদিগকে অনেক সময়ে অসামাজিক হইতেই হইবে। কারণ, সমাজ এখনো সম্পূর্ণ হয় নাই, সর্বাঙ্গসুন্দর হয় নাই— সমাজ যাহাকে ভালো বলে, তাহা মন্দের ভালো, তাহা বাস্তবিক ভালো নহে— আবার সমাজ স্বয়ং মন্দ বলিয়া অনেক ভালোও সমাজের পক্ষে মন্দ হইয়াছে। কবিরা যথার্থ ভালোকে ভালো বলেন, ও যথার্থ মন্দকে মন্দ বলিতে চাহেন, তাহাতে ফল হয় এই যে— যাহাতে মন্দকে আমাদের চাকরি হইতে ছাড়াইয়া দিতে পারি, অর্থাৎ মন্দ আমাদের কাজে না লাগিতে পারে ক্রমে এমন অবস্থা হয়, আর ভালোর উপযোগী হইতে পারি এইরূপ চেষ্টা করিতে পারি। নহিলে, ক্ষণিক ভালোকে ভালো বলিয়া জানিলে, ও ক্ষণিক মন্দকে মন্দ বলিয়া জানিলে তাহারাই চিরস্থায়ী ভালোমন্দরূপে পরিণত হয়— এবং ভালোই হউক, মন্দই হউক, পরিবর্তনের নাম মাত্র শুনিলেই আমরা ডরাইয়া উঠি। সমাজকে দাসভাবে অনুসরণ করিয়া না চলিলে কবিদের এই একটি মহৎ উপকার হয়— যখন সমাজের উপর দিয়া সহস্র বৎসরের পরিবর্তন চলিয়া গিয়াছে, যখন এক সমাজ ভাঙিয়া আর-এক সমাজ গঠিত হইয়াছে, যখন চারি দিকে সকলই ভাঙিতেছে গড়িতেছে— তখনও তাঁহাদের কবিতা দীপস্তম্ভের ন্যায় সমুদ্রের মধ্যে অটল ভাবে দাঁড়াইয়া থাকে। নতুবা সমাজের প্রত্যেক তরঙ্গের সহিত উঠিয়া পড়িয়া তাহারা কোথায় মিলাইয়া যায়।

ভারতী
ভাদ্র ১২৮৯

কাব্য : স্পষ্ট এবং অস্পষ্ট

বুদ্ধিগম্য বিষয় বুঝিতে না পারিলে লোকে লজ্জিত হয়। হয় বুঝিয়াছি বলিয়া ভান করে, না-হয় বুঝিবার জন্য প্রাণপণ প্রয়াস পায় কিন্তু ভাবগম্য সাহিত্য বুঝিতে না পারিলে অধিকাংশ লোক সাহিত্যকেই দোষী করে। কবিতা বুঝিতে না পারিলে কবির প্রতি লোকের অশ্রদ্ধা জন্মে, তাহাতে আত্মাভিমান কিছুমাত্র ক্ষুন্ন হয় না। ইহা অধিকাংশ লোকে মনে করে না যে, যেমন গভীর তত্ত্ব আছে তেমনি গভীর ভাবও আছে। সকলে সকল তত্ত্ব বুঝিতে পারে না। সকলে সকল

ভাবও বুঝিতে পারে না। ইহাতে প্রমাণ হয়, লোকের যেমন বুদ্ধির তারতম্য আছে তেমনি ভাবুকতারও তারতম্য আছে।

মুশকিল এই যে, তত্ত্ব অনেক করিয়া বুঝাইলে কোনো ক্ষতি হয় না, কিন্তু সাহিত্যে যতটুকু নিতান্ত আবশ্যক তাহার বেশি বলিবার জো নাই। তত্ত্ব আপনাকে বুঝাইবার চেষ্টা করে, নহিলে সে বিফল; সাহিত্যকে বুঝিয়া লইতে হইবে, নিজের টীকা নিজে করিতে গেলে সে ব্যর্থ। তুমি যদি বুঝিতে না পার তো তুমি চলিয়া যাও, তোমার পরবর্তী পথিক আসিয়া হয়তো বুঝিতে পারিবে; দৈবাৎ যদি সমজদারের চক্ষে না পড়িল, তবে অজ্ঞাতসারে ফুলের মতো ফুটিয়া হয়তো ঝরিয়া যাইবে; কিন্তু তাই বলিয়া বড়ো অক্ষরের বিজ্ঞাপনের দ্বারা লোককে আহ্বান করিবে না এবং গায়ে পড়িয়া ভাষ্যদ্বারা আপনার ব্যাখ্যা করিবে না।

একটা হাসির কথা বলিলাম, তুমি যদি না হাস তবে তৎক্ষণাৎ হার মানিতে হয়, দীর্ঘ ব্যাখ্যা করিয়া হাস্য প্রমাণ করিতে পারি না। করুণ উক্তি শুনিয়া যদি না কাঁদ তবে গলা টিপিয়া ধরিয়া কাঁদাইতে হয়, আর কোনো উপায় নাই। কপালকুণ্ডলার শেষ পর্যন্ত শুনিয়া তবু যদি ছেলেমানুষের মতো জিজ্ঞাসা কর 'তার পরে?' তবে দামোদরবাবুর নিকটে তোমাকে জিম্মা করিয়া দিয়া হাল ছাড়িয়া দিতে হয়। সাহিত্য এইরূপ নিতান্ত নাচার। তাহার নিজের মধ্যে নিজের আনন্দ যদি না থাকিত, যদি কেবলই তাহাকে পথিকের মুখ চাহিয়া থাকিতে হইত তবে অধিকাংশ স্থলে সে মারা পড়িত।

জ্ঞানদাস গাহিতেছেন : হাসি-মিশা বাঁশি বায়। হাসির সহিত মিশিয়া বাঁশি বাজিতেছে। ইহার অর্থ করা যায় না বলিয়াই ইহার মধ্যে গভীর সৌন্দর্য প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে। বাঁশির স্বরের সহিত হাসি মিশিতে পারে এমন যুক্তিহীন কথা কে বলিতে পারে? বাঁশির স্বরের মধ্যে হাসিটুকুর অপূর্ব আস্বাদ যে পাইয়াছে সেই পারে। ফুলের মধ্যে মধুর সন্ধান মধুকরই পাইয়াছে; কিন্তু বাছুর আসিয়া তাহার দীর্ঘ জিহ্বা বিস্তার করিয়া সমগ্র ফুলটা, তাহার পাপড়ি, তাহার বৃন্ত, তাহার আশপাশের গোটা-পাঁচ-ছয়-পাতা-সুদ্ধ মুখের মধ্যে নাড়িয়া-চাড়িয়া চিবাইয়া গলাধঃকরণ করে এবং সানন্দমনে হাম্বারব করিতে থাকে— তখন তাহাকে তর্ক করিয়া মধুর অস্তিত্ব প্রমাণ করিয়া দেয় এমন কে আছে?

কাব্যে অনেক সময়ে দেখা যায় ভাষা ভাবকে ব্যক্ত করিতে পারে না, কেবল লক্ষ করিয়া নির্দেশ করিয়া দিবার চেষ্টা করে। সে স্থলে সেই অনতিব্যক্ত ভাষাই একমাত্র ভাষা। এইপ্রকার ভাষাকে কেহ বলেন 'ধুঁয়া, কেহ বলেন 'ছায়া', কেহ বলেন 'ভাঙা ভাঙা' এবং কিছুদিন হইল নবজীবনের শ্রদ্ধাস্পদ সম্পাদকমহাশয় কিঞ্চিৎ হাস্যরসাবতারণার চেষ্টা করিতে গিয়া তাহাকে 'কাব্যি' নাম দিয়াছেন। ইহাতে কবি অথবা নবজীবনের সম্পাদক কাহাকেও দোষ দেওয়া যায় না। উভয়েরই অদৃষ্টের দোষ বলিতে হইবে।

ভবভূতি লিখিয়াছেন : স তস্য কিমপি দ্রব্যং যো হি যস্য প্রিয়োজনঃ! সে তাহার কী-জানি-কী যে যাহার প্রিয়জন! যদি কেবলমাত্র ভাষার দিক দিয়া দেখ, তবে ইহা ধুঁয়া নয় তো কী, ছায়া নয় তো কী! ইহা কেবল অস্পষ্টতা, কুয়াশা। ইহাতে কিছুই বলা হয় নাই। কিন্তু ভাবের দিক দিয়া দেখিবার ক্ষমতা যদি থাকে তো দেখিবে ভাবের অস্পষ্টতা নাই। তুমি যদি বলিতে 'প্রিয়জন অত্যন্ত আনন্দের সামগ্রী' তবে ভাষা স্পষ্ট হইত সন্দেহ নাই, তবে ইহাকে ছায়া অথবা ধুঁয়া অথবা কাব্যি বলিবার সম্ভাবনা থাকিত না, কিন্তু ভাব এত স্পষ্ট হইত না। ভাবের আবেগে ভাষায় একপ্রকার বিহ্বলতা জন্মে। ইহা সহজ সত্য, কাব্যে তাহার ব্যতিক্রম হইলে কাব্যের ব্যাঘাত হয়।

সীতার স্পর্শসুখে-আকুল রাম বলিয়াছেন : সুখমিতি বা দুঃখমিতি বা। কী জানি ইহা সুখ না দুঃখ! এমন ছায়ার মতো, ধুঁয়ার মতো কথা কহিবার তাৎপর্য কী? যাহা হয় একটা স্পষ্ট করিয়া বলিলেই হইত। স্পষ্ট কথা অধিকাংশ স্থলে অত্যাবশ্যক ইহা নবজীবন-সম্পাদকের সহিত এক বাক্যে স্বীকার করিতে হয়, তথাপি এ স্থলে আমরা স্পষ্ট কথা শুনিতে চাহি না। যদি কেবল

রথচক্র আঁকিতে চাও তবে তাহার প্রত্যেক অর স্পষ্ট আঁকিয়া দিতে হইবে, কিন্তু যখন তাহার ঘূর্ণগতি আঁকিতে হইবে, তাহার বেগ আঁকিতে হইবে, তখন অরগুলিকে ধুঁয়ার মতো করিয়া দিতে হইবে— ইহার অন্য উপায় নাই। সে সময়ে যদি হঠাৎ আবদার করিয়া বস আমি ধুঁয়া দেখিতে চাহি না, আমি অরগুলিকে স্পষ্ট দেখিতে চাই, তবে চিত্রকরকে হার মানিতে হয়। ভবভূতি ভাবের সঙ্গে সঙ্গে ভাবের আবেগ প্রকাশ করিতে গিয়াই বলিয়াছেন 'সুখমিতি বা দুঃখমিতি বা'। নহিলে স্পষ্ট কথায় সুখকে সুখ বলাই ভালো তাহার আর সন্দহ নাই।

বলরামদাস লিখিয়াছেন—

আধ চরণে আধ চলনি,
আধ মধুর হাস।

ইহাতে যে কেবল ভাষার অস্পষ্টতা তাহা নহে, অর্থের দোষ। 'আধ চরণ' অর্থ কী? কেবল পায়ের আধখানা অংশ? বাকি আধখানা না চলিলে সে আধখানা চলে কী উপায়ে! একে তো আধখানি চলনি, আধখানি হাসি, তাহাতে আবার আধখানা চরণ। এগুলো পুরা করিয়া না দিলে এ কবিতা হয়তো অনেকের কাছে অসম্পূর্ণ ঠেকিতে পারে। কিন্তু যে যা বলে বলুক, উপরি-উদ্‌ধৃত দুটি পদে পরিবর্তন চলে না। 'আধ চরণে আধ চলনি' বলিলে ভাবুকের মনে যে একপ্রকার চলন সুস্পষ্ট হইয়া উঠে, ভাষা ইহা অপেক্ষা স্পষ্ট করিলে সেরূপ সম্ভবে না।

অত্যন্ত স্পষ্ট কবিতা নহিলে যাঁহারা বুঝিতে পারেন না তাঁহারা স্পষ্ট কবিতার একটি নমুনা দিয়াছেন। তাঁহাদের ভূমিকা-সমেত উদ্‌ধৃত করি। 'বাংলার মঙ্গল-কাব্যগুলিও জ্বলন্ত অক্ষরে লেখা। কবিকঙ্কণের দারিদ্র্য-দুঃখ-বর্ণনা— যে কখনো দুঃখের মুখ দেখে নাই তাহাকেও দীনহীনের কষ্টের কথা বুঝাইয়া দেয়।

দুঃখ করো অবধান, দুঃখ করো অবধান
আমানি খাবার গর্ত দেখো বিদ্যমান।'

এই দুইটি পদের ভাষ্য করিয়া লেখক বলিয়াছেন, 'ইহাই সার্থক কবিত্ব; সার্থক কল্পনা; সার্থক প্রতিভা।' পড়িয়া সহসা মনে হয় এ কথাগুলি হয় গোঁড়ামি, না-হয় তর্কের মুখে অত্যুক্তি। আমানি খাবার গর্ত দেখাইয়া দারিদ্র্য সপ্রমাণ করার মধ্যে কতকটা নাট্যনৈপুণ্য থাকিতেও পারে, কিন্তু ইহার মধ্যে কাব্যরস কোথায়? দুটো ছত্র, কবিত্বে সিক্ত হইয়া উঠে নাই; ইহার মধ্যে অনেকখানি আমানি আছে, কিন্তু কবির অশ্রুজল নাই। ইহাই যদি সার্থক কবিত্ব হয় তবে 'তুমি খাও ভাঁড়ে জল আমি খাই ঘাটে', সে তো আরও কবিত্ব। ইহার ব্যাখ্যা এবং তার ভাষ্য করিতে গেলে হয়তো ভাষ্যকারের করুণরস উদ্‌বেলিত হইয়া উঠিতেও পারে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও সকলেই স্বীকার করিবেন ইহা কাব্যও নহে, কাব্যিও নহে, যাঁহার নামকরণের ক্ষমতা আছে তিনি ইহার আর-কোনো নাম দিন। যিনি ভঙ্গি করিয়া কথা কহেন তিনি না-হয় ইহাকে কাব্যি বলুন, শুনিয়া দৈবাৎ কাহারও হাসি পাইতেও পারে।

প্রকৃতির নিয়ম-অনুসারে কবিতা কোথাও স্পষ্ট কোথাও অস্পষ্ট, সম্পাদক এবং সমালোচকেরা তাহার বিরুদ্ধে দরখাস্ত এবং আন্দোলন করিলেও তাহার ব্যতিক্রম হইবার জো নাই। চিত্রেও যেমন কাব্যেও তেমনই— দূর অস্পষ্ট, নিকট স্পষ্ট; বেগ অস্পষ্ট, অচলতা স্পষ্ট; মিশ্রণ অস্পষ্ট, স্বাতন্ত্র্য স্পষ্ট। আগাগোড়া সমস্তই স্পষ্ট, সমস্তই পরিষ্কার, সে কেবল ব্যাকরণের নিয়মের মধ্যে থাকিতে পারে; কিন্তু প্রকৃতিতেও নাই, কাব্যেও নাই। অতএব ভাবুকেরা স্পষ্ট এবং অস্পষ্ট লইয়া বিবাদ করেন না, তাঁহারা কাব্যরসের প্রতি মনোযোগ করেন। 'আমানি খাবার গর্ত দেখো বিদ্যমান' ইহা স্পষ্ট বটে, কিন্তু কাব্য নহে। কিন্তু বিদ্যাপতির—

সখি, এ ভরা বাদর, মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর

স্পষ্টও বটে কাব্যও বটে। ইহা কেবল বর্ণনা বা কথার কথা মাত্র নহে, কেবল একটুকু পরিষ্কার

উক্তি নহে, ইহার মধ্য হইতে গোপনে বিরহিণীর নিশ্বাস নিশ্বসিত হইয়া আমাদের হৃদয় স্পর্শ করিতেছে—

শিশুকাল হৈতে বঁধুর সহিতে
পরানে পরানে লেহা

ইহা শুনিবামাত্র হৃদয় বিচলিত হইয়া উঠে, স্পষ্ট কথা বলিয়া যে তাহা নহে, কাব্য বলিয়া। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি ইহাও কি সকলের কাছে স্পষ্ট? এমন কি অনেকে নাই যাঁহারা বলিবেন, 'আচ্ছা বুঝিলাম, ভরা বাদল, ভাদ্র মাস এবং শূন্য গৃহ, কিন্তু ইহাতে কবিতা কোথায়? ইহাতে হইল কী?' ইহাকে আরও স্পষ্ট না করিলে হয়তো অনেক সমালোচকের 'কর্ণে কেবল ঝীম ঝীম রব' করিবে এবং 'শিরায় শিরায় রীণ রীণ' করিতে থাকিবে। ইহাকে ফেনাইয়া ফুলাইয়া তুলিয়া ইহার মধ্যে ধড়ফড় ছটফট বিষ ছুরি এবং দড়ি-কলসি না লাগাইলে অনেকের কাছে হয়তো ইহা যথেষ্ট পরিস্ফুট, যথেষ্ট স্পষ্ট হইবে না; হয়তো ধুঁয়া এবং ছায়া এবং 'কাব্যি' বলিয়া ঠেকিবে। এত নিরতিশয় স্পষ্ট যাঁহাদের আবশ্যক তাঁহাদের পক্ষে কেবল পাঁচালি ব্যবস্থা; যাঁহারা কাব্যের সৌরভ ও মধু-উপভোগে অক্ষম তাঁহারা বায়রনের 'জ্বলন্ত' চুল্লিতে হাঁক-ডাক ঝাল-মসলা ও খরতর ভাষার ঘণ্ট পাকাইয়া খাইবেন।

যাঁহারা মনোবৃত্তির সম্যক্ অনুশীলন করিয়াছেন তাঁহারাই জানেন, যেমন জগৎ আছে তেমনি অতিজগৎ আছে। সেই অতিজগৎ জানা এবং না-জানার মধ্যে, আলোক এবং অন্ধকারের মাঝখানে বিরাজ করিতেছে। মানব এই জগৎ এবং জগদতীত রাজ্যে বাস করে। তাই তাহার সকল কথা জগতের সঙ্গে মেলে না। এইজন্য মানবের মুখ হইতে এমন অনেক কথা বাহির হয় যাহা আলোকে অন্ধকারে মিশ্রিত; যাহা বুঝা যায় না, অথচ বুঝা যায়। যাহাকে ছায়ার মতো অনুভব করি, অথচ প্রত্যক্ষের অপেক্ষা অধিক সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি। সেই সর্বত্রব্যাপী অসীম অতিজগতের রহস্য কাব্যে যখন কোনো কবি প্রকাশ করিতে চেষ্টা করেন তখন তাঁহার ভাষা সহজে রহস্যময় হইয়া উঠে। সে স্থলে কেহ বা কেবলই ধুঁয়া এবং ছায়া দেখিয়া বাড়ি ফিরিয়া যায়, কেহ বা অসীমের সমুদ্রবায়ু সেবন করিয়া অপার আনন্দ লাভ করে।

পুনর্বার বলিতেছি, বুদ্ধিমানের ক্ষুদ্র মস্তিষ্কের ন্যায় প্রকৃতিতে যে সমস্তই স্পষ্ট এবং পরিষ্কার তাহা নহে। সমালোচকেরা যাহাই মনে করুন, প্রকৃতি অতি বৃহৎ, অতি মহৎ, সর্বত্র আমাদের আয়ত্তাধীন নহে। ইহাতে নিকটের অপেক্ষা দূর, প্রত্যক্ষের অপেক্ষা অপ্রত্যক্ষ, প্রামাণ্যের অপেক্ষা অপ্রামাণ্যই অধিক। অতএব যদি কোনো প্রকৃত কবির কাব্যে ছায়া দেখিতে পাওয়া যায় তবে বুদ্ধিমান সমালোচক যেন ইহাই সিদ্ধান্ত করেন যে, তাহা এই অসীম প্রকৃতির সৌন্দর্যময়ী রহস্যচ্ছায়া।

ভারতী ও বালক
চৈত্র ১২৯৩

সাহিত্যের উদ্দেশ্য

বিষয়ী লোকে বিষয় খুঁজিয়া মরে। লেখা দেখিলেই বলে, বিষয়টা কী? কিন্তু লিখিতে হইলে যে বিষয় চাই-ই এমন কোনো কথা নাই। বিষয় থাকে তো থাক্, না থাকে তো নাই থাক্, সাহিত্যের তাহাতে কিছু আসে যায় না। বিষয় বিশুদ্ধ সাহিত্যের প্রাণ নহে। প্রকৃত সাহিত্যের মধ্য হইতে তাহার উদ্দেশ্যটুকু টানিয়া বাহির করা সহজ নহে। তাহার মর্মটুকু সহজে ধরা দেয় না। মানুষের সর্বাঙ্গে প্রাণের বিকাশ— সেই প্রাণটুকু নাশ করিবার জন্য নানা দেশে নানা অস্ত্র আছে, কিন্তু

দেহ হইতে সেই প্রাণটুকু স্বতন্ত্র বাহির করিয়া আয়ত্তের মধ্যে আনিবার জন্য কোনো অস্ত্র বাহির হয় নাই।

আমাদের বঙ্গভাষায় সাহিত্যসমালোচকেরা আজকাল লেখা পাইলেই তাহার উদ্দেশ্য বাহির করিতে চেষ্টা করেন। বোধ করি তাহার প্রধান কারণ এই, একটা উদ্দেশ্য ধরিতে না পারিলে তাঁহাদের লিখিবার তেমন সুবিধা হয় না। যে শিক্ষকের ঝুঁটি ধরিয়া মারা অভ্যাস সহসা ছাত্রের মুণ্ডিত মস্তক তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত শোকের কারণ হয়।

মনে করো তুমি যদি অত্যন্ত বুদ্ধির প্রভাবে বলিয়া বস 'এই তরঙ্গভঙ্গময়, এই চূর্ণ-বিচূর্ণ সূর্যালোকে খচিত, অবিশ্রাম প্রবহমান জাহ্নবীর জলটুকু মারিয়া কেবল ইহার বিষয়টুকু বাহির করিব' এবং এই উদ্দেশে প্রবল অধ্যবসায়-সহকারে ঘড়া ঘড়া জল তুলিয়া চুলির উপরে উত্থাপন কর তবে পরিশ্রমের পুরস্কার-স্বরূপ বিপুল বাষ্প ও প্রচুর পঙ্ক লাভ করিবে— কিন্তু কোথায় তরঙ্গ! কোথায় সূর্যালোক! কোথায় কলধ্বনি! কোথায় জাহ্নবীর প্রবাহ!

উদ্দেশ্য হাতড়াইতে গিয়া কিছু-না-কিছু হাতে উঠেই। যেমন গঙ্গায় তলাইয়া অন্বেষণ করিলে তাহার পঙ্ক হইতে চিংড়িমাছ বাহির হইয়া পড়ে। ধীবরের পক্ষে সে কিছু কম লাভ নহে, কিন্তু আমার বলিবার তাৎপর্য এই যে, চিংড়িমাছ না থাকিলেও গঙ্গার মূলগত কোনো প্রভেদ হয় না। কিন্তু গঙ্গার প্রবাহ নাই, গঙ্গার ছায়ালোকবিচিত্র তরঙ্গমালা নাই, গঙ্গার প্রশান্ত প্রবল উদারতা নাই, এমন যদি হয় তবে গঙ্গাই নাই। কিন্তু প্রবাহ আয়ত্ত করা যায় না, ছিপ ফেলিয়া ছায়ালোক ধরা যায় না, গঙ্গার প্রশান্ত ভাব কেবল অনুভব করা যায়— কিন্তু কোনো উপায়ে ডাঙায় তোলা যায় না। উপরি-উক্ত চিংড়িমাছ গঙ্গার মধ্যে সহজে অনুভব করা যায় না, কিন্তু সহজেই ধরা যায়। অতএব বিষয়ী সমালোচকের পক্ষে মৎস্য-নাম-ধারী উক্ত কীটবিশেষ সকল হিসাবেই সুবিধাজনক।

বিশুদ্ধ সাহিত্যের মধ্যে উদ্দেশ্য বলিয়া যাহা হাতে ঠেকে তাহা আনুষঙ্গিক। এবং তাহাই ক্ষণস্থায়ী। যাহার উদ্দেশ্য আছে তাহার অন্য নাম— কোনো-একটা বিশেষ তত্ত্ব নির্ণয় বা কোনো-একটা বিশেষ ঘটনা বর্ণনা যাহার উদ্দেশ্য তাহার লক্ষণ-অনুসারে তাহাকে দর্শন বিজ্ঞান বা ইতিহাস বা আর-কিছু বলিতে পারো। কিন্তু সাহিত্যের উদ্দেশ্য নাই।

ঐতিহাসিক রচনাকে কখন সাহিত্য বলিব? যখন জানিব যে তাহার ঐতিহাসিক অংশটুকু অসত্য বলিয়া প্রমাণ হইয়া গেলেও তাহা বাঁচিয়া থাকিতে পারে। অর্থাৎ যখন জানিব ইতিহাস উপলক্ষমাত্র, লক্ষ্য নহে। দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক প্রভৃতি অন্য বিভাগ সম্বন্ধেও এই কথা খাটে।

সৃষ্টির উদ্দেশ্য পাওয়া যায় না, নির্মাণের উদ্দেশ্য পাওয়া যায়। ফুল কেন ফোটে তাহা কাহার সাধ্য অনুমান করে, কিন্তু ইটের পাঁজা কেন পোড়ে, সুরকির কল কেন চলে, তাহা সকলেই জানে। সাহিত্য সেইরূপ সৃজনধর্মী; দর্শন বিজ্ঞান প্রভৃতি নির্মাণধর্মী। সৃষ্টির ন্যায়, সাহিত্যই সাহিত্যের উদ্দেশ্য।

যদি কোনো উদ্দেশ্য নাই তবে সাহিত্যে লাভ কী! যাঁহারা সকলের চেয়ে হিসাব ভালো বুঝেন তাঁহারা এইরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবেন। উত্তর দেওয়া সহজ নহে। গোটাকতক সন্দেশ খাইলে যে রসনার তৃপ্তি ও উদরের পূর্তি-সাধন হয় ইহা প্রমাণ করা সহজ, যদি অজ্ঞানবশত কেহ প্রতিবাদ করে তবে তাহার মুখে দুটো সন্দেশ পুরিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার মুখ বন্ধ করা যায়। কিন্তু সমুদ্রতীরে থাকিলে যে এক বিশাল আনন্দ অলক্ষ্যে শরীর-মনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া স্বাস্থ্যবিধান করে তাহা হাতে হাতে প্রমাণ করা যায় না।

সাহিত্যের প্রভাবে আমরা হৃদয়ের দ্বারা হৃদয়ের যোগ অনুভব করি, হৃদয়ের প্রবাহ রক্ষা হয়, হৃদয়ের সহিত হৃদয় খেলাইতে থাকে, হৃদয়ের জীবন ও স্বাস্থ্য-সঞ্চার হয়। যুক্তিশৃঙ্খলের দ্বারা মানবের বুদ্ধি ও জ্ঞানের ঐক্যবন্ধন হয়, কিন্তু হৃদয়ে হৃদয়ে বাঁধিবার তেমন কৃত্রিম উপায় নাই। সাহিত্য স্বত উৎসারিত হইয়া সেই যোগসাধন করে। সাহিত্য অর্থেই একত্র থাকিবার

ভাব— মানবের ‘সহিত’ থাকিবার ভাব— মানবকে স্পর্শ করা, মানবকে অনুভব করা। সাহিত্যের প্রভাবে হৃদয়ে হৃদয়ে শীতাতপ সঞ্চারিত হয়, বায়ু প্রবাহিত হয়, ঋতুচক্র ফিরে, গন্ধ গান ও রূপের হাট বসিয়া যায়। উদ্দেশ্য না থাকিয়া সাহিত্যে এইরূপ সহস্র উদ্দেশ্য সাধিত হয়।

বন্ধুতে বন্ধুতে মিলন হইলে আমরা কত বাজে কথাই বলিয়া থাকি। তাহাতে করিয়া হৃদয়ের কেমন বিকাশ হয়। কত হাস্য, কত আলাপ, কত আনন্দ! পরস্পরের নয়নের হর্ষজ্যোতির সহিত মিশিয়া সূর্যালোক কত মধুর বলিয়া মনে হয়! বিষয়ী লোকের পরামর্শমতো কেবলই যদি কাজের কথা বলি, সকল কথার মধ্যেই যদি কীটের মতো উদ্দেশ্য ও অর্থ লুকাইয়া থাকে, তবে কোথায় হাস্যকৌতুক, কোথায় প্রেম, কোথায় আনন্দ! তবে চারি দিকে দেখিতে পাইব শুষ্ক দেহ, লম্ব মুখ, শীর্ণ গণ্ড, উচ্চ হনু, হাস্যহীন শুষ্ক ওষ্ঠাধর, কোটরপ্রবিষ্ট চক্ষু— মানবের উপছায়াসকল পরস্পরের কথার উপরে পড়িয়া খুদিয়া খুদিয়া খুঁটিয়া খুঁটিয়া অর্থই বাহির করিতেছে, অথবা পরস্পরের পলিতকেশ মুণ্ড লক্ষ্য করিয়া উদ্দেশ্য-কঠিন কথার লোষ্ট্র বর্ষণ করিতেছে।

অনেক সাহিত্য এইরূপ হৃদয়মিলন-উপলক্ষে বাজে কথা এবং মুখোমুখি, চাহাচাহি, কোলাকুলি। সাহিত্য এইরূপ বিকাশ এবং স্ফূর্তি মাত্র। আনন্দই তাহার আদি অন্ত মধ্য। আনন্দই তাহার কারণ, এবং আনন্দই তাহার উদ্দেশ্য। না বলিলে নয় বলিয়াই বলা ও না হইলে নয় বলিয়াই হওয়া।

ভারতী ও বালক
বৈশাখ ১২৯৪

সাহিত্য ও সভ্যতা

বোধ করি সকলেই দেখিয়েছেন, বিলাতি কাগজে আজকাল সাহিত্যরসের বিশেষ অভাব দেখা যায়। আগাগোড়া কেবল রাজনীতি ও সমাজনীতি। মুক্ত বাণিজ্য, জামার দোকান, সুদানের যুদ্ধ, রবিবারে জাদুঘর খোলা থাকা উচিত, ঘুষ দেওয়া সম্বন্ধে নূতন আইন, ডাবলিন দুর্গ ইত্যাদি। ভালো কবিতা বা সাহিত্য সম্বন্ধে দুই-একটা ভালো প্রবন্ধ শুনিতে পাই বিস্তর টাকা দিয়া কিনিতে হয়। তাহাতে সাহিত্যের আদর প্রমাণ হয়, না সাহিত্যের দুর্মূল্যতা প্রমাণ হয় কে জানে! স্পেক্‌টেটর র‍্যাম্‌ব্‌লার প্রভৃতি কাগজের সহিত এখনকার কাগজের তুলনা করিয়া দেখো, তখন কী প্রবল সাহিত্যের নেশাই ছিল! জেফ্রি, ডিকুইন্সি, হ্যাজ্‌লিট, সাদি, লে হান্ট, ল্যাম্বের আমলেও পত্র ও পত্রিকায় সাহিত্যের নির্ঝরিণী কী অবাধে প্রবাহিত হইত! কিন্তু আধুনিক ইংরাজি পত্রে সাহিত্যপ্রবাহ রুদ্ধ দেখিতেছি কেন? মনে হইতেছে আগেকার চেয়ে সাহিত্যের মূল্য বাড়িতেছে, কিন্তু চাষ কমিতেছে! ইহার কারণ কী?

আমার বোধ হয়, ইংলণ্ডে কাজের ভিড় কিছু বেশি বাড়িয়াছে। রাজ্য ও সমাজতন্ত্র উত্তরোত্তর জটিল হইয়া পড়িতেছে। এত বর্তমান অভাব-নিরাকরণ এত উপস্থিত সমস্যার মীমাংসা আবশ্যক হইয়াছে, প্রতিদিনের কথা প্রতিদিন এত জমা হইতেছে যে, যাহা নিত্য, যাহা মানবের চিরদিনের কথা, যে-সকল অনন্ত প্রশ্নের মীমাংসার ভার এক যুগ অন্য যুগের হস্তে সমর্পণ করিয়া চলিয়া যায়, মানবাত্মার যে-সকল গভীর বেদনা এবং গভীর আশার কাহিনী, সে আর উত্থাপিত হইবার অবসর পায় না। চিরনবীন চিরপ্রবীণ প্রকৃতি তাহার নিবিড় রহস্যময় অসীম সৌন্দর্য লইয়া পূর্বের ন্যায় তেমনি ভাবেই চাহিয়া আছে, চারি দিকে সেই শ্যামল তরুপল্লব, কালের চুপিচুপি রহস্যকথার মতো অরণ্যের সেই মর্মরধ্বনি, নদীর সেই চিরপ্রবাহময় অথচ চির-অবসরপূর্ণ কলগীতি; প্রকৃতির অবিরামনিশ্বসিত বিচিত্র বাণী এখনো নিঃশেষিত হয় নাই; কিন্তু যাহার

আপিসের তাড়া পড়িয়াছে, কেরানিগিরির সহস্র খুচরা দায় যাহার শাম্‌লার মধ্যে বাসা বাঁধিয়া কিচিকিচি করিয়া মরিতেছে, সে বলে— 'দূর করো তোমার প্রকৃতির মহত্ত্ব, তোমার সমুদ্র ও আকাশ, তোমার মানবহৃদয়, তোমার মানবহৃদয়ের সহস্রবাহী সুখ দুঃখ ঘৃণা ও প্রীতি, তোমার মহৎ মনুষ্যত্বের আদর্শ ও গভীর রহস্যপিপাসা, এখন হিসাব ছাড়া আর-কোনো কথা হইতে পারে না।' আমার বোধ হয় কল-কারখানার কোলাহলে ইংরেজেরা বিশ্বের অনন্ত সংগীতধ্বনির প্রতি মনোযোগ দিতে পারিতেছে না; উপস্থিত মুহূর্তগুলো পঙ্গপালের মতো ঝাঁকে ঝাঁকে আসিয়া অনন্তকালকে আচ্ছন্ন করিয়াছে।

আমরা আর-একটি প্রবন্ধে[1] লিখিয়াছি— সৃষ্টির সহিত সাহিত্যের তুলনা হয়। এই অসীম সৃষ্টিকার্য অসীম অবসরের মধ্যে নিমগ্ন। চন্দ্রসূর্য গ্রহনক্ষত্র অপার অবসরসমুদ্রের মধ্যে সহস্র কুমুদ কহ্লার পদ্মের মতো ধীরে ধীরে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। কার্যের শেষও নাই, অথচ তাড়াও নাই। বসন্তের একটি শুভ প্রভাতের জন্য শুভ্র চামেলি সৃষ্টির কোন্ অন্তঃপুরে অপেক্ষা করিয়া আছে, বর্ষার মেঘস্নিগ্ধ আর্দ্র সন্ধ্যার জন্য একটি শুভ্র জুঁই সমস্ত বৎসর তাহার পূর্বজন্ম যাপন করিতেছে। সাহিত্যও সেইরূপ অবসরের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে। ইহার জন্য অনেকখানি আকাশ, অনেকখানি সূর্যালোক, অনেকখানি শ্যামল ভূমির আবশ্যক। কার্যালয়ে শান-বাঁধানো মেজে খুঁড়িয়া যেমন মাধবীলতা উঠে না, তেমনি সাহিত্যও উঠে না।

উত্তরোত্তর ব্যাপমান বিস্তৃত রাজ্যভার, জটিল কর্তব্যশৃঙ্খল, অবিশ্রাম দলাদলি ও রাজনৈতিক কূটতর্ক, বাণিজ্যের জুয়াখেলা, জীবিকাসংগ্রাম, রাশীকৃত সম্পদ ও অগাধ দারিদ্র্যের একত্র অবস্থানে সামাজিক সমস্যা— এই-সকল লইয়া ইংরাজ মানবহৃদয় ভারাক্রান্ত। তাহার মধ্যে স্থানও নাই, সময়ও নাই। সাহিত্য সম্বন্ধে যদি কোনো কথা থাকে তো সংক্ষেপে সারো, আরও সংক্ষেপে করো। প্রাচীন সাহিত্য ও বিদেশী সাহিত্যের সার-সংকলন করিয়া পিলের মতো গুলি পাকাইয়া গলার মধ্যে চালান করিয়া দাও। কিন্তু সাহিত্যের সার-সংকলন করা যায় না। ইতিহাস দর্শন বিজ্ঞানের সার-সংকলন করা যাইতে পারে। মালতীলতাকে হামান্‌দিস্তায় ঘুঁটিয়া তাল পাকাইলে সেই তালটাকে মালতীলতার সার-সংকলন বলা যাইতে পারে না। মালতীলতার হিল্লোল, তাহার বাহুর বন্ধন, তাহার প্রত্যেক শাখা-প্রশাখার ভঙ্গিমা, তাহার পূর্ণযৌবনভার, হামান্‌দিস্তার মধ্যে ঘুঁটিয়া তোলা ইংরাজেরও অসাধ্য।

ইহা প্রায় দেখা যায়, অতিরিক্ত কার্যভার যাহার স্কন্ধে সে কিছু নেশার বশ হয়। যো সো করিয়া একটু অবসর পাইলে উৎকট আমোদ নহিলে তাহার তৃপ্তি হয় না। যেমন উৎকট কাজ তেমনি উৎকট অবসর কিন্তু বিশুদ্ধ সাহিত্যের মধ্যে নেশার তীব্রতা নাই। ভালো সন্দেশে যেমন চিনির আতিশয্য থাকে না, তেমনি উন্নত সাহিত্যে প্রচণ্ড বেগ এবং প্রশান্ত মাধুরী থাকে বটে, কিন্তু উগ্র মাদকতা থাকে না। এইজন্য নিরতিশয় ব্যস্ত লোকের কাছে সাহিত্যের আদর নাই। নেশা চাই। ইংলণ্ডে দেখো খবরের নেশা। সে নেশা আমরা কল্পনা করিতে পারি না। খবরের জন্য কাড়াকাড়ি তাড়াতাড়ি, যে খবর দুই ঘণ্টা পরে পাইলে কাহারও কোনো ক্ষতি হয় না সেই খবর দুই ঘণ্টা আগে জোগাইবার জন্য ইংলণ্ড ধনপ্রাণ অকাতরে বিসর্জন দিতেছে। সমস্ত পৃথিবী ঝাঁটাইয়া প্রতিদিনের খবরের টুকরা ইংলণ্ড দ্বারের নিকট স্তূপাকার করিয়া তুলিতেছে। সেই টুকরাগুলো চা দিয়া ভিজাইয়া বিস্কুটের সঙ্গে মিলাইয়া ইংলণ্ডের আবালবৃদ্ধবনিতা প্রতিদিন প্রভাতে এবং প্রদোষে পরমানন্দে পার করিতেছে। দুর্ভাগ্যক্রমে সাহিত্যে কোনো খবর পাওয়া যায় না। কারণ, যে-সকল খবর সকলেই জানে অধিকাংশ সাহিত্য তাহাই লইয়া।

উপস্থিত বিষয় উপস্থিত ঘটনার মধ্যে যেমন নেশা, স্থায়ী বিষয়ের মধ্যে তেমন নেশা নাই। গোলদিঘির ধারে মারামারি বা চক্রবর্তী-পরিবারের গৃহবিচ্ছেদ যত তুমুল বলিয়া বোধ হয়,

---

[1] ১. পূর্ববর্তী প্রবন্ধে

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধও এমন মনে হয় না। অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি মহাশয় যখন কালো আলপাকার চাপকান পরিয়া ছাতা হাতে, ক্যাপ মাথায়, চাঁদার খাতা লইয়া ব্যস্ত হইয়া বেড়ান তখন লোকে মনে করে পৃথিবীর আর-সমস্ত কাজকর্ম বন্ধ হইয়া আছে। যখন কোনো আর্য আর-কোনো আর্যকে অনার্য বলিয়া প্রমাণ করিবার জন্য গলা জাহির করেন ও দল পাকাইয়া তোলেন তখন নস্যরেণু তাম্রকূটধূম এবং আর্য-অভিমানে আচ্ছন্ন হইয়া তিনি এবং তাঁহার দলবল ভুলিয়া যান যে, তাঁহাদের চণ্ডীমণ্ডপের বাহিরেও বৃহৎ বিশ্বসংসার ছিল এবং এখনো আছে। ইংলণ্ডে না জানি আরও কী কাণ্ড! সেখানে বিশ্বব্যাপী কারখানা এবং দেশব্যাপী দলাদলি লইয়া না জানি কী মত্ততা! সেখানে যদি বর্তমানই দানবাকার ধারণ করিয়া নিত্যকে গ্রাস করে তাহাতে আর আশ্চর্য কী!

বর্তমানের সহিত অনুরাগভরে সংলগ্ন হইয়া থাকা যে মানুষের স্বভাব এবং কর্তব্য তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারে না। তাই বলিয়া বর্তমানের আতিশয্যে মানবের সমস্তটা চাপা পড়িয়া যাওয়া কিছু নয়। গাছের কিয়দংশ মাটির নীচে থাকা আবশ্যক বলিয়া যে সমস্ত গাছটাকে মাটির নীচে পুঁতিয়া ফেলিতে হইবে এমন কোনো কথা নাই। তাহার পক্ষে অনেকখানি ফাঁকা অনেকখানি আকাশ আবশ্যক। যে মাটির মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে সেই মাটি খুঁড়িয়াও মানবকে অনেক ঊর্ধ্বে উঠিতে হইবে, তবেই তাহার মনুষ্যত্বসাধন হইবে। কিন্তু ক্রমাগতই যদি সে ধূলি-চাপা পড়ে, আকাশে উঠিবার যদি সে অবসর না পায়, তবে তাহার কী দশা!

যেমন বদ্ধ গৃহে থাকিলে মুক্ত বায়ুর আবশ্যক অধিক, তেমনি সভ্যতার সহস্র বন্ধনের অবস্থাতেই বিশুদ্ধ সাহিত্যের আবশ্যকতা অধিক হয়। সভ্যতার শাসন-নিয়ম, সভ্যতার কৃত্রিম-শৃঙ্খল যতই আঁট হয়— হৃদয়ে হৃদয়ে স্বাধীন মিলন, প্রকৃতির অনন্ত ক্ষেত্রের মধ্যে কিছুকালের জন্য রুদ্ধ হৃদয়ের ছুটি, ততই নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া উঠে। সাহিত্যই সেই মিলনের স্থান, সেই খেলার গৃহ, সেই শান্তিনিকেতন। সাহিত্যই মানবহৃদয়ে সেই ধ্রুব অসীমের বিকাশ। অনেক পণ্ডিত ভবিষ্যদ্‌বাণী প্রচার করেন যে, সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের বিনাশ হইবে। তা যদি হয় তবে সভ্যতারও বিনাশ হইবে। কেবল পাকা রাস্তাই যে মানুষের পক্ষে আবশ্যক তাহা নয়, শ্যামল ক্ষেত্র তাহা অপেক্ষা অধিক আবশ্যক; প্রকৃতির বুকের উপরে পাথর ভাঙিয়া আগাগোড়া সমস্তটাই যদি পাকা রাস্তা করা যায়, কাঁচা কিছুই না থাকে, তবে সভ্যতার অতিশয় বৃদ্ধি হয় সন্দেহ নাই, কিন্তু সেই অতিবৃদ্ধিতেই তাহার বিনাশ। লণ্ডন শহর অত্যন্ত সভ্য ইহা কে না বলিবে, কিন্তু এই লণ্ডন-রূপী সভ্যতা যদি দৈত্যশিশুর মতো বাড়িতে বাড়িতে সমস্ত দ্বীপটাকে তাহার ইষ্টককঙ্কালের দ্বারা চাপিয়া বসে তবে সেখানে মানব কেমন করিয়া টিকে! মানব তো কোনো পণ্ডিত-বিশেষের দ্বারা নির্মিত কল-বিশেষ নহে।

দূর হইতে ইংলণ্ডের সাহিত্য ও সভ্যতা সম্বন্ধে কিছু বলা হয়তো আমার পক্ষে অনধিকারচর্চা। এ বিষয়ে অভ্রান্ত বিচার করা আমার উদ্দেশ্য নয় এবং সেরূপ যোগ্যতাও আমার নাই। আমাদের এই রৌদ্রতাপিত নিদ্রাতুর নিস্তব্ধ গৃহের এক প্রান্তে বসিয়া কেমন করিয়া ধারণা করিব সেই সুরাসুরের রণরঙ্গভূমি য়ুরোপীয় সমাজের প্রচণ্ড আবেগ, উত্তেজনা, উদ্যম, সহস্রমুখী বাসনার উদ্দাম উচ্ছ্বাস, অবিশ্রাম মথ্যমান ক্ষুব্ধ জীবন-মহাসমুদ্রের আঘাত ও প্রতিঘাত— তরঙ্গ ও প্রতিতরঙ্গ— ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি, উৎক্ষিপ্ত সহস্র হস্তে পৃথিবী বেষ্টন করিবার বিপুল আকাঙ্‌ক্ষা—! দুই-একটা লক্ষণ মাত্র দেখিয়া, রাজ্যের অভ্যন্তরীণ অবস্থার মধ্যে লিপ্ত না থাকিয়া, বাহিরের লোকের মনে সহসা যে কথা উদয় হয় আমি সেই কথা লিখিয়া প্রকাশ করিলাম এবং এই সুযোগে সাহিত্য সম্বন্ধে আমার মত কথঞ্চিৎ স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করিলাম।

ভারতী ও বালক
বৈশাখ ১২৯৪

আলস্য ও সাহিত্য

অবসরের মধ্যেই সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ সাহিত্যের বিকাশ, কিন্তু তাই বলিয়া আলস্যের মধ্যে নহে। মানবের সহস্র কার্যের মধ্যে সাহিত্যও একটি কার্য। সুকুমার বিকশিত পুষ্প যেমন সমগ্র কঠিন ও বৃহৎ বৃক্ষের নিয়ত শ্রমশীল জীবনের লক্ষণ তেমনি সাহিত্যও মানবসমাজের জীবন স্বাস্থ্য ও উদ্যমেরই পরিচয় দেয়, যেখানে সকল জীবনের অভাব সেখানে যে সাহিত্য জন্মিবে ইহা আশা করা দুরাশা। বৃহৎ বটবৃক্ষ জন্মিতে ফাঁকা জমির আবশ্যক, কিন্তু মরুভূমির আবশ্যক এমন কথা কেহই বলিবে না।

সুশৃঙ্খল অবসর সে তো প্রাণপণ পরিশ্রমের ফল, আর উচ্ছৃঙ্খল জড়ত্ব অলসের অনায়াসলব্ধ অধিকার। উন্নত সাহিত্য, যাহাকে সাহিত্য নাম দেওয়া যাইতে পারে, তাহা উদ্যমপূর্ণ সজীব সভ্যতার সহিত সংলগ্ন স্বাস্থ্যময়, সৌন্দর্যময়, আনন্দময় অবসর। যে পরিমাণে জড়ত্ব, সাহিত্য সেই পরিমাণে খর্ব ও সুষমারহিত, সেই পরিমাণে তাহা কল্পনার উদার দৃষ্টি ও হৃদয়ের স্বাধীন গতির প্রতিরোধক। অযত্নে যে সাহিত্য ঘনাইয়া উঠে তাহা জঙ্গলের মতো আমাদের স্বচ্ছ নীলাকাশ, শুভ্র আলোক, বিশুদ্ধ সুগন্ধ সমীরণকে বাধা দিয়া রোগ ও অন্ধকারকে পোষণ করিতে থাকে।

দেখো, আমাদের সমাজে কার্য নাই, আমাদের সমাজে কল্পনাও নাই, আমাদের সমাজে অনুভাবশক্তিও তেমন প্রবল নহে। অথচ একটা ভ্রান্ত বিশ্বাস প্রচলিত আছে যে, বাঙালিদের অনুভাবশক্তি ও কল্পনাশক্তি সবিশেষ তীব্র। কিন্তু বাঙালিরা যে অত্যন্ত কাল্পনিক ও সহৃদয় এ কথার প্রতিবাদ করিতে গেলে বিস্তর অপবাদের ভাগী হইতে হয়।

কাজ যাহারা করে না তাহারা যে কল্পনা করে ও অনুভব করে এ কথা কেমন করিয়া বিশ্বাস করা যায়। সুস্থ কল্পনা ও সরল অনুভাবের গতিই কাজের দিকে, আশমান ও আলস্যের দিকে নহে। চিত্রকরের কল্পনা তাহাকে ছবি আঁকিতেই প্রবৃত্ত করে; ছবিতেই সে কল্পনা আপনার পরিণাম লাভ করে। আমাদের মানসিক সমুদয় বৃত্তিই নানা আকারে প্রকাশ পাইবার জন্য ব্যাকুল। বাঙালির মন সে নিয়মের বহির্ভূত নহে। যদি এ কথা স্বীকার করা হয় সহজে বাঙালিকে কাজে প্রবৃত্ত করা যায় না, তবে এ কথাও স্বীকার করিতে হইবে— বাঙালির মনোবৃত্তি-সকল দুর্বল।

কল্পনা যাহাদের প্রবল, বিশ্বাস তাহাদের প্রবল; বিশ্বাস যাহাদের প্রবল তাহারা আশ্চর্য বলের সহিত কাজ করে। কিন্তু বাঙালি জাতির ন্যায় বিশ্বাসহীন জাতি নাই। ভূত-প্রেত, হাঁচি-টিকটিকি, আধ্যাত্মিক জাতিভেদ ও বিজ্ঞানবহির্ভূত অপূর্ব বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা-সকলের প্রতি একপ্রকার জীবনহীন জড় বিশ্বাস থাকিতে পারে; কিন্তু মহত্ত্বের প্রতি তাহাদের বিশ্বাস নাই। আফিসযানের চক্রচিহ্নিত পথ ছাড়িলে বৃহৎ জগতে আর-কোথাও যে কোনো গন্তব্য পাওয়া যাইবে ইহা কিছুতেই মনে লয় না। বড়ো ভাব ও বড়ো কাজকে যাহারা নীহার ও মরীচিকা বলিয়া মনে করে তাহাদের কল্পনা যে সবিশেষ সজীব তাহার প্রমাণ কী? স্পেনদেশ কলম্বসকে বিশ্বাস করিতে বহু বিলম্ব করিয়াছিল, কিন্তু যদি কোনো সুযোগে, বিধির কোনো বিপাকে, বঙ্গদেশে কোনো কলম্বস জন্মগ্রহণ করিত তবে দালান ও দাওয়ার আর্য দলপতি এবং আফিসের হেড্ কেরানিগণ কী কাণ্ডটাই করিত। দুই-চারিজন অনুগ্রহপূর্বক সরলভাবে তাহাকে পাগল ঠাহরাইত এবং অবশিষ্ট সুচতুরবর্গ যাহারা কিছুতেই ঠকে না এবং যাহাদের যুক্তিশক্তি অতিশয় প্রখর, অর্থাৎ যাহারা সর্বদা সজাগ এবং কথায় কথায় চোখ টিপিয়া থাকে, তাহারা বক্রবুদ্ধিতে দুই-চারি প্যাঁচ লাগাইয়া আমাদের কৃষ্ণকায় কলম্বসের সহস্র সংকীর্ণ নিগূঢ় মতলব আবিষ্কার করিত এবং আপন আফিস ও দরদালানের স্থানসংকীর্ণতা হেতুই অতিশয় আরাম অনুভব করিত।

বাঙালিরা কাজের লোক নহে, কিন্তু বিষয়ী লোক। অর্থাৎ, তাহারা সর্বদাই বলিয়া থাকে,

'কাজ কী বাপু!' ভরসা করিয়া তাহারা বুদ্ধিকে ছাড়া দিতে পারে না; সমস্তই কোলের কাছে জমা করিয়া রাখে এবং যত-সব ক্ষুদ্র কাজে সমস্ত বুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া বুদ্ধিকে অত্যন্ত প্রচুর বলিয়া বোধ করে। সুতরাং বড়ো কাজ, মহৎ লক্ষ্য, সুদূর সাধনাকে ইহারা সর্বদা উপহাস অবিশ্বাস ও ভয় করিয়া থাকে। কিন্তু কল্পনাকে এইরূপ সংক্ষিপ্ত পরিসরের মধ্যে বদ্ধ করিয়া রাখিবার ফল হয় এই, জগতের বৃহত্ত্ব দেখিতে না পাইয়া আপনাকে বড়ো বলিয়া ভুল হয়। নিরুদ্যম কল্পনা অধিকতর নিরুদ্যম হইয়া মৃতপ্রায় হয়। তাহার আকাঙ্ক্ষার পথ রুদ্ধ হইয়া যায় এবং অভিমানস্ফীত হৃদয়ের মধ্যে রুদ্ধ কল্পনা, রুগ্‌ণ ও রোগের আকর হইয়া বিরাজ করিতে থাকে।

ইহার প্রমাণস্বরূপে দেখো, আমরা আজকাল আপনাকে কতই বড়ো মনে করিতেছি। চতুর্দিকে অষ্টাদশ সংহিতা এবং বিংশতি পুরাণ গাঁথিয়া তুলিয়া তাহার মধ্যে ক্রমাগত অন্ধকার ও অহংকার সঞ্চয় করিতেছি। বহু সহস্র বৎসর পূর্বে মনু ও যাজ্ঞবল্ক্য আপন স্বজাতিকে পার্শ্ববর্তী কৃষ্ণচর্ম অসভ্য জাতির অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিতেন বলিয়া আমরা তাঁহাদের ও তাঁহাদের দাসবর্গের হীনবুদ্ধি ক্ষীণকায় দীনপ্রাণ অজ্ঞান-অধীনতায়-অতিভূত সন্ততি ও পোষ্যসন্ততিগণ আপনাকে পবিত্র, আর্য ও সর্বাপেক্ষা মহৎ বলিয়া আস্ফালন করিতেছি এবং প্রভাতের স্ফীতপুচ্ছ ঊর্ধ্বগ্রীব কুক্কুটের ন্যায় সমস্ত জাগ্রত জগতের প্রতি অবজ্ঞা ও অবহেলার তারস্বর উত্থাপন করিতেছি। পশ্চিমের বৃহৎ সাহিত্য ও বিচিত্র জ্ঞানের প্রভাবে এক অত্যুন্নত, তেজস্বী, নিয়তগতিশীল, জীবন্ত মানবসমাজের বিদ্যুৎপ্রাণিত স্পর্শ লাভ করিয়াও তাহাদের মহত্ত্ব যথার্থ উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না এবং বিবিধভঙ্গিসহকারে ক্ষীণ তীক্ষ্ণ সানুনাসিক স্বরে তাহাকে ম্লেচ্ছ ও অনুন্নত বলিয়া প্রচার করিতেছি। ইহাতে কেবলমাত্র আমাদের অজ্ঞতার অন্ধ অভিমান প্রকাশ পাইতেছে না, ইহাতে আমাদের কল্পনার জড়ত্ব প্রমাণ করিতেছে। আপনাকে বড়ো বলিয়া ঠাহরাইতে অধিক কল্পনার আবশ্যক করে না, কিন্তু যথার্থ বড়োকে বড়ো বলিয়া সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিতে উন্নত কল্পনার আবশ্যক।

অলস কল্পনা পবিত্র জীবনের অভাবে দেখিতে দেখিতে এইরূপ বিকৃতি প্রাপ্ত হইতে থাকে। আলস্যের সাহিত্যও তদনুসারে বিকৃত আকার ধারণ করে। ছিন্নবল্গ রথভ্রষ্ট অশ্বের ন্যায় অসংযত কল্পনা পথ হইতে বিপথে গিয়া উপস্থিত হয়। সেখানে দক্ষিণও যেমন বামও তেমনি; কেন যে এ দিকে না গিয়া ও দিকে যাই তাহার কোনো কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সেখানে আকার-আয়তনের মাত্রা পরিমাণ থাকে না। বলা নাই কহা নাই সুন্দর হঠাৎ কদর্য হইয়া উঠে। সুন্দরীর দেহ সুমেরু ডমরু মেদিনী গৃধিনী শুকচঞ্চু কদলী হস্তিশুণ্ড প্রভৃতির বিষম সংযোগে গঠিত হইয়া রাক্ষসী মূর্তি গ্রহণ করে। হৃদয়ের আবেগ কল্পনার তেজ হারাইয়া কেবল বঙ্কিম কথা-কৌশলে পরিণত হয়, যথা—

অদ্যাপি তন্মনসি সম্প্রতি বর্ততে মে
রাত্রৌ ময়ি ক্ষুতবতি ক্ষিতিপালপুত্র্যা
জীবেতি মঙ্গলবচঃ পরিহৃত্য কোপাৎ
কর্ণে কৃতং কনকপত্রমনালপন্ত্যা।

. . .

এখনো সে মোর মনে আছয়ে সর্বথা,
একরাতি মোর দোষে না কহিল কথা।
বিস্তর যতনে নারি কথা কহাইতে
ছলে হাঁচিলাম 'জীব' বাক্য বলাইতে।
আমি জীলে রহে তার আয়তি নিশ্চল
জানায়ে পরিল কানে কনককুণ্ডল।

—বিদ্যাসুন্দর

এইরূপ অত্যদ্ভুত মানসিক ব্যায়ামচর্চার মধ্যে শৈশবকল্পনার আত্মবিস্মৃত সরলতাও নাই এবং পরিণত কল্পনার সুবিচারসংগত সংযমও নাই। শাসনমাত্রবিরহিত আদর ও আলস্যে পালিত হইলে মনুষ্য যেমন পুত্তলির মতো হইয়া উঠে, শৈশব হারায়, অথচ কোনো কালে বয়োলাভ করে না এবং এইরূপে একপ্রকার কিম্ভূত বিকৃত মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হয়, অনিয়ন্ত্রিত আলস্যের মধ্যে পুষ্ট হইলে সাহিত্যও সেইরূপ অদ্ভুত বামনমূর্তি ধারণ করে।

চিরকালই, সকল বিষয়েই, আলস্যের সহিত দারিদ্র্যের যোগ। সাহিত্যেও তাহার প্রমাণ দেখা যায়। অলস কল্পনা আর-সমস্ত ছাড়িয়া উঞ্ছবৃত্তি অবলম্বন করে। প্রকৃতির মহৎ সৌন্দর্যসম্পদে তাহার অধিকার থাকে না; পরম সন্তুষ্ট চিত্তে আবর্জনাকণিকার মধ্যে সে আপনার জীবিকা সঞ্চয় করিতে থাকে। কুমারসম্ভবের মহাদেবের সহিত অন্নদামঙ্গলের মহাদেবের তুলনা করো। কল্পনার দারিদ্র্য যদি দেখিতে চাও অন্নদামঙ্গলের মদনভস্ম পাঠ করিয়া দেখো। বদ্ধ মলিন জলে যেমন দূষিতবাষ্পস্ফীত গাঢ় বুদ্‌বুদশ্রেণী ভাসিয়া উঠে তেমনি আমাদের এই বিলাসকলুষিত অলস বঙ্গ সমাজের মধ্য হইতে ক্ষুদ্রতা ও ইন্দ্রিয়বিকারে পরিপূর্ণ হইয়া অন্নদামঙ্গল ও বিদ্যাসুন্দর ভাসিয়া উঠিয়াছিল। নিরবচ্ছিন্ন আলস্যের মধ্যে এইরূপ সাহিত্যই সম্ভব।

ক্ষুদ্র কল্পনা হয় আপনাকে সহস্র মলিন ক্ষুদ্র বস্তুর সহিত লিপ্ত করিয়া রাখে, নয় সমস্ত আকার-আয়তন পরিহার করিয়া বাষ্পরূপে মেঘরাজ্য নির্মাণ করিতে থাকে। তাহার ঠিক-ঠিকানা পাওয়া যায় না। স্থানে স্থানে দৈবাৎ এক-একটা আকৃতিমতী মূর্তির মতো দেখা যায়, কিন্তু মনোযোগ করিয়া দেখিতে গেলে তাহার মধ্যে কোনো অভিব্যক্তি বা সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায় না। যাহাকে ঘন বলিয়া মনে হয় তাহা বাষ্প, যাহাকে সত্য বলিয়া ভ্রম হয় তাহা মরীচিকা। কেহ কেহ বলিতেছেন, আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে এইরূপ কল্পনাকুজ্‌ঝটিকার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। তাহা যদি সত্য হয় তবে ইহাও আমাদের ক্ষীণ ও অলস কল্পনার পরিচায়ক।

বলা বাহুল্য ইতিপূর্বে[১] যখন আমি লিখিয়াছিলাম যে, অবসরের মধ্যেই সাহিত্যের বিকাশ তখন আমি এরূপ মনে করি নাই যে অবসর ও আলস্য একই। কারণ, আলস্য কার্যের বিঘ্নজনক এবং অবসর কার্যের জন্মভূমি।

কতকগুলি কাজ আছে যাহা সমস্ত অবসর হরণ করিয়া লইবার প্রয়াস পায়। সেইরূপ কাজের বাহুল্যে সাহিত্যের ক্ষতি করে। যাহা নিতান্তই আপনার ছোটো কাজ, যাহার জন্য ঊর্ধ্বশ্বাসে দাপিয়া বেড়াইতে হয়, যাহার সঙ্গে সঙ্গে ঝন্‌ঝনি খিটিমিটি খুঁটিনাটি দুশ্চিন্তা লাগিয়াই আছে, তাহাই কল্পনার ব্যাঘাতজনক। বৃহৎ কাজ আপনি আপনার অবসর সঙ্গে লইয়া চলিতে থাকে। খুচরা কাজের অপেক্ষা তাহাতে কাজ বেশি এবং বিরামও বেশি। বৃহৎ কাজে মানবহৃদয় আপন সঞ্চরণের স্থান পায়। সে আপন কাজের মহত্ত্বে মহৎ আনন্দ লাভ করিতে থাকে। মহৎ কাজের মধ্যে বৃহৎ সৌন্দর্য আছে, সেই সৌন্দর্যই আপন বলে আকর্ষণ করিয়া হৃদয়কে কাজ করায় এবং সেই সৌন্দর্যই আপন সুধাহিল্লোলে হৃদয়ের শ্রান্তি দূর করে। মানুষ কখনো ভাবে মাতোয়ারা হইয়া কাজ করে, কখনো ঝঞ্ঝাটে পড়িয়া কাজ করে। কতকগুলি কাজে তাহার জীবনের প্রসর বৃদ্ধি করিয়া দেয়, কতকগুলি কাজে তাহার জীবনকে একটা যন্ত্রের মধ্যে সংকুচিত করিয়া রাখে। কোনো কোনো কাজে সে আপনাকে কর্তা, আপনাকে দেবসন্তান বলিয়া অনুভব করে, আবার কোনো কোনো কাজে সে আপনাকে কঠিন নিয়মে অবিশ্রাম পরিচালিত এই বৃহৎ যন্ত্রজগতের এক ক্ষুদ্র অংশ বলিয়া মনে করে। মানুষের মধ্যে মানবও আছে যন্ত্রও আছে, উভয়েই একসঙ্গে কাজ করিতে থাকে, কাজের গতিকে কেহ কখনো প্রবল হইয়া উঠে। যখন যন্ত্রই অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠে তখন আনন্দ থাকে না, সাহিত্য চলিয়া যায় অথবা সাহিত্য যন্ত্রজাত জীবনহীন পরিপাটি পণ্যদ্রব্যের আকার ধারণ করে।

বাংলা দেশে এক দল লোক কোনো কাজ করে না, আর-এক দল লোক খুচরা কাজে নিযুক্ত। এখানে মহৎ উদ্দেশ্য ও বৃহৎ অনুষ্ঠান নাই, সুতরাং জাতির হৃদয়ে উন্নত সাহিত্যের চির

আকরভূমি গভীর আনন্দ নাই। বসন্তের প্রভাতে যেমন বিহঙ্গেরা গান গাহে তেমনি বৃহৎ জীবনের আনন্দে সাহিত্য জাগ্রত হইয়া উঠে। সেই জীবন কোথায়? 'বঙ্গদর্শন' যখন ভগীরথের ন্যায় পাশ্চাত্যশিখর হইতে স্বাধীন ভাবস্রোত বাংলার হৃদয়ের মধ্যে আনয়ন করিলেন তখন বাংলা একবার নিদ্রোত্থিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার হৃদয়ে এক নূতন আশার সঞ্চার হইয়াছিল, তাহার আকাঙক্ষা জাগ্রত বিহঙ্গের ন্যায় নূতন ভাবালোকে বিহার করিবার জন্য উড্ডীয়মান হইয়াছিল। সে এক সুন্দর ও মহৎ জীবনের সঙ্গসুখ লাভ করিয়া হৃদয়ের মধ্যে সহসা নবযৌবনের পুলক অনুভব করিতেছিল। পৃথিবীর কাজ করিবার জন্য একদিন বাঙালির প্রাণ যেন ঈষৎ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল— সেই সময় বঙ্গসাহিত্য মুকুলিত হইতেছিল। এমন সময়ে কোথা হইতে বার্ধক্যের শীতবায়ু বহিল। প্রবীণ লোকেরা কহিতে লাগিল, 'এ কী মত্ততা! ছেলেরা সৌন্দর্য দেখিয়াই ভুলিল, এ দিকে তত্ত্বজ্ঞান যে ধূলিধূসর হইতেছে!' আমরা চিরদিনের সেই তত্ত্বজ্ঞানী জাতি। তত্ত্বজ্ঞানের আস্বাদ পাইয়া আবার সৌন্দর্য ভুলিলাম। প্রেমের পরিবর্তে অহংকার আসিয়া আমাদিগকে আচ্ছন্ন করিল! এখন বলিতেছি, আমরা মস্ত লোক, কারণ আমরা কুলীন, আমাদের অপেক্ষা বড়ো কেহই নাই! পশ্চিমের শিক্ষা ভ্রান্ত শিক্ষা! মনু অভ্রান্ত! কথাগুলো আওড়াইতেছি, অথচ ঠিক বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না। কূটবুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া কুটিল ব্যাখ্যা-দ্বারা অবিশ্বাসকে বিশ্বাস বলিয়া প্রমাণ করিতেছি। এ উপায়ে প্রকৃত বিশ্বাস বাড়ে না, কিন্তু অহংকার বাড়ে, বুদ্ধিকৌশলে দেবতাকে গড়িয়া তুলিয়া আপনাকেই দেবতার দেবতা বলিয়া মনে হয়। দিন-কতকের জন্য অনুষ্ঠানের বাহুল্য হয়, কিন্তু ভক্তির সজীবতা থাকে না। যাহা আছে তাহাই ভালো, মিথ্যা তর্কের দ্বারা এইরূপ মন ভুলাইয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিবার ইচ্ছা হয়। জীবন্ত জগতের মধ্যে কোথাও যথার্থ মহত্ত্ব নাই, আছে কেবল এক মৃত জাতির অঙ্গবিকারের মধ্যে, এইরূপ বিশ্বাসের ভান করিয়া আমরা আরামে মৃত্যুকে আলিঙ্গনপূর্বক পরম নিশ্চেষ্টভাবে শ্রেষ্ঠত্বগর্বসুখ ভোগ করিতে থাকি। এরূপ অবস্থায় উদ্যমহীন, আকাঙক্ষাহীন, প্রেমহীন, ছিন্নপক্ষ সাহিত্য যে ধুলায় লুণ্ঠিত হইবে ইহাতে আর আশ্চর্য কী! এখন সকলে মিলিয়া কেবল তত্ত্বজ্ঞান ও আত্মাভিমান প্রচার করিতেছে।

এই জড়ত্ব অবিশ্বাস ও অহংকার চিরদিন থাকিবে না। দীপ আপন নির্বাপিত শিখার স্মৃতিমাত্র লইয়া কেবল অহর্নিশি দুর্গন্ধ ধূম বিস্তার করিয়াই আপনাকে সার্থক জ্ঞান করিবে তাহা বিশ্বাস হয় না। জ্বলন্ত প্রদীপের স্পর্শে সে আবার জ্বলিয়া উঠিবে এবং সে আলোক তাহার নিজেরই আলোক হইবে। দ্বাররোধপূর্বক অন্ধকারে ইহসংসারের মধ্যে আপনাকেই একাকী বিরাজমান মনে করিয়া একপ্রকার নিশ্চেষ্ট পরিতোষ লাভ করা যায় বটে, কিন্তু একবার যখন বাহির হইয়া সমগ্র মানবসমাজের মধ্যে গিয়া দাঁড়াইব, এই বৃহৎ বিক্ষুব্ধ মানবজীবনের মধ্যে আপন জীবনের স্পন্দন অনুভব করিব, আপন নাভিপদ্মের উপর হইতে স্তিমিত দৃষ্টি উঠাইয়া লইয়া মুক্ত আকাশের মধ্যে বিকশিত আন্দোলিত জ্যোতির্মগ্ন সংসারের প্রতি দৃষ্টিপাত করিব, তখনই আমরা আমাদের যথার্থ মহত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারিব— তখন জানিতে পারিব, সহস্র মানবের জন্য আমার জীবন এবং আমার জন্য সহস্র মানবের জীবন। তখন সংকীর্ণ সুখ ও অন্ধ গর্ব উপভোগ করিবার জন্য কতকগুলা ঘর-গড়া তুচ্ছ মিথ্যারাশি ও ক্ষুদ্রতার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিবার আবশ্যকতা চলিয়া যাইবে। তখন যে সাহিত্য জন্মিবে তাহা সমস্ত মানবের সাহিত্য হইবে এবং সে সাহিত্য উপভোগ করিবার জন্য ব্যক্তিবিশেষের ক্ষুদ্র মত ও বুদ্ধিমানের ব্যাখ্যাকৌশলের প্রয়োজন থাকিবে না।

ভারতী ও বালক
শ্রাবণ ১২৯৪

কবিতার উপাদান রহস্য

(mystery)

ধরিতে গেলে স্ত্রী-পুরুষের প্রেমের অপেক্ষা সন্তান-বাৎসল্য পৃথিবীতে অধিক বৈ কম নহে। কিন্তু কবিতায় তাহার নিতান্ত অল্পতা কেন দেখা যায়? মানব-হৃদয়ের এমন একটা প্রবল প্রবৃত্তি কবিতায় আপনাকে ব্যক্ত করে নাই কেন? তাহার কারণ আমার বোধহয় রহস্য সৌন্দর্যের আশ্রয়স্থল; স্ত্রী-পুরুষের প্রেমের মধ্যে সেই রহস্য আছে, কিন্তু সন্তান-বাৎসল্যের মধ্যে সেই রহস্য নাই। খাদ্যের প্রতি ক্ষুধার আকর্ষণের রহস্য নাই, তেমনি সন্তানের প্রতি জননীর আসক্তির মধ্যে রহস্য নাই। অবশ্য রহস্য আছে, কিন্তু লোকের সহজেই মনে হয় আপনার পেটের ছেলেকে ভালোবাসিবে না তো কী! কিন্তু স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে আকর্ষণ সে এক অপূর্ব রহস্যময়। কাহাকে দেখিয়া কাহার প্রাণে যে কী সংগীত বাজিয়া উঠে, তাহার রহস্যের কেহ অন্ত পায় না। সৌন্দর্য সর্বাপেক্ষা রহস্যময় তাহার নিয়ম কেহ জানে না। ধর্মের মধ্যে দুই জায়গায় কবিতা আছে। এক, ঈশ্বরকে অতি মহান কল্পনা করিয়া; মেঘের মধ্যে, বজ্রনির্ঘোষের মধ্যে, অগ্নি, বিদ্যুৎ সূর্যের রুদ্র তেজের মধ্যে তাঁহার ভীষণ রহস্যের আভাস উপলব্ধি করিয়া। আর-এক, তাঁহাকে প্রকৃতির সৌন্দর্যের মধ্যে আপন হৃদয়ের প্রেমের মধ্যে সুন্দর বলিয়া জানিয়া। Old Testament-এ এবং বেদে অনেক গাথা আছে যাহা ঈশ্বরের সেই রুদ্র রহস্য উদ্দেশ করিয়া গীত। এবং ঈশ্বরের সৌন্দর্য রহস্যের বৈষ্ণব কবিদের গান উঠিয়াছে। ঈশ্বর আমাদিগকে লালনপালন পোষণ করিতেছেন, সংসার বিধিবদ্ধ করিয়া আমাদিগকে রক্ষা করিতেছেন— এ ভাব হইতে কবিতা উঠে নাই।

পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তক
২০/১১/১৮৮৮

সৌন্দর্য

৫৩-সংখ্যক প্রস্তাবে বড়দাদা সৌন্দর্য সম্বন্ধে যে প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন তাহার রীতিমতো উত্তর দেওয়া দুঃসাধ্য। সে সম্বন্ধে দু-একটা কথা যাহা বলিবার আছে বলি।

“নিজে না মাতিলে অন্যকে মাতানো যায় না” এ কথাটা অতি অল্প জায়গায় খাটে। অধিকাংশ স্থলেই যে মাতাইবে তাহাকে মাতিলে চলিবে না। “মাতা” বলিতে বুঝায় প্রবৃত্তির তরঙ্গে বুদ্ধির হাল ছাড়িয়া দেওয়া। নিজের উপরে নিজের প্রভুত্ব চলিয়া যাওয়া। বাগ্মী, যিনি বক্তৃতা করিয়া দেশ মাতাইতে চান, তাঁহার এমনি ঠিক থাকা আবশ্যক যে, ‘মাতা’ না মাতা তাঁহার সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন হয়। বাষ্পকে অধিকারায়ত্ত করিয়া যেমন কল চলে তেমনি নিজের মনোবৃত্তিকে সম্পূর্ণ দখলে রাখিয়া তবে দশজনের মনোবৃত্তি নিজের অভিপ্রায়মতো উদ্রেক করা যাইতে পারে। তবে এই কথা বলা যায় বটে যাহার হৃদয় নাই সে [অন্যের] হৃদয় বিচলিত করিতে পারে না— কিন্তু প্রবৃত্তির প্রাবল্যবশত নিজের উপর যাহার অধিকার নাই সে আপনি যতই চঞ্চল হৌক অন্যকে ... অতএব “নিজে না মাতিলে অন্যকে মাতানো যায় না” এ কথা [ঠিক] নহে।

সে যাহাই হৌক, নিজের মনের ভাব অন্যের মনে উদ্রেক করিতে হইলে প্রথমেই নিজের মনের ভাব থাকা আবশ্যক এ কথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু সৌন্দর্য তো মনের ভাব নহে— সুতরাং এক হৃদয়বৃত্তি অন্য হৃদয়ে যে সমবেদনার নিয়মে সঞ্চারিত হয় সে নিয়ম এখানে খাটে না।

আমার তো মনে হয় সৌন্দর্য স্বভাবতই অপ্রমত্ত কারণ পৃথিবীতে সৌন্দর্যই পরিপূর্ণতার আদর্শ। পরিপূর্ণতার সহিত মত্ততা শোভা পায় না। সৌন্দর্যের আপনার মধ্যে আপনার একটি

সামঞ্জস্য আছে— সে নিজের মধ্যে নিজেই সম্পূর্ণ— সে আর সকল হইতে আপনাকে সংহৃত করিয়া রাখে। এইজন্যই আর সকলে এমন প্রবলবেগে তাহার প্রতি আকৃষ্ট হয়। সৌন্দর্যের মধ্যে দৈন্য নাই, এইজন্যই, আমাদের ভিক্ষুক হৃদয় তাহার দ্বারে অতিথি হইয়া উপস্থিত হয়। সৌন্দর্যের মধ্যে এই ঐশ্বর্য এই পরিপূর্ণতা আছে বলিয়া সৌন্দর্যেই ক্ষুদ্রতার মধ্যে মহত্ত্ব, সীমার মধ্যে অসীমতা প্রকাশ পায়। পূর্ণতাকে আপন আয়ত্তের মধ্যে পাইয়া হৃদয় আনন্দে অভিভূত হয়। এই-সকল কারণেই পৃথিবী সৌন্দর্য [পূর্ণতা] অনুভব করিবার এক প্রধান উপায়।

যে রমণী আত্মসৌন্দর্য সম্বন্ধে সর্বদাই সচেতন, অর্থাৎ সৌন্দর্যের হাত হইতে নিজের হাতে কর্তৃত্ব গ্রহণ করে এবং হাবভাব ও টীকাভাষ্য দ্বারা সৌন্দর্যকে বিক্ষিপ্ত করিয়া তোলে সে সৌন্দর্যের স্থায়ী এবং গভীর প্রভাব নষ্ট করিয়া ফেলে— কারণ তাহার সৌন্দর্যের মধ্যে উদ্দেশ্য সুতরাং দৈন্যের চিহ্ন দেখা যায়। তাহাতে উপস্থিতমতো মনে করিয়া সুখ জন্মে যে এমন সৌন্দর্য আমার দ্বারে আসিয়া হাজির হইয়াছে আমার প্রশংসার অপেক্ষা রাখিতেছে। কিন্তু এই আত্মাভিমানের সুখ স্থায়ী হইতে পারে না, কারণ অবহেলার ভাব যে পরিমাণে বাড়িতে থাকে অহংকারের ভাব সেই পরিমাণে কমিতে থাকে। রাজা যদি একদিন রাজার ভাবে আমার গৃহে পদার্পণ করেন তবে আমার যথাসর্বস্ব অতিথিসংকারে ব্যয় করিয়া চরিতার্থতা লাভ করি— কিন্তু যদি অভাব জানাইয়া স্থায়ী অতিথিরূপে আমার গৃহে জমি জুড়িয়া বসেন তবে তাঁহার বরাদ্দ ক্রমেই কমিয়া আসিতে থাকে। মানুষ যে "তেলা মাথায় তেল ঢালে" তাহার কারণ এই যে ক্ষমতা এবং সৌন্দর্যের মধ্যে মানুষ ঈশ্বরের ভাব দেখিতে পাইয়া অভিভূত হয় স্বতই তাহার নিকটে আপনাকে বিসর্জন দিতে প্রবৃত্তি হয়— নতুবা আমার জন্য একটা লোক কাঁদে না কেন, আর নেপোলিয়নের জন্য হাজার লোক মরে কেন? এই সীমাবদ্ধ মর্ত্যভূমিতে থাকিয়াও অসীমের প্রতি আমাদের এমনি স্বাভাবিক আকর্ষণ। ক্ষমতার মধ্যে চেষ্টার চিহ্ন অপেক্ষাকৃত অল্প কিন্তু তবু আছে কারণ, তাহা ক্রিয়াসাপেক্ষ— কিন্তু সৌন্দর্য নিষ্ক্রিয়, সুতরাং তাহাতে চেষ্টার নামগন্ধ নাই। এইজন্য সৌন্দর্য অধিক পরিপূর্ণ; এইজন্য তাহা ক্ষমতা অপেক্ষা অধিক ক্ষমতাশালী। এইজন্য বৈষ্ণবেরা কৃষ্ণকে মথুরাপতিভাবে দেখিয়া সুখ পায় না, তাঁহাকে বৃন্দাবনবিহারীভাবে দেখিতে চায়। কারণ স্বাধীন আত্মার উপরে ক্ষমতা অপেক্ষা সৌন্দর্যের প্রভাব অধিক। পাঠকের মন অনেক সময় Paradise Lost -এর শয়তানের স্বপক্ষতা অবলম্বন করে; তাহার কারণ শুদ্ধ ক্ষমতার উপরে স্বভাবতই মানবাত্মার বিদ্রোহভাব উপস্থিত হয়, কিন্তু ঈশ্বরকে সৌন্দর্যস্বরূপভাবে দেখিলে তবেই শয়তানের বিদ্রোহকে যথার্থ শয়তানী বলিয়া মনে হয়।

উপরে যাহা যাহা বলিলাম তাহা যদি সত্য হয় তবে ইহা নিশ্চয় সৌন্দর্য মাতে না বলিয়াই মাতাইতে পারে।

পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তক
১৯/১২/১৮৮৮

Dialogue/
Literature

Dramatis Personae

R. Tagore
P. Chaudhuri
L. Palit

P. Ch. একটা কোনো বিষয় আলোচনা করা যাক।

L. P. তার দরকার কী? Vast World-এ একটা-না-একটা subject পাওয়া যায়ই।

R. T. সাহিত্য জিনিসটা বিষয়ের উপর বেশি নির্ভর করে না বলবার ভঙ্গির উপর।

L. P. বুঝিয়ে বলো।

P. C. সাহিত্যের বিষয়টা কী?— Guide book আর Book of travels-এ ঢের তফাত।

R. T. ওইতেই তো আমার প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেল— দুটোরই বিষয় এক, খালি manner তফাত।

L. P. দুটোর বিষয় আবার মতে তফাত, কেননা different points of view থেকে deal করা হচ্ছে— যেমন Physics আর Chemistry.

P. C. Guide books-এ খালি fact পাওয়া যায়— Book of travels-এ personal element আছে— আর তাইতেই literature হয়। impersonal information-এ science হতে পারে। literature হয় না।

R. T. তা হলে দেখতে হবে কিসে personality প্রকাশ হয়।

L. P. সেটা কি method-এর question নয়?

P. C. Method তো আর খালি style নয়।

L. P. Rhetorical point of view থেকে।

R. T. Mere facts সরল ভাষায় ব্যক্ত করা যেতে পারে কিন্তু তার সঙ্গে emotions express করতে হলেই ভাষাকেও নিজের মনের মতোন করে গড়ে তুলতে হয় যাতে নিজের ভাব নিজে ভালো রকম ব্যক্ত করে উঠতে পারে।

P. C. Put করবার তফাত তত নয়—যত দেখবার তফাত। একজন যত points দেখছে আর-এক জনা তত হয়তো দেখছে না— feelings-এর question তত নয়— knowledge-এরও question হতে পারে।

R. T. তা হলে তুমি বলছ যে কতকগুলো points literature-এর পক্ষে বেশি উপযোগী।

P. C. না, তা ঠিক নয়। জ্ঞানস্পৃহা, সৌন্দর্যস্পৃহা ইত্যাদি আমাদের অনেক faculties আছ—Science & Art আলাদা department নিয়ে deal করে; কিন্তু literature সমস্ত faculties-এর সামঞ্জস্য দেয়। নিদেন তাই literature-এর চেষ্টা— সব সময়ে perfect success হয় না।

L. P. আগে দেখা উচিত Literature-এর end কী? তা হলেই আমরা বুঝতে পারব তার subject এবং তার method কিরকম হওয়া উচিত।

P. C. Matthew Arnold বলেন Literature-এর উদ্দেশ্য humanize করা। মানুষের যতগুলি ভালো প্রবৃত্তি আছে তার প্রত্যেকটার Perfect development-এর সহায়তা করা। জ্ঞানস্পৃহা, সৌন্দর্যস্পৃহা প্রভৃতি সকল বৃত্তির সম্যক স্ফূর্তি সাধন করা। আমি বলি সেই উদ্দেশ্য সাধনের উপায় হচ্ছে enjoyment মুখ্য ও instruction গৌণ হওয়া।

L. P. খুব ঠিক। তা হলে দাঁড়াল এই যে আমাদের emotional nature-এ সব চেয়ে বেশি appeal করবে। আমি ধরে নিচ্ছি যে ethical মানে emotional। এই sense-এ যে ethics emotion-এর through দিয়ে literature-এ act করে। Reason-এর through নয়।

P. C. এ সম্বন্ধে বক্তব্য আছে। সত্য দুই ভাবে দেখা যায়। প্রথম— চিন্তার বিষয়। দ্বিতীয়— feel করবার বিষয়। literature-এ আমাদের জীবন্ত সত্যর সঙ্গে পরিচিত করে। সত্যকে তাহার সমগ্রভাবে আমাদের আয়ত্তগত করে। দৃষ্টান্ত— প্রকৃতিকে আমরা Physical Science-এর মতে Matter এবং Force-এর একটা সমষ্টি বলে মনে

করতে পারি মাত্র। কিন্তু প্রকৃতিকে তার সমস্ত সৌন্দর্যর সঙ্গে একটা palpable concrete thing বলে অনুভব করা সেটা যে মানসিক শক্তির দ্বারা হয় literature তারই expression।

L. P. প্রমথ কিছু mystic। এই mystic nature-এর সঙ্গে যুদ্ধ করতে হলে analysis-এর দরকার। সত্য হৃদয়ের দ্বারা অনুভব করা কিরকমে সম্ভব হয় বুঝতে পারছি নে। Nature-এর beauty-কে কী হিসাবে সত্য বলা যেতে পারে তাও জানি নে unless সত্য শব্দটার আরেকটা নূতন মানে দেওয়া যায়। Beauty আমাদের feelings affect করে আর সেই sense-এ purely emotional। একে যদি truth বলে তবে আমি যা আগে বলেছিলুম তার সঙ্গে কোনো তফাতই থাকে না। একই জিনিসের দুই quality থাকতে পারে। গাছ নদী পাহাড় পর্বতের যে সমষ্টিকে আমরা nature বলি তার একটা side unemotional তাই সেই sideটা আমরা purely scientifically enquire into করতে পারি। যে sideটা আমাদের emotion excite করে তার সত্য মিথ্যা উচিত অনুচিত নেই। এটা সুন্দর হওয়া উচিত এমন কোনো কথা নেই। সৌন্দর্য relative। মানুষের মন এবং nature-এর সঙ্গে একটা relation। সে relationটা universal নয় তাই ordinary scientific truth-এর category থেকে বার করে নিই।

P. C. আমার কথার মানে— literary subject beautiful, moral, এবং আমাদের intellect-এর grasp-এর মধ্যে। এর একটা কোনোটাকে বাদ দিলে literature অসম্পূর্ণ হয়।

L. P. Literature-এর aim হচ্ছে beauty। তবে যা আমাদের moral nature rovolt করে তা আমাদের Sense of the Beautifulও shock করে। কতকগুলো intellectual truthও আছে যা ব্যতিক্রম করলে একই effect হয়। আমাদের sympathy হচ্ছে Highest moral quality। তাকে excite করতে হলে truthful হওয়া দরকার কেননা impossible কিংবা non-existent creature-দের সঙ্গে sympathy-র কোনো আবশ্যক নেই। Living Human being এর সঙ্গে sympathy-র দরকার। এইটুকু truth বজায় রেখে আর বাকি truth আমরা ignore করতে পারি। emotion তা হলে হল end এবং moral ও intellectual হল means।

P. C. এ যদি লোকেনের কথা হয় তা হলে আমার কোনো আপত্তি নেই। তবে লোকেনের sympathy-র বদলে আমি love বসাতে চাই। আর meansটা aesthetical ও বটে।

প্রমথ প্রস্থান।

পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তক
Oct. 1. 89 [১৬ আশ্বিন ১২৯৬]

সাহিত্য

যেটুকু সাহিত্যের মর্ম, তাহা সংজ্ঞার মধ্যে ধরা দেয় না। তাহা প্রাণপদার্থের মতো— কী কী না থাকিলে তাহা টেঁকে না তাহা জানি, কিন্তু সে যে কী তাহা জানি না। জীবন হইতেই জীবন সংক্রামিত হয়, অগ্নি হইতেই অগ্নি জ্বালাইতে হয়— তেমনি লেখকের অন্তরাত্মা হইতে কলমের মুখে যখন প্রাণ স্ফুরিয়া পড়ে তখনই জীবন্ত সাহিত্যের জন্ম হয়। সাহিত্য সম্বন্ধে “জীবন” “প্রাণ” প্রভৃতি কথাগুলো হয়তো mystic। কিন্তু পরিষ্কার কথা বলিবার কোনো উপায় নাই। সাহিত্যের মধ্যে একটা জীবন আছে, এবং সে জীবন লেখকের মানবজীবনের নিগূঢ় কেন্দ্র হইতে

চুঁইয়া পড়ে, ভাষার মধ্যে স্থায়ী হয় ও ভাষাকে স্থায়ী করিয়া তুলে— এই কথাগুলো নিজের আন্তরিক অভিজ্ঞতার সাহায্যে একপ্রকার আন্দাজে বুঝিয়া লইতে হইবে।

Shakespeare তাঁহার নাটকের পাত্রগুলিকে আপনার প্রাণের মধ্য হইতে জন্ম দিয়াছেন— বুদ্ধি হইতেও নয়, ধর্মনীতি হইতেও নয়, এমন-কি, feelings হইতে নয়— সমস্ত মানববৃত্তির দ্বারা বেষ্টিত জীবনকোষের মধ্য হইতে। সাহিত্যের মধ্যে সৃজনের ভাব আছে, নির্মাণের ভাব নাই। সৃজনের মধ্যে একটা রহস্যময় প্রাণময় আত্মবিস্মৃত নিয়ম আছে, নির্মাণ আপনা হইতেই তাহার হাতধরা। সৃজনশক্তি এক হিসাবে নির্মাণশক্তি অপেক্ষা অচেতন, আবার আর-এক হিসাবে তাহা অপেক্ষা সচেতন। কারণ, নির্মাণকালে প্রতিমুহূর্তে সচেতন আত্মকর্তৃত্ব জড় উপাদানের প্রতি প্রয়োগ করিতে হয়। সৃজনে তাহা নয়। কিন্তু সৃজনকালে সেই জড় উপাদানের মধ্যে যেন এক অপূর্ব নিয়মে চেতনা সঞ্চার করিয়া দেওয়া হয়, সে যেন আপনাকে আপনি গড়িয়া তুলে। যেন নিজের নাড়ির সহিত তাহার যোগ সাধন করিয়া দেওয়া হয় এবং সহজেই তাহার মধ্যে জীবন প্রবাহিত হয়। বাষ্পীয় কলে দেখা যায় এক ঘূর্ণ্যমান চাকার সহিত আর-এক চাকার যোগ করিয়া বিভিন্ন দিকে গতি সঞ্চার করা [হয়।] তেমনি এই বৃহৎ সংসারচক্রের আবর্তনের সঙ্গে আমার জীবনচক্র ঘুরিতেছে, তাহারি কে[ন্দ্রের মধ্য] দিয়া সংসারের গতির সহিত সাহিত্যের যোগ সাধন করা হয়, এই উপায়ে সাহিত্য বৃহৎ জীবনের অনন্তগতি প্রাপ্ত হয়। কেহ-বা হাতে করিয়া ঠেলিতেছে, কেহ-বা ঘোড়া জুড়িয়া ছুটাইতেছে, কেহ-বা জীবনের চক্রের সহিত বাঁধিয়া দিতে পারিয়াছে, শেষোক্ত উপায়েই সাহিত্য স্থায়ী গতি প্রাপ্ত হয়।

কিন্তু এই-সকল তুলনা উপমাকে কল্পনার খেলা বলিয়া মনে হয়, পাকা কথা বলিয়া বোধ হয় না। পাকা কথা মানে, যে কথা সকলেই যাচাই করিয়া লইতে পারে। পূর্বেই একরকম বলা গিয়াছে এ-সকল কথা তেমন সন্তোষজনকরূপে পাকা করিয়া লওয়া অসম্ভব।

আমি নিজে বার বার দেখিয়াছি, এবং এ কথা বোধ হয় কাহাকেও নূতন বলিয়া বোধ হইবে না, যে, যখন সাহিত্যরচনার মধ্যে মগ্ন থাকা যায় তখন যেন এক প্রকার অতিচেতন অবস্থা প্রাপ্ত হইতে হয়। যেন আর-একজন অন্তঃপুরুষ আমার অধিকাংশ চেতনা অপহরণ করিয়া আমার অর্ধেক অজ্ঞাতসারে কাজ করিয়া যায়। সে যেন আমার সমস্ত সঞ্চিত জ্ঞাত ও অজ্ঞাত অভিজ্ঞতাকে আমার Real এবং Ideal-কে প্রতিদিনের আমাকে এবং আমার সম্ভাবিত আমাকে গলাইয়া লেখার মধ্যে তাহারই এক বিন্দু ঢালিয়া দেয়। আমার জীবনের যাহা সারবিন্দু তাহা সমস্ত মানবজীবনের ধন, তাহা কেবলমাত্র আমার একটা অজ্ঞেয় অপরিচিত অসম্পূর্ণ অংশ নহে। সুতরাং সেই জীবনশক্তি সাহিত্যের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া চিরদিন সমস্ত মানবের হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ লাভ করিতে পারে।

পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তক
২।১০।৮৯
[১৭ আশ্বিন ১২৯৬]

বাংলায় লেখা

বাংলা ভাষায় লিখিবার এক বিশেষ সুবিধা এই যে বাংলায় নূতন কথা বলা যায়। প্রকৃত নূতন কথা পৃথিবীতে নাই বলিলেই হয়— কেবল যখন ব্যক্তিবিশেষ সেই কথাটা নূতন করিয়া [ভা]বিয়া বলে তখনই তাহা নূতন হইয়া উঠে। বাংলায় কোনো চিন্তা ব্যক্ত করিতে গেলে তাহার সমস্তটাই একান্ত একাগ্রতার সহিত ভাবিয়া লইতে হয়, তাহার আগাগোড়া নিজের হাতে গড়িয়া লইতে হয়। অক্ষমতাবশত অসম্পূর্ণ ও অসংলগ্ন হইতে পারে কিন্তু অলক্ষিতভাবে অন্যের

নির্মিত পথে পড়িবার সম্ভাবনা বিরল। ইংরাজিতে প্রায় সকল ভাবেরই বহুকালসঞ্চিত ভাষা আছে— ভাবের উদয় হইবামাত্রই তাহারা দলে দলে আসিয়া আপনাদের মধ্যে ভুলাইয়া লইয়া যায়। এইরূপ অনায়াসলব্ধ ভাষায় স্বতঃপ্রবাহিত গতির মধ্যে পড়িয়া চিন্তাশক্তি কথঞ্চিৎ নিরুদ্যম হইয়া পড়ে।— আমি দেখিয়াছি একটা সামান্য কথাও বাংলায় লিখিয়া মনে হয় নূতন কথা লিখি[লাম— কারণ] ভাবা-কথাও সম্যক্‌রূপে ভাবিয়া লইতে হয়। সমস্ত হৃদয় মন বুদ্ধি চেষ্টা জাগাইয়া রাখিতে হয়— প্রত্যেক কথাটিকে নিজে ডাকিয়া আনিতে হয়। আমাদের গরিব বাংলা ভাষায় বিস্তর অসুবিধা, সমস্তই নিজের হাতে করিয়া-কর্মিয়া লইতে হয়, কিন্তু সেইটেই একটা সুবিধা।

পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তক
৬।১০।৮৯
[২১ আশ্বিন ১২৯৬]

অপরিচিত ভাষা ও অপরিচিত সংগীত

বিদেশী ভাষা নূতন শিখিতে আরম্ভ করিয়া যখন সেই ভাষার সাহিত্য পুস্তক পড়িতে চেষ্টা করা যায়, তখন দুই কারণে সেই সাহিত্যের প্রকৃত রস গ্রহণ করা যায় না। ১ম— তখন আমরা পরপুরুষ বলিয়া ভাষার অন্তঃপুরের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারি না। প্রত্যেক কথার অন্দর মহলে যে লাজুক ভাব-সকল বাস করে, যাহারা সেই কথার শ্রী, সৌন্দর্য, হৃদয়দেবতা তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ হয় না, কেবল তাহার বহির্দেশবাসী অর্থটুকুমাত্র আফিসের সাজে দেখা দেয়। ২য়— প্রত্যেক কথাটাকে পৃথক পৃথক করিয়া বুঝিতে হয়— অনভিজ্ঞ আনাড়ির কাছে তাহারা সকলেই স্বস্বপ্রধান হইয়া নিজমূর্তি ধারণ করে, তাহারা সকলেই বড়ো হইয়া সমগ্র পদটিকে (sentence-কে) আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। পুলিসের কন্‌স্টেবল যেমন আইন-অনভিজ্ঞ পাড়াগেঁয়ের নিকট প্রবলপ্রতাপান্বিত, আইন বজায় রাখা যাহাদের কাজ সুযোগক্রমে তাহারাই যেমন আইনের উপরে টেক্কা দিয়া দাঁড়ায় এও সেইরূপ। একটি কথার সহিত আর-একটি কথা যে একটি সুন্দর [ঐক্য] শৃঙ্খলার দ্বারা বদ্ধ হইয়া আত্মসংবরণ করিয়া রাখে সেই ঐক্যশৃঙ্খলার উপরে সাহিত্যের সৌন্দর্য ও প্রাণ নির্ভর করে। অপরিচিত অজ্ঞ ব্যক্তি সেই ঐক্যবন্ধন হইতে কথাগুলিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়। ক্রমে ক্রমে অর্থ বোধ হয় কিন্তু সৌন্দর্যবোধ পলায়ন করে।

বিদেশী সংগীত সম্বন্ধে এ কথা আরও খাটে। অভ্যস্ত শ্রেণীয় সংগীতে, সুরবিন্যাসের মধ্যে যে একটি ঐক্য আছে সেইটি সহজে ও শীঘ্র ধরিতে পারি। বিগত সুর স্মৃতিতে থাকে ও আগামী সুর পূর্ব হইতে কতকটা অনুমান করিয়া লইতে পারি— স্বতন্ত্র সুরগুলির অপেক্ষা তাহাদের ঐক্যমাধুর্যের প্রাধান্য অনুভব করিতে পারি, অর্থাৎ প্রকৃত সংগীতটুকু শুনিতে পাই। অনভ্যস্ত সংগীতে প্রত্যেক স্বতন্ত্র সুর উপদ্রব করিয়া মনকে তাড়াইয়া লইয়া যায়, কিছুর উপরে আশ্রয় লইতে দেয় না। সর্বদাই যেন শূন্যে শূন্যে বিরাজ করিতে হয়। তবু লিখিত ভাষার একটা সুবিধা আছে এই যে যখন ইচ্ছা বার বার ফিরিয়া আসা যায়, কিন্তু সুর উড়িয়া চলে, ধরা দেয় না। ভাষার অন্তর্গত প্রত্যেক কথার একটা অর্থ আছে, আমরা মনে মনে সেই অর্থ যোজনা করিয়া লইতে পারি। কিন্তু স্বতন্ত্র সুরের কোনো অর্থ নাই, তাহার সমস্ত অর্থ তাহার ঐক্যের মধ্যেই বিরাজ করে। এইজন্য বিদেশী সাহিত্য অপেক্ষা বিদেশী সংগীত হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ লাভ করিতে অধিক বাধা প্রাপ্ত হয়।

সৌন্দর্য সমগ্রভাবে হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করে, হৃদয়কে উদ্‌বেজিত করে না। বিশুদ্ধ বুদ্ধিগম্য বিষয়কে খণ্ড খণ্ড করিয়া বুঝিতে হয়, কার্যকারণশৃঙ্খলের প্রত্যেক অংশকে মনে মনে অনুসরণ

করিতে হয়— মনকে কর্তৃত্বভার গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু সৌন্দর্যের নিকট মন নিশ্চেষ্টভাব ধারণ করিয়া উপভোগ করে। মনের চেষ্টা শান্ত করিতে না পারিলে সেই সৌন্দর্য উপভোগের ব্যাঘাত হয়। অপরিচিত সাহিত্যে বিশেষত অপরিচিত সংগীতে সেই চেষ্টা অবিশ্রাম জাগ্রত থাকে। প্রত্যেক অনভ্যস্ত শব্দ ও স্বরবিন্যাসে মুহূর্তে মুহূর্তে মনের বিস্ময় উদ্রেক করিয়া তাহাকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তোলে।

পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তক
৬।১০।৮৯

সৌন্দর্য সম্বন্ধে গুটিকতক ভাব

সৃষ্টিকার্যের মধ্যে সৌন্দর্য সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য রহস্যময়। কারণ, জগৎরক্ষায় তাহার একান্ত উপযোগিতা দেখা যায় না।

সৌন্দর্য অন্ন নহে, বস্ত্র নহে, তাহা কাহারও পক্ষে প্রত্যক্ষরূপে আবশ্যক নহে।

তাহা আবশ্যকের অতিরিক্ত দান, তাহা ঈশ্বরের প্রেম।

যাহা কেবলমাত্র আবশ্যক— যাহা নহিলে নয় বলিয়া চাই, তাহাতে আমাদের দারিদ্র্য স্মরণ করাইয়া দেয়। এইজন্য তাহার প্রতি আমরা অনেক সময় অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া আপনার মর্যাদা উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করি। উদরপূর্তিকে আমরা হাতে কলমে অবহেলা করিতে পারি না, কিন্তু মুখে তাহার প্রতি যথেষ্ট দূরছাই প্রয়োগ করি। বুদ্ধি-চর্চার আনন্দকে আমরা উচ্চতর আসন দিই। তাহার একটা কারণ, উদরচর্চা অপেক্ষা বুদ্ধিচর্চা অধিকতর পরিমাণে আমাদের স্বাধীন ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। বিদ্যালোচনা না করিলে তুমি মূর্খ হইবে কিন্তু মারা পড়িবে না।

সংসারে যদি কেবল নির্জল আবশ্যকটুকুমাত্র থাকিত তবে আমরা জগদীশ্বরের দ্বারে ভিক্ষুকরূপে থাকিতাম। তাহা হইলে আমাদিগকে নিতান্তই কেবল দায়ে ফেলিয়া রাখা হইত।

সঙ্গে সঙ্গে প্রেম থাকিলে ভিক্ষা আর ভিক্ষাই থাকে না, যেমন জননীর নিকট হইতে অভাব মোচন।

সৌন্দর্য সেই প্রেমের লক্ষণ, আমাদের মন ভুলাইবার চেষ্টা। যদি সংসারের কাজ লওয়াই উদ্দেশ্য হয় তবে আমাদের মনোহরণের চেষ্টা বাহুল্য। জগতের বড়ো বড়ো দানব-শক্তির মাঝখানে ক্ষুদ্র প্রাণীদের নিকট হইতে অনায়াসে কান ধরিয়া কাজ আদায় করিয়া লওয়া যাইতে পারিত। জগতের সৌন্দর্য বাপুবাছা বলিয়া আমাদের গায়ে হাত বুলাইতেছে কেন?

ওইখানেই যন্ত্রনিয়মের উপরে প্রেমের নিয়ম দেখা দিতেছে। খাদ্যের সহিত রস, শব্দের সহিত সংগীত, দৃশ্যের সহিত আকার ও বর্ণসুষমা, ইহাতেই প্রেমের হাত দেখা যায়।

আমরা টিকিয়া থাকিব প্রকৃতির আত্মরক্ষার পক্ষে ইহাই যথেষ্ট, কিন্তু আনন্দে থাকিব ইহা বাড়ার ভাগ— বিশেষত তাহার জন্য আয়োজন তো কম করিতে হয় নাই! গ্রহতারা তো বেশ চলিতেছে, গাছপালা তো বেশ স্বাদহীন আহার করিয়া অন্ধ ও বধির ভাবে বংশবৃদ্ধি করিতেছে! কিন্তু যেখানেই চেতনার সঞ্চার করা হইয়াছে সেইখানেই কেবলমাত্র শক্তি নহে, তদতিরিক্ত প্রেম অনুভব করানো হইতেছে। শক্তিকে মধুর করিয়া তুলিবার চেষ্টা দেখা যাইতেছে।

শক্তির মধ্যে কার্যকারণশৃঙ্খলা দেখা যায়— এইজন্য তাহা কিয়ৎ-পরিমাণে বিজ্ঞানের আয়ত্ত। কিন্তু সৌন্দর্যের মধ্যে ইচ্ছা দেখা যায়, এইজন্য বিজ্ঞান সেখানে প্রতিহত। এইজন্য সৌন্দর্য অতীব আশ্চর্য রহস্যময়।

এইজন্য সৌন্দর্য অনাবশ্যক হইয়াও আমাদের আত্মার মধ্যে আলোড়ন উপস্থিত করে। যেন ওইখানে অনন্তের সহিত আমাদের নাড়ির টান উপলব্ধি করা যায়।

সৌন্দর্য সৃষ্টির সর্বকনিষ্ঠ, দুর্বল, সুকুমার। কিন্তু তাহাকে সকল বলের উপরিভাগে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। কঠিন গ্রানিটের ভিত্তির উপরে কোমল ধরণীর শ্যামল লাবণ্য। প্রবল গুঁড়ি ও ডালপালার উপরে সুন্দর পুষ্পপল্লব। কঠোর অস্থি-মাংসপেশীর উপরে সুকুমার দেহসৌন্দর্যের বিস্তার। উৎকট পুরুষবলের উপরে অবলা রমণী পুষ্পের মতো প্রস্ফুটিত।

স্বাধীনতাও সৃষ্টির সর্বশেষ সন্তান। মানবই আপন অন্তরে স্বাধীনতা অনুভব করিয়াছে। স্বাধীন আত্মার নিকটে এই দুর্বল সৌন্দর্যের বল সর্বাপেক্ষা অধিক। বলের প্রতিকূলে আমরা বল প্রয়োগ করি। সৌন্দর্যের কাছে আমরা আত্মবিসর্জন করি। সে আমাদের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করিতে চাহে না, আমরা তাহার হস্তে স্বাধীনতা সমর্পণ করিয়া কৃতার্থ হই।

সৌন্দর্য ধৈর্যসহকারে অপেক্ষা করিয়া থাকে। ফুল এক বসন্তে অনাদৃত হইয়া দ্বিতীয় বসন্তে ফোটে। বহির্জগতে কত ফুল ঝরিয়া একটি ফল হয়— ফুল হইতে আমাদের অন্তর্জগতেও যে ফল জন্মে তাহাও এইরূপ বহুবিফলতার সন্তান।

কিন্তু ঈশ্বরের শক্তি ঈশ্বরের ঝড় অপেক্ষা করে না। সে যখন প্রবাহিত হয় তখনি অরণ্যপর্বত কাঁপিয়া উঠে— তরুলতা ভূমিশায়ী হয়। তাহার ফল সদ্য সদ্য।

ধীরে ধীরে আমাদের পাষাণ হৃদয় গলাইয়া দিতেছে, পাশব বলের প্রতি আমাদের লজ্জা জন্মাইয়া দিতেছে— অথচ একটি কথাও কহিতেছে না, সে কে? সে এই অসীম ধৈর্যবান সৌন্দর্য।

সে কাড়িয়া লয় না, আনন্দ দান করিয়া যায়, লোকের প্রাণ আপনি বশ হয়। মানব সভ্যতার উচ্চতম শিক্ষাই এই— প্রেমের দ্বারা দুর্বলভাবে পশুবলের উপর জয়লাভ করো। সৌন্দর্য ছাড়া জগতের আর কোথাও তো এ কথা লিপিবদ্ধ হয় নাই। আর সকলেই মারামারি কাড়াকাড়ি করে, প্রেম স্নিগ্ধনেত্রে চাহিয়া থাকে, সহিয়া যায়।

যোগ্যতমের উদ্‌বর্তন— এই নিয়ম যদি আলোচনা করিয়া দেখা যায় তবে প্রতীতি হয় বলের অপেক্ষা সৌন্দর্যের টিকিবার শক্তি অধিক। কারণ, সৌন্দর্য কাহাকেও আঘাত করে না, সুতরাং জগতের আঘাত ইচ্ছা উদ্রেক করে না।

সৌন্দর্য ক্ষেত্রেই আমরা ঈশ্বরের সমকক্ষ। ক্ষমতায় তিনি কোথায় আমি কোথায়! যেখানে সৌন্দর্য সেখানে আমরা দেখিতে পাই ঈশ্বরও আমাদিগকে চাহিতেছেন।

বহির্জগতে সৌন্দর্য, অন্তর্জগতে প্রেম। ভয়ে, অভাববোধে কাজ চলে, আদান-প্রতিদানের নিয়মে কাজ চলে, প্রেম বাহুল্যমাত্র। এমন-কি, উহাতে কাজের ক্ষতিও হয়। প্রেম অনেক সময় আপন স্বাধীনতাগর্বে আমাদের কাজ বিগড়াইয়া দেয়— তবু প্রকৃতি উহাকে ধ্বংস করিতে পারে না, শাসন করিয়া নির্জীব করিতে পারে না। থাকিয়া থাকিয়া প্রচণ্ডবলে প্রকৃতির বিরুদ্ধে সে বিদ্রোহ করিয়া বসে। এমন-কি, প্রকৃতির ন্যায্য শাসনও অনেক সময়ে তাহার অসহ্য বোধ হয়। সে যেন বলে, আমি দেবকুমার, পরিপূর্ণ অক্ষয় স্বাধীনতাই আমার পিতৃভবন— সেইখানকার জন্যই সর্বদা আমার প্রাণ কাঁদিতেছে— এই মর্ত্য প্রকৃতির শাসন আমি মানিব না। জগৎ কে, সমাজ কে, লোকাচার কে! আমি যদি বলি, যাও— আমি তোমাদিগকে মানিতে চাহি না, তবে বড়ো জোর, আমাকে প্রাণে বিনাশ করিতে পারে, কিন্তু আমার সেই প্রবল স্বাধীন ইচ্ছাকে তো বাঁধিতে পারে না! সেই প্রেমের, সেই স্বাধীনতার মধ্যে একটি মরণাতীত দৈবভাব জাজ্জ্বল্যরূপে অনুভব করিতে পারি বলিয়াই তাহার খাতিরে অনেক সময়ে প্রাণকে তুচ্ছজ্ঞান করি, নহিলে প্রাণটা বড়ো সামান্য জিনিস নহে!

রচনা : [১৫] অক্টোবর ১৮৮৯
ভারতী ও বালক
শ্রাবণ ১২৯৯

বাংলা সাহিত্যের প্রতি অবজ্ঞা

[শেষাংশ]

যাহা অসম্ভব তাহা প্রত্যাশা করা অজ্ঞতার লক্ষণ। বহু যুগের চিন্তাস্তরের উপর ইংরাজি সাহিত্য নির্মিত, বঙ্গসাহিত্য যতই শির উত্তোলন করুক একেবারেই তাহার সমকক্ষ হইতে পারিবে না। অতএব তুলনা করিবার সময় ইংরাজি সাহিত্য হইতে তাহার সেই উচ্চ সুবিধাটুকু হরণ করিয়া লইয়া দেখিতে হয়।

আমরা ইংরাজি সাহিত্য হইতে যাহা-কিছু শিক্ষা পাইতেছি তাহার একেবারে আরম্ভ হইতে বাংলা ভাষায় নূতন করিয়া চিন্তা করিয়া লইতে হইতেছে। ইংরাজিতে সেগুলা হয়তো অত্যন্ত গোড়াকার কথা, এবং সমালোচকের চক্ষে তাহা যৎসামান্য ও নূতন [নহে] কিন্তু বাংলায় তাহা নূতন আবিষ্কৃত। নূতন আবিষ্কারের মধ্যে যে তেজ ও উজ্জ্বলতা থাকে উক্ত সামান্য কথাগুলিও বাংলায় সেই মহিমা লাভ করে। পুরাতন কথা নূতন হৃদয়ের মধ্যে সদ্য পুনর্জন্ম লাভ করিয়া নবজীবন প্রাপ্ত হয়। বর্তমান কালে ইংরাজি ভাষার অধিকাংশ লেখক নির্মাণ কার্যে নিযুক্ত আছেন, অর্থাৎ পুরাতন পরিচিত ভাবগুলি লইয়া বিচিত্র আকারে বিন্যাস করিতেছেন মাত্র। বঙ্গ ভাষায় সৃষ্টি করিতে হইতেছে, সুতরাং অন্য সাহিত্যের ক্ষুদ্র কথাটিও বাংলা ভাষায় অত্যন্ত মহৎ। আমাদের হৃদয়ে বিবিধ কর্মকাণ্ডের সংঘর্ষজনিত প্রবল আবেগ নাই বটে তথাপি যেটুকু উত্তাপ আছে তাহাই অনুরাগভরে সঞ্চারিত করিয়া Fossil সত্যগুলিকে পুনর্জীবিত করিয়া তুলিতেছি। যাঁহাদের লেখনীমুখে বঙ্গভাষায় সেই অর্ধজড়ত্বপ্রাপ্ত যৌবনহারা সত্যগুলি নববসন্ততাপে বিকশিত হইয়া উঠিতেছে, তাঁহারা সেই সৃজনের আনন্দে পুঁথিপড়া সমালোচকের উপেক্ষাকে উপেক্ষা করিতে পারেন।

বঙ্গদেশে প্রকৃত সাহিত্যের সমালোচনা করিতে পারেন এমন কয়জন লোক আছেন। কেহ নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। প্রচলিত বাংলা ভাষায় 'জ্যেঠামি' নামক একটি শব্দ আছে সেটি শ্রুতিমধুর নহে; কিন্তু আমাদের সমালোচনাকে আর কোনো নাম দেওয়া যায় না। যে ছেলে বুড়োদের মতো পাকা কথা কহে তাহাকে আমরা জ্যাঠা বলি। অর্থাৎ যাহার অভিজ্ঞতা নাই অথচ অভিজ্ঞতার বচনগুলি আছে সেই জ্যাঠা। বঙ্গদেশে আমাদের কোনো সাহিত্যের প্রকৃত অভিজ্ঞতা নাই। ইংরাজি সাহিত্য আমরা বই পড়িয়া জানি এবং বঙ্গসাহিত্য এখনো নূতন উর্বরা দ্বীপের ন্যায় অজ্ঞাত সমুদ্রগর্ভ হইতে সম্পূর্ণ জাগিয়া উঠে নাই। আমরা কোনো জীবনচঞ্চল সাহিত্যের সৃজনকার্যের মধ্যে থাকিয়া মানুষ হইয়া উঠি নাই। সুতরাং সাহিত্যের সেই অমোঘ নাড়িজ্ঞানটুকু আমরা লাভ করিতে পারি নাই। আমরা সাবধানে ভয়ে ভয়ে তুলনা করিয়া পুঁথি মিলাইয়া বিচার করি। কিন্তু সাহিত্যের ন্যায় জীবন্ত বস্তুর পক্ষে এরূপ নির্জীব বিচারপ্রণালী একেবারেই অসংগত। প্রতিক্ষণেই তাহার মধ্যে এত বিচিত্র আকার ও আলোকছায়ার সমাবেশ হইতেছে যে অলক্ষিতে বহুকালসঞ্চিত আন্তরিক সজাগ অভিজ্ঞতার দ্বারাই আমরা তাহার বিচার করিতে পারি।

চিত্রবিদ্যাই বল কবিত্বই বল এক হিসাবে প্রকৃতির সমালোচনা। চিত্রশিল্পী প্রকৃতির সহস্র আকারসংযোগের মধ্যে চিত্রপটের জন্য একটি বিশেষ অংশ নির্বাচন করিয়া লয়, কবি অন্তর ও বহিঃপ্রকৃতির মধ্যে বিশেষ একটি দৃশ্য কল্পনার আলোকে আলোকিত করিয়া লয়; এই নির্বাচনের উপরেই তাহাদের অমরত্ব নির্ভর করে। এই নির্বাচনেই কবি ও শিল্পীর সমালোচনশক্তি প্রকাশ পায়। বহুকাল হইতে অলক্ষিতে নিজের জীবনের মর্মমধ্যে প্রকৃতির যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন তাহা হইতেই তাঁহারা এই অভ্রান্ত সমালোচনপটুত্ব লাভ করিয়াছেন। যদি তাঁহারা প্রকৃতির মধ্যে বাস না করিয়া প্রকৃতির সতত আবর্তিত পরিবর্তিত জীবন্ত শক্তির মধ্যে মানুষ না হইয়া কেবল অলংকারশাস্ত্র ও সমালোচনার গ্রন্থ পাঠ করিতেন তবে তাঁহারা কি আন্তরিক

নিপুণতা লাভ করিতেন? তেমনি জীবন্ত সাহিত্যের প্রাণশক্তি যেখানে বর্তমান থাকিয়া কার্য করিতেছে সেইখানে সংলগ্নভাবে থাকিলে তবেই যথার্থ অন্তরের মধ্যে সেই অভ্রান্ত সাহিত্য-অভিজ্ঞতা লাভ করা যায় ও সমালোচনা করিবার ক্ষমতা জন্মে। তখন আর পুঁথি মিলাইয়া কাজ করিতে হয় না, তখন আর তর্জমা করিয়া পরখ করিতে হয় না, তখন নূতন সৃষ্টি নূতন সৌন্দর্য দেখিলে অগাধ সমুদ্রে পড়িতে হয় না, তখন কল্পনারাজ্যের নূতন পুরাতন সকলেরই সহিত চক্ষের নিমেষে কী এক মন্ত্রের [বলে] পরিচয় হইয়া যায়।

২৪।৩।৯০ (আজ সু [রেনরা] সোলাপুর যাচ্চে)—
পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তক
[১২ চৈত্র ১২৯৬]

[কাব্য]

কাব্যের আসল জিনিস কোন্‌টা তাহা লইয়া সর্বদাই বকাবকি হইয়া থাকে কিন্তু প্রায় কোনো মীমাংসা হয় না। এ সম্বন্ধে আমার মত আমি সংগীত ও কবিতা নামক প্রবন্ধে বাল্যকালে লিখিয়াছিলাম, এই খাতায় সংক্ষেপে তাহারই পুনরুক্তি করিতে বসিলাম।

... এইখানে আমি এমন একটা কথা বলিতে চাহি যাহা শুনিতে অত্যন্ত বাষ্পময় কাল্পনিক মনে হইতে পারে কিন্তু যাহা আমি একান্ত প্রকৃত সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি।— জগতের সমস্ত বিষয়ের মধ্যেই অসীমতা আছে; যাহাকে আমরা সুন্দর বলিয়া অনুভব করি এবং ভালোবাসি, তাহার মধ্যেই সেই অসীমতা আমরা কিয়ৎ পরিমাণে উপভোগ করিতে পারি। অতএব কোনো সৌন্দর্য সম্বন্ধে কেহ শেষ কথা বলিতে পারে না। কোনো ফুলের সম্বন্ধে পৃথিবীর আদি কবি যাহা বলিয়াছেন তাহাতে তিনি তাহার সৌন্দর্যের শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার পরবর্তী কবি যদি আরও কিছু বলিয়া থাকেন তবে তাহা সেই ক্ষুদ্র ফুলের পক্ষে অধিক হয় না। বিষয়টা একই এবং পুরাতন কিন্তু আদিকাল হইতে এখনো পর্যন্ত মানুষ তাহার নূতনত্ব শেষ করিতে পারে নাই! আমি একটি তুচ্ছ ফুল সম্বন্ধে যতটা কথা বলিতে পারি, কোনো কবি তাহার অপেক্ষা ঢের বেশি বলিলেও যদি কথাটা অকৃত্রিম সুন্দররূপে প্রকাশ করা হয়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ আমার মনে হইবে, বটে, বটে, ফুল সম্বন্ধে এতটা কথা বলা যাইতে পারে বটে! আমি যে এতদিন স্বীকার করি নাই, তাহাতে ফুলের খর্বতা নাই আমারই খর্বতা। ফুল আপনার মধ্যে অসীমতা প্রতিষ্ঠিত করিয়া সুন্দর হইয়া দাঁড়াইয়া আছে— যাহার যতটা ক্ষমতা সে ততটা অনুভব করে।

অতএব এখানে বিষয় লইয়া কথা নহে, প্রকাশ লইয়া কথা। জুঁইফুল সুন্দর এ কথা বড়ো কবিও জানে ছোটো কবিও জানে, অকবিও জানে— কিন্তু যে যত ভালো করিয়া প্রকাশ করে জুঁইফুলকে সে তত অধিক করিয়া আমার হাতে আনিয়া দেয়।

কেবল তাহাই নয়। কারণ, যদি কেবল তাহাই হইত, তাহা হইলে জুঁইফুল সম্বন্ধে সবচেয়ে বড়ো কবির কবিতা পড়িয়া তৎসম্বন্ধে আর-কোনো কবির রচনা পড়া অনাবশ্যক ও বিরক্তিজনক হইত।

কিন্তু ফুলের মধ্যে অসীমতা আছে বলিয়াই শ্রেষ্ঠ কবির কবিতায় তাহার অগাধ গভীরতা এবং ভালো মন্দ সহস্র কবির কবিতায় তাহার অপার বিস্তৃতি অনুভব করি। দেখিতে পাই, কালের অনেক পরিবর্তন হইয়াছে এবং মানবের মধ্যে অনেক বৈচিত্র্য আছে কিন্তু তথাপি সর্বকালে সর্বকবির মধ্যে এই ফুলের সমাদর। এইজন্য এক কবির পরে আর-এক কবি যখন একই পুরাতন কথা বলে তখন ফুলের অসীমতার প্রতি আমরা আরও একটু নূতন করিয়া অগ্রসর হই।

ফুলের মধ্যে প্রবেশ করিবার একটিমাত্র পথ আছে— তাহার বাহ্যিক সৌন্দর্য; আমাদের সমগ্র মানবত্ব তাহার মধ্যে আপনার স্থান করিয়া লইবার উপায় পায় না; এইজন্য ফুলে আমাদের আংশিক আনন্দ। কোনো কোনো কবির কবিতায় এই ফুলকে কেবলমাত্র জড়সৌন্দর্যভাবে না দেখিয়া ইহার মধ্যে আমাদের অনুরূপ মনোভাব এবং আত্মা কল্পনা করিয়া লইয়া আমাদের আনন্দ অপেক্ষাকৃত সংগতি প্রাপ্ত হয়।

যাহাদের কিছুমাত্র কল্পনাশক্তি আছে তাহারা সৌন্দর্যকে নির্জীবভাবে দেখিতে পারে না। কারণ, সৌন্দর্য বিষয়ের একটা অতিরিক্ত পদার্থ— তাহা তাহার আবশ্যকীয় নহে। এইজন্য মনে হয় সৌন্দর্যের মধ্যে যেন একটা ইচ্ছাশক্তি, একটা আনন্দ, একটা আত্মা আছে। ফুলের আত্মা যেন সৌন্দর্যে বিকশিত ও প্রফুল্ল হইয়া উঠে, জগতের আত্মা যেন অপার বহিঃসৌন্দর্যে আপনাকে প্রকাশ করে। অন্তরের অসীমতা যেখানে বাহিরে আপনাকে প্রকাশ করিতে পারিয়াছে সেইখানেই যেন সৌন্দর্য— সেই প্রকাশ যেখানে যত অসম্পূর্ণ সেইখানে তত সৌন্দর্যের অভাব, রূঢ়তা, জড়তা, চেষ্টা, দ্বিধা ও সর্বাঙ্গীণ অসামঞ্জস্য।

সে যাহাই হউক, ফুলের মধ্যে আমাদের সম্পূর্ণ আত্মপরিতৃপ্তি সম্ভবে না। এইজন্য কেবলমাত্র ফুলের কবিতা সাহিত্যে সর্বোচ্চ সমাদর পাইতে পারে না। আমরা যে কবিতায় একত্রে যত অধিক চিত্তবৃত্তির চরিতার্থতা লাভ করি তাহাকে ততই উচ্চশ্রেণীয় কবিতা বলিয়া সম্মান করি। সাধারণত স্বভাবত যে জিনিসে আমাদের একটিমাত্র বা অল্পসংখ্যক চিত্তবৃত্তির তৃপ্তি হয় কবি যদি তাহাকে এমনভাবে দাঁড় করাইতে পারেন যাহাতে তাহার মধ্যে আমাদের অধিকসংখ্যক চিত্তবৃত্তির চরিতার্থতা লাভ হয় তবে সে কবি আমাদের আনন্দের একটি নূতন উপায় আবিষ্কার করিয়া দিলেন বলিয়া তাঁহাকে সাধুবাদ দিই। বহিঃপ্রকৃতির মধ্যে আত্মার সৌন্দর্য সংযোগ করিয়া কবি Wordsworth এই কারণে আমাদের নিকট এত সম্মানাস্পদ হইয়াছেন।

এই প্রসঙ্গে আমার একটি কথা মনে পড়িতেছে। একদিন চৈতন্য লাইব্রেরিতে একজন কাব্যরসসন্দিগ্ধ ব্যক্তি আমাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, "আচ্ছা মহাশয়, বসন্তকালে বা জ্যোৎস্নারাত্রে লোকের মনে বিরহের ভাব কেন উদয় হইবে আমি তো কিছু বুঝিতে পারি না। গাছপালা ফুল পাখি প্রভৃতি ভালো ভালো জিনিসে মানুষ খুশি হইয়া যাইবে ইহা বুঝিতে পারি, কিন্তু বিরহব্যথায় চঞ্চল হইয়া উঠিবে ইহার কারণ পাওয়া যায় না।"

ইহার উত্তরে আমি বলিয়াছিলাম— প্রকৃতির যে-সকল সৌন্দর্যে আমাদের চিত্ত আকর্ষণ করে মানবের পক্ষে তাহা আংশিক। জ্যোৎস্না কেবল দেখিতে পাই, পাখির গান কেবল শুনিতে পাই, ফুল আমাদের বহিরিন্দ্রিয়ের দ্বারে আসিয়া প্রতিহত হয়। উপভোগের আকাঙ্ক্ষামাত্র জাগ্রত করিয়া দেয়, তাহার পরিতৃপ্তির পথ দেখায় না। তখন মানবের মন স্বভাবতই মানবের জন্য ব্যাকুল হয়। কারণ, মানব ভিন্ন আর কোথাও একাধারে মানবের দেহ মন আত্মার চরম আকাঙ্ক্ষাতৃপ্তির স্থান নাই। এইজন্যই বসন্তে জ্যোৎস্নারাত্রে বাঁশির গানে বিরহ।

এইজন্য প্রেমের গানে চিরনূতনত্ব। প্রেম সমগ্র মানবপ্রকৃতিকে একেবারে কেন্দ্রস্থলে আকর্ষণ করে। এককালে তাহার দেহ মন আত্মায় পরিপূর্ণ টান পড়ে। এইজন্য পৃথিবীর অধিকাংশ কবিতাই প্রেমের— এবং সাধারণত প্রেমের কবিতাতেই মানুষকে অধিক মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে।

আমার মতে সবসুদ্ধ এই দাঁড়াইতেছে নূতন আনন্দ আবিষ্কার করিয়া ও পুরাতন আনন্দ ব্যক্ত করিয়া কবিতা আমাদের নিকট মর্যাদা লাভ করে। নূতন সত্য আবিষ্কার করিয়া বা পুরাতন সত্য ব্যাখ্যা করিয়া নহে।

১২।১।৯১
বির্জিতলাও
পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তক

একটি পত্র

সহৃদয়েষু— অল্পদিন হইল, আমি কোনো কাব্য সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ কোনো কাগজে বাহির করিয়াছিলাম। সেটা পড়িয়া আপনি অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। আপনার মতে এরূপ লেখাকে রীতিমতো সমালোচনা বলা যায় না। আমার বক্তব্য এই যে, আমার সেই লেখাটুকুকে সমালোচনা না বলিয়া আর কোনো উপযুক্ত নাম দিলে যদি তাহার ভাব গ্রহণের অধিকতর সুবিধা হয়, আমার তাহাতে আপত্তি থাকিতে পারে না। আমি দেখিয়াছি, সমালোচক অনেক সময়ে নিজের নামকরণের সহিত নিজে বিবাদ করিয়া লেখকের উপর বিরক্ত হইয়া উঠেন। পুত্রমাত্রকেই পদ্মলোচন নাম দেওয়া যায় না— যদি মোহবশত অপাত্রে উক্ত নাম প্রয়োগ করা হইয়া থাকে, এবং যদি সেই নামধারী দুর্ভাগ্য ব্যক্তি চক্ষুর আয়তির অপেক্ষা নাসার দৈর্ঘ্যের জন্য বিখ্যাত হইয়া পড়ে, তবে তাহার উপর রাগ করা সংগত হয় না।

সমালোচনা বলিতে যদি বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, মনস্তত্ত্ব, নীতিশাস্ত্র প্রভৃতি ব্যায়ামপটু দলবল লইয়া কাব্যের অন্তঃপুর আক্রমণ বুঝায়, তবে আমার দ্বারা তাহা অসম্ভব। আমি এইটুকু বলিতে পারি, আমার কাছে কেমন লাগিল। আমি একজন মানুষ, আমার এক প্রকার বিশেষ মনের গঠন; বিশেষ কাব্যপাঠে আমার মনে যে ভাবোদয় হয়, আমি তাহাই প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি— কীরূপ ভাবোদয় হওয়া উচিত ছিল, তাহা আমি নির্ভয়ে সাহসপূর্বক বলিতে পারি না— যিনি বিশেষ কৌশলপূর্বক নিজেকে নিজে লঙ্ঘন করিতে পারেন, যিনি নিজের চেয়ে নিজে বেশি বুঝেন, তিনিই সে বিষয়ে নির্ভুল মত দিতে পারেন।

আমার অনেক সময়ে মনে হয়, ভূমিকা এবং উপসংহার ফাঁদিয়া আগাগোড়া মিল করিয়া বড়ো বড়ো প্রবন্ধ লেখা মনুষ্য-সমাজে প্রচলিত হওয়াতে পৃথিবীতে অনেক বাজে কথা এবং মিথ্যা কথার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থের উপর মানুষের একটি বর্বর অনুরক্তি আছে— এইজন্য প্রায় সকল জিনিসেরই গজে মাপিয়া মূল্য স্থির হয়। এই কারণেই সকল কথা বড়ো করিয়া বলিতে হয়। কিন্তু সত্য রবারের মতো স্থিতিস্থাপক পদার্থ নয়। বরঞ্চ তাহাকে বাড়াইতে গেলেই কমাইতে হয়। খাঁটিকে খাঁটি করিতে হইলে তাহাকে যেমনটি তেমনই রাখিতে হয়, ওজন বাড়াইবার জন্য তাহাতে যতই জল মিশানো যায়, ততই তাহার দর কমিয়া আইসে।

একটি কাব্যগ্রন্থ যখন ভালো লাগে, তখন তাহার সম্বন্ধে বেশি কথা বলা কতই শক্ত! ঠিক মনের কথা, তাহা লিখিলে রীতিমতো প্রবন্ধ কিংবা গ্রন্থ হয় না। এইজন্য বসিয়া বসিয়া, ভাবিয়া ভাবিয়া, পরিচ্ছেদের উপর পরিচ্ছেদ স্তূপাকার করিয়া, তত্ত্বের উপর তত্ত্ব আকর্ষণ করিয়া, নিজের মানসিক পরিশ্রমের একটা কীর্তিস্তম্ভ নির্মাণ করিয়া, সেটাকে খুব একটা উন্নত সত্য বলিয়া মনে হয়। বেশি পরিশ্রমের ধনকে বেশি গৌরবের বলিয়া মনে হয়। মাঝের হইতে যেটি ঠিক সত্য, যেটি আসল কথা, সেটি স্তূপের মধ্যে চাপা পড়ে।

ঠিক সত্য মানে কী? কাব্যসম্বন্ধীয় সত্য বৈজ্ঞানিক সত্য নহে। পাঁচ-সাতশো প্রমাণ তাহার প্রমাণ নহে। হৃদয়ই তাহার প্রমাণ। আমি যতটুকু ঠিক অনুভব করি, ততটুকু সত্য। অবশ্য শিক্ষা এবং প্রকৃতিগুণে কোনো কোনো সহৃদয় বিশেষরূপে কাব্যরসজ্ঞ, এবং তাঁহাদের পরীক্ষিত সিদ্ধান্ত সাহিত্যপ্রিয় লোকদের নিকট চিরকাল সমাদৃত হয়। অপর পক্ষে কোনো কোনো হৃদয়ে কাব্যের জ্যোতি রীতিমতো প্রতিফলিত হইবার মতো স্বচ্ছতা নাই, কিন্তু যেমনই হউক, কাব্যসম্বন্ধে নিজের নিজের ভাব ব্যক্ত করা ছাড়া আর কিছু সম্ভব হয় না।

কোনো কোনো ইংরাজ লেখক বলেন, সমালোচনা একটি বিশেষ ব্যবসায়, ইহার জন্য বিশেষ শিক্ষা আবশ্যক। প্রকৃত সমালোচককে নিজের ব্যক্তিত্ব বিসর্জন করিয়া, নিজের ভালোমন্দ-লাগাকে খাতির না করিয়া, বিচার করিতে হইবে। অর্থাৎ অকূল পাথারে লেখনী ভাসাইতে হইবে।

এ কথা অস্বীকার করা যায় না, একজন অশিক্ষিত লোকের যাহা ভালো লাগে, শিক্ষিত লোকের তাহা ভালো লাগে না, এবং অশিক্ষিত লোকের যেখানে অধিকার নাই, শিক্ষিত লোকের সেখানে বিহারস্থল। অর্থাৎ বুনো আমগাছ মাটি এবং বাতাস হইতে যথেষ্ট পরিমাণ শর্করা সংগ্রহ করিতে পারে না, কিন্তু বহুকাল চাষের গুণে সেই গাছের এমন একটা পরিবর্তন হয় যে, মিষ্ট রস উৎপাদন করা তাহার পক্ষে স্বাভাবিক হইয়া পড়ে।

কিন্তু দুই গাছই একই পদ্ধতি অনুসারে ফল ফলায়। উভয়েই নিজের ভিতর হইতে কাজ করে।

কাব্য-সমালোচনা-সম্বন্ধেও শিক্ষিত অশিক্ষিত নিজের হৃদয় দ্বারা রস গ্রহণ করে, তবে অবস্থা-গতিকে হৃদয়ের পার্থক্য জন্মিয়াছে। বিজ্ঞানের মীমাংসার স্থল বহির্জগতে; কাব্যের মীমাংসার স্থল নিজের অন্তর ব্যতীত আর-কোথাও হইতে পারে না।

এইজন্য কাব্যসমালোচনা ব্যক্তিগত। চাঁদের আলো পদ্মার বালুচরের উপর পড়িয়া একরূপ আকার ধারণ করে, নদীর জলের উপর পড়িয়া আর-একরূপ ভাব ধারণ করে, আবার ওপারের ঘনসন্নিবিষ্ট বনভূমির মধ্যে পড়িয়া আর-এক রূপে প্রতিভাত হয়। চন্দ্রালোকের মধ্যে যে কাব্যরস আছে, ইহাই তাহার তিন প্রকার সমালোচনা। কিন্তু ইহা পাত্রগত, তাহার আর সন্দেহ নাই। তথাপি চন্দ্রালোকের কবিত্ব হিসাবে তিনই সত্য। চন্দ্রালোককে দেশকালপাত্র হইতে উঠাইয়া লইয়া, তাহার অতি বিশুদ্ধ নিরপেক্ষ সমালোচনা করিতে হইলে, তাহার কবিত্ব ছাঁটিয়া দিতে হয়। তখন তাহা হইতে কেবল বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাই সম্ভব।

আরও একটি কথা আছে। বিশেষ কাব্য সম্বন্ধে আমি যে-কোনো তত্ত্বকথা লিখি, তাহা কালক্রমে মিথ্যা হইবার কোনো আটক নাই, কিন্তু আমার কেমন লাগিল, তাহা কোনো কালে মিথ্যা হইবার জো নাই। আমি যদি এমন করিয়া লিখিতে পারি, যাহাতে আমার ভালোমন্দ-লাগা অধিকাংশ যোগ্য লোকের মনে সঞ্চারিত করিয়া দিতে পারি, তবে সেটা একটা স্থায়ী সাহিত্য হইয়া দাঁড়ায়; কিন্তু আমি যদি একটা ভ্রান্তমত অধিকাংশ সাময়িক লোকের মনে বিশ্বাস জন্মাইয়া দিতে পারি, তথাপি সেটা স্থায়ী হয় না। মনে করুন, আমি যদি প্রমাণ করিয়া দিই যে, কুমারসম্ভব সাংখ্য মতের একটি সুচতুর ব্যাখ্যা, অতএব তাহা একটি শ্রেষ্ঠ কাব্য, তবে তাহা বর্তমান কালের স্বদেশবৎসল দার্শনিকবর্গের যতই মুখরোচক হউক, সাময়িক ভাব ও মতের পরিবর্তনকালে তাহার কোনো মূল্য থাকিবে না। কিন্তু তাঁহার কাব্যাংশ আমার যে কতখানি ভালো লাগে, আমি যদি ভালো করিয়া ব্যক্ত করিতে পারি, আমি যদি সুন্দর করিয়া বলিতে পারি, আহা কুমারসম্ভব কী সুন্দর, তবে সে কথা কোনো কালে অমূলক হইয়া যাইবে না।

কিন্তু আমি আত্মরক্ষা করিতে গিয়া অন্যকে আক্রমণ করিতে চাহি না। যাঁহারা বুদ্ধি দিয়া কাব্যকে বিশ্লিষ্ট করিয়া সমালোচনা করেন, তাঁহাদিগকে নিন্দা করি না। যখন মানব-হৃদয় হইতে কাব্য প্রসূত, তখন কাব্যের মধ্যে ইতিহাস সমাজনীতি মনস্তত্ত্ব সমস্তই জড়িত আছে বলিয়াই কাব্য ন্যূনাধিক পরিমাণে আমাদের ভালো লাগে; অতএব কৌতূহলী লোকদিগের শিক্ষার জন্য সেগুলিকে টুকরা টুকরা করিয়া দেখানো দোষের নহে।

শুদ্ধ আমার বক্তব্য এই যে, সমালোচনা কেবল ইহাকেই বলে না। কেবল কাব্যের উপাদান আবিষ্কার করিলেই হইবে না; কাব্যকে উপভোগ করিতে শিক্ষা দিতে হইবে। কোমর বাঁধিয়া নহে, তর্ক করিয়াও নহে। হৃদয়ের ভাব যে উপায়ে এক হৃদয় হইতে অন্য হৃদয়ে সংক্রামিত হয়, সেই পদ্ধতিতে অর্থাৎ ঠিক আন্তরিক ভাবটুকু অন্তরের সহিত ব্যক্ত করা। নিজের হৃদয়পটে কাব্যকে প্রতিফলিত করিয়া দেখানো। তালিকার পরিবর্তে চিত্র, তত্ত্বের পরিবর্তে ভাব প্রকাশ করা।

সাহিত্য
কার্তিক ১২৯৯

বাংলা লেখক

লেখকদিগের মনে যতই অভিমান থাক্, এ কথা অস্বীকার করিবার জো নাই যে, আমাদের দেশে পাঠক-সংখ্যা অতি যৎসামান্য। এবং তাহার মধ্যে এমন পাঠক 'কোটিকে গুটিক' মেলে কি না সন্দেহ, যাঁহারা কোনো প্রবন্ধ পড়িয়া, কোনো সুযুক্তি করিয়া আপন জীবনযাত্রার লেশমাত্র পরিবর্তন সাধন করেন। নির্জীব নিঃস্বত্ব লোকের পক্ষে সুবিধাই একমাত্র কর্ণধার, সে কর্ণের প্রতি আর কাহারও কোনো অধিকার নাই।

পাঠকের এই অচল অসাড়তা লেখকের লেখার উপরও আপন প্রভাব বিস্তার করে। লেখকেরা কিছুমাত্র দায়িত্ব অনুভব করেন না। সত্য কথা বলা অপেক্ষা চতুর কথা বলিতে ভালোবাসেন। সুবিজ্ঞ গুরু, হিতৈষী বন্ধু, অথবা জিজ্ঞাসু শিষ্যের ন্যায় প্রসঙ্গের আলোচনা করেন না, কূটবুদ্ধি উকিলের ন্যায় কেবল কথার কৌশল এবং ভাবের ভেলকি খেলাইতে থাকেন।

এখন দাঁড়াইয়াছে এই— যে যার আপন আপন সুবিধার সুখশয্যায় শয়ান, লেখকদিগের কার্য, স্ব স্ব দলের বৈতালিক বৃত্তি করিয়া সুমিষ্ট স্তবগানে তাঁহাদের নিদ্রাকর্ষণ করিয়া নেওয়া।

মাঝে মাঝে দুই দলের লেখক রঙ্গভূমিতে নামিয়া লড়াই করিয়া থাকেন এবং দ্বন্দ্বযুদ্ধের যত কৌশল দেখাইতে পারেন ততই নিজ নিজ সম্প্রদায়ের নিকট বাহবা লাভ করিয়া হাস্যমুখে গৃহে ফিরিয়া যান।

লেখকের পক্ষে ইহা অপেক্ষা হীনবৃত্তি আর কিছু হইতে পারে না। এই বিনা বেতনে চাটুকার এবং জাদুকরের কাজ করিয়া আমরা সমস্ত সাহিত্যের চরিত্র নষ্ট করিয়া দিই।

মানুষ যেমন চরিত্রবলে অনেক দুরূহ কাজ করে, অনেক অসাধ্য সাধন করে, যাহাকে কোনো যুক্তি, কোনো শক্তির দ্বারা বশ করা যায় না তাহাকেও চরিত্রের দ্বারা চালিত করে, এবং দীপস্তম্ভের নির্নিমেষ শিখার ন্যায় সংসারের অনির্দিষ্ট পথের মধ্যে জ্যোতির্ময় ধ্রুব নির্দেশ প্রদর্শন করে— সাহিত্যেরও সেইরূপ একটা চরিত্র আছে। সে চরিত্র, কৌশল নহে, তার্কিকতা নহে, আস্ফালন নহে, দলাদলির জয়গান নহে, তাহা অন্তর্নিহিত নির্ভীক, নিশ্চল জ্যোতির্ময় সত্যের দীপ্তি।

আমাদের দেশে পাঠক নাই, ভাবের প্রতি আন্তরিক আস্থা নাই, যাহা চলিয়া আসিতেছে তাহাই চলিয়া যাইতেছে, কোনো কিছুতে কাহারও বাস্তবিক বেদনাবোধ নাই; এরূপ স্থলে লেখকদের অনেক কথাই অরণ্যে ক্রন্দন হইবে এবং অনেক সময়েই আদরের অপেক্ষা অপমান বেশি মিলিবে।

এক হিসাবে অন্য দেশ অপেক্ষা আমাদের এ দেশে লেখকের কাজ চালানো অনেক সহজ। লেখার সহিত কোনো যথার্থ দায়িত্ব না থাকাতে কেহ কিছুতেই তেমন আপত্তি করে না। ভুল লিখিলে কেহ সংশোধন করে না, মিথ্যা লিখিলে কেহ প্রতিবাদ করে না, নিতান্ত ছেলেখেলা করিয়া গেলেও তাহা "প্রথম শ্রেণীর" ছাপার কাগজে প্রকাশিত হয়। বন্ধুরা বন্ধুকে অম্লানমুখে উৎসাহিত করিয়া যায়, শত্রুরা রীতিমতো নিন্দা করিতে বসা অনর্থক পণ্ডশ্রম মনে করে।

সকলেই জানেন, বাঙালির নিকটে বাংলা লেখার, এমন-কি, লেখামাত্রেরই এমন কোনো কার্যকারিতা নাই, যেজন্য কোনোরূপ কষ্ট স্বীকার করা যায়। পাঠকেরা কেবল যতটুকু আমোদ বোধ করে ততটুকু চোখ বুলাইয়া যায়, যতটুকু নিজের সংস্কারের সহিত মেলে ততটুকু গ্রহণ করে, বাকিটুকু চোখ চাহিয়া দেখেও না। সেইজন্য যে-সে লোক যেমন-তেমন লেখা লিখিলেও চলিয়া যায়।

অন্যত্র, যে দেশের লোকে ভাবের কার্যকরী অস্তিত্ব স্বীকার করে, যাহারা কেবলমাত্র সংস্কার সুবিধা ও অভ্যাসের দ্বারাই বদ্ধ নহে, যাহারা স্বাধীন বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারাও কিয়ৎপরিমাণে স্বহস্তে জীবন গঠিত করে, সুন্দর কাব্যে, প্রবল বাগ্মিতায়, সুসংলগ্ন যুক্তিতে যাহাদিগকে বাস্তবিকই

বিচলিত করে, তাহাদের দেশে লেখক হওয়া সহজ নহে। কারণ, লেখা সেখানে খেলা নহে, সেখানে সত্য। এইজন্য লেখার চরিত্রের প্রতি সেখানকার পাঠকদের সর্বদা সতর্ক তীব্র দৃষ্টি। লেখা সম্বন্ধে সেখানে কোনো আলস্য নাই। লেখকেরা সযত্নে লেখে, পাঠকেরা সযত্নে পাঠ করে। মিথ্যা দেখিলে কেহ মার্জনা করে না, শৈথিল্য দেখিলে কেহ সহ্য করে না। প্রতিবাদযোগ্য কথামাত্রের প্রতিবাদ হয় এবং আলোচনাযোগ্য কথামাত্রেরই আলোচনা হইয়া থাকে।

কিন্তু এ দেশে লেখার প্রতি সাধারণের এমনি সুগভীর অশ্রদ্ধা যে, কেহ যদি আন্তরিক আবেগের সহিত কাহারও প্রতিবাদ করে, তবে লোকে আশ্চর্য হইয়া যায়। ভাবে সময় নষ্ট করিয়া এত বড়ো একটা অনাবশ্যক কাজ করিবার কী এমন প্রয়োজন ঘটিয়াছিল! অনর্থক কেবল লোকটার মনে আঘাত দেওয়া। তবে নিশ্চয়ই বাদীর সহিত প্রতিবাদীর একটা গোপন বিবাদ ছিল, এই অবসরে তাহার প্রতিশোধ লইল।

কিন্তু যে কারণে, এক হিসাবে, এখানে লেখক হওয়া সহজ, সেই কারণেই, অন্য হিসাবে, এখানে লেখকের কর্তব্য পালন করা অত্যন্ত কঠিন। এখানে লেখকে পাঠকে পরস্পরের সহায়তা করে না। লেখককে একমাত্র নিজের বলে দাঁড়াইতে হয়। যেখানে কোনো লোক সত্য শুনিবার জন্য তিলমাত্র ব্যগ্র নহে, সেখানে আপন উৎসাহে সত্য বলিতে হয়। যেখানে লোকে কেবলমাত্র প্রিয়বাক্য শুনিতে চাহে, সেখানে নিতান্ত নিজের অনুরাগে তাহাদিগকে হিতবাক্য শুনাইতে হয়। যেখানে বহু-দর্শন থাকিলেও যা, না থাকিলেও তা, সযত্নে চিন্তা করিয়া কথা বলিলেও যা, অযত্নে রোখের মাথায় কথা বলিলেও তা— এবং অধিকাংশের নিকট শেষোক্ত কথারই অধিক আদর হয়, সেখানে কেবল নিজের শুভ ইচ্ছার দ্বারা চালিত হইয়া, চিন্তা করিয়া, সন্ধান করিয়া, বিবেচনা করিয়া কথা বলিতে হয়। চক্ষের সমক্ষে প্রতিদিন দেখিতে হইবে, বহু যত্ন, বহু আশার ধন সম্পূর্ণ অনাদরে নিষ্ফল হইয়া যাইতেছে; গুণ এবং দোষ, নৈপুণ্য এবং ত্রুটি সকলই সমান মূল্যে অর্থাৎ বিনামূল্যে পথপ্রান্তে পড়িয়া আছে; যে আশ্বাসে নির্ভর করিয়া পথে বাহির হওয়া গিয়াছিল, সে আশ্বাস প্রতিপদে ক্ষীণ হইতেছে অথচ পথ ক্রমশই বাড়িয়া চলিয়াছে— যথার্থ শ্রেষ্ঠতার আদর্শ একমাত্র নিজের অশ্রান্ত যত্নে সম্মুখে দৃঢ় এবং উজ্জ্বল করিয়া রাখিতে হইবে।

আমি বঙ্গদেশের হতভাগ্য লেখক-সম্প্রদায়ের হইয়া ক্রন্দনগীত গাহিতে বসি নাই। বিলাতের লেখকদের মতো আমাদের বহি বিক্রয় হয় না, আমাদের লেখা লোকে আদর করিয়া পড়ে না বলিয়া অভিমান করিয়া সময় নষ্ট করা নিতান্ত নিষ্ফল; কারণ, অভিমানের অশ্রুধারায় কঠিন পাঠকজাতির হৃদয় বিগলিত হয় না। আমি বলিতেছি, আমাদের লেখকদিগকে অতিরিক্তমাত্রায় চেষ্টান্বিত ও সতর্ক হইতে হইবে।

আমরা অনেকসময় অনিচ্ছাক্রমে অজ্ঞানত কর্তব্যভ্রষ্ট হই। যখন দেখি সত্য বলিয়া আশু কোনো ফল পাই না এবং প্রায়ই অনেকের অপ্রিয় হইতে হয়, তখন, অলক্ষিতে আমাদের, অন্তঃকরণ সেই দুরূহ কর্তব্যভার স্কন্ধ হইতে ফেলিয়া দিয়া নটের বেশ ধারণ করে। পাঠকদিগকে সত্যে বিশ্বাস করাইবার বিফল চেষ্টা ত্যাগ করিয়া চাতুরীতে চমৎকৃত করিয়া দিবার অভিলাষ জন্মে। ইহাতে কেবল অন্যকে চমৎকৃত করা হয় না, নিজেকেও চমৎকৃত করা হয়; নিজেও চাতুরীকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি।

একটা কথাকে যতক্ষণ না কাজে খাটানো হয়, ততক্ষণ তাহার নির্দিষ্ট সীমা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না; ততক্ষণ তাহাকে ঘরে বসিয়া সূক্ষ্মবুদ্ধি দ্বারা মার্জনা করিতে করিতে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম করিয়া তোলা যায়— ততক্ষণ এ পক্ষেও বিস্তর কথা বলা যায়, ও পক্ষেও কথার অভাব হয় না। আমাদের দেশে সেই কারণে অতিসূক্ষ্ম কথার এত প্রাদুর্ভাব। কারণ, কথা কথাতেই থাকিয়া যায়, তর্ক ক্রমে তর্কের সংঘর্ষণে উত্তরোত্তর শাণিতই হইতে থাকে, এবং সমস্ত কথাই বাষ্পাকারে এমন একটা লোকাতীত আধ্যাত্মিক রাজ্যে উৎক্ষিপ্ত করিয়া দেওয়া হয় যেখানকার কোনো মীমাংসাই ইহলোক হইতে হইবার সম্ভাবনা নাই।

আমাদের দেশের অনেক খ্যাতনামা লেখকও পৃথিবীর ধারণাযোগ্য পদার্থসকলকে গুরুমন্ত্র পড়িয়া ধারণাতীত করিয়া অপূর্ব আধ্যাত্মিক কুহেলিকা নির্মাণ করিতেছেন। পাঠকেরা কেবল নৈপুণ্য দেখিয়া মুগ্ধ হইতে আসিয়াছেন, তাহা লইয়া তাঁহারা গৃহকার্য করিবেন না, তাহাকে রীতিমতো আয়ত্তের মধ্যে আনিয়া তাহার সীমা নির্ধারণ করাও দুঃসাধ্য, সুতরাং সে যে প্রতিদিন মেঘের মতো নব নব বিচিত্র আকার ধারণ করিয়া অলস লোকের অবসরযাপনের সহায়তা করিতেছে তাহাতে কাহারও আপত্তি থাকিতে পারে না। কিন্তু এই বাষ্পগঠিত মেঘে কি মাঝে মাঝে সত্যকে ম্লান করিতেছে না? উদাহরণস্বরূপ কেবল উল্লেখ করি, চন্দ্রনাথবাবু তাঁহার "কড়াক্রান্তি" প্রসঙ্গে যেখানে মনুসংহিতা হইতে মাতৃসম্বন্ধে একটা নিরতিশয় কুৎসিত শ্লোক উদ্‌ধৃত করিয়া তাহা হইতে একটা বৃহৎ আধ্যাত্মিক বাষ্প সৃজন করিয়াছেন, সে কি কেবলমাত্র কথার কথা, রচনার কৌশল, সূক্ষ্মবুদ্ধির পরিচয়, আধ্যাত্মিক ওকালতি? সে কি মনুষ্যত্বের পবিত্রতম শুভ্রতম জ্যোতির উপরে নিঃসংকোচ স্পর্ধার সহিত কলঙ্ককালিমা লেপন করে নাই? অন্য কোনো দেশের পাঠক কি এরূপ নির্লজ্জ কদর্য তর্ক-চাতুরী সহ্য করিত?

আমরা সহ্য করি কেন? কারণ, আমাদের দেশে যে যেমন ইচ্ছা চিন্তা করুক, যে যেমন ইচ্ছা বিশ্বাস করুক, যে যেমন ইচ্ছা রচনা করুক, আমাদের কাজের সহিত তাহার যোগ নাই। অতএব আমরা অবিচলিতভাবে সকল কথাই শুনিয়া যাইতে পারি— তুমিও যেমন, উহাতে কাহার কী যায় আসে!

কিন্তু কেন কাহারও কিছু যায় আসে না! আমাদের সাহিত্যের মধ্যে চরিত্রবল নাই বলিয়া। যাহা অবহেলায় রচিত তাহা অবহেলার সামগ্রী। যাহাতে কেহ যথার্থ জীবনের সমস্ত অনুরাগ অর্পণ করে নাই, তাহা কখনো অমোঘ বলে কাহারও অন্তর আকর্ষণ করিতে পারিবে না।

এখন আমাদের লেখকদিগকে অন্তরের যথার্থ বিশ্বাসগুলিকে পরীক্ষা করিয়া চালাইতে হইবে, নিরলস এবং নির্ভীকভাবে সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে, আঘাত করিতে এবং আঘাত সহিতে কুণ্ঠিত হইলে চলিবে না।

একদিকে যেমন আমাদের কিছুতেই কিছু আসে যায় না, অন্য দিকে তেমনি আমাদের নিজের প্রতি তিলমাত্র কটাক্ষপাত হইলে গায়ে অত্যন্ত বাজে। ঘরের আদর অত্যন্ত অধিক পাইলে এই দশা হয়। নিজের অপেক্ষা আর কিছুকেই আদরণীয় মনে হয় না।

সেটা নিজের সম্বন্ধে যেমন, স্বদেশের সম্বন্ধেও তেমনিই। আদুরে ছেলের আত্মানুরাগ যেরূপ, আমাদের স্বদেশানুরাগ সেইরূপ। একটা যে হিতচেষ্টা কিংবা কঠিন কর্তব্যপালন তাহার নাম নাই— কেবল আহা উহু, কেবল কোলে কোলে নাচানো। কেবল কিছু গায়ে সয় না, কেবল চতুর্দিক ঘিরিয়া স্তবগান। কেহ যদি তাহার সম্বন্ধে একটা সামান্য অপ্রিয় কথা বলে, অমনি আদুরে স্বদেশানুরাগ ফুলিয়া ফাঁপিয়া কাঁদিয়া মুষ্টি উত্তোলন করিয়া অনর্থপাত করিয়া দেয়, অমনি তাহার মাতৃস্বসা এবং পিতৃস্বসা, তাহার মাতুলানী এবং পিতৃব্যানী মহা হাঁকডাক করিতে করিতে ছুটিয়া আসে এবং ছেলেটাকে কোলে তুলিয়া লইয়া, তাহার নাসাচক্ষু মোচন করিয়া তাহার চিরন্তন আদুরে নামগুলির পুনরাবৃত্তি করিয়া তাহার ব্যথিত হৃদয়ের সান্ত্বনা সাধন করে।

আমরা স্থির করিয়াছি, বাঙালির আত্মাভিমানকে নিশিদিন কোলে তুলিয়া নাচানো লেখকের প্রধান কর্তব্য নহে। কিন্তু কর্মক্ষেত্রে বয়স্ক সহযোগী ও প্রতিযোগীর সহিত আমরা যেরূপ ব্যবহার করি, তাহাদিগকে উচিত ভাবে প্রিয়বাক্যও বলি অপ্রিয় বাক্যও বলি, কিন্তু নিয়ত বাৎসল্য-গদগদ অত্যুক্তি প্রয়োগ করি না, স্বজাতি সম্বন্ধে সেইরূপ ব্যবহার করাই সুসংগত। আমরা আমাদের দেশের যথার্থ ভালো জিনিসগুলি লইয়া এত বাড়াবাড়ি করি, যে তাহাতে ভালো জিনিসের অমর্যাদা করা হয়। কালিদাস পৃথিবীর সকল কবির সেরা, মনুসংহিতা পৃথিবীর সকল সংহিতার শ্রেষ্ঠ, হিন্দুসমাজ পৃথিবীর সকল সমাজের উচ্চে— এরূপ করিয়া বলিয়া আমরা কালিদাস, মনুসংহিতা এবং হিন্দুসমাজের প্রতি মুরুব্বিয়ানা করি মাত্র। তাঁহারা যদি জীবিত ও উপস্থিত

থাকিতেন তাহা হইলে জোড়করে বলিতেন, 'তোমরা আমাদিগকে এত কৌশল এবং এত চীৎকার করিয়া বড়ো করিয়া না তুলিলেও আমাদের বিশেষ ক্ষতি হইত না। বাপু রে, একটু ধীরে, একটু বিবেচনাপূর্বক, একটু সংযতভাবে কথা বলো। পৃথিবীতে সকল জিনিসেরই ভালোও থাকে মন্দও থাকে— তোমরা যতই কূটতর্ক কর-না, অসম্পূর্ণতা হো হা দ্বারা ঢাকা পড়ে না। যাহার যথেষ্ট ভালো আছে, তাহার অল্পস্বল্প মন্দর জন্য ছলনা করিবার আবশ্যক হয় না, সে ভালো মন্দ দুই অবাধে প্রকাশ করিয়া সাধারণের ন্যায়বিচার অসংকোচে গ্রহণ করে। যাহারা ক্ষুদ্র, যাহাদের অল্পস্বল্প ভালো, তাহাদেরই জন্য সূক্ষ্ম পয়েন্ট ধরিয়া ওকালতি করো। চন্দ্র কখনো চন্দন দিয়া কলঙ্ক ঢাকে না, অথবা তাহার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাও করে না— তথাপি নিষ্কলঙ্ক কেরোসিন শিখার অপেক্ষা তাহার গৌরব বেশি। কিন্তু ওই কলঙ্কের জন্য বাজে কৈফিয়ত দিতে গেলেই কিংবা চন্দ্রকে নিষ্কলঙ্ক বলিয়া তাহার মিথ্যা আদর বৃদ্ধি করিতে গেলেই তাহার প্রতি অসম্ভ্রম করা হয়।'

সাধনা
মাঘ ১২৯৯

'সাহিত্য'-পাঠকদের প্রতি

কিয়ৎকাল পূর্বে ''হিং টিং ছট্' নামক একটি কবিতা সাধনায় প্রকাশিত হইয়াছিল। উক্ত কবিতা যে চন্দ্রনাথবাবুকেই বিশেষ লক্ষ্য করিয়া লিখিত হয় 'সাহিত্য' পত্রের কোনো লেখক পাঠকদের মনে এইরূপ সংশয় জন্মাইয়া দেন। আমি তাহার প্রতিবাদ 'সাহিত্য'-সম্পাদক মহাশয়ের নিকট পাঠাইয়া দিই, তিনি তাহা প্রকাশ করিয়া তাঁহার পাঠকদের অন্যায় সন্দেহমোচন করা কর্তব্য বোধ করেন নাই। এই কারণে, সাধনা পত্রিকা আশ্রয় করিয়া আমি পাঠকদিগকে জানাইতেছি যে, উক্ত কবিতা চন্দ্রনাথবাবুকে লক্ষ্য করিয়া লিখিত নহে এবং কোনো সরল অথবা অসরল বুদ্ধিতে যে এরূপ অমূলক সন্দেহ উদিত হইতে পারে তাহা আমার কল্পনার অগোচর ছিল।

এতৎপ্রসঙ্গে এইস্থলে জানাইতেছি যে, চন্দ্রনাথবাবুর উদারতা ও অমায়িক স্বভাবের আমি এত পরিচয় পাইয়াছি যে নিতান্ত কর্তব্য জ্ঞান না করিলে ও তাঁহাকে বর্তমান কালের একটি বৃহৎসম্প্রদায়ের মুখপাত্র বলিয়া না জানিলে তাঁহার কোনো প্রবন্ধের কঠিন সমালোচনা করিতে আমার প্রবৃত্তিমাত্র হইত না। চন্দ্রনাথবাবুকে বন্ধুভাবে পাওয়া আমার পক্ষে গৌরব ও একান্ত আনন্দের বিষয় জানিয়াও আমি লেখকের কর্তব্য পালন করিয়াছি।

সাধনা
চৈত্র ১২৯৯

রবীন্দ্রবাবুর পত্র

সাহিত্য-সম্পাদক মহাশয়
সমীপেষু—

পুরী
৬ই ফাল্গুন

মান্যবরেষু,

চন্দ্রনাথবাবুর প্রতি আমার বিদ্বেষভাব আপনি যেরূপে প্রমাণ করিতে বসিয়াছেন, তাহা আপনার উপযুক্ত হয় নাই। কারণ, বিষয়টা আপনি কেবল একদিক হইতে দেখিয়াছেন। আমার পক্ষ

হইতে যে দুই-একটি কথা বলা যাইতে পারিত তাহা আপনি একটিও বলেন নাই, সুতরাং আমাকেই বলিতে হইল।

বাল্যবিবাহ লইয়া চন্দ্রনাথবাবুর সহিত আমার প্রথম বাদ-প্রতিবাদ হয়। সে আজ বছর দুই-তিন পূর্বের কথা। ইতিমধ্যে আমি তাঁহার কোনো লেখা সম্বন্ধে কোনো কথা বলি নাই।

আপনার অবিদিত নাই, প্রথম ভাগ সাধনায় মাসিকপত্রের সমালোচনা বাহির হইত। তাহাতে উল্লেখযোগ্য অথবা প্রতিবাদযোগ্য প্রবন্ধ সম্বন্ধে মতামত ব্যক্ত হইত। সাহিত্যে চন্দ্রনাথবাবু যে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন সাধনার সাময়িক সমালোচনায় তাহার দুইটি লেখার প্রতিবাদ বাহির হয়— দুই-একটি প্রতিবাদ দীর্ঘ হইয়া পড়ায় স্বতন্ত্র প্রবন্ধরূপেও প্রকাশিত হইয়াছিল। চন্দ্রনাথবাবু যখন তাহার পুনঃপ্রতিবাদ করেন তখন তদুত্তরে আমাদের যাহা বক্তব্য ছিল আমরা প্রকাশ করিয়াছিলাম। আহার এবং লয়তত্ত্ব সম্বন্ধে এইরূপে উপর্যুপরি অনেকগুলি বাদ-প্রতিবাদ বাহির হয়। আপনি যদি এমন মনে করিয়া থাকেন যে, বাল্যবিবাহ সম্বন্ধে চন্দ্রনাথবাবুর সহিত আমার মতান্তর হওয়াতেই আমি সাধনায় সমালোচনার উপলক্ষ করিয়া তাঁহাকে আক্রমণপূর্বক আমার বিদ্বেষবুদ্ধির চরিতার্থতা সাধনা করিতেছিলাম, তবে তাহা আপনার ভ্রম— ইহার অধিক আর আমি কিছুই বলিতে চাহি না। 'কড়াক্রান্তি' প্রবন্ধে এমন দুই-একটি মত প্রকাশিত হইয়াছিল যাহার কঠিন প্রতিবাদ করা আমার একটি কর্তব্যস্বরূপে গণ্য করিয়াছিলাম। আপনি যদি সে প্রবন্ধটি সাধারণ সমক্ষে প্রকাশযোগ্য জ্ঞান করিয়া থাকেন, তাহার মধ্যে গুরুতর আপত্তিযোগ্য কিছু না পাইয়া থাকেন তবে উক্ত প্রতিবাদটিকে বিদ্বেষভাবের পরিচায়ক মনে করা আপনার পক্ষে অসংগত হয় নাই।

"হিং টিং ছট্‌" নামক কবিতায় আমি যে চন্দ্রনাথবাবুকে লক্ষ্য করিয়া বিদ্রূপ করিয়াছি ইহা কাহারও সরল অথবা অসরল কোনোপ্রকার বুদ্ধিতে কখনো উদয় হইতে পারে তাহা আমার, স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। আপনি লিখিয়াছিলেন 'অনেকেই বুঝিয়াছে যে, এই বিদ্রূপ ও ঘৃণাপূর্ণ কবিতার লক্ষ্য চন্দ্রনাথবাবু'— এই পর্যন্ত বলিতে পারি, যাহারা আমার সেই কবিতাটি বুঝিয়াছে তাহারা সেরূপ বুঝে নাই। অবশ্য আপনি অনেককে জানেন, এবং আমিও অনেককে জানি— আপনার অনেকের কথা বলিতে পারি না কিন্তু আমি যে-অনেককে জানি তাঁহাদের মধ্যে একজনও এরূপ মহৎ ভ্রম করেন নাই। এবং আমার আশা আছে চন্দ্রনাথবাবুও তাঁহাদের মধ্যে একজন।

চন্দ্রনাথবাবুর সহিত মতভেদ হওয়া আমি আমার দুর্ভাগ্য বলিয়া জ্ঞান করি। কারণ, আমি তাঁহার উদারতা ও অমায়িকতার অনেক পরিচয় পাইয়াছি। তাঁহার অধিকাংশ মত যদি বর্তমান কালের বৃহৎ একটি সম্প্রদায়ের মত না হইত তাহা হইলে তাঁহার সহিত প্রকাশ্য বাদ-প্রতিবাদে আমার কখনোই রুচি হইত না। কিন্তু মানুষ কর্তব্যবুদ্ধি হইতে যে কোনো কাজ করিতে পারে এ কথা দেশকালপাত্রবিশেষের নিকট প্রমাণ করা দুরূহ হইয়া পড়ে এবং তাহার আবশ্যকও নাই।

আপনি লিখিয়াছেন 'মানিলাম চন্দ্রনাথবাবুর মতই অপ্রামাণ্য, সকল সিদ্ধান্তই অসিদ্ধ এবং সকল কথাই অগ্রাহ্য। কিন্তু এই এক কথা একবার বলিয়াই তো রবীন্দ্রনাথবাবু খালাস পাইতে পারেন। এক কথা বারংবার বলিবার প্রয়োজন কী? যদি এমন সম্ভাবনা থাকিত যে, চন্দ্রনাথবাবু নিজের ভ্রান্ত মতসমূহ ত্যাগ করিয়া অবশেষে রবীন্দ্রনাথবাবুর মত গ্রহণ করিবেন, তাহা হইলেও এই অনন্ত তর্ক কতক বুঝা যাইত, কিন্তু সে সম্ভাবনা কিছুমাত্র নাই।' মার্জনা করিবেন, আপনার এই কথাগুলি নিতান্ত কলহের মতো শুনিতে হইয়াছে, ইহার ভালোরূপ অর্থ নাই। কলহের উত্তরে কলহ করিতে হয়, যুক্তি প্রয়োগ করা যায় না, অতএব নিরস্ত হইলাম।

উপসংহারে সবিনয় অনুরোধ এই যে, আপনি একটা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন যে, নিজের মত যদি সত্য বলিয়া জ্ঞান না করা যায় তবে পৃথিবীতে কেহ কোনো কথা বলিতে পারে না। অবশ্য, কেন সত্য জ্ঞান করি তাহার প্রমাণ দিবার ভার আমার উপর। যদি আমার মত প্রচারদ্বারা

পৃথিবীর কোনো উপকার প্রত্যাশা করি, এবং বিরুদ্ধ মতের দ্বারা সমাজের অনিষ্ট আশঙ্কা করা যায় তবে যতক্ষণ প্রমাণ দেখাইতে পারিব ততক্ষণ নিজের মত প্রচার করিব ও বিরুদ্ধ মত খণ্ডন করিব ইহা আমার সর্বপ্রধান কর্তব্য। এ কার্য যদি বারংবার করার আবশ্যক হয় তবে বারংবারই করিতে হইবে। কবে পৃথিবীতে এক কথায় সমস্ত কার্য হইয়া গিয়াছে? কোন্ বদ্ধমূল ভ্রমের মূলে সহস্রবার কুঠারাঘাত করিতে হয় নাই? আমি যাহা সত্য বলিয়া জানি তাহা বারংবার প্রচার করিতে চেষ্টা করিয়াও অবশেষে কৃতকার্য না হইতে পারি, আত্মক্ষমতার প্রতি এ সংশয় আমার যথেষ্ট আছে, তবু কর্তব্য যাহা তাহা পালন করিতে হইবে এবং যদি চন্দ্রনাথবাবুর সহিত আমার পুনর্বার মতের অনৈক্য হয় এবং তাঁহার কথার যদি কোনো গৌরব থাকে তবে আপনারা যিনি যেরূপ অর্থ বাহির করুন আমাকে পুনর্বার প্রতিবাদ করিতে হইবে।

পুঃ— অনুগ্রহপূর্বক নিম্নলিখিত পত্রখানি প্রকাশ করিবেন। —শ্রীরঃ

সাহিত্য
বৈশাখ ১৩০০

সাহিত্যের গৌরব

মৌরস য়োকাই হঙ্গেরি দেশের একজন প্রধান লেখক। তাঁহার সাহিত্যচর্চায় প্রবৃত্ত হইবার পর পঞ্চাশৎবার্ষিক উৎসব সম্প্রতি সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। দেশের আপামরসাধারণ কীরূপ মহোৎসাহের সহিত এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিল তাহা সংবাদপত্রপাঠকগণ অবগত আছেন।

সেই উৎসব-বিবরণ পাঠ করিলে তাহার সহিত আমাদের দেশে বঙ্কিমচন্দ্রের বিয়োগজনিত শোকপ্রকাশের তুলনা স্বতই মনে উদয় হয়।

ভিক্টর হ্যুগোর মৃত্যুর পর সমস্ত ফ্রান্স কীরূপ শোকাকুল হইয়া উঠিয়াছিল বর্তমান প্রসঙ্গে সে কথা উত্থাপন করিতে লজ্জা বোধ হয়, কারণ, ফ্রান্স য়ুরোপের শীর্ষস্থানীয়। বীরপ্রসবিনী হঙ্গেরির সহিতও নির্জীব বঙ্গদেশের তুলনা হইতে পারে না, তথাপি অপেক্ষাকৃত অসংকোচে তাহার নামোল্লেখ করিতে পারি।

আমরা যে বহু চেষ্টাতেও আমাদের দেশের মহাত্মাগণকে সম্মান এবং প্রীতি উপহার দিতে পারি না, আর য়ুরোপের একটি ক্ষুদ্র দুর্বল রাজ্যে রাজায়-প্রজায় মিলিয়া সামান্যবংশজাত একজন সাহিত্যব্যবসায়ীকে এমন অপর্যাপ্ত হৃদয়োচ্ছ্বাসে অভিষিক্ত করিয়া তুলিল ইহার কারণ কী?

ইহার প্রধান কারণ এই যে, সেখানে লেখক এবং পাঠক এক প্রাণের দ্বারা সঞ্জীবিত, পরস্পরের মধ্যে বিচ্ছেদ নাই। সেখানে সমস্ত দেশের লোক মিলিয়া একজাতি। তাহারা এর উদ্দেশ্যে এক জাতীয় উন্নতির অভিমুখে ধাবিত হইতেছে, তাহাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সরলপথ নির্দেশ করিতেছে, সে সর্বসাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইতেছে।

আমাদের দেশে পথিক নাই সুতরাং পথ খনন করিয়া কেহ যশস্বী হইতে পারে না। বঙ্কিম বঙ্গসাহিত্যের রাজপথ খনন করিয়া দিয়া গিয়াছেন, কিন্তু হায়, বঙ্গসাহিত্য কোথায়, বাঙালি জাতি কোথায়! যাহারা বাংলা লেখে তাহারাই বা কয়জন, যাহারা বাংলা পড়ে তাহাদেরই বা সংখ্যা কত!

বঙ্গসাহিত্য যে জাতীয়-হৃদয় অধিকার করিবার আশা করিতে পারে সে হৃদয় কোন্‌খানে! পূর্বকালে যখন আমাদের দেশে সাধারণজাতি নামক কোনো পদার্থ ছিল না তখন অন্তত রাজসভা ছিল। সেই সভা তখন সর্বসাধারণের প্রতিনিধি ছিল। সেই সভার মন হরণ করিতে পারিলে, সেই

সভার মধ্যে গৌরবের স্থান পাইলে সাহিত্য আপনাকে সার্থক জ্ঞান করিত। এখন সে সভাও নাই।

বঙ্গসাহিত্যের কোনো গৌরব নাই। কিন্তু সে যে কেবল বঙ্গসাহিত্যের দৈন্যবশত তাহা নহে। গৌরব করিবার লোক নাই। ইতস্ততবিক্ষিপ্ত কয়েকজনের নিকট তাহার সমাদর থাকিতে পারে কিন্তু একত্রসংহত সর্বসাধারণের নিকট তাহার কোনো প্রতিপত্তি নাই। কারণ, একত্রসংহত সর্বসাধারণ এ দেশে নাই।

যে দেশে আছে যেখানে সকলে সাধারণ মঙ্গল অমঙ্গল একত্রে অনুভব করে। সেখানে দেশীয় ভাষা এবং সাহিত্যের অনাদর হইতে পারে না, কারণ, যেখানে অনুভবশক্তি আছে সেইখানেই প্রকাশ করিবার ব্যাকুলতা আছে। যেখানে সর্বসাধারণে ভাবের ঐক্যে অনুপ্রাণিত হয় সেখানে সর্বসাধারণের মধ্যে ভাষার ঐক্য আবশ্যক হইয়া উঠে এবং এই সাধারণের ভাষা কখনোই বিদেশীয় ভাষা হইতে পারে না।

য়ুরোপে জাতি বলিতে যাহা বুঝায় আমরা বাঙালিরা তাহা নহি। অর্থাৎ, আমাদের একসঙ্গে আঘাত লাগিলে সর্ব অঙ্গে বেদনা বোধ হয় না। আমাদের সকলের মধ্যে বেদনাবহ বার্তাবহ আদেশবহ কোনো সাধারণ স্নায়ুতন্ত্র নাই। সুতরাং আমাদের মধ্যে সাধারণ সুখ-দুঃখ বলিয়া কোনো পদার্থ নাই, এবং সাধারণ সুখ-দুঃখ প্রকাশ করিবার কোনো আবশ্যক নাই।

এইজন্য দেশীয় ভাষার প্রতি সাধারণের আদর নাই এবং দেশীয় সাহিত্যের প্রতি সাধারণের অনুরাগের স্বল্পতা দেখা যায়। লোকে যে অভাব অন্তরের সহিত অনুভব করে না সে অভাব পূরণ করিয়া তাদের নিকট হইতে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রত্যাশা করা যায় না। অনেকে কর্তব্যবোধে কৃতজ্ঞ হইবার প্রাণপণ প্রয়াস পাইয়া থাকেন কিন্তু সে চেষ্টা কোনো বিশেষ কাজে আসে না।

আমাদের দেশে সাধারণের কোনো আবশ্যকবোধ না থাকাতে এবং সাধারণের আবশ্যকপূরণজনিত গৌরববোধ লেখকের না থাকাতে আমাদের সাহিত্যের ক্ষেত্র স্বভাবতই সংকীর্ণ হইয়া আসে এবং লেখকে-পাঠকে ঘনিষ্ঠ যোগ থাকে না। সাহিত্য কেবলমাত্র অল্পসংখ্যক শৌখিন লোকের নিকট আদরণীয় হইয়া থাকে। অথচ সেই সাহিত্যশৌখিন লোকগুলি প্রাচীনকালের রাজাদিগের ন্যায় সর্বত্রপরিচিত প্রভাবশালী মহিমান্বিত নহেন, সুতরাং তাঁহাদের আদরে সাহিত্য সাধারণের আদর লাভ করে না। কথাটা বিপরীত শুনাইতে পারে কিন্তু ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, কিয়ৎপরিমাণে আদর না পাইলে আদর পাওয়ার যোগ্য হওয়া যায় না।

হঙ্গেরিতে যে উৎসবের উল্লেখ করা যাইতেছে সে উৎসবের ক্ষেত্র সমস্ত জাতির হৃদয়রাজ্যে। হঙ্গেরীয় জাতি একহৃদয় হইয়া অনেক সুখ-দুঃখ অনুভব করিয়াছে, সকলে মিলিয়া রক্তপাত করিয়া জাতীয় ইতিহাসের পৃষ্ঠা উজ্জ্বল অক্ষরে অঙ্কিত করিয়াছে, স্বদেশের কল্যাণতরণী যখন বিপ্লবের ক্ষুব্ধ সমুদ্রমধ্যে নিমগ্নপ্রায় তখন সমস্ত দেশের লোক এক ধ্রুবতারার দিকে অনিমেষ দৃষ্টি স্থির রাখিয়া সেই দোদুল্যমান তরীকে উপকূলে উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছে; সেখানকার দেশীয় লেখক দেশীয় ভাষা অবলম্বন করিয়া শোকের সময় সান্ত্বনা করিয়াছে; বিপদের সময় আশা দিয়াছে, লজ্জার দিনে ধিক্‌কার এবং গৌরবের দিনে জয়ধ্বনি করিয়াছে, সমস্ত জাতির হৃদয়ে তাঁহার কণ্ঠস্বর প্রতিনিয়ত ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। সুতরাং সে দেশে রাজারানী হইতে কৃষক পর্যন্ত সকলেই লেখকের নিকট পরমোৎসাহে কৃতজ্ঞতা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করিয়াছে ইহাতে আশ্চর্যের কারণ কিছুই নাই।

এককালে হঙ্গেরীয় ভাষা ও সাহিত্য নানা রাষ্ট্রবিপ্লবে বিপর্যস্ত হইয়া লাটিন ও জর্মানের নিকট পরাভব স্বীকার করিয়াছিল। এমন-কি, ১৮৪৯ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত হঙ্গেরীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে লাটিন এবং জর্মান ভাষা অবলম্বন করিয়া বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হইত। সেই সময় গুটিকতক দেশানুরাগী পুরুষ দেশীয় ভাষা ও সাহিত্যের অবমানে ব্যথিত হইয়া ইহার প্রতিকার সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। আজ তাঁহাদের কল্যাণে হঙ্গেরিদেশে এমন ভূরি পরিমাণে শিক্ষা বিস্তার হইয়াছে যে,

প্রজা সংখ্যা তুলনা করিলে য়ুরোপে জর্মনি ব্যতীত আর কোথাও এত অধিক সংখ্যক বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিজ্ঞানশিক্ষাশালা নাই এবং সেই-সকল পাঠাগারে কেবলমাত্র হঙ্গেরিভাষায় সমস্ত বিষয় শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। এই পরিবর্তনসাধনের জন্য হঙ্গেরি মৌরস য়োকাইয়ের নিকট ঋণে বদ্ধ।

১৮৪৮ খৃস্টাব্দে হঙ্গেরি যখন বিদ্রোহী হয় তখন য়োকাই কেবল যে লেখনীর দ্বারা তাহাকে উত্তেজিত করিয়াছিলেন তাহা নহে স্বয়ং তরবারিহস্তে তাহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন। অবশেষে শান্তিস্থাপনের সময় তিনিই বিপ্লবের বহ্নিদাহ নির্বাপণে প্রধান উদ্যোগী ছিলেন।

ইহা হইতে পাঠকেরা বুঝিতে পারিবেন হঙ্গেরি দেশের মধ্যে সর্বত্র একটা জীবনস্রোত একটা কর্মপ্রবাহ চলিতেছে। সমস্ত জাতির আত্মা সচেতনভাবে কাজ করিতেছে। সেখানে সৃজন করিবার শক্তিও সবল, গ্রহণ করিবার শক্তিও সজাগ। আমাদের দেশে কোনো উদ্দেশ্য নাই, কোনো কার্য নাই, কোনো জীবনের গতি নাই, তবে সাহিত্য কোথা হইতে জীবন প্রাপ্ত হইবে? কেবল গুটিকতক লোকের ক্ষীণমাত্রায় একটুখানি শখ আছে মাত্র, আপাতত সেইটুকুর উপরেই সাহিত্যের ভিত্তি স্থাপন করিতে হয়।

'সমুদ্রের ন্যায় চক্ষু' নামক য়োকাইয়ের একটি উপন্যাস ইংরাজিতে অনুবাদিত হইয়াছে। ইহাতে উপন্যাসের সহিত লেখকের জীবনবৃত্তান্ত ঘনিষ্ঠভাবে মিশ্রিত দেখা যায়। এই আশ্চর্য গ্রন্থখানি পাঠ করিলে পাঠকেরা বুঝিতে পারিবেন লেখকের সহিত তাঁহার স্বদেশের কী যোগ। ইহাও বুঝিতে পারিবেন, যেখানে জীবনের বিচিত্র প্রবাহ একত্র মিশিয়া ঘাত-প্রতিঘাতে স্ফীত ও ফেনিল হইয়া উঠিতেছে লেখক সেইখানে কল্পনার জাল বিস্তারপূর্বক সজীব চরিত্রসকল আহরণ করিয়া আনিতেছেন। আমাদের সাহিত্যে কোথায় সেই ভালোমন্দের সংঘাত, কোথায় সে হৃদয়োচ্ছ্বাসের প্রবলতা, কোথায় সে ঘটনাস্রোতের দ্রুতবেগ, কোথায় সে মনুষ্যত্বের প্রত্যক্ষ জীবন্ত স্বরূপ!

আমরা নিক্তি হস্তে লইয়া বসিয়া বসিয়া তৌল করিতেছি সূর্যমুখী কুন্দনন্দিনীর অপেক্ষা এক মাষা এক রতি পরিমাণ অধিক ত্যাগ স্বীকার করিয়াছে কি না, আয়েষার ভালোবাসা ভ্রমরের ভালোবাসার অপেক্ষা এক চুল পরিমাণ উদারতর কি না, চন্দ্রশেখর এবং প্রতাপ উভয়ের মধ্যে কাহার চরিত্রে ভরি পরিমাণে মহত্ত্ব বেশি প্রকাশ পাইয়াছে। আমরা জিজ্ঞাসা করি না, কোন্‌টা যথার্থ, কে মানুষের মতো, কে সজীব, কোন্ চরিত্রের মধ্যে হৃদয়স্পন্দন আমরা সুস্পষ্টরূপে অনুভব করিতেছি।

তাহার প্রধান কারণ, আমাদের দেশে সুদূরব্যাপী কর্মস্রোত না থাকাতে সজীব মানব-চরিত্রের প্রবল সংস্পর্শ কাহাকে বলে তাহা আমরা ভালো করিয়া জানি না। মানুষ যে কেবল মানুষরূপেই কত বিচিত্র, কত বলিষ্ঠ, কত কৌতুকাবহ, কত হৃদয়াকর্ষক, যেখানে কোনো একটা কাজ চলিতেছে সেখানে সে যে কত কাণ্ড বাধাইয়া বসিতেছে তাহা আমরা সম্যক্ প্রত্যক্ষ ও অনুভব করি না, সেইজন্য মনুষ্য কেবলমাত্র মনুষ্য বলিয়াই আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে না। আমাদের এই মন্দগতি ক্ষীণপ্রাণ কৃশহৃদয় দেশে মানুষ জিনিসটা এতই অকিঞ্চিৎকর যে তাহাকে অনায়াসে বাদ দিতে পারি এবং তাহার স্থলে কতকগুলি নীতিশাস্ত্রোদ্‌ধৃত গুণকে বসাইয়া নির্জীব তুলাদণ্ডে প্রাণহীন বাটখারা দ্বারা তাহাদের গুরুলঘুত্ব পরিমাপ করাকে সাহিত্যসমালোচনা বলিয়া থাকি। কিন্তু এই হঙ্গেরীয় উপন্যাসখানি খুলিয়া দেখো, মানুষ কত রকমের, কত ভালো, কত মন্দ, কত মিশ্রিত এবং সবশুদ্ধ কেমন সম্ভব কেমন সত্য। উহাদের মধ্যে কোনোটিই নৈতিক গুণ নহে, সকলগুলিই রক্তমাংসের প্রাণী। 'বেসি' নামক এই গ্রন্থের নায়িকার চরিত্র পর্যালোচনা করিয়া দেখো, শাস্ত্রমতে সে যে বড়ো পবিত্র উন্নত স্বভাবের তাহা নহে, সে পরে পরে পাঁচ স্বামীকে বিবাহ করিয়াছে এবং শেষ স্বামীকে হত্যা করিয়া কারাগারে জীবন ত্যাগ করিয়াছে, কিন্তু তথাপি সে রমণী, সে বীরাঙ্গনা, অনেক সতীসাধ্বীর ন্যায় সে প্রীতি ও শ্রদ্ধার পাত্রী, কিছু না

হউক তাহার নারীপ্রকৃতি পরিপূর্ণ প্রাণশক্তিতে নিয়ত স্পন্দমান; সে সমাজের কলে পিষ্ট এবং লেখকের গৃহ-নির্মিত নৈতিক চালুনিতে ছাঁকা গৃহস্থের ঘরে ব্যবহার্য পয়লা নম্বরের পণ্যদ্রব্য নহে, সুবোধ গোপাল এবং সুমতি সুশীলার ন্যায় সে বাংলাদেশের শিশুশিক্ষার দৃষ্টান্তস্থল বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। প্রাণের পরিবর্তে তৃণে পরিপূর্ণ মিউজিয়ামের সিংহী যদি সহসা জীবনপ্রাপ্ত হয় তবে রক্ষকমহলে যেরূপ একটা হুলস্থুল পড়িয়া যায়, 'বেসি'র ন্যায় নায়িকা সহসা বঙ্গ সাহিত্যে দেখা দিলে সমালোচকমহলে সেইরূপ একটা বিভ্রাট বাধিয়া যায়, তাঁহাদের সূক্ষ্ম বিচার এবং নীতিতত্ত্ব বিপর্যস্ত হইয়া একটা দুর্ঘটনা ঘটিবার সম্ভাবনা হয়।

য়ুরোপে হঙ্গেরির সহিত পোল্যান্ডের অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। সেখানে আধুনিক পোল-সাহিত্যের নেতা ছিলেন ক্রাস্‌জিউস্কি।— ১৮৮৮ খৃস্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হইয়াছে। ১৮৭৯ খৃস্টাব্দে তাঁহার রচনারম্ভের পঞ্চাশৎ বার্ষিক উৎসব পরম সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। তদুপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে উপাধি দান করে, কার্পাথীয় গিরিমালার একটি শিখরকে তাঁহার নামে অভিহিত করা হয়। অস্ট্রিয়ার সম্রাট তাঁহাকে রাজসম্মানে ভূষিত করেন এবং দেশের লোকে মিলিয়া তাঁহাকে ছয় হাজার পাউন্ড মুদ্রা উপহার প্রদান করে।

এ সম্মান শূন্য সম্মান নহে। সমস্ত জীবন দিয়া ইহা তাঁহাকে লাভ করিতে হইয়াছে। তিনিই প্রথম পোলীয় উপন্যাস রচয়িতা। যখন তাঁহার বয়স আঠারো তখন পঠদ্দশাতেই তিনি পোল্যান্ডের স্বাধীনতা উদ্ধারের জন্য সহপাঠীদিগকে বিদ্রোহে উত্তেজিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। সেই অপরাধে দুই বৎসর কারাবাস যাপন করিয়া পুনর্বার তিনি বিদ্যালয়ে প্রবেশপূর্বক শিক্ষা সম্পূর্ণ করেন। কারাগারে অবস্থানকালে তিনি পোলীয়ভাষার প্রথম উপন্যাস রচনা করিয়াছিলেন।

পুনর্বার বিদ্রোহ অপরাধে জড়িত হইয়া তাঁহাকে পল্লীগ্রামে পলায়নপূর্বক বহুকাল সমাজ হইতে দূরে বাস করিতে হইয়াছিল। এবং অবশেষে পোল্যান্ড ত্যাগ করিয়া ১৮৬৩ খৃস্টাব্দে তিনি জর্মনিতে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং আমৃত্যুকালে আর স্বদেশে ফিরিতে পারেন নাই। সেখানেও বিস্মার্কের রাজনীতির বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করাতে মৃত্যুর অনতিপূর্বে বৃদ্ধবয়সে তাঁহাকে কারাদণ্ড ভোগ করিতে হয়।

ইহা হইতে পাঠকেরা বুঝিতে পারিবেন পর্বততুল্য কঠিন প্রতিভার দ্বারা আলোড়নপূর্বক কীরূপ সংক্ষুব্ধ সমুদ্রমন্থন করিয়া এই পোলীয় মনস্বী অমরতাসুধা লাভ করিয়াছিলেন। পোল্যান্ডে একটি বৃহৎ জাতীয়-হৃদয় ছিল বলিয়া সেখানে জাতীয় সাহিত্য এবং জাতীয় সাহিত্যবীর এত সমাদর প্রাপ্ত হইয়াছে এবং সে সাহিত্য এমন প্রভূত বলে আপন প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছে।

এই লেখক-রচিত 'ইহুদী' নামক একটি উপন্যাসগ্রন্থ ইংরাজিতে অনুবাদিত হইয়াছে। তাহা পাঠ করিলে, পাঠকগণ জানিতে পারিবেন, লেখকের প্রতিভা জাতীয় হৃদয়ের আন্দোলন দোলায় কেমন করিয়া লালিত হইয়াছে।

বাংলা সাহিত্যের প্রসঙ্গে আমরা যে এই দুই হঙ্গেরীয় ও পোলীয় লেখকের উল্লেখ করিলাম তাহার কারণ, ইঁহারা উভয়েই স্ব স্ব দেশে এক নব সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা করিয়া দিয়াছেন। ইঁহারা যেমন স্বদেশে সাহিত্যকে গতিশক্তি দিয়াছেন তেমনি তাহার চলিবার পথও স্বহস্তে খনন করিয়াছেন। প্রায় এমন কোনো বিষয় নাই যাহা তাঁহারা নিজে স্বভাষায় প্রচলিত করেন নাই। শিশুদের সুখপাঠ্য মনোরম রূপকথার গ্রন্থ হইতে আরম্ভ করিয়া বিজ্ঞান দর্শন ইতিহাস পর্যন্ত সমস্তই তাঁহারা নিজে রচনা করিয়াছেন। তাঁহারা স্বদেশীয় ভাষাকে বিদ্যালয়ে বদ্ধমূল এবং স্বদেশীয় সাহিত্যকে সমস্ত জাতির হৃদয়ে স্বহস্তে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়াছেন। তাহাতে তাঁহাদের নিজের ক্ষমতা প্রকাশ পায় বটে কিন্তু জাতির সজীবতাও সূচনা করে।

আমাদের দেশে লেখকগণ বিচ্ছিন্ন বিষণ্ণ সঙ্গবিহীন। তাঁহারা বৃহৎ মানবহৃদয়ের মাতৃসংস্পর্শ

হইতে বঞ্চিত হইয়া দূরে বসিয়া আপন উপবাসী শীর্ণ প্রতিভাকে নীরস কর্তব্যের কঠিন খাদ্যখণ্ডে কোনোমতে পালন করিয়া তুলিতে থাকেন। সামান্য বাধা সে লঙ্ঘন করিতে পারে না, সামান্য আঘাতে সে মুমূর্ষু হইয়া পড়ে, দেশব্যাপী নিত্যপ্রবাহিত গতি প্রীতি আনন্দ হইতে রসাকর্ষণ করিয়া সে আপনাকে সতত সতেজ রাখিতে পারে না। অল্পকালের মধ্যেই আপনার ভিতরকার সমস্ত খাদ্য নিঃশেষ করিয়া রিক্তবল রিক্তপ্রাণ হইয়া পড়ে। বাহিরের প্রাণ তাঁহাকে যথেষ্ট প্রাণ দেয় না।

কিন্তু যথার্থ সাহিত্য যেমন যথার্থ জাতীয় ঐক্যের ফল তেমনি জাতীয় ঐক্য সাধনের প্রধানতম উপায় সাহিত্য। পরস্পর পরস্পরকে পরিপুষ্ট করিয়া তুলে। যাহা অনুভব করিতেছি তাহা প্রকাশ করিতে পারিব, যাহা শিক্ষা করিতেছি তাহা রক্ষা করিতে পারিব, যাহা লাভ করিতেছি তাহা বিতরণ করিতে পারিব এমন একটা ক্ষমতার অভ্যুদয় হইলে তাহা সমস্ত জাতির উল্লাসের কারণ হয়। আমাদের বঙ্গদেশে সেই বিরাট ক্ষমতা শিশু আকারে জন্মগ্রহণ করিয়াছে কিন্তু এখনো সেই জাতি নাই যে উল্লাস প্রকাশ করিবে। তাহারই অপেক্ষা করিয়া আমরা পথ চাহিয়া আছি। যাঁহারা বাংলার সদ্যোজাত সাহিত্যের শিয়রে জাগরণপূর্বক নিস্তব্ধ রজনীর প্রহর গণিতেছেন তাঁহারা কোনো উৎসাহ কোনো পুরস্কার না পাইতে পারেন কিন্তু তাঁহাদের অন্তরে এক সুমহৎ আশা জাগ্রত দেবতার ন্যায় সর্বদা বরাভয় দান করিতেছে, তাঁহারা একান্ত বিশ্বাস করিতেছেন যে, এই শিশু অমর হইবে এবং জন্মভূমিকে যদি কেহ অমরতা দান করিতে পারে তো সে এই সাহিত্য পারিবে।

সাধনা
শ্রাবণ ১৩০১

মেয়েলি ব্রত

সাধনা পত্রিকা সম্পাদনকালে আমি ছেলে ভুলাইবার ছড়া এবং মেয়েলি ব্রত, সংগ্রহ ও প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত ছিলাম। ব্রতকথা সংগ্রহে অঘোরবাবু আমার প্রধান সহায় ছিলেন, সেজন্য আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ আছি।

অনেকের নিকট এই-সকল ব্রতকথা ও ছড়া নিতান্ত তুচ্ছ ও হাস্যকর মনে হয়। তাঁহারা গম্ভীর প্রকৃতির লোক এবং এরূপ দুঃসহ গাম্ভীর্য বর্তমান কালে বঙ্গসমাজে অতিশয় সুলভ হইয়াছে।

বালকদিগের এমন একটি বয়স আসে যখন তাহারা বাল্যসম্পর্কীয় সকল প্রকার বিষয়কেই অবজ্ঞার চক্ষে দেখে, অথচ পরিণত বয়সোচিত কার্যসকলও তাহাদের পক্ষে স্বাভাবিক হয় না। তখন তাহারা সর্বদা ভয়ে ভয়ে থাকে, পাছে কোনো সূত্রে কেহ তাহাদিগকে বালক মনে করে। বঙ্গসমাজের গম্ভীর-সম্প্রদায়েরও সেই দুর্গতি উপস্থিত হইয়াছে। তাঁহারা বঙ্গভাষা, বঙ্গসাহিত্য, বঙ্গদেশ-প্রচলিত সর্বপ্রকার ব্যাপারের প্রতি অবজ্ঞামিশ্রিত কৃপাকটাক্ষপাত করিয়া আপন প্রকৃতির অতলস্পর্শ গাম্ভীর্য এবং পরিণতির প্রমাণ দিতে প্রয়াস পাইয়া থাকেন। অথচ তাঁহারা আপন অভ্রভেদী মহিমার উপযোগী আর যে কিছু মহৎ কীর্তি রাখিয়া যাইবেন, এমন কোনো লক্ষণও প্রকাশ পাইতেছে না।

য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ দর্শন বিজ্ঞান ইতিহাসে যথেষ্ট মনোযোগ করিয়া থাকেন এবং ছড়া রূপকথা প্রভৃতি সংগ্রহেও সংকোচ বোধ করেন না। তাঁহাদের এ আশঙ্কা নাই, পাছে লোকসাধারণের নিকট তাঁহাদের মর্যাদা নষ্ট হয়। প্রথমত, তাঁহারা জানেন যে, যে-সকল কথা ও গাথা সমাজের অন্তঃপুরের মধ্যে চিরকাল স্থান পাইয়া আসিয়াছে, তাহারা দর্শন, বিজ্ঞান ও

ইতিহাসের মূল্যবান উপকরণ না হইয়া যায় না। দ্বিতীয়ত, যাহারা স্বদেশকে অন্তরের সহিত ভালোবাসে তাহারা স্বদেশের সহিত সর্বতোভাবে অন্তরঙ্গরূপে পরিচিত হইতে চাহে এবং ছড়া, রূপকথা, ব্রতকথা প্রভৃতি ব্যতিরেকে সেই পরিচয় কখনো সম্পূর্ণতা লাভ করে না।

সাধনায় যখন আমি এগুলি সংগ্রহ ও প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, তখন আমার কোনোপ্রকার মহৎ উদ্দেশ্য ছিল না। সমাজের সুধাভাণ্ডার যে অন্তঃপুর, তাহারই প্রতি স্বাভাবিক মমত্ববশত আকৃষ্ট হইয়া আমাদের মাতা মাতামহী আমাদের স্ত্রী কন্যা সহোদরাদের কোমল-হৃদয়-পালিত মধুর কণ্ঠলালিত চিরন্তন কথাগুলিকে স্থায়ী ভাবে একত্র করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম এবং অঘোরবাবুকে এই-সমস্ত মেয়েলি ব্রত গ্রন্থ-আকারে রক্ষা করিতে উৎসাহী করিয়াছি, সেজন্য গম্ভীর-প্রকৃতি পাঠকদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। এবং সেইসঙ্গে এ কথাও বলিয়া রাখি যে, এই-সকল সংগ্রহের দ্বারা ভবিষ্যতে যে কোনোপ্রকার গম্ভীর উদ্দেশ্য সাধিত হইবে না, এমনও মনে করি না।

এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত বাবু দীনেন্দ্রকুমার রায় মহাশয়ের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি। তিনি বঙ্গদেশের জনসাধারণ-প্রচলিত পার্বণগুলির উজ্জ্বল ও সুন্দর চিত্র সাধনায় প্রকাশ করিয়া সাধনা-সম্পাদকের প্রিয় উদ্দেশ্য সাধনে সহায়তা করিয়াছেন। সে চিত্রগুলি বঙ্গসাহিত্যে স্থায়ীভাবে রক্ষা করিবার যোগ্য এবং আশা করি দীনেন্দ্রকুমারবাবু সেগুলি গ্রন্থ-আকারে প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।

কার্সিয়াং
৭ কার্তিক ১৩০৩

সাহিত্যের সৌন্দর্য

আদিত্য। সাহিত্য জিনিসটা বিষয়ের উপর বেশি নির্ভর করে না রচনার উপরে? লক্ষ্যের উপরে না লক্ষণের উপরে?

নগেন্দ্র। তুমি তো এ কথাও জিজ্ঞাসা করিতে পার মানুষ বাম পায়ের উপর বেশি নির্ভর করে না ডান পায়ের উপর?

আদিত্য। মানুষ দুই পায়েরই উপর সমান নির্ভর করে এ যেমন স্পষ্ট অনুভবগোচর, সাহিত্য তার বিষয় এবং রচনাপ্রণালীর উপর সমান নির্ভর করে সেটা তেমন নিশ্চয় বোধগম্য নয় এবং এই কারণেই সাহিত্যে আজকাল কেহ-বা নীতিকে প্রাধান্য দেন, কেহ-বা সৌন্দর্যকে, কেহ-বা বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব-প্রচারকে। সেইজন্যই আলোচনা উত্থাপন করা গেল।

মন্মথ। বেশ কথা। তা হইলে একটা দৃষ্টান্ত অবলম্বন করিয়া আলোচনা শুরু করা যাক। ভ্রমণকারীদের সুবিধার জন্য যে 'গাইড'-বই রচনা করা হয় এবং ভ্রমণবৃত্তান্ত, এ দুইয়ের মধ্যে কোন্‌টা সাহিত্যলক্ষণাক্রান্ত সে বিষয়ে বোধ করি কারও মতভেদ নাই।

আদিত্য। ভালো, মতভেদ নাই— গাইড-বই সাহিত্য নহে। কিন্তু ওই কথাতেই আমার প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়। গাইড-বই এবং ভ্রমণবৃত্তান্তের বিষয় এক, কেবল রচনাপ্রণালীর প্রভেদ।

নগেন্দ্র। আমার মতে দুয়ের বিষয়েরই প্রভেদ। ফিজিক্স এবং কেমিস্ট্রি যেমন একই বস্তুকে ভিন্ন দিক দিয়া দেখে এবং সেইজন্য উভয়ের বিষয়কে স্বতন্ত্র বলা যায়, তেমনি গাইড-বই এবং ভ্রমণবৃত্তান্ত দেশ-বিশেষকে ভিন্ন তরফ হইতে আলোচনা করে।

মন্মথ। গাইড-বইয়ে কেবলমাত্র তথ্যসংগ্রহ থাকে, ভ্রমণবৃত্তান্তে ভ্রমণকারী লেখকের ব্যক্তিগত প্রভাব বিদ্যমান এবং তাহাতেই সাহিত্যের বিকাশ। ব্যক্তিত্ববর্জিত সমাচারমাত্র বিজ্ঞানে স্থান পাইতে পারে, সাহিত্যে নহে।

আদিত্য। তাহা হইলে দেখিতে হইবে, কিসে ব্যক্তিত্ব প্রকাশ করে। কেবলমাত্র তথ্য নিতান্ত সাদা ভাবায় বলা যায়, কিন্তু তাহার সহিত হৃদয়ের ভাব ব্যক্ত করিতে গেলেই ভাষা নানাপ্রকার আকার-ইঙ্গিতের সাহায্যে নিজের মতো করিয়া গড়িয়া তুলিতে হয়। তাহাকেই কি ইংরাজিতে ম্যানার এবং বাংলায় রচনাভঙ্গি বলা যায় না?

মন্মথ। কেবল রচনার ভঙ্গি নহে, দেখিবার সামগ্রীটাও বিচার্য। এমন-কি, কেবলমাত্র হৃদয়ের ভাবও নহে, কে কোন্ জিনিসটাকে বিশেষ করিয়া দেখিতেছে তাহার উপরেও তাহার ব্যক্তিত্ববিকাশ নির্ভর করে। কেমন করিয়া দেখিতেছে এবং কী দেখিতেছে এই দুটা লইয়াই সাহিত্য। কেমন করিয়া দেখিতেছে সেটা হইল হৃদয়ের এলাকা এবং কী দেখিতেছে সেটা হইল জ্ঞানের।

আদিত্য। তুমি কি বলিতে চাও, সাহিত্যের উপযোগী কতকগুলি বিশেষ দেখিবার বিষয় আছে? অর্থাৎ, কতকগুলি বিষয় বিশেষরূপে সাহিত্যের এবং কতকগুলি তাহার বহির্ভূত?

মন্মথ। আমি যাহা বলিতে চাই তাহা এই— জ্ঞানস্পৃহা সৌন্দর্যস্পৃহা প্রভৃতি আমাদের অনেকগুলি স্বতন্ত্র মনোবৃত্তি আছে, বিজ্ঞান দর্শন এবং কলাবিদ্যা প্রভৃতিরা সেগুলোকে স্বতন্ত্ররূপে চরিতার্থ করে। বিজ্ঞানে কেবল জিজ্ঞাসাবৃত্তির পরিতৃপ্তি, সংগীত প্রভৃতি কলাবিদ্যায় কেবল সৌন্দর্যবৃত্তির পরিতৃপ্তি, কিন্তু সাহিত্যে সমস্ত বৃত্তির একত্র সামঞ্জস্য। অন্তত সাহিত্যের সেই চরম চেষ্টা, সেই পরম গতি।

নগেন্দ্র। সাহিত্যের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আর-একটু খোলসা করিয়া বলো, শুনা যাক।

মন্মথ। ম্যাথ্যু আর্নল্ড্ বলেন, সাহিত্যের উদ্দেশ্য মনুষ্যত্ব বিকাশ করা। জ্ঞানস্পৃহা সৌন্দর্যস্পৃহা প্রভৃতি মানুষের যতগুলি উচ্চ প্রবৃত্তি আছে তাহার প্রত্যেকটার পরিপূর্ণ পরিণতির সহায়তা করা। আমার মতে শিক্ষাবিধানকে গৌণ করিয়া আনন্দ-উদ্রেককে মুখ্য করিলে সেই উদ্দেশ্য-সাধন হইতে পারে।

নগেন্দ্র। বেশ কথা। তাহা হইলে শেষে দাঁড়ায় এই যে, হৃদয়ের প্রতিই সাহিত্যের প্রধান অধিকার, মুখ্য প্রভাব। এ স্থলে নীতিবোধকেও আমি হৃদয়বৃত্তির মধ্যে ধরিতেছি। কারণ, সাহিত্যে হৃদয়পথ দিয়াই ধর্মবোধের উদ্দীপন করে, তর্কপথ দিয়া নহে।

মন্মথ। এ সম্বন্ধে বক্তব্য আছে। সত্যকে দুই খণ্ড করিয়া দেখা যায়। প্রথম, চিন্তার বিষয়রূপে; দ্বিতীয়, অনুভবের বিষয়রূপে। কিন্তু সাহিত্য সত্যকে আমাদের কাছে জীবন্ত অখণ্ড সমগ্রভাবে উপনীত করে। প্রাকৃত বিজ্ঞানের নির্দেশ অনুসারে আমরা প্রকৃতিকে কেবলমাত্র বস্তু এবং ক্রিয়ার সমষ্টিরূপে মনে করিতে পারি; কিন্তু প্রকৃতিকে তার সমস্ত বস্তু এবং ক্রিয়া এবং সৌন্দর্য -সহযোগে একটি অখণ্ড সত্তারূপে অনুভব করাইতে পারে যে-একটি একীভূত মানসিক শক্তি, সাহিত্যে সেই শক্তিরই বিকাশ।

নগেন্দ্র। সত্য হৃদয়ের দ্বারা কিরূপে অনুভব করা যায় বুঝিলাম না। প্রকৃতির সৌন্দর্যকেই বা কী হিসাবে সত্য বলা যায় ধারণা হইল না। সৌন্দর্য বিশেষরূপে আমাদের হৃদ্‌বৃত্তিকে উত্তেজিত করে, এই কারণে তাহা বিশুদ্ধরূপে হৃদয়-সম্পর্কীয়। ইহাকে যদি সত্য নাম দিতে চাও তবে ভাষার জটিলতা বাড়িয়া উঠিবে। নদী-অরণ্য-পর্বতের যে সমষ্টিকে আমরা প্রকৃতি বলি তাহার একটা বিভাগ হৃদয়-সম্পর্ক-বর্জিত, এইজন্য সেই বিভাগটাকে আমরা কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিকভাবে আলোচনা করিতে পারি। কিন্তু তাহার যে দিকটা আমাদের হৃদয়ভাবকে উত্তেজিত করে সে দিকে সত্য-মিথ্যা উচিত-অনুচিত নাই। এটা সুন্দর হওয়া উচিত বা উচিত নয় এমনও কোনো কথা নাই। সৌন্দর্য মানুষের মন এবং বহিঃপ্রকৃতির মধ্যগত একটা সম্বন্ধ মাত্র। সে সম্বন্ধ সর্বত্র এবং সর্বকালে সমান নহে, সেইজন্যই সাধারণত তাহাকে বৈজ্ঞানিক কোঠা হইতে দূরে রাখা হয়।

মন্মথ। অনেক কথা আসিয়া পড়িল। আমার মোট কথাটা এই, সাহিত্যের বিষয় সুন্দর,

নৈতিক এবং যুক্তিসংগত। ইহার কোনো গুণটা বাদ পড়িলে সাহিত্য অসম্পূর্ণ হয়।

নগেন্দ্র। সাহিত্যের লক্ষ্য হইতেছে সৌন্দর্য। তবে যাহা আমাদের ধর্মবোধকে ক্ষুণ্ণ করে তাহা আমাদের সৌন্দর্যবোধকেও আঘাত করে; কতকগুলি যুক্তির নিয়ম আছে তাহাকেও অতিক্রম করিলে সৌন্দর্য পরাভূত হয়। সেইজন্যই বলি, হৃদয়বৃত্তিই সাহিত্যের গম্যস্থান, নীতি ও বুদ্ধি তাহার সহায়মাত্র। অতএব, বিষয়গত সত্য এবং বিষয়গত নীতি অপেক্ষা বিষয়গত সৌন্দর্যই তাহার মুখ্য উপাদান; এবং সেই সৌন্দর্যকে সুন্দর ভাষা সুন্দর আকার-দানই তাহাতে প্রাণসঞ্চার।

আদিত্য। পুঁথির গহনা এবং হীরার গহনা গঠনসৌন্দর্যে সমান হইতে পারে কিন্তু ভালো গহনার উপকরণে পুঁথি দেখিলে আমাদের চিত্তে একটা ক্ষোভ জন্মিতে পারে; তাহাতে করিয়া সৌন্দর্যের পূর্ণফল নষ্ট করে। কবি বলিয়াছেন— 'বীর বিনা আহা রমণীরতন আর কারে শোভা পায় রে', তেমনি পাঠক-হৃদয় সাহিত্য ও সৌন্দর্যের সহিত বীর্যের সম্মিলন প্রত্যাশা করে। যথেষ্ট মূল্যবান গৌরববান বিষয়ের সহিত সৌন্দর্যের সমাবেশ না দেখিলে সেই অসংগতিতে পীড়া এবং ক্রমে অবজ্ঞা উৎপাদন করিতে পারে।

মন্মথ। ইহার মধ্যে বিপদের সম্ভাবনা এই যে, গঠনের মূল্য অপেক্ষা হীরার মূল্য নির্ণয় করা সহজ, সেইজন্য অধিকাংশ লোক অলংকারের অলংকারত্ব উপেক্ষা করিয়া হীরার ওজনেই ব্যস্ত হয় এবং যে রসজ্ঞ ব্যক্তি মূল্যলাভ অপেক্ষা আনন্দলাভকেই গুরুতর বলিয়া গণ্য করেন, নিক্তির মানদণ্ড-দ্বারা তাঁহাকে অপমান করিয়া থাকে। এই-সকল বৈষয়িক সাংসারিক পাঠক-সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্রোহী হইয়াই এক-এক সময় রসজ্ঞের দল সাহিত্যের বিষয়গৌরবকে অত্যন্ত অবহেলাপূর্বক নিরালম্ব কলাসৌন্দর্য সম্বন্ধে অত্যুক্তি প্রকাশ করিয়া থাকেন।

ভারতী
জ্যৈষ্ঠ ১৩০৫

সংগীত

সংগীত ও ভাব

অল্পদিন হইল বঙ্গসমাজের নিদ্রা ভাঙিয়াছে, এখন তাহার শরীরে একটা নব উদ্যমের সঞ্চার হইয়াছে। তাহার প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গে স্ফূর্তি বিকাশ পাইতেছে। সেই স্ফূর্তি, সেই উদ্যম, সে কাজে প্রয়োগ করিতে চায়— সে কাজ করিতে চায়। সে শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে, সে চলিতে ফিরিতে চেষ্টা করিতেছে। একদল লোক মহা শশব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিয়াছেন, 'আরে, সর্বনাশ হইল! তুই উঠিস নে, তুই উঠিস নে! কে জানে কোথায় পড়িয়া যাইবি! তোর উঠিয়া কাজ নাই, তুই ঘুমা!' কিন্তু শিশুদেরও যে প্রকৃতি, নূতন সমাজেরও সেই প্রকৃতি। যখন তাহার ঘুম ভাঙিল, তখন সে নব উদ্যমে খেলা করিয়া ছুটিয়া বেড়াইতে চায়। পড়িবে না তো কী! প্রকৃতি যদি শিশুদের হৃদয়ে পড়িবার ভয় দিতেন, তবে তাহারা ইহজন্মে চলিতে শিখিত না। নব-উত্থান-শীল সমাজের হৃদয়েও পড়িবার ভয় নাই। যাহারা খুব ভালো করিয়া চলিতে শিখিয়াছে এমন-সকল বড়ো বড়ো বয়ঃপ্রাপ্ত সমাজেরাই পড়িবার ভয় করুক; তাহাদের শক্ত হাড় দৈবাৎ একবার ভাঙিলে আর ঝট্ করিয়া জোড়া লাগিবে না। আমাদের শিশু সমাজ দশবার করিয়া পড়ুক তাহাতে বিশেষ হানি হইবে না; বরঞ্চ ভালো বৈ মন্দ হইবে না। তাই বলি, সমাজ একটা নূতন কাজে অগ্রসর হইবামাত্র অমনি দশজনে হাঁ হাঁ করিয়া ছুটিয়া না আসে যেন! আসিলেও বিশেষ কোনো ফল হইবে না। রক্ষণশীল মা বলিতেছেন, তাঁহার ছেলেটি চিরকাল তাঁহার স্তন্যপান করিয়া তাঁহার ঘরে থাকুক। উন্নতিপ্রিয় পিতা বলিতেছেন যে, তাঁহার ছেলেটির উপার্জন করিয়া খাইবার বয়স হইয়াছে, এখন তাহাকে ছাড়িয়া দাও, সে বাহির হইতে রোজগার করিয়া আনুক। ছেলেটিরও তাহাই ইচ্ছা। আর তাহাকে বাধা দেওয়া যায় না। এখন তাহাকে অস্বাস্থ্যকর স্নেহের জালে বদ্ধ করিয়া রাখা সুযুক্তিসংগত নহে।

আমাদের বঙ্গসমাজে একটা আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে, এমন-কি, সে আন্দোলনের এক-একটা তরঙ্গ য়ুরোপের উপকূলে গিয়া পৌঁছাইতেছে। এখন হাজার চেষ্টা করো-না, হাজার কোলাহল করো-না কেন, এ তরঙ্গ রোধ করে কাহার সাধ্য! এই নূতন আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশে সংগীতের নব অভ্যুদয় হইয়াছে। সংগীত সবে জাগিয়া উঠিয়াছে মাত্র, কাজ ভালো করিয়া আরম্ভ হয় নাই। এখনো সংগীত লইয়া নানা প্রকার আলোচনা আরম্ভ হয় নাই, নানা নূতন মতামত উত্থিত হইয়া আমাদের দেশের সংগীতশাস্ত্রের বদ্ধ জলে একটা জীবন্ত তরঙ্গিত স্রোতের সৃষ্টি করে নাই। কিন্তু দিন দিন সংগীত-শিক্ষার যেরূপ বিস্তার হইতেছে, তাহাতে সংগীত-বিষয়ে একটা আন্দোলন হইবার সময় উপস্থিত হইয়াছে বোধ করি। এ বিষয় লইয়া একটা তর্ক-বিতর্ক দ্বন্দ্ব-প্রতিদ্বন্দ্ব না হইলে ইহার তেমন একটা দ্রুত উন্নতি হইবে না।

আমাদের সংস্কৃত ভাষা যেরূপ মৃত ভাষা, আমাদের সংগীতশাস্ত্র সেইরূপ মৃত শাস্ত্র। ইহাদের প্রাণবিয়োগ হইয়াছে, কেবল দেহমাত্র অবশিষ্ট আছে। আমরা কেবল ইহাদের স্থির অচঞ্চল জীবনহীন মুখ মাত্র দেখিতে পাই; বিবিধ বিচিত্র ভাবের লীলাময়, ছায়ালোকময়, পরিবর্তনশীল মুখশ্রী দেখিতে পাই না। আমরা কতকগুলি কথা শুনিতে পাই; অথচ তাহার স্বরের উচ্চনীচতা শুনিতে পাই না, কেবল সমস্বরে একটি কথার পর আর-একটি কথা কানে আসে মাত্র। হয়তো ক্রমে ক্রমে তাহার অর্থবোধ মাত্র হয়, কিন্তু তাহার অর্থগুলিকে সম্যক্‌রূপে হজম করিয়া ফেলিয়া আমাদের হৃদয়ের রক্তের সহিত মিশাইয়া লইতে পারি না। আজ সংস্কৃত ভাষায় কেহ যদি কবিতা লেখেন, তবে নস্যসেবক চালকলাজীবী আলংকারিক সমালোচকেরা তাহাকে কী চক্ষে দেখেন? তৎক্ষণাৎ তাঁহারা ব্যাকরণ বাহির করেন, অলংকারের পুঁথিখানা খুলিয়া বসেন— ষত্বণত্ব

তদ্ধিতপ্রত্যয় সমাস সন্ধি মিলাইয়া যদি নিখুঁত বিবেচনা করেন, যদি দেখেন যশকে শুভ্র বলা হইয়াছে, নলিনীর সহিত সূর্যের ও কুমুদের সহিত চন্দ্রের মৈত্র সম্পাদন করা হইয়াছে, তবেই তাঁহারা পরমানন্দ উপভোগ করেন। আর, কেহ যদি আজ গান করেন, তবে তানপুরার কর্ণপীড়ক খরজ সুরের জন্মদাতাগণ তাহাকে কী চক্ষে সমালোচন করেন? তাঁহারা দেখেন একটা রাগ বা রাগিণী গাওয়া হইতেছে কি না; সে রাগ বা রাগিণীর বাদী সুরগুলিকে যথারীতি সমাদর ও বিসম্বাদী সুরগুলিকে যথারীতি অপমান করা হইয়াছে কি না; এ পরীক্ষাতে যদি গানটি উত্তীর্ণ হয় তবেই তাঁহাদের বাহবা-সূচক ঘাড় নড়ে। আমি সেদিন এক ব্যক্তির নিকট হইতে একটি চিঠি পাইয়াছিলাম; স্বাক্ষরিত নাম কিছুতেই পড়িয়া উঠিতে পারি নাই, অথচ সে চিঠির উত্তর দিতে হইবে। কী করি, সে যেরূপে তাহার নামটি লিখিয়াছিল অতি ধীরে ধীরে আমি অবিকল সেইরূপ নকল করিয়া দিলাম। যদি নামটি বুঝিতে পারিতাম, তবে সেই নামটি লিখিতাম অথচ নিজের হস্তাক্ষরে লিখিতাম। অবিকল নকল দেখিলেই বুঝা যায় যে, অনুকরণকারী অনুকৃত পদার্থের ভাব আয়ত্ত করিতে পারেন নাই। মনে করুন আমি সাহেব হইতে চাই, অথচ আমি সাহেবদিগের ভাব কিছুমাত্র জানি না, তখন আমি কী করি? না, অ্যান্ড্রু-নামক একটি বিশেষ সাহেবকে লক্ষ্য রাখিয়া অবিকল তাহার মতো কোর্তা ও পাজামা ব্যবহার করি, তাহার কোর্তার যে দুই জায়গায় ছেঁড়া আছে যত্নপূর্বক আমার কোর্তার ঠিক সেই দুই জায়গায় ছিঁড়ি, ও তাহার নাকে যে স্থানে তিনটি তিল আছে আমার নাকের ঠিক সেইখানে কালি দিয়া তিনটি তিল চিত্রিত করি। ওই একই কারণ হইতে, যাহাদের স্বাভাবিক ভদ্রতা নাই তাহারা ভদ্র হইতে ইচ্ছা করিলে আনুষ্ঠানিক ভদ্রতার কিছু বাড়াবাড়ি করিয়া থাকে। আমাদের সংগীতশাস্ত্র নাকি মৃত শাস্ত্র, সে শাস্ত্রের ভাবটা আমরা নাকি আয়ত্ত করিতে পারি না, এইজন্য রাগরাগিণী বাদী ও বিসম্বাদী সুরের ব্যাকরণ লইয়াই মহা কোলাহল করিয়া থাকি। যে ভাষার ব্যাকরণ সম্পূর্ণ হইয়াছে, সে ভাষার পরলোকপ্রাপ্তি হইয়াছে। ব্যাকরণে ভাষাকে বাঁচাইতে পারে না তো, প্রাচীন ইজিপ্ট্‌বাসীদের ন্যায় ভাষার একটা 'মমী' তৈরি করে মাত্র। যে সাহিত্যে অলংকারশাস্ত্রের রাজত্ব, সে সাহিত্যে কবিতাকে গঙ্গাযাত্রা করা হইয়াছে। অলংকারশাস্ত্রের পিঞ্জর হইতে মুক্ত হওয়াতে সম্প্রতি কবিতার কণ্ঠ বাংলার আকাশে উঠিয়াছে; আমার ইচ্ছা যে, কবিতার সহচর সংগীতকেও শাস্ত্রের লৌহকারা হইতে মুক্ত করিয়া উভয়ের মধ্যে বিবাহ দেওয়া হউক।

একটা অতি পুরাতন সত্য বলিবার আবশ্যক পড়িয়াছে। সকলেই জানেন— প্রথমে যেটি একটি উদ্দেশ্যের উপায় মাত্র থাকে, মানুষে ক্রমে সেই উপায়টিকে উদ্দেশ্য করিয়া তুলে। যেমন টাকা নানাপ্রকার সুখ পাইবার উপায় মাত্র, কিন্তু অনেকে সমস্ত সুখ বিসর্জন দিয়া টাকা পাইতে চান। রাগরাগিণীর উদ্দেশ্য কী ছিল? ভাব প্রকাশ করা ব্যতীত আর তো কিছু নয়। আমরা যখন কথা কহি তখনো সুরের উচ্চনীচতা ও কণ্ঠস্বরের বিচিত্র তরঙ্গলীলা থাকে। কিন্তু তাহাতেও ভাবপ্রকাশ অনেকটা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। সেই সুরের উচ্চনীচতা ও তরঙ্গলীলা সংগীতে উৎকর্ষতা প্রাপ্ত হয়। সুতরাং সংগীত মনোভাব-প্রকাশের শ্রেষ্ঠতম উপায় মাত্র। আমরা যখন কবিতা পাঠ করি তখন তাহাতে অঙ্গহীনতা থাকিয়া যায়; সংগীত আর কিছু নয়— সর্বোৎকৃষ্ট উপায়ে কবিতা পাঠ করা। যেমন, মুখে যদি বলি যে 'আমার আহ্লাদ হইতেছে' তাহাতে অসম্পূর্ণতা থাকিয়া যায়, কিন্তু যখন হাস্য করিয়া উঠি তখনই সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। যেমন, মুখে যদি বলি 'আমার দুঃখ হইতেছে' তাহাই যথেষ্ট হয় না, রোদন করিয়া উঠিলেই সম্পূর্ণ ভাব প্রকাশ হয়। তেমনি কথা কহিয়া যে ভাব অসম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করি, রাগরাগিণীতে সেই ভাব সম্পূর্ণতর রূপে প্রকাশ করি। অতএব রাগরাগিণীর উদ্দেশ্য ভাব প্রকাশ করা মাত্র। কিন্তু এখন তাহা কী হইয়া দাঁড়াইয়াছে? এখন রাগরাগিণীই উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যে রাগরাগিণীর হস্তে ভাবটিকে সমর্পণ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, সে রাগরাগিণী আজ বিশ্বাসঘাতকতাপূর্বক ভাবটিকে হত্যা করিয়া স্বয়ং সিংহাসন দখল করিয়া বসিয়া আছেন। আজ গান শুনিলেই সকলে

দেখিতে চান, জয়জয়ন্তী, বেহাগ বা কানেড়া বজায় আছে কি না। আরে মহাশয়, জয়জয়ন্তীর কাছে আমরা এমন কী ঋণে বদ্ধ যে, তাহার নিকটে অমনতর অন্ধ দাস্যবৃত্তি করিতে হইবে? যদি মধ্যমের স্থানে পঞ্চম দিলে ভালো শুনায়, আর তাহাতে বর্ণনীয় ভাবের সহায়তা করে, তবে জয়জয়ন্তী বাঁচুন বা মরুন, আমি পঞ্চমকেই বাহাল রাখিব না কেন— আমি জয়জয়ন্তীর কাছে এমনি কী ঘুষ খাইয়াছি যে, তাহার জন্য অত প্রাণপণ করিব? আজকাল ওস্তাদবর্গ যখন ভীষণ মুখশ্রী বিকাশ করিয়া গলদ্‌ঘর্ম হইয়া গান করেন, তখন সর্বপ্রথমেই ভাবের গলাটা এমন করিয়া টিপিয়া ধরেন ও ভাব বেচারিকে এমন করিয়া আর্তনাদ ছাড়ান যে, সহৃদয় শ্রোতামাত্রেরই বড়ো কষ্ট বোধ হয়। বৈয়াকরণে ও কবিতে যে প্রভেদ, উপরি-উক্ত ওস্তাদের সহিত আর-একজন ভাবুক গায়কের সেই প্রভেদ। একজন বলেন 'শুষ্কং কাষ্ঠং তিষ্ঠত্যগ্রে', আর একজন বলেন 'নীরসতরুরুহ পুরতো ভাতি'।

কোন্ কোন্ রাগরাগিণীতে কী কী সুর লাগে না-লাগে তাহা তো মান্ধাতার আমলে স্থির হইয়া গিয়াছে, তাহা লইয়া আর অধিক পরিশ্রম করিবার কোনো আবশ্যক দেখিতেছি না। এখন সংগীতবেত্তারা যদি বিশেষ মনোযোগ-সহকারে আমাদের কী কী রাগিণীতে কী কী ভাব আছে তাহাই আবিষ্কার করিতে আরম্ভ করেন, তবেই সংগীতের যথার্থ উপকার করেন। আমাদের রাগরাগিণীর মধ্যে একটা ভাব আছে, তাহা যাইবে কোথা বলো। কেবল ওস্তাদবর্গেরা তাহাদের অত্যন্ত উৎপীড়ন করিয়া থাকেন, তাহাদের প্রতি কিছুমাত্র মনোযোগ দেন না, এমন-কি তাহারা তাঁহাদের চোখে পড়েই না। সংগীতবেত্তারা সেই ভাবের প্রতি সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করুন। কেন বিশেষ-বিশেষ এক-এক রাগিণীতে বিশেষ-বিশেষ এক-একটা ভাবের উৎপত্তি হয় তাহার কারণ বাহির করুন। এই মনে করুন— পূরবীতেই বা কেন সন্ধ্যাকাল মনে আসে আর ভৈরোতেই বা কেন প্রভাত মনে আসে? পূরবীতেও কোমল সুরের বাহুল্য, আর ভৈরোতেও কোমল সুরের বাহুল্য, তবে উভয়েতে বিভিন্ন ফল উৎপন্ন করে কেন? তাহা কি কেবলমাত্র প্রাচীন সংস্কার হইতে হয়? তাহা নহে। তাহার গূঢ় কারণ বিদ্যমান আছে। প্রথমত প্রভাতের রাগিণী ও সন্ধ্যার রাগিণী উভয়েতেই কোমল সুরের আবশ্যক। প্রভাত যেমন অতি ধীরে ধীরে, অতি ক্রমশ নয়ন উন্মীলিত করে, সন্ধ্যা তেমনি অতি ধীরে ধীরে, অতি ক্রমশ নয়ন নিমীলিত করে। অতএব কোমল সুরগুলির, অর্থাৎ যে সুরের মধ্যে ব্যবধান অতি অল্প, যে সুরগুলি অতি ধীরে ধীরে অতি অলক্ষিত ভাবে পরস্পর পরস্পরের উপর মিলাইয়া যায়, সন্ধ্যা ও প্রভাতের রাগিণীতে সেই সুরের অধিক আবশ্যক তবে প্রভাতে ও সন্ধ্যায় কী বিষয়ে প্রভেদ থাকা উচিত? না, একটাতে সুরের ক্রমশ উত্তরোত্তর বিকাশ হওয়া আবশ্যক, আর-একটাতে অতি ধীরে ধীরে সুরের ক্রমশ নিমীলন হইয়া আসা আবশ্যক। ভৈরোতে ও পূরবীতে সেই বিভিন্নতা রক্ষিত হইয়াছে, এইজন্যই প্রভাত ও সন্ধ্যা উক্ত দুই রাগিণীতে মূর্তিমান।

কোন্ সুরগুলি দুঃখের ও কোন্ সুরগুলি সুখের হওয়া উচিত দেখা যাক। কিন্তু তাহা বিচার করিবার আগে, আমরা দুঃখ ও সুখ কিরূপে প্রকাশ করি দেখা আবশ্যক। আমরা যখন রোদন করি তখন দুইটি পাশাপাশি সুরের মধ্যে ব্যবধান অতি অল্পই থাকে, রোদনের স্বর প্রত্যেক কোমল সুরের উপর দিয়া গড়াইয়া যায়, সুর অত্যন্ত টানা হয়। আমরা যখন হাসি— হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ, কোমল সুর একটিও লাগে না, টানা সুর একটিও নাই, পাশাপাশি সুরের মধ্যে দূর ব্যবধান, আর তালের ঝোঁকে ঝোঁকে সুর লাগে। দুঃখের রাগিণী দুঃখের রজনীর ন্যায় অতি ধীরে ধীরে চলে, তাহাকে প্রতি কোমল সুরের উপর দিয়া যাইতে হয়। আর সুখের রাগিণী সুখের দিবসের ন্যায় অতি দ্রুত-পদক্ষেপে চলে, দুই-তিনটা করিয়া সুর ডিঙাইয়া যায়। আমাদের রাগরাগিণীর মধ্যে উল্লাসের সুর নাই। আমাদের সংগীতের ভাবই— ক্রমে ক্রমে উত্থান বা ক্রমে ক্রমে পতন। সহসা উত্থান বা সহসা পতন নাই। উচ্ছ্বাসময় উল্লাসের সুরই অত্যন্ত সহসা। আমরা সহসা হাসিয়া উঠি, কোথা হইতে আরম্ভ করি কোথায় শেষ করি তাহার ঠিকানা নাই—

রোদনের ন্যায় তাহা ক্রমশ মিলাইয়া আসে না। এরূপ ঘোরতর উল্লাসের সুর ইংরাজি রাগিণীতে আছে, আমাদের রাগিণীতে নাই বলিলেও হয়। তবে আমাদের দেশের সংগীতে রোদনের সুরের অভাব নাই। সকল রাগিণীতেই প্রায় কাঁদা যায়। একেবারে আর্তনাদ হইতে প্রশান্ত দুঃখ, সকল প্রকার ভাবই আমাদের রাগিণীতে প্রকাশ করা যায়।

আমাদের যাহা-কিছু সুখের রাগিণী আছে তাহা বিলাসময় সুখের রাগিণী, গদগদ সুখের রাগিণী। অনেক সময়ে আমরা উল্লাসের গান রচনা করিতে হইলে রাগিণী যে ভাবেরই হউক তাহাকে দ্রুত তালে বসাইয়া লই, দ্রুত তাল সুখের ভাব প্রকাশের একটা অঙ্গ বটে।

যাহা হউক, এইখানে দেখা যাইতেছে যে, তালও ভাব প্রকাশের একটা অঙ্গ। যেমন সুর তেমনি তালও আবশ্যকীয়, উভয়ে প্রায় সমান আবশ্যকীয়। অতএব ভাবের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তালও দ্রুত ও বিলম্বিত করা আবশ্যক— সর্বত্রই যে তাল সমান রাখিতেই হইবে তাহা নয়। ভাবপ্রকাশকে মুখ্য উদ্দেশ্য করিয়া, সুর ও তালকে গৌণ উদ্দেশ্য করিলেই ভালো হয়। ভাবকে স্বাধীনতা দিতে হইলে সুর এবং তালকেও অনেকটা স্বাধীন করিয়া দেওয়া আবশ্যক, নহিলে তাহারা ভাবকে চারি দিক হইতে বাঁধিয়া রাখে। এই-সকল ভাবিয়া আমার বোধ হয় আমাদের সংগীতে যে নিয়ম আছে যে, যেমন-তেমন করিয়া ঠিক একই স্থানে সমে আসিয়া পড়িতেই হয়, সেটা উঠাইয়া দিলে ভালো হয়। তালের সমমাত্রা থাকিলেই যথেষ্ট, তাহার উপরে আরো কড়াক্কড় করা ভালো বোধ হয় না। তাহাতে স্বাভাবিকতার অতিরিক্ত হানি করা হয়। মাথায় জলপূর্ণ কলস লইয়া নৃত্য করা যেরূপ, হাজার অঙ্গভঙ্গি করিলেও একবিন্দু জল উথলিয়া পড়িবে না, ইহাও সেইরূপ একপ্রকার কষ্টসাধ্য ব্যায়াম। সহজ স্বাভাবিক নৃত্যের যে-একটি শ্রী আছে ইহাতে তাহার যেন ব্যাঘাত করে; ইহাতে কৌশল প্রকাশ করে মাত্র। নৃত্যের পক্ষে কী স্বাভাবিক? না, যাহা নৃত্যের উদ্দেশ্য সাধন করে। নৃত্যের উদ্দেশ্য কী? না, অঙ্গভঙ্গির সৌন্দর্য, অঙ্গভঙ্গির কবিতা দেখাইয়া মনোহরণ করা। সে উদ্দেশ্যের বহির্ভূক্ত যাহা-কিছু তাহা নৃত্যের বহির্ভূক্ত। তাহাকে নৃত্য বলিব না, তাহার অন্য নাম দিব। তেমনি সংগীত কৌশলপ্রকাশের স্থান নহে, ভাবপ্রকাশের স্থান; যতখানিতে ভাবপ্রকাশের সাহায্য করে ততখানিই সংগীতের অন্তর্গত; যাহা-কিছু কৌশল প্রকাশ করে তাহা সংগীত নহে, তাহার অন্য নাম। একপ্রকার কবিতা আছে, তাহা সোজা দিক হইতে পড়িলেও যাহা বুঝায়, উল্‌টা দিক হইতে পড়িলেও তাহাই বুঝায়; সে রূপ কবিতা কৌশলপ্রকাশের জন্যই উপযোগী, আর কোনো উদ্দেশ্য তাহাতে সাধন করা যায় না। সেইরূপ আমাদের সংগীতে কৃত্রিম তালের প্রথা ভাবের হস্তপদে একটা অনর্থক শৃঙ্খল বাঁধিয়া দেয়। যাঁহারা এ প্রথা নিতান্ত রাখিতে চান তাঁহারা রাখুন, কিন্তু তালের প্রতি ভাবের যখন অত্যন্ত নির্ভর দেখিতেছি তখন আমার মতে আর-একটি অধিকতর স্বাভাবিক তালের পদ্ধতি থাকা শ্রেয়। আর-কিছু করিতে হইবে না, যেমন তাল আছে তেমনি থাকুক, মাত্রা-বিভাগ যেমন আছে তেমনি থাকুক, কেবল একটা নির্দিষ্ট স্থানে সমে ফিরিয়া আসিতেই হইবে এমন বাঁধাবাঁধি না থাকিলে সুবিধা বই অসুবিধা কিছুই দেখিতেছি না। এমন-কি, গীতিনাট্যে, যাহা আদ্যোপান্ত সুরে অভিনয় করিতে হয় তাহাতে, স্থানবিশেষে তাল না থাকা বিশেষ আবশ্যক। নহিলে অভিনয়ের স্ফূর্তি হওয়া অসম্ভব।

যাহা হউক, দেখা যাইতেছে যে, সংগীতের উদ্দেশ্যই ভাব প্রকাশ করা। যেমন কেবলমাত্র ছন্দ, কানে মিষ্ট শুনাক তথাপি অনাবশ্যক, ভাবের সহিত ছন্দই কবিদের ও ভাবুকদের আলোচনীয়, তেমনি কেবলমাত্র সুরসমষ্টি, ভাব না থাকিলে জীবনহীন দেহ মাত্র— সে দেহের গঠন সুন্দর হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে জীবন নাই। কেহ কেহ বলিবেন, তবে কি রাগরাগিণী-আলাপ নিষিদ্ধ? আমি বলি তাহা কেন হইবে? রাগরাগিণী-আলাপ ভাষাহীন সংগীত। অভিনয়ে pantomime যেরূপ ভাষাহীন অঙ্গভঙ্গি-দ্বারা ভাব প্রকাশ করা, সংগীতে আলাপও সেইরূপ। কিন্তু pantomime-এ যেমন কেবলমাত্র অঙ্গভঙ্গি হইলেই হয় না, যে-সকল অঙ্গভঙ্গি-দ্বারা ভাব

প্রকাশ হয় তাহাই আবশ্যক; আলাপেও সেইরূপ কেবল কতকগুলি সুর কণ্ঠ হইতে বিক্ষেপ করিলেই হইবে না, যে-সকল সুর-বিন্যাস-দ্বারা ভাব প্রকাশ হয় তাহাই আবশ্যক। গায়কেরা সংগীতকে যে আসন দেন, আমি সংগীতকে তদপেক্ষা উচ্চ আসন দিই; তাঁহারা সংগীতকে কতকগুলা চেতনাহীন জড় সুরের উপর স্থাপন করেন, আমি তাহাকে জীবন্ত অমর ভাবের উপর স্থাপন করি। তাঁহারা গানের কথার উপরে সুরকে দাঁড় করাইতে চান, আমি গানের কথাগুলিকে সুরের উপরে দাঁড় করাইতে চাই। তাঁহারা কথা বসাইয়া যান সুর বাহির করিবার জন্য, আমি সুর বসাইয়া যাই কথা বাহির করিবার জন্য। এইখানে গান রচনা সম্বন্ধে একটি কথা বলা আবশ্যক বিবেচনা করিতেছি। গানের কবিতা, সাধারণ কবিতার সঙ্গে কেহ যেন এক তুলাদণ্ডে ওজন না করেন। সাধারণ কবিতা পড়িবার জন্য ও সংগীতের কবিতা শুনিবার জন্য। উভয়ে যদি এতখানি শ্রেণীগত প্রভেদ হইল, তবে অন্যান্য নানা ক্ষুদ্র বিষয়ে অমিল হইবার কথা। অতএব গানের কবিতা পড়িয়া বিচার না করাই উচিত। খুব ভালো কবিতাও গানের পক্ষে হয়তো খারাপ হইতে পারে এবং খুব ভালো গানও হয়তো পড়িবার পক্ষে ভালো না হইতে পারে। মনে করুন, একজন হাঃ বলিয়া একটি নিশ্বাস ফেলিল, তাহা লিখিয়া লইলে আমরা পড়িব— হ'-এ আকার ও বিসর্গ, হাঃ। কিন্তু সে নিশ্বাসের মর্ম কি এরূপে অবগত হওয়া যায়? তেমনি আবার যদি আমরা শুনি কেহ খুব একটা লম্বাচৌড়া কবিত্বসূচক কথায় নিশ্বাস ফেলিতেছে, তবে হাস্যরস ব্যতীত আর কোনো রস কি মনে আসে? গানও সেইরূপ নিশ্বাসের মতো। গানের কবিতা পড়া যায় না, গানের কবিতা শুনা যায়।

উপসংহারে সংগীতবেত্তাদিগের প্রতি আমার এই নিবেদন যে, কী কী সুর কিরূপে বিন্যাস করিলে কী কী ভাব প্রকাশ করে, আর কেনই বা তাহা প্রকাশ করে, তাহার বিজ্ঞান অনুসন্ধান করুন। মূলতান ইমন-কল্যাণ কেদারা প্রভৃতিতে কী কী সুর বাদী আর কী কী সুর বিসম্বাদী তাহার প্রতি মনোযোগ না করিয়া, দুঃখ সুখ রোষ বা বিস্ময়ের রাগিণীতে কী কী সুর বাদী ও কী কী সুর বিসম্বাদী তাহাই আবিষ্কারে প্রবৃত্ত হউন। মূলতান কেদারা প্রভৃতি তো মানুষের রচিত কৃত্রিম রাগরাগিণী, কিন্তু আমাদের সুখদুঃখের রাগরাগিণী কৃত্রিম নহে। আমাদের স্বাভাবিক কথাবার্তার মধ্যে সেই-সকল রাগরাগিণী প্রচ্ছন্ন থাকে। কতকগুলা অর্থশূন্য নাম পরিত্যাগ করিয়া, বিভিন্ন ভাবের নাম অনুসারে আমাদের রাগ-রাগিণীর বিভিন্ন নামকরণ করা হউক। আমাদের সংগীতবিদ্যালয়ে সুর-অভ্যাস ও রাগরাগিণী-শিক্ষার শ্রেণী আছে, সেখানে রাগরাগিণীর ভাব-শিক্ষারও শ্রেণী স্থাপিত হউক। এখন যেমন সংগীত শুনিলেই সকলে বলেন 'বাঃ, ইহার সুর কী মধুর', এমন দিন কি আসিবে না যেদিন সকলে বলিবেন, 'বাঃ, কী সুন্দর ভাব'!

আমাদের সংগীত যখন জীবন্ত ছিল, তখন ভাবের প্রতি যেরূপ মনোযোগ দেওয়া হইত সেরূপ মনোযোগ আর কোনো দেশের সংগীতে দেওয়া হয় কি না সন্দেহ। আমাদের দেশে যখন বিভিন্ন ঋতু ও বিভিন্ন সময়ের ভাবের সহিত মিলাইয়া বিভিন্ন রাগরাগিণী রচনা করা হইত, যখন আমাদের রাগরাগিণীর বিভিন্ন ভাবব্যঞ্জক চিত্র পর্যন্ত ছিল, তখন স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, আমাদের দেশে রাগরাগিণী ভাবের সেবাতেই নিযুক্ত ছিল। সে দিন গিয়াছে। কিন্তু আবার কি আসিবে না!

ভারতী
জ্যৈষ্ঠ ১২৮৮

সংগীতের উৎপত্তি ও উপযোগিতা

(হর্বার্ট্‌ স্পেন্‌সরের মত)

'সংগীত ও ভাব'-নামক প্রবন্ধ রচনার পর হর্বার্ট স্পেন্‌সরের রচনাবলী পাঠ করিতে করিতে দেখিলাম 'The Origin and Function of Music'-নামক প্রবন্ধে যে-সকল মত অভিব্যক্ত হইয়াছে তাহা আমার মতের সমর্থন করে এবং অনেক স্থলে উভয়ের কথা এক হইয়া গিয়াছে।

স্পেন্‌সর সংগীতের শরীরগত কারণ সবিস্তারে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, বাঁধা কুকুর যখন দূর হইতে তাহার মনিবকে দেখে, বন্ধনমুক্ত হইবার আশায় অল্প অল্প লেজ নাড়িতে থাকে। মনিব যতই তাহার কাছে অগ্রসর হয়, ততই সে অধিকতর লেজ নাড়িতে এবং গা দুলাইতে থাকে। মুক্ত করিয়া দিবার অভিপ্রায়ে মনিব তাহার শিকলে হাত দিলে এমন সে লাফালাফি আরম্ভ করে যে, তাহার বাঁধন খোলা বিষম দায় হইয়া উঠে। অবশেষে যখন সম্পূর্ণ ছাড়া পায় তখন খুব খানিকটা ইতস্তত ছুটাছুটি করিয়া তাহার আনন্দের বেগ সামলায়। এইরূপ আনন্দে বা বিষাদে বা অন্যান্য মনোবৃত্তির উদয়ে সকল প্রাণীরই মাংসপেশিতে ও অনুভবজনক স্নায়ুতে উত্তেজনার লক্ষণ প্রকাশিত হয়। মানুষেও সুখে হাসে, যন্ত্রণায় ছটফট করে। রাগে ফুলিতে থাকে, লজ্জায় সংকুচিত হইয়া যায়। অর্থাৎ, শরীরের মাংসপেশিসমূহে মনোবৃত্তির প্রভাব তরঙ্গিত হইতে থাকে। মনোবৃত্তির অতিরিক্ত তীব্রতায় আমরা অভিভূত হইয়া পড়ি বটে, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও সাধারণ নিয়মস্বরূপে বলা যায় যে, শরীরের গতির সহিত হৃদয়ের বৃত্তির বিশেষ যোগ আছে। তাহা যেন হইল, কিন্তু সংগীতের সহিত তাহার কী যোগ? আছে। আমাদের কণ্ঠস্বর কতকগুলি বিশেষ মাংসপেশি দ্বারা উৎপন্ন হয়; সে-সকল মাংসপেশি শরীরের অন্যান্য পেশিসমূহের সঙ্গে সঙ্গে মনোভাবের উদ্রেকে সংকুচিত হইয়া যায়। এই নিমিত্ত আমরা যখন হাসি তখন অধরের সমীপবর্তী মাংসপেশি সংকুচিত হয়, এবং হাস্যের বেগ গুরুতর হইলে তৎসঙ্গে-সঙ্গে কণ্ঠ হইতেও একটা শব্দ বাহির হইতে থাকে। রোদনেও ঠিক সেইরূপ। এক কথায় বিশেষ বিশেষ মনোভাব- উদ্রেকের সঙ্গে সঙ্গে শরীরের নানা মাংসপেশি ও কণ্ঠের শব্দনিঃসারক মাংসপেশিতে উত্তেজনার আবির্ভাব হয়। মনোভাবের বিশেষত্ব ও পরিমাণ -অনুসারে কণ্ঠস্থিত মাংসপেশিসমূহ সংকুচিত হয়; তাহাদের বিভিন্ন প্রকারের সংকোচন অনুসারে আমাদের শব্দযন্ত্র বিভিন্ন আকার ধারণ করে; এবং সেই বিভিন্ন আকার অনুসারে শব্দের বিভিন্নতা সম্পাদিত হয়। অতএব দেখা যাইতেছে, আমাদের কণ্ঠনিঃসৃত বিভিন্ন স্বর বিভিন্ন মনোবৃত্তির শরীরগত বিকাশ।

আমাদের মনের ভাব বেগবান হইলে আমাদের কণ্ঠস্বর উচ্চ হয়, নহিলে অপেক্ষাকৃত মৃদু থাকে।

উত্তেজনার অবস্থায় আমাদের গলার স্বরে সুরের আমেজ আসে। সচরাচর সামান্য-বিষয়ক কথোপকথনে তেমন সুর থাকে না। বেগবান মনোভাবে সুর আসিয়া পড়ে। রোষের একটা সুর আছে, খেদের একটা সুর আছে, উল্লাসের একটা সুর আছে।

সচরাচর আমরা যে স্বরে কথাবার্তা কহিয়া থাকি তাহাই মাঝামাঝি স্বর। সেই স্বরে কথা কহিতে আমাদের বিশেষ পরিশ্রম করিতে হয় না। কিন্তু তাহার অপেক্ষা উঁচু বা নিচু স্বরে কথা কহিতে হইলে কণ্ঠস্থিত মাংসপেশির বিশেষ পরিশ্রমের আবশ্যক করে। মনোভাবের বিশেষ উত্তেজনা হইলেই তবে আমরা আমাদের স্বাভাবিক মাঝামাঝি সুর ছাড়াইয়া উঠি অথবা নামি। অতএব দেখা যাইতেছে, বেগবান মনোবৃত্তির প্রভাবে আমরা আমাদের স্বাভাবিক কথাবার্তার সুরের বাহিরে যাই।

সচরাচর যখন শান্তভাবে কথাবার্তা কহিয়া থাকি, তখন আমাদের কথার স্বর অনেকটা

একঘেয়ে হয়। সুরের উঁচুনিচু খেলায় না। মনোবৃত্তির তীব্রতা যতই বাড়ে, ততই আমাদের কথায় সুরের উঁচুনিচু খেলিতে থাকে। আমাদের গলা খুব নিচু হইতে খুব উঁচু পর্যন্ত উঠানামা করিতে থাকে। কণ্ঠের সাহায্য ব্যতীত ইহার দৃষ্টান্ত দেওয়া দুরূহ। পাঠকেরা একবার কল্পনা করিয়া দেখুন আমরা যখন কাহারও প্রতি রাগ করিয়া বলি, 'এ তোমার কী রকম স্বভাব?' 'এ' শব্দটা কত উঁচু সুরে ধরি ও 'স্বভাব' শব্দটায় কতটা নিচুসুরে নামিয়া আসি। ঠিক এক গ্রামের বৈলক্ষণ্য হয়।

যাহা হউক, দেখা যাইতেছে সচরাচর কথাবার্তার সহিত মনোবৃত্তির উত্তেজিত অবস্থার কথাবার্তার ধারা স্বতন্ত্র। পাঠকেরা অবধান করিয়া দেখিবেন যে, উত্তেজিত অবস্থার কথাবার্তার যে-সকল লক্ষণ, সংগীতেরও তাহাই লক্ষণ। সুখ দুঃখ প্রভৃতির উত্তেজনায় আমাদের কণ্ঠস্বরে যে-সকল পরিবর্তন হয়, সংগীতে তাহারই চূড়ান্ত হয় মাত্র। পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, উত্তেজিত মনোবৃত্তির অবস্থায় আমাদের কথোপকথনে স্বর উচ্চ হয়, স্বরে সুরের আভাস থাকে; সচরাচরের অপেক্ষা স্বরের সুর উঁচু অথবা নিচু হইয়া থাকে, এবং স্বরে সুরের উঁচুনিচু ক্রমাগত খেলিতে থাকে। গানের স্বরও উচ্চ, গানের সমস্তই সুর; গানের সুর সচরাচর কথোপকথনের সুর হইতে অনেকটা উঁচু অথবা নিচু হইয়া থাকে এবং গানের সুরে উঁচুনিচু ক্রমাগত খেলাইতে থাকে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, উত্তেজিত মনোবৃত্তির সুর সংগীতে যথাসম্ভব পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। তীব্র সুখ দুঃখ কণ্ঠে প্রকাশের যে লক্ষণ সংগীতেরও সেই লক্ষণ।

আমাদের মনোভাব গাঢ়তম তীব্রতম রূপে প্রকাশ করিবার উপায়-স্বরূপে সংগীতের স্বাভাবিক উৎপত্তি। যে উপায়ে ভাব সর্বোৎকৃষ্টরূপে প্রকাশ করি, সেই উপায়েই আমরা ভাব সর্বোৎকৃষ্টরূপে অন্যের মনে নিবিষ্ট করিয়া দিতে পারি। অতএব সংগীত নিজের উত্তেজনা-প্রকাশের উপায় ও পরকে উত্তেজিত করিবার উপায়।

সংগীতের উপযোগিতা সম্বন্ধে স্পেন্‌সর বলিতেছেন— আপাতত মনে হয় যেন সংগীত শুনিয়া যে অব্যবহিত সুখ হয়, তাহাই সাধন করা সংগীতের কার্য। কিন্তু সচরাচর দেখা যায়, যাহাতে আমরা অব্যবহিত সুখ পাই তাহাই তাহার চরম ফল নহে। আহার করিলে ক্ষুধা-নিবৃত্তির সুখ হয় কিন্তু তাহার চরম ফল শরীর-পোষণ, মাতা স্নেহের বশবর্তী হইয়া আত্মসুখসাধনের জন্য যাহা করেন তাহাতে সন্তানের মঙ্গলসাধন হয়, যশের সুখ পাইবার জন্য আমরা যাহা করি তাহাতে সমাজের নানা কার্য সম্পন্ন হয়— ইত্যাদি। সংগীতে কি কেবল আমোদমাত্রই হয়? অলক্ষিত কোনো উদ্দেশ্য সাধিত হয় না?

সকল-প্রকার কথোপকথনে দুইটি উপকরণ বিদ্যমান আছে। কথা ও যে ধরনে সেই কথা উচ্চারিত হয়। কথা ভাবের চিহ্ন (signs of ideas) আর ধরন অনুভাবের চিহ্ন (signs of feeling)। কতকগুলি বিশেষ শব্দ আমাদের ভাবকে বাহিরে প্রকাশ করে এবং সেই ভাবের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের হৃদয়ে যে সুখ বা দুঃখ উদয় হয়, সুরে তাহাই প্রকাশ করে। 'ধরন' বলিতে যদি সুরের বাঁকচোর উঁচুনিচু সমস্তই বুঝায় তবে বলা যায় যে, বুদ্ধি যাহা-কিছু কথায় বলে, হৃদয় 'ধরন' দিয়া তাহারই টীকা করে। কথাগুলি একটা প্রস্তাব মাত্র, আর বলিবার ধরন তাহার টীকা ও ব্যাখ্যা। সকলেই জানেন, অধিকাংশ সময়ে কথা অপেক্ষা তাহা বলিবার ধরনের উপর অধিক নির্ভর করি। অনেক সময়ে কথায় যাহা বলি, বলিবার ধরনে তাহার উল্টা বুঝায়। 'বড়োই বাধিত করলে!' কথাটি বিভিন্ন সুরে উচ্চারণ করিলে কীরূপ বিভিন্ন ভাব প্রকাশ করে সকলেই জানেন। অতএব দেখা যাইতেছে, আমরা একসঙ্গে দুই প্রকারের কথা কহিয়া থাকি। ভাবের ও অনুভাবের।

আমাদের কথোপকথনের এই উভয় অংশই একসঙ্গে উন্নতি লাভ করিতেছে। সভ্যতা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কথা বাড়িতেছে, ব্যাকরণ বিস্তৃত ও জটিল হইয়া উঠিতেছে, এবং সেইসঙ্গে-সঙ্গে যে আমাদের বলিবার ধরন পরিবর্তিত ও উন্নত হইতেছে তাহা সহজেই অনুমান

করা যায়। সভ্যতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যে কথা বাড়িতেছে তাহার অর্থই এই যে, ভাব ও অনুভাব বাড়িতেছে। সেইসঙ্গে-সঙ্গে যে, ভাব ও অনুভাব প্রকাশ করিবার উপায় সর্বতোভাবে সংস্কৃত ও উন্নত হইতেছে না তাহা বলা যায় না। বলা বাহুল্য যে, অনেকগুলি উন্নত ভাব ও সূক্ষ্ম অনুভাব অসভ্যদের নাই, তাহা প্রকাশ করিবার উপকরণও তাহাদের নাই। বুদ্ধির ভাষাও যেমন উন্নত হইতে থাকে, আবেগের (emotion) ভাষাও তেমনি উন্নত হয়। এখন কথা এই, সংগীত আমাদিগকে অব্যবহিত যে সুখ দেয়, তৎসঙ্গে-সঙ্গে আমাদের আবেগের ভাষার (language of the emotions) পরিস্ফুটতা সাধন করিতে থাকে। আবেগের ভাষাই সংগীতের মূল। সেই কারণ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া আজ ইহা এক স্বতন্ত্র বৃক্ষরূপে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু যেমন রসায়নশাস্ত্র বস্তুনির্মাণবিদ্যা হইতে জন্মলাভ করিয়া স্বতন্ত্র শাস্ত্ররূপে উন্নীত হইয়াছে, ও অবশেষে বস্তুনির্মাণবিদ্যার বিশেষ সহায়তা করিতেছে, যেমন শরীরতত্ত্ব চিকিৎসাবিদ্যা হইতে উৎপন্ন হইয়া স্বতন্ত্র শাস্ত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে ও চিকিৎসাবিদ্যার উন্নতি সাধন করিতেছে, তেমনি সংগীত আবেগের ভাষা হইতে জন্মাইয়া আবেগের ভাষাকে পরিস্ফুট করিয়া তুলিতেছে। সংগীতের এই কার্য।

অনেকে হয়তো সহসা মনে করিবেন এ কার্য তো অতি সামান্য। কিন্তু তাহা নহে। মনুষ্যজাতির সুখবর্ধনের পক্ষে আবেগের ভাষা, বুদ্ধির ভাষার সমান উপযোগী। কারণ সুরের বিচিত্র তরঙ্গ-ভঙ্গি আমাদের হৃদয়ের অনুভাব হইতে উৎপন্ন হয় এবং সেই অনুভাব অন্যের হৃদয়ে জাগ্রত করে। বুদ্ধি মৃত ভাষায় আপনার ভাব-সকল প্রকাশ করে আর সুরের লীলা তাহাতে জীবনসঞ্চার করে। ইহার ফল হয় এই যে, সেই ভাবগুলি আমরা কেবলমাত্র যে বুঝি তাহা নহে, তাহা আমরা গ্রহণ করিতে পারি। পরস্পরের মধ্যে সমবেদনা উদ্রেক করিবার ইহাই প্রধান উপায়। সাধারণের মঙ্গল ও আমাদের নিজের সুখ এই সমবেদনার উপর এতখানি নির্ভর করে যে, যাহাতে করিয়া আমাদের মধ্যে এই সমবেদনার বিশেষ চর্চা হয় তাহা সভ্য সমাজের পক্ষে অত্যন্ত আবশ্যক ও উপকারী। এই সমবেদনার প্রভাবেই আমরা পরের প্রতি ন্যায্য ও সদয় ব্যবহার করিয়া থাকি; এই সমবেদনার ন্যূনাধিক্যই অসভ্যদিগের নিষ্ঠুরতা ও সভ্যদিগের সর্বজনীন মমতার কারণ; বন্ধুত্ব, প্রেম, পারিবারিক সুখ, সমস্তই এই সমবেদনার উপরে গঠিত। অতএব এই সমবেদনা প্রকাশ করিবার উপায় সভ্যতার পক্ষে কতখানি উপযোগী তাহা আর বলিবার আবশ্যক করে না।

সভ্যতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের হৃদয়ের দ্বন্দ্বপরায়ণ ভাব-সকল অন্তর্হিত হইয়া সামাজিক ভাবের প্রাদুর্ভাব হইতেছে, কেবলমাত্র স্বার্থপর ভাব-সকল দূর হইয়া পরার্থসাধক ভাবের চর্চা হইতেছে। এইরূপ সামাজিক ভাবের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সভ্য জাতিদের সমবেদনার ভাব বিকশিত হইতেছে ও সেইসঙ্গে তাহাদের মধ্যে সমবেদনার ভাষাও বাড়িয়া উঠিতেছে।

অনেকগুলি উন্নততর সূক্ষ্মতর ও জটিলতর অনুভাব অল্পসংখ্যক শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে প্রচলিত আছে, তাহা কালক্রমে জনসাধারণে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে— তখন আবেগের ভাষাও বিস্তৃত হইয়া পড়িবে। এখন যেমন সভ্য দেশে ভাবপ্রকাশক ভাষা অত্যন্ত অসম্পূর্ণ অবস্থা হইতে এমন দ্রুত উন্নতি লাভ করিতেছে যে, অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও জটিল ভাব-সকলও তাহাতে অতি পরিষ্কাররূপে প্রকাশ হইতে পারিতেছে, তেমনি আবেগের ভাষা যদিও এখনো অসম্পূর্ণ রহিয়াছে, তথাপি ক্রমে এতদূর উন্নতি লাভ করিতে পারিবে যে, আমরা আমাদের হৃদয়াবেগ অতি জাজ্বল্যরূপে ও সম্পূর্ণরূপে অন্যের হৃদয়ে মুদ্রিত করিতে পারিব। সকলেই জানেন অভদ্রদের অপেক্ষা ভদ্রলোকদের গলা অধিক মিষ্ট। একজন অভদ্র যাহা বলে একজন ভদ্র ঠিক তাহাই বলিলে, অপরের অপেক্ষা অনেক মিষ্ট শুনায়। তাহার কারণ আর কিছুই নহে, অভদ্রের অপেক্ষা একজন ভদ্রের অনুভাবের চর্চা অধিক হইয়াছে, সুতরাং অনুভাব প্রকাশের উপায়ও তাঁহাদের সহজ ও স্বাভাবিক হইয়া গিয়াছে। তাহার ঠিক সুরগুলি তাঁহারা জানেন, কণ্ঠস্বরেই বুঝা যায় যে তাঁহারা ভদ্র। বহুকাল হইতে তাঁহারা ভদ্রতার ঠিক সুরটি শুনিয়া আসিতেছেন, তাহাই ব্যবহার

করিয়া আসিতেছেন। অনুভাবপূর্ণ সংগীত যাঁহারা চর্চা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের যে অনুভাবের ভাষা বিশেষ মার্জিত ও সম্পূর্ণ হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য কী আছে?

সুন্দর রাগিণী শুনিলে আমাদের হৃদয়ে যে সুখের উদ্রেক হয় তাহার কারণ বোধ করি অতি দূর ভবিষ্যতে উন্নত সভ্যতার অবস্থায় যে এক সুখময় অনুভাবের দিন আসিবে, সুন্দর রাগিণী তাহারই ছায়া আমাদের হৃদয়ে আনয়ন করে। এই-সকল রাগিণী, যাহার উপযুক্ত অনুভাব আজকাল আমরা খুঁজিয়া পাই না, এমন সময় আসিবে যখন সচরাচর ব্যবহৃত হইতে পারিবে। আজ সুরসমষ্টি মাত্র আমাদের হৃদয়ে যে সুখ দিতেছে, উন্নত যুগে অনুভাবের সহিত মিলিয়া লোকদের তাহার দ্বিগুণ সুখ দিবে। ভালো সংগীত শুনিলে আমাদের হৃদয়ে যে একটি দূর অপরিস্ফুট আদর্শ জগৎ মায়াময়ী মরীচিকার ন্যায় প্রতিবিম্বিত হইতে থাকে, ইহাই তাহার কারণ। এই তো গেল স্পেন্‌সরের মত।

স্পেন্‌সরের মতকে আর-এক পা লইয়া গেলেই বুঝায় যে, এমন একদিন আসিতেছে যখন আমরা সংগীতেই কথাবার্তা কহিব। সভ্যতার যখন এতদূর উন্নতি হইবে যে, আমাদের হৃদয়ের অঙ্গহীন রুগ্‌ণ, মলিন বৃত্তিগুলিকে সশঙ্কিত ভাবে আর ঢাকিয়া বেড়াইতে হইবে না, তাহারা পরিপূর্ণ সুস্থ ও সুমার্জিত হইয়া উঠিবে— যখন সমবেদনার এতদূর বৃদ্ধি হইবে যে, পরস্পরের নিকট আমাদের হৃদয়ের অনুভাব-সকল অসংকোচে ও আনন্দে প্রকাশ করিব, তখন অনুভাব প্রকাশের চর্চা অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিবে, তখন সংগীতই আমাদের অনুভাব প্রকাশের ভাষা হইয়া দাঁড়াইবে। মনুষ্যসমাজের তিনটি অবস্থা আছে। সমাজের বাল্য অবস্থায় মানুষ হৃদয় আচ্ছাদন করিয়া রাখে না, তাহারা দোষকে দোষ বলিয়া জানে না; যখন দোষ গুণ বিচার করিতে শিখে অথচ বহুকালক্রমাগত অসংযত স্বভাবের উপর একেবারে জয়লাভ করিতে পারে না, তখন সে আপনার হৃদয়কে নিতান্ত অনাবৃত রাখিতে লজ্জা বোধ করে; যখনি সমাজ অনাবৃত থাকিতে লজ্জা বোধ করিতে লাগিল তখন বুঝা গেল সংশোধন আরম্ভ হইয়াছে; অবশেষে যখন এই গোপন চিকিৎসার ফল এতদূর ফলিল যে ঢাকিয়া রাখিবার আর-কিছু রহিল না, তখন পুনর্বার প্রকাশ করিবার কাল আইসে। আধুনিক সভ্যতার গোপন রাখিবার ভাব উত্তীর্ণ হইয়া যখন ভবিষ্যৎ সভ্যতার প্রকাশ করিবার কাল আসিবে, তখন প্রকাশের ভাষার অত্যন্ত উন্নতি হইবার কথা। অনুভাব-প্রকাশের ভাষার অত্যন্ত উন্নতিই সংগীত। একজন মানুষের জীবনে তিনটি করিয়া যুগ আছে। প্রথম— বাল্যকালে সে যাহা-তাহা বকিয়া থাকে, তাহার নিয়ম নাই, শৃঙ্খলা নাই। দ্বিতীয়— তাহার শিক্ষার কাল, এই কাল তাহার চুপ করিয়া থাকিবার কাল। প্রবাদ আছে, চুপ না করিয়া থাকিলে কথা কহিতে শিখা যায় না। এখন চুপে চুপে তাহার চরিত্র, তাহার জ্ঞান গঠিত হইতেছে, এখনো গঠন সম্পূর্ণ হয় নাই। তৃতীয়— কথা কহিবার কাল। চুপ করিয়া সে যাহা শিখিয়াছে, এখন সে তাহাই বলিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহার চরিত্র সংগঠিত হইয়াছে, ভাব পরিণত হইয়াছে, ভাষা সম্পূর্ণ হইয়াছে। সমাজেরও সেই তিন অবস্থা আছে। প্রথমে সে যাহা-তাহা বকে, ঈষৎ জ্ঞান হইলেই যাহা-তাহা বকিতে লজ্জা বোধ হয়। সেই সময়টা চুপচাপ করিয়া থাকে। জ্ঞান যখন সম্পূর্ণ হয় তখন তাহার সে লজ্জা দূর হয়, তখন তাহার ভাষা পরিস্ফুটতা প্রাপ্ত হয়। অনুভাব সম্বন্ধে বর্তমান সভ্যতার সেই লজ্জার অবস্থা, চুপ করিয়া থাকিবার অবস্থা। এখন যাহা কথা বলে ছেলেবেলা অপেক্ষা অনেক ভালো বলে বটে, কিন্তু ঢাকিয়া বলে— যাহা মনে আসে তাহাই বলে না। কণ্ঠস্বরে যেন ইতস্ততের ভাব, সংকোচের ভাব থাকে, সুতরাং পরিস্ফুটতার ভাব থাকে না। সুতরাং এখনকার অনুভাবের ভাষা ছেলেবেলাকার ভাষার অপেক্ষা অনেক ভালো বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ ভালো নহে। এমন অবস্থা আসিবে, যখন অনুভাবের ভাষা সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবে, তখনকার ভাষা, বোধ করি, এখনকার সংগীত। এখন যেমন জ্ঞান প্রকাশের স্বাধীনতা হইয়াছে— freedom of thought যাহা পূর্বে অত্যন্ত গর্হিত বলিয়া ঠেকিত, যাহা সমাজ দমন করিয়া রাখিত, এখন তাহা সভ্যদেশে বিশিষ্টরূপে প্রচলিত

হইয়াছে এবং জ্ঞান প্রকাশের ভাষাও বিশেষরূপে উন্নতি লাভ করিয়াছে, নিশ্চয় এমন কাল আসিবে, যখন অনুভাব প্রকাশের স্বাধীনতা হইবে— পরস্পরের মধ্যে অনুভাবের আদানপ্রদানের বিশেষরূপ চর্চা হইবে ও সেইসঙ্গে আবেগের ভাষাও সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবে।

আমাদের দেশে সংগীত এমনি শাস্ত্রগত, ব্যাকরণগত, অনুষ্ঠানগত হইয়া পড়িয়াছে, স্বাভাবিকতা হইতে এত দূরে চলিয়া গিয়াছে যে, অনুভাবের সহিত সংগীতের বিচ্ছেদ হইয়াছে, কেবল কতকগুলা সুরসমষ্টির কর্দম এবং রাগরাগিণীর ছাঁচ ও কাঠামো অবশিষ্ট রহিয়াছে; সংগীত একটি মৃত্তিকাময়ী প্রতিমা হইয়া পড়িয়াছে— তাহাতে হৃদয় নাই, প্রাণ নাই। এইরূপ একই ছাঁচে-ঢালা, অপরিবর্তনশীল সংগীতের জড়প্রতিমা আমাদের দেবদেবীমূর্তির ন্যায় বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। যে-কোনো গায়ক-কুম্ভকার সংগীত গড়িয়াছে, প্রায় সেই একই ছাঁচে গড়িয়াছে। এইটুকু মাত্র তাহার বাহাদুরি যে, তাহার সম্মুখস্থিত আদর্শ-মূর্তির সহিত তাহার গঠিত প্রতিমার কিছুমাত্র তফাত হয় নাই— এমনি তাহার হাত দোরস্ত! মনসা শীতলা ওলাবিবি ও সত্যপীর প্রভৃতির ন্যায় দুই-চারিটা মাত্র প্রাদেশিক ও যাবনিক মূর্তি নূতন গঠিত হইয়াছে, কিন্তু তাহাও প্রাণশূন্য মাটির প্রতিমা। সংগীতে এতখানি প্রাণ থাকা চাই, যাহাতে সে সমাজের বয়সের সহিত বাড়িতে থাকে, সমাজের পরিবর্তনের সহিত পরিবর্তিত হইতে থাকে, সমাজের উপর নিজের প্রভাব বিস্তৃত করিতে পারে ও তাহার উপরে সমাজের প্রভাব প্রযুক্ত হয়। সমাজবৃক্ষের শাখায় শুদ্ধ মাত্র অলংকারস্বরূপে সংগীত নামে একটা সোনার ডাল বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে, গাছের সহিত সে বাড়ে না, গাছের রসে সে পুষ্ট হয় না, বসন্তে তাহাতে মুকুল ধরে না, পাখিতে তাহার উপর বসিয়া গান গাহে না। গাছের আর-কিছু উপকার করে না, কেবল শোভাবর্ধন করে।

শোভাবর্ধনের কথা যদি উঠিল তবে তৎসম্বন্ধে দুই-একটি কথা বলা আবশ্যক। সংগীতকে যদি শুদ্ধ কেবল শিল্প, কেবল মনোহারিণী বিদ্যা বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলেও স্বীকার করিতে হয় যে, আমাদের দেশীয় অনুভাবশূন্য সংগীত নিকৃষ্ট শ্রেণীর। চিত্রশিল্প দুই প্রকারের আছে। এক— অনুভাবপূর্ণ মুখশ্রী ও প্রকৃতির অনুকৃতি, দ্বিতীয়— যথাযথ রেখাবিন্যাস-দ্বারা একটা নেত্ররঞ্জক আকৃতি নির্মাণ করা। কেহই অস্বীকার করিবেন না যে, প্রথমটিই উচ্চতম শ্রেণীর চিত্রবিদ্যা। আমাদের দেশে শালের উপরে, নানাবিধ কাপড়ের পাড়ে, রেখাবিন্যাস ও বর্ণবিন্যাস দ্বারা বিবিধ নয়নরঞ্জক আকৃতি-সকল চিত্রিত হয়, কিন্তু শুদ্ধ তাহাতেই আমরা ইটালীয়দের ন্যায় চিত্রশিল্পী বলিয়া বিখ্যাত হইব না। আমাদের সংগীতও সেইরূপ সুরবিন্যাস মাত্র, যতক্ষণ আমরা তাহার মধ্যে অনুভাব না আনিতে পারিব, ততক্ষণে আমরা উচ্চশ্রেণীর সংগীতবিৎ বলিয়া গর্ব করিতে পারিব না।

ভারতী
আষাঢ় ১২৮৮

শিল্প

[মন্দিরপথবর্তিনী]

“ম্হাত্রে” উপাধিকারী একটি মহারাষ্ট্রী ছাত্র “মন্দিরপথবর্তিনী’ (To the Temple) নামক একটি রমণীমূর্তি রচনা করিয়াছিলেন। তাহারই সম্মুখের ও পার্শ্বের দুইখানি ফোটোগ্রাফ ভারতীয় শিল্পকলার গুণজ্ঞপ্রবর সার্‌ জর্জ বার্ড্‌বুডের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল। প্রস্তাব ছিল এই ছাত্রটিকে য়ুরোপে শিক্ষাদানের সুযোগ করিয়া দিলে উপকার হইবার সম্ভাবনা।

তদুত্তরে উক্ত ভারতবন্ধু ইংরাজমহোদয় এই মূর্তির প্রচুর প্রশংসা করিয়া পত্র লেখেন। তাহাতে প্রকাশ করেন, এই মূর্তিখানি গ্রীক ভাস্কর্যের চরমোন্নতিকালীন রচনার সহিত তুলনীয় হইতে পারে এবং বর্তমান য়ুরোপীয় শিল্পে ইহার উপমা মেলা দুষ্কর। তাঁহার মতে যে শিল্পী য়ুরোপীয় কলাবিদ্যা না শিখিয়া নিজের প্রতিভা হইতে এমন একটি অপরূপ সৌন্দর্যের উদ্‌ভাবন করিতে পারিয়াছেন তাহার ক্ষমতার পূর্ণ বিকাশ হইবার পূর্বে তাহাকে বিলাতে শিক্ষাদান না করাই শ্রেয়, কারণ য়ুরোপীয় শিল্পের অনুকরণে ভারতবর্ষের বিশেষ শ্রী, বিশেষ প্রাণটুকু অভিভূত হইয়া যাইতে পারে।

এইখানে বলা আবশ্যক, বার্ড্‌বুড্‌ সাহেব দুইটি ভুল করিয়াছিলেন। প্রথমত, তিনি ফোটোগ্রাফ হইতে বুঝিতে পারেন নাই যে, মূর্তিটি প্রস্তরমূর্তি নহে, তাহা প্যারিস-প্লাস্টারের রচনা মাত্র। দ্বিতীয়ত, ম্হাত্রে বোম্বাই আর্টস্কুলে য়ুরোপীয় শিক্ষকের নিকট শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন।

এই দুই ভ্রম উপলক্ষ করিয়া চিজ্‌হলম্‌ নামধারী কোনো অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান ‘পায়োনিয়র’ পত্রে বার্ড্‌বুড্‌ সাহেবের প্রতি কুটিল বিদ্রূপ বর্ষণ করিয়াছেন— এবং ম্হাত্রে-রচিত মূর্তির গুণপনা কথঞ্চিৎ স্বীকার করিয়াও তাহাকে খর্ব করিতে চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই।

শিল্প সম্বন্ধে আমাদের শিক্ষা অসম্পূর্ণ। অসম্পূর্ণ কেন, অনারব্ধ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সুতরাং এই তর্কের মধ্যে প্রবেশ করিতে ভারতবর্ষীয় কাহারও অধিকার আছে কি না সন্দেহ। কিন্তু এই নবীন শিল্পীর অভ্যুদয়ে আমাদের চিত্ত আশান্বিত হইয়া উঠিয়াছে।

বার্ড্‌বুড্‌ সাহেব -কর্তৃক সম্পাদিত ‘ভারতশিল্প’ পত্রিকায় পূর্বোক্ত দুটি ফোটোগ্রাফ বাহির হইয়াছে। তাহা বারংবার নিরীক্ষণ করিয়াও আমাদের পরিতৃপ্তি হয় না। রমণীর উত্তান বাম বাহুতে একটি থালা ও অধোলম্বিত দক্ষিণ হস্তে একটি পাত্র উরুদেশে সংলগ্ন। তাহার দক্ষিণজানু সুন্দর ভঙ্গিতে পশ্চাদ্‌বর্তী হইয়া সুকুমার পদাঙ্গুলির অগ্রভাগে ধরণীতল স্পর্শ করিয়া আছে। তাহার দেবীতুল্য গঠনলাবণ্য নিবিড় নিবদ্ধ কঞ্চুলিকা ও কুটিলকুঞ্চিত অঙ্গবস্ত্র-দ্বারা আচ্ছন্ন না হইয়াও, অতিশয় মনোরম ভাবে সংবৃত। তরুণ মুখখানি আমাদের ভারতবর্ষেরই মুখ; সরল, স্নিগ্ধ, শান্ত এবং ঈষৎ সকরুণ। সবসুদ্ধ চিত্রখানি বিশুদ্ধ, সংযত এবং সম্পূর্ণ।

এই চিত্রটি দেখিতে দেখিতে আমাদের বহুকালের বুভুক্ষিত আকাঙ্ক্ষা প্রতিক্ষণে চরিতার্থতা লাভ করিতে থাকে। সহসা বুঝিতে পারি যে, আমরা ভারতবর্ষীয় নারীরূপের একটি আদর্শকে মূর্তিমান দেখিবার জন্য এতদিন প্রতীক্ষা করিয়াছিলাম। সেই সৌন্দর্যকে আমরা লক্ষ্মীরূপে সরস্বতীরূপে অন্নপূর্ণারূপে অন্তরে অনুভব করিয়াছি, কিন্তু কোনো গুণীশিল্পী তাহাকে অমর দেহদান করিয়া আমাদের নেত্রসম্মুখে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেন নাই।

দেশীয় স্ত্রীলোকের ছবি অনেক দেখা যায় কিন্তু তাহা প্রাকৃত চিত্র। অর্থাৎ যাহারা প্রতিদিন ঘরে বাহিরে সঞ্চরণ করে, খায় পরে, আসে যায়, জন্মায় মরে তাহাদেরই প্রতিকৃতি। যে নারী আমাদের অন্তরে বাহিরে, আমাদের সাহিত্য সংগীতে নিত্যকাল জাগ্রত, বংশানুক্রমে চিরপ্রবহমান ভারতীয় নারীগণের মধ্যে স্থির হইয়া অমর হইয়া বিরাজ করিতেছেন, যিনি বৈদিককালে সরস্বতীতীরে তপোবনের গোষ্ঠগৃহে নবীনা ছিলেন এবং যিনি অদ্য লৌহশৃঙ্খলিত গঙ্গাকূলে

নবরাজধানীর ড্রয়িংরুম সোফাপর্যঙ্কেও তরুণী, সেই ভাবরূপিণী ভারত-নারী, যিনি সর্বকালে ভারতব্যাপিনী হইয়াও আমাদের প্রত্যক্ষগোচর নহেন— তাঁহাকে প্রত্যক্ষগম্য করা আমাদের চিত্তের কামনা, আমাদের শিল্পের সাধনা। যে শিল্পী কল্পনামন্ত্রে সেই দেহের অতীতকে মূর্তির দ্বারা ধরিতে পারেন তিনি ধন্য।

ম্হাত্রে-রচিত মূর্তির ছবিখানি দেখিলে মনে হয়, যে শুদ্ধশুচি ভক্তিমতী হিন্দুনারী চিরদিন মন্দিরের পথে গিয়াছে এবং চিরদিন মন্দিরের পথে যাইবে, এ সেই নামহীন জন্মহীন মৃত্যুহীন রমণী— ইহার সম্মুখে কোন্ এক অদৃশ্য নিত্য তীর্থদেবালয়, ইহার পশ্চাতে কোন্ এক অদৃশ্য নিত্য গৃহপ্রাঙ্গণ।

এই ছবির মধ্যে গ্রীসীয় শিল্পকলার একটা ছায়া যে পড়ে নাই, তাহা নহে। কিন্তু দেশীয় শিল্পীর প্রতিভাকে তাহা লঙ্ঘন করে নাই। বরঞ্চ তাহার সম্পূর্ণ অনুবর্তী হইয়া রহিয়াছে। ইহাকে ঠিক অনুকরণ বলে না। ইহাকে বরঞ্চ স্বীয়করণ নাম দেওয়া যায়। এইরূপ পরেরকে নিজের, বিদেশেরকে স্বদেশের, পুরাতনকে নূতন করিয়া লওয়াই প্রতিভার লক্ষণ।

ইংরাজি আর্টস্কুলে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া এই ছাত্রটির শিল্পবোধ উদ্‌বোধিত হইয়াছে তাহাতে আমাদের বিস্ময়ের বা ক্ষোভের কোনো কথা নাই। এবং তাহা হইতে এ কথাও মনে করা অকারণ যে, তবে তাহার রচনা মূলত য়ুরোপীয়।

ইংরাজি সাহিত্যের ইতিহাসে যাহাকে বলে শেক্‌স্‌পিরীয় যুগ তাহা তৎকালীন ইতালীয় ভাব-আন্দোলনের সংঘাত হইতে উদ্ভূত। তখন দেশীবিদেশীর সংস্রবে ইংরাজি সাহিত্যে খুব একটা আবর্ত জন্মিয়াছিল— তাহার মধ্যে অসংগত, অপরিণত, অপরিমিত, অনাসৃষ্টি অনেক জিনিস ছিল— তাহা শোভন সুসম্পূর্ণ এবং স্বাভাবিক হইয়া উঠিতে অল্প সময় লয় নাই। কিন্তু সেই আঘাতে ইংলন্ডের মন জাগিয়া উঠিয়াছিল এবং সাহিত্যকলার অনেকগুলি বাহ্য আকার প্রকার, ছন্দ এবং অলংকার ইংরাজ আত্মসাৎ করিতে পারিয়াছিল। তাহাতে ইংরাজি সাহিত্যের ক্ষতি হয় নাই, বৃদ্ধি হইয়াছে।

আমাদের মনকেও সুগভীর নিশ্চেষ্টতা হইতে প্রবুদ্ধ করিয়া তুলিবার জন্য একটি নূতন এবং প্রবল ভাবপ্রবাহের সংঘাত আবশ্যক হইয়াছিল। পশ্চিমের বেগবান ও প্রাণবান সাহিত্য ও শিল্পকলা সেই আঘাত করিতেছে। আপাতত তাহার সকল ফল শুভ এবং শোভন হইতে পারে না। এবং প্রথমে বাহ্য অনুকরণই স্বভাবত প্রবল হইয়া উঠে— কিন্তু ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে ভারতবর্ষের লক্ষ্মী তাহার মধ্যে প্রবেশ করিবে, অসংগতির মধ্যে সংগতি আনিবে— এবং সেই বিদেশী বন্যায় আনীত পলিমাটির ভিতর দিয়া দ্বিগুণ তেজে আপনারই শস্যগুলিকে অঙ্কুরিত, পুষ্পগুলিকে বিকশিত, ফলগুলিকে পরিণত করিয়া তুলিবে।

ইহা না হইয়া যায় না। আমাদের চতুর্দিকের বিপুল ভারতবর্ষ, আমাদের বহুকালের সুদূর ভারতবর্ষ, আমাদের অন্তর্নিহিত নিগূঢ় ভারতবর্ষকে নিরস্ত করিবার জো নাই। নূতন শিক্ষা ঝড়ের মতো বহিয়া যায়, বজ্রের মতো পতিত হয়, বৃষ্টির মতো ঝরিয়া পড়ে, আমাদের ভারতবর্ষ ধরণীর মতো তাহা গ্রহণ করে— কতকটা সফল হয়, কতকটা বিফল হয়, কতকটা কুফলও হয়, কিন্তু সমস্ত ফলাফলের মধ্যে ভারতবর্ষ থাকিয়া যায়।

বাংলা সাহিত্যে আমরা ইংরাজি হইতে অনেক বাহ্য আকার প্রকার লাভ করিয়াছি। তাহার মধ্যে যেগুলি, অন্তরের ভাবপরিস্ফুটনের জন্য সর্বজনীন ও সর্বকালীন রূপে সর্বাপেক্ষা উপযোগী তাহাই থাকিয়া যাইবে। উপন্যাস লিখিবার ধারা আমরা ইংরাজি সাহিত্য হইতে পাইয়াছি, কিন্তু প্রতিভাশালী লোকের হস্তে সে উপন্যাস সম্পূর্ণ বাংলা উপন্যাস হইয়াছে। সূর্যমুখী বাঙালি, ভ্রমর বাঙালি, কপালকুণ্ডলা ঘরের সংস্রব ছাড়িয়া, মনের মধ্যে পালিতা হইয়াও কোনো ছদ্মবেশধারিণী ইংরাজি রোমান্সের নায়িকা নহে, সে বাঙালি বনবালিকা।

আসল কথা, প্রতিভা বৃহৎ বনস্পতির ন্যায়। নূতন-চাষ-করা আধহাত গভীর জমির মধ্যে

শিকড় ঠেলিয়া, একটি বর্ষার ধারা এবং একটি শরতের রৌদ্র লইয়া অর্ধবৎসরের মধ্যে সে আপন জন্মমৃত্যু সমাপ্ত করিয়া যাইতে পারে না। অনেক নিম্নে এবং অনেক দূরে তাহাকে অনেক শিকড় নামাইতে হয় তবেই সে আপনার উপযোগী রস ও প্রাণ আকর্ষণ করিতে পারে। সেই সুদূর এবং গভীর বন্ধন স্বভাবতই স্বদেশ ব্যতীত আর কোথাও হইতে পারে না। যতই শিক্ষা লাভ করি বিদেশের সহিত আমাদের উপরিতলের সম্বন্ধ— তাহার সর্বত্র আমাদের গতি নাই, আমাদের অধিকার নাই। কিন্তু যুগ-যুগান্তর ও দূর-দূরান্তরের নিগূঢ় ও স্বাভাবিক সম্বন্ধবন্ধন ব্যতীত বৃহৎ প্রতিভা কখনো আপনাকে দাঁড় করাইতে আপনাকে চিরজীবী রাখিতে পারে না। এইজন্য প্রতিভা স্বতই আপন স্বদেশের মর্মের মধ্যে মূল বিস্তার করিয়া সার্বলৌকিক আকাশের মধ্যে শিরোত্তোলন করিয়া থাকে।

কেবল সাহিত্যের প্রতিভা কেন, মহত্ত্বমাত্রেরই এই লক্ষণ। বাহ্য অনুকরণ, বিদেশীয় ধরনধারণের তুচ্ছ আড়ম্বর, এমন-কি, বিজাতীয় বিলাসবিভ্রমের সুখস্বচ্ছন্দতায় বৃহৎ হৃদয় কখনোই পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারে না।

বিলাতি সমাজে বিলাতি ইতিহাসে যাহা গভীর, যাহা ব্যাপক, যাহা নিত্য— নকল বিলাতে তাহা যতই উজ্জ্বল ও দৃষ্টি-আকর্ষক হউক তাহা শুষ্ক সংকীর্ণ ও বিচ্ছিন্ন, তাহাতে উদার হৃদয়ের সমস্ত খাদ্য ও সমস্ত নির্ভর নাই। এইজন্য আমাদের যে-সকল বাঙালি অকস্মাৎ আপাদমস্তক সাহেবিয়ানায় কণ্টকিত হইয়া চতুর্দিককে জর্জরিত করিয়া তোলেন, তাঁহাদিগকে দেখিলে মনে হয়, সাহেবের বারান্দায় বিলাতি টবে মেমসাহেবের বারিসিঞ্চনে তাঁহারা একটি একটি সৌখিন চারা পল্লবিত হইয়া দড়িবাঁধা অবস্থায় শূন্যে ঝুলিতেছেন— দেশের মাটির সহিত যোগ নাই, অরণ্যের সহিত সম্বন্ধ নাই এবং সেই বিচ্ছেদসূত্রেই তাঁহাদের অহংকার এবং দোদুল্যমান অবস্থা।

কিন্তু অল্প খোরাকে যাহার চলে না, বহুমূল্য বিচিত্র চিনের টব অপেক্ষা দরিদ্র দেশের মাটি তাহার পক্ষে একান্ত আবশ্যক।

অতএব শিক্ষার দ্বারা দ্বিগুণ বল ও নূতন ক্ষমতা লাভ করিলেও যথার্থ প্রতিভা স্বতই আপন প্রাণের দায়ে আপন নাড়ির টানে স্বদেশ হইতেই আপন অমৃতরস সঞ্চয় করিতে প্রবৃত্ত হয়।

ম্হাত্রে যদি যথার্থ প্রতিভাশালী হন, তবে তাঁহার জন্য ভাবনার কারণ নাই— তিনি তাঁহার রচনায়, তাঁহার প্রতিভাবিকাশে শেষ পর্যন্ত ভারতবর্ষীয় থাকিতে বাধ্য— তাঁহার আর অন্য গতি নাই। যদি তাঁহার প্রতিভা না থাকে তবে অসংখ্য ক্ষুদ্র অনুকারীদলের মধ্যে ক্ষমতা-বিকারের আর-একটি দৃষ্টান্ত বাড়িলে তাহাতে ক্ষতিবৃদ্ধি বিশেষ দেখি না।

কিন্তু শিক্ষা এবং রীতিমতো শিক্ষা আবশ্যক। উপকরণের উপর সম্পূর্ণ দখল না থাকিলেই অনুকরণের নিরাপদ গণ্ডির বাহিরে পদার্পণ করিতে বিপদ ঘটে। অল্প সাঁতার জানিলে ঘাটের আশ্রয় ছাড়িতে পারা যায় না, তটের কাছাকাছি ঘুরিতে ফিরিতে হয়। সকল বিদ্যারই যে একটি বাহ্য অংশ আছে তাহাকে একান্ত আয়ত্ত করিতে পারিলে তবেই তাহাকে স্বাধীন ব্যবহারের স্বকীয় ভাবপ্রকাশের অনুকূল করা যায়। ভাস্কর্যবিদ্যার বাহ্য নিয়ম কৌশল এবং কারিগরিটুকু যখন ম্হাত্রের অধিকারগত এবং অনায়াসগম্য হইবে, তখন তাঁহার স্বদেশীয় প্রতিভা স্বাধীন সঞ্চরণের প্রশস্ত ক্ষেত্র লাভ করিবে, নতুবা তাঁহার রচনায় যখন-তখন পরকীয় আদর্শের ছায়া আসিয়া পড়িবে এবং তিনি অনুকরণবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবেন না।

কিন্তু ম্হাত্রে দরিদ্র ছাত্র। য়ুরোপের শ্বেতভুজা শিল্প-সরস্বতী তাঁহাকে ভূমধ্যসাগরের পরপার হইতে আপন ক্রোড়ে আহ্বান করিতেছেন, বালক সে আহ্বান আপন অন্তরের মধ্যে শ্রবণ করিয়া নিরতিশয় উৎসুক হইয়া উঠিয়াছে— কিন্তু তাহার পাথেয় নাই। যদি কোনো গুণজ্ঞ বিদেশী তাহার য়ুরোপীয় শিক্ষার ব্যয়ভার বহনে প্রস্তুত হন তবে তাহা আমাদের দেশের পক্ষে লজ্জার বিষয় হইবে— এবং স্বদেশী বিদেশী কেহই যদি প্রস্তুত না হন তবে তাহা আমাদের দেশের পক্ষে অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হইবে সন্দেহ নাই।

রুক্মিণীকান্ত নাগ নামক একটি বাঙালি ছাত্র কিছুদিন ইটালিতে শিল্প অধ্যয়নে নিযুক্ত থাকিয়া যথেষ্ট খ্যাতি ও উন্নতিলাভ করিতেছিলেন। কিন্তু অর্থাভাবে অনাহারে দুরারোগ্য রোগে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইয়া তাঁহার সমস্ত আশা অকালে অবসান হয়। আমাদের এই শিল্পদরিদ্র দেশের পক্ষে এ মৃত্যু যেমন লজ্জাজনক তেমনি শোকাবহ।

অনেকে হয়তো জানেন না, শশিভূষণ হেশ নামক কলিকাতা আর্ট-স্কুলের একটি বিশেষ ক্ষমতাশালী ছাত্র য়ুরোপে শিল্প অধ্যয়নে নিযুক্ত আছেন। মুক্তাগাছার মহারাজা সূর্যকান্ত আচার্য চৌধুরী তাহার সমস্ত খরচ জোগাইতেছেন। সেজন্য বঙ্গদেশ তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

ম্হাত্রেও য়ুরোপে শিল্পশিক্ষালাভের অধিকারী— অসামান্য ক্ষমতা প্রকাশের দ্বারা তাহার প্রমাণ দিয়াছেন। এক্ষণে দেশের লোক যদি আপন কর্তব্য পালন করে তবে বালকের উন্মুখী প্রতিভা পূর্ণপরিণতি লাভ করিয়া দেশের লোককে ধন্য, ভারতবন্ধু বার্ড্‌বুডের উৎসাহবাক্যকে সার্থক এবং চিজ্‌হলম্‌ প্রমুখ অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানগণের বিদ্বেষবিষাক্ত অবজ্ঞাকে অনন্তকালের নিকট ধিক্‌কৃত করিয়া রাখিবে।

ভারতী
আষাঢ় ১৩০৫

মন্দিরাভিমুখে

ম্হাত্রে নামক বোম্বাই শিল্পবিদ্যালয়ের একটি দরিদ্র ছাত্র প্যারিস-প্লাস্টারের এক নারীমূর্তি রচনা করিয়াছেন; তাহার নাম দিয়াছেন মন্দিরাভিমুখে (To the Temple)। এই ব্যাপারটুকু লইয়া ইংরাজিপত্রে একটি ছোটোখাটো রকমের দ্বন্দ্বযুদ্ধ হইয়া গেছে।

স্যর জর্জ বার্ড্‌বুড্‌ সাহেবের নিকট এই মূর্তির দুখানি ফোটোগ্রাফ পাঠানো হয়। ফোটোগ্রাফ দেখিয়া তিনি তাঁহার 'জর্নাল অফ ইন্ডিয়ান আর্টস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ' নামক শিল্পবিষয়ক পত্রে মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিয়া এক সমালোচনা লিখিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি মূর্তিটিকে প্রসিদ্ধ প্রাচীন গ্রীসীয় মূর্তি-সকলের সহিত তুলনীয় বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন।

হয়তো সহৃদয় বার্ড্‌বুড্‌ সাহেব তাঁহার ভারতবৎসলতা ও ভারতীয় শিল্পকলার ভাবী উন্নতি কল্পনার আবেগদ্বারা নীত হইয়া এই মূর্তি সম্বন্ধে কিছু অধিক বলিয়াছিলেন, সে কথা বিচার করা আমাদের সাধ্য নহে।

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি একটি ভুল করিয়াছিলেন। ফোটোগ্রাফ হইতে বুঝিতে পারেন নাই যে মূর্তিটি খড়ি দিয়া গঠিত। তিনি অনুমান করিয়াছিলেন ইহা পাথরের মূর্তি। অবশ্য উপকরণের পার্থক্যে শিল্পদ্রব্যের গৌরবের তারতম্য ঘটে এবং সেইজন্য খড়ির মূর্তির সহিত প্রাচীন পাথরের মূর্তির তুলনা করা হয়তো সংগত হয় নাই।

এই ছিদ্রটি অবলম্বন করিয়া কোনো অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান লেখক 'পায়োনিয়র' কাগজে বার্ড্‌বুডের সমালোচনার বিরুদ্ধে এক সুতীব্র বিদ্রূপ-বিষাক্ত পত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং এইরূপে একটি মহারাষ্ট্রী ছাত্র -রচিত খড়ির মূর্তি লইয়া ইংরাজি সাময়িকপত্রের রঙ্গভূমিতে দুই ইংরাজ যোদ্ধার মধ্যে একটি ছোটোখাটো রকম রক্তপাত হইয়া গেছে।

আমরা যে এ স্থলে মধ্যস্থ হইয়া বিচারে অবতীর্ণ হইব এমন ভরসা রাখি না। আমরা একে আনাড়ি, তাহাতে পক্ষপাতী— আমরা যদি আমাদের স্বদেশীয় নবীন শিল্পীর রচনাকে কিছু বেশি করিয়াই মনে করি তবে আশা করি ভারতের নিমকে পালিত তীব্রতম ভারতবিদ্বেষীও তাহাতে ক্ষুব্ধ হইবেন না।

অপরপক্ষে শিল্প সম্বন্ধে আমাদের মতো দীনহীন সম্প্রদায় আপাতত অল্পেই সন্তুষ্ট হইবে।

সংস্কৃত ভাষায় একটা শ্লোক আছে—

পরিক্ষীণঃ কশ্চিৎ স্পৃহয়তি যবানাং প্রসৃতয়ে
স পশ্চাৎ সংপূর্ণঃ কলয়তি ধরিত্রীং তৃণসমাম্।
অতশ্চানৈকান্ত্যাদি গুরুলঘুতয়ার্থেষু, ধনিনাম্
অবস্থা বস্তূনি প্রথয়তি চ সংকোচয়তি চ॥

অর্থাৎ, দীন ব্যক্তি এইটুকু ইচ্ছা করিয়াই ক্ষান্ত হয় যে, তাহার যবের সঞ্চয়টুকু কিছু বাড়ুক, কিন্তু সেই ব্যক্তিই যখন পরিপূর্ণ হইয়া উঠেন তখন তিনি ধরিত্রীকে তৃণসমান দেখেন। অতএব অর্থ সম্বন্ধে গুরুলঘুতার কোনো একান্ততা নাই; ধনীর অবস্থাই বস্তু-সকলকে কখনো বড়ো করিয়া তোলে কখনো বা ছোটো করিয়া আনে।

আমাদেরও সেই অবস্থা। আমাদের কোনো তরুণ প্রতিভান্বিত শিল্পী -রচিত মূর্তি প্রাচীন গ্রীসীয় মূর্তির সমকক্ষ না হইলেও আমরা সন্তুষ্ট থাকিব। যখন আমাদের তেমন দিন আসিবে, যখন ধরিত্রীকে তৃণসমান দেখিবার মতো অবস্থা আমাদের হইবে, তখন আমাদের ভালোমন্দ তুলনীয় বাটখারাও ওজনে বাড়িয়া চলিতে থাকিবে। অতএব য়ুরোপের কাছে যে জিনিস ছোটো আমাদের কাছে সে জিনিস যথেষ্ট বড়ো— কারণ ধনীর অবস্থাই বস্তু-সকলকে কখনো ছোটো করে, কখনো বড়ো করিয়া তোলে।

মাদ্রাজবাসী চিত্রশিল্পী রবিবর্মার দেশী ছবিগুলি যখন প্রথম আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় তখন তাহা যে পরিমাণ আনন্দ আমাদিগকে দান করিয়াছিল, ভাবী সমালোচকের অপক্ষপাত বিচারে তাহার সে পরিমাণ উৎকর্ষ প্রমাণিত হইবে কি না সন্দেহ। কিন্তু তাহা বুভুক্ষিতের রিক্তস্থালীর উপর যবের মুষ্টি বর্ষণ করিয়াছিল— আপাতত সেই যবমুষ্টি ভবিষ্যতের পূর্ণোদর ব্যক্তির স্বর্ণমুষ্টির চেয়ে বেশি।

রবিবর্মার ছবিতে চিত্রকলা সম্বন্ধে কী সমস্ত অসম্পূর্ণতা আছে, সে-সকল বিচার আমরা যখন উপযুক্ত হইব, তখন করিব। কিন্তু সম্প্রতি আমাদের যে আনন্দ তাহা শুদ্ধমাত্র সৌন্দর্যসম্ভোগের আনন্দ নহে, তাহা আশার আনন্দ। আমরা দেখিতেছি ভারতবর্ষের নিদ্রিত অন্তঃকরণের এক প্রান্তে সৌন্দর্যরচনার একটা চেষ্টা জাগিয়া উঠিতেছে। তাহা যতই অপরিস্ফুট অসম্পূর্ণ হউক-না-কেন, তাহা অত্যন্ত বিরাট আকারে আমাদের কল্পনাকে অভিভূত করিয়া তোলে। প্রাচীন ভারতবর্ষের সেই যে-সকল যুগের ইতিহাসপ্রদীপ নির্বাপিত হইয়া গেছে, যে সময়ে এক অপূর্ব শিল্পচেষ্টা ভারতের নির্জন গিরিগুহায় এবং দেবালয়ের পাষাণপুঞ্জমধ্যে আপনাকে অমরসুন্দর-আকারে প্রস্ফুটিত করিয়া তুলিতেছিল, সেই মূর্তিগড়া, মন্দিরগড়া, সেই ভাবুকস্পর্শে-পাথরকে-প্রাণ-দেওয়া যুগ ভবিষ্যতের দিগন্তপটে নূতন করিয়া প্রতিফলিত দেখিতে পাই।

আধুনিক ভারতবর্ষে যাঁহারা মাঝে মাঝে এই আশার আলোক জ্বালিয়া তুলিতেছেন তাঁহারা যদি-বা আমাদের সূর্যচন্দ্র নাও হন তথাপি আমাদের স্বদেশের অন্ধ রজনীতে তাঁহারা এক মহিমান্বিত ভবিষ্যতের দিকে আমাদিগকে পথ দেখাইয়া জাগিতেছেন। সম্ভবত সেই ভবিষ্যতের আলোকে তাঁহাদের ক্ষুদ্র রশ্মিটুকু একদিন ম্লান হইয়া যাইতে পারে কিন্তু তথাপি তাঁহারা ধন্য।

ভারতবর্ষ আজ পৃথিবীর সমাজচ্যুত। তাহাকে আবার সমাজে উঠিতে হইবে। কোনো-এক সূত্রে পৃথিবীর সহিত তাহার আদানপ্রদান আবার সমানভাবে চলিবে, এ আশা আমরা কিছুতেই ছাড়িতে পারি না। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা আমরা কবে ফিরিয়া পাইব এবং কখনো ফিরিয়া পাইব কিনা সে কথা আলোচনা করা বৃথা। কিন্তু নিজের ক্ষমতায় জগতের প্রতিভারাজ্যে আমরা স্বাধীন আসন লাভ করিব এ আশা কখনোই পরিত্যাগ করিবার নহে।

রাজ্যবিস্তারমদোদ্ধত ইংলন্ড আজকাল উষ্ণমণ্ডলবাসী জাতিমাত্রকে আপনাদের গোষ্ঠের গোরুর মতো দেখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সমস্ত এশিয়া এবং আফ্রিকা তাঁহাদের ভারবহন এবং

তাঁহাদের দুগ্ধ জোগাইবার জন্য আছে, কিড্‌ প্রভৃতি আধুনিক লেখকগণ ইহা স্বতঃসিদ্ধ সত্যরূপে ধরিয়া লইয়াছেন।

অদ্য আমাদের হীনতার অবধি নাই এ কথা সত্য কিন্তু উষ্ণমণ্ডলভুক্ত ভারতবর্ষ চিরকাল পৃথিবীর মজুরি করিয়া আসে নাই। ইজিপ্ট, ব্যাবিলন, কাল্ডিয়া, ভারতবর্ষ, গ্রীস এবং রোম ইঁহারাই জগতে সভ্যতার শিখা স্বহস্তে জ্বালাইয়াছিলেন, ইঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই ট্রপিক্‌সের অন্তর্গত, উষ্ণ সূর্যের করাধীন। সেই পুরাতন কালচক্র পৃথিবীর পূর্বপ্রান্তে পুনর্বার কেমন করিয়া ফিরিয়া আসিবে তাহা স্ট্যাটিস্টিক্‌স্‌ এবং তর্কদ্বারা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য, কারণ বড়ো বড়ো জাতির উন্নতি ও অধোগতি বিধির বিচিত্র বিধানে ঘটিয়া থাকে, তার্কিকের তর্কশৃঙ্খল তাহার সমস্ত মাপিয়া উঠিতে পারে না; তাহার কম্পাসের অর্ধাংশ মাত্রের ভুল বিশাল কালপ্রান্তরে ক্রমশই বাড়িতে বাড়িতে সত্য হইতে বহু দূরে গিয়া বিক্ষিপ্ত হয়।

প্রসঙ্গক্রমে এই অবান্তর কথা মনের আক্ষেপে আপনি উঠিয়া পড়ে। কারণ, যখন দেখিতে পাই ক্ষুধিত য়ুরোপ ঘরে বসিয়া সমস্ত উষ্ণভূভাগকে অংশ করিয়া লইবার জন্য খড়ি দিয়া চিহ্নিত করিতেছেন তখন নিজদিগকে সম্পূর্ণ মৃতপদার্থ বলিয়া শঙ্কা হয়, তখন নিজেদের প্রতি নৈরাশ্য এবং অবজ্ঞা অন্তঃকরণকে অভিভূত করিতে উদ্যত হয়।

ঠিক এইরূপ সময়ে জগদীশ বসুর মতো দৃষ্টান্ত আমাদিগকে পুনর্বার আশার পথ দেখাইয়া দেয়। জগদীশ বসু জগতের রহস্যান্ধকারমধ্যে বিজ্ঞানরশ্মিকে কতটুকু অগ্রসর করিয়াছেন তাহা আমাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই ঠিকমতো জানি না এবং জানিবার শক্তি রাখি না, কিন্তু সেই সূত্রে আশা এবং গৌরবের উৎসাহে আমাদের ক্ষমতা অনেকখানি বাড়াইয়া দিয়াছে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই।

ম্হাত্রে-রচিত মূর্তিখানি দেখিয়া একজন বিদেশী গুণজ্ঞ প্রবীণ সমালোচক যখন উদারভাবে মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করেন তখন শিল্পকলা সম্বন্ধে আমরা যতই মূঢ় হই, আশার পুলকে আমাদের সমস্ত অন্তঃকরণ যেন বিদ্যুদ্দীপ্ত হইয়া উঠে।

চিত্রবিদ্যা এবং ভাস্কর্যের একটা মহৎ সুযোগ এই যে তাহার ভাষা সর্বজনবিদিত। অবশ্য তাহার সূক্ষ্ম গুণপনা যথার্থভাবে বুঝিতে বিস্তর শিক্ষা এবং চর্চার প্রয়োজন। কিন্তু তাহাকে শুদ্ধমাত্র প্রত্যক্ষ করিতে বিশেষ কোনো বাধা অতিক্রম করিতে হয় না। এইজন্য ইহা বিনা-পরিচয়েই সমস্ত জগৎসভার মধ্যে আসিয়া খাড়া হইতে পারে। অদ্য আমাদের মধ্যে যদি একজন প্রতিভাসম্পন্ন ভাস্করের অভ্যুদয় হয় তবে কল্যই তিনি বিশ্বলোকে প্রকাশলাভ করিবেন।

অতএব ভারতবর্ষ যদি শিল্পকলায় আপন প্রতিভাকে প্রস্ফুটিত করিতে পারে তবে জগৎ-প্রাসাদের একটা সিংহদ্বার তাহার নিকট দ্রুত উদ্‌ঘাটিত হইয়া যায়।

এ কথা অত্যন্ত প্রচলিত যে, 'স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান্‌ সর্বত্র পূজ্যতে।' যে বিদ্যার এই সর্বজনীনতা এবং সর্বকালীনতা আছে তাহা বিদ্বানকে পূজার যোগ্য করে। আমাদের দেশের পট-আঁকা যে চিত্রবিদ্যা তাহা প্রাদেশিক, তাহার যৎকিঞ্চিৎ মূল্য কেবলমাত্র সংকীর্ণ সম্প্রদায়ের মধ্যে। যখন আমাদের চিত্রবিদ্যাকে আমরা সর্বজনীন করিয়া তুলিতে পারিব, তখন সর্বজনসভায় স্থানলাভ করিয়া আমাদের মনুষ্যত্বে প্রসারিত হইবে।

ইহার উদাহরণ বাংলা সাহিত্য। অর্ধশতাব্দী পূর্বে পাঁচালি এবং কবির গানে এ সাহিত্য প্রাদেশিক ছিল। মধুসূদন দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্রের মতো প্রতিভাশালী লেখকগণ এই সাহিত্যকে সর্বজনীন ক্ষেত্রে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছেন। দেখিতে দেখিতে পঁচিশ-ত্রিশ বৎসরের মধ্যে যে আশ্চর্য পরিবর্তন ঘটিয়াছে তাহা অলৌকিক বলিয়া মনে হয়। এখন এ সাহিত্য বাঙালির মনুষ্যত্বের প্রধান উপাদান। এখন এই সাহিত্যের মধ্য দিয়া বাঙালি জ্ঞানের স্বাধীনতা, কল্পনার উদারতা এবং হৃদয়ের বিস্তার অনুভব করিতেছে। এই সাহিত্যে বাঙালির হৃদয়ে বিশ্বহিতৈষা, দেশানুরাগ এবং একটি গভীর বিপুল ও অধীর আকাঙ্ক্ষার সঞ্চার করিয়া দিতেছে। এখন এ

সাহিত্যের মধ্যে ভালো ও মন্দ, সৌন্দর্য ও অসৌন্দর্যের যে আদর্শ আসিয়াছে তাহা প্রাদেশিক নহে তাহা সর্বজনীন ও সর্বকালীন।

তথাপি দুর্ভাগ্যক্রমে বাংলাভাষা কেবল ভারতবর্ষের একটি অংশের ভাষা। এ ভাষা যদি ভারতের ভাষা হইত এবং বঙ্গসাহিত্য যদি ভারতবর্ষের ত্রিশকোটি লোকের হৃদয়ের উপর দাঁড়াইতে পারিত, তবে ইহার মধ্যে যে কিছু অনিবার্য সংকোচ ও সংকীর্ণতা আছে তাহা ঘুচিয়া গিয়া এ সাহিত্য কী বিপুল বলিষ্ঠ হইয়া উঠিত এবং জগতের মধ্যে কী বিপুল বল প্রয়োগ করিতে পারিত। এখনো যে বাংলা সাহিত্য সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ মনুষ্যত্ব, প্রবল স্বাতন্ত্র্য ও গভীর পারমার্থিকতা লাভ করিতে পারে নাই তাহার প্রধান কারণ, অল্প লোকের সম্মুখে ইহা বিদ্যমান। এবং সেই অল্প লোক যদিও য়ুরোপীয় ভাবুকতার ব্যাপক আদর্শ বিদ্যালয়ে লাভ করিয়াছেন তথাপি তাহা যথার্থ আত্মসাৎ করিতে পারেন নাই। তাঁহারা আপনাদের সাহিত্যকে ক্ষুদ্রভাবে দেখেন, তাহাকে ব্যক্তিগত উদ্‌ভ্রান্ত খেয়াল ও সম্প্রদায়গত সংকীর্ণতার সহিত বিচার করেন। সাহিত্য বাহিরের আকাশ হইতে যথেষ্ট আলোক ও বৃষ্টি পাইতেছে কিন্তু সমাজের মৃত্তিকা হইতে প্রচুর আহার্য সংগ্রহ করিতে পারিতেছে না।

সেজন্য আমরা নৈরাশ্য অনুভব করি না। কারণ, সাহিত্য গাছেরই মতো বৎসরে বৎসরে কালে কালে আপনারই পুরাতন চ্যুত পল্লবের দ্বারা আপনার তলস্থ ভূমিকে উর্বরা করিয়া তুলিবে।

কিন্তু চিত্রশিল্প ও ভাস্কর্য প্রভৃতি কলাবিদ্যা যদিচ সাহিত্যের ন্যায় মানবপ্রকৃতির সর্বাঙ্গীণ খাদ্য নহে তথাপি তাহাদের একটা সুবিধা এই আছে যে, যেদিন তাহারা আপনার প্রাদেশিক ক্ষুদ্রতা মোচন করিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইবে সেইদিনই তাহারা বিশ্বলোকের। সেদিন হইতে আর তাহাদিগকে ব্যক্তিগত অহমিকা ও সম্প্রদায়গত মূঢ়তার মুখাপেক্ষা করিতে হয় না। সমস্ত জগতের হৃদয় হইতে রসাকর্ষণ করিয়া দেখিতে দেখিতে তাহারা আপনাকে দেশকালের অতীত করিয়া তুলিতে পারে।

অদ্য মহারাষ্ট্রদেশে কোনো নবীন কবি মানবের হৃদয়বীণার কোনো নূতন তন্ত্রীতে আঘাত করিতে পারিয়াছেন কি না তাহা আমরা বাঙালিরা জানি না এবং জানিতে গেলেও যথেষ্ট শিক্ষা ও চেষ্টার প্রয়োজন হয়। কিন্তু ম্হাত্রে-নামক একটি মারাঠি ছাত্র যে খড়ির মূর্তিটি নির্মাণ করিয়াছেন তাহার প্রতিমূর্তি আমরা প্রদীপের পত্রে বাঙালির সম্মুখে ধরিয়া দিলাম, বুঝিতে ও উপভোগ করিতে কাহারও কোনো বাধা নাই। আমাদের বঙ্কিমচন্দ্রকে মারাঠিরা আপনাদের বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়া এখনো জানেন না, কিন্তু ম্হাত্রে যদি আপনার প্রতিভাকে সবলা করিয়া তুলিতে পারেন তবে অবিলম্বেই তিনি আমাদের ম্হাত্রে হইবেন।

আমরা যদি এই মূর্তিটির সমালোচনার চেষ্টা করি তবে কিয়ৎপরিমাণে ভাবোচ্ছ্বাস প্রকাশ হইবে মাত্র, কিন্তু তাহাকে সমালোচনা বলে না। এইরূপ একটি সুসম্পূর্ণ মূর্তি আদ্যোপান্ত মনের মধ্যে প্রত্যক্ষবৎ কল্পনা করা যে কী অসামান্য ক্ষমতার কর্ম তাহা আমাদের মতো ভিন্ন-ব্যবসায়ীর ধারণার অগোচর। তাহার পরে সেই কল্পনাকে আকার দান করা— কোনো ক্ষুদ্রতম অংশও বাদ দিবার জো নাই, অঙ্গুলির নখাগ্রও নয়, গ্রীবাদেশের চূর্ণ কুন্তলও নয়— কাপড়ের প্রত্যেক ভাঁজটি, প্রত্যেক অঙ্গুলির ভঙ্গিটি স্পষ্ট করিয়া ভাবিতে ও প্রত্যক্ষ করিয়া গড়িতে হইবে। মূর্তিটির সম্মুখ পশ্চাৎ পার্শ্বে কোথাও কল্পনাকে অপরিস্ফুট রাখিবার পথ নাই। তাহার পরে, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বসনভূষণ ভাবভঙ্গি সমস্ত লইয়া কেশের অবস্থান এবং পদাঙ্গুলির বিন্যাস পর্যন্ত সবটা মিলাইয়া মানবদেহের একটি অপরূপ সংগীত একটি সৌন্দর্যসামঞ্জস্য কল্পনার মধ্যে এবং সেখান হইতে জড় উপকরণপিণ্ডে জাগ্রত করিয়া তোলা প্রতিভার ইন্দ্রজাল। বামপদের সহিত দক্ষিণ পদ, পদন্যাসের সহিত দেহন্যাস, বাম হস্তের সহিত দক্ষিণ হস্ত, সমস্ত দেহলতার সহিত মস্তকের ভঙ্গি এইগুলি অতি সুকুমার নৈপুণ্যের সহিত মিলাইয়া তোলাই দেহসৌন্দর্যের ছন্দোবন্ধ। এই

ছন্দোরচনার যে নিগূঢ় রহস্য তাহা প্রতিভাসম্পন্ন ভাস্করই জানেন এবং ম্হাত্রে-রচিত মূর্তির মধ্যে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বসনভূষণ বেশবিন্যাস এবং উদ্যতলঘুসুন্দর ভঙ্গিটির মধ্য হইতে সেই বিচিত্র অথচ সরল সংগীতটি নীরবে ঊর্ধ্বদেশে ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে, যেমন করিয়া একটি শুভ্র বিকচ রজনীগন্ধা আপন উদ্যত বৃন্তটির উপর ঈষৎ-হেলিত সরল ভঙ্গিতে দাঁড়াইয়া স্তব্ধনিশীথের নক্ষত্রলোকমধ্যে পরিপূর্ণতার একটি রাগিণী প্রেরণ করে।

পূর্বেই বলিয়াছিলাম সমালোচনা করিতে গেলে কতকটা ভাবোচ্ছ্বাস প্রকাশ হইবে মাত্র, তাহাতে কোনো পাঠকের কিছুমাত্র লাভ হইবে কিনা সন্দেহ।

মূর্তিটির রচয়িতা শ্রীযুক্ত গণপত কাশীনাথ ম্হাত্রের জীবন-সম্বন্ধে তাঁহার পত্রে যে বিবরণ পাওয়া গিয়াছে তাহা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। সংক্ষিপ্ত হইবারই কথা। তাঁহার বয়স বাইশ মাত্র। তিনি জাতিতে সোমবংশী ক্ষত্রিয়। ম্হাত্রে দেশীভাষা শিক্ষার পর ইংরাজি অল্পই অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ছবি আঁকা শিখিতে অত্যন্ত আকাঙ্ক্ষা বোধ করাতে অন্য-সকল পড়া ছাড়িয়া ম্হাত্রে বোম্বাই শিল্পবিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। সেখানে তিনি সকল পরীক্ষাতেই ভালোরূপে উত্তীর্ণ হইয়া বারংবার পারিতোষিক প্রাপ্ত হন। বোম্বাই শিল্পপ্রদর্শনীতে মধ্যে মধ্যে মূর্তি প্রদর্শন করাইয়া ম্হাত্রে অনেকগুলি রৌপ্যপদক লাভ করিয়াছেন। 'মন্দিরাভিমুখে' নামক মূর্তি রচনা করিয়া ম্হাত্রে বরোদার মহারাজার নিকট হইতে ২০০ টাকা পুরস্কার প্রাপ্ত হন; এই মূর্তিটি বোম্বাই শিল্পবিদ্যালয় ১২০০ টাকায় ক্রয় করিয়া চিত্রশালায় রক্ষা করিয়াছেন। এরূপ মূর্তির কীরূপ মূল্য হওয়া উচিত তাহা আমাদের পক্ষে বলা অসাধ্য, কিন্তু ম্হাত্রে ইহাকে যৎকিঞ্চিৎ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন এবং সম্ভবত ইহা যৎকিঞ্চিৎই হইবে।

তরুণ শিল্পী আমাদের দেশে ভাস্কর্য প্রভৃতি কলাবিদ্যার আদর নাই বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন। ভারতবর্ষে সেরূপ আক্ষেপ করিবার বিষয় অনেক আছে অতএব এ সম্বন্ধে আমরা তাঁহাকে কোনোপ্রকার সান্ত্বনা দিতে পারি না। যখন আমাদের দেশে গুণী বাড়িবে এবং ধনীও বাড়িতে থাকিবে তখন ধনের দ্বারা গুণের আদর পরিমিত হইতে পারিবে। আপাতত আধপেটা খাইয়া আধা-উৎসাহ পাইয়া এমন-কি, গুণহীন অযোগ্যব্যক্তিদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিদ্বেষ-কুশাগ্রের দ্বারা বিদ্ধ হইয়া আপনার কাজ করিয়া যাইতে হইবে। যেখানে সকল অবস্থাই অনুকূল, সেখানে বড়ো হইয়া বিশেষ গৌরব নাই। আধুনিক য়ুরোপেও অনেক বড়ো বড়ো চিত্রলেখক ও ভাস্করকে বহুকাল অনাদর ও অনাহারের মধ্যে কাজ করিতে হইয়াছে, ভাগ্যের সেই প্রতিকূলতাও বশীভূত শত্রুর ন্যায় প্রতিভাকে বহুতর বহুমূল্য উপহার প্রদান করিয়াছে।

দুই-একজন পার্সি ভদ্রলোক কাজ দিয়া ম্হাত্রেকে সাহায্য করিতেছেন। ম্হাত্রে আশা করেন বঙ্গভূমিও এরূপ সাহায্যদানে কৃপণতা করিবেন না।

প্রদীপ
পৌষ ১৩০৫

ধর্ম/দর্শন

সাকার ও নিরাকার উপাসনা

সম্প্রতি কিছুকাল হইতে সাকার নিরাকার উপাসনা লইয়া তীব্রভাবে সমালোচনা চলিতেছে। যাঁহারা ইহাতে যোগ দিয়াছেন তাঁহারা এম্‌নি ভাব ধারণ করিয়াছেন যেন সাকার উপাসনার পক্ষ অবলম্বন করিয়া তাঁহারা প্রলয়জলমগ্ন হিন্দুধর্মের পুনরুদ্ধার করিতেছেন। নিরাকার উপাসনা যেন হিন্দুধর্মের বিরোধী। এইজন্য তাহার প্রতি কেমন বিজাতীয় আক্রোশে আক্রমণ চলিতেছে। এইরূপে প্রাচীন ব্রহ্মজ্ঞানী ঋষি ও উপনিষদের প্রতি অসম্ভ্রম প্রকাশ করিতে তাঁহাদের পরম হিন্দুত্বের অভিমান কিছুমাত্র সংকুচিত হইতেছে না। তাঁহারা মনে করিতেছেন না, ব্রাহ্ম বলিয়া আমরা বৃহৎ হিন্দুসম্প্রদায়ের বহির্ভূত নহি। হিন্দুধর্মের শিরোভূষণ যাঁহারা, আমরা তাঁহাদের নিকট হইতে ধর্মশিক্ষা লাভ করি। অতএব ব্রাহ্ম ও হিন্দু বলিয়া দুই কাল্পনিক বিরুদ্ধপক্ষ খাড়া করিয়া যুদ্ধ বাধাইয়া দিলে গোলাগুলির বৃথা অপব্যয় করা হয় মাত্র।

বুলবুলের লড়াইয়ে যেমন পাখিতে পাখিতেই খোঁচাখুঁচি চলে অথচ উভয়পক্ষীয় লোকের গায়ে একটিও আঁচড় পড়ে না, আমি বোধকরি অনেক সময়ে সেইরূপ কথাতে কথাতে তুমুল দ্বন্দ্ব বাধিয়া যায় অথচ উভয়পক্ষীয়মত অক্ষত দেহে বিরাজ করিতে থাকে। সাকার ও নিরাকার উপাসনার অর্থই বোধ করি এখনো স্থির হয় নাই। কেবল দুটো কথায় মিলিয়া বাঁও-কষাকষি করিতেছে।

একটি মানুষকে যখন মুক্ত স্থানে অবারিতভাবে ছাড়িয়া দেওয়া যায়, সে যখন স্বেচ্ছামতে চলিয়া বেড়ায়, তখন সে প্রতিপদক্ষেপে কিয়ৎপরিমাণ মাত্র স্থানের বেশি অধিকার করিতে পারে না। হাজার গর্বে স্ফীত হইয়া উঠুন বা আড়ম্বর করিয়া পা ফেলুন, তিন-চারি হাত জমির বেশি তিনি শরীরের দ্বারায় আয়ত্ত করিতে পারেন না। কিন্তু তাই বলিয়া যদি সে বেচারাকে সেই তিন-চারি হাত জমির মধ্যেই বলপূর্বক প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেয়াল গাঁথিয়া গণ্ডিবদ্ধ করিয়া রাখা যায়, সে কি একই কথা হইল! আমি বলি ঈশ্বর-উপাসনা সম্বন্ধে এইরূপ হৃদয়ের বিস্তারজনক ও স্বাস্থ্যজনক স্বাধীনতাই অপৌত্তলিকতা এবং তৎসম্বন্ধে হৃদয়ের সংকীর্ণতা -জনক ও অস্বাস্থ্যজনক রুদ্ধভাবই পৌত্তলিকতা। সমুদ্রের ধারে দাঁড়াইয়া আমাদের দৃষ্টির দোষে আমরা সমুদ্রের সবটা দেখিতে পাই না, কিন্তু তাই বলিয়া একজন বিজ্ঞব্যক্তি যদি বলেন— এত খরচপত্র ও পরিশ্রম করিয়া সমুদ্র দেখিতে যাইবার আবশ্যক কী। কারণ, হাজার চেষ্টা করিলেও তুমি সমুদ্রের অতি ক্ষুদ্র একটা অংশ দেখিতে পাইবে মাত্র সমস্ত সমুদ্র দেখিতে পাইবে না। তাই যদি হইল তবে একটা ডোবা কাটিয়া তাহাকে সমুদ্র মনে করিয়া লও-না কেন?— তবে তাঁহার সে কথাটা পৌত্তলিকের মতো কথা হয়। আমরা মনে করিয়া ধরিয়া লইলেই যদি সব হইত তাহা হইলে যে ব্যক্তি আধগণ্ডূষ জল খায় তাহার সহিত সমুদ্রপায়ী অগস্ত্যের তফাত কী? আমি যেন বলপূর্বক ডোবাকেই সমুদ্র মনে করিয়া লইলাম— কিন্তু সমুদ্রের সে বায়ু কোথায় পাইব, সে স্বাস্থ্য কোথায় পাইব, সেই হৃদয়ের উদারতাজনক বিশালতা কোথায় পাইব, সেটা তো আর মনে করিয়া ধরিয়া লইলেই হয় না!

আমরা অধীন এ কথা কেহই অস্বীকার করে না, কিন্তু অধীন বলিয়াই স্বাধীনতার চর্চা করিয়া আমরা এত সুখ পাই— আমরা সসীম সে সম্বন্ধে কাহারও কোনো সন্দেহ নাই কিন্তু সসীম বলিয়াই আমরা ক্রমাগত অসীমের দিকে ধাবমান হইতে চাই, সীমার মধ্যে আমাদের সুখ নাই। ‘ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি।’ আমরা দুর্বল বলিয়া আমাদের যতটুকু বল আছে তাহাও কে বিনাশ করিতে চায়, আমরা সীমাবদ্ধ বলিয়া আমাদের যতটুকু স্বাধীনতা আছে তাহাও কে অপহরণ করিতে চায়, আমরা বর্তমানে দরিদ্র বলিয়া আমাদের সমস্ত ভবিষ্যতের আশাও কে উন্মূলিত করিতে চায়। আমাদের পথ রুদ্ধ করিয়ো না, আমাদের একমাত্র দাঁড়াইবার স্থান আছে আর

সমস্তই পথ— অতএব আমাদিগকে ক্রমাগতই চলিতে হইবে, অগ্রসর হইতে হইবে; কঞ্চির বেড়া বাঁধিয়া আমাদের যাত্রার ব্যাঘাত করিয়ো না।

কেহ কেহ পৌত্তলিকতাকে কবিতার হিসাবে দেখেন। তাঁহারা বলেন কবিতাই পৌত্তলিকতা, পৌত্তলিকতাই কবিতা। আমাদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি অনুসারে আমরা ভাবমাত্রকে আকার দিতে চাই, ভাবের সেই সাকার বাহ্যস্ফূর্তিকে কবিতা বলিতে পার বা পৌত্তলিকতা বলিতে পার। এইরূপ ভাবের বাহ্য প্রকাশ চেষ্টাকেই ভাবাভিনয়ন বলে।

কিন্তু কবিতা পৌত্তলিকতা নহে— অলংকারশাস্ত্রের আইনই পৌত্তলিকতা। ভাবাভিনয়নের স্বাধীনতাই কবিতা। ভাবাভিনয়নের অধীনতাই অলংকারশাস্ত্রসর্বস্ব পদ্য রচনা। কবিতায় হাসিকে কুন্দকুসুম বলে কিন্তু অলংকারশাস্ত্রে হাসিকে কুন্দকুসুম বলিতেই হইবে। ঈশ্বরকে আমরা হৃদয়ের সংকীর্ণতাবশত সীমাবদ্ধ করিয়া ভাবিতে পারি কিন্তু পৌত্তলিকতায় তাঁহাকে বিশেষ একরূপ সীমার মধ্যে বদ্ধ করিয়া ভাবিতেই হইবে। অন্য কোনো গতি নাই। কিন্তু কবরের মধ্যে জীবন বাস করিতে পারে না। কল্পনা উদ্রেক করিবার উদ্দেশ্যে যদি মূর্তি গড়া যায় ও সেই মূর্তির মধ্যেই যদি মনকে বদ্ধ করিয়া রাখি তবে কিছুদিন পরে সে মূর্তি আর কল্পনা উদ্রেক করিতে পারে না। ক্রমে মূর্তিটাই সর্বেসর্বা হইয়া উঠে, যাহার জন্য তাহার আবশ্যক সে অবসর পাইবামাত্র ধীরে ধীরে শৃঙ্খল খুলিয়া কখন যে পালাইয়া যায় আমরা জানিতেও পারি না। ক্রমেই উপায়টাই উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়ায়। ইহার জন্য কাহাকেও দোষ দেওয়া যায় না— মনুষ্যপ্রকৃতিরই এই ধর্ম।

যেখানে চক্ষুর কোনো বাধা নাই এমন এক প্রশস্ত মাঠে দাঁড়াইয়া চারি দিকে যখন চাহিয়া দেখি, তখন পৃথিবীর বিশালতা কল্পনায় অনুভব করিয়া আমাদের হৃদয় প্রসারিত হইয়া যায়। কিন্তু কী করিয়া জানিলাম পৃথিবী বিশাল? প্রান্তরের যতখানি আমার দৃষ্টিগোচর হইতেছে ততখানি যে অত্যন্ত বিশাল তাহা নহে। আজন্ম আমরণকাল যদি এই প্রান্তরের মধ্যে বসিয়া থাকিতাম আর কিছুই না দেখিতে পাইতাম তবে এইটুকুকেই সমস্ত পৃথিবী মনে করিতাম— তবে প্রান্তর দেখিয়া হৃদয়ের এরূপ প্রসারতা অনুভব করিতাম না। কিন্তু আমি না কি স্বাধীনভাবে চলিয়া বেড়াইয়াছি সেইজন্যই আমি জানিয়াছি যে, আমার দৃষ্টিপথ অতিক্রম করিয়াও পৃথিবী বর্তমান। সেইরূপ যাঁহারা সাধনা দ্বারা স্বাধীনভাবে ঈশ্বরকে ধ্যান করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন তাঁহারা যদিও একেবারে অনন্ত স্বরূপকে আয়ত্ত করিতে পারেন না তথাপি তাঁহারা ক্রমশই হৃদয়ের প্রসারতা লাভ করিতে থাকেন। স্বাধীনতা প্রভাবে তাঁহারা জানেন যে যতটা তাঁহারা হৃদয়ের মধ্যে পাইতেছেন তাহা অতিক্রম করিয়াও ঈশ্বর বিরাজমান। হৃদয়ের স্থিতিস্থাপকতা আছে, সে উত্তরোত্তর বাড়িতে পারে, কিন্তু স্বাধীনতাই তাহার বাড়িবার উপায়। পৌত্তলিকতায় তাহার বাধা দেয়। অতএব, নিরাকার উপাসনাবাদীরা আমাদিগকে কারাগার হইতে বাহির হইতে বলিতেছেন, অসীমের মুক্ত আকাশ ও মুক্ত সমীরণে স্বাস্থ্য বল ও আনন্দ লাভ করিতে বলিতেছেন, কারাগারের অন্ধকারের মধ্যে সংকোচ বিসর্জন করিয়া আসিয়া অসীমের বিশুদ্ধ জ্যোতি ও পূর্ণ উদারতায় হৃদয়ের বিস্তার লাভ করিতে বলিতেছেন, তাঁহারা জ্ঞানের বন্ধন মোচন করিতে আত্মার সৌন্দর্য সাধন করিতে উপদেশ করিতেছেন। তাঁহারা বলিতেছেন, কারার মধ্যে অন্ধকার অসুখ অস্বাস্থ্য; অনন্তস্বরূপের আনন্দ-আহ্বানধ্বনি শুনিয়া দুঃখ শোক ভুলিয়া বাহির হইয়া আইস— ব্যবধান দূর করিয়া অনন্তসৌন্দর্য-স্বরূপ পরমাত্মার সম্মুখে জীবাত্মা প্রেমে অভিভূত হইয়া একবার দণ্ডায়মান হউক, সে প্রেম প্রতিফলিত হইয়া সমস্ত জগৎচরাচরে ব্যাপ্ত হইতে থাকুক, জীবাত্মা ও পরমাত্মার প্রেমের মিলন হইয়া সমস্ত জগৎ পবিত্র তীর্থস্থানরূপে পরিণত হউক। তাঁহারা এমন কথা বলেন না যে এক লম্ফে অসীমকে অতিক্রম করিতে হইবে, দূরবীক্ষণ কষিয়া অসীমের সীমা নির্দেশ করিতে হইবে, অসীমের চারি দিকে প্রাচীর তুলিয়া দিয়া অসীমকে আমাদের বাগানবাটির সামিল করিতে হইবে। তাঁহারা কেবল বলেন সুখশান্তি স্বাস্থ্য মঙ্গলের জন্য অসীমে বাস করো অসীমে বিচরণ করো, পরিবর্তনশীল বিকারশীল আচ্ছন্নকারী

বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ক্ষুদ্র সীমার দ্বারা আত্মাকে অবিরত বেষ্টিত করিয়া রাখিয়ো না। সূর্যকিরণের অধিকাংশই সৌরজগতে নিযুক্ত আছে, অধিকাংশ অসীম আকাশে ব্যাপ্ত হইয়াছে, তাহার তুলনায় এই সর্ষপ পরিমাণ পৃথিবীতে সূর্যকিরণের কণামাত্র পড়িয়াছে। তাই বলিয়া এমন পৌত্তলিক কি কেহ আছেন যিনি বলিতে চাহেন এই আংশিক সূর্যকিরণের চেয়ে দীপশিখা পৃথিবীর পক্ষে ভালো! মুক্ত সূর্যকিরণসমুদ্রে পৃথিবী ভাসিতেছে বলিয়াই পৃথিবীর শ্রী সৌন্দর্য স্বাস্থ্য ও জীবন। পরমাত্মার জ্যোতিতেই আত্মার শ্রী সৌন্দর্য জীবন। আত্মা ক্ষুদ্র বলিয়া পরমাত্মার সমগ্র জ্যোতি ধারণ করিতে পারে না, কিন্তু তাই বলিয়া কি দীপশিখাই আমাদের অবলম্বনীয় হইবে?

অভিজ্ঞতার প্রভাবেই হউক অথবা যে কারণেই হউক, বহিরিন্দ্রিয়ের প্রতি আমরা অনেক সময় অবিশ্বাস করিয়া থাকি। চক্ষুরিন্দ্রিয়ে যেখানে আকাশের সীমা দেখি সেখানেই যে তাহার বাস্তবিক সীমা তাহা আমাদের বিশ্বাস হয় না। চিত্রবিদ্যা অথবা দৃষ্টিবিজ্ঞানে যাঁহাদের অধিকার আছে তাঁহারা জানেন আমরা চোখে যাহা দেখি মনে তৎক্ষণাৎ তাহা পরিবর্তন করিয়া লই— দূরাদূর অনুসারে দ্রব্যের প্রতিবিম্বে যে-সকল বিকার উপস্থিত হয় তাহার অনেকটা আমরা সংশোধন করিয়া লই। অধিকাংশ সময়েই চোখে যাহাকে ছোটো দেখি মনে তাহাকে বড়ো করিয়া লই— চোখে যেখানে সীমা দেখি মনে সেখান হইতেও সীমাকে দূরে লইয়া যাই। অন্তরিন্দ্রিয় সম্বন্ধেও এই কথা খাটিতে পারে। অন্তরিন্দ্রিয়ের দ্বারা ঈশ্বরকে দেখিতে গিয়া আমরা ঈশ্বরের মধ্যে যদি-বা সীমা দেখিতে পাই তথাপি আমরা সেই সীমাকে বিশ্বাস করি না। অন্তরিন্দ্রিয়ের ক্ষমতা আমাদের বিলক্ষণ জানা আছে, তাহার সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি বলিয়া যে সর্বতোরূপে তাহাকে আমাদের প্রভু বলিয়া বরণ করিয়াছি তাহা নহে। যেমন দূরবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা চাঁদকে যত বড়ো দেখায় চাঁদ তাহার চেয়ে অনেক বড়ো আমরা জানি তথাপি দূরবীক্ষণ যন্ত্রকে অবহেলা করিয়া ফেলিয়া দিতে পারি না— তেমনি অন্তরিন্দ্রিয়ের দ্বারা দেখিতে গেলে ঈশ্বরকে যদি-বা সীমাবদ্ধ দেখায় তথাপি আমরা অন্তরিন্দ্রিয়কে অবহেলা করিতে পারি না— কিন্তু তাই বলিয়া তাহাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি না, তাহাকে চূড়ান্ত মীমাংসক বলিয়া গণ্য করি না।

অসীমতা কল্পনার বিষয় নহে, সীমাই কল্পনার বিষয়। অসীমতা আমাদের সহজ জ্ঞান সহজ সত্য। সীমাকেই কষ্ট করিয়া পরিশ্রম করিয়া কল্পনা করিতে হয়। সীমা সম্বন্ধেই আমাদিগকে মিলাইয়া দেখিতে হয়, অনুমান ও তর্ক করিতে হয়, অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে হয়। যেমন সকল ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গেই স্বরবর্ণ পূর্বে কিংবা পরে বিরাজ করেই তেমনি অনন্তের ভাব আমাদের সমস্ত জ্ঞানের সহিত সহজে লিপ্ত রহিয়াছে। এইজন্য অসীমের ভাব আমাদের কল্পনার বিষয় নহে তাহা লক্ষ্য ও অলক্ষ্য ভাবে সর্বদাই আমাদের হৃদয়ে বিরাজ করিতেছে। মনে করুন, আমরা ষাট ক্রোশ একটা মাঠের মধ্যে বসিয়া আছি। আমরা বিলক্ষণ জানি এ মাঠ আমাদের দৃষ্টির সীমা অতিক্রম করিয়া বিরাজ করিতেছে এবং আমরা ইহাও নিশ্চয় জানি এ মাঠ অসীম নহে— কিন্তু তাই বলিয়া যদি মাঠের ঠিক ষাটক্রোশব্যাপী আয়তনই কল্পনা করিতে চেষ্টা করি তাহা হইলে সে চেষ্টা কিছুতেই সফল হইবে না। আমরা তখন বলিয়া বসি এ মাঠ অসীম, অসীম বলিলেই আমরা আরাম পাই, সীমা নির্ধারণের কষ্ট হইতে অব্যাহতি পাই।— সমুদ্রের মাঝখানে গেলে আমরা বলি সমুদ্রের কূলকিনারা নাই। আকাশের কোথাও সীমা কল্পনা করিতে পারি না, এইজন্য সহজেই আমরা আকাশকে বলি অসীম, আকাশকে সসীম কল্পনা করিতে গেলেই আমাদের মন অতিশয় ক্লিষ্ট হইয়া পড়ে, অক্ষম হইয়া পড়ে। কালকে আমরা সহজেই বলি অনন্ত, নক্ষত্রমণ্ডলীকে আমরা সহজেই বলি অগণ্য— এইরূপে সীমার সহিত যুদ্ধ বন্ধ করিয়া অসীমের মধ্যেই শান্তি লাভ করি। অসীম আমাদের মাতৃক্রোড়ের মতো বিশ্রাম স্থল, শিশুর মতো আমরা সীমার সহিত খেলা করি এবং শ্রান্তি বোধ হইলেই অসীমের কোলে বিশ্রাম লাভ করি— সেখানে সকল চেষ্টার অবসান— সেখানে কেবল সহজ সুখ, সহজ শান্তি, সেখানে কেবলমাত্র পরিপূর্ণ আত্মবিসর্জন। এই চিরপুরাতন চিরসঙ্গী অসীমকে বলপূর্বক বিভীষিকারূপে খাড়া করিয়া তোলা

অতি-পণ্ডিতের কাজ। তর্ক করিয়া যাঁহাদিগকে মা চিনিতে হয় মাকে দেখিলে তাহাদের সংশয় আর কিছুতেই ঘুচে না, কিন্তু স্বভাব-শিশু মাকে দেখিলেই হাত তুলিয়া ছুটিয়া যায়। সীমাতেই আমাদের শ্রান্তি, অসীমেই আমাদের শান্তি, ভূমৈব সুখং, ইহা লইয়া আবার তর্ক করিব কী! সীমা অসংখ্য, অসীম এক, সীমার মধ্যে আমরা বিক্ষিপ্ত, অসীমের মধ্যে আমরা প্রতিষ্ঠিত, সীমার মধ্যে আমাদের বাসনা, অসীমের মধ্যে আমাদের তৃপ্তি, ইহা লইয়া বিচার করিতে বসাই বাহুল্য। বুদ্ধি যখন দীপের আকার ধারণ করে তখন তাহা কাজে লাগে, যখন আলেয়ার আকার ধারণ করে তখন তাহা অনর্থের মূল হয়। অতএব পণ্ডিতেরা যাহাই বলুন, আমরা কেবল সীমায় সাঁতার দিয়া মরি কিন্তু অসীমে নিমগ্ন হইয়া বাঁচিয়া যাই।

পৌত্তলিকতার এক মহদ্দোষ আছে। চিহ্নকে যথার্থ বলিয়া মনে করিয়া লইলে অনেক সময়ে বিস্তর ঝঞ্ঝাট বাঁচিয়া যায় এইজন্য মনুষ্য স্বভাবতই সেইদিকে উন্মুখ হইয়া পড়ে। পুণ্য অত্যন্ত শস্তা হইয়া উঠে। পুণ্য হাতে হাতে ফেরে। পুণ্যের মোড়ক পকেটে করিয়া রাখা যায়, পুণ্যের পঙ্ক গায়ে মাখা যায়, পুণ্যের বীজ গাঁথিয়া গলায় পরা যায়। হরির নামের মাহাত্ম্যই এত করিয়া শুনা যায় যে, কেবল তাঁহার নাম উচ্চারণ করিয়াই ভবযন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায় তৎসঙ্গে তাঁহার স্বরূপ মনে আনা আবশ্যকই বোধ হয় না। ব্রাহ্মদের কি এ আশঙ্কা নাই! কেবল মূর্তিই কি চিহ্ন, ভাষা কি চিহ্ন নয়! আমি এমন কথা বলি না। মনুষ্যমাত্রেরই এই আশঙ্কা আছে এবং সেইজন্যই ইহার যথাসাধ্য প্রতিবিধান করা আবশ্যক। সকল চিহ্ন অপেক্ষা ভাষাচিহ্নে এই আশঙ্কা অনেক পরিমাণে অল্প থাকে। তথাপি ভাষাকে সাবধানে ব্যবহার করা উচিত। ভাষার দ্বারা পূজা করিতে গিয়া ভাষা পূজা করা না হয়। দেবতার নিকটে ভাষাকে প্রেরণ না করিয়া ভাষার জড়ত্বের মধ্যে দেবতাকে রুদ্ধ করা না হয়।

আসল কথা, আমাদের সীমা ও অসীমতা দুইই চাই। আমরা পা রাখিয়াছি সীমার উপরে, মাথা তুলিয়াছি অসীমে। আমাদের একদিকে সীমা ও একদিকে অসীম। বস্তুগত (realistic) কবিতার দোষ এই, সে আমাদের কল্পনার চোখে ধুলা দিয়া আমাদের দৃষ্টি হইতে অসীমের পথ লুপ্ত করিয়া দেয়। বস্তুগত কবিতায় বস্তু নিজের দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলে— আমাতেই সমস্ত শেষ, আমাকে ঘ্রাণ করো, আমাকে স্পর্শ করো, আমাকে ভক্ষণ করো, আমাকেই কায়মনোবাক্যে ভোগ করো। কিন্তু ভাব প্রধান (suggestive) কবিতার গুণ এই, সে আমাদিগকে এমন সীমারেখাটুকুর উপর দাঁড় করাইয়া দেয় যাহার সম্মুখেই অসীমতা। ভাবগত কবিতায় বস্তু কেবলমাত্র অসীমের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া ইশারা করিয়া দেখাইয়া দেয়, চোখের অতিশয় কাছে আসিয়া অসীম আকাশকে রুদ্ধ করিয়া দেয় না। আমরা চিহ্ন না হইলে যদি না ভাবিতেই পারি তবে সে চিহ্ন এমন হওয়া উচিত যাহাতে তাহা গণ্ডি হইয়া না দাঁড়ায়। যাহাতে সে কেবল ভাবকে নির্দেশ করিয়া দেয়, ভাবকে আচ্ছন্ন না করে।

ঈশ্বরের আশ্রয়ে আছি বলিতে গিয়া ভক্তের মন মনুষ্যস্বভাববশত সহজেই বলিতে পারে 'আমি ঈশ্বরের চরণচ্ছায়ায় আছি' তাহাতে আমার মতে পৌত্তলিকতা হয় না। কিন্তু যদি কেহ সেই চরণের অঙ্গুলি পর্যন্ত গণনা করিয়া দেয়, অঙ্গুলির নখ পর্যন্ত নির্দেশ করিয়া দেয়, তবে তাহাকে পৌত্তলিকতা বলিতে হয়। কারণ, শুদ্ধমাত্র ভাব নির্দেশের পক্ষে এরূপ বর্ণনার কোনো আবশ্যক নাই— কেবল আবশ্যক নাই যে তাহা নয়, ইহাতে করিয়া ভাব হইতে মন প্রতিহত হইয়া বস্তুর মধ্যে রুদ্ধ হয়।

'চরণচ্ছায়ায় আছি' বলিতে গেলেই অমনি যে রক্তমাংসের একজোড়া চরণ মনে পড়িবে তাহা নহে। চরণের তলে পড়িয়া থাকিবার ভাবটুকু মনে আসে মাত্র। একটা দৃষ্টান্ত দিই।

যদি কোনো কবি বলেন বসন্তের বাতাস মাতালের মতো টলিতে টলিতে ফুলে ফুলে প্রবাহিত হইতেছে, তবে তৎক্ষণাৎ আমার মনে একটি মাতালের ছায়াছবি জাগিয়া উঠিবে; তাহার চলার ভাবের সহিত বাতাসের চলার ভাবের তুলনা করিয়া সাদৃশ্য দেখিয়া আনন্দ লাভ করিব। কিন্তু

তাই বলিয়া কি সত্যসত্যই কোনো মহা পণ্ডিত অঙ্গুলিবিশিষ্ট, নখবিশিষ্ট, বিশেষ কোনো বর্ণবিশিষ্ট, রোমবিশিষ্ট, একজোড়া টলটলায়মান রক্তমাংসের পা বাতাসের গাত্রে ঝুলিতে দেখেন। কিন্তু কবি যদি কেবল ইশারায় মাত্র ভাব প্রকাশ না করিয়া মাতালের পায়ের উপরেই বেশি ঝোঁক দিতেন, যদি তাহার পায়জামা ও ছেঁড়া বুট, বাঁ পায়ের ক্ষতচিহ্ন, ডান পায়ের এক হাঁটু কাদার কথার উল্লেখ করিতেন, তাহা হইলে স্বভাবতই ভাব ও ভঙ্গির সাদৃশ্যটুকু মাত্র মনে আসিত না, সশরীরে এক জোড়া পা আমাদের সম্মুখে আসিয়া তাহার পায়জামা ও ছেঁড়া বুট লইয়া আস্ফালন করিত। কে না জানেন চন্দ্রানন বলিলে থালার মতো একটা মুখ মনে পড়ে না, অথবা করপদ্ম বলিলে কুঞ্চিত দলবিশিষ্ট গোলাকার পদার্থ মনে আসে না— কিন্তু তাই বলিয়া চাঁদের মতো মুখ ও পদ্মের মতো করতল চিত্রপটে যদি আঁকিয়া দেওয়া যায় তবে তাহাই যথার্থ মনে করা ব্যতীত আমাদের আর অন্য কোনো উপায় থাকে না। 'ব্যূঢ়োরস্কো বৃষস্কন্ধঃ শালপ্রাংশুর্মহাভুজঃ' ভাষাতে এই বর্ণনা শুনিলে কোনো তর্কবাগীশ একটা নিতান্ত অস্বাভাবিক মূর্তি কল্পনা করেন না, কিন্তু যদি একটা চিত্রে অথবা মূর্তিতে অবিকল বৃষের ন্যায় স্কন্ধ ও দুইটি শাল বৃক্ষের ন্যায় বাহু রচনা করিয়া দেওয়া যায় তবে দর্শক তাহাকেই প্রকৃত না মনে করিয়া থাকিতে পারে না।

আর-একটি কথা। কতকগুলি বিষয় আছে যাহা বিশুদ্ধ জ্ঞানের গম্য, যাহা পরিষ্কার ভাষায় ব্যক্ত করা যায় ও করাই উচিত। যেমন, ঈশ্বর ত্রিকালজ্ঞ। ঈশ্বরের কপালে তিনটে চক্ষু দিলেই যে ইহা আমরা অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার বুঝিতে পারি তাহা নহে। বরঞ্চ তিনটে চক্ষুকে আবার বিশেষ রূপে ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া বলিতে হয় ঈশ্বর ত্রিকালজ্ঞ। বিশুদ্ধ জ্ঞানের ভাষা অলংকারশূন্য। অলংকারে তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া দেয়, বিকৃত করিয়া দেয়, মিথ্যা করিয়া দেয়। জ্ঞানগম্য বিষয়কে রূপকের দ্বারা বুঝাইতে গেলেই পৌত্তলিকতা আসিয়া পড়ে। কবি টেনিসন একটি প্রাচীন ইংরাজি কাহিনী অবলম্বন করিয়া কাব্য লিখিয়াছেন। তাহাতে আছে— মহারাজ আর্থরের প্রতিনিধিস্বরূপ হইয়া নায়ক লান্‌স্‌লট্‌ কুমারী গিনেবিব্‌কে মহারাজের সহধর্মিণী করিবার জন্য কুমারীর পিতৃভবন হইতে আনিতে গিয়াছেন— কিন্তু সেই কুমারী প্রতিনিধিকেই আর্থর জ্ঞান করিয়া তাঁহাকেই মনে মনে আত্মসমর্পণ করেন; অবশেষে যখন ভ্রম বুঝিতে পারিলেন তখন আর হৃদয় প্রত্যাহার করিতে পারিলেন না— এইরূপে এক দারুণ অশুভ পরিণামের সৃষ্টি হইল। বিশুদ্ধ জ্ঞানের প্রতিনিধি রূপককে লইয়াও এইরূপ গোলযোগ ঘটিয়া থাকে। আমরা প্রথম দৃষ্টিতে তাহাকেই জ্ঞানের স্থলে অভিষিক্ত করিয়া লই ও জ্ঞানের পরিবর্তে তাহারই গলে বরমাল্য প্রদান করি— অবশেষে ভ্রম ভাঙিলেও সহজে হৃদয় ফিরাইয়া লইতে পারি না। ইহার পরিণাম শুভ হয় না। কারণ, জ্ঞানোদয় হইলে অজ্ঞানের প্রতি আমাদের আর শ্রদ্ধা থাকে না, অথচ অভ্যাস অনুসারে শ্রদ্ধাসূচক অনুষ্ঠানও ছাড়িতে পারি না। এইজন্য তখন টানিয়া বুনিয়া ব্যাখ্যা করিয়া হাড়গোড় বাঁকানো ব্যায়াম করিয়া জ্ঞানের প্রতি এই ব্যভিচারকে ন্যায়সংগত বলিয়া কোনোমতে দাঁড় করাইতে চাই। নিজের বুদ্ধির খেলায় নিজে আশ্চর্য হই, সুচতুর ব্যাখার সুচারু ফ্রেমে বাঁধাইয়া ধর্মকে ঘরের দেয়ালে টাঙাইয়া রাখি এবং তাহার চাকচিক্যে পরম পরিতোষ লাভ করি। কিন্তু এইরূপ ভেল্‌কিবাজির উপরে আত্মার আশ্রয়স্থল নির্মাণ করা যায় না। ইহাতে কেবল বুদ্ধিই তীক্ষ্ণ হয় কিন্তু আত্মা প্রতিদিন জড়তা কপটতা, ঘোরতর বৈষয়িকতার রসাতলে তলাইতে থাকে। ইহা তো ধর্মের সহিত চালাকি করিতে যাওয়া। ইহাতে ক্ষুদ্রতা প্রকাশ পায়। ইহার আচার্যেরা অভিমানী উদ্ধত ও অসহিষ্ণু হইয়া উঠেন। কারণ ইহাঁরা জানেন ইহাঁরাই ঈশ্বরকে ভাঙিতেছেন ও গড়িতেছেন, ইহাঁরাই ধর্মের সেতু।

জ্ঞানগম্য বিষয়কে রূপকে ব্যক্ত করা অনাবশ্যক ও হানিজনক বটে কিন্তু আমাদের ভাবগম্য বিষয়কে আমরা সহজ ভাষায় ব্যক্ত করিতে পারি না, অনেক সময়ে রূপকে ব্যক্ত করিতে হয়। ঈশ্বরের আশ্রয়ে আছি বলিলে আমার মনের ভাব ব্যক্ত হয় না, ইহাতে একটি ঘটনা ব্যক্ত হয় মাত্র; স্থাবর জঙ্গম ঈশ্বরের আশ্রয়ে আছে আমিও তাঁহার আশ্রয়ে আছি এই কথা বলা হয় মাত্র।

কিন্তু ঈশ্বরের চরণের তলে পড়িয়া আছি বলিলে তবেই আমার হৃদয়ের ভাব প্রকাশ হয়— ইহা কেবল আমার সম্পূর্ণ আত্মবিসর্জনসূচক পড়িয়া থাকার ভাব। অতএব ইহাতে কেবল আমারই মনের ভাব প্রকাশ পাইল, ঈশ্বরের চরণ প্রকাশ পাইল না। অতএব ভক্ত যেখানে বলেন, হে ঈশ্বর আমাকে চরণে স্থান দাও, সেখানে তিনি নিজের ইচ্ছাকেই রূপকের দ্বারা ব্যক্ত করেন, ঈশ্বরকে রূপকের দ্বারা ব্যক্ত করেন না।

যাই হোক, যদি কোনো ব্যক্তি নিতান্তই বলিয়া বসে যে আমি কোনোমতেই গৃহকার্য করিতে পারি না, আমি খেলা করিতেই পারি, তবে আমি তাহার সহিত ঝগড়া করিতে চাই না। কিন্তু তাই বলিয়া সে যদি অন্য পাঁচজনকে বলে গৃহকার্য করা সম্ভব নহে খেলা করাই সম্ভব তখন তাহাকে বলিতে হয় তোমার পক্ষে সম্ভব নয় বলিয়া যে সকলের পক্ষেই অসম্ভব সে কথা ঠিক না হইতে পারে। অথবা যদি বলিয়া বসে যে খেলা করা এবং গৃহকার্য করা একই, তবে সে সম্বন্ধে আমার মতভেদ প্রকাশ করিতে হয়। একজন বালিকা যখন পুতুলের বিবাহ দিয়া ঘরকন্নার খেলা খেলে, তখন পুতুলকে সে নিতান্তই মৃৎপিণ্ড মনে করে না— তখন কল্পনার মোহে সে উপস্থিতমতো পুতুল দুটিকে সত্যকার কর্তা-গৃহিণী বলিয়াই মনে করে, কিন্তু তাই বলিয়াই যে তাহাকে খেলা বলিব না সত্যকার গৃহকার্যই বলিব এমন হইতে পারে না। এই পর্যন্ত বলিতে পারি যে, স্নেহ প্রেম প্রভৃতি যে-সকল বৃত্তি আমাদিগকে গৃহকার্যে প্রবৃত্ত করায় এই খেলাতেও সেই-সকল বৃত্তির অস্তিত্ব প্রকাশ পাইতেছে। ইহাও বলিতে পারি খেলা ছাড়িয়া যখন তুমি গৃহকার্যে প্রবৃত্ত হইবে, তখন তোমার এই-সকল বৃত্তি সার্থক হইবে। আত্মার মধ্যেই ঈশ্বরের সহিত আত্মার সম্বন্ধ উপলব্ধি করিবার চেষ্টা এবং ঈশ্বরকে ইন্দ্রিয়গোচর করিবার চেষ্টা, এ দুইয়ের মধ্যেও সেই গৃহকার্য ও খেলার প্রভেদ। ইহার মধ্যে একটি আত্মার প্রকৃত লক্ষ্য, প্রকৃত কার্য, আত্মার গভীর অভাবের প্রকৃত পরিতৃপ্তিসাধন, আর-একটি তাহার খেলা মাত্র। কিন্তু এই খেলাতেই যদি আমরা জীবন ক্ষেপণ করি তবে আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যায়। সকলেই কিছু গৃহকার্য ভালোরূপ করিতে পারে না। কিন্তু তাই বলিয়া তাহাদিগকে বলিতে পারি না, তবে তোমরা পুতুল লইয়া খেলা করো। তাহাদিগকে বলিতে হয় তোমরা চেষ্টা করো। যতটা পার তাই ভালো, কারণ ইহা জীবনের কর্তব্য কার্য। ক্রমেই তোমার অধিকতর জ্ঞান অভিজ্ঞতা ও বল লাভ হইবে। আত্মার মধ্যে পরমাত্মাকে দেখিতে হইবে, নতুবা উপাসনা হইলই না, খেলা হইল। ঈশ্বরের ধ্যান করিলে আত্মা চরিতার্থ হয়, কিন্তু এ বিষয়ে সকলে সমান কৃতকার্য হইতে পারেন না, আর রসনাগ্রে সহস্রবার ধ্যানহীন ঈশ্বরের নাম জপ করিলে বিশেষ কোনো ফলই হয় না, অথচ তাহা সকলেরই আয়ত্তাধীন। কিন্তু আয়ত্তাধীন বলিয়াই যে শাস্ত্রের অনুশাসনে, নরকের বিভীষিকায় সেই নিষ্ফল নাম জপ অবলম্বনীয় তাহা নহে।

সীমাবদ্ধ যে-কোনো পদার্থকে আমরা অত্যন্ত ভালোবাসি, তাহাদের সম্বন্ধে আমাদের একটা বিলাপ থাকিয়া যায় যে তাহাদিগকে আমরা আত্মার মধ্যে পাই না। তাহারা আত্মময় নহে। জড় ব্যবধান মাঝে আসিয়া আড়াল করিয়া দাঁড়ায়। জননী যখন সবলে শিশুকে বুকে চাপিয়া ধরেন তখন তিনি যতটা পারেন ব্যবধান লোপ করিতে চান, কিন্তু সম্পূর্ণ পারেন না এইজন্য সম্পূর্ণ তৃপ্তি হয় না। কিন্তু ঈশ্বরকে আমরা ইচ্ছা করিয়া দূরে রাখি কেন? আমরা নিজে ইচ্ছাপূর্বক স্বহস্তে ব্যবধান রচনা করিয়া দিই কেন? তিনি আত্মার মধ্যেই আছেন আত্মাতেই তাঁহার সহিত মিলন হইতে পারে, তবে কেন আত্মার বাহিরে গিয়া তাঁহাকে শত সহস্র জড়ত্বের আড়ালে খুঁজিয়া বেড়াই? আত্মার বাহিরে যাহারা আছে তাহাদিগকে আত্মার ভিতরে পাইতে চাই, আর যিনি আত্মার মধ্যেই আছেন তাঁহাকে কেন আত্মার বাহিরে রাখিতে চাই?

নিরাকার উপাসনাবিরোধীদের একটা কথা আছে যে, নিরাকার ঈশ্বর নির্গুণ অতএব তাঁহার উপাসনা সম্ভবে না। আমি দর্শনশাস্ত্রের কিছুই জানি না, সহজ বুদ্ধিতে যাহা মনে হইল তাহাই বলিতেছি। ঈশ্বর সগুণ কি নির্গুণ কী করিয়া জানিব! তাঁহার অনন্ত স্বরূপ তিনিই জানেন। কিন্তু

আমি যখন সগুণ তখন আমার ঈশ্বর সগুণ। আমার সম্বন্ধে তিনি সগুণ ভাবে বিরাজিত। জগতে যাহা-কিছু দেখিতেছি তাহা যে তাহাই, তাহা কী করিয়া জানিব! তাহার নিরপেক্ষ স্বরূপ জানিবার কোনো সম্ভাবনা নাই। কিন্তু আমার সম্বন্ধে তাহা তাহাই। সেই সম্বন্ধ বিচার করিয়াই আমাকে চলিতে হইবে, আর-কোনো সম্বন্ধ বিচার করিয়া চলিলে আমি মারা পড়িব। হল্যান্ডে সমুদ্রে বন্যা আসিত। তাই বলিয়া কি হল্যান্ড সমুদয় সমুদ্র বাঁধিয়া ফেলিবে! সমুদ্রের যে অংশের সহিত তাহার অব্যবহিত যোগ সেইটুকুর সঙ্গেই তাহার বোঝাপড়া। মনে করুন একটি শিশুর পিতা জমিদার, দোকানদার, ম্যুনিসিপলিটি সভার অধ্যক্ষ, ম্যাজিস্ট্রেট, লেখক, খবরের কাগজের সম্পাদক— তিনি কলিকাতাবাসী, বাঙালি, হিন্দু, ককেশীয় শাখাভুক্ত, আর্যবংশীয়, তিনি মনুষ্য— তিনি অমুকের পিসে, অমুকের মেসো, অমুকের ভাই, অমুকের শ্বশুর, অমুকের প্রভু, অমুকের ভৃত্য, অমুকের শত্রু, অমুকের মিত্র ইত্যাদি— এক কথায়, তিনি যে কত কী তাহার ঠিকানা নাই— কিন্তু শিশুটি তাঁহাকে কেবল তাহার বাবা বলিয়াই জানে (বাবা কাহাকে বলে তাহাও সে ভালো করিয়া জানে না)— শিশুটি কেবল তাঁহাকে তাহার আপনার বলিয়া জানে, ইহাতে ক্ষতি কী! এই শিশু যেমন তাহার পিতাকে জানেও বটে, না জানেও বটে, আমরাও তেমনি ঈশ্বরকে জানিও বটে, না জানিও বটে। আমরা কেবল এই জানি তিনি আমাদের আপনার। ঈশ্বর সম্বন্ধে আমাদের হৃদয়ের যাহা উচ্চতম আদর্শ, তাহাই আমাদের পূজার ঈশ্বর, তাহাই আমাদের নেতা ঈশ্বর, তাহাই আমাদের সংসারের ধ্রুবতারা। তাঁহার যাহা নিগূঢ় স্বরূপ তাহার তথ্য কে পাইবে! কিন্তু তাই বলিয়া যে আমাদের দেবতা আমাদের মিথ্যা কল্পনা, আমাদের মনগড়া আদর্শ, তাহা নহে। আংশিক গোচরতা যেরূপ সত্য ইহাও সেইরূপ সত্য। পূর্বেই বলিয়াছি দৃষ্টিগোচর সমুদ্রকে সমুদ্র বলা এক আর ডোবাকে সমুদ্র বলা এক। ইহাকে আমি আংশিক বলিয়াই জানি— এইজন্য হৃদয় যতই প্রসারিত করিতেছি, আমার ঈশ্বরকে ততই অধিক করিয়া পাইতেছি— ন্যায় দয়া প্রেমের আদর্শ আমার যতই বাড়িতেছে ততই ঈশ্বরে আমি অধিকতর ব্যাপ্ত হইতেছি। প্রতি পদক্ষেপে, উন্নতির প্রত্যেক নূতন সোপানে পুরাতন দেবতাকে ভাঙিয়া নূতন দেবতা গড়িতে হইতেছে না। অতএব আইস, অসীমকে পাইবার জন্য আমরা আত্মার সীমা ক্রমে ক্রমে দূর করিয়া দিই, অসীমকে সীমাবদ্ধ না করি। যদি অসীমকেই সীমাবদ্ধ করি তবে আত্মাকে সীমামুক্ত করিব কী করিয়া। ঈশ্বরকে অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত দয়া, অনন্ত প্রেম জানিয়া আইস আমরা আমাদের জ্ঞান প্রেম দয়াকে বিস্তার করি, তবেই উত্তরোত্তর তাঁহার কাছে যাইতে পারিব। তাঁহাকে যদি ক্ষুদ্র করিয়া দেখি তবে আমরাও ক্ষুদ্র থাকিব, তাঁহাকে যদি মহৎ হইতে মহান বলিয়া জানি তবে আমরা ক্ষুদ্র হইয়াও ক্রমাগত মহত্ত্বের পথে ধাবমান হইব। নতুবা পৃথিবীর অসুখ অশান্তি, চিত্তের বিক্ষিপ্ততা বাড়িবে বৈ কমিবে না। সুখ সুখ করিয়া আমরা আকাশ-পাতাল আলোড়ন করিয়া বেড়াই, আইস আমরা মনের মধ্যে পুরাতন ঋষিদের এই কথা গাঁথিয়া রাখি 'ভূমৈব সুখং' ভূমাই সুখস্বরূপ, কোনো সীমা কোনো ক্ষুদ্রত্বে সুখ নাই— তা হইলে অনর্থক পর্যটনের দুঃখ হইতে পরিত্রাণ পাইব।

ভারতী
শ্রাবণ ১২৯২

নববর্ষ উপলক্ষে গাজিপুরে ব্রহ্মোপাসনা

(উদ্‌বোধন)

গতরাত্রিতে আমরা সেই বিশ্বজননীর ক্রোড়ে বিশ্রাম করিতেছিলাম। পাছে আমাদের নিদ্রার ব্যাঘাত হয় এইজন্য তিনি দীপ্ত ভানুকে নির্বাণ করিয়া দিলেন জগতের কোলাহল থামাইয়া দিলেন। চারি দিক নিস্তব্ধ হইল। বিশ্বচরাচর নিদ্রায় মগ্ন হইল। কেবল একমাত্র সেই বিশ্বতশ্চক্ষু

বিশ্বজননী শ্রান্ত জগতের শিয়রে বসিয়া অসংখ্য অনিমেষ তারকা-আঁখি তাহার উপর স্থাপিত করিয়া রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত ছিলেন। দিবসের কঠোর পরিশ্রমে জীবশরীরের যে-কোনো অঙ্গ ব্যথিত হইয়াছিল তাঁহার কোমল কর-সঞ্চালনে সে ব্যথা দূর করিলেন, সংসারের জ্বালাযন্ত্রণায় যে মন নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল তাহাকে অল্পে অল্পে সতেজ করিয়া তুলিলেন— যে আত্মা সংসারের মোহ প্রলোভনে মুহ্যমান হইয়াছিল তাহাকে প্রকৃতিস্থ করিলেন। জগৎ নব-বলে নব-উদ্যমে আবার কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইল।

সেই বিশ্বকর্মা বিশ্ববিধাতার শিল্পাগার চির উন্মুক্ত— দিবারাত্রিই তাঁহার কার্য অবিরামে চলিতেছে। যখন আর সকলেই নিদ্রিত থাকে, সেই বিধাতা পুরুষ জাগ্রত থাকিয়া তাঁহার রচিত বিশ্বযন্ত্রের জীর্ণসংস্কার করিতে থাকেন— তাঁহার এই সংস্কারকার্য কেমন গোপনে, বিনা আড়ম্বরে সম্পন্ন হয়। তিনি তাঁহার অসম্পূর্ণ সৃষ্টিকে একটা রহস্যময় আবরণে আবৃত করিয়া রাখিতে ভালোবাসেন। যতক্ষণ তাঁহার সৃষ্টি জীবন ও সুখসৌন্দর্যে পূর্ণরূপে ভূষিত না হয় ততক্ষণ তিনি তাহাকে বাহিরের পূর্ণ আলোকে আনিতে চাহেন না। সেই মহাশিল্পী সেই মহারহস্যের আবরণ ক্রমশ ভেদ করিয়া তাহার মধ্য হইতে অভিনব বিচিত্র জীবন-সৌন্দর্যের বিকাশ করিতেছেন। তিনি জরায়ুর অন্ধকারে অবস্থান করিয়া মানবশিশুর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যোজনা করেন। তিনি অণ্ডের মধ্যে থাকিয়া পক্ষীশাবকের শরীর গঠন করেন— তিনি বীজকোষে থাকিয়া বৃক্ষলতাকে পরিপুষ্ট করেন। তিনি পুরাতন বর্ষের গর্ভে নববর্ষের প্রাণ সঞ্চার করেন— তিনি করাল মৃত্যুর মধ্যে থাকিয়াও অমৃতের আয়োজন করেন। আর সেই মহারাত্রিকে একবার কল্পনার চক্ষে আনয়ন করো— যখন চন্দ্র সূর্য গ্রহ নক্ষত্র কিছুই ছিল না— যখন সেই স্বয়ম্ভু স্বপ্রকাশ তাঁহার সেই অসীম ব্রহ্মাণ্ডের অতি সূক্ষ্ম তন্মাত্রময় আবরণের মধ্যে বিলীন থাকিয়া আপনাকে আপনি বিকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই অবধি সৃষ্টি আরম্ভ হইল— প্রাণের স্রোত বহিতে লাগিল— সৌন্দর্যের উৎস উৎসারিত হইল। সেই মহাপ্রাণের বিরাম নাই— জগতের মৃত্যু নাই।— তাহা অস্তিত্বের অবসান নহে তাহা আবরণ মাত্র— তাহা প্রাণের লীন অবস্থা— তাহা নবজীবনের গূঢ় আয়োজন ভিন্ন আর কিছুই নহে। মৃত্যু আমাদের জীবনরঙ্গভূমির সজ্জাগৃহ মাত্র। ইহলোকের অভিনয়-মঞ্চ হইতে প্রস্থান করিয়া কিছুকাল আমরা মৃত্যুরূপ সজ্জাগৃহে বিশ্রাম করি ও পুনর্বার নবসাজে সজ্জিত হইয়া জীবনরঙ্গভূমিতে পুনঃপ্রবেশ করি ও নব-উদ্যমে পূর্ণ হইয়া জীবনের নূতন অঙ্ক অভিনয়ে প্রবৃত্ত হই।

বলিতে বলিতে ওই দেখো পূর্ব দিকের যবনিকা অল্পে অল্পে উদ্‌ঘাটিত করিয়া শুভ্রভূষা অকলুষা উষা ধীর পদক্ষেপে প্রবেশ করিতেছেন। সুকুমার শিশুর পবিত্র হাসির রেখা দিগন্তের রক্তিম অধরে দেখা দিয়াছে। সুখস্পর্শ প্রভাত সমীরণ মন্দ মন্দ বহিতেছে। উষার চুম্বনে কুসুমরাশি জাগ্রত হইয়া কেমন পবিত্র সৌরভ বিস্তার করিতেছে। বিহঙ্গকুলের মধুর কলরবে আকাশ ছাইয়া গেল। জগৎ জীবন সুখে পুনর্বার পূর্ণ হইল। এ সেই পবিত্র স্বরূপ, আনন্দ-স্বরূপ, মঙ্গল-স্বরূপেরই মহিমা। আইস এই নববর্ষের উৎসবে আমরা তাঁহারই মহিমা ঘোষণা করি, বর্ষের এই প্রথম দিনে সেই সর্বসিদ্ধিদাতার নাম উচ্চারণ করিয়া আমাদের রসনাকে পবিত্র করি— এই পবিত্র দিবসে এই পবিত্র প্রাতঃকালে তাঁহারই কার্যে আমাদের জীবনকে উৎসর্গ করিয়া জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করি।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা
জ্যৈষ্ঠ, ১৮১০ শক। ১২৯৫ বঙ্গাব্দ

ধর্ম ও ধর্মনীতির অভিব্যক্তি
(Evolution)

অভিব্যক্তিবাদ বলে একেবারে সম্পূর্ণ আকারে সৃষ্ট না হইয়া নিখিল ক্রমে ক্রমে পরিস্ফুট হইতেছে। এককালে মনে হইয়াছিল এই মত ধর্মের মূলে আঘাত করিবে, তাই ধর্মযাজকগণ সশঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু ক্রমে এ মত সহিয়া গেল, সকলে মানিয়া লইল, অথচ ধর্মের মূল অবিচলিত রহিল। লোকে হঠাৎসৃষ্টি অপেক্ষা অমোঘ সৃষ্টিনিয়মের মধ্যে ঐশ্বরিক ভাব অধিক উপলব্ধি করিতে লাগিল। একদল লোকের বিশ্বাস আমাদের মনের ধর্মভাব, ঈশ্বরধারণা সহজ আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ। আর-একদল লোক বলেন তাহা ভূতের ভয় হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশ অভিব্যক্ত। প্রথমোক্ত দল ভয় করেন যে শেষ মতটি প্রমাণ হইলে ধর্মের মূলে আঘাত লাগিবে। কিন্তু আমি সেরূপ আশঙ্কা দেখি না। ভূতের ভয় হইতেও যে অসীম ঈশ্বরের ভাব আমাদের মনে বিকশিত হইতে পারে ইহা পরম আশ্চর্য। স্বার্থপরতা হইতে মানবধর্মনীতি ক্রমে নিঃস্বার্থপরতার অভিমুখিন হইতেছে ইহাতেই মানবহৃদয়ের অন্তর্নিহিত মঙ্গলনিয়ম অধিক মাত্রায় অনুভব করা যায়। বীজে ও বৃক্ষে যেমন দৃশ্যমান প্রভেদ, এমন আর কিছুতে না, কিন্তু বৃক্ষ হইবার উদ্দেশ্য তাহার মধ্যে বর্তমান। বাষ্প হইতে সৌরজগতের অভিব্যক্তি বলিলে সৌরজগৎ যে বাষ্পেরই সামিল হইয়া দাঁড়ায় তাহা নহে। ইতিপূর্বে অমঙ্গল ও মঙ্গলকে, শয়তান ও ঈশ্বরকে দুই বিপরীত শ্রেণীতে ভুক্ত করা হইয়াছিল। এখন অভিব্যক্তিবাদ হইতে আমাদের মনে এই ধারণা হইতেছে অসত্য হইতে সত্য অমঙ্গল হইতে মঙ্গল উদ্‌ভূত হয়। সত্যের নিয়ম মঙ্গলের নিয়ম অসত্য এবং অমঙ্গলের মধ্যেও বিরাজ করিতেছে। অনন্ত জগতের অনন্ত কার্য সমগ্রভাবে দেখা আমাদের পক্ষে অসম্ভব, আংশিকভাবে দেখিতে গিয়া আমরা সকল সময়ে পাপপুণ্যের মধ্যে সামঞ্জস্য দেখিতে পাই না তথাপি মঙ্গল অভিব্যক্তির প্রতি আমাদের এমনি বিশ্বাস যে মন্দের মধ্যে হইতেও ভালো হইবে এই বিশ্বাস অনুসারে উপদেশ দিতে ও কাজ করিতে আমরা কিছুতেই বিরত হই না। অতএব অভিব্যক্তিবাদে এই মঙ্গলের প্রতি বিশ্বাস আমাদের মনে আরও বদ্ধমূল করিয়া দেয়, মনে হয় সৃষ্টির [মধ্যে যে] মঙ্গলকার্য দেখিতেছি তাহা সৃষ্টিকর্তার ক্ষণিক খেয়াল নহে, তাহা সৃষ্টির সহিত অবিচ্ছেদ্য অনন্ত নিয়ম।

পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তক
২২। ১১। ৮৮ [৮ অগ্রহায়ণ ১২৯৫]

চন্দ্রনাথবাবুর স্বরচিত লয়তত্ত্ব

পাঠকদের স্মরণ থাকিতে পারে, পরব্রহ্মে বিলীন হইয়া যাইবার চেষ্টাই হিন্দুর বিশেষত্ব এবং সেই বিশেষত্ব একান্ত যত্নে রক্ষা করাই আমাদের কর্তব্য, চন্দ্রনাথবাবু এইরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন। আমাদের ভিন্নরূপ মানসিক প্রকৃতিতে ভিন্নরূপ ধারণা হওয়ায় 'সাধনা'য় চন্দ্রনাথবাবুর প্রতিবাদ করিয়াছিলাম।

ইহাতে চন্দ্রনাথবাবু আমাদের উপর রাগ করিয়াছেন। রাগ করিবার একটা কারণ দেখাইয়াছেন যে, 'পূর্ব প্রবন্ধে এ কথা যে রকম করিয়া বুঝাইয়াছি তাহাতেও যদি কেহ না বুঝেন তবে তিনি এ কথা বুঝিতে হয় অসমর্থ না হয় অনিচ্ছুক'— দৈবাৎ তাঁহারই বুঝাইবার কোনো ত্রুটি ঘটিতেও পারে, মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ, এরূপ সংশয়মাত্র চন্দ্রনাথবাবুর মনে উদয় হইতে পারিল না অতএব যে দুঃসাহসিক তাঁহার সহিত একমত হইতে পারে নাই সেই নরাধম। যুক্তিটা

যদিও তেমন পাকা নহে এবং ইহাতে নম্রতা ও উদারতার কিঞ্চিৎ অভাব প্রকাশ পায়, তথাপি তর্কস্থলে এরূপ যুক্তি অনেকেই প্রয়োগ করিয়া থাকেন। চন্দ্রনাথবাবুও যদি সেই পথে যান, তবে আমরা তাঁহাকে মহাজন জানিয়াও ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করিতে ইচ্ছা করি।

প্রবন্ধের উপসংহারে চন্দ্রনাথবাবু রাগের মাথায়, আমাদিগকে অথবা কাহাকে ঠিক জানি না, স্বজাতিদ্রোহী বলিয়াছেন। বিশুদ্ধ জ্ঞানানুশীলনার মধ্যেও লোকে পরস্পরকে এমন সকল কঠিন কথা বলিয়া থাকে। অতএব, চন্দ্রনাথবাবু যে বলিয়াছেন ক্ষুদ্রতা হইতে যতই ব্যাপকতার দিকে উত্থান করা যায় ততই তীব্রতা দুর্দমনীয়তার হ্রাস হয়, সে কথা সপ্রমাণ হইতেছে না। আমাদের বক্তব্য এই যে, সত্য স্বজাতি অপেক্ষা ব্যাপক এবং নব্য গুরুদিগের অপেক্ষা প্রাচীন, অতএব আমরা সত্যদ্রোহী হওয়াকেই সর্বাপেক্ষা গুরুতর অপরাধ জ্ঞান করি।

চন্দ্রনাথবাবু যে প্রবন্ধটি লিখিয়াছেন, তাহা আকারে যদিও বৃহৎ কিন্তু তাহার মূল কথা দুটি-একটির অধিক নহে অতএব আসল তর্কটা সংক্ষেপে সারিতে পারিব এরূপ আশা করা যায়।

চন্দ্রনাথবাবু বলেন, হিন্দুর লয়তত্ত্বের অর্থ সগুণ অবস্থা পরিত্যাগ করিয়া নির্গুণ অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া। কিন্তু এই নির্গুণ অবস্থা প্রাপ্ত হইতে গেলে যে একেবারেই সংসারে বিমুখ হইতে হইবে তাহা নহে, বরঞ্চ সংসারধর্ম পালন সেই অবস্থা প্রাপ্তির একটি মুখ্য সোপান। কারণ, যাঁহারা মনে করেন নির্গুণ অবস্থা লাভের অর্থ আত্মনাশ 'তাঁহারা বড়ো ভুল বুঝেন— তাঁহারা বোধহয় তাঁহাদের মানসিক ও আধ্যাত্মিক প্রকৃতির সংকীর্ণতা বা বিকৃতিবশত আমাদের লয়তত্ত্বে প্রবেশ করিতে একেবারেই অসমর্থ'। তাঁহার মতে নির্গুণতা প্রাপ্তির অর্থ 'আত্মসম্প্রসারণ'। স্বার্থপরতা হইতে পরার্থপরতা এবং পরার্থপরতা হইতে ব্রহ্মজ্ঞানানুশীলনের সাহায্যে ক্রমশ নির্গুণতারূপ আত্মসম্প্রসারণ, ভিন্ন ভিন্ন পর্যায় মাত্র। অতএব পরার্থপরতার সম্যক্ অভ্যাসের জন্য সংসারধর্ম পালন অত্যাবশ্যক। আবার যাঁহারা বলেন, লয়তত্ত্ব মানিয়া চলিতে গেলে বিজ্ঞানশিক্ষা সৌন্দর্যচর্চা দূর করিতে হয় তাঁহারাও ভ্রান্ত। কারণ, 'পদার্থবিদ্যা প্রাণীবিদ্যা প্রভৃতি যাহাতে সৃষ্টিকৌশল ব্যাঘাত হয়, বিশ্বনাথের বিপুল বিচিত্র লীলা বর্ণিত হয় সে সকলই লয়প্রার্থীর অনুশীলনের জিনিস।' 'বিশ্বের সৌন্দর্য, বিশ্বের মাধুরী, বিশ্বের মধুময়তা (এই তিনটি শব্দবিন্যাসের মধ্যে বিশেষ যে অর্থবৈচিত্র্য আছে আমার বোধ হয় না। শ্রীরঃ) ব্রহ্মভক্ত ব্রহ্মপিপাসু ব্রহ্মচারী যেমন অনুভব করিবেন আর কেহই তেমন করিবেন না।' 'প্রকৃত সৌন্দর্যে মানুষকে ব্রহ্মেই মজাইয়া দেয়।'

মোট কথাটা এই। এক্ষণে, যদিও আশঙ্কা আছে আমাদের বুদ্ধিহীনতা অথবা অসারল্য, আমাদের মানসিক ও আধ্যাত্মিক প্রকৃতির সংকীর্ণতা ও বিকৃতি সম্বন্ধে চন্দ্রনাথবাবুর প্রত্যয় উত্তরোত্তর অধিকতর বদ্ধমূল হইয়া যাইবে, তথাপি আমাদিগকে অগত্যা স্বীকার করিতেই হইবে এবারে আমরা চন্দ্রনাথবাবুর কথা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

সগুণে নির্গুণে এমন একটা খিচুড়ি পাকাইয়া তোলা পূর্বে আমরা কোথাও দেখি নাই।

প্রথম কথা। ক্ষুদ্র অনুরাগ হইতে বৃহৎ অনুরাগ বুঝিতে পারি, কিন্তু বৃহৎ অনুরাগ হইতে নিরনুরাগের মধ্যে ক্রমবাহী যোগ কোথায় বুঝিতে পারি না।

যদি কেহ বলেন, অনুরাগের ব্যাপকতা অনুসারে তাহার প্রবলতা ক্রমশ হ্রাস হইয়া আসে সে কথা প্রামাণ্য নহে। একভাবে হ্রাস হইয়া আর-একভাবে বৃদ্ধি হয়। প্রকৃত দেশানুরাগ যে গৃহানুরাগের অপেক্ষা ক্ষীণবল ইতিহাসে এরূপ সাক্ষ্য দেয় না, দেশানুরাগের অপেক্ষা প্রকৃত সর্বজনীন প্রীতি যে নিস্তেজ এমন কথা কাহার সাধ্য বলে! বড়ো বড়ো অনুরাগে একেবারে প্রাণ লইয়া টানাটানি। দেশহিতের জন্য, লোকহিতের জন্য, ধর্মের জন্য মহাত্মারা যে অকাতরে প্রাণ বিসর্জন করিয়াছেন তাহা যে কত বড়ো 'বিরাট' অনুরাগের বলে, তাহা আমরা ঘরে বসিয়া অনুমান করিতেই পারি না। এই যে অনুরাগের উত্তরোত্তর বিশ্বব্যাপী বিস্তার ইহাকেই কি নির্গুণ লয় বলে? প্রীতি কি কখনো প্রীতিহীনতার দিকে আকৃষ্ট হয়? আত্মপ্রেম হইতে বিশ্বপ্রেম, বিশ্বপ্রেম

হইতে সগুণ ঈশ্বরপ্রেমের মধ্যে একটি পরস্পরসংলগ্ন পরিণতির পর্যায় আছে। কিন্তু 'হাঁ'-কে বড়ো করিয়া 'না' করা যায় এ কথা বিশ্বাস করিতে যেরূপ অসাধারণ মানসিক প্রকৃতির আবশ্যক আমাদের তাহা নাই স্বীকার করিতে হয়।

দ্বিতীয় কথা। 'সৃষ্টিকৌশলের' মধ্যে 'বিশ্বনাথের বিপুল বিচিত্র লীলা' দেখিয়া লয়প্রার্থী কী করিয়া যে ব্রহ্মের নির্গুণস্বরূপ হৃদয়ংগম করিতে সমর্থ হন তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। 'লীলা' কি নির্গুণতা প্রকাশ করে? 'লীলা' কি ইচ্ছাময়ের ইচ্ছাশক্তির বিচিত্র বিকাশ নহে? 'সৃষ্টিকৌশল' জিনিসটা কি নির্গুণ ব্রহ্মের সহিত কোনো যুক্তিসূত্রে যুক্ত হইতে পারে?

সৌন্দর্যের একমাত্র কার্য চিত্তহরণ করা অর্থাৎ হৃদয়ের মধ্যে প্রেমের আকর্ষণ সঞ্চার করিয়া দেওয়া। যাঁহারা প্রেমস্বরূপ সগুণ ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন সৃষ্টির সৌন্দর্যে তাঁহাদিগকে ঈশ্বরের প্রেম স্মরণ করাইয়া দেয়। ঈশ্বর যে আমাদিগকে ভালোবাসেন এই সৌন্দর্য বিকাশ করিয়াই যেন তাহার পরিচয় দিয়াছেন। তিনি যে কেবল আমাদিগকে অমোঘ নিয়মপাশে বাঁধিয়া আমাদিগকে বলপূর্বক কাজ করাইয়া লইতে চান তাহা নহে, আমাদের মনোহরণের প্রতিও তাঁহার প্রয়াস আছে। এই বিশ্বের সৌন্দর্যে তিনি আমাদিগকে বংশীস্বরে আহ্বান করিতেছেন— তিনি জানাইতেছেন তিনিও আমাদের প্রীতি চান। বৈষ্ণবদের কৃষ্ণরাধার রূপক এই বিশ্বসৌন্দর্য ও প্রেমের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। কৃষ্ণ কি নির্গুণ ব্রহ্ম? চন্দ্রনাথবাবু কী বলিবেন জানি না, কিন্তু চৈতন্যদেব অন্যরূপ বলেন। তিনি অহংব্রহ্মবাদীদিগকে 'পাষণ্ড' বলিয়াছেন। সে যাহাই হৌক, সৌন্দর্য বিরাট লয়প্রার্থীদিগকে যে কী করিয়া নির্গুণ ব্রহ্মে 'মজাইতে' পারে তাহা বুঝিতে পারিলাম না। সেটা আমাদের বুদ্ধির দোষ হইতে পারে এবং সেজন্য চন্দ্রনাথবাবু আমাদিগকে যথেচ্ছা গালি দিবেন, আমরা নির্বোধ ছাত্র-বালকের মতো নতশিরে সহ্য করিব, কিন্তু অবশেষে বুঝাইয়া দিবেন।

চন্দ্রনাথবাবু তাঁহার প্রবন্ধের একস্থানে প্রহ্লাদ ও নারদের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার স্মরণ করা উচিত ছিল প্রহ্লাদ ও নারদ উভয়েই বৈষ্ণব। উভয়েই ভক্ত এবং প্রেমিক। প্রহ্লাদের কাহিনীতে ঈশ্বরের সগুণতার যেরূপ দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে পুরাণের অন্য কোনো কাহিনীতে সেরূপ দেওয়া হয় নাই। প্রকৃত ভক্তির বশে ভক্তের কাছে ঈশ্বর যে কীরূপ প্রত্যক্ষভাবে ধরা দেন ইহাতে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। যে ঈশ্বর নানা বিপদ হইতে ভক্তকে কোলে করিয়া রক্ষা করিয়াছেন এবং অবশেষে নৃসিংহ মূর্তি ধরিয়া দৈত্যকে সংহার করিয়াছেন তিনি কি নির্গুণ ব্রহ্ম?

প্রসঙ্গক্রমে চন্দ্রনাথবাবু বঙ্কিমবাবুকে এক স্থলে সাক্ষ্য মানিয়াছেন। কিন্তু বঙ্কিমবাবু শ্রীকৃষ্ণকে গুণের আদর্শরূপে খাড়া করিয়া তাঁহারই অনুকরণের জন্য আমাদিগকে উৎসাহিত করিয়াছেন— নির্গুণতাকে আদর্শ করিয়া অপরূপ পদ্ধতি অনুসারে আত্মসম্প্রসারণ করিতে বলেন নাই।

আসল কথা, যাঁহারা যথার্থ লয়তত্ত্ববাদী, তাঁহারা লয়কে লয়ই বলেন, ইংরাজি শিখিয়া তাহাকে আত্মসম্প্রসারণ বলেন না। তাঁহাদের কাছে সৌন্দর্য কদর্য কিছুই নাই, এইজন্য তাঁহারা অতি কুৎসিত বস্তু ও চন্দনকে সমান জ্ঞান করেন। জগৎ তাঁহাদের কাছে যথার্থই অসৎ মায়া, বিশ্বনাথের সৃষ্টিকৌশল ও লীলা নহে।

মরুভূমি যেমন বিরাট এ তত্ত্বও তেমনি বিরাট, কিন্তু তাই বলিয়া ধরণীর বিচিত্র শস্যক্ষেত্রকে মরুভূমি করা যায় না; অকাতরে আত্মহত্যা করার মধ্যে একটা বিরাটত্ব আছে কিন্তু তাই বলিয়া প্রাণীদিগকে সেই বিরাটত্বে নিয়োগ করা কোনো জাতিবিশেষের একমাত্র কর্তব্য-কর্ম বলা যায় না। প্রেম প্রবল মোহ, জগৎ প্রকাণ্ড প্রতারণা এবং ঈশ্বর নাস্তিকতার নামান্তর এ কথা বিশ্বাস না করিলেও সংসারে 'বিরাটভাব' চর্চার যথেষ্ট সামগ্রী অবশিষ্ট থাকিবে।

আসল কথা, চন্দ্রনাথবাবু নিজের সহৃদয়তাগুণে লয়তত্ত্ব সম্যক্ গ্রহণ করিতে না পারিয়া ফাঁপরে পড়িয়াছেন। অথচ সেই সহৃদয়তাই দেশানুরাগের আকার ধারণ করিয়া তাঁহার নিকটে লয়তত্ত্বের সর্বোৎকৃষ্ট মাহাত্ম্য প্রমাণের চেষ্টা করিতেছে। সেই হৃদয়ের প্রাবল্যবশতই তিনি

অকস্মাৎ ক্ষুব্ধ হইয়া আমাদিগকে গালি দিয়াছেন এবং ভরসা করি, সেই সহৃদয়তাগুণেই তিনি আমাদের নানারূপ প্রগল্‌ভতা মার্জনা করিবেন।

সাধনা
আষাঢ় ১২৯৯

নব্য লয়তত্ত্ব

'সাহিত্যে' চন্দ্রনাথবাবু 'লয়' নামক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত করেন, আমাদের মতের সহিত অনৈক্য হওয়াতে সাধনা পত্রিকায় উক্ত প্রবন্ধের সমালোচনাকালে আমরা ভিন্ন মত ব্যক্ত করি। তাহা লইয়া চন্দ্রনাথবাবুর সহিত আমাদের বাদ-প্রতিবাদ চলিতেছে, তাহা 'সাহিত্য'-পাঠকদিগের অগোচর নাই। বিষয়টা গুরুতর, অতএব এ সম্বন্ধে বাদ-প্রতিবাদ হওয়া কিছুই আশ্চর্য নহে, কিন্তু চন্দ্রনাথবাবু উত্তরোত্তর আমাদের প্রতি রাগ করিতেছেন, ইহাতেই আমরা কিছু চিন্তিত হইয়াছি। চন্দ্রনাথবাবুর যে-একটা বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে তাঁহার মতের সহিত যখন আমাদের বিরোধ তখন অবশ্যই আমরা হিন্দুমতদ্বেষী, এ কথাটা কিছু গুরুতর। তিনি নানা ছলে আমাদিগকে সেইরূপ ভাবে দাঁড় করাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। হিন্দু হইয়া জন্মিলেই যে চন্দ্রনাথবাবুর সহিত কোনো মতভেদ হইবে না, এমন কথা কী করিয়া বলিব। বিশেষত, ইতিহাসে যখন তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় না। প্রসিদ্ধ ভক্ত রামপ্রসাদ 'লয়তত্ত্ব' সম্বন্ধে আপত্তি প্রকাশ করিয়া অবশেষে বলিয়াছেন, 'চিনি হতে চাই নে রে, ভাই, চিনি খেতে ভালোবাসি!' অর্থাৎ, 'বিরাট হিন্দু'র 'বিরাট লয়' তাঁহার নিকট প্রার্থনীয় নহে, এ কথা তিনি স্পষ্টরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। চৈতন্য অহংব্রহ্মবাদীর প্রতি কীরূপ বিরক্ত ছিলেন, পূর্বেই তাহার উল্লেখ করিয়াছি। ইঁহারা ছাড়া ভারতে দ্বৈতবাদী হিন্দুর সংখ্যা বিরল নহে। পূর্বোক্ত হিন্দু মহাপুরুষদিগের সহিত যখন চন্দ্রনাথবাবুর মতের ঐক্য হইতেছে না, তখন ভরসা করি আমার ন্যায় লোকের পক্ষেও তাঁহার সহিত মতবিরোধ প্রকাশ করা নিতান্তই দুঃসাহসের কাজ হইবে না।

চন্দ্রনাথবাবু যে লয়তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন সেটাকে আমি তাঁহার স্বরচিত লয়তত্ত্ব বলিয়াছি, ইহাতেই তিনি কিছু অধিক রাগ করিয়াছেন বলিয়া বোধ হইল। অতএব ও কথাটা ব্যবহার না করিলেই ভালো করিতাম, স্বীকার করি; কিন্তু তাহা হইলে আমাদের আসল কথাটাই বলা হইত না। শাস্ত্রে যে একটা লয়তত্ত্ব আছে, বিশেষরূপে তাহার প্রমাণ প্রয়োগ করা বাহুল্য— কিন্তু চন্দ্রনাথবাবু যে লয়তত্ত্বের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা যে শাস্ত্রে নাই, ইহাই আমার বক্তব্য।

এমনতরো স্বতোবিরোধী কথা শাস্ত্রে থাকিবেই বা কী করিয়া? লয় অর্থে আত্মসম্প্রসারণ, নির্গুণ অর্থে সগুণ, এ-সব কথা নূতন ধরনের। প্রথমত, আত্মসম্প্রসারণ বলিতে কাহার প্রসারণ বুঝায়, সেটা ঠিক করা আবশ্যক। ব্রহ্ম তো আছেনই; আমি যদি আপনাকে তাঁহার মধ্যে লুপ্ত করিয়া দিই, তাহাতে তাঁহার তিলমাত্র বৃদ্ধি হইবে না— তিনি পূর্বে যেমন ছিলেন, এখনো তেমনি থাকিবেন। আর আমি? আমি তখন থাকিব না। কারণ, আমি যদি থাকি তো আমাতে ব্রহ্মেতে ভেদ থাকে; আর আমি যদি না থাকি, তবে সম্প্রসারণ হইল কাহার? ব্রহ্মেরও নহে, আমারও নহে।

প্রকৃত লয়তত্ত্ববাদীগণ আত্মপ্রসারণ নহে, আত্মসংহরণ করিতে উপদেশ দেন। 'ইহা নহে' 'ইহা নহে' 'ইহা নহে' বলিয়া, সমস্ত উপাধি হইতেই তাঁহারা আপনাকে প্রত্যাহার করিয়া অবশেষে যে আমি ভাবিতেছে তাহাকেও বিলুপ্ত করিয়া দেন; জ্ঞাতৃ, জ্ঞান ও জ্ঞেয় -ভেদ দূর করিয়া দেন—

'নিষিধ্য নিখিলোপাধীন্নেতি নেতীতি বাক্যতঃ।
বিদ্যাদৈক্যং মহাবাক্যৈর্জীবাত্মপরমাত্মনোঃ।'

তাঁহারা স্পষ্টই বলেন, কর্মের দ্বারা কখনোই এই লয়সাধন হয় না, কারণ কর্ম এবং অবিদ্যা

অবিরোধী। কর্ম হইতে কর্ম, অনুরাগ হইতে অনুরাগেই লইয়া যায়। এইজন্য শংকরাচার্য বলেন—

'অবিরোধিতয়া কর্ম নাবিদ্যাং বিনিবর্তয়েৎ।'

কিন্তু চন্দ্রনাথবাবু যে লয়তত্ত্বের অবতারণা করিয়াছেন, সে লয় প্রাপ্তির পক্ষে কর্মসোপান 'একান্ত আবশ্যক।' তাহার কারণ, চন্দ্রনাথবাবু ব্রহ্মকে মুখে বলেন নির্গুণ, ভাবে বলেন সগুণ; মুখে বলেন লয়, কিন্তু তাহার অর্থ করেন সম্প্রসারণ।

আবার বলেন, লয়তত্ত্ববাদীরা 'যে জগৎকে অসৎ ও মায়া বলিয়াছেন সে কেবল ব্রহ্মের তুলনায়। নহিলে বলো দেখি কেন তাঁহারা এই অসৎটাকে এত ভয় করিয়া গিয়াছেন।' অর্থাৎ চন্দ্রনাথবাবুর মতে জগৎটা প্রকৃতপক্ষে অসৎ নহে। শঙ্করাচার্য বলিয়াছেন, শুক্তিকাকে যেমন রজত বলিয়া ভ্রম হইয়া থাকে। মোহমুদ্‌গরের নিম্নলিখিত শ্লোকটি সকলেরই নিকট সুপরিচিত—

অষ্টকুলাচল সপ্ত সমুদ্রা
ব্রহ্মপুরন্দরদিনকররুদ্রাঃ,
ন ত্বং নাহং নায়ং লোকঃ
তদপি কিমর্থং ক্রিয়তে শোকঃ॥

তাহা ছাড়া, 'তুলনায় মিথ্যা' বলিলে বিশেষ কিছুই বুঝায় না। মিথ্যা মাত্রেই তুলনায় মিথ্যা। মিথ্যার যদি স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকিত, তবে তো সে সত্যই হইত।

অতঃপর সগুণ নির্গুণ লইয়া তর্ক।

লয়তত্ত্ববাদীরা ব্রহ্মকে নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, নিত্য, নির্বিকল্প, নিরঞ্জন, নির্বিকার, নিরাকার, নিত্য, মুক্ত ও নির্মল বলিয়া থাকেন। এইজন্য ব্রহ্মত্ব লাভের জন্য তাঁহারা উপদেশ দিয়া থাকেন— 'ঔদাসীন্যমভীপ্স্যতাং।' অর্থাৎ অনুরাগ ছাড়িয়া ঔদাসীন্য অবলম্বন করিলে ব্রহ্মের অনুরূপ হওয়া যায়।

এদিকে আবার অন্যমতাবলম্বীরা ঈশ্বরকে ভক্তবৎসল বলেন। সে ঈশ্বর উদাসীন নহেন, কারণ তিনি পাপীর প্রতি ভীষণ ও পুণ্যাত্মার প্রতি প্রসন্ন। তিনি দৈত্যকে দলন করেন ও প্রহ্লাদকে রক্ষা করেন। তিনি নানা অবতার রূপ ধারণ করিয়া পৃথিবীকে নানা বিপদ হইতে উদ্ধার করেন। কেবল যদি তিনি চিদানন্দময় হন, কেবল যদি তাঁহার আপনাতেই আপনার আনন্দ হয়, তাঁহার যদি আর কোনো গুণ, আর কোনো স্বরূপ না থাকে এবং তাঁহার নিকট তিনি ছাড়া আর কিছুই স্থান না পায় (যথা— জ্ঞাতৃজ্ঞানজ্ঞেয়ভেদঃ পরাত্মনি ন বিদ্যতে। চিদানন্দৈকরূপত্বাদ্দীপ্যতে স্বয়মেব হি॥), তবে ঈশ্বর রুদ্র, ঈশ্বর দয়াময়, ঈশ্বর সৃষ্টিকর্তা, ঈশ্বর ভক্তবৎসল, এ সমস্ত কথাই মিথ্যা।

কিন্তু চন্দ্রনাথবাবু জগৎকে ঈশ্বরের 'সৃষ্টিকৌশল' 'ভগবানের লীলা' বলিতে কুণ্ঠিত হন না। এবং ব্যাখ্যা করিবার সময় বলেন, যদি ইহা তাঁহার লীলাই না হইবে, যদি তাঁহার সৃষ্টিই না হইবে, যদি নিতান্ত মায়া এবং অসৎ হইবে, তবে ইহাকে পণ্ডিতেরা কেন এত ভয় করিতে বলিয়া গিয়াছেন? আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, ইহা যদি ভগবানের লীলা হয়, সৃষ্টি হয়, তবেই বা ইহাকে ভয় করিতে হইবে কেন; তাঁহার লীলা কি দানবের লীলা? তাঁহার সৃষ্টি কি শয়তানের সৃষ্টি? জগৎ যদি তাঁহার ইচ্ছা হয়, তবে সে ইচ্ছা কি মঙ্গল ইচ্ছা নহে?

অতএব, যদি বল জগৎ তাঁহার ইচ্ছা নহে জগৎ সত্য নহে, তবেই বুঝিতে পারি মিথ্যা জগৎকে অতিক্রম করিবার জন্য সাধনা কর্তব্য, কিন্তু যদি বল জগৎ তাঁহার লীলা অর্থাৎ তাঁহার ইচ্ছা, তবে সে ইচ্ছাকে অবিশ্বাস করিলে তাঁহার প্রতি অবিশ্বাস করা হয়।

যাঁহারা প্রথমোক্ত মতাবলম্বী, তাঁহারা জগৎ হইতে জগৎবাসীদের মন ফিরাইবার জন্য ক্রমাগত বিভীষিকা দেখাইয়া থাকেন। জগতের যে অংশ হীন তাহারই প্রতি তাঁহারা ক্রমাগত দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকেন। এমন-কি, সৌন্দর্যকে কদর্য বীভৎসভাবে আঁকিতেও চেষ্টা করেন। তাঁহারা বলেন, সংসারে প্রেম কপটতামাত্র; যে পর্যন্ত ধনোপার্জনে শক্তি থাকে, পরিজনগণ সেই

পর্যন্তই অনুরাগ দেখায়, জরাজর্জর হইলে কেহ একটি কথাও জিজ্ঞাসা করে না। মানবহৃদয়ে যে অকৃত্রিম মৃত্যুঞ্জয় প্রেম আছে, সে প্রেমের ছবি তাঁহারা গোপন করিয়া যান। তাঁহারা বলেন—

'অয়মবিচারিতচারুতয়া
সংসারো ভাতি রমণীয়ঃ।'

অর্থাৎ, যে-সকল চারুতা দ্বারা সংসারকে রমণীয় বোধ হয়, সে-সকল চারুতা বিচারের চক্ষে তিরোহিত হইয়া যায়।

এই-সকল লয়তত্ত্ববাদীরা জগতের মধ্য দিয়া আত্মসম্প্রসারণ করিতে চাহেন নাই বলিয়াই, জগৎ হইতে জগৎবাসীকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে চাহিয়াছিলেন বলিয়াই, জগতের প্রতি বারংবার এত কলঙ্ক আরোপ করিয়াছেন। মানবের অকৃত্রিম প্রেমের মধ্যে, বিশ্বজগতের চিরনূতন চারুতার মধ্যে জগদীশ্বরের প্রেম এবং ঐশ্বর্য নির্দেশ করা তাঁহাদের তত্ত্বের বিরুদ্ধ। কারণ, তাঁহাদের ঈশ্বর নির্গুণ, তাঁহাদের জগৎ মায়া।

কিন্তু বৈষ্ণবেরা জগতের সৌন্দর্যকে সুন্দর বর্ণে চিত্রিত করিতে ভীত হন নাই এবং তাঁহারা ঈশ্বরপ্রেমকে মানবপ্রেমের সহিত তুলনা করিয়াছেন; তাহার কারণ, তাঁহারা ঈশ্বরকে সুন্দর বলেন, ঈশ্বরকে প্রেমস্বরূপ বলেন। বিশ্বের সমস্ত সৌন্দর্য তাঁহার বংশীধ্বনি, তাঁহার প্রেমসংগীত, আমাদের প্রতি তাঁহার আহ্বান। ভক্ত এবং ঈশ্বর যদি স্বতন্ত্র না থাকেন, তবে এ সৌন্দর্য কিসের সৌন্দর্য, কাহার কাছে সৌন্দর্য! চন্দ্রনাথবাবু যে 'বিশ্বব্যাপী বিশ্বরূপ সৌন্দর্যের' কথা বলিয়াছেন, লয়তত্ত্বে সে সৌন্দর্যের স্থান কোথায়? কারণ, ভেদজ্ঞানমাত্রেই মায়া— ভেদজ্ঞান ব্যতীত সৌন্দর্যের কোনো অস্তিত্বই থাকিতে পারে না, যেহেতু সৌন্দর্য অনুভবসাপেক্ষ। ঈশ্বরকে যতক্ষণ সুন্দর বলিব, ততক্ষণ ভক্তকে তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র স্বীকার করা বৈ আর গতি নাই। এইজন্য চন্দ্রনাথবাবু ব্যতীত কোনো লয়তত্ত্ববাদী ব্রহ্মকে সুন্দর বলেন না। তাঁহারা বলেন—

অনণ্বস্থূলহ্রস্বমদীর্ঘমজমব্যয়ং।
অরূপগুণবর্ণাখ্যং তদ্ ব্রহ্মেত্যবধারয়েৎ।

যাহা হউক, চন্দ্রনাথবাবু যাহাকে 'বিরাট লয়' বলেন, তাহা লয় নহে আত্মসম্প্রসারণ, অর্থাৎ লয়ের ঠিক বিপরীত। তাঁহার মতে নির্গুণ ব্রহ্ম নির্গুণ নহেন, প্রকৃতপক্ষে সগুণ এবং এই জগৎ তাঁহার সৃষ্টি, তাঁহার লীলা। অসৎ জগৎ প্রকৃতপক্ষে অসৎ নহে এবং বহু সাধনার পর চরম জ্ঞান লাভ করিলে একটা বিশ্বব্যাপী বিশ্বরূপ সৌন্দর্য দেখিতে পাওয়া যায়।

এরূপ লয়তত্ত্ব যে আমাদের মতের বিরুদ্ধ নহে, তাহা আমাদের প্রতিবাদ পড়িলেই পাঠকেরা বুঝিতে পারিবেন। কারণ, আত্ম হইতে পর এবং পর হইতে পরমাত্মার প্রতি আত্মার প্রসারণ— এবং জগৎ হইতে জগদীশ্বরের অসীম সৌন্দর্যের উপলব্ধি, বোধ করি, জগতের সমুদায় শ্রেষ্ঠ ধর্মমতেরই লক্ষ্য। ঈশ্বরের প্রতি একান্ত আত্মসমর্পণ করিয়া স্বার্থপরতার বিনাশ সাধন, বোধ করি, খৃস্টানধর্মেরও উপদেশ। ঈশ্বরচরিত্রকে আদর্শ করিয়া আপন ক্ষুদ্রতা পরিহার করা খৃস্টীয় ধর্মশাস্ত্রের একটি প্রধান অনুশাসন এবং সকল উন্নত ধর্মশাস্ত্রেই সেই উপদেশ দেয়।

চন্দ্রনাথবাবু যদি ইহাকে লয়তত্ত্ব নাম দেন তবে তাঁহার ভাষা সম্বন্ধে আমরা আপত্তি করিব, বলিব— লয়কে লয় অর্থে ব্যবহার না করিয়া তাহার বিপরীত অর্থে ব্যবহার করিলে কোনো ফল নাই, বরঞ্চ বিপরীত ফলেরই সম্ভাবনা; অতএব যখন তিনি 'আত্মসম্প্রসারণ'-নামক একটি শব্দ রচনা করিয়াছেন এবং উক্ত শব্দে তাঁহার মনোভাব যথার্থ ব্যক্ত হইতেছে, তখন ওই শব্দটাকেই যথাস্থানে প্রয়োগ করিলে 'সাধনা'র সমালোচক এবং 'সাহিত্যে'র পাঠকগণকে কোনোরূপ বিভ্রাটে ফেলা হইবে না।

সাহিত্য
ভাদ্র ১২৯৯

[সুখ না দুঃখ]

উক্ত প্রবন্ধ সম্বন্ধে বক্তব্য

লেখক মহাশয়ের লেখনী অজ্ঞাতসারে বামের দিকেই কিঞ্চিৎ অধিক হেলিয়াছে— তিনি মনে মনে দুঃখকেই যেন বেশি প্রাধান্য দিয়াছেন। কারণ, সংসারে যদি সুখের পরিমাণ অধিক থাকে তাহা হইলে মীমাংসার তো কোনো গোল থাকে না। জমা অপেক্ষা খরচ অধিক হইলে তহবিল মেলে না— জগতের জমাখরচে যদি দুঃখটাই বেশি হইয়া পড়ে তবে জগৎটার হিসাব-নিকাশ হয় না।

ধর্মব্যবসায়ীরা অন্ধভাবে বলপূর্বক দুঃখের অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে চাহেন। কিন্তু সেরূপ করিয়া কেবল ছেলে-ভুলানো হয় মাত্র। যাঁহারা সংসারের দুঃখতাপ অন্তরে বাহিরে চতুর্দিকে অনুভব করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকটে জগতের দুঃখের অংশ কোনোমতে গোঁজামিলন দিয়া সারিয়া লইবার চেষ্টা করা নিতান্ত মূঢ়ের কাজ। জগতে এমন শত সহস্র দুঃখ আছে যাহার মধ্যে মানববুদ্ধি কোনো মঙ্গল উদ্দেশ্য আবিষ্কার করিতে পারে না। এমন অনেক কষ্ট অনেক দৈন্য আছে যাহার কোনো মহিমা নাই, যাহা জীবের আত্মাকে অভিভূত সংকীর্ণ শ্রীহীন করিয়া দেয়— দুর্বলের প্রতি সবলের, প্রাণের প্রতি জড়ের এমন অনেক অত্যাচার আছে, যাহা অসহায়দিগকে অবনতির অন্ধকূপে নিক্ষেপ করে— আমরা তাহার কোনো কারণ, কোনো উদ্দেশ্য খুঁজিয়া পাই না। মঙ্গল পরিণামের প্রতি যাঁহার অটল বিশ্বাস আছে তিনি এ সম্বন্ধে বিনীতভাবে অজ্ঞতা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হন না এবং জগদীশ্বরের পক্ষাবলম্বন করিয়া মিথ্যা ওকালতি করিতে বসা স্পর্ধা বিবেচনা করেন। অতএব জগতে দুঃখের অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে চাহি না।

কিন্তু অনেক সময়ে একটা জিনিসকে তাহার চতুর্দিক হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া স্বতন্ত্রভাবে দেখিতে গেলে তাহাকে অপরিমিত গুরুতর করিয়া তোলা হয়। দুঃখকে বিশ্লিষ্ট করিয়া একত্র করিলে পর্বতের ন্যায় দুর্ভর ও স্তূপাকার হইয়া উঠে, কিন্তু স্বস্থানে তাহার এত ভার নাই।

সমুদ্র হইতে এক কলস জল তুলিয়া লইলে তাহা বহন করা কত কষ্টসাধ্য, কিন্তু জলের মধ্যে যখন ডুব দেওয়া যায়, তখন মাথার উপর শত সহস্র কলস জল তরঙ্গিত হইতে থাকে, তাহার ভার অতি সামান্য বোধ হয়। জগতে ভার যেমন অপরিমেয়, ভার সামঞ্জস্যও তেমনি অসীম। পরস্পর পরস্পরের ভার লাঘব করিতেছে। চিরজীবন নিত্যবহন করিবার পক্ষে আমাদের শরীর কিছু কম ভারী নহে। স্বতন্ত্র ওজন করিয়া দেখিলে তাহার ভারের পরিমাণ যথেষ্ট দুঃসহ মনে হইতে পারে। কিন্তু এমন একটি সামঞ্জস্য আছে যে, আমরা তাহা অক্লেশে বহন করি। সেইরূপ জগতে দুঃখ অপর্যাপ্ত আছে বটে, কিন্তু তাহা লাঘব করিবারও সহস্র উপায় বর্তমান। আমরা আমাদের কল্পনাশক্তির সাহায্যে দুঃখকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া একটা প্রকাণ্ড বিভীষিকা নির্মাণ করিতে পারি, কিন্তু অনন্ত সংসারের মধ্যে সে অনেকটা লঘুভারে ব্যাপ্ত হইয়া আছে। সেই কারণেই এই দুঃখপারাবারের মধ্যেও সমস্ত জগৎ এমন অনায়াসে সন্তরণ করিতেছে, অমঙ্গল মঙ্গলকে অভিভূত করিতে পারিতেছে না, এবং আনন্দ ও সৌন্দর্য চতুর্দিকে বিকশিত হইয়া উঠিতেছে।

সাধনা
মাঘ ১২৯৯

বেদান্তের বিদেশীয় ব্যাখ্যা

বেদান্তদর্শন সম্বন্ধে জর্মন অধ্যাপক ডাক্তর পৌল্ ডয়সেন্ সাহেবের মত 'সাধনা'র পাঠকদিগের নিমিত্ত নিম্নে সংকলন করিয়া দিলাম।

আধুনিক ভারতবর্ষে অধিকাংশ প্রাচীন দর্শনের কেবল ঐতিহাসিক গৌরব আছে মাত্র। যথার্থ সাংখ্যমতাবলম্বী অল্পই দেখা যায়; ন্যায় শুদ্ধমাত্র ব্যাকরণ এবং অঙ্কশাস্ত্রের মতো বুদ্ধির চর্চা এবং কৌশল প্রকাশে নিযুক্ত হইয়া থাকে। কিন্তু বেদান্ত এখনো প্রত্যেক চিন্তাপরায়ণ হিন্দুর হৃদয় মন জীবন্তভাবে অধিকার করিয়া আছে। যদিচ রামানুজ, মাধব এবং বল্লভ -কর্তৃক বিশিষ্টাদ্বৈত, দ্বৈত এবং শুদ্ধাদ্বৈত নামে বেদান্তদর্শনের ভিন্ন ভিন্ন রূপান্তর প্রচলিত হইয়াছে তথাপি এ কথা বলা যাইতে পারে যে, বৈদান্তিকদের মধ্যে বারো-আনা অংশই শংকরাচার্যের অনুগামী।

অধ্যাপক মহাশয়ের মতে দরিদ্র ভারতবর্ষের বিপুল দুর্ভাগ্যের মধ্যে ইহাই একটি মহৎ সান্ত্বনার কারণ। কারণ অনিত্য বিষয়ের অপেক্ষা নিত্য বিষয়ের গৌরব অধিক; এবং পৃথিবীতে নিত্য সত্য অন্বেষণ-চেষ্টায় মানবের প্রতিভা যত কিছু অমূল্যতম পদার্থ সঞ্চয় করিয়াছে শংকরাচার্যের বেদান্তভাষ্য তাহার অন্যতম; উহা প্লেটো এবং কান্টের রচনার সহিত তুলনীয়।

শংকর উপনিষদকে ধ্রুব প্রমাণস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন। সেইজন্য উপনিষদের নানা বিরুদ্ধ মতের সমন্বয়সাধনপূর্বক তাহা হইতে একটি আদ্যোপান্ত সুসংগত দর্শনশাস্ত্র প্রণয়ন করা সহজ ব্যাপার হয় নাই। উপনিষদের স্থানে স্থানে ব্রহ্মকে নানাপ্রকারে রঞ্জিত করা হইয়াছে আবার তিনি অনির্বচনীয় ও মনের অগম্য বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন— কোথাও বা ব্রহ্ম কীরূপে জগৎ সৃষ্টি করিলেন তাহার দীর্ঘ বিবরণ পাঠ করা যায় আবার কোথাও বা ব্রহ্ম ব্যতীত আর সমস্তই মায়া ইহাও কথিত হইয়াছে। কোথাও বা আত্মার সংসারভ্রমণের বিচিত্র কল্পনা দৃষ্ট হয়, আবার কোথাও বা উক্ত হইয়াছে আত্মা কেবল একমাত্র।

শংকর এই-সকল বিরুদ্ধ বচনের মধ্য হইতে আশ্চর্য নৈপুণ্যসহকারে পথ কাটিয়া বাহির হইয়াছেন। তিনি উপনিষদের সমস্ত উক্তি হইতে দুইটি শাস্ত্র গঠন করিয়াছেন— একটি কেবল নিগূঢ় দার্শনিক, ইংরাজিতে যাহাকে esoteric কহে, শংকর যাহাকে কখনো বা সগুণা বিদ্যা কখনো বা পারমার্থিকা অবস্থা কহিয়াছেন; ইহার মধ্যে সেই তত্ত্বজ্ঞানের কথা আছে যাহা সর্বদেশে এবং সর্বকালেই অতি অল্পসংখ্যক লোকের ধারণাগম্য। দ্বিতীয়টি সাধারণ ধর্মতত্ত্ব, শংকর ইহাকে সগুণা বিদ্যা, ব্যবহারিকী অবস্থা কহিয়াছেন; ইহা সর্বসাধারণের জন্য, যাহারা রূপ চাহে স্বরূপ সত্য চাহে না, পূজা করে ধ্যান করে না।

অধ্যাপক মহাশয় এই দুইটি, এক্সোটেরিক্ এবং এসোটেরিক্— ব্যবহারিক এবং পারমার্থিক বিদ্যাকে চারি প্রধান অংশে ভাগ করিয়া দেখাইতেছেন।

প্রথম।	ব্রহ্মতত্ত্ব	Theology
দ্বিতীয়।	জগত্তত্ত্ব	Cosmology
তৃতীয়।	অধ্যাত্মতত্ত্ব	Psychology
চতুর্থ।	পরকালতত্ত্ব	Eschatology

১। ব্রহ্মতত্ত্ব

উপনিষদে ব্রহ্মের স্বরূপ ব্যাখ্যায় নানা বিরুদ্ধ বর্ণনা দেখা যায়। তিনি সর্বব্যাপী আকাশ, তিনি সূর্যমধ্যস্থ দেবতা, তিনি চক্ষুরন্তর্গত পুরুষ; দ্যুলোক তাঁহার মস্তক, চন্দ্রসূর্য তাঁহার চক্ষু, বায়ু তাঁহার নিশ্বাস, পৃথিবী তাঁহার পাদপীঠ; তিনি জগদাত্মারূপে মহতোমহীয়ান এবং জীবাত্মা-রূপে অণোরণীয়ান্; তিনি বিশেষরূপে ঈশ্বর, মনুষ্যকৃত পাপপুণ্যের দণ্ডপুরস্কারবিধাতা।

শংকর এই-সমস্ত বর্ণনাকে তাঁহার সগুণা বিদ্যার মধ্যে সংগ্রহ করিয়াছেন। জ্ঞানের দ্বারা নহে,

ভক্তির দ্বারা নিত্য-সত্যের নিকটবর্তী হইবার জন্য এই-সকল বিদ্যা উপযোগী, এবং ইহাদের প্রত্যেকের বিশেষ বিশেষ ফল আছে। অধ্যাপক মহাশয় বলিতেছেন যে, লক্ষ করিয়া দেখা আবশ্যক, ব্রহ্মকে ঈশ্বররূপে বর্ণন সেও সগুণা বিদ্যার অন্তর্গত, সেও সাধারণের জন্য, তাহাতে পরমাত্মার যথার্থ তত্ত্ব প্রকাশ পায় না; বস্তুত যখন বিবেচনা করিয়া দেখা যায় গুণ (personality) বলিতে কী বুঝায়, তাহার সীমা কতই সংকীর্ণ, তাহা অহংকারের সহিত কত নিকটসম্বন্ধবিশিষ্ট, তখন ব্রহ্মের প্রতি গুণের আরোপ করিয়া তাঁহাকে খর্ব করিতে কে ইচ্ছা করিবে?

এই সগুণা বিদ্যার সহিত পরমাত্মার নির্গুণা বিদ্যার সম্পূর্ণ প্রভেদ। ব্রহ্ম মনুষ্যের বাক্যমনের অতীত ইহাই তাহার মূল সূত্র।

যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।

পুনশ্চ—

অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাম্।

পুনশ্চ, বৃহদারণ্যকউপনিষদ -ধৃত— নেতি নেতি। অর্থাৎ ব্রহ্মকে জানিতে যত প্রকার চেষ্টা কর এবং তাঁহাকে বর্ণনা করিতে যে-কোনো বাক্য প্রয়োগ কর, তাহার উত্তর, ইহা নহে, ইহা নহে। সেইজন্য রাজা বাষ্কলি যখন বাহ্ব ঋষিকে ব্রহ্মের স্বরূপ জিজ্ঞাসা করিলেন তিনি কেবল মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। রাজা পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন করিলে তিনি কহিলেন, আমি বলিলাম, কিন্তু তুমি বুঝিলে না— শান্তোহয়মাত্মা, পরমাত্মা শান্ত। আমরাও এক্ষণে কান্টের শিক্ষামতো জানিয়াছি যে, আমাদের মনের প্রকৃতিই এমন যে কিছুতেই আমরা দেশকাল ও কার্যকারণ সম্বন্ধের অতীত সত্তাকে জানিতে পারি না। অথচ তিনি আমাদের অপ্রাপ্য নহেন তিনি আমাদের হইতে দূরে নাই, কারণ তিনি সম্পূর্ণরূপে সমগ্রত আমাদের আত্মারূপেই রহিয়াছেন। এবং আমরা যখন বহির্দেশ হইতে, এই প্রতীয়মান জগৎসংসার হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া অন্তরের গভীরতম গুহার মধ্যে প্রবেশ করি সেখানে ব্রহ্মে আসিয়া উপনীত হই— জ্ঞানের দ্বারা নহে অনুভবের দ্বারা, আপনার মধ্যে আপনার সংহরণের দ্বারা।[১] জ্ঞানে এবং অনুভবে প্রভেদ এই যে, জ্ঞানে জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয় উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ থাকে পরন্তু অনুভবে উভয়ে সম্মিলিত হইয়া যায়। অনুভবের দ্বারা আমি ব্রহ্ম এই ধারণা লাভ করার অবস্থাকে শংকর 'সম্রাধন' কহিয়াছেন।

২। জগত্তত্ত্ব

জগত্তত্ত্বেরও দুই বিভাগ আছে, ব্যবহারিক এবং পারমার্থিক। ব্যবহারিক বিদ্যায় জগৎকে সত্য বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে এবং ব্রহ্ম-কর্তৃক তাহার সৃষ্টিকাহিনী বিচিত্র কল্পনা-সহকারে বর্ণিত হইয়াছে।

কিন্তু অনন্তকাল অনর্থক যাপন করিয়া সহসা কালের একটি বিশেষ অংশে অবস্তু কারণের দ্বারা বস্তু-জগতের সৃষ্টি কেবল যে যুক্তি এবং বিজ্ঞানের বিরোধী তাহা নহে তাহা বেদান্তের একটি প্রধান মতের বিপরীত, যে মতে আমাদিগকে 'সংসারস্য অনাদিত্বম্' জন্ম-মৃত্যুর অনাদি স্বভাব শিক্ষা দিয়া থাকে। শংকরাচার্য সুন্দর কৌশলে এই বিরোধ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছেন। তিনি বলেন, সৃষ্টি কেবল একবার হয় নাই, অনন্তকাল যাবৎ ব্রহ্মের দ্বারা সৃষ্টি হইতেছে এবং লয় পাইতেছে। কোনো সৃষ্টিকেই আমরা আদি সৃষ্টি বলিতে পারি না। কারণ, তাহা হইলে প্রশ্ন উঠিবে ব্রহ্ম কেন সৃষ্টি করিলেন? তাঁহার নিজের গৌরব প্রচারের জন্য? এরূপ অহংকার

---

[১] এইখানে বলিয়া রাখা আবশ্যক, ইংরাজি knowledge শব্দ জ্ঞান অর্থে এখানে অনুবাদ করিলাম।—অনুবাদক

তাঁহাতে আরোপ করা সংগত নহে। তাঁহার নিজের খেলার জন্য? কিন্তু অনন্তকাল তো তিনি এই খেলনকব্যতীত যাপন করিয়াছেন। জীবনের প্রতি প্রীতি প্রযুক্ত? কিন্তু জীবসৃষ্টির পূর্বে তাহার প্রতি প্রীতি কীরূপে সম্ভব হইবে, এবং অসংখ্য জীবকে সৃষ্টি করিয়া অনন্ত দুঃখে নিমগ্ন করার মধ্যে প্রীতির লক্ষণ কি দেখা যায়?— ব্যবহারিক বেদান্ত পুনঃপুনঃ-জগৎসৃষ্টির একটি ধর্মনিয়মগত আবশ্যকতা (moral necessity) দেখাইয়া এই-সকল প্রশ্নের সদুত্তর দিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

শংকর কহেন— মনুষ্য উদ্ভিদের ন্যায়। অল্পে অল্পে বর্ধিত হইয়া অবশেষে মৃত্যু প্রাপ্ত হয়। কিন্তু সম্পূর্ণ মরে না। শস্যের চারা যেমন মরিবার পূর্বে বীজ রাখিয়া যায় এবং সেই বীজ আপন গুণানুসারে নূতন চারা উৎপন্ন করে, তেমনি মনুষ্য মৃত্যুকালে আপন কর্ম রাখিয়া যায়, সেই কর্ম পরজন্মে অঙ্কুরিত হইয়া দণ্ডপুরস্কার বহন করে। কোনো জন্ম প্রথম নহে কারণ তাহা পূর্ববর্তী কর্মের ফল, এবং শেষ নহে কারণ তাহার কর্ম পরবর্তী জন্মে ফলিত হইবে। অতএব সংসার অনাদি অনন্ত এবং প্রলয়ের পরে জগতের পুনঃসৃজন ধর্মনিয়মানুসারে আবশ্যক।

অধ্যাপক মহাশয় বলেন, শাস্ত্রোল্লিখিত এই সংসার যদিচ পূর্ণ সত্য নহে, কিন্তু তাহা সত্যের কাল্পনিক ছবি। কারণ, সত্যকে স্বরূপভাবে আমরা বুদ্ধি দ্বারা গ্রহণ করিতে পারি না। এই পুনঃপুনঃ-জন্মমৃত্যুবাদকে কাল্পনিক কেন বলিতেছেন? না, যাহা যথার্থত দেশকালের অতীত সুতরাং আমাদের বুদ্ধির অগম্য তাহাকে দেশকালের ছাঁচে ঢালিয়া দেখানো হইতেছে। নির্গুণ বিদ্যা হইতে সগুণ বিদ্যা যত দূরে, সত্য হইতে এই সংসার তত দূরে। অর্থাৎ ইহার মধ্যে অনন্ত সত্য আছে বটে কিন্তু তাহা সত্যের রূপকমাত্র, যেহেতু রূপক ব্যতীত মনুষ্যবুদ্ধিতে সত্যের ধারণা হইতেই পারে না। ব্যবহারিক বেদান্ত এই রূপক লইয়া এবং পারমার্থিক বেদান্ত রূপগুণাতীত বিশুদ্ধ সত্যের সন্ধানে নিযুক্ত।

পারমার্থিক বিদ্যা কহিতেছেন, যাহাকে আমরা জগৎ বলি তাহা মৃগতৃষ্ণিকাবৎ মায়ামাত্র, নিকটে আসিলেই তাহা বিলয় প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মব্যতীত আর কিছুই নাই। জগৎ যে মায়ামাত্র তাহা তর্কের দ্বারা নহে অনুভবের দ্বারা জানা যায়। নিজের আত্মগুহায় প্রবেশ করিয়া যখন দেশকালাতীত নির্বিকার শুদ্ধসত্যের অনুভব হয় তখন তদ্‌ব্যতীত আর সমস্তই স্বপ্নরূপে উপলব্ধি হইয়া থাকে।

ভারতবর্ষীয় মনস্বীগণ এই পথে গিয়াছিলেন এবং গ্রীসীয় তত্ত্বজ্ঞানী প্লেটো, তিনিও এই সত্যে আসিয়া উপনীত হইয়াছিলেন, তিনিও বলিয়া গিয়াছেন, জগৎ ছায়ামাত্র এবং সত্য ইহার অন্তরালে অবস্থিতি করিতেছে। প্লেটো এবং বৈদান্তিক উভয়ের মতের আশ্চর্য ঐক্য আছে কিন্তু উভয়েই কেবল আত্মপ্রত্যয়দ্বারা এক সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছেন আপন মত কেহ প্রমাণ করিতে পারেন নাই। এইস্থানে জর্মন পণ্ডিত কান্ট আসিয়া গ্রীক এবং ভারতবর্ষীয় দর্শনের অভাব পূরণ করিয়া গিয়াছেন। কান্ট বৈদান্তিক ও প্লাটোনিক আত্মপ্রত্যয়ের পথ ছাড়িয়া বিশুদ্ধ যুক্তি ও বৈজ্ঞানিক প্রমাণ দ্বারা আপন মত প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। মানবমনকে বিশ্লেষণ করিতে গিয়া কান্ট দেখাইয়াছেন যে, বাহ্য জগতের তিন মূল পদার্থ দেশ, কাল এবং কার্যকারণসম্বন্ধ প্রকৃতপক্ষে বাহ্যসত্তার অনাদি অনন্ত ভিত্তিভূমি নহে, তাহা আমাদেরই বুদ্ধিবৃত্তির ছাঁচ মাত্র। তাহা বাহিরে নাই আমাদের মনে আছে ইহা কান্ট এবং তাঁহার প্রধান শিষ্য শোপেনহৌয়ার পরিষ্কাররূপে প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন। অতএব আমরা এই যে জগৎকে দেশে ব্যাপ্ত, কালে প্রবাহিত এবং কার্যকারণ-সম্বন্ধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত দেখিতেছি তাঁহাদের মতে ইহা কেবল আমার মনের কার্য মাত্র। শংকর কহেন, জগৎ মায়া; প্লেটো কহেন জগৎ ছায়া; কান্ট কহেন, জগৎ আমাদের মনের প্রতীতি মাত্র সত্য পদার্থ নহে। পৃথিবীর তিন বিভিন্ন প্রদেশে এই এক মত দেখা দিয়াছে কিন্তু ইহার বৈজ্ঞানিক প্রমাণ কেবল কান্ট-দর্শনের মধ্যেই আছে।

৩। অধ্যাত্মতত্ত্ব

সকলই মায়া, কেবল আমার আত্মা মায়া হইতে পারে না। শংকরাচার্য দেখাইয়াছেন আপনাকে অস্বীকার করিতে গেলেও স্বীকার না করিয়া থাকিবার জো নাই। এক্ষণে প্রশ্ন এই, জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার সম্বন্ধ কী। তাঁহার পরবর্তী রামানুজ, মাধ্ব এবং বল্লভের মত শংকর পূর্বে হইতেই খণ্ডন করিয়া গিয়াছেন। জীব ব্রহ্মের অংশ হইতে পারে না কারণ ব্রহ্ম অংশরহিত (অংশ বলিতে হয় কালের পর্যায়, নয় দেশের সংস্থান বুঝায়)। জীবাত্মা ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র হইতে পারে না, কারণ আমরা অনুভবের দ্বারা উপলব্ধি করিয়া থাকি ব্রহ্ম একমেবাদ্বিতীয়ম্। জীব ব্রহ্মের বিকার হইতে পারে না। কারণ, ব্রহ্ম নির্বিকার (কান্টের দ্বারাও প্রমাণিত হইয়াছে যে, ব্রহ্ম কার্যকারণসম্বন্ধের অতীত)। সিদ্ধান্ত এই যে, জীব ব্রহ্মের অংশও নহে, ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্রও নহে, ব্রহ্মের বিকারও নহে— পরন্তু সম্পূর্ণতা স্বয়ং পরমাত্মা। এই সিদ্ধান্তে বেদান্তবাদী শংকর, প্লেটো-দর্শনবাদী প্লোটিনোস্ এবং কান্ট-দর্শনবাদী শোপেনহৌয়ার ঐক্য লাভ করিয়াছেন। শংকর অপর দুই দার্শনিক হইতে অধিক দূর অগ্রসর হইয়াছেন। তিনি কহেন আমার আত্মাই যদি স্বয়ং ব্রহ্ম হইল তবে সুতরাং সর্বব্যাপকতা, নিত্যতা এবং সর্বশক্তিমত্তাও আমার আছে। (অর্থাৎ, আমি দেশকাল এবং কার্যকারণবন্ধনের অতীত।) শংকর কহেন, যেমন, কাষ্ঠের মধ্যে অগ্নি গোপন থাকে তেমনি এ-সকল শক্তিও আমার মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকে, মুক্তির পরে তাহার প্রকাশ হয়।

কেনই বা প্রচ্ছন্ন থাকে?

শংকর কহেন উপাধি-সকল তাহার কারণ।

উপাধি কী কী? না, মন এবং ইন্দ্রিয়, প্রাণ এবং তাহার পঞ্চ শাখা, এবং সূক্ষ্ম শরীর। ইহারাই জন্মে জন্মে আত্মাকে আবৃত করিয়া থাকে।

উপাধিত্রয় কোথা হইতে আসিল? মায়া হইতে। আবার মায়ার উৎপত্তি অবিদ্যা হইতে। কিন্তু এই যে আমাদের অজ্ঞান, পাপ এবং দুঃখের মূল কারণ অবিদ্যা, ইহার কারণ কী? ভারতবর্ষ এবং গ্রীস ইহার সদুত্তর দেন নাই। কান্ট কহিতেছেন, তুমি অবিদ্যার কারণ জিজ্ঞাসা করিতেছ? অবিদ্যার কারণ থাকিতেই পারে না। যেহেতু এই সংসারের মধ্যেই কার্যকারণসূত্রের অবসান— সংসারের বাহিরে কার্যকারণের শাসন নাই— অতএব অবিদ্যার কারণ অনুসন্ধান বৃথা। এইটুকু জানিলেই যথেষ্ট যে, এই দুঃখ পাপ অজ্ঞান হইতে আমাদের মুক্তিপথ আছে।[১]

৪। পরকালতত্ত্ব

এক্ষণে, সংসার হইতে যে মুক্তির পথ আছে তৎসম্বন্ধে সংক্ষেপে বলা যাউক।

বেদের প্রাচীন শ্লোকে প্রথমে স্বর্গ এবং পরে নরকের কথা আছে কিন্তু সংসারবাদ অর্থাৎ পুনর্জন্মবাদ কোথাও দেখা যায় না।

বেদান্তে স্বর্গনরক ভোগ এবং পুনর্জন্ম উভয় মতই মিশ্রিত হইয়াছে। বেদান্তের মতে পুণ্যকারীগণ পিতৃযান প্রাপ্ত হইয়া ক্রমশ চন্দ্রলোকে গমন করেন সেখানে আপন সৎকর্মের ফল নিঃশেষ করিয়া পুনশ্চ মর্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করেন। যাঁহারা সগুণ ব্রহ্মের উপাসক তাঁহারা দেবযান মার্গ প্রাপ্ত হইয়া উত্তরোত্তর ব্রহ্মলোকে গমন করেন, পৃথিবীতে তেষাং ন পুনরাবৃত্তিঃ, তাঁহাদের আর পুনরাবৃত্তি নাই। কিন্তু তাঁহারা যে-ব্রহ্মাকে প্রাপ্ত হন তিনি সগুণ ব্রহ্ম এবং এই সগুণ ব্রহ্মের উপাসকেরা যদিচ পুনর্জন্ম গ্রহণ করেন না তথাপি তাঁহাদিগকে সম্যক্‌দর্শন অর্থাৎ নির্গুণ ব্রহ্মের পূর্ণজ্ঞান লাভের দ্বারা মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য প্রতীক্ষা করিতে হয়। এতদ্ব্যতীত পাপকারীদের জন্য নরক যন্ত্রণা এবং তদবসানে বারংবার নীচজন্মভোগ বর্ণিত হইয়াছে।

---

১. শংকরাচার্য কহিতেছেন— অজ্ঞানং কেন ভবতীতিচেৎ? ন কেনাপি ভবতীতি। অজ্ঞানমনাদ্যনির্বচনীয়ং। অজ্ঞান কাহা হইতে হয়? কাহা হইতেও হয় না। অজ্ঞান অনাদি অনির্বচনীয়। —অনুবাদক

কিন্তু এই জগৎ এবং সংসার কেবল তাহাদেরই পক্ষে সত্য যাহারা অবিদ্যা দ্বারা আচ্ছন্ন। যাহারা অবিদ্যাকে অতিক্রম করিয়াছে তাহাদের পক্ষে নহে।

পারমার্থিক বেদান্তমতে এই জগৎ এবং সংসার কিছুই সত্য নহে, সত্য কেবল ব্রহ্ম যিনি আমাদের আত্মারূপে উপলব্ধ হন। 'আমিই ব্রহ্ম' এই জ্ঞানের দ্বারায় যে মোক্ষ লাভ হয় তাহা নহে, এই জ্ঞানই মোক্ষ।

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব সংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্দৃষ্টে পরাবরে।

যখন শ্রেষ্ঠ এবং নিকৃষ্ট সর্বত্রই তাঁহাকে দেখা যায় তখন হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হয়, সর্বসংশয় দূর হয় এবং সকল কর্মের ক্ষয় হইয়া থাকে।

নিঃসন্দেহ কোনো লোক কর্ম ব্যতীত প্রাণ.ধারণ করিতে পারে না, জীবন্মুক্তও নহে। কিন্তু তিনি জানেন যে, সকল কর্মই মায়াময় এইজন্য কর্মে তাঁহার আসক্তি থাকে না এবং সেই আসক্তিহীন কর্ম মৃত্যুর পরে পুনর্জন্মের কারণ হইতে পারে না।

অধ্যাপক মহাশয় বলেন, লোকে বেদান্তকে ধর্মনীতিঅংশে অঙ্গহীন বলিয়া দোষ দিয়া থাকে। বাস্তবিকও ভারতবর্ষীয় প্রকৃতি কর্ম অপেক্ষা ধ্যানের প্রতি অধিকতর পক্ষপাতী। কিন্তু তথাপি তাঁহার মতে উচ্চতম এবং বিশুদ্ধতম ধর্মনীতিজ্ঞান বেদান্ত হইতে প্রসূত হইয়া থাকে। প্রতিবেশীকে আপনার মতো ভালোবাসা বাইবেলের মতে সর্বোচ্চ ধর্মনীতি— এবং কথাটিও সত্য বটে। কিন্তু যখন আমি সমস্ত সুখ-দুঃখ নিজের মধ্যেই অনুভব করি প্রতিবেশীর মধ্যে করি না তখন প্রতিবেশীকে কেনই বা নিজের মতো ভালোবাসিব? বাইবেলে ইহার কোনো উত্তর নাই, কিন্তু বেদের একটি কথায় ইহার উত্তর আছে— তত্ত্বমসি— তুমিও সে। বেদ বলেন তুমি ভ্রমক্রমে আপনাকে প্রতিবেশী হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া জান, কিন্তু তোমরা এক। ভগবদ্‌গীতা বলিতেছেন— যিনি আপনার মধ্যে সকলকে দেখেন তিনি ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং, আপনার দ্বারা আপনাকে হিংসা করেন না। ইহাই সমস্ত ধর্মনীতির সার কথা এবং ইহাই ব্রহ্মজ্ঞানীর প্রতিষ্ঠাস্থল। তিনি আপনাকেই সর্ব বলিয়া জানেন এইজন্য কিছু প্রার্থনা করেন না; তিনি আপনাতেই সমস্ত উপলব্ধি করেন এইজন্য কাহারও ক্ষতি করেন না, তিনি মায়া দ্বারা পরিবৃত হইয়া জগতে বাস করেন অথচ মুগ্ধ হন না। অবশেষে যখন মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন তাঁহার পক্ষে আর সংসার থাকে না; ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি। তিনি ব্রহ্ম এব সন্ ব্রহ্ম অপ্যেতি। তিনি নদীর ন্যায় ব্রহ্মসমুদ্রে প্রবেশ করেন।

যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্র
অস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়,
তথা বিদ্বান্ নামরূপাদ্বিমুক্তঃ
পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্।

এই যে মিলন ইহা অনন্ত সমুদ্রে জলবিন্দুর মিলনের ন্যায় নহে; এ যেন অনন্ত সমুদ্র তুষারবন্ধন মোচন করিয়া আপন সেই সর্বব্যাপী নিত্য এবং সর্বক্ষমস্বরূপে প্রত্যাগমন করিল, যথার্থত যে স্বরূপ তাহার চিরকাল আছে এবং কোনো কালেই দূর হয় নাই।

অনুবাদকের প্রশ্ন

অধ্যাপক ডয়সেন্ বেদান্তমতের যে সুন্দর বিশদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা উপরে প্রকাশিত হইল।

আমরা অনেক সময় এক রহস্যের হস্ত হইতে উদ্ধার পাইবার উদ্দেশ্যে অন্য রহস্যের হস্তে আত্মসমর্পণ করি।

ডয়সেন্ সাহেব বেদান্তমত অবলম্বন করিয়া দেখাইয়াছেন যে, নির্বিকার ব্রহ্ম-কর্তৃক সৃষ্টি এবং অনন্তস্বরূপ ব্রহ্মে ও জীবে বিভাগ কল্পনা করা মানব যুক্তির বিরোধী। সে কথা অস্বীকার

করা যায় না। কিন্তু সেই রহস্য ভেদ করিতে চেষ্টা করিয়া যখন বেদান্ত বলেন যে, জগৎ নাই এবং ব্রহ্মে এবং জীবে যে প্রভেদ প্রতীয়মান হয় তাহা ভ্রম মাত্র তখন মানবের মনে যে সহজ দুই-একটি প্রশ্ন উদয় হয়, তাহার পরিষ্কার উত্তর পাওয়া যায় না।

প্রশ্ন। ভ্রম কাহার?

উত্তর। জীবের।

ইহাকে মীমাংসা বলে না। কারণ, জীবের ভ্রমে জীব হইতে পারে না।

শংকর কহেন, স্থূল সূক্ষ্ম এবং কারণ শরীর নামক উপাধিত্রয়ের দ্বারা আবৃত হওয়াতেই আত্মাকে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন জ্ঞান হয়। কিন্তু এই শরীর পরিগ্রহ কোথা হইতে হইল? শরীরপরিগ্রহঃ কেন ভবতি?

শংকরাচার্যই এই প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া তাহার উত্তর দিতেছেন।

কর্মণা। কর্ম দ্বারা শরীর পরিগ্রহ হয়।

কর্ম বা কেন ভবতীতি চেৎ? কর্মই বা কিসের দ্বারা হয়?

রাগাদিভ্যঃ। রাগ প্রভৃতি হইতে।

রাগাদিঃ কেন ভবতীতি চেৎ? রাগাদি কী করিয়া হয়?

অভিমানাৎ। অভিমান হইতে।

অভিমানঃ কেন ভবতীতি চেৎ? অভিমান কী জন্য হয়?

অবিবেকাৎ। অবিবেক হইতে।

অবিবেকঃ কেন ভবতীতি চেৎ? অবিবেক কী নিমিত্ত হয়?

অজ্ঞানাৎ। অজ্ঞান হইতে।

অজ্ঞানং কেন ভবতীতি চেৎ? অজ্ঞান কাহার দ্বারা হয়?

ন কেনাপি ভবতীতি। অজ্ঞানমনাদ্যনির্বচনীয়ম্। কাহার দ্বারাই হয় না। অজ্ঞান অনাদি অনির্বচনীয়।

এক্ষণে দেখা যাইতেছে উপাধিপরিগ্রহ দ্বারা জীবব্রহ্মে ভেদ জ্ঞান হইবার পূর্বকারণ অজ্ঞান, অবিদ্যা।

অজ্ঞান বলিতে আমরা যাহা বুঝি তাহার স্বাধীন সত্তা মনে করিতে পারি না; তাহা কাহাকেও অবলম্বন করিয়া আছে। সে অজ্ঞান যদি ব্রহ্মের হয় তবে ব্রহ্মকে নিরঞ্জন নির্বিকার বলা যায় না। যদি তাহার পৃথক্ অনাদি অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয় তবে ব্রহ্ম এবং অজ্ঞান এই দুই অস্তিত্ব মানিতে হয়। তবে ওটা কেবল একটা কথার কথা হইয়া দাঁড়ায়। অর্থাৎ ব্রহ্ম এবং অব্রহ্মের পৃথক অস্তিত্ব ভিন্ন নামে স্বীকার করা হয়। ব্রহ্মও অনাদি অনির্বচনীয় এবং অজ্ঞানও অনাদি অনির্বচনীয়, অথচ ব্রহ্মই অজ্ঞান নহেন এবং অজ্ঞান ব্রহ্মে নাই। ইহা স্বীকার করা যদি সহজ হয় তবে জীব এবং ব্রহ্ম, জগৎ এবং ঈশ্বর, বিভিন্নরূপে স্বীকার করাও সহজ।

বেদান্তশাস্ত্রে জগৎভ্রমের যতগুলি উপমা দেওয়া হইয়াছে সমস্তই দ্বৈতমূলক। শুক্তিতে মুক্তাভ্রম। এ ভ্রম ঘটিতে অন্যূন তিনটি পদার্থের আবশ্যক হয়— শুক্তি এবং মুক্তা এবং ভ্রান্ত ব্যক্তি। মৃগতৃষ্ণিকাও এইরূপ। যাহাকে ভ্রম করা যায়, যাহা বলিয়া ভ্রম করা যায় এবং যে ভ্রম করে এই তিন ব্যতীত ভ্রম কীরূপে সম্ভব হইতে পারে তাহা আমরা কিছুতেই কল্পনা করিতে পারি না।

ডয়সেন্ সাহেব তাঁহার প্রবন্ধের শেষে যে তুলনা প্রয়োগ করিয়াছেন সেই তুলনার দ্বারাই কথাটার আত্মবিরোধ প্রকাশ পায়। মূলের ভাষা উদ্‌ধৃত করা উচিত।

It is not the falling of the drop into the infinite ocean, it is the whole ocean, becoming free from the fetters of ice, returning from its frozen state to that what it is really and has never ceased to be, to its own all-pervading, eternal, almighty nature.

বস্তুত ইহার অর্থ এই যে, নদী সমুদ্রে পড়িতেছে এ কথা বলা যায় না, কারণ, তাহা হইলে ভেদ স্বীকার করা হয়; কঠিন সমুদ্র গলিয়া স্বাভাবিক স্বরূপ প্রাপ্ত হইল তাহাও বলা যায় না, কারণ তাহা হইলে স্বরূপের বিক্রিয়া স্বীকার করা হয়— বলিতে হয় সমুদ্র যাহা আছে যাহা ছিল তাহাই রহিল। কিন্তু ইহাতেও অর্থ পাওয়া যায় না, কারণ পূর্বে বলা হইতেছিল জীবন্মুক্ত যখন মৃত্যুপ্রাপ্ত হন তখন তাঁহার কী দশা হয়— তিনি নদীর মতো সমুদ্রে পড়েন অথবা কঠিনাবস্থাপ্রাপ্ত সমুদ্রের ন্যায় গ্রীষ্মোত্তাপে গলিয়া স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হন? তাহা হইলে দাঁড়ায় এই যে, যে জীবের মৃত্যুর কথা হইতেছিল সে জীব ছিল না এবং তাঁহার মৃত্যুও হয় নাই। তবে, সে জীব ছিল এ কথা উঠে কোথা হইতে? ভ্রম হইতে। কাহার ভ্রম? যদি ব্রহ্মের ভ্রম হয় তবে তো যথার্থই তাঁহার বিকার উপস্থিত হইয়াছিল। উত্তর, ভ্রম বটে কিন্তু কাহারও ভ্রম নহে! সে স্বতই ভ্রম, সে অনাদি অনির্বচনীয়!

স্বীকার করিতে হয় যে, যদি দ্বৈতবাদ অবলম্বন করা যায় তাহা হইলেও মূলরহস্যের আবর্তমধ্যে বুদ্ধিতরণী হইয়া গেলেই এইরূপ গোলকধাঁধার মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়। কিন্তু যখন কোনো অদ্বৈতবাদী দ্বৈতবাদকে যুক্তির বিরোধী বলিয়া নিজ মত সমর্থন করিতে থাকেন, তখন তাঁহাকেও কৈফিয়তের দায়িক না করিয়া থাকা যায় না। বোধ করি, অধ্যাত্মরাজ্যের মূল প্রদেশে দ্বৈত এবং অদ্বৈতের কোনো এক আশ্চর্য সমন্বয় আছে যাহা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির নিকট রহস্যাচ্ছন্ন। সেখানে বোধ করি অঙ্ক এবং যুক্তিশাস্ত্রের সমস্ত নিয়ম অতিক্রম করিয়া এককে দুই বলা যায় এবং দুইকে এক বলিলেও অর্থের বিরোধ হয় না।

বেদান্তের ধর্মনীতিবিষয়ে ডয়সেন্ সাহেব যে কথা কয়েকটি বলিয়াছেন তাহার সম্বন্ধেও আমাদের প্রশ্ন আছে।

ডয়সেন্ কহেন, পুনঃপুনঃ জন্মমরণ ও জগৎসৃষ্টির একটি moral necessity অর্থাৎ ধর্মনিয়মগত আবশ্যকতা আছে। অর্থাৎ পুণ্যের পুরস্কার ও পাপের দণ্ড বহনের জন্য জন্মলাভ অনন্তধর্মনিয়মের অবশ্যম্ভব বিধান। কর্মফল ফলিতেই হইবে।

কিন্তু অদ্বৈতবাদে ধর্মনিয়মের অবশ্যম্ভবতার কোনো অর্থ নাই। যেখানে এক ছাড়া দুই নাই সেখানে 'মরল্' বলিয়া কিছু থাকিতেই পারে না।

শংকরাচার্যের আত্মানাত্মবিবেক গ্রন্থ হইতে উদ্‌ধৃত করিয়া পূর্বেই দেখানো হইয়াছে যে, কর্ম অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন এবং অজ্ঞান অনাদি। অজ্ঞান নামক এক অনির্বচনীয় পদার্থ হইতে কর্ম নামক এক অনির্বচনীয় পদার্থ উৎপন্ন হইয়া আমাদের শরীর গ্রহণের কারণ হইয়াছে এবং সেই অনির্বচনীয় পদার্থের ফলস্বরূপে আমরা শরীরধারীগণ পুনঃপুনঃ জন্ম ও দুঃখ ভোগ করিতেছি ইহাকে যে-কোনো নিয়ম বলা যাক ধর্মনিয়ম বলিবার কোনো হেতু দেখি না। প্রথমত, অজ্ঞান বলিতে কী বুঝায় আমরা জানি না এবং জানিতেও পারি না, কারণ তাহা অনির্বচনীয়। (তবে যে কেন তাহাকে অজ্ঞান নাম দেওয়া হইল বলা কঠিন; কারণ, উক্ত শব্দে একটা নির্বচন প্রকাশ পায়।) দ্বিতীয়ত, তাহা হইতে কর্ম হইল বলিতে যে কী বুঝায় আমাদের বলা অসাধ্য, কারণ আমরা কর্ম বলিতে যাহা বুঝি তাহার স্বাধীন সত্তা নাই। অবশেষে আরও কতকগুলি নিরালম্ব গুণপরম্পরা হইতে শরীরী জীবের জন্ম হইল। এ-সকল কথা বলাও যা আর শরীরের প্রথম সৃষ্টি কী করিয়া হইল তাহা বলিতে পারি না এবং যদি কেহ বলিতে পারিত তথাপি আমরা বুঝিতে পারিতাম না এ কথা বলাও তা— বরঞ্চ শেষোক্ত কথাটা অপেক্ষাকৃত সংক্ষেপ ও সরল।

পূর্বোক্ত যুক্তি অনুসারে বেদান্ত যেমন আমাদের শরীর পরিগ্রহের কোনো জ্ঞানগম্য কারণ দেখাইতেছেন না, তেমনি আমাদের দুঃখভোগেরও কোনো কারণ নির্ণয় করিতেছেন না। যেহেতু, কর্ম নামক কোনো অনির্বচনীয় পদার্থকে আমাদের দুঃখভোগের কারণ বলাও যা, আর আমাদের দুঃখভোগের কারণ জানি না বলাও তা।

বেদব্যাস-রচিত ব্রহ্মসূত্র গ্রন্থে এ তর্ক উত্থাপিত হইয়াছে।

বেদব্যাস বলিতেছেন, ন কর্ম্মাবিভাগাদিতি চেন্ন অনাদিত্বাৎ। অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্বে কর্মের বিভাগ ছিল না এ কথা বলা যায় না যেহেতু কর্ম এবং সৃষ্টি কার্যকারণরূপে অনাদি। যেমন বীজ ও বৃক্ষ। বীজও বৃক্ষের কারণ এবং বৃক্ষও বীজের কারণ এইভাবে কোনো কালেও কাহারও আদি পাওয়া যায় না।

ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে, কর্মের ফল সৃষ্টি এবং সৃষ্টির ফল কর্ম ইহার আর শেষ নাই। বোধ করি এ স্থলে কর্ম বলিতে যাহা বুঝায় ইংরাজি ফোর্স্ বলিতেও তাহা বুঝায়— অর্থাৎ এমন একটা কিছু বুঝায় যাহা আমরা ঠিক বুঝি না অথচ বুদ্ধিগম্য একটা ছবির আভাস আমাদের মনে আসে, কিন্তু সেটা মিলাইয়া দেখিতে গেলে মিলাইতে পারি না।

তথাপি যেমন করিয়াই দেখি এবং বেদান্তশাস্ত্রে যেমন ব্যাখ্যাই পাওয়া যায় শেষকালে দাঁড়ায় এই যে, আমরা কেন হইয়াছি এ প্রশ্নের কোনো অর্থ নাই। আমরা হইয়াছি— আমাদের হওয়াটা অনাদি। এবং হওয়াটিই দুঃখভোগের কারণ— সুতরাং কেন দুঃখভোগ করিতেছি তাহারও কোনো কেনত্ব নাই। অতএব এ স্থলে 'মরল্' অথবা অন্য কোনো 'নেসেসিটি' দেখা যায় না।

মুক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, যখন অজ্ঞান অনাদি তখন সে অনন্ত। যতক্ষণ সে আছে ততক্ষণ কাহারও মুক্তি কল্পনা করা যায় না। কারণ, বেদান্ত মতে আমি সকলের অন্তর্গত এবং আমার অন্তর্গত সকলই, যতক্ষণ অজ্ঞান কোথাও আছে ততক্ষণ সে অজ্ঞান আমাকে বদ্ধ করিতেছে। এ যেন আপনার ছায়াকে আপনি লঙ্ঘন করিবার চেষ্টা করার মতো।

কেন ব্রহ্ম জগতের সৃষ্টি করিলেন তদুত্তরে ব্রহ্মসূত্র কহেন, লোকবত্তু লীলাকৈবল্যং। লোকেতে যেমন বালকেরা রাজা প্রভৃতি নানা রূপ ধারণ করিয়া লীলা করে জগৎও সেইরূপ ব্রহ্মের লীলামাত্র। এ মত অনুসারে, যাঁহার ইচ্ছাতেই জগৎ তাঁহার ইচ্ছা ব্যতীত জগতের মুক্তি হইতে পারে না। অর্থাৎ তিনি ইচ্ছা করিলে, অথবা ইচ্ছা প্রতিসংহার করিলে তাঁহার জগৎরূপ জীবরূপ দূর হইয়া তাঁহার শুদ্ধস্বরূপ প্রকাশ পাইতে পারে, অতএব এ স্থলে সমস্ত জগতের বিলয় ব্যতীত ব্যক্তিবিশেষের মুক্তির কোনো অর্থ থাকিতে পারে না। কারণ, ব্যক্তিবিশেষ হওয়া তাঁহার ইচ্ছা এবং ব্যক্তিবিশেষ না হওয়াও তাঁহার ইচ্ছা এবং ব্যক্তিবিশেষ না হইলেও যতক্ষণ জগৎ আছে ততক্ষণ তিনি লীলারূপেই বিরাজ করিবেন।

ডয়সেন্ সাহেব অন্যত্র তাঁহার দর্শনগ্রন্থে প্রকৃতিসম্বন্ধীয় তত্ত্ববিদ্যা নামক পরিচ্ছেদে প্রথমে দেখাইয়াছেন যে, কান্টের অকাট্যযুক্তি অনুসারে দেশকাল ও কার্যকারণত্ব আমাদের বুদ্ধির ধর্ম, বাহিরের ধর্ম নহে। অতএব বস্তুকে যে আমরা বস্তুরূপে দেখিতেছি তাহা আমাদের বুদ্ধির রচনা। এই বুদ্ধির আরোপ বাহির হইতে উঠাইয়া লইলে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাই বস্তুর যথার্থ স্বরূপ— সেই দেশকাল কারণাতীত সত্তাকে অধ্যাপক মহাশয় শোপেনহৌয়ারের মতে উইল (ইচ্ছা) এবং বেদান্তমতে আত্মা বলিতেছেন। এই একমেবাদ্বিতীয়ম্ অনবচ্ছিন্ন 'উইল' পদার্থের নেতি-আত্মক নির্গুণ ভাবই বিশুদ্ধভাব— তাহাতে পাপ নাই, দুঃখ নাই, অস্তিত্ব নাই।

এই বিশুদ্ধ, দুঃখবিহীন, কামনাবিহীন, নেতিত্বের আনন্দমধ্যে একটা মোহ একটা পাপের সূচনা দেখা দিল— (কোনো বিশেষকালে নহে, আজও বটে অনন্তকালও বটে অনন্তকালের পূর্বেও বটে) এই উইল এই আত্মা ইতি-আত্মক সগুণ ভাব ধারণ করিল।

মূলের ভাষা উদ্‌ধৃত করি—

Now there was formed— not at any time, but before all eternity, today and for ever, like an inexplicable clouding of the clearness of the heavens, in the pure, painless, and will-less bliss of denial a morbid propensity, a sinful bent : the affirmation of the Will to life. In it and with it is given the myriad host of all the sins and woes of which this immeasurable world is the revealer.

মানব-বুদ্ধি চিরকাল প্রশ্ন করিতেছে সৃষ্টি হইল কেমন করিয়া? দুঃখের উৎপত্তি হইল কেন?

শংকরাচার্য এবং ডয়সেন্ উত্তর দিতেছেন— এক অনাদি অনির্বচনীয় পদার্থে এক অনাদি অনির্বচনীয় ছায়া পড়িল তাহাই সৃষ্টি তাহাতেই দুঃখ। ইহার সরল অর্থ এই, সৃষ্টিই বা কী আর সৃষ্টির কারণই বা কী আর দুঃখ পাপই বা কেন তাহা কিছুই জানি না। এবং বেদান্ত মতে এই অনাদি অজ্ঞান হইতে মুক্তিই বা কীরূপে এবং মুক্তিই বা কাহার তাহাও সুস্পষ্টরূপে বলা যায় না।

বৌদ্ধ নাস্তিবাদীরা কিছুই মানে না। তাহারা এ কথাও স্বীকার করে না যে, জগৎ প্রতিভাত হইতেছে। তাহাদের মতে ব্রহ্মও নাই জগৎও নাই, আমিও নাই তুমিও নাই— তাহাদের যুক্তি কিছুকাল পূর্বে 'সাধনা'য় অনুবাদ করিয়া দেখানো হইয়াছিল। যাহা অনাদিকাল আছে তাহা অনন্তকালে ধ্বংস হইতে পারে না, তাহাকে মায়াই বল আর সত্যই বল, অতএব তাহাকে একবার স্বীকার করিলে মুক্তি স্বীকার করা যায় না। কিন্তু নাস্তিবাদীরা কিছুই মানে না তাহাদের পক্ষে সকল কথাই সহজ। যদি বলি কিছুই যদি নাই তবে তুমি তাহা প্রমাণ করিতেছ কী করিয়া। তখন তাহারা প্রমাণ করিতে বসে যে, তাহারা প্রমাণ করিতেছে না। যদি বলি, কিছুই যদি নাই তবে তুমি মুক্তির কথা পাড় কেন— তখন সে বলে যখন আমিই নাই, তখন আমি কোনো কথা বলিতেছি ইহাও হইতে পারে না। অতএব কোনো কথাই স্বীকার না করিলে গায়ের জোর খাটানো সহজ হয়। কিন্তু যখনই এক স্বীকার করা গেল অমনি দুই প্রমাণ করা অসাধ্য হইয়া দাঁড়ায় এবং দুই স্বীকার করিলেই তাহাকে এক বলিয়া চালানো কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে।

যদি আমাকে জিজ্ঞাসা কর, তুমি কী বল? আমি আদি অন্ত মধ্য কিছুই জানি না, আমি কেবল এইটুকু জানি, আমার হৃদয়ে যে প্রীতি ভক্তি দয়া স্নেহ সৌন্দর্যপ্রেম আছে তাহা অনন্ত চরিতার্থতা চায়— এমন-কি, আমার সেই-সকল আকাঙ্ক্ষার মধ্যেই আমি অনন্তের আস্বাদ পাই— সেই আমার সর্বসফলতা যিনিই হৌন, যেখানেই থাকুন, তিনিই আমার ব্রহ্ম তাঁহাতেই আমার মুক্তি।

সাধনা
ভাদ্র ১৩০১

রামমোহন রায়

একদা পিতৃদেবের নিকট শুনিয়াছিলাম যে, বাল্যকালে অনেক সময়ে রামমোহন রায় তাঁহাকে গাড়ি করিয়া স্কুলে লইয়া যাইতেন; তিনি রামমোহন রায়ের সম্মুখবর্তী আসনে বসিয়া সেই মহাপুরুষের মুখ হইতে মুগ্ধদৃষ্টি ফিরাইতে পারিতেন না, তাঁহার মুখচ্ছবিতে এমন একটি সুগভীর সুগম্ভীর সুমহৎ বিষাদচ্ছায়া সর্বদা বিরাজমান ছিল।

পিতার নিকট বর্ণনা-শ্রবণ-কালে রামমোহন রায়ের একটি অপূর্ব মানসী মূর্তি আমার মনে জাজ্বল্যমান হইয়া উঠে। তাঁহার মুখশ্রীর সেই পরিব্যাপ্ত বিষাদমহিমা বঙ্গদেশের সুদূর ভবিষ্যৎকালের সীমান্ত পর্যন্ত স্নেহচিন্তাকুল কল্যাণকামনার কোমল রশ্মিজালরূপে বিকীর্ণ দেখিতে পাই। আমরা বঙ্গবাসী নানা সফলতা এবং বিফলতা, দ্বিধা এবং দ্বন্দ্ব, আশা এবং নৈরাশ্যের মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে আপনার পথ নির্মাণ করিয়া চলিয়াছি। আমি দেখিতে পাইতেছি এখনো আমাদের প্রতি সেই নব্যবঙ্গের আদিপুরুষ রামমোহন রায়ের দূরপ্রসারিত বিষাদদৃষ্টি নিস্তব্ধভাবে নিপতিত রহিয়াছে। এবং আমরা যখন আমাদের সমস্ত চেষ্টার অবসান করিয়া এই জীবলোকের কর্মক্ষেত্র হইতে অবসৃত হইব, যখন নবতর বঙ্গবাসী নব নব শিক্ষা এবং চেষ্টা এবং আশার রঙ্গভূমি-মধ্যে অবতীর্ণ হইবে, তখনো রামমোহন রায়ের সেই স্নিগ্ধ গম্ভীর বিষণ্ণবিশাল দৃষ্টি তাহাদের সকল উদ্যোগের প্রতি আশীর্বাদ বিকীর্ণ করিতে থাকিবে। আমার পিতাকে যেদিন রামমোহন রায় সঙ্গে করিয়া বিদ্যালয়ে লইয়া যাইতেছিলেন সেদিন আমাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকেই ইহসংসারে ছিলেন না— সেদিন যে পথ দিয়া তাঁহার শকট চলিয়াছিল অদ্য সে পথের মূর্তি-পরিবর্তন

হইয়া গিয়াছে। তখন বঙ্গসমাজে একটি নূতন সন্ধ্যার আবির্ভাব হইয়াছিল— তখন পারস্য শিক্ষা অস্তপ্রায়, ইংরাজি শিক্ষার অরুণোদয় হইতেছে মাত্র এবং সংস্কৃত শিক্ষা স্বল্পতৈল দীপশিখার ন্যায় উজ্জ্বল আলোকের অপেক্ষা ভূরি পরিমাণে মলিন ধূম্র বিকীর্ণ করিতেছিল। তখনো বঙ্গসমাজের অভ্যুদয় হয় নাই; তখন ছোটো ছোটো গ্রামসমাজ-পল্লীসমাজে বঙ্গদেশ বিচ্ছিন্ন বিভক্ত হইয়া ছিল; ব্যক্তিবিশেষের জাতিকুল, কার্য অকার্য, বেতন এবং উপরিপ্রাপ্য সংকীর্ণ গ্রাম্যমণ্ডলীর সর্বপ্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল— এমন সময়ে একদিন রামমোহন রায় তাঁহার মহৎ প্রকৃতির, তাঁহার বৃহৎ সংকল্পের সমস্ত অপরিমেয় বিষাদভার লইয়া আমার পিতাকে তাঁহার স্বপ্রতিষ্ঠিত নববিদ্যালয়ে পৌঁছাইয়া দিতেছিলেন।

অদ্য ইংরাজি শিক্ষা দশ দিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে, অদ্য বাংলাদেশের প্রভাতবিহঙ্গেরা ইংরাজি-অনুবাদ-মিশ্রিত সংগীতে দিগ্‌বিদিক্‌ প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিয়াছেন, উষাসমীরণে শত শত সংবাদপত্র ইংরাজি ও বাংলাভাষায় মর্মরধ্বনি তুলিয়া অবিরাম আন্দোলিত হইতেছে। তখন গদ্য বাক্যবিন্যাস কী করিয়া বুঝিতে হয় রামমোহন রায় তাহা প্রথমে নির্দেশ করিয়া, তবে গদ্য লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। আজ দেখিতে দেখিতে বঙ্গসাহিত্যলতা গদ্যে পদ্যে পাঠ্যে অপাঠ্যে কোথাও-বা কণ্টকিত কোথাও-বা মঞ্জরিত হইয়া উঠিতেছে— আজ সভা-সমিতি আবেদন-নিবেদন আলোচনা-আন্দোলন বাদ-প্রতিবাদে বঙ্গভূমি শুকপক্ষীকুলায়ের ন্যায় মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। ফলত, বঙ্গসমাজপুরীর পুরাতন রাজপথের আজ অনেক নূতন সংস্কার হইয়া গিয়াছে, পথ এবং জনতা উভয়েরই বহুল পরিমাণে রূপান্তর দেখা যাইতেছে। কিন্তু, তথাপি আমি কল্পনা করিতেছি— যে শকটে রামমোহন রায় আমার পিতাকে বিদ্যালয়ে লইয়া গিয়াছিলেন সেই শকটে অদ্য আমরা তাঁহার সম্মুখবর্তী আসনে উপবিষ্ট রহিয়াছি, তাঁহার মুখ হইতে মুগ্ধ দৃষ্টি ফিরাইতে পারিতেছি না। দেখিতে পাইতেছি এখনো তাঁহার সমুন্নত ললাট ও উদার নেত্রযুগল হইতে সেই পুরাতন বিষাদচ্ছায়া অপনীত হয় নাই, এখনো তিনি ভবিষ্যতের দিগন্তাভিমুখে তাঁহার সেই গভীর চিন্তাবিষ্ট দূরদৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন।

হিমালয়ের দুর্গম নির্জন অভ্রভেদী গিরিশৃঙ্গমালার মধ্যে যে একটি নির্মল নিস্তব্ধ নিঃশব্দ তপঃপরায়ণ বিষাদ বিরাজ করে রামমোহন রায়ের বিষাদ সেই বিষাদ— তাহা অবসাদ নহে, নৈরাশ্য নহে; তাহা দূরগামী সংকল্প, দূরপ্রসারিত দৃষ্টি, সুদূরব্যাপী মহৎ প্রকৃতির ধ্যানধৈর্যের বিশালতা, অনন্ত স্বচ্ছ আকাশের নীলিমা; অতলস্পর্শ নির্মল ,সরোবরে শ্যামলতা যেরূপ উজ্জ্বল তাঁহার বৃহৎ অন্তঃকরণের বিষাদ সেইরূপ জ্যোতির্ময়, সেইরূপ বহুদূরবিস্তীর্ণ। যে বঙ্গভূমি তাঁহার ধ্যানদৃষ্টির সম্মুখে নিয়ত প্রকাশ পাইতেছিল সে বঙ্গভূমি তখন কোথায় ছিল এবং এখনই বা কোথায় আছে! রামমোহন রায়ের সেই বঙ্গদেশ, তখনকার বঙ্গভূমির সমস্ত ক্ষুদ্রতা জড়তা সমস্ত তুচ্ছতা হইতে বহুদূরে পশ্চিমদিক্‌প্রান্তভাগে স্বর্ণপ্রভামণ্ডিত মেঘমালার মধ্যে ছায়াপুরীর মতো বিরাজ করিতেছিল। যখন বঙ্গদেশের পণ্ডিতগণ মূঢ়ের মতো তাঁহাকে গালি দিতেছিল তখন তিনি সেই মানস বঙ্গলোক হইতে দূরাগত সংগীতধ্বনির প্রতি কান পাতিয়াছিলেন; সমাজ যখন তাঁহাকে তিরস্কৃত করিবার উদ্দেশে আপন ক্ষুদ্র গৃহদ্বার অবরুদ্ধ করিতেছিল তখন তিনি প্রসারিতবাহু বিশ্ববন্ধুর ন্যায় সেই মানস বঙ্গসমাজের নিত্য-উন্মুক্ত উদার জ্যোতির্ময় সিংহদ্বারের প্রতি আপন উৎসুক দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াছিলেন। সে সংগীত, সে দৃশ্য, ভবিষ্যতের সেই স্বর্গীয় আশারাজ্য যাহাদের সম্মুখে বর্তমান ছিল না, তাহারা তাঁহার সেই উদার ললাটের উপর সততসঞ্চরমাণ ছায়ালোকের কোনো অর্থই বুঝিতে পারিত না। তাহাদের আশা ছিল না, ভাষা ছিল না, সাহিত্য ছিল না, জাতিকে তাহারা বর্ণ বলিয়া জানিত, দেশ বলিতে তাহারা নিজের পল্লীকে বুঝিত; বিশ্ব তাহাদের গৃহকোণকল্পিত মিথ্যা বিশ্ব, সত্য তাহাদের অন্ধ সংস্কার; ধর্ম তাহাদের লোকাচারপ্রচলিত ক্রিয়াকর্ম, মনুষ্যত্ব কেবলমাত্র অনুগত-প্রতিপালন এবং পৌরুষ রাজদ্বারে সৎ ও অসৎ উপায়ে উচ্চ বেতন-লাভ। রামমোহন রায় যদি কেবল ইহাদের মধ্যে আপনার দৃষ্টিকে নিবদ্ধ রাখিতেন,

যদি সেই সংকীর্ণ বর্তমান কালের মধ্যে আপনার সমস্ত আশাকে প্রতিহত হইতে দিতেন, তাহা হইলে কদাচ কাজ করিতে পারিতেন না— তাহা হইলে তাঁহার মাতৃভূমিকে আপন আদর্শলোকের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করা তাঁহার পক্ষে অসাধ্য ও অসম্ভব বলিয়া বোধ হইত।

যদিও একই পৃথিবী একই মৃত্তিকা, তথাপি মহাপুরুষদিগের জন্মভূমি আমাদের হইতে অনেক স্বতন্ত্র। এই পৃথিবী এই মৃত্তিকা আমাদের অজ্ঞাতসারে অদৃশ্যভাবে তাঁহাদের পদতলে বহু ঊর্ধ্বে উন্নত হইয়া উঠে। যখন তাঁহারা আমাদের সহিত এক সমভূমিতে সঞ্চরণ করিতেছেন তখনো তাঁহারা পর্বতের শিখরাগ্রভাগে আছেন; সেইজন্য তাঁহারা গৃহের মধ্যে থাকিয়াও বিশ্বকে দেখিতে পান, বর্তমানের মধ্যে থাকিলেও ভবিষ্যৎ তাঁহাদিগকে আহ্বান করিতে থাকে, ইহলোকের মধ্যে থাকিয়াও পরলোক তাঁহাদের প্রত্যক্ষগোচর হয়। আমরা ভূগোলবিদ্যার সাহায্যে জ্ঞানে জানি যে, আমাদের ক্ষুদ্র পল্লীকে অতিক্রম করিয়াও বিশ্ব বিরাজ করিতেছে, কিন্তু আমরা সেই উচ্চ ভূমিতে নাই যেখান হইতে বিশ্বলোকের সহিত প্রত্যহ প্রত্যক্ষ পরিচয় হয়। আমরা কল্পনার সাহায্যে আমাদের ক্ষীণ দৃষ্টিকে ভবিষ্যৎ-অভিমুখে কিয়দ্দূর প্রেরণ করিতে পারি, কিন্তু আমরা সেই উন্নত লোকে বাস করি না যেখানে ভবিষ্যতের অনন্ত-আশ্বাস-সামগীতি বিশ্ব-বিধাতার নীরব মাভৈঃশব্দের সহিত নিরন্তর বিচিত্র স্বরে সম্মিলিত হইতেছে। আমাদের মধ্যে অনেকে পরলোকের প্রতি বিশ্বাসহীন নহি, কিন্তু আমরা সেই স্বাভাবিক সমুচ্চ আসনের উপর সর্বদা প্রতিষ্ঠিত নহি যেখান হইতে ইহলোক-পরলোকের জ্যোতির্ময় সংগমক্ষেত্র প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে অন্তরিন্দ্রিয়ের দৃষ্টিগোচর হইতে থাকে। সেইজন্য আমাদের এত সংশয়, এত দ্বিধা; সেইজন্যই আমাদের সংকল্প এমন দুর্বল, আমাদের উদ্যম এমন স্বল্পপ্রাণ; সেইজন্যই বিশ্বহিতের উদ্দেশে আত্মসমর্পণ আমাদের নিকট একটি সুমধুর কাব্যকথা মাত্র, সেইজন্য ক্ষুদ্র বাধা আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলে তাহাকে অতিক্রম করিয়া মহাসফলতার অনন্ত বিস্তীর্ণ উর্বরক্ষেত্র আর আমরা দেখিতেই পাই না। মর্ত্যসুখ যখন স্বর্ণমায়ামৃগের মতো আমাদিগকে প্রলুব্ধ করিয়া ধাবমান করে তখন অমৃতলোক আমাদের নিকট হইতে একেবারে অন্তর্হিত হইয়া যায়। আমাদের নিকট সংসারের ক্ষুদ্র সুখদুঃখ, বর্তমানের উপস্থিত বাধাবিপত্তি, মর্ত্যসুখের বিচিত্র প্রলোভনই প্রত্যক্ষ সত্য, আর-সমস্ত শুনা কথা— শিক্ষালব্ধ মুখস্থবিদ্যা এবং ছায়াময় কল্পনা। কিন্তু মহাপুরুষদের নিকট আমাদের সেই-সকল ছায়ারাজ্য প্রত্যক্ষ সত্য; বস্তুত সেইখানেই তাঁহারা বাস করিতেছেন। আমাদের সংসার, আমাদের সুখদুঃখ, আমাদের বাধাবিপত্তি তাঁহাদিগকে চরম পরিণাম-স্বরূপে আবৃত করিয়া রাখে না।

রামমোহন রায় সেই মহাপুরুষ, যিনি বঙ্গদেশে অবতীর্ণ হইয়াও বিধাতার প্রসাদে নিত্য সত্যলোকে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেইজন্য তাঁহার শারীরিক জন্মস্থানের সহিত তাঁহার মানসিক জন্মভূমির বিরোধ তাঁহার সম্মুখে প্রধূমিত হইয়া উঠিল। তাঁহার অন্তরে নিত্যসত্যের স্বাভাবিক আদর্শ, বাহিরে চতুর্দিকেই অসত্য প্রাচীন ভক্তিভাজন বেশে সঞ্চরণ করিতেছে। সেই অসত্যের সহিত তিনি কোনোক্রমেই সন্ধিস্থাপন করিতে পারেন না। সেইজন্য দেশের বৃদ্ধেরা যখন প্রাণহীন ক্রিয়াকর্ম ও প্রথার মধ্যে জড়ত্বের শান্তিসুখ অনুভব করিতেছিল তখন বালক রামমোহন মরীচিকাভীরু তৃষাতুর মৃগশাবকের ন্যায় সত্যের অন্বেষণে দুর্গম প্রবাসে দেশদেশান্তরে ব্যাকুলভাবে পর্যটন করিতেছিলেন। কত লক্ষ লক্ষ লোক, যেখানে জন্মগ্রহণ করে সেখানকার জড়সংস্কারের পুরাতন লূতাতন্তুজালের মধ্যে অনায়াসে নির্বিরোধে আত্মসমর্পণ করিয়া আশ্রয়লাভ করে, তদ্দ্বারা অন্তরাত্মাকে খর্ব জীর্ণ জড়বৎ করিয়া রাখে, তাহা আমৃত্যুকাল জানিতেও পারে না— রামমোহন রায়ের আত্মা প্রথম হইতেই সেই-সকল জড় সংস্কারে জড়িত হইতে চাহিল না। নীড়চ্যুত তরুণ ঈগল পক্ষী যেমন স্বভাবতই পৃথিবীর সমস্ত নিম্নভূমি পরিহার করিয়া আপন অভ্রংলিহ শৈলকুলায়ের প্রতি ধাবমান হয়, কিশোর রামমোহন রায় সেইরূপ বঙ্গসমাজের জীর্ণনীড় স্বভাবতই পরিত্যাগ করিয়া অভ্রভেদী অচলশিখর-প্রতিষ্ঠিত সত্য কুলায়ের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। লোকাচার,

সামাজিক সংস্কার, বহু পুরাতন হইতে পারে, কিন্তু সত্য তদপেক্ষা পুরাতন— সেই চিরপুরাতন সত্যের সহিত এই নবীন বাঙালি বালকের কোথায় পরিচয় হইয়াছিল? সেই সত্যের অভাবে গৃহবাস, সমাজের আশ্রয়, লৌকিক সুখশান্তি, এই গৃহপালিত তরুণ বাঙালির নিকটে কেমন করিয়া এত তুচ্ছ বোধ হইল? সেই ভূমা সত্যসুখের আস্বাদ সে কবে কোথায় লাভ করিয়াছিল? বঙ্গমাতা এই বালককে তাহার অন্যান্য শিশুর ন্যায় জ্ঞান করিয়া আপনার চিরপ্রচলিত ক্রীড়নকগুলি তাহার সম্মুখে একে একে আনিয়া উপস্থিত করিতে লাগিল; বালক কাতর কণ্ঠে বলিতে লাগিল, ‘ইহা নহে, ইহা নহে— আমি ধর্ম চাহি, ধর্মের পুত্তলি চাহি না; আমি সত্য চাহি সত্যের প্রতিমা চাহি না।’ বঙ্গমাতা কিছুতেই এই বালকটিকে ভুলাইয়া রাখিতে পারিল না— সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া সত্যের সন্ধানে সে একাকী বিশ্বজগতে বাহির হইয়া গেল। সে কোন্‌-এক সময় কেমন করিয়া বাংলাদেশের সমস্ত দেশাচার-লোকাচারের উপরে মস্তক তুলিয়া দেখিতে পাইয়াছিল যে, এই আচার-অনুষ্ঠানই চরম নহে, ইহার বাহিরে অসীম সত্য অনন্তকাল অমৃতপিপাসু ভক্ত মহাত্মাদের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া আছে। পূর্বেই বলিয়াছি মহাপুরুষদের পদতলে ধরণী অদৃশ্যভাবে উন্নত হইয়া উঠিয়া তাঁহাদিগকে প্রত্যক্ষগোচর চরাচরের বহির্বর্তী অনন্ত দৃশ্য দেখাইয়া দেয়, তখন তাঁহারা বরঞ্চ নিজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অস্তিত্ব অবিশ্বাস করিতে পারেন কিন্তু সেই বিশ্ববেষ্টনকারী দৃশ্যাতীত অনন্ত সত্যলোকের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হইতে পারেন না।

নারিকেলের বহিরাবরণের ন্যায় সকল ধর্মেরই বাহ্যিক অংশ তাহার অন্তরস্থিত অমৃতরসকে ন্যূনাধিক পরিমাণে গোপন ও দুর্লভ করিয়া রাখে। তৃষার্ত রামমোহন রায় সেই-সকল কঠিন আবরণ স্বহস্তে ভেদ করিয়া ধর্মের রসশস্য আহরণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি নিজে সংস্কৃত শিখিয়া বেদ-পুরাণের গহন অরণ্যের মধ্যে আপনার পথ কাটিয়া লইলেন, হিব্রু ও গ্রীক ভাষা শিখিয়া খৃস্টধর্মের মূল আকরের মধ্যে অবতরণ করিলেন, আরব্য ভাষা শিখিয়া কোরানের মূল মন্ত্রগুলি স্বকর্ণে শ্রবণ করিয়া লইলেন। ইহাই সত্যের জন্য তপস্যা। সত্যের প্রতি যাহার প্রকৃত বিশ্বাস নাই সে বিনা চেষ্টায় যাহা হাতের কাছে প্রস্তুত দেখিতে পায় তাহাকেই আশ্রয় করিয়া অবহেলে জীবনযাপন করিতে চাহে— কর্তব্যবিমুখ অলস ধাত্রীর ন্যায় মোহ-অহিফেন-সেবনে অভ্যস্ত করাইয়া অন্তরাত্মার সমস্ত চেষ্টা সমস্ত ক্রন্দন নিরস্ত করিতে প্রয়াস পায় এবং জড়ত্বসাধনার দ্বারা আত্মাকে অভিভূত করিয়া সংসারাশ্রমে পরিপুষ্ট সুচিক্কণ হইয়া উঠে।

একদিন বহু সহস্র বৎসর পূর্বে সরস্বতীকূলে কোন্‌-এক নিস্তব্ধ তপোবনে কোন্‌-এক বৈদিক মহর্ষি ধ্যানাসনে বসিয়া উদাত্ত স্বরে গান গাহিয়া উঠিয়াছিলেন—

শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ।
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ॥

হে দিবধামবাসী অমৃতের পুত্র-সকল, তোমরা শ্রবণ করো— আমি সেই তিমিরাতীত মহান্‌ পুরুষকে জানিয়াছি।

রামমোহন রায়ও একদিন উষাকালে নির্বাণদীপ তিমিরাচ্ছন্ন বঙ্গসমাজের গাঢ়নিদ্রামগ্ন নিশ্চেতন লোকালয়ের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিয়াছিলেন— হে মোহশয্যাশায়ী পুরবাসীগণ, আমি সত্যের দর্শন পাইয়াছি— তোমরা জাগ্রত হও!

লোকাচারের পুরাতন শুষ্ক পর্ণশয্যায় সুখসুপ্ত প্রাণীগণ রক্তনেত্র উন্মীলন করিয়া সেই জাগ্রত মহাপুরুষকে রোষদৃষ্টিদ্বারা তিরস্কার করিতে লাগিল। কিন্তু সত্য যাহাকে একবার আশ্রয় করে সে কি আর সত্যকে গোপন করিতে পারে? দীপবর্তিকায় অগ্নি যখন ধরিয়া উঠে তখন সেই শিখা লুক্কায়িত করা প্রদীপের সাধ্যায়ত্ত নহে— আমরা রুষ্ট হই আর সন্তুষ্ট হই, সে ঊর্ধ্বমুখী হইয়া জ্বলিতে থাকিবে, তাহার অন্য গতি নাই।

রামমোহন রায়েরও অন্য গতি ছিল না— সত্যশিখা তাঁহার অন্তরাত্মায় প্রদীপ্ত হইয়া

উঠিয়াছিল— সমাজ তাঁহাকে যত লাঞ্ছনা যত নির্যাতন করুক, তিনি সে আলোক কোথায় গোপন করিবেন? তখন হইতে তাঁহার আর বিশ্রাম নাই, নিভৃতগৃহবাসসুখ নাই, বঙ্গসমাজের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে শেষ পর্যন্ত জ্যোতি বিকীর্ণ করিতে হইবে। তাঁহাকে সমস্ত বিরোধ বিদ্বেষ প্রতিকূলতার রোষগর্জনের ঊর্ধ্বে কণ্ঠ তুলিয়া বলিতে হইবে— মিথ্যা! মিথ্যা! হে পৌরগণ, ইহাতে মুক্তি নাই, ইহাতে তৃপ্তি নাই, ইহা ধর্ম নহে, ইহা আত্মার উপজীবিকা নহে, ইহা মোহ, ইহা মৃত্যু! মিথ্যাকে স্তূপাকার করিয়া তুলিলেও তাহা সত্য হয় না, তাহা মহৎ হয় না; সত্যের প্রতি যদি বিশ্বাস থাকে তবে সাবধানে জ্ঞানালোকে তাহাকে অন্বেষণ করিয়া লইয়া তবে তাহার পূজা করো— যে ভক্তি যেখানে-সেখানে অর্ঘ্য-উপহার স্থাপন করিয়া দ্রুত তৃপ্তি লাভ করিতে চায় সে ভক্তি আত্মার আলস্য, তাহা আধ্যাত্মিক বিলাসিতা, তাহা তপস্যা নহে, তাহা যথার্থ আত্মোৎসর্গ নহে, তাহা অবহেলা, তাহাতে আত্মা বললাভ জ্যোতিলাভ মুক্তিলাভ করে না, কেবল উত্তরোত্তর জড়ত্বজালে জড়িত হইয়া সুপ্তিমগ্ন হইতে থাকে।

গ্রহণ করা এবং বর্জন করা জীবনের একটি প্রধান লক্ষণ। জীবনীশক্তি প্রবল থাকিলে এই গ্রহণবর্জনক্রিয়া অব্যাহতভাবে চলিতে থাকে; যখন ইহার ব্যাঘাত ঘটে তখন স্বাস্থ্য নষ্ট হয় এবং মৃত্যু আসিয়া অধিকার করে।

আমাদের শারীর প্রকৃতিতে এই গ্রহণবর্জনক্রিয়া আমাদের ইচ্ছার অপেক্ষা না রাখিয়া বহুলাংশে যন্ত্রবৎ চলিতে থাকে। আমরা অচেতনভাবে অম্লজান বায়ু গ্রহণ করি, অঙ্গারক বায়ু ত্যাগ করি; আমাদের দেহ প্রতিক্ষণে নূতন শারীর কোষ নির্মাণ করিতেছে— কী করিয়া যে তাহা আমরা জানি না।

আমাদের অন্তরপ্রকৃতিতেও বিচিত্র ক্রিয়া আমাদের অজ্ঞাতসারে গূঢ়ভাবে ঘটিয়া থাকে, কিন্তু সেখানে আমাদের কর্তৃত্বের অধিকার অপেক্ষাকৃত ব্যাপক এবং গুরুতরদায়িত্বপূর্ণ। ভালোমন্দ পাপপুণ্য শ্রেয়প্রেয় আমাদিগকে নিজের সতর্ক চেষ্টায় গ্রহণ ও বর্জন করিতে হয়। ইহাতেই আত্মার মাহাত্ম্যও। এ কার্য যদি সম্পূর্ণ জড়বৎ যন্ত্রবৎ সম্পন্ন হইতে থাকিত তবে আমাদের মনুষ্যত্বের গৌরব থাকিত না— তবে ধর্ম ও নীতিশব্দ অর্থহীন হইত।

আত্মার গ্রহণ বর্জন কার্য এইরূপ স্বাধীন ইচ্ছার উপর নির্ভর করাতে অনেক সময়ে ইচ্ছা আপন কর্তব্য কার্য সতর্কভাবে সম্পন্ন করে না; অনেক পুরাতন আবর্জনা সঞ্চিত হইতে থাকে, অনেক নূতন পোষণপদার্থ দূরে পরিত্যক্ত হয়। শরীর আপন মৃত কোষকে যেমন নির্মমভাবে বর্জন করে আমরা আমাদের মৃত বস্তুগুলিকে তেমন অকাতরে পরিহার করিতে পারি না, এইজন্য সকল মনুষ্যসমাজ এবং সকল ধর্মেরই চতুর্দিকে বহুযুগসঞ্চিত পরমপ্রিয় মৃতবস্তুগুলি উত্তরোত্তর স্তূপাকার হইয়া ক্রমে তাহার গতির পথ রোধ করিয়া দাঁড়ায়— অভ্যন্তরের বায়ুকে দূষিত করিয়া তোলে, বাহিরের স্বাস্থ্যকর বায়ুকে প্রবেশ করিতে দেয় না। যাহারা শনৈঃ শনৈঃ অলক্ষিত ভাবে এই বিষবায়ুর মধ্যে পালিত হইয়া উঠে তাহারা বুঝিতে পারে না যে, তাহারা কী আলোক কী স্বাস্থ্য কী মুক্তি হইতে আপনাকে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে। তাহারা মমত্ববশত ভস্মকে ত্যাগ করিতে পারে না, অবশেষে পবিত্র অগ্নি উত্তরোত্তর আচ্ছন্ন হইয়া কখন নির্বাপিত হইয়া যায় তাহা তাহারা জানিতেও পারে না।

ক্রমে এমন হয় যে যাহা মুখ্য বস্তু, যাহা সারপদার্থ, তাহা লোকচক্ষুর অন্তরালে পড়িয়া অনভ্যস্ত হইয়া যায়, তাহার সহিত আর পরিচয় থাকে না, তাহাকে আমাদের আর একান্ত আবশ্যক বলিয়াই বোধ হয় না; যাহা গৌণ, যাহা ত্যাজ্য, তাহাই পদে পদে আমাদের চক্ষুগোচর হইয়া অভ্যাসজনিত প্রীতি আকর্ষণ করিতে থাকে।

এমন সময়ে সমাজে মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়। তিনি বজ্রস্বরে বলেন, যে মিথ্যা সত্যকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে সেই মিথ্যাকে সত্য অপেক্ষা প্রিয় জ্ঞান করিয়া উপাসনা করিয়ো না। তখন এই অতি পুরাতন কথা লোকের নিকট সম্পূর্ণ নূতন বলিয়া বোধ হয়। কেহ-বা বলে,

'সত্যকে মিথ্যা স্তূপের মধ্য হইতে অন্বেষণ করিয়া বাহির করিবার কষ্ট আমরা স্বীকার করিব না, আমরা যাহা সহজে পাই তাহাকেই সত্যজ্ঞানে সমাদর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে ইচ্ছা করি।' অর্থাৎ যাহা বর্জনীয় তাহা বর্জন করিতে চাহি না, যাহা গ্রহণীয় তাহাও গ্রহণ করিতে পারি না, আমাদের আধ্যাত্মিক মৃত্যুদশা উপস্থিত হইয়াছে। তখন সেই মহাপুরুষ বিধিপ্রেরিত উদ্যত বজ্রাগ্নি সেই মৃত আবর্জনাস্তূপের প্রতি নিক্ষেপ করেন। ধূর্জটি যখন মৃত সতীদেহ কোনোমতেই পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না, নিষ্ফল মোহে তাহাকে স্কন্ধে করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, তখন বিষ্ণু আপন সুদর্শনচক্র-দ্বারা সেই মৃতদেহ ছিন্নভিন্ন করিয়া শিবকে মোহভার হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন। সেইরূপ মানব-সমাজকে মোহমুক্ত করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে মহাপুরুষগণ বিষ্ণুর সুদর্শনচক্র লইয়া আবির্ভূত হন— সমাজ আপনার বহুকালের প্রিয় মোহভার হইতে বঞ্চিত হইয়া একেবারে উন্মত্ত হইয়া উঠে, কিন্তু দেবতার চক্রকে আপন কর্ম হইতে কে নিবৃত্ত করিতে পারে?

সর্বত্রই এইরূপ হইয়া থাকে। আমাদের দেশও তাহার ব্যতিক্রমস্থল নহে। বরঞ্চ যে জাতি সজীব সচেষ্ট, যাহারা স্বাধীনভাবে চিন্তা করে, সবলভাবে কার্য করে, সানন্দমনে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে থাকে, যাহাদের সমাজে প্রাণের প্রবাহ কখনো অবরুদ্ধ থাকে না, তাহারা আপন গতিবেগের দ্বারা আপন ত্যাজ্য পদার্থকে বহুলাংশে দূরে লইয়া যায়, আপন দূষণীয়তা সংশোধন করিতে থাকে।

আমরা বহুকাল হইতে পরাধীন অধঃপতিত উৎপীড়িত জাতি; বহুদিন হইতে আমাদের সেই অন্তরের বল নাই যাহার সাহায্যে আমরা বাহিরের শত্রুকে বাহিরে রাখিতে পারি; সমাজের মধ্যে সেই জীবনশক্তির ঐক্য নাই যদ্দ্বারা আমরা বিপৎকালে এক মুহূর্তে এক হইয়া গাত্রোত্থান করিতে পারি; আমাদের মধ্যে বহুকাল হইতে কোনো মহৎ সংকল্পসাধন কোনো বৃহৎ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয় নাই— সেইজন্য আমাদের অন্তরপ্রকৃতি ক্রমশ তন্দ্রামগ্ন হইয়া আসিয়াছিল। আমাদের হৃদয় রাজপুরুষদের অপ্রতিহত স্বেচ্ছাচারিতায় দলিত নিস্তেজ, আমাদের অন্তঃকরণ বুদ্ধিবৃত্তির স্বাভাবিক সানন্দ পরিচালনার অভাবে জড়বৎ হইয়া আসিয়াছিল। এমন স্থলে আমাদের সমাজ আমাদের ধর্ম যে আপনি আদিম বিশুদ্ধ উজ্জ্বলতা অক্ষুণ্ণভাবে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে ইহা কদাচ সম্ভবপর নহে। যদি রক্ষা করিত তবে সে উজ্জ্বলতা সকল অংশে সকল দিকেই প্রকাশ পাইত; তবে আমাদের মুখচ্ছবি মলিন, মেরুদণ্ড বক্র, মস্তক অবনত হইত না; তবে আমরা লোকসমাজে সর্বদা নির্ভীকভাবে অসংকোচে সঞ্চরণ করিতে পারিতাম। যাহার ধর্ম যাহার সমাজ সজীব সতেজ বিশুদ্ধ উন্নত, ত্রিভুবনে তাহার কাহাকেও ভয় করিবার নাই। বারুদ এবং সীসকের গোলক-দ্বারা তাহার স্বাধীনতা অপহৃত হইতে পারে না। আগে আমাদের সমাজ নষ্ট হইয়াছে, ধর্ম বিকৃত হইয়াছে, বুদ্ধি পরবশ হইয়াছে, মনুষ্যত্ব মৃতপ্রায় হইয়াছে, তাহার পরে আমাদের রাষ্ট্রীয় দুর্গতির সূচনা হইয়াছে। সকল অবমাননা সকল দুর্বলতার মূল সমাজের মধ্যে, ধর্মের মধ্যে।

রামমোহন রায় সেই সমাজ সেই ধর্মের মধ্যে বিশুদ্ধ সত্যের আদর্শ স্থাপন করিলেন। তাঁহার নিজের আদর্শ নহে। তিনি এ কথা বলিলেন না যে, আমার এই নূতন-রচিত মত সত্য, আমার এই নূতন-উচ্চারিত আদেশ ঈশ্বরাদেশ। তিনি এই কথা বলিলেন— সত্য মিথ্যা বিচার করিয়া গ্রহণ করিতে হইবে, সতর্ক যুক্তিদ্বারা সমাজের সমস্ত অকল্যাণ দূর করিতে হইবে। যেমন বলের দ্বারা ধূম নিরস্ত হয় না, অগ্নিকে সম্পূর্ণ প্রজ্বলিত করিয়া তুলিলে ধূমরাশি আপনি অন্তর্হিত হয়— রামমোহন রায় সেইরূপ ধর্মের প্রচ্ছন্ন বিশুদ্ধ অগ্নিকে প্রজ্বলিত জাগ্রত করিয়া তুলিয়া তাহার ধূমজাল দূর করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি বেদ পুরাণ তন্ত্রের সারভাগ উদ্ধার করিয়া আনিয়া তাহার বিশুদ্ধ জ্যোতি আমাদের প্রত্যক্ষগোচর করিতে লাগিলেন। যে-সমস্ত নূতন কালিমা সেই পুরাতন জ্যোতিকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল তাহাকে তিনি সেই জ্যোতির আদর্শের দ্বারাই নিন্দিত

করিতে লাগিলেন। কিন্তু, হায়, আমাদের পক্ষে সেই পুরাতন জ্যোতিই নূতন, এই নূতন কালিমাই পুরাতন; সেই সনাতন বিশুদ্ধ সত্য শাস্ত্রের মধ্যে আছে, আর এই-সমস্ত অধুনাতন লোকাচার আমাদের ঘরে বাহিরে, আমাদের চিন্তায় কার্যে, আমাদের সুখে দুঃখে শত সহস্র চিহ্ন রাখিয়াছে— চক্ষু উন্মীলন করিলেই তাহাকে আমরা চতুর্দিকে দেখিতে পাই, শাস্ত্র উদ্‌ঘাটন না করিলে সনাতন সত্যের সাক্ষাৎ পাই না। অতএব, হে রামমোহন রায়, তুমি যে মুক্তা আহরণ করিয়াছ তাহা শ্রেয় হইতে পারে, কিন্তু যে শুক্তি যুক্তি-অস্ত্রে বিদীর্ণ করিয়া ফেলিয়া দিতেছ তাহাই আমাদের প্রেয়, আমাদের পরিচিত; আমরা মুক্তাকে মুখে বহুমূল্য বলিয়া সম্মান করিতে সম্মত আছি, কিন্তু শুক্তিখণ্ডকেই হৃদয়ের মধ্যে বাঁধিয়া রাখিব।

তাহা হউক, সত্যকেও সময়ের অপেক্ষা করিতে হয়। কিন্তু, একবার যখন সে প্রকাশ পাইয়াছে তখন তাহার সহিতও আমাদের ক্রমশ পরিচয় হইবে। সত্যের পথ যদি বাধাগ্রস্ত না হয় তবে সত্যকে আমরা সম্পূর্ণরূপে পরীক্ষা করিয়া চিনিয়া লইতে পারি না; সন্দেহের দ্বারা পীড়িত নিষ্পীড়িত করিয়া তবে আমরা সত্যের অজেয় বল, অটল স্থায়িতা বুঝিতে পারি। যে প্রিয় পুরাতন মিথ্যা আমাদের গৃহে আমাদের হৃদয়ে এতকাল সত্যের ছদ্মবেশে বিরাজ করিয়া আসিয়াছে তাহাকে কি আমরা এক মুহূর্তের মধ্যে অকাতরে বিদায় দিতে পারি? সত্য যখন আপন কল্যাণময় কঠিন হস্তে তাহাকে আমাদের বক্ষ হইতে একেবারে কাড়িয়া ছিনিয়া লইয়া যাইবে তখন তাহার জন্য আমাদের হৃদয়ের শোণিতপাত এবং অজস্র অশ্রু বর্ষণ করিতে হইবে। যে ব্যক্তি তাহার পুরাতন প্রেয় বস্তুকে আপন শিথিল মুষ্টি হইতে অতি সহজেই ছাড়িয়া দিতে পারে সে লোক নূতন শ্রেয়কে তেমন সবলভাবে একান্তমনে ধারণ করিতে পারে না। পুরাতনের জন্য শোক যেখানে মৃদু, নূতনের জন্য আনন্দ সেখানে ম্লান। অবসন্ন রজনীর বিদায়-শিশিরাশ্রুজলের উপরেই প্রভাতের আনন্দ-অভ্যুদয় নির্মল উজ্জ্বল সুন্দর রূপে উদ্‌ভাসিত হইয়া উঠে।

প্রথমে সকলেই বলিব, না না, ইহাকে চাহি না, ইহাকে চিনি না, ইহাকে দূর করিয়া দাও; তাহার পর একদিন বলিব, এসো এসো হে সর্বশ্রেষ্ঠ, এসো হে হৃদয়ের মহারাজ, এসো হে আত্মার জাগরণ, তোমার অভাবেই আমরা এতদিন জীবন্মৃত হইয়া ছিলাম।

এসো গো নূতন জীবন।
এসো গো কঠোর নিঠুর নীরব,
এসো গো ভীষণ শোভন।
এসো অপ্রিয় বিরস তিক্ত,
এসো গো অশ্রুসলিলসিক্ত,
এসো গো ভূষণবিহীন রিক্ত,
এসো গো চিত্তপাবন।
থাক্ বীণাবেণু, মালতীমালিকা,
পূর্ণিমানিশি, মায়াকুহেলিকা—
এসো গো প্রখর হোমানলশিখা
হৃদয়শোণিতপ্রাশন।
এসো গো পরমদুঃখনিলয়,
মোহ-অঙ্কুর করো গো বিলয়,
এসো সংগ্রাম, এসো মহাজয়,
এসো গো মরণসাধন।

প্রথমে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলাম বলিয়াই, যখন আবাহন করিব তখন একান্তমনে সমস্ত হৃদয়ের সঙ্গে করিব--- প্রবল দ্বন্দ্বের পর পরাজয় স্বীকার করিয়া যখন আত্মসমর্পণ করিব তখন সম্পূর্ণরূপেই করিব, তখন আর ফিরিবার পথ রাখিব না।

আমাদের দেশে এখনো সত্যমিথ্যার সেই দ্বন্দ্ব চলিতেছে। এই দ্বন্দ্বের অবতারণাই রামমোহন রায়ের প্রধান গৌরব। কারণ, যে সমাজে সত্যমিথ্যার মধ্যে কোনো বিরোধ নাই সে সমাজের অবস্থা অতিশয় শোচনীয়; এমন-কি, জড়ভাবে অন্ধভাবে সত্যকে গ্রহণ করিলেও সে সত্যে কোনো গৌরব থাকে না। সীতার ন্যায় সত্যকেও বারংবার অগ্নিপরীক্ষা সহ্য করিতে হয়।

অনেকে মনে মনে অধৈর্য প্রকাশ করিয়া থাকেন যে, রামমোহন রায় শাস্ত্র হইতে আহরণ করিয়া যে ধর্মকে বঙ্গসমাজে প্রেরণ করিয়াছিলেন এখনো তাহাকে সকলে গৃহে আহ্বান করিয়া লয় নাই; এমন-কি,. এক-এক সময় আশঙ্কা হয় সমাজ সহসা সবেগে তাহার বিপরীত মুখে ধাবিত হইতেছে, এবং রামমোহন রায়ের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য সফল হইতেছে না। কিন্তু, সে আশঙ্কায় মুহ্যমান হইবার আবশ্যক নাই। রামমোহন রায় যে ধর্মকে সত্য বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন সে ধর্মকে তিনি সত্য বলিয়া জানিয়াছিলেন— আমরাও অগ্রে সে ধর্মকে প্রকৃতরূপে সত্য বলিয়া জানিব তবে তাহাকে গ্রহণ করিব ইহাই তাঁহার অভিপ্রায়, সত্যকে কেবল পঠিত মন্ত্রের ন্যায় গ্রহণ করিব না।

সত্যকে যথার্থ সত্য বলিয়া জানা সহজ নহে— অনেকে যাঁহারা মনে করেন 'জানিয়াছি' তাঁহারাও জানেন না। রামমোহন রায় যে নিদারুণ পিপাসার পর যে কঠোর তপস্যার দ্বারা ধর্মে বিশ্বাস লাভ করিয়াছিলেন আমাদের সে পিপাসাও নাই, সে তপস্যাও নাই; আমরা কেবল পরম্পরাগত বাক্য শ্রবণ করিয়া যাই এবং মনে করি যে তাহা সত্য এবং তাহা বুঝিলাম। কিন্তু, আমাদের অন্তরাত্মা আকাঙ্ক্ষা-দ্বারা তাহাকে আকর্ষণ করিয়া তাহার সমস্ত সত্যতা একান্তভাবে লাভ করে না।

এখনো আমাদের বঙ্গসমাজে সেই আধ্যাত্মিক ক্ষুৎপিপাসার সঞ্চার হয় নাই, সত্যধর্মের জন্য আমাদের প্রাণের দায় উপস্থিত হয় নাই; যে ধর্ম স্বীকার করি সে ধর্ম বিশ্বাস না করিলেও আমাদের চলে, যে ধর্মে বিশ্বাস করি সে ধর্ম গ্রহণ না করিলেও আমাদের ক্ষতিবোধ হয় না— আমাদের ধর্মজিজ্ঞাসার সেই স্বাভাবিক গভীরতা নাই বলিয়া সে সম্বন্ধে আমাদের এমন অবিনয়, এমন চাপল্য, এমন মুখরতা। কোনো সন্ধান, কোনো সাধনা না করিয়া, অন্তরের মধ্যে কোনো অভাব অনুভব বা কোনো অভিজ্ঞতা লাভ না করিয়া, এমন অনায়াসে কোনো-এক বিশেষ পক্ষ অবলম্বন-পূর্বক উকিলের মতো নিরতিশয় সূক্ষ্ম তর্ক করিয়া যাইতে পারি। এমন করিয়া কেহ আত্মার খাদ্য-পানীয় আহরণ করে না। ইহা জীবনের সর্বোত্তম ব্যাপার লইয়া বাল্যক্রীড়া মাত্র।

দীর্ঘ সুপ্তির পর রামমোহন রায় আমাদিগকে নিদ্রোত্থিত করিয়া দিয়াছেন। এখন কিছুদিন আমাদের চিত্তবৃত্তির পরিপূর্ণ আন্দোলন হইলে পর তবে আমাদের আত্মার স্বাভাবিক সত্যক্ষুধা সঞ্চার হইবে— তখনি সে যথার্থ সত্যকে সত্যরূপে লাভ করিতে সক্ষম হইবে।

রামমোহন রায় এখন আমাদিগকে সেই সত্যলাভের পথে রাখিয়া দিয়াছেন। প্রস্তুত সত্য মুখে তুলিয়া দেওয়া অপেক্ষা এই সত্যলাভের পথে স্থাপন করা বহুগুণে শ্রেয়। এখন আমরা বহুকাল অলীক জল্পনা, নাস্তিক্যের অভিমান, বৃথা তর্কবিতর্ক এবং বহুবিধ কাল্পনিক যুক্তির মধ্যে অবিশ্রাম নৃত্য করিয়া ফিরিব; ধর্মের নানারূপ ক্রীড়ায় প্রভাত অতিবাহন করিব; অবশেষে সূর্য যখন মধ্যগগনে অধিরোহণ করিবে, যখন অন্তঃকরণ অমৃতসরোবরে সুধাস্নানের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিবে, ক্ষুধিত পিপাসিত অন্তরাত্মা তখন দেখিতে পাইবে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তর্ক বিস্তার করিয়া শান্তি বৈ পরিতৃপ্তি নাই— তখন যথার্থ অনুসন্ধান পড়িয়া যাইবে এবং যতক্ষণ আত্মার যথার্থ খাদ্য-পানীয় না পাইব ততক্ষণ আপনাকে বৃথা বাক্যের ছলনায় ভুলাইয়া রাখিতে পারিব না। তখন রামমোহন রায় আত্মার স্বাধীন চেষ্টার যে রাজপথ বাঙালিকে নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন সেই পথযাত্রা সার্থক হইবে এবং তখন রামমোহন রায়ের সেই শকট আপন গম্যস্থানে আত্মার বিদ্যামন্দিরে আমাদিগকে উত্তীর্ণ করিয়া দিবে।

রামমোহন রায় তাঁহার যজুর্বেদীয় কঠোপনিষদের বঙ্গানুবাদের ভূমিকায় যে প্রার্থনা করিয়াছেন আমরাও সেই প্রার্থনা করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করি—

'হে অন্তর্যামিন্, পরমেশ্বর, আমাদিগ্যে আত্মার অন্বেষণ হইতে বহির্মুখ না রাখিয়া যাহাতে তোমাকে এক অদ্বিতীয় অতীন্দ্রিয় সর্বব্যাপী এবং সর্বনিয়ন্তা করিয়া দৃঢ়রূপে আমরণান্ত জানি এমৎ অনুগ্রহ করো ইতি। ওঁ তৎসৎ।'

ভারতী

কার্তিক ১৩০৩

শিক্ষা

ছাত্রদের নীতিশিক্ষা

আজকাল আমাদের ছাত্রবৃন্দ নীতিশিক্ষা লইয়া অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। কমিটি, বক্তৃতা আর চটি বইয়ের এত ছড়াছড়ি আরম্ভ হইয়াছে যে, এই কয়টি উপাদানের মাহাত্ম্যে নীতির উৎকর্ষসাধন হইবার সম্ভাবনা থাকিলে অনতিবিলম্বে আজকালকার বালকগণ এক-একটি ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির রূপে অভিব্যক্ত হইবে এরূপ আশা করা যাইতে পারে; আর যদি এই সুফল ফলিতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হয় তো সে কেবল ছাত্রচরিত্রে নীতির অভাবের আধিক্যবশত, চটি বইগুলার ব্যর্থতাবশত নয়।

ছাত্রদের নীতি লইয়া যে প্রকার আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে সহজে মনে হইতে পারে যে, হঠাৎ বুঝি এ দেশের যুবাদের মধ্যে দুর্নীতির এত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে যে, আমরা সকলে মিলিয়া 'জন্ দি ব্যাপ্‌টিস্ট' না সাজিলে আর চলে না। লেফ্‌টেনেন্ট গবর্নর সার্কুলার জারি করিতেছেন, নন্-পোলিটিকাল স্বদেশহিতৈষীরা কমিটি করিতেছেন, কোনো কোনো কলেজের প্রিন্সিপাল 'মোরালিটি'তে পরীক্ষা প্রচলিত করাইবার চেষ্টায় আছেন, আর অনেকেই নিজের নিজের সাধ্যমতো 'মর‍্যাল টেক্স্‌ট্‌বুক্' প্রস্তুত করিতে ব্যস্ত আছেন।

ব্যাপারটা দেখিয়া একটু হুজুকের মতন মনে হয়। শুদ্ধমাত্র 'মর‍্যাল টেক্স্‌ট্‌বুক' পড়াইয়া নৈতিক উন্নতিসাধন করা যায় এ কথা যদি কেহ বিশ্বাস করেন, তাহা হইলে এ প্রকার অসীম বিশ্বাসকে সকৌতুকে প্রশংসা করা ছাড়া আমি আর কিছু বলিতে চাহি না। এরকম বিশ্বাসে পর্বত নড়ানো যায়, দুর্নীতি তো সামান্য কথা। 'চুরি করা মহাপাপ,' 'কদাচ মিথ্যা কথা বলিয়ো না' এইপ্রকার বাঁধি বোল দ্বারা যদি মানুষের মনকে অন্যায় কার্য হইতে নিবৃত্ত করা যাইতে পারিত তাহা হইলে তো ভাবনাই ছিল না। এ-সব কথা মান্ধাতার এবং তৎপূর্বকাল হইতেই প্রচলিত; ইহার জন্য নূতন করিয়া টেক্স্‌ট্ বুক ছাপাইবার প্রয়োজন নাই।

দুই-একটি টেক্স্‌ট্‌বুক দেখিয়া মনে হয় যেন বালকদের নীতিশিক্ষার জন্য নীতি শব্দটা একটি বিশেষ সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহার করাই আবশ্যক। আমাদের ছাত্রদের চরিত্র কি এই বিষয়ে এতই খারাপ যে, এই একটিমাত্র বিষয় লইয়াই এত বেশি আলোচনা করা দরকার? রাজসাহী কলেজের কোনো একজন প্রোফেসর 'ইন্দ্রিয়-সংযম' নামক এমন একখানি গ্রন্থ বাহির করিয়াছেন যে, আমি তো ওরকম পুস্তক বালকদের হস্তে দিতে সংকোচ বোধ করি। বালকবালিকা ও মহিলাদের পাঠ্য মাসিকপত্রে এরকম পুস্তকের সম্যক সমালোচনা করা অসম্ভব।

একটিমাত্র বিষয় অনেক দিক হইতে অনেক রকমে নাড়াচাড়া করিয়া প্রোফেসর মহাশয় দেখাইবার মধ্যে দেখাইয়াছেন যে, কতকগুলি প্রবৃত্তিকে সকলেই দূষণীয় জ্ঞান করে। তিনি কি মনে করেন যে, যাহারা সমাজের ও আত্মীয়স্বজনের মত উপেক্ষা করিয়া গোপনে দূষণীয় কার্যে রত থাকে তাহারা চটি বইটি পড়িবামাত্র চরিত্রসংশোধনের নিমিত্ত একান্ত উৎসুক হইয়া উঠিবে? আর যাহাদের এ-সকল প্রবৃত্তি নাই, তাহাদের নিকট এ-সকল বিষয় আলোচনা করা কি সংগত কিংবা প্রয়োজনীয়? এই বইখানি আবার রাজসাহী কলেজের নিয়ম অনুসারে সকল ছাত্রই পড়িতে ও শুধু পড়িতে নয় কিনিতে বাধ্য।

আমার কোনো এক তীক্ষ্ণ-জিহ্ব বন্ধু তাঁহার এক বক্তৃতার মধ্যে বলিয়াছিলেন, আজকাল নীতিশিক্ষার অর্থ দুইটি মাত্র : ১. রাজকর্মচারীদিগকে সেলাম করা এবং ২. সংস্কৃত কাব্যের কোনো কোনো বর্ণনা ছাঁটিয়া দেওয়া। প্রথমটি কলেজে কিংবা স্কুলে শিখাইবার কোনো প্রয়োজন নাই, স্কুল ছাড়িয়া একবার উমেদারী ধরিলেই শিক্ষাটি আপনা হইতেই আসিয়া পড়িবে। সংস্কৃত কাব্যের কোনো কোনো বর্ণনা ছাঁটিয়া দেওয়া কোনো কোনো সময়ে আবশ্যক হইতে পারে, কিন্তু

নিদানপক্ষে সে বর্ণনাগুলা তবু তো কবিতা বটে। এ-সব প্রসঙ্গ কাব্য হইতে ছাঁটিয়া দিয়া মর‍্যাল টেক্সট্‌বুক-এ নীরস শুষ্কভাবে আলোচনা করিবার প্রয়োজন দেখি না। বালকদের পাঠ্যপুস্তকে এরকম পাঁক লইয়া ঘাঁটাঘাঁটি করা আমার কাছে তো অত্যন্ত কুৎসিত মনে হয়।

নিঃসন্দেহ নীতিশিক্ষা দিবার ইচ্ছা ও চেষ্টা সর্বতোভাবেই প্রশংসনীয়। শুধু আমার বক্তব্য এই যে, কতকগুলি বাঁধি বোল দ্বারা এ কার্য সম্পন্ন হইবার কোনো সম্ভাবনা নাই। যাহাকে ইংরাজিতে 'কপি-বুক মোরালিটি' বলে, তাহার দ্বারা এ পর্যন্ত কাহারও চরিত্র সংশোধন হইতে দেখা যায় নাই। নীতিগ্রন্থে শুধু বলিয়া দেয় যে, এটা পাপ, ওটা পুণ্য; ইহা পাপ-পুণ্যের একটা ক্যাটালগস্বরূপ। কোন্‌টা ন্যায়, কোন্‌টা অন্যায় ইহা চলনসইরকম জানিবার নিমিত্ত ক্যাটালগের আবশ্যক করে না। অজ্ঞাত পাপ পৃথিবীতে অল্পই আছে। গুরুতর অন্যায় কার্যগুলা সকলেই অন্যায় বলিয়া জানে, এমন-কি, ব্যবসায়ী চোরেরাও চুরি করাটাকে নৈতিক কার্য বলিয়া বিবেচনা করে না।

হিন্দুশাস্ত্রানুসারে কতকগুলি কার্য, জ্ঞানেই হউক বা অজ্ঞানেই হউক, করিলেই পাপ। যেখানে শাস্ত্রে লেখা আছে যে, দক্ষিণমুখী হইয়া বসিতে হইবে, সে স্থলে উত্তর দিকে মুখ করিয়া বসিলে হিন্দুমতে পাপ হইতে পারে এবং এ কথাটা সকলেও নাও জানিতে পারে। কিন্তু এ প্রকার পাপ-পুণ্য আপাতত আলোচ্য নহে। বালকদিগকে নীতিশিক্ষা দিবার নিমিত্ত গ্রন্থে যে-সব অন্যায় কার্য উল্লেখ করা যায়, কিংবা যাইতে পারে, তাহার মধ্যে কোনোটাকে বোধ হয় কাহারও ভ্রমবশত ন্যায় কার্য বলিয়া ভাবিবার সম্ভাবনা নাই।

নীতিশিক্ষার প্রণালী স্থির করিবার পূর্বে নীতি কী প্রকার ভিত্তির উপর স্থাপিত ইহা নির্ণয় করা আবশ্যক। দেয়াল গাঁথিতে আরম্ভ করিবার পূর্বে, বুনিয়াদটা কী রকম, মালমসলা কী রকম এবং কী প্রকারে গাঁথিলে দেয়ালটা সোজা হইয়া থাকিবে ও পড়িয়া যাইবে না, এই-সব কথা ভাবিয়া লওয়াই ভালো। চরিত্রের দোষ দূর করিবার চেষ্টার পূর্বে দোষের কারণটা অনুসন্ধান করা যুক্তিসংগত। রোগের হেতু না জানিয়া চিকিৎসা করিতে বসিলে বিপরীত ফল হইবার সম্ভাবনা।

মানবহৃদয়ে সুখস্পৃহাই একমাত্র চালক-শক্তি। ইচ্ছা করিয়া কেহ কখনো দুঃখ সহ্য করে না। কথাটা শুনিবামাত্রই অনেকে তাড়াতাড়ি প্রতিবাদ করিতে উঠিবেন, কিন্তু একটু বুঝাইয়া বলি। কর্তব্যপালনের জন্য অনেক সময় কষ্ট সহ্য করিতে হয় বটে, কিন্তু কর্তব্যপালনেই আমার যে আন্তরিক সুখ হয়, সেই সুখ ওই কষ্ট অপেক্ষা বলবান বলিয়া, কিংবা পরকালে অধিক পরিমাণে সুখ পাইবার অথবা ততোধিক দুঃখ এড়াইবার আশায় আমরা কর্তব্যের অনুরোধে কষ্ট সহ্য করিয়া থাকি। এ স্থলে আমি ফিলজফির নিগূঢ় তর্ক তুলিতে চাহি না; কিন্তু সকলেই বোধ হয় নিদানপক্ষে এ কথাটা স্বীকার করিবেন যে, লোকে সুখের প্রলোভনেই অন্যায় পথ অবলম্বন করে, এবং কর্তব্যের প্রতি আন্তরিক টানই এই প্রলোভন অতিক্রম করিবার একমাত্র উপায়।

মানুষকে অন্তরে বাহিরে কর্তব্যের পথে রাখিবার একটি সহজ উপায় ধর্ম। কিন্তু এ স্থলে ধর্মের তর্ক তুলিতে চাহি না ও তুলিবার প্রয়োজনও নাই। আমাদের তো এ পথ বন্ধ। শিক্ষকদের উপর নীতিশিক্ষা দিবারই হুকুম জারি হইয়াছে, ধর্মশিক্ষা নিষেধ। তাহার উপর বাড়িতেও যে বড়ো একটা ধর্মশিক্ষা হয় তা নয়। নব্যশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে কেহ কেহ প্রকাশ্য 'আগ্‌নাস্তিক,' আর বাকির মধ্যে বেশি ভাগ্‌ নামে হিন্দু, কাজে কী তা বলা কঠিন। অতএব, ধর্ম অবলম্বন করিয়া নীতিশিক্ষা দিবার কথা আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন।

নীতিশিক্ষার আর-এক সহজ উপায় আইন-অনুযায়ী দণ্ডের কিংবা সামাজিক নিন্দার ভয় দেখানো। বুদ্ধিমানের নিকট এইপ্রকার নীতিশিক্ষার একমাত্র অর্থ ধরা পড়িয়ো না। আমাদের সমাজের আবার এমন অবস্থা যে, নীচজাতিকে স্পর্শ করিলে তোমাকে অবিলম্বে সমাজচ্যুত হইতে হইবে, কিন্তু শঠতা করো, প্রবঞ্চনা করো, মিথ্যা কথা বলো, মাতাল হও, কুৎসিত আমোদ-আহ্লাদে জীবন যাপন করো, সমাজ এ-সমস্ত অম্লানবদনে হজম করিয়া লইয়া তোমাকে সাদরে

নিমন্ত্রণ করিবে, এবং যদি উত্তম কুলীন হও ও সেইসঙ্গে কিঞ্চিৎ সম্পত্তি থাকে তো তোমাকে কন্যাদান করিবার নিমিত্ত আগ্রহ প্রকাশ করিবে। এমনও শোনা গিয়াছে যে, কারাদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিকে সমাজে লওয়া সম্বন্ধে এই একটিমাত্র আপত্তি কোনো কোনো স্থানে হইয়াছিল যে, জেলের মধ্যে পান-আহারের বন্দোবস্তে জাতিভেদটা নিখুঁত বজায় থাকে কি না সন্দেহ! এইপ্রকার সমাজের নিন্দার মূল্য লইয়া বাক্যব্যয় করিবার প্রয়োজন নাই।

মনুষ্যস্বভাব, বিশেষত বাল-স্বভাব অনুকরণশীল ও প্রশংসাপ্রিয়। অল্পবয়সে অন্যের, বিশেষত গুরুজনের ও প্রিয়জনের দৃষ্টান্ত ও তাঁহাদের প্রশংসা ও নিন্দা দ্বারা যে-সকল সংস্কার মনে বদ্ধমূল হয়, বস্তুত সেই-সব সংস্কার দ্বারাই আমাদের জীবন চালিত হয়। কিন্তু ছেলেরা বাড়িতে যে-সব দৃষ্টান্ত দেখে, তাহা হইতে নৈতিক উন্নতিসাধনের কোনোই আশা নাই। ছেলে স্কুলে শুষ্ক নীরস নীতিগ্রন্থে পড়িয়া আসিল যে, মিথ্যা কথা বলা অত্যন্ত নীতিবিরুদ্ধ; এবং বাড়ি আসিয়া দেখিল যে, তাহার বাপ, ভাই, জ্যাঠা, খুড়ো, সকলেই মুসলমান বাবুর্চির রান্না দ্বিপদ চতুষ্পদ প্রভৃতি সর্বপ্রকার জীবের মাংস গোপনে বিশেষ তৃপ্তির সহিত ভোজন করিয়া বাহিরে এ প্রকার আচরণ করিতেছেন যেন কখনো নিষিদ্ধ দ্রব্য আহার করেন না, এবং প্রয়োজন হইলে এ বিষয়ে স্পষ্ট মিথ্যা কথা বলিতেও বিন্দুমাত্র সংকুচিত হইতেছেন না। সেই স্থানে আবার যদি সনাতন হিন্দুধর্ম রক্ষার নিমিত্ত ধর্মসভা স্থাপিত হইয়া থাকে তো সেই বালক দেখিবে যে, তাহার অখাদ্য-ভোজী বাপ, ভাই, জ্যাঠা, খুড়ো সকলেই এই ধর্মসভার সভ্য; এবং ধর্মসভার নিয়মাবলীর মধ্যে এমন নিয়মও দেখিবে যে, যাঁহারা ‘প্রকাশ্য’ খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে কোনোরূপ অবৈধ আচরণ করেন, তাঁহারা সমাজচ্যুত হইবেন। (কোনো সরলমতি পাঠক কি শুনিয়া আশ্চর্য হইবেন যে, এই উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এই বঙ্গদেশে এইরূপ ধর্মসভার ও এইরূপ নিয়মের অস্তিত্ব আমার কল্পনাজাত নহে?) বালকটি নিতান্ত নির্বোধ হইলেও এ কথা বুঝিতে বিলম্ব হইবে না যে, উপরোক্ত নিয়মটির একমাত্র অর্থ সম্ভব— যাহা করিতে হয় লুকাইয়া করো; প্রয়োজন হইলে মিথ্যা কথা বলিয়ো, আমরা জানিয়া-শুনিয়াও চোখ-কান বুজিয়া থাকিব, কিছুই বলিব না; কিন্তু সাবধান, সত্য কথা বলিয়ো না, তাহা হইলেই তোমার সর্বনাশ। এই প্রকাণ্ড জীবন্ত মিথ্যার মধ্যে বাস করিয়া কি এই বালকের কখনো সত্যের প্রতি আন্তরিক নিষ্ঠা জন্মিতে পারে?

দৃষ্টান্ত চুলায় যাক, উপদেশ দ্বারাও যে, বাড়িতে কোনোরূপ নীতিশিক্ষা হয় তাও নয়। বাড়িতে যতগুলি পিতৃতুল্য গুরুজন আছেন (এবং বয়োজ্যেষ্ঠ সকলেই এই শ্রেণীভুক্ত) তাঁহাদের সহিত ছেলেদের গৃহস্থের সহিত চোরের সম্পর্ক। ছেলেদের হৃদয় পর্যন্ত পৌঁছাইতে তাঁহারা চেষ্টাও করেন না পৌঁছানও না। ছেলেরা বোঝে যে, এই-সব পিতৃতুল্য গুরুজন কেবল কারণে অকারণে ধমকাইবার নিমিত্ত ও ‘যা, যা, পড়্‌গে যা’ বলিয়া তাড়া দিবার নিমিত্তই সৃষ্ট হইয়াছেন। তাঁহাদের ভালোবাসা, স্ফূর্তি, উচ্ছ্বাস, আনন্দ সে স্থানে ফুটিবার নহে। গুরুজনের প্রশংসাটা নিতান্ত বিরল বলিয়া ছেলেদের হৃদয় পর্যন্ত পৌঁছাইতে পারে বটে, কিন্তু অমিশ্র প্রশংসা গুরুজনের নিকট পাওয়াই দুষ্কর। তাঁহারা আবার ছেলেদের নিকট হইতে এত তফাত যে, তাঁহাদের ভর্ৎসনা বা নিন্দা ছেলেদের মনে লেশমাত্র অঙ্কিত হইতে পারে না, তা ছাড়া তাঁহারা তো চিরকালই ভর্ৎসনা করিয়া থাকেন, এই তো তাঁহাদের কাজ। বকুনিটা খাবার সময় ছেলেদের মনে একটু অসোয়াস্তির ভাব আসে বটে, কিন্তু সেটা অন্যায় করিয়াছে বলিয়া নয়, বকুনি খাইতেছে বলিয়া, আর প্রহারের আশঙ্কায়।

বাড়ির ভিতরে মা পুত্রকে পিতৃশাসন হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত নিজে মিথ্যা বলিতেছেন ও মিথ্যা শিখাইতেছেন। ছেলেরা বাড়ির ভিতর যায় খাইবার জন্য ও আদর পাইবার জন্য। বাড়ির ভিতরটা নীতি কিংবা অন্য কোনো প্রকার শিক্ষার স্থান নহে। অশিক্ষিতা মাতারা, বালিকা বয়সেই মাতৃত্বভার স্কন্ধে লইয়া কীই বা শিক্ষা দিবেন! তাঁহারা কেবল ভালোবাসিতে পারেন, এবং তাঁহাদের কাছে অন্ধ ভালোবাসা ছাড়া আর কিছু প্রত্যাশা করাও যায় না।

নীতিশিক্ষার উচিত উপায় হচ্ছে, কর্তব্য ও পবিত্রতার সৌন্দর্য বাল্যাবস্থায় মনের মধ্যে ফুটাইয়া তোলা। পবিত্রতা, সত্য, দয়া, অহিংসা, ইত্যাদিকে যদি হৃদয়মধ্যে সংস্কাররূপে বদ্ধমূল করিতে চাহ তো এই-সব গুণের সৌন্দর্য পরিস্ফুট করিয়া দেখাইতে হইবে এবং তাহা হইলেই মন আপনা হইতেই এদিকে আকৃষ্ট হইবে। অপবিত্রতা, রাগ, দ্বেষ, হিংসা যে কতদূর কুৎসিত তাহাই দেখাইতে হইবে। এবং এমন করিয়া চরিত্র গঠন করিতে হইবে যে, আমরা যেমন অপরিষ্কার কিংবা বীভৎস কোনো পদার্থ স্পর্শ করার কল্পনা করিতেও সংকোচ ও ঘৃণা অনুভব করি, তেমনি অপবিত্রতার সংস্পর্শ কল্পনা করিতেও ঘৃণা অনুভব করিব ও অন্যায় কার্য করিতে সংকোচ বোধ করিব। আমরা যেমন ছেলেদের কাদায় লুটাইবার সুখ পরিহার করিয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিবার সুখ ভোগ করিতে শিক্ষা দিই, সেই প্রকারে তাহাদিগকে অপবিত্র ও অন্যায় কার্য পরিহার করিতে শিক্ষা দেওয়া উচিত। কিন্তু এ প্রকার শিক্ষা দু-চারিটি শুষ্ক নীরস নীতিবচনের কর্ম নহে; ইহা ঘরে ঘরে পদে পদে সহস্র ছোটোখাটো খুঁটিনাটির উপর দৃষ্টি রাখার কর্ম, ইহা বাল-হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া তাহাদের সুখদুঃখ, কষ্ট আহ্লাদ সহানুভূতির সহিত বুঝিয়া চলার কর্ম। নীতিবচনের বাঁধি বোলের মধ্যে পবিত্রতা ও ন্যায়ের সৌন্দর্য দেখিতে পাওয়া যায় না, যদি পবিত্রতা কতদূর সুন্দর ও অপবিত্রতা কতদূর কুৎসিত ইহা হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করাইতে চাহ তো বরং ভালো নভেল ও কবিতা পড়িতে দাও। মর‍্যাল টেক্স্ট্‌বুক-এর সহিত হৃদয়ের কোনোই সংস্রব নাই।

আমাদের নীতিজ্ঞেরা আমোদ-আহ্লাদের উপর বড়োই নারাজ। কিন্তু আমি বলি যে, যদি অবৈধ অপবিত্র আমোদ হইতে মনকে নিবৃত্ত করিতে চাও তো তাহার পরিবর্তে বৈধ আমোদ-আহ্লাদটা নিতান্ত প্রয়োজনীয়, সমাজে যদি বৈধ আমোদ-আহ্লাদের স্থান না রাখ তো লোকে স্বভাবত সমাজের বাহিরে অবৈধ আমোদ-আহ্লাদ অন্বেষণ করিবে, সহস্র নীতিজ্ঞানে আমোদ-আহ্লাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণ হইবে না। আমাদের সমাজের অবস্থা এ রকম যে, বাড়ি অত্যন্ত নিরানন্দ, এবং সব সময়ে শান্তির আলয়ও নয়; কাজেই ক্রীড়া কৌতুক ও বিশ্রামের জন্য লোকের বাধ্য হইয়া অন্যত্র যাইতে হয়। পেট্রিয়টরা শুনিয়া রাগ করিবেন, কিন্তু আমার মনে হয় যে, ইংলন্ডের ন্যায় আমাদের 'হোম লাইফ্‌' থাকিলে ভালোই হইত।

সাধনা
মাঘ ১২৯৯

ছাত্রবৃত্তির পাঠ্যপুস্তক

ভোজনের মাত্রা পরিপাকশক্তির সীমা ছাড়াইয়া গেলে তাহাতে লাভ নাই বরঞ্চ ক্ষতি, এ কথা অত্যন্ত পুরাতন। এমন-কি, স্বাস্থ্যতত্ত্ববিদ্‌দিগের মতে একেবারে ষোলো আনা ক্ষুধা মিটাইয়া আহার করাও ভালো নহে, দুই-এক আনা হাতে রাখাও কর্তব্য। মানসিক ভোজন সম্বন্ধেও এই নিয়ম খাটে এ কথাও নূতন নহে।

আমাদের এই দরিদ্র দেশের ছেলেদের আহারের পরিমাণ যেমনই হৌক, ইংরাজি শিক্ষার দায়ে পড়িয়া পড়াশুনাটা যে নিরতিশয় গুরুতর হইয়া পড়িয়াছে, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। ডাক্তর ডেলি সাহেব কিছুকাল বাঙালি ছাত্রদের শিক্ষকতা করিয়া স্টেট্‌স্‌ম্যান্‌পত্রে তাঁহার যে অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা হইতে এই বলপূর্বক শিক্ষা গলাধঃকরণের হাস্যজনক, অথচ সুগভীর শোচনীয় ফল প্রমাণিত হইতেছে। অনেক বাঙালি ডেলি সাহেবের উক্তপত্র হইতে শিক্ষাগ্রহণের চেষ্টা না করিয়া অযথা রোষ প্রকাশ করিয়াছেন। অভিমান, দুর্বলহৃদয় বাঙালিচরিত্রের একটা প্রধান লক্ষণ। হিতৈষীদের নিকট হইতেও তিলমাত্র আঘাত আমরা সহ্য

করিতে পারি না।

অন্তত এন্ট্রেন্স ক্লাস পর্যন্ত শিক্ষণীয় বিষয়গুলি যদি বাংলায় অধীত হয় তবে শিশুপীড়ন অনেকটা দূর হইতে পারে। কিন্তু কেহ কেহ বলেন, ছাত্রবৃত্তি দিয়া যাহারা এন্ট্রেন্স পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হয় তাহারা ভালো ফল প্রাপ্ত হয় না। প্রথমত, তাঁহাদের কথার সত্যতাসম্বন্ধে উপযুক্তরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় নাই, দ্বিতীয়ত, ছাত্রবৃত্তি পর্যন্ত যেরূপ ভাবে শিক্ষা দেওয়া হয় তাহাতে শিক্ষার উদ্দেশ্য সফল না হইবারই কথা। এগারো-বারো বৎসর বয়সের মধ্যে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার্থীদিগকে যে পরিমাণে বিষয় শিক্ষা করিতে হয়, এমন বোধ হয় আর কোথাও নাই। নিম্নে আমরা দেশীয় ভাষা-ভিত্তিমূলক এন্ট্রেন্স স্কুলের সহিত সেন্ট জেভিয়ার কলেজাধীন এন্ট্রেন্স স্কুলের শ্রেণীপর্যায় অনুসারে পাঠ্যপুস্তকের তালিকা পাশাপাশি বিন্যাস করিলাম। প্রথমোক্ত স্কুলে এন্ট্রেন্স পর্যন্ত নয় শ্রেণী, দ্বিতীয় স্কুলে ইন্‌ফ্যান্ট ক্লাস বাদ দিলে আট শ্রেণী। অতএব সেন্ট জেভিয়রের ইন্‌ফ্যান্ট ক্লাসকে আমরা প্রথমোক্তস্কুলের নবম শ্রেণীর সহিত তুলনা করিলাম। যদি ষোলোবৎসর বয়সকে এন্ট্রেন্স দিবার উপযুক্ত বয়স বলিয়া ধরা যায় তবে সাত বৎসর বয়সের সময় স্কুলের পাঠ আরম্ভ করা হইতেছে বলিয়া ধরিতে হইবে।

বাংলা স্কুল

নবম শ্রেণী

(৭ বৎসর বয়স)

ইংরাজি। ১। প্যারি সরকারের ফার্স্ট বুক।
২। Modern spelling book ; Word lessons.
বাংলা। ৩। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ে -কৃত বর্ণপরিচয়।
৪। শিশুশিক্ষা দ্বিতীয় ভাগ।
৫। শিশুশিক্ষা তৃতীয় ভাগ।
গণিত। ৬। পাটিগণিত।
৭। ধারাপাত।
ভূগোল। ৮। মৌখিক।

সেন্ট জেভিয়র স্কুল

ইন্‌ফ্যান্ট ক্লাস

(৭ বৎসর বয়স)

ইংরাজি। ১। Longman's Infant Reader.
২। Longman's Second Primer.
গণিত। ৩। একশত পর্যন্ত গণনা। যোগ, বিয়োগ এবং গুণ।

৮ম শ্রেণী

(৮ বৎসর বয়স)

ইংরাজি। ১। প্যারি সরকারের সেকেন্ড বুক।
২। Modern spelling book.
৩। গঙ্গাধরবাবুর Grammar and Composition.
বাংলা। ৪। চন্দ্রনাথবাবুর নূতন পাঠ।
৫। চিরঞ্জীব শর্মার বাল্যসখা।
৬। তারিণীবাবুর বাংলা ব্যাকরণ।

গণিত। ৭। পাটিগণিত।
৮। শুভঙ্করী।
৯। মানসাঙ্ক।
ইতিহাস। ১০। রাজকৃষ্ণবাবুর বাংলার ইতিহাস।
ভূগোল। ১১। শশীবাবুর ভূগোল পরিচয়।
বিজ্ঞান। ১২। কানিংহ্যামের স্বাস্থ্যের উপায়।

ফার্স্ট স্ট্যান্ডার্ড
(৮ বৎসর বয়স)

ইংরাজি। ১। Longman's New Reader. No. 1
২। Arithmetical Primer. No. 1

৭ম শ্রেণী
(৯ বৎসর বয়স)

ইংরাজি। ১। Royal Reader. No. 2
২। Child's Grammar and Composition.
বাংলা। ৩। সাহিত্যপ্রসঙ্গ।
৪। পদ্যপাঠ দ্বিতীয় ভাগ।
৫। বাংলা ব্যাকরণ।
গণিত। ৬। পাটিগণিত।
৭। শুভঙ্করী।
৮। মানসাঙ্ক।
৯। সরল পরিমিতি।
১০। ব্রহ্মমোহনের জ্যামিতি।
ইতিহাস। ১১। বাংলার ইতিহাস।
১২। ভূগোল-পরিচয়।
১৩। বঙ্গদেশ ও আসামের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।
বিজ্ঞান। ১৪। কৃষি সোপান।
১৫। স্বাস্থ্যের উপায়।
১৬। ভারতচন্দ্র-কৃত স্বাস্থ্যশিক্ষা।

সেকেন্ড স্ট্যান্ডার্ড
(৯ বৎসর বয়স)

ইংরাজি। ১। Longman's New Reader. No. 2.
২। Arithmetical Primer. No. 1.
ইতিহাস। ৩। বাইবেল ইতিহাস।

৬ষ্ঠ শ্রেণী
(১০ বৎসর বয়স)

ইংরাজি। ১। Royal Readers. No. 3
২। McLeod's Grammar
৩। Stapley's Exercises
বাংলা। ৪। সীতা।

৫। কবিগাথা।
৬। সাহিত্য প্রবেশ ব্যাকরণ।
গণিত। ৭। পাটিগণিত।
৮। শুভঙ্করী।
৯। সরল পরিমিতি।
১০। জ্যামিতি।
ইতিহাস। ১১। ভারতবর্ষের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।
১২। শশীবাবুর ভূগোল প্রকাশ।
১৩। যোগেশবাবুর প্রাকৃতিক ভূগোল।
বিজ্ঞান। ১৪। সরল পদার্থ বিজ্ঞান।
১৫। কানিংহ্যামের স্বাস্থ্যের উপায়।
১৬। রাধিকাবাবুর স্বাস্থ্যরক্ষা।

থার্ড স্ট্যান্ডার্ড

(১০ বৎসর বয়স)

ইংরাজি। ১। Longman's New Readers. No. 3
২। Arithmetical Primer. No. 2
ইতিহাস। ৩। বাইবেল ইতিহাস।
৪। Stories from English History No. 1.
ভূগোল। ৫। Geographical Primer No. 2

পঞ্চম শ্রেণী

(১১ বৎসর বয়স)

ইংরাজি। ১। Lethbridge's Easy selection.
২। McLeod's Child's Grammar.
৩। Stapley's Exercises.
বাংলা। ৪। প্রবন্ধকুসুম।
৫। সদ্ভাবশতক।
৬। সাহিত্যপ্রবেশ ব্যাকরণ।
৭। রচনা সোপান।
গণিত। ৮। পাটিগণিত।
৯। শুভঙ্করী।
১০। জ্যামিতি।
১১। পরিমিতি।
ইতিহাস। ১২। ইংলন্ডের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।
১৩। ভারতবর্ষের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।
ভূগোল। ১৪। ভূগোল প্রকাশ।
১৫। ভারতবর্ষের বিশেষ বিবরণ।
১৬। প্রাকৃতিক ভূগোল।
বিজ্ঞান। ১৭। সরল প্রাকৃতদর্শন।
১৮। স্বাস্থ্যরক্ষা।
১৯। স্বাস্থ্যের উপায়।

ফোর্থ স্ট্যান্ডার্ড

(১১ বৎসর বয়স)

ইংরাজি।	১।	Longman's New Readers. No. 4.
	২।	Dictionary for conjugation.
	৩।	Arithmetic for beginners.
ইতিহাস।	৪।	বাইব্‌ল্ ইতিহাস।
	৫।	Stories from English History. No. 2
ভূগোল।	৬।	First Geography

এইখানেই বাংলা পড়া শেষ হইল, অতএব আর উর্ধ্বে যাইবার আবশ্যক নাই। ইংরাজি স্কুলে ইংরাজিই মাতৃভাষা, সেখানে অন্যভাষা শিক্ষার প্রয়োজন নাই সেইজন্য তুলনাস্থলে বাংলা স্কুলের পাঠ্য তালিকা হইতে ইংরাজি বহিগুলা বাদ দেওয়া কর্তব্য। তাহা দিয়াও পাঠকেরা দেখিবেন, বাঙালি শিশুর স্কন্ধে কীরূপ বিপরীত বোঝা চাপানো হইয়াছে। অথচ তাহাদের স্বাস্থ্যের প্রতি শিক্ষাবিভাগের কর্তৃপক্ষের এমনি সস্নেহ দৃষ্টিপাত যে, তিনজনের রচিত তিনখানা স্বাস্থ্য-বিষয়ক গ্রন্থ ছাত্রদিগকে মুখস্থ করাইয়া তবে তাঁহারা তৃপ্তিলাভ করিয়াছেন। ওই তিনখানি পুস্তকই যদি উঠাইয়া দেওয়া হয়, তবে সেই পরিমাণে ছাত্রদের স্বাস্থ্যের উন্নতি হইবার সম্ভাবনা। বাংলা স্কুলগ্রন্থকারদিগের প্রতি সানুনয় নিবেদন এই যে, তাঁহারা আর কেহ যেন স্বাস্থ্য সম্বন্ধে আর-একখানা বহি তৈরি করিয়া না বসেন, বরঞ্চ ছাত্রগণের পিতামাতাগণ বর্ষে বর্ষে তাঁহাদের অরচিত গ্রন্থের সম্ভাবিত মূল্য ধরিয়া দিতে পারেন; তাহা হইলেও ডাক্তার খরচটা লাভ থাকে।

যাঁহারা সাধারণ মফস্বল স্কুলপাঠীদিগের নিরতিশয় দারিদ্র্য-সম্বন্ধে কিছুমাত্র অবগত আছেন তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন এইরূপ রাশীকৃত অনাবশ্যক গ্রন্থভারে ছাত্রদিগকে নিপীড়িত করা কীরূপ হৃদয়হীন বিবেচনাহীন নিষ্ঠুরতা। কত ছাত্রকে অর্ধাশনে থাকিয়া পাঠ্যগ্রন্থ সংগ্রহের জন্য ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিতে হয়। এইরূপে নির্বাসনে অনশনে কঠোর পরিশ্রমে বিদেশী খনি হইতে জ্ঞান সংগ্রহে যাহারা বাধ্য তাহাদের ভার যত লঘু, পথ যত সুগম করিয়া দেওয়া যায় ততই দেশের পক্ষে মঙ্গল। অল্পবয়সে শিক্ষার জাঁতায় বাঙালির ছেলের শরীর মন সম্পূর্ণ জীর্ণ নিষ্পেষিত করিয়া দিয়া সমস্ত বঙ্গদেশ ব্যাপিয়া এক হাস্যহীন ক্রীড়াহীন স্বাস্থ্যহীন অকালপক্ব প্রবীণতার অন্ধকার কলিযুগ অবতীর্ণ হইতেছে। দেশের রোগ, বিদেশের শিক্ষা, ঘরের দারিদ্র্য এবং পরের দাসত্ব এই সব-কটায় মিলিয়া আমাদের স্বল্পায়ু জীবনটাকে শোষণ করিতেছে। ইহার উপরে যদি আবার পাঠ্য নির্বাচন সমিতির স্বদেশীয় সভ্যগণও বাঙালির দুরদৃষ্টক্রমে নির্বিচারে বাঙালির ছেলের স্কন্ধে হেয়ার-প্রেস-বিনির্গত সকল প্রকার শুষ্ক বিদ্যার বোঝা চাপাইতে থাকেন তবে আমাদের দেশের দুর্দিন উপস্থিত হইয়াছে বলিতে হইবে।

অনেক ছাত্রবৃত্তিস্কুলে পদার্থবিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য মহেন্দ্রবাবুর গ্রন্থ অবলম্বন করা হইয়াছে; তাহাতে ছেলেদের বিদ্যা প্রায় পূর্ববৎ থাকে এবং পদার্থও শরীরে বড়ো অবশিষ্ট থাকে না। যখন দেখা যায় তিন বৎসর পূর্বে উক্ত গ্রন্থের উনবিংশ সংস্করণ মুদ্রিত হইয়াছে এবং যখন কল্পনা করি অন্তত অষ্টাদশ সহস্র হতভাগ্য বালককে এই গ্রন্থের পাষাণ সোপানের উপর জল হইতে উত্তোলিত মীনশাবকের ন্যায় আছাড় খাইতে ও খাবি খাইতে হইয়াছে, তখন শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। যে-সকল ভীষণ প্রান্তরে প্রাচীনকাল হইতে দস্যুসম্প্রদায় নিরুপায় পান্থদিগের প্রাণসংহার করিয়া আসিয়াছে, সেই অস্থিসংকুল সুবিস্তীর্ণ দুর্গম প্রান্তর দেখিলে হৃদয় যেরূপ ব্যাকুল হয়, এই পদার্থবিদ্যার উনবিংশ সংস্করণ দেখিলেও মনের মধ্যে সেইরূপ করুণামিশ্রিত ভীষণ ভাবের উদ্রেক হইতে থাকে।

মফস্বলের দরিদ্রস্কুলে কীরূপ শিক্ষক নিযুক্ত হইয়া থাকে, এবং সেখানে বিজ্ঞান সহজে

হৃদয়ংগম করাইবার কীরূপ উপকরণ পাওয়া যায় তাহা কাহারও অবিদিত নাই। এমন অবস্থায় যাঁহারা শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যারণ্য মহাশয়ের পদার্থবিদ্যা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার্থীদের জন্য নির্দিষ্ট করিয়াছেন তাঁহারা বিনাপরাধেই শিশুপালবধের জন্য প্রস্তুত। বিশ্বজগতে অনেকগুলি দুর্বোধ বিষয় আছে। যথা, নারিকেলের মতো এমন উপাদেয় ফল শাখাসংস্থানহীন বৃক্ষশিরে পঞ্চাশ হস্ত ঊর্ধ্বে ঝুলাইবার কী উদ্দেশ্য ছিল; হীরকের মতো এমন উজ্জ্বল রত্ন খনিগর্ভে দুর্গম অন্ধকারের মধ্যেই বা নিহিত থাকে কী অভিপ্রায়ে; ধান্য গোধূম যবের জন্য এত শ্রম সহকারে চাষের প্রয়োজন হয় কেন আর কাঁটা গাছগুলা বিনা চেষ্টায় অজস্র উৎপন্ন হইয়া কী উপকার সাধন করে; হিমালয়ের নির্জন শীতপ্রদেশে এত প্রচুর বরফ কী কাজে লাগে অথচ কলিকাতায় বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসের অসহ্য গ্রীষ্মের সময় হঠাৎ বরফের জোগান বন্ধ হইয়া যায় কেন; যখন চোর পালায় তখন হঠাৎ বুদ্ধি বাড়িয়া উঠিয়া ফল কী; গৃহে ফিরিয়া আসিয়া পরদিনে পরিহাসের উত্তর জোগায় কেন;

এবং ছাত্রবৃত্তিস্কুলে শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যারণ্য মহাশয়ের রচিত পদার্থবিজ্ঞান প্রচলিত হইবার কারণ কী?

উপরি-উক্ত কয়টা বিষয়ই দুর্বোধ, কিন্তু পদার্থবিজ্ঞানের ভাষা ও বিষয়বিন্যাস এই-সকল কয়েকটি প্রহেলিকা হইতেই দুর্বোধতর।

এই গ্রন্থখানি শিক্ষক ও ছাত্রদের পক্ষে যে কতদূর নিষ্ঠুর তাহা সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রেই কয়েকপৃষ্ঠা পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন। ছাত্রদের অনেকের মা-বাপ আছে কি না জানি না, কিন্তু শিক্ষাবিভাগ যে তাহাদের মা-বাপ নহেন সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই।

বিলাতে সুকুমারমতি বালকদিগকে সহজে বিজ্ঞানশিক্ষা দিবার বিচিত্র উপায় আছে; তথাপি ইংরাজি ভাষায় প্রথম শিক্ষার্থীদিগের জন্য হক্স্‌লিসাহেবের সম্পাদকতায় যে বৈজ্ঞানিক প্রথম পাঠগুলি রচিত হইয়াছে তাহা কীরূপ আশ্চর্য সরল!— তাহাতে বিজ্ঞান-বিদ্যারণ্যের জটিলতা ও ভাষার দুর্গমতা লেশমাত্র নাই। কারণ, তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য, ছাত্রদিগকে বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া। মুখ্যরূপে ভাষা শিক্ষা দেওয়া যে-সকল গ্রন্থের উদ্দেশ্য তাহাতে ভাষার কৌশল ও কাঠিন্য আবশ্যক হইতে পারে— কিন্তু যে বিজ্ঞান আমাদের দেশের ছাত্রদের পক্ষে সহজেই অত্যন্ত দুরূহ তাহার ভাষা ও বিষয়বিন্যাস যতদূর সম্ভব সহজ করা উচিত, নতুবা ছাত্রদিগের মানসিক শক্তির অন্যায় এবং নির্দয় অপব্যয় সাধন করা হয়। এবং মাঝে হইতে না বুঝিয়া মুখস্থ করিয়া তাহারা ভাষাও শেখে না বিজ্ঞানও শেখে না, কেবল মনকে ক্লান্ত, সময়কে নষ্ট ও শরীরকে ক্লিষ্ট করিয়া অপরাপর শিক্ষার ব্যাঘাত করে মাত্র।

আমরা ছাত্রদিগের শারীরিক ও মানসিক শক্তির এই অন্যায় অপব্যয় নিবারণের উদ্দেশেই এন্ট্রেন্স স্কুলে বাংলা ভাষায় বিষয় শিক্ষা দিতে অনুরোধ করি। এই প্রণালীতে, ছাত্রগণ যে সময় ও শক্তি হাতে পাইবে তাহা ইংরাজি শিক্ষায় প্রয়োগ করিয়া উক্ত ভাষা অনেক ভালো করিয়া শিখিবে সন্দেহ নাই এবং সেইসঙ্গে বিষয়গুলিও সহজে ও সম্পূর্ণতররূপে আয়ত্ত করিতে পারিবে। তাহাদের শরীরও অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইবে এবং মনোবৃত্তির চর্চাও অপেক্ষাকৃত সুসাধ্য ও স্বাভাবিক হইয়া উঠিবে।

সাধনা
ভাদ্র-আশ্বিন ১৩০২

মুসলমান ছাত্রের বাংলা শিক্ষা

গত বৎসর মুসলমান শিক্ষাসম্মিলন উপলক্ষে খ্যাতনামা জমিদার শ্রীযুক্ত সৈয়দ নবাবআলি চৌধুরী মহাশয় বাংলা শিক্ষা সম্বন্ধে একটি উর্দু প্রবন্ধ পাঠ করেন, তাহারই ইংরাজি অনুবাদ সমালোচনার্থে আমাদের নিকট প্রেরিত হইয়াছে।

বাংলা স্কুলে প্রচলিত পাঠ্যপুস্তকগুলি বিশেষরূপে হিন্দুছাত্রদের পাঠোপযোগী করিয়া প্রস্তুত হইয়া থাকে অথচ বাংলার অনেক প্রদেশেই হিন্দু অপেক্ষা মুসলমান প্রজাসংখ্যা অধিক; ইহা লইয়া সৈয়দসাহেব আক্ষেপ করিয়াছেন। বিষয়টি আলোচ্য তাহার সন্দেহ নাই এবং বক্তামহাশয়ের সহিত আমাদের সহানুভূতি আছে।

এরূপ হইবার প্রধান কারণ, এতদিন বিদ্যালয়ে হিন্দু ছাত্রসংখ্যাই অধিক ছিল এবং মুলসমান লেখকগণ বিশুদ্ধ বাংলা সাহিত্য রচনায় অগ্রসর হন নাই।

কিন্তু ক্রমশই মুসলমান ছাত্রসংখ্যা বাড়িয়া চলিয়াছে এবং ভালো বাংলা লিখিতে পারেন এমন মুসলমান লেখকেরও অভাব নাই। অতএব মুসলমান ছাত্রদের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া পাঠ্যপুস্তক রচনার সময় আসিয়াছে।

স্বধর্মের সদুপদেশ এবং স্বজাতীয় সাধুদৃষ্টান্ত মুসলমান বালকের পক্ষে একান্ত আবশ্যক, এ কথা কেহই অস্বীকার করিবেন না। আমরা আরও বলি মুসলমান শাস্ত্র ও সাধুদৃষ্টান্তের সহিত পরিচয় হিন্দু বালকদের শিক্ষার অবশ্যধার্য অঙ্গ হওয়া উচিত।

বাংলাদেশে হিন্দু-মুসলমান যখন ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী, পরস্পরের সুখ-দুঃখ নানা সূত্রে বিজড়িত, একের গৃহে অগ্নি লাগিলে অন্যকে যখন জল আনিতে ছুটাছুটি করিতে হয়, তখন শিশুকাল হইতে সকল বিষয়েই পরস্পরের সম্পূর্ণ পরিচয় থাকা চাই। বাঙালি হিন্দুর ছেলে যদি তাহার প্রতিবেশী মুসলমানের শাস্ত্র ও ইতিহাস এবং মুসলমানের ছেলে তাহার প্রতিবেশী হিন্দু শাস্ত্র ও ইতিহাস অবিকৃতভাবে না জানে তবে সেই অসম্পূর্ণ শিক্ষার দ্বারা তাহারা কেহই আপন জীবনের কর্তব্য ভালো করিয়া পালন করিতে পারিবে না।

অতএব সৈয়দসাহেব বাঙালি মুসলমান বালকের শিক্ষার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া যে-কথা বলিয়াছেন, আমরা বাঙালি হিন্দু বালকের শিক্ষার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ঠিক সেই কথাই বলি— অর্থাৎ বাংলা বিদ্যালয়ে হিন্দু ছেলের পাঠ্যপুস্তকে তাহার স্বদেশীয় নিকটতম প্রতিবেশী মুসলমানদের কোনো কথা না থাকা অন্যায় এবং অসংগত।

ইংরাজি শিক্ষার যেরূপ প্রচলন হইয়াছে, তাহাতে ইংরাজের ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, আচার-বিচার আমাদের কাছে লেশমাত্র অগোচর থাকে না; অথচ তাহারা বহুদূরদেশী এবং মুসলমানরা আমাদের স্বদেশীয়, এবং মুসলমানদের সহিত বহুদিন হইতে আমাদের রীতিনীতি পরিচ্ছদ ভাষা ও শিল্পের আদান-প্রদান চলিয়া আসিয়াছে। অদ্য নূতন ইংরাজি শিক্ষার প্রভাবে আত্মীয়ের মধ্যে প্রতিবেশীর মধ্যে ব্যবধান দাঁড়াইয়া গেলে পরম দুঃখের কারণ হইবে। বাঙালি মুসলমানের সহিত বাঙালি হিন্দুর রক্তের সম্বন্ধ আছে, এ কথা আমরা যেন কখনো না ভুলি।

বাংলায় একটা প্রবাদ আছে 'ঝিকে মারিয়া বউকে শেখানো'। ঝি আপনার বলিয়া তাহাকে দু ঘা মারিলে সয়, বউয়ের গায়ে হাত তোলা সকল সময় নিরাপদ নহে। সৈয়দসাহেব সেই নীতি অবলম্বন করিয়া বাংলা পাঠ্যপুস্তককে তর্জন করিয়াছেন, বোধকরি ইংরাজি পাঠ্যপুস্তকের প্রতি তাঁহার নিগূঢ় লক্ষ্য ছিল। মুসলমান শাস্ত্র ও ইতিহাসের বিকৃত বিবরণ বাংলা বই কোথা হইতে সংগ্রহ করিয়াছে? অস্ত্র হস্তে ধর্মপ্রচার মুসলমানশাস্ত্রের অনুশাসন, এ কথা যদি সত্য না হয় তবে সে অসত্য আমরা শিশুকাল হইতে শিখিলাম কাহার কাছে? হিন্দু ও মুসলমানের ধর্মনীতি ও ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে ইংরাজ লেখক যাহাই লিখিতেছে হিন্দু-মুসলমান ছাত্রগণ কি তাহাই নির্বিচারে

কণ্ঠস্থ করিতেছে না? এবং বাংলা পাঠ্যপুস্তক কি তাহারই প্রতিধ্বনি মাত্র নহে?

সম্প্রদায়গত পক্ষপাতের হাত একেবারে এড়ানো কঠিন। য়ুরোপীয় ইতিহাসের অনেক ঘটনা ও অনেক চরিত্রচিত্র প্রটেস্টান্ট লেখকের হাতে একভাবে এবং রোমান ক্যাথলিক লেখকের হাতে তাহার বিপরীতভাবে বর্ণিত হইয়া থাকে। য়ুরোপে দুই ধর্মসম্প্রদায়ের বিদ্যালয় অনেক স্থলে স্বতন্ত্র, সুতরাং ছাত্রদিগকে স্ব সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধ কথা শিক্ষা করিতে বাধ্য হইতে হয় না। কিন্তু ইংরাজ লেখকের সকল প্রকার ব্যক্তিগত ও জাতিগত সংস্কার আমরা শিরোধার্য করিয়া লইতে বাধ্য, এবং সেই-সকল সংস্কারের বিরুদ্ধে কোনো বাংলা বই রচিত হইলে তাহা কোনো বিদ্যালয়ে প্রচলিত হইবার কোনো সম্ভাবনা থাকে না। ইংরাজ লেখকেরই মত বাংলা বিদ্যালয়ের আদর্শ মত— সেই মত অনুসারে পরীক্ষা দিতে হইবে, নতুবা পরীক্ষার নম্বরেই দেখা যাইবে সমস্ত শিক্ষা ব্যর্থ হইয়াছে।

অনেক আধুনিক বাঙালি ঐতিহাসিক মুসলমান রাজত্বের ইতিহাসকে ইংরাজ-তূলিকার কালিমা হইতে মুক্ত করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। অক্ষয়বাবু তাঁহার সিরাজচরিতে অন্ধকূপহত্যাকে প্রায় অপ্রমাণ করিতে কৃতকার্য হইয়াছেন কিন্তু প্রমাণ যতই অমূলক বা তুচ্ছ হউক পরীক্ষাতিতীর্ষু বালক মাত্রই অন্ধকূপহত্যা ব্যাপারকে অসন্দিগ্ধ সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য।

অতএব বক্তামহাশয়ের বিবেচনা করিয়া দেখা কর্তব্য, পাঠ্যপুস্তকের মতামত সম্বন্ধে আমরা কঠিন শৃঙ্খলে আবদ্ধ। যতদিন না স্বাধীন-গবেষণা ও সুযুক্তিপূর্ণ বিচারের দ্বারা আমরা ইংরাজ সাহিত্যসমাজে প্রচলিত ঐতিহাসিক কুসংস্কারগুলিকে বিপর্যস্ত করিয়া দিতে পারি ততদিন আমাদের নালিশ গ্রাহ্য হইবে না। আমরা হিন্দু ও মুসলমান লেখকগণকে ইতিহাস-সংস্কারব্রত গ্রহণ করিতে আহ্বান করি। শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ন্যায় দুই-একজন হিন্দু লেখক এই দুরূহ সাধনায় রত আছেন, কিন্তু ইতিহাসের উপকরণমালা প্রায়ই পার্সি উর্দুভাষায় আবদ্ধ, অতএব মুসলমান লেখকগণের সহায়তা নিতান্তই প্রয়োজনীয়।

সৈয়দসাহেব বাংলা সাহিত্য হইতে মুসলমান-বিদ্বেষের যে উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন সেগুলি আমরা অনাবশ্যক ও অসংগত জ্ঞান করি। বঙ্কিমবাবুর মতো লেখকের গ্রন্থে মুসলমান-বিদ্বেষের পরিচয় পাইলে দুঃখিত হইতে হয় কিন্তু সাহিত্য হইতে ব্যক্তিগত সংস্কার সম্পূর্ণ দূর করা অসম্ভব। থ্যাকারের গ্রন্থে ফরাসি-বিদ্বেষ পদে পদে দেখা যায়, কিন্তু ইংরাজি সাহিত্যপ্রিয় ফরাসি পাঠক থ্যাকারের গ্রন্থকে নির্বাসিত করিতে পারেন না। আইরিশদের প্রতি ইংরাজের বিরাগ অনেক ইংরাজ সুলেখকের গ্রন্থে পরিস্ফুট হইয়া উঠে। এ-সমস্ত তর্ক-বিতর্ক ও সমালোচনার বিষয়। বঙ্কিমবাবুর গ্রন্থে যাহা নিন্দার্হ তাহা সমালোচক-কর্তৃক লাঞ্ছিত হউক, কিন্তু নিন্দার বিষয় হইতে কোনো সাহিত্যকে রক্ষা করা অসাধ্য। মুসলমান সুলেখকগণ যখন বঙ্গ সাহিত্য রচনায় অধিক পরিমাণে প্রবৃত্ত হইবেন তখন তাঁহারা কেহই যে হিন্দু পাঠকদিগকে কোনোরূপ ক্ষোভ দিবেন না এমন আমরা আশা করিতে পারি না।

ভারতী
কার্তিক ১৩০৭

সমাজ

বাঙালির আশা ও নৈরাশ্য

সভ্যতার প্রথম অবস্থায় ধনের আবশ্যক। যত দিন মনুষ্য আহারান্বেষণে ব্যস্ত থাকে, তত দিন তাহারা জ্ঞান অর্জনে যত্নশীল থাকে না। উর্বর দেশেই সভ্যতার প্রথম অঙ্কুর নিঃসৃত হয়। ভারতবর্ষ, ইটালি ও গ্রীস দেশের উর্বর ক্ষেত্রেই আর্যেরা আসিয়া জীবিকা ও সভ্যতা সহজে উপার্জন করেন। অভাবের উৎপীড়ন হইতে অবসর পাইলেই জ্ঞানের দিকে মনুষ্যের নেত্র পড়ে। এইরূপে অবসর-প্রাপ্ত ব্যক্তির অনুসন্ধিৎসু নেত্রের সম্মুখে জ্ঞানের দ্বার ক্রমশ উন্মুক্ত হইতে থাকে। এইজন্য আমাদের দেশের প্রাচীন ব্রাহ্মণদের কোনো কার্য ছিল না, জ্ঞানানুশীলনের উপযোগী বৃক্ষ-লতা-বেষ্টিত তপোবনে তাঁহাদের বাস ছিল; তাঁহারাই তো ভারতবর্ষে কবিতার সৃষ্টি করিয়াছেন, দর্শনের উন্নতি করিয়াছেন, বিজ্ঞানের অনুসন্ধান করিয়াছেন, শ্রেষ্ঠ ধর্মের আলোচনা করিয়াছেন, ভাষা ও ব্যাকরণের পূর্ণ-সংস্কার করিয়াছেন। অতএব সভ্যতার প্রথম অবস্থায় অবসর আবশ্যক করে, অবসর পাইবার জন্য ধন আবশ্যক, ও ধন উপার্জনের জন্য উর্বর ভূমির আবশ্যক।

উর্বর ভূমিই যদি সভ্যতার প্রথম কারণ হয়, তবে বঙ্গদেশ সে বিষয়ে সৌভাগ্যশালী, এই আশ্বাসে মুগ্ধ হইয়া আমরা মনে করিতে পারি যে, বঙ্গদেশ এককালে সভ্যতার উচ্চ শিখরে আরোহণ করিতে পারিবে। ভারতবর্ষের ধ্বংসাবশিষ্ট সভ্যতার ভিত্তির উপর য়ুরোপীয় সভ্যতার গৃহ নির্মিত হইলে সে কী সর্বাঙ্গসুন্দর দৃশ্য হইবে! য়ুরোপের স্বাধীনতা-প্রধান ভাব ও ভারতবর্ষের মঙ্গল-প্রধান ভাব, পূর্বদেশীয় গম্ভীর ভাব ও পশ্চিমদেশীয় তৎপর ভাব, য়ুরোপের অর্জনশীলতা ও ভারতবর্ষের রক্ষণশীলতা, পূর্বদেশের কল্পনা ও পশ্চিমের কার্যকরী বুদ্ধি উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য হইয়া কী পূর্ণ চরিত্র গঠিত হইবে। য়ুরোপীয় ভাষার তেজ ও আমাদের ভাষার কোমলতা, য়ুরোপীয় ভাষার সংক্ষিপ্ততা ও আমাদের ভাষার গাম্ভীর্য, য়ুরোপীয় ভাষার প্রাঞ্জলতা ও আমাদের ভাষার অলংকার-প্রাচুর্য উভয়ে মিশ্রিত হইয়া আমাদের ভাষার কী উন্নতি হইবে! য়ুরোপীয় ইতিহাস ও আমাদের কাব্য উভয়ে মিশিয়া আমাদের সাহিত্যের কী উন্নতি হইবে! য়ুরোপের শিল্প বিজ্ঞান ও আমাদের দর্শন উভয়ে মিলিয়া আমাদের জ্ঞানের কী উন্নতি হইবে! এই-সকল কল্পনা করিলে আমরা ভবিষ্যতের সুদূর সীমায় বঙ্গদেশীয় সভ্যতার অস্পষ্ট ছায়া দেখিতে পাই। মনে হয়, ওই সভ্যতার উচ্চ শিখরে থাকিয়া যখন পৃথিবীর কোনো অধীনতায় ক্লিষ্ট অত্যাচারে নিপীড়িত জাতির কাতর ক্রন্দন শুনিতে পাইব, তখন স্বাধীনতা ও সাম্যের বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়া তাহাদের অধীনতার শৃঙ্খল ভাঙিয়া দিব। আমরা নিজে শতাব্দী হইতে শতাব্দী পর্যন্ত অধীনতার অন্ধকার-কারাগৃহে অশ্রুমোচন করিয়া আসিয়াছি, আমরা সেই কাতর জাতির মর্মের বেদনা যেমন বুঝিব তেমন কে বুঝিবে? অসভ্যতার অন্ধকারে পৃথিবীর যে-সকল দেশ নিদ্রিত আছে, তাহাদের ঘুম ভাঙাইতে আমরা দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করিব। বিজ্ঞান দর্শন কাব্য পড়িবার জন্য দেশ-বিদেশের লোক আমাদের ভাষা শিক্ষা করিবে! আমাদের দেশ হইতে জ্ঞান উপার্জন করিতে এই দেশের বিশ্ববিদ্যালয় দেশ-বিদেশের লোকে পূর্ণ হইবে। বঙ্গের ভবিষ্যৎ ইতিহাসের অলিখিত পৃষ্ঠায় এই-সকল ঘটনা লিখিত হইবে, ইহা আমরা কল্পনা করিয়া লইতেছি সত্য, কিন্তু পাঠকেরা ইহা নিতান্ত অসম্ভব বোধ করিবেন না। প্রকাণ্ড সমুদ্রের কোন্ এক প্রান্তে কতকগুলি বালুকণা জমিয়া ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্র যে একটি তুষারাবৃত অনুর্বর দ্বীপ প্রস্তুত হইয়াছে, তাহার পূর্ব-নিবাসীদের আকাশই অম্বর ছিল, পশুবৎ ব্যবহার ছিল, তরুকোটর বাসস্থান ছিল, নর-রক্তলোলুপ ড্রুইডগণ পুরোহিত ছিল, আজ তাহাদেরই পুত্রপৌত্রগণ কোথা হইতে তাড়িয়া ফুঁড়িয়া অসভ্যদের

সভ্য করিবেন বলিয়া মহা গোলযোগ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন ইহাও যদি সম্ভব হইল, পতিত ইটালি ও গ্রীসও যদি পুনরায় জাগিয়া উঠিল, তবে যে নূতন জাতি আজ নব উদ্যমে জ্বলিয়া উঠিতেছে, নবজীবনে সঞ্জীবিত হইতেছে, নূতন মন্ত্রে দীক্ষিত হইতেছে, সে যে সভ্যতার চরম শিখরে না উঠিয়া বিশ্রাম করিবে না, তাহাতে অসম্ভব কী আছে? সভ্যতা পৃথিবীতে স্তরে স্তরে নির্মিত হইতে থাকে, একেবারে প্রচুর পরিমাণে সভ্যতা কখনো পৃথিবীতে জন্মিতে পারে না। ক্রমই প্রকৃতির নিয়ম। সভ্যতার অধিষ্ঠাত্রী দেবী আসিয়া ভারতবর্ষ, গ্রীস ও ইটালিতে এক স্তর সভ্যতা নির্মাণ করিয়া গিয়াছেন। ওই-সকল দেশ হইতে দেবী চলিয়া গিয়াছেন বটে, কিন্তু এক স্তর সভ্যতা সেখানে এখনও অবশিষ্ট আছে। তিনি এখন ফ্রান্স জর্মনি প্রভৃতি দেশে সভ্যতা নির্মাণ করিতেছেন এবং কিছুদিন পরে সেখানেও পদচিহ্ন রাখিয়া আবার আমেরিকা, রুসিয়া, জাপান মাড়াইয়া পুনরায় সেই প্রাচীন ভারতবর্ষের পূর্ব দিকে উদিত হইবেন, তাহাতে অসম্ভব কিছুই নাই। সভ্যতার অধিষ্ঠাত্রী দেবী এইরূপে পৃথিবীময় পরিভ্রমণ করিতেছেন এবং স্তরে স্তরে পৃথিবীতে পূর্ণ সভ্যতা নির্মাণ করিতেছেন। ভবিষ্যতের একদিন আমরা কল্পনাচক্ষে দেখিতেছি, যেদিন আমাদের দীপ্যমান সভ্যতার সম্মুখে ক্রমে ক্রমে ফ্রান্স, জর্মনি, ইংলন্ডের সভ্যতা নিবিয়া যাইবে। এ কথা অবিশ্বাস করিবার নহে। অনন্ত কাল-সমুদ্রে কত ঘটনা-তরঙ্গ উঠিবে ও পড়িবে, আর আমাদের এই বঙ্গদেশ, এই লক্ষ লক্ষ অধিবাসী চিরকালই যে অধীনতার অন্ধকারে নির্জীবভাবে ঝিমাইবে, তাহা আমরা কল্পনা করিতেও পারি না। আমরা য়ুরোপের সঞ্চিত সভ্যতা অল্পায়াসে অর্জন করিয়া লইতেছি, নিউটন যতখানি মাথা ঘুরাইয়া পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ বুঝিয়াছিলেন, তাহা বুঝিতে আমাদের নিউটনের এক-পঞ্চদশ অংশও ভাবিতে হয় না। য়ুরোপ যখন বৃদ্ধ ও ক্লান্ত হইয়া যাইবেন, তখন তাঁহার সঞ্চিত সভ্যতা অর্জন করিয়া লইয়া আমরা আবার নব উদ্যমে অধিকতর সঞ্চয় করিতে আরম্ভ করিব। যে জাতি নব উদ্যমে উঠিতে আরম্ভ করে, তাহারাই ক্রমে সভ্যতার উচ্চ-শিখরে আরোহণ করে। কী অল্প কালের মধ্যে আমাদের বঙ্গদেশ উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে। বঙ্গ ভাষায় গদ্য এই সেদিন তো নির্মিত হইয়াছে; যত দিন ভাষার উন্নতি না হয়, তত দিন জাতির উন্নতি হয় না, অথবা জাতির উন্নতির চিহ্নই ভাষার উন্নতি। যাঁহারা প্রায় বাংলা গদ্যের সৃষ্টিকর্তা তাঁহারা আজিও বর্তমান আছেন। বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্য এই অর্ধশতাব্দীর মধ্যে আশ্চর্য উন্নত হইয়াছে। এত দ্রুত ও এত অল্প কালের মধ্যে বোধ হয় কোনো ভাষারই উন্নতি হয় নাই। এই উন্নতি-স্রোত যদি দারুণ প্রতিঘাত না পায় তবে কখনো থামিবে না। বাঙালিদের এই অর্ধশতাব্দীর উন্নতি, ইহার মধ্যে তাহাদের উদ্যম কত বাড়িয়া উঠিয়াছে, অধীনতার অনুৎসাহের মধ্যে এতদূর আশা করা যায় না। স্কটলন্ডে গিয়া তাহারা কৃষিবিদ্যা অধ্যয়ন করিতেছে, লন্ডনে গিয়া সেখানকার বিজ্ঞান-আচার্য উপাধি আহরণ করিতেছে, অঙ্কবিদ্যা শিখিতেছে, জর্মনিতে নিজের মত প্রচার করিতেছে, রুসিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের আসন অধিকার করিতেছে, সমস্ত ভারতবর্ষে রাজনৈতিক ঐক্যতা স্থাপনের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে, সাহস-পূর্বক কত সামাজিক শৃঙ্খল ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছে, সফল হউক বা না হউক, গবর্নমেন্টের কুনিয়মের বিরুদ্ধে সাহসপূর্বক স্বীয় মত প্রকাশ করিতেছে, আমেরিকায় শিক্ষা পাইবার জন্য কত যুবক উদ্যত হইয়াছেন এবং আমরা শীঘ্রই দেখিতে পাইব যে, তাহারা পোত-নির্মাণবিদ্যা, যন্ত্র-বিদ্যা এবং ইংরাজেরা যদি যুদ্ধ শিক্ষা না দেন, তবে ফ্রান্সে গিয়া, জর্মনিতে গিয়া যুদ্ধ শিখিয়া আসিবে, ইহা নিশ্চয়ই। গবর্নমেন্টের অধীনে কার্য জুটিতেছে না, সুতরাং জীবিকার অভাবে বিদেশে গিয়া অর্থের নিমিত্তেও বিদ্যা শিখিবে, বাণিজ্যের উন্নতি হইবে, এখনি আমাদের দেশীয় লোকের বাণিজ্যের দিকে মন পড়িয়াছে, অর্ধশতাব্দীর মধ্যে অধীনতার সীমাবদ্ধক্ষেত্রে এত দূর উন্নতি কোন্ জাতি করিয়াছে জানি না।

পাঠকেরা জিজ্ঞাসা করিবেন যে আমরা পূর্বে বলিলাম সভ্যতার প্রথম অবস্থায় অর্থের আবশ্যক করে, তবে এখন কেন বলিতেছি যে, অর্থাভাবও বাঙালিদের জ্ঞান উপার্জনের প্রধান

প্রবর্তক? স্বাধীন সভ্যতার নিমিত্ত প্রথম অবস্থায় নিশ্চয়ই অর্থ আবশ্যক, আমাদের যদি ভাবিয়া চিন্তিয়া নিজের মস্তিষ্ক হইতে এই সভ্যতা গঠিত করিতে হইত, তবে নিশ্চয়ই অবসর নহিলে পারিতাম না, অপরে আমাদের জ্ঞান গিলাইয়া দিতেছে, ইহার জন্য অধিক অর্থ আবশ্যক করে না, আমরা নূতন বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্ক্রিয়া করিতে পারিব না, নূতন যন্ত্র উদ্‌ভাবন করিতে পারিব না, সুতরাং আমরা একটি জাতীয় মহত্ত্ব উপার্জন করিতে পারিব না। পৃথিবীতে এখন সভ্যতা গঠিত হইতেছে, এই গঠন-কার্যে আমরা কোনো সাহায্য করিতে পারিব কি না সন্দেহস্থল, তবে গঠিত হইলে জাতিসাধারণের সহিত তাহা আমরা ভোগ করিতে পারিব। আমাদের গঠন-শক্তি নানা বাহ্য কারণ হইতে ব্যাঘাত পাইতেছে। প্রথম দারিদ্র্য, দ্বিতীয় জলবায়ু।

আমাদের দেশ উর্বর সত্য, কিন্তু অনেক কারণে দারিদ্র্য প্রশ্রয় পাইতেছে। সাধারণ লোকদের মধ্যে সমানরূপে ধন বিভক্ত হইলেই দেশ ধনী হয়। দেশীয় কৃষকেরা যাহা উৎপন্ন করে তাহার সমস্ত লাভ মহাজন প্রভৃতিরাই ভোগ করে, তাহাদের কেবল জীবিকা-নির্বাহোপযোগী কিছু অবশিষ্ট থাকে, তদধিক সঞ্চয় করিবার কোনো উপায় নাই, দুর্ভিক্ষের পর দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইতেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যা শিখিবার জন্য অনেকে ধন এবং তদপেক্ষা বহুমূল্য স্বাস্থ্য নষ্ট করিতেছেন, কিন্তু শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া ধন উপার্জন করিবার কোনো উপায় দেখিতেছেন না। দেশের মৃত্তিকা ক্রমশ অনুর্বর হইয়া যাইতেছে, এক স্থানে ক্রমাগত একই শস্য জন্মিলে মৃত্তিকার তেজ নষ্ট হইয়া যায়। প্রাচীন লোকেরা বলেন, এখনকার খাদ্য-সামগ্রী ক্রমশ বিস্বাদ হইয়া যাইতেছে; তাহার কারণ, মৃত্তিকা ক্রমেই নিস্তেজ হইয়া যাইতেছে। এই দারিদ্র্যের জ্বালায় অস্থির হইয়া লোকে এক বিন্দু অন্য বিষয় ভাবিবার সময় পাইবে কোথায়? যদিই বা ক্রমে আমরা ধনী হই, তাহা হইলেও কি আমাদের দেশ জ্ঞান উপার্জন বিষয়ে সকল দেশের অগ্রগণ্য হইতে পারে, তাহাতেও সন্দেহ আছে। আমাদের জলবায়ু এমন অতেজস্কর যে, নিবাসীদের মন একেবারে উৎসাহশূন্য করিয়া ফেলিয়াছে। কোনো একটি কার্যে উঠিয়া পড়িয়া লাগা এ দেশে কাহারো সাধ্য নহে। যদি বা কোনো কৃত্রিম উপায়ে একবার উৎসাহ উদ্দীপ্ত করা যায়, তথাপি অধিক দিন তাহা স্থায়ী হয় না, অল্প দিনের মধ্যে শিথিল হইয়া যায়। দেশের আর্দ্র বায়ু স্বাস্থ্যের এত বিঘ্নজনক যে, তাহাতে অনেক অনিষ্ট হইতেছে। খর্বাকার রুগ্‌ণ শীর্ণ কতকগুলি লোকের কাছে কত দূর আশা করা যায়? শারীরিক বলের অভাবে তাহাদের মনের মহত্ত্ব জন্মিবে কোথা হইতে? তাহারা অত্যাচারে অভাবে শিশু ও অবলার ন্যায় ক্রন্দন করিতে পারে; পুরুষের মতো, বীরের মতো অত্যাচারের বিরুদ্ধে, অভাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে পারে না। আধ ঘণ্টা কঠিন বিষয় চিন্তা করিলে মাথা ঘুরিয়া যাইবে, দুই-চারিটি চিন্তা-সাধ্য পুস্তক লিখিলে মাথার পীড়া হইবে। তবে এখন নূতন বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কার করিবে কী করিয়া? যাঁহারা বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত, তাঁহারা আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞানান্বেষণে ব্যস্ত থাকেন, কত রাত্রি নিদ্রাহীন নেত্রে তারকার দিকে চাহিয়া থাকেন, কত দিবস আহার ত্যাগ করিয়া সূর্যগ্রহণের প্রতীক্ষা করিতে থাকেন। এ-সকল কি আমাদের দেশের দৃষ্টি অভাবে চশমা-চক্ষু, রাত্রি জাগরণে অজীর্ণ-রোগী, বিশ্রাম অভাবে রুগ্‌ণ-দেহ, জলবায়ুর দোষে শীর্ণ-ধাতু বিএ এমে-র কর্ম? বাংলা দেশ হইতে উঠিয়া না গেলে আমাদের নিস্তার নাই। ভারতবর্ষের অন্য কোনো স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিলেই তবে আমাদের রক্ষা, নহিলে কতকগুলি অপচ্যজ্ঞান গিলিয়া গিলিয়া বিকৃতমস্তিষ্ক, বিলাতি প্রভুদের বুট জুতার আঘাত সহিয়া সহিয়া হীন-প্রকৃতি, দিন-রাত্রি পরিশ্রম করিয়া করিয়া রুগ্‌ণ দেহ ও সাহেবি সভ্যতার সহিত নানাবিধ অভাব আমদানি হওয়াতে দরিদ্র হইয়া মরিতে হইবে।

আমাদের জ্ঞান অর্জনের যে-সকল বাধা জন্মিয়াছে, তাহা নিরাকৃত করিবার কি কোনো উপায় নাই? আমাদের কতখানি উন্নতির আশা আছে দুই-একটি কারণে তাহা যে নষ্ট হইবে ইহা তো সহ্য হয় না। প্রথম বিঘ্ন দারিদ্র্য, এই দারিদ্র্য কি কখনো চিরকাল তিষ্ঠিতে পারে? ইহা অসম্ভব যে একটি সমগ্র জাতি একেবারে না খাইয়া মরিবে, অথবা অভাবের উৎপীড়ন সহিয়াও

স্থির হইয়া থাকিবে। ইংলন্ড দেশটি কিছু উর্বর নহে তবে তাহারা ধনী হইল কী করিয়া? ভাবিয়া দেখিতে গেলে অভাবই তাহাদের ধনী করিয়াছে। নিজের দেশে জীবিকার সংস্থান করিতে না পারিয়া তাহারা দেশ-বিদেশে গিয়া অর্থ উপার্জন করিতেছে। যেখানে অভাব সেখানেই একটি-না-একটি উপায় আছে। আমাদের দেশে স্বাধীন বাণিজ্য-প্রচার আরম্ভ হইয়াছে, ক্রমশ যে তাহার উন্নতি হইবে না তাহা কে বলিতে পারে? গবর্নমেন্ট যদি বিঘ্ন না দেন, তবে বাঙালিরা নিশ্চয়ই বাণিজ্যের উন্নতি করিতে পারিবে। ভারতবর্ষের অন্যান্য জাতিরা অত্যন্ত বাণিজ্য-প্রিয়, কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে তাহাদের অনেক বাধা পড়িতেছে, কিন্তু শিক্ষিত ও স্বভাব-চতুর বাঙালিরা নদীবহুল ও সমুদ্রতীরস্থ বঙ্গদেশে এ বিষয়ে শীঘ্রই উন্নতি লাভ করিবে। অর্থ উপার্জিত হইলে জ্ঞান উপার্জ্জনের অনেক সুবিধা হইবে। কিন্তু ইংরাজদের কিছু অতিরিক্ত হইয়া পড়িয়াছে; অর্থ জ্ঞানের সহায়তা করে বটে, কিন্তু অতিরিক্ত হইলেই আবার জ্ঞানের শত্রুতাচরণ করে; বিলাস মনকে এমন নিস্তেজ করিয়া ফেলে যে জ্ঞানের শ্রমসাধ্য আলোচনায় অক্ষম হইয়া পড়ে। ইংলন্ডে বিলাস-স্রোত যেরূপ অপ্রতিহত প্রভাবে অগ্রসর হইতেছে, তাহাতে ইংলন্ডের সভ্যতা যে শীঘ্র ভাঙিয়া চুরিয়া যাইবে তাহার সম্ভাবনা দেখিতেছি। বিলাসের শীতল ছায়ায় লালিত পালিত হইয়া এখন সেখানে কেহ যুদ্ধ প্রভৃতি গোলযোগে প্রবৃত্ত হইতে চাহিতেছে না। ক্রমেই তাহারা আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইয়া পড়িবে। আমাদের দেশে অর্থ অধিক উপার্জিত হইলে বিলাস-বৃদ্ধির অধিকতর সম্ভাবনা, কিন্তু সে অনেক দিনের কথা। উত্থান-পতন-শীল কালের তরঙ্গে কত কী গঠিত হইবে ও কত কী বিপর্যস্ত হইয়া যাইবে, তাহা নিঃসংশয়ে স্থির করা সাধ্যাতীত। ভবিষ্যতের অন্ধকারময় পথে কী কী ঘটনা আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছে তাহা দেখা অতিশয় তীক্ষ্ণ দৃষ্টির কর্ম। কিন্তু এখনকার মতো আমাদের অর্থ নহিলে চলিতেছে না, এবং শীঘ্রই যে অর্থ উপার্জিত হইবে তাহার সম্ভাবনা দেখিতেছি। এক হিসাবে আমাদের অভাব অত্যন্ত উপকারী। অভাব না থাকিলে দেশের বাহিরে যাইবার প্রয়োজন হয় না, এবং একটি প্রদেশের ক্ষুদ্র সীমায় জ্ঞানও সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ে। বাণিজ্যদ্রব্যের সঙ্গে সঙ্গে দেশ-বিদেশ হইতে জ্ঞানও আহৃত হয়। এইরূপে নানা দেশের ধন লইয়া দেশ ধনশালী হয় এবং নানা জাতির জ্ঞান লইয়া জাতিও জ্ঞানশালী হয়। এইজন্য বলিতেছি যে, দারিদ্র্য প্রবল ও গবর্নমেন্ট অনুদার হইয়া আমাদের দেশের মূলে অনিষ্ট হইতেছে না, বরং তাহা দূরবর্তী মঙ্গলকে আহ্বান করিতেছে।

এক্ষণে একটি কথা উঠিতে পারে যে, নানা বাহ্য কারণে ও জলবায়ুর প্রভাবে বাঙালিদের এরূপ স্বভাব হইয়া গিয়াছে যে, বরং তাহারা না খাইয়া মরিবে, তথাপি পরিশ্রম করিয়া তাহা নিরাকরণ করিবে না, তবে অভাবে তাহাদের কী উপকার হইবে? কিন্তু বিদ্যা যতই প্রচার হইবে, ততই সে-সকল বাধা দূর হইবে। কর্তব্য-জ্ঞানে মনের এমন বল জন্মে যে, বাহিরের অনেক বাধা তাহার কোনো অনিষ্ট করিতে পারে না। এখন দেখা যাইতেছে যে, শিক্ষিতদের মধ্যে অনেকের বাণিজ্যের প্রতি অনুরাগ জন্মিয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে বাণিজ্য বহুলরূপে প্রচারিত হইলে জনসাধারণ শীঘ্রই তাঁহাদের অনুগামী হইবে।

আমাদের উন্নতির দ্বিতীয় বাধা জলবায়ু। ভাবিয়া দেখিলে ইহাই প্রতীতি হইবে যে, আমাদের দেশের জলবায়ু কিছু এত মন্দ নহে যে, তাহা হইতে উদ্ধার পাইবার কোনো উপায় নাই। আমাদের দেশে পরিশ্রম করিলেই বল সঞ্চয় করিতে পারা যায়। পল্লীগ্রামের শ্রমশীল কৃষকেরা তো দুর্বল নহে। আমাদের মনে উদ্যম জ্বলিয়া উঠিয়াছে, কেবল দুর্বল শরীর তাহার বাধা দিতেছে; কিন্তু এদেশীয় কৃষকদের ন্যায় যদি বল লাভ করা যায় তাহা হইলে আমাদের শরীর আমাদের মনকে সাহায্য করিবে। কর্তব্য জ্ঞান ও শিক্ষা -বলে বলীয়ান হইয়া শ্রমসাধ্য বিষয়ের প্রতি আমাদের অরুচি অন্তর্হিত হইবে। মন বৃদ্ধ হইয়া গেলেই শরীর বৃদ্ধ হয়, আমাদের দেশে অল্প-বয়সেই মহা বিজ্ঞ রকমের চাল-চুল প্রকাশ পাইতে থাকে। যতদিন নাচিয়া হাসিয়া, ক্রীড়া করিয়া কাটাইয়া দেওয়া যায়, ততদিন মনে বার্ধক্যের মরিচা পড়িতে পারে না। যাহা হউক,

আমাদের দেশের উন্নতির পক্ষে যে দুইটি বাধা বদ্ধমূল হইয়া আছে, তাহা নষ্ট করিবার তেমনি দুইটি অমোঘ উপায় আছে— ব্যবসায় ও ব্যায়াম।

ভারতী
মাঘ ১২৮৪

ইংরাজদিগের আদব-কায়দা

ইংরাজদিগের এবং য়ুরোপীয় অন্যান্য দেশের আদব-কায়দার কাছে আমাদের দেশের আদব-কায়দা ঘেঁষিতেও পারে না। য়ুরোপে সকলই যেমন যন্ত্রে নির্বাহিত হয়, তেমনি হৃদয়ের ভাবও য়ুরোপীয়েরা এমন যন্ত্রবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে যে, দুঃখ না হইলেও তাহারা দুঃখ প্রকাশ করিতে পারে, হাসি না পাইলেও হাসিতে পারে। ভদ্রতার ভাব হইতে যে-সব নিয়ম প্রসূত তাহাকেই তো আদব-কায়দা বলে? তোমার নিয়ম বাঁধা থাক্ বা না থাক্, যাহারা ভদ্র তাহারা কখনো অভদ্রতা করিতে পারে না। তাহারা স্বাভাবিক অবস্থায় পরের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করে তাহাই ভদ্রতা। আমাদের হিন্দুজাতির অত আইনকানুন নাই, অথচ স্বাভাবিক ভদ্রতার ভাব এমন আর কোথাও দেখিবে না। আমাদের দেশে তো এত নিয়মের বাঁধাবাঁধি নাই, তবুও তো মনিয়র উইলিয়াম্‌স কহিয়াছেন, ভারতবর্ষের ছোটোলোকেরাও এমন ভদ্র শান্ত প্রভুভক্ত, যে য়ুরোপে তাহার তুলনা পাইবে না। ইংরাজদিগের আচার-ব্যবহার আমাদের কাছে অনেক কারণে নূতন ও আমোদজনক লাগিবে।

ইংলন্ডে প্রণামের স্থলে শেক্-হ্যান্ড করিবার সময় স্ত্রীলোকরাই প্রথম হাত বাড়াইয়া দেন। তোমার অপেক্ষা মান-মর্যাদায় যিনি বড়ো তাঁহার প্রতি তুমি প্রথমে হাত বাড়াইতে বা গ্রীবা নত করিতে পার না। যাহাদের সঙ্গে তুমি আলাপ-পরিচয় রাখিতে ইচ্ছা কর না, তাহারা যদি তোমাকে প্রকাশ্যে অভিবাদন করে, তবে তুমি ফিরাইয়া না দিতেও পার। কিন্তু ইংরাজি আদব-কায়দাজ্ঞ ব্যক্তি কহেন— তাহা অপেক্ষা অভ্যস্ত-উপেক্ষার সহিত তাহার প্রণাম ফিরাইয়া দেওয়াই ভালো। কিন্তু তাই বলিয়া কোনো পুরুষ কোনো অবস্থায় স্ত্রীলোকের অভিবাদন উপেক্ষা করিতে পারেন না। স্ত্রীলোক ইচ্ছা করিলে কোনো পুরুষকে ওরূপ উপেক্ষা করিতে পারেন, কিন্তু কোনো অবিবাহিতা স্ত্রী বিবাহিতা স্ত্রীর অভিবাদন ওরূপ অগ্রাহ্য করিতে পারেন না। যদি কোনো ব্যক্তি নিমন্ত্রণ-সভায় কোনো মহিলাকে বিশেষ যত্ন করিয়া থাকেন, তাঁহার সহিত অধিক গল্প করিয়া থাকেন বা আহার-স্থানে হাত ধরিয়া লইয়া গিয়া থাকেন, তবে তাহার পরদিন কোনো প্রকাশ্য স্থানে দেখা হইলে সে মহিলা সে ভদ্রলোকটির প্রতি সম্মান-প্রদর্শনার্থ গ্রীবা নত করিতে পারেন। অনেক সাহেব ভারতবর্ষীয়দের অভিবাদন, মাথা কাঁপাইয়া বা টুপি ছুঁইয়া মাত্র ফিরাইয়া দেন, কিন্তু ভালো আদব-কায়দা অমন হোমিওপ্যাথিকমাত্রায় প্রণাম করিতে পরামর্শ দেন না, সম্পূর্ণরূপে টুপি না খুলিয়া যদি অভিবাদন করিতে চাও, তবে তাহার চেয়ে না করাই ভালো। যাহার সহিত শেক্-হ্যান্ড করিতে চাও, তাহার সহিত দেখা হইলে বাম হস্তে টুপি খুলিতে হইবে ও ডান হস্তে শেক্-হ্যান্ড করিতে হইবে। পথে আসিতে আসিতে কোনো পরিচিতা মহিলা যদি তোমার সম্মুখে আসিয়া পড়েন, তবে কথা কহিবার জন্য তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাঁহার পথ বন্ধ করিয়ো না, যেদিকে তিনি যাইতেছেন তাহা তোমার গম্য পথের বিপরীত দিক হইতে পারে, কিন্তু মহিলার পাশে পাশে সে দিকেই তোমার যাওয়া উচিত, পরে কথা শেষ করিয়া তোমার যাহা ইচ্ছা তাহা করিয়ো। যে মহিলার সহিত তুমি কথা কহিবে না, তাঁহার সহিত যদি দেখা হয়, তবে, তিনি যদি ডান দিকে থাকেন তবে বাম হস্তে বা যদি বাম দিকে থাকেন তবে ডান হস্তে টুপি খুলিতে হইবে অর্থাৎ যে হস্ত মহিলা হইতে অধিক দূর, সেই হস্তে টুপি খুলিতে হইবে।

ঘোড়ায় চড়িয়া যাইবার সময় যদি কোনো পদাতিক-মহিলার সহিত সাক্ষাৎ হয়, তবে ঘোড়া হইতে নামিয়া তাহার লাগাম ধরিয়া মহিলার সঙ্গে সঙ্গে গিয়া কথা কহিবে, ঘাড় উঁচু করিয়া কথা কহিবার কষ্ট যেন মহিলাকে না দেওয়া হয়। কোনো মহিলার সঙ্গে সঙ্গে চলিবার সময় তাঁহার হস্তে পুস্তক প্রভৃতি যাহা-কিছু থাকিবে তাহা তুমি বহন করিবে। যদি চুরট খাইতে খাইতে পথে আইস, তবে কোনো মহিলার সহিত কথা কহিতে হইলেই তাহা ফেলিয়া দিয়ো। শেক্-হ্যান্ড করিতে হইলে যাহাকে শেক্-হ্যান্ড করিবে, তাহার খুব কাছে না আসিলে হাত বাড়াইয়ো না, দূর হইতে হাত বাহির করিয়া আসিলে বড়ো ভালো দেখায় না। মহিলারা আসিলে ভদ্রলোকদিগকে উঠিয়া দাঁড়াইতে হইবে, কিন্তু পুরুষেরা আসিলে মহিলাদিগকে উঠিতে হয় না। অগ্নিকুণ্ডের (Fire place) কাছাকাছি যাইবার জন্য তুমি এক চৌকি ছাড়িয়া আর-এক চৌকিতে যাইতে পার না। গৃহের কর্ত্রী তোমাকে যদি কাহারো সহিত পরিচিত করিয়া দেন, তবে তুমি তাহার প্রতি গ্রীবা নত করিবে, তবে যদি সে ব্যক্তি কর্ত্রীর বিশেষ আত্মীয় বা পুরাতন বন্ধু হয় ও কর্ত্রী যদি তাহার সহিত তোমার বিশেষ আলাপ করিয়া দিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে শেক্-হ্যান্ড করিতে পার। মহিলারা পুরুষের প্রতি হাত বাড়াইয়া দেন বটে, কিন্তু হাত নাড়েন না, মহিলার হস্ত লইয়া নাড়িয়া দেওয়া পুরুষের কর্তব্য কর্ম। যুবতীরা অবিবাহিত পুরুষের প্রতি কেবলমাত্র গ্রীবা নত করিবেন। যখন কাহারো সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছ, যতক্ষণ থাকা প্রয়োজন ততক্ষণ থাকিয়াছ, এমন সময়ে যদি অন্য আগন্তুক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিয়া পাঠায়, তাহা হইলে তখনই তুমি উঠিয়া যাইয়ো না; যখন অভ্যাগতগণ চৌকিতে আসিয়া বসিল, তখন গৃহের কর্ত্রীর নিকট বিদায় লইয়া এবং নবাগতদিগকে অতি নম্র নমস্কার করিয়া চলিয়া যাইবে। হয়তো কর্ত্রী তোমাকে বসিবার জন্য অনুরোধ করিবেন, কিন্তু একবার যখন উঠিয়াছ, তখন আবার বসিতে গেলে বড়ো ভালো দেখাইবে না। কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিবার সময় যদি ঘড়ি দেখিবার প্রয়োজন হয় তবে 'অন্য কাজ আছে এইজন্য ঘড়ি দেখিতেছ' এই বলিয়া কারণ দর্শাইয়া ও অনুমতি লইয়া তুমি ঘড়ি দেখিবে। কোনো মহিলা বিদায় লইতে উঠিলে পুরুষেরও উঠিয়া দাঁড়াইতে হয়, এবং যদি তাঁহার নিজের বাড়ি হয় তবে গাড়িতে পৌঁছিয়া দিতে হয়। অভ্যাগত আইলে বিশেষ সম্ভ্রম দেখাইবার ইচ্ছা না থাকিলে মহিলারা অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবেন না, যদি তিনি এক পদ মাত্র অগ্রসর হইয়া তাহাকে শেক্-হ্যান্ড করেন ও সে না বসিলে না বসেন, তাহা হইলেই যথেষ্ট হইবে। অভ্যাগতগণ বিদায় লইবার সময় উঠিলে মহিলাকেও উঠিতে হইবে ও যতক্ষণ না তাঁহারা ঘর হইতে বাহির হইয়া যান ততক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিবেন, কিন্তু ঘরের সীমা পর্যন্ত তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে যাইবার কোনো প্রয়োজন নাই। নিজে যে চৌকিতে বসিয়া থাক, নিজে না বসিয়া সম্ভ্রম প্রদর্শনের জন্য সে চৌকি কাহাকেও বসিবার জন্য দিয়ো না, তবে যদি অন্য চৌকি না থাকে সে এক আলাদা কথা। এই তো গেল প্রণাম নমস্কার প্রভৃতি সম্ভ্রম প্রদর্শনের রীতি নীতি। এক্ষণে দেখা-সাক্ষাৎ করিবার নিয়ম-অনিয়মের বিষয় লিখি।

সকল সময়েই দর্শকদিগকে অভ্যর্থনা করাই ভদ্রতার নিয়ম। যদি তোমার হাতে সর্বদা কাজ থাকে, তবে চাকরদিগকে বলিয়া রাখিয়ো তাহারা আগন্তুকদিগকে বলিবে যে, প্রভু অমুক দিন বা অমুক সময় ব্যতীত কখনো ঘরে থাকেন না। যদি দৈবক্রমে ভৃত্য কাহাকেও ঘরের মধ্যে আনিয়া থাকে তবে যত অসুবিধাই হোক-না কেন, তাহাকে অভ্যর্থনা করাই উচিত। কোনো মহিলা আগন্তুকদিগকে অপেক্ষা করাইয়া রাখিবেন না। ছাতা এবং 'ওভার-কোট্' 'হলে' রাখিয়া দেখা করিতে যাইতে হইবে।

'মর্নিং-কল' অর্থাৎ দিনের বেলায় দেখা-সাক্ষাৎ করিতে যাওয়া বিকাল ৩টা হইতে ৫টার মধ্যেই উচিত। কারণ আহারাদি ও সাজগোজ করিবার সময় দেখা করিতে গেলে বড়ো অসুবিধা হয়।

দেখা করিতে যাইবার সময় টুপি খুলিয়া টেবিল বা অন্য কোনো দ্রব্যের উপর রাখা উচিত

নহে, টুপি হাতে করিয়া রাখিতে হইবে, অথবা যদি রাখিতেই হয় তবে ভূমির উপর রাখা উচিত। 'মর্নিং কল' করিতে যাইবার সময় শখের কুকুর সঙ্গে লইয়া ঘরে যাইয়ো না, কারণ তাহারা চেঁচামেচি করিতে পারে, অথবা কোনো লেডির গাউনের উপর বা মকমলের কৌচের উপর শুইতে কিছুমাত্র সংকোচ বোধ না করিতে পারে। অথবা গৃহের কর্ত্রীর সাধের বিড়ালটি হয়তো অগ্নিকুণ্ডের পার্শ্বে ঘুমাইতেছে, তাহার সহিত অনর্থক একটা বিবাদ বাধাইতে পারে। যদি কোনো মহিলা কাহারও সঙ্গে দেখা করিতে যান, তবে তিনি যেন তাঁহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছেলেপিলে সঙ্গে লইয়া না যান। কারণ, যাহার সঙ্গে দেখা করিতে যান সে বেচারীর হয়তো বুক ধড়াস ধড়াস করিতে থাকে, পাছে তাঁহার 'আলবাম' ছিঁড়িয়া ফেলে বা তাঁহার সাধের প্রস্তর-মূর্তিটি অঙ্গহীন করিয়া ফেলে। তোমার যদি গাড়ি না থাকে তবে বাদলার দিনে কাহারও সঙ্গে দেখা করিতে যাইয়ো না, কারণ তুমি যদি ভিজা কোটে ও কাদা-মাখা জুতায় কাহারও ঘরের কার্পেটের উপর বিচরণ কর তবে গৃহের কর্ত্রীর বড়োই মন খারাপ হইয়া যাইবে। লোকাকীর্ণ ঘরে গেলে প্রথমে গিয়াই গৃহের কর্ত্রীকে সম্ভ্রম জানানো আবশ্যক, পরে অন্য কাজ। কোনো মহিলা কাজকর্ম ছাড়া আর কোনো কারণে ভদ্র লোকদের সঙ্গে দেখা করিতে যাইতে পারেন না। বন্ধুত্বের সাক্ষাতে বড়ো অধিক কালব্যয় করিয়ো না, বড়ো জোর আধ ঘণ্টা কথাবার্তা কহিবে। আদব-কায়দাজ্ঞ ব্যক্তিরা কহেন যে, তুমি এতটুকু থাকিবে যাহাতে বন্ধুগণ তুমি এত শীঘ্র চলিয়া গেলে বলিয়া কষ্ট পান, কিন্তু দেরি করিতেছ বলিয়া মনে মনে তোমার বিদায় প্রার্থনা না করেন। কাহারও সামাজিক সাক্ষাৎ (অর্থাৎ যে সাক্ষাৎ বিশেষ নিয়মানুসারে করিতেই হয়, বন্ধুত্ব অথবা অন্য প্রকারের সাক্ষাৎ নহে) ফিরিয়া দিবার সময় ঘরের মধ্যে না গিয়া একটা কার্ড রাখিয়া গেলেও হয়। কিন্তু অমনি বাড়ির লোকেরা কেমন আছেন, সে সংবাদটা লইয়ো। আবার যে মহিলার সঙ্গে তুমি দেখা করিতে গিয়াছ তাঁহার সঙ্গে যদি তাঁহার ভগিনী বা কন্যাগণ থাকেন, তবে প্রত্যেককে আলাদা আলাদা কার্ড দিতে হইবে। অথবা যদি বাড়িতে অন্য অভ্যাগত উপস্থিত থাকেন, তবে কাহাকে কার্ড পাঠাইতেছ, তাহা বিশেষ করিয়া জানাইবার জন্য তোমার নামের উপর তাঁহার নাম লিখিয়ো। কাহারও শোকে শোক প্রকাশ করিবার জন্য যে সাক্ষাৎকারের নিয়ম আছে, তাহা শোকের ঘটনা ঘটিবার পরে সপ্তাহের মধ্যে পালন করা উচিত। তোমার যদি বিশেষ আত্মীয় বন্ধু না হন তবে কার্ড পাঠাইয়া দিয়ো। কাহারও আনন্দে আনন্দ প্রকাশ করিবার নিমিত্ত সাক্ষাৎ করিতে হইলে কার্ড না পাঠাইয়া নিজে যাইয়ো। যে বন্ধু বা আলাপীর বাড়িতে নিমন্ত্রণে গিয়াছ, বা যাহাদের নিমন্ত্রণের চিঠি পাইয়াছ, সপ্তাহের মধ্যে তাহাদের সহিত দেখা করিয়ো। দেশে আগমন ও বিদায় -বার্তা জানানো ভিন্ন অন্য কোনো কারণে চাকরের হস্তে কার্ড পাঠানো বড়োই অসম্ভ্রম প্রদর্শনের চিহ্ন।

কার্ডের উপর নাম ধাম সমস্ত লিখা থাকিবে। সাক্ষাৎ করিবার কার্ড খুব সাদাসিদা হওয়া উচিত, চকচকে কার্ডের 'ফ্যাশান' এখন আর নাই। নিজের নামের সহিত খেতাব প্রভৃতি যেন না থাকে, সাদাসিদা 'ইটালিক' অক্ষরে নাম লিখা থাকিবে, 'রোমান' বা অন্য প্রকার ঘোর-ফের অক্ষরে যেন নাম লেখা না হয়। 'কন্টিনেন্টে' অর্থাৎ ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে নামের পূর্বে 'মশিও' বা 'মিস্টর' বা 'মিস' প্রভৃতি লেখে না, ইংলন্ডেও কেহ কেহ তাহার অনুকরণ করেন। নিজের হাতের লেখার অনুরূপ অক্ষরে নাম লিখিলে, হাস্যাস্পদ হইতে হয়। তবে বড়ো বড়ো প্রতিভাসম্পন্ন লোক, যাঁহাদের হাতের অক্ষর দেখিতে লোকের কৌতূহল জন্মে, তাঁহারা এরূপ করিতে পারেন; জন্ স্টুয়ার্ট মিল বা কার্লাইলের হাতের অক্ষরের কার্ড শোভা পায়, অন্য লোকের নহে। শোকগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের কার্ডের চারি দিকে কালো ঘের থাকিবে। অবিবাহিতা কুমারী যাঁহারা পিত্রালয়ে বাস করিতেছেন, তাঁহাদের আর স্বতন্ত্র কার্ডের প্রয়োজন নাই। কার্ডে তাঁহাদের মাতার নামের নিম্নে নিজের নাম লিখা থাকিবে। যেমন

Mrs Charles Gilbert
Miss Charles Gilbert

কোনো কোনো বিবাহিত সস্ত্রীক দেখা করিতে আইলে উভয় নামের একটি কার্ড ব্যবহার করেন; যেমন Mr. & Mrs. Stewart Austin। পরিবারের কাহারও মৃত্যু হইলে ইংরাজেরা অনেক সময়ে কার্ড পাঠাইয়া সেই সংবাদ দেন; সেই কার্ডে মৃত ব্যক্তির নাম, বয়স, জন্মস্থান, বাসস্থান ও কবরস্থান লিখিত থাকে। বিদায় লইবার কার্ডের এক কোণে P.P.C. (pour prendre congé) অথবা P.D.A. (pour dire adieu) এই অক্ষর তিনটি খোদিত থাকে।

বিদেশ হইতে নবাগত ব্যক্তি যদি তোমার বন্ধুর পরিচয়-পত্র (Letter of introduction) তোমার কাছে পাঠাইয়া দেয়, তবে তাহার পরদিন গিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়ো। দেখা করিয়া তাহার পরেই তাঁহাকে ভোজনের নিমন্ত্রণ করিবে। যদি তেমন ক্ষমতা না থাকে, তবে তাঁহাকে লইয়া সংগীতালয় পশুশালা প্রভৃতি দেশে যাহা-কিছু দেখিবার স্থান আছে লইয়া যাইয়ো। যাহাকে কাহারও নিকট পরিচিত করিবার নিমিত্ত পরিচয়-পত্র লিখিবে, তাহার চরিত্রের বিষয় কিছু লিখিবার আবশ্যক নাই। চরিত্রের বিষয় কিছু না বলিলেও বুঝায় যে, যাহাকে তুমি তোমার বন্ধুর সহিত পরিচিত করিতে চাও, তাহাকে অবশ্য তোমার বন্ধুর পরিচয়ের যোগ্য মনে করিতেছ। শুদ্ধ এই লিখিলেই যথেষ্ট যে— 'অমুক ব্যক্তি তোমার বন্ধু হইলেন, ভরসা করি তোমার অন্যান্য বন্ধুরা তাঁহাকে আদরের সহিত গ্রহণ করিবেন।'

ভারতী
জ্যৈষ্ঠ ১২৮৫

নিন্দা-তত্ত্ব

নিন্দা কাকে বলে জিজ্ঞাসা করলেই লোকে বলে, পরের নামে দোষারোপ করাকে নিন্দা বলে। লোকে তাই বলে বটে, কিন্তু লোকে তাই মনে করে না। কে এমন আছে বলো দেখি যে, সে তার জীবনের প্রতিদিনই পরের নামে দোষারোপ না করে? পর যত দিন দোষ করতে ক্ষান্ত না হবে, তত দিন দোষারোপের মুখ বন্ধ হবে না। যে হিসেবে সকল মানুষই স্বার্থপর, সে হিসেবে সকল মানুষই নিন্দুক। প্রতি মানুষের জীবনের সমস্ত কাজ তুমি রাশীকৃত করে পরীক্ষা করে দেখো, দেখবে, যে খনিতে জন্মেছে তার গায়ে তার মাটি লেগে থাকবেই থাকবে। স্বার্থ যখন স্বার্থপরতার সাধারণ সীমা ছাপিয়ে ওঠে, তখনই আমরা তাকে স্বার্থপরতা বলি। নিন্দাও ঠিক তাই।

যদি বল যে, মিথ্যা দোষারোপ করাকেই নিন্দা বলে, তা হলে নিন্দার অর্থ অসম্পূর্ণ থেকে যায়! মিথ্যা নিন্দা নিন্দার একটা অংশ মাত্র। কে না জানে, এমন অনেক সময় আসে, যখন পর-নিন্দা শোনবার কষ্ট আমাদের নীরবে ধৈর্য ধরে সহ্য করতে হয়, কেননা আমাদের কোনো কথা বলবার থাকে না, নিন্দুক ব্যক্তি প্রতি মুহূর্তে বলছে 'সত্য কথা বলছি, তার আর কী!' কিন্তু সে সহস্র সত্য কথা বলুক-না কেন, তবুও নিন্দুক বলে তার উপর কেমন এক প্রকার ঘৃণা জন্মে।

কিন্তু কেন? সত্যি কথা বলছে, তবু কেন তাকে নিন্দুক বল? তার একটা কারণ আছে। সত্য হোক, মিথ্যা হোক, আমরা উদ্দেশ্য বুঝে নিন্দার নিন্দা করি। সকলেই স্বীকার করেন পরের প্রশংসা করা মাত্রকেই খোশামোদ বলে না। যখন কারও সদ্‌গুণ দেখে আমাদের উচ্ছ্বসিত হৃদয় থেকে প্রশংসা বেরোয় তখন, অবিশ্যি তাকে কেউ খোশামোদ বলে না। কিন্তু যখন তুমি তোমার নিজের স্বার্থ বা অন্য কোনো উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রশংসা কর, সে প্রশংসা সত্য হলেও তাকে খোশামোদ বলে। নিন্দার সম্বন্ধেও ঠিক এই কথাগুলি খাটে। তুমি একজনের কুকার্য দেখে ঘৃণায় অভিভূত হয়ে যদি বজ্রকণ্ঠে তার বিরুদ্ধে তোমার স্বর উত্থাপন কর, তা হলে নিন্দিত ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ তোমাকে নিন্দুক বলবে না। কিন্তু যখন দেখছি নিন্দা করতে আমোদ পাচ্ছ বলে তুমি

নিন্দা করছ, কাল যদি পৃথিবীতে সমস্ত কুকার্য রহিত হয় তা হলে তোমার জীবনের সুখের একটা উপাদান বিনষ্ট হয়, তা হলে তুমিও হয়তো অকাতরে তাদের সঙ্গে সহমরণে যাবার আয়োজন করতে পারো, তখন তুমি যুধিষ্ঠিরের চেয়ে সত্যবাদী হও-না-কেন, নিন্দুক বলে আমি তোমার সঙ্গে কথাবার্তা রহিত করি। যখন তুমি সত্য কথা বলবার জন্য নিন্দা কর না, কেবল নিন্দা করবার জন্য সত্য কথা বল, তখন তোমার সে সত্য কথা নীতির বাজারে মিথ্যা কথার সমান দরেই প্রায় বিক্রি হবে। অতএব নিন্দার যদি একটা বাঁধাবাঁধি ব্যাখ্যা স্থির করতে যাও, তা হলে বলা যেতে পারে যে, বিনা উদ্দেশ্যে বা হীন উদ্দেশ্যে পরের নামে সত্য বা মিথ্যা দোষারোপ করাকে নিন্দা বলে।

পরের নামে দোষারোপ করতে ও পরের নিন্দা শুনতে সাধারণত লোকের কেন অত ভালো লাগে? এক-এক সময়ে ভেবে দেখতে গেলে আশ্চর্য হতে হয়। মানুষের মনে সৌন্দর্যপ্রিয়তা সর্বদাই জেগে রয়েছে। বীভৎস-আবর্জনা-রাশি দেখতে তো আমাদের আমোদ বোধ হয় না, তবে পরের নিন্দে শুনতে কেন অত তৃপ্তি? অনেক দূর পর্যন্ত অনুসন্ধান করে এর মূল দেখতে গেলে আত্মশ্লাঘায় গিয়ে পৌঁছিতে হয়। নিন্দে শুনলে অলক্ষিত ভাবে আমাদের মনে হয় যে, আমি হলে এ কাজটা করতেম না, কিংবা আমি যে দোষ করে থাকি, অমুক লোকেরও তা আছে, অমুক লোকের চেয়ে আমি ভালো কিংবা আমি একলাই কেবল দোষী নই, এই দুটো কথা অজ্ঞাতসারে আমাদের মনে এক প্রকার গর্ব-মিশ্রিত তৃপ্তি জন্মিয়ে দেয়। সকল মানুষের মনেই সৌন্দর্যপ্রিয়তার ভাব রয়েছে বটে, কিন্তু শিক্ষা ও চর্চায় যে তার উন্নতি হয়, সে বিষয়ে তো আর কোনো সন্দেহ নেই। তুমি হয়তো চর্মচক্ষে একটা কুশ্রী জিনিস দেখতে পার না, কিন্তু তোমার হয়তো সৌন্দর্যপ্রিয়তা এত দূর প্রস্ফুটিত হয় নি, যে কুগুণ বা কুনীতির মতো একটা নিরাকার পদার্থের অসৌন্দর্য বা কুশ্রীত্ব তোমার মনে তেমন আঘাত দেয়। সুশিক্ষার গুণে সৌন্দর্যপ্রিয়তা যখন তোমার মনে যথেষ্ট বিকসিত হবে, তখন একটা কদাচরণের কথা শুনলে ঘৃণায় তোমার গা শিউরে উঠবে কিংবা লজ্জা ও সংকোচে তোমার মাথা হেঁট হয়ে যাবে বটে কিন্তু সেই কথা শুনে তোমার আমোদ বোধ হবে না, বা সেই কথা নিয়ে অবকাশের সময় বৈঠকখানায় বসে দশ জনের কাছে দশটা রসিকতা ও হাস্য-পরিহাস করতে রুচি হবে না। কিন্তু সৌন্দর্যের ভাব কজন লোকের মনে এমন প্রস্ফুটিত?

নিন্দা বিশ্বাস করবার দিকে আমাদের কেমন একটা টান আছে। একটা নিন্দা শুনলে আমরা প্রায় তার প্রমাণ জিজ্ঞাসা করি নে, আসল কথা হচ্ছে জিজ্ঞাসা করতে চাই নে। বোধ হয় আমাদের মনে মনে এক প্রকার সূক্ষ্ম ভয় থাকে, পাছে তার ভালো প্রমাণ না থাকে। নিন্দা বিশ্বাস করবার দিকে সাধারণের এত অনুরাগ যে, চণ্ডীমণ্ডপের বিচারালয়ে নিন্দিত ব্যক্তি অপেক্ষা নিন্দুকের সাক্ষী অধিকতর প্রামাণ্য বলে গৃহীত হয়। তুমি রাধামাধবের নামে আমার কাছে একটা দোষোত্থাপন করলে, আমি কোনো প্রমাণ না জিজ্ঞাসা করেও তা বিশ্বাস করলেম, তার পরে রাধামাধব যদি বলতে আসে যে, আমি কোনো দোষ করি নি, তা হলে আমি হয়তো প্রমাণ না পেলে তা ঝট্‌ করে বিশ্বাস করি নে। নিন্দিত ব্যক্তির অত্যন্ত সংকটের অবস্থা। আমরা সহজেই মনে করি, যে দোষী ব্যক্তি তো স্বভাবতই আপনার দোষ ক্ষালন করতে চেষ্টা পাবেই। সুতরাং আমরা তার কথায় কান দিই নে। অনেক সময়ে 'দোষ করি নি' ছাড়া আমাদের আর কিছু বক্তব্য থাকে না, আমরা অনেক সময়ে বিশেষ কতকগুলি গোপনীয় কারণে নির্দোষিতার প্রমাণ থাকতেও তা আমরা প্রমাণ করতে পারি নে। এ রকম অবস্থায় দায়ে পড়ে 'দশচক্রে ভগবান ভূত' হয়ে পড়েন। আমরা যে নিন্দা বিশ্বাস করতে ভালোবাসি তার আর-একটা প্রমাণ এই যে, মনে করো হরিহর রামধনের নামে তোমার কাছে একটা নিন্দা করেছে, তুমি সেটা বিশ্বাস করেছ ও সেই অবধি পরম আমোদে আছ, এবং দু-দশ জন বন্ধুর কাছে গল্প করেছ; আমি যদি আজ এসে তোমাকে বলি যে, হরিহর লোকটা অত্যন্ত নিন্দুক, তার কথা বিশ্বাস করবার যোগ্য নয়, তা হলে

তুমি কোনোমতে তা বিশ্বাস কর না, তুমি বলো, 'না, না, তা কি হয়? লোকটা কি একেবারে খাঁটি মিথ্যে কথা বলতে পারে?' কী আশ্চর্য! হরিহরের মুখে তুমি যখন রামধনের নিন্দের কথা শুনেছিলে, তখন তো তুমি প্রশংসনীয় উদারতার সঙ্গে বল নি যে, 'না, না, তা কি হয়! সে লোকটা কি এমন কাজ করতে পারে?' একটা নিন্দা তুমি অতি সহজে গলাধঃকরণ করলে, কিন্তু আর-একটা সেই শ্রেণীর নিন্দেই কেন তোমার গলায় হঠাৎ বাধল? এর কারণ অবশ্য সকলেই বুঝতে পারছেন। তিনি পরম আনন্দে একটি সুস্বাদ নিন্দা উপভোগ করছিলেন, আর তুমি কি না আর-একটি নীরস নিন্দা তাঁর হাতে দিয়ে সেটি তাঁর মুখ থেকে কেড়ে নিতে চাও? যে নিন্দুকের মুখ থেকে তিনি অমৃত পান করেন, তাকে তুমি আর যা খুশি বলে নিন্দে করো, কিন্তু মিথ্যেবাদী বলে খবরদার নিন্দে কোরো না, তা হলে তুমিই মিথ্যেবাদী হয়ে দাঁড়াবে।

বিশ্বাস-পরায়ণতা মনের সুস্থ ও স্বাভাবিক অবস্থা। যাঁরা পরনিন্দা শুনলে অতি সহজেই তা বিশ্বাস করেন, তাঁদের হয়তো তুমি বিশ্বাস-পরায়ণ বলবে। আমি তো ঠিক তার উল্টো বলি। যেমন তুমি যখন বল, আমি চার দিক অন্ধকার দেখছি, তখন তার অর্থ বোঝায়, আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছি নে, অর্থাৎ অন্ধকার দেখা, কিছু না-দেখার ভাষান্তর মাত্র, তেমনি নিন্দা-বিশ্বাসিতা, অবিশ্বাসিতার অন্য একটি নাম। তুমি দেখতে পাবে, সন্দিগ্ধ ও কুটিল হৃদয়েরাই নিন্দা নিয়ে লেনা-দেনা করে থাকেন। তুমি যথার্থ সরল ও অসন্দিগ্ধচিত্ত ব্যক্তির কাছে কারও নিন্দা উত্থাপন করো, তিনি বলে উঠবেন, 'না, না, এমনও কি মানুষে করতে পারে।' মানুষের চরিত্রের উপর তাঁর এত বিশ্বাস যে, তিনি, কেহ যে খারাপ কাজ করেছে, তা শীঘ্র বিশ্বাস করতে পারেন না। মনে করো, তোমার এক পরিচিত ব্যক্তি অত্যন্ত ধার্মিক, তাঁকে তুমি প্রত্যহ দুই সন্ধে দেবপূজা করতে দেখ, আমি তোমাকে একদিন কানে কানে ফুসফুস করে বললেম যে, চক্রবর্তীমশায় বৃহস্পতিবারে গোমাংস খেয়েছেন, অমনি তুমি তা বিশ্বাস করলে; তুমি কতদূর সন্দিগ্ধহৃদয় বলো দেখি! তুমি প্রত্যহ নিজের চক্ষে তাঁর ধার্মিকতার প্রমাণ পাচ্ছ, আরেকদিন একটা কানে কানে কথা শুনেই সে-সমস্ত তুমি অবিশ্বাস করলে? চণ্ডীমণ্ডপে গুটিপাঁচেক বৃদ্ধ গৃহস্বামী বসে ধূম-সেবন করছেন, চাণক্যের শ্লোক পাঠ করে ও বয়ঃপ্রাপ্তি অবধি চণ্ডীমণ্ডপের তাম্রকূটধূমাচ্ছন্ন ও নস্যগন্ধী পর-চর্চা শুনে সংসারের বিষয়ে তাঁদের অভিজ্ঞতা অসাধারণ পক্কতা প্রাপ্ত হয়েছে; রামশংকর খুড়ো তাঁদের এসে বললেন যে, মণ্ডলদের বাড়ির ছোটো বউ সমাজ-বিরুদ্ধ কাজ করেছে, তাঁরা অতি অল্প পরিশ্রমে সমস্ত সিদ্ধান্ত করে মহা বিজ্ঞভাবে বললেন যে, 'কিছু আশ্চর্য নয়, কারণ, "বিশ্বাসং নৈব কর্তব্যং স্ত্রীষু রাজকুলেষু চ"।' তাই তো বলি, নিন্দা বিশ্বাস করা সন্দিগ্ধ হৃদয়ের লক্ষণ। তবে কেউ কেউ আছেন, যাঁরা দূর অপেক্ষা আশু, অনুপস্থিত অপেক্ষা উপস্থিত, ও নিজের চোখের দেখা অপেক্ষা পরের মুখের কথা অধিক বিশ্বাস করেন। এখন তুমি তাঁকে একটি খবর দেও, তা বিশ্বাস করতে তাঁর যত পরিশ্রম ও সময় ব্যয় হবে, দু ঘণ্টা পরে আর-এক জন ঠিক তার বিপরীত খবর দিলে, তা বিশ্বাস করতে তাঁর তার চেয়ে কিছু অধিক হবে না। এমন লোকের শিশু-প্রকৃতির একটা ঘোরতর ভ্রমের ফল। এ দলের সম্বন্ধে আমার অধিক কিছু বক্তব্য নেই। নিন্দা অবিশ্বাস করবার ঝোঁক অনেকটা শিক্ষা ও অভ্যাস -সাপেক্ষ। এ বিষয়ে বিশেষ অভ্যাস ও বিবেচনা আবশ্যক। যে নিন্দা শুনলে তোমার মনে কষ্ট হয়, তা তুমি না বিশ্বাস করতেও পার, কিংবা যে নিন্দায় তোমার কষ্ট বা সুখ কিছুই না জন্মায়, তা তুমি বিশেষ প্রমাণ না পেলে অবিশ্বাস করতে পার, কিন্তু স্বার্থজড়িত কতকগুলি বিশেষ কারণে যে নিন্দা শুনলে তোমার আমোদ জন্মাবার সম্ভাবনা, তা বিশেষ প্রমাণ না পেয়ে বিশ্বাস না করা শিক্ষিত মনের লক্ষণ। আর-এক অবস্থায় আমরা নিন্দা অতি সহজে বিশ্বাস করি। আমরা একজন লোককে খারাপ বলে জানি, তার নামে একটা নিন্দা শুনবামাত্রেই আমরা অনায়াসে বিশ্বাস করি, আমরা মনে করি এটা কিছুই অসম্ভব নয়। সুতরাং আমরা তার আর প্রমাণ জিজ্ঞাসা করি নে কিন্তু শিক্ষিতমনা ব্যক্তিরা তখন বলেন যে, 'সমস্ত সম্ভব ঘটনা পৃথিবীতে ঘটে না।' একটা জিনিস

সম্ভব হতে পারে কিন্তু সত্য নাও হতে পারে। এক ব্যক্তি এসে যখন আমাদের কাছে একটা প্রিয়-নিন্দা উত্থাপন ক'রে বলে যে, 'এইরকম তো সকলে বলছে।' তখন আমরা আর কিছু বিচার করি নে, মনে করি 'সকলে বলছে', এর চেয়ে সুদৃঢ় প্রমাণ আর কিছুই হতে পারে না! কিন্তু, এই 'সকলে বলছে' কথাটি অত্যন্ত শূন্যগর্ভ। একজন তোমাকে এসে বললেন, সকলে বলছে অমুকে অমুক কাজ করেছে। সেখেনে 'সকলে' অর্থে তিনি যে ব্যক্তির মুখে শুনেছেন, তুমি তাঁর ধুয়ো ধরে আমাকে বললে যে, সকলে অমুক কথা বলছে। আমি অকাতরে বিশ্বাস করি যে, যখন ''সকলে বলছে'' তখন অবিশ্যি সত্যি! আমাকে একজন এসে যদি জিজ্ঞাসা করে যে, 'তুমি যে বলছ 'সকলে বলছে,' আচ্ছা, কে কে বলছে বলো দেখি?' আমি ভেবে ভেবে একজনের বেশি নাম করতে পারি নে, অবশেষে অপ্রস্তুত হয়ে আমি তোমাকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করি— 'ওহে, কে কে বলছে বলো দেখি?' তুমিও তথৈবচ। মূল অন্বেষণ করতে যতদূর পর্যন্ত যাও-না কেন, দেখবে তোমার চেয়ে এ বিষয়ে কারও জ্ঞান অধিক নয়। 'সকলে বলছে' কথাটা একটা সংক্রামক পীড়া। প্রথমত একজনের মুখ থেকে কথাটা বেরোয়, তার পরে দিবসান্তে সকলেরই মুখে শুনতে পাবে 'সকলে বলছে।' সকালবেলায় যে কথাটি সম্পূর্ণ অলীক ছিল, সন্ধেবেলায় সেটা সম্পূর্ণ সত্য হয়ে দাঁড়ায়। আমি একটা বিশেষ নিয়ম করেছি যে, 'সকলে বলছে' কথাটি যখনি শুনব, তখনি জিজ্ঞাসা করব 'কে কে বলছে?'

শিক্ষিত ব্যক্তিরা যখন একটা নিন্দা শোনেন তখন অনেক রকম বিচার করেন। আমরা তিন রকম ব্যক্তির কাছে নিন্দা শুনি : ১. বিখ্যাত নিন্দুক অর্থাৎ যাদের আমরা নিন্দুক বলে জানি। ২. যাদের বিষয়ে আমরা কিছুই অবগত নই। ৩. যাদের আমরা সত্যবাদী বলে জানি। প্রথমোক্ত ব্যক্তিদের মুখ থেকে যখন শিক্ষিতমনা ব্যক্তি কোনো নিন্দা শোনেন তখন তা অবিশ্বাস করতে তাঁর বড়ো পরিশ্রম হয় না। দ্বিতীয়োক্ত ব্যক্তির মুখ থেকে যখন শোনেন তখন তাঁর একটা ভাবনা আসে; হয়তো মনে করেন যে, 'এ লোকটার কথা অবিশ্বাস করবার আমার কী অধিকার আছে?' কিন্তু এ ভাবনা কোনো কাজের নয়, কেননা তখন আমাদের দুটো বিরোধী কর্তব্যের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। আর-এক জনের সচ্চরিত্রে অবিশ্বাস করবার আমার কী অধিকার আছে? এ রকম অবস্থায় তিনি বিশ্বাসও করেন না অবিশ্বাসও করেন না। বিশ্বাস ও অবিশ্বাস দুইয়েরই অধিকার -বহির্ভূত একটি দাঁড়াবার স্থান আছে। তিনি তখন সে নিন্দুককে বলেন যে, 'তোমার কথা সত্য হতে পারে, কিন্তু যতক্ষণ প্রমাণ না পাব ততক্ষণ তা বিশ্বাস করব না।' কিন্তু তৃতীয়োক্ত ব্যক্তির মুখে যখন তিনি নিন্দা শোনেন তখন তিনি যে-সকল যুক্তি অবলম্বন করেন সে বিষয় পরে বলছি।

যাকে তিনি নিন্দুক বলে জানেন তার মুখ থেকে কোনো নিন্দা শুনলে তিনি এই-সকল বিবেচনা করেন যে, 'প্রথমত এ ব্যক্তির কোনো অভিসন্ধি থাকতে পারে, কিংবা নিন্দার অভ্যাস থাকা বশত নিন্দা করছে। দ্বিতীয়ত, একটা সত্য কথার কিয়দংশ বাদ দিলে তা মিথ্যে হয়ে দাঁড়ায়, তুমি আমাকে এসে বললে যে, অমুক মদ খেয়েছে, কিন্তু তুমি হয়তো বাদ দিলে যে, তাকে ডাক্তারেরা মদ খেতে পরামর্শ দিয়েছিল; তুমি সত্য কথা বললে বটে কিন্তু এ মিথ্যার রূপান্তর মাত্র, অতএব একটা কথার সমগ্র না শুনলে সে বিষয়ে বিচার করা যায় না। যাঁকে তিনি সত্যবাদী বলে জানেন তাঁর কাছ থেকে যখন তিনি কোনো নিন্দা শোনেন, তখন তিনি প্রথমত মনে করেন, 'ইনি হয়তো একটা গুজব শুনে তাই বিশ্বাস করছেন। বিশ্বাস করবার কী কারণ জানি না, কিন্তু হয়তো সে কারণগুলি ভ্রমাত্মক।' দ্বিতীয়ত, 'ইনি হয়তো কতকগুলি কার্য দেখে একটা নিজের অনুমান করে নিয়েছেন, সে কার্যগুলি সমস্ত সত্য হতে পারে কিন্তু সে অনুমানটা হয়তো সমস্তই অমূলক।' তৃতীয়ত, 'তিনি হয়তো তাঁর নিজের কতকগুলি বিশেষ সংস্কারবশত একটা কাজ এমন খারাপ চক্ষে দেখছেন যে, তার তিল-প্রমাণ দোষ স্বভাবতই তাঁর সুমুখে তাল-প্রমাণ আকার ধারণ করছে।' চতুর্থত, অনেক সময় অনেক জিনিস যা আমাদের কল্পনায় সত্য বলে প্রতিভাত

হয়, তা আসলে সত্য নয়। মনে করো, একজন হিন্দু একদিন রবিবারে গির্জে দেখতে গিয়েছেন, সেইদিনকার বক্তৃতায় পাদ্রি সাহেব দৈবক্রমে Heathen-দের বিরুদ্ধে দুই-এক কথা উল্লেখ করেছিলেন। সেই হিন্দু কল্পনা করলেন যে, পাদ্রি তাঁর প্রতি লক্ষ্য করেই ওই বক্তৃতাটি করেন। এই কল্পনায় তাঁকে এমন অভিভূত করে তুললে যে, তাঁর মনে হল, যেন, বক্তা একবার তাঁর দিকে বিশেষ করে চেয়ে দেখলেন ও সেই সময়েই Heathen কথাটা বিশেষ জোর দিয়ে বললেন। সেই হিন্দুটি সত্যবাদী হতে পারেন, পাদ্রি যে সেদিন হীদেনদের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করেছিলেন সে বিষয়ে আমি তিল মাত্র সন্দেহ করি নে, কিন্তু তিনি যে তাঁর দিকে চেয়ে হীদেন কথাটি বিশেষ জোর দিয়ে বলেছিলেন, সে বিষয়ে আমার ঘোর সন্দেহ রয়ে গেল। এইরকম কত শত বিচার করবার জিনিস রয়েছে। আমার কাছে একবার একজন আমার এক পরিচিত ব্যক্তির নামে নিন্দা করেন, আমি তা বিশ্বাস না করাতে তিনি বলেন যে, তিনি সেই ব্যক্তির এক বাড়ির লোকের কাছে শুনেছেন। আমি তাঁকে বললেম, 'তাতে বিশেষ কিছুই প্রমাণ হচ্ছে না। বাড়ির লোক বলেছে বলে বিশ্বাস করবার একটা প্রধান প্রমাণ দেখাচ্ছ এই যে, বাড়ির লোক কখনো তার আত্মীয়ের নামে নিন্দা করে না। আচ্ছা ভালো। কিন্তু যখন দেখছ, এক-একটা ''বাড়ির লোক'' তার ''বাড়ির লোকের'' নামে নিন্দা করছে, তখন তার বাড়ির লোকত্ব পরলোকত্ব প্রাপ্ত হয়েছে। খুব সম্ভব, নিন্দিত ব্যক্তির সঙ্গে তার কোনো কারণে মনান্তর হয়েছে, তা যদি হয়ে থাকে তবে তার নামে অলীক অপবাদ রটাতে আটক কী? বাড়ির লোক যখন তার আত্মীয়ের নিন্দা করে, তখন তাকে আমি সর্বাপেক্ষা কম বিশ্বাস করি।' অনেক লোক আছেন, তাঁরা পরের অনিষ্ট করব বলে নিন্দে করেন না। তাঁরা ভদ্রলোক, তাঁরা পরের মনে কষ্ট দিতে চান না। তাঁরা যখন নিন্দা করেন তখন তার ফল বিবেচনা করে দেখেন না। তাঁরা কৃষ্ণকান্তবাবুর নামে একটা নিন্দা শুনেছেন, তাই জহরীলালের কাছে গল্প করে বললেন, 'ওহে, শোনা গেল, কৃষ্ণকান্তবাবু অমুক কাজ করেছেন।' জহরীলালের সঙ্গে কৃষ্ণকান্তের কোনো আলাপ-পরিচয় যোগাযোগ নেই, সুতরাং হঠাৎ তাঁদের মনে ঠেকতে পারে না যে, এ নিন্দায় কোনো দোষ আছে। দৈবক্রমে দূরত তার একটা কুফল ঘটতে পারে, তা তাঁরা ভেবে উঠতে পারেন না। তা ছাড়া অনাবশ্যক কারও নিন্দা করব না, এমনও একটা নিয়ম তাঁরা বাঁধেন নি। যখন দশ জন বন্ধু দশ রকম কথা কচ্ছ, তখন জিব অত্যন্ত পিছল হয়ে ওঠে, মনের কপাট আলগা হয়ে যায়, তখন বিশেষ একটা হানি না দেখলে একটা মজার কথা সামলে রাখা তাঁদের পক্ষে দায় হয়ে ওঠে। তখন তাঁদের মনে করা উচিত যে, তাঁরা রোষে একেবারে অধীর হয়ে ওঠেন কি না? তখন তাঁরা কেন মনকে বোঝান না যে, 'আমরা কেই-বা? আমাদের এক মুহূর্তের একটা কাজ একটা মানুষ কতক্ষণই বা মনে রাখতে পারবে বলো? আমরা আমাদের নিজের মনে সর্বদাই এমন জাগ্রত রয়েছি যে অন্য একটা অপরিচিত বা অল্পপরিচিত মানুষ আমাদের বিষয় কত কম ভাবে, তা আমরা ঠিক মনে করতে পারি নে!' তখন তাঁরা কেন ভাবেন না যে 'একজন অপরিচিত ব্যক্তি আমার দোষ জানলেই বা তাতে কী ক্ষতি?'

খবর দেবার বাতিক অনেক লোকের আছে। একটা নতুন খবর দিতে পারলে একজন যত গর্ব অনুভব করেন, একজন লেখক তাঁর মনের মতো রচনা শেষ করে ততটা অনুভব করেন না। খবর দেবার অতৃপ্ত পিপাসা তাঁদের একটা রোগ। এঁদের অনুগ্রহেই নিন্দার বাজারে যথেষ্ট মালের আমদানি হয়। একজনের ঘরের খবর ফাঁকি দিয়ে জানতে পারলে লোকের ভারি আমোদ হয়। তুমি পর্দার আড়ালে খেমটা নাচছ, তুমি মনে করছ আমি দেখতে পাচ্ছি নে, অথচ আমি দেখে নিচ্ছি তাতে আমাদের অত্যন্ত তৃপ্তি হয়। একটা কাজ যতই দুর্জ্ঞেয় ও গোপনীয়, তার প্রকাশ বক্তার ও শ্রোতার মনে ততই আমোদ হয়। একজন লোক একটা করতে গেল, কিন্তু আর-একটা হয়ে পড়ল; সে মনে করছে এ কাজটা গোপন রইল, অথচ সেটা প্রকাশ হয়ে পড়ল, তাতে আমাদের ভারি একটা মজা মনে হয়। হাস্যরসের বিষয়ে এমার্সন বলেছেন যে, 'সমুদয়

কৌতুক ও প্রহসনের মূল ও সার হচ্ছে, উদ্দেশ্যের অসম্পূর্ণতা— যা সিদ্ধ হবার কথা ছিল তার অসিদ্ধি; বিশেষত এক ব্যক্তি যখন সিদ্ধ হবার বিষয়ে উচ্চৈঃস্বরে আশা প্রকাশ করছে তখন তার নিরাশ হওয়া। বুদ্ধির অসামর্থ্য, আশার হতসিদ্ধি ও একটা কার্য-সূত্রের হঠাৎ মাঝখানে ছেদ হওয়ার নাম comedy।' গুপ্ত নিন্দা শুনতে আমাদের এইজন্যেই ভালো লাগে। একে তো নিন্দা, তাতে আবার গুপ্ত! এইজন্যেই যারা লোকের পরিবার সংক্রান্ত কোনো খবর দিতে পারে, তারা আপনাকে কৃত-কৃতার্থ ও পূর্বজন্মের অনেক পুণ্যের অধিকারী মনে করে।

অনেকের বাড়িয়ে বলা স্বভাবসিদ্ধ। অনেক সময়ে তারা নিজে বুঝতে পারে না যে, তারা বাড়িয়ে বলছে। আমি জানি, গোবিন্দবাবুর বাড়িয়ে বলা একটা বদ্ধমূল রোগ। তাঁতে আমাতে দুজনে মিলে যা দেখেছি, তাও আমার সাক্ষাতেই আর-এক জনের কাছে এমন বাড়িয়ে বলেন যে, আমি আশ্চর্য হয়ে যাই। তিনি যাকে পণ্ডিত বলে প্রশংসা করতে চান, তাকে বলেন তার মতো পণ্ডিত ভারতবর্ষে নেই, এই রকম করে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে তিনি নিদেন ভিন্ন ভিন্ন পঞ্চাশ জনকে ভারতবর্ষের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম পণ্ডিতের যশ অর্পণ করেছেন। তাঁর প্রধান রোগ হচ্ছে (অনেক ঐতিহাসিকের এই রোগটি আছে।), যে একটা সত্য ঘটনা বলা তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য নয়, সেই কথাটি বলে শ্রোতার মনে তাঁর অভিপ্রেত একটি ফল জন্মিয়ে দেওয়াই তাঁর মুখ্য অভিপ্রায়। যদি তিনি অসংলগ্ন দুই-একটা কথা দৈবাৎ শুনতে পান, তা হলে নিজের ট্যাঁক থেকে দু-চারটে কথা যোগ করে সেটা সংলগ্ন করে দেন, কেননা জানেন, নইলে শ্রোতাদের মনে কোনো ফল হবে না। যদি তিনি জানতে পারেন, একটা ঘটনা একটু মুচড়ে, ইতস্তত একটু ছেঁটে-ছুঁটে দিলে শ্রোতাদের মনে অধিকতর ফল হবে, তা হলে সে পরিশ্রমটুকু স্বীকার করতে তিনি কিছুমাত্র অসম্মত নন। সর্বদাই তাঁর শ্রোতৃমণ্ডলীকে হাঁ করিয়ে রাখা, তাঁর জীবনের প্রধান চেষ্টা। 'ভয়ানক' 'অসাধারণ' 'আশ্চর্য', এই-সকল বিশেষণে তাঁর তহবিল পূর্ণ রয়েছে। এঁরা যে-সকল নিন্দা ও মিথ্যে কথা বলেন, তার উদ্দেশ্য হচ্ছে, দশ জনকে তাক করে দেওয়া। এঁদের দল সংখ্যায় কম নয়।

এইরূপ যেমন নানা শ্রেণীর নিন্দুক আছে, নিন্দা করবার প্রথাও তেমনি শত সহস্র। এক দল নিন্দুক আছে, নিন্দা করাই যে তাদের উদ্দেশ্য তা স্পষ্ট বোঝা যায়। কিন্তু আর-এক দল আছে, নিন্দা করা যেন তাদের বাসনা নয় এই রকম প্রকাশ পেতে থাকে। বলা বাহুল্য যে, শেষোক্ত দলই অধিকতর ফল-জনক। তাঁদের নিন্দা করবার পদ্ধতি নানাবিধ। তাঁদের নিন্দের দু-চারটে নমুনা দিই।

অনেক সময়ে নীরবে নিন্দা করা যায়। পাঁচ জনে একজনের খুব প্রশংসা করছে, তুমি সেখানে এমন রহস্যপূর্ণ ভাবে চুপ করে বসে আছ, কিংবা তোমার ঠোঁটের এক কোণে এমন এক রত্তি হাসি উঁকি মারছে, যে খানিকক্ষণ তোমার এইরকম ভাবগতিক দেখে তাদের মুখের কথা মুখে মরে আসে, তারা মনে করে তুমি না জানি তার নামে কী একটা গুপ্ত সংবাদ জান, তোমাকে পীড়াপীড়ি আরম্ভ করলে তুমি বল যে, 'নাঃ, কিছু না।' এমন স্বরে বল যে, তার অর্থ এই হয়ে দাঁড়ায় যে, 'সে অনেক কথা!' আর-এক রকম নিন্দে আছে, তাকে বাজে নিন্দে বা উপরি নিন্দে বলা যেতে পারে। সে হচ্ছে, পাঁচ কথা বলতে বলতে এক কথা বলা। রামধনবাবুর কাল রাত্রে অত্যন্ত কাশি হয়েছিল, এই গল্পটি বলবার সময় একটু সুবিধে, অবকাশ ও ছিদ্র পেলেই, সুদক্ষ নিন্দুক যেন বিশেষ কোনো কথা নয় এমনি ভাবে হরকুমার যে মদ খায় সেই কথাটা সংক্ষেপে বলে যান। গানের পক্ষে যেমন তান, গল্পের পক্ষে এরকম নিন্দাও তাই। যেমন গানের সুর ও তাল বজায় রেখে দুই-একটা বাজে তান দিলে হানি নেই, গানের সুর বিগড়ে বা তাল মাটি করে একটা অসংলগ্ন তান দিলে শ্রোতাদের কানে ভালো শোনায় না, তেমনি গল্পের তাল বজায় রেখে ঠিক জায়গায় একটা উপরি কথা তুললে শ্রোতাদের মন্দ লাগে না; এরকম স্থলে বক্তার নিন্দুক বলে বদনাম রটে না; মনে হয় পাঁচ কথা বলতে এক কথা দৈবাৎ বেরিয়ে পড়ল। বেকন-এ আছে, যে, এক-একজন বাজে কথায় চিঠি পুরিয়ে কাজের কথা পুনশ্চ

নিবেদনের মধ্যে লেখেন। অনেক নিন্দুকও তাই করেন, সমস্ত কথার মধ্যে যে নিন্দাটা তাঁর বিশেষ বলা উদ্দেশ্য সেইটেকে তিনি এমন অপ্রাধান্য দিয়ে বলেন যে, মনে হয় যেন, সেটা বলবার জন্যে তাঁর বিশেষ মাথা-ব্যথা পড়ে নি। আবার অনেকে ভান করেন যেন, দৈবাৎ তিনি এক কথা বলে ফেললেন, আধখানা বলেই জিব কামড়ান, তার পরে পীড়াপীড়ির পর অতি আস্তে আস্তে সব বের করে ফেলেন। লোকে বলবে তিনি ইচ্ছে করে পারতপক্ষে কারো নিন্দে করেন নি। কেউ বা, যেন তিনি মনে করছেন যে তুমি তো জানোই, এমনিভাবে তোমার কাছে একটা কথা বলে ফেলেন; তার পরে যখন শোনেন যে, তুমি জানতে না, তখন ঘোরতর অনুতাপ আফসোস করতে আরম্ভ করেন। আবার অনেকে নিন্দে করবার সময় এইরকম ভাব দেখান যে, যেন 'সকলেই এ কথা জানে, তুমি জান না, এ ভারি আশ্চর্য।' এ-সকল নিন্দে নিন্দের নামে সংসারে গণ্য হয় না। সংসারে আর-এক প্রকারের নিন্দা আছে, তাকে আত্ম-নিন্দা বলতে গেলে সকল সময়ে বিনয় বোঝায় না। অধিকাংশ আত্ম-নিন্দা গর্ব থেকে উত্থিত হয়। তুমি সমস্ত সমাজকে উপেক্ষা করে বলতে থাকো যে, আমি পৃথিবীর নিন্দা গ্রাহ্য করি নে। আমি অমুক অমুক পাপাচরণ করেছি, এখন সমাজ! তুমি আমার কী করতে পারো করো। সমাজের উপর মহা খাপা। কেন? না সমাজের শক্তি আছে বলে। পাপাচরণ করলে সমাজ বলপূর্বক শাসন করেন বলে। সমাজের দুই-একটি আদুরে ছেলে ছাড়া আর কেউ বিপথে গেলে সমাজ তাকে স্নেহের স্বরে উপদেশ দেন না, তাকে কান ধরে সিধা পথে আনেন। আদরের ও স্নেহের দানা দেখিয়ে তিনি ছিন্ন-রজ্জু ঘোড়াকে আস্তাবলে ফেরাতে চেষ্টা করেন না, তাঁর নিয়ম হচ্ছে চাবুকের ভয় দেখানো। কিন্তু এক-একটা মানুষ আছে, যাদের মন্দ কাজ না করতে অনুরোধ করো, শুনবে, কিন্তু আদেশ করো, অমনি তার বিরুদ্ধে তারা কোমর বেঁধে দাঁড়াবে। আত্ম-নিন্দুক দলেরা অধিকাংশ এই শ্রেণীর লোক। বায়রন তার একটি বিখ্যাত আদর্শ। পর-নিন্দুকদের মতো আত্ম-নিন্দুকদের সকল কথাও বিশ্বাসযোগ্য নয়। আত্মনিন্দা যখন গর্ব থেকে উত্থিত হচ্ছে, তখনও তা অনেক পীড়াপীড়িতে দায়ে পড়ে স্বীকার করা হয়, তখন যে তার অনেক কথা বাড়ানো থাকা সম্ভব, তা বলাই বাহুল্য। এইরকম সমাজের বিরুদ্ধে যারা বিদ্রোহ করে তারা দুর্দান্ত বলিষ্ঠ-হৃদয় লোক। কিন্তু একটা দেখা যায়, এক ব্যক্তির সমাজ-বিদ্রোহিতা যতই বলবান হোক-না কেন, তবু এতটুকু আত্মশ্লাঘা ও নিন্দা-ভীরুতা তার মনে অবশিষ্ট থাকবে যে, কতকগুলি ছোটোখাটো দোষ সে সমাজের কাছে কোনো মতেই প্রকাশ করতে রাজি হবে না। একজন মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করতে পারবে যে, সে ডাকাতি করেছে, কিন্তু চুরি করেছে স্বীকার করতে সে কুণ্ঠিত হবে। কিন্তু এমন যদি কেউ থাকে যে, তার হৃদয়ের-বীভৎসতম স্থান পর্যন্ত লোকের চক্ষে অনাবৃত করে দিতে পারে, এমন কোনো পাপ পৃথিবীতে নেই যা সে প্রকাশ্যভাবে আপনার স্কন্ধে না নিতে পারে, তবে সে নরকের এক খণ্ড। পাপ যে করে সে বিকৃত-চরিত্র, কিন্তু যে প্রকাশ্যভাবে পাপ করে সে সে-বিশেষণের অনধিগম্য। আত্ম-নিন্দা ও বিনয় কেউ যেন এক পদার্থ মনে না করেন। বাংলা এক মহাকাব্যে মহাকবি রামের মুখে অনেক স্থলে 'ভিখারী' বলে আত্ম-পরিচয় বসিয়েছেন। যেমন 'ভিখারী রাঘব; দূতি, বিদিত জগতে!' বোধ হয় কবি রামকে বিনয়ী করবার অভিলাষে এইরকম করে থাকবেন, কিন্তু আমরা একে বিনয় বলতে পারি নে। 'আমি দরিদ্র' এ কথা বিনয়ে বলা যেতে পারে, কিন্তু আমি ভিক্ষা করে জীবিকা নির্বাহ করি এ কথা বিনয়ের কথা নয়। দারিদ্র্য দোষের নয়, কিন্তু পরমুখাপেক্ষী হয়ে ভিক্ষা করে জীবন ধারণ করবার রুচি মনের একটা বিকৃত অবস্থা। কেউ কখনো আমি মিথ্যাবাদী বা আমি জুয়াচোর বলে বিনয় প্রকাশ করে না।

আত্ম-নিন্দার ছলে অনেক সময়ে আমরা আত্ম-প্রশংসা করি। একজন নানা প্রকার ভূমিকা করে বললেন যে, 'দেখুন মহাশয়, আমার একটা ভারি দোষ আছে, আমি তা কোনো মতেই ছাড়াতে পারি নে, আমার যা মনে আসে আমি তা স্পষ্ট না বলে থাকতে পারি নে, আমি যা বলি তা মুখের সামনে বলি।' একে বিনীতভাবে অহংকার করা বলে।

আমরা আর-এক সময়ে আত্ম-নিন্দা করি। আমরা যখন মনে মনে জানি আমাদের একটা গুণ আছে, আমরা তখন কখনো কখনো আমাদের সেই গুণ নেই বলে বাইরে প্রকাশ করি; তার তাৎপর্য এই যে শ্রোতা আমার কথার বিরুদ্ধে নিজের মত ব্যক্ত করুক, সেইটে আমাদের শোনবার ইচ্ছে। আমরা এক-একজনকে দেখেছি, তাঁরা বন্ধুমণ্ডলীতে 'লোকটা তো বড়ো খোলাখালা!' এই প্রশংসাটুকু পাবার জন্য আপনার কতকগুলি ছোটোখাটো দোষের কথা হাসতে হাসতে উল্লেখ করেন, তাঁর নিন্দার মূল্যে প্রশংসো ক্রয় করতে চান।

এইরকম যত আত্ম-নিন্দা দেখা যায় প্রায় দেখবে যে, বিনয়ের জমি থেকে তার চারা ওঠে নি। গর্বই তার মূল। পরনিন্দার মূলেও গর্ব, আত্ম-নিন্দার মূলেও গর্ব। পরনিন্দাও যেমন দোষ, আত্ম-নিন্দাও তেমনি। পরহত্যা ও আত্মহত্যার মধ্যে নীতিশাস্ত্রে যেমন কম তফাত লেখে, পরনিন্দা ও আত্ম-নিন্দার মধ্যেও তাই।

ভারতী
আশ্বিন ১২৮৬

পারিবারিক দাসত্ব

সম্প্রতি স্বাধীনতা-নামক একটি শব্দ আমাদের বাংলা সাহিত্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। কিন্তু এ কথাটা আমাদের সাহিত্যের নিজস্ব সম্পত্তি নহে। এমন নহে যে, স্বাধীনতা বলিয়া একটা ভাব আমাদের হৃদয়ে আগে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, পরে আমরা যথা নিয়মে তাহার নামকরণ করিয়াছি; বরঞ্চ স্বাধীনতা বলিয়া একটা নাম আমরা হঠাৎ কুড়াইয়া পাইয়াছি, ও সেই নামটাকে বস্তু মনে করিয়া ষোড়শোপচারে তাহার পূজা করিতেছি। অল্প দিন হইল সংবাদপত্রে দেখিতেছিলাম যে, দাক্ষিণাত্যের অশিক্ষিত কৃষকদের য়ুরোপ হইতে আনীত কতকগুলি বাষ্পীয় হল-যন্ত্র দেওয়া হইয়াছিল, তাহারা সেগুলি ব্যবহার না করিয়া অলৌকিক দেবতা জ্ঞানে পূজা আরম্ভ করিয়া দিল; আমাদের বঙ্গীয় সাহিত্য-কৃষীগণ 'স্বাধীনতা' নামক ওইরূপ একটি বাষ্পীয় হল-যন্ত্র সহসা পাইয়াছে, কিন্তু না জানে তাহা ব্যবহার করিতে, না তাহা ব্যবহার করিতে অগ্রসর হয়। কেবল দিবানিশি ওই শব্দটার পূজাই চলিতেছে। কাগজে পত্রে পুঁথিতে সভাস্থলে মহা আড়ম্বরপূর্বক স্বাধীনতা শব্দের প্রতিমা প্রতিষ্ঠা হইতেছে। 'স্বাধীনতা স্বাধীনতা' বলিয়া ঢাকের একটা বোল তৈরি হইয়া গিয়াছে এবং কবিবর, মহাকবি ও সুপ্রসিদ্ধ কবি-নামক যত বড়ো বড়ো সাহিত্য-ঢাকীগণ ওই বোলে বাজাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। শুনিতেছি নাকি বড়ো মিঠা বাজিতেছে এবং সেই তালে তালে নাকি অধুনাতন বঙ্গ-যুবক-কলের-পুতুলগণ (ঈষৎ কল টিপিয়া দিলেই যাঁহারা নাচিয়া উঠেন এবং নাচা ব্যতীত যাঁহারা আর কিছু জানেন না) অতিশয় সুদৃশ্য নৃত্য আরম্ভ করিয়াছেন। যাহা যাহা হইতেছে তাহা অতিশয় সুদৃশ্য ও সুশ্রাব্য তাহার আর সন্দেহ নাই। কিন্তু অনেক হৃদয়বান ব্যক্তি এই বলিয়া আক্ষেপ করিয়া থাকেন যে, স্বাধীনতা শব্দ 'তাধিন্‌তা' শব্দের অপভ্রংশ নহে, ওই শব্দটি লইয়া যে কেবলমাত্র নৃত্যের ও ঢাকের বোল প্রস্তুত হয় তাহা নহে; ওই হল-যন্ত্র চালনা না করিয়া কেবলমাত্র পূজা করিলে কোনো প্রকার ফসলই জন্মাইবার সম্ভাবনা নাই।

স্বাধীনতা ও অধীনতা কাহাকে বলে তাহা বোধ হয় আমরা সকলে ঠিকটি হৃদয়ংগম করিতে পারি নাই। যে ভাব আমরা ভালোরূপে অনুভব করিতেই পারি না, সে ভাব হৃদয়ংগম করাও বড়ো সহজ ব্যাপার নহে। সাধারণত আমরা সকলে মনে করি যে, আমরা অধীন, কেননা ইংরাজেরা আমাদের রাজা, তাহারা আমাদের রাজা না থাকিলেই আমরা স্বাধীন। এরূপ কথা নিতান্তই লঘু। এই কথাটি সর্ব-সাধারণ্যে চলিত থাকাতে ফল হইয়াছে এই যে, যাঁহারা দেশ-

হিতৈষী বলিয়া পরিচয় দিতে চান, তাঁহারা দেশ-হিতৈষী হইবার একটি সহজ উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন। সেটি আর কিছু নয়, ইংরাজ জাতিকে যথেচ্ছা গালাগালি দেওয়া। তাঁহারা এই কথা বলেন যে, আমরা যে পরাধীন ইংরাজ জাতিই তাহার নিমিত্ত সম্পূর্ণরূপে দায়ী। কাঁঠাল বৃক্ষ যদি তাহার শাখাজাত ফলগুলির উপর মহা রাগ করিয়া বলিয়া উঠে যে, 'আঃ, এই ফলগুলা যদি না থাকিত তবে আমি আম্রবৃক্ষ হইতে পারিতাম,' তবে তাহাকে এই বলিয়া বুঝানো যায় যে, তুমি কাঁঠাল বৃক্ষ বলিয়াই তোমাতে কাঁঠাল ফলিয়াছে, তোমার শিকড় হইতে পাতা পর্যন্ত কাঁঠাল ফলিবার কারণে পরিপূর্ণ। আমাদের সমাজের শিরায় শিরায় অধীনতার কারণ সঞ্চারিত হইতেছে। ইংরাজেরা আছে, কারণ আমরা অধীন জাতি। ইংরাজ-রাজত্ব কাঁঠাল ফল মাত্র। আমাদের পক্ষে ইহা বড়ো কম সান্ত্বনার বিষয় নহে যে, আমরা যে পরাধীন ইংরাজেরাই তাহার কারণ, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ইহা সত্য নহে। প্রকৃত কথা এই যে, সম্প্রতি আমরা স্বাধীনতা ও অধীনতা নামক দুইটা শব্দ হাতে পাইয়াছি, এবং হঠাৎ-ধনীর ন্যায় তাহার যথেচ্ছা অযথা প্রয়োগ করিতেছি। যদি স্বাধীনতা কথাটা যথার্থ আমাদের হৃদয়ের কথা হয়, তবে যে, আমরা কতকগুলি অসংগত ব্যবহার করি তাহার অর্থ কে বুঝাইয়া দিবে?

আমরা সংবাদপত্রে মহা ক্রোধ প্রকাশ করিয়া থাকি যে, ইংরাজেরা ভারতবর্ষকে যথেচ্ছাতন্ত্রে শাসন করিতেছেন। ভারতবর্ষের আইন ভারতবর্ষীয়দের মতামত অপেক্ষা করে না। দুই-চারিটি ব্যক্তি মিলিয়া যাহা-কিছু নির্ধারিত করিয়া দেয়, আমরা লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি তাহা চুপচাপ করিয়া পালন করি। ইহা অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয়। ইহা হইতে স্পষ্টই জানা যাইতেছে আমরা অধীন জাতি। এবং কেতাবে পড়িয়াছি অধীনতা বড়ো ভালো দ্রব্য নহে, তাহা যদি হয় তবে দেখিতেছি আমাদের অবস্থা নিতান্তই শোচনীয়। তাহা যদি হয় তবে আমাদের বিলাপ করা নিতান্তই কর্তব্য। এইরূপ সাত-পাঁচ ভাবিয়া আমরা আজকাল যে-সকল শূন্যগর্ভ বিলাপ আরম্ভ করিয়াছি, তাহা আমরা কর্তব্য কাজ সমাধাস্বরূপে করিতেছি মাত্র! কিন্তু এ কথা আমরা কবে বুঝিব যে, যত দিনে না আমাদের হৃদয়ের অস্থিমজ্জাগত দাসত্বের ভাব দূর হইবে, ও স্বাধীনতা-প্রিয়তার ভাব হৃদয়ের শোণিতস্বরূপে হৃদয়ে বহমান হইবে ততদিন আমরা দাসই থাকিব। আমরা যে প্রতি পরিবারে এক-একটি করিয়া দাসের দল সৃষ্টি করিতেছি! আমরা যে আমাদের সন্তানদের— আমাদের কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের শৈশবকাল হইতে চব্বিশ ঘণ্টা দাসত্ব শিক্ষা দিতেছি! বড়ো হইলে তাহারা যাহাতে এক-একটি উপযুক্ত দাস হইতে পারে, তাহার বিহিত বিধান করিয়া দেওয়া হইতেছে; বড়ো হইলে যাহাতে কথাটি না কহিয়া তাহারা তাহাদের প্রভুদের মার ও গালাগালিগুলি নিঃশেষে হজম করিয়া ফেলিতে পারে, এমন একটি অসাধারণ পরিপাক-শক্তি তাহাদের শরীরে জন্মাইয়া দেওয়া হইতেছে! এইরূপে ইহারাও বড়ো হইলে স্বাধীনতা স্বাধীনতা করিয়া একটা তুমুল কোলাহল করিতে থাকিবে, অথচ অধীনতাকে আপনার পরিবারের হৃদয়ের মধ্যে স্থাপন করিয়া তাহাকে দুধ-কলা সেবন করাইবে! প্রাণের মধ্যে অধীনতার আসন ও রসনার উপরে স্বাধীনতার আসন। অমন একটা নর্তনশীল আসনের উপরে স্বাধীনতাকে বসাইয়া আমরা দিবানিশি ওই শব্দটার নৃত্যই দেখিতেছি। বড়ো আমোদেই আছি।

বঙ্গদেশের অনেক সৌভাগ্যফলে আজকাল দেশে যে-সকল মহা মহা জাতীয়-ভাব-গদ্‌গদ আর্যশোণিতবান তেজিয়ান দেশহিতৈষীগণের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, স্বাধীনতার মন্ত্র যাঁহারা চিৎকার করিয়া জপ করেন, নিজের পরিবারের মধ্যে তাঁহাদের অপেক্ষা যথেচ্ছাচারী শাসনকর্তা হয়তো অতি অল্পই পাইবে। ইহাই এক প্রধান প্রমাণ যে, স্বাধীনতার ভাব তাঁহাদের হৃদয়ের ভাব নহে।

যাহাদের স্বাভাবিক স্বাধীনতার ভাব আছে, আমাদের দেশের পরিবারের মধ্যে জন্মাইলে রুদ্ধ বায়ুতে তাহাদের হাঁপাইয়া উঠিতে হয়। বয়স্ক ব্যক্তিরা আজ্ঞা করিবার জন্য সততই উন্মুখ, অবসর পাইলেই হয়। অনেক গুরুজন গুরুজনের আর কোনো কর্তব্য সাধন করেন না, কেবল আজ্ঞা করিবার ও মারিবার ধরিবার সময়েই তাঁহারা সহসা গুরুজন হইয়া উঠেন। তাঁহারা 'হাঁরে'

করিয়া উঠিলেই ছেলেপিলেগুলার মাথায় বজ্র ভাঙিয়া পড়ে। এবং তাঁহারা যে তাঁহাদের কনিষ্ঠ সকলের ভীতির পাত্র, ইহাই তাঁহাদের প্রধান আমোদ।

মনুষ্য জাতি স্বভাবতই ক্ষমতার অন্ধ উপাসক। যে পক্ষে ক্ষমতা সেই পক্ষেই আমাদের সমবেদনা, আর অসহায়ের আমরা কেহ নই। এইজন্যই একজনের হাতে যথেচ্ছা ক্ষমতা থাকিলে অত্যন্ত ভয়ের বিষয়। তাহার ব্যবহারের ন্যায়ান্যায় বিচার করিবার লোক সংসারে পাওয়া যায় না। কাজেই তাহাকে আর বড়ো একটা ভাবিয়া চিন্তিয়া কাজ করিতে হয় না। যাহাদের বিবেচনা করিয়া চলা বিশেষ আবশ্যক, সংসারের গতিকে এমনি হইয়া দাঁড়ায় যে, তাহাদেরই বিবেচনা করিয়া চলিবার কম প্রবর্তনা হয়। এই গুরুজন সম্পর্কেই একবার ভাবিয়া দেখো-না। যত আইন, যত বাঁধাবাঁধি, যত কড়াক্কড় সমস্তই কি কনিষ্ঠদের উপরেই না? কেহ যদি নিতান্ত অসহ্য আঘাত পাইয়া গুরুজনের মুখের উপরে একটা কথা বলে, অমনি কি বড়ো বড়ো পক্ক-কেশ মস্তকে আকাশ ভাঙিয়া পড়ে না? আর, যদি কোনো গুরুজন বিনা কারণে বা সামান্য কারণে বা অন্যায় কারণে তাহার কনিষ্ঠের উপরে যথেচ্ছা ব্যবহার করে তবে তাহাতে কাহার মাথাব্যথা হয় বলো দেখি? গুরুজন মারুন, ধরুন, গালাগালি দিন, ঘরে বন্ধ করিয়া রাখুন, তাহাতে কাহারো মনোযোগ মাত্র আকর্ষণ করে না, আর কনিষ্ঠ ব্যক্তি যদি তাহার গুরুজনের আদিষ্ট পথের একচুল বামে কি দক্ষিণে হেলিয়াছে, গুরুজনের পান হইতে একতিল চুন খসাইয়াছে, অমনি দশ দিক হইতে দশটা যমদূত আসিয়া কেহ তাহার হাত ধরে, কেহ তাহার চুল ধরে, কেহ গালাগালি দেয়, কেহ বক্তৃতা দেয়, কেহ মারে ও তাহার দেহ ও মনকে সর্বতোভাবে ক্ষত-বিক্ষত করিয়া তবে নিষ্কৃতি দেয়। সমাজের এ কীরূপ বিচার বলো দেখি? যে দুর্বল, যাহার দোষ করিবার ক্ষমতা অপেক্ষাকৃত অল্প, তাহাকেই কথায় কথায় মেয়াদ ফাঁসি ও দ্বীপান্তরে চালান করিয়া দেওয়া হয়, আর যে বলিষ্ঠ, যাহার অন্যায় ব্যবহার করিবার সমূহ ক্ষমতা রহিয়াছে, তাহার কাজ একবার কেহ বিচার করিয়াও দেখে না। যেন ওই দন্তহীন কোমল শিশুগুলি এক-একটি দুর্জয় দৈত্য, উহাদের বশে রাখিতে সমাজের সমস্ত শক্তির আবশ্যক, আর ওই যমদূতাকার বেত্রহস্ত পাষাণহৃদয়রা নবনীতে গঠিত কুসুম-সুকুমার, উঁহাদের জন্য আর সমাজের পরিশ্রম করিতে হইবে না। এইজন্য সকল শাস্ত্রেই লিখিয়াছে যে, গুরুজনের অবাধ্য হওয়া পাপ, কোনো শাস্ত্রেই লিখে নাই, কনিষ্ঠদের প্রতি যথেচ্ছা ব্যবহার করা পাপ। কেহই হয়তো স্বীকার করিবেন না (যদি বা মুখে করেন তথাপি কাজে করিবেন না) যে গুরুজনের প্রতি অন্যায় ব্যবহার করা যতখানি পাপ, কনিষ্ঠদের প্রতি অন্যায় ব্যবহার করাও ঠিক ততখানি পাপ। একজন গুরু ব্যক্তি তাহার কনিষ্ঠকে অন্যায়রূপে মারিলে যতটুকু পাপে লিপ্ত হন, একজন কনিষ্ঠ ব্যক্তি তাহার গুরুজনকে অন্যায়রূপে মারিলে ঠিক ততটুকু পাপেই লিপ্ত হন, তাহার কিছুমাত্র অধিক নয়। ঈশ্বরের চক্ষে উভয়ই ঠিক সমান। কোন্ ব্যক্তি সাহসপূর্বক বলিতে পারে যে, এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ বলিয়া ঈশ্বর তাহার প্রতি কনিষ্ঠের অপেক্ষা অধিক অন্যায়াচরণ করিবার অধিকার দিয়াছেন! কিন্তু সকলেই যেন মনে মনে সেই সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছেন। সেই একই কারণ হইতে আমরা অবলাদিগের সামান্য দোষটুকু পর্যন্ত বরদাস্ত করিতে পারি না, অথচ পুরুষদের প্রতিপদেই মার্জনা করিয়া থাকি! যেন সবলেরাই কেবলমাত্র মার্জনার যোগ্য। যেন হীনবল স্ত্রীলোকদিগকে শাসনে রাখিবার জন্য পুরুষের বাহুবলই যথেষ্ট নহে তাহার উপরে ধর্মের বিভীষিকা ও সমস্ত সমাজের নিদারুণতর বিভীষিকার আবশ্যক, আর পুরুষদের জন্য যেন সে-সকল কিছুই আবশ্যক নাই। যাহা হউক, ছেলেবেলা হইতেই আমরা কি এইরূপ বলের উপাসনা করিতে শিখি না? এবং যে শিক্ষা বাল্যকাল হইতে আমাদের হাড়ে হাড়ে প্রবেশ করে বড়ো হইলে কি তাহা আমরা দূরে নিক্ষেপ করিতে পারি? সুতরাং যেখানে বাঙালি সেইখানেই পদাঘাত, সেইখানেই গালাগালি, সেইখানেই অপমান, এবং সেই অপমান পদাঘাতবৃষ্টির মধ্যে এই ক্ষীণ-শরীর সুন্দর বনবাসীদের শরশয্যাশায়ী ভীষ্মের ন্যায় অবিকৃত মুখশ্রী! ছেলেবেলা হইতে তাহারা

পদে পদে শিখিয়াছে যে, গুরুজনেরা মারে, ধরে, যাহা করে তাহার উপরে আর চারা নাই, ইচ্ছা করিলেই সকল করিতে পারেন, এবং সেরূপ ইচ্ছা প্রায়ই করিয়া থাকেন। জন্মগ্রহণ করিয়াই গুরুজনদের নিকট তাহাদের প্রথম শিক্ষা এই যে, 'যাহা বলি তাহার উপরে আর কথা নাই!' ভালো করিয়া বলিতে ও বুঝাইয়া বলিতে অনেক বাক্য ব্যয় হয়, অতএব যত অল্প পরিশ্রমে ও যত অল্প কথায় একটা আজ্ঞা দেওয়া যাইবে তাহা দেওয়া হইবে ও আজ্ঞা লইয়া যত কম আন্দোলন করিয়া যত শীঘ্র পালন করা হইবে ততই ভালো। দাদা আসিয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কহিলেন, 'কী করছিস, শুতে যা।' যে ছেলে বলে, 'কেন দাদা, এখনও তো সন্ধ্যা হয় নি।' তাহার কিছু হইবে না, যে ছেলে বলে, 'যে আজ্ঞে দাদা মহাশয়' তাহার তুল্য ছেলে হয় না।

ছেলেবেলায় যে আমরা শিক্ষা পাই যে, গুরুজনদের ভক্তি করা উচিত, তাহার অর্থ কী? না গুরুজনদের ভয় করা উচিত। কারণ, ভক্তির ভাব বালকদের নহে। তাহাদের নিকট সকলই সমান। তাহাদের হৃদয়ে কেবল অনুরাগ ও বিরাগের ভাব জন্মে মাত্র তাহারা কাহারও অনুরক্ত হয়, কাহারও হয় না, আবার কাহারও প্রতি তাহাদের স্বতই বিরাগ জন্মে। তাহাদের যখন ভর্ৎসনা করিয়া বলা হয় 'গুরুজন বলছেন শুনছিস নে!' তখন তাহারা এই বুঝে যে, না শুনিলে ভয়ের কারণ আছে। না শুনিলে তাঁহাদের এমন ক্ষমতা আছে, যে শুনিতে বাধ্য করাইতে পারেন। অতএব গুরুজনদের ভক্তি করিবে, অর্থাৎ ভয় করিবে; কেন ভয় করিবে? না তাঁহারা আমাদের অপেক্ষা বলিষ্ঠ, তাঁহাদের সঙ্গে আমরা কোনো মতে পারিয়া উঠি না। এইজন্যই, যখনি ছেলেরা দশজনে সমবয়স্কদের লইয়া মনের আমোদে খেলা করিতেছে, এবং যখনি গুরুজন বলিয়া উঠিয়াছেন, 'কী তোরা গোলমাল করছিস।' তখনি তাহারা তৎক্ষণাৎ থামিয়া যায়। বেশ বুঝিতে পারে যে, গুরুজন যে তাহাদের হিতাকাঙ্ক্ষা করিয়া ওই আজ্ঞাটি করিলেন তাহা নহে, তবে কেন তাহারা স্তব্ধ হইয়া গেল? না যিনি আজ্ঞা দিলেন তিনি তাহাদের অপেক্ষা ক্ষমতাশালী ব্যক্তি! আমার বল আছে অতএব তুই আজ্ঞা পালন কর্‌ এই ভাব ছেলেদের হৃদয়ে বদ্ধমূল করিয়া দেওয়া, তাহাদের চোখের সামনে দিনরাত্রি একটা অদৃশ্য বেত্র নাচানো, এইরূপ একটা ভয়ের ভাবে, একটা অবনতির ভাবে কোমল হৃদয় দীক্ষিত করা কি স্বাধীনতাপ্রিয় সহৃদয় গুরুজনের কাজ?

ভক্তির ভাব ভালো, কিন্তু ভক্তির অপেক্ষা অনুরাগের ভাব আরও ভালো; কারণ, ভক্তিতে অভিভূত করিয়া ফেলে আর অনুরাগে আকর্ষণ করিয়া আনে। যাহার হৃদয় যত প্রশস্ত, তাহার অনুরাগ ততই অধিক। পিতা তো পিতা, সমস্ত জগতের পিতাকে যাঁহারা সখা বলিয়া দেখেন তাঁহারা কে? না, তাঁহারা ভক্তদের অপেক্ষা অধিক ভক্ত! তাঁহারা ঈশ্বরের এত কাছে থাকেন যে, ঈশ্বরের সহিত তাঁহাদের সখ্যতা জন্মিয়া যায়। কত শত কালীভক্ত আছে, কিন্তু রামপ্রসাদের মতো কয় জন ভক্ত দেখা যায়। অন্য ভক্তেরা শত হস্ত দূরে থাকিয়া তটস্থ হইয়া কালীকে প্রণাম করে; কিন্তু রামপ্রসাদ যে কালীর কোলে মাথা রাখিয়া তাঁহার সঙ্গে কথাবার্তা কহিয়াছেন, রাগ করিয়াছেন, অভিমান করিয়াছেন। হাফেজের ন্যায় ঈশ্বর-ভক্ত কয় জন পাওয়া যায়, কিন্তু দেখো দেখি, হাফেজ কীভাবে ঈশ্বরের সহিত কথোপকথন করেন! হৃদয়ের প্রধান শিক্ষা অনুরাগ শিক্ষা, ভক্তি শিক্ষা তদপেক্ষা নিম্নশ্রেণীর শিক্ষা। যে হৃদয় যত উদার সে হৃদয় ততই অন্য হৃদয়ের অধিকতর নিকটবর্তী হইতে সমর্থ হয়, এবং যতই নিকটবর্তী হয়, ততই ভক্তি অপেক্ষা অনুরাগ করিতে শিখে। পিতার প্রতি পুত্রের কী ভাব থাকা ভালো? না, অভক্তির অপেক্ষা ভক্তি থাকা ভালো, আবার ভক্তি অপেক্ষা অনুরাগ থাকা আরও ভালো। সেই পুত্রই যে পিতাকে সখা বলিয়া জানে। কর্তব্যের সহিত প্রিয়কার্যের যতখানি প্রভেদ, ভক্তির সহিত অনুরাগের ঠিক ততখানি প্রভেদ। কর্তব্যজ্ঞান যেমন আমাদের হৃদয়ের দূর সম্পর্কীয় অথচ আত্মীয়, ভক্তিভাবও তেমনি আমাদের হৃদয়ের দূর সম্পর্কীয় অথচ আত্মীয়। ভক্তিভাজন ব্যক্তি আমাদের দূরের লোক অথচ নিজের লোক। আমি যদি জানি যে, একজন আত্মীয় নিয়তই আমার শুভাকাঙ্ক্ষা করেন, বাল্যকালের বিঘ্ন-সংকুল পথে আমার হাতে ধরিয়া যৌবনকালে পৌঁছাইয়া দিয়াছেন, আমার

সুখ-দুঃখের সহিত যাঁহার সুখ-দুঃখ অনেকটা জড়িত, তাঁহাকে আমার নিতান্ত নিকটের ব্যক্তি মনে না যদি করি তবে সে একটা কৃত্রিম প্রথার গুণে হইয়াছে বলিতে হইবে। মায়ের সহিত পিতার সম্পর্কগত প্রভেদ কিছু অধিক নহে, সমানই বলিতে হইবে। পিতা যদি ভক্তিভাজন হন তবে মাতাও ভক্তিভাজন হইবেন তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু সাধারণত কী দেখা যায়? পিতার প্রতি পুত্রের যে ভাব মাতার প্রতি কি সেই ভাব? আমি তো বলি মাকে যে ছেলে শুদ্ধ কেবল ভক্তি করে সে মায়ের প্রতি অন্যায় ব্যবহার করে। মায়ের সহিত আমাদের অনুরাগের সম্পর্ক। মায়ের এমন একটি গুণ আছে, যাহাতে তাঁহাকে আমরা অনুরাগ না করিয়া থাকিতে পারি না। সে গুণটি কী? না, তিনি আমাদের মনের ভাবগুলি বিশেষরূপে আয়ত্ত করিয়াছেন, আমাদের সহিত তাঁহার সম্পূর্ণ সমবেদনা আছে, তিনি কখনো জানিয়া শুনিয়া আমাদের হৃদয়ে আঘাত দিতে পারেন না, তিনি কখনো আমাদের আজ্ঞা দিতে চাহেন না, তিনি অনুরোধ করেন, বুঝাইয়া বলেন, আমরা একটা ভালো কাজে বিরত হইলে তিনি সাধ্যসাধনা করেন। এইজন্য মায়ের প্রতি আমাদের যে একটি আমরণ-স্থায়ী মর্মগত ভালোবাসা জন্মে, তাহা আমাদের হৃদয়ের একটি শিক্ষা। যে ব্যক্তি শৈশবকাল হইতে মাতৃস্নেহে বঞ্চিত হইয়াছে সে একটি শিক্ষা হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। নিঃস্বার্থ ভালোবাসা পাওয়া নিঃস্বার্থপরতা শিক্ষা করিবার প্রধান উপায়। মনে করো, একজন বালক তাহার সঙ্গীদের লইয়া খেলা করিতেছে, গোল করিতেছে, সেই সময়ে আসিয়া একটি গুরুজন তাহাকে খুব একটা চড় কসাইয়া দিল, ইহাতে তাহাকে স্বার্থ ত্যাগের শিক্ষা দেওয়া হয় না। পরের সুখের প্রতি মনোযোগ দেওয়া শিক্ষা ওই এক চড়েই হয় না। আমি নিজের সুখের জন্যে আর-একজনের সুখের হানি করিলাম, এবং তাহার উপরে একটা চড় কসাইলাম, ইহাতে তাহাকে কী শিক্ষা দেওয়া হইল? একটা কাজ আপাতত বন্ধ করিয়া দেওয়া এক, আর তাহার কারণ উঠাইয়া দেওয়া এক স্বতন্ত্র। প্রতি কাজে একটা কান ধরিবার জন্য একটা হাত নিযুক্ত রাখা, সে কানের পক্ষে ও সে হাতের পক্ষেই খারাপ। যে শাসন করে তাহার চরিত্রেও কুফল জন্মে আর যে শাসিত হয় তাহার চরিত্রেও কুফল জন্মে। শাসনপ্রিয়তার ভাব বর্বর ভাব, সে ভাব যত দমন করা যায় ততই ভালো। আর যে ব্যক্তি শাসনে অভ্যস্ত হইয়া যায় তাহার পক্ষেও বড়ো শুভ নহে।

আমাদের পরিবারের মূলগত ভাবটা কী? না, শাসনকারী ও শাসিতের সম্পর্ক, প্রভু ও অধীনের সম্পর্ক, গুরু ও কনিষ্ঠের সম্পর্ক। আর কোনো সম্পর্ক নাই। সম্মান ও প্রসাদ ইহাই আমাদের পরিবারের প্রাণ। এমন-কি, স্বামীর প্রতিও ভক্তি করা আমাদের শাস্ত্রের বিধান। স্বামীর আদেশ পালন করা পুণ্য। সেই সুগৃহিণী যাহার পতিভক্তি আছে! যাহার প্রতি স্বতই ভালোবাসা ধাবিত হয় এমন যে স্বামী, তাহার কথা শুনিবার জন্য কি ভক্তির আবশ্যক করে? স্বামী ভক্তিভাজন অতএব ইঁহার কথা পালন করিব, ইহা কি স্ত্রীর মুখে শোভা পায়? ভক্তির স্থলে স্বার্থত্যাগ একটা কর্তব্য কার্য, অনুরাগের স্থলে স্বার্থত্যাগ একটা প্রিয় কার্য। অনুরাগে স্বার্থ বিসর্জন দিতেছি বলিয়া মনেই হয় না। অনুরাগের নিশ্বাস-প্রশ্বাস স্বার্থ বিসর্জন দেওয়া। লোক মুখে শুনা গিয়াছে অনেক স্ত্রী প্রাতঃকালে উঠিয়া স্বামীর পদধূলি গ্রহণ করে! এমন হাস্যজনক কৃত্রিম অভিনয় তো আর দুটি নাই! কিন্তু এ ভাবটি আমাদের পরিবারের ভাব। আমরা সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছি যে, ভক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনোবৃত্তি আর নাই। ভক্তি ভাব পরিবার হইতে নির্বাসন করিয়া দেওয়া আমার মত নহে ও তাহা দেওয়াও বড়ো সহজ নহে, আমার মত এই যে, ভক্তি ব্যতীত অন্য নানা প্রকার স্বাভাবিক মনোবৃত্তি আছে, সেগুলিকে কৃত্রিম শিক্ষা দ্বারা দমন করিবার আবশ্যক নাই। ভাইয়ে ভাইয়ে সমান ভাব, সখ্যতার ভাব, স্ত্রী পুরুষে সমান ভাব, প্রেমের ভাব, পিতা পুত্রে অনুরাগের ভাব, এবং তাহার সহিত শ্রদ্ধার ভাব মিশ্রিত (ভক্তির ভাব সর্বত্র নহে), এই তো স্বাভাবিক। শ্রদ্ধার ভাব, অর্থাৎ পুষ্পাঞ্জলি দিয়া, চরণধূলি লইয়া পূজা করিবার ভাব নহে, সসম্ভ্রমে দশ হাত তফাতে দাঁড়াইবার ভাব নহে, কোনো কথা কহিলে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিতে বা তাহার উপরে তোমার মত ব্যক্ত করিতে নিতান্ত সংকোচের ভাব

নহে। এ ভাব শোভা পায় রাজার সম্মুখে, যাঁহার সহিত তোমার রক্তের সম্পর্ক নাই, যাঁহার প্রতি তোমার নাড়ীর টান নাই, যিনি তোমার কোনো প্রকার ত্রুটি মার্জনা করিবেন কি না তোমার সন্দেহ আছে। পিতার প্রতি শ্রদ্ধার ভাব কীরূপ? না, তোমার পিতার প্রতি তোমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, তিনি তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী, জান যে, তিনি কখনো কুপরামর্শ দিবেন না, জান যে, তোমার অপেক্ষা তাঁহার অনেক বিষয়ে অভিজ্ঞতা আছে, বিপদে-আপদে পড়িলে সকলকে ফেলিয়া তাঁহার পরামর্শ লইতে মন যায় এমন একটা আস্থা আছে, তাঁহার সহিত মতামত আলোচনা করিতে ইচ্ছা করে, এই পর্যন্ত; একেবারে চক্ষু-কর্ণ-নাসাবরোধক অন্ধ নির্ভর নহে। আমি নিজের স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াও একজনকে শ্রদ্ধা করিতে পারি, কিন্তু আমরা যাহাকে ভক্তি বলি, তাহার কাছে আমাদের আর স্বাধীনতা থাকে না। শ্রদ্ধাস্পদ ব্যক্তি উপদেশ দেন, পরামর্শ দেন, বুঝাইয়া বলেন, মীমাংসা করিয়া দেন। আদেশ দেন না; শাস্তি দেন না। আদেশ ও শাস্তি বিচারালয়ের ভাব, পরিবারের ভাব নহে। উপদেশ, অনুরোধ ও অভিমান আত্মীয়-সমাজের ভাব। এ ভাব যদি চলিয়া যায় ও পূর্বোক্ত ভাব পরিবারের মধ্যে প্রবেশ করে তবে সে পরিবারের প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে শত হস্ত ব্যবধান পড়িয়া যায়, তবে আত্মীয়েরা পর হইয়া, দূরবর্তী হইয়া একত্রে বাস করে মাত্র। সেরূপ পরিবারে ভয়ের ও শাসনের রাজত্ব। দৈবাৎ যদি ভয়টার রাজ্যচ্যুতি হয় (কর্তা ব্যক্তির মৃত্যুতে যেমন প্রায়ই হইয়া থাকে) তবে আত্মীয়দের মধ্যে কাক-চিলের সম্পর্ক বাধিয়া যায়। আর কোনো সম্পর্ক থাকে না।

আমাদের বঙ্গসমাজের মধ্যে এই ভয়ের এমন একাধিপত্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, যেখানে ভয় সেইখানে কাজ, যেখানে ভয় নাই সেখানে কাজ নাই। একজন নবাগত ইংরাজ তাঁহার বাঙালি বন্ধুর সহিত রেলোয়েতে ভ্রমণ করিতেছিলেন। সন্ধ্যা হইয়া গেল তথাপি গাড়িতে আলো পাইলেন না, অতি নম্রভাবে তিনি স্টেশনের একজন ভদ্র (!) বাঙালি কর্মচারীকে কহিলেন, 'অনুগ্রহপূর্বক একটা আলো আনাইয়া দিন, নহিলে বড়ো অসুবিধা হইতেছে'; কর্মচারীটি চলিয়া গেল। অমনি ইংরাজটির বাঙালি বন্ধু কহিলেন, 'আপনি বড়ো ভালো কাজ করিলেন না, এমন করিয়া বলিলে বাঙালিদের দেশে কখনো আলো পাওয়া যায় না; যদি আপনি ভেরিয়া হইয়া বলিতেন, এখনো আলো পাইলাম না, ইহার অর্থ কী— তাহা হইলে আলো পাইবার একটা সম্ভাবনা থাকিত।' আমি সেই বাঙালিটির কথা শুনিয়া নিতান্ত লজ্জা বোধ করিতে লাগিলাম। কিন্তু দুঃখের কথা বলিব কী, কথাটা সত্য হইয়া দাঁড়াইল। অবশেষে সে ইংরাজটি যথোপযুক্ত উপায় অবলম্বন করিয়া আলো আনাইলেন। এরূপ আরও সহস্র ঘটনা হয়তো আমাদের পাঠকেরা অবগত আছেন। অনেক বাঙালি রেলোয়েতে যাইতে হইলে কোট্ হ্যাট্ পরেন ও গলা বাঁকাইয়া কথা কহেন, কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলেন যে, বাঙালি স্টেশন-কর্মচারীদের জন্য দায়ে পড়িয়া তাঁহারা এই উপায় অবলম্বন করেন। ঈঙ্গবঙ্গেরা বাঙালি বলিয়া পরিচয় দিতে যে কুণ্ঠিত হন তাহার প্রধান কারণ এই যে, তাঁহারা জানেন যে, বাঙালিদের বাঙালিরা মানে না। তাহারা বলের দাস। একজন ভৃত্য তাহার কর্তব্যকাজে শৈথিল্য করিতেছে তাহাকে দুই চড় কসাইলে সে সিধা হয়। ভয় না থাকিলে সে হয়তো কাজ করিবেই না। অতএব দেখা যাইতেছে ভয়ের শাসনে কত কাজের ক্ষতি হয়। তাহাতে আপাতত একটু সুবিধা আছে। একটা চাবুক কসাইলে তৎক্ষণাৎ একটা কাজ সমাধা হয়, কিন্তু সেই চাবুকের কাজ অত্যন্ত বাড়িয়া যায়। ছেলেবেলা হইতে ভয়ের শাসনে থাকিয়া ভয়টাকেই আমরা প্রভু, রাজা বলিয়া বরণ করিয়াছি, সে ব্যতীত আর কাহারও কথা আমরা বড়ো একটা খেয়াল করি না। স্বাধীনতা শিক্ষার প্রণালী এইরূপ নাকি!

যদি স্বজাতিকে স্বাধীনতাপ্রিয় করিয়া তুলিতে চাও, তবে সভা ডাকিয়া, গলা ভাঙিয়া, করতালি দিয়া একটা হট্টগোল করিবার তো আমি তেমন আবশ্যক দেখি না। তাহার প্রধান উপায়, প্রতি ক্ষুদ্র বিষয়ে স্বাধীনতা চর্চা করা। জাতির মধ্যে স্বাধীনতার স্ফূর্তি ও পরিবারের মধ্যে অধীনতার শৃঙ্খল ইহা বোধ করি কোনো সমাজে দেখা যায় না। প্রতি পরিবারেই যদি

কর্তৃপক্ষীয়েরা তাঁহাদের ভ্রাতাদের, পুত্রদের, ভৃত্যদের স্বাধীনতা অপহরণ না করেন, পরিবারের মধ্যে যদি কতকগুলি কৃত্রিম-প্রথার অষ্ট-পৃষ্ঠ বন্ধন না থাকে, তবেই আমাদের কিছু আশা থাকে। যাঁহারা স্ত্রীকে শাসন করেন, কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের ও সন্তানদের প্রহার করেন, ভৃত্যদিগকে নিতান্ত নীচজনোচিত গালাগালি দেন, তাঁহারা জাতীয় স্বাধীনতার কথা যত কম ক'ন ততই ভালো। বোধ করি তাঁহারা চাকর-বাকর ছেলেপিলেগুলাকে মারিয়া ধরিয়া গালাগালি দিয়া বীর রসের চর্চা করিয়া থাকেন। এই মহাবীরবৃন্দ, এই পারিবারিক তৈমুরলঙ, জঙ্গিস খাঁ-গণ যথেচ্ছাচারের বিষয় যতই বলেন, আর স্বাধীনতার কথায় যত কম লিপ্ত থাকেন ততই তাঁহারা শোভা পান। তাঁহাদের আস্ফালনের প্রবৃত্তিটা কমিয়া গেলেই দেশের হাড় জুড়ায়।

আমাদের পরিবারের মধ্যে একটা স্বাধীন স্ফূর্তি নাই বলিয়া সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রেই বড়ো আক্ষেপ করিয়া থাকেন। আমোদের জন্য বিরামের জন্য আমাদের অন্যত্র যাইতে হয়। পরিবারের সকলে মিলিয়া আমোদ-আহ্লাদ করিবার শত সহস্র বাধা বর্তমান। ইনি শ্বশুর, উনি ভাসুর, ইনি দাদা, উনি ছোটো ভাই, ইনি বড়ো, উনি ছোটো ইত্যাদি কত যে সাত-পাঁচ ভাবিবার আছে তাহার আর সংখ্যা নাই। লাভের হইতে হয় এই যে, আত্ম-বিনোদনের জন্য পরের সহায়তা আবশ্যক করে। আমাদের পরিবার আমাদের আমোদের স্থান নহে। (আমোদ বলিতে যাঁহারা দূষণীয় কিছু বুঝেন, তাঁহাদের কল্পনা নিতান্তই বিকৃত।) ইহাকে ছুঁইলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, উহার সহিত কথা কহিলে, এমন-কি, উহার নিকট মুখ দেখাইলে বেহায়া বলিয়া বিষম অখ্যাতি হয়; যেদিন কোনো গুরুজন বাড়ির বধূর হাসির সুর শুনিতে পান, সেদিন সে বালিকা বেচারীর কপালে অনেক দুঃখ থাকে, দিনের বেলায় স্বামী-স্ত্রীতে দেখাশুনা কথাবার্তা হইলে পাড়ায় লোকের কাছে তাহাদের মুখ দেখাইবার জো থাকে না। নিজের ঘরেই যত বাঁধাবাঁধি, যত শাসন, যত আইন-কানুন, আর বন্ধনমুক্ত স্বাধীন ব্যবহার কি পরের সঙ্গেই! পরিবারের মধ্যেই কি যত ঢাকাঢাকি, লুকাচুরি, ত্রস্তভাব! ইহার অপেক্ষা অস্বাভাবিক কিছু কল্পনা করা যায় না। আধুনিক যে-সকল উন্নত পরিবারে এই-সকল কৃত্রিম বন্ধনসমূহ দূরীভূত হইয়াছে, আমোদের নিমিত্ত সে পরিবারভুক্ত কাহাকেও পরের নিকট ভিক্ষা করিতে হয় না। এই-সকল বন্ধনমুক্ত পরিবারে যে-কেহ প্রবেশ করেন তিনিই চমৎকৃত হইয়া যান। বুঝিতে পারেন যে, আপনার লোক আপনার হইলে পরের আবশ্যক অনেক কমিয়া যায়।

যাহারা আপনার কনিষ্ঠদের নিজের সম্পত্তি মনে করে, তাহারা যে নিজের ভৃত্যদেরও তাহাই মনে করিবে ইহাতে আর আশ্চর্য কী আছে। লেখক ইংলন্ড হইতে চিঠিতে লিখিয়াছিলেন যে, 'এখানে চাকরকে গালাগালি দেওয়া ও মারাও যা আর-একজন বাহিরের লোককে গালাগালি দেওয়া ও মারাও তাই। আমাদের দেশের মতো চাকরদের বেঁচে থাকা ছাড়া অন্য সমস্ত অধিকার মনিবদের হাতে নেই। চাকর কোনো কাজ করে দিলে ''Thank you'' ও তাকে কিছু আজ্ঞা করবার সময় ''Please'' বলা আবশ্যক।' ইহাতে কেহ কেহ এইরূপ বলিয়াছেন. 'চাকরদের সঙ্গে পদে পদে সম্মানসূচক ব্যবহার করা আষ্টেপৃষ্ঠে কাষ্ঠ-সভ্যতার ভার বহন করা আমাদের দেশের সহজ সভ্য লোকদের পোষায় না। এ-সকল কৃত্রিম সভ্যতার আমদানি যত কম হয় ততই ভালো; মনে করো ছেলের জ্বর হয়েছে আর যেই তার বাপ একটা হাতপাখা তুলে নিয়ে তার গায়ে বাতাস দিতে লাগল, অমনি ছেলে বলে উঠলেন, "Thank you বাবা!" এরূপ কাষ্ঠ-সভ্যতা কাষ্ঠ-হৃদয়ের উপরেই গুণ করিতে পারে, সহজ হৃদয়কে আগুন করিয়া তোলে!' জাতীয় ভাব এমন একটি যুক্তিবিহীন অন্ধ বধির ভাব যে, সে নিতান্ত বুদ্ধিমান ব্যক্তিকেও অযৌক্তিক করিয়া তোলে। আমাদের দেশে একটা সাধারণ সংস্কার আছে যে, ইংরাজদের সমস্ত আচার-ব্যবহার কাষ্ঠ-সভ্যতাপ্রসূত, এরূপ সংস্কার সাধারণ লোকদের মধ্যে বদ্ধ থাকা স্বাভাবিক, যাহারা কিছু বিবেচনা করে না, প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না, কেবল তাড়াতাড়ি বিশ্বাস করিতেই জানে তাহাদেরই মুখে এরূপ কথা শোভা পায়, কিন্তু চিন্তাশীল ব্যক্তি অত শীঘ্র একটা সংস্কারে উপনীত

হন না। Please কথা বলিবার ভাবটার মূল যে রসনায় নহে হৃদয়ে, ইহা মনে করিতে আপত্তিটা কী? আমার যে ভাবটি নাই, আর-এক ব্যক্তির সেই ভাব থাকিলেই তাহাকে মৌখিক বলিয়া মনে করা নিতান্ত অন্যায়। তাহা হইলে যত প্রকার অনুষ্ঠান আছে সমস্ত মৌখিক; জাতীয় হৃদয়ের সহিত তাহার কোনো সম্পর্ক নাই বলিতে হইবে। তাহা হইলে আমরা যে পিতাকে প্রণাম করি, তাহা কৃত্রিম কাষ্ঠ-সভ্যতার প্রথা, তাহা আন্তরিক নহে। আমি তো বলি, এইরূপ মনে করা উচিত যে, ইংরাজ জাতির হৃদয়গত এমন একটি ভাব আছে, যাহাতে করিয়া তাহাকে স্বতই Please বলায়। সে ভাবটি কী? না তাহাদের স্বাভাবিক স্বাতন্ত্র্য ভাব। তাহারা সকলেই নিজে নিজে নিজের কার্য করিতে চায় ও তাহাই করে, এই নিমিত্ত অপরে যতটুকুই কাজ করিয়া দেয়, তাহা যতই সামান্য হউক-না কেন, Thank you কথা আপনি বাহির হইয়া পড়ে, এবং অপরকে সামান্য কাজটুকু করিতে বাধ্য করিতে হইলেও তাহারা Please না বলিয়া থাকিতে পারে না। আমরা যেমন অনেক সামান্য কাজে পরের উপর নির্ভর করি, এবং পরের নিকটে অনেকটা আশা করি, আমাদের অত সহজে Please ও Thank you বাহির হয় না। এমন হইতে পারে যে, প্রতিবারেই যখন তাহারা Please ও Thank you বলে তখন তাহাদের হৃদয়ে ওইরূপ ভাব উদয় হয় না, কিন্তু ওই ভাব হইতে যে এই প্রথার উৎপত্তি তাহা কি কেহই অস্বীকার করিবেন? আমরা যখন প্রতি অবসরেই প্রত্যেক গুরুজনকে প্রণাম করি তখন যে ভক্তির উচ্ছ্বাস হইতে করি, তাহা নহে, অনেক সময়ে প্রথার বশবর্তী হইয়া করি, কিন্তু ইহা অসংকোচে বলা যায় যে, গুরুভক্তি আমাদের দেশে বিশেষ প্রচলিত।

জাতীয় ভাব আমাদের কী অন্ধ করিয়াই তুলে! মনে করো আমাদের দেশে যদি কবরের প্রথা প্রচলিত থাকিত ও ইংলন্ডে শবদাহ প্রচলিত থাকিত তবে আমরা (অর্থাৎ জাতীয় ভাবোন্মত্ত পুরুষেরা) কী বলিতাম? আর আজকালই বা কী বলি, একবার কল্পনা করিয়া দেখা যাউক। আজকাল আমরা বলি, 'দেখো দেখি শবদাহে কত সুবিধা! স্থান সংক্ষেপ, ব্যয় সংক্ষেপ, স্বাস্থ্যরক্ষা ইত্যাদি। এমন-কি, আমাদের দেখাদেখি দেখো আজকাল য়ুরোপেও এই প্রথা প্রচলিত হইতেছে।' আর আমাদের দেশে যদি কবর প্রথা প্রচলিত থাকিত, তবে আমরাই বলিতাম, 'যে দেশে কাষ্ঠ-সভ্যতা প্রচলিত সেই দেশেই শবদাহ শোভা পায়। সুবিধাই কি সর্বস্ব হইল, আর হৃদয় কি কিছুই নহে? যে দেহে সামান্য আঘাত মাত্র দিতে কুণ্ঠিত হইয়াছি, যে দেহের স্পর্শে প্রভূত আনন্দ লাভ করিয়াছি, আজ তাহা কিনা অকাতরে দগ্ধ করিলাম? কী জন্য? না, স্থান সংক্ষেপের জন্য, ব্যয় সংক্ষেপের জন্য, সুবিধার জন্য? সহজ-সভ্য দেশের কি এই প্রথা? আবার নিজ হস্তে প্রিয়জনের মুখাগ্নি করা কি সহৃদয় জাতির কাজ!' জাতীয় ভাব এইরূপ একটা অদূর-দৃষ্টি, যুক্তিহীন অথচ গোঁ-বিশিষ্ট ভাব। উহা দ্বারা অতিমাত্র বিচলিত হওয়া সাধারণ লোকদের কাজ, চিন্তাশীল লোকদের নহে।

ভারতী
চৈত্র ১২৮৭

জুতা-ব্যবস্থা

(১৮৯০ খৃস্টাব্দে লিখিত)

গবর্নমেন্ট একটি নিয়মজারি করিয়াছেন যে, 'যে হেতুক বাঙালিদের শরীর অত্যন্ত বে-জুৎ হইয়া গিয়াছে, গবর্নমেন্টের অধীনে যে যে বাঙালি কর্মচারী আছে, তাহাদের প্রত্যহ কার্যারম্ভের পূর্বে জুতাইয়া লওয়া হইবে!'

শহরের বড়ো দালানে বাঙালিদের একটি সভা বসিয়াছে। একজন বক্তা যাজ্ঞবল্ক্য, বুদ্ধ ও বেদব্যাসের জ্ঞানের প্রশংসা করিয়া, ইংরাজ জাতির পূর্বপুরুষেরা যে গায়ে রঙ মাখিত ও রথের চাকায় কুঠার বাঁধিত তাহারই উল্লেখ করিয়া সম্পূর্ণরূপে প্রমাণ করিলেন যে, এই জুতা-মারার নিয়ম অত্যন্ত কু-নিয়ম হইয়াছে, উনবিংশ শতাব্দীতে এমন নিয়ম অত্যন্ত অনুদার। (উনবিংশ শতাব্দীটা বোধ করি বাঙালিদের পৈতৃক সম্পত্তি হইবে; ও শব্দটা লইয়া তাঁহাদের এত নাড়াচাড়া, এত গর্ব।) তিনি বলিলেন, 'আমাদের যতদুর দুর্দশা হইবার তাহা হইয়াছে। ইংরাজ গবর্নমেন্ট আমাদের দরিদ্র করিবার জন্য সহস্রবিধ উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন। মনে করো, বন্ধুকে পত্র লিখিতে হইবে, ইস্ট্যাম্প চাই, তাহার জন্য রাজা প্রতিজনের কাছে দুই পয়সা করিয়া লন। মনে করো, ইংরাজ বণিকেরা আমাদের বাজারে সস্তা পণ্য আনয়ন করিয়াছেন, আমাদের স্বজাতীয়েরা ঢাকাই বস্ত্র কিনে না, দেশীয় পণ্য চাহে না, আমাদের দেশের লোকের কি কম সহ্য করিতে হইতেছে, আর ইংরাজেরা কি কম ধূর্ত। এমন-কি, মনে করো গবর্নমেন্ট ষড়যন্ত্র করিয়া আমাদের দেশে ডাকাতি ও নরহত্যা একেবারে রদ করিয়া দিয়াছেন, ইহাতে করিয়া আমাদের বাঙালি জাতির পুরাতন বীরভাব একেবারে নষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছে, (উপর্যুপরি করতালি) সমস্তই সহ্য হয়, সমস্তই সহ্য করিয়াছি, উত্তমাশা অন্তরীপ হইতে হিমালয় ও বঙ্গদেশ হইতে পঞ্জাবদেশ এক প্রাণ হইয়া উত্থান করে নাই, কিন্তু জুতা মারা নিয়ম যখন প্রচলিত হইল, তখন দেখিতেছি আর সহ্য হয় না, তখন দেখিতেছি আর রক্ষা নাই, সকলকে বদ্ধপরিকর হইয়া উঠিতে হইল, জাগিতে হইল, গবর্নমেন্টের নিকটে একখানা দরখাস্ত পাঠাইতেই হইল। (উৎসাহের সহিত হাততালি) কেন সহ্য হয় না যদি জিজ্ঞাসা করিতে চাও, তবে সমস্ত সভ্যদেশের, য়ুরোপের ইতিহাস খুলিয়া দেখো, উনবিংশ শতাব্দীর আচার-ব্যবহার পর্যবেক্ষণ করিয়া দেখো। দেখিবে, কোনো সভ্যদেশের গবর্নমেন্টে এরূপ জুতা-মারার নিয়ম ছিল না, এবং য়ুরোপের কোনো দেশে এ নিয়ম প্রচলিত নাই। ইংলন্ডে যদি এ নিয়ম থাকিত, ফ্রান্সে যদি এ নিয়ম থাকিত, তবে এ সভায় আজ এ নিয়মকে আমরা আনন্দের সহিত অভ্যর্থনা করিতাম, তবে এই সমবেত সহস্র সহস্র লোকের মুখে কী আনন্দই স্ফূর্তি পাইত, তবে আমরা এই সভ্য-দেশ-সম্মত অধিকার প্রাপ্তিতে পৃষ্ঠদেশের বেদনা একেবারে বিস্মৃত হইতাম!' (মুষলধারে করতালি বর্ষণ)। বক্তার উৎসাহ-অগ্নিগর্ভ বক্তৃতায় সভাস্থ সহস্র সহস্র ব্যক্তি এমন উত্তেজিত, উদ্দীপিত, উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল, সমবেত সাড়ে পাঁচ হাজার বাঙালির মধ্যে এত অধিক সংখ্যক লোকের মতের এমন ঐক্য হইয়াছিল যে, তৎক্ষণাৎ দরখাস্তে প্রায় সাড়ে চার শত নাম সই হইয়া গিয়াছিল।

লাটসাহেব রুখিয়া দরখাস্তের উত্তরে কহিলেন, 'তোমরা কিছু বোঝ না, আমরা যাহা করিয়াছি, তোমাদের ভালোর জন্যই করিয়াছি। আমাদের সিদ্ধান্ত ব্যবস্থা লইয়া বাগাড়ম্বর করাতে তোমাদের রাজ-ভক্তির অভাব প্রকাশ পাইতেছে। ইত্যাদি।'

নিয়ম প্রচলিত হইল। প্রতি গবর্নমেন্ট-কার্যশালায় একজন করিয়া ইংরাজ জুতা-প্রহর্তা নিযুক্ত হইল। উচ্চপদের কর্মচারীদের এক শত ঘা করিয়া বরাদ্দ হইল। পদের উচ্চ-নীচতা অনুসারে জুতা-প্রহার-সংখ্যার ন্যূনাধিক্য হইল। বিশেষ সম্মান-সূচক পদের জন্য বুট জুতা ও নিম্ন-শ্রেণীস্থ পদের জন্য নাগরা জুতা নির্দিষ্ট হইল।

যখন নিয়ম ভালোরূপে জারি হইল, তখন বাঙালি কর্মচারীরা কহিল, 'যাহার নিমক খাইতেছি, তাহার জুতা খাইব, ইহাতে আর দোষ কী? ইহা লইয়া এত রাগই বা কেন, এত হাঙ্গামাই বা কেন? আমাদের দেশে তো প্রাচীনকাল হইতেই প্রবচন চলিয়া আসিতেছে, পেটে খাইলে পিঠে সয়। আমাদের পিতামহ-প্রপিতামহদের যদি পেটে খাইলে পিঠে সইত তবে আমরা এমনই কী চতুর্ভুজ হইয়াছি, যে আজ আমাদের সহিবে না? স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মোভয়াবহঃ। জুতা খাইতে খাইতে মরাও ভালো, সে আমাদের স্বজাতি-প্রচলিত ধর্ম।' যুক্তিগুলি এমনই প্রবল বলিয়া বোধ হইল যে, যে যাহার কাজে অবিচলিত হইয়া রহিল। আমরা এমনই যুক্তির বশ। (একটা

কথা এইখানে মনে হইতেছে। শব্দ-শাস্ত্র অনুসারে যুক্তির অপভ্রংশে জুতি শব্দের উৎপত্তি কি অসম্ভব? বাঙালিদের পক্ষে জুতির অপেক্ষা যুক্তি অতি অল্পই আছে, অতএব বাংলা ভাষায় যুক্তি শব্দ জুতি শব্দে পরিণত হওয়া সম্ভবপর বোধ হইতেছে।)

কিছু দিন যায়। দশ ঘা জুতা যে খায়, সে একশো ঘা-ওয়ালাকে দেখিলে জোড় হাত করে, বুটজুতা যে খায় নাগরা-সেবকের সহিত সে কথাই কহে না। কন্যাকর্তারা বরকে জিজ্ঞাসা করে, কয় ঘা করিয়া তাহার জুতা বরাদ্দ। এমন শুনা গিয়াছে, যে দশ ঘা খায় সে ভাঁড়াইয়া বিশ ঘা বলিয়াছে ও এইরূপ অন্যায় প্রতারণা অবলম্বন করিয়া বিবাহ করিয়াছে। ধিক্, ধিক্, মনুষ্যেরা স্বার্থে অন্ধ হইয়া অধর্মাচরণে কিছুমাত্র সংকুচিত হয় না। একজন অপদার্থ অনেক উমেদারি করিয়াও গবর্নমেন্টে কাজ পায় নাই। সে ব্যক্তি একজন চাকর রাখিয়া প্রত্যহ প্রাতে বিশ ঘা করিয়া জুতা খাইত। নরাধম তাহার পিঠের দাগ দেখাইয়া দশ জায়গা জাঁক করিয়া বেড়াইত, এবং এই উপায়ে তাহার নিরীহ শ্বশুরের চক্ষে ধুলা দিয়া একটি পরমাসুন্দরী স্ত্রীরত্ন লাভ করে। কিন্তু শুনিতেছি সে স্ত্রীরত্নটি তাহার পিঠের দাগ বাড়াইতেছে বৈ কমাইতেছে না। আজকাল ট্রেনে হউক, সভায় হউক, লোকের সহিত দেখা হইলেই জিজ্ঞাসা করে, 'মহাশয়ের নাম? মহাশয়ের নিবাস? মহাশয়ের কয় ঘা করিয়া জুতা বরাদ্দ?' আজকালকার বি-এ এম-এ'রা নাকি বিশ ঘা পঁচিশ ঘা জুতা খাইবার জন্য হিমসিম খাইয়া যাইতেছে, এইজন্য পূর্বোক্ত রূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করাকে তাঁহারা অসভ্যতা মনে করেন, তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকের ভাগ্যে তিন ঘায়ের অধিক বরাদ্দ নাই। একদিন আমারই সাক্ষাতে ট্রেনে আমার একজন এম-এ বন্ধুকে একজন প্রাচীন অসভ্য জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, 'মহাশয়, বুট না নাগরা?' আমার বন্ধুটি চটিয়া লাল হইয়া সেখানেই তাহাকে বুট জুতার মহা সম্মান দিবার উপক্রম করিয়াছিল। আহা, আমার হতভাগ্য বন্ধু বেচারির ভাগ্যে বুটও ছিল না, নাগরাও ছিল না। এরূপ স্থলে উত্তর দিতে হইলে তাহাকে কী নতশির হইতেই হইত! আজকাল শহরে পাকড়াশী পরিবারদের অত্যন্ত সম্মান। তাঁহারা গর্ব করেন, তিন পুরুষ ধরিয়া তাঁহারা বুট জুতা খাইয়া আসিয়াছেন এবং তাঁহাদের পরিবারের কাহাকেও পঞ্চাশ ঘা'র কম জুতা খাইতে হয় নাই। এমন-কি, বাড়ির কর্তা দামোদর পাকড়াশী যত জুতা খাইয়াছেন, কোনো বাঙালি এত জুতা খাইতে পায় নাই। কিন্তু লাহিড়িরা লেপ্টেনেন্ট-গবর্নরের সহিত যেরূপ ভাব করিয়া লইয়াছে, দিবানিশি যেরূপ খোশামোদ আরম্ভ করিয়াছে, শীঘ্রই তাহারা পাকড়াশীদের ছাড়াইয়া উঠিবে বোধ হয়। বুড়া দামোদর জাঁক করিয়া বলে, 'এই পিঠে মন্টিথের বাড়ির তিরিশটা বুট ক্ষয়ে গেছে।' একবার ভজহরি লাহিড়ি দামোদরের ভাইঝির সহিত নিজের বংশধরের বিবাহ প্রস্তাব করিয়া পাঠাইয়াছিল, দামোদর নাক সিটকাইয়া বলিয়াছিল, 'তোরা তো ঠন্‌ঠোনে।' সেই অবধি উভয় পরিবারে অত্যন্ত বিবাদ চলিতেছে। সেদিন পূজার সময় লাহিড়িরা পাকড়াশীদের বাড়িতে সওগাতের সহিত তিন জোড়া নাগরা জুতা পাঠাইয়াছিল; পাকড়াশীদের এত অপমান বোধ হইয়াছিল যে, তাহারা নালিশ করিবার উদ্যোগ করিয়াছিল; নালিশ করিলে কথাটা পাছে রাষ্ট্র হইয়া যায় এইজন্য থামিয়া গেল। আজকাল সাহেবদিগের সঙ্গে দেখা করিতে হইলে সম্ভ্রান্ত 'নেটিব'গণ কার্ডে নামের নীচে কয় ঘা জুতা খান, তাহা লিখিয়া দেন, সাহেবের কাছে গিয়া জোড়-হস্তে বলেন, 'পুরুষানুক্রমে আমরা গবর্নমেন্টের জুতা খাইয়া আসিতেছি; আমাদের প্রতি গবর্নমেন্টের বড়োই অনুগ্রহ।' সাহেব তাঁহাদের রাজভক্তির প্রশংসা করেন। গবর্নমেন্টের কর্মচারীরা গবর্নমেন্টের বিরুদ্ধে কিছু বলিতে চান না; তাঁহারা বলেন, 'আমরা গবর্নমেন্টের জুতা খাই, আমরা কি জুতা-হারামি করিতে পারি!'

সেদিন একটা মস্ত মকদ্দমা হইয়া গিয়াছে। বেণীমাধব শিকদার গবর্নমেন্টের বিশেষ অনুগ্রহে আড়াইশো ঘা করিয়া জুতা খায়। জুতাবর্দারের সহিত মনান্তর হওয়াতে একদিন সে তাহাকে সাত ঘা কম মারিয়াছিল। ডিস্ট্রিক্ট জজের কোর্টে মকদ্দমা উঠিল। জুতাবর্দার নানা মিথ্যা সাক্ষী সংগ্রহ করিয়া প্রমাণ করিল যে, মারিতে মারিতে তাহার পুরাতন বুট ছিঁড়িয়া যায় কাজেই সে মার বন্ধ

করিতে বাধ্য হইয়াছিল। জজ মকদ্দমা ডিসমিস করিয়া দিলেন। হাইকোর্টে আপিল হইল। উভয়পক্ষে বিস্তর ব্যারিস্টর নিযুক্ত হইল। তিন মাস মকদ্দমার পর জজেরা সাব্যস্ত করিলেন সত্যই জুতা ছিঁড়িয়া গিয়াছিল, অতএব ইহাতে আসামীর কোনো দোষ নাই। বেণীমাধব প্রিবি কৌন্সিলে আপিল করিলেন। সেখানে বিচারক রায় দিলেন, 'হাঁ, সত্য সত্যই বেণীমাধবের প্রতি অন্যায় ব্যবহার করা হইয়াছে। সে যখন বারো বৎসর ধরিয়া নিয়মিত আড়াই শত জুতা খাইয়া আসিতেছে, তখন তাহাকে একদিন দুই শত তেতাল্লিশ জুতা মারা অতিশয় অন্যায় হইয়াছে। আর জুতা ছেঁড়ার ওজর কোনো কাজেরই নহে।' বেণীমাধব বুক ফুলাইয়া বলিল, 'হাঁ হাঁ, আমার সঙ্গে চালাকি!' সাধারণ লোকেরা বলিল, 'না হইবে কেন! কত বড়ো লোক? উঁহাদের সহিত পারিয়া উঠিবে কেন?' এই উপলক্ষে হিন্দু পেট্রিয়টে একটা আর্টিকেল লিখিত হয়; তাহাতে অনেক উদাহরণসমেত উল্লেখ থাকে যে, 'ইংরাজ জুতা-বর্দারেরা আমাদের বড়ো বড়ো সম্ভ্রান্ত নেটিব কর্মচারীদিগের মান-অপমানের প্রতি দৃষ্টি রাখে না। যাহার যত বরাদ্দ তাহাকে তাহার কম দিতে শুনা যায়। অতএব আমাদের মতে বাঙালি জুতাবর্দার নিযুক্ত হউক। কিন্তু এক কথায় তাঁহার সে-সমস্ত যুক্তি খণ্ডিত হইয়া যায়—'যদি বাঙালি জুতাবর্দার নিযুক্ত করা যায় তবে তাহাদের জুতাইবে কে?' আজকাল বঙ্গদেশে একমাত্র আশীর্বাদ প্রচলিত হইয়াছে, অর্থাৎ 'পুত্র-পৌত্রানুক্রমে গবর্নমেন্টের জুতা ভোগ করিতে থাকো, আমার মাথায় যত চুল আছে তত জুতা তোমার ব্যবস্থা হউক।' সেই আশীর্বচনের সহিত এই প্রবন্ধের উপসংহার করি।'[১]

ভারতী
জ্যৈষ্ঠ ১২৮৮

চীনে মরণের ব্যবসায়[২]

একটি সমগ্র জাতিকে অর্থের লোভে বলপূর্বক বিষপান করানো হইল; এমনতরো নিদারুণ ঠগীবৃত্তি কখনো শুনা যায় নাই। চীন কাঁদিয়া কহিল, 'আমি আহিফেন খাইব না।' ইংরাজ বণিক কহিল, 'সে কি হয়?' চীনের হাত দুটি বাঁধিয়া তাহার মুখের মধ্যে কামান দিয়া অহিফেন ঠাসিয়া দেওয়া হইল; দিয়া কহিল, 'যে অহিফেন খাইলে তাহার দাম দাও।' বহুদিন হইল ইংরাজেরা চীনে এইরূপ অপূর্ব বাণিজ্য চালাইতেছেন। যে জিনিস সে কোনো মতেই চাহে না, সেই জিনিস তাহার এক পকেটে জোর করিয়া গুঁজিয়া দেওয়া হইতেছে ও আর-এক পকেট হইতে তাহার উপযুক্ত মূল্য তুলিয়া লওয়া হইতেছে। অর্থ-সঞ্চয়ের এরূপ উপায়কে ডাকাইতি না বলিয়া যদি বাণিজ্য বলা যায়, তবে সে নিতান্তই ভদ্রতার খাতিরে। যে জাতি আফ্রিকার দাসত্ব-শৃঙ্খল মোচন করিয়া

---

[১] 'This evening's Englishman has discovered the secret of correctly treating the people of Bengal. It says, 'Kick them first and then speak to them.'—*Indian Mirror*. যে সমগ্র জাতিকে কোনো বিজাতীয় কাগজ হাটের মধ্যে এরূপ জুতা মারিতে সাহস করে, সে জাতি উপরি-প্রকাশিত প্রবন্ধ পড়িয়া বিস্মিত হইবে না। বোধ হয়, লেখক রহস্যচ্ছলে প্রবন্ধটি লিখিয়াছেন, কিন্তু উহা সত্যের এত কাছ ঘেঁষিয়া গিয়াছে যে, বাঙালি জাতির পক্ষে উহা রহস্যাত্মক হইবে না। আজ অন্য কোনো দেশে যদি কোনো কাগজ ওইরূপ অপমানের আভাস মাত্র দিত, তাহা হইলে দেশবাসীরা তৎক্ষণাৎ নানা উপায়ে তাহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার আয়োজন করিত। কিন্তু এতদিন হইতে আমরা জুতা হজম করিয়া আসিতেছি যে, আজ উহা আমাদের নিকট গুরুপাক বলিয়া ঠেকিতেছে না।—সং

[২] *The Indo-British Opium Trade* by Theodore Christlieb DD. Ph.D. Translated from the German by David B. Croom, M.A.

শত শত অসহায়ের আশীর্বাদভাজন হইয়াছেন, সেই জাতি আজ চীনকে কামানের সম্মুখে দাঁড় করাইয়া বলিতেছেন, ‘আমার পয়সার আবশ্যক হইয়াছে তুই বিষ খা!’ আসিয়ার একটি বৃহত্তম, প্রাচীন সভ্যদেশের বক্ষঃস্থলে বসিয়া বিষ কীটের ন্যায় তাহার শরীরের ও মনের মধ্যে প্রতি মুহূর্তে তিল তিল করিয়া মরণের রস সঞ্চারিত করিতেছেন। ইহা আর কিছু নয়, একটি সবল জাতি দুর্বলতর জাতির নিকটে মরণ বিক্রয় করিয়া ধ্বংস বিক্রয় করিয়া কিছু কিছু করিয়া লাভ করিতেছেন। এক পক্ষে কতই বা লাভ, আর-এক পক্ষে কী ভয়ানক ক্ষতি!

চীনে যেরূপ এই বাণিজ্য প্রবেশ করিয়াছে, তাহা পাঠ করিলে পাষাণ হৃদয়েও করুণা সঞ্চার হইবে। যুদ্ধ-বিগ্রহের নিদারুণ হত্যাকাণ্ড ও অত্যাচার সকল পাঠ করিলেও এত খারাপ লাগে না, তাহাতে মনে বিস্ময়-মিশ্রিত একটা ভীষণ ভাবের উদ্রেক হয় মাত্র, কিন্তু এই চীনের অহিফেন বাণিজ্যের মধ্যে এমন একটা নীচ হীন প্রবৃত্তির ভাব আছে, দস্যুবৃত্তির অপেক্ষা চৌর্যবৃত্তির ভাব এত অধিক আছে যে, তাহার ইতিহাস পড়িলে আমাদের ঘৃণা হয়।

১৭৮০ খৃস্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি মেকাও-সমীপবর্তী লার্ক উপসাগরে দুইটি ছোটো অহিফেনের জাহাজ পাঠাইয়া দেন। তখনো চীনে অহিফেন নেশার দ্রব্য স্বরূপে প্রচলিত ছিল না। ইতিপূর্বে কেবল ঔষধ স্বরূপে ২০০ সিন্ধুক অহিফেন চীনে আমদানি হইত। ১৭৮১ খৃস্টাব্দে যে ২৮০০ সিন্ধুক অহিফেন চীনে আসিয়াছিল, দেশে তাহার খরিদ্দার ছিল না। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একমাত্র ব্রত হইল কিসে এই পাপ চীনের মধ্যে প্রবেশ করে। ইংরাজেরা যখন আবশ্যক বিবেচনা করেন, তখন চাতুরী ও ধূর্ততার খেলা চমৎকার খেলিতে পারেন। চীনে সেই খেলা আরম্ভ হইল। ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের চেষ্টা এতদূর সফল হইয়া আসিল যে, ১৭৯৯ খৃস্টাব্দে অহিফেনের আমদানি একেবারে বন্ধ করিবার নিমিত্ত আইন প্রচার করিতে হইল। কিন্তু তথাপি ইংরাজ বণিকেরা বেআইনী গোপন ব্যবসায় (smuggling) চালাইতে লাগিলেন। ন্যায্য বা অন্যায্য যে উপায়েই হউক, প্রকাশ্যভাবেই হউক আর চৌরের ন্যায় অতি গোপনভাবেই হউক, চীনকে অহিফেন সেবন করাইতে কোম্পানি একবারে দৃঢ়-সংকল্প।

গোলযোগ দেখিয়া অহিফেনের জাহাজ লার্ক উপসাগর হইতে হ্বাম্পোয়াতে সরানো হইল। চীন গবর্নমেন্ট যাহাতে হ্বাম্পোয়াতে কোনো জাহাজে অহিফেন লইয়া না আসে, তাহার জামিন হংকং-এর সমস্ত বণিকদের নিকট হইতে লইলেন। এই আইন হইল যে, যদি কোনো জাহাজে অহিফেন থাকে, তবে সে জাহাজ তৎক্ষণাৎ মাল না নামাইয়া বন্দর হইতে চলিয়া যাইবেক এবং জামিনদাতাদের শাস্তি হইবে। এই আইন মাঝে মাঝে প্রায় পুনঃপ্রচারিত হইত, তথাপি তাহার বিশেষ ফল হইল না। অবশেষে ১৮২১ খৃস্টাব্দে ক্যান্টনের শাসনকর্তা বেআইনি গোপন ব্যবসায় সকল নিবারণে বিশেষ উদ্যোগী হইলেন। তিনি ইংরাজ, পর্টুগিজ ও মার্কিনদিগকে, এই অতি হীন বাণিজ্য-প্রণালী ও চীন রাজকর্মচারীদিগকে নীতিভ্রষ্ট করা রূপ অতি ঘৃণিত কার্য পরিত্যাগ করিতে বিশেষরূপে অনুরোধ করিলেন।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি হ্বাম্পোয়া হইতে তাঁহাদের জাহাজ সরাইয়া লিন্‌-টিন দ্বীপে লইয়া গেলেন। চীনের সমস্ত উপকূল পর্যটন করিবার জন্য জাহাজ প্রেরিত হইল। সেই-সকল জাহাজ হইতে কিছু দূরে অন্যান্য অহিফেন সমেত জাহাজ সঙ্গে সঙ্গে ভ্রমণ করিতে লাগিল। সেই জাহাজসমূহ হইতে অহিফেন লইয়া লুকাইয়া চুরাইয়া বেআইনি বাণিজ্য চলিতে লাগিল। দেশের অভ্যন্তর ভাগে লোকদের মধ্যে এই নেশা প্রচলিত করাইবার জন্য চীন রাজকর্মচারীদের ইংরাজেরা প্রায় মাঝে মাঝে ঘুষ দিতে লাগিল। ক্রিস্ট্‌লিয়েব্‌ বলিতেছেন যে, এইরূপ পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া ভারতবর্ষীয় ইংরাজ গবর্নমেন্ট চীনবাসীদের নিজ দেশের আইন লঙ্ঘন করিতে ও উপরিস্থ ব্যক্তিদিগের অবাধ্য হইতে যেরূপ শিক্ষা দিয়াছেন, এমন আর কেহ দেয় নাই।

১৮৩৪ খৃস্টাব্দে অহিফেন বাণিজ্যের বিরুদ্ধে নূতন শাসন প্রচারিত হইল। কিন্তু তথাপি গোপন ব্যবসায় এতদূর পর্যন্ত বাড়িয়া উঠিল যে, সমস্ত চীন দেশে অহিফেন লইয়া একটা

আন্দোলন উপস্থিত হইল। চীনের দেশ-হিতৈষীরা ইংরাজদের সহিত সমস্ত বাণিজ্য রদ করিবার প্রস্তাব করিলেন। প্রজাদিগের ঘোর অনিষ্ট সম্ভাবনা দেখিয়া সম্রাট ব্যাকুল হইয়া প্রতিনিধিস্বরূপ লিন্‌কে ক্যান্টনে প্রেরণ করিলেন। লিন্ বন্দরস্থিত জাহাজের সমস্ত অহিফেন ধ্বংস করিয়া দিলেন, ইংরাজদের সহিত বাণিজ্য রহিত করিলেন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সমস্ত কর্মচারীকে চীন হইতে দূর করিয়া দিলেন। অবশেষে ইংরাজদের সহিত যুদ্ধ বাধিল।

যুদ্ধের ফল সকলেই অবগত আছেন। পরাজিত চীন সন্ধি করিল। পাঁচটি বন্দর ইংরাজ বণিকদের নিকটে উন্মুক্ত হইল, হংকং ইংরাজেরা লাভ করিলেন, এবং ২১ কোটি ডলার ক্ষতিপূরণ স্বরূপে চীনের নিকট হইতে আদায় করিলেন। ইংরাজেরা অনুগ্রহ করিয়া সন্ধিপত্রে সম্মতি দিলেন যে, 'বেআইনী সমস্ত পণ্যদ্রব্য চীন গবর্নমেন্ট কাড়িয়া লইতে পারিবেন।' এই অবসরে ইংরাজেরা চেষ্টা করিয়াছিলেন যাহাতে অহিফেন বেআইনী পণ্যের মধ্যে গণ্য না হয়। কিন্তু সে চেষ্টা সফল হয় নাই। ইংরাজ প্রতিনিধি সার্ পটিঞ্জরকে চীন কর্তৃপক্ষীয়েরা অহিফেন বাণিজ্য একেবারে উঠাইয়া দিতে সাহায্য করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। তিনি কহিলেন, 'আচ্ছা, জাহাজে অহিফেন দেখিলে কাড়িয়া লইয়ো, তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই, তবে আমরা তোমাদের সাহায্য করিতে পারিব না।' তিনি বিলক্ষণ অবগত ছিলেন যে, অহিফেন-বাণিজ্যতরীসকল যুদ্ধ-সজ্জায় যেরূপ সুসজ্জিত, তাঁহাদের সাহায্য ব্যতীত দুর্বল চীন তাহাদের কাছে ঘেঁষিতে পারিবে না। এইরূপে প্রকাশ্যভাবে, অসহায় চীনের চোখের সামনে বেআইনী ব্যবসায় চলিতে লাগিল।

বিদেশীয়েরা উপর্যুপরি ও অবিরত তাহাদের দেশের আইন লঙ্ঘন করাতে চীনবাসীরা এত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল যে, 'লোহিত-কেশ' বিদেশীদের একেবারে বিনাশ করিতে তাহারা কল্পনা করিল। রাজকর্মচারী ইয়েঃ 'অ্যারো' নামক একটি ইংরাজ-জাহাজ ধৃত করাতে পুনর্বার চীনদের সহিত ইংরাজদের যুদ্ধ বাধিল। এবারে ফ্রান্স ইংলন্ডের সহিত যোগ দিলেন।

হতভাগ্য পরাজিত চীনকে সাতটি বন্দর বিদেশীদের নিকট উন্মুক্ত করিতে হইল। অহিফেন বেআইনী পণ্যের মধ্যে আর পরিগণিত হইল না। কেবল অহিফেনের উপর মাশুল নির্দিষ্ট হইল। যাহাতে মাশুল গুরুতর হয় চীনেরা তাহার জন্য বারংবার নিবেদন করে, কিন্তু ইংরাজরা তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছে। এইবারের সন্ধির পর হইতে অহিফেনের বাণিজ্য এমন শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিল যে, ১৮৭৫ খৃস্টাব্দে চীনে ৯০০০০ বাক্স অহিফেন আমদানি হইয়াছে।

এখন চীনে কোটি কোটি লোক অহিফেন সেবন করিতেছে। আমাদের দেশে যেমন বাড়িতে কেহ আসিলে আমরা তামাক দিই, চীনে সেইরূপ ধনী লোকেরা ও শ্রীসম্পন্ন ব্যবসায়ীরা প্রায় সাক্ষাৎকারীদের ও খরিদ্দারদের চণ্ডুর হুঁকা দিয়া থাকে। রাস্তায় রাস্তায় চণ্ডুর দোকান খুলিয়াছে। স্যানিহিয়েন নগরে অহিফেন-ধূম সেবনের এমন প্রাদুর্ভাব হইয়াছে যে, অধিবাসীরা নেশায় ভোর হইয়া দিনের বেলায় কোনো কাজ করিতে পারে না, মশাল জ্বালাইয়া রাত্রে কাজ করে। এক নিংপো নগরে কেবল দরিদ্র লোকদিগের জন্য ২৭০০ চণ্ডুর দোকান আছে। দেখা গিয়াছে যে যে স্থানে অহিফেন সেবনের বিশেষ প্রাদুর্ভাব, সেই সেই স্থানে দুর্ভিক্ষের প্রভাব অত্যন্ত অধিক হয়। প্রথম কারণ, লোকেরা অকর্মিষ্ঠ, দ্বিতীয় কারণ, এত অধিক জমি অহিফেনের চাষে নিয়োজিত যে, যথেষ্ট পরিমাণে শস্য উৎপাদনের স্থান নাই। এমন হইয়াছে দুর্ভিক্ষের সময় লোকের হাতে টাকা আছে, অথচ তাহারা টাকা খুঁজিয়া পায় না। তখন তাহারা বুঝিয়াছে যে, অহিফেনে পেট ভরে না। চীনবাসীরা ক্রমশই অকর্মণ্য হইয়া যাইতেছে। ১৮৩২ খৃস্টাব্দে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যখন এক হাজার সৈন্য প্রেরিত হয়, তাহার মধ্য হইতে দুইশত অহিফেনসেবী অকর্মণ্য সৈন্য ফেরত পাঠাইতে হইয়াছিল। বিদ্রোহী দলের মধ্যে সকলেই অহিফেন-বিদ্বেষী ছিল, অহিফেনসেবী রাজসৈনিকেরা তাহাদের নিকটে উপর্যুপরি পরাজিত হয়। চীনেরা বলে যে, সহজে চীনদেশ জয় করিবার অভিপ্রায়ে ধূর্ত ইংরাজেরা অহিফেন ব্যবসায় চীনে প্রচলিত করিয়াছে।

অহিফেনের জন্য প্রতি বৎসর চীনদেশ হইতে এত টাকা বাহির হইয়া যায় যে, ক্রমশই সে দরিদ্র হইয়া পড়িতেছে। ১৮৭২ খৃস্টাব্দে চীন ৮ কোটি ২ লক্ষ ৬১ হাজার ৩ শত ৮১ পাউন্ড অহিফেন কিনিয়াছে। কী ভয়ানক ব্যয়! অহিফেনসেবীদের নীতি এমনি বিগড়িয়া যায় যে, তাহারা নিজের সন্তান বিক্রয় করে ও নিজের স্ত্রীকে ভাড়া দেয়, চুরি-ডাকাতির তো কথাই নাই।’[1] এইরূপে এক বিদেশীয় জাতির হীন স্বার্থপরতা ও সীমাশূন্য অর্থলিপ্সার জন্য সমস্ত চীন তাহার কোটি কোটি অধিবাসী লইয়া শারীরিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক অধঃপতনের পথে দ্রুতবেগে ধাবিত হইতেছে। যেন, ইংরাজদিগের নিকট ধর্মের অনুরোধ নাই, কর্তব্যজ্ঞানের অনুরোধ নাই, সহৃদয়তার অনুরোধ নাই, কেবল একমাত্র পয়সার অনুরোধ বলবান। এই তো তাঁহাদের উনবিংশ শতাব্দীর খৃস্টীয় সভ্যতা!

পাদ্রিদিগের ধর্মোপদেশ শুনিলে চীনবাসীদের গা জ্বলিয়া যায়। জ্বলিবার কথাই তো বটে! একবার একজন আমেরিকান পাদ্রি কাইফংফু নগরে গিয়াছিলেন, সেখানে একদল লোক জুটিয়া তাঁহাকে দূর করিয়া দেয়। তাহারা তাঁহাকে বলে, ‘তোমরা আমাদের সম্রাটকে হত্যা করিলে, আমাদের রাজপ্রাসাদ ভূমিসাৎ করিলে, আমাদের ধ্বংস করিবার জন্য বিষ আনয়ন করিলে, আর আজ আমাদের ধর্ম শিখাইতে আসিয়াছ!!’ একজন ইংরাজ ফাট্‌সান নগরে চণ্ডুর দোকান দেখিতে গিয়াছিলেন, একজন চণ্ডুপায়ী তাঁহার কাছে স্বীকার করিয়াছিল যে, সে তাহার দৈনিক উপার্জনের দশ ভাগের আট ভাগ চণ্ডুপান করিয়া ব্যয় করে। সে অবশেষে ইংরাজটিকে বলে, ‘তুমি তো ইংলন্ড হইতে আসিতেছ? তাহা হইলে অবশ্য তুমি আমাদের মৃত্যুর নিদান বিষ লইয়া কারবার করিয়া থাক। আচ্ছা, তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, তোমাদের রানীটি না জানি কীরূপ দুষ্ট স্ত্রীলোক! আমরা তোমাদের ভালো ভালো চা ও রেশম পাঠাই, আর তিনি কি না তাহার পরিবর্তে আমাদের বধ করিবার জন্য বিষ পাঠাইয়া দেন?’ ইংরাজদের সম্বন্ধে চীনেরা এইরূপ বলে।

এই এক অহিফেন ব্যবসায় সম্বন্ধে বিদেশীয়দের প্রতি চীনের এতদূর অবিশ্বাস হইয়াছে যে, তাহারা স্বদেশে রেলোয়ে প্রভৃতি নির্মাণ করিতে চাহে না, পাছে অহিফেন দেশের অভ্যন্তরদেশে অধিক করিয়া প্রবেশ করিতে পারে। পাছে বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হয় ও তৎসঙ্গে সঙ্গে অতিরিক্ত পরিমাণে বিদেশীদের আমদানি হয়! এমন-কি, লৌহ ও কয়লার খনি ব্যতীত দেশের অন্যান্য বড়ো বড়ো খনি চীন গবর্নমেন্ট স্পর্শ করেন না, পাছে খনিতে বিদেশীয় কর্মচারী রাখিতে হয় ও পাছে বিদেশীয় বাণিজ্য আরও বাড়িয়া উঠে। অহিফেনে চীনের রাজস্বলাভ বড়ো অল্প হয় না, তথাপি চীন জোড় হস্তে বলে, ‘তোর ভিক্ষা দিয়া কাজ নাই, তোর কুকুর ডাকিয়া ল’!’ পটিঞ্জর যখন অহিফেনকে নিষিদ্ধ পণ্য-শ্রেণী-বহির্ভূত করিতে সম্রাটের নিকট প্রস্তাব করেন, তখন সম্রাট টাও কাং এই কথা বলিয়াছিলেন, ‘সত্য বটে, এ বিষের সঞ্চরণ আমি কোনো মতে রোধ করিতে পারিব না, কারণ অর্থলোলুপ, নীতিভ্রষ্ট লোকেরা লোভ ও ইন্দ্রিয়াসক্তির বশ হইয়া আমার মনের ইচ্ছা বিপর্যস্ত করিয়া দিবে। তথাপি আমি বলিতেছি— আমার নিজের প্রজাদের পাপ ও যন্ত্রণা হইতে যে আমি রাজস্ব লাভ করিব, এমন প্রবৃত্তি আমার কিছুতেই হইবে না।’

ইংরাজ জাতির প্রতি চীনের এইরূপ দারুণ অবিশ্বাস থাকাতে ইংরাজদের কম লোকসান হইতেছে না। চীনে ইংরাজ-বাণিজ্যের অত্যন্ত ক্ষতি হইতেছে। ইংরাজি পণ্য চীনে অল্প আমদানি হয়, এবং তাহা দেশের অভ্যন্তর ভাগে চালান করিতে অত্যন্ত কষ্ট পাইতে হয়। অল্প দিন হইল লন্ডন ব্যাঙ্ক-ওয়ালারা চীনে ইংরাজ-বাণিজ্যের শোচনীয় অবস্থা বিষয়ে গবর্নমেন্টের নিকট এক দরখাস্ত পাঠাইয়াছে।

এই অহিফেন বাণিজ্যে ভারতবর্ষেরই বা কী উপকার অপকার হইতেছে দেখা যাক।

---

১. একজন চীনবাসী অহিফেন-ধূমপায়ী বলিয়াছেন যে, ‘দক্ষিণ পর্বতের সমস্ত বাঁশে (বাঁশের কলম) অহিফেনের দোষ বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না; উত্তর সমুদ্রের সমস্ত জলেও ইহার কলঙ্ক প্রক্ষালিত হয় না!’

ভারতবর্ষীয় রাজস্বের অধিকাংশ এই অহিফেন বাণিজ্য হইতে উৎপন্ন হয়। কিন্তু অহিফেনের ন্যায় ক্ষতিবৃদ্ধিশীল বাণিজ্যের উপর ভারতবর্ষের রাজস্ব অত অধিক পরিমাণে নির্ভর করাকে সকলেই ভয়ের কারণ বলিয়া মনে করিতেছেন। ১৮৭১/৭২ খৃস্টাব্দে এই বাণিজ্য হইতে সাড়ে সাত কোটি পাউন্ডেরও অধিক রাজস্ব আদায় হইয়াছিল। কিন্তু কয়েক বৎসরের মধ্যে তাহা ৬ কোটি ৩ লক্ষ পাউন্ডে নামিয়া আসে। এরূপ রাজস্বের উপর নির্ভর করা অত্যন্ত আশঙ্কার কারণ। ভারতবর্ষীয় অহিফেন নিকৃষ্ট হইয়া আসিতেছে, সুতরাং তাহার দাম কমিবার কথা। তাহা ভিন্ন চীনে ক্রমশই অহিফেন চাষ বাড়িতেছে। চীনে স্থানে স্থানে অহিফেন-সেবন-নিবারক সভা বসিয়াছে। ক্যান্টনবাসী আমীর-ওমরাহগণ প্রায় সহস্র প্রসিদ্ধ পল্লীতে প্রতি গৃহস্থকে বলিয়া পাঠাইয়াছেন যে, 'তোমরা সাবধান থাকিয়ো যাহাতে বাড়ির ছেলেপিলেরা অহিফেন অভ্যাস না করিতে পায়।' যাহারা অহিফেন সেবন করে তাহাদের সমাজ হইতে বহিষ্কৃত করিবেন বলিয়া ভয় দেখাইয়াছেন। তিনটি বড়ো বড়ো নগরের অধিবাসী বড়োলোকেরা সমস্ত অহিফেনের দোকান বন্ধ করাইতে পারিয়াছেন। এইরূপে চীনে অহিফেনের চাষ এত বাড়িতে পারে, ও অহিফেন সেবন এত কমিতে পারে যে, সহসা ভারতবর্ষীয় রাজস্বের বিশেষ হানি হইবার সম্ভাবনা। অতএব ওই বাণিজ্যের উপর রাজস্বের জন্য অত নির্ভর না করিয়া অন্য উপায় দেখা উচিত। এতদ্ভিন্ন অহিফেন চাষে ভারতবর্ষের স্পষ্ট অপকার দেখা যাইতেছে। অহিফেন চাষ করিতে বিশেষ উর্বরা জমির আবশ্যক। সমস্ত ভারতবর্ষে দেড় কোটি একর (Acre) উর্বরতম জমি অহিফেনের জন্য নিযুক্ত আছে। পূর্বে সে-সকল জমিতে শস্য ও ইক্ষু চাষ হইত। এক বাংলা দেশে আধ কোটি একরেরও অধিক জমি অহিফেন চাষের জন্য নিযুক্ত। ১৮৭৭/৭৮-এর দুর্ভিক্ষে বাংলার প্রায় এক কোটি লোক মরে। আধ কোটি একর উর্বর ভূমিতে এক কোটি লোকের খাদ্য জোগাইতে পারে। ১৮৭১ খৃস্টাব্দে ডাক্তার উইল্‌সন পার্লিয়ামেন্টে কহিয়াছেন যে, মালোয়াতে অহিফেনের চাষে অন্যান্য চাষের এত ক্ষতি হইয়াছিল যে, নিকটবর্তী রাজপুতানা দেশে ১২ লক্ষ লোক না খাইয়া মরে। রাজপুতানায় ১২ লক্ষ লোক মরিল তাহাতে তেমন ক্ষতি বিবেচনা করি না, সে তো ক্ষণস্থায়ী ক্ষতি। এই অহিফেনে রাজপুতানার চিরস্থায়ী সর্বনাশের সূত্রপাত হইয়াছে। সমস্ত রাজপুতানা আজ অহিফেন খাইয়া আত্মহত্যা করিতে বসিয়াছে। অত বড়ো বীর জাতি আজ অকর্মণ্য, অলস, নির্জীব, নিরুদ্যম হইয়া ঝিমাইতেছে। আধুনিক রাজপুতানা নিদ্রার রাজ্য ও প্রাচীন রাজপুতানা স্বপ্নের রাজ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অত বড়ো জাতি অসার হইয়া যাইতেছে। কী দুঃখ! আসামে যেরূপে অহিফেন প্রবেশ করিয়াছে, তাহাতে আসামের অতিশয় হানি হইতেছে। বাণিজ্য-তত্ত্বাবধায়ক ক্রস্‌ সাহেব বলেন, 'অহিফেন সেবন রূপ ভীষণ মড়ক আসামের সুন্দর রাজ্য জনশূন্য ও বন্য জন্তুর বাসভূমি করিয়া তুলিয়াছে এবং আসামীদের মতো অমন ভালো একটি জাতিকে ভারতবর্ষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধম, দাসবৎ এবং নীতিভ্রষ্ট করিয়া তুলিয়াছে।' অহিফেন বাণিজ্য আমাদের ভারতবর্ষের তো এই-সকল উপকার করিয়াছে!

চীনের রাজা যদি বলিতে পারেন যে, 'আমার নিজের প্রজাদের পাপ ও যন্ত্রণা হইতে যে আমি রাজস্ব লাভ করিব, এমন প্রবৃত্তি কিছুতেই হইবে না।' তবে খৃস্টীয় ধর্মাভিমানী ইংরাজেরা কি বলিতে পারেন না যে, 'একটি প্রকাণ্ড জাতির পাপ ও যন্ত্রণা হইতে যে আমরা লাভ করিব, এমন প্রবৃত্তি আমাদের না হয় যেন।' কিন্তু আমরা খৃস্টান জাতিকে তো চিনি! এই খৃস্টান জাতিই তো প্রাচীন আমেরিকানদিগকে ধ্বংস করিয়াছেন! এই খৃস্টান ইংরাজদের লোভ-দৃষ্টিতে কোনো দুর্বল 'হীদেন' দেশ পড়িলে তাঁহারা কীরূপ খৃস্টান উপায়ে তাহা আদায় করেন তাহাও তো আমরা জানি! এই খৃস্টান ইংরাজগণ বর্মায় কীরূপ খৃস্টান নীতি অবলম্বনপূর্বক অহিফেন প্রচলিত করেন তাহাও তো আমরা জানি। ইংরাজদের মুষ্টিতে আসিবার পূর্বে আরাকানে অহিফেনসেবীদের প্রতি মৃত্যুদণ্ডের নির্দেশ ছিল। অধিবাসীরা পরিশ্রমী, মিতব্যয়ী ও সরল-হৃদয় লোক ছিল। অবশেষে কী হইল? ইংরাজ বণিকগণ অহিফেনের দোকান খুলিলেন। যত প্রকার

উপায়ে এই নেশা দেশে প্রচলিত হইতে পারে তাহা অবলম্বন করিলেন। অল্পবয়স্ক লোকদের দোকানে ডাকিয়া আনিয়া অহিফেন দেওয়া হইত। প্রথমে তাহার মূল্য লওয়া হইত না, অবশেষে এই উপায়ে অহিফেন যতই প্রচলিত হইতে লাগিল ততই মূল্যও উঠিতে লাগিল, বণিকদের পকেট পূরিতে লাগিল, গবর্নমেন্টের রাজস্ব বাড়িতে লাগিল। তাহার ফল কী হইল? আরাকানের সুস্থ বলিষ্ঠ জাতি অহিফেনের অন্ধ অনুরক্ত হইল, দিগ্‌বিদিক্‌-জ্ঞানশূন্য জুয়া খেলোয়াড় হইয়া উঠিল। তাহাদের শরীর ও নীতির ধ্বংস সাধিত হইল। এই তো খৃস্টান জাতি! যাহাদের বল নাই, যাহাদের সহায় নাই, তাহাদের সহিত ইংরাজ খৃস্টানরা যেরূপ ব্যবহার করেন, তাহা জগতে বিদিত। তাহাদের তাঁহারা লাথি মারিতে চান। খৃস্টানশাস্ত্রে লেখা আছে, তোমার এক গালে চড় মারিলে আর-এক গাল ফিরাইয়া দিবে! খৃস্টান ইংরাজগণ যখন রাজস্বের লোভ দেখাইয়া চীনের সম্রাটকে চীন হত্যা করিতে পরামর্শ দিতে গিয়াছিলেন, তখন অখৃস্টান চীনের সম্রাট যে মহদ্‌বাক্য বলিয়াছিলেন, তাহাতে ইংরাজদের খৃস্টানী গালে চড় মারা হইয়াছিল সন্দেহ নাই, দুঃখের বিষয় তাহার কোনো ফল হইল না।

ভারতী
জ্যৈষ্ঠ ১২৮৮

নিমন্ত্রণ-সভা

দশ জনে একত্রে মিলিত হইবার অনুষ্ঠান আমাদের নাই। আমাদের সামাজিক ভাব এতই অল্প যে, সম্মিলনের মূল্য আমরা বুঝি না। অনেক লোক একত্র হইলে সেই একত্র হওয়ার জন্যই যে আমোদ, শুদ্ধ পরস্পরের সহিত আলাপ-পরিচয়, কথাবার্তা কহিবার যে সুখ, তাহা আমরা ভালো করিয়া উপভোগ করিতেই পারি না। আমরা আলাপ-পরিচয়, আমোদ-প্রমোদ, হাস্য-পরিহাস করিতে নিমন্ত্রণ-সভায় যাই না, আহার করিতে যাওয়াই মুখ্য উদ্দেশ্য। নিরাহার নিমন্ত্রণ আমাদের কানে অত্যন্ত হাস্যজনক, ঘৃণাজনক বলিয়া ঠেকে। নিমন্ত্রণের আর-এক অর্থই— পরের বাড়িতে গিয়া আহার করা। 'নিমন্ত্রণ' বলিলেই আহার করা ভিন্ন আর কোনো ভাব আমাদের মনে আসে না। ঘণ্টা-দুই ধরিয়া কতকগুলা গোল, চৌকোণা, চেপ্টা, লম্বা, চৌড়া, তরল, কঠিন পদার্থ উদরের মধ্যে বোঝাই করাকেই কি আমরা শ্রেষ্ঠতম সুখ মনে করি না? একে তো আমরা শুদ্ধ কেবল সম্মিলনের উপলক্ষে নিমন্ত্রণ করি না, বিবাহ উপলক্ষে, পূজা উপলক্ষে ও অন্যান্য ক্রিয়াকাণ্ড উপলক্ষে করিয়া থাকি, তাহাতে আবার নিমন্ত্রণ করি কী উদ্দেশ্যে? না, শুদ্ধ কেবল আহারের উদ্দেশ্য। সাধারণত আমরা ভাবিয়া পাই না যে, শুদ্ধ কেবল বিশ-ত্রিশ জন লোক মিলিয়া, ঘণ্টা-দুই ধরিয়া কথাবার্তা কহিয়া যে যাহার বাড়ি ফিরিয়া গেল, এ পাগলা গারদ ভিন্ন অন্য কোথাও সম্ভবে? মনে করো, নিজের বাড়ি হইতে পরের বাড়ি যাইতে হইলে আমাদের কি কম হাঙ্গামা করিতে হয়? ধুতির কোঁচাটা চাদরের কাজ করিতেছিল, সেটাকে তাহার যথা-কাজে নিয়োগ করিয়া আবার একটা চাদর বাহির করিতে হয়, জুতা পরিতে হয়, জামা পরিতে হয়, তাহা ছাড়া আবার যাতায়াতের হাঙ্গামা আছে। এত পরিশ্রম বাঙালি করিতে রাজি আছে, যদি কিঞ্চিৎ আহার পায়। নহিলে বাড়িতে তাঁহার এমনি কী শয্যাকণ্টক উপস্থিত হইয়াছে যে, তাঁহার তাকিয়া ত্যাগ করিয়া, হাই-তোলা কাজ কামাই করিয়া, পরের বাড়িতে বাজে কথা কহিতে যাইবেন? যাহা হউক, দশটা বাঙালিকে একত্রে জড়ো করিবার প্রধান উপায় আহারের লোভ দেখানো, বাঙালিদের অপেক্ষা আরও অনেক ইতর প্রাণীকেও ওই উপায়ে একত্রিত করা যায়।

একে তো আহারের সময়ে ব্রাহ্মণদের কথোপকথন নিষেধ, তাহাতে নিষেধ সত্ত্বেও যদি বা কথোপকথন চলে, তবে সে লুচিগত, সন্দেশগত, রসগোল্লাগত কথোপকথনে সুরুচিবান

ব্যক্তিদের বড়োই বিরক্তি বোধ হয়। আহারের সময়ে আহারটাই নিমন্ত্রিতবর্গের মনে সর্বাপেক্ষা জাগরূক থাকে, সে সময় যে কথোপকথন নির্মিত হইতে থাকে, তাহার ভিত্তি উদর, তাহার ইষ্টক সন্দেশ, তাহার কড়িকাঠ পানতোয়া ও তাহার ছাদ লুচির রাশি। নিমন্ত্রণকারীর বাড়িতে যাওয়া, আহারটি করা ও পান চিবাইতে চিবাইতে বাড়িতে ফিরিয়া আসা নিমন্ত্রিতের কর্তব্য কাজ।

আমাদের নিমন্ত্রণের মধ্যে সামাজিক ভাব এত অল্প যে, নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আমরা প্রতিনিধি পাঠাই। আমরা জানি যে, আহার করানোই আমাদের নিমন্ত্রণের উদ্দেশ্য, আমি আহার না করি, আমার হইয়া আর-এক জন করিলেও সে উদ্দেশ্য সফল হইবে। আমার ভাইপোকে বা ভাগ্নেকে বা উভয়কে পাঠাইয়া দিলাম, তাহারা সাটিনের কাপড় পরিয়া এক পেট খাইয়া আসিল। পরস্পরকে আমোদ দেওয়া যদি আমাদের নিমন্ত্রণের উদ্দেশ্য হইত, তবে আমার পরিবর্তে অর্ধস্ফুট-বাণী ঝি সহায় একটি ভাগ্নেকে সভাস্থলে পাঠানো কী হাস্যজনক বোধ হইত! নিমন্ত্রণ সারিয়া চলিয়া যাইবার সময় গৃহকর্তা বিনীতভাবে বলেন, 'মহাশয়কে অত্যন্ত কষ্ট দেওয়া হইল।' মনে মনে ভাবি কথাটা মিথ্যা নহে, সাড়ে দশটার সময় আমার অহার করা অভ্যাস, সাড়ে চারিটার সময় আহার জুটিল। আহার ব্যতীত আর কোনো আমোদের যদি বন্দোবস্ত থাকিত, তাহা হইলেও এ কষ্ট বরদাস্ত হইত। কিন্তু আমরা মনে করি, আহারই শ্রেষ্ঠতম আমোদ এবং আহার ব্যতীত ভদ্রজনোচিত আমোদ আর কিছুই নাই।

বাড়িতে ফিরিয়া আসিয়া আমরা গল্প করিতে লাগিলাম। যদি নিন্দা করিবার অভিপ্রায় থাকে তো বলি যে, আহারের ব্যবস্থা অত্যন্ত মন্দ হইয়াছিল; প্রশংসা করিবার হইলে বলি যে, আহারের আয়োজন অতিশয় পরিপাটি হইয়াছিল। কাহারও কাছে নিমন্ত্রণের রিপোর্ট দিতে হইলে কোন্ খাদ্যটা ভালো ও কোন্ খাদ্যটা মন্দ তাহারই সমালোচনা বিস্তারিতরূপে করি। নিমন্ত্রণ-সভা হইতে ফিরিয়া আসিয়া এমন গল্প কোনো বাঙালি কখনো করে নাই যে—'হরিশবাবু আজ নিমন্ত্রণ-সভায় যে প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিয়াছিলেন, তাহাতে গিরিশবাবু এই কথা বলেন ও যোগেশবাবু এই কথা বলেন। সুরেশবাবু যাহা বলেন, এমনি চমৎকার করিয়া বলেন যে, সকলেরই মনে আঘাত লাগে।' নিমন্ত্রণ-সভায় লুচি, সন্দেশ ও মিঠায়েরই একাধিপত্য। সেখানে গিরিশবাবু, যোগেশবাবু ও সুরেশবাবুগণ আমার আমোদ সাধনের পক্ষে কিছুমাত্র আবশ্যকীয় পদার্থ নহেন। নাট্যশালায় সমাগত ক্রীত-টিকিট দর্শকবর্গ পরস্পরের আমোদের পক্ষে যতটুকু উপযোগী, প্রাপ্ত-পত্র নিমন্ত্রিতবর্গ পরস্পরের আমোদের পক্ষে ততটুকু উপযোগী।

নিমন্ত্রণের উদ্দেশ্য কী হওয়া উচিত? যাঁহাদের মধ্যে প্রত্যহ পরস্পরের দেখাশুনা হয় না, তাঁহাদের মিলন করাইয়া দেওয়া, যাঁহাদের মধ্যে পরস্পরের আলাপ হওয়া বাঞ্ছনীয়, তাঁহাদের একত্র করিয়া দেওয়া। সামাজিক মানুষের পরস্পরকে আমোদ দিবার ও পরস্পরের নিকট আমোদ পাইবার যে একটা আন্তরিক ইচ্ছা আছে, তাহাই চরিতার্থ করিবার সুযোগ দেওয়া। প্রত্যহ যাহা খাইতে পাই, তাহা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক খাইতে দেওয়া নিমন্ত্রণের উদ্দেশ্য নহে— অথবা নিমন্ত্রণকারীর বাড়িতে পদধূলি দিয়া ও তাঁহার খরচে এক উদর আহার করিয়া তাঁহাকে তাঁহার পূর্বপুরুষদিগকে কৃতকৃতার্থ করাও নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের কার্য নহে।

নিমন্ত্রণকারীর কর্তব্য যে, যে-লোকদের নিমন্ত্রণ করিলে পরস্পরের আমোদ বর্ধন হইবে তাঁহাদের একত্র করা। এখন যেমন আমাদের দেশের নিমন্ত্রণকারী যশ পাইতে ইচ্ছা করিলে সন্দেশ টিপিয়া দেখেন তাহাতে ছানার পরিমাণ অধিক আছে কি না— উৎকৃষ্টতর নিমন্ত্রণ পদ্ধতি প্রচারিত হইলে সুখ্যাতি-প্রয়াসী নিমন্ত্রক দেখিবেন, নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের আমোদ দিবার ও আমোদ পাইবার গুণ কাহার কীরূপ আছে। কে ভালো গল্প করিতে জানে ও কে মনোযোগ দিয়া শুনিতে জানে। কে ভালো রসিকতা করিতে জানে ও কে ভালো হাসিতে জানে। কে কথা কহিবার কৌশল জানে ও কে চুপ করিয়া থাকিবার কৌশল জানে। তিন জন উকিল যদি থাকেন তবে তাঁহাদের পৃথক পৃথক রাখা উচিত, নহিলে তাঁহারা মোকদ্দমা মামলার কথা পাড়িয়া আদালত-

ছাড়া লোকদিগকে দেশ-ছাড়া করিবার বন্দোবস্ত করেন। তিন জন গ্রন্থকার যদি সভাস্থলে থাকেন তবে তাঁহাদের পাশাপাশি একত্র রাখা যুক্তিসংগত কি না বিবেচনাস্থল, তাহা হইলে তাঁহারা তিন জনেই মুখ বন্ধ করিয়া থাকিবেন। আর, তিন জন যদি রসিকতাভিমানী ব্যক্তি থাকেন, তবে যে উপায়ে হউক তাঁহাদের ছাড়াছাড়ি রাখা আবশ্যক, তাঁহারা বিজ্ঞানের এই সহজ সত্যটি প্রায়ই বিস্মৃত হন যে, দুইটি পদার্থ একই স্থান অধিকার করিয়া থাকিতে পারে না। এক কথায় নিমন্ত্রণকারীর এই একমাত্র ব্রত হওয়া উচিত, যাহাতে নিমন্ত্রিতদিগের সর্বাঙ্গীণ আমোদ হয়। নিমন্ত্রিতদিগেরও কর্তব্য কাজ আছে, তাঁহারা যে মনে করিয়া রাখিয়াছেন যে, নিমন্ত্রকের কর্তব্য লুচি-সন্দেশের ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া ও তাঁহাদের একমাত্র কর্তব্য সেগুলি জঠরে রপ্তানি করিয়া দেওয়া, তাহা যথার্থ নহে। উৎকৃষ্টতর নিমন্ত্রণে তাঁহারাই লুচি, তাঁহারাই সন্দেশ। পরস্পরের মানসিক ক্ষুধা পিপাসা নিবারণের জন্য তাঁহারাই খাদ্য ও পানীয়। মহারাজা সামাজিকতার নিকটে তাঁহার অধীনস্থ আমরা সকলেই এই কর্তব্য-সূত্রে বদ্ধ আছি যে, দশ জন একত্রে আহূত হইলেই পরস্পরকে সুখী রাখিবার জন্য আমরা যথাশক্তি প্রয়োগ করিব। নিমন্ত্রিতবর্গের সকলেরই একমাত্র কর্তব্য, যথাসাধ্য অন্যকে সুখী করিতে চেষ্টা করা। যাহারা সভাস্থলে গোঁ হইয়া বসিয়া থাকে, তাহারা অসামাজিক, যাহারা নিজেই কথা কহিতে চাহে, পরের কথা শুনিতে চাহে না তাহারা অসামাজিক, যাহারা নিজের রসিকতা ব্যতীত আর কোনো কারণে হাসিতে চাহে না তাহারা অসামাজিক। এক-এক জন যেন মনের মধ্যে কেবল বিছুটির চাষ করিয়াছে, অন্যকে জ্বালাইতে না পারিলে তাহাদের রসিকতা হয় না, তাহারা অসামাজিক— উন্নততর নিমন্ত্রণ-সভার মানসিক আহার্যের পাতে এরূপ অসামাজিক লুচি-সন্দেশগুলি না থাকে যেন, ইঁহাদের কাহারও বা ঘি খারাপ, কাহারও বা ছানা কম, কাহারও বা রসের অভাব।

আমাদের দেশের নিমন্ত্রণ-সভায় পরস্পরকে আমোদ দিবার ভাব নাই। অর্থাৎ উচ্চ শ্রেণীর সামাজিকতার ভাব নাই। একটা আমোদের উপকরণ আছে (যেমন নাচ বা আহার) আর আমরা সকলে মিলিয়া তাহা উপভোগ করিতেছি তাহাও সামাজিকতার ভাব কিন্তু নিকৃষ্টতর সামাজিকতা। বক্তৃতাস্থল, রঙ্গভূমি, নাট্যশালা প্রভৃতিই সেইরূপ অতি ক্ষীণ সামাজিকতার স্থল, নিমন্ত্রণ-সভা নহে। সত্য কথা বলিতে কি আহারই যে আমাদের নিমন্ত্রণস্থলে প্রধান আমোদ বলিয়া গণ্য হইয়াছে, তাহার একটা কারণ আছে। আমাদের সামাজিকতার ভাব এতই অল্প যে, পরস্পরকে কী করিয়া আমোদ দিতে হয় তাহা আমরা জানি না। আমোদ দিবার শিক্ষাই আমাদের নাই, আর সে শিক্ষাতেও আমরা কিছুমাত্র মনোযোগ দিই না। যে ব্যক্তি আমাদের হাসায়, তাহার কথায় আমরা হাসি বটে, কিন্তু তাহাকে কেমন একটু নীচু-নজরে দেখি, তাহার পদ পাইতে আমরা ইচ্ছা করি না। তাহারও আবার কারণ আছে। আমাদের দেশে সচরাচর যাহারা হাসায় তাহারা এমন অশিক্ষিত-রুচি যে, তাহাদের রসিকতা হয় অশ্লীল নয় ব্যক্তিগত, নয় অর্থশূন্য অঙ্গভঙ্গিময় ভাঁড়ামি হইয়া পড়ে। এমন-কি, আমাদের ভাষায় wit বা humour-এর কথা নাই। রসিকতা বলিলে যে ভাবটা আমাদের মনে আসে, সেটা কেমন নির্দোষ, নিরীহ, নিরামিষ নহে। আমাকে যদি কেহ 'রসিক' বলে তবে আমার পিত্ত জ্বলিয়া যায়। আমাদের ভাষায় রসিকতার সঙ্গে কেমন একটা কলুষিত ভাবের সংযোগ আছে। ইংলন্ডের সমাজে কথোপকথন-কুশল ব্যক্তিদের যেরূপ অসাধারণ মান, আমাদের দেশে তাহা কিছুই নাই, বরং তাহার উল্টা। ইংলন্ডে কথোপকথন একটা বিদ্যার মধ্যে পরিগণিত, তাহার নানা পদ্ধতি আছে, নানা নিয়ম আছে। আমাদের দেশে অধিক কতাবার্তাকে লোকে বড়ো ভালো বলে না। আমাদের দেশে 'স্বর্ণময় নীরবতার' মূল্য জনসাধারণ এত অধিক বুঝিয়াছে যে, আমাদের সামাজিক এক্‌সচেঞ্জে কথাবার্তার রুপার বড়োই হানি হইতেছে। Metallic question-এর বিষয়ে আমি কিছু বলিতে প্রস্তুত নহি, কিন্তু এই পর্যন্ত বলিতে পারি, আমাদের সমাজে রুপার দর না বাড়িলে বড়োই অসুবিধা হইতেছে। আমাদের দেশের সভায় পরিচয় হয়, আলাপ হয় না। 'মহাশয়ের নাম?

মহাশয়ের ঠাকুরের নাম?' ইত্যাদি প্রশ্নে 'মহাশয়ে'র চতুর্দশ পুরুষের পরিচয় লওয়া হয়, কিন্তু আলাপ হয় না। চুপচাপ করিয়া, সংযত হইয়া বসিয়া থাকাকেই আমরা বিশেষ প্রশংসা করি। নিতান্ত বক্তৃতা স্থলে, প্রকাশ্য সভায় এইরূপ ভাব ভালো। কিন্তু নিমন্ত্রণ-সভাতেও যদি চুপচাপ বসিয়া থাকা নিয়ম হয়, তবে নিতান্তই আমাদের ব্যাঘাত হয়, এমন-কি, শিক্ষার ব্যাঘাত হয়। বিস্তৃত কথোপকথনের প্রথা না থাকিলে ভাবের আদান-প্রদান চলিবে কীরূপে? নানা প্রকার ভাব সাধারণ সমাজময় ছড়াইয়া পড়িবে কী উপায়ে? আমোদ দিবার আর-এক উপায় গীত-বাদ্য। আজকাল সংগীত অনেকটা প্রচলিত হইতেছে, কিন্তু ইহার কিছু পূর্বে যে ভদ্রলোক সংগীত শিখিত, তাহার মা-বাপেরা তাহাকে খরচের খাতায় লিখিতেন। এখনও যাঁহারা গান-বাজনা শিখেন, তাঁহারা নিজের শখ চরিতার্থ করিতে শিখেন মাত্র। আমাদের সমাজে ভালোরূপে মেশামেশি করিবার জন্য গান শিখিবার যে কিছুমাত্র আবশ্যক আছে তাহা নহে। অতএব দেখা যাইতেছে আমাদের নিমন্ত্রণ-সভায় হাসানো দূষ্য। অধিক হাসা বা কথা কহা নিয়ম-বিরুদ্ধ, (কথা কহিবার বিষয়ও অধিক নাই,) নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের মধ্যে গান-বাজনা করা অপ্রচলিত, তবে আর বাকি রহিল কী? আহার। অতএব নিমন্ত্রণে যাও আর আহার করো। মনোরঞ্জনীবিদ্যা শিখি না, শিখিবার আবশ্যক বিবেচনা করি না, এমন-কি, অনেক স্থলে শিখা দূষ্য মনে করি। সাধারণত আমাদের কেমন ধারণা আছে যে, পরকে আমোদ দেওয়া পেশাদারের কাজ; আমোদ দেওয়ার কাজটাই যেন নীচু। ইহা অপেক্ষা অসামাজিকতার ভাব আর কী আছে! এমন-কি, গাহিতে বলিলেই নিতান্ত অনিচ্ছা প্রকাশ না করিয়া যদি কেহ তৎক্ষণাৎ গায় তবে সে যেন অন্যান্য লোকের চোখে হাস্যাস্পদ বলিয়া প্রতীত হয়। পরকে আমোদ দেওয়া কর্তব্যকাজ, তাহার জন্য ঔৎসুক্য ও আগ্রহ থাকা উচিত এ ভাব যে কেন হাস্যাস্পদ বলিয়া প্রতীত হইবে বুঝিতে পারি না। আমার ভালো গলা থাক্ বা না থাক্ আমি ভালো গাহিতে পারি না পারি, তোমার মনোবিনোদনে আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করিব, এ ভাব সামাজিক জাতিদিগের নিকট প্রশংসনীয় বলিয়াই মনে হয়। আমাদের দেশে নিমন্ত্রণের সহিত বহুব্যয়সাধ্য আহারের বিশেষ যোগ থাকাতে একটা হানি হইয়াছে। সদাসর্বদা নিমন্ত্রণ করা লোকের পোষায় না। একটা উপলক্ষ না হইলে কেহ প্রায় নিমন্ত্রণ করে না। ইহাতে আমাদের দেশে সম্মিলনের অবসর কম পড়িয়াছে। রোগী দেখিতেও যদি কোনো কুটুম্বের বাড়ি যাওয়া যায়, তাহা হইলেও খাওয়াইতে হইবে। আপাতত মনে হয়, ইহাতে সামাজিক ভাবের আরও বহুল চর্চা হয়, কিন্তু তাহা নহে। ইহার ফল হয় এই যে, নিতান্ত আবশ্যক না হইলে কুটুম্বের বাড়ি যাওয়া হয় না। সদাসর্বদা যাতায়াত করিলে লোকে নিন্দা করে, এবং কুটুম্বও বড়ো আহ্লাদের সহিত অভ্যর্থনা করে না। অতএব নিমন্ত্রণের আরেক অর্থ যদি আহার না হয়, তাহা হইলে নিমন্ত্রণ অনেক বাড়ে, নিমন্ত্রণের অনেক শ্রীবৃদ্ধি সাধন হয়। নিমন্ত্রণের অন্যান্য নানা উপকরণের মধ্যে আহার বলিয়া একটা পদার্থ রাখা যায়, কিন্তু সমস্ত নিমন্ত্রণটা যেন আহার না হয়। পরস্পরে মিলিয়া গান-বাজনা, আমোদ-প্রমোদ, কথোপকথনের চর্চা আরও বহুলতররূপে আমাদের সমাজে প্রচলিত হউক। তাহা হইলে প্রকৃত রসিকতা কাহাকে বলে সে শিক্ষা আমাদের লাভ হইবে, প্রসঙ্গ কীরূপে আলোচনা করিতে হয়, সে অভ্যাস আমাদের হইবে, আহার ব্যতীত যে ভদ্রজনোচিত আমোদ যথেষ্ট আছে তাহা আমাদের বোধগম্য হইবে।

ভারতী
আষাঢ় ১২৮৮

চেঁচিয়ে বলা

আজকাল সকলেই সকল বিষয়েই চেঁচিয়ে কথা কয়। আস্তে বলা একেবারে উঠিয়া গিয়াছে। চেঁচিয়ে দান করে, চেঁচিয়ে সমাজ সংস্কার করে, চেঁচিয়ে খবরের কাগজ চালায়, এমন-কি, গোল থামাইতে গোল করে। সেকরা গাড়ি যত না চলে, ততোধিক শব্দ করে; তাহার চাকা ঝন ঝন করে, তাহার জানলা ঝর ঝর করে, তাহার গাড়োয়ান গাল পাড়িতে থাকে, তাহার চাবুকের শব্দে অস্থির হইতে হয়। বঙ্গসমাজও আজকাল সেই চালে চলিতেছে, তাহার প্রত্যেক ইঞ্চি হইতে শব্দ বাহির হইতেছে। সমাজটা যে চলিতেছে ইহা কাহারও অস্বীকার করিবার জো নাই; মাইল মাপিলে ইহার গতিবেগ যে অধিক মনে হইবে তাহা নহে, কিন্তু ঝাঁকানি মাপিলে ইহার গতিপ্রভাবের বিষয়ে কাহারো সন্দেহ থাকিবে না। ঝাঁকানির চোটে আরোহীদের মাথায় মাথায় অনবরত ঠোকাঠুকি লাগিয়াছে, আর শব্দ এত অধিক যে, একটা কথা কাহারও কর্ণ-গোচর করিতে গেলে গলার শির ছিঁড়িয়া যায়।

কাজেই বঙ্গসমাজে চেঁচানোটাই চলিত হইয়াছে। পক্ষীজাতির মধ্যে কাকের সমাজ, পশুজাতির মধ্যে শৃগালের সমাজ, আর মনুষ্য জাতির মধ্যে বাঙালির সমাজ যে এ বিষয়ে শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছে, ইহা শত্রুপক্ষকেও স্বীকার করিতে হইবে।

শুনা গেছে, পূর্বে লোকে গরীবকে লাখ টাকা দান করিয়াছে, অথচ টাকার শব্দ হয় নাই, কিন্তু এখন চার গণ্ডা পয়সা দান করিলে তাহার ঝম্‌ঝমানিতে কানে তালা লাগে। এই তো গেল দানের কথা। আবার, দান না করিয়া এত কোলাহল করা পূর্বে প্রচলিত ছিল না। ভিক্ষুক আসিল, দয়ার উদ্রেক হইল না, তাহাকে এক কথায় হাঁকাইয়া দিলাম, এই প্রাচীন প্রথা। কিন্তু এখন লোকে ভিক্ষুক তাড়াইতে গেলে, পোলিটিকল ইকনমির বড়ো বড়ো কথা আওড়াইতে থাকে, বলে, দান না করাই যথার্থ দয়া, দান করাই নিষ্ঠুরতা, ইহাতে সমাজের অপকার করা হয়, আলস্যকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়, ভিক্ষাবৃত্তিকে জিয়াইয়া রাখা হয়— ইত্যাদি ইত্যাদি। সমস্তই মানি। কিন্তু তোমার মুখে এ-সব কথা কেন? তুমি এক পয়সা উপার্জন কর না, ঘরের পয়সা ঘরে জমাইয়া রাখ, বাণিজ্য ব্যবসায়ের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নাই, কেবল অকেজো কতকগুলা বিলাস দ্রব্য কিনিয়া পয়সা ধ্বংস কর, ভিক্ষা দিবার সময়েই তোমার মুখে পোলিটিকল ইকনমি কেন? পোলিটিকল ইকনমিটাকে কেবল ঢাকের কাজেই ব্যবহার করা হয়, আর কোনো কাজে লাগে না।

দেশহিতৈষিতা, আলো জ্বালিবার গ্যাসের মতো যতক্ষণ গুপ্তভাবে চোঙের মধ্য দিয়া সঞ্চারিত হইতে থাকে, ততক্ষণ তাহা বিস্তর কাজে লাগে— কিন্তু যখন চোঙ্‌ ফুটা হইয়া ছাড়া পায় ও বাহির হইতে থাকে, তখন দেশ-ছাড়া হইতে হয়। আজকাল রাস্তায় ঘাটে দেশহিতৈষিতা-গ্যাসের গন্ধে ভূত পালাইতেছে, অথচ আবশ্যকের সময় অন্ধকার। গ্যাসটা কেবল নাকের মধ্য দিয়াই খরচ হইয়া যায়, বাকি কিছু থাকে না। আত্ম-পরিবারের মধ্যে যে ব্যক্তি শূল বেদনার মতো বিরাজমান, যে ব্যক্তি মাকে ভাত দেয় না, ভাইয়ের সঙ্গে লাঠালাঠি করে, পাড়া-প্রতিবেশীদের নাম পর্যন্তও জানে না— আজকাল সে ব্যক্তিও ভারতবর্ষকে মা বলে, বিশ কোটি লোককে ভাই বলে— শ্রোতারা আনন্দে হাততালি দিতে থাকে। পূর্বে আর-এক রূপ ছিল— তখনকার ভালো লোকেরা বাপ-পিতামহদের ভক্তি করিত— আত্ম-পরিবারের সহিত দৃঢ়রূপে সংলগ্ন ছিল, পাড়া-প্রতিবেশীর উৎসবে আমোদে কায়মনোবাক্যে যোগ দিত, বিপদে-আপদে প্রাণপণে সাহায্য করিত। কিন্তু বাপকে ভক্তি করিলে, ভাইকে ভালোবাসিলে, বন্ধু-বান্ধবদিগকে সাহায্য করিলে, তেমন একটা হট্টগোল উপস্থিত হয় না— পৃথিবীর বিস্তর উপকার হয়, কিন্তু সমস্ত চুপেচাপে সম্পন্ন হয়। কাজেই এখন 'ভ্রাতাগণ', 'ভগ্নীগণ', 'ভারতমাতা' নামক কতকগুলা শব্দ সৃষ্ট হইয়াছে, তাহারা অনবরত হাওয়া খাইয়া খাইয়া ফুলিয়া উঠিতেছে— ও তারাবাজির মতো উত্তরোত্তর আসমানের দিকেই উড়িতেছে, অনেক দূর আকাশে উঠিয়া হঠাৎ আলো নিবিয়া যায় ও ধপ

করিয়া মাটিতে পড়িয়া যায়। আমার মতে আকাশে এরূপ দুশো তারাবাজি উড়িলেও বিশেষ কোনো সুবিধা হয় না আর ঘরের কোণে মিটমিট করিয়া একটি মাটির প্রদীপ জ্বালিলেও অনেক কাজে দেখে।

আমি বেশ দেখিতেছি, আমার কথা অনেকে ভুল বুঝিবেন। আমি এমন বলি না যে, হৃদয়কে একটি ক্ষুদ্র পরিবারের মধ্যে অথবা একটি ক্ষুদ্র পল্লীর মধ্যে বদ্ধ করিয়া রাখাই ভালো। যদি সমস্ত ভারতবর্ষকে ভালোবাসিতে পারি, বিশ কোটি লোককে ভাই বলিতে পারি, তাহা অপেক্ষা আর কী ভালো হইতে পারে। কিন্তু তাহা হইল কই? যাহা আমাদের খাঁটি ছিল, তাহা যে গেল; তাহার স্থানে রহিল কী? বীজের গাছগুলা উপড়াইয়া ফেলিলাম, তাহার পরিবর্তে গোটাকতক গোড়া-কাটা বৃক্ষ পুঁতিয়া আগায় জল ঢালিতেছি। বিদেশী বন্দুকে ফাঁকা আওয়াজ করার চেয়ে যে আমাদের দিশি ধনুকে তীর ছোঁড়াও ভালো। কিন্তু আমাদের শব্দপ্রিয়তা এমন বাড়িয়া উঠিয়াছে যে, লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি নাই, শব্দের প্রতিই মনোযোগ।

কানটাই আমাদের এখন একমাত্র লক্ষ্য হইয়াছে। দেখো-না, বাংলা খবরের কাগজগুলি কেবল শব্দের প্রভাবেই পাঠকদের কান দখল করিয়া বসিয়া আছে। কী যে বলিতেছে তাহা বড়ো একটা ভাবিয়া দেখে না, কেবল গলা খাটো না হইলেই হইল। একটা কথা উঠিলে হয়, অমনি বাংলা খবরের কাগজে মহা চেঁচামেচি পড়িয়া যায়। কথাটা হয়তো বোঝাই হয় নাই, ভালো করিয়া শোনাই হয় নাই, হয়তো সে বিষয়ে কিছু জানাই নাই— কিন্তু আবশ্যক কী? বিষয়টা যত কম বোঝা যায়, বোধ করি, ততই হো হা করিয়া চেঁচাইবার সুবিধা হয়। জ্ঞানের অপেক্ষা বোধ করি অজ্ঞতার আওয়াজটা অধিক। ইহা তো সচরাচর দেখা যায়, আমাদের বাংলা সংবাদপত্র দেশের অবস্থা কিছুই জানে না, এমন-কি, দেশের নামগুলা উচ্চারণ পর্যন্ত করিতে পারে না, অথচ গবর্নমেন্টকে বিজ্ঞভাবে উপদেশ দেয়; আইন জানে না, উভয় পক্ষ দেখে না অথচ বিচারককে বিচার করিতে শিখায়; অনেক অনুসন্ধান করিয়া, বিস্তর বিবেচনা করিয়া যোগ্য ব্যক্তিদের দ্বারা যাহা অনেক দিনে স্থির হইয়াছে, তাহা অবহেলা করিয়া, অথচ নিজে কিছুমাত্র অনুসন্ধান না করিয়া যাহা মুখে আসে তাহাই বলিয়া বসে। গলা ভারী করিয়া কথা কয়, অথচ কথাগুলা ছেলেমানুষের মতো, বলিবার ভঙ্গি এবং বলিবার বিষয়ের মধ্যে এমন অসামঞ্জস্য যে, শুনিলে হাসি পায়। কথায় কথায় ইংরাজ গবর্নমেন্টের নিকট হইতে কৈফিয়ত তলব করা হয়। কেহ বা লিখিলেন, 'অমুক গাঁয়ের নিকট পদ্মায় সহসা এক ঝড় উঠিয়া তিনখানা নৌকা ডুবিয়া গিয়াছে, অমুক সালে আর-একবার এইরূপ সহসা ঝড় উঠিয়া অমুক স্থানে আর-দুইখানা নৌকা ডুবিয়া যায়, আশ্চর্য তথাপি আমাদের গবর্নমেন্টের চৈতন্য হইল না।' কেহ বা বলিলেন—'অমুক গাঁয়ে রাত্রি তিন ঘটিকার সময় এক ভয়ানক ভূমিকম্প উপস্থিত হয় ও জমিদারবাবুদের এক আস্তাবল পড়িয়া যায়, গবর্নমেন্টের পূর্ব হইতে সাবধান হওয়া উচিত ছিল।' কেহ বা লিখিলেন—'বাঙালিরা দুইবেলা ডাল ভাত খাইয়া অতিশয় দুর্বল হইয়া যাইতেছে, অথচ আমাদের শাসনকর্তারা এ বিষয়ে কিছুমাত্র মনোযোগ দিতেছেন না!' হয়তো ইহা হইতে প্রমাণ করিলেন যে, ইংরাজদের স্বার্থই এই যে, আমাদের ডাল ভাত খাওয়াইয়া রোগা করিয়া রাখা। এই বিষয় অবলম্বন করিয়া এক উদ্দীপনাপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিত হইল— বলা হইল যে, যে দেশে এককালে শাক্যসিংহ ও শঙ্করাচার্য জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সেই দেশের লোকেরা যে ডাল ভাত খাইয়া রোগা হইয়া যাইতেছেন ইহা কেবল বিদেশীয় শাসনের ফল! পাঠ করিয়া উক্ত জগৎবিখ্যাত কাগজের ১৩৭ জন অনারারি পাঠকের সর্ব শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। মাঝে একবার সহসা দেখা গেল, কোনো কোনো বাংলা কাগজ তারস্বরে ইংরাজি *Statesman* পত্রকে গাল দিতে আরম্ভ করিয়াছেন— রুচি-বিরুদ্ধ কঠোর ও অভদ্রভাবে উক্ত পত্রের বিরুদ্ধে বড়ো বড়ো প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। স্টেটস্‌ম্যানের অপরাধের মধ্যে তিনি বলিয়াছেন যে, স্বায়ত্ত-শাসনপ্রণালী যখন প্রবর্তিত হইল, তখন কোথায় তাহার পদ-স্খলন হইতে পারে তাহাই

দেখাইয়া দেওয়া যথার্থ কাজ। অমনি বাংলা খবরের কাগজের ঢাকে কাঠি পড়িল। এরূপ আচরণ অতিশয় হাস্যজনক। যে ব্যক্তি অপ্রিয় সত্য শুনিতে পারে না, সে ব্যক্তি মানুষের মধ্যেই নহে, সে ব্যক্তি বালক, দুর্বল, লঘুচিত্ত! তুমি কি চাও, আদুরে ছেলেটির মতো কেবল তোমার স্তুতিগান করিয়া তোমাকে বুকে তুলিয়া নাচাইয়া বেড়ানোই *Statesman* পত্রের কাজ? তোমার একটা দোষ দেখাইয়া দিলেই অমনি তুমি হাত-পা ছুঁড়িয়া চিৎকার করিয়া আকাশ ফাটাইয়া দিবে? যাহার হিতৈষিতার সহস্র প্রমাণ পাইয়াছ, সে যদিই বা হিত কামনা করিয়া একটা কঠোর কথা বলে অমনি তাহা বরদাস্ত করিতে পার না, এমনি তুমি নন্দদুলাল হইয়াছ?— পূর্বকৃত সমস্ত উপকার বিস্মৃত হইয়া তার কুটিল অর্থ বাহির করিতে থাক, এমনি তুমি অকৃতজ্ঞ? এইরূপ প্রত্যেক সামান্য ঘটনায় চিৎকার করিবার ভাব প্রতিনিয়ত বাংলা সংবাদপত্রে দেখা যাইতেছে। ইহাতে ফল এই হইতেছে, সাধারণের মধ্যে ছেলেমানুষের মতো এক প্রকার খুঁৎখুঁতে কাঁদুনে ভাবের প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতেছে। অনবরত আত্ম-প্রশংসা করিয়া নিজের দোষের জন্যে পরকে তিরস্কার করিয়া নিজের কর্তব্যভার পরের স্কন্ধে চাপাইয়া কেবল গলার আওয়াজেরই উন্নতি করিতেছি ও চক্ষু বুজিয়া মনে করিতেছি যে, আমাদের দুর্ভাগ্যের নিমিত্ত আমরা ব্যতীত আর বিশ্বসুদ্ধ সকলেই দায়ী।

গোটাকতক ইংরাজি শব্দ আসিয়া আমাদের অতিশয় অনিষ্ট করিতেছে। Independent Spirit নামক একটা শব্দ আমাদের সমাজে বিস্তর অপকার করিতেছে— বাঙালির ছেলেপিলে খবরের কাগজপত্র সকলে মিলিয়া এই Independent Spirit-এর চর্চায় ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। এই শব্দটার প্রভাবে প্রতিমুহূর্তে বাংলাদেশ হইতে সহজ ভদ্রভাব চলিয়া যাইতেছে ও এক প্রকার অভদ্র উদগ্র পরুষ ভাবের প্রাদুর্ভাব হইতেছে। খবরের কাগজের লেখাগুলার মধ্যে আগাগোড়া এক প্রকার অভদ্র ভঙ্গি দেখা যায়। ভালো মুখে মোলায়েম করিয়া কথা কহিলে যেন Spirit-এর অভাব দেখানো হয়— সেইজন্য সর্বদাই কেমন তেরিয়াভাবে কথা কহিবার ফেসিয়ান উঠিয়াছে— অনর্থক অনাবশ্যক গায়ে পড়িয়া অভদ্রতা করা খবরের কাগজে চলিত হইয়াছে। যেখানে উপদেশ দেওয়া উচিত সেখানে গালাগালি দেওয়া হয়— যেখানে কোনো প্রকার খুঁত ধরা রুচি-বিরুদ্ধ, সেখানে জোর করিয়া খুঁত ধরা হয়। এইরূপ সংবাদপত্রগুলি পাঠকদের পক্ষে যে কীরূপ কুশিক্ষার স্থল হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা ভাবিয়া দেখিলে অন্ধকার দেখিতে হয়! আজকালকার ছেলেদের সর্বাঙ্গ দিয়া এমনি Independent Spirit ফুটিয়া বাহির হইতেছে যে, তাহাদের ছুঁইতে ভয় করে। তাহারা সর্বদাই যেন মারিতে উদ্যত। চব্বিশ ঘণ্টা যেন তাহারা হাতের আস্তিন গুটাইয়া কোমর বাঁধিয়াই আছে। কিসে যে সহসা তাহাদের অপমান বোধ হয়, ভাবিয়া পাওয়া যায় না। এক-এক জন ইংরাজ যেমন দিশি-জুতা দেখিলে অপমান বোধ করে— তেমনি দিশি লৌকিক আচরণ ইহাদের পিঠে দিশি জুতার ন্যায় বাজিয়া থাকে। যদি দৈবাৎ কোনো অনভিজ্ঞ প্রাচীন ইহাদিগকে জিজ্ঞাসা করে, 'মহাশয়ের ঠাকুরের নাম কী?' অমনি ইহারা ফোঁস করিয়া উঠে। ইহাদের ভাব দেখিয়া মনে হয় যেন, জগৎ সংসার ইহাদিগকে অপমান করিবার জন্য অবিরত উদ্যোগী রহিয়াছে, তাই জন্যে ইহারা আগে হইতে পদে পদে জগৎকে অপমান করিবার জন্য ধাবমান হয়। শুঁয়াপোকার ন্যায় দিনরাত্রি কণ্টকিত হইয়া থাকাকেই ইহারা Independent Spirit কহে। গল্পে শুনা যায়, এমন এক-এক জন অতি-বুদ্ধিমান আছেন, যাঁহারা নাকে-কানে তুলা দিয়া মশারির মধ্যে বসিয়া থাকেন, পাছে তাঁহাদের বুদ্ধি কোনো সুযোগে বাহির হইয়া যায়; ইঁহারাও তেমনি সজারুর মতো সর্বদাই চারি দিকে কাঁটা উঁচাইয়া সমাজে সঞ্চরণ করিতে থাকেন, পাছে ইঁহাদের কেহ অপমান করে। এদিকে আবার ইঁহারা ভীরুর অগ্রগণ্য; দুর্বলের কাছে, ভৃত্যের কাছে, স্ত্রীর কাছে ইঁহারা Independent Spirit নামক বৃহৎ লাঙ্গুলটা এমনি আস্ফালন করিতে থাকেন যে, কাছাকাছির মধ্যে লোক তিষ্ঠিতে পারে না, আর, একটা শ্বেত মূর্তি দেখিলেই সে লাঙ্গুলটা গুটাইয়া কোথায় যে অদৃশ্য হইয়া যায় তাহার ঠিকানা

পাওয়া যায় না। যাহার যথার্থ বল আছে সে সর্বদাই ভদ্র— সে তাহার বলটাকে গণ্ডারের শিঙের মতো অহোরাত্র নাকের উপর খাড়া করিয়া রাখে না। আর যে দুর্বল, হয় সে লাঙুল গুটাইয়া কুঁকড়ি মারিয়া থাকে, নয় সে খেঁকি কুকুরের মতো ভদ্রলোক দেখিলেই দূর হইতে অবিরত ঘেউ ঘেউ করিতে থাকে। আমরাও কেবল দূর হইতে অভদ্রভাবে ঘেউ ঘেউ করিতেছি। শব্দে কান ফাটিয়া যাইতেছে।

প্রাণের সঙ্গে যখন কোনো কথা বলি, তখন যাহা বলি তাহারই একটা বল থাকে— যখন প্রাণে বাজে নাই অথচ মুখে বলিতে হইবে, তখন চেঁচাইয়া বলিতে হয়, বিস্তর বলিতে হয়। বঙ্গ সমাজে যে আজকাল বিশেষ চেঁচামেচি পড়িয়া গিয়াছে ইহাও তাহার একটি কারণ। বক্তা যখন বক্তৃতা দিতে উঠেন, তখন সে এক অতি কষ্টকর দৃশ্য উপস্থিত হয়। গ্রহণী রোগীর ন্যায় তাঁহার হাতে পায়ে আক্ষেপ ধরিতে থাকে, গলার শির ফুলিয়া ওঠে, চোখ দুটা বাহির হইয়া আসিতে চায়। যিনি বাংলা দেশের কিছুই জানেন না, তিনি কথায় কথায় বলেন, 'কুমারিকা হইতে হিমালয় ও সিন্ধুনদী হইতে ব্রহ্মপুত্র;' ফুঁ দিয়া দিয়া কথাগুলাকে যত বড়ো করা সম্ভব তাহা করা হয়; যেখানে বাংলা দেশ বলিলেই যথেষ্ট হয় সেখানে তিনি এশিয়া না বলিয়া থাকিতে পারেন না; যেখানে সামান্য জমা-খরচের কথা হইতেছে, সেখানে ভাস্করাচার্য ও লীলাবতীর উল্লেখ না করিলে তাহার মনঃপূত হয় না; একজন ফিরিঙ্গি বালকের সহিত দেশীয় বালককে ঝগড়া করিতে দেখিলে তাঁহার ভীষ্ম দ্রোণ ভীমার্জুনকে পর্যন্ত মনে পড়ে। যথার্থ প্রাণের সঙ্গে বলিলে কথাগুলা খাটো খাটো হয় ও কিছুই অতিরিক্ত হইতে পারে না।

আজকালকার সাহিত্য দেখো-না কেন, এইরূপ চিৎকারে প্রতিধ্বনিত। পরিপূর্ণতার মধ্য হইতে যে একটা গম্ভীর আওয়াজ বাহির হয়, সে আওয়াজ ইহাতে পাওয়া যায় না। যাহা-কিছু বলিতে হইবে তাহাই অধিক করিয়া বলা, যে-কোনো অনুভাব ব্যক্ত করিতে হইবে, তাহাকেই একেবারে নিংড়াইয়া তিক্ত করিয়া তোলা। যদি আহ্লাদ ব্যক্ত করিতে হইল, অমনি আরম্ভ হইল, বাজ বাঁশি, বাজ কাঁশি, বাজ ঢাক, বাজ ঢোল, বাজ ঢেঁকি, বাজ কুলো— ইহাকে তো আনন্দ বলে না, ইহা এক প্রকার প্রাণপণ মত্ততার ভান, এক প্রকার বিকার রোগ; যদি দুঃখ ব্যক্ত করিতে হইল, অমনি ছুরি ছোরা, দড়ি কলসী, বিষ আগুন, হাঁসফাঁস, ধড়ফড়, ছটফট— সে এক বিপর্যয় ব্যাপার উপস্থিত হয়। এখনকার কবিরা যেন হৃদয়ের অন্তঃপুরবাসী অনুভাবগুলিকে বিকৃতাকার করিয়া তুলিয়া হাটের মধ্যে দিগবাজি খেলাইতে ভালোবাসেন। কোনো কোনো কবিসমাজের নাসিকাকে উপেক্ষা করিয়া হৃদয়ের ক্ষতগ্রস্ত ভাবকে হয়তো কোনো কুলবধূর নামের সহিত মিশ্রিত করিয়া নিতান্ত বেআব্রু কবিতা লিখিয়া থাকেন। ইহাকেই চেঁচাইয়া কবিতা লেখা বলে। আমাদের প্রাচ্য-হৃদয়ে একটি আব্রুর ভাব আছে। আমরা কেবল দর্শকদের নেত্রসুখের জন্য হৃদয়কে উলঙ্গ করিয়া হাটে-ঘাটে প্রদর্শনের জন্য রাখিতে পারি না। আমরা যদি কৃত্রিম উপায়ে আমাদের প্রাচ্য ভাবকে গলা টিপিয়া না মারিয়া ফেলিতাম, তবে উপরোক্ত শ্রেণীর কবিতা পড়িয়া ঘৃণায় আমাদের গা শিহরিয়া উঠিত। সহজ সুস্থ অকপট হৃদয় হইতে এক প্রকার পরিষ্কার অনর্গল অনতিমাত্র ভাব ও ভাষা বাহির হয়, তাহাতে অতিরিক্ত ও বিকৃত কিছু থাকে না— টানা-হেঁচড়া করিতে গেলেই আমাদের ভাব ও ভাষা স্থিতিস্থাপক পদার্থের মতো অতিশয় দীর্ঘ হইতে থাকে ও বিকৃতাকার ধারণ করে।

যখন বাংলা দেশে নূতন ইংরাজি শিক্ষার আরম্ভ হইল, তখন নূতন শিক্ষিত যুবারা জোর করিয়া মদ খাইতেন, গোমাংস খাইতেন। চেঁচাইয়া সমাজ-বিরুদ্ধ কাজ করিতে বিশেষ আনন্দ বোধ করিতেন। এখনও সেই শ্রেণীর একদল লোক আছেন। তাঁহাদের অনেকে সমাজ-সংস্কারক বলিয়া গণ্য। কিন্তু ইহা জানা আবশ্যক যে, তাঁহারা যে হৃদয়ের বিশ্বাসের বেগে চিরন্তন প্রথার বিরুদ্ধে গমন করেন তাহা নহে, তাঁহারা অন্ধভাবে চেঁচাইয়া কাজ করেন। ভারতবর্ষীয় স্ত্রীলোকদের দুর্দশায় তাঁহাদের যে কষ্টবোধ হয় তাহা নহে, তাঁহারা যে হৃদয়ের মধ্যে অনুভব

করিয়া কোনো কাজ করেন তাহা নহে, তাঁহারা কেবল চেঁচাইয়া বলিতে চান আমরা স্ত্রী-স্বাধীনতার পক্ষপাতী। ইঁহাদের দ্বারা হানি এই হয় যে, ইঁহারা নিজ কার্যের সীমা-পরিসীমা কিছুই দেখিতে পান না— কোথা গিয়া পড়েন ঠিকানা থাকে না। কিন্তু যাঁহাদের হৃদয়ের মধ্যে একটি বিশ্বাস একটি সংস্কার ধ্রুবতারার মতো জ্বলিতে থাকে, তাঁহারা সেই ধ্রুবতারার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া চলিতে থাকেন; তাঁহারা জানেন কোন্‌খানে তাঁহাদের গম্যস্থান, কোন্ দিকে গেলে তাঁহারা কিনারা পাইবেন। কেবল দৈবাৎ কখনো স্রোতের বেগে ভাসিয়া বিপথে যান।

আমাদের সমাজে আজকাল যে এইরূপ অস্বাভাবিক চিৎকার-প্রথা প্রচলিত হইতেছে, তাহার কারণ আর কিছু নহে, আমরা হঠাৎ সভ্য হইয়াছি। আমরা বিদেশ হইতে কতকগুলা অচেনা ভাব পাইয়াছি, তাহাদের ভালো করিয়া আয়ত্ত করিতে পারি নাই, অথচ কর্তব্যবোধে তাহাদের অনুগমন করিতে গিয়া এক প্রকার বলপূর্বক চেঁচাইয়া কাজ করিতে হয়। আমরা নিজেই এখন ভালো করিয়া বুঝিতে পারিতেছি না, কোন্ কাজগুলা আমরা বিশ্বাসের প্রভাবে করিতেছি, আর কোন্‌গুলা কেবলমাত্র অন্ধভাবে করিতেছি। কোন্‌খানে আমরা নিজে দাঁড় টানিয়া যাইতেছি, আর কোন্‌খানে আমাদের ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে। বড়ো বড়ো বিদেশী কথার মুখোশ পরিয়া আমরা তো আপনাকে ও পরকে প্রবঞ্চনা করিতেছি না? আমাদের যেরূপ দেখাইতেছে আমরা সত্যই কি তাহাই হইয়াছি? যদি হইতাম তাহা হইলে কি এত চেঁচাইতে হইত? আর যদি না হইতেই পারিলাম, তবে কি মাংসখণ্ডের ছায়া দেখিয়া মুখের মাংসখণ্ডটি ফেলিয়া ভালো কাজ করিতেছি? শেষকালে কি অধ্রুবও যাইবে ধ্রুবও যাইবে?

ভারতী
ফাল্গুন ১২৮৯

জিহ্বা আস্ফালন

আমাদের সমাজে একদল পালোয়ান লোক আছেন, তাঁহারা লড়াই ছাড়া আর কোনো কথা মুখে আনেন না। তাঁহাদের অস্ত্রের মধ্যে একখানি ভোঁতা জিহ্বা ও একটি ইস্টিল পেন। তাঁহারা ম্লেচ্ছ অনার্যদের প্রতি অবিরত শব্দভেদী বাণ বর্ষণ করিতেছেন ও পরমানন্দে মনে করিতেছেন তাহারা যে-যাহার বাসায় গিয়া মরিতেছে। তাঁহাদের মুখগহ্বর হইতে ঘড়িঘড়ি এক-একটা বড়ো বড়ো হাওয়ার গোলা বাহির হইতেছে ও তাঁহাদের কল্পিত শত্রুপক্ষের আসমান-দুর্গের উপর এমনি বেগে গিয়া আঘাত করিতেছে ও তাহা হইতে এমনি মস্ত আওয়াজ বাহির হইতেছে যে, বীরত্বের গর্বে তাঁহাদের অল্প পরিসর একটুখানি বুক ফুলিয়া ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হইতেছে। সুতরাং এই-সকল মিলিটেরি ব্যক্তিদিগের নিজের গলার শব্দে নিজের কানে এমনি তালা ধরিয়াছে যে, এখন, কী সৌন্দর্যের মোহন বংশিধ্বনি, কী বিশ্বপ্রেমের উদার আহ্বানস্বর, কী বিকাশমান অনন্ত জীবনের আনন্দ উচ্ছ্বাস, কী পরদুঃখকাতরের করুণ সংগীত, কিছুই তাঁহাদের কানের মধ্যে প্রবেশ করিবার রাস্তা পায় না। যে-কেহ ভাঙা গলায় কামানের আওয়াজের নকল করিতে না চায়, যে-কেহ শিশুদিগের মতো জুজুর অভিনয় করিয়া চতুর্দিকস্থ বয়স্ক-লোকদিগকে নিতান্ত শঙ্কিত করিতেছে কল্পনা করিয়া আনন্দে হাত পা না ছোঁড়ে, তাহারা তাঁহাদিগের নিকট খাতিরেই আসে না। তাঁহারা চান, ভারতবর্ষের যে যেখানে আছে, সকলেই কেবল লড়াইয়ের গান গায়, লড়াইয়ের কবিতা লেখে, মুখের কথায়, যতগুলা রাজা ও যতগুলা উজীর মারা সম্ভব সবগুলাকে মারিয়া ফেলে। যেন বঙ্গসাহিত্যের প্রতি ছত্রে বারুদের গন্ধ থাকে, যাহাতে শুদ্ধমাত্র বঙ্গসাহিত্য পড়িয়া ভবিষ্যতের পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণ একবাক্যে স্বীকার করেন যে, বাঙালিজাতির মতো এত বড়ো পালোয়ান জাতি আজ পর্যন্ত জন্মগ্রহণ করে নাই। ইঁহারা সর্বদা সশঙ্কিত, পাছে বঙ্গসমাজ খারাপ

হইয়া যায়; ইঁহারা বঙ্গসমাজের কানে তুলা দিয়া রাখিতে চান পাছে সে গান শুনিয়া ফেলে ও তাহার প্রাণ কোমল হইয়া যায়, পাছে সে উপন্যাস পড়ে ও তাহার চিত্ত দুর্বল হইয়া পড়ে, পাছে সে নাট্যাভিনয় শোনে ও তাহার হৃদয় আর্দ্র হইয়া যায়। দিনরাত্রি কেবল বঙ্গসমাজকে ঘিরিয়া বসিয়া তাহার কানের কাছে তূরী ভেরী জগঝম্প বাজাও, যেখানে যে আছ ঢাকঢোল গলায় বাঁধো, ঢুলিতে দেখিলেই পরস্পর পরস্পরকে খোঁচা মারো এবং 'উঠ উঠ', 'জাগো জাগো' বলিয়া অস্থির করিয়া তোলো।

কিন্তু এই বীরপুরুষেরা বড়ো মনের আনন্দে আছেন। একখানা ছাতা ঘাড়ে করিয়া এই-সকল সরু সরু ব্যক্তিরা কেবলই চার দিকে ছটফট করিয়া বেড়াইতেছেন, বিশেষ একটা উদ্দেশ্য নাই, লক্ষ্য নাই, কেবল একটা গোলমাল চলিতেছে, মনে মনে অত্যন্ত স্ফূর্তি যে ভারি একটা কাজ করিতেছি। আর যত প্রকার কাজ আছে তাহা নিতান্ত অবহেলার চক্ষে দেখেন, যাহারা অন্যান্য কাজে মগ্ন রহিয়াছে তাহাদিগকে কৃপাপাত্র জ্ঞান করেন, ঈষৎ হাস্য করিয়া মনে করেন, আর সকলে কী ছেলেখেলাই করিতেছে! কাজ যা একমাত্র তিনিই করিতেছেন, কেননা তিনি যে কী করিতেছেন নিজেই তাহা পরিষ্কাররূপে জানেন না, কেবল এক প্রকার অস্পষ্ট ধারণা আছে যে, খুব একটা কী কাজ করিয়া বেড়াইতেছি। সত্য বটে, এক প্রকার ব্যস্ত কোমরবাঁধা মুষ্টিবদ্ধ উদগ্রভাব সর্বদাই দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু কেন যে এ ভাব তাহা তিনিও জানেন না, আমিও জানি না। কী যেন একটা ঘোরতর কারখানা বাধিয়াছে, কী যেন একটা সর্বনাশের উদ্যোগ হইতেছে, কেবল তিনি জাগ্রত সতর্ক আছেন বলিয়াই কোনো দুর্ঘটনা ঘটিতেছে না। শ্রাবণের রাত্রে বজ্রবিদ্যুৎ বর্ষণের সময় ব্যাঙের দল নিতান্ত ব্যস্তভাবে সমস্ত রাত্রি জাগিয়া জগতের কানের কাছে অনবরত মক্‌মক্‌ করিতে থাকে, তাহারাও বোধ করি মনে করে, ভাগ্যে তাহারা ছিল ও প্রাণপণে সমস্ত রাত্রি চিৎকার করিয়াছে, জগতে তাই আজ প্রলয় হইতে পারিল না। আমাদের বীরপুরুষেরাও মনে করেন, আজি এই দুর্যোগের রাত্রে ভারতবর্ষের ভার বিশেষরূপে তাঁহাদেরই হস্তে সমর্পিত হইয়াছে, এইজন্য উদ্দেশ্যহীনের ন্যায় অবিশ্রান্ত হো হো করিয়া হটপাট করিয়া বেড়াইতেছেন ও মনে করিতেছেন জগতের অত্যন্ত উপকার হইতেছে। কাজেই ইহাদের বুক ক্রমেই ফুলিতে থাকে ও প্রাণ ক্রমেই সংকীর্ণ হইতে থাকে, বঙ্গসমাজ বা বঙ্গসাহিত্যের সর্বাঙ্গীণ বিকাশকে অত্যন্ত ভয় করেন। ইঁহারা চান বঙ্গসাহিত্য কেবলমাত্র দাঁত ও নখের চর্চা করিতে থাকুক আর কিছু নয়। ক্ষমতাভেদেও ও অবস্থাভেদে যে প্রত্যেকে স্ব স্ব উপযোগী কার্যে প্রবৃত্ত হইবে ও এইরূপে সমাজের অন্তর্নিহিত বিচিত্র শক্তি চারি দিক হইতে বিকশিত হইয়া উঠিবে তাহা তাঁহাদের অভিপ্রেত নহে। আজ কয়েক বৎসর ধরিয়া এই শ্রেণীর কতকগুলি সংকীর্ণদৃষ্টি সমালোচক কবিদিগকে কবিত্ব শিখাইয়া আসিতেছেন ও অবিরত বীররস ফরমাস করিতেছেন এবং অবশিষ্ট আটটি রসের মধ্যে কোনো একটি রসের ছিটাফোঁটা দেখিবামাত্র ননীর পুতুলি বঙ্গসমাজের স্বাস্থ্যভঙ্গের ভয়ে শশব্যস্ত হইয়া উঠিতেছেন! তাহার কতকটা ফল ফলিয়াছে, বীররসটা ফ্যাশান হইয়া পড়িয়াছে। গদ্য লেখক ও পদ্য লেখকগণ পালোয়ান সমালোচকদিগের চিৎকার বন্ধ করিয়া দিবার জন্য তাহাদের মুখে বীররসের টুকরা ফেলিয়া দিতেছেন। সকলেই বলিতেছে, উঠ, জাগো; বাংলায় ইংরাজিতে গদ্যে, পদ্যে, মিত্রাক্ষরে, অমিত্রাক্ষরে, হাটে ঘাটে, নাট্যশালায়, সভায়, ছেলে মেয়ে বুড়ো সকলেই বলিতেছে, উঠ, জাগো। সকলেই যে অকপট হৃদয়ে বলিতেছে বা কেহই যে বুঝিয়া বলিতেছে তাহা নহে। সকলেই বলিতেছে, 'আজ উনবিংশ শতাব্দী', উনবিংশ শতাব্দীটা যেন বঙ্গসমাজের বাবা স্বয়ং রোজগার করিয়া আনিয়াছে! 'উনবিংশ শতাব্দী' নামক একটা অনুবাদিত শব্দ বাঙালির মুখে শুনিলে অত্যন্ত হাসি পায়। যে বাঙালি দুই দিন বিলাতে থাকিয়া বিলাতকে home বলেন তিনিও ইহা অপেক্ষা হাস্যজনক কথা বলেন না! উনবিংশ শতাব্দী আমাদের কে? আঠারোটি শতাব্দী যাহাদিগকে ক্রমান্বয়ে মানুষ করিয়া আসিয়াছে, নিজের বিদ্যালয়ে পাঠাভ্যাস করাইয়াছে, তাহারাই উনবিংশ শতাব্দী লইয়া গর্ব

করিতেছে। আর আমরা আজ দুদিন ইংরাজের সহিত আলাপ করিয়া এমনিভাবে কথাবার্তা আরম্ভ করিয়াছি যেন উনবিংশ শতাব্দীটা আমাদেরই। যেন উনবিংশ শতাব্দীটা অত্যন্ত সস্তা দামে বাংলা দেশে নিলাম হইয়া গিয়াছে, আর বঙ্গীয় বীরপুরুষ নামক জয়েন্ট স্টক্ কোম্পানি তাহা সমস্তটা কিনিয়া লইয়াছেন। ভাববিশেষ যখন সমাজে ফ্যাশান হইয়া যায় তখন এইরূপই ঘটে। তখন তাহার আনুষঙ্গিক কতকগুলা কথা মুখে মুখে চলিত হইয়া যায়, সে কথাগুলার যেন একটা অর্থ আছে এইরূপ ভ্রম হয়, কিন্তু জিজ্ঞাসা করিলে কেহ তাহার অর্থ ভালো করিয়া বুঝাইয়া দিতে পারেন না। কৃত্রিমতা মাত্রেই মন্দ, তথাপি মতের কৃত্রিমতা সহ্য করা যায়, কিন্তু হৃদয়ের অনুভাবের কৃত্রিমতা একেবারে অসহ্য। আজকাল যেখানে যাহার তাহার মুখে 'ভারত মাতা' সম্বন্ধীয় গোটাকতক হৃদয়সম্পর্কশূন্য বাঁধি বোল শুনিতে পাওয়া যায়; তাহারা এমনিভাবে কথাগুলো ব্যবহার করে যেন সব কথার মানে তাহারা জানে, যেন তাহা তাহাদের প্রাণের ভাষা! কিন্তু ইহাতে তাহাদের দোষ নাই, যে-সকল সমালোচক দিবারাত্রি চেষ্টা করিয়া এত বড়ো একটি মহৎ ভাবকে ফ্যাশানের ঘৃণিত হীনত্বে পরিণত করিয়াছেন, হৃদয়জাত ভাবকে সস্তা করিবার জন্য কলে ফেলিয়া গড়িতে পরামর্শ দিয়াছেন, অবশেষে তাহা আবালবৃদ্ধবনিতার হাতে হাতে দোকানের কেনাবেচা দ্রব্যের মতো, রাংতা-মাখানো শব্দ-উৎপাদক চকচকে ভেঁপুর মতো করিয়া তুলিয়াছেন তাঁহারাই ইহার জন্য দায়ী। যে ভাব ও যে কথার অর্থ ভুলিয়া যাই, যাহারা আর হৃদয় হইতে উঠে না, কেবল মুখে মুখে বিরাজ করে, তাহারা মরিয়া যায় ও জীবন অভাবে ক্রমশই পচিয়া উঠিতে থাকে। দেশহিতৈষিতার বুলিগুলিরও সেই দশা ধরিবে। তুমি জিজ্ঞাসা করিতেছ, 'বঙ্গসাহিত্যে ও ছাইভস্মগুলা কেন?' আমি বলিতেছি, 'কী করা যায়! একদল মহা বীর আছেন, তাঁহারা বঙ্গসাহিত্যে অগ্নিকাণ্ড করিতে চান। সময় অসময় আবশ্যক অনাবশ্যক কিছু না মানিয়া দিনরাত্রি আগুন জ্বালাইয়া রাখিতে চান, কাজেই বিস্তর ছাই ভস্ম জমিয়াছে।'

এইখানে একটা গল্প বলি। একটা পাড়ায় পাঁচ-সাতজন মাতাল বাস করিত। তাহারা একত্রে মদ্যপান করিয়া অত্যন্ত গোলমাল করিত। পাড়ার লোকেরা একদিন তাহাদিগকে ধরিয়া অত্যন্ত প্রহার দিল। সেই প্রহারের স্মৃতিতে পাঁচ-সাত দিন তাহাদের মদ খাওয়া স্থগিত রহিল, অবশেষে আর থাকিতে না পারিয়া তাহারা প্রতিজ্ঞা করিল আজ মদ খাইয়া আর কোনো প্রকার গোল করিব না। উত্তমরূপে দরজা বন্ধ করিয়া তাহারা নিঃশব্দে মদ্যপান আরম্ভ করিল। সকলেরই যখন মাথায় কিছু কিছু মদ চড়িয়াছে, তখন সহসা একজনের সাবধানের কথা মনে পড়িল ও সে গম্ভীর স্বরে কহিল, 'চুপ্!' অমনি আর-একজন উচ্চতর স্বরে কহিল, 'চুপ্!' তাহা শুনিয়া আবার আর-একজন আরও উচ্চস্বরে কহিল, 'চুপ্', এমনি করিয়া সকলে মিলিয়া চিৎকারস্বরে 'চুপ্ চুপ্' করিতে আরম্ভ করিল— সকলেই সকলকে বলিতে লাগিল 'চুপ্'। অবশেষে ঘরের দুয়ার খুলিয়া সকলে বাহির হইয়া আসিল, পাঁচ-সাতজন মাতাল মিলিয়া রাস্তায় 'চুপ্ চুপ্' চিৎকার করিতে করিতে চলিল, 'চুপ্ চুপ্' শব্দে পাড়া প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। আমাদের উঠ জাগো শব্দটিও কি ঠিক এইরূপ হয় নাই? সকলেই সকলকে বলিতেছে, উঠ, সকলেই সকলকে বলিতেছে, জাগো, কে যে উঠে নাই ও কে যে ঘুমাইতেছে সে বিষয়ে আজ পর্যন্ত ভালোরূপ মীমাংসাই হইল না।

ইহাতে একটা হানি এই দেখিতেছি, সকলেই মনে করিতেছে, কাজ করিলাম। গোলমাল করিতেছি, হাততালি দিতেছি, চেঁচাইতেছি, কী যেন একটা হইতেছে। দেশের জন্য প্রাণপণ করিতেছি মনে করিলে নিজের মহত্ত্বে নিজের শরীর লোমাঞ্চিত হইয়া উঠে, অতি নিষ্কণ্টকে সেই অতুল আনন্দ উপভোগ করিতেছি। মাথা-মুণ্ডহীন একটা গোলেমালেই সমস্ত চুকিয়া যাইতেছে, আর কাজ করিবার আবশ্যক হইতেছে না।

একদল লোক আছেন, তাঁহারা কেবল উত্তেজিত ও উদ্দীপ্তই করিতেছেন, তাঁহাদের বক্তৃতায় বা লেখায় কোনো উদ্দেশ্য দেখিতে পাওয়া যায় না। তাঁহারা কেবল বলিতেছেন, 'এখনও চৈতন্য

হইতেছে না, এখনও ঘুমাইতেছ? এই বেলা আলস্য পরিহার করো, গাত্রোত্থান করো। আমাদের পূর্বপুরুষদের একবার স্মরণ করো— ভীষ্ম দ্রোণ গৌতম বশিষ্ঠ ইত্যাদি।’ কী করিতে হইবে বলেন না, কোন্ পথে যাইতে হইবে বলেন না, পথের পরিণাম কোথায় বলেন না, কেবল উত্তেজিতই করিতেছেন। বন্দুকের বারুদে আগুন দিতেছেন, অথচ কোনো লক্ষ্যই নাই, ইহাতে ভালো ফল যে কী হইতে পারে জানি না, বরঞ্চ আপনা-আপনির মধ্যেই দু-চারজন জখম হওয়া সম্ভব। কোনো একটা কাজে প্রবৃত্ত হইতে পারিতেছি না কেবল তপ্তরক্তের প্রভাবে ইতস্তত ধড়ফড় করিতেছি। কতকগুলা অসম্ভব কল্পনা গড়িয়া তুলিয়া তাহাকে প্রাণ দিবার চেষ্টা করিতেছি, স্বদেশের বুকে যে শেল বিঁধিয়াছে, মনে করিতেছি বুঝি তাহা বলপূর্বক দুই হাতে করিয়া উপড়াইয়া ফেলিলেই দেশের পক্ষে ভালো, কিন্তু জানি না যে তাহা হইলে রক্তস্রোত প্রবাহিত হইয়া সাংঘাতিক পরিণাম উপস্থিত করিবে। বীরত্ব ফলাইবার জন্য সকলেই অস্থির হইয়া উঠিতেছেন, অথচ সামর্থ্য নাই, কাজেই দৈবাৎ যদি সুবিধামতে পথে অসহায় ফিরিঙ্গি-বালক দেখিতে পান অমনি তিন-চার জনে মিলিয়া তাহাকে ছাতিপেটা করিয়া আপনাদিগকে মস্ত বীরপুরুষ মনে করেন, মনে করেন একটা কর্তব্য কাজ সমাধা হইল। যথার্থ কর্তব্য কাজ চুলায় যায়, আর কতকগুলা সহজসাধ্য মিথ্যা-কর্তব্য তাড়াতাড়ি সাধন করিয়া তপ্তরক্ত শীতল করিতে হয়, নহিলে মানুষ বাঁচিবে কী করিয়া? তাই বলিতেছি, কতকগুলা অর্থহীন অনির্দিষ্ট অস্পষ্ট উদ্দীপনাবাক্য বলিয়া মিথ্যা উত্তেজিত করিবার চেষ্টা পাইয়ো না। কারণ, এইরূপ করিলে দুর্বলেরা অভদ্র হইয়া উঠে, অভদ্রতাকে বীরত্ব মনে করে, স্ত্রীর কাছে গর্ব করে ও কার্যকালে কী করিবে ভাবিয়া পায় না। গুরুজনকে মানে না, পূজ্যলোককে অপমান করে ও একপ্রকার খেঁকিবৃত্তি অবলম্বন করে। সম্প্রতি নরিস্ সাহেব ও জুরিস্‌ডিক্‌শন বিল প্রভৃতি লইয়া কোনো কোনো বাংলা কাগজ যেরূপ ব্যবহার করিয়াছে তাহা দেখিলেই আমাদের কথা সপ্রমাণ হইবে। তিরস্কার করিবার সময়, এমন-কি, গালাগালি দিবার সময়েও ভদ্রলোক ভদ্রলোকই থাকে, কিন্তু বানরের মতো মুখ-ভেংচাইয়া দাঁত বাহির করিয়া রুচিহীন অভদ্রের মতো অতিবড়ো শত্রুকেও অপমান করিতে চেষ্টা করিলে নিজেকেই অপমান করা হয়, তাহাতে বিপক্ষপক্ষের যত না মানহানি হয় ততোধিক আত্মগৌরবের লাঘব করা হয়। এরূপ ব্যবহারকে যাঁহারা নির্ভীকতা ও বীরত্ব মনে করেন তাঁহারা ভীরু, হীন, কারণ প্রকৃত বীরত্ব আত্মসম্মান রক্ষা করিয়া চলে।

পুনশ্চ বলিতেছি, যাঁহারা বক্তৃতা দেন ও উদ্দীপক গদ্য পদ্য লেখেন তাঁহারা যেন একটা উদ্দেশ্য দেখাইয়া দেন, একটা কর্তব্য নির্দেশ করিয়া দেন। আমাদের সমাজের পদে পদে এতশত প্রকার কর্তব্য রহিয়াছে যে, কতকগুলা অস্পষ্ট বাঁধি বোল বলিয়া সময় ও উদ্যম নষ্ট করা উচিত হয় না। দীপ্তরক্ত যুবকেরা যাহাতে কতকগুলা কুহেলিকাময় পর্বতাকার উদ্দেশ্য লইয়াই নাচিয়া না বেড়ান, ছোটো ছোটো কাজের মধ্যে যে-সকল মহৎ বীরত্বের কারণ প্রচ্ছন্ন আছে সেগুলিকে যেন হেয় জ্ঞান না করেন। গড়ের মাঠে, বা কেল্লার মধ্যেই কেবল বীরত্বের রঙ্গভূমি নাই, হয়তো গৃহের মধ্যে, অন্তঃপুরের ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যে তাহা অপেক্ষা বিস্তৃত রণস্থল রহিয়াছে! এত সামাজিক শত্রু চারি দিকে রহিয়াছে তাহাদিগকে কে নাশ করিবে! দুর্ভাগ্যক্রমে ইহাতে agitation করিতে হয় না, ইহাতে ঢাকঢোল বাজে না, হট্টগোল হয় না। Agitation করা অনেকের একটা নেশার মতো হইয়াছে, মদ্যপানের মতো ইহাতে আমোদ পান— সকলেই উদ্দেশ্য বুঝিয়া কর্তব্য বুঝিয়া agitate করেন না।

সুযোগ্য বক্তা শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সেদিন বঙ্গবাসীদিগকে moderation, অর্থাৎ মিতব্যবহার অবলম্বন করিতে অনুরোধ করিয়াছেন শুনিয়া অত্যন্ত সুখী হইলাম। অধিকাংশ বঙ্গযুবক মনে করেন পেট্রিয়ট হইতে হইলে হঠাৎ অত্যন্ত উন্মাদ হইয়া উঠিতে হইবে, হাত-পা ছুঁড়িতে হইবে, ছুটোপাটি করিতে হইবে, যাহাকে যাহা না বলিবার তাহা বলিতে হইবে। তাঁহারা মনে করেন, সফরীপুচ্ছের ন্যায় অবিরত ফর্‌ফরায়মান তাঁহাদের অতি লঘু, অতি ছিব্‌লা

ওই জিহ্বাটার জুরিস্‌ডিক্‌শন সর্বত্রই আছে। একটি স্থির উদ্দেশ্য অবলম্বন করিয়া, আত্মসংযমন করিয়া, না ফুলিয়া ফাঁপিয়া ফেনাইয়া, বালকের মতো কতকগুলা নিতান্ত অসার কথা না বলিয়া অপ্রতিহত বেগে বহিয়া যাও, গম্যস্থানে গিয়া পৌঁছিবে, যে-সকল পাষাণ স্তূপ পথে পড়িয়া আছে, অবিশ্রাম স্থির প্রবাহ-বেগে তাহারা ক্রমেই ভাঙিয়া যাইবে। যতদিন পর্যন্ত না আমরা আত্মসংযম করিতে শিখিব, যতদিন পর্যন্ত অপরিণত বুদ্ধির ন্যায় আমাদের ভাবে ভাষায় ব্যবহারে একপ্রকার ছেলেমানুষী আতিশয্য প্রকাশ করিব, ততদিন পর্যন্ত বুঝিতে হইবে যে, আমরা স্বায়ত্তশাসনের উপযুক্ত হইতে পারি নাই। যখন আমরা নিজের স্বত্ব বুঝিব ও ধীর গম্ভীর দৃঢ়স্বরে যুক্তিসহকারে সেই স্বত্ব দাওয়া করিতে পারিব, তখন আমাদের কথা শুনিতেই হইবে। আর, নিতান্ত বালকের মতো না বুঝিয়া না শুনিয়া কেবল অনবরত আবদার করিলে, ঘ্যানঘ্যান করিলে, চিৎকার করিলে, কে আমাদের কথায় কর্ণপাত করিবে? তাই বলিতেছি, আগে দেশের অবস্থা সম্বন্ধে উদাহরণ সংগ্রহ করো, ভাবিতে আরম্ভ করো ও বলিতে শেখো, তাহা হইলে আর সকলে শুনিতে আরম্ভ করিবে। বেশি করিয়া বলিলে কিছুই হয় না, ভালো করিয়া বলিলে কী না হয়। আতিশয্যের দিকে যাইয়ো না, কারণ যেখানেই যুক্তিহীন আতিশয্যপ্রিয় প্রজা, সেইখানেই স্বেচ্ছাচারী প্রভুতন্ত্র শাসন প্রণালী।

ভারতী
শ্রাবণ ১২৯০

জিজ্ঞাসা ও উত্তর

আমাদের কাছে এক প্রশ্ন আসিয়াছে, জাতীয়তার লক্ষণ কী? কী কী গুণ থাকিলে কতকগুলি লোক একজাতীয় বলিয়া গণ্য হয়। এক দেশে যাহারা থাকে তাহারাই কি এক জাতীয়? কিন্তু তাহা হইলে যে আর-একটা কথা ওঠে। এক দেশ কাহাকে বলে? যে পরিমিত ভূমির অধিকাংশ অধিবাসী এক জাতীয় তাহাই তো এক দেশ। অতএব, গোড়ায় জাতি নির্দেশ না হইলে দেশ নির্দেশ হইবে কী করিয়া? তাহা ছাড়া পূর্বোক্ত সংজ্ঞা অনুসারে মুসলমানেরাও আমাদের সহিত এক জাতীয় হইয়া পড়ে। তবে কি ধর্মের ঐক্যে জাতির ঐক্য স্থির হয়? তাহাই বা কী করিয়া বলিব? কারণ তাহা হইলে খৃস্টান হইলেই আমি ইংরাজ হইয়া যাই। তাহা হইলে ফরাসি ও জর্মানেরাও ধর্মের ঐক্যে ইংরাজদের সহিত একজাতি বলিয়া গণ্য হয়। যদি বল যাহারা এক রাজতন্ত্রের অন্তর্ভূত তাহারা এক জাতি, তবে তাহার বিরুদ্ধেও বক্তব্য আছে; কারণ তাহা হইলে ব্রিটিশ ব্রহ্মদেশীয়েরাও আমাদের সহিত এক জাতি। কেহ কেহ বলিবেন যাহাদের পরস্পরের মধ্যে সামাজিক আচার-ব্যবহারের ঐক্য আছে, তাহারা এক জাতীয় বলিয়া গণ্য হয়। কিন্তু সে কথা ঠিক নহে, কারণ আমাদের দেশীয় মহারাষ্ট্রী, বাঙালি, পঞ্জাবি প্রভৃতিদের সামাজিক আচার-ব্যবহারের বিস্তর অনৈক্য আছে; তাহা ছাড়া অনেক বিভিন্ন য়ুরোপীয় জাতির আচার-ব্যবহারের অনেক ঐক্য আছে। কেহ কেহ বলিবেন, যাহাদের পূর্বপুরুষগণ এক সূত্রে বদ্ধ ছিল, ও সেই অবধি পুরুষানুক্রমে একত্রে বাস করিয়া আসিতেছে তাহাদের এক জাতি বলা যায়। কিন্তু এ নিয়ম তো সর্বত্র খাটে না। একজন হিন্দু কয়েক বৎসর ইংলন্ডে বাস করিয়া অনুষ্ঠানবিশেষ আচরণ করিলে ইংরাজ হইয়া যাইতে পারেন। কিন্তু হিন্দুর পূর্বপুরুষ ইংরাজের পূর্বপুরুষের সহিত ঐতিহাসিক কালের মধ্যে কখনো একসূত্রে বদ্ধ ছিলেন না। অতএব স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, ইংরাজেরা Nation বলিতে যাহা বুঝেন, আমরা জাতি বলিতে তাহা বুঝি না। জাতি শব্দ Nation অপেক্ষা অনেক বিস্তৃত এবং Nation অপেক্ষা অনেক সংকীর্ণ অর্থে প্রয়োগ হয়। আমরা মনুষ্য সাধারণকে মনুষ্যজাতি বলি, হিন্দু ধর্মাবলম্বীদিগকে হিন্দুজাতি বলি, আবার তাহারও

উপবিভাগকে জাতি বলি, যথা, বাঙালি জাতি, আবার সামাজিক সংকীর্ণ শ্রেণী-বিভাগকেও জাতি শব্দে অভিহিত করিয়া থাকি, যথা ব্রাহ্মণ জাতি, কায়স্থ জাতি ইত্যাদি। জাতি শব্দের ধাতুগত অর্থ দেখিতে গেলে দেখা যায়, জন্মের সাদৃশ্য বুঝাইতেই জাতি শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। কিন্তু স্পষ্টই দেখা যাইতেছে ক্রমশ ইহার অর্থান্তর ঘটিয়াছে।

প্রশ্নকর্তা হয়তো জিজ্ঞাসা করিবেন, আমরা হিন্দুজাতি বলিলে যাহা বুঝি, সে জাতিত্ব কিসে স্থির হয়? তাহার উত্তর, ধর্মে। কতকগুলি ধর্ম হিন্দুধর্ম বলিয়া স্থির হইয়া গিয়াছে। হিন্দুধর্ম নামক এক মূল ধর্মের নানা শাখা-প্রশাখা চারি দিকে বিস্তারিত হইয়াছে, (তাহা হইতে আরও অনেক শাখা-প্রশাখা এখনও বাহির হইতে পারে) এই-সকল ধর্ম উপধর্ম যাহারা আশ্রয় করিয়া থাকে তাহারা হিন্দু। কিন্তু যখনি কোনো হিন্দু এই-সকল শাখা-প্রশাখা পরিত্যাগ করিয়া একেবারে সর্বতোভাবে ভিন্ন ধর্মবৃক্ষ আশ্রয় করেন তখনি তিনি আর হিন্দু থাকেন না। মুসলমান জাতিদিগেরও এইরূপ। ইংরাজ ফরাসি প্রভৃতি য়ুরোপীয়দিগের এরূপ নহে। রাজ্যতন্ত্রের ঐক্যেই তাহাদের জাতিত্ব নির্ধারিত হয়। একজন ইংরাজ ও একজন মার্কিনবাসীর হয়তো আর কোনো প্রভেদ নাই, উভয়ের এক পূর্বপুরুষ, এক ভাষা, এক ধর্ম, এক আচার-ব্যবহার পরিচ্ছদ, তথাপি উভয়ে এক Nation-ভুক্ত নহেন, কারণ উভয়ের রাজ্য-তন্ত্রগত প্রভেদ আছে।

অতএব দেখা গেল, হিন্দু জাতির ধর্মই মুখ্য লক্ষণ, আহার ব্যবহার পরিচ্ছদ ভাষা প্রভৃতি গৌণ। ইংরাজ জাতির রাজ্যতন্ত্রই মুখ্য লক্ষণ, ধর্ম প্রভৃতি অবশিষ্ট আর-সকল গৌণ।

এইখানে একটি কথা উত্থাপন করা যাইতে পারে। 'জাতীয়' নামক একটি শব্দ আমাদের ভাষায় নূতন সৃষ্ট হইয়াছে। 'দেশীয়' শব্দটি কানে যেমন দেশী বোধ হয়, 'জাতীয়' শব্দটি সেরূপ হয় না। অনবরত ব্যবহার করিয়া এ শব্দটি যাঁহাদের অভ্যাস হইয়া গিয়াছে, তাঁহাদের কথা বলিতে পারি না, কিন্তু 'জাতীয় পত্রিকা' বা 'জাতীয় নাট্যশালা' বলিতে কানে কেমন খারাপ শুনায়, কেবল তাহাই নয়, একজন সরল দিশি লোক ও শব্দটির অর্থ ঠিক বুঝিতেই পারিবে না; কারণ জাতি শব্দে আমাদের ভাষায় বৃহৎ হইতে ক্ষুদ্র এত অর্থ বুঝায়, যে বিশেষণ যোগ করিয়া না দিলে উহার ঠিক অর্থ নির্দিষ্ট হয় না। হিন্দুজাতীয় পত্রিকা বা হিন্দুজাতীয় নাট্যশালা বলিলে শুনিবামাত্রই অর্থবোধ হয়। তাহাতে এই বুঝায়, ধর্ম ও অন্যান্য ঐক্য থাকাতে যে জাতি হিন্দু নামে উক্ত হইয়াছেন, এই পত্রিকা ও এই নাট্যশালা তাঁহাদেরই কর্তৃক ও তাঁহাদেরই সম্বন্ধীয়। জাতীয় পত্রিকা ও জাতীয় নাট্যশালার পরিবর্তে দেশীয় পত্রিকা ও দেশীয় নাট্যশালা শব্দ ব্যবহার করো, তাহা হইলেই দেখিতে পাইবে কোন্ শব্দটা সাধারণ লোকে শুনিবামাত্রই বুঝিতে পারে।

National fund নামক শব্দ 'জাতীয় তহবিল' 'জাতীয় ধনভাণ্ডার' ইত্যাদি নানারূপে অনুবাদিত হইতেছে। কিন্তু ইহাতে কি অর্থের ব্যাঘাত হইতেছে না? যখন মুসলমানদিগের নিকট হইতেও উক্ত ভাণ্ডারের জন্য টাকা লওয়া হইতেছে, তখন উক্ত ভাণ্ডারকে জাতীয় কীরূপে বলা যায়? ইচ্ছা করিলে কে কী না বলিতে পারে কিন্তু ইহা আমাদের ভাষার বিরোধী। তাহার চেয়ে 'দেশীয় তহবিল' বা 'দেশীয় ধনভাণ্ডার' বলা হউক-না কেন? একেবারে অবিকল ইংরাজির তর্জমা করিবার আবশ্যক কী? ইংরাজি Nation শব্দের স্থলে আমাদের দেশ শব্দ ঠিক খাটে না বটে, কিন্তু ইংরাজেরা যেখানেই National শব্দ ব্যবহার করেন, সেইখানেই সহজ বাংলায় 'দেশীয়' শব্দ প্রয়োগ হয়। National Institution-কে 'দেশীয় অনুষ্ঠান' বলিলেই তবে ঠিক National হয়, নতুবা উহা প্রায় ইংরাজিই থাকিয়া যায়।

এইখানে একটি প্রশ্ন উঠে। প্রাচীন হিন্দুগণ নিজের নামকরণ করেন নাই। তাঁহারা অন্যান্য জাতির নাম দিয়াছিলেন, যথা শক, যবন, কিরাত রোমক ইত্যাদি, কিন্তু নিজের নাম নিজে দিবার আবশ্যক বিবেচনা করেন নাই। কেবল সাধারণত আর সকলের সহিত প্রভেদ জানাইবার সময় আপনাদিগকে আর্য ও আর সকলকে অনার্য বলিতেন। কিন্তু আর্য শব্দ একটি বিশেষণ শব্দ মাত্র, উহা জাতির বিশেষ নামবাচক শব্দ নহে। অতএব, Nation অর্থে জাতি শব্দের ব্যবহার সংস্কৃত

সাহিত্যে কখন হইতে আরম্ভ হইয়াছে? যবন রোমক প্রভৃতিকে শুদ্ধমাত্র যবন রোমক বলা হইত, না যবন জাতি, রোমক জাতি বলা হইত? সংক্ষেপে, Nation অর্থে জাতি শব্দের ব্যবহার প্রাচীন সংস্কৃতে আছে কি না? যদি না থাকে তো কখন হইতে আরম্ভ হইয়াছে কেহ বলিতে পারেন কি না? আর জাতি শব্দ ঠিক কী কী অর্থে সংস্কৃতে ব্যবহার হইত, তাহার প্রয়োগ সমেত কেহ অনুগ্রহ-পূর্বক দেখাইয়া দিবেন কি? ব্রাহ্মণ শূদ্র প্রভৃতি সামাজিক শ্রেণীবিভাগকে প্রাচীন ভাষায় ‘বর্ণ’ বলা হইত, কোথাও কি জাতি বলা হইয়াছে? মাগধ, কৈকেয়, প্রভৃতি ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশবাসীকে কি প্রাচীন সংস্কৃতে বিভিন্ন জাতি বলা হইয়াছে? এক কথায় জাতি শব্দে প্রাচীন সংস্কৃতে ঠিক কী কী অর্থ বুঝাইত, এবং কী কী বুঝাইত না, সে বিষয়ে আমরা শিক্ষা লাভ করিতে চাহি।

ভারতী
ভাদ্র ১২৯০

সমাজ সংস্কার ও কুসংস্কার[1]

উভয় পক্ষের কথা তো শুনা গেল। এখন বিচার করিয়া স্থির করিবার সময় আসিয়াছে। হাজার প্রয়োজনীয় বিষয় হউক তবু এক কথা বার বার শুনিতে ভালো লাগে না, তাহার পরে আবার, শ্রীমতীতে শ্রীমতীতে বোঝাপড়া চলিতেছিল মাঝে হইতে কোথাকার এক শ্রীযুক্ত আসিয়া যোগ দিলে পাঠকরা বিরক্ত হইতে পারেন। কিন্তু দুই পক্ষে তর্ক-বিতর্ক আরম্ভ হইলে শীঘ্র মিটিবে না ও পাঠকদের বিরক্তিজনক হইবে বিবেচনা করিয়া আমি শ্রী তৃতীয় পক্ষ আসিয়া যথাসাধ্য সংক্ষেপে সারিবার চেষ্টা করিলাম। প্রথমত, গোড়ায় কী কী কথা উঠিয়াছিল ও তাহার কীরূপ উত্তর দেওয়া হইয়াছে, তাহা সংক্ষেপে উত্তর-প্রত্যুত্তরচ্ছলে সাজাইয়া দিই, তাহা হইলে বোধ করি আমাকে আর বেশি কথা বলিতে হইবে না।

প্রথম পক্ষ। আমাদের নব্য সম্প্রদায় উন্নতিপথের কন্টকস্বরূপ কুসংস্কারগুলিকে একেবারে উন্মূলিত করিতে চান, ইহা অপেক্ষা দেশের সৌভাগ্য আর কিছুই নাই। কিন্তু কোন্‌টা কুসংস্কার সেইটে বিশেষ মনোযোগ করিয়া আগে স্থির করা দরকার। মন্দ মনে করিয়া ভালোকে দূর করিয়া দিলে দেশের বিশেষ উপকার হয় না, কারণ, কেবলমাত্র মহৎ-উদ্দেশ্য লইয়া ঘরকন্না চলে না। তাহা ছাড়া, দেশী কুসংস্কারের জায়গায় হয়তো বিলাতি কুসংস্কার রোপণ করা হইল, তাহার ফল হইল এই যে, গোরা ডাকিয়া সিপাই তাড়াইলে, এখন গোরার উৎপাতে দেশছাড়া হইতে হয়। যাহা হউক, ইহা বোধ করি কেহ অস্বীকার করিবেন না যে, যদি সেই কুসংস্কারই পুষিতে হইল তবে আমাদের দেশের আয়ত্তাধীন রোগা ভেতো কুসংস্কারই ভালো, বিলাতের গোখাদক জোয়ান কুসংস্কার অতি ভয়ানক।

দ্বিতীয় পক্ষ। উত্তর নাই।

প্রথম পক্ষ। এমন কতকগুলি লোক আছেন, তাঁহারা বিলাতি আচার-ব্যবহারের সহিত যাহার মিল আছে তাহাকেই সুসংস্কার মনে করেন ও যাহার বিলাতি প্রতিরূপ নাই তাহাকেই কুসংস্কার বলিয়া ত্যাগ করেন। এ বিষয়ে বিবেচনাশক্তি খাটানো বাহুল্য জ্ঞান করেন। যাঁহারা এই শ্রেণীর লোক, যাঁহারা বিলাতি অনাবশ্যক আচার-ব্যবহারও সগর্বে গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে কি

---

[1] ১. ভারতী, আষাঢ় ১২৯০ সংখ্যায় বঙ্গমহিলা সভায় জ্ঞানদানন্দিনী দেবী-কর্তৃক পঠিত ‘সমাজ সংস্কার ও কুসংস্কার’ প্রকাশিত হলে, ভাদ্র সংখ্যায় ‘শ্রীমতী’ স্বাক্ষরে এর প্রতিবাদ মুদ্রিত হয়। আশ্বিন সংখ্যায় ‘তৃতীয় পক্ষ’ নামে ‘শ্রীরঃ’ স্বাক্ষরে রবীন্দ্রনাথের রচনাটি প্রকাশিত হয়।

হৃদয়ের দোহাই দিয়া জিজ্ঞাসা করা যায় না যে, তোমরা আমাদের দেশের অনাবশ্যক, এমন-কি, বিশেষ আবশ্যক, অনুষ্ঠানগুলি সগর্বে ত্যাগ করিলে কেন? তোমরা নব্য বালিকারা, আত্মীয় ও সখীদিগের জন্মতিথির দিনে ছবি-আঁকা কার্ড পাঠাইয়া ইংরাজি ধরনে উৎসব কর, ইংরাজি বৎসরের আরম্ভের দিন ইংরাজি প্রথানুসারে পরস্পরকে কুশল-লিপি প্রেরণ করিয়া থাক, এপ্রিলের ১লা তারিখে ইংরাজদের অনুকরণে পরস্পরকে নানাপ্রকার ঠকাইতে চেষ্টা কর, এ কাজগুলি কিছু মহাপাতক নয়, ইহাদের বিরুদ্ধে আমার কোনো বক্তব্যও নাই। কিন্তু একটা কথা আমার জিজ্ঞাসা করিবার আছে, তোমরা ভাইদ্বিতীয়ার অনুষ্ঠান ত্যাগ করিলে কেন? তোমরা বড়ো হইলে জামাইষষ্ঠী পালন কর না কেন? এমনও দেখিয়াছি সামান্য ইংরাজি অনুষ্ঠানের ব্যত্যয় হইলে তোমরা লজ্জায় মরিয়া যাও, আর ভালো ভালো দিশি অনুষ্ঠান পালন না করিলে কিছুই মনে হয় না। ইহা হইতে এইটেই দেখা যাইতেছে যে, তোমরা সুসংস্কার কুসংস্কার বাছিয়া কাজ কর না, দিশি বিলাতি বাছিয়া কাজ কর।

দ্বিতীয় পক্ষ। দেশীয় ভাবের অনাদরে লেখিকার প্রাণে বাজিয়াছে বলিয়া তিনি প্রকৃতিস্থ হইয়া কথা কহিতে পারেন নাই! লেখিকা দেশীয় ও বিদেশীয় ভাবের একজন নিরপেক্ষ বিচারক নহেন, তিনি দেশীয় ভাবের পক্ষপাতী। এরূপ পক্ষপাতে হৃদয় প্রকাশ পায় বটে কিন্তু যুক্তির অভাব অনুমান হয়। অনেক নব্যদের কাছে সেকেলে ভাবের আদর দেখা যায় না বটে, কিন্তু সাহেবিয়ানাই তাহার কারণ নয়। সমাজ সংস্কারের আবশ্যক হইয়াছে, নব্য সম্প্রদায় তাহা বুঝিয়াছেন ও কাজে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। উৎসাহের চোটে অনেক সময় হিতে বিপরীত করেন বটে, কিন্তু সেটা কি সাহেবিয়ানা? তাঁহারা সাহেবদের ভালো লইতে গিয়া ধাঁধা লাগিয়া মন্দও লন, কিন্তু দেশকে সাহেবি করিবার জন্য তাহা করেন না, দেশের ভালো করিবার জন্যই এরূপ করিয়া থাকেন। কারণ, সাহেবি করিবার ইচ্ছা করিলে অনায়াসে তাঁহারা হ্যাটকোট পরিয়া অবিকল ইংরাজ সাজিতে পারিতেন, কিছুমাত্র দিশি অবশিষ্ট রাখিবার দরকার কী ছিল? যাহা হউক, আমার কথাটার মর্ম এই, নব্য সম্প্রদায় যাহা-কিছু গলদ করেন তাহা অতিশয় উৎসাহের প্রভাবেই করিয়া থাকেন, সাহেবিয়ানা হইতে করেন না।

তৃতীয় পক্ষ। লোকের কাজ দেখিয়া মনের ভাব জানিতে হয়, আমি (এবং লেখিকাদ্বয়) কিছু অন্তর্যামী নহি। প্রথম পক্ষ দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইতেছেন যে, একদল লোক আছেন তাঁহারা ইংরাজি অনাবশ্যক এবং অর্থহীন প্রথাগুলিকেও সমাদরে গ্রহণ করেন, অথচ, দিশি অনাবশ্যক, এমন-কি, আবশ্যক প্রথাগুলিকে অকাতরে পরিত্যাগ করেন। ইহা দেখিলেই কী মনে হয়? মনে হয় যে, ইঁহারা আবশ্যক অনাবশ্যক দেখিয়া যে কিছু গ্রহণ করিতেছেন তাহা নয়, ইঁহারা বিলাতিকে আবশ্যক জ্ঞান করেন, দিশিকে অনাবশ্যক জ্ঞান করেন। সাহেব দেখিয়া তাঁহাদের ধাঁধা লাগিতে পারে বটে, কারণ আমাদের বরাবর কালো দেখা অভ্যাস, সুতরাং সহসা সাদা দেখিলে ধাঁধা লাগিয়া যায়— কিন্তু ধাঁধা লাগিয়া নাহয় সাহেবদের দুটো মন্দই গ্রহণ করিলাম, কিন্তু ধাঁধা লাগিয়া আমাদের স্পষ্ট ভালো জিনিসগুলিকে পরিত্যাগ করি কেন? শ্রীমতী— গোড়াতেই একটা ভুল করিতেছেন। এইরূপ ধাঁধা লাগাকেই যে বলে সাহেবিয়ানা! সাহেব দেখিয়া ধাঁধা লাগিয়া যখন একজন দিশি লোক সাহেবের অনাবশ্যক প্রথাকে আবশ্যক জ্ঞান করেন ও আমাদের আবশ্যক প্রথাকেও অনাবশ্যক জ্ঞান করেন ও সেই অনুসারে কাজ করেন তখনই বলা যায় তিনি সাহেবিয়ানা করিতেছেন। কারণ, এই সামান্য ঘটনা হইতে দেখা যায় যে, একজন সাহেব দেখিয়াই আমাদের দেশের প্রতি তাঁহার সদ্ভাব এমনি বিপর্যস্ত হইয়া গিয়াছে যে, দেশের ভালোও তাঁহার চক্ষে অনাবশ্যক বা মন্দ বলিয়া বোধ হইতেছে। তাঁহার উদ্দেশ্য খুবই ভালো হইতে পারে, তিনি হয়তো সত্য সত্যই মনের সহিত সাহেবিকে শ্রদ্ধেয় ও দিশিকে ঘৃণ্য জ্ঞান করেন, সুতরাং দেশে সাহেবি প্রচলিত করা ও দিশি নষ্ট করাই তিনি তাঁহার কর্তব্য বিবেচনা করেন, কিন্তু বিনা কারণে কেবলমাত্র ধাঁধা লাগিয়া এইরূপ মনে করাকেই বলে সাহেবিয়ানা অর্থাৎ সাহেবি-প্রিয়তা।

অতএব যখন দেবী জ্ঞানদানন্দিনী অকারণে বিলাতি প্রথা অনুষ্ঠান ও অকারণে দেশী প্রথা পরিত্যাগের উল্লেখ করিয়া তাহাকে সাহেবিয়ানা বলিয়াছেন, তখন তাঁহাকে দোষ দেওয়া যায় না। আর যাহাই হউক, তিনি যে 'প্রকৃতিস্থ' ছিলেন তাহা সহজেই মনে হয়।

শ্রীমতী— বলেন, সাহেবিয়ানাই যদি তাঁহাদের উদ্দেশ্য হয়, তবে তাঁহারা পূরা সাহেবিয়ানা করেন না কেন? তাহা আমি কী জানি? কিন্তু তাঁহারা যতটা করিতেছেন ততটা যে সাহেবিয়ানা তাহা আমরা স্পষ্ট দেখিয়াছি, সে বিষয়ে প্রথম পক্ষ দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন— তাঁহারা কী যে করেন না, তাহা তিনি বলেন নাই, সুতরাং তাহার জবাবদিহি তিনি করিতে পারেন না। হইতে পারে, সমাজের শাসন একেবারে লঙ্ঘন করিতে তাঁহারা সাহস করেন না, আস্তে আস্তে অল্পে অল্পে যতটা সয় ততটা অবলম্বন করিতেছেন; হইতে পারে, পাড়া-প্রতিবেশীদের উপহাস বিদ্রূপ সহ্য করিতে পারেন না; হইতে পারে, তাঁহারা যে অবস্থায় থাকেন সে অবস্থা পূরা সাহেবিয়ানার অনুকূল নহে। এমন আরও দুইশো কারণ থাকিতে পারে। এমনও হইতে পারে, সাহেবিয়ানাই তাঁহাদের আদর্শ বটে, অথচ সমাজ-সংস্কার করিতেছি মনে করিয়া আত্ম-প্রবঞ্চনা করেন, আগাগোড়া সাহেবি করিলে সংস্কার করিতেছি মনে করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করা যায় না, সুতরাং কিছু কিছু দিশি রাখিয়া মাঝে মাঝে বিলাতি চাকচিক্য অবলম্বন করিয়া সংস্কার করিবার গর্ব অনুভব করা যায়, কেবল তাহাই নয়, সেই আত্মপ্রসাদের প্রভাবে moral courage-এর ধুয়া ধরিয়া দেশীয় সমাজকে উপেক্ষা করিবার বল সঞ্চয় করা যায়। এই পর্যন্ত থাক্। পুনশ্চ পূর্বপক্ষের কথা শোনা যাউক।

প্রথম পক্ষ। এতক্ষণ ছোটো ছোটো প্রথার কথা বলিলাম। কিন্তু এখন একটা বড়ো বিষয়ে হাত দিতেছি। কোনো কোনো সমাজ-সংস্কারক সম্প্রদান প্রথা পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, 'মেয়ে কি একটা ঘটিবাটি যে, একজনের হাত হইতে আর-একজনের হাতে পড়িবে?' এ কী হৃদয়হীন কথা? জগতে ঘটিবাটির অধিকার ছাড়া আর কোনো প্রকারের অধিকার নাই কি? স্নেহ প্রেমের কোনো অধিকার নাই কি? মনুষ্য-সমাজে অরাজকতা উচ্ছৃঙ্খলতা কেন নাই? যার যা খুশি সে তা করে না কেন? তাহার কারণ মানুষের উপর মানুষের অধিকার আছে। পরস্পরের জন্য পরস্পরকে অনেকটা সহিয়া থাকিতে হয়, অনেকটা আত্মসংযম করিতে হয়। এই পরস্পরের প্রতি যে দৃষ্টি রাখা, এ কি কেবল সুবিধার শাসনেই হয়? তাহা নয়, সভ্য সমাজে হৃদয়ের শাসনই বলবান হইতে থাকে। আমি একটি জন্তুকে যত সহজে বধ করিতে পারি, একটি মানুষকে তত সহজে বধ করিতে পারি না, সমাজের সুবিধা-অসুবিধার প্রতি দৃষ্টিপাত করাই কি তাহার কারণ? তাহা নয়। তাহার কারণ এই যে, একজন মানুষের হৃদয়ের উপর, দয়ার উপর আর একজন মানুষের অধিকার আছে, সেই অধিকার লঙ্ঘন করা অসভ্যতা, পাপ! এক জাতি বলিয়া মানুষের উপর মানুষের যেরূপ অধিকার আছে, তেমনি এক পরিবার বলিয়া পরিবারস্থ ব্যক্তিদিগের পরস্পরের প্রতি বেশি অধিকার আছে, সে অধিকার লঙ্ঘন করিলে সমাজে ঘোর উচ্ছৃঙ্খলতা ও পাপের সৃষ্টি হয়, আবার পরিবারস্থ বিশেষ ঘনিষ্ঠ-সম্পর্ক ব্যক্তির বিশেষ ঘনিষ্ঠ অধিকার আছে, এই-সকল অধিকারের সহিত ঘটিবাটির অধিকার কি তুলনীয়? অতএব মেয়ের উপরে বাপের অধিকার নাই এ কথা কী করিয়া বলা যায়? ইত্যাদি ইত্যাদি।

দ্বিতীয় পক্ষ। তাহা যেন বুঝিলাম, মানিলাম সম্প্রদান প্রথা অন্যায় নহে। কিন্তু ইহা হইতে এই প্রমাণ হইতেছে যে, সংস্কারকদিগের বুঝিবার ভুল হইয়াছিল। কিন্তু ইহাকে তো আর সাহেবিয়ানা বলা যায় না। কারণ সাহেবদের মধ্যে সম্প্রদান প্রথা আছে।

তৃতীয় পক্ষ। সাহেবদের মধ্যে কীরূপ প্রথা প্রচলিত তাহা আমি জানি না, সুতরাং সে বিষয়ে কিছু বলিতে পারি না। সকলেই স্বাধীন, সকলেরই স্বতন্ত্র অধিকার আছে, ইত্যাদি ভাব আমরা ইংরাজের কাছ হইতে পাইয়াছি, সেই-সকল সাহেবি মতের ধুলায় অন্ধ হইয়া দেশীয় ভাবকে তাড়াতাড়ি উপেক্ষা করিতে যাওয়া কতকটা সাহেবি-প্রিয়তার ফল। ইংরাজেরা যদি ঠিক ইহার

উল্টা কথাটা বলিতেন, আমরা হয়তো ঠিক ইহার উল্টা আচরণ করিতাম। যাহাই হউক, ইহা দেখা যাইতেছে, নব্যদিগের হৃদয়ে এমন একটি ভাব প্রবেশ করিয়াছে, যাহার প্রভাবে কথায় কথায় অকাতরে তাঁহারা দেশীয় প্রথা ত্যাগ করিতে পারেন, তাহার প্রতি একটু দরদ থাকিলে যতটা সাবধানে যতটা বিবেচনা করিয়া কাজ করা যাইত, ততটা করা হয় না। একটা লম্বাচৌড়া মত শুনিবামাত্রই অমনি তড়িঘড়ি এক-একটা দিশি প্রথাকে নির্বাসন করিতে যাওয়ার ভাবটাই ভালো নহে।

প্রথম পক্ষ। আচ্ছা, যদি পূর্বোক্ত সংস্কারকগণ কন্যার উপরে পিতার বা স্ত্রীর উপর স্বামীর অধিকার বাস্তবিকই স্বীকার না করেন, তবে কেন তাঁহারা, কন্যা যতদিন অবিবাহিত থাকে ততদিন তাহাকে তাহার পিতার পদবী দেন ও বিবাহিত হইলে কেন তাহাকে তাহার স্বামীর পদবীতে ডাকেন? যথা, অবিবাহিত কন্যার নাম কমলমণি ঘোষ, বিবাহিত কন্যার নাম কমলমণি নন্দী। তাহার নিজের নামের স্থায়িত্ব নাই কেন? সে কি একটা জড় পদার্থ, তাহার কি এতটুকু স্বাতন্ত্র্য নাই যে যখন যাহাদের ঘরে যাইবে তখনই তাহাদের নাম গ্রহণ করিবে?

দ্বিতীয় পক্ষ। লেখিকা কী অর্থে 'স্বাতন্ত্র্য' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন তাহা ঠিক বুঝা গেল না। স্ত্রীলোক বংশের পদবী গ্রহণ করিতে স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যের যে কী খর্বতা হয় তাহাও বুঝিতে পারি না। পুরুষরা তো বংশের উপাধি গ্রহণ করেন, সেইজন্য কি তাঁহাদের স্বাতন্ত্র্য বিন্দুমাত্র কমিয়াছে?

তৃতীয় পক্ষ। এ কেমনতরো খাপছাড়া উত্তর হইল কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। পদবী গ্রহণে তো স্বাতন্ত্র্যের খর্বতা হয় না, কিন্তু পদবী পরিবর্তনে হয়। যত দিন স্ত্রী ঘোষ-পিতার অধীনে আছে ততদিন সে ঘোষ, আর, যখন সে বোস-স্বামীর বাড়িতে গেল তখনই সে বোস হইল, ইহাকে 'প্রকৃতিস্থ' লোকে স্বাতন্ত্র্যের অভাব বলে না তো কী বলে? বিবাহের পর স্ত্রীর অনুসারে স্বামীর নামেরও পরিবর্তন হয় না কেন? স্বামীরা কর্তা বলিয়া। যাহা হউক, স্ত্রী স্বাতন্ত্র্য ভালো কি মন্দ সে কথা হইতেছে না, কথাটা এই যে যাঁহারা স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যের পাছে একটুখানি খর্বতা হয় বলিয়া সম্প্রদান প্রথা উঠাইয়া দিতে চান তাঁহারা কোন্ মুখে স্ত্রীলোকের পদবী পরিবর্তন প্রথা গ্রহণ করিতে পারেন?

প্রথম পক্ষ। তবে, যদি বল পরিচয়ের সুবিধার জন্য স্ত্রীলোকদের নামের সহিত পদবী গ্রহণ ও বিবাহ হইলে তাহার পরিবর্তন সমাজের বর্তমান অবস্থায় আবশ্যক করে, তবে তাহার বিরুদ্ধে বক্তব্য এই যে, ঘোষ বা বোস বলিলে আমাদের দেশে পরিচয়ের বিশেষ কী এমন সুবিধা হইল? আমাদের দেশের ঘোষ বোস প্রভৃতি উপাধি পরিবার-বিশেষের নাম নহে, বিস্তৃত শ্রেণীবিশেষের উপাধি, সুতরাং ইহাতে ব্যক্তিবিশেষগত পরিচয়ের কোনো সুবিধা হইল না।

দ্বিতীয় পক্ষ। পরিচয়ের সুবিধার জন্যই যে এই প্রথা প্রচলিত হইয়াছে সে কথা লেখিকা কোথা হইতে সংগ্রহ করিলেন? আমি তো মনে করি, দেবী ও দাসীর প্রভেদ উঠাইয়া দিবার জন্যই এই প্রথা অবলম্বন করিতে হইয়াছে। এককালে শূদ্রেরা দাসত্ব করিত, তাই বলিয়া যখন দাসত্ব করে না তখনও যে নামের সহিত সেই দাসত্বের স্মৃতি যত্নপূর্বক পুষিয়া রাখিতে হইবে এমন কোনো কথা নাই। দ্বিতীয়ত, এখন জাতিভেদ উঠিয়া গিয়া অসবর্ণ বিবাহ হইতেছে; একজন ব্রাহ্মণকন্যা শূদ্রপত্নী হইলে তিনি আপনাকে দেবী বলিবেন, না দাসী বলিবেন? এরূপ অবস্থায় তিনি কী করিবেন?

তৃতীয় পক্ষ। স্ত্রীলোকের নামের সম্বন্ধে শ্রীমতী অনামিকা একটি ভুল বুঝিয়াছেন দেখিতেছি। দেবী জ্ঞানদানন্দিনী স্ত্রীলোকদিগের নামের শেষে দেবী দাসী যোগ করা লইয়া কিছুই বলেন নাই, সে বিষয়ে তাঁহার কী মত তাহা জানিও না। তিনি কেবল বলিয়াছেন স্ত্রীলোকদের নামের সহিত বংশের পদবী যোগ করা, কানেও খারাপ শুনায় বটে আবার তাহাতে পরিচয়েরও কোনো সুবিধা হয় না। সুতরাং, এ প্রথাটি ভালো নয়। শ্রীমতী— যে বলিতেছেন নামের সঙ্গে দেবী দাসীর প্রভেদ থাকা ভালো নয়, সে বিষয়ে আমারও তাঁহার সহিত কোনো বিবাদ নাই, কিন্তু স্ত্রীলোকের

নামের সহিত বংশের পদবী যোগ করা যে ভালো এ কথার সহিত পূর্বোক্ত কথাটার বিশেষ যোগ কোথায়। একটা ভালো নয় বটে, কিন্তু আর-একটা যে তাই বলিয়া ভালো তাহা কী করিয়া বলিব। আর শ্রীমতী— যে পরিচয়ের সুবিধার কথাটা একেবারে উড়াইয়া দিয়াছেন, সেটা ভালো করেন নাই। জিজ্ঞাসা করি, নামের সৃষ্টি কিসের জন্য? কেবলমাত্র পরিচয়ের জন্য, উহার আর কোনোই উদ্দেশ্য নাই। যদি সে উদ্দেশ্য উপেক্ষা কর তবে নাম রাখিবার কোনো দরকার নাই। জাতিভেদের উপর আমাদের সমাজ-ব্যবহার অনেকটা নির্ভর করে, সুতরাং সামাজিকতার অনুরোধে দাসী ও দেবীর ভিন্ন পরিচয় পাওয়া আমাদের দেশে নিতান্ত আবশ্যক। যাঁহাদের সে অনুরোধ নাই, যাঁহারা জাতিভেদ মানেন না, তাঁহাদের আর দেবী দাসী বলিয়া পরিচয় দিবার দরকার নাই বটে, কিন্তু তাঁহারা বসু বা বাঁড়ুয্যে বলিয়াই বা পরিচয় দেন কীরূপে? কারণ 'বসু' ব্যক্তিবিশেষগত পরিচয় নয়, পরিবারবিশেষগত পরিচয় নয়, উহা জাতিবিশেষগত পরিচয়। যাঁহারা বলেন 'আমি বসু' তাঁহারা বলেন, 'আমি কায়স্থজাতির শ্রেণীবিশেষভুক্ত ব্যক্তি।' বসু বলিতে আর কিছুই বুঝায় না। সুতরাং সেই তো তাঁহারা জাতিভেদের পরিচয় দিলেন। সেই তো তাঁহারা ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ জাতির প্রভেদ স্বীকার করিলেন। আমাদের দেশের জাতিভেদ শাস্ত্র অনুসারে নির্দিষ্ট অতএব তুমি যদি একবার জাতিভেদ স্বীকার কর, তবে শাস্ত্র অনুসারে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ জাতি ও শূদ্র অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট জাতি, এতটা পর্যন্তই যদি হইল তবে আর দেবী দাসী হইতে বেশি দূরে রহিল কই? তোমাদের কাজে ও কথায় মিল করিতে হইলে দেবী দাসীও ছাড়িতে হয়, ঘোষ বোসও ছাড়িতে হয়। হয়, কেবলমাত্র নামের পূর্বার্ধ রাখিয়া দাও, নয় রমণীপরিচয়সূচক এমন একটি নূতন সাধারণ শব্দ প্রচলিত করিয়া নামের শেষে যোগ করো যাহাতে জাতিভেদের অথবা শ্রেষ্ঠ-নিকৃষ্টত্বের কোনো উল্লেখ না থাকে। বোধ করি, মহারাষ্ট্রীয়দিগের 'বাই' শব্দ কতকটা এইরূপ। প্রতিবাদে যতগুলি কথা বলা হইয়াছিল, আমরা তাহার সকলগুলিই আলোচনা করিয়া দেখিলাম, কোনোটিই বোধ করি ছাড়িয়া দিই নাই।

যাহা হউক, যতদূর দেখা গেল, তাহাতে দেবী জ্ঞানদানন্দিনীর অপ্রকৃতিস্থতার কোনো লক্ষণ পাওয়া গেল না, তাঁহার লেখায় হৃদয় প্রকাশ পাইয়াছে, যুক্তিরও অভাব দেখিলাম না, এবং তাঁহার কথার প্রকৃত প্রতিবাদও দেখিলাম না, সুতরাং এখনও তাঁহারই মত প্রবল রহিল।

ভারতী
আশ্বিন ১২৯০

ন্যাশনল ফন্ড

'ন্যাশনল' শব্দটার ব্যবহার অত্যন্ত প্রচলিত হইয়াছে। ন্যাশনল থিয়েটর, ন্যাশনল মেলা, ন্যাশনল পেপর ইত্যাদি। এমন কোনোপ্রকার অনুষ্ঠান দেখিতে পাই না, যাহার প্রতি ন্যাশনল শব্দের প্রয়োগ রীতিবিরুদ্ধ হয়। আমি জিজ্ঞাসা করি ন্যাশনল কসাইখানা করিলে কেমন হয়। সেখানে ন্যাশনল গোরু জবাই করিয়া ন্যাশনল হোটেলে ন্যাশনল বীফস্টেকের আয়োজন করা যাইতে পারে। কারণ, এখন একদল আর্য উঠিয়াছেন, তাঁহারা বিলাতি ছাড়া কিছুই ব্যবহার করেন না, কিন্তু ন্যাশনল শব্দের গণ্ডূষ করিয়া তাহাকে শোধন করিয়া লন।

ক্রমেই ন্যাশনলের দল-পুষ্টি হইতেছে। সম্প্রতি ন্যাশনল ফন্ড নামে আর-একটা কথা শুনা যাইতেছে। যখনই কোনো অনুষ্ঠানকে আগেভাগে জোর করিয়া ন্যাশনল বলা হয় তখনই মনের ভিতর কেমন সন্দেহ হয় বুঝি এ জিনিসটা ঠিক ন্যাশনল নয়, তাই ইহাকে এত করিয়া ন্যাশনল বলা হইতেছে। দুর্গাপূজাকে কেহ যদি বলে ন্যাশনল দুর্গাপূজা, তাহা হইলেই ভয় হয় ইহার কিছু গোলযোগ আছে। এই ফন্ডের সম্বন্ধেও আমাদের সেইরূপ একটা সন্দেহ হইয়াছে।

ন্যাশনল বলিতে আমি তো এই বুঝি, সমস্ত নেশন যাহা করিতেছে, সমস্ত নেশনের ভিতর হইতে যাহা স্বতঃ উদ্ভিন্ন হইয়া বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে, যাহা না হইয়া থাকিতে পারে না, যাহাকে জোর করিয়া ন্যাশনল বলিবার আবশ্যক হয় না; কারণ তাহা ন্যাশনল নয় বলিয়া কাহারও মুহূর্তের জন্য সন্দেহও হয় না। আমরা অকারণে বড়ো বড়ো কথা ব্যবহার ভালো বলি না, কারণ, তাহা হইলে ক্রমে সে কথাগুলির প্রতি লোকের অবিশ্বাস জন্মিয়া যায় ও তাহাদের দ্বারা ভবিষ্যতে আর কোনো ভালো কাজ হয় না। যাহা হউক, আলোচ্য প্রস্তাবটি ন্যাশনল কি না তাহা স্থির করা আবশ্যক।

শুনা যাইতেছে একমাত্র Political agitationই ওই অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য। ওই শব্দটার বাংলা কী ঠিক জানি না, কেহ কেহ বলেন রাজনৈতিক আন্দোলন, আমরাও তাহাই গ্রহণ করিলাম।

প্রথমত, Political agitation জিনিসটাই ন্যাশনল নয়। ইহা কেহই অস্বীকার করিবে না, ও কথাটা বোঝে খুব কম লোক, আবার যে দু-চার জন লোক বোঝে তাহাদের মধ্যে সকলের ও কাজটার প্রতি বিশেষ অনুরাগ নাই, কথাটার মানে জানে এই পর্যন্ত।

দ্বিতীয়ত, এই কাজটার ভার কাহাদের উপরে এবং তাঁহারা কী উপায়ে ইহা সাধন করিতেছেন? যাঁহারা বাংলা ভাষা অবহেলা করেন, বাংলা ভাষা জানেন না, ইংরাজি ভাষায় বাগ্মিতা প্রদর্শন করাই যাঁহাদের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য, তাঁহারাই ইহার প্রধান। গোড়াতে ইহার নামই হইয়াছে National Fund, ইংরাজিতেই ইহার উদ্দেশ্য প্রচার হইয়াছে, আজ পর্যন্ত ইংরাজিতেই ইহার কাণ্ডকারখানা চলিতেছে। অথচ মুখে বলা হইতেছে, peopleরাই আমাদের সহায়, peopleদের জন্যই আমরা এতটা করিতেছি, peopleদের উপরেই আমাদের ভরসা। এ-সব ভান করিবার দরকার কী? peopleরা যে তোমাদের কথাই বুঝিতে পারে না। ইংরাজি ভাষায় তোমাদের তর্জন গর্জন শুনিয়া সে বেচারিরা যে হাঁ করিয়া তাকাইয়া থাকে! তোমরা যদি তাহাদের ভালোবাসিতে, তবে তাহাদের ভাষা শিখিতে; বিলাতি হৃদয় কী করিয়া উত্তেজিত করিতে হয় তাহাই তোমরা একরত্তি বয়স হইতে অভ্যাস করিয়া আসিতেছ, যাহারা হাততালি দিতে জানে না, যাহারা রেজোলিউশন মুব্ করে না, সেকেন্ড করে না, যাহারা constitutional history পড়ে নাই তাহাদের হৃদয়ের সুখদুঃখ কোন্‌খানে, কোন্‌খানে ঘা পড়িলে তাহাদের প্রাণ কাঁদিয়া উঠে তাহা কি তোমরা জান, না, জানিতে কেয়ার কর? শুনিয়াছি বটে, মাঝে মাঝে তোমরা মিটিং ডাকিয়া একজন ইংরাজিতে বক্তৃতা দাও, আর-একজন সেইটেকে বাংলায় ব্যাখ্যা করেন, ইহা অপেক্ষা হাস্যজনক ও দুঃখজনক ব্যাপার কি কিছু আছে? যখন বাঙালির কাছে বাঙালিতে কথা কহিতেছে, তখনও কি ইন্টরপ্রেটরের দরকার হইবে? যদি বল, বাংলায় যাঁহাদের কাছ হইতে কাজের প্রত্যাশা করা যায় তাঁহারা বাংলা শুনিতে চান না, বাংলা ভাষা জানেন না, কাজেই ইংরাজিতে এ অনুষ্ঠান আরম্ভ করিতে হইয়াছে, প্রধানত ইংরাজিতে ইহা প্রচার করিতে হইয়াছে— তবে আর কী বলিব— তবে এই বলিতে হয় বাংলাদেশের অবস্থা নিতান্তই শোচনীয়, তবে আজিও বাংলাদেশে কোনো ন্যাশনাল অনুষ্ঠান আরম্ভ করিবার সময় হয় নাই। তবে আর people-এর নাম মুখে উচ্চারণ কর কেন? উহা কি একটা ছেলে ভুলাইবার কথা? আর, সে লোকেরা কাহারা? তোমরাই তো তাহারা! তোমরাই তো বাংলা জান না, ইংরিজিতে কথা কও! ইংরাজি খবরের কাগজে তোমাদের কথা ছাপা না হইলে তোমাদের মনস্তুষ্টি হয় না!

তোমরা বলিবে ইহা পোলিটিক্যাল ব্যাপার, ইংরাজদের জানানো আবশ্যক, কাজেই ইংরাজিতে বলা উচিত। কিন্তু সে কোনো কাজের কথা নয়। যখন agitation করিবে তখন নাহয় ইংরাজিতে করিয়ো, কিন্তু যখন দেশের লোকের কাছে সাহায্য চাহিতেছ তখনো কি দেশের লোকের ভাষায় কথা কহিবে না?

কিন্তু গোড়াতেই যে গলদ। একমাত্র Political agitation-ই যাহার প্রাণ, তাহার উদ্দেশ্য সাধারণের কাছে বুঝাইবে কীরূপে? সাধারণে যে বুঝিবে না। না বুঝিলেও যে আপাতত বিশেষ

ক্ষতি আছে তাহা নহে, কেন, তাহা বলিতেছি।

যে-সকল দেশহিতৈষীদিগের Political agitation একমাত্র ব্যবসায় তাহাদের উপর আমার বড়ো শ্রদ্ধা নাই। আমাদের দেশে Political agitation করার নাম ভিক্ষাবৃত্তি করা। যে নিতান্তই দরিদ্র সময়ে সময়ে তাহাকে ভিক্ষা করিতেই হয়, উপায় নাই, কিন্তু ভিক্ষাই যে একমাত্র উন্নতির উপায় স্থির করিয়াছে, তাহার প্রতি কাহারও ভক্তি থাকিতে পারে না। ভিক্ষুক মানুষেরও মঙ্গল নাই, ভিক্ষুক জাতিরও মঙ্গল নাই, ক্রমশই তাহাকে হীন হইতে হয়। ইতিহাস ভুল বুঝিয়া আমাদের এই-সকল বিড়ম্বনা ঘটিয়াছে। আমরা ভুলিয়া গিয়াছি যে স্বাধীন দেশে Political agitation-এর অর্থ, আর পরাধীন দেশে উহার সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র অর্থ। সে দেশে Political agitation অর্থ নিজের কাজ নিজে করা, আর এ দেশে Political agitation-এর অর্থ নিজের কাজ পরকে দিয়া করানো। কাজেই ইহার ফল উভয় দেশে এক প্রকারের নহে।

ইংরাজদের কাছে ভিক্ষা করিয়া আমরা আর সব পাইতে পারি, কিন্তু আত্মনির্ভর পাইতে পারি না। আর, তাহাই যদি না পাই, তবে আসল জিনিসটাই পাইলাম না। কারণ, ভিক্ষার ফল অস্থায়ী, আত্মনির্ভরের ফল স্থায়ী। আমাদের সমস্ত জাতির যদি এই একমাত্র কাজ হয়, ইংরাজদের কাছে আবদার করা, ইংরাজদের কাছে ভিক্ষা করা, তাহা হইলে প্রত্যহ আমাদের জাতির জাতিত্ব নষ্ট হইতে থাকিবে, ক্রমশই আমাদের আত্মত্ব বিসর্জন দিতে হইবে। তাহা হইলে আমরা শুভ্র ইংলন্ডের গায়ে একটা কালো পোকার মতো লাগিয়া থাকিব ও ইংরাজের গায়ের রক্ত শোষণ করিয়া আবশ্যকের অভাবে আমাদের পাকযন্ত্র অদৃশ্য হইয়া যাইবে! এইজন্যই কি ন্যাশনল ফন্ড?

আমরা কী শিখিতেছি? ন্যাশনল ফন্ড সংগ্রহ করিয়া আমরা কী কাজের জন্য প্রস্তুত হইতেছি? না, কেমন করিয়া দরখাস্ত করিতে হয়, পার্লামেন্টে কী উপায়ে মনের দুঃখ নিবেদন করা যাইতে পারে, কোন্‌ সাহেবকে কীরূপ করিয়া আয়ত্ত করা যায়, ঠিক কোন্‌ সময়ে ভিক্ষার পাত্রটি বাড়াইলে এক মুঠা পাওয়া যাইতে পারিবে। অনিমেষ নেত্রে পর্যবেক্ষণ করিতে থাকো ইংরাজি কোন্‌ মন্ত্রীর কী ভাব, কখন ministry বদল হয়, কখন রাজা আমাদের অনুকূল, কখন আমাদের প্রতিকূল ঘড়ি ঘড়ি ইংরাজদের কাছে গিয়া বলো, তোমরা অতি মহদাশয় লোক, তোমরা ধর্মাবতার, তোমাদের কাছে অনুগ্রহ প্রত্যাশা করিয়া কি আমরা বঞ্চিত হইব? কখনোই না। আজ রাজার মুখ প্রসন্ন দেখিলে কালীঘাটে পূজা দাও, আর কাল তাঁহাকে বিমুখ দেখিলে ঘরে হাহাকার পড়িয়া যাক। যাও, ছ লাখ টাকা দিয়া একটা মস্ত constitutional ভিক্ষার ঝুলি কেনো, কখন কে লাটসাহেব হইল, কখন কে রাজমন্ত্রী হইল তাহাই অনুসন্ধান করিয়া ঠিক সময় বুঝিয়া ভিক্ষার ঝুলি পাতো গে। কিন্তু, তার পরে মনে করো ইংরাজ চলিয়া গেল, মগের মুল্লুক হইল। তখন কাহার কাছে আবদার করিবে? তখন তোমাদের দিশি মুখে বিলাতি বোল শুনিয়া ইস্কুল মাস্টারের মতো কে তোমাদের পিঠে উৎসাহের থাবড়া দিবে? ঘর হইতে কাপড় আনাইয়া কে তোমাদের কাপড়টি পরাইয়া দিবে? সহসা পিতৃহীন আদুরে ছেলেটির মতো কঠোর সংসারে আসিয়া টিকিবে কীরূপে? আর কিছু না হউক সমস্ত বাঙালি জাতি যখন agitation-ওয়ালা হইয়া উঠিবে তখন হঠাৎ তাহাদের agitation বন্ধ হইলে যে নিশ্বাস বন্ধ হইয়া মরিবে। বরঞ্চ দুই দিন আহার বন্ধ হইলে চলিয়া যাইবে, কিন্তু দুই দণ্ড মুখ বন্ধ হইলে বাঙালি বাঁচিবে কী করিয়া?

ইহা বোধ করি কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে, যথেষ্ট টাকা সংগ্রহ করিলে আমাদের দেশে এমন ঢের কাজ আছে যাহা আমরা নিজেই করিতে পারি, এবং যাহা-কিছু আমরা নিজে করিব তাহা সফল না হইলেও তাহার কিছু-না-কিছু শুভ ফল স্থায়ী হইয়া থাকিবে। তাহাই যদি সত্য হয়, তবে যাঁহারা কেবলমাত্র অথবা প্রধানত গবর্মেন্টের কাছে ভালোরূপ ভিক্ষা করিয়া দেশের উন্নতি করিতে চান তাঁহারা কীরূপ দেশহিতৈষী। গবর্মেন্টকে চেতন করাইতে তাঁহারা যে পরিশ্রম করিতেছেন, নিজের দেশের লোককে চেতন করাইতে সেই পরিশ্রম করিলে যে বিস্তর

শুভ ফল হইত। দেশের লোককে তাঁহারা কেবলই জ্বলন্ত উদ্দীপনায় শাক্যসিংহ ব্যাস বাল্মীকি ও ভীষ্মার্জুনের দোহাই দিয়া গবর্মেন্টের কাছে ভিক্ষা চাহিতে বলিতেছেন। তাহার চেয়ে সেই উদ্দীপনাশক্তি ব্যয় করিয়া তাহাদিগকে উপার্জন করিতে বলুন-না কেন? আমরা কি নিজের সমস্ত কর্তব্য কাজ সারিয়া বসিয়া আছি যে, এখন কেবল গবর্মেন্টকে তাহার কর্তব্য স্মরণ করাইয়া দিলেই হইল! সত্য বটে পরাধীন জাতি নিজের সমস্ত হিত নিজে সাধন করিতে পারে না, কিন্তু যতখানি পারে ততখানি সাধন করাই তাহার প্রথম কর্তব্য, গবর্মেন্টের কাছে ভিক্ষা চাওয়া বা গবর্মেন্টকে পরামর্শ দিতে যাওয়া পরে হইতে পারে, বা তাহার আনুষঙ্গিক স্বরূপে হইতে পারে।

গবর্মেন্টের কাছ হইতে আজ আমাদিগকে ভিক্ষা চাহিতে হইতেছে কেন? এ প্রশ্নের উত্তর দিবার আগে আর-একটা প্রশ্ন উঠে। ভিক্ষা কে চায়? যাহার অধিকার নাই সেই চায়; স্বত্বাভাবে অর্থাভাবে এবং কোনো কোনো সময়ে বলের অভাবে যে তণ্ডুল মুষ্টিতে আমার অধিকার নাই সেই তণ্ডুল মুষ্টির জন্য আমাকে ভিক্ষা মাগিতে হয়। আমরা গবর্মেন্টের কাছে ভিক্ষা মাগিতেছি কেন? এখনও আমাদের অধিকার জন্মে নাই বলিয়া, অধিকার বিশেষের জন্য আমরা প্রস্তুত হইতে পারি নাই বলিয়া। যখন কেবল দুই-চারি জন নয়, আমরা সমস্ত জাতি অধিকার বিশেষের জন্য প্রস্তুত হইব, তখন কি আমরা ভিক্ষা চাহিব, তখন আমরা দাবি করিব, গবর্মেন্টকে দিতেই হইবে। আজ গবর্মেন্ট আমাদিগকে স্বায়ত্তশাসন দিয়াছেন, কিন্তু ভিক্ষার মতো দিয়াছেন, অনুগ্রহের মতো দিয়াছেন, যেন পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য দিয়াছেন, এ বিষয়ে যেন নানা সংশয় আছে, নানা বিবেচনার বিষয় আছে, কাল যদি দেখা যায় এ প্রণালী ভালো খাটিল না, তবে কালই হয়তো ইহা বন্ধ করিতে হইবে। কিন্তু যদি আমরা সমস্ত জাতি এই স্বায়ত্তশাসন প্রণালীর জন্য আগে প্রস্তুত হইতে পারিতাম, তবে এ অধিকার আমরা অসংকোচে গ্রহণ করিতাম ও গবর্মেন্টকে অবিচারে দিতে হইত। এইরূপ প্রস্তুত হইবার উপায় কী? তাহার এক উত্তর আছে বিদ্যাশিক্ষার প্রচার। আজ যে ভাবগুলি কেবল গুটি দুই-তিন মাত্র লোক জানে, সেই ভাব সাধারণে যাহাতে প্রচার হয় তাহারই চেষ্টা করা, এমন করা, যাহাতে দেশের গাঁয়ে গাঁয়ে, পাড়ায় পাড়ায়, নিদেন গুটিকতক করিয়া শিক্ষিত লোক পাওয়া যায়, এবং তাঁহাদের দ্বারা অশিক্ষিতদের মধ্যেও কতকটা শিক্ষার প্রভাব ব্যাপ্ত হয়। কেবল ইংরাজি লিখিলে কিংবা ইংরাজিতে বক্তৃতা দিলে এটি হয় না! ইংরাজিতে যাহা শিখিয়াছ তাহা বাংলায় প্রকাশ করো, বাংলা সাহিত্য উন্নতি লাভ করুক ও অবশেষে বঙ্গবিদ্যালয়ে দেশ ছাইয়া সেই সমুদয় শিক্ষা বাংলায় ব্যাপ্ত হইয়া পড়ুক। ইংরাজিতে শিক্ষা কখনোই দেশের সর্বত্র ছড়াইতে পারিবে না। তোমরা দুটি-চারটি লোক ভয়ে ভয়ে ও কী কথা কহিতেছ, সমস্ত জাতিকে একবার দাবি করিতে শিখাও কিন্তু সে কেবল বিদ্যালয় স্থাপনের দ্বারা হইবে, Political agitation-এর দ্বারা হইবে না।

তোমরা স্থির করিয়াছ যে, গবর্মেন্ট যখন একটা কলেজ উঠাইতে চাহিবে বা বিদ্যাশিক্ষা নিয়মের পরিবর্তন করিবে, তোমরা অমনি লাখ-দুই খরচ করিয়া সভা করিয়া, আবেদন করিয়া, বিলাতে লোক পাঠাইয়া, পার্ল্যামেন্টে দরখাস্ত করিয়া, ইংরাজিতে কাঁদিয়া কাটিয়া গবর্মেন্টকে বলিবে, 'ওগো গবর্মেন্ট, এ কালেজ উঠাইয়ো না।' যদি গবর্মেন্ট শুনিল তো ভালো, নহিলে সমস্ত ব্যর্থ হইল। তাহার চেয়ে তোমরা নিজেই একটা কলেজ করো-না কেন? গবর্মেন্টের কলেজের চেয়ে তাহা অনেকাংশে হীন হইতে পারে, শিক্ষার সুবিধা ততটা না থাকিতেও পারে, কিন্তু গবর্মেন্ট কলেজের চেয়ে সেখানে একটি শিক্ষা বেশি পাইবে, তাহার নাম আত্মনির্ভর। কেবলমাত্র পরকে কাজ করিতে অনুরোধ করিবার জন্য তোমরা যে টাকাটা সঞ্চয় করিতেছ, সেই টাকায় নিজে কাজ করিলেই ভালো হয়, এই আমার কথার মর্ম।

যথার্থ দেশোপকার ব্রত অতি গুরুতর ব্রত, সে কাজ অতি কঠিন কাজ— তাহাতে সদ্য সদ্য ফল পাওয়া যায় না কিন্তু নিশ্চয়ই ফল পাওয়া যায়। তাহাতে ছোটো ছোটো কাজে হাত দিতে

হয়, ক্রমে ক্রমে কাজ করিতে হয়, প্রত্যহ সংবাদপত্রের দৈনিক বাহবাই উদ্যমের একমাত্র জীবনধারণের উপায় নহে। অপর পক্ষে যাঁহারা agitation করিয়া কাজ করিতে চান তাঁহাদের কাজ কত সহজ, কত সামান্য! তাঁহাদের কাজ দেশের কোনো অভাব বা হানি দেখিলেই গবর্মেন্টকে তিরস্কার করা। অত্যন্ত সুখের কাজ! পরকে দায়ী করার চেয়ে আর সুখের কী হইতে পারে! পরকে কাজ করিতে স্মরণ করাইয়া দেওয়াই আমার একমাত্র কাজ, সে কাজ সাধন করা আমার কাজ নহে ইহার অপেক্ষা আরাম আর কী আছে! কিছুই করিলাম না, কেবল আর-একজনকে অনুরোধ করিলাম মাত্র, অথচ মনে মনে ভ্রম হইল যেন কাজটাই করিয়া ফেলিলাম। তাহার পরে আবার চারি দিকে একটা কোলাহল উঠিল, নামটা ব্যাপ্ত হইল। যত অল্পে যতটা বেশি হইতে পারে তাহা হইল, তাহার উপরে আবার মনে মনে আত্মপ্রসাদ লাভ করিলাম যে, দেশের জন্য আমি কী না করিলাম? কেবল মুখের কথাতেই এতটা যদি হয় তবে আর কাজ করিবার দরকার কী? একটা ছোটো রকমের দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক : নাইট সাহেব যখন বোম্বাইয়ের সংবাদপত্রের সম্পাদক ছিলেন তখন তিনি সর্বদা দেশীয়দের পক্ষ সমর্থন করিতেন, অবশেষে যখন তিনি অবসর লইলেন, তখন বোম্বাইবাসীরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে অগ্রসর হইল। কিন্তু কী করে, তাহারা তো আমাদের মতো এত কথা কহিতে পারে না কাজেই তাহাদিগকে কাজ করিতেই হইল— তাহাদিগকে টাকা দিতে হইল। এদিকে দেখো, রিয়ক সাহেব আমাদের অসময়ে অনেক উপকার করিয়াছেন— স্বজাতি সমাজ উপেক্ষা এতটা করিতে কে পারে? ইল্‌বর্ট বিলের জন্য ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্য তিনি কতটা লড়িয়াছিলেন তাহা সকলেরই মনে আছে। সেই রিয়ক যখন স্বজাতি-সহায়-বর্জিত হইয়া প্রায় রিক্ত হস্তে দেশে ফিরিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন, তখন কৃতজ্ঞ বাঙালিরা কী করিলেন? বাচস্পতি মহাশয়েরা সভা ডাকিয়া দু-চারিটা মিষ্ট মুখের কথা বলিয়া ও মিষ্টান্ন খাওয়াইয়া এমনি পরিতৃপ্ত হইলেন যে, আর আর কিছু করিবার আবশ্যক জ্ঞান করিলেন না।

সেই জিভের খাটুনিটা আরও বাড়াইবার জন্য ছ লাখ টাকা সংগ্রহ হইতেছে। আমি বলি, এই ছ লাখ টাকা খরচ করিয়া বাঙালিদের জিভের কাজ একটু কমে যদি, তবে এতটা অর্থব্যয় সার্থক হয়!

যাঁহারা যথার্থ দেশহিতৈষী তাঁহারা দেশের অল্প উপকারকে নিজের অযোগ্য বলিয়া ঘৃণা করেন না। তাঁহারা ইহা নিশ্চয় জানেন যে যদি হাঙ্গাম করা উদ্দেশ্য না হয়, দেশের উপকার করাই বাস্তবিক উদ্দেশ্য হয়, তবে অল্পে অল্পে একটু একটু করিয়া কাজ করিতে হয়, তাহাতে এক রাত্রের মধ্যে যশস্বী হওয়া যায় না বটে, মোটা মোটা কথা বলিবার সুবিধা হয় না বটে কিন্তু দেশের উপকার হয়। তাঁহারা ইহা জানেন যে, মস্ত মস্ত উদ্দেশ্য জাহির করিলে দেশের যত না কাজ হয়, ছোটো ছোটো কাজ করিলে তাহার চেয়ে বেশি হয়। ন্যাশনল ফন্ড সংগ্রহ করিয়া একেবারে সমস্ত ভারতবর্ষের উপকার করিব এতটা সংকল্প না করিয়া যদি কেবল বাংলা দেশের জন্য ফন্ড সংগ্রহ করা হয় ও বাংলা দেশের অভাবের প্রতিই দৃষ্টিপাত করা হয়, তাহা হইলে তাহা সহজসাধ্য হয় ও সম্ভবপর হয়। শুনিতে তেমন ভালো হয় না বটে, কিন্তু কাজের হয়। যদি ভারতবর্ষের প্রত্যেক বিভাগ নিজের নিজের অভাব মোচন ও উন্নতি সাধনের জন্য ধন সঞ্চয় করিয়া রাখেন ও বিশেষ আবশ্যকের সময় সকলে একত্রে মিলিয়া যদি দেশহিতকর কাজে প্রবৃত্ত হন তবে তাহাতেই বাস্তবিক উপকার হইবে। নহিলে মস্ত একটা নাম লইয়া বৃহৎ কতকগুলা উদ্দেশ্যের বোঝা লইয়া ন্যাশনল ফন্ড নামক একটা নড়নচড়নহীন অতি বৃহৎ জড়পদার্থ প্রস্তুত হইবে।

উপসংহারে বলিতেছি কেবলমাত্র Political agitation লইয়া থাকিলে আমরা আরও অকেজো হইয়া যাইব, আমরা নিজের দায় পরের ঘাড়ে চাপাইতে শিখিব— দুটো কথা বলিয়াই আপনাকে খালাস মনে করিব। একে সেই দিকেই আমাদের সহজ গতি, তাহার উপর আবার

এত আড়ম্বর করিয়া আমাদের সেই গুণগুলির চর্চা করিবার আবশ্যক দেখিতেছি না। তবে যদি কাজ করাই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য হয় ও অসমর্থ পক্ষে ভিক্ষা চাওয়া ইহার গৌণ উদ্দেশ্য হয়, তবেই ইহার দ্বারা আমাদের দেশের স্থায়ী উন্নতি হইবে। নচেৎ ঠিক উন্নতি হইতেছে বলিয়া মনে হইবে, অনুষ্ঠানের ত্রুটি হইবে না বরং হাঁক-ডাক কিছু বেশি হইবে তথাপি দেশের অস্থি-মজ্জাগত উন্নতি হইবে না!

ভারতী
কার্তিক ১২৯০

টৌন্‌হলের তামাশা

সেদিন টাউনহলে একটা মস্ত তামাশা হইয়া গিয়াছে। দুই-চারিজন ইংরাজে মিলিয়া আশ্বাসের ডুগডুগি বাজাইতেছিলেন ও দেশের কতকগুলি বড়োলোক বড়ো বড়ো পাগড়ি পরিয়া নাচন আরম্ভ করিয়া দিয়াছিলেন।

দেশের লোক অবাক হইয়া গেল। শীতের সময় কলিকাতায় অনেক প্রকার তামাশা আসিয়া থাকে, সার্কস্‌, অপেরা ইত্যাদি। কিন্তু বড়োলোকের নাচনী সচরাচর দেখা যায় না।

সাহেব বলিল, তাই, তাই, তাই; অমনি বড়ো বড়ো খোকারা হাততালি দিতে লাগিল!

কিন্তু ভালো দেখাইল না। কারণ, নাচন কিছু সকলকেই মানায় না। তোমাদের এ বয়সে, এ শরীরে এত সহজে যদি নাচিয়া ওঠ, সে একটা তামাশা হয় সন্দেহ নাই, রাস্তার লোকেরা হো হো করিয়া হাসিতে থাকে, কিন্তু তাই বলিয়া আপনার লোকেরা তো আর হাসিতে পারে না। তাহাদের নিতান্ত লজ্জা বোধ হয়, দুঃখ হয়, ধিক ধিক করিয়া মুখ ফিরাইয়া, নতশির হইয়া চলিয়া যায়, সুতরাং ইহাকে ঠিক তামাশা বলা যায় না!

কিন্তু যাই বল, সাহেবদিগকে ধন্য বলিতে হয়। যাঁহারা উইল্‌সনের সার্কস্‌ দেখিতে গিয়াছেন তাঁহারা সকলেই দেখিয়াছেন ইংরাজ ঘোড়া নাচাইয়াছেন এবং অরণ্যের বড়ো বড়ো প্রাণীদের পোষ মানাইয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা যে বাংলার গোটাকতক জমিদার ধরিয়া আনিয়া এত সহজে বশ করিতে পারিবেন এ কে জানিত?

বশ করা কিছু আশ্চর্য নয়, কিন্তু ইহার কিছু পূর্বেই যে লাথি ঝাঁটা বৈ আর কিছু খোরাকি জোটে নাই, সেগুলি যে এত শীঘ্র হজম করিয়া ফেলিয়া দানার লোভে তোমরা উহাদের কাছে ঘেঁসিয়া যাইতেছ এইটেই আশ্চর্য!

ডারুয়িন বলিয়াছেন, প্রাণীর ক্রমোন্নতি সহকারে মানুষের কাছাকাছি আসিয়া তাহার লেজ খসিয়া যায়। যেমন শারীরিক লেজ খসিয়া যায়, তেমনি তাহার আনুষঙ্গিক মানসিক লেজটাও খসিয়া যায়। মান-অপমান তুচ্ছ করিয়া, লাথি ঝাঁটা শিরোধার্য করিয়া কেবল একটুখানি সুবিধার অনুরোধে বাপান্তবাগীশের গা ঘেঁসিয়া গেলে মানসিক লেজের অস্তিত্ব প্রকাশ পায়। সে জিনিসটা যদি থাকে তো চাপিয়ে রাখো, অত নাড়িতেছ কেন? ওটা দেখিতে পাইলে পণ্ডিতেরা তোমাদিগকে হীন ও মহৎ প্রাণীদের মধ্যস্থিত missing link বলিয়া গণ্য করিতেও পারে!

তোমাদের একটা কথা আছে যে, 'কাহারও সহিত এক বিষয়ে মতভেদ হইলে অন্য বিষয়ে মতের ঐক্য সত্ত্বেও মিশিতে বাধা কী?' সে তো ঠিক কথা। কিন্তু মতের আবার ইতরবিশেষ আছে। 'ক' কখন কহিল, সূর্য পশ্চিমে ওঠে, তখন 'খ'য়ের সহিত এ সম্বন্ধে তাহার সম্পূর্ণ মতভেদ সত্ত্বেও 'ক'য়ে 'খ'য়ে গলাগলি ভাব থাকার আটক নাই। কিন্তু যখন 'ক'য়ের মত 'খ' এবং তাহার বাপ-পিতামহ সকলেই চোর, মিথ্যাবাদী ও প্রবঞ্চক, তখন এ মতভেদ সত্ত্বেও উভয়ের আর ভালোরূপ বনিবনাও হওয়া সম্ভব নহে।

যাহারা দেশকে অপমান করে দেশের কোনো সুপুত্র তাহাদের সহিত সম্পর্ক রাখিতে পারে

না। একটুখানি সুযোগের প্রত্যাশায় যাহারা দাঁতের পাটি সমস্তটা বাহির করিয়া তাহাদের সহিত আত্মীয়তা করিতে যাইতে পারে তাহাদিগকে দেখিলে নিতান্তই ঘৃণা বোধ হয়।

তোমরা বলিবে, এ-সকল কথা বালকেরই মুখে শোভা পায়, ইহা পাকা কাজের লোকের মতো কথা হইল না। কার্য উদ্ধার করিতে হইলে অত বিচার করিয়া চলা পোষায় না। বড়ো বড়ো sentimentগুলি ঘরের শোভা সম্পাদনের জন্য, সচ্ছল অবস্থায় বড়ো বড়ো ছবির মতো তাহাদিগকে ঘরে টাঙাইয়া রাখিয়াছিলাম; কিন্তু যখন গাঁঠের কড়িতে টান পড়িল, তখন সুবিধামতো তাহাদের একটাকে টাউনহলে নিলামে highest bidder-দের বিক্রি করিয়া আসিলাম, ইহাতে আর দোষ হইয়াছে কী? Political Economy-র মতে ইহাতে দোষ কিছুই হয় নাই, যেমন বাজার দেখিয়াছ তেমনি বিক্রয় করিয়াছ এতবড়ো দোকানদারি বুদ্ধি কয়জনের মাথায় জোগায়। কিন্তু তাই যদি হইল, তোমরাই যদি এমন কাজ করিতে পার ও এমন কথা বলিতে পার, তবে ভারতবর্ষ এতকাল তাহার নিজের ক্ষীরটুকু সরটুকু খাওয়াইয়া তোমাদিগকে পোষণ করিল কেন? যাহারা প্রত্যহ একমুষ্টি উদরান্নের জন্য প্রাণপণ করিয়া মরে, এতবড়ো ভয়ংকর কাজের লোক হওয়া বরঞ্চ তাহাদিগকে শোভা পায়, বড়ো বড়ো sentiment বরঞ্চ তাহাদিগের নিকটেই মহার্ঘ বলিয়া গণ্য হইতে পারে কিন্তু তোমরা যে জন্মাবধি এতকাল এত অবসর পাইয়া আসিয়াছ একটা মহৎ sentiment চর্চা করিতেও কি পারিলে না? তবে আর কুলীন ধনী পরিবারদিগকে দেশ কেন পোষণ করিতেছে? তাহারা না খাটিবে, না তাহাদের অবকাশের সদ্‌ব্যবহার করিবে! দেশের সমস্ত স্বাস্থ্য শোষণ করিয়া মস্ত মস্ত জমকালো বিস্ফোটকের মতো শোভা পাওয়াই কি তাহাদের একমাত্র কাজ! আমাদের বিশ্বাস ছিল, কুলক্রমাগত সচ্ছল সম্ভ্রান্ত অবস্থা উদরতা ও মহত্ত্ব সঞ্চয়ের সাহায্য করে— এরূপ কুলীনেরা সামান্য হীন সুবিধার খাতির অগ্রাহ্য করে ও মানের কাছে প্রাণকে তুচ্ছ জ্ঞান করে— দেশের সম্ভ্রম তাহারাই রাখে; আর তাই যদি না হয়, একটু মাত্র কাল্পনিক সুবিধার আশা পাইলেই অমনি তাহার যদি নীচত্ব করিতে প্রস্তুত হয়, নিজের অপমান ও দেশের অপমানকে গুলি-পাকাইয়া অম্লানবদনে গলাধঃকরণ করিয়া ফেলিতে পারে তবে তাহারা যত শীঘ্র সরিয়া পড়ে ততই দেশের পক্ষে মঙ্গল। দেখিতেছি চোখে ঠুলি পরিয়া তাহারা কেবল টাকার ঘানি টানিয়া দুই-চারি হাত জমির মধ্যে ঘুরিয়া মরিতেছে, কিছুই উন্নতি হয় নাই, এক পা অগ্রসর হইতে পারে নাই! মান-সম্ভ্রম-মহত্ত্ব সমস্তই ঘানিতে ফেলিয়া কেবল তেলই বাহির করিতে হইবে! বোধ করি স্বদেশকে ও বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে তোমাদের ওই ঘানিতে ফেলিতে পার যদি একটুখানি তেল বাহির হয়! সমস্ত জীবন তোমাদের ওই ঘানি-দেবতাকে প্রদক্ষিণ করিয়া মরো ও উহার ক্যাঁচ্ ক্যাঁচ্ শব্দে জগতের সমস্ত সংগীত ডুবিয়া যাক!

তোমরা হিন্দু, তোমরা জাতিভেদ মানিয়া থাক। আমরণ তোমাদের সন্তানের যদি বিবাহ না হয় তথাপি সহস্র সুবিধা সত্ত্বেও একটা ফিরিঙ্গির সন্তানের সহিত তাহার বিবাহ দাও না, কেন? না শাস্ত্রে নিষেধ আছে। কিন্তু আর-একটি অলিখিত শাস্ত্র এবং মহত্ত্বর জাতিভেদ আছে, যদি সে শাস্ত্রজ্ঞান ও সে সহৃদয়তা থাকিত, তবে একটুখানি সুবিধার আশায় গোটাকতক অ্যাংলো-ইন্ডিয়নের সহিত মিলনসূত্রে বদ্ধ হইতে পারিতে না! সকলই প্রজাপতির নির্বন্ধ বলিতে হইবে। নহিলে তোমরা যত শ্যাম তনু, ক্ষীণ, ক্ষুদ্রগণ ঘড়ির চেনটি পরিয়া ললিত হাস্যে মধুর সম্ভাষণে ওই বড়ো বড়ো গোরাদের আদর কাড়িতে গিয়াছ ও কৃতকার্য হইয়াছ ইহা কী করিয়া সম্ভব হইল। এ তো প্রকাশ্যে, এ তবু ভালো! কিন্তু বিশ্বাস হয় না লোকে কানাকানি করিতেছে, কালায় গোরায় গোপনে নাকি গান্ধর্ব মিলন চলিতেছে! শুনিতেছি নাকি কানে কানে কথা, হাতে হাতে টেপাটেপি ও পরস্পর সুবিধার মালাবদল হইতেছে।

সুবিধাই বা কতটুকু! তোমরা নিজে কিছু কম লোক নও। রাজ-সরকারে তোমাদের যথেষ্ট মান-মর্যাদা, খ্যাতি-প্রতিপত্তি আছে। তাহা ছাড়া, তোমরা নিতান্ত মুখচোরাও নও যে, তোমাদের

হইয়া আর-একজনকে কথা কহিতে হইবে। তোমরা বেশ বলিতে পার লিখিতে পার, তোমাদের কথা গবর্মেন্ট কান পাতিয়া শুনিয়া থাকেন। তোমাদের টাকা আছে, পদ আছে, প্রতিপত্তি আছে, তবে দুঃখটা কিসের। তবে কেন ওই খোদাবন্দ্‌দিগের হাঁটুর কাছে হামাগুড়ি দিয়া বেড়াইতেছ! যাহারা সকল বিষয়েই অনবরত গবর্মেন্টের অন্ধ-বিদ্রোহিতা করিয়া আসিতেছে তাহাদিগকে কামানস্বরূপ করিয়া বারুদ ঠাসিয়া আগুন লাগাইয়া গবর্মেন্টের বিরুদ্ধে গোলাবর্ষণ করিতে থাকিলে কি সরকার বড়ো খুশি হইবে।

কী আর বলিব! ইহা এক অপূর্ব অথচ শোচনীয় দৃশ্য। আমাদের দেশের বড়ো বড়ো মাথাগুলা যে এত সহজেই সোডা-ওয়াটারের ছিপির মতো চারি দিকে টপাটপ উড়িতে আরম্ভ করিয়াছে ও জলধারা উচ্ছ্বসিত হইয়া বক্ষ ভাসাইয়া প্রবাহিত হইতেছে এ দৃশ্যে মহত্ত্ব কিছুই না। ইহাতে বঙ্গদেশের বর্তমানের জন্য লজ্জা বোধ হয় ও ভবিষ্যতের জন্য আশঙ্কা জন্মে।

ভারতী
পৌষ ১২৯০

অকাল কুষ্মাণ্ড

সাবিত্রী লাইব্রেরির সাংবৎসরিক উৎসব উপলক্ষে লিখিত

পরামর্শ দেওয়া কাজটা না কি গুরুতর নহে, অথচ যিনি পরমর্শ দেন তিনি সহসা অত্যন্ত গুরুতর হইয়া উঠেন, এই নিমিত্ত পরমার্শদাতার অভাব লইয়া সমাজ বা ব্যক্তিবিশেষকে বোধ করি কখনো আক্ষেপ করিতে হয় নাই। নিতান্ত যে গরীব, যাহার একবেলা এক কুন্‌কে চাল জোটে, সে তিন সন্ধে তিন বস্তা করিয়া পরামর্শ বিনি খরচায় ও বিনি মাসুলে পাইয়া থাকে— আশ্চর্য এই যে তাহাতে তাহার পেট ভরিবার কোনো সহায়তা করে না। বিশেষত কতকগুলি নিতান্ত সত্য কথা আছে তাহারা এত সত্য যে সচরাচর কোনো ব্যবহারে লাগে না অর্থাৎ তাহারা এত সস্তা যে, তাহাদের পয়সা দিয়া কেহ কেনে না— কিন্তু গায়ে পরিয়া বদান্যতা করিবার সময় তেমন সুবিধার জিনিস আর কিছু হইতে পারে না। যৎপরোনাস্তি সত্য কথাগুলির দশা কী হইত যদি সংসারে পরামর্শদাতার কিছুমাত্র অভাব থাকিত! তাহা হইলে কে বলিত, 'বাপু সাবধান হইয়া চলিয়ো, বিবেচনাপূর্বক কাজ করিয়ো, মনোযোগপূর্বক বিষয়-আশয় দেখিয়ো; এগ্‌জামিন পাস হইতে চাও তো ভালো করিয়া পড়া মুখস্থ করিয়ো— খামকা পড়িয়া হাত-পা ভাঙিয়ো না, খবরদার জলে ডুবিয়া মরিয়ো না— ইত্যাদি?' এই কথাগুলো কোম্পানির মাল হইয়া পড়িয়াছে, দরিয়ায় ঢালিতে হইলে ইহাদের প্রতি আর কেহ মায়া-মমতা করে না!

অনেক ভালো ভালো পরামর্শও দুরবস্থায় পড়িয়া সস্তা হইয়া উঠিয়াছে। সহসা তাহাদের এত বেশি আমদানি হইয়া পড়িয়াছে যে, তাহাদের দাম নাই বলিলেও হয়। যাহাদের মূলধন কম, এমন সাহিত্য-দোকানদার মাত্রেই তাড়াতাড়ি এই-সকল সস্তা ও পাঁচরঙা পদার্থ লইয়া দৈনিকে, সাপ্তাহিকে, পাক্ষিকে, মাসিকে, ত্রৈমাসিকে, পুঁথিতে চটিতে, এক কলম, দু কলম, এক পেজ, দু পেজ, এক ফর্মা দু ফর্মা, যাহার যেমন সাধ্য পসরা সাজাইয়া ভারি হাঁকডাক আরম্ভ করিয়াছে। দেশকে উপদেশ এবং আদেশ করিতে কেহই পরিশ্রমের ত্রুটি করেন না; রাস্তায় যত লোক চলিতেছে তাহা অপেক্ষা ঢের বেশি লোক পথ দেখাইয়া দিতেছে। (বাংলাটা Finger-Post-এরই রাজত্ব হইয়া উঠিল।) কিন্তু তাহাদের এই অত্যন্ত গুরুতর কর্তব্য সমাধান করিতে তাহারা এত বেশি ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়াছে যে, পথিকেরা চলিবার রাস্তা পায় না। সহসা সকলেরই একমাত্র ধারণা হইয়াছে যে, দেশটা যে রসাতলে যাইতেছে সে কেবলমাত্র উপদেশের অভাবে। কিন্তু কেহ কেহ এমনও বলিতেছেন যে, ঢের হইয়াছে— গোটাকতক কুড়োনো কথা ও আর তিনশোবার

করিয়া বলিয়ো না— ওটাতে যা-কিছু পদার্থ ছিল, সে তোমাদের আওয়াজের চোটে অনেক কাল হইল নিকাশ হইয়া গিয়াছে। আমাদের এই ক্ষুদ্র সাহিত্যের ডোঙাটা একটুখানি হাল্কা করিয়া দাও, বাজে উপদেশ ও বাঁধি পরামর্শ ইহার উপর আর চাপাইয়ো না— বস্তার উপর বস্তা জমিয়াছে, নৌকাডুবি হইতে আর বিস্তর বিলম্ব নাই— কাতর অনুরোধে কর্ণপাত করো, ওগুলো নিতান্তই অনাবশ্যক। তুমি তো বলিলে অনাবশ্যক! কিন্তু ওগুলো যে সস্তা! মাথার খোলটার মধ্যে একটা সিকি পয়সা ও আধুলি বৈ আর কিছু নাই, মাথা নাড়িলে সেই দুটোই ঝম্‌ঝম্‌ করিতে থাকে, মনের মধ্যে আনন্দ বোধ হয়— সেই দুটো লইয়াই কারবার করিতে হইবে— সুতরাং দুটো-চারটে অতি জীর্ণ উপদেশ পুরোনো তেঁতুলের সহিত শিকেয় তোলা থাকে— বুদ্ধির ডোবা হইতে এক ঘটি জল তুলিয়া তাহাতে ঢালিয়া দিলে তাহাই অনেকটা হইয়া ওঠে এবং তাহাতেই গুজ্‌রান্‌ চলিয়া যায়। একটা ভালো জিনিস সস্তা হইলে এই প্রকার খুচরা দোকানদার মহলে অত্যন্ত আনন্দ পড়িয়া যায়। দেখিতেছেন না, আজকাল ইহাদের মধ্যে ভারি স্ফূর্তি দেখা যাইতেছে! সাহিত্যের ক্ষুদে পিঁপড়েগণ ছোটো ছোটো টুকরো মুখে লইয়া অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া ও অত্যন্ত গর্বের সহিত সার বাঁধিয়া চলিয়াছে! এখানে একটা কাগজ, ওখানে একটা কাগজ, সেখানে একটা কাগজ, এক রাত্রের মধ্যে হুস করিয়া মাটি ফুঁড়িয়া উঠিতেছে। ইহা হইতে স্পষ্টই প্রমাণ হইতেছে যে, আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকেরা যখন ইংরিজি বিদ্যাটাকে কলা দিয়ে চটকাইয়া ফলার করিতেছিলেন, তখন তাঁহাদের পাতের চার দিকে পোলিটিকল্‌ ইকনমি ও কন্‌স্টিট্যুশনল হিস্ট্রির, বর্কলের ও মিলের এবং এ-ও-তার কিছু কিছু গুঁড়া পড়িয়াছিল— সাহিত্যের ক্ষুধিত উচ্ছিষ্টপ্রত্যাশী এক দল জীববিশেষ তাহাদের অসাধারণ ঘ্রাণশক্তি প্রভাবে শুঁকিয়া শুঁকিয়া তাহা বাহির করিয়াছে। বড়ো বড়ো ভাবের আধখানা শিকিখানা টুকরা পথের ধুলার মধ্যে পড়িয়া সরকারি সম্পত্তি হইয়া উঠিয়াছে, ছোটো ছোটো মুদি ও কাঁসারিকুলতিলকগণ পর্যন্ত সেগুলোকে লইয়া রাস্তার ধারে দাঁড়াইয়া ইঁটপাটকেলের মতো ছোড়াছুড়ি করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এত ছড়াছড়ি ভালো কি না সে বিষয়ে কিছু সন্দেহ আছে— কারণ, এরূপ অবস্থায় উপযোগী দ্রব্যসকলও নিতান্ত আবর্জনার সামিল হইয়া দাঁড়ায়— অস্বাস্থ্যের কারণ হইয়া উঠে এবং সমালোচকদিগকে বড়ো বড়ো ঝাঁটা হাতে করিয়া ম্যুনিসিপলিটির শকট বোঝাই করিতে হয়।

এমন কেহ বলিতে পারেন বটে যে, ভালো কথা মুখে মুখে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িলে তাহাতে হানি যে কেন হইবে বুঝিতে পারিতেছি না। হানি হইবার একটা কারণ এই দেখিতেছি— যে কথা সকলেই বলে, সে কথা কেহই ভাবে না। সকলেই মনে করে, আমার হইয়া আর পাঁচশো জন এ কথাটা ভাবিয়াছে ও ভাবিতেছে, অতএব আমি নির্ভাবনায় ফাঁকি দিয়া কথাটা কেবল বলিয়া লই-না কেন? কিন্তু ফাঁকি দিবার জো নাই— ফাঁকি নিজেকেই দেওয়া হয়। তুমি যদি মনে করে একটা ঘোড়াকে স্থায়ীরূপে নিজের অধিকারে রাখিতে হইলে আর কিছুই করিতে হইবে না, কেবল রশারশি দিয়া খুব শক্ত করিয়া বাঁধিয়া রাখিলেই হইল, তাহাকে দানা ছোলা দিবার কোনো দরকার নাই— এবং সেইমতো আচরণ কর, তাহা হইলে কিছুদিনের মধ্যে দেখিবে দড়িতে একটা জিনিস খুব শক্তরূপে বাঁধা আছে বটে কিন্তু সেটাকে ঘোড়া না বলিলেও চলে। তেমনি ভাষারূপ দড়িদড়া দিয়া ভাবটাকে জিহ্বার আস্তাবলে দাঁতের খুঁটিতে খুব শক্ত করিয়া বাঁধিয়া রাখিলেই যে সে তোমার অধিকারে চিরকাল থাকিবে তাহা মনে করিয়ো না— তিন সন্ধ্যা তাহার খোরাক জোগাইতে হইবে। যে ভাবনার মাটি ফুঁড়িয়া যে কথাটি উদ্ভিদের মতো বাড়িয়ে উঠিয়াছে, সেই মাটি হইতে সেই কথাটিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইলে সে আর বেশিদিন বাঁচিতে পারে না। দিন দুই-চার সবুজ থাকে বটে ও গৃহশোভার কাজে লাগিতে পারে কিন্তু তার পর যখন মরিয়া যায় ও পচিয়া উঠে তখন তাহার ফল শুভকর নহে। একটা গল্প আছে, একজন অতিশয় বুদ্ধিমান লোক বিজ্ঞানের উন্নতি সাধনের উদ্দেশে একটা পরীক্ষায় নিযুক্ত ছিলেন, তিনি দেখিতেছিলেন ঘোড়াকে

নিয়মিতরূপে না-খাওয়ানো অভ্যাস করাইলে সে টেঁকে কি না। অভ্যাসের গুণে অনেক হয় আর এটা হওয়াই বা আশ্চর্য কী! কিন্তু সেই বিজ্ঞানহিতৈষী বুদ্ধিমান ব্যক্তি সম্প্রতি এই বলিয়া আক্ষেপ করিতেছেন যে— প্রতিদিন একটু একটু করিয়া ঘোড়ার খোরাক কমাইয়া যখন ঠিক একটিমাত্র খড়ে আসিয়া নাবিয়াছি, এমন সময়টিতে ঘোড়াটা মারা গেল! নিতান্ত সামান্য কারণে এত বড়ো একটা পরীক্ষা সমাপ্ত হইতেই পারিল না, ও এ বিষয়ে বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত নিতান্ত অসম্পূর্ণ রহিয়াই গেল। আমরাও বুদ্ধিমান বিজ্ঞানবীরগণ বোধ করি কতকগুলি ভাব লইয়া সেইরূপ পরীক্ষা আরম্ভ করিয়াছি— কিছুমাত্র ভাবিব না— অথচ গোটাকতক বাঁধা ভাব পুষিয়া রাখিব, শুধু তাই নয় চব্বিশ ঘণ্টা তাহাদের ঘাড়ে চড়িয়া রাস্তার ধুলা উড়াইয়া দেশময় দাপাদাপি করিয়া বেড়াইবে, অবশেষে পরীক্ষা সম্পূর্ণ হইবার ঠিক পূর্বেই দেখিব, কথা সমস্তই বজায় আছে অথচ ভাবটার যে কী খেয়াল গেল যে হঠাৎ মরিয়া গেল! অনেক সময়ে প্রচলিত কথার বিরুদ্ধ কথা শুনিলে আমাদের আনন্দ হয় কেন? কারণ, এই উপায়ে ডোবায় বদ্ধ স্তব্ধ নিস্তরঙ্গ প্রচলিত মতগুলি গুরুতর নাড়া পাইয়া আন্দোলনের প্রভাবে কতকটা স্বাস্থ্যজনক হয়। যে-সকল কথাকে নিতান্তই সত্য মনে করিয়া নির্ভাবনায় ও অবহেলায় ঘরের কোণে জমা করিয়া রাখিয়াছিলাম, তাহাদের বিরুদ্ধে সন্দেহ উত্থাপিত হইলে ফের তাহাদের টানিয়া বাহির করিতে হয়, ধুলা ঝাড়িয়া চোখের কাছে লইয়া নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিতে হয়— ও এইরূপে পুনশ্চ তাহারা কতকটা ঝকঝকে হইয়া উঠে। যতবড়ো বুদ্ধিমানই হউন-না-কেন সত্য কথার বিরুদ্ধে কাহারও কথা কহিবার সাধ্য নাই— তবে যখন কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তির নিকট হইতে প্রচলিত সত্যের বিপক্ষে কোনো কথা শুনা যায় তখন একটু মনোযোগপূর্বক ভাবিয়া দেখিলেই দেখা যায় যে, সেটা একটা ফাঁকি মাত্র। তিনি সেই কথাটাই কহিতেছেন, অথচ ভান করিতেছেন যেন তাহার সহিত ভারি ঝগড়া চলিতেছে। এইরূপে নির্জীব কথাটার অন্ত্যেষ্টিসংকার করিয়া আর-একটা নূতন কথার দেহে সত্যকে প্রতিষ্ঠা করা হয়— দেখিতে ঠিক বোধ হইল যেন সত্যটাকেই পুড়াইয়া মারিলেন, কিন্তু আসলে কী করলেন, না, জরাগ্রস্ত সত্যের দেহান্তর প্রাপ্তি করাইয়া তাহাকে অমর যৌবন দান করিলেন।

য়ুরোপে যাহা হইয়াছে তাহা সহজে হইয়াছে, আমাদের দেশে যাহা হইতেছে তাহা দেখাদেখি হইতেছে এইজন্য ভারি কতকগুলি গোলযোগ বাধিয়াছে। সমাজের সকল বিভাগেই এই গোলযোগ উত্তরোত্তর পাকিয়া উঠিতেছে। আমরা য়ুরোপীয় সভ্যতার আগডালে বসিয়া আনন্দে দোল খাইতেছি, তাহার আগাটাই দেখিতেছি, তাহার যে আবার একটা গোড়া আছে ইহা কোনোক্রমেই বিশ্বাস হয় না। কিন্তু এরূপ ভ্রম শাখামৃগেরই শোভা পায়। যে কারণে এতটা কথা বলিলাম তাহা এই— য়ুরোপে দেখিতে পাই বিস্তর পাক্ষিক ত্রৈমাসিক বার্ষিক সাময়িক পত্র প্রকাশিত হয়, ইহা সেখানকার সভ্যতার একটা নিদর্শন বলিতে হইবে। আমাদের দেশেও বিস্তর সাময়িক পত্র বাহির হইতে আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু ইহাই লইয়া কি উল্লাস করিব? এ বিষয়ে আমি কিন্তু একটুখানি ইতস্তত করিয়া থাকি। আমার সন্দেহ হয় ইহাতে ঠিক ভালো হইতেছে কি না। য়ুরোপে লেখক ও চিন্তাশীল ব্যক্তি বিস্তর আছে তাই কাগজপত্র আপনা হইতে জাগিয়া উঠিতেছে। আমরা তাই দেখাদেখি আগেভাগে কাগজ বাহির করিয়া বসিয়া আছি, তার পরে লেখক লেখক করিয়া চতুর্দিকে হাৎড়াইয়া বেড়াইতেছি। ইহাতে যে কুফল কী হইতে পারে, তাহা ক্রমশ ব্যক্ত করা যাইতেছে।

আমার একটি বিশ্বাস এই যে, য়ুরোপেই কী আর অন্য দেশেই কী, সাহিত্য সম্বন্ধে নিয়মিত জোগান দিবার ভার গ্রহণ করা ভালো নয়; কারণ, তাহা হইলে দোকানদার হইয়া উঠিতে হয়। সাহিত্যে যতই দোকানদারি চলিবে ততই তাহার পক্ষে অমঙ্গল। প্রথমত, ভাবের জন্য সবুর করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না, লেখাটাই সর্বাগ্রে আবশ্যক হইয়া পড়ে। কিন্তু ইহা অপেক্ষাও গুরুতর আশঙ্কার বিষয় আরেকটি আছে। ইংরাজেরা দাস-ব্যবসায় উঠাইয়া দিয়াছেন— কিন্তু

স্বাধীন ভাবগুলিকে ক্রীতদাসের মতো কেনাবেচা করিবার প্রথা তাঁহারাই অত্যন্ত প্রচলিত করিয়াছেন। এইরূপে শতসহস্র ভাব প্রত্যহই নিতান্ত হেয় হইয়া পড়িতেছে। স্বাধীন অবস্থায় তাহারা যেরূপ গৌরবের সহিত কাজ করিতে পারে, দাসত্বের জোর-জবরদস্তিতে ও অপমানে তাহারা সেরূপ পারে না ও এইরূপে ইংরাজিতে যাহাকে cant বলে সেই cant-এর সৃষ্টি হয়। ভাব যখন স্বাধীনতা হারায়, দোকাদারেরা যখন খরিদ্দারের আবশ্যক বিবেচনা করিয়া তাহাকে শৃঙ্খলিত করিয়া হাটে বিক্রয় করে তখন তাহাই cant হইয়া পড়ে। য়ুরোপের বুদ্ধি ও ধর্মরাজ্যের সকল বিভাগেই cant নামক একদল ভাবের শূদ্রজাতি সৃজিত হইতেছে। য়ুরোপের চিন্তাশীল ব্যক্তিরা আক্ষেপ করেন যে, প্রত্যহ Theological cant, Sociological cant, Political cant-এর দলপুষ্টি হইতেছে। আমার বিশ্বাস তাহার কারণ— সেখানকার বহুবিস্তৃত সাময়িক সাহিত্য ভাবের দাস-ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছে। কেননা, পূর্বে যাহা বলা হইয়াছে তাহাতেই বুঝাইতেছে— স্বাধীন ভাবেরই অবস্থান্তর cant। যদি কোনো সহৃদয় ব্যক্তি cant-এর দাসত্বশৃঙ্খল খুলিয়া দিয়া পুনশ্চ তাহাকে মুক্ত করিয়া দেন, তবে সেই আবার স্বাধীন ভাব হইয়া ওঠে— এবং তাহাকেই সকলে বহুমান করিয়া পূজা করিতে থাকে। সত্যকথা মহৎকথাও দোকানদারীর অনুরোধে প্রচার করিলে অনিষ্টজনক হইয়া ওঠে। যথার্থ হৃদয় হইতে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিলে যে কথা দেবতার সিংহাসন টলাইতে পারিত, সেই কথাটাই কি না ডাকমাসুল সমেত সাড়ে তিন টাকা দরে মাসহিসাবে বাঁটিয়া-বাঁটিয়া ছেঁড়া কাগজে মুড়িয়া বাড়ি-বাড়ি পাঠান। যাহা সহজ প্রকৃতির কাজ তাহারও ভার নাকি আবার কেহ গ্রহণ করিতে পারে! কোনো দোকানদার বলুক দেখি সে মাসে মাসে এক-একটা ভাগীরথী ছাড়িবে, সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার সময় লাটাই বাঁধিয়া ধূমকেতু উড়াইবে বা প্রতি শনিবারে ময়দানে একটা করিয়া ভূমিকম্পের নাচ দেখাইবে। সে হুঁকার জল ফিরাইতে, ঘুড়ি উড়াইতে ও বাঁদর নাচাইতে পারে বলিয়া যে অম্লান বদনে এমনতরো একটা গুরুতর কার্য নিয়মিতরূপে সম্পন্ন করিবার ভার গ্রহণ করিতে চাহে, ইহা তাহার নিতান্ত স্পর্ধার কথা। আজকাল খাতায় টুকিয়া রাখিতে হয়— অমুক দিন ঠিক অমুক সময়ে পকেট হইতে রুমালটি বাহির করিয়া দেশের জন্য কাঁদিব— তাহার পরদিন সাড়ে তিনটের সময় সহসা দেশের লোকের কুসংস্কার কিছুতেই বরদাস্ত করিতে পারিব না ও তাহাই লইয়া ঠিক তিনপোয়া-আন্দাজ রাগ ও একপোয়া-আন্দাজ দুঃখ করিব; বন্ধু যখন নিমন্ত্রণ করিতে আসেন— উনত্রিংশে চৈত্র ১১টার সময় আমার ওখানে আহার করিতে আসিয়ো, তখন আমাকে বলিতে হয়— 'না ভাই তাহা পারিব না। কারণ ত্রিংশে চৈত্র আমার কাগজ বাহির হইবে, অতএব কাল ঠিক এগারোটার সময় দেশের অনৈক্য দেখিয়া আমার হৃদয় ভয়ানক উত্তেজিত হইয়া উঠিবে এবং ভীষ্ম দ্রোণ ও অশ্বত্থামাকে স্মরণ করিয়া আমাকে অতিশয় শোকাতুর হইতে হইবে।' য়ুরোপে লেখক বিস্তর আছে, সেখানে তবু এতটা হানি হয় না, কিন্তু হানি কিছু হয়ই। আর, আমাদের দেশে লেখক নাই বলিলেও হয়, তবুও তো এতগুলো কাগজ চলিতেছে। কেমন করিয়া চলে? লেখার ভান করিয়া চলে। সহৃদয় লোকদের হৃদয়ে অন্তঃপুরবাসী পবিত্র ভাবগুলিকে সাহিত্যসমাজের অনার্যেরা যখনি ইচ্ছা অসংকোচে তাহাদের কঠিন মলিন হস্তে স্পর্শ করিয়া অশুচি করিয়া তুলিতেছে। এই-সকল ম্লেচ্ছেরা মহৎবংশোদ্ভব কুলীন ভাবগুলির জাত মারিতেছে। কঠিন প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া তবে তাহাদিগকে সমাজে তুলিতে হয়। কারণ, সকল বিষয়েই অধিকারী ও অনধিকারী আছে। লেখার অধিকারী কে? না, যে ভাবে, যে অনুভব করে। ভাবগুলি যাহার পরিবারভুক্ত লোক। যে-খুশি-সেই কোম্পানির কাছ হইতে লাইসেন্স লইয়া ভাবের কারবার করিতে পারে না। সেরূপ অবস্থা মগের মুলুকেই শোভা পায় সাহিত্যের রাম-রাজত্বে শোভা পায় না। কিন্তু আমাদের বর্তমান সাহিত্যের অরাজকতার মধ্যে কি তাহাই হইতেছে না! না হওয়াই যে আশ্চর্য। কারণ এত কাগজ হইয়াছে যে, তাহার লেখার জন্য যাকে-তাকে ধরিয়া বেড়াইতে হয়— নিতান্ত অর্বাচীন হইতে ভীমরতিগ্রস্ত পর্যন্ত কাহাকেও ছাড়িতে পারা যায় না। মনে করো,

হঠাৎ যুদ্ধ করিবার আবশ্যক হইয়াছে, কেল্লায় গিয়া দেখিলাম সৈন্য বড়ো বেশি নাই— তাড়াতাড়ি মুটেমজুর চাষাভুষো যাহাকে পাইলাম এক-একখানা লাল পাগড়ি মাথায় জড়াইয়া সৈন্য বলিয়া দাঁড় করাইয়া দিলাম। দেখিতে বেশ হইল। বিশেষত রীতিমতো সৈন্যের চেয়ে ইহাদের এক বিষয়ে শ্রেষ্ঠতা আছে— ইহারা বন্দুকটা লইয়া খুব নাড়িতে থাকে, পা খুব ফাঁক করিয়া চলে এবং নিজের লাল পাগড়ি ও কোমরবন্ধটার বিষয় কিছুতেই ভুলিতে পারে না— কিন্তু তাহা সত্ত্বেও যুদ্ধে হার হয়। আমাদের সাহিত্যেও তাই হইয়াছে— লেখাটা চাই-ই চাই, তা-সে যেই লিখুক-না-কেন। এ লেখাতেও না কি আবার উপকার হয়! উপকার চুলায় যাউক স্পষ্ট অপকার হয় ইহা কি কেহ অস্বীকার করিতে পারেন! অনবরত ভান চলিতেছে— গদ্যে ভান, পদ্যে ভান, খবরের কাগজে ভান, মাসিকপত্রে ভান, রাশি রাশি মৃত-সাহিত্য জমা হইতেছে, ভাবের পাড়ায় মড়ক প্রবেশ করিয়াছে। ভারত-জাগানো ভাবটা কিছু মন্দ নয়। বিশেষত যথার্থ সহৃদয়ের কাতর মর্মস্থান হইতে এই জাগরণ-সংগীত বাজিয় উঠিলে, আমাদের মতো কুম্ভকর্ণেরও এক মুহূর্তের জন্য নিদ্রাভঙ্গ হয়; নিদেন হাই তুলিয়া গা-মোড়া দিয়া পাশ ফিরিয়া শুইতে ইচ্ছা করে। কিন্তু এখন এমনি হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, ভারত-জাগানো কথাটা যেন মারিতে আসে! তাহার কারণ আর কিছুই নয়, আজ দশ-পনেরো বৎসর ধরিয়া অনবরত বালকে এবং স্ত্রীলোকে পর্যন্ত ভারত-জাগানোর ভান করিয়া আসিয়াছে— ভাবটা ফ্যাশন হইয়া পড়িল, সাহিত্য-দোকানদারেরা লোকের ভাব বুঝিয়া বাজারের দর দেখিয়া দিনে দিনে সপ্তাহে সপ্তাহে মাসে মাসে প্রচুর পরিমাণে আমদানি করিতে লাগিল; কাপড়ের একটা নতুন পাড় উঠিলে তাহা যেমন সহসা হাটে-ঘাটে-মাঠে অত্যন্ত প্রচলিত হইয়া ওঠে— ভারত-জাগানোটাও ঠিক তেমনি হইয়া উঠিল— কাজেই ঝট্ করিয়া তাহাকে মারা পড়িতে হইল। কুম্ভকর্ণকে যেমন ঢাকঢোল জগঝম্প বাজাইয়া উৎপীড়ন করিয়া কাঁচাঘুম হইতে জাগাইয়া তুলিল ও সে যেমন জাগিল, তেমনি মরিল। ইহার বিপুল মৃতদেহ আমাদের সাহিত্যক্ষেত্রের কতটা স্থান জুড়িয়া পড়িয়া আছে একবার দেখো দেখি! এখনও কেহ কেহ কাজকর্ম না থাকিলে জেঠাইমাকে গঙ্গাযাত্রা হইতে অব্যাহতি দিয়া এই মৃতদেহের কানের কাছে ঢাকঢোল বাজাইতে আসেন। কিন্তু এ আর উঠিবে না, এ নিতান্তই মারা পড়িয়াছে। যদি ওঠে তবে প্রতিভার সঞ্জীবনী মন্ত্রে নূতন দেহ ধারণ করিয়া উঠিবে। এমন একটার উল্লেখ করিলাম কিন্তু প্রতিদিন, প্রতি সপ্তাহে, প্রতি মাসে শতকরা কত কত ভাব হৃদয়হীন কলমের আঁচড়ে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া ও কপট কৃত্রিম রসনা শয্যার উপরে হাত-পা খিচাইয়া ধুনষ্টংকার হইয়া মরিতেছে তাহার একটা তালিকা কে প্রস্তুত করিতে পারে! এমনতরো দারুণ মড়কের সময় অবিশ্রাম চুলা জ্বালাইয়া এই শত সহস্র মৃত সাহিত্যের অগ্নিসংকার করিতে কোন্ সমালোচক পারিয়া ওঠে। চাহিয়া দেখো-না, বাংলা নবেলের মধ্যে নায়ক-নায়িকার ভালোবাসাবাসির একটা ভান, কবিতার মধ্যে নিতান্ত অমূলক একটা হা-হুতাশের ভান, প্রবন্ধের মধ্যে অত্যন্ত উত্তেজনা উদ্দীপনা ও রোখা-মেজাজের ভান! এ তো ভান করিবার বয়েস নয়— আমাদের সাহিত্য এই যে সে-দিন জন্মগ্রহণ করিল— এরই মধ্যে হাবভাব করিতে আরম্ভ করিলে বয়সকালে ইহার দশা যে কী হইবে কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।

কথাটা সত্য হইলেই যে সমস্ত দায় হইতে এড়াইলাম তাহা নহে। সত্য কথা অনুভব না করিয়া যে বলে তাহার বলিবার কোনো অধিকার নাই। কারণ সত্যের প্রতি সে অন্যায় ব্যবহার করে। সত্যকে সে এমন দীনহীনভাবে লোকের কাছে আনিয়া উপস্থিত করে, যে কেহ সহসা তাহাকে বিশ্বাস করিতে চায় না। বিশ্বাস যদি বা করে তা মৌখিকভাবে করে, সসম্ভ্রমে হৃদয়ের মধ্যে ডাকিয়া আনিয়া তাহাকে আসন পাতিয়া দেয় না। সে যত বড়ো লোকটা তদুপযুক্ত আদর পায় না। অনবরত রসনায় রসনায় দেউরিতে দেউরিতে ফিরিতে থাকে হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিতে পায় না, ক্রমে রসনার শোভা হইয়া ওঠে, হৃদয়ের সম্পত্তি হয় না। হৃদয়ের চারা রসনায় পুঁতিলে কাজেই সে মারা পড়ে।

সত্যের দুই দিক আছে— প্রথম, সত্য যে সে আপনা-আপনিই সত্য, দ্বিতীয়, সত্য আমার কাছে সত্য। যতক্ষণ-না আমি সর্বতোভাবে অনুভব করি ততক্ষণ সত্য হাজার সত্য হইলেও আমার নিকটে মিথ্যা। সুতরাং আমি যখন অনুভব না করিয়া সত্য কথা বলি, তখন সত্যকে প্রায় মিথ্যা করিয়া তুলি। অতএব বরঞ্চ মিথ্যা বলা ভালো তবু সত্যকে হত্যা করা ভালো নয়। কিন্তু প্রত্যহই যে সেই সত্যের প্রতি মিথ্যাচারণ করা হইতেছে। যাহারা বোঝে না তাহারাও বুঝাইতে আসিয়াছে, যাহারা ভাবে না তাহারাও টিয়া পাখির মতো কথা কয়, যাহারা অনুভব করে না তাহারাও তাহাদের রসনার শুষ্ককাষ্ঠ লইয়া লাঠি খেলাইতে আসে। ইহার কি কোনো প্রায়শ্চিত্ত নাই! অপমানিত সত্য কি তাঁহার অপমানের প্রতিশোধ লইবেন না! লক্ষ লক্ষ বৎসর অবিশ্রাম ভান করিলেও কি কোনোকালে যথার্থ হইয়া ওঠা যায়। দেবতাকে দিনরাত্রি মুখ ভেংচাইয়াই কি দেবতা হওয়া যায়, না তাহাতে পুণ্য সঞ্চয় হয়!

সম্পূর্ণ বিদেশীয় ভাবের সংস্রবে আসিয়াই, বোধ করি, আমাদের এই উৎপাত ঘটিয়াছে। আমরা অনেক তত্ত্ব তাহাদের কেতাব হইতে পড়িয়া পাইয়াছি।— ইহাকেই বলে প'ড়ে পাওয়া— অর্থাৎ ব্যবহারী জিনিস পাইলাম বটে কিন্তু তাহার ব্যবহার জানি না। যাহা শুনিলাম মাত্র, ভান করি যেন তাহাই জানিলাম। পরের জিনিস লইয়া নিজস্ব স্বরূপে আড়ম্বর করি। কথায় কথায় বলি, উনবিংশ শতাব্দী, ওটা যেন নিতান্ত আমাদেরই। একে বলি ইনি আমাদের বাংলার বাইরন, ওঁকে বলি উনি আমাদের বাংলার গ্যারিবল্ডি, তাঁকে বলি তিনি আমাদের বাংলার ডিমস্থিনিস— অবিশ্রাম তুলনা করিতে ইচ্ছা যায়— ভয় পাছে এটুকুমাত্র অনৈক্য হয়— হেমচন্দ্র যে হেমচন্দ্রই এবং বাইরন যে বাইরনই, তাহা মনে করিলে মন কিছুতেই সুস্থ হয় না। জবরদস্তি করিয়া কোনোমতে বটকে ওক বলিতেই হইবে, পাছে ইংলন্ডের সহিত বাংলার কোনো বিষয়ে এক চুল তফাত হয়। এমনতরো মনের ভাব হইলে ভান করিতেই হয়— পাউডর মাখিয়া সাদা হইতেই হয়, গলা বাঁকাইয়া কথা কহিতেই হয় ও বিলাতকে 'হোম্' বলিতে হয়! সহজ উপায়ে না বাড়িয়া আর-একজনের কাঁধের উপরে দাঁড়াইয়া লম্বা হইয়া উঠিবার এইরূপ বিস্তর অসুবিধা দেখিতেছি! আমরা খল্সেরা দেখিতেছি অ্যাংবাংগণ খুব থপ্থপ্ করিয়া চলিতেছে, সুতরাং খল্সে বলিতেছেন, আমিও যাই! যাও তাহাতে তো দুঃখ নাই, কিন্তু আমাদের চাল যে স্বতন্ত্র! অ্যাব্যাংয়ের চালে চলিতে চেষ্টা করিলে আমাদের চলিবার সমূহ অসুবিধা হইবে এইটে জানা উচিত!

আমাদের এ সাহিত্য প্রতিধ্বনির রাজ্য হইয়া উঠিতেছে। চারি দিকে একটা আওয়াজ ভোঁ ভোঁ করিতেছে মাত্র, কিন্তু তাহা মানুষের কণ্ঠস্বর নহে, হৃদয়ের কথা নহে, ভাবের ভাষা নহে। কানে তালা লাগিলে যেমন একপ্রকার শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়— সে শব্দটা ঘূর্ণ্যবায়ুর মতো বন্বন্ করিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে মস্তিষ্কের সমস্ত ভাবগুলিকে ধূলি ও খড়কুটার মতো আস্মানে উড়াইয়া দিয়া মাথার খুলিটার মধ্যে শাঁখ বাজাইতে থাকে; জগতের যথার্থ শব্দগুলি একেবারে চুপ করিয়া যায় ও সেই মিথ্যা শব্দটাই সর্বেসর্বা হইয়া বৃত্রাসুরের মতো সংগীতের স্বর্গরাজ্যে একাধিপত্য করিতে থাকে; মাথা কাঁদিয়া বলে, ইহা অপেক্ষা অরাজকতা ভালো, ইহা অপেক্ষা বধিরতা ভালো— আমাদের সাহিত্য তেমনি করিয়া কাঁদিয়া বলিতেছে— শব্দ খুবই হইতেছে কিন্তু এ ভোঁ ভোঁ, এ মাথাঘোরা আর সহ্য হয় না! এই দিগন্ত-বিস্তৃত কোলাহলের মহামরুর মধ্যে, এই বধিরকর শব্দরাজ্যের মহানীরবতার মধ্যে একটা পরিচিত কণ্ঠের একটা কথা যদি শুনিতে পাই, তবে আবার আশ্বাস পাওয়া যায়— মনে হয়, পৃথিবীতেই আছি বটে, আকার-আয়তনহীন নিতান্ত রসাতলরাজ্যে প্রবেশ করিতেছি না।

আমরা বিশ্বামিত্রের মতো গায়ের জোরে একটা মিথ্যাজগৎ নির্মাণ করিতে চাহিতেছি— কিন্তু ছাঁচে ঢালিয়া, কুমারের চাকে ফেলিয়া, মস্ত একতাল কাদা লইয়া জগৎ গড়া যায় না! বিশ্বামিত্রের জগৎ ও বিশ্বকর্মার জগৎ দুই স্বতন্ত্র পদার্থ— বিশ্বকর্মার জগৎ এক অচল অটল

নিয়মের মধ্য হইতে উদ্ভিন্ন হইয়া বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহার আর বিনাশ নাই; তাহা রেষারেষি করিয়া, তর্জমা করিয়া, গায়ের জোরে বা খামখেয়াল হইতে উৎপন্ন হয় নাই; এই নিমিত্তই তাহার ভিত্তি অচলপ্রতিষ্ঠ। এই নিমিত্তই এই জগৎকে আমার এত বিশ্বাস করি— এই নিমিত্তই এক পা বাড়াইয়া আর-এক পা তুলিবার সময় মাথায় হাত দিয়া ভাবিতে হয় না পাছে জগৎটা পায়ের কাছ হইতে হুস করিয়া মিলাইয়া যায়! আর বিশ্বামিত্রের ঘরগড়া জগতে যে হতভাগ্য জীবদিগকে বাস করিতে হইত তাহাদের অবস্থা কী ছিল একবার ভাবিয়া দেখো দেখি! তাহারা তপ্ত ঘিয়ে ময়দার চক্র ছাড়িয়া দিয়া ভাবিতে বসিত ইহা হইতে লুচি হইবে কি চিনির শরবত হইবে। এক গাছ ফল দেখিলেও তাহাদের গাছে উঠিয়া পাড়িতে প্রবৃত্তি হইত না, সন্দেহ হইত পাছে হাত বাড়াইলেই ওগুলো পাখি হইয়া উড়িয়া যায়। তাহাদের বড়ো বড়ো পণ্ডিতেরা মিলিয়া তর্ক করিত পায়ে চলিতে হয় কি মাথায় চলিতে হয়; কিছুই মীমাংসা হইত না। প্রতিবার নিশ্বাস লইবার সময় দুটো-তিনটে ডাক্তার ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিতে হইত, নাকে নিশ্বাস লইব কি কানে নিশ্বাস লইব, কেহ বলিত নাকে, কেহ বলিত কানে। অবশেষে একদিন ঠিক দুপুরবেলা যখন সেখানকার অধিবাসীরা ক্ষুধা পাইলে খাইতে হয় কি উপবাস করিতে হয়, এই বিষয়ে তর্ক করিতে করিতে গলদ্‌ঘর্ম হইয়া উঠিতেছিল, এমন সময়ে হঠাৎ বিশ্বামিত্রের জগৎটা উল্টোপাল্টা, হিজিবিজি, হ-য-ব-র-ল হইয়া, ভাঙিয়া চুরিয়া ফাটিয়া, বোমার মতো আওয়াজ করিয়া, হাউয়ের মতো আকাশে উঠিয়া সবসুদ্ধ কোন্‌খানে যে মিলাইয়া গেল, আজ পর্যন্ত তাহার ঠিকানাই পাওয়া গেল না! তাহার কারণ আর কিছু নয়— সৃষ্ট হওয়ায় এবং নির্মিত হওয়ায় অনেক তফাত। বিশ্বামিত্রের জগৎটা যে অন্যায় হইয়াছিল তা বলিবার জো নাই— তিনি এই জগৎকেই চোখের সুমুখে রাখিয়া এই জগৎ হইতেই মাটি কাটিয়া লইয়া তাঁহার জগৎকে তাল পাকাইয়া তুলিয়াছিলেন, এই জগতের বেলের খোলার মধ্যে এই জগতের কুলের আঁটি পুরিয়া তাঁহার ফল তৈরি করিয়াছিলেন; অর্থাৎ এই জগতের টুকরো লইয়া খুব শক্ত শিরীষের আঠা দিয়া জুড়িয়াছিলেন সুতরাং দেখিতে কিছু মন্দ হয় নাই। আমাদের এই জগৎকে যেমন নিঃশঙ্কে আকাশে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে, এ আপনার কাজ আপনি করিতেছে, আমার নিয়মে আপনি বাড়িয়া উঠিতেছে, কোনো বালাই নাই, বিশ্বামিত্রের জগৎ সেরূপ ছিল না; তাহাকে ভারি সন্তর্পণে রাখিতে হইত, রাজর্ষির দিন-রাত্রি তাহাকে তাঁহার কোঁচার কাপড়ে বাঁধিয়া লইয়া বেড়াইতেন, এক দণ্ড ছাড়িয়া থাকিতে পারিতেন না। কিন্তু তবু তো সে রহিল না! তাহার কারণ, সে মিথ্যা। মিথ্যা কেমন করিয়া হইল! এইমাত্র যে বলিলাম, এই জগতের টুকরা লইয়াই সে গঠিত হইয়াছে, তবে সে মিথ্যা হইল কী করিয়া? মিথ্যা নয় তো কী? একটি তালগাছের প্রত্যেক ক্ষুদ্রতম অংশ বজায় থাকিতে পারে, তাহার ছাল আঁশ কাঠ মজ্জা পাতা ফল শিকড় সমস্তই থাকিতে পারে; কিন্তু যে অমোঘ সজীব নিয়মে তাহার নিজ চেষ্টা ব্যতিরেকেও সে দায়ে পড়িয়া তালগাছ হইয়াই উঠিয়াছে, মাথা খুঁড়িয়া মরিলেও তাহার তুলসীগাছ হইবার জো নাই, সেই নিয়মটি বাহির করিয়া লইলে সে তালগাছ নিতান্ত ফাঁকি হইয়া পড়ে, তাহার উপরে আর কিছুমাত্র নির্ভর করা যায় না! তাহার উপরে যে লোক নির্ভর করিতে পারে, সে কৃষ্ণনগরের কারিগরের গঠিত মাটির কলা খাইতেও পারে— কিন্তু সে কলায় শরীর পুষ্টও হয় না, জিহ্বা তুষ্টও হয় না, কেবল নিতান্ত কলা খাওয়াই হয়।

যাহা বলা হইল তাহাতে এই বুঝাইতেছে যে, অংশ লইয়া অনেক লইয়া সত্য নহে, সত্য একের মধ্যে মূল নিয়মের মধ্যে বাস করে। আমাদের সাহিত্যে নবেল থাকিতে পারে, নাটক থাকিতে পারে, মহাকাব্য গীতিকাব্য খণ্ডকাব্য থাকিতে পারে, সাপ্তাহিক পত্র থাকিতে পারে এবং মাসিক পত্রও থাকিতে পারে কিন্তু সেই অমোঘ নিয়ম না থাকিতেও পারে, যাহাতে করিয়া নবেল নাটক পত্রপুষ্পের মতো আপনা-আপনি বিকশিত হইয়া উঠিতেছে। আমরা একটি গঠিত সাহিত্য দিনরাত্রি চোখের সুমুখে দেখিতে পাইতেছি। আমরা লিখিবার আগেই সমালোচনা পড়িতে

পাইয়াছি; আমরা আগেভাগেই অলংকারশাস্ত্র পড়িয়া বসিয়া আছি, তাহার পরে কবিতা লিখিতে শুরু করিয়াছি। সুতরাং ন্যাজায় মুড়োয় একাকার হইয়া সমস্তই বিপর্যয় ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সাহিত্যটা যেরূপ মোটা হইয়া উঠিতেছে তাহাকে দেখিলে সকলেই পুলকিত হইয়া উঠেন। কিন্তু ওই বিপুল আয়তনের মধ্যে রোগের বীজ বিনাশের কারণ প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। কোন্ দিন সকালে উঠিয়াই শুনিব— 'সে নাই।' খবরের কাগজে কালো গণ্ডি আঁকিয়া বলিবে 'সে নাই।' 'কিসে মরিল?' 'তাহা জানি না হঠাৎ মরিয়াছে।' বঙ্গসাহিত্য থাকিতে পারে, খাঁটি বাঙালি জন্মিতে পারে, কিন্তু এ সাহিত্য থাকিবে না। যদি থাকে তো কিছু থাকিবে। যাঁহারা খাঁটি হৃদয়ের কথা বলিয়াছেন তাঁহাদের কথা মরিবে না।

সত্য ঘরে না জন্মাইলে সত্যকে 'পুষ্যি' করিয়া লইলে ভালো কাজ হয় না। বরঞ্চ সমস্তই সে মাটি করিয়া দেয়। কারণ সে সত্যকে জিহ্বার উপরে দিনরাত্রি নাচাইয়া নাচাইয়া আদুরে করিয়া তোলা হয়। সে কেবল রসনা-দুলাল হইয়া উঠে। সংসারের কঠিন মাটিতে নামাইয়া তাহার দ্বারা কোনো কাজ পাওয়া যায় না। সে অত্যন্ত খোশ-পোশাকী হয় ও মনে করে আমি সমাজের শোভা মাত্র! এইরূপ কতকগুলো অকর্মণ্য নবাবী সত্য পুষিয়া সমাজকে তাহার খোরাক জোগাইতে হয়। আমাদের দেশের অনেক রাজা-মহারাজা শখ করিয়া এক-একটা ইংরাজ চাকর পুষিয়া থাকেন, কিন্তু তাহাদের দ্বারা কোনো কাজ পাওয়া দূরে থাক্ তাহাদের সেবা করিতে করিতেই প্রাণ বাহির হইয়া যায়! আমরাও তেমনি অনেকগুলি বিলিতি সত্য পুষিয়াছি, তাহাদিগকে কোনো কাজেই লাগাইতে পারিতেছি না, কেবল গদ্যে পদ্যে কাগজে পত্রে তাহাদের অবিশ্রাম সেবাই করিতেছি। ঘোরো সত্য কাজকর্ম করে ও ছিপছিপে থাকে, তাহাদের আয়তন দুটো কথার বেশি হয় না আর নবাবী সত্যগুলো ক্রমিক মোটা হইয়া ওঠে ও অনেকটা করিয়া কাগজ জুড়িয়া বসে— তাহার সাজ-সজ্জা দেখিলে ভালো মানুষ লোকের ভয় লাগে— তাহার সর্বাঙ্গে চারি দিকে বড়ো বড়ো নোটগুলো বটগাছের শিকড়ের মতো ঝুলিতেছে— বড়ো বড়ো ইংরিজির তর্জমা, অর্থাৎ ইংরিজি অপেক্ষা ইংরিজিতর সংস্কৃত, যে সংস্কৃত শব্দের গন্ধ নাকে প্রবেশ করিলে শুচি লোকদিগকে গঙ্গাস্নান করিতে হয়, এমনতরো বৃহদায়তন ম্লেচ্ছ সংস্কৃত ও অসাধু সাধু ভাষা গলগণ্ডের মতো, ফোস্কার মতো, ব্রণর মতো তাহার সর্বাঙ্গে ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিয়াছে— তাহারই মধ্যে আবার বন্ধনী-চিহ্নিত ইংরিজি শব্দের উক্তির স্তূপ— ইহার উপরে আবার ভূমিকা উপসংহার পরিশিষ্ট— পাছে কেহ অবহেলা করে এইজন্য তাহার সঙ্গে সঙ্গে সাত-আটটা করিয়া নকীব তাহার সাতপুরুষের নাম হাঁকিতে হাঁকিতে চলে— বেকন্, লক্, হব্স্, মিল্, স্পেন্সর, বেন্— শুনিয়া আমাদের মতো ভীতু লোকের সর্দিগর্মি হয়, পাড়াপড়শির লোকের দাঁতকপাটি লাগে। যাহাই হউক, এই ব্যক্তিটার শাসনেই আমরা চলিতেছি। এমনি হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সত্য বিলিতি বুটজুতা পরিয়া না আসিলে তাহাকে ঘরে ঢুকিতে দিই না। এবং সত্যের পায়ে [illegible] পায়ে নাগ্‌রা জুতো দেখিলে আমাদের পিত্তি জ্বলিয়া ওঠে ও তৎক্ষণাৎ তাহার সহিত [illegible] আরম্ভ করি! যদি শুনিতে পাই, সংস্কৃতে এমন একটা দ্রব্যের বর্ণনা আছে, যাহাকে টানিয়া-বুনিয়া টেবিল বলা যাইতে পারে বা রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডের বিশেষ একটা জায়গায় কাঁটাচামচের সংস্কৃত প্রতিশব্দ পাওয়া গিয়াছে। বা বারুণী ব্র্যান্ডির, সুরা শেরীর, মদিরা ম্যাডেরার, ধীর বিয়ারের অবিকল ভাষান্তর মাত্র— তবে আর আমাদের আশ্চর্যের সীমা-পরিসীমা থাকে না— তখনই সহসা চৈতন্য হয় তবে তো আমার সভ্য ছিলাম! যদি প্রমাণ করিতে পারি, বিমানটা আর কিছুই নয়, অবিকল এখানকার বেলুন, এবং শতঘ্নীটা কামান ছাড়া আর কিছু হইতেই পারে না, তাহা হইলেই ঋষিগুলোর উপর আর কথঞ্চিৎ শ্রদ্ধা হয়! এ-সকল তো নিতান্ত অপদার্থের লক্ষণ! সকলেই বলিতেছেন, এইরূপ শিক্ষা, এইরূপ চর্চা হইতে আমরা বিস্তর ফল লাভ করিতেছি। ঠিক কথা, কিন্তু সে ফলগুলো কী রকমের? গজভুক্তকপিত্থবৎ।

ইহার ফল কি এখনি দেখা যাইতেছে না! আমরা প্রতিদিনই কি মনুষ্যত্বের যথার্থ গাম্ভীর্য

হারাইতেছি না। এক প্রকার বিলিতি পুতুল আছে তাহার পেট টিপিলেই সে মাথা নাড়িয়া ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ করিয়া খঞ্জনী বাজাইতে থাকে, আমরাও অনবরত সেইরূপ ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দও করিতেছি, মাথা নাড়িয়া খঞ্জনীও বাজাইতেছি, কিন্তু গাম্ভীর্য কোথায়। মানুষের মতো দেখিতে হয় কই যে, বাহিরের পাঁচ জন লোক দেখিয়া শ্রদ্ধা করিবে! আমরা জগতের সম্মুখে পুৎলোবাজি আরম্ভ করিয়াছি, খুব ধড়ফড় ছটফট করিতেছি ও গগনভেদী তীক্ষ্ণ উচ্চস্বরে কথোপকথন আরম্ভ করিয়াছি। সাহেবরা কখনো হাসিতেছেন, কখনো হাততালি দিতেছেন, আমাদের নাচনী ততই বাড়িতেছে, গলা ততই উঠিতেছে! ভুলিয়া যাইতেছি এ কেবল অভিনয় হইতেছে মাত্র— ভুলিয়া যাইতেছি যে জগৎ একটা নাট্যশালা নহে, অভিনয় করাও বা কাজ করাও তা একই কথা নহে। পুতুল নাচ যদি করিতে চাও, তবে তাহাই করো— আর কিছু করিতেছি মনে করিয়া বুক ফুলাইয়া বেড়াইয়ো না; মনে করিয়ো না যেন সংসারের যথার্থ গুরুতর কার্যগুলি এইরূপে অতি সহজে অবহেলে ও অতি নিরুপদ্রবে সম্পন্ন করিয়া ফেলিতেছি; মনে করিয়ো না অন্যান্য জাতিরা শত শত বৎসর বিপ্লব করিয়া প্রাণপণ করিয়া, রক্তপাত করিয়া যাহা করিয়াছেন আমরা অতিশয় চালাক জাতি কেবলমাত্র ফাঁকি দিয়া তাহা সারিয়া লইতেছি— জগৎসুদ্ধ লোকের একেবারে তাক লাগিয়া গিয়াছে। আমাদের এই প্রকার চাতুলতা অত্যন্ত বিস্ময়জনক সন্দেহ নাই— কিন্তু ইহা হইতেই কি প্রমাণ হইতেছে না আমরা ভারি হাল্কা। এ প্রকার ফড়িংবৃত্তি করিয়া জাতিত্বের অতি দুর্গম উন্নতিশিখরে উঠা যায় না এবং এই প্রকার ঝিঁঝিপোকার মতো চেঁচাইয়া কাল নিশীথের গভীর নিদ্রাভঙ্গ করানো অসম্ভব ব্যাপার। অত্যন্ত অভদ্র, অনুদার, সংকীর্ণ গর্বস্ফীত ভাবের প্রাদুর্ভাব কেন হইতেছে! লেখায় কুরুচি, ব্যবহারে বর্বরতা, সহৃদয়তার আত্যন্তিক অভাব কেন দেখা যাইতেছে! কেন পূজ্য ব্যক্তিকে ইহারা ভক্তি করে না, গুণে সম্মান করে না, সকলই উড়াইয়া দিতে চায়। মনুষ্যত্বের প্রতি ইহাদের বিশ্বাস নাই কেন? যখনি কোনো বড়ো লোকের নাম করা যায়, তখনি সমাজের নিতান্ত বাজে লোকেরা রাম শ্যাম কার্তিকেরাও কেন বলে, হ্যাঁঃ, অমুক লোকটা হম্বগ, অমুক লোকটা ফাঁকি দিয়া নাম করিয়া লইয়াছে, অমুক লোকটা আর-এক জনকে দিয়ে লিখাইয়া লয়, অমুক লোকটা লোকের কাছে খ্যাত বটে, কিন্তু খ্যাতির যোগ্য নহে। ইহারা প্রাণ খুলিয়া ভক্তি করিতে জানে না, ভক্তি করিতে চাহে না, ভক্তিভাজন লোকদিগকে হট করিতে পারিলেই আপনাদিগকে মস্ত লোক মনে করে, এবং যখন ভক্তি করা আবশ্যক বিবেচনা করে তখন সে কেবল ইংরাজি দস্তুর বলিয়া সভ্যজাতির অনুমোদিত বলিয়া করে, মনে করে দেখিতে বড়ো ভালো হইল! এত অবিশ্বাস কেন, এত [illegible] স্পর্ধা কেন— অভদ্রতা এত ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে কেন, ছেলেপিলেগুলো [illegible] কেন, দাম্ভিক ভীরুদিগের ন্যায় অকারণ গায়ে পড়া রূঢ় ব্যবহার ও [illegible] পারিলেই আপনাদিগকে মহাবীর বলিয়া মনে করিতেছে কেন; [illegible] বুকে চাদর বাঁধিয়া মালকোঁচা আঁটিয়া হাতের আস্তিন [illegible] ঘুষি দিয়া দু দিনে বিশ্বসংসার উড়াইয়া দিবার সংকল্প করিয়াছেন কেন? তাহার [illegible] প্রাদুর্ভাব হইয়াছে বলিয়া— কিছুরই [illegible] যথার্থ সত্তা নাই, কিছুরই যে যথার্থ মূল্য আছে তাহা কেহ মনে করে না, সকলই মুখের কথা, আস্ফালনের বিষয় ও মাদকতার সহায় মাত্র। সেইজন্যই সকলেই দেখিতেছেন, আজকাল কেবল একপ্রকার ছিবলেমির প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। জগৎ যেন একটা তামাশা হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং আমরা কেবল যেন মজা দেখিতেই আসিয়াছি। খুব মিটিং করিতেছি, খুব কথা কহিতেছি, আজ এখানে যাইতেছি, কাল ওখানে যাইতেছি, ভারি মজা হইতেছে। আতসবাজি দেখিলে ছেলেরা যেমন আনন্দে একেবারে অধীর হইয়া উঠে, এক-একজন লোক বক্তৃতা দেয় আর ইহাদের ঠিক তেমনিতরো আনন্দ হইতে থাকে, হাত-পা নাড়িয়া চেঁচাইয়া, করতালি দিয়া আহ্লাদ আর রাখিতে পারে না; বক্তাও উৎসাহ পাইয়া আর কিছুই করেন না, কেবলই মুখ-গহ্বর হইতে তুবড়িবাজি ছাড়িতে

থাকেন, উপস্থিত ব্যক্তিদিগের আর কোনো উপকার না হউক অত্যন্ত মজা বোধ হয়। মজার বেশি হইলেই অন্ধকার দেখিতে হয়, মজার কম হইলেই মন টেঁকে না, যেমন করিয়া হউক মজাটুকু চাই-ই। যতই গম্ভীর হউক ও যতই পবিত্র হউক-না কেন, জীবনের সমুদয় অনুষ্ঠানই একটি মিটিং, গোটাকতক হাততালি ও খবরের কাগজের প্রেরিত পত্রে পরিণত করিতে হইবে— নহিলে মজা হইল না! গম্ভীরভাবে অপ্রতিহত প্রভাবে আপনার কাজ আপনি করিব, আপনার উদ্দেশ্যের মহত্ত্বে আপনি পরিপূর্ণ হইয়া তাহারই সাধনায় অবিশ্রাম নিযুক্ত থাকিব, সুদূর লক্ষ্যে প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া দক্ষিণে বামে কোনো দিকে দৃক্‌পাতমাত্র না করিয়া সিধা রাস্তা ধরিয়া চলিব; চটক লাগাইতে করতালি জাগাইতে চেঁচাইয়া ভূত ভাগাইতে নিতান্তই ঘৃণা বোধ করিব, কোথাকার কোন্ গোরা কী বলে না-বলে তাহার প্রতি কিছুমাত্র মনোযোগ করিব না এমন ভাব আমাদের মধ্যে কোথায়! কেবলই হৈ হৈ করিয়া বেড়াইব ও মনে করিব কী-যেন একটা হইতেছে! মনে করিতেছি, ঠিক এইরকম বিলাতে হইয়া থাকে, ঠিক এইরকম পার্লামেন্টে হয়, এবং আমাদের এই আওয়াজের চোটে গবর্মেন্টের তক্তপোশের নীচে ভূমিকম্প হইতেছে। আমরা গবর্মেন্টের কাছে ভিক্ষা করিতেছি, অথচ সেইসঙ্গে ভান করিতেছি যেন বড়ো বীরত্ব করিতেছি; সুতরাং চোখ রাঙাইয়া ভিক্ষা করি ও ঘরে আসিয়া ভাত খাইতে খাইতে মনে করি হ্যাম্প্‌ডেন ও ক্রমোয়েলগণ ঠিক এইরূপ করিয়াছিলেন; আহারটা বেশ তৃপ্তিপূর্বক হয়। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, চোখ-রাঙানি ও বুক-ফুলানির যতই ভান কর-না-কেন, যতক্ষণ পর্যন্ত ভিক্ষাবৃত্তিকে আমাদের উন্নতির একমাত্র বা প্রধানতম উপায় বলিয়া গণ্য করিব, ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের যথার্থ উন্নতি ও স্থায়ী মঙ্গল কখনোই হইবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত আমার অলক্ষ্য ও অদৃশ্যভাবে পিছনের দিকেই অগ্রসর হইতে থাকিব। গবর্মেন্ট যতই আমাদিগকে এক-একটি করিয়া অধিকার ও প্রসাদ দান করিতেছেন, ততই দৃশ্যত লাভ হইতেছে বটে, কিন্তু অদৃশ্যে যে লোকসানটা হইতেছে তাহার হিসাব রাখে কে? ততই যে গবর্মেন্টের উপর নির্ভর বাড়িতেছে। ততই যে উর্ধ্ব কণ্ঠে বলিতেছি 'জয় ভিক্ষাবৃত্তির জয়'— ততই যে আমাদের প্রকৃত জাতিগত ভাবের অবনতি হইতেছে। বিশ্বা হইতেছে চাহিলেই পাওয়া যায়, জাতির যথার্থ উদ্যম বেকার হইয়া পড়িতেছে, কণ্ঠস্বরটাই কেবল অহংকারে ফুলিয়া উঠিতেছে ও হাত-পাগুলো পক্ষাঘাতে জীর্ণ হইতেছে। গবর্মেন্ট যে মাঝে মাঝে আমাদের আশাভঙ্গ করিয়া দেন, আমাদের প্রার্থনা বিফল করিয়া দেন, তাহাতে আমাদের মহৎ উপকার হয়, আমাদের সহসা চৈতন্য হয় যে, পরের উপরে যতখানা নির্ভর করে ততখানাই অস্থির, এবং নিজের উপর যতটুকু নির্ভর করে, ততটুকুই ধ্রুব! এ সময়ে, এই লঘুচিত্ততা নাট্যোৎসবের সময়ে আমাদিগকে যথার্থ মনুষ্যত্ব ও পৌরুষ শিখাইবে কে? অতিশয় সহজসাধ ভান দেশহিতৈষিতা হইতে ফিরাইয়া লইয়া যথার্থ গুরুতর কঠোর কর্তব্য সাধনে কে প্রবৃ করাইবে! সাহেবদিগের বাহবাধ্বনির ঘোরতর কুহক হইতে কে মুক্ত করিবে। সে কি এই ভা সাহিত্য! এ কী ফাঁকা আওয়াজ! সকলেই একতানে ওই একই কথা বলিতেছ কেন? সকলে একবাক্যে কেন বলিতেছ ভিক্ষা চাও, ভিক্ষা চাও! কেহ কি হৃদয়ের কথা বলিতে জানে না কেবলই কি প্রতিধ্বনির প্রতিধ্বনি উঠাইতে হইবে! যতবড়ো গুরুতর কথাই হউক-না-কে দেশের যতই হিত বা অহিতের কারণ হউক-না-কেন, কথাটা লইয়া কি কেবল একটা রবারে গোলার মতো মুখে মুখে লোফালুফি করিয়া বেড়াইতে হইবে! এ কি কেবল খেলা! এ তামাশা, আর কিছুই নয়। হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করিবার নাই, বিবেচনা করিবার নাই— গুলিডাণ্ডা খেলানো ছাড়া তাহার আর কোনো ফলাফল নাই! যথার্থ হৃদয়বান লোক যদি থাকে তাঁহারা একবার একবাক্যে বলুন— যে, যথার্থ কর্তব্য কার্যের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া পরে মুখাপেক্ষা না করিয়া পরের প্রশংসাপেক্ষা না করিয়া গম্ভীরভাবে আমরা নিজের কাজ নি করিব, সবই যে ফাঁকি, সবই যে তামাশা, সবই যে কণ্ঠস্থ, তাহা নয়— কর্তব্য যতই সামা হউক-না-কেন, তাহার গাম্ভীর্য আছে, তাহার মহিমা আছে, তাহার সহিত ছেলেখেলা করি

গেলে তাহা অতিশয় অমঙ্গলের নিদান হইয়া উঠে। Agitation করিতে হয় তো করো, কিন্তু দেশের লোকের কাছে করো— দেশের লোককে তাহাদের ঠিক অবস্থাটি বুঝাইয়া দাও— বলো যে, গবর্মেন্ট যাহা করিবার তাহা করিতেছেন, কেবল তোমরাই কিছু করিতেছ না। তোমরা শিক্ষা লাভ করো, শিক্ষা দান করো, অবস্থার উন্নতি করো। দেশের যাহা-কিছু অবনতি তাহা তোমাদেরই দোষে, গবর্মেন্টের দোষে নহে। এ কথা বলিবামাত্রই চারি দিকের খুচরা কাগজপত্রে বড্ড গোলমাল উঠিবে— তাহারা বলিবে এ কী কথা! ইংলণ্ডে তো এরূপ হয় না, Political Agitation বলিতে তো এমন বুঝায় না, Mazzini তো এমন কথা বলেন নাই; Garibaldi যে আর-এক রকম কথা বলিয়াছেন— Washington-এর কথার সহিত এ কথাটার ঐক্য হইতেছে না, যদি একটা কাজ করিতেই হইল তবে ঠিক পার্ল্যামেন্টের অনুসারে করাই ভালো ইত্যাদি। উহারাও আবার যদি কথা কহিতে আসে তো কহুক-না, উহাদের মাথা চাষ করিলে বালি ওঠে, আবাদ করিলে কচুও হয় না, অতএব বাঁধি বোলের মহাজনী না করিলে উহাদের গুজরান চলে না। কিন্তু হৃদয়ের কথা সমস্ত কোলাহল অতিক্রম করিয়া কানের মধ্যে গিয়া পৌঁছাইবেই ইহা নিশ্চয়ই!

সেদিন কথোপকথনকালে একজন শ্রদ্ধাস্পদ ব্যক্তি বলিতেছিলেন যে, রোমকেরা যখন প্রাচীন ইংলন্ডের অকালসভ্য শেল্টদিগকে ফেলিয়া আসিয়াছিল, তখন তাহার ইংলন্ডেই পড়িয়াছিল, কিন্তু ইংরাজ যদি কখনো ভারতবর্ষ হইতে চলিয়া যায়, তবে জাহাজে গিয়া দেখিবে বাঙালিরা আগেভাগে গিয়া কাপ্তেন নোয়া সাহেবের পা-দুটি ধরিয়া জাহাজের খোলের মধ্যে চাদর মুড়ি দিয়া গুটিসুটি মারিয়া বসিয়া আছে! আর কেহ যাক না-যাক— আধুনিক বাংলা সাহিত্যটা তো যাইবেই! কারণ ইংরাজি সাহিত্যের গ্যাসলাইট ব্যতীত এ সাহিত্য পড়া যায় না, হৃদয়ের আলোক এখানে কোনো কাজে লাগিবে না, কারণ, ইহা হৃদয়ের সাহিত্য নহে। আমার বাংলা পড়ি বটে কিন্তু ইংরাজির সহিত মিলাইয়া পড়ি— ইংরাজি চলিয়া গেলে এ বাংলা রাশীকৃত কতকগুলো কালো কালো আঁচড়ে পরিণত হইবে মাত্র! সুতরাং সেই হীনাবস্থা হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য এ যে আগেভাগে জাহাজে গিয়া চড়িয়া বসিবে তাহার কোনো ভুল নাই— সেখানে গিয়া বাবুর্চিখানার উনুন জ্বালাইবে বটে, কিন্তু তবুও থাকিবে ভালো!

অকাল কুষ্মাণ্ড কাহাকে বলে জানি না, কিন্তু এরূপ সাহিত্যকে কি বলা যায় না!

একটা আশার কথা আছে; এ সাহিত্য চিরদিন থাকিবার নহে। এ সাহিত্য নিজের রোগ নিজে লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে, এ নিজের বিনাশ নিজে সাধন করিবে— কেবল দুঃখ এই যে, মরিবার পূর্বে বিস্তর হানি করিয়া তবে মরিবে; অতএব এ পাপ যত শীঘ্র বিদায় হয় ততই ভালো। প্রভাত হইবে কবে, নিশাচরের মতো অন্ধকারে কতকগুলা মশাল জ্বালাইয়া তারস্বরে উৎকট উৎসবে না মাতিয়া, নিশীথের গুহার মধ্যে দল বাঁধিয়া বিশৃঙ্খল অস্বাভাবিক উন্মত্ততা না করিয়া কবে পরিষ্কার দিনের আলোতে বিমল-হৃদয়ে আগ্রহের সহিত, সকলে মিলিয়া নূতন উৎসাহে, স্বাস্থ্যের উল্লাসে, সংসারের যথার্থ কাজগুলি সমাধা করিতে আরম্ভ করিব! সেই দিন প্রভাতে বাঙালির যথার্থ হৃদয়ের সাহিত্য জাগিয়া উঠিবে, অলসদিগকে ঘুম হইতে জাগাইয়া তুলিবে, নিরাশ-হৃদয়েরা পাখির গান শুনিয়া প্রভাতের সমীরণ স্পর্শ করিয়া ও নবজীবনের উৎসব দেখিয়া নূতন প্রাণ লাভ করিবে অর্থাৎ বাংলাদেশ হইতে নিদ্রার রাজত্ব, প্রেতের উৎসব, অস্বাস্থ্যের গুপ্ত সঞ্চরণ একেবারে দূর হইয়া যাইবে। জানি না সে কোন্ শক কোন্ সাল, সেই বৎসরই সাবিত্রী লাইব্রেরির যথার্থ গৌরবের সাংবৎসরিক উৎসব হইবে, সেদিনকার লোক সমাগম, সেদিনকার উৎসাহ, সেদিনকার প্রতিভার দীপ্তি ও কেবলমাত্র বহিঃস্থিত দর্শকদের জড় কৌতূহলের ভাব নহে যথার্থ প্রাণে প্রাণে মিলন কল্পনাচক্ষে অস্পষ্ট ছায়ার মতো দেখা যাইতেছে।

ভারতী
চৈত্র ১২৯০

হাতে কলমে

প্রেমের ধর্ম এই, সে ছোটোকেও বড়ো করিয়া লয়। আর, আড়ম্বর-প্রিয়তা বড়োকেও ছোটো করিয়া দেখে। এই নিমিত্ত প্রেমের হাতে কাজের আর অন্ত নাই, কিন্তু আড়ম্বরের হাতে কাজ থাকে না। প্রেম শিশুকেও অগ্রাহ্য করে না, বার্ধক্যকে উপেক্ষা করে না, আয়তন মাপিয়া সমাদরের মাত্রা স্থির করে না। প্রেমের অসীম ধৈর্য; যে চারা শত বৎসর পরে ফলবান হইবে, তাহাতেও সে এমন আগ্রহসহকারে জলসেক করে যে, ব্যবসায়ী লোকেরা ফলবান তরুকেও তেমন যত্ন করিতে পারে না। সে যদি একটা বড়ো কাজে হাত দেয়, তবে তাহার ক্ষুদ্র সোপানগুলিকে হতাদর করে না। প্রেম, প্রেমের সামগ্রীর বসনের প্রান্ত চরণের চিহ্ন পর্যন্ত ভালোবাসিয়া দেখে। আর আড়ম্বর ধরাকেও সরা জ্ঞান করে। ছোটো কাজের কথা হইলেই তিনি বলিয়া বসেন, 'ও পরে হইবে।' তিনি বলেন, এক-পা এক-পা করিয়া চলাও তো আপামরসাধারণ সকলেই করিয়া থাকে, তবে উৎকট লম্ফ-প্রয়োগ যদি বল তবে তিনিই তাহা সাধন করিবেন এবং ইতিহাসে যদি সত্য হয় তবে ত্রেতাযুগে তাঁহারই এক পূর্বপুরুষ তাহা সাধন করিয়াছিলেন।[১] তিনি এমন সকল কাজে হস্তক্ষেপ করেন যাহা 'উনবিংশ শতাব্দীর' শাস্ত্রসম্মত, ইতিহাসসম্মত, যাহা কনস্টিট্যুশনল। সমস্ত ভারতবর্ষের যত দুঃখ-দুর্দশা, দুর্ঘটনা, দুর্নাম আছে সমস্তই তিনি বালীর লাঙ্গুলপাশবদ্ধ দশাননের ন্যায় এক পাকে জড়াইয়া একই কালে ভারতসমুদ্রের জলে চুবাইয়া মারিবেন, কিন্তু ভারতবর্ষের কোনো-একটা ক্ষুদ্র অংশের কোনো-একটা কাজ সে তাঁহার দ্বারা হইয়া উঠিবে না। বিপুলা পৃথিবীতে জন্মিয়া ইঁহার আর কোনো কষ্ট নাই, কেবল স্থানাভাবের জন্য কিঞ্চিৎ কাতর আছেন। বামনদেব তিনপায়ে তিন লোক অধিকার করিয়াছিলেন, কিন্তু তদাপেক্ষা বামন এই বামনশ্রেষ্ঠের জিহ্বার মধ্যে তিনটে লোক তিনটে বাতাসার মতো গলিয়া যায়! 'হিমালয় হইতে কন্যাকুমারী' ও 'সিন্ধুনদ হইতে ব্রহ্মপুত্রের' মধ্যে অবিশ্রাম ফুঁ দিয়া ইনি একটা বেলুন বানাইতেছেন; অভিপ্রায়, আসমানে উড়িবেন; সেখানে আকাশ-কুসুমের ফলাও আবাদ করিবার অনুষ্ঠান-পত্র বাহির হইয়াছে। ইনি যদি ইঁহার উদ্দেশ্য কিঞ্চিৎ সংক্ষেপ করেন সে একরকম হয়, আর তা যদি নিতান্ত না পারেন তবে না হয় খুব ঘটা করিয়া নিদ্রার আয়োজন করুন। হিমালয় নামক উঁচু জায়গাটাকে শিয়রের বালিশ করিয়া কন্যাকুমারী পর্যন্ত পা ছড়াইয়া দিন, দুই পাশে দুই ঘাটগিরি রহিল। স্থানসংক্ষেপ করিয়া কাজ নাই, কারণ আড়ম্বরের স্বভাবই এই, একবার সে যখন ঘুমায় তখন চতুর্দিকে হাত-পা ছড়াইয়া এমনি আয়োজন করিয়া ঘুমায় যে, কাহার সাধ্য তাহাকে জাগায়। তাহার জাগরণও যেরূপ বিকট তাহার ঘুমও সেইরূপ সুগভীর।

কেবল আড়ম্বর-প্রিয়তার নহে, ক্ষুদ্রত্বেরই লক্ষণ এই যে, সে ক্ষুদ্রের প্রতি মন দিতে পারে না। পিপীলিকাকে আমার যে চক্ষে দেখি ঈশ্বর সে চক্ষে দেখেন না। বড়োর প্রতি যে মনোযোগ বা হস্তক্ষেপ করে, আত্মশ্লাঘা, যশ, ক্ষমতাপ্রাপ্তির আশায় সদাসর্বক্ষণ তাহাকে উত্তেজিত করিয়া রাখিতে পারে, সে তাহার ক্ষুদ্রত্বের চরম পরিতৃপ্তি লাভ করিতে থাকে। কিন্তু ছোটোর প্রতি যে মন দেয়, তাহার তেমন উত্তেজনা কিছুই থাকে না, সুতরাং তাহার প্রেম থাকা চাই, তাহার মহত্ত্ব থাকা চাই— তাহার পুরস্কারের প্রত্যাশা নাই, সে প্রাণের টানে সে নিজের মহিমার প্রভাবে কাজ করে, তাহার কাজের আর অন্ত নাই।

আত্মপরতা অপেক্ষা স্বদেশ-প্রেম যাহার বেশি সেই প্রাণ ধরিয়া স্বদেশের ক্ষুদ্র দুঃখ ক্ষুদ্র অভাবের প্রতি মন দিতে পারে; সে কিছুই ক্ষুদ্র বলিয়া মনে করে না। বাস্তবিকপক্ষে কোন্‌টা

---

[১] ইহা যদি কেহ 'রুচিবিরুদ্ধ' বা গালাগালি জ্ঞান করেন তবে আমি 'উনবিংশ শতাব্দীর' ডারুয়িনের দোহাই দিব!

ছোটো কোন্‌টা বড়ো তাহা স্থির করিতে পারে কে! ইতিহাসবিখ্যাত একটা কুহেলিকাময় দিগ্‌গজ ব্যাপারই যে বড়ো, আর দ্বারের নিকটস্থ একটি রক্তমাংসময় দৃষ্টিগোচর অসম্পূর্ণতাই যে সামান্য তাহা কে জানে! কিসের হইতে যে কী হয়, কোন্ ক্ষুদ্র বীজ হইতে যে কোন্ বৃহৎ বৃক্ষ হয় তাহা জানি না, এই পর্যন্ত জানি সহজ হৃদয়ের প্রেম হইতে কাজ করিলে কিছুই আর ভাবিতে হয় না। কারণ, সহজ ভাবের গুণ এই, সে আর হিসাবের অপেক্ষা রাখে না। তাহার আপনার মধ্যেই আপনার নথী, আপনার দলিল। তাহাকে আর চৌদ্দ অক্ষর গণিয়া ছন্দ রচনা করিতে হয় না, সুতরাং তাহার আর ছন্দোভঙ্গ হয় না; আর যাহাকে গণনা করিতে হয়, তাহার গণনায় ভুল হইতেই বা আটক কী! সে বড়োকে ছোটো মন করিতে পারে, ছোটোকে বড়ো মনে করিতে পারে।

আমাদের স্বদেশহিতৈষীদের কোনো দোষ দেওয়া যায় না। তাঁহাদের এক হাতে ঢাল এক হাতে তলোয়ার— তাঁহাদের হাতের অপেক্ষা হাতিয়ার বেশি হইয়া পড়িয়াছে, এইজন্য কাজকর্ম সমস্তই একেবারে স্থগিত রাখিতে হইয়াছে। এবং এই অবসরে দুশো পাঁচশো ঊর্ধ্বপুচ্ছ জিহ্বা এককালে ছাড়া পাইয়া দেশের লোকের কানের মাথাটি মুড়াইয়া ভক্ষণ করিতেছে। এই-সকল ভীমার্জুনের প্রপৌত্রগণের, স্বদেশের উপর প্রেম এত অত্যন্ত বেশি যে স্বদেশের 'লোকের' উপর প্রেম আর বড়ো অবশিষ্ট থাকে না। এই কারণে, ইহারা স্বদেশের হিতসাধনে অত্যন্ত উন্মুখ, সুতরাং স্বদেশীর হিতসাধনে সময় পান না। ব্যাপারটা যে কীরূপ হইতেছে তাহা বলা বাহুল্য। ঘোড়াটা না খাইতে পাইয়া মরিতেছে ও সকলে মিলিয়া একটা ঘোড়ার ডিম লইয়া তা' দিতেছেন, দেশে-বিদেশে রাষ্ট্র তাহা হইতে এক জোড়া পক্ষিরাজের জন্ম হইবে।

যে ব্যক্তি দয়া প্রচার করিয়া বেড়ায় অথচ ভিক্ষুককে এক মুঠা ভিক্ষা দেয় না, তাহার প্রতি আমার কেমন স্বভাবতই অবিশ্বাস জন্মে। সে কথায় বড়ো বড়ো চেক কাটে, কেননা কোনো ব্যাঙ্কেই তাহার এক পয়সা জমা নাই। পুরাকালে কাঠবিড়ালীদের মধ্যে একজন জ্ঞানী জন্মিয়াছিলেন। তিনি কুলবৃক্ষে বাস করিতেন। দর্শনশাস্ত্রে যখন তাঁহার অত্যন্ত ব্যুৎপত্তি জন্মিল, তখন তিনিই প্রথম আবিষ্কার করেন যে, একটি শ্বেত পদার্থের অপেক্ষা শ্বেতবর্ণ ব্যাপক, একটি কুলফলের অপেক্ষা কুলফলত্ব বৃহৎ, কারণ তাহা চরাচরস্থ যাবৎ কুলফলের আধার। এই মহৎতত্ত্ব আবিষ্কারের পর হইতে কুলের প্রতি তাঁহার এমনি ঘৃণা জন্মিল যে, তিনি কুল ভক্ষণ একেবারে পরিত্যাগ করিলেন— কুলত্বের চারা কীরূপে আবাদ করা যাইতে পারে ইহারই অন্বেষণে তাঁহার অবশিষ্ট জীবন ক্ষেপণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু এই গুরুতর গবেষণার প্রভাবে তাঁহার অবশিষ্ট জীবন এমন সংক্ষিপ্ত হইয়া আসিল যে, কুলত্বের চারা আজ পর্যন্ত বাহির হইল না। আজিও সেই কুলগাছ তাঁহার সমাধির উপরে মনুমেন্টস্বরূপ দাঁড়াইয়া আছে, এবং ভক্ত কাঠবিড়ালীগণ আজিও দূর-দূরান্তর হইতে আসিয়া তাঁহাকে স্মরণপূর্বক সেই বৃক্ষ হইতে পেট ভরিয়া কুল খাইয়া যায়। বিষ্ণুশর্মার অপ্রকাশিত পুঁথিতে এই গল্পটি পাঠ করিয়া আমার মনে হইল, হিতবাদ, প্রত্যক্ষবাদ এবং অন্যান্য বাদানুবাদের ন্যায় উক্ত কুলফলত্ববাদও সমাজে বহুল পরিমাণে প্রচলিত আছে। কিন্তু এই 'বাদ'কে যে কোনো অনুষ্ঠান আশ্রয় করে সে উক্ত পূজনীয় কাঠবিড়ালী মহাশয়ের ন্যায় বেশিদিন বাঁচে না। আমাদের দেশহিতৈষিতাও বোধ করি নিজের মহত্ত্বের অভিমানে স্থূল খাদ্য ভক্ষণ করা নিতান্ত হেয় জ্ঞান করিয়া হাওয়া ও বাষ্পের মতো খোরাকে জীবনধারণ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। এই নিমিত্ত দেখা যায় আমাদের এই দেশহিতৈষিতা পদার্থটা কামারের হাপরের ন্যায় মুহূর্তের মধ্যে ফুলিয়া ঢাক হইয়া উঠিতেছে এবং পরের মুহূর্তেই চুপসিয়া শুকনা চামচিকার আকার ধারণ করিতেছে। ইহার উত্তরোত্তর উন্নতি নাই। ইহা হাওয়ার গতিকে হঠাৎ কাঁপিয়া উঠে, আবার একটু আঘাত পাইলেই আওয়াজ করিয়া ফাটিয়া যায়, তার পরে আর সে আওয়াজও করে না, ফোলেও না। কিন্তু, খোরাক বদল করা যায় যদি, যদি ইহা ত্বগিন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থূল পদার্থের প্রতি দক্ষিণহস্ত চালনা করে, তবে আর এমনতরো আকস্মিক

দুর্ঘটনাগুলো ঘটিতে পায় না।

একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। আজকাল প্রতিদিন প্রাতে উঠিয়াই ইংরাজ-কর্তৃক দেশীয়দের প্রতি অত্যাচারের কাহিনী একটা-না-একটা শুনিতেই হয়। কিন্তু কে সেই স্বদেশীয় অসহায়দের সাহায্য করিতে অগ্রসর হয়! বাংলার জেলায় জেলায় নবাব সিরাজুদ্দৌলার বিলিতি উত্তরাধিকারীগণ চাবুক হস্তে দোর্দণ্ড প্রতাপে যে রাজত্ব অর্থাৎ অরাজকত্ব করিতেছে, তাহাদের হাত হইতে আমাদের দেশের সরলপ্রকৃতি গরীব অনাথদের পরিত্রাণ করিতে কে ধাবমান হয়! পেট্রিয়টেরা বলিতেছেন স্বদেশের দুঃখে তাঁহাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে, অর্থাৎ তাঁহারা পাকে-প্রকারে জানাইতে চান তাঁহাদের হৃদয় নামক একটা পদার্থ আছে; তাঁহার তাঁহাদের 'মাথাব্যথার' কথাটা এমনই রাষ্ট্র করিয়া দিতেছেন যে, লোকে তাঁহাদের মাথা না দেখিতে পাইলেও মনে করে সেটা কোনো এক জায়গায় আছে বা। কিন্তু হৃদয় যদি থাকিবে, হৃদয়ের সাড়া পাওয়া যায় না কেন? চারি দিক হইতে যখন নিপীড়ত স্বদেশীদের আর্তস্বর উঠিতেছে, তখন সেই স্বজাতিবৎসল হৃদয় নিদ্রা যায় কী করিয়া? এই তো সেদিন শুনিলাম, স্বজাতিদুঃখকাতর কতকগুলি লোক মিলিয়া একটি সভা স্থাপন করিয়াছেন, আমাদের দেশীয় ব্যারিস্টর অনেকগুলি তাহাতে যোগ দিয়াছেন। কিন্তু বোধ করি, উক্ত ব্যারিস্টরগুলির মধ্যে মহাত্মা মনোমোহন ঘোষ ব্যতীত এমন অল্প লোকই আছেন যাঁহারা বিদেশীয় অত্যাচারীর হস্ত হইতে স্বদেশীয় অসহায়কে মুক্তি দিবার জন্য প্রাণ ধরিয়া টাকার মায়া ত্যাগ করিতে পারিয়াছেন। স্বজাতির প্রতি যাঁহাদের আন্তরিক প্রাণের টান নাই, তাঁহাদের 'স্বদেশ' জিনিসটা কী জানিতে কৌতূহল হয়! সেটা কি রাম লক্ষ্মণ সীতা হনুমান ও রাবণ -বিবর্জিত রামায়ণ? না কলার আত্যন্তিক অভাববিশিষ্ট কলার কাঁদি! না লাঙ্গুলের সম্পর্কশূন্য কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড! ইতিহাসপড়া স্বদেশহিতৈষিতা এমনিতরো একটা ঘোড়া-ডিঙাইয়া ঘাস-খাওয়া। দেখিতে পাওয়া যায়, সমস্ত স্বদেশের দুঃখে যাহাদের হৃদয় একেবারে বিদীর্ণ হয়, তাহারা সেই হৃদয়বিদারণ-ব্যাপারটাকে বিশেষ একটা দুর্ঘটনা বলিয়া জ্ঞান করে না। তাহারা সেই বিদীর্ণ হৃদয়টাকে সভায় লইয়া আসে, তাহার মধ্যে ফুঁ দিয়া ভেঁপু বাজাইতে থাকে ও উৎসব বাধাইয়া দেয়। আমাদের দেশে সম্প্রতি এই বিদীর্ণ-হৃদয়ের রীতিমতো কন্সর্ট বসিয়া গেছে, নৃত্যেরও বিরাম নাই। কিন্তু এই অবিশ্রাম নৃত্যের উৎসাহে কিছুক্ষণের মধ্যে নটদিগের শরীর ক্লিষ্ট হইয়া পড়ে ও তাহারা নাট্যশালার আলো নিভাইয়া দ্বাররুদ্ধ করিয়া গৃহে গিয়া শয়ন করে। কিন্তু দেশের লোকের সত্যকার ক্রন্দনধ্বনিতে— অলংকারশাস্ত্রসম্মত কাল্পনিক অশ্রুজলে নহে— মনুষ্যচক্ষুপ্রবাহিত লবণাক্ত জলবিশিষ্ট সত্যকার অশ্রুধারায় যাঁহাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়, কেবলমাত্র শ্রোতৃবর্গের করতালিবর্ষণে তাঁহাদের সে বিদীর্ণ-হৃদয়ের শান্তি নাই। তাঁহারা কাতরের অশ্রুজল মুছাইবার জন্য নিজের ক্ষতিস্বীকার অনায়াসে করিতে পারেন। তাঁহারা কাজ করেন।

যেরূপ অবস্থা হইয়া দাঁড়াইয়াছে কীরূপ কাজ তাহার উপযোগী তাহা জানি না! অনেকের মতে মুষ্টিযোগের ন্যায় অত্যাচারের আর ঔষধ নাই— অবশ্য, রোগীর ধাত বুঝিয়া যাহারা খৃস্টান সভ্যতার ভান করিয়াও মনে মনে পশুবলের উপাসক, অকাতরে অসহায়দের প্রতি শারীরিক বল প্রয়োগ করিতে কুণ্ঠিত হয় না এবং তাহা ভীরুতা মনে করে না, খেলাচ্ছলে কালো মানুষের প্রাণহিংসা করিতে পারে, কড়া মুষ্টিযোগ ব্যতীত আর কোনো ঔষধ কি তাহারা মানে! স্নিগ্ধ কবিরাজি তৈল তাহাদের চরণে অবিশ্রাম মর্দন করিয়া তাহার কি কোনো ফল দেখা গেল! ইহাদের হিংস্র প্রবৃত্তি, বোধ করি ব্যাঘ্রের মতো ইহাদের হৃদয়ের ঝোপের মধ্যে লুকাইয়া থাকে, অবসর পাইলেই কাতরের মাথার উপরে অকাতরে লম্ফ দিয়া পড়ে। ইহাদের ধাত ইহারাই বুঝে। তাহার সাক্ষী আইরিশ জাতি। তাহারাও খুনী, এইজন্য তাহারা খুনের মাদারটিংচার ব্যবস্থা করিয়াছে। তাহারা তাহাদের দুঃখ নিরাকরণের সহজ উপায় দেখে নাই, এইজন্য ডাকের পরিবর্তে দাইনামাইটযোগে আগ্নেয় দরখাস্ত ইংলন্ডের ঘরে ঘরে প্রেরণ করিতেছে। তাহাদের ধর্মশাস্ত্র স্বয়ং

তাহাদের রোগীর জন্য অনন্ত অগ্নিদাহ প্রেস্ক্রিপশন করিয়া রাখিয়াছে, তাহাদের আর অন্বেষণে কী করিবে? Similia Similibus curantur, অর্থাৎ শঠে শাঠ্যাং সমাচরেৎ, ইহা হোমিওপ্যাথিক বৈদ্যদের মত। কিন্তু আমরা তো খুনী জাত নহি, এবং ততদূর সভ্য হইয়া উঠিতে আমরা চাহিও না; মুষ্টিযোগ চিকিৎসাশাস্ত্রে আমাদের কিছুমাত্র ব্যুৎপত্তি নাই, এবং সে চিকিৎসা রোগীর পক্ষে আশুফলপ্রদ হইলেও চিকিৎসকের পক্ষে পরিণামে শুভকরী নহে। সুতরাং আমাদিগকে অন্য কোনো সহজ উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। ইংরাজের অত্যাচার নিবারণের উদ্দেশ্যে আমরা দেশীয় লোকদিগকে প্রাণপণে সাহায্য করিব। দেশের লোকের জন্য কেবল জিহ্বা আন্দোলন নহে, যথার্থ স্বার্থত্যাগ করিতে শিখিব। বিদেশীয়ের হস্তে দেশের লোকের বিপদ নিজের অপমান ও নিজের বিপদ বলিয়া জ্ঞান করিব। নহিলে একে, ইংরাজেরা আমাদের বিধাতৃপুরুষ, মফস্বলে তাহাদের অসীম প্রভাব, তাহারা সুশিক্ষিত সতর্ক, তাহাতে আবার ইংরাজ ম্যাজিস্ট্রেট ও ইংরাজ জুরি তাহাদের বিচারক; কেবল তাহাই নয়, তাহাদের স্বজাতি সমস্ত অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান তাহাদের সহায়— এমন স্থলে একজন ভীত ত্রস্ত অশিক্ষিত স্বদেশী-সহায়বর্জিত দরিদ্র কৃষ্ণকায়ের আশা-ভরসা কোথায়!

আমাদের দেশের বাগীশবর্গ বলেন, agitate করো, অর্থাৎ বাকযন্ত্রটাকে এক মুহূর্ত বিশ্রাম দিয়ো না। ইল্‌বার্ট বিল ও লোকল সেলফ্ গবর্মেন্ট সম্বন্ধে পাড়ায় পাড়ায় বক্তৃতা করিয়া বেড়াও। তাহার একটা ফল এই হইবে যে, লোকেদের মধ্যে পোলিটিকল এডুকেশন বিস্তৃত হইবে। স্বদেশের হিত কাহাকে বলে লোকে তাহাই শিখেবে। ইত্যাদি। কিন্তু ইন্দ্রদেবের ন্যায় আকাশের মেঘের মধ্যে থাকিয়া মর্ত্যবাসীদের পরম উপকার করিবার জন্য কনস্টিট্যুশনল হিস্ট্রি-পড়া ইংরাজি বক্তৃতায় শিলাবৃষ্টি বর্ষণ করিয়া তাহাদের মাথা ভাঙিয়া দিলেও তাহাদের মস্তিষ্কের মধ্যে 'পোলিটিকল এডুকেশন' প্রবেশ করে কি না সন্দেহ। আমি বোধ করি এ-সকল শিক্ষা ঘরের ভিতর হইতে হয়, অত্যন্ত পরিপক্ক লাউ-কুমড়ার মতন চালের উপর হইতে গড়াইয়া পড়ে না! যতবার মফস্বলে একজন ইংরাজ একজন দেশীয়ের প্রতি অত্যাচার করে, যতবার সেই দেশীয়ের পরাভব হয়, যতবার সে অদৃষ্টের মুখ চাহিয়া সেই অত্যাচার ও পরাভব নীরবে সহ্য করিয়া যায়, যতবার সে নিজেকে সর্বতোভাবে অসহায় বলিয়া অনুভব করে, ততবারই যে আমাদের দেশ দাসত্বের গহ্বরে এক-পা এক-পা করিয়া আরও নামিতে থাকে। কেবল কতকগুলা মুখের কথায় তুমি তাহাকে আত্মমর্যাদা শিক্ষা দিবে কী করিয়া! যাহার গৃহের সম্ভ্রম প্রতিদিন নষ্ট হইতেছে, তুমি তাহাকে লোকল সেলফ্ গবর্মেন্টের মাচার উপর চড়াইয়া কী আর রাজা করিবে বলো! ঘরে যাহার হাঁড়ি চড়ে না, তুমি তাহার ছবির হাতে একটা টাকার তোড়া আঁকিয়া তাহার ক্ষুধার যন্ত্রণা কীরূপে নিবারণ করিবে! যাহারা নিজের সম্ভ্রম রক্ষার বিষয়ে হতাশ্বাস হইয়া পড়িয়াছে, শাসনকর্তাদের ভয়ে যাহাদের অহর্নিশি নাড়ী ঠক্‌ঠক করিতেছে, তাহাদের হাতে শাসনভার দিতে যাওয়া নিষ্ঠুর বিদ্রূপ বলিয়া বোধ হয়। শিক্ষা দিতে চাও তো এক কাজ করো; একবার একজন ইংরাজের হাত হইতে একজন দেশীয়কে ত্রাণ করো, একবার সে বুঝিতে পারুক ইংরাজ ও অদৃষ্ট একই ব্যক্তি নহে, একবার সে হৃদয়ের মধ্যে জয়গর্ব অনুভব করুক, একবার তাহার হৃদয়ের ন্যায্য প্রতিশোধস্পৃহা চরিতার্থ হউক। তখন আমাদের দেশের লোকের আত্মমর্যাদাজ্ঞান বাস্তবিক হৃদয়ের মধ্যে অঙ্কুরিত হইতে থাকিবে। সে জ্ঞান যদি হৃদয়ের মধ্যে বদ্ধমূল না হয় তবে জাতির উন্নতি কোথায়। ইংরাজেরা যে আমাদের পশুর ন্যায় জ্ঞান করে ও তাহা ব্যবহারে ক্রমাগত প্রকাশ করে, ড্যাম নিগর বলিয়া সম্বোধন করে ও কটাক্ষপাতে কাঁপাইয়া তোলে, ইহার যে কুফল তাহার প্রতিবিধান কিসে হইবে। Agitate করিয়া দরখাস্ত করিয়া একটা সুবিধাজনক আইন পাস করাইয়া যেটুকু লাভ, তাহাতে এ লোকসান পূরণ করিতে পারে না। ইংরাজের প্রতিদিনকার ব্যবহারগত যথেচ্ছাচারিতা দমন করিয়া যখন দেশের লোকেরা আপনাদিগকে কতকটা তাহাদের সমকক্ষ জ্ঞান করিবে, তখনই আমাদের যথার্থ উন্নতি আরম্ভ

হইবে, দাসত্বের থরহরভীতি দূর হইবে ও আমরা নতশির আকাশের দিকে তুলিতে পারিব! সে কখন হইবে, যখন আমাদের দেশের সাধারণ লোকেরাও ইংরাজের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইয়া কথঞ্চিৎ আত্মরক্ষার প্রত্যাশা করিতে পারিবে। সে শুভদিনই বা কখন আসিবে? যখন স্বদেশের লোক স্বদেশের লোকের সাহায্য করিবে। এ যে শিক্ষা, এই যথার্থ শিক্ষা এ জিহ্বার ব্যায়াম শিক্ষা নহে, ইহাই স্বদেশহিতৈষিতার প্রকৃত চর্চা।

আমরা যখন স্বদেশীয় বিপন্নদের সাহায্য করিতে অগ্রসর হইব, তখন আমাদের আর-এক মহৎ উপকার হইবে। তখন আমাদের দেশের লোক স্বদেশ কাহাকে বলে বুঝিতে পারিবে। স্বদেশপ্রেম প্রভৃতি কথা আমরা বিদেশীদের কাছ হইতে শিখিয়াছি, কিন্তু স্বদেশীদের কাছ হইতে আজিও শিখিতে পাই নাই। তাহার কারণ, আমরা স্বদেশপ্রেম দেখিতে পাই না। আমাদের চারি দিকে জড়তা, নিশ্চেষ্টতা, হৃদয়ের অভাব। কেহ কাহারো সাড়া পাই না, কেহ কাহারো সাহায্য পাই না, কেহ বলে না মাভৈঃ। এমন শ্মশানক্ষেত্রের মধ্যে দাঁড়াইয়া ইহাকেও গৃহ মনে করা অসাধারণ কল্পনার কাজ! আমি উপবাসে মরিয়া গেলেও যে জনমণ্ডলী আমাকে এক মুঠা অন্ন দেয় না, আমাকে বাহিরের লোক আক্রমণ করিলে দাঁড়াইয়া তামাশা দেখে, আমার পরম বিপদের সময়েও আমার সম্মুখে বসিয়া স্বচ্ছন্দে নৃত্যগীত উৎসব করে, তাহাদিগকে আমার আত্মীয়-পরিবার মনে করিতে হইবে! কেন করিতে হইবে! না, শহরের কালেজ হইতে একজন বক্তা আসিয়া অত্যন্ত উর্ধ্বকণ্ঠে বলিতেছেন তাহাই মনে করা উচিত। আমাকে যদি একজন ইংরাজ পথে অন্যায় প্রহার করে, তবে সেই বক্তাই পাশ কাটাইয়া চলিয়া যান। সে সময়ে কি আমরা আমাদের স্বদেশের কোনো লোকের সাহায্য প্রত্যাশা করি! স্বদেশীয়দের মধ্যে আমরা যেমন অসহায় এমন আর কোথাও নহি! এইজন্যই বলিতেছি, যদি স্বদেশপ্রেম শিক্ষা দিতে হয় তবে সে পিতামহদের নাম উল্লেখ করিয়া সিন্ধু হইতে ব্রহ্মপুত্র বিকম্পিত করিয়া agitate করিয়া বেড়াইলে হইবে না! হাতে কলমে এক-একজন করিয়া স্বদেশীয়ের সাহায্য করিতে হইবে। যে কৃষক, নাগরিক মহাশয়ের উদ্দীপক বক্তৃতা ও জাতীয় সংগীত শুনিয়া প্রথমে হাঁ করিয়াছিল, তাহার পর হাই তুলিয়াছিল, তাহার পর চোখ বুজিয়া ঢুলিয়াছিল ও অবশেষে বাড়ি ফিরিয়া গিয়া স্ত্রীকে সংবাদ দিয়াছিল যে কলিকাতার বাবু সত্যিপীরের গান করিতে আসিয়াছেন; সেই যখন বিপদের সময়, অকূলপাথারে ডুবিবার সময় দেখিবে তাহার স্বদেশীয় দক্ষিণ হস্ত প্রসারণ করিয়া তাহাকে উদ্ধার করিতে আসিয়াছেন, তখন তাহার যে শিক্ষা হইবে সে শিক্ষার কোনো কালে বিনাশ নাই। আমাদের সন্তানরা যখন দেখিবে চারি দিকে স্বদেশীয়েরা স্বদেশীয়ের সাহায্য করিতেছে, তখন কি আর স্বদেশপ্রেম নামক কথাটা তাহাদিগকে ইংরাজের গ্রন্থ হইতে শিখিতে হইবে! তখন সেই ভাব তাহারা পিতার কাছে শিখিবে, মাতার কাছে শিখিবে, ভ্রাতাদের কাছে শিখিবে, সঙ্গীদের কাছে শিখিবে। কাজ দেখিয়া শিখিবে, কথা শুনিয়া শিখিবে না। তখন আমাদের দেশের সম্ভ্রম রক্ষা হইবে, আমাদের আত্মমর্যাদা বৃদ্ধি পাইবে; তখন আমরা স্বদেশে বাস করিব স্বজাতিকে ভাই বলিব। আজ আমরা বিদেশে আছি, বিদেশীয়দের হাজতে আছি, আমাদের সম্ভ্রমই বা কী, আস্ফালনই বা কী! আমাদের স্বজাতি যখন আমাদিগকে স্বজাতি বলিয়া জানে না, তখন কাহার কাছে কোন্ চুলায় আমরা 'agitate' করিতে যাইব।

তবে agitate করিতে যাইব কি ইংরাজের কাছে! আমরা পথে সসংকোচে ইংরাজকে পথ ছাড়িয়া দিই, আফিসে ইংরাজ প্রভুর গালাগালি ও ঘৃণা সহ্য করি, ইংরাজের গৃহে গিয়া জোড়া হস্তে তাহাকে মা বাপ বলিয়া তাহার নিকটে উমেদারি করি, ও তাহার খানসামা রসুলবক্সকে সেলাম করিয়া খাঁ-সাহেব বলিয়া চাচা বলিয়া খুশি করি, ইংরাজ আমাদিগকে সরকারি বাগানের বেঞ্চিতে বসিতে দেখিলে ঘাড় ধরিয়া উঠাইয়া দিতে চায়, ইংরাজ তাহাদের ক্লবে আমাদিগকে প্রবেশ করিতে দিতে চায় না, ইংরাজ রেলগাড়িতে তাহাদের বসিবার আসন স্বতন্ত্র করিয়া লইতে চায়, Gentleman শব্দে ইংরাজ ইংরাজকে বোঝে ও ব্যাবু অর্থে মসীজীবী ভীরু দাসকে বোঝে,

ইংরাজ আমাদের প্রাণ তাহাদের আহার্য পশুর প্রাণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করে না, ইংরাজ আমাদের গৃহে আসিয়া আমাদিগকে অপমান করিয়া যায় আমরা তাহার প্রতিবিধান করিতে পারি না, সেই ইংরাজের কাছে আমরা agitate করিতে যাইব যে, তোমরা আমাদিগকে তোমাদের সমকক্ষ আসন দাও! মনে করি, কেবলমাত্র আমাদের হাঁক শুনিয়া তাহারা ত্রস্ত হইয়া তাহাদের নিজের আসন তৎক্ষণাৎ ছাড়িয়া দিবে! কেতাবে পড়িয়াছি ইংরাজেরা স্বদেশে কী করিয়া agitate করে, মনে করি তবে আর কী, আমরাও ঠিক অমনি করিব ফলও ঠিক সেইরূপ হইবে; কিন্তু একটা constitutional সিংহচর্ম পরিলেই কি ক্ষুরের জায়গায় নখ উঠিবার সম্ভাবনা আছে! গল্প আছে একটা গোরু রোজ তাহার গোয়াল হইতে দেখিত তাহার মনিবের কুকুরটি লম্ফ-ঝম্প করিয়া ল্যাজ নাড়িয়া মনিবের কোলের উপর দুই পা তুলিয়া দিত এবং পরমাদরে প্রভুর পাত হইতে খাদ্যদ্রব্য খাইতে পাইত; গোরুটা অনেক দিন ভাবিয়া, অনেক খড়ের আঁটি নীরবে চর্বণ করিয়া স্থির করিল, মনিবের পাত হইতে দুই-এক টুকরা সুস্বাদু প্রসাদ পাইবার পক্ষে এই চরণ উত্থাপন এবং সঘনে লাঙ্গুল ও লোলজিহ্বা আন্দোলনই প্রকৃত Constitutional agitation; এই স্থির করিয়া সে তাহার দড়িদড়া ছিঁড়িয়া ল্যাজ নাড়িয়া মনিবের কোলের উপরে লম্ফ-ঝম্প আরম্ভ করিল। কুকুরের সহিত তাহার ব্যবহার সমস্ত অবিকল মিলিয়াছিল কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে. তথাপি গোষ্ঠবিহারীকে নিরাশ হইয়া অবিলম্বে গোয়াল-ঘরে ফিরিয়া যাইতে হইয়াছিল। কিঞ্চিৎ আহার হইয়াছিল বটে, কিন্তু এই বাহ্যিক আহারে পেট না ফুলিয়া পিঠ ফুলিয়া উঠিয়াছিল। আমরাও agitate করি, বাহ্যিক পিঠ-থাবড়াও খাই, কিন্তু তাহাতে কি পেট ভরে? আর, ইংরাজের সমকক্ষ হইবার জন্য ইংরাজের কাছে হাতজোড় করিতে যাওয়া এই বা কেমনতরো তামাশা! সমকক্ষ আমরা নিজের প্রভাবে হইব না? আমরা নিজের জাতির গৌরব নিজে বাড়াইব না? নিজের জাতির শিক্ষা বিস্তার করিব না? নিজের জাতির অপমানের প্রতিবিধান করিব না, অসম্মান দূর করিব না? কেবল ইংরাজের পায়ের ধুলা লইয়া জোড়হাতে সম্মুখে দাঁড়াইয়া গলবস্ত্র হইয়া বলিতে থাকিব, 'দোহাই সাহেব', দোহাই হজুর, ধর্মাবতার, আমরা তোমাদের সমকক্ষ, আমরা তোমাদের ওই উনবিংশ শতাব্দীর অতি পরিপক্ক কদলী-লোলুপ, আমাদিগকে তোমাদের লাঙ্গুলে জড়াইয়া উঠাও, তোমাদের উচ্চ শাখার পাশে বসাও, আমরা তোমাদের উক্ত পরহিতৈষী লাঙ্গুলে তৈল দিব!' যদি বা ইংরাজ অত্যন্ত দয়ার্দ্রচিত্তে আমাদিগকে বসিবার আসন দেয় ও আমাদের পিঠে হাত বুলাইয়া দেয়, তাহাতেই কি আমাদের প্রতিদিনকার নেপথ্যপ্রাপ্য লাথি-ঝাঁটার অপমানচিহ্ন একেবারে মুছিয়া যাইবে! ইংরাজের প্রসাদে আমাদের যখন পদবৃদ্ধি হয়, সে পায়া কাঠের পায়া মাত্র, সহজ পদের অপেক্ষা তাহাতে পদশব্দ বেশি হয় বটে, কিন্তু সে জিনিসটা যখনই খুলিয়া লয় তখনই পুনশ্চ অলাবুর মতো ভূতলে গড়াইতে থাকি। কিন্তু নিজের পদের উপরে দাঁড়ালেই আমরা ধ্রুবপদ প্রাপ্ত হই। ভিক্ষালব্ধ সম্মানের তাজ না হয় মাথায় পরিলাম, কিন্তু কৌপীন তো ঘুচিল না; এইরূপ বেশ দেখিয়া কি প্রভুরা হাসে না! ঢেঁকিরা দরখাস্ত করিতেছেন স্বর্গস্থ হইবার দুরাশায়, কিন্তু ধানভানাই যদি কপালে থাকে তবে স্বর্গে গেলে তাঁহারা এমনিই কী ইন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হইবেন!

নিজের সম্মান যে নিজে রাখে না, পরের এমনিই কী মাথাব্যথা তাহাকে সম্মানিত করিতে আসিবে? আমরাই বা কেন আমাদের স্বজাতিকে ঘৃণা করি, স্বভাষায় কথা কই না, স্ববস্ত্র পরিতে চাই না, ইংরাজের রুমালটা কুড়াইয়া দিতে পারিলে গোলোক-প্রাপ্তিসুখ অনুভব করিতে থাকি! আমরা আমাদের ভাষার, আমাদের সাহিত্যের এমন উন্নতি করিতে চেষ্টা না করি কেন, যাহাতে আমাদের ভাষা আমাদের সাহিত্য পরম শ্রদ্ধেয় হইয়া উঠে! যে স্বদেশীয়েরা আমাদের জাতিকে, আমাদের ব্যবহারকে, আমাদের ভাষাকে, আমাদের সাহিত্যকে নিতান্ত হেয় জ্ঞান করিয়া নিজের উন্নতিগর্বে স্ফীত হইয়া উঠেন, তাঁহারাই হয়তো সভা করিয়া জাতীয় সম্মানের জন্য ইংরাজের কাছে নাম-সহি-করা দরখাস্ত পাঠাইতেছেন; নিজে যাহাদিগকে সম্মান করিতে পারেন না, প্রত্যাশা

হইবে, দাসত্বের থরহরভীতি দূর হইবে ও আমরা নতশির আকাশের দিকে তুলিতে পারিব! সে কখন হইবে, যখন আমাদের দেশের সাধারণ লোকেরাও ইংরাজের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইয় কথঞ্চিৎ আত্মরক্ষার প্রত্যাশা করিতে পারিবে। সে শুভদিনই বা কখন আসিবে? যখন স্বদেশের লোক স্বদেশের লোকের সাহায্য করিবে। এ যে শিক্ষা, এই যথার্থ শিক্ষা এ জিহ্বার ব্যায়াম শিক্ষ নহে, ইহাই স্বদেশহিতৈষিতার প্রকৃত চর্চা।

আমরা যখন স্বদেশীয় বিপন্নদের সাহায্য করিতে অগ্রসর হইব, তখন আমাদের আর-এক মহৎ উপকার হইবে। তখন আমাদের দেশের লোক স্বদেশ কাহাকে বলে বুঝিতে পারিবে। স্বদেশপ্রেম প্রভৃতি কথা আমরা বিদেশীদের কাছ হইতে শিখিয়াছি, কিন্তু স্বদেশীদের কাছ হইতে আজিও শিখিতে পাই নাই। তাহার কারণ, আমরা স্বদেশপ্রেম দেখিতে পাই না। আমাদের চারি দিকে জড়তা, নিশ্চেষ্টতা, হৃদয়ের অভাব। কেহ কাহারো সাড়া পাই না, কেহ কাহারো সাহায্য পাই না, কেহ বলে না মাভৈঃ। এমন শ্মশানক্ষেত্রের মধ্যে দাঁড়াইয়া ইহাকেও গৃহ মনে করা অসাধারণ কল্পনার কাজ! আমি উপবাসে মরিয়া গেলেও যে জনমণ্ডলী আমাকে এক মুঠা অন্ন দেয় না, আমাকে বাহিরের লোক আক্রমণ করিলে দাঁড়াইয়া তামাশা দেখে, আমার পরম বিপদের সময়েও আমার সম্মুখে বসিয়া স্বচ্ছন্দে নৃত্যগীত উৎসব করে, তাহাদিগকে আমার আত্মীয়-পরিবার মনে করিতে হইবে! কেন করিতে হইবে! না, শহরের কালেজ হইতে একজন বক্তা আসিয়া অত্যন্ত উর্ধ্বকণ্ঠে বলিতেছেন তাহাই মনে করা উচিত। আমাকে যদি একজন ইংরাজ পথে অন্যায় প্রহার করে, তবে সেই বক্তাই পাশ কাটাইয়া চলিয়া যান। সে সময়ে কি আমরা আমাদের স্বদেশের কোনো লোকের সাহায্য প্রত্যাশা করি! স্বদেশীয়দের মধ্যে আমরা যেমন অসহায় এমন আর কোথাও নহি! এইজন্যই বলিতেছি, যদি স্বদেশপ্রেম শিক্ষা দিতে হয় তবে সে পিতামহদের নাম উল্লেখ করিয়া সিন্ধু হইতে ব্রহ্মপুত্র বিকম্পিত করিয়া agitate করিয়া বেড়াইলে হইবে না! হাতে কলমে এক-একজন করিয়া স্বদেশীয়ের সাহায্য করিতে হইবে। যে কৃষক, নাগরিক মহাশয়ের উদ্দীপক বক্তৃতা ও জাতীয় সংগীত শুনিয়া প্রথমে হাঁ করিয়াছিল, তাহার পর হাই তুলিয়াছিল, তাহার পর চোখ বুজিয়া ঢুলিয়াছিল ও অবশেষে বাড়ি ফিরিয়া গিয়া স্ত্রীকে সংবাদ দিয়াছিল যে কলিকাতার বাবু সত্যিপীরের গান করিতে আসিয়াছেন; সেই যখন বিপদের সময়, অকূলপাথারে ডুবিবার সময় দেখিবে তাহার স্বদেশীয় দক্ষিণ হস্ত প্রসারণ করিয়া তাহাকে উদ্ধার করিতে আসিয়াছেন, তখন তাহার যে শিক্ষা হইবে সে শিক্ষার কোনো কালে বিনাশ নাই। আমাদের সন্তানরা যখন দেখিবে চারি দিকে স্বদেশীয়েরা স্বদেশীয়ের সাহায্য করিতেছে, তখন কি আর স্বদেশপ্রেম নামক কথাটা তাহাদিগকে ইংরাজের গ্রন্থ হইতে শিখিতে হইবে! তখন সেই ভাব তাহারা পিতার কাছে শিখিবে, মাতার কাছে শিখিবে, ভ্রাতাদের কাছে শিখিবে, সঙ্গীদের কাছে শিখিবে। কাজ দেখিয়া শিখিবে, কথা শুনিয়া শিখিবে না। তখন আমাদের দেশের সম্ভ্রম রক্ষা হইবে, আমাদের আত্মমর্যাদা বৃদ্ধি পাইবে; তখন আমরা স্বদেশে বাস করিব স্বজাতিকে ভাই বলিব। আজ আমরা বিদেশে আছি, বিদেশীয়দের হাজতে আছি, আমাদের সম্ভ্রমই বা কী, আস্ফালনই বা কী! আমাদের স্বজাতি যখন আমাদিগকে স্বজাতি বলিয়া জানে না, তখন কাহার কাছে কোন্ চুলায় আমরা 'agitate' করিতে যাইব।

তবে agitate করিতে যাইব কি ইংরাজের কাছে! আমরা পথে সসংকোচে ইংরাজকে পথ ছাড়িয়া দিই, আফিসে ইংরাজ প্রভুর গালাগালি ও ঘৃণা সহ্য করি, ইংরাজের গৃহে গিয়া জোড়া হস্তে তাহাকে মা বাপ বলিয়া তাহার নিকটে উমেদারি করি, ও তাহার খানসামা রসুলবক্সকে সেলাম করিয়া খাঁ-সাহেব বলিয়া চাচা বলিয়া খুশি করি, ইংরাজ আমাদিগকে সরকারি বাগানের বেঞ্চিতে বসিতে দেখিলে ঘাড় ধরিয়া উঠাইয়া দিতে চায়, ইংরাজ তাহাদের ক্লবে আমাদিগকে প্রবেশ করিতে দিতে চায় না, ইংরাজ রেলগাড়িতে তাহাদের বসিবার আসন স্বতন্ত্র করিয়া লইতে চায়, Gentleman শব্দে ইংরাজ ইংরাজকে বোঝে ও ব্যাবু অর্থে মসীজীবী ভীরু দাসকে বোঝে,

ইংরাজ আমাদের প্রাণ তাহাদের আহার্য পশুর প্রাণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করে না, ইংরাজ আমাদের গৃহে আসিয়া আমাদিগকে অপমান করিয়া যায় আমরা তাহার প্রতিবিধান করিতে পারি না, সেই ইংরাজের কাছে আমরা agitate করিতে যাইব যে, তোমরা আমাদিগকে তোমাদের সমকক্ষ আসন দাও! মনে করি, কেবলমাত্র আমাদের হাঁক শুনিয়া তাহারা ত্রস্ত হইয়া তাহাদের নিজের আসন তৎক্ষণাৎ ছাড়িয়া দিবে! কেতাবে পড়িয়াছি ইংরাজেরা স্বদেশে কী করিয়া agitate করে, মনে করি তবে আর কী, আমরাও ঠিক অমনি করিব ফলও ঠিক সেইরূপ হইবে; কিন্তু একটা constitutional সিংহচর্ম পরিলেই কি ক্ষুরের জায়গায় নখ উঠিবার সম্ভাবনা আছে! গল্প আছে একটা গোরু রোজ তাহার গোয়াল হইতে দেখিত তাহার মনিবের কুকুরটি লম্ফ-ঝম্প করিয়া ল্যাজ নাড়িয়া মনিবের কোলের উপর দুই পা তুলিয়া দিত এবং পরমাদরে প্রভুর পাত হইতে খাদ্যদ্রব্য খাইতে পাইত; গোরুটা অনেক দিন ভাবিয়া, অনেক খড়ের আঁটি নীরবে চর্বণ করিয়া স্থির করিল, মনিবের পাত হইতে দুই-এক টুকরা সুস্বাদু প্রসাদ পাইবার পক্ষে এই চরণ উত্থাপন এবং সঘনে লাঙ্গুল ও লোলজিহ্বা আন্দোলনই প্রকৃত Constitutional agitation; এই স্থির করিয়া সে তাহার দড়িদড়া ছিঁড়িয়া ল্যাজ নাড়িয়া মনিবের কোলের উপরে লম্ফ-ঝম্প আরম্ভ করিল। কুকুরের সহিত তাহার ব্যবহার সমস্ত অবিকল মিলিয়াছিল কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তথাপি গোষ্ঠবিহারীকে নিরাশ হইয়া অবিলম্বে গোয়াল-ঘরে ফিরিয়া যাইতে হইয়াছিল। কিঞ্চিৎ আহার হইয়াছিল বটে, কিন্তু এই বাহ্যিক আহারে পেট না ফুলিয়া পিঠ ফুলিয়া উঠিয়াছিল। আমরাও agitate করি, বাহ্যিক পিঠ-থাবড়াও খাই, কিন্তু তাহাতে কি পেট ভরে? আর, ইংরাজের সমকক্ষ হইবার জন্য ইংরাজের কাছে হাতজোড় করিতে যাওয়া এই বা কেমনতরো তামাশা! সমকক্ষ আমরা নিজের প্রভাবে হইব না? আমরা নিজের জাতির গৌরব নিজে বাড়াইব না? নিজের জাতির শিক্ষা বিস্তার করিব না? নিজের জাতির অপমানের প্রতিবিধান করিব না, অসম্মান দূর করিব না? কেবল ইংরাজের পায়ের ধুলা লইয়া জোড়হাতে সম্মুখে দাঁড়াইয়া গলবস্ত্র হইয়া বলিতে থাকিব, 'দোহাই সাহেব', দোহাই হুজুর, ধর্মাবতার, আমরা তোমাদের সমকক্ষ, আমরা তোমাদের ওই ঊনবিংশ শতাব্দীর অতি পরিপক্ব কদলী-লোলুপ, আমাদিগকে তোমাদের লাঙ্গুলে জড়াইয়া উঠাও, তোমাদের উচ্চ শাখার পাশে বসাও, আমরা তোমাদের উক্ত পরহিতৈষী লাঙ্গুলে তৈল দিব!' যদি বা ইংরাজ অত্যন্ত দয়ার্দ্রচিত্তে আমাদিগকে বসিবার আসন দেয় ও আমাদের পিঠে হাত বুলাইয়া দেয়, তাহাতেই কি আমাদের প্রতিদিনকার নেপথ্যপ্রাপ্য লাথি-ঝাঁটার অপমানচিহ্ন একেবারে মুছিয়া যাইবে! ইংরাজের প্রসাদে আমাদের যখন পদবৃদ্ধি হয়, সে পায়া কাঠের পায়া মাত্র, সহজ পদের অপেক্ষা তাহাতে পদশব্দ বেশি হয় বটে, কিন্তু সে জিনিসটা যখনই খুলিয়া লয় তখনই পুনশ্চ অলাবুর মতো ভূতলে গড়াইতে থাকি। কিন্তু নিজের পদের উপরে দাঁড়ালেই আমরা ধ্রুবপদ প্রাপ্ত হই। ভিক্ষালব্ধ সম্মানের তাজ না হয় মাথায় পরিলাম, কিন্তু কৌপীন তো ঘুচিল না; এইরূপ বেশ দেখিয়া কি প্রভুরা হাসে না! ঢেঁকিরা দরখাস্ত করিতেছেন স্বর্গস্থ হইবার দুরাশায়, কিন্তু ধানভানাই যদি কপালে থাকে তবে স্বর্গে গেলে তাঁহারা এমনিই কী ইন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হইবেন!

নিজের সম্মান যে নিজে রাখে না, পরের এমনিই কী মাথাব্যথা তাহাকে সম্মানিত করিতে আসিবে? আমরাই বা কেন আমাদের স্বজাতিকে ঘৃণা করি, স্বভাষায় কথা কই না, স্ববস্ত্র পরিতে চাই না, ইংরাজের রুমালটা কুড়াইয়া দিতে পারিলে গোলোক-প্রাপ্তিসুখ অনুভব করিতে থাকি! আমরা আমাদের ভাষার, আমাদের সাহিত্যের এমন উন্নতি করিতে চেষ্টা না করি কেন, যাহাতে আমাদের ভাষা আমাদের সাহিত্য পরম শ্রদ্ধেয় হইয়া উঠে! যে স্বদেশীয়েরা আমাদের জাতিকে, আমাদের ব্যবহারকে, আমাদের ভাষাকে, আমাদের সাহিত্যকে নিতান্ত হেয় জ্ঞান করিয়া নিজের উন্নতিগর্বে স্ফীত হইয়া উঠেন, তাঁহারাই হয়তো সভা করিয়া জাতীয় সম্মানের জন্য ইংরাজের কাছে নাম-সহি-করা দরখাস্ত পাঠাইতেছেন; নিজে যাহাদিগকে সম্মান করিতে পারেন না, প্রত্যাশা

করিতে থাকেন ইংরাজেরা তাহাদিগকে সম্মান করিবে! সে স্থলে স্বজাতি বলিয়া বোধ হয় তাঁহারা আপনাদের গুটি কয়েককে বুঝেন ও নিজেদের সামান্য অভিমানে আঘাত লাগাতে স্বজাতির অপমান হইয়াছে জ্ঞান করেন। আমাদের গলার শৃঙ্খলটা ধরিয়া ইংরাজ যদি আমাদিগকে তাহাদের কড়িকাষ্ঠে অত্যন্ত উঁচু জায়গায় লটকাইয়া দেয় তাহা হইলেই কি আমাদের চরম উন্নতি আমাদের পরম সম্মান হইল! যথার্থ স্থায়ী ও ব্যাপক উন্নতি কি আমাদের নিজের ভাবা নিজের সাহিত্য নিজের গৃহের মধ্যে হইতে হইবে না। নহিলে পেটের মধ্যে ক্ষুধা লইয়া হাওয়া খাইয়া বেড়াইলে কীরূপ স্বাস্থ্যরক্ষা হইবে! হৃদয়ের মধ্যে আত্মাবমান বহন করিয়া অনুগ্রহলব্ধ বাহিরের সম্মান খুঁটিয়া খুঁটিয়া মোরগপুচ্ছ বিস্তার করিলে মহত্ত্ব কী! যেমন তেলা মাথায় লোকে তেল দেয়, তেমনি টাকগ্রস্ত মাথা হইতে লোকে চুল ছিঁড়িয়া লয়। যে অবমানিত, তাহাকে আরও অবমানিত করিতে লোকে কুণ্ঠিত হয় না। আমরা ঘরে অবমানিত, সেইজন্য আমাদিগকে পরে অবমান করে। সেইজন্য বলিতেছি, আইস আমরা ঘরের সম্মান রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হই; স্বহস্তে আমাদের উৎকর্ষ সাধন করি; আমাদের গৃহের মধ্যে লক্ষ্মীর প্রতিষ্ঠা করি; তবে আমাদের হৃদয়ের মধ্যে বল সঞ্চয় হইবে। তখন এমন মহত্ত্ব লাভ করিব যে, পরের কাছে সামান্য সম্মানটুকু না পাইলে দিন রাত্রি খুঁত খুঁত করিয়া মারা পড়িব না।

যাহা বলিলাম, তাহার সংক্ষেপ মর্ম এই— ইংরাজেরা আমাদিগকে সম্মান করে না, তাহাদের অপেক্ষা হীন জ্ঞান করে এইজন্য সর্বত্র শ্বেত-কৃষ্ণের প্রভেদ রাখিতে চায়। এ কথা সকলেই স্বীকার করেন। ইহার প্রতিবিধানের জন্য সকলেই প্রস্তাব করিতেছেন, আমরা ইংরাজের নিকটে খুব গলা ছাড়িয়া বলিতে থাকি, তোমরা আমাদিগকে হীন-জ্ঞান করিয়ো না, তাহা হইলেই তাহারা আমাদিগকে সম্মান করিতে আরম্ভ করিবে।

আমি বলিতেছি, প্রথমত, এ প্রস্তাবটা অসংগত, দ্বিতীয়ত, যদি বা ইংরাজরা আমাদিগের প্রতি সম্মানের ভান করে, তাহাতেই বা আমাদের লাভ কী! বিকারের রোগী কতকগুলা প্রলাপ বকিতেছে দেখিয়া তুমি নাহয় তাহার মুখে কাপড় গুঁজিয়া দিলে কিন্তু তাহার রোগের উপায় কী করিলে! আমাদের দেশের দুরবস্থার কারণ তাহার অস্থি-মজ্জার মধ্যে নিহিত রহিয়াছে, বাহ্যিক লক্ষণ যে-সকল প্রকাশ পাইতেছে তাহা ভালো বৈ মন্দ নহে, কারণ, তাহাতে রোগের নির্ণয় হয়। আমি তাহার রীতিমতো চিকিৎসার জন্য সকলের কাছে প্রার্থনা করিতেছি। আর, রোগও তো এক-আধটা নহে; আমাদের দেশের শরীরং তো ব্যাধিমন্দিরং নহে, যে একেবারে ব্যাধিব্যারাকং।

যদি আমার এই কথা কাহারো যথার্থ বলিয়া বোধ হয়, যদি দৈবক্রমে আমার এ-সকল কথা কাহারও হৃদয়ের মধ্যে স্থান পায়, তিনি সহসা এমন স্থির করিতে পারেন যে, একটা সভা আহ্বান করিয়া সকলে মিলিয়া দেশের উন্নতি সাধনে প্রবৃত্ত হওয়া যাক। কিন্তু আমার বলিবার অভিপ্রায় তাহা নহে।

এখন আমাদের কী কাজ। এখন কি 'সভা' নামক একটা প্রকাণ্ডকায় যন্ত্রের মধ্যে আমাদের সমস্ত কাজকার্ম ফেলিয়া দিয়া আমরা নিশ্চিন্ত হইব? মনে করিব যে, আমাদের স্বদেশকে একটা এঞ্জিনের পশ্চাতে জুড়িয়া দিলাম, এখন এ ঊর্ধ্বশ্বাসে উন্নতির পথেই ছুটিতে থাকুক! এখন কি Public নামক একটা কাল্পনিক ভাঙা-কুলার উপরে দেশের সমস্ত ছাই ফেলিবার ভার অর্পণ করিব ও যদি তাহাতে ত্রুটি দেখিতে পাই, তবে সেই অনধিগম্য উপচ্ছায়ার প্রতি অত্যন্ত অভিমান করিয়া ঘরের ভাত বেশি করিয়া খাইব! অর্থাৎ, কর্তব্য কাজকে কোনো মতেই গৃহের মধ্যে না রাখিয়া অনাবশ্যক জেঠাইমার মতো অবসর পাইবামাত্র সুদূরে গঙ্গাতীরে সমর্পণ করিয়া আসিব ও তাহার পরম সদ্‌গতি করিলাম মনে করিয়া আত্মপ্রসাদসুখ অনুভব করিব! তাহা নহে। জিজ্ঞাসা করি, Public কোথায়, Public কী। চারি দিকে মরুভূমির এই যে বালুকাসমষ্টি ধূধূ করিতেছে দেখিতেছি, ইহাই কি Public। ইহার মধ্য হইতে কয়েক মুষ্টি একত্র করিয়া স্তূপ করিয়া একটা যে মূর্তির মতো গড়িয়া তোলা হয়, তাহাই কি Public! তাহারই মাথার উপরে আমরা

যত পারি কার্যভার নিক্ষেপ করি ও তাহা বার বার ধসিয়া যায়। তাহার মধ্যে অটল স্থায়িত্বের লক্ষণ কি আমার কিছু দেখিতে পাইতেছি!

কথায় কথায় সভা ডাকিয়া Public নামক একটা কাল্পনিক মূর্তির হৃদয় হাতড়াইয়া বেড়াইবার একটা কুফল আছে। তাহাতে কোনো কাজই হইয়া উঠে না; একটা কাজ উঠিলেই মনে হয়, আমি কী করিব, একটা বিরাট সভা নহিলে এ কাজ হইতে পারে না! আমি একলা যতটুকু কাজ করিতে পারি, ততটুকুও কোনো কালে হইয়া উঠে না। মনে করি, একটা অত্যন্ত ফলাও ব্যাপার করিব, নয় কিছুই করিব না। ক্ষুদ্র কাজ মনে করিলেই হাসি আসে। তাহা ছাড়া হয়তো এমনও মনে হয়, সভা করিয়া তোলা সভ্যদেশপ্রচলিত একটা দস্তুর; সুতরাং সভা না করিয়া কোনো কাজ করিলে মনের তেমন তৃপ্তি হয় না! ইহা ব্যতীত, নিজের উদ্যম নিজের উৎসাহ, নিজের দায়িকতা, অতলস্পর্শ সভার গর্ভে অকাতরে জলাঞ্জলি দিয়া আসা যায়।

আমাদের দেশের অবস্থা কী, তাহাই প্রথমে দেখা আবশ্যক। এখানে Public নাই। উপন্যাসের দুয়ারানী যেমন কুলগাছের কাঁটায় আঁচল বাধাইয়া স্বামী-কর্তৃক অবরোধসুখ কল্পনা করিত, আমরা তেমনি কাপড়চোপড় পরাইয়া একটা ফাঁকি পবলিক সাজাইয়া রাখিয়াছি, কখনো তাহাকে আদর করিতেছি, কখনো তিরস্কার করিতেছি, কখনো বা তাহার প্রতি অভিমান প্রকাশ করিতেছি এবং এইরূপে মনে মনে ঐতিহাসিক সুখ অনুভব করিতেছি। কিন্তু এখনও কি খেলার সময় ফুরায় নাই, এখনও কি কাজের সময় আসে নাই! মনে যদি কষ্ট হয় তো হউক, কিন্তু এই পুত্তলিকাটাকে বিসর্জন করিতে হইবে। এমন এই মনে করিতে হইবে, আমরা সকলেই কাজ করিব। যেখানে প্রত্যেক স্বতন্ত্র ব্যক্তি নিরুদ্যমী, সেখানে ব্যক্তিসমষ্টির কার্যতৎপরতা একটা গুজবমাত্র। আমি উনি তুমি তিনি সকলেই নিদ্রা দিব, অথচ আশা করিব 'আমরা' নামক সর্বনাম শব্দটা জাগ্রত থাকিয়া কাজ করিতে থাকিবে! সর্বত্রই সমাজের প্রথম অবস্থায় ব্যক্তিবিশেষ ও পরিণত অবস্থায় ব্যক্তিসাধারণ। প্রথম অবস্থায় মহাপুরুষ, পরিণত অবস্থায় মহামণ্ডলী। জলনিমগ্ন শৈশব পৃথিবীতেও আভ্যন্তরিক গূঢ়বিপ্লবে বিচ্ছিন্ন উন্নত শিখরসকল জয়ের উপর ইতস্তত জাগিয়া উঠিত। তাহারা একক মাহাত্ম্যে চতুর্দিকের কল্লোলময় মহাপ্লাবনের মধ্যে জীবদিগকে আশ্রয় দিত। সমলগ্ন সমতল উন্নত মহাদেশ, সে তো আজ পৃথিবীর পরিণত অবস্থায় দেখিতেছি। এখনই যথার্থ পৃথিবীর ভূ-পবলিক তৈরি হইয়াছে। আগে যেখানে ছিল মহাশিখর, এখন সেখানে হইয়াছে মহাদেশ। আমাদের এই তরুণ সমাজে, আমাদের এই ভাবিতে হইবে, কবে আমাদের এই সামাজিক মহাদেশ সৃজিত হইবে! কিন্তু সেই মহাদেশ তো একটা ভুঁইফোঁড়া ভেল্কি নহে! সেই মহাদেশ সৃজন করিবার উদ্দেশে আমাদের সকলকেই আপনাকে সৃজন করিতে হইবে, আপনার আশপাশ সৃজন করিতে হইবে। আপনাকে উন্নত করিয়া তুলিতে হইবে। প্রত্যেকে উঠিব, প্রত্যেককে উঠাইব, এই আমাদের এখনকার কাজ। কিন্তু সে না কি কঠোর সাধনা, সে না কি নিভৃতে সাধ্য, সে না কি প্রকাশ্যস্থলে হাঙ্গাম করিবার বিষয় নহে, সে প্রত্যহ অনুষ্ঠেয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাজের সমষ্টি, সে কঠিন কর্তব্য বটে, অথচ ছায়াময়ী বৃহদাকৃতি দুরাশা নহে, এই নিমিত্ত উদ্দীপ্ত হৃদয়দের তাহাতে রুচি হয় না। এরূপ অবস্থায় এই-সকল ছোটো কাজই বাস্তবিক দুরূহ, প্রকাণ্ড মূর্তি কাজের ভান ফাঁকি মাত্র! আমাদের চারি দিকে, আমাদের আশেপাশে, আমাদের গৃহের মধ্যে আমাদের কার্যক্ষেত্র। সমস্ত কাজই বাকি রহিয়াছে, এমন স্থলে সমস্ত ভারতবর্ষকে একেবারে উদ্ধার করা, সে বরাহ বা কূর্ম অবতারই পারেন; আমাদের না আছে নাসার পার্শ্বে তেমন দন্ত না আছে পৃষ্ঠের উপরে তেমন বর্ম।

এখন আমাদের গঠন করিবার সময়, শিক্ষা করিবার সময়। এখন আমাদিগকে চরিত্র গঠন করিতে হইবে, সমাজ গঠন করিতে হইবে, পবলিক গঠন করিতে হইবে। বিদেশীয়দের দেখাদেখি আগেভাগে মনে করিতেছি, সমস্ত গঠিত হইয়া গিয়াছে। সেইজন্য গঠনশালার গোপনীয়তা নষ্ট করিয়া কতকগুলি কুগঠিত কাঠখড়-বাহির-করা অসম্পূর্ণ বিরূপ মূর্তি জনসমাজে আনয়ন করিয়া

আমরা তামাশা দেখিতেছি। শত্রুপক্ষ হাসিতেছে।

এতক্ষণে সকলে নিশ্চয় বুঝিয়াছেন পবলিকের উপযোগিতা স্বীকার করি বলিয়াই আমি এত কথা বলিতেছি। এখন দেখিতে হইবে পবলিক গঠন করিতে হইবে কী উপায়ে! সে কেবল পরস্পরকে সাহায্য করিয়া। হাতে কলমে প্রকৃত সাহায্য করিয়া। পরস্পর পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস করা চাই, পরস্পর পরস্পরের প্রতি নির্ভর করা চাই। মমতাসূত্রে সকলের একত্রে গাঁথা থাকা চাই। নতুবা, কাজের বেলায় কে কাহার তাহার ঠিকানা নাই, অথচ বক্তৃতা করিবার সময় বক্তা ওঝা মহাশয় মন্ত্র পড়িয়া কোন্ বটবৃক্ষ হইতে যে পবলিক ব্রহ্মদৈত্যটাকে সভাস্থলে নাবান তাহা ঠাহর পাওয়া যায় না। পরস্পরের মধ্যে বিশ্বাস, পরস্পরের প্রতি মমতা, পরস্পরের প্রতি নির্ভর— এ তো চাঁদা করিয়া রেজোল্যুশন পাস করিয়া হয় না। প্রত্যেকের ক্ষুদ্র কাজের উপর ইহার প্রতিষ্ঠা। এবং সে-সকল কাজ সকলেরই আয়ত্তাধীন। এখন সেই উদ্দেশ্যের প্রতি আমরা সকলে লক্ষ্য স্থির করি না কেন! অর্থাৎ যেখানে বাস করিতেছি, সেখানটা যাহাতে গৃহের মতো হয় তাহার চেষ্টা করি না কেন! নহিলে যে, বাহির হইতে যে-সে আসিয়া আমাদের সম্ভ্রম হানি করিয়া যাইতেছে; এমন একটু স্থান পাইতেছি না যাহা নিতান্ত আমাদেরই, যেখানে পরের কোনো অধিকার নাই, যেখানে আত্মীয়দের স্নেহের অমৃতে পুষ্টিলাভ করিয়া আমরা কার্যক্ষেত্রে প্রতিদিন দ্বিগুণ উৎসাহে কাজ করিতে যাই, বাহির হইতে সঞ্চয় করিয়া যেখানে আনয়ন ও বিতরণ করি, আমাদের পিতামাতারা যেখানে আশ্রয় পাইয়াছিলেন, আমাদের সন্তানেরা যেখানে আশ্রয় পাইবে বলিয়া আমাদের ধ্রুব বিশ্বাস, যেখানে কেহ আমাদিগকে হীন জ্ঞান করিবে না, কেহ আমাদিগের প্রতি অবিচার করিবে না, কেহ আমাদিগের ম্লানমুখ নতশির সহ্য করিতে পারিবে না, যেখানকার রমণীরা আমাদিগের লক্ষ্মীস্বরূপিণী আনন্দবিধায়নী অন্নপূর্ণা, যেখানকার বালক-বালিকারা আমাদেরই গৃহের আলোক আমদেরই গৃহের ভাবী আশা, যেখানে কেহ আমাদের মাতৃভাষা আমাদের দেশীয় সাহিত্য আমাদের জাতির আচার-ব্যবহার অনুষ্ঠানকে কঠোরহৃদয় বিদেশীয়ের ন্যায় অকাতরে উপহাস ও উপেক্ষা করিবে না। আর কিছু নয়, সেই গৃহপ্রতিষ্ঠা, স্বদেশে সেই স্বদেশপ্রতিষ্ঠা, স্বদেশীয়ের প্রতি স্বদেশীয়ের বাহু প্রসারণ, এই আমাদের এখনকার ব্রত, এই আমাদের প্রত্যেকের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। ইংরাজেরা আমাদিগকে সোহাগ করে কি না করে তাহারই প্রতীক্ষা করা তাহার জন্য আবদার করিতে যাওয়া— সে তো অনেক হইয়া গেছে, এখন এই নূতন পথ অবলম্বন করিয়া দেখা যাক-না কেন।

ভারতী
ভাদ্র-আশ্বিন ১২৯১

একটি পুরাতন কথা

অনেকেই বলেন, বাঙালিরা ভাবের লোক, কাজের লোক নহে। এইজন্য তাঁহারা বাঙালিদিগকে পরামর্শ দেন practical হও। ইংরাজি শব্দটাই ব্যবহার করিলাম। কারণ, ওই কথাটাই চলিত। শব্দটা শুনিলেই সকলে বলিবেন, 'হাঁ হাঁ, বটে, এই কথাটাই বলা হইয়া থাকে বটে।' আমি তাহার বাংলা অনুবাদ করিতে গিয়া অনর্থক দায়িক হইতে যাইব কেন? যাহা হউক তাহাদের যদি জিজ্ঞাসা করি, practical হওয়া কাহাকে বলে, তাঁহারা উত্তর দেন— ভাবিয়া চিন্তিয়া ফলাফল বিবেচনা করিয়া কাজ করা, সাবধান হইয়া চলা, মোটা মোটা উন্নত ভাবের প্রতি বেশি আস্থা না রাখা, অর্থাৎ ভাবগুলিকে ছাঁটিয়া ছুঁটিয়া কার্যক্ষেত্রের উপযোগী করিয়া লওয়া। খাঁটি সোনায় যেমন ভালো মজবুত গহনা গড়ানো যায় না, তাহাতে মিশাল দিতে হয়, তেমনি খাঁটি ভাব লইয়া সংসারের কাজ চলে না, তাহাতে খাদ মিশাইতে হয়। যাহারা বলে সত্য কথা বলিতেই হইবে, তাহারা sentimental লোক, কেতাব পড়িয়া তাহারা বিগড়াইয়া গিয়াছে, আর যাহারা

আবশ্যকমতো দুই-একটা মিথ্যা কথা বলে ও সেই সামান্য উপায়ে সহজে কার্যসাধন করিয়া লয় তাহারা Practical লোক।

এই যদি কথাটা হয়, তবে বাঙালিদিগকে ইহার জন্য অধিক সাধনা করিতে হইবে না। সাবধানী ভীরু লোকের স্বভাবই এইরূপ। এই স্বভাববশতই বাঙালিরা বিস্তর কাজে লাগে, কিন্তু কোনো কাজ করিতে পারে না। চাকরি করিতে পারে কিন্তু কাজ চালাইতে পারে না।

উল্লিখিত শ্রেণীর practical লোক ও প্রেমিক লোক এক নয়। Practical লোক দেখে ফল কী— প্রেমিক তাহা দেখে না, এই নিমিত্ত সেইই ফল পায়। জ্ঞানকে যে ভালোবাসিয়া চর্চা করিয়াছে সেই জ্ঞানের ফল পাইয়াছে; হিসাব করিয়া যে চর্চা করে তাহার ভরসা এত কম যে, যে-শাখাগ্রে জ্ঞানের ফল সেখানে সে উঠিতে পারে না, সে অতি সাবধান-সহকারে হাতটি মাত্র বাড়াইয়া ফল পাইতে চায়— কিন্তু ইহারা প্রায়ই বেঁটে লোক হয়— সুতরাং 'প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্‌বাহুরবি বামনঃ' হইয়া পড়ে।

বিশ্বাসহীনেরাই সাবধানী হয়, সংকুচিত হয়, বিজ্ঞ হয়, আর বিশ্বাসীরাই সাহসিক হয়, উদার হয়, উৎসাহী হয়। এইজন্য বয়স হইলে সংসারের উপর হইতে বিশ্বাস হ্রাস হইলে পর তবে সাবধানিতা বিজ্ঞতা আসিয়া পড়ে। এই অবিশ্বাসের আধিক্য হেতু অধিক বয়সে কেহ একটা নূতন কাজে হাত দিতে পারে না, ভয় হয় পাছে কার্য সিদ্ধ না হয়— এই ভয় হয় না বলিয়া অল্প বয়সে অনেক কার্য হইয়া উঠে, এবং হয়তো অনেক কার্য অসিদ্ধও হয়।

আমি সাবধানিতা বিজ্ঞতার নিন্দা করি না, তাহার আবশ্যকও হয়তো আছে। কিন্তু যেখানে সকলেই বিজ্ঞ সেখানে উপায় কী! তাহা ছাড়া বিজ্ঞতার সময় অসময় আছে। বারোমেসে বিজ্ঞতা কেবল বঙ্গদেশেই দেখিতে পাওয়া যায়, আর কোথাও দেখা যায় না। শিশু যদি সাবধানী হইয়াই জন্মিত তবে সে চিরকাল শিশুই থাকিয়া যাইত, সে আর মানুষ হইয়া বাড়িয়া উঠিতে পারিত না। কালক্রমে জ্ঞানার্জনশক্তির অশক্ত ডানা হইতে পালক ঝরিয়া যায়— তখন সে ব্যক্তি কোটরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া শাবকদিগকে ডানা ছাঁটিয়া ফেলিতে বলে, ডানার প্রতি বিশ্বাস তাহার একেবারে চলিয়া যায়। এই ডানা যাহাদের শক্ত আছে তাহারাই নির্ভয়ে উড়িয়া চলিয়া যায়, তাহাদের বিচরণের ক্ষেত্র প্রশস্ত, তাহাদিগকেই জরাগ্রস্তগণ sentimental বলিয়া থাকেন— আর এই ডানার পালক খসাইয়া যাহারা বদনমণ্ডল গোলাকার করিয়া বসিয়া থাকে, এক পা এক পা করিয়া চলে, ধূলির মধ্যে খুঁটিয়া খুঁটিয়া খায়, চাণক্যেরা তাহাদিগকে বিজ্ঞ বলিয়া থাকেন।

মানুষের প্রধান বল আধ্যাত্মিক বল। মানুষের প্রধান মনুষ্যত্ব আধ্যাত্মিকতা। শারীরিকতা বা মানসিকতা দেশ কাল পাত্র আশ্রয় করিয়া থাকে। কিন্তু আধ্যাত্মিকতা অনন্তকে আশ্রয় করিয়া থাকে। অনন্ত দেশ ও অনন্ত কালের সহিত আমাদের যে যোগ আছে, আমরা যে বিচ্ছিন্ন স্বতন্ত্র ক্ষুদ্র নহি, ইহাই অনুভব করা আধ্যাত্মিকতার একটি লক্ষণ। যে মহাপুরুষ এইরূপ অনুভব করেন, তিনি সংসারের কাজে গোঁজামিলন দিতে পারেন না। তিনি সামান্য সুবিধা অসুবিধাকে তুচ্ছ জ্ঞান করেন। তিনি আপনার জীবনের আদর্শকে লইয়া ছেলেখেলা করিতে পারেন না— কর্তব্যের সহস্র জায়গায় ফুটা করিয়া পালাইবার পথ নির্মাণ করেন না। তিনি জানেন অনন্তকে ফাঁকি দেওয়া চলে না। সত্যই আছে, অনন্তকাল আছে, অনন্তকাল থাকিবে, মিথ্যা আমার সৃষ্টি— আমি চোখ বুজিয়া সত্যের আলোক নিকটে রুদ্ধ করিতে পারি, কিন্তু সত্যকে মিথ্যা করিতে পারি না। অর্থাৎ, ফাঁকি আমাকে দিতে পারি কিন্তু সত্যকে দিতে পারি না।

মানুষ পশুদের ন্যায় নিজে নিজের একমাত্র সহায় নহে। মানুষ মানুষের সহায়। কিন্তু তাহাতেও তাহার চলে না। অনন্তের সহায়তা না পাইলে সে তাহার মনুষ্যত্বের সকল কার্য সাধন করিতে পারে না। কেবলমাত্র জীবন রক্ষা করিতে হইলে নিজের উপরেই নির্ভর করিয়াও চলিয়া যাইতে পারে, স্বত্বরক্ষা করিতে হইলে পরস্পরের সহায়তার আবশ্যক, আর প্রকৃতরূপ আত্মরক্ষা করিতে হইলে অনন্তের সহায়তা আবশ্যক করে। বলিষ্ঠ নির্ভীক স্বাধীন উদার আত্মা সুবিধা,

কৌশল, আপাতত প্রভৃতি পৃথিবীর আর্বজনার মধ্যে বাস করিতে পারে না। তেমন অস্বাস্থ্যজনক স্থানে পড়িলে ক্রমে সে মলিন দুর্বল রুগ্‌ণ হইয়া পড়িবেই। সাংসারিক সুবিধাসকল তাহার চতুর্দিকে বল্মীকের স্তূপের মতো উত্তরোত্তর উন্নত হইয়া উঠিবে বটে, কিন্তু সে নিজে তাহার মধ্যে আচ্ছন্ন হইয়া প্রতি মুহূর্তে জীর্ণ হইতে থাকিবে। অনন্তের সমুদ্র হইতে দক্ষিণা বাতাস বহিলে তবেই তাহার স্ফূর্তি হয়; তবেই সে বল পায়, তবেই তাহার কুজ্‌ঝটিকা দূর হয়; তাহার কাননে যত সৌন্দর্য ফুটিবার সম্ভাবনা আছে সমস্ত ফুটিয়া উঠে।

বিবেচনা বিচার বুদ্ধির বল সামান্য, তাহা চতুর্দিকে সংশয়ের দ্বারা আচ্ছন্ন, তাহা সংসারের প্রতিকূলতায় শুকাইয়া যায়— অকূলের মধ্যে তাহা ধ্রুবতারার ন্যায় দীপ্তি পায় না। এইজন্যেই বলি, সামান্য সুবিধা খুঁজিতে গিয়া মনুষ্যত্বের ধ্রুব উপাদানগুলির উপর বুদ্ধির কাঁচি চালাইয়ো না। কলসি যত বড়োই হউক না, সামান্য ফুটা হইলেই তাহার দ্বারা আর কোনো কাজ পাওয়া যায় না। তখন যে তোমাকে ভাসাইয়া রাখে সেই তোমাকে ডুবায়।

ধর্মের বল নাকি অনন্তের নির্ঝর হইতে নিঃসৃত, এইজন্যই সে আপাতত অসুবিধা, সহস্রবার পরাভব, এমন-কি, মৃত্যুকে পর্যন্ত ডরায় না। ফলাফল লাভেই বুদ্ধিবিচারের সীমা, মৃত্যুতেই বুদ্ধিবিচারের সীমা— কিন্তু ধর্মের সীমা কোথাও নাই।

অতএব এই অতি সামান্য বুদ্ধিবিবেচনা বিতর্ক হইতে কি একটি সহস্র জাতি চিরদিনের জন্য পুরুষানুক্রমে বল পাইতে পারে। একটি মাত্র কূপে সমস্ত দেশের তৃষানিবারণ হয় না। তাহাও আবার গ্রীষ্মের উত্তাপে শুকাইয়া যায়। কিন্তু যেখানে চিরনিঃসৃত নদী প্রবাহিত সেখানে যে কেবলমাত্র তৃষা নিবারণের কারণ বর্তমান তাহা নহে, সেখানে সেই নদী হইতে স্বাস্থ্যজনক বায়ু বহে, দেশের মলিনতা অবিশ্রাম ধৌত হইয়া যায়, ক্ষেত্র শস্যে পরিপূর্ণ হয়, দেশের মুখশ্রীতে সৌন্দর্য প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে। তেমনি বুদ্ধিবলে কিছুদিনের জন্য সমাজ রক্ষা হইতেও পারে, কিন্তু ধর্মবলে চিরদিন সমাজের রক্ষা হয়, আবার তাহার আনুষঙ্গিকস্বরূপে চতুর্দিক হইতে সমাজের স্ফূর্তি, সমাজের সৌন্দর্য, ও স্বাস্থ্য-বিকাশ দেখা যায়। বদ্ধ গুহায় বাস করিয়া আমি বুদ্ধিবলে রসায়নতত্ত্বের সাহায্যে কোনো মতে অক্সিজেন গ্যাস নির্মাণ করিয়া কিছু কাল প্রাণধারণ করিয়া থাকিতেও পারি— কিন্তু মুক্ত বায়ুতে যে চিরপ্রবাহিত প্রাণ চিরপ্রবাহিত স্ফূর্তি চিরপ্রবাহিত স্বাস্থ্য ও আনন্দ আছে তাহা তো বুদ্ধিবলে গড়িয়া তুলিতে পারি না। সংকীর্ণতা ও বৃহত্ত্বের মধ্যে যে কেবলমাত্র কম ও বেশি লইয়া প্রভেদ তাহা নহে, তাহার আনুষঙ্গিক প্রভেদই অত্যন্ত গুরুতর।

ধর্মের মধ্যে সেই অত্যন্ত বৃহত্ত্ব আছে— যাহাতে সমস্ত জাতি একত্রে বাস করিয়াও তাহার বায়ু দূষিত করিতে পারে না। ধর্ম অনন্ত আকাশের ন্যায়; কোটি কোটি মনুষ্য পশুপক্ষী হইতে কীটপতঙ্গ পর্যন্ত অবিশ্রাম নিশ্বাস ফেলিয়া তাহাকে কলুষিত করিতে পারে না। আর যাহাই আশ্রয় কর-না-কেন, কালক্রমে তাহা দূষিত ও বিষাক্ত হইবেই। কোনোটা বা অল্প দিনে হয়, কোনোটা বা বেশি দিনে হয়।

এইজন্যেই বলিতেছি— মনুষ্যত্বের যে বৃহত্তম আদর্শ আছে, তাহাকে যদি উপস্থিত আবশ্যকের অনুরোধে কোথাও কিছু সংকীর্ণ করিয়া লও, তবে নিশ্চয়ই ত্বরায় হউক আর বিলম্বই হউক, তাহার বিশুদ্ধতা সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়া যাইবে। সে আর তোমাকে বল ও স্বাস্থ্য দিতে পারিবে না। শুদ্ধ সত্যকে যদি বিকৃত সত্য, সংকীর্ণ সত্য, আপাতত সুবিধার সত্য করিয়া তোল তবে উত্তরোত্তর নষ্ট হইয়া সে মিথ্যায় পরিণত হইবে, কোথাও তাহার পরিত্রাণ নাই। কারণ, অসীমের উপর সত্য দাঁড়াইয়া আছে, আমারই উপর নহে, তোমারই উপর নহে, অবস্থা বিশেষের উপর নহে— সেই সত্যকে সীমার উপর দাঁড় করাইলে তাহার প্রতিষ্ঠাভূমি ভাঙিয়া যায়— তখন বিসর্জিত দেবপ্রতিমার তৃণ-কাষ্ঠের ন্যায় তাহাকে লইয়া যে-সে যথেচ্ছা টানা-ছেঁড়া করিতে পারে। সত্য যেমন অন্যান্য ধর্মনীতিও তেমনি। যদি বিবেচনা কর পরার্থপরতা আবশ্যক, এইজন্যই তাহা শ্রদ্ধেয়; যদি মনে কর, আজ আমি অপরের সাহায্য করিলে কাল সে আমার

সাহায্য করিবে, এইজন্যই পরের সাহায্য করিব— তাকে কখনোই পরের ভালো রূপ সাহায্য করিতে পার না ও সেই পরার্থপরতার প্রবৃত্তি কখনোই অধিক দিন টিকিবে না। কিসের বলেই বা টিকিবে। হিমালয়ের বিশাল হৃদয় হইতে উচ্ছ্বসিত হইতেছে বলিয়াই গঙ্গা এতদিন অবিচ্ছেদে আছে, এতদূর অবাধে গিয়াছে, তাই এত গভীর এত প্রশস্ত; আর এই গঙ্গা যদি আমাদের পরম সুবিধাজনক কলের পাইপ হইতে বাহির হইত তবে তাহা হইতে বড়ো জোর কলিকাতা শহরের ধূলাগুলি কাদা হইয়া উঠিত আর-কিছু হইত না। গঙ্গার জলের হিসাব রাখিতে হয় না; কেহ যদি গ্রীষ্মকালের দুই কলসি অধিক তোলে বা দুই অঞ্জলি অধিক পান করে তবে টানাটানি পড়ে না— আর কেবলমাত্র কল হইতে যে জল বাহির হয় একটু খরচের বাড়াবাড়ি পড়িলেই ঠিক আবশ্যকের সময় সে তিরোহিত হইয়া যায়। যে সময়ে তৃষা প্রবল, রৌদ্র প্রখর, ধরণী শুষ্ক, যে সময়ে শীতল জলের আবশ্যক সর্বাপেক্ষা অধিক সেই সময়েই সে নলের মধ্যে তাতিয়া উঠে, কলের মধ্যে ফুরাইয়া যায়।

বৃহৎ নিয়মে ক্ষুদ্র কাজ অনুষ্ঠিত হয়, কিন্তু সেই নিয়ম যদি বৃহৎ না হইত তবে তাহার দ্বারা ক্ষুদ্র কাজটুকুও অনুষ্ঠিত হইতে পারিত না। একটা পাকা আপেল ফল যে পৃথিবীতে খসিয়া পড়িবে তাহার জন্য চরাচরব্যাপী মাধ্যাকর্ষণ শক্তির আবশ্যক— একটি ক্ষুদ্র পালের নৌকা চলিবে কিন্তু পৃথিবীবেষ্টনকারী বাতাস চাই। তেমনি সংসারের ক্ষুদ্র কাজ চালাইতে হইবে এইজন্য অনন্ত-প্রতিষ্ঠিত ধর্মনীতির আবশ্যক।

সমাজ পরিবর্তনশীল, কিন্তু তাহার প্রতিষ্ঠাস্থল ধ্রুব হওয়া আবশ্যক। আমরা জীবগণ চলিয়া বেড়াই কিন্তু আমাদের পায়ের নীচেকার জমিও যদি চলিয়া বেড়াইত, তাহা হইলে বিষম গোলাযোগ বাধিত। বুদ্ধি-বিচারগত আদর্শের উপর সমাজ প্রতিষ্ঠা করিলে সেই চঞ্চলতার উপর সমাজ প্রতিষ্ঠা করা হয়। মাটির উপর পা রাখিয়া বল পাই না, কোনো কাজই সতেজ করিতে পারি না। সমাজের অট্টালিকা নির্মাণ করি কিন্তু জমির উপরে ভরসা না থাকাতে পাকা গাঁথুনি করিতে ইচ্ছা যায় না— সুতরাং ঝড় বহিলে তাহা সবসুদ্ধ ভাঙিয়া আমাদের মাথার উপরে আসিয়া পড়ে।

সুবিধার অনুরোধে সমাজের ভিত্তিভূমিতে যাঁহারা ছিদ্র খনন করেন, তাঁহারা অনেকে আপনাদিগকে বিজ্ঞ practical বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। তাঁহারা এমন ভাব প্রকাশ করেন যে, মিথ্যা কথা বলা খারাপ, কিন্তু political উদ্দেশ্যে মিথ্যা কথা বলিতে দোষ নাই। সত্যঘটনা বিকৃত করিয়া বলা উচিত নহে, কিন্তু তাহা করিলে যদি কোনো ইংরাজ অপদস্থ হয় তবে তাহাতে দোষ নাই। কপটতাচরণ ধর্মবিরুদ্ধ, কিন্তু দেশের আবশ্যক বিবেচনা করিয়া বৃহৎ উদ্দেশ্যে কপটতাচরণ অন্যায় নহে। কিন্তু বৃহৎ কাহাকে বল। উদ্দেশ্য যতই বৃহৎ হউক-না-কেন, তাহা অপেক্ষা বৃহত্তর উদ্দেশ্য আছে। বৃহৎ উদ্দেশ্য সাধন করিতে গিয়া বৃহত্তর উদ্দেশ্য ধ্বংস হইয়া যায় যে! হইতেও পারে, সমস্ত জাতিকে মিথ্যাচরণ করিতে শিখাইলে আজিকার মতো একটা সুবিধার সুযোগ হইল— কিন্তু তাহাকে যদি দৃঢ় সত্যানুরাগ ও ন্যায়ানুরাগ শিখাইতে তাহা হইলে সে যে চিরদিনের মতো মানুষ হইতে পারিত! সে যে নির্ভয়ে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিত, তাহার হৃদয়ের যে অসীম বল জন্মাইত। তাহা ছাড়া সংসারের কার্য আমাদের অধীন নহে। আমরা যদি কেবলমাত্র একটি সূচী অনুসন্ধান করিবার জন্য দীপ জ্বালাই সে সমস্ত ঘর আলো করিবে, তেমনি আমরা যদি একটি সূচী গোপন কবিবার জন্য আলো নিবাইয়া দিই, তবে তাহাতে সমস্ত ঘর অন্ধকার হইবে। তেমনি আমারা যদি সমস্ত জাতিকে কোনো উপকার সাধনের জন্য মিথ্যাচরণ শিখাই তবে সেই মিথ্যাচরণ যে তোমার ইচ্ছার অনুসরণ করিয়া কেবলমাত্র উপকারটুকু করিয়াই অন্তর্হিত হইবে তাহা নহে, তাহার বংশ সে স্থাপনা করিয়া যাইবে। পূর্বেই বলিয়াছি বৃহত্ত্ব একটি মাত্র উদ্দেশ্যের মধ্যে বদ্ধ থাকে না, তাহার দ্বারা সহস্র উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। সূর্যকিরণ উত্তাপ দেয়, আলোক দেয়, বর্ণ দেয়, জড় উদ্ভিদ্ পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ সকলেরই

উপরে তাহার সহস্রপ্রকারের প্রভাব কার্য করে; তোমার যদি এক সময়ে খেয়াল হয় যে পৃথিবীতে সবুজ বর্ণের প্রাদুর্ভাব অত্যন্ত অধিক হইয়াছে, অতএব সেটা নিবারণ করা আবশ্যক ও এই পরম লোকহিতকর উদ্দেশে যদি একটা আকাশজোড়া ছাতা তুলিয়া ধর তবে সবুজ রঙ তিরোহিত হইতেও পারে কিন্তু সেইসঙ্গে লাল রঙ নীল রঙ সমুদয় রঙ মারা যাইবে— পৃথিবীর উত্তাপ যাইবে, আলোক যাইবে, পশুপক্ষী কীটপতঙ্গ সবাই মিলিয়া সরিয়া পড়িবে। তেমনি কেবলমাত্র political উদ্দেশ্যের মধ্যেই সত্য বদ্ধ নহে। তাহার প্রভাব মনুষ্য সমাজের অস্থিমজ্জার মধ্যে সহস্র আকারে কার্য করিতেছে— একটি মাত্র উদ্দেশ্য বিশেষের উপযোগী করিয়া যদি তাহার পরিবর্তন কর, তবে সে আর আর শত সহস্র উদ্দেশ্যের পক্ষে অনুপযোগী হইয়া উঠিবে। যেখানে যত সমাজের ধ্বংস হইয়াছে এইরূপ করিয়াই হইয়াছে। যখনি মতিভ্রমবশত একটি সংকীর্ণ হীত সমাজের চক্ষে সর্বেসর্বা হইয়া উঠিয়াছে এবং অনন্ত হিতকে সে তাহার নিকটে বলিদান দিয়াছে, তখনি সেই সমাজের মধ্যে শনি প্রবেশ করিয়াছে; তাহার কলি ঘনাইয়া আসিয়াছে। একটি বস্তা সর্ষপের সদ্‌গতি করিতে গিয়া ভরা নৌকা ডুবাইলে বাণিজ্যের যেরূপ উন্নতি হয় উপরি-উক্ত সমাজের সেইরূপ উন্নতি হইয়া থাকে। অতএব স্বজাতির যথার্থ উন্নতি যদি প্রার্থনীয় হয়, তবে কলকৌশল ধূর্ততা চাণক্যতা পরিহার করিয়া যথার্থ পুরুষের মতো মানুষের মতো মহত্ত্বের সরল রাজপথে চলিতে হইবে, তাহাতে গম্য স্থানে পৌঁছিতে যদি বিলম্ব হয় তাহাও শ্রেয়, তথাপি সুরঙ্গ পথে অতি সত্বরে রসতল রাজ্যে গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করা সর্বথা পরিহর্তব্য।

পাপের পথে ধ্বংসের পথে যে বড়ো বড়ো দেউড়ি আছে সেখানে সমাজের প্রহরীরা বসিয়া থাকে, সুতরাং সে দিক দিয়া প্রবেশ করিতে হইলে বিস্তর বাধা পাইতে হয়; কিন্তু ছোটো ছোটো খিড়কির দুয়ারগুলিই ভয়ানক, সে দিকে তেমন কড়াক্কড় নাই। অতএব, বাহির হইতে দেখিতে যেমন হউক, ধ্বংসের সেই পথগুলিই প্রশস্ত।

একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। যখনই আমি মনে করি 'লোকহিতার্থে যদি একটা মিথ্যা কথা বলি তাহাতে তেমন দোষ নাই' তখনই আমার মনে যে বিশ্বাস ছিল 'সত্য ভালো', সে বিশ্বাস সংকীর্ণ হইয়া যায়, তখন মনে হয় 'সত্য ভালো, কেননা সত্য আবশ্যক।' সুতরাং যখনি কল্পনা করিলাম লোকহিতের জন্য সত্য আবশ্যক নহে, তখন স্থির হয় মিথ্যাই ভালো। সময় বিশেষে সত্য মন্দ মিথ্যা ভালো এমন যদি আমার মনে হয়, তবে সময় বিশেষেই বা তাহাকে বদ্ধ রাখি কেন? লোকহিতের জন্য যদি মিথ্যা বলি, তো আত্মহিতের জন্যই বা মিথ্যা না বলি কেন?

উত্তর— আত্মহিত অপেক্ষা লোকহিত ভালো।

প্রশ্ন— কেন ভালো? সময় বিশেষে সত্যই যদি ভালো না হয়, তবে লোকহিতই যে ভালো এ কথা কে বলিল?

উত্তর— লোকহিত আবশ্যক বলিয়া ভালো।

প্রশ্ন— কাহার পক্ষে আবশ্যক?

উত্তর— আত্মহিতের পক্ষেই আবশ্যক।

তদুত্তর— কই, তাহা তো সকল সময়ে দেখা যায় না। এমন তো দেখিয়াছি পরের অহিত করিয়া আপনার হিত হইয়াছে।

উত্তর— তাহাকে যথার্থ হিত বলে না।

প্রশ্ন— তবে কাহাকে বলে।

উত্তর— স্থায়ী সুখকে বলে।

তদুত্তর— আচ্ছা, সে কথা আমি বুঝিব। আমার সুখ আমার কাছে। ভালোমন্দ বলিয়া চরম কিছুই নাই। আবশ্যক অনাবশ্যক লইয়া কথা হইতেছে; আপাতত অস্থায়ী সুখই আমার আবশ্যক বলিয়া বোধ হইতেছে। তাহা ছাড়া পরের অহিত করিয়া আমি যে সুখ কিনিয়াছি তাহাই যে স্থায়ী

নহে তাহার প্রমাণ কী? প্রবঞ্চনা করিয়া যে টাকা পাইলাম তাহা যদি আমরণ ভোগ করিতে পাই, তাহা হইলেই আমার সুখ স্থায়ী হইল।' ইত্যাদি ইত্যাদি।

এইখানেই যে তর্ক শেষ হয়, তাহা নয়, এই তর্কের সোপান বাহিয় উত্তরোত্তর গভীর হইতে গভীরতর গহ্বরে নামিতে পারা যায়— কোথাও আর তল পাওয়া যায় না, অন্ধকার ক্রমশই ঘনাইতে থাকে; তরণীর আশ্রয়কে হেয়জ্ঞানপূর্বক প্রবল গর্বে আপনাকেই আপনার আশ্রয় জ্ঞান করিয়া অগাধ জলে ডুবিতে শুরু করিলে যে দশা হয় আত্মার সেই দশা উপস্থিত হয়।

আর, লোকহিত তুমিই বা কী জান, আমিই বা কী জানি! লোকের শেষ কোথায়! লোক বলিতে বর্তমানের বিপুল লোক ও ভবিষ্যতের অগণ্য লোক বুঝায়। এত লোকের হিত কখনোই মিথ্যার দ্বারা হইতে পারে না। কারণ মিথ্যা সীমাবদ্ধ, এত লোকে আশ্রয় সে কখনোই দিতে পারে না। বরং, মিথ্যা একজনের কাজে ও কিছুক্ষণের কাজে লাগিতে পারে, কিন্তু সকলের কাজে ও সকল সময়ের কাজে লাগিতে পারে না। লোকহিতের কথা যদি উঠে তো আমার এই পর্যন্ত বলিতে পারি যে, সত্যের দ্বারাই লোকহিত হয়, কারণ লোক যেমন অগণ্য সত্য তেমনি অসীম।

এত কথা আমি কি অনাবশ্যক বলিতেছি? এই-সকল পুরাতন কথার অবতারণা করা কি বাহুল্য হইতেছে? কী করিয়া বলিব! আমাদের দেশের প্রধান লেখক প্রকাশ্যভাবে অসংকোচে নির্ভয়ে অসত্যকে সত্যের সহিত একাসনে বসাইয়াছেন, সত্যের পূর্ণ সত্যতা অস্বীকার করিয়াছেন, এবং দেশের সমস্ত পাঠক নীরবে নিস্তব্ধভাবে শ্রবণ করিয়া গিয়াছেন। সাকার-নিরাকারের উপাসনা ভেদ লইয়াই সকলে কোলাহল করিতেছেন, কিন্তু অলক্ষ্যে ধর্মের ভিত্তিমূলে যে আঘাত পড়িতেছে সেই আঘাত হইতে ধর্মকে ও সমাজকে রক্ষা করিবার জন্য কেহ দণ্ডায়মান হইতেছে না। এ কথা কেহ ভাবিতেছেন না যে, যে সমাজে প্রকাশ্যভাবে কেহ ধর্মের মূলে কুঠারঘাত করিতে সাহস করে, সেখানে ধর্মের মূল না জানি কতখানি শিথিল হইয়া গিয়াছে। আমাদের শিরার মধ্যে মিথ্যাচরণ ও কাপুরুষতা যদি রক্তের সহিত সঞ্চারিত না হইত তাহা হইলে কি আমাদের দেশের মুখ্য লেখক পথের মধ্যে দাঁড়াইয়া স্পর্ধা সহকারে সত্যের বিরুদ্ধে একটি কথা কহিতে সাহস করিতেন! অথচ কাহারো তাহা অদ্ভুত বলিয়াও বোধ হইল না! আমরা দুর্বল. ধর্মের যে অসীম আদর্শ চরাচরে বিরাজ করিতেছে আমরা তাহার সম্পূর্ণ অনুসরণ করিতে পারি না, কিন্তু তাই বলিয়া আপনার কলঙ্ক লইয়া যদি সেই ধর্মের গাত্রে আরোপ করি, তাহা হইলে আমাদের দশা কী হইবে! যে সমাজের গণ্য ব্যক্তিরাও প্রকাশ্য রাজপথে ধর্মের সেই আদর্শপটে নিজ দেহের পঙ্ক মুছিয়া যায়— সেখানে সেই আদর্শে না জানি কত কলঙ্কের চিহ্নই পড়িয়াছে. তাই তাঁহাদিগকে কেহ নিবারণও করে না। তা যদি হয় তবে সে সমাজের পরিত্রাণ কোথায়? তাহাকে আশ্রয় দিবে কে, সে দাঁড়াইবে কিসের উপরে! সে পথ খুঁজিয়া পাইবে কেমন করিয়া? তাহার অক্ষয় বলের ভাণ্ডার কোথায়! সে কি কেবলই কুতর্ক করিয়া চলিতে থাকিবে, সংশয়ের মধ্যে গিয়া পড়িবে, আকাশের ধ্রুবতারার দিকে না চাহিয়া নিজের ঘূর্ণ্যমান মস্তিষ্ককেই আপনার দিঙ্‌নির্ণয় যন্ত্র বলিয়া স্থির করিয়া রাখিবে এবং তাহারই ইঙ্গিত অনুসরণ করিয়া লাঠিমের মতো ঘুরিতে ঘুরিতে পথপার্শ্বস্থ পয়ঃপ্রণালীরা মধ্যে গিয়া বিশ্রাম লাভ করিবে?

লেখক মহাশয় একটি হিন্দুর আদর্শ কল্পনা করিয়া বলিয়াছেন, তিনি 'যদি মিথ্যা কহেন তবে মহাভারতীয় কৃষ্ণোক্তি স্মরণ পূর্বক যেখানে লোক হিতার্থে মিথ্যা নিতান্ত প্রয়োজনীয়— অর্থাৎ যেখানে মিথ্যাই সত্য হয়, সেইখানেই মিথ্যা কথা কহিয়া থাকেন।' কোনোখানেই মিথ্যা সত্য হয় না, শ্রদ্ধাস্পদ বঙ্কিমবাবু বলিলেও হয় না স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলিলেও হয় না। বঙ্কিমবাবু শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া বিশ্বাস করেন। কিন্তু, ঈশ্বরের লোকহিত সীমাবদ্ধ নহে— তাঁহার অখণ্ড নিয়মের ব্যতিক্রম নাই। অসীম দেশ ও অসীম কালে তাঁহার হিত-ইচ্ছা কার্য করিতেছে— সুতরাং একটুখানি বর্তমান সুবিধার উদ্দেশ্যে খানিকটা মিথ্যার দ্বারা তালি-দেওয়া লোকহিত তাঁহার কার্য হইতেই পারে না। তাঁহার অনন্ত ইচ্ছার নিম্নে পড়িলে ক্ষণিক ভালোমন্দ চূর্ণ হইয়া

যায়। তাঁহার অগ্নিতে সংলোকও দগ্ধ হয় অসংলোকও দগ্ধ হয়। তাঁহার সূর্যকিরণ স্থানবিশেষের সাময়িক আবশ্যক অনাবশ্যক বিচার না করিয়াও সর্বত্র উত্তাপ দান করে। তেমনি তাঁহার অনন্ত সত্য ক্ষণিক ভালোমন্দের অপেক্ষা না রাখিয়া অসীমকাল সমভাবে বিরাজ করিতেছে। সেই সত্যকে লঙ্ঘন করিলে অবস্থা নির্বিচারে তাহার নির্দিষ্ট ফল ফলিতে থাকিবেই। আমরা তাহার সমস্ত ফল দেখিতে পাই না, জানিতে পারি না। এজন্যই আরও অধিক সাবধান হও। ক্ষুদ্র বুদ্ধির পরামর্শে ইহাকে লইয়া খেলা করিয়ো না।

অসত্যের উপাসক কি বিস্তর নাই? আত্মহিতের জন্যই হউক আর লোকহিতের জন্যই হউক অসত্য বলিতে আমাদের দেশের লোক কি এতই সংকুচিত যে অসত্য ধর্ম প্রচারের জন্য শ্রীকৃষ্ণের দ্বিতীয়বার অবতরণের গুরুতর আবশ্যক হইয়াছে? কঠোর সত্যাচরণ করিয়া আমাদের এই বঙ্গসমাজের কি এতই অহিত হইতেছে যে অসাধারণ প্রতিভা আসিয়া বাঙালির হৃদয় হইতে সেই সত্যের মূল শিথিল করিয়া দিতে উদ্যত হইয়াছেন। কিন্তু হায়, অসাধারণ প্রতিভা ইচ্ছা করিলে স্বদেশের উন্নতির মূল শিথিল করিতে পারেন কিন্তু সত্যের মূল শিথিল করিতে পারেন না।

যেখানে দুর্বলতা সেইখানেই মিথ্যা প্রবঞ্চনা কপটতা, অথবা যেখানে মিথ্যা প্রবঞ্চনা কপটতা সেইখানেই দুর্বলতা। তাহার কারণ, মানুষের মধ্যে এমন আশ্চর্য একটি নিয়ম আছে, মানুষ নিজের লাভ ক্ষতি সুবিধা অসুবিধা গণনা করিয়া চলিলে যথেষ্ট বল পায় না। এমন-কি, ক্ষতি, অসুবিধা, মৃত্যুর সম্ভাবনাতে তাহার বল বাড়াইতেও পারে। Practical লোকে যে-সকল ভাবকে নিতান্ত অবজ্ঞা করেন, কার্যের ব্যাঘাতজনক জ্ঞান করেন, সেই ভাব নহিলে তাহার কাজ ভালোরূপ চলেই না। সেই ভাবের সঙ্গে বুদ্ধি বিচার তর্কের সম্পূর্ণ ঐক্য নাই। বুদ্ধি বিচার তর্ক আসিলেই সেই ভাবের বল চলিয়া যায়। এই ভাবের বলে লোকে যুদ্ধে জয়ী হয়, সাহিত্যে অমর হয়, শিল্পে সুনিপুণ হয়— সমস্ত জাতি ভাবের বলে উন্নতির দুর্গমশিখরে উঠিতে পারে, অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া তুলে, বাধাবিপত্তিকে অতিক্রম করে। এই ভাবের প্রবাহ যখন বন্যার মতো সবল পথে অগ্রসর হয় তখন ইহার অপ্রতিহত গতি। আর যখন ইহা বক্রবুদ্ধির কাটা নালা-নর্মদার মধ্যে শত ভাগে বিভক্ত হইয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া চলে তখন ইহা উত্তরোত্তর পঙ্কের মধ্যে শোষিত হইয়া দুর্গন্ধ বাষ্পের সৃষ্টি করিতে থাকে। ভাবের এত বল কেন? কারণ, ভাব অত্যন্ত বৃহৎ। বুদ্ধিবিবেচনার ন্যায় সীমাবদ্ধ নহে। লাভক্ষতির মধ্যে তাহার পরিধির শেষ নহে— বস্তুর মধ্যে সে রুদ্ধ নহে। তাহার নিজের মধ্যেই তাহার নিজের অসীমতা। সম্মুখে যখন মৃত্যু আসে তখনও সে অটল, কারণ ক্ষুদ্র জীবনের অপেক্ষা ভাব বৃহৎ। সম্মুখে যখন সর্বনাশ উপস্থিত তখনও সে বিমুখ হয় না, কারণ লাভের অপেক্ষাও ভাব বৃহৎ। স্ত্রী পুত্র পরিবার ভাবের নিকট ক্ষুদ্র হইয়া যায়। এই ভাবের সমুদ্রকে বাঁধাইয়া বাঁধাইয়া যাঁহারা কূপ খনন করিতে চান, তাঁহারা সেই কূপের মধ্যে তাঁহাদের নিজের গুরুভার বিজ্ঞতাকে বিসর্জন দিন, কিন্তু সমস্ত স্বজাতিকে বিসর্জন না দিলেই মঙ্গল।

আমাদের জাতি নতুন হাঁটিতে শিখিতেছে, এ সময়ে বৃদ্ধ জাতির দৃষ্টান্ত দেখিয়া ভাবের প্রতি ইহার অবিশ্বাস জন্মাইয়া দেওয়া কোনোমতেই কর্তব্য বোধ হয় না। এখন ইতস্তত করিবার সময় নহে। এখন ভাবের পতাকা আকাশে উড়াইয়া নবীন উৎসাহে জগতের সমরক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে হইবে। এই বাল্য-উৎসাহের স্মৃতিই বৃদ্ধ সমাজকে সতেজ করিয়া রাখে। এই সময়ে ধর্ম, স্বাধীনতা, বীরত্বের যে একটি অখণ্ড পরিপূর্ণ ভাব হৃদয়ে জাজ্বল্যমান হইয়া উঠে, তাহারই সংস্কার বৃদ্ধকাল পর্যন্ত স্থায়ী হয়। এখনি যদি হৃদয়ের মধ্য ভাঙাচোরা টলমল অসম্পূর্ণ প্রতিমা তবে উত্তরকালে তাহার জীর্ণ ধূলিমাত্র অবশিষ্ট থাকিবে। অল্প বয়সে শরীরের যে কাঠামো নির্মিত হয়, সমস্ত জীবন সেই কাঠামোর উপর নির্ভর করিয়া চালাইতে হয়। এখন আমাদের সাহিত্য সম্বন্ধে অনেকেই বলিয়া থাকেন, বই বিক্রি করিয়া টাকা হয় না, এ সাহিত্যের মঙ্গল হইবে কি করিয়া!

বুড়া য়ুরোপীয় সাহিত্যের টাকার থলি দেখিয়া হিংসা করিয়া এই কথা বলা হইয়া থাকে। কিন্তু আমাদের এ বয়েসের এ কথা নহে। বই লিখিয়া টাকা নাই হইল! যে না লিখিয়া থাকিতে পারিবে না সেই লিখিবে, যাহার টাকা না হইলে চলে না সে লিখিবে না। উপবাস ও দারিদ্র্যের মধ্যে সাহিত্যর মূল পত্তন, ইহা কি অন্য দেশেও দেখা যায় না! বাল্মীকি রামায়ণ রচনা করিয়া কি কুবেরের ভাণ্ডার লুঠ করিয়াছিলেন? যদি তাঁহার কুবের ভাণ্ডার থাকিত রামায়ণ রচনার প্রতিবন্ধক দূর করিতে তিনি সমস্ত ব্যয় করিতে পারিতেন। প্রখর বিজ্ঞতার প্রভাবে মনুষ্যপ্রকৃতির প্রতি অত্যন্ত অবিশ্বাস না থাকিলে কেহ মনে করিতে পারে না যে উদরের মধ্যেই সাহিত্যের মূল হৃদয়ের মধ্যে নহে। লেখার উদ্দেশ্য মহৎ না হইলে লেখা মহৎ হইবে না।

যেমন করিয়াই দেখি, সংকীর্ণতা মঙ্গলের কারণ নহে। জীবনের আদর্শকে সীমাবদ্ধ করিয়া কখনোই জাতির উন্নতি হইবে না। উদারতা নহিলে কখনোই মহত্ত্বের স্ফূর্তি হইবে না। মুখশ্রীতে যে একটি দীপ্তির বিভাস হয়, হৃদয়ের মধ্যে যে একটি প্রতিভার বিকাশ হয়, সমস্ত জীবন যে সংসার তরঙ্গের মধ্যে অটল অচলের ন্যায় মাথা তুলিয়া জাগিয়া থাকে, সে কেবল একটি ধ্রুব বিপুল উদারতাকে আশ্রয় করিয়া। সংকোচের মধ্যে গেলেই রোগে জীর্ণ, শোকে শীর্ণ, ভয়ে ভীত, দাসত্বে নতশির, অপমানে নিরুপায় হইয়া থাকিতে হয়, চোখ তুলিয়া চাহিতে পারা যায় না, মুখ দিয়া কথা বাহির হয় না, কাপুরুষতার সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়। তখন মিথ্যাচারণ, কপটতা, তোষামোদ জীবনের সম্বল হইয়া পড়ে। অসামান্য প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিরা কাপুরুষতার আশ্রয়স্থল এই হীন মিথ্যাকে সবলে সমূলে উৎপাটন না করিয়া যদি তাহার বীজ গোপনে বপন করেন তবে সমাজের ঘোরতর অমঙ্গলের আশঙ্কায় হতাশ্বাস হইয়া পড়িতে হয়। যিনিই যাহা বলুন, পরম সত্যবাদী বলিয়া আমাদিগকে উপহাস করুন, sentimental বলিয়া আমাদিগকে অবজ্ঞাই করুন, বা শ্রীকৃষ্ণের দোহাই দিন, এ মিথ্যাকে আমরা কখনোই ঘরে থাকিতে দিব না, ইহাকে আমরা বিসর্জন দিয়া আসিব। সুবিধাই হউক লাভই হউক, আত্মহিতই হউক লোকহিতই হউক, মিথ্যা বলিব না, মিথ্যাচরণ করিব না, সত্যের ভান করিব না, আত্মপ্রবঞ্চনা করিব না— সত্যকে আশ্রয় করিয়া মহত্ত্বে উন্নত হইয়া সরল ভাবে দাঁড়াইয়া ঝড় সহ্য করিব সেও ভালো, তবু মিথ্যায় সংকুচিত হইয়া সুবিধার গর্তর মধ্যে প্রবেশ করিয়া নিরাপদ সুখ অনুভব করিবার অভিলাষে আত্মার কবর রচনা করিব না।

ভারতী
অগ্রহায়ণ ১২৯১

কৈফিয়ত

আমি গত অগ্রহায়ণ মাসের ভারতীতে ‘পুরাতন কথা’ নামক একটি প্রবন্ধ লিখি, তাহার উত্তরে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় উক্ত মাসের প্রচারে ‘আদি ব্রাহ্মসমাজ ও নব হিন্দু সম্প্রদায়’ নামক একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। তাহা পাঠ করিয়া জানিলাম যে, বঙ্কিমবাবুর কতগুলি কথা আমি ভুল বুঝিয়াছিলাম। অতিশয় আনন্দের বিষয়। কিন্তু পাছে কেহ আমার প্রতি অন্যায় দোষারোপ করেন এইজন্য, কেন যে ভুল বুঝিয়াছিলাম, সংক্ষেপে তাহার কারণ লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

আমার প্রবন্ধের প্রসঙ্গক্রমে বঙ্কিমবাবু আনুষঙ্গিক যে-সকল কথার উল্লেখ করিয়াছেন তৎসম্বন্ধে আমার যাহা বক্তব্য তাহা পরে বলিব। আপাতত প্রধান আলোচ্য বিষয়ের অবতারণা করা যাউক।

বঙ্কিমবাবু বলেন, ‘রবীন্দ্রবাবু ‘‘সত্য’’ এবং ‘‘মিথ্যা’’ এই দুইটি শব্দ ইংরাজি অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। সেই অর্থেই আমার ব্যবহৃত ‘‘সত্য’’ ‘‘মিথ্যা’’ বুঝিয়াছেন। তাঁহার কাছে সত্য

Truth মিথ্যা Falsehood। আমি সত্য মিথ্যা শব্দ ব্যবহারকালে ইংরেজির অনুবাদ করি নাই...“সত্য” “মিথ্যা” প্রাচীনকাল হইতে যে অর্থে ভারতবর্ষে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে, আমি সেই অর্থে ব্যবহার করিয়াছি। সে দেশী অর্থে, সত্য Truth, আর তাহা ছাড়া আরও কিছু। প্রতিজ্ঞা রক্ষা, আপনার কথা রক্ষা, ইহাও সত্য।’

বঙ্কিমবাবু যে অর্থে মনে করিয়া সত্য মিথ্যা শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন তাহা এখন বুঝিলাম। কিন্তু প্রচারের প্রথম সংখ্যার হিন্দুধর্ম শীর্ষক প্রবন্ধে যে কথাগুলি ব্যবহার করিয়াছেন তাহাতে এই অর্থ বুঝিবার কোনো সম্ভাবনা নাই, আমার সামান্য বুদ্ধিতে এইরূপ মনে হয়।

তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা উদ্‌ধৃত করি। ‘যদি মিথ্যা কহেন, তবে মহাভারতীয় কৃষ্ণোক্তি স্মরণপূর্বক যেখানে লোকহিতার্থে মিথ্যা নিতান্ত প্রয়োজনীয় অর্থাৎ যেখানে মিথ্যাই সত্য হয়, সেইখানেই মিথ্যা কথা কহিয়া থাকেন।’

প্রথমে দেখিতে হইবে সংস্কৃতে সত্য মিথ্যার অর্থ কী। একটা প্রয়োগ না দেখিলে ইহা স্পষ্ট হইবে না। মনুতে আছে—

সত্যং ব্রুয়াৎ, প্রিয়ং ব্রুয়াৎ ন ব্রুয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্।
প্রিয়ঞ্চ নানৃতং ব্রুয়াৎ, এষ ধর্মঃ সনাতনঃ।

অর্থাৎ— সত্য বলিবে, প্রিয় বলিবে, কিন্তু অপ্রিয় সত্য বলিবে না, প্রিয় মিথ্যাও বলিবে না, ইহাই সনাতন ধর্ম— এখানে সত্য বলিতে কেবলমাত্র সত্য কথাই বুঝাইতেছে, তৎসঙ্গে প্রতিজ্ঞা-রক্ষা বুঝাইতেছে না। যদি প্রতিজ্ঞারক্ষা বুঝাইত তবে প্রিয় ও অপ্রিয় শব্দের সার্থকতা থাকিত না। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, এখানে মনু সত্য শব্দে Truth ছাড়া ‘আরও কিছু’-কে ধরেন নাই, এই অসম্পূর্ণতাবশত সংহিতাকার মনুকে যদি কেহ অনুবাদপরায়ণ বা খৃস্টান বলিয়া গণ্য করেন, তবে আমি সেই পুরাতন মনুর দলে ভিড়িয়া খৃস্টিয়ান হইব— আমার নতুন হিন্দুয়ানিতে আবশ্যক? সত্য শব্দের মূল ধাতু ধরিয়াই দেখি আর ব্যবহার ধরিয়াই দেখি— দেখা যায়, সত্য অর্থে সাধারণত Truth বুঝায় ও কেবল স্থলবিশেষে প্রতিজ্ঞা বুঝায়। অতএব যেখানে সত্যের সংকীর্ণ ও বিশেষ অর্থের আবশ্যক সেখানে বিশেষ ব্যাখ্যারও আবশ্যক।

দ্বিতীয়ত— ‘সত্য’ বলিতে প্রতিজ্ঞা ‘রক্ষা’ বুঝায় না। সত্য পালন বা সত্য রক্ষা বলিতে প্রতিজ্ঞারক্ষা বুঝায়— কেবলমাত্র সত্য শব্দ বুঝায় না।

তৃতীয়ত— বঙ্কিমবাবু ‘সত্য’ শব্দের উল্লেখ করেন নাই, তিনি ‘মিথ্যা’ শব্দই ব্যবহার করিয়াছেন। সত্য শব্দে সংস্কৃতে স্থলবিশেষে প্রতিজ্ঞা বুঝায় বটে— কিন্তু মিথ্যা শব্দে তদ্‌বিপরীত অর্থ সংস্কৃত ভাষায় বোধ করি প্রচলিত নাই— আমার এইরূপ বিশ্বাস।

ভ্রম হইবার আর-একটি গুরুতর কারণ আছে। বঙ্কিমবাবু লিখিয়াছেন ‘যদি মিথ্যা কথা কহেন’— সত্য রক্ষা না করাকে ‘মিথ্যা কথা কওয়া’ কোনো পাঠকের মনে হইতে পারে না তিনি হিন্দুই হউন খৃস্টিয়ানই হউন স্বাধীনচিন্তাশীলই হউন আর অনুবাদপরায়ণই হউন ‘মিথ্যা কথা কহা’ শুনিলেই তাহার প্রত্যহপ্রচলিত সহজ অর্থই মনে হইবে। অর্জুন যখন প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, যে-কেহ তাঁহার গাণ্ডীবের নিন্দা করিবে তাহাকে তিনি বধ করিবেন, তখন তিনি মিথ্যা কথা কহেন নাই। কারণ, অর্জুন এখানে কোনো সত্য গোপন করিতেছেন না, তাঁহার হৃদয়ের যাহা বিশ্বাস বাক্যে তাহার অন্যথাচরণ করিতেছেন না, তৎকালে সত্য সত্যই যাহা সংকল্প করিয়াছেন তাহাই ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন, কোনো প্রকার সত্যের ভানও করেন নাই। আমি যদি বলি যে ‘আমি কাল তোমার বাড়ি যাইব’ ও ইতিমধ্যে আজই মরিয়া যাই তবে আমাকে কোন্ নৈয়ায়িক মিথ্যাবাদী বলিবে? এখানে হৃদয়ের বিশ্বাস ধরিয়া সত্য মিথ্যা বিচার করিতে হয়— আমি যখন বলিয়াছিলাম তখন আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল যে তোমার বাড়ি যাইতে পারিব। মানুষ যখন অতীত বা বর্তমান সম্বন্ধে কোনো কথা বলে তখন তাহার জ্ঞান লইয়া সত্য মিথ্যা বিচার করিতে হয়, সে যদি বলে কাল তোমার বাড়ি গিয়াছিলাম অথচ না

গিয়া থাকে তবে সে মনের মধ্যে জানিল এক মুখে বলিল আর, অতএব সে মিথ্যাবাদী। আর যখন ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোনো কথা বলে তখন তাহার বিশ্বাস লইয়া সত্য মিথ্যা বিচার করিতে হয়। যে বলে কাল তোমার বাড়ি যাইব, তাহার মনে যদি বিশ্বাস থাকে যাইব না, তবেই সে মিথ্যাবাদী। অর্জুন যে তাঁহার সত্য পালন করিলেন না সে যে তাঁহার ক্ষমতাসত্ত্বেও কেবলমাত্র খেয়াল-অনুসারে করিলেন না তাহা নহে, সহৃদয় ধর্মজ্ঞ ব্যক্তি পক্ষে সম্পূর্ণ অনতিক্রমণীয় গুরুতর বাধাপ্রযুক্ত করিতে পারিলেন না— মনুষ্য-জ্ঞানের অসম্পূর্ণতাবশত এ বাধার সম্ভাবনা তাঁহার মনে উদয় হয় নাই। যদি বা উদয় হইয়া থাকে তবে মনুষ্যবুদ্ধির অসম্পূর্ণতাবশত বিশ্বাস হইয়াছিল যে, তথাপি সংকল্প রক্ষা করিতে পারিবেন, কিন্তু কার্যকালে দেখিলেন তাহা তাঁহার ক্ষমতার অতীত (শারীরিক ক্ষমতার কথা বলিতেছি না)। অতএব সত্যপালনে অক্ষম হওয়াকে 'মিথ্যা কথা কহা' বলা যায় না যদি কেহ বলেন তবে তিনি মনুষ্যের সহজ বুদ্ধিকে নিতান্ত পীড়ন করিয়া বলেন। যদি বা আবশ্যকের অনুরোধে নিতান্তই বলিতে হয় তবে সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন, সেখানে বিশেষ ব্যাখ্যারও নিতান্ত আবশ্যক।

বঙ্কিমবাবু এইরূপ বলেন যে, আমি যখন মহাভারতীয় কৃষ্ণোক্তির উপর বরাত দিয়াছি তখন অগ্রে সেই কৃষ্ণোক্তি অনুসন্ধান করিয়া পড়িয়া তবে আমার কথার যথার্থ মর্মগ্রহণ করা সম্ভব। কিন্তু বঙ্কিমবাবু যখন তাঁহার প্রবন্ধে মহাভারতীয় কৃষ্ণের বিশেষ উক্তির বিশেষ উল্লেখ করেন নাই, তখন, আমার এবং অনেক পাঠকের সর্বজনখ্যাত দ্রোণপর্বস্থ কৃষ্ণের সত্য-মিথ্যা সম্বন্ধে উক্তিই মনে উদয় হওয়া অন্যায় হয় নাই। বিশেষত যখন তাঁহার লেখা পড়িয়া সত্য কথনের কথাই মনে হয় সত্য পালনের কথা মনে হয় না তখন মহাভারতের যে কৃষ্ণোক্তি তাহারই সমর্থনের স্বরূপ সংগত হয় অগত্যা তাহাই আমাদের মনে আসে। মনে না আসাই আশ্চর্য। বিশেষত সেইটাই অপেক্ষাকৃত প্রচলিত। 'হত ইতি গজে'র কথা সকলেই জানে, কিন্তু গাণ্ডীবের কথা এত লোক জানে না।

যখন অর্থ বুঝিতে কষ্ট হয় তখনই লোকে নানা উপায়ে বুঝিতে চেষ্টা করে, কিন্তু যখন কোনো অর্থ সহজেই মনে প্রতিভাত হয় ও সাধারণের মনে কেবলমাত্র সেইরূপ অর্থই প্রতিভাত হওয়া সম্ভব বলিয়া মনে হয় তখন চেষ্টা করিবার কথা মনেই আসে না। আমি সেইজন্যই বঙ্কিমবাবুর উক্ত কথা বুঝিতে অতিরিক্ত মাত্রায় চেষ্টা করি নাই।

প্রবন্ধের মূল আলোচ্য বিষয় এইটুকু, এখন অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়ের উল্লেখ করা যাক।

বঙ্কিমবাবু একস্থলে কৌশলে ইঙ্গিতে বলিয়াছিলেন যে, আমার প্রবন্ধে আমি মিথ্যাকথা কহিয়াছি। যদিও বলিয়াছেন কিন্তু তিনি যে তাহা বিশ্বাস করেন তাহা আমার কোনোমতেই বোধ হয় না, কৌতুক করিবার প্রলোভন ত্যাগ করিতে না পারিয়া তিনি একটি ক্ষুদ্র কথাকে কিঞ্চিৎ বৃহৎ করিয়া তুলিয়াছেন, এই মাত্র। আমি বলিয়াছিলাম, 'লেখক মহাশয় একটি হিন্দুর আদর্শ কল্পনা করিয়া বলিয়াছেন' ইত্যাদি। বঙ্কিমবাবু বলিয়াছেন, 'প্রথম, "কল্পনা" শব্দটি সত্য নহে; আমি আদর্শ হিন্দু "কল্পনা" করিয়াছি এ কথা আমার লেখার ভিতর কোথাও নাই। আমার লেখার ভিতরে এমন কিছুই নাই যে, তাহা হইতে এমন অনুমান করা যায়। প্রচারের প্রথম সংখ্যার হিন্দুধর্ম শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে কথাটা রবীন্দ্রবাবু তুলিয়াছেন। পাঠক ওই প্রবন্ধ পড়িয়া দেখিবেন যে, "কল্পনা" নহে। আমার নিকট পরিচিত দুই জন হিন্দুর দোষগুণ বর্ণনা কবিয়াছি।'

উল্লিখিত প্রচারের প্রবন্ধে দুই জন হিন্দুর কথা আছে, একজন ধর্মভ্রষ্ট আর-একজন আচারভ্রষ্ট। ধর্মভ্রষ্ট হিন্দুর উল্লেখস্থলে তিনি বলিয়াছেন বটে, 'আমরা একটি জমিদার দেখিয়াছি, তিনি' ইত্যাদি— কিন্তু আমা-কর্তৃক আলোচিত আচারভ্রষ্ট হিন্দুর উল্লেখস্থলে তিনি কেবলমাত্র বলিয়াছেন— 'আর একটি হিন্দুর কথা বলি।' কাল্পনিক আদর্শের উল্লেখকালেও এরূপ ভাষা প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। প্রথমে একটি সত্য উদাহরণ দিয়া তাহার পরেই সর্বতোভাবে তাহার একটি বিরুদ্ধ-পক্ষ খাড়া করিবার উদ্দেশ্যে একটি কাল্পনিক উদাহরণ গঠিত করা অনেক স্থলেই

দেখা যায়। প্রচারের লেখা হইতে এরূপ অনুমান করা যে কোনোমতেই সম্ভব হইতে পারে না এমন কথা বলা যায় না। যদি স্বল্পবুদ্ধিবশত আমি এরূপ অনুমান করিয়া থাকি তবে তাহা তরুণবয়সসুলভ ভ্রম মনে করাই বঙ্কিমবাবুর ন্যায় উদারহৃদয় মহদাশয়ের উচিত, স্বেচ্ছাকৃত মিথ্যা উক্তি মনে করিলে আমি কিঞ্চিৎ বিস্মিত এবং অত্যন্ত ব্যথিত হইব। বিশেষত তিনি যখন প্রকাশ্যে আমাকে তাঁহার সুহৃৎশ্রেণীমধ্যে গণ্য করিয়াছেন তখন সেই আমার গর্বের সম্পর্ক ধরিয়া আমি কিঞ্চিৎ অভিমান প্রকাশ করিতে পারি, সে অধিকার আমাকে তিনি দিয়াছেন।

আমার দ্বিতীয় নম্বর মিথ্যার উল্লেখে বলিয়াছেন— 'তার পর "আদর্শ" কথাটি সত্য নহে। "আদর্শ" শব্দটা আমার উক্তিতে নাই। ভাবেও বুঝায় না। যে ব্যক্তি কখনো কখনো সুরাপান করে সে ব্যক্তি আদর্শ হিন্দু বলিয়া গৃহীত হইল কী প্রকারে?'

প্রথম কথা এই যে, আমি বলিয়াছিলাম 'তিনি একটি "হিন্দুর আদর্শ" কল্পনা করিয়া বলিয়াছেন' ইত্যাদি। আমি এমন বলি নাই যে— তিনি একটি আদর্শ হিন্দু কল্পনা করিয়া বলিয়াছেন। 'একটি হিন্দুর আদর্শ কল্পনা করা' ও 'একটি আদর্শ হিন্দু কল্পনা করা' উভয়ে অর্থের কত প্রভেদ হয় পাঠকেরা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। দ্বিতীয় কথা— ভাবেও কি বুঝায় না? আদর্শ বলিতে আমি সাধারণ্যে প্রচলিত হিন্দুর আদর্শস্থল মনে করি নাই। বঙ্কিমবাবুর আদর্শস্থল মনে করিয়াছিলাম। মনে করার কারণ যে কিছুই নাই তাহা নহে। প্রবন্ধ পড়িয়া এমন সংস্কার হয় যে, বঙ্কিমবাবুর মতে, কথঞ্চিৎ আচারবিরুদ্ধ কাজ করিলেই যে সমস্ত একেবারে দূষ্য হইয়া গেল তাহা নহে, ধর্মবিরুদ্ধ কাজ করিলেই বাস্তবিক দোষের কথা হয়। ইহাই দাঁড় করাইবার জন্য তিনি এমন একটি চিত্র আঁকিয়াছেন যাহা বিরুদ্ধাচার সমর্থন করিয়াও সাধারণের চক্ষে অপেক্ষাকৃত মনোহর আকারে বিরাজ করে। দুইটি চিত্রের মধ্যে কোন্ চিত্রে লেখক মহাশয়ের হৃদয় পড়িয়া রহিয়াছে, কোন্ চিত্রের প্রতি তিনি (জ্ঞাতসারেই হউক আর অজ্ঞাতসারেই হউক) পাঠকদের হৃদয়াকর্ষণের চেষ্টা করিয়াছেন তাহা পড়িলেই টের পাওয়া যায়। দুইটি চিত্রই যে তিনি সমান অপক্ষপাতিতার সঙ্গে আঁকিয়াছেন তাহা নহে। ইহার মধ্যে যে চিত্রের উপর তাঁহার প্রীতির লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে সেইটিকেই সম্পূর্ণ না হউক অপেক্ষাকৃত আদর্শস্থল বলিয়া মনে করা অসম্ভব নহে। যখন বলা যায় বঙ্কিমবাবু একটি হিন্দুর আদর্শ কল্পনা করিয়াছেন, তখন যে মহত্তম আদর্শই বুঝায় তাহাও নহে। দোষে গুণে জড়িত একটি আদর্শও হইতে পারে। যে-কোনো-একটা চিত্র খাড়া করিলেই তাহাকে আদর্শ বলা যায়।

তৃতীয় কথা— কেহ বলিতে পারেন যে, আলোচ্য হিন্দুটিকে বঙ্কিমবাবু যদি মহত্তম আদর্শস্থল বলিয়া খাড়া করিয়া না থাকেন তবে তাহার চরিত্রগত কোনো-একটা গুণ অথবা দোষ লইয়া এত আলোচনা করিবার আবশ্যক কী ছিল। কিন্তু আদর্শ হিন্দুর দোষ-গুণ লইয়া আমি সমালোচনা করি নাই। বঙ্কিমবাবু নিজের মুখে যাহা বলিয়াছেন তৎসম্বন্ধেই আমার বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছি। যেখানে বলিয়াছেন— 'যেখানে লোকহিতার্থে মিথ্যা নিতান্ত প্রয়োজনীয় অর্থাৎ যেখানে মিথ্যাই সত্য হয়'— সেখানে তিনি নিজেরই মত ব্যক্ত করিয়াছেন— এ তো আদর্শ হিন্দুর কথা নহে।

বঙ্কিমবাবু যে দুইটি অসত্যের অপবাদ আমাকে দিয়াছেন তৎসম্বন্ধে আমার যাহা বক্তব্য আমি বলিলাম। কিন্তু যেখানে তিনি বলিয়াছেন 'প্রয়োজন হইলে এরূপ উদাহরণ আরও দেওয়া যাইতে পারে' সেখানে আমার বক্তব্যের পথ রাখেন নাই। প্রয়োজন আছে কি না জানি না; যদি থাকিত তবে উদাহরণ দিলেই ভালো ছিল আর যদি না থাকিত তবে গোপনে এই বিষবাণক্ষেপণেরও প্রয়োজন ছিল না।

বঙ্কিমবাবু লিখিয়াছেন 'লোকহিত' শব্দের অর্থ বুঝিতে আমি ভুল করিয়াছি। তিনি সংশোধন করিয়া দেন নাই এইজন্য সেই ভুল আমার এখনও রহিয়া গেছে। সলজ্জে স্বীকার করিতেছি, এখনও আমি আমার ভ্রম বুঝিতে পারি নাই। অন্য যাঁহাদের জিজ্ঞাসা করিয়াছি তাঁহারাও আমার অজ্ঞান দূর করিতে পারেন নাই।

লেখকের নিজের সম্বন্ধে আর-একটি কথা আছে। বঙ্কিমবাবু বলিয়াছেন ভারতীতে প্রকাশিত মল্লিখিত প্রবন্ধে গালিগালাজের বড়ো ছড়াছড়ি বড়ো বাড়াবাড়ি আছে। শুনিয়া আমি নিতান্ত বিস্মিত হইলাম। বঙ্কিমবাবুর লেখার প্রসঙ্গে আমার যাহা বলিবার বলিয়াছি কিন্তু বঙ্কিমবাবুকে কোথাও গালি দিই নাই। তাঁহাকে গালি দিবার কথা আমার মনেও আসিতে পারে না। তিনি আমার গুরুজন তুল্য, তিনি আমা অপেক্ষা কিসে না বড়ো! আমি তাঁহাকে ভক্তি করি, আর কেই বা না করে। তাঁহার প্রথম সন্তান দুর্গেশনন্দিনী বোধ করি আমা অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠা। আমার যে এতদূর আত্মবিস্মৃতি ঘটিয়াছিল যে তাঁহাকে অমান্য করিয়াছি কেবলমাত্র অমান্য নহে তাঁহাকে গালি দিয়াছি তাহা সম্ভব নহে। ক্ষুব্ধ-হৃদয়ে অনেক কথা বলিয়াছি, কিন্তু গালিগালাজ হইতে অনেক দূরে আছি। মেছোহাটার তো কথাই নাই আঁষটে গন্ধটুকু পর্যন্ত নাই। যে স্থান উদ্‌ধৃত করিয়াছেন তাহা গালি নহে তাহা আক্ষেপ উক্তি। 'মেছোহাটা'ই বলো আর 'প্রার্থনা মন্দির'ই বলো আমি কোথা হইতেও ফরমাশ দিয়া কথা আমদানি করি নাই— আমি বাণিজ্য-ব্যবসায়ের ধার ধারি না— হৃদয় হইতে উৎসারিত না হইলে সে কথা আমার মুখ দিয়া বাহির হইত না, যিনি বিশ্বাস করেন করুন, না করেন নাই করুন।

বঙ্কিমবাবু বলিয়াছেন— প্রথম সংখ্যক 'প্রচার' বাহির হওয়ার পর রবীন্দ্রবাবুর সহিত আমার চার-পাঁচ বার দেখা হইয়াছিল এবং প্রধানত সাহিত্য সম্বন্ধে কথোপকথন হইয়াছিল, তিনি কেন আমাকে প্রচারের উক্ত প্রবন্ধ সম্বন্ধে কোনো কথা জিজ্ঞাসা করেন নাই? করি নাই বটে, কিন্তু তাহাতে কী আসে যায়! মূল কথাটার সহিত তাহার কী যোগ? না করিবার অনেক কারণ থাকিতে পারে। সে-সব ঘরের কথা। পাঠকদের বলিবার নহে। বর্তমান লেখকের নানা দোষ থাকিতে পারে। দুর্বলস্বভাবশত আমার চক্ষুলজ্জা হইতে পারে। বঙ্কিমবাবু পাছে বিরোধী মত সহিতে না পারিয়া আমাকে ভুল বুঝেন এমন আশঙ্কা মনে উদয় হইতে পারে। প্রথম যখন পড়িয়াছিলাম তখন স্বাভাবিক অনবধানতা বা মন্দবুদ্ধিবশত উক্ত কয়েক ছত্রের গুরুত্ব উপলব্ধি না করিতে পারি। কিছুদিন পরে অন্য কোনো ব্যক্তির মুখে এ সম্বন্ধে আলোচনা শুনিয়া আমার মনে আঘাত লাগিতেও পারে। উক্ত প্রবন্ধ দ্বিতীয়বার পড়িবার সময় আমার মনে নূতন ভাব উদয় হওয়াও অসম্ভব নহে। কিন্তু, প্রকৃত কারণ এই যে, বাড়িতে 'প্রচার' আসিবামাত্র কে কোন্ দিক হইতে লইয়া যায় খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এইজন্য ভালো করিয়া পড়িতে প্রায় বিলম্ব হইয়া যায়। আমার মনে আছে প্রথম খণ্ড প্রচার একটি পুস্তকালয়ে গিয়া চোখ বুলাইয়া দেখিয়া আসি। সকল লেখা পড়িতে পাই নাই। পরে একদিন শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের মুখে হিন্দুধর্ম নামক প্রবন্ধের মর্মটা শুনি কিন্তু তিনি সত্য-মিথ্যা বিষয়ে কোনো উল্লেখ করেন নাই। পরে সুবিধা অথবা অবসর অনুসারে বহু বিলম্বে উক্ত প্রবন্ধ প্রচারে পড়িতে পাই। কিন্তু এ-সকল কথা কেন? আমার প্রবন্ধে আমি যদি কোনো অন্যায় কথা না বলিয়া থাকি তাহা হইলে আমার আর কোনো দুঃখ নাই।

আমার নিজের সম্বন্ধে যাহা বক্তব্য তাহা বলিলাম। এখন আর দুই-একটি কথা আছে। বঙ্কিমবাবুর লেখার ভাব এই যে, তিনি রবীন্দ্রনাথ নামক ব্যক্তিবিশেষের লেখার উত্তর দেওয়া আবশ্যক বিবেচনা করিতেন না যদি না উক্ত রবীন্দ্রনাথ আদি ব্রাহ্মসমাজের সহিত লিপ্ত থাকিতেন। বাস্তবিকই আমি বঙ্কিমবাবুর সহিত মুখোমুখি উত্তর-প্রত্যুত্তর করিবার যোগ্য নহি, তিনিই আমার স্পর্ধা বাড়াইয়াছেন। তবে, বঙ্কিমবাবুর হস্ত হইতে বজ্রাঘাত পাইবার সুখ ও গর্ব অনুভব করিবার জন্যই আমি লিখি নাই, বিষয়টি অত্যন্ত গুরুতর বলিয়া আমার জ্ঞান হইয়াছিল, তাই আমার কর্তব্যকার্য সাধন করিয়াছি। নহিলে সাধ করিয়া বঙ্কিমবাবুর বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে আমার প্রবৃত্তিও হয় না ভরসাও হয় না। যাহা হউক, আলোচ্য বিষয়ের গৌরবের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বঙ্কিমবাবু উত্তর লিখিতে প্রবৃত্ত হন নাই; তিনি আমার প্রবন্ধকে উপলক্ষ মাত্র করিয়া আদি ব্রাহ্মসমাজকে দুই-এক কথা বলিয়াছেন। প্রথম কথা এই যে, আদি ব্রাহ্মসমাজের লেখকেরা

উত্তরোত্তর মাত্রা চড়াইয়া বঙ্কিমবাবুকে আক্রমণ ও গালিগালাজ করিয়াছেন। আক্রমণমাত্রই যে অন্যায় এরূপ আমার বিশ্বাস নহে। আদি ব্রাহ্মসমাজের কতকগুলি মত আছে। উক্ত ব্রাহ্মসমাজের দৃঢ় বিশ্বাস যে, সেই-সকল মত প্রচার হইলে দেশের মঙ্গল। যদি উক্ত সমাজবর্তী কেহ সত্যসত্যই অথবা ভ্রমক্রমেই এমন মনে করেন যে অন্য কোনো মত তাঁহাদের মত-প্রচারের ব্যাঘাত করিতেছে, এবং দেশের মঙ্গলের প্রতি লক্ষ্য করিয়া যদি সে মতকে খণ্ডন করিবার চেষ্টা করেন, তবে তাহাতে তাঁহাকে দোষ দেওয়া যায় না এবং তাহাতে কোনো পক্ষেরই ক্ষুব্ধ হইবার কোনো কারণ দেখা যায় না। এইরূপ হওয়াই স্বাভাবিক এবং ভালো, এইরূপ না হওয়াই মন্দ। তবে, গালিগালাজ করা কোনো হিসাবেই ভালো নহে সন্দেহ নাই। এবং সে কাজ আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে হয়ও নাই। তত্ত্ববোধিনীতে বঙ্কিমবাবুর মতের বিরুদ্ধে যে দুইটি প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে তাহাতে গালিগালাজের কোনো সম্পর্ক নাই। বিশেষত নব্য হিন্দু সম্প্রদায় নামক প্রবন্ধে বিশেষ বিনয় ও সম্মানের সহিত বঙ্কিমবাবুর উল্লেখ করা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাশচন্দ্র সিংহ নব্যভারতে বঙ্কিমবাবুর বিরুদ্ধে যে ঐতিহাসিক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহার সহিত আদি ব্রাহ্মসমাজের বা 'জোড়াসাঁকোর ঠাকুর মহাশয়দের' কোনো যোগই থাকিতে পারে না। তিনি ইচ্ছা করিলে আরও অনেক ঐতিহাসিক প্রবন্ধে আরও অনেক মহারথীকে আরও গুরুতররূপে আক্রমণ করিতে পারেন, আদি ব্রাহ্মসমাজের অথবা ঠাকুর মহাশয়দের তাঁহাকে নিবারণ করিবার কোনো অধিকার নাই। আমি যদি বলি বঙ্কিমবাবু নবজীবনে অথবা প্রচারে যে-সকল প্রবন্ধ লেখেন, তাঁহার এজলাসের সহিত অথবা ডেপ্যুটি ম্যাজিস্ট্রেটসমাজের সহিত তাহাদের সবিশেষ যোগ আছে তবে সে কেমন শুনায়? আমার লেখাতেও কোনো গালিগালাজ নাই। দ্বিতীয়ত, আমি যে লেখা লিখিয়াছি তাহা সমস্ত বঙ্গসমাজের হইয়া লিখিয়াছি বিশেষরূপে আদি ব্রাহ্মসমাজের হইয়া লিখি নাই।[১]

বঙ্কিমবাবু তাঁহার প্রবন্ধে যেখানেই অবসর পাইয়াছেন আদি ব্রাহ্মসমাজের প্রতি সুকঠোর সংক্ষিপ্ত ও তির্যক কটাক্ষপাত করিয়াছেন। সেরূপ কটাক্ষপাতে আমি ক্ষুদ্র প্রাণী যতটা ভীত ও আহত হইব আদি ব্রাহ্মসমাজের ততটা হইবার সম্ভাবনা নাই। আদি ব্রাহ্মসমাজের নিকটে বঙ্কিমবাবু নিতান্তই তরুণ। বোধ করি বঙ্কিমবাবু যখন জীবন আরম্ভ করেন নাই তখন হইতে আদি ব্রাহ্মসমাজ নানা দিক হইতে নানা আক্রমণ সহ্য করিয়া আসিতেছেন কিন্তু কখনোই তাঁহার ধৈর্য বিচলিত হয় নাই। বঙ্কিমবাবু আজ যে বঙ্গভাষার ও যে বঙ্গসাহিত্যের পরম গৌরবের স্থল, আদি ব্রাহ্মসমাজ সেই বঙ্গভাষাকে পালন করিয়াছেন সেই বঙ্গসাহিত্যকে জন্ম দিয়াছেন। আদি ব্রাহ্মসমাজ বিদেশীদ্বেষী তরুণ বঙ্গসমাজে য়ুরোপ হইতে জ্ঞান আহরণ করিয়া আনিয়াছিলেন এবং পাশ্চাত্যালোকে অন্ধ স্বদেশদ্বেষী বঙ্গযুবকদিগের মধ্যে প্রাচীন হিন্দুদিগের ভাব রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন; আদি ব্রাহ্মসমাজ হিন্দুসমাজপ্রচলিত কুসংস্কার বিসর্জন দিয়াছেন কিন্তু তৎসঙ্গেসঙ্গে হিন্দুহৃদয় বিসর্জন দেন নাই— এইজন্য চারি দিক হইতে ঝঞ্ঝা আসিয়া তাঁহার শিখর আক্রমণ

---

[১] সঞ্জীবনীতে নবজীবনের সূচনা লইয়া যে লেখালেখি চলিয়াছিল তাহার সহিত বঙ্কিমবাবুর কী যোগ কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। যদি বলেন বঙ্কিমবাবু নবজীবনের লেখক তবে সে বিষয়ে আমিও তাঁহার সহযোগী বলিয়া গর্ব করিতে পারি। অতএব সঞ্জীবনীর উক্ত লেখা আমার প্রতি আক্রমণই বা নহে কেন? যদি বলেন যে, বঙ্কিমবাবু যে হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যা করিতেছেন উক্ত প্রবন্ধে তাহার প্রতি আক্রমণ করা হইয়াছে, তাহাও ঠিক কথা নহে। নবজীবনের সূচনা নামক প্রবন্ধে যে নবযুগ প্রতিষ্ঠার কিঞ্চিৎ আড়ম্বর করা হইয়াছিল সঞ্জীবনীতে তাহারই প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছিল। তাহার পর চন্দ্রনাথবাবুতে আর আমাতে যে কিঞ্চিৎ কথা কাটাকাটি হইয়াছিল সে তাহাতে আমাদের বোঝাপড়া। বঙ্কিমবাবু এই ব্যাপারটি অকারণে কেন নিজের স্কন্ধে তুলিয়া লইলেন কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।

করিয়াছে, কিন্তু কখনো তাঁহার গাম্ভীর্য নষ্ট হয় নাই। আজি সেই পুরাতন আদি ব্রাহ্মসমাজের অযোগ্য সম্পাদক আমি কাহারও কটাক্ষপাত হইতে আদি ব্রাহ্মসমাজকে রক্ষা করিতে অগ্রসর হইব ইহা দেখিতে হাস্যজনক।

বঙ্কিমবাবুর প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ভক্তি আছে তিনি তাহা জানেন। যদি তরুণ বয়সের চপলতাবশত বিচলিত হইয়া তাঁহাকে কোনো অন্যায় কথা বলিয়া থাকি তবে তিনি তাঁহার বয়সের ও প্রতিভার উদারতাগুণে সে সমস্ত মার্জনা করিয়া এখনও আমাকে তাঁহার স্নেহের পাত্র বলিয়া মনে রাখিবেন। আমার সবিনয় নিবেদন এই যে, আমি সরলভাবে যে-সকল কথা বলিয়াছি, আমাকে ভুল বুঝিয়া তাহার অন্য ভাব গ্রহণ না করেন।

ভারতী
পৌষ ১২৯১

[দুর্ভিক্ষ]

অধিক দূরে নয়, তোমাদের দ্বারের নিকট ক্ষুধিতেরা দাঁড়াইয়া আছে। তোমরা দুই বেলা যে উচ্ছিষ্ট অন্ন কুক্কুর বিড়ালদের ফেলিয়া দিতেছ, তাহার প্রতি তাহার কী কাতরদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছে। তোমাদের নবকুমারের জন্মোপলক্ষে গৃহে কত আনন্দ পড়িয়াছে— আহারাভাবে কোলের ছেলেটির কাঁদিবার শক্তিও নাই— তোমাদের গৃহে বিবাহের বাঁশি বাজিতেছে, কেবল একমুষ্টি অন্নের অভাবে তাহাদের গৃহে বিবাহ-বন্ধন চিরদিনের মতো বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতেছে— স্ত্রীর মুখে অন্ন দিয়া স্বামী তাহার শেষ কর্তব্য সাধন করিতে পারিতেছে না। তোমরা গৃহে বসিয়া নিশ্চিতমনে কত কথা লইয়া আলাপ করিতেছ, কত হাস্য-পরিহাস করিতেছ, সংসারের কত শত কাজে মন দিতেছ— তাহাদের আর কোনো কথা নাই, কোনো ভাবনা নাই, কোনো কাজ নাই— তাহাদের জীবনের সমস্ত চিন্তা, তাহাদের হৃদয়ের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা, তাহাদের দিনরাত্রির সমস্ত আশা কেবল একটি মুষ্টি অন্নের উপরে বদ্ধ রহিয়াছে। তাহাদের চক্ষে এক্ষণে সমস্ত জগতে একমুষ্টি অন্নের চেয়ে বাঞ্ছনীয় আর কিছু নাই— একমুষ্টি অন্ন উপাজর্নের চেয়ে আর মহত্তর উদ্দেশ্য নাই— এমন-কি, সমস্ত জগতে অন্নের অতীত আর কোনো কিছুই নাই।

ক্ষুধা যে কী ভয়ানক বিপদ, তাহা আমরা অনেকে কল্পনা করিতে পারি না। অন্যান্য অনেক বিপদে মনুষ্যের মনুষ্যত্ব জাগাইয়া তুলে— কিন্তু ক্ষুধায় মনুষ্যত্ব দূর করিয়া দেয়। ক্ষুধার সময় মনুষ্য অত্যন্ত ক্ষুদ্র। আত্মরক্ষার জন্য যখন একমুষ্টি অন্নাভাবের সহিত মনুষ্যকে যুদ্ধ করিতে হয়, তখন মনুষ্য একটি পিপীলিকার সমতুল্য। সে যুদ্ধেও যখন মনুষ্যের পরাজয় হয়— একমুষ্টি তণ্ডুলের অভাবেও যখন মনুষ্যজীবনের শত সহস্র মহৎ আশা উদ্দেশ্য ধরাশায়ী হয়, তখন মনুষ্যজাতির দীনতা দেখিয়া হৃদয় হাহাকার করিতে থাকে। ক্ষুধার জ্বালায় বড়ো ভাই ছোটো ভাইয়ের মুখ হইতে তাহার বহু কষ্টের গ্রাস কাড়িয়া লইতে সংকুচিত হয় না— ক্ষুধায় মানুষ অত্যন্ত হীন, ক্ষুধায় কোনো মহত্ত্ব নাই। এই ক্ষুধার হাত হইতে কাতরদিগকে পরিত্রাণ করো— এই ক্ষুধায় মানুষদের— আপনার ভাইদের মরিতে দিয়ো না— সে মানুষের পক্ষে অত্যন্ত লজ্জার কথা।

তোমার যদি আপনার ভাই থাকে, তবে যাহার ভাই আজ অনাহারে মরিতেছে, তাহার প্রতি একবার মুখ তুলিয়া চাও— তোমার যদি আপনার মা থাকে, তবে অন্নাভাবে মরণাপন্ন মায়ের মুখের দিকে হতাশ হইয়া যে তাকাইয়া আছে, তাহাকে কিছু সাহায্য করো— তোমার যদি নিজের সন্তান থাকে তবে কোলের উপর বসিয়া যাহার শিশু-সন্তান প্রতিমুহূর্তে শীর্ণ হইয়া মরিতেছে, তোমার উদ্ধৃত [উদ্‌বৃত্ত] অন্নের কিছু অংশ তাহাকে দাও। সত্যসত্যই তোমার কি কিছুই নাই? যে আজ কয় দিন ধরিয়া কেবল তেঁতুল বীজের শস্য সিদ্ধ করিয়া খাইয়াছে, তাহার চেয়েও কি

তুমি নিঃসম্বল? যে আজ তিনদিন ধরিয়া কেবল শুষ্ক ইক্ষুমূল জলে ভিজাইয়া অল্প অল্প চর্বণ করিতেছে, তাহাকেও কি তুমি সাহায্য করিতে পার না? তুমি হয়তো মনে মনে বলিতেছ— 'এত শত ধনী আছে তাহারাই যদি দুঃখীদের সাহায্য না করিল তো আমরা আর কী করবি!' এমন কথা বলিয়ো না। যে নিষ্ঠুর সে আপনাকে আপনি বঞ্চিত করিতেছে। যে পাষাণ কোনো বেদনাই অনুভব করে না সে নিজের জড়ত্বসুখ লইয়া স্বচ্ছন্দে থাকুক, তাই বলিয়া তাহার দেখাদেখি আপনাকে পাষাণ করিয়ো না! বিলাসসুখ প্রতিদিবসের অন্নপানের ন্যায় যাহার অভ্যাস হইয়াছে যে নিজের সামান্য অনাবশ্যক সুখকে পরের অত্যাবশ্যক অভাবের চেয়ে গুরুতর জ্ঞান করে, সে দুঃখীর মুখের দিকে চায় নাই বলিয়া সকলেই যদি দুঃখীর প্রতি বিমুখ হয়, তবে তো মানবসমাজ রাক্ষসপুরী হইয়া উঠে। হৃদয়হীন বিলাসের ক্রোড়ে যে নিদ্রিত আছে, মহেশ্বরের বজ্রশব্দে যদি একদিন সে জাগিয়া উঠে তবেই তাহার চেতনা হইবে, নতুবা দুঃখী-অনাথের ক্রন্দন ধ্বনিতে তাহার নিদ্রা ভঙ্গ হইবে না।

তত্ত্বকৌমুদী
জ্যৈষ্ঠ ১২৯২

লাঠির উপর লাঠি

সম্পাদক মহাশয়

আপনি ব্যায়ামচর্চা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন সে বিষয়ে কাহারও দ্বিরুক্তি করিবার সম্ভাবনা নাই, ক্ষুদ্রবুদ্ধিবশত আমার মনে দু-একটা প্রশ্নোদয় হইয়াছে। সংশয় দূর করিয়া দিবেন।

আপনি য়ুরোপীয় ও আমেরিকানদের সঙ্গে আমাদের যে তুলনা করিয়াছেন সে তুলনা ভালো খাটে না। আমাদের ব্যায়ামচর্চা কর্তব্যবোধে করিতে হইবে, য়ুরোপীয়দের ব্যায়ামচর্চায় স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। সে অনেকটা জলবায়ুর গুণে। শীতের হাত এড়াইবার প্রধান উপায় ব্যায়ামচর্চা। গ্রীষ্মের হাত এড়াইবার প্রধান উপায় যথাসাধ্য বিরাম। তবে যে ইংরাজেরা এ দেশে আসিয়াও ব্যায়াম ভুলেন না তাহার কারণ আজীবন ও পুরুষানুক্রমিক সংস্কার। আমরাও বোধ করি বিলাতে গেলে আমাদের জড়তা সম্পূর্ণ পরিহার করিতে পারি না।

দ্বিতীয় কথা— দেখিতে হইবে আমার কী খাই ও য়ুরোপীয়রা কী খায়। য়ুরোপীয়েরা যে মদ মাংস খায় তাহার প্রবল উত্তেজনায় তাহাদের একদণ্ড স্থির থাকিতে দেয় না। আমরা ডাল ভাত খাইয়া অত্যন্ত স্নিগ্ধ থাকি, চোখে ঘুম আসে। তবে কি খাদ্য পরিবর্তন করিতে হইবে? সে কি সহজ কথা! আর য়ুরোপীয়দের খাদ্য আমাদের দেশে খাটে কি না খাটে তাই বা কে বলিবে। কেবল সে কথা নহে। এত টাকা কোথায়! পেট ভরিয়া ডাল ভাত তাই জোটে না। নুনের ট্যাক্সের দায়ে অনেক গরীব শুধু ভাত খাইয়া মরে, নুনও জোটে না। এদেশে সকলে মিলিয়া যে মাংস খাইতে আরম্ভ করিবে সে সম্ভাবনাও অত্যন্ত বিরল।

ছাত্রেরা যে খেলাধূলা আমোদ প্রমোদ ভুলিয়া ঘরে বসিয়া বিদেশী ব্যাকরণের শুষ্ক সূত্র, বীজগণিতের কঠিন আঁটি ও জ্যামিতির তীক্ষ্ণ ত্রিকোণ চতুষ্কোণ গিলিতে থাকে, তাহার অবশ্যই একটা কারণ আছে। জ্যামিতি বীজগণিতের প্রেমে পড়িয়া তাহারা কিছু নিতান্তই আত্মহত্যা করিতে বসে নাই। আসল কথা এই যে, আমরা নিতান্ত গরীব, আমরা যে কত গরীব সম্পাদক মহাশয়ের বোধ করি তাহা ধারণা নাই। সম্পাদক মহাশয় বোধ করি ঠিক কল্পনা করিতে পারেন না যে তাঁহার 'বালকের' দু টাকা মূল্য দিবার সময় আমাদিগকে কত ভাবিতে হয়। আমি যে কাগজখানায় লিখিতেছি তাহাতে তাঁহারা জুতাও মোড়েন না। যে কলমটায় লিখিতেছি তাহা তাঁহাদের কান চুলকাইবারও অযোগ্য। আমাদের সবুর করিবার সময় নাই। বিদ্যাটাকে আফিসের ভাতের মতো গিলিতে হয়। পান তামাক খাইবারও সময় থাকে না। সম্পাদক বলিবেন তাহাতে

তো ভালো শেখা হয় না। কে বলে যে হয়। এক্‌জামিন পাস হয় সন্দেহ নাই। যদি কেহ বলেন মাঝে মাঝে খেলাধুলা না থাকিলে এক্‌জামিনও পাস হয় না, তবে তাহার প্রমাণাভাব। বাঙালির ছেলের আর যাই দোষ থাক্ পাস করিতে তাহারা যে পটু এ কথা শত্রুপক্ষীয়দিগকেও স্বীকার করতে হয়।

তাড়াতাড়ি পাস না করিলে চলে কই? আমাদের টাকাও অল্প, জীবনও অল্প, অথচ দায় অল্প নয়। সৌভাগ্যক্রমে আমার পিতা বর্তমান। তিনি মাসে চল্লিশটি টাকা করিয়া বেতন পান। শীঘ্রই বাধ্য হইয়া পেনশন লইতে হইবে। আমার দুটি ছোটো ভাই আছে। আমি বিদ্যা সমাপন করিয়া কিঞ্চিৎ রোজগার করিলে তবে তাহাদের রীতিমতো অধ্যয়নের কতকটা সুবিধা হইবে। আমি গত বৎসর এল. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছি। এম. এ. পর্যন্ত পড়িয়া একটা যৎসামান্য চাকরি জোটাইতে নিদেনপক্ষে আর পাঁচটা বৎসর মাথা খুঁড়িতে হইবে। ইতিমধ্যে আমার ভগ্নীটির বিবাহ না দিলে নয়। আমরা কায়স্থ। আমাদের ঘর হইতে মেয়ে বিদায় করিতে হইলে যথার্থই ঘরের লক্ষ্মী বিদায় করিতে হয়। সে যখন যায় ঘর হইতে সোনারুপার চিহ্ন মুছিয়া যায়। অ্যাসিড-বিশেষে বাসনের গিল্টি যেমন উঠাইয়া দেয়, আমাদের মেয়েরা তেমনি গৃহের সচ্ছলতা উদরের অন্ন উঠাইয়া লইয়া যায়। ঋণদায় গ্রহণ করিয়া কন্যাদায় মোচন করিতে হয়। বাবার মুখে অন্ন রোচে না, রাত্রে নিদ্রা হয় না। পড়াশুনা আর চলে না, চাকরির চেষ্টা দেখিতেছি। বালকের কার্যাধ্যক্ষের কিংবা কেরানির কিংবা কোনো একটা কাজ খালি যদি হয় তবে হতভাগ্যকে একবার স্মরণ করিবেন।

ভগ্নীর বিবাহ দিতে হইলে নিজে বিবাহ করিতে হইবে। তাহা হইলে হাতে কিঞ্চিৎ টাকা আসিবে। যে হতভাগ্যের ভগ্নীকে বিবাহ করিব তাহার তহবিলে রসকষ কিছু বাকি থাকিবে না। তাহার পাতে পিঁপড়ার হাহাকার উঠিবে।

আমি সবে এল. এ. পাস করিয়াছি, আমার দর বেশি নয়। বিবাহ করিয়া নিতান্ত বেশি কিছু পাইব না। কিন্তু সংসারের নতুন বোঝার চাপুনি যে মাথায় পড়িবে তাহাতে মাথা তুলিবার শক্তি থাকিবে না।

খেলাধুলা ছাড়িয়া কেন যে দিনরাত্রি ব্যাকরণ লইয়া পড়িয়াছি তাহা বোধ করি সম্পাদক মহাশয় এতক্ষণে কিছু বুঝিয়াছেন। কেবল পাস করিলেই চলিবে না, যাহাতে ছাত্রবৃত্তি পাই সে চেষ্টাও করিতে হইবে। আমার মতো ও আমার চেয়ে গরীব ঢের আছে। ছাত্রবৃত্তির প্রতি তাঁহারা সকলেই লুব্ধনেত্রে চাহিয়া— এমন স্থলে লাঠি ঘুরাইয়া ব্যায়াম করিতে কি ইচ্ছা যায়? পেটের দায়ে বিলাতে দরজির মেয়েরা খেলা ভুলিয়া সূর্যালোক ও মুক্ত বায়ু ছাড়িয়া কামিজ সেলাই করিতেছে। কবি হুড তাহাদের বিলাপগান জগতে প্রচার করিয়াছেন। আমরাও পেটের দায়ে লাঠি ঘুরাইয়া ব্যায়াম করিতে পারি না, দিনরাত্রি ব্যাকরণের দুয়ারে মাথা খুঁড়িতেছি। কই, আমাদের দুঃখের কথা তো কোনো মহাকবি উল্লেখ করেন না। উন্টিয়া স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম জানি না বলিয়া মাঝে মাঝে ভর্ৎসনা সহিতে হয়। (বোধ করি যত সব স্কুল-পালানে ছেলেই কবি হয়। এক্‌জামিনের যন্ত্রণা তাহারা জানে না।)

আমি একজন অক্‌স্‌ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণ ভালো ইংরাজের কাছে শুনিয়াছি যে সেখানকার দরিদ্র ছেলেরা মাথায় ভিজে তোয়ালে বাঁধিয়া ছাত্রবৃত্তির জন্য যেরূপ গুরুতর পরিশ্রম করে আমরা তাহার সিকিও পারি না। তাহাদের অনেকে নৌকার দাঁড় টানে না, ক্রিকেট খেলে না, বই কামড়াইয়া পড়িয়া থাকে। সেখানকার ঠাণ্ডা বাতাসের জোরে টিকিয়া থাকে, পাগল হইয়া যায় না। সেখানকার চেয়ে এখানে এরূপ ছাত্রের সংখ্যা যদি বেশি দেখা যায় তবে এই বুঝিতে হইবে এখানে দরিদ্রের সংখ্যাও বেশি। এখানকার ছেলেরা যদি আমেরিকার ছেলেদের মতো লাঠি না ঘুরায় তবে তাহাতে আর কাহারো দোষ দেওয়া যায় না, সে দারিদ্র্যের দোষ। ছাত্রদের বুঝিতে বাকি নাই যে ব্যায়ামচর্চা করিলে শরীর সুস্থ হয় এবং সুস্থ থাকিলেই

ভালো, অসুস্থ থাকিলে কষ্ট পাইতে হয়।

পড়াশুনা সম্বন্ধেও য়ুরোপীয়দের সঙ্গে আমাদের তুলনা হয় না। তাহারা নিজের ভাষায় জ্ঞান উপার্জন করে, আমরা পরের ভাষায় জ্ঞানোপার্জন করি। বিদেশীয় ভাষা ও বিদেশীয় ভাব আয়ত্ত করিতে আমাদের কত সময় চলিয়া যায়, তাহার পরে সেই ভাষার ভাণ্ডারস্থিত জ্ঞান। মাতার ভাষা আমরা স্নেহের সঙ্গে শিক্ষা করি। মাতৃদুগ্ধের সহিত তাহা আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করে। নিশ্বাস-প্রশ্বাসের সহিত তাহা আমরা আকর্ষণ করি। সে ভাষা আমাদের আদরের ভাষা, প্রতিদিনের সুখদুঃখের ভাষা, সে ভাষা আমাদের মা-বাপের ভাষা, আমাদের ভাই-বোনের ভাষা, আমাদের খেলাধুলার ভাষা। আর বিমাতৃ-ভাষা আমাদের তিক্ত ঔষধ, শক্ত পিল, গিলিতে হয়। গলায় বাধে, নাক চোখ চলে ভাসিয়া যায়। 'হি ইজ্ আপ্'— তিনি হন উপরে, 'আই গেট্ ডাউন্'— আমি পাই নীচে— ইহা মুখস্থ করিতে করিতে কোন্ বাঙালির ছেলের না রক্ত জল হইয়া যায়! ভাষা নামক কেবল একটা যন্ত্র আয়ত্ত করিতে গিয়াই আমাদের হাড়গোড় সেই যন্ত্রের তলে পিষিয়া যায়। ইংরাজের কি সে অসুবিধা আছে? যে শৈশবকাল স্নেহের মাতৃদুগ্ধ পান করিবার সময়, সেই শৈশবে বিদেশী চালকড়াইভাজা দন্তহীন মাড়ি দিয়া চিবাইয়া কোনোমতে গলাধঃকরণ করিতে হয়। তবুও যদি পাকশক্তি অক্ষুণ্ণ থাকে। জ্ঞানের প্রতি অরুচি না হয়, তবে সে পরম সৌভাগ্য বলিতে হইবে। আমাদের মাথার উপরে দারিদ্র্যের বোঝা, সম্মুখে বিদেশীয় ভাষার দুর্গম পর্বত, তাড়াতাড়ি করিয়া পার হইতে হইবে। সত্যসত্যই আমাদের লাঠি ঘুরাইবার সময় নাই।

আমাদের মেয়েরাও আবার আজকাল এক্‌জামিন পাস করিতে উদ্যত হইয়াছেন; বাঙালি জাতটাই কি একেবারে এক্‌জামিন দিতে দিতে জগৎ সংসার হইতে 'পাস' হইয়া যাইবে? পাসকরা ছেলেদেরই শরীর তো ভাঙিয়া পড়িতেছে। মেয়েদের মধ্যেও কি শীর্ণ শরীর, জীর্ণ মস্তিষ্ক, রুগ্‌ণ পাকযন্ত্র প্রচলিত হইবে? মেয়েদেরও কি চোখে চশমা, পকেটে কুইনাইন, উদরে দাওয়াইখানার প্রাদুর্ভাব হইবে? পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার আশায় ছয় মাস ধরিয়া উন্মাদ উত্তেজনা, এবং পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হইলে হৃদয়বিদারক লজ্জা ও নিরাশা— ইহা কি আমাদের দেশের সকমারী বালিকাদেরও আয়ুক্ষয় করিতে থাকিবে? পরীক্ষাশালায় প্রবেশ করিবার সময় বড়ো বড়ো জোয়ান বালকের যে হৃৎকম্প উপস্থিত হয় তাহাতেই তাহাদের দশ বৎসর পরমায়ু হ্রাস হইয়া যায়, তবে মেয়েদের দশা কী হইবে? মেয়েরা যে বিদ্যাশিক্ষা করিবে তাহার একটা অর্থ বুঝিতে পারি— কিন্তু মেয়েরা কেন যে পরীক্ষা দিবে তাহার কোনো অর্থ বুঝিতে পারি না। এমন সযত্নে তাহাদিগকে এমন সৎশিক্ষা দাও যাহাতে জ্ঞানের প্রতি তাহাদের স্বাভাবিক অনুরাগ জন্মে। আয়ুক্ষকর এবং কোমল হৃদয়ের বিকারজনক প্রকাশ্য গৌরবলাভের উত্তেজনায় তাহাদিগকে নাকে চোখে জ্ঞান গিলিতে প্রবৃত্ত করানো ভালো বোধ হয় না। পরীক্ষা দেওয়া গৌরব লোভে একপ্রকার জুয়া খেলা। ইহা হৃদয়ের অস্বাভাবিক উত্থান-পতনের কারণ। প্রকাশ্য গৌরবলাভের জন্য প্রকাশ্য রঙ্গভূমিতে যোঝাযুঝি করিতে দণ্ডায়মান হইলে অধিকাংশ স্থলেই হৃদয়ের দুর্মূল্য সৌকুমার্য দূর হইয়া যায়। কেবল তাহাই নয়, জ্ঞানলাভ গৌণ এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়াই মুখ্য উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়ায়। পরীক্ষার অপকার সম্পূর্ণ পাওয়া যায় অথচ জ্ঞানলাভের সম্পূর্ণ উপকার পাওয়া যায় না। আমাদের বাংলাশেটা একটা প্রকাণ্ড ইউনিভার্‌সিটি চাপা পড়িয়া মরিবার উদ্যোগ হইয়াছে। এসো-না কেন, আমরা এম. এ., বি. এ. ডিগ্রিগুলি গলায় বাঁধিয়া মেয়েপুরুষে মিলিয়া বঙ্গোপসাগরের জলে ডুবিয়া মরি? সে বড়ো গৌরবের কথা হইবে। আমেরিকা ও য়ুরোপ হাততালি দিতে থাকিবে।

এক কথা বলিতে গিয়া আর-এক কথা উঠিল। একেবারে যে যোগ নাই তাহা নহে। স্বাস্থ্যের কথা উঠিল বলিয়া এত কথা বলিতে হইল।

সম্পাদক মহাশয় আমার প্রগল্‌ভতা মাপ করিবেন। লিখিতে বিস্তর সময় গেল, এতক্ষণ লাঠি ঘুরাইলেও হইত। যাহা হউক, এক্ষণে এক্‌জামিনের পড়া মুখস্থ করিতে চলিলাম।

বশংবদ শ্রীঃ-

বালক
জ্যৈষ্ঠ ১২৯২

সত্য

সরলরেখা আঁকা সহজ নহে, সত্য বলাও সহজ ব্যাপার নহে। সত্য বলিতে গুরুতর সংযমের আবশ্যক। দৃঢ় নির্ভর দৃঢ় নিষ্ঠার সহিত তোমাকেই সত্যের অনুসরণ করিতে হইবে, সত্য তোমার অনুসরণ করিবে না। আমরা অনেক সময়ে মনে করিয়া থাকি, সত্য যে সত্য হইল সে কেবল আমি প্রচার করিলাম বলিয়া। সত্যের প্রতি আমরা অনেক সময়ে মুরুব্বিয়ানা করিয়া থাকি— আমরা তাহাকে আশ্বাস দিয়া বলি, তোমার কিছু ভয় নাই, আমি তোমাকে খাড়া করিয়া তুলিব। সত্যের যেন বাস্তবিক কোনো দাওয়া নাই তাই আমার অনুগ্রহের উপরে সে দাবি করিতে আসিয়াছি, এবং আমি তাহাকে আমার মহৎ আশ্রয় দিয়া যেন কৃতার্থ করিলাম এবং হৃদয়ের মধ্যে মহত্ত্বাভিমান অনুভব করিলাম। এইরূপে সত্যের চেয়ে বড়ো হইতে গিয়া আমরা সত্যকে দূর করিয়া দিই, মিথ্যাকে আহ্বান করিয়া আনি। আমরা ভুলিয়া যাই যে, সত্য সমস্ত জগতের আশ্রয়স্থল, এজন্য সত্য কোনো ব্যক্তিবিশেষের অনুগ্রহ বা তোষামোদের বশ নহে। আমার সুবিধামতো আমি যদি সত্যকে বাঁকাইতে পারিতাম তো সত্য কি সহজ হইতে পারিত! কিন্তু আমি সত্যের কাছে বাঁকিয়া ভাঙিয়া যাইতে পারি, সত্য তাহার অটল সরল সুন্দর মহিমায় দাঁড়াইয়া থাকে— সত্য আমার মুখ তাকাইলে চলে না, কারণ সকলেই তাহার মুখ তাকাইয়া আছে।

এইজন্যই সত্যের এত বল। সত্য আমার প্রতি নির্ভর করে না বলিয়াই আমি সত্যের প্রতি নির্ভর করিতে পারি। সত্যকে যদি আবশ্যকমতো বাঁকানো যাইতে পারিত তবে আমরা সিধা থাকিতাম কী করিয়া! সত্য যদি কথায় কথায় স্থান পরিবর্তন করিত তবে আমরা দাঁড়াইতাম কিসের উপরে! সত্য যদি না থাকে তবে আমরা আছি কে বলিল!

আমরা যখন মিথ্যাপথে চলি, তখন আমরা দুর্বল হইয়া পড়ি এইজন্য। তখন আমরা আত্মহত্যা করি। তখন আমরা একেবারে আমাদের মূলে আঘাত করি। আমরা যাহার উপরে দাঁড়াইয়া আছি তাহাকেই সন্দেহ করিয়া বসি। যতখানি আমাদের মিথ্যা অভ্যাস হয় ততখানি আমরা লুপ্ত হইয়া যাই। সত্যের প্রভাবে আমরা বাড়িতে থাকি, মিথ্যার বশে আমরা কমিয়া আসি। কারণ সত্যরাজ্যের সীমানা কোথাও নাই। দেশ, জাতি, সম্প্রদায়, আত্মপর প্রভৃতি যে-সকল ব্যবধানকে আমরা পাষাণ-প্রাচীর মনে করিয়া নিশ্চেষ্ট ছিলাম, সহসা সত্যের বিদ্যুতালোকে দেখি তাহারা কোথাও নাই। তাহারা আমার কল্পনায়। তাহারা অসীম সত্যরাজ্যের কাল্পনিক সীমানা, বালুকার উপরে মানুষের অঙ্গুলির চিহ্ন। তাহারা ছেলে ভুলাইয়া আমার অধিকার সংক্ষেপ করিতেছে। মিথ্যা আমাদিগকে এই বৃহৎ জগতের অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে চাহিতেছে। সত্যের আশ্রয়ে আমরা বিশ্বজগতে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ি, মিথ্যা তাহার কুঠারাঘাতে প্রতিদিন আমাদিগকে ছেদন করিতে থাকে। মিথ্যা আমাদিগকে একেবারে নিঃস্ব করিয়া দেয়, অল্পে অল্পে আমাদের সব কাড়িয়া লয়; আমাদের আশ্রয়ের স্থান, আমাদের জীবনের খাদ্য, আমাদের লজ্জা নিবারণের বস্ত্র। এমন ঘোর দারিদ্র্য জন্মাইয়া দেয় যে, পৃথিবীসুদ্ধকে দরিদ্র দেখি; অন্নপূর্ণাকে অন্নহীন বলিয়া বোধ হয়।

ইহার প্রমাণ কি আমরা প্রতিদিন দেখিতে পাই না? আমরা মিথ্যাচারীর দল, আমরা প্রতিদিন

প্রতি ক্ষুদ্র কাজে কি মনে করি না যে, ন্যূনাধিক প্রবঞ্চনা ব্যতীত পৃথিবীর কাজ চলিতে পারে না, খাঁটি সত্য ব্যবহার কেতাবে পড়িতে যত ভালো শুনায় কাজের বেলায় তত ভালো বোধ হয় না। অর্থাৎ যে নিয়মের উপর সমস্ত জগৎ নির্ভয়ে নির্ভর করিয়া আছে, সে নিয়মের উপর আমি নির্ভর করিতে পারি না, মনে হয় আমার ভার সে সামলাইতে পারিবে না— চন্দ্র সূর্য তাহাতে গাঁথা রহিয়াছে কিন্তু আমাকে সে ধারণ করিতে পারিবে না, আমাকে সে বিনাশের পথে নিক্ষেপ করিবে। প্রতিদিন মিথ্যার জাল রচনা করিয়া আমরা সত্যকে এমনই আচ্ছন্ন করিয়া তুলিয়াছি যে, আমাদের স্থূলে ভুল, মূলে অবিশ্বাস জন্মায়— মনে হয় জগতের গোড়ায় গলদ। এইজন্যই আমাদের ধারণা হয় যে, কেবল কৌশল করিয়াই টিকিতে হইবে। কৌশলই একমাত্র উপায়। ডালপালা মনে করে আমি কৌশল করিয়া থাকিব, গুঁড়িতে সংলগ্ন হইয়া থাকা কোনো কাজের নহে, গুঁড়ি বলে আমার শিকড় নাই, কোনোপ্রকার ফন্দি করিয়া সিধা থাকিতে হইবে। দুই পা বলে মাটিকে নিতান্ত মাটি জ্ঞান করিয়া আমি আপনারই উপরে দাঁড়াইব, সে কম কৌশলের কথা নয়, কিন্তু অবশেষে যে আশ্রয় ছাড়িয়া তাহারা লম্ফ দেয়, সেই আশ্রয়ের উপরে পড়িয়াই তাহাদের অস্থি চূর্ণ হইয়া যায়।

মনুষ্যসমাজের এই অতি বৃহৎ জটিল মিথ্যা-ব্যবসায়ের মধ্যে পড়িয়া সত্যকে অবলম্বন করা আমাদের পক্ষে কী কঠিন ব্যাপার হইয়া পড়িয়াছে। চক্ষের উপরে চতুর্দিক হইতে ধুলাবৃষ্টি হইতেছে— আমরা সত্যকে দেখিব কী করিয়া! আমরা জন্মাবধিই গুটিপোকার মতো সামাজিক গুটির মধ্যে আচ্ছন্ন। অতি দীর্ঘ পুরাতন দৃঢ় মিথ্যাসূত্রে সেই গুটি রচিত। সত্যের অপেক্ষা প্রথাকে আমরা অধিক সত্য বলিয়া জানি। প্রথা আমাদের চক্ষু আচ্ছন্ন করিয়া ধরিয়াছে, আমাদের হাতে পায়ে শৃঙ্খল বাঁধিয়াছে, বলপূর্বক আমাদিগকে চিন্তা করিয়া নিষেধ করিতেছে, পাছে তাহাকে অতিক্রম করিয়া আমরা সত্য দেখিতে পাই— বাল্যকাল হইতে আমাদিগকে মিথ্যা মান, মিথ্যা মর্যাদার কাছে পদানত করিতেছে; মিথ্যা কথন, মিথ্যাচরণ আমাদের কর্তব্যের মতো করিয়া শিক্ষা দিতেছে। আমরা বলি এক, করি এক; জানি এক, মানি এক— স্নায়ুর বিকার ঘটিলে যেমন আমরা ইচ্ছা করি একরূপ অথচ আমাদের অঙ্গ অন্যরূপে চালিত হয়— তেমনি বিকৃত শিক্ষায় আমরা সত্যের আদেশ শুনি একরূপ, অথচ মিথ্যার বশে পড়িয়া অন্যরূপে চালিত হই। প্রথা বলে অন্যায়াচরণ করো পাপাচরণ করো তাহাতে হানি নাই, কিন্তু আমার বিরুদ্ধাচরণ করিয়ো না, তাহা হইলে তোমার মানহানি হইবে, তোমার মর্যাদা নষ্ট হইবে— অতি পুরাতন মান, অতি পুরাতন মর্যাদা, সত্য তাহার কাছে কিছুই নয়। এই-সকল সহ্য করিতে না পারিয়া মাঝে মাঝে মহৎ লোকেরা আসিয়া মানমর্যাদা, কুলশীল চিরন্তন প্রথা, সমাজের সহস্র মিথ্যাপাশ সকল ছিন্ন করিয়া বাহির হইয়া আসেন, তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে শত শত কারাবাসী মুক্তিলাভ করে। কেবল প্রথার প্রিয় সন্তান-সকল বহুকাল শৃঙ্খলের আলিঙ্গনে পড়িয়া জড় শৃঙ্খলের উপরে যাহাদের প্রেম জন্মিয়াছে, বিমল অনন্ত মুক্ত আকাশকে যাহারা বিভীষিকার স্বরূপে দেখে, তাহারাই তাহাদের ভগ্ন কারাপ্রাচীরের পার্শ্বে বসিয়া ছিন্ন শৃঙ্খল বক্ষে লইয়া মুক্তিদাতাকে গালি দেয় ও ভগ্নাবশেষের ধূলিস্তূপের মধ্যে পুনরায় আপনার অন্ধকার বাসগহ্বর খনন করিতে থাকে।

এই সমাজ-ধাঁধার মধ্যে পড়িয়া আমি সত্যের দিকে দৃষ্টি স্থির রাখিতে চাই। যেমন নানারূপে বিচলিত হইলেও চুম্বকশলাকা সরলভাবে উত্তরে দিকে মুখ রাখে। সত্যের সহিত আত্মার যে একটি সরল চুম্বকার্ষণ যোগ আছে, সেইটি চিরদিন অক্ষুণ্ণভাবে যেন রক্ষা করিতে পারি। ভয় হয় পাছে সংসারের সহস্র মিথ্যার অবিশ্রাম সংস্পর্শে আত্মার সেই সহজ চুম্বকশক্তি নষ্ট হইয়া যায়। যেন এই দৃঢ় পণ থাকে যে, সত্যানুরাগের প্রচারের চারি দিকের জটিলতা-সকল ছিন্ন করিয়া সমাজকে সরল করিতে হইবে। মানুষের চলিবার পথ নিষ্কণ্টক করিতে হইবে। সংশয় ভয় ভাবনা অবিশ্বাস দূর করিয়া দিয়া দুর্বলকে বলিষ্ঠ করিতে হইবে।

আমাদের জাতি যেমন সত্যকে অবহেলা করে এমন আর কোনো জাতি করে কি না জানি

না। আমরা মিথ্যাকে মিথ্যা বলিয়া অনুভব করি না। মিথ্যা আমাদের পক্ষে অতিশয় সহজ স্বাভাবিক হইয়া গিয়াছে। আমরা অতি গুরুতর এবং অতি সামান্য বিষয়েও অকাতরে মিথ্যা বলি। অনেক কাগজ বঙ্গদেশে অত্যন্ত প্রচলিত হইয়াছে তাহারা মিথ্যাকথা বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে, পাঠকদের ঘৃণা বোধ হয় না। আমরা ছেলেদের সযত্নে ক খ শেখাই, কিন্তু সত্যপ্রিয়তা শেখাই না— তাহাদের একটি ইংরাজি শব্দের নানান ভুল দেখিলে আমাদের মাথায় বজ্রাঘাত হয়, কিন্তু আমাদের প্রতিদিবসের সহস্র ক্ষুদ্র মিথ্যাচরণ দেখিয়া বিশেষ আশ্চর্য বোধ করি না। এমন-কি, আমরা নিজে তাহাদিগকে ও তাহাদের সাক্ষাতে মিথ্যাকথা বলি ও স্পষ্টত তাহাদিগকে মিথ্যাকথা বলিতে শিক্ষা দিই। আমরা মিথ্যাবাদী বলিয়াই তো এত ভীরু! এবং ভীরু বলিয়াই এমন মিথ্যাবাদী। আমরা ঘুষি মারিতে লড়াই করিতে পারি না বলিয়া যে আমরা হীন তাহা নহে— স্পষ্ট করিয়া সত্য বলিতে পারি না বলিয়া আমরা এত হীন। আবশ্যক বা অনাবশ্যক মতো মিথ্যা আমাদের গলায় বাধে না বলিয়াই আমরা এত হীন। সত্য জানিয়া আমরা সত্যানুষ্ঠান করিতে পারি না বলিয়াই আমরা এত হীন। পাছে সত্যের দ্বারা আমাদের তিলার্ধমাত্র অনিষ্ট হয় এই ভয়েই আমরা মরিয়া আছি।

কবি গেটে বলিয়াছেন, মিথ্যাকথা বলিবার একটা সুবিধা এই যে তাহা চিরদিন ধরিয়া বলা যায়, অথচ তাহার সহিত কোনো দায়িত্ব লগ্ন থাকে না, কিন্তু সত্যকথা বলিলেই তৎক্ষণাৎ কাজ করিতে হইবে, অতএব বেশিক্ষণ বলিবার অবসর থাকে না। মিথ্যার কোনো হিসাব নাই ঝঞ্ঝাট নাই; কিন্তু সত্যের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার একটা হিসাব লাগিয়া আছে তোমাকে মিলাইয়া দিতে হইবে। লোকে বলিবে, তুমি যাহা বলিতেছ তাহা সত্য কি না দেখিতে চাই। আমরা বাঙালিরা মিথ্যা বলিতেছি বলিয়াই এতদিন ধরিয়া কাজ না করিয়াও অনর্গল বলিবার সুবিধা হইয়াছে; কাহাকেও হিসাব দিতে, প্রমাণ দেখাইতে হইতেছে না— আমরা যদি সত্যবাদী হইতাম তবে আমাদের কাজও কথার মতো সহজ হইত। আমরা সত্য বলিতে শিখিলেই আমরা একটা জাতি হইয়া উঠিব— আমাদের বক্ষ প্রশস্ত হইবে, আমাদের ললাট উচ্চ হইবে, আমাদের শির উন্নত হইবে, আমাদের মেরুদণ্ড দৃঢ় সবল ও সরল হইয়া উঠিবে। লাট ডাফ্‌রিনের প্রসাদে ভলান্টিয়ার হইতে পারিলেও আমাদের এত উন্নতি হইবে না। সত্যকথা বলিতে শিখিলে আমরা মাথা তুলিয়া মরিতে পারিব, গুটিসুটি মারিয়া বাঁচিয়া থাকা অপেক্ষা দাঁড়াইয়া মরিতে সুখ বোধ হইবে। নিতান্ত ম্যালেরিয়া বা ওলাউঠায় না ধরিলে যে জাতি মরিতে জানে না, যে জাতি যেমন-তেমন করিয়াই হৌক বাঁচিয়া থাকিতে চায়, সে জাতির মূলে অনুসন্ধান করিয়া দেখো তাহারা প্রকৃত সত্যপ্রিয় নহে। মিথ্যায় যাহাকে মারিয়া রাখিয়াছে সে আর মরিবে কী, সত্যের বলে যে জীবন পাইয়াছে সে অকাতরে জীবন দিতে পারে। আমরা বাঙালিরা আমাদের জীবনের যতটা সত্য করিয়া অনুভব করি আর-কোনো সত্যকে ততটা সত্য বলিয়া বোধ করি না— এইজন্য আমরা এই প্রাণটুকুর জন্য সমস্ত সত্য বিসর্জন দিতে পারি, কিন্তু কোনো সত্যের জন্য এই প্রাণ বিসর্জন দিতে পারি না। তাহার কারণ, যাহা আমাদের কাছে মিথ্যা বলিয়া প্রতিভাত, তাহার জন্য আমরা এক কানাকড়িও দিতে পারি না, কেবলমাত্র যাহাকে সত্য বলিয়া অনুভব করি তাহার জন্যই ত্যাগ স্বীকার করিতে পারি। মমতার প্রভাবে মা সন্তানকে এতখানি জীবন্ত সত্য বলিয়া অনুভব করিতে থাকে যে, সন্তানের জন্য মা আপনার প্রাণ বিসর্জন দিতে পারে। আর মিথ্যাচারীরা বলিয়া থাকে, 'আত্মানাং সততং রক্ষেৎ দারৈরপি ধনৈরপি।' অর্থাৎ আপনার কাছে আর কিছুই সত্য নহে, দারা সত্য নহে, দারার প্রতি কর্তব্য সত্য নহে।

অতএব, প্রাণবিসর্জন শিক্ষা করিতে চাও তো সত্যাচরণ অভ্যাস করো। সত্যের অনুরোধে সমাজের মধ্যে পরিবারের মধ্যে প্রতিদিন সহস্র ত্যাগ স্বীকার করিতে হইবে। উদ্দাম মনকে মাঝে মাঝে কঠোর রশ্মি দ্বারা সংযত করিয়া বলিতে হইবে, আমার ভালো লাগিতেছে না বলিয়াই যে অমুক কাজ বাস্তবিক ভালো নয় তাহা না হইতেও পারে, আমার ভালো লাগিতেছে বলিয়াই যে

অমুক জিনিস বাস্তবিক ভালো তাহা কে বলিল? পাঁচজনে বলিতেছে বলিয়াই যে এইটে ভালো, এতকাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে বলিয়াই যে ওইটে ভালো তাহাও নয়। এইরূপ প্রতিদিন প্রত্যেক পারিবারিক ও সামাজিক কাজে কর্তব্যানুরোধে আপনাকে দমন করিয়া ও লোকভয় বিসর্জন দিয়া চলিলে প্রতিদিন সত্যকে সত্য বলিয়া হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করিতে শিখিব, জীবনের প্রত্যেক মুহূর্ত সত্যের সহবাসে যাপন করিয়া সত্যের প্রতি আমাদের প্রেম বদ্ধমূল হইয়া যাইবে, তখন সেই প্রেমে আত্মবিসর্জন করা সহজ ও সুখকর হইয়া উঠিবে। আর, যাহারা শিশুকাল হইতে সংসারে প্রতিদিন কেবল আপনার সুখ ও পরের সুখ চাহিয়া কাজ করিয়া আসিতেছে, সুবিজ্ঞ পিতামাতা আত্মীয়স্বজনদের নিকট হইতে উপদেশ পাইয়া প্রতি নিয়মের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছলনা ও ভীরু আত্মগোপন অভ্যাস করিয়া আসিতেছে, তাহারা কি সহসা একদিন সেই বিপুল মিথ্যাপঙ্ক হইতে গাত্রোত্থান করিয়া নির্মল সত্যের জন্য সমাজের রণক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া প্রাণপণ সংগ্রাম করিতে পারিবে! তাহাদের সত্যনিষ্ঠা কি কখনো এতদূর বলিষ্ঠ থাকিতে পারে!

মিথ্যাপরায়ণ বাঙালি তবে কি বাস্তবিক সত্যের জন্য সংগ্রাম করিবে! চতুর্দিকে এই যে কলরব শুনা যাইতেছে, এ কি বাস্তবিক রণসংগীত! নিদ্রিত বাঙালি তবে কি সত্যসত্যই সত্যের মর্মভেদী আহ্বান শুনিয়াছে! এ কথা বিশ্বাস হয় না। যদি বা আমরা সংশয়গ্রস্ত ভীত দুর্বলচিত্তে রণক্ষেত্রে গিয়া দাঁড়াই যুদ্ধ করতে পারিব না, বিঘ্নবিপদ দেখিলে মূর্ছিত হইয়া পড়িব, ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করিব। যে বাঙালি স্বজাতিকে স্পষ্ট উপদেশ দেয় যে, ছলনা আশ্রয় করিয়া গোপনে অখাদ্যখাদন প্রভৃতি সমাজবিরুদ্ধ কাজ করিলে কোনো দোষ নাই, প্রকাশ্যে করিলেই তাহা দূষণীয়, যে বাঙালি এই উপদেশ অসংকোচে শুনিতে পারে, এবং যে বাঙালি কাজেও এইরূপ অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, সে বাঙালি কখনো ধর্মযুদ্ধের আহ্বানে উত্থান করিবে না। তাহারা দলাদলি গালাগালি ঝগড়াঝাঁটি তর্কবিতর্ক এ-সকল কার্য পরম উৎসাহের সহিত সম্পন্ন করিবে, কপট কৃত্রিম মিথ্যাকথা সকল অত্যন্ত সহজে উচ্চারণ করিবে— তদূর্ধ্বে আর কিছুই নয়। এ কথা কি কাহাকেও বলিতে হইবে যে, বাঙালিদের একমাত্র বিশ্বাস সেয়ানামির উপরে! প্রবাদ আছে, 'হুজুগে বাঙালি'। বাঙালি মনে করে যথেষ্ট পরিমাণে পরিশ্রম না করিয়াও গোলেমালে কাজ সারিয়া লওয়া যায়, বীজ রোপণ না করিয়াও কৌশলে ফললাভ করা যায়, তেমন ফন্দি করিতে পারিলে মিথ্যার দ্বারাও সত্যের কাজ আদায় করা যাইতে পারে। এইজন্য বাঙালি কাগজ লইয়া দাম দেয় না, দাম লইয়া কাগজ দেয় না, কাজ না করিয়াও দেশহিতৈষী হইয়া উঠে, বিশ্বাস করে না তবু লেখে ও এই উপায়ে মিথ্যাকথা বলিয়া অর্থ সঞ্চয় করে। বাঙালির জীবনটা কেবল গোঁজামিলন। যেখানে সহজে ফাঁকি চলে সেখানে বাঙালি ফাঁকি দিবেই। এইরূপে পৃথিবীকে বঞ্চনা করিতে চেষ্টা করিয়া বাঙালি প্রতিদিন বঞ্চিত হইতেছে।

কেবলই কি বাঙালিকে মিষ্ট মিথ্যাকথা-সকল বলিতে হইবে? কেবলই বলতে হইবে, আমরা অতি মহৎ জাতি, আমরা আর্যশ্রেষ্ঠ, ইংরাজেরা অতি হীন, উহারা ম্লেচ্ছ যবন। আমরা সকল বিষয়েই উপযুক্ত, কেবল ইংরেজেরাই আমাদিগকে ফাঁকি দিতেছে। বলিতে হইবে ইংরেজসমাজ স্বেচ্ছাচারিতার রসাতলে গমন করিয়াছে, আর আমাদের আর্যসমাজ উন্নতির এমনি চূড়ান্ত সীমায় উঠিয়াছিল যে তদূর্ধ্বে আর এক ইঞ্চি উঠিবার স্থান ছিল না, তাহাতে আর এক-তিল পরিবর্তন চলিতে পারে না। এই উপায়ে ক্ষুদ্রের অহংকার ক্রমিক পরিতৃপ্ত করিয়া কি 'পপুলার' হইতেই হইবে? আমরা যে কত ক্ষুদ্র তাহা আমরা জানি না, সেইটাই আমাদের জানা আবশ্যক। আমরা যে কত মস্ত লোক, তাহা ক্রমাগতই চতুর্দিক হইতে শুনা যাইতেছে। কর্ণ জুড়াইয়া নিদ্রাকর্ষণ হইতেছে, সুখস্বপ্নে আপন ক্ষুদ্রত্বকে অত্যন্ত বৃহৎ দেখাইতেছে। এখন মিথ্যাকথা সব দূর করো, একবার সত্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করো। অন্য জাতির কেন উন্নতি হইতেছে এবং আর্যশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতিরই বা কেন অবনতি হইতেছে, তাহা ভালো করিয়া দেখো। আমাদের মজ্জার মধ্যে কী হীনত্ব আছে, আমাদের শাস্ত্রের কোন্ মর্মস্থলে ঘুণ ধরিয়াছে যাহাতে আমাদের

এমন দুর্দশা হইল, তাহা ভালো করিয়া দেখো। ইংরেজসমাজের মধ্যে এমন কী গুণ আছে, যাহার ফলে এমন উন্নত সাহিত্য, এমন-সকল বীরপুরুষ, স্বদেশপ্রেমী মানবহিতৈষী, জ্ঞান ও প্রেমের জন্য আত্মবিসর্জন-তৎপর নরনারী ইংরেজসমাজে জন্মলাভ করিতেছে, আর আমাদের সমাজের মধ্যেই বা এমন কী গুরুতর দোষ আছে যাহার ফলে এমন-সকল অলস, ক্ষুদ্র, স্বার্থপর, পল্লবগ্রাহী, মিথ্যাঅহংকার-পরায়ণ সন্তান-সকল জন্মগ্রহণ করিতেছে, সত্যজিজ্ঞাসু হইয়া অপক্ষপাতিতার সহিত তাহা পর্যালোচনা করিয়া দেখো। ইহাতে উপকার হইতে পারে। আর, আমরাই ভালো এবং ইংরেজেরাই মন্দ ইহা ক্রমাগত বলিলে ও ক্রমাগত শুনিলে ক্রমাগতই মিথ্যাপ্রচার ছাড়া আর কোনো ফললাভ হইবে না।

. সত্যকথা বলা ভালো আজ আমার এই কথা সকলের পুরাতন ঠেকিতেছে। সত্য চিরদিনই নূতন, কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে, দুর্বলতাবশত পুরাতন হইয়া যায়। সত্যকে যতক্ষণ সত্য বলিয়া অনুভব করিতে থাকি, ততক্ষণ তাহা নূতন থাকে, কিন্তু যখন মনের অসাড়তাবশত আমরা সত্যকে কেবলমাত্র মানিয়া লই অথচ মনের মধ্যে অনুভব করিতে পারি না, তখন তাহার অর্ধেক সত্য চলিয়া যায়, সে প্রায় মিথ্যা হইয়া উঠে। যে শব্দ আমরা ক্রমাগত শুনি, অভ্যাসবশত তাহা আর শুনিতে পাই না, এই কারণে পুরাতন সত্য সকলে বলিতে পারে না। মহাপুরুষেরাই পুরাতন সত্য বলিতে পারেন— বুদ্ধ, খৃস্ট, চৈতন্যেরাই পুরাতন সত্য বলিতে পারেন। সত্য তাঁহাদের কাছে চিরদিন নূতন থাকে, কারণ সত্য তাঁহাদের যথার্থ প্রিয়ধন। আমরা যাহাকে ভালোবাসি সে কি আমাদের কাছে কখনো পুরাতন হয়! তাহাকে কি প্রতি নিমেষেই নূতন করিয়া অনুভব করি না? প্রথম সাক্ষাতেও নেত্র যেমন অসীম তৃপ্তি অথবা অপরিতৃপ্তির সহিত তাহার মুখের প্রতি আবদ্ধ থাকিতে চায়, দশ বৎসর সহবাসের পরেও কি নেত্র সেই প্রথম আগ্রহের সহিত তাহাকেই চারি দিকে অনুসন্ধান করিতে থাকে না? সত্য মহাপুরুষদের পক্ষে সেইরূপ চিরনূতন প্রিয়বস্তু। আমার কি তেমন সত্যপ্রেম আছে যে, আজ এই পুরাতন যুগে মানবসভ্যতা প্রাদুর্ভাবের কত সহস্র বৎসর পরে পুরাতন সত্যকে নূতন করিয়া মানবহৃদয়ে জাগ্রত করিতে পারিব!

যাহারা সহজেই সত্য বলিতে পারে তাহাদের সে কী অসাধারণ ক্ষমতা! যাহারা হিসাব করিয়া পরম পারিপাট্যের সহিত সত্য রচনা করিতে থাকে, সত্য তাহাদের মুখে বাধিয়া যায়, তাহারা ভরসা করিয়া পরিপূর্ণ সত্য বলিতে পারে না। রামপ্রসাদ ঈশ্বরের পরিবারভুক্ত হইয়া যেরূপ আত্মীয় অন্তরঙ্গের ন্যায় ঈশ্বরের সহিত মান অভিমান করিয়াছেন, আর কেহ কি দুঃসাহসিকতায় ভর করিয়া সেরূপ পারে! অন্য কেহ হইলে এমন এক জায়গায় এমন একটা শব্দ প্রয়োগ, এমন একটা ভাবের গলদ করিত যে, তৎক্ষণাৎ সে ধরা পড়িত। অনুভব করিয়া বলিলে সত্য কেমন সহজে সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ হইয়া ধরা দেয় তাহার একটা দৃষ্টান্ত আমার মনে পড়িতেছে।

প্রাচীন ঋষি সরল হৃদয়ে যে প্রার্থনা উচ্চারণ করিয়াছিলেন, 'অসত্যো মা সদ্‌গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মামৃতং গময়, আবিরাবীর্ম এধি, রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যং।' অপরূপ নিয়মে হীরক যেমন সহজেই হীরক হইয়া উঠে, এই প্রার্থনা তেমনি সহজে ঋষিহৃদয়ে উজ্জ্বল আকার ধারণ করিয়া উদিত হইয়াছিল, আজ যদি কেহ হিসাব করিয়া এই প্রার্থনার ভাব সংশোধন করিতে বসেন, তাহা হইলে আমাদের হৃদয়ে আঘাত লাগে, হয়তো তাহাতে এই প্রার্থনাস্থিত সত্যের সহজ উজ্জ্বলতা ম্লান হইয়া যায়। 'রুদ্র তোমার যে প্রসন্ন মুখ তাহার দ্বারা আমাকে সর্বদা রক্ষা করো' প্রার্থনার এই অংশটুকু পরিবর্তন করিয়া কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, 'দয়াময় তোমার যে অপার করুণা, তাহার দ্বারা আমাকে সর্বদা রক্ষা করো,' এইরূপে ঋষিদিগের এই প্রাচীন প্রার্থনার কিয়দংশ ছিন্ন করিয়া তাহাতে একটি নূতন ভাব তালি দিয়া লাগানো হইয়াছে— কিন্তু এ কি বাস্তবিক সংশোধন হইল? সরলহৃদয় ঋষি কি মিথ্যা

বলিয়াছেন? এই প্রার্থনায় ঈশ্বরকে যে রুদ্র বলা হইয়াছে সত্যপরায়ণ ঋষির মুখ দিয়া অতি সহজে এই সম্বোধন বাহির হইয়াছে। অসত্য, অন্ধকার মৃত্যুর ভয়ে ভীত হইয়াই ঋষি ঈশ্বরকে ডাকিতেছেন, কিন্তু সেইসঙ্গে তাঁহার মনের এই বিশ্বাস ব্যক্ত হইতেছে, যে, সত্য আছে, জ্যোতি আছে, অমৃত আছে। এই বিশ্বাসে ভর করিয়াই তিনি বলিয়াছেন, 'রুদ্র তোমার যে প্রসন্ন মুখ'— এমন আশ্বাসবাণী আর কী হতে পারে, এমন মাভৈঃ ধ্বনি শুনিতেছি আমাদের আর ভয় কী! যে 'প্রসন্ন মুখ'— এমন আশ্বাসবাণী আর কী হইতে পারে, এমন মাভৈঃ ধ্বনি শুনিতেছি আমাদের ভয় কী! যে ঋষি অসত্যের মধ্যে সত্য, অন্ধকারের মধ্যে জ্যোতি, মৃত্যুর মধ্যে অমৃত দেখিয়াছেন, তিনিই রুদ্রের দক্ষিণমুখ দেখিয়াছেন, এবং সেই আনন্দবারতা প্রচার করিতেছেন, তিনি বলিতেছেন ভয়ের মধ্যে অভয়, শাসনের মধ্যে প্রেম বিরাজ করিতেছে। এখানে 'দয়াময়' বলিলে এত কথা ব্যক্ত হয় না, সে কেবল একটা কথার কথা হয় মাত্র। তাহাতে রুদ্রভাবের মধ্যেও প্রসন্নতা, আপাতপ্রতীয়মান অমঙ্গলরাশির মধ্যেও সরল হৃদয়ে মঙ্গলস্বরূপের প্রতি দৃঢ় নির্ভর এমন সুন্দররূপে ব্যক্ত হয় না। মহর্ষি এতশত ভাবিয়া বলেন নাই, ঈশ্বরের প্রসন্ন দক্ষিণমুখ দেখিতে পাইয়াছেন বলিয়াই তিনি নির্ভয়ে ঈশ্বরকে রুদ্র বলিতে পারিয়াছেন, তাঁহার মুখ দিয়া সত্য অবাধে বাহির হইয়াছে, আর আমরা বিস্তর তর্ক করিয়া যুক্তি করিয়া তাহার একটি কথা পরিবর্তন করিলাম, তাহার সর্বাঙ্গ সম্পূর্ণতা নষ্ট হইয়া গেল।

ইহা হইতেই প্রমাণ হইতেছে, সত্য বলা সহজ নয়। ইস্কুলের পড়ার মতো সত্য মুখস্থ করিয়া সত্য বলা যায় না। সত্যের প্রতি ভালোবাসা আগে সাধনা করিতে হইবে, ভালোবাসার দ্বারা সত্যকে বশ করিতে হইবে, সংসারের সহস্র কুটিলতার মধ্যে হৃদয়কে সরল রাখিতে হইবে তার পরে সত্য বলা সহজ হইবে। কেবল যদি লোভ ক্রোধ প্রভৃতি কুপ্রবৃত্তি-সকল আমাদের সত্যপথের বাধা হইত, তাহা হইলেও আমাদের তত ভাবনার কারণ ছিল না। কিন্তু আমাদের অনেক সুপ্রবৃত্তিও আমাদিগকে সত্যপথ হইতে বিচলিত করিবার জন্য আমাদিগকে আকর্ষণ করিতে থাকে। আমাদের আত্মানুরাগ, দেশানুরাগ, লোকানুরাগ অনেক সময়ে আমাদিগকে সত্যভ্রষ্ট করিতে চেষ্টা করিতে থাকে; এইজন্যই সত্যানুরাগকে এই-সকল অনুরাগের উপরে শিরোধার্য করা আবশ্যক।

আমার আর সকল কথা লোকের বিরক্তিজনক পুরাতন ঠেকিতে পারে কিন্তু আমার একটি কথা পুরাতন হইলেও বোধ করি অনেকের কর্ণে অত্যন্ত নূতন ঠেকিতেছে। আমি বলিতেছি, সত্যকথা বলো, সত্যাচরণ করো, কারণ দেশের উন্নতি তাহাতেই হইবে। এ কথা সচরাচর শুনা যায় না। কথাটা এত অল্প, এত শীঘ্র ফুরাইয়া যায়, এবং এমন প্রাচীন ফ্যাশনের যে, কাহারো বলিয়া সুখ হয় না, শুনিতে প্রবৃত্তি হয় না, ইহাতে সুগভীর চিন্তাশীলতা বা গবেষণার পরিচয় পাওয়া যায় না, ইহাতে এমন উদ্দীপনা উত্তেজনা নাই যাহাতে করতালি আকর্ষণ করিতে পারে। দেশহিতৈষীরা কেহ বলেন দেশের উন্নতির জন্য জিম্‌ন্যাস্টিক করো, কেহ বলেন সভা করো, আন্দোলন করো, ভারতসংগীত গান করো, কেহ বলেন মিথ্যা বলো, মিথ্যা প্রচার করো, কিন্তু কেহ বলিতেছেন না সত্যকথা বলো, ও সত্যানুষ্ঠান করো। উপরি-উক্ত সকল ক'টার মধ্যে এইটেই সকলের চেয়ে বলা সহজ এবং সকলের চেয়ে করা শক্ত, এইটেই সকলের চেয়ে আবশ্যক বেশি, এবং সকলের চেয়ে অধিক উপেক্ষিত। সত্য সকলের গোড়ায় এবং সকলের শেষে, আরম্ভে সত্যবীজ রোপন করিলে শেষে সত্যফল পাওয়া যায়; মিথ্যায় যাহার আরম্ভ মিথ্যায় তাহার শেষ। আমরা যে ভীত সংকুচিত সংশয়গ্রস্ত ক্ষুদ্র ধূলিবিহারী কীটাণু হইয়াছি ইংরেজের মিথ্যা নিন্দা করিলে আমরা বড়ো হইব না, আপনাদের মিথ্যা প্রশংসা করিলেও আমরা মস্ত হইব না। আমরা যে পরস্পরকে ক্রমাগত সন্দেহ করি, অবিশ্বাস করি, দ্বেষ করি, মিলিয়া কাজ করিতে পারি না, পরের স্তুতি পাইবার জন্য হাঁ করিয়া থাকি, কথায় কথায় আমাদের দল ভাঙিয়া যায়, কাজ আরম্ভ করিতে সংশয় হয়, কাজ চালাইতে উৎসাহ থাকে না,

আমরা যে ক্ষুদ্রতা লইয়া থাকি, খুঁটিনাটি লইয়া মান অভিমান করি, মুখ্য ভুলিয়া গিয়া গৌণ লইয়া অশিক্ষিতা মুখরার ন্যায় বিবাদ করিতে থাকি, আড়ালে পরস্পরের নিন্দা করি, সম্মুখে দোষারোপ করিতে অত্যন্ত চক্ষুলজ্জা হয়, তাহার কারণ আমরা মিথ্যাচারী, সত্যের প্রভাবে সরল নহি, উদার উৎসাহী ও বিশ্বাসপরায়ণ নহি। আমরা যে আগাটায় জল ঢালিতেছি, তাহার গোড়া নাই, নানাবিধ অনুষ্ঠান করিতেছি কিন্তু তাহার মূলে সত্য নাই, এইজন্য ফললাভ হইতেছে না। যেমন, যে রাগিণীতে যে গান গাও-না-কেন, একটা বাঁধা সুর অবলম্বন করিতে হইবে, সেই এক সুরের প্রভাবে গানের সকল সুরের মধ্যে ঐক্য হয়, নানা বিভিন্ন সুর এক উদ্দেশ্য সাধন করিতে থাকে, কেহ কাহাকেও অতিক্রম করে না, তেমনি আমরা যে কাজ করি-না-কেন সত্যকে তাহার মূল সুর ধরিতে হইবে। আমরা সেই মূল সুর ভুলিয়াছি বলিয়াই এ কলরব হইতেছে, ঐক্য ও শৃঙ্খলার এত অভাব দেখা যাইতেছে। এত বিশৃঙ্খলা সত্ত্বেও সকলে কোলাহলই উত্তেজিত করিতেছেন, কেহ মূল সুরের প্রতি লক্ষ করিতে বলিতেছেন না, তাহার কারণ ইহার প্রতি সকলের তেমন দৃঢ় আস্থা নাই, ইহাকে তাঁহারা অলংকারের হিসাবে দেখেন, নিতান্ত আবশ্যকের হিসাবে দেখেন না। পেট্রিয়টেরা দেশের উন্নতির জন্য নানা উপায় দেখিতেছেন, নানা কৌশল খেলিতেছেন। এদিকে মিথ্যা নীরবে আপনার কার্য করিতেছে, সে ধীরে ধীরে আমাদের চরিত্রের মূল শিথিল করিয়া দিতেছে, সে আমাদের পেট্রিয়টদিগের কোলাহলময় ব্যস্ততাকে কিছুমাত্র খাতির করিতেছে না। পেট্রিয়টেরা পদ্মার তীরে দুর্গ নির্মাণে মত্ত হইয়াছেন, কিন্তু মায়াবিনী পদ্মা তাহার অবিশ্রাম খরস্রোতে তলে তলে তটভূমি জীর্ণ করিতেছে। তাই মাঝে মাঝে দেখিতে পাই আমাদের পেট্রিয়টদিগের বিস্তৃত আয়োজন-সকল সহসা একরাত্রের মধ্যে স্বপ্নের মতো অন্তর্ধান করে। যেখানে জাতীয় চরিত্রের মূল শিথিল হইয়া গিয়াছে, সেখানে যে পাঁচজন পেট্রিয়টে মিলিয়া জোড়াতাড়া, তালি ঠেকো প্রভৃতি অবলম্বন করিয়া কৌশল খেলাইয়া স্থায়ী কিছু করিয়া উঠিতে পারিবেন এমন আমার বিশ্বাস হয় না। অনন্তের অমোঘ নিয়মকে কৌশলের দ্বারা ঠেলিবে কে? যেখানে সত্য সিংহাসনচ্যুত হওয়াতে অরাজকতা ঘটিয়াছে, সেখানে চাতুরী আসিয়া কী করিবে! হায়, দেশ উদ্ধারের জন্য সত্যকে কেহই আবশ্যক বিবেচনা করিতেছেন না। চিরনবীন চিরবলিষ্ঠ সত্যকে বুদ্ধিমানেরা অতি প্রাচীন বলিয়া অবহেলা করিতেছেন। কিন্তু যাঁহারা জীবন নূতন আরম্ভ করিয়াছেন, যৌবনের পূত হুতাশন যাঁহাদের হৃদয়কে উদ্দীপ্ত ও উজ্জ্বল করিয়া বিরাজ করিতেছে যাহার সহস্র শিখা দীপ্ত তেজে মহত্ত্বের দিকেই অবিশ্রাম অঙ্গুলি নির্দেশ করিতেছে, যাঁহারা বিষয়ের মিথ্যাজালে জড়িত হন নাই, মিথ্যা যাঁহাদের নিশ্বাস প্রশ্বাসের ন্যায় অভ্যস্ত হইয়া যাই নাই, তাঁহারা প্রতিজ্ঞা করুন প্রার্থনা করুন যেন সত্যপথে চিরদিন অটল থাকিতে পারেন, তাহা হইলে অমর যৌবন লাভ করিয়া তাঁহারা পৃথিবীর কাজ করিতে পারিবেন। মিথ্যাপরায়ণ বিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গেই জরাগ্রস্ত বার্ধক্য আমাদের প্রাণের মধ্যে প্রবেশ করে, আমাদের মেরুদণ্ড বাঁকিয়া যায়, আমাদের প্রাণের দৃঢ় সূত্র-সকল শিথিল হইয়া পড়ে, সংশয় ও অবিশ্বাসের প্রভাবে মাংস কুঞ্চিত হইয়া যায়। আমরা এই প্রতিজ্ঞা করিয়া সংসারের কার্যক্ষেত্রে বাহির হইব যে মিথ্যার জয় দেখিলেও আমরা সত্যকে বিশ্বাস করিব, মিথ্যার বল দেখিলেও আমরা সত্যকে আশ্রয় করিব, মিথ্যার চক্রান্ত ভেদ করিবার উদ্দেশ্যে মিথ্যা অস্ত্র ব্যবহার করিব না। আমরা জানি শাস্ত্রেও মিথ্যা আছে, চিরন্তন প্রথার মধ্যেও মিথ্যা আছে, আমরা জানি, অনেক সময়ে আমাদের হিতৈষী আত্মীয়েরা মিথ্যাকেই আমাদের যথার্থ হিতজ্ঞান করিয়া জ্ঞানত বা অজ্ঞানত আমাদিগকে মিথ্যা উপদেশ দিয়া থাকেন। সত্যানুরাগ হৃদয়ের মধ্যে অটল রাখিয়া এইসকল মিথ্যার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে হইবে। সত্যানুরাগ সত্ত্বেও আমরা ভ্রমে পড়িব, কিন্তু সেই ভ্রম সংশোধন হইবে, সেই ভ্রমই আমাদিগকে পুনরায় সত্যপথ নির্দেশ করিয়া দিবে। কিন্তু শুদ্ধমাত্র প্রথানুরাগ বা শাস্ত্রানুরাগ -বশত যখন ভ্রমে পড়ি তখন সে ভ্রম হইতে আর আমাদের উদ্ধার নাই, তখন ভ্রমকে আমরা আলিঙ্গন করি, মিথ্যাকে প্রিয় বলিয়া বরণ করি, মিথ্যা প্রাচীন ও পূজনীয়

হইয়া উঠে, পূর্বপুরুষ হইতে উত্তরপুরুষে সযত্নে সংক্রামিত হইতে থাকে এইরূপ সমাদর পাইয়া বিনাসের বীজ মিথ্যা আপন আশ্রয়ের স্তরে স্তরে শিকড় বিস্তার করিতে থাকে, অবশেষে সেই জীর্ণ জর্জর মন্দিরকে সঙ্গে করিয়া ভূমিসাৎ হয়। আমাদের এই দুর্দশাপন্ন ভারতবর্ষ সেই ভূমিসাৎ জীর্ণ মন্দিরের ভগ্নস্তূপ। কালক্রমে বন্ধনজর্জর সত্য এই ভারতবর্ষে এমনি হীনাসনপ্রাপ্ত হইয়াছিল যে, গুরু, শাস্ত্র এবং প্রথাই এখানে সর্বেসর্বা হইয়া উঠিয়াছিল; স্বর্গীয় স্বাধীন সত্যকে গুরু শাস্ত্র এবং প্রথার দাসত্বে নিযুক্ত হইতে হইয়াছিল। মিথ্যা উপায়ের দ্বারা সত্য প্রচার করিবার ও সহস্র মিথ্যা অনুশাসন দ্বারা সত্যকে বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল। বুদ্ধিমানেরা বলিয়া থাকেন মিথ্যার সাহায্য না হইলে সাধারণের নিকটে সত্য গ্রাহ্য হয় না, এবং মিথ্যা বিভীষিকা না দেখাইলে দুর্বলেরা সত্যপালন করিতে পারে না। মিথ্যার প্রতি এমনি দৃঢ় বিশ্বাস। ইতিহাসে পড়া যায় বিলাসী সভ্যজাতি বলিষ্ঠ অসভ্যজাতিকে আত্মরক্ষার্থ আপন ভৃত্যশ্রেণীতে নিযুক্ত করিত, ক্রমে অসভ্যেরা নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া মনিব হইয়া দাঁড়াইল— সত্যকে মিথ্যার দ্বারস্থ হইতে হইল। সত্যের এইরূপ অবমান দশায় শতসহস্র মিথ্যা আসিয়া আমাদের হিন্দুসমাজে, হিন্দুপরিবারে নির্ভয়ে আশ্রয় লইল কেহ তাহাদিগকে রোধ করিবার রহিল না; তাহার ফল এই হইল সত্যকে দাস করিয়া আমরা মিথ্যার দাসত্বে রত হইলাম, দাসত্ব হইতে গুরুতর দাসত্বে উত্তরোত্তর নামিতে লাগিলাম। আজ আর উত্থানশক্তি নাই— আজ পঙ্গুদেহে পথপার্শ্বে বসিয়া ভিক্ষাপাত্র হাতে লইয়া কাতরস্বরে বলিতেছি, 'দেও বাবা ভিখ্ দেও!'

বালক

চৈত্র ১২৯২

আপনি বড়ো

মুখে যাহারা বড়াই করে তাহারা সুখে থাকে, তাহাদের অল্প অহংকার অল্পেই উদ্‌বেলিত হইয়া প্রশমিত হইয়া যায়। কিন্তু মনে মনে যাহারা বড়ো হইয়া বসিয়া আছে, অথচ বুদ্ধির আতিশয্যবশত মুখ ফুটিয়া বলিতে পারে না, তাহাদের অবস্থা সুখের নহে। যেমন বাষ্পের ধর্ম ব্যাপ্ত হওয়া, তেমনি অহংকারের ধর্মই প্রকাশ পাওয়া। যে তাহাকে অন্তরে আটকে রাখিতে চায় সে তাহার সেই রুদ্ধ অহংকারের অবিশ্রাম আঘাতে সর্বদাই পীড়িত হইতে থাকে। বরং নিজের দুঃখশোক নিজের মধ্যে রোধ করিয়া থাকিলে মহৎ ধৈর্যজনিত একপ্রকার গভীর সুখ লাভ করা যাইতে পারে, কিন্তু চপল অহংকারকে হৃদয়ের গোপন কক্ষের মধ্যে পোষণ করিয়া সেই মহত্ত্বের সুখটুকুও পাওয়া [যায়] না।

যাহারা দুঃখ শোক নীরবে বহন করিয়া সহিষ্ণুতা সঞ্চয় করিয়াছে, তাহাদের বিশীর্ণ পাণ্ডুমুখের উপরে একপ্রকার উত্তাপবিহীন জ্যোতির্ময় ছায়া পড়ে, কিন্তু অপরিতৃপ্ত অহংকার যাহাদের হৃদয়-বিবরে ক্ষণে ক্ষণে উষ্ণনিশ্বাস ত্যাগ করিতেছে, তাহাদের নেত্রের অধঃপল্লবে একপ্রকার জ্যোতিহীন জ্বালা, তাহাদের চিরশীর্ণ তীক্ষ্ণ মুখে, দৃঢ়বদ্ধ ওষ্ঠাধরপ্রান্তে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গভীর রহস্যরেখা সকল প্রকাশ পায়। বরঞ্চ যৌবনকালে এই উগ্র প্রাখর্য তাহাদের সৌন্দর্যের তেমন ক্ষতিকর না হইতেও পারে, কিন্তু প্রৌঢ় বয়সের যে বিমল শান্তিময় মমতাপূর্ণ অচঞ্চল শারদ শোভা তাহা তাহারা কিছুতেই রক্ষা করিতে পারে না। বয়সকালে তাহাদের চক্ষুপল্লবে সেই উজ্জ্বল কোমল অশ্রুরেখার ন্যায় ভারাক্রান্ত স্নিগ্ধদৃষ্টি, তাহাদের ওষ্ঠাধরে সেই স্নেহভাষায় জড়িত বাসনাহীন সান্ত্বনাপূর্ণ সুধাধৌত মৃদুহাস্য কিছুতেই প্রকাশ পায় না। তাহারা সৌন্দর্য প্রাণপণে রক্ষা করিতে চায়, কিন্তু তাহাদের হৃদয়ের অন্ধকূপ হইতে কুৎসিত বাষ্প অল্পে অল্পে উত্থিত হইয়া তাহাদের মুখের সহজ মানব-শোভা লোপ করিয়া দেয়। তাঁহারা বার্ধক্য গোপন করিতে চায়, অকালে বৃদ্ধ হইয়া পড়ে, অথচ কোনোকালে বার্ধ্যক্যের পরিণত গাম্ভীর্য লাভ করিতে পারে না।

যাহারা কিছু একটা কাজ করিয়া তুলিয়াছিল, কোনো একটা অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছে, এবং সাধ্যানুসারে ক্রমশ তাহা সম্পন্ন করিতেছে, তাহাদের হৃদয়ে অহংকার সঞ্চিত হইতে পারে না, কার্যস্রোতের সঙ্গে বাহির হইয়া ভাঙিয়া চলিয়া যায়। কিন্তু যাহারা কিছু করে না, করিতে পারে না, মনে করে করিতে পারি অথচ করিতে গিয়া নিষ্ফল হয়, তাহারা অহংকার বাহির করিয়া ফেলিবার পথ পায় না। তাহারা কিছুতেই আপনার কাছে এবং পরের কাছে প্রমাণ করিতে পারে না যে তাহারা বড়ো, এইজন্য মনের খেদে মনে মনে আপনার বড়োত্বের প্রতি ক্রমশ অধিকতর অন্ধ বিশ্বাস স্থাপন করিয়া আপনাকে প্রাণপণে সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করে। কিন্তু কণ্টকশয্যায় যেমন বিরাম নাই, তেমনি সে সান্ত্বনায় সান্ত্বনা নাই। তাহারা যত আপনাকে বড়ো মনে করে ততই আরও অধিকতর দগ্ধ হইতে থাকে।

আমি যাহাদের কথা বলিতেছি, তাহাদের বুদ্ধি আছে অথচ এমন ক্ষমতা নাই যে কোনো মহৎ কাজ সম্পন্ন করিয়া উঠিতে পারে। এই বুদ্ধির প্রভাবে তাহারা আপনাকে সম্পূর্ণ প্রতারণা করিতে পারে না। কেবল সচেতন বেদনা অনুভব করিতে থাকে। তাহারা দেখিতে পায় যে, আমরা আপনাকে এত বড়ো মনে করিতেছি তবুও কিছুতেই বড়ো হইয়া উঠিতেছি না। এই অলস অহংকার দান্তের নরকযন্ত্রণা বর্ণনায় স্থান পাইবার যোগ্য। বিপুল অভিমানে বিদীর্ণ হইবার উপক্রম করিতেছি অথচ এক-তিল প্রসর বাড়িতেছে না, সে কোন্ মহাপাতকের ভোগ!

এইরূপ বুদ্ধিমান গুপ্ত অহংকারী সর্বদাই বৃহৎ সংকল্প সৃষ্টি করিতে থাকে। সকল দিকেই হাত বাড়াইতে থাকে অথচ নাগাল পায় না। পাশের লোক তাহাকে যে, কোনো বিষয়ে অতিক্রম করিয়া যাইবে ইহা তাহার ইচ্ছা নহে। এইজন্য কাহাকে কোনো লক্ষ্যমুখে যাত্রা করিতে দেখিলে সেও এক-এক সময়ে তাড়াতাড়ি ছুটিতে আরম্ভ করে, পথের মধ্য হইতে ফিরিয়া আসে ও মনে মনে কহে যদি শেষ পর্যন্ত যাইতাম তো আমিই জিতিতাম। সে চুপি চুপি এইরূপ প্রচার করে আমি যে কোনো কিছুতেই বাস্তবিক কৃতকার্য হইতে পারি নাই, সে কেবল ঘটনাবশত। কারণ যাহারা নিজ নিজ সংকল্পে কৃতকার্য হইয়াছে, তাহাদের অপেক্ষা সে আপনাকে মনে মনে এত বড়ো বলিয়া ঠিক করিয়া রাখিয়াছে যে নিজের অক্ষমতা সে কল্পনা করিতে পারে না, ক্ষমতা আছে অথচ ক্রমিক প্রতিকূল ঘটনাবশত বড়ো হইতে পারিতেছি না, এই দুঃখে সে সর্বদাই এক প্রকার তীরস্বভাব অবলম্বন করিয়া থাকে। এমন-কি, তাহার ঈশ্বর ভক্তি চলিয়া যায়। তাহার সমস্ত ভক্তি সে নিজের পদতলে আনিয়া গোপনে আপনার পূজা করিতে থাকে— বলিতে থাকে ‘আমি মহৎ— সমস্ত জগৎ আমার প্রতিকূল, ঈশ্বর আমার প্রতিবাদী। কিন্তু যে যাহা বলে বলুক, আমি আমাকেই আমার শিরোধার্য করিয়া সংসারের পথে সবলে পদক্ষেপ করিব।’ এই বলিয়া সে কখনো কখনো সবলে বন্ধন ছিঁড়িয়া হঠাৎ এক রোখে ছুটিতে থাকে, সগর্বে চারি দিকে চাহিতে থাকে— বলে ‘কী আমার দৃঢ়চিত্ততা! স্বকপোলকল্পিত কর্তব্যের অনুরোধে সমস্ত জগৎসংসারের প্রতি কী প্রবল উপেক্ষা!’ বুঝিতে পারে না যে তাহা সহসা প্রতিহত সংকীর্ণ আত্মাভিমানের সফেন উচ্ছ্বাস মাত্র।

পূর্বেই বলিয়াছি ইহাদের বুদ্ধি যথেষ্ট আছে, এত আছে যে, বন্ধুবান্ধবেরা সকলেই প্রত্যাশা করিয়া আছেন কবে ইহারা আপন বুদ্ধিকে স্থায়ী কার্যে নিযুক্ত করিবে। বন্ধুদিগের উত্তেজনায় এবং আত্মাভিমানের তাড়নায় তাহাদের বুদ্ধি অবিশ্রাম চঞ্চল হইয়া বেড়াইতে থাকে, মনে করে হাতের কাছে আমার অনুরূপ কার্য কিছুই নাই। কোনো একটা অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতে ভয় হয় পাছে ক্ষমতায় কুলাইয়া না উঠে এবং আত্মীয়সাধারণের চিরবর্ধিত প্রত্যাশার মূলে কুঠারাঘাত পড়ে। ফলাফলের ভার বিধাতার হস্তে সমর্পণপূর্বক মহৎ কার্যের অমোঘ আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া আত্মসমর্পণ করা এরূপ লোকের দ্বারা সম্ভবপর নহে।

সুতরাং অবজ্ঞা, উপেক্ষা, প্রবল তর্ক এবং সমালোচনার আগ্নেয় বেগে ইহারা আপনাকে সকলের ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত করিতে চায়। অভিমান-শাণিত তীক্ষ্ণ বুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া ইহারা সমস্ত

সৃষ্টিকার্যকে ক্ষতবিক্ষত করিয়া তোলে। অন্য সকলকে অত্যন্ত সূক্ষ্ম বিচারে বিপর্যস্ত করিয়া মনে করে, 'গঠন কার্যে নিশ্চয়ই আমার অসাধারণ নৈপুণ্য আছে নহিলে এমন সূক্ষ্মাণুসূক্ষ্ম বুঝিতে পারি কী করিয়া!' কিন্তু এত ক্ষমতা সত্ত্বেও তাহারা কেন যে কোনো সৃজনকার্যে প্রবৃত্ত হইতে চাহে না ইহাই ভাবিয়া ভাবিয়া তাহারা এবং তাহাদের প্রতিবেশীবর্গ নিরতিশয় আশ্চর্য হইতে থাকে।

ইহারা নিতান্ত পার্শ্ববর্তী লোকের প্রশংসা সহ্য করিতে পারে না। কারণ পাশের লোক হইতে নিজের ব্যবধান অধিক নহে। পাশের লোক যদি বড়ো তবে আমিই বা বড়ো নহি কেন এই কথা মনে আসিয়া আঘাত দেয়। আমার বুদ্ধি ইহার অপেক্ষা অল্প নহে। বিচার করিতে তর্ক করিতে সূক্ষ্ম যুক্তি বাহির করিতে আমার মতো কয়জন আছে? তবে আমিই বা ইহার অপেক্ষা খাটো কিসে! এ ব্যক্তি কেবল আপন সামান্য শক্তি প্রকাশ করিয়াছে এবং পাঁচজন মূর্খ লোকে ইহাকে বলপূর্বক বাড়াইয়া তুলিয়াছে— দৈবক্রমে আমার বিপুল শক্তি মহৎ মস্তিষ্কভারে চাপা পড়িয়া আছে বলিয়া আমাকে আমি এবং দুই-একটি বন্ধু ছাড়া আর কেহ চিনিল না! আমি বর্তমান থাকিতে আমার পার্শ্বে যে লোকের দৃষ্টি পড়ে ইহা অপেক্ষা মূঢ়-সাধারণের অবিবেচনার প্রমাণ আর কী আছে! এরূপ স্থলে নিকটস্থ লোককে খাটো করিবার অভিপ্রায়ে ইহারা দূরস্থ লোকের অতিশয় প্রশংসা করে, হঠাৎ এত প্রশংসা করিতে আরম্ভ করে যে তাহার আর আদি অন্ত পাওয়া যায় না!

অধিকাংশ স্থলে ইহাদের কতকগুলি করিয়া নিজের জীব থাকে। তাহাদিগকে ইহারা সমাধা করিয়া তুলিতে চাহে। এই-সকল স্বহস্তগঠিত পুত্তল মূর্তিকে যখন তাহারা সর্বসাধারণের সমক্ষে পূজা করিতে থাকে, তখন তাহাতে করিয়া তাহাদের আত্মাভিমান ক্ষুণ্ণ হয় না, বরঞ্চ পরিতৃপ্ত হইতে থাকে। কারণ এই পুত্তলপ্রতিষ্ঠার মধ্যে তাহারা আপনাদের আত্মকর্তৃত্ব বিশেষরূপে অনুভব করিতে থাকে।

ইহাদের একপ্রকার শুষ্ক বিনয় আছে তাহার মধ্যে বিনয়ের মাধুর্য কিছুই নাই। সে বিনয় এত কঠিন যে অবিনয় তাহা অপেক্ষা অধিক কঠিন নহে। মনে হয় যেন অহংকার তাহার সমস্ত মাংসপেশী কাষ্ঠের ন্যায় শক্ত করিয়া সবলে স্থির হইয়া আছে। বিনয়বচনের মধ্যে যেন কেমন একটা পরিহাসের স্বর প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। অভিমান যেন গভীর বিদ্রূপভরে বিনয়ের অনুকরণ করিতেছে। অথবা সে যেন সকলকে ডাক দিয়া বলিতেছে, 'আমি নিজের মহোচ্চ স্কন্ধের উপর চড়িয়া এতই উন্নত উঠিয়াছি যে বিনয় প্রকাশ করিলেও আমার কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। আমি আপনাকে বিস্তর বড়ো বলিয়া জানি এইজন্য বিস্তর অহংকারভরে বিস্তর বিনয় করিয়া থাকি।'

ইহারা যতই আত্মসংযম অভ্যাস করুক না, থাকিয়া থাকিয়া আত্মীয়স্বজনদের প্রতি ইহাদের কঠোর কটাক্ষ, নিষ্ঠুর বাক্য, ক্রূর পরিহাস বাহির হইয়া পড়ে। সংবরণ করিতে পারে না। তীব্র জ্বালাস্রোত মরুহৃদয়ের ভূগর্ভে অন্তঃসলিলা বহিতে থাকে, সময়ে সময়ে সামান্য কারণে ক্ষীণ আবরণ ভেদ করিয়া রক্তনেত্র, বিস্ফারিত নাসারন্ধ্র, বিদীর্ণ ওষ্ঠাধরের মধ্য দিয়া বাহিরে উৎসারিত হইয়া উঠে। এক-এক সময়ে বিদ্যুৎস্ফুলিঙ্গের ন্যায় এক-একটি ক্ষুদ্র তীক্ষ্ণ সহাস্য বাক্যে তাহাদের গোপন মর্মগহ্বরের বিস্তীর্ণ অগ্নিকুণ্ড চক্ষের সমক্ষে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। এরূপ আকস্মিক নিষ্ঠুরতার কারণ তৎক্ষণাৎ খুঁজিয়া বাহির করা যায় না, কিন্তু সে কারণ অল্পে অল্পে বহুদিন ধরিয়া হৃদয়ে সঞ্চিত হইতেছিল। অবরুদ্ধ অহংকারে অজ্ঞানে অলক্ষিতভাবে যখন-তখন আঘাত সহিতেছিল, অবশেষে সহিষ্ণুতা উত্তরোত্তর ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া একদিন সামান্য আঘাতে দ্বিধা হইয়া যায় এবং অভিমানের বিষদন্ত সম্মুখে যাহাকে পায় তাহাকেই আসিয়া বিদ্ধ করে।

এই হৃদয়বিবরবাসী অহংকারের উষ্ণ নিশ্বাস-বাষ্পে প্রশান্ত স্নেহ, নিরভিমান, প্রেম ও উদার করুণা আচ্ছন্ন হইয়া যায় এবং ক্রমশ কলুষিত হইয়া উঠে। আত্মবিস্মৃত সরল সহৃদয়তার সুখ

আর ভোগ করিতে পারি না, সর্বদাই রুদ্ধ দ্বার, রুদ্ধ হৃদয়, তামসী মুখশ্রী, সংকীর্ণ জীবনের গতি। গৃহকোণ অবলম্বন করিয়া কাল্পনিক উদারতার অভাব নাই, অথচ যথার্থ হৃদয়ের সহিত কাহাকেও হৃদয়ের কাছাকাছি অভ্যর্থনা করিয়া আনিতে পারি না। এই বিচিত্র জনপূর্ণ সহস্র সুখদুঃখময় পৃথিবীতে সকলকে দূরে রাখিয়া, স্বজনদিগকে আঘাত দিয়া, আত্মম্ভরিতার অন্ধকূপের মধ্যে আপনাকে লুপ্ত করিয়া আমাদের মর্ত্যজীবন অন্ধকারে নিষ্ফল অতিবাহিত করিয়া দিই, অবশেষে মৃত্যু আসিয়া আমাদিগকে এই জীবন্মৃত্যু হইতে শুভক্ষণে মুক্ত করিয়া দেয়।

কল্পনা
জ্যৈষ্ঠ ১২৯৪

হিন্দুদিগের জাতীয় চরিত্র ও স্বাধীনতা

সেদিন মোহিনী এক Theory বাহির করিয়াছিলেন যে, যে জাতি সমতলভূমিতে থাকে তাহারা অপেক্ষাকৃত ন্যায়শাস্ত্রব্যবসায়ী হয়। কথাটা নিতান্তই কাল্পনিক বোধ হয় না। যাহারা সমতলক্ষেত্রে থাকে, কষ্টস্বীকার করিয়া অতিক্রম করিবার অভ্যাস তাহাদের চলিয়া যায়, স্বভাবতই অলস হইয়া যায়। এইজন্য কোনোপ্রকার মানসিক [চিন্তা] তাহাদের পক্ষে দুঃসহ, ঘর-পড়া ন্যায়শাস্ত্রের জাদুপ্রভাবে সমস্তই তাহারা পরিষ্কার সমভূমি করিয়া দিতে চায়, সমস্তই একটা System একটা তন্ত্রের মধ্যে আনিতে চায়। তাহারা স্বাধীন মানবমন হইতে প্রসূত সাহিত্য [রচনার] একটা কল বানাইয়া দিয়াছে— এমন একটা স্বভাববিরুদ্ধ অলংকারশাস্ত্র গড়িয়া দিয়াছে, যাহাতে আপন হইতে লিখিবার ল্যাঠা যথাসম্ভব ঘুচিয়া যায়। সংগীতকে তাহারা এমন রাগরাগিণীজালের মধ্যে বাঁধিয়া দিয়াছে [যাহাতে] গীতরচনা করিতে যান্ত্রিক শিক্ষা ছাড়া স্বাভাবিক ক্ষমতার বড়ো একটা আবশ্যক বোধ হয় না। সকল দুরূহ [প্রশ্নেরই] চট্‌পট্ একটা মীমাংসা বাহির করিয়া ফেলে। কিছুতেই যখন পাওয়া যায় না তখন একটা গল্প তৈরি করে। পঞ্চপাণ্ডব যে এক স্ত্রী বিবাহ করিল সেটা যেম্‌নি বুঝিতে একটু গোল বাধে অম্‌নি তাহার গল্প বাহির হয়। [ইহ]জন্মে যাহার নিকাশ পাওয়া যায় না পূর্বজন্ম হইতে তাহার কৈফিয়ত তলব হয়। কিছুই অমীমাংসিত থাকে না। যাহারা সকল বিষয়েরই চরম মীমাংসার জন্য অতিমাত্র ব্যগ্র, তাহারা কোনো বিষয়ের প্রকৃত মীমাংসায় [পৌঁছিতে পারে] না, অথবা যদিবা পৌঁছায় তো দৈবাৎ পৌঁছায়— কারণ তাহারা হাতের কাছে যাহা পায় তাহাকে [সত্য] মানিয়া নিষ্কৃতি পাইতে চাহে। Facts কাহারো মন জোগাইয়া চলে না, এইজন্য Facts-কে তাহারা [ভয় পায়]— এইজন্য চোখ বুজিয়া বহিঃপ্রকৃতির মুখ-চাপা দিয়া নিজের মন হইতে মনের মতো তন্ত্র বাহির করিতে [চায়, এই] জন্য সমস্তটাকে অত্যন্ত Elaborate করিতে হয়— আরম্ভের কথাগুলো অসত্য হৌক কিন্তু সেগুলিকে মানিয়া [লইলে] তাহার পরে তাহাদের মধ্যে একটা সুবিস্তৃত জটিল সামঞ্জস্য স্থাপন করা আবশ্যক হয়, নহিলে লোকে সেগুলিকে গ্রাহ্য করিবে না। এইজন্য প্রাণপণে Consistent হইতে হয়, যাহাতে গঠননৈপুণ্য দেখিয়াই লোকের [বিশ্বাস] জন্মে। পৃথিবীকে দেখা হয় নাই অথচ পৃথিবীর বিষয় লিখিতে হইবে এইজন্য পৃথিবীকে অবিকল একটি [বিকশিত] শতদলের ন্যায় কল্পনা করা হইল তাহার প্রত্যেক দলের স্বতন্ত্র নামকরণ হইল, সুমেরু-নামক কাল্পনিক পর্বতকে [তার] মধ্যস্থিত সুবর্ণ বীজকোষের মতো স্থাপন করা হইল, সমস্ত কল্পনার মধ্যে এমনি একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ সুষমা প্রকাশ পাইল যে অজ্ঞ লোকের পক্ষে তাহাকে অবিশ্বাস করা দুরূহ— এবং লোকেরাও বিশ্বাস করিবার জন্য নিরতিশয় ব্যাকুল— অবিশ্বাসের পক্ষে যে অশান্তি ও পরিশ্রম আছে সেটুকু অলস লোকে বহন করিতে চায় না। সত্যের মধ্যে যে পরিপূর্ণ শৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্য আছে এ কথা সত্য— কিন্তু প্রথমত আংশিক সত্যগুলিকে খণ্ড খণ্ড বিশৃঙ্খলভাবে দেখিয়া ক্রমে যথানিয়মে সেই শৃঙ্খলাবদ্ধ

সুন্দর সত্যের প্রতি ধাবমান হওয়া যায়। তাড়াতাড়ি করিতে গেলে আপনার মনের সংকীর্ণ কল্পনার ক্ষুদ্র পারিপাট্যটুকু লাভ করা যায় কিন্তু উদার প্রকৃতির বৃহৎ সামঞ্জস্য [দেখা] যায় না। টলেমির কাল্পনিক জ্যোতিষ্কমণ্ডল যতই সুবিহিত সুষম হউক-না- কেন সুষমা-সৌন্দর্যে প্রাকৃতিক জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর সহিত তাহার তুলনা হয় না। কাল্পনিক পারিপাট্যের চর্চা করিতে গেলে ক্রমে তাহা সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্ম অবস্থা প্রাপ্ত হয়, কারণ বহির্জগৎ হইতে তাহার বাধা নাই এবং তাহার টীকাভাষ্যও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সূত্রে [মাকড়সাজালে] প্রকৃতি আচ্ছন্ন হইয়া যায়— তখনই এই কাল্পনিক জগৎই একপ্রকার সত্য হইয়া দাঁড়ায়।

আমার বিশ্বাস অন্য কোনো দেশের ধর্মশাস্ত্র লোকের আহার বিহার শয়ন নিদ্রা প্রভৃতি দিনের প্রত্যেক [মুহূর্তের] কার্য নিয়মে বাঁধিয়া দেয় নাই। আমাদের দেশেই এইরূপ অনুশাসন স্বাভাবিক এবং হয়তো আবশ্যক। আমাদের স্বাধীনতা অপহৃত হইলে আমরা বাঁচিয়া যাই— নির্ভাবনা বাঁধা রাস্তায় চলিতে পারি। এমন-কি আমরা নিজের [স্বাতন্ত্র্য] রক্ষা করিতে পারি না— এমন স্থলে আমাদের হস্তে যে-কোনো বিষয়ে স্বাধীনতা দিবে তাহাই ক্রমে ক্রমে [নিতান্তই] শিথিল ও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া যাইবে। এইজন্য আমাদের দেশে বাঁধা নিয়মের প্রাদুর্ভাব এবং নিয়মের দাসত্বকে সাধারণে দুঃখ জ্ঞান করে না। কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে বাঁধা নিয়ম করিতে গেলেই সকল অবস্থা ও সকল [সময়ের] প্রতি দৃষ্টি রাখা অসম্ভব— সকল অবস্থায় সকল সময়েই সকলকেই সকল বিষয়েই একটা মোটামুটি নিয়মের মধ্যে আপনাকে যো-সো করিয়া স্থাপিত করিতে হয়। এইরূপে আমরা হাড়গোড় ভাঙিয়া সকলেই সমান নির্বীর্য নির্জীব... শান্তিসুখ উপভোগ করিতেছি। আর যাহা হৌক বা না হৌক কোনো উপদ্রব নাই। ভাবনা-চিন্তা তর্ক [বিতর্কের বদলে] শাস্ত্র আছে এবং পঞ্জিকা আছে। একান্নবর্তী পরিবারের মধ্যে পরস্পর পরস্পরকে জড়াইয়া ধরিয়া... মিলিয়া দুই হাতে শাস্ত্রখণ্ড অবলম্বন করিয়া ভবস্রোতে নির্বিঘ্নে ভাসিয়া যাইতেছি, সন্তরণ শিক্ষা করিবার আবশ্যক নাই, ব্যক্তিগত বল সঞ্চয় করিবার প্রয়োজন নাই। কেবল যে প্রয়োজন নাই তাহা নহে, তাহা অন্যায়; একজন নিজের বলে আর-একজনের চেয়ে বেশি মাথা তুলিতে চেষ্টা করিলে আমাদের শান্তিপূর্ণ নিয়মবদ্ধ সমাজের মধ্যে আগাগোড়া একটা গোল উপস্থিত হয়। এইজন্য যখন রাম-রাজত্বে শূদ্রক তপশ্চরণাদি দ্বারা আপনাকে... পদবীতে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন তখন দয়াময় রামচন্দ্র সমাজের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তাঁহার শিরশ্ছেদন করিলেন। সীতার বনবাস আমাদের এই অতি-নিয়মবদ্ধ সমাজতন্ত্রের একটি দৃষ্টান্তস্থল বলিয়া বোধ হয়। ব্যক্তিগত ন্যায়পরতাও এই সমাজশাসনে পিষ্ট হইয়া যায়— অর্থাৎ ব্যক্তি একেবারেই কেহ নহে... পূর্বেই বলিয়াছি ইহা হইতে এই প্রমাণ হয় যে আমাদের জাতীয় অভিজ্ঞতা হইতে এই স্থির হইয়াছে যে, সামান্য এমন কোনো বিষয় নাই যাহাতে আমরা আপনাকে বিশ্বাস করিতে পারি। খাওয়া শোওয়া সে বিষয়েও হে শাস্ত্র তুমি বলিয়া দাও আমাদিগকে কী করিতে হইবে। কোথাও কিছু যদি ছিদ্র থাকে আমাদের আলস্যবশত ক্রমেই সেটা বাড়িয়া উঠিবে। সীতার প্রতি প্রমাণহীন সন্দেহ সেটা একটা ছিদ্র কিন্তু সেটা যদি রাখিতে দাও তবে আমাদের (জাতীয়) স্বভাবগুণে ক্রমে সেটা মস্ত হইয়া উঠিবে।

[আজি]কার দিনে যে সমস্যা উঠিয়াছে তাহা এই যে এমন লোকদিগকে কী নিয়মে চালনা করা উচিত? ইহারা [বহুদিন] হইতে স্বাধীনতা পায় নাই এবং না পাইবার কারণও ছিল। ইহারা পরজাতীয়ের নিকট হইতে যে স্বাধীনতা প্রত্যাশা করিতেছে তাহা কি সংগত? স্বাধীনতা লাভের জন্য কঠোর সাধনা সকল জাতিরই [করিতে হয়] ... কিন্তু যদি অতি বিশেষ সাধনা কাহারো আবশ্যক থাকে তবে তাহা ভারতবর্ষীয়ের। কিন্তু ইহারা [যদি] কেবলমাত্র আবদার করিয়াই পায় তবে কি তাহা তাহাদের জাতীয় জীবনের মধ্যে তাহাদের হাড়ে হাড়ে [প্রবেশ] করিতে পাইবে? তাহা কি তাহারা যথার্থ পাইবে, না বাহিরে দেখিতে হইবে যেন পাইল?

দ্বিতীয় কথা। আমরা যে যথার্থই স্বাধীনতা চাহি তাহা জানিবার উপায় কী? যাহা আমাদের

কখনো [আছে] কখনো নাই তাহা আমরা হৃদয়ের সহিত প্রার্থনা করিতে পারি না। কারণ আমরা জানি না [সেটা] কী? আমরা শুনিয়াছি তাহা ভালো জিনিস, বিশ্বাস হইয়াছে তাহা পাইলে ভালো হয়... কিন্তু তাহা আমাদের আবশ্যক ও উপযোগী কি না তাহা বলা শক্ত। ঘোড়া মূল্যবান পদার্থ এবং ঘোড়া চড়িলে আনন্দ [হয়] একজন ছেলে এ কথা শুনিয়া বাপের কাছে আবদার করিতে পারে যে 'হে বাবা আমাকে একটা ঘোড়া দাও।' বাবা বলিল, 'কেন রে। তোর আবার এ বাতিক গেল কেন!' সে বলিল, 'কেন বাবা, [তুমি] তো বলো ঘোড়া খুব ভালো, ঘোড়ায় চড়তে ভালো লাগে।' তখন বাবা মনে করে, এ ছেলেটা ঘোড়ার ব্যবহার জানে না তাই ঘোড়ায় চড়তে এত ব্যস্ত। কিন্তু যদি ঘোড়ার পিঠে একে চড়িয়ে দিই তা হলে ওঠবার জন্যে যত [আগ্রহ] প্রকাশ করেছিল নাব্‌বার জন্যে ততোধিক আগ্রহ প্রকাশ করবে।...স্বাধীনতা সম্বন্ধে আমাদের [এইরূপ] ঘটিতে পারে। স্বাধীনতা কী তাহার স্বাদ জানিয়া এবং তাহা Realize করিয়া যদি স্বাধীনতা চাহিতাম [তাহা হইলে] লোকে নিদেন এইটে বুঝিত যে ঠিক জিনিসটা চাহিতেছে বটে। কিন্তু কানে-শোনা স্বাধীনতাব নামে [আমরা] যে কী চাহিতেছি তাহা আমরা নিজেই জানি না। যথার্থ স্বাধীনতা পাইলে হয়তো আমরা চীৎকার [করিয়া] বলিয়া উঠি 'দোহাই, তোমার কুত্তা বুলাইয়া লও।' কিছু আশ্চর্য নাই। স্বাধীনতা আমাদের জাতীয় স্বভাব। আমরা চিরদিন শাস্ত্রের অধীন, রাজার অধীন, গুরুর অধীন, গুরুজনের অধীন— সেটা তো একটা দৈব ঘটনামাত্র [নয় তাহার] মূল কারণ আমাদের মর্মের মধ্যে নিহিত।

আমাদের দেশের এত অল্প পরিমাণ লোক শিক্ষিত এবং অল্পশিক্ষিত— যে আমরা সমস্ত জাতির দায় স্কন্ধে লইতে পারি না। আমরা ক'জনে মিলিয়া যাহা চাহিতেছি তাহা সমস্ত জাতির পক্ষে বাস্তবিক ভালো কি মন্দ (তাহা) আমরা কি জানি? অশিক্ষিত লোকদের ভালোমন্দ সুবিচার করিবার ক্ষমতা আমরা অনেকটা হারাইয়া [ফেলিয়াছি]। শিক্ষিত লোকে নিজের অবস্থা বিচার করিয়া স্থির করিতে পারে যে বাল্যবিবাহ মন্দ, কিন্তু যখনি... [হইতে] মনে করে বর্তমান অবস্থায় সমস্ত ভারতবর্ষের পক্ষে তাহা মন্দ তখনি ভ্রমে পতিত হয়। এবং [অশিক্ষিত] লোকদের মৌন অবসরের মধ্যে সে যদি বকিয়া বকিয়া বাল্যবিবাহের বিপক্ষে একটা সাধারণ আইন জারী [করিয়া] লয় তবে সে কি গুরুতর অন্যায় করে? আমাদের গুরুতর দায়িত্ব বিস্মৃত হইয়া আমরা সমস্ত জাতির নামে [যখন] আবদার করিতে থাকি তখন বোধ করি মুহূর্তের জন্য আমাদিগকে সচেতন করিয়া দেওয়া আবশ্যক। [এখন] আবশ্যক শিক্ষা বিস্তার করা— অনেক অবস্থার অনেক লোক অনেকদিন হইতে শিক্ষা লাভ করিয়া যে বিষয়ে [নিজের]... মত প্রকাশ করে তাহাকে দেশের মত বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। ইংরাজি শিক্ষা দ্বারা প্রথম প্রথম [আমা]দের জাতীয়স্বভাবের এক প্রকার বাহ্যিক বিপর্যয় দৃষ্ট হয়। তখন হঠাৎ মনে হয় ইহারা [বুঝি] সত্যই ভারতবর্ষীয় বিশেষ ভাব পরিহার করিয়াছে এবং ইংরাজি institution সকলের উপযোগী হইয়াছে। অনেক দিন ধরিয়া অনেক লোকের মধ্যে শিক্ষা বিস্তৃত হইলে তবে এ বিষয়ে একটা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত [হইতে পারা] যাইবে। কেবল কতকগুলি লোকের মধ্যে ইংরাজি শিক্ষা প্রচলিত হইয়া কীরূপে যে দেশের... অবস্থার পরিবর্তন হইতে পারে, তাহা আমি জানি না।

[অনেকে বলিতে] পারেন যে ইংলন্ডেই কি আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই শিক্ষিত? কিন্তু তবে [সেখানে কী করে] লোকেরা অশিক্ষিত লোকদের প্রতিনিধিস্বরূপ নিযুক্ত হইতে পারেন? কিন্তু আমার বিবেচনায় ইংলন্ডের শিক্ষিত অশিক্ষিত লোকের সহিত আমাদের দেশের শিক্ষিত অশিক্ষিত লোকের অনেক প্রভেদ আছে। তাহাদের শিক্ষা ও উন্নতির মূল কারণ তাহাদের সমাজ তাহাদের অবস্থার মধ্যেই নিহিত। সুতরাং তাহাদের শিক্ষিত অশিক্ষিতের মধ্যে জাতিগত ভেদ নাই, শিক্ষার ন্যূনাধিক্যের ভেদমাত্র। জাতীয় স্বাধীনতা সম্বন্ধে তাহাদের সকলেরই একটা স্বাভাবিক ধারণা আছে— তবে কাহারো মনে স্পষ্ট কাহারো মনে অস্পষ্ট। আমাদের দেশে শিক্ষিত অশিক্ষিতের মধ্যে সম্পূর্ণ আলো-অন্ধকারের ভেদ। একের কথা আরেকের পক্ষে বিদেশীয়। উভয়ের মধ্যে

মানসিক সম্বন্ধ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। একজন ইংরাজের সহিত বাঙালি অশিক্ষিতের যে প্রভেদ, ইংরাজিওয়ালা বাঙালির সহিত সাধারণের তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ কম প্রভেদমাত্র। আমাদের শিক্ষিত লোকদের আর-একটা গোল এই যে আমাদের এই নূতন শিক্ষা আমাদের মধ্যে কতটা খাপ খাইয়া বসিয়াছে তাহা আমরা অর্থাৎ কতক পরিমাণে আমরা নিজেকে নিজে জানি না। অর্থাৎ যে কথা [বলিতেছি] যে কাজ করিতেছি তাহা ঠিক বলিতেছি ঠিক করিতেছি কি না নিজেরই সন্দেহ বোধ হয়। তাহার [ফলে] আমাদের অশিক্ষিত সাধারণকে জানিবার উপায় হইতেও অনেক পরিমাণে বঞ্চিত হইতেছি। আমরা কী এবং উহারা কে ঠিক জানি না। অনেক সময়ে চোখ বুজিয়া মনে করি যে যাহা মনে করিতেছি তাহাই ঠিক।... তবে আমাদের একটা কথা বলিবার আছে। স্বাধীনতা এতই আমাদের পক্ষে বিদেশীয় যে তাহা আমাদের মধ্যে প্রবিষ্ট করাইতে বাহিরের সাহায্য অনেক পরিমাণে আবশ্যক। প্রথমে কতকটা ঔদাসীন্য বা অনিচ্ছা সত্ত্বেও... কতক পরিমাণে স্বাধীনতার স্বাদ আবশ্যক। অতএব এ অবস্থায় আমাদের ইচ্ছা ও... অভাব থাকিলেও আমরা অল্পে অল্পে স্বাধীনতা শিক্ষালাভের জন্য অন্য স্বাধীনতাপ্রিয় জাতির নিকটে আবেদন করিতে পারি। তাহা ব্যতীত আমাদের আর গতি নাই। তাহার পরে আমাদের চেষ্টা স্বভাব ও অবস্থার উপর সমস্ত নির্ভর করিবে। কিন্তু যেমন করিয়াই দেখি ইহা একটা পরীক্ষা মাত্র। সকল জাতিই যে স্বাধীনতার সমান অধিকারী তাহা নহে। হয়তো এমন দেখা যাইতে পারে আমরা স্বাধীনতার যোগ্যই নহি। হয়তো আমরা অনেকগুলি স্বাভাবিক কারণে [অধীন] অবস্থার উপযোগী হইয়া আছি। সে কারণগুলি কী এবং সে কারণগুলি দূর হইতে পারে কি না তাহা বিশেষ বিবেচনার সহিত আলোচনা করিয়া দেখা কর্তব্য। জলবায়ু ভৌগোলিক অবস্থা সমাজনীতি ধর্মনীতির মধ্যে ইহার মূল... কেবল দুই-একটা আকস্মিক অবস্থার উপর ইহার নির্ভর তাহা চিন্তা করিয়া দেখা আবশ্যক। তাহা হইলে আমরা [কামনা] করিতেছি তাহার একটা সীমা ও লক্ষ্য নিরূপিত হইতে পারে— নতুবা আমরা ইতিহাসে যাহাই পড়ি তাহাই হাত বাড়াইয়া চাহিয়া বসিব ইহা আমার ঠিক বোধ হয় না।

১৭/১১/[১৮৮৮]
শনিবার
পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তক

স্ত্রী ও পুরুষের প্রেমে বিশেষত্ব

ক

আমার মনে হয় স্ত্রীলোকের প্রতি পুরুষের এবং পুরুষের প্রতি স্ত্রীলোকের ভালোবাসার মধ্যে মাত্রাভেদ নহে জাতিভেদ বর্তমান। পুরুষের ভালোবাসা সৌন্দর্যপ্রিয়তার সহিত সংযুক্ত, আর স্ত্রীলোকের ভালোবাসা নির্ভরপরতা সুতরাং ক্ষমতার প্রতি আসক্তি হইতে উৎপন্ন। পুরুষের যথার্থ ভালোবাসা Ideal-এর প্রতি এবং স্ত্রীলোকের যথার্থ ভালোবাসা Real-এর প্রতি। এ স্থলে Ideal এবং Real আমি হয়তো একটু বিশেষ অর্থে ব্যবহার করিতেছি। সৌন্দর্যের প্রতি অনুরাগ Ideality-র সহিতই বিশেষরূপে সম্বন্ধ এবং ক্ষমতার প্রতি অনুরাগ Reality-র মধ্যে নিবিষ্ট। ক্ষমতার প্রতি অবলম্বন করা যায়, তাহার মধ্যে আপন দুর্বলতা বিসর্জন দিয়া বিশ্রাম লাভ করা যায়। কিন্তু সৌন্দর্যকে ধরা যায় না, তাহার প্রতি ভর দেওয়া যায় না, আমাদের পক্ষে তাহার যে কী উপযোগিতা তাহা সম্পূর্ণ জানি না, এই পর্যন্ত জানি যে, তাহার প্রতি আমাদের আত্মার একটি অনিবার্য আকর্ষণ আছে। স্পর্শনযোগ্য নির্ভরযোগ্য Reality-র পক্ষে সৌন্দর্য অতি অক্ষম,

তাহাকে সযত্নে সকাতরে রক্ষা করিতে হয়; তাহা আঘাতে ক্লিষ্ট হয়, উত্তাপে ম্লান হইয়া যায় কিন্তু Ideality-র পক্ষে তাহার অসীম প্রভাব, সমস্ত বলবুদ্ধি অবহেলে তাহার শরণাপন্ন হইয়া পড়ে। পুরুষ যখন রমণীকে ভালোবাসে তখন সেই ভালোবাসার মধ্যে সে সম্পূর্ণ বিরাম পায় না; যদিও তাহার ভালোবাসার মধ্যে একটি অনির্বচনীয় সুখ থাকে তথাপি কী একটা আকাঙ্ক্ষাপূর্ণ সুগভীর বিষাদ ছায়ার ন্যায় তাহার অনুবর্তী হইয়া থাকে। কারণ সমুদয় যথার্থ সৌন্দর্যের মধ্যে একটি চিরনিলীন আকাঙ্ক্ষা সর্বদা বিরাজ করিতে থাকে। যেমন ভালো গান শুনিলে প্রাণ উদাস হইয়া যায়, প্রকৃতির উদার সৌন্দর্য অনুভব করিলে হৃদয়ের মধ্যে ব্যাকুলতা জন্মে। বস্তুর মধ্যেই সৌন্দর্যের সমাপ্তি নহে, সে যেন আপন আশ্রয়স্থলকে সম্পূর্ণ অতিক্রম করিয়া একটি অসীমতাকে ব্যাপ্ত করিয়া থাকে। আমরা বস্তুকে গ্রহণ করি, স্পর্শ করি, ঘ্রাণ করি, কিন্তু সেই অসীমতাকে আয়ত্ত করিতে পারি না। এইজন্য আমাদের কর্মের চঞ্চলতা দূর হয় না। এইজন্য আমরা ভ্রমবশত সহস্র বস্তুকে স্পর্শ করিয়া দেখিতে চাহি এবং সেই স্পর্শকেই সৌন্দর্যের ভোগ বলিয়া ভ্রম হয়, এবং এইরূপে ভ্রান্ত লোকের মন হইতে সৌন্দর্যের আধ্যাত্মিকতার প্রতি বিশ্বাস নিতান্ত শারীরিকতার মধ্যে হারাইয়া যাইতে পারে। এইজন্য পুরুষের প্রেমের চাঞ্চল্য ও ভোগপ্রিয়তা লোকবিখ্যাত। কিন্তু উচ্চশ্রেণীর পদার্থ মাত্রেরই মধ্যে পরিপূর্ণতা (Perfection) অতি বিরল। একটি গাছের মধ্যে তাহার অধিকাংশ ফুল ও পাতা তাহার আপনার মধ্যে সম্পূর্ণতা লাভ করিয়া সুন্দর হইয়া উঠে। কুশ্রী বেল জুঁই চাঁপা অতি দুর্লভ। কিন্তু মানুষের মধ্যে শারীরিক সর্বতোমুখী সম্পূর্ণতা বিরল। সেইরূপ, আমার বিশ্বাস, সৌন্দর্যপ্রিয়তা হইতে যে প্রেমের উৎপত্তি তাহা উন্নতশ্রেণীয় প্রেম। এইজন্য সাধারণত সেই প্রেমের চরম বিকাশ দেখা যায় না, এবং অধিকাংশ স্থলে তাহার বিকার লক্ষিত হয়। আমি অনুভব করি পুরুষের সম্পূর্ণ প্রেমের সহিত স্ত্রীলোকের প্রেমের তুলনা হয় না। পুরুষ যখন তাহার সমস্ত বলবুদ্ধি বৃহত্ত্ব কুসুমপেলব সৌন্দর্যের নিকট বিসর্জন দেয় তখন সেই প্রেমের মধ্যে একটি সুমহৎ রহস্য উদ্ভাবিত হইতে থাকে। প্রেম রমণীর পক্ষে বাস্তবিক আশ্রয়স্থল— এইজন্য সে তাহার মধ্যে পরিতৃপ্ত থাকে— ক্ষমতাকে সর্বতোভাবে কায়মনোবাক্যে অবলম্বন করিয়া সে পরিপূর্ণ বিশ্রাম লাভ করে। সৌন্দর্য তাহার হৃদয়কে চঞ্চল ও বিক্ষিপ্ত করে না। সে যাহা পাইয়াছে তাহার মধ্যেই তাহার আকাঙক্ষার অবসান। রমণী এই কারণে বিশেষ Practical। সে কিছু অসমাপ্ত দেখিতে পারে না। যতক্ষণ পর্যন্ত গল্পের সমস্ত হিসাব না চুকিয়া যায় ততক্ষণ সে জিজ্ঞাসা করে 'তার পর।' শুদ্ধ কাল্পনিকতার প্রতি তাহার এক প্রকার বিদ্বেষ আছে। আমার সামান্য অভিজ্ঞতায় এই দেখিয়াছি রমণীরা প্রকৃত সাহিত্যের যথার্থ রসগ্রাহী ও সমালোচক হইতে পারে না।

রমণীর প্রেমের মধ্যে পরিতৃপ্তি আছে, বিশ্বাস আছে, নিষ্ঠা আছে, কিন্তু পুরুষের প্রেমের মধ্যে যে একটি চির অতৃপ্তিপূর্ণ অনির্বচনীয় সুখ আছে তাহা বোধ করি খুব অল্প রমণী উপভোগ করিয়াছে। সেই প্রেমে যেন মানবাত্মার অন্তর্নিহিত গভীর অমরতা হইতে এক অপূর্ব রাগিণীময় গান বাহিরের সৌন্দর্যময়ী অসীমতার দিকে কম্পিত হোমশিখার ন্যায় সর্বদা উত্থিত হইতে থাকে। প্রেমের অবস্থায় যত কবিতা এবং [গান তাহা] হৃদয় হইতেই বাহির হইয়াছে। সৌন্দর্যপ্রেমের মধ্যে সেই চিরচঞ্চলা শক্তি আছে যাহা হইতে কবিতা ও গান বাহির হইতে পারে— গভীর সুখ গভীর দুঃখ গভীর তৃপ্তির সহিত গভীর কামনার যোগে মানব হৃদয়ের এই-সকল কাতর গান জাগিয়া উঠে— প্রেমিক গাহিয়া উঠে—

'জনম অবধি হম রূপ নেহারনু নয়ন না তিরপিত ভেল,
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু তবু হিয়ে জুড়ন না গেল।'

কেহ কাহাকেও সত্য সত্যই লাখ যুগ হৃদয়ে হৃদয়ে রাখে নাই, কিন্তু উদ্দাম মুহূর্তের মধ্যে সেই লক্ষ যুগ রহিয়াছে। মনের মধ্যে অনুভব হয় যে, যে সৌন্দর্যের জন্যে হৃদয় কাতর লক্ষ যুগেও সে সৌন্দর্যের তৃপ্তি নাই কারণ তাহা অসীম।

খ

পুরুষের কবিতায় স্ত্রীলোকের প্রেমের ভাব

যদিও যোগেশচন্দ্র শুনিয়া অত্যন্ত হাসিবেন তথাপি আমাকে স্বীকার করিতে হইবে যে, আমার Ideal সৌন্দর্য আমি কেবল স্ত্রীসৌন্দর্যের মধ্যেই দেখিতে পাই। যতবার আমি সুন্দরী স্ত্রী দেখি ততবারই আমার মনে এক বৃহৎ... উদয় হয়— আমি মনে মনে না বলিয়া থাকিতে পারি না 'কী আশ্চর্য! কেমন করিয়া এমনটা হইল'! জগতের সমস্ত সৌন্দর্যের কেন্দ্রস্থলে আমি যেন এক লক্ষ্মীরূপিণী মানসী স্ত্রীমূর্তি দেখিতে পাই। কী পুষ্পলতার মতো লালিত্য, মাধুর্য পরিস্ফুটিত, কী গতির হিল্লোল! কী সর্বাঙ্গে হৃদয়ের বিকাশ! কী আপনার মধ্যে আপনার সামঞ্জস্য, আত্মসম্ভ্রম, ইতরসাধারণ হইতে নির্লিপ্ত অনিন্দ্য শোভন ভাব! সমস্ত সৌন্দর্যের মধ্যে কী একটি সুমধুর সংযম!

আমাদের দেশের বৈষ্ণব কবিরা অনেক স্থলে রাধিকার যে প্রেম বর্ণনা করিয়াছেন আমার বোধ হয় তাহা পুরুষের প্রেম, স্ত্রীলোকের প্রেম নহে। সৌন্দর্যের অতৃপ্তিভাব পুরুষের প্রেমেরই বিশেষ লক্ষণ— কৃষ্ণের প্রতি রাধিকার যে ব্যাকুল সৌন্দর্যমোহ তাহা পুরুষ কবির পুরুষভাব হইতে উত্থিত। উষাকে দেখিয়া ঋষিরা যেমন গান গাহিয়া উঠিতেন, কৃষ্ণের সৌন্দর্য দেখিয়া রাধা স্থানে স্থানে সেইরূপ গীতোচ্ছ্বাস প্রকাশ করিয়াছেন ইহা আমার অত্যন্ত বিপরীত বলিয়া বোধ হয়। পুরুষের মধ্যে সেই বিকশিত মঞ্জরিত পরিপূর্ণ সংহৃত হৃদয়ের ভাব দিয়া সুসংযত সৌন্দর্য মূর্তিমান হইয়া প্রকাশ পায় না, তাহাকে দেখিয়া যথার্থ সৌন্দর্যস্তব উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতে পারে না। পুরুষ কবিরা এইরূপে অনেক সময়ে আত্মভাব স্ত্রীতে আরোপ করিয়া একপ্রকার অস্বাভাবিক সুখ অনুভব করে— তাহারা কল্পনা করে 'আমরা উহাদিগকে যেরূপ আগ্রহের সহিত যেরূপ ভালোবাসিতেছি উহাদের কোমল হৃদয়ের মধ্য হইতে উহারাও আমাদিগকে অবিকল সেইরূপ ভালোবাসা দিতেছে।' কিন্তু তাহা ঠিক নহে। উহারা আমাদিগকে আর-এক রকম করিয়া ভালোবাসে এবং ভালোবাসিয়া আর-এক রকম সুখ পায়। আমরা উহাদিগকে প্রকৃতির সমস্ত সৌন্দর্যের সহিত মিলাইয়া উহাদের সীমা দূর করিয়া উহাদিগকে আয়ত্তের বাহির করিয়া সুখ পাই। আর উহারা আমাদিগকে সমস্ত হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া আমাদের সীমা নির্ধারণ করিয়া আপন আয়ত্তটুকুর মধ্যে আনিয়া সুখ পায়। আমরা আশ্রয়হীন আকাশে সুখী হই, উহারা পরিবৃত নীড়ে নির্ভর করিয়া সুখী হয়। আমাদিগকে উহারা দৃঢ়, আশ্রয়যোগ্য definite মনে করিয়াই ভালোবাসে, আমাদের মধ্যে দর্শনস্পর্শনাতীত অতিলৌকিক অসীম suggestiveness দেখিয়া যে ভালোবাসে তাহা নহে।

গ

ধর্মে ভয়, কৃতজ্ঞতা ও প্রেম

প্রথম প্রথম প্রকৃতির মধ্যে একটা প্রবল শক্তি দেখিয়া আমরা ঈশ্বরকে অনুভব করিতাম ও সভয়ে তাঁহার নিকট নত হইতাম। তাহার পরে প্রকৃতির মধ্যে করুণার ভাব, লালন-পালনের ভাব দেখিয়া ঈশ্বরের সহিত বাধ্যবাধক সম্বন্ধে কৃতজ্ঞতা সূত্রে পিতার প্রতি পুত্রের কর্তব্যপাশে বদ্ধ হইলাম। তাহার পরে প্রকৃতিতে সৌন্দর্য দেখিয়া ঈশ্বরের সহিত প্রেমের সম্বন্ধ স্থাপিত হইল। প্রেমের সম্বন্ধের মধ্যে 'কেন' 'কী বৃত্তান্ত' নাই— তুমি সুন্দর বলিয়া তোমাকে ভালোবাসি, তোমাকে না ভালোবাসিয়া থাকিতে পারি না বলিয়া ভালোবাসি। তুমি রাজা বলিয়া পিতা বলিয়া নহে, তুমি আত্মার আনন্দ বলিয়া।

মনে হয় ঈশ্বরের প্রতি এই সৌন্দর্যপ্রেম চরম আধ্যাত্মিকতা। কারণ, ইহাতেই আত্মার নিঃস্বার্থ স্বাধীনতা। বৈষ্ণব ধর্ম এই প্রেমের ধর্ম।

১৯/১১/১৮৮৮
পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তক

আমাদের সভ্যতায় বাহ্যিক ও মানসিকের অসামঞ্জস্য

জ্ঞানের রাস্তার দুই ভাগ আছে— একটা ঐন্দ্রিয়ক অর্থাৎ শারীরিক আর-একটা মানসিক। একটা, Facts প্রত্যক্ষ করা, আরেকটা তাহার মধ্য হইতে তত্ত্ব উদ্ভাবন। জলবায়ুর প্রভাবজনিত জড়তাবশত আমাদের দেশে সেই শারীরিক অংশের প্রতি অবহেলা ছিল। সুতরাং মানসিক দিকটাই স্বভাবত অতিপ্রবল হইয়া সমস্ত জ্ঞানরাজ্য অধিকার করিয়া লইল। অলস শরীর পড়িয়া রহিল, মন ঘরে বসিয়া তন্ত্র বাঁধিতে লাগিল।

পৃথিবীর মধ্যে বৃহৎ সমতলক্ষেত্রে বৃহৎ সভ্যতার দুই দৃষ্টান্ত আছে। এক চীন আর-এক ভারতবর্ষ। উভয় দেশেই সভ্যতার মধ্যে জীবনের গতি নাই— নূতন গ্রহণ ও পুরাতন পরিহার নামক জীবনের যে প্রধান তাহা নাই। যাহা কিছু উদ্ভুত হয় তাহা তৎক্ষণাৎ বদ্ধ হইয়া যায়, তাহার আর বর্ধনশক্তি থাকে না। বহিঃপ্রকৃতির সহিত সংঘর্ষণে তাহাদের চরিত্র দৃঢ় হইয়াছে, বাধা অতিক্রমণের চেষ্টাতেই তাহারা স্বভাবত সুখ পায় এবং বহিঃপ্রকৃতিকে তাহারা অবহেলার সামগ্রী মনে করে না, সর্বদাই তাহার প্রতি তাহাদের মনোযোগ দায়ে পড়িয়া আকৃষ্ট হয়। প্রকৃতির সহিত সংগ্রামে কাল্পনিক কেল্লা কোনো কাজেই লাগে না। কঠিন Fact সকলের মধ্যে যে বৃহৎ নিয়ম বিরাজ করে সেই নিয়মকে আবিষ্কার করিলে তবে Facts-এর উপর জয়লাভ করিবার সম্ভাবনা থাকে। এরূপ স্থলে কেহ ইচ্ছা করিয়া ঘরে বসিয়া মিথ্যা মায়াগণ্ডি রচনা করিয়া চোখ বুজিয়া নিজেকে নিরাপদ জ্ঞান করিতে পারে না। শরীর মন দুই একসঙ্গে সমান বলে কাজ করিতে থাকে— তাই দুয়েরই উন্নতি হয় এবং মাঝে হইতে [কাম] সিদ্ধ হয়। আমরা যদি পৃথিবীতে না জন্মিয়া কোনো কল্পনারাজ্যে জন্মিতাম তাহা হইলে কোনো ভাবনা ছিল না; তাহা হইলে কেবলমাত্র মানসিক ও আধ্যাত্মিক চর্চা করিয়া আমরা শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে পারিতাম। কিন্তু পৃথিবীতে শরীরকে অবহেলা করিয়া মন উন্নতি লাভ করিতে পারে না। বহিশ্চক্ষুকে উপেক্ষা করিয়া কেবল অন্তশ্চক্ষুর সাহায্যে জ্ঞান লাভ করা যায় না। আমাদের দেশে শরীর হইতে একপ্রকার বিচ্ছিন্ন হইয়া [মন] অস্বাভাবিক কুষ্মাণ্ডের মতো অকালে অন্যায়রূপ ডাগর হইয়া উঠিয়াছিল। অনেকগুলো আশ্চর্য আশ্চর্য কাজ করিয়াছিল, কিন্তু কোনোটাই পূর্ণতা লাভ করে নাই, সকলগুলোই মাঝে এক সময় হঠাৎ টোল খাইয়া তুবড়াইয়া বাঁকিয়া শুকাইয়া গেল। অঙ্কুর উদ্গম হইল শস্য হইল কিন্তু তাহার মধ্যে নূতন শস্যের বীজ হইল না। যাহা হইয়াছিল তাহার স্মৃতিমাত্র রহিল। নব নব জীবনের মধ্যে জীবন্ত হইয়া রহিল না। য়ুরোপে Alchemy Chemistry হইল, Astrology Astronomy হইল— কিন্তু আমাদের দেশে শিশুবিজ্ঞান হঠাৎ লম্বা হইয়া উঠিয়া মাজা ভাঙিয়া পড়িয়া রহিল। বোধ হয় ইহার কারণ আমাদের সভ্যতায় মন ও শরীর, অন্তর ও বাহিরের অসমান বিকাশ।

অধীনতার সহিত যখনি সংগ্রাম করিয়াছে য়ুরোপ তখনি জয়ী হইয়াছে। Catholic ধর্মের অধীনতার উপর Protestantগণ জয়ী হইল। জ্ঞান ধর্ম ও রাজ্য সম্বন্ধীয় অধীনতার বিরুদ্ধে য়ুরোপ বার বার জয়ী হইয়াছে। আমাদের দেশে ব্রাহ্মণ শাসনের সময় বুদ্ধধর্ম একবার বিদ্রোহ

আনয়ন করিয়াছিল— অধীনতাপাশের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের মানবহৃদয় সেই একবার বলপ্রয়োগ করিয়াছিল, কিন্তু পরাভূত হইয়া নির্বাসিত হইল।

২০/১১/১৮৮৮
পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তক

সমাজে স্ত্রী-পুরুষের প্রেমের প্রভাব

স্ত্রী-পুরুষগত প্রেমের ন্যায় প্রবল শক্তি আর কিছু আছে কি না সন্দেহ। এই শক্তি ষোলো আনা মাত্রায় সমাজের কাজে লাগাইলে মানবসভ্যতা অনেকটা বল পায়। এই শক্তি হইতে বঞ্চিত করিলে সমাজের একটি প্রধান বল অপহরণ করা হয়। দাবাহীন শতরঞ্চ খেলার মতো হয়। য়ুরোপীয় সমাজে এই শক্তি সম্পূর্ণ প্রয়োগ করা হইয়াছে। তাহাদের স্ত্রী-পুরুষপ্রেম ব্যক্তিবিশেষে বদ্ধ নহে, সমস্ত সমাজের মধ্যে সঞ্চারিত। স্ত্রী-সাধারণের প্রতি পুরুষসাধারণ এবং পুরুষসাধারণের প্রতি স্ত্রীসাধারণের আকর্ষণে সমস্ত সমাজ গতিপ্রাপ্ত হইতেছে। স্ত্রী-প্রকৃতি এবং পুরুষ-প্রকৃতি উভয়ে আপনাকে পরিপূর্ণ মাত্রায় বিকশিত করিবার চেষ্টা করিতেছে। প্রেমের প্রভাবেই মানব সমগ্রভাবে পরিস্ফুট হইয়া উঠে। স্বাভাবিক নিয়মে পুষ্প ও ফল যেমন সমগ্রভাবে সূর্যের উত্তাপ গ্রহণ করে, তেমনি প্রেমে মানব-প্রকৃতির মধ্যে সর্বত্র সমভাবে উত্তাপ সঞ্চারিত করিয়া দেয়, তাহার চূড়ান্ত সুমিষ্টতা ও সৌরভ তাহার আদ্যোপান্তে পরিণত হইয়া উঠে। অনুশাসন ও সংহিতা ধোঁয়া দিয়া পাকানোর মতো তাহাতে এককালে সর্বাঙ্গীণ পরিণতি হয় না। তাহাতে কোথাও রঙ ধরে কোথাও ধরে না, তাহাতে আঁঠি পর্যন্ত পাকিয়া উঠে না। প্রেমে আমাদের অন্তঃকরণ সজীব হইয়া উঠিয়া বাহিরের সজীব শক্তিকে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করিতে পারে— প্রেমের অভাবে অন্তঃকরণ অসাড় থাকে, কেবল বাহিরের শক্তি তাহার উপরে বলপ্রয়োগ করিয়া যতটুকু করিয়া তোলে। অতএব সংহিতা অনুশাসন মুমূর্ষু সমাজের প্রতি সেঁকতাপের ন্যায় প্রয়োগ করা যাইতে পারে। সজীব সমাজের আপাদমস্তকে উক্ত কৃত্রিম তাপ অবিশ্রাম প্রয়োগ করিলে তাহার স্বাভাবিক তেজ হ্রাস হয়। য়ুরোপীয় সমাজে স্ত্রী-পুরুষপ্রেম স্বাভাবিক ব্যাপ্ত সূর্যতাপের ন্যায় সমাজের সর্বাঙ্গে পত্র, পুষ্প, ফল বীর্য ও সৌন্দর্য সমগ্রভাবে উদ্ভিন্ন করিয়া তুলিতেছে। স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা বায়ুর ন্যায় অদৃশ্যভাবে সর্বত্র প্রবাহিত হইতেছে। কেবল যন্ত্রের ন্যায় জড়চালনা নহে জীবনের বিচিত্র গতিহিল্লোল রক্ষিত হইতেছে।

কিন্তু এই জীবন পদার্থটা অত্যন্ত দুরায়ত্ত। তাহাকে কাটাছাঁটা নিয়মের মধ্যে আনা যায় না। তাহার সহস্রমুখী নিয়ম সহজে ধরা দেয় না। অতএব যাহারা সমাজকে একটা স্বকপোলকল্পিত নিয়মের মধ্যে বাঁধিতে চাহে এই জীবন পদার্থটা তাহাদের অত্যন্ত বিঘ্নের কারণ হয়। ইহার গলায় ফাঁস লাগাইয়া ইহাকে আধমারা করিয়া তবে তাহাদের উদ্দেশ্য সফল হয়। ইহার নিজের একটা জটিল নিয়ম আছে কিন্তু সেটাকে কায়দা করিয়া আপন মতের স্বপক্ষে খাটাইয়া লওয়া অত্যন্ত দুরূহ। অতএব প্রকৃতিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া যাঁহারা উন্নতির একটা ভারি সহজ উপায় বাহির করিতে চান, তাঁহারা এই উপদ্রবটাকে সর্বাগ্রে নিকাশ করিতে ইচ্ছা করেন। স্ত্রী-পুরুষপ্রেম ভারতবর্ষীয় সমাজের মৃত্যুবৎ শান্তির পক্ষে অত্যন্ত ব্যাঘাতজনক, তাহাতে সমাজে একটা জীবনপূর্ণ চাঞ্চল্য সর্বদা সঞ্চরণ করিতে থাকে; এই চাঞ্চল্য সম্পূর্ণ দমন করিয়া সমাজকে নিতান্ত ভালোমানুষ করিয়া তোলাই আমাদের উদ্দেশ্য ছিল। স্ত্রীলোকদিগকে প্রাচীররুদ্ধ করিয়া রাখা সেই উদ্দেশ্য সফলতার অন্যতম কারণ হইয়াছে। অনেক বিপদ অনেক অশান্তির হাত

এড়ানো গিয়াছে, সেইসঙ্গে অনেকখানি জীবন একরকম চুকাইয়া দেওয়া গেছে। আমরা সকল সভ্যসমাজ অপেক্ষা বেশি ঠাণ্ডা হইয়াছি, তাহার কারণ আমাদের নাড়ি নাই বলিলেই হয়।

আমাদের দেশে পরিবার আছে, কিন্তু সমাজ নাই তাহার এক প্রধান কারণ স্ত্রীলোকেরা পরিবারের মধ্যে বদ্ধ, সমাজের মধ্যে ব্যাপ্ত নহে। স্ত্রীলোকের প্রভাব কেবলমাত্র পরিবারের পরিধির মধ্যেই পর্যাপ্ত। পরিবারের বাহিরে আর মানব সমাজ নাই, কেবল পুরুষ সমাজ আছে। কেবল পুরুষে পুরুষ গড়িতে পারে না। এমন-কি পুরুষ প্রকৃতি গড়িয়া তুলিতে স্ত্রীলোকেরই বিশেষ আবশ্যক। কারণ, স্ত্রীলোকেই চাহে পুরুষ পরিপূর্ণ রূপে পুরুষ হউক। পুরুষের উন্নত আদর্শ স্ত্রীলোকের হৃদয়েই বিরাজ করিতে পারে। স্ত্রীলোকের জন্যই পুরুষদিগকে বিশেষরূপে পুরুষ হওয়া আবশ্যক।

কেহ বলিতে পারেন পরিবারের মধ্যে স্ত্রীলোকের প্রভাব আবদ্ধ থাকাতে পরিবারের সুখ ও উন্নতি বৃদ্ধি হইয়াছে। সে সম্বন্ধে দুই-একটা কথা বলা যাইতে পারে। প্রত্যেক লোকের সাধারণ শিক্ষা ও বিশেষ কাজ আছে। প্রথমে মানুষ হওয়া আবশ্যক, তাহার পরে কেরানি হওয়া বা জজ হওয়া বা আর কিছু হওয়া। সমস্ত জীবন কেবলমাত্র বিশেষ আবশ্যকের জন্য প্রস্তুত হইতে গেলে কখনো মনুষ্যত্ব লাভ করা যায় না। চাষা আজন্মকাল প্রধানত কৃষি ব্যবসায়ের জন্যই উপযোগী হইয়াছে, এইজন্য সে কেবল চাষা। ব্যবসায়ীদের প্রতি সাধারণ ঘৃণার ভাব কতকটা এই কারণবশত। তাহারা বিশেষ কাজের যন্ত্র হইয়া পড়ে, মানুষ হইতে পায় না। স্ত্রীলোকের সম্বন্ধেও এই নিয়ম খাটে। আমাদের স্ত্রীলোকেরা অতি বাল্যকাল হইতে কেবলমাত্র পরিবারের সেবা করিবার জন্য বিশেষরূপে প্রস্তুত হইতে থাকে। আত্মোৎকর্ষ সাধনের জন্য পৃথিবীতে যে-সকল উপায় আছে তাহা হইতে বঞ্চিত হইয়া তাহারা পরিপূর্ণতা লাভ করিতে পারে না। তাহারা সম্পূর্ণ স্ত্রীলোক হইতে পারে না, তাহারা কেবলমাত্র গার্হস্থ্যের উপাদান সামগ্রী হইয়া উঠে। অবশ্য পরিবারের কাজ করিতে গেলে স্নেহ, প্রেম প্রভৃতি অনেকগুলি উচ্চ মানব প্রবৃত্তির চর্চা স্বভাবতই হইয়া থাকে, এইজন্য আমাদের দেশের স্ত্রীলোক আমাদের দেশের পুরুষ সাধারণের অপেক্ষা অনেক ভালো, তথাপি ইহা নিশ্চয় স্ত্রীলোকের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির পথ আমাদের দেশে সম্পূর্ণ রুদ্ধ। আমাদের দেশের স্ত্রীলোকেরা কেবলমাত্র গৃহিণী, তাহা ব্যতীত আর কিছুই নহে। তাহাদের সহিত কেবল আমাদের সুবিধার যোগ, শিক্ষিত পুরুষের অধিকাংশই তাহাদের নিকট রহস্য। অর্থাৎ মানবের উন্নতি ব্যাপারে তাহারা সামান্য দাসীর কার্য করে মাত্র। সুতরাং স্বভাবতই তাহাদের আত্মসম্ভ্রম থাকে না এবং সমাজের নিকট হইতে যথোচিত সম্মান প্রাপ্ত হয় না— দীনভাবে নিতান্ত আচ্ছন্ন, সংকুচিত, জড়ীভূত হইয়া থাকে, তাহাদের সমগ্র মধুর মহৎ স্ত্রীপ্রকৃতি বিকশিত হইয়া উঠিতে পারে না।

চাষা কেবলমাত্র চাষা থাকিয়াই চাষের কাজ একরকম চালাইয়া দিতে পারে, কিন্তু স্ত্রীলোক কেবলমাত্র গৃহিণী হইয়া গৃহকার্য যথোচিত সম্পন্ন করিতে পারে না। কারণ ইহা কেবলমাত্র জড়প্রকৃতির সহিত কারবার নহে। সন্তান পালন কেবলমাত্র স্তনদান নহে, স্বামীর সঙ্গিনী হওয়া কেবল স্বামীর ভাতের মাছি তাড়ানো, পা ধুইবার জল জোগানো নহে। এ-সকল কাজের জন্য প্রথমত সাধারণ শিক্ষা আবশ্যক, মানুষ হওয়া আবশ্যক।

আমাদের জাতি কেবল পরিবারের সমষ্টি, কিন্তু জাতি নহে এবং প্রকৃত প্রস্তাবে সমাজ নহে। স্ত্রী-পুরুষের যোগে এই সমাজ স্থাপিত এবং স্ত্রী-পুরুষের আকর্ষণে ইহা গতিপ্রাপ্ত হইতে পারে। আমরা কেবল অসম্পূর্ণ পুরুষ, স্ত্রীলোকেরা কেবল আমাদের ঘরের কাজ অসম্পূর্ণরূপে করে মাত্র।

২৪/১১/১৮৮৮

পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তক

আমাদের প্রাচীন কাব্যে ও সমাজে স্ত্রী-পুরুষ প্রেমের অভাব

আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে দাম্পত্যপ্রেমের বহুল উল্লেখ আছে, কিন্তু স্ত্রী-পুরুষ স্বাধীন প্রেমের কথা অতি...[অল্পই] আছে। য়ুরোপীয় কাব্যসাহিত্যে দাম্পত্যপ্রেম অপেক্ষা স্বাধীন প্রেমই অধিক বিস্তৃত। আমাদের সমাজে... [স্বাধীন] প্রেমের স্থান ছিল না। কিন্তু তথাপি মানবহৃদয় আপন স্বাধীন প্রেমের আকাঙ্ক্ষা দমন করিয়া রাখিতে পারে নাই। নানা কৌশলে প্রাচীন কবি সেই গভীর আকাঙ্ক্ষা কাব্যে ব্যক্ত করিতেন। প্রাচীররুদ্ধ সমাজের বহির্ভাগে তাঁহারা এমন সকল কল্পকুঞ্জ রচনা করিতেন যেখানে স্বাধীন প্রেম অব্যাহতভাবে ক্রীড়া করিতে পারিত। মালিনী [তটবর্তী] তপোবনে, বনজ্যোৎস্না ও সহকারকুঞ্জে বিকাশোন্মুখী শকুন্তলা, অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদা সমাজকারাবাসী হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষাস্বপ্ন। শকুন্তলা সমাজবিরোধী কাব্য। বিক্রমোর্বশী অসামাজিক। তাহাতে সমাজবন্ধন ছিন্ন করিয়া... প্রেম সৌন্দর্যের প্রতি ধাবিত হইয়াছে। মৃচ্ছকটিকও অস্বাভাবিক সমাজের বিরুদ্ধে মানবহৃদয়ের বিদ্রোহ, [বসন্তসেনা] সমাজ হইতে নির্বাসিতা, তাহার প্রতি চারুদত্তের ন্যায় সর্বগুণসম্পন্ন নাগরিকের একনিষ্ঠ প্রেম সমাজের বাঁধা নিয়মের প্রতি কবির বিশ্বাসের ও আন্তরিক অনুরাগের অভাব। মেঘদূত বিরহের কাব্য— বিরহাবস্থায় দাম্পত্য সূত্র বিচ্ছিন্ন হইয়া মানব যেন পুনশ্চ স্বাধীনভাবে ভালোবাসিবার অবসর পায়। স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে সেই পড়ে... যেখানে হৃদয়ের প্রবল অভিমুখী গতি আপনাকে স্বাধীনভাবে প্রবাহিত করিতে স্থান পায়।... আকর্ষণে এক হইতে আর-একের দিকে ধাবমান হইবার জন্য হৃদয় মধ্যবর্তী আকাশ পায়। যেখানে দাম্পত্য... সেখানে একটি চিরস্থায়ী বিরহ থাকে, সেই বিরহকে অবলম্বন করিয়া প্রেমের আকর্ষণ আপন কার্য করিতে... হৃদয়ের সমস্ত শক্তিকে বহির্মুখী করিয়া বিকশিত করিয়া তোলে।

সঙ্গমবিরহবিকল্পে
বরমপি বিরহো, ন সঙ্গমস্তস্যা
সঙ্গে সৈব তথৈকা
ত্রিভুবনমপি তন্ময়ং বিরহে।

...বিরহে হৃদয়ের স্বাধীনতা থাকে, সে আপনার প্রেম দিয়া সমস্ত বিরহকে পূর্ণ করিয়া ফেলে। এইজন্য... দাম্পত্যের মধ্যে বিরহ আনিয়া প্রেমকে স্বাধীন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কুমারসম্ভবে কুমারী গৌরী একাকিনী মহাদেবের সেবা করিতেছেন ইহা সমাজ নিয়মের ব্যতিক্রম, কিন্তু এ নিয়ম লঙ্ঘন না করিলে তৃতীয় ...অমন অতুল্য কাব্যের সৃষ্টি হইবে কী করিয়া? একদিকে বসন্তপুষ্পাভরণা সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতার মতো শিরিষ...বেপথুমতী উমা, আর-একদিকে যোগাসীন মহাদেবের অগাধস্তম্ভিত সমুদ্রবিশাল হৃদয়, চক্ষুর পলকে [উভয়ের] মধ্যে বিশ্ববিজয়ী প্রেমের আকর্ষণ বদ্ধ হইবে কী করিয়া? ইহাতে কঠিন নিয়মের কারাপ্রাচীরের মধ্য হইতেও স্বাধীন প্রকৃতির জয়সংগীত ধ্বনিত হইতেছে। রাধাকৃষ্ণের সমাজবিদ্রোহী প্রেমগান যে আমাদের এই আটঘাট [বাঁধা] সমাজের ও সর্বত্র প্রচলিত হইল ইহাতেও প্রমাণ হইতেছে আমাদের রুদ্ধ হৃদয় ব্যাকুলভাবে প্রেমের স্বাধীনতা [খুঁজিতেছে]। চিরদিন বদ্ধ থাকিয়াও সৌন্দর্যের প্রতি হৃদয়ের সেই স্বাধীন আকাঙ্ক্ষা এখনও সম্পূর্ণ বিনষ্ট [হয় নাই]। কারণ,... সমাজনিয়ম আর যাহাই করুক, প্রকৃতির সমস্ত সৌন্দর্য আপন জটিল জালের দ্বারা আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতে পারে নাই। প্রকৃতি তাহার বিচিত্র সৌন্দর্য দ্বারা সর্বদা আমাদের সৌন্দর্যচাঞ্চল্য জাগাইয়া রাখে... সে কী করিতে চায়; বৃদ্ধ সমাজপতিরা এই চাঞ্চল্য দমন করিবার জন্য নানা ফন্দি বাহির করেন, কিন্তু সেই চঞ্চলতা জীবন থাকিতে কিছুতেই বাঁধা পড়ে না।

প্রাকৃতিক শক্তি সকলকে লোপ করিয়া বাহাদুরী করাকে সভ্যতা বলে না, সাধারণ মঙ্গলের প্রতি লক্ষ্য করিয়া... নিয়মিত করাই সভ্যতার কার্য। স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে একটি অমোঘ আকর্ষণ

আছে এইজন্য ভয়ে ভয়ে তাড়াতাড়ি উভয়ের... দিলে মঙ্গল হয় না, সেই আকর্ষণকে যথানিয়মে মানবের কার্যে প্রয়োগ করা আবশ্যক। আমরা কোনো প্রাকৃতিক শক্তিকে লোপ করিতে পারি না, কিন্তু নিয়মিত করিয়া আপন কার্যে লাগাইতে পারি।

বিদ্যাসুন্দর এবং আমাদের সাধারণ প্রচলিত প্রেমগান হইতে এই প্রমাণ হয় যে, সমাজনিয়মের শাসন সত্ত্বেও প্রেম আমাদের হৃদয় হইতে লুপ্ত হয় নাই, কেবল সূর্যকিরণের অভাবে কলুষিত হইয়া গিয়াছিল। আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে হৃদয়ে বিরাজ করিতেছিল, কেবল তাহা মুক্ত আকাশের অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়া কুঞ্চিত কীটের ন্যায় মৃত্তিকাতলে সহস্র গহ্বর খোদিত করিয়াছিল। হেয় বিকৃত অমরতা লাভ করিয়া সে তলে তলে সমাজকে ধ্বংসের পথে আকর্ষণ করিতেছিল।

২৬/১১/১৮৮৮
পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তক

CHIVALRY

কুমারী Mary-র প্রতি ভক্তি য়ুরোপে স্ত্রীসম্মানের এক প্রধান কারণ বলিয়া উল্লিখিত হয়। কিন্তু আমাদের দেশে শাক্তদের মধ্যে chivalry-র প্রচলন হয় নাই কেন? chivalry-র মধ্যে যে সম্মানের ভাব আছে তাহা প্রেমের সম্মান তাহা ভক্তির সম্মান নহে। সুকুমার সৌন্দর্যের প্রতি যে একটি সযত্নসম্ভ্রম ভাবের উদয় হয় chivalry তাহাই। আমাদের দেশে স্ত্রীলোকের প্রতি যে সম্মান আছে, তাহা জননীভাবে, দেবীভাবে। তাহার কারণ, কেবলমাত্র পতিব্রতা সতী এবং জননী এই দুইভাবে আমাদের স্ত্রীলোকেরা ভক্তির যোগ্য। তাহারা কোনোকালে কুমারী বা সুন্দরী নহে— সুন্দরী না হওয়াটার অর্থ এই যে, সাধারণের মধ্যে তাহাদের সৌন্দর্যের কোনো কার্য নাই। আমাদের দেশে কুমারী শিশু আছে কিন্তু কুমারী স্ত্রীলোক নাই। সুতরাং স্ত্রীপুরুষ মাত্রেরই মধ্যে যে একটি স্বাভাবিক প্রেমের সম্বন্ধ তাহা এদেশে জন্মিতে পারে নাই। প্রেম আকর্ষণই স্ত্রীলোকের প্রধান বল; যে সমাজে স্ত্রীলোক প্রেম উদ্রেক করিতে পারে সেই সমাজেই স্ত্রীলোক প্রকৃত আত্মশক্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত। যে সমাজে সেই প্রেম উদ্রেকের বাধা আছে সেইখানে স্ত্রীলোকের প্রধান বল অপহরণ করা হইয়াছে। স্ত্রী বলিয়া নহে, জননী বলিয়া নহে, স্ত্রীলোক বলিয়াই স্ত্রীলোকের একটি মাহাত্ম্য আছে, সে মাহাত্ম্য পুরুষের হৃদয়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত; কেবলমাত্র গার্হস্থ্যের মধ্যে [রুদ্ধ] থাকিলে স্ত্রীলোক সেই আপন রাজ্য হইতে সিংহাসন হইতে বঞ্চিত হয়। কেবল সতী বা জননীভাবে এক প্রকার দূরস্থিত মৃদু ভক্তি থাকিতে পারে, কিন্তু সেভাবে ধন মন জীবন সমর্পণ করা যায় না। কিন্তু পুরুষ স্ত্রীলোকের জন্য ধন মন জীবন দান করিবে প্রকৃতিতে এইরূপ কথা আছে, স্বভাব শাস্ত্রে এইরূপ বিধান আছে। সুতরাং আত্মোৎসর্গের জন্য হৃদয় উন্মুক্ত হয় ম্রিয়মাণ হইয়া থাকে নয় নানাবিধ গোপন পথ অবলম্বন করে। য়ুরোপীয় সমাজে স্ত্রীলোকের প্রতি স্বাভাবিক আত্মোৎসর্গ হইতে সহস্র মানবকার্যের জন্য আত্মোৎসর্গ শিক্ষা হয়। স্বাভাবিক পদ্ধতি ত্যাগ করিয়া কেবল শুষ্ক ধর্মোপদেশ দ্বারা লোকের ধন মন প্রাণ কাড়িতে পারা যায় না। আমাদের দেশের লোকেরা উক্ত তিনটে পদার্থ গর্ত খুঁড়িয়া কত সযত্নে সঞ্চয় করিয়া রাখে। সুদৃঢ় অভ্যাসবশত এক প্রকার দাসের মতো প্রাণ দেওয়া যায় বটে, কিন্তু স্বাধীনভাবে প্রাণ দিবার শিক্ষা কেবল প্রেম হইতেই হয়।

নানা কারণে আমার মনে হয় না যে দেবভক্তি হইতে chilvary-র উৎপত্তি। আমাদের দেশে শাক্তদের মধ্যে কৃত্রিম কুমারী পূজা আছে কিন্তু প্রকৃত কুমারী পূজা নাই। যেখানে স্ত্রীলোক রুদ্ধ নহে সেইখানেই chilvary-র জন্ম। chilvary অন্ধ পশুবলের উপরে সৌন্দর্যের জয়লাভ সৌন্দর্যের স্বাভাবিক কার্যই তাই। স্বাধীনতা লাভ করিয়া স্ত্রীলোক সবল হয় এবং সবলতা লাভ

করিয়া স্ত্রীলোক জয়ী হয়। কেবল স্বামী পুত্র পরিবারের নহে, সমস্ত পুরুষের প্রেম আকর্ষণ করিয়া তবে সমাজে একটি সমগ্র স্ত্রীলোক উদ্ভিন্ন হইতে পারে। সেই স্ত্রীলোককে আমরা ভালোবাসি, কিন্তু আংশিক অসম্পূর্ণ স্ত্রীলোককে মাতা দেবী সম্বোধন করিয়া দূরে চলিয়া যাই। Browning-এর *In a Balcony* নামক নাট্যকাব্যে রাজ্ঞী দুঃখ করিতেছেন যে, কেবলমাত্র রানী হইয়া স্ত্রীলোকের সম্পূর্ণতা নাই সুখ নাই; যদি একজন সামান্যতম প্রজা সমস্ত রাজসম্মান উপেক্ষা করিয়া তাঁহাকে ভালোবাসে তাহা হইলেও যেন তাঁহার স্ত্রী-প্রকৃতি কতকটা চরিতার্থ হয়। স্ত্রীলোক কেবল মাতা ও দেবী হইতে চাহে না, পুরুষের হৃদয় অধিকার করিয়া তবে তাহারা পূর্ণতা লাভ করে।

২৬/১১/১৮৮৮

পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তক

নব্যবঙ্গের আন্দোলন

আজকাল গবর্নমেন্টের কর্তব্য সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে যে-সকল আন্দোলন চলিতেছে তাহা দেখিয়া আশা ও আনন্দ জন্মে। কিন্তু যেখানে ভালোবাসা বেশি সেখানে আশঙ্কাও বেশি। স্বজাতির উন্নতি যদি বাস্তবিক প্রিয় এবং ঈপ্সিত হয় তবে ভাবনার কারণ সম্বন্ধে দুই চক্ষু মুদ্রিত করিয়া অন্ধভাবে কেবল আনন্দ করিয়া বেড়ানো স্বাভাবিক নহে।

যাঁহারা স্বজাতিবৎসল, তাঁহাদের কি মাঝে মাঝে সর্বদাই এরূপ আশঙ্কা উদয় হয় না, এই যে সমস্ত কাণ্ডকারখানা দেখিতেছি, এ কি সত্য না স্বপ্ন? যদি একান্ত অমূলক হয় তবে আগেভাগে তাড়াতাড়ি আনন্দ করিয়া বেড়ানো পরিণামে দ্বিগুণ লজ্জা ও বিষাদের কারণ হইবে।

ন্যাশনাল শব্দটা যখন বাংলা দেশে প্রথম প্রচার হয় তখনকার কথা মনে পড়ে। একদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া হঠাৎ দেখা গেল, চারি দিকে ন্যাশনাল পেপার, ন্যাশনাল মেলা, ন্যাশনাল সং (song), ন্যাশনাল থিয়েটার— ন্যাশনাল কুজ্ঝটিকায় দশ দিক আচ্ছন্ন।

হঠাৎ এরূপ ঘটিবার কারণ ছিল। প্রথম ইংরাজি শিখিয়া বাঙালি যুবকেরা বিকট বিজাতীয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। গোরু খাওয়া তাঁহারা নৈতিক কর্তব্যস্বরূপ জ্ঞান করিতেন এবং প্রাচীন হিন্দুজাতিকে গবাদি চতুষ্পদের সহিত একশ্রেণীভুক্ত বলিয়া তাঁহাদের ভ্রম জন্মিত। ইতিমধ্যে মহাত্মা রামমোহন রায়- প্রচারিত ব্রাহ্মধর্ম দেশে অল্পে অল্পে মূল বিস্তার করিতে লাগিল। আমাদের দেশে যে বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদ বহু প্রাচীনকালে প্রচলিত ছিল এই জ্ঞানই স্বদেশীয় প্রাচীনকালের প্রতি শ্রদ্ধা আকর্ষণের মূল কারণ হইল। এমন সময়ে য়ুরোপেও সংস্কৃত ভাষার আদিমতা, আমাদের প্রাচীন দর্শনের গভীরতা, শকুন্তলা প্রভৃতি সংস্কৃত কাব্যের মাধুর্য প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা উপস্থিত হইল। তখন হিন্দুসভ্যতার কাহিনী বিলাত হইতে জাহাজে চড়িয়া হিন্দুস্থানে আসিয়া পৌঁছিল। য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ পুঁথি খুলিয়া অনুসন্ধান করিতে বসিয়া গেলেন, আমরা পুঁথি বন্ধ করিয়া ঢোল লইয়া ন্যাশনাল বোল বাজাইতে বাজাইতে ভারি খুশি হইয়া বেড়াইতে লাগিলাম। তাঁহারা বিশুদ্ধ জ্ঞানস্পৃহার বশবর্তী হইয়া সমস্ত স্বাভাবিক বাধা অতিক্রম করিয়া দুরূহ দুষ্প্রাপ্য দুর্বোধ সংস্কৃত শাস্ত্র হইতে ইতিহাস উদ্ধার করিতে লাগিলেন, আর আমরা তখন হইতে এ পর্যন্ত ঐতিহাসিক পদ্ধতি অনুসারে আমাদের শাস্ত্রালোড়নের পরিশ্রম স্বীকার করিলাম না অথচ শাস্ত্রের উপরিভাগ হইতে অহংকার-রস শোষণ করিয়া লইয়া বিপরীত মাত্রায় স্ফীত হইয়া উঠিলাম।

যে জাতি স্বদেশের প্রাচীনকাল লইয়া বহুদিন হইতে অবিশ্রাম অহংকার করিয়া আসিতেছে অথচ স্বদেশের প্রাচীনকালের যথার্থ অবস্থা সম্বন্ধে জানিবার জন্য তিলমাত্র শ্রম স্বীকার করিতে

প্রস্তুত নহে তাহাদের রচিত একটা আন্দোলন দেখিলে প্রথমেই সন্দেহ জন্মে যে, ইহার সহিত যতটুকু অহংকার-আস্ফালনের যোগ ততটুকুই তাহাদের লক্ষ্য ও অবলম্বনস্থল, প্রকৃত আত্মবিসর্জন অনেক দূরে আছে।

শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার 'গীতসূত্রসার' নামক অতি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থের এক স্থলে লিখিয়াছেন, 'ভারতীয় লোকের প্রাচীন বিষয়ের প্রতি শ্রদ্ধা ও আদর আছে বটে। কিন্তু তাহা ইতিহাস-প্রিয়তাজনিত নহে, তাহা আলস্য ও নিশ্চেষ্টতার ফল।' এ কথা আমার সত্য বলিয়া বোধ হয়। মনে আছে বাল্যকালে যখন ন্যাশনাল ছিলাম তখন অর্ধজ্ঞাত ইতিহাসের অনতিস্ফুট আলোকে অহরহ প্রাচীন আর্যকীর্তি সম্বন্ধে জাগ্রতস্বপ্ন দেখিয়া চরম আনন্দ লাভ করিতাম। ইংরাজের উপর তখন আমাদের কী আক্রোশই ছিল! তাহার কারণ আছে। যখন কাহারো মনে দৃঢ় বিশ্বাস থাকে যে, তিনি তাঁহার প্রতিবেশীর সমকক্ষ সমযোগ্য লোক, অথচ কাজকর্মে কিছুতেই তাহার প্রমাণ হইতেছে না, তখন উক্ত প্রতিবেশীর বাপান্ত না করিলে তাঁহার মন শান্তিলাভ করে না। আমরা ন্যাশনাল অবস্থায় ঘরে বসিয়া এবং সভায় দাঁড়াইয়া নিষ্ফল আক্রোশে ইংরাজ জাতির বাপান্ত করিতাম; বলিতাম, আমাদের পূর্বপুরুষ যখন ইন্দ্রপ্রস্থে রাজত্ব করিতেছেন তখন ইংরাজের পূর্বপুরুষ গায়ে রঙ মাখিয়া কাঁচা মাংস খাইয়া বনে বনে নেকড়িয়া বাঘের সহিত লড়াই করিয়া বেড়াইতেছে। আবার বিদ্রূপ করিয়া এমনও বলিতাম— ডারুয়িন ইংরাজ তাই আদিম পূর্বপুরুষদিগকে বানর বলিতে বাধ্য হইয়াছেন। ইংরাজের লালমূর্তি ও কদলীপ্রিয়তার উল্লেখপূর্বক চতুর্ভুজ জাতীয় রক্তমুখচ্ছবি জীবের সহিত তুলনা করিয়া ন্যাশনাল পাঠকদিগের মনে সবিশেষ কৌতুক উদ্দীপন করিতাম। ইংরাজি বই পড়িতাম, ইংরাজি কাগজ লিখিতাম, ইংরাজি খাদ্য একটু বিশেষ ভালোবাসিতাম, ইংরাজি জিনিসপত্র বিশেষ আদরের সহিত ব্যবহার করিতাম, মূর্তিমান ইংরাজ দেখিলে মনে বিশেষ সম্ভ্রমের উদয় হইত, অথচ তাহাতে করিয়া ইংরাজের প্রতি রাগ বাড়িত বৈ কমিত না। দেশে ডাকাতি হয় না বলিয়া আক্ষেপ করিতাম, বলিতাম, অতিশাসনে দেশ হীনবীর্য হইয়া পড়িল, আবার গ্রামের কাছাকাছি ডাকাতির সংবাদ পাইলে ইংরাজ শাসনের শৈথিল্যের প্রতি মনোযোগ আকৃষ্ট হইত।

এই ন্যাশনাল উদ্দীপনা এককালে অত্যন্ত টনটনে হইয়া উঠিয়াছিল এখন ইহা chronic ভাব ধারণ করাতে ইহার প্রকাশ্য দব্‌দবানি অনেকটা কমিয়াছে। অনেকটা সংহত হইয়া এখন ইহা Political agitation আকার ধারণ করিয়াছে।

এই আজিটেশনের মধ্যে একটা ভাব এই লক্ষ হয় যে, আমাদের নিজের কিছুই করিবার নাই, কেবল পশ্চাৎ হইতে মাঝে মাঝে গবর্নমেন্টের কোর্তা ধরিয়া যথাসাধ্য টান দেওয়া আবশ্যক। আমরা বড়ো, তবু আমাদিগকে ভারি ছোটো দেখাইতেছে, সে কেবল তোমরা চাপিয়া রাখিয়াছ বলিয়া। স্প্রিংয়ের পুতুল বাক্সর মধ্যে চাপা থাকে ডালা খুলিবামাত্র এক লম্ফে নিজমূর্তি ধারণ করে। আমাদেরও সেই অবস্থা। কিছুই করিবার নাই— তোমরা বাহির হইতে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের টিপন্ দিয়া ডালা খুলিয়া দাও আমরা ক্যাঁচ্ শব্দ করিয়া গাত্রোত্থান করি।

আবার এইসঙ্গে যাঁহারা আমাদের সাহিত্যের নেতা তাঁহারা সম্প্রতি এক বিশেষ ভাব ধারণ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, আমাদের মতো এমন সমাজ আর পৃথিবীতে কোথাও নাই। হিন্দু বিবাহ আধ্যাত্মিক এবং বাল্যবিবাহ ব্যতীত তাহার সেই পরম আধ্যাত্মিকতা রক্ষা হয় না, আবার একান্নবর্তী প্রথা না থাকিলে উক্ত বিবাহ টেঁকে না— এবং যেহেতুক হিন্দু বিবাহ আধ্যাত্মিক, বিধবা বিবাহ অসম্ভব, এদিকে জাতিভেদ প্রথা এই অপূর্ব আধ্যাত্মিক সমাজের শৃঙ্খলা, শ্রমবিভাগও সর্বাঙ্গীণ উন্নতির কারণ। অতএব আমাদের সমাজ একেবারে সর্বাঙ্গসম্পন্ন। য়ুরোপীয় সমাজ ইন্দ্রিয়সুখের উপরেই গঠিত, এইজন্য তাহার মধ্যে আদ্যোপান্ত উচ্ছৃঙ্খলতা। আবার বলেন, আমাদের দেশের প্রচলিত উপধর্ম মানবজাতির একমাত্র অবলম্বনীয়, উহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম মানব-বুদ্ধির অতীত।

সবসুদ্ধ দাঁড়াইতেছে এই সমাজ বা ধর্ম সম্বন্ধে হাত দিবার বিষয় আমাদের কিছুই নাই। যাহা আছে সর্বাপেক্ষা ভালোই আছে এখন কেবল গবর্নমেন্ট আমাদের ডালা খুলিয়া দিলেই হয়। মাঝে একবার দিনকতক সমাজ সংস্কারের ধুয়া উঠিয়াছিল। শিক্ষিত যুবকেরা সকলেই জাতিভেদ বাল্যবিবাহ প্রভৃতির অপকারিতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিঃসন্দিগ্ধ ছিল। কিন্তু তথাপি কেবল দুই-চারি ঘর উৎপীড়িত সমাজবহির্ভূত ব্রাহ্ম পরিবার ছাড়া আর সর্বত্রই সমাজনিয়ম পূর্ববৎ সমানই ছিল। জড়তা এবং কর্তব্যের সংগ্রামে জড়তাই জয়লাভ করিল, অবশেষে কালক্রমে তাহার সহিত অহংকার আসিয়া যোগ দিল। মাঝে যে ঈষৎ চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছিল তাহা দূর হইয়া বাঙালি ঠাণ্ডা হইয়া বসিল। তাকিয়া ঠেসান দিয়া বসাকে যখন আবার কর্তব্য বলিয়া স্থির করি তখন যেমন নিরনুতাপ আরাম ও নিঃস্বপ্ন নিদ্রার সুযোগ এমন অন্য সময়ে নহে। আমরা প্রাচীন দেশাচারকে স্ফীত তাকিয়ার মতো বানাইয়া লইয়া পশ্চাতের দিকে সমস্ত স্থূল শরীরটিকে হেলান দিয়া রাখিয়াছি— সম্মুখে অগ্রসর হওয়াই একটা গুরুতর অন্যায় বলিয়া জ্ঞান করিতেছি— কেবল মাঝে মাঝে পাশ ফিরিয়া গবর্নমেন্টকে ডাকিয়া বলিতেছি, 'বাবা, এই খাটসুদ্ধ তাকিয়াসুদ্ধ তুলিয়া তোমাদের বিলাতের বানানো একটা কলের গাড়িতে তুলিয়া দাও আমি ভোঁ হইয়া উন্নতির টর্মিনসে গিয়া পৌঁছিব।'

নব্যবঙ্গেরা প্রথম অবস্থায় গোরু খাইত এবং মনে করিত, এই সহজ উপায়ে ইংরাজ হইতে পারিবে। দ্বিতীয় অবস্থায় আবিষ্কার করিল পূর্বপুরুষেরাও গোরু খাইতেন অতএব তাঁহারা য়ুরোপীয় অপেক্ষা সভ্যতায় ন্যূন ছিলেন না, সুতরাং আমরা ইংরাজের চেয়ে কম নহি। সম্প্রতি তৃতীয় অবস্থায় গোবর খাইতে আরম্ভ করিয়াছে এবং মনে মনে ইংরাজকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। বৈজ্ঞানিক যুক্তির সহিত প্রমাণ হইয়া গেছে, গোরুর চেয়ে গোবরে ঢের বেশি আধ্যাত্মিকতা আছে; সমস্ত মাথাটার মধ্যে কিছুই নাই থাকুক শুদ্ধ পশ্চাদ্দিকে টিকিটুকুর ডগায় আধ্যাত্মিকতা গলায় ফাঁস লাগাইয়া ঝুলিতে থাকে। পূর্বে যখন দেশে বড়ো বড়ো বনেদি টিকির ছিল তখন সে ছিল ভালো। আজকাল শিক্ষিত লোকদের মাথার পিছনে যে ক্ষুদ্রকায় হঠাৎ-টিকির প্রাদুর্ভাব হইয়াছে তাহা হইতে কেবল একটা অনাবশ্যক অস্বাভাবিক কৃত্রিম দাম্ভিকতা উৎপন্ন হইতেছে।

যদি কোনো দুঃসাহসিক ব্যক্তি এমন কথা বলেন যে, কেবল গবর্নমেন্টকে ডাকাডাকি না করিয়া আমাদের নিজের হাতেও কিছু কাজ করা আবশ্যক তাহা হইলে সে কথাটা তাড়াতাড়ি চাপা দিতে ইচ্ছা করে। তাহার প্রধান কারণ আমার এই মনে হয় যে, কী কী উপায়ে আমাদের দেশের অভাববিশেষ নিরাকৃত হইতে পারে তাহা নির্ধারণ করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে— কম কাজ করিয়া বেশি করিতেছি দেখানোই উদ্দেশ্য। তা ছাড়া আমাদের যে কিছু দোষ আছে, আমাদের যে কোনো বিষয়ে চেষ্টা করিয়া যোগ্য হওয়া আবশ্যক এ কথা আমরা সহ্য করিতে পারি না। মনে হয় ওরকম কথা Patriotic নহে। মনে হয় ও কথা সত্য হইলেও বলা উচিত নহে, কারণ তাহা হইলে গবর্নমেন্ট সচেতন হইয়া উঠিবে। অতএব নিদেন Policy-র জন্য বলা আবশ্যক আমাদের যাহা হইবার তাহা বেবাক হইয়া গেছে, এখন তোমাদের পালা। আমরা সকলেই সকল বিষয়ের জন্য যোগ্য, এখন তোমরা যোগ্যের সহিত যোগ্যকে যোজনা করো। আমি নিজের কথা আলোচনা করিয়া এবং আমার অভিজ্ঞতার প্রতি নির্ভর করিয়া বলিতে পারি, আমাদের মধ্যে অতি অল্প লোকই আছেন যাঁহারা আমাদের রাজ্যশাসনতন্ত্র এবং Representative Government-এর মূল নিয়ম এবং আমাদের দেশে বর্তমানকালে তাহার উপযোগিতা ও সম্ভাবনা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু অবগত আছেন অথবা প্রকৃত পরিশ্রম স্বীকার করিয়া তদ্‌বিষয়ে কিছু জানিতে অভিলাষী আছেন। কিন্তু আমরা সকলেই জানি রাজ্যশাসনের আমরা যোগ্য, Representative Government লাভে আমরা অধিকারী। কথাগুলা উচ্চারণ করিতে পারিলেই যে প্রকৃত বস্তুতে অধিকার জন্মে তাহা নহে। অন্য দেশের লোকেরা যাহা প্রাণপণ চেষ্টায়, স্বাভাবিক মহত্ত্ব ও প্রবল বীরত্বের প্রভাবে আবিষ্কার ও উপার্জন করিয়াছে, আমরা তাহা কানে

শুনিয়াই আপনাদিগকে অধিকারী জ্ঞান করিতেছি। শিক্ষা করিবার পরিশ্রমটুকুও স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। যদি গবর্নমেন্ট এমন একটা নিয়মজারী করিতেন যে, আমাদের দেশের শাসনতন্ত্র এবং Representative Government-এর সম্বন্ধে একটা বিশেষ পরীক্ষায় আপনার সম্পূর্ণ জ্ঞান প্রকাশ না করিলে সে বিষয়ে কাহাকেও কথা কহিতে দিবেন না, তাহা হইলে বোধ করি কথাবার্তা এক প্রকার বন্ধ হয়। আমাদের চরিত্রে আমাদের জীবনে আমরা যোগ্যতা লাভ করিব না, পরিশ্রম করিয়া কতকগুলি fact শিক্ষা তাহাও করিব না। দেশের যে-সকল অভাব মোচন অধিক পরিমাণে আমাদের নিজের সাধ্যায়ত্ত তাহাতেও হস্তক্ষেপ করিব না, অথচ কোন্ মুখে বলিব, আমরা আন্তরিক নিষ্ঠার সহিত Political agitation-এ যোগ দিয়াছি?[1]

এ-সকল agitation-এর উপর যে সাধারণ লোকের বিশেষ বিশ্বাস আছে তাহাও দেখিতে পাই না। এ-সকল বিষয়ে কেহ ঝট করিয়া টাকা দিতে চাহে না, বলে— ও কতদিন টিকিবে! আর তাহা ছাড়া আমাদের দেশে এক প্রবাদ প্রচলিত আছে— কোম্পানিকা মাল দরিয়ামে ডাল্! সাধারণ কার্যে টাকা দিয়া লোকের বিশ্বাস হয় না যে, সে টাকার যথোপযুক্ত সদ্‌ব্যয় হইবে। মনে করে পাঁচজনের টাকা গোলেমালে দশজনের ট্যাকে অদৃশ্য হইয়া যাইবে অথবা এমন এলোমেলোভাবে খরচ হইবে যে, সমস্তটাই ন দেবায় ন ধর্মায় হইবে। আমরা বলি 'ভাগের মা গঙ্গা পায় না' অর্থাৎ মাকে গঙ্গাযাত্রা করানো এক বিষম লেঠা, নিতান্ত কেহ না থাকিলে কাজেই কায়ক্লেশে নিজেকে ভার লইতে হয় কিন্তু যখন আরও পাঁচটা ভাই আছে, তখন আর কে ওঠে! আমরা আমাদের জাতভাইকে এমন চিনি যে কাহারো বিশ্বাস হয় না যে, সাধারণের কাজ সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন হইতে পারে। এমন-কি, বাণিজ্যে যাহাতে সকলেরই স্বার্থ আছে তাহাতেও আমরা পাঁচজনে মিলিয়া লাগিতে পারি না। একে তো পরস্পরকে অবিশ্বাস করিব অথচ নিজেও কাজ করিব না। কাহারো সততা এবং সত্যনিষ্ঠার উপর বিশ্বাস নাই। গোড়াতেই মনে হয় সমস্তটা ফাঁকি একটা হুজুক মাত্র।

ইহার কারণ আমাদের জাতীয় চরিত্রের মধ্যে নিহিত। আমরা সত্যপরায়ণ নহি সুতরাং কোনো কাজেই পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি না। বিশ্বাস ব্যতীত কোনো কাজই হয় না, আবার বিশ্বাসযোগ্য না হইলে বিশ্বাস করা যায় না। অতএব গোড়ায় দরকার চরিত্র গঠন। জাতির মধ্যে উদ্যম, সত্যপরতা, আত্মনির্ভর, সৎসাহস না থাকিলে অঞ্জলিবদ্ধ করিয়া রেপ্রেজেন্টেটিব গবর্নমেন্ট ভিক্ষা চাহিতে বসা বিড়ম্বনা। আমার মনে হয়, আমাদের দেশের

---

[1] লেখক আমাদের এখনকার পলিটিক্যাল আন্দোলন যেরূপ অসার মনে করেন একটু ভাবিয়া দেখিলেই দেখিবেন তাহা নহে। এই আন্দোলনের মধ্যেই— কাজ করিবার একটি ইচ্ছা জাতীয় মহত্ত্ব লাভের দিকে অগ্রসর হইবার একটি উদ্যম প্রকাশ পাইতেছে, তবে লেখক একদিনেই যদি আমাদের শত শত বৎসরের অবনতির বিনাশ দেখিতে চান তাহা কী করিয়া পাইবেন? লেখক বলিয়াছেন, 'আমাদের মধ্যে অতি অল্প লোকই আছেন যাঁহারা আমাদের রাজ্যশাসনতন্ত্র এবং Representative Government-এর মূল নিয়ম এবং আমাদের দেশে বর্তমানকালে তাহার উপযোগিতা ও সম্ভাবনা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু অবগত আছেন অথবা প্রকৃত পরিশ্রম স্বীকার করিয়া তদ্‌বিষয়ে কিছু জানিতে অভিলাষী আছেন।' অবশ্য দেশের অধিকাংশ লোক যদি যোগ্য হইত তাহা হইলে তো সমস্ত গোল চুকিয়া যাইত, এরূপ পলিটিক্যাল আন্দোলনেরই বা তাহা হইলে আবশ্যক কোথা? কিন্তু আমাদের দেশ কোন্ ছার কথা য়ুরোপের কোনো দেশেই কি অধিকাংশ লোকে রাজ্যশাসনতন্ত্রের মর্মগত নিয়ম বিচার করিয়া কাজ করে? এরূপ স্থলে সর্বত্রই নেতাগণ প্রধান, তাহাদের প্রাণগত চেষ্টা, মহত্ত্বই জাতীয় উন্নতির কারণ। আমাদিগের পলিটিক্যাল নেতাগণের সকলে না হউন যখন অনেকেই তাঁহাদের উদ্দেশ্যসাধনে প্রাণগত চেষ্টা করিতেছেন, তখন কি এই আন্দোলনকে আমরা সারশূন্য বলিতে পারি? চরিত্র মাহাত্ম্য নহিলে কোনো উন্নতি হয় না সত্য, কিন্তু ইহার দিকে আমাদের যে লক্ষ পড়িয়াছে— তাহার উক্তরূপ অনেক প্রমাণ দেখা যাইতেছে, তাহা ছাড়া লেখকের বর্তমান প্রবন্ধই তাহার একটি প্রমাণ।—ভারতী-সম্পাদক।

লোকদের ডাকিয়া ক্রমাগত এই কথা বলা আবশ্যক যে, ইংরেজ গবর্নমেন্ট প্রসাদে সুশাসন প্রভৃতি যে-সকল ভালো জিনিস পাইয়াছি, কোনো জাতি সেগুলি পড়িয়া পায় নাই, তাহার জন্য বিস্তর যোঝাযুঝি, সংযম, আত্মশিক্ষা, ত্যাগ স্বীকার করিতে হইয়াছে। আমরা যে-সকল অধিকার অনায়াসে অযাচিতভাবে পাইয়াছি, তাহার জন্য গবর্নমেন্টকে ধন্যবাদ দিয়া প্রাণপণে যেন তাহার যোগ্য হইবার চেষ্টা করি— কারণ পড়িয়া পাওয়াকে পাওয়া বলে না, কেননা তাহার স্থায়িত্ব নাই, তাহাতে কেবল নিশ্চিন্ত বা নিশ্চেষ্টভাবে সুখে থাকা যায় মাত্র কিন্তু তাহাতে জাতীয় চরিত্রের বিশেষ উন্নতি হয় না। আমরা যে সুখ পাইতেছি আমরা তাহার যোগ্য নহি, আমরা যে দুঃখ পাইতেছি সে কেবল আমাদের নিজের দোষে। এ কথা শুনিলে লোকে অত্যন্ত উল্লসিত হইয়া উঠিবে না— এ কথা কেবলমাত্র জয়ধ্বজায় লিখিয়া উড়াইয়া বেড়াইবার কথা নহে, এ কথার অর্থ নিজে কাজ করো, ধৈর্যসহকারে শিক্ষা লাভ করো, বিনয়ের সহিত গভীর লজ্জার সহিত আপনার দোষ ও অযোগ্যতা স্বীকার করিয়া তাহা আপন যত্নে দূর করিবার চেষ্টা করো, যাঁহাদের কাছে সহস্র বিষয়ে ঋণী আছ তাঁহাদের ঋণ স্বীকার করো, সে ঋণ ধীরে ধীরে শোধ করো। আমাদের লোকের একটি যে দোষ আছে ভিক্ষাকে আমরা হক্ মনে করি, পরের উপার্জনের উপর অতি অসংকোচে আপনার ভাগ বসাই, আবার তাহাতে সামান্য ত্রুটি হইলে চোখ রাঙাইয়া উঠি এই প্রকৃতিগত অভ্যাস যেন ত্যাগ করি। কেবল অলসভাবে পড়িয়া পড়িয়া পরের কর্তব্য সমালোচনা করিয়া নিজের কর্তব্য ভুলিয়া না যাই। গবর্নমেন্টের 'আহ্লাদে ছেলেটি'র মতো কেবল সকল বিষয়েই আবদার করিব এবং নিজের দোষ স্মরণ করাইয়া দিলেই অমনি ফুলিয়া দাপাইয়া কাঁদিয়া-কাটিয়া মাথা খুঁড়িয়া কুরুক্ষেত্র করিয়া দিব এই ভাবটি ত্যাগ করি। আজকাল যে কাণ্ড চলিতেছে তাহাতে ইহার উল্টা ভাবটাই আমাদের মনে বদ্ধমূল হইয়া যাইতেছে যে, গবর্নমেন্ট সহস্র বিষয়ে অপরাধী এবং আমাদের কোনো অপরাধ নাই— অলস এবং অহংকারী লোকদের মন হইতে এ ভাবটা দূর করাই একান্ত চেষ্টাসাধ্য, এ ভাব মুদ্রিত করিবার জন্য বিশেষ আয়োজনের অপেক্ষা করে না।

ভারতী ও বালক
ভাদ্র ও আশ্বিন ১২৯৬

ইতিহাস

ঝান্‌সীর রানী

আমরা এক দিন মনে করিয়াছিলাম যে, সহস্রবর্ষব্যাপী দাসত্বের নিপীড়নে রাজপুতদিগের বীর্যবহ্নি নিভিয়া গিয়াছে ও মহারাষ্ট্রীয়েরা তাহাদের দেশানুরাগ ও রণকৌশল ভুলিয়া গিয়াছে, কিন্তু সে দিন বিদ্রোহের ঝটিকার মধ্যে দেখিয়াছি কত বীরপুরুষ উৎসাহে প্রজ্বলিত হইয়া স্বকার্যসাধনের জন্য সেই গোলমালের মধ্যে ভারতবর্ষের প্রদেশে প্রদেশে যুঝাযুঝি করিয়া বেড়াইয়াছেন। তখন বুঝিলাম যে, বিশেষ বিশেষ জাতির মধ্যে যে-সকল গুণ নিদ্রিতভাবে অবস্থিতি করে, এক- একটা বিপ্লবে সেই-সকল গুণ জাগ্রত হইয়া উঠে। সিপাহি যুদ্ধের সময় অনেক রাজপুত ও মহারাষ্ট্রীয় বীর তাঁহাদের বীর্য অযথা পথে নিয়োজিত করিয়াছিলেন, এ কথা স্বীকার করিলেও মানিতে হইবে যে, তাঁহারা যথার্থ বীর ছিলেন। তাঁতিয়া টোপী ও কুমারসিংহ ক্ষুদ্র দুইটি বিদ্রোহী মাত্র নহেন, ইতিহাস লিখিতে হইলে পৃথিবীর মহা মহা বীরের নামের পার্শ্বে তাঁহাদের নাম লিখা উচিত; যে অশীতিবর্ষীয় অশ্বারোহী কুমারসিংহ লোলভ্রূ রজ্জুতে বাঁধিয়া হস্তে কৃপাণ লইয়া হাইলন্ডের সৈন্যদলকে ছিন্নভিন্ন করিয়া দিয়াছিলেন, যে তাঁতিয়া টোপী কতকগুলি বিক্ষিপ্ত সৈন্যদল লইয়া যথোচিত অস্ত্র নাই, আহার নাই, অর্থ নাই, অথচ ভারতবর্ষে বিদেশীয় শাসন বিচলিতপ্রায় করিয়াছিলেন, যদিও তাঁহাদের কার্য লইয়া গৌরব করিবার আমদিগের অধিকার নাই তথাপি তাঁহাদের বীর্যের, উদ্যমের, জ্বলন্ত উৎসাহের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারি না। কিন্তু ভারতবর্ষের কী দুর্ভাগ্য, এমন সকল বীরেরও জীবনী বিদেশীয়দের পক্ষপাতী ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে সংগ্রহ করিতে হয়।

সিপাহি যুদ্ধের সময় রাসেল টাইম্‌স্‌ পত্রে লিখেন যে, ‘তাঁতিয়া টোপী মধ্য ভারতবর্ষকে বিপর্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন; বড়ো বড়ো থানা ও ধনাগার লুঠ করিয়াছেন, অস্ত্রাগার শূন্য করিয়াছেন, বিক্ষিপ্ত সৈন্যদল সংগ্রহ করিয়াছেন, বিপক্ষ সৈন্য বলপূর্বক তাঁহার সমুদয় অপহরণ করিয়া লইয়াছে, আবার যুদ্ধ করিয়াছেন, পরাজিত হইয়াছেন, পুনরায় ভারতবর্ষীয় রাজাদিগের নিকট হইতে কামান লইয়া যুদ্ধ করিয়াছেন, বিপক্ষ সৈন্যেরা পুনরায় তাহা অপহরণ করিয়া লইয়াছে, আবার সংগ্রহ করিয়াছেন, আবার হারাইয়াছেন। তাঁহার গতি বিদ্যুতের ন্যায় দ্রুত। সপ্তাহ ধরিয়া তিনি প্রত্যহ ২০/২৫ ক্রোশ ভ্রমণ করিয়াছেন, নর্মদা এপার হইতে ওপার, ওপার হইতে এপার ক্রমাগত পার হইয়াছেন। তিনি কখনো আমাদের সৈন্যশ্রেণীর মধ্য দিয়া, কখনো পার্শ্ব দিয়া, কখনো সম্মুখ দিয়া, সৈন্য লইয়া গিয়াছেন। পর্বতের উপর দিয়া, নদী অতিক্রম করিয়া, শৈলপথে, উপত্যকায় জলার মধ্য দিয়া, কখনো সম্মুখে, কখনো পশ্চাতে, কখনো পার্শ্বে, কখনো তির্যকভাবে চলিয়াছেন। ডাকগাড়ির উপর পড়িয়া, চিঠি অপহরণ করিয়া, গ্রাম লুঠিয়া কখনো বা সৈন্য চালনা করিতেছেন, কখনো বা পরাজিত হইয়া পলাইতেছেন, অথচ কেহ তাঁহাকে ধরিতে ছুঁইতে পারিতেছে না।’ এই অসামান্য বীর যখন পারোনের জঙ্গলের মধ্যে ঘুমাইতেছিলেন, তখন মানসিংহ বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া তাঁহাকে শত্রুহস্তে সমর্পণ করিয়াছিল। গুরুভার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া, সৈনিক-বিচারালয়ে আহূত হইয়া তিনি ফাঁসি কাষ্ঠে আরোহণ করিলেন। মৃত্যু পর্যন্ত তাঁহার প্রকৃতি নির্ভীক ও প্রশান্ত ছিল। তিনি বিচারের প্রার্থনা করেন নাই, তিনি বলিয়াছিলেন যে, ‘আমি ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের হস্তে মৃত্যু ভিন্ন অন্য কিছুই আশা করি না। কেবল এইমাত্র প্রার্থনা যে, আমার প্রাণ-দণ্ড যেন শীঘ্রই সমাধা হয়, ও আমার জন্য যেন আমার নির্দোষী বন্দী পরিবারেরা কষ্ট ভোগ না করে।’

ইংরাজেরা যদি স্বার্থপর বণিক জাতি না হইতেন, যদি বীরত্বের প্রতি তাঁহাদের অকপট ভক্তি থাকিত, তবে হতভাগ্য বীরের এরূপ বন্দীভাবে অপরাধীর ন্যায় অপমানিত হইয়া মরিতে হইত

না, তাহা হইলে তাঁহার প্রস্তর-মূর্তি এত দিনে ইংলন্ডের চিত্রশালায় শ্রদ্ধার সহিত রক্ষিত হইত। যে ঔদার্যের সহিত আলেক্‌জান্ডার পুরুরাজের ক্ষত্রিয়োচিত স্পর্ধা মার্জনা করিয়াছিলেন, সেই ঔদার্যের সহিত তাঁতিয়া টোপীকে ক্ষমা করিলে কি সভ্যতাভিমানী ইংরাজ জাতির পক্ষে আরও গৌরবের বিষয় হইত না? যাহা হউক ইংরাজেরা এই অসামান্য ভারতবর্ষীয় বীরের শোণিতে প্রতিহিংসারূপ পশু-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিলেন।

আমরা সিপাহি যুদ্ধ সময়ের আরও অনেক বীরের নামোল্লেখ করিতে পারি, যাঁহারা ইউরোপে জন্মগ্রহণ করিলে, ইতিহাসের পৃষ্ঠায়, কবির সংগীতে, প্রস্তরের প্রতিমূর্তিতে, অভ্রভেদী স্মরণস্তম্ভে অমর হইয়া থাকিতেন। বৈদেশিকদের লিখিত ইতিহাসের একপ্রান্তে তাহাদের জীবনীর দুই-এক ছত্র অনাদরে লিখিত রহিয়াছে, ক্রমে ক্রমে কালের স্রোতে তাহাও ধৌত হইয়া যাইবে এবং আমাদের ভবিষ্যবংশীয়দের নিকট তাঁহাদের নাম পর্যন্ত অজ্ঞাত থাকিবে।

শঙ্করপুরের রাণা বেণীমাধু লর্ড ক্লাইভের আগমনে নিজ দুর্গ পরিত্যাগ করিলেন এবং তাঁহার ধন সম্পত্তি অনুচরবর্গ কামান ও অন্তঃপুরচারিণী স্ত্রীলোকদিগকে সঙ্গে লইয়া অযোধ্যার বেগম ও বির্জিস্ কাদেরের সহিত যোগ দিলেন। তিনি তাঁহাদিগকেই আপনার অধিপতি বলিয়া জানিতেন, এই নিমিত্ত তাঁহাদিগকে রাজার ন্যায় মান্য করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁহার এই প্রতিজ্ঞা পালন করিয়াছিলেন। ব্রিটিশ গবর্নমেন্ট তাঁহাকে তাঁহার রাজ্য প্রত্যর্পণ করিতে চাহিলেন, তাঁহাকে মৃত্যু-দণ্ড হইতে অব্যাহতি দিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন, তাঁহার ক্ষতিপূরণ করিতে প্রস্তুত হইলেন এবং তাঁহার কষ্টের কারণ অনুসন্ধান করিবেন বলিয়া স্বীকৃত হইলেন, কিন্তু রাজা সমুদয় প্রস্তাব তুচ্ছ করিয়া বেগম ও তাঁহার পুত্রের জন্য টেরাই প্রদেশে আশ্রয়হীন ও রাজ্যহীন হইয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। বেণীমাধু জীবনের বিনিময়েও তাঁহার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেন নাই এবং ইংরাজদের হস্তে ক্োনো মতে আত্মসমর্পণ করেন নাই। রাজপুত বীর নহিলে আপনার প্রতিজ্ঞা পালনের জন্য কয়জন লোক এরূপ ত্যাগস্বীকার করিতে পারে?

রয়ার রাজপুত অধিপতি, নৃপৎসিং খঞ্জ ছিলেন। তিনি যুদ্ধের সময় প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, 'ঈশ্বর আমার একটি অঙ্গ লইয়াছেন, অবশিষ্ট অঙ্গগুলি আমার দেশের জন্য দান করিব।'

কিন্তু আমরা সর্বাপেক্ষা বীরাঙ্গনা ঝান্‌সীর রানী লক্ষ্মীবাইকে ভক্তিপূর্বক নমস্কার করি। তাঁহার যথার্থ ও বিস্তারিত ইতিহাস পাওয়া দুষ্কর, অনুসন্ধান করিয়া যাহা পাওয়া গেল তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়া পাঠকদিগকে উপহার দিলাম।

লর্ড ড্যালহৃসি ঝান্‌সী রাজ্য ইংরাজশাসনভুক্ত করিলেন, এবং ঝান্‌সীর রানী লক্ষ্মীবাইয়ের জন্য অনুগ্রহ করিয়া উপজীবিকাস্বরূপ যৎসামান্য বৃত্তি নির্ধারিত করিয়া দিলেন। এই স্বল্প বৃত্তি রানীর সম্ভ্রম-রক্ষার পক্ষে যথেষ্ট ছিল না, এই নিমিত্ত তিনি প্রথমে গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হন, অবশেষে অগত্যা তাঁহাকে গ্রহণ করিতে হইল। কিন্তু ইংরাজ কর্তৃপক্ষীয়েরা ইহাতেই ক্ষান্ত হইলেন না, লক্ষ্মীবাইয়ের মৃত স্বামীর যাহা-কিছু ঋণ ছিল তাহা রানীর জীবিকা হইতে পরিশোধ করিতে লাগিলেন। রানী ইহাতে আপত্তি করিলেন, কিন্তু তাহা গ্রাহ্য হইল না। ইংরাজেরা তাঁহার রাজ্যে গো-হত্যা আরম্ভ করিল, ইহাতে রাজ্ঞী ও নগরবাসীরা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া ইহার বিরুদ্ধে আবেদন করিল কিন্তু তাহাও গ্রাহ্য হইল না।

এইরূপে রাজ্যহীনা, সম্পত্তিহীনা, অভিমানিনী রাজ্ঞী নিষ্ঠুর অপমানে মনে মনে প্রতিহিংসার অগ্নি পোষণ করিতে লাগিলেন এবং যেমন শুনিলেন কোম্পানির সৈনিকেরা বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে, অমনি তাঁহার অপমানের প্রতিশোধ দিবার জন্য সুকুমার দেহ রণসজ্জায় সজ্জিত করিলেন। লক্ষ্মীবাই অত্যন্ত সুন্দরী ছিলেন। তাঁহার বয়ঃক্রম বিংশতি বৎসরের কিছু অধিক, তাঁহার দেহ যেমন বলিষ্ঠ মনও তেমনি দৃঢ় ছিল।

রাজ্ঞী অতিশয় তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন। রাজ্যপালনের জটিল ব্যাপার সকল অতিসুন্দররূপে

বুঝিতেন। ইংরাজ কর্মচারীগণ তাঁহাদের জাতিগত স্বভাব অনুসারে এই হৃতরাজ্য-রাজ্ঞীর চরিত্রে নানাবিধ কলঙ্ক আরোপ করিলেন, কিন্তু এখনকার ঐতিহাসিকেরা স্বীকার করেন যে, তাহার এক বর্ণ সত্য নহে।

ঝান্‌সী নগরী অতিশয় পরিপাটী পরিচ্ছন্ন, উহা দৃঢ় প্রাচীরে পরিবেষ্টিত, এবং বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষের কুঞ্জ ও সরোবরে-সেই সকল প্রাচীরের চতুর্দিকে সুশোভিত ছিল। একটি উচ্চ শৈলের উপর দৃঢ়-দুর্গ-বদ্ধ রাজপ্রাসাদ দাঁড়াইয়া আছে। নগরীতে বাণিজ্য-ব্যবসায়ের প্রাদুর্ভাব ছিল বলিয়া অনেক ইংরাজ অধিবাসী সেখানে বাস করিত। কাপ্তেন ডান্‌লপের হস্তে ঝান্‌সী নগরীর রক্ষাভার ছিল। ভারতবর্ষে যখন বিদ্রোহ জ্বলিয়া উঠিয়াছে তখন ইংরাজ কর্তৃপক্ষীয়েরা তাঁহাকে সতর্ক হইতে পরামর্শ দেন, কিন্তু ঝান্‌সীর শান্ত অবস্থা দেখিয়া তিনি তাহা হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন।

এই প্রশান্ত ঝান্‌সিরাজ্যে বিধবা রাজ্ঞী ও তাঁহার ভৃত্যবর্গের উত্তেজনায় ভিতরে ভিতরে একটি বিষম বিপ্লব ধূমায়িত হইতেছিল। সহসা একদিন স্তব্ধ আগ্নেয়গিরির ন্যায় নীরব ঝান্‌সি নগরীর মর্মস্থল হইতে বিদ্রোহের অগ্নিস্রাব উদ্‌গীরিত হইল।

প্রকাশ্য দিবালোকে কান্টনমেন্টের মধ্যে দুইটি ডাকবাঙলা বিদ্রোহীরা দগ্ধ করিয়া ফেলিল, যেখানে বারুদ ও ধনাগার রক্ষিত ছিল, সেখান হইতে বিদ্রোহীদিগের বন্দুক-ধ্বনি শ্রুত হইল, এক দল সিপাহি ওই দুর্গ অধিকার করিয়াছে, তাহারা উহা কোনো মতে প্রত্যর্পণ করিতে চাহিল না। ইউরোপীয়েরা আপনাপন পরিবার ও সম্পত্তি লইয়া নগরী-দুর্গে আশ্রয় লইল। ক্রমে ক্রমে সৈন্যেরা স্পষ্ট বিদ্রোহী হইয়া অধিকাংশ ইংরাজ সেনানায়কদিগকে নিহত করিল। বিদ্রোহীগণ দুর্গে উপস্থিত হইল।

ক্যাপটেন ডান্‌লপ হিন্দু সৈন্যদিগকে নিরস্ত্র করিতে আদেশ করিলেন, কিন্তু তাহারা সেইখানেই তাঁহাকে বন্দুকে হত করিল। দুর্গস্থ সৈন্যদের সহিত যুদ্ধ উপস্থিত হইল। মধ্যাহ্নে বিদ্রোহী-সৈন্যেরা দুর্গের নিম্নঅংশ অধিকার করিয়া লইল। পরাজিত ইংরাজ সেনারা বিদ্রোহী সেনাদের হস্তে আত্ম-সমর্পণ করিল, কিন্তু উন্মত্ত সৈন্যেরা তাহাদিগকে নিহত করিল। এই নিধন কার্যে রাজ্ঞীর কোনো হস্ত ছিল না, এমন-কি, এ সময়ে রাজ্ঞীর কোনো অনুচরও উপস্থিত ছিল না। যখন রাজ্যে একটিও ইংরাজ অবশিষ্ট রহিল না তখন রাজ্ঞী এই অন্যায়কারীদিগকেও রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। এক্ষণে কথা উঠিল, কে রাজ্য অধিকার করিবে? রাজ্ঞী সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন; সদাশিব রাও নামে একজন ওই রাজ্যের প্রার্থী কুরারা দুর্গ অধিকার করিল। পরে রাজ্ঞীর সৈন্য-কর্তৃক তাড়িত হইয়া সিন্ধিয়া-রাজ্যে পলায়ন করিল। এইরূপে ইংরাজেরা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হত ও তাড়িত হইলে পর ১৮৫৭ খৃ. অব্দে লক্ষ্মীবাই হৃত-সিংহাসনে পুনরায় আরোহণ করিলেন। কিছুকাল রাজত্ব করিয়া লক্ষ্মীবাই ১৮৫৮ খৃস্টাব্দে পুনরায় ইংরাজ সৈন্যদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন।

ইংরাজ সেনানায়ক সার হিউ রোজ সৈন্যদল সমভিব্যাহারে ঝান্‌সী নগরীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রস্তরময় নগর-প্রাচীরে ব্রিটিশ কামান গোলা বর্ষণ আরম্ভ করিল। দুর্গস্থ লোকেরা আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল। পুরমহিলাগণ দুর্গ-প্রাকার হইতে কামান ছুড়িতে আরম্ভ করিল এবং সৈন্যদের খাদ্যাদি বণ্টন করিতে লাগিল, এবং সশস্ত্র ফকিরগণ নিশান হস্তে লইয়া জয়ধ্বনি করিতে লাগিল।

৩১ মার্চ রানী দেখিলেন, তাঁতিয়া টোপী ও বানপুরের রাজা অল্পসংখ্যক সৈন্যদল লইয়া ইংরাজ-শিবির-পার্শ্বে নিবেশ স্থাপন করিয়া সংকেত-অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া দিয়াছেন। হর্ষধ্বনি ও তোপের শব্দে ঝান্‌সীদুর্গ প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। তাহার পর দিন ইংরাজ সৈন্যদের সহিত তাঁতিয়া টোপীর ঘোরতর যুদ্ধ বাধিল, এই যুদ্ধে তাঁতিয়া টোপীর ১৫০০ সৈন্য হত হইল এবং তিনি পরাজিত হইয়া বেটোয়ার পরপারে পলায়ন করিলেন।

যুদ্ধে প্রত্যহ রাজ্ঞীর ৫০/৬০ জন করিয়া লোক মরিতে লাগিল। তাঁহার সর্বোৎকৃষ্ট

কামানগুলির মুখ বন্ধ করা হইয়াছে এবং ভালো ভালো গোলন্দাজেরা হত হইয়াছে।

ক্রমে ইংরাজ সৈন্যেরা গোলার আঘাতে নগর প্রাচীর ভেদ করিল এবং প্রাসাদ ও নগরীর প্রধান প্রধান অংশ অধিকার করিল। প্রাসাদের মধ্যে ঘোরতর সম্মুখযুদ্ধ বাধিল। রানীর শরীর-রক্ষকদের মধ্যে ৪০ জন অশ্বশালার সম্মুখে দাঁড়াইয়া প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিল। আহত সৈন্যেরা মুমূর্ষু অবস্থাতেও ভূতলে পড়িয়া অস্ত্র চালনা করিতে লাগিল। একে একে ৩৯ জন হত হইলে অবশিষ্ট এক জন বারুদে আগুন লাগাইয়া দিল, আপনি উড়িয়া গেল ও অনেক ইংরাজ সৈন্যও সেইসঙ্গে হত হইল।

রাত্রেই রাজ্ঞী কতকগুলি অনুচরের সহিত দুর্গ পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন, শত্রুরা তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুসরণ করিয়াছিল এবং আর একটু হইলেই তাঁহাকে ধরিতে সক্ষম হইত। লেপ্টনেন্ট বাউকর অশ্বারোহী সৈন্যদলের সহিত ঝান্‌সী হইতে দশ ক্রোশ পর্যন্ত রাজ্ঞীর অনুসরণ করিয়াছিলেন। অবশেষে দেখিলেন অশ্বারোহী লক্ষ্মীবাই চারি জন অনুচরের সহিত গমন করিতেছেন। বহুসৈন্যবেষ্টিত বাউকর এই চারি জন অশ্বারোহী-কর্তৃক এমন আহত হইলেন যে, আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না। এই সময়ে তাঁতিয়া টোপী কতকগুলি সৈন্য লইয়া রানীর রক্ষক হইলেন।

৪ এপ্রিলে ইংরাজরা সমস্ত ঝান্‌সী নগরী অধিকার করিয়া লইল। সৈনিকেরা নগরে দারুণ হত্যা আরম্ভ করিল, কিন্তু নগরবাসীরা কিছুতেই নত হইল না। পাঁচ সহস্রের অধিক লোক ব্রিটিশ বেয়নেটে বিদ্ধ হইয়া নিহত হইল। নগরবাসীরা শত্রুহস্তে আত্মসমর্পণ করা অপমান ভাবিয়া স্বহস্তে মরিতে লাগিল। অসভ্য ইংরাজ সৈনিকেরা স্ত্রীলোকদের প্রতি নিষ্ঠুর অত্যাচার করিবে জানিয়া পৌরজনেরা স্বহস্তে স্ত্রী-কন্যাগণকে বিনষ্ট করিয়া মরিতে লাগিল।

রাও সাহেব পেশোয়া বংশের শেষ বাজিরাওয়ের দ্বিতীয় পোষ্য পুত্র। তিনি, তাঁতিয়া টোপী ও ঝান্‌সীরানী বিক্ষিপ্ত সৈন্যদল সংগ্রহ করিয়া ব্রিটিশদিগকে প্রতিরোধ করিবার জন্য কুঞ্চ নগরে সৈন্য স্থাপন করিলেন। অবিরল কামান বর্ষণ করিয়া হিউ রোজ তাঁহাদের তাড়াইয়া দিল। চারিক্রোশ রানীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাড়না করিয়া সেনাপতি চারিবার ঘোড়ার উপর হইতে মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন।

অবশেষে লক্ষ্মীবাই কাল্পীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার এই শেষ অস্ত্রাগার রক্ষার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিলেন। মনে করিয়াছিলেন রাজপুতেরা যোগ দিবে, কিন্তু তাহারা দিল না। ব্রিটিশ সৈন্যেরা একত্র হইয়া আক্রমণ করিল, অদৃঢ়দুর্গ কাল্পীতে রাজ্ঞীর সৈন্য আর তিষ্ঠিতে পারিল না।

কুঞ্চের পরাজয়ের পর তাঁতিয়া টোপী যে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেলেন কেহ জানিতে পারিল না। তিনি এখন গোয়ালিয়রের বাজারে প্রচ্ছন্নভাবে ইংরাজদের মিত্ররাজা সিন্ধিয়াকে সিংহাসনচ্যুত করিবার ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন। তাঁতিয়া টোপী অধিবাসীদিগকে উত্তেজিত করিতে অনেকটা কৃতকার্য হইলে পর রাজ্ঞীকে সংবাদ দিলেন। রাজ্ঞী গোপালপুর হইতে রাজাকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, তাঁহারা রাজার সহিত শত্রুতা করিতে যাইতেছেন না, তবে কিছু অর্থ ও খাদ্যাদি পাইলেই তাঁহারা দক্ষিণে চলিয়া যাইবেন, রাজা তাহাদের যেন বাধা না দেন, কারণ বাধা দেওয়া অনর্থক। গোয়ালিয়রের লোকেরা ইংরাজ-বিরুদ্ধে উত্তেজিত হইয়াছে। তাঁহারা তাহাদের নিকট হইতে দুইশত আহ্বান-পত্র পাইয়াছেন। কিন্তু ইংরাজভক্ত সিন্ধিয়া তাহাতে অসম্মত হইলেন।

রাও ও রানী দৃঢ়স্বরে তাঁহাদের অনুচরদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'আমরা বোধ হয় নাগরিকদের নিকট হইতে কোনো বাধা প্রাপ্ত হইব না, যদি বা পাই তবে তোমাদের ইচ্ছা হয় তো পলাইয়ো, কিন্তু আমরা মরিতে প্রস্তুত হইয়াছি।'

১ জুনে সিন্ধিয়া ৮০০০ লোক ও ২৪টি কামান লইয়া বিদ্রোহীদিগকে আক্রমণ করিলেন। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে তাঁহার সৈন্যদল ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। সিন্ধিয়া তাঁহার শরীর-রক্ষকদিগকে

যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাইলেন কিন্তু তাহারা হত ও আহত হইল। সিন্ধিয়া অশ্বারোহণে আগ্রার দিকে পলায়ন করিলেন। মহারানীর মাতা 'গুজ্জারাজা' সিন্ধিয়া বিদ্রোহীদের হস্তে বন্দী হইয়াছেন মনে করিয়া, কৃপাণ লইয়া অশ্বারোহণে তাঁহাকে মুক্ত করিতে গেলেন; অবশেষে সিন্ধিয়া পলায়ন করিয়াছেন শুনিয়া নিবৃত্ত হইলেন। ঝান্‌সীরাজ্ঞীর সৈন্যগণ সিন্ধিয়ার রাজকোষ হস্তগত করিল, এবং তাহা হইতে রানী সৈন্যদের ছয় মাসের বেতন চুকাইয়া দিলেন ও নগরবাসীদিগকে পুরস্কার দানে সন্তুষ্ট করিলেন। কিন্তু তাঁতিয়া টোপী ও রাজ্ঞী দুর্গরক্ষার কিছুমাত্র আয়োজন করেন নাই; তাঁহারা প্রকাশ্য ক্ষেত্রেই সৈন্য স্থাপন করিয়াছিলেন; সমুদয় বন্দোবস্ত রানী একাকীই সম্পন্ন করিতেছিলেন। তিনি সৈনিকের বেশ পরিয়া, যে রৌদ্রে ইংরাজ-সেনাপতি চারিবার মূর্ছিত হইয়া পড়েন, সেই রৌদ্রে অপরিশ্রান্ত ভাবে মুহূর্ত বিশ্রাম না করিয়া অশ্বারোহণে এখানে ওখানে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছেন।

সার হিউ রোজ যখন শুনিলেন যে, গোয়ালিয়র শত্রুহস্তগত হইয়াছে, তখন সৈন্যদল সংগ্রহ করিয়া রাজ্ঞী-সৈন্যের দুর্বলভাগ আক্রমণ করিলেন। ঘোরতর যুদ্ধ বাধিল। সেই যুদ্ধের দরুন বিপ্লবের মধ্যে রাজ্ঞী অসি হস্তে ইতস্তত অশ্বচালনা করিতেছেন। রাজ্ঞীর সৈন্যরা ভঙ্গ দিল; বিপক্ষ সৈন্যদের গুলিতে রাজ্ঞী অত্যন্ত আহত হইলেন। তাঁহার অশ্ব সম্মুখে একটি খাত দেখিয়া কোনোমতে উহা উল্লঙ্ঘন করিতে চাহিল না; লক্ষ্মীবাইয়ের স্কন্ধে বিপক্ষের তলবারের আঘাত লাগিল, তথাপি তিনি অশ্বপরিচালনা করিলেন। তাঁহার পার্শ্ববর্তিনী ভগিনীর মস্তকে তলবারের আঘাত লাগিল এবং উভয়ে পাশাপাশি রণক্ষেত্রে পতিত হইলেন। এই ভগিনী যুদ্ধের সময়ে কোনো ক্রমে রাজ্ঞীর পার্শ্ব পরিত্যাগ করেন নাই, অবিশ্রান্ত তাঁহারই সহযোগিতা করিয়া আসিয়াছেন। কেহ কেহ বলে যে, তিনি রাজ্ঞীর ভগিনী নহেন, তিনি তাঁহার স্বামীর উপপত্নী ছিলেন।

ইংরাজি ইতিহাস হইতে আমরা রাজ্ঞীর এইটুকু জীবনী সংগ্রহ করিয়াছি। আমরা নিজে তাঁহার যেরূপ ইতিহাস সংগ্রহ করিয়াছি, তাহা ভবিষ্যতে প্রকাশ করিবার বাসনা রহিল।

ভারতী
অগ্রহায়ণ ১২৮৪

কাজের লোক কে

আজ প্রায় চারশো বৎসর হইল পঞ্জাবে তলবন্দী গ্রামে কালু বলিয়া একজন ক্ষত্রিয় ব্যাবসা-বাণিজ্য করিয়া খাইত। তাহার এক ছেলে নানক। নানক কিছু নিতান্ত ছেলেমানুষ নহে। তাহার বয়স হইয়াছে, এখন কোথায় সে বাপের ব্যাবসা-বাণিজ্যে সাহায্য করিবে তাহা নহে— সে আপনার ভাবনা লইয়া দিন কাটায়, সে ধর্মের কথা লইয়াই থাকে।

কিন্তু বাপের মন টাকার দিকে, ছেলের মন ধর্মের দিকে— সুতরাং বাপের বিশ্বাস হইল এ ছেলেটার দ্বারা পৃথিবীর কোনো কাজ হইবে না। ছেলের দুর্দশার কথা ভাবিয়া কালুর রাত্রে ঘুম হইত না। নানকেরও যে রাত্রে ভালো ঘুম হইত তাহা নহে, তাহারও দিনরাত্রি একটা ভাবনা লাগিয়া ছিল।

বাবা যদিও বলিতেন ছেলের কিছু হইবে না, কিন্তু পাড়ার লোকেরা তাহা বলিত না। তাহার একটা কারণ বোধ করি এই হইবে যে, নানকের ধর্মে মন থাকাতে পাড়ার লোকের বাণিজ্য-ব্যাবসার বিশেষ ক্ষতি হয় নাই। কিন্তু বোধ করি তাহারা, নানকের চেহারা, নানকের ভাব দেখিয়া আশ্চর্য হইয়াছিল। এমন-কি, নানকের নামে একটা গল্প রাষ্ট্র আছে। গল্পটা যে সত্য নয় সে আর কাহাকেও বলিতে হইবে না। তবে, লোকে যেরূপ বলে তাহাই লিখিতেছি। একদিন নানক মাঠে গোরু চরাইতে গিয়া গাছের তলায় ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন। সূর্য অস্ত যাইবার সময় নানকের

মুখে রোদ লাগিতেছিল। শুনা যায় নাকি একটা কালো সাপ নানকের মুখের উপর ফণা ধরিয়া রোদ আড়াল করিয়াছিল। সে দেশের রাজা সে সময়ে পথ দিয়া যাইতেছিলেন, তিনি নাকি স্বচক্ষে এই ঘটনা দেখিয়াছিলেন। কিন্তু আমরা রাজার নিজের মুখে এ কথা শুনি নাই, নানকও কখনো এ গল্প করেন নাই, এবং এমন পরোপকারী সাপের কথাও কখনো শুনি নাই— শুনিলেও বড়ো বিশ্বাস হয় না।

কালু অনেক ভাবিয়া স্থির করিলেন, নানক যদি নিজের হাতে ব্যাবসা আরম্ভ করেন তবে ক্রমে কাজের লোক হইয়া উঠিতে পারেন। এই ভাবিয়া তিনি নানকের হাতে কিছু টাকা দিলেন; বলিয়া দিলেন, 'এক গাঁয়ে নুন কিনিয়া আর-এক গাঁয়ে বিক্রয় করিয়া আইস।' নানক টাকা লইয়া বালসিন্ধু চাকরকে সঙ্গে করিয়া নুন কিনিতে গেলেন। এমন সময়ে পথের মধ্যে কতকগুলি ফকিরের সঙ্গে নানকের দেখা হইল। নানকের মনে বড়ো আনন্দ হইল। তিনি ভাবিলেন, এই ফকিরদের কাছে ধর্মের বিষয় জানিয়া লইবেন। কিন্তু কাছে গিয়া যখন তাহাদিগকে কথা জিজ্ঞাসা করিলেন তখন তাহারা কথার উত্তর দিতে পারে না। তিন দিন তাহারা খাইতে পায় নাই, এমনি দুর্বল হইয়া গিয়াছে যে মুখ দিয়া কথা সরে না। নানকের মনে বড়ো দয়া হইল। তিনি কাতর হইয়া তাঁহার চাকরকে বলিলেন, 'আমার বাপ কিছু লাভের জন্য আমাকে নুনের ব্যাবসা করিতে হুকুম করিয়াছেন। কিন্তু এ লাভের টাকা কতদিনই বা থাকিবে! দুই দিনেই ফুরাইয়া যাইবে। আমার বড়ো ইচ্ছা হইতেছে। এই টাকায় এই গরিবদের দুঃখ মোচন করিয়া যে লাভ চিরদিন থাকিবে সেই পুণ্য লাভ করি।' বালসিন্ধু কাজের লোক ছিল বটে, কিন্তু নানকের কথা শুনিয়া তাহার মন গলিয়া গেল। সে কহিল, 'এ বড়ো ভালো কথা।' নানক তাঁহার ব্যাবসার সমস্ত টাকা ফকিরদের দান করিলেন। তাহার পেট ভরিয়া খাইয়া যখন গায়ে জোর পাইল তখন নানককে ডাকিয়া ঈশ্বরের কথা শুনাইল। তাহারা নানককে বুঝাইয়া দিল, ঈশ্বর কেবল একমাত্র আছেন আর সমস্ত তাঁহারই সৃষ্টি। এই-সকল কথা শুনিয়া নানকের মনে বড়ো আনন্দ হইল।

তাহার পরদিন নানক বাড়ি ফিরিয়া আসিলেন। কালু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কত লাভ করিলে?' নানক বলিল, 'বাবা, আমি গরিবদের খাওয়াইয়াছি। তোমার এমন ধনলাভ হইয়াছে যাহা চিরকাল থাকিবে!' কিন্তু সেরূপ ধনের প্রতি কালুর বড়ো একটা লোভ ছিল না। সুতরাং সে রাগিয়া ছেলেকে মারিতে লাগিল। এমন সময়ে সে প্রদেশের ক্ষুদ্র রাজা পথ দিয়া যাইতেছিলেন। তাঁহার নাম রায়বোলার। নানককে মারিতে দেখিয়া তিনি ঘরে প্রবেশ করিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কী হইয়াছে? এত গোল কেন?' যখন সমস্ত ব্যাপার শুনিলেন তখন তিনি কালুকে খুব করিয়া তিরস্কার করিলেন। বলিলেন, 'আর যদি কখনো নানকের গায়ে হাত তোল তো দেখিতে পাইবে।' এমন-কি, রাজা অত্যন্ত ভক্তির সহিত নানককে প্রণাম করিলেন। লোকে বলে যে, যখন সাপ নানককে ছাতা ধরিয়াছিল তখন রাজা তাহা দেখিয়াছিলেন, এইজন্যই নানকের উপর তাঁহার এত ভক্তি হইয়াছিল। কিন্তু সে সাপের ছাতা-ধরা সমস্তই গুজব; আসল কথা, নানকের সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া রাজা বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে নানক একজন মস্তলোক।

নানকের উপর আর তো মারধোর চলে না। কালু অন্য উপায় দেখিতে লাগিলেন।

জয়রাম নানকের ভগিনীপতি। পাঠান দৌলতখাঁর শস্যের গোলা জয়রামের জিম্মায় ছিল। কালু স্থির করিলেন, নানককেও জয়রামের কাজে লাগাইয়া দিবেন, তাহা হইলে ক্রমে নানক কাজের লোক হইয়া উঠিবেন। নানকের বাপ যখন নানকের কাছে এই প্রস্তাব করিলেন তখন তিনি বলিলেন, 'আচ্ছা।' এই বলিয়া নানক সুলতানপুরে জয়রামের কাছে গিয়া উপস্থিত। সেখানে দিনকতক বেশ কাজ করিতে লাগিলেন। সকলের 'পরেই তাঁহার ভালোবাসা ছিল, এইজন্য সুলতানপুরের সকলেই তাঁহাকে ভালোবাসিতে লাগিল। কিন্তু কাজে মন দিয়া নানক তাঁহার আসল কাজটি ভুলেন নাই। তিনি ঈশ্বরের কথা সর্বদাই ভাবিতেন।

এমন কিছুকাল কাটিয়া গেল। একদিন সকালে নানক একলা বসিয়া ঈশ্বরের ধ্যান

করিতেছেন, এমন সময়ে একজন মুসলমান ফকির আসিয়া তাঁহাকে বলিল, 'নানক, তুমি আজকাল কী লইয়া আছ বলো দেখি। এ-সকল কাজকর্ম ছাড়িয়া দাও। চিরদিনের যথার্থ ধন তাহাই উপার্জনের চেষ্টা করো।' ফকির যাহা বলিলেন তাহার অর্থ এই যে, ধর্ম উপার্জন করো, পরের উপকার করো, পৃথিবীর ভালো করো, ঈশ্বরে মন দাও— টাকা রোজগার করিয়া পেট ভরিয়া খাওয়ার চেয়ে ইহাতে বেশি কাজ দেখে।

ফকিরের এই কথাটা হঠাৎ এমনি নানকের মনে লাগিল যে তিনি চমকিয়া উঠিলেন, ফকিরের মুখের দিকে একবার চাহিয়া দেখিলেন ও মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। মূর্ছা ভাঙিতেই তিনি গরিব লোকদিগকে ডাকিলেন ও শস্য যাহা-কিছু ছিল সমস্ত তাহাদিগকে বিলাইয়া দিলেন। নানক আর ঘরে থাকিতে পারিলেন না; কাজকর্ম সমস্ত ছাড়িয়া দিয়া তিনি পলাইয়া গেলেন।

নানক পলাইলেন বটে কিন্তু অনেক লোক তাঁহার সঙ্গ লইল। যাঁহার ধর্মের দিকে এত টান, এমন মধুর ভাব, এমন মহৎ স্বভাব, তিনি সকলকে ছাড়িলেও তাঁহাকে সকলে ছাড়ে না। মর্দানা তাঁহার সঙ্গে গেল; সে ব্যক্তি বীণা বাজাইত, গান গাহিত। লেনা তাঁহার সঙ্গে গেল। সেই-যে পুরানো চাকর বালসিন্ধু ছেলেবেলায় নানকের সঙ্গে নুন বিক্রয় করিয়া টাকা লাভ করিতে গিয়াছিল আজও সে নানকের সঙ্গে চলিল; এবারেও বোধ করি কিঞ্চিৎ ধনলাভের আশা ছিল, কিন্তু যে-সে ধন নয়, সকল ধনের শ্রেষ্ঠ যে ধন সেই ধর্ম। রামদাসও নানককে ছাড়িতে পারিল না; তাহার বয়স বেশি হইয়াছিল বলিয়া সকলে তাহাকে বলিত বুড্‌ঢা। আর কত নাম করিব, এমন ঢের লোক সঙ্গে গেল।

নানক যথাসাধ্য সকলের উপকার করিয়া সকলকে ধর্মোপদেশ দিয়া দেশে দেশে বেড়াইতে লাগিলেন। হিন্দু মুসলমান সকলকেই তিনি ভালোবাসিতেন। হিন্দুধর্মের যাহা দোষ ছিল তাহাও তিনি বলিতেন, মুসলমান ধর্মের যাহা দোষ ছিল তাহাও তিনি বলিতেন। অথচ হিন্দু মুসলমান সকলেই তাঁহাকে ভক্তি করিত। নানক আমাদের বাংলাদেশেও আসিয়াছিলেন। শিবনাভু বলিয়া কোন্-এক দেশের রাজা নানা লোভ দেখাইয়া নানককে উচ্ছন্ন দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু নানক তাহাতে ভুলিবেন কেন? উল্‌টিয়া রাজাকে তিনি ধর্মের দিকে লওয়াইলেন। মোগল সম্রাট বাবরের সঙ্গে একবার নানকের দেখা হয়। সম্রাট নানকের সাধুভাব দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বিস্তর টাকা পুরস্কার দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু নানক তাহা লইলেন না; তিনি বলিলেন, 'যে জগদীশ্বর সকল লোককে অন্ন দিতেছেন, অনুগ্রহ ও পুরস্কার আমি তাঁহারই কাছ হইতে চাই, আর কাহারো কাছে চাই না।' নানক যখন মক্কায় বেড়াইতে গিয়াছিলেন তখন একদিন তিনি মসজিদের দিকে পা করিয়া ঘুমাইতেছিলেন। তাহাই দেখিয়া একজন মুসলমানের বড়ো রাগ হইল। সে তাঁহাকে জাগাইয়া বলিল, 'তুমি কেমন লোক হে! ঈশ্বরের মন্দিরের দিকে পা করিয়া তুমি ঘুমাইতেছ!' নানক বলিলেন, 'আচ্ছা ভাই, জগতের কোন্ দিকে ঈশ্বরের মন্দির নাই একবার দেখাইয়া দাও।' নানক লোক ভুলাইবার জন্য কোনো আশ্চর্য কৌশল দেখাইয়া কখনো আপনাকে মস্ত লোক বলিয়া প্রচার করিতে চাহেন নাই। গল্প আছে একবার কেহ কেহ তাঁহাকে বলিয়াছিল, 'আচ্ছা, তুমি যে একজন মস্ত সাধু, আমাদিগকে একটা কোনো আশ্চর্য অলৌকিক ঘটনা দেখাও দেখি।' নানক বলিলেন, 'তোমাদিগকে দেখাইবার যোগ্য আমি কিছুই জানি না। আমি কেবল পবিত্র ধর্মের কথা জানি, আর কিছুই জানি না। ঈশ্বর সত্য, আর সমস্ত অস্থায়ী।'

নানক অনেক দেশ-বিদেশ ভ্রমণ করিয়া দেশে ফিরিয়া আসিয়া গৃহস্থ হইলেন। গৃহে থাকিয়া তিনি সকলকে ধর্মোপদেশ দিতেন। তিনি কোরান পুরাণ কিছুই মানিতেন না। তিনি সকলকে ডাকিয়া বলিতেন, এক ঈশ্বরকে পূজা করো, ধর্মে মন দাও, অন্য সকলের দোষ মার্জনা করো, সকলকে ভালোবাসো। এইরূপ সমস্ত জীবন ধর্মপথে থাকিয়া সকলকে ধর্মোপদেশ দিয়া সত্তর বৎসর বয়সে নানকের মৃত্যু হয়।

কালু বেশি কাজের লোক ছিল কি কালুর ছেলে নানক বেশি কাজের লোক ছিল আজ

তাহার হিসাব করিয়া দেখো দেখি। আজ যে শিখ জাতি দেখিতেছ, যাহাদের সুন্দর আকৃতি, মহৎ মুখশ্রী, বিপুল বল, অসীম সাহস দেখিয়া আশ্চর্য বোধ হয়, এই শিখ জাতি নানকের শিষ্য। নানকের পূর্বে এই শিখ জাতি ছিল না। নানকের মহৎ ভাব ও ধর্মবল পাইয়া এমন একটি মহৎ জাতি উৎপন্ন হইয়াছে। নানকের ধর্মশিক্ষার প্রভাবেই ইহাদের হৃদয়ের তেজ বাড়িয়াছে, ইহাদের শির উন্নত হইয়াছে, ইহাদের চরিত্রে ও ইহাদের মুখে মহৎ ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। কালু যে টাকা রোজগার করিয়াছিল নিজের উদরেই তাহা খরচ করিয়াছে, আর নানক যে ধর্মধন উপার্জন করিয়াছিলেন আজ চারশো বৎসর ধরিয়া মানবেরা তাহা ভোগ করিতেছে। কে বেশি কাজ করিয়াছে।

বালক
বৈশাখ ১২৯২

গুটিকত গল্প

১

নেপোলিয়ন বোনাপার্টের নাম তোমরা সকলেই শুনিয়াছ। তিনি এক সময়ে ইংরাজের দেশ আক্রমণ করিবেন স্থির করিয়াছিলেন। যখন যুদ্ধের উদ্‌যোগ চলিতেছে তখন কী-গতিকে একজন ইংরাজি জাহাজের গোরা ফরাসি সৈন্যদের কাছে ধরা পড়ে। শত্রুপক্ষের লোক দেখিয়া ফরাসিরা তাহাকে নিজের দেশে ধরিয়া আনিয়া সমুদ্রের ধারে ছাড়িয়া দেয়। সে বেচারা একা একা সমুদ্রের ধারে ঘুরিয়া বেড়াইত। দেশে ফিরিবার জন্য তাহার প্রাণ কাঁদিত। সমুদ্রের পরপারেই তার স্বদেশ। সে সমুদ্রও কিছু বেশি বড়ো নয়। এমন-কি, এক-এক দিন হয়তো মেঘ কাটিয়া গেলে রোদ উঠিলে ইংলন্ডের সাদা সাদা পাহাড়ের রেখা নীল-সমুদ্রের উপর মেঘের মতো দেখা যাইত। সে আকাশে চাহিয়া দেখিত, গরমির দিনে কত ছোটো ছোটো পাখি পাখা তুলিয়া ইংলন্ডের দিকে উড়িয়া যাইতেছে।

একদিন রাত্রে ঝড় হইয়া গেলে পর সকালে উঠিয়া দেখে একটি পিপে সমুদ্রের ঢেউয়ে ডাঙার দিকে ভাসিয়া আসিতেছে। সেই পিপেটি লইয়া সে একটি পাহাড়ের গর্তের মধ্যে লুকাইয়া রাখিল। সমস্তদিন ধরিয়া বসিয়া বসিয়া সেই পিপেটি ভাঙিয়া সে নৌকা বানাইত। কিন্তু সে গরিব— নৌকা বানাইবার সরঞ্জাম কোথায় পাইবে? সে সেই ভাঙা পিপের কাঠের চারি দিকে নরম গাছের ডাল বুনিয়া একপ্রকার নৌকার মতো গড়িয়া তুলিল। দেশের জন্য এমনি তাহার প্রাণ আকুল হইয়াছে যে সে একবার বিবেচনা করিল না যে এ নৌকা সমুদ্রের জলে একদণ্ড টিকিতে পারিবে না। যাহা হউক, সেই নৌকাটি লইয়া যখন সে সমুদ্রে ভাসাইতেছে, এমন সময় ফরাসি সৈন্যেরা তাহাকে দেখিতে পাইল। ফরাসিরা তাহাকে ধরিল। বেচারার এত কষ্টের নৌকা ভাসানো হইল না— এতদিনের আশা নির্মূল হইল।

এই কথা কী করিয়া নেপোলিয়নের কানে উঠিল। নেপোলিয়ন সমুদ্রের ধারে গিয়া সমস্ত দেখিলেন। তিনি সেই ইংরাজ বালককে বলিলেন— 'তোমার এ কী রকম সাহস। এই খানকতক কাঠ আর গাছের ডাল বেঁধে তুমি সমুদ্র পার হতে চাও। দেশে তোমার কেই বা আছে।'

সেই ইংরাজ বলিল— 'আমার মা আছে। আমার মাকে অনেক দিন দেখি নাই, মাকে দেখিবার জন্য আমার প্রাণ বড়ো ব্যাকুল হইয়াছে।' বলিতে বলিতে তাহার চোখ ছলছল করিয়া আসিল।

নেপোলিয়ন তৎক্ষণাৎ বলিলেন— 'আচ্ছা— মায়ের সঙ্গে তোমার দেখা হবে, আমি দেখা করিয়ে দেব। যে ছেলে এমন সাহসী তাহার মা না-জানি কত মহৎ।'

নেপোলিয়ন তাহাকে একটি মোহর দিলেন— এবং নিজের জাহাজে করিয়া তাহাকে ইংলণ্ডে পাঠাইয়া দিলেন। দুঃখে পড়িলেও সেই মোহরটি সে কখনো ভাঙায় নাই, নেপোলিয়নের দয়া মনে রাখিবার জন্য সেই মোহরটি সে চিরদিন কাছে রাখিয়াছিল।

২

একশো বৎসরেরও অধিক হইল একদিন জর্মনির একটি ছোটো প্রদেশের চার্লস্ নামে এক রাজা আহার করিয়া উঠিয়া আসিতেছেন এমন সময়ে শুনিতে পাইলেন তাঁহার রাজবাটির সম্মুখে একদল লোক জমা হইয়াছে। বাটির বাহিরে আসিয়া দেখিলেন একদল ছেলে। কী, ব্যাপারটা কী? রাজার নিকট একটি নিবেদন আছে। রাজার সহিসের ছেলে ডানেকর, পায়ে জুতা নাই, গায়ে ময়লা কাপড়— সে অগ্রসর হইয়া আপনাদের প্রার্থনা রাজাকে জানাইল। রাজার একটি স্কুল আছে, কেবল তাঁহার সৈন্যেরা সেই স্কুলে পড়ে। সম্প্রতি শুনা গেছে রাজা নিয়ম করিয়াছেন অন্য ছেলেরাও সেখানে পড়িতে পাইবে, তাই শুনিয়া রাজার সেই স্কুলে ভর্তি হইবার জন্য ইহারা প্রার্থনা করিতে আসিয়াছে।

সহিসের ছেলে ডানেকর ছবি আঁকিতে বড়ো ভালোবাসিত। সে মাটিতে দেয়ালে যেখানে পাইত খড়ি দিয়া নানারকম ছবি আঁকিত। সে জানিত রাজার স্কুলে ছবি আঁকা শিখানো হয়। তাই যখন সে শুনিল রাজার স্কুলে সকলেই যাইতে পারে তখন ভারি খুশি হইয়া সেই স্কুলে ভর্তি হইবার জন্য বাপের কাছে প্রস্তাব করে। বাপ চটিয়া গরম হইয়া উঠিল— বলিল, 'তুমি নিজের কাজে মন দাও তো বাপু। লেখাপড়া শিখিতে হইবে না!' এই বলিয়া তাহাকে মারিয়া ঘরে চাবিবন্ধ করিয়া রাখিল। ডানেকর জানালার মধ্য দিয়া গলিয়া আপনার সমবয়সী একদল ছোটো ছেলে জুটাইয়া স্বয়ং রাজার দুয়ারে আসিয়া উপস্থিত। রাজা সন্তুষ্ট হইয়া ডানেকরকে স্কুলে পাঠাইতে রাজি হইলেন। ডানেকরের বাপ দেখিল ছেলে স্কুলে গেলে আস্তাবলের কাজের কিছু অসুবিধা হইবে— ভারি বিরক্ত হইয়া মারধোর করিয়া ছেলেকে বাড়ি হইতে দূর করিয়া দিল। কিন্তু ছেলের মা গুটিকতক গায়ের কাপড় পুঁটুলিতে বাঁধিয়া তাহার সঙ্গে দিলেন— এবং খানিক রাস্তা তাহার সঙ্গে গিয়া ছেলের কল্যাণের জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিয়া কাঁদিয়া ফিরিয়া আসিলেন।

ডানেকর গরিব— এইজন্য স্কুলে তাহাকে কেহ গ্রাহ্য করিত না। সেখানে তাহাকে উঠান ঝাঁট দিতে হইত, চাকরের কাজ করিতে হইত। বোধ করি যত্ন করিয়া তাহাকে কেহ শিখাইত না— অনেক সময়ে ডানেকর লুকাইয়া গোপনে শিক্ষা করিত। স্কুলে ছবি-আঁকা শেখা ফুরাইলে পর, আরও বেশি করিয়া শিখিবার জন্য ডানেকর পায়ে হাঁটিয়া দেশে বিদেশে ভ্রমণ করেন। এমনি করিয়া প্রায় কুড়ি-পঁচিশ বৎসর কাটিয়া গেল।

এখন এই ডানেকরের নাম য়ুরোপে সকল জায়গায় বিখ্যাত। ডানেকরের মতো পাথরের মূর্তি গড়িতে কয়জন লোক পারে! যে রাজার স্কুলে তিনি পড়িতে অনুমতি পাইয়াছিলেন, সেই রাজার নাম আজ আর বড়ো কাহারো মনে পড়ে না, কিন্তু সেই রাজার একজন সহিসের ছেলের নাম য়ুরোপের দেশে দেশে রাষ্ট্র হইতেছে!

৩

মাড়োয়ারের রাজপুত রাজা যশোবন্ত দিল্লির বাদশা আরঙ্গজীবের একজন সেনাপতি ছিলেন। তাঁহার অধীনে নহর খাঁ নামক এক হিন্দু রাজপুত বীর ছিলেন। নহর খাঁ বলিয়া তাহাকে সকলে ডাকিত বটে কিন্তু তাঁহার আসল নাম ছিল মুকুন্দদাস। এক সময়ে তিনি বাদশাকে অমান্য করাতে বাদশা তাঁহার উপর চটিয়া যান। বাদশা হুকুম দিলেন— 'কোনো প্রকার অস্ত্র না লইয়া মুকুন্দকে একটা বাঘের খাঁচার মধ্যে গিয়া বাঘের সঙ্গে লড়াই করিতে হইবে।' মুকুন্দ বলিলেন, 'আচ্ছা,

তাহাই হইবে।' নির্ভয়ে খাঁচার মধ্যে প্রবেশ করিয়া তিনি বাঘকে ডাকিয়া বলিলেন— 'ওহে তুমি তো মিঞা সাহেবের বাঘ, একবার যশোবন্তের বাঘের কাছে এসো দেখি!' এই বলিয়া চোখ রাঙাইয়া তিনি বাঘের দিকে চাহিলেন। হঠাৎ কী কারণে বাঘের এমনি ভয় হইল যে, সে মুখ ফিরাইয়া লেজ গুটাইয়া সুড়সুড় করিয়া কোণে চলিয়া গেল। রাজপুত বীর কহিলেন, 'যে-শত্রু ভয়ে পালায় তাহাকে তো আমরা মারিতে পারি না। তাহা আমাদের ধর্মবিরুদ্ধ।' এই আশ্চর্য ঘটনা দেখিয়া বাদশা তাঁহাকে পুরস্কার দিয়া ছাড়িয়া দিলেন।

বাঘেরা অত্যন্ত ভয়ানক জানোয়ার বটে কিন্তু এক-এক সময়ে তাহারা হঠাৎ অত্যন্ত সামান্য কারণে কেমন ভয় পায়। একটা গল্প বোধ করি তোমরা সকলে শুনিয়া থাকিবে— একদল ইংরাজ সুন্দরবনে শিকার করিতে গিয়াছিলেন। যখন আহারের সময় হইল, বনের মধ্যে আসন পাতিয়া সকলে আহারে বসিয়া গেলেন। এমন সময়ে জঙ্গলের ভিতর হইতে একটা বাঘ লাফ দিয়া তাঁহাদের কাছে আসিয়া পড়িল। বাঘ দেখিয়া একটি মেমসাহেব তাড়াতাড়ি ছাতা খুলিয়া তাহার মুখের সামনে ধরিলেন। হঠাৎ অদ্ভুত একটা ছাতা-খোলার ব্যাপার দেখিয়া বাঘের এমনি ভয় লাগিল যে সেখানে অধিকক্ষণ থাকা সে ভালো বোধ করিল না, চটপট ঘরে ফিরিয়া গেল। এমন শোনা যায় বাঘের চোখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিলে বাঘ আক্রমণ করিতে সাহস করে না। এটা লোকের মুখে শোনা কথা। কথাটার সত্যমিথ্যা ঠিক বলিতে পারি না। নিজে পরখ করিয়া যে বলিব এমন সুবিধাও নাই সাধও নাই। পরখ করিতে গেলে ফিরিয়া আসিয়া বলিবার সাবকাশ না থাকিতে পারে।

নহর খাঁর আর-একটা গল্প বলি। রাজপুতদের একপ্রকার খেলা আছে। ঘোড়ায় চড়িয়া একটা গাছের নীচে দিয়া ঘোড়া ছুটাইয়া দিতে হয়। ঘোড়া যখন ছুটিতেছে তখন গাছের ডাল ধরিয়া ঝুলিতে হয়, ঘোড়া পায়ের নীচে দিয়া চলিয়া যায়। বাদশাহের এক ছেলে একবার নহর খাঁকে এই খেলা খেলিতে হুকুম করেন। নহর রাগিয়া উঠিয়া বলিলেন, 'আমি তো আর বাঁদর নই। রাজা যদি খেলা দেখিতে ইচ্ছা করেন তো লড়াই করিতে হুকুম দিন একবার তলোয়ারের খেলাটা দেখাইয়া দিই।' বাদশার পুত্র বলিলেন— 'আচ্ছা, তুমি সৈন্য লইয়া সিরোহীর রাজা সুরতানকে ধরিয়া লইয়া আইস।' নহর রাজি হইলেন। সিরোহীর রাজা অচলগড় নামক তাঁর এক পর্বতের দুর্গের মধ্যে লুকাইয়া রহিলেন। নহর বাছা-বাছা একদল লোক লইয়া গভীর রাত্রে গোপনে দুর্গের মধ্যে গিয়া রাজাকে নিজের পাগড়ির কাপড়ে বাঁধিয়া ফেলিলেন। রাজাকে এইরূপে বন্দী করিয়া নহর তাঁহাকে দিল্লীতে নিজের প্রভু যশোবন্ত সিংহের নিকট আনিয়া দিলেন। যশোবন্ত সুরতানকে বাদশার সভায় লইয়া যাইবেন স্থির করিলেন এবং সেইসঙ্গে কথা দিলেন যে বাদশাহের সভায় কেহ তাঁহাকে কোনোরূপ অপমান করিতে পারিবে না। সিরোহীর রাজাকে আরঙ্জীবের সভায় লইয়া যাওয়া হইল। দস্তুর আছে যে বাদশাহের সভায় গেলে বাদশাহকে সকলেরই নত হইয়া সেলাম করিতে হয়। সেই দস্তুর অনুসারে সকলে সুরতানকে সেলাম করিতে বলিল। তিনি সদর্পে মাথা তুলিয়া বলিলেন— 'আমার প্রাণ বাদশাহের হাতে— কিন্তু আমার মান আমার নিজের হাতে। কখনো কোনো মানুষের কাছে মাথা নোয়াই নাই কখনো নোয়াইব না।' সভার লোকেরা আশ্চর্য হইয়া গেল। কিন্তু যশোবন্তের প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া কেহ তাঁহাকে কিছু বলিল না। তাহারা একটা কৌশল করিল। একটি ছোটো দরজার মতো ছিল তাহার মধ্য দিয়া গলিতে হইলে মাথা নীচু না করিলে চলে না— সেই দরজার ভিতর দিয়া তাঁহাকে বাদশাহের সম্মুখে যাইতে বলিল। কিন্তু পাছে মাথা হেঁট হয় বলিয়া তিনি আগে পা গলাইয়া দিয়া মাথা বাহির করিয়া আনিলেন। বাদশাহ রাজার এই নির্ভীকতায় রাগ না করিয়া সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, 'তুমি কোন্ রাজ্য পুরস্কার চাও আমি দিব।' রাজা তৎক্ষণাৎ বলিলেন, 'আমার অচলগড়ের মতো রাজ্য আর কোথায় আছে, সেইখানেই আমাকে ফিরিয়া যাইতে দিন।' বাদশাহ সন্তুষ্ট হইয়া তাহাই অনুমতি করিলেন। এই রাজা এবং রাজবংশ চিরদিন আপনাদের স্বাধীনতা

রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। কখনোই মোগল সম্রাটদের দাস হন নাই। যিনি বন্দী অবস্থাতেও নিজের মান রাখিয়া চলিতে পারেন তাঁহাকে দমন করিতে পারে কে?

বালক
বৈশাখ ১২৯২

আকবর শাহের উদারতা

একজন প্রাচীন ইংরাজ ভ্রমণকারী আকবর বাদশাহের উদারতা সম্বন্ধে একটি গল্প করিয়াছেন তাহা নিম্নে লিখিতেছি।

আকবর শাহের মাতৃভক্তি অত্যন্ত প্রবল ছিল। এমন-কি, এক সময়ে যখন তাঁহার মা পালকি চড়িয়া লাহোর হইতে আগ্রায় যাইতেছিলেন, তখন আকবর এবং তাঁহার দেখাদেখি অন্যান্য বড়ো বড়ো ওমরাওগণ নিজের কাঁধে পালকি লইয়া তাঁহাকে নদী পার করিয়াছিলেন। সম্রাটের মা সম্রাটকে যাহা বলিতেন তিনি তাহাই পালন করিতেন। কেবল আকবর শা মায়ের একটি আজ্ঞা পালন করেন নাই। সম্রাটের মা সংবাদ পাইয়াছিলেন যে পর্টুগিজ নাবিকগণ একটি মুসলমান জাহাজ লুঠ করিয়া একখণ্ড কোরান গ্রন্থ পাইয়াছিল, তাহারা সেই গ্রন্থ একটি কুকুরের গলায় বাঁধিয়া বাজনা বাজাইয়া অর্মজ শহর প্রদক্ষিণ করিয়াছিল। এই সংবাদে ক্রুদ্ধ হইয়া সম্রাটমাতা আকবরকে অনুরোধ করিয়াছিলেন যে একখণ্ড বাইবেল গাধার গলায় বাঁধিয়া আগ্রা শহর ঘোরানো হউক। সম্রাট তাহার উত্তরে বলিয়াছিলেন— 'যে কার্য একদল পর্টুগালবাসীর পক্ষেই নিন্দনীয় সে কার্য একজন সম্রাটের পক্ষে অত্যন্ত গর্হিত সন্দেহ নাই। কোনো ধর্মের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করিলে ঈশ্বরের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করা হয়। অতএব আমি একখানা নিরীহ গ্রন্থের উপর দিয়া প্রতিশোধস্পৃহা চরিতার্থ করিতে পারিব না।'

বালক
আষাঢ় ১২৯২

ন্যায় ধর্ম

প্রুসিয়ার 'মহৎ' উপাধিপ্রাপ্ত ফ্রেড্‌রিক সম্রাট রাজধানী হইতে কিছু দূরে একটি বাগানবাড়ি নির্মাণের সংকল্প করিয়াছিলেন। যখন সমস্ত বন্দোবস্ত স্থির হইয়া গেল তখন শুনিতে পাইলেন যে, একজন কৃষকের একটি শস্য চূর্ণ করিবার জাঁতাকলগৃহ মাঝে পড়াতে তাঁহার বাগান সম্পূর্ণ হইতে পারিতেছে না। বিস্তর টাকার প্রলোভনেও কৃষক তাহার গৃহ উঠাইয়া লইতে রাজি হয় নাই শুনিয়া সম্রাট কৃষককে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন— 'তুমি এত টাকা পাইতেছ তবু কেন ঘর ছাড়িতেছ না?' কৃষক উত্তর করিল— 'ইহা আমার পৈতৃক গৃহ। ওইখানেই আমার পিতা তাঁহার জীবন নির্বাহ করিয়াছেন ও মরিয়াছেন, এবং ওইখানেই আমার পুত্রের জন্ম হইয়াছে, আমি উহা বেচিতে পারিব না।'

সম্রাট কহিলেন, 'আমি ওই স্থানে আমার প্রাসাদ নির্মাণ করিতে চাহি।'

কৃষক কহিল, 'মহারাজ বোধ করি বিস্মৃত হইয়াছেন যে, ওই জাঁতাকলের ঘর আমার প্রাসাদ।'

সম্রাট কহিলেন—'তুমি যদি বিক্রয় না কর তো ওই গৃহ আমি কাড়িয়া লইতে পারি।'

কৃষক কহিল, 'না, পারেন না। বার্লিন নগরে বিচারক আছে।'

এই কথা শুনিয়া সম্রাট কৃষকের ঘরে আর হস্তক্ষেপ করিলেন না। তিনি ভাবিলেন রাজারা

আইন গড়িতে পারেন কিন্তু আইন ভাঙিতে পারেন না। কৃষকের সেই জাঁতাকল আজ পর্যন্ত সম্রাটের উদ্যানে রহিয়াছে।

গুজরাটের রানীর সম্বন্ধে এইরূপ আর-একটি গল্প প্রচলিত আছে। বহু পূর্বের কথা। তখন গুজরাট সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিল। রানীর নাম মীনল দেবী। তাঁহার রাজত্বকালে ধোলকা গ্রামে তিনি 'মীনলতলাও' নামে একটি পুষ্করিণী খনন করাইতেছিলেন। ওই পুষ্করিণীর পূর্ব দিকে একটি দুশ্চরিত্রা রমণীর বাসগৃহ ছিল। সেই গৃহ থাকাতে পুষ্করিণীর আয়তনসামঞ্জস্যের ব্যাঘাত হইতেছিল। রানী অনেক অর্থ দিয়া সেই ঘর ক্রয় করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু গৃহকর্ত্রী মনে করিল, পুষ্করিণী খনন করাইয়া রানী যেরূপ কীর্তিলাভ করিবেন, পুষ্করিণী খননের ব্যাঘাত করিয়া আমারও তেমনি একটা নাম থাকিয়া যাইবে। এই বলিয়া সে গৃহ বিক্রয় করিতে অসম্মত হইল। রানী কিছুমাত্র বলপ্রয়োগ করিলেন না। গৃহ সেইখানেই রহিল। আজিও মীনলতলাওয়ের পূর্ব দিকের সীমা অসমান রহিয়াছে। সেই অবধি উক্ত প্রদেশে একটি প্রবাদ প্রচলিত হইয়াছে যে, 'ন্যায় ধর্ম দেখিতে চাও তো মীনলতলাও যাও।'

বালক
শ্রাবণ ১২৯২

বীর গুরু

বনের একটা গাছে আগুন লাগিলে অন্যান্য যে-সকল গাছে উত্তাপ প্রচ্ছন্ন ছিল সেগুলাও যেমন আগুন হইয়া উঠে, তেমনি যে জাতির মধ্যে একজন বড়োলোক উঠে, সে জাতির মধ্যে দেখিতে দেখিতে মহত্ত্বের শিখা ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে, তাহার গতি আর কেহই রোধ করিতে পারে না।

নানক যে মহত্ত্ব লইয়া জন্মিয়াছিলেন সে তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই নিবিয়া গেল না। তিনি যে ধর্মের সংগীত, যে আনন্দ ও আশার গান গাহিলেন, তাহা ধ্বনিত হইতে লাগিল। কত নূতন নূতন গুরু জাগিয়া উঠিয়া শিখদিগকে মহত্ত্বের পথে অগ্রসর করিতে লাগিলেন।

তখনকার যথেচ্ছাচারী মুসলমান রাজারা অনেক অত্যাচার করিলেন, কিন্তু নবধর্মোৎসাহে দীপ্ত শিখ জাতির উন্নতির পথে বাধা দিতে পারিলেন না। বাধা ও অত্যাচার পাইয়া শিখেরা কেমন করিয়া বীর জাতি হইয়া উঠিল তাহার গল্প বলি শুন।

নানকের পর পঞ্জাবে আট জন গুরু জন্মিয়াছেন, আট জন গুরু মরিয়াছেন, নবম গুরুর নাম তেগ্‌বাহাদুর। আমরা যে সময়কার কথা বলিতেছি তখন নিষ্ঠুর আরঞ্জীব দিল্লীর সম্রাট ছিলেন। রামরায় বলিয়া তেগ্‌বাহাদুরের একজন শত্রু সম্রাটের সভায় বাস করিত। তাহারই কথা শুনিয়া সম্রাট তেগ্‌বাহাদুরের উপরে ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহাকে ডাকিতে পাঠাইয়াছেন।

আরঞ্জীবের লোক যখন তেগ্‌বাহাদুরকে ডাকিতে আসিল তখন তিনি বুঝিলেন যে তাঁহার আর রক্ষা নাই। যাইবার সময়ে তিনি তাঁহার ছেলেকে কাছে ডাকিলেন। ছেলের নাম গোবিন্দ, তাহার বয়স চোদ্দ বৎসর। পূর্বপুরুষের তলোয়ার গোবিন্দের কোমরে বাঁধিয়া দিয়া তাহাকে বলিলেন, 'তুমিই শিখেদের গুরু হইলে। সম্রাটের আদেশে ঘাতক আমাকে যদি বধ করে তো আমার শরীরটা যেন শেয়াল-কুকুরে না খায়। আর এই অন্যায় অত্যাচারের বিচার তুমি করিয়ো, ইহার প্রতিশোধ তুমি লইয়ো।' বলিয়া তিনি দিল্লী চলিয়া গেলেন।

রাজসভায় তাঁহাকে তাঁহার গোপনীয় কথা সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন করা হইল। কেহ বা বলিল, 'আচ্ছা, তুমি যে মস্ত লোক তাহার প্রমাণস্বরূপ একটা অলৌকিক কারখানা দেখাও দেখি!' তেগ্‌বাহাদুর বলিলেন, 'সে তো আমার কাজ নহে। মানুষের কর্তব্য ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইয়া থাকা। তবে তোমাদের অনুরোধে আমি একটা অদ্ভুত ব্যাপার দেখাইতে পারি। একটা কাগজে

মন্ত্র লিখিয়া ঘাড়ে রাখিয়া দিব, সে ঘাড় তলোয়ারে বিচ্ছিন্ন হইবে না।' এই বলিয়া মন্ত্র-লেখা কাগজ ঘাড়ে রাখিয়া তিনি ঘাড় পাতিয়া দিলেন। ঘাতক তরবারি উঠাইয়া আঘাত করিলে মাথা বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। কাগজ তুলিয়া লইয়া সকলে দেখিল, তাহাতে লেখা আছে, 'শির দিয়া, সির নেহি দিয়া।' অর্থাৎ মাথা দিলাম, গুপ্তকথা দিলাম না।' এইরূপে মাথা দিয়া তেগ্‌বাহাদুর রাজসভার প্রশ্নের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন।

বালক গোবিন্দের মনে বড়ো আঘাত লাগিল। মুসলমানদের যথেচ্ছাচার নিবারণ করিবেন এই তাঁহার সংকল্প হইল। কিন্তু তাড়াতাড়ি করিলে তো কিছুই হয় না; এখনও সুসময়ের জন্যে ধৈর্য ধরিয়া অপেক্ষা করিতে হইবে, আয়োজন করিতে হইবে, বহুদিন অবিশ্রাম চিন্তা করিয়া মনে মনে সমস্ত সংকল্প গড়িয়া তুলিতে হইবে, তবে যদি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। যাহারা দুই দিনেই দেশের উপকার করিয়া সমস্ত চুকাইয়া দিতে চায়, যাহাদের ধৈর্য নাই, যাহারা অপেক্ষা করিতে জানে না, তাহাদের তড়িঘড়ি কাজ ও আড়ম্বর দেখিয়া লোকের চমক লাগিয়া যায়, কিন্তু তাহারা বড়ো লোক নহে, তাহাদের কাজ স্থায়ী হয় না। তাহারা তাহাদের উদ্দেশ্যের জন্য সমস্ত জীবন দিতে চাহে না, জীবনের গোটাকতক দিন দিতে চাহে মাত্র, অথচ তাড়াতাড়ি বড়ো লোক বলিয়া খুব একটা প্রশংসা পাইতে চাহে। গোবিন্দ সেরূপ লোক ছিলেন না। তিনি প্রায় কুড়ি বৎসর ধরিয়া যমুনাতীরের ছোটো ছোটো পাহাড়ের মধ্যে বিজনে পারস্যভাষা-শিক্ষা ও শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন; বাঘ ও বন্য শূকর শিকার করিয়া এবং মনে মনে আপনার সংকল্প স্থির করিয়া অবসরের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন।

গুরু গোবিন্দের শিষ্যেরা তাঁহার চারি দিকে জড়ো হইতে লাগিল। সমস্ত শিখজাতিকে একত্রে আহ্বান করিবার জন্য তিনি চারি দিকে তাঁহার শিষ্যদিগকে পাঠাইয়া দিলেন। এইরূপে সমস্ত পঞ্জাব হইতে বিস্তর লোক আসিয়া তাঁহাকে চারি দিকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। তিনি তাহাদিগকে আহ্বান করিয়া বলিতে লাগিলেন, দেব-দৈত্য সকলেই নিজের উপাসনা প্রচলিত করিতে চায়; গোরখনাথ রামানন্দ প্রভৃতি ধর্মমতের প্রবর্তকেরা নিজের নিজের এক-একটা পন্থা বাহির করিয়া গিয়াছেন। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিবার সময়ে মহম্মদ নিজের নাম উচ্চারণ করিতে আদেশ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তিনি, গোবিন্দ, ধর্মপ্রচার, পুণ্যের জয়-বিস্তার ও পাপের বিনাশ-সাধনের জন্য আসিয়াছেন। অন্যান্য মানুষও যেমন তিনিও তেমনি একজন; তিনি পিতা পরমেশ্বরের দাস; এই পরমাশ্চর্য জগতের একজন দর্শক মাত্র; তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া যে পূজা করিবে নরকে তাহার গতি হইবে। কোরান পুরাণ পাঠ করিয়া, প্রতিমা বা মৃত ব্যক্তির পূজা করিয়া, ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। শাস্ত্রে বা কোনো প্রকার পূজার কৌশলে ঈশ্বর মিলে না। বিনয়ে ও ভক্তিতে ঈশ্বরকে পাওয়া যায়।

তিনি বলিলেন, 'আজ হইতে সমস্ত লোক এক হইয়া গেল। উচ্চ-নীচের প্রভেদ রহিল না। জাতিভেদ উঠিয়া গেল। সকলে অত্যাচারী তুর্ক জাতির বিনাশের ব্রত গ্রহণ করিলাম।'

জাতিভেদ উঠিয়া গেল শুনিয়া ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়দের অনেকে অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিল, অনেকে রাগ করিয়া চলিয়া গেল। গোবিন্দ বলিলেন, 'যাহারা নীচে আছে তাহাদিগকে উঠাইব, যাহাদিগকে সকলে ঘৃণা করে তাহারা আমার পাশে স্থান পাইবে।' ইহা শুনিয়া নীচজাতির লোকেরা অত্যন্ত আনন্দ করিতে লাগিল। এই সময়ে গোবিন্দ সমস্ত শিখ জাতিকে সিংহ উপাধি দিলেন। কুড়ি হাজার লোক গোবিন্দের দলে রহিল।

এইরূপে গোবিন্দ শিখ জাতিকে নূতন উৎসাহে দীপ্ত করিয়া ধনমানের আশা বিসর্জন করিয়া নিজের সংকল্প-সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। গোবিন্দের যদি মনের আশা থাকিত তাহা হইলে তিনি অনায়াসে আপনাকে দেবতা বলিয়া চালাইতে পারিতেন, কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই। ধনের প্রতি গোবিন্দের বিরাগ সম্বন্ধে একটা গল্প আছে বলি। গোবিন্দের একজন ধনী শিষ্য তাঁহাকে পঞ্চাশ হাজার টাকার মূল্যের একজোড়া বলয় উপহার দিয়াছিল। গোবিন্দ তাহার মধ্য হইতে

একটি বলয় লইয়া নদীর জলে ফেলিয়া দিলেন। দৈবাৎ পড়িয়া গেছে মনে করিয়া একজন শিখ পাঁচ শত টাকা পুরস্কারের লোভ দেখাইয়া একজন ডুবারিকে সেই বলয় খুঁজিয়া আনিতে অনুরোধ করিল। সে বলিল, 'আমি খুঁজিয়া আনিতে পারি, যদি আমাকে ঠিক জায়গাটা দেখাইয়া দেওয়া হয়।' শিখ গোবিন্দকে ডাকিয়া আনিয়া জিজ্ঞাসা করিল, বালা কোন্‌খানে পড়িয়া গেছে। গোবিন্দ অবশিষ্ট বালাটি লইয়া জলে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া বলিলেন, 'ওইখানে।' শিখ তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া আর খুঁজিল না।

হিমালয়ের ক্ষুদ্র পার্বত্য রাজাদের সঙ্গে গুরু গোবিন্দের এক যুদ্ধ হয়, তাহাতে গোবিন্দের জয় হয়। মুখোয়াল-নামক স্থানে থাকিয়া গোবিন্দ চারিটি নূতন দুর্গ নির্মাণ করিলেন। দুই বৎসর যুদ্ধ-বিগ্রহ করিয়া চারি দিকের অনেক দেশ জয় ও অধিকার করিলেন। পর্বতের রাজারা ইহাতে ভয় পাইয়া দিল্লীর সম্রাটের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়া এক দরখাস্ত পাঠাইয়া দিল। জবর্দস্ত খাঁ ও শম্‌স্‌ খাঁ নামক দুই আমীরকে সম্রাট পার্বত্য রাজাদের সাহায্যে নিয়োগ করিলেন। এইরূপে দুই মুসলমান আমীর এবং পর্বতের রাজারা একত্র হইয়া মুখোয়াল দুর্গ ঘিরিয়া ফেলিল। দুর্গের বাহিরে সাত মাস ধরিয়া ক্রমাগত যুদ্ধ চলিল। অবশেষে গোবিন্দ তাঁহার দুর্গের ভিতর প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তাঁহার আহার ফুরাইয়া গেল। তাহা ছাড়া গোবিন্দের অনুচরেরা তাঁহাকে ছাড়িয়া যাইবে বলিয়া স্থির করিয়াছে। এ দিকে তাঁহার মা গুজরী একদিন রাত্রে গোবিন্দের দুটি ছেলে লইয়া পলাইয়া গেলেন। কিন্তু ছেলে দুটিকে রক্ষা করিতে পারিলেন না। পথের মধ্যে সির্হিন্দ-নামক স্থানে মুসলমানেরা তাহাদিগকে জীবিত অবস্থায় পুঁতিয়া ফেলে। গুজরী সেই শোকে প্রাণত্যাগ করেন। এ দিকে আহারাভাবে গোবিন্দ অত্যন্ত বিপদে পড়িলেন। তাঁহার অনুচরেরা আর থাকিতে চাহে না। তিনি তাহাদিগকে ভীরু বলিয়া ভর্ৎসনা করিলেন। দুর্গের দরজা খুলিয়া ফেলিয়া বলিলেন, 'এসো, তবে আর-একবার যুদ্ধ করিয়া দেখা যাক। যদি মরি তাহা হইলে কীর্তি থাকিয়া যাইবে; যদি জয়লাভ করি তবে আমাদের উদ্দেশ্য সফল হইল। বীরের মতো মরিলে গৌরব আছে, ভীরুর মতো মরা হীনতা।' কিন্তু গোবিন্দের কথা কেহ মানিল না। তাঁহাকে একখানি চিঠি লিখিয়া অনুচরেরা দুর্গ হইতে বাহির হইয়া গেল। কেবল চল্লিশ জন গোবিন্দের সঙ্গে রহিল। গোবিন্দ তাহাদিগকে বলিলেন, 'তোমরাও যাও!' তাহারা বলিল, 'যে শিখেরা ছাড়িয়া পালাইয়াছে তাহাদিগকে মাপ করো গুরু, আমরা তোমার জন্য প্রাণ দিব।' এই চল্লিশ জন অনুচর সঙ্গে লইয়া মুখোয়াল হইতে পালাইয়া গুরু চমকৌর দুর্গে আশ্রয় লইলেন। সেখানেও বিপক্ষেরা তাঁহাদিগকে ঘিরিল। প্রাতঃকালে দুর্গের দ্বার খুলিয়া তাঁহারা মুসলমানদের উপর গিয়া পড়িলেন। বিপক্ষ-পক্ষের অনেকগুলিকে মারিলেন এবং তাঁহাদেরও অনেকগুলি মরিল। কেবল পাঁচ জন মাত্র বাকি রহিল। গোবিন্দের দুই পুত্র রণজিৎ ও অজিত যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিলেন। গোবিন্দ আবার পলায়ন করিলেন। বহুদিন ধরিয়া পথে অনেক বিপদ-আপদ সহ্য করিয়া অবশেষে গোবিন্দ একে একে পলাতক শিষ্যদিগকে সংগ্রহ করিয়া লইলেন। এইরূপে গোবিন্দের অধীনে বারো হাজার সৈন্য জড়ো হইল।

মুসলমানেরা এই খবর পাইয়া তাঁহাকে আবার আক্রমণ করিল। শিখেরা বলিল, 'এবার হয় জয় করিব নয় মরিব।' জয় হইল। মুকতসরের নিকট যুদ্ধে মুসলমানদের সম্পূর্ণ হার হইল। এই জয়ের খবর চারি দিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। প্রত্যহ চারি দিক হইতে নূতন সৈন্য আসিয়া গোবিন্দের দলে প্রবেশ করিতে লাগিল।

সম্রাট আরঞ্জীব তখন দক্ষিণে ছিলেন। গোবিন্দের জয়ের সংবাদ পাইয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। তাঁহার কাছে হাজির হইবার জন্য গোবিন্দকে এক আদেশপত্র পাঠাইয়া দিলেন। গোবিন্দ তাহার উত্তরে লিখিয়া পাঠাইলেন, 'তোমার উপরে আমার কিছুমাত্র বিশ্বাস নাই। তুমি আমাদের প্রতি যে অন্যায়াচরণ করিয়াছ শিখেরা তাহার প্রতিশোধ লইবে।' গোবিন্দ তাঁহার পত্রে, মোগলেরা শিখগুরুদিগের প্রতি যে-সকল অত্যাচার করিয়াছে তাহার উল্লেখ করিয়া বলিলেন,

'আমার সন্তানেরা বিনষ্ট হইয়াছে; আমার পৃথিবীর সমস্ত বন্ধন বিচ্ছিন্ন হইয়াছে; মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করিয়া আছি; আমি কাহাকেও ভয় করি না, ভয় করি কেবল জগতের একমাত্র সম্রাট রাজার রাজাকে। ভগবানের নিকট দরিদ্রের প্রার্থনা বিফল হয় না; তুমি যে-সকল অত্যাচার ও নিষ্ঠুরতাচরণ করিয়াছ একদিন তাহার হিসাব দিতে হইবে।' এই পত্রে গোবিন্দ সম্রাটকে লিখিয়াছিলেন যে, 'তুমি হিন্দুদিগকে মুসলমান করিয়া থাক, আমি মুসলমানদিগকে হিন্দু করিব। তুমি আপনাকে নিরাপদ ভাবিয়া সুখে আছ, কিন্তু সাবধান, আমি চড়াই পাখিকে শিখাইব বাজপাখিকে কী করিয়া ভূমিশায়ী করিতে হয়!' পাঁচ জন শিখের হাত দিয়া এই চিঠি গোবিন্দ সম্রাটের কাছে পাঠাইয়া দিলেন। সম্রাট সেই চিঠি পড়িয়া ক্রুদ্ধ না হইয়া সন্তোষ প্রকাশ করিলেন ও সেই পাঁচ জন শিখের হাত দিয়া গোবিন্দকে চিঠি ও সওগাত পাঠাইয়া দিলেন। চিঠিতে লিখিয়া দিলেন যে, গোবিন্দ যদি দাক্ষিণাত্যে আসেন তবে সম্রাট তাঁহাকে সমাদরের সহিত অভ্যর্থনা করিবেন। এই চিঠি পাইয়া গোবিন্দ কিছুদিন শান্তি উপভোগ করিতে লাগিলেন। অবশেষে আরঙ্জীবের সহিত সাক্ষাৎ করাই স্থির করিলেন ও সেই অভিপ্রায়ে দক্ষিণে যাত্রা করিলেন। তিনি যখন পথে তখন আরঙ্জীবের মৃত্যু হইয়াছে। দক্ষিণে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, বাহাদুরশা সম্রাট হইয়াছেন। বাহাদুরশা বহুবিধ সওগাত উপহার দিয়া গোবিন্দকে পাঁচ হাজার অশ্বারোহীর অধিপতি করিয়া দিলেন।

গোবিন্দের মৃত্যুঘটনা বড়ো শোচনীয়। কেহ কেহ বলে, ক্রমাগত শোকে বিপদে নিরাশায় অভিভূত হইয়া গোবিন্দ শেষ দশায় কতকটা পাগলের মতো হইয়াছিলেন ও জীবনের প্রতি তাঁহার অতিশয় বিরাগ জন্মিয়াছিল। একদিন একজন পাঠান তাঁহার নিকট একটি ঘোড়া বিক্রয় করিতে আসিয়াছিল; গোবিন্দ সেই ঘোড়া কিনিয়া তাহার দাম দিতে কিছুদিন বিলম্ব করিয়াছিলেন। অবশেষে পাঠান ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে গালি দিয়া তরবারি লইয়া আক্রমণ করিল। গোবিন্দ পাঠানের হাত হইতে তরবারি কাড়িয়া লইয়া তাহাকে কাটিয়া ফেলিলেন।

এই অন্যায় কার্য করিয়া তাঁহার অত্যন্ত অনুতাপ উপস্থিত হইল। তিনি সেই পাঠানের পুত্রকে অনেক অর্থ দান করিলেন। তাহাকে তিনি যথেষ্ট স্নেহ করিতেন এবং তাহার সহিত খেলা করিতেন। একদিন সেই পাঠান-তনয়কে তিনি বলিলেন, 'আমি তোমার পিতাকে বধ করিয়াছি, তুমি যদি তাহার প্রতিশোধ না লও তবে তুমি কাপুরুষ ভীরু।' কিন্তু সেই পাঠান গোবিন্দকে অত্যন্ত মান্য করিত, এইজন্য সে গোবিন্দের হানি না করিয়া মনে মনে পালাইবার সংকল্প করিল।

আর-একদিন সেই পাঠানের সহিত শতরঞ্চ খেলিতে খেলিতে গোবিন্দ তাহাকে তাহার পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ লইতে উত্তেজিত করিয়া দিলেন। সে আর থাকিতে না পারিয়া গোবিন্দের পেটে ছুরি বসাইয়া দিল।

গোবিন্দের অনুচরেরা সেই পাঠানকে ধরিবার জন্য চারি দিক হইতে ছুটিয়া আসিল। গোবিন্দ তাহাদিগকে নিবারণ করিয়া বলিলেন, 'আমি উহার কাছে অপরাধ করিয়াছিলাম, ও তাহার প্রতিশোধ দিয়াছে। আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য আমিই উহাকে এইরূপ পরামর্শ দিয়াছিলাম। উহাকে তোমরা ধরিয়ো না।'

অনুচরেরা গোবিন্দের ক্ষতস্থান সেলাই করিয়া দিল। কিন্তু জীবনের প্রতি বিরক্ত হইয়া গোবিন্দ এক দৃঢ় ধনুক লইয়া সবলে নোওয়াইয়া ধরিলেন, সেই চেষ্টাতেই তাঁহার ক্ষতস্থানে সেলাই ছিঁড়িয়া গেল ও তাঁহার মৃত্যু হইল।

গোবিন্দ যে সংকল্প সিদ্ধ করিতে তাঁহার জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন সে সংকল্প বিফল হইল বটে, কিন্তু তিনিই প্রধানত শিখদিগকে যোদ্ধৃজাতি করিয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে একদিন শিখেরা স্বাধীন হইয়াছিল; সে স্বাধীনতার দ্বার তিনিই উদ্‌ঘাটন করিয়া দিয়াছিলেন।

বালক
শ্রাবণ ১২৯২

শিখ-স্বাধীনতা

গুরু গোবিন্দই শিখদের শেষ গুরু। তিনি মরিবার সময় বন্দা-নামক এক বৈরাগীর উপরে শিখদের কর্তৃত্বভার দিয়া যান। তিনি যে সংকল্প অসম্পূর্ণ রাখিয়া যান সেই সংকল্প পূর্ণ করিবার ভার বন্দার উপরে পড়িল। অত্যাচারী বিদেশীদের হাত হইতে স্বজাতিকে পরিত্রাণ করা গোবিন্দের এক ব্রত ছিল, সেই ব্রত বন্দা গ্রহণ করিলেন।

বন্দার চতুর্দিকে শিখেরা সমবেত হইতে লাগিল। বন্দার প্রতাপে সমস্ত পঞ্জাব কম্পিত হইয়া উঠিল। বন্দা সির্হিন্দ হইতে মোগলদের তাড়াইয়া দিলেন। সেখানকার শাসনকর্তাকে বধ করিলেন। সির্‌মুরে তিনি এক দুর্গ স্থাপন করিলেন। শতদ্রু এবং যমুনার মধ্যবর্তী প্রদেশ অধিকার করিয়া লইলেন, এবং জিলা সাহারানপুর মরুভূমি করিয়া দিলেন।

মুসলমানদের সঙ্গে মাঝে মাঝে যুদ্ধ চলিতে লাগিল। লাহোরের উত্তরে জম্বু পর্বতের উপরে বন্দা নিবাস স্থাপন করিলেন, পঞ্জাবের অধিকাংশই তাঁহার আয়ত্ত হইল।

এই সময়ে দিল্লির সম্রাট বাহাদুরশা'র মৃত্যু হইল। তাঁহার সিংহাসন লইয়া তাঁহার উত্তরাধিকারীদের মধ্যে গোলযোগ চলিতে লাগিল। এই সুযোগে শিখেরা সমবেত হইয়া বিপাশা ও ইরাবতীর মধ্যে গুরুদাসপুর নামক এক বৃহৎ দুর্গ স্থাপন করিল।

লাহোরের শাসনকর্তা বন্দার বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ হইল। এই যুদ্ধে মুসলমানদের জয় হইল। এই জয়ের পর সির্হিন্দে একদল শিখসৈন্য পুনর্বার প্রেরিত হইল। সেখানকার শাসনকর্তা বয়াজিদ্ খাঁ শিখদিগকে আক্রমণ করিলেন। একজন শিখ গোপনে বয়াজিদের তাম্বুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে নিহত করিল; দিল্লির সম্রাট কাশ্মীরের শাসনকর্তা আবদুল সম্মদ্ খাঁ নামক এক পরাক্রান্ত তুরানিকে শিখদিগের বিরুদ্ধে যাত্রা করিতে আদেশ করিলেন। দিল্লি হইতে তাঁহার সাহায্যার্থে এক দল বাছা বাছা সৈন্য প্রেরিত হইল। সম্মদ্ খাঁও সহস্র সহস্র স্বজাতীয় তুরানি সৈন্য লইয়া যাত্রা করিলেন। লাহোর হইতে কামান-শ্রেণী সংগ্রহ করিয়া তিনি শিখদিগের উপরে গিয়া পড়িলেন। শিখেরা প্রাণপণে যুদ্ধ করিল। আক্রমণকারীদের বিস্তর সৈন্য নষ্ট হইল। কিন্তু অবশেষে পরাজিত হইয়া বন্দা গুরুদাসপুরের দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। শত্রুসৈন্য তাঁহার দুর্গ সম্পূর্ণ বেষ্টন করিয়া ফেলিল। দুর্গে খাদ্য-যাতায়াত বন্ধ হইল। সমস্ত খাদ্য এবং অখাদ্য পর্যন্ত যখন নিঃশেষ হইয়া গেল তখন বন্দা শত্রুহস্তে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন। ৭৪০ জন শিখ বন্দী হইল। কথিত আছে, যখন বন্দীগণ লাহোরের পথ দিয়া যাইতেছিল তখন বয়াজিদ্ খাঁর বৃদ্ধা মাতা তাহার পুত্রের হত্যাকারীর মস্তকে পাথর ফেলিয়া দিয়া বধ করিয়াছিল। বন্দা যখন দিল্লিতে নীত হইলেন তখন শত্রুরা শিখদের ছিন্নশির বর্শাফলকে করিয়া তাঁহার আগে আগে বহন করিয়া লইয়া যাইতেছিল। প্রতিদিন একশত করিয়া শিখ বন্দী বধ করা হইত। একজন মুসলমান ঐতিহাসিক লিখিয়াছিলেন যে, 'শিখেরা মরিবার সময় কিছুমাত্র চাঞ্চল্য প্রকাশ করে নাই; কিন্তু অধিকতর আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আগে মরিবার জন্য তাহারা আপনা-আপনির মধ্যে বিবাদ ও তর্ক করিত। এমন-কি, এইজন্য তাহারা ঘাতকের সঙ্গে ভাব করিবার চেষ্টা করিত।' অষ্টম দিনে বন্দা বিচারকের সমক্ষে আনীত হইলেন। একজন মুসলমান আমীর তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এমন বুদ্ধিমান্ ও শাস্ত্রজ্ঞ হইয়াও এত পাপাচরণে তোমার মতি হইল কী করিয়া?' বন্দা বলিলেন, 'পাপীর শাস্তি-বিধানের জন্য ঈশ্বর আমাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ঈশ্বরের আদেশের বিরুদ্ধে যাহা-কিছু কাজ করিয়াছি তাহার জন্য আবার আমারও শাস্তি হইতেছে।' বিচারকের আদেশে তাঁহার ছেলেকে তাঁহার কোলে বসাইয়া দেওয়া হইল। তাঁহার হাতে ছুরি দিয়া স্বহস্তে নিজের ছেলেকে কাটিতে হুকুম হইল। অবিচলিত ভাবে নীরবে তাঁহার ক্রোড়স্থ ছেলেকে বন্দা বধ করিলেন। অবশেষে দগ্ধ লৌহের সাঁড়াশি দিয়া তাঁহার মাংস

ছিঁড়িয়া তাঁহাকে বধ করা হইল।

বন্দার মৃত্যুর পর মোগলেরা শিখদের প্রতি নিদারুণ অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিল। প্রত্যেক শিখের মাথার জন্য পুরস্কার-স্বরূপ মূল্য ঘোষণা করা হইল।

শিখেরা জঙ্গলে ও দুর্গম স্থানে আশ্রয় লইল। প্রতি ছয় মাস অন্তর তাহারা একবার করিয়া অমৃতসরে সমবেত হইত। পথের মধ্যে যে-সকল জমিদার ছিল তাহারা ইহাদিগকে পথের বিপদ হইতে রক্ষা করিত। এই ষাণ্মাসিক মিলনের পর আবার তাহারা জঙ্গলে ছড়াইয়া পড়িত।

পঞ্জাব জঙ্গলে আবৃত হইয়া উঠিল। নাদিরশা আফগানিস্থান হইতে ভারতবর্ষে আসিবার সময় পঞ্জাব দিয়া আসিতেছিলেন। নাদিরশা জিজ্ঞাসা করিলেন, শিখদের বাসস্থান কোথায়? পঞ্জাবের শাসনকর্তা উত্তর করিলেন, ঘোড়ার পৃষ্ঠের জিনই শিখদের বাসস্থান।

নাদিরশাহের ভারত-আক্রমণকালে শিখেরা ছোটো ছোটো দল বাঁধিয়া তাঁহার পশ্চাদ্‌বর্তী পারসিক সৈন্যদলকে আক্রমণ করিয়া লুটপাট করিতে লাগিল। এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধবিগ্রহে রত হইয়া শিখেরা পুনশ্চ দুঃসাহসিক হইয়া উঠিল। এখন তাহারা প্রকাশ্যভাবে শিখতীর্থ অমৃতসরে যাতায়াত করিতে লাগিল। একজন মুসলমান লেখক বলেন— প্রায়ই দেখা যায়, অশ্বারোহী শিখ পূর্ণবেগে ঘোড়া ছুটাইয়া তাহাদের তীর্থ উপলক্ষে চলিয়াছে। কখনো কখনো কেহ বা ধৃতও হইত, কেহ বা হতও হইত, কিন্তু কখনো এমন হয় নাই যে, একজন শিখ ভয়ে তাহার স্বধর্ম ত্যাগ করিয়াছে। অবশেষে শিখেরা উত্তরোত্তর নির্ভীক হইয়া ইরাবতীর তীরে এক ক্ষুদ্র দুর্গ স্থাপন করিল। ইহাতেও মুসলমানেরা বড়ো একটা মনোযোগ দিল না। কিন্তু তাহারা যখন বৃহৎ দল বাঁধিয়া আমিনাবাদের চতুষ্পার্শ্ববর্তী স্থানে কর আদায় করিতে সমবেত হইল, তখন মুসলমান সৈন্য তাহাদের আক্রমণ করিল। কিন্তু মুসলমানেরা পরাজিত হইল ও তাহাদের সেনাপতি বিনষ্ট হইল। মুসলমানেরা অধিকসংখ্যক সৈন্য লইয়া দ্বিতীয়বার আক্রমণ করিল ও শিখদিগকে পরাভূত করিল। লাহোরে এই উপলক্ষে বিস্তর শিখবন্দী নিহত হয়। যেখানে এই বধকার্য সমাধা হয় লাহোরের সেই স্থান সুহিদগঞ্জ নামে অভিহিত। এখনও সেখানে ভাই তরুসিংহের কবরস্থান আছে। কথিত আছে, তরুসিংহকে তাঁহার দীর্ঘ কেশ ছেদন করিয়া শিখধর্ম ত্যাগ করিতে বলা হয়। কিন্তু গুরু গোবিন্দের এই বৃদ্ধ অনুচর তাঁহার ধর্ম ত্যাগ করিতে অসম্মত হইলেন এবং শিখদের শাস্ত্রানুমোদিত জাতীয় চিহ্নস্বরূপ দীর্ঘ কেশ ছেদন করিতে রাজি হইলেন না। তিনি বলিলেন, 'চুলের সঙ্গে খুলির সঙ্গে এবং খুলির সঙ্গে মাথার সঙ্গে যোগ আছে। চুলে কাজ কী, আমি মাথাটা দিতেছি।'

এইরূপে ক্রমাগত জয়পরাজয়ের মধ্যে সমস্ত শিখ জাতি আন্দোলিত হইতে লাগিল, কিন্তু কিছুতেই তাহারা নিরুদ্যম হইল না। এক সময়ে যখন তাহারা সির্হিন্দের শাসনকর্তা জেইন খাঁর উপরে ব্যাঘ্রের ন্যায় লম্ফ দিবার উদ্‌যোগ করিতেছিল। এমন সময়ে দুর্দান্তপরাক্রম পাঠান আমেদশা তাঁহার বৃহৎ সৈন্যদলসমেত তাহাদের উপর আসিয়া পড়িলেন। এই যুদ্ধে শিখদের সম্পূর্ণ পরাজয় হয়, তাহাদের বিস্তর লোক মারা যায়। আমেদশা অমৃতসরের শিখ-মন্দির ভাঙিয়া দিলেন। গোরক্ত ঢালিয়া অমৃতসরের সরোবর অপবিত্র করিয়া দিলেন। শিখদের ছিন্ন শির স্তূপাকার করিয়া সজ্জিত করিলেন। এবং কাফের শত্রুদের রক্তে মসজিদের ভিত্তি ধৌত করিয়া দিলেন।

কিন্তু ইহাতেও শিখেরা নিরুদ্যম হইল না। প্রতিদিন তাহাদের দল বাড়িতে লাগিল। প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি সমস্ত জাতির হৃদয়ে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। প্রথমে তাহারা কসুর-নামক পাঠানদের উপনিবেশ আক্রমণ, লুণ্ঠন ও গ্রহণ করিল। তাহার পরে তাহারা সির্হিন্দে অগ্রসর হইল। সেখানকার শাসনকর্তা জেইন খাঁর সহিত যুদ্ধ বাধিল। যুদ্ধে পাঠান পরাজিত ও নিহত হইল। শতদ্রু হইতে যমুনা পর্যন্ত সির্হিন্দ প্রদেশ শিখদের করতলস্থ হইল। লাহোরের শাসনকর্তা কাবুলি-মলকে শিখেরা দূর করিয়া দিল। ঝিলম হইতে শতদ্রু পর্যন্ত সমস্ত পঞ্জাব শিখদের হাতে

আসিল। এই বিস্তৃত ভূখণ্ড সর্দারেরা মিলিয়া ভাগ করিয়া লইলেন। শিখেরা বিস্তর মসজিদ ভাঙিয়া ফেলিল। শৃঙ্খলবদ্ধ আফগানদের দ্বারা শূকররক্তে মসজিদ-ভিত্তি ধৌত করানো হইল। সর্দারেরা অমৃতসরে সম্মিলিত হইয়া আপনাদের প্রভাব প্রচার এবং শিখমুদ্রা প্রচলিত করিলেন।

এতদিন পরে শিখেরা সম্পূর্ণ স্বাধীন হইল। গুরু গোবিন্দের উদ্দেশ্য কিয়ৎপরিমাণে সফল হইল। তার পরে রণজিৎ সিংহের অভ্যুদয়। তার পরে ব্রিটিশ-সিংহের প্রতাপ। তার পরে ধীরে ধীরে সমস্ত ভারতবর্ষ লাল হইয়া গেল। রণজিতের বিখ্যাত ভবিষ্যদ্‌বাণী সত্য হইল। সে-সকল কথা পরে হইবে।

বালক
আশ্বিন-কার্তিক ১২৯২

গ্রন্থসমালোচনা

ভারতবর্ষের ইতিহাস। শ্রীহেমলতা দেবী। মূল্য আট আনা।

বিধাতা স্ত্রীজাতিকে এত কোমল করিয়াছেন, যে সেই কোমলতার অবশ্যসহচর দুর্বলতার দ্বারা তাহারা অসহায় এবং পরাধীন। তথাপি তাহা যুগ যুগান্তর চলিয়া আসিতেছে, তাহার কারণ ছেলেদের মানুষ করিবার জন্য এই কোমলতা অত্যাবশ্যক। মাকে কোমলকান্ত করিয়া বিধাতা বলিয়াছেন বাল্যাবস্থায় মাধুর্যের আনন্দচ্ছটা এবং স্নেহের সুধাভিষেকে মানুষ পালনীয়। পীড়ন, শাসন, সংকীর্ণ নিয়মের লৌহশৃঙ্গল তখনকার উপযোগী নয়। খাওয়ানো পরানো সম্বন্ধীয় মানুষ করা চিরকাল এইভাবেই চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু ইতিমধ্যে মানুষের মনুষ্যত্ব বিপুল বিস্তার লাভ করিয়াছে। মানসিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এখন মানুষ-করা ব্যাপারটা জটিল হইয়া উঠিয়াছে। এখন কেবল অন্নপান নহে বিদ্যাদানেরও প্রয়োজন হইয়াছে। কিন্তু বিধাতার নিয়ম সমান আছে। বাল্যাবস্থায় বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গেও আনন্দের স্বাভাবিক স্ফূর্তি এবং স্বাধীনতা অত্যাবশ্যক। কিন্তু অবস্থাগতিকে পুরুষের হাতে বিদ্যাদানের ভার পড়িয়া জগতে বহুল দুঃখ এবং অনর্থের সৃষ্টি হইয়াছে। বালকের স্বাভাবিক মুগ্ধতার প্রতি পুরুষের ধৈর্য নাই, শিশুচরিত্রের মধ্যে পুরুষের সস্নেহ প্রবেশাধিকার নাই। আমাদের পাঠালয় এবং পাঠ্যনির্বাচনসমিতি তাহার নিষ্ঠুর দৃষ্টান্ত। এইজন্য মানুষের বাল্যজীবন নিদারুণ নিরানন্দের আকর হইয়া উঠিয়াছে। পুনরায় শিশু হইয়া জন্মিয়া বিদ্যালাভ করিতে হইবে এই ভয়ে পুনর্জন্মে বিশ্বাস করিতে আমাদের প্রবৃত্তি হয় না। আমাদের মত এই যে, মা মাসি দিদিরাই অন্নপান ও জ্ঞান শিক্ষার দ্বারা বিশেষ বয়স পর্যন্ত ছেলেদের সর্বতোভাবে পালন পোষণ করিবেন। তাহাই তাঁহাদের কর্তব্য। বেত্রবজ্রধর গুরুমহাশয় তাঁহাদের স্নেহস্বর্গের অধিকার হরণ করিয়া লইয়াছে। ছেলে যখন কাঁদিতে কাঁদিতে পাঠশালায় যায় তখন মাকে কি কাঁদাইয়া যায় না? এই প্রকৃতিদ্রোহী অবস্থা কি চিরদিন জগতে থাকিবে?

সমালোচ্য বাল্যপাঠ্যগ্রন্থখানি শিক্ষিত মহিলার রচনা বলিয়া আমরা বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছি। পূর্বেই বলিয়াছি শিশুদিগকে শিক্ষা দান তাঁহাদের শিক্ষালাভের একটি প্রধান সার্থকতা। অধুনা আমাদের দেশের অনেক স্ত্রীলোক উচ্চ শিক্ষা লাভ করিতেছেন, তাঁহাদের সেই শিক্ষা যদি তাঁহারা মাতৃভাষায় বিতরণ করেন তবে বঙ্গগৃহের লক্ষ্মীমূর্তির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের সরস্বতীমূর্তি বিকশিত হইয়া উঠিবে।

শ্রীমতী হেমলতা দেবী যে ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রণয়ন করিয়াছেন স্কুলে প্রচলিত সাধারণ ইতিহাসের অপেক্ষা দুই কারণে তাহা শ্রেষ্ঠ। প্রথমত তাহার ভাষা সরল, দ্বিতীয়ত ভারতবর্ষের সমগ্র ইতিহাসের একটি চেহারা দেখাইবার জন্য গ্রন্থকর্ত্রী প্রয়াস পাইয়াছেন। আমাদের মতে ইতিহাসের নামাবলী ও ঘটনাবলী মুখস্থ করাইবার পূর্বে আর্য ভারতবর্ষ, মুসলমান ভারতবর্ষ

এবং ইংরেজ ভারতবর্ষের একটি পুঞ্জীভূত সরস সম্পূর্ণ চিত্র ছেলেদের মনে মুদ্রিত করিয়া দেওয়া উচিত। তবেই তাহারা বুঝিতে পারিবে ঐতিহাসিক হিসাবে ভারতবর্ষ জিনিসটা কী। এমন-কি, আমরা বলি, ভারতবর্ষের ভূগোল ইতিহাস এবং সমস্ত বিবরণ জড়াইয়া শুদ্ধমাত্র 'ভারতবর্ষ' নাম দিয়া একখানি বই প্রথমে ছেলেদের পড়িতে দেওয়া উচিত। পরে ভারতবর্ষের ভূগোল ও ইতিহাস পৃথকভাবে ও তন্ন তন্ন রূপে শিক্ষা দিবার সময় আসিবে। আমরা বোধ করি ইংরাজিতে এরূপ গ্রন্থের বিস্তৃত আদর্শ সার্ উইলিয়ম্ হন্টারের 'ইণ্ডিয়ান এম্পায়ার'। এই সুসম্পূর্ণ সুন্দর পুস্তকটিকে যদি কোনো শিক্ষিত মহিলা শিশুদের অথবা তাহাদের পিতামাতাদের উপযোগী করিয়া বাংলায় রচনা করেন তবে বিস্তর উপকার হয়।

কিন্তু টেক্স্‌ট্‌বুক্ কমিটির খাতিরে গ্রন্থকর্ত্রী তাঁহার বইখানিকে যে সম্পূর্ণ নিজের মনের মতো করিয়া লিখিতে পারেন নাই তাহা বেশ বুঝা যায়। ইস্কুলে ছেলেদের যে-সকল সম্পূর্ণ অনাবশ্যক শুষ্ক তথ্য মুখস্থ করিতে দেওয়া হয় লেখিকা তাহার সকলগুলি বর্জন করিতে সাহসী হন নাই। আমরা ভরসা করিয়া বলিতে পারি যে, মোগল রাজত্বের পূর্বে তিনশত বৎসরব্যাপী কালরাত্রে ভারত সিংহাসনে দাসবংশ হইতে লোদিবংশ পর্যন্ত পাঠান রাজন্যবর্গের যে রক্তবর্ণ উল্কাবৃষ্টি হইয়াছে তাহা আদ্যোপান্ত কাহারই বা মনে থাকে। এবং মনে রাখিয়াই বা ফল কী? অন্তত এ ইতিহাসে তাহার একটা মোটামুটি বর্ণনা থাকিলেই ভালো হইত। নীরস ইংরাজ শাসনকাল সম্বন্ধেও আমাদের এই মত।

ছাত্রপাঠ্য গ্রন্থে আর্য-ইতিবৃত্তের তারিখ সম্বন্ধে মৌনাবলম্বনই শ্রেয়। 'খৃষ্ট জন্মের প্রায় ২০০০ বৎসর পূর্বে আর্যগণ উত্তর-পশ্চিম দিক্ দিয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিলেন", "ভারতবর্ষে আসিবার একহাজার বৎসর পরে তাঁহারা মিথিলা প্রদেশ পর্যন্ত আসিয়াছিলেন"— এ-সমস্ত সম্পূর্ণ আনুমানিক কালনির্দেশ আমরা অসংগত জ্ঞান করি।

সিরাজদৌল্লার রাজ্যশাসনকালে অন্ধকূপহত্যার বিবরণ লেখিকা অসংশয়ে প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি যদি শ্রীযুক্তবাবু অক্ষয়কুমার মৈত্রের "সিরাজদ্দৌলা" পাঠ করিতেন তবে এ ঘটনাকে ইতিহাসে স্থান দিতে নিশ্চয়ই কুণ্ঠিত হইতেন।

ভারতী
জ্যৈষ্ঠ ১৩০৫

মুর্শিদাবাদ কাহিনী। শ্রীনিখিলরায় প্রণীত। মূল্য কাগজে বাঁধা দুই টাকা, কাপড়ে বাঁধা ২ টাকা আট আনা।

মুসলমানের রাজত্ব গিয়াছে অথচ কোথাও তাহার জন্য শূন্য স্থান নাই। ইংরাজ রাজত্বের রেলের বাঁশি, স্টীমারের বাঁশি, কারখানার বাঁশি চারি দিকে বাজিয়া উঠিয়াছে— চারি দিকে আপিস ঘর, আদালত ঘর, থানা ঘর মাথা তুলিতেছে, ইংরাজের নূতন চুনকামকরা ফিট্-ফাট্ ধব্‌ধবে প্রতাপ দেশ জুড়িয়া ভিত্তি গাড়িয়াছে— কোথাও বিচ্ছেদ নাই। তথাপি নিখিলবাবুর মুর্শিদাবাদকাহিনী পড়িতে পড়িতে মনে হয়, এই নূতন কর্মকোলাহলময় মহিমা মরীচিকাবৎ নিঃশব্দে অন্তর্হিত, তাহার পাটের কলের সমস্ত বাঁশি নীরব, কেবল আমাদের চতুর্দিকে মুসলমানদের পরিত্যক্ত পুরীর প্রকাণ্ড ভগ্নাবশেষ নিস্তব্ধ দাঁড়াইয়া। নিঃশব্দ নহবৎখানা, হস্তীহীন হস্তীশালা, প্রভুশূন্য রাজতক্ত, প্রজাশূন্য আম্ দরবার, নির্বাণদীপ বেগম মহল একটি পরম বিষাদময় বৈরাগ্যময় মহত্ত্বে বিরাজ করিতেছে। মুসলমান রাজলক্ষ্মী যেন শতাধিক বৎসর পরে তাহার সেই অনাথ পুরীর মধ্যে গোপনে প্রবেশ করিয়া একে একে তাহার পূর্বপরিচিত কীর্তিমালার ভগ্ন চিহ্নসকল অনুসরণ করিয়া সনিশ্বাসে দূরস্মৃতি আলোচনায় নিরত হইয়াছে।

নিখিলবাবু তাঁহার অধিকাংশ প্রবন্ধে সেকাল একালের তুলনা বা ভালোমন্দ বিচারের অবতারণা করেন নাই। তিনি সেই প্রাচীন কালকে খণ্ড খণ্ড চিত্র আকারে নিবদ্ধ করিয়া পাঠকদের

সম্মুখে ধরিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বইখানি যেন নবাবী আমলের ভগ্নশেষের অ্যালবম্। চিত্রগুলি সেদিনকার অসীম ঐশ্বর্য এবং বিচিত্রব্যাপারসংকুল মহৎ প্রতাপের অবসানদশার জন্য একটি স্নিগ্ধ করুণা এবং গভীর বিষাদের উদ্রেক করিতেছে।

এ প্রকার ঐতিহাসিক চিত্রগ্রন্থ বঙ্গভাষায় আর নাই। নিখিলবাবুর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া যদি ভিন্ন ভিন্ন জেলা-নিবাসী লেখকগণ তাঁহাদের স্থানীয় প্রাচীন ঐতিহাসিক চিত্রাবলী সংকলন করিতে থাকেন তাহা হইলে বাংলাদেশের সহিত বঙ্গবাসীর যথার্থ সুদূরব্যাপী পরিচয় সাধন হইতে পারে। নিখিলবাবুর এই সদ্দৃষ্টান্ত, তাঁহার এই গবেষণা ও অধ্যবসায়ের জন্য বঙ্গসাহিত্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

এই বৃহৎ গ্রন্থে কেবল একটি নিন্দার বিষয় উল্লেখ করিবার আছে। নিখিলবাবু যেখানে সরলভাবে ঐতিহাসিক তথ্য বর্ণনা করিয়াছেন তাঁহার রচনা অব্যাহত ভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। কিন্তু যেখানে তিনি অলংকার প্রয়োগের প্রয়াস পাইয়াছেন সেখানে তাঁহার লেখার লাবণ্য বৃদ্ধি হয় নাই, পরন্তু তাহা ভারগ্রস্ত হইয়াছে।

ভারতী
শ্রাবণ ১৩০৫

ঐতিহাসিক চিত্র

ঐতিহাসিক চিত্রের সূচনা লিখিবার জন্য সম্পাদক-দত্ত অধিকার পাইয়াছি, আর কোনো প্রকারের অধিকারের দাবি রাখি না। কিন্তু আমাদের দেশের সম্পাদক ও পাঠকবর্গ লেখকগণকে যেরূপ প্রচুর পরিমাণে প্রশ্রয় দিয়া থাকেন তাহাতে অনধিকার প্রবেশকে আর অপরাধ বলিয়া জ্ঞান হয় না।

এই ঐতিহাসিক পত্রে আমি যদি কিছু লিখিতে সাহস করি তবে তাহা সংক্ষিপ্ত সূচনাটুকু। কোনো শুভ অনুষ্ঠানের উৎসব-উপলক্ষে ঢাকীকে মন্ত্রও পড়িতে হয় না, পরিবেশনও করিতে হয় না— সিংহদ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া সে কেবল আনন্দধ্বনি ঘোষণা করিতে থাকে। সে যদিচ কর্তাব্যক্তিদের মধ্যে কেহই নহে, কিন্তু সর্বাগ্রে উচ্চকলরবে কার্যারম্ভের সূচনা তাহারই হস্তে।

যাঁহারা কর্মকর্তা, গীতা তাঁহাদিগকে উপদেশ দিয়াছেন যে : কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন। অর্থাৎ, কর্মেই তোমার অধিকার আছে, ফলে কদাচ নাই। আমরা কর্মকর্তা নহি। আমাদের একটা সুবিধা এই যে, কর্মে আমাদের অধিকার নাই, কিন্তু ফলে আছে। সম্পাদক-মহাশয় যে অনুষ্ঠান ও যেরূপ আয়োজন করিয়াছেন তাহার ফল বাংলার, এবং আশা করি অন্য দেশের, পাঠকমণ্ডলী চিরকাল ভোগ করিতে পারিবেন।

অদ্য 'ঐতিহাসিক চিত্রে'র শুভ জন্মদিনে আমরা যে আনন্দ করিতে উদ্যত হইয়াছি তাহা কেবলমাত্র সাহিত্যের উন্নতিসাধনের আশ্বাসে নহে। তাহার আর-একটি বিশেষ কারণ আছে।

পরের রচিত ইতিহাস নির্বিচারে আদ্যোপান্ত মুখস্থ করিয়া পণ্ডিত এবং পরীক্ষায় উচ্চ নম্বর রাখিয়া কৃতী হওয়া যাইতে পারে, কিন্তু স্বদেশের ইতিহাস নিজেরা সংগ্রহ এবং রচনা করিবার যে উদ্‌যোগ সেই উদ্‌যোগের ফল কেবল পাণ্ডিত্য নহে। তাহাতে আমাদের দেশের মানসিক বদ্ধ জলাশয়ে স্রোতের সঞ্চার করিয়া দেয়। সেই উদ্যমে, সেই চেষ্টায় আমাদের স্বাস্থ্য— আমাদের প্রাণ।

বঙ্গদর্শনের প্রথম অভ্যুদয়ে বাংলাদেশের মধ্যে একটি অভূতপূর্ব আনন্দ ও আশার সঞ্চার হইয়াছিল, একটি সুদূরব্যাপী চাঞ্চল্যে বাংলার পাঠকহৃদয় যেন কল্লোলিত হইয়া উঠিয়াছিল। সে আনন্দ স্বাধীন চেষ্টার আনন্দ। সাহিত্য যে আমাদের আপনাদের হইতে পারে, সেদিন তাহার ভালোরূপ প্রমাণ হইয়াছিল। আমরা সেদিন ইস্কুল হইতে, বিদেশী মাস্টারের শাসন হইতে, ছুটি

পাইয়া ঘরের দিকে ফিরিয়াছিলাম।

বঙ্গদর্শন হইতে আমরা 'বিষবৃক্ষ', 'চন্দ্রশেখর', 'কমলাকান্তের দপ্তর' এবং বিবিধ ভোগ্য বস্তু পাইয়াছি, সে আমাদের পরম লাভ বটে। কিন্তু সকলের চেয়ে লাভের বিষয় সাহিত্যের সেই স্বাধীন চেষ্টা। সেই অবধি আজ পর্যন্ত সে চেষ্টার আর বিরাম হয় নাই। আমাদের সাহিত্যের ভাবী আশার পথ চিরদিনের জন্য উন্মুক্ত হইয়া গিয়াছে।

বঙ্গদর্শন আমাদের সাহিত্যপ্রাসাদের বড়ো সিংহদ্বারটা খুলিয়া দিয়াছিলেন। এখন আবার তাহার এক-একটি মহলের চাবি খুলিবার সময় আসিয়াছে। 'ঐতিহাসিক চিত্র' অদ্য 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' নামক একটা প্রকাণ্ড রুদ্ধবাতায়ন রহস্যাবৃত হর্ম্যশ্রেণীর দ্বারদেশে দণ্ডায়মান।

সম্পাদক-মহাশয় তাঁহার প্রস্তাবনাপত্রে জানাইয়াছেন— 'নানা ভাষায় লিখিত ভারতভ্রমণ-কাহিনী এবং ইতিহাসাদি প্রামাণ্য গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ, অনুসন্ধানলব্ধ নবাবিষ্কৃত ঐতিহাসিক তথ্য, আধুনিক ইতিহাসাদির সমালোচনা এবং বাঙালি রাজবংশ ও জমিদারবংশের পুরাতত্ত্ব প্রকাশিত করাই মুখ্য উদ্দেশ্য।'

এই তো প্রত্যক্ষ ফল। তাহার পর পরোক্ষ ফল সম্বন্ধে আশা করি যে, এই পত্র আমাদের দেশে ঐতিহাসিক স্বাধীন চেষ্টার প্রবর্তন করিবে। সেই চেষ্টাকে জন্ম দিতে না পারিলে, 'ঐতিহাসিক চিত্র' দীর্ঘকাল আপন মাহাত্ম্য রক্ষা করিয়া চলিতে পারিবে না— সমস্ত দেশের সহকারিতা না পাইলে ক্রমে সংকীর্ণ ও শীর্ণ হইয়া লুপ্ত হইবে। সেই চেষ্টাকে জন্ম দিয়া যদি 'ঐতিহাসিক চিত্রে'র মৃত্যু হয়, তথাপি সে চিরকাল অমর হইয়া থাকিবে।

সমস্ত ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আশা করিতে পারি না, কিন্তু বাংলার প্রত্যেক জেলা যদি আপন স্থানীয় পুরাবৃত্ত সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করে, প্রত্যেক জমিদার যদি তাহার সহায়তা করেন এবং বাংলার রাজবংশের পুরাতন দপ্তরে যে-সকল ঐতিহাসিক তথ্য প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে 'ঐতিহাসিক চিত্র' তাহার মধ্যে প্রবেশাধিকার লাভ করিতে পারে, তবেই এই ত্রৈমাসিক পত্র সার্থকতা প্রাপ্ত হইবে।

এখন সংগ্রহ এবং সমালোচনা ইহার প্রধান কাজ। সমস্ত জনশ্রুতি, লিখিত এবং অলিখিত, তুচ্ছ এবং মহৎ, সত্য এবং মিথ্যা— এই পত্রভাণ্ডারে সংগ্রহ হইতে থাকিবে। যাহা তথ্য-হিসাবে মিথ্যা অথবা অতিরঞ্জিত, যাহা কেবল স্থানীয় বিশ্বাস-রূপে প্রচলিত, তাহার মধ্যেও অনেক ঐতিহাসিক সত্য পাওয়া যায়। কারণ, ইতিহাস কেবলমাত্র তথ্যের ইতিহাস নহে, তাহা মানবমনের ইতিহাস, বিশ্বাসের ইতিহাস। আমরা একান্ত আশা করিতেছি, এই সংগ্রহকার্যে 'ঐতিহাসিক চিত্র' সমস্ত দেশকে আপন সহায়তায় আকর্ষণ করিয়া আনিতে পারিবে।

অর্থব্যবহারশাস্ত্র শ্রমকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে— বন্ধ্য এবং অবন্ধ্য (productive এবং unproductive)। বিলাসসামগ্রী যে শ্রমের দ্বারা উৎপন্ন তাহাকে বন্ধ্য বলা যায়; কারণ, ভোগেই তাহার শেষ, তাহা কোনোরূপে ফিরিয়া আসে না। আমরা আশা করিতেছি, 'ঐতিহাসিক চিত্র' যে শ্রমে প্রবৃত্ত হইতেছে তাহা বন্ধ্য হইবে না; কেবলমাত্র কৌতূহল পরিতৃপ্তিতেই তাহার অবসান নহে। তাহা দেশকে যাহা দান করিবে তাহার চতুর্গুণ প্রতিদান দেশের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইবে, একটি বীজ রোপণ করিয়া তাহা হইতে সহস্র শস্য লাভ করিতে থাকিবে।

আমাদের দেশ হইতে রূঢ় দ্রব্য বিলাতে গিয়া সেখানকার কারখানায় কারুপণ্যে পরিণত হইয়া এ দেশে বহুমূল্যে বিক্রীত হয়— তখন আমরা জানিতেও পারি না তাহার আদিম উপকরণ আমাদের ক্ষেত্র হইতেই সংগৃহীত। যখন দেশের কোনো মহাজন এইখানেই কারখানা খোলেন তখন সেটাকে আমাদের সমস্ত দেশের একটা সৌভাগ্যের কারণ বলিয়া জ্ঞান করি।

ভারত-ইতিহাসের আদিম উপকরণগুলি প্রায় সমস্তই এখানেই আছে; এখনও যে কত নূতন নূতন বাহির হইতে পারে তাহার আর সংখ্যা নাই। কিন্তু, কী বাণিজ্যে, কী সাহিত্যে, ভারতবর্ষ কি কেবল আদিম উপকরণেরই আকর হইয়া থাকিবে? বিদেশী আসিয়া নিজের চেষ্টায় তাহা

সংগ্রহ করিয়া নিজের কারখানায় তাহাকে না চড়াইলে আমাদের কোনো কাজেই লাগিবে না?

'ঐতিহাসিক চিত্র' ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটি স্বদেশী কারখানাস্বরূপ খোলা হইল। এখনও ইহার মূলধন বেশি জোগাড় হয় নাই, ইহার কল-বলও স্বল্প হইতে পারে, ইহার উৎপন্ন দ্রব্যও প্রথম প্রথম কিছু মোটা হওয়া অসম্ভব নহে, কিন্তু ইহার দ্বারা দেশেও যে গভীর দৈন্য— যে মহৎ অভাব-মোচনের আশা করা যায় তাহা বিলাতের বস্তা বস্তা সূক্ষ্ম ও সুনির্মিত পণ্যের দ্বারা সম্ভবপর নহে।

ঐতিহাসিক চিত্র
পৌষ ১৩০৫

বিজ্ঞান

সামুদ্রিক জীব

প্রথম প্রস্তাব

কীটাণু

এই সমুদ্র, এই জলময় মহা মরুপ্রদেশ, যাহা মনুষ্যদিগের মৃত্যুর আবাস, যাহা শত শত জলমগ্ন অসহায় জলযাত্রীর সমাধিস্থান, তাহাই আবার কত অসংখ্য জীবের জন্মভূমি, ক্রীড়াস্থল। স্থলপ্রদেশ এই জলজগতের তুলনায় কত সামান্য, কত ক্ষুদ্র। মিশ্লে (Michelet) কহেন, পৃথিবীতে জলই নিয়ম-স্বরূপ, শুষ্ক ভূমি তাহার ব্যতিক্রম মাত্র। পৃথিবীর এই চর্তুদিকব্যাপী, এই কুমেরু হইতে সুমেরু পর্যন্ত বিস্তৃত মহাপরিখা যদি শুষ্ক হইয়া যায়, তবে কী মহান, কী গম্ভীর দৃশ্য আমাদের সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত হয়, কত পর্বত, কত উপত্যকা, সামুদ্রিক-উদ্ভিদ-শোভিত কত কানন কত ক্ষুদ্র ও প্রকাণ্ড জীব আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হয়। এই সামুদ্রিক অরণ্যে কত প্রাণী ছুটিতেছে, সাঁতার দিতেছে, বালির মধ্যে লুকাইতেছে, কেহ বা বিশাল পর্বতের গাত্রে লগ্ন হইয়া আছে, কেহ বা গহ্বরে আবাস নির্মাণ করিতেছে, কোথাও বা পরস্পরের মধ্যে মহা বিবাদ বাধিয়া গিয়াছে, কোথাও পরস্পর মিলিয়া স্নেহের খেলায় রত রহিয়াছে। আমাদের প্রসিদ্ধ কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী মহাশয় সমুদ্র-বর্ণনাস্থলে যে একটি লোমহর্ষণ চিত্র দিয়াছেন তাহা এই স্থলে উদ্‌ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

৪১

'যতই তোমার ভাব, ভাবি হে অন্তরে,
ততই বিস্ময়-রসে হই নিমগন;
এমন প্রকাণ্ড কাণ্ড যাহার উপরে,
না জানি কী কাণ্ড আছে ভিতরে গোপন।

৪২

আজি যদি আসি সেই মুনি মহাবল,
সহসা সকল জল শোষেন চুম্বুকে;
কী এক অসীমতর গভীর অতল,
আচম্বিতে দেখা দেয় আমার সমুখে!

৪৩

কী ঘোর গর্জিয়া উঠে প্রাণী লাখে লাখ,
কী বিষম ছটফট ধড়ফড় করে;
হঠাৎ পৃথিবী যেন ফাটিয়া দোফাক,
সমুদয় জীবজন্তু পড়েছে ভিতরে।

৪৪

কোলাহলে পুরে গেছে অখিল সংসার,
জীবলোক দেবলোক চকিত স্থগিত;
আর্তনাদে হাহাকারে আকাশ বিদার
সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড যেন বেগে বিলোড়িত।

৪৫

আমি যেন কোন্ এক অপূর্ব পর্বতে
উঠিয়া দাঁড়ায়ে আছি সর্বোচ্চ চূড়ায়;
বালুময় ঢালুভাগ পদমূল হতে
ক্রমাগত নেমে গিয়ে মিশেছে তলায়।

৪৬

ধুধু করে উপত্যকা, অতল অপার,
অসংখ্য দানব যেন তাহার ভিতরে,
করিতেছে হুড়াহুড়ি— তুমুল ব্যাপার,
মরীয়া হইয়া যেন মেতেছে সমরে।

৪৭

ফেরো গো ও পথ থেকে কল্পনা সুন্দরী
ওই দেখো যাদকুল নিতান্ত আকুল,
নিতান্তই মারা যায় মরুর উপরি,
হেরে কি অন্তর তব হয় নি ব্যাকুল?

৪৮

সেই মহা জলরাশি আনো ত্বরা ক'রে,
ঢেকে দাও এই মহা মরুর আকার,
অমৃত বর্ষিয়া যাক ওদের উপরে;
শান্তিতে শীতল হোক সকল সংসার।'

ক্ষুদ্রতম অদৃশ্য কীটাণু হইতে বৃহৎ তিমি মৎস্য পর্যন্ত এবং আণুবীক্ষণিক উদ্ভিদ হইতে সহস্র হস্ত দীর্ঘ অ্যাল্‌জি (Algæ) নামক উদ্ভিদ পর্যন্ত এই সমুদ্রের গর্ভে প্রতিপালিত হইতেছে। এই সমুদ্রগর্ভে যত প্রাণী আছে, স্থল-প্রদেশে তত প্রাণী নাই।

সমুদ্রে এক প্রকার অতি নিকৃষ্টতম শ্রেণীর প্রাণী দেখিতে পাইবে। তাহারা উদ্ভিজ্জ শ্রেণী হইতে এক সোপান মাত্র উন্নত। তাহাদের শারীরযন্ত্র এত সামান্য যে, সহসা তাহাদের প্রাণী বলিয়া বোধ হয় না। ইহারাই পৃথিবীর প্রাণীসৃষ্টির মধ্যে আদিম সৃষ্টি বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। পৃথিবী যত প্রাচীন হইতে লাগিল, ততই জটিল শরীর-প্রকৃতি-বিশিষ্ট জীবের উৎপত্তি হইল, অবশেষে তাহার উৎকর্ষের সীমা মনুষ্যে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। কেহ মনে করেন, এইখানেই আসিয়া শেষ হইল, আর অধিক অগ্রসর হইবে না, কিন্তু কে বলিতে পারে, এই মনুষ্যালয়ের উপর আর-এক স্তর মৃত্তিকা পড়িয়া যাইবে না, ও এই মনুষ্য-সমাজের সমাধির উপর আর-একটি উন্নততর জীবের উৎপত্তি হইবে না। পৃথিবীর প্রথম অবস্থায় উদ্ভিদ ভিন্ন আর কিছুই ছিল না, তাহার মধ্যে প্রথমে আবার নিকৃষ্টতম উদ্ভিদের জন্ম হয়।

যদি কিয়ৎপরিমাণে জল খোলা জায়গায় কোনো পাত্রে রাখিয়া দেওয়া হয়, তবে শীঘ্রই দেখা যায়, তাহার উপর পীত ও হরিৎবর্ণের অতি সূক্ষ্ম আবরণ পড়িয়াছে, অণুবীক্ষণ দিয়া দেখিতে গেলে দেখা যাইবে, সেগুলি আর কিছুই নহে, সহস্র সহস্র উদ্ভিদ-পদার্থ ভাসিতেছে। তাহার পরেই সহস্র কীটাণু দেখা যাইবে, তাহারা দলবদ্ধ হইয়া সাঁতার দিতেছে ও সেই উদ্ভিজ্জ আহার করিয়া প্রাণ ধারণ করিতেছে। এই উদ্ভিদ-পদার্থ যাহা আমরা অণুবীক্ষণের সাহায্য ব্যতীত দেখিতে পাই না, তাহাই হয়তো তাহাদের নিকটে একটি বৃহৎ রাজ্য। পরে আর-এক দল কীটাণু

উত্থিত হইয়া প্রথমজাত কীটাণুদিগকে আক্রমণ করে, ও উদরসাৎ করিয়া ফেলে। প্রথমে উদ্ভিদ, পরে উদ্ভিদ-ভোজী জীব, তৎপরে মাংসাশী প্রাণী উৎপন্ন হয়।

কোন্‌খানে উদ্ভিদ-শ্রেণী শেষ হইল ও জীব-শ্রেণীর আরম্ভ হইল, তাহা ঠিক নিরূপণ করা অতিশয় কঠিন। দেখা গিয়াছে যে, শৈবালের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অংশে, অ্যাল্‌জি জাতীয় উদ্ভিদে, প্রাণী-জীবনের কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ বর্তমান আছে; মনে হয় যেন তাহাদের চলনেন্দ্রিয় আছে। তাহাদের গাত্রে চলনশীল যে সূক্ষ্ম সূত্র লম্বমান থাকে, তাহার দ্বারা তাহারা ইতস্তত চলিয়া বেড়ায়, তাহা দেখিয়া সর্বতোভাবে মনে হয় যেন তাহারা ইচ্ছাপূর্বক চলিয়া বেড়াইতেছে। কতকগুলি উদ্ভিদের অঙ্কুর এবং উদ্ভিদের উৎপাদনী আণবিক রেণুকণা (Fecundating corpuscles) জলে ভাসিবার সময় নিকৃষ্ট প্রাণীদিগের ন্যায় ইতস্তত ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়, গহ্বরের মধ্যে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করে, আবার পুনরায় ফিরিয়া আসে ও পুনরায় সেদিকে ধাবমান হয়। এইরূপে আপাতত প্রতীয়মান হয়, যেন তাহাদের চেষ্টা করিবার ক্ষমতা আছে। ইহাদের সহিত যদি সামুদ্রিক কতকগুলি নিকৃষ্ট জাতীয় জীবের তুলনা করা হয়, তবে কাহারা উদ্ভিদ ও কাহারা প্রাণী তাহা স্থির করা দুষ্কর হইয়া পড়ে।

পূর্বোক্ত নিকৃষ্ট জাতীয় জীবদিগকে য়ুরোপীয় ভাষায় জুফাইট (Zoophyte) অর্থাৎ উদ্ভিদজীব বা উদ্ভিদ-প্রাণী কহে। কারণ ইহাদের মধ্যে অনেকের বাহ্য আকৃতি উদ্ভিদের ন্যায়, তাহাদের শরীর হইতে উদ্ভিদের ন্যায় শাখা বহির্গত হয়। এবং তাহাদের কোনো কোনো অঙ্গ নানা বর্ণে চিত্রিত এবং দেখিতে পুষ্পের ন্যায়। প্রবালদিগকে দেখিতে অবিকল উদ্ভিদের ন্যায়, মৃত্তিকায় বা পর্বতে তাহাদের মূল-দেশ নিহিত থাকে, এবং গাত্র হইতে শাখা-প্রশাখা বহির্গত হয়, এবং তাহাদের রঙিল অঙ্গগুলি কাল-বিশেষে অবিকল পুষ্পের ন্যায় আকার ধারণ করে। অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা এই প্রবালকে নিঃসংশয়ে উদ্ভিদ বলিয়া গণ্য করিয়া গিয়াছেন, সম্প্রতি ইহা প্রাণী বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে।

এই নিকৃষ্টতম প্রাণীদিগের কি বুদ্ধি বা মনোবৃত্তি আছে? ইহা স্থির করা এক প্রকার অসম্ভব। প্রথমত ইহারা প্রাণী কি উদ্ভিদ, তাহাই কত কষ্টে স্থিরীকৃত হইয়াছে, এক্ষণে ইহাদের বুদ্ধি বা মনোবৃত্তি আছে কি না তাহা স্থির করিতে বোধহয় অনেক বিলম্ব লাগিবে। শুক্তিরা তো জন্মাবধি এক শৈলেই আবদ্ধ থাকে। কীটাণুরাও একটিমাত্র ক্ষুদ্রতম স্থান ব্যাপিয়া ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়। অ্যামিবি কীটগণ, মিনিটের মধ্যে যাহারা শত বার আকার পরিবর্তন করে, তাহারা তো জীবন্ত পরমাণু মাত্র। ইহাদের বুদ্ধি ও মনোবৃত্তি আছে কি না তাহা স্থির করা যে দুরূহ, তাহা বলা বাহুল্য।

উদ্ভিদজীবদিগের কঙ্কাল অতিশয় অপূর্ণ, স্নায়ুযন্ত্র অত্যন্ত অপরিস্ফুট। এই জাতীয় অধিকাংশ জীবের স্পর্শ ভিন্ন অন্য প্রকার অনুভূতি নাই, ইহারাই প্রাণী-জগতের শেষ শ্রেণীর নিকৃষ্টতম জাতির অন্তর্ভূত। উদ্ভিদজীবেরা অনেক জাতিতে বিভক্ত।

লয়বেনহয়েক (Leuwenhoek) যখন অণুবীক্ষণ লইয়া সমুদ্রের এক বিন্দু জল পরীক্ষা করিতে গেলেন, তখন দেখিলেন, সেই এক বিন্দু জলের মধ্যে একটি নূতন জগৎ প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। সেই নূতন রাজ্যের অধিবাসীদিগের সংক্ষেপ বিবরণ পাঠ করা যাক।

রিজোপডা (Rizopoda) বা শীকড়-পদ কীটগণের বিশেষ প্রকৃতির মধ্যে, উহাদের পাকযন্ত্র নাই, জলজ উদ্ভিদগণের ন্যায় উহাদের গাত্রে যে সূক্ষ্ম সূত্র থাকে তাহা দ্বারা চলা-ফিরা করে, নিজ শরীর ইচ্ছাক্রমে বর্ধিত ও শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত করিতে পারে। সময়ে সময়ে দেখা যায়, শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত অঙ্গগুলি ক্রমে গ্রমে গুটাইয়া আসে ও ক্রমে তাহাদের শরীরের মধ্যে মিলাইয়া যায়। মনে হয় যেন আপনার শরীর আপনিই ভক্ষণ করিয়া ফেলিল। এই জাতীয় কীটেরা আবার অন্যান্য কীট এবং অন্যান্য জন্তুদিগের গাত্রে লগ্ন হইয়া প্রাণ ধারণ করে। অনেক জাতীয় রিজোপডা আছে, তন্মধ্যে দুই-তিনটির বিবরণ প্রকাশ করা যাইতেছে।

অ্যামিবি (Amibæ) নামক কীটাণুদিগের আঠাবৎ শরীর এমন স্বচ্ছ, এত ক্ষুদ্র যে, অণুবীক্ষণ যন্ত্রে রাখিয়া সময়ে সময়ে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ইহাদের শরীরের গঠন যে কী প্রকার তাহা কিছুই ভাবিয়া পাওয়া যায় না। অণুবীক্ষণ দিয়া দেখিতে ইহারা এক বিন্দু জলের ন্যায়, কিন্তু মুহূর্তে মুহূর্তে ইহারা এত বিভিন্ন আকার ধারণ করে যে, ইহাদের আকৃতি কোনোমতে নির্ধারিত করা যায় না। ইহাদের শরীরে পাকযন্ত্র দেখা যায় না, তবে ইহারা কী করিয়া জীবন ধারণ করে? এইরূপ স্থির হইয়াছে যে, খাদ্যদ্রব্য তাহারা শরীরের সহিত মিশাইয়া লয়। অণুবীক্ষণ দিয়া ইহাদের শরীরে মাঝে মাঝে উদ্ভিদের অংশ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা যেরূপ ইচ্ছামতে শরীর প্রসারিত ও কুঞ্চিত করিতে পারে, তাহাতে শরীরের সহিত খাদ্য মিশ্রিত করিবার ইহাদের অনেকটা সুবিধা আছে। কোনো একটি উদ্ভিদাণুর উপরে নিজ শরীর প্রসারিত করিয়া পুনরায় কুঞ্চিত করিলে সহজেই তাহা তাহাদের শরীরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া যায়।

ফরামিনিফেরা (Foraminifera) নামক পূর্বোক্ত জাতীয় আর-এক প্রকার কীট আছে, তাহারা প্রায় চক্ষুর অদৃশ্য বলিলেও হয়, তাহাদের আয়তন এক ইঞ্চির দুই শতাংশ অপেক্ষা অধিক নহে, কিন্তু এই ক্ষুদ্র কীটগণের দ্বারা কত বৃহৎ ব্যাপার সম্পাদিত হইয়াছে, ভাবিয়া দেখিলে আশ্চর্য হইতে হয়। পৃথিবীর অনেক স্থানের আবরণ কেবলমাত্র ইহাদেরই দেহে নির্মিত হইয়াছে। আমাদের আবাস-গ্রহের তরুণাবস্থায় বোধহয় এই কীটগণ অসংখ্য পরিমাণে সমুদ্রের বাস করিত। তাহাদের রাশীকৃত মৃত দেহে কত বৃহৎ পর্বত সৃষ্টি হইয়া সমুদ্র-গর্ভ হইতে মাথা তুলিয়াছে। সমুদ্রের বালুকা অণুবীক্ষণ দিয়া পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে, তাহাদের অর্ধেক ইহাদের কঠিন গাত্রাবরণ। রুসিয়ার প্রকাণ্ড চুনের পর্বতগুলি ইহাদের দেহে নির্মিত। যে চা-খড়ির পর্বত ফ্রান্স দেশস্থ শ্যাম্পেন হইতে ইংলণ্ডের মধ্য পর্যন্ত বিস্তৃত, তাহা এই জীবদেহের স্তূপ মাত্র। যে চা-খড়ির দ্বারা প্রায় প্যারিসের সমগ্র ভূভাগ নির্মিত, তাহা ইহাদেরই দেহ-সমষ্টি। এই কীট-সমষ্টির উপরে কত বিদ্রোহ, কত বিপ্লব, কত রক্তপাত হইয়া গেছে, ও হইবে। এই কীট-সমষ্টির উপর সভ্যতার উন্নততম প্রাসাদ নির্মিত। প্রকৃত কথা এই যে, এই ক্ষুদ্র কীটগণের মৃতদেহ-রাশির উপরে জগতের আর-এক জাতীয় উন্নততর কীটাণু ক্রীড়া করিতেছে!

ডর্বিঞি (D'orbigny) তিন গ্র্যাম বালুকার মধ্যে চারি লক্ষ চল্লিশ সহস্র ফরামিনিফেরার গাত্রাবরণ পাইয়াছেন। ইহাদের কত দেহ যে পৃথিবীর ভূভাগের আয়তন বর্ধিত করিতে নিযুক্ত হইয়াছে তাহা কল্পনারও অগম্য। ইহাদের স্তূপে অ্যালেকজান্দ্রিয়ার বন্দর ক্রমশ পূর্ণ হইয়া আসিয়াছে, ইহাদের স্তূপে সমুদ্রের কত স্থানের তীরভাগ নির্মিত হইয়াছে। প্রবাল এবং অন্যান্য দুই-একটি সামুদ্রিক পদার্থের ন্যায় ইহারাও সমুদ্রের মধ্যে অনেক দ্বীপ নির্মাণ করিয়াছে। এই চক্ষুর অদৃশ্য পদার্থ সমুদ্রের বিশাল উদর পূর্ণ করিয়া ক্রমে ক্রমে কীরূপে দ্বীপ ও পর্বতসমূহ নির্মাণ করে ভাবিয়া দেখিলে আশ্চর্য হইতে হয়।

ইহাদের দেহ আঠাবৎ পদার্থে নির্মিত। স্বীয় গাত্রাবরণের মধ্য দিয়া ইহারা শাখা-প্রশাখাবান অঙ্গ বহির্গত করে, এই অঙ্গ দ্বারা তাহারা চলা-ফিরা করিয়া থাকে। ইহাদের ওই ক্ষুদ্রতম হস্তপদে আবার বিষাক্ত পদার্থ আছে। দেখা গিয়াছে, ইন্‌ফিউসোরিয়া (Infusoria) প্রভৃতি কীটের গাত্রে ইহাদের বিষাক্ত হস্ত লাগিলে তৎক্ষণাৎ তাহারা অচল হইয়া যায়। এইরূপে তাহারা শিকার করিয়া থাকে। এই ক্ষুদ্র কীটগণ নিষ্ঠুর মাংসাশী, ইহারা আবার কত কীটাণুর বিভীষিকাস্বরূপ। ইহারা আবার আপনাদিগের ক্ষুদ্র কীটাণু-রাজ্যে আক্রমণ করে, সংহার করে, কতই গোলযোগ করে। দুজার্দ্যাঁ (Durjadin) দেখিয়াছেন, ইহারা ইচ্ছা করিলে আপনার শরীর হইতে নূতন হস্তপদ নির্মিত করিতে পারে, প্রয়োজন অতীত হইয়া গেলেই পুনরায় তাহা আপনার শরীরের সহিত মিশাইয়া ফেলে। ইহাদেরও শরীরে এ পর্যন্ত পাকযন্ত্র দেখা যায় নাই। ইহাদের সুদৃশ্য গাত্রাবরণ নানা প্রকার। ইহাদের বিভিন্ন গাত্রাবরণ অনুসারে ইহাদের জাতির ভিন্নতা নিরূপিত হয়।

সমুদ্রে নক্তালোকা (Noctiluca) নামক কীটের বিষয় দুই-এক কথা বলা যাউক। বাল্মীকি

সমুদ্র-বর্ণনায় লিখিয়াছেন যে, 'স্থানে স্থানে প্রকাণ্ড শৈল। উহা অতলস্পর্শ। ভীম অজগরগণ গর্ভে লীন রহিয়াছে; উহাদের দেহ জ্যোতির্ময়। সাগর-বক্ষে যেন অগ্নি-চূর্ণ প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে।' এখনকার নাবিকেরাও সমুদ্র ভ্রমণ করিবার সময়, সময়ে সময়ে দেখিতে পান, সাগরবক্ষে যেন অগ্নিচূর্ণ প্রক্ষিপ্ত রহিয়াছে। দাঁড়ের আঘাতে এবং তরঙ্গের গতিতে তাহাদের উজ্জ্বলতা আরও বৃদ্ধি হইয়া উঠে। সমস্ত সমুদ্র যেন একটি জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড বলিয়া বোধ হয়। কখনো ভাঁটা পড়িয়া গেলে দেখা যায় পর্বত-দেহে, সামুদ্রিক তৃণসমূহে ও তীর-ভূমিতে যেন আগুন লাগিয়াছে। বাল্মীকির সময়ে যাহা লোকে অজগরের দেহজ্যোতি বলিয়া মনে করিত, বৈজ্ঞানিকেরা অসংখ্য ক্ষুদ্র কীটের দেহ-নিঃসৃত ফস্‌ফরিয় আলোক বলিয়া জানিয়াছেন। সেই কীটদিগের নাম নক্তালোকা। ঝটিকামত্ত অন্ধকার রাত্রে রজত ফেনময় অধীর তরঙ্গের দ্বারা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইয়া এই জ্বলন্ত কিরণ কী সুন্দর শোভাই ধারণ করে।

ইনফিউসোরিয়া (Infusoria) কীট অ্যামিবির ন্যায় পরিষ্কার বা লবণাক্ত, শীতল বা উষ্ণ সকল প্রকার জলেই বাস করে। সপ্তদশ শতাব্দীর বিখ্যাত বিজ্ঞানবিৎ লয়বেনহয়েক ইহাদের প্রথম আবিষ্কর্তা, এই চির-অস্থির কীটাণুগণ এত ক্ষুদ্র যে, একবিন্দু জলে ইহাদের কোটি কোটি বাস করিতে পারে। গঙ্গা প্রতিবৎসর এত ইনফিউসোরিয়া সমুদ্রকে উপহার দিতেছে যে, তাহা একত্র করিলে ইজিপ্টের পিরামিড অপেক্ষা ছয়-সাত গুণ অধিক হয়। মরুপ্রদেশে উৎকৃষ্ট জীবগণ বাস করিতে পারে না, কিন্তু সেখানেও ইহারা অসংখ্য পরিমাণে জীবন ধারণ করিয়া আছে। পৃথিবীর উচ্চতম পর্বতের পরিমাণ অপেক্ষা গভীরতর সমুদ্র-তলদেশে এই অসংখ্য জীবিত-কণা বাস করিতেছে। মনুষ্যের ন্যায় এই অদৃশ্য কীটাণুগণও এই মহান জগতের একটি অংশ। এই কীটাণুদিগকে জগৎ হইতে বাদ দাও, জগৎ এক বিষয়ে অসম্পূর্ণ হইল। এমন স্থান নাই, যেখানে ইহারা নাই। সমুদ্রে, নদীতে, পুষ্করিণীতে, এমন-কি, আমাদের শরীরস্থ রসে ইহারা সঞ্চরণ করে। অনেক স্থানে পৃথিবীর স্তর বহুদূর ব্যাপিয়া কেবল মাত্র ইহাদের দেহে নির্মিত। ইহাদিগের দেহের নিমিত্তই গঙ্গা নীল প্রভৃতি নদীতীরস্থ কর্দমে উর্বরা শক্তি জন্মে। ইহাদের ক্ষুদ্রতম গাত্রাবরণ জমিয়া এক প্রকার প্রস্তর নির্মিত হয়। ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ কহেন— অনেক উচ্চ পর্বত ইহাদেরই দ্বারা নির্মিত হইয়াছে। এই ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্র— বিন্দু-জলে যাহারা কোটি কোটি বাস করিতে পারে— তাহাদের স্তূপে পর্বত নির্মিত হইয়াছে।

এই কীটাণুগণ, কেহ কেহ জলে, কেহ বা আর্দ্র শৈলে, কেহ কেহ বা অন্য জন্তুর শরীরে বাস করিয়া থাকে। এমন-কি, স্ত্রীলোকের স্তন-দুগ্ধেও ইহাদিগকে পাওয়া গিয়াছে। পাঠকেরা যদি কেহ অণুবীক্ষণ দিয়া এই কীটাণুগণকে দেখিতে চান, তবে এক পাত্র জলে, ডিম্বের শ্বেতাংশ ফেলিয়া মুক্ত স্থানে রাখিয়া দিবেন, ইহাতে ফসফেট অফ সোডা বা কার্বোনেট অফ সোডা অথবা নাইট্রেট কিংবা অক্সালেট্‌স অফ অ্যামোনিয়া দিলে এই কীটাণুগণ অতি শীঘ্র শীঘ্র বর্ধিত হইয়া উঠিবে।

এই কীটাণুদিগের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষের প্রভেদ আছে। কিন্তু গর্ভ ভিন্ন অন্য কারণেও ইহারা জন্মলাভ করে। ইহাদের অসংখ্য সঙ্গীগণ হইতে একটি কীটাণুকে স্বতন্ত্র লইয়া যদি অণুবীক্ষণ দিয়া পরীক্ষা করা যায়, তবে দেখা যাইবে, ইহার দেহের মধ্যভাগ ক্রমশ ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে, এবং ক্রমে নিম্ন প্রদেশে কতকগুলি চলনেন্দ্রিয়সূত্র দেখা যাইতেছে। অবশেষে ক্রমশ ওই কীট একেবারে দুই ভাগে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, এবং এইরূপে দুইটি কীটের জন্ম হয়। বিচ্ছিন্ন অংশটিরও মুখ এবং অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেখা যায়। ইহাদের মধ্যে যেমন 'আত্মাবৈ জায়তে পুত্রঃ' এমন মনুষ্যের মধ্যে নহে। এইরূপে একটি ইনফিউসোরিয়া, যাহা কত যুগ পূর্বে বর্তমান ছিল, তাহারই খণ্ডাংশ হয়তো আজ পর্যন্ত চলিয়া আসিতেছে। দেখা গিয়াছে এক মাসের মধ্যে দুইটি কীটাণুর বিচ্ছিন্ন শরীরে ১০ লক্ষ ৪৮ সহস্র কীটাণু জন্মলাভ করিয়াছে। ৪২ দিনে একটি কীটাণু শরীর হইতে এক কোটি ছত্রিশ লক্ষ চল্লিশ সহস্র কীটাণু জন্মিয়াছে।

এই অতি ক্ষুদ্র কীটাণুর গাত্রেও আবার ক্ষুদ্রতর কীটাণু সঞ্চরণ করিতেছে, বৃহত্তর কীটাণুর গাত্র তাহার নিবাস ও আহারস্থান। ঘণ্টাকতক মাত্র এই কীটাণুদিগের জীবনকাল। কিন্তু একটি আশ্চর্য দেখা গিয়াছে, যাহাতে বায়ু না পায় এমন করিয়া যত্নপূর্বক ইনফিউসোরিয়াকে ঢাকিয়া রাখো, যতদিন পরেই হউক-না-কেন, গাত্রে এক বিন্দু জল লাগিলেই পুনরায় বাঁচিয়া উঠিবে। এইরূপে এই দুই ঘণ্টার জীব শত বৎসর মৃত থাকিয়া আবার মুহূর্তে বাঁচিয়া উঠিতে পারে।

এই কীটাণুদিগের আর-একটি আশ্চর্য প্রকৃতি আছে। ইহাদের শরীরের কিয়দংশ বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলেও ইহারা মরিয়া যায় না। মৃত অর্ধাংশ অদৃশ্য হইয়া যায়, আর জীবিত অংশটি যেন অতি নিশ্চিতভাবে পুনরায় খেলা করিয়া বেড়ায়, যেন তাহার কিছুমাত্র ক্ষতিবৃদ্ধি হয় নাই, অথচ সে হয়তো তাহার পূর্ব শরীরের ষোড়শ অংশে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে।

যে জলবিন্দুতে এই কীটাণুগণ সাঁতার দিয়া বেড়ায়, তাহাতে যদি অ্যামোনিয়াসিক্ত একটি পালক ডুবানো যায়, তবে তৎক্ষণাৎ তাহাদের গতি বন্ধ হইয়া যায়। চলিবার জন্য তাহারা হাত-পা সঞ্চালন করিতে থাকে বটে কিন্তু চলিতে পারে না। ক্রমে তাহাদের শরীর গলিয়া যাইতে থাকে। আবার যদি তাহাতে ভালো জল দেওয়া যায়, তৎক্ষণাৎ তাহাদের গলন বন্ধ হইয়া যায়, আবার অবশিষ্ট অংশ সুখে সাঁতার দিয়া বেড়ায়।

এক প্রকার ইনফিউসোরিয়া আছে, উদ্ভিদ অথবা প্রাণীগণের গলিত দেহে তাহাদিগকে পাওয়া যায় কিন্তু যখনই অন্যান্য কীট তাহাদের স্থান অধিকার করে, তখনই তাহারা অদৃশ্য হইয়া যায়। অর্থাৎ অন্য জাতীয় কীটেরা তাহাদিগকে ভক্ষণ করিয়া ফেলে। আবার যখন সেই-সমস্ত দ্রব্য এমন পচিয়া যায় যে আর অন্য কোনো কীট তাহাতে থাকিতে পারে না, তখন তাহারা পুনরায় আবির্ভূত হয়। দাঁতে যে শ্বেত পদার্থ আছে তাহাতেও লয়বেনহয়েক এই কীটাণু দেখিতে পাইয়াছিলেন। অনেক রোগগ্রস্ত প্রাণীর শরীরস্থ রসেও ইহাদের বসতি। এক প্রকার ইনফিউসোরিয়া আছে, তাহার শরীর স্ক্রুর ন্যায় পেঁচালো। ইহারা এমন আশ্চর্য বেগে ঘুরিতে থাকে যে, চোখ দিয়া দেখা যায় না, এবং কেন যে অত বেগে ঘুরিতেছে তাহার কোনো কারণ ভাবিয়া পাওয়া যায় না। আর-এক প্রকার কীটাণু আছে, তাহাদের শরীর যেন তাহাদের নিজের নহে। ইহাদের অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর কীটসমূহ ইহাদের পশ্চাতে পশ্চাতে তাড়না করিয়া বেড়ায়, এবং ধরিতে পারিলেই তাহাদের গাত্রে চড়িয়া বসে, এবং বেচারীর সমস্ত রক্ত শোষণ করে এবং রহিয়া বসিয়া তাহাকেও ভক্ষণ করিয়া ফেলে। উকুন বা ছারপোকার মতো একটুতেই ইহারা সন্তুষ্ট নহেন, যতক্ষণে সমস্ত আহার্য না ফুরাইয়া যায় ততক্ষণ ইহারা ছাড়েন না। এ কীটাণুদের শুদ্ধ এই এক যন্ত্রণা নহে, আর-এক প্রকারের কীটাণু ইহাদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া আছে, যেমন ইহারা কাছে আসে, অমনি তাহারা ইহার শরীরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। এবং অল্প সময়ের মধ্যে সে বেচারীর শরীরে ঘর-কন্না ফাঁদিয়া বসে, অবশেষে পুত্র-পৌত্র লইয়া সুখে তাহার শরীর ভক্ষণ করিতে থাকে। একটি কীটাণুর শরীরের মধ্যে অমন পঞ্চাশটা ক্ষুদ্রতর ক্ষুদ্রতম কীটাণু পাওয়া গিয়াছে।

ভারতী
বৈশাখ ১২৮৫

দেবতায় মনুষ্যত্ব আরোপ

হর্বর্ট্ স্পেন্সর তাঁহার রচনাবলীর মধ্যে "The use of Anthropomorphism" নামক প্রবন্ধে দেবতায় মনুষ্যত্ব আরোপ সম্বন্ধে যাহা আলোচনা করিয়াছেন, তৎবিষয়ে আমাদের কতকগুলি বক্তব্য আছে। অগ্রে, তিনি যাহা বলেন, তাহা প্রকাশ করি, পরে আমাদের যাহা মত তাহা ব্যক্ত করিব।

স্পেন্সর বলেন মনুষ্য-সমাজে যখন যে ধর্মমতের প্রাদুর্ভাব থাকে, তখনকার পক্ষে সেই ধর্মমতই সর্বাপেক্ষা উপযোগী। এ কথা শুনিলেই হয়তো অনেকে আশ্চর্য হইবেন, কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলেই ইহার প্রমাণ পাইবেন।

মনুষ্য-বিশেষ এবং মনুষ্য-সমাজ উভয়েই গাছের মতো করিয়া বাড়ে, ইহাদের মধ্যে হঠাৎ-আরম্ভ কিছুই নাই। তাহা যদি সত্য হয়, তবে মনুষ্যের ধর্মমত, মনুষ্যের রাজ্যতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের ন্যায় অবস্থানুসারে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হয়, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। যে সময়ে যেরূপ ধর্ম প্রয়োজনীয়, সে সময়ে সেইরূপ ধর্ম আপনাআপনিই উদ্ভূত হইয়া থাকে। কেন হইয়া থাকে তাহা বিস্তৃত করিয়া বলা যাক।

ইহা সাধারণত সকলেই স্বীকার করেন যে, ঈশ্বরকে কল্পনা করিতে গেলে, আমরা তাঁহাতে আমাদের নিজত্ব আরোপ না করিয়া থাকিতে পারি না। ইহা আমাদের মনের ধর্ম। ন্যূনাধিক পরিমাণে সকল ধর্মেই এই মানব-স্বভাব লক্ষিত হয়। কোনো ধর্মে ইহারই মাত্রাধিক্য দেখিলেই আমাদের ঘৃণা উদয় হয়। যখন শুনা যায়, পলিনেসীয় জাতির ধর্মে তাহাদের দেবতারা মৃত মনুষ্যের আত্মা ভক্ষণ করে, অথবা প্রাচীন গ্রিসীয়দিগের দেবতারা কুটুম্ব-মাংস ভক্ষণ হইতে আরম্ভ করিয়া জঘন্যতম পাপাচরণ পর্যন্ত কিছুই বাকি রাখে নাই, তখন আমাদের মনে অতিশয় ঘৃণা উদয় হয়। কিন্তু যদি আমরা যুক্তি সহকারে বিবেচনা করিয়া দেখি, যদি আমরা দেবভক্তদিগের মনোভাব ও সময়ের অবস্থা আলোচনা করিয়া দেখি, তাহা হইলে আমরা বুঝিতে পারি যে, সেই ধর্মই সেই অবস্থার উপযোগী, অতএব তাহা নিন্দনীয় নহে।

কারণ, ইহা কি সত্য নহে যে কেবল অসভ্য দেবতাদেরই ভয়ে অসভ্য মনুষ্যেরা শাসনে থাকিতে পারে, তাহাদের প্রকৃতি যতই দুর্দান্ত হয় তাহাদের শাসন বিভীষিকা ততই নিদারুণ হওয়া আবশ্যক, ও শাসন নিদারুণ হইতে গেলে শাসনকর্তা দেবতাদেরও সেই পরিমাণে নিষ্ঠুর প্রতিহিংসা-পরায়ণ হওয়া আবশ্যক? বিশ্বাসঘাতক, চৌর্য-বৃত্তিপরায়ণ, মিথ্যাবাদী হিন্দুরা যে তপ্ত-তৈল-কটাহপূর্ণ নরকে বিশ্বাস করে, ইহা কি তাহাদের পক্ষে ভালো হয় নাই? এবং এইরূপ নরক সৃষ্টি করিতে পারে এমন নিষ্ঠুর দেবতা থাকাও আবশ্যক, সেইজন্যই তো তাহাদের দেবতারা ফকিরদের আত্মপীড়ন দেখিয়া সুখী হয়।

অতএব দেখা যাইতেছে, অসভ্য মনুষ্যের পক্ষে অসভ্য দেবতাই উপযোগী। আমরা যে ঈশ্বরকে আমাদের নিজ স্বভাবের আদর্শ করিয়াই গড়ি, তাহা আমাদের পক্ষে শুভ বৈ অশুভ নহে।

আবার ইহাও দেখা গিয়াছে, যে ধর্ম যে অবস্থার উপযোগী নহে, সে ধর্ম সে অবস্থায় বলপূর্বক প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিতে গেলে কোনো মতে টিঁকিতে পারে না। অসভ্য দেশে খৃস্টান ধর্ম নামেমাত্র খৃস্টান ধর্ম, অসভ্যদিগের প্রাচীন ধর্ম তাহার অভ্যন্তরে বিরাজ করিতে থাকে।

স্পেন্সরের মত উপরে উদ্‌ধৃত করা গেল, এক্ষণে আমাদের যাহা বক্তব্য তাহা বলি।

স্পেন্সরের প্রথম যুক্তি এই— মনুষ্য দেবতাকে নিজের আকার দিয়া পূজা করে অতএব, মনুষ্যেরও যেরূপ পরিবর্তন হইতে থাকে, দেবতারও সেইরূপ পরিবর্তন হইতে থাকে। মনুষ্য যখন ক্রোধপরায়ণ থাকে, তখন তাহাদের দেবতারাও ক্রোধপরায়ণ থাকে, মনুষ্য যখন দয়াবান হয়, তখন তাহাদের দেবতারাও দয়াবান হয়, ইত্যাদি। ইহা হইতে এই সিদ্ধান্ত হয় যে, একটি জাতির দেব চরিত্রে বা ধর্মে যত দিন গর্হিত আচরণের উল্লেখ থাকিবে, ততদিন জানা যাইবে যে, সে জাতির স্বভাবও গর্হিত।

স্পেন্সরের দ্বিতীয় যুক্তি এই যে, 'যেমন মানুষ, তেমনি দেবতাই তাহার পক্ষে ঠিক উপযোগী।' তাহা হইতে সিদ্ধান্ত হয় যে, সকল ধর্মই স্ব স্ব ভক্তের নিকট উপযোগী। কারণ পূর্বেই প্রমাণ হইয়াছে, মানুষ স্বভাবতই নিজেরই মতো করিয়া দেবতা গড়িয়া লয়, এখন যদি প্রমাণ

হয়, সেইরূপ দেবতাই তাহার পক্ষে যথার্থ উপযোগী, তাহা হইলেই প্রমাণ হইল যে, সকল জাতিরই নিজের নিজের ধর্ম নিজের নিজের পক্ষে উপযোগী। স্পেন্সর ধর্মের উপযোগিতা কাহাকে বলিতেছেন তাহাও এখানে বলা আবশ্যক। দুষ্কর্ম হইতে বিরত করিয়া রাখাই ধর্মের উপযোগিতা।

স্পেন্সরের তৃতীয় যুক্তি এই যে, যত দিন একটি দ্রব্যের উপযোগিতা থাকে, তত দিনই সে টিকিতে পারে, তাহার উর্ধ্বে নহে। অতএব জাতিবিশেষের স্বভাব যখন পরিবর্তিত হয়, তখন তাহাদের প্রাচীন ধর্ম অনুপযোগী হইয়া পড়ে, অতএব আপনাআপনিই ধ্বংস হইয়া যায়। তাহার পূর্বে যদি নূতন ধর্ম তাঁহাদের মধ্যে প্রচার করিতে যাও, তবে তাহা স্থান পায় না।

স্পেন্সর যে বলিতেছেন, যে, মনুষ্যেরা যখন নিজে ক্রোধপরায়ণ থাকে, তখন তাহাদের দেবতারাও ক্রোধপরায়ণ হয়, তাহাদের নিজের যে-সকল দুষ্প্রবৃত্তি থাকে দেবতাদিগের প্রতিও তাহাই আরোপ করে, তাহা নিতান্ত অঙ্গহীন অসম্পূর্ণ যুক্তি। যদি এমন হইত, মনুষ্য সর্বতোভাবে নিজের মন হইতেই দেবতা কল্পনা করিত, বাহ্য-জগতের সহিত, আমাদের ইন্দ্রিয়জ্ঞানের সহিত দেবতা-কল্পনার কোনো যোগ না থাকিত, তাহা হইলে স্পেন্সরের কথা সত্য হইত। কিন্তু তাহা তো নহে। ধর্মের শৈশব অবস্থায় মনুষ্যেরা বাহ্য প্রকৃতির এক-এক অংশকে দেবতা বলিয়া পূজা করে। তখন সূর্য, অগ্নি, বায়ু, সকলই দেবতা। যদি কোনো ভক্ত অগ্নিকে নিষ্ঠুর বলিয়া কল্পনা করে, তবে তাহা হইতে প্রমাণ হয় না যে, তাহার নিজের স্বভাব নিষ্ঠুর বলিয়া তাহার দেবতাকেও নিষ্ঠুর করিয়াছে, যদি কেহ বায়ুকে কোপন-স্বভাব কল্পনা করে, তবে তাহা হইতে অনুমান করা যায় না যে, সে নিজে কোপন-স্বভাব। সে যখন প্রত্যক্ষ দেখিতেছে, অগ্নি সহস্র জিহ্বা বিকাশ করিয়া কুটির, গ্রাম, বন, ধ্বংস করিয়া ফেলিতেছে, সে তখন নিজে দয়ালু হইলেও অগ্নিকে নিষ্ঠুর দেবতা সহজেই মনে করিতে পারে। বাহ্য জগতে সুখ দুঃখ, বিপদ সম্পদ, জীবন মৃত্যু দুইই আছে অতএব যাহারা বাহ্য-জগতের উপর দেবতা প্রতিষ্ঠা করে, তাহারা কতকগুলি দেবতাকে স্বভাবতই নিষ্ঠুর বলিয়া কল্পনা করে। বিশেষত অসভ্য অবস্থায় পদে পদে বিপদ, পদে পদে মৃত্যু, অতএব সে অবস্থায় নির্দয় দেবতা কল্পনা কেবলমাত্র মনের উপরেই নির্ভর করে না। অতএব আমি দয়ালুই হই, আর নিষ্ঠুরই হই, অগ্নির ধ্বংসশক্তিকে যতদিন দেবতা বলিয়া মনে করিব, ততদিন তাহা নিষ্ঠুর বলিয়া জানিব। আমার স্বভাবের পরিবর্তন হইতে পারে, কিন্তু অগ্নির স্বভাবের পরিবর্তন হইবে না তো। অতএব দেবতায় হীন স্বভাব হইতে মনুষ্যের হীন স্বভাব কল্পনা করা সকল সময় ঠিক খাটে না। আমাদের শাস্ত্র হইতে ইহার শত শত প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। ব্রহ্মার নিজ কন্যার প্রতি আসক্তির বিষয়ে সকলেই অবগত আছেন। কিন্তু সেরূপ ঘৃণিত আচরণ আর্যদিগের মধ্যে কখনোই প্রচলিত ছিল না, তবে এরূপ অসংগত কল্পনা কী করিয়া প্রাচীন আর্যদের হৃদয়ে উদিত হইল?

শতপথ ব্রাহ্মণে আছে— প্রজাপতি নিজের দুহিতা আকাশ অথবা উষাকে দেখিয়া তাহার সহিত সংগত হইলেন। দেবতাদের চক্ষে এ আচরণ পাপ, অতএব তাঁহারা কহিলেন, যিনি নিজের দুহিতা ও আমাদের ভগ্নীর প্রতি এরূপ আচরণ করেন, তিনি পাপ করেন, অতএব তাঁহাকে বিদ্ধ করো। রুদ্র তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন।— আমাদের বোধ হয় ইহা উষার প্রতি কুজ্ঝটিকা-আক্রমণের রূপক। কারণ ভাগবত পুরাণের এক স্থলে আছে— পিতার অধর্মে মতি দেখিয়া তাঁহার পুত্র মুনিগণ মরীচিকে পুরোভাগে লইয়া তাঁহাকে এই বলিয়া তিরস্কার করিলেন, 'তুমি যে আত্মদমন না করিয়া নিজ-দুহিতাগামী হইয়াছ, এমন পূর্বেও কখনো কৃত হয় নাই, এমন পরেও কখনো কৃত হইবে না। হে জগদ্গুরু, যাহাদের অনুসরণ করিয়া লোকে ক্ষেম প্রাপ্ত হয় এমন তেজস্বীদের পক্ষে এ কার্য কিছুতেই প্রশংসনীয় নহে।' নিজের সন্তানদিগকে এইরূপ কথা কহিতে শুনিয়া প্রজাপতি লজ্জিত হইলেন ও নিজ দেহ পরিত্যাগ করিলেন। সেই ঘোর দেহ দিক্ আচ্ছন্ন করিল ও তাহাই পণ্ডিতেরা অন্ধকার নীহার বলিয়া জানেন।

ভাগবত-পুরাণে ব্রহ্মার কন্যা উষার পরিবর্তে বাণী রহিয়াছে, আমরা উভয়কে মিলিত করিলাম। উপরে যাহা উদ্‌ধৃত হইল তাহাতেই দেখা যাইবে, ব্রহ্মার পাপাচরণ আর্যদিগের দ্বারা নিতান্ত নিন্দনীয় বলিয়া ব্যক্ত হইয়াছে। কিন্তু নিন্দনীয় হউক বা না হউক, তাঁহারা প্রত্যক্ষ দেখিতেছেন, কুজ্‌ঝটিকা বলপূর্বক উষাকে আচ্ছন্ন করিতেছে, ইহা তাঁহাদের পক্ষে সত্য ঘটনা-স্বরূপ।

গ্রীসীয় পুরাণে কোনো দেবতা যদি নিজের কুটুম্বকে ভক্ষণ করিয়া থাকেন, তবে তাহার কারণ কি এই যে, গ্রীসীয়গণ এমন অসভ্য ছিল যে, কুটুম্ব মাংস ভক্ষণ করিত, অথবা কুটুম্ব মাংস ভক্ষণ করা অন্যায় মনে করিত না? রজনী ও প্রভাত সম্বন্ধে এক সমস্যা শুনিয়াছিলাম, যে, জন্মাইয়া মাকে সন্তান খাইয়া ফেলিতেছে। উপরি-উক্ত গ্রীসীয় কাহিনীও কি সেরূপ কোনো একটা রূপকমূলক হইতে পারে না? যদি ইহা সত্য হয় যে, গ্রীসীয়গণ কুটুম্বকে ভক্ষণ করিত না ও কুটুম্ব ভক্ষণ করা পাপ মনে করিত, তবে তাহাদের দেবতাদের কেন কুটুম্ব মাংসে প্রবৃত্তি জন্মিল। যদি বল, অসভ্য অবস্থায় এককালে হয়তো গ্রীসীয়গণ আত্মীয়দিগকে উদরসাৎ করিয়া অধিকতর আত্মীয় করিত, সেই সময়েই উক্ত কাহিনীর আরম্ভ হয়— তবে, যখন সভ্য অবস্থায় গ্রীসীয়দের সে বিষয়ে মত ও আচরণ পরিবর্তিত হইল, তখন তাহাদের বিশ্বাসও পরিবর্তিত হইল না কেন?

মানুষেরা যে-সকল কার্য প্রকৃতি-বিরুদ্ধ বলিয়া অনুষ্ঠান করে না ও যে-সকল কার্যকে নিতান্ত নিন্দনীয় জ্ঞান করে, সে-সকলও যদি তাহাদের দেবতায় আরোপ করে, তবে কেমন করিয়া বলিব যে, তাহারা নিজের গুণ-দোষগুলিই দেবতায় আরোপণ করে?

অবস্থানুসারে সকল ধর্মই উপযোগী ইহাই প্রমাণ করিতে গিয়া স্পেন্সর বলিতেছেন, ‘ইহা কি সত্য নহে যে, কেবল অসভ্য দেবতাদের ভয়েই অসভ্য মনুষ্যেরা শাসনে থাকিতে পারে, তাহাদের প্রকৃতি যতই দুর্দান্ত হয়, তাহাদের শাসন-বিভীষিকা ততই নিদারুণ হওয়া আবশ্যক ও শাসন নিদারুণ হইতে গেলে শাসনকর্তা দেবতাদেরও সেই পরিমাণে নিষ্ঠুর প্রতিহিংসাপরায়ণ হওয়া আবশ্যক।’ স্পেন্সরের এ কথাটাও সর্বাঙ্গীণ সত্য নহে। ধর্মের একটা অবস্থা আছে, যখন কার্যসিদ্ধির জন্য, বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্যও স্বভাবত অনিষ্টকারী দেবতাদিগের হিংস্র-প্রবৃত্তি নিবারণ করিবার জন্য দেব-আরাধনা করাই ধর্মের একমাত্র উদ্দেশ্য থাকে। চুরি করিতে যাইতেছি, দেবতার পূজা করিলাম, খুন করিতে যাইতেছি, দেবতার পূজা করিলাম, কার্যসিদ্ধি হইবে। শত্রু দেশ আক্রমণ করিয়াছে, দেবতার পূজা করিলাম, বিপদ হইতে উদ্ধার পাইব। ওলাবিবি, শীতলা মনসা প্রভৃতি দেবতাদের পূজা করি, নহিলে তাহারা আমার অনিষ্ট করিবে। এরূপ অবস্থায় দেবতারা যতই নিদারুণ হউক-না-কেন, উপাসকদিগের দুষ্প্রবৃত্তি দমনের জন্য তাহারা কিছুমাত্র উপযোগী নহে। বরঞ্চ দুষ্প্রবৃত্তির উত্তেজক ও দুষ্কর্মের সহায়। কালীর উপাসনা করিয়া ও কালীর নিকট নরবলি দিয়া দস্যুদিগের হিংস্র-প্রবৃত্তির কি কিছু উপশম হয়? তাহারা কি তাহাদের দুষ্কর্মে দ্বিগুণ বল পায় না? অন্য শত সহস্র বাহ্য কারণ হইতে দস্যুদের স্বভাব পরিবর্তন হইতে পারে। কিন্তু যুগযুগান্তর কালী পূজা করিয়া আসিলে তাহাদের নিষ্ঠুরতা বর্ধিত হইবে বৈ হ্রাস হইবে না। তবে দেবতা নিদারুণ হওয়াতে উপাসকের দুর্দান্ত ভাবের দমন হইল কই? বরঞ্চ সে আরও স্ফূর্তি পাইল। সমাজের যখন কিয়ৎ পরিমাণে উন্নতি হইয়াছে, যখন, দেবতাদের কতকগুলি শুভ আদেশ আছে বলিয়া লোকের বিশ্বাস জন্মিয়াছে ও সেইগুলি লঙ্ঘন করিলে দেবতার কোপ দৃষ্টিতে পড়িতে হইবে বলিয়া ধারণা হইয়াছে, তখন স্পেন্সরের কথা অনেকটা খাটে। কিন্তু সে অবস্থা সমাজের অনেক উন্নতির ফল। এখনও শত শত লোক চারি দিকে দেখিতে পাওয়া যায় তাহারা কেবলমাত্র বিপদ-সম্পদের জন্যই দেব-আরাধনা করে, তাহারা অন্যায় মকদ্দমা জিতিবার জন্য, নিরীহ ব্যক্তিকে জেলে পাঠাইবার জন্য দেবতার পূজা করে ও একবার মনেও করে না যে, দেবতার আদেশ লঙ্ঘন করিবার জন্যই দেবতার প্রসাদ

প্রার্থনা করিতেছি। তাহারা তিন সন্ধ্যা দেবতার পূজা করিতে ভোলে না, কিন্তু দিনের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টা অসংকোচে শত সহস্র পাপাচরণ করে। পূজার একটা ফুল কম পড়িলে, একটা সামান্য ত্রুটি থাকিলে তাহারা সশঙ্কিত হইয়া উঠে, অথচ অন্যায় কাজ করিতে কিছু মনেই করে না! দেবতার নিকট রক্তপাত করিয়া ও দেবতার নিকট মন্ত্রপাঠ করিয়া ইহাদের স্বভাবের কি উন্নতি হইতে পারে?

এইস্থলে হর্বার্ট স্পেন্সর একটি গোঁজামিলন দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন—

'Certainly, such conceptions as those of the Greeks, who ascribed to the personages of their Pantheon every vice, are repulsive enough. But... the question to be answered is, whether these beliefs were beneficent in their effects on those who held them.'

এই-সকল বিশ্বাস যে উপাসকদিগের পক্ষে যথার্থ হিতসাধক তাহাই প্রমাণ করিবার জন্য বলিয়াছেন যে, অসভ্যদের প্রকৃতি যতই দুর্দান্ত হয় ততই তাহাদের শাসন কঠোর হওয়া আবশ্যক। এবং শাসন কঠোর হইতে গেলেই শাসনকর্তা দেবতাদিগকেও নিষ্ঠুর, প্রতিহিংসাপরায়ণ হওয়া আবশ্যক। যতটুকু স্পেন্সরের যুক্তির পক্ষে আবশ্যক, ততটুকুই তিনি উল্লেখ করিয়াছেন, অবশিষ্ট অংশটুকু গোপন করিয়া গিয়াছেন। নিষ্ঠুরতাই কিছু একমাত্র পাপ-প্রবৃত্তি (Vice) নহে। দেবতা নিষ্ঠুর না হইতেও পারে, দেবতা যদি চৌর্যবৃত্তিপরায়ণ শঠ হয়, দেবতা যদি মিথ্যাবাদী ভীরু হয়, তাহা হইলে সে দেবতা উপাসকের কী হিতসাধন করিতে পারে জানিতে ইচ্ছা করি! সকল দেবতারই যদি উপযোগিতা থাকে এমন মত হয়, তবে আমাদের এ প্রশ্নের উত্তর কী? সমস্ত ছাঁটিয়া এই দাঁড়ায় যে, স্পেন্সরের মতে অসভ্য অবস্থায় নিষ্ঠুর দেবতারই উপযোগিতা আছে। কিন্তু আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, এ কথাও সর্বতোভাবে সত্য নহে। সমাজের এমন অবস্থা আছে, যখন দেবতা যতই নিষ্ঠুর হউক-না-কেন, উপাসকদিগের দুর্দান্ত ভাব আরও বর্ধিত হইতে থাকে বৈ হ্রাস পায় না। যদি বল, সে সময়ে তাহাদের নিজ ধর্ম ব্যতীত আর কোনো ধর্ম তাহাদের নিকট টিকিতে পারে না, অতএব সেই ধর্মই তাহাদের পক্ষে একমাত্র সম্ভব ধর্ম ও সেই হিসাবে উপযোগী ধর্ম, তবে আমরা বলি তাহার যথেষ্ট প্রমাণ কোথায়? স্পেন্সর যে একমাত্র দৃষ্টান্ত উদ্‌ধৃত করিয়াছেন তাহা আমাদের নিকটে যথেষ্ট বলিয়া বোধ হইল না। তিনি বলেন, ফিজি দ্বীপবাসী ভেওয়া খৃস্টান অনুতাপীগণ আত্মার অশান্তিবশত অনেকক্ষণ ধরিয়া আর্তনাদ করিতে থাকে। অবশেষে শ্রান্ত হইয়া মূর্ছিত হইয়া পড়ে; চেতনা লাভ করিয়া তাহারা পুনরায় প্রার্থনা করিতে করিতে অজ্ঞান হইয়া পড়ে। এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া স্পেন্সর কহিতেছেন, ফিজি দ্বীপবাসীগণ নিতান্ত অসভ্যজাতি। তাহারা মানুষ খায়, শিশু হত্যা করে, নরবলি দেয়। তাহাদের পরিবারের মধ্যেও পরস্পরের প্রতি পরস্পরের বিশ্বাস নাই। তাহারা সর্পের পূজা করে। দেখা যাইতেছে, তাহারা খৃস্টান হইয়া খৃস্টান ধর্মের প্রতিহিংসা, অনন্ত যন্ত্রণা ও শয়তান-তন্ত্রটুকুই বাছিয়া লইয়াছে। এই নিমিত্তই তাহারা ভয়ে আর্তনাদ করে। তাহাদের সেই পুরাতন সর্প-উপাসনাই খৃস্টান ধর্ম নাম ধারণ করিয়াছে মাত্র। উন্নততর ধর্ম অবলম্বন করিয়া ভেওয়া খৃস্টানগণের যে কিছু উন্নতি হয় নাই, উপরি-উক্ত দৃষ্টান্তে তাহার কিছু প্রমাণ হয় না।

যদি এমন যুক্তি প্রয়োগ কর যে, যতদিন একটি দ্রব্যের উপযোগিতা থাকে ততদিনই সে টিকিতে পারে, তাহার ঊর্ধ্বে নহে, অতএব যে ধর্ম যে দেশে টিকিয়া আছে, সে ধর্ম সে দেশের উপযোগী। তবে সে সম্বন্ধেও আমাদের দুই-একটি কথা আছে।

মনুষ্য স্বভাবে উভয়ই আছে, স্থিতিশীলতা ও পরিবর্তনশীলতা। আবশ্যকের উপযোগী করিয়া পরিবর্তন যে হইয়াই থাকে তাহা নহে। মনুষ্য স্বভাবে কেন, সমস্ত জগতেই এই নিয়ম। প্লায়োসিন যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্যন্ত ঘোড়ার পায়ে যে অঙ্গুলির অসম্পূর্ণ আরম্ভ বর্তমান রহিয়াছে, তাহা তাহার কোনো কাজে লাগে না, উপযোগিতার নিয়মানুসারে তাহা কেন

ধ্বংস হইল না? স্তন্যপায়ী জীবের পুরুষ জাতিরও স্তন আছে, এমন-কি, তাহাদের 'mammary glands' পর্যন্ত বর্তমান আছে। অনেকে শুনিয়া থাকিবেন, অনেক পুরুষের স্তনে দুগ্ধের সঞ্চার হইয়াছে। পুরুষ জীবেরা যে কোনো কালে শাবকদিগকে স্তন্যপান করাইয়াছিল তাহার কোনো প্রমাণ নাই। প্রাচীন কাল হইতে আজ পর্যন্ত যদি পুরুষ মানুষ সন্তানকে স্তন দান করিয়া না থাকে তবে এই অনাবশ্যক প্রত্যঙ্গ কেন পুরুষ শরীরে বর্তমান রহিল?

উপাধ্যায় হেকেল বলেন, জীবিত প্রাণীদিগের মধ্যে দুই প্রকারের উদ্যম আছে; এক কেন্দ্রানুগ (centripetal) যাহাতে করিয়া তাহাদের বংশপরম্পরাগত বিশেষত্ব রক্ষা করে; আর এক কেন্দ্রাতিগ (centrifugal) যাহাতে করিয়া বাহ্য অবস্থার অনুকূল করিয়া তাহাদের পরিবর্তন সাধন করে। অর্থাৎ নিতান্ত প্রতিকূল অবস্থায় না পড়িলে অনেক অনাবশ্যক অঙ্গপ্রত্যঙ্গও থাকিয়া যায়। "The Genealogy of Animals" নামক প্রবন্ধে উপাধ্যায় হক্সলি যাহা বলিয়াছেন, তাহা উদ্‌ধৃত করিয়া দিই—

'I think it must be admitted that the existence of an internal metamorphic tendency must be as distinctly recognized as that of an internal conservative tendency; and that the influence of conditions is mainly, if not wholly, the result of the extent to which they favour the one, or the other, of these tendencies.'

এই নিয়ম ধর্ম সম্বন্ধেও খাটে। যদি স্বীকার করা যায়, যে অসভ্য অবস্থায় দুর্দান্ত হৃদয় দমনে রাখিবার জন্যই কুম্ভীপাক প্রভৃতি বিভীষিকাপূর্ণ নরক স্বভাবতই কল্পিত হইয়াছিল, তথাপি ইহা নিশ্চয় বলা যায় যে, যত দিন পর্যন্ত কোনো জাতির সেই নরকে বিশ্বাস বর্তমান থাকিবে, ততদিন পর্যন্তই যে, তাহাদের সেই অসভ্য অবস্থা ও দুর্দান্ত হৃদয় আছে বলিয়া প্রমাণ হইবে তাহা নহে। অবস্থা-বিশেষে একটা বিশ্বাসের জন্ম হইলে অবস্থার পরিবর্তনে যে সেই বিশ্বাসের ধ্বংস হয় তাহা নহে। বিশেষত স্বর্গ-নরকের বিশ্বাস শীঘ্র ধ্বংস হইবার কোনো কারণ নাই। তাহার বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। অর্থাৎ সে বিশ্বাসের প্রতিকূল অবস্থাবিশেষ কিছুই বর্তমান নাই। অতএব একবার যাহা বিশ্বাস জন্মিয়া গিয়াছে, তাহা পুনশ্চ ভাঙিয়া অবিশ্বাস করিবার কোনো কারণ নাই। আমাদের শাস্ত্রোল্লিখিত কুম্ভীপাক প্রভৃতি নরকের উল্লেখ করিয়া হর্বার্ট স্পেন্সর হিন্দুদিগকে বিশ্বাসঘাতক, চৌর, মিথ্যাবাদী বলিয়াছেন। ইহাই যদি হইল, তবে আমরা খৃস্টানদিগকে কী না বলিতে পারি! আমাদের শাস্ত্রে অনন্ত যন্ত্রণা নাই। যাহাদের অনন্ত নরকে বিশ্বাস করিতে হইয়াছে, না জানি তাহাদের স্বভাব কী পৈশাচিক হইবে! আসল কথা এই বিশ্বাসকে মানুষেরা উপযোগিতার চক্ষে দেখে না। 'আবশ্যক হইয়াছে, অতএব, আইস আমরা বিশ্বাস করি' এমন করিয়া যদি লোকে বিশ্বাস করিত, 'আবশ্যক চলিয়া গিয়াছে, অতএব আইস আমরা বিশ্বাস করিব না' এমন করিয়া যদি বিশ্বাস পরিত্যাগ করিত, তাহা হইলে সমস্তই অত্যন্ত সহজ হইয়া যাইত। একবার যাহা বিশ্বাস হয়, সে বিশ্বাস অনেক কাল চলিতে থাকে। একটা দৃষ্টান্ত প্রয়োগ করি। কোনো রাজ্যে এক জনের দোষে যদি আর-একজনকে শাস্তি দিবার প্রথা থাকে তবে সে প্রথাকে কে না নিন্দা করিবে? ন্যায়পরতার যে ভাব আমাদের হৃদয়ে বর্তমান আছে, তাহার সহিত উক্ত রূপ বিচারের ঐক্য হয় না। কিন্তু মনুষ্যের নিমিত্ত খৃস্টের মৃত্যু ঘটনাকে খৃস্টানেরা কেন ঈশ্বরের ন্যায়পরতার প্রমাণ স্বরূপেই উল্লেখ করেন? তাঁহারা নিজে যাহা করেন না, অন্যকে যাহা করিতে দেখিলে নিন্দা করেন, তাহাকেই ন্যায়পরতা বলিয়া ১৮০০ বৎসর বিশ্বাস করিয়া আসিতেছেন কীরূপে? ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুসংস্কারে বিশ্বাস কীরূপে চলিয়া আসে? ইংরাজেরা অনেকে যে বিশ্বাস করেন যে, এক টেবিলে ১৩ জন খাইলে তাহাদের মধ্যে ১ জনের এক বৎসরের মধ্যে মৃত্যু হইবে, অনেকবার হয়তো তাহার বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইয়াছেন তথাপি তাহা যায় না কেন?

অবশেষে জিজ্ঞাসা করি, গরিব হিন্দুদিগের প্রতি কেন যে নানাবিধ রূঢ় বিশেষণ প্রয়োগ করা হইয়াছে, তাহার কি একটা কারণ আছে? কুম্ভীপাক নরকের কথা পড়িয়াই কি স্পেন্সর সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, হিন্দুরা বিশ্বাসঘাতক, চোর, মিথ্যাবাদী? না, উহা একটা জানা সত্য, ও বিষয়ে কাহারো দ্বিরুক্তি বা দ্বিমত হইতে পারে না? হিন্দুরা যে বিশ্বাসঘাতক, চোর ও মিথ্যাবাদী সেইটে আগে প্রমাণ করিয়া তার পরে কুম্ভীপাক নরকের কথা তুলিয়া তাঁহার যুক্তি সমর্থন করিলে ঠিক ন্যায়শাস্ত্র অনুযায়ী কাজ হইত।

স্পেন্সর বলিয়াছেন, হিন্দুদের কঠোর নরক আছে, অতএব নিষ্ঠুর দেবতাও আছে। দেবতারা যে নিষ্ঠুর, তাহার প্রমাণ কী? না, তাহাদের ফকিরেরা আত্মপীড়ন করে। যে দেবতারা কষ্ট দেখিয়া সুখী হয়, তাহারা অবশ্য নিষ্ঠুর। প্রথমত, ফকিরেরা হিন্দু নহে। দ্বিতীয়ত, অনেক হিন্দু দেবতার নিকট আত্মপীড়ন করিয়া থাকে বটে (যেমন তারকেশ্বরের নিকট হত্যা দেওয়া ইত্যাদি) কিন্তু তাহা হইতে প্রমাণ হয় না যে, তাহাদের দেবতা নিষ্ঠুর। বরঞ্চ উল্‌টাটাই সত্য। আমাদের দেশে অনেক ভিক্ষুক আছে, তাহারা হত্যা দিয়া ভিক্ষা আদায় করে। তাহার কারণ এমন নহে যে ভিক্ষাদাতারা কষ্ট দেখিয়া অত্যন্ত পুলকিত হইয়া ভিক্ষুককে পুরস্কার দেন। মনুষ্যের পরকষ্ট-অসহিষ্ণুতার প্রতি ভারতবর্ষীয় ভিক্ষুকদের এমন বিশ্বাস আছে যে তাহারা ভিক্ষা করিবার জন্য নিজেকে পীড়ন করে। দেবতার দয়ার প্রতিও হিন্দু উপাসকের তেমনি বিশ্বাস। সে জানে যে, আমি যদি নিজেকে এতখানি কষ্ট দিই, তবে দয়াময় কখনোই সহিতে পারিবেন না, নিশ্চয়ই আসিয়া আমার বাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন। যদি আমাদের তপস্বীদিগকে স্পেন্সর ফকির বলিয়া থাকেন তবে সে সম্বন্ধে এই বলিতে পারি যে দেহকে দমন করিয়া আত্মার উন্নতি সাধন করিবার জন্য তপস্বীরা যে ঐহিক সুখ ও আরাম হইতে ইচ্ছাপূর্বক নিজেকে বঞ্চিত করিতেন, পাশ্চাত্য দার্শনিক তাহার মর্ম হয়তো ঠিক বুঝিতে পারিবেন না। এ বিষয়ে স্পেন্সরের ভ্রম বদ্ধমূল। এ ভ্রম কেবলমাত্র যে, এই প্রবন্ধে প্রকাশিত হইয়াছে তাহা নহে, তাঁহার *Data of Ethics* নামক গ্রন্থে স্পেন্সর ঠিক এই কথাগুলিই বলিয়াছেন।

ভারতী
বৈশাখ ১২৮৯

বৈজ্ঞানিক সংবাদ

আমরা তো জানিতাম, আমাদের দেশেই যত বিশ্বের মশা। শীতের দেশে মশার উৎপাত নাই। সে কথাটা ঠিক নহে। মেরু প্রদেশের আলাস্কা নামক শীতপ্রধান স্থানে মশার যেরূপ প্রাদুর্ভাব তাহা শুনিলে আশ্চর্য হইতে হয়। একজন লিখিয়াছেন— এখানে পশুপক্ষী শিকার করা দায়, ঘন মশার ঝাঁক মেঘের মতো উড়িয়া লক্ষ্য আচ্ছন্ন করে। কখনো কখনো মশায় সেখানকার কুকুর মারিয়া ফেলে। সোয়াট্‌কা সাহেব লিখিতেছেন যে, তিনি শুনিয়াছেন মশায় সেখানকার বৃহৎ ভল্লুককে মারিয়া ফেলিয়াছে। ভল্লুক মশা-সমাচ্ছন্ন জলাপ্রদেশে গিয়া পড়িলে দাঁড়াইয়া দুই পা দিয়া মশার ঝাঁকের সহিত যুদ্ধ করিতে চেষ্টা করে, কিন্তু বৃথা চেষ্টা। মশার গায়ে তাহার বড়ো বড়ো নখের একটি আঁচড়ও পড়ে না, এবং মশাকে জড়াইয়া ধরিবার কোনো সুবিধা হইয়া উঠে না। অবশেষে মশার দংশনে অন্ধ হইয়া ভল্লুক পড়িয়া থাকে, ও না খাইতে পাইয়া মরিয়া যায়। শীতপ্রধান মেরুদেশে মশার যেমন প্রবল প্রতাপ এমন আর কোথাও নহে। জাহাজে করিয়া যাঁহারা মেরুদেশে ভ্রমণ করিতে যান তাঁহারা সকলেই এ কথা জানেন। যেখানে যেখানে জাহাজ থামে সেইখানেই মশার পাল আসিয়া জাহাজ আক্রমণ করে— জামার আস্তিনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ভয়ানক রক্তশোষণ করিতে থাকে। জাহাজ হইতে নামিয়া দুইজন বীরপুরুষ শিকার করিতে গিয়াছিলেন। তাহার একজন জর্মন্‌ সেনা। ইনি যুদ্ধের সময় অশ্বারোহণে বীরপরাক্রমে ফ্রান্স পর্যটন করিয়াছিলেন,

কোনো বিপদ হয় নাই; কিন্তু এখানে মশার উপদ্রবে ঘোড়া হইতে পড়িয়া খোঁড়া হইয়া যান। মশার জ্বালায় ঘোড়া এবং আরোহী এমনই অস্থির হইয়া পড়িয়াছিলেন যে আত্মসংযমন উভয়ের পক্ষেই অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। সেই সৈন্য জাহাজে আসিয়া গল্প করিলেন— 'পেটের মধ্যে মশা যায়, নিশ্বাস টানি নাকে মশা ঢোকে, থু থু করিয়া মুখের মধ্য হইতে মশা ফেলিয়া দিতে হয়।' সে দেশে গ্রীষ্মকালে মশার উপদ্রব বরঞ্চ কিছু কম থাকে, কারণ পাখিরা আসিয়া অনেক মশা খাইয়া ফেলে। আমাদের দেশে এত পাখি আছে, মশাও তো কম নাই।

জলে আগুন জ্বলিতে দেয় না এইরূপ সাধারণের ধারণা, কিন্তু সম্প্রতি বেকর সাহেব পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, যদি কোনো জিনিস একেবারে শুকাইয়া ফেলা যাইতে পারে, তবে তাহা আর জ্বলে না। সম্পূর্ণ শুষ্ককাঠ জ্বলে না। কিন্তু ইহার পরীক্ষা করা শক্ত। কারণ, চতুর্দিকেই জলীয় পদার্থ আছে। বাতাসের মধ্যে জল আছে। গ্যাসে জল আছে। জলকে দূর করা দায়। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, এই জলীয় পদার্থ না থাকিলে অতিশয় দাহ্য পদার্থও জ্বলিতে পারে না। অতএব দেখা যাইতেছে, জল জ্বালাইবার সহায়তা করে।

যুদ্ধে বন্দুকের গুলি কত যে বৃথা খরচ হয়, তাহার একটা হিসাব বাহির হইয়াছে। ফরাসি-প্রুশীয় যুদ্ধে দেখা গিয়াছে এক-একটি সৈন্য মারিতে ১৩০০ গুলি খরচ হইয়াছে। সল্‌ফেরিনোর যুদ্ধে প্রত্যেক সৈন্য বধ করিতে ৪২০০ গুলি লাগিয়াছে।

অনেক পণ্ডিত অনুমান করেন সমুদ্রের ন্যায় ভূপৃষ্ঠও ক্রমাগত তরঙ্গিত বিচলিত হইতেছে; ভূপৃষ্ঠে জোয়ারভাটা খেলিতেছে। কোথাও বা বড়ো ঢেউ কোথাও বা ছোটো ঢেউ উঠিতেছে। পৃথিবীর তরঙ্গসংকুল দেশের মধ্যে জাপান একটি প্রধান স্থান। সেখানে ছোটো বড়ো ঢেউ ক্রমাগত উত্থিত হইতেছে। আমাদের এখানে এতটা ঢেউ নাই, কিন্তু সম্পূর্ণ যে স্থির আছে তাহা নহে। সমুদ্রে দাঁড় ফেলিলে সমুদ্রের জল যেমন কাঁপিয়া উঠে, রাস্তা দিয়া গাড়ি প্রভৃতি চলিলে ভূতল তেমনি কাঁপিতে থাকে, ইহা সকলেই দেখিয়াছেন। এই ভূ-তরঙ্গ সম্বন্ধে য়ুরোপের বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা সম্প্রতি পরীক্ষা আরম্ভ করিয়াছেন।

আহারান্বেষণ ও আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে ছদ্মবেশ ধারণ কীটপতঙ্গের মধ্যে প্রচলিত আছে তাহা বোধ করি অনেকে জানেন। তাহা ছাড়া, ফুল, পত্র প্রভৃতির সহিত স্বাভাবিক আকার-সাদৃশ্য থাকাতেও অনেক পতঙ্গ আত্মরক্ষা ও খাদ্যসংগ্রহের সুবিধা করিয়া থাকে। একটা নীল প্রজাপতি ফুলে ফুলে মধু অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছিল। পুষ্পস্তবকের মধ্যে একটি ঈষৎ শুষ্কপ্রায় ফুল দেখা যাইতেছিল, প্রজাপতি যেমন তাহাতে শুঁড় লাগাইয়াছে, অমনি তাহার কাছে ধরা পড়িয়াছে। সে ফুল নহে, সে একটি সাদা মাকড়সা। কিন্তু এমন একরকম করিয়া থাকে যাহাতে তাহাকে সহসা ফুল বলিয়া ভ্রম হয়।

টিকটিকির কাটা লেজ যেমন নড়িতে থাকে, মাকড়সার বিচ্ছিন্ন পাও তেমনি নড়িয়া থাকে। কোনো শত্রু আসিয়া পা ধরিলে মাকড়সা অনায়াসে পায়ের মায়া ত্যাগ করিয়া তাহার পা খসাইয়া ফেলে। দুই-একটা পা গেলেও তাহাদের বড়ো একটা ক্ষতি হয় না— অনায়াসে ছুটিয়া চলে।

বিলাতের উদ্যানকারদের মধ্যে একটা প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, যেখানে বিলাতি বেগুনের গাছ রোপণ করা হয় সেখানে পোকামাকড় আসিতে পারে না। যে গাছে পোকা ধরিবার সম্ভাবনা আছে তাহার চারি পাশে বিলাতি বেগুন রোপণ করিয়া গাছকে রক্ষা করা যায়। এটা অনায়াসেই পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারা যায়।

পণ্ডিতবর টাইলর সাহেব বলেন— পরীক্ষা করিয়া দেখিলে উদ্ভিদদের কার্যেও কতকটা যেন স্বাধীন বুদ্ধির আভাস দেখিতে পাওয়া যায়। বৃক্ষ নিতান্ত যে জড়যন্ত্রের মতো কাজ করে তাহা নহে, কতকটা যেন বিচার-বিবেচনা করিয়া চলে। টাইলর সাহেব এই বিষয় লইয়া অনেক বৎসর ধরিয়া পরীক্ষা করিয়া আসিতেছেন। তিনি বলেন কৃত্রিম বাধা স্থাপন করিলে গাছেরা তাহা নানা উপায়ে অতিক্রম করিবার চেষ্টা করে, এমন-কি, নিজের সুবিধা অনুসারে পল্লব সংস্থানের বন্দোবস্ত পরিবর্তন করিয়া থাকে। এ বিষয়ে তিনি অন্যান্য নানাবিধ প্রমাণ প্রয়োগ করিয়া সম্প্রতি একটি বক্তৃতা দিয়াছেন।

ত্রিবাঙ্কুরের উপকূলে নারাকাল ও আলেপিতে যে বন্দর আছে, সেখানে সমুদ্র অতিশয় প্রশান্ত। চারি দিকে যখন ঝড় ঝঞ্ঝা উপপ্লব তখনও এ বন্দর দুটির শান্তিভঙ্গ হয় না। ইহার একটি কারণ আছে। ইংরাজিতে প্রাচীনকাল হইতে একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, ক্ষুব্ধ সমুদ্রে তেল ঢালিলে তাহা শান্ত হয়। অনেকে তাহা অমূলক মনে করিতেন। কিন্তু সম্প্রতি পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে যে, বাস্তবিকই তেল ঢালিলে জলের ঢেউ থামিয়া যায়। কিছুদিন হইল একটি প্রস্তাব পাঠ করিয়াছিলাম তাহাতে প্রত্যেক জাহাজে প্রচুর পরিমাণে তৈল রাখিতে পরামর্শ দেওয়া হইয়াছিল; ঝড়ের সময় অল্পে অল্পে সেই তৈল জাহাজের দুই পার্শ্বে ঢালিতে হইবে। নারাকাল এবং আলেপি বন্দরের সমুদ্রতল হইতে ক্রমাগত পেট্রোলিয়ম তৈল উত্থিত হইতেছে। কালিফর্নিয়াতীরের নিকটবর্তী একস্থানের সমুদ্রে এইরূপ তৈল-উৎস আছে। সেখানকার সমুদ্রও শান্ত থাকে।

আমেরিকার শিল্পী ও মজুরদের মধ্যেও বহুল পরিমাণে বিদ্যাচর্চা প্রচলিত আছে এইজন্য সেখানকার হাতের কাজ অতি সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়। য়ুনাইটেড স্টেট্‌স্‌-এ দুই লক্ষ পঁচিশ হাজার আটশত প্রকাশ্য বিদ্যালয় আছে, অর্থাৎ প্রত্যেক দুইশো লোকের মধ্যে একটি করিয়া বিদ্যালয় আছে। একমাত্র মাসচুসেট্‌স্‌ প্রদেশে দুই হাজার পুস্তকালয় আছে, অর্থাৎ প্রত্যেক আটশত লোকের মধ্যে একটি করিয়া পুস্তকালয় আছে। অনেকে মনে করেন বিদ্যাশিক্ষায় শিল্পকাজের ব্যাঘাত করে, কিন্তু তাহা ভ্রম। বিদ্যাশিক্ষায় সকল কাজেরই সহায়তা করে। ফরাসি-প্রুশীয় যুদ্ধে জর্মনদের যে জিত হইল তাহার একটা প্রধান কারণ তাহারা শিক্ষিত— এই নিমিত্ত তাহারা যুদ্ধাস্ত্র ব্যবহার করিতে অধিকতর নিপুণতা লাভ করিয়াছিল।

আমাদের বিশ্বাস ছিল, যাহাদের এক ইন্দ্রিয় অসম্পূর্ণ তাহাদের অন্য ইন্দ্রিয় তীক্ষ্ণতর হয়। কিন্তু এ কথা সকল স্থানে খাটে না। দেখা গিয়াছে যাহারা বধির তাহারাই অধিকাংশ অন্ধ এবং যাহারা অন্ধ তাহারাই অধিকাংশ বধির।

কার্বনিয়ে নামক একজন ফরাসি পণ্ডিত বলেন যে, গঙ্গার নিকটবর্তী জলাশয়ে একপ্রকার অতি ক্ষুদ্র মৎস্য আছে, তাহারা পাখির ন্যায় জলে নীড় প্রস্তুত করে। ইহারা দেখিতে অতি সুন্দর, রামধনুর ন্যায় নানা বর্ণে রঞ্জিত। ইহারা জলের মধ্য হইতে একপ্রকার উদ্ভিদ মুখে করিয়া জলের

উপরে রাখে, পুনর্বার তাহা জলমগ্ন না হয় এই উদ্দেশ্যে তাহারা মুখ হইতে বায়ু নির্গত করিয়া জলবুদ্‌বুদের উপর তাহা ভাসাইয়া রাখে। পরদিন সেই গাছের মধ্যে জলবুদ্‌বুদ পুরিয়া দেয় এবং তাহা গোলাকারে পরিণত করে। পুরুষ মৎস্য তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহা পরিষ্কার করিলে পর স্ত্রী মৎস্য ডিম পাড়িতে আহূত হয়। ডিম পাড়িয়া সে তো প্রস্থান করে, পুরুষ মৎস্য সেই ডিম্বের তত্ত্বাবধান করে। এইরূপে দশ দিবস যায়। ডিম ফুটিয়া গেলে সে সেই নীড়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ফুটা করিয়া জলবুদ্‌বুদ কতকটা বাহির করিয়া দেয়। তখন তাহা আর গোলাকার থাকে না, প্রশস্ত হইয়া পড়ে।

আমরা তো গঙ্গার কাছাকাছি থাকি, কিন্তু এ মাছটি যে কী মাছ তাহা তো ঠিক জানি না। গঙ্গাতীরবর্তী পাঠকেরা কি এই মাছের কোনো খবর রাখেন?

বালক
আশ্বিন-কার্তিক ১২৯২

গতি নির্ণয়ের ইন্দ্রিয়

আমাদের কর্ণকুহরের এক অংশে তিনটি অর্ধচন্দ্রাকৃতি চোঙের মতো আছে তাহার বিশেষ কার্য কী এ পর্যন্ত ভালোরূপ স্থির হয় নাই। পূর্বে শারীরতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ অনুমান করিতেন যে ইহার দ্বারা শব্দের দিক নির্ণয় হইয়া থাকে। কিন্তু সম্প্রতি দুই-এক জন পণ্ডিত ইহার অন্যরূপ কার্য স্থির করিয়াছেন।

তাঁহারা বলেন, আমরা কী করিয়া গতি অনুভব করি এ পর্যন্ত তাহার কোনো ইন্দ্রিয়তত্ত্ব জানা যায় নাই। একটা গাড়ি যদি কোনোরূপ ঝাঁকানি না দিয়া সমভাবে সরল পথে চলিয়া যায় তাহা হইলে গাড়ি যে চলিতেছে তাহা আমরা বুঝিতে পারি না— পালের নৌকা ইহার দৃষ্টান্তস্থল। কিন্তু গাড়ি যদি ডাহিনে কিংবা বামে বেঁকে অথবা থামিয়া যায় তবে আমরা তৎক্ষণাৎ জানিতে পারি। পণ্ডিতগণের মতে কর্ণেন্দ্রিয়ের উক্ত অংশই এই গতিপরিবর্তন অনুভব করিবার উপায়। এক- প্রকার রোগ আছে যাহাতে রোগী টলমল করিয়া চলে, একপাশে কাত হইয়া পড়ে এবং কানে শুনিতে পায় না। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে সেই অর্ধচন্দ্রাকৃতি কর্ণযন্ত্রের বিকৃতিই তাহাদের রোগের কারণ। কোন্ দিকে কতটা হেলিতেছে ঠিক বুঝিতে না পারিলে কাজেই তাহাদের পক্ষে শক্ত হইয়া চলা অসম্ভব হইয়া পড়ে। সকলেই জানেন ভূমির উচ্চ-নীচতা মাপিবার জন্য কাঁচের নলের মধ্যে তরল পদার্থ দিয়া একপ্রকার যন্ত্র নির্মিত হয়, আমাদের উক্ত কর্ণপ্রণালীর মধ্যেও সেই প্রকার তরলদ্রব্য আছে, সম্ভবত তাহা আমাদের গতিপরিবর্তন অনুসারে স্থান পরিবর্তন করিয়া আমাদের স্নায়ুকে সচেতন করিয়া দেয় এবং আমরাও তদনুযায়ী তৎক্ষণাৎ আমাদের শরীরের ভার সামঞ্জস্য করিতে প্রবৃত্ত হই।

ইচ্ছামৃত্যু

শরীরের সকল ইন্দ্রিয়ের উপরেই আমাদের ইচ্ছাশক্তির আধিপত্য নাই। পরিপাক রক্তচলাচল প্রভৃতি কার্য আমাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না। আমরা ইচ্ছা করিলে চোখের পাতা বুজিতে পারি কিন্তু কান বুজিতে পারি না। সীল মৎস্য জলে ডুবিবার সময় স্বেচ্ছামতো নাক কান বুজিতে পারে। আমাদের নাসা ও কর্ণ রুদ্ধ করিবার মাংসপেশী আছে কিন্তু তাহারা প্রায় অকর্মণ্য হইয়া গিয়াছে— দুর্গন্ধ অনুভব করিলে আমরা নাসা কুঞ্চিত করিতে পারি বন্ধ করিতে পারি না। কিন্তু দৈবাৎ এক-এক জন লোক পাওয়া যায় যাহারা জন্তুর ন্যায় অবলীলাক্রমে কান

দুলাইতে পারে, মাথার উপরকার চর্ম নাড়াইতে পারে। গোরু জাবর কাটিতে পারে মানুষের পক্ষে তাহা অসাধ্য, কিন্তু অনেক লোক ইচ্ছা-মাত্র অনায়াসে বমন করিতে পারে, দৈবক্রমে পাকস্থলীর মাংসপেশীর উপর তাহাদের কর্তৃত্ব জন্মিয়াছে। সকলেই জানেন আমাদের কতকগুলি স্নায়ু আছে যাহারা আমাদের ইচ্ছার হুকুম তামিল করে। ইচ্ছা হইল হাত তুলিব অমনি স্নায়ুযোগে সেই হুকুম হাতের মাংসপেশীর উপর জারি হইল, হাত উঠিল। কিন্তু পূর্বে বলিয়াছি, শরীরের সর্বত্র এই ইচ্ছাদূতের গতিবিধি নাই; দৈবাৎ শরীরসংস্থানের কোনোরূপ বিপর্যয়বশত এই ইচ্ছাপ্রচারী স্নায়ুর অস্থানে সঞ্চার হইয়া মানুষের অসাধারণ ইন্দ্রিয়ক্ষমতা জন্মিতে পারে। সাধারণত ইচ্ছামাত্র শরীরক্রিয়া নিরোধ করা মানুষের সাধ্যায়ত্ত নহে। কিন্তু ডাক্তারি শাস্ত্রে তাহার এক আশ্চর্য উদাহরণ লিপিবদ্ধ আছে। কর্নেল টাউনশেন্ড নামক এক ব্যক্তি ইচ্ছা করিলেই মরিতে পারিতেন। প্রথমে ডাক্তাররা তাহা বিশ্বাস করেন নাই। তাঁহারা পরীক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কর্নেল সাহেব চিত হইয়া স্থিরভাবে কিছুক্ষণ শুইয়া রহিলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার নাড়ী কমিয়া হৃৎপিণ্ডের গতিরোধ হইয়া আসিল; অবশেষে জীবনের কোনো লক্ষণ রহিল না। ডাক্তাররা ভয় পাইলেন। কিন্তু আবার আধঘণ্টা পরে ক্রমে তাঁহার নাড়ী ফিরিয়া আসিল, নিশ্বাস-প্রশ্বাস চলিতে আরম্ভ করিল, তিনি কথা কহিতে লাগিলেন। ডাক্তারি শাস্ত্রে বলে, কোনো এক অস্বাভাবিক কারণে হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুসের মাংসপেশীর উপর তাঁহার স্বেচ্ছাস্নায়ুর অধিকার জন্মিয়াছিল। কিন্তু আধঘণ্টাকাল শরীরক্রিয়া রোধ করিয়া কীরূপে প্রাণরক্ষা হয় তাহা কে বলিতে পারে? আমাদের দেশে যোগীদের মধ্যে এরূপ দৃষ্টান্ত মাঝে মাঝে পাওয়া গিয়াছে শুনা যায়। কিন্তু যোগী ও রোগীর মধ্যে প্রভেদ এই যে, যোগী সাধনার দ্বারা যে ক্ষমতা লাভ করিয়াছেন রোগী দেহযন্ত্রের অনিচ্ছাকৃত বিকৃতিক্রমে সেই ফল প্রাপ্ত হইয়াছেন।

মাকড়সা-সমাজে স্ত্রীজাতির গৌরব

পৌরুষ সম্বন্ধে স্ত্রী-মাকড়সার সহিত পুরুষ-মাকড়সার তুলনাই হয় না। প্রথমত, আয়তনে মাকড়সার অপেক্ষা মাকড়সিকা ঢের বড়ো, তার পর তাহার ক্ষমতাও ঢের বেশি। স্বামীর উপর উপদ্রবের সীমা নাই, তাহাকে মারিয়া কাটিয়া অস্থির করিয়া দেয়। এমন-কি, অনেক সময় তাহাকে মারিয়া ফেলিয়া খাইয়া ফেলে; এরূপ সম্পূর্ণ দাম্পত্য একীকরণের দৃষ্টান্ত উচ্চশ্রেণীর জীবসমাজে আছে কি না সন্দেহ।

উটপক্ষীর লাথি

নীড় রচনার সময় এই মরুবিহারী বিরাট পক্ষী অত্যন্ত দুর্ধর্ষ হইয়া উঠে। নিকটে মানুষ দেখিলে ছুটিয়া গিয়া আক্রমণ করে, পা দুলাইয়া দুলাইয়া এক প্রচণ্ড লাথি কসাইয়া দেয়। এই এক লাথির চোটে অশ্বের মেরুদণ্ড ভাঙিয়া গিয়াছে শুনা যায়। এই পাখির আক্রমণ হইতে ছুটিয়া পালানো অসম্ভব। দ্রুতবেগে ইহাকে কেহ হারাইতে পারে না। এরূপ স্থলে উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িয়া সহিষ্ণুভাবে ইহার লাথি সহ্য করাই একমাত্র গতি। একজন এইরূপ পাখির দ্বারা আক্রান্ত হইয়া সবলে তাহার গ্রীবা ভূমিতে নত করিয়া ধরিয়াছিল। দৈবক্রমে পাখির লাথি নিজেরই নতমস্তকের উপর পড়িয়া আপনার মস্তিষ্ক বিক্ষিপ্ত করিয়া দিল এবং সেই লোকটি বিনা আঘাতে পরিত্রাণ পাইল।

সাধনা
অগ্রহায়ণ ১২৯৮

জীবনের শক্তি

আমরা ইচ্ছা করি আর নাই করি আমাদের শরীরের ক্রিয়া অবিশ্রাম চলিতেছে; তাহাতে যে কী বিপুল শক্তি ব্যয় হইতেছে তাহা আমরা জানিতে পারি না।

আমাদের হৃৎপিণ্ড চারিটি কোটরে বিভক্ত। তাহার মধ্যে দুইটি কোটরে শরীরের রক্ত আসিয়া প্রবেশ করিতেছে এবং অপর দুইটি অংশ স্যাকরার হাপরের মতো সংকুচিত হইয়া শরীরের সর্বত্র রক্ত প্রবাহিত করিতেছে। দিনরাতি এ কাজের আর বিশ্রাম নাই। এইটুকু চর্মযন্ত্রের পক্ষে কাজও নিতান্ত সামান্য নয়। রক্তসঞ্চারী কোটরদ্বয়ের বাম কোটরটি প্রত্যেক সংকোচনে চার আউন্স রক্ত নয় ফুট দূরে উৎসারিত করে। দক্ষিণ কোটরটি অপেক্ষাকৃত দুর্বল, কিন্তু তাহাকেও খাটিতে হয়। সুস্থশরীর বয়স্ক লোকের হৃৎপিণ্ড মিনিটে ৭৫/৭৬ বার সংকুচিত হয়। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে রক্তসঞ্চালনক্রিয়ায় হৃৎপিণ্ড চব্বিশ ঘণ্টায় যে শক্তি ব্যয় করে সেই শক্তিদ্বারা তিন হাজার মণের অধিক (১২০ টন) ভার এক ফুট ঊর্ধ্বে তুলা যাইত।

যেমন হৃৎপিণ্ডের সংকোচন-প্রসারণ অবিশ্রাম চলিতেছে তেমনি নিশ্বাস-প্রশ্বাসেরও বিরাম নাই। তাহাতে করিয়া বক্ষস্থল ক্রমাগত উঠিতেছে পড়িতেছে এবং বুকের পাঁজরা মাংসপেশী এবং ফুসফুস সেই উত্থান-পতনের কার্যে লাগিয়া রহিয়াছে। বিশ্রামকালে চব্বিশ ঘণ্টায় প্রাপ্তবয়স্ক লোকের ফুসফুসের মধ্য দিয়া ছয় লক্ষ ছিয়াশি হাজার বর্গ ইঞ্চি পরিমাণ বায়ু প্রবাহিত হয় এবং পরিশ্রমকালে সেই বায়ুর পরিমাণ পনেরো লক্ষ আটষট্টি হাজার তিনশো নব্বই বর্গ ইঞ্চি পর্যন্ত বাড়িতে পারে। এতটা বায়ু আকর্ষণ ও নিঃসারণ বড়ো সামান্য কাজ নহে। তাহা ছাড়া ফুসফুস এবং বক্ষপ্রাচীর এই বাতাস বাধা দেয় এবং মাংসপেশীর বলে সেই বাধা অতিক্রম করিয়া নিশ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে হয়। চব্বিশ ঘণ্টায় আমাদের শ্বাসসাধক মাংসপেশী যে শক্তি প্রয়োগ করে তাহার দ্বারা ২০০ মণের অধিক ভার (২১ টন) এক ফুট ঊর্ধ্বে তুলা যাইতে পারে।

ইহা ছাড়া মস্তিষ্কের কাজ, পাকযন্ত্রের কাজ এবং অন্যান্য বিবিধ শারীরিক ক্রিয়া বাকি আছে, সে-সমস্ত হিসাব করিয়া দেখিলে দেখা যায় নিরবচ্ছিন্ন আলস্যেও কী প্রচুর শক্তি ব্যয় হইয়া থাকে। আমরা তো কেবল চব্বিশ ঘণ্টার হিসাবের কিঞ্চিদংশ দেখিলাম। একজন মানুষের সমস্ত জীবিতকাল আলোচনা করিলে জীবনের শক্তি যে কী অপরিমেয় তাহা বুঝা যায়।

ভূতের গল্পের প্রামাণিকতা

সার এডমন্ড হর্নবি চীন এবং জাপানের সর্বোচ্চ কন্সুলার কোর্টের প্রধান জজ ছিলেন। তিনি নিজের জীবনের একটি প্রত্যক্ষ ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন।

তিনি মকদ্দমায় যে রায় লিখিতেন সন্ধ্যার সময় খবরের কাগজের সংবাদদাতারা আসিয়া সেই রায় চাহিয়া লইয়া যাইত এবং পরদিনের সংবাদপত্রে প্রকাশ করিত। একদিন এইরূপ রায় লিখিয়া তাঁহার খানসামার কাছে রাখিয়া দিয়াছিলেন; কথা ছিল যখন সংবাদদাতা আসিবে ভৃত্য এই রায় তাহার হস্তে দিবে। জজসাহেব রাত্রে নিদ্রিত আছেন এমন সময় শয়নগৃহের দ্বারে আঘাত শুনিয়া জাগিয়া উঠিলেন। বুঝিলেন কেহ গৃহে প্রবেশের অনুমতির অপেক্ষা করিয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া আছে, তিনি প্রবেশ করিবার আদেশ করিলে সেই খবরের কাগজের সংবাদদাতা গম্ভীরভাবে গৃহে প্রবেশ করিয়া তাঁহার রায় প্রার্থনা করিল। শয়নগৃহে তাহার এরূপ অনধিকার প্রবেশে ক্রোধ প্রকাশ করিয়া হর্নবি তাহাকে খানসামার নিকট হইতে রায় চাহিয়া লইতে আদেশ করিলেন, কিন্তু তথাপি সে পুনঃ পুনঃ পূর্বমতো প্রার্থনা করিতে লাগিল। কতক বা তাহার অনুনয়ে বিচলিত হইয়া কতক বা নিজপত্নী লেডি হর্নবির জাগরণ আশঙ্কায় তিনি আর কিছু না

করিয়া সংক্ষেপে তাঁহার লিখিত রায়ের মর্ম মুখে মুখে বলিয়া গেলেন, সে তাহা লিখিয়া লইল এবং ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া চলিয়া গেল। তখন রাত্রি দেড়টা। অনতিবিলম্বে লেডি হর্নবি জাগ্রত হইলে তাঁহার স্বামী তাঁহাকে সমস্ত ঘটনা বলিলেন। পরদিন জজসাহেব আদালতে গেলে সংবাদ পাইলেন যে, সেই সংবাদদাতা পূর্বরাত্রে একটা হইতে দেড়টার মধ্যে প্রাণত্যাগ করিয়াছে এবং সে রাত্রে সে গৃহত্যাগ করে নাই। ইন্‌কোয়েস্ট পরীক্ষায় হৃদ্‌রোগই তাহার মৃত্যুর কারণ বলিয়া স্থির হইয়াছে।

এই গল্পটি যখন নাইন্‌টিন্থ সেঞ্চুরি পত্রিকায় প্রকাশিত হইল তখন সাধারণের মনে অত্যন্ত বিস্ময় উদ্রেক করিল। বিশেষত হর্নবি সাহেব একটি বড়ো আদালতের বড়ো জজ— প্রমাণের সত্য-মিথ্যা সূক্ষ্মভাবে অবধারণ করাই তাঁহার কাজ। এবং তিনি নিজের সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, তিনি পুরুষানুক্রমে আইনব্যবসায়ী, কল্পনাশক্তিপরিশূন্য এবং অলৌকিক ঘটনার প্রতি বিশ্বাসবিহীন।

এই ঘটনা কাগজে প্রকাশ হইবার চারি মাস পরে 'নর্থ চায়না হেরাল্ডে'-র সম্পাদক ব্যাল্‌ফোর সাহেব নাইন্‌টিন্থ সেঞ্চুরিতে নিম্নলিখিতমতো প্রতিবাদ করেন।

১। হর্নবি সাহেব বলেন, বর্ণিত ঘটনাকালে লেডি হর্নবি তাঁহার সহিত একত্রে ছিলেন। কিন্তু সে সময়ে লেডি হর্নবি নামক কোনো ব্যক্তিই ছিলেন না। কারণ হর্নবি সাহেবের প্রথম স্ত্রী উক্ত ঘটনার দুই বৎসর পূর্বে গত হন এবং ঘটনার চারি মাস পরে তিনি দ্বিতীয় স্ত্রীকে বিবাহ করেন।

২। হর্নবি সাহেব ইন্‌কোয়েস্টের দ্বারা মৃতদেহ পরীক্ষার উল্লেখ করেন, কিন্তু স্বয়ং পরীক্ষক 'করোনার' সাহেবের নিকট সন্ধান লইয়া জানিলাম, উক্ত মৃতদেহ সম্বন্ধে ইনকোয়েস্ট বসে নাই।

৩। হর্নবি সাহেব ১৮৭৫ খৃস্টাব্দের ২৮ জানুয়ারি তাঁহার রায় প্রকাশের দিন বলিয়া নির্দেশ করেন। কিন্তু আদালতের গেজেটে সে দিনে কোনো রায় প্রকাশিত হয় নাই।

৪। হর্নবি বলেন, সংবাদদাতা রাত্রি একটার সময় মরে। এ কথা অসত্য। প্রাতঃকালে ৮/৯ ঘটিকার সময় তাহার প্রাণত্যাগ হয়।

ব্যাল্‌ফোর সাহেবের এই প্রতিবাদের বিরুদ্ধে সার হর্নবি কিছু বলিতে পারিলেন না, সব কথা এক প্রকার মানিয়া লইতে হইল।

ইহার পর অলৌকিক ঘটনার প্রামাণ্য সাক্ষ্য সম্বন্ধে নিঃসংশয় হওয়া দুঃসাধ্য হইয়া উঠে।

মানব শরীর

যাঁহারা সাধনায় প্রকাশিত 'প্রাণ ও প্রাণী' প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা পূর্বেই আভাস পাইয়াছেন যে, প্রাণীশরীর অণুপরিমাণ জীবকোষের সমষ্টি। এ কথা ভালো করিয়া পর্যালোচনা করিলে বিস্ময়ের উদ্রেক হয়।

বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা বলেন, আমাদের শরীরের যে যে অংশে জীবনের প্রবাহ আছে সমস্তই প্রটোপ্ল্যাজ্‌ম নামক পঙ্কবৎ পদার্থে নির্মিত। কেবল মানবশরীর নহে উদ্ভিদ প্রভৃতি যে-কোনো জীবিত পদার্থ আছে প্রটোপ্ল্যাজ্‌ম ব্যতীত আর কোনো পদার্থেই জীবনীশক্তি নাই।

মানবশরীর অণুবীক্ষণযোগে পরীক্ষা করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, এই প্রটোপ্ল্যাজ্‌ম অতি ক্ষুদ্র কোষ আকারে বদ্ধ হইয়া সর্বদা কার্য করিতেছে। কোথাও কোথাও তন্তু আকার ধারণ করিয়া আমাদের মাংসপেশী ও স্নায়ু রচনা করিয়াছে। কিন্তু পূর্বোক্ত কোষগুলিই আমাদের শরীরের জীবনপূর্ণ কর্মশীল উপাদান।

কণামাত্র প্রটোপ্ল্যাজ্‌ম নামক প্রাণপদার্থ সূক্ষ্ম আবরণে বদ্ধ হইয়া এক-একটি কোষ নির্মাণ করে। প্রত্যেক প্রাণকোষের কেন্দ্রস্থলে একটি করিয়া ঘনীভূত বিন্দু আছে। এই কোষগুলি এত ক্ষুদ্র যে, তাহার ধারণা করা অসম্ভব।

এই কোষগুলিই আমাদের শরীরের কর্মকর্তা, আমাদের প্রাণরাজ্যের প্রজা। ইহারাই আমাদের অস্থি নির্মাণ করিতেছে, শরীরের আবর্জনা বাহির করিয়া দিতেছে, মাংসপেশীরূপে পরিণত হইতেছে। স্নায়ুকোষগুলি শরীরের রাজস্থানীয়। তাহারাই শরীরের রাজ্যরক্ষা আইনজারি প্রভৃতি বড়ো বড়ো কাজে নিযুক্ত।

ইহাদের মধ্যে কার্যের ভাগ আছে, পাকযন্ত্রের পাচক রস নিঃসারণ হইতে অস্থি নির্মাণ পর্যন্ত সমস্ত কাজ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দলের উপর বিলি করিয়া দেওয়া হইয়াছে। একদল অন্যদলের কার্যে তিলমাত্র হস্তক্ষেপ করে না। তাহাদের অধিকাংশ কার্যই প্রায় স্বাধীনভাবে নির্বাহিত হয়। যদিও তাহারা মস্তিষ্ক ও স্নায়ুকে কর্তৃপক্ষীয় বলিয়া স্বীকার করে।

আমাদের শরীরের কাজ যে কত অসংখ্য এবং কোষের দল সেই-সমস্ত কাজ কত শৃঙ্খলাপূর্বক নির্বাহ করিতেছে তাহা আলোচনা করিয়া দেখিলে আশ্চর্য হইতে হয়। কেহ বা জিহ্বাতলে লালা জোগাইতেছে, কেহ বা বাষ্প সৃজন করিয়া চক্ষুতারকাকে সরস করিয়া রাখিতেছে, কেহ বা পাকস্থলীতে রস নির্মাণ করিতেছে— আরও কতক সহস্র কাজ আছে। যকৃৎ যে-সকল জীব-কোষে নির্মিত তাহারা কেবল যকৃতেরই সহস্র কাজ করিয়া থাকে, আর কিছুই করে না, প্রত্যেক প্রত্যঙ্গবর্তী কোষের এইরূপ কার্যনিয়ম। মস্তিষ্ক যে-সকল কোষে নির্মিত তাহারা শরীরের সর্বোচ্চ মণ্ডপে বসিয়া অবিশ্রাম রাজকার্যে নিযুক্ত।

অতএব মানবশরীরটা একটা সমাজের মতো। অসংখ্য প্রজার ঐক্যসমষ্টি। একটা সৈন্যের দল যেমন অশ্বারোহী পদাতি প্রভৃতি নানা অংশে বিভক্ত। এবং প্রত্যেক অংশে নানা লোকের সমষ্টি অথচ সকলে মিলিয়া একটা বৃহৎ প্রাণীর মতো অতিশয় সংহত ঐক্য রক্ষা করিয়া চলে; কতকগুলি মরিতেছে আবার নূতন লোক আসিয়া তাহার স্থান পূরণ করিতেছে— মানবের জীবিত শরীর অবিকল সেইভাবে কাজ করিতেছে। আমরা প্রত্যেকেই একা এক সহস্র, এমন-কি তাহার চেয়ে ঢের বেশি।

সাধনা
পৌষ ১২৯৮

রোগশত্রু ও দেহরক্ষক সৈন্য

জল যেমন মৎস্যে, স্থল যেমন জীবজন্তুতে, বায়ু তেমনি অসংখ্য জীবাণু-বীজে পরিপূর্ণ এ কথা আজকালকার দিনে নূতন নহে। সকলেই জানেন গুড় এবং মধুতে যে গাঁজ উৎপন্ন হয়, জিনিসপত্রে ছাতা পড়ে, মৃতদেহ পচিয়া যায়, এই জীবাণুই তাহার কারণ। এই জীবাণুবীজ উপযুক্ত ক্ষেত্রে পড়িলে অবিলম্বে পরিণতি লাভ করিয়া বংশ বৃদ্ধি করিতে থাকে। ইহারা যে কত ক্ষুদ্র ভালো করিয়া তাহা ধারণা করা অসম্ভব। কোনো লেখক বলেন, এক বর্গ ইঞ্চি স্থানে এক থাক করিয়া সাজাইলে তাহাতে ব্যাক্টিরিয়া নামক জীবাণু লন্ডনের জনসংখ্যার একশত গুণ ধরানো যাইতে পারে।

বিখ্যাত ফরাসিস্ পণ্ডিত প্যাস্টর্ এই জীবাণুকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছেন। একদলের নাম দিয়াছেন এরোবি, অন্য দলের নাম অ্যানেরোবি। এরোবিগণ মৃতদেহের উপরিভাগে জন্মলাভ করিয়া তাহাকে পচাইয়া অল্পে অল্পে জ্বালাইয়া ধ্বংস করিয়া ফেলে, এবং অ্যানেরোবিগণ গলিত পদার্থের নিম্নভাগে উৎপন্ন হইয়া তাহার ক্ষয় সাধন করিতে থাকে; বিশুদ্ধ বায়ুর অক্সিজেন-বাষ্প লাগিলেই তাহারা মরিয়া যায় এবং উপরিতলস্থ এরোবিগণ তাহাদিগকে নষ্ট করিয়া ফেলে। এইরূপে দুইদলে মিলিয়া পৃথিবীর সমস্ত মৃত পদার্থ অপসৃত করিতে থাকে। ইহারা না থাকিলে মৃত্যু অমর হইয়া থাকিত এবং অবিকৃত মৃতদেহস্তূপে ধরাতলে পা ফেলিবার স্থান থাকিত না। পৃথিবীর যে অংশে এই জীবাণুদের গতিবিধি নাই সেখানে জীবজন্তু উদ্ভিদ

কিছুই নাই । সেখানে হয় বালুকাময় মরুভূমি নয় অনন্ত তুষারক্ষেত্র। সেখানে মৃতদেহ কিছুতেই পচিতে চায় না; শকুনি গৃধিনী ও দৈবাগত কোনো মাংসাদ জীবের সাহায্য ব্যতীত সেখানকার মৃতদেহ অপসারণের অন্য কোনো উপায় নাই।

ফ্রান্সে যখন একসময়ে গুটিপোকার মধ্যে একপ্রকার মড়ক উপস্থিত হইয়া রেশমের চাষের বড়োই ব্যাঘাত করিতে লাগিল তখন বিশেষ অনুরুদ্ধ হইয়া প্যাস্টর অন্য কর্ম ফেলিয়া সেই গুটিপোকার রোগতথ্য অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। প্যাস্টর ডাক্তার নহেন, জীবতত্ত্ববিৎ নহেন, রসায়নশাস্ত্রেই তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি— মদ কী করি গাঁজিয়া বিকৃত হইয়া উঠে সেই অনুসন্ধানেই তিনি অধিকাংশ সময়ক্ষেপ করিয়াছেন, সহসা গুটিপোকার রোগ নির্ণয় করিতে বসা তাঁহার পক্ষে একপ্রকার অনধিকারচর্চা বলিয়া মনে হইতে পারে। এবং প্যাস্টরও এই কার্যভার গ্রহণ করিতে প্রথমে কিছু ইতস্তত করিয়াছিলেন। কিন্তু কী আশ্চর্য, অণুবীক্ষণের সাহায্যে কিছুদিন সন্ধান করিতে করিতে পণ্ডিতবর দেখিতে পাইলেন, জীবাণুতে যেমন মদ গাঁজিয়া উঠে, জীবাণুই তেমনি গুটিপোকার রোগের কারণ। মদের রোগ ও প্রাণীর রোগের মধ্যে ঐক্য বাহির হইয়া পড়িল, এবং পূর্বে তিনি যে সন্ধানে প্রবৃত্ত ছিলেন এখানেও তাহার অনুবৃত্তি ধরিতে পারিলেন। অবশেষে এই সূত্র অবলম্বন করিয়া ক্রমে ক্রমে দেখা গেল, জীবশরীরের অনেক রোগ এই জীবাণুদের দ্বারাই সংঘটিত হইয়া থাকে। ইহারা অনুক্ষণ শনি ও কলির ন্যায় শরীরে প্রবেশ করিবার ছিদ্র অন্বেষণ করিতেছে; স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম লঙ্ঘন করিলেই ইহারা সেই অবসরে দেহ আশ্রয় করিয়া বসে এবং শরীরের রসকে বিকৃত করিতে থাকে।

বাহিরে যখন আমাদের এত অদৃশ্য শত্রু অন্তরে অবশ্য তাহার কতকটা প্রতিবিধান আছে সন্দেহ নাই। সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে শত্রুও যেমন, আমাদের অন্তর্বর্তী রক্ষকও সেইরূপ। কুকুরের অনুরূপ মুগুর। দুইই নিরতিশয় ক্ষুদ্র। ডাক্তার উইলসন সাহেব তৎসম্বন্ধে যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন আমরা তাহারই কতক কতক সংকলন করিয়া দিলাম।

ভালো অণুবীক্ষণ দিয়া দেখিতে গেলে রক্তকণা জলের মতো বর্ণহীন দেখায়। তাহার কারণ এই, আসলে, বর্ণহীন রসের উপর অসংখ্য লোহিত কণা ভাসিতেছে; খালি চোখে সেই লোহিত বর্ণের কণাগুলিই আমাদের নিকটে রক্তকে লাল বলিয়া প্রতিভাত করে— অণুবীক্ষণের সাহায্য ব্যতীত সেই বর্ণহীন রস আমরা দেখিতে পাই না। রক্তের এই লোহিত কণাগুলির বিশেষ কাজ আছে। আমরা নিশ্বাসের সহিত যে বায়ু গ্রহণ করি ওই লোহিত কণাগুলি তাহার মধ্য হইতে অক্সিজেন সংগ্রহ করিয়া লয় এবং শরীরের কার্বনিক অ্যাসিড বাষ্প নামক বিষবায়ু ফুসফুসের নিকট বহন করিয়া আনে এবং আমরা তাহা প্রশ্বাসের সহিত নিষ্ক্রান্ত করিয়া দিই।

রক্তস্থ শ্বেতকণার কার্য অন্যরূপ। তাহারা প্রত্যেকে অতিশয় ক্ষুদ্র জীবনবিশিষ্ট কোষ। ইহাদের আয়তন এক ইঞ্চির পঁচিশ শত ভাগের একভাগ। গতসংখ্যক সাধনায় 'প্রাণ ও প্রাণী' প্রবন্ধে প্রটোপ্ল্যাজ্‌ম নামক সর্বাপেক্ষা আদিম প্রাণীশিশুর বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে; রক্তের এই শ্বেতকণাগুলি সেই প্রটোপ্ল্যাজ্‌ম কোষ। আমাদের শরীরে বাস করে বটে তথাপি ইহারা স্বাধীন জীব। এই লক্ষ লক্ষ প্রাণীপ্রবাহ আমাদের শরীরে যথেচ্ছ চলাফেরা করিয়া বেড়ায়; ইহাদের গতিবিধির উপরে আমাদের কোনো হাত নাই। ইহারা অনেক সময় যেন যদৃচ্ছাক্রমে রক্তবহ নাড়ি ভেদ করিয়া আমাদের শরীরতন্তুর মধ্যে প্রবেশ করে, এবং দেহের নানা স্থানে ভ্রমণ করিতে বাহির হয়।

অণুবীক্ষণযোগে পরীক্ষা করিয়া দেখিলে দেখা যায় অ্যামিবা প্রভৃতি জীবাণুদের ন্যায় ইহারা অনুক্ষণ আকার পরিবর্তন করিতে থাকে। এবং ইহাও দেখা গিয়াছে খাদ্যকণা পাইলে ইহারা তাহাকে আক্রমণ করিয়া রীতিমতো পরিপাক করিতে প্রবৃত্ত হয়। এই আহারের ক্ষমতা দেখিয়াই পণ্ডিতগণ ইহার নাম 'ফ্যাগোসাইট' অর্থাৎ ভক্ষককোষ রাখিয়াছেন। ইহার অপর নাম 'লিউকোসাইট' বা শ্বেতকোষ।

ইহারা যে কীরূপ আহারপটু তাহার একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। সকলেই জানেন ব্যাঙাচি ব্যাঙ হইয়া দাঁড়াইলে তাহার ল্যাজ অন্তর্হিত হইয়া যায়। আণুবীক্ষণিক পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে, ব্যাঙাচির রক্তবহ নাড়ি ত্যাগ করিয়া বিস্তর শ্বেতকোষ দলে দলে তাহার ল্যাজটুকু অধিকার করিয়া আহারে প্রবৃত্ত হইয়াছে। সেখানকার স্নায়ু এবং মাংসপেশী ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া খাইতেছে। শরীরের অধিবাসীরা এমনতরো মনঃসংযোগপূর্বক লাগিলে তুচ্ছ পুচ্ছটুকু আর কতক্ষণ টিকিতে পারে। বয়ঃপ্রাপ্তি হইলে ব্যাঙাচির কান্‌কা লোপ পায় সেও এইরূপ কারণে।

কেবল যে শরীরের অনাবশ্যক ভার মোচন ইহাদের কাজ তাহা নহে। রোগস্বরূপে বাহিরের যে-সকল জীবাণু আমাদের শরীরে প্রবেশ করে ইহারা তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া রীতিমতো হাতাহাতি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। বাহিরের আক্রমণকারীগণ যদি যুদ্ধে জয়ী হয় তবে আমরা জ্বর প্রভৃতি বিবিধ ব্যাধি দ্বারা অভিভূত হই, আর যদি আমাদের শরীরের রক্ষক-সৈন্যদল জয়ী হয় তবে আমরা রোগ হইতে নিষ্কৃতি পাই।

স্মরণ হইতেছে, অন্যত্র কোনো প্রবন্ধে পাঠ করিয়াছি কেবল রোগ কেন, পীড়াজনক যে-কোনো পদার্থ আমাদের শরীরে নিবিষ্ট হয় এই সর্বভুকগণ তাহাকে আক্রমণ করিয়া ধ্বংস করিতে চেষ্টা পায়। চোখে একটুকরা বালি পড়িলে সেটাকে লোপ করিবার জন্য ইহারা তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসে— চক্ষু সেই সংগ্রামচিহ্নে রক্তবর্ণ হইয়া উঠে। শরীরে কিছু বিদ্ধ হইলে এই সৈন্যকণিকাগুলি ভিড় করিয়া আসিয়া সে স্থান লাল করিয়া তোলে। ক্ষতস্থানের পুঁজ পরীক্ষা করিয়া দেখা যায়, ব্যাধিবীজগুলিকে ইহারা চারি দিক হইতে আক্রমণ করিয়া খাইবার চেষ্টা করিতেছে।

শরীরের সবল অবস্থায় বোধ করি এই শ্বেতকোষগুলি স্বভাবত তেজস্বী থাকে এবং ব্যাধিবীজকে সহজে পরাহত করিতে পারে। অনাহার অতিশ্রম অজীর্ণ প্রভৃতি কারণে শরীরের দুর্বল অবস্থায় যখন ইহারা হীনতেজ থাকে তখন ম্যালেরিয়া ওলাউঠা প্রভৃতি ব্যাধিবীজগণ অকস্মাৎ আমাদিগকে আক্রমণ করিয়া পরাভূত করে।

যাহা হউক, বায়ুবিহারী জীববীজাণুগণ ব্যাধিশস্য উৎপাদনের জন্য সর্বদা উপযুক্ত ক্ষেত্র অনুসন্ধান করিতেছে এই কথা স্মরণ করিয়া আহার, পানীয় ও বাসস্থান পরিষ্কার রাখা আমাদের নিজের ও প্রতিবেশীদের হিতের পক্ষে কত অত্যাবশ্যক তাহা কাহারো অবিদিত থাকিবে না।

সাধনা
পৌষ ১২৯৮

উদয়াস্তের চন্দ্রসূর্য

উদয়াস্তের সময় দিক্‌সীমান্তে চন্দ্রসূর্যকে কেন বড়ো দেখিতে হয় ইহাই লইয়া প্রথম বৎসরের সাধনায় কিঞ্চিৎ আলোচনা চলে। সাধনার কোনো পাঠক লিখিয়া পাঠান, বায়ুর রিফ্রাক্‌শন্‌ বশতই এইরূপ ঘটিয়া থাকে। তৎসম্বন্ধে প্রক্টর ও র‍্যানিয়ার্ড সাহেবের রচিত 'ওল্‌ড্‌ অ্যাণ্ড্‌ নিয়ু অ্যাস্‌ট্রনমি' নামক গ্রন্থে যাহা কথিত হইয়াছে আমরা তাহার সার সংকলন করিয়া দিলাম।

প্রক্টর সাহেব দেখাইয়াছেন, বায়ুর রিফ্রাক্‌শন্‌ বশত সূর্যের দৃশ্যমান পরিধি লম্বভাবে কমিয়া যায় অথচ পার্শ্বের দিকে বাড়ে না। এমন-কি, চন্দ্রের পরিধি লম্বভাগে এবং পার্শ্বভাগে উভয়তই কমিয়া যায়।

কী কী কারণবশত এরূপ ঘটে তাহার বিস্তারিত বিবরণ অনেক পাঠকের নিকট জটিল ও বিরক্তিজনক হইবে জানিয়া আমরা বিবৃত করিতে ক্ষান্ত হইলাম। ইচ্ছা করিলে পাঠকগণ আমাদের বর্তমান অবলম্বনীয় গ্রন্থের ২৪৭ পৃষ্ঠা পাঠ করিলে সমস্ত জানিতে পারিবেন।

যাহা হউক, বায়ুর রিফ্র্যাক্‌শনে চন্দ্রসূর্যমণ্ডল ছোটো দেখিতে হয়— তবে তাহাদিগকে বড়ো

বলিয়া ভ্রম হয় কেন?

প্রক্টর সাহেব বলেন, আকাশ আমাদের চক্ষে একটি গোলাকার মণ্ডপস্বরূপ দেখা দেয়। আমাদের মাথার উপরে এই মণ্ডপ যতটা দূর মনে হয়, নিম্নে দিগন্তের দিকে ইহার সীমা তাহা অপেক্ষা অনেক বেশি দূরবর্তী বলিয়া বোধ হয়। তাহার কারণ, সাধারণত আকাশের উচ্চতা পরিমাপের সামগ্রী বড়ো বেশি নাই, কিন্তু যখন দেখি, বাড়ি ঘর, লোকালয়, শস্যক্ষেত নদী অরণ্য পর্বত অতিক্রম করিয়াও আকাশ দিগন্তে মিশিয়াছে তখন সেই দিকে তাহার দূরত্ব নির্দেশ করিবার অনেকগুলি পদার্থ পাওয়া যায়। এইরূপে চিরাভ্যাসক্রমে অজ্ঞানত দিগন্তবর্তী আকাশকে ঊর্ধ্বাকাশের অপেক্ষা আমরা অনেক দূরস্থ বলিয়া মনে করি।

অতএব চন্দ্রসূর্যকে যখন উদয়াস্তকালে দিগন্তসংলগ্ন দেখি তখন উক্ত সংস্কারবশত তাহাকে অপেক্ষাকৃত বহুদূরবর্তী বলিয়া জ্ঞান হয়; এইজন্য, চক্ষে তাহার পরিধি যতটা দেখা যায় মনে মনে তদপেক্ষা তাহাকে বড়ো করিয়া লই।

ইহার অনুকূলে একটি পরীক্ষাসিদ্ধ প্রমাণ আছে। সাদা কাগজে খুব বড়ো একটি কালো অক্ষর আঁকিয়া তাহার প্রতি অনেকক্ষণ চাহিয়া থাকো। অবশেষে চাহিয়া চাহিয়া চক্ষু যখন পরিশ্রান্ত হইয়া যাইবে, তখন অক্ষর হইতে চোখ তুলিয়া লইয়া যদি সেই কাগজের সাদা অংশে দৃষ্টিপাত কর, তবে সেখানেও সেই অক্ষরের অনুরূপ একটা সাদা অক্ষর দেখিতে পাইবে। কারণ, বহুক্ষণ চাহিয়া থাকায় চক্ষুতারকায় উক্ত অক্ষর মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু সেই অক্ষরের দিকে দীর্ঘকাল চাহিয়া যদি সহসা দূরের দেয়ালের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ কর, তবে অতিশয় বৃহদাকারের একটা অক্ষর দেখিতে পাইবে। অথচ প্রকৃতপক্ষে কাগজে লিখিত অক্ষরের অপেক্ষা তাহা কখনোই বৃহৎ নহে, কারণ, ঠিক সেই অক্ষরটিই চক্ষুরতারকায় অঙ্কিত হইয়াছে। কিন্তু দেয়ালের দূরত্বের সহিত গুণ করিয়া লইয়া আমরা চিরসংস্কার অনুসারে তাহাকে মনে মনে বাড়াইয়া লই।

অনেক সময় কুয়াশার ভিতর দিয়া চন্দ্রসূর্যকে ওই একই কারণে, তাহার যথার্থ দৃশ্যমান, আয়তনের অপেক্ষা বড়ো বলিয়া মনে হয়। কারণ, দূরের জিনিস ঝাপ্‌সা হয়, এইজন্য, ঝাপসা জিনিসকে বেশি দূরের বলিয়া ভ্রম হয়। যত বেশি দূর মনে হইবে, আয়তনও তদনুসারে বৃহত্তর বলিয়া প্রতিভাত হইবে। লেখক বলেন, অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, কুয়াশার ভিতর দিয়া একটা জাহাজ বিসদৃশ বৃহৎ দেখায়, কিন্তু উপযুক্ত যন্ত্রের দ্বারা তুলনা করিয়া পরিমাপ করিলে দেখা যায়, কুয়াশামুক্ত অবস্থার সহিত তাহার আয়তনের কিছুমাত্র ইতর বিশেষ নাই।

যথারীতি পরিমাপের দ্বারা দিগন্তবিলম্বী চন্দ্র মধ্যাকাশগত চন্দ্রের অপেক্ষা কিছুমাত্র বড়ো প্রমাণ হয় নাই।

সাধনা
জ্যৈষ্ঠ ১৩০০

অভ্যাসজনিত পরিবর্তন

অভ্যাসের দ্বারা আমাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পরিবর্তন সাধিত হইতে পারে। হলধারী চাষা এবং লেখনীধারী ভদ্রলোকের হাতের অনেক প্রভেদ। কৃত্রিম উপায়ে চীনরমণীর পা কীরূপ ক্ষুদ্র ও বিকৃত হইয়া যায় তাহা সকলেই অবগত আছেন।

কিন্তু এইরূপ অভ্যাস ও কৃত্রিমকারণজনিত পরিবর্তন সকল পুরুষানুক্রমে সঞ্চারিত হয় কি না ইহা লইয়া আজকাল বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে আলোচনা চলিতেছে।

হার্বার্ট স্পেন্সর বলেন, হয় যে, এ কথা না মানিলে অভিব্যক্তিবাদ অসম্পূর্ণ থাকে। কিন্তু জর্মান পণ্ডিত বাইস্‌মান্ বহুল যুক্তি, দৃষ্টান্ত ও পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে, অভ্যাসজনিত নূতনসাধিত অঙ্গবৈচিত্র্য সন্ততিপরম্পরায় সঞ্চারিত হয় না। বিখ্যাত অভিব্যক্তিবাদী ওয়ালেস্

সাহেবও বাইস্‌মানের পক্ষ সমর্থন করেন।

তিনি বলেন, ভালো জাতের যুবক ঘোড়া অথবা কুকুর যদি কোনো কারণে পঙ্গু অথবা অঙ্গ হীন হইয়া পড়ে, তবে পশুব্যবসায়ীরা তাহাকে সন্তান উৎপাদনের জন্য স্বতন্ত্র করিয়া রাখিয়া দেয়। এবং তাহার সন্ততিবর্গ তাহার পূর্বপুরুষদের অপেক্ষা কোনো অংশে হীন হয় না।

সাধারণের মধ্যেও একটা সংস্কার আছে যে, তন্তুবায় প্রভৃতি শিল্পীশ্রেণীদের মধ্যে পূর্বপুরুষদিগের অভ্যাসপ্রসূত বিশেষ কার্যনৈপুণ্য উত্তরবংশীয়েরা বিনা শিক্ষাতেও প্রাপ্ত হয়। ওয়ালেস্‌ বলেন ইহা ভ্রম। কারণ, যদি ইহা সত্য হইত তবে পিতার অধিক বয়সের সন্তান অধিকতর স্বাভাবিক নিপুণতা লাভ করিত। তাহা হইলে কনিষ্ঠ ছেলেরাই শ্রেষ্ঠ হইত। কিন্তু তৎপক্ষে কোনো প্রমাণ নাই। প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তির সন্তানেরা প্রতিভাসম্পন্ন হয় না, বরং তাহার বিপরীত হয় এরূপ দৃষ্টান্তই অধিক পাওয়া যায়। তাহা যদি না হইত তবে জগতে শিল্পনৈপুণ্য ও প্রতিভা উত্তরোত্তর বংশানুক্রমে অত্যন্ত বিকাশ লাভ করিয়াই চলিত।

কিন্তু কোনো কোনো লেখক বলেন যে, বিশেষ শ্রেণীর জন্তুদের মধ্যে যে বিশেষ নূতন প্রত্যঙ্গের উদ্ভব দেখা যায় তাহা বহুকালের ক্রমশ অভ্যাসজনিত না মনে করিলে অন্য কারণ পাওয়া যায় না। যেমন শৃঙ্গ। যে-সমস্ত জন্তু মাথা দিয়া ঢুঁ মারিত তাহাদেরই কপালের চামড়া পুরু হইয়াছিল এবং হাড় ঠেলিয়া উঠিয়াছিল; সেই পরিবর্তন সন্তানদের মধ্যে সঞ্চারিত হইয়া অভ্যাসে বৃদ্ধি পাইয়া বিচিত্রাকার শৃঙ্গে পরিণত হইয়াছে।

ওয়ালেস্‌ বলেন এ কথার কোনো প্রমাণ নাই। ডারুয়িনের গ্রন্থে দেখা যায় কোনো কোনো দেশে ঘোড়ার কপালে ক্ষুদ্র শৃঙ্গের মতো উচ্চতা দেখা গিয়াছে। কিন্তু ঘোড়ার প্রাচীন বংশের মধ্যে কোনো জাতেরই শিং দেখা যায় নাই। যদি শিং থাকিত তবে প্রাকৃতিক নির্বাচনের নিয়মানুসারে এমন একটা আত্মরক্ষার অস্ত্র বিলুপ্ত না হইবারই সম্ভাবনা ছিল। অতএব এই ঘোড়ার ছোটো শিং নূতন উদ্ভব।

শজারুর কাঁটা, পাখির পালক এ-সমস্ত যে, বিশেষ অভ্যাসের দ্বারা উৎপন্ন হইয়াছে এমন বলা যায় না।

পরীক্ষার দ্বারা জানা গিয়াছে আমাদের শরীরের সর্বাংশে স্পর্শশক্তি সমান নহে। আমাদের পিঠের মাঝখানে যে জিনিস অনুভব করিতে পারি না, আমাদের আঙুলের ডগায় তাহা অনায়াসে অনুভূত হয়। হার্বার্ট স্পেন্সর বলেন ইহার কারণ, প্রধানত অঙ্গুলি দ্বারা আমরা সকল দ্রব্য স্পর্শ করিয়া দেখি বলিয়া অভ্যাসে তাহার স্পর্শশক্তি বাড়িয়া উঠিয়াছে এবং সেই শক্তি বংশানুক্রমে চলিয়া আসিয়াছে। কিন্তু পৃষ্ঠে তাহার বিপরীত।

ওয়ালেস্‌ বলেন প্রাকৃতিক নির্বাচন ইহার কারণ। স্পর্শশক্তির উপরে আমাদের জীবনরক্ষা অনেকটা নির্ভর করিতেছে। শরীরের যে যে স্থানে আঘাত লাগিলে জীবনের অধিক ক্ষতি করে সেই সেই স্থানে স্পর্শশক্তি সেই পরিমাণে অধিক। চক্ষুর স্পর্শশক্তি সর্বাপেক্ষা অধিক, অথচ এ কথা কেহ বলিতে পারে না যে, চক্ষু দ্বারা দ্রব্যাদি স্পর্শ করা আমাদের সর্বাপেক্ষা অভ্যস্ত। কিন্তু চক্ষু গেলে জীবনধারণ করা দুরূহ; অতএব যে-সকল প্রাণীর চক্ষু অত্যন্ত স্পর্শক্ষম, চক্ষে তিলমাত্র আঘাত লাগিলেই জানিতে পারে ও চক্ষুরক্ষার জন্য তৎক্ষণাৎ সচেষ্ট হইতে পারে তাহারাই প্রাকৃতিক নির্বাচনে টিকিয়া যায়। এরূপ আরও অনেক দৃষ্টান্ত দেখানো হইয়াছে।

অতএব ওয়ালেসের মতে অভিব্যক্তির অভ্যাসের কোনো কার্যকারিতা নাই। প্রাকৃতিক নির্বাচনই তাহার প্রধান অঙ্গ। অর্থাৎ, যে সন্তানগণ কোনো কারণে অন্যদের অপেক্ষা একটা অতিরিক্ত সুবিধা লইয়া জন্মগ্রহণ করে তাহারাই জীবনযুদ্ধে জয়ী হইয়া টিকিয়া যায়, অন্যেরা তাহাদের সহিত পারিয়া উঠে না, সুতরাং মারা পড়ে। এইরূপে এই নূতন সুবিধা ও তৎসম্পন্ন জীব স্থায়ী হয়। শৃঙ্গহীন হরিণদের মধ্যে যদি নিগূঢ় কারণে একটা শৃঙ্গী হরিণ জন্মগ্রহণ করে তবে তাহার শিংয়ের জোরে সেই বেশি আহার এবং মনোমতো হরিণী সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইবে।

এবং তাহার বংশে যতই শৃঙ্গী হরিণের জন্ম হইবে ততই শৃঙ্গহীন হরিণের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িবে।

অতএব বর্তমান অনেক অভিব্যক্তিবাদীদের মতে সহজাত সুবিধাগুলি জীবরাজ্যে স্থায়ী হয়, অভ্যাসজাত সুবিধাগুলি নহে।

সাধনা
আষাঢ় ১৩০০

ওলাউঠার বিস্তার

ভারতবর্ষ যে ওলাউঠা রোগের জন্মভূমি, এ সম্বন্ধে সন্দেহ অতি অল্পই আছে। ১৮১৭ খৃস্টাব্দে এই ভীষণ মড়ক বঙ্গদেশ হইতে দিগ্‌বিজয় করিতে বাহির হইয়া সিন্ধু, য়ুফ্রাটিস, নীল, দানিয়ুব, ভল্‌গা, অবশেষে আমেরিকার সেন্টলরেন্স এবং মিসিসিপি নদী পার হইয়া দেশবিদেশে হাহাকার ধ্বনি উত্থিত করিয়াছিল।

কিন্তু এই রোগ জল, খাদ্য অথবা বায়ু কোন্ পথ অবলম্বন করিয়া ভ্রমণ করে এখনও তাহা নিঃসংশয়রূপে স্থির হয় নাই। তবে, জলটাই তাহার সর্বাপেক্ষা প্রধান বাহন তাহার অনেকগুলা প্রমাণ পাওয়া যায়। মে মাসের নিয়ু রিভিয়ু পত্রে এ সম্বন্ধে আলোচনা আছে।

১৮৪৯ খৃস্টাব্দে লন্ডনে যখন এই মড়কের প্রাদুর্ভাব হয় তখন সেখানে সাধারণত টেম্‌স্ নদীর জল ব্যবহার হইত। শহরের নর্দমা এই নদীতে গিয়া মিশিত। সেই সময় দেখা গিয়াছে, নদীর জল শহরের যত নীচে হইতে লওয়া হইয়াছে মৃত্যুসংখ্যা ততই বাড়িয়াছে, এবং শহরের সম্মুখে অপেক্ষাকৃত অল্পদূষিত অংশের জল যাহারা ব্যবহার করিয়াছে তাহাদের মধ্যে মৃত্যুসংখ্যাও তত অল্প হইয়াছে।

১৮৫৪ খৃস্টাব্দে লন্ডনে যে ওলাউঠার মড়ক হয় তখনও এ সম্বন্ধে একটি প্রমাণ পাওয়া গেছে। লন্ডনে যে দুই জলের কলওয়ালা জল জোগাইয়া থাকে তন্মধ্যে সাউথ্‌ওয়ার্ক্ ওয়াটার কোম্পানি ব্যাটার্সি নামক স্থানের পয়ঃপ্রণালীর নিকটবর্তী টেম্‌স্ হইতে জল লইত। এবং ল্যাম্বেথ্ ওয়াটার কোম্পানি নদীর অনেক উপর হইতে অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ জল আহরণ করিত। লন্ডনের স্থানে স্থানে এই দুই কম্পানির পাইপ সংলগ্নভাবে দুই পাশাপাশি বাড়িতে ব্যবহৃত হইয়াছে অথচ মৃত্যুসংখ্যা তুলনা করিয়া দেখা গিয়াছে সাউথ্‌ওয়ার্ক্ কোম্পানির জল যাহারা ব্যবহার করিয়াছে তাহাদের মধ্যে হাজার করা সাতান্ন জন মরিয়াছে আর ল্যাম্বেথ্ কোম্পানির জল যাহারা পান করিত তাহাদের মধ্যে হাজার করা এগারো জনের মৃত্যু হয়।

১৮৫৪ খৃস্টাব্দে ইংলন্ডে সোহোপল্লীর গোল্‌ডন্ স্কোয়ার নামক একটি ক্ষুদ্র অংশে ওলাউঠা দেখা দেয়। তাহার কারণ নির্ণয়ের জন্য যে কমিশন বসে তাঁহারা দেখিলেন সেখানে পল্লীর লোক একটি বিশেষ কূপের জল পান করিয়া থাকে। এবং সন্ধানের দ্বারা জানিলেন, মড়কের প্রাদুর্ভাবের প্রাক্‌কালে স্থানীয় একটি নল-কূপ কীরূপে জীর্ণ হইয়া যায় এবং মৃত্তিকাতল দিয়া আবর্জনাপ্রবাহ এই জলের সহিত মিশ্রিত হয়। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যেখানে এই জলাশয় অবস্থিত সেই রাস্তার উপরেই একটি মদ চোঁয়াইবার কারখানা ছিল, সেখানকার কর্মচারীরা উক্ত জল পান করিত না এবং তাহাদের মধ্যে একজনেরও ওলাউঠা হয় নাই।

১৮৮৫ খৃস্টাব্দে ডোরাডা নামক একটি কুলিজাহাজ ইংলন্ড ছাড়িয়া মাসখানেক পরে জাভাদ্বীপের বন্দরে কয়লা তুলিয়াছিল। সেখানে কোনো মাল বোঝাই হয় নাই, কেবল ফার্স্ট ক্লাস প্যাসেঞ্জারদের জন্য ফল এবং শাকসবজি লওয়া হয়। সমস্ত পথ ডিস্টিল্-করা জল ব্যবহার হইয়াছে এবং কোনো বন্দর হইতে জল লওয়া হয় নাই। বন্দর ছাড়ার পর জাহাজে ওলাউঠা দেখা দিল। কিন্তু প্রথমশ্রেণীর প্যাসেঞ্জারদের কেহ রোগগ্রস্ত হয় নাই। তাহারাই ফল ও উদ্ভিজ্জ

খাইয়াছিল এবং বন্দরে নামিয়া রাত্রিযাপন করিয়া আসিয়াছিল। জাহাজের ডেক্ সাফ করিবার জন্য তীর হইতে কিয়ৎ পরিমাণে বালুকা আনা হইয়াছিল। সেই বালুকা জাহাজের কোনো কোনো বিভাগে দুই দিন ব্যবহার করিয়া দুর্গন্ধবোধে ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছিল, জাহাজের লোকের বিশ্বাস সেই বালুকার মধ্যেই ওলাউঠার বীজ ছিল। যদি তাহাই সত্য হয় তবে এ স্থলে জলের দোষ দেওয়া যায় না। বালুকা হইতে বিষ নিশ্বাসযোগে শরীরে গৃহীত হইয়াছে এইরূপ অনুমান করিতে হয়।

'ইংলন্ড' নামক স্টীমার ১৮৬৬ খৃস্টাব্দে লিভারপুল হইতে যাত্রা করিয়া হ্যালিফ্যাক্সে পৌঁছায়। পথের মধ্যে ওলাউঠায় তিনশো লোক মরে। বন্দরে আসিলে পাইলট উক্ত জাহাজের সহিত নৌকা বাঁধিয়া তাহাকে যথাস্থানে পৌঁছাইয়া দেয়। ওই পাইলট এবং তাহার দুই জন সঙ্গী জাহাজে পদার্পণমাত্র করে নাই। দুই দিন পরেই ওই পাইলট ওলাউঠায় আক্রান্ত হয় এবং তৃতীয় দিনে তাহার একটি সঙ্গীকেও ওলাউঠায় ধরে। তখন সে অঞ্চলে আর কোথাও ওলাউঠা ছিল না। এখানেও বায়ু ব্যতীত আর কিছুকে দায়ী করা যায় না।

১৮৮৪ খৃস্টাব্দে কক্ সাহেব, ওলাউঠাকে শরীরের উপরে জীবাণুবিশেষের ক্রিয়া বলিয়া সাব্যস্ত করেন। যদিও এ মত এখনো সম্পূর্ণ সর্ববাদীসম্মত হয় নাই তথাপি অধিকাংশের এই বিশ্বাস।

অনেক জীবাণুবীজ বহুকাল শুষ্ক অবস্থায় থাকিয়া অনুকূল আধার পাইলে পুনরায় বাঁচিয়া উঠে। কিন্তু কক্ সাহেবের ওলাউঠা-জীবাণুগণকে এ পর্যন্ত বীজ সৃজন করিতে দেখা যায় নাই এবং একবার শুষ্ক হইয়া গেলে তাহারা মরিয়া যায়। এ কথা যদি সত্য হয় তবে ধুলা প্রভৃতি শুষ্ক আধার অবলম্বন করিয়া সজীব ওলাউঠা-জীবাণু বায়ুযোগে চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হইতে পারে না। জলপথই তাহার, প্রশস্ত পথ এবং ওলাউঠা-জীবাণু জলজ।

ঈথর

ঈথর স্পর্শের অতীত, এবং পদার্থের গতিকে কিছুমাত্র বাধা দেয় না, এ সম্বন্ধে বিস্তর পরীক্ষা করা হইয়াছে। এইজন্য বোধ হয়, অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি ঈথরের অস্তিত্বকে কাল্পনিক অনুমান মনে করেন। কিন্তু ঈথর আমাদের ইন্দ্রিয়ের অগম্য নহে, আলোকবোধ ও উত্তাপবোধই তাহার প্রমাণ।

কথাটা সংক্ষেপে এই— পৃথিবীতে প্রধানত সূর্য হইতে আলোক ও উত্তাপ বিকীর্ণ হইতেছে। এই পৃথিবী ও সূর্যের মাঝখানকার আকাশে যদি কোনো জানত বস্তু থাকে, সে অতি সূক্ষ্ম গ্যাস; কোথাও বা পরমাণু আকারে, কোথাও বা খানিকটা সমষ্টিবদ্ধভাবে; কিন্তু ইহাদের পরস্পরের মধ্যে দীর্ঘ ব্যবধান। এই বিচ্ছিন্ন পদার্থগুলি আলোকবহনকার্যে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। বিশেষত আলোক যে গতি অবলম্বন করিয়া আসে, কোনো কঠিন, তরল অথবা বাষ্পীয় পদার্থ সে গতি চালনা করিতে পারে না। অতএব তাহার একটা স্বতন্ত্র বাহন আছে সন্দেহ নাই। বাহন আছে তাহা অস্বীকার করিবার জো নাই, কারণ, কিরণমাত্রই যে তরঙ্গবৎ কম্পমান এবং তাহার গতির সময় সুনির্দিষ্ট ইহা সম্পূর্ণ প্রমাণ হইয়া গেছে।

ক্রিয়া শূন্য আশ্রয় করিয়া হইতে পারে না ইহাও বিজ্ঞানের একটি অকাট্য সিদ্ধান্ত। বস্তু আপন সংলগ্ন পদার্থের উপরেই কাজ ক '। শক্তি অবিচ্ছিন্ন মধ্যস্থ পদার্থ অবলম্বন করিয়াই একস্থান হইতে অন্যস্থানে সঞ্চরণ করিতে পারে। পৃথিবী ও সূর্যের মধ্যে যে কেবল কিরণের সম্বন্ধ তাহা নহে, একটা আকর্ষণের যোগ আছে। আকর্ষণটি বড়ো কম নহে; যে টান পড়ে তাহা সতেরো ফুট চওড়া ১০০০০০০০০০০০০টা ইস্পাতের রজ্জুও সহিতে পারে না। এত বড়ো একটা প্রবল শক্তিকে কে চালনা করিতেছে? একটা ইস্পাতের পাতকে বিস্তর বলপ্রয়োগ

করিয়াও বিচ্ছিন্ন করা কঠিন; অথচ এ কথা সকলেরই জানা আছে যে, বস্তুমাত্রেরই পরমাণু গায়ে গায়ে সংলগ্ন নহে; পরস্পরের মধ্যে ফাঁক আছে এবং সেই ফাঁকে ঈথর নামক বিশ্বব্যাপী যোজক পদার্থ অবস্থিতি করিয়া অসংলগ্ন পরমাণুপুঞ্জকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। এই মধ্যস্থ জিনিসটি স্পর্শাতীত বটে, কিন্তু তাহার এমন গুণ আছে যে, প্রবলতম আকর্ষণ সঞ্চার করিতে পারে।

এই ঈথরের কম্পন কেবল যে আমরা আলোক ও উত্তাপবোধের দ্বারা অনুভব করি তাহা নহে। যে-সকল বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের দ্বারা তড়িৎপ্রবাহ সম্বন্ধে আমরা জ্ঞানলাভ করিয়া থাকি, সেগুলাও যেন সেই বিশ্বব্যাপী ঈথরের নাড়ীর বেগ অনুমান করিবার যন্ত্র। এখনো এই আলোক এই তড়িতের গতি ও শক্তিতত্ত্ব নির্ণয় হয় নাই; এখনো ইহার ক্রিয়াকলাপ যন্ত্রতন্ত্রের ধারণার বাহিরে। বর্তমান শতাব্দীতে ইহাদের সম্বন্ধে বিস্তর তথ্য জানা গিয়াছে। অনেক পণ্ডিত আশা করিয়া আছেন ভাবী শতাব্দীতে ইহার একটা তত্ত্বনির্ণয় হইবে এবং সেই তত্ত্বের উপর সমস্ত পদার্থবিদ্যার একটা নূতন ভিত্তি স্থাপিত হইবে। জীবনীশক্তি এবং মানসশক্তি এখনো বিজ্ঞানের হস্তে ধরা দেয় নাই, কিন্তু বিখ্যাত পদার্থতত্ত্ববিৎ অধ্যাপক অলিভার লজ সাহেব অনুমান করিতেছেন ঈথরের সঙ্গে সঙ্গেই সে দুটো ধরা পড়িবে, পরস্পরের মধ্যে বোধ করি বা কোনো একটা নিগূঢ় যোগ আছে।

সাধনা
ভাদ্র ১৩০০

ভূগর্ভস্থ জল এবং বায়ুপ্রবাহ

বৃষ্টির জল ভূতলে আসিয়া পড়িলে তাহার কিয়দংশ মাটিতে শুষিয়া লয়, কিয়দংশ বাতাসে উবিয়া যায় এবং অবশিষ্ট অংশ জলস্রোত এবং নদী-আকারে ভূমিতল হইতে গড়াইয়া পড়ে।

মাটি যদি তেমন কঠিন হয় তবে অনেকটা জল উপরে থাকিয়া গিয়া বিল, জলা প্রভৃতির সৃষ্টি করে।

যে জল মাটির মধ্যে গিয়া প্রবেশ করে বর্তমান প্রবন্ধে তাহারই আলোচনা করা যাইতেছে।

এই মৃত্তিকা-শোষিত জলের কিছু অংশ ঘাস এবং গাছের শিকড় টানিয়া লয় এবং সেই রস পাতার মধ্য দিয়া বাষ্প আকারে উবিয়া যায়। কিন্তু বেশির ভাগ জল ছিদ্র এবং ফাটলের মধ্য দিয়া নিম্নস্তরে সঞ্চিত হয় এবং স্তর যদি ঢালু হয় তবে সেই ভূমধ্যস্থ জলও তদনুসারে গড়াইয়া পড়িতে থাকে।

মৃত্তিকাস্তর ছিদ্রবহুল হইলে উপরিস্থ জলস্রোত কীরূপ অন্তর্ধান করে তাহা ফল্গু প্রভৃতি অন্তঃসলিলা নদীর দৃষ্টান্তে বুঝিতে পারা যায়।

পৃথিবীর উপরকার জল ক্রমে মাটির ভিতরে কত নীচে পর্যন্ত চুঁইয়া পড়ে এবং কেন বা একস্থানে আসিয়া বাধা পায় এখনও তাহার ভালোরূপ তথ্য নির্ণয় হয় নাই। কিন্তু ইহা দেখা গিয়াছে যে, ভূতলের নিম্নস্তরে কিছুদূর নামিয়া আসিলেই একটি সম্পূর্ণ জলসিক্তস্থানে আসিয়া পৌঁছানো যায়, সেখানে মৃত্তিকার প্রত্যেক ছিদ্র বায়ুর পরিবর্তে কেবলমাত্র জলে পরিপূর্ণ।

যেমন সমুদ্রের জল সর্বত্রই সমতল তেমনি মাটির নীচের জলেরও একটা সমতলতা আছে। কোনো বিশেষ প্রদেশের ভূগর্ভস্থ জলের তলোচ্চতা কী, তাহা সে দেশের কূপের জলতল দেখিলেই বুঝা যাইতে পারে।

এই জল অবিশ্রাম মন্দগতিতে সমুদ্র অথবা নিকটবর্তী জলাশয়ের দিকে প্রবাহিত হইতে থাকে, এবং ঋতুবিশেষে এই জলতল কখনো উপরে উঠে কখনো নীচে নামিয়া যায়।

ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে মাটির প্রকৃতি অনুসারে এই ভূগর্ভস্থ জলতলের উচ্চতা পরিমিত হয়।

জলা জায়গায় হয়তো কয়েক ফুট নীচেই এই জলতল পাওয়া যায়, আবার কোনো কোনো জায়গায় বহুশত ফুট নিম্নে এই জলতল দৃষ্টিগোচর হয়। যে প্রদেশে ভূতলের যত নিম্নে জলধারণযোগ্য অভেদ্য মৃত্তিকাস্তর আছে সে প্রদেশে ভূগর্ভস্থ জলতল সেই পরিমাণে নির্দিষ্ট হয়।

এই ভূগর্ভস্থ সর্বব্যাপী জলপ্রবাহ মানুষের পক্ষে নিতান্ত সামান্য নহে। কূপ সরোবর উৎস প্রভৃতি আশ্রয় করিয়া এই জলই পৃথিবীর অধিকাংশ মানবের তৃষ্ণা নিবারণ করে— এবং স্বাস্থ্যরক্ষার সহিতও ইহার ঘনিষ্ঠ যোগ আছে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, ঋতুবিশেষে এই ভূগর্ভস্থ জলের তলোচ্চতা উঠিয়া-নামিয়া থাকে। এবং এই উঠা-নাবার সহিত রোগবিশেষের হ্রাস-বৃদ্ধির যোগ আছে। পেটেন্‌কোফার সাহেব বলেন, জলতল যত উপরে উঠে টাইফয়েড জ্বর ততই বিস্তার লাভ করে। তাঁহার মতে, ভূমির আর্দ্রতা রোগবীজপালনের সহায়তা করে বলিয়াই এরূপ ঘটে।

কোনো কোনো পণ্ডিত অন্য কারণ নির্দেশ করেন। তাঁহারা বলেন, ভূগর্ভস্থ জল ভূতলের অনতিনিম্নে পর্যন্ত যখন উঠে তখন পৃথিবীর অনেক আবর্জনার সহিত সহজে মিশ্রিত হইতে পারে।

কীরূপে মিশ্রিত হয় তাহার একটা দৃষ্টান্ত দিলে কথাটা স্পষ্ট হইবে। পল্লীগ্রামে যেখানে শহরের মতো পয়ঃপ্রণালীর পাকা বন্দোবস্ত নাই সেখানে অনেক স্থলে কুণ্ডের মধ্যে মলিন পদার্থ সঞ্চিত হইতে থাকে— যখন উপরে উঠে তখন মলমিশ্রিত মৃত্তিকার সহিত জলের সংযোগ হইতে থাকে এবং সেই জল রোগবীজ ও দূষিত পদার্থসকল বহন করিয়া কূপ ও সরোবরকে কলুষিত করিয়া ফেলে।

ইহা হইতে পাঠকেরা বুঝিতে পারিবেন, পানীয় জল বিশুদ্ধ রাখিতে হইলে বিস্তর সতর্কতার আবশ্যক। কাপড় কাচিয়া স্নান করিয়া জলাশয়ের জল মলিন করিতে না দিলেও অদূরবর্তী আবর্জনা প্রভৃতির মলিনতা জলমধ্যে সঞ্চারিত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে।

এই মলিনতা অনেক সময় দূরের জলাশয়কে স্পর্শ করে অথচ নিকটের জলাশয়কে অব্যাহতি দেয় এমন দেখা গিয়াছে। তাহার একটি কারণ আছে। পূর্বে বলা হইয়াছে ভূগর্ভস্থ জল সমুদ্র অথবা অন্য কোনো নিকটবর্তী জলাশয়ের অভিমুখে ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতে থাকে। আবর্জনাকুণ্ডের উজানে যে কূপ প্রভৃতি থাকে তাহা নিকটবর্তী হইলেও, মলিন পদার্থ স্রোতের প্রতিকূলে সে জলাশয়ে গমন করিতে পারে না, কিন্তু অনুকূল স্রোতে দূষিত পদার্থ অনেক দূরেও উপনীত হইতে পারে। ভূগর্ভস্থ জলপ্রবাহের অভিমুখ-গতি কোন্ দিকে তাহা স্থির হইলে জলাশয়ের জলদোষ নিবারণ সম্বন্ধে ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

কূপ হইতে অধিক পরিমাণে জল তুলিয়া লওয়া হইলে সেই শূন্যপ্রায় কূপ চতুর্দিক হইতে বলসহকারে জল আকর্ষণ করিতে থাকে। তখন উপর হইতে নিম্ন হইতে দূর-দূরান্তর হইতে জলধারা আকৃষ্ট হওয়াতে সেইসঙ্গে অনেক দূষিত পদার্থ সঞ্চারিত হইতে পারে। অছিদ্র জমির অপেক্ষা সছিদ্র বালুময় জমিতে এইরূপ আকর্ষণের সম্ভাবনা অনেক অধিক। ওলাউঠা প্রভৃতি সংক্রামক রোগের বীজ এইরূপ উপায়ে বালু-জমিতে অতি শীঘ্র ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে।

ভূতলের নিম্নে যেমন জলপ্রবাহ আছে, তেমনি বায়ুপ্রবাহও আছে। এঁটেল মাটিতে এই বায়ুপ্রবাহ কিছু কম এবং সছিদ্র আল্‌গা মাটিতে কিছু বেশি।

আকাশে প্রবাহিত বায়ুস্রোতে যে পরিমাণে কার্বনিক অ্যাসিড গ্যাস আছে ভূগর্ভস্থ বায়ুস্রোতে তদপেক্ষা অনেক বেশি থাকিবার কথা। কারণ, মাটির সহিত নানা প্রকার জান্তব এবং উদ্ভিজ্জ পদার্থ মিশ্রিত থাকে, সেই-সকল পদার্থজাত কার্বনের সহিত বাতাসের অক্সিজেন মিশ্রিত হইয়া কার্বনিক অ্যাসিডের উৎপত্তি হয়; ইহা ছাড়া মাটির নীচেকার অনেক পচা জিনিস হইতেও কার্বনিক অ্যাসিড গ্যাসের উদ্ভব হইয়া থাকে।

মাটির আর্দ্রতা এবং উত্তাপ অনুসারেও এই কার্বনিক অ্যাসিড গ্যাসের পরিমাণ বাড়িতে

থাকে। ম্যুনিক্ শহরে পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে আষাঢ়-শ্রাবণে ভূগর্ভস্থ বায়ুর কার্বনিক অ্যাসিডের পরিমাণ সর্বাপেক্ষা বাড়িয়া ওঠে, এবং মাঘ-ফাল্গুনে সর্বাপেক্ষা কমিয়া যায়।

সাধারণত ইহাও দেখা গিয়াছে যে, আল্‌গা ভাঙা মাটিতে কার্বনিক অ্যাসিড অল্প এবং যে শক্ত মাটিতে সহজে বায়ু প্রবেশ করিতে পারে না তাহাতে কার্বনিক অ্যাসিডের পরিমাণ অধিক। চষা জমি অপেক্ষা পতিত জমিতে কার্বনিক অ্যাসিড চতুর্গুণ অধিক। ইহার কারণ, যে মাটির মধ্যে বায়ু বদ্ধ হইয়া থাকে তাহাতে কার্বনিক অ্যাসিড অধিক সঞ্চিত হয়।

ভূগর্ভস্থ জলের ন্যায় ভূগর্ভস্থ বায়ুরও একটা স্রোত আছে তাহা পরীক্ষা দ্বারা স্থির হইয়া গেছে। এই বায়ুচলাচলের উপর আমাদের স্বাস্থ্যের হ্রাস-বৃদ্ধি অনেকটা নির্ভর করে। কারণ, দেখা গিয়াছে এই বায়ুতে বহুল পরিমাণে কার্বনিক অ্যাসিড এবং অন্যান্য দূষিত গ্যাস আছে। তাহা ছাড়া, মাটির ভিতরকার রোগ-বীজ এই বায়ুপ্রবাহ অবলম্বন করিয়া চতুর্দিকে সঞ্চারিত হইতে পারে।

নানা কারণে ভূগর্ভস্থ বায়ুর প্রবাহ রক্ষিত হইয়া থাকে। ভূতলের উপরিস্থ বায়ু-চলাচল তাহার একটা কারণ।

আরও কারণ আছে। বহুকাল অনাবৃষ্টির পরে যখন মুষলধারে বৃষ্টি পতিত হয় তখন সেই বৃষ্টিজল ভূগর্ভস্থ বায়ুকে ঠেলিয়া অনেকটা নীচের দিকে লইয়া যায় এবং সিক্তভূমি হইতে তাড়িত হইয়া শুষ্কভূমি দিয়া বায়ুপ্রবাহ উপরে উঠিতে থাকে। যে বাড়ির মেজে ভালো করিয়া বাঁধানো নহে বর্ষার সময় ভূগর্ভবায়ু সেই মেজে দিয়া বাহির হইবার সুবিধা পায়। কোনো কোনো স্থলে ডাক্তারেরা দেখিয়াছেন বহুকাল অনাবৃষ্টি-অন্তে বৃষ্টিপতনের পর সহসা নিউমোনিয়া কাশের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। তাহার একটি কারণ এইরূপ অনুমান করা যায় যে, বৃষ্টিতাড়িত ভূগর্ভবায়ু রোগ-বীজ সঙ্গে লইয়া নানা শুষ্ক স্থান দিয়া উপরে উঠিতে থাকে।

পূর্বে বলিয়াছি, পেটেন্‌কোফারের মতে, যখন ভূগর্ভস্থ জলতল উপরে উঠিতে থাকে তখন সেই জলসংযোগে কোনো কোনো রোগের বৃদ্ধি হয়। রোগ-বীজের উপর জলের ক্রিয়াই যে তাহার একমাত্র কারণ তাহা নহে। জলতল যত উপরে উঠে ভূগর্ভের বায়ুকেও সে তত ঠেলিয়া তুলিতে থাকে— এবং সেই বায়ুর সঙ্গে অনেক দূষিত বাষ্প এবং রোগ-বীজ উঠিয়া পড়ে।

ভূগর্ভে বায়ু-চলাচলের আর-একটি বৃহৎ কারণ আছে। তাহা আকাশ-বায়ু এবং ভূগর্ভ-বায়ুর উত্তাপের অসাম্য। তাহার বিস্তৃত আলোচনা আবশ্যক।

মাটি নানা প্রকৃতির আছে এবং সকল মাটি সমান সহজে উত্তপ্ত হয় না। কিন্তু জল সকল মাটি অপেক্ষাই বিলম্বে উত্তাপ গ্রহণ করে।

যে জিনিস সহজে উত্তাপ গ্রহণ করে সে জিনিস সহজে উত্তাপ ত্যাগও করে। এই কারণে, জল মাটি অপেক্ষা বিলম্বে উত্তপ্ত হয় এবং উত্তাপ ছাড়িতেও বিলম্ব করে। ভিজা স্যাঁতসেঁতে মাটি রৌদ্রোত্তাপ সহজে গ্রহণ করে না। তেমনি, সহজে ত্যাগও করে না, শুষ্ক বেলে মাটি শীঘ্রই গরম হইয়া উঠে আবার শীঘ্রই জুড়াইয়া যায়।

ভূমির উত্তাপের ফল কেবল যে ভূমিতেই পর্যবসান হয় তাহা নহে। আকাশের বায়ুতাপের প্রতিও তাহার প্রভাব আছে। সাধারণত উক্ত হয় যে, শুষ্ক বায়ু বিকিরিত উত্তাপকে সহজে পথ ছাড়িয়া দেয় এবং ভিজা বায়ু সেই উত্তাপ বহুল পরিমাণে শোষণ করিয়া লয়। সম্পূর্ণ শুষ্ক বাতাস প্রকৃতির কোথাও দেখা যায় না, এইজন্য সকল বায়ুই সূর্যোত্তাপ এবং পৃথিবী হইতে বিকিরিত উত্তাপের দ্বারা উত্তপ্ত হয়। পরীক্ষা দ্বারা যতদূর দেখা গিয়াছে তাহাতে বোধ হয় বাতাসের তাপ অব্যবহিত সূর্যতাপের অপেক্ষা ভূমির তাপের দ্বারাই অধিক পরিমাণে নিয়মিত হয়। তপ্ত ভূমির সংস্পর্শে প্রথমত বায়ুর নিম্নতন স্তর উত্তপ্ত হইয়া বিস্তার লাভ করে এবং উপরে উঠিয়া যায়, উপরের অপেক্ষাকৃত শীতল বায়ু নীচে নামিয়া ভূমির তাপ গ্রহণ করে, এমনি করিয়া সমস্ত বায়ু গরম হইয়া উঠে। সকলেই জানেন, বহু উচ্চ আকাশের বায়ু পৃথিবীর নিকটবর্তী বায়ুর অপেক্ষা

অনেক পরিমাণে শীতল।

ইহা হইতে বুঝা যাইবে মাটির তাপ এবং বাতাসের তাপ সমান নহে। এবং সাধারণত মাটির তাপই অধিক।

মাটি ভালো তাপ-পরিচালক নহে, এইজন্য মাটির উপরিতলের উত্তাপ নিম্নতলে পৌঁছিতে বিলম্ব হয়। এই কারণেই গ্রীষ্মকালে ভূতল যখন উষ্ণ হইয়া উঠে তখন নিম্নস্তর অপেক্ষাকৃত শীতল থাকে এবং শীতকালে যখন ভূতলের তাপ হ্রাস হয় তখন সেই শৈত্য নিম্নস্তরে পৌঁছিতে বিলম্ব হয়; এইজন্য শীতকালে ভূমির উপরিতলের মাটির অপেক্ষা নিম্নতলের মাটি বেশি গরম থাকে। চাণক্য-শ্লোকে আছে যে, কূপোদক শীতকালে উষ্ণ এবং গ্রীষ্মকালে শীতল হইয়া থাকে। পূর্বলিখিত নিয়মানুসারে ইহার কারণ নির্ণয় কঠিন নহে।

গ্রীষ্মকালে ভূতল ভূগর্ভ হইতে অধিকতর উত্তপ্ত হওয়াতে ভূমির উপরিস্তরবর্তী বায়ু নিম্নস্তরের অভিমুখে প্রবেশ করিতে থাকে এবং শীতকালে তাহার বিপরীত ঘটিয়া থাকে। ঘর যদি অগ্নির উত্তাপে অত্যন্ত গরম করা যায় এবং মেজে যদি উপযুক্তরূপ বাঁধানো না থাকে তবে স্থানীয় ভূগর্ভস্থ গ্যাস সেই গৃহে ভাসমান হইয়া উঠিতে থাকে ইহার অনেক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

অল্পকাল হইল ডবলিন শহরের রাস্তা পাথরে বাঁধানো হইয়াছে। তাহার পর হইতে সেখানে টাইফয়েড জ্বরের প্রাদুর্ভাব অনেক বাড়িয়াছে। তাহার কারণ, ভূগর্ভবায়ু এখন রাজপথে বাহির হইতে পায় না, কাঁচা মেজের ভিতর দিয়া বাহির হইতে থাকে। এইরূপে গৃহমধ্যে দূষিত বাষ্পের সঞ্চার হয়।

এমনও দেখা গিয়াছে খুব শীতের সময় যখন পথঘাটে বরফ জমিয়া যায়, তখন রাজপথের নিম্নবর্তী গ্যাস-পাইপের পলাতক গ্যাস রাস্তা দিয়া বাহির হইবার স্থান না পাইয়া ঘরের ভিতরে বাহির হইতে থাকে এবং এইরূপে বিষাক্ত বায়ু গ্রহণে অনেকে সংকটাপন্ন অবস্থায় পতিত হইয়াছে।

যাহা হউক, এই প্রবন্ধ হইতে পাঠকেরা বুঝিতে পারিবেন ভূগর্ভস্থ জল এবং বায়ুর উপর আমাদের স্বাস্থ্য বহুল পরিমাণে নির্ভর করে। যাহাতে জলাশয়ের নিকটবর্তী কোনো স্থানে দূষিত পদার্থ না জমিতে পারে সেজন্য সতর্ক হওয়া উচিত। এবং ঘরের মেজে ও বাড়ির চারি দিকে কিছুদূর পর্যন্ত ভালো করিয়া বাঁধাইয়া দিয়া ভূগর্ভস্থ দূষিত বাষ্পমিশ্রিত বায়ুর পথ রোধ করা বিশেষ আবশ্যক।

সাধনা
আশ্বিন-কার্তিক ১৩০১

বিবিধ

সান্ত্বনা

আমার সময়ে সময়ে কেমন মন খারাপ হইয়া যায়, হয় হউক গে তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু অমনি লোকে সান্ত্বনা দিতে আইসে কেন? অমনি দশ জনে ঝুঁকিয়া পড়িয়া কী হইয়াছে, কেন হইয়াছে, করিয়া এমন বিরক্ত করিয়া তুলে যে, হাজার কষ্ট হইলেও 'কিছুই হয় নাই কিছুই হয় নাই' করিয়া মুখে হাসি টানিয়া আনিতে হয়, সে হাসির চেয়ে আর কষ্টকর কিছু আছে? এ হাসি হাসার অপেক্ষা যদি সমস্ত দিনরাত্রি মুখ গম্ভীর করিয়া ভাবিতে পারিতাম তবে বাঁচিয়া যাইতাম। তাহারা কি এ-সকল বুঝে না? হয়তো বুঝে, কিন্তু মনে করে, পাছে আমি মনে করি যে, আমি এমন মুখ বিষণ্ণ করিয়া বসিয়া আছি, তথাপি আমাকে একটি কথাও জিজ্ঞাসা করিল না, কাজেই তাহাদের কর্তব্য কাজ করিতে আসে। যেমন চিঠিতে মান্যবর, পরম পূজনীয়, প্রাণাধিক প্রভৃতি সম্বোধন পড়িবার সময় আমরা চোখ বুলাইয়া যাই মাত্র, তখন মনে একতিলও বিশ্বাস হয় না যে, যিনি আমাকে লিখিতেছেন তিনি আমাকে সর্বাপেক্ষা মান্য করেন বা আমাকে পরম পূজা করিয়া থাকেন, বা আমি তাঁহার প্রাণেরও অধিক, অতীত কালের শিরোনামা-স্রষ্টারা উহা আমাদের বরাদ্দ দিয়াছেন মাত্র, তেমনি উহারা আমাকে যখন জিজ্ঞাসা করিতে আসে, তখন বেশ বুঝিতে পারি যে, আমাকে মমতা করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছে না, জিজ্ঞাসা করিতে হয় বলিয়া করিতেছে, তাহাতে আমার যে কী সান্ত্বনা হয়, তাহা আমিই জানি। অধিকাংশ লোক সান্ত্বনা করিবার পদ্ধতি জানে না, তাহারা যে দুঃখে সান্ত্বনা দিতে আসে, সে দুঃখ তাহাদের সান্ত্বনা বাক্য অপেক্ষা অধিকতর মিষ্ট বোধ হয়। সান্ত্বনা দিতে হইলে প্রায়ই লোকে কহিয়া থাকে, তোমার কিসের দুঃখ? আরও তো কত লোক তোমার মতো কষ্ট পাইতেছে। এমন কষ্টকর সান্ত্বনা আর নাই, প্রথমত, যে এ কথা বলিয়া সান্ত্বনা দিতে আইসে, স্পষ্টই বোধ হয় আমার দুঃখে তাহার কিছু মাত্র মমতা হয় নাই; কারণ সে আমার দুঃখকে এত তুচ্ছ বলিয়া জানে যে, এত ক্ষুদ্র দুঃখে তাহার মমতাই জন্মিতে পারে না, দ্বিতীয়ত, মনে হয় যে, আমার মনের দুঃখ সে বুঝিলই না, যে সকলের সঙ্গে আমার দুঃখের তুলনা করিয়া বেড়ায়, সে আমার দুঃখের মর্যাদাই বুঝে নাই, আমার যেটুকু দুঃখ হইয়াছে তাহাতেই তোমার মমতা জন্মায় তো জন্মাউক, নহিলে আর কেহ এরূপ দুঃখ পায় কি না, আর কাহাকেও এত কষ্ট পাইতে হয় কি না, এত শত ভাবিয়া চিন্তিয়া আমার দুঃখের গুরুলঘুত্ব ওজন করিয়া তবে তুমি আমার সহিত একটুখানি মমতা করিতে আসিবে, আমার সে মমতায় কাজ নাই। যদিও মমতা উদয় হইবার অব্যবহিত পূর্বেই ওই-সকল ভাবনা হয়তো অলক্ষিতভাবে হৃদয়ে কার্য করে; কিন্তু তাই বলিয়া মুখে ওই-সকল কথা বলিয়া সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করিলে তাহা কষ্টকর হইয়া পড়ে, আর কাহারো হয় কি না জানি না কিন্তু আমার হয়। আমি কাহাকেও সান্ত্বনা করিতে গেলে অমনি করি না, আমি হয়তো বলি যে, আহা, বাস্তবিক তোমার বড়ো কষ্টের অবস্থা, সে মনে করে যে, আহা, তবু আমার কষ্ট একজন বুঝিতে পারিল, সে তাহাতে হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচে ও তখন আমার কাছে কত কথাই বলিতে থাকে, এইরূপে তাহার হৃদয়ের ভার অনেকটা লঘু হইয়া যায়। এমন করিয়া সান্ত্বনা দেওয়া আবশ্যক যে, শোকগ্রস্ত ব্যক্তি না বুঝিতে পারে যে তাহাকে সান্ত্বনা দিতে আসা হইয়াছে। আমি যদি বুঝিতে পারি আমাকে কেহ সান্ত্বনা দিতে আসিয়াছে, অমনি মনে হয়, ও ব্যক্তি আমার কষ্টে কষ্ট অনুভব করে নাই, ও ব্যক্তি মনে করে যে, আমার এ কষ্টে কষ্ট পাওয়া উচিত নহে, নহিলে সে আমার এ কষ্ট থামাইতে চেষ্টা করিবে কেন? যে ব্যক্তি মনে করে যে, যে কষ্টে আমি শোক করিতেছি সে কষ্ট শোকের উপযুক্ত নহে, সে ব্যক্তি আমার কষ্টে তেমন মমতা অনুভব করিতেছে না তাহা অনেকটা নিশ্চয়। সে হয়তো মনে করিতেছে যে এ কী ছেলেমানুষ! আমি হইলে তো এরূপ করিতাম না। মনে না করুক আমাকে সেইরূপ বিশ্বাস করাইতে চায়। অতটা আত্মাবমাননা

স্বীকার করিয়া আমি মমতা প্রর্থনা করি না। একজন যে গম্ভীরভাবে বসিয়া বসিয়া আমার অশ্রুজলের সমালোচনা করিতেছে ইহা জানিতে পারা অতিশয় কষ্টকর। কী। আমি যে কষ্টে কষ্ট পাইতেছি, তাহা কষ্ট পাইবার যোগ্যই নহে; আমার কষ্ট এতই সামান্য, আমি এতই দুর্বল যে অত সামান্য কষ্টেই কষ্ট পাই? এ কথা মনে করিয়া কেহ কেহ হয়তো সান্ত্বনা পাইতেও পারে, আপনার প্রতি ধিক্কার দিতেও পারে ও ক্রমে দুঃখ ভুলিতেও পারে। কিন্তু আমার মতো লোকও তো ঢের আছে, আমার সে সান্ত্বনাকারীর প্রতি রাগ হয়, মনে হয় কী, আমাকে এত ক্ষুদ্র ঠাহরাইতেছে? তুমি যদি আমার শোকের কারণ দেখিয়া কষ্ট পাইয়া থাক তো আইস, তোমাকে আমার মনের কথা বলি, তাহা হইলে আমার কষ্টের অনেকটা লাঘব হইবে, নহিলে তোমার যদি মনে হইয়া থাকে, দুর্বল হৃদয়, অল্পেতেই কষ্ট পাইতেছে, উহাকে একটু থামাইয়া থুমাইয়া দিই, তবে তোমায় কাজ নাই, তোমার সান্ত্বনা দিতে হইবে না। আসল কথাটা এই যে, সান্ত্বনা অনেক সময় বড়ো বিরক্তিজনক, অনেক সময় মনে হয় যে, আমার নিজের দুঃখের ভাবনা ভাবিবার যেটুকু সময় পাইয়াছি, একজন আসিয়া তাহা মিছামিছি নষ্ট করিয়া দিতেছে মাত্র; দুঃখ ভাবনা ভাবিবার সময় নষ্ট হইলে যে কষ্ট হয় না তাহা নহে, দুঃখের ভাবনা ভাবিবার সময় লোকে গোলমাল করিতে আসিলে বড়ো কষ্ট হয়, এইজন্যই বিজনে দুঃখের ভাবনা ভাবিতে ভালো লাগে। শোকার্ত ব্যক্তির পক্ষে তাহার দুঃখের কারণ কষ্টের হউক কিন্তু দুঃখের ভাবনা অনেকটা সুখের, যদি তুমি তাহার দুঃখের কারণ বিনাশ করিতে পার তো ভালো, নতুবা তাহার ভাবনার সময় অলীক সান্ত্বনা দিতে গিয়া তাহার ভাবনায় ব্যাঘাত দিয়ো না।

ভারতী
চৈত্র ১২৮৪

নিঃস্বার্থ প্রেম

দেখো ভাই, সেদিন আমার বাস্তবিক কষ্ট হয়েছিল। অনেকদিন পরে তুমি বিদেশ থেকে এলে; আমরা গিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম। 'আমাদের কি মনে পড়ত?' তুমি ঠোঁটে একটু হাসি, চোখে একটু ভ্রূকুটি করে বললে, 'মনে পড়বে না কেন? উত্তরটা শুনেই তো আমার মাথায় একেবারে বজ্রাঘাত হল; নিতান্ত দুঃসাহসে ভর করে সংকুচিত স্বরে আর-একবার জিজ্ঞাসা করলুম, 'অনেক দিন পরে এসে আমাদের কেমন লাগছে?' তুমি আশ্চর্য ও বিরক্তিময় স্বরে অথচ ভদ্রতার মিষ্টহাসিটুকু রেখে বললে, 'কেন, খারাপ লাগবার কী কারণ আছে?' আর সাহস হল না। ও-রকম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা আর হল না। বিদেশে গিয়ে অবধি তুমি আমাকে দু-তিনখানা বৈ চিঠি লেখ নি, সেজন্য আমার মনে মনে একটুখানি অভিমান ছিল। বড়ো সাধ ছিল, সেই কথাটা নিয়ে হেসে হেসে অথচ আন্তরিক কষ্টের সঙ্গে, ঠাট্টা করে অথচ গম্ভীরভাবে একটুখানি খোঁটা দেব', কিন্তু তোমার ভাব দেখে, তোমার ভদ্রতার অতিমিষ্ট হাসি দেখে তোমার কথার স্বর শুনে আমার অভিমানের মূল পর্যন্ত শুকিয়ে গেল। তখন আমিও প্রশ্নের ভাব পরিবর্তন করলুম। জিজ্ঞাসা করলুম, 'যে দেশে গিয়েছিলে সে দেশের জল-বাতাস নাকি বড়ো গরম? সে দেশের লোকেরা নাকি মস্ত মস্ত পাগড়ি পরে, আর তামাক খাওয়াকে ভারি পাপ মনে করে? এখান থেকে সেকেন্ড ক্লাসে সেখেনে যেতে কত ভাড়া লাগে?' এইরকম করে তোমার কাছ থেকে সেদিন অনেক জ্ঞান লাভ করে বাড়ি ফিরে এয়েছিলুম! তোমার আচরণ দেখে দুঃখ প্রকাশ করেছিলুম শুনে তুমি লিখেছ যে, 'প্রথমত আমার যতদূর মনে পড়ে তাতে আমি যে তোমার ওপর কোনো প্রকার কুব্যবহার করেছিলুম, তা তো মনে হয় না। দ্বিতীয়ত, যদি-বা তোমার কতকগুলি প্রশ্নের ভালোরকম উত্তর না দিয়ে দু-চার কথা বলে উড়িয়ে দিয়ে থাকি, তাতেই বা আমার দোষ কী?

সে রকম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবারই বা তোমার কি আবশ্যক ছিল?' তোমার প্রথম কথার কোনো উত্তর দেওয়া যায় না। সত্যই তো, তুমি আমার সঙ্গে কোনো কু-ব্যবহারই কর নি। যতগুলি কথা জিজ্ঞাসা করেছিলুম, সকলগুলিরই তুমি একটা-না-একটা উত্তর দিয়েছিলে, তা ছাড়া হেসেও ছিলে, গল্পও করেছিলে। তোমার কোনোরকম দোষ দেওয়া যায় না। কিন্তু তবু তুমি আমার সঙ্গে ভালো ব্যবহার কর নি; সে তোমাকে বা আর কাউকে আমি বোঝাতে পারব না সুতরাং তার আর বাহুল্য উল্লেখ করব না। দ্বিতীয় কথাটি হচ্ছে, কেন তোমাকে ও-রকম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলুম। আচ্ছা ভাই তোমার তো হৃদয় আছে, একবার তুমিই বিবেচনা করে দেখো-না— কেন জিজ্ঞাসা করেছিলুম। তোমার ভালোবাসার উপর সন্দেহ হয়েছিল বলেই কি তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম, যে, 'আমাদের কি মনে পড়ত' কিংবা 'আমাদের কি ভালো লাগছে', না তোমার ভালোবাসার ওপর সন্দেহ তিলমাত্র ছিল না বলেই জিজ্ঞাসা করেছিলুম? যদি স্বপ্নেও জানতুম যে, আমাকে তোমার মনে পড়ত না, কিংবা আমাকে তোমার ভালো লাগছে না, তা হলে কী ও-রকমের কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করতুম। তোমার মুখে শোনবার ভারি ইচ্ছা ছিল যে, বিদেশে আমাকে তোমার প্রায়ই মনে পড়ত। কেবলমাত্র ওই কথাটুকু নয়, ওই কথা থেকে তোমার আরও কত কথা মনে আসত। আমার বড়ো ইচ্ছা ছিল যে, তুমি বলবে— 'অমুক জায়গায় আমি একটি সুন্দর উপত্যকা দেখলুম; সেখেনে একটি নির্ঝর বয়ে যাচ্ছিল, জায়গাটা দেখেই মনে হল, আহা ভা— যদি এখানে থাকত তা হলে তার বড়ো ভালো লাগত!' একটা ছোটো প্রশ্ন থেকে এইরকম কত উত্তরই শুনতে পাবার সম্ভাবনা ছিল। যখন প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করেছিলুম তখন মনের ভিতর এইরকম অনেক কথা চাপা ছিল!

আমি তোমার কাছে দুঃখ করবার জন্যে এ চিঠিটা লিখছি নে; কিংবা তোমার কাছে অভিমান করাও আমার উদ্দেশ্য নয়! আমি ভাই, কোনো কোনো লোকের মতো ঢাক ঢোল বাজিয়ে অভিমান করতে পারি নে; যার প্রতি অভিমান করেছি, তার কাছে গিয়ে 'ওগো আমি অভিমান করেছি গো, আমি অভিমান করেছি' বলে হাঁকাহাঁকি করতেও ভালোবাসি নে। যদি আমি অভিমান করি তো সে মনে মনে। আমার অভিমানের অশ্রু কেউ কখনো দেখতে পায় না, আমার অভিমানের কথাও কেউ কখনো শোনে নি; অভিমান আমার কাছে এমনই গোপনের সামগ্রী। তাই বলছি তোমার কাছে আজ আমি অভিমান করতে বসি নি। তোমার সঙ্গে আমার কতকগুলি তর্ক আছে, তার মীমাংসা করতে আমার ভারি ইচ্ছে।

তোমার সমস্ত চিঠিটার ভাব দেখে আমার এই মনে হল যে তোমার মতে যারা নিঃস্বার্থ ভালোবাসে তারা আর ভালোবাসা ফেরত পাবার আশা করে না। যেখানে ভালোবাসার বদলে ভালোবাসা পাবার আশা আছে সেইখানেই স্বার্থপরতা আছে। এ সম্বন্ধে তোমাকে একটি কথা বলি শোনো। আমরা অনেক সময়ে ভালো করে অর্থ না বুঝে অনেক কথা ব্যবহার করে থাকি! মুখে মুখে কথাগুলো এমন চলিত, এমন পুরোনো, হয়ে যায় যে, সেগুলো আমরা কানে শুনি বটে কিন্তু মনে বুঝি নে, নিঃস্বার্থ ভালোবাসা কথাটাও বোধ করি সেইরকম একটা কিছু হবে। যখন আমরা শুনে যাই তখন আমরা কিছুই বুঝি নে, একটু পীড়াপীড়ি করে বোঝাতে বললে হয়তো দশজনে দশ রকম ব্যাখ্যা করি। স্বার্থপরতা কথা সচরাচর আমরা কী অর্থে ব্যবহার করে থাকি? আহার করা বা স্নান করাকে কি স্বার্থপরতা অতএব নিন্দনীয় বলে? আহার না করা বা স্নান না করাকে কি নিঃস্বার্থপরতা অতএব প্রশংসনীয় বলে? মূল অর্থ ধরতে গেলে আহার বা স্নান করাকে স্বার্থপরতা বলা যায় বৈকি? কিন্তু চলিত অর্থে তাকে স্বার্থপরতা বলে না। সকল মানুষই মনে মনে এমন সামঞ্জস্যবাদী, যে, যখন বলা হল যে, 'আহার করা ভালো' তখন কেউ এমন বোঝেন না, বিরাম বিশ্রাম না দিয়ে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ছাব্বিশ ঘণ্টাই আহার করা ভালো। তেমনি যখন আমরা স্বার্থপরতা কথা ব্যবহার করি, তখন কেউ মনে করে না যে, নিশ্বাস গ্রহণ করা স্বার্থপরতা বা বাতাস খাওয়া স্বার্থপরতা। যা-কিছু পঙ্কজ তাকে যেমন পঙ্কজ বলে না, যা

কিছু অ-চল তাকে যেমন অচল বলে না, তেমনি যা-কিছু স্বার্থপরতা তাকেই স্বার্থপরতা বলে না। খাওয়াদাওয়াকে স্বার্থপরতা বলে না, কিন্তু যে ব্যক্তি কেবলমাত্র খাওয়াদাওয়া করে আর কিছু করে না, কিংবা যার খাওয়াদাওয়াই বেশি, পরের জন্য কোনো কাজ অতি যৎসামান্য, তাকে স্বার্থপর বলা যায়। আবার তার চেয়ে স্বার্থপর হচ্ছে যারা পরের মুখের গ্রাস কেড়ে নিজে খায়। এ ছাড়া আর কোনো অর্থে, কোনো ভাবে স্বার্থপর কথা ব্যবহার করা হয় না। তা যদি হয় তা হলে নিঃস্বার্থ ভালোবাসা বলতে কী বুঝায়? যদি মূল অর্থ ধর তাহলে ভালোবাসাই স্বার্থপরতা। যখন এক জনকে দেখতে ভালো লাগে, তার কথা শুনতে ভালো লাগে, তার কাছে থাকতে ভালো লাগে ও সেইসঙ্গে সঙ্গে তাকে না দেখলে, তার কথা না শুনলে ও তার কাছে না থাকলে কষ্ট হয়, তার সুখ হলে আমি সুখী হই, তার দুঃখ হলে আমি দুঃখী হই, তখন অতগুলো ভাবের সম্মিলনকেই ভালোবাসা বলে। ভালোবাসার আর-একটা উপাদান হচ্ছে, সে আমাকে ভালো বাসুক, অর্থাৎ তার চোখে আমি সর্বাংশে প্রীতিজনক হই এই বাসনা। ভেবে দেখতে গেলে এর মধ্যে সকলগুলিই স্বার্থপরতা। এতগুলি স্বার্থপরতার সমষ্টি থেকে একটি স্বার্থপরতা বাদ দিলেই কি বাকিটুকু নিঃস্বার্থ হয়ে দাঁড়ায়? কিন্তু যেটিকে বাদ দেওয়া হল সেটি অন্যান্যগুলির চেয়ে কী এমন বেশি অপরাধ করেছে? তা ছাড়া এর মধ্যে কোনোটাকেই বাদ দেওয়া যায় না। এর একটি যখন নেই তখন বোঝা গেল যে, যথার্থ ভালোবাসাই নেই। যাকে তোমার দেখতে ভালো লাগে না, যার কথা শুনতে ইচ্ছে করে না, যার কাছে থাকতে মন যায় না তাকে যদি ভালোবাসা সম্ভব হয় তা হলেই যার ভালোবাসা পেতে ইচ্ছে করে না তাকে ভালোবাসাও সম্ভব হয়। যাকে দেখতে শুনতে ও যার কাছে থাকতে ভালো লাগে, কোনো কোনো ব্যক্তি দুদিন তাকে দেখতে শুনতে না পেলে ও তার কাছে না থাকলে তাকে ভুলে যায় ও তার ওপর থেকে তার ভালোবাসা চলে যায়, তেমনি আবার যার ভালোবাসা পেতে ইচ্ছে করে তার ভালোবাসা না পেলেই কোনো কোনো ব্যক্তির ভালোবাসা তার কাছ থেকে দূর হয়; তাদের সম্বন্ধে এই বলা যায় যে, তাদের গভীররূপে ভালোবাসবার ক্ষমতা নেই। এটা নিশ্চয় বলা যায় যে, ভালোবাসার যতগুলি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের উল্লেখ করলুম, ভালোবাসা যেখানে থাকে তারাও সেইখানে থাকবেই থাকবে। তাদের মধ্যে একটাকে বাদ দিয়ে বাকিটুকুকে নিঃস্বার্থ ভালোবাসা বলাও যা আর ঘড়ির কল বা তার কাঁটা বা তার সময় চিহ্ন বাদ দিয়ে তাকে খাঁটি ঘড়ি বলাও তা। এখন এক-এক সময় হয় বটে, যখন ভালোবাসার প্রতিদান পাবার কথা মনেই আসে না— যেমন দ্বারশূন্য বাতায়নশূন্য আলোকশূন্য জনশূন্য কারাগারে রুদ্ধ ব্যক্তির মুক্তির কথা কল্পনাতেই আসে না। কিন্তু সেই কারারুদ্ধ ব্যক্তির মুক্তির কথা মনে আসে না বলে বলা যায় না যে স্বাধীনতার ইচ্ছা মানুষের স্বভাব-সিদ্ধ নহে। তেমনি যখন আমার ভালোবাসার পাত্র আকাশের জ্যোতির্ময় জলদ-সিংহাসনে, আর আমি পৃথিবীর মৃত্তিকায় একটি সামান্য কীট ধুলায় অন্ধ হয়ে বিচরণ করছি— যখন তার পদ-জ্যোতির একটুমাত্র আভাস দেখা, যখন সংগীত নয় কথা নয়, কেবল অতি দূর থেকে তাঁর কণ্ঠের অস্ফুট স্বরটুকু মাত্র শোনা আমার অদৃষ্টে আছে, যখন তাঁর নিশ্বাস বহন ক'রে তাঁর গাত্র স্পর্শ ক'রে তাঁর কুন্তল উড়িয়ে বাতাস আমার গায়ে অমৃত সিঞ্চন করে, ও সেইটুকু সুখেই আমার চোখ ঢুলে পড়ে, আমার গা শিউরে উঠে, তার চেয়ে আমার আর কোনো আশা নেই, তখন যদি আমার ভালোবাসার প্রতিদান পাবার কথা মনে না আসে তো তা থেকে বলা যায় না যে, ভালোবাসার প্রতিদান পাবার আশা স্বভাবতই ভালোবাসার সঙ্গে সঙ্গে যে থাকবে এমন নয়, সেইরকম অবস্থায় ভালোবাসার প্রতিদান পাবার আশা মনে স্পষ্ট না আসুক, তবু কি সে ব্যক্তির মনে তৃপ্তি থাকে? সর্বদাই কি তার মনটা হাহাকার করতে থাকে না? তার মনের মধ্যে কি এমন একটা নিদারুণ অভাব ঘোরতর শূন্যতা থাকে না, যে-শূন্য সমস্ত জগৎ গ্রাস করেও পূর্ণ হতে পারে না? তার হৃদয়ের সে মরুভাব কেন? সে কি তার প্রতিদানের মর্মভেদী আশাকে নিরাশার সর্বব্যাপী বালুকার তলে নিহিত করে ফেলা হয়েছে বলেই না? এমন কোনো

অমানুষিক মানুষকে কি কেউ দেখেছে, যে ভালোবাসার প্রতিদান না পেয়েও, প্রতিদানের আশা বা কল্পনা না করেও মহাযোগীর মতো মনের আনন্দে আছে। প্রতিদানের আশা ত্যাগ করেও অনেকে ভালোবাসে বটে, কিন্তু ভালোবেসে কি সুখী হয়? আচ্ছা তর্কের অনুরোধে মনেই করা যাক যে, ভালোবাসার প্রতিদান পাবার আশা যে ভালোবাসার সঙ্গে সঙ্গে থাকবেই তা নয়, কিন্তু তাই বলে কি প্রতিদান পাবার একটা ইচ্ছামাত্রই স্বার্থপরতা? যোগাভ্যাস-ক্রমে কোনো যোগী ক্ষুধাতৃষ্ণা একেবারে দূর করে নিষ্কাম হয়ে থাকতে পারেন, কিন্তু ক্ষুধাতৃষ্ণা কি স্বার্থপরতা? আমার শরীরের ধর্মই এই যে, অবস্থা বিশেষে আমার ক্ষুধাতৃষ্ণার উদ্রেক হয়, সে উদ্রেকটুকু অবশ্য স্বার্থপরতা নয়; কিন্তু আমার সেই ক্ষুধানিবৃত্তির জন্যে আর-একজন ক্ষুধিত ব্যক্তিকে যদি তার আহার থেকে বঞ্চিত করি, তা হলে আমার স্বার্থপরতা হয় বটে! আমার মনের ধর্ম এই যে, ভালোবাসার প্রতিদান পেতে ইচ্ছে করে কিন্তু সেই ইচ্ছাটুকুই স্বার্থপরতা নয়; তবে যদি সেই ইচ্ছায় অন্ধ হয়ে এমন অন্যায় উপায়ে আমার ভালোবাসার পাত্রের কাছে প্রতিদান পাবার চেষ্টা করি যে, সে তাতে কষ্ট পায় বা বিপদে পড়ে তা হলেই সেটা স্বার্থপরতা হয়ে দাঁড়ায়।

তোমার চিঠি পড়ে একটা কারণে বড়ো হাসি পেল। ভাবে বোধ হয় যে, তোমার মতে যারা নিঃস্বার্থ ভালোবাসে তারা ভালোবাসার পাত্রের কাছে যে আদর না পেয়েও কেবল সুখী থাকবে তা নয়, অনাদর পেয়েও তারা কষ্ট পাবে না। যেরকম অবস্থা হোক না তারা কেবল নিজে ভালোবেসেই সুখী থাকবে। ভালোবাসার লোকের মিষ্টি হাসিমুখখানি দেখলে যদি নিঃস্বার্থ প্রেমিকের আনন্দ হয় তবে তার কাছে আদর পেলেই বা কেন না হবে। তার মুখখানি না দেখলে যদি কষ্ট হয় তবে আদর গেলেই বা কষ্ট না হবে কেন?

আমি কাকে স্বার্থপর ভালোবাসা বলি জান? যে ভালোবাসা খাঁটি ভালোবাসা নয়। ভালোবাসার গিল্টি করা ইন্দ্রিয়-বিকার। সে ভালোবাসায় ভালোবাসার চাকচিক্য আছে, ভালোবাসার সুবর্ণ বর্ণ আছে, কেবল ভালোবাসা নেই। সেরকম ভালোবেসে যে তোমার ভালোবাসার পাত্রকে তোমার চক্ষে অত্যন্ত নীচ করে ফেলছ তাতে তোমার বুকে লাগে না। তোমার চক্ষে যে সে রক্তমাংসের সমষ্টি একটা উপভোগ্য সামগ্রী বৈ আর কিছুই দাঁড়াচ্ছে না, তাতে তোমার কিছুমাত্র আত্মগ্লানি উপস্থিত হয় না! যখন তার প্রতিমাকে তোমার হৃদয়ের মধ্যে আনো, তখন তোমার হৃদয়ের মধ্যে এমন এক তিল নির্মল স্থান রাখ নি যেখানে তাকে বসাতে পারো! তোমার বীভৎস দুর্গন্ধময় হৃদয়ে সে প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করে, দিনরাত তার পদে কুৎসিত লালসা ও কলুষিত কল্পনা উপহার দিচ্ছ, তেমন বীভৎস প্রতিমাপূজাকে যদি ভালোবাসা নিতান্ত বলতে হয় তা হলে একেই আমি স্বার্থপর ভালোবাসা বলি। আমার মত এই যে, দৈত্যদের যেমন দৈত্যই বলে, কুদেবতা বা কোনো রকম বিশেষত্ব-বিশিষ্ট দেবতা বলে না তেমনি উপরি-উক্ত ব্যবহারকে স্বার্থপর ভালোবাসা না বলে তার যা যথার্থ নাম তাকে সেই নামেই ডাকা উচিত, তার জাল-নাম ভালোবাসা তার যথার্থ নাম ইন্দ্রিয়পরতা। ভালোবাসার চক্ষে যাকে দেখা যায়, কল্পনা তাকে স্বর্গের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠা করে, তার চার দিকে স্বর্গের কিরণ দীপ্তি পেতে থাকে— আর ইন্দ্রিয়পরতার চক্ষে যাকে দেখ, সে যদি স্বর্গীয় হয় তবু তোমার কল্পনা তাকে সে স্বর্গের আসন থেকে নামিয়ে, পৃথিবীর আবর্জনা-মধ্যে স্থাপন করে, এর চেয়েও কি স্বার্থপরতা আর আছে?

ভারতী
কার্তিক ১২৮৭

যথার্থ দোসর

হে তারকা, ছুটিতেছে আলোকের পাখা ধরে,
তোমারে শুধাই আমি, বলো গো বলো গো মোরে,
তুমি তারা রজনীর কোন্ গুহা মাঝে যাবে?
আলোকের ডানাগুলি মুদিয়া রাখিতে পাবে?
ম্লান মুখ হে শশাঙ্ক, ভ্রমিছ সমস্ত রাত্রি,
আশ্রয় আলয়-হীন আকাশ-পথের যাত্রী,
দিবসের, নিশীথের কোন্ ছায়াময় দেশে
বিশ্রাম লভিতে তুমি পাইবে গো অবশেষে?

পরিশ্রান্ত সমীরণ, বলো গো খুঁজিছ কারে?
আতিথ্য না পেয়ে ভ্রম' জগতের দ্বারে দ্বারে,
গোপন আলয় তব আছে কি মলয় বায়,
তরঙ্গ-শয়নে কিংবা নিভৃত নিকুঞ্জ-ছায়?

—Shelley

আধুনিক ইংরাজি কবিতার মধ্যে আশ্রয়-প্রয়াসী হৃদয়ের বিলাপ-সংগীত প্রায় শুনা যায়। আধুনিক ইংরাজ কবিরা অসন্তোষ ও অতৃপ্তির রাগিণীতেই অধিকাংশ গান গাহিয়া থাকেন। যাহা ছিল ও হারাইয়া গিয়াছে তাহার জন্য যে কেহ বিলাপ করিবেন তাহাতে আশ্চর্য নাই, কিন্তু যাহা ছিল না, যাহা পাইতেছি না, অথচ যাহা জানি না, তাহার জন্যই সম্প্রতি একটা বিলাপ-ধ্বনি উঠিয়াছে। কিছুতেই একটা আশ্রয় মিলিতেছে না, এই একটা ভাব; যেন একটা আশ্রয় আছে, আমি জানি, তাহার ঠিক রাস্তাটা খুঁজিয়া পাইতেছি না বলিয়া মিলিতেছে না, দিক্‌ভ্রম ঘুচিলেই মিলিবে, এইরূপ একটা বিশ্বাস। মনে হইতেছে জানি, অথচ জানি না, কী চাহি তাহা যেন ভাবিলেই মনে আসিবে, অথচ মনে আসে না। এক-এক সময়ে একজনকে ডাকিয়া, যেমন কী জন্য ডাকিলাম ভুলিয়া যাই, তখন যেমন অধীরতা উপস্থিত হয়, ইহাও সেইরূপ অধীর ভাব। এখনকার কবিরা দেখিতেছেন, প্রেমে তৃপ্তি নাই, সে অতৃপ্তি নিরাশার অতৃপ্তি নহে, অভাবের অতৃপ্তি। তাঁহারা কাহাকে ভালোবাসিবেন খুঁজিয়া পান না, অথচ হৃদয়ে ভালোবাসার অভাব নাই। প্রেমের অগ্নি, আলেয়ার আলোকও বিদ্যুতের শিখার ন্যায় আপনি জ্বলিতেছে। অথচ তাহার ইন্ধন নাই। ভালোবাসিবার জন্য তাঁহাদিগকে কাল্পনিক প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিতে হয়। এমনতর প্রেম পূর্বকার কবিদিগের ছিল না, এমনতর প্রেম সাধারণ লোকেরা বুঝে না। পূর্বকার কবিদিগের প্রেম ব্যক্তিগত ছিল, হাত, পা, নাক, মুখ, চোখ অবলম্বন না করিয়া যে ভালোবাসা থাকিতে পারে, ইহা তাঁহাদের কল্পনার অতীত ছিল। তাঁহারা ব্যক্তিবিশেষকে লইয়া মাতিয়া উঠিতেন, এইজন্য তাহাদের প্রেমের ধর্মে পৌত্তলিকতার উন্মত্ততা ছিল। তাহারা মিলনে একেবারে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেন, বিরহে একেবারে মুমূর্ষ হইয়া পড়িতেন। অতৃপ্তির নীচু সুরের নিশ্বাস তাঁহারা ফেলিতেন না, আর্তনাদের উঁচু সুরে তাঁহারা বিরহের গান গাহিতেন। সভ্যতা বৃদ্ধি সহকারে হৃদয়ের বৃত্তিসকল যে ক্রমশ মার্জিত ও সূক্ষ্ম হইয়া আসিয়াছে ইহাই তাহার একটি প্রমাণ। এমন এক সময় ছিল যখন প্রেম ইন্দ্রিয়গত ছিল, যখন বড়ো বড়ো চোখের কটাক্ষে কবিদিগের হৃদয়ে ভূমিকম্প উপস্থিত হইত, তিলফুল নাসা কুঞ্চিত দেখিলে তাঁহারা জগৎ অন্ধকার দেখিতেন। ফণিনী-গঞ্জিত বেণী তাঁহাদের হৃদয়কে সাতপাকে বাঁধিয়া রাখিত। তখন বিরহিণী গান করিত, 'আসার আশা রবে, কিন্তু নবযৌবন রবে না!' ক্রমে প্রেমের

অতীন্দ্রিয় ভাব কবিদিগের হৃদয়ে পরিস্ফুট হইতে লাগিল। তাঁহারা এমন ভালোবাসা অনুভব করিতে লাগিলেন, যাহাতে মুখ চক্ষু নাসিকার কোনো হাত নাই। তাঁহারা যাহাকে ভালোবাসিতেন, তাহার শরীরকেই ভালোবাসিতেন না, কিন্তু কিছুতেই ঠাহর করিতে পারিতেন না, কেনই বা তাহাকে ভালোবাসেন। কিন্তু ক্রমে ক্রমে এখন এমন হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, কবিরা ভালোবাসিতেছেন, অথচ ভালোবাসিবার লোক নাই। এক ব্যক্তির সহিত মিলনের জন্য অত্যন্ত ঔৎসুক্য, অথচ তাহার সঙ্গে কোনো জন্মে দেখা-সাক্ষাৎ আলাপ-পরিচয়, জানাশুনা পর্যন্ত হয় নি। মন যেন কে-একজনকে ভালোবাসিতেছে, অথচ নিজে তাহার সম্বন্ধে কিছুমাত্র জানে না। পূর্বে নাক-চোখ-মুখের উপর ভালোবাসার পরগাছা ঝুলিত; অথবা ব্যক্তিবিশেষের উপর ভালোবাসার উদ্ভিদ গজাইত, যদিও তাহার বীজ পাখিতেই আনিয়া দিত, বা বাতাসেই বহন করিয়া আনিত, বা কী করিয়া আসিত কেহ ঠিকানা করিতে পারিত না। কিন্তু যখন দেখা যাইতেছে যে, ভালোবাসা হৃদয়ে সর্বপ্রথমে জন্মগ্রহণ করিয়া ব্যক্তিবিশেষকে খুঁজিয়া বেড়ায়। তাহার মাপে ঠিক হইবে, এমন ব্যক্তিবিশেষ অনুসন্ধান করিয়া ফিরে। দুই-চারিটা (বা তাহার অধিক) গায়ে দিয়া দেখে। কোনোটা বা ঢিলা হয় কোনোটা বা কষা হয়; কোনোটা বা মনে হয় হইবে, কিন্তু গায়ে দিলে হয় না; কোনোটা বা আর-সব দিকে বেশ হইয়াছে কেবল গলার কাছটা আঁট হয়; কোনোটা বা ভালোরূপে না হউক একপ্রকার চলনসইরূপে হয় ও তাহা লইয়াই ভালোবাসা সন্তুষ্ট থাকে। আগে ছিল প্রথমে আমদানি, পরে 'চাহিদা' (demands), এখন হইয়াছে প্রথমে 'চাহিদা' পরে আমদানি। ইহাই স্বাভাবিক অবস্থা। এখন কবিরা দেখিতেছেন, হৃদয় প্রেমের অতিথিশালা নহে, হৃদয় প্রেমের জন্মভূমি। প্রেম একটি পাত্র অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছে। কিন্তু পূর্বে খুব একটা বড়ো চোখ, সোজা নাক বা বিম্বৌষ্ঠের নাড়া না খাইলে কবিরা বুঝিতেই পারিতেন না যে, হৃদয়ে প্রেমের অস্তিত্ব আছে। সুতরাং তাঁহারা মনে করিতেন যে, ওই বড়ো চোখ ও বিম্বৌষ্ঠের সঙ্গে সঙ্গে প্রেম বলিয়া এক ব্যক্তি বুঝি হৃদয়ে বলপূর্বক আতিথ্য গ্রহণ করিল; এইজন্যই কেহ-বা তাহাকে ভালো মুখে সম্ভাষণ করিত, কেহ-বা গালাগালমন্দ দিত; যাহার যেমন স্বভাব। সে যে ঘরের লোক এমন কাহারো মনে হয় নাই।

পূর্বকার কবিরা সহসা আশ্চর্য হইতেন যে, ইহাকে ভালোবাসিলাম কেন? এ পাষাণ-হৃদয়া, মনোরাজ্য-অধিকার-লোলুপ, ইহার নিকট হইতে প্রেমের প্রতিদান পাইবার কোনো সম্ভাবনাই নাই, তবে ইহাকে ভালোবাসিলাম কেন? ইহার বিশেষ কোনো গুণ নাই, আমি যে যে গুণ ভালোবাসি, তাহা যে ইহার আছে এমন নহে, আমি যে যে দোষ ঘৃণা করি, তাহা যে ইহার নাই এমন নহে, আমি চেষ্টা করিতেছি ইহাকে না ভালোবাসি, তবে ইহাকে ভালোবাসি কেন? এখনকার কবিরা এক-একবার সহসা আশ্চর্য হন যে, ইহাকে ভালোবাসিলাম না কেন? এ কোমল-হৃদয়, আমার প্রতি নিতান্ত অনুরাগিণী, যে যে গুণ আমি ভালোবাসি সকলই ইহার আছে, যে যে দোষ ঘৃণা করি সকলই ইহার নাই; আমি ইচ্ছা করিতেছি ইহাকে ভালোবাসি, তবে ইহাকে ভালোবাসিতে পারিলাম না কেন? সাধারণ লোকে সহজেই উত্তর দিবে, চেষ্টা করিয়া কি ভালোবাসা বা না বাসা যায়? সে তো অতি সহজ উত্তর, কিন্তু কেনই বা না যাইবে? ভালো না বাসিলে যাহাকে ঘৃণা করিতাম, কেনই বা তাহাকে ভালোবাসিব? আর যে সর্বতোভাবে ভালোবাসিবার যোগ্য কেনই বা তাহাকে না ভালোবাসিব? এক দল কবি তাহার উত্তর দিতেছেন—

> কে জানে কোথায় এই জগতের পরে
> রয়েছে অপেক্ষা করি দীর্ঘ— দীর্ঘ দিন
> একটি আশ্রয়হীন হৃদয়ের তরে
> আরেকটি হৃদয় একেলা সঙ্গীহীন।
> উভয়ে উভয়ে খুঁজে দিনরাত্রি ধ'রে

অবশেষে তাদের সহসা একদিন
দেখা হয় দুই জনে কে জানে কী করে।
উভয়ে সম্পূর্ণ হয়ে হয় রে বিলীন।
জীবনের দীর্ঘ নিশা তখনি ফুরায়
অনন্ত দিনের দিকে পথ খুলে যায়।

—Edwin Arnold

অর্থাৎ একটি হৃদয়ের জন্য আর-একটি হৃদয় গঠিত হইয়া আছেই। তাহারা পরস্পর পরস্পরের জন্য। শত ক্রোশ ব্যবধানে, এমন-কি জগৎ হইতে জগদন্তরের ব্যবধানেও তাহাদের মধ্যে একটা আকর্ষণ থাকে। তাহাদের মধ্যে দেখাশুনা হউক বা না-হউক, জানাশুনা থাকুক বা না-থাকুক, তাহাদের উভয়ের মধ্যে যেমন সম্বন্ধ, তেমন কোনো দুই পরিচিত ব্যক্তির, কোনো দুই বন্ধুর মধ্যে নাই। ঘটনাচক্রে পড়িয়া তাহারা বিচ্ছিন্ন, কিন্তু তাহারা বিবাহিত। তাহাদের অনন্ত দাম্পত্য। সামাজিক বিবাহ, অনন্তকালস্থায়ী বিবাহ নহে। সচরাচর বিবাহে হয় একতর পক্ষে নয় উভয় পক্ষে প্রেমের অভাব দেখা যায়, এমন-কি, হয়তো স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে আমরণ-স্থায়ী ঘৃণার সম্পর্ক। হয়তো একজন বৃদ্ধ একজন তরুণীকে বিবাহ করিল, উভয়ের মধ্যে সকল বিষয়েই আকাশ-পাতাল প্রভেদ, মাল্য পরিবর্তন হইল, কিন্তু হৃদয় স্ব-স্ব স্থানে রহিল। হয়তো একজন রূপবতী একজন ধনবানকে বিবাহ করিল; ধনের আকর্ষণে রূপ অগ্রসর হইল বটে কিন্তু হৃদয়ের আকর্ষণে হৃদয় অগ্রসর হইল না। হয়তো এমন দুইজনে বিবাহ হইল, শুভদৃষ্টির পূর্বে যাহাদের মধ্যে দেখাশুনা হয় নাই। হয়তো এমন বালক-বালিকার বিবাহ দেওয়া হইল, যাহারা বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া দেখিল উভয়ের প্রকৃতিতে দারুণ বৈসাদৃশ্য। এই বৃদ্ধ ও তরুণী, এই রূপবতী ও ধনবান, এই দুই বিসদৃশ প্রকৃতি সামাজিক দম্পতির বিবাহ কি কখনো অনন্ত-কাল-স্থায়ী বিবাহ বলিয়া গণ্য হইতে পারে? কিন্তু দুই-দুইটি করিয়া হৃদয় আছে, প্রকৃতি নিজে পৌরোহিত্য করিয়া যাহাদের বিবাহ দিয়াছেন। তাহাদের বিবাহ-বন্ধন বিচ্ছিন্ন হইবার নহে। হৃদয় যে একটি প্রেমের পাত্র চায়, সে প্রেমের পাত্র আর কেহ নহে। সেই নির্দিষ্ট হৃদয়। হয়তো পৃথিবীতে তাহার সহিত দেখাশুনা হইল না, কবে যে হইবে তাহার স্থিরতা নাই। কোথায় সে আছে তাহা জানি না। কিন্তু—

কোথা-না-কোথাও আছেই আছে
যে মুখ দেখি নি, শুনি নি যে স্বর;
সে হৃদয়, যাহা এখনো— এখনো
আমার কথায় দেয় নি উত্তর।
কোথা-না-কোথাও আছেই আছে,
হয়তো বা দূরে হয়তো কাছে;
ছাড়াইয়া দেশ, সাগরের তীরে,
হয়তো বা কোথা দৃষ্টির বাহিরে,
হয়তো ছাড়ায়ে চাঁদের সীমানা,
হয়তো কোথায় তারকা অজানা,
রয়েছে তাহারি কাছে,
কে জানে কোথায় আছে!
কোথা-না-কোথাও আছেই আছে,
হয়তো বা দূরে হয়তো কাছে;
একটি হয়তো বেড়া বা দেয়াল
মাঝে রাখিয়াছে করিয়া আড়াল।

নব বরষের ঘাসের 'পরে
গত বরষের কুসুম ঝরে,
নূতন, পুরানো, মাঝখানে তার
হয়তো দাঁড়ায়ে সেজন আমার।

—Christina Rossetti

হয়তো ওই একটি বেড়ার আড়াল পড়িল বলিয়া, যাহার সহিত আমার চিরজীবনের সম্বন্ধ, তাহার সহিত ইহজন্মে আর দেখা হইল না। হয়তো রাজপথে সে আমার পাশ দিয়া চলিয়া গিয়াছে, মুখ ফিরানো ছিল বলিয়া দেখা হইল না, মিলন হইল না। তোমার জন্য যে হৃদয় নির্দিষ্ট রহিয়াছে তোমার মনের এমনই ধর্ম যে, তাহাকে দেখিয়া তুমি না ভালোবাসিয়া থাকিতে পারিবে না, এবং সেও তোমাকে ভালোবাসিবে, প্রকৃতি এমনই উপায় করিয়া রাখিয়া দিয়াছেন। কিন্তু তবে কেন সংসারে প্রণয় লইয়া এত গোলযোগ হয়? তবে কেন 'প্রকৃত প্রোত প্রশান্তভাবে বহে না?' যতক্ষণে না আমাদের যথার্থ দোসরকে পাই, ততক্ষণে তাহার সহিত যাহার কোনো বিষয়ে মিল আছে, আমরা তাহার প্রতিই আকৃষ্ট হই। এমনও সচরাচর হইয়া থাকে, প্রথমে একজনকে ভালোবাসিলাম, তাহার কিছুদিন পরে তাহাকে আর ভালোবাসিলাম না, এমন-কি, আর-একজনকে ভালোবাসিলাম। তাহার কারণ এই যে প্রথমে তাহার সহিত আমার প্রকৃত দোসরের সাদৃশ্য দেখিয়া তাহার প্রতি অনুরক্ত হইলাম, কিন্তু কিছুদিন নিরীক্ষণ করিয়া তাহার বৈসাদৃশ্যগুলি একে একে চক্ষে পড়িতে লাগিল ও অবশেষে তাহার অপেক্ষা সদৃশতর লোককে দেখিতে পাইলাম, আমার ভালোবাসা স্থান পরিবর্তন করিল। এমন এক-এক সময় হয়, আমরা সহসা এক ব্যক্তির মুখের এক পার্শ্বভাগ দেখিতে পাইলাম, সহসা মনে হইল, ইহাকে অমুকের মতন দেখিতে, হয়তো তাহার ভুরুর প্রান্তভাগ, তাহার অধরের সীমান্তভাগ মাত্র দেখিয়া মনে হইয়াছে ইহার সহিত অমুকের আদল আসে, হয়তো সমস্ত মুখটা দেখিলে দেখিতে পাই কিছুমাত্র আদল নাই। অনেক সময়ে দূর হইতে দেখিলে সহসা মনে হয় ইহাকে অমুকের মতন দেখিতে, কাছে আসিয়া দেখি তাহা নয়, অনেক সময় পশ্চাৎ হইতে দেখিয়া মনে হয় 'এ অমুক হইবে', সম্মুখে আসিয়া দেখি যে সে নয়। আমরা অনেক সময়ে পাশ হইতে ভালোবাসি, দূর হইতে ভালোবাসি, পশ্চাৎ হইতে ভালোবাসি, সুতরাং এমন হয় যে সম্মুখে আসিয়া কাছে আসিয়া আর ভালোবাসি না। অনেক সময়ে আবার হয়তো সত্যসত্যই আমরা আদল দেখিতে পাইয়া ভালোবাসি, কিন্তু তাহার অপেক্ষা অধিকতর আদল দেখিতে পাইলে আর-একজনকেও ভালোবাসিতে পারি। এইরূপ অবস্থায় আমরা আমাদের ভালোবাসার প্রতিদান দৈবক্রমে পাইতেও পারি, আবার অনেক সময়ে না পাইতেও পারি। এই-সকল কারণেই প্রেমে এত গোলযোগ বাধে। এই-সকল কারণেই আমরা (তাহার দোষ থাকুক বা গুণ থাকুক) একজনকে অন্ধভাবে ভালোবাসি, অথচ কেন ভালোবাসি ভাবিয়া পাই না, সে আমাদের প্রতি সহস্র নির্যাতন করুক, সহস্র অন্যায় ব্যবহার করুক, কিছুতেই তাহাকে না ভালোবাসিয়া থাকিতে পারি না। এই-সকল কারণেই, আমরা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না যে, এইরূপ চরিত্রবিশিষ্ট ব্যক্তি ভালোবাসিব, আর এইরূপকে ভালোবাসিব না।

একটি রঙের সহিত আর-একটি রঙ যখন মিলাইয়া গেল, তখন সেই উভয় বর্ণের অতি সূক্ষ্মতম বর্ণাণুগুলি কোন্‌ সীমায় ধীরে ধীরে মিলাইয়া গেল আমরা দেখিতে পাই না, এই পর্যন্ত বুঝিতে পারি যে, উভয় বর্ণের বর্ণাণুগুলির মধ্যে পরস্পর মিলিবার শক্তি আছে, আর কোনো শ্রেণীর বর্ণাণু হইলে মিলিতে পারিত না। তেমনি আমার বর্ণাণু আর কোন্‌ হৃদয়ের বর্ণাণুর সহিত মিলিতে পারিবে, তাহা কোনো পার্থিব সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে পড়িবার জো নাই, কিন্তু মিল আছেই। এমন বস্তু নাই যাহার মিল নাই। এ জগতে মিলের রাজ্য, প্রতি বর্ণের মিল আছে, প্রতি সুরের মিল আছে, প্রতি হৃদয়েরও মিল আছে। এ জগৎ মিত্রাক্ষরের কবিতা। এত মিল, এত অনুপ্রাস কোনো কবিতাতেই নাই।

যখন ভাবিয়া দেখা যায় যে, মনুষ্যের হৃদয়ে দোসর পাইবার ইচ্ছা কী বলবতী, তাহার জন্য সে কী না করিতে পারে, সে ইচ্ছার নিকটে জীবন পর্যন্ত কী অকিঞ্চিৎকর, মনের মতো দোসর পাইলে সে কী আনন্দই পায়, না পাইলে সে কী হাহাকারই করে, তখন মনে হয় যে, প্রতি লোকের দোসর আছেই, এককালে-না-এককালে পরস্পরের সহিত মিলন হইবেই। সংসারে যখন মাঝে মাঝে দোসরের মরীচিকা দেখিতে পাওয়া যায়, তখন নিশ্চয় বোধ হয়, জলাশয় কোনো দিকে-না-কোনো দিকে আছেই, নহিলে আকাশপটে তাহার প্রতিবিম্ব পড়িতই না। মনের মানুষ পাইবার জন্য যেরূপ দুর্দান্ত ইচ্ছা অথচ সংসারে মনের মানুষ লইয়া এত অশ্রুপাত, হৃদয়ের এত রক্তপাত করিতে হয় যে, মনে হয় একদিন বোধ করি আসিবে যেদিন মনের মানুষ মিলিবে, অথচ এত কাঁদিতে হইবে না। হৃদয়ের প্রতিমার নিকট হৃদয়কে বলিদান দিতে হইবে না। ভালোবাসা ও সুখ, ভালোবাসা ও শান্তি এক পরিবারভুক্ত হইয়া বাস করিবে। এ সংসারে লোকে ভালোবাসে, অথচ ভালোবাসার সমগ্র প্রতিদান পায় না, ইহা বিকৃত অবস্থা, অসম্পূর্ণ অবস্থা। এ অসম্পূর্ণ অবস্থা, একদিন-না-একদিন দূর হইবে। যখন বন্ধুত্বের প্রতারণায় প্রেমের যন্ত্রণায় মন অশ্রুবর্ষণ করিতে থাকে, মন একেবারে ম্রিয়মাণ হইয়া ধুলায় লুটাইয়া পড়ে, তখন ইহা অপেক্ষা সান্ত্বনা কী হইতে পারে? একবার যদি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ভাবে, এ-সমস্ত মরীচিকা; তাহার যথার্থ ভালোবাসিবার লোক যে আছে সে কখনো তাহাকে কাঁদাইবে না, তাহাকে তিলমাত্র কষ্ট দিবে না, তাহার সহিত একদিন অনন্ত সুখের মিলন হইবে, তখন কী আরাম সে না পায়। আর-একজন 'আমার' আছে, সৃষ্ট জীবের মধ্যে তেমন 'আমার' আর কেহ নাই। এমন সময় যখন আসে, যখন ভালোবাসিবার জন্য হৃদয় লালায়িত হয়, এমন ঋতু যখন আসে যখন

'How many a one, though none be near to love,
Loves then the shade of his own soul half seen
In any mirror—'

তখন হৃদয়ে সেই দোসরের একটি অশরীরী প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাকেই ভালোবাসো, তাহার সহিত কথোপকথন করো। তাহাকে বলো, 'হে আমার প্রাণের দোসর, আমার হৃদয়ের হৃদয়, আমি সিংহাসন প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি, কবে তুমি আসিবে? এ সিংহাসনে যদি আর কাহাকেও বসাইয়া থাকি তবে তাহা ভ্রমক্রমে হইয়াছে; কিছুতেই সন্তোষ হয় নাই, কিছুতেই তৃপ্তি হয় নাই, তাই তোমার জন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়া আছি।'

তাহাকে বলো—

In all my singing and speaking,
I send my soul forth seeking;
O soul of my soul's dreaming;
When wilt thou hear and speak?
Lovely and lonely seeming,
Thou art there in my dreaming.
Hast thou no sorrow for speaking
Hast thou no dream to seek?
In all my thinking and sighing,
In all my desolate crying,
I send my heart forth yearning ,
O heart that may'st be nigh!
Like a bird weary of flying,
My heavy heart, returning,

Bringeth me no replying.
Of word, or thought, or sigh.
In all my joying and grieving.
Living, hoping, believing,
I send my love forth flowing,
To find my unknown love.
O world, that I am leaving,
O heaven, where I am going,
Is there no finding and knowing,
Around, within or above?
O soul of my soul's seeing
O heart of my heart's being.
O love of dreaming and waking
And living and dying for—
Out of my soul's last aching
Out of my heart just breaking—
Doubting, failing forsaking,
I call on you this once more.
Are you too high or too lowly
To come at lengh upto me?
Are you too sweet or too holy
For me to have and to see?
Wherever you are, I call you,
Ere the falseness of life enthral you,
Ere the hollow of death appal you,
While yet your spirit is free.
Have you not seen, in sleeping,
A lover that might not stay,
And remembered again with weeping
And thought of him through the day
Ah! thought of him long and dearly,
Till you seemed to behold him clearly
And could follow the dull time merely
With heart and love far away?
And what are you thinking and saying,
In the land where you are delaying?
Have you a chain to sever?
Have you a prison to break?
O love! there is one love for ever,
And never another love— never,
And hath it not reached you, my praying?

And singing these years for your sake?
We two made one, should have power
To grow to a beautiful flower,
A tree for men to sit under
Beside life's flowerless stream;
But I without you am only
A dreamer fruitless and lonely;
And you without me, a wonder
In my most beautiful dream.

—Arthur O'Shaughnessy

ভারতী
জ্যৈষ্ঠ ১২৮৮

গোলাম-চোর

অদৃষ্ট আমাদের জীবনের তাসে অনেকগুলির মিল রাখিয়াছেন, কিন্তু মাঝে মাঝে একটা একটা করিয়া গোলাম রাখিয়া দিয়াছেন, তাহার আর মিল খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। চিরজন্ম গোলাম-চোর খেলিয়া আসিতেছি, কত বাজি যে খেলা হইল তাহার আর সংখ্যা নাই, খেলোয়াড়দের মধ্যে কে জাঁক করিয়া বলিতে পারে যে, সে একবারও গোলাম-চোর হয় নাই? অদৃষ্টের হাতে নাকি তাস, আমরা দেখিয়া টানিতে পারি না, তাহা ছাড়া অদৃষ্টের তাস খেলায় নাকি গোলামের সংখ্যা একটি নহে, এমন অসংখ্য গোলাম আছে কাজেই সকলকেই প্রায় গোলাম-চোর হইতে হয়। আমরা সকলেই চাই— মিলকে পাইতে ও অমিলকে তাড়াইতে। গোলাম পাইলে আমরা কোনো উপায়ে গলাবাজি করিয়া চালাকি করিয়া প্রতিবেশীর হাতে চালান করিয়া দিতে চাই। উদাহরণ দেওয়া আবশ্যক। মনে করো অ্যাকাউন্টেন্ট জেনেরালের আপিসে গোলাম-চোর খেলা হইতেছে— যতক্ষণ হিসাবে মিল হইতেছে ততক্ষণ কোনো গোলযোগ নাই। প্রথম সাহেব খেলোয়াড় যেই অমিলের গোলামটি পাইয়াছেন অমনি এক হাত দু হাত করিয়া সকলের শেষ খেলোয়াড় কেরানি বাবুটির হাতে গোলামটি চালান করিয়া দিলেন, মাঝে হইতে গরিব কেরানি বাবুটি গোলাম-চোর হইয়া দাঁড়াইলেন। দায়িত্বের গোলামটি কেহই হাতে রাখিতে চায় না। এমন প্রতি বিষয়েই গোলাম-চোর খেলা চলিতেছে। খুব সামান্য দৃষ্টান্ত দেখো। ঘোড়ার নিলামে যাঁহারা ঘোড়া কেনেন, সকলেই জানেন, যাহার হাতে খোঁড়া ঘোড়ার গোলাম আছে, কেমন কৌশলপূর্বক তোমার হাতে তাহা চালান করিয়া দেয়, যখন টানিবার উপক্রম করিয়াছ, তখন হয়তো জানিতে পার নাই, গোলাম টানিয়া চৈতন্য হইল, সেই নিলামেই গোলাম আর-একজনের হাতে চালান করিয়া দিলে। এমন দশ হাত ফিরিয়া জানি না কোন্ হতভাগ্য গোলাম-চোর হয়।

বাপের হাতে একটি অতি কুরূপা কন্যার গোলাম আসিয়াছে, গোলাম-দায়গ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছেন, বেহাত করিতে পারিলে বাঁচেন, হতভাগ্য বরের হাতে বেমালুম চালান করিয়া দিলেন, বর বেচারি শুভ দৃষ্টির সময়ে দেখিল, সে গোলাম-চোর হইয়াছে।

হোমিওপ্যাথি ডাক্তারেরা প্রায় গোলাম-চোর হন। তাঁহারাই নাকি সকলের শেষ খেলোয়াড়— এমন প্রায়ই হয় যে, গোলাম ছাড়া আর কোনো কাগজ তাঁহাদের টানিবার থাকে না, অ্যালোপ্যাথি ডাক্তার হোমিওপ্যাথির হাতে গোলামটি সমর্পণ করিয়া বিদায় হন, তিনি গোলাম-চোর হইয়া ধীরে ধীরে বাড়ি ফিরেন।

অদৃষ্টের হাত হইতে যখন তাস টানি, তখন হয়তো আমার হাতের সকল তাসগুলিই প্রায়

মিলিয়া গেল, কেবল একটা বা দুইটা এমন গোলাম টানিয়া বসি যে, চিরকালের মতো গোলাম-চোর হইয়া থাকি। মনে করো, আমার বিদ্যার তাস মিলিয়াছে, ধনের তাস মিলিয়াছে, কোথা হইতে একটা অপযশের গোলাম টানিয়া বসিয়াছি, গোলাম-চোর বলিয়া পাড়ায় টী টী পড়িয়া গিয়াছে। মনে করো, আমার ভ্রাতার তাস মিলিয়াছে, বন্ধুর তাস মিলিয়াছে, কোথা হইতে একটা স্ত্রীর গোলাম টানিয়াছি, আমরণ গোলাম-চোর হইয়া কাটাইতে হইল। এইরূপ একটা-না-একটা গোলাম সকলেরই হাতে আছে। তথাপি মানুষের এমনি স্বভাব, একজন গোলাম-চোর হইলেই নিকটবর্তী খেলোয়াড়েরা হাসিয়া উঠে; তখন তাহারা ভুলিয়া যায় যে, তাহাদের হাতে, সে রঙের না হউক, অমন দশখানা অন্য রঙের গোলাম আছে। জীবনের তাস খেলা যখন ফুরায়-ফুরায় হয়, সুখ-দুঃখ, আশা-ভরসার মিল-অমিল সকল তাসই যখন মৃত্যু একত্র করিয়া চিরকালের তরে বাক্সয় তুলে, তখন যদি প্রতি খেলোয়াড় একবার করিয়া গনিয়া দেখে, কতবার সে গোলাম-চোর হইয়াছে আর কত রঙের গোলাম তাহার হাতে আসিয়াছিল, তাহা হইলেই সে বুঝিতে পারে, অন্যান্য খেলোয়াড়দের তুলনায় তাহার হার কি জিত।

আমাদের দেশের বিবাহ-প্রণালীর মতো গোলাম-চোর খেলা আর নাই। প্রজাপতি তাস বিলি করিয়া দিয়াছেন। সত্য মিথ্যা জানি না, বিবাহিত বন্ধুবান্ধবের মুখে শুনিতে পাই যে, তাসে গোলামের ভাগই অধিক। চৌধুরী হালদারের হাত হইতে তাস টানিবে; দেখিয়া টানা-পদ্ধতি নাই। চৌধুরীর হাতে যদি দুরি থাকে আর হালদারের হাতেও দুরি থাকে তবেই শুভ নতুবা যদি গোলাম টানিয়া বসেন, তবেই সর্বনাশ। আন্দাজ করিয়া টানিতে হয়, আগে থাকিতে জানিবার উপায় নাই। কিন্তু কী আশ্চর্য। কোথায় চৌধুরী কোথায় হালদার; হালদারের হাত হইতে চৌধুরী দৈবাং একটা তাস টানিল, চৌষট্টিটা তাসের মধ্যে হয়তো সেইটাই মিলিয়া গেল। যেই মিলিল, অমনি মিল-দম্পতি বিশ্রাম পাইল। অন্যান্য অবিবাহিত তাসেরা হাতে হাতে মিল অনুসন্ধান করিয়া ফিরিতে লাগিল, তাহাদের আর বিরাম বিশ্রাম নাই। এইখানে সাধারণকে বিদিত করিতেছি, আমি একটি অবিবাহিত তাস আছি, আমার মিল কাহার হাতে আছে জানিতে চাই। আমার বন্ধুবান্ধবেরা আমাকে বলেন, গোলাম। বলেন, আমার মিল ত্রিজগতে নাই। যে কন্যাকর্তা টানিবেন তিনি গোলাম-চোর হইবেন। কিন্তু বোধ করি, তাঁহারা রহস্য করিয়া থাকেন, কথাটা সত্য নহে।

অনেক অসাবধানী এমন আলগা করিয়া তাস ধরেন, তাঁহাদের হাতের কাগজ সকলেই দেখিতে পায়। পাঠকেরা যেন এমন করিয়া তাস না ধরেন। এমন অনেক বড়ো বড়ো ধনী খেলোয়াড় দেখিয়াছি, তাঁহারা এমনই আলগা করিয়া তাস ধরেন যে, প্রতিবেশীরা তাঁহাদের হাত হইতে আবশ্যকমতো সাতা টানে, আটা টানে, নহলা টানে, তাঁহারা মনে মনে ফুলিতে থাকেন, তবে বুঝি গোলামটাও টানিবে। তাঁহাদের হাতের কাগজ সব ফুরাইয়া যায়, কেবল গোলামটাই অবশিষ্ট থাকে।

পাঠকদের হাতে যদি গোলাম আসিয়া থাকে, চালান করিয়া দিবার কৌশল অবগত হউন। কোনো মতে মুখ-ভাবে না প্রকাশ হয়, হাতে গোলাম আছে। অনেক বড়ো বড়ো হৌসের হাতে গোলাম আসিয়া থাকে, লোকে যদি অঙ্কুশ মাত্রে জানিতে পারে যে, হৌসের হাতের কাগজে গোলাম দেখা দিয়াছে, তাহা হইলেই তাহার খেলা সাঙ্গ হয়। যে পরিবারের হাতে মূর্খ বরের গোলাম আছে, তাহারা যদি চারি দিকে কেতাব ছড়াইয়া রাখে, মুখস্থ বুলি বলিতে পারে, তাহা হইলে তাহারাও গোলাম চালাইয়া দিতে পারে। তুমি আমি যদি এ সংসারে মুখের জোরে চলিয়া যাইতে পারি, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হইতে পারি, রায় বাহাদুর হইতে পারি, তাহা হইলে আরও অনেক গোলাম চলিয়া যাইতে পারে।

একে তো গোলাম-চোর হইতেই বিশেষ আপত্তি আছে, তাহাতে যদি জানিতে পারি যে, আর-একজন কৌশল করিয়া ভাঁড়াইয়া আমার হাতে গোলামটি চালান করিয়া দিয়াছেন, তাহা

হইলে কিছু অপ্রস্তুত হইতে হয়। সংবাদপত্র ও মাসিকপত্রের সমালোচনা ও বিজ্ঞাপন যাঁহারা পাঠ করেন তাঁহারা ট্যাকের পয়সা খরচ করিয়া সহসা আবিষ্কার করেন, যে, গোলাম-চোর হইয়াছেন। সত্য কথা বলিতে কী, অনেক পাঠক তাসের কাগজ চেনেন না, তাঁহারা অনেক সময়ে জানিতেই পারেন না যে, তাঁহারা গোলাম টানিয়াছেন। রঙচঙ দেখিয়া তাঁহারা ভারি খুশি হন, কিন্তু যাঁহারা তাসের কাগজ চেনেন, তাঁহারা গোলাম-চোরকে দেখিয়া মনে মনে হাসেন।

যাহা হউক, পাঠকেরা একবার ভাবিয়া দেখুন, কতবার গোলাম-চোর হইয়াছেন, কত রঙের গোলাম তাঁহার হাতে আছে। প্রকাশ করিবার আবশ্যক নাই, কথাটা চাপিয়া রাখুন, কিন্তু প্রতিবেশী গোলাম-চোর হইলে তাহা লইয়া অতিরিক্ত হাস্য-পরিহাস না করেন।

ভারতী
আষাঢ় ১২৮৮

চর্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়

জঠর-তত্ত্ববিৎ বুধগণ উদর-সেবাকে চারি ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। চর্বণ করা, শোষণ করা, লেহন করা ও পান করা। আহারের অনুষঙ্গিক ও অতি নিকট সম্পর্কীয় একটি পদার্থ আছে, পুরাতন নস্য-সেবকেরা তাহাকে অনাদর করিয়াছেন যথা, ধূমায়ন অর্থাৎ ধোঁয়ান। যাহা হউক, 'ভক্ষণ ও ভক্ষণায়ন' সভার সভ্যগণ তাঁহাদের শাস্ত্রের পাঁচটা পরিচ্ছেদ নির্মাণ করিয়াছেন, প্রথম চর্ব্য; দ্বিতীয় চোষ্য; তৃতীয় লেহ্য; চতুর্থ পেয় ও পঞ্চম ধৌম্য। এই শেষ পরিচ্ছেদটাকে অনেকে রীতিমতো পরিচ্ছেদ বলিয়া গণনা করেন না, তাঁহারা ইহাকে পরিশিষ্ট স্বরূপে দেখেন।

আমাদের বুদ্ধির খোরাককেও এইরূপ পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা যায়। শ্রীযুক্ত লালা আহার-বিহারী উদরাম্বুধি মহাশয় দেখিবেন, তাঁহাদের ভোজের সহিত বুদ্ধির ভোজের যথেষ্ট সৌসাদৃশ্য আছে।

চর্ব্য। কাঁচা, আভাঙা সত্য। ইহা একেবারে উদরে যাইবার উপযোগী নহে। গলা দিয়া নামে না, পেটে গিয়া হজম হয় না। ইহা অতিশয় নিরেট পদার্থ। ইংরাজি বুদ্ধিজীবী ঔদরিকগণ ইহাকে facts বলেন। যদি ইহাকে দাঁত দিয়া ভাঙিয়া ভাঙিয়া, বিশ্লেষণ করিয়া, রহিয়া বসিয়া না খাও, যেমন পাও তেমনি গিলিতে আরম্ভ কর তবে তাহাতে বুদ্ধিগত শরীরের পুষ্টি সাধন হয় না। এইটি না জানার দরুন অনেক হানি হয়। স্কুলে ছেলেদের ইতিহাসের পাতে যে আহার দেওয়া হয় তাহা আদ্যোপান্ত চর্ব্য। বেচারিদের ভাঙিবার দাঁত নাই, কাজেই ক্রমিক গিলে। কোন্ রাজার পর কোন্ রাজা আসিয়াছে; কোন্ রাজা কোন্ সালে সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়াছে ও কোন্ সালে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, এই-সকল শক্ত শক্ত ফলের আঁঠিগুলি তাহাদের গিলিতে হয়। মাস্টারবর্গ মনে করেন, ছাত্রদের মনের ক্ষেত্রে এই যে-সকল বীজ রোপণ করিতেছেন, ভবিষ্যতে ইহা হইতে বড়ো বড়ো গাছ উৎপন্ন হইবে। কথাটা যে চাষার মতো হইল; কারণ, এ যে ক্ষেত্র নয়, এ পাকযন্ত্র। এখানে গাছ হয় না, রক্ত হয়। আজকাল য়ুরোপে এই সত্যটি আবিষ্কৃত হইয়াছে ও পাঠ্য ইতিহাস লিখিবার ধারাও পরিবর্তিত হইয়াছে। এখনকার ইতিহাস কতকগুলা ঘটনার সংবাদপত্র ও রাজাদিগের নামাবলী নহে। অবশ্য চর্ব্য পদার্থের কাঠিন্যের কমবেশ পরিমাণ আছে। কোনোটা বা চিবাইতে কষ্ট বোধ হয় না মুখে দিলেই মিলাইয়া যায়, কোনোটা চিবাইতে বিষম কষ্ট হয়। যাঁহাদের বুদ্ধি দাঁত-ওয়ালা, চর্ব্য তাঁহাদের স্বাভাবিক খাদ্য। তাঁহারা কঠিন কঠিন চর্ব্যগুলিকে লইয়া বিশ্লেষণ দাঁত দিয়া ভাঙিয়া, মুখের মধ্যে আনুমানিক ও প্রামাণিক যুক্তির রসে রসালো করিয়া লইয়া এমনি আকারে তাহাকে পরিণত করেন যে, তাহার চর্ব্য অবস্থা ঘুচিয়া যায় ও সে পরিপাকের উপযোগী ও রক্ত-নির্মাণক্ষম হইয়া উঠে। ইহা একটি শারীর-তত্ত্বের নিয়ম যে, খাদ্য যতক্ষণ চর্ব্য অবস্থায় থাকে, অর্থাৎ facts যখন কেবলমাত্র facts রূপেই থাকে, ততক্ষণ তাহা

রক্ত নির্মাণ করিতে পারে না, রক্তের সহিত মিশিতে পারে না। তাহার সাক্ষ্য, আমাদের অসংখ্য এম-এ বি-এ'দের খাইয়া খাইয়া পিলে হয়; উদরী হয়; কাহারো কাহারো বা অপরিমিত চর্বি হয়, ও বাহির হইতে বিষম বলিষ্ঠ বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু বল হয় না।

আমরা এখনও ভালো করিয়া চর্ব্য খাইতে পারি না, আমরা চোষ্য খাইয়া থাকি। যাহাদের দাঁত উঠে নাই তাহারা শোষণ করিয়া খায়। মাতৃস্তন্য শোষণ করিয়া খাইতে হয়। অর্থাৎ মাতার শরীরে চর্ব্য দ্রব্য সকল হজম হইয়া সার দুগ্ধরূপে পরিণত হয়, সন্তান তাহাই শোষণ করিয়া খায়। অনেকগুলি সহজ সত্য আমরা অতীত কালের স্তন হইতে পান করি। বহুবিধ অভিজ্ঞতার চর্ব্য খাইয়া খাইয়া অতীতের স্তনে সেই দুগ্ধ জন্মিয়াছিল। আমরা বিনা আয়াসে তাহা প্রাপ্ত হই। তাহা আর চিবাইতে হয় না, একেবারে পরিপাকের উপযোগী হইয়াই থাকে। কোনো কোনো মাতার স্তনে দুগ্ধ অধিক থাকে, কাহারো দুগ্ধ কম থাকে। আমরা একটা বিলাতি দাইয়ের দুগ্ধ পান করিতেছি, আমাদের মায়ের দুধ কম। এই অস্বাভাবিক উপায়ে দুধ খাওয়া অনেকের সহে না, অনেকের পক্ষে ঘটিয়া উঠে না, ইহা বড়োই ব্যয়সাধ্য। পণ্ডিতদিগের মত এই যে, আমাদের সাহিত্য-মা যদি ভালো ভালো পুষ্টিকর খাদ্য খাইয়া, দুধ কিনিয়া নিজে খাইয়া, শরীর সুস্থ রাখিয়া স্তনে প্রচুর পরিমাণে দুগ্ধ সঞ্চার করিতে পারেন, তবে দাই নিযুক্ত করা অপেক্ষা তাহাতে অনেক বিষয়ে ভালো হয়। সন্তানদের সে দুধ ভালোরূপে হজম হয়, সকল সন্তানই সে দুধ পাইতে পারে ও তাহা ব্যয়সাধ্য হয় না। এইখানে একটা কথা বলা আবশ্যক, নিতান্ত শিশু-অবস্থা অতীত হইয়া গেলে একটু একটু করিয়া চর্ব্য দেওয়া আবশ্যক, তাহাতে দাঁত শক্ত হয়, দাঁত উঠিবার সহায়তা করে। অনেক সময়ে চিবাইয়া দাঁত শক্ত করিবার জন্য ছেলেদের হাতে চুষি দেয়। বড়ো বড়ো উন্নত সমাজ এক কালে এইরূপ খাদ্য ভ্রমে চুষি চিবাইয়াছে, তাহাতে আর কিছু না হউক, তাহাদের দাঁত উঠিবার অনেকটা সহায়তা করিয়াছে। মধ্যযুগের য়ুরোপীয় পণ্ডিতমণ্ডলীতে এইরূপ কূট তর্কের চুষি চিবানোর প্রার্দুভাব হইয়াছিল। আমাদের ন্যায়শাস্ত্রের অনেকগুলি তর্ক এইরূপ চুষি, অতএব দাঁত উঠিবার সহায়তা করিতে কঠিন দ্রব্যের বিশেষ আবশ্যক। আমাদের, বোধ করি, এতটুকু দাঁত উঠিয়াছে যে, একটু একটু করিয়া চর্ব্য খাইতে পারি। অতএব হে বঙ্গ বিদ্বন্মণ্ডলী, একটা ভালো দিন স্থির করিয়া আমাদের অন্নপ্রাশন করা হউক। হে মাসিকপত্রসমূহ, আমাদের কেবলমাত্র দুগ্ধ না দিয়া একটু একটু করিয়া অন্ন খাইতে দিয়ো।

'লেহ্যে'র কোঠায় আসিবার আগে 'পেয়' সম্বন্ধে আলোচনা করা আবশ্যক। প্রাপ্তবয়স্ক লোকদের শরীরের পক্ষে চর্ব্য যেরূপ আবশ্যক, পেয়ও সেইরূপ আবশ্যক। শরীরের তরল জলীয় অংশ পূরণ করাই পানীয় দ্রব্যের কাজ। অতএব, ইহা শরীরের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। বুদ্ধিজীবী লোকদের খোরাকে কবিতাই পানীয়। ইহা তাঁহাদের রক্তের জলীয় অংশ প্রস্তুত করে, ইহা তাঁহাদের শিরায় উপশিরায় প্রবাহিত হয়। ইহা কখনো মাদকের স্বরূপে তাঁহাদের মুহ্যমান দেহে চেতনার বল সঞ্চার করে, অলস শরীরে স্ফূর্তি ও উদ্যমের উদ্রেক করে, সময় বিশেষে আবেশে গদগদ করিয়া দেয়। আবার কখনো শীতল জলস্বরূপে সংসারের রৌদ্রদগ্ধ ব্যক্তির পিপাসা শান্তি করে, শরীর শীতল করে। দেহের রক্ত উষ্ণ হইয়া যখন একটা অসংযত উত্তেজনা শরীরে জ্বলিয়া উঠে তখন তাহা জুড়াইয়া দেয় অর্থাৎ, অকর্মণ্যকে উত্তেজিত করে, অশান্তকে শান্তি দেয়, শ্রান্ত ক্লান্তকে বিশ্রাম বিতরণ করে। অতএব বয়স্ক বুদ্ধিজীবী লোকদের পক্ষে বুদ্ধির খাদ্য চর্ব্য সকলও যেমন আবশ্যক, আবেগের পানীয় কবিতাও তেমনি উপযোগী।

চর্ব্য কঠিন ও পেয় গভীর, কিন্তু লেহ্য তরল, অগভীর ও বিস্তৃত। যাহাদের শোষণ করিবার বয়স গিয়াছে, অথচ দাঁতের জোর কম, তাহারা লেহ্য খাইয়া বাঁচে। অধিক চিবাইতে হয় না, অধিক তলাইতে হয় না, উপর হইতে লেহন করিয়া লয়। এই বেচারিদের উপকার করিবার জন্য অনেক দন্তবান বলিষ্ঠ লোকে কঠিন কঠিন চর্ব্য পদার্থকে বিধিমতে গলাইয়া, রসে পরিণত করিয়া লেহ্য বানাইয়া দেন। নিতান্তই যাহা গলে না তাহা ফেলিয়া দেন। বলা বাহুল্য যে, এইরূপ

গলাইতে অধিকাংশ সময়ে পানীয় পদার্থের আবশ্যক করে। প্রক্টর সাহেব কঠিন জ্যোতির্বিদ্যাকে পানীয় পদার্থে গলাইয়া জনসাধারণের জন্য মাঝে মাঝে প্রায় এক-এক পাত্র লেহ্য প্রস্তুত করিয়া দেন। আজকাল ইংলন্ডে এই লেহ্য সেবনের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব পড়িয়াছে। ম্যাকমিলান, ব্ল্যাকবুড প্রভৃতি দোকানদারেরা এইরূপ নানা প্রকার পদার্থের লেহ্য প্রস্তুত করিয়া ইংলন্ডের ভোজনপরায়ণদের দ্বারে দ্বারে ফিরিতেছেন। কোনো কোনো পণ্ডিত আশঙ্কা করিতেছেন যে, লেহ্য সাহিত্যের অধিক প্রাদুর্ভাব হইলে লোকের দাঁতের ব্যবহার এত কমিয়া যাইবে যে, দাঁত ক্রমশই শিথিলতর হইয়া পড়িবে।

এই সকল প্রকার খাদ্য ও পানীয়ের আবার নানা প্রকার আস্বাদন আছে, কোনোটা বা মিষ্ট, কোনোটা বা তিক্ত, কোনোটা বা ঝাল, কোনোটা বা অম্ল। কোন্ প্রকারের খাদ্য মিষ্ট তাহা বলিবার আবশ্যক নাই, সকলেই জানেন। যাহা তীব্র, ঝাঁঝালো বিদ্রূপ; যাহাতে বেলেস্তরার কাজ করে; যাহা খাইতে খাইতে চোখে জল আসে, তাহাই ঝাল। অনেকের নিকট ইহা মুখরোচক, কিন্তু শরীরের পক্ষে বড়ো ভালো নহে। সচরাচর লোকে বলিয়া থাকে 'ঝাল ঝাড়া'। অর্থাৎ মনে জ্বালা ধরিলে আর-একজনকে জ্বালানো। বেচারি পূর্ববঙ্গবাসীগণ ক্রমাগতই ঝাল খাইয়া আসিতেছে। অম্লরস ঝালের মতো ঝাঁঝালো উষ্ণ নহে। ইহা বড়ো ঠাণ্ডা আর হজমের সহায়তা করে। ইহার বর্ণ লঙ্কার ন্যায় লাল টক্‌টকে নয়, দধির ন্যায় বিশদ, স্নিগ্ধ। ইহাকে ইংরাজিতে humour বলে, বাংলায় কিছুই বলে না। ইহার নাম বিমল, অপ্রখর রসিকতা। ইহা মুচকি হাসির ন্যায় পরিষ্কার ও শুভ্র। ইহা দুধকে ঈষৎ বিকৃত করিয়া দেয়, কিন্তু সে বিকৃত পদার্থ অন্যান্য বিকৃত পদার্থের ন্যায় ঘৃণাজনক, দুর্গন্ধ ও বিস্বাদ নহে। সেই বিকারের কেমন একটু বেশ মজার স্বাদ আছে। আমাদের বঙ্কিমবাবুর সকল লেখায় এইরূপ কেমন একটু অম্লরসের সঞ্চার আছে, মুখে বড়োই ভালো লাগে। তাঁহার কমলাকান্তের দপ্তরে অনেক সময়ে তিনি শুষ্ক চিড়া-সকল দই দিয়া এমন ভিজাইয়া দিয়াছেন যে, সে চিড়ার ফলারও ভোক্তাদের মুখরোচক হইয়াছে। 'ঘোল খাওয়ানো' বলিয়া একটা কথা আমাদের শাস্ত্রে প্রচলিত আছে, তাহার অর্থ— মুচকি হাসিয়া অতি ঠাণ্ডা ভাবে একজনের পিত্ত টকাইয়া তুলা, ইহাতে ভোজন-কর্তার হাস্য ও পিত্ত একসঙ্গে উদ্দীপিত করে; ঝালের সে গুণটি নাই, অশ্রুর সহিত তাহার কারবার! অতিরিক্ত টক ভালো নহে। টক কেন, সকল দ্রব্যেই প্রায় অতিরিক্ত কিছুই ভালো নহে। যখন মিষ্ট খাইয়া খাইয়া রুচি খারাপ হইয়া গেছে তখন তিক্ত কাজে দেখে। সম্পাদকগণ ও গ্রন্থকারবর্গ আমাদের বাঙালি পাঠকদের মিষ্ট ছাড়া আর কিছু খাওয়াইতে চান না। যাহা পাঠকদের মুখে রোচে, তাহাই তাঁহারা সংগ্রহ করিয়া দেন, স্বাস্থ্যজনক হউক আর না হউক। তাঁহারা ক্রমাগত পাঠকদের শুনাইতে থাকেন—'আমাদের দেশের যাহা-কিছু তাহাই ভালো, বিদেশ হইতে যাহা আনীত হয় তাহাই মন্দ। যাহা চলিয়া আসিতেছে তাহা হইতে ভালো আর কিছু নাই, যাহা নূতন আসিতেছে, তাহা অপেক্ষা মন্দ আর কিছু হইতে পারে না।' এই-সকল কথা আমাদের পাঠকদের বড়োই মিষ্ট লাগে, এইজন্য দোকানেও প্রচুর পরিমাণে বিক্রয় হয়। আমার বোধ হয় এখন একটু একটু তিক্ত খাওয়াইবার সময় আসিয়াছে, নতুবা স্বাস্থ্যের বিষম ব্যাঘাত হইতেছে।

কথা প্রসঙ্গে তামাকের কথাটা ভুলিয়া গিয়াছিলাম। জঠর-তত্ত্বের যে পরিচ্ছেদে এই তামাকের কথা আছে, তাহার নাম ধূমায়ন। বুদ্ধির ভোজে নভেলকে তামাক বলে। বুদ্ধিজীবীগণ ইহাকে বুদ্ধিগত শরীরের পক্ষে অপরিহার্য আবশ্যক বলিয়া বিবেচনা করেন না। তাঁহাদের অনেকে ইহাকে মৌতাতের স্বরূপে দেখেন। বড়ো বড়ো আহারের পর এক ছিলিম তামাক বড়ো ভালো লাগে, পরিশ্রম করিয়া আসিয়া এক ছিলিম তামাক বিশেষ আবশ্যক। নিতান্ত একলা বসিয়া আছি, হাতে কিছু কাজ নাই। বসিয়া বসিয়া তামাক টানিতেছি। ইহার মাদকতা শক্তি কিয়ৎ পরিমাণে আছে। কিন্তু ইহার ফল উপরি-উল্লিখিত ভোজ্যসমূহের অপেক্ষা অনেকটা ক্ষণস্থায়ী ও লঘু, খানিকটা ধোঁয়া টানিলাম, উড়িয়া গে তামাক পুড়িয়া গেল, আগুন নিভিয়া গেল, লঘু

ধোঁয়ার উপর চড়িয়া সময়টাকে আকাশের দিকে চলিয়া গেল। তামাকের আবার নানাবিধ শ্রেণী আছে। অনেক আষাঢ়ে আছে, যাহাকে গাঁজা বলা যায়। বঙ্কিমবাবু ডাবা হুঁকায় আমাদের যে তামাক খাওয়ান এমন তামাক সচরাচর খাওয়া যায় না। ইহার গুণ এই, ধোঁয়া অনেকটা জলের মধ্য দিয়া ঠাণ্ডা হইয়া আসে। বঙ্কিমবাবুর হুঁকার খোলে অনেকটা কবিতার জল থাকে। এক-এক জন লোক আছে, তাহারা হুঁকার জল ফিরায় না; দশ দিন দশ ছিলিম তামাক সাজিয়া দেয়, একই জল থাকে। এক-এক জন পাঠক আছে, তাহাদের চুরট না হইলে চলে না। তাহারা বর্ণনা চায় না, কবিত্বপূর্ণ ভাব চায় না, সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অনুভাবের লীলাখেলা দেখিতে চায় না; তাহারা মাথায়-আকাশ-ভাঙা, গা-শিওরনো, চমক-লাগা ঘটনার দশ-বারোটা গরম গরম টান টানিয়া একেবারে সমস্তটা ছাই করিতে চায়। কোনো কোনো নবন্যাসবর্দার আমাদের গুড়গুড়িতে তামাক দেন। তাহার দশ হাত লম্বা, দশ পাক পেঁচানো নলের মধ্য দিয়া ধোঁয়া মুখের মধ্যে আসিতে অনেকটা দেরি করে। কিন্তু একবার আসিলেই অবিশ্রাম আসিতে থাকে। কোনো কোনো হুঁকায় আগুন (interest) নিভিয়া যায়। কোনো কোনো কলিকায় পাঠক যদি শ্রম স্বীকারপূর্বক প্রথম প্রথম খানিকটা ফুঁ দিয়া দিয়া আগুন জাগাইয়া রাখিতে পারেন, তবে শেষাশেষি অনেকটা ধোঁয়া পান।

মাসিক সংবাদপত্রের ভাণ্ডারে উপরি-উল্লিখিত ভোজের সমস্ত উপকরণগুলিই থাকা আবশ্যক। সকল প্রকার ভোক্তার খোরাক জোগানো দরকার। বিভিন্ন বিভিন্ন দোকানে ফুরন করা থাকে, কিন্তু তাহারা প্রতিবারে সময়মতো সরবরাহ করিতে পারে না, কাজেই এক-একবার এক-এক শ্রেণীর পাঠক চটিয়া উঠেন। ভারতীর নিমন্ত্রণ-সভায় সম্পাদক মহাশয়, স্বর-রহস্য, জ্যামিতি, ভৌতিক বিজ্ঞান, অধ্যাত্মবিদ্যা প্রভৃতি যে-সকল দাঁতভাঙা চর্ব্যের পরিবেশন আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাতে উপস্থিত প্রস্তাব-লেখক বিশেষ ভীত ও ব্যাকুল হইয়া তাঁহার নিকট সবিনয় নিবেদন করিতেছে যে, যে-সকল গুরুপাক খাদ্যের মাসিক বরাদ্দ হইয়াছে, তাহাদিগকে আর-একটু লেহ্য আকারে পাতে দিলে মুখে তুলিতে ভরসা হয়, নচেৎ তাহাতে পাত পূরিবে বটে, কিন্তু পেট পূরিবে না।

ভারতী
শ্রাবণ ১২৮৮

দরোয়ান

আমাদের কর্তা আমাদের যে স্থানে বিদ্যা শিক্ষার জন্য পাঠাইয়াছেন, সেখানে এত প্রকারের আপদ-বিপদের সম্ভাবনা আছে যে, আমাদের প্রত্যেকের মনের দেউড়িতে তিনি যুক্তি বা বুদ্ধি বলিয়া এক-একটা দরোয়ান খাড়া করিয়া রাখিয়াছেন। এ ব্যক্তি আমাদের কী ভয়ানক শাসনেই রাখিয়াছে। আমাদের উপরে ইহার কী দারুণ একাধিপত্য! ইনি যাহাদের না চেনেন, এমন কোনো লোককে ঘরে ঢুকিতে দেন না। সদা সর্বদা পাহারা। ইনি যে গণ্ডিটি দিয়া রাখিয়াছেন, তাহার বাহিরে আমাদের কোনো মতেই যাইতে দেন না। রাত্রি হইলে এ লোকটি ঘুমাইয়া পড়ে, সেই অবসরে অনেক প্রকারের লোক পা টিপিয়া পা টিপিয়া আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসে, কখনো বা উৎপাত করে কখনো বা আমোদে রাখে। যেই দরোয়ানটা জাগিয়া উঠে, ঘরের মধ্যে গোলযোগ শুনিতে পাইয়া সে ডাকিয়া উঠে, 'কে রে? আমার হুকুম না লইয়া ঘরে কে আসিয়াছিস?' অমনি আমাদের স্বপ্ন-নাটকের পাত্রগণ, আমাদের Dreamatis Personœ[1] দরজা দিয়া, জানালা দিয়া, খিড়কি দিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া পালায়। আমরা সকলে ছেলেমানুষ লোক, যে আসে তাহাকেই বিশ্বাস করি, এই নিমিত্ত দরোয়ান এমন কাহাকেও প্রবেশ করিতে

---

[1] অপূর্ব লাটিন হইল।

দেয় না যে বিশ্বাসযোগ্য নহে। স্বপ্নে আমরা কাহাকে না বিশ্বাস করি। বিশ্বাস করাই আমাদের স্বাভাবিক অবস্থা। কিন্তু আমাদের দরোয়ান হাজার হুঁশিয়ার হউক-না-কেন, ভদ্রলোকের মতো কাপড়-চোপড় পরিয়া অনেক অবিশ্বাস্য লোক আমাদের মনের মধ্যে প্রবেশ করে, তাহারা অনেক লোকসান করিয়া থাকে। অনেক সময়ে আমাদের প্রতিবেশীর দরোয়ান আমাদের দরোয়ানকে সাবধান করিয়া দেয়। যদি দরোয়ানের তাহাতে চৈতন্য হয় তবে তৎক্ষণাৎ তাহাকে ডাকিয়া গলাধাক্কা দিয়া বাহির করিয়া দেন। নানা চরিত্রের দরোয়ান আছে, ভাব অতিথিগণ তাহাদের নানা উপায়ে বশ করিতে পারে। কেহ-বা হীরার আংটি ঘড়ির চেন-পরা বাবুটিকে দেখিলেই ছাড়িয়া দেয়; কেহ-বা মিষ্ট কথা শুনিলেই গলিয়া যায়, অবিশ্বাস মন হইতে চলিয়া যায়; কেহ-বা বিশ্বাস করুক বা না করুক, সন্দেশের লোভ পাইলে চক্ষুকর্ণ বুজিয়া তাহাকে প্রবেশ করিতে দেয়। কত বড়ো বড়ো জাঁকালো-মত, ভুঁড়িবান ভাব হীরা জহরাৎ পরিয়া কত নাবালকের বৈঠকখানায় আদরের সহিত গৃহীত হইয়াছে, অথচ তাহারা আদরের যোগ্য নহে; কত মতকে আমরা মিঠা ভাবা, মিঠা গলা শুনিয়া ডাকিয়া আনিয়াছি; আবার অনেক মতকে আমরা ঠিক বিশ্বাস করি না, কিন্তু বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা করে বলিয়া, বিশ্বাস করিবার প্রলোভন আছে বলিয়া ঘরে ঢুকিতে দিই। অনেক সময়ে দিনের বেলায় দরোয়ান ঝিমায়। দুই প্রহরে চারি দিক হয়তো ধাঁ ধাঁ করিতেছে, জানালা দিয়া অল্প অল্প বাতাস আসিতেছে, খাটিয়াটির উপরে পড়িয়া দরোয়ানের তন্দ্রা আসিয়াছে, সেই সময়ে কত শত পরস্পর অচেনা ভাব আমাদের হৃদয়ের প্রবেশ-দ্বার অরক্ষিত দেখিয়া আস্তে আস্তে প্রবেশ করে; কত প্রকার অদ্ভুত খেলা খেলিতে থাকে তাহার ঠিকানা নাই; অনেকের এইরূপ অলস দরোয়ান আছে। আবার এক-একটা এমন দুর্দান্ত ভাব আছে যে, আমাদের দরোয়ানদের ঠেঙাইয়া জোর-জবরদস্তি করিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে। এই মনে করো, ভূতের-ভয় বলিয়া এক ব্যক্তি যখন কাহারো মনের মধ্যে প্রবেশ করে, তখন যুক্তিসিং হাজার ঢাল-তলোয়ার লইয়া আস্ফালন করুন-না-কেন, তাহার কাছে ঘেঁষিতে পারেন না। কাহারো বা রোগা দরোয়ান, কাহারো বা ভালো মানুষ দরোয়ান, কাহারো বা অলস দরোয়ান।

এক-একটি ছেলে আছে, যাহার এই দরোয়ানটির উপর দৃঢ় বিশ্বাস। তাহাকে না লইয়া কোথাও যাইতে চায় না; সকল কাজেই তাহাকে খাড়া করিয়া রাখিয়া দেয়। সে ভাবে, কে জানে কোথায় কে দুষ্ট লোক আছে, কোথায় কোন্‌খানে গিয়া পৌঁছাইব, তাহার ঠিক নাই। সে যেখানে আছে, যুক্তিও তাহার তক্‌মা পরিয়া পাগড়ি আঁটিয়া আসাসোঁটা ধরিয়া কাছে কাছে হাজির আছে। আবার এমন এক-একটা যথেচ্ছাচারী দুষ্ট ছেলে আছে, যে এই দরোয়ানটাকে দুচক্ষে দেখিতে পারে না। সে ভাবে, এ একটা কোথাকার মেড়ুয়াবাদী আমার স্বাধীনতা অপহরণ করিয়া বসিয়া আছে! একটা যে সংকীর্ণ গণ্ডি টানিয়া দিয়াছে, তাহার মধ্যে কষ্টই থাক্ আর দুঃখই থাক্, আগুনেই পুড়ি, আর জলেই হাবুডুবু খাই, তাহার বাহিরে কোনো মতেই যাইতে দেয় না। অবশেষে নিতান্ত জ্বালাতন হইয়া দুষ্টামি করিয়া তাহাকে মদ খাওয়াইয়া দেয়; এইরূপে বুদ্ধি যখন মাতাল হইয়া অচেতন হইয়া পড়ে, তখন তাহারা গণ্ডির বাহিরে গিয়া উপস্থিত হয়। অনেক লোকে যে মদ খাইতে ভালোবাসে, তাহার কারণ এই যে, তাহারা স্বাধীনতা পাইতে চায়; বুদ্ধিটাকে কোনো প্রকারে অভিভূত করিয়া ফেলিয়া যথেচ্ছা বিচরণ করিতে চায়; ইহাতে যে বিপদই ঘটুক-না-কেন তাহারা ভাবে না। এই উভয় দলেই কিছু অন্যায় বাড়াবাড়ি করিয়া থাকেন। নিতান্তই যুক্তির নির্দিষ্ট চারটি দেয়ালের মধ্যে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়ানো মনের স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো নহে, আবার সর্বতোভাবে যুক্তিকে অমান্য করিয়া যথেচ্ছাচার করিয়া বেড়ানোও ভালো নয়। যুক্তির সীমানা ছাড়াইয়া যে নিরাপদ স্থান নাই, এমত নহে। অতএব মাঝে মাঝে যুক্তির অনুমতি লইয়া কল্পনার রাজ্যে খুব খানিকটা ছুটিয়া বেড়াইয়া আসা উচিত। এইরূপে যুক্তিকে কাজ হইতে অব্যাহতি দিয়া মাঝে মাঝে ছুটি দিলে তাহার শরীরের পক্ষেও ভালো।

'সিদ্ধি খাইলে বুদ্ধি বাড়ে।' অর্থাৎ বুদ্ধি-দরোয়ান সিদ্ধিটি খাইলে থাকে ভালো। অল্প পরিমাণে সিদ্ধি খাইলে ভালো থাকে বটে, কিন্তু অধিক পরিমাণে খাইলে খুব বলবান দরোয়ান নহিলে সামলাইতে পারে না; মাথা ঘুরিয়া যায়, ভোঁ হইয়া পড়ে। অল্প সিদ্ধি খাইলে সাবধানিতা বাড়ে, কিন্তু অধিক সিদ্ধি খাইলে এমন যশের নেশা লাগিতে পারে যে, একেবারে অসাবধানী হইয়া পড়া সম্ভব। শুনিয়াছি সিদ্ধি ও ভাঙে প্রভেদ নাই। হিন্দুস্থানীতে যাহাকে ভাঙ্ বলে বাঙালিরা তাহাকেই সিদ্ধি বলে। জাতি বিশেষে এইরূপ হওয়াই সম্ভব। একটি জাতির পক্ষে নেশা করিয়া, উদ্যম হারাইয়া, অচেতন হইয়া পড়িয়া থাকায় সিদ্ধি, অর্থাৎ চরম ফল, সেইটি হইলে সে চূড়ান্ত মনে করে; আর-একটি জাতির পক্ষে নেশা করিয়া অজ্ঞান হইয়া থাকা ভাঙ্ মাত্র; অর্থাৎ অবসরমতো একটু একটু কাজে ভঙ্গ দেওয়া, সচরাচর অবস্থা, স্বাভাবিক অবস্থা হইতে একটু বিক্ষিপ্ত হওয়া। যাহা হউক, আমাদের বুদ্ধির দরোয়ানদের মধ্যে সিদ্ধি ও ভাঙ্ দুই এক পদার্থ নহে। উভয়ের ফল বিভিন্ন। সিদ্ধিতে উত্তেজিত উল্লাসিত করিয়া তুলে, ভাঙেতে অবসন্ন ম্রিয়মাণ করিয়া দেয়। লেখকের দরোয়ানটা ক্রমিক ভাঙ্ খাইয়া আসিতেছে। সে বেচারির কপালে সিদ্ধি আর জুটিল না।

দরোয়ানদের আর-একটা কাজ আছে। লাঠালাঠি করা, দাঙ্গা-হাঙ্গামা করা। আমোদের জন্যও বটে, কাজের জন্যও বটে। এক-এক জন এমন দাঙ্গাবাজ লোক আছে, তাহারা তাহাদের লাঠিয়াল দরোয়ানটাকে সভাস্থলে, নিমন্ত্রণে, যেখানে-সেখানে লইয়া যায়, সামান্য সূত্র পাইলেই অমনি অন্যের দরোয়ানের সঙ্গে মারামারি বাধাইয়া দেয়। এই লোকগুলা অত্যন্ত অসামাজিক। একটা দরোয়ানকে কাছে হাজির রাখা দোষের নহে, কিন্তু ছুতানাতা ধরিয়া, যখন-তখন যেখানে-সেখানে একটা তর্কের লাঠি চালাইতে হুকুম দেওয়া মনের একটা অসভ্য অসামাজিক ভাব। নিজের বুদ্ধিকে যাহারা ভেড়া মনে করে, তাহারাই বুদ্ধিকে লইয়া এইরূপ ভেড়ার লড়াই করিয়া বেড়াক। কিন্তু যাহারা ভেড়া-বুদ্ধি নহে তাহারা যেন উহাদের অনুকরণ না করে। উহারা এমনতরো দাঙ্গাবাজ যে, দাঙ্গা করিবার কিছু না থাকিলে দেয়ালে ঢুঁ মারিয়া থাকে। সর্বত্রই এমনতরো বাহাদুরি করিয়া বেড়ানো সুরুচি-সংগত নহে।

এক-এক জনের দেউড়িতে এমন এক-একটা লম্বাচৌড়া দরোয়ান আছে, তাহাকে কেহ কখনো লড়িতে দেখে নাই, অথচ তাহাকে মস্ত পালোয়ান বলিয়া লোকের ধারণা। মুখে মুখে তাহার খ্যাতি সর্বত্র বিস্তৃত হইয়া গিয়াছে; কী করিয়া যে হইল, তাহার ঠিকানা পাওয়া যায় না। তাহাকে দরোয়ানেরা দেখে, নমস্কার করে, আর চলিয়া যায়। তাহার এক সুবিধা এই যে, তাহাকে প্রায় লাঠি ব্যবহার করিতে হয় না। অন্য লোকদের বড়ো বড়ো ভাব, বড়ো বড়ো মতসকলকে কেবল চোখ রাঙাইয়া ভাগাইয়া দেয়। যদি দৈবাৎ কেহ সাহস করিয়া তাঁহার সঙ্গে লড়াই করিতে যায়, তবেই তাঁহার সর্বনাশ। এক-একটা দরোয়ান আছে, গায়ে ভয়ানক জোর, কিন্তু সাহস কম; কোনো মতেই কুস্তিতে অগ্রসর হইতে চাহে না। কিন্তু কোনো কোনো দরোয়ানের গায়ে জোর কম থাকুক, এত প্রকার কুস্তির প্যাঁচ জানে যে, অপেক্ষাকৃত বলবানদেরও পাড়িয়া ফেলিতে পারে।

যাঁহারা দেউড়ির উন্নতি করিতে চান তাঁহারা দরোয়ানদের ভালো আহার দিবেন, মাঝে মাঝে ছুটি দিবেন, দিনরাত্রি অকর্মণ্য করিয়া রাখিবেন না, আর মদ খাইতে না দেন। আমরা যেরূপ শিশু-প্রকৃতি, যাহা তাহা বিশ্বাস করি, সকলই সমান চক্ষে দেখি; আমরা যে বিপদের দেশে আছি, নানা চরিত্রের, নানা ব্যবসায়ের লোকের মধ্যে বাস; এখানে ভালো দরোয়ান রাখা নিতান্তই আবশ্যক। তাহা ছাড়া, নিতান্ত স্বার্থপর হইয়া নিজের দরোয়ানকে যেন কেবলমাত্র নিজের কাজেই নিযুক্ত না রাখি, আবশ্যকমতো পরের সাহায্য করিতে দেওয়া সামাজিক কর্তব্য। আমাদের দেশে অতি পূর্বকালে পুলিসের পদ্ধতি ছিল। ব্রাহ্মণ, ঋষি ইন্‌স্পেক্টরগণ নিজের নিজের কনস্টেবল লইয়া বাড়ি বাড়ি, রাস্তায় রাস্তায়, হাটে-বাজারে, চোর-ডাকাত তাড়াইয়া

বেড়াইতেন। তাঁহাদের বেতন ছিল, ওই কাজেই তাঁহারা নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু ইহার একটু কুফল এই হয় যে, স্বার্থ-সাধন উদ্দেশে বা ভুল বুঝিয়া ইন্‌স্পেক্টরগণ যথার্থ ভদ্রলোকদের প্রতিও উৎপীড়ন করিতে পারেন। শুনা যায় তাঁহারা সেইরূপ অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত বৌদ্ধদলেরা খেপিয়া এমন পুলিস ঠেঙাইতে আরম্ভ করিয়াছিল যে, কন্‌স্টেবলগণ ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়িয়াছিল। কিন্তু বিদ্রোহী-দল বেশি দিন টিকিতে পারে নাই। অবশেষে তাহারা নির্বাসিত হইয়াছিল। আজকাল এরূপ পুলিসের পদ্ধতি নাই। সুতরাং সাধারণের উপকারার্থে সকলকেই নিজের নিজের দরোয়ানকে মাঝে মাঝে পুলিসের কাজে নিযুক্ত করা উচিত। দেশে এত শত প্রকার সিঁদেল চোর আছে, রাত্রিযোগে এমন পা টিপিয়া তাহারা গৃহে প্রবেশ করে যে, এরূপ না করিলে তাহাদের শাসন হইবার সম্ভাবনা নাই। আমার দরোয়ানটা রোগা হউক, যাহা হউক, তাহাকে এইরূপ অনরারি পুলিস কন্‌স্টেবলের কাজে নিযুক্ত করিয়াছি। অনেক সময়ে লড়াই করিয়া সে বেচারি পারিয়া উঠে না, বলবান দস্যুদের কাছ হইতে লাঠি খাইয়া অনেকবার অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু তথাপি তাহার উদ্যম ভঙ্গ হয় নাই।

ভারতী
ভাদ্র ১২৮৮

জীবন ও বর্ণমালা

আমাদের পণ্ডিত মহাশয়ের এমনি খরদৃষ্টি (বলা বাহুল্য, 'খরদৃষ্টি' ষষ্ঠী তৎপুরুষ নহে) যে তাঁহার দৃষ্টির সম্মুখে একটি তৃণ পর্যন্তও এড়ায় না। তিনি সকলেরই মধ্যে গূঢ় অর্থ দেখিতে পান। যে যেমন ভাবেই কথা কহুক-না-কেন, তিনি তাহার মধ্য হইতে এমন একটি ভাব বাহির করিতে পারেন, যাহা বক্তার ও শ্রোতার মনে কস্মিন কালেও উদয় হয় নাই। ইহাকেই বলে প্রতিভা! প্রতি সামান্য কথার অসামান্য অর্থসকল বাহির করিয়া সংসারে তিনি এত অনর্থের উৎপত্তি করিয়াছেন যে, এ বিষয়ে কেহ তাঁহার সমকক্ষ হইতে পারে না। সাধারণ যশের কথা! এই অতি উদার মহৎ গুণ প্রতিপদে চালনা করিতে করিতে দৈবাৎ মাঝে মাঝে এক-একটা অতি নিরীহ কার্যও তিনি সাধন করিয়া থাকেন। সম্প্রতি তিনি বর্ণমালার গূঢ় অর্থ বাহির করিয়াছেন অথচ তাহাতে কাহারো সর্বনাশ করা হয় নাই এই নিমিত্ত তাহা সংক্ষেপে পাঠকদের উপহার দিব।

এই পণ্ডিত-প্রবর আজ পঁচিশ বৎসর, বর্ণজ্ঞানশূন্য শিশুদের কর্ণধার হইয়া তাহাদিগকে জ্ঞান-তরঙ্গিণী পার করিয়া আসিতেছেন। যদি কোনো শিশু বিস্মৃতির ভাটায় এক পা পিছাইয়া পড়ে, তবে তাহার কর্ণ ধরিয়া এমন সুন্দর ঝিঁকা মারিতে পারেন যে, সে আর এগোইবার পথ পায় না। 'উঃ' 'ইঃ' 'আঃ' প্রভৃতি স্বরবর্ণগুলি অতি সহজে, সতেজে ও সমস্ত মনের সহিত উচ্চারণ করাইবার জন্য তিনি অতি সহজ কতকগুলি কৌশল উদ্ভাবন করিয়াছেন। অতএব বর্ণমালা সম্বন্ধে ইঁহার কথাগুলি বিনা উত্তরে শিরোধার্য করা উচিত।

লিখিত ভাষা-বিশেষ পড়িবার জন্য যে বর্ণমালা বিশেষ উপযোগী তাহা নহে। তাহাতে জাতীয় জীবন প্রতিবিম্বিত থাকে। একটা উদাহরণ দিলেই সমস্ত স্পষ্ট হইবে। ইংরেজদের ও আমাদের বিবাহ পদ্ধতির কী প্রভেদ, তাহা দেখিতে মনুও খুলিতে হইবে না, ইতিহাসও পড়িতে হইবে না; বর্ণমালা অনুসন্ধান করিয়া দেখো, বাহির হইয়া পড়িবে। ইংরাজি বর্ণমালায় 'L' অক্ষরের পর 'M' অর্থাৎ Love-এর পর Marriage। আমাদের বর্ণমালায় 'ব'-এর পর 'ভ অর্থাৎ বিবাহের পর ভালোবাসা। ইহার উপরে আর কথা আছে? আসল কথা এই, সমাজ যে নিয়মে গঠিত হয়, বর্ণমালাও সেই নিয়মে গঠিত হয়।

যাহা হউক, কয়েক বৎসর ধরিয়া পণ্ডিত মহাশয় তাঁহার বিশাল নাসাগহ্বরে এক-এক টিপ

করিয়া নস্য নামাইয়াছেন ও বর্ণজ্ঞান-সমুদ্র হইতে এক-এক রাশি রত্ন তুলিয়াছেন। পাঠকদিগকে তাহার নমুনা দেওয়া যাইতেছে।

আমাদের বর্ণমালায় পাঁচটি বর্গ আছে, আমাদের জীবনেও পাঁচ ভাগ আছে। কবর্গ, চবর্গ, টবর্গ, তবর্গ, পবর্গ; শৈশব, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়, বার্ধক্য।

কবর্গ, অর্থাৎ শৈশব। (কাঁ)দা, (খে)লা, (গে)লা, (ঘা)লাগা ও উ আঁ(ঙ) করা; ইহার অধিক আর কিছুই নহে।

চবর্গ, কৈশোর। এখন আর গিলিতে হয় না, (চি)বাইতে শিখিয়াছে; গড়াইতে হয় না, (চ)লিতে শিখিয়াছে; (ছু)টাছুটি করিতে পারে। সামাজিকতার বিকাশ আরম্ভ হইয়াছে। পাঁচ জন সমবয়স্কে মিলিয়া (জ)ড়ো হইতে শিখিয়াছে। কিন্তু প্রথম সামাজিকতার আরম্ভে (ঝ)গড়া হইবেই। অসভ্যদের মধ্যে দেখো। তাহারা একত্র হইয়া ঝগড়া করে, ঝগড়া করিতেই একত্র হয়। দ্বন্দ্ব শব্দের অর্থ মিলন ও বিবাদ উভয়ই। সামাজিকতা শব্দের অর্থও কতকটা সেইরূপ। বালকেরা ঝগড়া আরম্ভ করিয়াছে। এবং পরস্পরের মধ্যে ঈঁ অঁ(ঞ) নামক একটা কুঁজ-বিশিষ্ট বক্র-ভাবের ও তদনুযায়ী মুখভঙ্গির আদান-প্রদান চলিতেছে।

টবর্গ বা যৌবন। এইবার যথার্থ জীবনের আরম্ভ। ইহা পাঁচ বর্গের মধ্যবর্গ। ইহার পূর্বে দুইটি বর্গ জীবনের ভূমিকা; ইহার পরে দুইটি বর্গ জীবনের উপসংহার। এবং এই বর্গই জীবন। এইবার (ট)লমল করে তরী; এ পথে যাইব কী ও পথে যাইব? পথে বিষম (ঠে)লাঠেলি; ভিড়ের মধ্যে সকলেই পথ করিয়া লইতে চায়! (ঠো)কর খাইতেছে (ঠে)কিয়া শিখিতেছে বা শিখিতেছে না। বন্ধন আরম্ভ হইতেছে; যশের (ডো)রে, প্রেমের (ডো)রে, চির-উদ্দীপিত আশার (ডো)রে মন বাঁধা পড়িতেছে। যশেরই হউক আর অপযশেরই হউক, চারি দিকে (ঢা)ক (ঢো)ল বাজিতেছে। চোখে নিদ্রা নাই, মাঝে মাঝে (ঢু)লিয়া থাকে মাত্র। ইহা একটি ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকির কাল। যৌবন কাল টঠ অক্ষরের ন্যায় কঠিন দৃঢ়প্রতিষ্ঠ। 'ক' ও 'চ'-র ন্যায় কচি নহে 'ত'য়ের ন্যায় শিথিল নহে, 'প ফ'য়ের ন্যায় একেবারে ওষ্ঠাগত নহে।

তবর্গ বা প্রৌঢ়। 'ট'য়ে যাহা কঠিন ছিল, 'ত'য়ে তাহা শিথিল (ত)লতোলে হইয়া পড়িয়াছে। এখন (ত)লাইয়া বুঝিবার কাল। যৌবনে উপরে উপরে যাহা চক্ষে পড়িত, তাহাই খাঁটি বলিয়া মনে হইত, এখন না (ত)লাইয়া কিছু বিশ্বাস হয় না। মনের দরজায় একটা (তা)লা পড়িয়াছে। যৌবনে এক মুহূর্তের তরে দ্বার বন্ধ করা মনে আসিত না; সেই অসাবধানে বিস্তর লোকসান হইয়াছে, এমন-কি, আস্ত মনটি চুরি গিয়াছে এবং সেই ডাকাতির সময় মনের সুখ শান্তি সমুদয় ভাঙিয়া চুরিয়া একেবারে নাস্তানাবুদ হইয়া গিয়াছে। কেহ-বা হারানো মন ভাঙাচোরা অবস্থায় উদ্ধার করিতে পারিয়াছেন, কেহ-বা পারেন নাই, আস্তে আস্তে দুয়ারে তালা লাগাইয়াছেন। ইঁহাদের মন (থি)তাইয়া আসিয়াছে, এক জায়গায় আসিয়া (দাঁ)ড়াইয়াছেন; মত বাঁধিয়াছেন, সংসার বাঁধিয়াছেন, ছেলেমেয়েদের বিবাহে বাঁধিয়াছেন। মাঝে মাঝে একটা একটা (ধা)ক্কা খাইতেছেন; (যৌবনের ন্যায় সামান্য ঠোকর খাওয়া নহে) উপযুক্ত পুত্র মরিয়া গেল, জামাই যথেচ্ছাচারী হইয়া গিয়াছে, দেনায় বিষয় যায় যায়। অবশেষে তাহার মন (ন)রম হইয়া আসিয়াছে, তাহার শরীর মন (নু)ইয়া পড়িয়াছে। তবর্গে লোকে (তা)স্ খেলে, (তা)মাক খায়, (দা)লানে বসিয়া (দ)লাদলি করে, (নি)ন্দা করে ও (নি)দ্রা যায়। যৌবনে ঢুলিত মাত্র, এখন (নি)দ্রা আরম্ভ হইয়াছে। যাহা হউক, দন্ত্য ন শেষ হইল, দন্তেরও শেষ হইল।

পবর্গ বা বার্ধক্য। প্রৌঢ়ে যাহা নুইতে আরম্ভ করিয়াছিল, এখন তাহার (প)তন হইল। পতিত বৃক্ষকে যেমন সহস্র লতায় চারি দিক হইতে জড়াইয়া ধরে, তেমনি সংসারের সহস্র (ফাঁ)দে বৃদ্ধকে চারি দিক হইতে আচ্ছন্ন করে; ছেলে, মেয়ে, নাতি, নাতনী ইত্যাদি। (বি)রাম, (বি)শ্রাম। (ভ্রা)ন্তি, (ভ)য়, (ভ)র, (ভি)ক্ষা ও অবশেষে (ম)রণ। ঢোলা নয়, নিদ্রা নয়, মহা নিদ্রা।

মানুষ (ক)(র্ম)-ক্ষেত্রে নামিল— ক হইতে আরম্ভ করিল, ম-য়ে শেষ করিল। কাঁদিয়া জন্মিল, ক্রন্দনের মধ্যে অপসারিত হইল। কিন্তু মানুষের এই সমগ্র জীবন আরম্ভ ক-বর্গের মধ্যে প্রতিবিম্বিত আছে। ক-বর্গে কী কী আছে? কাঁদা, খেলা, গেলা, ঘা লাগা ও উঁ আঁ করা। প্রথম কাঁদা, শৈশবের ক্রন্দন, দ্বিতীয় খেলা, কৈশোরের খেলা। তৃতীয় গেলা অর্থাৎ ভোগ, যৌবনের ভোগ। চতুর্থ ঘা লাগা, প্রৌঢ়ের শোক। পঞ্চম উঁ আঁ করা, বৃদ্ধের রোগ; বৃদ্ধের বিলাপ। জীবনের ভোজ অবসান হইলে যে-সকল ছেঁড়া পাত ভাঙা পাত্র, বিক্ষিপ্ত উচ্ছিষ্ট ইতস্তত পড়িয়া থাকে, তাহাও ক-বর্গের মধ্যে গিয়া পড়ে, যথা— (কা)ঠ, (খা)ট, (গ)ঙ্গার (ঘা)ট ও বিলাপের উঁ আঁ শব্দ। আরম্ভের সহিত অবসানের এমনি নিকট সম্বন্ধ!

অ আ প্রভৃতি স্বরবর্ণগুলি আমাদের জীবনের অনুভাবসমূহ। এগুলি ব্যতীত কোনো ব্যঞ্জনবর্ণ দাঁড়াইতে পারে না। জীবনের যে-কোনো ঘটনা ঘটুক-না তাহার সহিত একটা অনুভাবের স্বরবর্ণ লিপ্ত আছেই। কখনো বা তৃপ্তিসূচক আ, কখনো বা তীব্র যন্ত্রণা-সূচক ই, কখনো বা গভীর যন্ত্রণা-সূচক উ, আমাদের ঘটনার ব্যঞ্জনবর্ণে যুক্ত হয়। মর্ত্য-জীবনের বর্ণমালায় সমুদয় ব্যঞ্জনবর্ণের সহিত অভাব-সূচক 'অ' লিপ্ত থাকে। তাহাই তাহার মূল সহচর। অদৃষ্ট আমাদের এই-সকল অক্ষর সাজাইয়া এক-একটা গ্রন্থ রচনা করিতেছে। কাহারো বা কাব্য হয়, কাহারো বা দর্শন হয়, কাহারো বা ছাড়া ছাড়া অর্থহীন কতকগুলা অক্ষর-সমষ্টি হয় মাত্র, দেখিয়া মনে হয়, তাহার অদৃষ্ট হাত-পাকাইবার জন্য চিরজীবন কেবল মক্‌শো করিয়াই আসিতেছে, পদরচনা করিতে আর শিখিল না! এই-সকল রচনার খাতা হাতে করিয়া বোধ করি পরলোকে মহাগুরুর নিকটে গিয়া একদিন দাঁড়াইতে হইবে; তিনি যাহাকে যে শ্রেণীর উপযুক্ত বিবেচনা করিবেন, উত্তীর্ণ করিয়া দিবেন।

বিষয়টা অত্যন্ত শোকাবহ হইয়া দাঁড়াইল। আমাদের আলংকারিকেরা বিয়োগান্ত নাটকের বিরোধী। তবে কেন আমাদের বৈয়াকরণিকেরা এমনতরো বিয়োগান্ত করুণ রসোদ্দীপক বর্ণমালার সৃষ্টি করিলেন? কিন্তু পাঠকেরা ভুলিয়া গেছেন, আমাদের সাহিত্যে পাঁচ অঙ্কেই নাটক শেষ হয় না, আরো দুটো অঙ্ক বাকি থাকে। পাঁচটা বর্গেই আমাদের বর্ণমালা শেষ হয় না, আরো দুটো বর্গ থাকে। মরণেই আমাদের জীবন-পুস্তকের সমাপ্তি নহে; তাহা একটা পদের পর একটা দাঁড়ি মাত্র। অমন কত সহস্র পদ আছে, কত সহস্র দাঁড়ি আছে কে জানে? অবশিষ্ট দুটি বর্গের কথা পরে বলিব; আপাতত পাঠকদিগকে আশ্বাস দিবার জন্য এইটুকু বলিয়া রাখি 'হ'য়ে আমাদের বর্ণমালা শেষ। হ অর্থে হওয়া, মরা নহে। অতএব বিলাপ করিবার কিছুই নাই। আমাদের ব্যঞ্জনবর্ণ আমাদের নাটকের ন্যায় (কাঁ)দায় আরম্ভ (হা)সায় শেষ।

আমাদের বর্ণমালা 'অহং' শব্দের একটি ব্যাখ্যা। অ-য়ে ইহার আরম্ভ, হ-য়ে ইহার শেষ!

ভারতী
আশ্বিন-কার্তিক ১২৮৮

রেল গাড়ি

আমরা মনে করি, বিশ্বাসের উপর কিছুমাত্র নির্ভর না করিয়া কেবলমাত্র যুক্তির হাত ধরিয়া আমরা জ্ঞানের পথে চলিতে পারি। অনেক ন্যায়রত্ন এই বলিয়া গর্ব করেন যে— সমস্ত জীবনে তাঁহারা যত কাজ করিয়াছেন, তাহাতে বিশ্বাসের কোনো হাত নাই। ইঁহারা ইহা বুঝেন না যে, বিশ্বাস না থাকিলে যুক্তি এক দণ্ড টিকিয়া থাকিতে পারে না। যুক্তিকে বিশ্বাস করি বলিয়াই তাহার এত জোর, নহিলে সে কোথাকার কে? যুক্তিকে কেন বিশ্বাস করি, তাহার একটা যুক্তি কেহ দেখাইতে পারে? কেহই না। অতএব দেখা যাইতেছে যুক্তির উপর আমাদের একটা যুক্তিহীন বিশ্বাস, অন্ধ বিশ্বাস আছে। আমরা দৃশ্যমান পদার্থকে বিশ্বাস করি কোন্ যুক্তি

অনুসারে? স্পৃশ্যমান বস্তুর উপরে অটল বিশ্বাস স্থাপন করি কোন্ যুক্তি অনুসারে? তথাপি আমাদের বিশ্বাস, যুক্তিই সর্বেসর্বা, বিশ্বাস কেহই নয়। ইহা হইতে একটা তুলনা আমার মনে পড়িতেছে। যুক্তি হচ্ছে, স্টিম-এঞ্জিন, আর বিশ্বাস হচ্ছে রেলের রাস্তা। বিশ্বসুদ্ধ লোকের নজর এঞ্জিনের উপরে; সকলে বলিতেছে— 'বাহবা, কী কল বাহির হইয়াছে! অত বড়ো গাড়িটাকে অবাধে টানিয়া লইয়া যাইতেছে।' নীচে যে একটা রেল পাতা রহিয়াছে, ইহা কাহারো চোখে পড়ে না, মনেও থাকে না। বিশ্বাসের রেলের উপর একটা বাধা স্থাপন করো, একটা গাছের গুঁড়ি ফেলিয়া রাখো, অমনি গাড়ি থামিয়া যায়; দুটি ক্ষুদ্র নুড়ি রাখিয়া দেয়, অমনি গাড়ি উল্টাইয়া পড়ে, ইহা কেহ মনে ভাবিয়া দেখে না কেন? যেখানে বিশ্বাসের রেল, সেইখানেই যুক্তির গাড়ি চলে, যে রাস্তায় রেল পাতা নাই, সে রাস্তায় চলে না, ইহা কাহারো মনে হয় না কেন? তাহার কারণ আর-কিছু নয়; স্টিম-এঞ্জিনটা বিষম শব্দ করে, তাহার একটা সারথি আছে, তাহার শরীর প্রকাণ্ড, তাহার মধ্যে কত-কী কল উঠিতেছে, পড়িতেছে, এগোইতেছে, পিছাইতেছে; তাহার চোখ দিয়া আলো, নাক দিয়া ধোঁয়া বাহির হইতেছে; পদভরে মেদিনী কম্পমান। আর, রেল কত দিন হইতে পাতা রহিয়াছে, কে পাতিয়াছে, তাহার ঠিকানা নাই; অধিক শব্দ করে না, বরঞ্চ শব্দ নিবারণ করে; নিঃশব্দে রাস্তা দেখাইয়া দেয়, বহন করিয়া লইয়া যায়। সে পথ, সে বিঘ্ন-অপহারক সে ধ্রুব, নিশ্চল, পুরাতন, ভারবহ। সে কাহারো নজরে পড়ে না; আর, একটা ধূমন্ত, ফুঁসন্ত, জ্বলন্ত, চলন্ত পদার্থকে সকলে সর্বেসর্বা বলিয়া দেখে।

রেলের গাড়ির তুলনা যদি উঠিলে, তবে ও বিষয়ে যত কথা উঠিতে পারে, উঠানো যাক। সাহিত্যের রেল গাড়িতে ভাবগণ বা ভাবুকগণ আরোহী। যশের এঞ্জিনে কালের রাস্তায় চলিতেছে। যে যত মূল্য দিয়াছে, সে তত উচ্চ-শ্রেণীতে স্থান পাইয়াছে, কেহ ফার্স্ট ক্লাসে, কেহ সেকেন্ড ক্লাসে, কেহ থার্ড ক্লাসে। যে যত মূল্য দিয়াছে, সে সেই পরিমাণে দূরে যাইতে পারিবে। কোন্ কালে বাল্মীকি ফার্স্ট ক্লাসে টিকিট লইয়া গাড়িতে চড়িয়াছেন, এখনও পর্যন্ত তাঁহার স্টেশন ফুরায় নাই। আমাদের ক্ষীণ দৃষ্টি যতদূর চলে ততদূর চালনা করিয়া কিয়ৎ পরিমাণে অলংকার দিয়া এইরূপ বলিতে পারি যে, যেখানে কালের Terminus— যাহার ঊর্ধ্বে আর স্টেশন নাই, যে স্টেশনে চন্দ্র সূর্য গ্রহ নক্ষত্র আসিয়া থামিবে, সেই স্টেশনে যাইবার টিকিট তিনি ক্রয় করিয়াছেন। গাড়ির গার্ড পাঠক সম্প্রদায়, সমালোচক। ইঁহারা যে নিজের কাজ যথেষ্ট মনোযোগ দিয়া করেন না, তাহা সকলেই জানেন। আরোহীদের প্রতি সর্বদাই বিশেষ অন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকেন। কত শত ভাব তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট কিনিয়া গোলমালে প্রথম শ্রেণীতে উঠিয়া পড়ে; সকলেই তাহাকে খাতির করে, সেলাম করে, অভ্যর্থনা করে। এমন দু-এক স্টেশনে গিয়া কেহ কেহ ধরা পড়ে, গার্ড তৎক্ষণাৎ তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া বাহির করে, তাহার যথোপযুক্ত গাড়িতে উঠাইয়া দেয়; কেহ কেহ এমন কত স্টেশন পার হইয়া যায় কেহ খোঁজ লয় না। ইহা তো কেবলমাত্র অমনোযোগিতা, কিন্তু গার্ডেরা ইহা অপেক্ষাও অন্যায় কাজ করিয়া থাকেন। আলাপ থাকিলে, বন্ধুতা থাকিলে অনেক থার্ড ক্লাসকে ফার্স্ট ক্লাসে চড়াইয়া দেন। এমন তো সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, নালিশ করি কাহার কাছে? যিনি দোষী, তিনিই বিচারক। কত শত মুখচোরা, ভীরুস্বভাব, সংকোচ-পরায়ণ বেচারি ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট কিনিয়া, ভিড়ে, গোলেমালে, ঠেলাঠেলিতে শশব্যস্ত হইয়া থার্ড ক্লাসে উঠিয়া পড়েন, কত শত স্টেশন পার হইয়া সহসা গার্ডের নজরে পড়েন ও তাঁহারা উপযুক্ত শ্রেণীতে স্থান পান। এই-সকল বে-বন্দোবস্ত কোনো কালে যে দূর হইবে, এমন ভরসা হয় না। সকল বিষয়েই দেখো, জগতে মূল্য দিয়া তাহার উপযুক্ত সামগ্রী খুব কম লোকেই পাইয়াছে; হয় দোকানদার তাহাকে ঠকাইয়াছে, নয়, সে দোকানদারকে ঠকাইয়াছে। এ-সকল কেবল অসাবধানিতার ফল। যত দিন রেলগাড়ি থাকিবে, তত দিন শত শত ফার্স্ট ক্লাসের আরোহী থার্ড ক্লাসে চড়িবে, থার্ড ক্লাসের আরোহী ফার্স্ট ক্লাসে চড়িবে, ইহা নিবারণের উপায় দেখিতেছি না। কিন্তু ইহা অপেক্ষা আর-একটা আমার দুঃখ আছে।

রেলোয়ের কর্মচারীগণ বিনা টিকিটে সেকেন্ড ক্লাসে ভ্রমণ করিতে পারেন। তাঁহারা চিরদিন পরের টিকিট সমালোচনা করিয়াই কালযাপন করিয়াছেন, নিজে একখানি টিকিটও ক্রয় করেন নাই। ইহা কি সত্য নয় যে, তিনি নিজে আপনাকে যত বড়ো ব্যক্তিই মনে করুন-না, যতক্ষণে না তিনি ট্যাকের পয়সায় টিকিট কিনিবেন, ততক্ষণে তিনি চতুর্থ শ্রেণীর আরোহী অপেক্ষাও অল্প সম্মান পাইবার যোগ্য। কিন্তু এই সমালোচকবর্গ যে বিনা পয়সায় দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট-ক্রেতাদিগের সমতুল্য সম্মান পাইয়া থাকেন, ও অহংকারে এতখানি ফাঁপিয়া উঠেন যে, পাঁচটা আরোহীর জায়গা একা জুড়িয়া বসেন, ইহা সর্বতোভাবে ন্যায়-বিরুদ্ধ। অনেকে বিনা টিকিটে অসংকোচে গাড়িতে চড়িয়া বসেন, ভাব দেখিয়া সকলেই মনে করে, অবশ্য ইহার কাছে টিকিট আছে, কেহ সন্দেহও করে না, জিজ্ঞাসাও করে না। গার্ড দেখিল, তাঁহার পাকা দাড়ি, পাকা চুল; অনেকদিন হইতে ফার্স্ট ক্লাসে চড়িয়া আসিতেছেন; তাঁহাকে টিকিটের কথা জিজ্ঞাসা করিতে প্রবৃত্তিও হইল না সাহসও হইল না। কাহারো বা হীরার আংটি, ঘড়ির চেন, জরির তাজ দেখিল— আর টিকিট দেখিল না। সাহিত্য রেলোয়ে কোম্পানিতে এইরূপ বহুবিধ অনিয়ম ঘটিতেছে; আমি বরাবর বলিয়া আসিতেছি, যত বড়ো লোকই হউন-না-কেন টিকিট নিতান্ত মনোযোগ সহকারে আলোচনা না করিয়া কাহাকেও ছাড়া উচিত নহে। কিন্তু অত পরিশ্রম করে কে? আবার, অধিক কড়াক্কড় করিলেও নিন্দা হয়।

যাঁহারা টিকিট কিনিয়া ট্রেন মিস্ করেন, তাঁহাদের জন্য বড়ো মায়া করে। তাঁহারা ঠিক সময়ে আসেন নাই। সময়মাফিক আসিয়াছিল বলিয়া কত থার্ড ক্লাসের লোক গাড়িতে উঠিল, এমন-কি, কত লোক টিকিট না কিনিয়াও গাড়িতে উঠিল; অসময়ে আসিয়াছেন বলিয়া কত ফার্স্ট ক্লাসের লোক পড়িয়া রহিলেন। যাহা হউক, তাঁহাদের জন্য ভবিষ্যৎ আছে, দ্বিতীয় ট্রেন আসিলে তাঁহারা চড়িতে পাইবেন। কিন্তু ইঁহাদের অনেকে বিরক্ত, ক্ষুব্ধ হইয়া বাড়িতে ফিরিয়া যান, স্টেশনে অপেক্ষা করেন না। এইরূপে কত প্রথম শ্রেণীর ব্যক্তি বিরক্ত হইয়া তাঁহাদের টিকিট ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছেন, পকেটে পয়সা আনিয়া টিকিট ক্রয় করেন নাই, তাঁহাদের সংখ্যা গণনা কে করিবে? জেফ্রি যে ট্রেনে গার্ড ছিলেন, বাইরন যে ট্রেনে আরোহী ছিলেন, সেই ট্রেন ধরিবার জন্য ওয়ার্ড্‌স্বার্থ ও শেলী স্টেশনে উপস্থিত হইলেন, কিন্তু তখন গাড়ি দ্রুতবেগে চলিয়াছে; তাঁহারা ট্রেন মিস্ করিলেন; দ্বিতীয় ট্রেন আসিলে পর তাঁহারা স্থান পাইলেন। আমাদের বঙ্গীয় সাহিত্যে সম্প্রতি যে ট্রেন চলিতেছে, অনেক বড়ো বড়ো ব্যক্তি সে ট্রেনটা মিস্ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা কেন নিরাশ হইতেছেন? দশ মিনিট সবুর করুন আর-একখানা ট্রেন এল বলে!

বঙ্গীয় সাহিত্য ট্রেনে ফার্স্ট সেকেন্ড ক্লাসে আরোহী নিতান্তই কম, অন্যান্য ক্লাসে অত্যন্ত ভিড়। এই নিমিত্ত গার্ডেরা বাছিয়া বাছিয়া দুই-এক জনকে ফার্স্ট ক্লাসে বসিতে দেয়। তাহারা যদিও ফার্স্ট ক্লাসে বসিয়াছে, তথাপি গার্ড জানে যে, তাহারা থার্ড ক্লাসের আরোহী। তাহাদের বলে, বাংলার মিল্‌টন, বাংলার বাইরন, বাংলার ফসেট্‌ ইত্যাদি, অথচ মনে মনে সকলেই জানে যে, তাহারা মিল্‌টন, বাইরন, ফসেটের সমতুল্য নহে; অনুগ্রহ করিয়া এক ক্লাসে বসিতে দিয়াছে মাত্র। কিন্তু এমন করিবার আবশ্যক কী? ইহাতে বুদ্ধিমান লোকের নিতান্ত সংকোচ জন্মিবার কথা। তাহাদের জন্য স্বতন্ত্র গাড়ির বন্দোবস্ত করিয়া দিলেই তো ভালো হয়।

বঙ্গীয় সাহিত্য কোম্পানিতে, খুচরা, টুকরা মাল-বোঝাই গোটা কতক মালগাড়ি অর্থাৎ খবরের কাগজ, একরকম বেশ চলিতেছে। কিন্তু ভাব-আরোহীদিগের জন্য আরোহী-শকট অর্থাৎ মাসিক প্রবন্ধ-পত্র ভালো চলিতেছে না। গাড়ি চলিবার জন্য এঞ্জিনে শ্বেতবর্ণ খনিজ কয়লার আবশ্যক। কোথায় পাইবে বলো! সাহিত্য এঞ্জিন কেন, দেশে সহস্র এঞ্জিন বেকার পড়িয়া আছে ভারতবর্ষের রাজা-গঞ্জে রানী-গঞ্জে কয়লা যে নাই, এমন নহে, কিন্তু এত গভীর অকালে নিহিত যে, সহস্র মাথা খুঁড়িলেও পাইবার কোনো সম্ভাবনা নাই। আর এক উদ্যমের কয়লা আছে, তাহাও বাংলা দেশে এমন বিরল ও বাংলার কয়লার এত অধিক ধোঁয়া হয় ও এত কম আগুন

জ্বলে যে, দুই পা গিয়াই গাড়ি চলে না। আমারও কলমের কয়লা ফুরাইয়া গিয়াছে, এইখানেই চলা বন্ধ করিয়াছে; স্টেশন যদিও দূরে আছে, কথা যদিও বাকি আছে, কিন্তু আর লিখিতে পারিতেছি না, কয়লা নিভিয়া গিয়াছে।

ভারতী
অগ্রহায়ণ ১২৮৮

লেখা কুমারী ও ছাপা সুন্দরী

গুটিকতক কবিতা লেখা ছিল, অনেক দিন ধরিয়া খাতায় পড়িয়াছিল, যতই দিন যাইতে লাগিল, ততই সে লেখাগুলিকে ভালো বলিয়া জ্ঞান হইতে লাগিল। অবশেষে সম্প্রতি সেগুলি ছাপা হইয়া গেছে। ধারণা ছিল, নিজের লেখা ছাপার অক্ষরে পড়িতে বুঝি বড়োই আনন্দ হইবে।

কিন্তু কই, তাহা তো হইল না! আজ সমস্তদিন ধরিয়া মুদ্রাযন্ত্রের লৌহগর্ভ হইতে সদ্যপ্রসূত বইখানি হাতে লইয়া এ-পাত ও-পাত করিতেছি, কিছুই ভালো লাগিতেছে না।

লেখাগুলির পানে চাহিয়া চাহিয়া আমার প্রাণ বলিতেছে 'বাছারা, আজ তোদের এমনতর দেখিতেছি কেন? অক্ষরগুলি মাথায় মাথায় সমান, কাষ্ঠের মতো খাড়া দাঁড়াইয়া আছে! একটু কিছুই এদিক-ওদিক হয় নাই। লাইনগুলি সমান, দুই ধারে মার্জিন, উপরে পাতার সংখ্যা। এ-সব তো সিপাহিদের মতো ছোরা-ছুরি-সঙ্গিন ওচানো সার-বাঁধা পোশাক-পরা অক্ষর। এ-সব তো সীসা ঢালা ছাঁচের অক্ষর, যেখানে যত বই দেখি, সকলই তো এইরকম অক্ষরের দেখিতে পাই! আমার সে বাঁকাচোরা সরু-মোটা অক্ষরগুলি কী হইল? কোনোটা-বা শুইয়া, কোনোটা-বা বসিয়া, কোনোটা উপরে, কোনোটা-বা নীচে। সেগুলি তো এমনতর কোণ-ওয়ালা খোঁচা-খোঁচা রেখা-রেখা খাড়া-খাড়া অক্ষর নহে; গোল, মোলায়েম, আঁকাবাঁকা, জড়ানো, অক্ষর। প্রত্যেক অক্ষরগুলি স্ব-স্ব প্রধান নয়। সকলেই সকলের গায়ে পড়িয়া, গলা ধরিয়া, হাতে হাতে জড়াইয়া ঘেঁসাঘেঁসি করিয়া থাকে। তাহাদের পানে চাহিলে ভাবের একটা চেহারা দেখিতে পাওয়া যায়, ভাবটিকে রক্তমাংসের বলিয়া মনে হয়। সে লেখা আমার প্রিয়জনেরা সকলেই ভালো করিয়া জানে, সে লেখা পথের প্রান্তে কুড়াইয়া পাইলেও তাহারা আমার বলিয়া চিনিতে পারে, সে লেখা বিদেশে পাইলে তাহাদের মন আনন্দে নাচিয়া উঠে। তাহারা সে লেখার মধ্যে আমার মুখ দেখিতে পায়, আমার স্পর্শ অনুভব করে, আমার কণ্ঠধ্বনি শুনিতে পায়। সে আমার চিরপরিচিতগণ গেল কোথায়? আর এরা কে রে! এরা তো সব দাসের জাতি। সীসার কঠিন শৃঙ্খলে বাঁধা, ভাবশূন্য মুখে খাড়া রহিয়াছে, টাকার লোভে কাজ করিতেছে। ইহাদের সহিত আমার ভাবের নাড়ির টান নাই, ইহারা আমার ভাবগুলির প্রতি মমতার দৃষ্টিতে চায় না। আমার কাজ সমাধা করিয়া দিয়াই আবার তখনই হয়তো আমার সমালোচকের কাজ করিতে যায়! এ-সকল হৃদয়হীন দাসগুলিকে দেখিয়া আমার মন খারাপ হইয়া গেছে।

ওরে, তোদের সে কাটাকুটিগুলি গেল কোথায়! তোদের সে কালির দাগগুলা যে দেখি না! পূর্বে তো তোদের এমনতর নিখুঁত ভদ্রলোকটির মতো চেহারা ছিল না। ঘরের ছেলের মতো গায়ে ধুলা-কাদা মাখা, কাপড়ে দাগ, সেই তো তোকে শোভা পাইত। আর আজ সহসা তোদের এমনতর পরিপাটি বিজ্ঞভাব দেখিলে যে জেঠামি বলিয়া মনে হয়। বাপু, তোরা কি জানাইতে চাস তোদের মধ্যে একেবারে বানান ভুল ছিল না? কোথাও দন্ত্য সয়ের জায়গায় তালব্য শ ছিল না? আজ বড়ো লজ্জা বোধ হইল? পাড়াগেঁয়ে ছেলে শহরে আসিয়া যেমন প্রাণপণে শহুরে উচ্চারণে কথা কহিতে চায় তোদেরও কি সেই দশা হইল? তোরা আমার পাড়াগেঁয়ে ছেলে, তোদের উচ্চারণ শুনিয়া শহরশুদ্ধ লোকের পেট ফাটিয়া যাইবে. কিন্তু বাপের কানে অমন মিষ্ট

আর কী আছে। তোদের সে বানান-ভুলগুলি আমার পরিচিত হইয়া গেছে, তোদের মুখের সহিত, আমার স্নেহের সহিত তাহারা জড়িত হইয়া গেছে। তাহাদের না দেখিলে আমি ভালো থাকি না। তাহাদের না দেখিলে তোদের যে ভাবে লিখিয়াছিলাম, সে ভাব আমার ঠিক মনে পড়ে না।

আগে তোদের আদর কম ছিল? জলটি লাগিলে তোদের অক্ষর মুছিয়া যাইত, একটি পাতা দৈবাৎ ছিঁড়িয়া বা হারাইয়া গেলে হাজার টাকা দিলেও আর সেটি পাওয়া যাইত না। ছাপার অক্ষর ধোয় না মোছে না, একটা বই হারাইয়া গেলে একটা টাকা দিলেই তৎক্ষণাৎ আর-একটা বই আসিয়া পড়ে। তোরা এখন আর অমূল্য নহিস, একমাত্র নহিস, তোদের গায়ে দোয়াত-শুদ্ধ কালি উলটাইয়া পড়িলেও কেহ আহা-উহু করিবে না।

আসল কথা, এখন তোরা যে নতুন কাগজে, নতুন অক্ষরে প্রকাশিত হইয়াছিস, ইহাতে তোদের আজন্মকালের ইতিহাস লুপ্ত করিয়া দিয়াছে। তোদের দেখিলেই মনে হয় যেন তোরা এই নির্ভুল নির্বিকার অবস্থাতেই একেবারে হঠাৎ আকাশ হইতে পড়িলি। যে মানুষকে ভাবিতে হয়, যাহাকে সংশোধন করিতে হয় তাহার ঘরে যেন তুই জন্মগ্রহণ করিস নাই। কেহ যদি তোকে তোর খাতা-নিবাসী সহোদরটির কথা জিজ্ঞাসা করে, তুই যেন এখনই লজ্জিত হইয়া বলিবি, ও আমার বাড়ির সরকার! এইজন্যই কেহ তোকে মায়া করে না, তোর একটা দোষ দেখিলেই সমালোচকেরা খাঁটা তুলিয়া ধরে। কাঁচা কালির অক্ষর ও কাটাকুটির মধ্যে তোকে দেখিলে কি কেহ আর তোকে অমন কঠোর নিষ্ঠুরভাবে পীড়ন করিতে পারে! তুই এমনি সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান অক্ষরে সাজসজ্জা করিয়াছিস যে তোর সামান্য ভুলটিও কাহারো বরদাস্ত হয় না।

সেই কাঁচা অক্ষর, কাটাকুটি, কালির দাগ দেখিলেই, আমার সমস্ত কথা মনে পড়ে; কখন লিখিয়াছিলাম, কী ভাবে লিখিয়াছিলাম, লিখিয়া কী সুখ পাইয়াছিলাম, সমস্ত মনে পড়ে। সেই বর্ষার রাত্রি মনে পড়ে, সেই জানলার ধারটি মনে পড়ে, সেই বাগানের গাছগুলি মনে পড়ে, সেই অশ্রুজলে সিক্ত আমার প্রাণের ভাবগুলিকে মনে পড়ে। আর, আর-একজন যে আমার পাশে দাঁড়াইয়াছিল, তাহাকে মনে পড়ে, সে যে আমার খাতায় আমার কবিতার পার্শে হিজিবিজি কাটিয়া দিয়াছিল, সেইটে দেখিয়া আমার চোখে জল আসে। সেই তো যথার্থ কবিতা লিখিয়াছিল। তাহার সে অর্থপূর্ণ হিজিবিজি ছাপা হইল না, আর আমার রচিত গোটাকতক অর্থহীন হিজিবিজি ছাপা হইয়া গেল! তোদের সেই সুখদুঃখপূর্ণ শৈশবের ইতিহাস আর তেমন স্পষ্ট দেখিতে পাই না, তাই আর তেমন ভালো লাগে না।

তোরা আমার কন্যা। যখন তোরা খাতায় তোদের বাপের বাড়িতে থাকিতিস, তখন তোরা কেবলমাত্র আমারই সুখ-দুঃখের সহচরী ছিলি। মাঝে মাঝে তোদের কাছে যাইতাম, তোদের সঙ্গে কথাবার্তা কহিতাম, মনের ভার লাঘব হইত। বন্ধু-বান্ধবরা আসিলে তোদের ডাকিয়া আনিতাম, তাহারা আদর করিত। তাহারা কহিত এমন মেয়ে কাহারো আজ পর্যন্ত হয় নাই, শীঘ্র হইবে যে এমন বোধ হয় না, শুনিয়া বড়ো খুশি হইতাম। এখন আর তোরা আমার নহিস, তোদের রাজশ্রী শ্রীমান সাধারণের হাতে সমর্পণ করিয়াছ।। তোরা এখন দিনরাত্রি ভাবিতেছিস আমার এই দোর্দণ্ড-প্রতাপ জামাতা বাবাজি তোদের আদর করে কি না। যদি দৈবাৎ কোথাও একটা ভুল হয়, পান হইতে চুন খসে, অমনি অপ্রস্তুত হইয়া তাড়াতাড়ি শুদ্ধিপত্রে মার্জনা ভিক্ষা করিস। রঙকরা পাড়ওয়ালা মলাটের ঘোমটা দিয়া মনোরঞ্জনের চেষ্টা করিস। শ্বশুরবাড়ি পাছে কেহ তোকে ভুল বোঝে এই ভয়েই সারা, সর্বদা ভূমিকা, সূচীপত্র, পরিশিষ্ট প্রভৃতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। সমালোচনা শাশুড়িমাগী উঠিতে বসিতে খুঁত ধরে। কথায় কথায় তোদের বাপের বাড়ির দৈন্য লইয়া খোঁটা দেয়। বাপের বাড়ির নিঃসংকোচ লজ্জাহীনতা, ঘোমটাহীন এলোথেলোভাব যত্নপূর্বক দূর করিয়াছিস, শ্বশুরবাড়ির খোঁপা-বাঁধা পারিপাট্য ও ঘোমটা-দেওয়া বিনীত ভাব অবলম্বন করিয়াছিস। এক কথায়, বাপের বাড়ির আর কিছু রহিল না। এখন আর

একমাত্র আমার কথাই ভাবিস না, কে কী বলে তাই ভাবিয়া সারা।

আবার আমার চিরায়ুষ্মান জামাইটির মতো খামখেয়ালি মেজাজের লোক অতি অল্পই আছে। সে আজ আদর করিল বলিয়া যে কালও আদর করিবে তাহা নহে। এক-এক সময় তাহার এক-একটি সুয়ারানী থাকে তাহারই প্রাদুর্ভাবে আর বাকি সকল রূপবতী গুণবতীগণ দুয়ারানীর শ্রেণীতে গণ্য হইয়া যায়। তাহার রাজান্তঃপুরে কত আদরের মহিষী আছে, তাহাদের মধ্যে আমার এই গুটিকতক ভীরু স্বভাব দুর্বল কুসুম-পেলবা কন্যা স্থাপন করা কি ভালো হইল! একবার চাহিয়া দেখো, অপরিচিত স্থানে গিয়া, অনভ্যস্ত অলংকার পরিয়া উহাদের মুখশ্রীর স্বাভাবিকতা যেন চলিয়া গিয়াছে। উহাদিগকে যেন এক সার কাঠের পুতুলের মতো দেখাইতেছে। আর যাহাই হউক, আমার এ সাদাসিধা পাড়াগেঁয়ে কবিতাগুলিকে এরকম ছাপার অক্ষরে মানায় না। দম্ভোলি, ইরম্মদ ও কড়কড় শব্দ নহিলে যেন ছাপার অক্ষর সাজে না।

এমন কাজ কেন করিলাম। কবিতাগুলি যখন খাতায় ছিল তখন আমার সুখের কি অভাব ছিল! এখন যে সকলেই বিদেশীর মতো ইহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিবে। কেহ বলিবে ভালো, কেহ বলিবে মন্দ, কেহ সম্মান করিবে, কেহ অপমান করিবে, কিন্তু ইহার ত্রুটি তো কেহই মার্জনা করিবে না; ইহাকে আপনার লোক বলিয়া কেহই তো কোলে তুলিয়া লইবে না। আপনার ধন পরের সম্পত্তি হইয়া গেল, যে যাহা করে, যে যাহা বলে চুপ করিয়া সহিতেই হইবে। আয় রে ফিরিয়া আয়— তোদের সেই কাঁচা অক্ষর, বানান-ভুল, কালির দাগের মধ্যে ফিরিয়া আয়, স্নেহের আরামে থাকিবি। চব্বিশ ঘণ্টা সোজা লাইনের নীচে অমনতর খাড়া হইয়া থাকিতে হইবে না।'

ভারতী
জ্যৈষ্ঠ ১২৯০

গোঁফ এবং ডিম

সকলেই বলিতেছেন, এখানে গোঁফ না বলিয়া গুম্ফ বলা উচিত ছিল। আমি বলিতেছি তাহার কোনো আবশ্যক নাই। গোঁফটা কিছু এমন একটা হেয় পদার্থ নহে যে, তাহাকে সংস্কৃত গঙ্গাজলে না ধুইয়া ভদ্রসমাজে আনা যায় না। স্বনামা পুরুষো ধন্যঃ। গোঁফের পিতামহের নাম ছিল গুম্ফ; তিনি ভরদ্বাজ, কাশ্যপ, শাণ্ডিল্যদের মুখে যথাকাল বিরাজ করিয়া গুম্ফলীলা সংবরণ করিয়াছেন, তাঁহারই কুল-কজ্জল বংশধর শ্রীযুক্ত গোঁফ অধুনা চাটুর্যে বাঁড়ুয্যে মুখুয্যেদের ওষ্ঠ বৈদূর্য সিংহাসনের উপর উপবিষ্ট হইয়া দিবারাত্রি নাসারন্ধ্রের সমীরণ সুখে সেবন করিতেছেন। অতএব গোঁফ যখন তাহার পিতা-পিতামহের বাস্তুভিটা না ছাড়িয়া তাহার পাঁচ-ছয় সহস্র বৎসরের পৈতৃক স্বত্ব সমান প্রভাবে বজায় রাখিয়াছে, তখন যদি তাহাকে তাহার নিজের নামে অভিহিত না করিয়া গুম্ফের নামে তাহার পরিচয় দেওয়া হয়, তবে অভিমানে সে চিবুকের নীচে আসিয়া ঝুলিয়া পড়ে।

তোমাদের কল্পনাশক্তি সামান্য, এইজন্যই ছোটো কথাকে বড়ো করিয়া না বলিলে তোমাদের কানে পৌঁছায় না। বাজের শব্দ তোমরা শুনিতেই পাও না, কাজেই তোমাদের জন্য ইরম্মদের কড়্কড়্ করা আবশ্যক। প্রকৃতির ছোটো জিনিসের মহত্ত্ব তোমরা দেখিতে পাও না, এইজন্য তোমাদিগকে হাঁ করাইবার অভিপ্রায়ে বড়ো বড়ো আতস কাচ আনাইয়া শিশুদের মুখের উপর ধরিয়া তাহাদিগকে দৈত্য দানব করিয়া তুলিতে হয়। কিন্তু তাই বলিয়া যে তোমাদের স্থূল কল্পনাকে আঁকড়াইয়া ধরিবার জন্য আমি এই দুই-চারি ইঞ্চি গোঁফকে টানিয়া টানিয়া চিনেম্যানের টিকির মতো অযথা পরিমাণে বাড়াইয়া তুলি, এবং গোঁফ শব্দের সহজ-মাহাত্ম্যের পেটের মধ্যে গোটা আষ্টেক-দশ বড়ো বড়ো অভিধান পুরিয়া তাহাকে উদরী রোগীর মতো অসম্ভব স্ফীত

করিয়া তুলি তাহা আমার কর্ম নহে।

আমি আজ গোঁফের সম্বন্ধে কেবলমাত্র গুটিকতক সহজ সত্য বলিব ও আমার বিশ্বাস, তাহা হইলেই কল্পনাবান মনস্বীগণ স্বতই তাহার পরম মহত্ত্ব অনুভব করিতে পারিবেন।

ইহা দেখা গিয়াছে গোঁফ যতদিন না উঠে ততদিন পরিষ্কাররূপে বুদ্ধির বিকাশ হয় না। স্ত্রীলোকদের গোঁফ উঠে না, স্ত্রীলোকদের পরিপক্ব বুদ্ধিরও অভাব দেখিতে পাওয়া যায়। বিপদে পড়িলে বুদ্ধির নিমিত্ত গোঁফের শরণাপন্ন হইতে হয় না, এমন কয়জন গুঁফো লোক আছে জানিতে চাহি। সংসার ক্ষেত্রে কাজ করিতে করিতে একটা কঠিন সমস্যা উপস্থিত হইলেই তৎক্ষণাৎ দুই হাতে গোঁফের হাতে ধরিয়া পায়ে ধরিয়া গায়ে হাত বুলাইয়া ১০/১৫ মিনিট অনবরত খোশামোদ করিতে হয়, তবেই তিনি প্রসন্ন হইয়া ভক্তের সেব্যমান হস্তে পাকা বুদ্ধি অর্পণ করেন।

অতএব স্পষ্টই প্রমাণ হইতেছে, বুদ্ধির সহিত গোঁফের সহিত একটা বিশেষ যোগ আছে। বয়স্কেরা যে শ্মশ্রুগর্বে গর্বিত হইয়া অজাত-শ্মশ্রুদিগকে অর্বাচীন জ্ঞান করেন, অবশ্যই তাহার একটা মূল আছে। গোঁফ উদ্গত হইয়াই তৎক্ষণাৎ একজোড়া ঝাঁটার মতো বালকদের বুদ্ধিরাজ্যের সমস্ত মাকড়সার জাল ঝাঁটাইয়া পরিষ্কার করিয়া ফেলে, ভাবের ধুলা ঝাড়িয়া দেয়, সমস্ত যেন নূতন করিয়া দেয়। অতএব এই অজ্ঞান-ধূমকেতু গোঁফ যুগলের সহিত বুদ্ধির কী যোগ আছে, আলোচনা করিয়া দেখা যাক।

এ বিষয়ে মনোনিবেশপূর্বক ধ্যান করিতে করিতে সহসা আমার মনে উদিত হইল, 'গোঁফে তা দেওয়া' নামক একটি শব্দ চলিত ভাষায় ব্যবহৃত হয়। আপেল ফল পতন যেমন মাধ্যাকর্ষণতত্ত্ব আবিষ্কারের মূলস্বরূপ হইয়াছিল, 'গোঁফে তা দেওয়া' শব্দটি তেমনি বর্তমান আলোচ্য মহত্তর আবিষ্কারের মূলস্বরূপ হইল। ইহা হইতে এই অতি দুর্লভ সত্য বা তত্ত্ব সংগ্রহ করা যায় যে বায়ুবাহিত বা পক্ষীমুখভ্রষ্ট বীজ অপেক্ষা তদুৎপন্ন বৃক্ষ অনেকগুণে বৃহৎ ও বিস্তৃত হইয়া থাকে।

'তা দেওয়া' শব্দ আমার মাথায় আসিতেই আমার সহসা মনে পড়িল যে নাকের গুহার নীচে এই যে গোঁফটা ঝুলিতেছে ইহা বুদ্ধির নীড় মাত্র। বুদ্ধি বল, ভাব বল, এইখানে তাহার ডিম পাড়িয়া যায়। কতশত বুদ্ধির ডিম, ভাবের ডিম আমাদের গোঁফ-নীড়ের অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য ভাবে রক্ষিত হইয়াছে, দিবারাত্রি উত্তপ্ত নিশ্বাসবায়ু লাগিয়া ফুটিয়া ফুটিয়া উঠিতেছে, তাহা কি আমরা জানিতে পারি? মায়াবিনী প্রকৃতিদেবী সকল কার্য কী গোপনেই সম্পন্ন করিতেছেন! বিশেষত অপরিস্ফুট জন্ম-পূর্ব অবস্থায় তিনি সকল দ্রব্যকে কী প্রচ্ছন্ন ভাবেই পোষণ করিতে থাকেন। বৃক্ষ হইবার পূর্বে বীজ মৃত্তিকার মধ্যে লুক্কায়িত থাকে, প্রাণীদিগের ভ্রূণ জঠরান্ধকারে নিহিত থাকে, এবং এই চরাচর অস্ফুট শৈশবে অন্ধকারগর্ভে আবৃত ছিল, মনুষ্যের বুদ্ধির এবং ভাবের ডিমও গোঁফের মধ্যেই আচ্ছন্ন হইয়া বাস করিতে থাকে। মনুষ্যবুদ্ধি বিজ্ঞান মায়াবীর কাঁধে চড়িয়া প্রকৃতির মহা-রহস্যশালার দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া আছে ও সেই রুদ্ধ দ্বারের ছিদ্রের মধ্য দিয়া সেই অপরিসীম অন্ধকারের মধ্যে দৃষ্টি চালাইবার চেষ্টা করিতেছে কিন্তু আজ পর্যন্ত কয়জন বিজ্ঞানবিৎ গোঁফের অন্ধকারের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ভাবডিম্ব পরিস্ফুটনের মহত্তত্ত্ব আবিষ্কারে অগ্রসর হইয়াছেন। আমি আজ দুঃসাহসে ভর করিয়া সেই গোঁফের মহারণ্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছি, ইহার অগণ্য শাখা-প্রশাখার উপরে কতবিধ জাতীয় ভাব আসিয়া নিঃশব্দে ডিম পাড়িয়া যাইতেছে, তাহাই চুপ করিয়া দেখিতেছি।

আমরা অনেক সময়ে জানিতেই পারি না কোথা হইতে সহসা এ বুদ্ধি আমার মাথায় আসিয়া উপস্থিত হইল! কেমন করিয়া জানিব বলো! কখন আমাদের গোঁফে নিঃশব্দে ডিম্ব ভাঙিয়া পাখিটি মাথায় আসিয়া উড়িয়া বসিল, তাহা সব সময়ে টের পাওয়া যায় না তো। কিন্তু যখন আমাদের তাড়াতাড়ি একটা কোনো বুদ্ধির আবশ্যক পড়ে, তখন স্বভাবতই আমরা ঘন ঘন

গোঁফে তা দিতে থাকি, ও তামাক টানিয়া তাহার উত্তপ্ত ধোঁয়া গোঁফের শাখায় শাখায় সঞ্চারিত করিয়া দিই।

আজ গোঁফের কী মহত্ত্ব আমাদের মনের সম্মুখে সহসা উদ্‌ঘাটিত হইয়া গেল। ভাবের প্রবাহ অনুসরণ করিয়া করিয়া আমরা গোঁফের গঙ্গোত্রী শিখরের উপরে গিয়া উপনীত হইয়াছি। আজ ভূতত্ত্বশাস্ত্র অনুসারে পৃথিবীর যুগপরম্পরা অতিক্রম করিয়া, দ্রব অবস্থায় পৃথিবী যে চতুর্দিকব্যাপী ঘন মেঘনীড়ের মধ্যে আচ্ছন্ন ছিল, ভাবজগতের সেই আদিম গুম্ফমেঘনীড়ের মধ্যে বিজ্ঞান-বলে গিয়া উপস্থিত হইয়াছি, মহৎ ভাবে সর্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিয়াছে।

ব্যাসদেবের যে অত্যন্ত বৃহৎ এক জোড়া গোঁফ ছিল এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই; কারণ যে গোঁফে তিনি বৃহৎ মহাভারতের অষ্টাদশ পর্বের আঠারোটা ডিম নয়টা নয়টা করিয়া দুইদিকে অদৃশ্যভাবে ঝুলাইয়া বহন করিয়া বেড়াইতেন সে বড়ো সাধারণ গোঁফ হইবে না। ক্রম্‌ওয়েল সাহেবের গোঁফে ইংলন্ডের বর্তমান পার্ল্যামেন্টের ডিম যখন ঝুলিত, তখন কেহ দেখিতে পায় নাই, আজ দেখো, সেই পার্ল্যামেন্ট ডিম ভাঙিয়া মস্ত ডাগর হইয়া ক্যাঁক ক্যাঁক করিয়া বেড়াইতেছে। পিতামহ ব্রহ্মার আর কিছু থাক্ না থাক্, চার মুখে চার জোড়া খুব বড়ো বড়ো গোঁফ অনন্ত আকাশ আচ্ছন্ন করিয়াছিল, ইহা কি কেহ অস্বীকার করিতে পারিবে? নহিলে চরাচর কোথায় থাকিত।

হায় হায়, যাহারা গোঁফ কামায়, তাহারা জানে না কী ভয়ানক কাজ করিতেছে। হয়তো এক জোড়া গোঁফের সঙ্গে সঙ্গে একটা দেশের স্বাধীনতা কামাইয়া ফেলা হইল! একটা ভাষার সাহিত্য কামাইয়া ফেলা হইল। হয়তো কাল প্রত্যুষেই আমি মানব সমাজে এক ভূমিকম্প উপস্থিত করিতে পারিতাম, কিন্তু আজ সন্ধ্যাবেলায় গোঁফ কামাইয়া ফেলিলাম, ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে একটা সমাজের ভূমিকম্প কামাইয়া ফেলিলাম! কবি গ্রে সাহেব কবরস্থানে গিয়া মূক, গৌরবহীন মৃত গ্রাম্য মিল্টনদের স্মরণ করিয়া বিলাপ করিয়াছেন, কিন্তু তিনি যদি নাপিতের ক্ষৌরশালায় গিয়া কবির দিব্যচক্ষে ছিন্ন গোঁফরাশির মধ্যে শত শত ধূলিধূসরিত সভ্যতা, সাধু সংকল্প ও মহৎ উদ্দেশ্যের ভ্রূণহত্যা দেখিতে পাইতেন, ধূলিতে লুণ্ঠমান নীরব সংগীত শিশু, অঙ্কুরে বিদলিত মহত্ত্বের কল্পবৃক্ষ সকল দেখিতে পাইতেন, তবে না জানি কী বলিতেন।

আমি যখন কোনো বড়ো লোক দেখি, তখন তাঁহার গোঁফজোড়াটা দেখিয়াই সম্ভ্রমে অভিভূত হইয়া পড়ি। তাঁহার সহিত তর্ক করিবার সময় তিনি যদি গোঁফে চাড়া লাগান্ তো ভয়ে তর্ক বন্ধ করিয়া ফেলি! মনে মনে একবার কল্পনা করিয়া দেখি, যেন, বর্তমান কাল অত্যন্ত ভীত হইয়া ওই গোঁফের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে, ভাবিতেছে, না জানি কোন্ একটা বলবান ভবিষ্যৎ-বাচ্ছা কাল-পরশুর মধ্যে ডিম্ব ভেদ করিয়া গরুড়-পরাক্রমে ওই গোঁফের ভিতর দিয়া হুস্ করিয়া বাহির হইয়া পড়িবে, ও বর্তমান কালটাকে সিংহাসন হইতে হেঁচড়াইয়া আনিয়া নিজে তাহার উপরে গট্ হইয়া বসিবে! মনে মনে এই কামনা করি যে নাপিতের ক্ষুর কখনো যেন ও গোঁফজোড়া স্পর্শ না করে।

নৈয়ায়িক মহাশয়েরা গোটাকতক তীক্ষ্ণ-চঞ্চু ক্ষুদ্রচক্ষু হিংস্র পাখি পুষিয়া রাখিয়াছেন, তাহারা কোনো কালে নিজে ডিম পাড়িতে পারে না, কেবল পরের নীড়ে খোঁচা মারিয়া ও পরের শাবককে ঠোকরাইয়া বেড়ায়। এইরূপে ইঁহারা অনেক ভালো ভালো জাতের ভাবগুলিকে বধ করিয়া থাকেন। মনে মনে বিষম অহংকার। কিন্তু ইহা হয়তো জানেন না, যদি এই শাবক বেচারিরা নিতান্তই শিশু অবস্থায় এরূপ খোঁচা না খাইত ও পুষ্ট হইয়া কিছু বড়ো হইতে পারিত, তবে এই নৈয়ায়িক হিংস্র পক্ষীগণ ইহাদের কাছে ঘেঁসিতে পারিত না। আমার সামান্য গোঁফ হইতে আজ এই যে একটি পাখি বাহির হইয়াছে, ইহার জন্ম সংবাদ পাইয়াই অমনি চারি দিক হইতে নৈয়ায়িক পক্ষীগণ ইহার চারিদিকে চ্যাঁ চ্যাঁ করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। কেহ-বা ইতিহাসে ঠোঁট শানাইয়া আসিয়াছেন, কেহ-বা পুরাণের আগায় ঠোঁট ঘষিয়া আসিয়াছেন, কেহ-

বা তর্কশাস্ত্র নামক ইস্পাতের ছুরি দিয়া ঠোঁট চাঁচিয়া চাঁচিয়া নিন্দুকের কলমের আগার মতো ঠোঁটটাকে খরধার করিয়া আসিয়াছেন, রক্তপাত করিবার আশায় উল্লসিত। ইহাঁরা আমার শাবককে নানারূপে আক্রমণ করিতেছেন। একজন নিতান্ত কর্কশ স্বরে বলিতেছেন, যে, 'তোমার কথা অপ্রামাণ্য। কারণ ভারতবর্ষের পূর্বতন ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ গোঁফ দাড়ি এমন-কি, চুল পর্যন্ত কামাইয়া কেবল একটুখানি টিকি রাখিতেন! তাঁহারা কি আর বুদ্ধির চর্চা করিতেন না।' এই লোকটার কর্কশ কণ্ঠ শুনিয়া একবার ভাবিলাম, 'আমি ভাবকে জন্ম দিয়া থাকি, কাজেই ন্যায়শাস্ত্র লইয়া খোঁচাখুঁচি করা আমার কাজ নহে। আমরা ভাবের উচ্চ আসনে বসিয়া থাকি, কাজেই উহারা নীচে হইতে চেঁচামেচি করিয়া থাকে। করুক, উহাদের সুখে ব্যাঘাত দিব না।' অবশেষে গোলমালে নিতান্ত বিরক্ত হইয়া উহাদেরই অস্ত্র অবলম্বন করিতে হইল। আমি কহিলাম— 'প্রমাণ খুঁটিয়া খুঁটিয়া বেড়ানো আমার পেশা নহে, সুতরাং আমার সে অভ্যাস নাই; আমি কেবল একটি কথা বলিতে চাহি, ভারতবর্ষে যখন বৃহৎভাবের জন্ম হইত, তখন ঋষিদের বড়ো বড়ো গোঁফ ছিল। অবশেষে ভাবের জন্ম যখন বন্ধ হইল, কেবলমাত্র সঞ্চয়ের ও শ্রেণীবিভাগের পালা পড়িল, তখন গোঁফের আবশ্যকতা রহিল না। তখন সঞ্চিত ভাবের দলকে মাঝে মাঝে টিকি টানিয়া জাগাইয়া দিলেই যথেষ্ট হইত, তখন আর তা দিয়া ফুটাইয়া তুলিবার প্রয়োজন রহিল না। কিন্তু আর্যদের অবনতির আরম্ভ হইল কখন হইতে? না, যখন হইতে তাঁহারা গোঁফ কামাইয়া টিকি রাখিতে আরম্ভ করিলেন। এককালে যে ওষ্ঠের ঊর্ধ্বে ভাবের নিবিড় তপোবন বিরাজ করিত, এখন সেখানে সমতল মরুভূমি! কেবল প্রাচীন কালের কতকগুলি ভাবের পক্ষী ধরিয়া স্মৃতির খাঁচায় রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহারা সকালে বিকালে একটু একটু শুষ্ক মস্তিষ্ক খাইয়া থাকে। অনেকগুলা মরিয়া গিয়াছে, অনেকগুলা ডাকে না, কেহ আর ডিম পাড়ে না, স্বাধীন ভাবে গান গায় না, কেবল টিকি নাড়া দিলে মাঝে মাঝে চেঁচায়। গোঁফ কামাইয়া এই তো ফল হইল! অতএব হে ভারতবর্ষীয়গণ, আজই তোমরা 'রাখো গোঁফ কাটো টিকি'।

'যাঁহারা বিশুদ্ধ জ্ঞান ও বিশুদ্ধ কাব্যের প্রতি বিমুখ, যাঁহারা পদে পদে ফল, উদ্দেশ্য ও তত্ত্ব দেখিতে চান তাঁহাদের নিমিত্ত আমার এই গোঁফ তত্ত্ব আবিষ্কারের ফল বুঝাইয়া দিই! আমার এই লেখা পড়িলে ভারতবাসীদের চৈতন্য হইবে যে— ভারতবর্ষে বহুবিধ খনিজ ও উদ্ভিজ্জ পদার্থ সত্ত্বেও আমাদের জ্ঞান ও উদ্যমের অভাবে যেরূপ তাহা থাকা না থাকা সমান হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তেমনি আমরা গোঁফের উপযোগিতা জানি না বলিয়া তাহার যথার্থ সদ্ব্যবহার করিতে পারিতেছি না, ও এইরূপে দেশের উন্নতির ব্যাঘাত হইতেছে। আজ হইতে আমরা যদি গোঁফের শুশ্রূষা করি, গোঁফে অনবরত তা দিতে থাকি ও গোঁফ না কামাই, তবে তাহা হইতে না জানি কী শুভ ফলই প্রসূত হইবে। যেদিন ভারতবর্ষের বিংশতি কোটি লোক আকর্ণ-পূরিত গোঁফ নাপিতের ভীষণ আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়া রাখিবে, সেদিন ভারতবর্ষের কী শুভদিন! আমি যেন দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইতেছি পূর্ব দিকের মেঘমালার অন্ধকার হইতে যেমন ধীরে ধীরে সূর্য উত্থান করিতে থাকেন, তেমনি ভারতবর্ষের বিংশতি কোটি সন্তানের গুম্ফমেঘের মধ্য হইতে ওই দেখো ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সূর্য ধীরে ধীরে উত্থান করিতেছে, ওই দেখো সিন্ধুনদ হইতে ব্রহ্মপুত্র ও হিমালয় হইতে কন্যাকুমারী পর্যন্ত আলোকিত হইয়া উঠিতেছে, যাজ্ঞবল্ক্য ও শাক্যসিংহের পবিত্র জন্মভূমিতে পুনরায় প্রভাত কিরণ বিস্তীর্ণ হইতেছে!' (ঘন ঘন করতালি)।

হে আমি, হে গোঁফতত্ত্ববিৎ বুধঃ, তুমি আজ ধন্য হইলে! আজ তোমার গোঁফের কী গর্বের দিন! তাহারই নীড়জাত শাবকগুলি আজ কলকণ্ঠে গাহিতে গাহিতে তোমার মুখ দিয়া অনর্গল বাহির হইয়া আসিতেছে এবং সেই গোঁফ স্নেহভরে নতনেত্রে মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া সগর্বে মুখ হইতে উড্ডীন শাবকদিগের প্রতি চাহিয়া রহিয়াছে।

হে সমালোচকশ্রেষ্ঠ, তুমি যদি এই শাবকগুলি ধরিয়া তোমার খরশাণ কলম দিয়া জবাই কর

ও লঙ্কা মরিচ দিয়া রন্ধন কর তবে তাহা নব্যশিক্ষিত পাঠকদের মুখরোচক হইবে সন্দেহ নাই, কিন্তু সে কাজটা কি হিন্দুসন্তানের মতো হইবে?

ভারতী
আষাঢ় ১২৯০

সত্যং শিবং সুন্দরম্

সত্য কেবলমাত্র হওয়া, শিব থাকা, সুন্দর ভালো করিয়া থাকা। সত্য শিব না হইলে থাকিতে পারে না, বিনাশ প্রাপ্ত হয়, অসত্য হইয়া যায়। শিব আপনার শিবত্বের প্রভাবে অবশেষে সুন্দর হইয়া উঠে। সত্য আমাদিগকে জন্ম দেয়, শিব আমাদিগকে বলপূর্বক বাঁচাইয়া রাখে, সুন্দর আমাদিগকে আনন্দ দিয়া আমাদের স্বেচ্ছার সহিত বাঁচাইয়া রাখে। মনুষ্যজীবন সত্য, কর্তব্য অনুষ্ঠান শিব, প্রেম সুন্দর। বিজ্ঞান সত্য, দর্শন শিব, কাব্য সুন্দর।

ভারতী
আষাঢ় ১২৯১

ভানুসিংহ ঠাকুরের জীবনী

ভারতবর্ষের কোন্ মূর্খ বা কোন্ পণ্ডিত কোন্ খৃস্টাব্দে জন্মিয়াছিলেন বা মরিয়াছিলেন, তাহার কিছুই স্থির নাই, অতএব ভারতবর্ষে ইতিহাস ছিল না ইহা স্থির। এ বিষয়ে পণ্ডিতবর হচিন্‌সন সাহেব যে অতি পরমাশ্চর্য সারগর্ভ গবেষণাপূর্ণ যুক্তিবহুল কথা বলিয়াছেন তাহা এইখানে উদ্ধৃত করি— ‘প্রকৃত ইতিহাস না থাকিলে আমরা প্রাচীনকালের বিষয় অতি অল্পই জানিতে পারি।’[১]

আমাদের দেশে যে ইতিহাস ছিল না, এবং ইতিহাস না থাকিলে যে কিছুই জানা যায় না তাহার প্রমাণ, বৈষ্ণব চূড়ামণি অতি প্রাচীন কবি ভানুসিংহ ঠাকুরের বিষয় আমরা কিছুই অবগত নহি। ইহা সামান্য দুঃখের কথা নহে। ভারতবর্ষের এই দুরপনেয় কলঙ্ক মোচন করিতে আমরা অগ্রসর হইয়াছি। কৃতকার্য হইয়াছি এই তো আমাদের বিশ্বাস। যাহা আমরা স্থির করিয়াছি, তাহা যে পরম সত্য তদ্‌বিষয়ে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই।

কোন্ সময়ে ভানুসিংহ ঠাকুরের আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহাই প্রথমে নির্ণয় করিতে হয়। কেহ বলে বিদ্যাপতি ঠাকুরের পূর্বে, কেহ বলে পরে। যদি পূর্বে হয় তো কত পূর্বে ও যদি পরে হয় তো কত পরে? বহুবিধ প্রামাণ্য গ্রন্থ হইতে এ সম্বন্ধে বিস্তর সাহায্য পাওয়া যায়; যথা—

প্রথমত— চারি বেদ। ঋক্ যজু সাম অথর্ব। বেদ চারি কি তিন, এ বিষয়ে কিছুই স্থির হয় নাই। আমরা স্থির করিয়াছি, কিন্তু অনেকেই করেন নাই। বেদ যে তিন তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। ঋগ্‌বেদে আছে— ‘ঋষয় স্ত্রয়ী বেদা বিদুঃ ঋচো যজুংষি সামানি।’ চতুর্থ শতপথ ব্রাহ্মণে কী লেখা আছে তাহা কাহারো অবিদিত নাই। বেদের সূত্র যাঁহারা অবসরমতে পড়িয়া থাকেন, তাঁহারাও দেখিয়া থাকিবেন তন্মধ্যে অথর্ব বেদের সূত্রপাত নাই। যাহা হউক, প্রমাণ হইল বেদ

---

১. *Memories of Catternob Cruikshank Hutchinson,* Vol. V, p. 1058.

ইংরাজিতে বানান ভুল যদি কিছু থাকে, পাঠকেরা জানিবেন তাহা মুদ্রাকরের দোষ। ভবানী মাস্টারের কাছে আমি দেড় বৎসর যাবৎ ইংরাজি পড়িয়াছিলাম, বাংলা আমাকে পড়িতে হয় নাই; কাঁটাগাছের মতো বিনা চাষে আপনিই গজাইয়া উঠিয়াছে।

তিন বৈ নয়। এক্ষণে সেই তিন বেদে ভানুসিংহের বিষয় কী কী প্রমাণ পাওয়া যায় তাহা আলোচনা করিয়া দেখা যাক। বেদে ছন্দ আছে, মন্ত্র আছে, ব্রাহ্মণ আছে, সূত্র আছে, কিন্তু ভানুসিংহের কোনো কথা নাই।[১] এমন-কি, বেদের সংহিতা ভাগে ইন্দ্র, বরুণ, মরুৎ, অগ্নি, রুদ্র, রবি প্রভৃতি দেবগণের কথাও আছে কিন্তু ইতিহাস রচনায় অনভিজ্ঞতাবশত ভানুসিংহের কোনো উল্লেখ নাই।[২]

শ্রীমদ্ভাগবতে ও বিষ্ণুপুরাণে নন্দবংশ রাজগণের কথা পাওয়া যায়। এমন-কি, তাহাতে ইহাও লিখিয়াছে যে, মহাপদ্ম নন্দীর সুমাল্য প্রভৃতি আট পুত্র জন্মিবে— কৌটিল্য ব্রাহ্মণের কথাও আছে, অথচ ভানুসিংহের কোনো কথা তাহাতে দেখিতে পাইলাম না।[৩] যদি কোনো দুঃসাহসিক পাঠক বলেন যে, হাঁ, তাহাতে ভানুসিংহের কথা আছে, তিনি প্রমাণ প্রয়োগপূর্বক দেখাইয়া দিন— তিনি আমাদের এবং ভারতবর্ষের ধন্যবাদভাজন হইবেন।

আমরা ভোজ প্রবন্ধ আনাইয়া দেখিলাম, তাহাতে ধারা নগরাধিপ ভোজরাজার বিস্তারিত বিবরণ আছে। তাহাতে নিম্নলিখিত পণ্ডিতগণের নাম পাওয়া যায়— কালিদাস, কর্পূর, কলিঙ্গ , কোকিল, শ্রীদচন্দ্র। এমন-কি মুচকুন্দ, ময়ূর ও দামোদরের নামও তাহাতে পাওয়া গেল, কিন্তু ভানুসিংহের নাম কোথাও পাওয়া গেল না।[৪]

বিশ্বগুণাদর্শ দেখো— মাঘশ্চোরো ময়ূরো মুরারি পুরসরো ভারবিঃ সারবিদ্যঃ
শ্রীহর্ষঃ কালিদাসঃ কবিরথ ভবভূত্যাদয়ো ভোজরাজঃ

দেখো, ইহাতেও ভানুসিংহের নাম নাই।[৫]

বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন উল্লেখ স্থলে ভানুসিংহের নাম পাওয়া যায় ভাবিয়া আমরা বিস্তর অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছি—

ধন্বন্তরিঃ ক্ষপণকোমর সিংহ শঙ্কুর্বেতাল ভট্ট ঘটকর্পর কালিদাসাঃ
খ্যাতা বরাহ মিহিরো নৃপতেঃ সভায়াং রত্নানি বৈ বররুচির্ণব বিক্রমস্য।

কৈ ইহার মধ্যেও তো ভানুসিংহের নাম পাওয়া গেল না।[৬] তবে, কোনো কোনো ভাবুকব্যক্তি সন্দেহ করেন কালিদাস ও ভানুসিংহ একই ব্যক্তি হইবেন। এ সন্দেহ নিতান্ত অগ্রাহ্য নহে, কারণ কবিত্বশক্তি সম্বন্ধে উভয়ের সম্পূর্ণ সাদৃশ্য দেখা যায়।

অবশেষে আমরা বত্রিশ সিংহাসন, বেতাল পঁচিশ, তুলসীদাসের রামায়ণ, আরব্য উপন্যাস ও সুশীলার উপাখ্যান বিস্তর গবেষণার সহিত অনুসন্ধান করিয়া কোথাও ভানুসিংহের উল্লেখ দেখিতে পাইলাম না। অতএব কেহ যেন আমাদের অনুসন্ধানের প্রতি দোষারোপ না করেন— দোষ কেবল গ্রন্থগুলির।

ভানুসিংহের জন্মকাল সম্বন্ধে চারি প্রকার মত দেখা যায়। শ্রদ্ধাস্পদ পাঁচকড়িবাবু বলেন ভানুসিংহের জন্মকাল খৃস্টাব্দের ৪৫১ বৎসর পূর্বে। পরম পণ্ডিতবর সনাতনবাবু বলেন খৃস্টাব্দের ১৬৮৯ বৎসর পরে। সর্বলোকপূজিত পণ্ডিতাগ্রগণ্য নিতাইচরণবাবু বলেন ১১০৪

---

১. See *English Translation of Hitopadesha* by H.M. Dibdin. Vol. 3, p. 551.

২. কোনো কোনো অতি বুদ্ধিমান ব্যক্তি এরূপ সন্দেহ করিয়া থাকেন যে, উক্ত ইন্দ্র প্রভৃতি ঠাকুরগণের মধ্যে রবির যে উল্লেখ দেখা যায়, তাহা ভানুর নামান্তর হইতে পারে। কিন্তু তাহা নিতান্ত অপ্রামাণিক।

৩. Vide *Pictorial Handbook of Modern Geography*, Vol. 1, p. 139.

৪. See *Hong-chang-ching* by Kong-fu.

৫. 'সাহনামা', দ্বিতীয় সর্গ।

৬. Peterhoff's *Chromkroptologisheder Unterlutungeln.*

খৃস্টাব্দ হইতে ১৭৯৯ খৃস্টাব্দের মধ্যে কোনো সময়ে ভানুসিংহের জন্ম হইয়াছিল। আর, মহামহোপাধ্যায় সরস্বতীর বরপুত্র কালাচাঁদ দে মহাশয়ের মতে ভানুসিংহ, হয় খৃস্ট শতাব্দীর ৮১৯ বৎসর পূর্বে, না-হয় ১৬৩৯ বৎসর পরে জন্মিয়াছিলেন, ইহার কোনো সন্দেহ মাত্র নাই। আবার কোনো কোনো মূর্খ নির্বোধ গোপনে আত্মীয় বন্ধু-বান্ধবদের নিকটে প্রচার করিয়া বেড়ায় যে, ভানুসিংহ ১৮৬১ খৃস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া ধরাধাম উজ্জ্বল করেন। ইহা আর কোনো বুদ্ধিমান পাঠককে বলিতে হইবে না যে, এ কথা নিতান্তই অশ্রদ্ধেয়। যাহা হউক, ভানুসিংহের জন্মকাল সম্বন্ধে আমাদের যে মত তাহা প্রকাশ করিতেছি। ইহার সত্যতা সম্বন্ধে কোনো বুদ্ধিমান সুবিবেচক পাঠকের সন্দেহ থাকিবে না। নীল পুরাণের একাদশ সর্গে বৈতস মুনিকে ভানব বলা হইয়াছে।[১] তবেই দেখা যাইতেছে তিনি ভানুর বংশজাত। এক্ষণে, তিনি ভানুর কত পুরুষ পরে ইহা নিঃসন্দেহ স্থির করা দুঃসাধ্য। রামকে রাঘব বলা হইয়া থাকে। রঘুর তিন পুরুষ পরে রাম। মনে করা যাক, বৈতস ভানুর চতুর্থ পুরুষ। প্রত্যেক পুরুষের মধ্যে ২০ বৎসরের ব্যবধান ধরা যাক, তাহা হইলে ভানুসিংহের জন্মের আশি বৎসর পরে বৈতসের জন্ম। যিনি রাজতরঙ্গিণী পড়িয়াছেন, তিনিই জানেন বৈতস ৫১৮ খৃস্টাব্দের লোক।[২] তাহা হইলে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে ভানুসিংহের জন্মকাল ৪৩৮ খৃস্টাব্দে। কিন্তু ভাষার প্রমাণ যদি দেখিতে হয় তাহা হইলে ভানুসিংহকে আরও প্রাচীন বলিয়া স্থির করিতে হয়। সকলেই জানেন, ভাষা লোকের মুখে মুখে যতই পুরাতন হইতে থাকে ততই সংক্ষিপ্ত হইতে থাকে। 'গমন করিলাম' হইতে 'গেলুম' হয়। 'ভ্রাতৃজায়া' হইতে 'ভাজ' হয়। 'খুল্লতাত' হইতে 'খুড়ো' হয়। কিন্তু ছোটো হইতে বড়ো হওয়ার দৃষ্টান্ত কোথায়? অতএব নিঃসন্দেহ 'পিরীতি' শব্দ 'প্রীতি' অপেক্ষা 'তিখিনী' শব্দ 'তীক্ষ্ণ' অপেক্ষা প্রাচীন। অষ্টাদশ ঋকের এক স্থলে দেখা যায় 'তীক্ষ্ণানি সায়কানি'। সকলেই জানেন অষ্টাদশ ঋক্ খৃস্টের ৪০০০ বৎসর পূর্বে রচিত হয়। একটি ভাষা পুরাতন ও পরিবর্তিত হইতে কিছু না-হউক দুহাজার বৎসর লাগে। অতএব স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, খৃস্টজন্মের ছয় সহস্র বৎসর পূর্বে ভানুসিংহের জন্ম হয়। সুতরাং নিঃসন্দেহ প্রমাণ হইল যে, ভানুসিংহ ৪৩৮ খৃস্টাব্দে অথবা খৃস্টাব্দের ছয় সহস্র বৎসর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। কেহ যদি ইহার প্রতিবাদ করিতে পারেন, তাঁহাকে আমাদের পরম বন্ধু বলিয়া জ্ঞান করিব কারণ, সত্যের প্রতিই আমাদের লক্ষ্য; এ প্রবন্ধের প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে।

ভানুসিংহের আর সমস্তই তো ঠিকানা করিয়া দিলাম, এখন এইরূপ নিঃসন্দেহে তাঁহার জন্মভূমির একটা ঠিকানা করিয়া দিতে পারিলেই নিশ্চিন্ত হইতে পারি। এ সম্বন্ধেও মতভেদ আছে। পরম শ্রদ্ধাস্পদ সনাতনবাবু একরূপ বলেন ও পরমভক্তিভাজন রূপনারায়ণ বাবু আর-একরূপ বলেন। তাঁহাদের কথা এখানে উদ্‌ধৃত করিবার কোনো আবশ্যক নাই। কারণ, তাঁহাদের উভয়ের মতই নিতান্ত অশ্রদ্ধেয় ও হেয়। তাঁহারা যে লেখা লিখিয়াছেন তাহাতে লেখকদিগের শরীরে লাঙ্গুল ও ক্ষুরের অস্তিত্ব এবং তাঁহাদের কর্ণের অমানুষিক দীর্ঘতা সপ্রমাণ হইতেছে। ইতিহাস কাহাকে বলে আগে তাহাই তাঁহারা ইস্কুলে গিয়া শিখিয়া আসুন, তার পরে আমার কথার প্রতিবাদ করিতে সাহসী হইবেন। আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি তাঁহাদের উপরে আমার ন্দুমাত্র রাগ নাই, এবং আমার কেহ প্রতিবাদ করিলে আমি আনন্দিত বৈ রুষ্ট হই না, কেবল ত্যের অনুরোধে ও সাধারণের হিতের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এক-একবার ইচ্ছা করে তাঁহাদের লেখাগুলি চণ্ডালের দ্বারা পুড়াইয়া তাহার ভস্মশেষ কর্মনাশার জলে নিক্ষিপ্ত হয় এবং লেখকদ্বয়ও লায় কলসি বাঁধিয়া তাহারই অনুগমন করেন।

---

১. See *The Grammer of the Red Indian Tchouk-Tchouk-Hmhm-Hmhm language,* Conjongation of Verbs. Vol. 3 p. 999

২. *History of the Art of Embroidery and Crewel Work.* Appendix.

তিন বৈ নয়। এক্ষণে সেই তিন বেদে ভানুসিংহের বিষয় কী কী প্রমাণ পাওয়া যায় তাহা আলোচনা করিয়া দেখা যাক। বেদে ছন্দ আছে, মন্ত্র আছে, ব্রাহ্মণ আছে, সূত্র আছে, কিন্তু ভানুসিংহের কোনো কথা নাই।[১] এমন-কি, বেদের সংহিতা ভাগে ইন্দ্র, বরুণ, মরুৎ, অগ্নি, রুদ্র, রবি প্রভৃতি দেবগণের কথাও আছে কিন্তু ইতিহাস রচনায় অনভিজ্ঞতাবশত ভানুসিংহের কোনো উল্লেখ নাই।[২]

শ্রীমদ্ভাগবতে ও বিষ্ণুপুরাণে নন্দবংশ রাজগণের কথা পাওয়া যায়। এমন-কি, তাহাতে ইহাও লিখিয়াছে যে, মহাপদ্ম নন্দীর সুমাল্য প্রভৃতি আট পুত্র জন্মিবে— কৌটিল্য ব্রাহ্মণের কথাও আছে, অথচ ভানুসিংহের কোনো কথা তাহাতে দেখিতে পাইলাম না।[৩] যদি কোনো দুঃসাহসিক পাঠক বলেন যে, হাঁ, তাহাতে ভানুসিংহের কথা আছে, তিনি প্রমাণ প্রয়োগপূর্বক দেখাইয়া দিন— তিনি আমাদের এবং ভারতবর্ষের ধন্যবাদভাজন হইবেন।

আমরা ভোজ প্রবন্ধ আনাইয়া দেখিলাম, তাহাতে ধারা নগরাধিপ ভোজরাজার বিস্তারিত বিবরণ আছে। তাহাতে নিম্নলিখিত পণ্ডিতগণের নাম পাওয়া যায়— কালিদাস, কর্পূর, কলিঙ্গ , কোকিল, শ্রীদচন্দ্র। এমন-কি মুচকুন্দ, ময়ূর ও দামোদরের নামও তাহাতে পাওয়া গেল, কিন্তু ভানুসিংহের নাম কোথাও পাওয়া গেল না।[৪]

বিশ্বগুণাদর্শ দেখো— মাঘশ্চোরো ময়ূরো মুরারি পুরসরো ভারবিঃ সারবিদ্যঃ
শ্রীহর্ষঃ কালিদাসঃ কবিরথ ভবভূত্যাদয়ো ভোজরাজঃ

দেখো, ইহাতেও ভানুসিংহের নাম নাই।[৫]

বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন উল্লেখ স্থলে ভানুসিংহের নাম পাওয়া যায় ভাবিয়া আমরা বিস্তর অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছি—

ধন্বন্তরিঃ ক্ষপণকোমর সিংহ শঙ্কুর্বেতাল ভট্ট ঘটকর্পর কালিদাসাঃ
খ্যাতা বরাহ মিহিরো নৃপতেঃ সভায়াং রত্নানি বৈ বররুচির্ণব বিক্রমস্য।

কৈ ইহার মধ্যেও তো ভানুসিংহের নাম পাওয়া গেল না।[৬] তবে, কোনো কোনো ভাবুকব্যক্তি সন্দেহ করেন কালিদাস ও ভানুসিংহ একই ব্যক্তি হইবেন। এ সন্দেহ নিতান্ত অগ্রাহ্য নহে, কারণ কবিত্বশক্তি সম্বন্ধে উভয়ের সম্পূর্ণ সাদৃশ্য দেখা যায়।

অবশেষে আমরা বত্রিশ সিংহাসন, বেতাল পঁচিশ, তুলসীদাসের রামায়ণ, আরব্য উপন্যাস ও সুশীলার উপাখ্যান বিস্তর গবেষণার সহিত অনুসন্ধান করিয়া কোথাও ভানুসিংহের উল্লেখ দেখিতে পাইলাম না। অতএব কেহ যেন আমাদের অনুসন্ধানের প্রতি দোষারোপ না করেন— দোষ কেবল গ্রন্থগুলির।

ভানুসিংহের জন্মকাল সম্বন্ধে চারি প্রকার মত দেখা যায়। শ্রদ্ধাস্পদ পাঁচকড়িবাবু বলেন ভানুসিংহের জন্মকাল খৃস্টাব্দের ৪৫১ বৎসর পূর্বে। পরম পণ্ডিতবর সনাতনবাবু বলেন খৃস্টাব্দের ১৬৮৯ বৎসর পরে। সর্বলোকপূজিত পণ্ডিতাগ্রগণ্য নিতাইচরণবাবু বলেন ১১০৪

---

১. See *English Translation of Hitopadesha* by H.M. Dibdin, Vol. 3, p. 551.

২. কোনো কোনো অতি বুদ্ধিমান ব্যক্তি এরূপ সন্দেহ করিয়া থাকেন যে, উক্ত ইন্দ্র প্রভৃতি ঠাকুরগণের মধ্যে রবির যে উল্লেখ দেখা যায়, তাহা ভানুর নামান্তর হইতে পারে। কিন্তু তাহা নিতান্ত অপ্রামাণিক।

৩. Vide *Pictorial Handbook of Modern Geography*, Vol. 1, p. 139.

৪. See *Hong-chang-ching* by Kong-fu.

৫. 'সাহনামা', দ্বিতীয় সর্গ।

৬. Peterhoff's *Chromkroptologisheder Unterlutungeln.*

খৃস্টাব্দ হইতে ১৭৯৯ খৃস্টাব্দের মধ্যে কোনো সময়ে ভানুসিংহের জন্ম হইয়াছিল। আর, মহামহোপাধ্যায় সরস্বতীর বরপুত্র কালাচাঁদ দে মহাশয়ের মতে ভানুসিংহ, হয় খৃস্ট শতাব্দীর ৮১৯ বৎসর পূর্বে, না-হয় ১৬৩৯ বৎসর পরে জন্মিয়াছিলেন, ইহার কোনো সন্দেহ মাত্র নাই। আবার কোনো কোনো মূর্খ নির্বোধ গোপনে আত্মীয় বন্ধু-বান্ধবদের নিকটে প্রচার করিয়া বেড়ায় যে, ভানুসিংহ ১৮৬১ খৃস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া ধরাধাম উজ্জ্বল করেন। ইহা আর কোনো বুদ্ধিমান পাঠককে বলিতে হইবে না যে, এ কথা নিতান্তই অশ্রদ্ধেয়। যাহা হউক, ভানুসিংহের জন্মকাল সম্বন্ধে আমাদের যে মত তাহা প্রকাশ করিতেছি। ইহার সত্যতা সম্বন্ধে কোনো বুদ্ধিমান সুবিবেচক পাঠকের সন্দেহ থাকিবে না। নীল পুরাণের একাদশ সর্গে বৈতস মুনিকে ভানব বলা হইয়াছে।[১] তবেই দেখা যাইতেছে তিনি ভানুর বংশজাত। এক্ষণে, তিনি ভানুর কত পুরুষ পরে ইহা নিঃসন্দেহ স্থির করা দুঃসাধ্য। রামকে রাঘব বলা হইয়া থাকে। রঘুর তিন পুরুষ পরে রাম। মনে করা যাক, বৈতস ভানুর চতুর্থ পুরুষ। প্রত্যেক পুরুষের মধ্যে ২০ বৎসরের ব্যবধান ধরা যাক, তাহা হইলে ভানুসিংহের জন্মের আশি বৎসর পরে বৈতসের জন্ম। যিনি রাজতরঙ্গিণী পড়িয়াছেন, তিনিই জানেন বৈতস ৫১৮ খৃস্টাব্দের লোক।[২] তাহা হইলে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে ভানুসিংহের জন্মকাল ৪৩৮ খৃস্টাব্দে। কিন্তু ভাষার প্রমাণ যদি দেখিতে হয় তাহা হইলে ভানুসিংহকে আরও প্রাচীন বলিয়া স্থির করিতে হয়। সকলেই জানেন, ভাষা লোকের মুখে মুখে যতই পুরাতন হইতে থাকে ততই সংক্ষিপ্ত হইতে থাকে। 'গমন করিলাম' হইতে 'গেলুম' হয়। 'ভ্রাতৃজায়া' হইতে 'ভাজ' হয়। 'খুল্লতাত' হইতে 'খুড়ো' হয়। কিন্তু ছোটো হইতে বড়ো হওয়ার দৃষ্টান্ত কোথায়? অতএব নিঃসন্দেহ 'পিরীতি' শব্দ 'প্রীতি' অপেক্ষা 'তিখিনী' শব্দ 'তীক্ষ্ণ' অপেক্ষা প্রাচীন। অষ্টাদশ ঋকের এক স্থলে দেখা যায় 'তীক্ষ্ণানি সায়কানি'। সকলেই জানেন অষ্টাদশ ঋক্ খৃস্টের ৪০০০ বৎসর পূর্বে রচিত হয়। একটি ভাষা পুরাতন ও পরিবর্তিত হইতে কিছু না-হউক দুহাজার বৎসর লাগে। অতএব স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, খৃস্টজন্মের ছয় সহস্র বৎসর পূর্বে ভানুসিংহের জন্ম হয়। সুতরাং নিঃসন্দেহ প্রমাণ হইল যে, ভানুসিংহ ৪৩৮ খৃস্টাব্দে অথবা খৃস্টাব্দের ছয় সহস্র বৎসর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। কেহ যদি ইহার প্রতিবাদ করিতে পারেন, তাঁহাকে আমাদের পরম বন্ধু বলিয়া জ্ঞান করিব কারণ, সত্যের প্রতিই আমাদের লক্ষ্য; এ প্রবন্ধের প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে।

ভানুসিংহের আর সমস্তই তো ঠিকানা করিয়া দিলাম, এখন এইরূপ নিঃসন্দেহে তাঁহার জন্মভূমির একটা ঠিকানা করিয়া দিতে পারিলেই নিশ্চিন্ত হইতে পারি। এ সম্বন্ধেও মতভেদ আছে। পরম শ্রদ্ধাস্পদ সনাতনবাবু একরূপ বলেন ও পরমভক্তিভাজন রূপনারায়ণ বাবু আর-একরূপ বলেন। তাঁহাদের কথা এখানে উদ্‌ধৃত করিবার কোনো আবশ্যক নাই। কারণ, তাঁহাদের উভয়ের মতই নিতান্ত অশ্রদ্ধেয় ও হেয়। তাঁহারা যে লেখা লিখিয়াছেন তাহাতে লেখকদিগের শরীরে লাঙ্গুল ও ক্ষুরের অস্তিত্ব এবং তাঁহাদের কর্ণের অমানুষিক দীর্ঘতা সপ্রমাণ হইতেছে। ইতিহাস কাহাকে বলে আগে তাহাই তাঁহারা ইস্কুলে গিয়া শিখিয়া আসুন, তার পরে আমার কথার প্রতিবাদ করিতে সাহসী হইবেন। আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি তাঁহাদের উপরে আমার বিন্দুমাত্র রাগ নাই, এবং আমার কেহ প্রতিবাদ করিলে আমি আনন্দিত বৈ রুষ্ট হই না, কেবল সত্যের অনুরোধে ও সাধারণের হিতের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এক-একবার ইচ্ছা করে তাঁহাদের লেখাগুলি চণ্ডালের দ্বারা পুড়াইয়া তাহার ভস্মশেষ কর্মনাশার জলে নিক্ষিপ্ত হয় এবং লেখকদ্বয়ও গলায় কলসি বাঁধিয়া তাহারই অনুগমন করেন।

---

[১] See *The Grammer of the Red Indian Tchouk-Tchouk-Hmhm-Hmhm Language*, Conjongation of Verbs. Vol. 3 p. 999

[২] *History of the Art of Embroidery and Crewel Work.* Appendix.

সিংহল দ্বীপের অন্তর্বর্তী ত্রিনকমলিতে একটি পুরাতন কূপের মধ্যে একটি প্রস্তরফলক পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে ভানুসিংহের নামের ভ এবং হ অক্ষরটি পাওয়া গিয়াছে। বাকি অক্ষরগুলি একেবারেই বিলুপ্ত। 'হ'টিকে কেহ বা 'ক্ষ্ম' বলিতেছেন, কেহ-বা 'ঞ্চ' বলিতেছেন কিন্তু তাহা যে 'হ' তাহাতে সন্দেহ নাই। আবার 'ভ'টিকে কেহ-বা বলেন 'চ্চঁ', কেহ-বা বলেন 'ক্লে', কিন্তু তাঁহারা ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন, 'ভানুসিংহ' শব্দের মধ্যে উক্ত দুই অক্ষর আসিবার কোনো সম্ভাবনা নাই। অতএব ভানুসিংহ ত্রিন্‌কমলিতে বাস করিতেন, কূপের মধ্যে কি না সে বিষয়ে তর্ক উঠিতে পারে। কিন্তু আবার আর-একটা কথা আছে। নেপালে কাটমুণ্ডের নিকটবর্তী একটি পর্বতে সূর্যের (ভানু) প্রতিমূর্তি পাওয়া গিয়াছে, অনেক অনুসন্ধান করিয়া তাহার কাছাকাছি সিংহের প্রতিমূর্তিটা পাওয়া গেল না। পাষণ্ড যবনাধিকারে আমাদের কত গ্রন্থ, কত ইতিহাস, কত মন্দির ধ্বংস হইয়াছে; সেই সময়ে ঔরংজীবের আদেশানুসারে এই সিংহের প্রতিমূর্তি ধ্বংস হইয়া থাকিবে। কিন্তু সম্প্রতি পেশোয়ারের একটি ক্ষেত্র চাষ করিতে করিতে সিংহের প্রতিমূর্তিখোদিত ফলকখণ্ড প্রস্তর বাহির হইয়া পড়িয়াছে— স্পষ্টই দেখা যাইতেছে ইহা সেই নেপালের ভানুপ্রতিমূর্তির অবশিষ্টাংশ, নাহলে ইহার কোনো অর্থই থাকে না। অতএব দেখা যাইতেছে ভানুসিংহের বাসস্থান নেপালে থাকা কিছু আশ্চর্য নয়, বরঞ্চ সম্পূর্ণ সম্ভব। তবে তিনি কার্যগতিকে নেপাল হইতে পেশোয়ারে যাতায়াত করিতেন কি না সে কথা পাঠকেরা বিবেচনা করিবেন এবং স্নান-উপলক্ষে মাঝে মাঝে ত্রিন্‌কমলির কূপে যাওয়াও কিছু আশ্চর্য নহে। ভানুসিংহের বাসস্থান সম্বন্ধে অভ্রান্তবুদ্ধি সূক্ষ্মদর্শী অপ্রকাশচন্দ্রবাবু যে তর্ক করেন তাহা নিতান্ত বাতুলের প্রলাপ বলিয়া বোধ হয়। তিনি ভানুসিংহের স্বহস্তে-লিখিত পাণ্ডুলিপির একপার্শ্বে কলিকাতা শহরের নাম দেখিয়াছেন। ইহার সত্যতা আমরা অবিশ্বাস করি না। কিন্তু আমরা স্পষ্ট প্রমাণ করিতে পারি যে, ভানুসিংহ তাঁহার বাসস্থানের উল্লেখ সম্বন্ধে অত্যন্ত ভ্রমে পড়িয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন বটে আমি কলিকাতায় বাস করি— কিন্তু তাহাই যদি সত্য হইবে, তাহা হইলে কলিকাতায় এত কূপ আছে কোথাও কি প্রমাণসমেত একটা প্রস্তরফলক পাওয়া যাইত না? শব্দশাস্ত্র অনুসারে কাটমুণ্ডু ও ত্রিন্‌কমলির অপভ্রংশে কলিকাতা লিখিত হওয়ারও সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। যাহা হউক, ভানুসিংহ যে নিজ বাসস্থানের সম্বন্ধে ভ্রমে পড়িয়াছিলেন তাহাতে আর ভ্রম রহিল না।

ভানুসিংহের জীবনের সম্বন্ধে কিছুই জানা নাই। হয়তো বা অন্যান্য মতিমান লেখকেরা জানিতে পারেন, কিন্তু এ লেখক বিনীতভাবে তদ্‌বিষয়ে অজ্ঞতা স্বীকার করিতেছেন। তাঁহার ব্যবসায় সম্বন্ধে কেহ বলে তাঁহার কাঠের দোকান ছিল, কেহ বলে তিনি বিশ্বেশ্বরের পূজারী ছিলেন।

ভানুসিংহের কবিতা সম্বন্ধে বেশি কিছু বলিব না। ইহা মা সরস্বতীর চোরাই মাল। জনশ্রুতি এই যে, এ কবিতাগুলি স্বর্গে সরস্বতীর বীণায় বাস করিত। পাছে বিষ্ণুর কর্ণগোচর হয় ও তিনি দ্বিতীয়বার দ্রব হইয়া যান, এই ভয়ে লক্ষ্মীর অনুচরগণ এগুলি চুরি করিয়া লইয়া মর্ত্যভূমে ভানুসিংহের মগজে গুঁজিয়া রাখিয়া যায়। কেহ কেহ বলেন যে, এগুলি বিদ্যাপতির অনুকরণে লিখিত, সে কথা শুনিলে হাসি আসে। বিদ্যাপতি বলিয়া একব্যক্তি ছিল কি না ছিল তাহাই তাঁরা অনুসন্ধান করিয়া দেখেন নাই।

যাহা হউক, ভানুসিংহের জীবনী সম্বন্ধে সমস্তই নিঃসংশয়রূপে স্থির করা গেল। তবে, এই ভানুসিংহই যে বৈষ্ণব কবি তাহা না হইতেও পারে। হউক বা না হউক সে অতি সামান্য বিষয়, আসল কথাটা তো স্থির হইয়া গেল।

নবজীবন
শ্রাবণ ১২৯১

পুষ্পাঞ্জলি

সূর্যদেব, তুমি কোন্ দেশ অন্ধকার করিয়া এখানে উদিত হইলে? কোন্‌খানে সন্ধ্যা হইল? এদিকে তুমি জুঁইফুলগুলি ফুটাইলে, কোন্‌খানে রজনীগন্ধা ফুটিতেছে? প্রভাতের কোন্ পরপারে সন্ধ্যার মেঘের ছায়া অতি কোমল লাবণ্যে গাছগুলির উপরে পড়িয়াছে। এখানে আমাদিগকে জাগাইতে আসিয়াছ সেখানে কাহাদিগকে ঘুম পাড়াইয়া আসিলে? সেখানকার বালিকারা ঘরে দীপ জ্বালাইয়া ঘরের দুয়ারটি খুলিয়া সন্ধ্যালোকে দাঁড়াইয়া কি তাহাদের পিতার জন্য অপেক্ষা করিতেছে? সেখানে তো মা আছে— তাহারা কি তাহাদের ছোটো ছোটো শিশুগুলিকে চাঁদের আলোতে শুয়াইয়া, মুখের পানে চাহিয়া, চুমো খাইয়া, বুকে চাপিয়া ধরিয়া ঘুম পাড়াইতেছে? কত শত সেখানে কুটির গাছপালার মধ্যে, নদীর ধারে, পর্বতের উপত্যকায়, মাঠের পাশে অরণ্যের প্রান্তে আপনার আপনার স্নেহ প্রেম সুখ-দুঃখ বুকের মধ্যে লইয়া সন্ধ্যাচ্ছায়ায় বিশ্রাম ভোগ করিতেছে। সেখানে আমাদের কোনো অজ্ঞাত একটি পাখি এই সময়ে গাছের ডালে বসিয়া ডাকে; সেখানকার লোকের প্রাণের সুখ-দুঃখের সহিত প্রতি সন্ধ্যাবেলায় এই পাখির গান মিশিয়া যায়। তাহাদের দেশে যে-সকল কবিরা বহুকাল পূর্বে বাস করিত, যাহারা আর নাই, লোকে যাহাদের গান জানে কিন্তু নাম জানে না, তাহারাও কোন্ সন্ধ্যাবেলায় কোন্-এক নদীর ধারে ঘাসের 'পরে শুইয়া এই পাখির গান শুনিত ও গান গাহিত। সে হয়তো আজ বহুদিনের কথা— কিন্তু তখনকার প্রেমিকেরাও তো সহসা এই স্বর শুনিয়া পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়াছিল, বিরহীরা এই পাখির গান শুনিয়া সন্ধ্যাবেলায় নিশ্বাস ফেলিয়াছিল! কিন্তু তাহারা তাহাদের সে-সমস্ত সুখ-দুঃখ লইয়া একেবারে চলিয়া গিয়াছে। তাহারাও যখন জীবনের খেলা খেলিত ঠিক আমাদের মতো করিয়াই খেলিত, এমনি করিয়াই কাঁদিত— তাহারা ছায়া ছিল না, মায়া ছিল না, কাহিনী ছিল না। তাহাদের গায়েও বাতাস ঠিক এমনি জীবন্তভাবেই লাগিত— তাহারা তাহাদের বাগান হইতে ফুল তুলিত— তাহারা এককালে বালক-বালিকা ছিল— যখন মা-বাপের কোলে বসিয়া হাসিত, তখন মনে হইত না তাহারাও বড়ো হইবে। কিন্তু তবুও তাহারা আজিকার এই চারি দিকের জীবময় লোকারণ্যের মধ্যে কেমন করিয়া একেবারে 'নাই' হইয়া গেল। বাগানে এই যে বহুবৃদ্ধ বকুল গাছটি দেখিতেছি— একদিন কোন্ সকাল বেলায় কী সাধ করিয়া কে একজন ইহা রোপণ করিতেছিল— সে জানিত সে ফুল তুলিবে, সে মালা গাঁথিবে; সেই মানুষটি শুধু নাই, সেই সাধটি শুধু নাই, কেবল ফুল ফুটিতেছে আর ঝরিয়া পড়িতেছে। আমি যখন ফুল সংগ্রহ করিতেছি তখন কি জানি কাহার আশার ধন কুড়াইতেছি, কাহার যত্নের ধনে মালা গাঁথিতেছি! হায় হায়, সে যদি আসিয়া দেখে, সে যাহাদিগকে যত্ন করিত, সে যাহাদিগকে রাখিয়া গিয়াছে, তাহারা আর তাহার নাম করে না, তাহারা আর তাহাকে স্মরণ করাইয়া দেয় না— যেন তাহারা আপনিই হইয়াছে, আপনিই আছে এমনি ভান করে— যেন তাহাদের সহিত কাহারো যোগ ছিল না!

—

কিন্তু, এই বুঝি এ জগতের নিয়ম! আর, এ নিয়মের অর্থও বুঝি আছে! যতদিন কাজ করিবে ততদিন প্রকৃতি তোমাকে মাথায় করিয়া রাখিবে। ততদিন ফুল তোমার জন্যই ফুটে, আকাশের সমস্ত জ্যোতিষ্ক তোমার জন্যই আলো ধরিয়া থাকে, সমস্ত পৃথিবীকে তোমারই বলিয়া মনে হয়। কিন্তু যেই তোমা দ্বারা আর কোনো কাজ পাওয়া যায় না, যেই তুমি মৃত হইলে, অমনি সে তাড়াতাড়ি তোমাকে সরাইয়া ফেলে— তোমাকে চোখের আড়াল করিয়া দেয়— তোমাকে এই জগৎ দৃশ্যের নেপথ্যে দূর করিয়া দেয়। খরতর কালস্রোতের মধ্যে তোমাকে খরকুটার মতো ঝাঁটাইয়া ফেলে, তুমি হু হু করিয়া ভাসিয়া যাও, দিন-দুই বাদে তোমার আর একেবারে নাগাল পাওয়া যায় না। এমন না হইলে মৃতেরাই এ জগৎ অধিকার করিয়া থাকিত, জীবিতদের এখানে স্থান থাকিত না। কারণ, মৃতই অসংখ্য, জীবিত নিতান্ত অল্প। এত মৃত অধিবাসীর জন্য

আমাদের হৃদয়েও স্থান নাই। কাজেই অকর্মণ্য হইলে যত শীঘ্র সম্ভব প্রকৃতি জগৎ হইতে আমাদিগকে একেবারে পরিষ্কার করিয়া ফেলে। আমাদের চিরজীবনের কাজের, চিরজীবনের ভালোবাসার এই পুরস্কার! কিন্তু পুরস্কার পাইবে কে বলিয়াছিল! এই তো চিরদিন হইয়া আসিতেছিল, এই তো চিরদিন হইবে। তাহা যদি সত্য হয়, তবে এই অতিশয় কঠিন নিয়মের মধ্যে আমি থাকিতে চাই না। আমি সেই বিস্মৃতদের মধ্যে যাইতে চাই— তাহাদের জন্য আমার প্রাণ আকুল হইয়া উঠিয়াছে। তাহারা হয়তো আমাকে ভুলে নাই, তাহারা হয়তো আমাকে চাহিতেছে! এককালে এ জগৎ তাহাদেরই আপনার রাজ্য ছিল— কিন্তু তাহাদেরই আপনার দেশ হইতে তাহাদিগকে সকলে নির্বাসিত করিয়া দিতেছে— কেহ তাহাদের চিহ্নও রাখিতে চাহিতেছে না। আমি তাহাদের জন্য স্থান করিয়া রাখিয়াছি, তাহারা আমার কাছে থাকুক। বিস্মৃতিই যদি আমাদের অনন্তকালের বাসা হয় আর স্মৃতি যদি কেবলমাত্র দুদিনের হয় তবে সেই আমাদের স্বদেশেই যাই-না কেন। সেখানে আমার শৈশবের সহচর আছে; সে আমার জীবনের খেলাঘর এখান হইতে ভাঙিয়া লইয়া গেছে— যাবার সময় সে আমার কাছে কাঁদিয়া গেছে— যাবার সময় সে আমাকে তাহার শেষ ভালোবাসা দিয়া গেছে। এই মৃত্যুর দেশে এই জগতের মধ্যাহ্ন কিরণে কি তাহার সেই ভালোবাসার উপহার প্রতি মুহূর্তেই শুকাইয়া ফেলিব! আমার সঙ্গে তাহার যখন দেখা হইবে, তখন কি তাহার আজীবনের এত ভালোবাসার পরিণামস্বরূপ আর কিছুই থাকিবে না, আর কিছুই তাহার কাছে লইয়া যাইতে পারিব না কেবল কতকগুলি নীরস স্মৃতির শুষ্ক মালা! সেগুলি দেখিয়া কি তাহার চোখে জল আসিবে না!

—

হে জগতের বিস্মৃত, আমার চিরস্মৃত, আগে তোমাকে যেমন গান শুনাইতাম, এখন তোমাকে তেমন শুনাইতে পারি না কেন? এ-সব লেখা যে আমি তোমার জন্য লিখিতেছি। পাছে তুমি আমার কণ্ঠস্বর ভুলিয়া যাও, অনন্তের পথে চলিতে চলিতে যখন দৈবাৎ তোমাতে আমাতে দেখা হইবে, তখন পাছে তুমি আমাকে চিনিতে না পার, তাই প্রতিদিন তোমাকে স্মরণ করিয়া আমার এই কথাগুলি তোমাকে বলিতেছি, তুমি কি শুনিতেছ না! এমন একদিন আসিবে যখন এই পৃথিবীতে আমার কথার একটিও কাহারো মনে থাকিবে না— কিন্তু ইহার একটি-দুটি কথা ভালোবাসিয়া তুমিও কি মনে রাখিবে না। যে-সব লেখা তুমি এত ভালোবাসিয়া শুনিতে, তোমার সঙ্গেই যাহাদের বিশেষ যোগ, একটু আড়াল হইয়াছ বলিয়াই তোমার সঙ্গে আর কি তাহাদের কোনো সম্বন্ধ নাই। এত পরিচিত লেখার একটি অক্ষরও মনে থাকিবে না? তুমি কি আর-এক দেশে আর-এক নূতন কবির কবিতা শুনিতেছ?

—

আমরা যাহাদের ভালোবাসি তাহারা আছে বলিয়াই যেন এই জ্যোৎস্না রাত্রির একটা অর্থ আছে— বাগানের এই ফুলগাছগুলিকে এমনিতরো দেখিতে হইয়াছে— নহিলে তাহারা যেন আর-একরকম দেখিতে হইত। তাই যখন একজন প্রিয় ব্যক্তি চলিয়া যায়, তখন সমস্ত পৃথিবীর উপর দিয়া যেন একটা মরুর বাতাস বহিয়া যায়— মনে আশ্চর্য বোধ হয় তবুও কেন পৃথিবীর উপরকার সমস্ত গাছপালা একেবারে শুকাইয়া গেল না। যদিও তাহারা থাকে তবু তাহাদের থাকিবার একটা যেন কারণ খুঁজিয়া পাই না। জগতের সমুদয় সৌন্দর্য যেন আমাদের প্রিয়ব্যক্তিকে তাহাদের মাঝখানে বসাইয়া রাখিবার জন্য। তাহারা আমাদের ভালোবাসার সিংহাসন আমাদের ভালোবাসার চারি দিকে তাহারা জড়াইয়া উঠে, লতাইয়া উঠে, ফুটিয়া উঠে। এক-একদিন কী মাহেন্দ্রক্ষণে প্রিয়তমের মুখ দেখিয়া আমাদের হৃদয়ের প্রেম তরঙ্গিত হইয়া উঠে। প্রভাতে চারি দিকে চাহিয়া দেখি সৌন্দর্যসাগরেও তাহারই একতালে আজ তরঙ্গ উঠিয়াছে— কত বিচিত্র বর্ণ, কত বিচিত্র গন্ধ, কত বিচিত্র গান। কাল যেন জগতে এত মহোৎসব ছিল না। অনেকদিনের পরে সহসা যেন সূর্যোদয় হইল। হৃদয়ও যখন আলো দিতে লাগিল সমস্ত জগৎও

তাহার সৌন্দর্যচ্ছটা উদ্ভাসিত করিয়া দিল। সমস্ত জগতের সহিত হৃদয়ের এক অপূর্ব মিলন হইল! একজনের সহিত যখন আমাদের মিলন হয়, তখন সে মিলন আমরা কেবল তাহারই মধ্যে বদ্ধ করিয়া রাখিতে পারি না, অলক্ষ্যে অদৃশ্যে সে মিলন বিস্তৃত হইয়া জগতের মধ্যে গিয়া পৌঁছায়। সূচ্যগ্র ভূমির জন্যও যখন আলো জ্বালা হয়, তখন সে আলো সমস্ত ঘরকে আলো না করিয়া থাকিতে পারে না!

—

যখন আমাদের প্রিয়-বিয়োগ হয়, তখন সমস্ত জগতের প্রতি আমাদের বিষম সন্দেহ উপস্থিত হয় অথচ সন্দেহ করিবার কোনো কারণ দেখিতে পাই না বলিয়া হৃদয়ের মধ্যে কেমন আঘাত লাগে; যেমন নিতান্ত কোনো অভূতপূর্ব ঘটনা দেখিলে আমাদের সহসা সন্দেহ হয় আমরা স্বপ্ন দেখিতেছি, আমাদের হাতের কাছে যে জিনিস থাকে তাহা ভালো করিয়া স্পর্শ করিয়া দেখি এ সমস্ত সত্য কি না; তেমনি আমাদের প্রিয়জন যখন চলিয়া যায়, তখন আমরা জগৎকে চারি দিকে স্পর্শ করিয়া দেখি— ইহারা সব ছায়া কি না, মায়া কি না, ইহারাও এখনই চারি দিক হইতে মিলাইয়া যাইবে কি না। কিন্তু যখন দেখি ইহারা অচল রহিয়াছে, তখন জগৎকে যেন তুলনায় আরও দ্বিগুণ কঠিন বলিয়া মনে হয়। দেখিতে পাই যে, তখন যে ফুলেরা বলিত, সে না থাকিলে ফুটিব না, যে জ্যোৎস্না বলিত সে না থাকিলে উঠিব না, তাহারাও আজ ঠিক তেমনি করিয়াই ফুটিতেছে, তেমনি করিয়াই উঠিতেছে। তাহারা তখন যতখানি সত্য ছিল, এখনও ঠিক ততখানি সত্যই আছে— একচুলও ইতস্তত হয় নাই!—

এইজন্য সে যে নাই এই কথাটাই অত্যন্ত বেশি করিয়া মনে হয়, কারণ, সে ছাড়া আর সমস্তই অতিশয় আছে।

—

আমাকে যাহারা চেনে সকলেই তো আমার নাম ধরিয়া ডাকে, কিন্তু সকলেই কিছু একই ব্যক্তিকে ডাকে না এবং সকলকেই কিছু একই ব্যক্তি সাড়া দেয় না! এক-একজনে আমার এক-একটা অংশকে ডাকে মাত্র, আমাকে তাহারা ততটুকু বলিয়াই জানে। এইজন্য, আমরা যাহাকে ভালোবাসি তাহার একটা নূতন নামকরণ করিতে চাই; কারণ সকলের-সে ও আমার-সে বিস্তর প্রভেদ। আমার যে গেছে সে আমাকে কতদিন হইতে জানিত— আমাকে কত প্রভাতে, কত দ্বিপ্রহরে, কত সন্ধ্যাবেলায় সে দেখিয়াছে! কত বসন্তে, কত বর্ষায় কত শরতে আমি তাহার কাছে ছিলাম! সে আমাকে কত স্নেহ করিয়াছে, আমার সঙ্গে কত খেলা করিয়াছে, আমাকে কত শত সহস্র বিশেষ ঘটনার মধ্যে খুব কাছে থাকিয়া দেখিয়াছে! যে-আমাকে সে জানিত সে সেই সতেরো বৎসরের খেলাধুলা, সতেরো বৎসরের সুখ-দুঃখ, সতেরো বৎসরের বসন্ত বর্ষা। সে আমাকে যখন ডাকিত, তখন আমার এই ক্ষুদ্র জীবনের অধিকাংশই, আমার এই সতেরো বৎসর তাহার সমস্ত খেলাধুলা লইয়া তাহাকে সাড়া দিত। ইহাকে সে ছাড়া আর কেহ জানিত না, জানে না। সে চলিয়া গেছে, এখন আর ইহাকে কেহ ডাকে না, এ আর কাহারো ডাকে সাড়া দেয় না! তাঁহার সেই বিশেষ কণ্ঠস্বর, তাঁহার সেই অতি পরিচিত সুমধুর স্নেহের আহ্বান ছাড়া জগতে এ আর কিছুই চেনে না। বহির্জগতের সহিত এই ব্যক্তির আর কোনো সম্বন্ধই রহিল না— সেখান হইতে এ একেবারেই পালাইয়া আসিল— এ-জন্মের মতো আমার হৃদয়-কবরের অতি গুপ্ত অন্ধকারের মধ্যে ইহার জীবিত সমাধি হইল।

আমি কেবল ভাবিতেছি, এমন তো আরও সতেরো বৎসর যাইতে পারে! আবার তো কত নূতন ঘটনা ঘটিবে কিন্তু তাহার সহিত তাঁহার তো কোনো সম্পর্কই থাকিবে না। কত নূতন সুখ আসিবে, কিন্তু তাহার জন্য তিনি তো হাসিবেন না— কত নূতন দুঃখ আসিবে কিন্তু তাহার জন্য তিনি তো কাঁদিবেন না। কত শত দিন-রাত্রি একে একে আসিবে কিন্তু তাহারা একেবারেই তিনি-হীন হইয়া আসিবে! আমার সম্পর্কীয় যাহা-কিছু তাহার প্রতি তাঁহার বিশেষ স্নেহ আর এক

মুহূর্তের জন্যও পাইব না! মনে হয়— তাঁহারও কত নূতন সুখ-দুঃখ ঘটিবে, তাহার সহিত আমার কোনো যোগ নাই। যদি অনেকদিন পরে সহসা দেখা হয়, তখন তাঁহার নিকটে আমার অনেকটা অজানা, আমার নিকট তাঁহার অনেকটা অপরিচিত। অথচ আমরা উভয়ের নিতান্ত আপনার লোক।

—

কোথায় নহবৎ বসিয়াছে। সকাল হইতে-না-হইতেই বিবাহের বাঁশি বাজিয়া উঠিয়াছে। আগে বিছানা হইতে নূতন ঘুম ভাঙিয়া যখন এই বাঁশি শুনিতে পাইতাম তখন জগৎকে কী উৎসবময় বলিয়া মনে হইত। বাঁশিতে কেবল আনন্দের কণ্ঠস্বরটুকুমাত্র দূর হইতে শুনিতে পাইতাম, বাকিটুকু কী মোহময় আকারে কল্পনায় উদিত হইত! কত সুখ, কত হাসি, কত হাস্য-পরিহাস, কত মধুময় লজ্জা, আত্মীয়-পরিজনের আনন্দ, আপনার লোকদের সঙ্গে কত সুখের সম্বন্ধে জড়িত হওয়া, ভালোবাসার লোকের মুখের দিকে চাওয়া, ছেলেদের কোলে করা, পরিহাসের লোকদের সহিত স্নেহময় মধুর পরিহাস করা— এমন কত-কী দৃশ্য সূর্যালোকে চোখের সমুখে দেখিতাম! এখন আর তাহা হয় না! আজি ওই বাঁশি শুনিয়া প্রাণের একজায়গা কোথায় হাহাকার করিতেছে। এখন কেবল মনে হয়, বাঁশি বাজাইয়া যে-সকল উৎসব আরম্ভ হয়, সে-সব উৎসবও কখন একদিন শেষ হইয়া যায়। তখন আর বাঁশি বাজে না! বাপ-মায়ের যে স্নেহের ধনটি কাঁদিয়া অবশেষে কঠিন পৃথিবী হইতে নিশ্বাস ফেলিয়া চলিয়া যায়— একদিন সকালে মধুর সূর্যের আলোতে তাহার বিবাহেও বাঁশি বাজিয়াছিল। তখন সে ছেলেমানুষ ছিল, মনে কোনো দুঃখ ছিল না, কিছুই সে জানিত না! বাঁশির গানের মধ্যে, হাসির মধ্যে, লোকজনের আনন্দের মধ্যে, চারি দিকে ফুলের মালা ও দীপের আলোর মধ্যে সেই ছোটো মেয়েটি গলায় হার পরিয়া পায়ে দুগাছি মল পরিয়া বিরাজ করিতেছিল। অল্প বয়সে খুব বৃহৎ খেলা খেলিতে যেরূপ আনন্দ হয় তাহার সেইরূপ আনন্দ হইতেছিল। কে জানিত সে কী খেলা খেলিতে আরম্ভ করিল! সেদিনও প্রভাত এমনি মধুর ছিল!

দেখিতে দেখিতে কত লোক তাহার নিতান্ত আত্মীয় হইল, তাহার প্রাণের খুব কাছাকাছি বাস করিতে লাগিল, পরের সুখ-দুঃখ লইয়া সে নিজের সুখ-দুঃখ রচনা করিতে লাগিল। সে তাহার কোমল হৃদয়খানি লইয়া দুঃখের সময় সান্ত্বনা করিত, কোমল হাত দুখানি লইয়া রোগের সময় সেবা করিত। সেদিন বাঁশি বাজাইয়া আসিল, সে আজ গেল কী করিয়া! সে কেন চোখের জল ফেলিল! সে তাহার গভীর হৃদয়ের অতৃপ্তি, তাহার আজন্ম কালের দুরাশা, শ্মশানের চিতার মধ্যে বিসর্জন দিয়া গেল কোথায়! সে কেন বালিকাই রহিল না, তাহার ভাই-বোনদের সঙ্গে চিরদিন খেলা করিল না! সে আপনার সাধের জিনিস-সকল ফেলিয়া, আপনার ঘর ছাড়িয়া, আপনার বড়ো ভালোবাসার লোকদের প্রতি একবার ফিরিয়া না চাহিয়া— যে কোলে ছেলেরা খেলা করিত, যে হাতে সে রোগীর সেবা করিত, সেই স্নেহমাখানো কোল, সেই কোমল হাত, সেই সুন্দর দেহ সত্যসত্যই একেবারে ছাই করিয়া চলিয়া গেল!

কিন্তু সেদিনকার সকালবেলার মধুর বাঁশি কি এত কথা বলিয়াছিল? এমন রোজই কোনো-না-কোনো জায়গায় বাঁশি তো বাজিতেছেই! কিন্তু এই বাঁশি বাজাইয়া কত হৃদয় দলন হইতেছে, কত জীবন মরুভূমি হইয়া যাইতেছে, কত কোমল হৃদয় আমরণকাল অসহায়ভাবে প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে নূতন নূতন আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া যাইতেছে— অথচ একটি কথা বলিতেছে না, কেবল চোখে তাহাদের কাতরতা এবং হৃদয়ের মধ্যে চিরপ্রচ্ছন্ন তুষের আগুন। সবই যে দুঃখের তাহা নহে কিন্তু সকলেরই তো পরিণাম আছে। পরিণামের অর্থ— উৎসবের প্রদীপ নিবিয়া যাওয়া, বিসর্জনের পর মর্মভেদী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলা। পরিণামের অর্থ— সূর্যালোক এক মুহূর্তের মধ্যে একেবারে ম্লান হইয়া যাওয়া— সহসা জগতের চারি দিক সুখহীন, শান্তিহীন, প্রাণহীন, উদ্দেশ্যহীন মরুভূমি হইয়া যাওয়া! পরিণামের অর্থ— হৃদয়ের মধ্যে কিছুতেই বলিতেছে না যে,

সমস্তই শেষ হইয়া গেছে অথচ চারি দিকেই তাহার প্রমাণ পাওয়া— প্রতি মুহূর্তে প্রতি নূতন ঘটনায় অতি প্রচণ্ড আঘাতে নূতন করিয়া অনুভব করা যে— আর হইবে না, আর ফিরিবে না, আর নয়, আর কিছুতেই নয়। সেই অতি নিষ্ঠুর কঠিন বজ্র পাষাণময় 'নয়' নামক প্রকাণ্ড লৌহদ্বারের সম্মুখে মাথা খুঁড়িয়া মরিলেও সে এক তিল উদ্‌ঘাটিত হয় না।

—

মানুষে মানুষে চিরদিনের মিলন যে কী গুরুতর ব্যাপার তাহা সহসা সকলের মনে হয় না। তাহা চিরদিনের বিচ্ছেদের চেয়ে বেশি গুরুতর বলিয়া মনে হয়। আমরা অন্ধভাবে জগতের চারি দিক হইতে গড়াইয়া আসিতেছি, কে কোথায় আসিয়া পড়িতেছি তাহার ঠিকানা নাই। যে যেখানকার নয়, সে হয়তো সেইখানেই রহিয়া গেল। এ জীবনে আর তাহার নিষ্কৃতি নাই। যাহা বাসস্থান হওয়া উচিত ছিল তাহাই কারাগার হইয়া দাঁড়াইল। আমরা সচেতন জড়পিণ্ডের মতো অহর্নিশি যে গড়াইয়া চলিতেছি আমরা কি জানিতে পারিতেছি পদে পদে কত হৃদয়ের কত স্থান মাড়াইয়া চলিতেছি, আশেপাশের কত আশা কত সুখ দলন করিয়া চলিতেছি। সকল সময়ে তাহাদের' বিলাপটুকুও শুনিতে পাই না, শুনিলেও সকল সময়ে অনুভব করিতে পারি না। সারাদিন আঘাত তো করিতেছিই, আঘাত তো সহিতেছিই, কিছুতেই বাঁচাইয়া চলিতে পারিতেছি না! তাহার কারণ, আমরা পরস্পরকে ভালো করিয়া বুঝিতে পারি না— দেখিতে পাই না— কোন্‌খানে যে কাহার ঘাড়ে আসিয়া পড়িলাম জানিতেই পারি না। আমরা শৈলশিখর-চ্যুত পাষাণ-খণ্ডের মতো। আমাদের পথে পড়িয়া দুর্ভাগা ফুল পিষ্ট হইতেছে, লতা ছিন্ন হইতেছে, তৃণ শুষ্ক হইতেছে— আবার, হয়তো, আমরা কাহার সুখের কুটিরের উপর অভিশাপের মতো পড়িয়া তাহার সুখের সংসার ছারখার করিয়া দিতেছি। ইহার কোনো উপায় দেখা যায় না। সকলেরই কিছু-না-কিছু ভার আছেই, সকলেই জগৎকে কিছু-না-কিছু পীড়া দেয়ই। যতক্ষণ তাহারা দৈবক্রমে তাহাদের ভারসহনক্ষম স্থানে তিষ্ঠিয়া থাকে ততক্ষণ সমস্ত কুশল, কিন্তু সময়ে তাহারা এমন স্থানে আসিয়া পৌঁছায় যেখানে তাহাদের ভার আর সয় না। যাহার উপর পা দেয় সেও ভাঙিয়া যায়, আর অনেক সময় যে পা দেয় সেও পড়িয়া যায়।

—

হৃদয়ে যখন গুরুতর আঘাত লাগে তখন সে ইচ্ছাপূর্বক নিজেকে আরও যেন অধিক পীড়া দিতে চায়। এমন-কি, সে তাহার আশ্রয়ের মূলে কুঠারাঘাত করিতে থাকে। যে-সকল বিশ্বাস তাহার জীবনের একমাত্র নির্ভর তাহাদের সে জলাঞ্জলি দিতে চায়। নিষ্ঠুর তর্কদিগের ভয়ে যে প্রিয় বিশ্বাসগুলিকে সযত্নে হৃদয়ের অন্তঃপুরে রাখিয়া দিত, আজ অনায়াসে তাহাদিগকে তর্কে-বিতর্কে ক্ষত-বিক্ষত করিতে থাকে। প্রিয়বিয়োগে কেহ যদি তাহাকে সান্ত্বনা করিতে আসিয়া বলে— 'এত প্রেম, এত স্নেহ, এত সহৃদয়তা, তাহার পরিণাম কি ওই খানিকটা ভস্ম। কখনোই নহে।' তখন সে যেন উদ্ধত হইয়া বলে— 'আশ্চর্য কী! তেমন সুন্দর মুখখানি— কোমলতায় সৌন্দর্যে লাবণ্যে হৃদয়ের ভাবে আচ্ছন্ন সেই জীবন্ত চলন্ত দেহখানি সেও যে— আর কিছু নয়, দুই মুঠা ছাইয়ে পরিণত হইবে এই বা কে হৃদয়ের ভিতর হইতে বিশ্বাস করিতে পারিত। বিশ্বাসের উপরে বিশ্বাস কী!' এই বলিয়া সে বুক ফাটিয়া কাঁদিতে থাকে। সে অন্ধকার জগৎ-সমুদ্রের মাঝখানে নিজের নৌকাডুবি করিয়া আর কূল-কিনারা দেখিতে চায় না! তাহার খানিকটা গিয়াছে বলিয়া সে আর বাকি কিছুই রাখিতে চায় না। সে বলে, তাহার সঙ্গে সমস্তটাই যাক। কিন্তু সমস্তটা তো যায় না, আমরা নিজেই বাকি থাকি যে। তাই যদি হইল তবে কেন আমরা সহসা আপনাকে উন্মাদের মতো নিরাশ্রয় করিয়া ফেলি? হৃদয়ের এই অন্ধকারের সময় আশ্রয়কে আরও বেশি করিয়া ধরি না কেন? এ সময়ে মনে করি না কেন, বিশ্বের নিয়ম কখনোই এত ভয়ানক ও এত নিষ্ঠুর হইতেই পারে না! সে আমাকে একেবারেই ডুবাইবে না, আমাকে আশ্রয় দিবেই। যেখানেই হউক এক জায়গায় কিনারা আছেই, তা সে সমুদ্রের তলেই হউক আর সমুদ্রের পারেই হউক—

মরিয়াই হউক, আর বাঁচিয়াই হউক! মিছামিছি তো আর ভাবা যায় না।

তুমি বলিতেছ, প্রকৃতি আমাদিগকে প্রতারণা করিতেছে। আমাদিগকে কেবল ফাঁকি দিয়া কাজ করাইয়া লইতেছে। কাজ হইয়া গেলেই সে আমাদিগকে গলাধাক্কা দিয়া দূর করিয়া দেয়। কিন্তু এতবড়ো যাহার কারখানা, যাহার রাজ্যে এমন বিশাল মহত্ত্ব বিরাজ করিতেছে সে কি সত্যসত্যই এই কোটি কোটি অসহায় জীবকে একেবারেই ফাঁকি দিতে পারে! সে কি এই-সমস্ত সংসারের তাপে তাপিত, অহর্নিশি কার্যতৎপর, দুঃখে ভাবনার ভারাক্রান্ত দীনহীন গলদ্‌ঘর্ম প্রাণীদিগকে মেকি টাকায় মাহিয়ানা দিয়া কাজ করাইয়া লইতেছে! সে টাকা কি কোথাও ভাঙাইতে পারা যাইবে না! এখানে না হয়, আর কোথাও! এমন ঘোরতর নিষ্ঠুরতা ও হীন প্রবঞ্চনা কি এতবড়ো মহত্ত্ব ও এতবড়ো স্থায়িত্বের সহিত মিশ খায়! কেবলমাত্র ফাঁকির জাল গাঁথিয়া গাঁথিয়া কি এমনতরো অসীম ব্যাপার নির্মিত হইতে পারিত। কেবলমাত্র আশ্বাসে আজন্মকাল কাজ করিয়া যদি অবশেষে হৃদয়ের শীতবস্ত্রটুকুও পৃথিবীতে ফেলিয়া পুরস্কারস্বরূপ কেবলমাত্র অতৃপ্তি ও অশ্রুজল হইয়া সকলকেই মরণের মহামরুর মধ্যে নির্বাসিত হইতে হয়— তবে এই অভিশপ্ত রাক্ষস সংসার নিজের পাপসাগরে নিজে কোন্‌কালে ডুবিয়া মরিত। কারণ, প্রকৃতির মধ্যেই ঋণ এবং পরিশোধের নিয়মের কোথাও ব্যতিক্রম নাই। কেহই এক কড়ার ঋণ রাখিয়া যাইতে পারে না, তাহার সুদসুদ্ধ শুধিয়া যাইতে হয়— এমন-কি, পিতার ঋণ পিতামহের ঋণ পর্যন্ত শুধিতে সমস্ত জীবন যাপন করিতে হয়। এমন স্থলে প্রকৃতি যে চিরকাল ধরিয়া অসংখ্য জীবের দেনদার হইয়া থাকিবে এমন সম্ভব বোধ হয় না, তাহা হইলে সে নিজের নিয়মেই নিজে মারা পড়িত।

তুমি যে-ঘরটিতে রোজ সকালে বসিতে, তাহারই দ্বারে স্বহস্তে যে-রজনীগন্ধার গাছ রোপণ করিয়াছিলে তাহাকে কি আর তোমার মনে আছে। তুমি যখন ছিলে, তখন তাহাতে এত ফুল ফুটিত না, আজ সে কত ফুল ফুটাইয়া প্রতিদিন প্রভাতে তোমার সেই শূন্য ঘরের দিকে চাহিয়া থাকে। সে যেন মনে করে বুঝি তাহারই 'পরে অভিমান করিয়া তুমি কোথায় চলিয়া গিয়াছ। তাই সে আজ বেশি করিয়া ফুল ফুটাইতেছে। তোমাকে বলিতেছে— তুমি এসো, তোমাকে রোজ ফুল দিব। হায় হায়, যখন সে দেখিতে চায় তখন সে ভালো করিয়া দেখিতে পায় না— আর যখন সে শূন্য হৃদয়ে চলিয়া যায়, এ জন্মের মতো দেখা ফুরাইয়া যায়— তখন আর তাহাকে ফিরিয়া ডাকিলে কী হইবে! সমস্ত হৃদয় তাহার সমস্ত ভালোবাসার ডালাটি সাজাইয়া তাহাকে ডাকিতে থাকে। আমিও তোমার গৃহের শূন্যদ্বারে বসিয়া প্রতিদিন সকালে একটি একটি করিয়া রজনীগন্ধা ফুটাইতেছি— কে দেখিবে! ঝরিয়া পড়িবার সময় কাহার সদয় চরণের তলে ঝরিয়া পড়িবে! আর-সকলেই ইচ্ছা করিলে এ ফুল ছিঁড়িয়া লইয়া মালা গাঁথিতে পারে, ফেলিয়া দিতে পারে— কেবল তোমারই স্নেহের দৃষ্টি এক মুহূর্তের জন্যও ইহাদের উপরে আর পড়িবে না।

—

তোমার ফুলবাগানে যখন চারি দিকেই ফুল ফুটিতেছে, তখন যে তোমাকে দেখিতে পাই না, তাহাতে তেমন আশ্চর্য নাই। কিন্তু যখন দেখি ঘরে ঘরে রোগের মূর্তি, তখনও যে রোগীর শিয়রের কাছে তুমি বসিয়া নাই, এ যেন কেমন বিশ্বাস হয় না। উৎসবের সময় তুমি নাই, বিপদের সময় তুমি নাই, রোগের সময় তুমি নাই! তোমার ঘরে যে প্রতিদিন অতিথি আসিতেছে— হৃদয়ের সরল প্রীতির সহিত তাহাদিগকে কেহ যে আদর করিয়া বসিতে বলে না। তুমি যাহাকে বড়ো ভালোবাসিতে সেই ছোটো মেয়েটি যে আজ সন্ধ্যাবেলায় আসিয়াছে— তাহাকে আদর করিয়া খেতে দিবে কে! এখন আর কে কাহাকে দেখিবে! যে অযাচিত-প্রীতি স্নেহ-সান্ত্বনায় সমস্ত সংসার অভিষিক্ত ছিল সে নির্ঝর শুষ্ক হইয়া গেল— এখন কেবল কতকগুলি স্বতন্ত্র স্বার্থপর কঠিন পাষাণখণ্ড তাহারই পথে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিল।

—

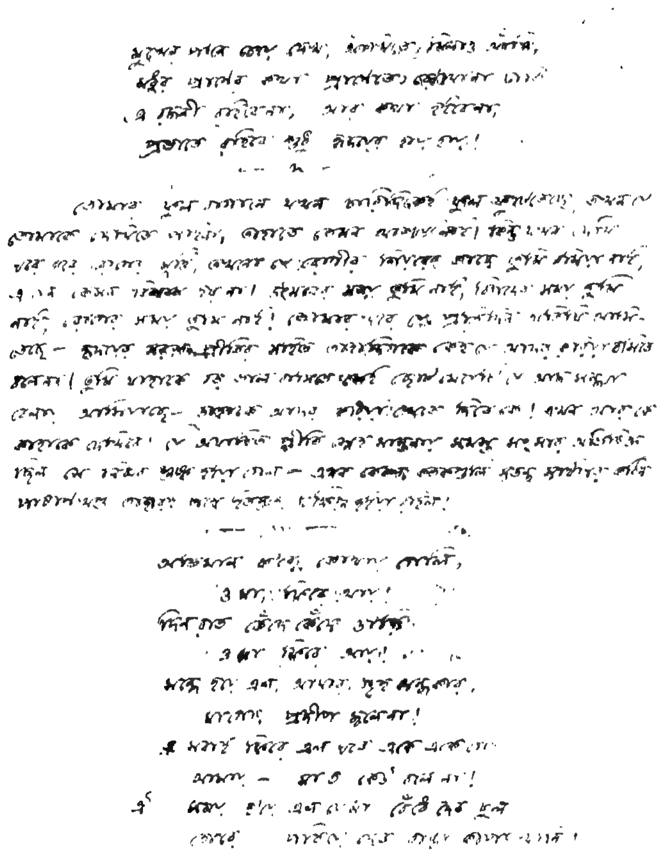

দুখের মাঝে তোমায় দেখি, [illegible] ভিজাও আঁখি,
মধুর প্রাণের কথা প্রাণেতেই লুকাইয়া রাখি
এ জীবনে কহিব না, আর কারে কহিব না,
প্রভাতে রহিবে শুধু তোমার সনে সনে!

— ২ —

তোমার দুটি পায়ের মধ্যে [illegible] সুখ অনুভব করি, তখনি তোমাকে দেখিতে পাই, তাহাতে কেমন [illegible]। কিন্তু যখন দেখি ঘরে ঘরে [illegible], যেখানে সে [illegible] সেইখানে তুমি নাই নাই, এ যে কেমন [illegible] হয় না। ইহাদের মধ্যে তুমি নাই, উহাদের মধ্যে তুমি নাই, আমার মধ্যে তুমি নাই! তোমার [illegible] যে [illegible] [illegible] [illegible] — হৃদয়ের [illegible] মধ্যে [illegible] [illegible] আমার [illegible] হলো না। তুমি আমাকে যে সকল [illegible] [illegible] সে সব সঞ্চিত রেখে, আশীর্বাদে — আমাকে আমার [illegible] দিয়েছ! এখন তাহারা আমাকে কাঁদায়। সে আশীর্বাদ তুমি আর আমাকে [illegible] [illegible] [illegible] হইল যে [illegible] [illegible] [illegible] — এখন কেবল [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তোমার পায়ে [illegible] [illegible]!

— ৩ —

অশ্রুজলে ভাসিয়ে তোমার পায়,
ও মা, ফিরে এসো!
দিন রাত কেঁদে কেঁদে ডাকি
ও মা ফিরে এসো!
সন্ধ্যা হয়ে এল, সংসার দুঃখ অন্ধকার,
ঘরেতে প্রদীপ জ্বলে না!
ঐ সবাই ফিরে এল ঘরে একে একে গো
আমার — মা ও তো এল না!
ঐ সন্ধ্যা হয়ে এল [illegible] কেঁদে কেঁদে ফুল
তোমার [illegible] [illegible] [illegible] আমার [illegible]!

পুষ্পাঞ্জলি
রবীন্দ্রপাণ্ডুলিপিচিত্র

যাহারা ভালো, যাহারা ভালোবাসিতে পারে, যাহাদের হৃদয় আছে সংসারে তাহাদের কিসের সুখ! কিছু না, কিছু না। তাহারা তারের যন্ত্রের মতো, বীণার মতো— তাহাদের প্রত্যেক কোমল স্নায়ু, প্রত্যেক শিরা সংসারের প্রতি আঘাতে বাজিয়া উঠিতেছে। সে গান সকলেই শুনে, শুনিয়া সকলেই মুগ্ধ হয়— তাহাদের বিলাপ ধ্বনি রাগিণী হইয়া উঠে, শুনিয়া কেহ নিশ্বাস ফেলে না। তাই যেন হইল, কিন্তু যখন আঘাত আর সহিতে পারে না, যখন তার ছিঁড়িয়া যায়, যখন আর বাজে না, তখন কেন সকলে তাহাকে নিন্দা করে, তখন কেন কেহ বলে না আহা!— তখন কেন তাহাকে সকলে তুচ্ছ করিয়া বাহিরে ফেলিয়া দেয়! হে ঈশ্বর, এমন যন্ত্রটিকে তোমার কাছে লুকাইয়া রাখ-না কেন— ইহাকে আজিও সংসারের হাটের মধ্যে ফেলিয়া রাখিয়াছে কেন— তোমার স্বর্গলোকের সংগীতের জন্য ইহাকে ডাকিয়া লও— পাষণ্ড নরাধম পাষাণহৃদয় যে ইচ্ছা সেই ঝন্‌ঝন্‌ করিয়া চলিয়া যায়, অকাতরে তার ছিঁড়িয়া হাসিতে থাকে— খেলাচ্ছলে তাহার প্রাণে সংগীত শুনিয়া তার পরে যে যার ঘরে চলিয়া যায়, আর মনে রাখে না। এ বীণাটিকে তাহারা দেবতার অনুগ্রহ বলিয়া মনে করে না— তাহারা আপনাকেই প্রভু বলিয়া জানে— এইজন্য কখনো-বা উপহাস করিয়া কখনো-বা অনাবশক জ্ঞান করিয়া এই সুমধুর সুকোমল পবিত্রতার উপরে তাহাদের কঠিন চরণের আঘাত করে, সংগীত চিরকালের জন্য নীরব হইয়া যায়।

ভারতী
বৈশাখ ১২৯২

বিবিধ প্রসঙ্গ ১

আমি মাঝে মাঝে ভাবি, এই পৃথিবী কত লক্ষকোটি মানুষের কত মায়া কত ভালোবাসা দিয়া জড়ানো। কত যুগ-যুগান্তর হইতে কত লোক এই পৃথিবীর চারি দিকে তাহাদের ভালোবাসার জাল গাঁথিয়া আসিতেছে! মানুষ যেটুকু ভূমিখণ্ডে বাস করে, সেটুকুকে কতই ভালোবাসে। সেইটুকুর মধ্যে চারি দিকে গাছটি পালাটি, ছেলেটি, গোরুটি, তাহার ভালোবাসার কত জিনিসপত্র দেখিতে দেখিতে জাগিয়া উঠে; তাহার প্রেমের প্রভাবে সেইটুকু ভূমিখণ্ড কেমন মায়ের মতো মূর্তি ধারণ করে, কেমন পবিত্র হইয়া উঠে, মানুষের হৃদয়ের আবির্ভাবে বন্য প্রকৃতির কঠিন মৃত্তিকা লক্ষ্মীর পদতলস্থ শতদলের মতো কেমন অপূর্ব সৌন্দর্যপ্রাপ্ত হয়। ছেলেপিলেদের কোলে করিয়া মানুষ যে গাছের তলাটিতে বসে সে গাছটিকে মানুষ কত ভালোবাসে, প্রণয়িনীকে পাশে লইয়া মানুষ যে আকাশের দিকে চায় সেই আকাশের প্রতি তাহার প্রেম কেমন প্রসারিত হইয়া যায়! যেখানেই মানুষ প্রেম রোপণ করে, দেখিতে দেখিতে সেই স্থান প্রেমের শস্যে আচ্ছন্ন হইয়া যায়। মানুষ চলিয়া যায় কিন্তু তাহার প্রেমের পাশে পৃথিবীকে সে বাঁধিয়া রাখিয়া যায়। সে ভালোবাসিয়া যে গাছটি রোপণ করিয়াছিল সে গাছটি রহিয়া গেছে, তাহার ঘর-বাড়িটি আছে, ভালোবাসিয়া সে কত কাজ করিয়াছে সে কাজগুলি আছে— জয়দেব তাঁহার কেন্দুবিল্বগ্রামের তমালবনে বসিয়া ভালোবাসিয়া কতদিন মেঘের দিকে চাহিয়া গিয়াছেন, তিনি নাই কিন্তু তাঁহার সেই বহুদিনসঞ্চিত ভালোবাসা একটি গানের ছত্রে রাখিয়া গিয়াছেন— মেঘৈর্মেদুরম্বরম্বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈঃ। অতীত কালের সংখ্যাতীত মৃত মনুষ্যের প্রেমে পৃথিবী আচ্ছন্ন; সমস্ত নগর গ্রাম কানন ক্ষেত্রে বিস্মৃত মনুষ্যের প্রেম শতসহস্র আকারে শরীর ধারণ করিয়া আছে, শতসহস্র আকারে বিচরণ করিতেছে; মৃত মনুষ্যের প্রেম ছায়ার মতো আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছে; আমাদের সঙ্গে শয়ন করিতেছে, আমাদের সঙ্গে উত্থান করিতেছে।

২

আমরাও সেই মৃত মনুষ্যের প্রেম, নানা ব্যক্তি-আকারে বিকশিত। আমাদের এক-এক জনের মধ্যে অতীত কালের কত কোটি কোটি মাতার মাতৃস্নেহ, কত কোটি কোটি পিতার পিতৃস্নেহ,

কত কোটি কোটি মনুষ্যের প্রণয় প্রেম সৌভ্রাত্র পুঞ্জীভূত হইয়া জীবন লাভ করিয়া বিরাজ করিতেছে। কত বিস্মৃত যুগ-যুগান্তর আমার মধ্যে আজ আবির্ভূত। তাই যখন শুনি আমাদের অতি প্রাচীন পূর্বপুরুষদের সময়েও 'আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে মেঘমাশ্লিষ্ট সানু' দেখা যাইত, তখন এমন অপূর্ব আনন্দ লাভ করি। তখন আমরা আমাদের আপনাদের মধ্যে আমাদের সেই পূর্বপুরুষদিগকে অনুভব করিতে পাই, তাঁহাদের সেই মেঘ-দেখার সুখ আমাদের আপনাদের মধ্যে লাভ করি, বুঝিতে পারি আমাদের পূর্বপুরুষদিগের সহিত আমরা বিচ্ছিন্ন নহি। যাঁহারা গেছেন তাঁহারাও আছেন।

৩

মানুষের প্রেম যেন জড়পদার্থের সঙ্গেও লিপ্ত হইয়া যাইতে পারে। নূতন বাড়ির চেয়ে যে বাড়িতে দুই পুরুষে বাস করিয়াছে সেই বাড়ির যেন বিশেষ একটা কী মাহাত্ম্য আছে। মানুষের প্রেম যেন তাহার ইটকাঠের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আছে এমনি বোধ হয়। বিজনে অরণ্যের বৃক্ষ নিতান্ত শূন্য, কিন্তু যে বৃক্ষের দিকে একজন মানুষ চাহিয়াছে, সে বৃক্ষে সে মানুষের চাহনি যেন জড়িত হইয়া গেছে। বহুদিন হইতে যে গাছের তলায় রৌদ্রের বেলায় মানুষ বসে সে গাছে যেমন হরিৎবর্ণ আছে তেমনি মনুষ্যত্বের অংশ আছে। স্বদেশের আকাশ আমাদের সেই পূর্বপুরুষদিগের প্রেমে পরিপূর্ণ— আমাদের পূর্বপুরুষদিগের নেত্রের আভা আমাদের স্বদেশ-আকাশের তারকার জ্যোতিতে জড়িত। স্বদেশের বিজনে আমাদের শতসহস্র সঙ্গীরা বাস করিতেছেন, স্বদেশে আমাদের দীর্ঘজীবন, আমাদের শতসহস্র বৎসর পরমায়ু।

৪

ছেলেবেলা হইতে দেখিয়া আসিতেছি আমাদের বাড়ির প্রাচীরের কাছে ওই প্রাচীন নারিকেলগাছগুলি সারি বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া আছে। যখনই ওই গাছগুলিকে দেখি তখনই উহাদিগকে রহস্যপরিপূর্ণ বলিয়া মনে হয়। উহারা যেন অনেক কথা জানে! তা নহিলে উহারা অমন নিস্তব্ধ দাঁড়াইয়া আছে কেন? বাতাসে অমন ধীরে ধীরে ঘাড় নাড়িতেছে কেন? পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নার সময়ে উহাদের মাথার উপরকার ডালপালার মধ্যে অমন অন্ধকার কেন? গাছেরা বাস্তবিক রহস্যময়। উহারা যেন বহুদিন দাঁড়াইয়া তপস্যা করিতেছে। এ পৃথিবীতে সকলেই আনাগোনা করিতেছে, কিন্তু আনাগোনার রহস্য কেহই ভেদ করিতে পারিতেছে না। বৃক্ষের মতো যাহারা মাঝখানে খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, তাহারাই যেন এই অবিশ্রাম আনাগোনার রহস্য জানে। চারি দিকে কত-কে আসিতেছে যাইতেছে উহারা সমস্তই দেখিতেছে, বর্ষার ধারায়, সূর্যকিরণে, চন্দ্রালোকে আপনার গাম্ভীর্য লইয়া দাঁড়াইয়া আছে।

৫

ছেলেবেলায় এককালে যাহারা এই গাছের তলায় খেলা করিয়াছে, যাহাদের খেলা একেবারে সাঙ্গ হইয়া গেছে, আজ এ গাছ তাহাদের কথা কিছুই বলিতেছে না কেন? আরও কত দ্বিপ্রহর রাত্রে এমনি ভাঙা মেঘের মধ্য হইতে ভাঙা চাঁদের আলো নিদ্রাকুল নেত্রে পরাজিত চেতনার মতো অন্ধকারের এখানে-সেখানে একটু-আধটু জড়াইয়া যাইতেছিল; তেমন রাত্রে কেহ কেহ এই জানলা হইতে নিদ্রাহীন নেত্রে ওই রহস্যময় বৃক্ষশ্রেণীর দিকে চাহিয়াছিল, সে কথা ইহারা আজ মানিতেছে না কেন? সে যে কীভাবে কী মনে করিয়া জীবনের কোন্ কাজের মধ্যে থাকিয়া ওই গাছের দিকে— গাছ অতিক্রম করিয়া ওই আকাশের দিকে— চাহিয়াছিল, ওই গাছে ওই আকাশে তাহার কোনো আভাসই পাই না কেন? যেন এমন জ্যোৎস্না আজ প্রথম হইয়াছে, যেন এ বাতায়ন হইতে আমিই উহাদিগকে আজ প্রথম দেখিতেছি, যেন কোনো মানুষের জীবনের কোনো কাহিনীর সহিত এ গাছ জড়িত নহে। কিন্তু এ কথা ঠিক নয়। ওই দেখো, উহারা যেন দীর্ঘ হইয়া মেঘের দিকে মাথা তুলিয়া সেই দূর অতীতের পানেই চাহিয়া আছে। উহাদের ধীর

গম্ভীর ঝর ঝর শব্দে সেই প্রাচীনকালের কাহিনী যেন ধ্বনিত হইতেছে, আমিই কেবল সকল কথা বুঝিতে পারিতেছি না। উহাদের ধ্যাননেত্রের কাছে অতীতকালের সুখ-দুঃখপূর্ণ দৃষ্টিগুলি বিরাজ করিতেছে, আমিই কেবল সেই দৃষ্টির বিনিময় দেখিতে পাইতেছি না। আজিকার এই জ্যোৎস্নারাত্রির মধ্যে এমন কত রাত্রি আছে; তাহাদের কত আলো-আঁধার লইয়া এই গাছের চারি দিকে তাহারা ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাই ওই ছায়ালোকে বেষ্টিত স্তব্ধ প্রাচীন বৃক্ষশ্রেণীর দিকে চাহিয়া আমার হৃদয় গাম্ভীর্যে পরিপূর্ণ হইয়া যাইতেছে।

৬

শোকে মানুষকে উদাস করিয়া দেয়, অর্থাৎ স্বাধীন করিয়া দেয়। এতদিন জগৎসংসারের প্রত্যেক ক্ষুদ্র জিনিস আমাদের মাথার উপর ভারের মতো চাপিয়া ছিল, আজ শোকের সময় সহসা যেন সমস্ত মাথার উপর হইতে উঠিয়া যায়। চন্দ্র সূর্য আকাশ আর আমাদিগকে ঘেরিয়া রাখে না, সুখ-দুঃখ আশা আর আমাদিগকে বাঁধিয়া রাখে না, ক্ষুদ্র জিনিসের গুরুত্ব একেবারে চলিয়া যায়। তখন এক মুহূর্তে আবিষ্কার করি যে, আমরা স্বাধীন। যাহাকে এতদিন বন্ধন মনে করিয়াছিলাম তাহা তো বন্ধন নহে, তাহা তো লূতা-তন্তুর মতো বাতাসে ছিঁড়িয়া গেল; বুঝিলাম বন্ধন কোথাও নাই; ধরা না দিলে কেহ কাহাকেও ধরিয়া রাখিতে পারে না; যাহারা বলে আমি তোমাকে বাঁধিয়াছি, তাহারা নিতান্তই ফাঁকি দিতেছে। প্রতিদিনের সুখ-দুঃখ, প্রতিদিনের ধূলিরাশি আমাদের চারি দিকে ভিত্তি রচনা করিয়া দেয়, শোকের এক ঝটিকায় সে-সমস্ত ভূমিসাৎ হইয়া যায়, আমরা অনন্তের রাজপথে বাহির হইয়া পড়ি। এতদিন আমরা প্রতিদিনের মানুষ ছিলাম, এখন আমরা অনন্তকালের জীব; এতদিন আমরা বাড়ি-ঘর-দুয়ারের জীব ছিলাম, এখন আমরা অনন্ত জগতের সীমাহীনতার মধ্যে বাস করি। যাহাদিগকে নিতান্ত আপনার মনে করিয়াছিলাম, তাহারা তত আপনার নহে, সেইজন্য তাহাদিগকে বেশি করিয়া আদর করি, মনে করি এ পান্থশালা হইতে কে কবে কোন্ পথে যাত্রা করিব, এ দুদিনের সৌহার্দ্যে যেন বিচ্ছেদ বা অসম্পূর্ণতা না থাকে। যাহাদিগকে নিতান্ত পর মনে করিতাম তাহারা তত পর নহে, এইজন্য তাহাদিগকে ঘরে ডাকিয়া আনিতে ইচ্ছা করে। এতদিন আমার চারি দিকে একটা গণ্ডি আঁকা ছিল, সে রেখাটাকে দৃঢ় প্রাচীরের অপেক্ষা কঠিন মনে হইত, হঠাৎ উল্লঙ্ঘন করিয়া দেখি সেটা কিছুই নহে, গণ্ডির ভিতরেও যেমন বাহিরেও তেমন। আপনিও যেমন পরও তেমনি। আপনার লোকও চিরদিনের তরে পর হইয়া যায়, তখন একজন পথিকের সহিত যে সম্বন্ধ তাহার সহিত সে সম্বন্ধও থাকে না।

৭

সচরাচর লোকে মাকড়সার জালের সহিত আমাদের জীবনের তুলনা দিয়া থাকে। কথাটা পুরানো হইয়া গিয়াছে বলিয়া তাহা যে কতটা সত্য তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। বন্ধনই আমাদের বাসস্থান। বন্ধন না থাকিলে আমরা নিরাশ্রয়। সে বন্ধন আমরা নিজের ভিতর হইতে রচনা করি। বন্ধন রচনা করা আমাদের এমনই স্বাভাবিক যে, একবার জাল ছিঁড়িয়া গেলে দেখিতে দেখিতে আবার শত শত বন্ধন বিস্তার করি, জাল যে ছেঁড়ে এ কথা একেবারে ভুলিয়া যাই। যেখানেই যাই সেখানেই আমাদের বন্ধন জড়াইতে থাকি। সেখানকার গাছে ভূমিতে আকাশে সেখানকার চন্দ্র সূর্য তারায়, সেখানকার মানুষে, সেখানকার রাস্তায় ঘাটে, সেখানকার আচারে ব্যবহারে, সেখানকার ইতিহাসে, আমাদের জালের শত শত সূত্র লগ্ন করিয়া দিই, মাঝখানে আমরা মস্ত হইয়া বিরাজ করি। কাছে একটা কিছু পাইলেই হইল। এমনই আমরা মাকড়সার জাতি!

৮

সংসারে লিপ্ত না থাকিলে তবেই ভালোরূপে সংসারের কাজ করা যায়। নহিলে চোখে ধুলা লাগে, হৃদয়ে আঘাত লাগে, পায়ে বাধা লাগে। মহৎ লোকেরা আপন আপন মহত্ত্বের উচ্চ

শিখরে দাঁড়াইয়া থাকেন, চারি দিকের ছোটোখাটো খুঁটিনাটি অতিক্রম করিয়া তাঁহারা দেখিতে পান। ক্ষুদ্রসকল বৃহৎ হইয়া তাঁহাদিগকে বাধা দিতে পারে না। তাঁহাদের বৃহত্ত্ববশত চতুর্দিক হইতে তাঁহারা বিচ্ছিন্ন আছেন বলিয়াই চতুর্দিকের প্রতি তাঁহাদের প্রকৃত মমতা আছে। যে ব্যক্তি সংসারের আবর্তের মধ্যস্থলে ঘুরিতেছে, সে কেবল আপনার সহিত পরের সম্বন্ধ দেখিতে পায়, কিন্তু মহৎ যে সে আপনা হইতে বিযুক্ত করিয়া পরকে দেখিতে পায়, এইজন্য পরকে সেই বুঝিতে পারে। কাজ সেই করিতে পারে। হাতের শৃঙ্খল সেই ছিঁড়িয়াছে। প্রত্যেক পদক্ষেপে সে ব্যক্তি সহস্র ক্ষুদ্রকে অতিক্রম করিতে না পারে, প্রত্যেক ক্ষুদ্র উঁচু-নিচুতে যাহার পা বাধিয়া যায় সে আর চলিবে কী করিয়া। সংসারের সুখে-দুঃখে যাহারা ভারাক্রান্ত, সংসারপথের প্রত্যেক সূচ্যগ্র ভূমি তাহাদিগকে মাড়াইয়া চলিতে হয়। এইজন্য ঘর হইতে আঙিনা তাহাদের বিদেশ, আপনার সাড়ে-তিন হাতের বাহিরে তাহাদের পর। এইজন্যে তাহারা দূরদেশের কথা, জগতের বৃহত্ত্বের কথা, সত্যের অসীমত্বের কথা বিশ্বাস করিতে পারে না। আপনার খোলসটির মধ্যে তাহাদের সমস্ত বিশ্বাস বদ্ধ। অসীম জগৎ-সংসারের অপেক্ষা আপনার চারি দিকের বাঁশের বেড়া ও খড়ের চাল তাহাদের নিকট অধিক সত্য।

শোকে আমাদের সংসারের ভার লাঘব করিয়া দেয়, আমাদের চরণের বেড়ি খুলিয়া দেয়, সংসারের অবিশ্রাম মাধ্যাকর্ষণ রজ্জু যেন ছিন্ন করিয়া দেয়। আমরা সংসারের সহিত নির্লিপ্ত হই। এইজন্য শোকে আমরা মহত্ত্ব উপার্জন করি। এইজন্য বিধবারা মহৎ। এইজন্য বিধবারা সংসারের কাজ অধিক করিতে পারে।

৯

মানুষের মধ্যে উদারতা এবং সংকীর্ণতা দুই থাকা চাই, কারণ তাহাই স্বাভাবিক। উদারতা এবং সংকীর্ণতার মিলনে জগৎ সৃষ্ট। অসীম ভাব সীমাবদ্ধ আকারে প্রকাশ হওয়ার অর্থই জগৎ। পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হওয়ার অর্থ মৃত্যু, একত্ব প্রাপ্ত হওয়ার অর্থ জীবন। অর্থাৎ, পঞ্চ একে পরিণত হওয়া, বৃহৎ ক্ষুদ্রে পরিণত হওয়াই সৃষ্টি। অতএব একাধারে ক্ষুদ্র বৃহৎ, উদারতা সংকীর্ণতা থাকাই স্বাভাবিক, ইহার বিপরীত হওয়াই অস্বাভাবিক। প্রকৃতিতে আকর্ষণ-বিকর্ষণ মেলামেশা করিয়া থাকে, কেন্দ্রানুগ এবং কেন্দ্রাতিগ শক্তি একসঙ্গে কাজ করে, ঐক্য এবং অনৈক্য এক গৃহে বাস করে। দুই বিপরীতের মিলনই এই বিশ্ব। মনুষ্য এই বিশ্ব-নিয়মের বাহিরে থাকে না। মনুষ্যও বৃহৎ এবং ক্ষুদ্রের মিলনস্থল। মনুষ্য, আপনাষ্ব না থাকিলে, পরের দিকে যাইতে পারে না, সীমাবদ্ধ না হইলে সে অসীমের জন্য প্রস্তুত হইতে পারে না, অনন্তকালে থাকিলে সে কোনোকালে হইতেই পারিত না।

১০

আমরা বদ্ধ না হইলে মুক্ত হইতে পাই না। ইংরাজিতে যাহাকে Freedom বলে তাহা আমাদের নাই, বাংলায় যাহাকে স্বাধীনতা বলে তাহা আমাদের আছে। কঠিনতর অধীনতাকেই স্বাধীনতা বলে। সর্বং পরবশং দুঃখং সর্বমাত্মবশং সুখং। কিন্তু পরের অধীন হওয়াই সহজ, আপনার অধীন হওয়াই শক্ত।

স্বাধীনতার অর্থ আপনার অর্থাৎ একের অধীনতা, অধীনতার অর্থ পরের অর্থাৎ সহস্রের অধীনতা। যাহার গৃহ নাই, তাহাকে কখনো গাছতলে, কখনো মাঠে, কখনো খড়ের গাদায়, কখনো দয়াবানের কুটিরে আশ্রয় লইতে হয়; যাহার গৃহ আছে সে সংসারের অসংখ্যের মধ্যে ব্যাকুল নহে; তাহার এক ধ্রুব আশ্রয় আছে। যে নৌকা হালের অধীন নহে সে কিছু স্বাধীন বলিয়া গর্ব করিতে পারে না, কারণ সে শতসহস্র তরঙ্গের অধীন। যে দ্রব্য পৃথিবীর ভারাকর্ষণের অধীনতাকে উপেক্ষা করে, তাহাকে প্রত্যেক সামান্য বায়ু-হিল্লোলের অধীনতায় দশ দিকে ঘুরিয়া মরিতে হইবে। অসীম জগৎসমুদ্রে অগণ্য তরঙ্গ, এখানে স্বাধীনতা ব্যতীত আমাদের গতি নাই। অতএব, স্বাধীনতা অর্থে বন্ধনমুক্তি নহে, স্বাধীনতার অর্থ নোঙরের শৃঙ্খল গলায় বাঁধিয়া রাখা।

১১

যাহাদের সহিত চোখের দেখা মুখের আলাপ মাত্র, তাহাদের সহিত আমরা চিরদিন নির্বিরোধে কাটাইয়া দিতে পারি, বিবাদ হইলেও তাহার পরদিন আবার তাহাদের সহিত হাস্যমুখে কথা কওয়া যায়, ভদ্রতা রক্ষা করিয়া চলা যায় কিন্তু যেখানে গভীর প্রেম ছিল, সেখানে যদি বিচ্ছেদ হয় তো হাসিমুখে কথা কহা আর চলে না, ভদ্রতা রক্ষা আর হয় না। অনেক সময়ে উচ্চশ্রেণীর জীবের গাত্রে একটা আঁচড় লাগিলে সে মরিয়া যায় আর নিকৃষ্ট পুরুভুজকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিলেও সেই বিচ্ছিন্ন অংশ খেলাইয়া বেড়ায়। নিকৃষ্ট প্রেমের বন্ধনও এইরূপ বিচ্ছিন্ন হইলেও বাঁচিয়া থাকে।

১২

অনেক বড়ো মানুষ দেখা যায় তাহারা ক্রমাগত আপনাদের চারি দিকে বিপুল মাংসরাশি সঞ্চয় করিতে থাকে, অতিশয় স্ফীত হইয়া সমাজের সামঞ্জস্য নষ্ট করে। আমার তো বোধ হয় এইরূপ বিপুল স্ফীতির যুগ পৃথিবী হইতে চলিয়া যাইতেছে। এইরূপ প্রচুর মাংসস্তূপ, প্রকাণ্ড জড়তা ও অসাড়তা এখনকার দিনের উপযোগী নহে। এককালে ম্যামথ্ ম্যাস্টডন, হস্তিকায় ভেক, প্রকাণ্ডকায় সরীসৃপগণ পৃথিবীর জলস্থল অধিকার করিয়াছিল। এখন সে-সকল মাংসপিণ্ডের লোপ হইয়া গেছে ও যাইতেছে। এখন পরিমিতদেহ ও সূক্ষ্মস্নায়ু জীবদিগের রাজত্ব। এখন সুমহৎ জড় পদার্থেরা অন্তর্ধান করিলেই পৃথিবীর ভার লাঘব হয়।

১৩

সেদিন আমাকে একজন বন্ধু জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, নূতন কবির আর আবশ্যক কী? পুরাতন কবির কবিতা তো বিস্তর আছে। নূতন কথা এমনিই কী বলা হইতেছে? এখন পুরাতন লইয়াই কাজ চলিয়া যায়।

সকল গোরুই তো জাবর কাটিয়া থাকে, কিন্তু তাই বলিয়া ঘাস বন্ধ করিলে জাবর কাটাও বেশি দিন চলে না। নূতনই পুরাতনকে রক্ষা করিয়া থাকে। নূতনের মধ্যেই পুরাতন বাঁচিয়া থাকে, পুরাতনের মধ্যেই নূতন বাস করে। পুরাতন বৃক্ষ যে প্রতিদিন নূতন পাতা নূতন ফুল নূতন ডালপালা উৎপন্ন করে তাহার কারণ তাহার জীবন আছে। যেদিন সে আর নূতন গ্রহণ করিতে পারিবে না ও নূতন দান করিতে পারিবে না সেই দিনই তাহার মৃত্যু হইবে। নূতনে পুরাতনে বিচ্ছেদ হইলেই জীবনের অবসান। যেদিন দেখিব পৃথিবীতে নূতন কবি আর উঠিতেছে না, সেদিন জানিব পুরাতন কবিদের মৃত্যু হইয়াছে।

আমাদের হৃদয়ের সহিত প্রাচীন কবিতার যোগ-রক্ষা প্রবাহ-রক্ষা করিতেছে কে? নূতন কবিতা। নূতন কবিতা শুষ্ক হইয়া গেলে আমরা কোন্ স্রোত বাহিয়া পুরাতনের মধ্যে গিয়া উপস্থিত হইব? আমাদের মধ্যেকার এ দীর্ঘ ব্যবধান অবিশ্রাম লোপ করিয়া রাখিতেছে কে? নূতন কবিতা।

জগৎ হইতে সংগীতের প্রবাহ লোপ করিতে কে চাহে? নূতন বসন্তের নূতন পাখির গান বন্ধ করিতে কে চাহে। বসন্ত যদি পুরাতন গানকে প্রতি বৎসর নূতন করিয়া না গাওয়াইত, পুরাতন ফুলকে প্রতি বৎসর নূতন করিয়া না ফুটাইত তবে তো নূতনও থাকিত না পুরাতনও থাকিত না, থাকিত কেবল শূন্যতা, মরুভূমি।

ভারতী
জ্যৈষ্ঠ ১২৯২

বিবিধ প্রসঙ্গ ২

এক 'আমি' মাঝে আসাতেই প্রকৃতিতে কত গোলযোগ ঘটিয়াছে দেখো। 'আমি'-কে যেমনি লোপ করিয়া ফেলিবে অমনি প্রকৃতির পূর্ব-পশ্চিমে, অতীত-ভবিষ্যতে, অন্তর-বাহিরে গলাগলি এক হইয়া যাইবে। 'আমি' আসাতেই প্রকৃতির মধ্যে এত গৃহবিচ্ছেদ ঘটিয়াছে। কাহাকেও বা আমি আমার পশ্চাতে ফেলিয়াছি, কাহাকেও বা আমার সম্মুখে ধরিয়াছি, কাহাকেও বা আমার দক্ষিণে বসাইয়াছি, কাহাকেও বা আমার বামে রাখিয়াছি। মনে করিতেছি আমার পিঠের দিক এবং আমার পেটের দিক চিরকাল স্বভাবতই স্বতন্ত্র, কারণ, জগতের আর সমস্তের প্রতি আমার অবিশ্বাস হইতে পারে কিন্তু 'আমার পিঠ' ও 'আমার পেট' এ আমি কিছুতেই ভুলিতে পারি না। 'আমি'কে যে যত দূরে সরাইয়াছে জগতের মধ্যে সে ততই সাম্য দেখিয়াছে। যেখানে যত বিবাদ, যত অনৈক্য, যত বিশৃঙ্খলা, 'আমি'টাই সকল নষ্টের গোড়া, যত প্রেম, যত সদ্ভাব, যত শান্তি, আমার বিলোপই তাহার কারণ।

২

উদরের ভিতরকার একটা অংশই যে কেবল পাকযন্ত্র তাহা নহে, আমাদের মন ইন্দ্রিয় প্রভৃতি যাহা-কিছু আছে সমস্তই আমাদের পাকযন্ত্র। ইহারা সমস্ত জগৎকে আমাদের উপযোগী করিয়া বানাইয়া লয়। আমাদের যাহা যতটুক যেরূপ আকারে আবশ্যক, ইহাদের সাহায্যে আমরা কেবল তাহাই দেখি, তাহাই শুনি, তাহাই পাই, তাহাই ভাবি। অসীম জগৎ আমাদের হাত এড়াইয়া কোথায় বিরাজ করিতেছে! আমাদের যে জগৎদৃশ্য, জগৎজ্ঞান, তাহা, আমাদের ভুক্ত জগৎ, পরিপাকপ্রাপ্ত জগতের বিকার, তাহা আমাদের উপযোগী রক্ত মাত্র, আমাদের ইন্দ্রিয় মনের কারখানায় প্রস্তুত হইয়া আমাদের ইন্দ্রিয় মনের মধ্যেই প্রবাহিত হইতেছে। তাহা প্রকৃত জগৎ নয়, অসীম জগৎ নহে।

৩

আমরা সকলে বাতায়নের পাশে বসিয়া আছি। আমরা বাতায়নের ভিতর হইতে দেখি, বাতায়নের বাহিরে গিয়া দেখিতে পাই না। এইজন্য নানা লোক নানা রকম দেখে। কেহ এ-পাশ দেখে কেহ ও-পাশ দেখে, কাহারো দক্ষিণে জানলা কাহারো উত্তরে জানলা। এই আশপাশ দেখিয়া, খানিকটা ভুল দেখিয়া, খানিকটা না দেখিয়া যত আমাদের ভালোবাসা ঘৃণা, যত আমাদের তর্কবিতর্ক। একেকটি মানুষ একেকটি খড়খড়ি খুলিয়া বসিয়া আছি, কেহ-বা হাসিতেছি কেহ-বা নিশ্বাস ফেলিতেছি। জানলার ভিতরকার ওই মুখগুলি কেহ যদি আঁকিতে পারিত! পৃথিবীর রাস্তার দুই ধারে ওই-সকল অন্তঃপুরবাসী মুখের কতই ভাব, কতই ভঙ্গি! সবাই ছবির মতো বসিয়া কতই ছবি দেখিতেছে!

৪

'সে কহে বিস্তর মিছা যে কহে বিস্তর।' কারণ অনেক সত্য কথা কে বলিতে পারে! স্থূল কারাগারের ফুটাফাটা দিয়া সত্যের দুই-একটা রশ্মিরেখা শুভলগ্নে দৈবাৎ দেখিতে পাই। একটুখানি সত্যের চতুর্দিকে পুঞ্জীভূত অন্ধকার থাকিয়া যায়। সংশয় নিশীথের একটি ছিদ্রের মধ্য দিয়া বিশ্বাসকে তারার মতো দেখিতে পাওয়া যায়। যে ব্যক্তি মনে করে সত্যকে ফলাও করিয়া তুলিতে হইবে— তাহাকে বৃহৎ করিয়া একটা বিস্তৃত তন্ত্রের মতো শাস্ত্রের মতো গড়িয়া তুলিতে হইবে— প্রলোভনে এবং দায়ে পড়িয়া সে ব্যক্তি একটি সত্যের সহিত অনেক মিথ্যা মিশাল দেয়। সে আপনার কাছে আপনি প্রবঞ্চিত হয়। সত্য হীরার মতো একটুখানি পাওয়া যায়, কিন্তু যা পাই তাই ভালো। কত মূল্যবান সত্যের কণিকা সঙ্গদোষে মারা পড়িয়াছে।

৫

ব্যাপ্ত হইলে যাহা অন্ধকার, সংহত হইলে তাহা আলোক, আরও সংহত হইলে তাহা অগ্নি। বৃহত্ত্বই জড়ত্ব। সংক্ষেপ সংহতিই প্রাণ। সংহত হইলেই তেজ, প্রাণ, আকার, ব্যক্তি, জাগ্রত হইয়া উঠে। আমরা জড়োপাসক শক্তি-উপাসক বলিয়া বৃহত্ত্বের উপাসনা করিয়া থাকি। বৃহত্ত্বে অভিভূত হইয়া যাই। কিন্তু বৃহৎ অপেক্ষা ক্ষুদ্র অধিক আশ্চর্য। হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন বাষ্পরাশি অপেক্ষা এক বিন্দু জল আশ্চর্য। সুবিস্তৃত নীহারিকা অপেক্ষা সংক্ষিপ্ত সৌরজগৎ আশ্চর্য। আরম্ভ বৃহৎ পরিণাম ক্ষুদ্র। আবর্তের মুখ অতি বৃহৎ আবর্তের শেষ একটি বিন্দুমাত্র। সুবিশাল জগৎ ঘুরিয়া ঘুরিয়া এই ক্ষুদ্রত্বের দিকে বিন্দুত্বের দিকে যাইতেছে কি না কে জানে! কেন্দ্রের মহৎ আকর্ষণে পরিধি সংক্ষিপ্ত হইয়া কেন্দ্রত্বে আত্মবিসর্জন করিতে যাইতেছে কি না কে জানে!

৬

যত বৃহৎ হই তত দেশকালের অধীন হইতে হয়। আয়তন লইয়া আমাদিগকে কেবল যুদ্ধ করিতে হয়। কাহার সঙ্গে? দানব-কাল ও দানব দেশের সঙ্গে। দেশকাল বলে— আয়তন আমার; আমার জিনিস আমাকে ফিরাইয়া দাও। অবিশ্রাম লড়াই করিয়া অবশেষে কাড়িয়া লয়। শ্মশানক্ষেত্রে তাহার ডিক্রিজারি হয়। আমাদের ক্ষুদ্র আয়তন মহা আয়তনে মিশিয়া যায়।

৭

কিন্তু আমরা জানি আমরা মৃত্যুকে জিতিব। অর্থাৎ দেশকালকে অতিক্রম করিব। মনুষ্যের অভ্যন্তরে এক সেনাপতি আছে সে দৃঢ়বিশ্বাসে যুদ্ধ করিতেছে। প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ মরিতেছে কিন্তু যুদ্ধের বিরাম নাই। অনেক মরিয়া তবে বাঁচিবার উপায় বাহির হইবে। আমরা সংহতিকে অধিকার করিয়া ব্যাপ্তিকে জিতিব— মনুষ্যত্বের এই সাধনা।

৮

সংহতিকে অধিকার করাই শক্ত। আমাদের হৃদয় মন বাষ্পের মতো চারি দিকে ছড়াইয়া আছে। হু হু করিয়া ব্যাপ্ত হইয়া পড়া যেমন বাষ্পের স্বাভাবিক গুণ— আমরাও তেমনি স্বভাবতই চারি দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ি— অভ্যন্তরে সুদৃঢ় আকর্ষণ শক্তি না থাকিলে আমার হইয়া আমরা পর হইয়া যাই। আমাকে বিন্দুতে নিবিষ্ট করাই শক্ত। যোগীরা এই বিন্দুমাত্রে স্থায়ী হইবার জন্য বৃহৎ সংসারের আশ্রয় ছাড়িয়াছেন। সূচ্যগ্রস্থানের জন্যই তাঁহাদের লড়াই। তাঁহারা বিন্দুর বলে ব্যাপককে অধিকার করিবেন। সংকীর্ণতার বলে বিকীর্ণতা লাভ করিবেন।

৯

সংহত দীপশিখা তাহার আলোকে সমস্ত গৃহ অধিকার করে। কিন্তু সেই শিখা যখন প্রচ্ছন্ন উত্তাপ আকারে গৃহের কাঠে, উপকরণে ইতস্তত ব্যাপ্ত হইয়া থাকে তখন গৃহই তাহাকে বধ করিয়া রাখে, সে জাগিতে পায় না। যতটা ব্যাপ্ত হইব ততটা অধিকার করিব এইরূপ কেহ কেহ মনে করেন। কিন্তু ইহার উল্টাটাই ঠিক। অর্থাৎ যতটা ব্যাপ্ত হইবে তুমি ততই অধিকৃত হইবে। কিন্তু চারি দিক হইতে আপনাকে প্রত্যাহার করিয়া যখন বহ্নিশিখার মতো স্বতন্ত্র দীপ্তি পাইবে, তখন তোমার সেই প্রখর স্বাতন্ত্র্যের জ্যোতিতে চারি দিক উজ্জ্বল রূপে অধিকার করিতে পারিবে এইরূপ কাহারো কাহারো মত।

১০

য়ুরোপীয় সভ্যতার চরম— ব্যাপ্তি, অর্থাৎ বিজ্ঞান শাস্ত্র— ভারতবর্ষীয় সভ্যতার চরম— সংহতি, অর্থাৎ অধ্যাত্মযোগ। য়ুরোপীয়েরা প্রকৃতির সহিত সন্ধি করিতে চান, ভারতবর্ষীয়েরা প্রকৃতিকে জয় করিতে চান। প্রাণশক্তি, মানসশক্তি, অধ্যাত্মশক্তিকে সংহত করিতে পারিলে বিরাট প্রকৃতিকে জয় করা যায়। এই কি যোগশাস্ত্র?

১১

আমার কোনো বন্ধু লিখিয়াছেন— অতীতকাল অমরাবতী। আমি তাহার অর্থ এইরূপ বুঝি যে, অতীতে যাহারা বাস করে তাহারা অমর। অতীতে অমৃত আছে। অতীত সংক্ষিপ্ত। বর্তমান কেবল কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মহত্ত্ব, অতীতকালে সেই মহত্ত্বরাশি সংহত হইয়া যায়। বর্তমান ত্রিশটা পৃথক দিন, অতীত একটা সমগ্র মাস। বর্তমান বিচ্ছিন্ন, অতীত সমগ্র। যাহাকে প্রত্যেক বর্তমান মুহূর্তে দেখি আমরা প্রতিক্ষণে তাহার মৃত্যুই দেখিতে পাই, যাহাকে অতীতে দেখি তাহার অমরতা দেখিতে পাই।

১২

আরম্ভের মধ্যে পূর্ণতার ছবি ও সমাধানেই অসম্পূর্ণতা— মানুষের সকল কাজেই প্রায় বিধাতার এই অভিশাপ। যখন গড়িতে আরম্ভ করি তখন প্রতিমা চোখের সম্মুখে জাগিয়া থাকে, যখন শেষ করিয়া ফেলি তখন দেখি তাহা ভাঙিয়া গেছে। সুদূর গৃহাভিমুখে যখন যাত্রা আরম্ভ করি তখন গৃহের প্রতি এত টান যে, গৃহ যেন প্রত্যক্ষ, আর পথপ্রান্তে যখন যাত্রা শেষ করি তখন পথের প্রতি এত মায়া যে গৃহ আর মনে পড়ে না। যাহাকে আশা করি তাহাকে যতখানি পাই আশা পূর্ণ হইলে তাহাকে আর ততখানি পাই না। অর্থাৎ, চাহিলে যতখানি পাই, পাইলে ততখানি পাই না। যখন মুকুল ছিল তখন ছিল ভালো, ফলের আশা তাহার মধ্যে ছিল, যখন মাটিতে পড়িয়াছে তখন দেখি মাটি হইয়াছে ফল ধরে নাই। এইজন্য আরম্ভ দিনের স্মৃতি আমাদের নিকট এত মনোহর, এইজন্য সমাপ্তির দিনে আমরা মাথায় হাত দিয়া বসিয়া থাকি, নিশ্বাস ফেলি। জন্মদিনে যে বাঁশি বাজে সে বাঁশি প্রতিদিন বাজে না। অশ্রুনেত্রে আমরা প্রতিদিন দেখিতেছি উপায়ের দ্বারা উদ্দেশ্য নষ্ট হইতেছে। বাঁশি গানকে বধ করিতেছে। হাতের দ্বারা হাতের কাজ আঘাত পাইতেছে।

১৩

আসল কথা, শেষ মানুষের হাতে নাই। 'শেষ হইল' বলিয়া যে আমরা দুঃখ করি তাহার অর্থ এই— 'শেষ হয় নাই তবুও শেষ হইল! আকাঙ্ক্ষা রহিয়াছে অথচ চেষ্টার অবসান হইল।' এইজন্য মানুষের কাছে শেষের অর্থ দুঃখ। কারণ মানুষের সম্পূর্ণতার অর্থ অসম্পূর্ণতা।

১৪

জীবনের কাজ দেখিয়া সম্পূর্ণ পরিতৃপ্তি কাহার হয় জানি না— যাহার হয় সে আপনাকে চেনে নাই। সে আপনার চেয়ে আপনাকে ছোটো বলিয়া জানে। সে জানে না সে যে-কাজ করিয়াছে, তাহা অপেক্ষা বড়ো কাজ করিতে আসিয়াছিল। সে আপনাকে ছোটো করিয়া লইয়াছে বলিয়াই আপনাকে এত বড়ো মনে করে। মনুষ্যের পদমর্যাদা সে যদি যথার্থ বুঝিত, তাহা হইলে তাহার এত অহংকার থাকিত না।

১৫

আমি কি জানিতাম অবশেষে আমি খেলেনাওয়ালা হইব? প্রতিদিন একটা করিয়া কাচের পুতুল গড়িয়া সাধারণের খেলার জন্য জোগাইব। আমি কি জানি না আমার একেকটি কাজ আমারই একেকটি অংশ— আমারই জীবনের একেকটি দিন। দিনকে ছাড়িয়া দিলেই দিন চলিয়া যায়, কিন্তু দিনের কাজের মধ্যে দিনকে আটক করিয়া রাখা যায়। আমার জীবন তো কতকগুলি দিনের সমষ্টি, সেই জীবনকে যদি রাখিতে চাই তবে তাহার প্রত্যেক দিনকে কার্য আকারে পরিণত করিতে হইবে। কিন্তু আমি যে আমার সমস্ত দিনটি হাতে করিয়া লইয়া তাহাকে কেবল একটি পুতুল করিয়া তুলিতেছি— আমি কি জানি না আমার যতগুলি পুতুল ভাঙিতেছে আমিই ভাঙিয়া যাইতেছি। অবশেষে যখন একে একে সবগুলি ধূলিসাৎ হইয়া গেল তখন কি আমার সমস্ত জীবন বিফল হইয়া গেল না। এই চীনের পুতুলগুলি লইয়া আজ সকলে হাসিতেছে খেলিতেছে, কাল যখন এগুলিকে অকাতরে পথের প্রান্তে ফেলিয়া দিবে তখন কি সেই হৃতগৌরব ভগ্ন কাচখণ্ডের

সঙ্গে আমার সমস্ত মানব জন্মের বিসর্জন হইবে না। 'আমি নিষ্ফল হইলাম' বলিয়া যে দুঃখ সে অপরিতৃপ্ত অহংকারের দুঃখ নহে। ইহা নিজের হাতে নিজের একমাত্র আশা একমাত্র আদর্শকে বিসর্জন দিয়া প্রাণাধিকের বিনাশের জন্য শোক!

১৬

কারণ, আমার হৃদয়ের মধ্যস্থিত আদর্শ আমার চেয়ে বড়ো। তাহা আমার মনুষ্যত্ব। আমি আমার ধর্মজ্ঞানের হাতে একটি যন্ত্রমাত্র। সে আমাকে দিয়া তাহার কাজ করাইয়া লইতে চায়। আমার একমাত্র দুঃখ এই যে আমি তাহার উপযোগী নহি— আমার দ্বারা তাহার কাজ সম্পন্ন হয় না। আমি দুর্বল। তাহার কাজ করিতে গিয়া আমি ভাঙিয়া যাই। কিন্তু সেই ভাঙিয়া যাওয়াতে আনন্দ আছে। মনে এই সান্ত্বনা থাকে যে, তাহারই কাজে আমি ভাঙিলাম। আমি নিষ্ফল হইলাম বলিতে বুঝায়, আমার প্রভুর কাজ হইল না। মনুষ্যত্ব আমাকে আশ্রয় করিয়া মগ্ন হইল। স্বামিন্, তোমার আদেশ পালন হইল না!

১৭

সাধারণের কাছ হইতে যে ব্যক্তি খ্যাতি উপহার পায় তাহার রক্ষা নাই। এ বিষকন্যার হাতে যদি মৃত্যু না হয় তো বন্দী হইতে হইবে। এই খ্যাতি তাপসের তপস্যা ভঙ্গ করিতে সাধকের সাধনায় ব্যাঘাত করিতে আসে। যে ব্যক্তি সাধারণের প্রিয় সাধারণ তাহার জন্য আফিম বরাদ্দ করিয়া দেয়, সাধারণের দাঁড়ে বসিয়া সে ঝিমাইতে থাকে, সে আগেকার মতো তাহার ডানাদুটি লইয়া মেঘের দিকে তেমন করিয়া আর উড়িতে পারে না। তার পরে এক দিন যখন খামখেয়ালি সাধারণ তাহার সাধের পাখির বরাদ্দ বন্ধ করিয়া দিবে, তখন পাখির গান বন্ধ তাহার প্রাণ কণ্ঠাগত।

ভারতী
ভাদ্র ১২৯২

বর্ষার চিঠি

সুহৃদ্‌বর, আপনি তো সিন্ধুদেশের মরুভূমির মধ্যে বাস করছেন। সেই অনাবৃষ্টির দেশে বসে একবার কলকাতার বাদলাটা কল্পনা করুন।

এবারকার চিঠিতে আপনাকে কেবল বাংলার বর্ষাটা স্মরণ করিয়ে দিলুম— আপনি বসে বসে ভাবুন। ভরা পুকুর, আমবাগান, ভিজে কাক ও আষাঢ়ে গল্প মনে করুন। আর যদি গঙ্গার তীর মনে পড়ে, তবে সেই স্রোতের উপর মেঘের ছায়া, জলের উপর জলবিন্দুর নৃত্য, ওপারের বনের শিয়রে মেঘের উপর মেঘের ঘটা, মেঘের তলে অশথগাছের মধ্যে শিবের দ্বাদশ মন্দির স্মরণ করুন। মনে করুন পিছল ঘাটে ভিজে ঘোমটায় বধূ জল তুলছে; বাঁশঝাড়ের তলা দিয়ে, পাঠশাল ও গয়লাবাড়ির সামনে দিয়ে সংকীর্ণ পথে ভিজতে ভিজতে জলের কলস নিয়ে তারা ঘরে ফিরে যাচ্ছে; খুঁটিতে বাঁধা গোরু গোয়ালে যাবার জন্যে হাম্বারবে চিৎকার করছে; আর মনে করুন, বিস্তীর্ণ মাঠে তরঙ্গায়িত শস্যের উপর পা ফেলে ফেলে বৃষ্টিধারা দূর থেকে কেমন ধীরে ধীরে চলে আসছে; প্রথমে মাঠের সীমান্তস্থিত মেঘের মতো আমবাগান, তার পরে এক-একটি করে বাঁশঝাড়, এক-একটি করে কুটির, এক-একটি করে গ্রাম বর্ষার শুভ্র আঁচলের আড়ালে ঝাপসা হয়ে মিলিয়ে আসছে, কুটিরের দুয়ারে বসে ছোটো ছোটো মেয়েরা হাততালি দিয়ে ডাকছে 'আয় বৃষ্টি হেনে, ছাগল দেব মেনে'— অবশেষে বর্ষা আপনার জালের মধ্যে সমস্ত মাঠ, সমস্ত বন, সমস্ত গ্রাম ঘিরে ফেলেছে; কেবল অবিশ্রান্ত বৃষ্টি— বাঁশঝাড়ে, আমবাগানে, কুঁড়ে ঘরে, নদীর জলে, নৌকোর হালের নিকটে আসীন গুটিসুটি জড়োসড়ো কম্বলমোড়া মাঝির

মাথায় অবিশ্রাম ঝরঝর বৃষ্টি পড়ছে। আর কলকাতায় বৃষ্টি পড়ছে আহিরিটোলায়, কাঁশারিপাড়ায়, টেরিটির বাজারে, বড়বাজারে, শোভাবাজারে, হরিকৃষ্ণর গলি, মতিকৃষ্ণর গলি, রামকৃষ্ণর গলিতে, জিগ্‌জ্যাগ্ লেনে— খোলার চালে, কোঠার ছাতে, দোকানে, ট্রামের গাড়িতে, ছ্যাকরা গাড়ির গাড়োয়ানের মাথায় ইত্যাদি।

কিন্তু আজকাল ব্যাঙ ডাকে না কেন? আমি কলকাতার কথা বলছি। ছেলেবেলায় মেঘের ঘটা হলেই ব্যাঙের ডাক শুনতুম— কিন্তু আজকাল পাশ্চাত্য সভ্যতা এল, সার্বভৌমিকতা এবং 'উনবিংশ শতাব্দী' এল, পোলিটিকল্ অ্যাজিটেশন, খোলা ভাঁটি এবং স্বায়ত্তশাসন এল, কিন্তু ব্যাঙ গেল কোথায়? হায় হায়, কোথায় ব্যাস বশিষ্ঠ, কোথায় গৌতম শাক্যসিংহ, কোথায় ব্যাঙের ডাক!

ছেলেবেলায় যেমন বর্ষা দেখতেম, তেমন ঘনিয়ে বর্ষাও এখন হয় না। বর্ষার তেমন সমারোহ নেই যেন, বর্ষা এখন যেন ইক‍নমিতে মন দিয়েছে— নমোনমো করে জল ছিটিয়ে চলে যায়— কেবল খানিকটা কাদা, খানিকটা ছাঁট, খানিকটা অসুবিধে মাত্র— একখানা ছেঁড়া ছাতা ও চীনে বাজারের জুতোয় বর্ষা কাটানো যায়— কিন্তু আগেকার মতো সে বজ্র বিদ্যুৎ বৃষ্টি বাতাসের মাতামাতি দেখি নে। আগেকার বর্ষায় একটা নৃত্য ও গান ছিল, একটা ছন্দ ও তাল ছিল— এখন যেন প্রকৃতির বর্ষার মধ্যেও বয়স প্রবেশ করেছে, হিসাব কিতাব ও ভাবনা ঢুকেছে, শ্লেষ্মা শঙ্কা ও সাবধানের প্রাদুর্ভাব হয়েছে। লোকে বলছে, সে আমারই বয়সের দোষ।

তা হবে! সকল বয়সেরই একটা কাল আছে, আমার সে বয়স গেছে হয়তো। যৌবনের যেমন বসন্ত, বার্ধক্যের যেমন শরৎ, বাল্যকালের তেমনি বর্ষা। ছেলেবেলায় আমরা যেমন গৃহ ভালোবাসি এমন আর কোনো কালেই নয়। বর্ষাকাল ঘরে থাকবার কাল, কল্পনা করবার কাল, গল্প শোনবার কাল, ভাইবোনে মিলে খেলা করবার কাল। বর্ষার অন্ধকারের মধ্যে অসম্ভব উপকথাগুলো কেমন যেন সত্যি হয়ে দাঁড়ায়। ঘনবৃষ্টিধারার আবরণে পৃথিবীর আপিসের কাজগুলো সমস্ত ঢাকা পড়ে যায়। রাস্তায় পথিক কম, ভিড় কম, হাটে ঘাটে কাজের লোকের ঘোরতর ব্যস্ত ভাব আর দেখা যায় না— ঘরে ঘরে দ্বাররুদ্ধ, দোকানপসারের উপর আচ্ছাদন পড়েছে— উদরানলের ইস্টিম প্রভাবে মনুষ্যসমাজ যে রকম হাঁসফাঁস ক'রে কাজ করে সেই হাঁসফাঁসানি বর্ষাকালে চোখে পড়ে না এইজন্যে মনুষ্যসমাজের সাংসারিক আবর্তের বাইরে বসে উপকথাগুলিকে সহজেই সত্য মনে করা যায়, কেউ তার ব্যাঘাত করে না। বিশেষত মেঘ বৃষ্টি বিদ্যুতের মধ্যে উপকথার উপকরণ আছে যেন। যেমন মেঘ ও বৃষ্টিধারা আবরণের কাজ করে— তেমনি বৃষ্টির ক্রমিক একঘেয়ে শব্দও একপ্রকার আবরণ। আমরা আপনার মনে যখন থাকি তখন অনেক কথা বিশ্বাস করি— তখন আমরা নির্বোধ, আমরা পাগল, আমরা শিশু; সংসারের সংস্রবে আসলেই তবে আমরা সম্ভব-অসম্ভব বিচার করি, আমাদের বুদ্ধি জেগে ওঠে, আমাদের বয়স ফিরে পাই। আমরা অবসর পেলেই আপনার সঙ্গে পাগলামি করি, আপনাকে নিয়ে খেলা করি— তাতে আমাদের কেউ পাগল বলে না, শিশু বলে না— সংসারের সঙ্গে পাগলামি বা খেলা করলেই আমাদের নাম খারাপ হয়ে যায়। একটু ভেবে দেখলেই দেখা যায় বুদ্ধি বিচার তর্ক বা চিন্তার শৃঙ্খলা— এ আমাদের সহজ ভাব নয়, এ আমাদের যেন সংসারে বেরোবার আপিসের কাপড়— দ্বিতীয় ব্যক্তির সঙ্গে দেখা করবার সময়েই তার আবশ্যক— আপনার ঘরে এলেই ছেড়ে ফেলি। আমরা স্বভাব-শিশু, স্বভাব-পাগল, বুদ্ধিমান সেজে সংসারে বিচরণ করি। আমরা আপনার মনে বসে যা ভাবি— অলক্ষ্যে আমাদের মনের উপর অহরহ যে-সকল চিন্তা ভিড় করে— সেগুলো যদি কোনো উপায়ে প্রকাশ পেত। সংসারের একটু সাড়া পেয়েছি কী, একটু পায়ের শব্দ শুনেছি কী অমনি চকিতের মধ্যে বেশ পরিবর্তন করে নিই— এত দ্রুত যে আমরা নিজেও এ পরিবর্তনপ্রণালী দেখতে পাই নে। তাই বলছিলেম যদি কোনোমতে আমরা আপনার মনে থাকতে পাই তা হলে আমরা অনেক অসম্ভবকে বিশ্বাস করতে পারি। সেইজন্যে গভীর অন্ধকার রাত্রে যা সম্ভব বলে বোধ হয় দিনের আলোতে তার অনেকগুলি কোনোমতে সম্ভব বোধ হয় না— কিন্তু

এমনি আমাদের ভোলা মন যে, রোজ দিনের বেলায় যা অবিশ্বাস করি রোজ রাত্রে তাই বিশ্বাস করি। রাত্রিকে রোজ সকালে অবিশ্বাস করি, সকালকে রোজ রাত্রে অবিশ্বাস করি! আসল কথা এই, আমাদের বিশ্বাস স্বাধীন, সংসারের মধ্যে পড়ে সে বাঁধা পড়েছে— আমরা দায়ে পড়েই অবিশ্বাস করি— একটু আড়াল পেলে, একটু ছুটি পেলে, একটু সুবিধা পেলেই আমরা যা-তা বিশ্বাস করে বসি, আবার তাড়া খেলেই গণ্ডির মধ্যে প্রবেশ করি। নিতান্ত আপনার কাছে থাকলে তাড়া দেবার লোক কেউ থাকে না। বর্ষাধারার ক্রমিক ঝর্ঝর শব্দ সংসারের সহস্র শব্দ হতে আমাদের ঢেকে রাখে— আমরা অবিশ্রাম ঝর্ঝর শব্দের আচ্ছাদনের মধ্যে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে বিশ্রাম করবার স্বাধীনতা উপভোগ করি। এইজন্যই বর্ষাকাল উপকথার কাল। এইজন্য আষাঢ় মাসের সঙ্গেই আষাঢ়ে গল্পের যোগ। এইজন্যই বলছিলাম, বর্ষাকাল বালকের কাল— বর্ষাকালে তরুলতার শ্যামল কোমলতার মতো আমাদের স্বাভাবিক শৈশব স্ফূর্তি পেয়ে ওঠে— বর্ষার দিনে আমাদের ছেলেবেলার কথাই মনে পড়ে।

তাই মনে পড়ে, বর্ষার দিন আমাদের দীর্ঘ বারান্দায় আমরা ছুটে বেড়াতেম— বাতাসে দুমদাম করে দরজা পড়ত, প্রকাণ্ড তেঁতুলগাছ তার সমস্ত অন্ধকার নিয়ে নড়ত, উঠোনে একহাঁটু জল দাঁড়াত, ছাতের উপরকার চারটে টিনের নল থেকে স্থূল জলধারা উঠোনের জলের উপর প্রচণ্ড শব্দে পড়ত ও ফেনিয়ে উঠত, চারটে জলধারাকে দিক্‌হস্তীর শুঁড় বলে মনে হত। তখন আমাদের পুকুরের ধারের কেয়াগাছে ফুল ফুটত (এখন সে গাছ আর নেই)। বৃষ্টিতে ক্রমে পুকুরের ঘাটের এক-এক সিঁড়ি যখন অদৃশ্য হয়ে যেত ও অবশেষে পুকুর ভেসে গিয়ে বাগানে জল দাঁড়াত— বাগানের মাঝে মাঝে বেলফুলের গাছের ঝাঁকড়া মাথাগুলো জলের উপর জেগে থাকত এবং পুকুরের বড়ো বড়ো মাছ পালিয়ে এসে বাগানের জলমগ্ন গাছের মধ্যে খেলিয়ে বেড়াত, তখন হাঁটুর কাপড় তুলে কল্পনায় বাগানময় জলে দাপাদাপি করে বেড়াতেম। বর্ষার দিনে ইস্কুলের কথা মনে হলে প্রাণ কী অন্ধকারই হয়ে যেত, এবং বর্ষাকালের সন্ধেবেলায় যখন বারান্দা থেকে সহসা গলির মোড়ে মাস্টার মহাশয়ের ছাতা দেখা দিত তখন যা মনে হত তা যদি মাস্টারমশায় টের পেতেন তা হলে—। শুনেছি এখনকার অনেক ছেলে মাস্টারমশায়কে প্রিয়তম বন্ধুর মতো জ্ঞান করে, এবং ইস্কুলে যাবার নাম শুনে নেচে ওঠে। এটা শুভলক্ষণ বোধ হয়। কিন্তু তাই বলে যে ছেলে খেলা ভালোবাসে না, বর্ষা ভালোবাসে না, গৃহ ভালোবাসে না এবং ছুটি একেবারেই ভালোবাসে না— অর্থাৎ ব্যাকরণ ও ভূগোলবিবরণ ছাড়া এই বিশাল বিশ্বসংসারে আর কিছুই ভালোবাসে না, তেমন ছেলের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়াও কিছু নয়। তেমন ছেলে আজকাল অনেক দেখা যাচ্ছে। তবে হয়তো প্রখর সভ্যতা, বুদ্ধি ও বিদ্যার তাত লেগে ছেলেমানুষের সংখ্যা আমাদের দেশে কমে এসেছে, পরিপক্কতার প্রাদুর্ভাব বেড়ে উঠেছে। আমাদেরই কেউ কেউ ইঁচড়ে-পাকা বলত, এখন যে-রকম দেখছি তাতে ইঁচড়ের চিহ্নও দেখা যায় না, গোড়াগুড়িই কাঁঠাল।

বালক
শ্রাবণ ১২৯২

বরফ পড়া

(দৃশ্য)

ছবির রেখা মন হইতে কেমন অল্পে অল্পে অস্পষ্ট হইয়া আসে; প্রতিদিন যে-সকল জিনিস দেখি, তাহাদেরই ছায়া অগ্রবর্তী হইয়া মনের মধ্যে ভিড় করিয়া দাঁড়ায়, কিছুদিন আগে যাহা দেখিয়াছিলাম, তাহাদের প্রতিবিম্ব গোলেমালে কোথায় মিলাইয়া যায়, ভালো করিয়া ঠাহর করিবার জো থাকে না।

১৮৭৮ খৃস্টাব্দে আমি ইংলন্ডে যাই, সে আজ সাত বৎসর হইল। তখন আমার বয়সও নিতান্ত অল্প ছিল। তখন ইংলন্ডে যাহা দেখিয়াছিলাম তাহার একটা মোটামুটি ভাব মনে আছে বটে, কিন্তু তাহার সকল ছবি খুব পরিষ্কাররূপে মনে আনিতে পারি না, রেখায় রেখায় মিলাইয়া লইতে পারি না। ইহারই মধ্যে আমার স্মৃতিপটবর্তী ইংলন্ডের উপর কোয়াশা পড়িয়া আসিতেছে। ছবিগুলি মাঝে মাঝে রৌদ্রে বাহির করিয়া ঝাড়িয়া দেখিতে হয়। সেইজন্য আজ স্মৃতিপট রৌদ্রে বাহির করিয়াছি।

আমি যখন ইংলন্ডে গিয়া পৌঁছাই, তখন অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি। তখনও খুব বেশি শীত বলিয়া আমার মনে হয় নাই। আমরা ব্রাইটনে ছিলাম। ব্রাইটনে তখনও যথেষ্ট রৌদ্র ছিল। রৌদ্রে পুলকিত হইয়া সমুদ্রের ধারের পথে ছেলে বুড়ো ঝাঁকে ঝাঁকে বাহির হইয়াছে। রোগীরা এবং জরাগ্রস্তরা ঠেলাগাড়িতে চলিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে পাশে পাশে একটি-দুইটি মেয়ে, বা পরিবারের কেহ। মেয়েরা নানাসাজপরা, ছাতা মাথায়। ছোটো ছেলেরা লোহার চাকা গড়াইয়া পথে ছুটিতেছে। সমুদ্রের তীরে কোনো মেয়ে ছাতা মাথায় দিয়া বসিয়া। সমুদ্রের ঢেউয়ের অনুসরণ করিয়া কেহ কেহ নানাবিধ ঝিনুক সংগ্রহ করিতেছে। ইটালীয় ভিক্ষুক পথে পথে আর্গিন বাজাইয়া ফিরিতেছে। শাকসবজিওয়ালা, দুধওয়ালা, গাড়ি করিয়া ঘরে ঘরে জোগান দিয়া ফিরিতেছে। বেড়াইবার পথে অশ্বারোহী এবং অশ্বারোহিণী পাশাপাশি ছুটিয়াছে— পশ্চাতে কিছুদূরে একটি করিয়া অশ্বারোহী সহিস তক্‌মা পরিয়া অনুসরণ করিতেছে। এক-একটি শিক্ষক তাহার পশ্চাতে এক পাল ইস্কুলের ছেলে লইয়া— অথবা এক-একটি শিক্ষয়িত্রী ঝাঁকে ঝাঁকে ইস্কুলের মেয়ে লইয়া সার বাঁধিয়া সমুদ্রতীরের পথে হাওয়া খাইতে আসিয়াছে; হাওয়া না হউক— রৌদ্র খাইতে আসিয়াছে। আমরা প্রায় মাঝে মাঝে ছেলেদের লইয়া সমুদ্রতীরের তৃণক্ষেত্রে ছুটাছুটি করিতাম। ছুটাছুটি করিবার ঠিক বয়স নয় বটে— কিন্তু সেখানে আমাদের এই রীতি-বহির্ভূত ব্যবহার সমালোচনা করিবার যোগ্যপাত্র কেহ উপস্থিত ছিলেন না। দশটা-এগারোটার সময় আমাদের বেড়াইবার সময় ছিল। যাহা হউক, আমরা যখন ব্রাইটনে আসিয়া পৌঁছিলাম, তখন সমুদ্রতীরে সূর্যকরোৎসব।

দিন যাইতে লাগিল— শীত বাড়িতে লাগিল। রাস্তার কাদা শীতে শক্ত হইয়া উঠিল। ঘাসের উপরে শিশির জমিয়া যাইত, কে যেন চুন ছড়াইয়াছে। সকালে উঠিয়া দেখি শার্শির কাচে চিত্রবিচিত্র তুষারের স্ফটিকলতা আঁকা রহিয়াছে। কখনো কখনো পথে দেখিতাম, দুই-একটা চড়ুই পাখি শীতে মরিয়া পড়িয়া রহিয়াছে। গাছের যে কয়েকটা হলদে পাতা অবশিষ্ট ছিল, তাহাও ঝরিয়া পড়িল, শীর্ণ ডালগুলো বাহির হইতে লাগিল। বিশ্বস্ত-হৃদয় ছোটো ছোটো রবিন পাখি কাচের জানালার কাছে আসিয়া রুটির টুকরা ভিক্ষা চায়। সকলে আশ্বাস দিল, শীঘ্রই বরফ পড়া দেখিতে পাইবে।

ক্রিস্টমাসের সময় আগতপ্রায়। কনকনে শীত। জ্যোৎস্না রাত্রি। ঘরের জানলা দরজা বন্ধ, পরদা ফেলা। গ্যাস জ্বলিতেছে। গরমের জন্য আগুন জ্বালা হইয়াছে। সন্ধ্যাবেলা আহার করিয়া অগ্নিকুণ্ড ঘিরিয়া আমরা গল্পে নিমগ্ন। দুটি ছেলে আমার প্রতি আক্রমণ করিয়াছেন। তাঁহারা যে আমার সঙ্গে ভদ্রজনোচিত ব্যবহার করিতেন না, তাহার সহস্র প্রমাণ সত্ত্বেও আমি এখানে সে-সকল কথার উল্লেখ করিতে চাহি না। তাহারা এখন বড়ো হইয়া উঠিয়াছে, 'বালক' পড়িয়া থাকে— তাহাদের সম্বন্ধে একটা কথা লিখিয়া শেষকালে জবাবদিহি করিতেই প্রাণ বাহির হইয়া যায়। আর কিছুদিন পরে তাহারা আবার প্রতিবাদ করিতেও শিখিবে। তখন আমি তাহাদের সঙ্গে পারিয়া উঠিব না— এই ভয়ে আমি ক্ষান্ত রহিলাম। পাঠকেরা তাহাদের স্বভাব চরিত্র সম্বন্ধে যাহার যেমন সাধ্য অনুমান করিয়া লইবেন— আমি ইচ্ছাপূর্বক কোনোরূপ দায় স্কন্ধে লইতে চাই না।

গরম হইয়া সকলে বসিয়া আছি, এমন সময়ে খবর আসিল, বরফ পড়িয়াছে। কখন পড়িতে আরম্ভ হইয়াছিল, জানিতে পারি নাই, আমাদের দ্বার সমস্ত রুদ্ধ ছিল। ছেলেপিলে মিলিয়া

লাফালাফি করিয়া বাহিরে গিয়া দেখি— কী চমৎকার দৃশ্য! শীতে জ্যোৎস্না-স্তর যেন জমিয়া জমিয়া, রাস্তায়, ঘাসের উপর, গাছের শূন্য ডালে, গড়ানো স্লেটের ছাতে পুঞ্জীভূত হইয়া আছে। পথে লোক নাই। আমাদের সম্মুখের গৃহশ্রেণীর জানলা দরজা সমস্ত বন্ধ। সেই রাত্রি ও নির্জনতা, জ্যোৎস্না ও বরফ সমস্ত মিলিয়া কেমন এক অপূর্ব দৃশ্য সৃজন করিয়াছিল। ছেলেরা (এবং আমিও) ঘাসের উপর হইতে বরফ কুড়াইয়া পাকাইয়া গোলা করিতেছিল। সেগুলো ঘরে আনিতেই ঘরের তাতে গলিয়া জল হইয়া যাইতে লাগিল।

আমার পক্ষে এই প্রথম বরফ পড়া রাত্রি। ইহার পরে আরও অনেক বরফ পড়া দেখিয়াছি। কিন্তু তাহার বর্ণনা করা সহজ নহে; বিশেষত এতদিন পরে। সর্বাঙ্গ কালো গরম কাপড়ে আচ্ছন্ন; রাস্তা দিয়া চলিয়াছি। আকাশ ধূসর বর্ণ। গুঁড়িগুঁড়ি বরফ কুইনাইনের গুঁড়ার মতো চারি দিকে পড়িতেছে। বৃষ্টির মতো টপ্‌টপ্ করিয়া পড়ে না— লঘুচরণে উড়িয়া উড়িয়া নাচিয়া নাচিয়া পড়ে। কাপড়ের উপরে আসিয়া ছুঁইয়া থাকে, ঝাড়িলেই পড়িয়া যায়। চারি দিক শুভ্র। কোমল বরফের স্তরের উপর গাড়ির চাকার দাগ পড়িয়া যাইতেছে। শুভ্র বরফের আস্তরণের উপরে কাদাসুদ্ধ জুতার পদচিহ্ন ফেলিতে কেমন মায়া হয়। মনে হয়, স্বর্গ হইতে যেন ফুলের পাপড়ি, যেন পারিজাতের কেশর ঝরিয়া পড়িতেছে। পথিকদের কালো কাপড়ে কালো ছাতায় বরফ লাগিয়াছে।

কেমন অল্পে অল্পে সমস্ত বরফে আচ্ছন্ন হইয়া আসে। প্রথমে পথে ঘাটে সাদা-সাদা রেখা-রেখার মতো পড়িতে লাগিল। আমাদের বাড়ির সম্মুখেই অল্প একটুখানি জমি আছে, তাহাতে খানকতক গাছের চারা ও গুল্ম আছে— গাছে পাতা নাই, কেবল ডাঁটা সার; সেই ডাঁটাগুলি এখনও আচ্ছন্ন হয় নাই— সবুজে সাদায় মেশামেশি হইতেছে। গাছের চারাগুলো যেন শীতে হীহী করিতেছে। তাহাদের গাত্রবস্ত্র গিয়াছে, বরফের সাদা শোক-উত্তরীয় পরিয়া তাহাদের শিরার ভিতরকার রস যেন জমিয়া যাইতেছে। বাড়ির কালো স্লেটের চাল অল্প অল্প পাণ্ডুবর্ণ হইয়া ক্রমে সাদা হইয়া উঠিতেছে। ক্রমে পথ আচ্ছন্ন হইয়া গেল— ছোটো ছোটো চারা বরফে ডুবিয়া গেল। জানালার সম্মুখে সংকীর্ণ আলিসার উপরে বরফের স্তর উঁচু হইয়া উঠিতে লাগিল। যে দুই-একজন পথিক দেখা যায়, তাহাদের নাক নীল হইয়া গিয়াছে, মুখ শীতে সংকুচিত। অদূরে গির্জার চূড়া শ্বেতবসন প্রেতের মতো আকাশে আবছায়া দেখা যাইতেছে।

শীত যে কতখানি তাহা এই ভাদ্রমাসের গুমটে কল্পনা করা বড়ো শক্ত। মনে আছে, সকালে ঠাণ্ডা জলে স্নান করিয়া হাত এমন অসাড় হইয়া যাইত যে, পকেটে রুমাল খুঁজিয়া পাইতাম না। গায়ে গরম কাপড়ের সীমা পরিসীমা নাই— মোটা জুতো ও মোটা মোজার মধ্যে পায়ের তেলো দুটো কথায় কথায় হিম হইয়া উঠিত। রাত্রে কম্বলের বস্তার মধ্যে প্রবেশ করিয়াও পাশ ফিরিতে নিতান্ত ভাবনা উপস্থিত হইত, কারণ যেখানে ফিরিব সেইখানেই ছ্যাঁক করিয়া উঠিবে। শুনা গেল, একটা জেলে-নৌকায় চারজন জেলে সমুদ্রে মাছ ধরিতে গিয়াছিল, কোনো জাহাজের কাছে আসিতে জাহাজের লোকেরা দেখিল, তাহারা চারজনেই শীতে জমিয়া মরিয়া আছে। রাত্রে গাড়ির উপরে গাড়ির কোচমান মরিয়া আছে। জলের নলের মধ্যে জল জমিয়া মাঝে মাঝে নল ফাটিয়া যায়। টেম্‌স্ নদীর উপরে বরফ জমিয়াছে। হাইড্‌পার্ক নামক উদ্যানের ঝিল জমিয়া গেছে। প্রতিদিন শতসহস্র লোক একপ্রকার লৌহপাদুকা পরিয়া সেই ঝিলের উপর স্কেট করিতে সমাগত।

এই স্কেট করা এক অপূর্ব ব্যাপার। কঠিন জলাশয়ের উপর শতসহস্র লোক স্কেটজুতা পরিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া হেলিয়া দুলিয়া পিছলিয়া চলিতেছে। পালে নৌকা চলা যেমন, স্কেটে মানুষ চলাও তেমনি— শরীর ঈষৎ হেলাইয়া মাটির উপর দিয়া কেমন অবলীলাক্রমে ভাসিয়া যাওয়া যায়। পদক্ষেপ করিবার পরিশ্রম নাই— মাটির সহিত বিবাদ করিয়া, পদাঘাতের দ্বারা প্রতিপদে মাটিকে পরাভূত করিয়া চলিতে হয় না।

কিন্তু কল্পনাযোগে আমাদের দেশে সেই বিলাতের শীত আমদানি করিবার চেষ্টা করা বৃথা— আমাদের এখানকার উত্তাপে তাহা দেখিতে দেখিতে তাতিয়া উঠে, বরফের মতো গলিয়া যায় তাহাকে আয়ত্ত করা যায় না। আমাদের এখানকার লেপ-কাঁথার মধ্যে তাহার যথেষ্ট সমাদর হয় না।

বালক
আশ্বিন-কার্তিক ১২৯২

শিউলিফুলের গাছ

আমি সমস্ত দিন কেবল টুপ্‌টাপ্‌ করিয়া ফুল ফেলিতেছি; আমার তো আর কোনো কাজ নাই। আমার প্রাণ যখন পরিপূর্ণ হইয়া উঠে, আমার সাদা সাদা হাসিগুলি মধুর অশ্রুজলের মতো আমি বর্ষণ করিতে থাকি।

আমার চারি দিকে কী শোভা! কী আলো! আমার শাখায় শাখায় পাতায় পাতায় সূর্যের কিরণ নাচিতেছে। বীণার তারের উপর মধুর সংগীত যেমন আপনার আনন্দে থর্‌থর্‌ করিয়া কাঁপিয়া উঠে, স্বর্গ হইতে নামিয়া আসে, এবং কাঁপিতে কাঁপিতে স্বর্গেই চলিয়া যায়; আমার পাতায় পাতায় প্রভাতের আলো তেমনি করিয়া কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে, চমক খাইয়া আকাশে ঠিক্‌রিয়া পড়িতেছে, সেই আলোকের চম্পক-অঙ্গুলি স্পর্শে আমার প্রাণের ভিতরেও ঝিন্‌ঝিন্‌ করিয়া বাজিয়া উঠিতেছে, কাঁদিয়া উঠিতেছে— আমি আপনাকে আর রাখিতে পারিতেছি না— বিহ্বল হইয়া আমার ফুলগুলি ঝরিয়া পড়িতেছে।

বাতাস আসিয়াছে। ভোরের বেলায় জাগিয়া উঠিয়াই আমাকে তাহার মনে পড়িয়াছে। রাত্রে সে স্বপ্ন দেখিয়া মাঝে মাঝে জাগিয়া আমার কোলের উপর আসিয়া আবার ঘুমাইয়া পড়ে। আমার কোমল পল্লবের স্তরের মধ্যে আসিয়া সে আরাম পায়। আধো-আধো স্বরে সে আমাকে ঘিরিয়া ঘিরিয়া কথা কহে, সে তাহার খেলার গল্প করে, আকাশের মেঘ ও সমুদ্রের ঢেউয়ের কাহিনী বলে— বলিতে বলিতে ভুলিয়া যায়, চলিয়া যায়— আবার কখন আপন মনে ফিরিয়া আসে। সে যখন দূর হইতে আসিয়া দুই-একটা কথা বলিয়া আমার পাশ দিয়া চলিয়া যায়, তাহার উড়ন্ত আঁচলটি আমার গায়ে একটু ঠেকিয়া অমনি উড়িয়া যায়, আমার সমস্ত ডালপালা চঞ্চল হইয়া উঠে, আমার ফুলগুলি তাহার পিছন পিছন উড়িয়া যায়, স্নেহভরে ভূমিতে পড়িয়া যায়।

দুপুরবেলা চারি দিক নিঝুম হইয়া গেলে একটি পাখি আসিয়া আমার পাতার মধ্যে বসিয়া এক সুরে ডাকিতে থাকে। তাহার সেই সুর শুনিয়া ছায়াখানি আমার তলায় ঘুমাইয়া পড়ে। বাতাস আর চলিতে পারে না। মেঘের টুকরা স্বপ্নের মতো ভাসিয়া যায়। দূর হইতে রাখালের বাঁশির স্বর মিলাইয়া আসে। ঘাসের ভিতরে বেগুনি ফুলগুলি বৃন্তসুদ্ধ মাথা হেঁট করিয়া থাকে। দুই-একটা করিয়া আমার ফুল যেন ভুলিয়া ঝরিয়া পড়ে। তাহারাও সেই পাখির এক সুরে এক গানের মতো, সমস্ত দুপুরবেলা একভাবে একছন্দে একটির পরে একটি করিয়া ঝরিতে থাকে— ভূমিতে পড়িয়া মরিতে থাকে— আপনার মনে মিলাইয়া যায়।

সন্ধ্যার কনক-উপকূল ছাপাইয়া অন্ধকার যখন জগৎ ভাসাইয়া দেয়, আমি তখন আকাশে চাহিয়া থাকি। আমার মনে হয় আমার আজন্মকালের ঝরা ফুলগুলি আকাশে তারা হইয়া উঠিয়াছে। উহাদের মধ্যেও দু-একটা কখনো কখনো ঝরিয়া আসে, বোধ করি আমারই তলায় আসিয়া পড়ে, সকালে তাহার উপরে শিশির পড়িয়া থাকে। এইরূপ স্বপ্ন ভাবিতে ভাবিতে আমি ঘুমাইয়া পড়ি এবং ঘুমাইতে ঘুমাইতে স্বপ্ন দেখি; নিশীথের মাধুরী আমাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। আমি স্বপ্নে অনুভব করিতে থাকি ধীরে ধীরে আমার কুঁড়িগুলি আমার সর্বাঙ্গে পুলকের মতো ছাইয়া উঠিতেছে। আধঘুমঘোরে শুনিতে পাই আমার সন্ধ্যাবেলাকার ফোটা ফুলগুলি টুপ্‌টাপ্‌ করিয়া অন্ধকারে ঝরিয়া পড়িতেছে।

আমি সমস্ত দিনরাত্রি এই নীল আকাশের তলে দাঁড়াইয়া আছি— আমি চলিতে পারি না, খুঁজিতে পারি না, কোথায় কী আছে সকল দেখিতে পাই না। আমি কেবল আকাশের গুটিকত তারা চিনিয়া রাখিয়াছি, আর কাননের গুটিকতক গাছ দেখিতে পাই, তাহারা প্রভাতের আনন্দে আমারই মতো কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠে। আমার কাছে দূর বন হইতে ফুলের গন্ধ আসে, কিন্তু সে ফুল আমি দেখিতে পাই না। পল্লবের মর্মর শুনিতে পাই কিন্তু কোথায় সে ছায়াময় বন! শুভ্র ক্ষীণ মেঘ আকাশের উপর দিয়া ভাসিয়া যায়— কিন্তু কোথায় সে যায়! যে পাখি অনেক দূর হইতে উড়িয়া আমার ডালে আসিয়া বসে সে কেন আমাকে জগতের সকল কথা বলিয়া যায় না!

আমি এক জায়গায় দাঁড়াইয়া থাকি— যাহার জন্য আমার ফুল ফুটিতেছে মনের সাধ মিটাইয়া তাহাকে খুঁজিয়া বেড়াইতে পারি না। এইজন্য আমি সমস্তদিন ফুল ফেলিয়া ফেলিয়া দিই— আমি দাঁড়াইয়া থাকি কিন্তু আমার সুগন্ধ আমার প্রাণের আশা ঘুরিয়া বেড়ায়। আমার ফুলগুলি আমি বাঁধিয়া রাখি না, তাহারা উড়িয়া যায়। তাহাদের আমি জগতে পাঠাইয়া দিই, আমার আনন্দের বার্তা তাহারা দূরে গিয়া প্রচার করিয়া আসে। আমি আমার অজানা অচেনাকে ফুলের অক্ষরে চিঠি লিখিয়া পাঠাই। নিশ্চয় তাহার হাতে গিয়া পৌঁছায়, নহিলে আমার মনের ভার লাঘব হয় কেন? আমি নীলাকাশে চাহিয়া উদ্দেশে আমার প্রিয়তমের চরণে অনুক্ষণ অঞ্জলিপূর্ণ ফুল ঢালিয়া দিই, আমি যেখানে যাইতে পারি না, আমার ফুলেরা সেখানে চলিয়া যায়।

ছোটো মেয়েটি আমার তলা হইতে অবহেলে অমনি একমুঠো ফুল কুড়াইয়া লয়, মাথায় দুটো ফুল গুঁজিয়া চলিয়া যায়। কোথায় কোন্ নদীর ধারে কোন্ ছোটো কুটিরে তাহার ছোটো ছোটো সুখদুঃখের মধ্যে আমার ফুলের গন্ধ মিশাইতে থাকে। বৃদ্ধ সকালে সাজি করিয়া আমার ফুল দেবতার চরণে অর্পণ করে, তাহার ভক্তির সহিত আমার ফুলের গন্ধ আকাশে উঠিতে থাকে।

আমি প্রতিদিন সকালে যে আনন্দপূর্ণ সূর্যালোক, স্নেহপূর্ণ বাতাস পাই, আমি আমার ফুলের মধ্যে করিয়া সেই আলোক সেই বাতাস ফিরাইয়া দিই। জগতের প্রেম আমার মধ্যে ফুল হইয়া ফুটিয়া জগতে ফিরিয়া যায়। আমার যত আছে তত দিই। আরও থাকিলে আরও দিতাম।

দিয়া কী হয়? শুকাইয়া যায় ছড়াইয়া যায়— কিন্তু ফুরাইয়া যায় না, আমার কোল তো শূন্য হয় না, প্রতিদিন আবার আমার প্রাণ ভরিয়া উঠে। প্রতিদিন নূতন প্রাণের উচ্ছ্বাস হৃদয় হইতে বাহির করিয়া সূর্যালোকে ফুটাইয়া তুলা, এবং প্রতিদিন আনন্দধারা অজস্রধারে জগতের মধ্যে বিসর্জন করিয়া দেওয়া এই সুখই আমি কেবল জানি; তার পরে আমার ফুল কে চায় আমার ফুল কে গ্রহণ করে, আমার ফুল কে দলন করে আমি তাহার কিছুই জানি না। মনের মধ্যে এই বিশ্বাস যে, আমার এই ফুল ফোটানো ফুল বিসর্জন অবশ্য কিছু-না-কিছু কাজে লাগেই। আমার ঝরা ফুলগুলি জগৎ কুড়াইয়া লয়। অতীত আমার ঝরা ফুল লইয়া মালা গাঁথে। আমার সহস্র ফুল অবিশ্রাম ঝরিয়া ঝরিয়া সুদূর ভবিষ্যতের জন্য এক অপূর্ব নূতন শতদল রচনা করে। প্রভাতসংগীতের তালে তালে আমার ফুলের পতন হয়। সেই সুমধুর ছন্দে আমার ফুলের পতনে জগতের নৃত্যগীত সম্পূর্ণ হইতেছে।

আকাশের তারাগুলিও স্বর্গীয় কল্পতরুর ঝরা ফুল, তাহারা কি কোনো কাজে লাগে না? মালার মতো গাঁথিয়া কেহ কি তাহাদের গলায় পরে নাই? কোমল বলিয়া আমার ফুলগুলির উপরে কেহ কি পাও রাখিবে না? আমি জানি আমার ফুলগুলি ঝরিয়া জননী লক্ষ্মীর পদ্মাসনের তলে পুনর্জন্ম লাভ করে। সেখানে অমৃতধারায় অনন্তকাল প্রফুল্ল হইয়া থাকে। সেই অমর সৌন্দর্যের স্তরের উপর স্তরে জগৎব্যাপী স্তরের মধ্যে একটি ছোটো পাপড়ি হইয়া আনন্দে বিকশিত হইতে থাকে।

বালক

অগ্রহায়ণ ১২৯২

বানরের শ্রেষ্ঠত্ব

বানর বলিতেছেন— আমরা বানর, অতি শ্রেষ্ঠ পুরাতন বনুবংশজাত, অতএব আমরাই সকল জীবের প্রধান। নল নীল অঙ্গদ এবং সুবিখ্যাত মর্কটেরা এই বনুবংশেই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের নমস্কার।

আমরা যে শ্রেষ্ঠ, তার প্রমাণ এই যে, আমাদের ভাষায় বানর অর্থই শ্রেষ্ঠ— আর আর সকল জীবই অশ্রেষ্ঠ। মনুষ্যদের আমরা ম্লেচ্ছ বলিয়া থাকি। যেহেতু তাহারা অপক্ব কদলী দগ্ধ করিয়া খায়, এরূপ আচরণ আমরা স্বপ্নেও কল্পনা করিতে পারি না। তাহা ছাড়া তাহারা সাতজন্মে গায়ের উকুন বাছিয়া খায় না এমনি অশুচি। আত্মীয় বান্ধবের সহিত দেখা হইলে তাহারা পরস্পরের গায়ের উকুন বাছিয়া দেয় না তাহাদের সমাজে এমনি সহৃদয়তার অভাব। শ্রেষ্ঠজাতি বানর জাতি এই-সকল কারণে মনুষ্য জাতিকে ম্লেচ্ছ বলিয়া থাকে।

আমাদের শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় কত দিব? আমরা পুরুষানুক্রমে কখনো চাষ করিয়া খাই না। সনাতন বানরশাস্ত্রে চাষ করার কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না। প্রাচীন বনুর সময়ে যে নিয়ম ছিল আমরা আজও সেই নিয়ম পালন করিয়া আসিতেছি— এমনি আমরা শ্রেষ্ঠ! আমাদিগকে ভ্রষ্টাচারী কেহ বলিতে পারে না। কিন্তু ম্লেচ্ছ মনুষ্য জাতি চাষ করিয়া খায়, তাহারা চাষা।

চাষ না করাই যে সাধু আচার তাহার প্রমাণ এই, এতকাল ধরিয়া শ্রেষ্ঠ বানরসমাজে চাষ না করাই প্রচলিত। চাষ করাই যদি সদাচার হইত, তবে বনু-আচার্য কি চাষ করিতে বলিতেন না? আমাদের বানর বংশে যে মহাত্মা জাম্বুবানের মতো এত বড়ো দূরদর্শী পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, কই তিনি তো চাষের কোনো উল্লেখ করেন নাই। তবে যদি আধুনিক অর্বাচীন নব্য বানরের মধ্যে কোনো মহাপুরুষ লেজ খসাইয়া মানুষীয়ানা করিতে চান, তবে তিনি সনাতন পবিত্র বানর প্রথা ত্যাগ করিয়া চাষ করিতে থাকুন!

কিন্তু অত্যন্ত আমোদের বিষয় এই যে, বানরদের শ্রেষ্ঠতায় মুগ্ধ হইয়া মানুষেরা সম্প্রতি প্রমাণ করিতে আসিয়াছে যে, মানুষরা বানর বংশজাত। এইরূপ মিথ্যাযুক্তির সাহায্যে গোলেমালে কোনোপ্রকারে মানুষ বানরের দলে মিশিতে চায়! হে বানর ভ্রাতৃবৃন্দ, তোমরা সাবধান, মানুষ যে বানর এরূপ গুরুতর ভ্রম মনে স্থান দিয়ো না।

গোটাকতক বিষয়ে বানরে ও মানবে সাদৃশ্য দেখা যায় বটে। কিন্তু তাহা হইতে কী প্রমাণ হইতেছে! এই প্রমাণ হইতেছে যে, মানবেরা বানর হইবার দুরাকাঙ্ক্ষায় ক্রমাগত আমাদের অনুকরণ করিতেছে— ক্রমাগত আমাদিগকে ape করিতেছে। ম্লেচ্ছ মানব কাঁচকলা খাইত বটে, কিন্তু পক্ব কদলীর গৌরব আমাদের কাছ হইতে শিখিয়াছে। উকুনবাছা সম্বন্ধেও মানবীরা আমাদের অতি অসম্পূর্ণ অনুকরণ আরম্ভ করিয়াছে, শ্রেষ্ঠ বানরেরা তাহা দেখিয়া হাস্য সংবরণ করিতে পারে না। আনন্দ উপলক্ষে অনেক সময়ে মানবেরা দন্তপঙ্‌ক্তি বিকাশ করে বটে, এবং মনে করে বুঝি অবিকল বানরের মতো হইলাম— কিন্তু সে মুখভঙ্গি আমাদের পবিত্র বানরজাতি-প্রচলিত সনাতন দন্তবিকাশের কাছ দিয়াও যায় না।

মানবের ভাষায় দুই-একটা এমন শব্দপ্রয়োগ দেখা যায় বটে, যাহাতে সহসা কোনো নির্বোধের ভ্রম হইতেও পারে যে বানরের সহিত মানবের যোগ আছে। 'লেজে তেল দেওয়া' 'লেজ মোটা হওয়া' শব্দ মানবেরা এমনভাবে ব্যবহার করে যেন তাহাদের সত্যসত্যই লেজ আছে। কিন্তু উহা ভান মাত্র— উহাতে কেবল তাহাদের হৃদয়ের বাসনা প্রকাশ পায় মাত্র— হায় রে দুরভিলাষ! আমি শুনিয়াছি দুরাশাগ্রস্ত লোককে মানুষ বলিয়া থাকে 'অমুক কাজ করিয়া এমনি কী চতুর্ভুজ হইয়াছ!' ইহাতে চতুর্ভুজ হইবার জন্য মানুষের প্রাণপণ চেষ্টা প্রকাশ পায়। শ্রেষ্ঠ বনুবংশজাত বানরেরা সহজেই চতুর্ভুজ হইয়াছে, কিন্তু ম্লেচ্ছ মানবেরা শত জন্ম তপস্যা করিলেও তাহা হইতে পারিবে না।

যাহা হউক, স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, মানবেরা বানর বলিয়া পরিচয় দিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে। এমন-কি, বস্ত্রদ্বারা তাহারা সযত্নে গাত্র আচ্ছাদন করিয়া রাখে, পাছে তাহাদের রোমাবলীর বিরলতা ও লাঙুলের অভাব ধরা পড়ে— পবিত্র বানরতনুর সহিত ম্লেচ্ছ মানবতনুর প্রভেদ দৃশ্যমান হয়। লজ্জার বিষয় বটে। কিন্তু বনুবংশীয়দের কী আনন্দ! আমরা কী গৌরবের সহিত আমাদের লাঙুল আস্ফালন করিতে পারি।

আমাদের কিচিকিচি-পুরাণ মানুষের পিতৃপুরুষের সাধ্য নাই যে বুঝে— কারণ শ্রেষ্ঠজাতির শাস্ত্র নিকৃষ্টজাতি কখনোই বুঝিতে পারে না। আমি জিজ্ঞাসা করি, মানুষের ভাষায় কি কোনো প্রকৃত তত্ত্বকথা আছে— যদি থাকিত তবে কি আমাদের পবিত্র কিচিকিচির সহিত তাহার কোনো সাদৃশ্য পাইতাম না?

অতএব আমাদের বনুদেব ও হনুমদাচার্য চিরজীবী হইয়া থাকুন, আমরা যেন চিরদিন বানর থাকি, এবং কিচিকিচি শাস্ত্রে সম্যক পারদর্শী হইয়া উত্তরোত্তর অধিকতর বানরত্ব লাভ করি। আমাদের সনাতন লেজ যেন সযত্নে রক্ষা করিতে পারি, এবং আস্ফালনের প্রভাবে তাহা দিনে দিনে যেন দীর্ঘতর হইতে থাকে! আর যে যা খায় খাক আমরা যেন কেবল কলা খাইতেই থাকি, এবং শ্রেষ্ঠ বানর ব্যতীত অন্য জীবকে দেখিবামাত্র দাঁত খিঁচাইয়া আনন্দলাভ করি।

বালক
চৈত্র ১২৯২

কার্যধ্যক্ষের নিবেদন

কার্যাধ্যক্ষের অপটুতাবশত কিছুকাল হইতে বালক প্রকাশে ও বিতরণে অনিয়ম ঘটিয়াছে এবং উত্তরোত্তর অধিকতর অনিয়ম ঘটিবার সম্ভাবনা, এইজন্য পাঠকদিগের নিকটে মার্জনা প্রার্থনা করিয়া কার্যাধ্যক্ষ অবসর গ্রহণ করিতেছেন। বালক কার্যাধ্যক্ষ সাহিত্য-ব্যবসায়ী, যথেষ্ট অবকাশ তাঁহার পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক— তিনি কর্মিষ্ঠতা ও কার্যনিপুণতার জন্যও বিখ্যাত নহেন, তৎসত্ত্বেও তাঁহার হাতে অন্যান্য কাজের ভার আছে, ভরসা করি এই-সকল বিবেচনা করিয়া বালকের গ্রাহকেরা প্রসন্ন মনে তাঁহাদের কার্যধ্যক্ষকে বিদায় দিবেন।

বালক কার্যাধ্যক্ষ

বালক
চৈত্র ১২৯২

সৌন্দর্য ও বল

পরিমিত বেশভূষা দ্বারা স্ত্রীলোক আপন সৌন্দর্য বৃদ্ধির চেষ্টা করিলে আমাদের খারাপ লাগে না। কিন্তু কেহ বিশেষ কোনো হাবভাবভঙ্গি অনুশীলন করিয়া রূপচ্ছটা বিকাশ করিবার চেষ্টা করিতেছে ইহা জানিতে পারিলেই আমাদের অত্যন্ত খারাপ লাগে এবং অধিকাংশ স্থলে রূপসীর উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। ইহার কারণ কী? সৌন্দর্য আমাদের মনে পূর্ণতার ভাব আনয়ন করে, পূর্ণতার সহিত চপলতার যোগ নাই; পূর্ণতার মধ্যে একটি বিরাম আছে। পরিমিত বসনভূষণ আমাদের মনকে নিমেষে নিমেষে উত্তেজিত করে না— রূপের সহিত মিলিয়া মিশিয়া একটি পরিপূর্ণতা আমাদের সমক্ষে আনয়ন করে। এইজন্য সর্বত্র বলে লজ্জা স্ত্রীলোকের ভূষণ। লজ্জা অর্থে সংযম, সামঞ্জস্য, বিরাম। কোনো প্রকার গতিচাপল্য বা উচ্চস্বর প্রভৃতি যাহাতে সৌন্দর্যের শোভন সামঞ্জস্য নষ্ট করে তাহা নির্লজ্জতার অঙ্গ। এই হিসাবে অত্যধিক অলংকার এবং অতি রঙচঙ নির্লজ্জতা। বিবসন নিশ্চল প্রশান্ত গ্রীক প্রস্তরমূর্তির মধ্যে একটি আশ্চর্য সসম্ভ্রম সলজ্জ ভাব আছে— কিন্তু বিস্তর বাহার-করা বাসাচ্ছাদিতা ভঙ্গি-নিপুণা রূপসীর মধ্যে তাহা নাই। চেষ্টার

ভাব পূর্ণতার ভাবকে হ্রাস করে— বসনভূষণ অপেক্ষা হাবভাবে অধিক চেষ্টা প্রকাশ পায়— মন প্রতিক্ষণে প্রশ্ন করে এমন সময়ে হাত কেন নাড়িল, অমন সময়ে ঘাড় কেন বাঁকাইল, যদি তাহার কোনো স্বাভাবিক উদ্দেশ্য না খুঁজিয়া পায় তবে তখনই বুঝিতে পারে তাহা সৌন্দর্য-বৃদ্ধির চেষ্টা; এবং মন বলে সৌন্দর্যের সহিত চেষ্টার তো কোনো যোগ নাই। বলের সহিত সৌন্দর্যের প্রভেদ তাহাই। চেষ্টা হইতে চেষ্টার জন্ম হয়। বলের মধ্যে চেষ্টা আছে, এইজন্য সেই চেষ্টাকে প্রতিহত করিবার জন্য স্বভাবতই আমাদের মনে চেষ্টার উদয় হয়। এইজন্য বলের অধীন হইতে আমাদের লজ্জা বোধ হয়, দাসত্ব বলিয়া জ্ঞান হয়, তাহার মধ্যে পরাজয় অনুভব করি। নিশ্চেষ্ট নিরস্ত্র সৌন্দর্যের নিকট আমরা নিশ্চেষ্ট নিরস্ত্র ভাবে আত্মসমর্পণ করি। তাহার মধ্যে যখনই চেষ্টা দেখি তখনই তাহা বলের সামিল হইয়া দাঁড়ায়, তৎক্ষণাৎ আমাদের মন সচেতন হইয়া তাহার বিরুদ্ধে বদ্ধপরিকর হয়। 'দেখি, কে হারে কে জেতে' এই ভাবটাই প্রবল হইয়া উঠে।

পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তক
২১।১১।১৮৮৮

আবশ্যকের মধ্যে অধীনতার ভাব

আবশ্যকের প্রতি আমাদের এক প্রকার ঘৃণা আছে। যাহার মধ্যে আবশ্যকের ভাব যত পরিস্ফুট তাহাকে ততই নীচশ্রেণীয় মনে করি। চাষ নিতান্তই আবশ্যকীয়— বুদ্ধিবৃত্তির মধ্যে একান্ত আবশ্যকতা তত জাজ্বল্যরূপে নজরে পড়ে না। যাহারা খাটিয়া খায় তাহারা সমাজের পক্ষে একান্ত আবশ্যক এবং তাহারা নীচশ্রেণীয়, যাহারা বসিয়া খায় সমাজের পক্ষে তাহাদের তেমন স্পষ্ট আবশ্যক দেখা যায় না তাহারা উচ্চশ্রেণীয়। ঘটিবাটির প্রতি আমাদের এক ভাব ফুলদানির প্রতি অন্যভাব। এইজন্য আমরা আবশ্যকের বিবাহকে হেয় এবং প্রেমের বিবাহকে উচ্চশ্রেণীয় মনে করি। স্ত্রীকে যদি আবশ্যক জ্ঞান করি তবে স্ত্রী দাসী, স্ত্রীকে যদি ভালোবাসি তবে সে লক্ষ্মী। Marriage de convenance-কে এইজন্য ইংরাজেরা সাধারণত কেমন ঘৃণার ভাবে উল্লেখ করে। প্রকৃত প্রেমের মধ্যে সেই অত্যাবশ্যকতা নাই, এইজন্য তাহার মধ্যে স্বাধীনতার গৌরব আছে, তাহাতে দাসত্ববন্ধন নাই। মর্ত্যের সমস্ত নিয়ম আবশ্যকের নিয়ম, প্রেম যেন সেই নিয়মকে অতিক্রম করিয়া অমর্ত্য উজ্জ্বলভাব ধারণ করে এবং সেই প্রেমের বন্ধনে স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধের মধ্যে বিশুদ্ধ সম্মানের ভাব আসিয়া পড়ে। মনুষ্য সহস্র আবশ্যক বন্ধনে বদ্ধ প্রকৃতির দাস— কেবল প্রেমের মধ্যে সে আপনাকে স্বাধীন ও গৌরবান্বিত জ্ঞান করে। এই স্বাধীনতার বন্ধন অন্য সকল বন্ধন অপেক্ষা গুরুতর, কারণ অন্য সকল বন্ধন ছিন্ন করিবার প্রয়াস আমাদের মনে সর্বদা জাগ্রত থাকে, এ বন্ধনে সেই প্রয়াসকেও অভিভূত করিয়া রাখে। সেইজন্য এক হিসাবে প্রকৃত স্বাধীনতা সকল অধীনতা অপেক্ষা দৃঢ়তর অধীনতা— কারণ স্বাধীনতা সবল অধীনতা, পরাধীনতা দুর্বল অধীনতা। যথেচ্ছাচারিতাকে আমি স্বাধীনতা বলিতেছি না তাহা, অধীনতার সোপান ও অঙ্গ।

পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তক
২১।১১।১৮৮৮

শরৎকাল

আবার শরৎকাল আসিয়াছে। এই শরৎকালের মধ্যে আমি একটি নিবিড় গভীরতা, একটি নির্মল নিরতিশয় আনন্দ অনুভব করি। এই প্রথম বর্ষা অপগমে প্রভাতের প্রকৃতি কী অনুপম প্রসন্নমূর্তি ধারণ করে। রৌদ্র দেখিলে মনে হয় যেন প্রকৃতি কী এক নূতন উত্তাপের দ্বারা সোনাকে গলাইয়া

বাষ্প করিয়া এত সূক্ষ্ম করিয়া দিয়াছেন যে, সোনা আর নাই কেবল তাহার লাবণ্যের দ্বারা চারি দিক আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। বায়ু-হিল্লোলের মধ্যে একটি চিরপরিচিত স্পর্শ প্রবাহিত হইতে থাকে, কাজকর্ম ভুলিয়া যাইতে হয়; বেলা চলিয়া যাইতেছে, না মন্ত্রমুগ্ধ আলস্যে অভিভূত হইয়া পড়িয়া আছে, বুঝা যায় না। শরতের প্রভাতে যেন আমার বহুকালের স্মৃতি একত্রে মিশিয়া রূপান্তরিত হইয়া রক্ত আকারে আমার হৃদয়ের শিরার মধ্যে সঞ্চরণ করিতে থাকে। কবিতার মধ্যে অনেক সময়ে এইরূপ স্মৃতিজাগরণের কথা লেখা হয়, সে কথা সকল সময়ে ঠিক বোঝা যায় না— মনে হয় ও একটা কবিতার অলংকার মাত্র। হৃদয়ের ঠিক ভাবটি ভাষায় প্রকাশ করা এমনি কঠিন কাজ! বাঁশির শব্দে, পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায়, কবিরা বলেন, হৃদয়ের মধ্যে স্মৃতি জাগিয়া উঠে। তাহাকে স্মৃতির অপেক্ষা বিস্মৃতি বলিলেই ঠিক হয়। কিন্তু যে বিস্মৃতি বলিলে একটি অভাবাত্মক অবস্থা বোঝায় এ তাহা নয়, এ একপ্রকার ভাবাত্মক বিস্মৃতি। নহিলে 'বিস্মৃতি জাগিয়া উঠা' কথাটা ব্যবহার হইতেই পারে না। এরূপ অবস্থায় স্পষ্ট যে কিছু মনে পড়ে তাহা নয়, কিন্তু ধীরে ধীরে পুরাতন কথা মনে পড়িলে যেমনতর মনের ভাবটি হয়, অনেকটা সেইরূপ ভাবমাত্র অনুভব করা যায়। যে-সকল স্মৃতি স্বাতন্ত্র্য পরিহার করিয়া একাকার হইয়াছে, যাহাদিগকে পৃথক করিয়া চিনিবার জো নাই, আমাদের হৃদয়ের চেতনরাজ্যের বহির্ভাগে যাহারা বিস্মৃতি-মহাসাগররূপে স্তব্ধ হইয়া শয়ান আছে, তাহারা যেন এক-এক সময়ে চঞ্চল ও তরঙ্গিত হইয়া উঠে; তখন আমাদের চেতনহৃদয় সেই বিস্মৃতি-তরঙ্গের আঘাত অনুভব করিতে থাকে, তাহাদের রহস্যময় অগাধ প্রবল অস্তিত্ব উপলব্ধ হয়, সেই মহা বিস্মৃত, অতি বিস্তৃত বিপুলতার ক্রন্দনধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়।

শরৎকালের সূর্যালোকে আমার এইরূপ অবস্থা হয়। দুই-একটা জীবনের ঘটনা, দুই-একটা অতীতকালের মধুর শরৎ মনে পড়ে, কিন্তু সেইসঙ্গে যে-সকল শরৎকাল মনে পড়ে না, যে-সকল ঘটনা ভুলিয়া গিয়াছি, সেইগুলিই যেন অধিক মনে পড়ে। বছর তিন-চারের পূর্বে একটি শরৎকাল আমি অন্তরের সহিত উপভোগ করিয়াছিলাম। বাড়ির প্রান্তে একটি ছোট্ট ঘরে একটি ছোট্ট ডেস্কের সম্মুখে বাস করিতাম। আরও দুটি-একটি ছোট্ট আনন্দ আমার আশেপাশে আনাগোনা করিত। সে বৎসর যেন আমার সমস্ত জীবন ছুটি লইয়াছিল। আমি সেই ঘরটুকুর মধ্যে থাকিয়াই জগতে ভ্রমণ করিতাম, এবং বহির্জগতের মধ্যে থাকিয়াও ঘরের ভিতরটুকুর মধ্যে যে স্নেহপ্রেমের বিন্দুটুকু ছিল তাহা একান্ত আগ্রহের সহিত উপভোগ করিতাম। আমি যেন একপ্রকার আত্মবিস্মৃত হইয়াছিলাম। মনের উপর হইতে সমস্ত ভার চলিয়া গিয়া, আমি একপ্রকার লঘুভাবে জগতের সমস্ত মধুরতার মধ্য দিয়া অতি সহজে সঞ্চরণ করিতাম। বোধহয় সেই বৎসরই শরৎকালের সহিত আমার প্রথম বন্ধুভাবে পরিচয় হইয়াছিল।

এক মুহূর্তের জন্য প্রগাঢ় সুখ অনুভব করিলে, সেই মুহূর্তকে যেমন আর মুহূর্ত বলিয়া মনে হয় না— মনে হয় যেন তাহার সহিত অনন্তকালের পরিচয় ছিল, বোধহয় আমারও সেইরূপ এক শরৎকাল রাশীকৃত শরৎ হইয়া উঠিয়াছে। আমি সেই শরতের মর্মের মধ্য দিয়া যেন বহুসহস্র সুদূর শরৎপরম্পরা দেখিতে পাই— দীর্ঘ পথের দুই পার্শ্ববর্তী বৃক্ষশ্রেণী যেমন অবিচ্ছিন্ন সংহতভাবে দেখা যায়, সেইরূপে— অর্থাৎ সবসুদ্ধ মিলিয়া একটা নিবিড় শারদ আনন্দের ভাবরূপে।

আমার মনে হয় স্বভাবতই শরৎকাল স্মৃতির কাল এবং বসন্ত বর্তমান আকাঙ্ক্ষার কাল। বসন্তে নবজীবনের চাঞ্চল্য, শরতে অতীত সুখদুঃখময় জীবনের পূর্ণতা। বাল্যকাল না গেলে যেন শরতের অতলস্পর্শ প্রশান্তি অনুভব করা যায় না।

আশ্বিন সপ্তমীপূজা ১৮৮৯।
পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তক
মানসী, আশ্বিন ১৩২০

ছেলেবেলাকার শরৎকাল

এই শরতের প্রভাতের রৌদ্রে জানলার বাহির দিয়া গাছপালার দিকে চাহিয়া দেখিলেই আমার মনে পড়ে ছেলেবেলায় চারি দিকের প্রকৃতির শোভা কী একান্ত ভালো লাগিত। ভোরের বেলায় বাড়িভিতরের বাগানে গিয়া পথের দুইধারি ফুটন্ত জুঁই ফুলের গন্ধে কী আশ্চর্য আনন্দ লাভ করিতাম! গাছের গোপন সবুজের মধ্য হইতে একটি আধফুটো জহরী-চাঁপা খুঁজিয়া পাইলে কী যেন একটা সম্পদ লাভ করিতাম মনে হইত। বাহিরের তেতালার টবে অনাহূত অতিথির মতো একটু বুনোলতা কী সুযোগে জন্মিয়াছিল, প্রতিদিন সকালে উঠিয়া যখন দেখিতাম সেই লতা বেগুনি ফুলে একেবারে ভরিয়া গেছে আমার মনে কী এক অপূর্ব বিস্ময়পূর্ণ উল্লাসের সঞ্চার হইত। বাস্তবিক বিস্ময়ের কথা বটে। সকালবেলায় ঘুম হইতে উঠিয়াই একেবারে, দুর্বল, কোমল পেলব, কতরকমের সুন্দর ভঙ্গিমায় বঙ্কিম ক্ষীণ লতাটির শাখায় শাখায় ফুল— নবীন, পরিপূর্ণ পরিস্ফুট— সকল রঙগুলি ফলানো, রঙের আভাসগুলি অতি সুকোমলভাবে আঁকা, পাপড়ির অগ্রভাগগুলি অতি সযত্নে বাঁকাইয়া অমনি টুপ করিয়া একটুখানি মুখ করিয়া দেওয়া, সুকুমার বৃন্তটুকুর উপর অতি সরল সুন্দর ভারলেশহীন নিশ্চেষ্ট ভঙ্গিতে বসানো— কোথাও কিছুমাত্র তাড়াতাড়ি নাই, ভ্রম নাই, ত্রুটি নাই, রসভঙ্গ নাই, প্রতিকূল বিমুখ ভাব নাই— সমস্ত বিশ্বসংসার যেন তাহার প্রতি একাগ্র প্রসন্ন দৃষ্টিপাত করিতেছে এবং সে যেন সমস্ত বিশ্বের প্রতি পরিপূর্ণ প্রসন্ন হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে; তাহার প্রত্যেক সুকুমার বঙ্কিমার লেশটুকুর মধ্যে অপরিসীম প্রেমের ইতিহাস যেন লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তাহার সর্বাঙ্গের সুকোমল সুগোলতার মধ্যে, বিশেষত তাহার বুকের মাঝখানটিতে যেখানে চারি দিকের রঙের ঘোর অতি ধীরে ধীরে নরম হইয়া একেবারে মোলায়েম সাদা হইয়া আসিয়াছে— যেন অনন্তকালের সযত্ন সোহাগের চুম্বন লাগিয়া আছে। অতিশয় আশ্চর্য! একটি গোপন জহরী চাঁপা একটি গোপন সম্পদ তাহার আর সন্দেহ নাই। ইহা ছেলেমানুষের অপরিণত হৃদয়ের মোহমাত্র নহে। এখন সে বিস্ময়ের আনন্দ চলিয়া গেছে। এখন একটা অনাদৃত বুনোলতার বেগুনি ফুলকে নিতান্ত যৎকিঞ্চিৎ মনে হয়। ফুল যে ফুটিবারই কথা। ফুল সুন্দর বটে এবং অনেক ফুল দুর্লভও বটে, কিন্তু তাহার মধ্যে সেই নিবিড় বিস্ময়ের স্থান নাই। ভিক্ষুকের যখন ভিক্ষা বরাদ্দ হইয়া যায়, তখন তাহার আর কৃতজ্ঞতা জন্মে না। শিশুকালে আমরা ভালো করিয়া জানিতাম না চারি দিকের এ অসীম সৌন্দর্য আমাদের নিত্যনিয়মিত বরাদ্দ। জননী যেমন প্রতি ক্ষুদ্র কাজে অজস্র স্নেহের দ্বারা আমাদিগকে অনুক্ষণ আচ্ছন্ন করিয়া রাখেন, তাহার মধ্যে অনেকটাই আমাদের আবশ্যকের অতিরিক্ত, তাহার অনেকটা আমাদের নজরে পড়ে না, তাহার অনেকটা আমরা অবহেলে গ্রহণ করি, কিন্তু বিচার করি না, কিন্তু উদার মাতৃস্নেহের তাহাতে কিছুই আসে যায় না— ইহাও সেইরূপ।

১০।১০।৮৯

[২৫ আশ্বিন ১২৯৬]

ইন্দুর-রহস্য

দিনকতক দেখা গেল সুরির দুটো-একটা বাজনার বই খোয়া যাইতেছে। সন্ধান করিয়া জানা গেল একটা ইন্দুর রাতারাতি উক্ত বইয়ের কাগজ কাটিয়া ছিন্ন খণ্ডগুলি পিয়ানোর তারের মধ্যে গুঁজিয়া দিয়াছে। বৈজ্ঞানিক কৌতূহল ছাড়া ইহার তো কোনো উদ্দেশ্য খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ইন্দুর জাতির স্বাভাবিক... মধ্যে একটা বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা প্রকাশ পায়। তাহারা যেরূপ নিজের ল্যাজের উপরে খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়া চারি দিক পর্যবেক্ষণ করে, তাহাদের যেরূপ উজ্জ্বল ক্ষুদ্র দৃষ্টি, যেরূপ তীক্ষ্ণ দন্ত, যেরূপ আগ্রহপূর্ণ সন্ধানপর নাসিকা, যেরূপ উর্ধ্বোত্থিত সতর্ক

কর্ণযুগল, যেরূপ বিদ্যুৎগতিতে চারি দিকে ধাবমান হইবার ক্ষমতা, সকল জিনিসেই যেরূপ ছিদ্রখনন করিবার তৎপরতা এবং যাহা পায় তাহারই টুক্‌রা যেরূপ সযত্নে নিভৃত গহ্বর— Laboratory-র মধ্যে সঞ্চয় করিবার স্পৃহা তাহাতে তাহাদের Scientific training সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ থাকে না। বর্তমান প্রবন্ধের ইন্দুরের উল্লেখ করা যাইতেছে সে বোধ করি স্বভাব-বৈজ্ঞানিক ইন্দুরবংশে একটি বিশেষ প্রতিভাসম্পন্ন মহৎ ইন্দুর। বিস্তর গবেষণায় সে বাজনার বইয়ের সহিত বাজনার তারের একটা সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে পারিয়াছে। এখন সমস্ত রাত ধরিয়া পরীক্ষা করিতেছে। বিচিত্র ঐকতানপূর্ণ সংগীতের আশ্চর্য রহস্য ভেদ করিবার চেষ্টা করিতেছে। তীক্ষ্ণ দন্তাগ্রভাগ দ্বারা বাজনার বই ক্রমাগত analyse করিতেছে, পিয়ানোর তারের সহিত তাহার মিলন সাধন করিতেছে। মনে করিতেছে ঠিক রাস্তা পাইয়াছে, এখন অধিকতর গবেষণার সহিত analyze করিয়া গেলে সংগীততত্ত্ব বাহির হইয়া পড়িবে। এখন বাজনার বই কাটিতে শুরু করিয়াছে, ক্রমে বাজনার তার কাটিবে, কাঠ কাটিবে, বাজনাটাকে শতছিদ্র করিয়া সেই ছিদ্রপথে আপন সরু নাসিকা ও চঞ্চল কৌতূহল প্রবেশ করাইয়া দিবে— মাঝে হইতে সংগীত দেশছাড়া। আমার মনে কেবল এই তর্ক উদয় হইতেছে যে, ইন্দুরকুলতিলক যে উপায় অবলম্বন করিয়াছে তাহাতে তার এবং কাগজের উপাদানসম্বন্ধে নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইতে পারে কিন্তু উক্ত কাগজের সহিত উক্ত তারের যথার্থ যে সম্বন্ধ তাহা কি সহস্র বৎসরেও বাহির হইবে? অবশেষে কি সংশয়পরায়ণ নব্য ইন্দুরদিগের মনে এইরূপ একটা বিতর্ক উপস্থিত হইবে না যে, কাগজ কেবল কাগজ মাত্র, এবং তার কেবল তার— কোনো জ্ঞানবান জীব-কর্তৃক উহাদের মধ্যে যে একটা আনন্দজনক উদ্দেশ্যবন্ধন বদ্ধ হইয়াছে তাহা কেবল প্রাচীন ইন্দুরদিগের যুক্তিহীন সংস্কার; সেই সংস্কারের একটা পরম সফলতা এই দেখা যাইতেছে তাহারই প্ররোচনায় অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া তার এবং কাগজের আপেক্ষিক কঠিনতা সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা জন্মিয়াছে। কিন্তু এক-একদিন গহ্বরের গভীরতলে দন্তচালনকার্যে নিযুক্ত থাকিয়া মাঝে মাঝে অপূর্ব সংগীতধ্বনি কর্ণকুহরে প্রবেশ করে। সেটা ব্যাপারটা কী? সেটা একটা রহস্য বটে। কিন্তু এই কাগজ এবং তার সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে করিতে ক্রমে এই রহস্য শতছিদ্র আকারে উদ্‌ঘাটিত হইয়া যাইবে।

পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তক
১৬।১০।১৮৮৯

কাজ ও খেলা

কাজ ও খেলা নামক ৭৩-সংখ্যক প্রবন্ধ সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে।

খেলা কাহাকে বলে ভালো করিয়া ভাবিয়া দেখিলে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়।

আমাদের মানবকার্য সাধনের জন্য বহুকাল হইতে কতকগুলি প্রবৃত্তি ও শক্তির চর্চা হইয়া আসিয়াছে। বংশানুক্রমে তাহারা আমাদের মধ্যে সংক্রামিত সঞ্চিত ও অনুশীলিত হইয়া আসিতেছে। সকল সময়ে আমরা তাহাদের হাতে কাজ দিতে পারি না। অথচ কাজ করিবার জন্য তাহারা অস্থির। সুতরাং যখন তাহাদিগকে সত্যকার কাজে খাটাইবার অবসর পাই না, তখন সঙ্গীদের সহিত একটা বোঝাপড়া করিয়া একটা কাজের ভান গড়িয়া তুলি ও এই উপায়ে আবশ্যকের অতিরিক্ত সঞ্চিত উদ্যমকে ছাড়া দিয়া আনন্দ অনুভব করি। অনেক সময়ে দীর্ঘ আলস্যের পর মাংসপেশীর রুদ্ধ উদ্যমকে দৌড়াদৌড়ি করিয়া খাটাইয়া লইতে ইচ্ছা করি। মানবহৃদয়ে একটা প্রতিযোগিতার প্রবৃত্তি আছে, দৈনিক কাজে তাহার যথেষ্ট ব্যয় হয় না, সুতরাং প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভান করিয়া হারজিতের খেলা গড়িয়া তাহার চরিতার্থতা সাধন করিতে হয়।

সভ্যতা-বৃদ্ধিসহকারে আমাদিগকে অনেক প্রবৃত্তি দমন করিয়া রাখিতে হয়, সুতরাং খেলাচ্ছলে তাহাদের নিবৃত্তি সাধন করিতে হয়। অসভ্য অবস্থায় শুদ্ধমাত্র গৌরবলাভের জন্য যুদ্ধ এই প্রবৃত্তির উত্তেজনায়। সভ্য অবস্থায় নানা প্রণালী বাহিয়া এই প্রবৃত্তি আপন শক্তি-উচ্ছ্বাস নিঃশেষিত করিতেছে। কতক কাজের ঠেলাঠেলিতে, কতক লেখালেখিতে, কতক শারীরিক কতক মানসিক প্রতিযোগিতায় এবং বাকি নানাবিধ খেলায়। কাব্য লিখিয়া, কাব্য পড়িয়া, অভিনয় দেখিয়া ও করিয়া নানা প্রবৃত্তির অলক্ষিত চরিতার্থতা সাধন হয়।

সত্যকার কাজে এত অধিক উত্তেজনা, তাহার সহিত স্বার্থের এত যোগ, তাহাতে এত প্রাণপণ কঠিন চেষ্টার উদ্রেক হয় যে শুদ্ধমাত্র প্রবৃত্তির পরিতৃপ্তির সুখ তাহাতে লাভ করা যায় না। বিশেষত তাহাতে আমাদের স্বাধীনতা নষ্ট করে। কার্যের কঠিন শৃঙ্খলে একেবারে বদ্ধ হইয়া পড়িতে হয়। খেলার মধ্যেও নিয়ম আছে নহিলে বাধা-অতিক্রমণের স্বাভাবিক সুখ হইতে বঞ্চিত হইতে হয়— কিন্তু সে নিয়মের বাধার মধ্যে কেবল ততটুকু দুঃখ আছে যতটুকু না থাকিলে সুখ নির্জীব হইয়া পড়ে। নিয়মকে নিয়ম অথচ তাহার ভার কিছুই নাই। অত্যাবশ্যকের মধ্যে স্বাধীনতার একান্ত পরাভবদুঃখ অনুভব করিতে হয়, খেলায় তাহা হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়

অতএব দেখা যাইতেছে কাজের ভান করিয়া শারীরিক মানসিক নানাবিধ শক্তিচালনা করা খেলা। কিন্তু ইহাতেও কথাটা সম্পূর্ণ হয় না। প্রবঞ্চনা করাকে খেলা বলে না। অনেকে মিথ্যা নিন্দা রটাইয়া সুখ পায়, কিন্তু তাহাকে খেলা বলিলে চলে না। খেলার মধ্যে প্রকাশ্য ভান থাকা চাই। আপনা-আপনির মধ্যে বোঝাপড়া করিয়া প্রবঞ্চনা। আমাদের একটা অংশ ভুলিতেছে এবং আরেকটা অংশ ভুলিতেছে না এমনি একটা ব্যাপার। আমরা যদি আপনাকে ও অন্যকে বা কেবল আপনাকে বা কেবল অন্যকে সম্পূর্ণ প্রবঞ্চনা করি তাহা হইলে আর খেলা হয় না।

অতএব 'কাজের ভান'ই খেলা বটে কিন্তু এমনি বাঁচাইয়া চলিতে হইবে যে বেশি 'কাজ'ও না হয় বেশি 'ভান'ও না হয়। সর্বস্ব অথবা বিস্তর টাকা পণ রাখিয়া জুয়াখেলা খেলাকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। লাভ-স্পৃহা ও প্রতিযোগিতা প্রবৃত্তিকে খেলার দ্বারা চরিতার্থ করিতে গেলে অল্প পয়সাকে বেশি পয়সা মনে করিয়া লইতে হয়— নতুবা খেলার বিশুদ্ধতা রক্ষা হয় না; স্বার্থের সহিত জড়িত হইলে খেলার লঘুতা দূর হয়, সে আমাদের প্রাণটা যেন চাপিয়া ধরে।— অপরপক্ষে Flirtationকে খেলা বলা যাইতে পারে। নিরুদ্যম প্রেমের প্রবৃত্তিকে খেলাচ্ছলে চরিতার্থ করিবার জন্য যদি উভয়পক্ষের মধ্যে মনে মনে বোঝাপড়া থাকে তবে তাহা খেলা বটে— কিন্তু আত্মপ্রবঞ্চনা বা পরস্পরকে প্রবঞ্চনা করিলে তাহা আর খেলা থাকে না। রীতিমতো প্রবঞ্চনা করিতে গেলে খেলার লঘুতা চলিয়া যায়— কারণ, খেলায় দুইপক্ষ কিয়ৎপরিমাণে আপনাকে ধরা দেয়, এইজন্য ভান করা গুরুতর চেষ্টাসাধ্য বা অধিক চিন্তার কারণ হয় না— তাহাতে আমাদের ধর্মবুদ্ধি পীড়িত হয় না এবং লোকসমাজের নিন্দা সহ্য করিতে হয় না— সমস্ত ফলাফল অল্পেই চুকিয়া যায়। নিয়মবন্ধন, কর্মফল, স্বার্থের প্রবল আকর্ষণ এইগুলো যথাসাধ্য বাদ দিয়া সুদ্ধ শরীর- হৃদয়-মনের অতিরিক্ত উদ্যমকে খাটাইয়া আনন্দ লাভ করা খেলার উদ্দেশ্য।

তবে দেখা যাইতেছে শারীরিক মানসিক শক্তিচালনার উদ্দেশে কাজের প্রকাশ্য ভান করা খেলা। অতএব Political Agitation-এর সঙ্গে খেলার তুলনা খাটে কি না ভাবিয়া দেখিতে হয়। আমরা কি আপনাকে ও পরকে ভুলাইতে চেষ্টা করিতেছি না?

পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তক

১৭।১০।১৮৮৯

[ঘানির বলদ]

ঘানির বলদ যদি মনে করে আমি যতই ঘুরছি ততই নূতন রাজ্য আবিষ্কার করছি তবে সেটা তার একটা অন্ধ ভ্রম, কিন্তু সে যদি জানে আমি সর্ষেকে পেষণ করে তার মধ্যেকার নিগূঢ় তেলটুকু বের করে নিচ্ছি তবে সে ঠিক কথাটা জানে।

বিজ্ঞান নিজের ঘানিযন্ত্রের চতুর্দিকে যতই সশব্দে ঘুরছে, রহস্যরাজ্যের সীমার দিকে এক পা অগ্রসর হতে পারছে না, কিন্তু বিবিধ বীজকে বিশ্লেষণ এবং পেষণ করে তার ভিতরকার তেল অনেকটা পরিমাণে বের করছে, এবং সে তেল থেকে মানুষের গৃহকোণের অন্ধকার দূর করবার একটা উপাদান তৈরি করছে সে কথা নিয়ে সে বাস্তবিক গর্ব করতে পারে।

পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তক
৬ এপ্রিল। সোমবার। ১৮৯১।
[২৪ চৈত্র ১২৯৭]

[জীবনের বুদ্‌বুদ]

মানুষকে দেখলে আমার অনেক সময়ে মনে হয়, গোলাকার মাথাটা নিয়ে পৃথিবী জুড়ে ক্রমাগতই কতকগুলো জীবনের বুদ্‌বুদ উঠছে। খানিকক্ষণের জন্যে সূর্যালোকে নীলাকাশের দিকে উন্মুখ হয়ে থাকে; তার পরে হঠাৎ ফেটে যায়, জীবনের তপ্তবাষ্পটুকু বেরিয়ে যায়, মৃত্তিকার আবরণটুকু এই মৃৎ-সাগরে মৃত্যুসাগরে লুপ্ত হয়, কারো গণনার মধ্যে আসে না।

উপমাটা অত্যন্ত পুরাতন, কিন্তু যখনই ভেবে দেখা যায় তখনই নূতন মনে হয়। মৃত্যুর চেয়ে পুরাতন এবং মৃত্যুর চেয়ে নূতন আর কিছু নেই।

পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তক
৬।৪।৯১। বির্জিতলাও।
[২৪ চৈত্র ১২৯৭]

বাগান

ভদ্রতার ভাষা, পরিচ্ছদ এবং আচরণের একটু বিশেষত্ব আছে। কুৎসিত শব্দ ভদ্রলোকের মুখ দিয়া বাহির হইতে চায় না, এবং যাহার মনে আত্মসম্মান বোধ আছে সে কখনো হাঁটুর উপরে একখানা ময়লা গামছা পরিয়া সমাজে সঞ্চরণ করিতে পারে না। তেমনি ভদ্রলোকের বাসস্থানেরও একটা পরিচ্ছদ এবং ভাষা আছে, নিদেন, থাকা উচিত। ভদ্রলোকের কূলে শীলে ঘরে বাহিরে সর্বত্রই একটা উজ্জ্বলতা থাকা চাই— যেখানে তাঁহার আবির্ভাব সেখানে পৃথিবী আদৃত শোভিত এবং স্বাস্থ্যময় যদি না হয়, যদি তাহার চারি দিকে আগাছা, জঙ্গল, বাঁশঝাড়, পানাপুকুর এবং আবর্জনাকুণ্ড থাকে তবে সেটা যে অত্যন্ত লজ্জার বিষয় হয় এ কথা আমরা সকল সময় মনে করি না। কেবল লোক দেখাইবার কথা হইতেছে না। অশোভনতার মধ্যে বাস করিলে আপনার প্রতি তেমন শ্রদ্ধা থাকে না, নিজের চতুর্দিক নিজেকে অপমান করিতে থাকে, আর সুখ-স্বাস্থ্যের তো কথাই নাই। আমরা যেমন স্নান করি এবং শুভ্র বস্ত্র পরি তেমনি বাড়ির চারি দিকে যত্নপূর্বক একখানি বাগান করিয়া রাখা ভদ্রপ্রথার একটি অবশ্যকর্তব্য অঙ্গ হওয়া উচিত।

রসিক লোকেরা পরিহাস করিয়া বলিবেন, উনবিংশ শতাব্দীর আর-একটা নূতন বাবুয়ানার অবতারণা হইতেছে, অন্নচিন্তায় রাত্রে ঘুম হয় না বাগান করিবার অবসর কোথায়! কিন্তু এ কথাটা একটা ওজরমাত্র। কাজের তো আর সীমা নাই! বঙ্গদেশে এমন কোন্ পল্লী আছে যেখানে প্রায় ঘরে ঘরে দুটি-চারটি অকর্মণ্য ভদ্রলোক পরমালস্যে কালযাপন না করেন। শহরের কথা স্বতন্ত্র, কিন্তু পাড়াগাঁয়ে অবসর নাই এমন ব্যস্ত লোক অতি বিরল। তাহা ছাড়া বাংলা দেশের মৃত্তিকায় একখানি বাগান করিয়া রাখা যে মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের সাধ্যাতীত তাহাও নহে। তবে আলস্য একটা অন্তরায় এবং ঘরের চারি দিক সুশ্রী এবং স্বাস্থ্যজনক করিয়া রাখা তেমন অত্যাবশ্যক বলিয়া ধারণা না হওয়ায় তাহার জন্য দুই পয়সা ব্যয় করিতে আমরা কাতর বোধ করি এবং যেমন-তেমন করিয়া ঝোপ-ঝাড় ও কচুবনের মধ্যে জীবনযাপন করিতে থাকি। এইজন্য বাংলার বসতি-গ্রামে মনুষ্যযত্ন-কৃত সৌন্দর্যের কোনো চিহ্ন দেখা যায় না, কেবল পদে পদে অযত্ন অনাদর ও আলস্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

মানুষের ভিতরে বাহিরে একটা ঘনিষ্ঠ যোগ আছে সে কথা বলাই বাহুল্য। অন্তর বাহিরকে আকার দেয় এবং বাহিরও অন্তরকে গড়িতে থাকে। বাহিরে চতুর্দিক যদি অযত্নসম্ভূত শ্রীহীনতায় আচ্ছন্ন হইয়া থাকে তবে অন্তরের স্বাভাবিক নির্মল পারিপাট্যপ্রিয়তাও অভ্যাসক্রমে জড়ত্ব প্রাপ্ত হইতে থাকে। অতএব চারি দিকে একখানি বাগান তৈরি করা একটা মানসিক শিক্ষার অঙ্গ বলিলেই হয়। ওটা কিছুতেই অবহেলার যোগ্য নহে। সন্তানদিগকে সৌন্দর্য, নির্মলতা এবং যত্নসাধ্য নিরলস পারিপাট্যের মধ্যে মানুষ করিয়া তুলিয়া অলক্ষ্যে তাহাদিগের হৃদয়ে উচ্চ আত্মগৌরব সঞ্চার করা পিতামাতার একটা প্রধান কর্তব্য। চারি দিকে অবহেলা, অমনোযোগ আলস্য এবং যথেচ্ছ কদর্যতার মতো কুশিক্ষা আর কী আছে বলিতে পারি না। বাহিরের ভূখণ্ড হইতে আরম্ভ করিয়া অন্তঃকরণ পর্যন্ত সর্বত্রই নিয়ত-জাগ্রত চেষ্টা এবং উন্নতি-ইচ্ছা সর্বদা প্রত্যক্ষ করিলে ছেলেরা মানুষ হইয়া উঠিতে পারে। বাসস্থানের বাহিরে যেখানে অবহেলায় জঙ্গল জন্মিতেছে, অযত্নে সৌন্দর্য দূরীভূত হইতেছে সেখানে ঘরের মধ্যে মনের ভিতরেও আগাছা জন্মিতেছে এবং সর্বাঙ্গীণ উন্নতির প্রতি ঔদাসীন্য মজ্জার মধ্যে প্রবেশ করিতেছে।

সাধনা
অগ্রহায়ণ ১২৯৮

ঠাকুরঘর

বড়ো ভয়ে ভয়ে লিখিতে হয়। এখানে সকলেই সকল কথা গায় পাতিয়া লয়। বিশেষত যদি দুটো অপবাদের কথা থাকে। মনে করি, এমন কৌশলে লিখিলাম যে, সকলেই মনে করিবে আমার প্রতিবেশীকে লক্ষ্য করা হইতেছে, ভারি খুশি হইবে; কিন্তু দেখি বিপরীত ফল হয়। সকলেই মনে করে ওর মধ্যে যে কথাটা সব চেয়ে গর্হিত সেটা বিশেষরূপে আমার প্রতি আড়ি করিয়াই লেখা হইয়াছে— নতুবা এমন লোক আর কে আছে!

ভান এবং অন্ধ অহংকারের উপর স্বভাবতই দুটো শক্ত কথা বলিতে ইচ্ছা করে। যদি ঠিক জায়গায় আঘাত লাগে তো খুশি হওয়া যায়। কিন্তু ও সম্বন্ধে কিছু নাড়া দিলেই দুই-দশজন নয় একেবারে দেশের লোকে তাড়া করিয়া আসে। ইহার কারণ কী?

তবে কি আমরা দেশসুদ্ধ লোকই ঠাকুরঘরে বসিয়া কলা খাইতেছি? অর্থাৎ যেটা দেবতার উদ্দেশে দেওয়া উচিত, গোপনে তাহার মধ্য হইতে উপাদেয় জিনিসটি লইয়া নিজে ভক্ষণ করিতেছি? আসলে, দেবতার প্রতি ষোলো-আনা বিশ্বাসই নাই?

যে নৈবেদ্যটা সম্পূর্ণ স্বদেশের প্রাপ্য তাহার সারভাগ নিজের জন্য সঞ্চয় করিতেছি। শাস্ত্রের দোহাই দিয়া অন্তর্গুহাশায়ী জড়ত্বটাকে দুধকলা খাওয়াইতেছি।

যে কারণেই হৌক, আমরা সহজে ঠাকুরঘর আর ছাড়িতে চাই না। কার্যক্ষেত্রে বিস্তর কাজ, এবং অনেক চিন্তা, এবং বাধা-বিপত্তির সঙ্গে কেবলই সংগ্রাম। কিন্তু ঠাকুরঘরে কোনো কাজকর্ম নাই; কেবলই স্তবপাঠ এবং ঘণ্টানাড়া। অথচ নিজের কাছে এবং পরের কাছে অতি অল্প চেষ্টায় পরম পবিত্র ভক্তিভাজন হইয়া উঠা যায়।

যদি কেহ বলে, ওহে, কাজকর্মের চেষ্টা দেখো। আমাদের ঠাকুর বলেন, আমরা জাত-পুরোহিত, কাজকর্মকে আমরা হেয় জ্ঞান করি; আমাদের পক্ষে সেটা শাস্ত্রবিরুদ্ধ।

এমন উন্নত মহানভাবে বলেন শুনিয়া তাঁর প্রতি ভক্তি হয়। ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া বলি— যে আজ্ঞা! আপনাকে আর কিছু করিতে হইবে না; আপনি এমনি পট্টবস্ত্র পরিয়া কেবল পবিত্র হইয়া বসিয়া থাকুন। ম্লেচ্ছদের মতো আপনি কাজকর্মে প্রবৃত্ত হইবেন না। মহাপুরুষেরা যে-সকল বচন রচনা করিয়া গিয়াছেন আপনি সেইগুলি সুর করিয়া আওড়ান (অর্থ না জানিলেও বিশেষ ক্ষতিবৃদ্ধি নাই)। যেগুলা সরল হৃদয়ের কথা সেগুলাকে পরম কৌশলে অতি সূক্ষ্ম তর্কের কথা করিয়া তুলুন এবং যেগুলা স্বভাবতই তর্কের কথা সেগুলা হইতে যুক্তি নির্বাসিত করিয়া দিয়া সহসা অকারণ হৃদয়াবেগপ্রাচুর্যে শ্রোতাদিগকে আর্দ্র বিগলিত বিমুগ্ধ করিয়া দিন। গোপনে কলা খান এবং দেশের শ্রাদ্ধ নির্বিবাদে সম্পন্ন করুন।

সাধনা
শ্রাবণ ১২২৯

নিষ্ফল চেষ্টা

অনেকগুলি বাংলা পদ্য, বিশেষত গদ্যপ্রবন্ধ পড়িয়া আমরা সর্বদাই কী-যেন কে-যেন কখন-যেন কেমন-যেন কী-যেন-কী-ময় হইয়া যাইতে ইচ্ছা করে।

কিন্তু কোনোরূপ সুযোগ পাইয়া উঠি না।

আপিসের ছুটি হইলে পদব্রজে পথে বাহির হই; মনে করি, একেবারে উদাস হইয়া কী-যেন হইয়া যাইব; কিন্তু দেখিয়াছি ঠিক নিয়মিত সময়ে বাড়িতে পৌঁছিয়া হাত-মুখ ধুইয়া জলযোগ করিয়া নিশ্চিন্তচিত্তে তামাক টানিতে বসি— মনে কোনো জায়গায় কোনোরূপ বিহ্বলতা অনুভব করি না।

বাড়ির গলির মোড়ে একটা প্রৌঢ়া পানওয়ালী বসিয়া থাকে সকালেও দেখিতে পাই, বিকালেও দেখিতে পাই, এবং নিমন্ত্রণ খাইয়া অনেক রাত্রি বাড়ি ফিরিবার সময় স্তিমিত দীপালোকে তাহার ক্লান্ত মুখচ্ছবি দৃষ্টিপথে পড়ে। মনে করা দুঃসাধ্য নয় যে, সে নিশিদিন যেন কাহার জন্য, যেন কিসের জন্য, যেন কোন্ অপরিচিত স্মৃতির জন্য, যেন কোন্ পরিচিত বিস্মৃতির জন্য প্রতীক্ষা করিয়া প্রত্যেক পথিকের মুখের দিকে চাহিতেছে। কিন্তু সেরূপ কল্পনা করিয়াও কোনো ফল হয় না। বিস্তর চেষ্টা করি, তবু কিছুতেই তাহাকে দেখিয়া হৃদয়ের মধ্যে জ্যোৎস্নার সুগন্ধ, বাঁশির আলিঙ্গন, নিস্তব্ধতার সংগীত জাগ্রত হইয়া উঠে না। তাঁহার স্বহস্তরচিত অনেক পান কিনিয়া খাইয়াছি কিন্তু তাহার মধ্যে চুন খয়ের এবং গুটিদুয়েক খণ্ড সুপারি ছাড়া একদিনের জন্যও বাসনা, স্মৃতি, আশা অথবা স্বপ্নের লেশমাত্রও পাই নাই।

যেদিন চাঁদ উঠে সেদিন মনে করি, চাঁদের দিকে তাকাইয়া থাকা যাক, দেখি তাহাতে কীরূপ ফল হয়। বেশিক্ষণ একভাবে থাকিতে পারি না। অনতিবিলম্বে ঘুম আসে।

বাতায়নে গিয়া বসি। রান্নাঘর হইতে ধোঁয়া আসে, আস্তাবল হইতে গন্ধ পাই এবং প্রতিবেশিনীগণ অসাধু ভাষায় পরস্পর সম্বন্ধে স্ব স্ব মনোভাব উচ্ছ্বসিত স্বরে ব্যক্ত করিতে থাকে। নিদ্রিত অথবা জাগ্রত কোনো প্রকার স্বপ্নই টিকিতে পারে না।

সেখান হইতে উঠিয়া একাকী ছাতে গিয়া বসি। আপিসের ময়রা, ইন্সিওরেন্সের টাকা,

ধোবার কাপড় দিতে বিলম্ব প্রভৃতি বিচিত্র বিষয় অসংলগ্নভাবে মনে উদয় হইতে থাকে, কিন্তু কিছুতেই কোনো বিস্মৃত মুখচ্ছবি, কোনো পূর্বজন্মের সুখস্বপ্ন মনে পড়ে না।

দেখিয়াছি আমার বন্ধুরা প্রায় সকলেই নীরব কবি। সকলেরই প্রায় হৃদয় ভাঙিয়া গেছে, অশ্রুজল শুকাইয়া গেছে, আশা ফুরাইয়া গেছে, কেবল স্মৃতি আছে এবং স্বপ্ন আছে। সুতরাং তাঁহাদের কাছে আমার মনের প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ করিতে লজ্জা হয়।

হৃদয় আছে অথচ প্রাণপণ চেষ্টাতেও হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে না এ কথা আমি কেমন করিয়া স্বীকার করি!

আমি বেশ আছি, আরামে আছি, নিয়মিত বেতন পাইলে আমার কোনোরূপ কষ্ট হয় না এ কথা একবার যদি প্রকাশ হইয়া পড়ে তবে বন্ধুসমাজে আমার আর কিছুমাত্র প্রতিপত্তি থাকিবে না।

সেই ভয়ে নীরব হইয়া থাকি। লোকে জিজ্ঞাসা করিলে বলি, নীরব চিন্তা সর্বাপেক্ষা গভীর চিন্তা, নীরব বেদনা সর্বাপেক্ষা তীব্র বেদনা এবং নীরব কবিতা সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কবিতা। চোখে যে সহজে অশ্রুজল পড়ে না ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ আমার হইয়া তাহার জবাব দিয়া গেছেন।

আসল কথা, আমার বন্ধু-বান্ধবদের সকলেরই একটি করিয়া 'কে-যেন' 'কী-যেন' আছে, অথবা ছিল অথবা ভবিষ্যতে থাকিবার সম্ভাবনা আছে; আমার আর-সমস্ত আছে কেবল সেইটা নাই।

আমি কী করিব? কী করিলে আমার বুক ফাটিবে, সুখ থাকিবে না, আশা ফুরাইবে। হাসিব কিন্তু সে কেবল লোক-দেখানো; আমোদ করিতে ছাড়িব না কিন্তু সে কেবল অদৃষ্টকে সবলে উপেক্ষা করিবার জন্য! আপিসে যাইব, কিন্তু সে কেবল কাজের মধ্যে আপনাকে নিমগ্ন করিবার অভিপ্রায়ে।

এক কথায়— কী করিলে একটি 'কে-যেন' একটি 'কী-যেন' পাওয়া যায়!—

ভারতী ও বালক
আশ্বিন ১২৯২

সফলতার দৃষ্টান্ত

হরি হরি! আমার কী হইল! মরি মরি, আমাকে এমন করিয়া পাগল কে করিতেছে!

তবে সমস্ত ইতিহাসটি খুলিয়া বলি।

কিছুদিন হইতে প্রত্যহ সকালে আমার ডেস্কের উপর একটি করিয়া ফুলের তোড়া কে রাখিয়া যায়?

হায়! কে বলিবে কে রাখিয়া যায়! তোমরা জান কি, কাহার কোমল চম্পক-অঙ্গুলি এই চাঁপাগুলি চয়ন করিয়াছিল? বলিতে পারে কি, এই গোলাপে কাহার লজ্জা, এই বেলফুলে কাহার হাসি, এই দোপাটি ফুলে কাহার দুটি বিন্দু অশ্রুজল এখনও লাগিয়া আছে? তোমরা সংসারের লোক, তোমরা বুঝিতে পারিবে কি সে হৃদয়ে কত ভালোবাসা, হরি হরি কত প্রেম!

রোজ মনে করি আজ দেখিব— এই নীরব হৃদয়ের প্রেমের উচ্ছ্বাস আমার ডেস্কের উপর কে রাখিয়া যায় আজ তাহাকে ধরিব, আমার অন্তরে অন্তরে যে ব্যথা হাহাকার করিতেছে আজ তাহাকে বলিব এবং মরিব।

কিন্তু ধরি ধরি ধরা হয় না, বলি বলি বলা হয় না, মরি মরি মরিতে পাইলাম না!

কেমন করিয়া ধরিব! যে গোপনে আসে গোপনে চলিয়া যায় তাহাকে কেমন করিয়া বাঁধিব! যে অদৃশ্যে থাকিয়া পূজা করে, যে নির্জনে গিয়া অশ্রুবর্ষণ করে, যে দেখা দেয় না, দেখিতে আসে, ওরে পাষাণ-হৃদয় তাহার গোপন প্রেমব্রত ভঙ্গ করিবি কেমন করিয়া?

কিন্তু থাকিতে পারিলাম কই— অশান্ত হৃদয় বারণ মানিল কই— একদিন প্রত্যূষে উঠিলাম। দেখিলাম আমার বাগানের মালী তোড়া হাতে করিয়া লইয়া আসিতেছে।

কৌতূহল সংবরণ করিতে পারিলাম না। কম্পিত হৃদয়ে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম— 'ওরে জগা, তুই এ তোড়া কোথায় পাইলি রে!'

সে তৎক্ষণাৎ কহিল, 'বাগান হইতে তৈয়ার করিয়া আনিলাম।'

আমি কাতরকণ্ঠে কহিলাম, 'প্রবঞ্চনা করিস না রে জগা, সত্য করিয়া বল— এ তোড়া তোকে কে দিল!'

সে কহিল, 'প্রভু, এ আমি নিজে বানাইয়াছি!'

আমি পুনশ্চ ব্যাকুল অনুনয়ের সহিত কহিলাম— 'আমার মাথা খাইস জগা, আমার কাছে কিছু গোপন করিস না, যে এ তোড়া তোকে দিয়াছে তাহার নামটি আমাকে বল!'

মালাকর অনেকক্ষণ অবাকভাবে আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল— প্রভুর আজ্ঞা পালন করিবে, না রমণীর বিশ্বাস রক্ষা করিবে, বোধ করি এই দুই কর্তব্যের মধ্যে তাহার চিত্ত দোদুল্যমান হইতেছিল। অবশেষে করজোড়ে একান্ত কাতরতা সহকারে সে উৎকল উচ্চারণমিশ্রিত গ্রাম্য ভাষায় কহিল— 'প্রভো, এ কুসুমগুচ্ছ আমারি স্বহস্তে রচনা।'

বুঝিলাম সে কিছুতেই সেই অজ্ঞাতনাম্নীর নাম প্রকাশ করিবে না।

আমি যেন চক্ষের সম্মুখে দেখিতে পাইলাম, আমার সেই অপরিচিত অনামিকা— আমার সেই জন্মান্তরের বিস্মৃতনামা, প্রিয়তমা তোড়াটি প্রস্তুত করিয়া মালীর হাতে দিতেছেন এবং অশ্রুগদগদ কাতরকণ্ঠে কহিতেছেন— 'এই তোড়াটি গোপনে তাঁহার ঘরে রাখিয়া আয় জগা, কিন্তু আমার মাথা খাস, আমার মৃতমুখ দর্শন করিস জগা, আমার নাম তাঁহাকে শুনাইস না, আমার কথা তাঁহাকে বলিস না, আমার পরিচয় তাঁহাকে দিস না, আমার হৃদয়ের বেদনা হৃদয়েই থাকুক, আমার জীবনের কাহিনী জীবনের সহিতই অবসান হইয়া যাক!'—

জগা তো চলিয়া গেল। কিন্তু আমি আর অশ্রু সংবরণ করিতে পারিলাম না। তোড়াটি হৃদয়ে চাপিয়া ধরিলাম, দুটি-একটি কণ্টক বক্ষে বিঁধিল— বুকের রক্তের সহিত ফুলের শিশির এবং ফুলের শিশিরের সঙ্গে আমার চোখের জল মিশিল। হরি হরি, সেই অবধি আমার এ কী হইল। কী যেন-আমাকে কী করিল! কে যেন আমাকে কী বলিয়া গেল! কোথায় যেন আমার কাহার সহিত দেখা হইয়াছিল! কখন যেন তাহাকে হারাইয়াছি। কেবল যেন এই তোড়াটি— এই কয়েকটি ক্রোটনের পাতা, এই শ্বেত গোলাপ এবং এই গুটিকতক দোপাটি— আমার কাছে চিরজীবনের মতো কী-যেন-কী হইয়া রহিল এবং এখন হইতে যখনই জগা মালীকে দেখি তাহার মুখে যেন কী-যেন-কী দেখিতে পাই এবং সেও আমার ভাবগতিক দেখিয়া অবাক হইয়া আমারও মুখে যেন কী-যেন-কী দেখিতে পায়! জগতের লোকে সকলে জানে যে, আমার জগা মালী আমাকে বাগান হইতে ফুল তুলিয়া তোড়া বাঁধিয়া দেয়, কেবল আমার অন্তর জানে, আমাকে কে যেন গোপনে তোড়া পাঠাইয়া দেয়।

ভারতী ও বালক

আশ্বিন ১২৯৯

[লেখক-জন্ম]

পূর্বজন্মে অবশ্য একটা মহাপাপ করিয়াছিলাম নতুবা লেখক হইয়া জন্মিলাম কেন? মনের ভাবগুলা যখন বাহিরে আনিয়া ফেলিয়াছি তখন বাহিরের লোক উচিত অনুচিত যে কথাই বলে না শুনিয়া উপায় নাই। সুধাকর চন্দ্র, তুমি যদি ক্ষীরোদ সমুদ্রের মধ্যেই আরামে শয়ান থাকিতে তাহা হইলে কবিদের কবিত্ব করিবার কিঞ্চিৎ ব্যাঘাত হইত বটে কিন্তু নিশীথের শৃগাল তোমার

দিকে মুখ তুলিয়া অকস্মাৎ তারস্বরে অসম্মান জানাইয়া যাইত না।

মনের ভাব যখন মনে ছিল সে যেন আমার গৃহদেবতা ইষ্টদেবতা ছিল; এখন কী মনে করিয়া তাহাকে চতুষ্পথে বটবৃক্ষের তলায় স্থাপন করিলাম? সকল জীবজন্তুই কি তাহার সম্মান বোঝে? যদি বা না বোঝে তবুও কি তাহাকে বিশ্বের চোখের সামনে পাথর হইয়া বসিয়া থাকিতে হয় না।

তাহার পর আবার আত্মীয় বন্ধুদের কাছেও জবাবদিহি আছে। এটা কেন লিখিলে, ওটা কীভাবে বলিলে, সেটার অর্থ কী? এও তো বিষম দায়! যেন আমি কোদাল দিয়া পথ কাটিতেছি বলিয়া গাড়ি করিয়া মানুষকে পার করিয়া দেওয়াও আমার কর্তব্য।

যাহা হৌক, ঝগড়া কাহার সহিত করিব? জন্মকালে অদৃষ্ট পুরুষ ললাটে এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন। বসিয়া কিন্তু সেই প্রবীণ ভাগ্যলিপিলেখক মহাশয়কে তাঁহার কোন্ লিখনের জন্য সহস্র লাঞ্ছনা করিলেও তিনি দিব্য গা-ঢাকা দিয়া বসিয়া থাকেন। আর তাঁহারই বশবর্তী হইয়া আমরা যদি দুটো কথা লিখি তাহা হইলে কথার আর শেষ থাকে না।

পকেটবুক

[রচনাকাল : ফাল্গুন ১২৯৯]

সম্পাদকের বিদায় গ্রহণ

এক বৎসর ভারতী সম্পাদন করিলাম। ইতিমধ্যে নানা প্রকার ত্রুটি ঘটিয়াছে। সে-সকল ত্রুটির যত-কিছু কৈফিয়ত প্রায় সমস্তই ব্যক্তিগত। সাংসারিক চিন্তা চেষ্টা আধিব্যাধি ক্রিয়াকর্মে সম্পাদকের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীকেও নানারূপে বিক্ষিপ্ত হইতে হইয়াছে। নিরুদ্‌বিগ্ন অবকাশের অভাবে পাঠকদেরও আশা পূর্ণ করিতে পারি নাই এবং সম্পাদকের কর্তব্য সম্বন্ধে নিজেরও আদর্শকে খণ্ডিত করিয়াছি।

সম্পাদক যদি অনন্যকর্মা হইয়া কর্ণধারের মতো পত্রিকার চূড়ার উপর সর্বদাই হাল ধরিয়া বসিয়া থাকিতে পারেন তবেই তাঁহার যথাসাধ্য মনের মতো কাগজ চালানো সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমাদের দেশের সম্পাদকের পত্রসম্পাদন হালগোরুর দুধ দেওয়ার মতো— সমস্ত দিন খেতের কাজে খাটিয়া কৃশ প্রাণের রসাবশেষটুকুতে প্রচুর পরিমাণে জল মিশাইয়া জোগান দিতে হয়; তাহাতে পরম ধৈর্যবান জন্তুটারও প্রাণান্ত হইতে থাকে, ভোক্তাও তাঁহার বার্ষিক তিন টাকা হিসাবে ফাঁকি পড়িল বলিয়া রাগ করিয়া উঠেন।

ধনীপল্লীতে যে দরিদ্র থাকে তাহার চাল খারাপ হইয়া যায়। তাহার ব্যয় ও চেষ্টা আপন সাধ্যের বাহিরে গিয়া পড়ে। য়ুরোপীয় পত্রের আদর্শে আমরা কাগজ চালাইতে চাই— অথচ অবস্থা সমস্ত বিপরীত। আমাদের সহায় সম্পদ অর্থবল লোকবল লেখক পাঠক সমস্তই স্বল্প— অথচ চাল বিলাতি, নিয়ম অত্যন্ত কড়া; সেই বিভ্রাটে হয় কাগজ, নয় কাগজের সম্পাদক মারা পড়ে।

ঠিক মাসান্তে ভারতী বাহির করিতে পারি নাই; সেজন্য যথেষ্ট ক্ষোভ ও লজ্জা অনুভব করিয়াছি। একা সম্পাদককে লিখিতে হয়, লেখা সংগ্রহ করিতে হয় এবং অনেক অংশে প্রুফ ও প্রবন্ধ সংশোধন করিতে হয়। এদিকে দেশী ছাপাখানার ক্ষীণ প্রাণ, কম্পোজিটর অল্প, শারীরধর্মবশত কম্পোজিটরের রোগতাপও ঘটে এবং প্লেগের গোলমালে ঠিকা লোক পাওয়াও দুর্লভ হয়।

যে ব্যক্তি পত্র চালনাকেই জীবনের মুখ্য অবলম্বন করিতে পারে, এই-সকল বাধা-বিঘ্নের সহিত প্রতিনিয়ত যুদ্ধ করা তাহাকেই শোভা পায়। কিন্তু পত্রের অধিকাংশ নিজের লেখার দ্বারা

পূরণ করিবার মতো যাহার প্রচুর অবকাশ ও ক্ষমতা নাই, নিয়মিত পরের লেখা সংগ্রহ করিবার মতো অসামান্য ধৈর্য ও অধ্যবসায় নাই, এবং ছাপাখানা ইত্যাদির সর্বপ্রকার সংকট নিবারণ যাহার সাধ্যের অতীত তাহার পক্ষে সম্পাদকের গৌরবজনক কাজ প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্‌বাহু বামনের চেষ্টার মতো হয়। ফলও যে নিরবচ্ছিন্ন মিষ্টস্বাদ এবং লোভের কারণও যে অত্যধিক তাহাও স্বীকার করিতে পারি না। আশা করি এই ফলের যাহা-কিছু মিষ্ট তাহাই পাঠকদের পাতে দিয়াছি, এবং যাহা-কিছু তিক্ত তাহা চোখ বুজিয়া নিঃশব্দে নিজে হজম করিবার চেষ্টা করিয়াছি।

প্রশ্ন উঠিতে পারে এ-সকল কথা গোড়ায় কেন ভাবি নাই। গোড়াতেই যাঁহারা শেষটা সুস্পষ্ট দেখিতে পান, তাঁহারা সৌভাগ্যবান ব্যক্তি এবং তাঁহারা প্রায়ই কোনো কার্যে ব্রতী হন না— আমার একান্ত ইচ্ছা সেই দলভুক্ত হইয়া থাকি। কিন্তু ঘূর্ণাবাতাসের মতো যখন কর্মের আবর্ত ঘেরিয়া ফেলে তখন ধূলায় বেশি দূর দেখা যায় না এবং তাহার আকর্ষণে অসাধ্য স্থানে গিয়া উপনীত হইতে হয়।

উপদেষ্টা পরামর্শদাতাগণ অত্যন্ত শান্ত স্নিগ্ধভাবে বলিয়া থাকেন একবার প্রবৃত্ত হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হওয়া ভালো দেখায় না। এ প্রসঙ্গে জনসনের একটি গল্প মনে পড়ে। একদা জনসন পার্শ্বে কোনো মহিলাকে লইয়া আহারে প্রবৃত্ত ছিলেন। না জানিয়া হঠাৎ এক চামচ গরম সুপ মুখে লইয়াই তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা ভোজন পাত্রে নিক্ষেপ করিলেন— এবং পার্শ্ববর্তিনী ঘৃণাসংকুচিতা মহিলাকে কহিলেন, 'ভদ্রে, কোনো নির্বোধ হইলে মুখ পুড়াইয়া গিলিয়া ফেলিত।' গরম সুপ যে ব্যক্তি একেবারেই লয় না সেই সব চেয়ে বুদ্ধিমান, যে ব্যক্তি লইয়া লজ্জার অনুরোধে গিলিয়া ফেলে, সর্বত্র তাহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতে ইচ্ছা করি না।

যাহাই হউক, সম্পাদন কার্যে ত্রুটি উপলক্ষে যাঁহারা আমাকে মার্জনা করিয়াছেন এবং যাঁহারা করেন নাই তাঁহাদের নিকট আর অধিক অপরাধী হইতে ইচ্ছা করি না। এবং সম্পাদকপদ পরিত্যাগ করিতেছি বলিয়াই যে-সকল পক্ষপাতী পাঠক অপরাধ গ্রহণ করিবেন তাঁহারা প্রীতিগুণেই পুনশ্চ অবিলম্বে ক্ষমা করিবেন বলিয়া আমার নিশ্চয় বিশ্বাস আছে। এক্ষণে গত বর্ষশেষে যে স্থান হইতে ভারতীর মহত্তার স্কন্ধে তুলিয়া লইয়াছিলাম বর্ষান্তে ঠিক সেই জায়গায় তাহা নামাইয়া ললাটের ঘর্ম মুছিয়া সকলকে নববর্ষের সাদর অভিবাদন জানাইয়া বিদায় গ্রহণ করিলাম।

ভারতী
চৈত্র ১৩০৫

গ্রন্থসমালোচনা

রাবণ-বধ দৃশ্য কাব্য। শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত। মূল্য ১ টাকা।

অভিমন্যু-বধ দৃশ্য কাব্য। শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত। মূল্য ১ টাকা।

সে দিন আমরা একখানি বাংলা কবিতা গ্রন্থে দেখিতেছিলাম সীতা দেবীকে বনবাস দিয়া লক্ষ্মণ যখন চলিয়া আসিতেছেন, তখন সীতা দেবী সকাতরে তাঁহাকে একটু দাঁড়াইবার জন্য এই বলিয়া মিনতি করিতেছেন—

"লক্ষ্মণ দেবর কেন ধাওয়া-ধাওয়ি যাও রে।
তোমার দাদার কিরে বারেক দাঁড়াও রে।"

এমন-কি, মাইকেলও তাঁহার মেঘনাদবধ কাব্যে শূর-শ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণ দেবকে কী বেরঙে আঁকিয়াছেন।— ইহা কি সামান্য পরিতাপের বিষয় যে, যে লক্ষ্মণকে আমরা রামায়ণে শৌর্যের আদর্শ স্বরূপ মনে করিয়াছিলাম— যে লক্ষ্মণকে আমরা কেবলমাত্র মূর্তিমান ভ্রাতৃস্নেহ ও নিঃস্বার্থ উদারতা ও বিক্রম বলিয়া ভাবিয়া আসিতেছি, সেই লক্ষ্মণকে মেঘনাদবধ কাব্যে একজন ভীরু স্বার্থপূর্ণ—"গোঁয়ার" মাত্র দেখিলে আমাদের বুকে কী আঘাতই লাগে! কেনই বা তা হইবে না? কল্পনার আদর্শভূত একটি পশুপক্ষীরও একগাছি লোমের হানি করিলেও আমাদের সহ্য হয় না। সুখের বিষয় এই যে শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র আমাদের প্রাণে সে আঘাত দেন নাই। কি তাঁহার অভিমন্যু-বধ, আর কি তাঁহার রাবণ-বধ— এই উভয় নাটকেই তিনি রামায়ণ ও মহাভারতের নায়ক ও উপনায়কদের চরিত্র অতি সুন্দর রূপে রক্ষা করিতে পারিয়াছেন। ইহা সামান্য সুখ্যাতির কথা নহে। এক খণ্ড কয়লার মধ্যে সূর্যের আলোক তো প্রবেশই করিতে পারে না, কিন্তু এক খণ্ড স্ফটিকে শুদ্ধ যে সূর্যকিরণ প্রবেশ করিতে পারে এমন নয়, আবার স্ফাটিক্য গুণে সেই কিরণ সহস্র বর্ণে প্রতিফলিত হইয়া সূর্যের মহিমা ও স্ফটিকের স্বচ্ছতা প্রচার করে। শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্রবাবুর কল্পনা সেই স্ফটিক-খণ্ড— এবং তাঁহার অভিমন্যু-বধ ও রাবণ-বধ প্রকৃত রামায়ণ ও মহাভারতের প্রতিফলিত রশ্মিপুঞ্জ। অভিমন্যুর নাম উচ্চারণ হইলেই আমাদের মনে যে ভাব উদয় হয় অভিমন্যু-বধ কাব্য পড়িয়া সে ভাবের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হয় না, বরং সে ভাব আরও উজ্জ্বলতর রূপে ফুটিয়া উঠে। যে অভিমন্যু বিশ্ববিজয়ী অর্জুন ও বীরাঙ্গনা সুভদ্রার সন্তান, তাহার তেজস্বিতা তো থাকিবেই, অথচ অভিমন্যুর কথা মনে আসিলেই সূর্যের কথা মনে আসে না, কারণ সূর্য বলিতেই কেবল প্রখর তীব্র তেজোরাশির সমষ্টি বুঝায়— কিন্তু অভিমন্যুর সঙ্গে কেমন একটি সুকুমার সুন্দর যুবার ভাব ঘনিষ্ঠ ভাবে সংযোজিত আছে যে, তাহার জন্য অভিমন্যুকে মনে পড়িলেই চন্দ্রের কথা মনে হওয়া উচিত, কিন্তু তাহাও হইতে পারে না, কারণ চন্দ্রের তেজস্বিতা তো কিছুই নাই। সেইজন্য অভিমন্যুকে আমরা চন্দ্র-সূর্য-মিশ্রিত একটি অপরূপ সামগ্রী বলিয়াই মনে করি। অভিমন্যু-বধের অভিমন্যু, আমাদের সেই মহাভারতের অভিমন্যু সেই আমাদের অভিমন্যু— সেই কল্পনার আদর্শভূত অভিমন্যু। এই বঙ্গীয় নাটকখানিতে যেখানেই আমরা অভিমন্যুকে পাইয়াছি— কি উত্তরার সঙ্গে প্রেমালাপে, কি সুভদ্রার সঙ্গে স্নেহ-বিনিময়ে, কি সপ্তরথীর দুর্ভেদ্য ব্যূহমধ্যে বীরকার্য সাধনে— সকল স্থানেই এই নাটকের অভিমন্যু প্রকৃত অভিমন্যুই হইয়াছে। বলিতে কি, মহাভারতের সকল ব্যক্তিগুলিই শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্রের হস্তে কষ্টকর মৃত্যুতে, জীবন না ফুরাইলেও অপঘাত মৃত্যুতে প্রাণ ত্যাগ করে নাই। ব্যাসদেবের কথা অনুসারে, যাহার যখন মৃত্যু আবশ্যক, গিরিশবাবু তাহাই করিয়াছেন। মাইকেল মহাশয় যেমন অকারণে লক্ষ্মণকে অসময়ে মেঘনাদের সঙ্গে যুদ্ধে মারিয়াছেন অর্থাৎ প্রকৃত প্রস্তাবে লক্ষ্মণের ধ্বংস সাধন করিয়াছেন গিরিশবাবু অভিমন্যুকে কি অর্জুনকে কি কৃষ্ণকে কোথাও সেরূপ হত্যা করেন নাই— ইহা তাঁহার বিশেষ গৌরব। তাঁহার আরও গৌরবের কথা বলিতে বাকি আছে। তাঁহার কল্পনার পরিচয় দিতে আমরা অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিতেছি।

স্বপ্নদেবীর সঙ্গে রজনীর যে আলাপ আছে, তাহা আমাদের অত্যন্ত প্রীতিকর বোধ হইয়াছে, এবং রোহিণীও আমাদের প্রিয় সখী হইয়া পড়িয়াছেন। স্বপ্ন ও তদীয় সঙ্গিনীগণের গানে আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। তবে দোষ দেখাইয়া দেওয়া সমালোচকদের কর্তব্য ভাবিয়াই বলিতে হইল যে নাটকের রাক্ষস-রাক্ষসীদের কথাগুলিতে বেণীসংহারের কথা আমাদের মনে পড়ে। কিন্তু তাহা মনে পড়িলেও আমরা এ কথা বলিতে সংকুচিত হইব না যে শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র একজন প্রকৃত কবি— একজন প্রকৃত ভাবুক। তাঁহার রাবণ-বধে যদিও রাম-লক্ষ্মণের প্রকৃতি বিশেষ রূপে পরিস্ফুট হয় নাই, তবুও তাঁহার রাবণ ও মন্দোদরী এমন জীবন্ত হইয়াছে, যে সেইজন্যই রাবণ-বধ নাটকখানি এত প্রীতিকর লাগে। রাবণের মহান বীরত্ব ও মন্দোদরীর কবিত্বময় তেজস্বিতা এত পরিস্ফুট রূপে রাবণ-বধ নাটকে প্রতিফলিত হইয়াছে যে তাহার উপরে আমাদের একটি কথা কহিবার আবশ্যক নাই। বিশেষত দেবী আরাধনা ও দেবী স্তোত্রগুলি অতি সুন্দর হইয়াছে। কেবল মৃত্যুবাণ আনয়ন ঘটনাটি ও সেই স্থানের বর্ণনাটি আমাদের বড়ো মনঃপূত হয় নাই। আমরা শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্রের নূতন ধরনের অমিত্রাক্ষর ছন্দের বিশেষ পক্ষপাতী। ইহাই যথার্থ অমিত্রাক্ষর ছন্দ। ইহাতে ছন্দের পূর্ণ স্বাধীনতা ও ছন্দের মিষ্টতা উভয়ই রক্ষিত হইয়াছে। কি মিত্রাক্ষরে কি অমিত্রাক্ষরে অলংকারশাস্ত্রোক্ত ছন্দ না থাকিয়া হৃদয়ের ছন্দ প্রচলিত হয়, ইহাই আমাদের একান্ত বাসনা ও ইহাই আমরা করিতে চেষ্টা করিয়া আসিতেছি। গিরিশবাবু এ বিষয়ে আমাদের সাহায্য করাতে আমরা অতিশয় সুখী হইলাম।

অভিমন্যু সম্ভব কাব্য। শ্রীপ্রসাদ দাস গোস্বামী কর্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। ইডেন্ প্রেস, মূল্য ছয় আনা মাত্র।

এই অমিত্রাক্ষর ছন্দের কাব্যখানি সুন্দর ও প্রাঞ্জল হইয়াছে। কিন্তু গ্রন্থকারের কল্পনা সুকুমার কিশোর কল্পনা। স্থলে স্থলে তাহার পদস্খলন হয়। সর্বত্রই সমভাবে তাঁহার বলিষ্ঠ স্ফূর্তি দেখা যায় না। ভাষাও সকল স্থানে সহজ স্রোতোবাহী হয় নাই। তথাপি আমরা কাব্যখানি পাঠ করিয়া প্রীত হইয়াছি।

The Indian Homoeopathic Review. Edited by B. L. Bhaduri.

এখানি আমাদের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় মাসিক পত্র। কবিরাজী বা হাকিমী, অ্যালোপ্যাথি বা হোমিওপ্যাথি, কোন্ প্রথাটা যে আমাদের উপকারী— সে বিষয় লইয়া তর্ক করিতে আমরা এখন চাহি না— চাহিলেও সিদ্ধান্তে আসিতে আমরা পারগ কি না, তাহাও বলিতে পারি না। তবে এই মাত্র বলিতে পারি, যে এরূপ সাময়িক পত্রে আমাদের উপকার ব্যতীত অপকারের সম্ভাবনা নাই। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই— এই পত্র আংশিক ভাবে বাংলা ভাষায় না হইয়া সমস্তটাই বাংলা ভাষায় প্রচারিত হইল না কেন?— কাহাদের জন্য এ পত্র প্রকাশিত হইতেছে?— যদি বাঙালিদের জন্য হয় তবে তাহা বাংলা ভাষাতেই প্রচারিত হওয়া উচিত। আর যদি ইংরাজদের জন্য হয়, তবে ইহা প্রকাশ করিবার আবশ্যক নাই। তবে এই আধা-ইংরাজি আধা-বাঙালি পত্র— এই ‘ইঙ্গ-বঙ্গ'' মাসিক পত্রের উদ্দেশ্য কী?

এই-সকল কথা মহোদয় সম্পাদকের ভাবা উচিত ছিল। আমরা স্বীকার করি যে সম্পাদকীয় কার্য সুন্দররূপে সম্পাদিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্রের সরল ও সহজ বাংলাতে যে প্রবন্ধগুলি লিখিত হইয়াছে তাহার আমরা সুখ্যাতি করি, কিন্তু এই পত্রিকাতে আরও বিস্তর লোকের লেখা আছে। M. M. Bose. M. D. L. R. C. P. একজন উক্ত পত্রিকার লেখক। তিনি ইংলন্ড ও আমেরিকায় শিক্ষা লাভ করিয়াও লিখিতেছেন যে ''May we hope that our educated countrymen of the locality will come forward to help the commission with informations as respects to drinking water &c.'' তিনি আরও লিখিতেছেন ''We would like to call the attention of manager &c to the teaching of elimentary knowledge of Animal Physiology &c.'' যদিও আমরা স্বীকার করি, বাঙালির ইংরাজিতে ভুল থাকাই সম্ভব, তথাপি যেমন করিয়া হউক ইংরাজি যে লিখিতেই হইবে তাহার আমরা কোনো আবশ্যক দেখি না। তবুও যাহা হউক লেখকের উন্নত উদ্দেশ্য দেখিয়া তাঁহার ইংরাজি লেখা মার্জনা করা যায়। আমরা এই অত্যাবশ্যক পত্রটির উন্নতি কামনা করি।

ভারতী
মাঘ ১২৮৮

আনন্দ রহো। ঐতিহাসিক নাটক। শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ দ্বারা প্রণীত ও প্রকাশিত। মূল্য ১ টাকা। এমনতর মাথা-মুণ্ড-বিরহিত নাটক আমরা কখনো দেখি নাই। ইহার না আছে শৃঙ্খলা, না আছে অর্থ, না আছে ভাব, না আছে একটা পরিষ্কার উপন্যাস। লেখকের কল্পনা, লাগাম খুলিয়া লইয়া, এই ৭৭ পৃষ্ঠার মধ্যে উনপঞ্চাশ বায়ুর ঘোড়দৌড় করাইয়াছেন। গিরিশবাবুর লেখায় আমরা এরূপ কল্পনার অরাজকতা আশা করি নাই।

সীতার বনবাস। দৃশ্যকাব্য। শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত। মূল্য ১ টাকা।
লক্ষ্মণ-বর্জন। দৃশ্যকাব্য। শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত। মূল্য চারি আনা।
গিরিশবাবুর রচিত পৌরাণিক দৃশ্য কাব্যগুলিতে তাঁহার কবিত্বশক্তির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। তিনি তাঁহার বিষয়গুলির সৌন্দর্য ও মহত্ত্ব কবির ন্যায় বুঝিয়াছেন ও তাহা অনেক স্থলে কবির ন্যায় প্রকাশ করিয়াছেন। সীতার বনবাসে লক্ষ্মণের বীরত্বই যথার্থ বীরত্ব। রাম যে কর্তব্যজ্ঞানের গুরুভারে অভিভূত হইয়া সীতাকে বনবাসে দিতে পারিয়াছেন, লক্ষ্মণের নিকট সে কর্তব্যজ্ঞান নিতান্ত লঘু। প্রজারঞ্জনের অনুরোধে যে, নির্দোষী সীতাকেও বনবাস দিতে হইবে, ইহার কর্তব্যতা লক্ষ্মণ বুঝিতে পারেন নাই, কিন্তু তবুও সেই সীতাকে বনবাসে দিতে তিনি বাধ্য হইয়াছিলেন। রাম তো আজ্ঞামাত্র দিয়া গৃহের মধ্যে লুক্কায়িত হইলেন, কিন্তু লক্ষ্মণ স্বহস্তে সেই সীতাকে বিসর্জন দিয়া আসিয়াছিলেন। সীতার বনবাসে রামকে নায়ক না করিয়া লক্ষ্মণকে নায়ক করিলে একটি অতি মহান চিত্র অঙ্কিত করা যায়। দুর্ভাগ্যক্রমে সীতার বিসর্জন আমাদের সমালোচ্য দৃশ্যকাব্যের এক অংশ মাত্র, উহাই সমস্ত নহে; সুতরাং সীতা বর্জনের মধ্যে যতটা কবিত্ব আছে, তাহা ইহাতে স্ফূর্তি পায় নাই। সীতা বর্জন ব্যাপারে রামের বাহ্য ঘটনার সহিত হৃদয়ের দ্বন্দ্ব, কর্তব্যজ্ঞানের সহিত অনুরাগের সংগ্রাম; লক্ষ্মণের কর্তব্যের সহিত কর্তব্যজ্ঞানের অনৈক্য, করুণার সহিত নিষ্ঠুরতার অনিচ্ছা সহবাস; সীতার জীবনের সহিত মরণের তর্কবিতর্ক, অর্থাৎ মরণের প্রতি অনুরাগের ও জীবনের প্রতি কর্তব্যজ্ঞানের সম্বন্ধ, এই যে-সকল দ্বন্দ্ব-প্রতিদ্বন্দ্ব ও কর্তব্যের সহিত হৃদয়ের সংগ্রাম আছে, তাহা এই দৃশ্যকাব্যে পরিস্ফুট হয় নাই। যতগুলি ঘটনা লইয়া এই কাব্যখানি রচিত হইয়াছে, তাহা একটি ক্ষুদ্রায়তন দৃশ্যকাব্যের মধ্যে পরিস্ফুট ভাবে বর্ণিত হইতে পারে না। ইহাতে সমস্তটার একটি ছায়া মাত্র পড়িয়াছে। কিন্তু ইহাতে কবিতার অভাব নাই। সীতা-বর্জনের ভার লক্ষ্মণের প্রতি অর্পিত হইলে লক্ষ্মণ রামকে যাহা কহিয়াছিলেন, তাহা অতি সুন্দর। যদিও বনবাসের পর সীতার বিলাপ সংক্ষেপ ও মর্মভেদী হয় নাই, দীর্ঘ ও অগভীর হইয়াছে, তথাপি সীতার শেষ প্রার্থনাটি অতি মনোহর হইয়াছে। যখন পৃথিবীতে জীবনের কোনো বন্ধন নাই, অথচ জীবন রক্ষা কর্তব্য, তখন দেবতার কাছে এই প্রার্থনা করা, সন্তান বাৎসল্য ভিক্ষা করা,

''জগৎ মাতা,
শিখাও গো দুহিতারে জননীর প্রেম।
ছিন্ন অন্য ডুরি,

প্রেমে বাঁধা রেখো মা সংসারে;
ওরে, কে অভাগা এসেছে জঠরে?"

অতি সুন্দর হইয়াছে।

"যবে গভীরা যামিনী, বসি দ্বারে।
শিশুদুটি ঘুমায় কুটিরে,
চাঁদ পানে চাহি কাঁদি সই,
চাঁদ মুখ পড়ে মনে।"

এই সরল কথায় সীতার বেশ একটি চিত্র দেওয়া হইয়াছে। অধিক উদ্‌ধৃত করিবার স্থান নাই, উদ্‌ধৃত করিলাম না।

লক্ষ্মণ-বর্জন বিষয়টি অতি মহান, কিন্তু তাহা দৃশ্যকাব্য রচনার উপযোগী কি না সন্দেহ। লেখক রাম-চরিত্রের অর্থ, রামচরিত্রের মর্ম ইহাতে নিবিষ্ট করিয়াছেন। রামের সমস্ত কার্য, সমস্ত বীরত্ব-কাহিনীকে তিনি দুইটি অক্ষরে পরিণত করিয়াছেন। সে দুইটি অক্ষর— প্রেম। এই সংক্ষেপ দৃশ্যকাব্যখানিতে লেখক একটি মহান কাব্যের রেখাপাত মাত্র করিয়াছেন। ইহাতে লক্ষ্মণের মহত্ত্ব অতি সুন্দর হইয়াছে। কবি যাহা বলেন, তাহার মর্ম এই, যে, বীরত্ব নামক গুণ স্বাবলম্বী গুণ নহে, উহা পরমুখাপেক্ষী গুণ। যেখানে বীরত্ব দেখা যাইবে, সেইখানে দেখিতে হইবে, সে বীরত্ব কাহাকে আশ্রয় করিয়া আছে, সে বীরত্বের বীরত্ব কী লইয়া। কে কত মানুষ খুন করিয়াছে, তাহা লইয়া বীরত্ব বিচার করা উচিত নহে, কাহাকে কিসে বীর করিয়া তুলিয়াছে, তাহাই লইয়া বীরত্বের বিচার। কেহ বা আত্মরক্ষার জন্য বীর, কেহ বা পরের প্রাণ রক্ষার জন্য বীর। জননী সন্তান-স্নেহের জন্য বীর, দেশ-হিতৈষী স্বদেশ-প্রেমে বীর। তেমনি লক্ষ্মণও বীর বলিয়াই বীর নহেন, তিনি বীর হইয়া উঠিয়াছিলেন। কিসে তাঁহাকে বীর করিয়া তুলিয়াছিল? প্রেমে। রামের প্রেমে। অনেকে প্রেমকে হৃদয়ের দুর্বলতা বলেন, কিন্তু সেই প্রেমের বলেই লক্ষ্মণ বীর। যখন সত্যের অনুরোধে রাম লক্ষ্মণকে ত্যাগ করিলেন, তখন লক্ষ্মণ কহিলেন,

"সেবা মম পূর্ণ এত দিনে,
আত্ম-বিসর্জনে পূজা করি সম্পূরণ!
ত্যাগ-শিক্ষা মোরে শিখাইলা দয়াময়,
করি আপনা বর্জন,
রঘুমণি,
সেই প্রেম স্মরি, সেই প্রেমবলে
জিনি অবহেলে পুরন্দর-জয়ী অরি,
পঙ্গু আমি লঙ্ঘিনু সুমেরু!
সেই প্রেম বলে
না টলিনু শক্তি-শেল হেরি,
উচ্চ-হৃদে পেতে নিনু শেল
রাম-প্রেমে শেলে পাইনু ত্রাণ।"

রাম ও লক্ষ্মণ, হিংসা, ঘৃণা, যশোলিপ্সা বা দুরাকাঙ্ক্ষার বলে বীর নহেন, তাঁহারা প্রেমের বলে বীর। তাঁহাদের বীরত্ব সর্বোচ্চ-শ্রেণীর বীরত্ব। এই মহান ভাব এই সংক্ষেপ দৃশ্যকাব্যখানির মধ্যে নিহিত আছে।

মুক্তি ও সাধন সম্বন্ধে হিন্দু-শাস্ত্রের উপদেশ। শ্রীবিপিন বিহারী ঘোষাল প্রণীত।

পুস্তকখানির জন্য আমরা গ্রন্থকারকে প্রাণের সহিত ধন্যবাদ দিতেছি। ইহাতে গ্রন্থকর্তার অসাধারণ

অনুসন্ধান, বিস্তৃত সংগ্রহ ও সরল অনুবাদের ভাষায় আমরা নিতান্ত প্রীত হইয়াছি। বাংলায় এ শ্রেণীর পুস্তক আমরা যতগুলি দেখিয়াছি, তন্মধ্যে এখানি সর্বোৎকৃষ্ট।

কুসুম-কানন। প্রথম ভাগ। শ্রীকায়কোবাদ প্রণীত।
এই গ্রন্থখানিতে দুটি-একটি মিষ্ট কবিতা আছে।

সরলা। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত।
প্রায়শ্চিত্ত। শ্রীহরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত।
এই দুইখানি গ্রন্থ ক্ষুদ্রায়তন সরল সামাজিক উপন্যাস। ইহাদের সম্বন্ধে বিশেষ বক্তব্য কিছুই নাই।

আদর। (প্রিয়তমার প্রতি)। শ্রীকল্পনাকান্ত গুহ প্রণীত।
ইহা পড়িয়া প্রিয়তমা সন্তুষ্ট হইতে পারেন। কিন্তু পাঠকেরা সন্তুষ্ট হইবেন না।

উর্মিলা-কাব্য। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন প্রণীত। মূল্য চারি আনা।
এই কাব্যখানির বিষয় নূতন ও কবিতাপূর্ণ। ইহাতে উর্মিলার দুঃখ বর্ণিত হইয়াছে। উর্মিলা বনবাসিনী সীতাকে পত্র লিখিতেছেন। এই ক্ষুদ্র পত্রখানিতে উর্মিলার চরিত্র ও উর্মিলার মনোভাব সুন্দর বিকশিত হইয়াছে। বিরহিণী উর্মিলা প্রাসাদের উদ্যানে বিচরণ করিতে করিতে কল্পনা-কুহকে নিজের চারি দিকে নানাবিধ মায়াজাল রচনা করিতেছেন ও ভাঙিতেছেন, এ ভাবটি সুন্দর হইয়াছে। স্থানে স্থানে ইহাতে সুন্দর কবিতা আছে।

সাদরে চিবুক মোর ধরি বীরবর
অধরে চুম্বিলা দেবী, হায় সে চুম্বন—
নিচল যমুনাজলে চন্দ্র-কর-লেখা
পড়ে গো নিঃশব্দে যথা, অথবা যেমতি
উষার মুকুট শোভা কুসুমের শিরে
নিশির শিশির পাত; নীরব, মৃদুল!

পত্র শেষ করিয়া পত্র সম্বন্ধে উর্মিলা কহিতেছেন—

পাঠ করি মনোসাধে, পরম কৌশলে
নিদ্রিত নাথের বক্ষে নিঃশব্দ চরণে—
রাখিয়া আসিয়ো দিদি করি গো বিনতি।

...

নিদ্রান্তে চকিতে যবে হেরিয়া এ লেখা,
শুধাবেন "কে আনিল!" কহিয়ো তাঁহারে,
"স্বর্গ হতে ফেলেছেন বুঝি রতিদেবী
চেতাইতে সুকঠিন অপ্রেমিক জনে,
নহে মানবের কাজ, দেবের এ লীলা।"
দাও গো বিদায় তবে আসিছে মন্থরা।
ভক্তিপূর্ণ নমস্কার জানায়ো শ্রীরামে,
কহিয়ো তাঁহারে দেবি, "দেব রঘুমণি
ফিরিয়া আসিলে ঘরে, ব্যাপিকা উর্মিলা,
পূর্বের কৌতুক আর করিতে নারিবে,
হাসিতেন রঘুবর সে ব্যঙ্গ কৌতুকে।
সে আমোদ হাসিমুখ ভুলিয়া গিয়াছে।"

...

আর জানাইয়ো দিদি তোমার দেবরে—
কী জানাবে? জানাবার কি গো আর আছে?
জানাইয়ো উর্মিলার নিষ্ফল প্রণয়,
জানাইয়ো উর্মিলার নয়নের বারি,
জানাইয়ো, প্রিয় দিদি, জানাইয়ো তারে,
অযোধ্যার রাজপুরে কি নিশি দিবসে,
উর্দ্ধমুখে, কখনো বা অবনত মুখে,
বিগলিত কেশপাশ পাণ্ডুর অধরা,
একটি রমণী মূর্তি ঘোরে অবিরত!

নির্ঝরিণী। (গীতি কাব্য) প্রথম খণ্ড। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন প্রণীত। মূল্য আট আনা।
এই কাব্যগ্রন্থখানিতে "আঁখির মিলন" প্রভৃতি দুই-একটি সুন্দর কবিতা আছে, কিন্তু সাধারণত সমস্ত কবিতাগুলি তেমন ভালো নহে।

রাজ-উদাসীন। প্রথম স্তবক। শাক্য সিংহ ও রামমোহন রায়। শ্রীদেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য চারি আনা মাত্র।
এই ক্ষুদ্র কাব্যখানির স্থানে স্থানে বর্ণনা উত্তম হইয়াছে। কিন্তু বিষয়টি যেরূপ গুরুতর তদুপযুক্ত রচনা হয় নাই। বুদ্ধদেব বা রামমোহন রায়ের স্বগত-উক্তি ও কথোপকথনগুলি উপদেশ-প্রবাহের ন্যায় শুনায়, তাহার সহিত কল্পনা-মিশ্রিত করিয়া তাহাকে কবিতা করিয়া তোলা হয় নাই। কাব্যখানি পড়িয়া মনে হয়, লেখক তাঁহার বিষয়ের মহান ভাব যতটা কল্পনা করিতে পারিয়াছেন, ততটা প্রকাশ করিতে পারেন নাই।

ভারতী
ফাল্গুন, ১২৮৮

জন্ স্টুয়ার্ট মিলের জীবনবৃত্ত। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ এম্ এ বিরচিত। মূল্য ১।০ মাত্র।
ইতালীর ইতিবৃত্ত সম্বলিত ম্যাট্‌সিনির জীবন-বৃত্ত। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ এম্ এ বিরচিত। মূল্য ১।০ মাত্র।
এই গ্রন্থ দুইখানি বহুকাল হইল, প্রকাশিত হইয়াছে, আমরা সম্প্রতি সমালোচনার্থে পাইয়াছি। যদি কোনো পাঠক আজিও এ গ্রন্থদ্বয়ের পরিচয় না পাইয়া থাকেন, তবে তাঁহাদের অনুরোধ করি, এ দুইখানি পুস্তক ক্রয় করিয়া পাঠ করিবেন। ইহার পূর্বে ভালো জীবনবৃত্ত বঙ্গভাষায় প্রচারিত হয় নাই। যোগেন্দ্রবাবু এ বিষয়ে পথ দেখাইয়া বঙ্গসাহিত্যের যথার্থ উপকার করিয়াছেন। আমাদের মতে এই দুইখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থের মধ্যে ম্যাট্‌সিনির জীবনবৃত্ত উৎকৃষ্টতর। তাহার দুই কারণ আছে— প্রথম, ম্যাট্‌সিনির জীবনবৃত্তে গ্রন্থের নায়কের সহিত লেখকের জ্বলন্ত সমবেদনা প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত সমভাবে প্রকাশ পাইতেছে; লেখক হৃদয়-লেখনী দিয়া সমস্ত পুস্তকখানি লিখিয়াছেন, এই নিমিত্ত পাঠকদের হৃদয়ের পত্রে তাহার মুদ্রাঙ্কন পড়িয়াছে। দ্বিতীয়, প্রথম পুস্তকখানি মস্তিষ্ক ও জ্ঞান চর্চার বিবরণ, দ্বিতীয় পুস্তকখানি হৃদয় ও কার্যের কাহিনী, সুতরাং বিষয়ের গুণে শেষ গ্রন্থটি অধিকতর মনোরম হইয়াছে।

হৃদয়োচ্ছ্বাস, বা ভারত বিষয়ক প্রবন্ধাবলি। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ এম এ প্রণীত। মূল্য ১ টাকা।
আজকাল অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাসিক পত্র বাহির হইয়াছে। এই নিমিত্ত বঙ্গদেশে লেখকের সংখ্যা অল্প হইলেও লেখার আবশ্যক অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছে, সুতরাং সাহিত্যসমাজে অত্যন্ত

চুরির প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। সমালোচ্য গ্রন্থখানির বিজ্ঞাপনে দেখিতেছি, যোগেন্দ্রবাবুর আর্যদর্শনে প্রকাশিত অনেকগুলি প্রবন্ধ এইরূপ চুরি যায়; চোরের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য আর্যদর্শন-সম্পাদক তাঁহার ভারত-বিষয়ক প্রবন্ধগুলি পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিয়াছেন। অনেকগুলি প্রবন্ধে লেখকের চিন্তাশীলতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু যথার্থ কথা বলিতে কি, প্রাচীন ভারতের উন্নতি লইয়া গর্ব, আধুনিক ভারতের অবনতি লইয়া দুঃখ, ঐক্যের অভাব লইয়া বিলাপ, বদ্ধপরিকর হইবার জন্য উত্তেজনা এত শুনা গিয়াছে যে, ও বিষয়ে শুনিবার আর বাসনা নাই। শুনিয়া যত দূর হইতে পারে তাহা এত দিনে হইয়াছে বোধ করি, বরঞ্চ ভাবগতিকে বোধ হয় মাত্রা অধিক হইয়া গিয়াছে। না যদি হইয়া থাকে তো আশ্চর্য বলিতে হইবে। ভারতের বিষয়ে কতকগুলা বিলাপ ও উদ্দীপন বাক্য উচ্চারণ করিবার কাল চলিয়া গিয়াছে। যখন দেশানুরাগের ভাব মাত্র লোকে জানিত না, তখন তাহা উপযোগী ছিল। ভারতের যে পূর্বে উন্নতি ছিল ও এখন যে অবনতি হইয়াছে, ভারতের উন্নতি সাধন করিতে সকলের যে সম্মিলিত হওয়া উচিত এ বিষয়ে বঙ্গীয় পাঠকমাত্রেই এতবার শুনিয়াছেন, যে, এ বিষয় বোধ করি কাহারো জ্ঞানের অগোচর নাই। অতএব আর অধিক নহে। এখন "ঐক্য" "উন্নতি" "বন্ধন" প্রভৃতি কতকগুলা সাধারণ কথা পরিত্যাগ করিয়া, ঐক্য ও উন্নতি সাধনের যে শত সহস্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাধা আমাদের সহিত এক পরিবারভুক্ত হইয়া বাস করিতেছে সেই-সকল বিশেষ বিশেষ বিষয়ের আলোচনা করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। বড়ো বড়ো কথা শুনিয়া আমাদের যুবকদিগের একটা বিষম রোগ উপস্থিত হইয়াছে। তাঁহারা তাঁহাদের দুই দুর্বল হস্তে দুই গুরুভার তরবারি লইয়া অধীনতা ছেদন করিবার জন্য দিগ্‌বিদিক্‌ হাতড়াইয়া দাপাদাপি করিয়া বেড়াইতেছেন। তাঁহাদের যদি বলা যায়, অত হাঙ্গাম করিবার আবশ্যক কী? অধীনতার অন্বেষণে ছুঁচাবাজির মতো চারি দিকে ধড়্‌ফড়্‌ করিয়া বেড়াইতেছ কেন? অধীনতা যে তোমাদের দুয়ারের কাছে। এমন-কি, তোমাদের গৃহের কোণ হইতে শত শত অধীনতার পাশ অতি সূক্ষ্ম মাকড়সার জালের মতো তোমাদের হাত-পা বেষ্টন করিয়া ধরিয়াছে। তলোয়ার দুটা রাখো। একে একে ধীরে ধীরে সেই সূক্ষ্ম গ্রন্থিগুলা মোচন করো। এ কথা শুনিলে তাঁহারা নিতান্ত নিরুৎসাহ হইয়া পড়েন। তাঁহারা জাহাজের কাছি, লোহার শিকল ছিঁড়িবার জন্য তলোয়ার ঝন্‌ঝন্‌ করিয়া বেড়াইতেছেন, তাঁহাদের ওই সরু সুতাগুলি দেখাইয়া দিলে তাঁহারা অপমান বোধ করেন। কেবল বড়ো বড়ো ভারী ভারী কথা শুনিয়া আমাদের এই দশা হইয়াছে। এখন ছোটো ছোটো ঘরের কথা কহিবার সময় আসিয়াছে। এখন এই মহাবীরবৃন্দকে ঠাণ্ডা করিয়া তাঁহাদের মুখের কথাগুলাকে ছাঁটিয়া, তাঁহাদের হাতের তলোয়ার দুটাকে নামাইয়া ছোটোখাটো ঘরের কাজে নিযুক্ত করানো আবশ্যক হইয়াছে। বনে মহিষ তাড়াইতে যাইবার পূর্বে ঘরে ইন্দুরের উৎপাত দূর করা হউক। তাই বলিতেছি হৃদয়োচ্ছ্বাসের অনেকগুলি প্রবন্ধে লেখকের দেশানুরাগ প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু বর্তমান পাঠকদের পক্ষে তাহার আবশ্যকতা অল্প। তাই বলিয়া হৃদয়োচ্ছ্বাসের সকল প্রবন্ধ সম্বন্ধেই আমরা এমন কথা বলিতে পারি না। ইহাতে অনেকগুলি প্রবন্ধ আছে যাহা সময়োপযোগী, বিশেষ-বিষয়গত ও সমাজের হিতসাধক।

স্যামুয়েল হানিমানের জীবনবৃত্ত। শ্রীমহেন্দ্রনাথ রায় কর্তৃক বিরচিত। মূল্য ছয় আনা।

যোগেন্দ্রবাবুর অনুসরণ করিয়া ইতিমধ্যেই আর-এক জন লেখক বঙ্গভাষায় আর-এক মহাত্মার জীবনবৃত্ত, রচনা করিয়াছেন, দেখিয়া আনন্দিত হইলাম। ইহা পুস্তক বিশেষের অনুবাদ নহে; লেখক অনেক পরিশ্রম ও অন্বেষণ করিয়া গ্রন্থখানি সংকলন করিয়াছেন। আমাদের দেশে এরূপ অধ্যবসায় প্রশংসাযোগ্য। গ্রন্থের ভাষা তেমন সহজ, পরিষ্কার সরস হয় নাই। অনর্থক কতকগুলা কঠোর সংস্কৃত কথা ও ঘোরালো পদ ব্যবহার করা হইয়াছে, এইজন্য পুস্তকখানি সুপাঠ্য হয় নাই। গ্রন্থকার হানিমানের জীবনী হইতে পদে পদে রাশি রাশি নীতি কথা বাহির করিয়াছেন,

সেগুলি বিশেষ করিয়া লিখিবার কোনো আবশ্যক ছিল না। তাহা ছাড়া, গ্রন্থের প্রধান দোষ এই যে, হানিমানের প্রতি পাঠকদের ভক্তি উদ্রেক করিবার জন্য লেখক প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন। একটা শ্রমসাধ্য চেষ্টার ভাব গ্রন্থের সর্বাঙ্গে প্রকাশ পাইতেছে। দুটা-তিনটা করিয়া জিজ্ঞাসার চিহ্ন দিয়া, "আহা" "আশ্চর্য" "ধন্য" "ভাবিতে মন অবসন্ন হইয়া পড়ে" "অদ্ভুত হানিমানের সকলি অদ্ভুত" ইত্যাদি বিস্ময়াত্মক কথা পদে পদে ব্যবহার করা হইয়াছে; যেন, পাঠকদিগকে ঠেলিয়া, ধাক্কা মারিয়া, চোখে আঙুল দিয়া কোনো প্রকারে আশ্চর্যান্বিত করিতেই হইবে, ইহাই লেখকের ব্রত হইয়াছে। এরূপ করিলে অনেক সময়ে পাঠকদের বিরক্তি বোধ হয়। নিজের ভাব পদে পদে প্রকাশ না করিয়া বর্ণনার গুণে স্বভাবতই পাঠকদের ভাব উদ্রেক করা সুলেখকের কাজ। অধিক করিয়া বলিয়া শ্রোতাদিগকে অভিভূত করিয়া দিবার বাসনা মহেন্দ্রবাবুর লেখার প্রধান দোষ দেখিতেছি। যে স্থলে হানিমানের স্ত্রীর গুণ বর্ণনা করা হইয়াছে, সে স্থল উদ্‌ধৃত করি।

"ফ্রেঞ্চ জর্মান, ইংরাজি, প্রভৃতি ভাষায় মিলানীর, 'অসাধারণ' অধিকার।... সভ্য জগতের তাবৎ সাহিত্যে তিনি 'অলৌকিক ব্যুৎপত্তি-শালিনী'। তিনি স্বীয় 'অপ্রতিদ্বন্দ্বী' রচনা বিষয়ে এক 'অলোকসামান্য' কবি। উঁহার কবিতা পাঠ করিতে করিতে 'প্রাণ মন বিগলিত' হইয়া যায়— 'শরীর শিথিলিত' হইয়া পড়ে। 'আহা কি সুন্দর মধুর কবিতা'! 'অন্তরাত্মা উচ্চ হইতে উচ্চতর ভাবে' উঠিতে থাকে এবং ভাবগ্রহ সমাপ্ত হইলে, 'উচ্চতম অবস্থা প্রাপ্ত হয়'। ইচ্ছা করে অনবরত তাহা আবৃত্তি করি। এই তো গেল কাব্যের কথা। চিত্র অঙ্কনেও 'অনির্বচনীয় যোগ্যতা— অনুপম অপ্রতিদ্বন্দ্বিতা'।"

বিশেষণগুলা দেখিলে ভীত হইয়া পড়িতে হয়। হানিমানের স্ত্রী ব্যতীত পৃথিবীতে এত বড়ো আর-একটি লোক জন্মগ্রহণ করে নাই। এমন কাহারো নাম শুনি নাই, একাধারে কবিতা ও চিত্রবিদ্যায় যাঁহার "অনুপম অপ্রতিদ্বন্দ্বিতা!" জীবনবৃত্ত লিখিতে হইলে ভাবাকে ইহা অপেক্ষা আরও অনেকটা সংযত করা আবশ্যক। বিষয়টিও ভালো, উপস্থিত গ্রন্থখানিও অনেক বিষয়ে ভালো, এই নিমিত্তই এত কথা বলিলাম।

যেমন রোগ তেমনি রোজা। প্রহসন। শ্রীরাজকৃষ্ণ দত্ত প্রণীত। মূল্য চারি আনা।

এ প্রহসনখানি মলিয়েরে-রচিত "Le medecin malgre lui" নামক ফরাসী প্রহসনের স্বাধীন অনুবাদ। লেখক কেন যে তাহা স্বীকার করেন নাই, বুঝিতে পারিলাম না। স্বীকার করাতে দোষের কিছুই নাই। বিদেশীয় ভাষার ভালো ভালো কাব্য নাটক বাংলায় অনুবাদিত হইলে বাংলা সাহিত্যের উন্নতি হইবার কথা। গ্রন্থখানি আমাদের ভালো লাগিয়াছে।

গার্হস্থ্য চিকিৎসা বিদ্যা। শ্রীঅম্বিকাচরণ রক্ষিত কর্তৃক সংকলিত। মূল্য ১৷০।

এই গ্রন্থের চিকিৎসাশাস্ত্র অনুযায়ী দোষ গুণ বলিতে আমরা ভরসা করি না। তবে ইহার একটি প্রধান গুণ এই দেখিলাম, ইহাতে আমাদের দেশী ও ইংরাজি উভয়বিধ ঔষধের উল্লেখ আছে। গ্রন্থের ভূমিকা হইতে উদ্‌ধৃত করিয়া দিতেছি। "ইহা কোনো পুস্তক বিশেষের অনুবাদ নহে। ইহাতে বর্ণিত বিষয় সকল বিবিধ গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। ...এদেশে সচরাচর যে-সকল পীড়া জন্মে তাহাদের ডাক্তারী ও দেশীয় ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা বিবরণ ইহাতে বিশদরূপে বিবৃত হইয়াছে। ইহাতে বর্ণিত দেশীয় ঔষধ সকল প্রায় পল্লীগ্রামের সকল স্থানেই পাওয়া যায়। সহজ সহজ পীড়ায় ও যে-সকল স্থানে চিকিৎসক পাওয়া না যায় তথায় এই পুস্তকের সাহায্যে গৃহস্থগণ অনেক উপকার প্রাপ্ত হইবেন বলিয়া আশা করা যায়।" আমরাও তাহাই আশা করি।

শার্ঙ্গধর। মহর্ষি শার্ঙ্গদর কৃত স্বনামখ্যাত আয়ুর্বেদীয় সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসা গ্রন্থ। শ্রীঅম্বিকাচরণ রক্ষিত কর্তৃক অনুবাদিত। মূল্য দুই টাকা দুই আনা।

আমাদের প্রাচীন গ্রন্থের এইরূপ সহজ অনুবাদ নানা কারণে হিতসাধক। এই গ্রন্থ অনুবাদ করিয়া

গ্রন্থকার সাধারণের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

যাবনিক পরাক্রম। (উপন্যাস।) শ্রীনীলরত্ন রায় চৌধুরী প্রণীত। মূল্য বারো আনা।
এই গ্রন্থখানির কিছুই প্রশংসা করিবার নাই।

স্বপন-সঙ্গীত। (গীতিকাব্য।) শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রণীত। মূল্য ছয় আনা।
এখানি একটি ক্ষুদ্র কাব্যগ্রন্থ। লেখকের এখনো হাত পাকে নাই। কিন্তু ইহার অনেক স্থানে যথার্থ কবিতা আছে, অনেক স্থানে লেখকের ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়।

উষাহরণ বা অপূর্ব-মিলন। গীতিনাট্য। শ্রীরাধানাথ মিত্র প্রণীত। মূল্য দশ পয়সা মাত্র।
মেঘেতে বিজলী বা হরিশ্চন্দ্র। গীতিনাট্য। শ্রীরাধানাথ মিত্র প্রণীত। মূল্য ।০ মাত্র।
উক্ত গ্রন্থকার-রচিত দুই-চারিখানি গীতিনাট্য আমরা সমালোচনার্থ পাইয়াছি। গীতগুলি রাগ-রাগিণী সংযোগে গাহিলে কিরূপ শুনায় বলিতে পারি না, কিন্তু পড়িতে ভালো লাগিল না।

ভারতী
বৈশাখ ১২৮৯

বনবালা। ঐতিহাসিক উপন্যাস। মূল্য বারো আনা।
এই ঐতিহাসিক উপন্যাসে না আছে ইতিহাস, না আছে উপন্যাস। নভেলের সমস্ত কাঠ-খড় আনা হইয়াছে, কেবল মূর্তি গড়া হয় নাই।

হরবিলাপ। শ্রীরাধানাথ মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য চারি আনা।
এই গীতিনাট্যখানিতে কতকগুলি সুন্দর গান আছে। পড়িতেই যখন ভালো লাগিতেছে, তখন সুর-সংযোগে শুনিলে আরও ভালো লাগিবার কথা। এই গ্রন্থখানি অভিনয়ের যোগ্য কি না বলিতে পারি না, কারণ ইহাতে উপাখ্যান ভাগ কিছুই নাই বলিলেও হয়, কিন্তু গ্রন্থখানি পাঠের যোগ্য ও গানগুলি গাহিবার যোগ্য সন্দেহ নাই।

কমলে কামিনী বা কুলেশ্বরী। শ্রীরাধানাথ মিত্র প্রণীত ও প্রকাশিত। মূল্য চারি আনা।
এই গীতিনাট্যখানি পড়িতে তেমন ভালো লাগিল না। কমলে-কামিনী দেখিয়া শ্রীমন্ত যে গান গাহিয়া উঠিয়াছে, সেই গানটিই পুস্তকের মধ্যে ভালো লাগিল।

কল্পনা-কুসুম। শ্রীমতী কামিনী সুন্দরী দেবী-কর্তৃক বিরচিত। মূল্য ।।০ আনা।
এই গ্রন্থখানি পড়িয়া স্পষ্টই মনে হয়, লেখিকার কবিত্ব শক্তি আছে। "অভাগিনীর বিলাপ" "নারদ" প্রভৃতি কতকগুলি যথার্থ কবিতা এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে।

কবিতাবলী। প্রথম ভাগ। শ্রীরামনারায়ণ অগস্তি প্রণীত। মূল্য দশ আনা।
কবিতাবলীর এই প্রথম ভাগ দেখিয়া দ্বিতীয় ভাগ দেখিবার আর বাসনা রহিল না। যে বন্ধু গ্রন্থকারকে এই কবিতাগুলি ছাপাইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন তিনি বাস্তবিকই বন্ধুর মতো কাজ করেন নাই।

কুসুমারিন্দম। শ্রীইন্দ্রনারায়ণ পাল প্রণীত। মূল্য ১ টাকা।
এই উপন্যাসখানি পড়িয়া আমরা বিস্মিত হইলাম। ইহার আদ্যোপান্ত একটা ঘোরতর বিশৃঙ্খল গোলমাল। ইহার অনেক জায়গায় বাস্তবিকই লেখকের ছেলেমানুষী প্রকাশ পাইয়াছে, আবার স্থানে স্থানে লেখকের ক্ষমতা ব্যক্ত হইয়াছে।

ভারতী
ভাদ্র ১২৮৯

সমালোচক কাব্য। মূল্য এক আনা।
সমালোচনা স্থলে ভারতী বর্তমান গ্রন্থকারের কোনো একটি কাব্যকে ভালো বলেন নাই, এই অপরাধে ভারতীকে আক্রমণ করিয়া এই গ্রন্থখানি লিখিত হইয়াছে। কিন্তু এই কাব্যখানি পড়িয়া তাঁহার পূর্বতন গ্রন্থ সম্বন্ধে আমাদের মতের কিছুমাত্র পরিবর্তন হইল না। এই লেখার দরুন পাঠকদিগের নিকটেও যে তাঁহার পূর্বগ্রন্থের বিশেষ আদর বাড়িবে, তাহাও নহে। তবে লিখিয়া ফল কী হইল? লেখক কি মনে মনে বড়ো আনন্দ উপভোগ করিতেছেন? তবে তাহাই করুন, তাহাতে আমরা ব্যাঘাত দিব না।

কথাটা এই যে, নিজের লেখা ভালো বলিয়া লেখকের দৃঢ় বিশ্বাস থাকিতে পারে, তাহা লইয়া কেহ তাঁহার সহিত বিবাদ করিবে না, কিন্তু সমালোচকেরও যে সে বিষয়ে তাঁহার সহিত মতের সম্পূর্ণ ঐক্য হইয়া যাইবে এরূপ আশা করাটা কিছু অতিরিক্ত হয়। আমাদের মতে অনর্থক গালিমন্দ দেওয়া বা ঠাট্টা বিদ্রূপ করা সমালোচকের কর্তব্য কাজ নহে। কিন্তু যে সমালোচক কোনো প্রকার অভদ্রতাচরণ না করিয়া শুদ্ধ মাত্র নিজের মত ব্যক্ত করিয়াছেন, তাঁহার সহিত লেখকের ঝগড়া করা ভালো দেখায় না। সমালোচকের কাজটা দেখিতেছি, ঘরের কড়ি খরচ করিয়া বনের মহিষ তাড়ানো, মাঝে মাঝে গুঁতাটাও খাইতে হয়।

তৃণপুঞ্জ। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বিরচিত। মূল্য আট আনা।
ইহা একখানি কাব্যগ্রন্থ। মনে হয় যেন, ইহার অনেকগুলি কবিতাতে লেখকের যাহা মনে আসিয়াছে তাহাই লিখিয়াছেন; তাহার একটা বিশেষ ভাব নাই, একটা দাঁড়াইবার স্থান নাই, একটা উদ্দেশ্য নাই— অথচ তাহার একটা নাম আছে ও তাহার সহিত মিল বা অমিল বিশিষ্ট, বাংলার বা বিকৃত বাংলায় লিখিত কয়েকটি ছত্র সংলগ্ন আছে। তবে, স্থানে স্থানে কবিত্বের রেখা পড়ে, কিন্তু আবার তখনি মুছিয়া যায়— কবিত্বে সমস্ত ছত্রগুলি ভরিয়া উঠে না, কঠিন ও বিকৃত ভাষার উৎপীড়নে ও ভাবের অভাবে কল্পনা ক্লিষ্ট হইয়া পড়ে। লেখক অনেক স্থলে ইংরাজি ভাব বাংলায় আনিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা দোষের কথা নহে, কিন্তু তিনি ইংরাজিকে বাংলা করিতে পারেন নাই, মাঝের হইতে বাংলাকে কেমন ইংরাজি করিয়া তুলিয়াছেন। এই গ্রন্থ পড়িয়া স্পষ্ট বুঝা যায়, লেখক বাংলায় কবিতা লিখিতে নূতন প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এই নিমিত্ত এখনো তাঁহার ভাবের প্রবাহ উন্মুক্ত হয় নাই, এখনো তিনি প্রতিকূল ভাষাকে আপনার অনুকূল করিয়া লইতে পারেন নাই, ভাষা তাঁহাকে অপরিচিত দেখিয়া তাঁহার ভাবগুলির প্রতি ভালোরূপ আতিথ্য-সংকার করিতেছে না। দেখা যাউক ভবিষ্যতে কী হয়।

শান্তি-কুসুম। শ্রীবিহারীলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত।
বিষয়টা কিছুই নহে, লিখিবার যোগ্যই নয়। বোধ করি গ্রন্থখানি ব্যক্তিবিশেষের জন্য লিখিত, সাধারণের জন্য লেখা হয় নাই। সুতরাং এ গ্রন্থ সমালোচনা করিবার কোনো আবশ্যক দেখিতেছি না। তবে প্রসঙ্গক্রমে বলিতেছি, লেখাটি বড়ো ভালো হইয়াছে। বাংলা ভাষাটি অবিকল বজায় আছে। আধুনিক গ্রন্থগুলি পড়িতে পড়িতে এ গ্রন্থখানি সহসা পড়িলে ইহার ভাষা দেখিয়া কিছু আশ্চর্য বোধ হয়। কিন্তু ইহার আর কোনো গুণ নাই।

সুরসভা। শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রণীত। মূল্য দুই আনা।
কৈলাস-কুসুম। ...

মণি মন্দির।... মূল্য তিন আনা।
পার্থ প্রসাদন।...

প্রমীলার পুরী। ... মূল্য এক আনা।
এই গ্রন্থগুলির মধ্যে শেষোক্ত দুইখানি ব্যতীত আর সকলগুলিই গীতিনাট্য। গীতিনাট্যের যথার্থ সমালোচনা সম্ভবে না, কারণ গীতগুলি কেবলমাত্র পড়িয়া সমালোচনা করা যায় না। গান

লিখিবার সময় কবিত্ব কিছু-না-কিছু হাতে রাখিয়া চলিতে হয়, সমস্তটা প্রকাশ করা যায় না, কারণ তাহা হইলে সুরের জন্য আর কিছুই স্থান থাকে না। গানের লেখাতে কবিত্বের যে কোরকটুকুমাত্র দেখা যায় সুরেতে তাহাকেই বিকশিত করিয়া তোলে। এই নিমিত্ত সকল সময় গান পাঠ করা বিড়ম্বনা, তথাপি বলিতে পারি, এই গীতিনাট্যগুলির স্থানে স্থানে ভালো ভালো গান আছে। মণি-মন্দিরের গানগুলিই আমাদের সর্বাপেক্ষা ভালো লাগিয়াছে।

ষড়ঋতুবর্ণন কাব্য। শ্রীআশুতোষ ঘোষ প্রণীত। মূল্য পাঁচ আনা।
গ্রন্থকার লিখিতেছেন "বহু দিবস হইতে আমার ইচ্ছা ছিল যে, পদ্যে একখানি গ্রন্থ রচনা করিব; অধুনা অনেক কষ্টে দুরাশাগ্রস্ত হইয়া অমিত্রাক্ষর চতুর্দশপদী ষড়ঋতুবর্ণন নামক কাব্যখানি রচনা করিয়া মহানুভাব পাঠক মহাশয়গণের করকমলে উপহার স্বরূপ অর্পণ করিলাম।" গ্রন্থকর্তার এতদিনকার এত আশার গ্রন্থখানিকে ভালো না বলিলে তিনি মনে আঘাত পাইবেন সন্দেহ নাই। কিন্তু কর্তব্যানুরোধ পালন করিতে হইলে এ গ্রন্থখানিকে কোনো মতেই সুখ্যাতি করিতে পারি না।

ভারতী
চৈত্র ১২৮৯

সিন্ধু-দূত। শ্রীনবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য ।০ আনা মাত্র।
প্রকাশক সিন্ধুদূতের ছন্দ সম্বন্ধে বলিতেছেন—"সিন্ধুদূতের ছন্দঃ প্রচলিত ছন্দঃ-সকল হইতে একরূপ স্বতন্ত্র ও নূতন। এই নূতনত্ব হেতু অনেকেরই প্রথম প্রথম পড়িতে কিছু কষ্ট হইতে পারে।... বাংলা ছন্দের প্রাণগত ভাব কী, ও তাহার স্বাভাবিক গতি কোন্ দিকে, এবং কী প্রণালীতেই বা ইচ্ছামতে উহার সুন্দর বৈচিত্র্যসাধন করা যায়, ইহার নিগূঢ়তত্ত্ব সিন্ধুদূতের ছন্দঃ আলোচনা করিলে উপলব্ধ হইতে পারে।"

আমাদের সমালোচ্য গ্রন্থের ছন্দ পড়িতে প্রথম প্রথম কষ্ট বোধ হয় সত্য কিন্তু ছন্দের নূতনত্ব তাহার কারণ নহে, ছত্র বিভাগের ব্যতিক্রমই তাহার একমাত্র কারণ। নিম্নে গ্রন্থ হইতে একটি শ্লোক উদ্‌ধৃত করিয়া দিতেছি।

"একি এ, আগত সন্ধ্যা, এখনো রয়েছি ব'সে সাগরের তীরে?
দিবস হয়েছে গত না জানি ভেবেছি কত,
প্রভাত হইতে বসে র'য়েছি এখানে বাহ্য জগৎ পাশরে
ক্ষুধা তৃষ্ণা নিদ্রাহার কিছু নাহি মোর; সব ত্যেজেছে আমারে।"

রীতিমতো ছত্র বিভাগ করিলে উপরি-উদ্‌ধৃত শ্লোকটি নিম্নলিখিত আকারে প্রকাশ পায়।

"একিএ, আগত সন্ধ্যা, এখনো রয়েছি ব'সে
সাগরের তীরে?
দিবস হয়েছে গত,
না জানি ভেবেছি কত,
প্রভাত হইতে বসে রয়েছি এখানে বাহ্য
জগৎ পাশরে
ক্ষুধা তৃষ্ণা নিদ্রাহার কিছু নাহি মোর; সব
ত্যেজেছে আমারে।"

মাইকেল-রচিত নিম্নলিখিত কবিতাটি যাঁহাদের মনে আছে তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন, সিন্ধুদূতের ছন্দ বাস্তবিক নূতন নহে।

"আশার ছলনে ভুলি কী ফল লভিনু, হায়,
তাই ভাবি মনে,
জীবনপ্রবাহ বহি কালসিন্ধু পানে ধায়
ফিরাব কেমনে?"

একটি ছত্রের মধ্যে দুইটি ছত্র পুরিয়া দিলে পর প্রথমত চোখে দেখিতে খারাপ হয়, দ্বিতীয়ত কোন্‌খানে হাঁফ ছাড়িতে হইবে পাঠকরা হঠাৎ ঠাহর পান না। এখানে-ওখানে হাতড়াইতে হাতড়াইতে অবশেষে ঠিক জায়গাটা বাহির করিতে হয়। প্রকাশক যে বলিয়াছেন, বাংলা ছন্দের প্রাণগত ভাব কী ও তাহার স্বাভাবিক গতি কোন্‌দিকে তাহা সিন্ধুদূতের ছন্দ আলোচনা করিলে উপলব্ধ হইতে পারে, সে বিষয়ে আমাদের মতভেদ আছে। ভাষার উচ্চারণ অনুসারে ছন্দ নিয়মিত হইলে তাহাকেই স্বাভাবিক ছন্দ বলা যায়, কিন্তু বর্তমান কোনো কাব্যগ্রন্থে (এবং সিন্ধুদূতেও) তদনুসারে ছন্দ নিয়মিত হয় নাই। আমাদের ভাষায় পদে পদে হসন্ত শব্দ দেখা যায়, কিন্তু আমরা ছন্দ পাঠ করিবার সময় তাহাদের হসন্ত উচ্চারণ লোপ করিয়া দিই এইজন্য যেখানে চোদ্দটা অক্ষর বিন্যস্ত হইয়াছে, বাস্তবিক বাংলার উচ্চারণ অনুসারে পড়িতে গেল তাহা হয়তো আট বা নয় অক্ষরে পরিণত হয়।

রামপ্রসাদের নিম্নলিখিত ছন্দটি পাঠ করিয়া দেখো—

মন্ বেচারীর কি দোষ আছে,
তারে, যেমন নাচাও তেম্‌নি নাচে।

দ্বিতীয় ছত্রের "তারে" নামক অতিরিক্ত শব্দটি ছাড়িয়া দিলে দুই ছত্রে ১১টি করিয়া অক্ষর থাকে। কিন্তু উহাই আধুনিক ছন্দে পরিণত করিতে হইলে নিম্নলিখিতরূপ হয়—

মনের কি দোষ আছে,
যেমন নাচাও নাচে।

ইহাতে দুই ছত্রে আটটি অক্ষর হয়; তাল ঠিক সমান রহিয়াছে অথচ অক্ষর কম পড়িতেছে। তাহার কারণ, শেষোক্ত ছন্দে আমরা হসন্ত শব্দকে আমল দিই না। বাস্তবিক ধরিতে গেলে রামপ্রসাদের ছন্দেও আটটির অধিক অক্ষর নাই—

মন্বেচারী কি দোষাছে,
যেমন্নাচা তেম্নি নাচে।

দ্বিতীয় ছত্র হইতে "নাচাও" শব্দের "ও" অক্ষর ছাড়িয়া দিয়াছি; তাহার কারণ, এই "ও"টি হসন্ত ও, পরবর্তী "তে"-র সহিত ইহা যুক্ত।

উপরে দেখাইলাম বাংলা ভাষার স্বাভাবিক ছন্দ কী। আর, যদি কখনো স্বাভাবিক দিকে বাংলা ছন্দের গতি হয় তবে ভবিষ্যতের ছন্দ রামপ্রসাদের ছন্দের অনুযায়ী হইবে।

আমাদের সমালোচ্য কবিতার বিষয়টি—"জাতীয় স্বাধীনতার জন্য উৎসর্গীকৃতপ্রাণ জনৈক নির্বাসিত ফরাসীস্ সাধারণতান্ত্রিক বীরবর কর্তৃক স্বদেশ সমীপে সাগরদূত দ্বারা সংবাদ প্রেরণ।" এই গ্রন্থ সচরাচর প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ হইতে অনেক ভালো। তবে সত্য কথা বলিতে কী ইহাতে ভাষার অবিরাম প্রবাহ যেমন দেখিলাম কবিতার উচ্ছ্বাস তেমন দেখা গেল না।

রামধনু। — শিল্প বিজ্ঞান স্বাস্থ্য গৃহস্থালী বিষয়ক সরল বিজ্ঞান। ঢাকা কলেজের লেবরেটারি অ্যাসিস্‌টান্ট ও ঢাকা মেডিকেল স্কুলের কেমিকেল অ্যাসিস্টেণ্ট শ্রীসূর্যনারায়ণ ঘোষ কর্তৃক সম্পাদিত। মূল্য এক টাকা চারি আনা।

এই বৃহদায়তন ১৯৩ পৃষ্ঠার অতি সুলভমূল্য গ্রন্থখানি পাঠকদিগের বিস্তর উপকারে লাগিবে সন্দেহ নাই। ইহার বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ নিতান্ত সরল। কিন্তু ইহার বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ অপেক্ষা ইহাতে যে-সকল গার্হস্থ্য প্রয়োজনীয় বিষয়ের উল্লেখ আছে তাহা আবালবৃদ্ধবনিতার বিস্তর কাজে

লাগিবে। দোষের মধ্যে, ইহাতে বিষয়গুলি ভালো সাজানো নাই, কেমন হিজিবিজি আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার চিত্রগুলিও অতি কদর্য, কতকগুলা অনাবশ্যক চিত্র দিয়া ব্যয়বাহুল্য ও স্থানসংক্ষেপ করিবার আবশ্যক ছিল না, যেগুলি না দিলে নয় সেইগুলি মাত্র থাকিলেই ভালো ছিল। যাহা হউক, পাঠকেরা, বিশেষত গৃহিণীরা, এ গ্রন্থ পাঠ করিয়া উপকার প্রাপ্ত হইবেন।

ঝংকার। গীতিকাব্য। শ্রীসুরেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত প্রণীত। মূল্য ।।০ আনা।
এরূপ বিশৃঙ্খল কল্পনার কাব্যগ্রন্থ সচরাচর দেখা যায় না। স্থানে স্থানে এক-একটি ছত্র জ্বল্‌জ্বল্ করিতেছে, কিন্তু কাহার সহিত কাহার যোগ, কোথায় আগা কোথায় গোড়া কিছুই ঠিকানা পাওয়া যায় না। সমস্ত গ্রন্থখানির মধ্যে কেবল বরষণ নামক কবিতাটিতে উন্মাদ উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা যায় না।

উচ্ছ্বাস। শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য তিন আনা মাত্র।
লেখক কবিতা লিখিতে নূতন আরম্ভ করিয়াছেন বোধ হয়, কারণ তাঁহার ভাষা পরিপক্ব হইয়া উঠে নাই। বিশেষত গ্রন্থের আরম্ভ ভাগের ভাষা ও ভাববিন্যাস পরিষ্কার হয় নাই। কিন্তু গ্রন্থের শেষ ভাগে উন্নাস শীর্ষক কবিতায় কবিত্বের আভাস দেখা যায়। ইহাতে প্রাণের উদারতা, কল্পনার উচ্ছ্বাস ও হৃদয়ের বিকাশ প্রকাশ পাইয়াছে। এবং ইহাতে ভাষার জড়তাও দূর হইয়াছে।

ভারতী
শ্রাবণ ১২৯০

সংগীত সংগ্রহ। (বাউলের গাথা)। দ্বিতীয় খণ্ড।
এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড সমালোচনাকালে গ্রন্থের মধ্যে আধুনিক শিক্ষিত লোকের রচিত কতকগুলি সংগীত দেখিয়া আমরা ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছিলাম। তদুপলক্ষে সংগ্রহকার বলিতেছেন, "যখন আধুনিক অশিক্ষিত বাউলের ও বৈষ্ণবের গান সংগ্রহ করিব— কারণ আধুনিক ও প্রাচীন গান প্রভেদ করিবার বড়ো কোনো উপায় নাই— তখন সুশিক্ষিত সুভাবুক লোকের সুন্দর সুন্দর স্বভাবপূর্ণ সংগীত কেন সংগ্রহ করিব না আমি বুঝিতে পারি না। এই সংগ্রহের লক্ষ্য ও ভাবের বিরোধী না হইলেই আমি যথেষ্ট মনে করি।" এ সম্বন্ধে আমাদের যাহা বক্তব্য আছে নিবেদন করি। প্রথমত গ্রন্থের নাম হইতে গ্রন্থের উদ্দেশ্য বুঝা যায়। এ গ্রন্থের নাম শুনিয়া মনে হয়, বাউল সম্প্রদায় -রচিত গান অথবা বাউলদিগের অনুকরণে রচিত গান-সংগ্রহই ইহার লক্ষ্য। তবে কেন ইহাতে শঙ্করাচার্য-রচিত "মূঢ় জহীহি ধনাগমতৃষ্ণাং" ইত্যাদি সংস্কৃত গান নিবিষ্ট হইল? মুন্সী জালালউদ্দিন-রচিত "আহে বন্দে খোদা, ঘুরা ছুক্তা কারো" ইত্যাদি দুর্বোধ উর্দুগান ইহার মধ্যে দেখা যায় কেন! গ্রন্থের উদ্দেশ্যবহির্ভূত গান আরও অনেক এই গ্রন্থে দেখা যায়। একটা তো নিয়ম রক্ষা, একটা তো গণ্ডি থাকা আবশ্যক। নহিলে, বিশ্বে যত গান আছে সকলেই তো এই গ্রন্থের মধ্যে স্থান পাইবার জন্য নালিশ উপস্থিত করিতে পারে। দ্বিতীয় কথা— আমরা কেন যে প্রাচীন ও অশিক্ষিত লোকের রচিত সংগীত বিশেষ মনোযোগ সহকারে দেখিতে চাই তাহার কারণ আছে। আধুনিক শিক্ষিত লোকদিগের অবস্থা পরস্পরের সহিত প্রায় সমান। আমরা সকলেই একত্রে শিক্ষা লাভ করি, আমাদের সকলেরই হৃদয় প্রায় এক ছাঁচে ঢালাই করা। এই নিমিত্ত আধুনিক হৃদয়ের নিকট হইতে আমাদের হৃদয়ের প্রতিধ্বনি পাইলে আমরা তেমন চমৎকৃত হই না। কিন্তু, প্রাচীন সাহিত্যের মধ্যে যদি আমরা আমাদের প্রাণের গানের একটা মিল খুঁজিয়া পাই, তবে আমাদের কী বিস্ময়, কী আনন্দ। আনন্দ কেন হয়? তৎক্ষণাৎ সহসা মুহূর্তের জন্য বিদ্যুতালোকে আমাদের হৃদয়ের অতি বিপুল স্থায়ী প্রতিষ্ঠাভূমি আমরা দেখিতে পাই বলিয়া। আমরা দেখিতে পাই, মগ্নতরী হতভাগ্যের ন্যায় আমাদের এই হৃদয় ক্ষণস্থায়ী যুগবিশেষের অভ্যাস ও শিক্ষা নামক খরস্রোতে ভাসমান বিচ্ছিন্ন কাষ্ঠখণ্ড আশ্রয় করিয়া ভাসিয়া

বেড়াইতেছে না। অসীম মানবহৃদয়ের মধ্যে ইহার নীড় প্রতিষ্ঠিত। আমাদের হৃদয়ের উপরে ততই আমাদের বিশ্বাস জন্মে, সুতরাং ততই আমরা বললাভ করিতে থাকি। আমরা তখন যুগের সহিত যুগান্তরের গ্রন্থনসূত্র দেখিতে পাই। আমার এই হৃদয়ের পানীয়, এ কি আমার নিজের হৃদয়স্থিত সংকীর্ণ কূপের পঙ্ক হইতে উত্থিত, না অভ্রভেদী মানবহৃদয়ের গঙ্গোত্রীশিখরনিঃসৃত সুদীর্ঘ অতীত কালের শ্যামল ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া প্রবাহিত বিশ্ব সাধারণের সেবনীয় স্রোতস্বিনীর জল! যদি কোনো সুযোগে জানিতে পারি শেষোক্তটিই সত্য, তবে হৃদয় কী প্রসন্ন হয়। প্রাচীন কবিতার মধ্যে আমাদের হৃদয়ের ঐক্য দেখিতে পাইলে আমাদের হৃদয় সেই প্রসন্নতা লাভ করে! অতীত কালের প্রবাহধারা যে হৃদয়ে আসিয়া শুকাইয়া যায়, সে হৃদয় কি মরুভূমি।

ওরে বংশীবট, অক্ষয় বট, কোথা রে তমাল বন!
ওরে বৃন্দাবনের তরুলতা শুকায়েছে কি কারণ!
ওরে শ্যামকুঞ্জ, রাধা কুঞ্জ, কোথা গিরি গোবর্ধন!

গ্রন্থ হইতে একটি গান উদ্‌ধৃত করিয়া আমাদের বক্তব্যের উপসংহার করি।

ঐ বুঝি এসেছি বৃন্দাবন।
আমায় বলে দে রে নিতাই ধন।।
ওরে বৃন্দাবনের পশুপাখীর রব শুনি না কি কারণ!

কেন এ বিলাপ! এ বৃন্দাবনের মধ্যে সে বৃন্দাবন নাই বলিয়া। বর্তমানের সহিত অতীতের একেবারে বিচ্ছেদ হইয়াছে বলিয়া! তা যদি না হইত, আজ যদি সেই কুঞ্জের একটি লতাও দৈবাৎ চোখে পড়িত, তবে সেই ক্ষীণ লতাপাশের দ্বারা পুরাতন বৃন্দাবনের কত মাধুরী বাঁধা দেখিতে পাইতাম! আমাদের হৃদয়ের কত তৃপ্তি হইত!

স্ত্রী শিক্ষা বিষয়ক আপত্তি খণ্ডন।—

কালীকচ্ছের কোনো পণ্ডিত স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে কতকগুলি আপত্তি উত্থাপিত করায় কালীকচ্ছ সার্বজনিক সভান্তর্গত স্ত্রীশিক্ষা বিভাগের সম্পাদিকা শ্রীমতী গুণময়ী— সেই আপত্তি সকল খণ্ডন করিয়া উল্লিখিত পুস্তিকাখানি রচনা করিয়াছেন।

পণ্ডিত মহাশয় যে আটটি আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন, তাহার দারুণ গুরুত্ব পাঠকদিগকে অনুভব করাইবার জন্য আমরা নিম্নে সমস্তগুলিই উঠাইয়া দিলাম।

আপত্তি।

১। স্ত্রীলোকের বিদ্যাশিক্ষার আবশ্যক কী? শিখিলে উপকার কী?
২। স্ত্রীলোকে লেখাপড়া শিখিলে অন্ধ হয়।
৩। স্ত্রীলোকে লেখাপড়া শিখিলে বিধবা হয়।
৪। স্ত্রীলোকের, লেখাপড়া শিখিলে, সন্তান হয় না।
৫। স্ত্রীলোক শিক্ষিতা হইলে, অবিনীতা, লজ্জাহীনা ও অকর্মণ্যা হয়।
৬। লেখাপড়া করিয়া কি মেয়েরা চাকুরি করিবে না জমিদারি মহাজনী করিবে?
৭। মেয়ে লেখাপড়া না শিখিলে কী ক্ষতি আছে।
৮। বিদ্যাশিক্ষায় নারীগণের চরিত্র দোষ জন্মে?

আপত্তিগুলির অধিকাংশই এমনতর যে একজন বালিকার মুখেও শোভা পায় না— পণ্ডিতের মুখে যে কিরূপ সাজে তাহা সকলেই বুঝিবেন। শ্রীমতী গুণময়ী যে আপত্তিগুলি অতি সহজেই খণ্ডন করিয়াছেন তাহা ইহার পর বলা বাহুল্য।

ভাষাশিক্ষা—

গ্রন্থকারের নাম নাই। গ্রন্থকর্তা নিজেই লিখিয়াছেন যে এই পুস্তকখানি ইংরাজি প্রণালী অনুসারে লিখিত, বাস্তবিকই তাহা সত্য। আজকাল "A Higher English Grammar, by Bain."

"Studies in English" by W. Mc. Mordie, Translation and Retranslation by Gangadhor Banerjee. প্রভৃতি যে-সকল পুস্তক এন্ট্রেন্স পরীক্ষার্থী বালক মাত্রেই পড়িয়া থাকেন, বলা বাহুল্য যে এই পুস্তকগুলির সম্পূর্ণ সাহায্য গ্রহণ করিয়া এই পুস্তকখানি রচিত হইয়াছে। পুস্তকখানি পাঠে, লেখকের ভাষা শিক্ষা দিবার সুরুচি দেখিয়া আমরা সন্তুষ্ট হইয়াছি। ইঁহার সহিত আমাদের অনেকগুলি মতের ঐক্য হইয়াছে, এবং সে মতগুলি সুরুচিসংগত জ্ঞান করি। আমাদিগের বিশ্বাস যে পুস্তকখানি পাঠে ব্যাকরণজ্ঞ বালকদিগের উপকার জন্মিতে পারে।

ভারতী
ভাদ্র, আশ্বিন ১২৯১

লালা গোলোকচাঁদ। পারিবারিক নাটক। শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র বসু।

নাটকটি অসম্ভব আতিশয্যে পরিপূর্ণ। সমস্তটা একটা সামাজিক ভেলকির মতো। কতকগুলি অদ্ভুত ভালো লোক এবং অদ্ভুত মন্দ লোক একটা অদ্ভুত সমাজে যথেচ্ছা অদ্ভুত কাজ করিয়া যাইতেছে, মাথার উপরে একটা বুদ্ধিমান অভিভাবক কেহ নাই। স্থানে স্থানে লেখকের পারিবারিক চিত্ররচনায় ক্ষমতা প্রকাশ পাইয়াছে। তীর্থযাত্রাকালে বৃদ্ধ কর্তা-গিন্নির গৃহত্যাগের দৃশ্য গ্রন্থের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট অংশ।

দেহাত্মিক-তত্ত্ব। ডাক্তার সাহা প্রণীত।

এই গ্রন্থে শ্রীদর্শন রাজচক্রবর্তী নামক একব্যক্তি গুরুর আসনে উপবিষ্ট। ভোলানাথ দাস নামক এক ব্যক্তি তাঁহার উপযুক্ত শিষ্য। উভয়ের মধ্যে কথোপকথন চলিতেছে। গুরুজি রূপকচ্ছলে জ্ঞানগর্ভ উপদেশ দিতেছেন— শিষ্য সেই উপদেশ শুনিয়া কৃতার্থ হইতেছেন। দেহ-মন ও জগতের শক্তি সকলকে দেব-দেবী রূপে কল্পনা করিয়া জগৎ-ব্রহ্মবাদের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। "যোগাকর্ষণ-দেব" "মাধ্যাকর্ষণ-দেব" "রসায়ন-দেব" "মস্তিষ্কাদেবী" প্রভৃতি দেব-দেবীর অবতারণা করা হইয়াছে। গ্রন্থের সার মর্ম এই যে, ব্রহ্ম কতকটা দৈহিকভাবে ও কতকটা আত্মিকভাবে আত্মস্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন। এবং সকল ধর্মের মধ্যেই কতকটা দৈহিক ও কতকটা আত্মিক ভাব বিদ্যমান। উপদেশের কিঞ্চিৎ নমুনা নিম্নে দেওয়া যাইতেছে।

"বলি, মস্তিষ্কা দেবি! আপনার কয়টি পুত্র ও কয়টি কন্যা আমায় বলিবেন কি?"

"ভোলানাথ! তুমি কী নিমিত্ত এরূপ প্রশ্ন করিতেছ? তোমার সাধ্য নয় যে, তুমি এ সকল বুঝিতে পার। এই দেখো, আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা, ইহার নাম স্পর্শ সত্তা বা ত্বক্‌, এই আমার দ্বিতীয় কন্যা, রসনা। এই আমার প্রথম পুত্র নয়ন, দ্বিতীয় পুত্র শ্রবণ, এই আমার তৃতীয় কন্যা নাসিকা" ইত্যাদি। গ্রন্থের "দৈহিক ভাবটি" অতি পরিপাটি। গ্রন্থের আত্মিক ভাব বুঝিবার জন্য ভোলানাথের ন্যায় সমজদার ব্যক্তির আবশ্যক। যাহা হউক, আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এইটুকু বুঝিতে পারি, এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে "মস্তিষ্কা দেবী"কে বিবিধ শৈত্য-উপচারে ঠাণ্ডা রাখা কর্তব্য।

সাধনা
ফাল্গুন ১২৯৮

সংগ্রহ। শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

গ্রন্থখানি ছোটো ছোটো গল্পের সমষ্টি। ইহার অধিকাংশ গল্পই সুপাঠ্য। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় ইহাই লেখকের পক্ষে যথেষ্ট প্রশংসার বিষয় নহে। যিনি "শ্যামার কাহিনী" লিখিতে পারেন তাঁহার নিকট হইতে কেবলমাত্র কৌতূহল অথবা বিস্ময়জনক গল্প আমরা প্রত্যাশা করি না। "শ্যামার কাহিনী" গল্পটি আদ্যোপান্ত জীবন্ত এবং মূর্তিমান, ইহার কোথাও বিচ্ছেদ নাই। অন্য গল্পগুলিতে লেখকের নৈপুণ্য থাকিতে পারে কিন্তু এই গল্পেই তাঁহার প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়।

লীলা। শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

লেখক এই গ্রন্থখানিকে "উপন্যাস" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন ইহা লইয়াই তাঁহার সহিত আমাদের প্রধান বিরোধ। ইহাতে উপন্যাসের সুসংলগ্নতা নাই এবং গল্পের অংশ অতি যৎসামান্য ও অসম্পূর্ণ। মাঝে মাঝে অনেক অকারণ অনাবশ্যক পরিচ্ছেদ সংযোগ করা হইয়াছে, এবং লেখকের স্বগত-উক্তিও স্থানে স্থানে সুদীর্ঘ এবং গায়েপড়া গোছের হইয়াছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও এই বইখানি পড়িয়া আমরা বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছি। বাংলার গার্হস্থ্য চিত্র ইহাতে উজ্জ্বলরূপে পরিস্ফুট হইয়াছে। গ্রন্থের নাম যদিও 'লীলা' কিন্তু কিরণ ও সুরেশচন্দ্রই ইহার প্রধান আলেখ্য। তাহাদের বাল্যদাম্পত্যের সুকুমার প্রেমাঙ্কুর-উদ্‌গম হইতে আরম্ভ করিয়া সংসারক্ষেত্রে নানা উপলক্ষে পরস্পরের মধ্যে ঈষৎ মনোবিচ্ছেদের উপক্রম পর্যন্ত আমরা আগ্রহের সহিত অনুসরণ করিয়াছি— অন্যান্য আর সমস্ত কথাই যেন ইহার মধ্যে মধ্যে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া বোধ হইয়াছে। যাহা হউক, বইখানি পড়িতে পড়িতে দুই-একটি গৃহস্থ ঘর আমাদের নিকট সুপরিচিত হইয়া উঠে। কিরণ, কিরণের মা, দিদিমা, বিন্দুবাসিনী, দাসী, ব্রাহ্মণী, প্রফুল্ল ইহারা সকলেই বাঙালি পাঠকমাত্রেরই চেনা লোক, ইহারা বঙ্গগৃহের আত্মীয় কুটুম্ব, কেবল সুরেশচন্দ্রকে স্থানে স্থানে ভালো বুঝিতে পারি নাই এবং লীলা ও আনন্দময়ী তেমন জীবন্তবৎ জাগ্রত হইয়া উঠে নাই। মনোমোহিনী অল্পই দেখা দিয়াছেন কিন্তু কী আবশ্যক উপলক্ষে যে আমরা তাঁহার সাক্ষাৎকার-সৌভাগ্য লাভ করিলাম তাহা বলিতে পারি না; কেবল, পিতৃধন-গর্বিতা রমণীর চিত্রাঙ্কনে প্রলুব্ধ হইয়া লেখক ইঁহার অনাবশ্যক অবতারণা করিয়াছেন তাহা বেশ বুঝা যায়।— যদিও গল্পের প্রত্যাশা উদ্রেক করিয়া গ্রন্থকার আমাদিগকে বঞ্চিত করিয়াছেন তথাপি বঙ্গগৃহের উজ্জ্বল চিত্রদর্শনসুখলাভ করিয়া তাঁহাকে আনন্দান্তঃকরণে মার্জনা করিলাম।

রায় মহাশয়। শ্রীহরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

যখন এই গল্পটি খণ্ডশ 'সাহিত্যে' প্রকাশিত হইতেছিল তখনি আমরা 'সাধনা'য় ইহার প্রশংসাবাদ করিয়াছিলাম। লেখকের ভাষা এবং রচনানৈপুণ্যে আমরা পরম প্রীতিলাভ করিয়াছি। তাঁহার লেখার বেশ-একটি বাঁধুনি আছে, আবোল তাবোল নাই; লেখক যেন সমস্ত বিষয়টিকে সমস্ত ব্যাপারটিকে দৃঢ়মুষ্টিতে ধরিতে পারিয়াছেন; যে একটি নিষ্ঠুর কাণ্ড বর্ণনা করিয়াছেন তাহার কিছুই যেন তাঁহার হাত এড়াইয়া যাইতে পারে নাই। জমিদারি সেরেস্তার গোমস্তা মুহুরি হইতে সামান্য প্রজা পর্যন্ত সকলেই যথাযথ পরিমাণে বাহুল্যবর্জিত হইয়া আপন আপন কাজ দেখাইয়া গেছে। এরূপ বাস্তব চিত্র বঙ্গসাহিত্যে বিরল।

প্রবাসের পত্র। শ্রীনবীনচন্দ্র সেন।

প্রকাশক বলিতেছেন "সাধারণের জন্য পত্রগুলি লিখিত হয় নাই। নবীনবাবু ভ্রমণ-উপলক্ষে যেখানে যাইতেন সেখান হইতে সহধর্মিণীকে পত্র লিখিতেন। পত্রগুলিও তাড়াতাড়ি লেখা। হয়তো রেলওয়ে স্টেশনে ট্রেনের অপেক্ষায় বিশ্রামগৃহে বসিয়া আছেন এবং পত্র লিখিতেছেন।'— এই গ্রন্থখানির সমালোচনা অতিশয় কঠিন কার্য। কারণ, ইহাকে প্রকাশ্য গ্রন্থ হিসাবে দেখিব, না, পত্র হিসাবে দেখিব ভাবিয়া পাই না। পড়িয়া মনে হয় যেন গোপন পত্র ভ্রমক্রমে প্রকাশ হইয়া গেছে। এ-সকল পত্র কবির জীবনচরিতের উপাদানস্বরূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে কিন্তু স্বতন্ত্র গ্রন্থরূপে বাহির হইতে পারে ইহাতে এমন কোনো বিশেষত্ব নাই। যখন একান্তই গ্রন্থ আকারে বাহির হইল তখন স্থানে স্থানে বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়সম্বন্ধীয় যে-সকল বিশ্রব্ধ কথা আছে সেগুলি বাদ দিলেই ভালো হইত। প্রথম পত্রেই উমেশবাবু ও মধুবাবুর স্ত্রীর তুলনা আমাদের নিকট সংকোচজনক বোধ হইয়াছে— এমন আরও দৃষ্টান্ত আছে। এইখানে প্রসঙ্গক্রমে আরও একটি কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। আজকালকার উচ্ছ্বাসময় লেখামাত্রেই স্থানে অস্থানে "হরি হরি" "মরি মরি" এবং "বুঝি" শব্দ-প্রয়োগের কিছু বাড়াবাড়ি

দেখা যায়। উহা আমাদের কাছে কেমন একটা ভঙ্গিমা বলিয়া ঠেকে— প্রথম যে লেখক এই ভঙ্গিটি বাহির করিয়াছিলেন তাঁহাকে কথঞ্চিৎ মার্জনা করা যায়— কিন্তু যখন দেখা যায় আজকাল অনেক লেখকই এই-সকল সুলভ উচ্ছ্বাসোক্তির ছড়াছড়ি করিয়া হৃদয়বাহুল্য প্রকাশ করিতে চেষ্টা করেন তখন অসহ্য হইয়া উঠে। নবীনবাবুও যে এই-সকল সামান্য বাক্য-কৌশল অবলম্বন করিবেন ইহা আমাদের নিকট নিতান্ত পরিতাপের বিষয় বলিয়া মনে হয়।

অপরিচিতের পত্র।
জগতের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী হইয়া জ-রি নামক প্রচ্ছন্ননামা কোনো ব্যক্তি এই পুস্তক ছাপাইয়াছেন। জগৎ ক্ষমা করিবে কি না জানি না কিন্তু আমরা এ ধৃষ্টতা মার্জনা করিতে পারি না। ইহাতে নির্লজ্জ এবং ঝুঁটা সেন্টিমেন্টালিটির চূড়ান্ত দেখানো হইয়াছে। এবং সর্বশেষে আড়ম্বরপূর্বক জগতের নিকট ক্ষমাভিক্ষার অভিনয়টি সর্বাপেক্ষা অসহ্য।

প্রকৃতির শিক্ষা।
গদ্যে অবিশ্রাম হৃদয়োচ্ছ্বাস বড়ো অসংগত শুনিতে হয়। গদ্যে যেমন ছন্দের সংযম নাই তেমনি ভাবের সংযম অত্যাবশ্যক— নতুবা তাহার কোনো বন্ধন থাকে না, সমস্ত অশোভনভাবে আলুলায়িত হইয়া যায়। গদ্যে যদি হৃদয়ভাব প্রকাশ করিতেই হয় তবে তাহা পরিমিত, সংযত এবং দৃঢ় হওয়া আবশ্যক। সমালোচ্য গ্রন্থের আরম্ভ দেখিয়াই ভয় হয়।

"আর পারি না! সংসারের উত্তপ্ত মরুভূমিতে শান্তির পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ হইয়া আর ঘুরিতে পারি না। প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিতেছে। শুষ্কতার উষ্ণ নিশ্বাসে হৃদয়ের সদ্ভাব ফল শুকাইয়া যাইতেছে, চারি দিকে কঠোরতা, কেবল কঠোরতাই দেখিতেছি। কিছুতেই তৃপ্তি হইতেছে না। জীবনটা অত্যন্ত নীরস বোধ হইতেছে। যেন কী হৃদয়হীন সংকীর্ণতার মধ্যে আবদ্ধ হইয়া পড়িতেছি, যেন ভালো করিয়া, বুক ভরিয়া নিশ্বাস ফেলিতে পারিতেছি না। কী যে ভার বুকের উপর চাপিয়া ধরিতেছে, বুঝিতে পারিতেছি না।... আর ভালো লাগে না ছাই সংসার!"

যদি সুন্দর করিয়া প্রকাশ করিতে না পারা যায় তবে সাহিত্যে হৃদয়ের ভাব প্রকাশের কোনো অর্থ নাই। কারণ, হৃদয়ভাব চিরপুরাতন, তাহা নূতন সংবাদও নহে এবং বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালকও নহে। তাহা সহস্রবার শুনিয়া কাহারও কোনো লাভ নাই। তবে যদি ভাবটিকে অপরূপ নূতন সৌন্দর্য দিয়া প্রকাশ করিতে পারা যায় তবেই তাহা মানবের চিরসম্পত্তিস্বরূপ সাহিত্যে স্থান পায়। এইজন্য ছন্দোময় পদ্য হৃদয়ভাব প্রকাশের অধিক উপযোগী। ভাবের সহিত একটি সংগীত যোগ করিয়া তাহার অন্তরের চিরনূতন সৌন্দর্যটি বাহির করিয়া আনে। কিন্তু সাধারণ গদ্যে হৃদয়োচ্ছ্বাস প্রকাশ করিতে গেলে তাহা প্রায়ই নিতান্ত মূল্যহীন প্রগল্‌ভতা হইয়া পড়ে এবং তাহার মধ্যে যদি বা কোনো চিন্তাসাধ্য জ্ঞানের কথা থাকে তবে তাহাও উচ্ছ্বাসের ফেনরাশির মধ্যে প্রচ্ছন্ন হইয়া যায়।

দ্বারকানাথ মিত্রের জীবনী। শ্রীকালীপ্রসন্ন দত্ত।
এ গ্রন্থখানি লিখিবার ভার যোগ্যতর হস্তে সমর্পিত হইলে আমরা সুখী হইতাম। গ্রন্থকার যদি নিজের বক্তৃতা কিঞ্চিৎ ক্ষান্ত রাখিয়া কেবলমাত্র দ্বারকানাথের জীবনীর প্রতি মনোযোগ করিতেন তবে আমরা তাঁহার নিকট অধিকতর কৃতজ্ঞ হইতাম। আমরা মহৎ ব্যক্তির জীবনচরিত পাঠ করিয়া আনন্দলাভ করিব এই আশ্বাসে গ্রন্থখানি পড়িতে বসি, কিন্তু মাঝের হইতে সমাজ ও লোকব্যবহার সম্বন্ধে কালীপ্রসন্নবাবুর মতামত শুনিবার জন্য আমাদের কী এমন মাথাব্যথা পড়িয়াছে! তিনি যেন পাঠকসাধারণের একটি জ্যেষ্ঠতাত অভিভাবক— একটি ভালো ছেলেকে দাঁড় করাইয়া ক্রমাগত অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিতেছেন "দেখ্ দেখি এ ছেলেটি কেমন! আর তোরা এমন লক্ষ্মীছাড়া হলি কেন!" আমরা দ্বারকানাথ মিত্রকে অন্তরের সহিত ভক্তি করি

এইজন্য কালীপ্রসন্নবাবুর মতামত ও সুমহৎ উপদেশ বাক্যাবলি হইতে পৃথক করিয়া আমরা স্বরূপত তাঁহাকেই দেখিতে ইচ্ছা করি। যাঁহারা বড়োলোকের জীবনী লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাঁহাদের সসম্ভ্রম বিনয়ের সহিত আপনাকে অন্তরালে রাখা নিতান্ত আবশ্যক। অন্যত্র তাঁহাদের মতের মূল্য থাকিতে পারে কিন্তু যেখানে বড়োলোকের কথা হইতেছে সেখানে থাকিয়া থাকিয়া নিজের কথার প্রতি সাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিলে বিরক্তিভাজন হইতে হয়।

সাধনা
অগ্রহায়ণ ১২৯৯

অশোকচরিত। শ্রীকৃষ্ণবিহারী সেন প্রণীত।
এই গ্রন্থখানি সকলেরই পাঠ করা উচিত। এইরূপ গ্রন্থ বঙ্গভাষায় দুর্লভ। শুধু বঙ্গভাষায় কেন, কোনো বিদেশীয় গ্রন্থে অশোকের চরিত এত বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হয় নাই। প্রসঙ্গক্রমে ইহাতে যে-সকল জ্ঞাতব্য বিষয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহা সমস্ত জানিতে হইলে অনেকগুলি গ্রন্থ পাঠ করিতে হয়। তাহা সকলের সাধ্যায়ত্ত নহে। গ্রন্থকার তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্যের ফল একাধারে সন্নিবিষ্ট করিয়া, সাধারণ পাঠকবর্গের মহৎ উপকার করিয়াছেন। এই অশোকচরিত পাঠ করিলে তৎকালীন ভারতবর্ষের ইতিহাস, অবস্থা, ভাষা, সভ্যতার উন্নতি প্রভৃতি অনেক বিষয়ের আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই গ্রন্থের আর-একটি গুণ এই যে, ইহা অতি সহজ প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত। গ্রন্থের উপসংহারে, অশোকচরিত সম্বন্ধীয় একটি ক্ষুদ্র নাটিকা সংযোজিত হইয়াছে। ইহাকে একটি 'ফাউ' স্বরূপ গণ্য করা যাইতে পারে। 'ফাউ'টিও ফেলার সামগ্রী নহে— উহাতেও একটু বেশ রস আছে।

পঞ্চামৃত। শ্রীতারাকুমার কবিরত্ন প্রণীত।
এই গ্রন্থে আমাদের দেশের পূর্বতন ভগবদ্‌ভক্ত মহাত্মাদিগের যে-সকল কল্যাণপ্রদ বচন উদ্‌ধৃত হইয়াছে তাহা বাছা বাছা রত্ন। এই গ্রন্থখানি কবিরত্ন মহাশয় অনাথ কুষ্ঠরোগীদিগের উপকারার্থ উৎসর্গ করিয়াছেন। ইহার জন্য তিনি তো সকলের কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেনই; কিন্তু জনসমাজে একজন যদি শারীরিক ব্যাধিতে প্রপীড়িত হয়, তবে তাহার তুলনায় শতসহস্র ব্যক্তি মানসিক ব্যাধিতে প্রপীড়িত। শেষোক্ত ব্যাধির ঔষধ যদি কিছু থাকে, তবে তাহা শুভানুধ্যায়ী দয়ার্দ্রচিত্ত সাধু ব্যক্তিদিগের অমৃতময় আশ্বাসবাণী এবং উপদেশ। বর্তমান গ্রন্থের প্রত্যেক পৃষ্ঠায় শেষোক্ত-রূপ মহৌষধ স্তরে স্তরে সাজানো রহিয়াছে। এইজন্য কবিরত্ন মহাশয়ের বিরচিত গ্রন্থ জয়যুক্ত হউক, ইহা আমাদিগের আন্তরিক প্রার্থনা।

সাধনা
পৌষ ১২৯৯

কঙ্কাবতী। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়।
এই উপন্যাসটি মোটের উপর যে আমাদের বিশেষ ভালো লাগিয়াছে তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। লেখাটি পাকা এবং পরিষ্কার। লেখক অতি সহজে সরল ভাষায় আমাদের কৌতুক এবং করুণা উদ্রেক করিয়াছেন এবং বিনা আড়ম্বরে আপনার কল্পনাশক্তির পরিচয় দিয়াছেন। গল্পটি দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে প্রকৃত ঘটনা এবং দ্বিতীয় ভাগে অসম্ভব অমূলক অদ্ভুত রসের কথা। এইরূপ অদ্ভুত রূপকথা ভালো করিয়া লেখা বিশেষ ক্ষমতার কাজ। অসম্ভবের রাজ্যে যেখানে কোনো বাঁধা নিয়ম, কোনো চিহ্নিত রাজপথ নাই, সেখানে স্বেচ্ছাবিহারিণী কল্পনাকে একটি নিগূঢ় নিয়মপথে পরিচালনা করিতে গুণপনা চাই। কারণ রচনার

বিষয় বাহ্যত যতই অসংগত ও অদ্ভুত হউক-না কেন, রসের অবতারণা করিতে হইলে তাহাকে সাহিত্যের নিয়ম বন্ধনে বাঁধিতে হইবে। রূপকথার ঠিক স্বরূপটি, তাহার বাল্য-সারল্য, তাহার অসন্দিগ্ধ বিশ্বস্ত ভাবটুকু লেখক যে রক্ষা করিতে পারিয়াছেন, ইহা তাঁহার পক্ষে অল্প প্রশংসার বিষয় নহে।

কিন্তু লেখক যে তাঁহার উপাখ্যানের দ্বিতীয় অংশকে রোগশয্যার স্বপ্ন বলিয়া চালাইবার চেষ্টা করিয়াছেন তাহাতে তিনি কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। ইহা রূপকথা, ইহা স্বপ্ন নহে। স্বপ্নের ন্যায় সৃষ্টিছাড়া বটে, কিন্তু স্বপ্নের ন্যায় অসংলগ্ন নহে। বরাবর একটি গল্পের সূত্র চলিয়া গিয়াছে। স্বপ্নে এমন কোনো অংশ থাকিতে পারে না যাহা স্বপ্নদর্শী লোকের অগোচর, কিন্তু এই স্বপ্নের মধ্যে মধ্যে লেখক এমন সকল ঘটনার অবতারণা করিয়াছেন যাহা নেপথ্যবর্তী, যাহা বালিকার স্বপ্নদৃষ্টির সম্মুখে ঘটিতেছে না। তাহা ছাড়া মধ্যে মধ্যে এমন সকল ভাব ও দৃশ্যের সংঘটন করা হইয়াছে, যাহা ঠিক বালিকার স্বপ্নের আয়ত্তগম্য নহে। দ্বিতীয়ত, উপাখ্যানের প্রথম অংশের বাস্তব ঘটনা এতদূর পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে যে, মধ্যে সহসা অসম্ভব রাজ্যে উত্তীর্ণ হইয়া পাঠকের বিরক্তিমিশ্রিত বিস্ময়ের উদ্রেক হয়। একটা গল্প যেন রেলগাড়িতে করিয়া চলিতেছিল, হঠাৎ অর্ধরাত্রে অজ্ঞাতসারে বিপরীত দিক হইতে আর-একটা গাড়ি আসিয়া ধাক্কা দিল এবং সমস্তটা রেলচ্যুত হইয়া মারা গেল। পাঠকের মনে রীতিমতো করুণা ও কৌতূহল উদ্রেক করিয়া দিয়া অসতর্কে তাহার সহিত এরূপ রূঢ় ব্যবহার করা সাহিত্য-শিষ্টাচারের বহির্ভূত। এই উপন্যাসটি পড়িতে পড়িতে 'অ্যালিস্ ইন্ দি ওয়ান্ডারল্যান্ড' নামক একটি ইংরাজি গ্রন্থ মনে পড়ে। সেও এইরূপ অসম্ভব, অবাস্তব, কৌতুকজনক বালিকার স্বপ্ন। কিন্তু তাহাতে বাস্তবের সহিত অবাস্তবের এরূপ নিকট সংঘর্ষ নাই। এবং তাহা যথার্থ স্বপ্নের ন্যায় অসংলগ্ন, পরিবর্তনশীল ও অত্যন্ত আমোদজনক।

কিন্তু গ্রন্থখানি পড়িতে পড়িতে আমরা এই-সমস্ত ত্রুটি মার্জনা করিয়াছি। এবং আমাদের মনে আশার সঞ্চার হইয়াছে যে, এতদিন পরে বাংলায় এমন লেখকের অভ্যুদয় হইতেছে যাঁহার লেখা আমাদের দেশের বালক-বালিকাদের এবং তাহাদের পিতামাতার মনোরঞ্জন করিতে পারিবে। বালক-বালিকাদের উপযোগী যথার্থ সরস গ্রন্থ আমাদের দেশের অতি অল্প লোকেই লিখিতে পারেন। তাহার একটা কারণ, আমরা জাতটা কিছু স্বভাববৃদ্ধ, পৃথিবীর অধিকাংশ কাজকেই ছেলেমানুষি মনে করি; সে স্থলে যথার্থ ছেলেমানুষি আমাদের কাছে যে কতখানি অবজ্ঞার যোগ্য তাহা সকলেই অবগত আছেন। আমরা ছেলেদের খেলাধুলা গোলমাল প্রায়ই ধমক দিয়া বন্ধ করি, তাহাদের বাল্য উচ্ছ্বাস দমন করিয়া দিই, তাহাদিগকে ইস্কুলের পড়ায় ক্রমিক নিযুক্ত রাখিতে চাহি, এবং যে ছেলের মুখে একটি কথা ও চক্ষে পলকপাত ব্যতীত অঙ্গ প্রত্যঙ্গে কোনো প্রকার গতি নাই, তাহাকেই শিষ্ট ছেলে বলিয়া প্রশংসা করি। আমরা ছেলেকে ছেলেমানুষ হইতে দিতে চাহি না, অতএব আমরা ছেলেমানুষি বই পছন্দই বা কেন করিব, রচনার তো কথাই নাই। শিশুপাঠ্য গ্রন্থে আমরা কেবল গলা গম্ভীর ও বদনমণ্ডল বিকটাকার করিয়া নীতি উপদেশ দিই। য়ুরোপীয় জাতিদের কাজও যেমন বিস্তর, খেলারও তেমনি সীমা নাই। যেমন তাহারা জ্ঞানে বিজ্ঞানে ও সকল প্রকার কার্যানুষ্ঠানে পরিপক্কতা লাভ করিয়াছে, তেমনি খেলাধুলা, আমোদপ্রমোদ কৌতুক-পরিহাসে বালকের ন্যায় তাহাদের তরুণতা। এইজন্য তাহাদের সাহিত্যে ছেলেদের বই এত বহুল এবং এমন চমৎকার। তাহারা অনায়াসে ছেলে হইয়া ছেলেদের মনোহরণ করিতে পারে এবং সে কার্যটা তাহারা অনাবশ্যক ও অযোগ্য মনে করে না। তাহাদের সমস্ত সাহিত্যেই এই তরুণতার আভাস পাওয়া যায়। চার্লস ল্যাম্বের অধিকাংশ প্রবন্ধগুলি যেরূপ উদ্দেশ্যবিহীন অবিমিশ্র হাস্যরসপূর্ণ, সেরূপ প্রবন্ধ বাংলায় বাহির হইলে, লেখকের প্রতি পাঠকের নিতান্ত অবজ্ঞার উদয় হইত— তাহারা পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিয়া বলিত, হইল কী? ইহা হইতে কী পাওয়া গেল? ইহার তাৎপর্য কী, লক্ষ্য কী? তাহারা পাকালোক, অত্যন্ত বিজ্ঞ,

সরস্বতীর সঙ্গেও লাভের ব্যবসায় চালাইতে চায়; কেবল হাস্য, কেবল আনন্দ লইয়া সন্তুষ্ট নহে, হাতে কী রহিল দেখিতে চাহে। আমাদের আলোচ্য গ্রন্থে বর্ণিত একঠেঙো মুল্লুকনিবাসী শ্রীমান ঘ্যাঘো ভূতের সহিত শ্রীমতী নাকেশ্বরী প্রেতিনীর শুভবিবাহবার্তা আমাদের এই দুইঠেঙো মুল্লুকের অত্যন্ত ধীর গম্ভীর সম্ভ্রান্ত পাঠকসম্প্রদায়ের কিরূপ ঠেকিবে আমাদের সন্দেহ আছে। আমাদের নিবেদন এই যে, সকল কথারই যে অর্থ আছে, তাৎপর্য আছে, তাহা নহে, পৃথিবীতে বিস্তর বাজে কথা, মজার কথা, অদ্ভুত কথা থাকাতেই দুটো-চারটে কাজের কথা, তত্ত্বকথা, আমরা ধারণা করিতে পারি। আমাদের দেশের এই পঞ্চবিংশতিকোটি সুগম্ভীর কাঠের পুতুলের মধ্যে যদি কোনো দয়াময় দেবতা একটা বৈদ্যুতিক তার সংযোগে খুব খানিকটা কৌতুকরস এবং বাল্যচাপল্য সঞ্চার করিয়া দিয়া এক মুহূর্তে নাচাইয়া তুলিতে পারেন তবে সেই অকারণ আনন্দের উদ্দাম চাঞ্চল্যে আমাদের ভিতরকার অনেক সার পদার্থ জাগ্রত হইয়া উঠিতে পারে। সাহিত্য যে সকল সময়ে আমাদের হাতে স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষগোচর লাভ আনিয়া দেয় তাহা নহে; আমাদের প্রকৃতির মধ্যে একটা আনন্দপূর্ণ আন্দোলন উপস্থিত করিয়া তাহাকে সজাগ ও সজীব করিয়া রাখে। তাহাকে হাসাইয়া কাঁদাইয়া, তাহাকে বিস্মিত করিয়া, তাহাকে আঘাত করিয়া তাহাকে তরঙ্গিত করিয়া তোলে। বিশ্বের বিপুল মানবহৃদয়জলধির বিচিত্র উত্থান-পতনের সহিত সংযুক্ত করিয়া তাহার ক্ষুদ্রত্ব ও জড়ত্ব মোচন করিয়া দেয়। কখনো বাল্যের অকৃত্রিম হাস্য, কখনো যৌবনের উন্মাদ আবেগ, কখনো বার্ধক্যের স্মৃতিভারাতুর চিন্তা, কখনো অকারণ উল্লাস, কখনো সকারণ তর্ক; কখনো অমূলক কল্পনা, কখনো সমূলক তত্ত্বজ্ঞান আনয়ন করিয়া আমাদের হৃদয়ের মধ্যে মানসিক ষড়ঋতুর প্রবাহ রক্ষা করে, তাহাকে মরিয়া যাইতে দেয় না।

সাধনা
ফাল্গুন ১২৯৯

ভক্তচরিতামৃত। শ্রীঅঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য দশ আনা।
রঘুনাথ দাস গোস্বামীর জীবনচরিত। শ্রীঅঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য দুই আনা।

এই দুইখানি গ্রন্থে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ভক্তপ্রবর শ্রীমৎ রূপ, সনাতন, জীবগোস্বামী এবং রঘুনাথ দাস গোস্বামীর জীবনচরিত প্রকাশিত হইয়াছে।

সম্প্রতি শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয় নব্যভারতে রূপ ও সনাতনের অকৃত্রিম সাধুতার প্রতি সন্দেহ প্রকাশ করিয়া প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন। আমাদের সমালোচ্য গ্রন্থে রূপ সনাতনের জীবনের প্রথমাবস্থার বিবরণ সুস্পষ্ট নহে। এমন-কি, গৌড়েশ্বর হুসেন্ সাহা [শাহ্] রূপকে পরস্বলুণ্ঠনকারী পলাতক দস্যু জ্ঞান করিতেন ইহাতে তাহার উল্লেখ আছে, এবং সনাতন রাজকার্য হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য পীড়ার ভান করিয়া মিথ্যাচার অবলম্বন করিয়াছিলেন এ কথাও চরিতলেখক স্বীকার করিয়াছেন।

কিন্তু তথাপি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের পূজ্য ভক্ত সাধুচরিত্রে কলঙ্ক আরোপ করিতে সংকোচ বোধ হয়। তাহার অনেক কারণ আছে।

প্রথমত, মানুষের চরিত্র আদ্যোপান্ত সুসংগত নহে। অনেকগুলি ছিদ্র সত্ত্বেও মোটের উপরে চরিত্রবিশেষকে মহৎ বলা যাইতে পারে।

দ্বিতীয়ত, কালবিশেষে ধর্মনীতির আদর্শের কথঞ্চিৎ ইতরবিশেষ ঘটিয়া থাকে। অর্থাৎ, এক সময়ে ধর্মনীতির যে অংশে সাধারণের শৈথিল্য ছিল এখন হয়তো সে অংশে নাই অপর কোনো অংশে আছে। এক সময় ছিল, যখন সম্রাটের প্রাপ্য নবাব লুণ্ঠন করিত, নবাবের প্রাপ্য ডিহিদার লুণ্ঠন করিত এবং দস্যুতা রাজ্যতন্ত্রের মধ্যে আদ্যোপান্ত ধারাবাহিকভাবে বিরাজ করিত। সে দস্যুতা এক প্রকার প্রকাশ্য ছিল এবং সাধারণের নিকট তাহা লজ্জার কারণ না হইয়া সম্ভবত শ্লাঘার বিষয় ছিল। সকলেই জানেন অল্পকাল পূর্বেও উপরি পাওনা সম্বন্ধে প্রশ্ন ভদ্রসমাজের

মধ্যেও শিষ্টাচারবিরুদ্ধ বলিয়া গণ্য হইত না। মিথ্যাচার, বিশেষত সদুদ্দেশ্য সাধনের জন্য মিথ্যাভান, যে, আমাদের দেশে অত্যন্ত নিন্দনীয় নহে এ কথা স্বীকার করিতে আমরা লজ্জিত হইতে পারি কিন্তু এ কথা সত্য। অতএব, স্বসাময়িক সাধারণ দুর্নীতিবশত কোনো কোনো বিষয়ে সংপথভ্রষ্ট হইলেও মহৎলোকের সাধুতার প্রতি সম্পূর্ণ সন্দিহান হইবার কারণ দেখি না।

তৃতীয়ত, আমাদের সম্মুখে সমস্ত প্রমাণ বর্তমান নাই। সামান্য দুই-একটা আভাস মাত্র হইতে বিচার করা সংগত হয় না।

চতুর্থত, রূপ এবং সনাতন তাঁহাদের স্বসাময়িক প্রধান প্রধান লোকের নিকট সাধু বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের চরিত্রের মধ্যে এমন সকল গুণ ছিল যাহাতে নিকটবর্তী লোকদিগকে তাঁহারা আকৃষ্ট ও মুগ্ধ করিয়াছিলেন— এবং আজ পর্যন্ত তাহারই স্মৃতি অক্ষুণ্ণভাবে প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে। আমাদের মতে অন্য সমস্ত প্রমাণাভাবে ইহাই তাঁহাদের মহত্ত্বের যথেষ্ট প্রমাণ।

সমালোচ্য গ্রন্থে অঘোরবাবু ভক্তচরিত্র অবলম্বন করিয়া বৈষ্ণব ধর্মের নিগূঢ় তত্ত্বসকল ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এজন্য তিনি ধন্যবাদের পাত্র। ভক্তিতত্ত্ব ভক্তের জীবনীর সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রকাশ করিলে পাঠকের নিকট উভয়ই সজীব হইয়া উঠে। শুষ্ক শাস্ত্রের মধ্যে তত্ত্ব পাওয়া যাইতে পারে কিন্তু সেই তত্ত্বের গভীরতা, মাধুর্য— মানবজীবনের মধ্যে তাহার পরিণতি, অনুভব করিতে গেলে ভক্তচরিত্রের মধ্য হইতে তাহাকে উদ্ধার করিয়া দেখিতে হয়। অতএব বৈষ্ণবধর্মের সুগভীর তত্ত্বসকল যাঁহারা লাভ করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা অঘোরবাবুর এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া পরিতৃপ্ত হইবেন।

চরিত রত্নাবলী। প্রথম ভাগ। শ্রীকাশীচন্দ্র ঘোষাল প্রণীত। মূল্য চারি আনা।
ইহাতে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মাবলম্বী অনেক সাধু নরনারীর সংক্ষিপ্ত চরিত বর্ণিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে কেবল "করমেতি বাই" নামক প্রথম চরিতটি আমাদের ভালো লাগে নাই। মানবহিতৈষণার জন্য যাঁহারা সংসার বিসর্জন করেন তাঁহাদের জীবনচরিত বর্ণনযোগ্য। কিন্তু আত্মসুখের আকর্ষণে যাঁহারা সুকঠিন সংসারকৃত্য ত্যাগ করিয়া পলায়ন করেন তাঁহাদের চরিত্রকে আদর্শ জ্ঞান করিতে পারি না। করমেতি বাই স্বামীগৃহ ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে "শ্যামল সুন্দর সিন্ধু তরঙ্গ মাঝারে" নিমগ্ন হইবার জন্য গমন করিয়াছিলেন। সুখী হইয়া থাকেন তো তিনিই সুখী হইয়াছেন— আমাদের তাহাতে কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। আমরা তাঁহার হতভাগ্য স্বামীর জন্য দুঃখিত।

অর্থই অনর্থ। দারোগার দপ্তর। শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য তিন আনা।
ঠগী কাহিনী। প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড। শ্রীপ্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য দেড় টাকা।
রোমহর্ষণ গল্প অনেকের ভালো লাগে, তাঁহাদের জন্য উপরিলিখিত গ্রন্থদ্বয় রচিত হইয়াছে।

সাধনা
অগ্রহায়ণ ১৩০১

উপনিষদঃ। অর্থাৎ ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক ও মাণ্ডুক্য এই ছয়খানি উপনিষৎ। শ্রীসীতানাথ দত্ত কৃত 'শঙ্কর-কৃপা' নাম্নী টীকা ও 'প্রবোধক' নামক বঙ্গানুবাদ সহিত। সুপ্রসিদ্ধ বেদাচার্য শ্রীযুক্ত সত্যব্রত সামশ্রমী কর্তৃক সংশোধিত। মূল্য এক টাকা।
আমরা সম্পাদকোচিত সর্বজ্ঞতার ভান করিতে পারি না। আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে যে, গ্রন্থকার-কৃত উপনিষদের টীকা ও বঙ্গানুবাদে কোনোপ্রকার ভ্রম অথবা ত্রুটি আছে কি না তাহা নির্ণয় করিতে আমরা সম্পূর্ণ অশক্ত। তবে যখন সামশ্রমী মহাশয়-কর্তৃক সংশোধিত তখন আমরা বিশ্বাসপূর্বক এই টীকা এবং অনুবাদ গ্রহণ করিতে পারি। এই উপনিষৎগুলি বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়া সীতানাথবাবু যে ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন সে বিষয়েও কোনো সন্দেহ নাই। তাঁহার

টীকা ও অনুবাদের সাহায্যে জগতের এই প্রাচীনতম তত্ত্বজ্ঞানভাণ্ডারে প্রবেশলাভ করিয়া আমরা চরিতার্থ হইয়াছি।

প্রবেশ লাভ করিয়াছি এ কথা বলা ঠিক হয় না। কারণ, এই প্রাচীন উপনিষৎগুলিতে ব্রহ্মতত্ত্ব আদ্যোপান্ত সংশ্লিষ্টভাবে প্রকাশিত হয় নাই। পাঠ করিতে করিতে মনে হয়, শ্লোকগুলি যেন কঠিন তপস্যার সংঘর্ষজনিত এক-একটি তেজ-স্ফুলিঙ্গের মতো ঋষিদের হৃদয় হইতে বর্ষিত হইতেছে— যে স্ফুলিঙ্গের সংস্পর্শে পরবর্তীকালে ভারতীয় দর্শন ষড়শিখা হুতাশনের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিয়াছিল।

এই-সকল উপনিষৎ-কথিত শ্লোকগুলি সর্বত্র সুগম নহে এবং বহুকালের পরবর্তী কোনো ভাষ্যকার, ঋষিদের গূঢ় অভিপ্রায় যে সর্বত্র ভেদ করিতে সক্ষম হইয়াছেন অথবা সক্ষম হইতে পারেন এরূপ আমাদের বিশ্বাস নহে; কারণ, অনেক স্থলেই শ্লোকগুলি পড়িলে, আর কিছুই ভালো বুঝা যায় না, কেবল এইটুকু বুঝা যায়, যে, সেগুলি নিগূঢ় এবং সংক্ষিপ্ত সংকেত মাত্র। সেই সংকেতের প্রকৃত অর্থ তপোবনবাসী সাধক এবং তাঁহার শিষ্যদের মধ্যেই প্রচলিত ছিল, এবং সেই ভাবার্থ ক্রমশ শিষ্যানুশিষ্যপরম্পরাক্রমে এবং কালভেদে মতের বিচিত্র পরিণতি অনুসারে বহুল পরিমাণে পরিবর্তিত হইবার কথা। তাঁহারা যে শব্দ যে বিশেষ অর্থে ব্যবহার করিতেন এখন আমরা আমাদের বর্তমান জ্ঞানের অবস্থা অনুসারে সম্ভবত তাহার অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিয়া থাকি। এইজন্য সর্বত্র আমরা ভাবের সামঞ্জস্য সাধন করিতে পারি না। অথচ অনেকগুলি উজ্জ্বল সত্যের আভাস আমাদের হৃদয়ে জাগ্রত হইয়া উঠে। কিন্তু সেইগুলিকে যখন আপন মনে স্পষ্টীকৃত করিতে চেষ্টা করি তখনই সংশয় হয়, ইহার কতখানি বাস্তবিক সেই ঋষির কল্পিত এবং কতখানি আমার কল্পনা। একটি উদাহরণ দিলে পাঠকগণ আমার কথা বুঝিতে পারিবেন।

অথর্ববেদের প্রশ্নোপনিষদে আছে— প্রজাপতি প্রজাকাম হইয়া তপস্যা করিলেন এবং তপস্যা করিয়া রয়ি (অর্থাৎ আদিভূত) এবং প্রাণ (অর্থাৎ চৈতন্য) এই মিথুন উৎপাদন করিলেন। আদিত্যই প্রাণ, চন্দ্রমাই রয়ি; মূর্ত ও অমূর্ত (সংশ্লিষ্ট) যাহা-কিছু এই সমস্তই রয়ি; (তন্মধ্যগত) মূর্ত বস্তু তো রয়ি বটেই।

বন্ধনী চিহ্নবর্তী শব্দগুলি মূলের নহে। অতএব, পিপ্পলাদ ঋষি রয়ি এবং প্রাণ শব্দ ঠিক কী অর্থে ব্যবহার করিতেন তাহা বলা কঠিন। ভাষ্যকার-কৃত অর্থের অনুবর্তী হইয়াও যে, সর্বত্র সমস্তই সুস্পষ্ট হইয়া উঠে তাহাও বলিতে পারি না; কারণ, আদিত্যকেই বা কেন চৈতন্য এবং চন্দ্রমাকেই বা কেন আদিভূত বলা হইল তাহার কোনো তাৎপর্য দেখা যায় না। অথচ আভাসের মতো এই তত্ত্ব মনে উদয় হয়, যে— দুই বিরোধী শক্তির মিলনে এই সৃষ্টিপ্রবাহ চলিয়া আসিতেছে, ভালো ও মন্দ, চেতনা ও জড়তা, জীবন ও মৃত্যু, আলোক ও অন্ধকার— রয়ি এবং প্রাণশব্দে স্পষ্ট ভাবে হৌক অস্পষ্টভাবে হৌক এই মিথুন নির্দিষ্ট হইয়াছে। এই প্রশ্নোপনিষদের স্থানান্তরে রহিয়াছে শুক্লপক্ষ প্রাণ এবং কৃষ্ণপক্ষ রয়ি; দিন প্রাণ এবং রাত্রি রয়ি। কর্ণ দ্বারা আমরা রয়িকে প্রাপ্ত হই, ব্রহ্মচর্য, শ্রদ্ধা ও জ্ঞান দ্বারা আমরা প্রাণকে প্রাপ্ত হই।

যাহাই হৌক, এই শ্লোকগুলি হইতে আমাদের মনে যে তত্ত্বটি প্রতিভাত হইতেছে তাহা এই উপনিষদের অভিপ্রেত কি না আমরা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না— আর কাহারও মনে অন্য কোনোরূপ অর্থেরও উদয় হইতে পারে।

অর্থ স্পষ্ট হৌক বা না হৌক এই উপনিষৎগুলির মধ্যে যে একটি সরল উদারতা, গভীরতা, প্রশান্তি এবং আনন্দ আছে তাহা বাংলা অনুবাদেও প্রকাশ পাইতেছে। ইহার সর্বত্রই অনির্বচনীয়কে বচনে প্রকাশ করিবার যে অসীম ব্যাকুলতা বিদ্যমান আছে তাহা এত সুগভীর যে, তাহাতে চাঞ্চল্য নাই। ইহাতে ঋষিরা জ্ঞানের এবং বাক্যের পরপারে ব্রহ্মকে যতদূর পর্যন্ত অনুসরণ করিয়াছেন এমন আর কোনো ধর্মে করে নাই, অথচ তাঁহাকে যত নিকটতম অন্তরতম আত্মীয়তম

করিয়া অনুভব করিয়াছেন এমন দৃষ্টান্তও বোধ করি অন্যত্র দুর্লভ। তাঁহারা একদিকে জ্ঞানের উচ্চতা অন্য দিকে আনন্দের গভীরতা উভয়ই সমানভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন। আমাদের বাংলাদেশে শাক্ত বৈষ্ণবেরা ঈশ্বরের নৈকট্য অনুভবকালে তাঁহার দূরত্বকে একেবারে লোপ করিয়া দেয়, ভক্তিকে অন্ধভাবে উন্মুক্ত করিয়া দিবার কালে জ্ঞানকে অবমানিত করে; কিন্তু উপনিষদে এই উভয়ের অটল সামঞ্জস্য থাকাতে তাহার মহাসমুদ্রের ন্যায় এমন অগাধ গাম্ভীর্য। এইজন্যই উপনিষদে সাধকের আত্মা কলনাদিনী কূলপ্লাবিনী প্রমত্ততায় উচ্ছ্বসিত না হইয়া নির্বাক্ আত্মসমাহিত ভূমানন্দে প্রসারিত হইয়া গিয়াছে।*

সাধনা
পৌষ ১৩০১

হাসি ও খেলা। শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সরকার প্রণীত। মূল্য দশ আনা।

বইখানি ছোটো ছেলেদের পড়িবার জন্য। বাংলা ভাষায় এরূপ গ্রন্থের বিশেষ অভাব ছিল। ছেলেদের জন্য যে-সকল বই আছে তাহা স্কুলে পড়িবার বই; তাহাতে স্নেহের বা সৌন্দর্যের লেশমাত্র নাই; তাহাতে যে পরিমাণে উৎপীড়ন হয় সে পরিমাণে উপকার হয় না।

ছেলেরা অত্যন্ত মূঢ় অবস্থাতেও কত আনন্দের সহিত ভাষা-শিক্ষা এবং কিরূপ কৌতূহলের সহিত বস্তুজ্ঞান লাভ করিতে থাকে তাহা কাহারও অগোচর নাই। প্রকৃতি যে নিয়মে যে প্রণালীতে ছেলেদিগকে শিক্ষা দিয়া থাকেন, মানুষ তাহার অনুসরণ না করিয়া নিজের পদ্ধতি প্রচার করিতে গিয়া শিশুদিগের শিক্ষা অনর্থক দুরূহ করিয়া তুলিয়াছে এবং তাহাদের আনন্দময় সুকুমার জীবনে একটা উৎকট উপদ্রব আনয়ন করিয়াছে।

শিক্ষা দিতে হইলে শিশুদের হৃদয় আকর্ষণ করা বিশেষ আবশ্যক; তাহাদের স্বাভাবিক কল্পনাশক্তি এবং কৌতূহল প্রবৃত্তির চরিতার্থতা সাধন করিয়া তাহাদিগকে জ্ঞানের পথে অগ্রসর করিতে হইবে; বর্ণমালা প্রভৃতি চিহ্নগুলিকে ছবির দ্বারা সজীব এবং শিক্ষণীয় বিষয়গুলিকে ভালো ভালো চিত্রের দ্বারা মনের মধ্যে মুদ্রিত করিয়া দিতে হইবে। অর্থাৎ, একসঙ্গে তাহাদের ইন্দ্রিয়বোধ কল্পনাশক্তি এবং বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলন সাধন করিতে হইবে। সেইরূপ করা হয় না বলিয়াই অধ্যাপনার জন্য শিশুদিগকে বিভীষিকার হস্তে সমর্পণ করিতে হয়। বালকদিগের অনেক বালাই আছে; সবচেয়ে প্রধান বালাই পাঠশালা।

পাঠশালার শুষ্ক শিক্ষাকে সরস করিয়া তুলিবার প্রত্যাশা রাখি না। কারণ, অধিকাংশ লোকের ধারণা, যে, ঔষধ যতই কুস্বাদু, চিকিৎসার পক্ষে তাহা ততই উপযোগী, এবং কঠোর ও অপ্রিয়

---

*এই স্থলে প্রসঙ্গক্রমে আমরা কেনোপনিষৎ হইতে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিতে ইচ্ছা করি।

কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ
কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতিযুক্তঃ।
কেনেষিতাং বাচমিমাং বদন্তি
চক্ষুঃ শ্রোত্রং ক উ দেবো যুনক্তি।

ইহার তাৎপর্য এই— মন কাহার দ্বারা প্রেরিত হইয়া পতিত হয়, অর্থাৎ নিজ বিষয়ের উপরে উপনীত হয়। প্রাণ কাহার দ্বারা প্রৈতিপ্রাপ্ত হইয়াছে, অর্থাৎ নিজ বিষয়ের অভিমুখে গতিলাভ করিয়াছে। কাহার দ্বারা প্রেরিত এই বাক্য লোকে উচ্চারণ করে এবং কোন্ দেবতাই বা চক্ষু শ্রোত্রকে স্ববিষয়ে যোজনা করেন।

"প্রৈতি" শব্দটির প্রতি আমরা পাঠকদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে ইচ্ছা করি। বাংলা ভাষায় এই শব্দটির অভাব আছে। যেখানে বেগপ্রাপ্তি বুঝাইতে ইংরাজিতে impulse শব্দের ব্যবহার হয় আমাদের বিবেচনায় বাংলায় সেই স্থলে "প্রৈতি" শব্দের প্রয়োগ হইতে পারে।

শিক্ষাই শিশুদের অজ্ঞানবিনাশের পক্ষে সবিশেষ ফলপ্রদ। অতএব, বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক-প্রণয়নের ভার বিদ্যালয়ের নিষ্ঠুর কর্তৃপক্ষদের হস্তে রাখিয়া আপাতত ছেলেদের ইচ্ছাপূর্বক ঘরে পড়িবার বই রচনা করা অত্যন্ত আবশ্যক হইয়াছে; নতুবা বাঙালির ছেলের মানসিক আনন্দ ও স্বাস্থ্যানুশীলনের এবং বুদ্ধিবৃত্তির সহজ পুষ্টিসাধনের অন্য উপায় দেখা যায় না।

হাসি ও খেলা বইখানি সংকলন করিয়া যোগীন্দ্রবাবু শিশুদিগের এবং শিশুদিগের পিতামাতার কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। বইখানি যেমন ভালো বাঁধানো, তেমনি ভালো করিয়া ছাপানো এবং ছবিতে পরিপূর্ণ। নিঃসন্দেহ গ্রন্থখানি অনেক ব্যয়সাধ্য হইয়াছে। আশা করি, যাহাতে প্রকাশককে ক্ষতিগ্রস্ত না হইতে হয় সেজন্য বাঙালি অভিভাবক মাত্রেই দৃষ্টি রাখিবেন।

এই গ্রন্থে যে রচনাগুলি প্রকাশিত হইয়াছে তাহা শিশুপাঠ্য। স্থানে স্থানে ভাষা ও ভাবের কথঞ্চিৎ অসংগতিদোষ ঘটিয়াছে। কিন্তু সেগুলি সত্ত্বেও যে, এই বইখানি শিশুদের মনোরঞ্জন করিতে পারিবে আমরা তাহার প্রমাণ পাইয়াছি। বালকদের হস্তে পড়িয়া অল্পকালের মধ্যে একখানি হাসি ও খেলার যেরূপ দুরবস্থা হইয়াছে তাহা দর্শন করিলে গ্রন্থপ্রণয়নকর্তা এককালে শোক ও আনন্দ অনুভব করিতেন। এরূপ গ্রন্থের পক্ষে, শিশুহস্তের অবিরল ব্যবহারে মলিন ও বিবর্ণ মলাট এবং বিচ্ছিন্নপ্রায় পত্রই সর্বাপেক্ষা অনুকূল সমালোচনা।

সাধন সপ্তকম্। মূল্য চারি আনা।

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানিতে জয়দেবের দশাবতার স্তোত্র, শঙ্করাচার্যের যতিপঞ্চক, সাধনপঞ্চক, অপরাধভঞ্জন স্তোত্র, ও মোহমুদ্গর, কুলশেখরের মুকুন্দমালা, এবং বিশ্বরূপস্তোত্র বাংলা পদ্যানুবাদসমূহ প্রকাশিত হইয়াছে।

সংস্কৃত ভাষায় এমন অনেক শ্লোক পাওয়া যায়, যাহা কেবলমাত্র উপদেশ অথবা নীতিকথা, যাহাকে কাব্যশ্রেণীতে ভুক্ত করা যাইতে পারে না। কিন্তু সংস্কৃত ভাষার সংহতিগুণে এবং সংস্কৃত শ্লোকের ধ্বনিমাধুর্যে তাহা পাঠকের চিত্তে সহজে মুদ্রিত হইয়া যায় এবং সেই শব্দ ও ছন্দের ঔদার্য শুষ্ক বিষয়ের প্রতিও সৌন্দর্য ও গাম্ভীর্য অর্পণ করিয়া থাকে। কিন্তু বাংলায় তাহাকে ব্যাখ্যা করিয়া অনুবাদ করিতে গেলে তাহা নিতান্ত নির্জীব হইয়া পড়ে। বাংলা উচ্চারণে যুক্ত অক্ষরের ঝংকার, হ্রস্ব-দীর্ঘ স্বরের তরঙ্গলীলা, এবং বাংলা পদে ঘনসন্নিবিষ্ট বিশেষণবিন্যাসের প্রথা না থাকাতে সংস্কৃত কাব্য বাংলা অনুবাদে অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর শুনিতে হয়। যতিপঞ্চকের নিম্নলিখিত শ্লোকে বিশেষ কোনো কাব্যরস আছে তাহা বলিতে পারি না—

পঞ্চাক্ষরং পাবনমুচ্চরন্তঃ
পতিং পশূনাং হৃদি ভাবয়ন্তঃ
ভিক্ষাশিনো দিক্ষু পরিভ্রমন্তঃ
কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ।

তথাপি ইহাতে যে শব্দযোজনার নিবিড়তা ও ছন্দের উত্থানপতন আছে তাহাতে আমাদের চিত্ত গুণী হস্তের মৃদঙ্গের ন্যায় প্রহত হইতে থাকে; কিন্তু ইহার বাংলা পদ্য অনুবাদে তাহার বিপরীত ফল হয়—

পঞ্চাক্ষর যুক্ত মন্ত্র পরম পাবন,
একান্তেতে সদা যারা করে উচ্চারণ;
নিখিল জীবের পতি, পশুপতি দেবে,
হৃদয়েতে ভক্তিভরে সদা যারা ভাবে;
ভিক্ষাশী হইয়া, সুখে সর্বত্র চারণ,
কৌপীনধারীরা হেন, বটে ভাগ্যবান্।

এক তো, আমরা পাঠকদিগকে ভিক্ষাশী ও কৌপীনধারী হইতে উপদেশ দিই না, দ্বিতীয়ত, বাংলার নিস্তেজ পয়ার ছন্দে সে উপদেশ শুনিতেও শ্রুতিমধুর হয় না। একস্থানে দেখা গেল "পাণিদ্বয়ং ভোক্তুমমন্ত্রয়ন্তঃ" পদটিকে অনুবাদে "আহারের পাত্ররূপ শুধু বাহুদ্বয়" করা হইয়াছে; বলা বাহুল্য, এ স্থলে পাণিদ্বয়ের স্থলে বাহুদ্বয় শব্দের প্রয়োগ সমুচিত হয় নাই।

নীতিশতক বা সরল পদ্যানুবাদসহ চাণক্যশ্লোক। শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় -সম্পাদিত। মূল্য দুই আনা মাত্র।

চাণক্যশ্লোকের নীতিগুলি যে নূতন তাহা নহে কিন্তু তাহার প্রয়োগনৈপুণ্য ও সংক্ষিপ্ততাগুণে তাহা আমাদের দেশে সাধারণের মধ্যে প্রচলিত হইয়াছে। যে-সকল উপদেশ জীবনযাত্রায় সর্বদা ব্যবহার্য তাহাকে সরল লঘু এবং সুডৌল করিয়া গড়িতে হয়; তাহাকে মুখে মুখে বহনযোগ্য এবং হাতে হাতে চালনযোগ্য করা চাই; চাণক্যশ্লোকের সেই গুণটি আছে, এইজন্য তাহা আমাদের সংসারের কাজে পুরাতন মুদ্রার মতো চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু আমরা পূর্বেই ব্যক্ত করিয়াছি বাংলা ছন্দে সংক্ষিপ্ততা ও ত্বরিতগতি না থাকাতে সংস্কৃতের জোড়া কথাকে ভাঙিয়া এবং ছোটো কথাকে বড়ো করিয়া গুরু কথার গুরুত্ব এবং লঘু কথার লঘুত্ব উভয়ই নষ্ট করা হয়। মহতের আশ্রয়ে থাকিলে সকল সময়ে যদি বা কোনো প্রত্যক্ষ উপকার না পাওয়া যায় তথাপি তাহার অপ্রত্যক্ষ সুফল আছে এই কথাটিকে চাণক্য সংক্ষেপে সুনিপুণভাবে বলিয়াছেন।—

সেবিতব্যো মহাবৃক্ষঃ ফলচ্ছায়াসমন্বিতঃ।
যদি দৈবাৎ ফলং নাস্তি ছায়া কেন নিবার্যতে॥

মনে রাখিবার এবং আবশ্যকমতো প্রয়োগ করিবার পক্ষে এ শ্লোকটি কেমন উপযোগী! ইহার বাংলা অনুবাদে মূলের উজ্জ্বলতা এবং লাঘবতা হ্রাস হইয়া এরূপ শ্লোকের কার্যকারিতা নষ্ট করিয়াছে।

ফল আর ছায়া যাতে আছে এ উভয়,
এরূপ তরুর তলে লইবে আশ্রয়।
দৈববশে ফল যদি নাহি মিলে তায়,
সুশীতল ছায়া তার বলো কে ঘুচায়।

দুটিমাত্র ছত্রে ইহার অনুবাদ হওয়া উচিত ছিল।

সাধনা
মাঘ ১৩০১

দেওয়ান গোবিন্দরাম বা দুর্গোৎসব। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সাধু -কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা।

গ্রন্থখানি একটি রীতিমতো উপন্যাস। লেখক আয়োজনের ত্রুটি করেন নাই। ইহাতে ভীষণ অন্ধকার রাত্রি, ঘন অরণ্য, দস্যু পাতালপুরী, ছদ্মবেশিনী সাধ্বী স্ত্রী, কপটাচারী পাষণ্ড এবং সর্ববিপৎলঙ্ঘনকারী ভাগ্যবান সাহসী সাধু পুরুষ প্রভৃতি পাঠক ভুলাইবার বিচিত্র উপকরণ আছে। গ্রন্থখানির উদ্দেশ্যও সাধু, ইহাতে অনেক সদুপদেশ আছে এবং গ্রন্থের পরিণামে পাপের পতন ও পুণ্যের জয় প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত এ কথা একবারও ভুলিতে পারি নাই, যে, গ্রন্থকার পাঠককে ভুলাইবার চেষ্টা করিতেছেন। দেওয়ানজি হইতে উজ্জ্বলা পর্যন্ত কেহই সত্যকার সজীব মানুষের মতো হয় নাই, তাহারা যে-সকল কথা কয় তাহার মধ্যে সর্বদাই লেখকের প্রম্প্‌টিং শুনা যায় এবং ঘটনাগুলির মধ্যে যদিও সম্ভবতা আছে কিন্তু অবশ্যসম্ভাব্যতা নাই। এইখানে স্পষ্ট করিয়া বলিয়া রাখা আবশ্যক, যে, উপন্যাসের সম্ভব অসম্ভব সম্বন্ধে আমাদের কোনোপ্রকার বাঁধা মত নাই। লেখক আমাদের বিশ্বাস জন্মাইতে পারিলেই

হইল, তা ঘটনা যতই অসম্ভব হউক। অনেক রচনায় সুসম্ভব জিনিসও নিজেকে সপ্রমাণ করিয়া উঠিতে পারে না, আবার, অনেক রচনায় অসম্ভব ব্যাপারও চিরসত্যরূপে স্থায়ী হইয়া যায়। 'মণ্টেক্রিস্টো'-উপন্যাস বর্ণিত ঘটনা প্রাকৃত জগতে সম্ভবপর নহে কিন্তু "ডুমা"র প্রতিভা তাহাকে সাহিত্যজগতে সত্য করিয়া রাখিয়াছে। কপালকুণ্ডলাকে বঙ্কিমের কল্পনা সত্য করিয়া তুলিয়াছে কিন্তু হয়তো নিকৃষ্ট লেখকের হাতে এই গ্রন্থ নিতান্ত অবিশ্বাস্য হাস্যকর হইয়া উঠিতে পারিত।

গ্রন্থখানি পড়িয়া বোধ হইল, যে, যদিচ ঘটনা সংস্থান এবং চরিত্র রচনায় গ্রন্থকার কৃতকার্য হইতে পারেন নাই তথাপি গ্রন্থ-বর্ণিত কালের একটা সাময়িক অবস্থা কতক পরিমাণে মনের মধ্যে জাগ্রত করিতে পারিয়াছেন। তখনকার সেই খাল বিল মাঠের ভিতরকার ডাকাতি এবং দস্যুবৃত্তিতে সম্ভ্রান্ত লোকদিগের গোপন সহায়তা প্রভৃতি অনেক বিষয় বেশ সত্যভাবে অঙ্কিত হইয়াছে। মনে হয় লেখক এ-সকল বিষয়ে অনেক বিবরণ ভালো করিয়া জানেন; কোমর বাঁধিয়া আগাগোড়া বানাইতে বসেন নাই।

মনোরমা। শ্রীকুমারকৃষ্ণ মিত্র প্রণীত।
গ্রন্থখানি দুই ফর্মায় সমাপ্ত একটি ক্ষুদ্র উপন্যাস। আরম্ভ হইয়াছে "রাত্রি দ্বি-প্রহর। চারিদিক নিস্তব্ধ। প্রকৃতিদেবী অন্ধকার সাজে সজ্জিত হইয়া গম্ভীরভাবে অধিষ্ঠিতা।" শেষ হইয়াছে "হায়! সামান্য ভুলের জন্য কী না সংঘটিত হইত পারে।" ইহা হইতে পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন, গ্রন্থখানি ক্ষুদ্র, ভুলটিও সামান্য কিন্তু ব্যাপারটি খুব গুরুতর।

কৌতুকপ্রিয় সমালোচক হইলে বলিতেন, "গ্রন্থখানির মধ্যে শেক্সপিয়ার হইতে উদ্‌ধৃত কোটেশনগুলি অতিশয় সুপাঠ্য হইয়াছে" এবং অবশিষ্ট অংশসম্বন্ধে নীরব থাকিতেন। কিন্তু গ্রন্থ সমালোচনায় সকল সময়ে কৌতুক করিবার প্রবৃত্তি হয় না। কারণ, এই কঠিন পৃথিবীতে যখন আর কিছু দিবার সাধ্য থাকে না তখন দুটো মিষ্ট কথা দিবার ক্ষমতা এবং অধিকার সকলেরই আছে, নাই কেবল সমালোচকের। একে তো যে গ্রন্থখানি সমালোচনা করিতে বসে তাহার মূল্য তাহাকে দিতে হয় না, তাহার উপরে সুলভ প্রিয়বাক্য দান করিবার অধিকার তাহাও বিধাতা তাহাকে সম্পূর্ণভাবে দেন নাই। এইজন্য, যখন কোনো গ্রন্থের প্রতি প্রশংসাবাদ প্রয়োগ করিতে পারি না তখন আমরা আন্তরিক ব্যথা অনুভব করি। নিজের রচনাকে প্রশংসাযোগ্য মনে করা লেখকমাত্রেরই পক্ষে এত সাধারণ ও স্বাভাবিক, যে, সেই ভ্রমের প্রতি কঠোরতা প্রকাশ করিতে কোনো লেখকের প্রবৃত্তি হওয়া উচিত হয় না। কিন্তু গ্রন্থকার যথার্থই বলিয়াছেন— হায়! সামান্য ভ্রমের জন্য কী না সংঘটিত হয়! অর্থব্যয়ও হয়, মনস্তাপও ঘটে।

সাধনা
ফাল্গুন ১৩০১

নূরজাহান। শ্রীবিপিনবিহারী ঘোষ দ্বারা প্রণীত ও প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা।
গ্রন্থখানি নাটক। এই নাটকের কি গদ্য, কি পদ্য, কি ঘটনা সংস্থান, কি চরিত্রচিত্র, কি আরম্ভ, কি পরিণাম সকলই অদ্ভুত হইয়াছে। ভাষাটা যেন বাঁকা বাঁকা, নিতান্তই বিদেশীয় বাংলার মতো এবং সমস্ত গ্রন্থখানি যেন পাঠকদের প্রতি পরিহাস বলিয়া মনে হয়। আরও আশ্চর্যের বিষয় এই, যে, স্থানে স্থানে ইহাতে নাট্যকলা এবং কবিত্বের আভাস নাই যে তাহাও নহে কিন্তু পরক্ষণেই তাহা প্রলাপে পরিণত হইয়াছে। তাই এক-এক সময়ে মনে হয় লেখকের ক্ষমতা আছে কিন্তু সে ক্ষমতা যেন প্রকৃতিস্থ অবস্থায় নাই।

শুভ পরিণয়ে।
বন্ধুর শুভ পরিণয়ে কোনো প্রচ্ছন্ননামা লেখক এই ক্ষুদ্র কাব্যগ্রন্থখানি রচনা করিয়াছেন। ইহা

পাঠকসাধারণের জন্য প্রকাশিত হয় নাই, এই কারণে আমাদের পত্রিকায় এ গ্রন্থের সমালোচনা অনাবশ্যক বোধ করি।

সাধনা
চৈত্র ১৩০১

রঘুবংশ। দ্বিতীয় ভাগ। শ্রীনবীনচন্দ্র দাস এম.এ. কর্তৃক অনুবাদিত। মূল্য এক টাকা।
বাংলা ভাষায় সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থের অনুবাদ করা নিরতিশয় কঠিন কাজ; কারণ, সংস্কৃত কবিতার শ্লোকগুলি ধাতুময় কারুকার্যের ন্যায় অত্যন্ত সংহতভাবে গঠিত— বাংলা অনুবাদে তাহা বিশ্লিষ্ট এবং বিস্তীর্ণ হইয়া পড়ে। কিন্তু নবীনবাবুর রঘুবংশ অনুবাদখানি পাঠ করিয়া আমরা বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছি। মূল গ্রন্থখানি পড়া না থাকিলেও এই অনুবাদের মাধুর্যে পাঠকদের হৃদয় আকৃষ্ট হইবে সন্দেহ নাই। অনুবাদক সংস্কৃত কাব্যের লাবণ্য বাংলা ভাষায় অনেকটা পরিমাণে সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছেন ইহাতে তাঁহার যথেষ্ট ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু পঞ্চদশ সর্গে তিনি যে দ্বাদশাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করিয়াছেন তাহা আমাদের কর্ণে ভালো ঠেকিল না। বাংলার পয়ার ছন্দে প্রত্যেক ছত্রে যথেষ্ট বিশ্রাম আছে— তাহা চতুর্দশ অক্ষরের হইলেও তাহাতে অন্যূন ষোলোটি মাত্রা আছে— এইজন্য পয়ার ছন্দে যুক্ত অক্ষর ব্যবহার করিবার স্থান পাওয়া যায়। কিন্তু দ্বাদশাক্ষর ছন্দে যথেষ্ট বিশ্রাম না থাকাতে যুক্ত অক্ষর ব্যবহার করিলে ছন্দের সামঞ্জস্য নষ্ট হইয়া যায়; যেন কুঠির পানসিতে মহাজনী নৌকার মাল তোলা হয়। দ্বাদশাক্ষর ছন্দে ধীর গমনের গাম্ভীর্য না থাকাতে তাহাতে সংস্কৃত কাব্যসুলভ ঔদার্য নষ্ট করে। আমরা সমালোচ্য অনুবাদ হইতে একটি পয়ারের এবং একটি দ্বাদশাক্ষরের শ্লোক পরে পরে উদ্‌ধৃত করিলাম :

প্রসবান্তে কৃশা এবে কোশল-নন্দিনী,
শয্যায় শোভিছে পাশে শয়ান কুমার—
শরদে ক্ষীণাঙ্গী যথা সুরতরঙ্গিণী
শোভিছে পূজার পদ্ম পুলিনে যাঁহার।

সে প্রভামণ্ডলী মাঝে সমুজ্জ্বলা
ফণীন্দ্রের ফণা-উৎক্ষিপ্ত আসনে
রাজিলা বসুধা স্ফুরিত কিরণে,
কটিতটে যাঁর সমুদ্র-মেখলা।

শেষোদ্‌ধৃত শ্লোকটির প্রত্যেক যুক্ত অক্ষরে রসনা বাধাপ্রাপ্ত হয় কিন্তু পূর্বোদ্‌ধৃত পয়ারে প্রত্যেক যুক্ত অক্ষরে ছন্দের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করিয়াছে। এমন-কি, দ্বিতীয় ছত্রে আর-একটি যুক্ত অক্ষরের জন্য কর্ণের আকাঙ্ক্ষা থাকিয়া যায়।

ফুলের তোড়া। শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য এক আনা।
এই ক্ষুদ্র কাব্যগ্রন্থখানির মধ্যে "ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালি কোকিল" কবিতাটি আমাদের ভালো লাগিয়াছে।

নীহার-বিন্দু। শ্রীনিতাইসুন্দর সরকার প্রণীত। মূল্য চারি আনা।
গ্রন্থকার ভূমিকায় লিখিতেছেন— 'পাখি গান গাহিয়া যায়— সুর, মিষ্ট কি কড়া— মানুষে শুনিয়া, ভালো কি মন্দ বলিবে— সে তার কোনো ধার ধারে না; সে শুধু, আপন মনে আপনিই,

নীলাকাশ প্রতিধ্বনিত করিয়া, গাহিয়া যায়।' অতএব ভরসা করি আমরা এই গ্রন্থলিখিত গান ক'টি ভালো না বলিলেও গ্রন্থকারের নীলাকাশ প্রতিধ্বনিত করিবার কোনো ব্যাঘাত হইবে না।

সাধনা
বৈশাখ ১৩০২

নির্ঝরিণী। শ্রীমতী মৃণালিনী প্রণীত। মূল্য এক টাকা।

মহিলা-প্রণীত গ্রন্থ সর্বতোভাবে নিরপেক্ষচিত্তে সমালোচনা করা কঠিন। বিশেষত বর্তমান সমালোচ্য গ্রন্থের লেখিকা নিতান্ত অল্পবয়স্কা এবং নববৈধব্যবেদনায় ব্যথিতা। গ্রন্থকর্ত্রীও ভূমিকায় পাঠকদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন যে, তাঁহার গ্রন্থে "কতখানি কবিত্ব আছে, কতখানি উচ্চতা আছে, কতখানি মাধুরী ও সৌন্দর্য আছে তাহার বিচার না করিয়া, বালিকার হৃদয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই পুস্তক প্রকাশিত করা সার্থক হইবে।"

এ কথার তাৎপর্য এই যে, নবীনা লেখিকা তাঁহার কবিতাগুলিকে কেবল কবিত্বের হিসাবে সাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছেন না, তাঁহার তরুণ হৃদয়ের সুখ দুঃখশোকের জন্য সমবেদনা প্রত্যাশা করিতেছেন। ইহাতে গ্রন্থকর্ত্রীর অল্পবয়স এবং সংসারতত্ত্বে অনভিজ্ঞতা সূচিত হইতেছে। ব্যক্তিগত দুঃখসুখের প্রকাশ যতক্ষণ না সর্বজনীন ও সর্বকালীন সৌন্দর্য লাভ করে ততক্ষণ সাহিত্যে তাহা কাহারও নিকট সমবেদনা প্রাপ্ত হয় না। এইজন্য অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই সাহিত্যে প্রধানত আত্মহৃদয়ের পরিচয় দিতে সংকোচ বোধ করেন। টেনিসনের 'ইন্ মেমোরিয়ম্' নামক কাব্য কেন সর্বসাধারণের নিকট এত প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে? তাহা টেনিসনের বন্ধুবিয়োগশোকের প্রকাশ বলিয়া নহে, তাহাতে মানবজাতির বিচ্ছেদশোকমাত্রই বিচিত্র রাগিণীতে আপনাকে ব্যক্ত করিয়াছে বলিয়াই তাহা সর্বসমক্ষে প্রকাশযোগ্য হইয়াছে— নচেৎ ব্যক্তিগত শোকের প্রকাশ্য বিলাপ টেনিসনের পক্ষে লজ্জার কারণ হইত।

অতএব, এই গ্রন্থের যে যে অংশে মুখ্যরূপে বালিকার আত্মশোকের কথা আছে তাহা আমরা সসংকোচে পরিহার করিতে ইচ্ছা করি। যথার্থ পতিশোকের উচ্ছ্বাসে যখন বালিকা বিধবা বিলাপ করিতে থাকে— তখন সেই বিলাপকে সমালোচনার যন্ত্রাদির দ্বারা বিশ্লেষণ করিতে বসিতে কাহারও প্রবৃত্তি হইতে পারে না। কেবল সাধারণভাবে এই কথা বলিতে পারি, যে, প্রথম জোয়ারের জলের ন্যায় প্রথম শোকের উচ্ছ্বাসে কাব্যকলার পরমাবশ্যক সংযম অনেকটা ভাসিয়া যায়, সর্বত্রই যেন বাহুল্য দৃষ্ট হইতে থাকে। শোক যখন জীবনের মধ্যে পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া একটি উদার গম্ভীর বৈরাগ্যের আকার ধারণ করে তখনি তাহা কাব্যে সুন্দরভাবে প্রতিফলিত হইবার অবসর লাভ করে।

এই গ্রন্থের মধ্যে গ্রন্থকর্ত্রী যেখানেই ব্যক্তিগত শোকের অন্ধ কারাগার হইতে বাহিরের সৌন্দর্য-রাজ্যে পদার্পণ করিয়াছেন, সেইখানেই তাঁহার কবিত্বের যথার্থ নিদর্শন পাওয়া যায়। "অনন্ত কালের পরিচয়" এবং "বিশ্বপ্রেম" নামক কবিতায় ভাষা ও ভাবের যে নৈপুণ্য ও গভীরতা এবং অকৃত্রিম সত্যতা, দেখিতে পাওয়া যায় তাহা কোনো বালিকার রচনায় কদাচ প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না; এবং তাহা বিশেষরূপে প্রশংসনীয়।

সাধনা
জ্যৈষ্ঠ ১৩০২

বঙ্গসাহিত্যে বঙ্কিম। শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত প্রণীত। মূল্য চারি আনা।

লেখক এই গ্রন্থে স্বহস্তে একটি উচ্চ মঞ্চ নির্মাণ করিয়া তাহার উপরে চড়িয়া বসিয়াছেন, এবং বঙ্কিমকেও সেইসঙ্গে বঙ্গসাহিত্যের আর কতকগুলি পরীক্ষোত্তীর্ণ ভালো ছেলেকে হাস্যমুখে

ছোটো বড়ো পারিতোষিক বিতরণ করিয়া লেখকসাধারণকে পরম আপ্যায়িত এবং উৎসোহিত করিয়াছেন। লেখক স্পষ্টই বলিয়াছেন তিনি কাহাকেও খাতির করিয়া কথা কহেন নাই। ভাষা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া লিখিয়াছেন "বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষা খুব মিষ্ট বটে, কিন্তু তাহাতেও যেন প্রাণের অভাব দেখিতে পাই। ... স্বয়ং বিদ্যাসাগর মহাশয় সম্বন্ধে যখন আমাদের এই মত, তখন অন্য (?) পরে কা কথা।"

শুনিয়া ভয়ে গাত্র রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে এবং এত বড়ো দোর্দণ্ড-প্রতাপের নিকট সহজেই অভিভূত হইয়া পড়িতে হয়। তথাপি কর্তব্যবোধে দুই-একটি কথা বলা আবশ্যক বোধ করি। বর্তমান গ্রন্থকার পাঠকদিগকে নিতান্ত যেন ঘরের ছেলে অথবা স্কুলের ছাত্রের মতো দেখিয়া থাকেন। এক স্থলে শুদ্ধমাত্র বঙ্কিমের "বন্দে মাতরং" গানটি তুলিয়া দিয়া লেখক প্রবীণ হেড্‌মাস্টারের মতো লিখিতেছেন "বঙ্কিমের কবিত্ব বুঝিলে?" তাহার পরেই প্রতাপ ও শৈবলিনীর সন্তরণ দৃশ্যটি উদ্‌ধৃত করিয়া দিয়া লেখক নবীন রসিক পুরুষের মতো বলিতেছেন "কবিত্ব কাহাকে বলে দেখিলে? আ মরি মরি! কী সুর রে!" পরপৃষ্ঠায় পুনশ্চ অতি পরিচিত কুটুম্বের মতো পাঠকদের গায়ে পড়িয়া বলিতেছেন "আরও শুনিবে? তবে শুন।" এক স্থলে দামোদরবাবুর রচিত 'কপালকুণ্ডলার অনুবৃত্তি' গ্রন্থের প্রতি লক্ষ্য করিয়া লেখক নথ-পরিহিতা প্রৌঢ়ার মতো বলিতেছেন— "সে, মৃন্ময়ী আবার পুনর্জীবিতা হইয়া সুখে ঘরকন্না করিতে লাগিল। পোড়াকপাল আর কি!" ভাষার এই-সকল অশিষ্ট ভঙ্গিমা ভদ্র সাহিত্য হইতে নির্বাসনযোগ্য।

গ্রন্থকার, বঙ্কিম-রচিত উপন্যাসের পাত্রগুলির মধ্যে কে কতটা পরিমাণে হিন্দুত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে তাহাই অতি সূক্ষ্মরূপে ওজন করিয়া তাহাদিগকে নিন্দা ও প্রশংসা বণ্টন করিয়া দিয়াছেন। এমন-কি, সেই ওজন অনুসারে 'মডেল ভগিনী'কেও 'চন্দ্রশেখরে'র সহিত তুলনা করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। আধুনিক বঙ্গসাহিত্যের পরম দুর্ভাগ্য এই যে, এ কথা আমাদের সমালোচকদিগকে সর্বদাই স্মরণ করাইয়া দিতে হয় যে, সাহিত্য-সমালোচনা-কালে মনুসংহিতা আদর্শ নহে, মানবসংহিতাই আদর্শ।

সাধনা
আষাঢ় ১৩০২

কবি বিদ্যাপতি ও অন্যান্য বৈষ্ণব কবিবৃন্দের জীবনী। শ্রীত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য এম্‌-এ, বি-এল্‌ প্রণীত। মূল্য বারো আনা।

এই গ্রন্থে প্রধানত বিদ্যাপতির এবং সংক্ষেপে অন্যান্য অনেক বৈষ্ণব কবির জীবনী প্রকাশিত হইয়াছে। এ পর্যন্ত বিদ্যাপতির জীবনী সম্বন্ধে যতগুলি আলোচনা বাহির হইয়াছে গ্রন্থকার তাহার সকলগুলি বিশ্লেষণ করিয়া দেখিয়াছেন এবং নানা স্থান হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া সত্য নির্ণয়ের চেষ্টা করিয়াছেন। বক্ষ্যমাণ বিষয় সম্বন্ধে আমাদের নিজের ভালোরূপ অভিজ্ঞতা নাই কিন্তু লব্ধপ্রতিষ্ঠ ইতিহাসজ্ঞ ত্রৈলোক্যবাবু এই গ্রন্থে যেরূপ সতর্কতা ও ভূয়োদর্শন সহকারে আপন মত প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন তাহাতে সাহসপূর্বক তাঁহার উপর আমরা সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারি। গ্রন্থকার ভিন্ন ভিন্ন কবির জীবনী স্বতন্ত্র ভাগ না করিয়া দেওয়াতে ইচ্ছামতো বিষয় খুঁজিয়া পাওয়া দুরূহ হইয়াছে; গ্রন্থে একখানি সূচিপত্র থাকার বিশেষ প্রয়োজন ছিল।

প্রসঙ্গমালা। মূল্য চারি আনা। শ্রীহরনাথ বসু প্রণীত।
মনোহর পাঠ। মূল্য ছয় আনা। শ্রীহরনাথ বসু প্রণীত।

এই শিশুপাঠ্য গ্রন্থ দুটি নীতিপ্রসঙ্গ, প্রাণীপ্রসঙ্গ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন প্রসঙ্গে বিভক্ত। বিষয়গুলি সরস করিয়া লেখাতে এই দুইখানি পুস্তক অল্পবয়স্ক ছাত্রদের মনোরম হইয়াছে সন্দেহ নাই। গল্পগুলির অধিকাংশই আমাদের দেশীয় গল্প হইলে ভালো হইত। প্রসঙ্গমালায় "স্পষ্টবাদিতা" নামক গল্পে

যে একটু কৌতুক-কৌশল আছে তাহা বালকবালিকাদের বোধগম্য হইবে না। গ্রন্থ দুইখানি বিদ্যালয়ে প্রচলিত হইবার উপযোগী হইয়াছে কেবল আশা করি দ্বিতীয় সংস্করণে ভূরি পরিমাণ ছাপার ভুল সংশোধিত হইবে।

ন্যায় দর্শন। গৌতমসূত্র, নূতন টীকা, বঙ্গভাষায় বিস্তৃত ব্যাখ্যা।[1]

এতৎশীর্ষক পুস্তক প্রাপ্ত হইয়া আমরা যার পর নাই আনন্দিত ও উৎসাহিত হইয়াছি। কেননা, এ যাবৎ বাংলা ভাষায় গৌতমের ন্যায় অনুবাদিত হয় নাই এবং উহার নূতন টীকাও এ পর্যন্ত কেহ করেন নাই। ভরসা করি, এই পুস্তক প্রচারিত হইলে সাহিত্য সংসারের বিশেষ উপকার সাধিত হইবে।

অনেক বঙ্গীয় পাঠক (যাঁহারা সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন নহেন) গৌতমের ন্যায় কিরূপ তাহা জানিবার জন্য ইচ্ছুক আছেন, এই পুস্তকের দ্বারা তাঁহাদের সে ইচ্ছা বহু পরিমাণে পূর্ণ হওয়া সুসম্ভব।

গৌতমের সূত্রনিচয় আমাদের সমালোচ্য নহে। নূতন টীকা ও তাহার বাংলা ভাষার ব্যাখ্যা সমালোচ্য হইলেও ন্যায় বিষয়ে অল্পাধিকার থাকায় আমরা ওই দুই অংশের যথোচিত সমালোচনা অর্থাৎ গুণদোষ বিচার করিতে অক্ষম। তবে পুস্তক পাঠে যাহা বোধগম্য হইয়াছে তাহা সাধারণ সমক্ষে ব্যক্ত করা দোষাবহ নহে বিবেচনায় ওই দুই বিষয়ে অল্প কিছু বলিলাম।

কোনো গভীর বিষয় সংক্ষেপে লিখিতে গেলে যে দোষের সম্ভাবনা থাকে সে দোষ ব্যতীত অন্য কোনো দোষ প্রাপ্ত ন্যায়দর্শনের নূতন টীকায় লক্ষিত হইল না। নূতন টীকার ভাষাটি বিশেষ সুখবোধ্য হইয়াছে। বাংলা ব্যাখ্যাও বিশেষ মনোরম ও নির্দোষ হইয়াছে। প্রাচীন টীকাকারেরা যে রীতিতে শব্দ বিন্যাস করিতেন, ন্যায়দর্শনের টীকা যেরূপ হওয়া উচিত, সেরূপ না হইলেও সাধারণত এই বলা যাইতে পারে যে, নূতন টীকাটি মন্দ হয় নাই। কেননা, কোথাও পদার্থের বৈপরীত্য ঘটনা হয় নাই। চতুরস্রা বুদ্ধির অথবা বহুদর্শনের অভাবে যে-সকল গুণের অভাব হইয়াছে, তাহার একটি এই—

টীকালেখক প্রথম সূত্রর টীকায় "প্রমাণপ্রমেয়াদীনাং ষোড়শ পদার্থানাং তত্ত্বজ্ঞানাৎ অসাধারণধর্ম্মপ্রকারেণাবধারণাৎ নিঃশ্রেয়সাবিগমঃ মোক্ষপ্রাপ্তির্ভবতীত্যর্থঃ" এই মাত্র লিখিয়াছেন। এই স্থানে অন্তত এরূপ একটা কথা লেখা উচিত ছিল যে, বস্তুতত্ত্ব আত্মতত্ত্বজ্ঞানাদেব মোক্ষঃ। কেননা, আত্মাতিরিক্ত প্রমেয়ের জ্ঞানে মোক্ষ হয় না, এ কথা বোধ হয় সকল লোকেই জানে। দেখুন উক্ত সূত্রের প্রাচীন ব্যাখ্যায় কেমন সুসমঞ্জস কথা আছে।

"যদি পুনঃ প্রমাণাদিপদার্থতত্ত্বজ্ঞানাৎ নিঃশ্রেয়সংস্যাৎ ন মোক্ষ্যমাণা মোক্ষায় ঘটেরন্। নহি কস্যচিৎ ক্বচিচ্চ তত্ত্বজ্ঞানং নাস্তীতি। তস্মাৎ আত্মাদ্যেব প্রমেয়ং মুমুক্ষুণা জ্ঞেয়ম ইতি।"—বার্ত্তিক।

ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন অতি সমঞ্জসরূপে ওই কথার সংগতার্থ প্রদর্শন করিয়াছেন। যথা—

"তদিদং তত্ত্বজ্ঞানং নিঃশ্রেয়সার্থং যথাবিদ্যং বেদিতব্যম্। ইহ তু অধ্যাত্ম বিদ্যায়াং আত্মাদি তত্ত্বজ্ঞানাৎ নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ অপবর্গঃ।"

বার্ত্তিককার ঐ ভাষ্যের আরও অধিক বিশদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যথা—

"সর্বাসু বিদ্যাসু তত্ত্বজ্ঞানমস্তি নিঃশ্রেয়সাধিগমশ্চেতি। ত্রয্যাং তাবৎ কিং তত্ত্বজ্ঞানং কশ্চ নিঃশ্রেয়সাধিগম ইতি? তত্ত্বজ্ঞানং তাবৎ অগ্নিহোত্রাদিসাধনা নাঃ সাধ্যত্বাদিপরিজ্ঞানঃ অনুপহতত্ত্বাদিপরিজ্ঞানঞ্চ। নিঃশ্রেয়সাধিগমোপি স্বর্গপ্রাপ্তি। তথাহ্যত্র। স্বর্গঃফলং শ্রূয়তে। অথ বার্ত্তায়াং কিং তত্ত্বজ্ঞানং কশ্চ নিঃশ্রেয়সাধিগম ইতি? ভূম্যাদিপরিজ্ঞানং তত্ত্বজ্ঞানং কৃষ্যাদ্যধিগমশ্চ

---

[1] সুশিক্ষিত সুবিখ্যাত জমিদার শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম, এ, বি, এল, মহাশয়ের বিশেষ সাহায্যে ও উদ্যোগে শ্রীকালীপ্রসন্ন ভাদুড়ির দ্বারা বরাহনগরে প্রকাশিত।

নিঃশ্রেয়সমিতি তৎফলত্বাৎ। দণ্ডনীত্যাং কিং তত্ত্বজ্ঞানকেন্চ নিঃশ্রেয়সাধিগম ইতি? সামদানদণ্ডভেদানাং যথাকালং যথাদেশং যথাশক্তি বিনিয়োগস্তত্ত্বজ্ঞানং নিঃশ্রেয়সং পৃথিবীজয়াদি। ইহ তু অধ্যাত্মবিদ্যায়াং আত্মজ্ঞানং তত্ত্বজ্ঞানং নিঃশ্রেয়সমপবর্গ ইতি।"

নিঃশ্রেয়স শব্দের মোক্ষ অর্থ গ্রহণকালে অন্যান্য পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান কারণ কোটিতে পরিত্যক্ত হয়। কেননা একমাত্র আত্মতত্ত্ব জ্ঞানই মোক্ষের কারণ। নিঃশ্রেয়স শব্দের মঙ্গল সাধারণতার্থ গ্রহণকালে অন্যান্য পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান সেই সেই প্রকারে উন্নয়ন করিতে হয়। কেননা, বিশেষ বিশেষ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানের বিশেষ বিশেষ ফল নির্দিষ্ট আছে।

এইরূপ ত্রুটি আরও কতিপয় স্থানে লক্ষিত হয়, সে-সকল পরিহৃত হইলে পুস্তকখানি বিশেষ উপকারী হইতে পারে।

কাতন্ত্রব্যাকরণম্ ভাবসেনত্রৈবিদ্যবিরচিতরূপমালা প্রক্রিয়াসহিতম্।
ব্যাকরণমিদং বাঙ্গৈঃ পণ্ডিতৈঃ কলাপব্যাকরণমিত্যাখ্যায়তে। স্বীকুর্বন্তি চাস্য ব্যাকরণস্যোৎকৃষ্টত্বং পণ্ডিতাঃ ক্রান্তি চাস্য হেতুরুৎকৃষ্টত্বে সারল্যমিতি। বয়মপাস্য সুষ্ঠুতাং অবগচ্ছামঃ। যৎকারণং অনেনৈব ব্যাকরণেন সুকুমারমতিকুমারাণাং স্বল্পায়াসেন ব্যাকরণপদপদার্থজ্ঞানং জায়ত ইতি। সন্তি হি বহুনি ব্যাকরণানি সিদ্ধান্তকৌমুদীপ্রমুখানি। পরন্তু তেষামতি দুরূহত্বাৎ ন যোগ্যানি বালানাম্। ব্যাকরণস্যেতস্য দুর্গসিংহকৃতা বৃত্তির্বঙ্গে প্রচরদ্রূপা ন তু ভাবসেনত্রৈবিদ্যদেববিরচিত রূপমালা। ইয়ং সমীচীনতমা রূপমালা প্রক্রিয়া দুষ্প্রাপ্যা আসীৎ। সম্প্রতি তু তদন্বিতং কৃত্বা কাতন্ত্র সূত্রমুদ্রণেন মহানুপকারোজাত ইতি মন্যামহে। এতদেব ব্যাকরণং রূপমালা প্রক্রিয়া সহিতং চেৎ পাঠশালায়াং প্রচরদ্রূপং ভবেৎ তর্হি বালানাং ব্যাকরণজ্ঞানং সহজেনোপায়েন সম্পৎস্যত ইত্যাশাস্মহে বয়ম্। অস্য চ মুদ্রণকার্য সর্বাঙ্গ সুন্দরংজাতমিত্যপরঃ পরিতোষহেতুরস্মাকং। কিং বহুনা, এতৎ প্রকাশকার শ্রীহীরাচন্দ্র নিমিচন্দ্র শ্রেষ্ঠনে মুম্বয্যবাসিনে বয়ং প্রশংসাবাদং উদীরয়াম ইতিশম্।

কাতন্ত্র ব্যাকরণ বঙ্গদেশে কলাপ ব্যাকরণ নামে প্রসিদ্ধ। এই ব্যাকরণ অন্যান্য ক্ষুদ্র ব্যাকরণ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। ইহার অনেকগুলি বৃত্তি ও ব্যাখ্যা বিদ্যমান আছে। তন্মধ্যে দুর্গসিংহকৃত ব্যাখ্যা বঙ্গদেশে প্রচলিত। দুর্গসিংহের ব্যাখ্যা অপেক্ষা ভাবসেন ত্রৈবিদ্য দেবের "রূপমালা প্রক্রিয়া" নাম্নী ব্যাখ্যা অনেক অংশে উৎকৃষ্ট। কিন্তু তাহা এ পর্যন্ত এদেশে নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য ছিল। সম্প্রতি বরোদা রাজ্যের অন্তর্গত ব্রহ্মণগ্রামোৎপন্ন বুম্বাপুরানিবাসী পণ্ডিত শ্রীনাথরামশাস্ত্রী ও বুম্বাইনিবাসী শ্রীহীরাচন্দ্র নেমিচন্দ্র শ্রেষ্ঠী এই দুই মহানুভাব উক্ত ব্যাখ্যার সহিত (রূপমালার সহিত) কাতন্ত্র সূত্র মুদ্রিত করিয়া সংস্কৃত শিক্ষার্থীদিগের সমূহ উপকার করিয়াছেন। পুস্তকের অক্ষর, মুদ্রাঙ্কণ, কাগজ, সমস্তই উত্তম এবং পরিশুদ্ধতায় অনবদ্য। মূল্য এক টাকা সুতরাং অধিক নহে। বলা বাহুল্য যে, এই পুস্তক মুগ্ধবোধের পরিবর্তে ব্যবহৃত হইলে ব্যাকরণ শিক্ষা সহজসাধ্য হইতে পারে।

সাধনা
ভাদ্র-কার্তিক ১৩০২

সাহিত্য চিন্তা। শ্রীপূর্ণচন্দ্র বসু। মূল্য এক টাকা।
পূর্ণবাবু আর্য সাহিত্য ও য়ুরোপীয় সাহিত্য তুলনা করিয়া সাহিত্যের আদর্শ নির্ণয়ে প্রয়াসী হইয়াছেন। গ্রন্থকার নৈপুণ্যসহকারে তাঁহার প্রবন্ধগুলিতে যথেষ্ট সূক্ষ্মবুদ্ধি খাটাইয়াছেন। কিন্তু আমাদের সন্দেহ হয়, যে, যে সরস্বতী এতদিন বিশ্বজনের বিচিত্রদল হৃৎপদ্মের উপর বিরাজ করিতেছিলেন তিনি হঠাৎ অদ্য পূর্ণবাবুর কঠিন গণ্ডিটুকুর মধ্যে আসিয়া বাস করিতে সম্মত হইবেন কি না। এবং তাহার জগদ্‌বাসী শতলক্ষ ভক্তের বিনীত প্রার্থনা এই যে, তিনি যেন

অসীমবিস্তৃত মানব হৃদয়ের রাজসিংহাসন পরিহার করিয়া পূর্ণবাবুর নীতি পাঠশালার হেড্‌মাস্টরি পদ গ্রহণ না করেন। সংক্ষেপে আমাদের বক্তব্য এই, যে সাহিত্যে খুন ভালো কি ভালো নয়, সাহিত্যে প্রেমের কোনো বিশেষ রূপ গ্রাহ্য কি পরিত্যাজ্য তাহা এক কথায় বলিয়া দেওয়া কাহারও সাধ্য নহে। কোনো বিশেষ কাব্যে বিশেষ স্থানে খুনের অবতারণায় সাহিত্যরস নষ্ট হইয়াছে কি না তাহাই রসজ্ঞলোকের বিচার্য— চরিত্র বিশেষে এবং অবস্থা বিশেষে প্রেমের কিরূপ বিকাশ সুরসিক পাঠকচিত্তে অখণ্ড আনন্দের কারণ হয় তাহাই সাহিত্যে আলোচনার বিষয় হইতে পারে। সাহিত্যের কল্পনাসংসার এই বাস্তব সংসারের ন্যায় অসীম বিচিত্র এবং পরম রহস্যময়, তাহা কেবলমাত্র, একখণ্ড আর্যদের বেড়া-দেওয়া ধর্মের ক্ষেত এবং আর-এক খণ্ড অনার্যদের প্রবৃত্তির কাঁটাবন নহে।

বামা সুন্দরী বা আদর্শ নারী। শ্রীচন্দ্রকান্ত সেন-প্রণীত। মূল্য আট আনা।
গ্রন্থখানি বামাসুন্দরসী নামধেয়া কোনো স্বর্গগতা পুণ্যবতী মহিলার জীবনচরিত, ভক্ত-কর্তৃক রচিত। এরূপ গ্রন্থের সমালোচনা করিতে সংকোচ বোধ করি। লেখকের আন্তরিক ভক্তি-উচ্ছ্বাস তাঁহার ভক্তি-ভাগিনীর জন্য উচ্চ সিংহাসন রচনার একান্ত চেষ্টা করিয়াছে। সেই স্পষ্ট প্রত্যক্ষ চেষ্টা তাঁহার উদ্দেশ্যকে কিয়ৎপরিমাণে ব্যর্থ করিয়াছে তথাপি বামাসুন্দরীর এই চরিত্রচিত্রে গৃহধর্মের নিঃস্বার্থপর উন্নত আদর্শ কতক পরিমাণে ব্যক্ত হইয়াছে। উপদেশপূর্ণ উচ্চভাবকে অতিস্ফুট করিবার প্রয়াসে চিত্রখানি সজীব, স্বাভাবিক ও প্রত্যক্ষগোচর হয় নাই।

শুশ্রূষা। প্রথম ভাগ। শ্যামাচরণ দে-প্রণীত। মূল্য এক টাকা।
আমাদের দেশের বহুবিস্তৃত একান্নবর্তী পরিবারে রোগেরও প্রাদুর্ভাব যথেষ্ট এবং শুশ্রূষারও অভাব নাই। বরং অতিশুশ্রূষায় রোগী বিপন্ন হইয়া পড়ে। এবং আত্মীয়দের একান্ত চেষ্টা ও উদ্‌বেগবশতই শুশ্রূষার ফল অনেক সময় বিপরীত হয়। রোগীর সুখস্বাস্থ্যবিধান কেবলমাত্র ইচ্ছা ও প্রয়াসের দ্বারা হয় না— সেজন্য শিক্ষা ও অভ্যাসের প্রয়োজন আছে। তাহা ছাড়া রোগীর পরিচর্যায় সুপ্রণালীবদ্ধ নিয়ম পালন বড়োই আবশ্যক— রুগ্‌ণকক্ষে প্রবেশ অবারিত, কথাবার্তা অসংযত, এবং সমস্তই বিধিব্যবস্থাহীন হইলে চলে না। কিন্তু হায়, সতর্ক এবং সুবিহিত ব্যবস্থা আমাদের প্রকৃতিবিরুদ্ধ, এবং চারি দিক হইতে আত্মীয়জনোচিত হৃদয়োচ্ছ্বাস-প্রকাশের সমস্ত পথ খুলিয়া রাখিতে গিয়া বিধিব্যবস্থার নিয়ম সংযমে সম্পূর্ণ ঢিলা দিতে হয়।

এই কারণে সমালোচ্য গ্রন্থখানি আমাদের দেশে মহোপকারী বলিয়া বোধ করি। গ্রন্থকার উপযুক্ত গ্রন্থ এবং সুচিকিৎসক বন্ধুর সাহায্যে এই পুস্তকখানি রচনা করিয়াছেন। তাঁহার ভাষা সরল এবং যথাসম্ভব পরিভাষাবর্জিত; ডাক্তারি সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানবিহীন পাঠক-পাঠিকাদের পক্ষে এ গ্রন্থখানি উপাদেয়।

কিন্তু কেবলমাত্র পাঠদ্বারা অল্পই ফল লাভ হইবে, শিক্ষা এবং চর্চা চাই। বালিকামাত্রেরই এই গ্রন্থ স্কুলপাঠ্য এবং পরীক্ষার বিষয় হওয়া উচিত। ঔষধ প্রয়োগ, ব্যান্ডেজ বাঁধা, পুল্টিস দেওয়া, পথ্য প্রস্তুত করা, রোগীর অবস্থা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা, সংক্রামক রোগাদিতে মারীবীজনাশক উপায়াদির সহিত সুপরিচিত হওয়া, এ-সমস্তই স্ত্রীশিক্ষার অবশ্যনির্দিষ্ট অঙ্গরূপে প্রচলিত হওয়া কর্তব্য। আজকাল দুরূহ শিক্ষা প্রণালী, পরীক্ষা-প্রতিযোগিতা এবং জীবিকা চেষ্টায় পুরুষ জাতির মধ্যে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত রুগ্‌ণসংখ্যা বাড়িয়া চলিয়াছে, রোগী-পরিচর্যা বিদ্যাটা যদি আমাদের স্ত্রীগণ বিশেষরূপে শিক্ষা করেন তবে দেশটা কিঞ্চিৎ সুস্থ হইতে পারে। তাঁহারাও যদি বাতি জ্বালিয়া রাত জাগিয়া আকণ্ঠ পড়া গিলিয়া পুরুষদের সহিত ঊর্ধ্বশ্বাসে বিদ্যা-বাহাদুরির ঘোড়-দৌড় খেলাইতে যান, দেহলতা জীর্ণ, মেরুদণ্ড নত এবং হরিণচক্ষু চশমাচ্ছন্ন করিয়া তোলেন তবে জয় বিশ্ববিদ্যালয়ের জয়— কিন্তু পরাজয় আমাদের জাতীয় সুখস্বাস্থ্যসৌন্দর্যের।

বাসনা। শ্রীমতী বিনোদিনী দাসী প্রণীত। মূল্য আট আনা।
বঙ্গসাহিত্যের এক সময় গিয়াছে যখন স্ত্রীলোকের রচনামাত্রকেই অযথা উৎসাহ দেওয়া সমালোচকগণ সামাজিক কর্তব্য বলিয়া জ্ঞান করিতেন, সেই সময়ে লেখিকা এই কাব্যগ্রন্থখানি প্রকাশ করিলে কিঞ্চিৎ যশঃ সঞ্চয় করিতে পারিতেন। কিন্তু এখন অনেক লেখিকা সাহিত্য-দরবারে উপস্থিত হওয়াতে সময়ের পরিবর্তন হইয়াছে— সুতরাং আজকাল স্ত্রীরচনা হইলেও কথঞ্চিৎ বিচার করিয়া প্রশংসা বিতরণ করিতে হয়, এইজন্য উপস্থিত গ্রন্থখানি সম্বন্ধে আমরা অধিক কথা বলিতে ইচ্ছা করি না।

পুষ্পাঞ্জলি। শ্রীরসময় লাহা -বিরচিত। মূল্য আট আনা।
গ্রন্থখানি কতকগুলি চতুর্দশপদী কবিতাবলীর সমষ্টি। এই পেলব কাব্যখণ্ডগুলির মধ্যে একটি সুকুমার মৃদু সৌরভ আছে। লেখকের ভাষায় যে একটি মিষ্ট সুর পাওয়া যায় তাহা সরল সংযত ও গম্ভীর এবং তাহাতে চেষ্টার লক্ষণ নাই। যদি এই-সকল পুষ্পের মধ্যে ভবিষ্যৎ ফলের আশা থাকে, যদি লেখকের রচনা চিন্তার বীজ এবং ভাবের রসে ভরিয়া পাকিয়া উঠে তবেই তাহা সার্থক হইবে, নচেৎ আপন মৃদু গন্ধ ক্ষণকালের মধ্যে নিঃশেষ করিয়া দিয়া ধূলিতে তাহার অবসান। যে-সকল বসন্তমুকুলে বৃন্তের জোর থাকে তাহারাই কালবৈশাখীর হাত হইতে টিকিয়া গিয়া সফলতা লাভ করে; লেখকের এই ক্ষুদ্র কাব্যগুলির মধ্যে নবমুকুলের গন্ধটুকু আছে কিন্তু এখনো তাহার বৃন্তের বল প্রমাণ হয় নাই।

ভারতী
জ্যৈষ্ঠ ১৩০৫

চিন্তালহরী। শ্রীচন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ প্রণীত।
শামুক যেমন তাহার নিজের বাসভবনটি পিঠে করিয়া লইয়া উপস্থিত হয় এ গ্রন্থখানিও তেমনি আপনার সমালোচনা আপনি বহন করিয়া বাহির হইয়াছে। গ্রন্থসম্পাদক শ্রীযুক্তবাবু অবিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিজ্ঞাপনে গ্রন্থ সম্বন্ধে নিজের অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি স্পষ্টই জানাইয়াছেন চিন্তালহরী পাঠ করিয়া পরিতৃপ্ত না হইলে তিনি ইহার প্রচারকার্যে হস্তক্ষেপ করিতেন না; এবং ইহাও বলিয়াছেন "ইহার প্রতি প্রবন্ধে ভাবুকমাত্রেরই মর্মের কথার— প্রাণের ব্যথার পরিস্ফুট ছায়া পড়িয়াছে।" অবিনাশবাবু জানেন না, ওই মর্মের কথা এবং প্রাণের ব্যথার অবতারণাকে ভাবুকেরা যত ভয় করেন এমন আর কাহাকেও নহে; ও জিনিসটা মর্মের মধ্যে প্রাণের মধ্যে থাকিয়া গেলেই ভালো হয়— এবং যদি উহাকে বাহিরে আসিতেই হয়ে তবে অপরিমিত প্রগল্‌ভতা ও ভাবভঙ্গিমার অবারিত, আড়ম্বর পরিহার করিয়া সরল সংযত সুন্দর বেশে আসাই তাহার পক্ষে শ্রেয়।

ইংরাজিতে যাহাকে বলে সেন্টিমেন্টালিজ্‌ম অর্থাৎ ভাবুকগিরি ফলানো, সহৃদয়তার ভড়ং করা, তাহার একটা বাংলা কথা থাকা উচিত ছিল। কিন্তু কথা না থাকিলেও জিনিসটা যে থাকে বাংলা সাহিত্যে এই ভাবুকতাবিকারে, কৃত্রিম হৃদয়োচ্ছ্বাসের উদ্‌ভ্রান্ত তাণ্ডব নৃত্যে তাহার প্রমাণ প্রতিদিন বাড়িয়া উঠিতেছে। এবং বর্তমান গ্রন্থখানি তাহার একটি অদ্ভুত দৃষ্টান্ত।

ভূমিকম্প। শ্রীবিপিনবিহারী ঘটক প্রণীত। মূল্য ছয় আনা।
ইহারও আরম্ভে বন্ধু-কর্তৃক এই কাব্যগ্রন্থের সমালোচনা ও প্রশংসাবাক্য সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। গদ্যে উচ্ছৃঙ্খল ভাবাবেগের উচ্ছ্বাস এক সম্প্রদায় পাঠকের রুচিকর; এবং তাহার রচনা সহজসাধ্য ও অহমিকাগর্ভ হওয়ায় অনেক লেখক তাহাতে আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। এই কারণে সেই-সকল অশোভন অশ্রুজলার্দ্র বিলাপ প্রলাপ ও কাকুক্তির আক্রমণ হইতে গদ্যকে রক্ষা করিবার চেষ্টা

সমালোচকমাত্রেরই করা কর্তব্য। কিন্তু পদ্যে অমিত্রাক্ষরছন্দে গত বর্ষের ভূমিকম্পমূলক ইতিহাস, বর্ণনা ও তত্ত্বোপদেশ কবিসাধারণের নিকট অনুকরণযোগ্য বলিয়া গণ্য হইবে না।

ভারতী
শ্রাবণ ১৩০৫

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। সমন্বয় ভাষ্য। সংস্কৃতের অনুবাদ। প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড। নববিধান মণ্ডলীর উপাধ্যায় কর্তৃক উদ্ভাসিত। প্রতিখণ্ডের মূল্য ছয় আনা।

ইংরাজি সাময়িক পত্র সম্পাদকগণের অধীনে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ অনেকগুলি সমালোচক সমালোচনা কার্যে নিযুক্ত থাকেন। বিষয়ভেদে যথোপযুক্ত লোকের হস্তে গ্রন্থ সমালোচনার ভার পড়ে। বাংলা পত্রিকার কম্পোজ করা এবং ছাপানো ছাড়া বাকি অধিকাংশ কাজই একা সম্পাদককে বহন করিতে হয়। অথচ সম্পাদকের যোগ্যতা সংকীর্ণ-সীমাবদ্ধ। সুতরাং সাধারণের নিকট মুখরক্ষা করিতে হইলে অনেক চাতুরী অনেক গোঁজামিলনের প্রয়োজন হয়।

বর্তমান গ্রন্থের উপযুক্ত সমালোচনা আমাদের সাধ্যায়ত্ত নহে। ইহাতে ভগবদ্গীতার বিচিত্র ভাষ্যের যথোচিত সমন্বয় হইয়াছে কি না তাহা বিচার করিবার মতো পাণ্ডিত্য আমাদের নাই। অথচ এখানি পণ্ডিতপ্রবর গৌরগোবিন্দ রায় মহাশয়-কর্তৃক রচিত— সুতরাং ইহার সম্বন্ধে কোনো কথা না বলিয়া আমরা অবহেলা-অপরাধের ভাগী হইতে পারি না। ইহার অনুবাদ অংশ যে নির্ভরযোগ্য, এবং ইহার বিস্তারিত বাংলা ভাষ্য যে, মনোযোগ এবং শ্রদ্ধা সহকারে পাঠ্য সে বিষয়ে আমাদের কোনো সন্দেহ নাই।

ভারতী
অগ্রহায়ণ ১৩০৫

সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা

ভারতী। ১৫শ ভাগ। আশ্বিন ও কার্তিক [১২৯৮]

এবারকার ভারতীতে লজ্জাবতী নামক একটি গল্প প্রকাশিত হইয়াছে। এ রচনাটি ছোটো গল্পলেখার আদর্শ বলিলেই হয়। দুটি-একটি বাঙালি অন্তঃপুরবাসিনীর জাজ্বল্যমান ছবি আঁকা হইয়াছে অথচ তাহাকে কোনোপ্রকার কাল্পনিক ভঙ্গি করিয়া বসানো হয় নাই, যেমনটি তেমনি উঠিয়াছে। কোনো বাড়াবাড়ি নাই, রকম-সকম নাই, রোমহর্ষণ ভাষাপ্রয়োগ নাই, অথচ পাঠসমাপ্তি কালে পাঠকের চোখে অতি সহজে অশ্রুবিন্দু সঞ্চিত হইয়া আসে। 'বিলাপ' একটি গদ্যপ্রবন্ধ। কিন্তু ইহাতে না আছে গদ্যের সংযম, না আছে পদ্যের ছন্দ। আজকাল এইরূপ উচ্ছৃঙ্খল অমূলক প্রবন্ধ বাংলা ভাষায় প্রায় দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এমন লেখার কোনো আবশ্যক দেখি না। —লিটারেরি। ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে যেমন প্রতিধ্বনি থাকে তেমনি সকল দলেরই পশ্চাতে কতকগুলি অনুবর্তী লোক থাকে তাহারা খাঁটি দলভুক্ত নহে অথচ ভাবভঙ্গির অনুকরণ করিয়া দলপতির সঙ্গে একত্রে তরিয়া যাইতে চাহে। এরূপ লোক সর্বত্রই উপহাসাস্পদ হইয়া থাকে। সেইরূপ যাঁহারা সারস্বতমণ্ডলীর ছায়াস্বরূপে থাকিয়া সাহিত্যের ভড়ং করিয়া থাকেন লেখক তাঁহাদিগকে লিটারেরি নাম দিয়া কিঞ্চিৎ বিদ্রূপ করিয়াছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে বাংলা দেশে সেরূপ মণ্ডলীও নাই এবং তাঁহাদের ফিকা অনুকরণও নাই। লেখক যে বর্ণনা প্রয়োগ করিয়াছেন তাহা বাংলা দেশের কোনো বিশেষ দলের প্রতিই প্রয়োগ করা যাইতে পারে না। লেখা পড়িয়াই মনে হয় সাহিত্য সম্বন্ধে কাহারও সহিত লেখকের তর্ক হইয়া থাকিবে, এবং প্রতিপক্ষের নিকট হইতে এমন কোনো রূঢ় উত্তর শুনিয়া থাকিবেন যে, "ও-সকল তুমি বুঝিবে কী করিয়া!" সেই ক্ষোভে তাঁহার প্রতিপক্ষের একটি বিরূপ প্রতিমূর্তি আঁকিয়া অমনি কাগজে ছাপাইয়া বসিয়াছেন। লেখকের বিবেচনায় তাঁহার এ রচনা যতই তীব্র এবং অসামান্য ব্যঙ্গরসপূর্ণ হৌক-না-কেন ইহা ছাপায় প্রকাশ করিবার যোগ্য নয়। এরূপ লেখা সত্যও নহে, সুন্দরও নহে, এবং ইহাতে কাহারও কোনো উপকার দেখি না। —প্ল্যাঞ্চেট। আদি ব্রাহ্মসমাজের শ্রদ্ধাস্পদ আচার্য শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় উক্ত নামে যে পত্র প্রকাশ করিয়াছেন তাহা বিশেষ প্রণিধানের যোগ্য। প্ল্যাঞ্চেটে বিদ্যারত্ন মহাশয় এবং একটি বালকের সহযোগে যে দুইটি ইংরাজি কবিতা বাহির হইয়াছে তাহা অতিশয় বিস্ময়জনক। বিশেষত শেষ কবিতাটি কোনো বাঙালির নিকট হইতে আশা করা যায় না। —'একাল ও ওকালের মেয়ে' যে লেখিকার রচনা আমরা তাঁহাকে ধন্যবাদ দিই। এরূপ সরল পরিষ্কার যুক্তিপূর্ণ এবং চিত্রিতবৎ লেখা কয়জন লেখক লিখিতে পারেন? লেখিকা কালের পরিবর্তন সম্বন্ধে যে গুটিকতক কথা বলিয়াছেন তাহা অতিশয় সারগর্ভ। যে লোক ট্রামে চড়িতেছে; পূর্বে যাহারা ঠন্‌ঠনের চটিও পরিত না আজ তাহারা বিলাতি জুতা-মোজা পরিতেছে; জীবনযাত্রা সম্বন্ধে পুরুষসমাজে যে আশ্চর্য পরিবর্তন প্রচলিত হইয়াছে তাহা কয়জন পূর্বের সহিত তুলনা করিয়া দেখেন? কিন্তু আমাদের স্ত্রীলোকদের মধ্যে বর্তমান কালোচিত পরিবর্তনের লেশমাত্র দেখিলেই এই নূতন ভাবের ভাবুক, এই নূতন বিদ্যালয়ের ছাত্র এই নূতন পরিচ্ছদ-পরিহিত নববিলাসী পরিহাস করেন, প্রহসন লেখেন এবং কেহ কেহ সীতা দময়ন্তীকে স্মরণ করিয়া প্রকাশ্যে অশ্রু বিসর্জন করিয়া থাকেন। তাঁহারা আশা করেন সমাজের পুরুষার্ধ শিক্ষাকিরণে পাকিয়া রাঙা হইয়া উঠিবে এবং বাকি অর্ধেক সনাতন কচিভাব রক্ষা করিবে। এক যাত্রায় পৃথক ফল হয় না, এক ফলে পৃথক নিয়ম খাটে না। অতএব ভালোই বল আর মন্দই বল পুরুষের অনুগামিনী হওয়া স্ত্রীলোকের প্রাচীন ধর্ম— বর্তমান সহস্র নূতনত্বের মধ্যে সেই প্রাচীন মনু-কথিত ধর্ম অব্যাহত থাকিবার চেষ্টা করিতেছে। লেখিকা বর্তমান আতিথ্য সম্বন্ধে যে দু-এক কথা লিখিয়াছেন তাহার মধ্যে অনেক ভাবিবার বিষয় আছে।

নব্যভারত। আশ্বিন ও কার্তিক। [১২৯৮]
'চৈতন্যচরিত ও চৈতন্যধর্ম'; বহুকাল হইতে এই প্রবন্ধ নব্যভারতে প্রকাশিত হইতেছে। চৈতন্যের জীবনচরিত ও ধর্ম সম্বন্ধে লেখক একটি কথাও বাকি রাখিতেছেন না। কিন্তু ইহার সঙ্গে সঙ্গে ঐতিহাসিক বিচার দ্বারা সত্য মিথ্যা নির্বাচন করিয়া গেলে ভালো হইত। যাহা হৌক, লেখকের পরিশ্রম এবং বিপুল সংগ্রহের জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতে হয় এবং সেইসঙ্গে সম্পাদককে বলিতে হয় এরূপ বিস্তারিত গ্রন্থ সাময়িক পত্রে প্রকাশের যোগ্য নহে। "সাঁওতালের বিবাহ প্রণালী" প্রবন্ধটি বিশেষ কৌতুকজনক। "মহা তীর্থযাত্রা" লেখকের নরোয়ে ভ্রমণ বৃত্তান্ত। বর্ণনাংশ বড়ো বেশি সংক্ষিপ্ত এবং লেখকের হৃদয়াবেগ অতিরিক্ত মাত্রায় প্রবল। শ্রীযুক্ত সখারাম গণেশ দেউস্কর মহাশয় "শকাব্দ" প্রবন্ধে শকাব্দ প্রবর্তনের ইতিহাস সমালোচনা করিয়াছেন। সাধারণের বিশ্বাস, এই অব্দ বিক্রমাদিত্য-কর্তৃক প্রচলিত। লেখক প্রমাণ করিতেছেন যে, এক সময়ে মধ্য এশিয়াবাসী শক জাতি (ইংরাজিতে যাহাদিগকে সাইথিয়ান্‌স্ বলে) ভারতে রাজ্য স্থাপন করিয়া এই অব্দ প্রচলিত করে। লেখক প্রাচীন গ্রন্থ হইতে অনেকগুলি প্রমাণ আবিষ্কার করিয়াছেন। রচনাটি অতিশয় প্রাঞ্জল হইয়াছে। সাধারণত বাংলা সাময়িক পত্রে পুরাতত্ত্ব প্রবন্ধগুলি অসংখ্য তর্কজালে জড়িত হইয়া পাঠকসাধারণের পক্ষে যেরূপ একান্ত দুর্গম ও ভীতিজনক হইয়া উঠে এ লেখাটিকে সে অপবাদ দেওয়া যায় না— আশ্চর্য এই যে প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত সুসংলগ্ন সংক্ষিপ্ত এবং বোধগম্য। "আত্মসম্ভ্রম" প্রবন্ধ হইতে আমরা দুই-এক জায়গা উদ্‌ধৃত করি। বিলাতি পণ্যদ্রব্য ব্যবহার সম্বন্ধে লেখক লিখিতেছেন, "তুমি যাহার কাপড় পরিয়া আরাম পাও, যাহার হার্মোনিয়ম বাজাইয়া পুলকিত হও, যাহার রেলগাড়ি ও টেলিগ্রাফ দেখিয়া চমকিয়া যাও, যাহার পমেটাম ল্যাভেন্ডার মাথায় দিয়া কৃতার্থ মনে কর, যাহার ফেটিঙে চড়িয়া স্বর্গসুখ লাভ কর, যাহার জাহাজ কামান তোমার দেবকীর্তি বোধ হয় তাহার সহিত তোমার কোনো সম্বন্ধ থাকুক বা না থাকুক, তাহার গোলাম তোমাকে হইতেই হইবে।... ইংরাজের শিল্প সম্বন্ধে আমার এ বিশ্বাস অটল যে, তাহার এ দেশের অর্ধেক আধিপত্য রেল ও স্টিমার হইতে হইয়াছে; কারণ, সাধারণে এইগুলি সর্বদা দেখিয়া থাকে ও বিস্ময়জনক মনে করে, সুতরাং ইহাতেই নিজের নিজের বল, সাহস ও অভিমান হারায়।"

সাহিত্য। দ্বিতীয় ভাগ। আশ্বিন। [১২৯৮]
এই সংখ্যায় 'ফুলদানী' নামক একটি ছোটো উপন্যাস ফরাসীস্ হইতে অনুবাদিত হইয়াছে। প্রসিদ্ধ লেখক প্রস্পর মেরিমে -প্রণীত এই গল্পটি যদিও সুন্দর কিন্তু ইহা বাংলা অনুবাদের যোগ্য নহে। বর্ণিত ঘটনা এবং পাত্রগণ বড়ো বেশি য়ুরোপীয়— ইহাতে বাঙালি পাঠকদের রসাস্বাদনের বড়োই ব্যাঘাত করিবে। এমন-কি, সামাজিক প্রথার পার্থক্যহেতু মূল ঘটনাটি আমাদের কাছে সম্পূর্ণ মন্দই বোধ হইতে পারে। বিশেষত মূল গ্রন্থের ভাবা-মাধুর্য অনুবাদে কখনোই রক্ষিত হইতে পারে না, সুতরাং রচনার আব্রুটুকু চলিয়া যায়। "শিক্ষিতা নারী" প্রবন্ধে শ্রীমতী কৃষ্ণভাবিনী বিস্তর গবেষণা প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় নারীদের অর্থোপার্জনশক্তির দৃষ্টান্তস্বরূপে মার্কিন স্ত্রী-ডাক্তার স্ত্রী-অ্যাটর্নি এবং ইংরাজ স্ত্রী-গ্রন্থকারদিকের আয়ের আলোচনা করা নিষ্ফল। বড়ো বড়ো ধনের অঙ্ক দেখাইয়া আমাদিগকে মিথ্যা প্রলোভিত করা হয় মাত্র। জর্জ এলিয়ট তাহার প্রথম গ্রন্থ বিক্রয় করিয়া লক্ষ টাকা মূল্য পাইয়াছিলেন। যদি নাও পাইতেন তাহাতে তাঁহার গৌরবের হানি হইত না। এমন দৃষ্টান্ত শুনা গিয়াছে অনেক পুরুষ গ্রন্থকার তাঁহাদের জগদ্‌বিখ্যাত গ্রন্থ নিতান্ত যৎসামান্য মূল্যে বিক্রয় করিয়াছেন। দ্বিতীয় কথা এই, পুরুষের কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া অর্থোপার্জন স্ত্রীলোকের কার্য নহে। যদি দুর্ভাগ্যক্রমে কোনো স্ত্রীলোককে বাধ্য হইয়া স্বয়ং উপার্জনে প্রবৃত্ত হইতে হয় তবে তাঁহাকে দোষ দেওয়া বা বাধা দেওয়া উচিত হয় না স্বীকার করি— 'কিন্তু সংসার রক্ষা করিতে হইলে সাধারণ স্ত্রীলোককে

স্ত্রী এবং জননী হইতেই হইবে। সর্বদেশে এবং সর্বকালেই স্ত্রীলোক যে পুরুষের সমান শিক্ষা লাভে বঞ্চিত হইয়াছেন অবশ্যই তাহার একটা প্রাকৃতিক কারণ আছে। মানুষের প্রথম শিক্ষা বিদ্যালয়ে নহে, বহির্জগতে, কর্মক্ষেত্রে। গর্ভধারণ এবং সন্তানপালনে অবশ্য নিযুক্ত হইয়া স্ত্রীলোক চিরকাল এবং সর্বত্র সেই শিক্ষায় বহুল পরিমাণে বঞ্চিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া এই জননীকর্তব্যের উপযোগী হইবার অনুরোধে তাঁহাদের শারীরিক প্রকৃতিও ভিন্নতা প্রাপ্ত হইয়াছে। এই ভিন্নতাই যে স্ত্রী-পুরুষের বর্তমান অবস্থাপার্থক্যের মূল প্রাকৃতিক কারণ তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যাহা হউক, এক্ষণে সভ্য সমাজের অবস্থা অনেক পরিমাণে নূতন আকার ধারণ করিয়াছে। প্রথমত, এককালে মানুষকে যাহা দায়ে পড়িয়া প্রকৃতির সহিত সংগ্রাম করিয়া শিক্ষা করিতে হইত, এখন তাহার অধিকাংশ বিনা বিপদ ও চেষ্টায় বিদ্যালয়ে পাওয়া যায়। দ্বিতীয়ত, অবিশ্রাম যুদ্ধবিগ্রহ প্রভৃতি নিবারিত হইয়া স্ত্রীপুরুষের মধ্যে ক্রমশ প্রকৃতির সামঞ্জস্য হইয়া আসিতেছে। কিন্তু সভ্যতার একটি লক্ষণ এই, উত্তরোত্তর কর্তব্যের ভাগ। কুঁড়ি যত ফুটিতে থাকে তাহার প্রত্যেক দল ততই স্বতন্ত্র হইয়া আসে। সভ্যতার উন্নতি অনুসারে স্ত্রীলোকের কর্তব্যও বাড়িয়া উঠিয়া তাহাকে পুরুষ হইতে পৃথক করিতে থাকিবে। অনেক পশু জন্মদান করিয়াই জননীকর্তব্য হইতে অব্যাহতি পায়। কিন্তু মনুষ্যমাতা বহুকাল সন্তানভার ত্যাগ করিতে পারেন না। অসভ্য অবস্থায় সন্তানের প্রতি মাতার কর্তব্য অপেক্ষাকৃত লঘু ও ক্ষণস্থায়ী। যত সভ্যতা বাড়িতে থাকে, যতই মানুষের সম্পূর্ণতা পরিস্ফুট হইতে থাকে, ততই "মানুষ করা" কাজটা গুরুতর হইয়া উঠে। প্রথমে যাহা বিনা শিক্ষায় সম্পন্ন হইতে পারিত, এখন তাহাতে বিশেষ শিক্ষার আবশ্যক করে। অতএব মানুষ যতই উন্নত হইয়া উঠিতে থাকে মাতার কর্তব্য ততই গৌরবজনক এবং শিক্ষাসাধ্য হইয়া উঠে। তাহার পর, যিনি জননী হইয়াছেন, জননীর স্নেহ, জননীর সেবাপরায়ণতা, জননীর শিক্ষা বিশেষ করিয়া লাভ করিয়াছেন তিনি কি সন্তান যোগ্য হইবামাত্র সেগুলি বাক্সয় তুলিয়া রাখিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারেন। তাঁহার সেই-সমস্ত শিক্ষা তাঁহার সেই-সমস্ত কোমল প্রবৃত্তির নিয়ত চর্চা ব্যতীত তিনি কি চরিতার্থতা লাভ করিতে পারেন? এইজন্য তিনি স্বতই তাঁহার স্বামী ও পরিবারের জননীপদ গ্রহণ করেন— ইহা তাঁহার জীবনের স্বাভাবিক গতি। এবং তাঁহার কন্যাও সেই জননীর গুণ প্রাপ্ত হয়, এবং নিঃসন্তান হইলেও হৃদয়ের গুণে তাঁহার সন্তানের অভাব থাকে না। প্রকৃতিই রমণীকে বিশেষ কার্যভার ও তদনুরূপ প্রবৃত্তি দিয়া গৃহবাসিনী করিয়াছেন, পুরুষের সার্বভৌমিক স্বার্থপরতা ও উৎপীড়ন নহে— অতএব বাহিরের কর্ম দিলে তিনি সুখীও হইবেন না, সফলও হইবেন না। দেনা-পাওনা, কেনাবেচা নিষ্ঠুর কাজ। সে কাজে যাহারা কৃতকার্যতা লাভ করিতে চাহে তাহারা কেহ কাহাকেও রেয়াত করে না। পরস্পরকে নানা উপায়ে অতিক্রম করিয়া নিজের স্বার্থটুকুকে রক্ষা করা ব্যাবসা, বিজ্‌নেস্‌। এইজন্য কার্যক্ষেত্রে সহৃদয়তা অধিকাংশ স্থলে হাস্যাস্পদ এবং বেশিদিন টিকিতেও পারে না। যিনি প্রকৃতির নির্দেশানুসারে সংসারের মা হইয়া জন্মগ্রহণ করেন তিনি যে শিক্ষা লাভ করিবেন তাহা বিক্রয় করিবার জন্য নহে, বিতরণ করিবার জন্য। অতএব আমেরিকায় যে দোকানদারি আরম্ভ হইয়াছে সে কথা না উত্থাপন করাই ভালো, তাহার ফলাফল এখনো পরীক্ষা হয় নাই।

তবে এ কথা সহস্রবার করিয়া বলিতে হইবে, মানুষকে 'মানুষ করিয়া' তুলিতে শিক্ষার আবশ্যক। সেও যে কেবল সামান্য ছিটেফোঁটা মাত্র তাহা নহে, রীতিমতো শিক্ষা। অবশ্য মানুষকে কেরানি করিয়া তুলিতে বেশি শিক্ষা চাই না, স্তনদানের পালা সাঙ্গ করিয়া পাঠশালায় ছাড়িয়া দিলেই চলে; দোকানদার করিতে হইলেও প্রায় তদ্রূপ। কিন্তু আমরা সচরাচর মনে করি মানুষ হইয়া তেমন লাভ নাই, সুদে পোষায় না, যেমন-তেমন করিয়া আপিসে প্রবেশ করিতে পারিলেই জীবনের কৃতার্থতা; অতএব মেয়েদের শিক্ষা দিবার আবশ্যক নাই, তাহারা স্তনদান এবং রান্না-বাড়না করুক, আমরা সে কাজগুলাকে আধ্যাত্মিক আখ্যা দিয়া তাহাদিগকে সান্ত্বনা দিব এবং শিক্ষা স্বাস্থ্য ও সুখ সম্মানের পরিবর্তে দেবী উপাধি দিয়া তাহাদিগকে বিনামূল্যে ক্রয় করিয়া রাখিব।

কার্তিক। [১২৯৮] কার্তিক মাসের সাহিত্যে "হিন্দুজাতির রসায়ন" একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধে অনেকগুলি প্রাচীন রাসায়নিক যন্ত্রের বর্ণনা প্রকাশিত হইয়াছে। এই সংখ্যায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আত্মজীবনচরিতের কয়েক পৃষ্ঠা বাহির হইয়াছে। ইহাতে অলংকারবাহুল্য বা আড়ম্বরের লেশমাত্র নাই। পূজনীয় লেখকমহাশয় সমগ্র গ্রন্থটি শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই বলিয়া মনে একান্ত আক্ষেপ জন্মে। এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইলে বাঙালিদের পক্ষে শিক্ষার স্থল হইত। প্রথমত, একটি অকৃত্রিম মহত্ত্বের আদর্শ বঙ্গসাহিত্যে চিরজীবন লাভ করিয়া বিরাজ করিত, দ্বিতীয়ত, আপনার কথা কেমন করিয়া লিখিতে হয় বাঙালি তাহা শিখিতে পারিত। সাধারণত বাঙালি লেখকেরা নিজের জবানী কোনো কথা লিখিতে গেলে অতিশয় সহৃদয়তা প্রকাশ করিবার প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া থাকেন— হায় হায় মরি মরি শব্দে পদে পদে হৃদয়াবেগ ও অশ্রুজল উদ্‌বেলিত করিয়া তোলেন। 'আত্মজীবনচরিত' যতটুকু বাহির হইয়াছে তাহার মধ্যে একটি সংযত সহৃদয়তা এবং নিরলংকার সত্য প্রতিভাত হইয়া উঠিয়াছে। স্ত্রীজাতির প্রতি লেখকমহাশয় যে ভক্তি প্রকাশ করিয়াছেন তাহা কেমন সরল সমূলক ও অকৃত্রিম। আজকাল যাঁহারা স্ত্রীজাতির প্রতি আধ্যাত্মিক দেবত্ব আরোপ করিয়া বাক্‌চাতুরি প্রকাশ করিয়া থাকেন তাঁহাদের সহিত কী প্রভেদ।

সাধনা
অগ্রহায়ণ ১২৯৮

নব্যভারত। অগ্রহায়ণ। [১২৯৮]
"হিন্দুধর্মের আন্দোলন ও সংস্কার" নামক প্রবন্ধে লেখক প্রথমে বাংলার শিক্ষিত সমাজে হিন্দুধর্মের নূতন আন্দোলনের ইতিহাস প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার পর দেখাইয়াছেন আমাদের বর্তমান অবস্থায় পুরাতন হিন্দুপ্রথা সম্পূর্ণভাবে পুনঃপ্রচলিত হওয়া অসম্ভব। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলেন 'ভিন্ন দেশজাত দ্রব্যমাত্রই হিন্দুদের ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। কিন্তু বিলাতি আলু, কপি, কাবুলি মেওয়া প্রভৃতিও এখন বিলক্ষণ প্রচলিত হইয়াছে।' 'সোডা লিমনেড্ বরফ প্রভৃতি প্রকাশ্যরূপে হিন্দুসমাজে প্রচলিত। এ-সমস্ত যে স্পষ্ট যবন ও ম্লেচ্ছদের হাতের জল।' তিনি বলেন, শাস্ত্রে পলাণ্ডুভক্ষণ নিষেধ কিন্তু দাক্ষিণাত্যে ব্রাহ্মণ হইতে ইতর জাতি পর্যন্ত সকলেই পলাণ্ডু ভক্ষণ করিয়া থাকে। 'যবনকে স্পর্শ করিলে স্নান করিতে হয়, কিন্তু বঙ্গদেশ ব্যতীত, ভারতবর্ষের অপর অংশের হিন্দুগণ মুসলমানদের সহিত একত্রে বসিয়া তাম্বুল ভক্ষণ করেন।' 'যজ্ঞ-উপবীত হইবার পর আমাদিগকে অন্যূন বারো বৎসর গুরুগৃহে বাস করিয়া ব্রহ্মচর্য অবলম্বনকরত শাস্ত্র আলোচনা এবং গুরুর নিকট হইতে উপদেশ গ্রহণ করিতে হয়। পরে গুরুর অনুমতি লইয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতে হয়। কিন্তু বর্তমান সময়ে এ পদ্ধতি অনুসারে কে কার্য করিয়া থাকে?' 'ব্রাহ্মণের ত্রিসন্ধ্যা করিতে হয় কিন্তু বর্তমান সময়ে যাঁহারা চাকুরি করেন তাঁহারা কী প্রকারে মধ্যাহ্নসন্ধ্যা সমাধা করিতে পারেন?' লেখক বলেন, যাঁহারা অনাচারী হিন্দুদিগকে শাসন করিবার জন্য সমুৎসুক তাঁহাদিগকেই হিঁদুয়ানি লঙ্ঘন করিতে দেখা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপে দেখাইয়াছেন, বঙ্গবাসী কার্যালয় হইতে নানাপ্রকার শাস্ত্রীয় গ্রন্থ প্রকাশ হইতেছে; ইহাতে করিয়া শাস্ত্রীয় বাক্য বেদবাক্যসকল স্ত্রী, শূদ্র, বলিতে কি, যবন ও ম্লেচ্ছদের গোচর হইতেছে। অধিক কী, বৈদিক সন্ধ্যাও তাঁহাদের কর্তৃক পরিচালিত পত্রিকায় প্রকাশিত ও ব্যাখ্যাত হইতেছে। অতঃপর লেখক বহুতর শাস্ত্রবচন উদ্‌ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন প্রাচীনকালেই বা ব্রাহ্মণের কীরূপ লক্ষণ ছিল এবং বর্তমানকালে তাহার কত পরিবর্তন হইয়াছে। এই প্রবন্ধের মধ্যে অনেক শিক্ষা ও চিন্তার বিষয় আছে। কেবল একটা কথা আমাদের নূতন ঠেকিল। বঙ্কিমবাবু যে শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন ও শশধর তর্কচূড়ামণির ধুয়া ধরিয়া হিন্দুধর্মের পক্ষপাতী হইয়াছেন এ কথা মুহূর্তকালের জন্যও প্রণিধানযোগ্য নহে। "ঋষি চিত্র" একটি কবিতা। লেখক শ্রীযুক্ত মধুসূদন রাও। নাম শুনিয়া কবিকে মহারাষ্ট্রীয় বলিয়া বোধ

হইতেছে। কিন্তু বঙ্গভাষায় এরূপ কবিত্ব প্রকাশ আর-কোনো বিদেশীর দ্বারায় সাধিত হয় নাই। কবির রচনার মধ্যে প্রাচীন ভারতের একটি শিশির-স্নাত পবিত্র নবীন উষালোক অতি নির্মল উজ্জ্বল এবং মহৎভাবে দীপ্তি পাইয়াছে। এই কবিতার মধ্যে আমরা একটি নূতন রসাস্বাদন করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছি। প্রাচীন ভারত সম্বন্ধে বাংলার অধিকাংশ লেখক যাহা লেখেন তাহার মধ্যে প্রাচীনত্বের প্রকৃত আস্বাদ পাওয়া যায় না; কিন্তু ঋষিচিত্র কবিতার মধ্যে একটি প্রাচীন গম্ভীর ধ্রুপদের সুর বাজিতেছে। নব্যভারতে শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্তের 'হিন্দু আর্যদিগের প্রাচীন ইতিবৃত্ত' খণ্ডশ বাহির হইতেছে। রমেশবাবু যে এতটা শ্রম স্বীকার করিয়াছেন দেখিয়া আশ্চর্য হইলাম, কারণ, আমাদের দেশের বুদ্ধিমানগণ প্রাচীন হিন্দুসমাজ ঘরে বসিয়া গড়িয়া থাকেন। সে সমাজে কী ছিল কী না ছিল, কোন্‌টা হিন্দু কোন্‌টা অহিন্দু সেটা যেন বিধাতাপুরুষ সূতিকাগৃহে তাঁহাদের মস্তিষ্কের মধ্যে লিখিয়া দিয়াছেন, তাহার অন্য কোনো ইতিহাস নাই। ঐতিহাসিক প্রণালী অনুসরণ করিয়া রমেশবাবু এই যে প্রাচীন সমাজচিত্র প্রকাশ করিতেছেন ইহার সহিত আমাদের বাংলার আজন্ম-পণ্ডিতগণের মস্তিষ্ক-লিখনের ঐক্য হইবে এরূপ আশা করা যায় না। নিজের শখ অনুসারে তাঁহারা প্রত্যেকেই দুটি-চারিটি মনের মতো শ্লোক সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন, ইতিহাস বিজ্ঞানকে তাহার কাছে ঘেঁসিতে দেন না। মনে করো তাহার কোনো-একটি শ্লোকে ঋষি বলিতেছেন রাত্রি, আমরা দেখিতেছি দিন। বঙ্গপণ্ডিত তৎক্ষণাৎ তাহার মীমাংসা করিয়া দিবেন 'আচ্ছা চোখ বুজিয়া দেখো দিন কি রাত্রি।' অমনি বিংশতি সহস্র চেলা চোখ বুজিবেন এবং মস্তক আন্দোলন করিয়া বলিবেন 'অহো কী আশ্চর্য! ঋষিবাক্যের কী মহিমা! গুরুদেবের কী তত্ত্বজ্ঞান! দিবালোকের লেশমাত্র দেখিতেছি না'। যে হতভাগ্য চোখ খুলিয়া থাকিবে, যদি তাহার চোখ বন্ধ করিতে অক্ষম হন তো ধোপা নাপিত বন্ধ করিবেন, এবং দুই-একজন মহাপ্রাজ্ঞ সৃষ্টিছাড়া তত্ত্ব উদ্‌ভাবন করিয়া তাহার চোখে ধুলা দিতে ছাড়িবেন না। দুঃখের বিষয়, বাঙালির এই স্বরচিত ভারতবর্ষ, সত্য হৌক, মিথ্যা হৌক খুব যে উচ্চশ্রেণীর ভারতবর্ষ তাহা নহে। বাংলাদেশের একখানি গ্রামকে অনেকখানি “আধ্যাত্মিক’ গঙ্গাজলের সহিত মিশাল করিয়া একটি বৃহৎ ভারতবর্ষ রচনা করা হয়; সেখানেও কয়েকজন নিস্তেজ নির্বীয মানুষ অদৃষ্টের কর-ধৃত নাসারজ্জু অনুসরণ করিয়া সাতিশয় কৃশ ও পবিত্রভাবে ধীরে ধীরে চলিতেছে; সমাজ অর্থে জাতি লইয়া দলাদলি, ধর্ম অর্থে সর্ববিষয়েই স্বাধীন বুদ্ধিকে বলিদান, কর্ম অর্থে কেবল ব্রতপালন এবং ব্রাহ্মণভোজন, বিদ্যা অর্থে পুরাণ মুখস্থ, এবং বুদ্ধি অর্থে সংহিতার শ্লোক লইয়া আবশ্যক অনুসারে ব্যাকরণের ইন্দ্রজাল দ্বারা আজ 'না'-কে হাঁ করা কাল 'হাঁ'-কে না করার ক্ষমতা। একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে বঙ্গসমাজ প্রাচীন হিন্দুসমাজের ন্যায় উন্নত ও সজীব নহে, অতএব বাঙালির কল্পনার দ্বারা প্রাচীন ভারতের প্রতিমূর্তি নির্মাণ অসম্ভব— প্রকৃষ্ট পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া রীতিমতো ইতিহাসের সাহায্য ব্যতীত আর গতি নাই। একজন চাষা বলিয়াছিল, আমি যদি রানী রাসমণি হইতাম তবে দক্ষিণে একটা চিনির হাঁড়ি রাখিতাম, বামে একটা চিনির হাঁড়ি রাখিতাম, একবার ডান দিক হইতে একমুষ্টি লইয়া খাইতাম একবার বাম দিক হইতে একমুষ্টি লইয়া মুখে পুরিতাম। বলা বাহুল্য, চিনির প্রাচুর্যে রানী রাসমণির এতাধিক সন্তোষ ছিল না। রমেশবাবুও প্রমাণ পাইয়াছেন প্রাচীন ভারতে ব্রহ্মণ্য ও সাত্ত্বিকতারই সর্বগ্রাসী প্রাদুর্ভাব ছিল না; মৃত্যুর যেরূপ একটা ভয়ানক নিশ্চল ভাব আছে তখনকার সমাজনিয়মের মধ্যে সেরূপ একটা অবিচল শ্বাসরোধী চাপ ছিল না, তখন বর্ণভেদ প্রথার মধ্যেও সজীব স্বাধীনতা ছিল। কিন্তু চিনিকেই যে লোক সর্বোৎকৃষ্ট খাদ্য বলিয়া স্থির করিয়াছে, তাহাকে রানী রাসমণির আহারের বৈচিত্র্য কে বুঝাইতে পারিবে?— দুর্ভাগ্যক্রমে একটি মত বহুকাল হইতে প্রচারিত হইয়াছে যে, হিন্দুসমাজের পরিবর্তন হয় নাই। সেই কথা লইয়া আমরা গর্ব করিয়া থাকি যে আমাদের সমাজ এমনি সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছিল যে সহস্র বৎসরে তাহার এক তিল পরিবর্তন সাধন করিতে পারে নাই। জগতের কোথাও কিছুই থামিয়া নাই, হয় সংস্কার নয় বিকারের দিকে যাইতেছে; যখন গঠন বন্ধ হয় তখনই ভাঙন আরম্ভ হয় জীবনের এই

নিয়ম। জগতের মধ্যে কেবল হিন্দুসমাজ থামিয়া আছে। হিন্দুসমাজের শ্রেষ্ঠতার পক্ষে সেই একটি প্রধান যুক্তি, এ সমাজ সাধারণ জগতের নিয়মে চলে না, এই ঋষি-রচিত সমাজ বিশ্বামিত্র-রচিত জগতের ন্যায় সৃষ্টিছাড়া। কিন্তু ইঁহারা এক মুখে দুই কথা বলিয়া থাকেন। একবার বলেন হিন্দুসমাজ নির্বিকার নিশ্চল, আবার সময়ান্তরে পতিত ভারতের জন্য বর্তমান অনাচারের জন্য কণ্ঠ ছাড়িয়া বিলাপ করিতে থাকেন। কিন্তু পতিত ভারত বলিতে কি প্রাচীন ভারতবর্ষের বিকার বুঝায় না? সেই হিন্দুধর্ম সেই হিন্দুসমাজ সবই যদি ঠিক থাকে তবে আমরা নূতনতর জীব কোথা হইতে আসিলাম? 'য়ুরোপীয় মহাদেশ' লেখাটি সন্তোষজনক নহে। কতকগুলা নোট এবং ইংরাজি, বাংলা, ফরাসি (ভুল বানানসমেত) একত্র মিশাইয়া সমস্ত ব্যাপারটা অত্যন্ত অপরিষ্কার এবং অসংলগ্ন হইয়াছে। বাংলা লেখার মধ্যে অনেকখানি করিয়া ইংরাজি এই পত্রে অন্যান্য প্রবন্ধেও দেখা যায় এবং সকল সময়ে তাহার অত্যাবশ্যকতা বুঝা যায় না। 'বঙ্গবাসীর মৃত্যু' প্রবন্ধে লেখক বড়ো বেশি হাঁসফাঁস করিয়াছেন; লেখক যত সংযত ভাবে লিখিতেন লেখার বল তত বৃদ্ধি পাইত। হৃদয়ের উত্তাপ অতিমাত্রায় রচনার মধ্যে প্রয়োগ করিলে অনেক সময়ে তাহা বাষ্পের মতো লঘু হইয়া যায়।

সাহিত্য। অগ্রহায়ণ।
বর্তমান-সংখ্যক সাহিত্যে 'আহার' সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের যে প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে তাহার বিস্তারিত সমালোচনা স্থানান্তরে প্রকাশিত হইল।[১] 'প্রাকৃতিক নির্বাচনে' চন্দ্রশেখরবাবু ডারুয়িনের মতের কিয়দংশ সংক্ষেপে সরল ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। 'মুক্তি' একটি ছোটো গল্প। কতকটা রূপকের মতো। কিন্তু আমরা ইহার উপদেশ সম্যক্ গ্রহণ করিতে পারিলাম না। মুক্তি যে সংসারের বাহিরে হিমালয়ের শিখরের উপরে প্রাপ্তব্য তাহা সংগত বোধ হয় না। মুক্তি অর্থে আত্মার স্বাধীনতা, কিন্তু স্বাধীনতা অর্থে শূন্যতা নহে। অধিকার যত বিস্তৃত হয় আত্মার ক্ষেত্র ততই ব্যাপ্ত হয়। সেই অধিকার বিস্তারের উপায় প্রেম। প্রেমের বিষয়কে বিনাশ করিয়া মুক্তি নহে, প্রেমের বিষয়কে ব্যাপ্ত করিয়াই মুক্তি। বৈষয়িক স্বার্থপরতায় আমরা সমস্ত সুখ সম্পদ কেবল নিজের জন্য সঞ্চয় করিতে চেষ্টা করি— কিন্তু সুখকে অনেকের মধ্যে বিভাগ করিয়া না দিলে সুখের প্রসারতা হয় না— এইজন্য কৃপণ প্রেমের বৃহত্তর সুখ হইতে বঞ্চিত হয়। আত্মসুখে বিশ্বসুখকে বাদ দিলে আত্মসুখ অতি ক্ষুদ্র হইয়া পড়ে। তেমনি আধ্যাত্মিক স্বার্থপরতায় আমরা আপনার আত্মাটি কক্ষে লইয়া অনন্ত বিশ্বকে লঙ্ঘন করিয়া একাকী মুক্তিশিখরের উপরে চড়িয়া বসিতে চাহি। কিন্তু প্রেমের মুক্তি সেরূপ নহে— যে বিশ্বকে ঈশ্বর ত্যাগ করেন নাই, সে বিশ্বকে সেও ত্যাগ করে না। যে দিন নিখিলকে আপনার ও আপনাকে নিখিলের করিতে পারিবে সেই দিনই তাহার মুক্তি। কিন্তু তাহার পূর্বে অসংখ্য সোপান আছে তাহার কোনোটিকে অবহেলা করিবার নহে। অধিকারের স্বাধীনতা এবং অধিকারহীনতার স্বাধীনতায় আকাশপাতাল প্রভেদ। —চীন পরিব্রাজক হিউএন্ সঙের ভ্রমণবৃত্তান্ত অবলম্বন করিয়া রজনীকান্ত গুপ্ত মহাশয় 'প্রাচীন ভারতবর্ষ' নামে খৃ. সপ্তম শতাব্দীর ভারতবর্ষের একটি চিত্র প্রকাশ করিতেছেন। নাম লইয়া তারিখ লইয়া কেবল তর্কবিতর্কের আবর্ত রচনা না করিয়া প্রাচীন কালের এক-একটি চিত্র অঙ্কিত করিলে পাঠকদিগের বাস্তবিক উপকার হয়। গুপ্ত মহাশয় যদি ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন সময়ের সামাজিক অবস্থা ও জীবনযাত্রার প্রণালী তৎসাময়িক সাহিত্য ও অন্যান্য প্রমাণ হইতে উদ্ধার করিয়া চিত্রবৎ পাঠকদের সম্মুখে ধরিতে পারেন তবে সাহিত্যের একটি মহৎ অভাব দূর হয়।

সাধনা
পৌষ ১২৯৮

---

[১] দ্র. "আহার সম্বন্ধে চন্দ্রনাথবাবুর মত", সমাজ, পরিশিষ্ট, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১২, পৃ. ৪৬২

নব্যভারত। পৌষ [১২৯৮]

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় এই সংখ্যায় 'হিন্দু আর্যদিগের প্রাচীন ইতিহাস' প্রবন্ধে প্রাচীন হিন্দুদিগের সামাজিক ও গার্হস্থ্য জীবন বর্ণনা করিয়াছেন। কথায় কথায় তুমুল তর্কবিতর্কের ঝড় না তুলিয়া এবং মাকড়সার জালের মতো চতুর্দিকে ইংরাজি বাংলা নোটের দ্বারা মূল কথাটাকে আচ্ছন্ন ও লুপ্তপ্রায় না করিয়া তিনি প্রাচীন ইতিহাসকে ধারাবাহিক চিত্রের ন্যায় পাঠকের সম্মুখে সুন্দররূপে পরিস্ফুট করিয়া তুলিতেছেন এজন্য আমরা লেখকের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। অজীর্ণ অন্নকে জীর্ণ অন্নের অপেক্ষা অধিক গুরুভার বলিয়া অনুভব হয়, সেই কারণে রমেশবাবুর এই ঐতিহাসিক প্রবন্ধ অনেক পাঠকের নিকট তেমন গুরুতর বলিয়া প্রতিভাত হইবে না; তাঁহারা মনে করিবেন ইহাতে যথেষ্ট 'গবেষণা' প্রকাশ হয় নাই; পড়িতে নিতান্ত সহজ হইয়াছে। বিপর্যয় পাণ্ডিত্য এবং ঐতিহাসিক ব্যায়াম-নৈপুণ্য আমরা বিস্তর দেখিয়াছি। তর্কের ধুলায় অস্পষ্ট প্রাচীন জগৎ উত্তরোত্তর অস্পষ্টতর হইয়া উঠিতেছে; রমেশবাবু নিজের পাণ্ডিত্য আড়ালে রাখিয়া আলোচ্য বিষয়টিকেই যে প্রকাশমান করিয়া তুলিয়াছেন, ইহাতে আমরা বড়ো আনন্দ লাভ করিয়াছি। লতাগুল্মসমাকীর্ণ অন্ধকার অরণ্যপথ ছাড়িয়া সহসা যেন একেবারে রাজপথে আসিয়া পড়িয়াছি।

সাহিত্য। পৌষ [১২৯৮]

পূর্ব মাস হইতে সাহিত্যে 'রায় মহাশয়' নামক এক উপন্যাস বাহির হইতেছে। গল্পটি শেষ না হইলে কোনো মত দেওয়া যায় না। এই পর্যন্ত বলিতে পারি ভাবাটি পরিষ্কার এবং সরস, ও পল্লিগ্রামের জমিদারি সেরেস্তার বর্ণনা অতিশয় যথাযথরূপে চিত্রিত হইতেছে। মাননীয়া শ্রীমতী কৃষ্ণভাবিনী দাস 'অশিক্ষিতা ও দরিদ্রা নারী' নামক প্রবন্ধে স্ত্রীজাতি, যে, 'সকল দেশে ও সকল অবস্থাতেই একরূপ কোমল প্রেমে ভূষিত, একরূপ সহিষ্ণুতায় মণ্ডিত ও একপ্রকার দৃঢ়তায় আবৃত' তাহাই প্রমাণ করিয়াছেন, এবং বলিয়াছেন 'এ জগতে যদি তাহাদের সেই কোমলতা, সহিষ্ণুতা ও দৃঢ়তার অপব্যবহার না হইত, তাহা হইলে, আজ আর নারীজাতির শ্রেষ্ঠতার বিষয়ে তর্কবিতর্কের কিছুমাত্র আবশ্যক রহিত না।' এখনো কোনো আবশ্যক দেখি না। যাহা সত্য তাহা স্বতই সত্য, তর্কবিতর্কের সাহায্যবশতই সত্য নহে। নিকৃষ্টতা কখনোই শ্রেষ্ঠতাকে পরাভূত করিয়া রাখিতে পারে না। অতএব শ্রেষ্ঠতা আপনিই প্রতিপন্ন হইবে। কেহ যদি-বা মুখে তাহাকে অস্বীকার করে তাহাতে তাহার কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি নাই, কারণ, কার্যে তাহার গৌরব স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু আজকাল কোনো কোনো নারীলেখক এই প্রমাণকার্যে এতই প্রাণপণে লাগিয়াছেন যে, মনে হয়, এ বিষয়ে যেন তাঁহাদের নিজেরই মনে কথঞ্চিৎ সংশয় আছে। আমার বোধ হয় স্বশ্রেণীর শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে অতিমাত্র সচেতন না হইয়া নিরভিমান ও সহজভাবে আত্মকর্তব্য সম্পন্ন করিয়া যাওয়ার মধ্যে একটি সুন্দর শ্রেষ্ঠতা আছে; আজকাল নারীগণ সেই শ্রেষ্ঠতা হইতে বিচ্যুত হইবার আয়োজন করিতেছেন। আর-একটি কথা আছে; যে রমণীগণ আপনাদের শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করিতেছেন তাঁহাদের এইটি স্মরণ রাখা উচিত যে, যুগযুগান্তর হইতে যে কর্তব্যপথ অবলম্বন করিয়া তাঁহারা আজি এই শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছেন, সে পথ ত্যাগ করিলে ক্রমশ কীরূপ অবস্থা ঘটিবে বলা কঠিন। নারী নারী বলিয়াই শ্রেষ্ঠ, তিনি পুরুষের কার্যে হস্তক্ষেপ করিলে যে শ্রেষ্ঠতর হইবেন তাহা নহে বরং বিপরীত ঘটিতে পারে; তাহাতে তাঁহাদের চরিত্রের কোমলতা, সহিষ্ণুতা ও দৃঢ়তার সামঞ্জস্য নষ্ট হওয়া আশ্চর্য নহে।— বর্তমান সংখ্যায় সাহিত্যসম্পাদক মহাশয় সাধনার সমালোচনা প্রকাশ করিয়া আমাদিগকে সবিশেষ উৎসাহিত করিয়াছেন।

সাহিত্য ও বিজ্ঞান। কার্তিক [১২৯৮]

এই নামে এক নূতন মাসিক পত্র বাহির হইতেছে। বর্তমান সংখ্যায় শ্রীযুক্ত সখারাম গণেশ

দেউস্কর 'এটা কোন্ যুগ' নামক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। লেখাটি বিশেষ কৌতুকাবহ। লেখক মনুসংহিতা, মহাভারত ও হরিবংশ হইতে দেখাইয়াছেন যে সত্যযুগ চারি সহস্র বৎসরে, ত্রেতাযুগ তিন সহস্র বৎসরে, দ্বাপরযুগ দুই সহস্র বৎসরে ও কলিযুগ এক সহস্র বৎসরে সম্পূর্ণ হয়। সর্বসমেত চারি যুগের পরিমাণ দ্বাদশ সহস্র বৎসর। প্রচলিত পঞ্জিকানুসারে কলিযুগ আরম্ভের পর ৪৯৯২ বৎসর অতীত হইয়াছে। সুতরাং মনুর মতে খৃস্টজন্মের ১৯০০ বৎসর পূর্বেই কলিযুগ শেষ হইয়াছে। তবে এখন এটা কোন্ যুগ। কুল্লুকভট্ট ও মেধাতিথি ইহার মীমাংসা চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন এই-সকল যুগবৎসর দৈব বৎসর। বাইবেলের সাপ্তাহিক সৃষ্টি বর্ণনার সহিত বিজ্ঞানের ঐক্য হয় না দেখিয়া য়ুরোপের অনেক খৃস্টান এইরূপ দৈব দিনের কল্পনা করিয়াছেন। কিন্তু এই দৈব বৎসরের কথা লেখক পরিষ্কাররূপে খণ্ডন করিয়াছেন। লেখক যে প্রশ্ন উত্থাপিত করিয়াছেন তাহার কোনো উত্তর দেন নাই। উত্তর দেওয়াও কঠিন বটে। কিন্তু আমরা দেখিতেছি আজকাল হঠাৎ সত্যযুগের লক্ষণ দেখা দিয়াছে; আর কোথাও না হৌক বাংলা দেশে। ভারতবর্ষের পূর্বপ্রান্তে কলির কুয়াশা ক্রমেই কাটিয়া উঠিতেছে এবং এক রাত্রির মধ্যেই আধ্যাত্মিকতার নব নব কুশাঙ্কুর সূচির মতো জাগিয়া উঠিয়া গত কলিযুগের বকেয়া পাপীদিগের পথ চলা বন্ধ করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছে। অতএব পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের পূর্বাচলে নব সত্যযুগের অভ্যুদয় যে আরম্ভ হইয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

সাধনা
মাঘ ১২৯৮

সাহিত্য। মাঘ [১২৯৮]

—লয়।[1] এই প্রবন্ধে শ্রদ্ধাস্পদ চন্দ্রনাথবাবু পরব্রহ্মে বিলীন হইবার কামনা ও সাধনাই যে হিন্দুর হিন্দুত্ব তাহাই নির্দেশ করিয়াছেন। এবং প্রবন্ধের উপসংহারে আক্ষেপ করিয়াছেন য়ুরোপের সংস্পর্শে আমাদের এই জাতীয়তা সংকটাপন্ন হইয়াছে, অতএব তাহা প্রাণপণে রক্ষা করা আমাদের সকলের একান্ত কর্তব্য। এ সম্বন্ধে আমাদের গুটিকতক কথা বলিবার আছে। ব্রহ্মে বিলীন হইবার সাধনা জাতীয়তা রক্ষার বিরোধী। কারণ সে সাধনার নিকট কোথায় গৃহবন্ধন, কোথায় সমাজবন্ধন, কোথায় জাতিবন্ধন! অতএব জাতীয়তা বিনাশচেষ্টাকেই যদি হিন্দুর জাতীয়তা বলা হয় তবে সে জাতীয়তা ধ্বংস করাই, যে, আধুনিক শিক্ষার উদ্দেশ্যে তাহা অস্বীকার করা যায় না। জগৎকে মায়া এবং চিত্তবৃত্তিকে মোহ বলিয়া স্থির করিলে বিজ্ঞানচর্চা বিদ্যাচর্চা সৌন্দর্যচর্চা সমস্তই নিষ্ফল এবং অনিষ্টকর বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। আমি ছাড়া যতদিন আর-কিছুকে দেখিতে পাইব অনুভব করিতে পারিব ততদিন আমি মায়াবদ্ধ; যখন আমি ছাড়া আর কেহ নাই কিছু নাই, অতএব যখন আমিও নাই (কারণ, অন্যের সহিত তুলনা করিয়াই আমির আমিত্ব) তখন সাধনার শেষ, মায়ামোহের বিনাশ। এমন সর্বনাশিনী জাতীয়তা যদি হতভাগ্য হিন্দুর স্কন্ধে আবির্ভূত হইয়া থাকে তবে সেটাকে প্রাণপণে বিলুপ্ত করা আমাদের সকলের একান্ত কর্তব্য। এই অসীম বৈরাগ্যতত্ত্ব আমাদের হিন্দুসমাজের অন্তরে অন্তরে প্রবেশ করিয়াছে এ কথা সত্য; তাহার ফল হইয়াছে আমাদের এ কূল ও কূল দুই গেছে। প্রত্যেকে এক-একটি সোহহং ব্রহ্ম হইতেও পারি নাই অথচ মনুষ্যত্ব একেবারে নির্জীব হইয়া আছে। মরণও হয় না, অথচ ষোলো আনা বাঁচিয়াও নাই। প্রকৃতিনিহিত প্রীতিবৃত্তিকে দর্শনশাস্ত্রের বিরাট পাষাণ একেবারে পিষিয়া ফেলিতে পারে নাই অথচ তাহার কাজ করিবার বল ও উৎসাহ যথাসম্ভব অপহরণ করা হইয়াছে। সৌভাগ্যক্রমে এরূপ বিরাট নাস্তিকতা মহামারীর মতো সমস্ত বৃহৎ জাতিকে একেবারে সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করিতে পারে না। সেইজন্য আমাদের দেশে মুখে মুখে

---

[1] ১. দ্র. "চন্দ্রনাথবাবুর স্বরচিত লয়তত্ত্ব" এবং "নব্যলয়তত্ত্ব", বর্তমান গ্রন্থ, পৃ. ৪১৬-৪২৩

বৈরাগ্যের কথা প্রচলিত, কিন্তু তৎসত্ত্বেও মানুষের প্রতি, সংসারের প্রতি, সৌন্দর্যের প্রতি নিগূঢ় অনুরাগ চিরানন্দস্রোতে মনুষ্যত্বকে যথাসাধ্য সতেজ ও সফল করিয়া অন্তরে অন্তরে প্রবাহিত হইতেছে। বিরাট নিপীড়নে সেই প্রেমানন্দকে পরাহত করিতে পারে নাই বলিয়াই চৈতন্য আসিয়া যেমনি প্রেমের তান ধরিলেন অমনি 'বিরাট' হিন্দুর 'বিরাট' হৃদয়ের কঠোর পাষাণ ভেদ করিয়া প্রেমের স্রোত আনন্দধারায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। আবার কি সেই বিরাট পাষাণখানাকে তিল তিল করিয়া গড়াইয়া জগতের অনন্ত জীবন-উৎসের মুখদ্বারে তুলিয়া বিরাট হিন্দুর বিরাট জাতীয়তা রক্ষা করিতে হইবে? কিন্তু হে বিরাট বিরাগী সম্প্রদায়, এ স্রোত তোমাদের দর্শনশাস্ত্রের সাধ্য নহে রুদ্ধ করা; যদি বা কিছুকালের মতো কিয়ৎপরিমাণে প্রতিহত থাকে আবার একদিন চতুর্গুণ বলে সমস্ত বাধা বিদীর্ণ করিয়া শাস্ত্রদগ্ধ শুষ্ক শূন্য বিরাট বৈরাগ্যমরুকে প্রাণ-স্রোতে প্লাবিত করিয়া কোমল করিয়া শ্যামল করিয়া সুন্দর করিয়া তুলিবে।

আমাদের আর-একটি কথা বলিবার অছে। আজকাল আমরা যখন স্বজাতির গুণগরিমা-কীর্তনে প্রবৃত্ত হই, তখন আমরা অন্য জাতিকে খাটো করিয়া আপনাদিগকে বড়ো করিতে চেষ্টা করি। তাহার একটা উপায়, স্বদেশে যে মহোচ্চ আদর্শ কেবল শাস্ত্রেই আছে সাধারণের মধ্যে নাই তাহার সহিত অন্য দেশের সাধারণ-প্রচলিত জীবনযাত্রার তুলনা করা। দুঃখের বিষয়, চন্দ্রনাথবাবুর লেখাতেও সেই অন্যায় অনুদারতা প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি বলিতে চান হিন্দুরা কেবল ব্রহ্মত্ব লাভের জন্যেই নিযুক্ত, আর য়ুরোপীয়েরা কেবল আত্মসুখের জন্যই লালায়িত। তিনি একদিকে বিষ্ণুপুরাণ হইতে প্রহ্লাদচরিত্র উদ্‌ধৃত করিয়াছেন, অন্য দিকে য়ুরোপীয়দের কথায় বলিয়াছেন 'ক্ষুধায় অন্ন এক মুঠা কম পাইলে, তৃষ্ণায় জল এক গণ্ডূষ কম পাইলে, শীতে একখানি কম্বল কম হইলে, চায়ের বাটিতে এক ফোঁটা চিনির অভাব হইলে, স্নান করিয়া একখানি বুরুশ না পাইলে, বেশবিন্যাসে একটি আলপিন কম হইলে তাহারা কাঁদিয়া রাগিয়া চেঁচাইয়া মহাপ্রলয় করিয়া তোলে।'

চন্দ্রনাথবাবু যদি স্থিরচিত্তে প্রণিধান করিয়া দেখেন তো দেখিতে পাইবেন, আমাদের দেশেও আদর্শের সহিত আচরণের অনেক প্রভেদ। নির্গুণ ব্রহ্ম হইয়া যাওয়া যদি আমাদের আদর্শ হয় তবে ব্যবহারে তাহার অনেক বৈলক্ষণ্য দেখা যায়। এত দেব এত দেবী এত কাষ্ঠ এত পাষাণ এত কাহিনী এত কল্পনার দ্বারা ব্রহ্মের উচ্চ আদর্শ কোন্‌ দেশে আচ্ছন্ন করিয়াছে! আমাদের দেশের নরনারীগণ কি প্রতিদিন মৃন্মূর্তির নিকট ধন পুত্র প্রভৃতি ঐহিক সুখসম্পত্তি প্রার্থনা করিতেছে না? মিথ্যা মকদ্দমায় জয়লাভ করিবার জন্য তাহারা দেবীকে কি বলির প্রলোভন দেখাইতেছে না? নিরপরাধী বিপক্ষকে বিনাশ করিবার জন্য তাহারা কি দেবতাকে নিজপক্ষ অবলম্বন করিতে স্তুতিবাক্যে অনুরোধ করিতেছে না? তাহারা কি নিজের স্বাস্থ্যের জন্য স্বস্ত্যয়ন ও প্রতিযোগীর ধ্বংসের জন্য হোমযাগ করে না? রাগদ্বেষ হিংসা মিথ্যাব্যবহার এবং বিবিধ কলঙ্কমসি দ্বারা তাহারা কি আপনাদের দেবচরিত্র অঙ্কিত করে নাই? শাস্ত্রের মধ্যে নিরঞ্জন ব্রহ্ম এবং মন্দিরের মধ্যে বিকৃত কল্পনা এমন আর কোথায় আছে!

অতএব তুলনার স্থলে আমাদের দেশের আদর্শের সহিত য়ুরোপের আদর্শের তুলনাই ন্যায়সংগত।

য়ুরোপীয় সভ্যতার আদর্শ আত্মসুখ নহে, বিশ্বসুখ। মনুষ্যত্বের চরম পরিণতি সাধনই তাহার সাধনার বিষয়। জ্ঞান এবং প্রেম, 'মাধুর্য এবং জ্যোতি' সমস্ত মানব-সাধারণের মধ্যে ব্যাপ্ত করিয়া দেওয়া তাহার উদ্দেশ্য। তাহাদের কবি সেই গান গাহিতেছে, তাহাদের মহাপুরুষ ও মহানারীগণ সেই উদ্দেশ্যে দেশদেশান্তরে জীবন বিসর্জন করিতেছে। আবার এদিকে সাধারণের মধ্যে আত্মসুখান্বেষণও বড়ো কম নহে; এদিকে পরের ধনে লোভ দিতে, পরের অন্ন কাড়িয়া খাইতে, পরের সুখ ছারখার করিতে ইহারা সকল সময়ে বিমুখ নহে। এবং এক দিকে ইহারা হিংস্র বিদেশের মরুনির্বাসনে একাকী ধর্মপ্রচার করিতে ও তুষার-কঠিন দুর্গম উত্তর মেরুর নিষ্ঠুর

শীতের মধ্যে জ্ঞানান্বেষণ করিতে কুণ্ঠিত হয় না, অন্য দিকে স্নানের পর বুরুশ না পাইলে এবং বেশবিন্যাসে আলপিনটি কম হইলে বাস্তবিক অস্থির হইয়া পড়ে। মানুষ এমনি মিশ্রিত, এমনি অদ্ভুত অসম্পূর্ণ জীব।

সর্বশেষে পাঠকদিগকে একটি কথা বলিয়া রাখি। আমরা যুরোপীয় সভ্যতার যে আদর্শভাব উপরে উল্লেখ করিয়াছি বঙ্কিমবাবু তাঁহার ‘ধর্মতত্ত্বে’ লিখিয়াছেন আমাদের হিন্দুধর্মেরও সেই আদর্শ— অর্থাৎ মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশসাধন। চন্দ্রনাথবাবুর মতে হিন্দুধর্মের আদর্শ মনুষ্যত্বের পূর্ণ ধ্বংসসাধন। তিনি বলেন হিন্দুধর্মের মূল মন্ত্র প্রলয়। এখন হিন্দুগণ বঙ্কিমবাবুর মতে বাঁচিবেন কি চন্দ্রনাথবাবুর মতে মরিবেন সেই একটা সমস্যা উঠিতে পারে। আমরা এ বিষয়ে একটা মত স্থির করিয়াছি। আমরা জীবনের প্রয়াসী, এবং ভরসা করি, লয় ব্যাপারটা যতই ‘বিরাট’ হোক তাহার এখনো বিস্তর বিলম্ব আছে।

সাধনায় [অগ্রহায়ণ ১২৯৮] আমরা ‘শিক্ষিতা নারী’ নামক প্রবন্ধের যে সমালোচনা প্রকাশ করিয়াছিলাম বর্তমান সংখ্যায় তাহার উত্তর বাহির হইয়াছে। লেখিকা বলিয়াছেন আমরা তাঁহার প্রবন্ধের মর্ম ভুল বুঝিয়াছিলাম। ভুল বুঝিবার কিঞ্চিৎ কারণ ছিল। তিনি আমেরিকার স্ত্রী-অ্যাটর্নি, স্ত্রী-বক্তা প্রভৃতি প্রবলা রমণীদের কথা এমনভাবে লিখিয়াছিলেন যাহাতে সহজেই মনে হইতে পারে যে, তিনি উক্ত ধনোপার্জনকারিণীদিগকে প্রধানত, শিক্ষিতা নারীর আদর্শস্থলরূপে খাড়া করিতে চাহেন। তাঁহার যদি এরূপ উদ্দেশ্য না থাকে তবে আমাদের সহিত তাঁহার মতান্তর দেখি না। কেবল এখনও তিনি ‘নারীজাতির অবরোধ ও অশিক্ষিত জীবনের মূলে যে পুরুষের স্বার্থপরতা বা উৎপীড়ন’ এ অভিযোগ ছাড়েন নাই। লেখিকা ভাবিয়া দেখিবেন ‘মূল’ বলিতে অনেকটা দূর বুঝায়। যদি আমরা বাঙালিরা বলি ইংরাজের স্বার্থপরতাই বাঙালির জাতীয় অধীনতার মূল তাহা হইলে তাহাতে দুর্বল প্রকৃতির বিবেচনাশূন্য কাঁদুনি প্রকাশ পায় মাত্র। ইংরাজ আপন স্বার্থপর প্রবৃত্তি আমাদের উপর খাটাইতেই পারিত না যদি আমরা গোড়ায় দুর্বল না হইতাম। অতএব স্বার্থপরতাকেই মূল না বলিয়া দুর্বলতাকেই মূল বলিয়া ধরা আবশ্যক। সকলপ্রকার অধীনতারই মূলে দুর্বলতা। লেখিকা বলিতে পারেন যে, এই সুসভ্য উনবিংশ শতাব্দীতে শারীরিক দুর্বলতাকে দুর্বলতা বলাই উচিত হয় না। কিন্তু বুদ্ধিচর্চা এবং জ্ঞানোপার্জনও বলসাধ্য। দুই জন লোকের যদি সমান বুদ্ধি থাকে এবং তাহাদের মধ্যে একজনের শারীরিক বল অধিক থাকে তবে বলিষ্ঠ ব্যক্তি বুদ্ধি-সংগ্রামেও অন্যটিকে পরাভূত করিবে, শরীর ও মনের মধ্যে এমন ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। তবে যদি প্রমাণ হয় স্ত্রীলোকের বুদ্ধিবৃত্তি পুরুষের অপেক্ষা অনেক বেশি তবে কথাটা স্বতন্ত্র হয়। যাহা হউক, প্রকৃতির পক্ষপাতের জন্য পুরুষকে অপরাধী করা উচিত হয় না। কারণ, পুরুষের পাপের বোঝা যথেষ্ট ভারী আছে। যেখানে ক্ষমতা সেখানে প্রায়ই ন্যূনাধিক অত্যাচার আছেই। ক্ষমতাকে সম্পূর্ণ সংযত করিয়া চলা সর্বসাধারণের নিকট প্রত্যাশা করা যায় না; সেই কারণে, রমণীর প্রতি পুরুষের উপদ্রবের অপরাধ পর্বত-প্রমাণ স্তূপাকার হইয়া উঠিয়াছে; তাহার উপরে আবার একটা ‘ওরিজিনাল্ সিন্’ একটা মূল পাপ পুরুষের স্কন্ধে চাপানো নিতান্ত অন্যায়। সেটা পুরুষের নহে প্রকৃতির। রমণীর কাছে পুরুষেরা সহস্র প্রেমের অপরাধে চির অপরাধী সেজন্য তাঁহারা সুমধুর অভিমানে আমাদিগকে দণ্ডিত করেন, সে-সকল আইন ঘরে ঘরে প্রচলিত; এমন-কি, তাহার দণ্ডবিধি বঙ্গসাহিত্যে প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু আজকাল নারীরা পুরুষের নামে এ কী এক নূতন অভিযোগ আনিয়া উপস্থিত করিয়াছেন এবং আমাদিগকে নীরস ও নিষ্ঠুরভাবে ভর্ৎসনা করিতেছেন। এরূপ অশ্রুজলশূন্য শুষ্ক শাসনের জন্য আমরা কোনোকালে প্রস্তুত ছিলাম না; এটা আমাদের কাছে নিতান্ত বেআইনি রকম ঠেকিতেছে।— রমণী সৌন্দর্যে পুরুষের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ (কেবল শারীরিক সৌন্দর্যে নহে)। দুর্ভাগ্যক্রমে মানবসমাজে সৌন্দর্যবোধ অনেক বিলম্বে পরিণতি লাভ করে। কিন্তু অনাদৃত

সৌন্দর্যও প্রেমপরিপূর্ণ ধৈর্যের সহিত প্রতীক্ষা করিতে জানে; অন্ধবল তাহার সম্মুখে দম্ভ প্রকাশ করে বলিয়া বলের প্রতি তাহার কোনো ঈর্ষা নাই; সে সেই খেদে বলিষ্ঠ হইয়া বলকে অতিক্রম করিতে চায় না, সুন্দর হইয়া অতি ধীরে ধীরে জয়লাভ করে। যিশু খৃস্ট যেরূপ মৃত্যুর দ্বারা অমর হইয়াছেন সৌন্দর্য সেইরূপ উৎপীড়িত হইয়াই জয়ী হয়। অধৈর্য হইবার আবশ্যক নাই; নারীর আদর কালক্রমে আপনি বাড়িবে, সেজন্য নারীদিগকে কোমর বাঁধিতে হইবে না; বরঞ্চ আরও অধিক সুন্দর হইতে হইবে। রাবণের ঘরে সীতা অপমানিতা; সেখানে কেবল পশুবল, সেখানে সীতা বন্দিনী। রামের ঘরে সীতা সম্মানিতা; সেখানে বলের সহিত ধর্মের মিলন, সেখানে সীতা স্বাধীনা। ধৈর্যকঠিন প্রেমকোমল সৌন্দর্যের অলক্ষ্য প্রভাবে মনুষ্যত্ব বিকশিত হইতে থাকিবে এবং সেই মনুষ্যত্ব বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে যথার্থ পৌরুষ যখন পরিণত হইয়া উঠিবে, তখন এই উদারহৃদয় পৌরুষই অনাদরের হাত হইতে সৌন্দর্যকে উদ্ধার করিবে; এজন্য নারীদিগকে লড়াই করিতে হইবে না।

সমালোচ্য প্রবন্ধের দুই-একটা বাংলা কথা আমাদের কানে নিরতিশয় বিলাতি রকম ঠেকিয়াছে এখানে তাহার উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না, মাননীয়া লেখিকা মার্জনা করিবেন। 'কর্ষিত বিচারশক্তি' 'মানসিক কর্ষণ' শব্দগুলা বাংলা নহে। একস্থানে আছে 'সংসারে যে গুরুতর কর্তব্য তাহার উপর অর্পিত হয়, তজ্জন্য, সমভাবময় হৃদয়ের ন্যায়, কর্ষিত মস্তকেরও একান্ত আবশ্যক।' 'সমভাবময় হৃদয়' কোন্ ইংরাজি শব্দের তর্জমা ঠাহর করিতে পারিলাম না সুতরাং উহার অর্থ নির্ণয় করিতে অক্ষম হইলাম; 'কর্ষিত মস্তক' কথাটার ইংরাজি মনে পড়িতেছে কিন্তু বাংলাভাষার পক্ষে এ শব্দটা একেবারে গুরুপাক।

'সোম' নামক প্রবন্ধে বৈদিক সোমরস যে সুরা অর্থেই ব্যবহৃত হইত না লেখক তাহাই প্রমাণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। 'সোম' বলিতে কী বুঝাইত ভবিষ্যৎসংখ্যক সাহিত্যে তাহার আলোচনা হইবে লেখক আশ্বাস দিয়াছেন। আমরা ঔৎসুক্যের সহিত প্রতীক্ষা করিয়া রহিলাম।

'রায় মহাশয়' গল্পে বাংলার জমিদারি শাসনের নিষ্ঠুর চিত্র বাহির হইতেছে। ক্ষমতাশালী লেখকের রচনা পড়িয়া সমস্তটা অত্যন্ত সত্যবৎ প্রতীয়মান হয়; আশা করি, ইহার মধ্যে কিছু কিছু অত্যুক্তি আছে।

সাধনা
ফাল্গুন ১২৯৮

নব্যভারত। মাঘ [১২৯৮]

'আলোক কি অন্ধকার?' সম্পূর্ণ অন্ধকার। এবং এরূপ লেখায় সে অন্ধকার দূর হইবার কোনো সম্ভাবনা নাই। কী করিলে ভারতবর্ষে জাতীয় জীবন সংঘটন হইতে পারিবে লেখক তাহারই আলোচনা করিয়াছেন। অবশেষে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন 'হিন্দুধর্মের ন্যায় আর ধর্ম নাই, এমন কল্পবৃক্ষ আর জন্মিবে না— যাঁহার যে প্রকার ধ্যান-ধারণার শক্তি তিনি সেই প্রকারেই সাধনা করিতে পারেন; এমন ধর্ম আর কোথায়? ছিন্নভিন্ন ভারতকে আবার যদি কেহ এক করিতে পারে, আবার যদি কেহ ভারতকে উন্নত করিয়া তাহার শরীরে হৈমমুকুট পরাইতে পারে, তবে সে সনাতন হিন্দুধর্ম।' লেখক মনে করিতেছেন কথাটা সমস্ত পরিষ্কার হইয়া গেল এবং আজ হইতে তাঁহার পাঠকেরা কেবল কল্পবৃক্ষের হাওয়া খাইয়া ভারতের 'শরীরে হৈমমুকুট' পরাইতে থাকিবে, কিন্তু তাহা ঠিক নহে। হিন্দুধর্ম কী? তাহা কবে ভারতবর্ষে ছিল না? তাহা কবেই বা ভারতবর্ষ হইতে চলিয়া গেল? তাহাকে আবার কোথা হইতে আনিতে হইবে এবং কোন্ 'অবতার' আনিবেন? যাঁহার যেরূপ শক্তি তিনি তদনুসারেই সাধনা করিতে পারিবেন এমন বহুরূপী ধর্মের মধ্যে ঐক্যবন্ধন কোন্‌খানে? এবং এই হিন্দুধর্মের প্রভাবে আদিম বৈদিক সময়ের পরে কোন্ কালে ভারতবর্ষে জাতীয় ঐক্য ছিল?

'সাঁওতালের শ্রাদ্ধ প্রণালী' লেখাটি কৌতূহলজনক। 'জাতীয় একতা' প্রবন্ধে লেখক কৌতুক করিতেছেন কি জ্ঞান দান করিতেছেন সহসা বুঝা দুঃসাধ্য; এই পর্যন্ত বলা যায় দুইটির মধ্যে কোনো উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হয় নাই।

'দোকানদারী।' বঙ্গসাহিত্যে এই ধরনের অশ্রুগদ্‌গদ সানুনাসিক প্রলাপোক্তি উত্তরোত্তর অসহ্য হইয়া উঠিতেছে। কোনো উচ্চশ্রেণীর সাময়িক পত্রে এরূপ গদ্যপ্রবন্ধ কেন স্থান প্রাপ্ত হয় বুঝা কঠিন।

সাহিত্য। ফাল্গুন [১২৯৮]

'সোম।' এই উৎকৃষ্ট প্রবন্ধে লেখক মহাশয় বেদ হইতে অনেকগুলি দৃষ্টান্ত উদ্‌ধৃত করিয়া প্রমাণ করিতেছেন বেদে সোম বলিতে ঈশ্বরপ্রেম বুঝায়। সোম বলিতে ঈশ্বরপ্রেম রূপকভাবে বুঝাইত, না তাহার প্রকৃত অর্থই এই, লেখক মহাশয় কোথাও তাহার আলোচনা করিয়াছেন বলিয়া মনে পড়িতেছে না। সুরাপানের আনন্দের সহিত ঈশ্বরপ্রেমানন্দের তুলনা অন্যত্রও পাওয়া যায়, হাফেজের কবিতা তাহার দৃষ্টান্তস্থল। রামপ্রসাদের কোনো গানেও তিনি সুরাকে আধ্যাত্মিক ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু তাহা হইতে প্রমাণ হয় না যে, তান্ত্রিকেরা কেবলমাত্র আধ্যাত্মিক সুরাই সেবন করিয়া থাকেন। যাহা হউক, এখনো আমাদের সম্পূর্ণ সন্দেহ মোচন হয় নাই।

'আহার।' শ্রদ্ধাস্পদ লেখক মহাশয় বলেন 'আমাদের মহাজ্ঞানী ও সূক্ষ্মদর্শী শাস্ত্রকারেরা আহারকে ধর্মের অন্তর্গত করিয়া গিয়াছেন।' এই ভাবের কথা আমরা অনেক দিন হইতে শুনিয়া আসিতেছি, কিন্তু ইহার তাৎপর্য সম্পূর্ণ বুঝিতে পারি না। অনেকেই গৌরব করিয়া থাকেন আমাদের আহার ব্যবহার সমস্তই ধর্মের অন্তর্ভূত— কিন্তু এখানে ধর্ম বলিতে কী বুঝায়? যদি বল ধর্মের অর্থ কর্তব্যজ্ঞান, মানুষের পক্ষে যাহা ভালো তাহাই তাহার কর্তব্য, ধর্ম এই কথা বলে, তবে জিজ্ঞাসা করি সে কথা কোন্ দেশে অবিদিত! শরীর সুস্থ রাখা যে মানুষের কর্তব্য, যাহাতে তাহার কল্যাণ হয় তাহাই তাহার অনুষ্ঠেয় এ কথা কে না বলে! যদি বল, এ স্থলে ধর্মের অর্থ পরলোকে দণ্ড-পুরস্কারের বিধান, অর্থাৎ বিশেষ দিনে বিশেষ ভাবে বিশেষ আহার করিলে শিবলোক প্রাপ্তি হইবে এবং না করিলে চতুর্দশ পুরুষ নরকস্থ হইবে, ধর্ম এই কথা বলে, তবে সেটাকে সত্য ধর্ম বলিয়া স্বীকার করা যায় না। কোনো এক মহাজ্ঞানী সূক্ষ্মদর্শী শাস্ত্রকার লিখিয়া গিয়াছেন মধুকৃষ্ণা ত্রয়োদশীতে গঙ্গাস্নান করিলে 'ত্রিকোটিকুলমুদ্ধরেৎ'; মানিয়া লওয়া যাক উক্ত ত্রয়োদশীতে নদীর জলে স্নান করিলে শরীরের স্বাস্থ্যসাধন হয়, কিন্তু ইহার মধ্যে গৌরবের অংশ কোন্‌টুকু? ওই পুরস্কারের প্রলোভনটুকু? কেবল ওই মিথ্যা প্রলোভন সূত্রে এই স্বাস্থ্যতত্ত্ব অথবা আধ্যাত্মিক তত্ত্বের নিয়মটুকুকে ধর্মের সহিত গাঁথা হইয়াছে। নহিলে, স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম পালন করা ভালো, এবং যাহা ভালো তাহাই কর্তব্য এ কথা কোন্ দেশের লোক জানে না? আহারের সময় পূর্বমুখ করিয়া উপবেশন করিলে তাহাতে পরিপাকের সহায়তা ও তৎসঙ্গে মানসিক প্রসন্নতার বৃদ্ধি সাধন করে অতএব পূর্বমুখে আহার করা ধর্মবিহিত এ কথা বলিলে প্রমাণ লইয়া তর্ক উঠিতে পারে কিন্তু মূল কথাটা সম্বন্ধে কাহারও কোনো আপত্তি থাকিতে পারে না। কিন্তু যদি বলা হয় পূর্বমুখে আহার না করিলে অপবিত্র হইয়া ত্রিকোটিকুলসমেত নরকে পতিত হইতে হইবে, ইহা ধর্ম, অতএব ইহা পালন করিবে, তবে এ কথা লইয়া গৌরব করিতে পারি না। যাহার সত্য মিথ্যা প্রমাণের উপর নির্ভর করে, যে-সকল বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞানোন্নতি সহকারে মতের পরিবর্তন কিছুই অসম্ভব নহে তাহাকে কী বলিয়া ধর্মনিয়মভুক্ত করা যায়? স্বাস্থ্য রক্ষা করা মানুষের কর্তব্য অতএব তাহা ধর্ম এ মূলনীতির কোনোকালে পরিবর্তন সম্ভব নহে, কিন্তু কোনো একটা বিশেষ উপায়ে বিশেষ দ্রব্য আহার করা ধর্ম, না করা অধর্ম, এরূপ বিশ্বাসে গুরুতর অনিষ্টের কারণ ঘটে।

মানব নীতির দুই অংশ আছে, এক অংশ স্বতঃসিদ্ধ, এক অংশ যুক্তিসিদ্ধ।* আধুনিক সভ্য জাতিরা এই দুই অংশকে পৃথক করিয়া লইয়াছেন; এই অংশকে ধর্মনৈতিক ও অপর অংশকে সামাজিক এবং রাজনৈতিক শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। একদিকে এই ধ্রুব শক্তি এবং অপর দিকে চঞ্চল শক্তির স্বাতন্ত্র্যই সমাজ-জীবনের মূল নিয়ম। সকলেই জানেন, আকর্ষণ শক্তি না থাকিলে জগৎ বাষ্প হইয়া অনন্তে মিশাইয়া যাইত এবং বিপ্রকর্ষণ শক্তি না থাকিলেও বিশ্বজগৎ বিন্দুমাত্রে পরিণত হইত। তেমনি অটল ধর্মনীতির বন্ধন না থাকিলে সমাজ বিচ্ছিন্ন হইয়া সমাজ-আকার ত্যাগ করে, এবং চঞ্চল লোকনীতি না থাকিলে সমাজ জড় পাষাণবৎ সংহত হইয়া যায়। আধুনিক হিন্দুসমাজে খাওয়া শোয়া কোনো বিষয়েই যুক্তির স্বাধীনতা নাই, সমস্তই এক অটল ধর্মনিয়মে বদ্ধ এ কথা যদি সত্য হয় তবে ইহা আমাদের গৌরবের আমাদের কল্যাণের বিষয় নহে। চন্দ্রনাথবাবুও অন্যত্র এ কথা একরূপ স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলেন, 'হিন্দুশাস্ত্রের নিষিদ্ধ দ্রব্যের মধ্যে কোনোটি ভক্ষণ করিয়া যদি মানসিক প্রকৃতির অনিষ্ট না হয় তবে সে দ্রব্যটি ভক্ষণ করিলে তোমার হিন্দুয়ানিও নষ্ট হইবে না তোমার হিন্দু নামেও কলঙ্ক পড়িবে না।' অর্থাৎ এ-সকল বিষয় ধ্রুব ধর্ম-নিয়মের অন্তর্গত নহে। ইহার কর্তব্যতা প্রমাণ ও অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে।

কিন্তু এই একটিমাত্র কথায় চন্দ্রনাথবাবু বর্তমান হিন্দুসমাজের মূলে আঘাত করিতেছেন। আমি যদি বলি গোমাংস খাইলে আমার মানসিক প্রকৃতির অনিষ্ট হয় না, আমি যদি প্রমাণস্বরূপে দেখাই গোমাংসভুক্‌ যাজ্ঞবল্ক্য অনেক কুষ্মাণ্ডভুক্‌ স্মার্তবাগীশের অপেক্ষা উচ্চতর মানসিক প্রকৃতিসম্পন্ন, তবে কি হিন্দুসমাজ আমাকে মাপ করিবেন? যদি কোনো ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাস্পদ চন্দ্রনাথবাবুর সহিত একাসনে বসিয়া আহার করেন এবং প্রমাণ করেন তাহাতে তাঁহার আধ্যাত্মিক প্রকৃতির কিছুমাত্র বিকার জন্মে নাই, তবে কি তাঁহার হিন্দুনামে কলঙ্ক পড়িবে না? যদি না পড়ে, এই যদি হিন্দুধর্ম হয়, হিন্দুধর্মে যদি মূল ধর্মনীতিকে রক্ষা করিয়া আচার সম্বন্ধে স্বাধীনতা দেওয়া থাকে তবে এতক্ষণ আমরা বৃথা তর্ক করিতেছিলাম।

'কাশ্মীর'। এরূপ সাময়িক প্রসঙ্গ লইয়া বাংলা কাগজে প্রায়ই লেখা হয় না। তাহার কারণ, উপযুক্ত লেখক পাওয়া কঠিন। কেবল অন্ধভাবে ইংরাজি কাগজের অনুবাদ বা প্রতিবাদ করিলে সকল সময়ে সত্য পাওয়া যায় না। নগেন্দ্রবাবু কাশ্মীরের বর্তমান বিপ্লব সম্বন্ধে এই যে প্রস্তাব লিখিয়াছেন ইহা কোনো কাগজের প্রতিধ্বনি নহে, ইহা তিনি যেন রঙ্গভূমিতে উপস্থিত থাকিয়া লিখিয়াছেন। সমালোচ্য প্রবন্ধটি বিশেষ সমাদরণীয়।

সাধনা
চৈত্র ১২৯৮

নব্যভারত। চৈত্র [১২৯৮]
—'পঞ্জিকা বিভ্রাট'। প্রবন্ধটি ভালো এবং আবশ্যক কিন্তু সাধারণের আয়ত্তগম্য নহে। 'জীবন ও কাব্য'।— লেখক বলিতেছেন, কবির জীবনের সঙ্গে তাঁহার কবিতার ঘনিষ্ঠ যোগ থাকে। গাছের সঙ্গে ফলের যোগ আছে বলাও যেমন বাহুল্য, কবির প্রকৃতির সঙ্গে কাব্যের প্রকৃতির যোগ আছে এ কথা বলাও তেমনি বাহুল্য। কিন্তু লেখক একটি নূতন সমাচার দিয়াছেন— তিনি বলেন বর্তমান বাংলা কবিদের জীবনের সহিত কাব্যের সামঞ্জস্য নাই। বঙ্গকবিদের জীবনবৃত্তান্ত লেখক কোথা হইতে সন্ধান করিয়া বাহির করিলেন বলা শক্ত। সামান্যতম মানবজীবনেও কত প্রহেলিকা

---

* এখানে আমরা তত্ত্ববিদ্যার তর্কে নামিতে চাহি না। বলা আবশ্যক, স্বতঃসিদ্ধ কিছু আছে বলিয়া অনেকে বিশ্বাস করেন না।

কত রহস্য আছে, তাহা উদ্‌ভেদ করিতে কত যত্ন, কত নিপুণতা, কত সহৃদয়তার আবশ্যক। লেখক ঘরে বসিয়া অবজ্ঞাভরে বঙ্গ-কবিদের জীবনের উপর দিয়া যে, তাঁহার মহৎ লেখনীর একটা কালির আঁচড় চালাইয়া গিয়াছেন কাজটা তাঁহার মতো লোকের উচিত হয় নাই। কারণ, তাঁহার প্রবন্ধে তিনি খুব উচ্চদরের নীতি-উপদেশ দিয়াছেন, অতএব লেখার সহিত লেখকের জীবনের যদি অবশ্যম্ভাবী যোগ থাকে তবে তাঁহার নিকট হইতেও ন্যায়াচরণ সম্বন্ধে মহৎ দৃষ্টান্ত প্রত্যাশা করিতে পারি। যাহা হউক, একটা কথা স্মরণ রাখা উচিত— আজকালকার কবি যদি কাব্যে কাপট্য করেন সত্য হয়, যাঁহারা সমালোচনা করেন কবিকে উপদেশ দেন তাঁহারা যে অকৃত্রিম সারল্য প্রকাশ করিয়া থাকেন তাহারও প্রমাণ আবশ্যক। আসল কথা, কাব্যই লিখুন আর সমালোচনাই লিখুন, সকল বিষয়েই অধিকার অনধিকার আছে, তাহাই বুঝিতে না পারিয়া অনেক লেখক মিথ্যা কাব্য লেখেন এবং অনেক সমালোচক কাব্য হইতে যথার্থ সত্য ও সৌন্দর্য উদ্ধার করিতে অক্ষমতা প্রকাশ করিয়া থাকেন।

'সুখাবতী'। বিখ্যাত ভ্রমণকারী শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র দাস মহাশয় সুখাবতী অর্থাৎ বৌদ্ধ স্বর্গ সম্বন্ধে এই প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। হিন্দু-মুসলমানদের স্বর্গে যেরূপ ভোগের প্রলোভন আছে বৌদ্ধদের স্বর্গে সেরূপ নাই। বৌদ্ধ স্বর্গে প্রাণীগণ হিংসাদ্বেষ ভুলিয়া পরস্পরের উপকার ও সুখবর্ধনে নিযুক্ত। 'তাঁহাদের এই মূলমন্ত্র যে, জগতে যাহা-কিছু সুখ আছে, সমস্তই পরের উপকার করিতে বাসনা করিলেই লাভ করা যায়। স্বার্থচিন্তাতে কেবল অনবচ্ছিন্ন দুঃখরাশিই উৎপন্ন হইয়া থাকে, কল্পবৃক্ষগণেরও ফলপ্রদান সময়ে স্বভাবতই শরীর কম্পিত হইয়া থাকে, অপরিসীম ক্ষীর সমুদ্রও অমৃতাভিলাষী দেবগণ -কর্তৃক মথিত হইয়া কম্পিত হন, কিন্তু সুখাবতীবাসী বোধিসত্ত্বগণ পরার্থে শত শতবার শরীর দানে নিষ্কম্পভাবে দণ্ডায়মান হইতে সমর্থ। সে সময়ে তাঁহাদের দেহ আনন্দে পুলকোৎকর বহন করে।' আমরা এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিলাম।

চৈত্র মাসের 'সাহিত্যে' শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত মহাশয় 'প্রাচীন ভারত' প্রবন্ধে খৃস্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে বৌদ্ধ রাজা শিলাদিত্যের রাজত্বকালীন 'সন্তোষক্ষেত্রের উৎসব' ব্যাপারের যে বর্ণনা করিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া আমরা পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছি। শিলাদিত্যের রাজত্বকালে পাঁচবার এই উৎসবকার্য যথাবিধি সম্পাদিত হইয়াছিল।...

গঙ্গাযমুনার সংগম-স্থল পরম পবিত্র প্রয়াগ এই মহোৎসবের ক্ষেত্র। এই স্থানের পাঁচ-ছয় মাইল পরিমাণের বিস্তীর্ণ ভূমিতে উৎসবকার্য সম্পন্ন হইত। দীর্ঘকাল হইতে এই ভূমি 'সন্তোষক্ষেত্র' নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছিল। এই ক্ষেত্রের চারি হাজার বর্গফিট পরিমিত ভূমি গোলাপ ফুলের গাছে পরিবেষ্টিত হইত। পরিবেষ্টিত স্থানের বৃহৎ বৃহৎ গৃহে, স্বর্ণ ও রৌপ্য, কার্পাস ও রেশমের নানাবিধ বহুমূল্য পরিচ্ছদ এবং অন্যান্য মূল্যবান দ্রব্য স্তূপাকারে সজ্জিত থাকিত। এই বেষ্টিত স্থানের নিকটে ভোজনগৃহ-সকল বাজারের দোকানের ন্যায় শ্রেণীবদ্ধভাবে শোভা পাইত। এই-সমস্ত গৃহের এক-একটিতে একেবারে প্রায় সহস্র লোকের ভোজন হইতে পারিত। উৎসবের অনেক পূর্বে সাধারণ্যে ঘোষণা দ্বারা ব্রাহ্মণ, শ্রমণ, নিরাশ্রয়, দুঃখী বা মাতাপিতৃহীন, আত্মীয়বন্ধুশূন্য, নিঃস্ব ব্যক্তিদিগকে নির্দিষ্ট সময়ে পবিত্র প্রয়াগে আসিয়া দানগ্রহণের জন্য আহ্বান করা হইত। মহারাজ শিলাদিত্য আপনার মন্ত্রী ও করদ রাজগণের সহিত এই স্থানে উপস্থিত থাকিতেন। বল্লভী-রাজ ধ্রুবপতু ও আসাম-রাজকুমার এই করদ রাজগণের মধ্যে প্রধান ছিলেন। এই করদ রাজা ও মহারাজ শিলাদিত্যের সৈন্য, সন্তোষক্ষেত্রের চারি দিক বেষ্টন করিয়া থাকিত। ধ্রুবপতুর সৈন্যের বহুসংখ্য অভ্যাগত লোক আপনাদের তাম্বু স্থাপন করিত।

অসীম আড়ম্বরের সহিত উৎসবের কার্য আরম্ভ হইত। শিলাদিত্য বৌদ্ধধর্মের পরিপোষক

হইলেও হিন্দুধর্মের অবমাননা করিতেন না, তিনি ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ, উভয়কেই আদরসহকারে আহ্বান করিতেন, এবং বুদ্ধের প্রতিকৃতি ও হিন্দু দেব-মূর্তি উভয়ের প্রতিই সম্মান দেখাইতেন। প্রথম দিন পবিত্র মন্দিরে বুদ্ধের প্রতিমূর্তি স্থাপিত হইত। এই দিনে সর্বাপেক্ষা বহুমূল্য দ্রব্য বিতরিত হইত, এবং সর্বাপেক্ষা সুখাদ্য দ্রব্য অতিথি-অভ্যাগতদিগকে দেওয়া যাইত। দ্বিতীয় দিনে বিষ্ণু ও তৃতীয় দিনে শিবের মূর্তি মন্দিরের শোভা বিকাশ করিত। প্রথম দিনের বিতরিত দ্রব্যের অর্ধাংশ এই এক-এক দিনে বিতরণ করা হইত। চতুর্থ দিন হইতে সাধারণ দান-কার্য আরম্ভ হইত। কুড়ি দিন ব্রাহ্মণ ও শ্রমণেরা, দশ দিন হিন্দু দেবতা-পূজকেরা, এবং দশ দিন উলঙ্গ সন্ন্যাসীরা দান গ্রহণ করিতেন। এতদ্‌ব্যতীত ত্রিশ দিন পর্যন্ত দরিদ্র নিরাশ্রয়, মাতাপিতৃহীন ও আত্মীয়স্বজনশূন্য ব্যক্তিদিগকে ধন দান করা হইত। সমুদয়ে পঁচাত্তর দিন পর্যন্ত উৎসবের কার্য চলিত। শেষদিনে মহারাজ শিলাদিত্য আপনার বহুমূল্য পরিচ্ছদ, মণিমুক্তা-খচিত স্বর্ণাভরণ, অত্যুজ্জ্বল মুক্তাহার প্রভৃতি সমুদয় অলংকার পরিত্যাগপূর্বক চীরশোভী বৌদ্ধ ভিক্ষুর বেশ পরিগ্রহ করিতেন। এই মহামূল্য আভরণরাশিও দরিদ্রদিগকে দান করা হইত। চীর ধারণ করিয়া মহারাজ শিলাদিত্য জোড় হাতে গম্ভীর স্বরে কহিতেন, 'আজ আমার সম্পত্তিরক্ষার সমুদায় চিন্তার অবসান হইল। এই সন্তোষক্ষেত্রে আজ আমি সমুদায় দান করিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। মানবের অভীষ্ট পুণ্য-সঞ্চয়ের মানসে ভবিষ্যতেও আমি এইরূপ দান করিবার জন্য আমার সমস্ত সম্পত্তি রাশীকৃত করিয়া রাখিব।' এইরূপে পবিত্র প্রয়াগে সন্তোষক্ষেত্রের উৎসব পরিসমাপ্ত হইত। মহারাজ মুক্তহস্তে প্রায় সমস্তই দান করিতেন। কেবল রাজ্য-রক্ষা ও বিদ্রোহ-দমন জন্য হস্তী, ঘোটক ও অস্ত্রাদি অবশিষ্ট থাকিত।

সাধনা
বৈশাখ ১২৯৯

নব্যভারত। বৈশাখ [১২৯৯]

'পুরাতন ও নূতন'। লেখক মহাশয়ের বক্তব্য এই যে, নূতন আসে এবং পুরাতন যায়— কিন্তু হায়, বর্তমান প্রবন্ধে সেই বিশ্বব্যাপী নিয়মের কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না। পদের পর পদ আসিতেছে, কিন্তু পুরাতন কথাও ঘুচে না নূতন কথাও জুটে না। কোনো কোনো মনস্তত্ত্ববিৎ পণ্ডিত বলেন কথা ব্যতীত ভাবা অসম্ভব, সে কথা কত দূর সত্য বলিতে পারি না, কিন্তু দেখা যাইতেছে আমরা কিছুমাত্র না ভাবিয়াও অনর্গল কথা কহিয়া যাইতে পারি। অনেক স্থলে কথা কীটের মতো অতি দ্রুতবেগে আপনার বংশবৃদ্ধি করিয়া চলে, ভাবের জন্য অপেক্ষা করে না। যদি একবার দৈবাৎ কলমের মুখে বাহির হইল— 'নূতনের ধারে পুরাতন থাকে না' অমনি তাহার পর আরম্ভ হইল 'বৃক্ষে নূতন পত্রের উদ্‌গম হইলে পুরাতন পত্র খসিয়া পড়ে।' তস্য পুত্র : 'নূতন ফুল ফুটিতেছে দেখিলে পুরাতন ফুল ঝরিয়া পড়ে।' তস্য পুত্র : 'নবীন সূর্য উঠিতেছে দেখিলে চাঁদ পালায়।' তস্য পুত্র : 'নব বসন্ত আসিতেছে দেখিলে শীত অন্তর্ধান হয়।' তস্য পুত্র : 'নূতন বন্ধুর উদয়ে পুরাতন বন্ধু লজ্জায় মুখ নত করিয়া চলিয়া যায়।' (মানবের সৌভাগ্যক্রমে পুরাতন বন্ধুর এরূপ অকারণ অতিলজ্জাশীলতা সচরাচর দেখা যায় না।) তস্য পুত্র : 'নূতন বৎসর আসিতেছে দেখিয়া পুরাতন বৎসর থাকিবে কেন?' অবশেষে '৯৯ উদয়ে ওই দেখো ৯৮ সাল কালের গর্ভে ডুবিয়া গিয়াছে।' এতক্ষণে কারণটা পাওয়া গেল— নববর্ষ আসিয়াছে, অতএব সময়োচিত কতকগুলা বাক্যবিন্যাস অত্যাবশ্যক, অতএব প্রথা অনুসারে কালের গতি সম্বন্ধে উন্নতিজনক উপদেশ.হতভাগ্য পাঠককে নতশিরে সহ্য করিতে হইবে। তাই 'হ্রাসবৃদ্ধি' কাহাকে বলে সেই অতি নূতন ও দুরূহ তত্ত্বটি সম্পাদক মহাশয় দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতে বসিয়াছেন, পাঠকেরাও অগত্যা কাঁচিয়া শিশু সাজিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিতেছেন— 'হ্রাসবৃদ্ধির

কথাটা বলিয়াছি তো আর-একটু ভালো করিয়া বলি। ছোটো ছেলেটি ক্রমাগতই বড়ো হইতেছে। কত ভাব, কত শিক্ষা, কত রূপ, কত শোভা, কত বুদ্ধি, কত প্রতিভা ক্রমে ক্রমে ফুটিতেছে। ক্রমাগত সে বাড়িতেছে। কাল সে যেরূপ ছিল, আজ আর সেরূপ নয়। বাড়িতে বাড়িতে যখন সে বার্ধক্যে উপস্থিত, তখন আবার তাহার সব হ্রাস হইতে লাগিল। সৌন্দর্য ডুবিতেছে, বুদ্ধি কমিতেছে, স্মৃতি লোপ পাইতেছে। দন্ত নড়িল, চর্ম শিথিল হইল, কালো চুল পাকিল, সে ক্রমে ক্রমে আরও পুরাতন, আরও পুরাতন হইতে লাগিল। শেষে নবীনের পার্শ্বে আর দাঁড়াইতে না পারিয়া, নবীনকে সকল সম্পদ ছাড়িয়া দিয়া, লজ্জায় মুখ নত করিয়া মরণকে চুম্বন করিল। নূতন আসিল পুরাতন সরিল।'— ছোটো ছেলেটি যে ক্রমে বড়ো হয় এবং তাহার বুদ্ধিও বাড়ে এ কথা সম্পাদক মহাশয় স্পষ্ট বুঝিয়াছেন ও বুঝাইয়াছেন— কিন্তু তাঁহার পাঠকদের সম্বন্ধে কি এ নিয়ম খাটে না? তাহারা যদি যথেষ্ট বড়ো হইয়া থাকে সেইসঙ্গে তাহাদের বুদ্ধি বিকাশ কি হয় নাই? এরূপ লেখা পড়িতে পড়িতে অবশেষে লেখকের অদ্ভুত সংযমশক্তি দেখিয়া আশ্চর্য হইতে হয়। লেখক যে বিস্তর কথা জোটাইতে পারেন ক্রমে সেটা আর তেমন আশ্চর্য বোধ হয় না; কিন্তু অবশেষে তাঁহাকেও যে একটা জায়গায় আসিয়া থামিতে হয় সেইটেই বিস্ময় এবং আন্তরিক কৃতজ্ঞতা উৎপাদন করে। এ কথা দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে হইবে অবাধে বাক্য সৃষ্টি করিয়া যাওয়া এবং অবসর পাইলেই পুরাতন উপদেশের ঝুলি খুলিয়া বসা ব্রাহ্মদের অত্যন্ত অভ্যস্ত হইয়াছে।— 'মামলায় মরণ'। মামলা-মোকদ্দমা ম্যালেরিয়া প্রভৃতি মড়কের ন্যায় আমাদের দেশে ব্যাপ্ত হইয়া কীরূপ সর্বনাশের উপক্রম করিয়াছে এই সুলিখিত প্রবন্ধটি পড়িলে হৃদয়ংগম হইবে। সকল ব্যাধিই আপন অনুকূল ক্ষেত্রে অতি শীঘ্র ফলবান হইয়া উঠে— সেই কারণে কূটবুদ্ধি বাঙালির ঘরে মামলা-মোকদ্দমার নিদারুণ প্রকোপ দেখা যাইতেছে। লেখক মহাশয় মামলার পরিবর্তে সালিশি নিষ্পত্তির পরামর্শ দিতেছেন। কিন্তু এ পরামর্শ কাহার কর্ণগোচর হইবে? দেশে এমন কয়টা মোকদ্দমা হয় যেখানে উভয় পক্ষই ন্যায্য নিষ্পত্তির প্রার্থী? অধিকাংশ স্থলেই, হয় দুই পক্ষেই নয় এক পক্ষে ফাঁকি দিতে চায়, সে অবস্থায় আদালতের মতো এমন সুবিধার জায়গা কোথায় পাওয়া যাইবে? মামলা তো একপ্রকার আইনসংগত জুয়াখেলা, অনেকটা দৈব এবং অনেকটা কৌশলের উপর জয়-পরাজয় নির্ভর করে। সেই খেলার সর্বনাশী উত্তেজনায় যাহারা সর্বস্ব পর্যন্ত পণ করিয়া বসে তাহাদিগকে উপদেশবাক্যে কে নিবৃত্ত করিবে? তাহারা বেশ জানে, মোকদ্দমার ফলাফল দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ, কিন্তু সেই তাহাদের পক্ষে প্রধান আকর্ষণ।— 'মুক্তিফৌজের অদ্ভুত কীর্তি' প্রবন্ধে জেনেরাল বুথ যে কীরূপ অসাধারণ উদ্যম, বুদ্ধি ও সহৃদয়তার সহিত পতিত-উদ্ধার কার্যে নিযুক্ত রহিয়াছেন তাহারই কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া হইয়াছে। ইহা পাঠ করিয়া আর-কিছু না হউক আমাদের— বাঙালিদের— অত্যুগ্র আত্মাভিমান যদি ক্ষণকালের জন্য কিঞ্চিৎ হ্রাস হয় তো সেও পরম লাভ বলিতে হইবে।

সাহিত্য। বৈশাখ [১২৯৯]

'প্রভাবতী সম্ভাষণ'। স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় -রচিত এই প্রবন্ধটি পাঠ করিলে হৃদয় করুণারসে আর্দ্র না হইয়া থাকিতে পারে না। রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যা প্রভাবতীকে বিদ্যাসাগর মহাশয় অপত্যনির্বিশেষে ভালোবাসিতেন। তাহার অকালমৃত্যুতে একান্ত ব্যথিত হইয়া প্রভাবতীর স্মৃতি চিরজাগরূক রাখিবার জন্য তিনি এই প্রবন্ধ রচনা করেন। ইহার একটি অংশ উদ্‌ধৃত করিয়া দিই।— লেখক মহাশয় প্রভাবতীকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছেন— 'আমি বাহিরের বারান্ডায় বসিয়া আছি; তুমি, বাড়ির ভিতরের নীচের ঘরের জানালায় দাঁড়াইয়া আমার সঙ্গে কথোপকথন করিতেছ। এমন সময়ে, শশী (রাজকৃষ্ণবাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র) কৌতুক করিবার নিমিত্ত বলিল, 'উনি আর তোমায় ভালো বাসবেন না।' তুমি অমনি শিরশ্চালনপূর্বক, 'ভালো বস্‌বি, ভালো বস্‌বি' এই কথা আমায় বারংবার বলিতে লাগিলে। অন্যান্য দিন, আমি, ভালো বাসিব

বলিয়া, অবিলম্বে তোমার শঙ্কা দূর করিতাম। সেদিন, সকলের অনুরোধে, আর ভালো বাসিব না, এই কথা বারংবার বলিতে লাগিলাম; তুমিও, প্রতিবারেই, 'না ভালো বস্‌বি' এই কথা বলিতে লাগিলে। অবশেষে, আমায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ স্থির করিয়া, তুমি, স্ফূর্তিহীন বদনে, 'তুই ভালো বস্‌বিনি, আমি ভালো বস্‌ব' এই কথা, এরূপ মধুর স্বরভঙ্গি ও প্রভূত স্নেহরসসহকারে বলিয়া বিরত হইলে, যে তদ্দর্শনে সন্নিহিত ব্যক্তি মাত্রেরই অন্তঃকরণ অননুভূতপূর্ব প্রীতিরসে পরিপূর্ণ হইল।'—

'মহারাষ্ট্রীয় ভাষার প্রাচীনত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব' প্রবন্ধটি বিশেষ অবধানযোগ্য। 'নূতন বাড়ি' গল্পটি পড়িয়া আমরা সন্তোষলাভ করিতে পারিলাম না— প্রভু মহেন্দ্রনাথবাবুকে কৌশলে আপনার সহিত বিবাহবন্ধনে বাঁধিবার জন্য বাগানের মালীর বিধবা কন্যা যে এমনতর আজগবি ফন্দি খাটায় সে আমাদের কাছে নিতান্ত সৃষ্টিছাড়া ঠেকিয়াছে।

সাধনা
জ্যৈষ্ঠ ১২৯৯

সাহিত্য। জ্যৈষ্ঠ [১২৯৯]

'লয়'। এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে আমাদের যাহা বক্তব্য পূর্ব পত্রিকাতেই বলিয়াছি। 'প্রাইভেট্ টিউটার'।— পত্রের উত্তর-প্রত্যুত্তর অবলম্বন করিয়া একটি ছোটো গল্প। গল্পের উপসংহারটি দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি। আমাদের বরাবর ভয় ছিল পাছে সবশেষে, হয় একটা-দুটা আত্মহত্যা, নয় সমাজ-বিদ্রোহ, নয় কোনো রকমের একটা উৎকট কবিত্ব আসিয়া পড়ে। কিন্তু তাহা দূরে যাউক, লেখক এমতভাবে শেষ করিয়াছেন যে, নায়ক-নায়িকার প্রেমবৃত্তান্তটা অমূলক কি সমূলক পাঠকদের ধাঁধা লাগিয়া যায়। বিজয় তাঁহার শেষ পত্রে যে ভাবটুকু ব্যক্ত করিয়াছেন সাধারণত নব্য বঙ্গযুবকের পক্ষে তাহাই স্বাভাবিক— একদিকে হৃদয়ের টান, আর-এক দিকে উদরের টান, শেষোক্ত অঙ্গটির আকর্ষণশক্তিই কিঞ্চিৎ প্রবলতর— একটুখানি উপন্যাসের ধরনে প্রেমচর্চা করিবার দিকেও মন যায়, অথচ সেটা এত প্রকৃত এবং দৃঢ় নয় যে তাহার জন্য খুব বেশিমাত্রায় একটা বিপ্লব বাধাইতে পারে। ওটা একটা শখ মাত্র, কিন্তু শামলা বাঁধিয়া আপিসে যাওয়া বাঙালির পক্ষে নিতান্ত শখের নহে, ওইটেই জীবনের সর্বপ্রধান ঘটনা। বিজয়ের মনের ভাবটা মোটের উপরে একটু মিশ্রিত গোছের, না-এদিক না-ওদিক, বিশেষ কোনো রকমের নয়, যেমন সচরাচর হইয়া থাকে; অথচ এখনো তাহার মনে মনে একটু বিশ্বাস আছে সে কেবলমাত্র তুলা-হাটের কেরানি নহে, সে উপন্যাসের নায়ক— কিন্তু সেটা ভুল বিশ্বাস। 'বৈদিক সোম। ৩য় প্রস্তাব'।— বেদে সোম অর্থে যে ঈশ্বরপ্রেম বুঝাইত লেখক মহাশয় তাহার আরও দুই-একটি নূতন দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন— পড়িয়া আমরা পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছি।

সাহিত্য। আষাঢ় [১২৯৯]

'কাশ্মীরের বর্তমান অবস্থা'। লেখাটি উৎকৃষ্ট হইয়াছে। বাংলায় এরূপ প্রবন্ধ প্রায় অত্যুক্তি এবং শূন্য হাহুতাশে পরিপূর্ণ থাকে— তাহার প্রধান কারণ, খাঁটি খবর আমরা পাই না, খাঁটি খবর আমরা চাইও না— মনে করি, খুব অলংকার দিয়া কেবল কতকগুলা ফাঁকা আবেগ প্রকাশ করিলে খুব উচ্চ অঙ্গের লেখা হয়। কোনো একটা আনুপূর্বিক বৃত্তান্ত বেশ পরিষ্কার সহজভাবে লিপিবদ্ধ করিতে আমরা অক্ষম, সময়ে অসময়ে নিজের হৃদয়টাকে যেখানে-সেখানে টানিয়া আনিয়া তাহাকে খুব খানিকটা আস্ফালন বা অশ্রুপাত না করাইলে আমাদের কিছুতেই মনঃপূত হয় না। আমরা যে ভারি সহৃদয় কেবল এইটে প্রমাণ করিবার জন্যই যেন আমরা নানা ছুতো অন্বেষণ করিতেছি; সেইজন্য আসল কথাটা ভালো করিয়া বলিবার সুযোগ হয় না, মনে হয় ততক্ষণ নিজের হৃদয়টা প্রকাশ করিলে কাজে লাগিত। সহৃদয়তা করিতে, কাঁদুনি গাহিতে,

বিস্মিত চকিত স্তম্ভিত হইতে বিশেষ পরিশ্রম করিতে হয় না, অনুসন্ধান অথবা চিন্তার আবশ্যক করে না এবং লেখাটাও বিস্তার লাভ করে। নগেন্দ্রবাবুর লেখায় কাশ্মীরের বর্তমান অবস্থা এবং তদপেক্ষা ভাবী অবস্থা সম্বন্ধে দুশ্চিন্তা জন্মাইয়া দেয়। 'সমুদ্রযাত্রা ও জন্মভূমি পত্রিকা'— প্রবন্ধটি প্রাঞ্জল, সরল ও নির্ভীক।

সাধনা
শ্রাবণ ১২৯৯

নব্যভারত। জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় [১২৯৯]

'মেঘনাদবধচিত্র'।— বহুকাল হইল প্রথম বর্ষের ভারতীতে [শ্রাবণ-কার্তিক, পৌষ, ফাল্গুন ১২৮৪] মেঘনাদবধ কাব্যের এক দীর্ঘ সমালোচনা বাহির হইয়াছিল, লেখক মহাশয় এই প্রবন্ধে তাহার প্রতিবাদ প্রকাশ করিতেছেন। তিনি যদি জানিতেন ভারতীর সমালোচক তৎকালে একটি পঞ্চদশবর্ষীয় বালক ছিল তবে নিশ্চয়ই উক্ত লোকবিস্মৃত সমালোচনার বিস্তারিত প্রতিবাদ বাহুল্য বোধ করিতেন।[1]— রিজ্‌লি সাহেবের নবপ্রকাশিত গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া ক্ষীরোদচন্দ্রবাবু 'ব্রাহ্মণ্যধর্মের শ্রীবৃদ্ধি' নামক যে প্রবন্ধ সংকলন করিয়াছেন, তাহাতে ভারতবর্ষের অনার্যজাতীয়েরা কী করিয়া ব্রাহ্মণ্যের গণ্ডির মধ্যে অল্পে অল্পে প্রবেশ লাভ করিয়াছে তাহার কথঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়— প্রবন্ধটি নিরতিশয় সংক্ষিপ্ত হওয়ায় আমরা যথেষ্ট তৃপ্তি লাভ করিলাম না।— 'সাকার ও নিরাকার উপাসনা'। ইহাতে যে-সকল তর্ক অবলম্বিত হইয়াছে তাহা এতই সরল যে, সহসা মনে প্রশ্ন উদয় হয় এ-সকল কথা কি কাহাকেও বিশেষ করিয়া বুঝানো আবশ্যক? দুঃখের বিষয় এই যে, আবশ্যক আছে। আরও দুঃখের বিষয় এই যে যাঁহারা মনে মনে এ সমস্তই বুঝেন, তাঁহারাও নানারূপ কৃত্রিম কূট তর্ক উদ্‌ভাবন করিতেছেন, সুতরাং এ যুক্তিগুলি স্থলবিশেষে ভুল ভাঙিবার এবং স্থলবিশেষে কেবলমাত্র মুখবন্ধ করিবার জন্য আবশ্যক হইয়াছে।[2]— 'অনাহারে মরণ'। বাল্যকাল হইতে যথেষ্ট পুষ্টিকর আহার পায় না বলিয়া যে বাঙালি জাতির মনুষ্যত্ব অসম্পূর্ণ থাকে এ কথা আমরা লেখকের সহিত স্বীকার করি। শরীর অপুষ্ট থাকাতে আমাদের চরিত্রের ভিত্তি কাঁচা থাকিয়া যায়। লেখকের মতের সহিত আমাদের সম্পূর্ণ ঐক্য আছে কেবল তাঁহার রচনার দুই-এক স্থলে আমাদের খটকা লাগিয়াছে। এক স্থলে আছে 'তাঁহারা বাক্যসার, বক্তাদিগের অপেক্ষা ভালো স্বদেশপ্রেমিক 'better patriots'।' ইংরাজি কথাটা জুড়িয়া দিবার অত্যাবশ্যক কারণ বুঝিতে পারিলাম না। প্রবন্ধের উপসংহারে গদ্য সহসা বিনা নোটিসে একপ্রকার ভাঙাছন্দ পদ্যে পরিণত হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য বুঝা কঠিন। সেইজন্য এই আড়ম্বরহীন গম্ভীর প্রবন্ধ শেষকালটায় হঠাৎ এক অদ্ভুত আকার ধারণ করিয়াছে; সংযতবেশ ভদ্রলোক সভাস্থলে অকস্মাৎ নটের ভাব ধারণ করিলে যেমন হয় সেইরূপ। শেষ অংশটুকু বিচ্ছিন্ন করিয়া একটা স্বতন্ত্র পদ্য রচনা করিলে এরূপ খাপছাড়া হইত না।

সাহিত্য। শ্রাবণ [১২৯৯]

'মধুচ্ছন্দার সোমযাগ'।— বেদে যে সোমযাগের উল্লেখ আছে এই অতি উপাদেয় প্রবন্ধে তাহারই আলোচনা উত্থাপিত হইয়াছে, লেখক মহাশয় বলেন বৈদিক ঋষিদের মধ্যে 'মধুবিদ্যা' নামক একটি গোপনীয় বিদ্যা ছিল। সেই বিদ্যার রহস্য যে জ্ঞানীরা অবগত ছিলেন তাঁহাদের নিকট মধু

---

[1] দ্র. পশ্চিমবঙ্গ সরকার -প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৫, পৃ. ১১২-১৪৮, বর্তমান গ্রন্থ, পৃ. ৮২-১২৫ এবং রবীন্দ্র-রচনাবলী অচলিত সংগ্রহ ২, পৃ. ৭৫

[2] দ্র. বর্তমান গ্রন্থ, পৃ. ৪০৫-৪১৩

অর্থাৎ সোম অর্থে ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মানন্দ। লেখক বলিতেছেন, ‘ঋগ্বেদের প্রথমেই মধুচ্ছন্দা নামক এক ঋষির কয়েকটি মন্ত্র আছে সেই মন্ত্রগুলির আদ্যন্ত আলোচনা করিলে, মধুচ্ছন্দার সোমযাগ কীরূপ ছিল, পাঠক তাহা বুঝিতে পারিবেন।’ এবারকার সংখ্যায়, মধুচ্ছন্দা ঋষি কে, তাহারই আলোচনা হইয়াছে। সোমযাগ কী তাহা জানিবার জন্য কৌতূহল রহিল। ‘উপাধি-উৎপাত’ প্রবন্ধে লেখক মনের আক্ষেপ তেজের সহিত প্রকাশ করিয়াছেন। যাঁহাদের আত্মসম্মান আপনাতেই পর্যাপ্ত, যাঁহারা রাজসম্মান চাহেন না, এমন-কি, প্রত্যাখ্যান করেন, তাঁহাদের মতো মানী লোক জগতে সর্বত্রই দুর্লভ। কিন্তু সাধারণত যাঁহারা রাজোপাধি লাভ করিয়া গৌরব অনুভব করেন তাঁহারা কি এতই তীব্র আক্রমণের যোগ্য! তাঁহাদের মধ্যে কি দেশের অনেক যথার্থ সারবান যোগ্য লোক নাই? উপাধি যদি স্থলবিশেষে অযোগ্য পাত্রে বর্ষিত হয় তবে সে রাজার দোষ— কিন্তু যাঁহারা রাজসম্মানের চিহ্নস্বরূপ উপাধি প্রাপ্ত হইয়া সন্তোষলাভ করেন তাঁহাদিগকে দোষ দেওয়া যায় না। কেবল রাজাদর কেন, পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা যায় জনাদরও অনেক সময় যোগ্য পাত্রকে উপেক্ষা করিয়া অযোগ্য পাত্রে ন্যস্ত হয়, তাই বলিয়া জনাদর যে নিতান্তই অবজ্ঞার সামগ্রী তাহা বলিতে পারি না। সম্মান, আদর মনুষ্যের নিকট চিরকাল প্রিয়, মানুষের এ দুর্বলতার জন্য স্থলবিশেষে ঈষৎ হাস্যের উদ্রেক হইতে পারে কিন্তু এতটা তর্জন কিছু যেন বেশি হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। বিশেষত, বঙ্কিমবাবু গবর্মেন্টের হস্ত হইতে রায় বাহাদুর উপাধি গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া লেখক যে আক্ষেপ প্রকাশ করিয়াছেন তাহা আমাদের নিকট নিতান্ত অযথা বলিয়া বোধ হয়। কারণ, বঙ্কিমবাবু বঙ্গদেশের দেশমান্য লেখক বলিয়া গবর্মেন্ট তাঁহাকে উপাধি দেন নাই— তিনি গবর্মেন্টের পুরাতন কর্মচারী— তাঁহার যোগ্যতা ও কর্তব্যনিষ্ঠায় সন্তুষ্ট হইয়া গবর্মেন্ট যদি তাঁহাকে যথোচিত সম্মানচিহ্ন দান করেন তাহা অবজ্ঞা করিলে তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত অশোভন এবং অন্যায় কার্য হইত সন্দেহ নাই। বঙ্কিমবাবু দেশের জন্য যাহা করিয়াছেন দেশের লোক তজ্জন্য তাঁহাকে অত্যন্ত উচ্চ আসন দিয়াছে— তিনি রাজার জন্য যাহা করিয়াছেন সে কাজ স্বতন্ত্র প্রকৃতির, তাহার পুরস্কারও স্বতন্ত্র শ্রেণীর— তাহার সহিত হৃদয়ের বিশেষ যোগ নাই, সে সমস্তই যথানির্দিষ্ট নিয়মানুগত— অতএব তাহা লইয়া ক্ষোভ করিতে বসা মিথ্যা। উপাধি লওয়া সম্বন্ধে কার্লাইল ও টেনিসনের সহিত বঙ্কিমবাবুর তুলনা ঠিক খাটে নাই। যাহা হউক, লেখাটি ভালো হইয়াছে সন্দেহ নাই। ‘বন্ধু’ গল্পটির মধ্যে পশ্চিমাঞ্চলের স্নিগ্ধ শ্রাবণ মাস বেশ একটি সংগীতমিশ্রিত সৌন্দর্য নিক্ষেপ করিয়াছে।— ‘আদর্শ সমালোচনা’। বোধ করি এমন ভাগ্যবান সমালোচক কখনো জন্মেন নাই যিনি আপন কর্তব্য কার্য সম্পন্ন করিয়া অক্ষত শরীরে পৃথিবী হইতে অপসৃত হইতে পারিয়াছেন। যখন উক্ত অপ্রিয় কর্তব্য স্কন্ধে লইয়াছি তখন আমরাও যে সহজে অব্যাহতি পাইব এমন দুরাশা আমাদের নাই। অতএব ‘আদর্শ-সমালোচনা’-লেখক যে গুপ্তভাবে আমাদের প্রতি বিদ্রূপবাণ নিক্ষেপ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন সেজন্য আমরা লেশমাত্র আশ্চর্য বা দুঃখিত হই নাই। দুঃখের বিষয় এই যে, লেখকের নিপুণতার আমরা প্রশংসা করিতে পারিলাম না। আমরা বন্ধুভাবে তাঁহাকে পরামর্শ দিতে পারি যে, তিনি যদি রসিকতা প্রকাশের নিষ্ফল চেষ্টা না করিয়া অন্য কোনো বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন তো হয়তো কৃতকার্য হইতেও পারেন। ‘কালিদাস ও সেক্ষপিয়র’ লেখার মধ্যে যথেষ্ট চিন্তাশীলতা আছে, আমরা ইহার পরিণামের জন্য অপেক্ষা করিয়া রহিলাম। ‘আমার “স্বরচিত” লয়তত্ত্ব সম্বন্ধে আমাদের যাহা বক্তব্য তাহা সাহিত্যেই লিখিয়া পাঠাইয়াছি।[১] এখানে কেবল সংক্ষেপে একটি কথা বলিয়া রাখি। আমরা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, ক্ষুদ্র অনুরাগ বৃহৎ অনুরাগে পরিণত হইতে পারে কিন্তু বৃহৎ অনুরাগ কী করিয়া নিরনুরাগে লইয়া যাইবে আমরা বুঝিতে পারি না। চন্দ্রনাথবাবু তাহার উত্তরে লিখিয়াছেন, ছোটো অনুরাগ যখন স্বদেশানুরাগ প্রভৃতি সম্পূর্ণ ভিন্ন বা বিপরীত প্রকৃতির বড়ো

---

১. দ্র. বর্তমান গ্রন্থ, পৃ. ৪১৯-৪২৩

অনুরাগে পরিণত হইতেছে তখন বড়ো অনুরাগ নিরনুরাগে পরিণত হওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। এক শক্তি ভিন্ন শক্তিতে রূপান্তরিত হইতে পারে বলিয়াই শক্তির ধ্বংস হওয়া আশ্চর্য নহে এরূপ যুক্তি আমরা প্রত্যাশা করি নাই। দেখিতেছি আমাদের আলোচনা ক্রমশ কথাকাটাকাটিতে পরিণত হইতেছে, অতএব এ আলোচনা এইখানেই লয় প্রাপ্ত হইলে মন্দ হয় না।

সাধনা

ভাদ্র-আশ্বিন ১২৯৯

সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা। প্রথম ভাগ। দ্বিতীয় সংখ্যা। শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত কর্তৃক সম্পাদিত। বার্ষিক মূল্য তিন টাকা।

সাহিত্য পরিষদ সভা হইতে এই ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছে। এই পত্রিকায় আমরা এমন সকল প্রবন্ধের প্রত্যাশ্যা করি যাহাতে বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাস এবং বঙ্গভাষার পুরাবৃত্ত, ব্যাকরণ, ভাষাতত্ত্ব ও অভিধান রচনার সহায়তা করে। অমাদের দেশের প্রাচীন পুঁথির পাঠোদ্ধার এবং অপ্রচলিত পুরাতন শব্দের অর্থবিচারও ইহার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত এবং বাংলা রূপকথা (Folklore), প্রবচন (Proverb), হরুঠাকুর, রামবসু প্রভৃতি লোকপ্রসিদ্ধ কবিওয়ালাদিগের গান, ছড়া (nursery-rhyme) প্রভৃতি সংগ্রহের প্রতিও ইহার দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। বর্তমান-সংখ্যক পত্রিকাটি দেখিয়া আমরা কিয়ৎপরিমাণে আশান্বিত হইয়াছি। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত -লিখিত কৃত্তিবাস এবং শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী -লিখিত বৈজ্ঞানিক পরিভাষা পরিষদ-পত্রিকার সম্পূর্ণ উপযোগী এবং সাধারণের সমাদরযোগ্য হইয়াছে। কিন্তু আমরা দুঃখের সহিত বলিতেছি সম্পাদক-লিখিত ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রবন্ধটির মধ্যে কেবল যে-সকল ছত্র ভূদেববাবুর গ্রন্থ হইতে উদধৃত সেই অংশগুলিই পাঠ্য এবং অবশিষ্ট সমস্তই অপ্রাসঙ্গিক ও অনাবশ্যক বাগাড়ম্বরে পরিপূর্ণ। আমরা লেখক মহাশয়ের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া প্রবন্ধের একটি অংশ উদ্‌ধৃত করি :

‘মিল্টন যখন কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেন, তখন ভয়াবহ বিপ্লবে সমগ্র ইংলন্ড আন্দোলিত হইয়াছিল। তখন স্বাধীনতার সহিত যথেচ্ছাচারের ভীষণ সংগ্রাম ঘটিয়াছিল। এই সংগ্রাম একদিনে পর্যবসিত হয় নাই; একস্থানে এই সংগ্রামস্রোতে অবরুদ্ধ হইয়া থাকে নাই, এক সম্প্রদায় এই সংগ্রামে আত্মোৎসর্গ করে নাই। এই সংগ্রামে ইংরেজ জাতির যেরূপ স্বাধীনতা লাভ হয়, সেইরূপ আমেরিকার আরণ্যপ্রদেশ সুদৃশ্য নগরাবলীতে শোভিত হইতে থাকে। অন্য দিকে গ্রীস দুইহাজার বৎসরের অধীনতাশৃঙ্খল ভগ্ন করিতে উদ্যত হইয়া উঠে। এই দীর্ঘকালব্যাপী সমরে য়ুরোপের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত এরূপ প্রচণ্ড বহ্নিস্তূপের আবির্ভাব হয় যে, উহার জ্বালাময়ী শিখা প্রত্যেক নিপীড়িত ও নিগৃহীত ব্যক্তির হৃদয়ে উদ্দীপিত হইয়া তাহাদিগকে দীর্ঘকালের নিপীড়ন ও নিগ্রহের গতিরোধে শক্তিসম্পন্ন করে।’

পাঠকেরা মনে করিতে পারেন ভূদেব মুখোপাধ্যায় য়ুরোপের এই এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তব্যাপী জ্বালাময়ী শিখার কিয়দংশ কোনো উপায়ে আহরণ করিয়া এই বাঙালি লেখকের ভাষায় ও কল্পনায় বর্তমান অগ্নিদাহ উপস্থিত করিয়াছেন; কিন্তু লেখক বলিতেছেন— তাহা নহে। ‘ভূদেবের সময় হিন্দুসমাজে যে বিপ্লব উপস্থিত হয়, তাহা মিল্টনের সময়ের বিপ্লবের ন্যায় সর্বত্র ভীষণ ভাবের বিকাশ করে নাই; উহাতে নরশোণিতস্রোত প্রবাহিত হয় নাই; প্রজালোকের সমক্ষে দেশাধিপতির শিরশ্ছেদন ঘটে নাই বা জনসাধারণ স্বাধীনতার জন্য উত্তেজিত হইয়া ভয়ংকর কার্যসাধনে আত্মোৎসর্গ করে নাই।’

বিস্তারিত ভাবে এমন হাস্যকর তুলনার অবতারণ এবং অবশেষে একে একে তাহার আদ্যন্ত খণ্ডন কোনো দেশের কোনো প্রহসনেও এ পর্যন্ত স্থান পায় নাই। গ্রন্থকার কুরুক্ষেত্রের সমস্ত যুদ্ধবর্ণনা মহাভারত হইতে আদ্যোপান্ত উদ্‌ধৃত করিয়া সর্বশেষে লিখিতে পারিতেন যে, ভূদেবের সময় যদিচ ‘নবীন ভাবের বাহ্যবিভ্রমে পুরাতন ভাবের স্থিতিশীলতা কিয়ৎপরিমাণে বিচলিত’

হইয়াছিল, যদিচ 'তখন ইংরেজি ভাবের প্রচার ও ইংরেজি শিক্ষা বদ্ধমূল হইয়াছিল' এবং 'বিজ্ঞানের কৌশলে ভারতবর্ষ যেন ইংলন্ডের দ্বারস্থ হইয়া উঠিয়াছিল' কিন্তু ঘটোৎকচবধ হয় নাই।

সাহিত্য পরিষদ সভার প্রতি আমাদের আন্তরিক মমতা আছে বলিয়া এবং তাহার নিকট হইতে আমরা অনেক প্রত্যাশা করি বলিয়াই সাধারণের সমক্ষে তাহার এরূপ অদ্ভুত বাল্যলীলা আমাদের নিকট নিরতিশয় লজ্জা ও কষ্টের কারণ হয়।

সাধনা
পৌষ ১৩০১

প্রদীপ। বৈশাখ [১৩০০]

'লাল পল্টন' ঐতিহাসিক প্রবন্ধটি শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রের রচনা। বিষয় এবং লেখকের নাম শুনিলেই পাঠকদের সন্দেহ থাকিবে না যে প্রবন্ধটি সর্বাংশেই পাঠ্য হইয়াছে। কিন্তু আমাদের একটি কথা বক্তব্য আছে। প্রবন্ধটি দীর্ঘ এবং গত দুই-তিনবারের অনুবৃত্তি। আমাদের বিবেচনায় ধারাবাহিকরূপে গ্রন্থ প্রকাশ সাময়িক পত্রের উদ্দেশ্য নহে। সাময়িক পত্রে বিচিত্র খণ্ড প্রবন্ধ এবং সাময়িক বিষয়ের আলোচনায় পাঠকের চিত্তকে নানা দিকে সজাগ করিয়া রাখে। কোনো শাখাপ্রশাখাবিশিষ্ট বিস্তৃত বিষয়কে শেষ পর্যন্ত অনুসরণ করা স্বভাবতই ইহার কাজ নহে। কারণ, বৃহৎ বিষয় অখণ্ড মনোযোগের দাবি রাখে, একক-সমগ্রতাই তাহার প্রধান গৌরব, নানা বিচিত্র বিষয়ের মাঝখানে তাহাকে টুকরা করিয়া বসাইয়া দেওয়া অসংগত। এইরূপে গৌরববান রচনাও তাহার লঘুপক্ষ সঙ্গীদের দ্রুতগামী জনতার মধ্যে পাঠকদের মনোযোগ হইতে ক্রমশই দূরে পিছাইয়া পড়িতে থাকে এবং কথঞ্চিৎ অবজ্ঞার বিষয় হইয়া উঠে। ক্ষমতাপন্ন লেখকদের লেখার এরূপ দুর্গতিসম্ভাবনা আমাদের নিকট অত্যন্ত ক্ষোভের বিষয় বলিয়া মনে হয়। যাহাই হৌক, বৃহৎ গ্রন্থ এবং সাময়িক পত্রের মধ্যে একটা সীমা নির্দিষ্ট থাকা কর্তব্য। 'বিজ্ঞান বা প্রকৃতির ইচ্ছা'— আমরা এরূপ গদ্য রচনার পক্ষপাতী নহি। ইহার মধ্যে ভাবুকতার চেষ্টা এবং চিন্তাশীলতার আড়ম্বর আছে কিন্তু আসল জিনিসটুকু নাই। 'বৃহস্পতির কলঙ্ক' সরল, সরস এবং কৌতূকাবহ। ধূমকেতুর সংঘর্ষে পৃথিবীর যে কী বিভ্রাট ঘটিতে পারে সুবিখ্যাত জ্যোতির্বিদ ফ্লামারিয় তাঁহার 'পৃথিবীর সংহার' নামক ফরাসি উপন্যাস গ্রন্থে তাহা সুন্দররূপে বর্ণনা করিয়াছেন। সৌরজগতের বিপুলতম গ্রহ বৃহস্পতি ধূমকেতুর কেশাকর্ষণ করিয়া তাহাকে কীরূপে আপন অন্তঃপুরসাৎ করিয়াছেন অপূর্ববাবু সমালোচ্য প্রবন্ধে তাহার বর্ণনা করিয়াছেন, আমাদের অবলা পৃথিবী উন্মাদ ধূমকেতুকে সেরূপ নিরাপদে আয়ত্ত করিতে পারে কি না সন্দেহ। 'চুলকাটা মিষ্মী' সচিত্র প্রবন্ধটি সুপাঠ্য। 'শ্রীবিলাসের দুর্বুদ্ধি' উপন্যাসটি সংক্ষিপ্ত, স্বভাবসংগত এবং সুরচিত হইয়াছে। সুবিখ্যাত মহারাষ্ট্রীয় পণ্ডিত রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকরের সচিত্র যে সংক্ষিপ্ত জীবনী বাহির হইয়াছে তাহা পাঠ করিয়া আমরা তৃপ্তিলাভ করিয়াছি। ভারতবর্ষীয় ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের মহাত্মাগণের সহিত আমাদের পরিচয় সাধন নানা কারণে শ্রেয়স্কর।

উৎসাহ। ফাল্গুন-চৈত্র [১৩০৪]

অক্ষয়বাবুর 'লাল পল্টন'কে যখন সাময়িক পত্রের অধিকার হইতে পরাহত করিবার চেষ্টা করিয়াছি তখন উৎসাহে প্রকাশিত তাঁহার 'অজ্ঞেয়বাদ'কে কোনোমতে আমল দিতে পারি না। বিষয়টি দুরূহ এবং ইহার যুক্তিগুলি পরস্পরসাপেক্ষ, এমত অবস্থায় ইহাকে ছিন্ন ছিন্ন করিয়া প্রকাশ করিলে প্রবন্ধের দুরূহতা বাড়িয়া যায় অথচ তাহার যুক্তির সংহত বল খণ্ডীকৃত হয়। লেখাটি এই খণ্ডেই সম্পূর্ণ হইয়াছে এক্ষণে গ্রন্থাকারে ইহার সহিত যথাযোগ্য সম্ভাষণের প্রত্যাশায় রহিলাম। শ্রীযুক্তবাবু রজনীকান্ত চক্রবর্তী 'শ্রীকৃষ্ণ লীলামৃত' নামক দুইশত বৎসরের একটি

প্রাচীন বৈষ্ণব কাব্যের পরিচয় দিয়াছেন। শ্রীযুক্তবাবু শশধর রায় ‘বর্ণ’ প্রবন্ধে মনুষ্য-ত্বকের বর্ণোৎপত্তির কারণ আলোচনা করিয়াছেন। পাঠকদের বোধ হয়, এবং লেখকও স্বীকার করিয়াছেন, প্রবন্ধ-ধৃত মত পরীক্ষা ও প্রমাণের অপেক্ষা রাখে। ‘ভৌতিক নোট’ গল্পটি সুনিপুণ। ছোটো কথা, আকারে অতি ছোটো এবং উপদেশে অত্যন্ত বড়ো বটে কিন্তু বিষয়ে অতিশয় পুরাতন এইজন্য রচনার বিশেষরূপ নৈপুণ্য না থাকায় তাহা নিরর্থক। ‘উকিল কলঙ্ক’-নামক ক্ষুদ্র প্রবন্ধে লেখক ব্যঙ্গচ্ছলে ওকালতি করিয়াছেন; সব শেষে তাহাতে এই কথাটা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, নীতি-উপদেষ্টাগণ নিজের হাতে ধর্মনীতির যে সোজা সোজা চক-কাটা ঘর বানাইয়াছেন, বিচিত্র মনুষ্য-চরিত্র তাহার মধ্যে সঞ্চরণ করিতে পারে না এবং জোর করিয়া চালনা করিতে গেলে হিতে বিপরীত হইয়া উঠে।

ভারতী
জ্যেষ্ঠ ১৩০৫

নব্যভারত। বৈশাখ [১৩০৫]
‘কি চাই কি পাই?’ প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া আমরা সম্পাদকের জন্য চিন্তিত হইয়া উঠিয়াছি। দোষদুর্বলতা আমাদের সকলেরই আছে এবং এই মাটির পৃথিবীতে দোষগুণে জড়িত আত্মীয়-বন্ধুবান্ধবদিগকে লইয়া আমরা কোনোপ্রকারে সন্তোষ অবলম্বন করিয়া আছি। কিন্তু নব্যভারতের ষোড়শবার্ষিক জন্মদিনে সম্পাদক মহাশয় বলিতেছেন ‘পঞ্চদশ বর্ষ আমি কেবল আদর্শ খুঁজিতেছি।’ মূঢ়সাধারণে ভুল করিত তিনি কেবল তাঁহার মাসিক পত্রের জন্য গ্রাহক ও লেখক খুঁজিতেছেন। কিন্তু লেখক বলেন ‘সাহিত্যের সেবা আমার কেবল কথার কথা, উপলক্ষ মাত্র; আমি লোক খুঁজিয়া লোক ধরিয়া কেবল অন্তর পরীক্ষা করিতেছি। পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, এমন লোক সম্মুখে পড়ে নাই, যিনি পরের সেবা করিতে করিতে আপনার স্বার্থ ভুলিয়াছেন, যিনি অম্লান চিত্তে দেশের জন্যে সর্বস্ব বিসর্জন দিতে পারিয়াছেন— যিনি চরিত্রে অটল, পুণ্য পবিত্রতায় উজ্জ্বল, যিনি দ্বেষহিংসা পরশ্রীকাতরতাহীন, যিনি পূর্ণাদর্শ।’ এইরূপে অনাহূত পরকে যাচাই করিয়া বেড়াইবার অনাবশ্যক কার্যভার নিজের স্কন্ধে গ্রহণ করিয়া পরীক্ষক মহাশয় এতই কষ্ট পাইতেছেন যে, আপন নাট্যমঞ্চের উপর চড়িয়া বসিয়া সকলকে বলিতেছেন ‘কাতরে পা ধরিয়া প্রার্থনা করিতেছি ঘৃণা লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া আমার সম্মুখে আদর্শ রূপে দাঁড়াও।’ তাঁহার কাতরতা দেখিয়া বিচলিত হইতে হয় কিন্তু ‘ঘৃণালজ্জা’ ত্যাগ করা সহজ নহে। এমন-কি, তিনিও তাহা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। বর্তমান প্রবন্ধে আদর্শরূপে দাঁড়াইতে গিয়া তিনিও স্থানে স্থানে পরমসাধুতাসম্মত বিনয়ের আবরণ রাখিয়াছেন; তিনিও বলিয়াছেন ‘আমি পতিত, মলিন, পাপে জর্জরিত— আমি অসারের অসারে মণ্ডিত— ঘৃণিত, মলিন। পরিত্যক্ত, নির্যিত, লাঞ্ছিত হওয়াই আমার পক্ষে সাজে ভালো।’ বিনয়ের সাধারণ অত্যুক্তিগুলিকে কেহ কখনো সত্য বলিয়া গ্রহণ করে না— সম্পাদক মহাশয়ও সেরূপ আশঙ্কা করেন নি। যদিবা আশঙ্কা থাকে লেখক তাহার প্রচুর প্রতিকার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন ‘স্বার্থ ভুলিয়া পরার্থ, নীচত্ব ভুলিয়া মহত্ত্ব, পশুত্ব ভুলিয়া চিন্ময়ত্ব, রিপুর উত্তেজনা ভুলিয়া সংযম পাইব আশায়, তোমার আহ্বানে, আমি কাঙাল, স্বেচ্ছায় দারিদ্র্যের মুকুট মস্তকে বহিয়া, আত্মীয়দিগের মায়ামমতায় ছাই ঢালিয়া ছুটিয়া আসিয়াছিলাম।’ ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্ত আর দুটি-চারটি আছে মাত্র এবং সেই ক্ষণজন্মা আদর্শ পুরুষদের ন্যায় আমাদের সম্পাদক মহাশয়ও কাঙাল, এবং তিনিও মায়ামমতায় ছাই ঢালিয়া ছুটিয়া আসেন। কিন্তু এ কথাটিও ভুলিতে পারেন নাই যে, যে দারিদ্র্য তিনি মস্তকে বহিয়াছেন তাহা ‘মুকুট’— এবং সেই মুকুট নাড়া দিয়া তিনি অদ্য আমাদের নিকট হইতে রাজকর আদায় করিতে আসিয়াছেন। ক্রমে যতই উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছেন তাঁহার লজ্জা ততই ঘুচিয়াছে— সকলকে ধিক্কার দিয়া বলিয়াছেন ‘সাধে কি আমি নৈরাশ্যের আগুন

জ্বালিয়া ভস্ম হইতে বসিয়াছি। পিতামাতার স্নেহের বন্ধন যাহার ছিন্ন, সে যে ভালোবাসার কত কাঙাল, তাহা, তুমি, ঐশ্বর্যের দাসানুদাস, কী বুঝিবে? আমি ভালোবাসার কাঙাল, কিন্তু ভালোবাসাকেও তুচ্ছ করিয়া ঠেলিয়া ফেলিয়াছি, দেবত্বের আকর্ষণে।' সম্পাদক মহাশয়কে আমরা কেহই বুঝিতে পারি নাই— কারণ আমরা ঐশ্বর্যের দাসানুদাস এবং তাঁহার মহীয়ান্ মস্তকে দারিদ্র্যের মুকুট; কিন্তু এমনি করিয়া যদি মধ্যে মধ্যে উচ্চৈঃস্বরে নিজেই বুঝাইতে শুরু করেন তাহা হইলে না বুঝিয়া আমাদের উপায় থাকিবে না। 'দেবত্বের আকর্ষণে' তিনি আমাদিগকে ছাড়াইয়া যে কতদূর পর্যন্ত পৌঁছিয়াছেন তাহা লিখিয়াছেন— 'আদর্শ ভুলিয়া আমি জটিল, কুটিল, মলিন, অপবিত্র ভালোবাসা বা একতা চাহি না। যদি তাহারই কাঙাল হইতাম, যাহাদের সহিত রক্তের সংস্রব ছিল তাঁহাদের স্নেহ ভুলিতাম না। তাঁহাদের স্নেহডোর ছিন্ন করিয়া দূরে দূরে, বিদেশে বিদেশে, নির্জনে নির্জনে, একাকিত্বের রাজ্যে কাঙালের ন্যায় বেড়াইতাম না!' কিন্তু এ কথা কেহ মনে করিয়ো না, নব্যভারতের সম্পাদক হওয়ার পর হইতে অদ্য পঞ্চদশ বৎসর ইহাঁর এই দশা! বাল্যকালে সুলক্ষণগুলি ছিল লেখক সে আভাস দিতে ছাড়েন নাই। 'আদর্শহীনতার জন্য বাল্যকাল হইতে কতজনের স্নেহডোর ছিঁড়িয়াছি; যত লোকের নিকট গিয়াছি, যখনই তাঁহাদের মধ্যে আদর্শহীনতা দেখিয়াছি, তখনই ছুটিয়া পলাইয়াছি। সেজন্য তাঁহারা আমার প্রতি আজ কত বিরক্ত! সেজন্য তাঁহারা কত ক্রোধান্বিত!!' আমাদের সহিত কত প্রভেদ! আমরা যখন ইস্কুল পলাইতাম, আমাদের সম্পাদক মহাশয় সেই বয়সে 'আদর্শহীনতা' হইতে পলায়ন করিতেন। মাস্টার আমাদের প্রতি রাগ করিতেন কিন্তু তাঁহার প্রতি ক্রোধান্বিত হইত জগতের সমস্ত আদর্শহীন ব্যক্তিরা! ভাবিয়া দেখো, সেই বালকটি বড়ো হইয়াছে এবং আজ লিখিতেছে 'চাহিয়াছি সত্য, পাইয়াছি মিথ্যা; চাহিয়াছি পুণ্য, পাইয়াছি পাপ; চাহিয়াছি স্বর্গ, পাইয়াছি নরক; চাহিয়াছি আন্তরিকতা, পাইয়াছি বাহ্যাড়ম্বর; চাহিয়াছি দেবত্ব, পাইয়াছি পশুত্ব; চাহিয়াছি সাত্ত্বিকতা, পাইয়াছি রাজসিকতা; চাহিয়াছি অমরত্ব, পাইয়াছি নশ্বরত্ব। কী তীব্র অভিজ্ঞতা!!' মহাপুরুষকে মিনতি করি তিনি শান্ত হউন, ক্ষান্ত হউন, ভাষাকে সংযত করুন, পৃথিবীকে ক্ষমা করুন, পাঠকদিগের প্রতি দয়া করুন, তাঁহার নববর্ষ-নাট্যশালার কৃত্রিম বজ্রটিকে প্রতিসংহার করিয়া লউন। তিনি যে সত্য চাহিয়াছিলেন সে গৌরব তাঁহারই থাক্ এবং যে মিথ্যা পাইয়াছেন সে লাঞ্ছনা আর সকলে বহন করিবে; তিনি যে পুণ্য চাহিয়া ফিরিয়াছিলেন সে দুর্বিষহ সাধুতা তাঁহাতেই বর্তিবে, এবং যে পাপ পাইয়াছেন সে অক্ষয় কলঙ্ক অপর সাধারণের ললাটে আঁকিয়া দিন; তিনি স্বর্গীয় তাই স্বর্গ চাহিয়াছিলেন কিন্তু নরক পাইয়াছেন সে হয়তো তাঁহারই আত্মদোষে নহে; তিনি অকপট, তাই চাহিয়াছিলেন আন্তরিকতা কিন্তু বাহ্যাড়ম্বরটা— সে আর কী বলিব! পরন্তু বর্তমান প্রবন্ধে তিনি যেরূপ আদর্শ হইয়া উঠিয়াছেন, পায়ে ধরিয়া প্রার্থনা করিলেও সকলে তেমনটি হইতে পারিবে না, কারণ, 'ঘৃণালজ্জা' একেবারেই পরিত্যাগ করা বড়ো কঠিন!

এই প্রসঙ্গে সম্পাদকের নিকট আমাদের একটি মিনতি আছে। যদিও তাঁহার হৃদয়োচ্ছ্বাস সাধারণের অপেক্ষা অনেক বেশি তথাপি বিস্ময়সূচক বা প্রবলতাসূচক তিলকচিহ্নগুলি (!) স্থানে স্থানে দ্বিগুণীকৃত করিয়া কোনো লাভ নাই। উহাকে লেখার মুদ্রাদোষ বলা যাইতে পারে। এ প্রকার চিহ্নকে একাধিক করিয়া তুলিলে কোথাও তাহার সীমা স্থাপন করা যায় না। ভাবিয়া দেখুন কোনো একটি নব্যতর-ভারত সম্পাদকের হৃদয়োচ্ছ্বাস যদি দুর্দৈবক্রমে দ্বিগুণতর হয় তবে তিনি 'কী তীব্র অভিজ্ঞতা' লিখিয়া তাহার পশ্চাতে চারটি!!!! তিলক চিহ্ন বসাইতে পারেন— এবং এইরূপ রোখ চড়িয়া গেলে ক্রমে ভাষার অপেক্ষা ইঙ্গিতের উপদ্রব বাড়িয়া চলিবে। এ কথা সম্পাদক মহাশয় নিশ্চয় জানিবেন, তাঁহার ভাষাই যথেষ্ট, তাঁহার ভঙ্গিমাও সামান্য নহে, তাহার পরে যদি আবার মুদ্রাদোষ যোগ করিয়া দেন, তবে তাহা সাধারণ লোকের পক্ষে কিছু অধিক হইয়া পড়ে।

প্রদীপ। জ্যৈষ্ঠ [১৩০৪]
'নবদ্বীপ' কবিতা শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায় -রচিত। কবিতাটি একদিকে সহজ এবং ব্যঙ্গোক্তিপূর্ণ অপর দিকে গম্ভীর এবং ভক্তিরসার্দ্র; একত্রে এরূপ অপূর্ব সম্মিলন যেমন দুরূহ তেমনি হৃদয়গ্রাহী। ইহাতে ভাষা ছন্দ এবং মিলের প্রতি কবির অনায়াস অধিকার পদে পদে সপ্রমাণ হইয়াছে। শ্রীমতী কৃষ্ণভাবিনী দাস 'আজকালকার ছেলেরা' শীর্ষক যে ক্ষুদ্র প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহা বিশেষ শ্রদ্ধা ও মনোযোগ সহকারে পাঠ্য। ছাত্রদের স্বভাব ও শিক্ষা ক্রমশ যে হীনতা পাইতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই; লেখিকার মতে তাহার একটি কারণ, আজকাল বিদ্যাদান দোকানদারিতে পরিণত হইয়াছে এবং ছাত্রদিগকে হস্তগত রাখিবার জন্য স্কুলের কর্তৃপক্ষদিগকে সর্বপ্রকার শাসন শিথিল করিতে হইয়াছে। ইহা ছাড়া, আমাদের বিশ্বাস, পরীক্ষার উত্তেজনা, পাঠ্যগ্রন্থের পরিমাণ, কী-পুস্তকের প্রচার এবং প্রাইভেট স্কুলগুলির প্রতিযোগিতায় মুখস্থ শিক্ষা ক্রমেই প্রবল বেগে বাড়িয়া উঠিয়াছে; পাঠ্যগ্রন্থ হইতে নব নব সরস ভাব গ্রহণের দ্বারা বালকদের হৃদয় স্বতই যে উপায়ে জাগ্রত হইয়া উচ্চ আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হয় এখন তাহা যেন প্রতিরুদ্ধ হইতেছে; এখন কেবল কথা ও কথার মানে, শিক্ষার সমস্ত শুষ্ক ধূলিরাশি, তাহাদের চিত্তকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। 'ওয়েল্‌স্-কাহিনী' প্রবন্ধে লেখক দেখাইয়াছেন, ওয়েলস্ ভাষা ইংরাজি হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং সেখানকার অধিবাসীগণ স্বপ্রদেশের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত। কিন্তু আমরা বলিতেছি তৎসত্ত্বেও যদি তাহারা দায়ে পড়িয়া ইংরাজি ভাষা ও সাহিত্যকে গ্রহণপূর্বক ইংরাজের সহিত এক হইয়া না যাইত তবে সংকীর্ণ প্রাদেশিকতার হস্ত এড়াইয়া তাহারা কখনোই জাতিমহত্ত্ব লাভ করিতে পারিত না। আমাদের দেশের উড়িয়া, আসামি ও বেহারিগণ যদি সামান্য অন্তরায়গুলি নষ্ট করিয়া ভাষা ও সাহিত্যসূত্রে বাঙালির সহিত মিশিতে পারে তবে বাঙালি জাতির অভ্যুত্থান আশাজনক হইয়া উঠে। 'সার্ সৈয়দ আহমদ খাঁর' সচিত্র জীবনী পাঠ করিলে আমরা একটি অকৃত্রিম মহৎ জীবনের আদর্শ লাভ করিতে পারি। আলিগড়ে যেরূপ কলেজ তিনি স্থাপন করিয়াছেন সেইরূপ ছাত্রনিবাসসহ-কৃত একটি কলেজ বাংলাদেশে স্থাপিত হওয়া বিশেষ আবশ্যক হইয়াছে।

উৎসাহ। বৈশাখ [১৩০৫]
শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের 'পুণ্যাহ' প্রবন্ধটি ক্ষুদ্র, মনোরম এবং কৌতুকাবহ হইয়াছে। অক্ষয়বাবু সেকালের মুসলমানরাজত্বের একটি অদৃশ্য বিস্মৃত ক্ষুদ্র কোণের উপর একটি ছোটো বাতি জ্বালিয়া ধরিয়াছেন এবং পাঠকের কল্পনাবৃত্তিকে ক্ষণকালের জন্য তৎকালীন ইতিহাসরহস্যের প্রতি উৎসুক করিয়া তুলিয়াছেন। 'জগৎশেঠ' প্রবন্ধটি সুলিখিত সারবান। কিছুকাল পূর্বে বাংলা সাময়িক পত্রে পুরাতত্ত্বঘটিত প্রবন্ধগুলি যেরূপ শুষ্ক, তর্কবহুল ও নোট-জালে জড়ীভূত জটিল ছিল অক্ষয়বাবু-নিখিলবাবুর ন্যায় লেখকদের প্রসাদে সে দশা ঘুচিয়া গেছে এবং বাংলা ইতিহাসের শুষ্ক তরু পল্লবিত মঞ্জরিত হইবার উপক্রম করিয়াছে। 'সে দেশে' শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র দাসের রচিত একটি কবিতা। কবিতা সমালোচনা করিতে আমরা সংকোচ বোধ করি কিন্তু এ স্থলে না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না যে, এই আটটি শ্লোকের কবিতাকে চারিটি শ্লোকে পরিণত করিলে ইহার গীতিরসমাধুর্য সুন্দর সুসম্পূর্ণ হইয়া উঠে— ইহার জোড়া জোড়া শ্লোকের দ্বিতীয় শ্লোকগুলি বাহুল্য, এবং তাহারা অতিবিস্তারে ভাবের গাঢ়তা হ্রাস করিয়াছে। আমরা নিম্নে এই মধুর কবিতার একটি সংক্ষিপ্ত পাঠ দিলাম :—

সে দেশে বসন্ত নাই, নাহি এ মলয়।
সে দেশে সরলা আছে, তাই ফুল ফোটে গাছে,
কোকিল কুহরি উঠে, কথা যদি কয়!

সে দেশে বসন্ত নাই, নাহি এ মলয়।
সে দেশে বরষা নাই, নাহি মেঘচয়।
সরলা আছে সে দেশে, তারি নীল কালো কেশে,
খেলে প্রেম ইন্দ্রধনুঃ চারু শোভাময়।
সে দেশে বরষা নাই, নাহি মেঘচয়।
সে দেশে শরৎ নাই, নাহি শীতভয়।
সে দেশে সরলা হাসে, জ্যোছনা তা নীলাকাশে,
স্থলে তাহা স্থলপদ্ম, জলে কুবলয়।
সে দেশে শরৎ নাই, নাহি শীত ভয়।
সে দেশে দিবস নাই, নিশা নাহি হয়।
সে দেশে সরলা আছে, রবি শশী তারি কাছে,
ঘোমটার তলে হাসে, একত্র উভয়।
সে দেশে দিবস নাই, নিশা নাহি হয়।

হেমেন্দ্রপ্রসাদবাবু 'রমণীর অধিকার' প্রবন্ধে যাহা বলিয়াছেন সে সম্বন্ধে তাঁহার সহিত আমাদের মতের সম্পূর্ণ ঐক্য আছে; কিন্তু যাহাদের সহিত তাঁহার মতের ঐক্য নাই তাহাদিগকে পরাভূত করিবার উপযোগী যুক্তি ও প্রমাণবিন্যাস এই ক্ষুদ্রপরিসর প্রবন্ধে সম্ভবপর হইতে পারে না। 'হেমের অনধিকার' নামক গল্পে স্ত্রীবিয়োগবিধুর উদ্‌ভ্রান্ত বিলাপকারীদের প্রতি করুণরসমিশ্রিত একটি নিগূঢ় বিদ্রূপ প্রকাশিত হইয়াছে। অসংযত হৃদয়োচ্ছ্বাসের মধ্যে যে একটি গোপন অলীকতা আছে লেখক সংক্ষেপে তাহার আভাস দিয়াছেন।

নির্মাল্য। জ্যৈষ্ঠ [১৩০৫]

এই নূতন পত্রের অধিকাংশ গদ্য ও পদ্য প্রবন্ধ পূর্ববারের অনুবৃত্তি। শেষ পত্রে প্রকাশিত 'প্রিয়তমের প্রতি নামক কবিতায় একটি অভূতপূর্ব অসাধারণ নূতনত্ব দেখা গেল; লেখাটি আমরা বঙ্কিমবাবুর পুরাতন রচনা বলিয়াই জানি কিন্তু নির্মাল্যে উক্ত কবিতার নিম্নে রমণীমোহন বসুর নাম প্রকাশিত; ওইটুকু নূতন, নির্লজ্জভাবে নূতন!

ভারতী

আষাঢ় ১৩০৫

নব্যভারত। জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়। [১৩০৫]

এই সংখ্যায় শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র শাস্ত্রী -লিখিত 'সহরৎ-এ-আম্' প্রবন্ধটি বিশেষ ঔৎসুক্যজনক। মুসলমান শাসনকালে ভারতবর্ষে পব্লিক-ওয়র্ক্স্-ডিপার্টমেণ্ট ছিল—লেখক প্রাচীন গ্রন্থাদি হইতে তাহার প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন। সেই বিভাগের পারসি নাম ছিল সহরৎ-এ-আম, অর্থাৎ সাধারণের সুবিধা। তাহার এইরূপ কর্তব্য বিভাগ ছিল— '১ম, প্রজাসাধারণের কৃষিকার্য ও জলের সুবিধা। ২য়, ডাকখানার বন্দোবস্ত। ৩য়, ঝটিতি শুভাশুভ সমাচার প্রেরণ বা জ্ঞাপন। ৪র্থ, সমাচার পত্র প্রকাশ করা। ৫ম, পূর্তবিভাগ অর্থাৎ ইঞ্জিনিয়ারিং।' এই প্রবন্ধে তৎকালীন সংবাদপত্র, ও ডাক বন্দোবস্তের যে আলোচনা আছে তাহা কৌতূহলজনক। পয়ঃপ্রণালী দ্বারা বহুদূর হইতে বিশুদ্ধ জল আনিবার যে ব্যবস্থা ছিল তৎপ্রসঙ্গে লেখক বলিতেছেন— 'এখন water works-এর সহিত তখনকার জলের কলের প্রভেদ এই যে, ইঞ্জিনের ব্যবহার মুসলমানদের সময়ে ছিল না, অথচ ইংরাজের জলের কলের ন্যায় অনায়াসে অনর্গল নির্মল জল দিবারাত্রি মিলিত, সুতরাং প্রজাসাধারণের নিকট হইতে জলের ট্যাক্স লওয়া হইত না।...

পিপাসিতকে পানীয় জল দিয়া তাহার নিকট হইতে পয়সা লওয়া আসিয়ার (oriental) রাজাদিগের ধর্ম ও আচারবিরুদ্ধ। জয়পুর প্রভৃতি দেশীয় রাজ্যের রাজারা প্রজাসাধারণকে জল জোগাইয়া কর গ্রহণ করেন না।' ইংরাজের ব্যবস্থায় জলও যেমন কলে আসে, সঙ্গে সঙ্গে করও তেমনি কলে আদায় হইয়া যায়। ইংরাজরাজ্যের সুশাসন ও সুব্যবস্থা যে আমাদের কাছে কলের মতো বোধ হয়, তাহা যে অনেক সময় আমাদের কল্পনা এবং হৃদয় আকর্ষণ করিতে পারে না তাহার কারণ ইংরাজ-রাজকার্যে রাজোচিত প্রত্যক্ষ ঔদার্য দেখিতে পাওয়া যায় না। রাজত্ব যেন একটা বৃহৎ দোকান : সওদাগরের 'একচেটে' রাজকার্য-নামক মালগুলি প্রজাদিগকে অগত্যা কিনিতে হয়। এমন-কি, রাজদ্বারে বিচারপ্রার্থী হইলেও দীনতম প্রজাকেও ট্যাক হইতে পয়সা গণিয়া দিতে হয়। হইতে পারে, সে কালে বিচারক ঘুষ লইতে ছাড়িত না, কিন্তু তাহা রাজার দাবি নহে, তাহা কর্মচারীর চুরি। তখন রাজপথ, পান্থশালা, দীর্ঘিকা রাজার দান বলিয়া প্রজারা কৃতজ্ঞচিত্তে গ্রহণ করিত। এখন পথকর পাবলিক কর গণিয়া দিয়াও তাহার প্রত্যক্ষফল অল্প লোকে দেখিতে পায়। পূর্বে রাজার জন্মদিনে রাজাই দান বিতরণ করিয়া সাধারণকে বিস্মিত করিয়া দিতেন এক্ষণে রাজকীয় কোনো মঙ্গলউৎসবে প্রজাদিগকেই চাঁদা জোগাইতে হয়। জেলায় ছোটোলাট প্রভৃতি রাজপ্রতিনিধির শুভাগমনকে আপনাদের নিকট স্মরণীয় করিবার জন্য প্রজাদের আপনাদিগকেই চেষ্টা করিতে হয় এবং তাহাদের সেই কৃতকীর্তিতে রাজা নিজের নাম অঙ্কিত করেন। কানুজংশনে যখন প্লেগ-সন্দিগ্ধদের বন্দীশালা দেখিতাম তখন বারংবার এ কথা মনে হইত যে, অশোকের ন্যায় আকবরের ন্যায় কোনো প্রাচ্য রাজা যদি সাধারণের হিতের জন্য এইপ্রকারের অবরোধ আবশ্যক বোধ করিতেন তবে তাহার ব্যবস্থা কখনোই এমন দীনহীন ও একান্ত অপ্রবৃত্তিকর হইত না— অন্তত নিরপরাধ অবরুদ্ধদের পানাহার রাজব্যয়ে সম্পন্ন হইত; যথেষ্ট বেতনভুক ডাক্তার প্রভৃতিরা সমস্ত স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করিতেছেন অথচ রাজ্যের হিতোদ্দেশে উৎসৃষ্ট যে-সকল দুর্ভাগা তাঁহাদের সযত্নসেব্য অতিথিস্থানীয়, যাহারা পরদেশে বিনাদোষে নিরুপায় ভাবে বন্দীকৃত, হয়তো পাথেয়বান সঙ্গীগণ হইতে বিচ্ছিন্ন, তাহাদিগকে স্বচেষ্টায় নিজব্যয়ে কষ্টে জীবনধারণ করিতে দেওয়া অন্তত প্রাচ্য প্রজাদের চক্ষে কোনোমতে রাজোচিত বলিয়া বোধ হয় না। সাধারণের জন্য রাজার হিতচেষ্টা বিভীষিকাময় না হইয়া যথার্থ রমণীয় মূর্তি ধারণ করিত যদি এই-সকল অবরোধশালা এবং মারী হাসপাতালের মধ্যে যত্ন ও ঔদার্য প্রকাশ পাইত। দৃষ্টিমাত্রেই যাহার বহিরাকারে দৈন্য এবং অবহেলা পরিস্ফুট হইয়া উঠে তাহার মধ্যে যে সাংঘাতিক অবস্থায় যথোপযুক্ত সেবা-শুশ্রূষা মিলিবে ইহা কাহারও প্রতীতি হয় না; রাজপুরুষের নিকট সর্ববিষয়ে আমাদের মূল্য যে কতই অল্প তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া সংকটের সময় আমাদের আতঙ্ক বাড়িয়া যায় এবং তখন ভীতসাধারণকে সান্ত্বনাদান করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। ঘোষণাদ্বারা আশ্বাসের দ্বারা যথেষ্ট ফল হয় না; যে-সকল প্রত্যক্ষ রাজচেষ্টা বরাভয় উদারমূর্তি ধারণ করিয়া আমাদের কল্পনাবৃত্তিকে রাজার কল্যাণ ইচ্ছার দিকে স্বতই আকর্ষণ করিয়া লইয়া যায় তাহাই ফলদায়ক। যাহা সংকল্পে শুভ এবং যাহা পরিণামে শুভ তাহাকে আকারেপ্রকারেও শুভসুন্দর করিয়া না তুলিলে তাহার হিতকারিত্ব সম্পূর্ণ হয় না, এমন-কি, অনেক সময় তাহা হিতে বিপরীত হয়। যাহা হউক, আলোচ্য প্রবন্ধের জন্য শাস্ত্রীমহাশয় আমাদের ধন্যবাদার্হ। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বড়াল ইংরাজি কবি হুড্-রচিত 'এ প্যেরেন্টাল্ ওড্ টু মাই সন্' নামক কবিতার মর্ম গ্রহণ করিয়া 'আদর' নামক যে কবিতা রচনা করিয়াছেন তাহা সুন্দর হইয়াছে— তাহাতে মূল কবিতার হাস্যমিশ্রিত স্নেহরসটুকু আছে অথচ তাহাতে অনুবাদের সংকীর্ণতা দূর হইয়া কবির স্বকীয় ক্ষমতা প্রকাশ পাইয়াছে। ডাক্তার যোগেন্দ্রনাথ মিত্রের 'প্লেগ্ বা মহামারী' সুলিখিত সময়োচিত প্রবন্ধ। শ্রীযুক্ত আবদুল করিমের 'খলিফাদিগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়া গেছে— নব্যভারতে তাহার খণ্ডশ পুনঃপ্রকাশ বাহুল্যমাত্র।

সাহিত্য। গতবর্ষের [১৩০৪] মাঘ, ফাল্গুন ও চৈত্রের সাহিত্য একত্রে হস্তগত হইল।

বাংলায় আজকাল ইতিহাসের আলোচনা সাহিত্যের অন্য সকল বিভাগকে অতিক্রম করিয়া উঠিয়াছে, ‘সাহিত্য’ পত্রের সমালোচ্য তিন সংখ্যা তাহার প্রমাণ। মাঘের পত্রে ‘রাজা টোডরমল্’, ‘রানী ভবানী’ এবং ‘বাংলার ইতিহাসে বৈকুণ্ঠ’ এই তিনটি প্রবন্ধ প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে। ‘রানী ভবানী’ একটি ঐতিহাসিক গ্রন্থ, অনেক দিন হইতে খণ্ডাকারে সাহিত্যে বাহির হইতেছে। ‘বৈকুণ্ঠ’ প্রবন্ধে লেখক শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর প্রতি ইতিহাসের অন্যায় অভিযোগ সকল ক্ষালনের চেষ্টা করিয়াছেন। নবাবী আমল সম্বন্ধে প্রচলিত ইতিহাসের চূড়ান্ত বিচারের উপরেও যে আপিল চলিতে পারে সুযোগ্য লেখক মহাশয় তাহা প্রমাণ করিয়াছেন। আমাদের মনে ক্রমে সংশয় জন্মিতেছে যে, বাল্যকালে বহুকষ্টে যে কথাগুলো মুখস্থ করিয়াছি, প্রৌঢ়বয়সে আবার তাহার প্রতিবাদগুলি মুখস্থ করিতে হয় বা। পরীক্ষাশালা হইতে নির্গত হইয়া ওগুলো যাঁহারা ভুলিতে পারিয়াছেন তাঁহারাই সৌভাগ্যবান। ফাল্গুন ও চৈত্রের সাহিত্যে ‘রানী ভবানী’, ‘মগধের পুরাতত্ত্ব’ এবং ‘রত্নাবলীর রচয়িতা শ্রীহর্ষ’ এই তিনটি ঐতিহাসিক প্রবন্ধ সর্বাপেক্ষা অধিক স্থান ও মাহাত্ম্য লাভ করিয়াছে। কোন্ শ্রীহর্ষ রত্নাবলী-রচয়িতা বলিয়া খ্যাত তাহার নির্ণয়ে লেখক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় যথেষ্ট অনুসন্ধান প্রকাশ করিয়াছেন। ‘সহযোগী সাহিত্যে’ লেখক মহাশয় সমালোচনা সম্বন্ধে যে কয়েকটি উপদেশ দিয়াছেন তাহাতে লেখকসম্প্রদায় পরম উপকৃত হইবেন। আমরা তাহা উদ্‌ধৃত করিলাম। ‘অস্মদ্দেশে সাহিত্যসেবা নিতান্তই শখের জিনিস; তজ্জন্য সাহিত্যসেবীরাও অসাধারণ সূক্ষ্মচর্মী। কেহ আমাদিগের রচনার সমালোচনা করিয়া কেবল প্রশংসা না করিয়া কোনোরূপ দোষ দেখাইলে আর আমাদিগের সহ্য হয় না। আমরা তাহার প্রতিবাদে সমালোচকের যুক্তির বিরুদ্ধে যুক্তি না দেখাইয়া তাঁহার উপর কেবল গালিবর্ষণ করি। আমাদিগের আত্মীয়, বন্ধুরা আশ্রিত অনুগতদিগের মধ্যে কেহ সমালোচককে গালি দিবার ভার গ্রহণ না করিলে আপনারাই মাসিকপত্রে প্রবন্ধ লিখিয়া বা সভা ডাকিয়া, সমালোচককে গালি দিয়া আদর্শের ক্ষুদ্রতা, উদ্দেশ্যের হীনতা ও হৃদয়ের নীচতার পরিচয় প্রদান করি, এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর পরিতৃপ্তি অনুভব করিয়া থাকি। আবার আমাদের ‘লিটারারি’ মোসাহেবগণ আমাদের এইরূপ কার্যকেও মহৎ কার্য বলিয়া আমাদিগকে আত্মদোষের বিষয়ে অন্ধ করিতে ত্রুটি করে না।’ এরূপ তীব্র ভাষায় এরূপ অনুতাপ-উক্তি আমরা দেখি নাই। কিন্তু লেখক নিজের প্রতি যতটা কালিমা প্রয়োগ করিয়াছেন তাহার প্রয়োজন ছিল না। কারণ সূক্ষ্মচর্ম কেবল তাঁহার একলার নহে, প্রায় লেখকমাত্রেরই। এবং তিনি আত্মগ্লানির প্রাবল্যবশত লেখকবর্গ সম্বন্ধে যে কথা বলিয়াছেন ঠিক সেই কথাই সমালোচকদিগকেও বলা যায়। সকল লেখাও নির্দোষ নহে, সকল সমালোচনাও অভ্রান্ত নহে। কিন্তু মাংসাশী প্রাণীর মাংস যেরূপ ভক্ষ্য নহে, সেইরূপ সমালোচকের সমালোচনা সাহিত্যসমাজে অপ্রচলিত। সমালোচনার উপযোগিতা সম্বন্ধে কাহারও মতভেদ হইতে পারে না। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সমালোচকের প্রবীণতা অভিজ্ঞতা ও উপযুক্ত শিক্ষা অভাবে আমাদের দেশের সমালোচনা অনেক স্থলেই কেবলমাত্র উদ্ধত স্পর্ধার সূচনা করে, এবং কেমন করিয়া নিঃসংশয়ে জানিব যে তাহা ‘আদর্শের ক্ষুদ্রতা, উদ্দেশ্যের হীনতা ও হৃদয়ের নীচতার পরিচয় প্রদান’ করে না? যে লেখকের কিছুমাত্র পদার্থ আছে তাঁহার স্বপক্ষ বিপক্ষ দুই দলই থাকিবে— বিপক্ষ দল স্বপক্ষকে বলেন স্তাবক, এবং স্বপক্ষ দল বিপক্ষকে বলেন নিন্দুক; সমালোচ্য প্রবন্ধের লেখকও কোনো এক পক্ষকে লক্ষ্য করিয়া ‘মোসাহেব’ ‘স্তাবক’ বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই। অধিকাংশ স্থলেই ভক্তকে ‘স্তাবক’ এবং বিরক্তকে ‘নিন্দুক’ বলে তাহারাই, যাহারা সত্য প্রচার করিতে চাহে না, বিদ্বেষ প্রকাশ করিতে চায়। কিন্তু লেখক যখন বিশ্বসাধারণের বিশেষ হিতের জন্য সমালোচনার উপকারিতা সম্বন্ধে নিরতিশয় পুরাতন ও সাধারণ সত্য প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত, কোনো ব্যক্তিবিশেষকে আক্রমণ করা তাঁহার উদ্দেশ্য নহে তখন এ-সকল বিদ্বেষপূর্ণ অত্যুক্তি অসংগত শুনিতে হয়।

পূর্ণিমা। শ্রাবণ [১৩০৫?]

'বঙ্কিমচন্দ্র ও মুসলমান সম্প্রদায়'। লেখক মহাশয় বঙ্কিমবাবুর বিরুদ্ধ সমালোচকদের প্রতি এতই রুষ্ট হইয়াছেন যে প্রবন্ধের একস্থলে উল্লেখ করিয়াছেন 'ইনিও (বঙ্কিমবাবু) নিন্দুকের নিন্দা অথবা মূর্খের ধৃষ্টতা হইতে নিরাপদ হইতে পারেন নাই।' এইরূপ সাধারণভাবের রূঢ় উক্তি, হয় অনাবশ্যক, নয় অন্যায়। কারণ, নিন্দুক ও মূর্খগণ, কেবল বঙ্কিমবাবুর সম্বন্ধে কেন, অনেকেরই সম্বন্ধে নিন্দা ও ধৃষ্টতা প্রকাশ করিয়া থাকে— সেটা কিছু নূতন কথাও নহে, আশ্চর্যের কথাও নহে। তবে যদি এ কথা লেখকের বলিবার অভিপ্রায় হয় যে, যাহারা বঙ্কিমবাবুর বিরুদ্ধ সমালোচনা করিয়াছে তাহারা মূর্খ ও নিন্দুক তবে তিনি নিজেও অপবাদভাজন হইবেন। 'সাহিত্য ও সমাজ' নামক পুস্তিকায় বিষবৃক্ষের কী সমালোচনা বাহির হইয়াছে দেখি নাই; লেখক সমালোচ্য প্রবন্ধে তাহার যেরূপ মর্ম উদ্ধার করিয়াছেন তাহা যদি অযথা না হইয়া থাকে, তবে সেই সমালোচক মহাশয় অন্তত বুদ্ধিপ্রভাবের পরিচয় দেন নাই। কিন্তু 'মীরকাসিম'-লেখকের প্রতি মতবিরোধ লইয়া অবজ্ঞা প্রকাশের অধিকার কাহারও নাই। বঙ্কিমবাবুর প্রতি ভক্তি সম্বন্ধে আমরা সমালোচ্য প্রবন্ধলেখকের অপেক্ষা ন্যূনতা স্বীকার করিতে পারি না, তাই বলিয়া মীরকাসিম-লেখক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্র মহাশয়ের প্রতি অবমাননা প্রদর্শন আমরা উচিত বোধ করি না। কারণ, ক্ষমতাবলে তিনিও বঙ্গসাহিত্যহিতৈষীগণের সম্মানভাজন হইয়া উঠিতেছেন। কিন্তু বর্তমান প্রসঙ্গে অন্য হিসাবে অক্ষয়বাবুর সহিত আমাদের সহানুভূতি নাই। কালানুক্রমে ভূপঞ্জরের যেরূপ স্তর পড়িয়াছিল হিমালয় পর্বতে তাহার অনেক বিপর্যয় দেখা যায়, তাই বলিয়া কোনো ভূতত্ত্ববিৎ হিমালয়কে খর্ব করিলেও কালিদাসের নিকট তাহার দেবাত্মা গুপ্ত থাকে না। বঙ্কিমবাবুর উপন্যাসে ইতিহাস যদি বা বিপর্যস্ত হইয়া থাকে তাহাতে বঙ্কিমবাবুর কোনো খর্বতা হয় নাই। উপন্যাসের [ইতিহাসের] বিকৃতি হইয়াছে বলিয়া নালিশ করাও যা, আর ধান্যজাত মদিরা অন্ন হইয়া উঠে নাই বলিয়া রাগ করাও তাই। উপকরণের মধ্যে ঐক্য থাকিতে পারে কিন্তু তবুও অন্ন মদ্য নহে এবং মদ্য অন্ন নহে এ কথাটা গোড়ায় ধরিয়া লইয়া তবে বস্তু-বিচার করা উচিত। অক্ষয়বাবু জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, যদি ইতিহাসকে মানিবে না তবে ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিবার প্রয়োজন কী? তাহার উত্তর এই যে, ইতিহাসের সংস্রবে উপন্যাসে একটা বিশেষ রস সঞ্চার করে, ইতিহাসের সেই রসটুকুর প্রতি ঔপন্যাসিকের লোভ, তাহার সত্যের প্রতি তাঁহার কোনো খাতির নাই। কেহ যদি উপন্যাসে কেবল ইতিহাসের সেই বিশেষ গন্ধটুকু এবং স্বাদটুকুতে সন্তুষ্ট না হইয়া তাহা হইতে অখণ্ড ইতিহাস উদ্ধারে প্রবৃত্ত হন তবে তিনি ব্যঞ্জনের মধ্যে আস্ত জিরে ধনে হলুদ শর্ষের সন্ধান করেন। মসলা আস্ত রাখিয়া যিনি ব্যঞ্জনে স্বাদ দিতে পারেন তিনি দিন. এবং যিনি বাঁটিয়া ঘাঁটিয়া একাকার করিয়া স্বাদ দিয়া থাকেন তাঁহার সঙ্গেও আমার কোনো বিবাদ নাই, কারণ স্বাদই এ স্থলে লক্ষ্য, মসলা উপলক্ষ মাত্র। কিন্তু ইতিহাস অক্ষয়বাবুর এতই অনুরাগের সামগ্রী যে ইতিহাসের প্রতি কল্পনার লেশমাত্র উপদ্রব তাঁহার অসহ্য, সিরাজদ্দৌলা গ্রন্থে নবীনবাবু তাহা টের পাইয়াছেন। ইতিহাস-ভারতীয় উদ্যানে চঞ্চলা কাব্য-সরস্বতী পুষ্পচয়ন করিয়া বিচিত্র ইচ্ছানুসারে তাহার অপরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন, প্রহরী অক্ষয়বাবু সেটা কোনোমতেই সহ্য করিতে পারেন না— কিন্তু মহারানীর খাস হুকুম আছে। উদ্যান প্রহরীরই জিম্মায় থাক্, কিন্তু এক সখীর কুঞ্জ হইতে আর-এক সখী পূজার জন্য হৌক বা প্রসাধনের জন্য হৌক যদি একটা ডালি ফুল পল্লব তুলিয়া লইয়া যায় তবে তিনি তাহার কৈফিয়তের দাবি করিয়া এত গোলমাল করেন কেন? ইহাতে ইতিহাসের কোনো ক্ষতি হয় না অথচ কাব্যের কিছু শ্রীবৃদ্ধি হয়। বিশেষ স্থলে যদি শ্রী সাধন না হয় তবে কাব্যের প্রতি দোষারোপ করা যায় সৌন্দর্যহানি হইল বলিয়া, সত্য হানি হইল বলিয়া নহে।

প্রদীপ। আষাঢ় [১৩০৫]
শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসুর 'বন্ধুবৎসল বঙ্কিমচন্দ্র' প্রবন্ধটি আন্তরিক সহৃদয়তা ও সরলতাগুণে সবিশেষ উপাদেয় হইয়াছে। সাধারণ লেখকের হস্তে পড়িলে সুলভ এবং শূন্য হৃদয়োচ্ছ্বাসের আড়ম্বরে প্রবন্ধটি স্ফীত ফেনিল হইয়া উঠিত। 'সমরু' প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় নবাবী আমলের সৈন্যরচনায় য়ুরোপীয় নায়কদিগের কর্তৃত্ব আলোচনা করিয়াছেন। 'চৈতালি-সমালোচনা সম্বন্ধে বক্তব্য' নামক প্রবন্ধরচয়িতার প্রতি ভারতী-সম্পাদক যদি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন তবে প্রার্থনা করি পাঠকগণ সেই অহমিকা ক্ষমা করিবেন। কোনো লেখকের কবিতা যে সকল পাঠকেরই ভালো লাগিবে এমন দুরাশা কেহ করিতে পারেন না, কিন্তু যিনি সরল শ্রদ্ধার সহিত তাহার মর্মগ্রহণে প্রবৃত্ত হন এবং উপভোগের আনন্দ মুক্তভাবে প্রকাশ করেন তাঁহার উৎসাহ লেখকের কাব্যকাননে বসন্তের দক্ষিণ সমীরণের ন্যায় কার্য করে। 'ঋণ-পরিশোধ' গল্পে ভাষার সরসতা সত্ত্বেও ঘটনা বর্ণনা এবং চরিত্র রচনার মধ্যে একটা বানানো ভাব থাকাতে তাহা পাঠকের নিকট সত্যবৎ প্রত্যয়জনক হইয়া উঠে নাই। প্রভাতকুমারের অধিকাংশ কবিতায় যে একটি প্রচ্ছন্ন স্নিগ্ধ হাস্য থাকে 'অনন্ত শয্যা' কবিতাটির মধ্যেও তাহা পাওয়া যায়।

অঞ্জলি। জ্যৈষ্ঠ [১৩০৫]। ২য় সংখ্যা। এখানি একটি শিক্ষা-বিষয়ক মাসিক পত্রিকা। শ্রীযুক্ত রাজেশ্বর গুপ্ত -কর্তৃক সম্পাদিত।
আমরা এই পত্রিকার উন্নতি প্রার্থনা করি। শিক্ষাপ্রণালীর উৎকর্ষবিধান সম্বন্ধে য়ুরোপে উত্তরোত্তর আলোচনা বাড়িয়া চলিয়াছে। শিক্ষা কী উপায়ে সহজ, মনোরম স্থায়ী এবং যুক্তিসংগত হইতে পারে তৎসম্বন্ধে নানা প্রকার পদ্ধতি এবং পুস্তকের প্রচার হইতেছে। ইংরাজি ভাষায় শিক্ষাসাধন করিতে হয় বলিয়া বাঙালির শিক্ষাকার্য একটি গুরুতর ভারস্বরূপ হইয়া আমাদের শরীর মনকে জীর্ণ করিতেছে— অতএব শিক্ষার নবাবিষ্কৃত সহজ ও প্রকৃষ্ট পথগুলির সম্বন্ধে আলোচনা আমাদের দেশে বিশেষ ফলপ্রদ হইবার কথা কিন্তু আমাদের দেশের উদাসীন শিক্ষকগণ চিরপ্রচলিত দুঃখাবহ পথগুলি যে সহজে ছাড়িবেন এমন আশা রাখি না। যাহা হউক, আমাদের স্কুলে প্রচলিত বিশেষ বিশেষ শিক্ষণীয় বিষয়, যথা ইতিহাস, ভূগোল, পাটিগণিত, জ্যামিতি, সংস্কৃতভাষা, ইংরাজিভাষা, ব্যাকরণ, প্রকৃতিবিজ্ঞান প্রভৃতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিস্তারিত আলোচনা এবং প্রতিবৎসর যে-সকল পাঠ্যপুস্তক নির্দিষ্ট ও পরীক্ষার প্রশ্ন দেওয়া হয় তাহার উপযুক্ত সমালোচনা আমরা অঞ্জলির নিকট হইতে আশা করি।

ভারতী
শ্রাবণ ১৩০৫

সাহিত্য। বৈশাখ [১৩০৫]
শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর 'প্রতীত্যসমুৎপাদ' প্রবন্ধটি চিন্তাপূর্ণ। নামটি এবং বিষয়টি আমাদের অপরিচিত। লেখক বলিতেছেন, ভগবান শাক্যকুমার সিদ্ধার্থ 'বোধিদ্রুমমূলে বুদ্ধত্বলাভের সময় জীবনব্যাধির কারণস্বরূপ দ্বাদশটি নিদানের আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এই নিদানতত্ত্বের নাম প্রতীত্যসমুৎপাদ। দ্বাদশটি নিদানের নাম যথাক্রমে এই— অবিদ্যা, সংস্কার, বিজ্ঞান, নামরূপ, ষড়ায়তন, স্পর্শ, বেদনা, তৃষ্ণা, উপাদান, ভব, জাতি, জরামরণ।' এই নিদানতত্ত্বের ব্যাখ্যা লইয়া নানা মত আছে, ত্রিবেদী মহাশয় তাহাতে আর-একটি যোগ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার ব্যাখ্যা কিয়দ্দূর পর্যন্ত শক্ত মাটির উপর দিয়া আসিয়া চোরাবালির মধ্যে হারাইয়া গেছে; পরিণাম পর্যন্ত পৌঁছে নাই। ত্রিবেদী মহাশয়ের ব্যাখ্যার প্রথমাংশ যদি ইতিহাসসংগত হয়, অর্থাৎ স্বাধীন যুক্তিমূলক না হইয়া যদি নানা বৌদ্ধশাস্ত্র ও সাহিত্যদ্বারা পোষিত হয়, তবে ইহা সত্য যে, বৌদ্ধদর্শন আধুনিক পাশ্চাত্যবিজ্ঞানমূলক দর্শনের সহিত প্রধানত একমতাত্মক। কিন্তু প্রচুর

ঐতিহাসিক প্রমাণ ব্যতীত এ সম্বন্ধে কথা চূড়ান্ত হইতে পারে না। অতএব ত্রিবেদী মহাশয় যে পথে চিন্তা প্রয়োগ করিয়াছেন সেই পথে গবেষণারও প্রেরণ আবশ্যক। 'একনিষ্ঠ বিবাহ' প্রবন্ধটি সংক্ষিপ্ত তথ্যপূর্ণ সুপাঠ্য। 'মহারাজ রামকৃষ্ণ' পাঠকদের বহুআশাউদ্দীপক একটি প্রবন্ধের প্রথম পরিচ্ছেদ। লেখক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্র লিখিতেছেন 'ইংরাজেরা যখন দেওয়ানি সনন্দ লাভ করেন, তখন জমিদারদল পদগৌরবে ও শাসনক্ষমতায় সর্বত্র গৌরবান্বিত হইয়াছিলেন। মহারাজ রামকৃষ্ণ ও তাঁহার সমসাময়িক জমিদারদিগের সময়ে সেই পদগৌরব ধূলিপটলের ন্যায় উড়িয়া গিয়াছে। সেকালের জমিদারগণ কী কৌশলে একালের উপাধিব্যাধিপীড়িত ক্রীড়াপুত্তলে পরিণত হইয়াছিলেন, মহারাজ রামকৃষ্ণের জীবনকাহিনী কিয়ৎপরিমাণে তাহার রহস্যোদ্‌ঘাটন করিতে সক্ষম।'

প্রদীপ। শ্রাবণ [১৩০৫]

'জীবজাতি নির্বাচন' প্রবন্ধটি সরল অথচ গভীর এবং চিন্তাউদ্রেককারী। জাতি নির্বাচন যে কত কঠিন তাহাই প্রমাণপূর্বক সেই সোপান বাহিয়া লেখক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় অভিব্যক্তিবাদের সীমায় আসিয়া উপনীত হইয়াছেন। এই সংখ্যায় ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের সচিত্র জীবনচরিতের প্রথম অংশ পাঠ করিয়া সুখী হইলাম।

অঞ্জলি। আষাঢ় [১৩০৫]

'বণিক বন্ধু' নামক প্রবন্ধে পণ্য ও বণিক্ শব্দের উৎপত্তি সম্বন্ধীয় আলোচনা উদ্‌ধৃত করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। 'সংস্কৃত পণ ধানু হইতে বণিজ্ শব্দ সিদ্ধ করা হইয়াছে। বৈয়াকরণেরা বণ ধাতু না করিয়া পণধাতু কেন করিলেন উহার তত্ত্ব এক রহস্যময় ব্যাপার। পুরাকালে রোমানেরা ফিনিসিয়ানদিগকে পূণিক বলিত। পূণিকেরা অতিবৈয়াকরণ যুগে ভারতবর্ষে ব্যাবসা-বাণিজ্য করিত। ভারতবাসীরা পূণিকদিগকে পণিক বলিত। পণিক সাধিবার জন্য পণ ধাতুর সৃষ্টি হইল। উত্তর কালে (আভিধানিক কালে) পণ ধাতুর চিহ্ন পণ্য রাখিয়া পণিকদের মাহাত্ম্য বিলোপ হওয়াতে পণিকনামও সংস্কৃত অভিধান হইতে বিদায় গ্রহণ করিল। পণিকদের পরে— সুদীর্ঘকাল পরে ভেনিজিয়া বা বণিজগণ ভারতে আগমন করে। তখন বৈয়াকরণিক ঋষিযুগ অতীত হইয়াছে। সংস্কৃতের আইনকানুন হইয়াছে, সংস্কৃত পিঞ্জরাবদ্ধা বিহঙ্গী, কাজেই পরবর্তীরা অনন্যোপায় হইয়া নবাগত বিজাতীয় শব্দগুলিকে নিপাতনের হাত ছোঁয়াইয়া শুদ্ধ করিয়া লইলেন। বণিজ্ শব্দও সেইরূপ শোধিত ও পণ ধাতুর পোষ্যপুত্র হইল। এই ভেনিস বা বণিজ্‌দের অতি আদরের সামগ্রী বলিয়া-নীল বণিকবন্ধু আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিল।'

ভারতী
ভাদ্র ১৩০৫

সাহিত্য। জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় [১৩০৫] সংখ্যা একত্রে হস্তগত হইল।

'জ্যৈষ্ঠের সাহিত্যে 'মোহনলাল' প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় অক্ষয়বাবু ও নিখিলবাবুর প্রতিবাদ করিয়া যে তর্ক তুলিয়াছেন তাহার মীমাংসা আমাদের আয়ত্তাতীত। লেখাটি ভাষার সরস সুস্পষ্টতা ও প্রমাণ সংগ্রহ এবং বাঙালি পাঠকের বিশেষ আগ্রহজনক কয়েকটি নূতন তথ্যের জন্য বিশেষ উপাদেয় হইয়াছে। 'সেকালের কলিকাতা গেজেট' সুপাঠ্য কৌতুকাবহ প্রবন্ধ। আষাঢ়ে নিখিলবাবুর 'মীরণের পরিণাম রহস্য' রহস্যপূর্ণ উপন্যাসের ন্যায় ঔৎসুক্যজনক।

সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা। শ্রীনগেন্দ্র নাথ বসু-কর্তৃক সম্পাদিত।

বর্তমান সম্পাদকের হস্তে আসিয়া অবধি এই পত্রিকা আশাতীত গৌরব লাভ করিয়াছে। এখন

ইহার কোনো সংখ্যাই অবহেলাপূর্বক হারাইতে দেওয়া যায় না— ইহার প্রতি সংখ্যাই বঙ্গ সাহিত্যের একটি মূল্যবান ভাণ্ডার নির্মাণ করিয়া তুলিতেছে। সম্পাদক মহাশয় তাঁহার গুরুতর কর্তব্য যথারূপে নির্ণয় করিতে পারিয়াছেন এবং তাহা পালন করিবার শক্তিও তাঁহার আছে।

প্রদীপ। ভাদ্র [১৩০৫]

'বেনামী চিঠি' কৌতুকরসপূর্ণ ক্ষুদ্র সুলিখিত গল্প। গত বৎসর সূর্যের পূর্ণগ্রাস পরিদর্শন উপলক্ষে দেশবিদেশ হইতে পণ্ডিতগণ ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সমবেত হইয়াছিলেন। কাপ্তেন হিল্‌স্‌ কেম্‌ব্রিজের নিউয়ল সাহেব পুলগাঁও স্টেশনে গ্রহণ পর্যবেক্ষণের জন্য শিবির স্থাপন করিয়াছিলেন। ভারত গবর্মেন্ট ইঁহাদের সহায়তার জন্য দেরাদুন হইতে কর্মচারী প্রেরণ করিয়াছিলেন। 'পুলগাঁওয়ে সূর্যগ্রহণ' প্রবন্ধের লেখক তাঁহাদের মধ্যে একজন। কীরূপ বহুচেষ্টাকৃত অভ্যাস ও সতর্কতার সহিত কিরূপ যন্ত্রসাধ্যবৎ শৃঙ্খলা সহকারে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সূর্যগ্রাসের বৈজ্ঞানিক পরিদর্শনকার্য সমাধা হয় এই প্রবন্ধে তাহার বর্ণনা পাঠ করিয়া আনন্দলাভ করিলাম। 'ছেলেকে বিলাতে পাঠাইব কি?' প্রবন্ধে লেখক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত তাঁহার স্বাভাবিক সরস ভাষায় সময়োপযোগী আলোচনার অবতারণা করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে আমাদের বিশ্বাস এই যে, বিলাতফেরতার দল যত সংখ্যায় বাড়িবে ততই তাঁহাদের বাহ্য বেশভূষার অভিমান ও উদ্ধত স্বাতন্ত্র্য কমিয়া যাইবে। প্রথম চটকে যে বাড়াবাড়ি হয় তাহার একটা সংশোধনের সময় আসে। হিন্দুসমাজও ক্রমে আপন অসংগত ও কৃত্রিম কঠোরতা শিথিল করিয়া আনিতেছে, তাঁহারাও যেন তাঁহাদের পুরাতন পৈতৃক সমাজের প্রতি অপেক্ষাকৃত বিনীতভাবে ধারণ করিতেছেন। তাহা ছাড়া বোধ করি কন্‌গ্রেস উপলক্ষে বোম্বাই প্রভৃতি প্রদেশের সবল ও সরল জাতীয় ভাবের আদর্শ আমাদের পক্ষে সুদৃষ্টান্তের কাজ করিতেছে। এই সংখ্যায় ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের সুরচিত জীবনী শেষ হইয়া পরলোকগত দীনবন্ধু মিত্রের সচিত্র জীবনচরিত বাহির হইয়াছে। স্বদেশের মহৎজীবনী প্রচারের দ্বারা প্রদীপ উত্তরোত্তর জ্যোতি লাভ করিতেছে।

উৎসাহ। জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় [১৩০৫]

'বিশ্বরচনা' প্রবন্ধটি সুগম্ভীর। 'জগৎশেঠ' নিখিলবাবুর রচিত ঐতিহাসিক প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধগুলিতে বাংলার ইতিহাস উত্তরোত্তর সঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া আমরা আশান্বিত হইতেছি। 'রাজা রামানন্দ রায়' স্বনামখ্যাত বৈষ্ণব মহাত্মার জীবনচরিত; উৎসাহের ক্ষুদ্রায়তনবশত ক্ষুদ্রখণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে ইহাই এ প্রবন্ধের একমাত্র দোষ। 'ভূগর্ভে' বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ যত্নপূর্বক পাঠ্য। আষাঢ় মাসের উৎসাহে 'হেস্টিংসের শিক্ষানবিশী' প্রবন্ধে সংক্ষেপে অনেক গুরুতর কথার সন্নিবেশ আছে। হেস্টিংস যখন ইংরাজের নবরাজ্যক্ষেত্রে সবেমাত্র অঙ্কুরিত হইয়া উঠিতেছেন তখনি বর্ধিতপ্রতাপ নন্দকুমারের ছায়া তাঁহাকে অভিভূত করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহার পর যখন হেস্টিংসের দিন আসিল তখন কি তিনি সে কথা একেবারে ভুলিয়াছিলেন?

অঞ্জলি। শ্রাবণ [১৩০৫]

আমরা আশা করি, অঞ্জলিতে শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে অপেক্ষাকৃত বিস্তারিত প্রবন্ধ বাহির হইবে; নতুবা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবন্ধে শিক্ষকেরা বিশেষ সাহায্য লাভ করিতে পারিবেন না। আজকাল শিক্ষাপদ্ধতি লইয়া ইংরাজিতে এত পুস্তক এবং পত্রিকা বাহির হইতেছে যে শিক্ষাসুগমের নূতন নূতন উপায় সম্বন্ধে লেখা শেষ করা যায় না। 'উচ্চারণ দোষ সংশোধন', 'ভৌগোলিক নাম লিখন ও পঠন', 'পুনরালোচনা' প্রভৃতি প্রবন্ধগুলি যথেষ্ট বিস্তীর্ণ হয় নাই— অনেকটা সাধারণ কথার উপর দিয়াই গিয়াছে। এবারকার অঞ্জলিতে 'সোনারুপার বিবাদ' প্রবন্ধটি প্রাঞ্জল এবং

সময়োপযোগী হইয়াছে। বর্তমান কালে মুদ্রাবিপাকের আলোচনা দেশে বিদেশে জাগিয়া উঠিয়াছে অথচ এ সম্বন্ধে মোটামুটি কথাও আমাদের দেশের অনেকের অগোচর।

ভারতী
আশ্বিন ১৩০৫

সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা। ৫ম ভাগ, ৩য় সংখ্যা [১৩০৫]

বর্তমান সংখ্যাটি বিচিত্র বিষয় বিন্যাসে বিশেষ ঔৎসুক্যজনক হইয়াছে। পত্রিকায় চণ্ডিদাসের যে নূতন পদাবলী প্রকাশিত হইতেছে তাহা বহু মূল্যবান। বিশেষত কয়েকটি পদের মধ্যে চণ্ডিদাসের জীবনবৃত্তান্তের যে আভাস পাওয়া যায় তাহা বিশেষ কৌতুকাবহ। সম্পাদক মহাশয় আদর্শ পুঁথির বানান সংশোধন করিয়া দেন নাই সেজন্য তিনি আমাদের ধন্যবাদভাজন। প্রাচীন-গ্রন্থসকলের যে-সমস্ত মুদ্রিত সংস্করণ আজকাল বাহির হয় তাহাতে বানান-সংশোধকগণ কালাপাহাড়ের বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহারা সংস্কৃত বানানকে বাংলা বানানের আদর্শ কল্পনা করিয়া যথার্থ বাংলা বানান নির্বিচারে নষ্ট করিয়াছেন। ইহাতে ভাষাতত্ত্বজিজ্ঞাসুদিগের বিশেষ অসুবিধা ঘটিয়াছে। বর্তমান সাহিত্যের বাংলা বহুল পরিমাণে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদিগের উদ্‌ভাবিত বলিয়া বাংলা বানান, এমন-কি, বাংলা পদবিন্যাস-প্রণালী তাহার স্বাভাবিক পথভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে, এখন তাহাকে স্বপথে ফিরাইয়া লইয়া যাওয়া সম্ভবপর নহে। কিন্তু আধুনিক বাংলার আদর্শে যাঁহারা প্রাচীন পুঁথি সংশোধন করিতে থাকেন তাঁহারা পরম অনিষ্ট করেন।

‘স্ত্রী কবি মাধবী’ প্রবন্ধের প্রারম্ভে লেখক শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী লিখিয়াছেন— ‘এ পর্যন্ত প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে আমরা একজনমাত্র স্ত্রী-কবির কবিতাকুসুমের সৌরভ সুষমার সন্ধান প্রাপ্ত হইয়াছি, তিনিই মাধবী দেবী।’ মাধবী উৎকলবাসিনী। প্রবন্ধে তাঁহার রচিত বাংলা পদাবলীর যে আদর্শ পাওয়া গিয়াছে তাহা বিস্ময়জনক। তাহার ভাষা পুরুষ বৈষ্ণব কবিদের অপেক্ষা কোনো অংশেই ন্যূন নহে। সেই প্রাচীনকালে উৎকল ভূমি বাংলা ভাষার উপর যে অধিকার লাভ করিয়াছিল এক্ষণে নব্যউৎকল তাহা স্বেচ্ছাপূর্বক পরিত্যাগ করিতেছে তাহা বাংলার পক্ষে দুঃখের কারণ এবং উৎকলের পক্ষেও দুর্ভাগ্যের বিষয়।

‘গৌড়াধিপ মহীপালদেবের তাম্রশাসন’ দিনাজপুরের ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীযুক্ত নন্দকৃষ্ণ বসুর সহায়তায় বর্তমান পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হইয়াছে। ‘বিলাসপুর নামক জয়স্কন্ধাবার হইতে, বিষুবসংক্রান্তিতে গঙ্গাস্নান করিয়া পরম সৌগত পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ মহীপালদেব ভট্টপুত্র হৃষীকেশের পৌত্র, মধুসূদনের পুত্র, পরাশর-গোত্রজ (শক্তি, বশিষ্ঠ ও পরাশর প্রবরভুক্ত) যজুর্বেদান্তর্গত বাজসনেয়-শাখাধ্যায়ী চাবটিগ্রামবাসী ভট্টপুত্র কৃষ্ণাদিত্যশর্মাকে বর্তমান তাম্রশাসন দান করেন।’ যিনি দিয়াছেন এবং তাম্রশাসনোক্ত যে গ্রাম দান করা হইয়াছে পত্রিকায় তাহার আলোচনা হইয়াছে। কিন্তু যাঁহাকে দেওয়া হইয়াছে তাঁহার সম্বন্ধে কোনোরূপ আলোচনাই নাই। কুলজিগ্রন্থ হইতে তাঁহার বিবরণ উদ্ধার করিলে ঐতিহাসিক কাল নির্ণয়ের অনেক সহায়তা হয়।

‘ধোয়ী কবির পবনদূত’ প্রবন্ধটি বিশেষ মনোহর হইয়াছে। গীতগোবিন্দের শ্লোকে ধোয়ী কবির নামোল্লেখ অনেকে দেখিয়াছেন। অনেকে দিন অনুসন্ধানের পর সম্প্রতি তাঁহার রচিত পবনদূত কাব্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাহার যে বিবরণ এবং মধ্যে মধ্যে অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন তাহা অত্যন্ত সরস হইয়াছে।

‘পাঁচালিকার ঠাকুরদাস’ প্রবন্ধে লেখক শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফি বাংলা পাঁচালি-সাহিত্য-ইতিহাসের একাংশ উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন।

প্রদীপ। আশ্বিন ও কার্তিক [১৩০৫]

এই যুগল-সংখ্যক প্রদীপ পাঠ করিয়া আমরা বিশেষ পরিতৃপ্ত হইয়াছি। ইহার প্রায় প্রত্যেক গদ্য

প্রবন্ধই আদরণীয় হইয়াছে। বাংলা সাময়িক পত্রে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী -রচিত 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর'-এর মতো প্রবন্ধ কদাচিৎ বাহির হয়। শাস্ত্রীমহাশয় প্রচুর ভাবসম্পদের অধিকারী হইয়াও বঙ্গসাহিত্যের প্রতি কৃপণতা করিয়া থাকেন এ অপবাদ তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইবে।

'হামির' প্রবন্ধটি বিষয়গুণে চিত্তাকর্ষক হইয়াছে।

'হাফ্‌টোন্ ছবি' শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর রচনা। অনেকেই হয়তো জানেন না হাফ্‌টোন্ লিপি সম্বন্ধে উপেন্দ্রবাবুর নিজের আবিষ্কৃত বিশেষ সংস্কৃত পদ্ধতি বিলাতের শিল্পী-সমাজে খ্যাতি লাভ করিয়াছে; উপেন্দ্রবাবু স্বাভাবিক বিনয়বশত তাঁহার প্রবন্ধের মধ্যে কোথাও এ ঘটনার আভাসমাত্র দেন নাই। তিনি বাঙালির মধ্যে প্রথম নিজচেষ্টায় হাফ্‌টোন্ শিক্ষা করেন এবং অল্পকালের মধ্যেই তাহার সংস্কার সাধনে কৃতকার্য হন। ভারতবর্ষের প্রতিকূল জলবায়ু এবং সর্বপ্রকার সহায়তা ও পরামর্শের অভাব সত্ত্বেও এই নূতন শিল্পবিদ্যা আয়ত্ত এবং তাহাকে সংস্কৃত করিতে যে কী পরিমাণ অধ্যবসায় ও মানসিক ক্ষমতার প্রয়োজন তাহা অব্যবসায়ীর পক্ষে মনে আনাই কঠিন। উপেন্দ্রবাবুর প্রবন্ধ অপেক্ষা তাঁহার রচিত যে সুন্দর আলেখ্যগুলি প্রদীপে বাহির হইয়াছে তাহাতেই তাঁহার যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায়।

'হীরার মূল্য' নামক ছোটো গল্পটিতে লেখক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের স্বাভাবিক প্রতিভা পরিস্ফুট হইয়াছে। গল্পটি ভাষার শ্রী, আখ্যায়িকার কৌশল, চরিত্ররচনার সহজ-নৈপুণ্য এবং সংক্ষিপ্ত সংহত উজ্জ্বলতাগুণে হীরকখণ্ডের মতো দীপ্তি পাইতেছে। গল্পটি পাঠ করিতে করিতে নবাব পরিবারের একটি হিন্দুস্থানী আবহাওয়া পাঠকের অন্তঃকরণকে বেষ্টন করিয়া ধরে। 'রাসায়নিক পরিভাষা' খ্যাতনামা বিজ্ঞানাচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের রচনা। প্রফুল্লবাবু বিশুদ্ধ বাংলা রাসায়নিক পরিভাষা প্রচলনের পক্ষপাতী। এ সম্বন্ধে তিনি জর্মনির দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। ইংরাজি বৈজ্ঞানিক গ্রন্থে যেখানে লাটিনমূলক পরিভাষা গৃহীত হইয়াছে জর্মানেরা সে স্থলে স্বদেশীভাষামূলক পরিভাষা ব্যবহার করিতেছেন। প্রফুল্লবাবু আর-একটি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। অদ্বিতীয় পণ্ডিত মান্ডেলিয়েফ্ রাসায়নিক তত্ত্বে নূতন পথ-প্রদর্শক। ইনি রুশীয়। 'কিছুদিন হইল এই জগদ্‌বিখ্যাত রাসায়নিক ও তাঁহার সহযোগীগণ স্বদেশপ্রেমে পূর্ণ হইয়া দৃঢ় সংকল্প করিলেন, আর পরকীয় ভাষায় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ বা গ্রন্থ রচনা করা হইবে না। পাশ্চাত্য রাসায়নিকগণ মহাসংকটে পড়িলেন। কাজেই অনেকে রুশীয় ভাষা শিক্ষা করিতে বাধ্য হইলেন। রসায়নবিদ্যায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রবন্ধলেখকের দুই জন বিলাতি বন্ধু কঠোর পরিশ্রমের পর মান্ডেলিয়েফ্ মূল ভাষায় পাঠ করিয়া সার্থকতা লাভ করেন। আমরা জিজ্ঞাসা করি, হতভাগ্য বাংলা ভাষা কি এতই অপরাধ করিল যে, ইহাকে রাসায়নিক পরিভাষা সংকলন হইতে বঞ্চিত করিতে হইবে।' বঙ্গ ভাষাও রুশীয় ভাষার ন্যায় গৌরব লাভ করিবে এ কথা মুখ ফুটিয়া বলিতে আমরা আর সংকোচ বোধ করি না; সম্প্রতি যে দুই-একজন বাঙালি আমাদিগকে এই উচ্চ আশার দিকে লইয়া যাইতেছেন ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাঁহাদের মধ্যে একজন।

'দাতা কালীকুমার' প্রবন্ধে লেখক এ কথা সম্পূর্ণ প্রমাণ করিয়াছেন যে স্বর্গগত কালীকুমার দত্তের জীবনবৃত্তান্ত কোনোমতেই বিস্মৃতির যোগ্য নহে। আশা করি এই মহাত্মার সম্পূর্ণ জীবনচরিত আমরা গ্রন্থাকারে দেখিতে পাইব। দেশের বর্তমান আর্থিক অবস্থা ও নূতন শিক্ষায় একান্নবর্তী পরিবারবন্ধন বিশ্লিষ্ট হইবার সময় আসিয়াছে; কালীকুমার দত্তের মহৎ জীবনবৃত্তান্ত ভবিষ্যৎ বাঙালি পাঠকের নিকট প্রাচীন বাংলা সমাজের এক উজ্জ্বল আদর্শ অঙ্কিত করিয়া রাখিবে। শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় বর্তমান সংখ্যক প্রদীপে তাঁহার বন্ধু এবং ভারতের বন্ধু আনন্দমোহন বসু সম্বন্ধে একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন 'আনন্দমোহনের জীবনে প্রাচ্য প্রেম ভক্তি ও প্রতীচ্য-কর্মশীলতা অপূর্বভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, ইহাতেই তাঁহাকে অনেক পরিমাণে আমাদের আদর্শস্থানীয় করিয়াছে।'

'স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বটব্যাল' নামক ক্ষুদ্র প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চক্রবর্তী উক্ত মহাত্মা

সম্বন্ধে আমাদের কৌতূহল উদ্রেক করিয়াছেন। উমেশচন্দ্র অধিক বয়সে বঙ্গসাহিত্যে প্রবেশ করিয়া অল্পকালের মধ্যেই প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহার লেখা যেমন সরস, প্রাঞ্জল এবং পরিপক্ক ছিল তেমনি তাহার মধ্যে লেখকের স্বকীয়তা, নির্ভীকতা এবং অকৃত্রিম দৃঢ় ধারণা প্রকাশ পাইত। কেবল যে রচনাগুণে তিনি শ্রদ্ধেয় ছিলেন তাহা নহে; রজনীকান্তবাবু লিখিতেছেন, 'ব্যবহারে তিনি কলঙ্কশূন্য ছিলেন। কোনোরূপ কুসংস্কার তাঁহার হৃদয় স্পর্শ করিতে পারিত না। পৌত্তলিকতার প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল না। উপনিষৎপ্রোক্ত ব্রহ্মোপাসনাই প্রকৃত হিন্দুধর্ম এ কথা তাঁহার মুখে ব্যক্ত হইত। উচ্চ শ্রেণীর সংস্কৃত শিক্ষার সহ উচ্চ শ্রেণীর ইংরাজি শিক্ষা মিলিত হইলে কী অমৃতময় ফল প্রসব করে, তাহা তাঁহার জীবনে পরিলক্ষিত হইত। তাঁহার কোনোরূপ আড়ম্বর ছিল না। তাঁহার রামনগর বাসাবাটিতে গিয়াছি, এক কম্বলাসনে বসিয়া নানা আলাপ করিয়াছি। যখনই গিয়াছি কিছু-না-কিছু শিখিয়া আসিয়াছি। নিয়ম পথ হইতে তিনি রেখামাত্র বিচ্যুত হইতেন না।'

সর্বশেষে, আমরা প্রদীপের উন্নতির সঙ্গে তাহার স্থায়িত্ব কামনা করি। প্রদীপ যেরূপ প্রচুর পরিমাণে তৈল পুড়াইতেছে তাহাতে আশঙ্কা হয় কোন্ দিন তাহার অকাল নির্বাণ হইবে। এত ছবি না ছাপাইয়া এবং এত খরচপত্র না করিয়াও কেবল প্রবন্ধগৌরবে প্রদীপ স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারিবে এইরূপ আমাদের বিশ্বাস।

ভারতী
অগ্রহায়ণ ১৩০৫

সাময়িক সারসংগ্রহ

নাইটিন্থ সেঞ্চুরি

মণিপুরের বর্ণনা

সার জেমস্ জন্‌স্টন্ জুন মাসের নাইন্টিন্থ সেঞ্চুরি পত্রিকায় মণিপুরের যে বর্ণনা প্রকাশ করিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া সহসা মনের মধ্যে একটি বিষাদের ভাব উদয় হয়।

স্থানটি রমণীয়। চারি দিকে পর্বত, মাঝখানে একটি উপত্যকা; বাহিরের পৃথিবীর সহিত কোনো সম্পর্ক নাই। ভূমি অত্যন্ত উর্বরা, মানুষগুলি সরল এবং উদ্‌যোগী, রাজকর নাই বলিলেই হয়, রাজাকে কেবল বরাদ্দমতো পরিশ্রম দিতে হয়। যে শস্য উৎপন্ন হয় আপনারাই সংবৎসর খায় এবং সঞ্চয় করে, বাহিরে পাঠায় না, বাহির হইতেও আমদানি করে না। অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে এখানকার দৃশ্যটি বড়ো মনোহর হইয়া উঠে। দিন উজ্জ্বল, আকাশ পরিষ্কার, বাতাস শীতল, পাকাধানে শস্যক্ষেত্র সোনার বর্ণ ধারণ করিয়াছে। মেয়েরা শোভন বস্ত্র পরিয়া দলে দলে ধান কাটিতেছে, বলিষ্ঠ পুরুষেরা শস্যের আঁটি বহন করিয়া ঘরে লইয়া যাইতেছে। নিকটে গোরুগুলি ধীর গতিতে প্রদক্ষিণ করিয়া ধান মাড়াই করিতেছে, শস্যবিচ্ছিন্ন তৃণ এক পার্শ্বে রাশীকৃত হইতেছে, ধান যখন ঘরে আসিবে তখন সেই তৃণে আনন্দোৎসবের অগ্নি প্রজ্বলিত হইবে।

রাজধানীতে সন্ধ্যাবেলায় হাট বসে, সেইটেই দিবসের মধ্যে প্রধান ঘটনা। যতই বেলা পড়িয়া আসিতে থাকে পথ হাট লোকে পরিপূর্ণ হইয়া যায়। পুরুষদের নির্মল শুভ্র বসন এবং মেয়েদের নানাবিধ উজ্জ্বল বর্ণের বিচিত্র সজ্জা। মেয়েরাই বিক্রেতা। দেখিতে পাওয়া যায় মাথায় পণ্য দ্রব্য এবং কোলে অথবা পিঠে কচি ছেলে লইয়া তাহারা 'সেনা কাইথেল' অর্থাৎ সোনাবাজারে হাট করিতে আইসে, পথ উজ্জ্বল হইয়া উঠে।

বাজারের কাছে পোলো খেলিবার মাঠ। শহরের ভালো ভালো খেলোয়াড় এমন-কি রাজপুত্রগণ সেইখানে প্রায় প্রত্যহ খেলা করে; সেখানে কুস্তিও চলে এবং রাজসৈন্যদের কুচও হইয়া থাকে।

রাজবাড়ির চারি দিকে খাল কাটা আছে সেইখানে আশ্বিন মাসে একবার করিয়া নৌকা বাচ হয়। সেই উপলক্ষে মহা সমাগম হয়। রাজা, রাজকুটুম্ব, রানী এবং রাজকন্যাগণ নির্দিষ্ট মঞ্চে বসিয়া বাচ খেলা দেখেন; মেয়েদের কোনোরূপ পর্দা নাই, অবগুণ্ঠন নাই।

ইহা ছাড়া জন্মাষ্টমী, দেওয়ালি, হোলি, রথযাত্রা প্রভৃতি আরও অনেক উৎসব আছে। আষাঢ় মাসে এক ব্যায়াম-উৎসব হইয়া থাকে তখন চারি দিক হইতে সমাগত পাহাড়িয়াদিগের সহিত মণিপুরীদের কুস্তি প্রভৃতি নানাবিধ ব্যায়ামনৈপুণ্যের পরীক্ষা হয়।

এই প্রচ্ছন্ন পর্বতপুরীতে ঐশ্বর্য-আড়ম্বরের কোনো চিহ্ন দেখা যায় না, কিন্তু এখানে সরল সুখ-সন্তোষের লেশমাত্র অভাব নাই। রাজা যথেচ্ছাচারী, কিন্তু প্রজাদিগের মনে স্বজাতীয় রাজগৌরব সর্বদা জাগরূক। তাহারা বহুকাল হইতে আপনাদের রাজা এবং রাজকীয় বিবিধ অনুষ্ঠান, আপনাদের সোনার হাট, নৌকাখেলা, উৎসব আমোদ লইয়া শৈলকুলায়ের মধ্যে সুখে বাস করিতেছে। এই জগতের একান্তবর্তী সন্তোষকলকূজিত নিভৃত নীড়ের মধ্যে সভ্যতার নির্মম হস্তক্ষেপ দেখিলে এই কথা মনে পড়ে,

গড়ন ভাঙিতে, সখি, আছে নানা খল,
ভাঙিয়া গড়িতে পারে সে বড়ো বিরল।

আমেরিকার সমাজচিত্র

বিখ্যাত ইংরাজলেখক হ্যামিল্টন আইডে লিখিতেছেন যে, যদিও আমেরিকায় আইরিশ হইতে আরম্ভ করিয়া কাফ্রি এবং চীনেম্যান প্রভৃতি বিচিত্র জাতির সমাবেশ হইয়াছে তথাপি তাহাদের মধ্যে একটা স্বভাবের ঐক্য দেখা যায়। যাহার টাকাকড়ি আছে সে আপন নিবাসস্থান শহরের উন্নতির জন্য যথেষ্ট অর্থব্যয় করা প্রধান কর্তব্য বোধ করে। তাহা ছাড়া খাঁটি মার্কিন, বিশ্রাম কাকে বলে জানে না; একদণ্ড স্থির থাকিতে হইলে তাহার প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়া যায়। নিজের কাজই করুক বা সাধারণের কাজেই লিপ্ত থাকুক প্রাণপণ খাটুনির ত্রুটি নাই। চিকাগো শহর একবার আগুন লাগিয়া ধ্বংস হইয়া গেল আবার দেখিতে দেখিতে কয়েক বৎসরের মধ্যে এমনি কাণ্ড করিয়া তুলিল যে, আজকাল অত বড়ো শহর মুলুকের মধ্যে আর দ্বিতীয় নাই। ইংরাজ যেখানে হতাশ্বাস হইয়া নিরস্ত হয়, মার্কিন সেখানে কিছুতেই দমে না। ব্যবসায়ে একবার যথাসর্বস্ব খোয়াইয়া পুনর্বার নবোদ্যমে অর্থসঞ্চয় আমেরিকায় প্রতিদিন দেখা যায়। ইহারা হাল ছাড়িয়া দিবার জাত নয়। ইংরাজের একান্ত অধ্যবসায় দেখিয়া আমাদের তাক লাগিয়া যায়, ইংরাজ আবার আমেরিকার অপ্রতিহত উদ্যম দেখিয়া ধন্য ধন্য করিতেছে।

কিন্তু লেখক বলেন, অবিশ্রাম কাজ করিয়া ইহারা যে সুখী আছে তাহা বলা যায় না। পুরুষদের মধ্যে অতিরিক্ত শ্রমের পর শ্রান্তি এবং মেয়েদের মধ্যে নিয়ত চাঞ্চল্য ও পরিবর্তনপ্রিয়তাকে সুখের অবস্থা বলা যায় না। আমেরিকায় দেখা যায়, উচ্চ শ্রেণীর নাট্যাভিনয় অপেক্ষা ভাঁড়ামি মস্করামি প্রভৃতিতে অধিকসংখ্যক লোক আকৃষ্ট হয়। লোকেরা এত অধিক মাত্রায় পরিশ্রম করে যে, অবসরের সময় তাহারা নিছক আমোদ চায়, যাহাতে মনোযোগ, চিন্তা বা মনোবৃত্তি বেশি উদ্রেক করে এমন কিছুই তাহাদের সহ্য হয় না।

মেয়েরা কেবলই বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে চঞ্চলভাবে উড়িয়া বেড়াইতেছে। শহর হইতে দূরে আপনার নিভৃত কুটিরের মধ্যে গার্হস্থ্য এবং গ্রাম কর্তব্য লইয়া দিনযাপন করা মার্কিন মেয়ের পক্ষে অসাধ্য। কোথায় ব্রাউনিং সম্বন্ধে ব্যাখ্যা হইতেছে, কোথায় বাগ্‌নারের সংগীত সম্বন্ধে তর্ক চলিতেছে; কোথায় কোন্ পণ্ডিত আজ্‌তেক জাতির বিবরণ সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতেছে, কোথায় ভূতনামানো হইতেছে, চঞ্চল কৌতূহল লইয়া সর্বত্রই আমেরিকানি উপস্থিত আছেন। সাধারণ ইংরাজ মেয়ে বিদ্যালয় ছাড়িলেই মনে করে শিক্ষা সমাপ্ত হইল, কিন্তু মার্কিন মেয়ে একটা-না-একটা কোনো অধ্যয়ন লইয়া লাগিয়া আছেই। সকলেরই প্রায় ক্ষুদ্র পরিবার এবং দুটি-চারটি চাকর, গৃহকর্ম সামান্য, এইজন্য মেয়েরা আমোদ অথবা শিক্ষা লইয়া চঞ্চলভাবে ব্যাপৃত থাকে। অনেক গৃহস্থ আপন কন্যাদিগকে শিক্ষার্থে য়ুরোপে প্রেরণ করেন। তাঁহারা বলেন, আমেরিকায় মেয়েরা বড়ো শীঘ্র পাকা হইয়া যায়। নিতান্ত অল্প বয়স হইতেই লোকলৌকিকতা আমোদ-অনুষ্ঠানে সকলের সহিত সমকক্ষভাবে দেখা-সাক্ষাৎ ও প্রেমাভিনয়ে অকালেই তাহাদের তারুণ্যের স্নিগ্ধ সৌরভ দূর হইয়া যায়। যাহা হউক, ইংরাজলেখক বলিতেছেন এমন অতিকর্মশীলতা এবং অতিচাঞ্চল্য সুখের অবস্থা নহে।

পৌরাণিক মহাপ্লাবন

বাইব্‌ল্-কথিত মহাপ্লাবনের বিবরণ সকলেই বিদিত আছেন। এবারকার পত্রিকায় বিখ্যাত বিজ্ঞান-অধ্যাপক হক্‌স্‌লি তাহার অসম্ভাব্যতা প্রমাণ করিয়াছেন। আমাদের দেশে প্রাচীন ধর্ম যে-যে স্থানে জীর্ণ হইয়া ভাঙিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে নব্য পণ্ডিতেরা সেইখানে বিজ্ঞানের ‘ঠেকো’ দিয়া তাহাকে অটল বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছেন। ইংলণ্ডে সেইরূপ বিচিত্র কৌশলে বিজ্ঞানকে শাস্ত্রোদ্ধারের কার্যে নিযুক্ত করার প্রয়াস চলিতেছে। কিন্তু সত্যের দ্বারা

ভ্রমকে বজায় রাখা অসাধারণ বুদ্ধিকৌশলেও সুসিদ্ধ হয় না। যখনই দেখা যায় সরল বিশ্বাসের স্থানে কুটিল ভাষ্যের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে তখনই জানা যায় শাস্ত্রের স্বাভাবিক মৃত্যুকাল উপস্থিত হইয়াছে। ইতিহাসে শুনা যায় প্রাচীন গ্রীক ধর্মশাস্ত্র মরিবার প্রাক্‌কালে নানা প্রকার রূপক ব্যাখ্যার ছলে আপনার সার্থকতা প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু তৈল না থাকিলে কেবল দীর্ঘ বর্তিকায় প্রদীপ জ্বলে না; কালক্রমে বিশ্বাস যখন হ্রাস হইয়াছে তখন বড়ো বড়ো ব্যাখ্যাকৌশল সূক্ষ্ম শির তুলিয়া অন্ধকারকে আলো করিতে পারে না।

মুসলমান মহিলা

কোনো তুরস্কবাসিনী ইংরাজরমণী মুসলমান নারীদিগের একান্ত দুরবস্থার যে বর্ণনা করিয়াছেন তাহা বিশেষ প্রমাণ না পাইলে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা উচিত জ্ঞান করি না। কিন্তু অসূর্যম্পশ্য জেনানার সুখ-দুঃখ সত্য-মিথ্যা কে প্রমাণ করিবে? তবে, আমাদের নিজের অন্তঃপুরের সহিত তুলনা করিয়া কতকটা বুঝা যায়।

লেখিকা গল্প করিতেছেন, তিনি দুইটি মুসলমান অন্তঃপুরচারিণীর সহিত গল্প করিতেছেন এমন সময়ে হঠাৎ দেখিলেন তাহাদের মধ্যে একজন তক্তার নীচে আর-একজন সিন্ধুকের তলায় তাড়াতাড়ি প্রবেশ করিয়া লুকাইয়া পড়িল। ব্যাপারটা আর কিছুই নয় তাহাদের দেবর দ্বারের নিকট উপস্থিত হইয়াছিল। আমাদের দেশে ভ্রাতৃবধূর দৃষ্টিপথে ভাসুরের অভ্যুদয় হইলে কতকটা এই মতোই বিপর্যয় ব্যাপার উপস্থিত হয়। নব্য মুসলমানেরা এইরূপ সতর্ক অবরোধ সম্বন্ধে বলিয়া থাকেন— 'বহুমূল্য জহরৎ কি কেহ রাস্তার ধারে ফেলিয়া রাখে? তাহাকে এমন সাবধানে ঢাকিয়া রাখা আবশ্যক যে, সূর্যালোকেও তাহার জ্যোতিকে ম্লান না করিতে পারে।' আমাদের দেশেও যাঁহারা বাক্যবিন্যাসবিশারদ তাঁহারা এইরূপ বড়ো বড়ো কথা বলিয়া থাকেন। তাঁহারা শাস্ত্রের শ্লোক ও কবিত্বের ছটার দ্বারা প্রমাণ করেন যে, যাহাকে তোমরা মনুষ্যত্বের প্রতি অত্যাচার বল তাহা প্রকৃতপক্ষে দেবত্বের প্রতি সম্মান। কিন্তু কথায় চিঁড়া ভিজে না। যে হতভাগিনী মনুষ্যসুলভ ক্ষুধা লইয়া বসিয়া আছে তাহাকে কেবলই শাস্ত্রীয় স্তুতি দিয়া মাঝে মাঝে পার্থিব দধি না দিলে তাহার বরাদ্দ একমুষ্টি শুষ্ক চিঁড়া গলা দিয়া নাবা নিতান্ত দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে।

লেখিকা একটি অতিশয় রোমহর্ষণ ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। জেনাবের যখন দশ বৎসর বয়স তখন তাহার বাপ তাহাকে হীরা জহরাতে জড়িত করিয়া পুত্তলিবেশে আপনার চেয়ে বয়সে ও ধনে সম্ভ্রমে বড়ো একটি বৃদ্ধ স্বামীর হস্তে সমর্পণ করিলেন। একবার স্বামীগৃহে পদার্পণ করিলে বাপ-মায়ের সহিত সাক্ষাৎ বহু সাধনায় ঘটে, বিশেষত যখন তাঁহারা কুলে মানে স্বামীর অপেক্ষা ছোটো। জেনাব দুই ছেলের মা হইল তথাপি বাপের সহিত একবার দেখা হইল না। নানা উপদ্রবে পাগলের মতো হইয়া একদিন সে দাসীর ছদ্মবেশে পলাইয়া পিতার চরণে গিয়া উপস্থিত হইল। কাঁদিয়া বলিল, 'বাবা আমাকে মারিয়া ফেলো কিন্তু শ্বশুরবাড়ি পাঠাইয়ো না।' ইহার পর তাহার প্রাণসংশয় পীড়া উপস্থিত হইল। তাহার অবস্থা ও আকৃতি দেখিয়া বাপের মনে বড়ো আঘাত লাগিল। বাপ জামাতাকে বলিয়া পাঠাইলেন, 'কন্যার প্রাপ্য হিসাবে এক পয়সা চাহি না বরঞ্চ তুমি যদি কিছু চাও তো দিতে প্রস্তুত আছি তুমি তোমার স্ত্রীকে মুসলমান বিধি অনুসারে পরিত্যাগ করো।' সে কহিল, 'এত বড়ো কথা! আমার অন্তঃপুরে হস্তক্ষেপ! মশাল্লা! এত সহজে যদি সে নিষ্কৃতি পায় তবে যে আমার দাড়িকে সকলে উপহাস করিবে!'

তাহার রকম-সকম দেখিয়া দূতেরা বাপকে আসিয়া কহিল, 'যে রকম গতিক দেখিতেছি তোমার মেয়েকে একবার হাতে পাইলেই বিষম বিপদ ঘটাইবে।' বাপ বহুযত্নে কন্যাকে লুকাইয়া রাখিলেন।

বলিতে হৃৎকম্প হয় পাষণ্ড স্বামী নিজের অপোগণ্ড বালক দুটিকে ঘাড় মটকাইয়া বধ করিয়া

তাহাদের সদ্যমৃত দেহ স্ত্রীর নিকট উপহারস্বরূপ পাঠাইয়া দিল।

মা কেবল একবার আর্তস্বরে চিৎকার করিয়া আর মাথা তুলিল না, দুই-চারি দিনেই দুঃখের জীবন শেষ করিল।

এইরূপ অমানুষিক ঘটনা জাতীয় চরিত্রসূচক দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করা লেখিকার পক্ষে ন্যায়সংগত হইয়াছে বলিতে পারি না কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে, একীকরণের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে যিনিই যত বড়ো বড়ো কথা বলুন, মানুষের প্রতি মানুষের অধিকারের একটা সীমা আছে; পৃথিবীর প্রাচ্য প্রদেশের স্ত্রীর প্রতি স্বামীর অধিকার সেই সীমা এতদূর অতিক্রম করিয়াছে যে, আধ্যাত্মিকতার দোহাই দিয়া কতকগুলা আগড়ম্ বাগড়ম্ বকিয়া আমাদিগকে কেবল কথার ছলে লজ্জা নিবারণ করিতে হইতেছে।

প্রাচ্য সভ্যতার প্রাচীনত্ব

মে মাসের পত্রিকায় আচার্য ম্যাক্সমূলার লিখিতেছেন প্রাচীনতার একটি বিশেষ গৌরব আছে সন্দেহ নাই কিন্তু প্রাচ্যতত্ত্ব আলোচনায় সেইটেকেই মুখ্য আকর্ষণ জ্ঞান করা উচিত হয় না। যাহা-কিছু বহুকেলে এবং সৃষ্টিছাড়া তাহাই যে বিশেষ আদরের সামগ্রী তাহা নহে। বরঞ্চ প্রাচীনের সঙ্গে যখন নবীনের যোগ দেখা যায়, যখন সম্পর্কসূত্রে নবীন প্রাচীন হইয়া যায় এবং প্রাচীন নবীন হইয়া আসে, তখনই আমাদের যথার্থ আনন্দ বোধ হয়। আর্য সভ্যতা আবিষ্কারের প্রধান মাহাত্ম্য এই যে, ইহার দ্বারা দূর নিকটবর্তী হইয়াছে এবং যাহাদিগকে পর মনে করিতাম তাহাদিগকে আপনার বলিয়া জানিয়াছি। মনুষ্যপ্রেম বিস্তারের, পৃথিবীর দেশ-বিদেশের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপনের একটি প্রাচীন পথ পাওয়া গিয়াছে। অতএব এ কেবল একটি শুষ্ক তত্ত্বমাত্র নহে, মনুষ্যত্বই ইহার আত্মা, মানবই ইহার লক্ষ্যস্থল।

তিনি বলিতেছেন একবার ভাবিয়া দেখো 'ইন্ডো-য়ুরোপিয়ান' শব্দটার মধ্যে কতটা মহত্ত্ব আছে। এই নামে ইংরাজি, জর্মান, কেল্টিক্, স্লাভোনিক, গ্রীক এবং লাটিন -ভাষীদের সহিত সংস্কৃত, পারসিক এবং আর্মানি -ভাষীরা এক হইয়া গিয়াছে। এই নামে এমন একটি বৃহৎ মিলনমণ্ডলীর সৃষ্টি হইয়াছে পৃথিবীর সমস্ত মহত্তম জাতি যাহার অঙ্গ— এই নামের প্রভাবে সেই-সমস্ত জাতি আপনাদের অন্তরের মধ্যে বৃহৎ ইন্ডো-য়ুরোপীয় ঐক্যের, প্রাচীন আর্য ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনের একটি মহৎ মর্যাদা অনুভব করিতে পারিতেছে।

ম্যাক্সমূলার মহাত্মার মতো কথা বলিয়াছেন। হায়, তিনি জানেন না তাঁহার প্রতিষ্ঠিত এই 'আর্য' শব্দ লইয়াই আমাদের দেশে দূরে নিকটে, মানবে মানবে কাল্পনিক ব্যবধান স্থাপিত হইতেছে। বাঙালি পণ্ডিতের মুখে যখন এই 'আর্য' নাম উচ্চারিত হয় তখন তাহার সুদূরব্যাপী উদারতা ঘুচিয়া গিয়া তাহা একটা গ্রাম্য দলাদলির কলহকোলাহলে পরিণত হয়। নামের দোষ নাই, যাহার যেমন প্রকৃতি, ভাষা তাহার মুখে তেমনি আকার ধারণ করে।

এই উপলক্ষে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের রচিত 'আর্যামি এবং সাহেবিয়ানা' পুস্তিকাখানি আমরা পাঠকগণকে পড়িতে সবিনয় অনুরোধ করি।

সাধনা

অগ্রহায়ণ ১২৯৮

ক্ষিপ্ত রমণীসম্প্রদায়

যে-সকল ইংরাজ স্ত্রীলোক রাজনৈতিক অধিকার লাভ করিয়া পুরুষের সমকক্ষ হইবার চেষ্টা করিতেছেন তাঁহাদের সম্বন্ধে বিলাতের বিখ্যাত লেখিকা লিন্ লিন্টন্ জুলাই মাসের নাইন্টিন্থ

সেঞ্চুরিতে এক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা গত সংখ্যক সাধনায় 'সাহিত্যে' প্রকাশিত প্রবন্ধবিশেষের সমালোচনায় রমণীদের বিশেষ কার্য সম্বন্ধে যে মত ব্যক্ত করিয়াছিলাম পাঠকগণ লিন্‌ লিন্টনের এই প্রবন্ধের সহিত তাহার বিস্তর ঐক্য দেখিতে পাইবেন।

লেখিকা বলেন, কথাটা শুনিতে ভালো লাগুক বা না লাগুক, জননী হওয়াই স্ত্রীলোকের অস্তিত্বের প্রধান সার্থকতা, এবং প্রকৃতি সেই কারণেই তাহাকে অঙ্গে প্রত্যঙ্গে পুরুষ হইতে স্বতন্ত্র করিয়া গড়িয়াছে। যাহাতে করিয়া রমণীর সুস্থ সন্তান উৎপাদন ও শিশুসন্তান পালনপোষণ করিবার শক্তি হ্রাস করে তাহা সমাজ ও প্রকৃতির নিকটে অপরাধস্বরূপ গণ্য হওয়া উচিত।

মনুষ্যের কতকগুলি বিশুদ্ধ ও উচ্চ ভাবের আকরস্থল আছে, গৃহ তাহার মধ্যে একটি। যদি পুরুষেরা উপার্জন রাজ্যশাসন প্রভৃতি বাহিরের কার্য এবং স্ত্রীলোকেরা স্বজনসেবা সমাজরক্ষা প্রভৃতি ভিতরের কার্য না করে তবে এই গৃহ এক দণ্ড টিকিতে পারে না। সমাজের যতই উন্নতি হয় স্ত্রী-পুরুষের কার্যবিভাগ ততই সুনির্দিষ্ট হইতে থাকে। সমাজের নিম্নস্তরেই দেখা যায় চাষাদের মেয়েরা কৃষিকার্যে পুরুষের সহযোগিতা করিয়া থাকে।

যাঁহারা একদিকে আত্মমাহাত্ম্য এবং অন্য দিকে রমণীর সুমিষ্ট সুকোমল হৃদয়বত্তার মধ্যে দোদুল্যমান হইতেছেন তাঁহাদিগকে একটু বিবেচনা করিতে অনুরোধ করি। একসঙ্গে দুই দিক রক্ষা হয় না। হয় রাজনৈতিক সংগ্রাম নয় পারিবারিক শান্তি, হয় বক্তৃতামঞ্চ নয় গৃহ, হয় স্বাতন্ত্র্য নয় প্রেম, হয় ধর্মপ্রবৃত্তির শুষ্কতা ও নিষ্ফলতা নয় উর্বরা পরিপূর্ণা বিচিত্রফলশালিনী স্ত্রীপ্রকৃতি, এই দুয়ের মধ্যে একটাকে বরণ করিতে হইবে।

স্ত্রীলোকের হস্তে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব দিবার বিরুদ্ধে এমন একটি যুক্তি আছে যাহার আর উত্তর সম্ভবে না। রাজকার্যে যখন আবশ্যক হইবে তখন পুরুষেরা রণক্ষেত্রে রক্তপাত করিতে বাধ্য কিন্তু স্ত্রীলোকের নিকট তাহা প্রত্যাশা করা যায় না। অতএব যুদ্ধ বাধাইবার বেলা স্ত্রীলোক থাকিবেন আর রক্তপাতের বেলায় পুরুষ এটা ঠিক সংগত হয় না। আর স্ত্রীলোক যে স্বভাবতই শান্তির পক্ষপাতী হইবে এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। য়ুরোপের কতকগুলি দারুণতর যুদ্ধ স্ত্রীলোকের দ্বারাই ঘটিয়াছে। মাডাম্‌ ডে ম্যান্টর্ন কি শান্তিপ্রয়াসিনী ছিলেন? ফ্রাঙ্কো-প্রুসীয় যুদ্ধের প্রাক্‌কালে 'বর্লিনে চলো' বলিয়া ফ্রান্সে যে একটা রব উঠিয়াছিল, যে উন্মত্ততার ফলে এত রক্ত এবং এত অর্থব্যয় হইয়া গেল, সম্রাজ্ঞী য়ুজেনির কি তাহাতে কোনো হাত ছিল না? রুশিয়ার সুন্দরী যুবতীদের মধ্যে কি এমন কোনো নাইহিলিস্ট নাই যাঁহারা হত্যা ও সর্বনাশ প্রচার করিয়া বেড়াইতেছেন? বাতাসে উইলোপত্র যেরূপ কাঁপিয়া ওঠে, উত্তেজনাবাক্যে রমণীহৃদয় সেইরূপ বিচলিত হয়। তাহার পর একবার রমণী খেপিয়া দাঁড়াইলে তাহার বাধা-বিপদের চেতনা থাকে না, হিতাহিতের জ্ঞান দূর হইয়া যায়।

ফ্রান্সে সর্ববিষয়ে স্ত্রীলোকের শাসন যেরূপ বলবৎ এমন আর কোথাও নয়, কিন্তু সেখানে স্ত্রীলোক যখনই রাজ্যতন্ত্রে হস্তক্ষেপ করিয়াছে তখনই বিপদ ঘটাইয়াছে।

সর্বময় প্রভুত্বপ্রিয়তা এবং আপনার মতকেই পাঁচ কাহন করা স্ত্রীস্বভাবের অবশ্যম্ভাবী লক্ষণ। আমেরিকায় রমণী যখনই প্রবল হয় একেবারে জবরদস্তি করিয়া মদের দোকান ভাঙিয়া দেয় এবং জোর হুকুমে মদ্যবিক্রয় বন্ধ করিয়া বসে। এদিকে ইঁহারা নিজে হয়তো চা, ইথর্‌ ক্লোরালে অভিষিক্ত হইয়া নিজের স্বাস্থ্য ও স্নায়ু জীর্ণ করিয়া ফেলিতেছেন, অপ্রিয় কর্মফল হইতে মুক্তিলাভের উদ্দেশ্যে বিবিধ বিপজ্জনক পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইতেছেন, কাহার সাধ্য তাহাতে হস্তক্ষেপ করে!

মাতৃত্বের মধ্যে একটি অপ্রতিহত কর্তৃত্ব আছে। শিশুসন্তানের উপর মায়ের অখণ্ড অধিকার। এ সম্বন্ধে কাহারো কাছে তাহার কোনো জবাবদিহি নাই। যুগ-যুগান্তর এই মাতৃকর্তৃত্ব চালনা করিয়া রমণীহৃদয়ে একটা অন্ধ আত্মপ্রভুত্বের ভাব বদ্ধমূল হইয়া আছে। বংশরক্ষার পক্ষে এই নিজ হৃদয়ানুসারী কর্তৃত্বপ্রিয়তা বিশেষ আবশ্যক কিন্তু রাজ্যরক্ষার পক্ষে, ব্যাপক ন্যায়াচরণের পক্ষে, সাধারণ হিতোদ্দেশে অল্পসংখ্যকের দমনের পক্ষে ইহা সম্পূর্ণ অনুপযোগী।

সীমান্ত প্রদেশ ও আশ্রিতরাজ্য

ইংরাজ যে কী কৌশলে রাজ্যবিস্তার ও রাজ্যরক্ষা করিতেছেন, অগস্ট মাসের নাইন্টিস্থ সেঞ্চুরি পত্রিকায় সার অ্যালফ্রেড লায়াল 'সীমান্তপ্রদেশ ও আশ্রিত রাজ্য' নামক প্রবন্ধে তাহা অনেকটা প্রকাশ করিয়াছেন।

লেখক বলেন, নিজ অধিকারের সন্নিকটে যখন প্রবল প্রতিবেশী থাকে তখন ইংরাজ মাঝখানে একটি করিয়া আশ্রিত রাজ্যের ব্যবধান রাখিয়া দেন। আশ্রিতরাজ্য স্থাপনের অর্থ এই যে, পার্শ্ববর্তী দুর্বল রাজাকে বল বা কৌশলের দ্বারা ইংরাজের আনুগত্য স্বীকার করানো। পরস্পরের মধ্যে এইরূপ করার থাকে যে, ইংরাজ তাহাকে শত্রু-আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবে এবং সে ইংরাজ ছাড়া অন্য কোনো প্রবল রাজাকে সাহায্য করিতে পারিবে না। ১৭৬৫ খৃস্টাব্দে যখন ইংরাজ বঙ্গদেশ অধিকার করিলেন তখন মহারাট্টাদের সংঘর্ষ হইতে রক্ষা পাইবার উদ্দেশ্যে মাঝখানে অযোধ্যাকে আশ্রিতরাজ্যস্বরূপ রক্ষা করিয়াছিলেন এবং বর্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে সেই কারণেই মধ্য ভারতের রাজপুত রাজ্যসকলকে আশ্রয় দান করা হইয়াছিল। পঞ্জাব অধিকারের পূর্বে শিখদিগের আক্রমণ ঠেকাইবার জন্য শতদ্রুতীরে গুটিকতক ছোটো ছোটো পোষ্য রাজা রাখিতে হইয়াছিল। এইরূপে বাংলাদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া মাঝে মাঝে এক-একটা বাঁধ বাঁধিয়া ইংরাজ ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত অধিকার করিয়া লইল।

ভারতের নীচের দিকে সমুদ্র ও উপরের দিকে হিমালয়ের দুই মস্ত বেড়া আছে। অতএব মনে হইতে পারে একবার ভারতের প্রান্তে আসিয়া পৌঁছিলে আর আশ্রিত রাজ্যপাতের আবশ্যক নাই। কিন্তু ওদিকে মধ্য এশিয়া হইতে রুশিয়া ঠিক ইংরাজের কৌশল অবলম্বন করিয়া এক-এক পা অগ্রসর হইতেছে। সেও খানিকটা করিয়া দখল এবং খানিকটা করিয়া সন্ধিরাজ্য স্থাপন করে। এমনি করিয়া ইংরাজ ও রুশিয়া দুই সাম্রাজ্যের সন্ধিরাজ্য অক্সস নদীর দুই তীরে আসিয়া ঠেকিয়াছে। রুশিয়ার পক্ষে বোখারা এবং ইংরাজের পক্ষে আফগানিস্তান ও বেলুচিস্তান। অতএব পর্বতের আড়ালে আসিয়াও রক্ষা নাই, তাহার পরপারেও সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হয়। আফগানিস্তান ও বেলুচিস্তানের সহিত যে কোনোরূপ পাকাপাকি লেখাপড়া আছে তাহা নহে— কিন্তু ইংরাজ এই পর্যন্ত একটা সীমা নির্ধারণ করিয়া দিয়াছেন এবং পারস্য ও রুশিয়ার সহিত কথা আছে তাঁহারা সে সীমা লঙ্ঘন করিতে পারিবেন না।

এইরূপে স্বরাজ্য ও সন্ধিরাজ্যে মিলিয়া ইংরাজের আধিপত্য ক্রমশই বিপুল হইয়া উঠিতেছে। এতদূর পর্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, তাঁহারা নিজেই অনেক সময় শঙ্কা পান, কিন্তু সহসা আর অধিক বাড়িবার সম্ভাবনা নাই। কারণ, এতদিন পরে ইংরাজের প্রতাপ পূর্ব ও পশ্চিমে দুই শক্ত জায়গায় আসিয়া ঠেকিয়াছে। উভয় পার্শ্বেই সুনিয়ন্ত্রিত দুই বৃহৎ রাজ্যের কঠিন বাধা প্রাপ্ত হইয়াছে। একদিকে রুশিয়া এবং একদিকে চীন।

ভারতবর্ষের উত্তরপ্রান্তে কাশ্মীর হইতে নেপাল পর্যন্ত কোনো সন্ধিরাজ্য স্থাপনার আবশ্যক হয় নাই। কারণ সেখানে তিনটি দুর্লঙ্ঘ্য প্রাকৃতিক প্রহরী আছে। হিমালয়, তৎপশ্চাতে মধ্য এশিয়ার উচ্চ মালক্ষেত্র এবং তাহার উত্তর মঙ্গোলীয় মরুভূমি। কিন্তু উত্তর রাষ্ট্র হইতে নেপালের সহিত কোনোপ্রকার গোলযোগ ইংরাজ সহ্য করিবেন না; এবং এক সময় তিব্বত ইংরাজাশ্রিত সিকিমের ঘাড়ে আসিয়া পড়িয়াছিল বলিয়া বছর দুয়েক হইল তাহার সহিত ইংরাজের একটি ছোটোখাটো খিটিমিটি বাধিয়া উঠিয়াছিল। এদিকে পূর্বাঞ্চলে বর্মার অভিমুখে চীনের সংস্রব সম্বন্ধে ইংরাজকে অনেকটা সাবধান থাকিতে হয়। যখন বর্মা ইংরাজের হস্তে আসে নাই তখন উহা একটি ব্যবধানস্বরূপ ছিল— এখন বর্মা অধিকার করিয়া ইংরাজ চীনের অত্যন্ত নিকট প্রতিবেশী হইয়াছেন; এইজন্য সম্প্রতি ইংরাজ বর্মা ও চীনের মধ্যবর্তী ক্যাম্বোডিয়ার অর্ধস্বাধীন অধিনায়কগণের সহিত সন্ধিবন্ধনে উদ্‌যোগী হইয়াছেন।

এইরূপে হিমালয়কে তাকিয়া করিয়া দুই দিকে দুই পাশবালিশ লইয়া ইংরাজ এক মস্ত রাজশয্যা পাতিয়াছেন কিন্তু গদি যে আর বেশি অগ্রসর হইবে এমন সম্ভাবনা সম্প্রতি নাই।

কেবল ভারতবর্ষের আশপাশ নহে ওদিকে ভূমধ্যসাগরে জিব্রাল্টর, সাইপ্রেস দ্বীপ, লোহিত সমুদ্রের প্রান্তে এডেন ইংরাজ-সতর্কতার পরিচয়স্থল। এডেন ভারতসমুদ্রপথে প্রবেশ করিবার প্রথম পদনিক্ষেপস্থান। এইখানে ইংরাজ একটি দুর্গ স্থাপন করিয়াছেন। কেবল তাহাই নহে। এডেনের চতুর্দিকে বিস্তৃত ভূখণ্ড ইংরাজের আশ্রয় স্বীকার করিয়াছে। এডেনের অনতিদূরবর্তী সাকোট্রা দ্বীপ ইংরাজের আশ্রিত এবং এডেনের পূর্ব দিকে ওমান হইতে মস্কট ও পারস্য উপসাগর পর্যন্ত আরবের সমস্ত উপকূল ইংরাজের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। ইংরাজের জাহাজ সেখানকার সামুদ্রিক পুলিসের কাজ করে এবং আরব নায়কগণ পরস্পর বিবাদ বিসম্বাদে ইংরাজের মধ্যস্থতা অবলম্বন করিয়া থাকে।

ইহার উপর আবার ইজিপ্টের প্রতি ইংরাজের দৃষ্টি। সেটা পাইলে ইংরাজের রাজপথ আরও পাকা হইয়া উঠে। কিন্তু তাহার প্রতি সমস্ত য়ুরোপের সমান টান থাকাতে ইংরাজের তেমন সুবিধা দেখিতেছি না।

যাহা হউক, ভারতের রাজলক্ষ্মীকে নিরাপদে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য ইংরাজের দূরদর্শিতা দেখিলে আশ্চর্য হইতে হয়। এমন আটেঘাটে বন্ধন, এমন অন্তরে বাহিরে পাহারা, এমন ছোটো বড়ো সমস্ত ছিদ্রাবরোধ কোনো আসিয়িক চক্রবর্তীর কল্পনাতেও উদয় হইতে পারিত না।

ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ

বিখ্যাত রণসংবাদদাতা আর্চিবল্ড্ ফর্বস্ কয়েক সংখ্যক নাইন্টিন্থ সেঞ্চুরিতে অনেকগুলি রণক্ষেত্রের কাহিনী লিপিবদ্ধ করিতেছেন। ফ্রাঙ্কো-প্রুসীয় যুদ্ধের সময় জর্মান সৈন্য যখন প্যারিস নগরী অবরোধ করিয়াছিল তখন অবরুদ্ধ পুরীর মধ্যে মহা অন্নকষ্ট উপস্থিত হয়। বিস্মার্ক উপহাস করিয়া বলিয়াছিলেন, প্যারিস আপন রসে আপনি সিদ্ধ হইতেছে। ঘোড়া কুকুর খাইয়া অবশেষে ক্ষুধার জ্বালা যখন অসহ্য হইয়া উঠিল তখন প্যারিস আপনার দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিল। রাজপথে আলো নাই, গ্যাস নির্মাণ করিবার কয়লার অভাব, হোটেলে হাসপাতাল, আহারের দোকান বন্ধ, বাণিজ্যের চলাচল রহিত, পথে কেবল সারি সারি মৃতদেহ-বাহক চলিয়াছে, অধিবাসীগণ ক্ষুধায় শীর্ণ এবং অনেকেই খঞ্জ ও অঙ্গহীন। যুদ্ধাবসানে দানব্রত-ইংরাজ প্যারিসে অন্নছত্র স্থাপন করিল। কিন্তু মানী লোকেরা বরঞ্চ মরিতে পারে কিন্তু দানগ্রহণ করিতে পারে না। লেখক বলিতেছেন, বিশেষত স্ত্রীলোকদের এ সম্বন্ধে অভিমান অত্যন্ত প্রবল। হয়তো খবর পাওয়া গেল, দুই জন স্ত্রীলোক অমুক বাসায় উপবাসে দিনযাপন করিতেছে। বার্তা লইতে গেলেই তাহারা মাথা তুলিয়া খাড়া হইয়া বসে, বলে, 'ইংরাজ অতিশয় দয়ালু জাতি এবং ঈশ্বর তাহাদের কল্যাণ করুন। উপরের তলায় কতকগুলি দরিদ্র বেচারা আছে বটে, তাহারা আহারাভাবে বিশেষ কষ্ট পাইতেছে। আমাদিগকে সাহায্য করিতে চাও, সেজন্য ধন্যবাদ দিই, কিন্তু না, আমরা দানগ্রহণ করিতে পারিব না।' এই বলিয়া সেই জ্যোতির্হীন নেত্র কোটরাবিষ্ট কপোল শীর্ণ রমণী ধীরে ধীরে দ্বার রুদ্ধ করিয়া দেয়।

সাধনা
পৌষ ১২৯৮

স্ত্রী-মজুর

কারখানার মজুরদের লইয়া য়ুরোপে আজকাল শ্রমিক আন্দোলন চলিতেছে। কল-কারখানা য়ুরোপের একটা প্রকাণ্ড অংশ অধিকার করিয়াছে এবং তাহার অধিকার উত্তরোত্তর বিস্তৃত

হইতেছে। পৃথিবীর ভার বাড়িয়া উঠিলে ভূভার-হরণের জন্য অবতারের আবশ্যক হয়। কল-কারখানা য়ুরোপীয় সমাজের মধ্যে একদিকে প্রকাণ্ড চাপ দিয়া তাহার ভার সামঞ্জস্যের যদি ব্যাঘাত করে তবে স্বাভাবিক নিয়মে একটা বিপ্লব উপস্থিত হওয়া কিছুই আশ্চর্য নহে। ব্যাপারটা কতদূর পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে আমাদের পক্ষে বলা বড়োই শক্ত, কিন্তু এই কথাটা লইয়াই সর্বাপেক্ষা অধিক নাড়াচাড়া চলিতেছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

কলের প্রাদুর্ভাব হইয়া অবধি মজুরী সম্বন্ধে স্ত্রী-পুরুষের প্রভেদ অনেকটা লুপ্ত হইয়া আসিতেছে। পূর্বে বিশেষ কারুকার্যে বিশেষ শিক্ষার আবশ্যক ছিল; এবং গৃহকার্যের ভার স্বভাবতই স্ত্রীলোকদের উপর থাকাতে পুরুষদেরই বিশেষ শিক্ষা ও অভ্যাসের অবসর ছিল। তাহা ছাড়া, পূর্বে অধিকাংশ কাজ কতক পরিমাণে বাহুবলের উপর নির্ভর করিত, সেজন্য পুরুষ কারিগরেরই প্রাধান্য ছিল। কেবল চরকা কাটা প্রভৃতি অল্পায়াসসাধ্য কাজ স্ত্রীলোকের মধ্যে ছিল। এখন কলের প্রসাদে অনেক কাজেই নৈপুণ্য এবং বলের আবশ্যক কমিয়া গিয়াছে, অথচ কাজের আবশ্যক অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। এইজন্য স্ত্রীলোক এবং বালকও প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের সহিত দলে দলে মজুরী কার্যে প্রবৃত্ত হইতেছে। কিন্তু কেবল কলের কাজ দেখিলেই চলিবে না, সমাজের উপরেও ইহার ফলাফল আছে।

সমাজের হিতের প্রতি লক্ষ করিয়া কারখানার মজুরদের সম্বন্ধে য়ুরোপে দুটো-একটা করিয়া আইনের সৃষ্টি হইতেছে। কলের আকর্ষণ কথঞ্চিৎ পরিমাণে খর্ব করাই তাহার উদ্দেশ্য।

সেপ্টেম্বর মাসের 'নিউ রিভিউ' পত্রিকায় খ্যাতনামা ফরাসি লেখক জুল্‌ সিমঁ ফ্রান্সের স্ত্রী-মজুরদের সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ লিখিয়াছেন।

তিনি বলেন, ফ্রান্সে প্রথম যখন বালক মজুরদিগের বয়সের সীমা নির্দিষ্ট করিবার জন্য আইন হয় তখন একটা কথা উঠে যে, ইহাতে করিয়া সন্তানের প্রতি পিতামাতার স্বাভাবিক অধিকারে হস্তক্ষেপ করা হইতেছে। তাছাড়া কারখানাওয়ালারা ভয় দেখায় যে, শিশুসহায় হইতে বঞ্চিত হইলে কারখানার ব্যয়ভার এত বাড়িয়া উঠিবে যে, কারখানা বন্ধ হইয়া যাইবে। কিন্তু আইন পাস হইল এবং কারখানা এখনও সমান তেজে চলিতেছে। কলিকালের সকল ভবিষ্যৎ-বাণীরই প্রায় এই দশা দেখা যায়। বালক মজুরদের পক্ষে প্রথমে আট বৎসর, পরে নয় বৎসর, পরে বারো বৎসর এবং অবশেষে তেরো বৎসরের অন্যূন বয়স নির্দিষ্ট হইয়াছে।

স্ত্রী-মজুরদের খাটুনি সম্বন্ধে যখন কতকগুলি বিশেষ আইন বিধিবদ্ধ করিবার চেষ্টা হয় তখন চারি দিক হইতে তুমুল আপত্তি উত্থাপিত হয়। সকলেই বলিতে লাগিল ইহাতে স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা হরণ করা হইতেছে। যদি কোনো বয়ঃপ্রাপ্ত স্ত্রীলোক বারো ঘণ্টা খাটিতে স্বীকার করে আইনের জোরে তাহাকে দশ ঘণ্টা খাটিতে বাধ্য করা অন্যায়। অনেকে বলেন, স্ত্রী-মজুরদের সম্বন্ধে বিশেষ আইন পাস করিলে স্ত্রীজাতির প্রতি কতকটা অসম্মান প্রকাশ হয়। তাহাতে বলা হয় যেন তাহারা পুরুষের সমকক্ষ নহে।

লেখক বলিতেছেন, যখন গর্ভধারণ করিতে হয় তখন বাস্তবিকই পুরুষের সহিত স্ত্রীলোকের বৈষম্য আছে। কারখানার ডাক্তারদের জিজ্ঞাসা করিলে জানা যায় যে, স্ত্রী-মজুরদিগকে প্রায়ই দুরারোগ্য রোগ বহন করিতে হয়। গর্ভাবস্থায় কাজ করা এবং প্রসবের দুই-তিন দিন পরেই বারো ঘণ্টা দাঁড়াইয়া খাটুনি এই-সকল রোগের প্রধানতম কারণ।

কেবল আজীবন রোগ বহন এবং রুগ্‌ণ সন্তান প্রসব করাই যে স্ত্রীলোকের অনিয়ন্ত্রিত খাটুনির একমাত্র কুফল, তাহা নহে। গৃহকার্যে অনবসর সমাজের পক্ষে বড়ো সামান্য অকল্যাণের কারণ নহে। পূর্ণ মাতৃস্নেহ হইতে শিশুদিগকে বঞ্চিত করিলে তাহা হইতে যে কত অমঙ্গলের উৎপত্তি হইতে পারে তাহা কে বলিতে পারে!

লেখক বলিতেছেন, বাষ্পীয় কল স্ত্রী-পুরুষ উভয়কে নিজের কাজে টানিয়া লইয়া স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাইতেছে। স্ত্রী-মজুর এখন স্ত্রী নহে মাতা নহে কেবলমাত্র মজুর।

ইহা হইতে যতদূর অনিষ্ট আশঙ্কা করা যায়, তাহা এখনও সম্পূর্ণ পরিণত হইবার সময় পায় নাই। কেবল দেখা যাইতেছে, পুরুষদের মধ্যে মদ্যপান এবং পাশবতা ক্রমশ দুর্দান্ত হইয়া উঠিতেছে এবং স্ত্রীলোকদের মধ্যে নারীসুলভ হৃদয়বৃত্তি শুষ্ক হইয়া মানসিক অসুখ এবং সন্তানপালনে অবহেলা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে।

দেখা যাইতেছে, য়ুরোপে আজকাল প্রধান সমস্যা এই— জিনিসপত্র, না মনুষ্যত্ব, কাহার দাম বেশি?

প্রাচীন-পুঁথি উদ্ধার

য়ুরোপের মধ্যযুগে যখন এক সময় বিদ্যার আদর সহসা অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছিল তখন প্রাচীন গ্রীক ও রোমান গ্রন্থের অন্বেষণ পড়িয়া যায়। বহু চেষ্টায় ধর্মমন্দিরস্থিত পুস্তকালয় হইতে অনেক প্রাচীন গ্রন্থের উদ্ধার হয়। সেই অন্বেষণকার্য এখনও চলিতেছে। কাজটা কীরূপ অসামান্য যত্নসাধ্য তাহা নভেম্বর মাসীয় 'লেজার আওয়ার' পত্রের প্রবন্ধবিশেষ হইতে কতকটা আভাস পাওয়া যায়।

প্রাচীন পুস্তকালয় অনুসন্ধান করিয়া যতদূর বাহির হইতে পারে তাহা বোধ করি একপ্রকার সমাধা হইয়াছে। কাজটা নিতান্ত সহজ নহে। কেবল বসিয়া বসিয়া পুঁথি বাছা বিস্তর ধৈর্যসাধ্য, তাহা ছাড়া আর একটা বড়ো কঠিন কাজ আছে। পুরাকালে লিপিকরগণ অনেক সময়ে একটা পুঁথির অক্ষর মুছিয়া ফেলিয়া তাহার উপর আর একটা গ্রন্থ লিখিতেন। বহুকষ্টে সেই মোছা অক্ষর পড়িয়া পড়িয়া অনেক দুর্লভ গ্রন্থ উদ্ধার করা হইয়াছে। এইরূপ এক-একখানি পুঁথি লইয়া এক-এক পণ্ডিত বিস্তর চেষ্টায় গুটিকতক লুপ্তপ্রায় দাঁড়ি কষি বিন্দু খুঁজিয়া বাহির করিলেন, আবার আর এক পণ্ডিত দ্বিগুণতর ধৈর্যসহকারে তাহাতে আরও গুটিকতক যোগ করিয়া দিলেন। এইরূপে পতিনিষ্ঠ সাবিত্রীর ন্যায় তাঁহারা অনেক সত্যবান গ্রন্থকে যমের দ্বার হইতে ফিরাইয়া লইয়া আসিয়াছেন।

নেপল্‌সের নিকটবর্তী ক্ষেত্র খনন করিয়া হর্ক্যুলেনিয়ম্‌ নামক একটি প্রাচীন নগর ভূগর্ভমধ্যে আবিষ্কৃত হইয়াছে, সেখানে একটি বৃহৎ অট্টালিকার মধ্যে সেকালের এক পুস্তকালয় বাহির হইয়াছে। তন্মধ্যে সহস্র সহস্র পুঁথি একেবারে কয়লা হইয়া গিয়াছে। ইহার কতকগুলি পুঁথি অসামান্য যত্নে অতি ধীরে ধীরে খোলা হইয়াছিল, কিন্তু কোনো বিশেষ ভালো বহি এ পর্যন্ত বাহির হয় নাই।

উত্তর ইজিপ্টের মরুমৃত্তিকা এত শুষ্ক যে তাহার মধ্যে কোনো জিনিস সহজে নষ্ট হয় না। কাগজ সূতা বস্ত্র পাতা প্রভৃতি দ্রব্যও তিন সহস্র বৎসর পরেও অবিকৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে— যেন তাহা সপ্তাহখানেক পূর্বে পুঁতিয়া রাখা হইয়াছে। সেখানে প্রাচীন নগরীর ভগ্নাবশেষের মধ্য হইতে অনেক গ্রন্থ বাহির হইয়াছে। ইলিয়াড্‌ প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ মৃতদেহের সহিত একত্রে পাওয়া গিয়াছে।

সকলেই জানেন প্রাচীন ইজিপ্টীয়গণ বিশেষ উপায়ে মৃতদেহ রক্ষা করিতেন। অনেক সময় তাঁহারা কাগজ দিয়া এই মৃতদেহের আবরণ প্রস্তুত করিতেন। তাহার মধ্যে অধিকাংশ ছেঁড়া কাগজ। মাঝে মাঝে আস্ত কাগজও পাওয়া যায়। অনেক সাহিত্যখণ্ড, দানপত্র, হিসাব, খৎ, চিঠি এই উপায়ে হস্তগত হইয়াছে। ভাবিয়া দেখিলে হৃদয় স্তম্ভিত হয়, কত সহস্র বৎসর পূর্বেকার কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আশা-ভরসা, কত বৈষয়িক বিবাদ-বিসম্বাদ, দর-দাম, মামলা-মোকদ্দমা আজ বিস্মৃত মৃতদেহ আচ্ছন্ন করিয়া পড়িয়া আছে।

আমাদের দেশেও কি অনেক প্রাচীন পুঁথি নানা গোপন স্থানে পুনরাবিষ্কারের প্রতীক্ষা করিয়া নাই? কিন্তু কাহার সেদিকে দৃষ্টি আছে? যে বিদেশীরা আমাদের খনি খুঁড়িয়া সোনা তুলিতেছে,

মাটি চষিয়া নব নব পণ্যদ্রব্য উৎপন্ন করিতেছে, তাহারাই পুঁথিরাশির মধ্য হইতে আমাদের লুপ্ত শাস্ত্র উদ্ধার করিতেছে এবং সেইগুলিই অলসভাবে নাড়িয়া চাড়িয়া, তাহাদেরই কৃত তর্জমা পড়িয়া আমরা এক-একজন আর্য দিগ্‌গজ হইয়া উঠিতেছি এবং মনে করিতেছি পৃথিবীতে আমাদের তুলনা কেবল আমরাই।

ক্যাথলিক সোশ্যালিজ্‌ম্

য়ুরোপে কিছুদিন হইতে সোশ্যালিস্ট নামক এক দলের অভ্যুদয় হইয়াছে তাহারা সর্বসাধারণের মধ্যে ধন সমভাবে বিভাগ করিয়া দিতে চায়। এ সম্বন্ধে ফরাসি পণ্ডিত রেনাঁ বলিতেছেন, বর্তমানকালে, এ একটি বিষম সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে; একদিকে সভ্যতা বজায় রাখিতে হইবে অন্য দিকে সভ্যতার সমস্ত সুখ-সম্পদ সাধারণের মধ্যে সমানভাবে বাঁটিয়া দিতে হইবে। কথাটা শুনিবামাত্রই স্বতোবিরোধী বলিয়া বোধ হয়; এক পক্ষে উত্থান এবং অপর পক্ষের পতন এ যেন প্রকৃতি এবং সমাজের মূল নিয়ম।

প্রাচীন সমাজে যখন হীনাবস্থার লোক সর্ব বিষয়েই হীনাবস্থায় ছিল তখন এ সম্বন্ধে কোনো কথা উঠে নাই। কিন্তু আজকাল য়ুরোপে সকলেরই রাজপুরুষ নির্বাচনের অধিকার জন্মিয়াছে। প্রত্যেকেরই আত্মমর্যাদাবোধ জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে। তাহারা বলে, আমরা সকলেই সমান রাজা কিন্তু আমাদের সমান রাজত্ব কই? তাহারা যে সংখ্যায় বেশি এবং তাহাদের হাতে অনেক ক্ষমতা আছে, এ কথা তাহারা প্রতিদিন বুঝিতেছে; এইজন্য সমস্যা প্রতিদিন গুরুতর এবং তাহার মীমাংসাকাল উত্তরোত্তর নিকটবর্তী হইতেছে।

এতকাল এই সোশ্যালিজ্‌ম্ মত প্রায় নাস্তিকতার সহচরস্বরূপে ছিল। প্রায় সমস্ত সোশ্যালিস্ট পত্রই নাস্তিকতার গোঁড়ামি প্রচার করিয়া আসিতেছেন। সম্প্রতি একটা পরিবর্তন দেখা যাইতেছে। রোমান-ক্যাথলিক ধর্মমণ্ডলী এই মতের প্রতি পক্ষপাত করিতেছে।

ইহাতে সোশ্যালিজ্‌মের বল কত বাড়িয়া উঠিতেছে তাহা বলা বাহুল্য। রোমান-ক্যাথলিকমণ্ডলীর অধিপতি পোপ লিয়ো অল্পদিন হইল তীর্থযাত্রী একদল ফরাসি মজুরদের সম্বোধন করিয়া আপনার অনুকূল মত প্রকাশ করিয়াছেন।

ইহা একটা লক্ষণস্বরূপ ধরা যাইতে পারে। রোমান-ক্যাথলিক সম্প্রদায় প্রায়ই প্রবল পক্ষকে আশ্রয় করিয়া বললাভ করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে। রোমের মোহন্তটি য়ুরোপের নাড়ী টিপিয়া বসিয়া আছেন। সোশ্যালিজ্‌মের আসন্ন উন্নতি ও ব্যাপ্তি নিশ্চিত অনুমান না করিলে তাঁহারা যে সহসা ইহার প্রতি প্রকাশ্য প্রসন্নতা দেখাইতেন ইহা তেমন সম্ভবপর বোধ হয় না; তাঁহারা এমন বালুকার 'পরে কখনোই চরণক্ষেপ করিতেন না যাহা দুই দণ্ডে ধসিয়া যাইবে।

সাধনা
মাঘ ১২৯৮

আমেরিকানের রক্তপিপাসা

বিখ্যাত আমেরিকান কবি লোয়েল তাঁহার কোনো কবিতায় লিখিয়াছেন, আমেরিকার দক্ষিণ হইতে উত্তর সীমা পর্যন্ত এই সমগ্র বৃহৎ জাতি রক্তের গন্ধ ভালোবাসে। একজন ইংরাজ লেখক নবেম্বর মাসের 'কন্টেম্পোরারি রিভিয়ু' পত্রিকায় এই কথার সাক্ষ্য দিয়াছেন। তিনি বলেন, যাহারা কখনো আমেরিকায় পদার্পণ করে নাই, বহি পড়িয়া আমেরিকান সভ্যতা সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিয়াছে তাহারা কল্পনা করিতে পারে না আমেরিকায় জীবনের মূল্য কত যৎসামান্য এবং

সেখানকার লোকেরা খুন অপরাধকে কত তুচ্ছ মনে করে। প্রথমত, সকল দেশেই যে-সকল কারণে কম-বেশি খুন হইয়া থাকে আমেরিকাতেও তাহা আছে। দ্বিতীয়ত, সেখানে অধিকাংশ লোকেই অস্ত্র বহন করিয়া বেড়ায় এবং সামান্য কারণে তাহা ব্যবহার করিতে কুণ্ঠিত হয় না। দুই-একটা দৃষ্টান্ত দেখানো যাইতে পারে। কালিফর্নিয়া বিভাগের সুপ্রীমকোর্টের এক জজ রেলোয়ে স্টেশনের ভোজনশালায় খাইতে বসিয়াছেন, আদালতের আর-একটি উচ্চ কর্মচারী তাঁহার সঙ্গী ছিল। ইতিমধ্যে এক বারিস্টার পূর্বকৃত অপমান স্মরণ করিয়া জজের সহিত বিবাদ বাধাইয়া দেন, এমন-কি, তাঁহার গায়েও হাত তোলেন। অন্য কর্মচারীটি তৎক্ষণাৎ পিস্তল ছুড়িয়া বারিস্টারকে বধ করিলেন, এমন-কি, সে মরিয়া পড়িয়া গেলেও তাহাকে আর এক গুলি মারিলেন। বারিস্টারের স্ত্রী চিৎকার করিয়া গাড়িতে ফিরিয়া গেলেন। ইঁহারা তাঁহাকে ধরিয়া তাঁহার মাল অনুসন্ধান করিয়া একটি পিস্তল বাহির করিলেন। জুরিরা তাহাই দেখিয়া অপরাধীকে খালাস দিল; কারণ এই পিস্তল দিয়া জজকে খুন করা নিতান্ত অসম্ভব ছিল না। সকলেই এই আইনের, এই বিচারের, এই কর্মচারীর সতর্কতার বিস্তর প্রশংসা করিল। পুলিসের হাতেও সর্বদা অস্ত্র থাকে এবং তাহাদের দ্বারা শত শত অন্যায় খুন ঘটিয়া থাকে। নিউইয়র্ক শহরে একজন পুলিসম্যান খবর পাইল একজন চোর অমুক রাস্তা দিয়া পলাইতেছে। অনুসন্ধান করিতে গিয়া দেখিল, একজন লোক কোনো বাড়ির সিঁড়ির উপর ঘুমাইতেছিল, গোলেমালে জাগিয়া উঠিয়া পলাইতে উদ্যত হইল। পুলিসম্যান তৎক্ষণাৎ তাহাকে লক্ষ্য করিয়া গুলি করিল। গুলি দৈবাৎ তাহাকে না লাগিয়া পথের অপর প্রান্তে আর-একজন পথিককে সাংঘাতিকরূপে আহত করিল। অবশেষে পলাতক ধরা পড়িলে জানা গেল তাহার কোনো অপরাধ ছিল না; সে কেবল ভয়ে দৌড় দিয়াছিল। বিচারে স্থির হইল পুলিসম্যান তাহার কর্তব্য পালন করিয়াছিল। যে দেশের আইনে এইরূপ ব্যবস্থা, পুলিসের এইরূপ ব্যবহার, সে দেশের সাধারণ লোকেরাও যে অস্ত্র প্রয়োগ সম্বন্ধে কোনোরূপ সংযম অভ্যাস করে না, তাহা বেশ অনুমান করা যায়। দেশের সর্বত্রই পরিবারগত বিদ্বেষ, ব্যক্তিগত বিবাদ, এমন-কি, অপরিচিত ব্যক্তিদের মধ্যে সামান্য বচসাতেই খুনাখুনি ঘটিয়া থাকে। প্রায় মাঝে মাঝে এমন ঘটিয়া থাকে, পথে, কর্মস্থানে অথবা সভাস্থলে দুই বিপক্ষে সাক্ষাৎ হইল, কেহ কোনো কথা না বলিয়া পরস্পরের প্রতি পিস্তল লক্ষ্য করিল, একজন অথবা দুইজনেই মরিয়া পড়িয়া গেল। কেবল ছোটোলোকের মধ্যে নহে, শিক্ষিত এবং পদস্থ ব্যক্তিদের মধ্যেও এরূপ ঘটিয়া থাকে। অনেক ভদ্র খুনী সমাজের মধ্যে সম্মানের সহিত বাস করিতেছে; তাহারাও নিজের অপরাধের জন্য লজ্জিত নহে, তাহাদের বন্ধু এবং সমাজও তাহাদের জন্য লজ্জা অনুভব করে না।

আমেরিকায় বালকে, এমন-কি, স্ত্রীলোকেও অনেক খুন করিয়া থাকে। লেখক রাস্তা দিয়া চলিতেছিলেন, দেখিলেন, একজন ভদ্রবেশধারিণী স্ত্রীলোকের সম্মুখে আর একজন ফিট্‌ফাট্ কাপড় পরা ভদ্রলোক যেমন দাঁড়াইল, অমনি দুই-এক কথার পরেই স্ত্রীলোকটি এক পিস্তল বাহির করিয়া সম্মুখবর্তী লোকটির প্রতি পরে পরে তিন-চারটি গুলি চালাইয়া দিল, লোকটা রাস্তায় পড়িয়া ছটফট করিতে লাগিল। লেখক খবরের কাগজ পড়িয়া জানিলেন, মৃত ব্যক্তিটি বিখ্যাত দালাল; তাহার নিকটে কোনো সূত্রে স্ত্রীলোকটির টাকা পাওনা ছিল কিন্তু আইনের দ্বারা বাধ্য করিবার কোনো উপায় না পাইয়া খুন করিয়া সে মনের ক্ষোভ মিটায়। মেয়েটির সাহস এবং তাহার চমৎকার লক্ষ্য সম্বন্ধে সকলেই ধন্য ধন্য করিতেছে। আমেরিকার এরূপ স্ত্রীলোকের বিশেষ সমাদর আছে। পুরুষেরা প্রায়ই বলিয়া থাকে, যে রমণীর মধ্যে কিঞ্চিৎ পরিমাণে শয়তানের অংশ নাই, তাহার এক কড়াও মূল্য নাই।

ইহা ছাড়া বিনা দোষে কালা আদমি খুনের যে দুটা-চারটা দৃষ্টান্ত লেখক প্রকাশ করিয়াছেন আমাদের পাঠকদের জন্য তাহা উদ্ধৃত করা বাহুল্য।

লেখক আমেরিকান জাতীয় চরিত্রগত এই বর্বরতার যে একটি প্রধান কারণ নির্দেশ

করিয়াছেন তাহা বিশেষ অবধানযোগ্য। তিনি বলেন, বহুকাল পর্যন্ত আমেরিকায় যে দাসত্ব প্রথা প্রচলিত ছিল তাহাতে করিয়া সেখানকার অধিবাসীদের মনুষ্যত্ব নষ্ট করিয়াছে। দাসদের প্রতি যথেচ্ছ অত্যাচারে অভ্যস্ত হইলে ন্যায়ান্যায় বোধ হ্রাস হইয়া মনুষ্যত্বের সংযম দূর হয়। অবশেষে চরিত্রের সেই উচ্ছৃঙ্খলতা তাহাদের নিজেরই সর্বনাশ সাধন করিতে থাকে।

আমাদের বিবেচনায় লেখক একটি কারণের উল্লেখ করেন নাই। এককালে আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের প্রতি নির্দয় উপদ্রবও যে এই চরিত্রগত পশুত্বের একটি মূল কারণ তাহাতে সন্দেহ নাই। যেখানে অপ্রতিহত পশুবলচালনার স্থান, সেখানেই মানুষের ভয়ানক বিপদ। স্বার্থ অথবা আত্মগৌরবের অনুরোধে নিরুপায়ের প্রতি আপনার কর্তৃত্ব প্রচার করিতে গিয়া নিজেরই অমূল্যধন স্বাধীনতাপ্রিয়তা ম্লান হইয়া আসে। ভারতশাসন ভারতবাসীদের পক্ষে যেমনই হউক ইংরাজের পক্ষে সুশিক্ষার কারণ নহে। আমাদের প্রতি তাঁহাদের যে একটি অনুরাগহীন অবহেলার ভাব সহজেই উদয় হইতেছে, তাহাতে করিয়া তাঁহাদের চরিত্রের উচ্চ আদর্শ অল্পে অল্পে অবনত হইতেছে সন্দেহ নাই। ফিট্‌জ্‌জেমস্‌ স্টীফন্‌, স্যার লেপেল গ্রিফিন প্রভৃতি অনেক অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান লেখকের রচনায় একপ্রকার কঠিন নিষ্ঠুরতা, একটা নৈতিক অধঃপতনের লক্ষণ দেখা যায়, যাহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, ভারতবর্ষে অসীম ক্ষমতা-মদিরার স্বাদ পাইয়া তাঁহাদের এই দুর্দশা ঘটিয়াছে। মনুষ্যজাতির মধ্যে একটা বিষ আছে; যখন এক জাতি আর-এক জাতিকে আহার করিতে বসে তখন ভক্ষ্য জাতি মরে এবং ভক্ষক জাতির শরীরেও বিষ প্রবেশ করে। আমেরিকানদের রক্তের মধ্যে বিষ গেছে।

সাধনা
ফাল্গুন ১২৯৮

উন্নতি

দিনেমার দার্শনিক হারাল্‌ড্‌ হ্যফ্‌ডিং জুলাই মাসের 'মনিস্ট্‌' পত্রিকায় মঙ্গলের মূলতত্ত্ব নামক এক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার যে অংশ ভারতবর্ষীয় পাঠকদের পক্ষে বিশেষ অবধানের যোগ্য, আমরা সংকলিত করিয়া দিলাম।

যে-সকল জীবের চিত্তবৃত্তি নিতান্ত আদিম অবস্থায় আছে তাহাদের পরিবর্তন সহজে ঘটে না। তাহাদের জীবনধারণের সামান্য অভাবগুলি যতদিন পূরণ হইতে থাকে ততদিন তাহারা একভাবেই থাকে। ইন্‌ফ্যুসোরিয়া, রিজোপড্‌ প্রভৃতি নিম্নতম শ্রেণীর জন্তুগণের আজও যে দশা, যুগ-যুগান্তর পূর্বেও অবিকল সেই দশা ছিল। তাহাদের আভ্যন্তরিক অবস্থার সহিত বাহ্য অবস্থার এমনি সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য যে, কোনোরূপ পরিবর্তনের কোনো কারণ ঘটে না। মনুষ্যের মধ্যেও ইহার উদাহরণ পাওয়া যায়। যাহাদের অভাববোধ অল্প, যাহারা আপনার চারি দিকের অবস্থার সহিত সম্পূর্ণ বনিবনাও করিয়া থাকিতে পারে তাহাদিগকে পরিবর্তন এবং উন্নতির দিকে প্রবর্তিত করিবার কোনোরূপ উত্তেজনা থাকে না। সংকীর্ণ সীমার মধ্যে সংকীর্ণ মনোবৃত্তি লইয়া তাহারা নিশ্চিন্তে কালযাপন করিতে থাকে। জটিল এবং বিচিত্র অবস্থাপন্ন মানবদের অপেক্ষা ইহাদের সুখ-সন্তোষ অনেকটা সম্পূর্ণ এবং অবিমিশ্র তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ছোটো পাত্র বড়ো পাত্র অপেক্ষা ঢের কম জলে ঢের বেশি পরিপূর্ণতা লাভ করিতে পারে।

তবে তো সেই ছোটো পাত্র হওয়াই সুবিধা। জীবনের কেবল কতকগুলি একান্ত আবশ্যক পূরণ করিয়া হৃদয়ের কেবল কতকগুলি আদিম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিয়া নির্বিকার শান্তি লাভ করাই তো ভালো। ফ্যুজিদ্বীপবাসীরা তো বেশ আছে— দক্ষিণ আমেরিকার আদিম নিবাসীরা কদলীবনের মধ্যে তো চিরকাল সমভাবেই কাটাইয়াছিল, সভ্যতার নব নব অশান্তি এবং বিপ্লবের কোনো ধার তাহারা ধারে না।

কিন্তু সে আক্ষেপ এখন করা বৃথা। সভ্য জাতিদের পক্ষে এরূপ জীবনযাত্রা নিতান্ত অসহ্য। তাহার কারণ, সভ্যতাবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে একটি নূতন মনোবৃত্তির উদ্ভব হইয়াছে, তাহার নাম কাজ করিবার ইচ্ছা, উন্নতির ইচ্ছা। এক কথায়, তাহাকে অসন্তোষ বলা যাইতে পারে। এ মনোবৃত্তি সকল জাতির সকল অবস্থায় থাকে না।

প্রথম প্রথম বাহিরের তাড়ায় মানুষ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে থাকে। ক্রমে, কাজ করিতে করিতে অন্তরের মধ্যে কর্মানুরাগ নামক একটা স্বতন্ত্র শক্তির সঞ্চার হয়; তখন বাহিরের উত্তেজনার অভাব সত্ত্বেও সে ভিতর হইতে আমাদিগকে অহর্নিশি কাজে প্রবৃত্ত করাইতে থাকে। তখন মানুষ বাহিরের শাসন হইতে অনেকটা মুক্তি লাভ করে; বাহ্য অভাব মোচন হইলেও অন্তরের সেই নবজাগ্রত শক্তি বিশ্রাম করিতে চাহে না, তখন নব নব উন্নত আদর্শের সৃষ্টি হইতে থাকে; তখন হইতে আমাদের পক্ষে নির্জীব নিস্পন্দভাবে থাকা অসাধ্য হইয়া উঠে, এবং তাহাতে আমরা যথার্থ সুখও পাই না।

জাতীয় আত্মরক্ষার পক্ষে এই প্রবৃত্তির একটা উপযোগিতা আছে, তাহা বিচার করিয়া দেখা কর্তব্য। প্রকৃতিতে সম্পূর্ণ স্থায়িত্ব কোথাও নাই। তোমার অব্যবহিত চতুষ্পার্শ্বে যদি বা পরিবর্তন তেমন খরস্রোতে প্রবাহিত না হয় তথাপি অনতিদূরে কোনো-না-কোনো জাতির মধ্যে পরিবর্তন ঘটিতেছেই, সুতরাং কোনো-না-কোনো সময়ে তাহাদের সহিত জীবিকাযুদ্ধের সংঘর্ষ অনিবার্য। সে সময়ে, যাহারা বহুকাল স্থিরভাবে সন্তুষ্টচিত্তে আছে তাহাদের পক্ষে নূতন আপৎপাতের বিরুদ্ধে নূতন পরিবর্তন সহজসাধ্য হয় না; যাহারা কর্মানুরাগী উদ্যোগী জাতি তাহারাই পরিবর্তনে অভ্যস্ত এবং সকল সময়েই প্রস্তুত, সুতরাং এই চঞ্চল সংসারে টিকিবার সম্ভাবনা তাহাদেরই সব চেয়ে বেশি।

কেবল জাতি নহে, ব্যক্তিবিশেষের পক্ষেও সংকীর্ণ সীমার মধ্যে আপনাকে সম্পূর্ণ নিহিত করিয়া সুখী হওয়ার অনেক বিপদ আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপে দেখা যায়, ঘরের আদুরে ছেলে হইয়া চিরকাল খোকা হইয়া থাকার অনেক সুবিধা থাকিতে পারে; কিন্তু চিরদিন ঘরের মধ্যে কাটাইয়া চলে না, এক সময়ে কঠিন সংসারের সংস্রবে আসিতে হয় তখন নিতান্ত নিঃসহায় হইয়া পড়িতে হয়। সংকীর্ণ সম্পূর্ণতা লাভ অপেক্ষা বৃহৎ বিকাশের উদ্যম ভালো।

উন্নতি বলিতে সর্বকামনার পর্যবসানরূপিণী একটা নির্বিকার নিরুদ্যম অবস্থা বুঝায় না। ভবিষ্যতের নব নব মঙ্গল সম্ভাবনার জন্য নব নব শক্তি সঞ্চয় করিয়া চলাই উন্নতি। সেই-সমস্ত শক্তির উত্তেজনায় ক্রমাগত নূতন নূতন উদ্দেশ্যের পশ্চাতে নূতন নূতন চেষ্টা ধাবিত হইতে থাকে। সেইসঙ্গে কেবল উদ্যমেই কার্যে বিকাশেই একটা সুখ জাগ্রত হইয়া উঠে, সমগ্র প্রকৃতির পরিচালনাতেই একটা গভীর আনন্দ লাভ হয়। সেই আনন্দে সভ্য জাতিরা এমন সকল দুঃসহ কষ্ট সহ্য করিতে পারে যাহার পেষণে অসভ্য জাতিরা মারা পড়ে। এই যে একটি স্বতন্ত্র উন্নতির প্রবৃত্তি, এই যে কর্মের প্রতিই একটা স্বতন্ত্র অনুরাগ, ইহা লইয়াই সভ্য ও অসভ্য জাতির মধ্যে প্রধান প্রভেদ।

সুখ দুঃখ

যাহারা রীতিমতো বাঁচিতে চাহে, মুমূর্ষুভাবে কালযাপন করিতে চাহে না, তাহারা দুঃখ দিয়াও সুখ কেনে। হ্যফ্‌ডিং বলেন ভালোবাসা ইহার একটি দৃষ্টান্তস্থল। ভালোবাসাকে সুখ বলিবে না দুঃখ বলিবে? গেটে তাঁহার কোনো নাটকের নায়িকাকে বলাইয়াছেন যে, ভালোবাসায়

কভু স্বর্গে তোলে, কভু হানে মৃত্যুবাণ।

অতএব সহজেই মনে হইতে পারে এ ল্যাঠায় আবশ্যক কী? কিন্তু এখনও গানটা শেষ হয় নাই। সুখ দুঃখ সমস্ত হিসাব করিয়া শেষ কথাটা এইরূপ বলা হইয়াছে—

সেই শুধু সুখী, ভালোবাসে যার প্রাণ।

ইহার মর্ম কথাটা এই যে, ভালোবাসায় হৃদয় মন যে একটা গতি প্রাপ্ত হয় তাহাতেই এমন একটা গভীর এবং উদার পরিতৃপ্তি আছে যে, প্রবল বেগে সুখ-দুঃখের মধ্যে আন্দোলিত হইয়াও মোটের উপর সুখের ভাবই থাকিয়া যায়, এমন-কি, এই আন্দোলনে সুখ বল প্রাপ্ত হয়।[1]

এই সুখের সহিত দুইটি মানসিক কারণ লিপ্ত আছে। প্রথমত, দুঃখ যে পর্যন্ত একটা বিশেষ সীমা না লঙ্ঘন করে সে পর্যন্ত সুখের পশ্চাতে থাকিয়া সুখকে প্রস্ফুটিত করিয়া তোলে। এই কারণে, যাহারা সুখের গাঢ়তাকে প্রার্থনীয় জ্ঞান করে তাহারা অবিমিশ্র সামান্য সুখের অপেক্ষা দুঃখমিশ্রিত গভীর সুখের জন্য অধিকতর সচেষ্ট। দ্বিতীয়ত, দুঃখেরই একটা বিশেষ আকর্ষণ আছে। কারণ, দুঃখের দ্বারা হৃদয়ের মধ্যে যে একটা প্রবল বেগ, সমস্ত প্রকৃতির একটা একাগ্র পরিচালনা উপস্থিত হয় তাহাতেই একটা বিশেষ পরিতৃপ্তি আছে। ক্ষমতার চালনামাত্রই নিতান্ত অপরিমিত না হইলে একটা আনন্দ দান করে। বিখ্যাত দার্শনিক ওগুস্ত্ কোঁৎ তাঁহার প্রণয়িনীর মৃত্যুর পরে এই বলিয়া শোক প্রকাশ করিয়াছিলেন, 'আমি মরিবার পূর্বে মনুষ্যপ্রকৃতির সর্বোচ্চ মনোভাব যে অনুভব করিতে পারিয়াছি সে কেবল তোমারই প্রসাদে। এই মনোভাবের সঙ্গে সঙ্গে যত কিছু কঠিনতম যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছি সেইসঙ্গে এ কথা সর্বদাই মনে উদয় হইয়াছে যে, হৃদয়কে পরিপূর্ণ করাই সুখের একমাত্র উপায়, তা সে যদি দুঃখ দিয়া তীব্রতম যন্ত্রণা দিয়া হয় সেও স্বীকার।'— আমরা যদি দুঃখ হইতে সম্পূর্ণ অব্যাহতি পাইতে চাই তবে কিছুতেই ভালোবাসিতে পারি না। কিন্তু ভালোবাসাই যদি সর্বোচ্চ সুখ হয় তবে দুঃখের ভয়ে কে তাহাকে ত্যাগ করিবে! কর্মানুষ্ঠানের প্রবলতা ও জীবনের পরিপূর্ণতার সঙ্গে সঙ্গে বিস্তর ব্যয়, মুহুর্মুহু ঘাত-প্রতিঘাত এবং অবিশ্রাম আন্দোলন আছেই। কিন্তু জীবনের সর্বোচ্চ সম্পদগুলি বিনামূল্যে কে প্রত্যাশা করে!

মনস্তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতের কথা উপরে প্রকাশিত হইল এখন কবি চণ্ডিদাসের দুটি কথা উদ্ধৃত করিয়া শেষ করি। রাধিকা যখন অসহ্য বেদনায় বলিতেছেন—

'বিধি যদি শুনিত, মরণ হইত,
ঘুচিত সকল দুখ'

তখন—

চণ্ডীদাস কয় 'এমতি হইলে
পিরীতির কিবা সুখ!'

দুঃখই যদি গেল তবে সুখ কিসের!

সাধনা
চৈত্র ১২৯৮

সোশ্যালিজম্

বিলাতি খবরের কাগজে দেখা যায় য়ুরোপে সোশ্যালিস্ট সম্প্রদায়ের উপদ্রব প্রতিদিন গুরুতর হইয়া উঠিতেছে। ইহাদের দ্বারা সেখানে আজ হউক বা দুই দিন পরে হউক, একটা প্রচণ্ড সামাজিক বিপ্লব ঘটা অসম্ভব নহে। অতএব সোশ্যালিজম্ মতটা কী তাহা আলোচনা করিয়া দেখিতে কৌতূহল জন্মে।

---

[1] বলা আবশ্যক, এ-সকল কথা বলিষ্ঠ এবং মহৎহৃদয় লোকদের কথা। যাহারা দুর্বল এবং ক্ষুদ্র তাহারা এত দুঃখ এবং এত সুখ সহিতে পারে না, সুতরাং তাহাদের পক্ষে দুঃখের পরিণামই অধিক হইয়া পড়ে। এইজন্য তাহারা বলিয়া থাকে, আমার সুখে কাজ নাই দুঃখেও কাজ নাই আমি স্বস্তি পাইলেই বাঁচি।

সোশ্যালিস্টদিগের মধ্যে যে মতের সম্পূর্ণ ঐক্য আছে তাহা নহে; এই কারণে, তাহাদিগের সকল মতগুলির বিস্তারিত সমালোচনা সহজসাধ্য নহে। আমরা এ স্থলে কেবল বেল্‌ফর্ট্ ব্যাক্স্ সাহেবের গ্রন্থ হইতে তাঁহার মত সংকলন করিয়া দিতেছি।

কিছুকাল পূর্বে ইংলন্ডে যাঁহারা কোনো কোনো প্রচলিত নিয়ম সংশোধন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে ও তাঁহাদের বর্তমান মতাবলম্বীদিগকে 'লিবারাল্' কহিয়া থাকে।

এই লিবারাল্‌দিগের সহিত সোশ্যালিস্টদিগের কোথায় প্রভেদ ব্যাক্স্ সাহেব তাহারই আলোচনা করিয়াছেন।

তিনি বলেন, এককালে রাজা ও প্রধানবর্গের সর্বময় কর্তৃত্ব ছিল; তাহারই বিরুদ্ধে যে চেষ্টা হয় তাহাকেই 'লিবারালিজ্‌ম্' বলা হইয়া থাকে। প্রজাদের মধ্যে প্রত্যেকেরই স্বাধীন অর্থসঞ্চয় এবং সম্পত্তি উপার্জনের অধিকার এই চেষ্টার দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছে। এই লিবারাল্‌দের সাহায্যে এমন সকল নিয়ম প্রচলিত হয় যাহাতে সকলের বিষয়-সম্পত্তি সম্পূর্ণ সুরক্ষিত হইতে পারে। কিন্তু এখন আবার এই স্বাধীনতা নূতন অধীনতার কারণ হইয়া উঠিয়াছে। এখন ধনের কর্তৃত্ব সর্বময় হইয়া উঠিতেছে। ধনকে সুরক্ষিত করিয়া লিবারালিজ্‌ম্ কেবল ধনীরই সুবিধা করিতেছে; সর্বসাধারণকে তাহার সম্যক্ সুখ ও উন্নতি হইতে বঞ্চিত করিতেছে।

সোশ্যালিজ্‌ম্ ধনীর কর্তৃত্বের স্থলে মানব-সাধারণের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহে।

কলের সৃষ্টি হওয়ার পর হইতে একটি নূতন বিপ্লবের সূত্রপাত হয়। কলের দ্বারা দুইটি দলের উৎপত্তি হইয়াছে। এক কলওয়ালা নব্য উন্নতিশীল, আর এক, কর্মচ্যুত প্রাচীন কারিকরের দল।

এক সময় ছিল, যখন কারিকরের ব্যক্তিগত নৈপুণ্যের উপরে পণ্য নির্ভর করিত। তখন, তাহাদের অপেক্ষাকৃত স্বাধীনতা ছিল। আপনার বুদ্ধি ও কৌশলের জোরে কারিকর অনেকটা নিজের গুমরে থাকিতে পারিত।

এখন কলে পণ্য উৎপন্ন এবং বিতরিত হওয়ায় কারিকরের নৈপুণ্যজাত স্বাধীনতার স্বভাবতই হ্রাস হইয়া কলওয়ালা ধনীর ক্ষমতা উত্তরোত্তর বাড়িয়া উঠিয়াছে।

সোশ্যালিস্ট্‌রা চাহে যে, এই পণ্য উৎপাদন ও বিতরণ কোনো বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তির হস্তে না থাকিয়া সাধারণ সমাজের হস্তে পড়ে। তাহারা বলে, ধন উৎপাদন এবং বণ্টন সমস্ত সমাজের কাজ। সম্প্রতি কেবল সম্পত্তিবান ব্যক্তিদের মর্জি এবং স্বার্থের উপরে তাহার নির্ভর থাকাতে জনসাধারণ স্ব স্ব অবস্থার সম্পূর্ণ উন্নতির সম্ভাবনা হইতে বঞ্চিত হইতেছে।

ধনের অধীনতা সামান্য নহে। ডাকাত যদি পিস্তল দেখাইয়া বলে 'টাকা দে নয় মারিব' সেও যেমন, তেমনি কলওয়ালা মহাজন যখন বলে 'হয় এমনি করিয়া খাট্, নয় মর্' সেও তদ্রূপ। যে নির্ধন সে একেবারে নিরুপায়। যখন ধন এবং জমি সাধারণের মধ্যে বিলি হইবে তখন এমন দৌরাত্ম্য হইতে পারিবে না।

তাহা ছাড়া কাজ এখনকার চেয়ে অনেক ভালো হইবে। দৃষ্টান্ত। মনে করো। সোশ্যালিস্ট বিধানমতে কোনো এক লোকের উপর সরকারি রুটি তৈয়ার করিবার ভার দেওয়া হইয়াছে। লোকটা রুটি যদি খারাপ করিয়া গড়ে তবে তাহার নিজের এবং সমাজের অসুখের কারণ হইবে। কাজে গোঁজামিলন দিয়া অথবা সস্তা মালমসলা যোগ করিয়া তাহার কোনো লাভ নাই— কারণ, সে বেতনও পায় না মূল্যও পায় না— সমাজের আদেশমতে কাজ করে। অতএব, যখন মন্দ রুটি গড়িয়া তাহার কোনো লাভ নাই এবং ভালো রুটি গড়িলে তাহার নিজের এবং সমস্ত সমাজের পরিতোষের কারণ হইবে তখন ভালো রুটি গড়া তাহার পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু বণিক মহাজনের স্বার্থই এই যত সস্তায় কাজ করিতে পারে— অর্থাৎ নিঃস্বার্থভাবে জিনিসটা ভালো করিবার দিকে তাহার কোনো দৃষ্টি থাকে না।

অনেকে বলিয়া থাকেন ধনের সহিত স্বাধীনতার অবিচ্ছেদ্য যোগ। যাহার ধন নাই তাহাকে স্বভাবতই নানা বিষয়ে অধীনতা স্বীকার করিতে হইবে, অতএব নির্ধনকে স্বাধীনতা দিবার জন্য

সোশ্যালিস্টগণ যে পণ করিয়াছেন তাহা প্রকৃতিবিরুদ্ধ। গ্রন্থকর্তা তদুত্তরে বলেন ধনহীন স্বাধীনতা অসম্ভব, কথাটা সত্য। সেইজন্যই ধন সাধারণের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া বিশেষ আবশ্যক— কারণ, তাহা ব্যতীত স্বাধীনতা সর্বসাধারণের মধ্যে কিছুতেই ব্যাপ্ত হইতে পারে না।

অতএব দেখা যাইতেছে সর্বসাধারণের স্বাধীনতাই সোশ্যালিজ্‌মের উদ্দেশ্য। এখন, কথা উঠিতে পারে যে, উদ্দেশ্য যাহাই হউক ফলে বিপরীত হইবে। কারণ, এখন স্বার্থের তাড়নায় লোকে খাটিতেছে এবং সমাজের কাজ চলিয়া যাইতেছে, কিন্তু ধনের প্রলোভন চলিয়া গেলে সমাজের তাড়নায় লোককে কাজ করিতেই হইবে, সে পীড়ন কম নহে। সকলেই ইচ্ছামতো আলস্যে নিযুক্ত থাকিলে কখনো সমাজ টিকিতে পারে না, অতএব একটা কোনোরূপ পীড়নের প্রথা থাকিবেই। গ্রন্থকার বলেন, একেবারে কোনোরূপ পীড়ন ব্যতীত সংসার চলে না, এখনকার বিধানমতে সমাজে অন্ধ পীড়নের প্রাদুর্ভাব, কিন্তু সোশ্যালিজ্‌মের নিয়মে সমাজে যুক্তি ও বিবেচনাসংগত যথাবশ্যক সুসংযত পীড়ন প্রচলিত হইবে। এবং স্বার্থের সংস্রব না থাকাতে সে পীড়ন ক্রমশ হ্রাস হইতে থাকিবে এরূপ আশা করা যায়।

ব্যাক্‌সাহেব বলেন, আদিমকালে সাধারণের মধ্যে ধনের বিভাগ ছিল, সভ্যতার প্রাদুর্ভাবে ক্রমে তাহার ব্যত্যয় হয়; ক্রমে সকলের স্ব স্ব প্রধান হইবার বাসনা জন্মে, প্রধান হইতে চেষ্টা করিলেই স্বভাবত দুই বিরোধী প্রতিদ্বন্দ্বী দলের সৃষ্টি হয়। এইরূপে সামাজিক ঐক্য নষ্ট হইয়া পার্থক্যের জন্ম হইতে থাকে। পূর্বে কেবলমাত্র বহির্জাতির সহিত শত্রুতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল, এখন প্রত্যেকে বড়ো হইতে চেষ্টা করিয়া ঘরের মধ্যে দলাদলি ঘটিতে থাকে। সভ্যতার স্বাভাবিক ফল এই। ইহার প্রধান লক্ষণ, সমাজের সহিত ব্যক্তির বিরোধ— প্রত্যেকের সমগ্রের অপেক্ষা অধিক ক্ষমতা হস্তগত করিবার চেষ্টা।

সোশ্যালিজ্‌ম সকলের মধ্যে ধনের সমবিভাগ করিয়া দিয়া পুনশ্চ সকলকে একতন্ত্রের মধ্যে বাঁধিতে চাহে এবং এই উপায়ে সকলকে যথাসম্ভব স্বাধীনতার অধিকারী করিতে চাহে, মানবসমাজে ঐক্য এবং স্বাধীনতার সামঞ্জস্য ইহার উদ্দেশ্য।

সাধনা
জ্যৈষ্ঠ ১২৯৯

প্রাচীন শূন্যবাদ

মায়ার হস্ত এড়াইবার উদ্দেশ্যে কীরূপ তর্কের মায়াপাশ বিস্তার করিতে হয় তাহার একটি দৃষ্টান্ত পাঠকদের কৌতূহলজনক বোধ হইতে পারে।

গ্রন্থখানির নাম মধ্যমকবৃত্তি। ইহা 'বিনয় সূত্র' নামক কোনো এক প্রাচীন বৌদ্ধ গ্রন্থের প্রাচীন ভাষ্য। ভাষ্যকারের নাম চন্দ্রকীর্তি আচার্য।

ইনি একজন শূন্যবাদী। কিছুই যে নাই ইহা প্রমাণ করাই ইঁহার উদ্দেশ্য। কী করিয়া প্রমাণ করিতেছেন দেখা যাউক।

প্রথমে প্রতিপক্ষ বলিলেন— দর্শন শ্রবণ ঘ্রাণ রসন স্পর্শন এবং মন এই ছয় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা দ্রষ্টব্য প্রভৃতি বিষয় আমাদের গোচর হইয়া থাকে।

টীকাকার বলিতেছেন, দর্শন যে একটা স্বাভাবিক শক্তি উপরি-উক্ত বচনে এই কথা মনিয়া লওয়া হইল। কিন্তু তাহা হইতে পারে না। দর্শনশক্তি যে আছে এ কথা কে বলিল?

কারণ,

স্বমাত্মানং দর্শনং হি তত্ত্বমেব ন পশ্যতি।
ন পশ্যতি যদাত্মানং কথং দ্রক্ষ্যতি তৎ পরান্‌।

অর্থাৎ চক্ষু আপনার তত্ত্ব আপনি দেখিতে পায় না, অতএব যে আপনাকে দেখিতে পায় না সে

অন্যকে কী করিয়া দেখিবে?

প্রমাণ হইয়া গেল চক্ষু দেখিতে পায় না। 'তস্মান্নাস্তি দর্শনং।'

কিন্তু প্রতিবাদী বলিতে পারেন—

'যদ্যপি স্বাত্মানং দর্শনং ন পশ্যতি, তথাপি অগ্নিবৎ পরান্ দ্রক্ষ্যতি। তথাহি অগ্নি পরাত্মানমেব দহতি ন স্বাত্মানং এবং দর্শনং পরানেব দ্রক্ষ্যতি ন স্বাত্মানং ইতি।

অর্থাৎ অগ্নি যেমন পরকে দহন করে কিন্তু আপনি দগ্ধ হয় না, তেমনি চক্ষু অন্যকে দেখে নিজেকে দেখিতে পায় না— ইহা অসম্ভব নহে।

উত্তরদাতা বলেন— এতদপ্যযুক্তং। ইহাও যুক্তিসিদ্ধ নহে।

কারণ,

ন পর্যাপ্তোহগ্নিদৃষ্টান্তো দর্শনস্য প্রসিদ্ধয়ে।
সদর্শনঃ স প্রত্যুক্তো গম্যমানগতাগতৈঃ।

অর্থাৎ অগ্নিদৃষ্টান্ত দর্শন প্রমাণের পক্ষে পর্যাপ্ত নহে। কারণ, গম্যমানগতাগতের দ্বারা দহনশক্তি এবং দর্শনশক্তি উভয়ই অপ্রমাণ হইতেছে।

'গম্যমানগতাগত' বলিতে কী বুঝায় সেটা একটু মনোযোগ করিয়া বুঝা আবশ্যক।

'গতং ন গম্যতে নাগতং ন গম্যমানং এবং অগ্নিনাপি দগ্ধং ন দহ্যতে নাদগ্ধং দহ্যতে ইত্যাদিনা সমং বাচ্যং। যথা চ ন গতং নাগতং ন গম্যমানং গম্যতে এবং ন দৃষ্টং দৃশ্যতে তাবদদৃষ্টং নৈব দৃশ্যতে। দৃষ্টাদৃষ্টবিনির্মুক্তং দৃশ্যমানং ন দৃশ্যতে।'

অর্থাৎ যাহা গত তাহা যাইতে পারে না, যাহা অগত তাহাও যাইতে পারে না এবং যাহা গতও নহে অগতও নহে কেবলমাত্র গম্যমান, তাহারই বা যাওয়া হইল কই? তেমনি, যাহা দগ্ধ তাহার দহন হয় না, যাহা অদগ্ধ তাহারও দহন হয় না, যাহা দহ্যমান তাহারই বা দাহ হইল কই? পুনশ্চ যাহা দৃষ্ট তাহা আর দেখা হয় না, যাহা অদৃষ্ট তাহাও দেখা হয় না, যাহা দৃষ্টও নহে অদৃষ্টও নহে কেবল দৃশ্যমান তাহাও দেখা হইতে পারে না। ভাবটা এই, যাহা হইয়া গেছে তাহা তো চুকিয়াই গেছে, যাহা হয় নাই তাহার কথা ছাড়িয়াই দাও, যাহা হইতেছে মাত্র তাহাকে হইল এমন কথা কেহ বলিতে পারে না।

'এবং দর্শনং পশ্যতে তাবদিত্যাদিনা অগ্নিদৃষ্টান্তেন সহ গম্যমানগতাগতৈর্যস্মাৎ সমং দূষণং অতোহগ্নিবদ্দর্শনসিদ্ধিরিতি ন যুজ্যতে।'

তবেই তো এক 'গম্যমানগতাগতে'র দ্বারা চক্ষুই বল অগ্নিই বল সমস্ত অসিদ্ধ হইয়া গেল।

সিদ্ধ হইল কী?

'ততশ্চ সিদ্ধমেতৎ স্বাত্মবদ্দর্শনং পরানপি ন পশ্যতীতি।'

অর্থাৎ চক্ষু যেমন আপনাকে দেখিতে পায় না তেমনি পরকেও দেখিতে পায় না।

সাধনা
অগ্রহায়ণ ১২৯৯

পরিবারাশ্রম

ফ্রান্সে ওয়াজ্ নদীর ধারে গীজ্ নামক একটি ক্ষুদ্র শহর আছে। সেখানে আজ চোদ্দ বৎসর হইল গোড্যাঁ সাহেব নূতন ধরনে এক বৃহৎ কারখানা খুলিয়াছেন, তাহার নাম দিয়াছেন, পরিবারাশ্রম সভা।

লোকটি তালাচাবি-নির্মাতা একটি কর্মকারের পুত্র। নিজের যত্নে ধন উপার্জন করিয়া, তিনি সমাজ হইতে কিসে দৈন্য দুঃখ দূর হয় এবং কী উপায়ে শ্রমজীবী লোকেরা রোগ, বার্ধক্য প্রভৃতি

অনিবার্য কারণজনিত অর্থক্লেশ হইতে রক্ষিত হইতে পারে সেই চিন্তা ও চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন।

তাঁহার সেই আমরণ চেষ্টার ফল এই পারিবারিক সমাজ। ইহা একটি কারখানা। এখানে প্রধানত লোহার উনান, অগ্নিকুণ্ড, ইমারৎ প্রস্তুতের সরঞ্জাম প্রভৃতি তৈয়ারি হয়।

এখানকার কর্মপ্রণালী অন্যান্য কারখানা হইতে অনেক স্বতন্ত্র। সংক্ষেপে এখানকার নিয়ম এই, কারবারের সুদ খরচা বাদে মোট যে লাভ হয়, তাহা হইতে শতকরা পঁচিশ অংশ বুদ্ধি অনুসারে এবং পঁচাত্তর অংশ পরিশ্রম অনুসারে কর্মচারীদের মধ্যে বন্টন করিয়া দেওয়া হয়। ইহা ব্যতীত তাহাদের যথানিয়মিত বেতন আছে। ত্রিশ বৎসর কাজের পর পেনশন নির্দিষ্ট হয়, কিন্তু বিশেষ কারণে অক্ষম হইয়া পড়িলে পনেরো বৎসরের পরেই একটা মাসহারার অধিকারী হওয়া যায়। দুঃখদুর্দিনের জন্য একটা বিশেষ বন্দোবস্ত আছে, এবং এই সভাভুক্ত যে-কেহ ইচ্ছা করিলে সন্তানদিগকে চোদ্দ বৎসর বয়স পর্যন্ত সরকারি ব্যয়ে বিদ্যাশিক্ষা দিতে পারে।

১৮৮৮ খৃস্টাব্দে গোড্যাঁ সাহেবের মৃত্যুকালে তিনি তাঁহার উপার্জিত ধনের অর্ধেক, অর্থাৎ এক লক্ষ চল্লিশ হাজার পৌন্ড এই কারখানায় দান করিয়া যান। শর্ত এই থাকে যে, নির্দিষ্ট সংখ্যক পরিবার যেখানে সুখে স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রার সামান্য অভাবসকল অনুভব না করিয়া কালযাপন করিতে পারে, এমন বাসস্থানের বন্দোবস্ত করা হইবে।

পীড়িত, অক্ষম, বৃদ্ধ, বিধবা, পিতৃমাতৃহীন বালকবালিকা, এমন-কি, সর্বপ্রকার অশক্ত লোকদিগের জন্য ইন্সিউরেন্সের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

আশ্রমবাসীদের আহার্য জোগাইতে হইবে।

তাহাদের শারীরিক মানসিক ও নৈতিক উন্নতির জন্য যে-সকল আমোদ-আহ্লাদের আবশ্যক, তাহার উপায় করিতে হইবে।

বালকবালিকারা যে পর্যন্ত না কাজে নিযুক্ত হয় সে পর্যন্ত তাহাদিগকে পালন করিতে ও শিক্ষা দিতে হইবে।

কর্মশালার নিকটেই মজুরদের বাসা ঠিক করিয়া দিতে হইবে।

এক কথায়, এমন বন্দোবস্ত করিতে হইবে, যাহাতে কারখানায় শ্রমজীবীরা সুখে একত্র বাস করিতে পারে, যাহাতে কারখানা ও ব্যবসায়ের লাভ কর্মকারদের মধ্যে ন্যায়নিয়মে ভাগ হইতে পারে এবং যাহাতে ক্রমে ক্রমে সমাজের সমুদয় সম্পত্তি অল্পে অল্পে তাহাদেরই হস্তগত হয়।

ছয় কারণে সভ্যগণ সমাজ হইতে দূরীভূত হইতে পারেন : ১. পানদোষ; ২. বাসস্থানের বায়ু দূষিত করা; ৩. গর্হিত আচরণ; ৪. শ্রমবিমুখতা; ৫. নিয়মের অবাধ্যতা অথবা উপদ্রব করা; ৬. সন্তানদিগকে উপযুক্ত শিক্ষাদানে শৈথিল্যাচরণ।

কেহ না মনে করেন, এই সমাজে পদে পদে নিয়মের কড়াকড়। প্রত্যেককে যথাসম্ভব স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছে। 'ফর্টনাইটলি রিভিয়ু' পত্রে যে লেখক এই প্রবন্ধ লিখিতেছেন, তিনি স্বয়ং সেখানে গিয়া দেখিয়া আসিয়াছেন। তিনি বলেন, সকলেই বেশ প্রফুল্লমুখে সন্তুষ্টভাবে কাজকর্মে প্রবৃত্ত আছে। স্ত্রীলোকেরা স্ব স্ব পরিবারের জন্য কাপড় কাচিতেছে, এবং কাজ করিতে করিতে গুনগুনস্বরে গান ও গল্প করিতেছে, কেহ বা বাগানে মধ্যাহ্ন-রৌদ্রে বসিয়া বসিয়া সেলাই করিতেছে। ছেলেদের থাকিবার ঘর ভিন্ন ভিন্ন বয়সের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ভাগে বিভক্ত এবং তাহার সমস্ত বন্দোবস্ত অতি চমৎকার। সাধারণের জন্য রুটি তৈয়ারির ঘর, কসাইখানা, সন্তরণ-শিক্ষার উপযোগী স্নানগৃহ, খেলা ও আমোদের জায়গা, নাট্যশালা, ভাণ্ডার প্রভৃতি নির্দিষ্ট আছে। ঘরদ্বার সমস্তই বহুযত্নে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা হয়। এ সমাজের একটি বিশেষ নিয়ম এই যে, ধর্মসম্বন্ধে প্রত্যেকের স্বাধীনতা সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ থাকিবে।

একান্নবর্তী পরিবার-প্রথার সহিত এই পরিবারাশ্রমের ঐক্য নিঃসন্দেহে পাঠকদের মনে উদয় হইয়াছে। কিন্তু আমাদের পরিবারতন্ত্রের যে-সকল কু-প্রথা হইতে সমাজে বিস্তর অমঙ্গলের উদ্ভব হয় সেগুলি উক্ত বাণিজ্য-সমাজে নাই। প্রথমত সকলকেই কাজ করিতে হয় এবং প্রত্যেকে

আপন কার্য ও যোগ্যতা অনুসারেই অংশ পাইয়া থাকে। দ্বিতীয়ত, ধর্ম ও কর্তব্যপালন সম্বন্ধে প্রত্যেকের পরিপূর্ণ স্বাধীনতা। তৃতীয়ত, একান্নবর্তী পরিবারের মধ্যে একজনের চরিত্র দূষিত হইলে তাহার দৃষ্টান্ত ও ব্যবহারে সমস্ত পরিবারের গুরুতর অহিত ও অসুখের কারণ হইয়া দাঁড়ায়, কিন্তু পরিবারাশ্রমের সভ্যগণ চরিত্রদোষ ও গর্হিতাচরণের জন্য সমাজ হইতে বহিষ্কৃত হইবার যোগ্য। এমন-কি, আলস্য ও অপরিচ্ছন্নতাবশত বাসস্থানের স্বাস্থ্যহানি করিয়া কেহ নিজের ও অন্যের অসুবিধা ঘটাইতে পারে না। এক কথায়, ইহাতে একত্রবাসের সমুদয় সুবিধা রক্ষা করিয়া অসুবিধাগুলি দূর করা হইয়াছে।

সাধনা
জ্যৈষ্ঠ ১৩০০

মানুষসৃষ্টি

জুন মাসের 'ফর্টনাইটলি রিভিয়ু' পত্রিকায় বিখ্যাত পর্যটক স্ট্যান্‌লি সাহেব মধ্য-আফ্রিকাবাসীদের মধ্যে প্রচলিত কতকগুলি গল্প প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার মধ্যে মানুষসৃষ্টির গল্প পাঠকদের কৌতুকাবহ মনে হইতে পারে।

প্রাচীনকালে এক সময় পৃথিবীতে কোনো জীবজন্তু ছিল না, কেবল একটি পুষ্করিণীতে একটি বড়োগোছের ব্যাঙ ছিল। আর আকাশে ছিল চাঁদ। উভয়ের মধ্যে কথাবার্তা চলিত।

একদিন চাঁদ বলিল, দেখো ব্যাঙ, মনে করিতেছি পৃথিবীর ফলশস্য ভোগ করিবার জন্য আমি একটি পুরুষ ও একটি স্ত্রী নির্মাণ করিব।

ব্যাঙ কহিল, আমি পৃথিবীতে থাকি, পৃথিবীর প্রাণী আমিই ভালোরূপ গড়িতে পারিব, অতএব সে ভার আমি লইলাম।

চাঁদ কহিল, আমি যাহাদের সৃজন করিব তাহারা অমর হইবে, তোমার সে শক্তি নাই।

ব্যাঙ কহিল, ভাই, তোমার আকাশ লইয়া তুমি থাকো-না, এ পৃথিবীর জীবসৃষ্টি আমারই কর্তব্য কার্য।

অতঃপর ব্যাঙ ভাবাবেশে ক্রমশ স্ফীত হইয়া একজোড়া পূর্ণতা-প্রাপ্ত নরনারীকে জন্মদান করিল।

চাঁদ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল, এ কী কাণ্ড করিয়াছ? এই যে দুটো জীবকে জন্ম দিয়াছ ইহাদের না আছে বুদ্ধি না আছে আত্মরক্ষার ক্ষমতা না আছে দীর্ঘ জীবন। বেচারাদের প্রতি দয়া করিয়া আমি যতটা পারি সংশোধন করিয়া লইব। উহাদিগকে কিছু বুদ্ধি দিব এবং আয়ুও বাড়াইয়া দিব কিন্তু তোমাকে আর রাখিতেছি না।

এই বলিয়া অত্যন্ত গরম হইয়া উঠিয়া ব্যাঙটাকে চাঁদ দগ্ধ করিয়া ফেলিল।

অতঃপর ভীত লুক্কায়িত মানুষ দুটোকে ধরিয়া তাহাদিগকে স্নান করাইয়া, ইতস্তত টিপিয়া-টুপিয়া তাহাদের শরীরের গড়ন কতকটা দুরস্ত করিয়া লইল। এবং পুরুষের নাম দিল বাটেটো এবং মেয়ের নাম দিল হানা। অবশেষে তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিল, দেখো, এই তৃণলতা তরুগুল্ম সবই তোমাদের এবং তোমাদের সন্তানদের জন্য। তোমাদিগকে বুদ্ধি দিয়াছি অতএব ইহার মধ্য হইতে তোমরা নিজেরা ভালোমন্দ বাছিয়া লইবে। এই লও একটি কুঠার। এবং তোমাদের জন্য আমি এই আগুন করিয়া দিলাম ইহাকে রক্ষা করিবে এবং কেমন করিয়া আহারের পাত্র গড়িতে হয় দেখাইয়া দিতেছি, শিখিয়া লও।

এই শিক্ষা দিয়া এবং রাঁধিয়া খাইবার উপদেশ দিয়া চাঁদ আকাশে চড়িলেন এবং প্রসন্ন হাস্যের সহিত ইহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন।

তখন এই নরনারী চন্দ্রালোকে ভ্রমণ করিতে করিতে একটি তরুকোটর দেখিয়া তাহার মধ্যে আশ্রয় লইল।

মাসখানেকের মধ্যেই হানা একটি যমজ পুত্রকন্যাকে জন্ম দিল। বাটেটা বড়ো খুশি হইয়া তাহার স্ত্রীর সেবা করিতে লাগিল এবং তাহার জন্য উত্তম সুখাদ্য সন্ধান করিয়া ফিরিতে লাগিল কিন্তু কিছুই প্রসূতির রুচিকর বোধ হয় না। তখন চাঁদের দিকে হাত তুলিয়া কহিল— হে চাঁদ, আমি তো আমার স্ত্রীর পছন্দমতো কোনো খাদ্যই খুঁজিয়া পাই না, একটা উপায় বলিয়া দাও!

চাঁদ নামিয়া আসিয়া বাটেটার হাতে একছড়া কলা দিয়া কহিল, দেখো দেখি, ইহার গন্ধটা কেমন লাগে?

বাটেটা কহিল, বাঃ অতি চমৎকার!

তখন চাঁদ একটির খোসা ছাড়াইয়া তাহার হাতে দিয়া কহিল, খাইয়া দেখো দেখি কেমন বোধ হয়?

সে খাইয়া মহা খুশি হইয়া স্ত্রীর জন্য লইয়া গেল। স্ত্রীও বড়ো পরিতোষ লাভ করিল। কহিল, জিনিসটি উত্তম কিন্তু ইহাতে শরীরে বল পাইতেছি না।

বাটেটা চাঁদকে সে কথা জানাইলে চাঁদ কহিল, দেখো দেখি ওই কী যায়?

বাটেটা কহিল, ও তো মহিষ।

চাঁদ বলিল— ঠিক বলিয়াছ। উহার পশ্চাতে কী যায়?

বাটেটা কহিল— ছাগল।

চাঁদ কহিল— আচ্ছা। তাহার পশ্চাতে কী বল দেখি!

বাটেটা কহিল— হরিণ।

চাঁদ কহিল— অতি উত্তম। তাহার পরে?

বাটেটা— ভেড়া।

চাঁদ— ভেড়াই বটে। এখন আকাশে কী উড়িতেছে দেখো দেখি!

বাটেটা— মুরগি এবং পায়রা।

চাঁদ কহিল— বেশ বলিয়াছ। তা, এই-সমস্ত তোমাদিগকে দেওয়া গেল। ইহারই মাংস স্ত্রীকে রাঁধিয়া খাওয়াও।

এইভাবে সময় যায়। আদি-দম্পতি হঠাৎ একদিন সকালে উঠিয়া দেখে মস্ত একটা আগুনের চাকার মতো আকাশে উঠিয়া আলোকে চতুর্দিক উজ্জ্বল করিয়াছে। হানা কহিল, বাটেটা এ কি হইল?

বাটেটা কহিল, চাঁদকে না জিজ্ঞাসা করিয়া তো বলিতে পারি না। এই বলিয়া চাঁদকে ডাকাডাকি করিতে লাগিল। একটা বজ্রতুল্য স্বর আকাশ হইতে কহিল— রোসো, আগে এই নূতন আলোকটা নিবিয়া যাক তার পরে কথাবার্তা হইবে।

অন্ধকার হইলে চাঁদ উঠিয়া কহিল, এখন হইতে সময় দিন এবং রাত্রে ভাগ হইবে। সকালে সূর্য এবং রাত্রে আমি এবং আমার সন্তান নক্ষত্রগণ আলো দিবে। এ নিয়মের কোনো কালে লঙ্ঘন হইবে না। এবং যেহেতু তোমরা সর্বপ্রথম প্রাণী তোমাদের সন্তানেরা জীবরাজ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হইবে। তোমাদিগকে আমি পরিপূর্ণতা এবং অনন্ত জীবন দান করিয়াছিলাম, কিন্তু সেই ব্যাঙটার জন্মদোষ তোমাদের শরীরে রহিয়া গেছে অতএব মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাইবে না। সবশেষে কহিল, যে পর্যন্ত তুমি এবং হানা পৃথিবীতে থাকিবে আমি আবশ্যকমতো তোমাদের সাহায্য ও পরামর্শ দিতে ত্রুটি করিব না— কিন্তু তোমাদের অবর্তমানে মানুষের সহিত আলাপ পরিচয় আর চলিবে না। অতএব তোমরা যাহা-কিছু শিখিবে ছেলেদের শিখাইয়া দিয়ো।

মানুষের উৎপত্তির এই ইতিহাস। ডারুয়িনের এভোল্যুশন থিওরি যে বহুপূর্বে আফ্রিকা দেশে আবিষ্কৃত হইয়াছিল এই ভেক হইতে মনুষ্যোৎপত্তির গল্প তাহার প্রমাণ; কিন্তু উক্ত জাতির মধ্যে এখনও তেমন সূক্ষ্মবুদ্ধি কেহ জন্মগ্রহণ করে নাই যে এই অকাট্য প্রমাণ অবলম্বন করিয়া য়ুরোপের দর্প চূর্ণ করে।

জিব্রল্টার বর্জন

গ্যাম্বিয়র সাহেব বলিতেছেন, ইংরাজ জিব্রল্টারের উপর দুর্গ ফাঁদিয়া ভারতবর্ষের পথ আগলাইয়া বসিয়া আছে, কিন্তু সে তাহার পণ্ডশ্রম মাত্র। কারণ, যুদ্ধের সময় যদি সুয়েজখালের পথ ব্যবহার করা সম্ভব হয় তবে জিব্রল্টার দুর্গের উপযোগিতা থাকে; কিন্তু লেখকের মতে তাহা সম্ভব নহে। কেননা, রুশিয়া প্রভৃতি কোনো য়ুরোপীয় সাম্রাজ্যের সহিত ইংরাজের যদি যুদ্ধ বাধে, তবে ইজিপ্ট কোনো পক্ষ অবলম্বন করিতে না পারিয়া সন্ধির নিয়মানুসারে ইংরাজকে খালের পথে প্রবেশ করিতে দিবে না। ফ্রান্স [ফরাসি] এবং রুশিরা যদি কখনো একত্র মিলিত হইয়া তুরস্ক আক্রমণ করে তবে তুরস্কের অধীনস্থ ইজিপ্ট আক্রমণে বাধা দিবার অধিকার ইংরাজের নাই, কারণ, ইংরাজ সেখানে অতিথি মাত্র। অতএব বিপদের সময় সুয়েজপথের কোনো মূল্য দেখা যায় না। কেবল তাহাই নহে। লেখক বলেন, জিব্রল্টার প্রণালী দিয়া অন্য য়ুরোপীয় সৈন্যপ্রবেশ প্রতিহত করা সহজ নহে, কারণ, প্রণালীটি যথেষ্ট প্রশস্ত। এবং আটলান্টিক ও ভূমধ্যসাগরের যোগসাধন করিয়া ফ্রান্স যে খাল খনন করিতে প্রস্তুত হইয়াছে তাহা সমাধা হইলে জিব্রাল্টরের কোনো মূল্যই থাকে না।

আরও একটা কথা আছে। সুয়েজখাল বালির মধ্য দিয়া একটা সামান্য নালা মাত্র। সের দেড়েক ডাইনামাইট লাগাইলেই তাহাকে ধ্বংস করা যায় এবং একটা জাহাজ যদি ইঁট ও লোহার রেলে বোঝাই পূর্বক আড় করিয়া মাঝখানে ডুবাইয়া দেওয়া যায় তাহা হইলেই পথ বন্ধ।

লেখক বলেন, ভূমধ্যসাগরের পথ ছাড়িয়া ইংলন্ড যদি উত্তমাশা অন্তরীপ দিয়া পথ ঘুরাইয়া লন তাহা হইলে আর কোনো চিন্তার কারণ থাকে না। তাহা হইলে য়ুরোপের সহিত আর কোনো সংস্রবই থাকে না, সমস্ত পথ খোলসা পাওয়া যায়।

লেখক প্রস্তাব করেন, স্পেনকে জিব্রল্টার ছাড়িয়া দিয়া তৎপরিবর্তে তাহার নিকট হইতে ক্যানারি দ্বীপ লওয়া হউক। সেখানে পথের মধ্যে দিব্য একটি দুর্গ ফাঁদিয়া বেশ শক্ত হইয়া বসা যায় এবং জাহাজ মেরামত, কয়লাতোলা এবং সৈন্যনিবাসের পক্ষে একটি সুবিধামতো আড্ডা হয়।

পর্টুগালের নিকট হইতে ম্যাডেরা দ্বীপটাও পাঁচরকম প্রলোভন দ্বারা জোগাড় করিয়া লওয়া যাইতে পারে।

তাহার পর ইজিপ্টের দখল ছাড়িয়া দিয়া ফ্রান্সের নিকট হইতে তৎপরিবর্তে ম্যাডাগাস্কর চাহিয়া লইলে ফ্রান্স নারাজ হইবে না।

তাহার পর ইংলন্ড হইতে বুক ফুলাইয়া ধূমোদ্গার করিয়া রণতরী ছাড়িবে এবং অবাধে সমস্ত আটলান্টিক কর্ষণ করিয়া ভারতসমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া একেবারে ভারতবর্ষের ঘাটে আসিয়া লাগিবে; য়ুরোপের চোখরাঙানিকে আর কিছুমাত্র কেয়ার করিতে হইবে না। ভারতবর্ষের কণ্ঠলগ্ন লৌহশৃঙ্খলটি বরাবর নিরাপদ সমুদ্রমধ্যে দিয়া একটানে চলিয়া গিয়া ইংলন্ডের দ্বারদেশে দৃঢ়পাকে বদ্ধ হইয়া থাকিবে।

সাধনা
ভাদ্র ১৩০০

পলিটিক্স্

আমাদের জাতীয় প্রজাসমিতি বা ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কন্‌গ্রেসের দশম বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতি মিঃ ওয়েব এবং হিন্দুহিতৈষিণী শ্রীমতী অ্যানি বেসেন্ট স্ব স্ব বক্তৃতাস্থলে পলিটিক্সের উপযোগিতা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন।

বিবি বেসেন্টের মতে পলিটিক্স্ ভারতবর্ষের ধাতুর সহিত ঠিক মিশ খায় না। চিন্তা করা, শিক্ষাদান করা এবং কার্যসাধন করা এই তিনের মধ্যে প্রথম দুইটি মহত্তর কার্যই ভারতবর্ষকে শোভা পায়, শেষোক্ত কার্যটা পলিটিক্সের অঙ্গ এবং তাহা ভারতবর্ষীয়ের জীবনের আদর্শ হওয়া উচিত হয় না।

এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, অট্টালিকাকে আকাশের দিকে উচ্চ করিয়া তুলিতে হইলে তাহাকে মাটির মধ্যে গভীর করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়। যদি কেহ মনে করেন অট্টালিকার যতটুকু মাটির মধ্যে প্রোথিত হইল সেটা অপব্যয় হইল, সেটাকে উচ্চে যোগ করিয়া দিলে অট্টালিকা আরও উচ্চতর হইতে পারিত তবে তাঁহাকে উন্নতির স্থায়িত্ব-তত্ত্বে অনভিজ্ঞ বলিতে হইবে।

শক্তিপরম্পরার মধ্যে একটা নিবিড় যোগ আছে। যে জাতি কেবল চিন্তা ক'রে কার্য করে না তাহার চিন্তাশক্তি ক্রমশ বিকৃত হইয়া যায়; যে জাতি কেবল কার্য করে চিন্তা করে না তাহার কার্যকারিতা নিষ্ফল হইতে থাকে। একটা জাত কেবল চিন্তা করিবে এবং আর-একটা জাত কেবল কার্য করিবে এমন বিভাগের নিয়ম টিকিতে পারে না; কারণ যে যেখানে অসম্পূর্ণতা পোষণ করে সেইখানে আঘাত লাগিয়াই সে বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

কোনো প্রাণীকে প্রচুর বাঁধা খোরাক দিয়া কেবলমাত্র মেদবৃদ্ধি করিলে তাহার মাংস অন্যের পক্ষে বড়ো উপাদেয় হয় কিন্তু তাহাতে তাহার নিজের সুবিধা দেখি না; আমরা ঘরে বসিয়া কেবলই চিন্তার খোরাকে পরিপুষ্ট হইয়াছি, তাহাতে অন্যান্য মাংসাশী জাতির বিশেষ উপকার হইয়াছে, এখন বুঝিতেছি শিং নাড়িয়া গুঁতা দিবার শিক্ষাটা আমাদের নিজের পক্ষে বিশেষ কার্যকরী।

কিন্তু কেবল আত্মরক্ষার শিক্ষাই পলিটিক্স্ নহে। চিন্তালব্ধ উচ্চতর নীতিগুলিকে মনুষ্যসমাজে কার্যে পরিণত করিবার উপায়সাধনও পলিটিক্সের অঙ্গ। এ সম্বন্ধে মি. ওয়েব যাহা বলিয়াছেন তাহা সারগর্ভ। তিনি বলেন— Politics are amongst the most comprehensive spheres of human activity and none should eventually be excluded from their exercise. There is much that is ludicrous much that is sad, much that is deplorable about them : yet they remain, and ever will remain the most effective field upon which to work for the good of our fellows.

মি. ওয়েব বলেন, রাজনীতির নির্মল ক্ষেত্র নীচ স্বার্থপরতা, অর্থলালসা ও আত্ম-পিপাসার পূতিগন্ধময় পঙ্কে কলুষিত হইতে দেওয়া কিছুতেই কর্তব্য নহে। পরার্থপরতায় ও সর্বসাধারণের হিতার্থে আত্মোৎসর্গেরই নাম 'পাবলিক লাইফ' বা রাজনীতিকের জীবন। সে জীবন সর্বথা সংস্কৃত, সংযত ও সমুন্নত থাকা প্রয়োজন। যতই ক্ষুদ্র, যতই নিম্ন ও অবনত, অবমানিত ও ঘৃণিত হউক, জাতি বর্ণ শ্রেণী ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে মনুষ্য মাত্রেরই রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কার্যাধিকার আছে, ফলত অবনতকে উন্নত ও পদদলিতকে মনুষ্যত্বের স্বত্ব ও দায়িত্বাধিকার প্রদান করাই উচ্চ রাজনীতি।

ইহা আধুনিক য়ুরোপীয় প্রজাতান্ত্রিক রাজনীতি বা ডেমোক্রেসির অনাবিল অংশ। ইহাই 'উচ্চতর পলিটিক্স্'। এবারকার কংগ্রেস সভাপতি অত্যল্প মাত্র মাত্রায় আমাদিগকে ইহারই আভাস দিয়াছিলেন।

পরন্তু বিবি বেসেন্ট বলেন পুরাতন সমাজের বনিয়াদ প্রথমত এবং প্রধানত মনুষ্যের কর্তব্যজ্ঞান ও কর্তব্য পরিচালনের উপকরণেই গঠিত হইয়াছিল; তাহার পর মনুষ্যের স্বত্বাধিকার (rights of man) বলিয়া একটি সামগ্রী তাহাতে আসিয়া সংযুক্ত হইয়াছে। তাঁহার বিবেচনায় মনুষ্যের কর্তব্যপরায়ণতাই সমাজ সংরক্ষণার্থে প্রচুর; উহার সহিত মানুষের স্বাভাবিক স্বত্বাধিকার রক্ষণচেষ্টার সংযোগ শুভদায়ক নহে। অতএব পলিটিক্স্ কেবল কর্তব্যাবধারণ, পরিচালন ও শাসনেই পর্যবসিত হওয়া উচিত; স্বত্বাধিকার বলিয়া যে সামগ্রীটি উপরপড়া হইয়া আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, উহা মনুষ্যসমাজের সীমানার মধ্যেই না থাকা ভালো। বলা বাহুল্য বিবির এই মর্মের উক্তি এবং ইঙ্গিত, তাঁহার প্রতি আমাদের সবিশেষ শ্রদ্ধা সত্ত্বেও, আমরা আদৌ অঙ্গীকার বা অনুমোদন করিতে প্রস্তুত নই। তিনি নিজেই অনতিকালপূর্বে, মনুষ্য জাতির স্বাভাবিক স্বত্বাধিকারের সমূহ পক্ষপাতিনী এবং অগ্রগণ্যা পরিচালিকা ও প্রচারিকা ছিলেন। ভারতবর্ষে আসিয়া আমাদের ভাগ্যদোষেই, বোধ হয়, তিনি তাঁহার পূর্বপ্রচারিত পবিত্র মত প্রত্যাহার করিতেছেন। কর্তব্যজ্ঞান ও কর্তব্যপালনের মাহাত্ম্য অবিসম্বাদিত। উহা সমাজের, মানুষের মনুষ্যত্বের মূল ভিত্তি, আদি উপাদান; তাহাতে কিছু মাত্র-সন্দেহ নাই। কিন্তু কর্তব্যানুভব করিয়া কর্তব্যপালন, বোধ হয়, কেবল মানবধর্ম-যুক্ত জীব মানুষেই করে; পশু, পতঙ্গ, কীটাণুকীটে মনুষ্যোচিত উচ্চতর কর্তব্যপালন করে না; তাহাদের মধ্যে কর্তব্যজ্ঞানের স্ফূর্তি হওয়াই সম্ভবে না। মনুষ্য জানে সে মানুষ; মনুষ্যত্বের স্বাভাবিক স্বত্বাধিকার সুতরাং কর্তব্যপালনের দায়িত্ব তাহার আছে। স্মরণ রাখা আবশ্যক স্বত্বাধিকারের সঙ্গেই দায়িত্ব সংযুক্ত। মনুষ্য যে-সকল স্থলে পশু অপেক্ষাও অধম বলিয়া পরিগণিত, তথায় তাহার কর্তব্যজ্ঞান পশু অপেক্ষা অধিক হওয়ার আশা করা যায় না। ফলত মনুষ্যের স্বাভাবিক স্বত্বাধিকারজনিত দায়িত্ব হইতেই প্রধানত তাহার কর্তব্যজ্ঞান উদ্ভূত হয়। যে স্থানে সে দায়িত্বের অভাব, সে স্থলে কর্তব্যজ্ঞানের অনটন অবশ্যম্ভব। পরন্তু, মনুষ্যত্বের স্বত্বাধিকারে বঞ্চিত হইলে তাহার উদ্ধার সাধনে তৎপর হওয়া নিজেই মানবধর্মের একটি প্রধান কর্তব্য।

যে ব্রাহ্মণ প্রাচীন ভারতে চিন্তা করিত এবং শিক্ষাদান করিত তাহার কি কেবল কর্তব্যজ্ঞানই ছিল স্বত্বাধিকার ছিল না? রাজ্যের মধ্যে তাহার কি একটা বিশেষ স্থান নির্দিষ্ট ছিল না? অপর সাধারণের নিকট তাহার কি কোনোপ্রকার দাবি ছিল না? প্রাচীন ইতিহাসে এমন আভাসও কি পাওয়া যায় না যে, একসময়ে ব্রাহ্মণের স্বত্বাধিকার লইয়া ক্ষত্রিয়দের সহিত তাহার রীতিমতো বিরোধ বাধিয়াছিল? ব্রাহ্মণ যদি আত্মসম্মান, আপনার স্বত্বাধিকার রক্ষা করিতে না পারিত তবে সে কি চিন্তা করিতে এবং শিক্ষা দান করিতে সক্ষম হইত? পরন্তু তখন রাজা এবং গুরু, ক্ষত্রিয় এবং ব্রাহ্মণ আপন স্বত্ব এতদূর পর্যন্ত বিস্তার করিয়া ছিলেন যে, অপর সাধারণের মনুষ্যোচিত অধিকার অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত হইয়া আসিয়াছিল— তাহাদের চিন্তার স্বাধীনতা, তাহাদের মনুষ্যত্বের পূর্ণবিকাশে তাঁহারা হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন— ভারতবর্ষের পতনের সেই একটা প্রধান কারণ, এখনকার পলিটিক্সের গতি অনুসারে সর্বসাধারণেই আপনার স্বাভাবিক স্বত্ব পূর্ণমাত্রায় লাভ করিবার অধিকারী। সকলেই আপন মনুষ্যগৌরব অনুভব করিয়া মনুষ্যত্বের কর্তব্য সাধনে উৎসাহী হইবে। যাহার হাতে ক্ষমতা আছে সে আপন খেয়াল অনুসারে অক্ষম ব্যক্তিকে উৎপীড়ন করিবে না, যাহার হাতে শাস্ত্র আছে সে কেবলমাত্র অনুশাসন দ্বারা অন্যের চিন্তা এবং কার্যকে শৃঙ্খলবদ্ধ করিবে না। রাজমন্ত্রীরাও ন্যায়মতে (অর্থাৎ দীনতম ব্যক্তিরও ন্যায্য স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ না করিয়া) আইন করিবেন, রাজপুরুষেরাও আইনমতে শাসন করিবেন, গুরুও যুক্তির দ্বারা আপন মত প্রচার করিবেন। এইরূপে প্রত্যেক আপন স্বত্বাধিকার রক্ষা করিতে পারিলে তবেই আপন সাধ্যমতো আপনার উন্নতি এবং সেইসঙ্গে জগতের উন্নতি সাধন করিতে সমর্থ হইবে। স্বত্বাধিকার ব্যতীত কর্তব্য অনুভব করা এবং কর্তব্য পালন করা সম্ভব নহে। স্বত্বাধিকার সংক্ষেপ হইলে কর্তব্যের পরিধিও সংক্ষিপ্ত হইয়া আসে।

ইংলন্ড, আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ার বৈভববিলাসের বিপন্নতা ও বীভৎস ব্যাপার দেখাইয়া বিবি বেসেন্ট আমাদিগকে পাশ্চাত্য জড়বাদের আপাতমনোহর এবং অত্যন্ত মোহকর আদর্শ পরিবর্জন পূর্বক ভারতীয় প্রাচীনকাল-প্রবর্তিত অধ্যাত্মপথ অনুসরণ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। সদুপদেশ সন্দেহ নাই। কিন্তু ভারতবর্ষের ন্যায় পুণ্য দেশেও একেবারে পঞ্চবিংশতি কোটি মহামুনির উদ্ভব সম্ভবপর নহে। যথাসম্ভব লোক আধ্যাত্মিক হইয়াও যথেষ্ট পরিমাণে পার্থিব লোক বাকি থাকিবে। তাহারা যাহাতে আত্মসম্ভ্রম, উন্নতি এবং মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারে সেজন্য চেষ্টা করা আবশ্যক; যাঁহারা না আধ্যাত্মিক না পার্থিব তাঁহাদের মতো শোচনীয় জীব জগতে আর নাই।

পাশ্চাত্যের পাপাদর্শ অতি সাবধানেই পরিবর্জনীয়। কিন্তু পুণ্যাদর্শও যদি সেখানে পাই, তাহা পরিত্যাগ করিব কেন? মিঃ ওয়েব আইরিশম্যান। আইরিশে ইংরেজে স্বার্থ ও রাজনৈতিক স্বত্বাধিকারের সম্বন্ধটা যে খুব সুমিষ্ট তাহা নহে। সকলেই জানেন যে সম্বন্ধ তীব্র তিক্তরসমিশ্রিত। এতাদৃশ অবস্থায় মিঃ ওয়েব আইরিশ 'হোমরুলার' হইয়াও, ইংরাজের একটি অতি মহৎ স্বরূপের আদর্শ আমাদের সম্মুখে ধরিয়াছিলেন। তাঁহার উক্তি এই—

'ইংরাজেরা অন্যান্য জাতি অপেক্ষা স্বভাবত অধিকতর সাহসীও নয়, সৎ ও শক্তিশালীও নয়। তাহাদের আত্মনির্ভরতা ও কর্তব্যজ্ঞানের উচ্চতা হইতেই, তাহাদের বিজয়কীর্তি ও কার্য-সফলতা অংশত উদ্ভূত। তাহারা যাহা সংকল্প করে, নিশ্চয়ই তাহা সিদ্ধ করে। অন্যান্য লোকের ন্যায়, তাহারাও স্বার্থপ্রণোদিত হইয়া কার্যে প্রবৃত্ত হয়; কিন্তু, রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই হউক কিংবা রাজ্য-শাসন ব্যাপারেই হউক; যখন তাহারা সাধারণের হিতসাধন সংকল্প করিয়া কার্যে প্রবৃত্ত হইল, তখন তাহারা কোনো ক্রমেই ব্যক্তিগত স্বার্থের বশবর্তী হইয়া সে সংকল্প সাধনে বিরত হইবে না; সে কার্য সম্পাদনে কিছুতেই শৈথিল্য করিবে না; ইহা নিশ্চয়। এবং ইহাও নিশ্চয় যে, তাহারা পরস্পরে পরস্পরকে বিশ্বাস করিতে জানে। অতএব এই-সকল বিষয়ে ইংরাজ-গুণের আদর্শ আমাদের গ্রহণীয়।'

এ দেশীয়দিগের বিশেষত এ দেশে অধুনা যাঁহারা রাজনৈতিক ব্যাপারে সংলিপ্ত, ও রাজ-প্রদত্ত আংশিক আত্ম-শাসনাধিকার ব্যপদেশে সাধারণ জনসাধারণের কার্য সম্পাদনে নিযুক্ত তাঁহাদের আপাতত যত কিছু শিক্ষণীয় আছে তাহার মধ্যে উপরোক্ত শিক্ষা সর্বপ্রধান স্থানীয়। জনসাধারণের কার্যে অক্ষুণ্ণ ও আন্তরিক মনঃসংযোগ, শম এবং অনুরাগ এবং তাহা সম্পাদনকালে আত্ম-স্বার্থের বা আত্মীয়স্বজনের ব্যক্তিগত বিরোধী স্বার্থের বশবর্তী হইয়া সর্বসাধারণের স্বার্থ বিনষ্ট না করা, উপস্থিত ক্ষেত্রে আমাদের এই দুইটি শিক্ষা অতিশয় আবশ্যক হইয়াছে। কাউন্সিলের মেম্বর, মিউনিসিপাল কমিশনর, ডিস্ট্রিক্ট ও লোকালবোর্ডের সদস্য হইতে গ্রাম্য চৌকিদারি সমিতির পঞ্চায়েতদিগের পর্যন্ত অল্পাধিক পরিমাণে ওই দুই শিক্ষার প্রয়োজন। পরন্তু নগরবাসী ও গ্রাম্য লোকদিগেরও এ শিক্ষা সম্বন্ধে উদাসীন থাকা উচিত নয়। ইহাই স্বায়ত্তশাসনাধিকারের অস্থিমজ্জা প্রাণ। এই শিক্ষার অভাবে, বলিতে লজ্জার ও ঘৃণার উদ্রেক হয়, আমরা যে এক বিন্দু আত্মশাসনাধিকার পাইয়াছি অনেকস্থলেই তাহার কেবল অপব্যবহার হইতেছে। ফলত সাধারণের কার্য সম্পাদন সম্বন্ধে এই শিক্ষায় সুশিক্ষিত না হওয়া পর্যন্ত আমরা অতিরিক্ত পরিমাণে আত্মশাসনাধিকার পাইবার উপযুক্ত হইব, এ কথা বলিতে অন্তত আমরা সাহসী নহি। আমাদের মধ্যে আত্ম-গরিমা প্রকাশের ইদানীং ইয়ত্তা নাই। অতএব এ স্থলে আমরা সেটা না করিয়া, সংগোপনে যদি দুই-একটি আত্মকথা এবং আসল কথার আলোচনা করিয়া থাকি, তাহাতে ইষ্ট বৈ অনিষ্ট হইবে না। সংবাদপত্রের আস্ফালন ও অফিসিয়াল রিপোর্টের আবরণ ক্ষণকালের জন্য দূরে রাখিয়া, উপস্থিত ক্ষেত্রে, আমাদের আত্মশাসনব্যাপারের অপক্ষপাত সমালোচনা করিয়া অকপট চিত্তে বলুন দেখি সে বিষয়ে আমাদের উপযুক্ততা কীরূপ জন্মিয়াছে?

কিন্তু, আমরা চিরকালই অনুপযুক্ত থাকিব এমনও কেহ মনে করিবেন না। কোনো কার্যের প্রথমে ও প্রারম্ভে পরিপক্কতা স্বভাবতই সম্ভবে না। কেবল সেই পরিপক্কতার কপট পরিচয় দেওয়াই মহাভ্রম। পক্ষান্তরে, গবর্নমেন্টের অযথা কঠোরতা এবং অশেষ ত্রুটি সত্ত্বেও, উহা মূলত প্রজাতান্ত্রিক প্রণালী। ভারতীয় ইংরাজের অসীম প্রভুত্ব-স্পৃহার অভ্যন্তরেও শাসনপ্রণালীর প্রজাতান্ত্রিক আসক্তি অলক্ষ্যে বিদ্যমান। য়ুরোপীয় ডেমক্রেসিকে একেবারে অতিক্রম করিয়া য়ুরোপীয়দিগের শাসনযন্ত্র কোথাও চলিতে পারে না। কোনো-না-কোনো প্রকারে তাহার সঙ্গে সংস্রব রাখিতে বাধ্য হয়। সুতরাং সাধারণ মত ও জনসাধারণের স্বত্বাধিকারকে উহা একেবারেই উপেক্ষা করিতে পারে না। ইহাই অবশ্য আমাদিগের আশা এবং এ আশা একান্ত বৃথা আশাও নহে। ইংরাজ শাসনের যেরূপ গতি প্রকৃতি তাহাতে এমন দিন অবশ্যই একসময়ে আসিতে পারে, যখন এদেশীয়েরা শ্রেণী ও সম্প্রদায়নির্বিশেষে ব্রিটিশ প্রজার প্রাপ্য স্বত্বাধিকারের সম্যক বা আংশিক অংশ পাইলেও পাইতে পারে। কিন্তু, তাহার উপযুক্ত ও তাহার জন্য প্রস্তুত হওয়া প্রয়োজন। প্রজানীতি, প্রকৃত প্রস্তাবে প্রতিষ্ঠিত ও সমগ্রদেশে পরিব্যাপ্ত হওয়ার পূর্বে, ব্রিটিশ রাজনীতি, ব্রিটিশ প্রজার স্বত্বাধিকার এদেশীয়দিগকে দিবেন না, ইহা নিশ্চিয়; পরন্তু আমাদের অনুপযুক্ততা ও অপ্রস্তুত অবস্থায় তাহা দেওয়াও নিষ্ফল। উষরক্ষেত্রে বীজ বপন বৃথা। আমাদের আশঙ্কা, ক্ষেত্র অদ্যাপি প্রস্তুত হয় নাই। প্রকৃত প্রজানৈতিক পলিটিক্সের এখনও আমাদের মধ্যে অত্যন্ত অভাব। পলিটিক্স্ এখনও আমাদের মধ্যে একটি পোশাকি জিনিসের বেশি আর কিছুই নয়। উহা এখনও আমাদের রক্ত মাংসে মেদ মজ্জায় মিশে নাই। উহা অদ্যাপি আমাদের প্রাত্যহিক জীবন ধারণের আহার্য স্বরূপ হয় নাই। তাহা না হওয়া পর্যন্ত আমাদের দাসত্ব ঘুচিয়া প্রকৃত ও পুষ্টিকর প্রজাত্ব জন্মিবে না।

আমরা বোধ হয় আমাদের রাজনৈতিক প্রবণতা কী প্রকৃতির তাহা উপরি-উক্ত আলোচনায় কিয়ৎ পরিমাণে বিবৃত করিয়াছি। এক্ষণে, সাম্রাজ্যের রাশিচক্র কৌন্সিলগৃহের উচ্চাকাশে কীরূপে আবর্তিত হইতেছে তাহা খণ্ড খণ্ড ভাবে দেখা আবশ্যক।

কন্‌গ্রেসে বিদ্রোহ

কিন্তু তৎপূর্বে প্রসঙ্গক্রমে সংক্ষেপে একটা কথা বলিতে ইচ্ছা করি। কন্‌গ্রেসের গত অধিবেশনে নর্টন সাহেবের প্রতি কোনো বিশেষ বক্তৃতার ভার ছিল বলিয়া কোনো কোনো সভ্য বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিলেন। চরিত্র-দোষজন্য কন্‌গ্রেসের সহিত নর্টনের ঘনিষ্ঠতা তাঁহারা প্রার্থনীয় মনে করেন না।

নর্টন যদি সমাজে পতিত হইয়া থাকেন তবে সমাজে তাঁহার নিমন্ত্রণ বন্ধ হইতে পারে—কিন্তু কন্‌গ্রেসসভায় অকৃত্রিম ভারতহিতৈষী মাত্রেরই অধিকার আছে। হাবড়ার ব্রিজ যদি কোনো মাতাল এঞ্জিনিয়ারের দ্বারা নির্মিত হইত তবে টেম্পারেন্স সভার সভ্যগণ কি সাঁতার দিয়া নদী পার হইতেন?

ভারত কৌন্সিলের স্বাধীনতা

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার 'সেসন'ই এ শীতে, সতেজ, সরগরম। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক বৈঠক বরং কিছু বিমর্ষ। কটন আইন ও ক্যান্টনমেণ্ট বিলের আলোচনায় এক বিরাট সমস্যা উপস্থিত; পুলিস রেগুলেশন বিলে বিস্তৃত আন্দোলনতরঙ্গ উত্তোলন করিয়াছে। আমাদের সুপ্রিম কৌন্সিল (বা বড়ো ব্যবস্থাপক সভা) সর্বতোভাবে স্বাধীন অথবা স্টেট সেক্রেটারির সারথ্যে ব্রিটিশ

পার্লামেন্টের কিঞ্চিৎ অধীন এই প্রশ্ন কটন বা কাপড় সূতার আইন যখন বিল ছিল তখনই অঙ্কুরিত হইয়া ক্যান্টনমেন্ট বিলের অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়ায় একটা কণ্টকবৃক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। বৃক্ষটার অনেকগুলা শাখা-প্রশাখা ও কাঁটা-খোঁচা বাহির হইয়াছে। কটন-অ্যাক্ট সম্বন্ধে সেক্রেটারি অব্ স্টেটের আদেশ বা 'ম্যান্ডেট' অথবা ব্যবস্থাপক সভাপতি 'এলগিন কর্তৃক তাহার উল্লেখ এই আকস্মিক উৎকণ্ঠা উৎপাদন ও বিপদপাতের অব্যবহিত কারণ। 'ম্যান্ডেট' উক্তিটিই যেন বোধ হয়, অনর্থ ঘটাইয়াছে। ব্যবস্থাপকগণ, বিশেষত 'আনঅফিশিয়াল' অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান মেম্বরেরা মহা বিরক্ত হইয়াছেন। সুতরাং এ ব্যাপারে ব্যবস্থাপক সভার বিশাল হিমাচলবৎ গাম্ভীর্যের এক বিন্দু ব্যতিক্রম হইয়াছে।

সকলেই জানেন যে ব্যবস্থাপক সভার অসীম স্বাধীনতা সংরক্ষণের চেষ্টায় শ্রীমান স্যর গ্রিফিথ ইভান্স এবং মাননীয় মি. প্লেফেয়ার এই দুই রথী অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন। ইঁহাদের উভয়েরই বিবেচনায় এখানকার এই আইন-সভার স্বাধীনতা অসীম হওয়া উচিত; অসীমই ছিল; কিছুকাল হইতে স্টেট সেক্রেটারি সংকল্প করিয়া সসীম করিতে বসিয়াছেন। ইহা, বে-আইনি, বে-নজিরি এবং বিষম বিপত্তিজনক। ইহাতে করিয়া ব্যবস্থাপক সভার বে-ইজ্জত, সে সভার সভাপতি স্বয়ং রাজপ্রতিনিধির সম্ভ্রমের হানি এবং ব্যবস্থাপকদিগের বিধিব্যবস্থা বিদ্রূপকর হইবে; পরন্তু, তদ্দ্বারা ভারতরাজ্য শাসন সম্বন্ধেও ভয়ানক বিভীষিকা উপস্থিত হইবে। কেবল তাহাই নহে, ব্রিটিশ ডেমক্রেসি আদৌ সাম্রাজ্য শাসনে সমর্থ কি না, সে বিষয়েই (শুনিতেছি) ঘোর সন্দেহ, উপস্থিত হইবে। কেবল সন্দেহ নহে; সে অসমর্থতা সম্পূর্ণরূপে সাব্যস্তই হইবে। The question whether a democracy can govern an Empire will have to be answered in the negative। পরন্তু, এরূপ অত্যাচার হইলে, ব্যবস্থাপক সভায় সুযোগ্য সভ্যই জুটিবে না। সিবিল সার্ভিসেও সম্ভবত সমর্থ লোক মিলা ভার হইবে। কেহই আর সাম্রাজ্যের শাসনযন্ত্র ছুঁইতে চাহিবে না; সংহিতাকার ও শাসয়িতাভাবে শাসন-রশ্মি শিথিল হইয়া সাম্রাজ্য ধ্বংস হইবে না; তাহাই বা কে বলিবে। গবর্নমেন্টের প্রতি প্রজাসাধারণের বিশ্বাস থাকিবে না, সম্ভ্রম ও শঙ্কা টলিবে; কাজেই শক্তির হ্রাস হইবে; সুতরাং তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল— ধ্বংসই বটে।

একদিকে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট; অপরদিকে ভারত গবর্নমেন্ট; মধ্যস্থলে স্টেট সেক্রেটারি। এই সেক্রেটারিই হইয়াছেন, এ ক্ষেত্রে, যত সর্বনাশের মূল। কিন্তু, এই সেক্রেটারি যথার্থই কি আমাদের সংহিতাকারদিগের স্বাধীনতাপহরণে প্রবৃত্ত? যতদূর দেখা যাইতেছে, তাহাতে কোনো প্রকারেই তো তাঁহার সেরূপ অসদভিসন্ধির লক্ষণ পরিদৃষ্ট হয় না।

ভারতে রাজ-শক্তি শতসহস্র স্রোতে, শাখা এবং প্রশাখায় প্রবাহিত। সে শক্তির মূল প্রস্রবণ আদি কেন্দ্রস্থলে ব্যক্তিবিশেষ নহেন, বিরাট ব্রিটিশ পার্লামেন্ট, অন্তত ইহাই আমরা অবগত আছি। বিধিব্যবস্থা ব্যবহারও ইহার বিরোধী নয়। অতএব রাজ-শক্তির আদিকেন্দ্রস্থল ব্রিটিশ পার্লামেন্ট-কর্তৃক, সে শক্তির সঞ্চালন, সংযম বা সম্প্রসারণ অন্যায় ও অসংগত বলিতে পারি না। স্টেট সেক্রেটারি ব্রিটিশ পার্লামেন্টের আদেশ, ইচ্ছা ও অবলম্বিত নীতি অনুধাবন করিয়া ভারতশাসন সম্বন্ধে, প্রধান প্রধান বিষয়ে রাজপ্রতিনিধির সমীপে পরামর্শ প্রেরণ করেন। অন্তত লর্ড এলগিন নিজেই এ কথা বলিয়াছেন; এবং তাঁহার কথা সমূলক নহে, এমন অনুমান করার কিছুমাত্র কারণও নাই। অতএব স্টেট সেক্রেটারির উপর দোষারোপ করা অনর্থক। তিনি পার্লামেন্টেরই শক্তি সঞ্চালন করেন; নিজে কোনো অভিনব নীতি সংগঠন করিয়া পাঠান না; পুরাতন নীতিরও পরিবর্তন করেন না। অতএব অপক্ষপাত বিচার করিলে, এ বিষয়ে তাঁহাকে 'বেকসুর' খালাসই দিতে হয়। তিনি তফাত হইলে অবশিষ্ট থাকে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ও আমাদের ব্যাবস্থাপক সভা। সভা কি সত্যসত্যই পার্লামেন্টকেও প্রত্যাখ্যান করিতে প্রস্তুত? স্যর গ্রিফিথ্ ও মি. প্লেফেয়ারের প্রস্তাবে তাহাই বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু পার্লামেন্টকে উল্লঙ্ঘন করার এ অভিলাষ বা আবদার এদেশীয় লোকেরা কখনোই অনুমোদন করিতে পারে না। শাসনশক্তির শত

শত তীক্ষ্ণ অঙ্কুশ বিদ্ধ হইয়া তাহাদের আর্তনাদের একমাত্র আশ্রয়স্থল ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ও ব্রিটিশ প্রজা। অতএব শাসকই হউন আর ব্যবস্থাপকই হউন, পার্লামেন্টের প্রভাব হইতে পৃথক হইয়া, ভারতশাসন ও ভারতীয় বিধিব্যবস্থা প্রস্তুত করুন, এরূপ প্রস্তাবে এদেশীয়রা কিছুতেই সায় দিতে পারে না। এ সম্বন্ধে মি. মেহতা ব্যবস্থাপক সভায় যাহা বলিয়াছেন, তাহাই এদেশীয় সমীচীন ব্যক্তিমাত্রের মত। হইতে পারে, অনেক সময়ে পার্লামেন্ট হইতে অবিচার ও এদেশীয় ব্যবস্থাপক সভা ও ভারত গবর্নমেন্টের নিকটে সুবিচারের সম্ভাবনা আছে; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও পার্লামেন্টের উপর, শেষ বিচারের জন্য, নির্ভর করা ভিন্ন উপায় নাই। পার্লিয়ামেন্টীয় শাসন ও অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানের শাসন দুয়ের কোনোটিই অবশ্য সম্যকরূপে নিরাপদ নহে; কেননা সময়ে সময়ে প্রবল স্বার্থ সংঘাতে সমূহ অমঙ্গলেরই সম্ভাবনা; পক্ষান্তরে এদেশীয়দিগের নিজের শাসনও এখন আকাশকুসুম অপেক্ষাও অসম্ভব; এরূপ স্থলে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানের শাসন অপেক্ষা পার্লিয়ামেন্টের শাসনই আমাদের পক্ষে শ্রেয়; যেহেতু পার্লিয়ামেন্টের ও ব্রিটিশ প্রজাসাধারণের ন্যায়পরতা ও মহত্ত্ব সাধারণত অধিকতর বিশ্বসনীয়।

পুলিস রেগুলেশন বিল

এই বিলটি ১৮৬১ সালের ৫ আইন সংশোধনের পাণ্ডুলিপি। ইহার ১৫ ধারার লিখিত বিষয়টি সংশোধন সম্বন্ধেই সমস্যা। ওই ধারার পূর্ব মর্মানুসারে নিয়ম ছিল এই যে, কোনো স্থানে বাদ বিসম্বাদ বা যে-কোনো কারণেই হউক দাঙ্গা হাঙ্গামা হইয়া শান্তিভঙ্গ হইলে বা শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা থাকিলে, তথাকার শান্তিরক্ষার্থে অতিরিক্ত পুলিস প্রহরী নিযুক্ত হইত এবং তাহার নির্বাহার্থে স্থানীয় অধিবাসীদিগের উপর একটি কর সংস্থাপিত হইত। কর সংস্থাপিত হইত দোষী ও নির্দোষী নির্বিশেষে; দাঙ্গায় সংশ্লিষ্ট থাকুক বা না থাকুক স্থানীয় লোক মাত্রই সে কর দিতে আইনানুসারে বাধ্য হইত। কিন্তু এরূপ আইন স্পষ্টত অন্যায়। ইহা কখনোই ন্যায়ানুমোদিত হইতে পারে না যে দোষীর সহিত নির্দোষীও শাস্তি পাইবে।

নির্দোষীর শাস্তি নিবারণ উপরোক্ত সংশোধনের উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্য সাধনের উপায় উদ্ভাবন করা দুষ্কর। গবর্নমেন্ট যে উপায় অবলম্বন করিতে চাহেন তাহাতে দোষী ও নির্দোষী নির্বাচনের ভার জিলার মাজিস্টর ও জজদিগের উপর বিন্যস্ত হয়। জজ বা মাজিস্টর ইহাদের যিনিই হউন স্থানীয় অবস্থা বুঝিয়া দোষী ও নির্দোষী নির্বাচনে ক্ষমবান হইবেন। সে ক্ষমতা পরিচালন করার দ্বারা দোষী ও নির্দোষী নিরাকরণকল্পে, দস্তুরমতো বিচার প্রণালী অবলম্বন করিয়া সাক্ষ্য প্রমাণাদি গ্রহণ ও উকিল-মোক্তারের সোয়াল জবাব গ্রহণান্তে, রায় লিখিত হইবে না— জজ বা মাজিস্টর স্থানীয় অবস্থানুসারে যাহা স্থির করিবেন তাহাই হইবে। দস্তুরমতো দেওয়ানি বিচার যখন হইবে না, তখন অবশ্য তাহার দেওয়ানি আপিলও চলিবে না। তবে বিভাগীয় কমিশনরের উহাতে হাত থাকিবে।

গবর্নমেন্ট পক্ষের যুক্তি এই যে এরূপ স্থলে দস্তুরমতো দেওয়ানি বিচার দ্বারা দোষী নির্দোষী নির্ধারণ করা সুকঠিন; অথচ নির্দোষীরও রক্ষা পাওয়া উচিত। শান্তি রক্ষা করিতে গবর্নমেন্ট স্বতঃ বাধ্য। শান্তিরক্ষার্থে, শান্তিভঙ্গের দণ্ডের জন্য দেওয়ানি বিচার সম্ভবে না। অতএব শাসন ও শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া নির্দোষীদিগকে অব্যাহতি দিবার জন্য জিলার জজ ও মাজিস্টরদিগকে যে অধিকার দেওয়া হইতেছে ইহাই প্রচুর। পূর্বে দোষী ও নির্দোষী দেশসুদ্ধ লোকেরই দণ্ড হইত, এখন অন্তত কতক লোকও তো রক্ষা পাইবে। নির্দোষী মাত্রই পরিত্রাণ না পাউক তাহাদের কতকও তো পাইবে। সংশোধিত আইন সর্বাঙ্গসুন্দর না হইলেও উহা মন্দের ভালো। বিশেষত এ আইন দণ্ড দিবার জন্য নয়, দাঙ্গা নিবারণই ইহার উদ্দেশ্য। গবর্নমেন্টের যুক্তি এই।

অপর পক্ষের কথা এই যে, শান্তিভঙ্গের আশঙ্কাস্থলে যখন দোষী নির্দোষী সকলেরই উপর

পুলিসের ব্যয়ভার স্থাপন করা হয় তখন বস্তুত কাহাকেও বিশেষ করিয়া দোষী করা হয় না। ইহাতে কেবল স্থানীয় লোকের 'পরে শান্তির ট্যাক্স বসানো হয় মাত্র। পরন্তু নূতন নিয়মে ব্যক্তিবিশেষদের প্রতি বিনা বিচারে অপরাধের কলঙ্ক এবং দণ্ড আরোপ করিবার ক্ষমতা কর্তৃপুরুষদের থাকিবে অথচ সে কলঙ্ক ক্ষালন করিবার কোনো উপায় দণ্ডিত ব্যক্তিদিগকে দেওয়া হইবে না। বিচার হইবে না অথচ দোষী সাব্যস্ত হইবে।

যদি এ কথা বলা যায় যে, আইনমতে বিচার করিতে গেলে অনেক সময় প্রকৃত দোষী ধরা পড়ে না, অতএব কর্তৃপক্ষীয়দিগকে সকল সময়েই আইনের দ্বারা বাধ্য করা কর্তব্য নহে, তবে জিজ্ঞাস্য এই, শাসনপ্রণালীর মধ্যে এই ছিদ্রকে একবার স্থান দিলে কোথায় ইহার সীমা নির্ণয় হইবে? বিচারকেরা যে মনুষ্যস্বভাবের দুর্বলতাবশত পক্ষপাত করিতে পারেন সে-সকল কথা আমরা দূরে রাখিতেছি— স্থূল কথা এই যে, আবশ্যক বুঝিয়া ট্যাক্স বসাইতে গবর্নমেন্টের অধিকার আছে; কিন্তু বিনা বিচারে দোষী করিতে এবং কোনো ব্যক্তিকে আপন দোষক্ষালনের অধিকার না দিতে গবর্নমেন্টের ন্যায্য অধিকার নাই। ম্যাজিস্ট্রেট যদি স্থানীয় অভিজ্ঞতাবশত সর্বজ্ঞ হইয়া থাকেন তবে শান্তিভঙ্গের আয়োজন জন্য চেষ্টা কেন অন্য অপরাধেরও আন্দাজমতো খেয়ালমতো বিচারের ভার তাঁহার উপর দেওয়া উচিত।

ভারতবর্ষীয় প্রকৃতি

জর্মান অধ্যাপক ওল্‌ডেন্‌বার্গ বুদ্ধের যে জীবনচরিত লিখিয়াছেন, তাহা ইংরাজিতে অনুবাদিত হইয়াছে এবং সেই সূত্রে তাঁহার বাঙালি পাঠকদিগের নিকট পরিচিতি হইয়াছে। সম্প্রতি তিনি জর্মান ভাষায় বেদের ধর্ম নামক এক গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন, আমরা তাহার অনুবাদের প্রতীক্ষা করিয়া আছি।

মনিস্ট নামক আমেরিকান পত্রিকায় সমালোচনাস্থলে এই গ্রন্থের কিয়দংশ উদ্‌ধৃত হইয়াছে, নিম্নে তাহা সংকলন করিয়া দিলাম।

আধুনিক হিন্দুগণ আপনাদের শান্তিপ্রিয় নির্দ্বন্দ্ব প্রকৃতিকে শ্রেষ্ঠতার লক্ষণ বলিয়া গর্ব করে, কিন্তু অধ্যাপক বলেন ইহা তাহাদের দুর্বলতার লক্ষণ। যে-সকল মহা দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষে য়ুরোপীয় জাতি বলিষ্ঠ পৌরুষ লাভ করিয়াছেন— ইরানীদের সহিত বিচ্ছেদের পর ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া অবধি ভারতবাসী আর্যগণ সেই-সকল প্রবল দ্বন্দ্ব হইতে বঞ্চিত হইয়া ক্রমশই শিথিলবল হইয়াছেন। এই ফলশস্যশালী নূতন নিবাসের নিস্তব্ধতার মধ্যে কৃষ্ণবর্ণ আদিম অসভ্য জাতির সহিত একত্র অবস্থান করিয়া তাঁহাদের হিন্দুত্ব ক্রমশই প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিয়াছিল। একে তো শীত দেশ হইতে আসিয়া এখানকার আবহাওয়ায় তাঁহাদের অনেকটা নিস্তেজ করিয়াছিল, তাহার পরে অসমকক্ষ অসভ্য প্রতিদ্বন্দ্বীদের সহিত সহজ সংগ্রামে জয়লাভপূর্বক উর্বরা বসুন্ধরা নির্বাধে ভোগ করিয়া তাঁহাদের চরিত্রে পুরুষোচিত কাঠিন্যের অভাব জন্মিতে লাগিল। তাঁহাদের জ্ঞানবিজ্ঞানচর্চার মধ্যে সেই কঠিন প্রয়াসের সুকঠোর সংঘাত ছিল না, যদ্দ্বারা বাস্তব জগতের গভীরতা ভেদ করিয়া সফলকাম হইয়া চিন্তারাজ্যের ভূমানন্দলোকে উত্তীর্ণ হওয়া যায়। অতি অনায়াসেই তাঁহারা বস্তুজগতের উপরিতলে সত্যের সহিত কল্পনা, সুন্দরের সহিত অদ্ভুত, বিবিধ নবতর আকারে জড়িত মিশ্রিত করিয়া বিচিত্র চিত্রজাল রচনা করিয়াছিলেন।

ওল্‌ডেন্‌বর্গের মত উদ্‌ধৃত করিয়া সমালোচক তাঁহার হিন্দু বন্ধুবর্গকে সম্বোধনপূর্বক বলিয়াছেন উপরি-উক্ত কথাগুলি চিন্তা করিয়া নিজেদের প্রকৃত অবস্থা অনুধাবন করিয়া দেখিলে আত্মোন্নতি সাধনের যথার্থ উপায় নির্ণয় হইতে পারে। তিনি বলেন, যে-সকল প্রাকৃতিক অবস্থাবশত হিন্দুরা অবসর এবং স্বচ্ছলতা লাভ করিয়াছিলেন সেই-সকল অবস্থাগতিকেই তাঁহাদের অনুষ্ঠান এবং চিন্তাপ্রণালী এমন কৃত্রিমতা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাঁহাদের বুদ্ধি স্বেচ্ছাচারিণী

কল্পনাকে সঙ্গে লইয়া বড়ো বড়ো রহস্যময় প্রহেলিকার সহিত স্বচ্ছন্দে ক্রীড়া করিতে ভালোবাসিয়াছে— একদিকে তাঁহারা ধর্ম এবং দর্শনের উচ্চতম শ্রেষ্ঠতম ভাবের মঞ্জরী বিকশিত করিয়া তুলিয়াছেন, অপর দিকে তাঁহাদের থিওরিগুলি বাস্তবতথ্যের সহিত একেবারে অসম্বদ্ধ রহিয়া গিয়াছে। যদি ইহা সত্য হয় যে, ভারতবর্ষের উন্নতি এক সময় মাঝখানে আসিয়া অবরুদ্ধ হইয়াছে, এবং তরুণতর পাশ্চাত্য সভ্যতা, বলে বুদ্ধিতে বিজ্ঞানে তাহাকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে, তবে, দৈবাগত ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্যে তাহার কারণ অন্বেষণ করিতে গেলে ভ্রমে পতিত হইতে হইবে; তাহার প্রকৃত কারণ, বিচারের, বিশেষত আত্মবিচারের অভাব (lack of criticism, and especially of self-criticism)। পাশ্চাত্যজাতির মধ্যে এই বিচার এবং আত্মবিচারের' প্রবৃত্তি নানা উৎপাত, প্রতিযোগিতা এবং দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের দ্বারা সঞ্জাত হইয়াছে। হিন্দুদিগকে সর্বদা এই কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, উন্নতি অর্থে দ্বন্দ্ব— তাঁহাদিগকে বলিষ্ঠ এবং কার্যতৎপর হইতে হইবে, বাস্তব সত্যের ঘনিষ্ঠ সংস্রবে তাঁহাদিগকে শক্ত হইয়া উঠিতে হইবে। ভারতবর্ষের নিকট, তাহার প্রাচীন আচার্যদের নিকট, পাশ্চাত্য জাতি অনেক শিক্ষালাভ করিয়াছে এক্ষণে পাশ্চাত্যজাতির নিকট ভারতবর্ষের শিক্ষালাভ করিবার সময় আসিয়াছে; কী বিষয়ে শিক্ষালাভ করিতে হইবে তৎসম্বন্ধে কাহারো দ্বিমত থাকিতে পারে না— তাহা আর কিছু নহে, বৈজ্ঞানিক প্রণালীর কঠিন যাথাযথ্য (exactness)। এই শিক্ষা করিতে হইবে যে, পরীক্ষাসিদ্ধ অভিজ্ঞতাই সত্যের চরম মানদণ্ড, ধ্যানলব্ধ কল্পনা নহে। (The ultimate criterion of Truth is not apriori speculation, but experience; not subjective thought, but objective reality.)

সমালোচক মহাশয়ের উপদেশে অনেক কথা আছে যাহাতে আমাদের দম্ভে আঘাত লাগিতে পারে, কিন্তু ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে ক্রমাগত আত্মশ্লাঘাদ্বারা নিশ্চেষ্ট অহংকারে পরিস্ফীত হইয়া ওঠাকে মহত্ত্বলাভ বলে না। যে-সকল কঠিন আঘাতে আমাদিগকে যথার্থ পৌরুষ দান করে, যাহা অপর্যাপ্ত অতি মিষ্ট তরল স্তুতিরসে অহরহ আমাদের আকণ্ঠ পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতেছে তাহা আমাদিগকে সাংঘাতিক অন্ধস্নেহে নিরুদ্যম জড়ত্বের দিকে, সর্বপ্রকার শৈথিল্যের দিকে কোমল আলিঙ্গনপাশে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যাইতেছে; তাহারা মায়া ছেদন করিতে না পারিলে আমাদের নিস্তার নাই।

ধর্মপ্রচার

হিন্দু কখনো ধর্মপ্রচার করিতে বাহির হয় নাই। কিন্তু কালের গতিকে হিন্দুকেও বিদেশে স্বধর্মের জয়ঘোষণা করিতে বাহির করিয়াছে। সম্প্রতি আটলান্টিক পার হইয়া হিন্দু আপন ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করিয়া আসিয়াছে এবং সেই নব ধরাতলবাসীগণ আমাদের প্রাচীন ধরাতলের পুরাতন কথা শুনিয়া পরিতৃপ্তি প্রকাশ করিয়াছে। ইহাতে উভয় জাতিরই গৌরবের কথা। পুরুষানুক্রমে এবং শৈশবকাল হইতেই যে-সকল সংস্কারের মধ্যে বর্ধিত হওয়া যায়, তাহার বাহিরের কথা, এমন-কি, বিরোধী কথা, ধৈর্যের সহিত ও শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করা বড়ো কঠিন। ধর্ম সম্বন্ধে আমরা তো আপনাদিগকে পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা উদার বলিয়াই জানি, কিন্তু সংস্কার-বিরোধী কথা আমরা তিলার্ধ পরিমাণও সহ্য করিতে পারি না। আমেরিকা যেরূপ অনুরাগ-সহকারে বিদেশীর মুখ হইতে হিন্দুধর্মের মর্ম ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়াছে তাহাতে এই প্রমাণ হয়, যে, তাহাদের জাতীয় প্রকৃতির মধ্যে সেই জীবনীশক্তি আছে যাহার প্রধান লক্ষণ, দান করিবার শক্তি এবং গ্রহণ করিবার শক্তি।

যাহা হউক, আমরা যে আমাদের ধর্মের সত্য প্রচার করিবার জন্য পল্লী ছাড়িয়া বাহির হইয়াছি ইহা আমাদের নবজীবনের লক্ষণ। এই উপলক্ষে নানা মতের সহিত রীতিমতো সংঘর্ষ

প্রাপ্ত হইয়া, সকল বিরোধের সহিত যুদ্ধ করিয়া, সকল আপত্তি খণ্ডনপূর্বক যখন নিজের ধর্মকে সকলের ধর্ম করিয়া তুলিতে পারিব, তখনই প্রকৃত উদারতা লাভ করিব; এখন আমরা যাহাকে উদারতা বলিয়া থাকি, তাহা ঔদাসীন্য, তাহা সকল অনুদারতার অধম।

সম্প্রতি ন্যুইয়র্ক নগরের নাইন্টিন্থ সেঞ্চুরি ক্লাবে বিশপ থোবর্ন এবং বীরচাঁদ গন্ধী নামক বোম্বাইবাসী জৈনধর্মাবলম্বী ব্যারিস্টারের মধ্যে 'ভারতবর্ষে ক্রিশ্চান মিশন' সম্বন্ধে তর্ক হয়— ডাক্তর পল্ কেরস্ মধ্যস্থ থাকেন। থোবর্ন, মিশনের হিতকারিতা, এবং বীরচাঁদ, তাহার অনুপযোগিতা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন। মধ্যস্থ কেরস্ সাহেব যাহা বলেন তাহার মধ্যে আমাদের প্রণিধানযোগ্য অনেক কথা আছে।

তিনি বলেন, যথার্থ দৃঢ় বিশ্বাস থাকিলে প্রচারকার্য অপরিহার্য হইয়া উঠে। যে ধর্মে বিশ্বাস করি সে ধর্ম প্রচার করিতে বিরত হওয়াকে অপক্ষপাত বলে না, তাহাতে ঔদাসীন্য, এবং প্রকৃত বিশ্বাসের অভাব প্রকাশ পায়।

আধ্যাত্মিক বিষয়েও প্রতিযোগিতার আবশ্যক, কারণ, প্রতিযোগিতা উন্নতির প্রধান সহায়। ভিন্ন ভিন্ন মতের সংঘর্ষ উপস্থিত না হইলে কখনোই সত্যের বিশুদ্ধতা ও উজ্জ্বলতা রক্ষিত হয় না। তিনি বলেন, অখৃস্টানদের নিকট ধর্মপ্রচার করিতে গিয়া খৃস্টধর্ম আপন সংকীর্ণতা পরিহার করিয়া উত্তরোত্তর প্রশস্ত হইয়া উঠে। অনেক সময় পরধর্মের ছিদ্র অন্বেষণ করিতে গিয়া নিজধর্মের ছিদ্র বাহির হইয়া পড়ে। তাহার একটি উদাহরণ দেখাইয়াছেন। স্পেন্স্ হার্ডি নামক মিশনারির নাম অনেকে অবগত আছেন। তিনি বুদ্ধধর্ম সম্বন্ধে অনেক রচনা প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থের একস্থলে আছে, বুদ্ধ নিজের ও অন্যের পূর্বজন্ম সম্বন্ধে যে-সকল তথ্য বলিয়াছেন তাহা প্রতারণা মাত্র। কারণ, বুদ্ধ বস্তুতই যদি অতি প্রাচীনকালে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন, তবে বিজ্ঞানে যে-সকল লুপ্তবংশ প্রাচীন জীবজন্তুর বিবরণ আছে, বুদ্ধের পূর্বজন্মের ইতিহাসে তাহাদের উল্লেখ থাকিত। পৃথিবীকে গোল না বলিয়া সমতল বলাতে বৌদ্ধ সাধুগণকে হার্ডি সাহেব নিন্দা করিয়াছেন। এবং বুদ্ধ যে-সকল অলৌকিক কার্য করিয়াছিলেন বলিয়া জনশ্রুতি আছে সেগুলি হার্ডিসাহেবের মতে এত অবিশ্বাস্য, যে, তাহা গম্ভীর ভাবে প্রতিবাদের যোগ্যই নহে।

কেরস্ সাহেব বলেন, হার্ডি সাহেবের এই-সকল নিন্দাবাদ শুনিবামাত্র মনে উদয় হয় যে, খৃস্টের প্রতিও এ সকল কথার প্রয়োগ হইতে পারে। খৃস্ট বলেন তিনি এব্রাহামের পূর্বেও ছিলেন অথচ ম্যামথ্ কিংবা টেরোড্যাক্টিল্ জন্তুর কোনোরূপ উল্লেখ করেন নাই। জলের উপর দিয়া বুদ্ধের গমন যদি অসম্ভব হয় তবে খৃস্টের গমনই বা কেন সম্ভব হইবে? পৃথিবীর সমতলতা সম্বন্ধে হার্ডিসাহেবের মৌন থাকাই শ্রেয় ছিল, কারণ খৃস্টানদের হাতে গ্যালিলিয়োর কীরূপ লাঞ্ছনা হইয়াছিল তাহা সকলেই অবগত আছে।

অতঃপর কেরস্ সাহেব বলিতেছেন, কিছুকাল হইতে বৌদ্ধধর্ম পাশ্চাত্য মনের প্রতি আপন প্রভাব বিস্তার করিয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু এ ধর্মকে য়ুরোপে কে আনয়ন করিল? স্পেন্স্ হার্ডি প্রভৃতি মিশনারিগণ। তাহারা বৌদ্ধধর্মের দেশে বৌদ্ধধর্মকে বিনাশ করিতে গিয়া খৃস্টধর্মের দেশে বৌদ্ধধর্মকে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছে এবং যদিচ বৌদ্ধপ্রচারক পাশ্চাত্য দেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করিতে যায় নাই তথাপি খৃস্টান প্রচারক সেই অভাব পূরণ করিয়া বৌদ্ধধর্মের সাহায্যে খৃস্টধর্মকে প্রশস্ত করিয়া তুলিতেছে।

কেরস্ সাহেবের এই-সকল উক্তির মধ্যে আমাদের গর্বানুভব করিবার উপযোগী যে অংশ আছে তাহা আমাদের কাহারো চক্ষু এড়াইবে না, সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই। ভারতবর্ষের নিকট হইতে শিক্ষালাভ করিয়া খৃস্টানগণ নিজধর্মের উন্নতি সাধন করিতেছেন ইহা শুনিবামাত্র আমাদের ক্ষুদ্রবক্ষ স্ফীত হইয়া উঠিবে, কিন্তু কেরস্ সাহেবের উক্তির মধ্যে আমাদের শিক্ষা করিবার যে বিষয় আছে তাহা সম্ভবত আমাদের নিকট সমাদর প্রাপ্ত হইবে না। প্রকৃত কথা এই যে, হিন্দুগণ

ঘরে বসিয়া আপনাদের ধর্ম এবং আপনাদের প্রকৃতিকে যত উদার বলিয়া মনে করে তাহা তাঁহাদের কল্পনামাত্র হইতে পারে। যতক্ষণ না প্রকৃত জগৎরঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন ততক্ষণ তাঁহারা যাহাকে সত্য বলিয়া মনে করিতেছেন তাহা প্রকৃত সত্য কি, তাঁহাদের সংস্কার মাত্র তাহার প্রমাণ হইবে না। মিথ্যার সহিত যখন হাতে হাতে সংগ্রাম বাধে তখনই সত্যের প্রভাব প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে। আমরা নিজে জানি না আমাদের ধর্ম কতখানি সত্য; কারণ, সে সত্যের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া, সে সত্যকে অগ্রবর্তী করিয়া আমরা মিথ্যার বিরুদ্ধে অগ্রসর হই না; আমরা আপন ধর্মকে আচ্ছাদন করিয়া রাখি; আমরা বলি হিন্দুর ধর্ম কেবল হিন্দুরই; অর্থাৎ হিন্দুধর্মের মধ্যে যে সত্য আছে সে সত্য অন্যত্র সত্য নহে; অতএব সকল ক্ষেত্রেই তাহাকে উপস্থিত করিয়া তাহার সত্যতা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার প্রয়োজন নাই; কেবল হিন্দুর বিশ্বাসের উপরেই তাহাকে স্থাপিত করিয়া রাখিতে হইবে।

হিন্দুমতে স্বগোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ; বৈজ্ঞানিকেরাও বলেন, স্বগোত্রে বিবাহ প্রচলিত হইলে বংশানুক্রমে নানা রোগ, পঙ্গুতা এবং মানসিক বিকার বদ্ধমূল হইয়া যায়। ধর্মমত সম্বন্ধেও এ কথা খাটে। যে ধর্ম বহুকাল অবধি অন্য ধর্মের সহিত সমস্ত সংস্পর্শ সযত্নে পরিহার করিয়া কেবল নিজের গণ্ডির মধ্যে বদ্ধ হইয়া উপধর্ম সৃজন দ্বারা বংশবৃদ্ধি করিতে থাকে, তাহার বংশে উত্তরোত্তর নানাজাতীয় বিকার ক্রমশ বদ্ধমূল হইয়া উঠে। মুসলমানধর্মের সংস্রববশত ভারতবর্ষের নানাস্থানে হিন্দুধর্মের মধ্যে অনেক বিপ্লবের লক্ষণ দেখা দিয়াছিল; এবং আধুনিক বৈষ্ণবধর্মের মধ্যেও মুসলমান ধর্মের প্রভাব কতটা আছে তাহা আলোচনা করিয়া দেখিবার যোগ্য। বঙ্কিম যদিচ পাশ্চাত্যদের প্রতি বহুল অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়াছেন তথাপি তাঁহার কৃষ্ণচরিত্র যিনি মনোযোগ-পূর্বক পাঠ করিয়া দেখিবেন তিনি দেখিতে পাইবেন খৃস্টধর্মের সাহায্য ব্যতীত এ গ্রন্থ কদাচ রচিত হইতে পারিত না। অনেকের নিকট তাহা কৃষ্ণচরিত্রের অগৌরবের বিষয় বলিয়া প্রতিভাত হইতে পারে। আমরা বলি ইহা তাহার প্রধান গৌরব। বঙ্কিম খৃস্টধর্মের আলোকে হিন্দুধর্মের মর্মনিহিত সত্যকে উজ্জ্বল করিতে চেষ্টা করিয়াছেন; তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষা দ্বারা হিন্দুধর্মের কৃত্রিম সংকীর্ণতা ছেদন করিয়াছেন এবং সেই উপায়েই ইহার যথার্থ মাহাত্ম্যকে বাধামুক্ত করিয়া সর্বদেশকালের উপযোগী করিয়া অসংকোচে সগর্বে জগতের সমক্ষে প্রকাশিত করিয়াছেন। বিশুদ্ধ সত্যের উপর কদাচ জাতিবিশেষের শিলমোহর ছাপ পড়ে না— যেখানে ছাপ পড়ে নিশ্চয় সেখানে খাদ আছে।

সাধনা
ফাল্গুন ১৩০১

ইন্ডিয়ান রিলিফ সোসাইটি

অর্থাৎ ভারত দুঃখ নিবারণ সভা। সভার নাম হইতেই তাহার উদ্দেশ্য অনুমান করিয়া লওয়া যাইতে পারে। এই সভাটি গোপনে স্থাপিত হইয়া কিছুকাল হইতে ভারতবর্ষের হিতোদ্দেশে নানা কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়া আসিতেছে। সভা যে পরিমাণে কাজ করিয়াছে সে পরিমাণে আপন নাম ঘোষণা করে নাই। ইহাতে আমাদের মনে যথেষ্ট আশার সঞ্চার হয়।

সাধারণত আমাদের দেশের রাজনৈতিক সভাসকল কী কী উদ্দেশ্য এবং উপায় অবলম্বন করিয়া থাকে তাহা সকলেই অবগত আছেন। এ সভারও সে-সকল অঙ্গের কোনো ত্রুটি নাই। কিন্তু তাহা ছাড়া ইহার একটি বিশেষত্ব আছে। এ সভা উপযুক্ত বোধ করিলে লোকবিশেষ এবং সম্প্রদায়বিশেষের পক্ষ অবলম্বন করিয়া তাহাদের দুঃখ দূর করিবার জন্য চেষ্টা করিয়া থাকে। কারণ, সভার মতে, ভারতবর্ষকে যেমন অনুচিত আইন হইতে রক্ষা করা চাই, তেমনি তাহাকে

অন্যায় শাসন হইতেও পরিত্রাণ করা আবশ্যক।

সভার এই বিশেষত্বটুকু আমাদের কাছে সব চেয়ে ভালো লাগিতেছে। তাহার বিশেষ কারণও আছে। অনুচিত আইন এবং অন্যায় শাসন যদি কোনো মন্ত্রবলে ভারতবর্ষ হইতে একেবারে উঠিয়া যায়— আইনকর্তারা যদি সম্পূর্ণ অপক্ষপাত এবং অপরিসীম বিচক্ষণ ব্যক্তি হন, ও শাসনকর্তারা সকলেই অভ্রান্ত ন্যায়পর ও অন্তর্যামী হইয়া উঠেন তবে দেশের অনেক দুঃখ দূর ও সুখ বৃদ্ধি হয় সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহাতে আমাদের জাতিগত আভ্যন্তরিক অবস্থার অধিক কিছু পরিবর্তন হয় না। কেবল সুআইন এবং সুশাসনে একটা জাত বাঁধিয়া দিতে পারে না; তাহাতে রাজভক্তি এবং রাজনির্ভর বাড়াইয়া দিতে পারে, কিন্তু স্বজাতিভক্তি এবং আত্মনির্ভর তাহাতে বাড়ে না। অথচ সেই স্বজাতিবন্ধনই দেশের সমস্ত স্থায়ী মঙ্গলের মূল ভিত্তি।

গবর্নমেন্টকে কোনো প্রকার শিক্ষা দিবার পূর্বে, স্বজাতি এবং স্বজাতির কর্তব্য কাহাকে বলে এই শিক্ষা দেশের লোককে দেওয়া বিশেষ আবশ্যক। এ শিক্ষা কেবল বই পড়াইয়া বা বক্তৃতা দিয়া হইতে পারে না, এ শিক্ষা কেবল প্রত্যক্ষ উদাহরণের দ্বারা হইয়া থাকে।

যখন একজন সামান্য চাষা দেখিতে পাইবে তাহাকে বিজাতি-কৃত অন্যায় হইতে রক্ষা করিবার জন্য নিঃস্বার্থ স্বদেশীয় দল অগ্রসর হইতেছে, এমন-কি, পরের বিপদ দূর করিতে গিয়া অনাবশ্যক নিজের বিপদ আহ্বান করিয়া লইতেছে তখন সে অন্তরের সহিত অনুভব করিতে স্বজাতি কাহাকে বলে; তখন সে ক্রমে ক্রমে বুঝিতে পারিবে কেবল ভাই বন্ধু তাহার আপন নহে, সমস্ত স্বজাতি তাহার আপন।

অনেক অন্যায় কেবল অবহেলাবশত ঘটিয়া থাকে। যখন জানা থাকে যে, দুর্বল ব্যক্তির অন্যায় প্রতিকারের কোনো ক্ষমতা নাই এবং অন্যায়কে সে আপন অদৃষ্টের লিখন জ্ঞান করিয়া তেমন সুতীব্রভাবে অনুভব করে না, তখন তাহার প্রতি সূক্ষ্মভাবে ন্যায়াচরণ করিতে তেমন একান্ত সতর্কতা জন্মে না। তখন তাহার হীনতা উপলব্ধি করিয়া তাহার সুখদুঃখের প্রতি কথঞ্চিৎ অবজ্ঞা জন্মিয়াই থাকে। কিন্তু যখন প্রত্যেক লোক তাহার স্বজাতির বলে বলী, তখন সে নিজেই অন্যায়ের প্রতি অসহিষ্ণু হইয়া উঠে এবং অন্যেও তাহার প্রতি নির্বিচারে অন্যায় করিতে সাহসী হয় না। কাঁদাকাটি করিয়া পরকে ন্যায়পর করিয়া তুলিবার চেষ্টা করা অপেক্ষা একত্র হইয়া নিজেকে বলশালী করিবার চেষ্টা করাই সংগত।

রিলিফ সোসাইটি যখন ব্যক্তিবিশেষ অথবা সম্প্রদায় বিশেষকে অন্যায় হইতে রক্ষা করিতে অগ্রসর হইবে তখন স্বজাতির নিকটে স্বজাতির মূল্য অনেক বাড়াইয়া দিবে। ইহা অপেক্ষা মহৎ উদ্দেশ্য আর কী হইতে পারে? যে অন্যায় নিবারণের জন্য তাঁহারা চেষ্টা করিবেন সে অন্যায় নিবারণে তাঁহারা সক্ষম না হইতে পারেন কিন্তু সেই নিষ্ফল চেষ্টাতেও তাঁহারা যে ফল লাভ করিবেন, তাহা, কোনো বিশেষ অন্যায় প্রতিকারের অপেক্ষা অনেক গুরুতর।

অন্যায় আইন রহিত করিয়া ভালো আইন প্রচলিত করা এবং ভারতবাসীদের স্বত্বাধিকার বিস্তার করার জন্য কন্‌গ্রেস্ যে চেষ্টা করিতেছেন সে চেষ্টা পরম হিতকর সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহার মুখ্য ফলের অপেক্ষা গৌণ ফল আমাদের নিকট অনেক বেশি মূল্যবান বলিয়া বোধ হয়। ভারতবর্ষীয় ভিন্ন জাতির একত্র সম্মিলন এবং পরস্পর হৃদয় বিনিময়— ইহাই আমাদের পরম লাভ— ইংরাজের রাজসভায় আসন লাভ করার অপেক্ষা ইহা অনেক সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ। এবং এই কারণেই, রিলিফ্ সোসাইটির অন্যান্য সকল কর্তব্য অপেক্ষা পূর্বোক্ত বিশেষ কর্তব্যটি আমাদের নিকট সর্বাপেক্ষা আদরণীয় বলিয়া বোধ হয়। অবস্থাবিশেষে পরের অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতে হয়, কিন্তু সকল অবস্থাতেই নিজের স্বাধীন বলবৃদ্ধির চেষ্টাই শ্রেয়।

উদ্দেশ্য সংক্ষেপ ও কর্তব্য বিস্তার

অনেক সময় বৃহৎ উদ্দেশ্য লইয়া বসিলে অল্পই কাজ হয় এবং উদ্দেশ্য খাটো করিলে ফল বেশি পাওয়া যায়। বিশেষত আমাদের অর্থ এবং সামর্থ্য উভয়ই স্বল্প— এইজন্য যথার্থ নিজের কর্তব্য পালন করিবার ইচ্ছা থাকিলে সে কর্তব্যকে আপন সাধ্যসীমার মধ্যে আনিতে হইবে।

বড়ো বড়ো স্বাধীন দেশে প্রায় অধিকাংশ শুভকার্যের ভূমিপত্তন হইয়া আছে। এইজন্য কোনো একটা ফলাও কাজে প্রবৃত্ত হওয়া তাহাদের পক্ষে সহজ। কিন্তু আমাদের দেশে সকল প্রকার দেশহিতকর কাজ একেবারে গোড়া হইতে আরম্ভ করিতে হয়। অতএব বহুদূরে না গিয়া নিকট হইতে কাজ শুরু করাই আবশ্যক।

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে, যাহারা সহজে কর্মপ্রিয় নহে তাহাদিগকে কর্মে উৎসাহিত করিতে হইলে খুব একটা বৃহৎ সংকল্পের উত্তেজনা সর্বদা সম্মুখে রাখিতে হয়। ছোটো কাজ হইতে বড়ো কাজে যাওয়া, না, বড়ো কাজ হইতে ছোটো কাজে আসা কোন্‌টা স্বাভাবিক পথ সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন ছোটো কাজের নদীপ্রবাহ বাহিয়া বড়ো কাজের সমুদ্রে গিয়া অবতীর্ণ হইতে হয়। আবার কেহ কেহ বলেন, বড়ো কাজের গুঁড়ি অবলম্বন করিয়া ছোটো কাজের শাখা-প্রশাখায় উত্তীর্ণ হওয়াই সংগত।

আসল কথাটা এই, দেশে যখন একটা নূতন ভাবের আবির্ভাব হয় তখন প্রথমে সেটার দ্বারা আপন কল্পনাকে পরিপূর্ণ করিয়া লইতে হয়— প্রথমে তাহার সমগ্র বৃহত্ত্বটা সম্মুখে রাখিয়া তাহার সম্যক পরিচয় গ্রহণ করিতে হয়— প্রথমে সেই ভাবটাকে সাধারণত দেশের আবহাওয়ার সঙ্গে মিশাইয়া লইতে হয়— তাহার পরে তাহার গূঢ় প্রভাব ছোটো বড়ো নানা কাজে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিতে আরম্ভ করে।

সেইজন্য, এক সময়ে বঙ্গসাহিত্যে সে-সকল ভারত-জাগানো গানের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল এখন তাহাকে অনেকে পরিহাসচক্ষে দেখিয়া থাকেন; কারণ, দেশহিতৈষণার সাধারণ ভাবটা এখন শিক্ষিতসাধারণের নিকট সুপরিচিত হইয়া গিয়াছে; এখন সাধারণ কথার অপেক্ষা বিশেষ কথার প্রয়োজন বেশি। এখন কোনো লোককে জাগিতে বলিলে সে বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠে, আরে বাপু, আমি অনেকক্ষণ জাগিয়া বসিয়া আছি এখন কী করিতে হইবে বলো দেখি।

যেমন ভাবের সম্বন্ধে তেমনি কাজের সম্বন্ধেও। এখনও আমাদের দেশহিতৈষিণী সভাগুলি অত্যন্ত বৃহৎ ব্যাপক উদ্দেশ্যের মধ্যে আপনাদিগকে দিশাহারা করিয়া রাখিয়াছেন। সে-সকল সভার দ্বারা অনেক শুভফল ফলিতেছে সন্দেহ নাই কিন্তু সেইসঙ্গে এমন কতকগুলি সভার আবশ্যক যাঁহারা উদ্দেশ্যের পরিধি সংক্ষিপ্ত করিয়া যথার্থ কর্তব্যের পরিধি বিস্তৃত করিবেন। অর্থাৎ যাঁহারা কেবল আন্দোলন না করিয়া কাজে হাত দিবেন।

আমাদের প্রথমেই মনে হয় সমস্ত ভারতবর্ষের জন্য বিস্তর সভাসমিতির সৃষ্টি হইয়াছে, এক্ষণে কোনো সভা যদি কেবলমাত্র সমস্ত বাংলা দেশের দুঃখ অভাব মোচনের জন্য কৃতসংকল্প হন তবে সম্ভবত কতকটা বেশি কাজ করিতে পারেন। আমাদের লোকবল, অর্থবল এবং চরিত্রবল যেরূপ, তাহাতে সমস্ত ভারতের হিতসাধনোদ্দেশে আমরা কেবল দরখাস্ত করিতে পারি— কিন্তু কেহ কেহ যদি কেবল বাংলাদেশের মধ্যেই আপন হিতৈষণার উদ্যম বদ্ধ করেন তবে সম্ভবত কতকটা পরিমাণে কাজ করিতে পারেন— এবং ক্রমে সেই উপায়ে সমস্ত ভারতবর্ষের উন্নতির পাকা ভিত্তি পত্তন করিতে পারেন।

একটা দৃষ্টান্ত দিই। এখন, অধিকাংশ রাজনৈতিক আন্দোলন ইংরাজিতেই হইয়া থাকে; তাহার কারণ, সমস্ত ভারতবর্ষ এবং সমস্ত ভারতবর্ষের রাজাকে কোনো কথা নিবেদন করিতে হইলে অগত্যা ইংরাজি ভাষা অবলম্বন করিতে হয়। কিন্তু তাহার ফল হয় এই যে, কেবল শিক্ষিতের নিকট শিক্ষা ছড়ানো হয়। ইংরাজ যে সর্বদাই খোঁটা দিয়া থাকে যে, আমাদের দেশের

পোলিটিকাল আন্দোলন কেবল ইংরাজিশিক্ষিতদিগের কৃত্রিম আন্দোলন, সেই নিন্দাবাদের কোনো যথার্থ প্রতিকার করা হয় না। পুলিস বিল, চৌকিদারি বিল, প্রভৃতি আইন সম্বন্ধে আমাদের আপত্তি আমরা বিদেশীভাষায় টাউন্‌হলে প্রকাশ করিয়া থাকি, তদ্দ্বারা সে-সকল বিল সংশোধন হইতেও পারে কিন্তু বিল সংশোধন অপেক্ষা দেশ-সংশোধন ঢের বড়ো কাজ। এই-সকল বিলে দেশের যে প্রজা-সাধারণের শুভাশুভ নির্ভর করিতেছে, সেই প্রজাদিগকে বিলগুলির উদ্দেশ্য এবং আমাদের সকলের কর্তব্য বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যক। তাহারা কী অধিকার পাইল এবং তাহাদের নিকট হইতে কী অধিকার প্রত্যাহরণ করা হইল ইহা তাহাদিগকে স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিলে যে উপকার হইবে ইংরাজ রাজসভায় দরবার করিয়া সে পরিমাণ উপকার হইবে না।

কেবল ইহাই নয়— দেশের রোগনিবারণ, শিক্ষাবিস্তার, ধনবৃদ্ধি, শান্তিরক্ষা, অন্যায়প্রতিকার প্রভৃতি সমস্ত কাজে ঢের বেশি তন্ন তন্ন করিয়া মনোযোগ দেওয়া যাইতে পারে। গবর্মেন্টকে কর্তব্যশিক্ষা দান করিবার বিস্তৃত আয়োজনে সমস্ত উদ্যম নিয়োগ না করিয়া নিজেদের অদূরবর্তী কর্তব্যপালনের জন্য কিছু অবশিষ্ট রাখা একান্ত আবশ্যক হইয়াছে।

উৎসবে ব্যসনেচৈব দুর্ভিক্ষে রাষ্ট্রবিপ্লবে
রাজদ্বারে শ্মশানে চ যস্তিষ্ঠতি স বান্ধবঃ।

দারিদ্র্যে, দুর্ভিক্ষে রাজদ্বারে আমরা আপন দেশের লোকের সাহায্যে আপনারা উপস্থিত থাকিয়া স্বজাতিই স্বজাতির সর্বপ্রধান বান্ধব ইহাই প্রমাণ করা আমাদের প্রধান কাজ। পার্লামেন্টের সহিত বন্ধুত্বস্থাপনচেষ্টাও মন্দ কাজ নহে— কিন্তু দেশের লোকের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপনের ন্যায় ফল তাহাতে পাইব না।

হিন্দু ও মুসলমান

আমাদের একটা মস্ত কাজ আছে হিন্দু-মুসলমানে সখ্যবন্ধন দৃঢ় করা। অন্য-দেশের কথা জানি না কিন্তু বাংলাদেশে যে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সৌহার্দ্য ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বাংলায় হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের সংখ্যা বেশি এবং হিন্দু-মুসলমানে প্রতিবেশিসম্বন্ধ খুব ঘনিষ্ঠ। কিন্তু আজকাল এই সম্বন্ধ ক্রমশ শিথিল হইতে আরম্ভ করিয়াছে। একজন সম্ভ্রান্ত বাঙালি মুসলমান বলিতেছিলেন বাল্যকালে তাঁহারা তাঁহাদের প্রতিবেশী ব্রাহ্মণ পরিবারদের সহিত নিতান্ত আত্মীয়ভাবে মেশামেশি করিতেন। তাঁহাদের মা-মাসিগণ ঠাকুরানীদের কোলে পিঠে মানুষ হইয়াছেন। কিন্তু আজকাল শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে নূতন হিন্দুয়ানি অকস্মাৎ নারদের ঢেঁকি অবলম্বন করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছে। তাঁহারা নবোপার্জিত আর্য অভিমানকে সজারুর শলাকার মতো আপনাদের চারি দিকে কণ্টকিত করিয়া রাখিয়াছেন; কাহারো কাছে ঘেঁসিবার জো নাই। হঠাৎবাবুর বাবুয়ানার মতো তাঁহাদের হঠাৎ হিঁদুয়ানি অত্যন্ত অস্বাভাবিক উগ্রভাবে প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। উপন্যাসে নাটকে কাগজে পত্রে অকারণে বিধর্মীদের প্রতি কটাক্ষপাত করা হইয়া থাকে। আজকাল অনেক মুসলমানেও বাংলা শিখিতেছেন এবং বাংলা লিখিতেছেন— সুতরাং স্বভাবতই এক পক্ষ হইতে ইঁট এবং অপরপক্ষ হইতে পাটকেল্ বর্ষণ আরম্ভ হইয়াছে। কোথায় তুর্কীর সুলতান তিনশত পাচক রাখিয়াছেন ইহা লইয়া ম্লেচ্ছদিগকে তিরস্কার ও হিঁদুয়ানির বড়াই করিয়া আপন পাড়ার প্রতিবেশীদের সহিত বিরোধের সূত্রপাত করিলে তাহাতে হিন্দুদের, মাহাত্ম্য নহে, পরন্তু ক্ষুদ্রতারই পরিচয় দেওয়া হয়। যদি আমাদের ধর্মের এমন কোনো গুণ থাকে যাহাতে আমাদের পুরাতন পাড়ার লোককেও আপন করিয়া লইতে বাধা দেয় তবে সে ধর্মের জন্য অহংকার করিবার কারণ কিছুই দেখি না।

কন্‌গ্রেসে বিদ্রোহ

কন্‌গ্রেসে নর্টনকে লইয়া যে বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল সে সম্বন্ধে আমাদের মত আমরা পূর্বেই ব্যক্ত করিয়াছিলাম। আমরা এই কথা বলিয়াছিলাম, যে ব্যক্তি সমাজে পতিত, সে যে অকৃত্রিম হিতৈষণাসত্ত্বেও ভারতহিতব্রতে যোগ দিতে পারিবে না আমরা এরূপ জুলুমের কোনো অর্থ বুঝিতে পারি না। মনে করা যাক হঠাৎ বর্ষায় নদী বাড়িয়া উঠিতেছে, হয়তো এক রাত্রেই জলপ্লাবনে দেশ নষ্ট হইতে পারে; কতকগুলি লোক বাঁধ বাঁধিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। এমন সময় যদি কোনো পাপী লোক আসিয়াও পরের জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে চাহে, নৈপুণ্যের সহিত সেই দুষ্কর কার্যে সাহায্য করিতে প্রবৃত্ত হয়— তবে কি তাহাকে বলিতে হইবে, আমরা সকলে সাধু এবং তুমি পাপী; অতএব তোমার নৈপুণ্য এবং তোমার হিতৈষণাবৃত্তি লইয়া তুমি চলিয়া যাও, তুমি বাঁধ বাঁধিতে পাইবে না? তখন কি ইহা দেখিব না, যাহার যথার্থ হিতেচ্ছা আছে হিতকর্মে তাহার অধিকার আছে— এবং তাহার অন্য অপরাধ স্মরণ করিয়া তাহাকে ভালো কাজ করিতে বাধা দিলে কেবল তাহাকেই বাধা দেওয়া হয় না, সে কাজকেও বাধা দেওয়া হয়? আমরা এই কথা বলি, দুঃসময়ে যে লোক বাঁধ বাধিতে আসিয়াছে, তাহার বাড়িতে নিমন্ত্রণ খাইতে না যাইতে পারি, তাহার সহিত কন্যার বিবাহ না দিতে পারি— কিন্তু তাহাকে বাঁধ বাঁধিতে বাধা দিতে পারি না। আমাদের মধ্যে এমন নিষ্কলঙ্ক সাধু অতি অল্পই আছেন যাঁহারা অকৃত্রিম সদনুষ্ঠান হইতে কোনো পাপীকে নিরস্ত করিবার অধিকার অসংকোচে লইতে পারেন?

আমরা একটি সংক্ষিপ্ত উপমা অবলম্বন করিয়া পূর্বোক্তরূপ মত ব্যক্ত করিয়াছিলাম। সঞ্জীবনী সেই উপমা প্রয়োগে বিষম বিচলিত হইয়া আমাদের প্রতি অত্যন্ত স্থূল গোছের একটা রসিকতা নিক্ষেপ করিয়াছেন। আমরা উপমা প্রয়োগ করিয়াছিলাম সে অপরাধ স্বীকার করিতেই হইবে কিন্তু কাহারো প্রতি গালি প্রয়োগ করি নাই। সঞ্জীবনীর মতো কাগজ, যাঁহাকে বিস্তর প্রচলিত মতের সহিত সর্বদা বিরোধ করিতে হয়, তিনি যে আজও মতের অনৈক্যে ধৈর্যরক্ষা করিতে শিক্ষা করিলেন না ইহাতে আমরা বিস্মিত হইয়াছি।

রাষ্ট্রীয় ব্যাপার

আমাদের কোনো বন্ধু গত মাসের সাধনায় পলিটিক্স শব্দের ব্যবহার দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছেন পলিটিক্স্ শব্দের স্থানে রাষ্ট্রীয় ব্যাপার শব্দ প্রয়োগ করা যাইতে পারে কি না?

বাংলার পলিটিক্সের পরিবর্তে রাজনীতি শব্দ প্রচলিত হইয়া গেছে। কিন্তু রাজনীতি শব্দটি পুরাতন, পলিটিক্স্ আমাদের পক্ষে নূতন। আমাদের দেশে যখন রাজনীতি ছিল তখন ঠিক আধুনিক পলিটিক্স্ ছিল না। সুতরাং উভয় শব্দের মধ্যে অর্থের কিছু ইতরবিশেষ আছেই। বোধ করি তাহারই প্রতি লক্ষ করিয়া আমাদের বন্ধু রাষ্ট্রীয় ব্যাপার শব্দটি ব্যবহার করিতে ইচ্ছুক।

যখন পূর্বকার রাজার সহিত এখনকার রাজার অনেক তফাত হইয়া গেছে তখন রাজনীতি হইতে রাজা শব্দটাই বাদ দেওয়া দরকার। অতএব রাজনীতি না বলিয়া রাষ্ট্রনীতি বলিলে কথাটা আরও পরিষ্কার হয় বটে। কারণ, রাষ্ট্রে রাজা থাকিতেও পারে, না থাকিতেও পারে। যেমন আমেরিকার সম্মিলিত রাষ্ট্রে রাজা নাই, সেখানে রাজনীতি নাই, রাষ্ট্রনীতি আছে। এই হিসাবে রাষ্ট্রনীতি শব্দ রাজনীতি শব্দের অপেক্ষা অধিকতর ব্যাপক।

পলিটিক্স্ জিনিসটা আমরা ইংরাজের নিকট হইতে পাইয়াছি, অতএব ওই শব্দটা ইংরাজি আকারে ব্যবহার করিতে আমাদের কোনো আপত্তি নাই, তাহাতে উহার ইতিহাসও রক্ষা হয় ভারও রক্ষা হয়। সেইসঙ্গে যদি একটা বাংলা প্রতিশব্দ থাকে তো থাক্। রাজনীতি শব্দটি প্রচলিত

হইয়া গিয়াছে। অনেক পুরাতন শব্দ কালক্রমে অর্থ পরিবর্তন করে এ স্থলেও তাহা ঘটিতে পারে। অপর পক্ষে রাষ্ট্রনীতি শব্দটিও দুরূহ নহে, এবং অধিকতর সংগত।

সাধনা
চৈত্র ১৩০১

ফেরোজ শা মেটা

মাননীয় ফেরোজ শা মেটা ভারত মন্ত্রীসভায় পুলিস বিলের যে প্রতিবাদ করিয়াছিলেন তাহা আমাদের কর্তৃপুরুষদিগের সহ্য হয় নাই। হঠাৎ একটা বজ্রের শব্দ শুনিলে ছেলেরা কাঁদিয়া উঠে— তাহারা মনে করে কে যেন উপর হইতে তাহাদের প্রতি ভারি একটা অন্যায় করিল, যেন তাহাদের কোথায় এক জায়গায় ঘা লাগিয়াছে— শ্রীযুক্ত মেটা ভারতসভায় যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহাতে যদিও তিনি কাহাকেও আঘাত করেন নাই তথাপি হঠাৎ তাহার শব্দে এবং নূতন আলোকের ছটায় সাহেবদের খামকা মনে হইল তাঁহাদের সিবিল সর্বিসের সুকোমল পৃষ্ঠে বুঝি কে মুষ্টিপাত করিল অমনি তাঁহারা বিচলিত হইয়া উঠিলেন। একটা নূতন আলোক অকস্মাৎ একটা জ্যোতির্ময় কবাঘাতের মতো মন্ত্রীসভার আকাশের গায়ে চমক দিয়া গিয়াছিল— তাই সাহেবরা অকস্মাৎ এতই চকিত হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, তাঁহারা মনে করিতে পারেন নাই তাঁহাদিগকে কেহ আঘাত করে নাই।

মেটা বলিয়াছিলেন— বিনা বিচারে দোষী সাব্যস্ত করিয়া তাহার আপিলের অধিকার না দিলে অবিচারের সম্ভাবনা আছে। কর্তৃপুরুষেরা ক্ষাপা হইয়া বলিয়া উঠিলেন— কেন, আমরা কি তবে সকলেই অবিচারী? গম্ভীরভাবে ইহার উত্তর দিতে বসিলে আমাদের কর্তাদের বুদ্ধির প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করা হয়— কেবল, এই প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করি, তবে কোনো অপরাধের জন্য কোনো প্রকার বাঁধা বিচারপ্রণালী থাকে কেন? আমাদের স্বর্গসম্ভব সিবিল সর্বিসের সভ্যগণকেও আইন পালন করিয়া বিচার করিতে হয় এ অপমান তাঁহারা স্বীকার করেন কেন? নিয়ম মাত্রই তো মানুষের স্বেচ্ছাধীন বিবেচনা, স্বাধীন ধর্মবুদ্ধি এবং অবাধ হৃদয়বৃত্তির প্রতি সন্দেহ প্রকাশ।

তাহার পরে আবার বাজেটের আলোচনাকালেও আমাদের বাংলাদেশের ছোটো বিধাতা ইস্কুলমাস্টারের মতো গলা করিয়া শ্রীযুক্ত মেটাকে বিস্তর উপদেশপূর্ণ ভর্ৎসনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, মেটা সাহেব খুব ভালো ছেলে শুনিয়াছিলাম কিন্তু তিনি আমাদের আশানুরূপ উচ্চ নম্বর রাখিতে পারিতেছেন না, অতএব তাঁহাকে ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক করা যায়। কর্তাদের মতে, বাজেটের আলোচনায় শ্রীযুক্ত মেটা কোনো প্রকার কাজের পরামর্শ দেন নাই কেবল সাধারণভাবে বিরোধ প্রকাশ করিয়াছেন।

মেটা সাহেব বলিয়াছিলেন, সৈন্যবিভাগের খরচ অত্যন্ত বেশি বাড়িয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষের ভূতপূর্ব রাজস্বসচিব সার্ অক্‌লান্ড কলভিনও ওই কথা বলিয়াছেন।

ওয়েস্ট্‌ল্যান্ড সাহেব পাকেপ্রকারে বলেন খরচ বাড়ে নাই, এক্সচেঞ্জের দুর্বিপাকে অধিক টাকা নষ্ট হইতেছে। তিনি বলেন পৌন্ডের হিসাবে হিসাব ধরিলে খরচ কম দৃষ্ট হইবে। এ কৈফিয়তটার মধ্যে কিছু চোখে ধুলা দেওয়া আছে এইরূপ আমরা অনুমান করি। ভারতবর্ষে যখন রৌপ্যমুদ্রায় অধিকাংশ খরচ নির্বাহিত হয় তখন পৌন্ডহিসাবে হিসাব করিয়া খরচ কম দৃষ্ট হইলেও প্রকৃতপক্ষে তাহাতে ব্যয়ের ন্যূনতা প্রমাণ হয় না। অতএব ওয়েস্ট্‌ল্যান্ড সাহেবের এ যুক্তির মধ্যে সরলতা নাই এবং তাহাতে আমাদের কোনো সান্ত্বনাও দেখি না।

আমরা কাজের কথা কী বলিব? আমরা যদি বলি, সাহেব কর্মচারীদিগকে ক্ষতিপূরণবৃত্তি (কম্পেন্‌সেশন অ্যালাউয়েন্স) দিবার আবশ্যক নাই, তোমরা বলিবে, না দিলে নয়। বর্তমান

এক্সচেঞ্জের হিসাবে ধরিয়াও তোমাদের স্বদেশের সহিত এখানকার বেতনের তুলনা করিয়া দেখো। এখানে বিদেশে থাকিয়া তোমাদের খরচ বেশি হয়? কেন হয়? এমন যদি বুঝিতাম এখানে তোমাদের যেরূপ চাল বিলাতেও তোমাদের সেই চাল তাহা হইলে আমাদের কোনো আপত্তির কারণ ছিল না। বিলাতের মধ্যবিত্ত অবস্থায় কয়জন লোক বৎসরের মধ্যে কয়দিন শ্যাম্পেন্-ডিনার ভোগ করিয়া থাকে? এ কথা কি সাহেবরা অস্বীকার করিতে পারেন যে, ভারতবর্ষে তাঁহারা বিস্তর অনভ্যস্ত এবং অনাবশ্যক নবাবী করিয়া থাকেন? সে-সমস্ত যদি তাঁহারা কিঞ্চিৎ খাটো করিতে প্রস্তুত হইতেন তাহা হইলে কি আমাদের এই-সকল অর্ধ-উপবাসীদের কষ্টসঞ্চিত উদরান্নে হাত দিতে হইত?

গল্পে কথিত আছে, বাবু যখন গোয়ালার বিল হইতে তাহার অর্ধেক পাওনা কাটিয়া দিলেন তখনও সে প্রসন্নমুখে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল— তাহার প্রসন্নতার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে কহিল, এখনও দুধে পৌঁছায় নাই। অর্থাৎ কাটাটা কেবল জলের উপর দিয়াই গিয়াছে। প্রতিকূল এক্সচেঞ্জেও এখনও সাহেবদের হুইস্কি সোডা এবং মুর্গি মটনে আঘাত করে নাই তাহা বড়ো জোর শ্যাম্পেন টোকে, এবং অতিরিক্ত ঘোড়া ঘোড়দৌড়ের উপর দিয়াই গিয়াছে; কিন্তু কম্পেন্‌সেশন অ্যালাউয়েন্স আমাদের মোটা চাউল এবং বহুজলমিশ্রিত কলাইয়ের ডালে গিয়া হস্তক্ষেপ করিয়াছে।

আমরা বলিতেছি, তোমাদের ভারত শাসনের যন্ত্রটা অত্যন্ত বহুব্যয়সাধ্য হইয়াছে— যদি অধিকতর পরিমাণে দেশী লোক নিয়োগ কর তাহা হইলে সস্তা হয়। তাহাতে যে কাজ খারাপ হয় এমন কোনো প্রমাণ নাই। তোমরা বলিবে সে কোনো মতেই হইতে পারে না।

তোমাদের কথাটা এই, আমরা সৈন্য বিভাগের বিস্তার করিব, ভারতবর্ষের দুশো-পাঁচশো মাইল দূরে যেখানে যত ভীমরুলের চাক আছে গায়ে পড়িয়া সবগুলাতে খোঁচা মারিয়া বেড়াইব, ইংরাজ কর্মচারীদিগকে ক্ষতিপূরণবৃত্তি দিব, এবং মোটা পদের ইংরাজ কর্মচারী নিয়োগ করিয়া ভারতবর্ষের রক্তরিক্ত দেহে মোটা দাঁত বসাইয়া খাদ্য শোষণ করিব— ইহার অন্যথা হইবে না, এক্ষণে ব্যয়সংক্ষেপ সম্বন্ধে আমাদিগকে কাজের পরামর্শ দাও।

অনেক সময় যথার্থ কাজের পরামর্শ অত্যন্ত সহজ এবং পুরাতন। অজীর্ণ রোগী যত বড়ো ডাক্তারের নিকট উপদেশ লইতে যাক সকলেই বলিবেন, তুমি পথ্যসংযম করো। কিন্তু রোগী যদি বলে ‘ওটা কোনো কাজের কথা হইল না— আমি ঘৃতপক্ক অখাদ্য খাইবই, এবং ক্ষুধার অবস্থা যেমনই থাক্ আহারের পরিমাণ বাড়াইতে থাকিব, তুমি যদি বড়ো ডাক্তার হও আমাকে একটা চিকিৎসার উপায় বলিয়া দাও’— তবে সে রোগীর নিকট খাদ্য পরিবর্তন, বায়ু পরিবর্তন প্রভৃতি স্বাস্থ্যতত্ত্বের সমস্ত মূলনীতিই নিতান্ত বাজে এবং সাধারণ কথা বলিয়াই মনে হইবে।

বিবাহ করিতে উদ্যত কোনো যুবকের প্রতি পাঞ্চ পত্রিকার একটি অত্যন্ত সহজ এবং সংক্ষিপ্ত উপদেশ ছিল— সেটি এই— ‘এমন কাজ করিয়ো না!’ অপব্যয় করিতে উদ্যত গবর্মেন্টের প্রতিও এতদপেক্ষা সহজ এবং সংগত উপদেশ হইতে পারে না। ফেরোজ শা মেটা সেই উপদেশটি দিয়াছিলেন— তাহাতেই কর্তারা অত্যন্ত উষ্মা প্রকাশপূর্বক বলিয়াছিলেন ইহা কোনো কাজের উপদেশ হইল না।

বেয়াদব

কৌন্সিল সভায় একটা নূতন জীবনের লক্ষণ দেখা দিয়াছে ইহাতেই রাজপুরুষেরা কিছু ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। এতদিন মন্ত্রণাকার্য যেন যন্ত্রের মতো চলিয়া আসিতেছিল এখন হঠাৎ তাহারই মাঝখানে একটা ব্যথিত হৃদয়ের আওয়াজ শুনিয়া ছোটো হইতে বড়োকর্তা পর্যন্ত ক্ষিপ্তপ্রায়

হইয়াছেন, তাঁহারা বলিতেছেন মন্ত্রিসভার গম্বুজের মধ্যে ভারতবর্ষের হৃদয়ের মতো এমন একটা সজীব পদার্থকে হঠাৎ আনয়ন করা কেহ প্রত্যাশা করে নাই— কৌন্সিল সভায় এত বড়ো বেয়াদবি ইতিপূর্বে কখনো ঘটে নাই।

কিন্তু, হায়, এই অবাধ্য বেয়াদবটিকে আর তো চাপিয়া রাখা যায় না। এ এখন সর্বত্রই প্রবেশ করিতেছে। সভা, সমিতি, সাহিত্য, সংবাদপত্র, সমুদ্রপারের পার্লামেন্টপরিষদ, সর্বত্রই ইহার অভ্যুদয় দেখা যাইতেছে। অবশেষে সজীব ভারতবর্ষ তাহার পক্ষে সর্বাপেক্ষা দুর্গমতম স্থানের দ্বারমোচন করিয়াছে, সে ভারত মন্ত্রিসভায় প্রবেশ প্রাপ্ত হইয়াছে।

যাঁহার বক্ষ আশ্রয় করিয়া ভারতবর্ষের হৃদয় এমন অসম্ভব স্থানে আপনাকে প্রকাশ করিতে পারিয়াছে সেই ফিরোজ শা মেটার নিকট অল্পকাল হইল আমরা ভারতবাসী প্রকাশ্যে কৃতজ্ঞতা জানাইয়াছি। মেটা যে কাজে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন তাহাতে সফল হইতে পারেন নাই কিন্তু তাহা হইতে উচ্চতর সফলতা লাভ করিয়াছেন।

কিন্তু এই উপলক্ষে গবর্মেন্ট এবং প্রজার মধ্যে আর-একটি বিভাগের সৃষ্টি হইল। মন্ত্রিসভায় এক পক্ষে ভারতবর্ষ এবং অন্যপক্ষে গবর্মেন্ট দণ্ডায়মান হইলেন; ইহাতে মাঝে মাঝে সংঘাত সংঘর্ষ হইবেই। সর্বত্রই এইরূপ হইয়া থাকে। যেখানে জীবন প্রবেশ করিয়াছে সেইখানেই জীবনের যুদ্ধ অনিবার্য।

কিন্তু আমরা দুর্বল পক্ষ। এ সংঘাতে কি আমাদের ভালো হইবে? যাঁহারা কেবলমাত্র প্রত্যক্ষ প্র্যাক্‌টিক্যাল ভালোর দিকে দৃষ্টি রাখেন তাঁহারা অনেক সময় নিরাশ হইবেন, অনেক সময় কেবল দলাদলির জিদ্‌ বজায় রাখিতে গিয়া গবর্মেন্ট আমাদের সংগত প্রস্তাবকেও অগ্রাহ্য করিবেন। কিন্তু সভ্যসমাজে গায়ের জোর একমাত্র জোর নহে; ক্রমশ আমরাই আবিষ্কার করিতে থাকিব যে যুক্তির বল, ঐক্যের বল, নিষ্ঠার বল, অধ্যবসায়ের বল সামান্য নহে। আমরা নিজে যুঝিয়া চেষ্টা করিয়া যতটুকু ক্ষুদ্র ফল পাই সেও পরের অযাচিত বদান্যতার অপেক্ষা মহত্তর।

আমরা যে আমরা, আমাদের লোক যে আমাদেরই লোক, এই চেতনাটি যত প্রকারে যত আকারে সজাগ হইয়া উঠে ততই আমাদের মঙ্গল; আমাদের কাজ আমাদের দেশের লোক করিতেছে ইহা আমরা যেখানে যত পরিমাণে দেখিতে পাই ততই আমাদের পক্ষে আনন্দের বিষয়। সম্ভবত অনেকস্থলে আমরা অনেক ভ্রম করিব, অনেক অযথাচরণ করিব, এমন-কি, অনভিজ্ঞতাবশত আমাদের নিজেদের স্বার্থেও আঘাত দিব তথাপি পরিণামে তাহাতে আমাদের পরিতাপের বিষয় থাকিবে না। অতএব ভারত মন্ত্রিসভায় যে লোক আমাদের ব্যথায় ব্যথিত হইয়া কর্তৃপক্ষের লাঞ্ছনা শিরোধার্য করিয়া আমাদের হইয়া লড়িয়াছেন রাজপুরুষেরা তাঁহার উপদেশকে যতই তুচ্ছ জ্ঞান করুন, তাঁহার সকল চেষ্টাই নিষ্ফল হউক, তথাপি তাঁহাকে আমরা ভারতবাসীরা যে আপনার লোক বলিয়া এক সকৃতজ্ঞ আত্মীয়তার আনন্দ অনুভব করিতেছি সেই আনন্দের মূল্য নাই। তাঁহাকে আমাদের সুহৃৎ জানিয়া তাঁহার প্রতি আমাদের প্রীতি প্রকাশ করিয়া আমরা অলক্ষিত ভাবে আপনারা সকলেই ঘনিষ্ঠতর সৌহার্দ্যবন্ধনে বদ্ধ হইতেছি।

এক্ষণে কর্তৃগণের নিকট নিবেদন এই যে, ভারতবর্ষের নবজাগ্রত হৃদয়টি যদি তাঁহাদের রাজসভায়, আরামশালায়, পাঠ্যপুস্তকে, তাঁহাদের সুখস্বপ্নে, তাঁহাদের সুরচিত সংকল্পের মাঝখানে গিয়া হঠাৎ প্রবেশ করে তবে তাহার সেই বেয়াদবিটি মাপ করিতে হইবে। হৃদয় জিনিসটাই বেয়াদব— তাঁহাদের নিজের পার্লামেন্টে, সাহিত্যে, সমাজে, তাহার অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। তবে যে ভারতবর্ষে তাহার অস্তিত্ব তাঁহাদের অতিমাত্র অসহ্য বোধ হইতেছে, তাহার একটা কারণ, ভারতবর্ষ বাসকালে হৃদয়ের চর্চা তাঁহাদের অনভ্যস্ত হইয়া গেছে। অন্য কোনো কারণ আছে কি না জানি না।

কথামালার একটি গল্প

এক কৃষক কৃষিকর্মের কৌশল সকল বিলক্ষণ অবগত ছিল। সে পুত্রদিগকে ওই-সকল কৌশল শিখাইবার নিমিত্ত, মৃত্যুর পূর্বক্ষণে বলিল, হে পুত্রগণ! আমি এক্ষণে ইহলোক হইতে প্রস্থান করিতেছি। আমার যে কিছু সংস্থান আছে, অমুক অমুক ভূমিতে অনুসন্ধান করিলে পাইবে। পুত্রেরা মনে করিল ওই-সকল ভূমির অভ্যন্তরে পিতার গুপ্তধন স্থাপিত আছে।

কৃষকের মৃত্যুর পর, তাহারা গুপ্তধনের লোভে সেই-সকল ভূমির অতিশয় খনন করিল। এইরূপে যারপরনাই পরিশ্রম করিয়া তাহারা গুপ্তধন কিছু পাইল না বটে, কিন্তু, ওই-সকল ভূমির অতিশয় খনন হওয়াতে, সে বৎসর এত শস্য জন্মিল, যে, গুপ্তধন না পাইয়াও তাহারা পরিশ্রমের সম্পূর্ণ ফল পাইল। —'কথামালা', পৃ. ৩৮

আমাদের পোলিটিক্যাল ক্ষেত্র হইতে কোনো গুপ্তধন পাইয়া আমাদের সকল দুঃখ দূর হইবে এরূপ যাঁহারা প্রত্যাশা করেন তাঁহারা নিরাশ হইবেন— কিন্তু সকলে একত্র মিলিয়া কর্ষণে যে শস্য জন্মিবে তাহাতে পরিশ্রমের সম্পূর্ণ ফল পাওয়া যাইবে।

সাধনা

বৈশাখ ১৩০২

চাবুক-পরিপাক

ইংরাজ গবর্নমেন্ট তাঁহার ইংরাজ কর্মচারীদিগকে প্রশ্রয় দিয়া কীরূপে নষ্ট করিতেছেন, কোনো দেশীয় পত্রে তাহারই উদাহরণস্বরূপে নিম্নলিখিত ঘটনাটি প্রকাশিত হইয়াছে।

ল্যাকস্ সাহেব সিন্ধুদেশের একটি সব্‌ডিবিশনের হর্তাকর্তা। তাঁহার ভৃত্য সেই অভিমানে রেলওয়ে পুলিসের নিষেধ অমান্য করিয়া রেলওয়ের বেড়া লঙ্ঘন করিয়া গিয়াছিল। পুলিস ইন্সপেক্টর তৎসম্বন্ধে তদন্ত করিয়া সাহেবের সেবককে জ্বলন্ত অঙ্গারবৎ পরিত্যাগ করে। সাহেব সেই সংবাদ পাইয়া ইন্সপেক্টরকে চাবুক মারে, ঘোড়ার পশ্চাতে দৌড় করায়, রাত্রি পর্যন্ত নিজের বাড়িতে ধরিয়া রাখে।— আমাদের দেশীয় পত্রিকা এই উপলক্ষে ইংরাজ গবর্নমেন্টের প্রতি অভিমান প্রকাশ করিতেছেন— বলিতেছেন, তোমাদের চাকরদের তোমরা খারাপ করিয়া দিতেছ তাহারা আমাদিগকে বড়ো মারে, আমাদের বড়ো লাগে!

এরূপ সংবাদ এবং তৎসম্বন্ধে এরূপ ভাষ্য পাঠ করিলে আমাদের স্বজাতির প্রতি নিরতিশয় ধিক্কার উপস্থিত হয়। এবং নতশির লুকাইবার স্থান খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। যে ব্যক্তি চাবুক খাইয়া স্থির থাকে, সেই কাপুরুষ যে চাবুক খাইবার যোগ্য এ কথা আমাদের কোনো সম্পাদক কেন আমাদের দেশের লোককে জানিতে দেন না— কেন হঠাৎ পিসিমা সাজিয়া তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া তাহার পিঠে হাত বুলাইয়া আহা উহু করিতে থাকেন? যাহার সম্মান-বোধ নাই তাহার অপমানের সম্ভাবনা কোথায়? এরূপ ব্যক্তিকে বলবানের অবজ্ঞা হইতে রক্ষা করা কি কোনো মর্ত্য গবর্নমেন্টের সাধ্যায়ত্ত? গবর্নমেন্ট কি কখনো প্রাকৃতিক নিয়মের পরিবর্তন সাধন করিতে পারেন?

মনে করা যাক, পারেন; মনে করা যাক গবর্নমেন্ট এমন এক আশ্চর্য আইন করিলেন, যদ্দ্বারা হেয় ব্যক্তিও লাঞ্ছনার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিল। তাহাতে আমাদের উপকারটা কী হইল? চাবুক হজম করিবার জন্য যে এক অসাধারণ পরিপাক শক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি সেটার কি কিছু লাঘব হইল? গবর্মেন্টের সতর্কতা যখনই শিথিল হইবে তখনই তো উন্নত প্রভুলোক হইতে আমাদের নতপৃষ্ঠে আবার চাবুক-বৃষ্টি হইতে থাকিবে। অপমান চাবুক-পাতে

নহে, চাবুক খাইবার যোগ্যতায়; চাবুকধারী অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগকে চাবুক মারিতে নিরস্ত থাকিয়া সে অপমান দূর করিতে পারে না— সে অপমান দূর করা একমাত্র আমাদের নিজের হাতে। কিন্তু আদুরে ছেলের মতো আমরা নিজেদের কেবল আদর দিতেই জানি এবং পরের নিকট কেবল আবদার কাড়িতেই শিখিয়াছি!

আমাদের দেশীয় পত্রিকা নাকী সুরে নালিশ করিতেছেন যে, ইংরাজ গবর্মেন্ট তাঁহার ভৃত্যদিগকে আদর দিয়া তাহাদিগকে চাবুক মারিতে শিখাইতেছেন— সম্পাদক মহাশয় এ কথা কেন ভুলিয়া যান যে, গবর্মেন্টের প্রতি অভিমান করিয়া এবং দেশের লোককে আদর দিয়া তিনি দেশের লোককে চাবুক খাইতে শিখাইতেছেন? যখন ঘরের ছেলে পরের পদাঘাত অনায়াসে শিরোধার্য করিয়া আদর পাইবার জন্য বাড়িতে কাঁদিতে আসে তখন অতিবৃদ্ধা পিতামহীর ন্যায় সেই পরকে গৃহ-কোণ হইতে বাপান্ত করিতে বসার চেয়ে ছেলেটাকে বেত্রাঘাত করিয়া বাড়ি হইতে বিদায় করিয়া দেওয়া উচিত।

চাবুক খাইবার জন্য আমাদিগকে সহস্রবার ধিক্— এবং চাবুক খাইয়া সাশ্রু নেত্রে ও সজল নাসিকায় গবর্মেন্টের প্রতি রাগ করিতে বসার জন্য আমাদিগকে ততোধিক ধিক্।

জাতীয় আদর্শ

আমরা স্বজাতির নিকট হইতে যদি কিছুমাত্র মনুষ্যত্ব আশা না করি তবে তদপেক্ষা আত্মাবমাননা আর কিছুই হইতে পারে না। আমরা সকরুণ সস্নেহ স্বরে বলিতে থাকি, আহা, আমরা বড়ো দুর্বল— আমাদিগকে যদি কেহ আঘাত করে আমরা তাহার প্রতিঘাত করিতে পারিব না— আমাদিগকে যদি কেহ অপমান করে তবে আমরা তাহার প্রতিকার করিতে অক্ষম— অতএব যাহারা আমাদিগকে আঘাত ও অপমান করে তাহারা অতি পাষণ্ড— শুনিয়া আমরা এত সান্ত্বনা লাভ করি, নিজেদের প্রতি এত অধিক স্নেহরসার্দ্র হইয়া উঠি যে, আপন অক্ষমতায় লজ্জা অনুভব করিবার অবসর পাওয়া যায় না। আমরা স্বজাতির নিকট হইতে তিলমাত্র সামর্থ্য প্রত্যাশা করি না বলিয়া আমাদের সামর্থ্য প্রকাশের চেষ্টামাত্র চলিয়া যায়, আমাদের জাতীয় সম্মানবোধের অঙ্কুরমাত্র উঠিতে পারে না। আমাদের জাতীয় আদর্শ সর্বদা উচ্চ রাখিতে হইবে— সেই আদর্শ হইতে লেশমাত্র স্খলন হইলে সুতীব্র ভর্ৎসনা দ্বারা আত্মগ্লানি উৎপাদন করিয়া দিতে হইবে, যে ব্যক্তি কাপুরুষতা প্রকাশ করিয়া স্বজাতির লাঞ্ছনার কারণ হইবে তাহার প্রতি অজস্র স্নেহ বর্ষণ না করিয়া তাহাকে আমাদের সমবেদনা লাভের অযোগ্য বলিয়া একবাক্যে তিরস্কৃত করিতে হইবে— তবেই আমাদের এই অগাধ অধঃপাত হইতে মাথা তুলিয়া উঠিবার সম্ভাবনা থাকে। হইতে পারে, ম্যাজিস্ট্রেট বেল্ কেশবলাল মিত্রকে মারিয়া ভালো কাজ করেন নাই, কিন্তু যে কেশবলাল মার খাইয়া ভূমে লুটাইয়াছিল তাহার মতো অবজ্ঞার পাত্র পৃথিবীতে দুর্লভ। রাউীচি কোনো জমিদার বিশেষকে অবমানিত করিয়া হঠকারিতা প্রকাশ করিয়াছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু যে জমিদার উপস্থিত ক্ষেত্রে তাহার প্রতিকারের চেষ্টামাত্র না করিয়া সমস্ত উপদ্রব নতশিরে বহন করিয়াছিল সে যৎপরোনাস্তি হেয়। এই-সকল কাপুরুষেরা অপমান সহ্য করিয়া স্বজাতিকে হীন আদর্শ দেখায় এবং পরজাতিকে স্পর্ধিত করিয়া তুলে।

অপূর্ব দেশহিতৈষিতা

অথচ আশ্চর্য এই যে, আমাদের সম্পাদক মহাশয়গণ জাতীয় আদর্শকে উচ্চে তুলিবার কিছুমাত্র চেষ্টা না করিয়া পরজাতিকে সর্বদা মহত্ত্বের পথে অটল রাখিতে প্রাণপণ প্রয়াস পাইয়া থাকেন। সে সম্বন্ধে তাঁহাদের সতর্কতার বিশ্রাম নাই। ইংরাজেরা রক্তমাংসের মানুষ নহেন, তাঁহারা

দেবতা— সেই দেবত্ব হইতে তাঁহাদের তিলমাত্র স্খলন না হয় এজন্য আমাদের সম্পাদক সম্প্রদায় দিবারাত্রি সজাগ হইয়া আছেন। তাঁহাদের মতে আমরাও দেবতা, কিন্তু আমরা ভূতপূর্ব দেবতা— আমাদের পিতামহগণ দেবতা ছিলেন, অতএব এক্ষণে আমরা বিশ্রাম করিতে পারি— আমাদের নিকট কাহারো কিছু প্রত্যাশা করিবার আবশ্যক নাই। গর্ব করিবার বেলায় অতীত কালকে লইয়া গর্ব করিব, এবং লাঞ্ছনা করিবার বেলায় পরকে লাঞ্ছনা করিব, এবং নিজেদের জড়ত্ব ও অক্ষমতাকে নির্লজ্জভাবে সর্বসমক্ষে বক্ষে তুলিয়া লইয়া তাহাকে স্নেহাশ্রুজলে অভিষিক্ত করিয়া দিব— অহংকার করিব অথচ আত্মোন্নতির চেষ্টা করিব না, অভিমান করিতে থাকিব অথচ অপমানের প্রতিকার করিব না, এইরূপ অদ্ভুত আচরণকে আমরা দেশহিতৈষিতা নাম দিয়াছি।

কুকুরের প্রতি মুগুর

পাশবতা সকল দেশেই আছে— কেবল তাহা নানাপ্রকার শাসনে সংযত হইয়া থাকে। ভারতবর্ষীয়ের সহিত ব্যবহারে অনেক ইংরাজের পশুত্ব যে স্ফূর্তি প্রাপ্ত হয় তাহার প্রধান কারণ, ভারতবর্ষের দিক হইতে তাহাদের পক্ষে কোনো প্রকার শাসন নাই। সেইজন্য তাহাদের আদিম প্রবৃত্তি, তাহাদের স্বাভাবিক রূঢ়তা নিয়া আত্মপ্রকাশ করে। য়ুরোপের বাহিরে আফ্রিকা আমেরিকা অস্ট্রেলিয়ায় ভ্রমণ অথবা উপনিবেশ স্থাপনকালে য়ুরোপীয়েরা আজ অনিয়ন্ত্রিত বর্বরতার সহস্র পরিচয় দিয়া থাকে। নাইট্ নামক এক ইংরাজ ভ্রমণকারী অল্পদিন হইল কাশ্মীর ও তাহার উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে ভ্রমণ করিতেছিল— সেই ব্যক্তি "Where three empires meet" নামক এক ভ্রমণবৃত্তান্ত রচনা করিয়াছে, তাহাতে স্বজাতি সম্বন্ধে ইংরাজের অপরিমেয় অন্ধ অহংকার, এবং দেশীয়দের প্রতি তাহার অত্যুগ্র অশিষ্ট ঔদ্ধত্য পদে পদে প্রকাশ পাইতেছে। ইংরাজ ভ্রমণকারীদের অনেক গ্রন্থেই ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। যদি ইংরাজকে উচ্চতর মনুষ্যত্বের পথে রক্ষা করিতে হয়, যদি তাহার অন্তর্নিহিত পাশবতাকে প্রশ্রয় না দিয়া দমন করা আবশ্যক বোধ কর— তবে কাঁদিয়া, অভিমান করিয়া গভর্নমেন্টের দোহাই পাড়িয়া তাহা কদাচ হইবে না। বল ব্যতীত পশুত্বের প্রতিষেধক আর কিছুই নাই। আমরা যখন অপমান কিছুতেই সহ্য করিব না, অন্যায় প্রতিকারের জন্য যখন প্রাণ দিতে কুণ্ঠিত হইব না তখন ইংরাজ আপন পাশবতাকে শৃঙ্খলিত করিয়া রাখিবে এবং আমাদিগকে সম্মান করিতে শিখিবে।

সাধনা
জ্যৈষ্ঠ ১৩০২

ইংলন্ডে ও ভারতবর্ষে সমকালীন সিবিল সর্বিস পরীক্ষা

হাউস্ অফ্ কমন্স্ সভার অর্ডর-বুকে ভারতবর্ষে ও ইংলন্ডে একই সময়ে সিবিল সর্বিস্ পরীক্ষা প্রচলন সম্বন্ধে দাদাভাই নওরোজি -কর্তৃক নিম্নলিখিত মোশনের বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছে। এক্ষণে সাধারণ ভারতবাসীর নিকট নিবেদন, তাঁহারা এ সম্বন্ধে প্রচুর স্বাক্ষরসমেত বহুল আবেদনপত্র শ্রীযুক্ত দাদাভাই নওরোজির যোগে পার্লামেন্টে প্রেরণ করিলে কার্যসিদ্ধির সম্ভাবনা আছে।

মোশনের বিজ্ঞাপন

মিস্টার নওরোজি— সিবিল সর্বিস্ (ইন্ডিয়া) (ইংলন্ডে এবং ভারতবর্ষে সমকালীন প্রকাশ্য পরীক্ষা)— যে, এই সভার মতে ব্রিটিশ প্রতাপের স্থায়িত্ব এবং ভারতবাসীর রাজভক্তি,

রাজবিশ্বাস এবং কৃতজ্ঞতা রক্ষা করিতে হইলে, তাহাদের আর্থিক ও নৈতিক অবস্থার উন্নতি সাধন করিতে হইলে, সমস্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বাণিজ্য ও শিল্পের বহুল পরিমাণে বিস্তার করিতে হইলে ১৮৩৩ খৃস্টাব্দের অ্যাক্টের প্রতিজ্ঞা সকল, সিপাই বিদ্রোহের পর ১৮৫৮ খৃস্টাব্দের ঘোষণাপত্র, দিল্লির দরবারে সম্রাজ্ঞী উপাধিধারণকালীন ১৮৭৭ খৃস্টাব্দের ঘোষণাপত্র, এবং মহামহিমান্বিতা রাজ্ঞী ও ভারতসম্রাজ্ঞীর পঞ্চাশংবার্ষিক রাজ্যাভিষেক উৎসব-ঘোষণাপত্রগুলির পুনঃপ্রতিশ্রুতি অনুসারে, রাষ্ট্রনীতির অন্যান্য সংস্কার সাধনের মধ্যে, ৩রা জুন ১৮৯৩ খৃস্টাব্দে বর্তমান সভা -কর্তৃক নিম্নলিখিত রেজোল্যুশন গ্রাহ্য হইয়াছিল তাহাকে কার্যে পরিণত করা আবশ্যক :—

যে, এ পর্যন্ত ভারতবর্ষীয় সিবিল সর্বিস পদপ্রাপ্তির জন্য একমাত্র ইংলন্ডে যে প্রকাশ্য পরীক্ষাসকল নির্ধারিত ছিল এক্ষণ হইতে তাহা ভারতবর্ষ এবং ইংলন্ড উভয়ত্রই সম্পাদিত হইতে থাকিবে— এই-সকল পরীক্ষা উভয় দেশেই সমান প্রকৃতির হইবে এবং যাঁহারা পরীক্ষা দিবেন তাঁহারা সকলেই যোগ্যতা অনুসারে এক তালিকায় শ্রেণীভুক্ত হইতে থাকিবেন।

মতের আশ্চর্য ঐক্য

পাঠকদের স্মরণ আছে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের প্রথম বার্ষিক অধিবেশন সভায় 'সাধনা'-সম্পাদক "বাংলা জাতীয় সাহিত্য" নামক একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। গত জ্যৈষ্ঠ মাসের 'সাহিত্য' পত্রে আমাদের বান্ধব শ্রীমান যোগিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় তাহার প্রতিবাদ করিয়া আমাদিগকে সম্মানিত করিয়াছেন। তিনি অত্যন্ত সরলভাবে 'অনুমান' করিয়া লইয়াছেন যে, যাহাতে 'গ্রন্থকারদের ভিক্ষার থলিতে কিঞ্চিৎ অর্থ সমাগমেরও সম্ভাবনা হয়' আমাদের পঠিত প্রবন্ধের এমন গোপন উদ্দেশ্যও থাকিতে পারে। আমাদের 'মাতৃভাষাবৎসলতার ঠাট' যে 'অলীক' তাহাও তাঁহার সুতীক্ষ্ণ এবং উদার অনুমানশক্তির নিকট ধরা পড়িয়াছে। এ সম্বন্ধে শ্রীমান যোগিনীমোহনের প্রতি আমাদের একটিমাত্র বক্তব্য আছে— নানা স্বাভাবিক কারণে মাতৃভাষার প্রতি আমাদের অনুরাগ অন্ধ এবং পক্ষপাতবিশিষ্ট হইতে পারে কিন্তু তাহা 'অলীক' এ কথা প্রকাশ করিয়া তিনি যে কেবল আমাদের প্রতি অন্যায় অসম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা নহে; সত্যের প্রতি যে-সকল ভদ্রজনের স্বাভাবিক ভক্তি আছে তাঁহারা অন্যকে অকারণে এরূপ অপবাদ দিতে অত্যন্ত কুণ্ঠিত বোধ করে।

মতের ঐক্য আমরা সকলেরই কাছে প্রত্যাশা করিতে পারি না, অতএব শ্রীমান যোগিনীমোহন আমাদের বিরুদ্ধবাদী হইলে আমরা কিছুমাত্র বিস্মিত হইতাম না। কিন্তু প্রকৃত আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তিনি কোথাও আমাদের কিছুমাত্র প্রতিবাদ করেন নাই। বাংলা ভাষা বাঙালি জাতির ভাষা; তাহা যে ভারতবর্ষের নানা বিভিন্ন জাতির ভাষা হইবে এ কথা আমরা বলি নাই। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য ইংরাজি ভাষা ও সাহিত্যের অপেক্ষা কোনো অংশে শ্রেষ্ঠ অথবা বঙ্গদেশে ইংরাজি শিক্ষা উঠিয়া গিয়া বাংলা শিক্ষা প্রচলিত হউক এমন কথারও আমরা কুত্রাপি আভাস দিই নাই, অতএব আমাদের প্রবন্ধের প্রতিবাদচ্ছলে যোগিনীমোহন ইংরাজি ভাষা ও সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন তাহার সহিত আমাদের বিশেষ মতবিরোধ নাই এবং উক্ত চিন্তাশীল সারগর্ভ রচনা 'সাহিত্য' পত্রে প্রকাশিত হইবার পূর্বেও ছিল না।

ইংরাজি ভাষা শিক্ষা

এই প্রসঙ্গে ইংরাজি ভাষা শিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের একটি বক্তব্য প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি। ভাষা শিক্ষা ও বিষয় শিক্ষা উভয়ই ছাত্রদের পক্ষে অত্যাবশ্যক— কিন্তু বিদেশী ভাষা যথাকথঞ্চিৎ

আয়ত্ত হইতে-না-হইতেই সেই ভাষাতেই যদি বিষয় শিক্ষা দিবার উপক্রম করা যায় তবে তাহাতে ভাষা শিক্ষা এবং বিষয়শিক্ষা উভয়েরই ব্যাঘাত হয়। না বুঝিয়া অনবরত মুখস্থ করিতে যে সময় ও শক্তির অপব্যয় হয় তাহাই রীতিমতো ভাষাশিক্ষায় প্রয়োগ করিলে উক্ত শিক্ষা অনেক পরিমাণে সম্পূর্ণতা লাভ করে। যাহারা এককালে দুই হাতে দুই লাঠি লইয়া খেলে, তাহারা শিক্ষাকালে প্রথমে স্বতন্ত্রভাবে প্রত্যেক হাতের অভ্যাস করিয়া পরে দুই হাত মিলাইয়া লয়। সেইরূপ, আমাদের মতে, অন্তত এন্ট্রেন্স পর্যন্ত ভাষা এবং বিষয়কে স্বতন্ত্ররূপে আয়ত্ত করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে উভয়কে একত্র মিলাইয়া লওয়া কর্তব্য। শিক্ষা এবং পরীক্ষা দুই ভাষায় হইলে যাহা ইংরাজিতে শিক্ষা করি তাহা বাংলায় এবং যাহা বাংলায় শিখি তাহা ইংরাজিতে পরখ করিয়া লওয়া যায়— নতুবা মুখস্থ বিদ্যার অন্তরালে যে সুগভীর শূন্যতা থাকিয়া যায় তাহার আবিষ্কার এবং সংশোধন করিবার কোনো উপায় দেখা যায় না।

জাতীয় সাহিত্য

আমরা "বাংলা জাতীয় সাহিত্য" প্রবন্ধের নামকরণে ইংরাজি "ন্যাশনাল" শব্দের স্থলে "জাতীয়" শব্দ ব্যবহার করিয়াছি বলিয়া 'সাহিত্য'-সম্পাদক মহাশয় আমাদের প্রতি কিঞ্চিৎ শ্লেষ কটাক্ষপাত করিয়াছেন।

প্রথমত, অনুবাদটি আমাদের কৃত নহে; এই শব্দ বহুকাল হইতে বাংলা সাহিত্যে ন্যাশনাল্ শব্দের প্রতিশব্দরূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। দ্বিতীয়ত, ভাষার পরিণতি সহকারে স্বাভাবিক নিয়মে অনেকগুলি শব্দের অর্থ বিস্তৃতি লাভ করে। 'সাহিত্য' শব্দটি তাহার উদাহরণস্থল। সাহিত্য-সম্পাদক মহাশয়ও সাহিত্য শব্দটিকে ইংরাজি 'লিটারেচর' অর্থে প্রয়োগ করিয়া থাকেন। সম্পাদক মহাশয় সংস্কৃতজ্ঞ, ইহা তাঁহার অবিদিত নাই যে, লিটারেচর শব্দের অর্থ যতদূর ব্যাপক, সাহিত্য শব্দের অর্থ ততদূর পৌঁছে না। শব্দকল্পদ্রুম অভিধানে 'সাহিত্য' শব্দের অর্থ এইরূপ নির্দিষ্ট হইয়াছে : 'মনুষ্যকৃত শ্লোকময় গ্রন্থবিশেষঃ। স তু ভট্টি রঘু কুমারসম্ভব মাঘ ভারবি মেঘদূত বিদগ্ধমুখমণ্ডন শান্তিশতক প্রভৃতয়ঃ।' এমন-কি, রামায়ণ-মহাভারতও সাহিত্যের মধ্যে গণ্য হয় নাই, তাহা ইতিহাসরূপে খ্যাত ছিল। এইজন্য মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় 'সাহিত্য' শব্দের পরিবর্তে 'বাঙ্‌ময়' শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। রঘুবংশের তৃতীয় সর্গে ২৭শ শ্লোকে আছে :

লিপেযথাবদ্ গ্রহণেন বাঙ্ময়ং
নদীমুখেনেব সমুদ্রমাবিশৎ।

অর্থাৎ রঘু লিপিবদ্ধ নদীপথ দিয়া বাঙ্ময়রূপ সমুদ্রে প্রবেশ করিলেন।

'জাতি' শব্দ এবং 'নেশন্' শব্দ উভয়েরই মূল ধাতুগত অর্থ এক। জন্মগত ঐক্য নির্দেশ করিবার জন্য উভয় শব্দের উৎপত্তি। আমরা ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বর্ণকে জন্মগত ঐক্যবশত জাতি বলি আবার বাঙালি প্রভৃতি প্রজাবর্গকেও সেই কারণেই জাতি বলিয়া থাকি। জাতি শব্দের শেষোক্ত প্রয়োগের স্থলে ইংরাজিতে 'নেশন্' শব্দ ব্যবহৃত হয়। যথা, বাঙালি জাতি,—বেঙ্গলি নেশন্। এরূপ স্থলে 'ন্যাশনাল্' শব্দের প্রতিশব্দরূপে 'জাতীয়' শব্দ ব্যবহার করাতে বিশেষ দোষের কারণ দেখা যায় না। আমরাও তাহাই করিয়াছি। কিন্তু সম্পাদক মহাশয় অকস্মাৎ অকারণে অনুমান করিয়া লইয়াছেন যে আমরা 'জাতীয় সাহিত্য' শব্দে 'ভর্ন্যাক্যুলর লিট্‌রেচর' শব্দের অপূর্ব তর্জমা করিয়াছি! বিনীতভাবে জানাইতেছি আমরা এমন কাজ করি নাই। সাহিত্য যে কেবলমাত্র ব্যক্তিগত আমোদ বা শিক্ষাসাধক নহে, তাহা যে সমস্ত জাতির 'জাতীয়' বন্ধন দৃঢ়তর করে, বাংলা সাহিত্য, যে বাঙালি জাতির ভূত ভবিষ্যৎকে এক সজীব সচেতন নাড়ি-বন্ধনে বাঁধিয়া দিয়া তাহাকে বৃহত্তর এবং ঘনিষ্ঠতর করিয়া তুলিবে— আমাদের প্রবন্ধে এই প্রসঙ্গের বিশেষরূপ অবতারণা ছিল বলিয়া, আমরা বাংলা সাহিত্যকে, ব্যক্তিগত রসসম্ভোগের হিসাবে

নহে, সমস্ত জাতীয় উপযোগিতার হিসাবে আলোচনা করিয়াছিলাম বলিয়াই তাহাকে বিশেষ করিয়া জাতীয় সাহিত্য আখ্যা দিয়াছিলাম। সভাস্থলে বক্তৃতা পাঠ করিতে হইলে শ্রোতৃসাধারণের দ্রুত অবগতির জন্য বিষয়টিকে কিঞ্চিৎ বিস্তারিত করিয়া বলা আবশ্যক হইয়া পড়ে— আমরাও বক্তৃতার বিষয় যথোচিত বিস্তৃত করিয়া বলিয়া কেবল সম্পাদক মহাশয়ের নিন্দাভাজন হইলাম কিন্তু তথাপিও তিনি আমাদের বক্তব্য বিষয়টিকে সম্যক্ গ্রহণ করিতে পারিলেন না ইহাতে আমাদের দ্বিগুণ দুঃখ রহিয়া গেল।

সাধনা
আষাঢ় ১৩০২

ভ্রম স্বীকার

গত জ্যৈষ্ঠমাসের 'সাহিত্য' পত্রে "বাংলা জাতীয় সাহিত্য" নামক প্রবন্ধ সমালোচনায় উক্ত প্রবন্ধের নামকরণ লইয়া একটি বিরূপবক্র নোট ছিল। ভ্রমক্রমে উক্ত নোট 'সাহিত্য'-সম্পাদক মহাশয়ের লিখিত মনে করিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছিলাম এবং সবিস্তারে তাহার উত্তর দিয়াছিলাম। কিন্তু পুনর্বার পাঠ করিয়া জানিলাম যে সেই নোটটুকুও প্রবন্ধলেখক শ্রীমান যোগিনীমোহনের স্বরচিত। এই অনবধান ও ভ্রমের জন্য আমরা সাহিত্য-সম্পাদক মহাশয়ের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। আষাঢ় মাসের সাহিত্যেও শ্রীমান লেখক পুনশ্চ তর্ক তুলিয়াছেন; তাহা পড়িয়া এইটুকু স্পষ্ট বুঝা গেল যে, এই আলোচনায় তাঁহার চিত্ত অত্যন্ত অশান্ত হইয়াছে। কিন্তু আর কিছুই স্পষ্ট বুঝিবার জো নাই।

চিত্রল অধিকার

চিত্রলের লড়াই তো শেষ হইল। এক্ষণে তাহার দখল রাখা লইয়া কাগজের লড়াই আরম্ভ হইয়াছে। উভয় পক্ষেই বিস্তর ইংরাজ সেনানায়ক এবং ভূতপূর্ব ভারতশাসনকর্তা সমবেত হইয়াছেন। চিত্রলের দখল ত্যাগ করার পক্ষে অনেক বড়ো বড়ো যোদ্ধা লড়িতেছেন, কিন্তু কোন্ পক্ষে আমাদের ভারতরথের সারথি জনার্দন আছেন এখনও তাহার সংবাদ পাওয়া যায় নাই। ভারতরক্ষার পক্ষে চিত্রল অধিকারের উপযোগিতা যে নাই এবং যদি থাকে তবে অপব্যয়ের তুলনায় তাহা অতি যৎসামান্য এ কথা অনেক প্রামাণ্য সাক্ষীর মুখে শুনিয়াছি। তাঁহারা ইহাও বলেন, ইংরাজ-অধিকারে রাস্তাঘাট নির্মাণ হইয়া চিত্রলের স্বাভাবিক দুর্গমতা দূর হইয়া যাইবে সেটা শত্রুর পক্ষে অসুবিধাজনক নহে।

কিন্তু ইঁহারা একটা কথা কেহই বলিতেছেন না। বন্ধুত্ব করিবার ক্ষমতা ইংরাজের নাই। অনর্থক অনাবশ্যক স্থানে অনধিকার প্রবেশ করিয়া অযথা ঔদ্ধত্যের দ্বারা শান্তির জায়গায় অশান্তি আনয়ন করিবার অসাধারণ প্রতিভা ইংরাজ জাতির আছে। চিত্রলের পথ সুগম হইল, এখন মাঝে মাঝে এক-এক ইংরাজ শিকারী কাঁধে এক বন্দুক তুলিয়া পার্বত্য ছাগ শিকারে বাহির হইবেন এবং অপরিমেয় দম্ভের দ্বারা দেশবাসীদিগকে ত্যক্তবিরক্ত করিয়া তুলিবেন। অতএব, চিত্রলের পথঘাট বাঁধিয়া দিয়া শত্রু-আগমনের পথ সুগম করা হইতেছে বলিয়া ইংরাজ রাজনীতিজ্ঞ ও যুদ্ধনীতিজ্ঞেরা যে আশঙ্কা করিতেছেন তাহা সমীচীন হইতে পারে কিন্তু পথ সুগম হইলে ইংরাজের সমাগম বাড়িবে, ইংরাজরাজ্যের এবং পার্বত্য জাতির শান্তির পক্ষে সেও একটা কম আশঙ্কার বিষয় নহে।

ইংরাজের লোকপ্রিয়তা

কিন্তু পৃথিবীসুদ্ধ লোকের বিশ্বাসের বিরুদ্ধে ইংরাজ এক দৃঢ় বিশ্বাস মনে পোষণ করিয়া থাকেন, যে, তাঁহারা বড়ো লোকপ্রিয়। যেখানে পদার্পণ করেন সেখানকার লোকেই তাঁহাদিগকে মা-বাপ বলিয়া জানে। তাঁহারা অনেক দিন হইতে বলিয়া আসিতেছেন যে, ইজিপ্টের প্রজাবর্গ তাঁহাদিগকে পরম সুহৃদ বলিয়া জ্ঞান করে, কিন্তু অদৃষ্টের এমনি পরিহাসপ্রিয়তা, যে, সেই দেশের লোকের হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য তাঁহারা আইনবন্ধনহীন সরাসরি বিচারের ভার নিজের হস্তে লইতে উদ্যত। সেখানকার লোকে তাঁহাদের প্রতি যে-সকল গুরুতর উপদ্রব আরম্ভ করিতেছে তাঁহাদের বিশ্বাস সেখানকার বিচারক তাহার উপযুক্ত শাসন করে না— তাঁহাদের প্রতি সাধারণের এতই প্রবল ভালোবাসা!

কর্তৃপক্ষেরা হয়তো ক্ষাপা হইবেন (কারণ, এখানে তাঁহারা কর্তৃপক্ষ) কিন্তু আমরা যদি ইজিপ্টে তাঁহাদের নিজের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া বলি যে, ইংরাজ-কর্তৃক দেশীয় উৎপীড়নের বিচারভার সম্পূর্ণরূপে দেশীয় লোকের হস্তে না দিলে ইংরাজ জুরির নিকট দেশীয় হতভাগ্যের সুবিচার প্রাপ্তির আশা অত্যল্প তবে সেটা কি অসংগত শুনিতে হয়?

কিন্তু ইংরাজের মনে দৃঢ় বিশ্বাস যে, ইজিপ্টে তিনি লোকপ্রিয় পরমসুহৃদ্, এবং ভারতবর্ষে তিনি সম্পূর্ণ অপক্ষপাত সুবিচারক।

ইংরাজের স্বদোষ-বাৎসল্য

নিজেদের জাতিগত দোষগুলির প্রতি ইংরাজদের এমন একটি স্নেহদৃষ্টি আছে যে, এক-এক সময় তাহা দেখিলে আঘাতও লাগে এবং হাসিও পায়। ইংলন্ডের 'স্পেক্টেটর' পরম খৃস্টান কাগজ। কিন্তু সেই কাগজে '*With Wilson in Matabeleland*' নামক গ্রন্থের প্রশংসাপূর্ণ সমালোচনার মধ্যে একস্থলে লিখিত হইয়াছে : "We have never seen the delight in killing, which is perhaps a normal trait in healthy human male animals, so frankly expressed as in these pages." অর্থাৎ বধস্পৃহা সুস্থপ্রকৃতি পুরুষজাতীয় মানবপ্রাণীর একটা স্বাভাবিক ধর্ম এ কথা সমালোচক মহাশয় প্রকাশ করিয়াছেন। অবশ্য, ইহাতে বধস্পৃহার প্রশংসা বুঝাইতেছে না, কিন্তু ওই সুস্থপ্রকৃতি বিশেষণ প্রয়োগ করিয়া এই বধস্পৃহার প্রতি বিশেষ একটু স্নেহ প্রকাশ করা হইয়াছে। সম্পাদক স্বজাতিসুলভ দোষের প্রতি মমতানুভব করিবার কালে এ কথা ভুলিয়াছেন যে, তাঁহার স্বাস্থ্যের আদর্শ অনুসারে যিশুখৃস্টের মতো রোগজীর্ণ প্রকৃতির দৃষ্টান্ত জগতে দুর্লভ। এই স্বজাতিসুলভ দোষগুলির প্রতি ইংরাজের বিশেষ স্নেহ-দৃষ্টি আছে বলিয়াই ভারতবর্ষে এতগুলি ইংরাজ উপর্যুপরি এতদ্দেশীয়কে হত্যা করিতেছে এবং উপর্যুপরি নিষ্কৃতিও পাইতেছে। এতগুলি ইংরাজকে যদি দেশীয়রা হত্যা করিত তবে তাঁহারা যে পরিমাণে রাগ করিতেন ও প্রতিহিংসা ও প্রতিকারের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া উঠিতেন দেশীয় হত্যায় তাঁহাদের সে পরিমাণ ক্রোধের সঞ্চার হয় না। তাঁহারা বেশ বুঝিতে পারেন একজন 'টমি অ্যাট্‌কিন্স' সামান্য রাগ হইলেই কেন একজন দেশীয় কালো লোককে হত্যা করিয়া ফেলে। তাঁহারা সেটাকে অপরাধ বলিয়া স্বীকার করেন কিন্তু মনের এক কোণে এই কথা উদয় হয় যে ওটা সুস্থপ্রকৃতি টমি অ্যাট্‌কিন্সের স্বাভাবিক ধর্ম।

ইংরাজের লোকলজ্জা

দেখিলাম, 'টাইম্‌স্‌' পত্রে একজন ইংরাজ লেখক আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন যে, চিত্রল অধিকার করিয়া যদি ছাড়িয়া দেওয়া যায়, তবে ইংরাজের এই অনিশ্চিত আগুপিছু পলিসি লইয়া ভারতবর্ষের দেশীয় রাজসভায় এবং প্রজাবর্গের মধ্যে বিরুদ্ধ সমালোচনা উত্থাপিত হইবে। আমরা দেখিয়া পরম সন্তোষ লাভ করিলাম যে, ভারতবাসীদের নিকটেও সময়ে সময়ে ইংরাজ লোকলজ্জা অনুভব করিয়া থাকেন। কিন্তু এ স্থলে লজ্জার কোনো কারণ দেখি না। একটা দেশ জয় করিয়া অপরাধীদিগকে শাসন করিয়া তাহা ত্যাগ করিয়া আসিলে ইংরাজের সেই নির্লোভ উদারতা ভারতবর্ষের নিকট প্রশংসার বিষয় বলিয়াই গণ্য হইবে।

কিন্তু যথার্থ যদি ইংরাজের তিলমাত্র লোকলজ্জা থাকে তবে গরিব ভারতবাসীর নিকট হইতে টাকা লইয়া মহারানীর নিমন্ত্রিত অভ্যাগতদের আতিথ্য করিতে ক্ষান্ত থাকা তাঁহাদের কর্তব্য। ভারতবর্ষের রাজন্যবর্গের নিকট মহারানীর নামে এই হীনতা-কলঙ্ক প্রচার না করিলেই ভালো হয়। গরীবের অর্থে রাজার আতিথ্য রাজোচিত দেখিতে হয় না। রাজায় রাজায় যুদ্ধ হইলেও উলুখড়ের প্রাণ যায় আবার রাজায় রাজায় বন্ধুত্বের বেলাও উলুখড় বেচারার পরিত্রাণ নাই।

তাহা ছাড়া, স্পষ্টরূপে স্বীকার করিয়া, কাবুলের মন পাইবার জন্য নসেরুল্লাকে লইয়া এমন অতিমাত্রায় ব্যগ্রতা প্রকাশ করাতে দেশীয় রাজা ও প্রজার নিকটে মহারানীর সম্মান যে কতখানি খর্ব হইতেছে তাহা ইংরাজ অন্ধভাবে বিস্মৃত হইতেছেন। নসেরুল্লাকে যদি মহারানী নিজের অতিথিভাবেই অভ্যর্থনা করিতেন তবে তাহাতে লজ্জার বিষয় কিছুই ছিল না, কিন্তু এই আতিথ্যকে ভারত-রাজকীয় পলিসির অঙ্গ করিয়া লইয়া ভারত ভাণ্ডার হইতে অর্থ লইবার উপক্রম করাতে ইংরাজের মর্যাদা অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইতেছে। যে ইংরাজের ঔদ্ধত্য ও অভিমান জগদ্‌বিখ্যাত, কাজ উদ্ধারের সময় সেই ইংরাজের মেরুদণ্ড কাবুলের পাঠানের নিকটে এমন অনায়াসে অবনত হইতেছে ইহা লইয়া কি হাসিবার লোক কেহই নাই? শুনা যাইতেছে অনেক মুকুটধারী য়ুরোপীয় রাজাও ইংলণ্ডে এরূপ আতিথ্য লাভ করেন নাই। পলিসিও যে খুব পাকা তাহা বলিতে পারি না। পদ্মাতীরে বালুভিত্তির উপর বহুব্যয়ে অট্টালিকা নির্মাণ করা সংগত নহে, সেখানে অল্প খরচে ক্ষণিক বন্দোবস্ত করাই শ্রেয়। কাবুলের সহিত বহুব্যয়সাধ্য সখ্য নির্মাণও সেইরূপ অবিবেচনার কাজ। কাবুলের সিংহাসন ইংরাজের বহুমূল্য সখ্যসমেত আজ বাদে কাল ধসিয়া যাওয়া কিছুই বিচিত্র নহে, অতএব কাবুলের মতো রাজ্যের সহিত স্বল্পব্যয়ে ক্ষণিক সখ্যের আয়োজন রাখাই সংগত। ভারতবর্ষের বহুকষ্টসঞ্চিত রাজভাণ্ডার তাহার পদমূলে উজাড় করিয়া দিলেও কাবুলের সিংহাসন এক বংশে স্থায়ী হইবে না।

প্রাচী ও প্রতীচী

নসেরুল্লার একটি আচরণে আমরা সন্তোষ লাভ করিয়াছি। পাশ্চাত্য সভ্যতা প্রাচ্য প্রথার প্রতি সর্বদাই নাসা কুঞ্চিত করিয়া থাকেন। এবারে নসেরুল্লা প্রাচ্য সভ্যতার তরফ হইতে পাশ্চাত্য বর্বর প্রথার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিয়া আসিয়াছেন। রাজপুত্র লেডি টুইড্‌মাউথের নৃত্যোৎসবে নিমন্ত্রিত হইয়া অভ্যাগত মহিলাদের উত্তরাঙ্গের বিবস্ত্রতা দর্শনে এতই লজ্জা বোধ করিয়াছিলেন যে, ঘরে প্রবেশ না করিয়া বহিঃকক্ষে বিচরণ করিতে লাগিলেন। নসেরুল্লা লেডি ল্যান্সডাউনের হস্ত ধরিয়া ভোজনাগারে লইয়া যাইবেন এইরূপ বন্দোবস্ত ছিল কিন্তু লেডির অনাবৃত হস্ত দেখিয়া তিনি ভদ্রোচিত সংকোচ প্রকাশপূর্বক করগ্রহণ না করিয়া অগ্রসর হইয়া চলিয়া গেলেন।

ইহাতে মহিলাদের প্রতি রূঢ়তা প্রকাশ হইয়াছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু প্রাচ্য রাজপুত্রের মনে যে সভ্যতার আদর্শ বিরাজ করিতেছে তাহাকে উপেক্ষা করাও তাঁহার কর্তব্য হইত না।

সাধনা
শ্রাবণ ১৩০২

নূতন সংস্করণ

নব্য হিন্দুদের বিশেষ সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে। তাঁহারা উনবিংশ শতাব্দীর নূতন জ্ঞান উপার্জন করিয়া, পুরাতনের প্রতি ভক্তি ও ভালোবাসা হারান নাই বটে, কিন্তু রুচির পরিবর্তন হওয়াতে তাঁহারা উহাকে অধুনাতনের সঞ্চিত মলিন আবরণশুদ্ধ গ্রহণ করিতে বড়োই কুণ্ঠিত।

মনুষ্যজীবনকে আমাদের পূর্বপুরুষেরা যে কবিত্বময় কল্পনার দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া উহাকে সংসারের দৈনিক বৈষয়িক ভাবনার কালুষ্য হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহার সৌন্দর্য ও আবশ্যকতা বুঝিয়াও, সেগুলিকে তাঁহাদের আধুনিক অর্থশূন্য কবিত্বহীন অসুন্দর আকারে অবলম্বন করিতে তাঁহারা কিছুতেই প্রস্তুত নহেন।

সম্প্রতি বোম্বাই অঞ্চলের একদল নব্য হিন্দু এই সমস্যা মীমাংসার যেরূপ উপায় স্থির করিয়াছেন তাহা পাঠকদের বিবেচনার নিমিত্ত বিবৃত করা যাইতেছে। তাঁহারা পুরাতন গঠনের আদিম সৌন্দর্যকে তাহার হীন ও মলিন বেশ হইতে মুক্ত করিয়া তাহার মধ্যে নূতন প্রাণ সঞ্চার করিয়া দিতে চাহেন। দুই-একটি দৃষ্টান্ত দিলে তাঁহাদের উদ্দেশ্য ও উপায় স্পষ্ট বুঝা যাইবে।

রাম-নবমীর দিনে রামকে দেবতারূপে পূজা করায়, দেবাধিদেব পরমেশ্বরের মহিমা ও ভারতের শ্রেষ্ঠ মহাকাব্যের সাহিত্য-মর্যাদা যুগপৎ খর্ব হওয়াতে তাঁহারা বিশেষ ব্যথিত হইয়াছেন, কিন্তু রাম-নবমীর দিন উৎসবে যোগ না দিয়া প্রচলিত কুসংস্কারে গালি দিয়া তাঁহারা কোনো সান্ত্বনা অনুভব করেন না। সুতরাং তাঁহারা স্থির করিয়াছেন যে, উক্ত শুভদিবস উপলক্ষে উৎসবক্ষেত্রে সকলে উপস্থিত হইয়া, ভোজনাদি আমোদপ্রমোদরূপ উৎসবের বাহ্য অঙ্গের পরে, কথকতা কীর্তন প্রভৃতির দ্বারা রামায়ণের কবিত্ব-রসাস্বাদন করিবেন এবং প্রবন্ধপাঠ ও আলোচনাদির দ্বারা উহার সাহিত্যনৈপুণ্য ও নীতি-মহত্ত্ব উপলব্ধি করিবেন।

শ্রাবণ মাসের দিনবিশেষে ব্রাহ্মণদের পুরাতন উপবীত পরিত্যাগ করিয়া নূতন উপবীত গ্রহণ করিবার রীতি আছে। কিন্তু আধুনিক শিক্ষা প্রভাবে, এইরূপ সূত্রগুচ্ছ পরিবর্তন এবং তাহার সহিত মন্ত্র উচ্চারণ ও পুরোহিতকে কিঞ্চিৎ অর্থ দান করিলেও তাঁহারা কোনো প্রকার আমোদ বা তৃপ্তি অনুভব করেন না। সুতরাং তাঁহারা এই দিবসকে মহৎ সংকল্প স্থির করিবার ও ব্রত গ্রহণ করিবার কার্যে উৎসর্গ করিতে চাহেন; একত্র মিলিত হইয়া স্মরণ করিতে চাহেন যে গলায় উপবীতধারণ করিয়া নিজেকে সর্বোচ্চ জাতির মধ্যে গণ্য হইবার উপযুক্ত বিবেচনা করা কী দারুণ দাম্ভিকতার কাজ; এবং বৎসরের মধ্যে অন্তত এই একবার অনুভব করিতে চাহেন যে, যে পবিত্র উপবীত পূর্ব মহর্ষিরা করিয়াছেন তাহার উপযুক্ত হইতে গেলে, অতি বিনীতভাবে নিজ হীনতা স্বীকার করিয়া, ব্রাহ্মণ জন্মের সুমহৎ দায়িত্ব বুঝিয়া জীবনের প্রত্যেক মুহূর্তে সত্যের ও মহত্ত্বের প্রতি কায়মনোবাক্যে অগ্রসর হইতে হইবে।

বোম্বাইয়ের নব্য হিন্দু সম্প্রদায় এইরূপে প্রত্যেক উৎসব ও পবিত্র দিবসকে উপযুক্ত অনুষ্ঠানের দ্বারা সজীব করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছেন এবং তাঁহাদের ক্ষুদ্র দলের মধ্যে অনেকটা কৃতকার্যও হইয়াছেন। উল্লিখিত সমস্যার এইরূপ সুন্দর মীমাংসা আমাদের দেশে

প্রচলিত হইবার উপযুক্ত। আমাদেরও প্রত্যেক শুভকার্যের সহিত যে-সকল সুরুচিবিরুদ্ধ ও অপ্রীতিকর প্রথা জড়িত আছে তাহা পরিত্যাগ করিলে নব্য হিন্দুরা নব উৎসাহে সেগুলিতে যোগ দিতে পারেন।

জাতিভেদ

'স্টেট্‌সম্যান' পত্রে কিছু দিন ধরিয়া জাতিভেদ ও বিবাহে পণগ্রহণ প্রথা লইয়া আলোচনা চলিতেছে।

দেখা গিয়াছে, লেখকদিগের মধ্যে অনেকে এই বলিয়া আমাদের দেশের জাতিভেদ প্রথার সমর্থন করিয়াছেন যে, য়ুরোপ প্রভৃতি অন্য সকল সভ্য দেশেই নানা আকারে জাতিভেদ বিরাজ করিতেছে।

সভ্য মনুষ্য যেমন ইঁটকাঠের ঘরে থাকে, তেমনি তাহার সামাজিক ঘর আছে; সেই ঘরগুলির নাম সম্প্রদায়। সামাজিক মনুষ্য দেখিতে দেখিতে সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়ে, তাহা তাহার স্বাভাবিক ধর্ম। সভা, সমিতি, ধর্মসম্প্রদায়, রাজনৈতিক সম্প্রদায়, আচারগত সম্প্রদায়— বৃহৎ সমাজমাত্রেই এমন নানাবিধ বিভাগের সৃষ্টি হয়। যে মূল নিয়মের প্রবর্তনায় মানুষ সমাজবন্ধনে বদ্ধ হয়, সেই নিয়মেরই প্রভাব সমাজের অঙ্গে প্রত্যঙ্গে কার্য করিয়া তাহার মধ্যে স্বভাবতই বিচিত্র শ্রেণীভেদ জন্মাইতে থাকে। সমাজবন্ধনের ন্যায় সম্প্রদায়বন্ধনও মানুষের স্বাভাবিক গৃহ, তাহার আশ্রয়স্থল।

কিন্তু গৃহ নির্মাণ করিতে হইলে যেমন ছাদ প্রাচীর গাঁথিতে হয়, তেমনি দরজা জান্‌লা বসানোও অত্যাবশ্যক। গৃহ যেমন কতক অংশে বদ্ধ, তেমনি তাহা কতক অংশে মুক্ত। এই জানলা দরজা বন্ধ করিয়া দিলে গৃহ গোরস্থানে পরিণত হয়। উভয়ের মধ্যে বিস্তর প্রভেদ।

সম্প্রদায়-গৃহের মধ্যেও যাতায়াতের দ্বার থাকা চাই; ভিতর হইতে বাহিরে যাইবার ও বাহির হইতে ভিতরে আসিবার পথ থাকিলে তবেই তাহার স্বাস্থ্য রক্ষা হয় নতুবা তাহা মৃত্যুর আবাসভূমি হইয়া উঠে।

য়ুরোপে বিশেষ গুণ বা কীর্তিদ্বারা সাধারণ শ্রেণীর লোক অভিজাতমণ্ডলীর মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে। আমাদের দেশে জন্ম ব্যতীত জাতিবিশেষের মধ্যে অন্য কোনোরূপ প্রবেশোপায় নাই।

প্রতিবাদকারীগণ বলেন, পূর্বে এরূপ ছিল না, এবং দেশের স্বাধীন রাজা থাকিলে এরূপ থাকিত না। কিন্তু এ বৃথা তর্কে আমাদের লাভই বা কী, সান্ত্বনাই বা কোথায়?

বিবাহে পণগ্রহণ

পুরুষ যখন কোনো বিশেষ কন্যাকে বিবাহ করে অবশ্যই তাহার কোনো বিশেষ কারণ থাকে। হয়, তাহাকে ভালোবাসে, নয়, তাহার কুলশীল রূপগুণ অথবা অর্থের আকর্ষণে বদ্ধ হয়। আমাদের দেশে বিবাহযোগ্যা কন্যার বয়স অল্প, এবং তাহার সহিত বিবাহযোগ্য পুরুষের পরিচয় থাকে না সুতরাং বিবাহের পূর্বে ভালোবাসার কোনো সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। কন্যার কী কী গুণ আছে এবং কালক্রমে কী কী গুণ ফুটিয়া বাহির হইবার সম্ভাবনা, তাহা কেবল কন্যাকর্তারা এবং অন্তর্যামীই জানেন। রূপ জিনিসটা দুর্লভ এবং বাল্য-সৌন্দর্য যুবকের চিত্তে অনতিক্রমণীয় মোহসঞ্চার করে না। আজকালকার ছেলেদের কাছে কুলগৌরবের বিশেষ কোনো মর্যাদা নাই। তবে একজন বুদ্ধিমান জীব কী দেখিয়া আমৃত্যু কালের জন্য সংসারভার মাথায় তুলিয়া লইবে?

সে কি পঞ্জিকার বিশেষ একটা দিনস্থির করিয়া প্রাতঃকালে উঠিয়া যে-কোনো কন্যাকে সম্মুখে দেখিবে তাহাকেই বিবাহ করিবে? সে কি কন্যাদায়গ্রস্তের কন্যাভার মোচনের জন্যই সংসারে আগমন করিয়াছিল?

মনুর বিধানের ফলে আমাদের দেশে একটি বিবাহযোগ্য পুরুষকে যখন কন্যার পিতা দশজনে আসিয়া আক্রমণ করে, তখন তাহাকে কোনো একটা বিশেষ সদ্‌বিবেচনার নিয়ম অবলম্বন করিয়া কন্যা নির্বাচন করিতে হইবে— যদি তাহা না করে তবে সে গর্দভ, এবং দশটি কন্যাদায়িকেরই তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া যাওয়া কর্তব্য। কলেজ হইতে বাহির হইবামাত্র অথবা বাহির হইবার পূর্বেই তাহাকে বিবাহের ফাঁদে ফেলিবার জন্য টানাটানি চলিতে থাকে। তখন তাহার সম্মুখে তরঙ্গসংকুল অকূল সংসার, এবং সেই সংকটসমুদ্রে পার হইবার উপায় অর্থ তরণী। তুমি নিজের স্কন্ধ হইতে একটি ভার লইয়া আর-একটি বুদ্ধিবৃত্তিবিশিষ্ট জীবের স্কন্ধে চাপাইয়া তাহাকে ওই অকূল সমুদ্রের মধ্যে ফেলিয়া দিতে চাও; সে সহজেই বলিতে পারে, আগে নৌকার সন্ধান দাও তাহার পরে তোমার বোঝাটি লইয়া আমি এই পারাবারে অবতীর্ণ হইতে পারি নতুবা ওটিকে কাঁধে করিয়া আমি সন্তরণ করিতে পারিব না— আজকালকার দিনে নিজের ভার সংবরণ করাই দুঃসাধ্য।

এই প্রস্তাবের জন্য ছেলেটিকে নিন্দা করা যায় না। অথচ যে সম্বন্ধ চিরজীবনের নিকটতম সম্বন্ধ আরম্ভকালেই সে সম্বন্ধকে ইতর দোকানদারির দ্বারা কলুষিত করিয়া তুলিতে আত্মসম্মানজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেরই ধিক্কার অনুভব করা স্বাভাবিক। কিন্তু পৃথিবীতে সকল সম্বন্ধের মূলেই হয় প্রীতি, নয় স্বার্থ। যেখানে প্রীতিসম্বন্ধের পথ নাই সেখানে স্বার্থ সম্বন্ধ ব্যতীত কী আশা করিতে পারি!

অতএব, দোষ দিতে হইলে সমাজবিধানকেই দোষ দিতে হয়, যে ব্যক্তি পণ লইয়া বিবাহ করে তাহাকে নহে। একটু সবুর করো, যুবকটিকে নিজের চেষ্টায় ও উপার্জনে স্বাধীন হইতে দাও, তাহার পরে সে যখন নিজের হৃদয়ের অনুসরণ করিয়া বিবাহ করিতে প্রবৃত্ত হইবে তখন যদি টাকার জন্য হাত বাড়াইয়া বসে তবে তাহাকে নির্লজ্জ অভদ্র অর্থলোলুপ অযোগ্য বলিয়া তিরস্কার করিতে পারো। যতক্ষণ তাহার পক্ষে কোনো বিশেষ আকর্ষণ নাই এবং তোমার পক্ষে স্বার্থ, ততক্ষণ স্বার্থের বিনিময়েই স্বার্থ সাধন করিয়া লইতে হইবে ইহাই সংসারের নিয়ম। এ নিয়মকে কোনো আইন অথবা আবদারের দ্বারা পরাহত করা সম্ভব নহে।

ইংরাজের কাপুরুষতা

আসানসোল স্টেশনে একটি দেশীয় বালিকার প্রতি পাশব অত্যাচার করা অপরাধে কয়েকজন রেলওয়ে সংক্রান্ত ইংরাজ অথবা ফিরিঙ্গি কর্মচারী অভিযুক্ত হয়। হাজির আসামীগণ জুরির বিচারে খালাস পাইয়াছে। এ সংবাদ যে-কোনো ভারতবর্ষীয়ের কর্ণগোচর হইয়াছে সকলেরই অন্তর্দাহ উপস্থিত করিয়াছে।

আমাদের ধারণা ছিল, বলিষ্ঠ স্বভাববশত অবলাজাতির প্রতি ইংরাজ পুরুষের একটি বিশেষ স্নেহ আছে। কিন্তু উক্ত নিদারুণ পাশবাচারে ভারতবর্ষীয় ইংরাজের পক্ষ হইতে যখন তাহার কোনো পরিচয় পাওয়া গেল না, তখন ইহাই বুঝিতে হইবে যে, অপরিসীম বিজাতিবিদ্বেষে ও উচ্ছৃঙ্খল প্রভুত্বগর্বে বীরজাতিরও পৌরুষ নষ্ট করে।

আমাদের প্রভুরা বলিতে পারেন, আইনমতে যাহার বিচার হইয়াছে তাহার উপরে আর কথা কী! ধরিয়া লইলাম সুবিচার করা হইয়াছে, আইন এবং অভিযুক্ত ইংরাজ উভয়েই রক্ষা পাইয়াছে; কিন্তু দেশের ইংরাজ এবং সমস্ত ইংরাজি সংবাদপত্র এ সম্বন্ধে এমন নীরব উদাসীন কেন? এ

ঘটনায় তাঁহাদের মনে তিলমাত্র ঘৃণা রোষের উদ্রেক হয় নাই? বালিকা যদি ইংরাজ ও উপদ্রবকারী যদি দেশীয় হইত তাহা হইলে ভারত জুড়িয়া তাঁহারা যেরূপ তূরী ভেরি পটহ নিনাদ করিয়া ভীষণ রণবাদ্য বাজাইতেন ততটা নাই আশা করিলাম কিন্তু কাহারো মুখে যে একটি শব্দ মাত্র নাই।

দুর্গম চিত্রলের যুদ্ধ জয় লইয়া ইংরাজ দেশে বিদেশে বীরত্বের আস্ফালন করিতেছেন; কিন্তু নিঃসহায় রমণীর প্রতি নির্দয়তম অত্যাচারে অবিচলিত থাকিয়া ভারতবর্ষীয় ইংরাজ যে আন্তরিক কাপুরুষতা প্রদর্শন করিয়াছেন যুদ্ধজয়গৌরবের অপেক্ষা তাহা অনেকগুণে গুরুতর। চিত্রল জয় করিয়া তাঁহারা শত্রুকে দূরে রাখিবার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু নিরুপায় অধীন জাতির প্রতি এইরূপ মনুষ্যত্ববিহীন অবজ্ঞার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া তাঁহারা আপন রাজ্যতন্ত্রের ভিত্তিমূলে স্বহস্তে পরম শত্রুতার বীজ রোপণ করিয়া রাখিতেছেন।

সাধনা
ভাদ্র-কার্তিক ১৩০২

পরিশিষ্ট

সারস্বত সমাজ ১

১২৮৯ সালে শ্রাবণ মাসের প্রথম রবিবারে ২ তারিখে দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলি ৬ নম্বর ভবনে সারস্বত সমাজের প্রথম অধিবেশন হয়।

ডাক্তর রাজেন্দ্রলাল মিত্র সর্বসম্মতিক্রমে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

সারস্বত সমাজ স্থাপনের আবশ্যকতা বিষয়ে সভাপতি মহাশয় এক বক্তৃতা দেন। বঙ্গভাষার সাহায্য করিতে হইলে কী কী কার্যে সমাজের হস্তক্ষেপ করা আবশ্যক হইবে, তাহা তিনি ব্যাখ্যা করেন। প্রথমত, বানানের উন্নতিসাধন। বাংলা বর্ণমালায় অনাবশ্যক অক্ষর আছে কি না এবং শব্দবিশেষ উচ্চারণের জন্য অক্ষরবিশেষ উপযোগী কি না, এই সমাজের সভ্যগণ তাহা আলোচনা করিয়া স্থির করিবেন। কাহারও কাহারও মতে আমাদের বর্ণমালায় স্বরের হ্রস্ব-দীর্ঘ ভেদ নাই, এ তর্কটিও আমাদের সমাজের সমালোচ্য। এতদ্‌ব্যতীত ঐতিহাসিক অথবা ভৌগোলিক নাম-সকল বাংলায় কীরূপে বানান করিতে [হইবে তাহা] স্থির করা আবশ্যক। আমাদের সাম্রাজ্ঞীর নামকে অনেকে "ভিক্‌টো [রিয়া" বানান] করিয়া থাকেন, অথচ ইংরাজি "V" অক্ষরের স্থলে অন্তঃস্থ "ব" সহজেই...হইতে পারে। ইংরাজি পারিভাষিক শব্দের অনুবাদ লইয়া বাংলায় বিস্তর ... ঘটিয়া থাকে— এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া সমাজের কর্তব্য। দৃ[ষ্টান্ত] স্বরূপে উল্লেখ করা যায়— ইংরাজি isthmus শব্দ কেহবা "ডমরু-মধ্য" কেহবা "যোজক" বলিয়া অনুবাদ করেন, উহাদের মধ্যে কোনোটাই হয়তো সার্থক হয় নাই।— অতএব এই-সকল শব্দ নির্বাচন বা উদ্‌ভাবন করা সমাজের প্রধান কার্য। উপসংহারে সভাপতি কহিলেন— এই-সকল, এবং এই শ্রেণীর অন্যান্য নানাবিধ সমালোচ্য বিষয় সমাজে উপস্থিত হইবে— যদি সভ্যগণ মনের সহিত অধ্যবসায় সহকারে সমাজের কার্যে নিযুক্ত থাকেন তাহা হইলে নিশ্চয়ই সমাজের উদ্দেশ্য সাধিত হইবে।

পরে সভাপতি মহাশয় সমাজের নিয়মাবলী পর্যালোচনা করিবার জন্য সভায় প্রস্তাব করেন।

স্থির হইল— বিদ্যার উন্নতিসাধন করাই এই সমাজের উদ্দেশ্য।

তৎপরে তিন-চারিটি নামের মধ্য হইতে অধিকাংশ উপস্থিত সভ্যের সম্মতিক্রমে সভার নাম স্থির হইল সারস্বত সমাজ।

সমাজের দ্বিতীয় নিয়ম নিম্নলিখিত মতে পরিবর্তিত হইল—

যাঁহারা বঙ্গসাহিত্যে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন এবং যাঁহারা বাংলাভাষার উন্নতিসাধনে বিশেষ অনুরাগী, তাঁহারাই এই সমাজের সভ্য হইতে পারিবেন।

সমাজের তৃতীয় নিয়ম কাটা হইল।

[সমাজের] চতুর্থ নিয়ম নিম্নলিখিত মতে রূপান্তরিত হইল—

সমাজের মাসিক অধিবেশনে উপস্থিত সভ্যের মধ্যে অধিকাংশের ঐকমত্যে [নূ]তন সভ্য গৃহীত হইবেন। সভ্যগ্রহণ কার্যে গোপনে সভাপতিকে মত জ্ঞাত করা হইবেক।

সমাজের চতুর্বিংশ নিয়ম নিম্নলিখিত মতে রূপান্তরিত হইল—

সভ্যদিগকে বার্ষিক ৬ টাকা আগামী চাঁদা দিতে হইবেক। যে সভ্য এককালে ১০০ টাকা চাঁদা দিবেন তাঁহাকে ওই বার্ষিক চাঁদা দিতে হইবেক না।

অধিকাংশ উপস্থিত সভ্যের সম্মতিক্রমে বর্তমান বর্ষের জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সমাজের কর্মচারীরূপে নির্বাচিত হইলেন।

সভাপতি। ডাক্তর রাজেন্দ্রলাল মিত্র।

সহযোগী সভাপতি। শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ডাক্তর শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর। শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সম্পাদক। শ্রীকৃষ্ণবিহারী সেন। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হইল।

রচনাকাল : শ্রাবণ ১২৮৯
রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসা ১, ১৯৬৫

সারস্বত সমাজ ২

১২৮৯ সালের ১৭ অগ্রহায়ণ শনিবার অপরাহ্ণ চার ঘটিকার সময় আলবার্ট হলে সারস্বত সমাজের অধিবেশন হয়।

ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রধান আসন গ্রহণ করেন।

শ্রীযুক্ত বাবু সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রস্তাব করিলেন যে সারস্বত সমাজের মুদ্রিত নিয়মাবলী গ্রাহ্য হউক। শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রনাথ বসু উক্ত প্রস্তাবের অনুমোদন করিলে পর সর্বসম্মতিক্রমে সারস্বত সমাজের মুদ্রিত নিয়মাবলী গ্রাহ্য হইল।

সভ্যসাধারণের দ্বারা আহূত হইয়া সভাপতি মহাশয় নিম্নলিখিত মতে ভৌগোলিক পরিভাষা সম্বন্ধে তাঁহার বক্তব্য প্রকাশ করিলেন—

প্রত্যেক গ্রন্থকার তাঁহার ভূগোল-গ্রন্থে নিজের নিজের মনোমতো শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন— আবার মানচিত্রকারও তাঁহার মানচিত্রে স্বতন্ত্র শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন। সুতরাং বালকেরা সর্বত্র এক শব্দ পায় না।

বক্তা দৃষ্টান্তস্বরূপে উল্লেখ করিলেন যে— এক Isthmus শব্দের স্থলে কেহ-বা যোজক, কেহ- বা ডমরু-মধ্যস্থান কেহ- বা সংকটস্থান ব্যবহার করিয়া থাকেন। শেষোক্ত শব্দটি বক্তাই প্রচার করিয়াছেন। সংস্কৃত অর্থ অনুসারে সংকট শব্দ স্থলেও ব্যবহার করা যায়, জলেও ব্যবহার করা যায়, গিরিতেও ব্যবহার করা যায়— সুতরাং উক্ত এক শব্দে Isthmus, channel, mountain-pass সমস্তই বুঝায়। অনেক গ্রন্থকার strait শব্দের স্থলে প্রণালী ব্যবহার করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রণালী শব্দে মল-নির্গম পথ বুঝায়। প্রণালী অর্থাৎ খাল বা খানা শব্দ সমুদ্রে আরোপ করা অকর্তব্য।

Peninsula বাংলায় সকলে উপদ্বীপ বলিয়া থাকেন। কিন্তু উপদ্বীপগুলিতে দ্বীপের ছোটোই বুঝায়, অতএব এইরূপে প্রসিদ্ধ শব্দের অপভ্রংশ করা উচিত হয় না। বক্তা উক্ত স্থলে "প্রায়দ্বীপ" শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন। প্রায়দ্বীপ শব্দেই তাহার আকার বুঝায়।

এইরূপ অনেক পারিভাষিক শব্দ আছে, তাহার একটা নিয়ম করা উচিত।

ভূগোলে কতকগুলি কথা আছে যাহা রূঢ়িক— এবং আর-কতকগুলি কথা আছে, যাহা অর্থজ্ঞাপনের নিমিত্ত সৃষ্ট। যেগুলি রূঢ়িক শব্দ তাহার অনুবাদ করা উচিত নহে, আর অপরগুলি অনুবাদের যোগ্য। ইংরাজিতে যাহাকে Red Sea বলে, ফরাসি প্রভৃতি ভাষাতেও তাহাকে লোহিত সমুদ্র বলে। কিন্তু India শব্দ অন্য ভাষায় অনুবাদ করে না। আমাদের ভাষায় এ নিয়মের প্রতি আস্থা নাই— কখনো এটা হয় কখনো ওটা হয়।

বক্তা বলিলেন, ইংরাজেরা বিদেশীয় ভাষা হইতে শব্দ গ্রহণ করে, কিন্তু সেইসঙ্গে শব্দের তদ্ধিত গ্রহণ করে না। ইন্ডিয়া শব্দ গ্রহণ করিয়া তাহার তদ্ধিত করিবার সময় তাহাকে ইন্ডিয়ান বলিয়া থাকে। বিভক্তিসুদ্ধ অনুকরণ করে না। কিন্তু বাংলায় এ নিয়মের ব্যভিচার দেখা যায়। অনেক বাংলা গ্রন্থকার কাস্পীয় সাগর না বলিয়া কাস্পিয়ান সাগর বলিয়া থাকেন।

এইরূপ শব্দ গ্রহণের একটা কোনো নিয়ম করা উচিত এবং কোন্‌গুলি অনুবাদ করিতে হইবে ও কোন্‌গুলি অনুবাদ না করিতে হইবে তাহাও স্থির করা আবশ্যক।

পরিভাষা— বিশেষ বিবেচনাপূর্বক ব্যবহার করা উচিত। Long সাহেবকে কেহই অনুবাদ

করিয়া দীর্ঘ সাহেব বলে না— কিন্তু একটা পর্বতের নামের বেলায় অনেকে হয়তো ইহার বিপরীত আচরণ করেন। আমরা যাহাকে ধবলগিরি বলি— তাহার ইংরাজি অনুবাদ করিতে হইলে তাহাকে White mountain বলিতে হয়— কিন্তু আমেরিকায় White mountain নামে এক পর্বত আছে। আবার ফরাসিতে ধবলগিরির অনুবাদ করিতে হইলে তাহাকে Mont Blanc বলিতে হয়, অথচ Mont Blanc নামে অন্য প্রসিদ্ধ পর্বত আছে। এইরূপ স্থলে একটি নিয়ম স্থির না হইলে দেশের নামের ব্যবহারে অত্যন্ত ব্যভিচার হইয়া থাকে।

গ্রন্থের স্থৈর্যরক্ষা করিতে হইলে সর্বত্র এক অর্থ রাখা আবশ্যক। অভিধান স্থির করিলে ইহা সহজ হইতে পারিত; কিন্তু তাহার উপায় নাই। কারণ অনেক শব্দ এখনও প্রস্তুত হয় নাই। অতএব এক-এক শাস্ত্র লইয়া তাহার শব্দগুলি আগে স্থির করা একান্ত আবশ্যক।

বক্তা বলিলেন, অল্পবয়স্ক শিশুদের হাতেই ভূগোল দেওয়া হয়— অতএব ভূগোলের পরিভাষা স্থির করাই সারস্বত সমাজের প্রথম কার্য হউক, তাহার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাকরণেরও কিছু কিছু হইলে ভালো হয়।

উপসংহারে বক্তা বলিলেন— সারস্বত সমাজের তিন-চারিজন সভ্য মিলিয়া একটি সমিতি করিয়া প্রথমত ভৌগোলিক পরিভাষা সম্বন্ধে একটা মীমাংসা করুন, পরে সাধারণ সভায় তাহা স্থির হউক।

তৎপরে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি সভায় পরে পরে উত্থাপিত ও গ্রাহ্য হইল—

প্রথম— ভূগোলের পরিভাষা স্থির করা আবশ্যক। দ্বিতীয়— তদ্‌বিষয়ে কী করা কর্তব্য তাহা অনুসন্ধানার্থ একটি সমিতি বসিবে ও নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সমিতির সভ্য হইবেন।

কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কালীবর বেদান্তবাগীশ, রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ বসু, হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

তৃতীয়— তিনমাস পরে উক্ত সমিতির কার্য সাধারণ সভায় বিজ্ঞাপিত হইবে।

চতুর্থ— যে-সকল ভৌগোলিক শব্দ আলোচনা করিতে হইবে, শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় তাহার তালিকা প্রস্তুত করিয়া সমিতিকে সমর্পণ করিবেন।

সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হইল।

রচনাকাল : অগ্রহায়ণ ১২৯১
মন্মথনাথ ঘোষ, 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ'

বিশেষ বিজ্ঞাপন

ত্রৈমাসিক সাধনা

আগামী অগ্রহায়ণ মাস হইতে সাধনা ত্রৈমাসিকপত্ররূপে প্রকাশিত হইতে থাকিবে। বর্তমান ত্রিসংখ্যক সাধনা হইতে গ্রাহকগণ ত্রৈমাসিক সাধনার আকার আয়তন কতকটা বুঝিতে পারিবেন। যাহাতে ত্রৈমাসিক পত্রিকাখানি বর্তমান সাধনা অপেক্ষা উৎকর্ষ লাভ করে তৎপক্ষে আমাদের চেষ্টার ত্রুটি থাকিবে না। গ্রাহকগণ অনুগ্রহপূর্বক অগ্রিম মূল্য তিন টাকা পাঠাইয়া আমাদিগকে বাধিত করিবেন। প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইবার একমাস মধ্যে যাঁহারা সাধনার মূল্য না দিবেন তাঁহাদিগকে নগদ ক্রেতাস্বরূপে গণ্য করা যাইবে। ত্রৈমাসিক সাধনার প্রতিখণ্ডের নগদ মূল্য এক টাকা।

৬নং দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলি
যোড়াসাঁকো
১৫ ভাদ্র ১৩০২

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সম্পাদক
শ্রীবলেন্দ্রনাথ ঠাকুর
কার্যাধ্যক্ষ

প্রাদেশিক সভার উদ্‌বোধন

ঢাকায় বিগত বঙ্গীয় প্রাদেশিক জনসভার যে অধিবেশন বসিয়াছিল তাহার সভাপতি ছিলেন মান্যবর শ্রীযুক্ত কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়। তাঁহার উদ্‌বোধনের সারমর্ম নিম্নে বাংলায় প্রকাশ করিলাম। ইহাতে মূল বক্তৃতার অসামান্য গাম্ভীর্য নৈপুণ্য ও তেজ, ভাষার প্রাঞ্জলতা ও সৌন্দর্য রক্ষা করিবার দুরাশা পরিত্যাগ করিয়াছি কেবল তাঁহার প্রধান বক্তব্য বিষয়গুলি সন্নিবেশিত করা হইয়াছে— আশা করি, পাঠকগণ ইহা হইতে সংক্ষেপে আমাদের বর্তমান রাজনীতির অবস্থা ও আমাদের রাজনৈতিক কর্তব্য সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিবেন। এ স্থলে বলিয়া রাখা কর্তব্য, অনুবাদটি কালীচরণবাবুকে দেখাইবার অবকাশ পাই নাই, এজন্য যদি কোনো অনৈক্য অসংগতি ঘটিয়া থাকে তবে আমরা তাঁহার ও পাঠকবর্গের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি।

—সম্পাদক।

আমাকে অদ্য আপনারা সভাপতিত্বে বরণ করিয়াছেন, সেজন্য যেমন আমি আপনাদের নিকট কৃতজ্ঞ, তেমনি আপন অযোগ্যতা অনুভব করিয়া সংকুচিত। আমি আপনাদের আদেশ শিরোধার্য করিয়া গ্রহণ করিলাম কিন্তু আমাকে এই ভার প্রদানের জন্য আপনারাই দায়ী তাহা স্মরণ রাখিবেন। এক্ষণে ঈশ্বরের এই আশীর্বাদ কামনা করি যে, এ সভা যেন প্রজাদের সহায় হয় এবং প্রজাপালকদেরও সাহায্য করে।

ভারতেশ্বরী মহারানীর মহৎজীবনের আরও একবৎসর কাল আমরা সৌভাগ্যস্বরূপে লাভ করিয়াছি।— যে উদার ঘোষণাপত্র তাঁহার রাজত্বের স্থায়ীকীর্তি, প্রার্থনা করি, তিনি বহুদীর্ঘকাল সজীব থাকিয়া তাঁহার সেই প্রতিশ্রুতিগুলিকে অটল ভিত্তির উপর স্থাপনপূর্বক প্রজাদিগকে আনন্দিত এবং আপন রাজবাক্যকে চরিতার্থ করিতে পারেন।

বর্ষে বর্ষে আমরা ইংলন্ডের প্রবীণ মহাপুরুষকে (Grand old man) তাঁহার জন্মোৎসবের আনন্দ-অভিবাদন প্রেরণ করিয়াছি। রাজনৈতিক আকাশের সেই উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক অদ্য অস্তমিত হইয়া উচ্চতর গগনে অধিরোহণ করিয়াছেন। আমরা তাঁহার শোকাকুল পরিবারের অশ্রুর সহিত অশ্রু সম্মিলিত করি, এবং তাঁহার পবিত্র স্মৃতির সহিত তাঁহার সেই মহাবাণী গ্রথিত করিয়া রাখি যে-বাণী অদ্য বিংশতি বৎসর হইল, তৎকালীন ভারতশাসনকর্তা-কর্তৃক প্রচলিত রাজদ্রোহীরচনা বিলের বিরুদ্ধে তিনি উচ্চারণ করিয়াছিলেন, যে অখণ্ডনীয় বাণী আমরা বিরোধীপক্ষকে পরাভব করিবার জন্য মহাস্ত্ররূপে গ্রহণ করিতে পারি। তিনি বলিয়াছিলেন—

মহাশয়গণ, যদিও মধ্যে মধ্যে আমরা ভারতরক্ষাকার্যের সহিত ব্রিটিশ স্বার্থকে বিজড়িত করিয়া আমাদের সেই প্রথম ও পরম কর্তব্য হইতে— অর্থাৎ সেখানকার প্রজাবর্গের উন্নতিসাধনে আমাদের একান্ত সহায়তা এবং সুবুদ্ধি পরিচালনা হইতে— বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ি, তথাপি, একটিমাত্র উপায় আছে যদ্দ্বারা আমরা ভারতশাসনের দুরূহ কার্যকে আশাপ্রদ ও সম্ভবপর করিয়া তুলিতে পারি— সে কেবল ভারতবাসীদের হিতের জন্য ভারতশাসনের চেষ্টা। আমরা যে এই ভিত্তির উপরে ভারতশাসনকার্যকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি ইহা অত্যুক্তি নহে এবং ইহাও সত্য যে, ভারতবাসীগণ তাহা জানে ও বিশ্বাস করে। তাহাদের নালিশ করিবার অনেক বিষয় আছে, অন্তত এইরূপ তাহাদের ধারণা। দুঃখের সহিত বলিতেছি বর্তমান প্রেস অ্যাক্ট তাহার মধ্যে একটি প্রধান। কিন্তু আমি দেখিয়াছি— বিশেষত এই অ্যাক্টের পোষকস্বরূপে যে-সকল লেখা উদ্‌ধৃত করিয়া পাঠানো হইয়াছে তাহাই পাঠ করিয়া দেখিয়াছি— ভারতবর্ষের এই-সকল নালিশ বিশেষ বিশেষ হেতুগত। আমরা এ দেশে যেমন করি তাহারাও সেইরূপ গবর্মেন্টের ত্রুটি অবলম্বন করিয়া অভিযোগ করে। যখন এমন কোনো আইন পাস হয় যাহাকে আমরা মন্দ জ্ঞান করি তখন তাহার বিরুদ্ধে আপত্তি জানাই, কিন্তু তাই বলিয়া রাজার সহিত প্রজাসম্বন্ধ

বিচ্ছিন্ন করি না। সেইরূপ— যদি ভারতবাসীর অন্তঃকরণ আমি ঠিক বুঝিয়া থাকি— তাহারাও বিশেষ ধারা অথবা বিশেষ আইনের প্রচলন সম্বন্ধেই আপত্তি প্রকাশ করে— কিন্তু ব্রিটিশ শাসন যে ভারতের পক্ষে হিতকারী তাহা অস্বীকার করিবার কোনো লক্ষণ কোথাও দেখা যায় না, এবং যখন একটি উদ্‌ধৃত রচনায় দেখিলাম লেখক বলিতেছেন, যে, বর্তমান অবস্থায়— ব্রিটিশ রাজ্যের ধ্বংস নহে— প্রত্যুত তাহার স্থায়িত্বই ভারতবর্ষের সকল আশার আশ্রয়স্থান— তখন আমি বিস্ময় এবং বিস্ময়ের সহিত আনন্দ উপভোগ করিয়াছি। ভালো, যখন এত দূরই অগ্রসর হইয়াছ, অথচ অনিবার্য অবস্থাবৈষম্যবশত যখন সমস্ত ভারতবর্ষে স্বায়ত্ত রাজ্যবিধির মূল সূত্রপাত করিতেও যথেষ্ট দ্বিধা উপস্থিত হয়, তখন অন্তত এটুকু অঙ্গীকার করিতেই হইবে যে, যাহা আমরা দান করিব তাহা আমরা প্রত্যাখ্যান করিব না; সুতরাং, আমাদের স্বরাজ্যতন্ত্রে আমরা যে সর্বোচ্চ উপকারগুলি ভোগ করি, অর্থাৎ প্রজাগণ যে-সকল রাজকার্যবিধিতে ঔৎসুক্যবান তাহাকে প্রকাশ্যতা দান করা, এবং অন্যায় ও ভ্রম হইতে রক্ষা পাইবার জন্য বিচার ও আলোচনার উদ্দেশে তাহাকে যথেষ্ট সময় দেওয়া— সেই অধিকার যখন আমরা ভারতবর্ষকে দান করিয়াছি; তখন বর্তমান ঘটনায় ভারতবর্ষীয় গবর্মেন্টের নিরতিশয় শঠকারিতা ও একান্ত গোপনতা পরম দুঃখের বিষয় হইয়াছে ; বিশেষত যখন এই ত্বরাতিশয্য ও মন্ত্রগুপ্তি কেবলমাত্র কোনো আংশিক সংশোধন ও পরিবর্তন-উদ্দেশে নহে, পরন্তু দেশীয় সংবাদপত্র সম্বন্ধে একটি গুরুতর আইনস্থাপনা উপলক্ষে।—

কনফারেন্সের গত অধিবেশনের পর আমরা আমাদের দেশের প্রবীণা মহানারীর মৃত্যুশোক অনুভব করিয়াছি— সেই কাশিমবাজারের রানী স্বর্ণময়ী যাঁহার দেশবিশ্রুত সদ্‌গুণ, ভারতবর্ষেরই সর্বসম্মত বিশেষ সদ্‌গুণ, দয়া। তাঁহার সেই দয়ায় প্রাচ্য দেশের মুক্তহস্ত বদান্যতা এবং প্রতীচ্যভাগের অর্থনৈতিক দূরদর্শিতা একত্রে মিশ্রিত হইয়াছিল।

এক্ষণে আমাদের এই সভার প্রথম কর্তব্য, বাংলার নূতন শাসনকর্তাকে স্বাগত সম্ভাষণ। তিনি তাঁহার রাজাসনে পদক্ষেপমাত্রেই আমাদের হৃদয় অধিকার করিয়াছেন। প্রজাপালনের জন্য সার জন্ বুড্‌বর্ন যে সর্বপ্রকার ত্যাগস্বীকারে উন্মুখ ইতিমধ্যে তিনি তাহার প্রমাণ দিয়াছেন, গুরুতর সংকটের সময় রাজনীতিকে তিনি প্রজাদের প্রার্থনার অনুকূল করিয়াছেন। তাঁহার মন্ত্রগৃহের আসনে বসিয়া তিনি অঙ্গীকার করিয়াছেন যে, শিল্পশিক্ষাপ্রাপ্ত দেশীয় লোকদিগকে সাহায্য করিবার জন্য তিনি প্রস্তুত এবং তিনি রাষ্ট্রীয় ব্যয় সংক্ষেপের উপায় উদ্‌ভাবনের জন্য মন্ত্রসভার বেসরকারি মন্ত্রীগণকে বিশেষরূপে অনুরোধ করিয়াছেন। এইরূপে সার জন বাংলা দেশের ভবিষ্যৎকে আশার আলোকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছেন।

বৎসরটি দুর্দৈবের বৎসর চলিতেছে। ভূমিকম্পের আন্দোলনের মধ্যে গত কনফারেন্সের অধিবেশন সমাপ্ত হইয়াছিল। বঙ্গদেশের গাত্র হইতে দৈবনিগ্রহের ক্ষতচিহ্নগুলি সম্পূর্ণ বিলুপ্ত না হইতেই পরে পরে দুর্ভিক্ষ এবং মারীর আবির্ভাব হইল। বিধাতার বিধানে অশুভ হইতেও শুভ ফল উৎপন্ন হয় গত দুর্ভিক্ষে তাহার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। সেই অন্নাভাবের দিনে বিপন্ন ভারতের প্রতি জগতের সর্বত্র হইতেই করুণা বর্ষিত হইয়াছে। পৃথিবীর বৃহৎ জাতির সহিত যে আমাদের এক বন্ধন আছে তাহা তাঁহারা এই উপলক্ষে স্বীকার করিয়াছেন এবং আমরাও তাহা হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করিতে পারিয়াছি।

কিন্তু প্লেগে যেন কতকটা তাহার বিপরীত ফল ফলিয়াছে; ইহাতে দুই জাতির হৃদয়বন্ধনে যেন কঠোর আঘাত করিয়াছে। রাজা-প্রজার পরস্পর বুঝাপড়ার অভাব হওয়াই তাহার মূল এবং শাসিত ও শাসনকর্তার মধ্যে অবাধ বার্তাবহনের অসম্পূর্ণতাই তাহার কারণ। জনসাধারণের স্বাভাবিক নেতাগণ, যে, বার্তা প্রদানে বিরত ছিলেন তাহা নহে, কিন্তু গবর্মেন্ট তাঁহাদিগকে মন্ত্রণায় আহ্বান না করায় সর্বসাধারণেও তাঁহাদের প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারে নাই। বোম্বাইয়ের দুর্বিপাক হইতে শিক্ষা লাভ করিয়া সার জন্ যে রাজনীতির অবতারণা করিয়াছেন

তাহাতে জননায়কদের হস্তেই এই মারীনিবারণের ভার অর্পিত হইয়াছে। ইহাতে আমাদের একটি বিশেষ সান্ত্বনার কথা আছে।— ইতিপূর্বে ম্যুনিসিপালিটির প্রতি এক অকারণ অভিযোগ আসিয়াছিল যে প্লেগসম্বন্ধীয় প্রতিকার বিধান তাহার সাধ্য নহে; এক্ষণে দেখা যাইতেছে লোকনায়কগণেরই সেই কাজ, সরকারি কর্মচারীদের দ্বারাই তাহা দুঃসাধ্য। এই প্রসঙ্গে বলিতে চাহি, প্লেগনিবারণের জন্য আমরা গবর্মেন্টের অপেক্ষা কম উৎসুক নহি কিন্তু প্রমাণহীন নূতন পরীক্ষার বিষয়ীভূত হইতে আমরা কুণ্ঠিত। উপযুক্ত পণ্ডিতদের যাহা বিধান হয় তাহা আমরা বহন করিতে প্রস্তুত আছি, এবং সেই বিধান পালনের ভার আমাদের নিজ হস্তে থাকিলে তাহার অনাবশ্যক কঠোরতা অনেক পরিমাণে হ্রাস হইবে।

এক্ষণে আলোচ্য এই যে, প্রাদেশিক জনসভার উদ্দেশ্য কী। কন্‌গ্রেসে এবং কন্‌ফারেন্সে, ভারতজনসভা ও প্রাদেশিক জনসভায় এই প্রভেদ নির্দিষ্ট হইয়াছে যে, একটি সাম্রাজ্য-ব্যাপারঘটিত এবং আর-একটি কেবল প্রাদেশিক। কিন্তু কন্‌গ্রেসে যে-সকল প্রস্তাব উত্থাপিত হয় কন্‌ফারেন্স তাহাতে বিশেষরূপ সাহায্য না করায় কন্‌গ্রেস ক্রমশ একঘেয়ে হইবার উপক্রম হইয়াছে। যদি এমন বন্দোবস্ত হয় যে, কনগ্রেসের আলোচিত প্রস্তাবগুলির তদন্তভার কনফারেন্সের বিশেষ বিশেষ বিভাগগত সেক্রেটারিদের হস্তে দেওয়া যায় এবং তাঁহারা সংবৎসরকাল সেই-সকল বিষয়ে স্থানীয় বিবরণ সংগ্রহ করিয়া বেসরকারি একটি শাসন-বিবরণী (administration report) প্রস্তুত করেন ও তাহা কনফারেন্সে গ্রাহ্য হইলে পর ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ হইতে কনগ্রেসের সেক্রেটারির নিকট পাঠানো হয় এবং তিনি তাহা হইতে একটি সাধারণ বিবরণী প্রস্তুত করিয়া কনগ্রেসে পাঠ করেন তবে তাহা বিশেষ ফলদায়ক হইতে পারে। রাজ্যচালনার মূলনীতি সম্বন্ধে আমরা অনেক কথা বুঝিয়াছি কিন্তু দোষের বিষয় এই যে, রাজ্যের সংবাদ আমাদের অল্পই জানা আছে— সেইজন্য আমাদের কথার জোর নাই, এবং অনেক সময় সেই কারণেই বিপক্ষের নিকট আমাদের হার মানিতে হয়। বর্তমান প্রস্তাবে তাহার প্রতিকার সম্ভব।

কনফারেন্সেও যে-সকল বিশেষ বিষয়ের অবতারণা হয় তৎসম্বন্ধে যদি আমরা একবৎসর ধরিয়া তথ্য সংগ্রহ করি ও যথোচিত প্রস্তুত হইয়া আসি তাহা হইলে আমাদের এই কনফারেন্স তিন দিবসব্যাপী একটা ইন্দ্রজালের মতো হয় না— সমস্ত বৎসর তাহার কাজ থাকে।

কনফারেন্সের আরও একটি উদ্দেশ্য জনসাধারণের রাজনৈতিক শিক্ষাবিস্তার। যদিও আমরা তাহাদের হিতেচ্ছা করি ও তাহাদের হিতকার্যে প্রবৃত্ত কিন্তু আরও নিকটভাবে প্রত্যক্ষভাবে তাহাদিগকে আমাদের এই অনুষ্ঠানের সহিত সংযুক্ত করিতে না পারিলে যথার্থ উপকার হয় না এবং বিপক্ষেও বলিবার পথ পায় যে আমরা সাধারণের প্রকৃত প্রতিনিধি নহি। এই জনসাধারণকে আকর্ষণ করিবার জন্য গত কনফারেন্সে বাংলা ভাষায় কার্যনির্বাহের অবতারণা হয়। ইহা ছাড়া, সাধারণে, জলকষ্ট প্রভৃতি, যে-সকল বিষয়ে বিশেষরূপে সংশ্লিষ্ট কনফারেন্সে তাহার যথেষ্ট আলোচনা হওয়া আবশ্যক।

বৎসরের আলোচনায় দুটি বিষয় বিশেষ করিয়া চক্ষে পড়ে; রাজদ্রোহের ধুয়া এবং সর্বপ্রকারে দমন করিবার চেষ্টা।

আমাদের বিশ্বাস, একদল ইংরাজের প্ররোচনায় নিতান্ত বাধ্য হইয়া কর্তৃপুরুষেরা রাজদ্রোহ সম্বন্ধে বিশেষ শাসন প্রচার করিয়াছেন। আসল কথা এই যে, একপক্ষে আমাদের রাজা আমাদিগকে কতকগুলি স্বাধীন অধিকার দিতে প্রতিশ্রুত, অপরপক্ষে পারকতা দ্বারা আমাদের দাবিও আমরা সপ্রমাণ করিয়াছি, এক্ষণে রাজদ্রোহের অপরাধ আরোপ না করিলে আমাদিগকে প্রাপ্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করিবার কোনো যুক্তিসংগত কারণ পাওয়া যায় না। আমাদের বিপক্ষগণ সেই অন্যায় ধুয়া তুলিয়া আমাদের দাবিকে দুর্বল করিবার চেষ্টায় আছেন।

রাজপুরুষগণ কখনো কখনো মৌখিক রাজভক্তির উল্লেখ করিয়া অবজ্ঞা প্রকাশ করেন, কিন্তু

রাজদ্রোহও যে অনেক সময় মৌখিক হইতে পারে সে তাঁহারা খেয়াল করেন না। হৃদয়ে আমাদের রাজদ্রোহ নাই, যদি কখনো চিত্তক্ষোভে অনবধানে মুখে বিরুদ্ধ কথা বাহির হয় তাহা কর্ণপাতের যোগ্য নহে।

জগদীশ্বরের রাজ্যই ধরণীশ্বরের রাজত্বের আদর্শ। ঈশ্বর মনুষ্যকে অনেক স্বাধীন অধিকার দিয়াছেন, মনুষ্য তাহার অসদ্‌ব্যবহার করিয়া পদে পদে দণ্ডনীয় হয় কিন্তু তাই বলিয়া সমূলে স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত হয় না। আমাদের নরপতি, বিশ্বপতির এই বিধান স্মরণ রাখিলে রাজনীতির উচ্চ আদর্শ স্থাপন করিতে পারিতেন।

এই তো গেল রাজদ্রোহের ধুয়া। তাহার পরে আমাদিগকে বিবিধ প্রকারে দমনের জন্য আয়োজন নানা আকারে দেখা যাইতেছে। ইহার মূলে শাসনকর্তাদিগের ক্ষমতা, এবং প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধির চেষ্টা। ভারত-রাজতন্ত্রে বিচার বিভাগ এবং কর্তৃত্ব বিভাগের অধিকার, ন্যায়াধীশ এবং দণ্ডাধীশের ক্ষমতা অনেক স্থলে একাধারে বর্তমান বলিয়া অনেক অন্যায়ের সৃষ্টি হইয়া থাকে— এই দুই ক্ষমতার পৃথকীকরণের জন্য দীর্ঘকাল আন্দোলন চলিতেছে, পাছে সেই যুক্তিযুক্ত আন্দোলন সফল হয় এইজন্যই বুঝিবা তৎপূর্বেই কর্তৃপুরুষের ক্ষমতা অসংগতরূপে বৃদ্ধি করা হইতেছে।

অনেক সময় দণ্ডাধীশ যাহাকে দোষী বলিয়া খাড়া করেন ন্যায়াধীশের বিচারে সে খালাস পায়— ইহাতে দণ্ডবিধানের একটা ব্যাঘাত ঘটে। কিন্তু চাণক্যের ন্যায় আমাদের কর্তারা স্থির করিয়াছেন— "তাড়নে বহবো গুণাঃ"— অতএব দমন-তাড়নের শক্তিকে তাঁহারা অপ্রতিহত করিতে চান। এক তো এমন এক ধারা বাহির হইল যাহাতে কোনো বিচারই নাই— তাহার পরে যেখানে বিচার আছে সেখানেও নূতন সংশোধিত দণ্ডবিধি এমন সকল বাধা স্থাপন করিয়াছে, যাহাতে অভিযুক্তগণ আপন নিরপরাধ প্রমাণের চিরপ্রচলিত অনেকগুলি সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। সওয়াল-জবাবের অধিকার হ্রাস করা হইয়াছে; পুলিসের ডায়ারি তদন্ত করিয়া কৃত্রিম প্রমাণ ধরিতে পারিবার যে উপায় ছিল তাহাও রোধ করা হইয়াছে; অবিচারের আশঙ্কায় এক হাকিমের হস্ত হইতে অন্য হাকিমের হস্তে মকদ্দমা চালান করিবার যে অধিকার ছিল তাহাও হ্রাস করা হইয়াছে। অবশ্য, বিচারকর্তারা অভিজ্ঞতার দ্বারা কোনো ত্রুটি পাইয়া যদি এই-সকল বিধি সংশোধনের পরামর্শ দিতেন তাহা হইলেও বুঝিতাম— কিন্তু তাহা নহে— এ কেবল কর্তৃপুরুষদেরই কৃতকার্য। নূতন বিধি প্রণয়নে হাইকোর্টের এক জজ নিযুক্ত ছিলেন বটে— কিন্তু এই সংশোধনগুলি তাঁহার বিচার-করা-কালীন পরামর্শসম্ভূত নহে। একদিকে আইন কড়া, অন্য দিকে দণ্ডবিধিও যদি সংকীর্ণ হয় তবে অভিযুক্তদিগের পক্ষে বড়োই সংকট। ইহা ব্রিটিশ ন্যায়নীতির বিরুদ্ধে। কারণ তাঁহাদের ন্যায়ের মূলসূত্র এই যে, ৯৯ জন অপরাধী খালাস পাইলেও ক্ষতি নাই কিন্তু একজনও নিরপরাধ যেন দণ্ড না পায়।

কর্তৃপুরুষদের ক্ষমতাবৃদ্ধির এই চেষ্টা আমাদের প্রাদেশিক শাসনেও লক্ষিত হয়। প্রজাস্বত্বসম্বন্ধীয় নূতন আইনে খাস মহল এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বহির্ভূক্ত মহলের প্রজাদের খাজানা বৃদ্ধির ক্ষমতা এক্ষণে একেবারে রেভিন্যু কর্মচারীদের হস্তে অর্পিত হইয়াছে। এই রেভিন্যু কর্মচারীরা কর্তৃত্ববিভাগের অঙ্গ।

পূর্বে এই রেভিন্যু কর্মচারীদিগকে দেওয়ানীকার্যবিধি অনুসারে চলিতে হইত, এবং তাঁহাদের রায়ের উপর সিভিল কোর্টে আপিল চলিবার বাধা ছিল না। নূতন নিয়ম অনুসারে তাঁহারাই সরাসরি ভাবে হুকুম দিবেন এবং তাহার উপরে আর আপিল চলিবে না। ইহাতে খাজনা বৃদ্ধির পথ সম্পূর্ণ অবাধ হইল। দুঃখের সহিত বলিতেছি আমাদের মধ্যে যাঁহারা মন্ত্রীসভায় এই আইনের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন জমিদারসম্প্রদায় তাঁহাদিগকে উপলক্ষ করিয়া কনগ্রেসের প্রতি বিমুখভাব প্রকাশ করিয়াছেন। কন্‌গ্রেসপক্ষীয়দের অবস্থা এমন যে, আমাদিগকে জমিদার ও রায়ত উভয়েরই প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হয়। যেখানে সামঞ্জস্য সম্ভব

সেখানে কথাই নাই, যেখানে বিরোধ অনিবার্য সেখানে আমরা বিশিষ্টসাধারণের খাতিরে জনসাধারণকে ত্যাগ করিতে পারিব না।

কলিকাতা ম্যুনিসিপাল বিলেও দমনচেষ্টার লক্ষণ দেখা যায়। এই বিলে কর্তৃপুরুষদিগকে এত অধিক ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে যে তাঁহারা আর কোনো প্রকার জবাবদিহির অধীনে নাই। ম্যুনিসিপালিটির অধিকাংশ সভ্যের হস্তে, কেবলমাত্র শ্মশানঘাট, কবরস্থান, নূতন বাজার স্থাপন, লোকসংখ্যা গণনা, টাকা জমা দিবার ব্যাঙ্ক স্থির করা প্রভৃতি সামান্য বিষয়ের ভার দেওয়া আছে। কথা আছে, মানহানি অপেক্ষা প্রাণহানি ভালো, এ বিল যদি পাস হয় তবে আমাদের স্বায়ত্তশাসনের অবশিষ্ট অনুগ্রহকণাটুকুও বিসর্জন দেওয়া শ্রেয়।

এক্ষণে, আমাদের কনফারেন্স সভায় যে-সকল কার্য উপস্থিত হইয়াছে আশা করি আপনারা তাহা দৃঢ়তা ও সংযমের সহিত পরিচালনা করিবেন এবং স্মরণ রাখিবেন রাজা ও প্রজা উভয়েরই প্রকৃত স্বার্থ অবিচ্ছিন্ন অবিরোধী।

ভারতী
আষাঢ় ১৩০৫

শারদ জ্যোৎস্নায়

ভগ্নহৃদয়ের গীতোচ্ছ্বাস

আবার, আবার, শুনা রে আবার,
পীযূষ-ভরা সে প্রেমের গান,
আবার, আবার, সে রবে আমার,
মাতিয়ে উঠুক অবশ প্রাণ!

সুমধুর সুরে বাঁধ্ রে বীণা,
পঞ্চমে চড়ায়ে ললিত তান,
আবার, আবার, সে রবে আমার,
মাতিয়ে উঠুক অবশ প্রাণ!

মাতিয়ে উঠুক অবশ পরান,
নাচিয়ে উঠুক হৃদয় আজ;
জোছনা-হাসিনী এমন যামিনী—
বিষাদের মাথে পড়ুক বাজ!

'জোছনা-হাসিনী, এমন যামিনী,'
প্রতিধ্বনি দিল সকল দিক্,
দিগঙ্গনা মেলি, দিল করতালি,
কুহু কুহু করি উঠিল পিক্!

ভাবে উজলিল যমুনার জল,
কুমুদের মুখে হাসি না ধরে,
হরষে পাপিয়া, আকাশ ছাপিয়া,
ধরিল সে গীত মধুর স্বরে!

ভ্রমর ভূতলে, ফুল-দলে দলে
গুন্ গুন্ রবে ধরিল তান,
'জোছনা-হাসিনী, এমন যামিনী'
দিশি দিশি এই উঠিল গান!

করো করো শশি, সুধা বরিষন!
মিটাও মিটাও চকোর-আশ,
ফুটাও ফুটাও কুমুদের বন,
পরাও জগতে রজত বাস!

'সব-ই অকারণ, বৃথাই জীবন,
জীবন কেবলই যাতনা সার—'
ধিক্ ও কথায়, শুনিতে কে চায়,
কবির কাঁদুনি সহে না আর!

জোছনা-হাসিনী, এমন যামিনী—
এমন শরৎ, এমন শশী,
আবার ভূতলে, যমুনার জলে,
কত ভাঙা চাঁদ পড়েছে খসি!

লহরী লীলায়, নেচে নেচে যায়,
নেচে নেচে যায় তারকাকুল!
লতাপাতাগুলি, নাচে হেলি দুলি,
ঘুম ঘুম আঁখি মেলিল ফুল!

ডাগর ডাগর, ফুটেছে টগর,
গোলাপ প্রলাপ বাড়ায় প্রাণে,
চামেলির ফুল, হেসেই আকুল,
কেতকী কত কী কুহক জানে!

শেফালিকা বেলা, করে কত খেলা,
মৃদুল পবন সহায় তায়,
মৃদুল পরশে, অলস-আবেশে
ঢুলে ঢুলে পড়ে এ ওর গায়!

বাঁধ্ তবে বীণা, আরও তুলে বাঁধ্,
নিখাদে চড়ায়ে ললিত তান,
আবার আবার, সে রবে আমার,
মাতিয়ে উঠুক অবশ প্রাণ!

এই যে চাঁদিমা বিমান উজলে,
উজলে তো আজি আমারি তরে,
আমারি তো লাগি, হইয়ে সোহাগী,
বহিছে যমুনা পুলক-ভরে!

বিষাদের ঘোর কেন রবে তবে,
ভাবনায় কেন দলিত হব,
চাহে না পৃথিবী, চাহি না পৃথিবী,
আপনার ভাবে আপনি রব।

আমার হৃদয় আমারি হৃদয়,
বেচি নি তো তাহা কাহারো কাছে,
ভাঙা-চোরা হোক, যা হোক তা হোক,
আমার হৃদয় আমারি আছে।

চাহি নে কাহারো আদরের হাসি,
ভ্রূকুটির কারো ধারি নে ধার,
মায়া-হাসিময় মিছে মমতায়,
ছলনে কাহারো ভুলি নে আর।

কাহারো ছলনে আর নাহি ভুলি
জ্বলিয়া পুড়িয়া হয়েছি খাক্,
তাদের সোহাগ, তাদের বিরাগ
তাদের আদর তাদেরি থাক্।

বাঁধ্ তবে বীণা, আরও তুলে বাঁধ্,
নিখাদে চড়ায়ে ললিত তান,
আপনার মন আপনারি ঠাঁই,
আপনারি ভাবে ভাসুক প্রাণ।

থাক্ থাক্ বীণা, শুনিতে চাহি না,
মরম-বিঁধুনি ও-সব গান,
শোন্ শোন্ শোন্ কোকিল উদিকে,
ধরেছে কেমন মধুর তান।

ক্ষণেক দাঁড়াও যমুনা! যমুনা!
পিউ পিউ ওই পাপিয়া গায়;
আকাশ পাতাল, সে রবে মাতাল,
আকাশ পাতাল অঘোর প্রায়!

গাও গাও, পাখি, আমোদের গান!
মৃদুল পবন, মাতিয়ে বও!
আয় লো যমুনা বহিয়ে উজান!
আজ শশি! তুমি হোথাই রও!

নিশি তুমি! আজ হোয়ো না প্রভাত,
ভানুর মাথায় পড়ুক বাজ,
কাঁদায়ে চকোরে, ফেলিয়ে আমারে,
মধুর যামিনী, যেয়ো না আজ॥

ভারতী
কার্তিক ১২৮৪

গ্রহগণ জীবের আবাসভূমি

কোনো মেঘ-বিনির্মুক্তা তারকাসমুজ্জ্বলা রজনীতে গৃহের বাহির হইয়া গগনমণ্ডলের প্রতি একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে, চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেরই মনে কতকগুলি চিন্তার উদয় হইবেই হইবে। যে-সকল অগণ্য জ্যোতিষ্কমণ্ডল দ্বারা নভস্তল বিভূষিত হইয়া রহিয়াছে, তাহারা কি শূন্য না আমাদের ন্যায় জ্ঞান-ধর্ম-প্রেম-বিশিষ্ট উন্নত জীবদ্বারা পূর্ণ? প্রাণস্বরূপ পরমেশ্বরের বিচিত্র অনন্ত রাজ্যের মধ্যে এমন কি কোনো স্থান থাকিতে পারে যেখানে প্রাণের চিহ্ন নাই? এই-সকল বিষয় সম্বন্ধে যাহাদের জ্ঞানের গভীরতা নাই, তাহারা হয়তো মনে করিবে, যে, দূরবীক্ষণের সাহায্য অবলম্বন করিলেই এই-সকল প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু তাহা ভ্রম মাত্র। এই যন্ত্রের প্রবল শক্তি সত্ত্বেও, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে এই প্রকার প্রশ্ন-সকলের উত্তর দেওয়া এখনও উহার সাধ্যাতীত। দূরবীক্ষণ যন্ত্রের এখনও এতদূর উন্নতি হয় নাই, যে ইহার সাহায্যে আমরা অতি দূরস্থ লোকের অতি ক্ষুদ্রতম পদার্থ পর্যন্ত জাজ্বল্যরূপে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হই। দূরবীক্ষণের এক্ষণে এই পর্যন্ত ক্ষমতা হইয়াছে, যে অতি দূরের বস্তুকে অপেক্ষাকৃত নিকটে আনিয়া দিতে পারে। মনে করো তুমি সহস্রমাত্রা-শক্তি-সম্পন্ন একটি দূরবীক্ষণ দ্বারা চন্দ্রলোক পর্যবেক্ষণ করিতেছ। চন্দ্র সৌরজগতের মধ্যস্থিত সমস্ত গ্রহমণ্ডলী অপেক্ষা পৃথিবীর নিকটস্থ। পৃথিবী হইতে চন্দ্র প্রায় ১২০,০০০ ক্রোশ দূরে অবস্থিত— এক্ষণে, এই দূরবীক্ষণের সাহায্যে, ১২০,০০০ ক্রোশ— ১২০ ক্রোশে পরিণত হইতে পারে এই মাত্র। তথাপি এই ১২০ ক্রোশ দূর হইতে চন্দ্রলোকের মনুষ্য ঘোটক, হস্তী অথবা অন্য কোনো প্রাকৃতিক পদার্থ আমাদের কি দৃষ্টিগোচর হইতে পারে? কখনোই না।

এই পৃথিবীর ন্যায় অন্যান্য গ্রহগণ জীবের আবাসভূমি কি না যদিও বিজ্ঞানশাস্ত্র এ পর্যন্ত এই প্রশ্নের উত্তরে কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিতে পারেন নাই তথাপি আনুমানিক প্রমাণ এতৎ সম্বন্ধে এত রাশি রাশি সংগ্রহ করিয়াছেন, যাহা প্রত্যক্ষের ন্যায় সমান বিশ্বাসযোগ্য, তদপেক্ষা কিছুমাত্র ন্যূন নহে।

যে-সকল গ্রহ পৃথিবীর সহিত সাদৃশ্য থাকা প্রযুক্ত পার্থিব গ্রহ বলিয়া উক্ত হয়, আমরা প্রথমে সেই-সকল গ্রহ সম্বন্ধে এই প্রশ্নটি বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

এই পার্থিব গ্রহ তিনটি : বুধ, শুক্র এবং মঙ্গল। ইহারা সৌরজগতের অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য গ্রহগণ অপেক্ষা সূর্য হইতে কম দূরে অবস্থিত হইয়া, তাহার চতুর্দিকে পৃথিবীর সঙ্গে সঙ্গে পরিভ্রমণ করে। সৌরজগতের অন্যান্য দূরবর্তী গ্রহগণের বিষয়ে আমরা পরে আলোচনা করিব।

কীরূপে আমাদের এই পৃথিবী মনুষ্য এবং অন্যান্য ইতর প্রাণীর বাসযোগ্য হইয়াছে, তাহা আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলে প্রথমে দেখিতে পাওয়া যায়, যে পরম কারুণিক পরমেশ্বর পৃথিবীকে আমাদের বাসযোগ্য করিবার জন্য বিবিধ প্রকার পরস্পর-উপযোগী ব্যবস্থা-সকল পূর্ব হইতে নিরূপিত করিয়া দিয়াছেন, সেই ব্যবস্থাগুলি এমন কোনো সাধারণ যান্ত্রিক নিয়ম হইতে উৎপন্ন হইতে পারে না, যাহা দ্বারা সাধারণত জড় জগতের গতিবিধি পরিবর্তন নিয়মিত হইতেছে। জড় জগতে কেবলই গতি ও পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়, যন্ত্রের ন্যায় চক্র-সকল কেবলই ঘূর্ণিত হইতেছে। কিন্তু যে নিয়মের বশবর্তী হইয়া এই পরস্পর-বিরোধী অসংখ্য চক্র-সকল পরস্পর উপযোগী হইয়া প্রাণিপুঞ্জের সুখ সৌকর্য বিধান করিতেছে, সেই নিয়মটি স্রষ্টার মঙ্গল সংকল্পের যত স্পষ্ট পরিচয় দেয়, এমন আর কিছুই নহে। মনে করো, এক্ষণকার ন্যায় তোমার নৈসর্গিক অভাব এবং তদ্‌বিষয়ক জ্ঞান রহিয়াছে— মনের প্রবৃত্তিসকল সমান রহিয়াছে— সুখ-দুঃখবোধ জাগরূক রহিয়াছে— অর্থাৎ এক্ষণকার ন্যায় সর্বাবয়ব-সম্পন্ন মনুষ্যই রহিয়াছে— আর হঠাৎ তুমি এই শোভাপূর্ণ পৃথিবীতে পদার্পণ করিলে। তুমি দেখিবে সুখস্পর্শ সমীরণ প্রবাহিত হইতেছে— স্বচ্ছ নির্মল জলরাশি প্রসারিত রহিয়াছে— প্রাণী ও উদ্ভিদ জগৎ জীবনসৌন্দর্যে পূর্ণ রহিয়াছে— পৃথিবীর এতটুকু আকর্ষণিক শক্তি তোমার শরীরের উপর

রহিয়াছে যে তাহাতে তোমার শরীরের প্রয়োজনীয় স্থায়িত্ব বিধান হইতেছে অথচ তাহার স্বাধীন গতিবিধির কিছুমাত্র ব্যাঘাত হইতেছে না— তোমার শরীরের মাংসপেশীর গঠন প্রণালী অনুযায়ী, পরিশ্রম এবং বিশ্রামের প্রয়োজন অনুসারে আলোক এবং অন্ধকার পর্যায়ক্রমে যাতায়াত করিতেছে— তোমার শরীরের প্রয়োজন অনুসারে, ছয় ঋতু যথাসময়ে পরিবর্তিত হইতেছে— এই-সমস্ত উপযোগিতার নিদর্শন পাইয়া, তুমি কি ক্ষণকাল মাত্রও সন্দেহ করিতে পার, যে তোমার বাসের জন্যই এই পৃথিবী সৃষ্ট হইয়াছে?

তবে যদি আমরা বিজ্ঞানের সাহায্যে জানিতে পারি যে আমাদের এই পৃথিবীর ন্যায় প্রত্যেক গ্রহই, নিয়মিত-কাল-মধ্যে সূর্যের চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করে— পৃথিবীর ন্যায় আলোক, উত্তাপ, বায়ু এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী দ্বারা সুসম্পন্ন— একই নিয়মে তথায় আলোক-অন্ধকারের পর্যায় উপস্থিত হইতেছে— ঋতুর পরিবর্তন হইতেছে— শীতোত্তাপের বিভিন্নতা হইতেছে— জলভূমির সুচারু বিভাগ সম্পাদিত হইতেছে— তখন কি ওই-সকল গ্রহগণ সর্বপ্রকারে আমাদেরই মতো জীবপুঞ্জের যে আবাসভূমি এ বিষয়ে আর সংশয় হইতে পারে?

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা
পৌষ ১৭৯৬ শক। ১২৮০ বঙ্গাব্দ

বঙ্গে সমাজ-বিপ্লব

বিশৃঙ্খলা অধিকদিন তিষ্ঠিতে পারে না। প্রাকৃতিক ঘটনায় এক-একটা যে বিপ্লব বিশৃঙ্খলা দেখিতে পাওয়া যায়, সে-সকল প্রকৃতির কার্য-শৃঙ্খলারই একটি অঙ্গ। বিপ্লব-বিশৃঙ্খলার অর্থই এই যে, এখন যে অবস্থা আছে ইহা এখনকার সময়ের উপযোগী নহে। ইহা পরিবর্তিত না হইলে সমূহ অনিষ্ট হইবে। বর্তমানে যখনই বিপ্লব দেখিব, তখনই জানিব যে, ভূতকালের যে ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া আছি, তাহা জীর্ণ বা অকর্মণ্য হইয়া গিয়াছে, ভবিষ্যতে পুনঃ-সংস্কার হইবে। যেখানকার বায়ু লঘু হইয়া যাইবে, সেইখানেই চারি দিক হইতে বায়ুর স্রোত আসিয়া একটি ঝটিকা বাধিবে বটে, কিন্তু তাহার ফল এই হইবে যে, বায়ু পুনরায় স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইবে। মনুষ্যের সামাজিক রাজ্যেও সেইরূপ এক-এক সময় ঝঞ্ঝা ঝটিকা বহিতে থাকে, তখন সকলেই ভয় করেন যে, বুঝি সমাজের সমুদয় শৃঙ্খলা উলটপালট হইয়া যায়। কিন্তু তাঁহাদের ভয় করিবার কোনো কারণ নাই ; তাঁহারা যদি ভবিষ্যৎ দেখিতে পাইতেন, তো দেখিতেন যে, জীর্ণ সমাজের কতক কতক ভগ্ন ও চূর্ণ হইয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু আবার দৃঢ়তর উপাদানে নূতন সমাজ নির্মিত হইয়াছে। রাজপুরুষের একাধিপত্য অনেকদিন য়ুরোপ-খণ্ডে চলিয়া আসিতেছিল, হয়তো ততদিন প্রয়োজন ছিল, কিন্তু যখনই সে সময় অতীত হইয়া গেল, অমনই একটা বিপ্লব বাধিল; দারুণ রক্তপাত, অরাজকতা, অত্যাচার উপস্থিত হইল, কিন্তু পরিণামে তাহা হইতে অশুভ ফল উৎপন্ন হইল না। অসভ্য অবস্থায় অসাধারণ পরাক্রমশালী প্রভুর প্রয়োজন ছিল, নচেৎ তখনকার দুর্দান্ত লোকেরা যুক্তিতে বা সুমিষ্ট ব্যবহারে বশ হইত না, কিন্তু সে অবস্থা চলিয়া গেলে সে নিয়ম খাটিল না। এক কথায় বলিতে গেলে বিপ্লব আপাতত অতিশয় বিকটাকার বোধ হইলেও পরিণামে তাহা হইতে অনেক শুভ ফল উৎপন্ন হয়। লন্ডনে যখন দারুণ মড়ক হইয়াছিল, তখন যে অগ্নিদাহ হয়, তাহা হইতে যদিও অনেক অনিষ্ট ঘটিয়াছিল, কিন্তু মড়কের বীজ দগ্ধ হইয়া গুরুতর অনিষ্ট নিরাকৃত হয়।

বঙ্গদেশের প্রাচীন লোকেরা সভয়ে দেখিতেছেন যে, নূতন বংশের অভ্যুত্থানশীল যুবকদের মধ্যে অতিশয় বিপ্লব চলিতেছে। তাঁহারা ভাবিতেছেন, কলির সন্ধ্যাকাল বুঝি উপস্থিত হইয়াছে; কেহ কাহাকে মানে না, সকলে স্ব স্ব প্রধান, স্বদেশ-সম্বন্ধে অভিজ্ঞ বৃদ্ধদের কাছে তাহারা পরামর্শ

চায় না, বিদেশের সর্ববিদ্যাভিমানী গ্রন্থকারের কথাই তাহাদের বেদবাক্য, প্রাচীন প্রথার অনুসরণ করিতে নিতান্ত বিমুখ, এবং ভালোই হউক আর মন্দই হউক তাহা লঙ্ঘন করিতে পারিলে আপনাকে মহাবীর বলিয়া মনে করে, সকলেই মনে করে, আমারই উপর বিধাতা এই অসভ্য বঙ্গদেশের সংস্কারের ভার অর্পণ করিয়াছেন, আমার কথাতেই সকলে চলিবে, আমি কাহারো কথায় চলিব না, এবং যাঁহারা একবার বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্পণ করেন বা তথা হইতে নির্গত হন, তাঁহারা দেশের লোকের রুচির, জ্ঞানের, সভ্যতার দোষ ধরিয়া বেড়ান, তাঁহারা মনে করেন সকল বিষয়েই আমার অধিকার আছে, এইজন্য তিনি বুঝুন বা না বুঝুন সকল কথা লইয়াই তোলাপাড়া করিয়া থাকেন। যাহা হউক, আমাদের এই নব্য বংশ এখনও বৃদ্ধদের শাসনে আছেন, কিন্তু যখন এই প্রাচীন বংশ লোপ পাইবেক, তখন এই যথেচ্ছাচারী শত শত শিক্ষিত লোক কী গোলযোগ বাধাইবেন কে বলিতে পারে। এই-সকল ভাবিয়া অনেকে ভয় পাইতেও পারেন, কিন্তু আমরা বলি এ বিপ্লব চিরকাল থাকিবে না। নিদ্রোন্মীলিত নয়নে নূতন জ্ঞানের আলোক লাগিয়া বঙ্গবাসীরা অন্ধ হইয়া গিয়াছেন, তাঁহারা দিগ্‌বিদিক্‌-শূন্য হইয়া কী করিবেন ভাবিয়া পাইতেছেন না। যখন এই আলোক তাঁহাদের চক্ষে সহিয়া যাইবে, তখন আবার তাঁহারা চারি দিক স্পষ্টতর দেখিতে পাইবেন এবং দেশ-কাল-পাত্র বুঝিয়া কর্তব্যাকর্তব্য নির্ধারিত করিতে পারিবেন। তাঁহারা পারিবারিক সুখের বন্ধন ছিঁড়িয়া ফেলাকেই স্বাতন্ত্র্য মনে করেন, যথেচ্ছারিতাকেই স্বাধীনতা বলিয়া আলিঙ্গন করেন ও স্বদেশকে ঘৃণা করাকেই সার্বভৌমিক ভাব মনে করেন। এ অবস্থা যে চিরকাল থাকিবে আমরা সে ভয় করি না, কিন্তু একটি বিষয়ে আমাদের ভয় হয়। এখন এই যে একটি সম্পূর্ণ নূতন ভাবস্রোত বহিতেছে, ইহাতে যাহা-কিছু সময়ের অনুযোগী তাহা ভাঙিয়া যাইবে বটে, কিন্তু সেইসঙ্গে যাহা উপযোগী তাহাও ভাঙিয়া যাইতে পারে, বা যাহা অনুপযোগী তাহাও নূতন ভাসিয়া আসিতে পারে, এই বিষয়ে আমাদের সাবধান হওয়া কর্তব্য; সহস্র-সহস্র বৎসরে যাহা গঠিত হয়, তাহা ভাঙিয়া গেলে গড়িতে কত পরিশ্রম করিতে হইবে এবং সহস্র বৎসরে যাহার ভার বহনে আমরা সমর্থ হইব, এখনই তাহা স্কন্ধে লইলে চাপা পড়িয়া মরিতে হইবে।

বঙ্গদেশের সামাজিক-বিপ্লব যে চিরকাল তিষ্ঠিতে পারিবে না, এখনই তাহার প্রমাণ পাইতেছি। আমাদের দেশের যুবকেরা যখন প্রথম ইংরাজি শিক্ষা পাইয়াছিলেন, তখন যাহা-কিছু দেশীয় তাহারই উপর তাঁহাদের আন্তরিক ঘৃণা ছিল ও যাহা-কিছু বিদেশীয় তাহারই উপর তাঁহাদের অতিশয় অনুরাগ জন্মিয়াছিল; এমন-কি, বিদেশীয় পানাহার চলিত হওয়াও তাঁহারা বঙ্গদেশের সভ্যতার একটি মুখ্য অঙ্গ বলিয়া মনে করিতেন; কিন্তু এখন দেখিতেছি যে, ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের সে ভাব অপনীত হইতেছে। এখন দেশীয় কাব্য, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতির উপর আমাদের অনুরাগ জন্মিতেছে ও বিদেশীয় অনেক আচার-ব্যবহারকে আমরা তুচ্ছ করিতে শিখিয়াছি। আমাদের দেশীয় কোনো লোক বিদেশীয়ের ছদ্মবেশ পরিয়া আসিলে আমরা তাহাকে ঘৃণা করি। কিছুদিন আগে কেবল ভাঙ্ ভাঙ্ শব্দ পড়িয়া গিয়াছিল, এখন সকলে রাখ্ রাখ্ করিয়া ছুটিয়া আসিতেছেন।

এখন সমাজে তিন দল উত্থিত হইয়াছেন। যাঁহারা আমূল-সংস্কার-প্রিয় তাঁহারা সকলই ভাঙিতে চান। যাঁহারা আমূল-রক্ষণ-প্রিয় তাঁহারা সকলই রাখিতে চান। যাঁহারা রক্ষণ-সংস্কার-প্রিয় তাঁহারা যাহা ভালো তাহাই রাখিতে চান, যাহা মন্দ তাহাই ভাঙিতে চান। এইরূপে উপরি-উক্ত দুইটি শক্তির ঘাত-প্রতিঘাতে এবং শেষোক্ত শক্তির উত্তেজনায় সমাজ ঠিক উন্নতির সরল পথে চলিতেছে।

উন্নতির পথ মধ্যবর্তী, উন্নতির পথ এক-ঝোকা নহে। কেন্দ্রাতিগ এবং কেন্দ্রানুগ শক্তি দুই দিক হইতে কোনো বস্তুর উপর কার্য করিলে তাহা মধ্যপথ আশ্রয় করে, আমূল-রক্ষণ-প্রিয় ও আমূল-সংস্কার-প্রিয় এই দুই শক্তি আমাদের সমাজের উপর কার্য করাতে সমাজ উন্নতির মধ্যবর্তী পথে অগ্রসর হইতেছে, তাহাতে আবার রক্ষণ-সংস্কার-প্রিয় উত্তেজনা করাতে সমাজ দ্বিগুণ সাহায্য প্রাপ্ত হইতেছে। যাঁহারা আমূল-রক্ষণ-প্রিয় তাঁহারা উন্নতিশীল নাম ধারণ করিতে পারেন

না; যাঁহারা আমূল-সংস্কার-প্রিয় তাঁহারাও উন্নতিশীল নহেন, যাঁহারা রক্ষণ-সংস্কার-প্রিয় তাঁহারাই প্রকৃত উন্নতিশীল। কিন্তু ইঁহাদের কাহাকেও সমাজ হইতে বাদ দেওয়া যাইতে পারে না। আমূল-রক্ষণ-প্রিয় মনে করিতেছেন, আমূল-উন্নতি-প্রিয় সমাজকে অবনতির দিকে আকর্ষণ করিতেছেন, আবার আমূল-উন্নতি-প্রিয় মনে করিতেছেন যে, আমূল-রক্ষণ-প্রিয় সমাজকে অবনতির গহ্বর হইতে উদ্ধার করিতে বাধা দিতেছেন, আবার রক্ষণ-সংস্কারশীল মনে করিতেছেন যে, আমূল-রক্ষণ-প্রিয় ও আমূল-সংস্কার-প্রিয় উভয়ে মিলিয়া সমাজের দারুণ অনিষ্ট সাধন করিতেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইঁহারা কেহই সমাজের উন্নতিপথের কণ্টক নহেন। তবে আমূল-সংস্কার ও আমূল-উন্নতি -প্রিয় উভয়ে ভ্রান্ত পথ আশ্রয় করিয়া সমাজের উন্নতির সাহায্য করিতেছেন ও রক্ষণ-সংস্কার-প্রিয় প্রকৃত পথ আশ্রয় করিয়া সমাজের উন্নতি সাধন করিতেছেন। যখন যুবকেরা নূতন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বহির্গত হন, যখন তাঁহাদের উন্নতির ইচ্ছা আছে কিন্তু অভিজ্ঞতা নাই, যখন তাঁহারা উন্নতির কতকগুলি মূল সূত্র শিখিয়াছেন, কিন্তু দেশ-কাল-পাত্রে প্রয়োগ করিতে শিখেন নাই, যখন তাঁহারা মনে করেন যে বলিষ্ঠ ব্যক্তির খাদ্য ও রোগীর পথ্য একই, যখন তাঁহারা মনে করেন যে, ইংলন্ডের বোঝা বাংলার স্কন্ধের উপযোগী, তখন তাঁহারা বঙ্গদেশকে একেবারে ইংলন্ড করিতে চান, ভাগীরথীকে টেম্‌স্‌ করিতে চান, বাঙালিকে ফিরাঙ্গি করিতে চান। কিন্তু যখন তাঁহারা সংসারে প্রবিষ্ট হন, তখন ক্রমশ শান্ত ও শীতল হইয়া আসেন ও রক্ষণশীলতার প্রতি একটু একটু করিয়া ঝুঁকিতে থাকেন। আবার তখনকার নব্য বংশ সমাজের আগাগোড়া ভাঙিবার জন্য গদা উদ্যত করেন। এইরূপে রক্ষণশীল ও সংস্কারশীল চিরকালই সমাজে জাগ্রত থাকে, না থাকিলে সমাজের দারুণ অনিষ্ট হয়। যখন ভারতবর্ষে উন্নতির মধ্যাহ্নকাল, তখন ধীরে ধীরে কতকগুলি নূতন দর্শন ও নূতন দল নির্মিত হইতে লাগিল এবং তাহাদের প্রভাবে বৌদ্ধধর্ম উত্থিত হইয়া সমাজে একটি ঘোরতর বিপ্লব বাধাইয়া দিল। পৌরাণিক ঋষিরা ভুল বুঝিলেন, তাঁহারা মনে করিলেন এরূপ বিপ্লব অনিষ্টজনক। অমনি পুরাণে, সংহিতায় ও অন্যান্য নানাপ্রকারে সমাজের হস্তপদ অষ্টপৃষ্ঠে বন্ধন করিয়া ফেলিলেন এবং ভবিষ্যতে এরূপ বিপ্লব না বাধে তাহার নানা উপায় করিয়া রাখিলেন। সমাজের স্বাস্থ্য নষ্ট হইল এবং সমাজ ক্রমশই অবনতির অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। সংস্কারশীলতার অভাবে ও রক্ষণশীলতার বাড়াবাড়িতেই হিন্দুসমাজ নির্জীব হইয়া পড়িল।

বঙ্গদেশের এই সামাজিক বিপ্লব আমাদের তো শুভ লক্ষণ বলিয়া মনে হয়; যে উপায়েই হউক, এই যে বহুকাল-ব্যাপী নিরুদ্যমের ঘুম ভাঙিয়াছে এবং শিক্ষিত লোকেরা নবউদ্যমে কার্য করিবার ক্ষেত্র অন্বেষণ করিতেছেন ইহা তো মঙ্গলেরই চিহ্ন। যেমন যুদ্ধ-বিপ্লবের অনুষ্ঠানে জাতির শারীরিক বল বর্ধিত হয়, সেইরূপ মানসিক বিপ্লবে মনের বল বাড়িবার কথা। আর অধিক দিন নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিলে সমস্ত বাঙালি জাতি নির্জীব হইয়া পড়িত। এখন যেরূপ ভাঙাগড়া ও চারি দিক হইতে উপাদান সংগ্রহ আরম্ভ হইয়াছে, ইহাতে বোধ হয়, অল্প-দিনের মধ্যে এই বাংলার সমাজ নূতন দৃঢ়তর ভিত্তিতে স্থাপিত হইবে।

ভারতী
মাঘ ১২৮৪

বিজন চিন্তা : কল্পনা

এই মহাকল্লোলময় মহানগরের এক প্রান্তে একখানি পর্ণকুটিরে আমার বাস। আমি সংসারী নহি, কেননা আমার সংসার নাই— আমি বিধবা, আমার আদর করিবার স্বামী নাই, সান্ত্বনা করিবার বন্ধু নাই, স্নেহ কিনিবার বিভব নাই, যত্ন লাভের সামর্থ্য নাই ; ছিন্ন তৃণবৎ আমি সংসার-সাগর-স্রোতে একলাই ভাসিতেছি, একলাই উঠিতেছি, একলাই পড়িতেছি। ভিক্ষা ভিন্ন আমার আর

উপায় নাই। ভিক্ষা করিতে গিয়া আমি নানা প্রকার লোক দেখিতে পাই— তাহাদের নানাবিধ ভাবভঙ্গি আলোচনা করি— বিদ্বান মূর্খদের দলে দাঁড়াইয়া তাহাদের মতামত শুনি, মনে মনে হাসি কখনো বা কাঁদি, আবার বাড়ি আসিয়া সেই-সব কথা লিখি। এইরূপে কোনোপ্রকারে সময় কাটাই। আমি এখন খুব স্বাধীন, অথচ স্বাধীনতায় সুখ পাই না। মনের ভিতর যেন কেমন একটা হু হু করিতে থাকে। প্রাতঃকাল হইতে রাত্রিকাল পর্যন্ত আমি কত লোকই দেখিতেছি কিন্তু আমি কেমন আছি, বা আমি কে, এ কথা জিজ্ঞাসা করিবার একজনকে দেখিতে পাই না— সুতরাং লক্ষ লক্ষ মানবের মধ্যে থাকিয়াও আমার পর্ণকুটিরের বিজনতা কখনোই ভঙ্গ হয় না। আমি আপনি হাসি, আপনি কাঁদি, আপনি ভাবি। মনে করিয়াছিলাম যে সংসারের শৃঙ্খল ছেদ করিয়া এই বিজন কুটিরে মনের সুখে বাস করিব। মনে করিয়াছিলাম যে, যখন কাহারো সঙ্গে আর সম্পর্ক নাই তখন কিসের উদ্‌বেগ, যখন আমি আর মোহের অধীন নহি তখন আর কিসের যাতনা, যখন মায়ায় আবদ্ধ নহি তখন কিসের ভাবনা, কিন্তু অপরিমিত স্বাধীনতাতেই কি সুখ?— অপরিমিত স্বাধীনতাতে রাজ্য উচ্ছিন্ন হয়, সমাজ উচ্ছৃঙ্খল হয়, ব্রহ্মাণ্ড বিপ্লবহু হয়। লোকে যেমন ভাষা কথায় বলিয়া থাকে— 'বড়ো হবে তো ছোটো হও' তেমনি স্বাধীনতা সম্বন্ধে এ কথাও বলা যাইতে পারে যে, স্বাধীন হবে তো পরাধীন হও। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডপক্ষে যে কথা স্থির সিদ্ধান্তপ্রায়, সমস্ত সমাজ, সমস্ত রাজ্যপক্ষে যে কথা স্থির সিদ্ধান্তপ্রায়, প্রত্যেক মনুষ্যের পক্ষে কেনই বা তাহা অপ্রতিষ্ঠ হইবে? সমস্ত বাহ্য প্রকৃতির নিয়ম পরাধীনতা; সমস্ত বাহ্য অন্তঃপ্রকৃতির নিয়মও পরাধীনতা; সমস্ত বাহ্য প্রকৃতি এক আকর্ষণের অধীন হইয়া চলিতেছে, সমস্ত অন্তঃপ্রকৃতিও এক আকর্ষণের অধীন হইয়া চলিতেছে। যে লোকে বলিয়াছেন—

'আমার হৃদয় আমারি হৃদয়
বেচি নি তো তাহা কাহারো কাছে।'

তিনি মিথ্যা কথা কহিয়াছেন। এরূপ গর্বিত আস্ফালন কোনো হৃদয়সম্পন্ন মানুষের কণ্ঠ হইতে নিঃসৃত হইতে পারে না। আমার হৃদয় আছে যখনই ভাবিতে পারিলাম তখন ইহাও নিশ্চয় যে সে হৃদয় পরাধীন— হয় কোনো ব্যক্তিবিশেষের নয় কোনো বস্তুবিশেষের। কিন্তু এই প্রকার পরাধীনতা কি বিষাদের? এই পরাধীনতার শৃঙ্খল কি মানুষ মাকড়শার মতো আপনা হইতেই উদ্‌গত করিয়া আপনিই তাহাতে বিজড়িত হইতে চাহে না? এই পরাধীনতার বীজ মানবহৃদয়ে নিহিত থাকিলেও মানুষে আপনি কি প্রাণ পর্যন্ত পণ করিয়া তাহা অঙ্কুরিত করিতে— তাহা বৃক্ষে পরিণত করিতে চাহে না? পরিণামে সেই বৃক্ষে বিষময় ফলই উৎপন্ন হোক আর সুধাময় ফলই উৎপন্ন হোক, সে বৃক্ষকে ফলিত করিতে কি মানুষে কোনো প্রকার ত্যাগ স্বীকার করিতে শিথিলপ্রযত্ন হয়? মানবহৃদয়ের ইতিবৃত্ত পড়িলে কখনোই তাহা বোধ হইবে না। কিন্তু কিসের মোহে মুগ্ধ হইয়া মানুষে এইরূপ স্ব-নির্মিত তরঙ্গে তরঙ্গিত হইতে থাকে? সে কেবল কল্পনার মোহে। মহাকবি শেক্‌স্‌পিয়র বলিয়াছেন বটে যে, কবি প্রণয়ী আর উন্মাদগ্রস্ত ইহারাই কল্পনাপ্রধান, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে বাহ্যপ্রকৃতি যেমন এক মাধ্যাকর্ষণ শক্তিতে পরিচালিত হইতেছে, মানবহৃদয়ও সেইপ্রকার কেবল কল্পনা-প্রভাবেই পরিচালিত হইতেছে। ম্যাডেগ্যাস্কর দ্বীপের অসভ্য জাতিরা যখন তাহাদের বিকট-দর্শন প্রস্তরময় দেবমূর্তির সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া কাতর হৃদয়ে বর প্রার্থনা করে, হিন্দুরা যখন বিজয়া-দশমীর দিন প্রতিমা বিসর্জন করিয়া ভগ্নহৃদয় হয়, খৃস্টানেরা যখন কুমারীপুত্র যিশুখৃস্টকে আপনাদের পাপের ভার বহন করিতে প্রার্থনা করে, তখন কি কল্পনার মোহন প্রভাব প্রতীত হয় না? ধনোপার্জন, বিদ্যাশিক্ষা, পুত্রপালন, এ সকলেরই গভীরতম মূল প্রদেশে কল্পনা-শক্তিই প্রচ্ছন্ন ভাবে বিরাজিত থাকে। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, এ-সকল কার্যে আশাই আমাদিগকে প্রবর্তিত করে, কিন্তু যদি আশানুরূপ দূরবীক্ষণ যন্ত্রের কাচ কল্পনার দ্বারা সুমার্জিত ও সুরঞ্জিত না হইত, তাহা হইলে আশার উত্তেজনায় কেহই উত্তেজিত হইত না।

কল্পনার মহান প্রভাব এখানেই ক্ষান্ত নহে, শুদ্ধ যে আমরা ইহার প্রভাবে সুন্দর সামগ্রীকে

সুন্দরতর দেখি এমন নহে, সুদ্ধ যে আমরা ইহার প্রভাবে সকল-প্রকার বিঘ্ন ব্যবধান অতিক্রম করিয়া মরুভূমিতে থাকিয়াও নন্দনকাননের শোভা সন্দর্শন করি এমন নহে, কিন্তু ইহার প্রভাবে আমরা সকল-প্রকার সুন্দর পদার্থ হইতে তাহাদের সুন্দরতম অংশগুলি গ্রহণ করিয়া অশেষবিধ তিলোত্তমা বা প্যান্ডোরা সৃজন করিতে পারি।

সত্য বটে যে কল্পনা যেমন সুখের কারণ, আবার কল্পনা তেমনি দুঃখের কারণ, সত্য বটে যে, কল্পনা-প্রভাবে আমরা বৈজয়ন্তধামকেও শ্মশানের চিতা আকারে রূপান্তরিত করিতে পারি, সত্য বটে যে কল্পনা প্রভাবে আমরা মিলটন-বর্ণিত দেবতুল্য মানবমুখেও বায়রন-বর্ণিত পিশাচের প্রতিকৃতি উপলব্ধি করিতে পারি এবং মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর দেবী-অংশভূতা নারীজাতিকেও হ্যামলেটের মতো অসতীত্বরূপ দুর্বলতার নামান্তর মনে করিতে পারি, কিন্তু তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে কল্পনার দোষ নহে, তাহা আমাদেরই দোষ। কল্পনাকে সংযত করা, শিক্ষিত করা ও বিবেকবুদ্ধির অধীন করা আমাদের উপরেই নির্ভর করিতেছে। কল্পনাই আমাদের কার্যের প্রবর্তক, ভাবনার প্রকৃত উত্তেজক, আশার চিত্রকর, সুখের আত্মা।

কল্পনার তারতম্যে আমাদের সুখেরও তারতম্য ঘটিয়া থাকে। এই যে সমস্ত বিশ্বকাণ্ড আমাদের সম্মুখে প্রসারিত রহিয়াছে, এই যে অনন্ত শোভার ভাণ্ডার আমাদের সম্মুখে মুক্তদ্বার রহিয়াছে— ইহার কি কোনো রসই আমরা অনুভব করিতে পারিতাম, কোনো ভাবই কি গ্রহণ করিতে পারিতাম, কোনো শোভাই কি উপভোগ করিতে পারিতাম যদি কল্পনার দ্বারা আমাদের দিব্য চক্ষু না পরিস্ফুটিত হইত? পৃথিবী তো মৃত্তিকাময়, সমুদ্র তো সলিলময়, সূর্য তো অগ্নিময় মাত্র— তবে কেন পৃথিবীর শোভা সন্দর্শনে হৃদয় দ্রবীভূত হয়, সাগরের উচ্ছ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ও উচ্ছ্বসিত হইতে থাকে এবং সূর্যের অভ্যুদয়ে হৃদয়ও এক নূতন জীবনে সঞ্জীবিত হইয়া উঠে।

কল্পনা বিরহিত হইলে কে আর শেক্‌স্‌পিয়রের মতন বৃক্ষ-পল্লবের অস্ফুট ভাষা বুঝিতে পারিত, প্রবহমান নদীবক্ষে গ্রন্থ পাঠ করিতে পারিত, প্রস্তর-খণ্ডে উপদেশ গ্রহণ করিতে পারিত ও সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডময় মঙ্গলভাব উপলব্ধি করিতে পারিত? কল্পনায় সকল দ্রব্যকেই হৃদয়ের উপভোগের মতো করিয়া লওয়া যায়—

The meanest floweret of the vale,
The simplest note that swells the gale,
The common sun, the air, the skies,
To him are sweetest Paradise.

ভারতী
ফাল্গুন ১২৮৪

কবিতা-পুস্তক

শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

সকল পুস্তকের উদ্দেশ্যই হয় জ্ঞান না-হয় আমোদ না-হয় উভয়ের সম্মিশ্র। এখানে আমোদ শব্দটি আমরা অতি প্রশস্তভাবে ব্যবহার করিতেছি। ডিকুইন্সি বলেন যে উচ্চ অঙ্গের কাব্য বা নাটক পড়িয়া আমরা আমোদ পাই— এ কথা বলিতে গেলে সে-সকল কাব্য বা নাটকের অবমাননা করা হয়; তিনি বলেন আমাদের হৃদয়ের নিভৃত বিজনে অনেক মহান্ ভাব এমন সুষুপ্ত ভাবে অবস্থান করে যে প্রাত্যহিক জীবনের কোনো ঘটনাই তাহাদিগকে জাগাইয়া দিতে পারে না— কিন্তু প্রকৃত কবিদের কাব্য পাঠ করিতে করিতে সেই-সকল ভাব জাগরিত হইয়া উঠে এবং আমরা এই দীন হীন ক্ষুদ্র জীব হইতে যে প্রকৃত পক্ষে কত দূর উচ্চপদবীগত তাহার প্রতি তখন আমাদের চেতন হয়। এ স্থলে সেই-সকল কাব্যগুলিকে আমোদ বা জ্ঞানপ্রদ বলা

অপেক্ষা শক্তিপ্রদ বলা উচিত। কিন্তু ডিকুইন্সির উত্তরে আমরা বলি যে ওই শক্তিপ্রদ গুণটি উচ্চ-অঙ্গের জ্ঞান ও আমোদের সমষ্টি বলিলে কোনো দোষ হয় না। এ বিষয়ে তর্ক না তুলিয়া আমরা এই সিদ্ধান্ত করিয়াই ক্ষান্ত হইলাম যে সকল পুস্তকের উদ্দেশ্যই প্রশস্ত ভাবে জ্ঞান কিংবা আমোদ কিংবা উভয়ের সমষ্টি। এই সিদ্ধান্তটি মনে রাখিলে অনেক পুস্তকের সমালোচনা সহজ হইয়া পড়ে।— এই সিদ্ধান্তটির উপর দৃষ্টি রাখিয়াই আমরা বলিতে বাধ্য হইলাম যে বঙ্কিমবাবুর কবিতা-পুস্তক আমাদিগের ভালো লাগিল না— জ্ঞানের কথা এ স্থলে উল্লেখ করাই বাহুল্য মাত্র, কিন্তু আমোদ— সাধারণ, সামান্য, অকিঞ্চিৎকর আমোদ পর্যন্ত এ পুস্তকের কোনো স্থল পাঠ করিয়া আমরা পাইলাম না— বঙ্কিমবাবুর কোনো গ্রন্থই যে এরূপ নীরস, নির্জীব, স্বাদগন্ধহীন— কিছুই না— হইবে, তাহা আমরা কখনো স্বপ্নেও ভাবি নাই।

প্রথম কবিতা পৃথ্বীরাজ-মহিষী সংযুক্তার বিষয়। বিষয়টি অতিশয় উচ্চ ও মহৎ। পৃথ্বীরাজ দুঃস্বপ্ন দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন— সেই দুঃস্বপ্ন যবন-কর্তৃক ভারত-বিজয়ের আভাস মাত্র, ক্রমে সেই স্বপ্ন প্রকৃত ঘটনায় পরিণত হইল— ঘোরির মহম্মদ আসিয়া স্থানেশ্বরে হিন্দুরাজকে পরাভব করিলেন, সংযুক্তা নিরুপায় হইয়া চিতারোহণ করিলেন।— এই বিষয়টির উপর যদি একজন প্রকৃত কবির কল্পনা খেলিতে পাইত, তাহা হইলে ইহাকে সূর্যকিরণসংযুক্ত স্ফটিকের ন্যায় নানা বর্ণে সুরঞ্জিত করিতে পারিত, কিন্তু বঙ্কিমবাবু যেন পরীক্ষা স্থলে 'সংযুক্তা কে ছিল'— 'স্থানেশ্বরের যুদ্ধে কী হইল' এবং 'সংযুক্তা কী রূপে মরিল'— এই তিনটি প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন। সমস্ত কবিতাটিতে এমন একটি ভাব নাই, এমন একটি কথা নাই, যাহাতে হৃদয় নাচিয়া উঠে, যাহাতে ধমনী দিয়া রক্ত প্রবলতর বেগে প্রবাহিত হয়— যাহাতে আর্য-গৌরবের কণামাত্রও কল্পনার চক্ষে বিভাসিত হয়।— অনর্থক শব্দ আড়ম্বরে কবিতাটির কায়া বৃদ্ধি হইয়াছে— অসংগত-মেদ-স্ফীত রোগীর ন্যায় ইহার লাবণ্য-শ্রী নাই— জীবনের আভাস মাত্রও আছে কি না সন্দেহ। পৃথ্বীরাজ দুঃস্বপ্ন দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন— মহিষীকে স্বপ্নের কথা ও আশঙ্কিত উৎপাতের কথা বলিয়া দুঃখে ও ভয়ে নিবেদন করিলেন

'বার বার বুঝি এই বার শেষ!
পৃথ্বীরাজ নাম বুঝি না রয়!'

তখন

'শুনি পতিবাণী, যুড়ি দুই পাণি
জয় জয় জয়! বলে রাজরানী
জয় জয় জয় পৃথ্বীরাজে জয়
জয় জয় জয়! বলিল বামা।
কার সাধ্য তোমা করে পরাভব
ইন্দ্র চন্দ্র যম বরুণ বাসব!
কোথাকার ছার তুরস্ক পহ্লব
জয় পৃথ্বীরাজ প্রথিতনামা॥

. . .

এত বলি বামা দিল করতালি
দিল করতালি গৌরবে উছলি।' ইত্যাদি।

আর্য-মহিষীর সহস্রবার সঘনে 'জয় জয়' করাতে আমাদের শৈশবকালের একটি কথা মনে পড়ে— ভূতের স্বপ্ন দেখিয়া সহসা জাগিয়া পড়িয়া যখন ভয়সূচক ক্রন্দন করিয়া উঠিতাম, তখন ওইরূপ সঘনে বারংবার 'রাম রাম' উচ্চারণ করিয়া ভীত ধাত্রী প্রেতযোনিকে খেদাইতে চেষ্টা করিতেন। পৃথ্বীরাজের মতো বীরপুরুষের পক্ষে দুঃস্বপ্ন দেখিয়া ভীত হওয়া এবং তাঁহার রানী সংযুক্তার পক্ষে সহস্র 'জয় জয়' ধ্বনি করিয়া আশ্বাস প্রদান করা যে কতদূর কল্পনার ব্যভিচার

তাহা আর কী বলিব। সিজরের মৃত্যুর পূর্বআভাসস্বরূপ তাঁহার মহিষী যখন নানা প্রকার দুঃস্বপ্ন, নানা অমঙ্গল-লক্ষণ দেখিয়া সিজরকে রোমের সাধারণ সভাস্থলে যাইতে নিষেধ করিতে লাগিলেন তখন সিজর এই বলিয়া উত্তর দিলেন— 'ভীরুরাই প্রকৃত মৃত্যুর পূর্বে শত সহস্রবার মরিয়া থাকে— কিন্তু বীরপুরুষ একবার ব্যতীত আর মৃত্যু আস্বাদন করে না।' সে যা হউক, সংযুক্তা হিন্দুমহিলা হইয়া কেমন করিয়া 'ইন্দ্র' ও 'বাসব' ভিন্ন ভিন্ন দেবতা বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন? কিন্তু সংযুক্তার এই শিক্ষার দোষ মার্জনীয় হইলেও তাঁর এরূপ স্থলে ঘন ঘন করতালি দেওয়া মার্জনীয় হইতে পারে না— তাঁহার ঘোর করতালি 'দেখিয়া হাসিল ভারতপতি'— তিনি তো স্বচক্ষে রানীর ওরূপ উন্মাদ অবস্থা দেখিয়া হাসিবেনই— আমরা কল্পনার চক্ষে দেখিয়াই হাসি সংবরণ করিতে পারিতেছি না— ওরূপ করতালির উপর করতালি অল্পবয়স্ক বালক-বালিকারই সাজে— রাজরানীর তো কথাই নাই— কোনো ভদ্র কুলনারী সহসা ওরূপ করিলে তাঁহাকে লোকে উন্মাদ মনে করিবে না তো আর কী করিবে।

দ্বিতীয় কবিতাটি 'আকাঙ্ক্ষা'— অর্থাৎ রাধিকা-সুন্দরী শ্রীকৃষ্ণকে কী কী হইতে অভিলাষ করিতেছেন এবং শ্যামসুন্দর তাহার কী কী উত্তর দিতেছেন তাহার একটা তালিকা। আমাদের মতে উত্তর-প্রত্যুত্তর-কবিতাতে প্রায়ই বড়ো একটা প্রকৃত কবিতা থাকিতে পারে না; কারণ উত্তরগুলি প্রায়ই হৃদয় অপেক্ষা বুদ্ধি-সাপেক্ষ— এরূপ স্থলে কেমন করিয়া খুব জবাব দিব ইহাই কবির উদ্দেশ্য হয়। প্রাচীন হরু ঠাকুর বা রাম বসু প্রভৃতি প্রকৃত কবিরা প্রশ্ন কবিতায় যতখানি কবিত্ব দেখাইয়াছেন, উত্তর কবিতায় তাহার শতাংশের একাংশও দেখাইতে পারেন নাই। স্বীকার করি যে তাহাদের উত্তরে কতকটা কারিগুরি, বাক্যবিন্যাসের কারিগুরি, দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা ব্যতীত প্রকৃত কবিতার আভাস মাত্রও কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। বঙ্কিমবাবুর 'সুন্দর সুন্দরী' দেখিয়া শুকশারীর পুরাতন কবিতাটি আমাদের মনে পড়িল—

শুক বলে আমার কৃষ্ণ কদমতলায় থানা,
শারী বলে আমার রাধা করে আনাগনা,
নইলে কিসের থানা,
শুক বলে আমার কৃষ্ণ গিরি ধ'রে ছিল,
শারী বলে আমার রাধা শক্তি সঞ্চারিল,
নইলে পারবে কেন?

কিন্তু 'শুক শারীর' কবিতার সহিত 'সুন্দর সুন্দরী'র কবিতার এই প্রভেদ যে— প্রথমটি উত্তর-কাটাকাটির দৃষ্টান্ত, দ্বিতীয়টি মনস্তুষ্টিকর উত্তর-প্রত্যুত্তরের দৃষ্টান্ত। সুন্দরী শ্রীকৃষ্ণকে নানা বস্তু হইতে অভিলাষ করিতেছেন, সুন্দরও তাহাই হইতে উত্তরে অভিলাষ করিতেছেন— কিন্তু সুন্দরী, রমণী-প্রকৃতি-সুলভ লজ্জায় সকল কথা খুলিয়া বলিতে পারিতেছেন না, সুন্দর সুরসিক পুরুষের মতো কেবল সুন্দরীর অভিলাষের উপর মাত্রা চড়াইতেছেন।

সুন্দরী বলিলেন :

কেন না হইলে তুমি চাঁদের কিরণ,
ওহে হৃষীকেশ!
বাতায়নে বিষাদিনী,   বসিত যবে গোপিনী,
বাতায়ন পথে তুমি লভিতে প্রবেশ॥
আমার প্রাণেশ!

সুন্দর উত্তর করিলেন :

কেন না হইনু আমি চন্দ্রকরলেখা,
রাধার বরন,
রাধার শরীরে থেকে,   রাধারে ঢাকিয়ে রেখে,

ভুলাতাম রাধারূপে অন্যজনমন—
পর ভুলান কেমন?

সুন্দরী বলিলেন :

কেন না হইলি তুই, কাননকুসুম,
রাধাপ্রেমাধার—
না ছুঁতেম অন্য ফুলে, বাঁধিতাম তোরে চুলে,
চিকণ গাঁথিয়া মালা, পরিতাম হার॥
মোর প্রাণাধার!

সুন্দর উত্তর করিলেন :

কেন না হইনু হায়! কুসুমের দাম,
কণ্ঠের ভূষণ।
এক নিশা স্বর্গ সুখে, বঞ্চিয়া রাধার বুকে,
ত্যজিতাম নিশি গেলে জীবন যাতন—
মেখে শ্রীঅঙ্গচন্দন॥

দুঃখের বিষয় আমরা 'তথাস্তু' বলিতে পারিলাম না।

তৃতীয়, অধঃপতন সংগীতটিতে বঙ্কিম-ভাবের(?) রসিকতার চূড়ান্ত হইয়াছে। কিন্তু বিষয়ের দোষে রস মারা পড়িয়াছে— হাসিতে হাসিতে অধঃপতনে যাইতেছি কখনো যেন আর কাঁদিতে হইবে না— এ ভাব কী ভয়ানক ভাব। মানুষ মরিতেছে তাহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া হাস্য-পরিহাস আমোদ-প্রমোদ— আমোদ-প্রমোদ করিবার আর কি স্থান নাই! কবিতাটিতে উত্তম রসিকতা প্রকাশ হইয়াছে; কিন্তু বিষয় নাকি অধঃপতন— নাম শুনিলেই গা কাঁপে— এ স্থানে রসিকতার হাস্যবদন দেখিয়া, অমাবস্যা রজনীতে শ্মশানমধ্যে একজন সুন্দরী রমণীকে খিল্‌খিল্‌ করিয়া হাসিতে দেখিয়া— কাহারো যে হাসি পাইবে, সহৃদয় মানব প্রকৃতিতে তো এরূপ লেখে না; তবে যদি গ্রন্থকার দানব-প্রকৃতিকে লক্ষ্য করিয়া কবিতাটি রচিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহা বিকট হাস্য হাসাইবার মতো— ঘোরতর একটি অধঃপতনের পাথেয় সম্বল হইয়াছে— ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

চতুর্থ— 'সাবিত্রী'— এই কবিতাটির স্থানে স্থানে দু-একটি সুন্দর বর্ণনা আছে— যখন যমরাজ শোকাতুরা সাবিত্রীর সম্মুখীন হইতেছে কবি লিখিতেছেন :

'হেরে আচম্বিতে এ ঘোর সংকটে,
ভয়ংকর ছায়া আকাশের পটে,
ছিল যত তারা তাহার নিকটে
ক্রমে ম্লান হয়ে গেল নিবিয়া।*
সে ছায়া পশিল কাননে— অমনি,
পলায় শ্বাপদ, উঠে পদধ্বনি,
বৃক্ষ শাখা কত ভাঙিল আপনি,
সতী ধরে শবে বুকে আঁটিয়া॥

কিন্তু গ্রন্থকার যে সত্যবানকে জীবন দান না করিয়া সাবিত্রীকে পর্যন্ত মারিয়া ফেলিলেন কেন— তাহা তো আমরা বুঝিতে পারি না। কোথায় সতীত্বের অমোঘ প্রভাবে যমহস্ত হইতেও

---

* ছায়ার নিকট তারা ম্লান হইয়া নিভিয়া গেল— ইহা কীরূপ সংগত বুঝিতে পারি না। ছায়া কি দিবাকরতুল্য?

পতিব্রতা সতী মৃত স্বামীকে ফিরিয়া লইবেন— না সাবিত্রীও এ দেশীয় শত সহস্র স্ত্রীর মতো যমের নিকটে সহমরণের বর প্রার্থনা করিয়া পতির সঙ্গেই সহমরণে অন্তর্ধান হইলেন। যদি কোনো পুরাণে এরূপ কথা থাকিত তা হইলেও বুঝিতাম যে গ্রন্থকার কী করিবেন— কিন্তু তাহা নয়, বঙ্কিমবাবু স্বেচ্ছামতো পুরাণের উৎকর্ষ সাধন করিতে গিয়া দেশীয় একটি অতি সুন্দর কাহিনীর সুন্দরতম অংশটুকু একেবারে মৃত্তিকাসাৎ করিয়াছেন। আমরা স্বীকার করি যে স্বামীর সহিত ইচ্ছাপূর্বক সহমরণে যাওয়া বিশেষ অনুরাগের লক্ষণ। কিন্তু তাহা মহান সতীত্বের পরাকাষ্ঠা নহে;— অসতীর অগ্রগণ্যা ক্লিয়োপেট্রাও আন্টনির মৃত্যুর পর ইচ্ছাপূর্বক জীবন বিসর্জন করিয়াছিলেন— তিনিও মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে ইরাস্ নামক সহচরীকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন 'ত্বরায়— ত্বরায়— রে শান্ত ইরাস্— আর বিলম্ব করিস না— আমি যেন শুনিতে পাইতেছি আমাকে আন্টনি ডাকিতেছেন, আমি যেন দেখিতে পাইতেছি তিনি আমার এই আত্ম-বিসর্জনরূপ মহৎ কার্য দেখিবার জন্য জাগিয়া উঠিতেছেন।' স্বীকার করি যে এ কথাগুলি শেক্‌সপিয়রের, কিন্তু শেক্‌সপিয়র ইতিহাসের মূলোচ্ছেদ করিয়া কপোলকল্পিত কতকগুলি প্রলাপ বাক্য কহেন নাই— তিনি ইতিহাসকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াও কল্পনা-প্রাচুর্য খুবই দেখাইয়াছেন— বঙ্কিমবাবু বিপরীত প্রথা অবলম্বন করিয়া বিপরীত ফল উৎপাদন করিয়াছেন। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে আন্টনি ক্লিয়োপেট্রার স্বামী ছিল না— কিন্তু তাহাতে কী এলো গেল— তাহাতে আরও সপ্রমাণ হইতেছে যে সতী স্ত্রী না হইলেও অনুরাগের ঝোঁকে এক জন অসতীও সহমরণে যাইতে পারে; মনে করো— ক্লিয়োপেট্রার শেষ দশায় যখন আন্টনির সহিত প্রণয় হইল— তখন আন্টনির যদি বিবাহই হইত, তাহা হইলেই কি ক্লিয়োপেট্রার পূর্বের বেশ্যাবৃত্তি ভুলিয়া তাঁহার ইচ্ছামৃত্যু দেখিয়াই তাঁহাকে সতী ও পতিব্রতা কহিতাম?— সহমরণে যাওয়াই কি সাবিত্রীর অলৌকিক পাতিব্রত্যের পরাকাষ্ঠা মনে করিতে হইবে?— পুরাণে তাহা বলে না; পুরাণে এই কথাই বলে যে সাবিত্রী আপনার সতীত্ব-প্রভাবে উত্তেজিত হইয়া এই সংকল্প করিলেন যে সতীত্বের অলৌকিক মাহাত্ম্যে যমের হস্ত হইতে পর্যন্ত আমার মৃত স্বামীকে ফিরাইয়া আনিব। সেই সংকল্প অনুসারে তিনি একাকিনী চতুর্দশীর ভীষণ নিশীথ-যোগে বিকট অরণ্যে মৃত পতিকে ক্রোড়ে লইয়া যমরাজের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন— যমরাজ সাবিত্রীকে দেখিয়া প্রীত হইলেন— প্রীত হইয়া অবশেষে সত্যবানকে সতী স্ত্রীর আলিঙ্গনে প্রত্যর্পণ করিলেন।— পুরাণের এ কথা কেহ বিশ্বাস করিবেন না বটে, কিন্তু ইহার ভিতর একটি ভাব আছে— এবং সেই ভাবের প্রভাবে সাবিত্রীর গল্পটি ভারতবাসিনীদের হৃদয়ের শিরা এবং উপশিরায় ঘোর ঘনিষ্ঠ ভাবে বিজড়িত আছে। দুই-তিন সহস্র সতী স্ত্রী মৃত পতির সহিত সহমরণে গিয়াছে— কিন্তু কেহই তাহাদের সহমরণকে সতীত্বের যারপরনাই মাহাত্ম্য লক্ষণ মনে করে না। পুরাণের সহিত বাল্যক্রীড়া করা আমাদের মতে যুক্তি-সংগত নহে।

পঞ্চম— 'আদর'— এ কবিতাটি মন্দ নহে— ইহার প্রথম কথাগুলিই অতি সুন্দর হইয়াছে—

'মরুভূমিমাঝে যেন, একই কুসুম,
পূর্ণিত সুবাসে।
বরষার রাত্রে যেন, একই নক্ষত্র,
আঁধার আকাশে॥
নিদাঘ সন্তাপে যেন একই সরসী,
বিশাল প্রান্তরে।
রতন শোভিত যেন, একই তরণী,
অনন্ত সাগরে।
তেমনি আমার তুমি, প্রিয়ে, সংসার-ভিতরে॥

কিন্তু গ্রন্থকার কিছু বাড়াবাড়ি করিতে গিয়া হাস্যাস্পদ হইয়া পড়িয়াছেন— তিনি আরও বলিতেছেন—

সুশীতল ছায়া তুমি, নিদাঘ সন্তাপে,
রম্য বৃক্ষতলে।
শীতের আগুন তুমি, তুমি মোর ছত্র,
বরষার জলে॥

এই কথাগুলি পড়িয়া বাউলদের একটি পুরানো গান আমাদের মনে পড়িল—

'গৌর আমার নাকের নথ, কণ্ঠের কণ্ঠমালা
গৌর আমার কানের দুল, হাতের বাজু বালা
গো-উ-র হ-রি।

ষষ্ঠ— 'বায়ু'— এই কবিতাটি একটি প্রহেলিকা স্বরূপ। ইহার শীর্ষে 'বায়ু' শব্দটি না থাকিলে ইহা একটি সুন্দর হেঁয়ালি হইতে পারিত। বায়ু বলিতেছে—

'আমিই রাগিণী, আমি ছয় রাগ,
কামিনীর মুখে আমিই সোহাগ,
বালকের বাণী অমৃতের ভাগ,
মম রূপান্তর॥'

'কামিনী সোহাগ' বা 'বালকের বাণী' যে বায়ুরই রূপান্তর তাহা একজন কবি অপেক্ষা একজন বৈজ্ঞানিক বুঝাইয়া দিলে ভালো হইত। এইজন্যই কবি ক্যাম্প্‌বেল বলিয়াছেন যে 'কঠোর বিজ্ঞানশাস্ত্র আসিয়া প্রকৃতির মুখ হইতে মোহিনী অবগুণ্ঠন তুলিয়া লয় এবং সকল বস্তুকেই পাঞ্চভৌতিক নিয়মের অধীন করিতে চাহে।'

—আমরা বিজ্ঞানের অবমাননা করিতে চাহি না— কিন্তু কবির কল্পনা হইতে বিজ্ঞানের তন্ন তন্ন দৃষ্টির স্বাতন্ত্র্য রাখা উচিত। কিন্তু বায়ুর আরও বক্তব্য আছে— সে বলিতেছে—

আমি বাক্য, ভাষা আমি,
সাহিত্য বিজ্ঞান স্বামী,
মহীর ভিতর॥'

এত কথা— আরও বিস্তর-বিস্তর কথা পর্যায়ক্রমে না বলিয়া বায়ু তো এক কথা বলিতে পারিত— 'আমি সংসারের জীবন— সংসারে যাহা-কিছু আছে আমি না থাকিলে কিছুই থাকিত না।' বায়ু অতিশয় বাচাল, তাই আরও বলিতেছে—

'উড়াই খগে গগনে—'

গ্রন্থকার মনে করিলেন যে বায়ুর এ কথা সহজে কেহ বিশ্বাস করিবে না, অথবা বুঝিতে পারিবে না— তিনি সেইজন্য পাঠকদের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া নীচে টীকার ছলে বলিয়াছেন— 'Vide Reign of Law, by Duke of Argyll, —chap VII. Flight of Birds.' কিন্তু গ্রন্থকার এ স্থলে টীকা না করিয়া বায়ু কেমন করিয়া 'সাহিত্য বিজ্ঞান স্বামী' হইল তাহা বুঝাইয়া দিলে আমরা প্রকৃতপক্ষে উপকৃত হইতাম।

সপ্তম— 'আকবর সাহেব খোষ রোজ' এ কবিতাটি কতক সুশ্রাব্য হইয়াছে— কিন্তু ইহাতে আবার কল্পনার যতদূর ব্যভিচার হইয়াছে এমন আর কুত্রাপি হয় নাই। একটি ক্ষত্র-কুলনারী আকবর শার খোষ রোজ দেখিতে আসিয়াছিলেন। তিনি 'খোষরোজের' অশ্লীল ব্যাপার দেখিয়া ঘৃণায় ও ক্রোধে সে স্থল হইতে পলাইতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু পথ না দেখিতে পাওয়ায় যখন তিনি কাতর স্বরে রোদন করিতেছেন তখন আকবর শা সেইখানে আসিয়া পড়িল এবং রমণীর রূপলাবণ্যে বিমোহিত হইয়া রমণীর ধর্মনাশ কামনায় সবলে তাঁহাকে ধরিয়া টানিতে লাগিলেন— তখন রমণী নিরুপায় হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

'শুকাল বামার বদন-নলিনী
ডাকে ত্রাহি ত্রাহি ত্রাহি মে দুর্গে।
ত্রাহি ত্রাহি ত্রাহি! বাঁচাও জননি!
ত্রাহি ত্রাহি ত্রাহি ত্রাহি মে দুর্গে॥'

এত 'ত্রাহি'র আদ্য শ্রাদ্ধ হইলেও পাষণ্ড যখন কিছুই শুনিল না, তখন রূপসী ছুরিকা বাহির করিয়া আকবর শাকে বধ করিতে কৃতসংকল্প হইল। সম্রাট আশ্চর্য হইয়া এবং প্রীত হইয়া নিরস্ত হইলেন। তখন আর্যকুলনারী অসি নামাইলেন—

হাসিয়া রূপসী নামাইল অসি,
বলে মহারাজ এ বড় রস।
রমণীর রণে হারি মান তুমি
পৃথিবীপতির বাড়িল যশ॥
দুলায়ে কুণ্ডল, অধরে অঞ্চল,
হাসে খল খল, ঈষৎ হেলে।
বলে মহাবীর, এই বলে তুমি
রমণীরে বল করিতে এলে?

সহৃদয় পাঠকমাত্রকেই জিজ্ঞাসা করিতেছি যে এই কল্পিত ছবিখানি কতদূর বীভৎসকর! ইহা কি একটি রোষান্বিতা অগ্নিশিখাবৎ ক্ষত্রকুলনারীর প্রতিমা, না লীলাময়ী যবন-বেগমের বিভ্রমবিলাসের মূর্তি?— থাক্— আর আমরা পারি না— 'মন এবং সুখ' ইত্যাদি নানা বিষয়ক কতকগুলি যে কবিতা আছে তাহা সকলই এক ছাঁচে ঢালা, সুতরাং সেগুলির সমালোচনা করা বাহুল্য— 'ললিতা' ও 'মানস' নামক কবিতা দুটি গ্রন্থকার পঞ্চদশ বয়সের সময় লিখিয়াছিলেন— সুতরাং শৈশবরচনা প্রায় সকলই যেমন হইয়া থাকে, এ দুটিও সেইরূপ।

সমস্ত কবিতাপুস্তকের মধ্যে তিনটি গদ্য-পদ্যই আমাদের ভালো লাগিয়াছে। উপসংহার কালে আমরা একটিমাত্র কথা বলিব— বঙ্কিমবাবু উপন্যাস লিখিয়া যতদূর প্রতিষ্ঠাবান হইয়াছেন, এই নিকৃষ্ট কবিতাখানির প্রভাবে তাঁহার সে যশ কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হইবে না। আমরা বিলক্ষণ জানি যে ভালো একজন উপন্যাস-লেখক ভালো কবি হইতে পারেন না। সর্ ওয়াল্টর স্কটের কবিতাগুলি পর্যন্ত প্রধান প্রধান সমালোচকদের মতে ছন্দগ্রথিত উপন্যাস মাত্র। কিন্তু তাহা না হইলেও সকল ব্যক্তিতে সর্ ওয়াল্টর স্কটের প্রতিভা সম্ভাবিত নহে। কবি এবং উপন্যাস-লেখক ভিন্ন উপাদানে নির্মিত— তাঁহাদের অন্তর্দৃষ্টি ও বহির্দৃষ্টি ভিন্নভাবে নিক্ষিপ্ত হয়, একজন কেবল ঘটনাগুলি এমন করিয়া সাজাইতে চাহেন যে তাহাতে উদ্দেশ্য-সাধন হইতে পারে— অপর জন ঘটনার প্রতি ঈষৎ মাত্র দৃষ্টি রাখিয়া কেবল ভাবের বিকাশের দিকেই লক্ষ্য স্থির রাখেন।— স্কটের 'লেডি অফ্ দি লেকে'র সহিত বাইরনের 'জাওয়ারে'র তুলনা করিয়া দেখিলে আমাদের কথার সার্থকতা সপ্রমাণ হইবে।

ভারতী
ভাদ্র ১২৮৫

আবদারের আইন

ভারত গবর্নমেন্ট সুদীর্ঘ গ্রীষ্মাবকাশের পর গৃহে আসিয়াই এক উৎকট কর সংস্থাপনের উদ্দেশ্যে একটি অভিনব আইনের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। সুপ্রিম কাউন্সিলের কলিকাতা অধিবেশনে এবারকার সর্বপ্রথম কার্য সুতা ও কাপড়ের উপর কর সংস্থাপন আইনের পাণ্ডুলিপি। ইহা প্রবাসেই প্রস্তুত হইয়াছিল; গবর্নমেন্ট পকেটে করিয়াই ইহা আনিয়াছিলেন; রাজধানীতে পদার্পণ

করিয়াই রাজ্যমধ্যে এই পাণ্ডুলিপি প্রচার করেন। কয়েকদিনের মধ্যেই পাণ্ডুলিপি পুরা আইনে পরিণত হইয়া গিয়াছে।

ইহার— এই কাপড় ও সুতার শুল্ক-আইনের এক অংশে পুরাতনের ও পরিবর্জিতের পুনঃপ্রচার; অপর অংশ সম্পূর্ণ অভিনব, তাহা একটি স্বতন্ত্র ও সাংঘাতিক আইন। শেষোক্ত প্রথমেরই অবশ্যম্ভাবী ফল; উভয়ের একটিও কিন্তু অযাচিত নয়, আকস্মিকও নয়। অনেক সময়ে আকাশ হইতে আইন আসিয়া অকস্মাৎ আমাদের মাথার উপর পড়ে। আইনের আবশ্যকতা লোকের ইষ্টানিষ্টের প্রতি অপরিসীম উপেক্ষা করিয়া গবর্নমেন্ট দেশীয় সংবাদপত্র ও সভা-সমিতির অজ্ঞাতে ও অনভিমতে নূতন নূতন আইন-কানুন করিয়া থাকেন। বলা অনাবশ্যক, ইহা অন্যায়, যথেচ্ছাচার, যারপরনাই দূষণীয়। কিন্তু উপস্থিত আইনের অনুষ্ঠান সম্বন্ধে গবর্নমেন্টকে এ দোষ দেওয়া যাইতে পারে না। যে কারণেই হোক, গবর্নমেন্ট আত্ম-ইচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া অযাচিতভাবে ও অকস্মাৎ এ আইনের অবতারণা করেন নাই। প্রত্যুত এ দেশে যাহা ও যাঁহারা সাধারণ অভিমতের অধিনেতা বলিয়া অভিহিত ও আত্মপরিচয় দিয়া থাকেন, তাহার ও তাঁহাদের তুমুল আন্দোলনে ও অস্বাভাবিক আবেদনে গবর্নমেন্ট এই আইন উপস্থিত করিবার অবসর পাইয়াছেন, উপস্থিত করিতে অগত্যা বাধ্য হইয়াছেন। নহিলে এ আইন সম্ভবত হইত না; সহজে হইবার সুদূর সম্ভাবনা মাত্র ছিল না। গবর্নমেন্ট এ-দেশীয় লোকের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া যে এ আইন করিতেন না, তাহা নহে; এ-দেশীয় বস্ত্রশিল্প অচিরাৎ উৎসন্নে যাইবে বা কাপড়-সূতার কল শৈশবেই স্বর্গারোহণ করিবে বলিয়া যে গবর্নমেন্ট কিছুমাত্র শঙ্কিত হইতেন তাহাও নহে; পরন্তু এ-দেশীয়দিগের পরিধেয়ের জন্যও যে পরম উৎকণ্ঠিত হইয়া গবর্নমেন্ট এই আইন করিতেন না, এমনও বলি না। এ দেশের লোক অনাহার অর্ধাহারে মরুক আর উলঙ্গ অবস্থায় থাকুক বা প্রদেশীয় শিল্প-বাণিজ্য পঞ্চভূতে বিলীন হউক, তাহাতে এই গুরুগম্ভীর গবর্নমেন্টের অবিচলিত ঔদাসীন্যের এক বিন্দুও উদ্‌বেগ উপস্থিত হইবার আদৌ কারণাভাব। কিন্তু, তথাচ এই আইন হইত না। হইত না সম্পূর্ণ অন্য কারণে। সে কারণ, সকলেই জানেন, মাঞ্চেস্টারের মহীয়সী শক্তি, লাঙ্কাশায়রের বাণিজ্যস্বার্থ। কিন্তু, শুনিতে পাই, মাঞ্চেস্টার, লাঙ্কাশায়র আমাদের শত্রু। স্বীকারই করি উহারা আমাদের পরম শত্রু। শত্রুর স্বার্থ সর্বথা হননীয় শুক্রাদির নীতি অনুসারে ইহাও আসুন, স্বীকার করি। কিন্তু, এই শত্রুদিগের স্বার্থের অনুরোধে এ-দেশীয় গরিব-দুঃখীরা একটু সুলভ বস্ত্র পরিধান করিতে পাইত; পরন্তু, সেই স্বার্থেরই অনুরোধে, এ দেশের আধুনিক অনুষ্ঠান কলের কাপড় সুতার উপর এত দিন কোনো শুল্ক সংস্থাপিত হয় নাই, ইহাও অগত্যা সকলেই স্বীকার করিতে বাধ্য। এক কথায়, শত্রুর স্বার্থে সাধারণত এ দেশেরই সুবিধা ছিল, সরল ও সত্য কথা বলিতে হইলে, অপেক্ষাকৃত সস্তা বস্ত্রে সুখও কিছু না হইয়াছিল এমন নয়। কিন্তু, তথাচ শত্রু শত্রু ভিন্ন মিত্র নহে। স্বদেশহিতৈষী সম্প্রদায়ের শত্রুহনন-স্পৃহাসমূহ বলবতী; তবে সে শক্তির অত্যন্ত অভাব বটে। কিন্তু, এ সম্বন্ধে শত্রুহননের এক মহা শুভক্ষণ উপস্থিত হইয়াছিল। কী-জানি-কোনো এক অজ্ঞাত অভিসন্ধি-সূত্রে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান বণিকসম্প্রদায় মাঞ্চেস্টারের স্বার্থের বিরুদ্ধে বন্দুকে সঙিন চড়াইয়া, বারুদবাহকের কার্য করিবার জন্য নেটিব পেট্রিয়টদিগকে ডাকিয়াছিলেন। সাহেবি ডাক; সামান্য নয়, অসুমার সম্ভ্রমেরই কথা। ডাক পড়িবা মাত্র পেট্রিয়টেরা, পূর্বাপর না ভাবিয়া, অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া, স্বদেশের প্রকৃত, অতি প্রত্যক্ষ ও অব্যবহিত, অস্থিমজ্জাময় শরীরী স্বার্থ আদৌ উপেক্ষা করিয়া, তাহার একটা মরীচিকা-কঙ্কালের কল্পনায়, সাহেবদের পদ-প্রান্তে দলে দলে যাইয়া হাজির হন; বিদেশীয় ও বিলাতি আমদানি বস্ত্র এবং সূত্রের উপর শুল্ক সংস্থাপনের জন্য, সজোরে ও সমস্বরে হল্লা করিতে আরম্ভ করেন। অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানের বিলাতি বন্দুকে নেটিব পেট্রিয়টের বাক্য-বারুদ বিক্ষিপ্ত হইয়া একটা বিষম বিসদৃশ রাজনৈতিক আওয়াজ উৎপন্ন ও উৎসারিত করে। তাহারই ফল আমাদের অদ্যকার আলোচ্য এই আইন। ইতর কথায়, ইহাকেই বলে 'আপন নাসিকা কর্তন করিয়া পরের

যাত্রাভঙ্গ'। শত্রুর শুভযাত্রা ভঙ্গ করা সর্বথা কর্তব্য হইতে পারে; কিন্তু, নিজের নাসিকাটিও তো নেহাত নিষ্কর্মা দ্রব্য নহে। নাসিকাটির কি একেবারেই কোনো মূল্য নাই যে, নির্মম হইয়া তাহাকে নির্মূল করিবে? কিন্তু, পরিতাপ এ-দেশীয় পেট্রিয়টেরা, প্রকৃত প্রস্তাবে তাহাই করিয়াছেন, অথচ পূর্ণমাত্রায় তাহা কাহারো যাত্রাভঙ্গের প্রতিবন্ধক হয় নাই। বিদেশীয় বস্ত্রশিল্পের শুভযাত্রা সম্যক্‌রূপে ভঙ্গ হইবে না; আদৌ এক বিন্দু ভঙ্গ হইবে কি না সে বিষয়ে সম্পূর্ণ সন্দেহ; কিন্তু স্বদেশীয় সূত্র-শিল্পের ও সুলভ বস্ত্রের নাসিকাটি নিশ্চিন্তপুরে পলায়ন করিয়াছে। নাসিকাছেদনজনিত যন্ত্রণায় এখন রোদন করা বৃথা। যাতনার তীব্রতার সঙ্গে এক রত্তি তামাশাও আছে। নাসা না থাকা নিজেই এক তামাশা বটে; কিন্তু, এ ব্যাপারে তদতিরিক্ত আর-একটু তামাশা আছে। নাসিকাটি কোথা হইতে কতখানি স্থান পর্যন্ত কর্তিত হইয়াছে, তাহার সহিত অন্য কোনো অঙ্গের হানি হইয়াছে কি না, আমাদের পরিচালক ও পেট্রিয়টবৃন্দ, তাহা এখনও নাকে হাত দিয়া দেখেন নাই। সেই সামগ্রীটি 'গিয়াছে গিয়াছে', বলিয়াই কেবল রোদন ও রোষ প্রকাশ করিতেছেন। কেন গেল, কাহার দোষে গেল, কত দূর লইয়া গিয়াছে, নাসিকা পুনঃপ্রাপ্তির কোনো সম্ভাবনা নাই, তবুও তো এ-সকল কথা এখন অনায়াসে নিশ্চিন্তভাবে ভাবিয়া দেখা যাইতে পারে। অনর্থক চিৎকারে ও চাঞ্চল্য প্রকাশেই কি পুরুষার্থ?

গত বৎসর ফেব্রুয়ারির শেষে লর্ড এলগিনের রাজত্ব আরম্ভ। তাঁহার অভিষেকের অব্যবহিত পরেই প্রাথমিক ব্যবস্থাপক বৈঠকে বাজেটের আলোচনা। অর্থের অনটন; অর্থাগমের অন্যতম উপায় উদ্ভাবন— ট্যারিফ ট্যাক্সের পুনঃ সংস্থাপন। ক'মাসেরই বা কথা; সকলেরই ইহা স্মরণ আছে এবং সে স্মৃতি এখনও খুব টাটকা আছে। বিদেশ ও বিলাত হইতে আমদানি বহু দ্রব্যের উপর কর বসিল; কেরোসিন তেলের ট্যাক্স বাড়িল। পেট্রিয়টগণ পুলকিত হইলেন। ইন্‌কম ট্যাক্স বাড়িল না বলিয়া কেহ, নূতন ট্যাক্স হইল না বলিয়া কেহ, বিলাতি দ্রব্যের স্পর্শে মহাপাতকগ্রস্ত হইতে ও নরক গমন করিতে হইবে না বলিয়া কেহ, পরন্তু স্বদেশীয় শিল্পী ও শ্রমজীবীদিগের সুবিধার স্বপ্ন কল্পনা করিয়া কেহ; নানা জনে নানা অনুমানে আনন্দিত হইলেন। কিন্তু এই অস্বাভাবিক আনন্দের প্রকৃত কোনো কারণ ছিল না; রক্তমাংসময় পৃথিবীর সহিতও উহার সবিশেষ কোনো সম্বন্ধ ছিল না। দেশের অনিবার্য ব্যবহার্য দ্রব্যের উপর আমদানি-শুল্ক সংস্থাপনে সজীব জাতির যেরূপ আনন্দ উৎপন্ন হয়, তাহা আমেরিকার ইতিবৃত্তেই জ্ঞাতব্য। আনন্দই বটে! সে আনন্দে অস্ত্রনির্ঘোষ, রাষ্ট্রবিপ্লব ও শোণিতস্রোতেরই সম্ভাবনা। কিন্তু অঙ্গহীন অসাড় জাতির সবই উল্টা। পক্ষাঘাতে পাঁচটি ইন্দ্রিয়ই বিকল, কাজেই হর্ষ-বিষাদের কারণ অনুভবে অক্ষম। বুদ্ধিবৃত্তিও তদনুরূপ সূক্ষ্ম; সংসারের সংবাদ রাখেন তেমনি সবিশেষ; সুতরাং আমদানি-শুল্কে উপরোক্ত আমোদ অনুভূত হইয়াছিল। সে আমোদের যদি একান্তই কোনো কারণ নির্দেশ করিতে হয়— তাহার একটা কারণ হুজুগ; আর-একটা কারণ 'হবি'। বাতিকের অশ্ব আরোহণ করিয়া অহরহ ইন্দ্রলোকে গমনের চেষ্টা। ইহাই 'হবি'। সংসারে হবিওয়ালা লোকের অভাব নাই, হুজুগওয়ালা তো অসংখ্য। সুতরাং সেই জাতীয় লোকের মধ্যেই ওই আমদানি-শুল্কে আনন্দের উদ্রেক হইয়াছিল। নহিলে যাঁহারা সংসারের সবিশেষ সংবাদ রাখেন, বাজারের বৃত্তান্ত বুঝিয়া অপক্ষপাতে বিচার করিতে পারেন এবং দেশের অস্থি মজ্জা মেধ, দরিদ্র রায়ত ও কৃষকের সুখ-দুঃখের একটা অস্তিত্ব অনুভব করেন, তাঁহাদের কেহই এই আমদানি-শুল্কে সন্তুষ্ট হন নাই। উহাতে দেশের অন্তর্ভেদী একটি অসন্তোষই উৎপন্ন হইয়াছে। দেশের লোক অদৃষ্টবাদী বল-ও-বাক-শক্তি-বিরহিত. তজ্জন্যই এ অসন্তোষ অস্ফুট ও অব্যক্ত; সংবাদপত্রে উঠে নাই, বাগ্মীর বক্তৃতায় ফুটে নাই, বলে বণিকের পণ্য-পাট লুণ্ঠিত হয় নাই। লোকের বাকশক্তি ও বল থাকিলে ফল অন্যরূপ হইত। এই অন্তর্ভেদী অব্যক্ত অসন্তোষের কারণ অতীব স্পষ্ট। পেট্রিয়টিজমের প্রিয় 'হবি' যাহাই হউক, ইহা পরিষ্কার ও প্রাতিদৈনিক প্রত্যক্ষ ঘটনা যে, স্বদেশীয় বা বিলাতি বিদেশীয়ও হউক, যে দ্রব্য জনসমাজে অনিবার্যভাবে চলিয়া গিয়াছে, যাহা জীবনধারণোপকরণের

একটা অংশ অথবা জীবনধারণের সহিত এবং স্বাভাবিক ও সামাজিক সম্ভ্রমরক্ষণের সহিত যে সামগ্রীর অলঙ্ঘনীয় সম্বন্ধ, তাহার উপর শুল্ক বসিয়া সে দ্রব্য দুর্মূল্য বা মহার্ঘ হইলে মনুষ্য মাত্রেরই মর্মান্তিক বাজে; বিশেষত এই দরিদ্র দেশের দুঃখী লোকদের হৃদয়ে তাহা অধিকতর দারুণভাবে অনুভূত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ দুই-একটা দ্রব্যই গ্রহণ করুন। প্রথম ধরুন লবণ; লবণের সের ছয় পয়সা মাত্র। তুমি আমি হয়তো মনে করিতে পারি লবণ খুব শস্তা। কিন্তু শতকরা অন্তত ৭০ জন লোকের মধ্যে এ দেশে এখন লবণ শস্তা নয়; মহা মহার্ঘ। লবণ-শুল্ক অর্থাৎ উক্ত দ্রব্য সরকার বাহাদুরের একচাটিয়া হওয়ার পূর্বে তাহাদের মধ্যে উহা শস্তা ছিল; তাহাদের অনেকে লবণ প্রস্তুত করিয়া খাইত, গবাদি গৃহপালিত পশুকে খাওয়াইতে পারিত। কিন্তু এখন আর তাহা পারে না। ছয় পয়সা সেরের লবণ কিনিয়া খাইতেও তাহাদের কষ্ট হয়। গবাদিকে লবণ খাওয়ানোর তো কথাই নাই; নিজেদের অন্ন জুটিলে অনেক সময়েই তাহাতে লবণ জুটে না। বিনা লবণে ভাত খায় ও আপন আপন অদৃষ্টকে অভিসম্পাত করে। ইহা কি খুব একটা সন্তোষের কারণ? স্বদেশীয় সম্পাদক মহাশয়দিগের প্রতিই প্রশ্নটি করিলাম। কেহ কেহ হয়তো লুকাইয়া এক-আধ বিন্দু লবণ তৈয়ারি করিতে যায়; কিন্তু সে পাপের কী প্রচণ্ড শাস্তি তাহা প্রতিদিনের পুলিস রিটার্ন ও ফৌজদারি রিপোর্টেই প্রকাশ। পুনঃ জিজ্ঞাসা করি, ইহাও কি মহাশয় স্বদেশীয় ইতর সাধারণের একটা সন্তোষের কারণ? পরন্তু ধরুন কেরোসিন তৈল। কেরোসিন তৈল ক্রমে এখন এ দেশের প্রায় আপাদমস্তক প্রচলিত হইয়াছে; কারণ তাহা অন্যান্য তৈল অপেক্ষা শস্তা। তেলি নিজে সর্বপাদির তৈল প্রস্তুত করে, তথাচ কেরোসিন তৈল কিনিয়া পোড়ায়; কারণ তাহা শস্তা। দরিদ্রের দেশে শস্তা দ্রব্যেরই আদর; শস্তা দ্রব্যেরই আবশ্যক; তা দেশীই হউক আর বিলাতিই হউক; শস্তাতেই লোকের সুখ শান্তি সুবিধা। সুতরাং শস্তাগণ্ডাই গরিব লোকে দেখে; দেশী বিলাতি বুঝে না। ইহা স্বভাবের নিয়ম ও মনুষ্যপ্রকৃতি। তোমার পক্ষপঞ্জরবিহীন ও পুচ্ছহীন পেট্রিয়টিজম দ্বারা মনুষ্যপ্রকৃতি পরিবর্তন করিতে যে চাহ সে কেবল পাগলামি। নেহাত নির্বোধ ব্যতীত আর কেহই নৈসর্গিক নিয়মে হস্তক্ষেপ করিতে যাইয়া হাস্যাস্পদ হয় না। যদি প্রকৃত প্রস্তাবেই পেট্রিয়ট হও, দেশী দ্রব্য ও স্বদেশীয় শিল্পে যথার্থই আন্তরিক অনুরাগ থাকে, তবে তাহার উন্নতিকল্পে অগ্রে চেষ্টা করো; প্রাণপণ প্রতিযোগিতা করিয়া দেশী দ্রব্যের দুর্মূল্যত্ব ঘুচাও; নহিলে তাহা কখনোই গরিব লোকের ব্যবহার্য হইবে না; যে নিজে তাহা স্বহস্তে তৈয়ার করে, সেও তাহা ব্যবহার করিবে না। কিন্তু যাউক সে কথা। গত মার্চ মাসে ট্যারিফট্যাক্সের পুনরাবির্ভাবে কেরোসিন তৈলের মাশুল বৃদ্ধি হইয়া তাহা পূর্বাপেক্ষা মহার্ঘ হইয়াছে। মাশুলের পরিমাণে মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে কি না ঠিক বলিতে পারি না; অত হিসাব করিয়া দেখি নাই। কিন্তু মূল্য বিলক্ষণই বৃদ্ধি হইয়াছে। ওই তৈলের যে টিন ছিল ১৷৷/০ তাহা হইয়াছে এখন ১৸/০; টিন প্রতি অন্যাধিক ৷০ বৃদ্ধি। মধ্যবিত্ত গৃহস্থেরই যখন ইহা মর্মান্তিক বাজিয়াছে, তখন গরিব ইতর সাধারণের আর কথা কী। যাহারা এক পয়সার তৈল কিনিয়া তিন রাত্রি পোড়াইত, তাহাদের সে তৈলে এখন পুরা দুই রাত্রিও চলে না। অতএব পুনঃ জিজ্ঞাসা করি, কেরোসিন তৈলের এই 'পোত'টা কি পরম সন্তোষেরই বিষয় হইয়াছে? এখন কেরোসিন তৈলের দৃষ্টান্ত কাপড়ের উপর প্রয়োগ করুন; ফল সেই একই হইবে। দেশী তাঁতের কাপড় অপেক্ষা বিলাতি বা বোম্বাই কলের কাপড় শস্তা। সংগতিহীনে শস্তাই পরে। তাঁতি নিজহস্তে তাঁত বুনে; দেশী বস্ত্র তৈয়ার করে; কিন্তু পরে কি? পরে কি শিমলার কালাপেড়ে? না শান্তিপুরের কল্কাপেড়ে? কিংবা ফরাসডাঙার কাশীপেড়ে? সম্পাদক শিরোমণিরা নিজে এ-সব বরং পরিয়া বাহার দিতে পারেন। কিন্তু তন্তুবায় তাহা পারে না। তাহার প্রাণে পেট্রিয়টিজম থাকিলেও হাতে পয়সা নাই। সুতরাং সে স্বহস্তে কল্কাপেড়ে প্রস্তুত করিয়াও পরিয়া থাকে বিলাতি কলের থানফাড়া ধুতি; কাপড় সুতায় শুল্ক বসিল, সে ধুতির উপর চাদর জুটা ভার হইবে। অনেকের ধুতিও জুটিবে না; লঙ্গটিতে লজ্জা নিবারিত যদি হইবার হন তবেই হইবেন; নহিলে লজ্জা

নিজেই লজ্জা পাইয়া পলাইবেন। পরন্তু দেশীয় তাঁতির তাঁতের সম্বল বিলাতি সূতা; ইহাও বারেক স্মরণীয়। বিলাতি সূত্র-শুল্কে দেশী কাপড়ের উন্নতিকল্পনা আকাশকুসুমেরই অন্তর্গত।

বিগত মার্চের ট্যারিফট্যাক্সে অনেকানেক দ্রব্যের উপরেই আমদানিমাশুল বসিয়াছে। কিন্তু এখনও কতক দ্রব্য আছে, যাহাদের উপর হয়তো মাশুল বসে নাই; অথচ মূল্য তাহাদের বাড়িয়াছে। বাজারে যে দ্রব্যই দর কর সবই মহার্ঘ; বানিয়া বলে 'মহাশয় মাশুল বসিয়াছে; কাজেই মহার্ঘ'। ইহা বানিয়ার চাতুরী অথবা ট্যারিফ তহশীলদারদের বাহাদুরি ঠিক বলা যায় না। তবে ট্যারিফের নিয়ম গঠনেও যে গলদ আছে ইহাও নিশ্চয়। আইনের উপস্থিত সংশোধনে সে দোষ দূরীভূত হইলেও হইতে পারে। কিন্তু কেবল করদ দ্রব্যের দুর্বোধ্য ও অনির্দিষ্ট শ্রেণী বাঁধিয়া দিলেই চলিবে না। পরন্তু কেবল ইন্ডিয়া গেজেটে ট্যারিফের নিয়মাবলী প্রকাশিত করিয়া তাহা বড়ো বড়ো বন্দরে প্রেরণ করা প্রচুর নহে। কোন্ কোন্ দ্রব্যের উপর আমদানি মাশুল বসিল তাহা নির্দিষ্ট ও পরিষ্কারভাবে দেশীয় ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় লিখিয়া সর্বসাধারণের বিদিতার্থে বাজারে প্রচার করা উচিত। নহিলে বিক্রেতা ক্রেতা উভয়েরই সংকট। এ বিষয়ে যে কেবল বড়ো বড়ো সওদাগরেরাই সংশ্লিষ্ট তাহা নহে। ক্ষুদ্র দোকানী পসারী ও দ্রব্যের খরচকারী ক্রেতা মাত্রেই ইহার সহিত জড়িত। অতএব অর্থসচিব শ্রীযুক্ত ওয়েস্টল্যান্ড বাহাদুর যে কেবল ইন্ডিয়া গেজেটের উপরেই নির্ভর করিতেছেন,[1] ইহা ঠিক নহে।

গত মার্চ মাসে অনেকানেক আমদানি দ্রব্যের উপরেই মাশুল বসিয়াছিল; বসে নাই কেবল কাপড় ও সুতার উপরে। মাঞ্চিস্টারের মাহাত্ম্যেই হউক কিংবা অন্য যে কারণেই হউক, সম্ভবত মাঞ্চিস্টারের মহিমাতেই, সেক্রেটারি-অব্-স্টেট কাপড় সুতার মাশুল অনুমোদন করেন নাই। নহিলে ইন্ডিয়া গবর্নমেন্টের তাহাতে সবিশেষ ইচ্ছা না ছিল এমন নহে। স্টেট-সেক্রেটারি মি. ফাউলার সাহেবকে তাঁহার উক্ত অনভিমতের জন্য অনেক নিন্দা তিরস্কার ও লাঞ্ছনার ভাগী হইতে হইয়াছিল। কাউন্সিলের প্রায় সকল মেম্বরই তাঁহার প্রতি কুটিল কটাক্ষ করিয়াছিলেন। সরকারি সদস্যেরা সাফই বলিয়াছিলেন যে, তাঁহারা হুকুমের চাকর সুতরাং কাপড় সুতার কর বসাইতে পারিলেন না। পরন্তু সাহেব সওদাগরেরা সাংঘাতিক রুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিলেন; একটা অস্বাভাবিক আন্দোলন উঠাইয়াছিলেন। নেটিব পেট্রিয়টেরা যাইয়া সে আন্দোলনে যেরূপে যোগ দেন অগ্রে উল্লেখ করিয়াছি। কাপড় সুতার করের অভিলাষে আন্দোলন ভয়ানক ফাঁপিয়া উঠে। দেশীয় স্বদেশহিতৈষী ও সম্পাদকবর্গ একবাক্যে বলিয়া উঠেন— 'ইহা ইংরাজের একান্ত অন্যায়, অপরিসীম অবিচার, পৈশাচিক অত্যাচার; সুতা ও কাপড়ের কর অবিলম্বে চাই, এখনই চাই; নহিলে দেশ এই দণ্ডেই উৎসন্নে যাইবে।'

আশ্চর্য! আমরা এরূপ আশ্চর্য আন্দোলন ও অভিমত খুব কমই দেখিয়াছি। ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী লোক, সর্ববিষয়ে স্বতন্ত্র পথানুসারী সংবাদপত্র, এ সম্বন্ধে সকলেরই এক রায়— 'কাপড় সুতার কর না বসিলে ভারতভূমি অচিরাৎ অধঃপাতে যাইবে।' ঘোরতর কংগ্রেস-বাদী 'বেঙ্গলী' হইতে কংগ্রেসের বিকট বিদ্বেষী 'বঙ্গবাসী' পর্যন্ত উভয় শ্রেণীর স্বদেশভক্তই, এ ক্ষেত্রে একাসনে উপবিষ্ট! তৈলে জলে দুগ্ধ শর্করাবৎ সংমিশ্রণ! অর্থনৈতিক সমস্যায় এরূপ অস্বাভাবিক একাকার আমরা আর কখনো দেখি নাই। এরূপ প্রকাণ্ড প্রমাদও আর কখনো দেখি নাই।

আন্দোলনের তুফান উঠিল। কয়েক মাস ধরিয়া আরজি ও আবেদনের ফুটকড়াই ছুটিল। সহস্র সহস্র স্বাক্ষরপূর্ণ সুদীর্ঘ আবেদন বিলাতে প্রেরিত হইল। স্বাক্ষর গ্রহণের সীমা ছিল না; দিগ্‌বিদিগ্‌বিচার ছিল না; অজ্ঞানে সজ্ঞানে যেমনেই হউক দস্তখত হইলেই হইল। দস্তখত সংগ্রহের জন্য দস্তুরমতো কমিশন কবুল করিয়া লোক নিযুক্ত হইয়াছিল। শুনিয়াছি কোনো পেট্রিয়ট তাঁহার আপিসের পবিত্র প্রকোষ্ঠে বসিয়া এই সৎকার্য সম্পাদন করিয়াছিলেন।

---

১. মি. ওয়েস্টল্যান্ডের ইন্ডিয়া কাউন্সিলের বক্তৃতা : ১৭ ডিসেম্বর ১৮৯৪।

ব্রিটিশ সিংহ আন্দোলন গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্যই করুন, একান্ত উপেক্ষা করেন না; দৃশ্যত উপেক্ষার ভাব দেখাইলেও তাহাতে করিয়া অন্তরে অন্তরে তিনি একটু উত্তেজিত হইয়া থাকেন; ঈষৎ মাত্রায় আশঙ্কিতও না হইয়া থাকেন এমন নহে। মৌলিক হউক বা মেকিই হউক ‘পাবলিক ওপিনিয়ন’ নামক পদার্থমাত্রই অবিকৃত বিলাতি ধাতুতে ‘সূচিকাভরণ’স্বরূপ। এ লক্ষণ সাধারণত সুলক্ষণ তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে কোনো কোনো সময়ে যে তদ্দ্বারা সুবিধার পরিবর্তে অসুবিধাও হইতে পারে, সে স্বতন্ত্র কথা। সেটা ‘পাবলিক ওপিনিয়ন’ প্রস্তুতকারীদের উক্ত পদার্থ প্রস্তুতকরণের পাপনিবন্ধনই ঘটে। উপস্থিত ক্ষেত্রে তাহাই ঘটিয়াছে। ব্রিটিশ সিংহ বাহিরের কোলাহলে বিচলিত হইবার পাত্র নহেন; এ কথা লর্ড এলগিন, সিংহশক্তির সামঞ্জস্য ও তৎকৃত কার্যমাত্রের মাহাত্ম্য বা প্রমাদরাহিত্য প্রতিপাদনার্থে অবশ্যই বলিতে পারেন; আলোচ্য আইন বিধিবদ্ধ করিবার দিন ইহা বিশিষ্টভাবে বুঝাইবারই চেষ্টা করিয়াছিলেন।[1] কিন্তু তাই বলিয়া কথাটা অখণ্ডভাবে অঙ্গীকার করা যাইতে পারে না। কাপড়ের কর আন্দোলন ব্যতীত আদৌ জন্মিত না; পূর্বাপর ঘটনাতেই ইহা প্রমাণ হইয়াছে।

ওই কর-সংস্থাপন কামনায় সাহেব সওদাগরদিগের সংগ্রামের সহিত দেশীয় স্বদেশ-হিতৈষীদিগের সংযোগে ভারত গবর্নমেন্ট না হউন ব্রিটিশ রাজনৈতিকেরা বিলক্ষণ বিচলিত হইয়াছিলেন। পার্লামেন্টে প্রশ্নের পর প্রশ্ন উঠিয়াছিল। এবং অচিরাৎ বিলাতি আমদানি কাপড় সুতার উপর কর না বসিলে অসন্তোষের উগ্র অনলে ভারতরাজ্য দগ্ধ হইবে, বিলাতে ও ভারতে এই অমূলক অলীক কথাও অপ্রকাশ ছিল না। তৎকালে ওই অসন্তোষ আস্ফালিত করিবার এক হাস্যকর অতি বৃহৎ সুযোগও উপস্থিত হইয়াছিল। ট্যারিফ আন্দোলনের সময় উত্তরবিহারের আমবাগানে এক আমোদ উপস্থিত হয়। সকলেরই স্মরণ আছে সে আমোদ কী— বৃক্ষে বৃক্ষে কর্দমাক্ত কেশ শোণিত সম্পৃক্ত। কোন্ গ্রাম্য বালকেরা ওই বালসুলভ ক্রীড়া করিত, অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। ত্রিহুতিয়েরা উহাকে বলিয়াছিল ‘হনুমানজীউর তিলক’। হনুমানজীউর হউক, আর যাহারই হউক, এই তথাকথিত তিলক একটা রাজনৈতিক তুফান উপস্থিত করিয়াছিল। অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানেরা উহাতে একটা অজ্ঞাত আসন্ন ও অতি বিরাট বিভ্রাট কল্পনা করিয়াছিলেন, তিলকাঙ্কে প্রকৃত প্রস্তাবেই সেই ত্রেতাযুগপ্রসিদ্ধ বীরের লঙ্কাদগ্ধকারী মার্তণ্ড মূর্তি সন্দর্শন করিয়া আতঙ্কে অতি চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছিলেন। রাজার জাতি যাহাতে জুজু দেখেন, তাহাই রাজনীতির অন্তর্গত; অন্যের তুচ্ছাদপি তুচ্ছ হইলেও তাহা রাজনীতির চক্ষে ভীষণ বিভীষিকা; সুতরাং ত্রিহুতের তিলক-চালাচালি সিপাহি মিউটিনির সময়ের চাপাটি-চালাচালির অনুরূপ বলিয়াই উক্ত হইয়াছিল। অন্যান্য অনেক অদ্ভুত কারণের মধ্যে এই তিলকের একটা প্রকাণ্ড কারণ আবিষ্কৃত হইয়াছিল এই যে, কাপড় সুতার উপর কর না বসাতেই লোকে অসন্তোষে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে; অচিরাৎ একটা মিউটিনি করিয়া অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদিগকে অ্যাভাবাচ্ছাসহ সটান অক্ষয় স্বর্গধামে পাঠাইবে। বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী আসন্ন। সেই বিপ্লবের পূর্বলক্ষণ আম্রবৃক্ষে তিলকাকারে অঙ্কিত!!

মোটের উপর অবস্থা হইয়াছিল এই। অতএব উপরোক্ত আন্দোলন অস্বাভাবিক ও মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে উত্থিত হইলেও নিষ্ফল হইবে কেন? মাঞ্চেস্টারের স্বার্থ ও স্টেট-সেক্রেটারির সদিচ্ছা সত্ত্বেও বিলাতি আমদানি কাপড় সুতার করের অঙ্কুর তখনই হইয়াছিল। সে অঙ্কুর এখন

---

১. লর্ড এলগিন ইঙ্গিতে বোধ হয় মাঞ্চেস্টারের ইষ্ট সিদ্ধির আরোপিত পক্ষপাতকে আক্রমণ করিয়া বলিয়াছিলেন : It is alleged in certain quarters. . .that in consenting to introduce this Bill in its present form the Government has made a cowardly surrender to a pressure which if not unconscious is at any rate unusual, and oppressive. I wish to take exception to any such statement. ইত্যাদি।

এক বৃহৎ বৃক্ষে পরিণত হইয়াছে। বিলাতি আমদানি কাপড় ও সুতার উপর শুল্ক বসিয়াছে এবং সেইসঙ্গে ও সেই অনুপাতে এ-দেশীয় কলের সুতার উপরেও কর নির্দিষ্ট হইয়াছে। হইবারই কথা। স্বাধীন বাণিজ্যের মূল সূত্র এবং ততোধিক, বাণিজ্যপরায়ণ ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের লাঙ্কেশায়েরি স্বার্থ, উহা অগত্যাই করিতে বাধ্য। বিলাতি আমদানি কাপড় সুতার উপর কর বসিলে এ-দেশীয় কলের কাপড় সুতার উপর অবশ্যই কর বসিবে, এ কথা গবর্নমেন্ট তখনই স্পষ্টাক্ষরে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। আন্দোলনকারীদের কতক লোকে হয়তো তাহা বুঝেন নাই; কতক লোকে তাহা বুঝিয়া সজ্ঞানে ও সুস্পষ্ট ভাষায় সে করও বহনে সম্মত হইয়াছিলেন। নহিলে পরের যাত্রা- ভঙ্গার্থে আপন নাসিকার সম্পূর্ণ ছেদনকার্য সম্পাদন হইবে কেন? অতএব যাঁহারা বিলাতি আমদানি বস্ত্রের মাশুলের আকাঙ্ক্ষায় এ-দেশীয় কলের কাপড়ের উপর কর দিতে স্বীকার করিয়াছিলেন, অন্তত তাঁহাদের পক্ষে এখন উক্ত কর বসিয়াছে বলিয়া ক্রন্দন করা কেবল অন্যায় ও অসংগত নহে, উন্মাদ রোগের লক্ষণ। বিলাতি আমদানি কাপড়ের উপর কর বসিলে দেশী কাপড়েও কর লাগিবে ইহা সকলেই জানিত; গবর্নমেন্ট নিজে এ কথা বলিয়াছিলেন, স্টেট-সেক্রেটারি সেই শর্তে আমদানি কর মঞ্জুর করিয়াছিলেন; কাউন্সিলগৃহে স্বদেশহিতৈষী পক্ষ সে কর স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন।[১] তবে এখন আবার কথা কেন, গবর্নমেন্টকে গালাগালি কেন আর এত গণ্ডগোলই বা কেন? আপন নাসিকা আপনারাই কাটিয়াছ তাহাতে পরের দোষ কী? আবদার করিয়াছিলে আইন হইয়াছে আবার কী?

সাহেব সওদাগরেরা বিলাতি কাপড়ের জন্য কেন অত আন্দোলন করিয়াছিলেন আমরা অদ্যাপি ভালো করিয়া বুঝিতে পারি নাই। তাঁহাদের সাধুতার অন্তরালে আসল অভিপ্রায় যাহা তাহা অত্যল্প পরিমাণে অনুমান করিতে পারিলেও আমরা এ স্থলে বলিতে চাই না। পরন্তু স্বদেশভক্ত সম্প্রদায় সে করের জন্য কেন অত 'উতলা' হইয়াছিলেন তাহাও বুঝা কঠিন। তাঁহাদের অধৈর্যের একটা কারণ আমরা উপরেই নির্দেশ করিয়াছি। তাহা হুজুক 'হবি' ভিন্ন আর কিছুই নহে। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, বিলাতি কাপড়ে মাশুল হইলে, কাপড়ের দেশী কলওয়ালাদিগের সুবিধা হইবে, দেশের শিল্পোন্নতি হইবে এই অনুমানেই স্বদেশহিতৈষীরা আমদানি-করের আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু এ কথা কার্যত কোনো কথাই নয়। কেননা আমদানি-কর হইলে 'এক্সাইস' করও হইবে ইহা উভয় পক্ষে অঙ্গীকারই করা হইয়াছিল। এ সম্বন্ধে সুপ্রিম কাউন্সিলের সম্মাননীয় সদস্য মি. ফাজুলভাই বিশরামের ইংরাজি উক্তি আমরা ফুটনোটে উদ্‌ধৃত করিয়াছি। তিনি বলিয়াছিলেন, 'আমি নিজে কাপড়ের কলের স্বত্বাধিকারী তথাচ বিলাতি কাপড় সুতার উপর আমদানি করের আকাঙ্ক্ষায় এ-দেশীয় কাপড় সুতায় শুল্ক সংস্থাপনে সম্মত হইতেছি।'

পরন্তু আমদানি-করে হস্তনির্মিত দেশীয় বস্ত্রশিল্পের উন্নতিকল্পনা কেবল বিড়ম্বনা ব্যতীত আর কিছুই নয়। এরূপ বিড়ম্বনাময়ী বিচিত্র কল্পনা কেবল মরীচিকাপ্রলুব্ধ পেট্রিয়টি মস্তিষ্কেই উদ্ভূত হওয়া সম্ভবে। ক্ষুদ্র লোকের এমনি বৃহৎ কল্পনা করা সাধ্য নহে। তাঁতি রাজা মান্ধাতার আমলের আর্য-তাঁতে বিশুদ্ধ বস্ত্র বয়ন করে; সে বস্ত্র মাঞ্চিস্টারের ম্লেচ্ছভাবাপন্ন নহে; অতি উত্তম কথা। পরন্তু সেই বিশুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করিয়া পূতাত্মা আর্যসন্তানদিগের সন্ধ্যাহ্নিক আওড়াইবার অতিরিক্ত সুবিধা হইতে পারে। ইহা আরও উত্তম। কিন্তু এই যে আর্য-তাঁতের বিশুদ্ধ বস্ত্র ইহাতে সূত্র কাহার? সুতা কোথা হইতে আসে সে সংবাদ কি সত্য সত্যই আপনারা

---

[১] সুপ্রিম কাউন্সিলের বেসরকারি সদস্য মাননীয় শ্রীযুক্ত ফাজুলভাই বিশরাম বলিয়াছিলেন : I, for one, speaking as a mill owner, would be willing to support the levying of an excise duty on cotton goods manufactured in India, assuming of course that such an import can be practically levied without injustice and serious trouble.

কেহ রাখেন না? চিক্কণ চটকদার কালাপেড়ে পরিয়া তাহার উপর অভ্র ইস্তিরির অতি সূক্ষ্ম উড়ানি উড়াইয়া তুমি যে দেশী বস্ত্রের বাহার দেখাও সুতা কিন্তু তাহার বিলাতি। বিলাতি সুতা ব্যতীত, তোমার দেশী বস্ত্রের বাবুগিরি গলিয়া যায়; দেশী তাঁতির তাঁত শিকায় উঠে। বোম্বায়ের কলে জোর ২৪ নম্বরের সূত্র অবধি জন্মে, তাহার অধিক সূক্ষ্ম সূত্র জন্মে না; কিন্তু তোমার বাবুয়ানার উপকরণ ও গৃহিণীর লজ্জানিবারণের (!) জন্য বস্ত্রটা ৮০ নম্বরেরও অতিরিক্ত সূক্ষ্ম সূত্রে প্রস্তুত হইলে ভালো হয়; কিন্তু, সে-সব সূত্র বিলাত হইতেই আসিয়া থাকে। দেশী তাঁতি বিলাতি সূত্রের দ্বারাই বস্ত্র বোনে। অতএব বিলাতি সূত্রে শুল্ক বসিয়া দেশীয় বস্ত্রের শিল্পোন্নতি কোন্ ঐন্দ্রজালিক মন্ত্রবলে হইবে তাহা আমরা আদৌ বুঝিতে অক্ষম। ট্যারিফ শুল্কে বিলাতি বস্ত্রের মূল্যাধিক্যের অনুপাতে দেশী বস্ত্রের মূল্যও দারুণ বৃদ্ধি হইবে; কেননা বিলাতি সূত্রে দেশী বস্ত্র নির্মিত; সূত্রের মূল্য বৃদ্ধি হইলেই বস্ত্রের মূল্য বৃদ্ধি হয়। অতএব এরূপ স্থলে লোকে বিলাতি কাপড় (তাহার মূল্য আমদানি শুল্কে এখনকার অপেক্ষা বাড়িলেও) ছাড়িয়া তদপেক্ষা চতুর্গুণ অধিক মূল্যের দেশী বস্ত্র কিনিতে চাহিবে কেন? আর পেট্রিয়টিজমের অনুরোধে তাহা চাহিলেও তত পয়সা পাইবে কোথায়? পেট্রিয়টিক স্পিরিটে তো আর উলঙ্গ হইয়া থাকা চলে না। বলিবে, 'বোম্বাই কলের কাপড় পরিবে। বঙ্গদেশেও কাপড়ের কল হইতেছে।' বঙ্গীয় কলের বস্ত্র আজও বাহির হয় নাই; হইলেও তাহা এবং বোম্বাই কলের বস্ত্র, বিলাতি বস্ত্রের অপেক্ষা এক কাক্রিও সস্তা হইবে না; বরং এক আনা বেশিই হইবে। কারণ আকাঙ্ক্ষিত আমদানি-করের অনুকম্পায় সে কাপড়ের সুতার উপরেও এক্সাইস শুল্ক বসিয়াছে। এক্সাইস শুল্ক না বসিলেও সম্ভবত তাহা বিলাতি কাপড়ের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে সমর্থ হইত না। পরন্তু দেশী কলে কাপড় অপেক্ষাকৃত অতি অল্পই জন্মে, আর সে কাপড় এত অধিক মোটা যে এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে তাহা সর্বদা ব্যবহারেরও যোগ্য নহে। আমরা প্রত্যক্ষ ঘটনা ও সংসারের প্রাতিদৈনিক সম্ভাবনাকেই সম্মুখে রাখিয়া এই কথাগুলি বলিতেছি। উদ্ভট 'অঘটনপটিয়স' পেট্রিয়টিজমের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র বটে। সে কথায় বড়ো বড়ো বক্তৃতা ও লম্বা-চওড়া প্রবন্ধ প্রস্তুতই হইতে পারে; সংসারের আর কোনো কার্যই তদ্দ্বারা হয় না; বিশেষত উদরের অন্ন ও অঙ্গের আবরণের সহিত তাহার আকাশ-পাতাল অপেক্ষাও সুদূর সম্বন্ধ। তবেই এখন দেখা যাইতেছে যে, আমদানিকারীদের অনর্থক আবদারে বস্ত্রাদির উপর আমদানি-কর বসিয়া আমাদের ইতঃভ্রষ্টস্ততোনষ্ট হইয়াছে। বিলাতি বস্ত্র মহার্ঘ হইল, বোম্বাই কলের কাপড়ের মূল্য বাড়িল; পরন্তু দেশী কাপড়ও অগ্নিমূল্য হইল। অতএব এই আমদানি শুল্কে দেশটা রাতারাতি উন্নতির ঊর্ধ্বমার্গে দশ যোজন ঠেলিয়া উঠিয়াছে, পাপমুখে এ কথা কীরূপে বলিব?

বলিবে আর যত কিছু না হউক মাঞ্চেস্টার বস্ত্রবণিকের তো অনিষ্ট হইল। তা বটে! কিন্তু প্রথম জিজ্ঞাস্য মাঞ্চেস্টারের অনিষ্ট চেষ্টা করা পুরাতন নীতিশাস্ত্রানুসারে অন্যায়; কিন্তু ইষ্ট না থাকা সত্ত্বেও পরের অনিষ্ট করাকে কী বলিবে? দ্বিতীয় জিজ্ঞাস্য মাঞ্চেস্টারের সবিশেষ অনিষ্টই বা হইবে কেন? তাহার দশ জোড়া কাপড় যেখানে বিক্রয় হইত, সেখানে না-হয় এখন ছয় জোড়া বিক্রয় হইবে; ইহার অধিক তো আর কিছু নয়! কিন্তু তাহার অবশিষ্ট ও অবিকৃত সেই চারি জোড়া কাপড় যাহারা কিনিয়া এত দিন পরিতে পারিত, তাহারা অতঃপর যে একেবারেই কাপড় পরিতে পারিবে না; এই মাঘের শীতে 'জানু ভানু কৃষাণু' ব্যতীত অনন্যোপায় হইবে, সে অনিষ্ট কাহার? মাঞ্চেস্টারের অথবা তুমি যে দেশের ভক্ত বলিয়া ভড়ং দেখাইয়া থাক, সেই দেশেরই? তৃতীয় প্রশ্ন, প্রকৃত প্রস্তাবে মাঞ্চেস্টারের অপরাধই বা কী যে, তাহার পশ্চাতে লাগিয়াছিলে? স্বদেশের প্রাচীন সভ্যতা আমাদের স্বতঃশিরোধার্য, কিন্তু, তাহার অযথার্থত মহিমা কীর্তন করাকে আমরা তাহার প্রকৃত মর্যাদাটিকে মাটি করাই মনে করি। তুমি বড়ায়ের বোকামি করিয়া আর্যামির যতই অতিরিক্ত আস্পর্ধা কর-না কেন, ইহা সকলেই জানে যে, সে কালের চরকার আমলে দেশের অদরিদ্রদের মধ্যেও অতি অল্প লোকে দুইখানা বস্ত্র একত্রে ব্যবহার

করিতে পাইত। দরিদ্র শ্রেণীর বস্ত্র-পরিধান-বিলাসের কথা এখানে না বলাই ভালো। ব্রাহ্মণ-ঠাকুরানীরাও তখন চরকা কাটিতেন। অন্যূন চারিমাস চরকা না ঘুরাইলে একখানা কাপড়ের উপযুক্ত সুতার সংস্থান হইত না। ইহাতেই বুঝিতে হইবে বস্ত্রের সুবিধাটি তখন কেমন ছিল। তোমার সাত গাঁটের বস্ত্র সওদাগরি ও ঢাকাই মসলিন মসলন্দের কথা শুনিবা মাত্রই আমরা মোহিত হইয়া 'মরি মরি' বলিলেও বলিতে পারি। কিন্তু সে 'মরি মরিতে' আসল ঘটনা মারা যাইবে না। তখন সমগ্র দেশমধ্যেই বস্ত্রের অভাব বিলক্ষণই ছিল। মাঞ্চেস্টারের অপরাধ এই যে, সে এ দেশে বহু পরিমাণে বস্ত্র আমদানি করিয়াছিল এবং করিতেছে। সুলভ বস্ত্র আনিয়া দেশের ইতর ভদ্র সর্বসাধারণকে বস্ত্র পরাইয়াছে। সে সূক্ষ্ম সূত্র পাঠাইয়া তোমার বাবুগিরি বজায় রাখিয়াছে; বরং বিলক্ষণ বৃদ্ধিই করিয়াছে। পরন্তু, তাহারই জন্য দেশীয় তাঁতির তাঁত আজও চলিয়াছে। মাঞ্চেস্টারের অপরাধ এই। এই অপরাধে এত রাগ? তুমি আরও রাগিয়া বলিবে, 'অপরাধ অবশ্যই অপরিসীম অপরাধ। তাহারই জন্য তো এ-দেশীয় তাঁতিকুল উৎসন্নে গিয়াছে।' এইরূপ উক্তির ধুয়াটা কিছুকাল হইতে খুব অতিরিক্ত মাত্রায় উঠিয়াছে বটে; কিন্তু, প্রিয় মহাশয়, আপনার এ কথাটা সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া স্বীকার করা যায় না। কেন স্বীকার করা যায় না তাহা বুঝাইবার স্থান এখানে নাই; কিছু সবুর করিলে বুঝাইতে পারি। কিন্তু, তাহা স্বীকার করিলেই বা কী? স্বীকারই না-হয় করিলাম মাঞ্চেস্টারের সুলভ বস্ত্রের দৌরাত্ম্যে দেশের তাঁতিদের তাঁতবোনার ব্যাঘাত হইয়াছে; তাহাদের অন্ন মারা গিয়াছে; তাহারা উৎসন্ন হইতেছে। কিন্তু মাঞ্চেস্টারের এই অনিষ্টে, অনিষ্টই যদি ইহা হয়— আমাদের তাঁতিরা কি উৎসন্নের পথ হইতে ফিরিতে পারিবে? আমরা উপরেই দেখাইয়াছি, মহাশয়রা অনর্থক আন্দোলনে যাহা করিলেন, তাহাতে আমাদের তাঁতিদের তাঁতিকুল ও বৈষ্ণবকুল দুই কুলই বরং গেল। তার পর কেবল এক তাঁতিকুলের সুবিধা সচ্ছলতার জন্য, সমগ্র দেশের লোক দুঃখ সহ্য করিবে, সুলভ বস্ত্র ব্যবহারে বঞ্চিত হইবে, সভ্যতার কথা ছাড়িয়া দিয়া, ইহাই কি স্বভাবের নিয়ম? অথবা সুযুক্তির কথা? এখন সর্বশেষে আর-একটি প্রশ্ন আছে। এই যে আমদানি মাশুল বসিল, এ মাশুল ফলিতার্থে দিবে কে? দিবে বিক্রেতা কিংবা ক্রেতা? ক্রেতারই তো এ মাশুল দিতে হইবে। মাঞ্চেস্টার তো এ মাশুল দিবে না মহাশয়; দিতে হইবে যে আমাদেরই। এ কথাটি কি আপনারা একটিবারও ভাবিয়াছিলেন? হায়! ভাবিবার অবসর পান নাই; ভাবা অনাবশ্যক মনে করিয়াছিলেন।

অতীব অভাগ্যের বিষয় যে, আবদারকারীরা চিন্তাশীলতার অতি গুরুত্বে বস্ত্রক্রেতা বলিয়া যে একটা জীবও জগতে আছে তাহা একেবারেই বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিলেন; অথবা তাহাদের অস্তিত্ব আদৌ বিবেচনাধীনে গ্রহণ করেন নাই। তাঁহারা হয়তো মনে করিয়াছিলেন এ মাশুল মাঞ্চেস্টারই দিবে। ভারতবাসীর দিতে হইবে না। কিন্তু স্টেট-সেক্রেটারি আপন কর্তব্য ভুলেন নাই। তিনি যথাসময়েই স্মরণ করিয়া দিয়াছিলেন যে, আমদানি-কর মাঞ্চেস্টারের স্কন্ধে পড়িবে না; প্রকৃত প্রস্তাবে পড়িবে তাহা ভারতেরই স্কন্ধে। পরন্তু তাহাতে করিয়া দরিদ্র রায়তের বস্ত্র ব্যবহারে সবিশেষ বিভ্রাটই ঘটিবে।[১] কিন্তু সে কথা শুনে কে? সেক্রেটারির সমীচীন উক্তি তৎপ্রতি পলিসি আরোপেরই কারণ হইয়াছিল। কিন্তু উচিত কথা বলিতে হইলে সেক্রেটারি-অব-স্টেট এ সম্বন্ধে অবশ্যই ধন্যবাদের পাত্র। তবে তিনি সকল দিক রাখিতে গিয়া কোনো দিকই রক্ষা করিতে পারেন নাই; এ কথাও সত্য। তিনি এ-দেশীয় আন্দোলকদিগের সন্তোষার্থে বিলাতি

---

১. I should like to ask who is going to pay the taxes on the goods imported ? The people of India, the consumers of India. . . .Whether import duties are right or wrong, whatever duty you levy on cotton goods must inevitably be paid by the people who wear these cotton goods in India. The tax, would therefore be a tax upon the people of India and not upon the Lancashire manufacture. সেক্রেটারি-অব-স্টেট মি. ফাউলারের বক্তৃতা হইতে উদ্‌ধৃত।

বস্ত্রের আমদানি-কর এবং মাঞ্চেস্টারের মন রাখিবার জন্য এ দেশে এক্সাইস কর বসাইয়াছেন—ফল হইয়াছে উভয় পক্ষেরই অসন্তোষ। পরন্তু বস্ত্রক্রেতা দরিদ্র প্রজা-সাধারণেরও তিনি সন্তোষভাজন হইতে পারেন নাই। কারণ কাপড়ের কর তাহাদিগেরই দিতে হইবে।

এ স্থলে কথা উঠিতে পারে যে, গবর্নমেন্টের অর্থের অনটন। বজেটে আয় অপেক্ষা ব্যয়ের অঙ্ক বিষম বেশি। ব্যয়ের অঙ্কের সহিত আয়ের অঙ্ক যে রূপেই হউক সমান করিতে হইত। তজ্জন্য গরিব রায়তের শরীরের শিরা কাটিয়া শোণিত বাহির করিতে হইলেও গবর্নমেন্ট ছাড়িতেন না। অতএব ট্যারিফট্যাক্স হইয়া বরং ঠেকাইয়াছে। নহিলে নিশ্চয়ই আর-একটা নেহাত সাংঘাতিক শুল্ক সংস্থাপিত হইয়া দেশমধ্যে মহা অনর্থ ঘটাইত।

আমরা এরূপ যুক্তি আপাদমস্তক অনুমোদন করিতে পারি না। বজেটের দুই দিকে একই অঙ্ক সন্নিবেশের জন্য গবর্নমেন্ট গর্হিত উপায়ে আয়ের অঙ্ক না বাড়াইয়া উচিত উপায়ে ব্যয়ের অঙ্ক কমাইয়া আয়ের অঙ্কের অনুপাতে আনিতে পারিতেন। তজ্জন্য আন্দোলন হইতেছিল। সেই আন্দোলন অধিকতর ব্যাপ্ত ও বলশালী করা উচিত ছিল। ন্যাশনাল কংগ্রেস গবর্নমেন্টের অন্যায্য ও অতিরিক্ত ব্যয় কমাইবার জন্য বহুকাল আন্দোলন করিতেছেন। সে আন্দোলন একেবারেই যে নিষ্ফল হইয়াছে ও হইবে এমনও নয়। এ সম্বন্ধে অন্তত একটা কমিশনেরও আদেশ হইয়াছে। সে কমিশনের কার্য আরম্ভ ও শেষ না হওয়া পর্যন্ত গবর্নমেন্টকে এই উৎকট কর বসাইবার অবসর দেওয়া ও অনুরোধ করা প্রজানীতির উচিত হয় নাই। গবর্নমেন্ট স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া বস্ত্র ব্যতীত অন্যান্য দ্রব্যের উপর আমদানি ট্যাক্স বসাইয়াছিলেন। তাহারই প্রাণপণ প্রতিবাদ হওয়া আবশ্যক ছিল; গবর্নমেন্ট যে দ্রব্যের উপর ট্যাক্স বসাইতে উৎসুক ছিলেন না, অস্বাভাবিক আন্দোলন দ্বারা তাহাতে তাঁহাকে প্রবৃত্ত করা প্রকৃত প্রজানীতির অনুরূপ কার্য হয় নাই। পরন্তু, এই কাপড়ের কর আর কোনো একটা কুৎসিত কর সংস্থাপন করিলে এবং প্রজাপক্ষ হইতে অধ্যবসায়ের সহিত তাহাতে আপত্তি হইলে, সে কর নিশ্চয়ই চিরকাল টিকিত না। ফলত আবদার করিয়া একটা এত বড়ো করভার গ্রহণ করা নেহাত নির্বোধের কাজ—নিজের নাসিকা ছেদনের মতোই হইয়াছে। কর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষই হউক কর ভিন্ন আর কিছুই নহে। পরোক্ষ হওয়াতে করের প্রচণ্ডতা কিছুই কমে না; তাহাতে করিয়া কেবল তাহার কপটতা ও প্রবঞ্চনাই সূচিত হয়।

এ দেশে ইংরাজের আমলে বস্ত্রকর বহুকালই ছিল না। খৃ. ১৮৫৯ সালে এই কর প্রবর্তিত হয়। আমদানি কাপড় ও সুতার উপর শতকরা পাঁচ টাকা হারে শুল্ক বসে। এবং সেই হিসাবে ওই শুল্ক পাঁচ বৎসর পর্যন্ত চলে। ১৮৬৪ সালের ২৩ আইনে উহা পাঁচ টাকা হইতে শতকরা সাড়ে সাত টাকায় উঠে। ১০/১১ বৎসর পরে ১৮৭৫ সালের ১৬ আইনে উহা পুনঃ পাঁচ টাকায় পরিণত হয়। ১৮৮২ সালে এই শুল্ক একেবারেই উঠিয়া যায়। ১৮৮২ সালের ১১ আইনে ট্যারিফ ট্যাক্স সম্পূর্ণরূপে রহিত হইয়াছিল এবং অনেকানেক রপ্তানি দ্রব্যের মাশুলও উঠিয়া গিয়াছিল।

আজ আবার বারো বৎসর পরে পুনঃ বস্ত্রকর আসিয়া উপস্থিত। বস্ত্র যখন নিষ্কর ছিল তখনই সব লোকে বস্ত্রের ব্যয় কুলাইয়া উঠিতে পারিত না। দেশ এতই দরিদ্র যে, মাঞ্চেস্টারের মহা সুলভ বস্ত্রও সকলে কিনিতে পারে নাই। এই প্রবন্ধের লেখক দেশমধ্যে এমন অনেক পল্লী ও পরগনা দেখিয়াছে যেখানে বারো আনা রকম লোক নির্বস্ত্র। কৃষাণ ও মজুর শ্রেণীর পরিধেয় কেবল অর্ধহস্ত পরিমিত একটি লঙ্গটি মাত্র। 'শতগ্রন্থি বস্ত্র' প্রবাদবাক্য; কিন্তু সহস্রাধিক গ্রন্থিযুক্ত জীর্ণ বস্ত্রে ললনা-অঙ্গের লজ্জা আবৃত বা অনাবৃত হইতেও অনেক স্থলে দেখিয়াছি। বস্ত্রের নিষ্কর সময়েও অনেক স্থলে অবস্থা এই; অতএব বস্ত্রের উপর কর বসিয়া তাহার মূল্য কিঞ্চিৎমাত্র বাড়িলেও ওই অবস্থা কীরূপ হইবে তাহা কেবল অনুভবনীয়। অন্ন এবং বস্ত্র এই দুইটি দ্রব্য মনুষ্যজীবনে এবং মনুষ্যসমাজে একান্ত অপরিহার্য আবশ্যকীয়; এই দুই সামগ্রী যত সুলভ ও

সুপ্রাপ্য হওয়া সম্ভাবিত হইতে পারে, তাহা করা রাজনীতি ও প্রজানীতি উভয়েরই কর্তব্য। মনুষ্য-অস্তিত্বের সর্বপ্রধান উপাদান অন্নবস্ত্রের উপর কোনো কর বসাই উচিত নয়; বিশেষত উহা অতিরিক্ত করের বিষয়ীভূত হওয়া ন্যায়ত ও ধর্মত অন্যায়; রাজনৈতিক ক্ষেত্রে উহা প্রাজ্ঞতারও অনুমোদিত নহে।

এবারকার আইনটি যেরূপ হইল অল্পের মধ্যেই বলা যাইতেছে। বিদেশী ও বিলাতি আমদানি কাপড় ও সুতার শতকরা পাঁচ টাকা কর নির্ধারিত হইয়াছে। ইহা সাবেক সি কাসটাম ট্যারিফ আইনেরই অন্তর্গত। কিন্তু ইহা ব্যতীত স্বতন্ত্র একটি আইন হইয়াছে, তাহার নাম ১৮৯৪ সালের 'কটন ডিউটিস্ অ্যাক্ট'। এই আইন আমদানি বস্ত্র শুল্ক আইনেরই অনিবার্য ফল, অগ্রেই বলিয়াছি। কেননা বিদেশী বা বিলাতি বস্ত্র বিক্রয়ের ব্যারসা করিয়া, গবর্নমেন্ট, স্বাধীন বাণিজ্যের সূত্রানুসারে, এ-দেশীয় কল-শিল্পজাত বস্ত্রপণ্যের বিক্রয় সংরক্ষণ করিতে সমর্থ নহেন। সুতরাং এ-দেশীয় কলের কাপড়ের উপর কর বসাইতে বাধ্য। সেই কর বসাইবার জন্যই এই 'কটন ডিউটিস্ অ্যাক্ট'। বিলাতি বস্ত্রে শুল্ক না বসিলে এ অ্যাক্ট বা আইন নিশ্চয়ই হইত না। এই আইন অনুসারে দেশী কলের সুতার উপর কর বসিল। সুতার শুল্কের অর্থই বস্ত্রের কর; কারণ যে সুতার বস্ত্রে বয়ন হইবে সে সুতারও শুল্ক লাগিবে; সুতরাং বোনা বস্ত্রের উপর কর না বসিয়া অবোনা সুতার উপরেই শুল্ক হইয়াছে। অর্থ একই। করের হার আমদানি-করেরই সমান অর্থাৎ শতকরা পাঁচ টাকা করিয়াই হইয়াছে। তবে ইহার মধ্যে একটু কথা এই যে, দেশী কলে হয় মোটা সুতা; বিলাতি কলে জন্মে সরু সুতা। বোম্বে অঞ্চলের কল, বিলাতি কলের সরু সুতার সহিত বড়ো বেশি প্রতিযোগিতা করে না। যে পরিমাণে প্রতিযোগিতা সেই পরিমাণেই কর বা আইন প্রয়োজন। অতএব দেশী কলে যে পরিমাণে অপেক্ষাকৃত ও অত্যল্প সরু সুতা উৎপন্ন হয়; তাহারই উপর কর বসিয়াছে। অর্থাৎ দেশী কলে ২০ নম্বরের সুতার ও তন্নিম্ন শ্রেণীর সুতার কর লাগিবে না; ২১ নম্বর হইতে তদূর্ধ্ব নম্বরের সরু সুতারই শুল্ক লাগিবে। গবর্নমেন্ট যদি কখনো ইচ্ছা করেন অর্থাৎ ইহার পর অতিরিক্ত তথ্য সংগৃহীত হইয়া প্রতিপন্ন হয় যে, এ-দেশীয় কলে ২০ নম্বরের সুতা অপেক্ষা সূক্ষ্ম সুতা প্রস্তুত হয় না; তাহা হইলে আইন একটু সংশোধিত করিবেন; ২০ নম্বর ২৪ নম্বরে পরিণত হইবে। অর্থাৎ ২৪ নম্বর পর্যন্ত সুতার শুল্ক লাগিবে না, তদূর্ধ্ব হইলেই তাহা লাগিবে। পরন্তু, এ-দেশীয় কল হইতে যে-সকল সুতা অন্য দেশে রপ্তানি হইবে, তাহার শুল্ক লাগিবে না; দেশমধ্যে যে-সকল সুতা বিক্রয় হইবে এবং দেশমধ্যে বিক্রেয় বস্ত্র যে-সকল সুতায় প্রস্তুত হইবে তাহারই কেবল শুল্ক লাগিবে। দেশের লোকের সুখ-সুবিধার প্রতি ইহা যৎপরোনাস্তি শুভ দৃষ্টি বটে!! 'কটন ডিউটিস্ অ্যাক্ট' সমগ্র ব্রিটিশ ভারতে সমান বর্তিবে এবং আইন হওয়ার পর হইতেই, আজ কয়েক দিন হইল উহা আমলে আসিয়াছে। দেশীয় রাজাদিগের রাজ্যও বাদ পড়ে নাই। তাহা বিদেশ ও বিলাতের মধ্যেই পরিগণিত হইয়াছে। তথাকার কল হইতে যে-সকল কাপড় সুতা ব্রিটিশ-ভারতে আসিবে তাহারও শুল্ক চাই। অতএব দেশীয় রাজার রাজ্যে গিয়াও যে কাপড় সুতার কল পাতিয়া আইনের হস্ত এড়াইবে, সে উপায়ও নাই। মাননীয় মি. ওয়েস্টল্যান্ডের এ সম্বন্ধে আমাদের উপকারে উক্তি অতি চমৎকার উপাদেয়। তাহাতে হাস্য করুণ এই উভয়বিধ বিরোধী রসেরই একত্রে উদ্রেক হয়।

কয়েক দিন ধরিয়া সুপ্রিম কাউন্সিলে এই আইনের অত্যধিক আলোচনা হইয়াছিল। এবং তাহাতে অত্যধিক পরিমাণে অর্থনৈতিক কথাও নিহিত ছিল। কিন্তু তাহা সমালোচনা করার স্থান নাই। তবে এক কথায় ইহা বলা যাইতে পারে যে, এ দেশের পক্ষ হইতে বেসরকারি সদস্যেরা যে-সকল তর্ক উপস্থিত করিয়াছিলেন তাহা রাজনৈতিক ও আনুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক হিসাবে এত দুর্বল যে, তাহা দাঁড়াইতে পারে নাই বলিয়া আমরা আশ্চর্য নহি।

কটন ডিউটি আইনে অন্যান্য অনিষ্ট ব্যতীত স্বদেশীয় শিল্প ও শ্রমের বিপুল অনিষ্টসাধন করিবে। এ আইন যতই সাবধানে অনুষ্ঠিত হউক এখন হইতে এ-দেশীয় কাপড় সুতার

কলগুলিকে সরকারি পাহারার প্রচণ্ড দৃষ্টির উপর সর্বদাই থাকিতে হইবে। বিন্দুমাত্রও পদস্খলন হইলে নিস্তার থাকিবে না। কলের কার্য ও সমস্ত কাগজপত্র যদৃচ্ছা সরকারি পরীক্ষা ও পরিদর্শনের অধীন হইবে, হিসাবের একটুকুও এদিক-ওদিক হইলে দ্রব্যের দেয় মাশুলের তিনগুণ মাশুল আদায় হইবে। সরকারি তফিখাতে কোনো রকমের তঞ্চকতা-প্রবঞ্চনাদি প্রমাণ হইলে হাজারো টাকা জরিমানা হইবে; পেনালকোড আমলে আসিবে; কলওয়ালাদিগের কারাবাসও হইতে পারিবে। কলের কাপড় সুতার স্বদেশীয় শিল্প তাহার এই শৈশবাবস্থায় আইনের এত অগ্নিপরীক্ষা পার হইয়া উঠিতে পারিবে কি না সন্দেহ। সুতরাং কলের স্বত্বাধিকারীরা স্বভাবতই মহা উৎকণ্ঠিত ও আতঙ্কিত হইয়াছেন। আইনে আপত্ত করিতেছেন। কিন্তু এখন আপত্তি করা অনর্থক। 'ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন।' আক্ষেপ এই যে, স্বদেশহিতৈষীরা তাঁহাদিগকে ভাবিবার অবসর দেন নাই। আবদার করিয়াই এই উৎকট আইন করাইয়াছেন। আইনের উদ্দেশ্যে স্পষ্টই লিখিত আছে—

The finer classes of cotton manufactured in India enter into direct competition with the cotton manufactures imported from England. As it is intended to weight these last with an import duty, it is considered necessary to levy at the same time a contervailing duty upon the competitive classes of Indian manufactures.

অতএব আপত্তি করা এখন বৃথা। এই আইন হওয়ার অঙ্গীকারেই আমদানি-কর বসিয়াছে। আমদানি-কর না উঠিয়া গেলে, এ আইন রদেরও সম্ভাবনা নাই! আমরা এ উভয়কেই সমান আপদজনক বিবেচনা করি। বেঙ্গল কাউন্সিলে ড্রেনেজ কর প্রস্তুত হইয়াছে; অবিলম্বেই আবির্ভূত হইয়া জমিদার ও রায়তের কর-ভারপীড়িত স্কন্ধ পুনঃ প্রপীড়িত করিবে। তাহার পূর্বেই কাপড়ের কর উপস্থিত। দেশে অন্নবস্ত্রের একেই তো এই সচ্ছলতা তাহার উপর আইন-কানুনের এমন সব মেওয়া ফল, পরম রমণীয়ই বটে! তবে আমাদের শত্রুশিবির হইতে বরং কিঞ্চিৎ মঙ্গল আগমনের আশা করা যাইতে পারে। আমদানি মাশুলে মাঞ্চেস্টারের মহাজন ও শক্তিশালী শ্রমজীবীগণ আপত্তি উপস্থিত করিয়াছেন। এ আপত্তি উগ্রভাব ধারণ করিলে, তাহা উল্লঙ্ঘন করা বড়ো সহজসাধ্য হইবে না; একটা সুযোগ খুঁজিয়া আমদানি-কর উঠাইতেই হইবে। যদি আদৌ কোনো আশা থাকে, ইহাই এখন আশা।

সাধনা
মাঘ ১৩০১

সংযোজন

পৃ ১২৯ ।। ছত্র ১৩-এর পরে 'ভুবনমোহিনীপ্রতিভা, অবসরসরোজিনী ও দুঃখসঙ্গিনী' প্রবন্ধটির শেষাংশ :

"THE WOUNDED CUPID"

Cupid, as he lay among
Roses, by a bee was stung.
Whereupon, in anger flying
To his mother said thus, crying,
Help, O help, your boy's a-dying!
And why my pretty lad, said she.
Then, blubbering, replied he,
A winged snake has beaten me,
Which country people call a bee.
At which she smiled; then with her hairs
And kisses drying up his tears
Alas, said she, my wag! if this
Such a pernicious torment is;
Come, tell me then, how great's the smart
Of those thou woundest with thy dart?

"HERRICK"

মধুমক্ষিকা-দংশন

একদা মদন করিয়া যতন,
বাছি বাছি তুলি কুসুমরতন
রচিল শয়ন মনের মতন,

*

ঘুমের ঘোরেতে হয়ে অচেতন
মুদিয়া নয়ন রহিল মদন

*

ঘুমঘোরে কাম নড়িল যেমন,
মধুমাছি-দেহে বাজিল চরণ;
রাগভরে মাছি সবলে তখন
ফুটাইল কাম-চরণে হুল।
অধীর হইয়া বিষের জ্বালায়
উঠি রতিপতি ছুটিয়ে পালায়
প্রিয়তমা রতি বসিয়ে যথায়
গাঁথিতে ছিলেন মালতী ফুল।
'অয়ি প্রিয়তমে!' কহিল রতিরে
'রতিনাথ, প্রাণ যায় যে অচিরে

*

কেন শুইলাম বিছাইয়া ফুল
তাই মধুমাছি ফুটাইল হুল
কী হবে কী করি প্রাণ যে যায়!'

*

কহে কামে রতি নিকটে আসিয়ে,
'ছোটো মধুমাছি দিয়েছে বিঁধিয়ে

*

তাই তুমি, নাথ! হইলে কাতর
ভালো, বলো দেখি দাসীর গোচর
কতই জ্বলিবে তাহার অন্তর,
পঞ্চশর তুমি বিঁধিবে যায়?'

Flow on thou shining river;
But ere thou reach the sea,
Seek Ella's bower and give her
The wreath I fling o'er thee etc.
MOORE

প্রবাহি চলিয়া যাও অয়ি লো তটিনি!
কিছু দূরে গিয়ে, পরে দেখিবে নয়নে;
তব তটে বসি মম সুচারু হাসিনী
নব বিবাহিতা বালা আনত আননে!
এই লও, স্রোতে তব দিনু ভাসাইয়া
কমলকুসুমমালা, দিয়ে করে তার।
ইত্যাদি।

এই ইংরাজি কবিতা ও বাংলা কবিতাগুলিতে অতি অল্প প্রভেদ আছে।

বাঙালি ভায়ারা করি নিবেদন
জোড় করি বন্দি ও রাঙা চরণ।
যা-কিছু বলিনু ভালোরি কারণ
ভাবি দেখো মনে কোরো না রাগ।
রাগ তো কর না দাসত্ব করিতে
রাগ তো কর না নিগার হইতে
পাদুকা বহিতে অধীন রহিতে
হৃদয়ে লেপিয়া কলঙ্কদাগ!
এ-সব করিতে রাগ যদি নাই
আমার কথায় রেগো না দোহাই
বাড়িবে কলঙ্ক আরও তা হলে!

অবসরসরোজিনীর কবি ভাবিতেছেন তিনি হাসিতে হাসিতে, উপহাস করিতে করিতে খুব বুঝি অর্থ স্পর্শ করিতেছেন, কিন্তু 'বাঙালি ভায়ারা' ইত্যাদিতে কবিতার উপর অভক্তি ভিন্ন আর কোনো ভাব মনে আসে না। তাঁহার মনোরচিত কবিতার মধ্যে ছন্দ আছে বটে, কিন্তু ভাব নাই। তাঁহার প্রেমের কবিতার মধ্যে কৃত্রিমতা ও আড়ম্বর আছে বটে কিন্তু অনুরাগের জ্বলন্ত তেজ নাই। তিনি 'কেন ভালোবাসি?'র ন্যায় একটি কবিতা লিখিতে পারেন না এবং ভুবনমোহিনীরও

তাঁহার 'প্রিয়তমা হাসিল'র ন্যায় কবিতা মনে আসিতে পারে না। সরোজিনীর মধ্যে রূপক তুলনার কৌশলবাক্যের আড়ম্বর আছে, কিন্তু সেগুলি হৃদয় স্পর্শ করে না। ভুবনমোহিনীর কবিতার মধ্যে অর্থহীনতা, অসম্বদ্ধ রচনা অনেক আছে তথাপি সেগুলি সত্ত্বেও কতকগুলি কবিতা হৃদয় স্পর্শ করে।

যদিও ভুবনমোহিনীর কবিতার মধ্যে প্রয়াসজাত কবিতা নাই, সবগুলিই প্রতিভার চিরজীবন্ত নির্ঝরিণী হইতে উৎসারিত, তথাপি যদি ভুবনমোহিনীকে মন হইতে স্থানান্তরিত করিয়া কবিতাগুলি পড়ি তবে কেমন লাগে বলিতে পারি না। আমরা ইহার যাহাই পড়িতে যাই তাহাতেই ভুবনমোহিনীকে মনে পড়ে। গুণ পাইলে অমনি ভুবনমোহিনীকে মনে পড়ে, অমনি সেই গুণ দ্বিগুণিত হইয়া মনে উঠে। দোষ পাইলে অমনি ভুবনমোহিনীকে মনে পড়ে, অমনি তাহার চতুর্থাংশ কমিয়া যায়। যখন আমরা

রুধির মেখেছে, রুধির পিতেছে,
রুধির প্রবাহে দিতেছে সাঁতার
ছিন্ন শীর্ষ শব, ভেসে যায় সব
পিশাচী প্রেতিনী কাতারে কাতার।
সস্বনে নিস্বনে মলয় পবন,
আহ্বরি সুরভি নন্দনরতন
মন্দারসৌরভ অমৃতরাশি
মর্মরিছে তরু অটল ভূধর,
দমিছে দাপেতে কাঁপিছে শিখর—

প্রভৃতি পড়িয়া কিছুই অর্থ করিতে পারি না তখন ভুবনমোহিনীকে মনে পড়ে এবং ইহার অর্থ বুঝিতেও চাই না! যখন উন্মাদিনী পড়িয়া আমাদের হাসি আসে তখন ভুবনমোহিনীকে মনে পড়ে, অমনি হাসি চাপিয়া ফেলি! যখন প্রতিভার 'পিশাচী' 'প্রেতিনী' -ময়ী কবিতার মধ্যে কোনো কর্কশ কথা পাই তখনি ভুবনমোহিনীকে মনে পড়ে ও আমরা যথাসাধ্য কোমল করিয়া পাঠ করি! একজনকে আমি 'উন্মাদিনী' কবিতার অর্থ বুঝাইতে বলি; তিনি কহিলেন আমি ইহার অর্থ বুঝাইতে পারি না, কিন্তু ইহার অভ্যন্তরে একটি মাধুর্য আছে। কবিতার মধ্যে যাহা অসম্বদ্ধ প্রলাপ, যাহার অর্থ হয় না, লোকে তাহার মধ্যে মাধুর্য কল্পনা করে; এবং দর্শনের মধ্যে যে অংশটুকু দুর্বোধ্য ও কঠোর তাহাই পাঠকেরা গভীর দর্শন বলিয়া মনে করেন। অনেক গীতিকাব্যের দোষ এই যে তাহার শৃঙ্খলা নাই, অর্থ নাই, উন্মত্ততাময়; অনেকে মনে করেন এরূপ উন্মত্ততা না হইলে কবির উচ্ছ্বসিত হৃদয় হইতে যে কবিতা প্রসৃত হইয়াছে তাহার প্রমাণ থাকে না। প্রতিভা এই দোষে কলঙ্কিত। ইহার অনেক দোষ পরিহার করিয়া কতকগুলি কবিতা পাই যাহা উচ্চশ্রেণীর কবিতা বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

'সরোজিনী' ও 'প্রতিভা' পড়িতে পড়িতে আমরা 'দুঃখসঙ্গিনী'কে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। দুঃখসঙ্গিনীতে আর্যসংগীত নাই, আর্যরক্ত নাই, যবন নাই, রক্তারক্তি নাই; ইহাতে হৃদয়ের অশ্রুজল, হৃদয়ের রক্ত ও প্রেম ভিন্ন আর কিছুই নাই। হৃদয়ের বৃত্তিনিচয়ের মধ্যে প্রেমে যেমন বৈচিত্র্য আছে এমন আর কিছুতেই নাই। প্রেমের মধ্যে দুঃখ আছে, সুখ আছে, নৈরাশ্য আছে, দ্বেষ আছে, এবং প্রেমের সহিত অনেকগুলি মনোবৃত্তি জড়িত। এখন কতকগুলি সমালোচক ধুয়া ধরিয়াছেন যে প্রেমের কথা কহিলে বঙ্গদেশ অধঃপাতে যাইবে। এ কথার অর্থ খুব অল্পই আছে। হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ বৃত্তি প্রেমকে অবহেলা করিয়া যিনি তেজস্বিতা সঞ্চয় করিতে চাহেন তিনি মানবপ্রকৃতি বুঝেন না। যে মনুষ্যের হৃদয়ে প্রেম নাই তেজস্বিতা আছে, তাহার হৃদয় নরক! কিন্তু যাহার হৃদয়ে প্রকৃত প্রেম আছে, তাহার তেজস্বিতা আছেই। তুমি কবি! নৈরাশ্য বিষাদ -জনিত অশ্রুজল যদি তোমার হৃদয়ে জমিয়া থাকে, তবে তাহা প্রকাশ করিয়া ফেলো! তাহা দমন করিয়া

তুমি বলপূর্বক যেন 'ভারত' 'একতা' 'যবন' প্রভৃতি বলিয়া চিৎকার করিয়ো না। কবিতা হৃদয়ের প্রস্রবণ হইতে উত্থিত হয়, সমালোচকদের তিরস্কার হইতে উত্থিত হয় না। দুঃখসঙ্গিনীর বিষয় আমরা এই বলিতে পারি— তাহার ভাষা অতিশয় মিষ্ট। তিনি যেখানে কিছু বর্ণনা করিয়াছেন সেইখানকার ভাবাই মিষ্ট হইয়াছে। তবে একটি কথা স্বীকার করিতে হয় যে, তাঁহার ভাবের মাধুর্য অপেক্ষা ভাষার মাধুর্য অধিকতর মন আকর্ষণ করে। এই পুস্তকের মধ্যে হইতে আমরা অনেক সুন্দর পঙ্‌ক্তি তুলিয়া দিবার মানস করিয়াছিলাম, কিন্তু বাহুল্য-ভয়ে পারিলাম না।

গ্রন্থপরিচয়

রবীন্দ্রনাথের যে-সকল রচনা দীর্ঘকাল যাবৎ অগ্রন্থিত থাকিয়া গিয়াছে এবং বিভিন্ন সাময়িকপত্রে প্রকীর্ণ হইয়া আছে, বিভিন্ন সময়ে রবীন্দ্রানুরাগী গবেষকেরা তাহার তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন। সম্পূর্ণ এবং অভ্রান্ত না হইলেও, সেইসব তালিকা আমাদের বিচার-বিবেচনার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সাহায্য করে। বর্তমান খণ্ডের রচনাগুলি এবং ইহার গ্রন্থপরিচয় সংকলনের কাজে আমরা প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রবোধচন্দ্র সেন, পুলিনবিহারী সেন এবং কানাই সামন্তের বিভিন্ন গবেষণার কাছে ঋণী। পরবর্তী পর্যায়ে এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য কাজ করিয়াছেন শ্রীঅমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, শ্রীমতী সঙ্ঘমিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীপ্রশান্তকুমার পাল, শ্রীমতী সাধনা মজুমদার এবং শ্রীঅনাথনাথ দাস। সেইসব কাজের, এবং আরও কোনো কোনো নূতন সন্ধানের সাহায্য লইয়া এই গ্রন্থপরিচয় সংকলিত হইল। গ্রন্থপরিচয় প্রস্তুত করিয়াছেন শ্রীঅনাথনাথ দাস এবং শ্রীপ্রশান্তকুমার পাল।

কবিতা

কবিতাগুলির সাময়িকপত্রে, কোনো কোনো স্থলে গ্রন্থে, প্রথম প্রকাশের সূচী নিম্নে দেওয়া হইল :

১. অভিলাষ	তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ৮ম কল্প, ৪র্থ ভাগ, অগ্রহায়ণ ১৭৯৬ শক (১২৮১ বঙ্গাব্দ)
২. 'হোক ভারতের জয়'	বান্ধব, মাঘ ১২৮১
৩. হিন্দুমেলায় উপহার	অমৃতবাজার পত্রিকা, ১৪ ফাল্গুন ১২৮১। ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৫
৪. প্রকৃতির খেদ : দ্বিতীয় পাঠ	প্রতিবিম্ব, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, বৈশাখ ১২৮২
৫. প্রকৃতির খেদ : প্রথম পাঠ	তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, আষাঢ়, ১৭৯৭ শক। ১২৮২ বঙ্গাব্দ, জুন ১৮৭৫ খৃস্টাব্দ।
৬. 'জ্বল্ জ্বল্ চিতা! দ্বিগুণ, দ্বিগুণ'	জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর -প্রণীত 'সরোজিনী বা চিতোর আক্রমণ নাটক'-এর অন্তর্গত। অগ্রহায়ণ ১২৮২। নভেম্বর ১৮৭৫
৭. প্রলাপ ১	জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব, অগ্রহায়ণ ১২৮২
৮. প্রলাপ ২	জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব, ফাল্গুন ১২৮২
৯. প্রলাপ ৩	জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব, বৈশাখ ১২৮৩
১০. দিল্লি দরবার	জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত 'স্বপ্নময়ী' নাটকের অন্তর্গত। ১৮৮২ খৃস্টাব্দ
১১. ভারতী	ভারতী, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, শ্রাবণ ১২৮৪
১২. হিমালয়	ভারতী, ভাদ্র ১২৮৪
১৩. আগমনী	ভারতী, আশ্বিন ১২৮৪
১৪. আকুল আহ্বান	বালক, আশ্বিন-কার্তিক ১২৯২
১৫. অবসাদ	বালক, চৈত্র ১২৯২
১৬. মেঘ্‌লা শ্রাবণের বাদ্‌লা রাতি	আনন্দবাজার পত্রিকা, শারদীয়া সংখ্যা ১৩৭১
১৭. শারদা	ভারতবর্ষ, কার্তিক ১৩২৪

১. ৩৯টি স্তবকে রচিত 'অভিলাষ' কবিতাটির শিরোনামের নীচে 'দ্বাদশবর্ষীয় বালকের রচিত' এই সম্পাদকীয় মন্তব্য মুদ্রিত আছে। সজনীকান্ত দাস কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের রচনা, এইরূপ

অনুমান করিয়া 'তাঁহার নিকট উপস্থিত করিলে তিনি উহা নিঃসংশয়ে আপনার বলিয়া স্বীকার' করেন। বর্তমান প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য, সজনীকান্ত দাস -কৃত 'রবীন্দ্র-রচনাপঞ্জী', শনিবারের চিঠি, অগ্রহায়ণ ১৩৪৬ এবং 'রবীন্দ্রনাথ/জীবন ও সাহিত্য' গ্রন্থ (প্রকাশ ১৩৬৭)।

২. কালীপ্রসন্ন ঘোষ -সম্পাদিত, ঢাকা হইতে প্রকাশিত 'বান্ধব' মাসিক পত্রিকার মাঘ ১২৮১ সংখ্যায় 'হোক ভারতের জয়' শীর্ষক কবিতাটি প্রকাশিত। রচনাশেষে '(র)' আদ্যক্ষর মুদ্রিত। 'হিন্দুমেলা উপলক্ষে এই কবিতাটি রচিত হইয়াছিল' এই মন্তব্য পাদটীকায় আছে। কবিতাটি রথীন্দ্রকান্ত ঘটকচৌধুরী 'রবীন্দ্রনাথের একটি দুষ্প্রাপ্য কবিতা' শিরোনামে ১৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৩ সংখ্যা 'দেশ' পত্রিকায় প্রাসঙ্গিক তথ্যসহ পুনর্মুদ্রণ করেন। এই কবিতা হিন্দুমেলার উদ্‌বোধন উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ আবৃত্তি করেন তাহার প্রমাণ *Indian Daily News* (১৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৫) ও *The Bengalee*-র প্রতিবেদনে (২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৫) লক্ষ করা যায়। *The Bengalee* পত্রিকার পরিবেশিত তথ্যানুসারে, কবিতাপাঠের তারিখ ১ ফাল্গুন ১২৮১ (১২ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৫), কিন্তু *Indian Daily News* পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ অনুসারে কবিতাপাঠের তারিখ ৩০ মাঘ ১২৮১ (১১ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৫)।

অগ্রজ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর -রচিত 'মিলে সবে ভারত সন্তান' গান হইতে 'হোক ভারতের জয়' শিরোনামটি যে রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করেন, তাহা উদ্‌ধৃতি-চিহ্নযুক্ত কবিতা-শিরোনাম হইতে অনুমেয়।

৩. দ্বি-ভাষিক সাপ্তাহিক অমৃতবাজার পত্রিকায় ১৪ ফাল্গুন ১২৮১ (২৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৫) 'শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর' স্বাক্ষরে 'হিন্দুমেলায় উপহার' কবিতাটি প্রকাশিত। পত্রিকার পুরাতন ফাইল হইতে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কবিতাটি উদ্ধার করিয়া ১৩৩৮ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসের 'প্রবাসী' পত্রিকায় পুনর্মুদ্রিত করেন। রবীন্দ্রনাথের পূর্ণ-স্বাক্ষরিত সাময়িকপত্রে মুদ্রিত ইহাই প্রথম কবিতা।

৪. অস্বাক্ষরিত। কবিতা শেষে 'ক্রমশঃ' শব্দটি মুদ্রিত ছিল। পরে অন্য-কোনো পত্রিকায় পরবর্তী অংশ প্রকাশিত হইয়াছিল কি না, এ-বিষয়ে সন্দেহ আছে।

'বিদ্বজ্জন সমাগম'-এর সভায়, রবিবার ২৭ বৈশাখ ১২৮২ (৯ মে ১৮৭৫) কবিতাটি রবীন্দ্রনাথ পাঠ করিয়াছিলেন। উল্লেখনীয়, এই সভায় রবীন্দ্রনাথ 'প্রকৃতির খেদ' কবিতার যে রূপটি আবৃত্তি করিয়া শোনান 'প্রতিবিম্ব' পত্রিকায় প্রকাশকালে তাহার অনেকখানি পরিবর্তিত হইয়া প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকায় সম্পাদকীয় টীকা হইতে জানা যায়, '...লেখক প্রথমে এই পদ্যটির কাপি যেরূপ প্রেরণ করেন, প্রুফ সংশোধনের সময় তাহার অনেক পরিবর্ত্ত করিয়া দেন।... লেখকের সংশোধিত পদ্যটি তৎকালে ['বিদ্বজ্জন সমাগম'-এর সভা : রবিবার ২৭ বৈশাখ ১২৮২] আমাদের নিকট থাকায় অসংশোধিত কাপিখানি দেখিয়া অর্দ্ধাংশমাত্র মুদ্রিত করিয়া 'বিদ্বজ্জনসমাগম' সভায় প্রদান করা হয়। এ জন্য রচয়িতার এই সংশোধিত রচনার সহিত সভার মুদ্রিত রচনার স্থানে স্থানে অনেক প্রভেদ লক্ষিত হইবে।'

৫. 'বালকের রচিত' এই উল্লেখ শিরোনামের নীচে মুদ্রিত। সজনীকান্ত দাস মুদ্রিত কবিতাটি রবীন্দ্রনাথকে দেখাইলে তাঁহার রচনা বলিয়া স্বীকার করেন। বর্তমান প্রসঙ্গে সজনীকান্ত শনিবারের চিঠি-র অগ্রহায়ণ ১৩৪৬ সংখ্যায় প্রকাশিত 'রবীন্দ্র-রচনাপঞ্জী'তে লিখিয়াছেন, 'আশ্চর্যের বিষয়, রবীন্দ্রনাথকে দেখাইতেই তিনি ইহার কয়েক পংক্তি মুখস্থ বলিতে পারিলেন, যদিও দীর্ঘ চৌষট্টি বৎসরের পূর্বেকার কথা।...' এই কবিতা যে রবীন্দ্রনাথ-রচিত তাহার আরও প্রমাণ, অক্ষয়চন্দ্র সরকার -সম্পাদিত 'সাধারণী' ৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৮২ সংখ্যায় প্রকাশিত সংবাদ— 'বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর "প্রকৃতির খেদ" নামে স্বরচিত একটি পদ্যপ্রবন্ধ পাঠ করেন।...' প্রবোধচন্দ্র সেন সম্পূর্ণ সংবাদটি 'রবীন্দ্রনাথের বাল্যরচনা' শীর্ষক প্রবন্ধে (প্রকাশ, দেশ, ১৬ চৈত্র ১৩৫২) সংকলন করিয়াছেন। ইহা ছাড়া, ১২৮২ বঙ্গাব্দের ২ জ্যৈষ্ঠ

শিলাইদহ হইতে লেখা একটি পত্রে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ গুণেন্দ্রনাথকে এই কবিতা প্রসঙ্গে লেখেন, 'বিদ্বজ্জনের card ও রবির কবিতা পাইয়াছি— কর্ত্তামহাশয় কবিতাটী পাঠ করিয়া ভাল বলিলেন।...'

৬. জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সরোজিনী বা চিতোর আক্রমণ নাটক'-এর (প্রকাশ, অগ্রহায়ণ ১২৮২। নভেম্বর ১৮৭৫) ষষ্ঠ অঙ্কের অন্তর্ভুক্ত গান। বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি' (প্রকাশ ১৩২৬) গ্রন্থ হইতে এই তথ্যটি প্রথম জানা গিয়াছে—

> "আমি [জ্যোতিরিন্দ্রনাথ] ও রামসর্ব্বস্ব দুইজনে রবির পড়ার ঘরে বসিয়াই 'সরোজিনী'র প্রুফ্ সংশোধন করিতাম। রামসর্ব্বস্ব খুব জোরে জোরে পড়িতেন। পাশের ঘর হইতে রবি শুনিতেন, ও মাঝে মাঝে পণ্ডিত মহাশয়কে উদ্দেশ্য করিয়া, কোন্ স্থানে কি করিলে ভাল হয়, সেই মতামত প্রকাশ করিতেন। রাজপুত মহিলাদের চিতা প্রবেশের যে একটা দৃশ্য আছে, তাহাতে পূর্ব্বে আমি গদ্যে একটা বক্তৃতা রচনা করিয়া দিয়াছিলাম। যখন এই স্থানটা পড়িয়া প্রুফ্ দেখা হইতেছিল, তখন রবীন্দ্রনাথ পাশের ঘরে পড়াশুনা বন্ধ করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া বসিয়া শুনিতেছিলেন। গদ্য-রচনাটি এখানে একেবারেই খাপ খায় নাই বুঝিয়া, কিশোর রবি একেবারে আমাদের ঘরে আসিয়া হাজির। তিনি বলিলেন— এখানে পদ্য রচনা ছাড়া কিছুতেই জোর বাঁধিতে পারে না। প্রস্তাবটা আমি উপেক্ষা করিতে পারিলাম না— কারণ, প্রথম হইতেই আমারও মনটা কেমন খুঁৎ খুঁৎ করিতেছিল। কিন্তু এখন আর সময় কৈ? আমি সময়াভাবের আপত্তি উত্থাপন করিলে, রবীন্দ্রনাথ সেই বক্তৃতাটির পরিবর্ত্তে একটা গান রচনা করিয়া দিবার ভার লইলেন, এবং তখনই খুব অল্প সময়ের মধ্যেই 'জ্বল্ জ্বল্ চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ' এই গানটি রচনা করিয়া আনিয়া, আমাদিগকে চমৎকৃত করিয়া দিলেন।"

৭-৯. স্বাক্ষরিত রচনা। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কোনো কাব্যের মধ্যে 'প্রলাপ' কবিতাগুচ্ছকে স্থান দেন নাই। 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থের "রচনাপ্রকাশ" অধ্যায়ে আলোচ্য পর্বের কবিতাগুলি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, "এমন সময় 'জ্ঞানাঙ্কুর' নামে এক কাগজ বাহির হইল। কাগজের নামের উপযুক্ত একটি অঙ্কুরোদ্গত কবিও কাগজের কর্তৃপক্ষেরা সংগ্রহ করিলেন। আমার সমস্ত পদ্যপ্রলাপ নির্বিচারে তাঁহারা বাহির করিতে শুরু করিয়াছিলেন। কালের দরবারে আমার সুকৃতি দুষ্কৃতি বিচারের সময় কোন্‌দিন তাহাদের তলব পড়িবে, এবং কোন্ উৎসাহী পেয়াদা তাহাদিগকে বিস্মৃত কাগজের অন্দরমহল হইতে নির্লজ্জভাবে লোকসমাজে টানিয়া বাহির করিয়া আনিবে, জেনানার দোহাই মানিবে না, এ ভয় আমার মনের মধ্যে আছে।"

ইতিপূর্বে প্রকাশিত 'অভিলাষ', 'হোক ভারতের জয়', 'হিন্দুমেলায় উপহার', 'প্রকৃতির খেদ' ইত্যাদি কবিতার সঙ্গে 'প্রলাপ'গুচ্ছটিকেও রবীন্দ্রনাথ বর্জন করেন। 'প্রলাপ' প্রথম সংকলিত হয় রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষ উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ সরকার -কর্তৃক প্রকাশিত 'রবীন্দ্র-রচনাবলী,' তৃতীয় খণ্ডে।

১০. লর্ড লিটনের সময়ে অনুষ্ঠিত (১৮৭৭ খৃস্টাব্দ) দিল্লি দরবার উপলক্ষে রচিত। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'স্বপ্নময়ী' নাটকের (প্রকাশ ১৮৮২ খৃস্টাব্দ) চতুর্থ অঙ্কের চতুর্থ গর্ভাঙ্কে শুভসিংহের স্বগত-উক্তিরূপে মুদ্রিত। 'সাধারণী' সাপ্তাহিক পত্রে ৪ মার্চ ১৮৭৭ তারিখে প্রকাশিত সংবাদে জানা যায়, "... রবীন্দ্রবাবু 'দিল্লীর দরবার' সম্পর্কে একটি কবিতা এবং একটি গীত রচনা করিয়াছিলেন। আমরা একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষ ছায়ায় দূর্ব্বাসনে উপবিষ্ট হইয়া তাঁহার কবিতা এবং গীতটি শ্রবণ করি।... ইচ্ছা হইল রবীন্দ্রের গলা ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলি— আয় ভাই 'আমরা গাইব অন্য গান'।"

যতিনাথ ঘোষ কবিতাটি যথার্থভাবে নিরূপণ করিয়া ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাসকে জানান। বর্তমান প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য, ব্রজেন্দ্রনাথের 'রবীন্দ্র-গ্রন্থ-পরিচয়' (সং মাঘ ১৩৫০) ও সজনীকান্তের 'রবীন্দ্রনাথ / জীবন ও সাহিত্য' (১৩৬৭) গ্রন্থ। উভয় স্থলেই কবিতাটি সংকলিত। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের সঙ্গে আলোচনাকালে রবীন্দ্রনাথ 'ধৃতরাষ্ট্রের বিলাপ'/'ধৃতরাষ্ট্র বিলাপ' নামে একটি কবিতা ('লর্ড লিটনের সময়ের কবিতা') হিন্দুমেলায় পাঠ করিয়া প্রশংসা অর্জন করিয়াছিলেন, অস্পষ্টভাবে এইটুকু স্মরণ করিতে পারিয়াছিলেন। কবিতাটির সন্ধান এখনো পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই।— দ্রষ্টব্য, 'রবীন্দ্রনাথ', প্রশান্তচন্দ্র মহলাবিশ, দিনলিপি। 'রবীন্দ্রবীক্ষা', সংকলন ২৮, শ্রাবণ ১৪০২।

১১. অস্বাক্ষরিত। 'ভারতী' পত্রিকার প্রথম কয়েক বৎসরের অস্বাক্ষরিত রবীন্দ্ররচনা তালিকাবদ্ধ করিয়া সজনীকান্ত দাস রবীন্দ্রনাথকে দিয়া যে অনুমোদন করাইয়া লইয়াছিলেন, তাহাতে এই কবিতাটি আছে। রবীন্দ্রনাথের জীবৎকালেই 'শনিবারের চিঠি'র অগ্রহায়ণ ১৩৪৬ সংখ্যায় প্রকাশিত সজনীকান্ত-কৃত 'রবীন্দ্র-রচনাপঞ্জী' প্রবন্ধে 'ভারতী' কবিতার নাম তালিকাবদ্ধ হইয়াছে।

শিল্পী ত্রৈলোক্যনাথ দেব -অঙ্কিত 'ভারতী' পত্রিকার প্রচ্ছদ-চিত্রের সহিত রবীন্দ্রনাথের কবিতাটির ভাব-সামঞ্জস্য লক্ষণীয়।

১২. অস্বাক্ষরিত। সজনীকান্ত দাসের পূর্ব-উল্লিখিত তালিকা এবং 'রবীন্দ্র-রচনাপঞ্জী'-ভুক্ত। পরবর্তীকালে 'মালতীপুঁথি'তে ইহার প্রাথমিক রূপটির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার -প্রকাশিত (১৩৯০) 'রবীন্দ্র-রচনাবলী', তৃতীয় খণ্ডে সংকলিত।

১৩. অস্বাক্ষরিত। প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের 'রবীন্দ্র-পরিচয়' প্রবন্ধাবলির (প্রকাশ 'প্রবাসী', মাঘ-চৈত্র ১৩২৮, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯, আষাঢ়-শ্রাবণ ১৩২৯) রচনাপ্রকাশ' অধ্যায়ে রবীন্দ্র-রচনা হিসাবে চিহ্নিত। দ্রষ্টব্য. প্রসঙ্গ 'রবীন্দ্রনাথ' (১৩৯২) গ্রন্থ। রবীন্দ্রনাথ-সমর্থিত, সজনীকান্ত দাস -কৃত তালিকাতেও রচনাটির নাম পাওয়া যায়।

১৪. 'পুষ্পাঞ্জলি'র পাণ্ডুলিপিতে কবিতাটির আদিরূপের সন্ধান পাওয়া যায়, সেখানে ৩৬টি ছত্রে কবিতাটি শেষ হইয়াছে। 'বালক' পত্রিকায়, কবিতাটির মুদ্রিত রূপে দেখা যায় ৭৬টি ছত্রে সমাপ্ত। পাণ্ডুলিপি ও পত্রিকা -ধৃত 'আকুল আহ্বান'-এর মধ্যে নানাবিধ পার্থক্য আছে।

'কড়ি ও কোমল' কাব্যের প্রথম সংস্করণে (১২৯৩) রবীন্দ্রনাথ কবিতাটিকে বিভিন্ন শিরোনামে, নানারূপ গ্রহণ-বর্জনের মধ্য দিয়া তিনটি স্বতন্ত্র কবিতায় পরিণত করিয়াছেন। কবিতাগুলি যথাক্রমে, 'আকুল আহ্বান', 'পাষাণী মা', 'মায়ের আশা'। পরবর্তীকালে প্রকাশিত 'শিশু' কাব্যে 'আকুল আহ্বান' ও 'মায়ের আশা' সংকলনকালে রবীন্দ্রনাথ পুনরায় সম্পাদনা করিয়াছেন। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে, পত্রিকা হইতে গ্রন্থে সংকলনকালে কবিতামধ্যস্থ ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ ক্রমশ বর্জিত হইয়াছে।

আলোচ্য কবিতা-বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য, কানাই সামন্ত, "রবীন্দ্রপাণ্ডুলিপি-বিবরণ/পুষ্পাঞ্জলি", 'বিশ্বভারতী পত্রিকা', শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭৫ এবং 'রবীন্দ্রপাণ্ডুলিপি-পরিচয়' (প্রকাশ ১৩৯৮) গ্রন্থ।

১৫. 'মালতীপুঁথি'তে শিরোনামহীন অবস্থায় কিঞ্চিৎ ভিন্নতর পাঠে কবিতাটি পাওয়া যায়। রচনার স্থান কাল রবীন্দ্রনাথ লিখিয়া রাখিয়াছেন 'Ahmedabad/1878-July 6th / আষাঢ় ২৩শে [১২৮৫] শনিবার।' প্রবোধচন্দ্র সেন 'রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসা' প্রথম খণ্ডে (প্রকাশ, কার্তিক ১৩৭২), 'মালতীপুঁথি/পাণ্ডুলিপি-পরিচয়' প্রবন্ধে রচনাটি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার -প্রকাশিত শতবার্ষিক সংস্করণ 'রবীন্দ্র-রচনাবলী', চতুর্থ খণ্ডে

'শৈশব সঙ্গীত' কাব্যের পরিশিষ্টরূপে 'অবসাদ' সংগ্রথিত হইয়াছে।

১৬. শিরোনামহীন এই কবিতাটি গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর -গৃহীত একটি আলোকচিত্র গ্রহণ উপলক্ষে অথবা আলোকচিত্রটি দেখিয়া রবীন্দ্রনাথ রচনা করেন। গগনেন্দ্রনাথের ফোটোগ্রাফি-চর্চার সময়ের হিসাব অনুমান করিয়া কবিতাটির রচনাকাল ১৮৯০ হইতে ১৮৯৫ খৃস্টাব্দের মধ্যে, এইরূপ ধরা যাইতে পারে। কবিতায় যে-পাঁচজন বন্ধুর উল্লেখ আছে, তাঁহারা অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, সমরেন্দ্রনাথ, সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় ও হরিশ্চন্দ্র হালদার। রবীন্দ্রনাথও সম্ভবত এই সান্ধ্য-মজলিশের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, ঘটনার অনুপুঙ্খ বর্ণনা পড়িয়া তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। এই কবিতা-বিষয়ে প্রাসঙ্গিক অন্যান্য তথ্যাদি আছে, 'রবীন্দ্রবীক্ষা' সংকলন ২৮, শ্রাবণ ১৪০২ সংখ্যায়।

১৭. ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়কে (১২৫৮-১৩১০) লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্রের সহিত 'শারদা' কবিতাটির সন্ধান পাইয়া অমরেন্দ্রনাথ রায় 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার কার্তিক ১৩২৪ সংখ্যায় 'সাহিত্য-প্রসঙ্গ' (পৃ. ৫৭৭) নিবন্ধের-মধ্যে মুদ্রিত করেন। ১৩০১ হইতে ১৩০৯ বঙ্গাব্দের মধ্যে কোনো সময়ে কবিতাটি রচিত হয় বলিয়া অনুমান। এই সময়সীমার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের সহিত ঠাকুরদাসের যোগাযোগের প্রমাণ পাওয়া যায়। কোনো সাময়িক পত্রিকার শারদ সংখ্যার জন্য কবিতাটি রচিত হইয়াছিল এরূপ অনুমান করা যায়, কিন্তু কোথাও মুদ্রিত হইয়াছিল কি না, আমাদের জানা নাই। অমরেন্দ্রনাথ রায় বর্তমান প্রসঙ্গে যাহা লিখিয়াছেন, এখানে তাহা উদ্‌ধৃত হইল—

> রবীন্দ্রবাবুর পত্র :—
>
> রবীন্দ্রবাবু ঠাকুরদাসবাবুকে যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার একখানির মধ্যে তাঁহার হাতের লেখা 'শারদা' শীর্ষক একটি চতুর্দ্দশপদী কবিতা পাইয়াছি। কবিতাটি কোথাও মুদ্রিত হইয়াছে কি না জানি না। সময়োপযোগী বোধে আমরা পত্রের সঙ্গে তাহা মুদ্রিত করিলাম।—
>
> ওঁ
>
> যোড়াসাঁকো
>
> সাদর নমস্কার নিবেদন—
>
> আমি আগামী সোমবার রাত্রে বোলপুর 'শান্তি-নিকেতন' উদ্যানে যাত্রা করিব। ইতিমধ্যে কখন আপনি আমার সহিত দেখা করিতে পারিবেন লিখিয়া পাঠাইলে সুখী হইব। ইতি। শনিবার
>
> শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মালতীপুঁথি-ধৃত কবিতাবলী। রবীন্দ্রভবন অভিলেখাগারে সংরক্ষিত, এ-তাবৎ প্রাপ্ত, সর্বপ্রাচীন রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি 'মালতীপুঁথি' (অভিজ্ঞান সংখ্যা ২৩১) হইতে ১৩টি কবিতা রবীন্দ্র-রচনাবলীর বর্তমান খণ্ডে সংকলিত হইল। দিল্লির লেডি আরউইন স্কুলের অধ্যাপিকা মালতী সেন ১৯৪৩ খৃস্টাব্দের প্রথম দিকে এই পাণ্ডুলিপি বিশ্বভারতীকে দান করেন। তাঁহার নাম হইতেই পাণ্ডুলিপিটির 'মালতীপুঁথি' নামকরণ হইয়াছে। এই পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে প্রবোধচন্দ্র সেনের প্রবন্ধ "মালতীপুঁথি : পাণ্ডুলিপি-পরিচয়" 'রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসা' প্রথম খণ্ড (১৯৬৫), বর্তমান প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য। তাঁহার যুক্তি অনুসারে পাণ্ডুলিপিভুক্ত রচনাবলী ১৮৭৪ খৃস্টাব্দ হইতে ১৮৮২ খৃস্টাব্দ কালসীমার মধ্যে রচিত। পরবর্তীকালে 'রবীন্দ্রবীক্ষা' সংকলন ৮ পৌষ ১৩৮৯ সংখ্যায় প্রকাশিত কানাই সামন্তর 'মালতীপুঁথি পর্যালোচনা'য় নূতনতর কিছু আলোচনা আছে।

বর্তমান রচনাবলীতে 'মালতীপুঁথি'ভুক্ত যে-সকল কবিতা সম্পূর্ণ বলিয়া বিবেচিত সেগুলি গৃহীত হইল। সংকলিত কবিতাবলীর মধ্যে শিরোনামযুক্ত একমাত্র কবিতা 'উপহার-গীতি'। শিরোনামহীন কবিতাগুলির ক্ষেত্রে কবিতার প্রথম ছত্র অথবা প্রথম ছত্রের অংশবিশেষ

শিরোনামরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে :

১. হা বিধাতা ছেলেবেলা হ'তেই এমন
২. এসো আজি সখা
৩. পার কি বলিতে কেহ
৪. ছেলেবেলাকার আহা
৫. আমার এ মনোজ্বালা
৬. উপহার-গীতি
৭. পাষাণ হৃদয়ে কেন
৮. ভেবেছি কাহারো সাথে
৯. হা রে বিধি কী দারুণ
১০. ও কথা বোলো না সখি
১১. কী হবে বলো গো সখি
১২. এ হতভাগারে ভালো
১৩. জানি সখা অভাগীরে

—রচনাকাল : ১৮৭৪-১৮৮২ খৃস্টাব্দ

১. হা বিধাতা— ছেলেবেলা হ'তেই এমন। পাণ্ডুলিপিতে শিরোনামহীন, তবে শিরোনামস্থলে 'প্রথম সর্গ' লিখিত থাকায় অনুমান করা যায়, এটি একটি কাব্য-পরিকল্পনার সূচনা-অংশ। কবিতাটি 'মালতীপুঁথি'র আরম্ভে সংস্কৃত-শিক্ষার নিদর্শনমূলক পৃষ্ঠার পরই লিখিত আছে। প্রবোধচন্দ্র সেনের অনুমান, 'প্রথম সর্গ' রবীন্দ্রনাথের লুপ্ত পাণ্ডুলিপি 'পৃথ্বীরাজের পরাজয়' কাব্যের 'কবিকৃত দ্বিতীয় সংস্করণের অসমাপ্ত অংশ।'

৬. 'উপহার-গীতি' শিরোনামযুক্ত কবিতাটির রচনাকাল অনুমান করা যাইতে পারে ১২৮৪ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসের শেষ দিকে। এরূপ অনুমানের কারণ, কবিতাটির নীচেই '১লা কার্ত্তিক...' তারিখচিহ্নিত 'কবি-কাহিনী' কাব্যের সূচনা। 'উপহার-গীতি', কবি-কাহিনীর 'উৎসর্গপত্ররূপে কল্পিত হওয়া অবাস্তব মনে হয় না'— কানাই সামন্ত এরূপ অনুমান করিয়াছেন (দ্রষ্টব্য, 'রবীন্দ্রবীক্ষা', সংকলন ৮, পৌষ ১৩৮৯)। কবিতাটির শেষে লিখিত আছে '*Les Poetes* হইতে/অনুবাদিত—।' এই শিরোনামের পাশে অস্পষ্টভাবে দেখা যায় 'ভগ্ন [হৃদয়ের] উপরে'। সম্ভবত, ভিক্টর য়্যুগোর *Les Contemplations* কাব্যগ্রন্থের *Les Poetes* কবিতার অনুবাদ এই স্থলে করিবেন, রবীন্দ্রনাথ এইরূপ ভাবিয়াছিলেন। 'উপহার-গীতি'র পাশের পৃষ্ঠায় ভিক্টর য়্যুগোর একটি কবিতার অনুবাদ দৃষ্ট হয় : ওই যেতেছেন কবি কাননের পথ দিয়া।

সংযোজন

সন্ধ্যাসংগীত (১৮৮২), প্রভাতসংগীত (১৮৮৩), ছবি ও গান (১৮৮৪), ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী (১৮৮৪) ও কড়ি ও কোমল (১৮৮৬) কাব্যগ্রন্থগুলির প্রথম সংস্করণে মুদ্রিত নিম্নলিখিত কবিতাগুলি পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথ বর্জন করিয়াছিলেন; সেই কবিতাগুলি এই অংশে সংকলিত হইল। বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ সরকার -প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনাবলী প্রথম খণ্ডে (১৩৮৭) এই কবিতাগুলি মূল কাব্যগ্রন্থের 'সংযোজন' অংশে সংকলিত হইয়াছে।

সন্ধ্যাসংগীত

১. সন্ধ্যা
২. কেন গান গাই
৩. কেন গান শুনাই
৪. বিষ ও সুধা

প্রভাতসংগীত

৫. স্নেহ-উপহার
৬. শরতে প্রকৃতি

ছবি ও গান

৭. বিরহ

ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী

৮. সখি রে— পিরীত বুঝবে কে?
৯. হম সখি দারিদ নারী।

কড়ি ও কোমল

১০. শরতের শুকতারা
১১. পত্র (মাগো আমার লক্ষ্মী)
১২. পত্র (বসে বসে লিখলেম চিঠি)
১৩. জন্মতিথির উপহার
১৪. চিঠি (চিঠি লিখব কথা ছিল)
১৫. পত্র (দামু বোস আর চামু বোসে)

১. বিশ্বভারতী-প্রকাশিত 'রবীন্দ্র-রচনাবলী' প্রথম খণ্ড (আশ্বিন ১৩৪৬) প্রকাশকালে রবীন্দ্রনাথ 'সন্ধ্যা' শীর্ষক কবিতাটি বর্জন করেন।

২-৩. এই কবিতা দুইটি সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় -কর্তৃক প্রকাশিত 'কাব্য গ্রন্থাবলী' (আশ্বিন ১৩০৩) সংস্করণে বর্জিত হয়।

৪. 'বিষ ও সুধা' 'সন্ধ্যাসংগীত' কাব্যগ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে (জ্যৈষ্ঠ ১২৯৯) বর্জিত। কবিতাটির কিয়দংশের পাণ্ডুলিপি 'মালতীপুঁথি'তে পাওয়া যায়।
বর্তমান প্রসঙ্গে বিশ্বভারতী-প্রকাশিত 'সন্ধ্যাসংগীত' পাঠান্তর-সংবলিত সংস্করণ (১৯৬৯) দ্রষ্টব্য।

৫. দশম বর্ষীয়া ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবীর উদ্দেশে 'প্রভাতসংগীত' কাব্যগ্রন্থের প্রথম সংস্করণে উৎসর্গ-কবিতারূপে মুদ্রিত হয়। কিন্তু দ্বিতীয় সংস্করণ (চৈত্র ১২৯৮) হইতে কবিতাটি বর্জিত।

৭. 'বিরহ' কবিতাটি পরবর্তী সংস্করণ সমূহের অনেকগুলিতে বর্জিত হয়, রবীন্দ্র-রচনাবলী প্রথম খণ্ডে (আশ্বিন ১৩৪৬) ও সুলভ প্রথম খণ্ডে গ্রহণ করা হয় নাই। বিশ্বভারতী-প্রকাশিত 'ছবি ও গান' পাঠান্তর-সংবলিত সংস্করণ (১৯৯৫) বর্তমান প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।

৮. প্রকাশ, ভারতী, ফাল্গুন ১২৮৪

৯. প্রকাশ, ভারতী, মাঘ ১২৮৪
—দুইটি কবিতাই পত্রিকাতে 'ভানুসিংহের কবিতা' শিরোনামে মুদ্রিত।
দ্রষ্টব্য, 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী', পাঠান্তর-সংবলিত সংস্করণ (১৩৭৬)।

১০. প্রকাশ, ভারতী, অগ্রহায়ণ ১২৯১। দ্বিতীয় সংস্করণ হইতে বর্জিত।

১১-১২. ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবীর উদ্দেশে রচিত।

১৩. বালক, চৈত্র ১২৯২। 'জন্মতিথির উপহার/(একটি কাঠের বাক্স)' শিরোনামে প্রকাশিত। ইন্দিরা দেবীর জন্মদিন উপলক্ষে রচিত।

১৪. প্রকাশ, বালক, ফাল্গুন ১২৯২। ইন্দিরা দেবীর উদ্দেশে রচিত।

১৫. প্রকাশ, 'সঞ্জীবনী', ১ চৈত্র ১২৯২। ১৩ মার্চ ১৮৮৬। 'প্রাপ্ত' কলমে 'দামু ও চামু। (বাউলের সুর)' শিরোনামে স্বাক্ষরহীনভাবে মুদ্রিত হয়। কবিতাটি 'বঙ্গবাসী' পত্রিকার সম্পাদক যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু ও বিশিষ্ট লেখক চন্দ্রনাথ বসুকে ব্যঙ্গ করিয়া লিখিত, এই অনুমানে বিভিন্ন পত্রিকায় তীব্র বিতর্কের সৃষ্টি হয়। এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য, প্রশান্তকুমার পাল, 'রবিজীবনী' তৃতীয় খণ্ড (১৩৯৪)।

অনুবাদ-কবিতা

'ভারতী' প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা (শ্রাবণ ১২৮৪) হইতেই 'সম্পাদকের বৈঠক' নামক একটি বিভাগে বিভিন্ন লেখকের মৌলিক রচনা মুদ্রিত হইয়া আসিতেছিল। মাঘ ১২৮৪ সংখ্যা হইতে রবীন্দ্রনাথের কিছু কিছু অনুবাদ-কবিতা প্রকাশিত হইতে থাকে। এই রচনাগুলি অস্বাক্ষরিত। রবীন্দ্রনাথের কোনো কোনো কাব্যগ্রন্থে ও গীত-সংকলনে কয়েকটি গৃহীত হইয়াছে। 'মালতী-পুঁথি'তে কয়েকটি অনুবাদের মূল পাওয়া যায়।

ডাকিনী। ম্যাকবেথ। 'সম্পাদকের বৈঠক', ভারতী আশ্বিন ১২৮৭। William Shakespeare (1564-1616)-লিখিত *Macbeth* নাটকের প্রথম অঙ্ক প্রথম দৃশ্যটির সম্পূর্ণ, তৃতীয় দৃশ্যের প্রথমাংশ এবং চতুর্থ অঙ্ক প্রথম দৃশ্য প্রথম অংশের অনুবাদ। বর্তমান গ্রন্থে মুদ্রিত বানানরীতি পত্রিকার অনুরূপ।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহাদের গৃহশিক্ষক জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্যের নির্দেশানুযায়ী সম্পূর্ণ ম্যাকবেথ নাটকের তর্জমা করিয়াছিলেন। ১৮৭৫ খৃস্টাব্দের জানুয়ারি মাসের (মাঘ ১২৮১ বঙ্গাব্দ) মধ্যেই সম্ভবত এই অনুবাদকর্ম সমাপ্ত করেন। 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে এই অনুবাদ এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়কে তাহা শোনাইবার প্রসঙ্গ আছে। অনুবাদের মূল খাতাটি বিনষ্ট হইলেও অংশত 'ভারতী' পত্রিকায় মুদ্রিত আকারে থাকিয়া গিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলোচনাসূত্রে এই অনুবাদের কোনো কোনো অংশ জানিতে পারিয়া সজনীকান্ত দাস 'ভারতী' পত্রিকা হইতে কিয়দংশ তাঁহার সংকলিত 'রবীন্দ্র-রচনাপঞ্জী'তে (শনিবারের চিঠি, কার্তিক-চৈত্র ১৩৪৬) মুদ্রিত করেন। সজনীকান্ত 'রবীন্দ্রনাথ : জীবন ও সাহিত্য' (১৩৬৭) গ্রন্থে এ বিষয়ে জানাইয়াছেন, 'রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ -প্রদত্ত সূত্র ধরিয়া খুঁজিতে খুঁজিতে ১২৮৭ সালের ভারতীর আশ্বিন সংখ্যায় 'সম্পাদকের বৈঠকে' তাহার সন্ধান পাইলাম।'

পশ্চিমবঙ্গ সরকার -প্রকাশিত জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ 'রবীন্দ্র-রচনাবলী' পঞ্চদশ খণ্ডে (১৩৭৩) এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার -প্রকাশিত 'রবীন্দ্র-রচনাবলী' পঞ্চদশ খণ্ডে (১৪০১) এই অনুবাদ সংকলিত হইয়াছে।

বিচ্ছেদ। প্রতিকূল বায়ুভরে, ঊর্মিময় সিন্ধু-'পরে। সম্পাদকের বৈঠক। অনুবাদ। ভারতী, মাঘ ১২৮৪।

Thomas Moore (1779-1882), *Moore's Irish Melodies* (1846)
প্রথম ছত্র : As slow our ship her foamy track। চারিটি স্তবকযুক্ত এই কবিতাটির দ্বিতীয় স্তবকের অনুবাদ রবীন্দ্রনাথ করেন নাই। রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক ব্যবহৃত গ্রন্থটি রবীন্দ্রভবন গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে। 'মালতীপুঁথি'তে এই অনুবাদটির পাণ্ডুলিপি আছে।

বিদায়-চুম্বন। একটি চুম্বন দাও প্রমদা আমার। সম্পাদকের বৈঠক। অনুবাদ। ভারতী, মাঘ ১২৮৪

Robert Burns (1759-1796)
শিরোনাম : Parting Song to Clarinda
প্রথম ছত্র : Ae Fond kiss, and then we sever

কষ্টের জীবন। মানুষ কাঁদিয়া হাসে। সম্পাদকের বৈঠক, ভারতী, মাঘ ১২৮৪।
George Gordon Byron (1788-1824)
গ্রন্থ : *Childe Harold's Pilgrimage,* সর্গ XXXII, XXXIII, XXXIV
প্রথম ছত্র : They mourn, but smile, at length ; and, মূল কবিতার শেষাংশের অনুবাদ 'ভারতী'তে মুদ্রিত হয় নাই। 'মালতীপুঁথি'তে অনুবাদটির পাণ্ডুলিপি আছে,

সেখানে অতিরিক্ত কয়েকটি ছত্র নিম্নরূপ—

মানুষের নিরাশার
অগ্নিময় আছে কি জীবন।
সে বিষ বাঁচায়ে রাখে
কোনো ক্রমে ভগন হৃদয়,
নিরাশার সে জীবন
কিন্তু সেই ফলের মতন
মৃত সিন্ধুতীরে জন্মে
অভ্যন্তর যার ভস্মময়।

জীবন উৎসর্গ। এসো এসো এই বুকে নিবাসে তোমার। সম্পাদকের বৈঠক, ভারতী, মাঘ ১২৮৪।

Thomas Moore, *Moore's Irish Melodies*
প্রথম ছত্র : Come, rest in this bosom, my own stricken deer
মালতীপুঁথিতে মূল অনুবাদটি পাওয়া গিয়াছে।

ললিত-নলিনী। (কৃষকের প্রেমালাপ)। ললিত/হা নলিনী গেছে আহা কী সুখের দিন। সম্পাদকের বৈঠক, ভারতী, মাঘ ১২৮৪

Robert Burns.
শিরোনাম : Philly and Willy : A duet
প্রথম ছত্র : He/O Philly, happy be that day

বিদায়। যাও তবে প্রিয়তম সুদূর প্রবাসে। সম্পাদকের বৈঠক, ভারতী, মাঘ ১২৮৪।
Mrs. Amelia Opie (1769-1853)
প্রথম ছত্র : Go youth, beloved, in distant glades

সংগীত। কেমন সুন্দর আহা ঘুমায়ে রয়েছে। সম্পাদকের বৈঠক, ভারতী, মাঘ ১২৮৪।
William Shakespeare, *Merchant of Venice*, Act V Sc I
প্রথম ছত্র : How sweet the moonlight sleeps upon this bank !

গভীর গভীরতম হৃদয়প্রদেশে। সম্পাদকের বৈঠক, ভারতী, আষাঢ় ১২৮৫।
George Gordon Byron, *The Corsair* XIV (1-4)
প্রথম ছত্র : Deep in my soul that tender secret dwells

যাও তবে প্রিয়তম সুদূর সেথায়। সম্পাদকের বৈঠক, ভারতী, আষাঢ় ১২৮৫
Thomas Moore, *Moore's Irish Melodies*
প্রথম ছত্র : Go where Glory waits thee

আবার আবার কেন রে আমার। সম্পাদকের বৈঠক, ভারতী, আষাঢ় ১২৮৫
George Gordon Byron, *Hours of Idleness*
প্রথম ছত্র : I would I were a careless child

বৃদ্ধ কবি। মন হতে প্রেম যেতেছে শুকায়ে। সম্পাদকের বৈঠক, ভারতী, কার্তিক ১২৮৬। সুর নির্দেশ : ভূপালী রাগিণী। অনুবাদের শেষে প্রদত্ত তথ্য : Translated from an English translation of the poem, by Talhaiarn the Welsh poet.

জাগি রহে চাঁদ আকাশে যখন। সম্পাদকের বৈঠক, ভারতী, কার্তিক ১২৮৬। সুর নির্দেশ : বেহাগ রাগিণী।

পাতায় পাতায় দুলিছে শিশির। সম্পাদকের বৈঠক, ভারতী, কার্তিক ১২৮৬। সুর নির্দেশ : পূরবী।

অনুবাদের শেষে প্রদত্ত তথ্য : Translated from an English translation of an Irish Song.

বলো গো বালা, আমারি তুমি। সম্পাদকের বৈঠক, ভারতী, কার্তিক ১২৮৬। সুর নির্দেশ : পিলু।

Thomas Moore, *Moore's Irish Melodies*
শিরোনাম : If thou 'lt be mine.
প্রথম ছত্র : If thou 'lt be mine, the treasures of air,

গিয়াছে সে দিন, যে দিন হৃদয়। সম্পাদকের বৈঠক, ভারতী, কার্তিক ১২৮৬
Thomas Moore, *Moore's Irish Melodies*
শিরোনাম : Love's young Dream.
প্রথম ছত্র : Oh ! the days are gone, when Beauty bright। মূল কবিতার তৃতীয় স্তবকটির বঙ্গানুবাদ করা হয় নাই।

রূপসী আমার, প্রেয়সী আমার। সম্পাদকের বৈঠক, ভারতী, কার্তিক ১২৮৬
Robert Burns
শিরোনাম : The Birds of Aberfeldy
প্রথম ছত্র : Bonnie Lassie, will ye go,

সুশীলা আমার, জানালার 'পরে। সম্পাদকের বৈঠক, ভারতী, কার্তিক ১২৮৬
Robert Burns
শিরোনাম : Mary Morison
প্রথম ছত্র : O Mary, at thy window be,

কোরো না ছলনা, কোরো না ছলনা। সম্পাদকের বৈঠক, ভারতী, কার্তিক ১২৮৬
William Chappel (1809-1888)

চপলারে আমি অনেক ভাবিয়া। সম্পাদকের বৈঠক, ভারতী, কার্তিক ১২৮৬
Lord Cantalupe
পত্রিকায় অনুবাদের শেষাংশ মুদ্রণক্রটির ফলে ৩২২ পৃষ্ঠায় স্থানান্তরিত হইয়াছে।

প্রেমতত্ত্ব। নিঝর মিশিছে তটিনীর সাথে। সম্পাদকের বৈঠক, ভারতী, কার্তিক ১২৮৬
P. B. Shelley (1792-1822)
শিরোনাম : Love's Philosophy
প্রথম ছত্র : The fountains mingle with the river

নলিনী/লীলাময়ী নলিনী। সম্পাদকের বৈঠক, ভারতী, কার্তিক ১২৮৬
Alfred Tennyson (1809-1892)
শিরোনাম : Lilian
প্রথম ছত্র : Airy, fairy Lilian

দিনরাত্রি নাহি মানি। সম্পাদকের বৈঠক, ভারতী, আষাঢ় ১২৮৮
Thomas Moore
শিরোনাম : Ne'er ask the hour
প্রথম ছত্র : Ne'er ask the hour— what is it to us

দামিনীর আঁখি কিবা ধরে জ্বল জ্বল বিভা। সম্পাদকের বৈঠক, ভারতী, আষাঢ় ১২৮৮
Thomas Moore, *Moore's Irish Melodies*
প্রথম ছত্র : Lesbia hath a beaming eye,
'মালতীপুঁথি'তে সম্পূর্ণ অনুবাদটি পাওয়া গিয়াছে।

অদৃষ্টের হাতে লেখা সূক্ষ্ম এক রেখা। সম্পাদকের বৈঠক, ভারতী, কার্তিক ১২৮৮
Matthew Arnold (1822-1888)
শিরোনাম : Too Late
প্রথম ছত্র : Each on his own strict line we move,

ভুজ-পাশ-বদ্ধ অ্যান্টনি। এই তো আমরা দোঁহে বসে আছি কাছে কাছে। সম্পাদকের বৈঠক, ভারতী, আশ্বিন-কার্তিক ১২৮৮
Robert Buchanan (1841-1901)
শিরোনাম : Antony in Arms
প্রথম ছত্র : So, we are side by side

সুখী প্রাণ। জানো না তো নির্ঝরিণী, আসিয়াছ কোথা হতে। আলোচনা, প্রথম খণ্ড প্রথম সংখ্যা, ভাদ্র ১৮০৬ শক। ১২৯১ বঙ্গাব্দ।
Robert Buchanan
রবীন্দ্র-রচনাবলী, শতবার্ষিক সংস্করণ, চতুর্থ খণ্ডে সংকলিত।

জীবন মরণ। ওরা যায়, এরা করে বাস। আলোচনা, প্রথম বর্ষ, কার্তিক ১৮০৬ শক। ১২৯১ বঙ্গাব্দ।
Victor Hugo (1802-1885)
গ্রন্থ : *Les Contemplations* (1857) Vol 1.
শিরোনাম : Quia/Pulvis/es
প্রথম ছত্র : Ceux-ei partent, ceux-la demeurent.
রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত মূল গ্রন্থটির মধ্যে (পৃ. ২২৬) রবীন্দ্রনাথের স্বহস্ত-কৃত অনুবাদ লক্ষ করা যায়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার -প্রকাশিত শতবার্ষিক সংস্করণ, রবীন্দ্র-রচনাবলী চতুর্থ খণ্ডে সংকলিত।

১৯২৪ খৃস্টাব্দে চীন ভ্রমণকালে প্রদত্ত একটি ভাষণে (At the Scholar's Dinner, Peking, *Talks in China* (1925) গ্রন্থের Autobiographical II অধ্যায়ভুক্ত) রবীন্দ্রনাথ হাইনের অনুবাদচর্চার মধ্য দিয়া জার্মান ভাষা শিক্ষার যে বিবরণ দিয়াছেন, এখানে প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় তাহা উদ্‌ধৃত হইল—

'I also wanted to know German literature and, by reading Heine in translation, I thought I had caught a glimpse of the beauty there. Fortunately I met a missionary lady from Germany and asked her help. I worked hard for some months, but being rather quick-witted, which is not a good quality, I was not persevering. I had the dangerous facility which helps one to guess the meaning too easily. My teacher thought I had almost mastered the language,— which was not true. I succeeded, however, in getting through Heine, like a man walking in sleep crossing unknown paths with ease, and I found immense pleasure.'

ইহার পূর্বে ইংরাজি অনুবাদের মধ্য দিয়া হাইনের কবিতার সহিত রবীন্দ্রনাথের

পরিচয় ঘটিয়াছিল। ১৮৮৭ খৃস্টাব্দে, রবীন্দ্রনাথের জন্মদিবসে স্বর্ণকুমারী দেবীর পুত্র জ্যোৎস্নানাথ ঘোষাল রবীন্দ্রনাথকে Edgar Alfred Bowring -অনূদিত *The Poems of Heine* (1884) গ্রন্থটি উপহার দিয়াছিলেন। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ মূল জার্মান *Poetische Werke von H. Heine* (1885) গ্রন্থটি সংগ্রহ করেন। উল্লিখিত দুইটি গ্রন্থই রবীন্দ্রভবন গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে। দ্বিতীয় গ্রন্থটিতে রবীন্দ্রনাথ-অনূদিত হাইনের সকল মূল কবিতাই দেখা যায়।

Heinrich Heine (1790-1850)-এর মোট নয়টি কবিতার অনুবাদ সাধনা, বৈশাখ ১২৯২ বঙ্গাব্দে মুদ্রিত :

স্বপ্ন দেখেছিনু প্রেমাগ্নিজ্বালার
প্রথম ছত্র : Mir traümte einst von Wildem Liebesglühn,
গ্রন্থ : *Junge Leiden* (1817-1821) : Traumbilder No. 1.

আঁখি পানে যবে আঁখি তুলি।
প্রথম ছত্র : Wenn ich in deine Augen sehe,
গ্রন্থ : *Lyrisches Intermezzo* (1822-1823). No. 4.

প্রথমে আশাহত হয়েছিনু।
প্রথম ছত্র : Anfangs Wollt ich fast verzagen,
গ্রন্থ : *Junge Leiden* : Lieder, No. 8

নীল বায়লেট নয়ন দুটি করিতেছে ঢলঢল।
প্রথম ছত্র : Die blauen veilchen der Äeugelein,
গ্রন্থ : *Lyrisches Intermezzo*, No. 30

গানগুলি মোর বিষে ঢালা।
প্রথম ছত্র : Vergifted sind miene Lieder;—
গ্রন্থ : *Lyrisches Intermezzo*, No. 51

তুমি একটি ফুলের মতো মণি।
প্রথম ছত্র : Du bist wie wine Blume,
গ্রন্থ : *Die Heimkehr* (1823-1824), No. 47

রানী, তোর ঠোঁটদুটি মিঠি।
প্রথম ছত্র : Mädchen mit dem roten Mündchen.
গ্রন্থ : *Die Heimkehr*. No. 50

বারেক ভালোবেসে যে জন মজে।
প্রথম ছত্র : Wer zum ersien Male liebt,
গ্রন্থ : *Die Heimkehr*. No. 63

বিশ্বামিত্র, বিচিত্র এ লীলা।
প্রথম ছত্র : Den könig Wiswamitra,
গ্রন্থ : *Die Heimkehr*. No. 45

ভালোবাসে যারে তার চিতাভস্ম পানে। 'মালতীপুঁথি'-ধৃত।
George Gordon Byron, *Childe Harold's Pilgrimage* Canto II, Stanza XV

'রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসা' প্রথম খণ্ডে (প্রকাশ ১৯৬৫, পৃ. ৬) এই অনুবাদটির নয়টি ছত্র উদ্ধার করা হইয়াছে। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রবীক্ষা সংকলন ৮ (পৃ. ৩২) মুদ্রণে আরও দুই-একটি ছত্রের উদ্ধার সম্ভব হওয়ায়, বর্তমান রচনাবলীতে পরিবর্তিত পাঠটি গৃহীত হইল।

প্রবন্ধ

সাহিত্য

সাময়িক পত্রিকাতে ও কোনো কোনো স্থলে গ্রন্থে, প্রবন্ধগুলির প্রকাশের সূচী নিম্নরূপ—

১. ভুবনমোহিনী প্রতিভা, অবসরসরোজিনী ও দু[ঃ]খসঙ্গিনী।	জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব, কার্তিক ১২৮৩
২. মেঘনাদবধ কাব্য। (মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রণীত)	ভারতী, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, কার্তিক, পৌষ, ফাল্গুন ১২৮৪
৩. স্যাক্‌সন জাতি ও অ্যাংলো স্যাক্‌সন সাহিত্য	ভারতী, শ্রাবণ ১২৮৫
৪. বিয়াত্রিচে দান্তে ও তাঁহার কাব্য	ভারতী, ভাদ্র ১২৮৫
৫. পিত্রার্কা ও লরা	ভারতী, আশ্বিন ১২৮৫
৬. গেটে ও তাঁহার প্রণয়িনীগণ	ভারতী, কার্তিক ১২৮৫
৭. নর্ম্যান জাতি ও অ্যাংলো-নর্ম্যান সাহিত্য [প্রথম প্রস্তাব]	ভারতী, ফাল্গুন ১২৮৫
৮. [নর্ম্যান জাতি ও অ্যাংলো-নর্ম্যান সাহিত্য] দ্বিতীয় প্রস্তাব	ভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১২৮৬
৯. চ্যাটার্টন— বালক কবি	ভারতী, আষাঢ় ১২৮৬
১০. বাঙালি কবি নয়	ভারতী, ভাদ্র ১২৮৭
১১. বাঙালি কবি নয় কেন?	ভারতী, আশ্বিন ১২৮৭
১২. 'দেশজ প্রাচীন কবি ও আধুনিক কবি' (প্রত্যুত্তর)	ভারতী, ভাদ্র ১২৮৯
১৩. কাব্য : স্পষ্ট এবং অস্পষ্ট	ভারতী ও বালক, চৈত্র ১২৯৩
১৪. সাহিত্যের উদ্দেশ্য	ভারতী ও বালক, বৈশাখ ১২৯৪
১৫. সাহিত্য ও সভ্যতা	ভারতী ও বালক, বৈশাখ ১২৯৪
১৬. আলস্য ও সাহিত্য	ভারতী ও বালক, শ্রাবণ ১২৯৪

পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তক -ধৃত রচনা

১৭. কবিতার উপাদান রহস্য (Mystery)	দেশ, শারদীয়া ১৩৫৩
১৮. সৌন্দর্য	দেশ, শারদীয়া ১৩৫২
১৯. Dialogue/Literature	রবীন্দ্রবীক্ষা ১, শ্রাবণ ১৩৮৩
২০. সাহিত্য	রবীন্দ্রবীক্ষা ১, শ্রাবণ ১৩৮৩
২১. বাংলায় লেখা	রবীন্দ্রবীক্ষা ১, শ্রাবণ ১৩৮৩
২২. অপরিচিত ভাষা ও অপরিচিত সংগীত	রবীন্দ্রবীক্ষা ১, শ্রাবণ ১৩৮৩
২৩. সৌন্দর্য সম্বন্ধে গুটিকতক ভাব	ভারতী ও বালক, শ্রাবণ ১২৯৯
২৪. বাংলা সাহিত্যের প্রতি অবজ্ঞা	রবীন্দ্রবীক্ষা ১, শ্রাবণ ১৩৮৩
২৫. [কাব্য]	রবীন্দ্রবীক্ষা ১, শ্রাবণ ১৩৮৩
২৬. একটি পত্র	সাহিত্য, কার্তিক ১২৯৯
২৭. বাংলা লেখক	সাধনা, মাঘ ১২৯৯

২৮. 'সাহিত্য'-পাঠকদের প্রতি	সাধনা, চৈত্র ১২৯৯
২৯. রবীন্দ্রবাবুর পত্র	সাহিত্য, বৈশাখ ১৩০০
৩০. সাহিত্যের গৌরব	সাধনা, শ্রাবণ ১৩০১
৩১. মেয়েলি ব্রত	অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়-লিখিত গ্রন্থের ভূমিকা, ১৩০৩ বঙ্গাব্দ
৩২. সাহিত্যের সৌন্দর্য	ভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১৩০৫

১. নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'ভুবনমোহিনী প্রতিভা' কাব্য (প্রথম ভাগ, প্রকাশ ১৭৯৭ শক। ১৮৭৫ খৃস্টাব্দ), রাজকৃষ্ণ রায়ের 'অবসর সরোজিনী' (প্রথম ভাগ, ১২৮৩ বঙ্গাব্দ) ও হরিশ্চন্দ্র নিয়োগীর 'দুঃখসঙ্গিনী' (১২৮২ বঙ্গাব্দ) কাব্যত্রয়ের রবীন্দ্রনাথ-লিখিত প্রথম সমালোচনামূলক প্রবন্ধ। 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থের 'রচনাপ্রকাশ' অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথ রচনাটির ইতিহাস এইভাবে জানাইয়াছেন—

"প্রথম যে গদ্যপ্রবন্ধ লিখি তাহাও এই জ্ঞানাঙ্কুরেই বাহির হয়। তাহা গ্রন্থসমালোচনা। তাহার একটু ইতিহাস আছে।

তখন ভুবনমোহিনীপ্রতিভা নামে একটি কবিতার বই বাহির হইয়াছিল। বইখানি ভুবনমোহিনী নামধারিণী কোনো মহিলার লেখা বলিয়া সাধারণের ধারণা জন্মিয়া গিয়াছিল। সাধারণী কাগজে অক্ষয় সরকার মহাশয় এবং এডুকেশন গেজেটে ভূদেববাবু এই কবির অভ্যুদয়কে প্রবল জয়বাদ্যের সহিত ঘোষণা করিতেছিলেন।

তখনকার কালের আমার একটি বন্ধু আছেন— তাঁহার বয়স আমার চেয়ে বড়ো। তিনি আমাকে মাঝে মাঝে 'ভুবনমোহিনী' সই-করা চিঠি আনিয়া দেখাইতেন। 'ভুবনমোহিনী' কবিতায় ইনি মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং 'ভুবনমোহিনী' ঠিকানায় প্রায় তিনি কাপড়টা বইটা ভক্তি-উপহাররূপে পাঠাইয়া দিতেন।

এই কবিতাগুলির স্থানে স্থানে ভাবে ও ভাষায় এমন অসংযম ছিল যে, এগুলিকে স্ত্রীলোকের লেখা বলিয়া মনে করিতে আমার ভালো লাগিত না। চিঠিগুলি দেখিয়াও পত্রলেখককে স্ত্রীজাতীয় বলিয়া মনে করা অসম্ভব হইল। কিন্তু আমার সংশয়ে বন্ধুর নিষ্ঠা টলিল না, তাঁহার প্রতিমাপূজা চলিতে লাগিল।

আমি তখন ভুবনমোহিনীপ্রতিভা, দুঃখসঙ্গিনী ও অবসরসরোজিনী বই তিনখানি অবলম্বন করিয়া জ্ঞানাঙ্কুরে এক সমালোচনা লিখিলাম।'

উক্ত বন্ধু সম্ভবত প্রবোধচন্দ্র ঘোষ।

২. রচনাশেষে 'ভঃ' চিহ্নিত। 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থের 'ভারতী' শীর্ষক অধ্যায়ে বর্তমান রচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

"এই সময়টাতেই বড়দাদাকে সম্পাদক করিয়া জ্যোতিদাদা ভারতী পত্রিকা বাহির করিবার সংকল্প করিলেন। এই আর-একটা আমাদের পরম উত্তেজনার বিষয় হইল। আমার বয়স তখন ঠিক ষোলো। কিন্তু আমি ভারতীর সম্পাদকচক্রের বাহিরে ছিলাম না। ইতিপূর্বেই আমি অল্পবয়সের স্পর্ধার বেগে মেঘনাদবধের একটি তীব্র সমালোচনা লিখিয়াছিলাম। কাঁচা আমের রসটা অম্লরস— কাঁচা সমালোচনাও গালিগালাজ। অন্য ক্ষমতা যখন কম থাকে তখন খোঁচা দিবার ক্ষমতাটা খুব তীক্ষ্ণ হইয়া উঠে। আমিও এই অমর কাব্যের উপর নখরাঘাত করিয়া নিজেকে অমর করিয়া তুলিবার সর্বাপেক্ষা সুলভ উপায় অন্বেষণ করিতেছিলাম। এই দাম্ভিক সমালোচনাটা দিয়া আমি ভারতীতে প্রথম লেখা আরম্ভ করিলাম।..."

ভারতীর পত্রে পত্রে আমার বাল্যলীলার অনেক লজ্জা ছাপার কালির কালিমায় অঙ্কিত হইয়া আছে। কেবলমাত্র কাঁচা লেখার জন্য লজ্জা নহে— উদ্ধত অবিনয়, অদ্ভুত আতিশয্য ও সাড়ম্বর কৃত্রিমতার জন্য লজ্জা।'

পশ্চিমবঙ্গ সরকার -প্রকাশিত 'রবীন্দ্র-রচনাবলী' শতবার্ষিক সংস্করণ পঞ্চদশ খণ্ডে (১৩৭৩), এই প্রবন্ধটিতে একস্থলে একটি বাক্য, অপর এক স্থলে একটি বাক্যাংশ যোজনা দেখা যায়। ইহা ছাড়া, অনেকগুলি জায়গায় শব্দ-সংস্কার লক্ষিত হয়। অনুমান করা যাইতে পারে, রবীন্দ্রনাথের ব্যবহৃত 'ভারতী' হইতে তৎকালে এই পরিমার্জিত পাঠ গ্রহণ করা হইয়াছিল, কিন্তু তাহার কোনো সূত্রোল্লেখ না থাকায় বর্তমান রচনাবলীতে পত্রিকা-ধৃত পাঠটিই গৃহীত হইল।

পত্রিকা-ধৃত পাঠের সহিত শতবার্ষিক সংস্করণ রবীন্দ্র-রচনাবলীর যে-যে স্থলে পাঠ-বৈচিত্র্য লক্ষিত হয়, তাহা নিম্নরূপ—

বর্তমান রচনাবলী		ভারতী-ধৃত পাঠ	শতবার্ষিক রচনাবলী-ধৃত পাঠ
পৃষ্ঠা	ছত্র		
১৩২	৩৩	'...দ্বারবানের তুলনা দিয়াছেন।'	পুষ্করিণীর সহিত সমুদ্রের তুলনা দিলে
১৩২	৩৭-৩৯	ইহার পর সংযোজিত বাক্য : বাংলার একটি ক্ষুদ্র কাব্যের সহিত বাল্মীকির বিশাল কাব্যের তুলনা করিতে যাওয়াও যা, আর মহাদেবের সহিত একটা দ্বারবানের তুলনা করাও তা, কিন্তু কি করা যায়, কোনো কোনো....	সমুদ্রকেই ছোটো বলিয়া মনে হয়। বাংলার একটি ক্ষুদ্র কাব্যের সহিত বাল্মীকির বিশাল কাব্যের তুলনা করিতে যাওয়া অন্যায় বটে কিন্তু কোনো কোনো...
১৩৫	১১	বিকাশপূর্বক	উদ্গারপূর্বক
১৩৯	৩২	আমি রাম এবং তাঁহার দলবলগুলাকে ঘৃণা করি, রাবণের ভাব মনে করিলে...	আমি রাম এবং তাঁহার অনুচরদিগকে ঘৃণা করি, কিন্তু রাবণের ভাব মনে করিলে...
১৪০	১২	...যদি পুত্র থাকিত, তবে তাহাদের...	...যদি পুত্র থাকিত, তাহা হইলে তাহাদের...
১৫২	১০	...লক্ষ্মী প্রায় মাথার দিব্য দিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন যে,	...লক্ষ্মী প্রায় মাথার দিব্য দিয়া বলিয়াছিলেম যে,
১৫৬	১৮	অবলা স্ত্রীলোকদের	অবলা স্ত্রীলোকের
১৫৯	৩২	রামের সম্বন্ধে	রাম সম্বন্ধে
১৫৯	৩৪	...অতিশয় হীনতা প্রকাশ করা মাত্র।	...অতিশয় হীনতা প্রকাশ মাত্র।
১৬০	১৪	...অন্যান্য দেবগণকেও বিসংজ্ঞ করিতে পারে।	...অন্যান্য দেবগণকেও বিসংগত করিত—

৩. প্রথমবার বিলাত যাত্রার পূর্বে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার অগ্রজ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে আমেদাবাদে থাকার সময় (জ্যৈষ্ঠ ১২৮৫। মে ১৮৭৮ - শ্রাবণ ১২৮৫। আগস্ট ১৮৭৮) কতকটা নিজেকে প্রস্তুত করিবার জন্য ইংরাজি সাহিত্য এবং য়ুরোপীয় ইতিহাসের যে চর্চা করিয়াছিলেন তাহারই অনিবার্য ফল বিশ্বসাহিত্য বিষয়ে তাঁহার একাধিক প্রবন্ধ। প্রবন্ধগুলি আমেদাবাদ ও বোম্বাইয়ে অবস্থানকালে (জ্যৈষ্ঠ-ভাদ্র ১২৮৫। মে-সেপ্টেম্বর ১৮৭৮) রচিত। উল্লেখ করা যাইতে পারে, রবীন্দ্রনাথ ২০ সেপ্টেম্বর ১৮৭৮ (৫ আশ্বিন ১২৮৫) তারিখে বোম্বাই হইতে ইংল্যাণ্ডের উদ্দেশে যাত্রা করেন। কলিকাতা ত্যাগের পূর্বেই রবীন্দ্রনাথ ইংরাজি গ্রন্থ সংগ্রহ আরম্ভ করিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

'জীবনস্মৃতি'র প্রথম পাণ্ডুলিপিতে রবীন্দ্রনাথ এই সময়ে তাঁহার ইংরাজি-চর্চার যে বিবরণ দিয়াছেন, প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় তাহা এখানে সংকলিত হইল, "ইংরাজিতে যে আমি নিতান্তই কাঁচা ছিলাম বিলাত যাইবার পূর্ব্বে সেটা আমার একটা বিশেষ ভাবনার বিষয়

হইল। মেজদাদাকে বলিলাম আমি ইংরাজি সাহিত্যের ইতিহাস বাংলায় লিখিব, আমাকে বই আনাইয়া দিন। তিনি আমার সম্মুখে টেন্ প্রভৃতি গ্রন্থকার রচিত ইংরাজি ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসসংক্রান্ত রাশি রাশি গ্রন্থ উপস্থিত করিলেন। আমি তাহার দুরূহতা বিচারমাত্র না করিয়া অভিধান খুলিয়া পড়িতে বসিয়া গেলাম। সেইসঙ্গে আমার লেখাও চলিতে লাগিল। এমন-কি, অ্যাংলো স্যাক্সন ও অ্যাংলো নর্ম্মান সাহিত্য সম্বন্ধীয় আমার সেই প্রবন্ধগুলাও ভারতীতে বাহির হইয়াছিল। এইরূপ লেখার উপলক্ষ্যে আমি সকাল হইতে আরম্ভ করিয়া মেজদাদার কাছারি হইতে প্রত্যাবর্ত্তন পর্য্যন্ত একান্ত চেষ্টায় ইংরাজি গ্রন্থের অর্থসংগ্রহ করিয়াছি।”

আলোচ্য ‘স্যাক্সন জাতি ও অ্যাংলো স্যাক্সন সাহিত্য’ প্রবন্ধমধ্যে রবীন্দ্রনাথ *Beowulf* মহাকাব্যের সারাংশ এবং কাব্যের কিয়দংশ গদ্যানুবাদ করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত, Cædmon-রচিত *Genesis* ও *Exodus* কাব্যের কোনো কোনো অংশের পদ্যানুবাদও করিয়াছেন। উল্লিখিত অনুবাদগুলির একটি কবিতা ছাড়া বাকি সকল কবিতার খসড়া ‘মালতীপুঁথি’তে দেখা যায়, পরে প্রবন্ধমধ্যে ব্যবহারের সময় রবীন্দ্রনাথ কোনো কোনো স্থলে পরিমার্জনা করিয়াছেন।

৪. পূর্ববর্তী প্রবন্ধের মতো এই প্রবন্ধের মধ্যেও অনেকগুলি গদ্য ও পদ্যানুবাদ আছে। চীন ভ্রমণকালে (১৯২৪) প্রদত্ত একটি ভাষণে রবীন্দ্রনাথ জানাইয়াছিলেন, “When I was young I tried to approach Dante, unfortunately through a translation. I failed utterly, and felt it my pious duty to desist. Dante remained a closed book to me.”—*Talks in China*, Autobiographical II (1925)। এরূপ অনুবাদের প্রধান আধার ‘মালতীপুঁথি’ হইলেও বর্তমান প্রবন্ধ-ধৃত অনুবাদগুলি ‘মালতীপুঁথি’তে নাই। অনুমান করা যাইতে পারে, অনুরূপ একাধিক খাতায় এই সময় রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যচর্চা করিয়াছিলেন, সেগুলির মধ্যে একমাত্র ‘মালতীপুঁথি’ই রক্ষা পাইয়াছে।

৫. পিত্রার্কার অনেকগুলি কবিতার অনুবাদ ‘মালতীপুঁথি’তে পাওয়া যায়, ‘পিত্রার্কা ও লরা’ প্রবন্ধমধ্যে অনুবাদগুলি মুদ্রিত হইয়াছে।

৬. ‘বিয়াত্রিচে দান্তে ও তাঁহার কাব্য’, ‘পিত্রার্কা ও লরা’ এবং ‘গেটে ও তাঁহার প্রণয়িনীগণ’—এই প্রবন্ধত্রয় একই ভাবসূত্রে গ্রথিত।

‘ভারতী’র কার্তিক ১২৮৫ সংখ্যায় ‘গেটে ও তাঁহার প্রণয়িনীগণ’ প্রকাশকালে রবীন্দ্রনাথ ব্রাইটনে বসবাস করিতেছিলেন।

পরবর্তীকালে মূল জার্মান ভাষায় রবীন্দ্রনাথ গেটে-র রচনা পড়িবার যে চেষ্টা করিয়াছিলেন, পূর্ব-উল্লিখিত *Talks in China* গ্রন্থ হইতে তাহা জানা যায়, ‘Then I tried Goethe. But that was too ambitious. With the help of the little German I had learnt, I did go through Faust. I believe I found my entrance to the palace, not like one who has keys for all the doors, but as a casual visitor who is tolerated in some general guest room, comfortable but not intimate.’

৭-৮. ‘ভারতী’ শ্রাবণ ১২৮৫ সংখ্যায় প্রকাশিত ‘স্যাক্সন জাতি ও অ্যাংলো স্যাক্সন সাহিত্য’ প্রবন্ধের অনুক্রমে এই প্রবন্ধ দুটি রচিত। Hippolyte Taine (1828-1893)-রচিত ইংরাজি সাহিত্যের ইতিহাস ও অপর কোনো গ্রন্থ হইতে রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধগুলির উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সম্ভবত এইভাবে, রবীন্দ্রনাথ ইংরাজি সাহিত্যের একটি ইতিহাস রচনার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হইতেছিলেন, অনুমান করা যাইতে পারে।

৯. ইংল্যান্ডে বসবাসকালে রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধটি রচনা করেন, ধরা যাইতে পারে; যদিও

ইংল্যান্ডের 'বালক-কবি' Thomas Chatterton (1752-1770)-এর জীবনকাহিনীর সহিত রবীন্দ্রনাথের পরিচয় অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর সূত্রে পূর্বেই ঘটিয়াছিল। চ্যাটার্টনের পদাঙ্ক অনুসরণে ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী রচনার যে সূত্রপাত হইয়াছিল, 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থের সূত্রে এই তথ্য আমাদের নিকট পরিজ্ঞাত। এই গ্রন্থের 'ভানুসিংহের কবিতা' অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথ জানাইয়াছেন, "ইতিপূর্বে অক্ষয়বাবুর কাছে ইংরেজ বালককবি চ্যাটার্টনের বিবরণ শুনিয়াছিলাম।... চ্যাটার্টন প্রাচীন কবিদের এমন নকল করিয়া কবিতা লিখিয়াছিলেন যে অনেকেই তাহা ধরিতে পারে নাই। অবশেষে ষোলো বছর বয়সে এই হতভাগ্য বালককবি আত্মহত্যা করিয়া মরিয়াছিলেন। আপাতত ঐ আত্মহত্যার অনাবশ্যক অংশটুকু হাতে রাখিয়া, কোমর বাঁধিয়া দ্বিতীয় চ্যাটার্টন হইবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলাম।"

স্বদেশে চ্যাটার্টনের কবিতা পাঠের সুযোগ রবীন্দ্রনাথের ঘটিয়াছিল কি না জানা যায় না, তবে ইংল্যান্ডে থাকাকালীন এই অকালমৃত কবির রচনার সহিত তাঁহার যে পরিচয় ঘটে, তাহার প্রমাণ আলোচ্য প্রবন্ধে চ্যাটার্টন-রচিত তিনটি কাব্যাংশের অনুবাদ।

'ভারতী' পত্রিকায় এই প্রবন্ধের শেষে 'ক্রমশঃ' থাকিলেও প্রবন্ধটি সম্পূর্ণ হয় নাই।

১০-১১. এই দুটি প্রবন্ধের সম্পাদিত রূপ 'নীরব কবি ও অশিক্ষিত কবি', সমালোচনা (১২৯৪) গ্রন্থভুক্ত, বিশ্বভারতী-প্রকাশিত 'রবীন্দ্র-রচনাবলী' অচলিত দ্বিতীয় খণ্ডে : সুলভ পঞ্চদশ খণ্ডে সংকলিত।

'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার পৌষ ১২৮২ সংখ্যায় প্রকাশিত লেখকের স্বাক্ষরহীন প্রবন্ধ 'বাঙালি কবি কেন' এবং 'বান্ধব' পত্রিকার মাঘ ১২৮১ সংখ্যায় প্রকাশিত কালীপ্রসন্ন ঘোষের 'নীরব কবি' পাঠ করিয়া রবীন্দ্রনাথ 'ভারতী' পত্রিকায় কতকটা প্রতিবাদ করিয়াই সাহিত্যতত্ত্বমূলক এই দুটি প্রবন্ধ রচনা করেন।

'বাঙালি কবি নয়' প্রবন্ধে প্রসঙ্গক্রমে রবীন্দ্রনাথ Christopher Marlow -রচিত 'The Passionate Shepherd to His Love' শীর্ষক কবিতার সম্পূর্ণ বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন। 'বাঙালি কবি নয় কেন?' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ সমকালীন বাংলাসাহিত্য হইতে উদাহরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। সাহিত্যতত্ত্বমূলক প্রবন্ধ হিসাবে এই দুটি প্রবন্ধকে রবীন্দ্ররচনার মধ্যে অগ্রাধিকার দেওয়া যাইতে পারে। ইহার সূত্রপাত অবশ্যই 'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব' পত্রিকার কার্তিক ১২৮৩ সংখ্যায় প্রকাশিত 'ভুবনমোহিনী প্রতিভা, অবসরসরোজিনী ও দু[ঃ]খসঙ্গিনী' কাব্যত্রয়ের সমালোচনামূলক প্রবন্ধ রচনার মধ্য দিয়া।

১২. রচনাশেষে 'শ্রীরঃ' আদ্যক্ষর মুদ্রিত। সম্পূর্ণ প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথের কোনো গ্রন্থভুক্ত না হইলেও প্রথম অনুচ্ছেদটির সম্পাদিত রূপ 'সত্যের অংশ' নামে 'সমালোচনা' (১২৯৪) গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ-লিখিত এই 'প্রত্যুত্তর', ভারতী পত্রিকার আষাঢ় ও শ্রাবণ ১২৮৯ দুটি সংখ্যায় প্রকাশিত, অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী -রচিত ('শ্রী অঃ' আদ্যক্ষরে) 'দেশজ প্রাচীন কবি ও আধুনিক কবি' (প্রথম প্রস্তাব, দ্বিতীয় প্রস্তাব) শিরোনামে প্রকাশিত একটি দীর্ঘ প্রবন্ধের বক্তব্যের উত্তর।

১৩. অক্ষয়চন্দ্র সরকার 'নবজীবন' পত্রিকার অগ্রহায়ণ ১২৯৩ সংখ্যায় 'কাব্যি-সমালোচনা' নামে একটি ব্যঙ্গধর্মী সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথের নাম অনুচ্চারিত রাখিয়া 'কুয়াসার প্রহেলিকায়, নিরাশার প্রহেলিকায় বঙ্গসাহিত্যে গো-ধূলি গোধূলি করিবার চেষ্টা'র যে অভিযোগ আনেন, বস্তুত তাহারই প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথের এই প্রবন্ধ। বিশ্বভারতী-প্রকাশিত 'সাহিত্য' (১৩৬১) গ্রন্থের সংযোজন অংশে এই প্রবন্ধ সংকলিত হইয়াছে।

১৪-১৬. তিনটি প্রবন্ধই 'কাব্য : স্পষ্ট ও অস্পষ্ট' প্রবন্ধের সূত্রে লিখিত। 'সাহিত্য' (১৩৬১) গ্রন্থের সংযোজনভুক্ত।

পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তক। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কলিকাতা বির্জিতলাওস্থিত বাসভবনে রক্ষিত একটি বড়ো মাপের খাতায় তাঁহাদের পরিবারস্থ অনেকে বিচিত্রবিষয়ক রচনা স্বহস্তে লিখিয়া রাখিতেন। ইন্দিরা দেবীচৌধুরানী 'রবীন্দ্রস্মৃতি' (১৩৬৭) গ্রন্থে খাতাটি সম্পর্কে লিখিয়াছেন, 'আমাদের একটি পারিবারিক খাতা ছিল যেটি... ভবানীপুরের বাড়িতে সিঁড়ির উপরে একটি উঁচু ডেস্কের উপর শিকল দিয়ে বাঁধা থাকত। যার যখন ইচ্ছে তাতে নিজের বক্তব্য লিখে রাখত।... এরকম দুখানি খাতা পর পর ছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয় দ্বিতীয়টির কোনো সন্ধান পাওয়া যায় নি। প্রথমটি রথীর পঞ্চাশত্তম জন্মদিনে তাকে উপহার দিই, এখন এটি সযত্নে রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত আছে।'

এই পাণ্ডুলিপিটি 'পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তক' নামে পরিচিত। লিপিবদ্ধ রচনাগুলির কালব্যাপ্তি মোটামুটি কার্তিক ১২৯৫ হইতে চৈত্র ১২৯৭ বঙ্গাব্দ। খাতাটির মুখপাতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিয়া রাখিয়াছেন '... ইহাতে পরিবারের/ অন্তর্ভূক্ত/ সকলেই/ (আত্মীয়, বন্ধু, কুটুম্ব, স্বজন)/ আপন আপন মনের ভাব চিন্তা স্মর্তব্য বিষয়/ ঘটনা প্রভৃতি লিপিবদ্ধ করিতে পারেন।...' এই বিধির পূর্বে রবীন্দ্র-হস্তাক্ষরে কয়েকটি 'নিষেধ' এইরূপ— '১। পেন্সিলে লেখা। ২। আমাদের পরিবারের বাহিরে এই খাতা লইয়া যাওয়া। ৩। যতদিন এই খাতা লেখা চলিবে ততদিন এ খাতার প্রবন্ধ কাগজে অথবা পুস্তকে ছাপান।'

ইতিপূর্বে এই পাণ্ডুলিপি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা এবং রচনাগুলি সংকলন করিয়াছেন পুলিনবিহারী সেন, পশুপতি শাসমল ও কানাই সামন্ত।

রবীন্দ্র-রচনাবলীর বর্তমান খণ্ডে পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তকের অন্তর্গত রবীন্দ্র-রচনাগুলি বিষয়ানুক্রমে বিভিন্নস্থলে বিন্যস্ত হইল। সাহিত্য-বিষয়ক রচনাগুলি প্রথমে সংকলিত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে তথ্যাদি নিম্নরূপ—

১৭. কবিতার উপাদান রহস্য (Mystery)। রচনাকাল : ২০ নভেম্বর ১৮৮৮

১৮. সৌন্দর্য। রচনাকাল : ১৯ ডিসেম্বর ১৮৮৮

১৯. Dialogue/Literature। রচনাকাল : ১ অক্টোবর ১৮৮৯

সাহিত্যবিষয়ক এই আলোচনায় যাঁহারা যোগ দিয়াছিলেন, পাণ্ডুলিপিতে তাঁহাদের নামের আদ্যক্ষরটুকু পাওয়া যায়। আলোচনাকারীগণ যথাক্রমে রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী ও লোকেন্দ্রনাথ পালিত। এই সংক্ষিপ্ত রচনার পরিমার্জিত রূপ 'ভারতী' পত্রিকার জ্যৈষ্ঠ ১৩০৫ সংখ্যায় 'সাহিত্যের সৌন্দর্য' নামে প্রকাশিত। রচনাটি অস্বাক্ষরিত। 'সাহিত্য' (১৩৬১ সংস্করণ) গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত।

২০. সাহিত্য। রচনাকাল : ২০ অক্টোবর ১৮৮৯

২১. বাংলায় লেখা। রচনাকাল : ৬ অক্টোবর ১৮৮৯

২২. অপরিচিত ভাষা ও অপরিচিত সংগীত। রচনাকাল : ৬ অক্টোবর ১৮৮৯

২৩. সৌন্দর্য সম্বন্ধে গুটিকতক ভাব। প্রকাশ : ভারতী ও বালক, শ্রাবণ ১২৯৯। 'পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তকে' শিরোনাম, 'সৌন্দর্য সম্বন্ধে notes'। রচনাশেষে লিখিত আছে : '১৫ই বোধহয়।' অক্টোবর ১৮৮৯।

২৪. বাংলা সাহিত্যের প্রতি অবজ্ঞা। রচনাকাল : ২৪ মার্চ ১৮৯০। প্রকাশ : সাধনা, বৈশাখ ১২৯৯। 'সাহিত্য' গ্রন্থে সংকলিত। পত্রিকায় ও গ্রন্থে প্রবন্ধের শেষাংশ বর্জিত। পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তক -ধৃত, গ্রন্থে বর্জিত পাঠ এখানে গৃহীত হইয়াছে।

২৫. [কাব্য]। রচনাকাল : ১২ জানুয়ারি ১৮৯১, প্রকাশ : সাধনা, চৈত্র ১২৯৮ সংখ্যায় 'কাব্য' শিরোনামে। 'সাহিত্য' গ্রন্থভুক্ত। 'পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তক'-ধৃত প্রথম অনুচ্ছেদ ও শেষ একাদশটি অনুচ্ছেদ বাদ দিয়া 'সাধনা' পত্রিকায় মুদ্রিত হয়, অনুরূপভাবে 'সাহিত্য' গ্রন্থেও সংকলিত। বর্তমান রচনাবলীতে শুধু বর্জিত অংশগুলি সংকলন করা হইল।

২৬. একটি পত্র। সাহিত্য, কার্তিক ১২৯৯। সুরেশচন্দ্র সমাজপতিকে 'সুহৃদ্বরেষু' এই সম্বোধনে লিখিত হইলেও এটি প্রবন্ধের মর্যাদা পাইতে পারে। রবীন্দ্রনাথের কোনো প্রবন্ধ পাঠ করিয়া সুরেশচন্দ্র অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহারই প্রসঙ্গে পত্রাকারে এই প্রবন্ধ।

২৭. বাংলা লেখক। সাধনা। মাঘ ১২৯৯। 'সাহিত্য' গ্রন্থের (১৩৬১) সংযোজন অংশভুক্ত।

২৮-২৯. 'সাধনা' শ্রাবণ ১২৯৯ সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের 'হিং টিং ছট্' কবিতা প্রকাশিত হইলে নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত 'সাহিত্য' ফাল্গুন ১২৯৯ সংখ্যায় 'তর্কবৈচিত্র্য' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে 'হিং টিং ছট্' কবিতাটি চন্দ্রনাথ বসু ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে বিতর্কের সূত্রে রচিত, এইরূপ মন্তব্য করেন। সামাজিক মতামত বিষয়ে চন্দ্রনাথ বসুর সহিত রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক ইতিপূর্বেই নানা কারণে তিক্ত থাকায় এই কবিতা প্রকাশকে কেন্দ্র করিয়া তাহা আরও জটিল হইয়া উঠে। 'তর্কবৈচিত্র্য' প্রবন্ধে লেখকের নাম না থাকায় রবীন্দ্রনাথ রচনাটি সুরেশচন্দ্র সমাজপতি -কর্তৃক লিখিত, এই অনুমানে তাঁহার নিকট যে প্রতিবাদপত্রটি পাঠান সুরেশচন্দ্র সেটি 'সাহিত্য' পত্রিকায় না ছাপাইয়া, রবীন্দ্রনাথকে একটি ব্যক্তিগত পত্রে তাহার উত্তর দেন। ইহা হইতে রবীন্দ্রনাথের ধারণা হয়, "তিনি তাহা প্রকাশ করিয়া তাঁহার পাঠকদের অন্যায় সন্দেহ মোচন করা কর্তব্য বোধ করেন নাই।" ফলে, "সাধনা পত্রিকা আশ্রয় করিয়া", চৈত্র ১২৯৯ সংখ্যায় 'সাহিত্য-পাঠকদের প্রতি' শীর্ষক এই রচনাটি প্রকাশ করিয়া তাঁহার বক্তব্য জানান।

অতঃপর, 'সাহিত্য' বৈশাখ ১৩০০ সংখ্যায়, পুরী হইতে ৬ ফাল্গুন ১২৯৯ বঙ্গাব্দে রবীন্দ্রনাথের লেখা পত্রাকারে রচিত প্রবন্ধটি 'রবীন্দ্রবাবুর পত্র' শিরোনামে প্রকাশিত হয়। এই পত্রের পাদটীকায় 'সাহিত্য'-সম্পাদকের যে দীর্ঘ মন্তব্যটি মুদ্রিত হইয়াছিল, তাহা এ স্থলে সংকলিত হইল—

"গত বর্ষের একাদশ-সংখ্যক সাহিত্যে 'তর্কবৈচিত্র্য' নামক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। সেই প্রবন্ধ প্রসঙ্গে মাননীয় শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্র ঠাকুর মহাশয়ের এই পত্র। কিন্তু, এই পত্র, সাহিত্য সম্পাদককে কেন লেখা হইল, তাহা কেবল এক রবীন্দ্রবাবু ব্যতীত আর কাহারও বুঝিতে পারিবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সে কথা তিনি কিছুই বুঝাইয়া বলেন নাই। রবীন্দ্রবাবু কোন বনিয়াদে আমাদিগকে তর্কবৈচিত্র্যের লেখক স্থির করিলেন? ইহা তাঁহার কবিজনোচিত স্বপ্ন হইতে পারে, কিন্তু ইহার মধ্যে কবিত্ব কিছুই নাই! সুতরাং, পুরাতন বা তাঁহার নবাবিষ্কৃত সত্যও নাই। তর্কবৈচিত্র্য প্রবন্ধ আমরা নিজে লিখি নাই। অতএব, তাহার মতামতের জন্য আমরা দায়ী নহি। সে বিষয়ে রবীন্দ্রবাবুর যাহা কিছু বক্তব্য, তাহা প্রবন্ধাকারে ও প্রাসঙ্গিকভাবে লিখিয়া পাঠানই রবীন্দ্রবাবুর উচিত ছিল। কিন্তু তিনি তাহা না করিয়া আমাদিগকে অনর্থক আক্রমণ করিয়া এই পত্র লেখেন ও প্রকাশিত করিতে অনুরোধ করেন। পরের কথা যাহাই হউক, প্রথমেই রবীন্দ্রবাবুর এই বিষম ভ্রম। পত্র প্রকাশিত করিয়া, তাঁহার এই ভ্রম প্রদর্শন করা আমাদের ইচ্ছা ছিল না; আর সেই জন্যই তাঁহার পত্র আমরা প্রকাশিত না করিয়া, পত্রের দ্বারা পত্রের প্রত্যুত্তর দিয়াছিলাম। কিন্তু রবীন্দ্রবাবু তাহাতে সন্তুষ্ট নহেন। উপস্থিত বিষয়ে যে তিনি বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, তাহা প্রকাশিত না হইলে কিছুতেই তিনি নিরস্ত হইবেন না। কাজেই অগত্যা আমরা, তাঁহার পত্র, প্রকাশের উপযুক্ত না হইলেও, প্রকাশ করিলাম। প্রকাশ করিলাম কেবল তাঁহারও অনুরোধে এবং সাধনায় অযথা দোষারোপের জন্য। নহিলে, বহুদিনাবধি সাময়িকপত্রের লেখক ও কিয়ৎ পরিমাণে পরিচালক হইয়া রবীন্দ্রবাবু এরূপ বেতালা পত্র লিখিতে কুণ্ঠিত হয়েন না এবং তাহা প্রকাশ করিবার জন্য অনুরোধ করেন, ইহা সাধারণ্যে প্রকাশ করা তাঁহার সম্মানের পরিচায়ক নহে।

রবীন্দ্রবাবু আমাদিগকে সম্বোধন করিয়া যে সকল কথা বলিতেছেন, আমাদিগকে সম্বোধন করার জন্যই তাহাদের একটিরও অর্থ নাই। অতএব সে সকল কথার উত্তর দেওয়া আমরা আদৌ আবশ্যক বিবেচনা করি না। 'তর্কবৈচিত্র্য' প্রবন্ধের লেখক যদি আবশ্যক বোধ করেন, দিতে পারেন।— সাহিত্য-সম্পাদক।"

ইহা ছাড়া, 'রবীন্দ্রবাবুর পত্র' রচনাটির তৃতীয় অনুচ্ছেদের শেষে (...আপনার পক্ষে অসঙ্গত হয় নাই।), পাদটীকার চিহ্ন দিয়া সুরেশচন্দ্র সমাজপতি যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহাও এখানে মুদ্রিত হইল—

"তা বটে। এই অযাচিত উপদেশের জন্য মাননীয় উপদেষ্টাকে ধন্যবাদ। তাঁহার এ উক্তির দ্বারা চন্দ্রনাথবাবুর প্রতি যথেষ্ট সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রকট হইতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। আর এই অদ্ভুত যুক্তি দেখিয়া আমাদের, 'আদর্শ সমালোচনা'র দু'একটি ছত্র মনে পড়ে।'

দ্রষ্টব্য, 'আদর্শ সমালোচনা', 'সাহিত্য', শ্রাবণ ১২৯৯।

৩০. 'সাহিত্য' (১৩৬১) গ্রন্থের সংযোজনভুক্ত।

বর্তমান প্রবন্ধ রচনার অব্যবহিত পূর্বে রবীন্দ্রনাথ দুটি বিদেশী উপন্যাস পাঠ করিয়াছিলেন, সেই অভিজ্ঞতা হইতে প্রবন্ধটির উৎপত্তি বলা যাইতে পারে। প্রবন্ধমধ্যে উপন্যাসদুটির উল্লেখ আছে— পোলিশ লেখক Jozef Igancy Kraszewski (1821-1887)-রচিত *The Jew* এবং হাঙ্গেরিয়ান লেখক Mourus Jokai (1825-1904)-রচিত *Eyes like Sea*। রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসদুটির ইংরাজি অনুবাদ পড়িয়াছিলেন। প্রথম উপন্যাস প্রসঙ্গে 'ছিন্নপত্রাবলী' গ্রন্থে ইন্দিরা দেবীকে লেখা ১২৯ সংখ্যক পত্রে 'নভেলটা নিতান্তই অপাঠ্য' এরূপ মন্তব্য করিলেও প্রবন্ধ রচনার সময় ভিন্নতর দৃষ্টিভঙ্গির সহিত বিচার করিয়াছেন।

৩১. অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় -রচিত 'মেয়েলি ব্রত' (প্রকাশ ১৩০৩ বঙ্গাব্দ) গ্রন্থের ভূমিকা। 'সাধনা' পত্রিকা সম্পাদনার শেষ বৎসরে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন আশ্রমের কর্মী অঘোরনাথকে নানাভাবে উৎসাহিত করিয়া বাংলাদেশের ব্রতকথার একটি সংকলন করাইয়াছিলেন। এগুলির মধ্যে কয়েকটি তৎকালে 'সাধনা' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। ৭ কার্তিক ১৩০৩ বঙ্গাব্দে, কার্সিয়ঙে থাকাকালীন রবীন্দ্রনাথ এই গ্রন্থের ভূমিকা রচনা করিয়া অঘোরনাথের কাছে পাঠাইয়া দেন।

৩২. অস্বাক্ষরিত রচনা। 'পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তক'-ধৃত, বর্তমান রচনাবলীতে সংকলিত 'Dialogue/ Literature' শীর্ষক আলোচনার পরিমার্জিত রূপ 'সাহিত্যের সৌন্দর্য'। 'সাহিত্য' গ্রন্থের (১৩৬১) সংযোজন অংশভুক্ত।

সংগীত

সংগীত বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের দুইটি রচনা এখানে সংকলিত হইল :

১. সংগীত ও ভাব	ভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১২৮৮
২. সংগীতের উৎপত্তি ও উপযোগিতা (হর্বার্ট স্পেন্সরের মত)	ভারতী, আষাঢ় ১২৮৮

এই বিষয়ে তাঁহার অধিকাংশ রচনা 'সংগীতচিন্তা' (বৈশাখ ১৩৭৩) গ্রন্থে ও রবীন্দ্র-রচনাবলী অষ্টাবিংশ খণ্ডে (পৌষ ১৪০২) : সুলভ ষোড়শ খণ্ডে সংকলিত হইয়াছে। ভারতী ১২৮৮ জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যায় প্রকাশিত 'সংগীত ও ভাব' এবং ভারতী ১২৮৮ আষাঢ়-সংখ্যায় প্রকাশিত 'সংগীতের উৎপত্তি ও উপযোগিতা' প্রবন্ধ দুইটিকে মিলাইয়া এবং সংশোধন পরিবর্ধন পরিবর্জন করিয়া

রবীন্দ্রনাথ যে পাঠ প্রস্তুত করিয়াছিলেন তাহাই সেখানে 'সংগীত ও ভাব' নামে মুদ্রিত হইয়াছিল। 'সংগীতচিন্তা'র নূতন সংস্করণে (১৩৯২) দুইটি প্রবন্ধ আলাদা করিয়া ছাপা হয়। এখানেও দুইটি প্রবন্ধ স্বতন্ত্রভাবে সংকলিত হইল।

'সংগীত ও ভাব' প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথ ৯ বৈশাখ ১২৮৮ (বুধবার ২০ এপ্রিল ১৮৮১) তারিখে রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে কলিকাতার মেডিক্যাল কলেজের হলে বেথুন সোসাইটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সভায় পাঠ করেন। তিনি 'জীবনস্মৃতিতে' লিখিয়াছেন, "দ্বিতীয়বার বিলাতে যাইবার পূর্বদিন সায়াহ্নে বেথুন-সোসাইটির আমন্ত্রণে মেডিকাল কলেজের হলে আমি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলাম। সভাস্থলে এই আমার প্রথম প্রবন্ধ পড়া।... প্রবন্ধের বিষয় ছিল সংগীত। যন্ত্রসংগীতের কথা ছাড়িয়া দিয়া আমি গেয় সংগীত সম্বন্ধে ইহাই বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম যে, গানের কথাকেই গানের সুরের দ্বারা পরিস্ফুট করিয়া তোলা এই শ্রেণীর সংগীতের মুখ্য উদ্দেশ্য। আমার প্রবন্ধে লিখিত অংশ অল্পই ছিল। আমি দৃষ্টান্ত দ্বারা বক্তব্যটিকে সমর্থনের চেষ্টায় প্রায় আগাগোড়াই নানাপ্রকার সুর দিয়া নানাভাবের গান গাহিয়াছিলাম। সভাপতি মহাশয় 'বন্দে বাল্মীকি-কোকিলং' বলিয়া আমার প্রতি যে প্রচুর সাধুবাদ প্রয়োগ করিয়াছিলেন আমি তাহার প্রধান কারণ এই বুঝি যে, আমার বয়স তখন অল্প ছিল এবং বালককণ্ঠে নানা বিচিত্র গান শুনিয়া তাঁহার মন আর্দ্র হইয়াছিল।" পত্রিকার পাদটীকায় লেখা হয়, "এই বক্তৃতাতে বক্তার মত উদাহরণ দ্বারা সমর্থিত হইয়াছিল। এই বক্তৃতাতে বহু সংখ্যক গান গাহিয়া কি-কি সুরবিন্যাস দ্বারা কি-কি ভাব প্রকাশিত হয়, তাহারই দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছিল। বিভিন্ন ভাব-ব্যঞ্জক গানের ভাবকে ও তৎসঙ্গে সুরকে বিশ্লেষণ করিয়া বক্তা নিজ-মত সমর্থন করিয়াছিলেন। সে সকল উদাহরণে কণ্ঠের সাহায্য আবশ্যক, এ নিমিত্ত সমস্তই পরিত্যাগ করিতে হইল, কেবল মাত্র ভূমিকা ও উপসংহার প্রকাশিত হইতেছে। —সং।" পত্রিকায় শিরোনামের নীচেই মুদ্রিত হয় '(বেথুন সোসাইটিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বক্তৃতা)'—ভারতী-তে এইটিই রবীন্দ্রনাথের প্রথম নামাঙ্কিত রচনা।

শিল্প

শিল্প-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের নিম্নলিখিত দুইটি রচনা এখানে সংকলিত হইয়াছে :

১. [মন্দিরপথবর্তিনী]	ভারতী, আষাঢ় ১৩০৫
২. মন্দিরাভিমুখে	প্রদীপ, পৌষ ১৩০৫

১. গণপত কাশীনাথ ম্হাত্রে (ম্‌হাত্রে, ১৮৭৬-১৯৪৭) বোম্বাইয়ের স্যার জে. জে. স্কুল অব্ আর্ট হইতে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া 'টু দি টেম্পল' নামের ৫ ফুট দীর্ঘ প্লাস্টার অব্ প্যারিসের এক নারীমূর্তি প্রস্তুত করেন। ইহার জন্য তিনি বম্বে আর্ট সোসাইটির পদক লাভ করেন (১৮৯৫)। এই মূর্তির সম্মুখ ও পার্শ্বের দুইটি ফোটোগ্রাফ ভারতশিল্পের বিশিষ্ট পণ্ডিত স্যার জর্জ বার্ডউডের নিকট পাঠাইয়া ছাত্রটির য়ুরোপে শিক্ষালাভের সুযোগ করিয়া দেওয়ার জন্য প্রার্থনা জানানো হইয়াছিল। স্যার বার্ডউড ফোটোগ্রাফ দুইটি তাঁহার সম্পাদিত *The Journal of Indian Arts and Industries* পত্রিকায় ছাপাইয়া শিল্পীর প্রতিভার প্রশংসা করেন। উক্ত ফোটোগ্রাফ ও মন্তব্য অবলম্বন করিয়া রবীন্দ্রনাথ 'প্রসঙ্গকথা' শিরোনামে বর্তমান রচনাটি লিখিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধের ভিতরে মূর্তিটিকে 'মন্দিরপথবর্তিনী' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, তাহা হইতে শিরোনামটি গ্রহণ করা হইয়াছে।

২. 'মন্দিরাভিমুখে'ও একই বিষয় অবলম্বনে লিখিত। তবে প্রবন্ধটি সচিত্র, স্যার বার্ডউডের উল্লিখিত পত্রিকায় প্রকাশিত ফোটোগ্রাফ দুইটি ইহার সহিত মুদ্রিত হইয়াছে। প্রবন্ধের শুরুতেই রবীন্দ্রনাথ যে লিখিয়াছেন, 'ইংরাজিপত্রে একটি ছোটোখাটো রকমের দ্বন্দ্বযুদ্ধ হইয়া

গেছে'— তাহার ইতিহাসটি এইরূপ : ২৬ নভেম্বর ১৮৯৬ স্যার বার্ডউড-লিখিত 'To the Temple'-শীর্ষক একটি রচনা *Bombay Gazette*-এ প্রকাশিত হয়। ইহার উত্তরে জে. জে. স্কুল অব্ আর্টের তৎকালীন অধ্যক্ষ Edwin Greenwood রচনাটির কোনো-কোনো ত্রুটি দেখাইয়া উক্ত পত্রিকায় ৫ ডিসেম্বর একটি পত্র প্রকাশ করেন। প্রত্যুত্তরে বার্ডউডের পত্র মুদ্রিত হয় পত্রিকাটির ৭ জানুয়ারি ১৮৯৭-সংখ্যায়। রবীন্দ্রনাথ কোনো অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান লেখকের যে তীব্র সমালোচনার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা 'An Art Critic Astray' নামে ৩১ ডিসেম্বর ১৮৯৬ *Pioneer Mail* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, লেখকের নাম R. F. Chisholm।

ধর্ম/দর্শন

১. সাকার ও নিরাকার উপাসনা	ভারতী, শ্রাবণ ১২৯২
২. নববর্ষ উপলক্ষে গাজিপুরে ব্রহ্মোপাসনা (উদ্‌বোধন)	তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, জ্যৈষ্ঠ ১৮১০ শক : ১২৯৫
৩. ধর্ম ও ধর্মনীতির অভিব্যক্তি (Evolution)	রবীন্দ্রবীক্ষা ১, শ্রাবণ ১৩৮৩ রচনা : ১২৯৫
৪. চন্দ্রনাথবাবুর স্বরচিত লয়তত্ত্ব	সাধনা, আষাঢ় ১২৯৯
৫. নব্য লয়তত্ত্ব	সাহিত্য, ভাদ্র ১২৯৯
৬. 'সুখ না দুঃখ' / উক্ত প্রবন্ধ সম্বন্ধে বক্তব্য	সাধনা, মাঘ ১২৯৯
৭. বেদান্তের বিদেশীয় ব্যাখ্যা	সাধনা, ভাদ্র ১৩০১
৮. রামমোহন রায়	ভারতী, কার্তিক ১৩০৩

১. ১০ শ্রাবণ ১২৯২ তারিখের 'সঞ্জীবনী' পত্রিকায় একটি সংবাদ প্রকাশিত হয় : "১১ শ্রাবণ রবিবার অপরাহ্ণ ৫।০টার সময়ে আদি ব্রাহ্ম-সমাজে শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'সাকার ও নিরাকার উপাসনা" বিষয়ে বক্তৃতা করিবেন।" এইটিই সেই প্রবন্ধ। ইহা ভাদ্র সংখ্যা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতেও (পৃ. ৯৪-১০২) সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি ব্যাখ্যাত্মক টীকা-সহ পুনর্মুদ্রিত হয়। ১৯তম অনুচ্ছেদে 'কিন্তু আমার সম্বন্ধে তাহা তাহাই সেই সম্বন্ধ বিচার করিয়াই আমাকে চলিতে হইবে, আর কোন সম্বন্ধ বিচার করিলে আমি মারা পড়িব' বাক্যটির টীকায় তিনি লেখেন,

"কাগজের যেমন ও পিট্ বাদে শুদ্ধ কেবল এ-পিট্-মাত্র অবশিষ্ট থাকিতে পারে না— সেইরূপ কোন সত্তারই গুণ-বাদে শুদ্ধ কেবল বস্তু-মাত্র অবশিষ্ট থাকিতে পারে না। শাস্ত্র এবং আত্মপ্রত্যয় দুইই এই সত্যটি প্রতিপাদন করিতেছে যে, চিৎ এবং আনন্দ এই দুই আধ্যাত্মিক গুণ এবং তাহার আধার-ভূত বস্তু সৎ তিন ধরিয়া "সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম" এই এক সত্য আত্মাতে প্রতীয়মান হয়। সং"

প্রবন্ধটি সেই সময়ে যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছিল। ভারতী-র আশ্বিন-কার্তিক সংখ্যায় গোবিন্দলাল দত্ত ইহার একটি সুদীর্ঘ 'প্রতিবাদ' (পৃ. ২৮৭-৯২) প্রকাশ করেন। শ্রীকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও 'সোমপ্রকাশ'-এর ২৩ ও ৩০ অগ্রহায়ণ সংখ্যাতে একটি দীর্ঘ প্রতিবাদ-পত্র মুদ্রিত করিয়াছিলেন।

২. ১ বৈশাখ ১২৯৫ গাজিপুর ব্রাহ্মসমাজে রবীন্দ্রনাথ যে প্রারম্ভিক উপাসনা করিয়াছিলেন, তাহাই 'নববর্ষ উপলক্ষে গাজিপুরে ব্রহ্মোপাসনা (উদ্বোধন)' নামে মুদ্রিত হয়। রচনাটিতে লেখকের নাম নাই, ভাষা ও ভাবের বিচারে ইহা রবীন্দ্রনাথের রচনা বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে।

৩. 'ধর্ম ও ধর্মনীতির অভিব্যক্তি (Evolution)' রচনাটি পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তক-এ রবীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষরে পাওয়া গিয়াছে, রচনার তারিখ ২২ নভেম্বর ১২৮৮ (৮ অগ্রহায়ণ ১২৯৫)।

৪. 'সাধনা'-য় রবীন্দ্রনাথ 'সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা' নামক একটি বিভাগের প্রবর্তন করিয়াছিলেন তাহা পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। 'চন্দ্রনাথবাবুর স্বরচিত লয়তত্ত্ব' প্রবন্ধটি প্রকৃতপক্ষে এইরূপই একটি রচনা, আকারের দীর্ঘতার জন্য স্বতন্ত্র প্রবন্ধরূপে মুদ্রিত হইয়াছে। সাধনা-র আষাঢ় ১২৯৯ সংখ্যায় উক্ত বিভাগটির অনুপস্থিতিও লক্ষণীয়। চন্দ্রনাথ বসুর 'লয়'-সংক্রান্ত প্রথম প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় মাঘ ১২৯৮-সংখ্যা 'সাহিত্য'-তে, রবীন্দ্রনাথ তাহার সমালোচনা করেন সাধনা-র ফাল্গুন সংখ্যায় (দ্র বর্তমান রচনাবলী, 'সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা' : সাধনা, ফাল্গুন ১২৯৮)। সেই সমালোচনার প্রত্যুত্তরে চন্দ্রনাথ উক্ত বিষয়ে দ্বিতীয় প্রবন্ধটি রচনা করেন, তাহা সাহিত্য ১২৯৯ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় মুদ্রিত হয়। তাহারই উত্তর বর্তমান রচনাটি।

৫. লয়-বিষয়ক চন্দ্রনাথ বসুর তৃতীয় রচনা 'আমার "স্বরচিত" লয়তত্ত্ব' সাহিত্য ১২৯৯ শ্রাবণ সংখ্যায় মুদ্রিত হয়। রবীন্দ্রনাথ ইহার উত্তরে 'নব্য লয়তত্ত্ব' প্রবন্ধ লিখিয়া উক্ত পত্রিকাতেই পাঠাইয়া দেন। এই বিষয়ে তিনি সাধনা-র ভাদ্র-আশ্বিন সংখ্যার 'সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা'য় লেখেন, '...আমাদের যাহা বক্তব্য তাহা সাহিত্যেই লিখিয়া পাঠাইয়াছি।" শেষে লেখেন, "দেখিতেছি আমাদের আলোচনা ক্রমশঃ কথাকাটাকাটিতে পরিণত হইতেছে, অতএব আলোচনা এইখানেই লয় প্রাপ্ত হইলে মন্দ হয় না।" চন্দ্রনাথ এই প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছিলেন।

৬. মাঘ ১২৯৯-সংখ্যা সাধনা-তে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী 'সুখ না দুঃখ' নামে যে প্রবন্ধ লেখেন, রবীন্দ্রনাথ 'উক্ত প্রবন্ধ সম্বন্ধে বক্তব্য' শিরোনামে তাঁহার মতামত প্রকাশ করিয়াছেন বর্তমান রচনাটিতে।

৭. 'বেদান্তের বিদেশীয় ব্যাখ্যা' রচনাটিতে রবীন্দ্রনাথ জার্মান অধ্যাপক ডাঃ পল ডয়সেনের বেদান্তদর্শন বিষয়ক একটি প্রবন্ধ অনুবাদ করেন, শেষে 'অনুবাদকের প্রশ্ন' শিরোনামে তাঁহার বক্তব্যের সমালোচনা করিয়াছেন।

৮. ১২ আশ্বিন ১৩০৩ (২৭ সেপ্টেম্বর ১৮৯৬) তারিখে মির্জাপুর স্ট্রীটে অবস্থিত সিটি কলেজে রাজা পিয়ারীমোহন মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত রামমোহন রায়ের ৬৩তম মৃত্যুবার্ষিকী স্মরণসভায় রবীন্দ্রনাথ 'রামমোহন রায়' প্রবন্ধটি পাঠ করেন। 'ভারতপথিক রামমোহন রায়' (১৩৬৬) গ্রন্থে সংকলিত।

শিক্ষা

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-বিষয়ক অধিকাংশ রচনা রবীন্দ্র-রচনাবলী দ্বাদশ ও অষ্টাবিংশ খণ্ডে : সুলভ ষষ্ঠ ও ষোড়শ খণ্ডে সংকলিত হইয়াছে। এখানে আরও তিনটি রচনা সাময়িক পত্র হইতে সংকলন করা হইল। ইহাদের প্রকাশ-সূচী নিম্নরূপ :

১. ছাত্রদের নীতিশিক্ষা	সাধনা, মাঘ ১২৯৯
২. ছাত্রবৃত্তির পাঠ্যপুস্তক	সাধনা, ভাদ্র-কার্তিক ১৩০২
৩. মুসলমান ছাত্রের বাংলা শিক্ষা	ভারতী, কার্তিক ১৩০৭

১. 'ছাত্রদের নীতিশিক্ষা' 'প্রসঙ্গ-কথা' নামে মুদ্রিত হয়, সূচীপত্রে 'ছাত্রদের নীতিশিক্ষা' নামটি পাওয়া যায়। রচনাটি স্বাক্ষরহীন, বক্তব্য ও রচনারীতির দিক দিয়া ইহাকে রবীন্দ্র-রচনা বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ইহা রাজশাহী কলেজের এক অধ্যাপকের লেখা

'ইন্দ্রিয়-সংযম' নামক একটি গ্রন্থের সমালোচনা, দৈর্ঘ্য ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য আলোচনার সুযোগ লাভের উদ্দেশ্যে স্বতন্ত্র প্রবন্ধাকারে উপস্থাপিত হইয়াছে।

২. 'ছাত্রবৃত্তির পাঠ্যপুস্তক' রচনাটি স্বাক্ষরহীন, বিষয়বস্তু ও ভাষাভঙ্গির বিচারে ইহাকে রবীন্দ্র-রচনা বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে।

৩. "গত বৎসর মুসলমান শিক্ষাসম্মিলন উপলক্ষ্যে খ্যাতনামা জমিদার শ্রীযুক্ত সৈয়দ্ নবাবআলি চৌধুরী মহাশয় বাঙ্গলা শিক্ষা সম্বন্ধে একটি উর্দ্দু প্রবন্ধ পাঠ করেন তাহারই ইংরেজী অনুবাদ ['Vernacular Education in Bengal'] সমালোচনার্থে আমাদের নিকট প্রেরিত হইয়াছে"— এই মন্তব্য-সহ রবীন্দ্রনাথ উক্ত ভাষণের সমালোচনা করেন 'মুসলমান ছাত্রের বাংলা শিক্ষা' প্রবন্ধটিতে।

উল্লেখ্য, রবীন্দ্র-রচনাবলীর বর্তমান খণ্ডে 'সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা' বিভাগে আষাঢ় ১৩০৫-সংখ্যা ভারতী-তে কৃষ্ণভাবিনী দাস -লিখিত 'আজকালকার ছেলেরা' প্রবন্ধ (প্রদীপ, জ্যৈষ্ঠ ১৩০৫) এবং উক্ত পত্রিকার শ্রাবণ ১৩০৫-সংখ্যায় রাজেশ্বর গুপ্ত -সম্পাদিত 'অঞ্জলি' মাসিক পত্রিকা (জ্যৈষ্ঠ ১৩০৫) সম্পর্কে মন্তব্য করিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথ তাঁহার শিক্ষা-বিষয়ক মতামত সংক্ষেপে ব্যক্ত করিয়াছেন।

সমাজ

রবীন্দ্রনাথের সমাজ-বিষয়ক বহু রচনা বিভিন্ন গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হইয়া রবীন্দ্র-রচনাবলীর বিভিন্ন খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। এখানে উনবিংশ শতাব্দীতে লিখিত উক্ত বিষয়ের অগ্রন্থিত রচনাগুলি সংকলিত হইল। ইহাদের সাময়িক পত্রের প্রকাশ-সূচী এইরূপ :

১.	বাঙালির আশা ও নৈরাশ্য	ভারতী, মাঘ ১২৮৪
২.	ইংরাজদিগের আদব-কায়দা	ভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১২৮৫
৩.	নিন্দা-তত্ত্ব	ভারতী, আশ্বিন ১২৮৬
৪.	পারিবারিক দাসত্ব	ভারতী, চৈত্র ১২৮৭
৫.	জুতা-ব্যবস্থা	ভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১২৮৮
৬.	চীনে মরণের ব্যবসায়	ভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১২৮৮
৭.	নিমন্ত্রণ-সভা	ভারতী, আষাঢ় ১২৮৮
৮.	চেঁচিয়ে বলা	ভারতী, ফাল্গুন ১২৮৯
৯.	জিহ্বা আস্ফালন	ভারতী, শ্রাবণ ১২৯০
১০.	জিজ্ঞাসা ও উত্তর	ভারতী, ভাদ্র ১২৯০
১১.	সমাজ সংস্কার ও কুসংস্কার	ভারতী, আশ্বিন ১২৯০
১২.	ন্যাশনল ফন্ড	ভারতী, কার্তিক ১২৯০
১৩.	টৌন্হলের তামাশা	ভারতী, পৌষ ১২৯০
১৪.	অকাল কুষ্মাণ্ড	ভারতী, চৈত্র ১২৯০
১৫.	হাতে কলমে	ভারতী, ভাদ্র-আশ্বিন ১২৯১
১৬.	একটি পুরাতন কথা	ভারতী, অগ্রহায়ণ ১২৯১
১৭.	কৈফিয়ত	ভারতী, পৌষ ১২৯১
১৮.	[দুর্ভিক্ষ]	তত্ত্বকৌমুদী, জ্যৈষ্ঠ ১২৯২
১৯.	লাঠির উপর লাঠি	বালক, জ্যৈষ্ঠ ১২৯২
২০.	সত্য	বালক, চৈত্র ১২৯২
২১.	আপনি বড়ো	কল্পনা, জ্যৈষ্ঠ ১২৯৪

২২.	হিন্দুদিগের জাতীয় চরিত্র ও স্বাধীনতা	রবীন্দ্রবীক্ষা ১, শ্রাবণ ১৩৮৩, রচনা : ১৮৮৮
২৩.	স্ত্রী ও পুরুষের প্রেমের বিশেষত্ব	দেশ, শারদীয় ১৩৫৩, রচনা : ১৮৮৮
২৪.	আমাদের সভ্যতায় বাহ্যিক ও মানসিকের অসামঞ্জস্য	দেশ, শারদীয় ১৩৫২, রচনা : ১৮৮৮
২৫.	সমাজে স্ত্রী-পুরুষের প্রেমের প্রভাব	পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তক, রচনা : ১৮৮৮
২৬.	আমাদের প্রাচীন কাব্যে ও সমাজে স্ত্রী-পুরুষ প্রেমের অভাব	দেশ, শারদীয় ১৩৫৩, রচনা : ১৮৮৮
২৭.	Chivalry	দেশ, শারদীয় ১৩৫৩, রচনা : ১৮৮৮
২৮.	নব্যবঙ্গের আন্দোলন	ভারতী ও বালক, ভাদ্র ও আশ্বিন ১২৯৬

১. 'বাঙালির আশা ও নৈরাশ্য' প্রবন্ধটি ও একই সংখ্যায় মুদ্রিত 'বঙ্গে সমাজ-বিপ্লব' রচনা দুইটিকে সজনীকান্ত দাস শনিবারের চিঠি, অগ্রহায়ণ ১৩৪৬-সংখ্যায় 'রবীন্দ্র-রচনাপঞ্জী'তে অন্তর্ভুক্ত করিয়াও মন্তব্য করিয়াছেন, 'রচনা দুইটি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের সংশয় আছে'; কিন্তু তাঁহার 'রবীন্দ্রনাথ : জীবন ও সাহিত্য' (১৩৬৭) গ্রন্থে এই বাক্যটি বাদ দিয়াছেন। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ইহাদের উল্লেখই করেন নাই। পুলিনবিহারী সেন 'রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত সাময়িক পত্র' (দেশ, শতবর্ষপূর্তি সংখ্যা ১৩৬৯) প্রবন্ধের পরিশিষ্টে প্রদত্ত 'ভারতী প্রথম বর্ষে প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনার সূচী'তে উক্ত রচনাদ্বয় অন্তর্ভুক্ত করিয়া প্রবন্ধ দুইটি পুনর্মুদ্রিত করিয়াছেন। 'বাঙালির আশা ও নৈরাশ্য' প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথের লেখা হইলেও 'বঙ্গে সমাজ-বিপ্লব' বিষয়ে কিছু সংশয় আছে। প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ *Golden Book of Tagore* [1931]-এ 'বাঙালির আশা ও নৈরাশ্য' প্রবন্ধটিকেই তাঁহার রচনা বলিয়া চিহ্নিত করিয়াছেন। 'বঙ্গে সমাজ-বিপ্লব' প্রবন্ধটি অবশ্য এই গ্রন্থের পরিশিষ্ট বিভাগে সংকলিত হইল।

২. 'ইংরাজদিগের আদব-কায়দা' প্রবন্ধটি প্রথমবার বিলাতযাত্রার আগে আমেদাবাদে অবস্থানের সময়ে লেখা। বিলাতযাত্রার প্রস্তুতি হিসাবে সেখানকার সামাজিক রীতিনীতির সহিত পরিচিত হইবার উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ যে-সকল ইংরেজি গ্রন্থ পাঠ করিতেছিলেন, তাহা অবলম্বন করিয়া প্রবন্ধটি রচিত হইয়াছে ইহা মনে করা যাইতে পারে।

৩. 'নিন্দা-তত্ত্ব' প্রবন্ধটি সম্পর্কে সজনীকান্ত দাস লিখিয়াছেন, 'প্রবন্ধটি সম্পূর্ণ চলতি ভাষায় ('য়ুরোপযাত্রী কোন বঙ্গীয় যুবকের পত্রে'র ভাষায়) লিখিত হইলেও এতৎসম্পর্কে আমি নিঃসংশয় নহি।' কিন্তু প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁহার 'রবীন্দ্রনাথের বাল্যরচনা : কালানুক্রমিক সূচী'-তে (দ্র রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসা ১ম খণ্ড, পৃ. ২৪৫) প্রবন্ধটিকে নিঃসন্দিগ্ধভাবে তালিকাভুক্ত করিয়াছেন, কিন্তু কোনো যুক্তি দেখান নাই। তবু কয়েকটি কারণে রচনাটিকে রবীন্দ্রনাথের লেখা বলিয়া চিহ্নিত করা যায়। প্রথমত, সামান্য একটি বক্তব্যের ক্ষীণ সূত্র ধরিয়া কথার জাল বুনিয়া বুনিয়া একটি প্রবন্ধ তৈয়ারি করার যে-প্রবণতা তাঁহার পরবর্তীকালের 'যথার্থ দোসর', 'গোলাম চোর' প্রভৃতি রচনাগুলিতে দেখা যায়, 'নিন্দা-তত্ত্ব'-কে তাহারই পূর্বসূরী বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। দ্বিতীয়ত, সমকালীন ও অল্প-কিছু পরবর্তীকালের লেখকদের মধ্যে গুরুচণ্ডালী দোষ না ঘটাইয়া চল্‌তি ভাষায় গদ্যরচনা প্রায় বিরল এবং যে-দোষ হইতে রবীন্দ্রনাথ প্রথমাবধিই সম্পূর্ণ মুক্ত— আলোচ্য রচনাটিতে সেই বিশুদ্ধ চল্‌তি ভাষার পরিচয় পাওয়া যায়। তৃতীয়ত, 'মেঘনাদবধ কাব্য' সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের যে-বিরূপতার সাক্ষাৎ স্থানে-অস্থানে পাওয়া যায়, বর্তমান রচনাটিতেও তাহা উপস্থিত।

৪. 'পারিবারিক দাসত্ব' প্রবন্ধটি সম্পর্কে প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া সজনীকান্ত দাস লিখিয়াছিলেন, 'য়ুরোপ যাত্রী কোন বঙ্গীয় যুবকের পত্র' ধারাবাহিক ভাবে 'ভারতী'তে বাহির হয়। শেষের দিকে কোনও কোনও উগ্র মতামতের দরুন সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রনাথ লেখক রবীন্দ্রনাথকে পাদটীকায় কঠিন সমালোচনা করেন। এই প্রবন্ধটি সম্ভবত জ্যেষ্ঠে-কনিষ্ঠে মতান্তরের ফল। সদ্য বিলাতফেরত রবীন্দ্রনাথ এদেশীয় সমাজ-ব্যবস্থাকে আক্রমণ করিতে চাহিয়াছেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধের পরেও সম্পাদকীয় প্রতিবাদ-মন্তব্য যোগ করেন।' ইংলন্ড হইতে লেখা একটি পত্রে [ভারতী, পৌষ ১২৮৬, পৃ. ৩৯৪-৪১১, য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র (৯)] রবীন্দ্রনাথ জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠ ও প্রভু-ভৃত্য সম্পর্ক সম্বন্ধে তাঁহার তৎকালীন ধারণা ব্যক্ত করিতে গিয়া লিখিয়াছিলেন, 'আমরা পারিবারিক দাসত্বকে দাসত্ব নাম দিই নে' এবং পত্রটির উপরে দীর্ঘ সম্পাদকীয় টীকা মুদ্রিত হয়— কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রত্যুত্তর প্রকাশিত হয় নাই। বর্তমান প্রবন্ধটিই সেই প্রত্যুত্তর। ইহার উত্তরে দ্বিজেন্দ্রনাথ যে মন্তব্য করেন, তাহা নিম্নে উদ্‌ধৃত হইল—

পূর্বকালে চিকিৎসকেরা পুঁথির বচন অভ্রান্ত মনে করিয়া রোগ কেবল নয় রোগের আধার পর্যন্ত— রোগী পর্যন্ত বিনাশ করিতে ত্রুটি করিতেন না, লোকের যখন চক্ষু ফুটিতে লাগিল তখন হাতুড়িয়ার দল ক্রমে ক্রমে পসার করিতে আরম্ভ করিল; অব্যর্থ ঔষধির বিজ্ঞাপন সংবাদপত্রের আপাদমস্তক জুড়িয়া আশ্বাস বাক্যের ঘটায় রোগীর অর্ধেক রোগ নিবারণ করিতে লাগিল, উঁহারা ইঁহাদিগকে হাতুড়িয়া— ইঁহারা উঁহাদিগকে গোবৈদ্য বলিয়া উড়াইয়া দিতে লাগিলেন, কিন্তু জনসাধারণের রোগ উড়াইয়া দেওয়া তেমন সহজ ব্যাপার নহে। সমাজ-সংক্রান্ত রোগেরও ওইরূপ দুই দল চিকিৎসক দেখিতে পাওয়া যায়, এক দল চিকিৎসক পুরাতন রীতিনীতিকে অব্যর্থ ঔষধি মনে করেন আর-এক দল আপনাদের নব নব সিদ্ধান্তকে অব্যর্থ মহৌষধি মনে করেন। ফরাসিস বিদ্রোহে দুই দলেরই বিশিষ্টরূপে বল পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে কিন্তু এখনও তাহার জের চলিতেছে— তাহার সাক্ষী— সম্প্রতি হাতুড়িয়ার হাতে পড়িয়া রুশিয়াকে পতিহীন হইতে হইয়াছে। দুই দলকেই লক্ষ্য করিয়া বলা যাইতে পারে সর্বমত্যন্ত গর্হিতং। বর্তমান প্রস্তাব উপলক্ষে আমরা তাহাই বলিতে বাধ্য হইতেছি।

পারিবারিক দাসত্ব কথাটাই আমাদের কেমন কেমন ঠেকে— তাহাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া পারিবারিক বন্ধন কথাটাই আমাদের মনের সমক্ষে বলপূর্বক দণ্ডায়মান হয়— কিন্তু তাহা বলিয়া বলকে প্রশ্রয় দেওয়া আমাদের অভিপ্রায় নহে। দুই কথাকেই যুক্তির তুলাদণ্ডে তৌল করিয়া যাহা দাঁড়াইবে তাহাই আমরা শিরোধার্য করিতে প্রস্তুত। দাসত্ব শব্দের ভাবটা কিছু গোলমেলে; ও কথা সম্বন্ধে নানারূপ প্রশ্ন উঠিতে পারে; ভূতপূর্ব আমেরিকার প্রভুদের নিকট কাফ্রীদের আজ্ঞাধীনতাকে যেরূপ দাসত্ব বলিতে পারা যায়, সেনাপতির নিকট সৈন্যদিগের আজ্ঞাধীনতাকে সেরূপ দাসত্ব বলিতে পারা যায় কি না? প্রভুর নিকট একজন কিঙ্করের আজ্ঞাকারিতাকে যেমন দাসত্ব বলিতে পারা যায়— পিতামাতার নিকট পুত্রের আজ্ঞাকারিতাকে সেরূপ দাসত্ব বলিতে পারা যায় কি না? দাসত্ব কথাটা শুনিলেই মনে হয় যে, তাহার সহিত কাপুরুষত্ব জড়ানো আছে, কিন্তু ছোটো ভাই যদি দাদা যাহা বলে তাহা শুনে তাহা হইলে তাহাকে কি কাপুরুষ বলিয়া মনে হয়— কিংবা সৈন্য যদি সেনাপতির কথা শুনে তাহাকে কি কাপুরুষ বলিয়া মনে হয়, তাহা দূরে থাকুক রাম অপেক্ষা লক্ষ্মণকে আরও বেশি বীরপুরুষ বলিয়া মনে হয়। লেখকের লেখার ধরন দেখিলে হঠাৎ লোকের যাহা মনে হইতে পারে তাহা লক্ষ করিয়া আমরা উপরি-উক্ত কথাগুলি বলিলাম— কিন্তু লেখক বোধ হয় রামের নিকট লক্ষ্মণের আজ্ঞাধীনতাকে দাসত্ব বলিয়া দোষ দিতে কখনোই প্রবৃত্ত হইবেন না। কৈকেয়ীর মতন গুরুজনের নিকট রামের দাসত্বকেই লেখক দাসত্ব বলিয়া দোষারোপ করেন, কিন্তু তাহা হইলেও দাসত্ব শব্দটা শুনিবামাত্র কাপুরুষত্বের ভাব সহসা যাহা আমাদের মনে উদয় হয়, সে ভাব দূরে থাকুক তাহার ঠিক বিপরীত ভাবই আমাদের মনকে ভক্তি ও বিস্ময় -রসে

অভিভূত করে; কৈকেয়ীর সমীপে রামের আজ্ঞাকারিতা অসাধারণ বীরপুরুষের লক্ষণ বলিয়া মনে হয়। সৈন্যেরা যে সেনাপতির দাসত্ব করে, পুত্র যে পিতার দাসত্ব করে, সে দাসত্ব মহত্ত্বেরই লক্ষণ; একটি গান আছে 'ভয় করিলে যাঁরে না থাকে অন্যের ভয়'— সেনাপতির দাসত্ব করিলে শত্রুর দাসত্ব-শৃঙ্খলে বদ্ধ হইতে হয় না, পিতার দাসত্ব করিলে অজ্ঞাত-কুলশীল যে-সে লোকের দাসত্ব-শৃঙ্খলে বদ্ধ হইতে হয় না; একজন জর্মান বক্তা বলিয়াছেন, Liberty I am thy slave— এ দাসত্ব যেমন, পিতার কাছে দাসত্বও সেইরূপ উচ্চ দরের দাসত্ব। এইরূপ মহত্ত্ব-সূচক দাসত্ব যিনি যত অভ্যাস করেন তিনি তত নীচত্ব-সূচক দাসত্বের হস্ত হইতে দূরে অবস্থিতি করেন— দুই দাসত্বের মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ। এই তো গেল শব্দের মার-প্যাঁচ— এখন আসল কথাটা কী দেখা যাক— লেখকের অভিপ্রায় এই যে, রাম কৈকেয়ীর আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে পারেন না বলিয়া কৈকেয়ীর কি কর্তব্য যে, তিনি রামকে বনে পাঠান? এখন— রামের গুরুজন বলিলে অগ্রে কৌশল্যা সুমিত্রা দশরথ বশিষ্ঠ প্রভৃতিকেই মনে পড়ে— কৈকেয়ীকে গুরুজনের ওঁচা বলিয়া মনে হয়। এ স্থলে দেখা উচিত যে, কৈকেয়ী আপনার ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়াছে বলিয়া সাধারণত রামের গুরুজন তাহার জন্য দায়ী নহেন। এমনি— কোথায় কোন্ গুরুজন আপনার ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়াছে বলিয়া সাধারণত সকল গুরুজন সে দোষে দোষী হইতে পারে না; কিন্তু লেখক বলেন সাধারণত গুরুজনদিগের স্ব স্ব ক্ষমতার অপব্যবহার করিবারই কথা— না করেন তো সে ছোটোদের পরম সৌভাগ্য। ক্ষমতার অপব্যবহার করা মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ এই মূল তত্ত্বটির উপর দাঁড়াইয়া লেখক গুরুজনদিগের প্রতি ঘোরতর কটাক্ষপাত করিতেছেন, তিনি বলেন 'মনুষ্যজাতি স্বভাবত ক্ষমতার অন্ধ উপাসক। যে পক্ষে ক্ষমতা সেই পক্ষে আমাদের সমবেদনা আর অসহায়ের আমরা কেহ না, এইজন্যই একজনের হাতে যথেচ্ছা ক্ষমতা থাকিলে অত্যন্ত ভয়ের বিষয়। তাহার ব্যবহারের ন্যায়ান্যায় বিচার করিবার লোক সংসারে পাওয়া যায় না, কাজে তাহাকে আর বড়ো একটা ভাবিয়া চিন্তিয়া কাজ করিতে হয় না। যাহাদের বিবেচনা করিয়া চলা বিশেষ আবশ্যক সংসারের গতিকে এমনই হইয়া দাঁড়ায় যে, তাঁহাদেরই বিবেচনা করিয়া চলিবার কম প্রবর্তনা হয়, এই গুরুজন সম্পর্কেই একবার ভাবিয়া দেখো-না। আইন যত বাঁধাবাঁধি যত কড়াক্কড় সমস্তই কি কনিষ্ঠদের উপরে না?'

এ স্থলে বক্তব্য এই যে, ক্ষমতার অপব্যবহার যেমন মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ, ছোটোদের প্রতি স্নেহও তেমনি মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ— বিশেষত ঘরের ছেলেদের প্রতি— আপনার ছেলেদের তো কথাই নাই। দুষ্ট বালকেরা অনেক জায়গায় গুরুজনদিগেরই স্নেহকে সহায় করিয়া গুরুজনদিগেরই প্রতি অবাধ্যতাচরণ করে— তাহারা মনে মনে বলে, 'হদ্দ মারিবেন নয় বকিবেন ফাঁসি তো আর দিবেন না'— গুরুজনদিগের স্নেহ তাঁহাদের প্রভুতাকে ছাপাইয়া উঠে— ইহা বলা বাহুল্য। স্নেহের বাঁধ অতিক্রম করিয়া ক্ষমতার অপব্যবহার মাল-মোকদ্দামা স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায়— ওইরূপ বিশেষ বিশেষ স্থলে যাহা হয় তাহা সাধারণত সকল স্থলেই সংলগ্ন হইতে পারে না।

অদ্যাপি এমন কোনো সমাজ-তত্ত্ববিৎ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কি না সন্দেহ যাঁহাকে না মানিতে হইয়াছে যে— সমাজ-তত্ত্বের অতি অল্পই তাঁহাদের বুদ্ধির আয়ত্তাধীন। সামাজিক সকল তত্ত্বেরই দুই দিক আছে এবং দুই দিকেই ভালো মন্দ দুই-ই আছে; এক দিকের ভালো এক দেশে শোভা পায়, আর-এক দিকের ভালো আর-এক দেশে শোভা পায়, এক দিকের ভালো এক কালে শোভা পায়, আর-এক দিকের ভালো আর-এক কালে শোভা পায়; এ ভিন্ন সকল দিকের ভালো একই দেশে একই কালে শোভা পাইবে কি সম্ভবই নহে।

ইংলন্ডে প্রভু যে দাসকে আজ্ঞা না করিয়া অনুগ্রহ করিতে বলেন তাহার ভালোর দিকটাই লেখক দেখাইয়াছেন— কিন্তু অতটা কায়দা-কানুন আমাদের দেশের সহজ-শোভন প্রকৃতির সহিত কোনো মতেই মিল খায় না— আমাদের দেশের গৃহস্থেরা চাকরবাকরদের তুই-তোকারি করে বটে কিন্তু তাহার মধ্যে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের ভাব দূরে থাকুক স্নেহ-বাৎসল্যেরই প্রাবল্য দৃষ্ট হয়— আমাদের

দেশের 'বাপু বাছা' শব্দ Please, thank you প্রভৃতি শব্দ অপেক্ষা হৃদয়ের গভীরতর প্রদেশ হইতে বাহির হয়; এবং সাধারণত এইরূপ দেখা যায় যে, ছেলেদের উপর পিতার কটু-কাটব্য করিবার যতটুকু অধিকার তাহার সীমা লঙ্ঘন করিয়া ভৃত্যদের প্রতি কটূক্তি করা আমাদের দেশের প্রকৃতি-বিরুদ্ধ; তবে— শহর অঞ্চলের প্রকৃতিকে সাধারণত আমাদের দেশের প্রকৃতি বলিয়া গণ্য করিলে আমরা নিরুত্তর।

ভক্তি এবং অনুরাগ সম্বন্ধে লেখক যাহা বলিয়াছেন তাহাও আমাদের সংগত বোধ হয় না। পূজ্যের প্রতি অনুরাগকেই ভক্তি কহে— সমানের প্রতি অনুরাগকেই প্রেম কহে— শাসন-ভয়কে তো আর ভক্তি বলে না। মনুষ্যের স্থায়ী উন্নতি-স্পৃহাও আছে এবং ক্ষণিক আমোদ-স্পৃহাও আছে, উন্নত লোকদিগের প্রতি ভক্তিও স্বাভাবিক, সমানে সমানে প্রেমও স্বাভাবিক। নেপোলিয়নের প্রতি সৈন্যদের কেমন অনুরাগ ছিল— সে অনুরাগ একরূপ, আর বয়স্যে বয়স্যে অনুরাগ একরূপ; প্রথম প্রকারের অনুরাগের নামই ভক্তি, দ্বিতীয় প্রকার অনুরাগের নামই প্রণয়; ভক্তি-প্রকাশ করা যেমন করিয়াই হউক-না-কেন তাহাতে কিছু আইসে যায় না, কিছু না করিয়া ভক্তি প্রকাশ করা হোক, সেলাম করিয়া ভক্তি প্রকাশ করা হোক, প্রণাম করিয়া ভক্তি প্রকাশ করা হোক, যাহাই হউক-না-কেন ভক্তির পাত্রে ভক্তি ভিন্ন নীচু শ্রেণীর অনুরাগ শোভা পায় না; মনে করো ব্যাসদেব আসিয়া তোমার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহার সহিত শেক্‌হ্যান্ড করিবার জন্য হাত বাড়াইয়া দিতে তোমার কি মনে একটুও কিন্তু হইবে না? একত্রবাসী ঘরের লোকদের মধ্যে কিছু না করিয়াও ভক্তিই বলো, আর প্রণয়ই বলো ব্যক্ত করা হইয়া থাকে; পুত্রেরা পিতাকে প্রণাম না করিয়াও ভক্তি প্রদর্শন করে, ভ্রাতারা পরস্পর আলিঙ্গন না করিয়াও সৌহার্দ্য বিস্তার করে। ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি অপেক্ষা প্রেমের মূল্য অধিক বলিয়া যদি মানা যায় তবে তাহার একটি বিশেষ কারণ আছে— সে কারণ অন্য কোথাও খাটে না, সে কারণ এই যে, তিনি যেমন দূর হইতে দূরতম তেমনি নিকট হইতে নিকটতম— যেমন বৃহৎ হইতে বৃহৎ তেমনি অণু হইতে অণু; কিন্তু সংসারে যে বড়ো সে বড়ো, যে ছোটো সে ছোটো— বড়ো-ছোটোর মধ্যে এইরূপ প্রাচীরের আড়াল রহিয়াছে; তাহা যদি না থাকে তবে সংসারের বৈচিত্র্য রক্ষা হইতে পারে না।

লেখক বলিয়াছেন, 'এইজন্য সকল শাস্ত্রেই লিখিয়াছে যে, গুরুজনের অবাধ্য হওয়া পাপ— কোনো শাস্ত্রেই লেখে নাই, কনিষ্ঠদের প্রতি যথেচ্ছা ব্যবহার করা পাপ।' এ কথাটি ঠিক নয়। মনু বলিয়াছেন, 'গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্যাকার্যমজানতঃ। উৎপথ প্রতিপন্নস্য ন্যায্যংভবতি শাসনং।' গুরু যদি গর্বিত কার্যাকার্য-জ্ঞানশূন্য ও বিপথগামী হন তাঁহাকেও শাসন করা উচিত। এখনও লোকপ্রবাদ আছে যে, 'দোষাবাচ্যা গুরোরপি।'

৫. 'জুতা-ব্যবস্থা' প্রবন্ধটির শিরোনামের নীচে কৌতুক করিয়া মুদ্রিত হয়, '(১৮৯০ খৃস্টাব্দে লিখিত।)' অর্থাৎ আরও দশ বৎসর পরে বাঙালি জাতির কীরূপ অবস্থা হইবে তাহারই কাল্পনিক চিত্র ইহাতে অঙ্কিত হইয়াছে। প্রবন্ধটির শেষে সম্পাদকীয় পাদটীকায় লিখিত হয়— "This evening's Englishman has discovered the secret of correctly treating the people of Bengal. It says 'Kick them first and then speak to them'" —*Indian Mirror*. যে সমগ্র জাতিকে কোনো বিজাতীয় কাগজ হাটের মধ্যে এরূপ জুতা মারিতে সাহস করে, সে জাতি উপরি-প্রকাশিত প্রবন্ধ পড়িয়া বিস্মিত হইবে না। বোধ হয়, লেখক রহস্যচ্ছলে প্রবন্ধটি লিখিয়াছেন, কিন্তু উহা সত্যের এত কাছ ঘেঁসিয়া গিয়াছে যে বাঙালি জাতির পক্ষে উহা রহস্যাত্মক হইবে না। আজ অন্য কোনো দেশে যদি কোনো কাগজ ওইরূপ অপমানের আভাস মাত্র দিত, তাহা হইলে দেশবাসীরা তৎক্ষণাৎ নানা উপায়ে তাহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার আয়োজন করিত। কিন্তু এত দিন হইতে আমরা জুতা হজম করিয়া আসিতেছি যে, আজ উহা আমাদের নিকট গুরু পাক বলিয়া ঠেকিতেছে না— সং।" মন্তব্যটি *Englishman* পত্রিকায় প্রকাশিত হয় 30 April 1881, *Hindoo Patriot* 2 May ইহার উপর মন্তব্য করিতে গিয়া লেখে : 'This evening's Englishman has discovered the secret of correctly treating the people of Bengal. It says "KICK THEM FIRST AND THEN SPEAK TO THEM." *Age lat, pechoo bat.* It is so throughly gentlemanly to kick a whole nation before speaking to them that none can question its propriety. We congratulate the leading Anglo-Indian paper in Calcutta on having publicly laid down this sound principle of good conduct. Alas! that the churls of the nation should wince under the treatment!' উক্ত মন্তব্যটিকে কেন্দ্র করিয়া বিভিন্ন দেশীয় পত্রিকায় যে আলোড়ন চলিয়াছিল, তাহারই প্রতিক্রিয়ায় প্রবন্ধটি রচিত হয়।

৬. 'চীনে মরণের ব্যবসায়' প্রবন্ধটির ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গি রবীন্দ্রনাথের মতো না হইলেও ইহা যে রবীন্দ্র-রচনা তাহার অন্যতম প্রমাণ *The Modern Review* [Vol. XXXVII, No. 5, May 1925, pp. 504-07] পত্রিকায় 'The Death Traffic' শিরোনামায় লেখক হিসাবে তাঁহার নাম দিয়া প্রবন্ধটির একটি ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ। বর্তমান প্রবন্ধটির পাদটীকায় লিখিত হইয়াছে : 'The Indo-British Opium Trade by Theodore Christlieb DD. PH. D. Translated from German by David B. Croom, M.A. প্রবন্ধ অবলম্বনে রচিত।' দীর্ঘকাল পরেও প্রবন্ধটি যে তাৎপর্য হারায় নাই, তাহা বিবৃত করিয়া অনুবাদটির সূচনায় চার্লস্ ফ্রিয়ার অ্যান্ডরুজ লিখিয়াছেন :

> The article which follows was written by the Poet in May, 1881, exactly forty-four years ago, for the Bengali magazine "Bharati". At Geneva, in May, 1923... Mr. John Campbell, the official representative of the Government of India, made the statement to the World Press assembled, that "*from the very beginning, the Government of India had handled the opium question with perfect honesty of purpose; and not even its most ardent opponents, including Mr. Gandhi, had ever made any reproach in that respect.*" Although called upon to withdraw the latter part of this statement, Mr. Campbell has never done so. Mahatma Gandhi has contradicted it in *Young India* : many passages have been quoted also, in contradiction, from the writings of Mr. Dadabhai Naoraji, G. K. Gokhale, Surendranath Banerjea, and others of a quite early date, as well as later expressions of opinion, but still the statement remains as it was uttered. This article, written by the Poet in Bengali when he was twenty years of age and now for the first time translated, is further convincing proof of Mr. Campbell's inaccuracy. In the original Bengali, the article takes the form of an editorial review of Dr. Christlieb's book entitled "The Indo-British Opium Trade."

৭. ১২৮৬ অগ্রহায়ণ-সংখ্যা ভারতী-তে প্রকাশিত 'য়ুরোপ-যাত্রী কোন বঙ্গীয় যুবকের পত্র'-তে (দ্র য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র, ষষ্ঠ পত্র) ইংলন্ডের নিমন্ত্রণসভা-সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যে মন্তব্য করিয়াছিলেন, সেই বিষয়টি লইয়া 'নিমন্ত্রণ-সভা' প্রবন্ধটি রচিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। উল্লেখ করা দরকার, এই সময়ে পত্রগুলি গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হইতেছে।

৮. 'চেঁচিয়ে বলা' তরুণ রবীন্দ্রনাথের একটি উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক প্রবন্ধ হইলেও সম্ভবত

সাময়িক উত্তেজনাপ্রসূত ইহার তীব্র ব্যঙ্গাত্মক প্রকাশভঙ্গির কারণে পূর্বোল্লিখিত 'জুতা-ব্যবস্থা' এবং অব্যবহিত পরবর্তীকালে রচিত 'জিহ্বা আস্ফালন', 'ন্যাশনল ফন্ড', 'টৌনহলের তামাশা' প্রভৃতি প্রবন্ধগুলির মতো এই রচনাটিকে তিনি কোনো গ্রন্থভুক্ত করেন নাই।

৯. 'জিহ্বা আস্ফালন' রচনাটি স্বাক্ষরবিহীন। হাইকোর্টের জজ নরিস সাহেবের অভিযোগক্রমে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আদালত অবমাননার দায়ে দুই মাস কারাদণ্ড ভোগ করিয়া ৪ জুলাই ১৮৮৩ তারিখে মুক্তি লাভ করেন। এই বিচার ও কারাদণ্ড সেই সময়ে বাংলাদেশে ও সমগ্র ভারতে প্রচণ্ড উত্তেজনা সৃষ্টি করিয়াছিল। তাঁহার মুক্তির দিনে নিমতলার ফ্রি চার্চ কলেজে তাঁহাকে যে সংবর্ধনা দেওয়া হয়, সেই সভায় ও পরে ১৭ জুলাই তারিখের বিরাট জনসভায় তিনি জনসাধারণকে ধৈর্য ও মিতব্যবহার অবলম্বনের উপদেশ দেন। ইহাই রবীন্দ্রনাথের বর্তমান প্রবন্ধ রচনার অব্যবহিত উপলক্ষ।

১০. 'জিজ্ঞাসা ও উত্তর' নামে একটি নূতন বিভাগ ভারতী-র বৈশাখ ১২৯০-সংখ্যা হইতে শুরু হয়। শ্রাবণ-সংখ্যায় এই বিভাগে দুইটি প্রশ্ন করা হইয়াছিল, বর্তমান সংখ্যায় ইহার উত্তর মুদ্রিত হইয়াছে। প্রথম প্রশ্ন— 'আদিশূরের সময়ে পাঁচজন কায়স্থের বাংলায় আসিবার কারণ কি'— উত্তর দিয়াছেন কৈলাসচন্দ্র সিংহ। দ্বিতীয় প্রশ্নটি ছিল 'জাতীয়তার লক্ষণ কি?' বিভিন্ন দিক দিয়া এই প্রশ্নের যে উত্তর দেওয়া হইয়াছে তাহার রচয়িতার নাম না থাকিলেও বিভাগটি রবীন্দ্রনাথই পরিচালনা করিতেন বলিয়া ইহা তাঁহার রচনা বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে।

১১. ভারতী পত্রিকার আষাঢ় ১২৯০-সংখ্যায় জ্ঞানদানন্দিনী দেবী-পঠিত 'সমাজ সংস্কার ও কুসংস্কার' নামক যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, ভাদ্র-সংখ্যায় 'শ্রীমতী—' তাহার একটি 'প্রতিবাদ' লেখেন। বর্তমান প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ 'শ্রীরঃ—' স্বাক্ষরে উভয়পক্ষের যুক্তিতর্কগুলির সারসংক্ষেপ ও বিচার করিয়া 'তৃতীয় পক্ষ' হিসাবে তাঁহার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়াছেন।

১২. সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কারামুক্তির পরে ১৭ জুলাই ১৮৮৩ তারিখে কলিকাতার অনাথনাথ দেবের বাজারে একটি বিরাট জনসভা হয়। এই সভার বিবরণে সোমপ্রকাশ (৮ শ্রাবণ ১২৯০) পত্রিকা লেখে, 'প্রায় ৫।৬ হাজার লোক একত্র মিলিত হইয়া একটি সভা করিয়াছিলেন। সভাস্থলে এই প্রস্তাব হয়, ইংলণ্ডে ও ভারতে রাজনীতি সংক্রান্ত আন্দোলনার্থ ছয় লক্ষ টাকা মূলধন সংগ্রহ করা আবশ্যক। এই প্রস্তাবটি সভার অঙ্গীকৃত ও অবধারিত হইয়াছে।' কিছুকাল পূর্বে ইলবার্ট বিলের বিরুদ্ধে আন্দোলনের জন্য ইংরাজেরা প্রায় দেড় লক্ষ টাকা চাঁদা তুলিয়াছিল। তাহাদের সাফল্যে উৎসাহিত হইয়াই এই ন্যাশনাল ফান্ডের পরিকল্পনা গৃহীত হয়। রবীন্দ্রনাথ 'ন্যাশনল ফন্ড' প্রবন্ধে কয়েকটি বিশেষ প্রশ্নে প্রস্তাবটির সমালোচনা ও কতকগুলি গঠনমূলক পরিকল্পনা পেশ করিয়াছেন।

গঠনমূলক এই পরিকল্পনা প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে অনেকদিন পরে রবীন্দ্রনাথ নিজেই একবার এই ফান্ডের নিকট হইতে সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন, শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে তাঁতের কাজ শিখাইবার ব্যবস্থা করিবার জন্য। ভারতসভার কাছে প্রেরিত সেই চিঠিটি (১০ বৈশাখ ১৩২৬) এখানে উদ্‌ধৃত হইল :

ওঁ

বিনয় সম্ভাষণ পূর্ব্বক নিবেদন—

শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের সংস্রবে তাঁতের কাজ শিক্ষা দিবার জন্য আমরা আয়োজন করিতেছি। শ্রীরামপুর হইতে তাঁত আনানো হইয়াছে। আমাদের আর্থিক অবস্থা সচ্ছল নহে এই কারণে যথোচিতভাবে আমাদের সঙ্কল্পসাধনে বাধা পড়িতেছে। ন্যাশনাল ফন্ড

হইতে তাই আমরা অর্থসাহায্য প্রার্থনা করিয়া আবেদনপত্র পাঠাইতেছি। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলে এই জায়গাটা তাঁতের কাজের প্রধান আড্ডা ছিল। এখনো অনেক তাঁতী নিকটবর্ত্তী গ্রামে বাস করে। এই কারণে এখানে তাঁতের শিক্ষালয় খুলিলে অনেক উপকার হইবে। আর যাই হোক ফন্ডের প্রদত্ত অর্থের কোনোপ্রকার অপব্যয় ঘটিবার আশঙ্কা নাই। আমাদের দাবী অসঙ্গত নহে মনে করিয়া ফন্ড হইতে উপযুক্ত পরিমাণে মাসিক সাহায্য দান সম্বন্ধে আপনি যদি আমাদিগকে আনুকূল্য করেন তবে আপনার নিকট আমরা বিশেষ কৃতজ্ঞ থাকিব। ইতি ১০ই বৈশাখ ১৩২৬।

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

—দ্রষ্টব্য : বিকাশ প্রধান, "ভারতসভা ও রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত চিঠি", 'প্রতিক্ষণ', মে ১৯৯৪, পৃ. ৬৪-৬৮। রবীন্দ্রনাথের পত্রের পাণ্ডুলিপিচিত্র এইসঙ্গে মুদ্রিত আছে।

১৩. 'টৌনহলের তামাশা' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ টাউন হলে অনুষ্ঠিত বাংলার ভূম্যধিকারীদের যে সভাকে 'তামাশা' বলিয়া ব্যঙ্গ করিয়াছেন, তাহা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল ১৭ নভেম্বর ১৮৮৩ তারিখে। এই সভার বিবরণ দিয়া *The Hindoo Patriot* [Nov 19] লেখে :

> A grand meeting of the Central Committee of the Landholders of Bengal and Behar was held at the Town Hall on Saturday last at 3-30 p.m. Although, strictly speaking, it was a meeting of the Committee, still it was open to those interested in the land question and to sympathisers, and the attendance was unexpectedly large. There were present about six hundred picked gentlemen, representing the landed property-holders of the country, and the flowers of the native society.
>
> The meeting was a great success. By far the most interesting feature of the meeting was the union of Europeans and Natives. Both went hand in hand in denouncing the confiscatory policy of the Government, the inequitableness of its proceedings, and its utter disregard of honesty and justice in connection with the matter. It remains to be seen what effect will this united protest of Europeans and natives have upon Her Majesty's Government both here and in England.

—প্রতিবেদনের 'union of Europeans and Natives', 'both went hand in hand' প্রভৃতি মন্তব্যই রবীন্দ্রনাথের ব্যঙ্গপ্রবৃত্তিকে উত্তেজিত করিয়াছিল। কিছুদিন আগে জুরিসডিকশন বিল বা ইলবার্ট বিল লইয়া য়ুরোপীয় ও অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানরা দেশীয়দের বিরুদ্ধে যে কটূক্তির ঝড় বহাইয়া দিয়াছিল, বর্তমান প্রবন্ধটি সেই ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে পঠনীয়।

১৪. 'অকাল কুষ্মাণ্ড' প্রবন্ধটি 'সাবিত্রী লাইব্রেরীর সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে লিখিত।' ১৮ নং অক্রূর দত্ত লেনে প্রতিষ্ঠিত সাবিত্রী লাইব্রেরির ৫ম বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে চন্দ্রনাথ বসুর সভাপতিত্বে ১১ চৈত্র ১২৯০ (২৩ মার্চ ১৮৮৪) রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধটি পাঠ করেন। প্রবন্ধটি ঈষৎ পরিবর্তিত আকারে 'সাবিত্রী' (১২৯৩) গ্রন্থে মুদ্রিত হয়, এখানে পত্রিকার পাঠ গ্রহণ করা হইয়াছে।

১৫. 'হাতে কলমে' প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথ সাবিত্রী লাইব্রেরির অন্তর্গত সাবিত্রী-সভার অধিবেশনে ৯ ভাদ্র ১২৯১ (২৪ আগস্ট ১৮৮৪) তারিখে পাঠ করেন। রবীন্দ্রভবনে সংরক্ষিত একখণ্ড 'ভারতী'তে নীল পেনসিলে রচনাটির অনেক অংশ বর্জন-চিহ্নিত— সম্ভবত

রবীন্দ্রনাথ কোনো সময়ে প্রবন্ধটিকে গ্রন্থভুক্ত করার কথা চিন্তা করিয়াছিলেন। এই প্রবন্ধটিও পূর্বোল্লিখিত 'সাবিত্রী' (১২৯৩) গ্রন্থে মুদ্রিত হয়। এখানেও পত্রিকার পাঠটিই গ্রহণ করা হইয়াছে।

১৬-১৭. 'একটি পুরাতন কথা' প্রবন্ধটির বিতর্কমূলক অংশগুলি বাদ দিয়া 'সমালোচনা' (১২৯৪) গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল, এখানে পত্রিকার পাঠটি মুদ্রিত হইল।

শ্রাবণ ১২৯১-তে অক্ষয়চন্দ্র সরকারের সম্পাদনায় 'নবজীবন' ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পৃষ্ঠপোষকতায় 'প্রচার' মাসিকপত্র প্রকাশিত হইলে বঙ্কিমচন্দ্র উভয় পত্রিকাতেই তাঁহার নব্য হিন্দুধর্ম ব্যাখ্যা করিতে শুরু করেন। ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ও অন্যান্য কয়েকটি পত্রিকায় তাঁহার বক্তব্যের বিরোধিতা করা হয়। ফলে যে বিতর্কের সৃষ্টি হয়, রবীন্দ্রনাথও তাহাতে জড়িত হইয়া পড়েন। 'সঞ্জীবনী' পত্রিকায় কয়েকটি চিঠি-চাপাটির পরে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের একটি বক্তব্যের বিরোধিতা করিয়া 'একটি পুরাতন কথা' প্রবন্ধটি লিখিয়া কার্তিক ১২৯১-এর কোনো এক তারিখে আদি ব্রাহ্মসমাজ লাইব্রেরি হলে পাঠ করেন ও সেটি অগ্রহায়ণ-সংখ্যা ভারতী-তে মুদ্রিত হয়। এই-সব সমালোচনার উত্তরে বঙ্কিমচন্দ্র প্রচার-এর অগ্রহায়ণ-সংখ্যায় 'আদি ব্রাহ্ম সমাজ ও ''নব হিন্দু সম্প্রদায়''' -শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখিয়া রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য সম্পর্কে কটাক্ষ করিয়া লেখেন, 'আমার বিরুদ্ধে কেহ কখন কোন কথা লিখিলে বা বক্তৃতায় বলিলে এ পর্যন্ত কোন উত্তর করি নাই। ...তবে যে এ কয় পাতা লিখিলাম, তাহার কারণ, এই রবির পিছনে একটা বড় ছায়া দেখিতেছি।' রবীন্দ্রনাথ ইহারই উত্তরে 'কৈফিয়ত' প্রবন্ধটি রচনা করেন। উল্লেখ্য, রবীন্দ্রনাথ এই সময়ে আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক। সম্পূর্ণ রচনাটি ইতিপূর্বে বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ-প্রকাশিত 'বঙ্কিমচন্দ্র' (১৩৮৪) গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। তৎপূর্বে পুলিনবিহারী সেন -কর্তৃক সংকলিত 'রবীন্দ্রগ্রন্থপঞ্জী' প্রথম খণ্ডে (১৩৮০ বঙ্গাব্দ) 'সমালোচনা' গ্রন্থের বিশদ বিবরণ প্রসঙ্গে 'একটি পুরাতন কথা' ও 'কৈফিয়ৎ'—রচনাদুইটির প্রাসঙ্গিক অংশ মুদ্রিত।

১৮. '[দুর্ভিক্ষ]।' প্রবন্ধটি দুষ্প্রাপ্য তত্ত্বকৌমুদী (১ জ্যৈষ্ঠ ১৮০৭ শক) হইতে উদ্ধার করিয়া প্রশান্তকুমার পাল 'রবিজীবনী' দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশ করিয়াছেন, শিরোনামহীন রচনাটি ওই গ্রন্থ হইতে গৃহীত হইয়াছে।

পর পর দুই বৎসর অনাবৃষ্টির ফলে ১২৯১ বঙ্গাব্দের শেষ দিকে বাঁকুড়া, বীরভূম ও বর্ধমান জেলার কিয়দংশ ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হয়। এই কারণে ৩১ চৈত্র আদি ব্রাহ্মসমাজগৃহে বর্ষশেষ উপাসনার দিনে, 'তত্ত্বকৌমুদী'তে লেখা হইয়াছে, 'বীরভূম অঞ্চলে দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকদিগের সাহায্যার্থ দান সংগ্রহের জন্য একটি সভার আয়োজন করা হয়। এই উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ 'আজি কাঁদে কারা ওই শুনা যায়' গানটি রচনা করেন ও 'দুর্ভিক্ষের সাহায্যপ্রার্থী হইয়া ... একটী সুন্দর প্রবন্ধ' পাঠ করেন।

১৯. বালক-পাঠ্য 'বালক' পত্রিকার সম্পাদিকা জ্ঞানদানন্দিনী দেবী বৈশাখ ১২৯২ সংখ্যায় ১২টি চিত্র সহযোগে 'ব্যায়াম' নামক প্রবন্ধে ফিলাডেলফিয়ার একটি স্কুলে একজন আমেরিকানের লাঠি লইয়া ব্যায়ামের অভিজ্ঞতা ও উপযোগিতা বর্ণনা করিয়াছিলেন। বর্তমান 'লাঠির উপর লাঠি' রচনায় রবীন্দ্রনাথ 'বশম্বদ শ্রীঃ-' স্বাক্ষরে (বার্ষিক সূচীতে তাঁহার নাম আছে) লঘু ভঙ্গিতে উক্ত প্রবন্ধ সম্পর্কে একটি বিতর্কের অবতারণা করেন। এই সংখ্যাতেই 'সম্পাদকের নিবেদন'-এ সম্পাদিকা তাহার যে উত্তর দেন, আমরা তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি—

সম্পাদকের নিবেদন

'লাঠির পরে লাঠি' লেখক আমারিই লাঠি ঘুরাইয়া আমাকেই বিলক্ষণ শিক্ষা দিয়াছেন। তাঁহার লাঠি খেলার চমৎকার কৌশল,— তাঁহার বাক্য বিন্যাসের ঘটা, তাঁহার রসিকতার ছটা আমাদের মুখ হইতে বারংবার বাহবা বাহির করিয়াছে। আমাদের দেশের দরিদ্র বালকদের অবস্থাদি সম্বন্ধে আমার অজ্ঞতা দূর করিয়া তিনি আমার পরম ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। আর 'স্কুল পালানে ছেলেরাই কবি হয়' সুকবি হইবার এই সুন্দর সংকেতটি বলিয়া দিয়া তিনি জগৎশুদ্ধ লোককে উপকৃত করিয়াছেন। লেখক আমাদের আধুনিক অবস্থার যে জীবন্ত চিত্র আঁকিয়াছেন আমি কিংবা আর কেহ যে তাহার কোনো অংশ সংশোধন করিয়া দিতে পারে এমন বোধ হয় না। তবে কি না আমার জ্ঞানস্পৃহাটা বড়োই বলবতী, তাহারি উত্তেজনায় আমি আরও কিছু শিক্ষা লাভের জন্যে লালায়িত, তাই গুটিকতক কথা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। এই কথাগুলিতে যদি আমার অত্যন্ত অসাধারণ অজ্ঞতা বা নির্বুদ্ধিতা প্রকাশ পায় তদ্দৃষ্টে লেখক আমার প্রতি ঘৃণার পরিবর্তে যেন কৃপাদৃষ্টিপাত করেন এইমাত্র প্রার্থনা। আমাদের দেশীয় লোকদের স্বভাবতই ব্যায়ামে বিরাগ ও ইয়ুরোপীয়দের তাহাতে অনুরাগ এ সম্বন্ধে লেখকেতে আমাতে কখনোই মতভেদ ছিল না। ইয়ুরোপীয়ানদের সহিত সেই প্রভেদ ঘুচাইবার জন্যে, আমাদের যে মদ মাংস খাইতেই হইবে, এমন কোনো কথা আমি কি না কোনোখানেই বলি নাই, অতএব লেখক ওই কথাটার উপরে যেরূপ আক্রোশ প্রকাশ করিয়াছেন এবং মাংস খাওয়া এ দেশীয় লোকের সাধ্যায়ত্ত কি না, ইয়ুরোপীয়দের খাদ্য আমাদের দেশে খাটে কি না খাটে এই সমস্ত বিষয় লইয়া তিনি যেরূপ ভাবিত হইয়া উঠিয়াছেন তদ্দ্বারা এই অল্প বয়সে তাঁহার এতাদৃশ দূরদৃষ্টির পরিচয় পাইয়া পরম প্রীত হইলাম।

লেখক বলিয়াছেন, 'আমাদের ব্যায়াম চর্চা কর্তব্য বোধে করিতে হইবে' আমিও তো তাহাই বলিতেছি। 'ছাত্রেরা যে খেলাধূলা আমোদপ্রমোদ ভুলিয়া ঘরে বসিয়া বিদেশী ব্যাকরণের শুষ্ক সূত্র, বীজগণিতের কঠিন আঁটি ও জ্যামিতির তীক্ষ্ণ ত্রিকোণ চতুষ্কোণ গিলিতে থাকে তাহার অবশ্যই একটা কারণ আছে।' সে কারণটি কী? তাহারা যে 'বীজগণিতের প্রেমে পড়িয়া এরূপ করে না' তাহা লেখক নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। আমার তো বোধ হয় তাহার কারণ এই যে, ছাত্রদের বিশ্বাস যে, এই কষ্টগুলি ভোগ করিলে ইহা অপেক্ষা গুরুতর কতকগুলি কষ্টের হাত এড়াইতে সক্ষম হইবার পক্ষে খুবই সম্ভাবনা আছে। এই বিশ্বাসের জোরেই তাহারা 'বিদেশী চালকড়াই ভাজা দন্তহীন মাড়ি দিয়া চিবাইতে' এবং 'বীজগণিতের কঠিন আঁটি গিলিতে' চেষ্টা পায় ও তাহাতে কৃতকার্যও হয়। বিদ্যা-শেখা-না-শেখার ফলাফল তাহাদের যেরূপ হৃদয়ংগম হইয়াছে এবং ওই বিশ্বাসটি তাহাদের হৃদয়ে যেরূপ বদ্ধমূল হইয়াছে সেইরূপ, স্বাস্থ্যের নিয়ম সকল পালন না করিলে শরীর যথোচিতরূপে বর্ধিত হয় না, অসম্পূর্ণ শরীরে মানসিক বৃত্তি সকলের যথোচিত স্ফূর্তি কখনোই হইতে পারে না, শরীর ও মন এ দুইই যথোচিতরূপে বর্ধিত এবং সুস্থ ও বলিষ্ঠ না থাকিলে এ পৃথিবীতে কোনো কাজই সুসিদ্ধ হয় না, কোনো স্থায়ী উন্নতি লাভ করা যায় না— এইগুলি যদি তাহাদের হৃদয়ংগম হয় আর, শরীর ও মনের শুভাশুভ যে অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা, এই বিশ্বাসটি তাঁহাদের হৃদয়ে সেইরূপ বদ্ধমূল হয়, তাহা হইলে যেমন নীরসতা সত্ত্বেও তাঁহারা 'বীজগণিতের আঁটি গেলেন' তেমনি ব্যায়ামে বিরাগ সত্ত্বেও তাহার উপকারিতাবোধে তাঁহারা তাহা করিবেন। যখন কর্তব্যবোধে একটা কাজ করিয়া আসিতেছেন তখন কর্তব্যবোধে আর-একটা কাজ কেনই বা না করিতে পারিবেন, বিশেষত দুই কর্তব্যেরই যখন সমান গুরুত্ব? দুই কর্তব্যই বা কেন বলিতেছি, যখন শরীর সুস্থ না রাখিলে মন সুস্থ রাখা যাইতে পারে না, তখন মনের প্রতি কর্তব্য আর শরীরের প্রতি কর্তব্য দুইই তো একই কর্তব্যের সামিল হইল। ছাত্রদের শরীরের প্রতি তাচ্ছিল্য দেখিয়া মনে হয় যে, শরীর, মনের নিকটসম্বন্ধ

এখনও তাঁহাদের তাদৃশ হৃদয়ংগম হয় নাই। কিন্তু লেখক একস্থানে বলিয়াছেন যে 'ছাত্রদের বুঝিতে বাকি নাই যে ব্যায়াম চর্চায় শরীর সুস্থ হয়' তবে বোধ হয় তাহা জানিয়াও, ছ্যাকড়া গাড়ির কর্তারা তাহাদের ঘোড়াকে যেরূপ ভাবে দেখে ছাত্ররাও তাঁহাদের শরীরটাকে সেই ভাবে দেখেন— যত কম সেবায় যত অল্পদিনের মধ্যে যত বেশি কাজ দিতে পারে ততই ভালো। যত শীঘ্র যে-কোনো প্রকারে হউক চোখে-মুখে খানিকটা বিদ্যা গুঁজিয়া পাসটা দিয়া একটা দশ-কুড়ি টাকার চাকরি জোটাইতে পারিলে হয়। বস্‌, তাহা হইলেই পার্থিব সুখের একেবারে চূড়ান্ত সীমা হইল! হইল কি? না পাসটা হইলেই চাকরিটা হইবে এই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া পাসটা হইবার আগেই হয়তো বালক বিবাহ করিয়া বসিয়া আছেন, হয়তো তাঁহার দু-একটি ছেলেমেয়েও হইয়াছে। বালকের সেই বড়ো দুঃখের দশ-কুড়ি টাকার চাকরিটি হস্তগত হইতে-না-হইতেই তাঁহার মস্তকের উপরে সংসারের বোঝা চারি দিক হইতে চাপিয়া পড়িল। তিনি তখন 'হা অন্ন, হা অন্ন' করিয়া নিজেও ঝালাপালা হইতে লাগিলেন আর তাঁহার অপেক্ষাকৃত সচ্ছল অবস্থাপন্ন আত্মীয়-বন্ধুদিগকেও ঝালাপালা করিয়া তুলিলেন। ছ্যাকড়া গাড়ির ঘোড়ার শরীরের প্রতি যে অত্যাচার হয় তাহার ফল কেবলমাত্র সেই ঘোড়াতেই ফলে আর তাহাতেই শেষ হয়। কিন্তু বালকের শরীরের প্রতি যে অত্যাচার হয় তাহার ফল পুরুভুজের ন্যায় বালকের প্রত্যেক শাখা-প্রশাখায় জীবন্ত হইয়া উঠে। অসম্পূর্ণরূপে বর্ধিত ও অপক্ক-শরীর বালকের সন্তান-সন্ততি কখনোই পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না; সন্তানেরা ক্ষীণ কিংবা রুগ্‌ণ শরীর লইয়াই জন্মগ্রহণ করে। তাহার পরে হয়তো যথাবশ্যক আহারাভাবে তাহাদের শরীরের অবস্থা মন্দ হইতে মন্দতর হইতে থাকে। এইরূপে মরিয়া বাঁচিয়া কোনোপ্রকারে মানুষ হইতে থাকে। আবার পাছে বাপের বিপুল কষ্টরাশির কোনো অংশ হইতে সন্তানটি বঞ্চিত হয় এই ভয়েই যেন বালক যত শীঘ্র হয়, ছেলের লেখাপড়া আরম্ভ করিয়া দেন, তাহাকে ধমকাইয়া, মারিয়া, রাত জাগাইয়া পাসের জন্য প্রস্তুত করেন। এই অপূর্ণ, রুগ্‌ণ, ভগ্ন শরীর লইয়া পাসটাস দিয়া ছেলে যদি বা আর কোনো কালে কখনো মাথা তুলিতে সক্ষম হয়, সে সম্ভাবনা যেন সম্পূর্ণরূপে দূর করিয়া দিবার জন্যেই পাস দিতে-না-দিতেই পিতা পুত্রের গলায় একটি বধূ বাঁধিয়া দেন। বালক যে হতভাগিনীর পাণিগ্রহণ করিয়াছেন স্বামীর দুঃখে, সন্তানের কষ্টে তাহার তো একদিনের তরেও চোখের জল শুকায় না। এইরূপে দেখা যাইতেছে যে, বালকের শরীরের প্রতি অত্যাচারের ফল শুদ্ধ একজনে বা এক পুরুষে শেষ হয় না, ক্রমিকই বিস্তৃত হইতে ও বৃদ্ধি পাইতে থাকে। বাঙালি বালকের জীবনের এখন এই তিনটি কাজ হইয়াছে— জন্ম, পাস, মৃত্যু। জীবনের সমস্ত কাজ সারিয়া ফেলিবার এতই যদি তাড়াতাড়ি পড়িয়া থাকে তাহা হইলে গুষ্টিশুদ্ধ দগ্ধে দগ্ধে মরা কেন, জন্মের পরেই মৃত্যুটাকে আনিলেই তো সব ল্যাঠা একেবারে চুকিয়া যায়— সব জ্বালা-যন্ত্রণার হাত চট করিয়া চিরকালের মতো এড়ানো যায়।

একটা একজামিন পাস্ করিয়া যৎকথঞ্চিৎ গ্রাসাচ্ছাদনের জোগাড় করিতে পারিলেই কি মনুষ্যজীবনের সার্থকতা সম্পাদন হইল? আমরা কি কেবল একজামিন পাস করিতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছি। মনুষ্যজীবনের কি উহা অপেক্ষা উচ্চ আশা, মহৎ উদ্দেশ্য আর কিছুই নাই? সত্য বটে গ্রাসাচ্ছাদনের সংস্থান সর্বাগ্রে প্রয়োজন, কিন্তু তাহাই বা সুসম্পন্ন হইতেছে কোথায়? আর, ওই কার্যসিদ্ধির নিমিত্তে যে উপায় অবলম্বন করা হইতেছে সে যে আত্মঘাতী উপায়!! ছেলের অন্নবস্ত্রের উপায় করিতে গিয়া, যে-শরীরকে সে অন্ন পোষণ করিবে, যে-শরীরকে সে বস্ত্র আবৃত করিবে সেই শরীরকেই যে ক্ষয় করিয়া ফেলা হইতেছে। ছেলের প্রাণ বাঁচাইতে গিয়া তাহাকে যে অতি দ্রুতপদে মরণের পথে অগ্রসর করিয়া দিতেছি। বিদ্যাশিক্ষাদ্বারা ছেলের বুদ্ধিবৃত্তি বৃদ্ধি হইবে বলিয়া শীঘ্র শীঘ্র তাহার মাথার ভিতরে বিদ্যা ঠাসিয়া ঠাসিয়া সেই বুদ্ধিবৃত্তির ভিত্তিভূমিকেই যে একেবারে চাপিয়া পিষিয়া চূর্ণ করিয়া দিতেছি। এ যে গোড়া কাটিয়া আগায় জল ঢালা!!! ইহা দেখিয়া, জানিয়া বুঝিয়া তবুও কি ইহার প্রতিকারের কোনো উপায় অবলম্বন

করিবে না? আমাদের অবস্থা মন্দ হইয়াছে বলিয়া কি মন্দকেই আমাদের অঙ্গের আভরণের মতো করিয়া দেখিব? আমাদের আশা-ভরসা, আকাঙ্ক্ষা, উদ্দেশ্যকে একেবারে গণ্ডিবদ্ধ করিয়া রাখিব, গণ্ডির বাহিরে দৃক্‌পাতও করিতে দিব না? আমরা তো আর উদ্ভিদ্ হইয়া জন্মাই নি যে, যে-অবস্থায় জন্মিয়াছি সেইখানে মাটি কামড়াইয়া পড়িয়া থাকিতেই হইবে।

লেখক ব্যায়ামের উপকারিতা স্বীকার করিয়া তাহার একটি বাধা দেখাইয়াছেন— সময়ের অভাব। সময়াভাবের দুইটি কারণ দিয়াছেন : ১ম, দরিদ্রতা, ২য়, দুর্জ্ঞেয় বিদেশী ভাষা অল্প সময়ের মধ্যে আয়ত্ত করিবার আবশ্যকতা। প্রথম বাধার সম্বন্ধে আমার যাহা বক্তব্য তাহাই প্রথমে বলি, ব্যায়ামের অর্থ— শারীরিক পরিশ্রম। আমরা সচরাচর, যে-পরিশ্রম আমরা শখ করিয়া করি তাহাকে বলি ব্যায়াম। পরিশ্রমের কাজ এই যে, সমস্ত শরীরটা খানিকটা নাড়াচড়া পাওয়াতে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে বেশ ভালোরূপে রক্ত চলাচল হয় এবং সেইজন্যে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি যথোচিত পুষ্ট ও বলিষ্ঠ হইতে পারে। যে 'দরিদ্র বালকদের ভাতে নুন জোটে না' তাহাদের যে দুই বেলা হাঁটিয়া স্কুলে যাতায়াত করিতে হয় এ-বিষয়ে বোধ করি কাহারো কিছু মাত্র সন্দেহ থাকিতে পারে না, তদ্‌ব্যতীত তাহাদের অনেক সময় বাজারে যাইতে হয় ও নানাবিধ কাজকর্ম উপলক্ষে নানা স্থানে আনাগোনা করিতে হয়। দরিদ্র বালকদের দায়ে পড়িয়া হয়তো এত পরিশ্রম করিতে হয় যে, তাহাদের পক্ষে 'ব্যায়ামের' অপেক্ষা 'বিরামের' উপদেশ অধিক উপযোগী।

২য় বাধা— দুর্জ্ঞেয় বিদেশী ভাষা অল্প সময়ের মধ্যে আয়ত্ত করিবার আবশ্যকতা হেতু সময়াভাব। ৯টা-১০টা বেলায় ছেলেরা স্কুলে যায়, তিন-চারিটার সময় বাড়ি আসে। ইহাতে তাহাদের প্রত্যূষে এক ঘণ্টা কাল ও সন্ধ্যার পূর্বে এক ঘণ্টা কাল ব্যায়ামের আমি তো কোনো বাধা দেখিতে পাই না। সমস্তক্ষণ স্কুলে পড়িয়া শ্রান্ত মস্তিষ্কে, পথের রৌদ্রের তাপে শীর্ণ শরীরে বিকালে বাড়ি আসিয়াই তখনই আবার পড়িতে বসিলে স্বাস্থ্যের তো হানি হয়ই, তদ্‌ব্যতীত শরীর মনের দুর্বলতাপ্রযুক্ত তৎকালে পাঠাভ্যাস অন্য সময় অপেক্ষা অধিক আয়াসসাধ্য হইয়া উঠে। স্কুল হইতে আসিবার পর খানিকটা ব্যায়াম দ্বারা শরীর-মন বেশ তাজা হইয়া উঠিলে তখন আবার পাঠাভ্যাসে প্রবৃত্ত হইলে সকল দিকেই মঙ্গল।

আমাদের বিদেশী ভাষায় জ্ঞান উপার্জন করিতে হয় ইহা বড়োই কষ্টকর, এ কষ্ট আমি লেখকের সহিত ঠিক সমানভাবে অনুভব করিতেছি। আমাদের পূর্বপুরুষদিগের কর্মফলস্বরূপ এই কষ্ট আমরা ভোগ করিতেছি। কিন্তু আমাদের এই একটা অসুবিধা ঘটিয়াছে, তাই একটা কষ্টভোগ করিতে হইতেছে বলিয়া সেই দুঃখে গা ঢালিয়া দিয়া শারীরিক, মানসিক উন্নতির আর সকল প্রকার উপায়ের প্রতি কি আমরা অন্ধ হইয়া থাকিব এবং এইরূপে আরও পাঁচরকম অসুবিধা, আরও পাঁচটা কষ্ট আপনাদের উপর চাপাইব? ইংরাজেরা আমাদের দেশ জয় করিয়া বলপূর্বক তাহাদের ভাষা এ-দেশে প্রচলিত করিয়াছে, সেই অভিমানে আত্মহত্যা করিয়া আমরা কি তাহার শোধ তুলিতে উদ্যত হইয়াছি? না ইংরাজদের উপর আড়ি করিয়া শরীর-মন এমন ক্ষীণ করিয়া ফেলিতে হইবে যে আর কোনোকালে তাহাদের দাসত্বশৃঙ্খল ছিঁড়িবার কোনো সম্ভাবনা না থাকে? জ্বর হইয়াছে বলিয়া কি ঔষধ-পথ্যের প্রতি তাচ্ছিল্য করিয়া বিকার পর্যন্ত টানিয়া আনিতে হইবে? এই কি উচিত? কষ্ট নিবারণের যথাসাধ্য চেষ্টা না করিয়া কেবল যদি খেদ করিয়াই কাল কাটাই, তাহা হইলে এই সমস্ত কষ্টের বোঝা আমাদের সন্তান-সন্ততির মাথায় চাপাইয়া আমরা কি পাপের ভাগী হইব না?

এখন তোমাদের— বালকদের উপরেই সমস্ত নির্ভর করিতেছে। তোমরাই আমাদের একমাত্র আশা-ভরসার স্থল। তোমরা বিদেশীদের জ্ঞানসকল সুন্দররূপে পরিপাক করিয়া স্বদেশীয় রক্তমাংসে পরিণত করো। নানা ভাষা হইতে নানা রত্নরাজি আহরণ করিয়া দুঃখিনী মাতৃভাষার অভাবসকল শীঘ্র দূর করো। তাহা হইলে বিদেশীয় ভাষায় বিদ্যা উপার্জনের কষ্ট

> আর সহিতে হইবে না। যত দিন পরিবার-পোষণে সক্ষম না হইবে ততদিন পর্যন্ত পরিবারের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়ো না। তাহা হইলে দরিদ্রতার দুঃখ অনেক পরিমাণে হ্রাস হইবে। যখন নববধূকে ঘরে আনিবার জন্যে মা তোমাকে অনুরোধ করিবেন, তখন তুমি মায়ের পা জড়াইয়া কাঁদিয়া বলিয়ো, মা, আমরা এই কয়জনেই অন্নবস্ত্রের ক্লেশে সারা হইতেছি এখন আবার ঘরে আরও লোক আনিয়া কেন আমাদের দুঃখ-কষ্ট বাড়াইয়া তুলিব, আর কী করিয়াই বা একটি সুকুমারী বালিকাকে আমাদের এই দারুণ দুঃখ-ক্লেশের ভাগী করিব— মা, যতদিন পর্যন্ত আমাদের জীবিকা নির্বাহোপযোগী যথেষ্ট অর্থ উপার্জনে সক্ষম না হই ততদিন তুমি, আমাকে এই অনুরোধটি করিয়ো না। মা পরম স্নেহময়ী, তিনি যখন বুঝিবেন যে, পুত্র এখন বিবাহ করিলে যথার্থই পরিবারস্থ সকলের কষ্ট বৃদ্ধি হইবে তখন তিনি আর এ-অনুরোধ করিবেন না। তোমাদের হাতে সকলই রহিয়াছে। তোমরা দলবদ্ধ, প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে কোন্ মহৎ কার্য না সুসিদ্ধ হইতে পারে। তোমাদের স্বাস্থ্যের উপরেই দেশের স্বাস্থ্য নির্ভর করিতেছে— তোমাদের উন্নতি হইলেই দেশের উন্নতি হইবে— তোমাদের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলেই দেশের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল।
>
> তোমাদের এই-সকল কথা বলিবার, তোমাদের অনুরোধ করিবার সুযোগ পাইব বলিয়া এই 'বালক' পত্র প্রকাশে প্রবৃত্ত হইয়াছি— তোমাদের মঙ্গলই ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য।

—পত্রিকাটির আষাঢ় সংখ্যায় 'শ্রীকেদার-দক্ষিণেশ্বর' স্বাক্ষরে কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৬৩-১৯৪৯) 'লাঠালাঠি' প্রবন্ধ লিখিয়া বিতর্কের উপসংহার ঘটান।

২০. 'সত্য' প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথ ১ বৈশাখ ১২৯৩ তারিখ মধ্যাহ্নে সিটি কলেজ গৃহে পাঠ করিয়াছিলেন, যদিও তাহার পূর্বেই ইহা চৈত্র ১২৯২-সংখ্যা 'বালক' ও ২৯ চৈত্র ১২৯২-সংখ্যা 'সঞ্জীবনী'-তে মুদ্রিত হইয়াছিল। ইহা বৈশাখ ১৮০৮ শক-সংখ্যা 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' এবং ১৬ বৈশাখ ও ১ জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যা 'তত্ত্বকৌমুদী'-তেও পুনর্মুদ্রিত হইয়াছিল।

২১. রবীন্দ্রনাথের স্বাক্ষর-সংবলিত 'আপনি বড়ো' প্রবন্ধটি দুষ্প্রাপ্য 'কল্পনা' পত্রিকা হইতে উদ্ধার করিয়া প্রশান্তকুমার পাল ১৩৯৪ বঙ্গাব্দের সাহিত্য-সংখ্যা 'দেশ'-এ পুনর্মুদ্রিত করেন, বর্তমান পাঠটি পত্রিকা হইতে সংকলিত হইয়াছে।

বর্তমান বিভাগের ২২-২৭ সংখ্যক রচনাগুলি 'পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তক' নামাঙ্কিত রবীন্দ্রভবনের ২৭২-সংখ্যক পাণ্ডুলিপিতে লিখিত হইয়াছিল, এই পাণ্ডুলিপির পরিচয় পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে। পুলিনবিহারী সেন ইহার অন্তর্গত অনেক রচনা ১৩৫২-১৩৫৪ বঙ্গাব্দের শারদীয়া দেশ পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছিলেন, রবীন্দ্রবীক্ষা ১ (শ্রাবণ ১৩৮৩) সংকলনে কানাই সামন্ত অবশিষ্ট রচনাগুলি প্রকাশ করেন।

২২. দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জামাতা মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়ের সহিত পূর্ববর্তী একটি আলোচনার সূত্র ধরিয়া 'হিন্দুদিগের জাতীয় চরিত্র ও স্বাধীনতা' নিবন্ধে রবীন্দ্রনাথ একটি বিতর্কমূলক বিষয়ের অবতারণা করিয়া বাঁধা নিয়মের প্রতি হিন্দুদিগের আনুগত্যের প্রকৃতি নির্ণয় করিতে প্রবৃত্ত হন। এই রচনাটি ১৭ নভেম্বর ১৮৮৮ (৩ অগ্রহায়ণ ১২৯৫) তারিখে লেখা। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ১৭ ও ১৯ নভেম্বরের দুইটি প্রস্তাবে বক্তব্যের এই অংশ সম্পর্কে তাঁহার ভিন্নমত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই সমালোচনার প্রত্যুত্তরে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বক্তব্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন 'আমাদের সভ্যতায় বাহ্যিক ও মানসিকের অসামঞ্জস্য'-শীর্ষক বর্তমান সংকলনের ২৪-সংখ্যক রচনায়।

২৩. 'স্ত্রী ও পুরুষের প্রেমের বিশেষত্ব' রচনাটি ১৯ নভেম্বর ১৮৮৮ (৫ অগ্রহায়ণ ১২৯৫) তারিখে রচিত। এইটি 'পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তক'-এর ২৬-সংখ্যক প্রস্তাব— ইহা লইয়াই সর্বাধিক বিতর্ক উপস্থিত হইয়াছিল। শরৎকুমারী চৌধুরানী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, যোগেশচন্দ্র চৌধুরী ও সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর বিতর্কে যোগ দিয়াছিলেন। 'মায়ার খেলা' রচনার

শুরু (আশ্বিন ১২৯৪) হইতে 'মানসী' কাব্যগ্রন্থের অনেকগুলি কবিতার মধ্য দিয়া 'রাজা ও রানী' (চৈত্র ১২৯৫) নাট্যকাব্য রচনা পর্যন্ত প্রায় দেড় বৎসর রবীন্দ্রনাথের মন নারী ও পুরুষের প্রেমের রহস্য উদ্‌ঘাটনে ব্যাপৃত ছিল, উল্লিখিত রচনাটি ও বর্তমান বিভাগে সংকলিত ২৫-২৭ সংখ্যক প্রস্তাবে এই বিষয়েরই বিভিন্ন দিক আলোচিত হইয়াছে। ইহাদের রচনাকাল ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য নিম্নে প্রদত্ত হইল :

২৪. 'আমাদের সভ্যতায় বাহ্যিক ও মানসিকের অসামঞ্জস্য' রচনাটি ২০ নভেম্বর ১৮৮৮ (৬ অগ্রহায়ণ ১২৯৫) তারিখে লেখা। ২২-সংখ্যক টীকা দ্রষ্টব্য।

২৫. 'সমাজে স্ত্রী-পুরুষের প্রেমের প্রভাব', রচনা : ২৪ নভেম্বর ১৮৮৮ (১০ অগ্রহায়ণ ১২৯৫)।

২৬. 'আমাদের প্রাচীন কাব্যে ও সমাজে প্রেমের অভাব', রচনা : ২৬ নভেম্বর ১৮৮৮ (১২ অগ্রহায়ণ ১২৯৫)।

২৭. 'Chivalry', রচনা : ২৬ নভেম্বর ১৮৮৮ (১২ অগ্রহায়ণ ১২৯৫)। এই প্রস্তাবে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন : 'Browning এর *In a Balcony* নামক নাট্যকাব্যে রাজ্ঞী দুঃখ করিতেছেন যে, কেবলমাত্র রানী হইয়া স্ত্রীলোকের সম্পূর্ণতা নাই সুখ নাই, যদি একজন সামান্যতম প্রজা সমস্ত রাজসম্মান উপেক্ষা করিয়া তাহাকে ভালোবাসে তাহা হইলে যেন তাঁহার স্ত্রী-প্রকৃতি কতকটা চরিতার্থ হয়।' 'রাজা ও রানী' নাটকের সুমিত্রার মধ্যে এই ভাবনার ছায়া লক্ষিত হয়।

২৮. 'নব্যবঙ্গের আন্দোলন' রচনাটি স্বাক্ষরহীন হইলেও বার্ষিক সূচীতে রবীন্দ্রনাথের নাম আছে। প্রবন্ধটিতে সমকালীন রাজনৈতিক আন্দোলন সম্পর্কে লেখকের নৈরাশ্যব্যঞ্জক দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশিত হইয়াছে মনে করিয়া রবীন্দ্রনাথের রচনার দ্বাদশ অনুচ্ছেদের পাদটীকায় ভাং সং (ভারতী-সম্পাদিকা স্বর্ণকুমারী দেবী) লিখিয়াছেন,

> লেখক আমাদের এখনকার পলিটিক্যাল আন্দোলন যেরূপ অসার মনে করেন একটু ভাবিয়া দেখিলেই দেখিবেন তাহা নহে। এই আন্দোলনের মধ্যে— কাজ করিবার একটি ইচ্ছা জাতীয় মহত্ত্ব লাভের দিকে অগ্রসর হইবার একটি উদ্যম প্রকাশ পাইতেছে, তবে লেখক একদিনেই যদি আমাদের শত শত বৎসরের অবনতির বিনাশ দেখিতে চান তাহা কি করিয়া পাইবেন? লেখক বলিয়াছেন, 'আমাদের মধ্যে অতি অল্প লোকই আছেন যাঁহারা আমাদের রাজ্যশাসনতন্ত্র এবং Representative Government-এর মূল নিয়ম এবং আমাদের দেশে বর্তমানকালে তাহার উপযোগিতা ও সম্ভাবনা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু অবগত আছেন অথবা প্রকৃত পরিশ্রম স্বীকার করিয়া তদ্‌বিষয়ে কিছু জানিতে অভিলাষী আছেন।' অবশ্য দেশের অধিকাংশ লোক যদি যোগ্য হইত তাহা হইলে তো সমস্ত গোল চুকিয়া যাইত, এরূপ পলিটিক্যাল আন্দোলনেরই বা তাহা হইলে আবশ্যক কোথা? কিন্তু আমাদের দেশে কোন্ ছার কথা য়ুরোপের কোনো দেশেই কি অধিকাংশ লোকে রাজ্যশাসনতন্ত্রের মর্মগত নিয়ম বিচার করিয়া কাজ করে? এরূপ স্থলে সর্বত্রই নেতাগণ প্রধান, তাঁহাদের প্রাণগত চেষ্টা, মহত্ত্বই জাতীয় উন্নতির কারণ। আমাদিগের পলিটিক্যাল নেতাগণের সকলে না হউন যখন অনেকেই তাঁহাদের উদ্দেশ্যসাধনে প্রাণগত চেষ্টা করিতেছেন, তখন কি এই আন্দোলনকে আমরা সারশূন্য বলিতে পারি? চরিত্র-মাহাত্ম্য নহিলে কোনো উন্নতি হয় না সত্য, কিন্তু ইহার দিকে আমাদের যে লক্ষ পড়িয়াছে— তাহার উজ্জ্বল অনেক প্রমাণ দেখা যাইতেছে, তাহা ছাড়া লেখকের বর্তমান প্রবন্ধই তাহার একটি প্রমাণ।— ভাং সং।

ইতিহাস

এই বিভাগের অন্তর্গত রচনাগুলির সাময়িকপত্রে প্রকাশসূচী নিম্নে সংকলিত হইল—

১.	ঝান্‌সীর রানী	ভারতী, অগ্রহায়ণ ১২৮৪
২.	কাজের লোক কে	বালক, বৈশাখ ১২৯২
৩.	গুটিকত গল্প	বালক, বৈশাখ ১২৯২
৪.	আকবর শাহের উদারতা	বালক, আষাঢ় ১২৯২
৫.	ন্যায়ধর্ম	বালক, শ্রাবণ ১২৯২
৬.	বীর গুরু	বালক, শ্রাবণ ১২৯২
৭.	শিখ-স্বাধীনতা	বালক, আশ্বিন-কার্তিক ১২৯২
৮.	ভারতবর্ষের ইতিহাস : হেমলতা দেবী	ভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১৩০৫
৯.	মুর্শিদাবাদ কাহিনী : নিখিলনাথ রায়	ভারতী, শ্রাবণ ১৩০৫
১০.	ঐতিহাসিক চিত্র/সূচনা	ঐতিহাসিক চিত্র, জানুয়ারি ১৮৯৯

১. 'ঝান্‌সীর রাণী' রচনাটি 'ভ' স্বাক্ষরযুক্ত, তাঁহার 'ভানু' নামের আদ্যক্ষর— সুতরাং ইহার রচয়িতার পরিচয় লইয়া কোনো সংশয় নাই। ইহা ছাড়া এতাবৎ-প্রাপ্ত সর্বপ্রাচীন রবীন্দ্রনাথের পাণ্ডুলিপি 'মালতীপুঁথি'-তে 'ঝান্সী রাণী' শিরোনামে একটি গদ্যরচনা পাওয়া যায়, যাহার সহিত 'ভারতী'-তে প্রকাশিত প্রবন্ধটির মধ্যবর্তী অনেক অংশের বিষয় ও ভাষার সাদৃশ্য আছে। পাণ্ডুলিপিতে রচনাটির শেষাংশ পাওয়া যায় না। ইংরেজি কোনো ইতিহাসগ্রন্থ অবলম্বনে এই অসম্পূর্ণ রচনাটি লিখিত। রচনাশেষে লেখকের প্রতিশ্রুতি আছে, তাঁহার সংগৃহীত ইতিহাস ভবিষ্যতে প্রকাশ করিবেন— তাহা রক্ষিত হয় নাই।

২, ৬, ৭. এই রচনাগুলি শিখ-ইতিহাস অবলম্বনে বালকদের উপযোগী করিয়া গল্পাকারে লিখিত। Joseph Davey Cunningham -লিখিত *History of the Sikhs from the Origin of the Nation to the Battles of the Sutlej* [1849] গ্রন্থটির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের কথা বিভিন্ন সূত্রে জানা যায়।

'বীর গুরু' প্রবন্ধ অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথ জীবনের বিভিন্ন সময়ে একাধিক কবিতা রচনা করেন। শিখগুরু গোবিন্দ সিংহের নির্লোভতার দৃষ্টান্তমূলক ঘটনাটিকে অবলম্বন করিয়া ; রি ২৭ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৫ তারিখে 'নিষ্ফল উপহার' কবিতাটি লেখেন ও তাহা 'মানসী' (১২৯৭) গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়, পরে এই কবিতারই একটি পরিবর্তিত রূপ 'কথা' (১৩০৬) কাব্যগ্রন্থে স্থান লাভ করিয়াছে। উক্ত প্রবন্ধের শেষাংশ অবলম্বনে তিনি লেখেন 'শেষ শিক্ষা' (রচনা : ৬ কার্তিক ১৩০৬) কবিতা।

অনুরূপভাবে 'শিখ-স্বাধীনতা' প্রবন্ধের দুইটি কাহিনী অবলম্বন করিয়া তিনি 'বন্দী বীর' (রচনা : ৩০ কার্তিক ১৩০৬) ও 'প্রার্থনাতীত দান' (রচনা : ২ কার্তিক ১৩০৬) কবিতা দুইটি রচনা করেন।

৩, ৪, ৫. এই রচনাগুলির বিষয় রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন সূত্রে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সবগুলিই বালকদের উপযোগী করিয়া লিখিত। উল্লেখনীয় যে, 'গুটিকত গল্প'— এর শেষ গল্পটি অবলম্বন করিয়া রবীন্দ্রনাথ 'মানী' (রচনা : ১ কার্তিক ১৩০৬) কবিতাটি রচনা করিয়াছিলেন, দ্রষ্টব্য 'কথা', রবীন্দ্র-রচনাবলী, সপ্তম খণ্ড : সুলভ চতুর্থ খণ্ড।

৮-৯. হেমলতা দেবী -রচিত 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' ও নিখিলনাথ রায় -কৃত 'মুর্শিদাবাদ কাহিনী' গ্রন্থ দুইটি সম্পর্কে আলোচনা 'গ্রন্থ সমালোচনা' হিসাবে ভারতী-তে মুদ্রিত হইয়াছিল, ইতিহাস-বিষয়ক বলিয়া বর্তমান রচনাবলীতে এই বিভাগের অন্তর্গত করা হইল। ইহারা স্বতন্ত্র 'ইতিহাস' (১৩৬২) গ্রন্থেরও অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। এইরূপ আরও দুইটি গ্রন্থসমালোচনা

'সিরাজদ্দৌলা' ও 'মুসলমান রাজত্বের ইতিহাস' 'ভারতী' পত্রিকায় স্বতন্ত্র মর্যাদায় মুদ্রিত হইয়াছিল বলিয়া 'আধুনিক সাহিত্য' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হইয়া রবীন্দ্র-রচনাবলী নবম খণ্ডে : সুলভ পঞ্চম খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে।

১০. 'ঐতিহাসিক চিত্র' নামে অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের সম্পাদনায় যে ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশের আয়োজন হইতেছিল, তাহার 'অনুষ্ঠান পত্র' অবলম্বন করিয়া রবীন্দ্রনাথ 'প্রসঙ্গ কথা' লিখিয়াছিলেন ভাদ্র ১৩০৫-সংখ্যা 'ভারতী'-তে। পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়, বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগ অনুযায়ী, ৫ জানুয়ারি ১৮৯৯ (২২ পৌষ ১৩০৫)। এই সংখ্যার জন্য রবীন্দ্রনাথ 'সূচনা'টি লিখিয়া দেন।

বিজ্ঞান

বিজ্ঞান-বিষয়ক রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি রচনা এই বিভাগে সংকলিত হইল; ইহাদের সাময়িকপত্রের প্রকাশ-সূচী নিম্নরূপ—

১. সামুদ্রিক জীব	ভারতী, বৈশাখ ১২৮৫
২. দেবতায় মনুষ্যত্ব আরোপ	ভারতী, বৈশাখ ১২৮৯
৩. বৈজ্ঞানিক সংবাদ	বালক, আশ্বিন-কার্তিক ১২৯২
৪. বৈজ্ঞানিক সংবাদ : গতি নির্ণয়ের ইন্দ্রিয়, ইচ্ছামৃত্যু, মাকড়সা-সমাজে স্ত্রীজাতির গৌরব, উটপক্ষীর লাথি	সাধনা, অগ্রহায়ণ ১২৯৮
৫ বৈজ্ঞানিক সংবাদ : জীবনের শক্তি, ভূতের গল্পের প্রামাণিকতা, মানবশরীর	সাধনা, পৌষ ১২৯৮
৬. রোগশত্রু ও দেহরক্ষক সৈন্য	সাধনা, পৌষ ১২৯৮
৭. সাময়িক সার সংগ্রহ : উদয়াস্তের চন্দ্রসূর্য	সাধনা, জ্যৈষ্ঠ ১৩০০
৮. সাময়িক সার সংগ্রহ : অভ্যাসজনিত পরিবর্তন	সাধনা আষাঢ় ১৩০০
৯. সাময়িক সার সংগ্রহ : ওলাওঠার বিস্তার, ঈশ্বর	সাধনা ভাদ্র ১৩০০
১০. ভূগর্ভস্থ জল এবং বায়ুপ্রবাহ	সাধনা, আশ্বিন-কার্তিক ১৩০১

১. এই রচনাটি পত্রিকায় 'সামুদ্রিক জীব/প্রথম প্রস্তাব/কীটাণু' নামে প্রকাশিত হইয়াছিল। রচনাশেষে 'ভ' স্বাক্ষর দেখিয়া রচয়িতাকে চিনিয়া লওয়া যায়। 'প্রথম প্রস্তাব' এইরূপ উল্লেখ হইতে মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ এই বিষয়ে আরও লিখিবেন বলিয়া ভাবিয়াছিলেন— কিন্তু বিলাতযাত্রার প্রস্তুতিতে ব্যস্ত হইয়া পড়ার জন্য আর লেখা হয় নাই।

২. 'দেবতায় মনুষ্যত্ব আরোপ' প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথের লেখা বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। জীবনস্মৃতি-র পাণ্ডুলিপিতে তিনি লিখিয়াছিলেন, 'সদর স্ট্রীটে বাসের সঙ্গে আমার আর-একটা কথা মনে আসে। এই সময়ে বিজ্ঞান পড়িবার জন্য আমার অত্যন্ত একটা আগ্রহ উপস্থিত হইয়াছিল। তখন হক্স্‌লির রচনা হইতে জীবতত্ত্ব ও লক্‌ইয়ার, নিউকোম্ব প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে জ্যোতির্বিদ্যা নিবিষ্টচিত্তে পাঠ করিতাম। জীবতত্ত্ব ও জ্যোতিষ্কতত্ত্ব আমার কাছে অত্যন্ত উপাদেয় বোধ হইত।' বর্তমান প্রবন্ধটি সম্ভবত এই পাঠচর্চার ফল। তিনি হার্বার্ট স্পেনসরের রচনাবলীর অনুরাগী পাঠক ছিলেন, বর্তমান রচনাটি তাঁহার 'The Use of Anthropomorphism' প্রবন্ধ অবলম্বনে লেখা— শতপথ ব্রাহ্মণ, ভাগবত পুরাণ, গ্রীক

পুরাণ, টমাস হেনরি হাক্সলির 'The Genealogy of Animals' প্রবন্ধ প্রভৃতি হইতে উদ্‌ধৃতি দিয়া ইহাতে স্পেনসরের বক্তব্যের বিরোধিতা করা হইয়াছে। প্রবন্ধের শেষে স্পেনসরের *Data of Ethics* গ্রন্থের উল্লেখ করা হইয়াছে, ইংলন্ড হইতে ফিরিবার পথে রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থটি পড়িয়াছিলেন।

৩. 'বালক' পত্রিকায় প্রকাশিত 'বৈজ্ঞানিক সংবাদ'-এ রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত বিভিন্ন বিদেশী পত্রিকা হইতে বারোটি কৌতূহলোদ্দীপক বৈজ্ঞানিক তথ্য সংকলন করিয়া দিয়াছেন। এই পত্রিকায় বিভাগটির পুনরাবৃত্তি হয় নাই।

৪-৫. 'সাধনা' পত্রিকার প্রথম সংখ্যাতেই বিভিন্ন বিদেশী পত্রিকা অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথ 'বৈজ্ঞানিক সংবাদ' বিভাগটি শুরু করেন, কিন্তু পরবর্তী পৌষ সংখ্যা ছাড়া এই বিভাগের নাম দিয়া আর কোনো রচনা মুদ্রিত হয় নাই। 'মানবশরীর' রচনায় 'প্রাণ ও প্রাণী' নামক যে প্রবন্ধের উল্লেখ আছে, তাহা সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের লিখিত।

৬, ১০. 'রোগশত্রু ও দেহরক্ষক সৈনা', 'ভূগর্ভস্থ জল এবং বায়ুপ্রবাহ' প্রবন্ধ দুইটি প্রকৃতপক্ষে 'বৈজ্ঞানিক সংবাদ' বিভাগেরই রচনা, আকার দীর্ঘ হওয়ার জন্য স্বতন্ত্র প্রবন্ধরূপে মুদ্রিত হইয়াছে।

৭-৯. এই রচনাগুলি 'সাময়িক সার সংগ্রহ'-এর অন্তর্ভুক্ত হইলেও বিজ্ঞান-বিষয়ক বলিয়া বর্তমান বিভাগে লওয়া হইয়াছে।

বিবিধ

বিভিন্ন বিষয়ে লেখা রবীন্দ্রনাথের রচনাগুলি এই বিভাগে সংকলিত হইল। সাময়িক পত্রে ইহাদের প্রকাশের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল—

১. সান্ত্বনা	ভারতী, চৈত্র ১২৮৪
২. নিঃস্বার্থ প্রেম	ভারতী, কার্তিক ১২৮৭
৩. যথার্থ দোসর	ভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১২৮৮
৪. গোলাম-চোর	ভারতী, আষাঢ় ১২৮৮
৫. চর্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়	ভারতী, শ্রাবণ ১২৮৮
৬. দরোয়ান	ভারতী, ভাদ্র ১২৮৮
৭. জীবন ও বর্ণমালা	ভারতী, আশ্বিন-কার্তিক ১২৮৮
৮. রেল গাড়ি	ভারতী, অগ্রহায়ণ ১২৮৮
৯. লেখা কুমারী ও ছাপা সুন্দরী	ভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১২৯০
১০. গোঁফ এবং ডিম	ভারতী, আষাঢ় ১২৯০
১১. সত্যং শিবং সুন্দরম্‌	ভারতী, আষাঢ় ১২৯১
১২. ভানুসিংহ ঠাকুরের জীবনী	নবজীবন, শ্রাবণ ১২৯১
১৩. পুষ্পাঞ্জলি	ভারতী, বৈশাখ ১২৯২
১৪. বিবিধ প্রসঙ্গ ১	ভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১২৯২
১৫. বিবিধ প্রসঙ্গ ২	ভারতী, ভাদ্র ১২৯২
১৬. বর্ষার চিঠি	বালক, শ্রাবণ ১২৯২
১৭. বরফ পড়া	বালক, আশ্বিন-কার্তিক ১২৯২
১৮. শিউলিফুলের গাছ	বালক, পৌষ ১২৯২
১৯. বানরের শ্রেষ্ঠত্ব	বালক, চৈত্র ১২৯২
২০. কার্যাধ্যক্ষের নিবেদন	বালক, চৈত্র ১২৯২

২১. সৌন্দর্য ও বল	দেশ, শারদীয় ১৩৫৩, রচনা : ১২৯৫
২২. আবশ্যকের মধ্যে অধীনতার ভাব	দেশ, শারদীয় ১৩৫৩, রচনা : ১২৯৫
২৩. শরৎকাল	মানসী, আশ্বিন ১৩২০, রচনা : ১২৯৬
২৪. ছেলেবেলাকার শরৎকাল	দেশ, শারদীয় ১৩৫৪, রচনা : ১২৯৬
২৫. ইন্দুর রহস্য	রবীন্দ্রবীক্ষা ১, শ্রাবণ ১৩৮৩, রচনা : ১২৯৬
২৬. কাজ ও খেলা	দেশ, শারদীয় ১৩৫২, রচনা : ১২৯৬
২৭. [ঘানির বলদ]	রবীন্দ্রবীক্ষা ১, শ্রাবণ ১৩৮৩, রচনা : ১২৯৭
২৮. [জীবনের বুদ্‌বুদ]	রবীন্দ্রবীক্ষা ১, শ্রাবণ ১৩৮৩, রচনা : ১২৯৭
২৯. বাগান	সাধনা, অগ্রহায়ণ ১২৯৮
৩০. ঠাকুরঘর	সাধনা, শ্রাবণ ১২৯৯
৩১. নিষ্ফল চেষ্টা	ভারতী ও বালক, আশ্বিন ১২৯৯
৩২. সফলতার দৃষ্টান্ত	ভারতী ও বালক, আশ্বিন ১২৯৯
৩৩. [লেখক-জন্ম]	পকেট বুক, রচনা : ? ফাল্গুন ১২৯৯
৩৪. সম্পাদকের বিদায় গ্রহণ	ভারতী, ফাল্গুন-চৈত্র ১৩০৫

১. 'সান্ত্বনা' রচনাটি 'ভ'-স্বাক্ষরে প্রকাশিত হইয়াছে, উহা রবীন্দ্রনাথের রচনা বলিয়া ইহাকে চিনিতে সাহায্য করে। এইরূপ হৃদয়ভাব-মূলক রচনা রবীন্দ্রনাথ এই সময়ে আরও দুই-একটি লিখিয়া থাকিতে পারেন— যেমন ভারতী-র ফাল্গুন ১২৮৪-সংখ্যায় মুদ্রিত 'বিজন চিন্তা : কল্পনা' রচনাটি— কিন্তু ইহার নিম্নে 'বিধবা' স্বাক্ষর থাকাতে রচয়িতার পরিচয় নির্দিষ্ট করা কঠিন।

২. 'নিঃস্বার্থ প্রেম' শীর্ষক চলিত ভাষায় 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র'-এর ঢঙে লেখা পত্র-প্রবন্ধটি কাহারো দৃষ্টি আকর্ষণ না করিলেও ইহাকে রবীন্দ্রনাথের রচনা বলিয়া মনে করিবার অনেক কারণ আছে। রচনাটির মধ্যে 'ভা-' অর্থাৎ 'ভানু' শব্দটির আদ্যক্ষরের ব্যবহার এই সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে।

৩-৮. ভারতী-র প্রথম বর্ষ হইতে রবীন্দ্রনাথ ও অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী একধরনের আত্মভাবনামূলক প্রবন্ধ রচনার সূচনা করিয়াছিলেন— 'যথার্থ দোসর', 'গোলাম-চোর', 'চর্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়', 'দরোয়ান', 'জীবন ও বর্ণমালা', এবং 'রেল গাড়ি' এই শ্রেণীরই রচনা— পরিণত রবীন্দ্রনাথের গদ্যভাষায় তাহা আরও বিচিত্র রূপ গ্রহণ করিয়াছে। ইহাদের তিনি কোনো গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করেন নাই বটে, কিন্তু অন্তত 'চর্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়' এবং 'জীবন ও বর্ণমালা' রচনা দুইটিকে তিনি যে গ্রন্থভুক্ত করার কথা ভাবিয়াছিলেন, রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত 'ভারতী'-র একটি খণ্ডে তাহার প্রমাণ রহিয়াছে— কিছু-কিছু অংশ তিনি বর্জন-চিহ্নাঙ্কিত করিয়াছিলেন। এখানে পত্রিকার সম্পূর্ণ পাঠই গৃহীত হইয়াছে।

৯. 'লেখা কুমারী ও ছাপা সুন্দরী' রচনাটি 'প্রভাতসংগীত' কাব্য প্রকাশের সহিত সম্পর্কান্বিত। কাব্যটি প্রকাশিত হয়, বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকানুযায়ী, ১১ মে ১৮৮৩ (২৯ বৈশাখ ১২৯০) তারিখে।

১০. 'গোঁফ এবং ডিম' লঘুস্বাদের এই রচনাটি 'রবীন্দ্রজীবনী'-কার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ছাড়া আর কেহ রবীন্দ্র-রচনা বলিয়া দাবি না করিলেও ভাষা ও অলস কল্পনার স্বচ্ছন্দ বিস্তার দেখিয়া ইহাকে সহজেই রবীন্দ্র-রচনা বলিয়া চিনিয়া লওয়া যায়।

১১. 'সত্যং শিবং সুন্দরম্' 'বিবিধ প্রসঙ্গ'-জাতীয় রচনা 'সৌন্দর্য ও প্রেম'-এর অন্তর্গত একটি ক্ষুদ্র নিবন্ধ, 'আলোচনা' (১২৯২) গ্রন্থে সংকলিত হয় নাই।

১২. 'ভানুসিংহ ঠাকুরের জীবনী' 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'-রচয়িতার কাল্পনিক জীবনকথা। উক্ত গ্রন্থটির প্রকাশ (১ জুলাই ১৮৮৪) উপলক্ষে ইহা লিখিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

দেশীয় ও বিদেশী বহু ঐতিহাসিক ইতিহাসের সন ও তারিখ লইয়া সমকালে যে বিচিত্র গবেষণা প্রকাশ করিতেছিলেন, ইহার মধ্যে তাঁহাদের ব্যঙ্গ করা হইয়াছে। ইতিপূর্বে পুলিনবিহারী সেন -সংকলিত 'রবীন্দ্রগ্রন্থপঞ্জী' প্রথম খণ্ড (১৩৮০) এবং শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায় -সম্পাদিত 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' পাঠান্তর-সংবলিত সংস্করণ (১৩৬৭) গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

১৩. 'পুষ্পাঞ্জলি' কাদম্বরী দেবীর শোচনীয় আত্মহননের (বৈশাখ ১২৯১) পটভূমিকায় লেখা। ইহা বৈশাখ ১২৯২-সংখ্যা 'ভারতী'-তে প্রকাশিত হইলেও ইহার রচনাকাল অন্তত ভাদ্র ১২৯১-এর পূর্ববর্তী, কারণ রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত 'পুষ্পাঞ্জলি'-র পাণ্ডুলিপির (অভিজ্ঞান সংখ্যা ৮৫) অন্তর্গত 'তোরা বসে গাঁথিস্‌ মালা' গানটি 'হায়' শিরোনামে 'ভারতী'-র ভাদ্র ১২৯১-সংখ্যায় মুদ্রিত হইয়াছিল। রচনাটি সম্ভবত একটানা লেখা নয়, ডায়ারির মতো এক-এক দিনে একটি বা দুইটি করিয়া অনুচ্ছেদ, কবিতা বা গান লিখিত হইয়াছে— সবগুলিই কাদম্বরী দেবীর স্মৃতি-সুরভিত। রচনাটি রবীন্দ্র-রচনাবলী সপ্তদশ খণ্ডে : সুলভ নবম খণ্ডে 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থের 'গ্রন্থপরিচয়' অংশে মুদ্রিত হইয়াছিল, বর্তমান খণ্ডে স্বতন্ত্র রচনার মূল্য দিয়া প্রকাশিত হইল।

১৪-১৫. ১২৯০ বঙ্গাব্দে 'বিবিধ প্রসঙ্গ' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়া গিয়াছিল বলিয়া সম্ভবত একই জাতীয় বর্তমান রচনাগুলি কোনো গ্রন্থভুক্ত হয় নাই।

১৬. যৌবনে যাঁহারা রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ বন্ধুশ্রেণীর অন্তর্গত ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত (১৮৬১-১৯৪০) ১৮৮৪ সালে *Phoenix* পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব লইয়া করাচি-প্রবাসী হন। 'বর্ষার চিঠি' এই পত্রাকার প্রবন্ধটি তাঁহারই উদ্দেশে রচিত। কৌতুক, বাল্যস্মৃতির রোমন্থন, কবিত্বময় কল্পনার সংমিশ্রণে উপভোগ্য এই রচনাটির স্মৃতিচারণের অংশটি 'জীবনস্মৃতি'-র কোনো কোনো বর্ণনাকে মনে করাইয়া দেয়।

১৭. ১৮৭৮ সালে ইংলণ্ডে অবস্থানকালে তুষারপাতের দৃশ্য দেখার রোমাঞ্চকর প্রথম অভিজ্ঞতা রবীন্দ্রনাথ 'বরফ পড়া' রচনাটিতে বালকদের চিত্তাকর্ষক করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

১৮. 'শিউলিফুলের গাছ' অলস কবিকল্পনায় পূর্ণ একটি গদ্য রচনা।

১৯: 'বানরের শ্রেষ্ঠত্ব' একটি ব্যঙ্গরচনা, তৎকালে একশ্রেণীর বাঙালি বুদ্ধিজীবী আর্যত্বের মহিমা লইয়া যে অলীক গর্ব প্রকাশ করিতেন তাহাকেই এই রচনায় তীব্র কশাঘাত করা হইয়াছে।

২০. জ্ঞানদানন্দিনী দেবী রবীন্দ্রনাথকে কার্যাধ্যক্ষ করিয়া বালক-বালিকাদের জন্য 'বালক' পত্রিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম সম্পাদিকা বলিয়া ঘোষিত হইলেও রবীন্দ্রনাথই ছিলেন প্রকৃত সম্পাদক। এক বৎসর এই কাজ করিয়া তিনি উক্ত দায়িত্ব ত্যাগ করেন। 'কার্যাধ্যক্ষের নিবেদন' রচনাটি তাহারই কৈফিয়ত।

বর্তমান বিভাগের ২১-৩২ সংখ্যক রচনাগুলি 'পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তক' নামাঙ্কিত রবীন্দ্রভবনের ২৭২-সংখ্যক পাণ্ডুলিপিতে লিখিত হইয়াছিল, এই পাণ্ডুলিপির পরিচয় পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে। ইহার অন্তর্গত বিচিত্র-বিষয়ক রচনাগুলি এখানে সংকলিত হইয়াছে। ইহাদের রচনাকাল ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য নিম্নে প্রদত্ত হইল—

২১. 'সৌন্দর্য ও বল', রচনা : ২১ নভেম্বর ১৮৮৮ (৭ অগ্রহায়ণ ১২৯৫)।

২২. 'আবশ্যকের মধ্যে অধীনতার ভাব', রচনা : ২১ নভেম্বর ১৮৮৮ (৭ অগ্রহায়ণ ১২৯৫)।

২৩. 'সপ্তমীপূজা। ১৮৮৯' (১ অক্টোবর : ১৬ আশ্বিন ১২৯৬)-র দিন 'শরৎকাল'-শীর্ষক একটি প্রস্তাবে রবীন্দ্রনাথ শরৎপ্রকৃতিকে অবলম্বন করিয়া তাঁহার পূর্বস্মৃতি বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার মূল ভাবনাটি অবলম্বন করিয়া তিনি পঞ্চভূত গ্রন্থের 'গদ্য ও পদ্য' প্রবন্ধের প্রথম অনুচ্ছেদটি রচনা করেন (সাধনা, ফাল্গুন ১২৯৯)। পরে মূল রচনাটির ঈষৎ সংস্কার করিয়া

তিনি 'মানসী' পত্রিকার আশ্বিন ১৩২০-সংখ্যায় প্রকাশ করেন।

২৪. ৭ ও ৮ অক্টোবর ১৮৮৯ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'ছেলেবেলাকার কথা' নামক দুইটি প্রস্তাব লেখেন। এই রচনা দুইটির প্রভাবে রবীন্দ্রনাথ ১০ অক্টোবর (২৫ আশ্বিন ১২৯৬) 'ছেলেবেলাকার শরৎকাল' প্রস্তাবটি রচনা করেন।

২৫. 'ইন্দুর-রহস্য' রচনা : ১৬ অক্টোবর ১৮৮৯ (১ কার্তিক ১২৯৬)। এই রচনাটি সামান্য পরিবর্তিত আকারে 'সাধনা'-র ভাদ্র-কার্তিক ১৩০২ সংখ্যায় প্রকাশিত 'বৈজ্ঞানিক কৌতূহল' প্রবন্ধের শেষাংশে সমীরের উক্তি হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে, দ্রষ্টব্য 'পঞ্চভূত', রবীন্দ্র-রচনাবলী দ্বিতীয় খণ্ড : সুলভ প্রথম খণ্ড।

২৬. 'কাজ ও খেলা' এবং 'খেলার কি কোন কার্যকারিতা নাই' নামে দুইটি প্রসঙ্গের অবতারণা করেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যথাক্রমে ৮ ও ৯ অক্টোবর ১৮৮৯ তারিখে। তাঁহার বক্তব্যকে সম্প্রসারিত করিয়া 'কাজ ও খেলা' প্রস্তাবটি রবীন্দ্রনাথ লেখেন ১৭ অক্টোবর ১৮৮৯ (২ কার্তিক ১২৯৬)।

২৭-২৮. এই দুইটি রচনা ৬ এপ্রিল ১৮৯১ (২৪ চৈত্র ১২৯৭) তারিখে রচিত হয়। রচনার অভ্যন্তর হইতে শব্দগুচ্ছ সংগ্রহ করিয়া ইহাদের শিরোনাম দেওয়া হইয়াছে।

২৯-৩০. 'বাগান' ও 'ঠাকুরঘর' রচনা দুইটি সম্ভবত পত্রিকার শূন্যস্থান পূর্ণ করিবার জন্য লিখিত।

৩১-৩২. 'নিষ্ফল চেষ্টা' ও 'সফলতার দৃষ্টান্ত' হাস্যরসাত্মক এই দুইটি রচনায় রবীন্দ্রনাথ সমকালীন বাংলা গল্প ও গদ্যরচনারীতি লইয়া ব্যঙ্গ করিয়াছেন। একই সময়ে লিখিত ও 'সাধনা'-র ভাদ্র-আশ্বিন ১২৯৯ সংখ্যায় প্রকাশিত 'রীতিমত নভেল' গল্পটিও একই বিষয়কে অবলম্বন করিয়াছে।

৩৩. 'লেখক-জন্ম' রচনাটি রবীন্দ্রসাহিত্যের ইতিহাসে বহুলপরিচিত 'পকেটবুক' বা 'মজুমদারপুঁথি' নামক পাণ্ডুলিপি (রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত ফোটোকপির নির্দেশক সংখ্যা ৪২৬) হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। শিরোনাম সম্পাদকমণ্ডলির দেওয়া। রচনাটিতে তারিখ নাই, আগে-পরে লিখিত পাণ্ডুলিপির পৃষ্ঠাগুলির বিচারে আনুমানিক রচনাকাল ফাল্গুন ১২৯৯ নির্ধারণ করা হইয়াছে।

৩৪. রবীন্দ্রনাথ ১৩০৫ বঙ্গাব্দে এক বৎসরের জন্য 'ভারতী' সম্পাদনা করিয়া এই দায়িত্ব ত্যাগ করেন। 'সম্পাদকের বিদায় গ্রহণ' রচনাটিতে তাঁহার কৈফিয়ত প্রদত্ত হইয়াছে।

গ্রন্থসমালোচনা

ইংল্যান্ড হইতে স্বদেশে ফিরিয়া আসিবার পর (১২৮৬।১৮৮০) রবীন্দ্রনাথ 'ভারতী' পত্রিকার সম্পাদনাকর্মের সহিত ঘনিষ্ঠতরভাবে যুক্ত হন। এই সূত্রেই তিনি পত্রিকা-দপ্তরে সমালোচনার জন্য প্রেরিত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত আলোচনা লিখিতে আরম্ভ করেন।

রাবণ-বধ দৃশ্য কাব্য, অভিমন্যু-বধ দৃশ্য কাব্য, অভিমন্যু সম্ভব কাব্য, *The Indian Homœpathic Review*।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা, ভারতী, মাঘ ১২৮৮

গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত 'রাবণ-বধ দৃশ্য কাব্য' ও 'অভিমন্যু-বধ দৃশ্য কাব্য' এই দুটি গ্রন্থের সমালোচনায় পূর্বে 'ভারতী' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধকাব্য' সম্বন্ধে যে-সমস্ত অভিযোগ সবিস্তারে আলোচনা করিয়াছিলেন, এখানে সংক্ষেপে সেই প্রসঙ্গগুলি পুনরালোচিত। এখানে গিরিশচন্দ্রের নাট্যসংলাপের ছন্দ সম্পর্কে যে বিচার, তাহার মধ্যেও রবীন্দ্রনাথের স্বকীয়তা লক্ষণীয়।

বর্তমান সংখ্যায় অপর দুটি সমালোচিত গ্রন্থ—
প্রসাদদাস গোস্বামী, 'অভিমন্যু সম্ভব কাব্য', B. L. Bhaduri -সম্পাদিত মাসিক পত্র *The Indian Homœopathic Review*।

আনন্দ রহো। ঐতিহাসিক উপন্যাস : গিরিশচন্দ্র ঘোষ
সীতার বনবাস। দৃশ্যকাব্য : গিরিশচন্দ্র ঘোষ
লক্ষ্মণবর্জন। দৃশ্যকাব্য : গিরিশচন্দ্র ঘোষ
মুক্তি ও সাধন সম্বন্ধে হিন্দু-শাস্ত্রের উপদেশ : বিপিনবিহারী ঘোষাল
কুসুম-কানন। প্রথম ভাগ : শ্রী কায়কোবাদ
সরলা : যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
প্রায়শ্চিত্ত : হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়
আদর (প্রিয়তমার প্রতি) : কল্পনাকান্ত গুহ
উর্মিলা-কাব্য : দেবেন্দ্রনাথ সেন
নির্ঝরিণী (গীতিকাব্য), প্রথম খণ্ড : দেবেন্দ্রনাথ সেন
রাজ-উদাসীন। প্রথম স্তবক : শাক্য সিংহ ও রামমোহন রায়।
সংক্ষিপ্ত সমালোচনা, ভারতী, ফাল্গুন ১২৮৮

সমালোচিত এই গ্রন্থগুলির মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ সেন -রচিত 'উর্মিলা-কাব্য' ও 'নির্ঝরিণী'র আলোচনাসূত্রেই অনুমান করা যাইতে পারে, রবীন্দ্রনাথ ও দেবেন্দ্রনাথ সেনের মধ্যে পত্রালাপের সূচনা হয়। 'ভারতী' পত্রিকার জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩ সংখ্যায় দেবেন্দ্রনাথ সেন তাঁহার 'স্মৃতি' রচনায় লিখিয়াছেন, "রবিবাবু আমার ফুলবালা কাব্য ও উর্মিলা কাব্যের পক্ষপাতী ছিলেন ও আমার 'নির্ঝরিণী' কাব্যের 'আঁখির মিলন' কবিতা তাঁহার বড়ই ভাল লাগিয়াছিল।..."

জন্ স্টুয়ার্ট মিলের জীবনবৃত্ত : যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ
ইতালীর ইতিবৃত্ত সম্বলিত ম্যাট্সিনির জীবনবৃত্ত : যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ
হৃদয়োচ্ছ্বাস, বা ভারতবিষয়ক প্রবন্ধাবলি : যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ
স্যামুয়েল হানিমানের জীবনবৃত্ত : মহেন্দ্রনাথ রায়
যেমন রোগ তেমনি রোজা। প্রহসন : রাজকৃষ্ণ দত্ত
গার্হস্থ্য চিকিৎসা বিদ্যা : অম্বিকাচরণ রক্ষিত কর্তৃক সংকলিত
শার্ঙ্গধর : অম্বিকাচরণ রক্ষিত কর্তৃক অনুবাদিত
যাবনিক পরাক্রম। উপন্যাস : নীলরত্ন রায়চৌধুরী
স্বপন-সঙ্গীত। গীতিকাব্য : নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
উষাহরণ বা অপূর্ব-মিলন। গীতিনাট্য : রাধানাথ মিত্র
সংক্ষিপ্ত সমালোচনা, ভারতী, বৈশাখ ১২৮৯

'হৃদয়োচ্ছ্বাস, বা ভারতবিষয়ক প্রবন্ধাবলি'র বক্তব্যের সহিত তুলনীয়, ভারতী, চৈত্র ১২৮৭ সংখ্যায় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের 'পারিবারিক দাসত্ব' প্রবন্ধের বক্তব্য।

'ভারতী' ফাল্গুন ১২৮৮ সংখ্যায় প্রকাশিত 'সংক্ষিপ্ত সমালোচনা' দেবেন্দ্রনাথ সেনের 'উর্মিলা-কাব্য', 'নির্ঝরিণী'র সূত্রে উভয়ের মধ্যে যোগ স্থাপনের সম্ভাবনা যেমন অনুমিত হয়, অনুরূপভাবে বর্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত নগেন্দ্রনাথ গুপ্তর 'স্বপন-সঙ্গীত' সমালোচনা সূত্রেই, অনুমান করা যাইতে পারে, রবীন্দ্রনাথ ও নগেন্দ্রনাথের মধ্যে যোগ স্থাপিত হইয়াছিল।

বনবালা। ঐতিহাসিক উপন্যাস : রাধানাথ মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত
হরবিলাপ : রাধানাথ মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত
কমলে কামিনী বা ফুলেশ্বরী : রাধানাথ মিত্র প্রণীত ও প্রকাশিত

কল্পনা-কুসুম : কামিনীসুন্দরী দেবী
কবিতাবলী। প্রথম ভাগ : রামনারায়ণ অগস্তি
কুসুমারিন্দম : ইন্দ্রনারায়ণ পাল
সংক্ষিপ্ত সমালোচনা, ভারতী, ভাদ্র ১২৮৯

সমালোচক কাব্য : জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ
তৃণপুঞ্জ : জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ
শান্তি-কুসুম : বিহারীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
সুরসভা : নগেন্দ্রনাথ ঘোষ
কৈলাস-কুসুম, মণিমন্দির, পার্থ প্রসাদন, প্রমীলার পুরী
ষড়ঋতু বর্ণন কাব্য : আশুতোষ ঘোষ
সংক্ষিপ্ত সমালোচনা : ভারতী, চৈত্র ১২৮৯

সিন্ধু-দূত : নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
রামধনু : সূর্যনারায়ণ ঘোষ কর্তৃক সম্পাদিত
ঝংকার। গীতিকাব্য : সুরেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত
উচ্ছ্বাস : বিপিনবিহারী মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত
সংক্ষিপ্ত সমালোচনা, ভারতী, শ্রাবণ ১২৯০

'সিন্ধু-দূত' প্রণেতা নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'ভুবনমোহিনী প্রতিভা' কাব্য ইতিপূর্বে রবীন্দ্রনাথ 'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব' পত্রিকার কার্তিক ১২৮৩ সংখ্যায় সমালোচনা করেন; বস্তুত ইহাই রবীন্দ্রনাথের প্রথম গ্রন্থসমালোচনা।

বিশ্বভারতী-প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনাবলী, একবিংশ খণ্ডের (প্রকাশ ১৩৫৩) : সুলভ একাদশ খণ্ডের পরিশিষ্ট অংশে 'বাংলাভাষার স্বাভাবিক ছন্দ' শিরোনামে, শেষ অনুচ্ছেদটি বাদ দিয়া প্রকাশিত; বর্তমান রচনাবলীতে পূর্ণপাঠ গৃহীত।

সংগীত সংগ্রহ (বাউলের গাঁথা[গাথা]) দ্বিতীয় খণ্ড
স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক আপত্তি খণ্ডন : শ্রীমতী গুণময়ী
ভাষাশিক্ষা
সমালোচনা, ভারতী, ভাদ্র-আশ্বিন ১২৯১

সংগীত সংগ্রহ, দ্বিতীয় খণ্ডের আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, "এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড সমালোচনাকালে গ্রন্থের মধ্যে আধুনিক শিক্ষিত লোকের রচিত কতকগুলি সংগীত দেখিয়া আমরা ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছিলাম।..."

রবীন্দ্র-রচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ, দ্বিতীয় খণ্ড : সুলভ পঞ্চদশ খণ্ড-ভুক্ত 'বাউলের গান' বর্তমান প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।

লালা গোলোকচাঁদ। পারিবারিক নাটক : সুরেশচন্দ্র বসু
দেহাত্মিক তত্ত্ব : ডাক্তার সাহা প্রণীত
প্রাপ্ত গ্রন্থ, সাধনা, ফাল্গুন ১২৯৮

সংগ্রহ : নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
লীলা : নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
রায় মহাশয় : হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রবাসের পত্র : নবীনচন্দ্র সেন
অপরিচিতের পত্র : জ-রি
প্রকৃতির শিক্ষা

দ্বারকানাথ মিত্রের জীবনী : কালীপ্রসন্ন দত্ত

সমালোচনা, সাধনা, অগ্রহায়ণ ১২৯৯

'রায় মহাশয়' উপন্যাস বিষয়ে সাধনা, মাঘ ১২৯৮ সংখ্যায় প্রকাশিত 'সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা'য় রবীন্দ্রনাথ পূর্বেই সংক্ষেপে আলোচনা করিয়াছেন। 'সাহিত্য' পত্রিকার অগ্রহায়ণ ১২৯৮ সংখ্যা হইতে 'রায় মহাশয়' উপন্যাসটি মুদ্রিত হইতে আরম্ভ হয়। পৌষ ১২৯৮ সংখ্যা 'সাহিত্য' পত্রিকা সমালোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ এই উপন্যাস সম্পর্কে সংক্ষেপে মতামত প্রকাশ করিয়াছেন। দ্রষ্টব্য, বর্তমান রচনাবলীর 'সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা' সংকলন অংশ।

অশোকচরিত : কৃষ্ণবিহারী সেন

পঞ্চামৃত : তারাকুমার কবিরত্ন

সমালোচনা : সাধনা, পৌষ ১২৯৯

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যাইতে পারে, 'অশোকচরিত' রচয়িতা কৃষ্ণবিহারী সেন, কেশবচন্দ্র সেনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা এবং রবীন্দ্রনাথের বন্ধুস্থানীয়। তাঁহার অকালমৃত্যুতে রবীন্দ্রনাথের শোকজ্ঞাপক প্রবন্ধ "কৃষ্ণবিহারী সেন" 'সাধনা', আষাঢ় ১৩০২ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

কঙ্কাবতী

সমালোচনা, সাধনা, ফাল্গুন ১২৯৯

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় -রচিত 'কঙ্কাবতী' উপন্যাসের সমালোচনা।

স্বাক্ষরহীন। বিজনবিহারী ভট্টাচার্য -সম্পাদিত 'কঙ্কাবতী' গ্রন্থে (প্রকাশ ১৩৬৭) এই রবীন্দ্র-রচনা ভূমিকারূপে সংকলিত।

ভক্তচরিতামৃত : অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়

রঘুনাথ দাস গোস্বামীর জীবনচরিত : অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়

চরিত রত্নাবলী। প্রথম ভাগ : কালীচন্দ্র ঘোষাল

অর্থই অনর্থ। দারোগার দপ্তর : প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়

ঠগী কাহিনী : প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড : প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়

গ্রন্থ সমালোচনা, সাধনা, অগ্রহায়ণ ১৩০১

উপনিষদঃ : সীতানাথ দত্ত কৃত বঙ্গানুবাদ

সমালোচনা, সাধনা, পৌষ ১৩০১

এ-পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্যানুসারে ইহা উপনিষদ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের প্রথম রচনা।

হাসি ও খেলা : যোগীন্দ্রনাথ সরকার

সাধন সপ্তকম্

নীতিশতক বা সরল পদ্যানুবাদসহ চাণক্যশ্লোক : অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত

সমালোচনা, সাধনা, মাঘ ১৩০১

'হাসি ও খেলা' প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, যোগীন্দ্রনাথ সরকার -সম্পাদিত 'গল্পসঞ্চয়' সংকলনের পরিচিতিতে রবীন্দ্রনাথ ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৩৬ অনুরূপ প্রশংসা করেন।

দেওয়ান গোবিন্দরাম বা দুর্গোৎসব : যোগেন্দ্রনাথ সাধু -কর্তৃক প্রকাশিত

মনোরমা : কুমারকৃষ্ণ মিত্র

গ্রন্থ সমালোচনা : সাধনা, ফাল্গুন ১৩০১

'ছিন্নপত্রাবলী' গ্রন্থের ১৯০ সংখ্যক পত্রে রবীন্দ্রনাথ এই সমালোচনা প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন, "...সাধনার জন্যে 'সংক্ষিপ্ত সমালোচনা' এখনো বাকি আছে। দু খানা অপাঠ্য বই পড়ে তার উপরে অপ্রিয় কথা লিখতে হবে। নিতান্ত বাজে কাজ— এরকম কাজ এমন দিনে করা অন্যায়। কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাস-বশত ফাল্গুনের এই প্রশান্ত মধ্যাহ্নে এই নির্জন অবসরে এই নিস্তরঙ্গ

পদ্মার উপরে এই নিভৃত বোটের মধ্যে ব'সে সম্মুখে সোনার রৌদ্র সুনীল আকাশ এবং ধূসর বালুর চর নিয়ে শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সাধু-কর্তৃক প্রকাশিত দেওয়ান গোবিন্দরামের সমালোচনা করতে প্রবৃত্ত হতে হচ্ছে। সে বইও কেউ পড়বে না, সে সমালোচনাও কেউ পড়বে না, মাঝের থেকে আজকের এই দুর্লভ দিনটা নষ্ট হবে।"

নূর জাহান : বিপিনবিহারী ঘোষ
শুভ পরিণয়ে
গ্রন্থ সমালোচনা, সাধনা, চৈত্র ১৩০১
রঘুবংশ, দ্বিতীয় ভাগ : নবীনচন্দ্র দাস কর্তৃক অনুবাদিত
ফুলের তোড়া : অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়
নীহার-বিন্দু : নিতাইসুন্দর সরকার
গ্রন্থ সমালোচনা, সাধনা, বৈশাখ ১৩০২
নির্ঝরিণী : শ্রীমতী মৃণালিনী (ঘোষ/সিংহ)
গ্রন্থ সমালোচনা, সাধনা, জ্যৈষ্ঠ ১৩০২
বঙ্গসাহিত্যে বঙ্কিম : হারাণচন্দ্র রক্ষিত
গ্রন্থ সমালোচনা : সাধনা, আষাঢ় ১৩০২

১৮৯৪ খৃস্টাব্দের নভেম্বর মাসে, চৈতন্য লাইব্রেরি ও বিডন স্কোয়ার লিটারেরি ক্লাব -আয়োজিত 'বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের স্থান' বিষয়ে রচনা-প্রতিযোগিতায় অন্যতম বিচারক রবীন্দ্রনাথ হারাণচন্দ্রের এই প্রবন্ধটিকে প্রাপ্ত রচনাসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করিয়া স্বর্ণপদক দান অনুমোদন করিলেও 'সাধনা'র পৃষ্ঠায় প্রবন্ধটির বিরূপ সমালোচনা করিয়াছেন। মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি তাঁহার সম্পাদিত 'অনুশীলন ও পুরোহিত' পত্রিকার শ্রাবণ ১৩০২ সংখ্যায় এই বিরূপ সমালোচনা করার জন্য কটাক্ষ করেন।

কবি বিদ্যাপতি ও অন্যান্য বৈষ্ণব কবিবৃন্দের জীবনী : ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য
প্রসঙ্গমালা : হরনাথ বসু
মনোহর পাঠ : হরনাথ বসু
ন্যায়দর্শন : যতীন্দ্রনাথ চৌধুরীর সহায়তায় কালীপ্রসন্ন ভাদুড়ি-কর্তৃক প্রকাশিত
কাতন্ত্র ব্যাকরণম্ : শ্রীনাথরাম শাস্ত্রী ও হীরাচন্দ্র নেমিচন্দ্র শ্রেষ্ঠী-সম্পাদিত।
গ্রন্থ সমালোচনা, সাধনা, ভাদ্র-কার্তিক ১৩০২
সাহিত্যচিন্তা : পূর্ণচন্দ্র বসু
বামাসুন্দরী বা আদর্শ নারী : চন্দ্রকান্ত সেন
শুশ্রূষা। প্রথম ভাগ : শ্যামাচরণ দে
বাসনা : বিনোদিনী দাসী
পুষ্পাঞ্জলি : রসময় লাহা
গ্রন্থ সমালোচনা, ভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১৩০৫
চিন্তালহরী : চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ
ভূমিকম্প : বিপিনবিহারী ঘটক
গ্রন্থ সমালোচনা, ভারতী, শ্রাবণ ১৩০৫
শ্রীমদ্ভগবদগীতা। সমন্বয় ভাষ্য, সংস্কৃতের অনুবাদ। প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড : গৌরগোবিন্দ রায়
গ্রন্থ সমালোচনা, ভারতী, অগ্রহায়ণ ১৩০৫

সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা

অগ্রহায়ণ ১২৯৮ বঙ্গাব্দ হইতে সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পাদকতায় 'সাধনা' পত্রিকা প্রকাশিত হইতে থাকিলেও রবীন্দ্রনাথ প্রথমাবধি এই পত্রিকার সম্পাদনাকর্মের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। ইহারই সূত্রে তিনি 'সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা' নামে একটি নূতন বিভাগের প্রবর্তন করেন, যাহা বাংলা সাময়িক পত্রের ইতিহাসে একটি অভিনব সংযোজন। এই বিভাগে সমকালীন বিভিন্ন পত্রিকার উল্লেখনীয় রচনাগুলি সম্পর্কে তিনি অম্লমধুর সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করিয়া বঙ্গীয় পাঠকসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের এই আদর্শ অনুসরণ করিয়া কিছুকালের মধ্যেই কয়েকটি সাময়িক পত্রিকায় এই বিভাগটির প্রবর্তন হয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সম্পাদিত অন্যান্য পত্রিকাতেও পরবর্তীকালে এই বিভাগটির অনুবর্তন করিয়াছেন, দেখা যায়।

ভারতী [ও বালক], ১৫শ ভাগ, আশ্বিন ও কার্তিক [১২৯৮]
নব্যভারত, আশ্বিন ও কার্তিক [১২৯৮]
সাহিত্য, দ্বিতীয় ভাগ, আশ্বিন [১২৯৮]
সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা, সাধনা, অগ্রহায়ণ ১২৯৮

'সাহিত্য' আশ্বিন ১২৯৮ সংখ্যায় মুদ্রিত কৃষ্ণভাবিনী দাসের 'শিক্ষিতা নারী' প্রবন্ধ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এই আলোচনার প্রসঙ্গে উভয়ের মধ্যে মতবিনিময় চলে 'সাহিত্য' পৌষ, মাঘ ১২৯৮ সংখ্যায় এবং 'সাধনা' মাঘ, ফাল্গুন ১২৯৮ সংখ্যা পর্যন্ত।

পরবর্তীকালে, আষাঢ় ১৩০৫ সংখ্যা 'ভারতী' পত্রিকায় 'সাময়িক সাহিত্য' বিভাগে রবীন্দ্রনাথ, কৃষ্ণভাবিনী দেবী রচিত, 'প্রদীপ' পত্রিকায় মুদ্রিত 'আজকালকার ছেলেরা' প্রবন্ধের আলোচনা করেন।

নব্যভারত, অগ্রহায়ণ [১২৯৮]
সাহিত্য, অগ্রহায়ণ [১২৯৮]
সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা, সাধনা, পৌষ ১২৯৮

নব্যভারত, পৌষ [১২৯৮]
সাহিত্য, পৌষ [১২৯৮]
সাহিত্য ও বিজ্ঞান, কার্তিক [১২৯৮]
সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা, সাধনা, মাঘ ১২৯৮

সাহিত্য, মাঘ [১২৯৮]
সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা, সাধনা, ফাল্গুন ১২৯৮

চন্দ্রনাথ বসু -রচিত 'লয়' প্রবন্ধ কেন্দ্র করিয়া রবীন্দ্রনাথের আলোচনা বর্তমান ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকে নাই। পরবর্তীকালে 'সাধনা' পত্রিকার আষাঢ় ১২৯৯ সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ স্বতন্ত্র দীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করেন 'চন্দ্রনাথবাবুর স্বরচিত লয়তত্ত্ব' শিরোনামে। বর্তমান রচনাবলীর 'ধর্ম/দর্শন' বিভাগে ইহা সংকলিত হইয়াছে।

নব্যভারত, মাঘ [১২৯৮]
সাহিত্য, ফাল্গুন [১২৯৮]
সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা, সাধনা, চৈত্র ১২৯৮

'সাহিত্য' পত্রিকার আলোচ্য সংখ্যায় প্রকাশিত চন্দ্রনাথ বসুর ধারাবাহিক 'আহার' প্রবন্ধের সমালোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মত তাঁহার পূর্বাপর অন্যান্য রচনার সহিত তুলনীয়।

নব্যভারত, চৈত্র [১২৯৮]
সাহিত্য, চৈত্র [১২৯৮]
সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা, সাধনা, বৈশাখ ১২৯৯

- নব্যভারত, বৈশাখ [১২৯৯]
- সাহিত্য, বৈশাখ [১২৯৯]
    - সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা, সাধনা, জ্যৈষ্ঠ ১২৯৯
- সাহিত্য, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় [১২৯৯]
    - সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা, সাধনা, শ্রাবণ ১২৯৯

রবীন্দ্রনাথ বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ১৮ আষাঢ় ১২৯৯ তারিখে এক পত্রে লিখিতেছেন, “নব্যভারত এ পর্য্যন্ত না পাওয়াতে কেবল দুই সংখ্যা সাহিত্যের সমালোচনাই পাঠিয়ে দিলুম।”

- নব্যভারত, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় [১২৯৯]
- সাহিত্য, শ্রাবণ [১২৯৯]
    - সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা, সাধনা, ভাদ্র-আশ্বিন ১২৯৯
- সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় সংখ্যা
    - সমালোচনা, সাধনা, পৌষ ১৩০১
- প্রদীপ, বৈশাখ [১৩০৫]
- উৎসাহ, ফাল্গুন-চৈত্র [১৩০৪]
    - সাময়িক সাহিত্য, ভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১৩০৫
- নব্যভারত, বৈশাখ [১৩০৫]
- প্রদীপ, জ্যৈষ্ঠ [১৩০৫]
- উৎসাহ, বৈশাখ [১৩০৫]
- নির্মাল্য, জ্যৈষ্ঠ [১৩০৫]
    - সাময়িক সাহিত্য, ভারতী, আষাঢ় ১৩০৫
- নব্যভারত, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় [১৩০৫]
- সাহিত্য, মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র [১৩০৪]
- পূর্ণিমা, শ্রাবণ [১৩০৫]
- প্রদীপ, আষাঢ় [১৩০৫]
- অঞ্জলি, জ্যৈষ্ঠ, দ্বিতীয় সংখ্যা [১৩০৫]
    - সাময়িক সাহিত্য, ভারতী, শ্রাবণ ১৩০৫
- সাহিত্য, বৈশাখ [১৩০৫]
- প্রদীপ, শ্রাবণ [১৩০৫]
- অঞ্জলি, আষাঢ় [১৩০৫]
    - সাময়িক সাহিত্য, ভারতী, ভাদ্র ১৩০৫
- সাহিত্য, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় [১৩০৫]
- সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা [চতুর্থ ভাগ, দ্বিতীয় সংখ্যা]
- প্রদীপ, ভাদ্র [১৩০৫]
- উৎসাহ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় [১৩০৫]
- অঞ্জলি, শ্রাবণ [১৩০৫]
    - সাময়িক সাহিত্য, ভারতী, আশ্বিন ১৩০৫
- সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, পঞ্চম ভাগ, তৃতীয় সংখ্যা
- প্রদীপ, আশ্বিন ও কার্তিক [১৩০৫]
    - সাময়িক সাহিত্য, ভারতী, অগ্রহায়ণ ১৩০৫

সাময়িক সারসংগ্রহ

এই বিভাগটি রবীন্দ্রনাথ 'সাধনা'-র প্রথম সংখ্যা অগ্রহায়ণ ১২৯৮ হইতে শুরু করেন, ইহাতে ইংরেজি সাময়িকপত্রের বিশিষ্ট প্রবন্ধসমূহের সারবস্তু মন্তব্য সহযোগে পরিবেশিত হইত— প্রথম দুইটি সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ একাই লিখিয়াছেন, পরবর্তী সংখ্যা হইতে বলেন্দ্রনাথ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রভৃতি অনেকেই বিভাগটিতে লিখিতে আরম্ভ করেন। মাঝে মাঝে কোনো কোনো সংখ্যায় ইহা মুদ্রিত হয় নাই, ফাল্গুন ১৩০১-সংখ্যা হইতে বিভাগটির নাম হয় 'আলোচনা'। বিদেশী পত্রিকার উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধগুলির সহিত বাঙালি পাঠকের পরিচয় করাইয়া দিয়া তাঁহাদের চিত্তোৎকর্ষ-বৃদ্ধির এই পদ্ধতিটি রবীন্দ্রনাথ খুবই পছন্দ করিতেন— পরবর্তীকালে 'প্রবাসী' ও 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'-তে তিনি শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের শিক্ষকগণ, নিজের কন্যাদ্বয় মাধুরীলতা ও মীরা দেবী এবং ভ্রাতুষ্পুত্রবধূ হেমলতা দেবী প্রমুখদের দিয়া বিভিন্ন ইংরেজি পত্রিকা হইতে সার-সংকলন করাইয়াছেন। 'সাধনা'-র 'সাময়িক সারসংগ্রহ' বিভাগের অন্তর্ভুক্ত অনেকগুলি রচনা বিজ্ঞান-বিষয়ক বলিয়া আমরা সেগুলি 'বিজ্ঞান' বিভাগের অন্তর্গত করিয়াছি। আরও কয়েকটি রচনা রবীন্দ্র-রচনাবলীর পূর্ববর্তী খণ্ডগুলিতে লওয়া হইয়াছে বলিয়া এখানে মুদ্রিত হইল না। বর্তমান খণ্ডে গৃহীত রচনাগুলির সাময়িকপত্রে প্রকাশসূচীটি এইরূপ—

১-৪.	মণিপুরের বর্ণনা, আমেরিকার সমাজচিত্র, পৌরাণিক মহাপ্লাবন, প্রাচ্য সভ্যতার প্রাচীনত্ব	সাধনা, অগ্রহায়ণ ১২৯৮
৫-৭.	ক্ষিপ্ত রমণীসম্প্রদায়, সীমান্ত প্রদেশ ও আশ্রিতরাজ্য, ভিক্ষায়াং নৈব নৈবচ	সাধনা, পৌষ ১২৯৮
৮-১০.	স্ত্রী-মজুর, প্রাচীন পুঁথি উদ্ধার, ক্যাথলিক সোশ্যালিজ্‌ম	সাধনা, মাঘ ১২৯৮
১১.	আমেরিকানের রক্তপিপাসা	সাধনা, ফাল্গুন ১২৯৮
১২-১৩.	উন্নতি, সুখ দুঃখ	সাধনা, চৈত্র ১২৯৮
১৪.	সোশ্যালিজ্‌ম	সাধনা, জ্যৈষ্ঠ ·১২৯৯
১৫.	প্রাচীন শূন্যবাদ	সাধনা, অগ্রহায়ণ ১২৯৯
১৬.	পরিবারাশ্রম	সাধনা, জ্যৈষ্ঠ ১৩০০
১৭-১৮.	মানুষসৃষ্টি, জিব্রল্টার বর্জন	সাধনা, ভাদ্র ১৩০০
১৯-২২.	পলিটিক্স, কন্‌গ্রেসে বিদ্রোহ, ভারত কৌন্সিলের স্বাধীনতা, পুলিস রেগুলেশন বিল, ভারতবর্ষীয় প্রকৃতি, ধর্মপ্রচার	সাধনা, ফাল্গুন ১৩০১
২৩-২৬.	ইন্ডিয়ান রিলিফ সোসাইটি, উদ্দেশ্যসংক্ষেপ ও কর্তব্যবিস্তার, হিন্দু ও মসুলমান, কন্‌গ্রেসে বিদ্রোহ, রাষ্ট্রীয় ব্যাপার	সাধনা, চৈত্র ১৩০১
২৭-২৯.	ফেরোজ শা মেটা, বেয়াদব, কথামালার একটি গল্প	সাধনা, বৈশাখ ১৩০২
৩০-৩৩.	চাবুক-পরিপাক, জাতীয় আদর্শ, অপূর্ব দেশহিতৈষিতা, কুকুরের প্রতি মুগুর	সাধনা, জ্যৈষ্ঠ ১৩০২
৩৪-৩৭.	ইংলন্ডে ও ভারতবর্ষে সমকালীন সিবিল সর্বিস পরীক্ষা, মতের আশ্চর্য ঐক্য, ইংরাজি ভাষা শিক্ষা, জাতীয় সাহিত্য	সাধনা, আষাঢ় ১৩০২

৩৮-৪৩. ভ্রম স্বীকার, চিত্রল অধিকার, ইংরাজের লোকপ্রিয়তা, ইংরাজের স্বদোষ-বাৎসল্য, ইংরাজের লোকলজ্জা, প্রাচ্য ও প্রতীচী	সাধনা, শ্রাবণ ১৩০২
৪৪-৪৭. নূতন সংস্করণ, জাতিভেদ, বিবাহে পণগ্রহণ, ইংরাজের কাপুরুষতা	সাধনা, ভাদ্র-কার্তিক ১৩০২

পরিশিষ্ট

১. সারস্বত সমাজ ১	রচনা : শ্রাবণ ১২৮৯
২. সারস্বত সমাজ ২	রচনা : অগ্রহায়ণ ১২৮৯
৩. বিশেষ বিজ্ঞাপন ত্রৈমাসিক সাধনা	সাধনা, ভাদ্র ১৩০২
৪. প্রাদেশিক সভার উদ্‌বোধন	ভারতী, আষাঢ় ১৩০৫

এই রচনাগুলিকে পরিশিষ্টের অন্তর্গত করা হইয়াছে। কারণ রবীন্দ্রনাথের লেখা হইলেও এগুলি মূলত বিজ্ঞপ্তি বা বিবরণ মাত্র।

১-২. 'বাংলার সাহিত্যিকগণকে একত্র করিয়া একটি পরিষৎ স্থাপন এবং বাংলার পরিভাষা বাঁধিয়া দেওয়া ও সাধারণত সর্বপ্রকার উপায়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পুষ্টিসাধন" করিবার উদ্দেশ্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 'সারস্বত সমাজ' নামক একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিবার প্রস্তাব করেন। ১ শ্রাবণ ১২৮৯ তারিখে ৬ নং দ্বারকানাথ ঠাকুর লেনে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সভাপতিত্বে ইহার প্রথম অধিবেশন হয়। রবীন্দ্রনাথ তাহার একটি কার্যবিবরণী 'মালতীপুঁথি' নামে পরিচিত পাণ্ডুলিপিতে লিখিয়া রাখেন। "১২৮৯ সালে শ্রাবণ মাসের প্রথম রবিবারে" অধিবেশন হয়, তারিখটি ছিল ১ শ্রাবণ, রবীন্দ্রনাথ পরে লিখিবার সময়ে ভ্রমক্রমে "২রা তারিখে" লিখিয়াছেন। এই কার্যবিবরণীটি মালতীপুঁথি-র অন্তর্ভুক্ত হইয়া 'রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসা' প্রথম খণ্ডে মুদ্রিত হইয়াছিল। সেখান হইতে রচনাটি সংকলিত হইল।

১৭ অগ্রহায়ণ ১২৮৯ তারিখে অ্যালবার্ট হলে উক্ত সমাজের যে অধিবেশন বসে, তাহার "রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক লিপিবদ্ধ এবং শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রমোহন [নাথ] ঠাকুর মহাশয় কর্তৃক সংগৃহীত" একটি কার্যবিবরণী মন্মথনাথ ঘোষ 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ' (১৩৩৪) গ্রন্থে উদ্‌ধৃত করিয়াছেন। সেটি এখানে 'সারস্বত সমাজ ২' শিরোনামে সংকলিত হইল।

৩. এই 'বিশেষ বিজ্ঞাপন'টি 'সাধনা' পত্রিকার ভাদ্র-কার্তিক ১৩০২ সংখ্যায় মুদ্রিত হয়, কিন্তু বিভিন্ন পাঠাগারে রক্ষিত উক্ত সংখ্যার কপিগুলিতে ইহার সন্ধান পাওয়া যায় না— সম্ভবত মলাট বাদ দিয়া বাঁধাইবার ফলে ইহা বিনষ্ট হইয়াছে। রাজেন্দ্রকুমার মিত্র স্ব-সম্পাদিত 'সচিত্র খামখেয়ালী' পত্রিকার মাঘ ১৩৫৮ সংখ্যায় (১৪শ বর্ষ ৫ম সংখ্যা) 'খেয়ালখাতা' নিবন্ধে ইহা উদ্‌ধৃত করেন (পৃ. ৪০২)— সেখান হইতে রচনাটি এখানে সংকলিত হইল। উল্লেখ্য, অগ্রহায়ণ ১৩০২ হইতে 'ত্রৈমাসিকপত্ররূপে' সাধনা প্রকাশিত হইবার কথা বিজ্ঞাপিত হইলেও, উহা কার্যকর হয় নাই।

৪. ৩০-৩১ মে ও ১ জুন ১৮৯৮ (১৭-১৯ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৫) তারিখে পূর্ববঙ্গের প্রধান শহর ঢাকা নগরীতে রেভারেন্ড কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ, আশুতোষ চৌধুরী প্রভৃতি যোগদান করেন। ৩০ মে সভাপতি যথারীতি ইংরেজিতে তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন। 'রবীন্দ্রজীবনী'-কার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

লিখিয়াছেন, “রবীন্দ্রনাথ এই সভায় উপস্থিত ছিলেন ও তিনিই সভাপতির সম্ভাষণের সারমর্ম বাংলায় পাঠ করিয়াছিলেন।” বহু বৎসর পরে ‘রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত’ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ পূর্ববর্তী বৎসরে নাটোর-সম্মেলনে বাংলাভাষা প্রবর্তনে তাঁহার প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করিয়া লেখেন, “পর বৎসরে রুগ্‌ণ শরীর নিয়ে ঢাকা-কন্‌ফারেন্‌সেও আমাকে এই চেষ্টায় প্রবৃত্ত হতে হয়েছিল”। এই চেষ্টার পরিচয় পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথ-কৃত কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইংরেজি ভাষণের বাংলা অনুবাদ ‘প্রাদেশিক সভার উদ্‌বোধন’ রচনায়। বার্ষিক সূচীতে অনুবাদক হিসাবে রবীন্দ্রনাথের নাম উল্লিখিত হইয়াছে।

উনিশ শতকের বাংলা সাময়িকপত্রগুলি অনেক সময়েই রচনার সহিত লেখকের নাম প্রকাশ করিত না। কখনো কখনো মলাটে লেখকের নাম উল্লিখিত হইলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে পত্রিকাগুলি বাঁধাই করিবার সময়ে মলাট ও বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠাগুলি বাদ দেওয়ার ফলে অনেক মূল্যবান ঐতিহাসিক তথ্যের সঙ্গে লেখকের পরিচয়টিও লুপ্ত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের প্রথম বয়সের অনেক রচনা এই কারণে বিতর্কের সৃষ্টি করিয়াছে। বর্তমান রচনাবলীর মূল অংশে এইরূপ বিতর্কিত কিছু রচনা অভ্যন্তরীণ ও অন্যান্য তথ্যের বিচার করিয়া রবীন্দ্রনাথের লেখা বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। কিন্তু কয়েকটি রচনার ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহ হওয়া সম্ভবপর হয় নাই। সেই রচনাগুলি ইতিহাসের সূত্র রক্ষার খাতিরে বর্তমান পরিশিষ্টের অন্তর্গত করা হইল। রচনাগুলির সাময়িকপত্রে প্রকাশসূচি ও অন্যান্য তথ্য নিম্নে প্রদত্ত হইল—

১.	শারদ জ্যোৎস্নায় ভগ্নহৃদয়ের গীতোচ্ছ্বাস	ভারতী, কার্তিক ১২৮৪
২.	গ্রহগণ জীবের আবাসভূমি	তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, পৌষ ১৭৯৬ শক (১২৮১)
৩.	বঙ্গে সমাজ-বিপ্লব	ভারতী, মাঘ ১২৮৪
৪.	বিজন চিন্তা : কল্পনা	ভারতী, ফাল্গুন ১২৮৪
৫.	কবিতা-পুস্তক	ভারতী, ভাদ্র ১২৮৫
৬.	আবদারের আইন	সাধনা, মাঘ ১৩০১

সজনীকান্ত দাস তাঁহার ‘রবীন্দ্রনাথ : জীবন ও সাহিত্য’ (১৩৬৭) গ্রন্থে ‘ভারতী’ পত্রিকায় প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনার সূচী তৈয়ারি করিতে গিয়া লিখিয়াছেন, ‘এই তালিকাধৃত রচনাগুলিকে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং একটি দলিলে স্বীকৃতি দিয়াছেন’। রবীন্দ্রনাথের স্বাক্ষরিত এই তালিকায় উপরে উল্লিখিত ‘শারদ জ্যোৎস্নায় ভগ্নহৃদয়ের গীতোচ্ছ্বাস’, ‘বঙ্গে সমাজ-বিপ্লব’ ও ‘কবিতা-পুস্তক’ রচনা তিনটি আছে।

১. ‘শারদ জ্যোৎস্নায় ভগ্নহৃদয়ের গীতোচ্ছ্বাস’ কবিতাটিকে তালিকাভুক্ত করিয়া সজনীকান্ত দাস মন্তব্য করিয়াছেন, ‘এই কবিতাটিকে অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন কিন্তু শেষ চার পংক্তিতে “ভানু” দেখিয়া রবীন্দ্রনাথকেই ইহার রচয়িতা বলিয়া মনে হয়।’

২. রবীন্দ্রনাথ-স্বাক্ষরিত সজনীকান্তের তালিকায় প্রথমেই আছে, ‘ “ভারতবর্ষীয় জ্যোতিষশাস্ত্র” বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের প্রথমাংশ, বেদান্তবাগীশ মহাশয় -কর্তৃক সংশোধিত, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ৮ম কল্প, ৩য় ভাগ, ১৭৯৫ শকাব্দ, জ্যৈষ্ঠ হইতে কয়েক সংখ্যায়।’ ১২৮০ বঙ্গাব্দে রবীন্দ্রনাথ যখন পিতার সহিত হিমালয়ে গিয়াছিলেন, সেই সময়ের স্মৃতিচারণ করিয়া তিনি পরবর্তীকালে ‘জীবনস্মৃতি’ গ্রন্থের প্রথম পাণ্ডুলিপিতে লিখিয়াছেন, ‘প্রক্টরের লিখিত সরল-পাঠ্য জ্যোতিষ গ্রন্থ হইতে তিনি আমাকে স্থানে স্থানে বুঝাইয়া দিতেন আমি তাহা বাংলায় লিখিতাম।’ বিষয়টি তিনি আরও বিস্তৃত করিয়া লিখিয়াছেন ‘বিশ্বপরিচয়’ গ্রন্থে, ‘তিনি যা বলে যেতেন তাই মনে করে তখনকার কাঁচা হাতে আমি একটা বড় প্রবন্ধ লিখেছি। স্বাদ পেয়েছিলুম বলেই লিখেছিলুম, জীবনে এই আমার প্রথম ধারাবাহিক রচনা, আর সেটা

বৈজ্ঞানিক সংবাদ নিয়ে।' রবীন্দ্রনাথ হিমালয়ে থাকার সময়েই জ্যৈষ্ঠ ১৭৯৫ শকের 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'-য়, 'ভারতবর্ষীয় জ্যোতিষশাস্ত্র' নামক একটি ধারাবাহিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়া শুরু হয়, এবং আষাঢ়, আশ্বিন, কার্তিক, পৌষ ও মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়া 'ক্রমশঃ প্রকাশ্য' অবস্থাতেই বন্ধ হইয়া যায়। এই সূত্র অনুসরণ করিয়া সজনীকান্ত রবীন্দ্রনাথকে প্রশ্ন করিলে তিনি ১৫ অক্টোবর ১৯৩৯ তাঁহাকে লেখেন :

> পিতৃদেবের মুখ থেকে জ্যোতিষের যে বিদ্যাটুকু সংগ্রহ করে নিজের ভাষায় লিখে নিয়েছিলুম সেটা যে তখনকার কালে তত্ত্ববোধিনীতে ছাপা হয়েছে এই অদ্ভুত ধারণা আজ পর্যন্ত আমার মনে ছিল। এর দুটো কারণ থাকতে পারে। এক এই যে, সম্পাদক [আনন্দচন্দ্র] বেদান্তবাগীশ মহাশয় ছাপানো হবে বলে বালককে আশ্বাস দিয়েছিলেন, বালক শেষ পর্যন্ত তার প্রমাণ পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করে নি। আর একটা কারণ এই হতে পারে যে, অন্য কোনো যোগ্য লেখক সেটাকে প্রকাশযোগ্য রূপে পূরণ করে নিয়েছিলেন। শেষোক্ত কারণটিই সঙ্গত বলে মনে হয়। এই উপায়ে আমার মন তৃপ্ত হয়েছিল এবং কোনো লেখকেরই নাম না থাকাতে এতে কোনো অন্যায় করা হয় নি। এ না হলে এমন দৃঢ়বদ্ধমূল সংস্কার আমার মনে থাকতে পারত না।

সজনীকান্ত এই চিঠি উদ্‌ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন, 'আমাদের মনে হয়, ইহার পর আর কাহারও মনে এ বিষয়ে সংশয় থাকিতে পারে না।' কিন্তু তাঁহার সংশয় ছিল বলিয়াই তিনি পূর্বে লিখিয়াছিলেন, 'এ প্রবন্ধ সম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দিগ্ধ নহি বলিয়া নমুনা দিলাম না।' দেবেন্দ্রনাথ প্রক্টরের গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া পুত্রকে জ্যোতিষ বিষয়ে শিক্ষা দিয়াছিলেন, প্রসঙ্গক্রমে তিনি ভারতীয় জ্যোতিষশাস্ত্র সম্পর্কে কিছু আলোচনা করিয়া থাকিলেও তাঁহার আলোচ্য বিষয় ছিল পাশ্চাত্য জ্যোতির্বিদ্যা। কিন্তু 'ভারতবর্ষীয় জ্যোতিষশাস্ত্র' প্রবন্ধের লক্ষ্য একান্তভাবেই ভারতীয় জ্যোতিষ।

সেই কারণে কেহ কেহ মনে করেন 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'-র পৌষ ১৭৯৬ শক (১২৮১) সংখ্যায় মুদ্রিত 'গ্রহগণ জীবের আবাসভূমি' 'ক্রমশঃ প্রকাশ্য' প্রবন্ধটিই রবীন্দ্রনাথের সেই জ্যোতিষ-বিষয়ক রচনা। 'ক্রমশঃ প্রকাশ্য' লেখা থাকিলেও পরবর্তী কোনো সংখ্যায় ইহার কোনো কিস্তি প্রকাশিত হয় নাই। 'জীবনস্মৃতি' (১৩৬৮)-র তথ্যপঞ্জীতে সংশয়-চিহ্নিত ভাবে প্রবন্ধটির উল্লেখ করা হইয়াছে। এই-সকল কারণবশত এই প্রবন্ধটিকে পরিশিষ্টে গ্রহণ করা হইল।

৩. 'বঙ্গে সমাজ-বিপ্লব' সজনীকান্ত দাসের তালিকায় আছে। 'দেশ', রবীন্দ্রশতবর্ষপূর্তি সংখ্যা ১৩৬৯-এ 'রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত সাময়িক পত্র' প্রবন্ধের পরিশিষ্টে প্রদত্ত 'ভারতী প্রথম বর্ষে প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনার সূচী'র অন্তর্ভুক্ত করিয়া পুলিনবিহারী সেন প্রবন্ধটি পুনর্মুদ্রিত করিয়াছিলেন। ইহার বক্তব্য ও ভাষা রবীন্দ্রনাথের অপেক্ষা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ভাষা ও তাঁহার তৎকালীন আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকীয় বক্তব্যের সহিত মেলে বলিয়া কেহ কেহ ইহাকে রবীন্দ্রনাথের রচনা মনে করেন না। তাছাড়া একই সংখ্যায় মুদ্রিত 'বাঙালির আশা ও নৈরাশ্য' প্রবন্ধটিকে রবীন্দ্র-রচনা বলিয়া স্বীকৃতি দিয়া এই নিবন্ধটিকে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ উপেক্ষা করিয়াছেন। সেইজন্য রচনাটিকে পরিশিষ্টে স্থান দেওয়া হইল।

৪. 'বিজন চিন্তা : কল্পনা' প্রবন্ধটির শেষে রচয়িতার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে 'বিধবা' নামে, এই কারণেই আত্মভাবনামূলক এই রচনাটির প্রতি কাহারো দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নাই। কিন্তু ইহাতে রবীন্দ্রনাথের সমকালীন রচনার সকল বৈশিষ্ট্যই বর্তমান বলিয়া ইহাকে পরিশিষ্টে স্থান দেওয়া হইল।

৫. 'কবিতা-পুস্তক' বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উক্ত নামীয় কাব্যগ্রন্থের সমালোচনা। রবীন্দ্রনাথ-স্বাক্ষরিত সজনীকান্ত দাসের তালিকায় রচনাটি অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। কিন্তু ইহার যাথার্থ্য

> সম্পর্কে সংশয়িত হইবার কারণ আছে। বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগ অনুযায়ী গ্রন্থটি প্রকাশের তারিখ ১৮ আগস্ট ১৮৭৮ (৩ ভাদ্র ১২৮৫)। যদি এই তারিখ ঠিক হয়, তবে আমেদাবাদে রবীন্দ্রনাথের কাছে বইটি প্রেরণ করা ও সেখান হইতে তাঁহার দ্বারা সমালোচিত হইয়া ভাদ্র মাসের মাঝামাঝি 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশ করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। তাহা ছাড়া ইহাতে স্কট, বায়রন, শেক্সপিয়র প্রভৃতি বিদেশী কবি এবং রাম বসু, হরু ঠাকুর প্রভৃতি কবিওয়ালাদের রচনার সহিত যেরূপ স্বাচ্ছন্দ্য-সহকারে তুলনামূলক আলোচনা করা হইয়াছে, এই ক্ষমতা রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত তখনও আয়ত্ত করিতে পারেন নাই। মনে রাখা দরকার, এই সময়ে অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী তাঁহার সঙ্গে ছিলেন না— ইঁহারই সাহায্য লইয়া তিনি 'ভুবনমোহিনীপ্রতিভা, অবসরসরোজিনী ও দুঃখসঙ্গিনী' গ্রন্থগুলির পাণ্ডিত্যপূর্ণ সমালোচনা করিতে পারিয়াছিলেন।

ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত গ্রন্থসমালোচনটিতে বঙ্কিমচন্দ্রের কবিতার উদ্‌ধৃতির ক্ষেত্রে কয়েকটি জায়গায় মুদ্রণপ্রমাদ দৃষ্ট হয়। মূল গ্রন্থে প্রকাশ অনুযায়ী কয়েকটি জায়গায় সংশোধন করা হইল :

পৃষ্ঠা। ছত্র	ভারতী	গ্রন্থ
৪৯৩। ৮	[ছত্রটি পত্রিকায় ছিল না]	চিকণ গাঁথিয়া মালা, পরিতাম হার।
৪৯৫। ১২	মরুমাঝে	মরুভূমিমাঝে
৪৯৬। ৩২	ত্রাহি মা দুর্গে	ত্রাহি মে দুর্গে

৬. এই লেখাটির বিষয়ে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মন্তব্য করিয়াছেন : 'প্রবন্ধটি কোনো গ্রন্থে মুদ্রিত হয় নাই এবং সাধনায় উহা স্বাক্ষরিত নহে। তবে বিশ্বভারতী গ্রন্থাগারের 'সাধনা'য় রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধটি তাঁহার রচিত বলিয়া চিহ্নিত করিয়াছিলেন।' এতৎসত্ত্বেও কেহ কেহ সংশয় প্রকাশ করেন যে এটির রচয়িতা রবীন্দ্রনাথ নন। সেই কারণেই লেখাটি পরিশিষ্টের অন্তর্গত হইয়াছে।

স্বীকৃতি

অগ্রন্থিত রবীন্দ্ররচনা প্রকাশের কাজ ত্বরান্বিত করিবার জন্য বিশ্বভারতী একটি সম্পাদনা-সমিতি গঠন করেন। উপাচার্য শ্রীদিলীপকুমার সিংহ, কর্মসচিব শ্রীদিলীপ মুখোপাধ্যায় এবং গ্রন্থনবিভাগের অধ্যক্ষ শ্রীঅশোক মুখোপাধ্যায় -সহ এই সমিতিতে আছেন শ্রীভূদেব চৌধুরী, শ্রীভবতোষ দত্ত, শ্রীশঙ্খ ঘোষ, শ্রীউজ্জ্বলকুমার মজুমদার, শ্রীপ্রশান্তকুমার পাল, শ্রীঅমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, শ্রীঅনাথনাথ দাস এবং শ্রীসুবিমল লাহিড়ী। বর্তমান খণ্ডের গ্রন্থপরিচয় প্রস্তুত করিয়াছেন শ্রীঅনাথনাথ দাস এবং শ্রীপ্রশান্তকুমার পাল। সংকলন এবং প্রকাশনের কাজে বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন শ্রীদিলীপকুমার হাজরা, শ্রীতুষারকান্তি সিংহ, শ্রীআশিসকুমার হাজরা এবং শ্রীঅমিত সেন।

১৪০৪

বর্ণানুক্রমিক সূচী

অকাল কুষ্মাণ্ড … ৪০৯
অদৃষ্টের হাতে লেখা … ১২০
অদৃষ্টের হাতে লেখা সূক্ষ্ম এক রেখা … ১২০
অপরিচিত ভাষা ও অপরিচিত সংগীত … ২৬১
অপূর্ব দেশহিতৈষিতা … ৭১২
অবসাদ … ৪৪
অভিমান ক'রে কোথায় গেলি … ৪২
অভিলাষ … ৩
অভ্যাসজনিত পরিবর্তন … ৫১৮
অস্ত গেল দিনমণি। সন্ধ্যা আসি ধীরে … ৬৪
আঁখি পানে যবে আঁখি তুলি … ১২৪
আকবর শাহের উদারতা … ৪৮৩
আকুল আহ্বান … ৪২
আগমনী … ৩৯
আপনি বড়ো … ৪৫২
আব্দারের আইন … ৭৪৬
আবশ্যকের মধ্যে অধীনতার ভাব … ৫৮৬
আবার আবার কেন রে আমার … ১০৭
আমাদের প্রাচীন কাব্যে ও সমাজে স্ত্রী-পুরুষ প্রেমের অভাব … ৪৬৪
আমাদের সভ্যতায় বাহ্যিক ও মানসিকের অসামঞ্জস্য … ৪৬১
আমার এ মনোজ্বালা … ৫২
আমার এ মনোজ্বালা কে বুঝিবে সরলে … ৫২
আমেরিকানের রক্তপিপাসা … ৬৮২
আমেরিকার সমাজচিত্র … ৬৭৪
আয় রে বাছা কোলে বসে চা' মোর মুখ-পানে … ৭৫
আয় লো প্রমদা! নিঠুর ললনে … ৩২
আলস্য ও সাহিত্য … ২৫২
ইংরাজদিগের আদব-কায়দা … ৩৫৯
ইংরাজি ভাষা শিক্ষা … ৭১৪

ইংরাজের কাপুরুষতা ... ৭২১
ইংরাজের লোকপ্রিয়তা ... ৭১৭
ইংরাজের লোকলজ্জা ... ৭১৮
ইংরাজের স্বদোষ-বাৎসল্য ... ৭১৭
ইংলন্ডে ও ভারতবর্ষে সমকালীন সিবিল সর্বিস পরীক্ষা ... ৭১৩
ইচ্ছামৃত্যু ... ৫১১
ইন্ডিয়ান রিলিফ সোসাইটি ... ৭০৩
ইন্দুর-রহস্য ... ৫৮৯
ঈশ্বর ... ৫২১
উটপক্ষীর লাথি ... ৫১২
উদয়াস্তের চন্দ্রসূর্য ... ৫১৭
উদ্দেশ্য সংক্ষেপ ও কর্তব্য বিস্তার ... ৭০৫
উন্নতি ... ৬৮৪
উপহার-গীতি ... ৫৩
এই তো আমরা দোঁহে বসে আছি কাছে কাছে ... ১২০
একটি চুম্বন দাও প্রমদা আমার ... ১০০
একটি পত্র ... ২৬৭
একটি পুরাতন কথা ... ৪২৮
একাদশী রজনী ... ৮১
এলিনোর ... ২১৭
এসো আজি সখা ... ৪৯
এসো আজি সখা বিজন পুলিনে ... ৪৯
এসো এসো এই বুকে নিবাসে তোমার ... ১০২
এসো এসো ভ্রাতৃগণ ... ৮
এসো সখি, এসো মোর কাছে ... ৬৩
এ হতভাগারে ভালো কে বাসিতে চায় ... ৫৬
ঐতিহাসিক চিত্র ... ৪৯২
ওই শুনি শূন্যপথে রথচক্রধ্বনি ... ৪৬
ও কথা বোলো না সখি ... ৫৫
ও কথা বোলো না সখি— প্রাণে লাগে ব্যথা ... ৫৫
ওরা যায়, এরা করে বাস ... ১২২
ওলাউঠার বিস্তার ... ৫২০
কই গো প্রকৃতি রানী, দেখি দেখি মুখখানি ... ৭৬
কথামালার একটি গল্প ... ৭১১
কন্‌গ্রেসে বিদ্রোহ ... ৬৯৭, ৭০৭

কবিতা-পুস্তক ... ৭৪০
কবিতার উপাদান রহস্য (Mystery) ... ২৫৬
কষ্টের জীবন ... ১০১
কাজ ও খেলা ... ৫৮৯
কাজের লোক কে ... ৪৭৭
[কাব্য] ... ২৬৫
কাব্য : স্পষ্ট এবং অস্পষ্ট ... ২৪৪
কার্যাধ্যক্ষের নিবেদন ... ৫৮৫
কী হবে বলো গো সখি ... ৫৫
কী হবে বলো গো সখি ভালোবাসি অভাগারে ... ৫৫
কুকুরের প্রতি মুগুর ... ৭১৩
কেন গান গাই ... ৬১
কেন গান শুনাই ... ৬৩
কেমন সুন্দর আহা ঘুমায়ে রয়েছে ... ১০৪
কৈফিয়ত ... ৪৩৫
কোরো না ছলনা কোরো না ছলনা ... ১১৪
ক্যাথলিক সোশ্যালিজ্‌ম্‌ ... ৬৮২
ক্ষিপ্ত রমণীসম্প্রদায় ... ৬৭৬
গতি নির্ণয়ের ইন্দ্রিয় ... ৫১১
গভীর গভীরতম হৃদয়প্রদেশে ... ১০৫
গানগুলি মোর বিষে ঢালা ... ১২৪
গিয়াছে সে দিন, যে দিন হৃদয় ... ১১২
গিরির উরসে নবীন নিঝর ... ২৫
গুটিকত গল্প ... ৪৮০
গুরুভার মন লয়ে কত বা বেড়াবি ব'য়ে ... ৬১
গেটে ও তাঁহার প্রণয়িনীগণ ... ১৯২
গোঁফ এবং ডিম ... ৫৫৫
গোলাম-চোর ... ৫৪০
গ্রন্থসমালোচনা ... ৬০১-৬৩৪
গ্রহগণ জীবের আবাসভূমি ... ৭৩৫
[ঘানির বলদ] ... ৫৯১
চন্দ্রনাথবাবুর স্বরচিত লয়তত্ত্ব ... ৩১৫
চপলারে আমি অনেক ভাবিয়া ... ১১৫
চর্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় ... ৫৪২
চাবুক-পরিপাক ... ৭১১

চিঠি ... ৮৭
চিঠি লিখব কথা ছিল ... ৮৭
চিরকাল অধিকার ... ৭১৬
চীনে মরণের ব্যবসায় ... ৩৭৯
চেঁচিয়ে বলা ... ৩৮৮
চ্যাটার্টন— বালক-কবি ... ২১৪
ছাত্রদের নীতিশিক্ষা ... ৩৪১
ছাত্রবৃত্তির পাঠ্যপুস্তক ... ৩৪৪
ছেলেবেলাকার আহা, ঘুমঘোরে দেখেছিনু ... ৫১
ছেলেবেলাকার শরৎকাল ... ৫৮৮
ছেলেবেলা হতে বালা, যত গাঁথিয়াছি মালা ... ৫৩
জনমনোমুগ্ধকর উচ্চ অভিলাষ! ... ৩
জন্মতিথির উপহার ... ৮৬
জাগি রহে চাঁদ ... ১১০
জাগি রহে চাঁদ আকাশে যখন ... ১১০
জাতিভেদ ... ৭২০
জাতীয় আদর্শ ... ৭১২
জাতীয় সাহিত্য ... ৭১৫
জান না তো নির্ঝরিণী, আসিয়াছ কোথা হতে ... ১২২
জানি সখা অভাগীরে ভালো তুমি বাস না ... ৫৬
জিজ্ঞাসা ও উত্তর ... ৩১৬
জিব্রল্টার বর্ণন ... ৬১৩
জিহ্বা আস্ফালন ... ৩১২
জীবন ও বর্ণমালা ... ৫৪৮
জীবন মরণ ... ১২২
[জীবনের বুদ্‌বুদ] ... ৫৯১
জীবনের শক্তি ... ৫১৩
জুতা-ব্যবস্থা ... ৩৭৬
‘জ্বল্ জ্বল্ চিতা! দ্বিগুণ, দ্বিগুণ’ ... ২৪
ঝড় বাদলে আবার কখন ... ৯৭
ঝান্সীর রানী ... ৪৭৩
টৌন্‌হলের তামাশা ... ৪০৭
ঠাকুরঘর ... ৫৯২
ঢাল্! ঢাল্ চাঁদ! আরো আরো ঢাল্! ... ৩০
তুমি একটি ফুলের মতো মণি ... ১২৫

দয়াময়ি, বাণি, বীণাপাণি ... ৪৪
দরোয়ান ... ৫৪৫
দামিনীর আঁখি কিবা ... ১১৮
দামু বোস আর চামু বোসে ... ৯১
দিন রাত্রি নাহি মানি ... ১১৭
দিন রাত্রি নাহি মানি, আয় তোরা আয় রে ... ১১৭
দিল্লি দরবার ... ৩৫
[দুর্ভিক্ষ] ... ৪৪১
দেখিছ না অয়ি ভারত-সাগর ... ৩৫
দেবতায় মনুষ্যত্ব আরোপ ... ৫০২
'দেশজ প্রাচীন কবি ও আধুনিক কবি'/(প্রত্যুত্তর) ... ২৪১
ধর্মপ্রচার ... ৭০১
ধর্ম ও ধর্মনীতির অভিব্যক্তি (Evolution) ... ৩১৫
ধর্মে ভয়, কৃতজ্ঞতা ও প্রেম ... ৪৬০
ধীরে ধীরে প্রভাত হল, আঁধার মিলায়ে গেল ... ৭৮
নববর্ষ উপলক্ষে গাজিপুরে ব্রহ্মোপাসনা/উদ্‌বোধন ... ৩১৩
নব্য জয়তত্ত্ব ... ৩১৮
নব্যবঙ্গের আন্দোলন ... ৪৬৬
নর্ম্যান জাতি ও অ্যাংলো-নর্ম্যান সাহিত্য ... ১৯৮
নলিনী ... ১১৬
নিঃস্বার্থ প্রেম ... ৫৩০
নিঝর মিশিছে তটিনীর সাথে ... ১১৬
নিন্দা-তত্ত্ব ... ৩৬২
নিমন্ত্রণ-সভা ... ৩৮৪
নিষ্ফল চেষ্টা ... ৫৯৩
নীল বায়লেট নয়ন দুটি করিতেছে ঢলঢল ... ১২৪
নূতন সংস্করণ ... ৭১৯
ন্যায় ধর্ম ... ৪৮৩
ন্যাশনল ফন্ড ... ৪০২
পত্র ... ৮৩
পত্র ... ৮৫
পত্র ... ৯১
পরিবারাশ্রম ... ৬৮৯
পলিটিক্স্ ... ৬৯৪
পাতায় পাতায় দুলিছে শিশির ... ১১০

পার কি বলিতে কেহ ... ৫১
পার কি বলিতে কেহ কী হল এ বুকে ... ৫১
পারিবারিক দাসত্ব ... ৩৬৯
পাষাণ-হৃদয়ে কেন সঁপিনু হৃদয়? ... ৫৪
পিত্রার্কা ও লরা ... ১৮৫
পুরুষের কবিতায় স্ত্রীলোকের প্রেমের ভাব ... ৪৬০
পুলিস রেগুলেশন বিল ... ৬৯৯
পুষ্পাঞ্জলি ... ৫৬৩
পৌরাণিক মহাপ্লাবন ... ৬৭৪
প্রকৃতির খেদ [প্রথম পাঠ] ... ১৭
প্রকৃতির খেদ [দ্বিতীয় পাঠ] ... ১৪
প্রতিকূল বায়ুভরে, উর্মিময় সিন্ধু-'পরে ... ১০০
প্রথমে আশাহত হয়েছিনু ... ১২৪
প্রলাপ ১ ... ২৫
প্রলাপ ২ ... ৩০
প্রলাপ ৩ ... ৩২
প্রাচী ও প্রতীচী ... ৭১৮
প্রাচীন-পুঁথি উদ্ধার ... ৬৮১
প্রাচীন শূন্যবাদ ... ৬৮৮
প্রাচ্য সভ্যতার প্রাচীনত্ব ... ৬৭৬
প্রাদেশিক সভার উদ্‌বোধন ... ৭২৮
প্রেমতত্ত্ব ... ১১৬
ফেরোজ শা মেটা ... ৭০৮
বঙ্গে সমাজ-বিপ্লব ... ৭৩৬
বরফ পড়া ... ৫৭৯
বর্ষার চিঠি ... ৫৭৭
বলো গো বালা, আমারি তুমি ... ১১১
বসে বসে লিখলেম চিঠি ... ৮৫
বাগান ... ৫৯১
বাংলা লেখক ... ২৬৯
বাংলায় লেখা ... ২৬০
বাংলা সাহিত্যের প্রতি অবজ্ঞা ... ২৬৪
বাঙালি কবি নয় ... ২১৯
বাঙালি কবি নয় কেন? ... ২২৭
বাঙালির আশা ও নৈরাশ্য ... ৩৫৫

বানরের শ্রেষ্ঠত্ব ... ৫৮৪
বারেক ভালোবেসে যে জন মজে ... ১২৫
বিয়াত্রিচে, দান্তে ও তাঁহার কাব্য ... ১৭৪
বিচ্ছেদ ... ১০০
বিজন চিন্তা : কল্পনা ... ৭৩৮
বিদায় ... ১০৪
বিদায়-চুম্বন ... ১০০
বিবাহে পণগ্রহণ ... ৭২০
বিবিধ প্রসঙ্গ ১ ... ৫৬৯
বিবিধ প্রসঙ্গ ২ ... ৫৭৪
বিরহ ... ৭৮
বিশেষ বিজ্ঞাপন/ত্রৈমাসিক সাধনা ... ৭২৭
বিশ্বামিত্র, বিচিত্র এ লীলা ... ১২৬
বিষ ও সুধা ... ৬৪
বিস্তারিয়া উর্মিমালা, বিধির মানস-বালা ... ১৭
বিস্তারিয়া উর্মিমালা, সুকুমারী শৈলবালা ... ১৪
বীর গুরু ... ৪৮৪
বৃদ্ধ কবি ... ১০৯
বেদান্তের বিদেশীয় ব্যাখ্যা ... ৩২২
বেয়াদব ... ৭০৯
বৈজ্ঞানিক সংবাদ ... ৫০৮
ব্যথা বড়ো বাজিয়াছে প্রাণে ... ৫৯
ভানুসিংহ ঠাকুরের জীবনী ... ৫৫৯
ভারত কৌন্সিলের স্বাধীনতা ... ৬৯৭
ভারতী ... ৩৬
ভারতবর্ষীয় প্রকৃতি ... ৭০০
ভারতবর্ষের ইতিহাস (গ্রন্থসমালোচনা) ... ৪৯০
ভালোবাসে যারে তার চিতাভস্ম-পানে ... ১২৬
ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ ... ৬৭৯
ভুজ-পাশ-বদ্ধ অ্যান্টনি ... ১২০
ভুবনমোহিনীপ্রতিভা, অবসরসরোজিনী ও দুঃখসঙ্গিনী ... ১২৯
ভূগর্ভস্থ জল এবং বায়ুপ্রবাহ ... ৫২২
ভূতের গল্পের প্রামাণিকতা ... ৫১৩
ভেবেছি কাহারো সাথে ... ৫৪
ভেবেছি কাহারো সাথে মিশিব না আর ... ৫৪

ভ্রম স্বীকার ... ৭১৬
মণিপুরের বর্ণনা ... ৬৭৩
মতের আশ্চর্য ঐক্য ... ৭১৪
মন হতে প্রেম যেতেছে শুকায়ে ... ১০৯
[মন্দিরপথবর্তিনী] ... ২৯৭
মন্দিরাভিমুখে ... ৩০০
মাকড়সা-সমাজে স্ত্রীজাতির গৌরব ... ৫১২
মাগো আমার লক্ষ্মী ... ৮৩
মানব শরীর ... ৫১৪
মানুষ কাঁদিয়া হাসে ... ১০১
মানুষসৃষ্টি ... ৬৯১
মুর্শিদাবাদ কাহিনী (গ্রন্থসমালোচনা) ... ৪৯১
মুসলমান ছাত্রের বাংলা শিক্ষা ... ৩৫০
মুসলমান মহিলা ... ৬৭৫
মেঘনাদবধ কাব্য ... ১৩১
মেঘ্‌লা শ্রাবণের বাদ্‌লা রাতি ... ৪৫
মেয়েলি ব্রত ... ২৭৮
ম্যাক্‌বেথ্‌ ... ৯৭
যথার্থ দোসর ... ৫৩৪
যাও তবে প্রিয়তম সুদূর প্রবাসে ... ১০৪
যাও তবে প্রিয়তম সুদূর সেথায় ... ১০৬
যেখানে জ্বলিছে সূর্য, উঠিছে সহস্র তারা ... ৩৭
রবীন্দ্রবাবুর পত্র ... ২৭২
রামমোহন রায় ... ৩৩০
রানী, তোর ঠোঁট দুটি মিঠি ... ১২৫
রাষ্ট্রীয় ব্যাপার ... ৭০৭
রূপসী আমার, প্রেয়সী আমার ... ১১৩
রেলগাড়ি ... ৫৫০
রোগশত্রু ও দেহরক্ষক সৈন্য ... ৫১৫
ললিত-নলিনী ... ১০২
লাঠির উপর লাঠি ... ৪৪২
লীলাময়ী নলিনী ... ১১৬
[লেখক-জন্ম] ... ৫৯৬
লেখা কুমারী ও ছাপা সুন্দরী ... ৫৫৩
শরৎকাল ... ৫৮৭

শরতে প্রকৃতি ... ৭৬
শরতের শুকতারা ... ৮১
শারদ জ্যোৎস্নায় ভগ্নহৃদয়ের গীতোচ্ছ্বাস ... ৭৩২
শারদা ... ৪৬
শিউলিফুলের গাছ ... ৫৮২
শিখ-স্বাধীনতা ... ৪৮৮
শুধাই অয়ি গো ভারতী তোমায় ... ৩৬
সংগীত ... ১০৪
সংগীত ও ভাব ... ২৮৫
সংগীতের উৎপত্তি ও উপযোগিতা ... ২৯০
সখি রে— পিরীত বুঝবে কে ... ৭৯
সত্য ... ৪৪৫
সত্যং শিবং সুন্দরম্ ... ৫৫৯
সন্ধ্যা ... ৫৯
সফলতার দৃষ্টান্ত ... ৫৯৪
সমাজ সংস্কার ও কুসংস্কার ... ৩৯৮
সমাজে স্ত্রী-পুরুষের প্রেমের প্রভাব ... ৪৬২
সম্পাদকের বিদায় গ্রহণ ... ৫৯৬
সাকার ও নিরাকার উপাসনা ... ৩০৭
সান্ত্বনা ... ৫২৯
সাময়িক সাহিত্য. সমালোচনা ... ৬৩৭-৬৭০
সামুদ্রিক জীব ... ৪৯৭
সারস্বত সমাজ ১ ... ৭২৫
সারস্বত সমাজ ২ ... ৭২৬
সাহিত্য ... ২৫৯
সাহিত্য ও সভ্যতা ... ২৪২
'সাহিত্য'-পাঠকদের প্রতি ... ২৭২
সাহিত্যের উদ্দেশ্য ... ২৪৭
সাহিত্যের গৌরব ... ২৭৪
সাহিত্যের সৌন্দর্য ... ২৭৯
সীমান্ত প্রদেশ ও আশ্রিত রাজ্য ... ৬৭৮
সুখ দুঃখ ... ৬৮৫
[সুখ না দুঃখ] উক্ত প্রবন্ধ সম্বন্ধে বক্তব্য ... ৩২১
সুখী প্রাণ ... ১২২
সুধীরে নিশার আঁধার ভেদিয়া ... ৩৯

সুশীলা আমার, জানালার 'পরে … ১১৪
সোশ্যালিজ্‌ম্‌ … ৬৮৬
সৌন্দর্য … ২৫৬
সৌন্দর্য ও বল … ৫৮৫
সৌন্দর্য সম্বন্ধে গুটিকতক ভাব … ২৬২
স্যাক্‌সন জাতি ও অ্যাংলো স্যাক্‌সন সাহিত্য … ১৬৪
স্ত্রী ও পুরুষের প্রেমে বিশেষত্ব … ৪৫৮
স্ত্রী-মজুর … ৬৭৯
স্নেহ উপহার … ৭৫
স্নেহ-উপহার এনেছি রে দিতে … ৮৬
স্বপ্ন দেখেছিনু প্রেমাগ্নিজ্বালার … ১২৫
হম সখি দারিদ নারী … ৮০
হাতে কলমে … ৪২০
হা নলিনী গেছে আহা কী সুখের দিন … ১০২
হা বিধাতা— ছেলেবেলা হতেই এমন … ৪৭
হা রে বিধি কী দারুণ অদৃষ্ট আমার … ৫৫
হিন্দু ও মুসলমান … ৭০৬
হিন্দুদিগের জাতীয় চরিত্র ও স্বাধীনতা … ৪৫৫
হিন্দুমেলায় উপহার … ১১
হিমাদ্রি শিখরে শিলাসন-'পরি … ১১
হিমালয় … ৩৭
হোক ভারতের জয়। … ৮

Chivalry … ৪৬৫
Dialogue/Literature … ২৫৭

রবীন্দ্র রচনাবলী

অষ্টাদশ খণ্ড

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্র-রচনাবলী

অষ্টাদশ খণ্ড

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

52,224.

বিশ্বভারতী
২, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা

প্রকাশক—শ্রীপুলিনবিহারী সেন
বিশ্বভারতী, ৬৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর গলি, কলিকাতা

প্রথম প্রকাশ—শ্রাবণ, ১৩৫১
মূল্য ৪॥০, ৬৸০, ৭৸০ ও ১০৲

মুদ্রাকর—শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য
প্রভু প্রেস, ৩০ কর্নওআলিস স্ট্রীট, কলিকাতা

সূচী

চিত্রসূচী ।৵৹

কবিতা ও গান

শেষ সপ্তক ১
সংযোজন ১০৫

নাটক ও প্রহসন

শেষ বর্ষণ ১২৫
নটীর পূজা ১৪৫
নটরাজ ১৯১

উপন্যাস ও গল্প

গল্পগুচ্ছ ২৫১

প্রবন্ধ

সঞ্চয় ৩২৭
পরিচয় ৪২৩
কর্তার ইচ্ছায় কর্ম ৫৪৩
গ্রন্থ-পরিচয় ৫৬৭
বর্ণানুক্রমিক সূচী ৫৯৩

চিত্রসূচী

আমার শেষবেলাকার ঘরখানি ৩
ঘট ভরা ১১৫

কবিতা ও গান

শেষ সপ্তক

শেষ সপ্তক

এক

স্থির জেনেছিলেম, পেয়েছি তোমাকে,
মনেও হয়নি
তোমার দানের মূল্য যাচাই করার কথা।
তুমিও মূল্য করনি দাবি।
দিনের পর দিন গেল, রাতের পর রাত,
দিলে ডালি উজাড় ক'রে।
আড়চোখে চেয়ে
আনমনে নিলেম তা ভাণ্ডারে ;
পরদিনে মনে রইল না।
নববসন্তের মাধবী
যোগ দিয়েছিল তোমার দানের সঙ্গে,
শরতের পূর্ণিমা দিয়েছিল তাকে স্পর্শ।

তোমার কালো চুলের বন্যায়
আমার দুই পা ঢেকে দিয়ে বলেছিলে
"তোমাকে যা দিই
তোমার রাজকর তার চেয়ে অনেক বেশি ;
আরো দেওয়া হল না
আরো যে আমার নেই।"
বলতে বলতে তোমার চোখ এল ছলছলিয়ে।

আজ তুমি গেছ চলে,
দিনের পর দিন আসে, রাতের পর রাত,
তুমি আস না।

এতদিন পরে ভাণ্ডার খুলে
দেখছি তোমার রত্নমালা,
নিয়েছি তুলে বুকে ।
যে গর্ব আমার ছিল উদাসীন
সে নুয়ে পড়েছে সেই মাটিতে
যেখানে তোমার দুটি পায়ের চিহ্ন আছে আঁকা

তোমার প্রেমের দাম দেওয়া হল বেদনায়,
হারিয়ে তাই পেলেম তোমায় পূর্ণ ক'রে ।

শান্তিনিকেতন
১ অগ্রহায়ণ, ১৩৩৯

দুই

একদিন তুচ্ছ আলাপের ফাঁক দিয়ে
কোন্ অভাবনীয় স্মিতহাস্যে
আমার আত্মবিহ্বল যৌবনটাকে
দিলে তুমি দোলা ;
হঠাৎ চমক দিয়ে গেল তোমার মুখে
একটি অমৃতরেখা ;
আর কোনোদিন তার দেখা মেলেনি ।
জোয়ারের তরঙ্গলীলায় গভীর থেকে উৎক্ষিপ্ত হল
চিরদুর্লভের একটি রত্নকণা
শতলক্ষ ঘটনার সমুদ্র-বেলায় ।

এমনি এক পলকে বুকে এসে লাগে
অপরিচিত মুহূর্তের চকিত বেদনা
প্রাণের আধখোলা জানলায়
দূর বনান্ত থেকে
পথ-চলতি গানে ।

অভূতপূর্বের অদৃশ্য অঙ্গুলি বিরহের মীড় লাগিয়ে যায়
হৃদয়-তারে
বৃষ্টিধারামুখর নির্জন প্রবাসে,
সন্ধ্যাযূথীর করুণ স্নিগ্ধ গন্ধে,
রেখে দিয়ে যায় কোন্ অলক্ষ্য আকস্মিক
আপন স্খলিত উত্তরীয়ের স্পর্শ।

তার পরে মনে পড়ে
একদিন সেই বিস্ময়-উন্মনা নিমেষটিকে
অকারণে অসময়ে ;
মনে পড়ে শীতের মধ্যাহ্নে,
যখন গোরুচরা শস্যরিক্ত মাঠের দিকে
চেয়ে চেয়ে বেলা যায় কেটে ;
মনে পড়ে, যখন সঙ্গহারা সায়াহ্নের অন্ধকারে
সূর্যাস্তের ওপার থেকে বেজে ওঠে
ধ্বনিহীন বীণার বেদনা।

তিন

ফুরিয়ে গেল পৌষের দিন ;
কৌতূহলী ভোরের আলো
কুয়াশার আবরণ দিলে সরিয়ে।
হঠাৎ দেখি শিশিরে-ভেজা বাতাবি গাছে
ধরেছে কচি পাতা ;
সে যেন আপনি বিস্মিত
একদিন তমসার কূলে বাল্মীকি
আপনার প্রথম নিশ্বসিত ছন্দে
চকিত হয়েছিলেন নিজে,—
তেমনি দেখলেম ওকে।

অনেকদিনকার নিঃশব্দ অবহেলা থেকে
অরুণ-আলোতে অকুণ্ঠিত বাণী এনেছে
-এই কয়টি কিশলয় ;
সে যেন সেই একটুখানি কথা
যা তুমিই বলতে পারতে,
কিন্তু না ব'লে গিয়েছ চলে ।

সেদিন বসন্ত ছিল অনতিদূরে ;
তোমার আমার মাঝখানে ছিল
আধ-চেনার যবনিকা ;
কেঁপে উঠল সেটা মাঝে মাঝে ;
মাঝে মাঝে তার একটা কোণ গেল উড়ে ;
দুরন্ত হয়ে উঠল দক্ষিণ বাতাস,
তবু সরাতে পারেনি অন্তরাল ।
উচ্ছৃঙ্খল অবকাশ ঘটল না ;
ঘণ্টা গেল বেজে,
সায়াহ্নে তুমি চলে গেলে অব্যক্তের অনালোকে ।

চার

যৌবনের প্রান্তসীমায়
জড়িত হয়ে আছে অরুণিমার ম্লান অবশেষ ;—
যাক কেটে এর আবেশটুকু ;
সুস্পষ্টের মধ্যে জেগে উঠুক
আমার ঘোর-ভাঙা চোখ
স্মৃতিবিস্মৃতির নানা বর্ণে রঞ্জিত
দুঃখসুখের বাষ্পঘনিমা
স'রে যাক সন্ধ্যামেঘের মতো
আপনাকে উপেক্ষা ক'রে ।

ঝরে-পড়া ফুলের ঘনগন্ধে আবিষ্ট আমার প্রাণ,
চারদিকে তার স্বপ্ন মৌমাছি
গুন গুন করে বেড়ায়,
কোন্ অলক্ষ্যের সৌরভে।
এই ছায়ার বেড়ায় বন্ধ দিনগুলো থেকে
বেরিয়ে আসুক মন
শুভ্র আলোকের প্রাঞ্জলতায়।
অনিমেষ দৃষ্টি ভেসে যাক
কথাহীন ব্যথাহীন চিন্তাহীন
সৃষ্টির মহাসাগরে।

যাব লক্ষ্যহীন পথে,
সহজে দেখব সব দেখা,
শুনব সব সুর,
চলন্ত দিনরাত্রির
কলরোলের মাঝখান দিয়ে।
আপনাকে মিলিয়ে নেব
শস্যশেষ প্রান্তরের
সুদূরবিস্তীর্ণ বৈরাগ্যে।
ধ্যানকে নিবিষ্ট করব
ঐ নিস্তব্ধ শালগাছের মধ্যে
যেখানে নিমেষের অন্তরালে
সহস্রবৎসরের প্রাণ নীরবে রয়েছে সমাহিত

কাক ডাকছে তেঁতুলের ডালে,
চিল মিলিয়ে গেল রৌদ্রপাণ্ডুর সুদূর নীলিমায়।
বিলের জলে বাঁধ বেঁধে
ডিঙি নিয়ে মাছ ধরছে জেলে।
বিলের পরপারে পুরাতন গ্রামের আভাস,
ফিকে রঙের নীলাম্বরের প্রান্তে
বেগনি রঙের আঁচলা।

গাঙচিল উড়ে বেড়াচ্ছে
মাছধরা জালের উপরকার আকাশে ।
মাছরাঙা স্তব্ধ বসে আছে বাঁশের খোঁটায়,
তার স্থির ছায়া নিস্তরঙ্গ জলে ।
ভিজে বাতাসে শ্যাওলার ঘন স্নিগ্ধগন্ধ ।

চারদিক থেকে অস্তিত্বের এই ধারা
নানা শাখায় বইছে দিনেরাত্রে ।
অতি পুরাতন প্রাণের বহুদিনের নানা পণ্য নিয়ে
এই সহজ প্রবাহ,—
মানব-ইতিহাসের নূতন নূতন
ভাঙনগড়নের উপর দিয়ে
এর নিত্য যাওয়া আসা ।

চঞ্চল বসন্তের অবসানে
আজ আমি অলস মনে
আকণ্ঠ ডুব দেব এই ধারার গভীরে ;
এর কলধ্বনি বাজবে আমার বুকের কাছে
আমার রক্তের মৃদুতালের ছন্দে ।
এর আলো ছায়ার উপর দিয়ে
ভাসতে ভাসতে চলে যাক আমার চেতনা
চিন্তাহীন তর্কহীন শাস্ত্রহীন
মৃত্যু-মহাসাগরসংগমে ।

পাঁচ

বর্ষা নেমেছে প্রান্তরে অনিমন্ত্রণে ;
ঘনিয়েছে সার-বাঁধা তালের চূড়ায়,
রোমাঞ্চ দিয়েছে বাঁধের কালো জলে ।
বর্ষা নামে হৃদয়ের দিগন্তে
যখন পারি তাকে আহ্বান করতে ।

কিছুকাল ছিলেম বিদেশে।
সেখানকার শ্রাবণের ভাষা
আমার প্রাণের ভাষার সঙ্গে মেলেনি।
তার অভিষেক হল না
আমার অন্তরপ্রাঙ্গণে।

সজল মেঘ-শ্যামলের
সঞ্চরণ থেকে বঞ্চিত জীবনে
কিছু শীর্ণতা রয়ে গেল।
বনস্পতির অঙ্গের আয়তি
ঐ তো দেয় বাড়িয়ে
বছরে বছরে;
তার কাষ্ঠফলকে চক্রচিহ্নে স্বাক্ষর যায় রেখে

তেমনি ক'রে প্রতি বছরে বর্ষার আনন্দ
আমার মজ্জার মধ্যে রসসম্পদ
কিছু যোগ করে।
প্রতিবার রঙের প্রলেপ লাগে
জীবনের পটভূমিকায়
নিবিড়তর ক'রে;
বছরে বছরে শিল্পকারের
অঙ্গুলি-মুদ্রার গুপ্ত সংকেত
অঙ্কিত হয় অন্তর-ফলকে।

নিরালায় জানলার কাছে বসেছি যখন
নিষ্কর্মা প্রহরগুলো নিঃশব্দ চরণে
কিছু দান রেখে গেছে আমার দেহলিতে;
জীবনের গুপ্ত ধনের ভাণ্ডারে
পুঞ্জিত হয়েছে বিস্মৃত মুহূর্তের সঞ্চয়।

বহু বিচিত্রের কারুকলায় চিত্রিত
এই আমার সমগ্র সত্তা
তার সমস্ত সঞ্চয় সমস্ত পরিচয় নিয়ে
কোনো যুগে কি কোনো দিব্যদৃষ্টির সম্মুখে
পরিপূর্ণ অবারিত হবে ?

তার সকল তপস্যায় সে চেয়েছে
গোচরতাকে ;
বলেছে, যেমন বলে গোধূলির অস্ফুট তারা,
বলেছে, যেমন বলে নিশান্তের অরুণ আভাস,—
"এস প্রকাশ, এস।"

কবে প্রকাশ হবে পূর্ণ,
আপনি প্রত্যক্ষ হব আপনার আলোতে
বধূ যেমন সত্য ক'রে জানে আপনাকে,
সত্য ক'রে জানায়,
যখন প্রাণে জাগে তার প্রেম,
যখন দুঃখকে পারে সে গলার হার করতে,
যখন দৈন্যকে দেয় সে মহিমা,
যখন মৃত্যুতে ঘটে না তার অসমাপ্তি।

ছয়

দিনের প্রান্তে এসেছি
গোধূলির ঘাটে।
পথে পথে পাত্র ভরেছি
অনেক কিছু দিয়ে।
ভেবেছিলেম চিরপথের পাথেয় সেগুলি ;
দাম দিয়েছি কঠিন দুঃখে।

অনেক করেছি সংগ্রহ মানুষের কথার হাটে,
কিছু করেছি সঞ্চয় প্রেমের সদাব্রতে।
শেষে ভুলেছি সার্থকতার কথা,
অকারণে কুড়িয়ে বেড়ানোই হয়েছে অন্ধ অভ্যাসে বাঁধা ;
ফুটো ঝুলিটার শূন্য ভরাবার জন্যে
বিশ্রাম ছিল না।

আজ সামনে যখন দেখি
ফুরিয়ে এল পথ,
পাথেয়ের অর্থ আর রইল না কিছুই।
যে প্রদীপ জ্বলেছিল মিলন-শয্যার পাশে
সেই প্রদীপ এনেছিলেম হাতে ক'রে।
তার শিখা নিবল আজ,
সেটা ভাসিয়ে দিতে হবে স্রোতে।
সামনের আকাশে জ্বলবে একলা সন্ধ্যার তারা।
যে বাঁশি বাজিয়েছি
ভোরের আলোয়, নিশীথের অন্ধকারে,
তার শেষ সুরটি বেজে থামবে
রাতের শেষ প্রহরে।

তার পরে ?
যে জীবনে আলো নিবল,
সুর থামল,
সে যে এই আজকের সমস্ত কিছুর মতোই
ভরা সত্য ছিল,
সে-কথা একেবারেই ভুলবে জানি,
ভোলাই ভালো।
তবু তার আগে কোনো একদিনের জন্য
কেউ একজন
সেই শূন্যটার কাছে একটা ফুল রেখো
বসন্তের যে ফুল একদিন বেসেছি ভালো।

আমার এতদিনকার যাওয়া-আসার পথে
শুকনো পাতা ঝরেছে,
সেখানে মিলেছে আলোক ছায়া,
বৃষ্টিধারায় আমকাঁঠালের ডালে ডালে
জেগেছে শব্দের শিহরণ,
সেখানে দৈবে কারো সঙ্গে দেখা হয়েছিল
জল-ভরা ঘট নিয়ে যে চলে গিয়েছিল
চকিত পদে।

এই সামান্য ছবিটুকু
আর সব কিছু থেকে বেছে নিয়ে
কেউ একজন আপন ধ্যানের পটে এঁকো
কোনো একটি গোধূলির ধূসরমুহূর্তে।

আর বেশি কিছু নয়।
আমি আলোর প্রেমিক ;
প্রাণরঙ্গভূমিতে ছিলুম বাঁশি-বাজিয়ে।
পিছনে ফেলে যাব না একটা নীরব ছায়া
দীর্ঘনিঃশ্বাসের সঙ্গে জড়িয়ে।
যে পথিক অস্তসূর্যের
ম্লায়মান আলোর পথ নিয়েছে
সে তো ধুলোর হাতে উজাড় করে দিয়ে
সমস্ত আপনার দাবি ;
সেই ধুলোর উদাসীন বেদীটার সামনে
রেখে যেয়ো না তোমার নৈবেদ্য ;
ফিরে নিয়ে যাও অন্নের থালি,
যেখানে তাকিয়ে আছে ক্ষুধা,
যেখানে অতিথি বসে আছে দ্বারে,
যেখানে প্রহরে প্রহরে বাজছে ঘণ্টা
জীবনপ্রবাহের সঙ্গে কালপ্রবাহের
মিলের মাত্রা রেখে।

সাত

অনেক হাজার বছরের
মরু-যবনিকার আচ্ছাদন
যখন উৎক্ষিপ্ত হল,
দেখা দিল তারিখ-হারানো লোকালয়ের
বিরাট কঙ্কাল ;—
ইতিহাসের অলক্ষ্য অন্তরালে
ছিল তার জীবনক্ষেত্র।
তার মুখরিত শতাব্দী
আপনার সমস্ত কবিগান
বাণীহীন অতলে দিয়েছে বিসর্জন।
আর, যে-সব গান তখনো ছিল অঙ্কুরে, ছিল মুকুলে,
যে বিপুল সম্ভাব্য
সেদিন অনালোকে ছিল প্রচ্ছন্ন
অপ্রকাশ থেকে অপ্রকাশেই গেল মগ্ন হয়ে—
যা ছিল অপ্রজ্বল ধোঁওয়ার গোপন আচ্ছাদনে
তাও নিবল।
যা বিকাল, আর যা বিকাল না,—
দুই-ই সংসারের হাট থেকে গেল চলে
একই মূল্যের ছাপ নিয়ে।
কোথাও রইল না তার ক্ষত,
কোথাও বাজল না তার ক্ষতি।

ঐ নির্মল নিঃশব্দ আকাশে
অসংখ্য কল্প-কল্পান্তরের
হয়েছে আবর্তন।
নূতন নূতন বিশ্ব
অন্ধকারের নাড়ি ছিঁড়ে
জন্ম নিয়েছে আলোকে,

ভেসে চলেছে আলোড়িত নক্ষত্রের ফেনপুঞ্জে ;
অবশেষে যুগান্তে তারা তেমনি করেই গেছে
যেমন গেছে বর্ষণশান্ত মেঘ,
যেমন গেছে ক্ষণজীবী পতঙ্গ ।

মহাকাল, সন্ন্যাসী তুমি ।
তোমার অতলস্পর্শ ধ্যানের তরঙ্গ-শিখরে
উচ্ছৃত হয়ে উঠছে সৃষ্টি
আবার নেমে যাচ্ছে ধ্যানের তরঙ্গতলে ।
প্রচণ্ড বেগে চলেছে ব্যক্ত অব্যক্তের চক্রনৃত্য,
তারি নিস্তব্ধ কেন্দ্রস্থলে
তুমি আছ অবিচলিত আনন্দে
হে নির্মম, দাও আমাকে তোমার ঐ সন্ন্যাসের দীক্ষা ।
জীবন আর মৃত্যু, পাওয়া আর হারানোর মাঝখানে
যেখানে আছে অক্ষুব্ধ শান্তি
সেই সৃষ্টি-হোমাগ্নিশিখার অন্তরতম
স্তিমিত নিভৃতে
দাও আমাকে আশ্রয় ।

১৯ চৈত্র, ১৩৪১

আট

মনে মনে দেখলুম
সেই দূর অতীত যুগের নিঃশব্দ সাধনা
যা মুখর ইতিহাসকে নিষিদ্ধ রেখেছে
আপন তপস্যার আসন থেকে ।

দেখলেম দুর্গম গিরিব্রজে
কোলাহলী কৌতূহলী দৃষ্টির অন্তরালে
অসূর্যম্পশ্য নিভৃতে

ছবি আঁকছে গুণী
গুহাভিত্তির 'পরে,
যেমন অন্ধকার পটে
সৃষ্টিকার আঁকছেন বিশ্বছবি।

সেই ছবিতে ওরা আপন আনন্দকেই করেছে সত্য,
আপন পরিচয়কে করেছে উপেক্ষা,
দাম চায়নি বাইরের দিকে হাত পেতে,
নামকে দিয়েছে মুছে।
হে অনামা, হে রূপের তাপস,
প্রণাম করি তোমাদের।
নামের মায়াবন্ধন থেকে মুক্তির স্বাদ পেয়েছি
তোমাদের এই যুগান্তরের কীর্তিতে।

নাম-ক্ষালন যে পবিত্র অন্ধকারে ডুব দিয়ে
তোমাদের সাধনাকে করেছিলে নির্মল,
সেই অন্ধকারের মহিমাকে
আমি আজ বন্দনা করি।
তোমাদের নিঃশব্দ বাণী
রয়েছে এই গুহায়,
বলছে—নামের পূজার অর্ঘ্য,
ভাবীকালের খ্যাতি,
সে তো প্রেতের অন্ন;
ভোগশক্তিহীন নিরর্থকের কাছে উৎসর্গ-করা।
তার পিছনে ছুটে
সদ্য বর্তমানের অন্নপূর্ণার
পরিবেষণ এড়িয়ে যেয়ো না, মোহান্ধ।

আজ আমার দ্বারের কাছে
শজনে গাছের পাতা গেল ঝ'রে,

ডালে ডালে দেখা দিয়েছে
কচি পাতার রোমাঞ্চ ;
এখন প্রৌঢ় বসন্তের পারের খেয়া
চৈত্রমাসের মধ্যস্রোতে ;
মধ্যাহ্নের তপ্ত হাওয়ায়
গাছে গাছে দোলাদুলি ;
উড়তি ধুলোয় আকাশের নীলিমাতে
ধূসরের আভাস,
নানা পাখির কলকাকলিতে
বাতাসে আঁকছে শব্দের অস্ফুট আলপনা ।

এই নিত্য-বহমান অনিত্যের স্রোতে
আত্মবিস্মৃত চলতি প্রাণের হিল্লোল ;
তার কাঁপনে আমার মন ঝলমল করছে
কৃষ্ণচূড়ার পাতার মতো ।
অঞ্জলি ভরে এই তো পাচ্ছি
সদ্য মুহূর্তের দান,
এর সত্যে নেই কোনো সংশয়, কোনো বিরোধ ।
যখন কোনোদিন গান করেছি রচনা,
সেও তো আপন অন্তরে
এইরকম পাতার হিল্লোল,
হাওয়ার চাঞ্চল্য,
রৌদ্রের ঝলক,
প্রকাশের হর্ষবেদনা ।
সেও তো এসেছে বিনা নামের অতিথি,
গর-ঠিকানার পথিক ।
তার যেটুকু সত্য
তা সেই মুহূর্তেই পূর্ণ হয়েছে,
তার বেশি আর বাড়বে না একটুও,
নামের পিঠে চড়ে ।

বর্তমানের দিগন্তপারে
যে-কাল আমার লক্ষ্যের অতীত
সেখানে অজানা অনাত্মীয় অসংখ্যের মাঝখানে
যখন ঠেলাঠেলি চলবে
লক্ষ লক্ষ নামে নামে,
তখন তারি সঙ্গে দৈবক্রমে চলতে থাকবে
বেদনাহীন চেতনাহীন ছায়ামাত্রসার
আমারো নামটা,
ধিক থাক্ সেই কাঙাল কল্পনার মরীচিকায়।
জীবনের অল্প কয়দিনে
বিশ্বব্যাপী নামহীন আনন্দ
দিক আমাকে নিরহংকার মুক্তি।

সেই অন্ধকারকে সাধনা করি
যার মধ্যে স্তব্ধ বসে আছেন
বিশ্বচিত্রের রূপকার, যিনি নামের অতীত,
প্রকাশিত যিনি আনন্দে।

১।৪।৩৫
শান্তিনিকেতন

নয়

ভালোবেসে মন বললে—
"আমার সব রাজত্ব দিলেম তোমাকে।"
অবুঝ ইচ্ছাটা করলে অত্যুক্তি;
দিতে পারবে কেন?
সবটার নাগাল পাব কেমন ক'রে?
ও যে একটা মহাদেশ,
সাত সমুদ্রে বিচ্ছিন্ন।
ওখানে বহুদূর নিয়ে একা বিরাজ করছে
নির্বাক্ অনতিক্রমণীয়।

তার মাথা উঠেছে মেঘে-ঢাকা পাহাড়ের চূড়ায়,
তার পা নেমেছে আঁধারে-ঢাকা গহ্বরে।

এ যেন অগম্য গ্রহ এই আমার সত্তা,
বাষ্প-আবরণে ফাঁক পড়েছে কোণে কোণে,
দুরবীনের সন্ধান সেইটুকুতেই।
যাকে বলতে পারি আমার সবটা,
তার নাম দেওয়া হয়নি,
তার নকশা শেষ হবে কবে ?
তার সঙ্গে প্রত্যক্ষ ব্যবহারের সম্পর্ক হবে কার ?
নামটা রয়েছে যে-পরিচয়টুকু নিয়ে,
টুকরো-জোড়া দেওয়া তার রূপ,
অনাবিষ্কৃতের প্রান্ত থেকে সংগ্রহ-করা।

চারিদিকে ব্যর্থ ও সার্থক কামনার
আলোয় ছায়ায় বিকীর্ণ আকাশ।
সেখান থেকে নানা বেদনার রঙিন ছায়া নামে
চিত্তভূমিতে ;
হাওয়ায় লাগে শীত বসন্তের ছোঁওয়া ;
সেই অদৃশ্যের চঞ্চল লীলা
কার কাছেই বা স্পষ্ট হল ?
ভাষার অঞ্জলিতে
কে ধরতে পারে তাকে ?
জীবনভূমির এক প্রান্ত দৃঢ় হয়েছে
কর্মবৈচিত্র্যের বন্ধুরতায়,
আর এক প্রান্তে অচরিতার্থ সাধনা
বাষ্প হয়ে মেঘায়িত হল শূন্যে,
মরীচিকা হয়ে আঁকছে ছবি।

এই ব্যক্তিজগৎ মানবলোকে দেখা দিল
জন্মমৃত্যুর সংকীর্ণ সংগমস্থলে।

তার আলোকহীন প্রদেশে
বৃহৎ অগোচরতায় পুঞ্জিত আছে
আত্মবিস্মৃত শক্তি,
মূল্য পায়নি এমন মহিমা,
অনঙ্কুরিত সফলতার বীজ মাটির তলায়।
সেখানে আছে ভীরুর লজ্জা,
প্রচ্ছন্ন আত্মাবমাননা,
অখ্যাত ইতিহাস,
আছে আত্মাভিমানের
ছদ্মবেশের বহু উপকরণ,—
সেখানে নিগূঢ় নিবিড় কালিমা
অপেক্ষা করছে মৃত্যুর হাতের মার্জনা।

এই অপরিণত অপ্রকাশিত আমি,
এ কার জন্যে, এ কিসের জন্যে?
যা নিয়ে এল কত সূচনা, কত ব্যঞ্জনা,
বহু বেদনায় বাঁধা হতে চলল যার ভাষা,
পৌঁছল না যা বাণীতে,
তার ধ্বংস হবে অকস্মাৎ নিরর্থকতার অতলে,
সইবে না সৃষ্টির এই ছেলেমানুষি।

অপ্রকাশের পর্দা টেনেই কাজ করেন গুণী;
ফুল থাকে কুঁড়ির অবগুণ্ঠনে,
শিল্পী আড়ালে রাখেন অসমাপ্ত শিল্পপ্রয়াসকে;
কিছু কিছু আভাস পাওয়া যায়,
নিষেধ আছে সমস্তটা দেখতে পাওয়ার পথে।

আমাতে তাঁর ধ্যান সম্পূর্ণ হয়নি,
তাই আমাকে বেষ্টন ক'রে এতখানি নিবিড় নিস্তব্ধতা।
তাই আমি অপ্রাপ্য, আমি অচেনা;

অজানার ঘেরের মধ্যে এ সৃষ্টি রয়েছে তাঁরি হাতে,
কারো চোখের সামনে ধরবার সময় আসেনি,
সবাই রইল দূরে,—
যারা বললে "জানি", তারা জানল না।

২৭।৩।৩৫
শান্তিনিকেতন

দশ

মনে হয়েছিল আজ সব-কটা দুর্গ্রহ
চক্র ক'রে বসেছে দুর্মন্ত্রণায়।
অদৃষ্ট জাল ফেলে অন্তরের শেষ তলা থেকে
টেনে টেনে তুলছে নাড়ি-ছেঁড়া যন্ত্রণাকে।
মনে হয়েছিল, অন্তহীন এই দুঃখ;
মনে হয়েছিল, পন্থহীন নৈরাশ্যের বাধায়
শেষ পর্যন্ত এমনি ক'রে
অন্ধকার হাতড়িয়ে বেড়ানো।
ভিতসুদ্ধ বাসা গেছে ডুবে,
ভাগ্যের ভাঙনের অপঘাতে।

এমন সময়ে সদ্যবর্তমানের
প্রাকার ডিঙিয়ে দৃষ্টি গেল
দূর অতীতের দিগন্তলীন
বাগ্‌বাদিনীর বাণীসভায়।
যুগান্তরের ভগ্নশেষের ভিত্তিচ্ছায়ায়
ছায়ামূর্তি বাজিয়ে তুলেছে রুদ্রবীণায়
পুরাণখ্যাত কালের কোন্‌ নিষ্ঠুর আখ্যায়িকা।

দুঃসহ দুঃখের স্মরণতন্তু দিয়ে গাঁথা
সেই দারুণ কাহিনী।

কোন্ দুর্দাম সর্বনাশের
বজ্রঝঞ্ঝনিত মৃত্যুমাতাল দিনের
হুহুংকার,
যার আতঙ্কের কম্পনে
ঝংকৃত করছে বীণাপাণি
আপন বীণার তীব্রতম তার।

দেখতে পেলেম
কতকালের দুঃখ লজ্জা গ্লানি,
কত যুগের জ্বলংধারা মর্মনিঃস্রাব
সংহত হয়েছে,
ধরেছে দহনহীন বাণীমূর্তি
অতীতের সৃষ্টিশালায়।

আর তার বাইরে পড়ে আছে
নির্বাপিত বেদনার পর্বতপ্রমাণ ভস্মরাশি,
জ্যোতির্হীন বাক্যহীন অর্থশূন্য।

এগারো

ভোরের আলো-আঁধারে
থেকে থেকে উঠছে কোকিলের ডাক
যেন ক্ষণে ক্ষণে শব্দের আতশবাজি।
ছেঁড়া মেঘ ছড়িয়েছে আকাশে
একটু একটু সোনার লিখন নিয়ে।

হাটের দিন,
মাঠের মাঝখানকার পথে
চলেছে গোরুর গাড়ি।
কলসীতে নতুন আখের গুড়, চালের বস্তা,
গ্রামের মেয়ে কাঁখের ঝুড়িতে নিয়েছে
কচুশাক, কাঁচা আম, শজনের ডাঁটা।

ছুটী বাজল ইস্কুলের ঘড়িতে।
ঐ ঘণ্টার শব্দ আর সকাল বেলাকার কাঁচা রোদ্দুরের রং
মিলে গেছে আমার মনে।
আমার ছোটো বাগানের পাঁচিলের গায়ে
বসেছি চৌকি টেনে
করবীগাছের তলায়।
পুবদিক থেকে রোদ্দুরের ছটা
বাঁকা ছায়া হানছে ঘাসের 'পরে।
বাতাসে অস্থির দোলা লেগেছে
পাশাপাশি দুটি নারকেলের শাখায়।
মনে হচ্ছে যমজ শিশুর কলরবের মতো।
কচি দাড়িম ধরেছে গাছে
চিকন সবুজের আড়ালে।

চৈত্রমাস ঠেকল এসে শেষ হপ্তায়।
আকাশে ভাসা বসন্তের নৌকায়
পাল পড়েছে ঢিলে হয়ে।
দূর্বাঘাস উপবাসে শীর্ণ;
কাঁকর-ঢালা পথের ধারে
বিলিতি মৌসুমি চারায়
ফুলগুলি রং হারিয়ে সংকুচিত।
হাওয়া দিয়েছে পশ্চিম দিক থেকে,—
বিদেশী হাওয়া চৈত্রমাসের আঙিনাতে।
গায়ে দিতে হল আবরণ অনিচ্ছায়।
বাঁধানো জলকুণ্ডে জল উঠছে শিরশিরিয়ে,
টলমল করছে নালগাছের পাতা,
লাল মাছ কটা চঞ্চল হয়ে উঠল।

নেবুঘাস ঝাঁকড়া হয়ে উঠেছে
খেলা-পাহাড়ের গায়ে।

তার মধ্যে থেকে দেখা যায়
গেরুয়া পাথরের চতুর্মুখ মূর্তি।
সে আছে প্রবহমান কালের দূর তীরে
উদাসীন ;
ঋতুর স্পর্শ লাগে না তার গায়ে।
শিল্পের ভাষা তার,
গাছপালার বাণীর সঙ্গে কোনো মিল নেই।
ধরণীর অন্তঃপুর থেকে যে শুশ্রূষা
দিনে রাতে সঞ্চারিত হচ্ছে
সমস্ত গাছের ডালে ডালে পাতায় পাতায়,
ঐ মূর্তি সেই বৃহৎ আত্মীয়তার বাইরে।
মানুষ আপন গূঢ় বাক্য অনেক কাল আগে
যক্ষের মৃত ধনের মতো
ওর মধ্যে রেখেছে নিরুদ্ধ ক'রে,
প্রকৃতির বাণীর সঙ্গে তার ব্যবহার বন্ধ।

সাতটা বাজল ঘড়িতে।
ছড়িয়ে-পড়া মেঘগুলি গেছে মিলিয়ে।
সূর্য উঠল প্রাচীরের উপরে,
ছোটো হয়ে গেল গাছের যত ছায়া।
খিড়কির দরজা দিয়ে
মেয়েটি ঢুকল বাগানে।
পিঠে দুলছে ঝালরওআলা বেণী,
হাতে কঞ্চির ছড়ি ;
চরাতে এনেছে
একজোড়া রাজহাঁস,
আর তার ছোটো ছোটো ছানাগুলিকে।
হাঁস দুটো দাম্পত্য দায়িত্বের মর্যাদায় গম্ভীর,
সকলের চেয়ে গুরুতর ঐ মেয়েটির দায়িত্ব

জীবপ্রাণের দাবি স্পন্দমান
ছোট্ট ঐ মাতৃমনের স্নেহরসে।

আজকের এই সকালটুকুকে
ইচ্ছে করেছি রেখে দিতে।
ও এসেছে অনায়াসে,
অনায়াসেই যাবে চলে।
যিনি দিলেন পাঠিয়ে
তিনি আগেই এর মূল্য দিয়েছেন শোধ ক'রে
আপন আনন্দ-ভাণ্ডার থেকে।

বারো

কেউ চেনা নয়
সব মানুষই অজানা।
চলেছে আপনার রহস্যে
আপনি একাকী।
সেখানে তার দোসর নেই।
সংসারের ছাপমারা কাঠামোয়
মানুষের সীমা দিই বানিয়ে।
সংজ্ঞার বেড়া-দেওয়া বসতির মধ্যে
বাঁধা মাইনের কাজ করে সে।
থাকে সাধারণের চিহ্ন নিয়ে ললাটে।

এমন সময় কোথা থেকে
ভালোবাসার বসন্ত-হাওয়া লাগে,
সীমার আড়ালটা যায় উড়ে,
বেরিয়ে পড়ে চির-অচেনা।
সামনে তাকে দেখি স্বয়ংস্বতন্ত্র, অপূর্ব, অসাধারণ,
তার জুড়ি কেউ নেই।

তার সঙ্গে যোগ দেবার বেলায়
বাঁধতে হয় গানের সেতু,
ফুলের ভাষায় করি তার অভ্যর্থনা।

চোখ বলে,
যা দেখলুম, তুমি আছ তাকে পেরিয়ে।
মন বলে
চোখে-দেখা কানে-শোনার ওপারে যে রহস্য
তুমি এসেছ সেই অগমের দূত,—
রাত্রি যেমন আসে
পৃথিবীর সামনে নক্ষত্রলোক অবারিত ক'রে।
তখন হঠাৎ দেখি আমার মধ্যেকার অচেনাকে,
তখন আপন অনুভবের
তল খুঁজে পাইনে,
সেই অনুভব
"তিলে তিলে নূতন হোয়।"

তেরো

রাস্তায় চলতে চলতে
বাউল এসে থামল
তোমার সদর দরজায়।
গাইল, "অচিন পাখি উড়ে আসে খাঁচায়" :
দেখে অবুঝ মন বলে—
অধরাকে ধরেছি।

তুমি তখন স্নানের পরে এলোচুলে
দাঁড়িয়েছিলে জানলায়।
অধরা ছিল তোমার দূরে-চাওয়া চোখের
পল্লবে,
অধরা ছিল তোমার কাঁকন-পরা নিটোল হাতের
মধুরিমায়।

ওকে ভিক্ষে দিলে পাঠিয়ে,
ও গেল চলে ;
জানলে না এইগানে তোমারই কথা।

তুমি রাগিণীর মতো আস যাও
একতারার তারে তারে।
সেই যন্ত্র তোমার রূপের খাঁচা,
দোলে বসন্তের বাতাসে।
তাকে বেড়াই বুকে ক'রে ;
ওতে রং লাগাই, ফুল কাটি
আপন মনের সঙ্গে মিলিয়ে।
যখন বেজে ওঠে, ওর রূপ যাই ভুলে,
কাঁপতে কাঁপতে ওর তার হয় অদৃশ্য
অচিন তখন বেরিয়ে আসে বিশ্বভুবনে,
খেলিয়ে যায় বনের সবুজে
মিলিয়ে যায় দোলনচাঁপার গন্ধে।

অচিন পাখি তুমি,
মিলনের খাঁচায় থাক,
নানা সাজের খাঁচা।
সেখানে বিরহ নিত্য থাকে পাখির পাখায়,
স্খলিত ওড়ার মধ্যে।
তার ঠিকানা নেই,
তার অভিসার দিগন্তের পারে
সকল দৃশ্যের বিলীনতায়।

চোদ্দো

কালো অন্ধকারের তলায়
পাখির শেষ গান গিয়েছে ডুবে।
বাতাস থমথমে,
গাছের পাতা নড়ে না,

স্বচ্ছরাত্রের তারাগুলি
যেন নেমে আসছে
পুরাতন মহানিম গাছের
ঝিল্লি-ঝংকৃত স্তব্ধ রহস্যের কাছাকাছি।

এমন সময়ে হঠাৎ আবেগে
আমার হাত ধরলে চেপে ;
বললে, "তোমাকে ভুলব না কোনোদিনই।"
দীপহীন বাতায়নে
আমার মূর্তি ছিল অস্পষ্ট,
সেই ছায়ার আবরণে
তোমার অন্তরতম আবেদনের
সংকোচ গিয়েছিল কেটে।

সেই মুহূর্তে তোমার প্রেমের অমরাবতী
ব্যাপ্ত হল অনন্ত স্মৃতির ভূমিকায়।
সেই মুহূর্তের আনন্দবেদনা
বেজে উঠল কালের বীণায়,
প্রসারিত হল আগামী জন্মজন্মান্তরে।
সেই মুহূর্তে আমার আমি
তোমার নিবিড় অনুভবের মধ্যে
পেল নিঃসীমতা।
তোমার কম্পিত কণ্ঠের বাণীটুকুতে
সার্থক হয়েছে আমার প্রাণের সাধনা,
সে পেয়েছে অমৃত।
তোমার সংসারে অসংখ্য যা-কিছু আছে
তার সবচেয়ে অত্যন্ত ক'রে আছি আমি,
অত্যন্ত বেঁচে।

এই নিমেষটুকুর বাইরে আর যা-কিছু
সে গৌণ।

এর বাইরে আছে মরণ,
একদিন রূপের আলো-জ্বালা রঙ্গমঞ্চ থেকে
সরে যাবে নেপথ্যে।
প্রত্যক্ষ সুখদুঃখের জগতে
মূর্তিমান অসংখ্যতার কাছে
আমার স্মরণচ্ছায়া মানবে পরাভব।
তোমার দ্বারের কাছে আছে যে কৃষ্ণচূড়া
যার তলায় দুবেলা জল দাও আপন হাতে,
সেও প্রধান হয়ে উঠে’
তার ডালপালার বাইরে
সরিয়ে রাখবে আমাকে
বিশ্বের বিরাট অগোচরে।
তা হ’ক,
এও গৌণ।

পনেরো

শ্রীমতী রানী দেবী কল্যাণীয়াসু

১

আমি বদল করেছি আমার বাসা।
দুটিমাত্র ছোটো ঘরে আমার আশ্রয়।
ছোটো ঘরই আমার মনের মতো।
তার কারণ বলি তোমাকে।

বড়ো ঘর বড়োর ভান করে মাত্র,
আসল বড়োকে বাইরে ঠেকিয়ে রাখে অবজ্ঞায়।
আমার ছোটো ঘর বড়োর ভান করে না।
অসীমের প্রতিযোগিতার স্পর্ধা তার নেই
ধনী ঘরের মূঢ় ছেলের মতো।

আকাশের পথ ঘরে মেটাতে চাইনে ;
তাকে পেতে চাই তার স্বস্থানে,
পেতে চাই বাইরে পূর্ণভাবে।

বেশ লাগছে।
দূর আমার কাছেই এসেছে।
জানলার পাশেই বসে বসে ভাবি —
দূর ব'লে যে পদার্থ সে সুন্দর।
মনে ভাবি সুন্দরের মধ্যেই দূর।
পরিচয়ের সীমার মধ্যে থেকেও
সুন্দর যায় সব সীমাকে এড়িয়ে
প্রয়োজনের সঙ্গে লেগে থেকেও থাকে আলগা,
প্রতিদিনের মাঝখানে থেকেও সে চিরদিনের।

মনে পড়ে এক দিন মাঠ বেয়ে চলেছিলেম
পালকিতে অপরাহ্ণে ;
কাহার ছিল আটজন।
তার মধ্যে একজনকে দেখলেম
যেন কালো পাথরে কাটা দেবতার মূর্তি ;
আপন কর্মের অপমানকে প্রতিপদে সে চলছিল পেরিয়ে
ছিন্ন শিকল পায়ে নিয়ে পাখি যেমন যায় উড়ে।
দেবতা তার সৌন্দর্যে তাকে দিয়েছেন সুদূরতার সম্মান।

এই দূর আকাশ সকল মানুষেরই অন্তরতম ;
জানলা বন্ধ, দেখতে পাইনে।
বিষয়ীর সংসার, আসক্তি তার প্রাচীর,
যাকে চায় তাকে রুদ্ধ করে কাছের বন্ধনে।
ভুলে যায় আসক্তি নষ্ট করে প্রেমকে,
আগাছা যেমন ফসলকে মারে চেপে।

আমি লিখি কবিতা, আঁকি ছবি।
দূরকে নিয়ে সেই আমার খেলা ;

দূরকে সাজাই নানা সাজে,
আকাশের কবি যেমন দিগন্তকে সাজায়
সকালে সন্ধ্যায়।

কিছু কাজ করি তাতে লাভ নেই, তাতে লোভ নেই,
তাতে আমি নেই।
যে কাজে আছে দূরের ব্যাপ্তি
তাতে প্রতিমুহূর্তে আছে আমার মহাকাশ।
এই সঙ্গে দেখি মৃত্যুর মধুর রূপ, স্তব্ধ নিঃশব্দ সুদূর,
জীবনের চারদিকে নিস্তরঙ্গ মহাসমুদ্র;
সকল সুন্দরের মধ্যে আছে তার আসন, তার মুক্তি।

২

অন্য কথা পরে হবে।
গোড়াতেই বলে রাখি তুমি চা পাঠিয়েছ, পেয়েছি।
এতদিন খবর দিইনি সেটা আমার স্বভাবের বিশেষত্ব।
যেমন আমার ছবি আঁকা, চিঠি লেখাও তেমনি।
ঘটনার ডাকপিওনগিরি করে না সে।
নিজেরই সংবাদ সে নিজে।

জগতে রূপের আনাগোনা চলছে,
সেই সঙ্গে আমার ছবিও এক-একটি রূপ,
অজানা থেকে বেরিয়ে আসছে জানার দ্বারে।
সে প্রতিরূপ নয়।
মনের মধ্যে ভাঙাগড়া কত, কতই জোড়াতাড়া,
কিছু বা তার ঘনিয়ে ওঠে ভাবে,
কিছু বা তার ফুটে ওঠে চিত্রে;
এতদিন এই সব আকাশবিহারীদের ধরেছি কথার ফাঁদে।

মন তখন বাতাসে ছিল কান পেতে,
যে ভাব ধ্বনি খোঁজে তারি খোঁজে।

আজকাল আছে সে চোখ মেলে।
রেখার বিশ্বে খোলা রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে, দেখবে ব'লে।
সে তাকায়, আর বলে, দেখলেম।
সংসারটা আকারের মহাযাত্রা।
কোন্ চির-আগন্তুকের সামনে দিয়ে চলেছে,
তিনিও নীরবে বলছেন, দেখলেম।
আদি যুগে রঙ্গমঞ্চের সম্মুখে সংকেত এল,
"খোলো আবরণ।"
বাষ্পের যবনিকা গেল উঠে,
রূপের নটীরা এল বাহির হয়ে;
ইন্দ্রের সহস্র চক্ষু, তিনি দেখলেন।
তাঁর দেখা আর তাঁর সৃষ্টি একই।
চিত্রকর তিনি।
তাঁর দেখার মহোৎসব দেশে দেশে কালে কালে।

৮।৪।৩৫
শান্তিনিকেতন

৩

অসীম আকাশে কালের তরী চলেছে
রেখার যাত্রী নিয়ে,
অন্ধকারের ভূমিকায় তাদের কেবল
আকারের নৃত্য;
নির্বাক অসীমের বাণী
বাক্যহীন সীমার ভাষায়, অন্তহীন ইঙ্গিতে।—
অমিতার আনন্দসম্পদ
ডালিতে সাজিয়ে নিয়ে চলেছে সুমিতা,
সে ভাব নয়, সে চিন্তা নয়, বাক্য নয়,
শুধু রূপ, আলো দিয়ে গড়া।

আজ আদিসৃষ্টির প্রথম মুহূর্তের ধ্বনি
পৌঁছল আমার চিত্তে,—

যে ধ্বনি অনাদি রাত্রির যবনিকা সরিয়ে দিয়ে
বলেছিল, "দেখো।"
এতকাল নিভৃতে
আপনি যা বলেছি আপনি তাই শুনেছি,
সেখান থেকে এলেম আর-এক নিভৃতে,
এখানে আপনি যা আঁকছি, দেখছি তাই আপনি।
সমস্ত বিশ্ব জুড়ে দেবতার দেখবার আসন,
আমিও বসেছি তাঁরই পাদপীঠে,
রচনা করছি দেখা।

ষোলো

শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ দত্ত কল্যাণীয়েষু

১

পড়েছি আজ রেখার মায়ায়।
কথা ধনীঘরের মেয়ে,
অর্থ আনে সঙ্গে করে,
মুখরার মন রাখতে চিন্তা করতে হয় বিস্তর।
রেখা অপ্রগল্‌ভা, অর্থহীনা,
তার সঙ্গে আমার যে ব্যবহার সবই নিরর্থক।
গাছের শাখায় ফুল ফোটানো ফল ধরানো,
সে কাজে আছে দায়িত্ব;
গাছের তলায় আলোছায়ার নাট-বসানো
সে আর-এক কাণ্ড।
সেইখানেই শুকনো পাতা ছড়িয়ে পড়ে,
প্রজাপতি উড়তে থাকে,
জোনাকি ঝিকমিক করে রাতের বেলা।
বনের আসরে এরা সব রেখা-বাহন
হাল্কা চালের দল,
কারো কাছে জবাবদিহি নেই।

কথা আমাকে প্রশ্রয় দেয় না, তার কঠিন শাসন ;
রেখা আমার যথেচ্ছাচারে হাসে,
তর্জনী তোলে না।

কাজকর্ম পড়ে থাকে, চিঠিপত্র হারিয়ে ফেলি,
ফাঁক পেলেই ছুটে যাই রূপ-ফলানোর অন্দরমহলে।
এমনি করে, মনের মধ্যে
অনেকদিনের যে-লক্ষ্মীছাড়া লুকিয়ে আছে
তার সাহস গেছে বেড়ে।
সে আঁকছে, ভাবছে না সংসারের ভালোমন্দ,
গ্রাহ্য করে না লোকমুখের নিন্দাপ্রশংসা।

মনটা আছে আরামে।
আমার ছবি-আঁকা কলমের মুখে
খ্যাতির লাগাম পড়েনি।
নামটা আমার খুশির উপরে
সর্দারি করতে আসেনি এখনো,
ছবি-আঁকার বুক জুড়ে
আগেভাগে নিজের আসনটা বিছিয়ে বসেনি ;
ঠেলা দিয়ে দিয়ে বলছে না
“নাম রক্ষা ক’রো।”
অথচ ঐ নামটা নিজের মোটা শরীর নিয়ে
স্বয়ং কোনো কাজই করে না।
সব কীর্তির মুখ্য ভাগটা আদায় করবার জন্যে
দেউড়িতে বসিয়ে রাখে পেয়াদা ;
হাজার মনিবের পিণ্ড-পাকানো
ফরমাশটাকে বেদী বানিয়ে স্তূপাকার ক’রে রাখে
কাজের ঠিক সামনে।

এখনো সেই নামটা অবজ্ঞা ক'রেই রয়েছে অনুপস্থিত ;—
আমার তুলি আছে মুক্ত
যেমন মুক্ত আজ ঋতুরাজের লেখনী।

৭ এপ্রিল, ১৯৩৫

সতেরো

শ্রীমান ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কল্যাণীয়েষু

আমার কাছে শুনতে চেয়েছ
গানের কথা ;
বলতে ভয় লাগে,
তবু কিছু বলব।

মানুষের জ্ঞান বানিয়ে নিয়েছে
আপন সার্থক ভাষা।
মানুষের বোধ অবুঝ, সে বোবা,
যেমন বোবা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড।
সেই বিরাট বোবা
আপনাকে প্রকাশ করে ইঙ্গিতে,
ব্যাখ্যা করে না।
বোবা বিশ্বের আছে ভঙ্গি, আছে ছন্দ,
আছে নৃত্য আকাশে আকাশে।

অণুপরমাণু অসীম দেশে কালে
বানিয়েছে আপন আপন নাচের চক্র,
নাচছে সেই সীমায় সীমায় ;
গড়ে তুলছে অসংখ্য রূপ।
তার অন্তরে আছে বহ্নিতেজের দুর্দাম বোধ
সেই বোধ খুঁজছে আপন ব্যঞ্জনা,
ঘাসের ফুল থেকে শুরু ক'রে
আকাশের তারা পর্যন্ত।

মানুষের বোধের বেগ যখন বাঁধ মানে না,
বাহন করতে চায় কথাকে,—
তখন তার কথা হয়ে যায় বোবা,
সেই কথাটা খোঁজে ভঙ্গি, খোঁজে ইশারা,
খোঁজে নাচ, খোঁজে সুর,
দেয় আপনার অর্থকে উলটিয়ে,
নিয়মকে দেয় বাঁকা ক'রে।
মানুষ কাব্যে রচে বোবার বাণী।

মানুষের বোধ যখন বাহন করে সুরকে
তখন বিদ্যুচ্চঞ্চল পরমাণুপুঞ্জের মতোই
সুরসংঘকে বাঁধে সীমায়,
ভঙ্গি দেয় তাকে,
নাচায় তাকে বিচিত্র আবর্তনে।
সেই সীমায়-বন্দী নাচন
পায় গানে-গড়া রূপ।
সেই বোবা রূপের দল মিলতে থাকে
সৃষ্টির অন্দরমহলে,
সেখানে যত রূপের নটী আছে
ছন্দ মেলায় সকলের সঙ্গে
নূপুর-বাঁধা চাঞ্চল্যের
দোলযাত্রায়।

আমি যে জানি
এ-কথা যে-মানুষ জানায়
বাক্যে হ'ক সুরে হ'ক, রেখায় হ'ক,
সে পণ্ডিত।
আমি যে রস পাই, ব্যথা পাই,
রূপ দেখি,

এ-কথা যার প্রাণ বলে
গান তারি জন্যে,
শাস্ত্রে সে আনাড়ি হলেও
তার নাড়িতে বাজে সুর।

যদি সুযোগ পাও
কথাটা নারদমুনিকে শুধিয়ো,
ঝগড়া বাধাবার জন্যে নয়,
তত্ত্বের পার পাবার জন্যে সংজ্ঞার অতীতে।

আঠারো

শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য সুহৃদ্‌বরেষু

আমরা কি সত্যই চাই শোকের অবসান?
আমাদের গর্ব আছে নিজের শোককে নিয়েও।
আমাদের অতি তীব্র বেদনাও
বহন করে না স্থায়ী সত্যকে—
সান্ত্বনা নেই এমন কথায়;
এতে আঘাত লাগে আমাদের দুঃখের অহংকারে।

জীবনটা আপন সকল সঞ্চয়
ছড়িয়ে রাখে কালের চলাচলের পথে;
তার অবিরাম-ধাবিত চাকার তলায়
গুরুতর বেদনার চিহ্নও যায়
জীর্ণ হয়ে, অস্পষ্ট হয়ে।
আমাদের প্রিয়তমের মৃত্যু
একটিমাত্র দাবি করে আমাদের কাছে
সে বলে—"মনে রেখো।"

কিন্তু সংখ্যা নেই প্রাণের দাবির,
তার আহ্বান আসে চারিদিক থেকেই
মনের কাছে;

সেই উপস্থিত কালের ভিড়ের মধ্যে
অতীতকালের একটিমাত্র আবেদন
কখন হয় অগোচর।

যদি বা তার কথাটা থাকে
তার ব্যথাটা যায় চলে।
তবু শোকের অভিমান
জীবনকে চায় বঞ্চিত করতে।
স্পর্ধা ক'রে প্রাণের দূতগুলিকে বলে—
খুলব না দ্বার।
প্রাণের ফসলখেত বিচিত্র শস্যে উর্বর,
অভিমানী শোক তারি মাঝখানে
ঘিরে রাখতে চায় শোকের দেবত্র জমি,—
সাধের মরুভূমি বানায় সেখানটাতে,
তার খাজনা দেয় না জীবনকে।
মৃত্যুর সঞ্চয়গুলি নিয়ে
কালের বিরুদ্ধে তার অভিযোগ।
সেই অভিযোগে তার হার হতে থাকে দিনে দিনে।
কিন্তু চায় না সে হার মানতে ;
মনকে সমাধি দিতে চায়
তার নিজকৃত কবরে।

সকল অহংকারই বন্ধন,
কঠিন বন্ধন আপন শোকের অহংকার।
ধন জন মান সকল আসক্তিতেই মোহ,
নিবিড় মোহ আপন শোকের আসক্তিতে।

উনিশ

তখন বয়স ছিল কাঁচা ;
কতদিন মনে মনে এঁকেছি নিজের ছবি,
বুনো ঘোড়ার পিঠে সওয়ার,
জিন নেই, লাগাম নেই,
ছুটেছি ডাকাত-হানা মাঠের মাঝখান দিয়ে
ভরসন্ধ্যেবেলায় ;
ঘোড়ার খুরে উড়েছে ধুলো
ধরণী যেন পিছু ডাকছে আঁচল দুলিয়ে।
আকাশে সন্ধ্যার প্রথম তারা
দূরে মাঠের সীমানায় দেখা যায়
একটিমাত্র ব্যগ্র বিরহী আলো একটি কোন্ ঘরে
নিদ্রাহীন প্রতীক্ষায়।

যে ছিল ভাবীকালে
আগে হতে মনের মধ্যে
ফিরছিল তারি আবছায়া,
যেমন ভাবী আলোর আভাস আসে
ভোরের প্রথম কোকিল-ডাকা অন্ধকারে।

তখন অনেকখানি সংসার ছিল অজানা,
আধজানা।
তাই অপরূপের রাঙা রংটা
মনের দিগন্ত রেখেছিলে রাঙিয়ে ;
আসন্ন ভালোবাসা
এনেছিল অঘটন-ঘটনার স্বপ্ন।
তখন ভালোবাসায় যে কল্পরূপ ছিল মনে
তার সঙ্গে মহাকাব্যযুগের
দুঃসাহসের আনন্দ ছিল মিলিত।

এখন অনেক খবর পেয়েছি জগতের,
মনে ঠাওরেছি
সংসারের অনেকটাই মার্কামারা খবরের
মালখানা।
মনের রসনা থেকে
অজানার স্বাদ গেছে মরে,
অনুভবে পাইনে
ভালোবাসায় সম্ভবের মধ্যে
নিয়তই অসম্ভব,
জানার মধ্যে অজানা,
কথার মধ্যে রূপকথা।
ভুলেছি প্রিয়ার মধ্যে আছে সেই নারী,
যে থাকে সাত সমুদ্রের পারে,
সেই নারী আছে বুঝি মায়ার ঘুমে,
যার জন্যে খুঁজতে হবে সোনার কাঠি।

বিশ

সেদিন আমাদের ছিল খোলা সভা
আকাশের নিচে
রাঙামাটির পথের ধারে।
ঘাসের 'পরে বসেছে সবাই।
দক্ষিণের দিকে শালের গাছ সারি সারি,
দীর্ঘ, ঋজু, পুরাতন,—
স্তব্ধ দাঁড়িয়ে,
শুক্লনবমীর মায়াকে উপেক্ষা ক'রে;—
দূরে কোকিলের ক্লান্ত কাকলিতে বনস্পতি উদাসীন
ও যেন শিবের তপোবন-দ্বারের নন্দী,
দৃঢ় নির্মম ওর ইঙ্গিত।

সভার লোকেরা বললে,—
“একটা কিছু শোনাও, কবি,
রাত গভীর হয়ে এল।”
খুললেম পুঁথিখানা,
যত পড়ে দেখি
সংকোচ লাগে মনে।
এরা এত কোমল, এত স্পর্শকাতর,
এত যত্নের ধন।
এদের কণ্ঠস্বর এত মৃদু,
এত কুণ্ঠিত।

এরা সব অন্তঃপুরিকা,
রাঙা অবগুণ্ঠন মুখের ’পরে ;
তার উপরে ফুলকাটা পাড়,
সোনার সুতোয়।
রাজহংসের গতি ওদের,
মাটিতে চলতে বাধা।
প্রাচীন কাব্যে এদের বলেছে ভীরু,
বলেছে, বরবর্ণিনী।
বন্দিনী ওরা বহু সম্মানে।
ওদের নূপুর ঝংকৃত হয় প্রাচীরঘেরা ঘরে,
অনেক দামের আস্তরণে।
বাধা পায় তারা নৈপুণ্যের বন্ধনে।
এই পথের ধারের সভায়,
আসতে পারে তারাই
সংসারের বাঁধন যাদের খসেছে,
খুলে ফেলেছে হাতের কাঁকন
মুছে ফেলেছে সিঁদুর ;
যারা ফিরবে না ঘরের মায়ায়,
যারা তীর্থযাত্রী ;

যাদের অসংকোচ অক্লান্ত গতি,
ধূলিধূসর গায়ের বসন ;
যারা পথ খুঁজে পায় আকাশের তারা দেখে ;
কোনো দায় নেই যাদের
কারো মন জুগিয়ে চলবার ;
কত রৌদ্রতপ্ত দিনে
কত অন্ধকার অর্ধরাত্রে
যাদের কণ্ঠ প্রতিধ্বনি জাগিয়েছে
অজানা শৈলগুহায়,—
জনহীন মাঠে,
পথহীন অরণ্যে।
কোথা থেকে আনব তাদের
নিন্দা প্রশংসার ফাঁদে টেনে।

উঠে দাঁড়ালেম আসন ছেড়ে।
ওরা বললে, “কোথা যাও কবি ?”
আমি বললেম,—
“যাব দুর্গমে, কঠোর নির্মমে,
নিয়ে আসব কঠিনচিত্ত উদাসীনের গান।”

একুশ

নূতন কল্পে
সৃষ্টির আরম্ভে আঁকা হল অসীম আকাশে
কালের সীমানা
আলোর বেড়া দিয়ে।
সব চেয়ে বড়ো ক্ষেত্রটি
অযুত নিযুত কোটি কোটি বৎসরের মাপে।
সেখানে ঝাঁকে ঝাঁকে
জ্যোতিষ্ক-পতঙ্গ দিয়েছে দেখা,
গণনায় শেষ করা যায় না।

তারা কোন্ প্রথম প্রত্যুষের আলোকে
কোন্ গুহা থেকে উড়ে বেরোল অসংখ্য,
পাখা মেলে ঘুরে বেড়াতে লাগল চক্রপথে
আকাশ থেকে আকাশে।

অব্যক্তে তারা ছিল প্রচ্ছন্ন,
ব্যক্তের মধ্যে ধেয়ে এল
মরণের ওড়া উড়তে ;—
তারা জানে না কিসের জন্যে
এই মৃত্যুর দুর্দান্ত আবেগ।

কোন্ কেন্দ্রে জ্বলছে সেই মহা আলোক
যার মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে পড়বার জন্যে
হয়েছে উন্মত্তের মতো উৎসুক।
আয়ুর অবসান খুঁজছে আয়ুহীনের অচিন্ত্য রহস্যে
একদিন আসবে কল্পসন্ধ্যা,
আলো আসবে ম্লান হয়ে,
ওড়ার বেগ হবে ক্লান্ত
পাখা যাবে খসে,
লুপ্ত হবে ওরা
চিরদিনের অদৃশ্য আলোকে।

ধরার ভূমিকায় মানব-যুগের
সীমা আঁকা হয়েছে
ছোটো মাপে
আলোক-আঁধারের পর্যায়ে
নক্ষত্রলোকের বিরাট দৃষ্টির
অগোচরে।
সেখানকার নিমেষের পরিমাণে
এখানকার সৃষ্টি ও প্রলয়।

বড়ো সীমানার মধ্যে মধ্যে
ছোটো ছোটো কালের পরিমণ্ডল
আঁকা হচ্ছে মোছা হচ্ছে।
বুদ্‌বুদের মতো উঠল মহেন্দজারো,
মরুবালুর সমুদ্রে, নিঃশব্দে গেল মিলিয়ে।
সুমেরিয়া, আসীরিয়া, ব্যাবিলন, মিসর,
দেখা দিল বিপুল বলে
কালের ছোটো-বেড়া-দেওয়া
ইতিহাসের রঙ্গস্থলীতে,
কাঁচা কালির লিখনের মতো
লুপ্ত হয়ে গেল
অস্পষ্ট কিছু চিহ্ন রেখে।

তাদের আকাঙ্ক্ষাগুলো ছুটেছিল পতঙ্গের মতো
অসীম দুর্লক্ষ্যের দিকে।
বীরেরা বলেছিল
অমর করবে সেই আকাঙ্ক্ষার কীর্তিপ্রতিমা;
তুলেছিল জয়স্তম্ভ।
কবিরা বলেছিল, অমর করবে
সেই আকাঙ্ক্ষার বেদনাকে,
রচেছিল মহাকবিতা।

সেই মুহূর্তে মহাকাশের অগণ্য-যোজন পত্রপটে
লেখা হচ্ছিল
ধাবমান আলোকের জলদক্ষরে
সুদূর নক্ষত্রের
হোমহুতাগ্নির মন্ত্রবাণী।
সেই বাণীর একটি একটি ধ্বনির
উচ্চারণ কালের মধ্যে
ভেঙে পড়েছে যুগের জয়স্তম্ভ,

নীরব হয়েছে কবির মহাকাব্য,
বিলীন হয়েছে আত্মগৌরবে স্পর্ধিত জাতির ইতিহাস।

আজ রাত্রে আমি সেই নক্ষত্রলোকের
নিমেষহীন আলোর নিচে
আমার লতাবিতানে বসে
নমস্কার করি মহাকালকে।
অমরতার আয়োজন
শিশুর শিথিল মুষ্টিগত
খেলার সামগ্রীর মতো
ধুলায় পড়ে বাতাসে যাক উড়ে।
আমি পেয়েছি ক্ষণে ক্ষণে অমৃতভরা
মুহূর্তগুলিকে,
তার সীমা কে বিচার করবে?
তার অপরিমেয় সত্য
অযুত নিযুত বৎসরের
নক্ষত্রের পরিধির মধ্যে
ধরে না।
কল্পান্ত যখন তার সকল প্রদীপ নিবিয়ে
সৃষ্টির রঙ্গমঞ্চ দেবে অন্ধকার করে
তখনো সে থাকবে প্রলয়ের নেপথ্যে
কল্পান্তরের প্রতীক্ষায়।

বাইশ

শুরু হতেই ও আমার সঙ্গ ধরেছে,
ঐ একটা অনেক কালের বুড়ো,
আমাতে মিশিয়ে আছে এক হয়ে।
আজ আমি ওকে জানাচ্ছি—
পৃথক হব আমরা।

ও এসেছে কতলক্ষ পূর্বপুরুষের
রক্তের প্রবাহ বেয়ে ;
কত যুগের ক্ষুধা ওর, কত তৃষ্ণা ;
সে সব বেদনা বহু দিনরাত্রিকে মথিত করেছে
সুদীর্ঘ ধারাবাহী অতীত কালে ;
তাই নিয়ে ও অধিকার করে বসল
নবজাত প্রাণের এই বাহনকে,
ঐ প্রাচীন, ঐ কাঙাল।

আকাশবাণী আসে ঊর্ধ্বলোক হতে,
ওর কোলাহলে সে যায় আবিল হয়ে।
নৈবেদ্য সাজাই পূজার থালায়,
ও হাত বাড়িয়ে নেয় নিজে।

জীর্ণ করে ওকে দিনে দিনে পলে পলে,
বাসনার দহনে,
ওর জরা দিয়ে আচ্ছন্ন করে আমাকে
যে-আমি জরাহীন।
মুহূর্তে মুহূর্তে ও জিতে নিয়েছে আমার মমতা,
তাই ওকে যখন মরণে ধরে
ভয় লাগে আমার
যে-আমি মৃত্যুহীন।

আমি আজ পৃথক্ হব।
ও থাক্ ঐ খানে দ্বারের বাহিরে,
ঐ বৃদ্ধ, ঐ বুভুক্ষু।
ও ভিক্ষা করুক, ভোগ করুক,
তালি দিক্ বসে বসে
ওর ছেঁড়া চাদরখানাতে ;

জন্মমরণের মাঝখানটাতে
যে আল-বাঁধা খেতটুকু আছে
সেইখানে করুক উঞ্ছবৃত্তি।

আমি দেখব ওকে জানলায় ব'সে,
ঐ দূরপথের পথিককে,
দীর্ঘকাল ধরে যে এসেছে
বহু দেহমনের নানা পথের বাঁকে বাঁকে
মৃত্যুর নানা খেয়া পার হয়ে।
উপরের তলায় বসে দেখব ওকে
ওর নানা খেয়ালের আবেশে,
আশা-নৈরাশ্যের ওঠা-পড়ায় সুখদুঃখের আলো আঁধারে।
দেখব যেমন করে পুতুলনাচ দেখে;
হাসব মনে মনে।

মুক্ত আমি, স্বচ্ছ আমি, স্বতন্ত্র আমি,
নিত্যকালের আলো আমি,
সৃষ্টি-উৎসের আনন্দধারা আমি,
অকিঞ্চন আমি,
আমার কোনো কিছুই নেই
অহংকারের প্রাচীরে ঘেরা।

তেইশ

আজ শরতের আলোয় এই যে চেয়ে দেখি
মনে হয় এ যেন আমার প্রথম দেখা।
আমি দেখলেম নবীনকে,
প্রতিদিনের ক্লান্ত চোখ
যার দর্শন হারিয়েছে।

কল্পনা করছি,—
অনাগত যুগ থেকে
তীর্থযাত্রী আমি
ভেসে এসেছি মন্ত্রবলে।
উজান স্বপ্নের স্রোতে
পৌঁছলেম এই মুহূর্তেই
বর্তমান শতাব্দীর ঘাটে।
কেবলি তাকিয়ে আছি উৎসুক চোখে।
আপনাকে দেখছি আপনার বাইরে,—
অন্যযুগের অজানা আমি
অভ্যস্ত পরিচয়ের পরপারে।
তাই তাকে নিয়ে এত গভীর কৌতূহল
যার দিকে তাকাই
চক্ষু তাকে আঁকড়িয়ে থাকে
পুষ্পলগ্ন ভ্রমরের মতো।

আমার নগ্নচিত্ত আজ মগ্ন হয়েছে
সমস্তের মাঝে।
জনশ্রুতির মলিন হাতের দাগ লেগে
যার রূপ হয়েছে অবলুপ্ত,
যা পরেছে তুচ্ছতার মলিন চীর
তার সে জীর্ণ উত্তরীয় আজ গেল খ'সে।
দেখা দিল সে অস্তিত্বের পূর্ণ মূল্যে।
দেখা দিল সে অনির্বচনীয়তায়।
যে বোবা আজ পর্যন্ত ভাষা পায়নি
জগতের সেই অতি প্রকাণ্ড উপেক্ষিত
আমার সামনে খুলেছে তার অচল মৌন,
ভোর-হয়ে-ওঠা বিপুল রাত্রির প্রান্তে
প্রথম চঞ্চল বাণী জাগল যেন।

আমার এতকালের কাছের জগতে
আমি ভ্রমণ করতে বেরিয়েছি দূরের পথিক।
তার আধুনিকের ছিন্নতার ফাঁকে ফাঁকে
দেখা দিয়েছে চিরকালের রহস্য।
সহমরণের বধূ
বুঝি এমনি ক'রেই দেখতে পায়
মৃত্যুর ছিন্নপর্দার ভিতর দিয়ে
নূতন চোখে
চিরজীবনের অম্লান স্বরূপ।

চব্বিশ

আমার ফুলবাগানের ফুলগুলিকে
বাঁধব না আজ তোড়ায়,
রংবেরঙের সুতোগুলো থাক্,
থাক্ পড়ে ঐ জরির ঝালর।

শুনে ঘরের লোকে বলে,
"যদি না বাঁধ জড়িয়ে জড়িয়ে
ওদের ধরব কী করে,
ফুলদানিতে সাজাব কোন্ উপায়ে?"

আমি বলি,
"আজকে ওরা ছুটি-পাওয়া নটী,
ওদের উচ্চহাসি অসংযত,
ওদের এলোমেলো হেলাদোলা
বকুলবনে অপরাহ্নে,
চৈত্রমাসের পড়ন্ত রৌদ্রে।
আজ দেখো ওদের যেমন-তেমন খেলা,
শোনো ওদের যখন-তখন কলধ্বনি,
তাই নিয়ে খুশি থাকো।"

বন্ধু বললে,
"এলেম তোমার ঘরে
ভরা পেয়ালায় তৃষ্ণা নিয়ে।
তুমি খ্যাপার মতো বললে,
আজকের মতো ভেঙে ফেলেছি
ছন্দের সেই পুরোনো পেয়ালাখানা।
আতিথ্যের ত্রুটি ঘটাও কেন?"

আমি বলি, "চলো না ঝরনাতলায়,
ধারা সেখানে ছুটছে আপন খেয়ালে,
কোথাও মোটা, কোথাও সরু।
কোথাও পড়ছে শিখর থেকে শিখরে,
কোথাও লুকোল গুহার মধ্যে।
তার মাঝে মাঝে মোটা পাথর
পথ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে বর্বরের মতো,
মাঝে মাঝে গাছের শিকড়
কাঙালের মতো ছড়িয়েছে আঙুলগুলো,
কাকে ধরতে চায় ঐ জলের ঝিকিমিকির মধ্যে?"

সভার লোকে বললে,
"এ যে তোমার আবাধা বেণীর বাণী,
বন্দিনী সে গেল কোথায়?"
আমি বলি, "তাকে তুমি পারবে না আজ চিনতে,
তার সাতনলী হারে আজ ঝলক নেই,
চমক দিচ্ছে না চুনি-বসানো কঙ্কণে।"
ওরা বললে, "তবে মিছে কেন?
কী পাবে ওর কাছ থেকে?"

আমি বলি, "যা পাওয়া যায় গাছের ফুলে
ডালে পালায় সব মিলিয়ে।

পাতার ভিতর থেকে
তার রং দেখা যায় এখানে সেখানে,
গন্ধ পাওয়া যায় হাওয়ার ঝাপটায়।
চারদিকের খোলা বাতাসে
দেয় একটুখানি নেশা লাগিয়ে।
মুঠোয় করে ধরবার জন্যে সে নয়,
তার অসাজানো আটপহরে পরিচয়কে
অনাসক্ত হয়ে মানবার জন্যে
তার আপন স্থানে।"

পঁচিশ

পাঁচিলের এধারে
ফুলকাটা চিনের টবে
সাজানো গাছ সুসংযত।
ফুলের কেয়ারিতে
কাঁচিছাঁটা বেগনি গাছের পাড়।
পাঁচিলের গায়ে গায়ে
বন্দী-করা লতা।
এরা সব হাসে মধুর করে,
উচ্চহাস্য নেই এখানে;
হাওয়ায় করে দোলাদুলি
কিন্তু জায়গা নেই দুরন্ত নাচের,
এরা আভিজাত্যের সুশাসনে বাঁধা।
বাগানটাকে দেখে মনে হয়
মোগল বাদশার জেনেনা,
রাজ-আদরে অলংকৃত,
কিন্তু পাহারা চারদিকে,
চরের দৃষ্টি আছে ব্যবহারের প্রতি।

পাঁচিলের ওপারে দেখা যায়
একটি সুদীর্ঘ য়ুকলিপটাস
খাড়া উঠেছে ঊর্ধ্বে ।
পাশেই দুটি তিনটি সোনাঝুরি
প্রচুর পল্লবে প্রগল্‌ভ ।
নীল আকাশ অবারিত বিস্তীর্ণ
ওদের মাথার উপরে ।

অনেকদিন দেখেছি অন্যমনে,
আজ হঠাৎ চোখে পড়ল
ওদের সমুন্নত স্বাধীনতা,
দেখলেম, সৌন্দর্যের মর্যাদা
আপন মুক্তিতে ।
ওরা ব্রাত্য, আচারমুক্ত, ওরা সহজ ;
সংযম আছে ওদের মজ্জার মধ্যে
বাইরে নেই শৃঙ্খলার বাঁধাবাঁধি ।
ওদের আছে শাখার দোলন
দীর্ঘ লয়ে ;
পল্লবগুচ্ছ নানা খেয়ালের ;
মর্মরধ্বনি হাওয়ায় ছড়ানো ।

আমার মনে লাগল ওদের ইঙ্গিত ;
বললেম, “টবের কবিতাকে
রোপণ করব মাটিতে,
ওদের ডালপালা যথেচ্ছ ছড়াতে দেব
বেড়াভাঙা ছন্দের অরণ্যে ।”

ছাব্বিশ

আকাশে চেয়ে দেখি
অবকাশের অন্ত নেই কোথাও।
দেশকালের সেই সুবিপুল আনুকূল্যে
তারায় তারায় নিঃশব্দ আলাপ,
তাদের দ্রুতবিচ্ছুরিত আলোক-সংকেতে
তপস্বিনী নীরবতার ধ্যান কম্পমান।

অসংখ্যের ভারে পরিকীর্ণ আমার চিত্ত;
চারদিকে আশু প্রয়োজনের কাঙালের দল;
অসীমের অবকাশকে খণ্ড খণ্ড করে
ভিড় করেছে তারা
উৎকণ্ঠ কোলাহলে।

সংকীর্ণ জীবনে আমার স্বর তাই বিজড়িত,
সত্য পৌঁছয় না অনুজ্জ্বল বাণীতে।
প্রতিদিনের অভ্যস্ত কথার
মূল্য হল দীন;
অর্থ গেল মুছে।
আমার ভাষা যেন
কুয়াশার জড়িমায় অবমানিত
হেমন্তের বেলা,
তার সুর পড়েছে চাপা।
সুস্পষ্ট প্রভাতের মতো
মন অনায়াসে মাথা তুলে বলতে পারে না-
"ভালোবাসি।"
সংকোচ লাগে কণ্ঠের কৃপণতায়।

তাই ওগো বনস্পতি,
তোমার সম্মুখে এসে বসি সকালে বিকালে,

শ্যামচ্ছায়ায় সহজ করে নিতে চাই
আমার বাণী।
দেখি চেয়ে, তোমার পল্লবস্তবক
অনায়াসে পার হয়েছে,
শাখাব্যূহের জটিলতা,
জয় করে নিয়েছে চারদিকে নিস্তব্ধ অবকাশ।
তোমার নিঃশব্দ উচ্ছ্বাস সেই উদার পথে
উত্তীর্ণ হয়ে যায়
সূর্যোদয়-মহিমার মাঝে।
সেই পথ দিয়ে দক্ষিণ বাতাসের স্রোতে
অনাদি প্রাণের মন্ত্র
তোমার নবকিসলয়ের মর্মে এসে মেলে—
বিশ্বহৃদয়ের সেই আনন্দমন্ত্র—
“ভালোবাসি।”

বিপুল ঔৎসুক্য আমাকে বহন করে নিয়ে যায়
সুদূরে;
বর্তমান মুহূর্তগুলিকে
অবলুপ্ত করে কালহীনতায়।
যেন কোন্ লোকান্তরগত চক্ষু
জন্মান্তর থেকে চেয়ে থাকে
আমার মুখের দিকে,—
চেতনাকে নিষ্কারণ বেদনায়
সকল সীমার পরপারে দেয় পাঠিয়ে।
ঊর্ধ্বলোক থেকে কানে আসে
সৃষ্টির শাশ্বতবাণী—
“ভালোবাসি।”

যেদিন যুগান্তের রাত্রি হল অবসান
আলোকের রশ্মিদূত

বিকীর্ণ করেছিল এই আদিমবাণী
আকাশে আকাশে।

সৃষ্টিযুগের প্রথম লগ্নে
প্রাণসমুদ্রের মহাপ্লাবনে
তরঙ্গে তরঙ্গে দুলেছিল এই মন্ত্র-বচন।

এই বাণাই দিনে দিনে রচনা করেছে
স্বর্ণচ্ছটায় মানসী প্রতিমা
আমার বিরহ-গগনে
অস্তসাগরের নির্জন ধূসর উপকূলে।

আজ দিনান্তের অন্ধকারে
এজন্মের যত ভাবনা যত বেদনা
নিবিড় চেতনায় সম্মিলিত হয়ে
সন্ধ্যাবেলার একলা তারার মতো
জীবনের শেষবাণাতে হ'ক উদ্ভাসিত-
"ভালোবাসি।"

সাতাশ

আমার এই ছোটো কলসিটা পেতে রাখি
ঝরনাধারার নিচে।
বসে থাকি
কোমরে আঁচল বেঁধে,
সারা সকালবেলা,
শেওলা-ঢাকা পিছল পাথরটাতে
পা ঝুলিয়ে।

এক নিমেষেই ঘট যায় ভরে
তার পরে কেবলি তার কানা ছাপিয়ে ওঠে,

জল পড়তে থাকে ফেনিয়ে ফেনিয়ে
বিনা কাজে বিনা ত্বরায় ;
ঐ যে সূর্যের আলোয়
উপচে-পড়া জলের চলে ছুটির খেলা,
আমার খেলা ঐ সঙ্গেই ছলকে ওঠে
মনের ভিতর থেকে।

সবুজ বনের মিনে-করা
উপত্যকার নীল আকাশের পেয়ালা,
তারি পাহাড়-ঘেরা কানা ছাপিয়ে
পড়ছে ঝরঝরানির শব্দ।
ভোরের ঘুমে তার ডাক শুনতে পায়
গাঁয়ের মেয়েরা।
জলের ধ্বনি
বেগনি রঙের বনের সীমানা যায় পেরিয়ে,
নেমে যায় যেখানে ঐ বুনোপাড়ার মানুষ
হাট করতে আসে,
তরাই গ্রামের রাস্তা ছেড়ে
বাঁকে বাঁকে উঠতে থাকে চড়াই পথ বেয়ে,
তার বলদের গলায়
ঝুনুঝুনু ঘণ্টা বাজে,
তার বলদের পিঠে
শুকনো কাঠের আঁটি বোঝাই-করা।

এমনি করে
প্রথম প্রহর গেল কেটে।
রাঙা ছিল সকালবেলাকার
নতুন রৌদ্রের রঙ,
উঠল সাদা হয়ে।
বক উড়ে চলেছে পাহাড় পেরিয়ে
জলার দিকে,

শঙ্খচিল উড়ছে একলা
ঘন নীলের মধ্যে,
ঊর্ধ্বমুখ পর্বতের উধাও চিত্তে
নিঃশব্দ জপমন্ত্রের মতো।

বেলা হল,
ডাক পড়ল ঘরে।
ওরা রাগ করে বললে,
"দেরি করলি কেন?"
চুপ করে থাকি নিরুত্তরে।
ঘট ভরতে দেরি হয় না
সে তো সবাই জানে;
বিনাকাজে উপচে-পড়া-সময় খোওয়ানো,
তার খাপছাড়া কথা ওদের বোঝাবে কে?

আটাশ

তুমি প্রভাতের শুকতারা
আপন পরিচয় পালটিয়ে দিয়ে -
কখনো বা তুমি দেখা দাও
গোধূলির দেহলিতে,
এই কথা বলে জ্যোতিষী।
সূর্যাস্তবেলায় মিলনের দিগন্তে
রক্ত-অবগুণ্ঠনের নিচে
শুভদৃষ্টির প্রদীপ তোমার জ্বাল
শাহানার সুরে।
সকালবেলায় বিরহের আকাশে
শূন্য বাসরঘরের খোলা দ্বারে
ভৈরবীর তানে লাগাও
বৈরাগ্যের মূর্ছনা।

স্মৃতিসমুদ্রের এপারে ওপারে
চিরজীবন
সুখদুঃখের আলোয় অন্ধকারে
মনের মধ্যে দিয়েছ
আলোকবিন্দুর স্বাক্ষর।
যখন নিভৃতপুলকে রোমাঞ্চ লেগেছে মনে
গোপনে রেখেছ তার 'পরে
সুরলোকের সম্মতি,
ইন্দ্রাণীর মালার একটি পাপড়ি,
তোমাকে এমনি করেই জেনেছি
আমাদের সকালসন্ধ্যার সোহাগিনী।

পণ্ডিত তোমাকে বলে শুক্রগ্রহ ;
বলে, আপন সুদীর্ঘ কক্ষে
তুমি বৃহৎ, তুমি বেগবান,
তুমি মহিমান্বিত ;
সূর্যবন্দনার প্রদক্ষিণপথে
তুমি পৃথিবীর সহযাত্রী,
রবিরশ্মিগ্রথিত-দিনরত্নের মালা
দুলছে তোমার কণ্ঠে।

যে মহাযুগের বিপুল ক্ষেত্রে
তোমার নিগূঢ় জগদ্ব্যাপার
সেখানে তুমি স্বতন্ত্র, সেখানে সুদূর,
সেখানে লক্ষকোটিবৎসর
আপনার জনহীন রহস্যে তুমি অবগুণ্ঠিত।
আজ আসন্ন রজনীর প্রান্তে
কবিচিত্তে যখন জাগিয়ে তুলেছ
নিঃশব্দ শান্তিবাণী

সেই মুহূর্তেই
আমাদের অজ্ঞাত ঋতুপর্যায়ের আবর্তন
তোমার জলে স্থলে বাষ্পমণ্ডলীতে
রচনা করছে সৃষ্টিবৈচিত্র্য।
তোমার সেই একেশ্বর যজ্ঞে
আমাদের নিমন্ত্রণ নেই,
আমাদের প্রবেশদ্বার রুদ্ধ।

হে পণ্ডিতের গ্রহ,
তুমি জ্যোতিষের সত্য
সে-কথা মানবই,
সে সত্যের প্রমাণ আছে গণিতে।
কিন্তু এও সত্য, তার চেয়েও সত্য
যেখানে তুমি আমাদেরি
আপন শুকতারা, সন্ধ্যাতারা,
যেখানে তুমি ছোটো, তুমি সুন্দর,
যেখানে আমাদের হেমন্তের শিশিরবিন্দুর সঙ্গে তোমার তুলনা,
যেখানে শরতের শিউলি ফুলের উপমা তুমি,
যেখানে কালে কালে
প্রভাতে মানব-পথিককে
নিঃশব্দে সংকেত করেছ
জীবনযাত্রার পথের মুখে,
সন্ধ্যায় ফিরে ডেকেছ
চরম বিশ্রামে।

ঊনত্রিশ

অনেককালের একটিমাত্র দিন
কেমন করে বাঁধা পড়েছিল
একটা কোনো ছন্দে, কোনো গানে,
কোনো ছবিতে।

কালের দূত তাকে সরিয়ে রেখেছিল
চলাচলের পথের বাইরে।
যুগের ভাসান খেলায়
অনেক কিছু চলে গেল ঘাট পেরিয়ে,
সে কখন ঠেকে গিয়েছিল বাঁকের মুখে
কেউ জানতে পারেনি।

মাঘের বনে
আমের কত বোল ধরল,
কত পড়ল ঝরে;
ফাল্গুনে ফুটল পলাশ,
গাছতলায় মাটি দিল ছেয়ে;
চৈত্রের রৌদ্রে আর সর্ষের খেতে
কবির লড়াই লাগল যেন
মাঠে আর আকাশে।
আমার সেই আটকে-পড়া দিনটির গায়ে
কোনো ঋতুর কোনো তুলির
চিহ্ন লাগেনি।

একদা ছিলেম ঐ দিনের মাঝখানেই।
দিনটা ছিল গা ছড়িয়ে
নানা কিছুর মধ্যে;
তারা সমস্তই ঘেঁষে ছিল আশেপাশে সামনে।
তাদের দেখে গেছি সবটাই
কিন্তু চোখে পড়েনি সমস্তটা।
ভালোবেসেছি,
ভালো করে জানিনি
কতখানি বেসেছি।
অনেক গেছে ফেলাছড়া;
আনমনার রসের পেয়ালায়
বাকি ছিল কত।

সেদিনের যে পরিচয় ছিল আমার মনে
আজ দেখি তার চেহারা অন্য ছাঁদের।
কত এলোমেলো, কত যেমন-তেমন
সব গেছে মিলিয়ে।
তার মধ্যে থেকে বেরিয়ে পড়েছে যে
তাকে আজ দূরের পটে দেখছি যেন
সেদিনকার সে নববধূ।
তনু তার দেহলতা,
ধূপছায়া রঙের আঁচলটি
মাথায় উঠেছে খোঁপাটুকু ছাড়িয়ে।
ঠিকমতো সময়টি পাইনি
তাকে সব কথা বলবার,
অনেক কথা বলা হয়েছে যখন-তখন,
সে-সব বৃথা কথা।
হতে হতে বেলা গেছে চলে।

আজ দেখা দিয়েছে তার মূর্তি,—
স্তব্ধ সে দাঁড়িয়ে আছে
ছায়া-আলোর বেড়ার মধ্যে,
মনে হচ্ছে কী একটা কথা বলবে,
বলা হল না,—
ইচ্ছে করছে ফিরে যাই পাশে,
ফেরার পথ নেই।

ত্রিশ

যখন দেখা হল
তার সঙ্গে চোখে চোখে
তখন আমার প্রথম বয়েস;
সে আমাকে শুধাল,
"তুমি খুঁজে বেড়াও কাকে?"

আমি বললেম,
"বিশ্বকবি তাঁর অসীম ছড়াটা থেকে
একটা পদ ছিঁড়ে নিলেন কোন্ কৌতুকে,
ভাসিয়ে দিলেন
পৃথিবীর হাওয়ার স্রোতে,
যেখানে ভেসে বেড়ায়
ফুলের থেকে গন্ধ,
বাঁশির থেকে ধ্বনি।
ফিরছে সে মিলের পদটি পাবে ব'লে ;
তার মৌমাছির পাখায় বাজে
খুঁজে বেড়াবার নীরব গুঞ্জরণ।"

শুনে সে রইল চুপ করে
অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে।
আমার মনে লাগল ব্যথা,
বললেম, "কী ভাবছ তুমি ?"
ফুলের পাপড়ি ছিঁড়তে ছিঁড়তে সে বললে,—
"কেমন করে জানবে তাকে পেলে কিনা,
তোমার সেই অসংখ্যের মধ্যে
একটিমাত্রকে।"

আমি বললেম,
"আমি যে খুঁজে বেড়াই
সে তো আমার ছিন্ন জীবনের
সবচেয়ে গোপন কথা ;
ও-কথা হঠাৎ আপনি ধরা পড়ে
যার আপন বেদনায়,
আমি জানি
আমার গোপন মিল আছে তারি ভিতর।"

কোনো কথা সে বলল না।

কচি শ্যামল তার রঙটি;
গলায় সরু সোনার হারগাছি,
শরতের মেঘে লেগেছে
ক্ষীণ রোদের রেখা।
চোখে ছিল
একটা দিশাহারা ভয়ের চমক
পাছে কেউ পালায় তাকে না ব'লে
তার দুটি পায়ে ছিল দ্বিধা,
ঠাহর পায়নি
কোন্‌খানে সীমা
তার আঙিনাতে।

দেখা হল।
সংসারে আনাগোনার পথের পাশে
আমার প্রতীক্ষা ছিল
শুধু ঐটুকু নিয়ে।
তার পরে সে চলে গেছে।

একত্রিশ

পাড়ায় আছে ক্লাব,
আমার একতলার ঘরখানা
দিয়েছি ওদের ছেড়ে।
কাগজে পেয়েছি প্রশংসাবাদ,
ওরা মীটিং করে আমাকে পরিয়েছে মালা।

আজ আট বছর থেকে
শূন্য আমার ঘর।
আপিস থেকে ফিরে এসে দেখি
সেই ঘরের একটা ভাগে

টেবিলে পা তুলে
কেউ পড়ছে খবরের কাগজ,
কেউ খেলছে তাস,
কেউ করছে তুমুল তর্ক।
তামাকের ধোঁয়ায়
ঘনিয়ে ওঠে বদ্ধ হাওয়া,
ছাইদানিতে জমতে থাকে,
ছাই, দেশলাইকাঠি,
পোড়া সিগারেটের টুকরো।

এই প্রচুর পরিমাণ ঘোলা আলাপের
গোলমাল দিয়ে
দিনের পর দিন
আমার সন্ধ্যার শূন্যতা দিই ভরে।
আবার রাত্তির দশটার পরে
খালি হয়ে যায়
উপুড়-করা একটা উচ্ছিষ্ট অবকাশ।
বাইরে থেকে আসে ট্র্যামের শব্দ,
কোনোদিন আপন মনে শুনি
গ্রামোফোনের গান,
যে কয়টা রেকর্ড আছে
ঘুরে ফিরে তারি আবৃত্তি।

আজ ওরা কেউ আসে নি;
গেছে হাবড়া স্টেশনে
অভ্যার্থনায়;
কে সদ্য এনেছে
সমুদ্রপারের হাততালি
আপন নামটার সঙ্গে বেঁধে।

নিবিয়ে দিয়েছি বাতি।

যাকে বলে 'আজকাল'
অনেকদিন পরে
সেই আজকালটা, সেই প্রতিদিনের নকীব
আজ নেই সন্ধ্যায় আমার ঘরে।
আটবছর আগে
এখানে ছিল হাওয়ায়-ছড়ানো যে স্পর্শ,
চুলের যে অস্পষ্ট গন্ধ,
তারি একটা বেদনা লাগল
ঘরের সব কিছুতেই।
যেন কী শুনব বলে
রইল কান পাতা ;
সেই ফুলকাটা ঢাকাওআলা
পুরোনো খালি চৌকিটা
যেন পেয়েছে কার খবর।

পিতামহের আমলের
পুরোনো মুচকুন্দ গাছ
দাঁড়িয়ে আছে জানলার সামনে
কৃষ্ণ রাতের অন্ধকারে।
রাস্তার ওপারের বাড়ি
আর এই গাছের মধ্যে যেটুকু আকাশ আছে
সেখানে দেখা যায়
জ্বলজ্বল করছে একটি তারা।
তাকিয়ে রইলেম তার দিকে চেয়ে,
টনটন করে বুকের ভিতরটা।
যুগল জীবনের জোয়ার জলে
কত সন্ধ্যায় দুলেছে ঐ তারার ছায়া।

অনেক কথার মধ্যে
মনে পড়ছে ছোট্ট একটি কথা।

সেদিন সকালে
কাগজ পড়া হয়নি কাজের ভিড়ে ;
সন্ধ্যেবেলায় সেটা নিয়ে
বসেছি এই ঘরেতেই,
এই জানলার পাশে
এই কেদারায় ।
চুপি চুপি সে এল পিছনে
কাগজখানা দ্রুত কেড়ে নিল হাত থেকে ।
চলল কাড়াকাড়ি
উচ্চ হাসির কলরোলে ।
উদ্ধার করলুম লুঠের জিনিস,
স্পর্ধা করে আবার বসলুম পড়তে ।
হঠাৎ সে নিবিয়ে দিল আলো ।
আমার সেদিনকার
সেই হার-মানা অন্ধকার
আজ আমাকে সর্বাঙ্গে ধরেছে ঘিরে,
যেমন করে সে আমাকে ঘিরেছিল
দুয়ো-দেওয়া নীরব হাসিতে ভরা
বিজয়ী তার দুই বাহু দিয়ে,
সেদিনকার সেই আলো-নেবা নির্জনে ।

হঠাৎ ঝরঝরিয়ে উঠল হাওয়া
গাছের ডালে ডালে,
জানলাটা উঠল শব্দ করে,
দরজার কাছের পর্দাটা
উড়ে বেড়াতে লাগল অস্থির হয়ে ।

আমি বলে উঠলেম,
"ওগো, আজ তোমার ঘরে তুমি এসেছ কি
মরণলোক থেকে
তোমার বাদামি রঙের শাড়িখানি পরে ?"

একটা নিঃশ্বাস লাগল আমার গায়ে,
শুনলেম অশ্রুতবাণী,
"কার কাছে আসব ?"
আমি বললেম,
"দেখতে কি পেলে না আমাকে ?"
শুনলেম,
"পৃথিবীতে এসে
যাকে জেনেছিলেম একান্তই,
সেই আমার চিরকিশোর বঁধু
তাকে তো আর পাইনে দেখতে
এই ঘরে।"
শুধালেম, "সে কি নেই কোথাও ?"
মৃদু শান্তসুরে বললে,
"সে আছে সেইখানেই
যেখানে আছি আমি।
আর কোথাও না।"

দরজার কাছে শুনলেম উত্তেজিত কলরব,
হাবড়া স্টেশন থেকে
ওরা ফিরেছে।

বত্রিশ

পিলসুজের উপর পিতলের প্রদীপ,
খড়কে দিয়ে উসকে দিচ্ছে থেকে থেকে।
হাতির দাঁতের মতো কোমল সাদা
পঙ্খের কাজ-করা মেজে ;
তার উপরে খান-দুয়েক মাদুর পাতা।
ছোটো ছেলেরা জড়ো হয়েছে ঘরের কোণে
মিটমিটে আলোয়।
বুড়ো মোহন সর্দার

কলপ-লাগানো চুল বাবরি-করা,
মিশকালো রং,
চোখ দুটো যেন বেরিয়ে আসছে,
শিথিল হয়েছে মাংস,
হাতের পায়ের হাড়গুলো দীর্ঘ,
কণ্ঠস্বর সরু-মোটায় ভাঙা।
রোমাঞ্চ লাগবার মতো তার পূর্ব-ইতিহাস।
বসেছে আমাদের মাঝখানে,
বলছে রোঘো ডাকাতের কথা।
আমরা সবাই গল্প আঁকড়ে বসে আছি।
দক্ষিণের হাওয়া-লাগা ঝাউডালের মতো
দুলছে মনের ভিতরটা।

খোলা জানলার সামনে দেখা যায় গলি,
একটা হলদে গ্যাসের আলোর খুঁটি
দাঁড়িয়ে আছে একচোখো ভূতের মতো।
পথের বাঁ ধারটাতে জমেছে ছায়া।
গলির মোড়ে সদর রাস্তায়
বেলফুলের মালা হেঁকে গেল মালী।
পাশের বাড়ি থেকে
কুকুর ডেকে উঠল অকারণে।
নটার ঘণ্টা বাজল দেউড়িতে।

অবাক হয়ে শুনছি রোঘোর চরিতকথা।

তত্ত্বরত্নের ছেলের পৈতে,
রোঘো বলে পাঠাল চরের মুখে,
"নমো নমো করে সারলে চলবে না ঠাকুর,
ভেবো না খরচের কথা।"
মোড়লের কাছে পত্র দেয়
পাঁচ হাজার টাকা দাবি ক'রে ব্রাহ্মণের জন্যে।

রাজার খাজনা-বাকির দায়ে
বিধবার বাড়ি যায় বিকিয়ে.
হঠাৎ দেওয়ানজির ঘরে হানা দিয়ে
দেনা শোধ ক'রে দেয় রঘু।
বলে—"অনেক গরিবকে দিয়েছ ফাঁকি,
কিছু হালকা হ'ক তার বোঝা।"

একদিন তখন মাঝরাত্তির,
ফিরছে রোঘো লুঠের মাল নিয়ে,
নদীতে তার ছিপের নৌকো
অন্ধকারে বটের ছায়ায়।
পথের মধ্যে শোনে—
পাড়ায় বিয়েবাড়িতে কান্নার ধ্বনি,
বর ফিরে চলেছে বচসা করে ;
কনের বাপ পা আঁকড়ে ধরেছে বরকর্তার।
এমন সময় পথের ধারে
ঘন বাঁশ বনের ভিতর থেকে
হাঁক উঠল, রে রে রে রে রে রে।

আকাশের তারাগুলো
যেন উঠল থরথরিয়ে।
সবাই জানে রোঘো ডাকাতের
পাঁজর-ফাটানো ডাক।
বরসুদ্ধ পালকি পড়ল পথের মধ্যে ;
বেহারা পালাবে কোথায় পায় না ভেবে।
ছুটে বেরিয়ে এল মেয়ের মা
অন্ধকারের মধ্যে উঠল তার কান্না—
"দোহাই বাবা, আমার মেয়ের জাত বাঁচাও।"
রোঘো দাঁড়াল যমদূতের মতো—
পালকি থেকে টেনে বের করলে বরকে,

বরকর্তার গালে মারল একটা প্রচণ্ড চড়,
পড়ল সে মাথা ঘুরে।

ঘরের প্রাঙ্গণে আবার শাঁখ উঠল বেজে,
জাগল হুলুধ্বনি ;
দলবল নিয়ে রোঘো দাঁড়াল সভায়,
শিবের বিয়ের রাতে ভূতপ্রেতের দল যেন।
উলঙ্গপ্রায় দেহ সবার, তেলমাখা সর্বাঙ্গে,
মুখে ভুসোর কালি।
বিয়ে হল সারা।
তিন প্রহর রাতে
যাবার সময় কনেকে বললে ডাকাত
"তুমি আমার মা,
দুঃখ যদি পাও কখনো
স্মরণ ক'রো রঘুকে।"

তারপরে এসেছে যুগান্তর।
বিদ্যুতের প্রখর আলোতে
ছেলেরা আজ খবরের কাগজে
পড়ে ডাকাতির খবর।
রূপকথা-শোনা নিভৃত সন্ধ্যেবেলাগুলো
সংসার থেকে গেল চলে,
আমাদের স্মৃতি
আর নিবে-যাওয়া তেলের প্রদীপের সঙ্গে সঙ্গে।

তেত্রিশ

বাদশাহের হুকুম,—
সৈন্যদল নিয়ে এল আক্রাসায়েব খাঁ, মুজফ্‌ফর খাঁ,
মহম্মদ আমিন খাঁ,
সঙ্গে এল রাজা গোপাল সিং ভদৌরিয়া,
উদইৎ সিং বুন্দেলা।

গুরুদাসপুর ঘেরাই করল মোগল সেনা।
শিখদল আছে কেল্লার মধ্যে,
বন্দা সিং তাদের সর্দার।
ভিতরে আসে না রসদ,
বাইরে যাবার পথ সব বন্ধ।

থেকে থেকে কামানের গোলা পড়ছে
প্রাকার ডিঙিয়ে,—
চারদিকের দিক্‌সীমা পর্যন্ত
রাত্রির আকাশ মশালের আলোয় রক্তবর্ণ।

ভাণ্ডারে না রইল গম, না রইল যব,
না রইল জোয়ারি ;—
জ্বালানি কাঠ গেছে ফুরিয়ে।
কাঁচা মাংস খায় ওরা অসহ্য ক্ষুধায়,
কেউ বা খায় নিজের জঙ্ঘা থেকে মাংস কেটে।
গাছের ছাল, গাছের ডাল গুঁড়ো ক'রে
তাই দিয়ে বানায় রুটি।

নরক-যন্ত্রণায় কাটল আট মাস,
মোগলের হাতে পড়ল
গুরদাসপুর গড়।
মৃত্যুর আসর রক্তে হল আকণ্ঠ পঙ্কিল,
বন্দীরা চীৎকার করে
"ওয়াহি গুরু, ওয়াহি গুরু,"
আর শিখের মাথা স্খলিত হয়ে পড়ে
দিনের পর দিন।

নেহাল সিং বালক ;
স্বচ্ছ তরুণ সৌম্যমুখে
অন্তরের দীপ্তি পড়েছে ফুটে।

চোখে যেন স্তব্ধ আছে
সকালবেলার তীর্থযাত্রীর গান।
সুকুমার উজ্জ্বল দেহ,
দেবশিল্পী কুঁদে বের করেছে
বিদ্যুতের বাটালি দিয়ে।
বয়স তার আঠারো কি উনিশ হবে,
শালগাছের চারা,
উঠেছে ঋজু হয়ে,
তবু এখনো
হেলতে পারে দক্ষিণের হাওয়ায়।
প্রাণের অজস্রতা
দেহে মনে রয়েছে
কানায় কানায় ভরা।

বেঁধে আনলে তাকে।
সভার সমস্ত চোখ
ওর মুখে তাকাল বিস্ময়ে করুণায়।
ক্ষণেকের জন্যে
ঘাতকের খড়্গ যেন চায় বিমুখ হতে
এমন সময় রাজধানী থেকে এল দূত,
হাতে সৈয়দ আবদুল্লা খাঁয়ের
স্বাক্ষর-করা মুক্তিপত্র।

যখন খুলে দিলে তার হাতের বন্ধন,
বালক শুধাল, আমার প্রতি কেন এই বিচার?
শুনল, বিধবা মা জানিয়েছে
শিখধর্ম নয় তার ছেলের,
বলেছে, শিখেরা তাকে জোর করে রেখেছিল
বন্দী ক'রে।

ক্ষোভে লজ্জায় রক্তবর্ণ হল
বালকের মুখ।
বলে উঠল, “চাইনে প্রাণ মিথ্যার কৃপায়,
সত্যে আমার শেষ মুক্তি,
আমি শিখ।”

চৌত্রিশ

পথিক আমি।
পথ চলতে চলতে দেখেছি
পুরাণে কীর্তিত কত দেশ আজ কীর্তি-নিঃস্ব।
দেখেছি দর্পোদ্ধত প্রতাপের
অবমানিত ভগ্নশেষ,
তার বিজয় নিশান
বজ্রাঘাতে হঠাৎ স্তব্ধ অট্টহাসির মতো
গেছে উড়ে;
বিরাট অহংকার
হয়েছে সাষ্টাঙ্গে ধুলায় প্রণত,
সেই ধুলার ’পরে সন্ধ্যাবেলায়
ভিক্ষুক তার জীর্ণ কাঁথা মেলে বসে,
পথিকের শ্রান্ত পদ
সেই ধুলায় ফেলে চিহ্ন,—
অসংখ্যের নিত্য পদপাতে
সে চিহ্ন যায় লুপ্ত হয়ে।

দেখেছি সুদূর যুগান্তর
বালুর স্তরে প্রচ্ছন্ন,
যেন হঠাৎ ঝঞ্ঝার ঝাপটা লেগে
কোন্ মহাতরী
হঠাৎ ডুবল ধূসর সমুদ্রতলে,
সকল আশা নিয়ে, গান নিয়ে, স্মৃতি নিয়ে

এই অনিত্যের মাঝখান দিয়ে চলতে চলতে
অনুভব করি আমার হৃৎস্পন্দনে
অসীমের স্তব্ধতা।

পঁয়ত্রিশ

অঙ্গের বাঁধনে বাঁধাপড়া আমার প্রাণ
আকস্মিক চেতনার নিবিড়তায়
চঞ্চল হয়ে ওঠে ক্ষণে ক্ষণে,
তখন কোন্ কথা জানাতে তার এত অধৈর্য।
—যে কথা দেহের অতীত।

খাঁচার পাখির কণ্ঠে যে বাণী
সে তো কেবল খাঁচারি নয়,
তার মধ্যে গোপনে আছে সুদূর অগোচরের অরণ্য-মর্মর,
আছে করুণ বিস্মৃতি।

সামনে তাকিয়ে চোখের দেখা দেখি—
এ তো কেবলি দেখার জাল-বোনা নয়।—
বসুন্ধরা তাকিয়ে থাকেন নির্নিমেষে
দেশ-পারানো কোন্ দেশের দিকে,
দিখলয়ের ইঙ্গিতলীন
কোন্ কল্পলোকের অদৃশ্য সংকেতে।

দীর্ঘপথ ভালোমন্দয় বিকীর্ণ,
রাত্রিদিনের যাত্রা দুঃখসুখের বন্ধুর পথে।
শুধু কেবল পথ চলাতেই কি এ পথের লক্ষ্য?
ভিড়ের কলরব পেরিয়ে আসছে গানের আহ্বান,
তার সত্য মিলবে কোন্খানে?

মাটির তলায় সুপ্ত আছে বীজ।
তাকে স্পর্শ করে চৈত্রের তাপ,
মাঘের হিম, শ্রাবণের বৃষ্টিধারা।
অন্ধকারে সে দেখছে অভাবিতের স্বপ্ন।
স্বপ্নেই কি তার শেষ?
উষার আলোয় তার ফুলের প্রকাশ;
আজ নেই, তাই বলে কি নেই কোনোদিনই?

ছত্রিশ

শীতের রোদ্দুর।
সোনা-মেশা সবুজের ঢেউ
স্তম্ভিত হয়ে আছে সেগুন বনে।
বেগনি-ছায়ার ছোঁওয়া-লাগা
ঝুরি-নামা বৃদ্ধ বট
ডাল মেলেছে রাস্তার ওপার পর্যন্ত।
ফলসাগাছের ঝরা পাতা
হঠাৎ হাওয়ায় চমকে বেড়ায় উড়ে
ধুলোর সাঙাত হয়ে।

কাজ-ভোলা এই দিন
উধাও বলাকার মতো
লীন হয়ে চলেছে নিঃসীম নীলিমায়।
ঝাউগাছের মর্মরধ্বনিতে মিশে
মনের মধ্যে এই কথাটি উঠছে বেজে,
"আমি আছি।"

কুয়োতলার কাছে
সামান্য ঐ আমের গাছ;
সারা বছর ও থাকে আত্মবিস্মৃত,
বনের সাধারণ সবুজের আবরণে
ও থাকে ঢাকা।

এমন সময় মাঘের শেষে
হঠাৎ মাটির নিচে
শিকড়ে শিকড়ে তার শিহর লাগে,
শাখায় শাখায় মুকুলিত হয়ে ওঠে বাণী—
"আমি আছি,"
চন্দ্রসূর্যের আলো আপন ভাষায়
স্বীকার করে তার সেই ভাষা।

অলস মনের শিয়রে দাঁড়িয়ে
হাসেন অন্তর্যামী,
হঠাৎ দেন ঠেকিয়ে সোনার কাঠি
প্রিয়ার মুগ্ধ চোখের দৃষ্টি দিয়ে,
কবির গানের সুর দিয়ে
তখন যে-আমি ধূলিধূসর সামান্য দিনগুলির
মধ্যে মিলিয়ে ছিল,
সে দেখা দেয় এক নিমেষের অসামান্য আলোকে।
সে-সব দুর্মূল্য নিমেষ
কোনো রত্নভাণ্ডারে থেকে যায় কি না জানিনে;
এইটুকু জানি—
তারা এসেছে আমার আত্মবিস্মৃতির মধ্যে,
জাগিয়েছে আমার মর্মে
বিশ্বমর্মের নিত্যকালের সেই বাণী
"আমি আছি।"

সাঁইত্রিশ

বিশ্বলক্ষ্মী,
তুমি একদিন বৈশাখে
বসেছিলে দারুণ তপস্যায়
রুদ্রের চরণতলে।

তোমার তনু হল উপবাসে শীর্ণ,
পিঙ্গল তোমার কেশপাশ।

দিনে দিনে দুঃখকে তুমি দগ্ধ করলে
দুঃখেরি দহনে,
শুষ্ককে জ্বালিয়ে ভস্ম করে দিলে
পূজার পুণ্যধূপে।
কালোকে আলো করলে,
তেজ দিলে নিস্তেজকে,
ভোগের আবর্জনা লুপ্ত হল
ত্যাগের হোমাগ্নিতে।

দিগন্তে রুদ্রের প্রসন্নতা
ঘোষণা করলে মেঘগর্জনে,
অবনত হল দাক্ষিণ্যের মেঘপুঞ্জ
উৎকণ্ঠিতা ধরণীর দিকে।
মরুবক্ষে তৃণরাজি
শ্যাম আস্তরণ দিল পেতে,
সুন্দরের করুণ চরণ
নেমে এল তার 'পরে।

আটত্রিশ

হে যক্ষ, সেদিন প্রেম তোমাদের
বদ্ধ ছিল আপনাতেই
পদ্মকুঁড়ির মতো।
সেদিন সংকীর্ণ সংসারে
একান্তে ছিল তোমার প্রেয়সী
যুগলের নির্জন উৎসবে,
সে ঢাকা ছিল তোমার আপনাকে দিয়ে,
শ্রাবণের মেঘমালা

যেমন হারিয়ে ফেলে চাঁদকে
আপনারি আলিঙ্গনের
আচ্ছাদনে।

এমন সময়ে প্রভুর শাপ এল
বর হয়ে,
কাছে থাকার বেড়া-জাল গেল ছিঁড়ে।
খুলে গেল প্রেমের আপনাতে-বাঁধা
পাপড়িগুলি,
সে-প্রেম নিজের পূর্ণ রূপের দেখা পেল
বিশ্বের মাঝখানে।
বৃষ্টির জলে ভিজে' সন্ধ্যাবেলাকার জুঁই
তাকে দিল গন্ধের অঞ্জলি।
রেণুর ভারে মন্থর বাতাস
তাকে জানিয়ে দিল
নীপ-নিকুঞ্জের আকৃতি।

সেদিন অশ্রুধৌত সৌম্য বিষাদের
দীক্ষা পেলে তুমি ;
নিজের অন্তর-আঙিনায়
গড়ে তুললে অপূর্ব মূর্তিখানি
স্বর্গীয় গরিমায় কান্তিমতী।
যে ছিল নিভৃত ঘরের সঙ্গিনী
তার রসরূপটিকে আসন দিলে
অনন্তের আনন্দমন্দিরে
ছন্দের শঙ্খ বাজিয়ে।

আজ তোমার প্রেম পেয়েছে ভাষা,
আজ তুমি হয়েছ কবি,
ধ্যানোদ্ভবা প্রিয়া

বক্ষ ছেড়ে বসেছে তোমার মর্মতলে
বিরহের বীণা হাতে।
আজ সে তোমার আপন সৃষ্টি
বিশ্বের কাছে উৎসর্গ-করা

উনচল্লিশ

ওরা এসে আমাকে বলে,
কবি, মৃত্যুর কথা শুনতে চাই তোমার মুখে।
আমি বলি,
মৃত্যু যে আমার অন্তরঙ্গ,
জড়িয়ে আছে আমার দেহের সকল তন্তু।
তার ছন্দ আমার হৃৎস্পন্দনে,
আমার রক্তে তার আনন্দের প্রবাহ।
বলছে সে,—চলো চলো,
চলো বোঝা ফেলতে ফেলতে,
চলো মরতে মরতে নিমেষে নিমেষে
আমারি টানে, আমারি বেগে।
বলছে, চুপ করে বস যদি
যা-কিছু আছে সমস্তকে আঁকড়িয়ে ধরে
তবে দেখবে, তোমার জগতে
ফুল গেল বাসি হয়ে,
পাঁক দেখা দিল শুকনো নদীতে,
ম্লান হল তোমার তারার আলো।
বলছে, “থেমো না, থেমো না,
পিছনে ফিরে তাকিয়ো না,
পেরিয়ে যাও পুরোনোকে জীর্ণকে ক্লান্তকে অচলকে।
“আমি মৃত্যু-রাখাল
সৃষ্টিকে চরিয়ে চরিয়ে নিয়ে চলেছি
যুগ হতে যুগান্তরে
নব নব চারণ-ক্ষেত্রে।

"যখন বইল জীবনের ধারা
আমি এসেছি তার পিছনে পিছনে,
দিইনি তাকে কোনো গর্তে আটক থাকতে।
তীরের বাঁধন কাটিয়ে কাটিয়ে
ডাক দিয়ে নিয়ে গেছি মহাসমুদ্রে,
সে সমুদ্র আমিই।
"বর্তমান চায় বর্তিয়ে থাকতে।
সে চাপাতে চায়
তার সব বোঝা তোমার মাথায়,
বর্তমান গিলে ফেলতে চায়
তোমার সব-কিছু আপন জঠরে।
তার পরে অবিচল থাকতে চায়
আকণ্ঠপূর্ণ দানবের মতো
জাগরণহীন নিদ্রায়।
তাকেই বলে প্রলয়।
এই অনন্ত অচঞ্চল বর্তমানের হাত থেকে
আমি সৃষ্টিকে পরিত্রাণ করতে এসেছি,
অন্তহীন নব নব অনাগতে।"

চল্লিশ

পরি দ্যাবা পৃথিবী সদ্য আয়ম্
উপাতিষ্ঠে প্রথমজামৃতস্য।
—অথর্ববেদ

ঋষি কবি বলেছেন—
ঘুরলেন তিনি আকাশ পৃথিবী,
শেষকালে এসে দাঁড়ালেন
প্রথমজাত অমৃতের সম্মুখে।

কে এই প্রথমজাত অমৃত,
কী নাম দেব তাকে ?
তাকেই বলি নবীন,
সে নিত্যকালের।

কত জরা কত মৃত্যু
বারে বারে ঘিরল তাকে চারদিকে,
সেই কুয়াশার মধ্যে থেকে
বারে বারে সে বেরিয়ে এল,
প্রতিদিন ভোরবেলার আলোতে
ধ্বনিত হল তার বাণী—
"এই আমি প্রথমজাত অমৃত।"

দিন এগোতে থাকে,
তপ্ত হয়ে ওঠে বাতাস,
আকাশ আবিল হয়ে ওঠে ধুলোয়,
বৃদ্ধ সংসারের কর্কশ কোলাহল
আবর্তিত হতে থাকে
দূর হতে দূরে।

কখন দিন আসে আপন শেষপ্রান্তে,
থেমে যায় তাপ,
নেমে যায় ধুলো,
শান্ত হয় কর্কশ কণ্ঠের পরিণামহীন বচসা,
আলোর যবনিকা সরে যায়
দিক্‌সীমার অন্তরালে।

অন্তহীন নক্ষত্রলোকে,
গ্লানিহীন অন্ধকারে
জেগে ওঠে বাণী—
"এই আমি প্রথমজাত অমৃত।"

শতাব্দীর পর শতাব্দী
আপনাকে ঘোষণা করে
মানুষের তপস্যায় ;
সে-তপস্যা
ক্লান্ত হয়,
হোমাগ্নি যায় নিবে,
মন্ত্র হয় অর্থহীন,
জীর্ণ সাধনার শতছিদ্র মলিন আচ্ছাদন
ম্রিয়মাণ শতাব্দীকে ফেলে ঢেকে।

অবশেষে কখন
শেষ সূর্যাস্তের তোরণদ্বারে
নিঃশব্দচরণে আসে
যুগান্তের রাত্রি,
অন্ধকারে জপ করে শান্তিমন্ত্র
শবাসনে সাধকের মতো।
বহুবর্ষব্যাপী প্রহর যায় চলে,
নবযুগের প্রভাত
শুভ্র শঙ্খ হাতে
দাঁড়ায় উদয়াচলের স্বর্ণশিখরে,
দেখা যায়,
তিমিরধারায় ক্ষালন করেছে কে
ধূলিশায়ী শতাব্দীর আবর্জনা ;
ব্যাপ্ত হয়েছে অপরিসীম ক্ষমা
অন্তর্হিত অপরাধের
কলঙ্কচিহ্নের 'পরে।
পেতেছে শান্ত জ্যোতির আসন
প্রথমজাত অমৃত।
বালক ছিলেম,
নবীনকে তখন দেখেছি আনন্দিত চোখে

ধরণীর সবুজে,
আকাশের নীলিমায়।

দিন এগোল।
চলল জীবনযাত্রার রথ
এ-পথে ও-পথে।
ক্ষুব্ধ অন্তরের তাপতপ্ত নিঃশ্বাস
শুকনো পাতা ওড়াল দিগন্তে।
চাকার বেগে
বাতাস ধুলায় হল নিবিড়।
আকাশচর কল্পনা
উড়ে গেল মেঘের পথে,
ক্ষুধাতুর কামনা
মধ্যাহ্নের রৌদ্রে
ঘুরে বেড়াল ধরাতলে
ফলের বাগানে ফসলের খেতে
আহূত অনাহূত।
আকাশে পৃথিবীতে
এ জন্মের ভ্রমণ হল সারা
পথে বিপথে।
আজ এসে দাঁড়ালেম
প্রথমজাত অমৃতের সম্মুখে।

১ বৈশাখ, ১৩৪২
শান্তিনিকেতন

একচল্লিশ

হালকা আমার স্বভাব,
মেঘের মতো না হ'ক
গিরিনদীর মতো।

আঁমার মধ্যে হাসির কলরব
আজও থামল না।
বেদীর থেকে নেমে আসি,
রঙ্গমঞ্চে বসে বাঁধি নাচের গান,
তার বায়না নিয়েছি প্রভুর কাছে।
কবিতা লিখি,
তার পদে পদে ছন্দের ভঙ্গিমায়
তারুণ্য ওঠে মুখর হয়ে,
ঝিঁঝিট খাম্বাজের ঝংকার দিতে
আজো সে সংকোচ করে না।

আমি সৃষ্টিকর্তা পিতামহের
রহস্য-সখা।
তিনি অর্বাচীন নবীনদের কাছে
প্রবীণ বয়সের প্রমাণ দিতে
ভুলেই গেছেন।
তরুণের উচ্ছৃঙ্খল হাসিতে
উতরোল তাঁর কৌতুক,
তাদের উদ্দাম নৃত্যে
বাজান তিনি দ্রুততালের মৃদঙ্গ।
তাঁর বজ্রমন্দ্রিত গাম্ভীর্য মেঘমেদুর অম্বরে,
অজস্র তাঁর পরিহাস
বিকশিত কাশবনে,
শরতের অকারণ হাস্যহিল্লোলে।
তাঁর কোনো লোভ নেই
প্রধানদের কাছে মর্যাদা পাবার;
তাড়াতাড়ি কালো পাথর চাপা দেন না
চাপল্যের ঝরনার মুখে।
তাঁর বেলাভূমিতে
ভঙ্গুর সৈকতের ছেলেমানুষি
প্রতিবাদ করে না সমুদ্রের।

আমাকে চান টেনে রাখতে তাঁর বয়স্যদলে,
তাই আমার বার্ধক্যের শিরোপা
হঠাৎ নেন কেড়ে
ফেলে দেন ধুলোয়—
তার উপর দিয়ে নেচে নেচে
চলে যায় বৈরাগী
পাঁচ রঙের তালি-দেওয়া আলখাল্লা পরে।
যারা আমার মূল্য বাড়াতে চায়,
পরায় আমাকে দামি সাজ,
তাদের দিকে চেয়ে
তিনি ওঠেন হেসে,
ও সাজ আর টিঁকতে পায় না
আনমনার অনবধানে।

আমাকে তিনি চেয়েছেন
নিজের অবারিত মজলিসে,
তাই ভেবেছি যাবার বেলায় যাব
মান খুইয়ে,
কপালের তিলক মুছে,
কৌতুকে রসোল্লাসে।
এস আমার অমানী বন্ধুরা
মন্দিরা বাজিয়ে—
তোমাদের ধুলোমাখা পায়ে
যদি ঘুঙুর বাঁধা থাকে
লজ্জা পাব না

বিয়াল্লিশ

শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র দত্ত প্রিয়বরেষু

তুমি গল্প জমাতে পার।
বসো তোমার কেদারায়,
ধীরে ধীরে টান দাও গুড়গুড়িতে,
উচ্ছলে ওঠে আলাপ
তোমার ভিতর থেকে
হালকা ভাষায়,
যেন নিরাসক্ত ঔৎসুক্যে,
তোমার কৌতুকে-ফেনিল মনের
কৌতূহলের উৎস থেকে।

ঘুরেছ নানা জায়গায়, নানা কাজে,
আপন দেশে, অন্য দেশে।
মনটা মেলে রেখেছিলে চারদিকে,
চোখটা ছিলে খুলে।
মানুষের যে-পরিচয়
তার আপন সহজভাবে,
যেমন-তেমন অখ্যাত ব্যাপারের ধারায়
দিনে দিনে যা গাঁথা হয়ে ওঠে,
সামান্য হলেও যাতে আছে
সত্যের ছাপ,
অকিঞ্চিৎকর হলেও যার আছে বিশেষত্ব,
সেটা এড়ায়নি তোমার দৃষ্টি।
সেইটে দেখাই সহজ নয়,
পণ্ডিতের দেখা সহজ।

শুনেছি তোমার পাঠ ছিল সায়ান্সে,
শুনেছি শাস্ত্রও পড়েছ সংস্কৃত ভাষায়;
পার্সি জবানিও জানা আছে।

গিয়েছ সমুদ্রপারে,
ভারতে রাজসরকারের
ইম্পীরিয়ল রথযাত্রায় লম্বা দড়িতে
'হেঁইয়ো' ব'লে দিতে হয়েছে টান।
অর্থনীতি রাষ্ট্রনীতি
মগজে বোঝাই হয়েছে কম নয়,
পুঁথির থেকেও কিছু,
মানুষের প্রাণযাত্রা থেকেও বিস্তর।

তবু সব-কিছু নিয়ে
তোমার যে পরিচয় মুখ্য
সে তোমার আলাপ-পরিচয়ে।
তুমি গল্প জমাতে পার।
তাই যখন-তখন দেখি,
তোমার ঘরে মানুষ লেগেই আছে,
কেউ তোমার চেয়ে বয়সে ছোটো
কেউ বয়সে বেশি।

গল্প করতে গিয়ে মাস্টারি কর না,
এই তোমার বাহাদুরি।
তুমি মানুষকে জান, মানুষকে জানাও,
জীবলীলার মানুষকে।

একে নাম দিতে পারি সাহিত্য,—
সব-কিছুর কাছে-থাকা।
তুমি জমা করেছ তোমার মনে
নানা লোকের সঙ্গ,
সেইটে দিতে পার সবাইকে
অনায়াসে,—

সেইটেকে জ্ঞানবিজ্ঞানের তকমা পরিয়ে
পণ্ডিত-পেয়াদা সাজাও না
থমকিয়ে দিতে ভালোমানুষকে।

তোমার জ্ঞানবিজ্ঞানের ভাণ্ডারটা
পূর্ণ আছে যথাস্থানেই।
সেটা বৈঠকখানাকে কোণ-ঠেসা করে রাখেনি।
যেখানে আসন পাত
গল্পের ভোজে
সেখানে ক্ষুধিতের পাতের থেকে ঠেকিয়ে রাখ
লাইব্রেরি ল্যাবরেটরিকে।

একটিমাত্র কারণ,—
মানুষের 'পরে আছে তোমার দরদ,—
যে-মানুষ চলতে চলতে হাঁপিয়ে ওঠে
সুখদুঃখের দুর্গম পথে,
বাঁধা পড়ে নানা বন্ধনে
ইচ্ছায় অনিচ্ছায়,—
যে-মানুষ বাঁচে,
যে-মানুষ মরে
অদৃষ্টের গোলকধাঁধার পাকে।
সে-মানুষ রাজাই হ'ক ভিখিরিই হ'ক
তার কথা শুনতে মানুষের অসীম আগ্রহ।

আর কথা যে-লোক পারে বলতে সহজেই
সে-ই পারে,
অন্যে পারে না।
বিশেষ এই হাল-আমলে।
আজ মানুষের জানাশোনা
তার দেখাশোনাকে
দিয়েছে আপাদমস্তক ঢেকে।

একটু ধাক্কা পেলে
তার মুখে নানা কথা অনর্গল ছিটকে পড়ে
নানা সমস্যা, নানা তর্ক,
একান্ত মানুষের আসল কথাটা
যায় খাটো হয়ে।

আজ বিপুল হল সমস্যা,
বিচিত্র হল তর্ক,
দুর্ভেদ্য হল সংশয়,—
আজকের দিনে
সেইজন্যেই এত করে বন্ধুকে খুঁজি,
মানুষের সহজ বন্ধুকে
যে গল্প জমাতে পারে।
এ দুর্দিনে
মাস্টারমশায়কেও অত্যন্ত দরকার।
তাঁর জন্যে ক্লাস আছে
পাড়ায় পাড়ায়—
প্রায়মারি, সেকেণ্ডারি।
গল্পের মজলিস জোটে দৈবাৎ।

সমুদ্রের ওপারে
একদিন ওরা গল্পের আসর খুলেছিল,
তখন ছিল অবকাশ ;
ওরা ছেলেদের কাছে শুনিয়েছিল,
রবিন্‌সন্ ক্রুসো,
সকল বয়সের মানুষের কাছে
ডন্ কুইক্‌সোট্।

দুরূহ ভাবনার আঁধি লাগল
দিকে দিকে ;

লোকাচারের বান ডেকে এল,
জলে স্থলে কাদায় পাঁকে
গেল ঘুলিয়ে।

অগত্যা
অধ্যাপকেরা জানিয়ে দিলে
একেই বলে গল্প।

বন্ধু,
দুঃখ জানাতে এলুম
তোমার বৈঠকে।
আজকাল-এর ছাত্রেরা দেয়
আজকাল-এর দোহাই।
আজকাল-এর মুখরতায়
তাদের অটুট বিশ্বাস।
হায় রে আজকাল
কত ডুবে গেল কালের মহাপ্লাবনে
মোটাদামের মার্কা-মারা।
পসরা নিয়ে।
যা চিরকাল-এর
তা আজ যদি বা ঢাকা পড়ে
কাল উঠবে জেগে।
তখন মানুষ আবার বলবে খুশি হয়ে,—
গল্প বলো।

তেতাল্লিশ

শ্রীমান অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী কল্যাণীয়েষু

পঁচিশে বৈশাখ চলেছে
জন্মদিনের ধারাকে বহন করে
মৃত্যুদিনের দিকে।

সেই চলতি আসনের উপর বসে
কোন্ কারিগর গাঁথছে
ছোটো ছোটো জন্মমৃত্যুর সীমানায়
নানা রবীন্দ্রনাথের একখানা মালা।

রথে চড়ে চলেছে কাল;
পদাতিক পথিক চলতে চলতে
পাত্র তুলে ধরে,
পায় কিছু পানীয় ;—
পান সারা হলে
পিছিয়ে পড়ে অন্ধকারে ;
চাকার তলায়
ভাঙা পাত্র ধুলায় যায় গুঁড়িয়ে।
তার পিছনে পিছনে
নতুন পাত্র নিয়ে যে আসে ছুটে,
পায় নতুন রস,
একই তার নাম,
কিন্তু সে বুঝি আর-একজন।

একদিন ছিলেম বালক।
কয়েকটি জন্মদিনের ছাঁদের মধ্যে
সেই যে-লোকটার মূর্তি হয়েছিল গড়া
তোমরা তাকে কেউ জান না।
সে সত্য ছিল যাদের জানার মধ্যে
কেউ নেই তারা।
সেই বালক না আছে আপন স্বরূপে
না আছে কারো স্মৃতিতে।
সে গেছে চলে তার ছোটো সংসারটাকে নিয়ে ;
তার সেদিনকার কান্না-হাসির
প্রতিধ্বনি আসে না কোনো হাওয়ায়।

তার ভাঙা খেলনার টুকরোগুলোও
দেখিনে ধুলোর 'পরে।

সেদিন জীবনের ছোটো গবাক্ষের কাছে
সে বসে থাকত বাইরের দিকে চেয়ে।
তার বিশ্ব ছিল
সেইটুকু ফাঁকের বেষ্টনীর মধ্যে।
তার অবোধ চোখ-মেলে চাওয়া
ঠেকে যেত বাগানের পাঁচিলটাতে
সারি সারি নারকেল গাছে।
সন্ধ্যেবেলাটা রূপকথার রসে নিবিড়;
বিশ্বাস অবিশ্বাসের মাঝখানে
বেড়া ছিল না উঁচু,
মনটা এদিক থেকে ওদিকে
ডিঙিয়ে যেত অনায়াসেই।
প্রদোষের আলো-আঁধারে
বস্তুর সঙ্গে ছায়াগুলো ছিল জড়িয়ে,
দুইই ছিল একগোত্রের।

সে-কয়দিনের জন্মদিন
একটা দ্বীপ,
কিছুকাল ছিল আলোতে,
কাল-সমুদ্রের তলায় গেছে ডুবে।
ভাঁটার সময় কখনো কখনো
দেখা যায় তার পাহাড়ের চূড়া,
দেখা যায় প্রবালের রক্তিম তটরেখা।

পঁচিশে বৈশাখ তার পরে দেখা দিল
আর-এক কালান্তরে,
ফাল্গুনের প্রত্যূষে
রঙিন আভার অস্পষ্টতায়।

তরুণ যৌবনের বাউল
সুর বেঁধে নিল আপন একতারাতে,
ডেকে বেড়াল
নিরুদ্দেশ মনের মানুষকে
অনির্দেশ্য বেদনার খ্যাপা সুরে।

সেই শুনে কোনো-কোনোদিন বা
বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীর আসন টলেছিল,
তিনি পাঠিয়ে দিয়েছেন
তাঁর কোনো কোনো দূতীকে
পলাশবনের রংমাতাল ছায়াপথে
কাজ-ভোলানো সকাল বিকালে।
তখন কানে কানে মৃদু গলায় তাদের কথা শুনেছি,
কিছু বুঝেছি কিছু বুঝিনি।
দেখেছি কালো চোখের পক্ষ্মরেখায়
জলের আভাস;
দেখেছি কম্পিত অধরে নিমীলিত বাণীর
বেদনা;
শুনেছি ক্বণিত কঙ্কণে
চঞ্চল আগ্রহের চকিত ঝংকার।

তারা রেখে গেছে আমার অজানিতে
পঁচিশে বৈশাখের
প্রথম ঘুমভাঙা প্রভাতে
নতুন ফোটা বেলফুলের মালা;
ভোরের স্বপ্ন
তারি গন্ধে ছিল বিহ্বল।

সেদিনকার জন্মদিনের কিশোর জগৎ
ছিল রূপকথার পাড়ার গায়ে-গায়েই,
জানা না-জানার সংশয়ে।

সেখানে রাজকন্যা আপন এলোচুলের আবরণে
কখনো বা ছিল ঘুমিয়ে,
কখনো বা জেগেছিল চমকে উঠে'
সোনার কাঠির পরশ লেগে।

দিন গেল।
সেই বসন্তীরঙের পঁচিশে বৈশাখের
রং-করা প্রাচীরগুলো
পড়ল ভেঙে।
যে পথে বকুলবনের পাতার দোলনে
ছায়ায় লাগত কাঁপন,
হাওয়ায় জাগত মর্মর,
বিরহী কোকিলের
কুহুরবের মিনতিতে
আতুর হত মধ্যাহ্ন,
মৌমাছির ডানায় লাগত গুঞ্জন
ফুলগন্ধের অদৃশ্য ইশারা বেয়ে,
সেই তৃণ-বিছানো বীথিকা
পৌঁছল এসে পাথরে-বাঁধানো রাজপথে।

সেদিনকার কিশোরক
সুর সেধেছিল যে-একতারায়
একে একে তাতে চড়িয়ে দিল
তারের পর নতুন তার।
সেদিন পঁচিশে বৈশাখ
আমাকে আনল ডেকে
বন্ধুর পথ দিয়ে
তরঙ্গমন্দ্রিত জনসমুদ্রতীরে।

বেলা-অবেলায়
ধ্বনিতে ধ্বনিতে গেঁথে
জাল ফেলেছি মাঝদরিয়ায় ;
কোনো মন দিয়েছে ধরা,
ছিন্ন জালের ভিতর থেকে
কেউ বা গেছে পালিয়ে।

কখনো দিন এসেছে ম্লান হয়ে,
সাধনায় এসেছে নৈরাশ্য,
গ্লানিভারে নত হয়েছে মন।
এমন সময়ে অবসাদের অপরাহ্নে
অপ্রত্যাশিত পথে এসেছে
অমরাবতীর মর্ত্যপ্রতিমা ;
সেবাকে তারা সুন্দর করে,
তপঃক্লান্তের জন্যে তারা
আনে সুধার পাত্র ;
ভয়কে তারা অপমানিত করে
উল্লোল হাস্যের কলোচ্ছ্বাসে ;
তারা জাগিয়ে তোলে দুঃসাহসের শিখা
ভস্মে-ঢাকা অঙ্গারের থেকে ;
তারা আকাশবাণীকে ডেকে আনে
প্রকাশের তপস্যায়।
তারা আমার নিবে-আসা দীপে
জ্বালিয়ে গেছে শিখা,
শিথিল-হওয়া তারে
বেঁধে দিয়েছে সুর,
পঁচিশে বৈশাখকে
বরণমাল্য পরিয়েছে
আপন হাতে গেঁথে।

তাদের পরশমণির ছোঁওয়া
আজো আছে
আমার গানে আমার বাণীতে।

সেদিন জীবনের রণক্ষেত্রে
দিকে দিকে জেগে উঠল সংগ্রামের সংঘাত
গুরু গুরু মেঘমন্দ্রে।
একতারা ফেলে দিয়ে
কখনো বা নিতে হল ভেরী।
খর মধ্যাহ্নের তাপে
ছুটতে হল
জয়পরাজয়ের আবর্তনের মধ্যে।

পায়ে বিঁধেছে কাঁটা,
ক্ষত বক্ষে পড়েছে রক্তধারা।
নির্মম কঠোরতা মেরেছে ঢেউ
আমার নৌকার ডাইনে বাঁয়ে,
জীবনের পণ্য চেয়েছে ডুবিয়ে দিতে
নিন্দার তলায়, পঙ্কের মধ্যে।
বিদ্বেষে অনুরাগে
ঈর্ষায় মৈত্রীতে,
সংগীতে পরুষ কোলাহলে
আলোড়িত তপ্ত বাষ্পনিঃশ্বাসের মধ্য দিয়ে
আমার জগৎ গিয়েছে তার কক্ষপথে।
এই দুর্গমে, এই বিরোধ-সংক্ষোভের মধ্যে
পঁচিশে বৈশাখের প্রৌঢ় প্রহরে
তোমরা এসেছ আমার কাছে।
জেনেছ কি,
আমার প্রকাশে
অনেক আছে অসমাপ্ত

অনেক ছিন্ন বিচ্ছিন্ন
অনেক উপেক্ষিত ?
অন্তরে বাহিরে
সেই ভালো মন্দ,
স্পষ্ট অস্পষ্ট,
খ্যাত অখ্যাত,
ব্যর্থ চরিতার্থের জটিল সম্মিশ্রণের মধ্য থেকে
যে আমার মূর্তি
তোমাদের শ্রদ্ধায়, তোমাদের ভালোবাসায়,
তোমাদের ক্ষমায়
আজ প্রতিফলিত,
আজ যার সামনে এনেছ তোমাদের মালা,
তাকেই আমার পঁচিশে বৈশাখের
শেষবেলাকার পরিচয় বলে
নিলেম স্বীকার করে,
আর রেখে গেলেম তোমাদের জন্যে
আমার আশীর্বাদ।
যাবার সময় এই মানসী মূর্তি
রইল তোমাদের চিত্তে,
কালের হাতে রইল বলে
করব না অহংকার।

তার পরে দাও আমাকে ছুটি
জীবনের কালো-সাদা সূত্রে গাঁথা
সকল পরিচয়ের অন্তরালে ;
নির্জন নামহীন নিভৃতে ;
নানা সুরের নানা তারের যন্ত্রে
সুর মিলিয়ে নিতে দাও
এক চরম সংগীতের গভীরতায়।

চুয়াল্লিশ

আমার শেষবেলাকার ঘরখানি
বানিয়ে রেখে যাব মাটিতে,
তার নাম দেব শ্যামলী।
ও যখন পড়বে ভেঙে
সে হবে ঘুমিয়ে পড়ার মতো,
মাটির কোলে মিশবে মাটি ;
ভাঙা থামে নালিশ উঁচু করে
বিরোধ করবে না ধরণীর সঙ্গে ;
ফাটা দেয়ালের পাঁজর বের ক'রে
তার মধ্যে বাঁধতে দেবে না
মৃতদিনের প্রেতের বাসা।

সেই মাটিতে গাঁথব
আমার শেষ বাড়ির ভিত
যার মধ্যে সব বেদনার বিস্মৃতি,
সব কলঙ্কের মার্জনা,
যাতে সব বিকার সব বিদ্রূপকে
ঢেকে দেয় দূর্বাদলের স্নিগ্ধ সৌজন্যে ;
যার মধ্যে শত শত শতাব্দীর
রক্তলোলুপ হিংস্র নির্ঘোষ
গেছে নিঃশব্দ হয়ে।

সেই মাটির ছাদের নিচে বসব আমি
রোজ সকালে শৈশবে যা ভরেছিল
আমার গাঁটবাঁধা চাদরের কোনা
এক-একমুঠো চাঁপা আর বেল ফুলে।
মাঘের শেষে যার আমের বোল
দক্ষিণের হাওয়ায়
অলক্ষ্য দূরের দিকে ছড়িয়েছিল
ব্যথিত যৌবনের আমন্ত্রণ।

আমি ভালোবেসেছি
বাংলাদেশের মেয়েকে ;
যে-দেখায় সে আমার চোখ ভুলিয়েছে
তাতে আছে যেন এই মাটির শ্যামল অঞ্জন,
ওর কচি ধানের চিকন আভা।
তাদের কালো চোখের করুণ মাধুরীর উপমা দেখেছি
ঐ মাটির দিগন্তে
নীল বনসীমায় গোধূলির শেষ আলোটির
নিমীলনে।

প্রতিদিন আমার ঘরের সুপ্ত মাটি
সহজে উঠবে জেগে
ভোরবেলাকার সোনার কাঠির
প্রথম ছোঁওয়ায় ;
তার চোখ-জুড়ানো শ্যামলিমায়
স্মিত হাসি কোমল হয়ে ছড়িয়ে পড়বে
চৈত্ররাতের চাঁদের
নিদ্রাহারা মিতালিতে।

চিরদিন মাটি আমাকে ডেকেছে
পদ্মার ভাঙনলাগা
খাড়া পাড়ির বনঝাউবনে,
গাঙশালিকের হাজার খোপের বাসায় ;
সর্ষে-তিসির দুইরঙা খেতে
গ্রামের সরু বাঁকা পথের ধারে,
পুকুরের পাড়ির উপরে।
আমার দু-চোখ ভরে
মাটি আমায় ডাক পাঠিয়েছে
শীতের ঘুঘু ডাকা দুপুরবেলায়,
রাঙা পথের ওপারে,

যেখানে শুকনো ঘাসের হলদে মাঠে
চরে বেড়ায় দুটি-চারটি গোরু
নিরুৎসুক আলস্যে,
লেজের ঘায়ে পিঠের মাছি তাড়িয়ে।
যেখানে সাথিবিহীন
তালগাছের মাথায়
সঙ্গ-উদাসীন নিভৃত চিলের বাসা।

আজ আমি তোমার ডাকে
ধরা দিয়েছি শেষবেলায়।
এসেছি তোমার ক্ষমাস্নিগ্ধ বুকের কাছে,
যেখানে একদিন রেখেছিলে অহল্যাকে,
নবদূর্বাশ্যামলের
করুণ পদস্পর্শে
চরম মুক্তি-জাগরণের প্রতীক্ষায়,
নবজীবনের বিস্মিত প্রভাতে।

পঁয়তাল্লিশ

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী কল্যাণীয়েষু

তখন আমার আয়ুর তরণী
যৌবনের ঘাট গেছে পেরিয়ে।
যে-সব কাজ প্রবীণকে প্রাজ্ঞকে মানায়
তাই নিয়ে পাকা করছিলেম
পাকা চুলের মর্যাদা।

এমন সময়ে আমাকে ডাক দিলে
তোমার সবুজপত্রের আসরে।
আমার প্রাণে এনে দিলে পিছুডাক,
খবর দিলে
নবীনের দরবারে আমার ছুটি মেলেনি।

দ্বিধার মধ্যে মুখ ফিরালেম
পেরিয়ে-আসা পিছনের দিকে।
পর্যাপ্ত তারুণ্যের পরিপূর্ণ মূর্তি
দেখা দিল আমার চোখের সম্মুখে।
ভরা যৌবনের দিনেও
যৌবনের সংবাদ
এমন জোয়ারের বেগে এসে লাগেনি আমার লেখনীতে।
আমার মন বুঝল
যৌবনকে না ছাড়ালে
যৌবনকে যায় না পাওয়া।

আজ এসেছি জীবনের শেষ ঘাটে।
পুবের দিক থেকে হাওয়ায় আসে
পিছু ডাক,
দাঁড়াই মুখ ফিরিয়ে।
আজ সামনে দেখা দিল
এ জন্মের সমস্তটা।

যাকে ছেড়ে এলেম
তাকেই নিচ্ছি চিনে।
সরে এসে দেখছি
আমার এতকালের সুখ দুঃখের ঐ সংসার,
আর তার সঙ্গে
সংসারকে পেরিয়ে কোন্ নিরুদ্দিষ্ট।
ঋষি-কবি প্রাণপুরুষকে বলেছেন -
"ভুবন সৃষ্টি করেছ
তোমার এক অর্ধেককে দিয়ে,-
বাকি আধখানা কোথায়
তা কে জানে।"
সেই একটি-আধখানা আমার মধ্যে আজ ঠেকেছে
আপন প্রান্তরেখায় ;

দুইদিকে প্রসারিত দেখি দুই বিপুল নিঃশব্দ;
দুই বিরাট আধখানা,—
তারি মাঝখানে দাঁড়িয়ে
শেষকথা ব'লে যাব—
দুঃখ পেয়েছি অনেক,
কিন্তু ভালো লেগেছে,
ভালোবেসেছি।

ছেচল্লিশ

তখন আমার বয়স ছিল সাত।
ভোরের বেলায় দেখতেম জানলা দিয়ে
অন্ধকারের উপরকার ঢাকা খুলে আসছে,
বেরিয়ে আসছে কোমল আলো
নতুন ফোটা কাঁটালিচাঁপার মতো।

বিছানা ছেড়ে চলে যেতেম বাগানে
কাক ডাকবার আগে,
পাছে বঞ্চিত হই
কম্পমান নারকেল শাখাগুলির মধ্যে
সূর্যোদয়ের মঙ্গলাচরণে।

তখন প্রতিদিনটি ছিল স্বতন্ত্র, ছিল নতুন।
যে প্রভাত পূর্বদিকের সোনার ঘাট থেকে
আলোতে স্নান করে আসত
রক্তচন্দনের তিলক এঁকে ললাটে,
সে আমার জীবনে আসত নতুন অতিথি,
হাসত আমার মুখে চেয়ে।—
আগেকার দিনের কোনো চিহ্ন ছিল না তার উত্তরীয়ে

তারপরে বয়স হল
কাজের দায় চাপল মাথার 'পরে।
দিনের পরে দিন তখন হল ঠাসাঠাসি।
তারা হারাল আপনার স্বতন্ত্র মর্যাদা।
একদিনের চিন্তা আর-একদিনে হল প্রসারিত,
একদিনের কাজ আর-একদিনে পাতল আসন।
সেই একাকার-করা সময় বিস্তৃত হতে থাকে
নতুন হতে থাকে না।
একটানা বয়েস কেবলি বেড়ে ওঠে,
ক্ষণে ক্ষণে সমে এসে
চিরদিনের ধুয়োটির কাছে
ফিরে ফিরে পায় না আপনাকে

আজ আমার প্রাচীনকে নতুন ক'রে নেবার দিন এসেছে।
ওঝাকে ডেকেছি, ভূতকে দেবে নামিয়ে।
গুণীর চিঠিখানির জন্যে
প্রতিদিন বসব এই বাগানটিতে,
তাঁর নতুন চিঠি
ঘুম-ভাঙার জানলাটার কাছে।
প্রভাত আসবে
আমার নতুন পরিচয় নিতে,
আকাশে অনিমেষ চক্ষু মেলে
আমাকে শুধাবে
"তুমি কে?"
আজকের দিনের নাম
খাটবে না কালকের দিনে।

সৈন্যদলকে দেখে সেনাপতি,
দেখে না সৈনিককে ;—
দেখে আপন প্রয়োজন,
দেখে না সত্য,

দেখে না স্বতন্ত্র মানুষের
বিধাতাকৃত আশ্চর্যরূপ।
এতকাল তেমনি করে দেখেছি সৃষ্টিকে,
বন্দিদলের মতো
প্রয়োজনের এক শিকলে বাঁধা।
তার সঙ্গে বাঁধা পড়েছি
সেই বন্ধনে নিজে।

আজ নেব মুক্তি।
সামনে দেখছি সমুদ্র পেরিয়ে
নতুন পার।
তাকে জড়াতে যাব না
এ পারের বোঝার সঙ্গে
এ নৌকোয় মাল নেব না কিছুই
যাব একলা
নতুন হয়ে নতুনের কাছে।

সংযোজন

স্মৃতি-পাথেয়

একদিন কোন্ তুচ্ছ আলাপের ছিন্ন অবকাশে
সে কোন্ অভাবনীয় স্মিতহাসে
অন্যমনা আত্মভোলা
যৌবনেরে দিয়ে ঘন দোলা
মুখে তব অকস্মাৎ প্রকাশিল কী অমৃত-রেখা,
কভু যার পাই নাই দেখা,
দুর্লভ সে প্রিয়
অনির্বচনীয়।

হে মহা অপরিচিত
এক পলকের লাগি হয় সচকিত
গভীর অন্তরতর প্রাণে
কোন্ দূর বনান্তের পথিকের গানে ;
সে অপূর্ব আসে ঘরে
পথহারা মুহূর্তের তরে।
বৃষ্টিধারামুখরিত নির্জন প্রবাসে
সন্ধ্যাবেলা যূথিকার সকরুণ স্নিগ্ধ গন্ধশ্বাসে,
চিত্তে রেখে দিয়ে গেল চিরস্পর্শ স্বীয়
তাহারি স্খলিত উত্তরীয়।

সে বিস্মিত ক্ষণিকেরে পড়ে মনে
কোনোদিন অকারণে ক্ষণে ক্ষণে
শীতের মধ্যাহ্নকালে গোরুচরা শস্যরিক্ত মাঠে
চেয়ে চেয়ে বেলা যবে কাটে।
সঙ্গহারা সায়াহ্নের অন্ধকারে সে স্মৃতির ছবি
সূর্যাস্তের পার হতে বাজায় পূরবী।

পেয়েছি যে-সব ধন যার মূল্য আছে
ফেলে যাই পাছে
সেই যার মূল্য নাই, জানিবে না কেও
সঙ্গে থাকে অখ্যাত পাথেয়।

শেষ সপ্তকের দুই-সংখ্যক কবিতা তুলনীয়।

বাতাবির চারা

একদিন শান্ত হলে আষাঢ়ের ধারা
বাতাবির চারা
আসন্ন-বর্ষণ কোন্ শ্রাবণ প্রভাতে
রোপণ করিলে নিজহাতে
আমার বাগানে।
বহুকাল গেল চলি; প্রখর পৌষের অবসানে
কুহেলি ঘুচাল যবে কৌতূহলী ভোরের আলোক,
সহসা পড়িল চোখ,—
হেরিনু শিশিরে ভেজা সেই গাছে
কচিপাতা ধরিয়াছে,
যেন কী আগ্রহে
কথা কহে,
যে-কথা আপনি শুনে পুলকেতে দুলে;
যেমন একদা কবে তমসার কূলে
সহসা বাল্মীকি মুনি
আপনার কণ্ঠ হতে আপন প্রথম ছন্দ শুনি'
আনন্দ সঘন
গভীর বিস্ময়ে নিমগন।

কোথায় আছ না-জানি এ সকালে
কী নিষ্ঠুর অন্তরালে,—

সেথা হতে কোনো সম্ভাষণ
পরশে না এ প্রান্তের নিভৃত আসন।
হেনকালে অকস্মাৎ নিঃশব্দের অবহেলা হতে
প্রকাশিল অরুণ আলোতে
এ কয়টি কিশলয়।
এরা যেন সেই কথা কয়
বলিতে পারিতে যাহা তবু না বলিয়া
চলে গেছ প্রিয়া।

সেদিন বসন্ত ছিল দূরে
আকাশ জাগেনি সুরে,
অচেনার যবনিকা কেঁপেছিল ক্ষণে ক্ষণে
তখনো যায়নি সরে দুরন্ত দক্ষিণ সমীরণে।
প্রকাশের উচ্ছৃঙ্খল অবকাশ না ঘটিতে,
পরিচয় না রটিতে,
ঘণ্টা গেল বেজে
অব্যক্তের অনালোকে সায়াহ্নে গিয়েছ সভা ত্যেজে।

তিন-সংখ্যক কবিতা তুলনীয়।

শেষ পর্ব

যেথা দূর যৌবনের প্রান্তসীমা
সেথা হতে শেষ অরুণিমা
শীর্ণপ্রায়
আজি দেখা যায়।

সেথা হতে ভেসে আসে
চৈত্রদিবসের দীর্ঘশ্বাসে
অস্ফুট মর্মর,
কোকিলের ক্লান্ত স্বর,

ক্ষীণস্রোত তটিনীর অলস কল্লোল,—
রক্তে লাগে মৃদুমন্দ দোল।

এ আবেশ মুক্ত হ'ক ;
ঘোরভাঙা চোখ
শুভ্র সুস্পষ্টের মাঝে জাগিয়া উঠুক।
রঙকরা দুঃখ সুখ
সন্ধ্যার মেঘের মতো যাক সরে
আপনারে পরিহাস করে।
মুছে যাক সেই ছবি—চেয়ে থাকা পথপানে,
কথা কানে কানে,
মৌনমুখে হাতে হাত ধরা,
রজনীগন্ধায় সাজি ভরা,
চোখে চোখে চাওয়া
দুরু দুরু বক্ষ নিয়ে আসা আর যাওয়া।

যে-খেলা আপনা সাথে সকালে বিকালে
ছায়া-অন্তরালে,
সে খেলার ঘর হতে
হল আসিবার বেলা বাহির-আলোতে।
ভাঙিব মনের বেড়া কুসুমিত কাঁটালতা ঘেরা,
যেথা স্বপনেরা
মধুগন্ধে মরে ঘুরে ঘুরে
গুন গুন সুরে।
নেব আমি বিপুল বৃহৎ
আদিম প্রাণের দেশ— তেপান্তর মাঠের সে-পথ
সাত সমুদ্রের তটে তটে
যেখানে ঘটনা ঘটে,
নাই তার দায়,
যেতে যেতে দেখা যায়, শোনা যায়,

দিনরাত্রি যায় চলে
নানা ছন্দে নানা কলরোলে।

থাক্ মোর তরে
আপক্ক ধানের খেত অঘ্রানের দীপ্ত দ্বিপ্রহরে ;
সোনার তরঙ্গদোলে
মুগ্ধ দৃষ্টি যার 'পরে ভেসে যায় চলে
কথাহীন ব্যথাহীন চিন্তাহীন সৃষ্টির সাগরে,
যেথায় অদৃশ্য সাথি লীলাভরে
সারাদিন ভাসায় প্রহর যত
খেলার নৌকার মতো।
দূরে চেয়ে রব আমি স্থির

বিস্তীর্ণ বক্ষের কাছে
যেথা শাল গাছে
সহস্র বর্ষের প্রাণ সমাহিত রয়েছে নীরবে
নিস্তব্ধ গৌরবে।
কেটে যাক আপনা-ভোলানো মোহ,
কেটে যাক আপনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ,
প্রতি বৎসরের আয়ু কর্তব্যের আবর্জনাভার
না করুক স্তূপাকার,—
নির্ভাবনা তর্কহীন শাস্ত্রহীন পথ বেয়ে বেয়ে
যাই চলে অর্থহীন গান গেয়ে গেয়ে।

প্রাণে আর চেতনায় এক হয়ে ক্রমে
অনায়াসে মিলে যাব মৃত্যুমহাসাগর-সংগমে,
আলো-আঁধারের দ্বন্দ্ব হয়ে ক্ষীণ
গোধূলি নিঃশব্দ রাত্রে যেমন অতলে হয় লীন।

জোড়াসাঁকো
৫ এপ্রিল, ১৯৩৪

চার-সংখ্যক কবিতা তুলনীয়।

মর্মবাণী

শিল্পীর ছবিতে যাহা মূর্তিমতী,
গানে যাহা ঝরে ঝরনায়,
সে বাণী হারায় কেন জ্যোতি,
কেন তা আচ্ছন্ন হয়ে যায়
মুখের কথায়
সংসারের মাঝে
নিরন্তর প্রয়োজনে জনতার কাজে ?
কেন আজ পরিপূর্ণ ভাষা দিয়ে
পৃথিবীর কানে কানে বলিতে পারিনে "প্রিয়ে
ভালোবাসি" ?
কেন আজ সুরহারা হাসি
যেন সে কুয়াশা মেলা
হেমন্তের বেলা ?

অনন্ত অম্বর
অপ্রয়োজনের সেথা অখণ্ড প্রকাণ্ড অবসর,
তারি মাঝে এক তারা অন্য তারকারে
জানাইতে পারে
আপনার কানে কানে কথা।
তপস্বিনী নীরবতা
আসন বিস্তীর্ণ যার অসংখ্য যোজন দূর ব্যেপে
অন্তরে অন্তরে উঠে কেঁপে
আলোকের নিগূঢ় সংগীতে।
খণ্ড খণ্ড দণ্ডে পলে ভারাকীর্ণ চিতে
নাই সেই অসীমের অবসর ;
তাই অবরুদ্ধ তার স্বর,
ক্ষীণসত্য ভাষা তার।

প্রত্যহের অভ্যস্ত কথার
মূল্য যায় ঘুচে,
অর্থ যায় মুছে।

তাই কানে কানে
বলিতে সে নাহি জানে
সহজে প্রকাশি'
"ভালোবাসি"।
আপন হারানো বাণী, খুঁজিবারে,
বনস্পতি, আসি তব দ্বারে।
তোমার পল্লবপুঞ্জ শাখাব্যূহভার
অনায়াসে হয়ে পার
আপনার চতুর্দিকে মেলেছে নিস্তব্ধ অবকাশ।
সেথা তব নিঃশব্দ উচ্ছ্বাস
সূর্যোদয় মহিমার পানে
আপনারে মিলাইতে জানে।

অজানা সাগর পার হতে
দক্ষিণের বায়ুস্রোতে
অনাদি প্রাণের যে বারতা
তব নব কিশলয়ে রেখে যায় কানে কানে কথা,—
তোমার অন্তরতম—
সে কথা জাগুক প্রাণে মম;—
আমার ভাবনা ভরি উঠুক বিকাশি'
"ভালোবাসি"।
তোমার ছায়ায় বসে বিপুল বিরহ মোরে ঘেরে;
বর্তমান মুহূর্তেরে
অবলুপ্ত করি দেয় কালহীনতায়।
জন্মান্তর হতে যেন লোকান্তরগত আঁখি চায়
মোর মুখে।

নিষ্কারণ দুখে
পাঠাইয়া দেয় মোর চেতনারে
সকল সীমার পারে।
দীর্ঘ অভিসারপথে সংগীতের সুর
তাহারে বহিয়া চলে দূর হতে দূর।
কোথায় পাথেয় পাবে তার
ক্ষুধা পিপাসার,
এ সত্য বাণীর তরে তাই সে উদাসী
"ভালোবাসি"।
ভোর হয়েছিল যবে যুগান্তের রাতি
আলোকের রশ্মিগুলি খুঁজি সাথি
এ আদিম বাণী
করেছিল কানাকানি
গগনে গগনে।
নব সৃষ্টি যুগের লগনে
মহাপ্রাণ-সমুদ্রের কূল হতে কূলে
তরঙ্গ দিয়েছে তুলে
এ মন্ত্রবচন।
এই বাণী করেছে রচন
সুবর্ণকিরণ বর্ণে স্বপন-প্রতিমা
আমার বিরহাকাশে যেথা অস্তশিখরের সীমা।
অবসাদ-গোধূলির ধূলিজাল তারে
ঢাকিতে কি পারে?
নিবিড় সংহত করি এ-জন্মের সকল ভাবনা
সকল বেদনা
দিনান্তের অন্ধকারে মম
সন্ধ্যাতারা সম
শেষবাণী উঠুক উদ্ভাসি—
"ভালোবাসি"।

ছাব্বিশ-সংখ্যক কবিতা তুলনীয়।

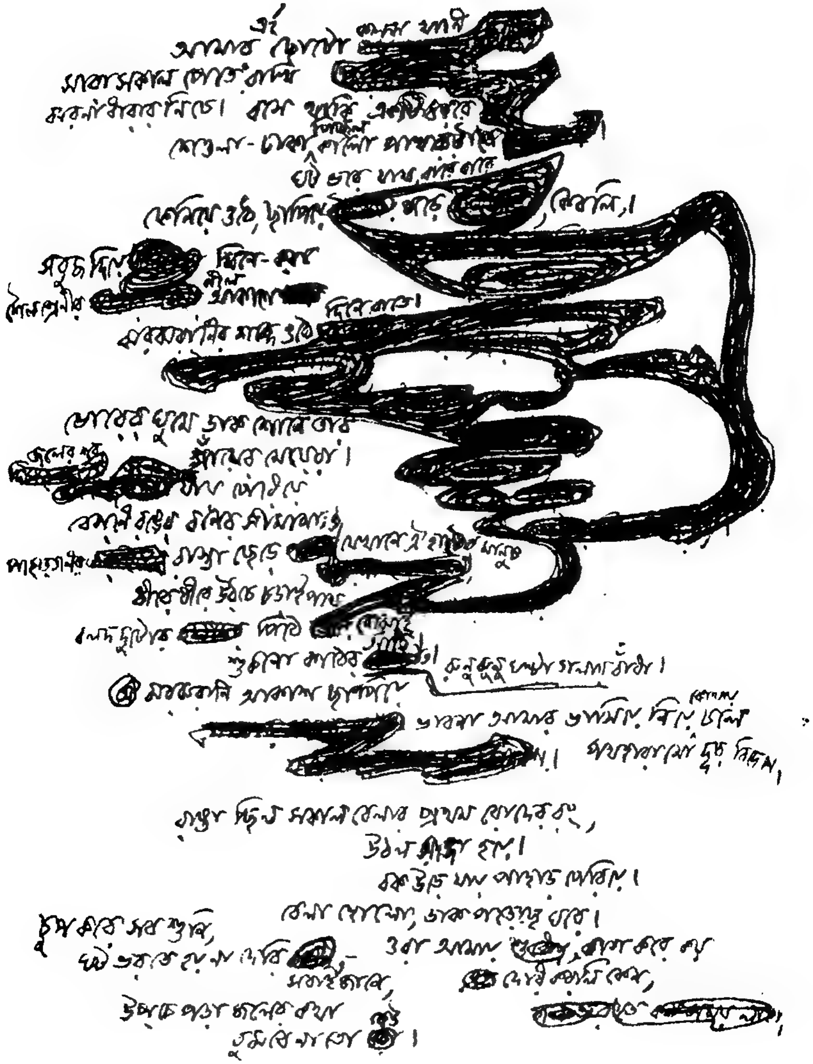

'ঘট ভরা' কবিতার পাণ্ডুলিপি

ঘট ভরা

আমার এই ছোটো কলসখানি
সারা সকাল পেতে রাখি
ঝরনাধারার নিচে।
বসে থাকি একটি ধারে
শেওলাঢাকা পিছল কালো পাথরটাতে।
ঘট ভরে যায় বারে বারে—
ফেনিয়ে ওঠে, ছাপিয়ে পড়ে কেবলি।

সবুজ দিয়ে মিনে-করা
শৈলশ্রেণীর নীল আকাশে
ঝরঝরানির শব্দ ওঠে দিনে রাতে।
ভোরের ঘুমে ডাক শোনে তার
গাঁয়ের মেয়েরা।
জলের শব্দ যায় পেরিয়ে
বেগনি রঙের বনের সীমানা,
পাহাড়তলির রাস্তা ছেড়ে
যেখানে ঐ হাটের মানুষ
ধীরে ধীরে উঠছে চড়াইপথে,
বলদ দুটোর পিঠে বোঝাই
শুকনো কাঠের আঁটি;
রুমুঝুমু ঘণ্টা গলায় বাঁধা।

ঝরঝরানি আকাশ ছাপিয়ে
ভাবনা আমার ভাসিয়ে নিয়ে কোথায় চলে
পথহারানো দূর বিদেশে।
রাঙা ছিল সকালবেলার প্রথম রোদের রং,
উঠল সাদা হয়ে।

বক উড়ে যায় পাহাড় পেরিয়ে।
বেলা হল ডাক পড়েছে ঘরে।
ওরা আমায় রাগ ক'রে কয়
"দেরি করলি কেন ?"
চুপ করে সব শুনি ;
ঘট ভরতে হয় না দেরি সবাই জানে,
উপচে-পড়া জলের কথা
বুঝবে না তো কেউ।

[আশ্বিন, ১৩৪৩]

সাতাশ-সংখ্যক কবিতা তুলনীয়।

প্রশ্ন

দেহের মধ্যে বন্দী প্রাণের ব্যাকুল চঞ্চলতা
দেহের দেহলীতে জাগায় দেহের অতীত কথা।
খাঁচার পাখি যে বাণী কয়
সে তো কেবল খাঁচারি নয়,
তারি মধ্যে করুণ ভাষায় সুদূর অগোচর
বিস্মরণের ছায়ায় আনে অরণ্য মর্মর।

চোখের দেখা নয় তো কেবল দেখারি জালবোনা,
কোন্ অলক্ষ্যে ছাড়িয়ে সে যায় সকল দেখাশোনা।
শীতের রৌদ্রে মাঠের শেষে
দেশ-হারানো কোন্ সে দেশে
বসুন্ধরা তাকিয়ে থাকে নিমেষ-হারা চোখে
দিগ্বলয়ের ইঙ্গিত-লীন উধাও কল্পলোকে।

ভালোমন্দ বিকীর্ণ এই দীর্ঘ পথের বুকে
রাত্রি-দিনের যাত্রা চলে কত দুঃখে সুখে।
পথের লক্ষ্য পথ-চলাতেই
শেষ হবে কি ? আর কিছু নেই ?

দিগন্তে যার স্বর্ণ লিখন, সংগীতের আহ্বান,
নিরর্থকের গহ্বরে তার হঠাৎ অবসান ?

নানা ঋতুর ডাক পড়ে যেই মাটির গহন তলে
চৈত্রতাপে, মাঘের হিমে, শ্রাবণ বৃষ্টিজলে,
স্বপ্ন দেখে বীজ সেখানে
অভাবিতের গভীর টানে,
অন্ধকারে এই যে ধেয়ান স্বপ্নে কি তার শেষ ?
উষার আলোয় ফুলের প্রকাশ, নাই কি সে উদ্দেশ ?

১৫ নবেম্বর, ১৯৩৪

পঞ্চত্রিশ-সংখ্যক কবিতা তুলনীয়।

আমি

এই যে সবার সামান্য পথ, পায়ে হাঁটার গলি
সে পথ দিয়ে আমি চলি
সুখে দুঃখে লাভ ক্ষতিতে,
রাতের আঁধার দিনের জ্যোতিতে।
প্রতি তুচ্ছ মুহূর্তেরই আবর্জনা করি আমি জড়ো,
কারো চেয়ে নইকো আমি বড়ো।
চলতে পথে কখনো বা বিঁধছে কাঁটা পায়ে,
লাগছে ধুলো গায়ে
দুর্বাসনার এলোমেলো হাওয়া,
তারি মধ্যে কতই চাওয়া পাওয়া,
কতই বা হারানো,
খেয়া ধরে ঘাটে আঘাটায়
নদী পারানো।

এমনি করে দিন কেটেছে, হবে সে-দিন সারা
বেয়ে সর্বসাধারণের ধারা।

শুধাও যদি সবশেষে তার রইল কী ধন বাকি,
স্পষ্ট ভাষায় বলতে পারি তা কি।
জানি, এমন নাই কিছু যা পড়বে কারো চোখে,
স্মরণ-বিস্মরণের দোলায় দুলবে বিশ্বলোকে।
নয় সে মানিক, নয় সে সোনা,—
যায় না তারে যাচাই করা, যায় না তারে গোনা।

এই দেখো-না, শীতের রোদে দিনের স্বপ্নে বোনা
সেগুন বনে সবুজ-মেশা সোনা,
শজনে গাছে লাগল ফুলের রেশ,
হিমঝুরির হৈমন্তী পালা হয়েছে নিঃশেষ।
বেগনি ছায়ার ছোঁওয়া-লাগা শুক্ক বটের শাখা
ঘোর রহস্যে ঢাকা।
ফলসা গাছের ঝরা পাতা গাছের তলা জুড়ে
হঠাৎ হাওয়ায় চমকে বেড়ায় উড়ে।
গোরুর গাড়ি মেঠো পথের তলে
উড়তি ধুলোয় দিকের আঁচল ধূসর ক'রে চলে।
নীরবতার বুকের মধ্যখানে
দূর অজানার বিধুর বাঁশি ভৈরবী সুর আনে।
কাজভোলা এই দিন
নীল আকাশে পাখির মতো নিঃসীমে হয় লীন।
এরি মধ্যে আছি আমি,
সব হতে এই দামি।
কেননা আজ বুকের কাছে যায় যে জানা,
আরেকটি সেই দোসর আমি উড়িয়ে চলে বিরাট তাহার ডানা
জগতে জগতে
অন্তবিহীন ইতিহাসের পথে।

ঐ যে আমার কুয়োতলার কাছে
সামান্য ঐ আমের গাছে

কখনো বা রৌদ্র খেলায়, কভু শ্রাবণধারা,
সারা বরষ থাকে আপনহারা
সাধারণ এই অরণ্যানীর সবুজ আবরণে,
মাঘের শেষে অকারণে
ক্ষণকালের গোপন মন্ত্রবলে
গভীর মাটির তলে
শিকড়ে তার শিহর লাগে,
শাখায় শাখায় হঠাৎ বাণী জাগে,—
“আছি, আছি, এই যে আমি আছি।”
পুষ্পোচ্ছ্বাসে ধায় সে বাণী স্বর্গলোকের কাছাকাছি
দিকে দিগন্তরে।
চন্দ্র সূর্য তারার আলো তারে বরণ করে।

এমনি করেই মাঝে মাঝে সোনার কাঠি আনে
—কভু প্রিয়ার মুগ্ধ চোখে, কভু কবির গানে—
অলস মনের শিয়রেতে কে সে অন্তর্যামী ;
নিবিড় সত্যে জেগে ওঠে সামান্য এই আমি।

যে আমিরে ধূসর ছায়ায় প্রতিদিনের ভিড়ের মধ্যে দেখা
সেই আমিরে এক নিমেষের আলোয় দেখি একের মধ্যে একা।
সে-সব নিমেষ রয় কি না রয় কোনোখানে,
কেউ তাহাদের জানে বা না-ই জানে,
তবু তারা জীবনে মোর দেয় তো আনি
ক্ষণে ক্ষণে পরম বাণী
অনন্তকাল যাহা বাজে
বিশ্বচরাচরের মর্মমাঝে
“আছি আমি আছি”—
যে বাণীতে উঠে নাচি
মহাগগন-সভাঙ্গনে আলোক-অপ্সরী
তারার মাল্য পরি।

ছত্রিশ-সংখ্যক কবিতা তুলনীয়।

আষাঢ়

নব বরষার দিন
বিশ্বলক্ষ্মী তুমি আজ নবীন গৌরবে সমাসীন
রিক্ত তপ্ত দিবসের নীরব প্রহরে
ধরণীর দৈন্য 'পরে
ছিলে তপস্যায় রত
রুদ্রের চরণতলে নত।
উপবাসশীর্ণ তনু, পিঙ্গল জটিল কেশপাশ,
উত্তপ্ত নিঃশ্বাস।
দুঃখেরে করিলে দগ্ধ দুঃখেরি দহনে
অহনে অহনে;
শুষ্কেরে জ্বালায়ে তীব্র অগ্নিশিখারূপে
ভস্ম করি দিলে তারে তোমার পূজার পুণ্যধূপে।
কালোরে করিলে আলো,
নিস্তেজেরে করিলে তেজালো;
নির্মম ত্যাগের হোমানলে
সম্ভোগের আবর্জনা লুপ্ত হয়ে গেল পলে পলে।
অবশেষে দেখা দিল রুদ্রের উদার প্রসন্নতা,
বিপুল দাক্ষিণ্যে অবনতা
উৎকণ্ঠিতা ধরণীর পানে।
নির্মল নবীন প্রাণে
অরণ্যানী।
লভিল আপন বাণী।
দেবতার বর
মুহূর্তে আকাশ ঘিরি রচিল সজল মেঘস্তর।
মরুবক্ষে তৃণরাজি
পেতে দিল আজি
শ্যাম আস্তরণ,
নেমে এল তার 'পরে সুন্দরের করুণ চরণ।

সকল তপস্যা তব
জীর্ণতারে সমর্পিল রূপ অভিনব ;
মলিন দৈন্যের লজ্জা ঘুচাইয়া
নব ধারাজলে তারে স্নাত করি দিলে মুছাইয়া
কলঙ্কের গ্লানি ;
দীপ্ততেজে নৈরাশ্যেরে হানি
উদ্বেল উৎসাহে
রিক্ত যত নদীপথ ভরি দিলে অমৃতপ্রবাহে।
জয় তব জয়
গুরুগুরু মেঘগর্জে ভরিয়া উঠিল বিশ্বময়।

সাঁইত্রিশ-সংখ্যক কবিতা তুলনীয়।

যক্ষ

হে যক্ষ তোমার প্রেম ছিল বদ্ধ কোরকের মতো,
একান্তে প্রেয়সী তব সঙ্গে যবে ছিল অনিয়ত
সংকীর্ণ ঘরের কোণে, আপন বেষ্টনে তুমি যবে
রুদ্ধ রেখেছিলে তারে দু-জনের নির্জন উৎসবে
সংসারের নিভৃত সীমায়, শ্রাবণের মেঘজাল
কৃপণের মতো যথা শশাঙ্কের রচে অন্তরাল
আপনার আলিঙ্গনে আপনি হারায়ে ফেলে তারে,
সম্পূর্ণ মহিমা তার দেখিতে পায় না একেবারে
অন্ধ মোহাবেশে। বর তুমি পেলে যবে প্রভুশাপে,
সামীপ্যের বন্ধ ছিন্ন হ'ল, বিরহের দুঃখতাপে
প্রেম হ'ল পূর্ণ বিকশিত ; জানিল সে আপনারে
বিশ্বধরিত্রীর মাঝে। নির্বাধে তাহার চারিধারে
সান্ধ্য অর্ঘ্য করে দান বৃষ্টিজলে সিক্ত বনযূথী
গন্ধের অঞ্জলি ; নীপনিকুঞ্জের জানাল আকৃতি

বেণুভারে মন্থর পবন। উঠে গেল যবনিকা
আত্মবিস্মৃতির, দেখা দিল দিকে দিগন্তরে লিখা
উদার বর্ষার বাণী, যাত্রামন্ত্র বিশ্বপথিকের
মেঘধ্বজে আঁকা, দিগ্বধূ-প্রাঙ্গণ হতে নির্ভীকের
শূন্যপথে অভিসার। আষাঢ়ের প্রথম দিবসে
দীক্ষা পেলে অশ্রুধৌত সৌম্য বিষাদের ; নিত্যরসে
আপনি করিলে সৃষ্টি রূপসীর অপূর্ব মুরতি
অন্তহীন গরিমায় কান্তিময়ী। এক দিন ছিল সেই সতী
গৃহের সঙ্গিনী, তারে বসাইলে ছন্দশঙ্খ রবে
অলোক-আলোকদীপ্ত অলকার অমর গৌরবে
অনন্তের আনন্দ-মন্দিরে। প্রেম তব ছিল বাক্যহীন,
আজ সে পেয়েছে তার ভাষা, আজ তার রাত্রিদিন
সংগীত তরঙ্গে আন্দোলিত। তুমি আজ হলে কবি,
মুক্ত তব দৃষ্টিপথে উদ্ঘাটিত নিখিলের ছবি
শ্যামমেঘে স্নিগ্ধচ্ছায়া। বক্ষ ছাড়ি মর্মে অধ্যাসীনা
প্রিয়া তব ধ্যানোদ্ভবা লয়ে তার বিরহের বীণা।
অপরূপ রূপে রচি বিচ্ছেদের উন্মুক্ত প্রাঙ্গনে
তোমার প্রেমের সৃষ্টি উৎসর্গ করিলে বিশ্বজনে।

দার্জিলিং
১৮ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০

আটত্রিশ-সংখ্যক কবিতা তুলনীয়।

দুঃখ যেন জাল পেতেছে

দুঃখ যেন জাল পেতেছে চারদিকে ;
চেয়ে দেখি যার দিকে
সবাই যেন দুর্‌গ্রহদের মন্ত্রণায়
গুমরে কাঁদে যন্ত্রণায়।
লাগছে মনে এই জীবনের মূল্য নেই,
আজকে দিনের চিত্তদাহের তুল্য নেই।
যেন এ দুখ অন্তহীন,
ঘরছাড়া মন ঘুরবে কেবল পন্থহীন।

এমন সময় অকস্মাৎ
মনের মধ্যে হানল চমক তড়িদ্‌ঘাত,
এক নিমেষেই ভাঙল আমার বন্ধ দ্বার,
ঘুচল হঠাৎ অন্ধকার।
সুদূর কালের দিগন্তলীন বাগ্‌বাদিনীর পেলেম সাড়া,
শিরায় শিরায় লাগল নাড়া।
যুগান্তরের ভগ্নশেষে
ভিত্তিছায়ায় ছায়ামূর্তি মুক্তকেশে
বাজায় বীণা ; পূর্বকালের কী আখ্যানে
উদার সুরের তানের তন্তু গাঁথছে গানে ;
দুঃসহ কোন্‌ দারুণ দুখের স্মরণ-গাথা
করুণ গাথা ;
দুর্দাম কোন্‌ সর্বনাশের ঝঞ্ঝাঘাতের
মৃত্যুমাতাল বজ্রপাতের
গর্জরবে
রক্তরঙিন যে-উৎসবে
রুদ্রদেবের ঘূর্ণিনৃত্যে উঠল মাতি
প্রলয়রাতি,

তাহারি ঘোর শঙ্কাকাঁপন বারে বারে
ঝংকারিয়া কাঁপছে বীণার তারে তারে।

জানিয়ে দিলে আমায়, অয়ি
অতীতকালের হৃদয়পদ্মে নিত্য-আসীন ছায়াময়ী,
আজকে দিনের সকল লজ্জা সকল গ্লানি
পাবে যখন তোমার বাণী,
বর্ষশতের ভাসান-খেলার নৌকা যবে
অদৃশ্যেতে মগ্ন হবে,
মর্মদহন দুঃখশিখা
হবে তখন জ্বলনবিহীন আখ্যায়িকা,
বাজবে তারা অসীম কালের নীরব গীতে
শান্ত গভীর মাধুরীতে ;
ব্যথার ক্ষত মিলিয়ে যাবে নবীন ঘাসে,
মিলিয়ে যাবে সুদূর যুগের শিশুর উচ্চহাসে।

২৮ আষাঢ়, ১৩৪১

শেষ সপ্তকের দশ-সংখ্যক কবিতা তুলনীয়।

নাটক ও প্রহসন

শেষ বর্ষণ

শেষ বর্ষণ

রাজা, পারিষদবর্গ, নটরাজ, নাট্যাচার্য ও গায়ক-গায়িকা

গান আরম্ভ

রাজা। ওহে থামো তোমরা, একটু থামো। আগে ব্যাপারখানা বুঝে নিই। নটরাজ, তোমাদের পালাগানের পুঁথি একখানা হাতে দাও না।

নটরাজ। (পুঁথি দিয়া) এই নিন মহারাজ।

রাজা। তোমাদের দেশের অক্ষর ভাল বুঝতে পারিনে। কী লিখছে? "শেষবর্ষণ"।

নটরাজ। হাঁ মহারাজ।

রাজা। আচ্ছা বেশ ভালো। কিন্তু পালাটা যার লেখা সে লোকটা কোথায়?

নটরাজ। কাটা ধানের সঙ্গে সঙ্গে খেতটাকে তো কেউ ঘরে আনে না। কাব্য লিখেই কবি খালাস, তার পরে জগতে তার মতো অদরকারি আর কিছু নেই। আখের রসটা বেরিয়ে গেলে বাকি যা থাকে তাকে ঘরে রাখা চলে না। তাই সে পালিয়েছে।

রাজা। পরিহাস বলে ঠেকছে। একটু সোজা ভাষায় বলো। পালাল কেন?

নটরাজ। পাছে মহারাজ বলে বসেন, ভাব অর্থ সুর তান লয়, কিছুই বোঝা যাচ্ছে না সেই ভয়ে। লোকটা বড়ো ভিতু।

রাজকবি। এ তো বড়ো কৌতুক। পাঁজিতে দেখা গেল তিথিটা পূর্ণিমা, এদিকে চাঁদ মেরেছেন দৌড়, পাছে কেউ ব'লে বসে তাঁর আলো ঝাপসা।

রাজা। তোমাদের কবিশেখরের নাম শুনেই মধুকপত্তনের রাজার কাছ থেকে তাঁর গানের দলকে আনিয়ে নিলেম, আর তিনি পালালেন?

নটরাজ। ক্ষতি হবে না, গানগুলো সুদ্ধ পালাননি। অস্তসূর্য নিজে লুকিয়েছেন কিন্তু মেঘে মেঘে রং ছড়িয়ে আছে।

রাজকবি। তুমি বুঝি সেই মেঘ? কিন্তু তোমাকে দেখাচ্ছে বড়ো সাদা।

নটরাজ। ভয় নেই, এই সাদার ভিতর থেকেই ক্রমে ক্রমে রং খুলতে থাকবে।

রাজা। কিন্তু আমার রাজবুদ্ধি, কবির বুদ্ধির সঙ্গে যদি না মেলে? আমাকে বোঝাবে কে?

নটরাজ। সে ভার আমার উপর। ইশারায় বুঝিয়ে দেব।

রাজা। আমার কাছে ইশারা চলবে না। বিদ্যুতের ইশারার চেয়ে বজ্রের বাণী স্পষ্ট, তাতে ভুল বোঝার আশঙ্কা নেই। আমি স্পষ্ট কথা চাই। পালাটা আরম্ভ হবে কী দিয়ে?

নটরাজ। বর্ষাকে আহ্বান ক'রে।

রাজা। বর্ষাকে আহ্বান? এই আশ্বিন মাসে?

রাজকবি। ঋতু-উৎসবের শবসাধনা? কবিশেখর ভূতকালকে খাড়া ক'রে তুলবেন। অদ্ভুত রসের কীর্তন।

নটরাজ। কবি বলেন, বর্ষাকে না জানলে শরৎকে চেনা যায় না। আগে আবরণ তার পরে আলো।

রাজা। (পারিষদের প্রতি) মানে কী হে?

পারিষদ। মহারাজ, আমি ওঁদের দেশের পরিচয় জানি। ওঁদের হেঁয়ালি বরঞ্চ বোঝা যায় কিন্তু যখন ব্যাখ্যা করতে বসেন তখন একেবারেই হাল ছেড়ে দিতে হয়।

রাজকবি। যেন দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ, টানলে আরও বাড়তে থাকে।

নটরাজ। বোঝবার কঠিন চেষ্টা করবেন না মহারাজ, তাহলেই সহজে বুঝবেন। জুঁই ফুলকে ছিঁড়ে দেখলে বোঝা যায় না, চেয়ে দেখলে বোঝা যায়। আদেশ করুন এখন বর্ষাকে ডাকি।

রাজা। রসো রসো। বর্ষাকে ডাকা কী রকম? বর্ষা তো নিজেই ডাক দিয়ে আসে।

নটরাজ। সে তো আসে বাইরের আকাশে। অন্তরের আকাশে তাকে গান গেয়ে ডেকে আনতে হয়।

রাজা। গানের সুরগুলো কি কবিশেখরের নিজেরই বাঁধা?

নটরাজ। হাঁ মহারাজ।

রাজা। এই আর এক বিপদ।

রাজকবি। নিজের অধিকারে পেয়ে কাব্যরসের হাতে কবি রাগিণীর দুর্গতি ঘটাবেন। এখন রাজার কর্তব্য গীতসরস্বতীকে কাব্যপীড়ার হাত থেকে রক্ষা করা। মহারাজ, ভোজপুরের গন্ধর্বদলকে খবর দিন না। দুই পক্ষের লড়াই বাধুক তা হলে কবির পক্ষে "শেষ বর্ষণ" নামটা সার্থক হবে।

নটরাজ। রাগিণী যতদিন কুমারী ততদিন তিনি স্বতন্ত্রা, কাব্যরসের সঙ্গে পরিণয় ঘটলেই তখন ভাবের রসকেই পতিব্রতা মেনে চলে। উলটে, রাগিণীর হুকুমে ভাব যদি

পায়ে পায়ে নাকে খত দিয়ে চলতে থাকে সেই স্ত্রৈণতা অসহ্য। অন্তত আমার দেশের চাল এ রকম নয়।

রাজা। ওহে নটরাজ, রস জিনিসটা স্পষ্ট নয়, রাগিণী জিনিসটা স্পষ্ট। রসের নাগাল যদি বা না পাই, রাগিণীটা বুঝি। তোমাদের কবি কাব্যশাসনে তাকেও যদি বেঁধে ফেলেন তা হলে তো আমার মতো লোকের মুশকিল।

নটরাজ। মহারাজ, গাঁঠছড়ার বাঁধন কি বাঁধন? সেই বাঁধনেই মিলন। তাতে উভয়েই উভয়কে বাঁধে। কথায় সুরে হয় একাত্মা।

পারিষদ। অলমতিবিস্তরেণ। তোমাদের ধর্মে যা বলে তাই করো, আমরা বীরের মতো সহ্য করব।

নটরাজ। (গায়কগায়িকাদের প্রতি) ঘনমেঘে তাঁর চরণ পড়েছে। শ্রাবণের ধারায় তাঁর বাণী কদম্বের বনে তাঁর গন্ধের অদৃশ্য উত্তরীয়। গানের আসনে তাঁকে বসাও, সুরে তিনি রূপ ধরুন, হৃদয়ে তাঁর সভা জমুক। ডাকো—

এস নীপবনে ছায়াবীথিতলে,
এস করো স্নান নবধারাজলে।
দাও আকুলিয়া ঘন কালো কেশ,
পরো দেহ ঘেরি মেঘনীল বেশ;
কাজল নয়নে যূথীমালা গলে
এস নীপবনে ছায়াবীথিতলে।
আজি ক্ষণে ক্ষণে হাসিখানি, সখী,
অধরে নয়নে উঠুক চমকি।
মল্লারগানে তব মধুস্বরে
দিক্ বাণী আনি বনমর্মরে।
ঘন বরিষনে জল-কলকলে
এস নীপবনে ছায়াবীথিতলে।

নটরাজ। মহারাজ, এখন একবার ভিতরের দিকে তাকিয়ে দেখুন, 'রজনী শাঙন ঘন, ঘন দেয়া গরজন, রিমঝিম শবদে বরিষে'।

রাজা। ভিতরের দিকে? সেই দিকের পথই তো সব চেয়ে দুর্গম।

নটরাজ। গানের স্রোতে হাল ছেড়ে দিন, সুগম হবে। অনুভব করছেন কি প্রাণের আকাশের পুব হাওয়া মুখর হয়ে উঠল। বিরহের অন্ধকার ঘনিয়েছে। ওগো

সব গীতরসিক, আকাশের বেদনার সঙ্গে হৃদয়ের রাগিণীর মিল করো। ধরো ধরো, 'ঝরে ঝর ঝর'।

ঝরে ঝর ঝর ভাদর বাদর,
বিরহকাতর শর্বরী।
ফিরিছে এ কোন অসীম রোদন
কানন কানন মর্মরি।
আমার প্রাণের রাগিণী আজি এ
গগনে গগনে উঠিল বাজিয়ে।
হৃদয় একি রে ব্যাপিল তিমিরে
সমীরে সমীরে সঞ্চরি।

নটরাজ। শ্রাবণ ঘরছাড়া উদাসী। আলুথালু তার জটা, চোখে তার বিদ্যুৎ। অশ্রান্ত ধারায় একতারায় একই সুর সে বাজিয়ে বাজিয়ে সারা হল। পথহারা তার সব কথা বলে শেষ করতে পারলে না। ওই শুনুন মহারাজ মেঘমল্লার।

কোথা যে উধাও হল মোর প্রাণ উদাসী
আজি ভরা বাদরে।
ঘন ঘন গুরু গুরু গরজিছে,
ঝরঝর নামে দিকে দিগন্তে জলধারা,
মন ছুটে শূন্যে শূন্যে অনন্তে
অশান্ত বাতাসে।

রাজা। পুব দিকটা আলো হয়ে উঠল যে, কে আসে?

নটরাজ। শ্রাবণের পূর্ণিমা।

রাজকবি। শ্রাবণের পূর্ণিমা! হাঃ হাঃ হাঃ। কালো খাপটাই দেখা যাবে, তলোয়ারটা রইবে ইশারায়।

রাজা। নটরাজ, শ্রাবণের পূর্ণিমায় পূর্ণতা কোথায়? ও তো বসন্তের পূর্ণিমা নয়।

নটরাজ। মহারাজ, বসন্তপূর্ণিমাই তো অপূর্ণ। তাতে চোখের জল নেই কেবলমাত্র হাসি। শ্রাবণের শুক্ল রাতে হাসি বলছে আমার জিত, কান্না বলছে আমার। ফুল ফোটার সঙ্গে ফুল ঝরার মালাবদল। ওগো কলস্বরা, পূর্ণিমার ডালাটি খুলে দেখো, ও কী আনলে।

আজ শ্রাবণের পূর্ণিমাতে কী এনেছিস বল্,
হাসির কানায় কানায় ভরা কোন্ নয়নের জল।

বাদল হাওয়ার দীর্ঘশ্বাসে
যূথীবনের বেদন আসে,
ফুল-ফোটানোর খেলায় কেন ফুল-ঝরানোর ছল।
কী আবেশ হেরি চাঁদের চোখে,
ফেরে সে কোন্ স্বপনলোকে।
মন বসে রয় পথের ধারে,
জানে না সে পাবে কারে,
আসা-যাওয়ার আভাস ভাসে বাতাসে চঞ্চল।

রাজা। বেশ, বেশ, এটা মধুর লাগল বটে।

নটরাজ। কিন্তু মহারাজ, কেবলমাত্র মধুর? সেও তো অসম্পূর্ণ?

রাজা। ওই দেখো, যেমনি আমি বলেছি মধুর অমনি তার প্রতিবাদ। তোমাদের দেশে সোজা কথার চলন নেই বুঝি?

নটরাজ। মধুরের সঙ্গে কঠোরের মিলন হলে তবেই হয় হরপার্বতীর মিলন। সেই মিলনের গানটা ধরো।

বজ্র-মানিক দিয়ে গাঁথা
আষাঢ় তোমার মালা।
তোমার শ্যামল শোভার বুকে
বিদ্যুতেরি জালা।
তোমার মন্ত্রবলে
পাষাণ গলে, ফসল ফলে,
মরু বহে আনে তোমার পায়ে ফুলের ডালা।
মরমর পাতায় পাতায়
ঝরঝর বারির রবে,
গুরু গুরু মেঘের মাদল
বাজে তোমার কী উৎসবে।
সবুজ সুধার ধারায় ধারায়
প্রাণ এনে দাও তপ্ত ধরায়,
বামে রাখ ভয়ংকরী
বন্যা মরণ-ঢালা।

রাজা। সব রকমের খ্যাপামিই তো হল। হাসির সঙ্গে কান্না, মধুরের সঙ্গে কঠোর, এখন বাকি রইল কী?

নটরাজ। বাকি আছে অকারণ উৎকণ্ঠা। কালিদাস বলেন, মেঘ দেখলে সুখী মানুষও আনমনা হয়ে যায়। এইবার সেই যে "অন্যথাবৃত্তি চেতঃ", সেই যে পথ-চেয়ে-থাকা আনমনা, তারই গান হবে। নাট্যাচার্য, ধরো হে—

পুব হাওয়াতে দেয় দোলা আজ মরি মরি।
হৃদয়-নদীর কূলে কূলে জাগে লহরী।
পথ চেয়ে তাই একলা ঘাটে
বিনা কাজে সময় কাটে,
পাল তুলে ওই আসে তোমার সুরেরই তরী।
ব্যথা আমার কূল মানে না বাধা মানে না,
পরান আমার ঘুম জানে না জাগা জানে না।
মিলবে যে আজ অকূল পানে,
তোমার গানে আমার গানে,
ভেসে যাবে রসের বানে আজ বিভাবরী।

নটরাজ। বিরহীর বেদনা রূপ ধ'রে দাঁড়াল, ঘনবর্ষার মেঘ আর ছায়া দিয়ে গড়া সজল রূপ। অশান্ত বাতাসে ওর সুর পাওয়া গেল কিন্তু ওর বাণীটি আছে তোমার কণ্ঠে, মধুরিকা।

অশ্রুভরা বেদনা দিকে দিকে জাগে।
আজি শ্যামল মেঘের মাঝে
বাজে কার কামনা।
চলিছে ছুটিয়া অশান্ত বায়,
ক্রন্দন কার তার গানে ধ্বনিছে,
করে কে সে বিরহী বিফল সাধনা।

রাজা। আর নয় নটরাজ, বিরহের পালাটাই বড়ো বেশি হয়ে উঠল, ওজন ঠিক থাকছে না।

নটরাজ। মহারাজ, রসের ওজন আয়তনে নয়। সমস্ত গাছ একদিকে, একটি ফুল একদিকে, তবু ওজন ঠিক থাকে। অসীম অন্ধকার একদিকে, একটি তারা একদিকে, তাতেও ওজনের ভুল হয় না। ভেবে দেখুন, এ সংসারে বিরহের সরোবর চারিদিকে ছলছল করছে, মিলনপদ্মটি তারই বুকের একটি দুর্লভ ধন।

রাজকবি। তাই না হয় হল কিন্তু অশ্রুবাষ্পের কুয়াশা ঘনিয়ে দিয়ে সেই পদ্মটিকে একেবারে লুকিয়ে ফেললে তো চলবে না।

নটরাজ। মিলনের আয়োজনও আছে। খুব বড়ো মিলন, অবনীর সঙ্গে গগনের। নাট্যাচার্য একবার শুনিয়ে দাও তো।

ধরণীর গগনের মিলনের ছন্দে
বাদল বাতাস মাতে মালতীর গন্ধে।
উৎসবসভা মাঝে
শ্রাবণের বীণা বাজে,
শিহরে শ্যামল মাটি প্রাণের আনন্দে।
দুই কূল আকুলিয়া অধীর বিভঙ্গে
নাচন উঠিল জেগে নদীর তরঙ্গে।
কাঁপিছে বনের হিয়া
বরষনে মুখরিয়া,
বিজলি ঝলিয়া উঠে নবঘন মন্দ্রে।

রাজা। আঃ, এতক্ষণে একটু উৎসাহ লাগল। থামলে চলবে না। দেখো না, তোমাদের মাদলওআলার হাত দুটো অস্থির হয়েছে, ওকে একটু কাজ দাও।

নটরাজ। বলি ও ওস্তাদ, ওই যে দলে দলে মেঘ এসে জুটল, ওরা যে খ্যাপার মতো চলেছে। ওদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলো না, একেবারে মৃদঙ্গ বাজিয়ে বুক ফুলিয়ে যাত্রা জমে উঠুক না সুরে কথায় মেঘে বিদ্যুতে ঝড়ে।

পথিক মেঘের দল জোটে ঐ শ্রাবণ-গগন-অঙ্গনে।
মন রে আমার, উধাও হয়ে নিরুদ্দেশের সঙ্গ নে।
দিক-হারানো দুঃসাহসে
সকল বাঁধন পড়ুক খসে,
কিসের বাধা ঘরের কোণের শাসন-সীমা লঙ্ঘনে।
বেদনা তোর বিজুলশিখা জ্বলুক অন্তরে;
সর্বনাশের করিস সাধন বজ্র-মন্তরে।
অজানাতে করবি গাহন,
ঝড় সে পথের হবে বাহন,
শেষ করে দিস আপনারে তুই প্রলয়রাতের ক্রন্দনে।

রাজকবি। ওই রে আবার ঘুরে ফিরে এলেন সেই 'অজানা' সেই তোমার 'নিরুদ্দেশ'। মহারাজ, আর দেরি নেই, আবার কান্না নামল বলে।

নটরাজ। ঠিক ঠাউরেছ। বোধ হচ্ছে চোখের জলেরই জিত। বর্ষার রাতে সাথিহারার স্বপ্নে অজানা বন্ধু ছিলেন অন্ধকার ছায়ায় স্বপ্নের মতো; আজ বুঝি বা শ্রাবণের প্রাতে চোখের জলে ধরা দিলেন। মধুরিকা, ভৈরবীতে করুণ সুর লাগাও, তিনি তোমার হৃদয়ে কথা কবেন।

বন্ধু, রহো রহো সাথে
আজি এ সঘন শ্রাবণপ্রাতে।
ছিলে কি মোর স্বপনে
সাথিহারা রাতে।
বন্ধু, বেলা বৃথা যায় রে
আজি এ বাদলে আকুল হাওয়ায় রে।
কথা কও মোর হৃদয়ে
হাত রাখো হাতে।

রাজা। কান্না হাসি বিরহ মিলন সব রকমই তো খণ্ড খণ্ড করে হল, এইবার বর্ষার একটা পরিপূর্ণ মূর্তি দেখাও দেখি।

নটরাজ। ভালো কথা মনে করিয়ে দিলেন মহারাজ। নাট্যাচার্য, তবে ওইটে শুরু করো।

ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে,
জলসিঞ্চিত ক্ষিতি-সৌরভ-রভসে,
ঘনগৌরবে নবযৌবনা বরষা,
শ্যাম গম্ভীর সরসা।
গুরু গর্জনে নীল অরণ্য শিহরে
উতলা কলাপী কেকা-কলরবে বিহরে;
নিখিল-চিত্ত-হরষা
ঘনগৌরবে আসিছে মত্ত বরষা।
কোথা তোরা অয়ি তরুণী পথিক-ললনা,
জনপদবধূ তড়িৎ-চকিত-নয়না.
মালতী-মালিনী কোথা প্রিয়-পরিচারিকা,
কোথা তোরা অভিসারিকা।

ঘনবনতলে এস ঘননীলবসনা,
ললিত নৃত্যে বাজুক স্বর্ণরশনা,
আনো বীণা মনোহারিকা।
কোথা বিরহিণী, কোথা তোরা অভিসারিকা।
আনো মৃদঙ্গ, মুরজ, মুরলী মধুরা,
বাজাও শঙ্খ, হুলুরব করো বধূরা,
এসেছে বরষা, ওগো নব অনুরাগিণী,
ওগো প্রিয়সুখভাগিনী।
কুঞ্জকুটিরে, অয়ি ভাবাকুললোচনা,
ভূর্জপাতায় করো নবগীত রচনা
মেঘমল্লার রাগিণী।
এসেছে বরষা, ওগো নব অনুরাগিণী।
কেতকীকেশরে কেশপাশ করো সুরভি,
ক্ষীণ কটিতটে গাঁথি লয়ে পরো করবী,
কদম্বরেণু বিছাইয়া দাও শয়নে,
অঞ্জন আঁকো নয়নে।
তালে তালে দুটি কঙ্কণ কনকনিয়া,
ভবনশিখীরে নাচাও গনিয়া গনিয়া
স্মিত-বিকসিত বয়নে;
কদম্বরেণু বিছাইয়া ফুল-শয়নে।
এসেছে বরষা, এসেছে নবীনা বরষা,
গগন ভরিয়া এসেছে ভুবন-ভরসা,
দুলিছে পবনে সন সন বনবীথিকা,
গীতময় তরুলতিকা।
শতেক যুগের কবিদলে মিলি আকাশে
ধ্বনিয়া তুলিছে মত্তমদির বাতাসে
শতেক যুগের গীতিকা,
শত শত গীত-মুখরিত বনবীথিকা।

রাজা। বাঃ, বেশ জমেছে। আমি বলি আজকের মতো বাদলের পালাই চলুক।

নটরাজ। কিন্তু মহারাজ দেখছেন না, মেঘে মেঘে পালাই-পালাই ভাব। শেষ

কেয়াফুলের গন্ধে বিদায়ের সুর ভিজে হাওয়ায় ভরে উঠল। ওই যে 'এবার আমার গেল বেলা' বলে কেতকী।

একলা বসে বাদলশেষে শুনি কত কী।
'এবার আমার গেল বেলা' বলে কেতকী।
বৃষ্টি-সারা মেঘ যে তারে
ডেকে গেল আকাশপারে,
তাই তো সে যে উদাস হল
নইলে যেত কি।
ছিল সে যে একটি ধারে বনের কিনারায়,
উঠত কেঁপে তড়িৎ-আলোর চকিত ইশারায়।
শ্রাবণ-ঘন অন্ধকারে
গন্ধ যেত অভিসারে,
সন্ধ্যাতারা আড়াল থেকে
খবর পেত কি।

রাজা। নটরাজ, বাদলকে বিদায় দেওয়া চলবে না। মনটা বেশ ভরে উঠেছে।

নটরাজ। তাহলে কবির সঙ্গে বিরোধ বাধবে। তাঁর পালায় বর্ষা এবার যাব যাব করছে।

রাজা। তুমি তো দেখি বিদ্রোহী দলের একজন, কবির কথাই মান, রাজার কথা মান না? আমি যদি বলি যেতে দেব না?

নটরাজ। তাহলে আমিও তাই বলব। কবিও তাই বলবে। ওগো রেবা, ওগো করুণিকা, বাদলের শ্যামল ছায়া কোন্ লজ্জায় পালাতে চায়?

নাট্যাচার্য। নটরাজ, ও বলছে ওর সময় গেল।

নটরাজ। গেলই বা সময়। কাজের সময় যখন যায় তখনই তো শুরু হয় অকাজের খেলা। শরতের আলো আসবে ওর সঙ্গে খেলতে। আকাশে হবে আলোয় কালোয় যুগল মিলন।

শ্যামল শোভন শ্রাবণ-ছায়া, নাই বা গেলে
সজল বিলোল আঁচল মেলে।
পুব হাওয়া কয়, 'ওর যে সময় গেল চলে',
শরৎ বলে, 'ভয় কী সময় গেল বলে,

বিনা কাজে আকাশ মাঝে কাটবে বেলা
অসময়ের খেলা খেলে"।
কালো মেঘের আর কি আছে দিন।
ও যে হল সাথিহীন।
পুব হাওয়া কয়, "কালোর এবার যাওয়াই ভালো",
শরৎ বলে, "মিলবে যুগল কালোয় আলো,
সাজবে বাদল সোনার সাজে আকাশ মাঝে
কালিমা ওর ঘুচিয়ে ফেলে"।

নটরাজ। শরতের প্রথম প্রত্যূষে ওই যে শুকতারা দেখা দিল অন্ধকারের প্রান্তে। মহারাজ দয়া করবেন, কথা কবেন না।

রাজা। নটরাজ, তুমিও তো কথা কইতে কসুর কর না।

নটরাজ। আমার কথা যে পালারই অঙ্গ।

রাজা। আর আমার হল তার বাধা। তোমার যদি হয় জলের ধারা, আমার না হয় হল নুড়ি, দুইয়ে মিলেই তো ঝরনা। সৃষ্টিতে বাধা যে প্রকাশেরই অঙ্গ। যে বিধাতা রসিকের সৃষ্টি করেছেন অরসিক তাঁরই সৃষ্টি, সেটা রসেরই প্রয়োজনে।

নটরাজ। এবার বুঝেছি আপনি ছদ্মরসিক, বাধার ছলে রস নিংড়ে বের করেন। আর আমার ভয় রইল না। গীতাচার্য গান ধরো।

দেখো শুকতারা আঁখি মেলি চায়
প্রভাতের কিনারায়।
ডাক দিয়েছে রে শিউলি ফুলেরে
আয় আয় আয়।
ও যে কার লাগি জ্বালে দীপ,
কার ললাটে পরায় টিপ,
ও যে কার আগমনী গায়—
আয় আয় আয়।
জাগো জাগো, সখী,
কাহার আশায় আকাশ উঠিল পুলকি।
মালতীর বনে বনে
ওই শুন ক্ষণে ক্ষণে
কহিছে শিশিরবায়
আয় আয় আয়।

নটরাজ। ওই দেখুন শুকতারার ডাক পৃথিবীর বনে পৌঁছেছে। আকাশের আলোকের যে লিপি সেই লিপিটিকে ভাষান্তরে লিখে দিল ওই শেফালি। সে লেখার শেষ নেই, তাই বারে বারেই অশ্রান্ত ঝরা আর ফোটা। দেবতার বাণীকে যে এনেছে মর্ত্যে, তার ব্যথা কজন বোঝে? সেই করুণার গান সন্ধ্যার সুরে তোমরা ধরো।

ওগো শেফালি,
সবুজ ছায়ার প্রদোষে তুই জ্বালিস দীপালি।
তারার বাণী আকাশ থেকে
তোমার রূপে দিল এঁকে
শ্যামল পাতায় থরে থরে আখর রুপালি।
বুকের খসা গন্ধ-আঁচল রইল পাতা সে
কাননবীথির গোপন কোণের বিবশ বাতাসে।
সারাটা দিন বাটে বাটে
নানা কাজে দিবস কাটে,
আমার সাঁঝে বাজে তোমার করুণ ভূপালি।

রাজা। নটরাজ, অমন শুকতারাতে শেফালিতে ভাগ করে করে শরৎকে দেখাবে কেমন করে?

নটরাজ। আর দেরি নেই, কবি ফাঁদ পেতেছে। যে মাধুরী হাওয়ায় হাওয়ায় আভাসে ভেসে বেড়ায় সেই ছায়ারূপটিকে ধরেছে কবি আপন গানে। সেই ছায়ারূপিণীর নূপুর বাজল, কঙ্কণ চমক দিল কবির সুরে, সেই সুরটিকে তোমাদের কণ্ঠে জাগাও তো।

যে-ছায়ারে ধরব বলে করেছিলেম পণ
আজ সে মেনে নিল আমার গানেরি বন্ধন।
আকাশে যার পরশ মিলায়
শরৎ মেঘের ক্ষণিক লীলায়
আপন সুরে আজ শুনি তার নূপুরগুঞ্জন।
অলস দিনের হাওয়ায়
গন্ধখানি মেলে যেত গোপন আসাযাওয়ায়।
আজ শরতের ছায়ানটে
মোর রাগিণীর মিলন ঘটে
সেই মিলনের তালে তালে বাজায় সে কঙ্কণ।

নটরাজ। শুভ্র শান্তির মূর্তি ধরে এইবার আসুন শরৎশ্রী। সজল হাওয়ার দোল

থেমে যাক—আকাশে আলোক-শতদলের উপর তিনি চরণ রাখুন, দিকে দিগন্তে সে বিকশিত হয়ে উঠুক।

এস শরতের অমল মহিমা,
এস হে ধীরে।
চিত্ত বিকাশিবে চরণ ঘিরে।
বিরহ-তরঙ্গে অকূলে সে যে দোলে
দিবাযামিনী আকুল সমীরে।

বাদললক্ষ্মীর প্রবেশ

রাজা। ও কী হল নটরাজ, সেই বাদললক্ষ্মীই তো ফিরে এলেন; মাথায় সেই অবগুণ্ঠন। রাজার মানই তো রইল, কবি তো শরৎকে আনতে পারলেন না।

নটরাজ। চিনতে সময় লাগে মহারাজ। ভোররাত্রিকেও নিশীথরাত্রি বলে ভুল হয়। কিন্তু ভোরের পাখির কাছে কিছুই লুকোনো থাকে না; অন্ধকারের মধ্যেই সে আলোর গান গেয়ে ওঠে। বাদলের ছলনার ভিতর থেকেই কবি শরৎকে চিনেছে, তাই আমন্ত্রণের গান ধরল।

ওগো শেফালিবনের মনের কামনা,
কেন সুদূর গগনে গগনে
আছ মিলায়ে পবনে পবনে
কেন কিরণে কিরণে ঝলিয়া
যাও শিশিরে শিশিরে গলিয়া
কেন চপল আলোতে ছায়াতে
আছ লুকায়ে আপন মায়াতে
তুমি মুরতি ধরিয়া চকিতে নামো না।
আজি মাঠে মাঠে চলো বিহরি,
তৃণ উঠুক শিহরি শিহরি।
নামো তালপল্লববীজনে,
নামো জলে ছায়াছবি সৃজনে,
এস সৌরভ ভরি আঁচলে,
আঁখি আঁকিয়া সুনীল কাজলে,
মম চোখের সমুখে ক্ষণেক থামো না॥

ওগো সোনার স্বপন সাধের সাধনা।
কত আকুল হাসি ও রোদনে,
রাতে দিবসে স্বপনে বোধনে,
জ্বালি' জোনাকি প্রদীপ-মালিকা,
ভরি নিশীথ-তিমির থালিকা,
প্রাতে কুসুমের সাজি সাজায়ে,
সাঁঝে ঝিল্লি-ঝাঁঝর বাজায়ে,
কত করেছে তোমার স্তুতি-আরাধনা।
ওগো সোনার স্বপন, সাধের সাধনা।
ওই বসেছ শুভ্র আসনে
আজি নিখিলের সম্ভাষণে।
আহা শ্বেতচন্দনতিলকে
আজি তোমারে সাজায়ে দিল কে?
আহা বরিল তোমারে কে আজি
তার দুঃখ-শয়ন তেয়াজি',
তুমি ঘুচালে কাহার বিরহ-কাঁদনা।

নটরাজ। প্রিয়দর্শিকা, সময় হয়েছে, এইবার বাদললক্ষ্মীর অবগুণ্ঠন খুলে দেখো। চিনতে পারবে সেই ছদ্মবেশিনীই শরৎপ্রতিমা। বর্ষার ধারায় যাঁর কণ্ঠ গদগদ, শিউলি-বনে তাঁরই গান, মালতী বিতানে তাঁরই বাঁশির ধ্বনি।

এবার অবগুণ্ঠন খোলো।
গহন মেঘমায়ায় বিজন বনছায়ায়
তোমার আলসে অবলুণ্ঠন সারা হল।
শিউলি-সুরভি রাতে
বিকশিত জ্যোৎস্নাতে
মৃদু মর্মর গানে তব মর্মের বাণী ব'লো।
গোপন অশ্রুজলে মিলুক শরম-হাসি—
মালতীবিতানতলে বাজুক বঁধুর বাঁশি।
শিশিরসিক্ত বায়ে
বিজড়িত আলোছায়ে
বিরহমিলনে গাঁথা নব প্রণয়দোলায় দোলো। [অবগুণ্ঠন মোচন

নটরাজ। অবগুণ্ঠন তো খুলল। কিন্তু এ কী দেখলুম। এ কি রূপ, না বাণী? এ কি আমার মনেরই মধ্যে, না আমার চোখেরই সামনে?

তোমার নাম জানিনে সুর জানি।
তুমি শরৎপ্রাতের আলোর বাণী।
সারাবেলা শিউলিবনে
আছি মগন আপন মনে,
কিসের ভুলে রেখে গেলে
আমার বুকে ব্যথার বাঁশিখানি।
আমি যা বলিতে চাই হল বলা,
ওই শিশিরে শিশিরে অশ্রুগলা।
আমি যা দেখিতে চাই প্রাণের মাঝে
সেই মুরতি এই বিরাজে,
ছায়াতে আলোতে আঁচল গাঁথা
আমার অকারণ বেদনার বীণাপাণি।

রাজা। শরৎশ্রী কাকে ইশারা করে ডাকছে? বলো তো এবার কে আসবে?

নটরাজ। উনি ডাকছেন সুন্দরকে। যা ছিল ছায়ার কুঁড়ি তা ফুটল আলোর ফুলে। গানের ভিতর দিয়ে তাকিয়ে দেখুন।

সুন্দরের প্রবেশ

কার বাঁশি নিশিভোরে বাজিল মোর প্রাণে?
ফুটে দিগন্তে অরুণ-কিরণ-কলিকা।
শরতের আলোতে সুন্দর আসে,
ধরণীর আঁখি যে শিশিরে ভাসে
হৃদয়কুঞ্জবনে মঞ্জরিল
মধুর শেফালিকা।

রাজা। নটরাজ, শরৎলক্ষ্মীর সহচরটি এরই মধ্যে চঞ্চল হয়ে উঠলেন কেন?

নটরাজ। শিশির শুকিয়ে যায়, শিউলি ঝরে পড়ে, আশ্বিনের সাদা মেঘ আলোয় যায় মিলিয়ে। ক্ষণিকের অতিথি স্বর্গ থেকে মর্ত্যে আসেন। কাঁদিয়ে দিয়ে চলে যান। এই যাওয়াআসায় স্বর্গমর্ত্যের মিলনপথ বিরহের ভিতর দিয়ে খুলে যায়।

হে ক্ষণিকের অতিথি,
এলে প্রভাতে কারে চাহিয়া,
ঝরা শেফালির পথ বাহিয়া।
কোন্ অমরার বিরহিণীরে
চাহনি ফিরে,
কার বিষাদের শিশিরনীরে
এলে নাহিয়া।
ওগো অকরুণ, কী মায়া জান,
মিলনছলে বিরহ আন।
চলেছ পথিক আলোক-যানে
আঁধারপানে,
মন-ভুলানো মোহন তানে
গান গাহিয়া।

নটরাজ। এইবার কবির বিদায় গান। বাঁশি হবে নীরব। যদি কিছু বাকি থাকে সে থাকবে স্মরণের মধ্যে।

আমার রাত পোহাল শারদ প্রাতে।
বাঁশি, তোমায় দিয়ে যাব কাহার হাতে।
তোমার বুকে বাজল ধ্বনি
বিদায়গাথা, আগমনী, কত যে,
ফাল্গুনে শ্রাবণে, কত প্রভাতে রাতে।
যে কথা কয় প্রাণের ভিতর অগোচরে
গানে গানে নিয়েছিলে চুরি করে।
সময় যে তার হল গত
নিশিশেষের তারার মতো
তারে শেষ করে দাও শিউলিফুলের মরণ সাথে।

রাজা। ও কী। একেবারে শেষ হয়ে গেল নাকি? কেবল দুদণ্ডের জন্যে গান বাঁধা হল, গান সারা হল! এত সাধনা, এত আয়োজন, এত উৎকণ্ঠা—তার পরে?

নটরাজ। 'তার পরে' প্রশ্নের উত্তর নেই সব চুপ। এই তো সৃষ্টির লীলা এ তো কৃপণের পুঁজি নয়। এ যে আনন্দের অমিতব্যয়। মুকুল ধরেও যেমন ঝরেও তেমনি। বাঁশিতে যদি গান বেজে থাকে সেই তো চরম। তার পরে? কেউ চুপ করে শোনে,

কেউ গলা ছেড়ে তর্ক করে। কেউ মনে রাখে, কেউ ভোলে, কেউ ব্যঙ্গ করে। তাতে কী আসে যায়?

গান আমার যায় ভেসে যায়,
চাসনে ফিরে দে তারে বিদায়।
সে যে দখিন হাওয়ায় মুকুল ঝরা,
ধুলার আঁচল হেলায় ভরা,
সে যে শিশিরফোঁটার মালা গাঁথা বনের আঙিনায়।
কাঁদন-হাসির আলোছায়া সারা অলস বেলা,
মেঘের গায়ে রঙের মায়া খেলার পরে খেলা
ভুলে যাওয়ার বোঝাই ভরি
গেল চলে কতই তরী
উজানবায়ে ফেরে যদি কে রয় সে আশায়।

রাজা। উত্তম হয়েছে।

রাজকবি। আরও অনেক উত্তম হতে পারত।

নটীর পূজা

নাট্যোল্লিখিত পাত্রীগণ

লোকেশ্বরী	রাজমহিষী, মহারাজ বিম্বিসারের পত্নী
মল্লিকা	মহারানী লোকেশ্বরীর সহচরী
বাসবী, নন্দা, রত্নাবলী, অজিতা, ভদ্রা	রাজকুমারীগণ
উৎপলপর্ণা	বৌদ্ধ ভিক্ষুণী
শ্রীমতী	বৌদ্ধধর্মরতা নটী
মালতী	বৌদ্ধধর্মানুরাগিণী পল্লীবালা, শ্রীমতীর সহচরী
রাজকিংকরী ও রক্ষিণীগণ	

সূচনা

ভিক্ষু উপালির প্রবেশ

গান

পূর্বগগনভাগে
দীপ্ত হইল সুপ্রভাত
তরুণারুণরাগে।
শুভ্র শুভ মুহূর্ত আজি
সার্থক কর রে,
অমৃতে ভর রে
অমিত পুণ্যভাগী কে
জাগে, কে জাগে।

কে আছ? ভিক্ষা চাই, ভগবান বুদ্ধের নামে ভিক্ষা আমার।

নটীর প্রবেশ ও প্রণাম

শুভম্ভবতু কল্যাণম্। বৎসে, তুমি কে?

নটী। আমি এই রাজবাড়ির নটী।

উপালি। এই পুরীতে আজ একা কেবল তুমিই জেগে?

নটী। রাজকন্যারা সকলেই ঘুমিয়ে আছেন।

উপালি। ভগবান বুদ্ধের নামে ভিক্ষা চাই।

নটী। প্রভু, অনুমতি করুন, রাজকন্যাদের ডেকে আনি।

উপালি। আজ তোমারই কাছে ভিক্ষা জানাতে এসেছি।

নটী। আমি যে অভাগী। প্রভুর ভিক্ষাপাত্রে আমার দান কুণ্ঠিত হবে। কী দেব অনুমতি করুন।

উপালি। তোমার যা শ্রেষ্ঠ দান।

নটী। আমার মধ্যে শ্রেষ্ঠ কী সে তো আমি জানিনে।

উপালি। না, ভগবান তোমাকে দয়া করেছেন, তিনি জানেন।

নটী। প্রভু, তাহলে তিনি স্বয়ং তুলে নিন যা আছে আমার।

উপালি। তাই নেবেন, তোমার পূজায় ফুল। ঋতুরাজ বসন্ত যেমন করে পুষ্পবনের আত্মদানকে আপনিই জাগিয়ে তোলেন। তোমার সেইদিন এসেছে আমি তোমাকে জানিয়ে গেলুম। তুমি ভাগ্যবতী।

নটী। আমি অপেক্ষা করে থাকব। [প্রস্থান

রাজকন্যাদের প্রবেশ

প্রভু, ভিক্ষা নিয়ে যান। ফিরে যাবেন না, ফিরে যাবেন না। এ কী হল? চলে গেলেন?

রত্নাবলী। ভয় কী তোমাদের, বাসবী? ভিক্ষা নেবার লোকের অভাব নেই— ভিক্ষা দেবার লোকই কম।

নন্দা। না রত্না, ভিক্ষা নেবার লোককেই সাধনা করে খুঁজে পেতে হয়। আজকের দিন ব্যর্থ হল। [প্রস্থান

নটীর পূজা

প্রথম অঙ্ক

মগধপ্রাসাদ কুঞ্জবনে

মহারানী লোকেশ্বরী, ভিক্ষুণী উৎপলপর্ণা

লোকেশ্বরী। মহারাজ বিম্বিসার আজ আমাকে স্মরণ করেছেন?

ভিক্ষুণী। হাঁ।

লোকেশ্বরী। আজ তাঁর অশোকচৈত্যে পূজা আয়োজনের দিন— সেইজন্যেই বুঝি?

ভিক্ষুণী। আজ বসন্তপূর্ণিমা।

লোকেশ্বরী। পূজা? কার পূজা?

ভিক্ষুণী। আজ ভগবান বুদ্ধের জন্মোৎসব—তাঁর উদ্দেশে পূজা।

লোকেশ্বরী। আর্যপুত্রকে ব'লো গিয়ে আমার সব পূজা নিঃশেষে চুকিয়ে দিয়েছি। কেউ বা ফুল দেয় দীপ দেয়—আমি আমার সংসার শূন্য করে দিয়েছি।

ভিক্ষুণী। কী বলছ মহারানী?

লোকেশ্বরী। আমার একমাত্র ছেলে, চিত্র—রাজপুত্র আমার,— তাকে ভুলিয়ে নিয়ে গেল ভিক্ষু করে। তবু বলে পূজা দাও। লতার মূল কেটে দিলে তবু চায় ফুলের মঞ্জরী।

ভিক্ষুণী। যাকে দিয়েছ তাকে হারাওনি। কোলে যাকে পেয়েছিলে আজ বিশ্বে তাকেই পেয়েছ।

লোকেশ্বরী। নারী, তোমার ছেলে আছে?

ভিক্ষুণী। না।

লোকেশ্বরী। কোনোদিন ছিল?

ভিক্ষুণী। না। আমি প্রথমবয়সেই বিধবা।

লোকেশ্বরী। তাহলে চুপ করো। যে-কথা জান না সে-কথা ব'লো না।

ভিক্ষুণী। মহারানী, সত্যধর্মকে তুমিই তো রাজান্তঃপুরে সকলের প্রথমে আহ্বান করে এনেছিলে? তবে কেন আজ—

লোকেশ্বরী। আশ্চর্য—মনে আছে তো দেখি! ভেবেছিলেম সে-কথা বুঝি তোমাদের গুরু ভুলে গিয়েছেন। ভিক্ষু ধর্মরুচিকে ডাকিয়ে প্রতিদিন কল্যাণপঞ্চবিংশতিকা পাঠ করিয়ে তবে জল গ্রহণ করেছি, এক-শ ভিক্ষুকে অন্ন দিয়ে তবে ভাঙত আমার উপবাস, প্রতিবৎসর বর্ষার শেষে সমস্ত সংঘকে ত্রিচীবর বস্ত্র দেওয়া ছিল আমার ব্রত। বুদ্ধের ধর্মবৈরী দেবদত্তের উপদেশে যেদিন এখানে সকলেরই মন টলমল, একা আমি অবিচলিত নিষ্ঠায় ভগবান তথাগতকে এই উদ্যানের অশোকতলায় বসিয়ে সকলকে ধর্মতত্ত্ব শুনিয়েছি। নিষ্ঠুর, অকৃতজ্ঞ, শেষে এই পুরস্কার আমারই! যে-মহিষীরা বিদ্বেষে জ্বলেছিল, আমার অন্নে বিষ মিশিয়েছে যারা, তাদের তো কিছুই হল না, তাদের ছেলেরা তো রাজভোগে আছে।

ভিক্ষুণী। সংসারের মূল্যে ধর্মের মূল্য নয় মহারানী। সোনার দাম আর আলোর দাম কি এক?

লোকেশ্বরী। যেদিন দেবদত্তের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন কুমার অজাতশত্রু, আমি নির্বোধ সেদিন হেসেছিলেম। ভেবেছিলেম ভাঙা ভেলায় এরা সমুদ্র পার হতে চায়। দেবদত্তের শক্তির জোরে পিতা থাকতেই রাজা হবেন এই ছিল তাঁর আশা। আমি নির্ভয়ে সগর্বে বললেম, দেবদত্তের চেয়েও যে-গুরুর পুণ্যের জোর বেশি তাঁর প্রসাদে অমঙ্গল কেটে যাবে। এত বিশ্বাস ছিল আমার। ভগবান বুদ্ধকে—শাক্যসিংহকে—আনিয়ে তাঁকে দিয়ে আর্যপুত্রকে আশীর্বাদ করালেম। তবু জয় হল কার?

ভিক্ষুণী। তোমারই। সেই জয়কে অন্তর থেকে বাইরে ফিরিয়ে দিয়ো না।

লোকেশ্বরী। আমারই!

ভিক্ষুণী। নয় তো কী! পুত্রের রাজ্যলোভ দেখে মহারাজ বিম্বিসার স্বেচ্ছায় যেদিন সিংহাসন ছেড়ে দিতে পারলেন সেদিন তিনি যে রাজ্য জয় করেছিলেন—

লোকেশ্বরী। সে রাজ্য মুখের কথা, ক্ষত্রিয় রাজার পক্ষে সে বিদ্রূপ। আর আমার দিকে তাকাও দেখি। আমি আজ স্বামীসত্ত্বে বিধবা, পুত্রসত্ত্বে পুত্রহীনা, প্রাসাদের মাঝখানে থেকেও নির্বাসিতা। এটা তো মুখের কথা নয়। যারা তোমাদের ধর্ম কোনো দিন মানেনি তারা আজ আমাকে দেখে অবজ্ঞায় হেসে চলে যাচ্ছে। তোমরা যাঁকে বল শ্রীবজ্রসত্ত্ব, আজ কোথায় তিনি—পড়ুক না তাঁর বজ্র এদের মাথায়।

ভিক্ষুণী। মহারানী, এর মধ্যে সত্য আছে কোথায়। এ তো ক্ষণকালের স্বপ্ন—যাক না ওরা হেসে।

লোকেশ্বরী। স্বপ্ন বটে! তা এই স্বপ্নটা আমি চাইনে। আমি চাই অন্য স্বপ্নটা,

যাকে বলে বিত্ত, যাকে বলে পুত্র, যাকে বলে মান। সেই স্বপ্নে বিকশিত হয়ে ওইদিকে যাঁরা মাথা উঁচু করে বেড়াচ্ছেন, বলো না তাঁদের গিয়ে পুজো দিন না তাঁরা।

ভিক্ষুণী। যাই তবে।

লোকেশ্বরী। যাও, কিন্তু আমার মতো নির্বোধ নয় ওরা। ওদের কিছুই হারাবে না, সবই থাকবে,—ওরা তো বুদ্ধকে মানেনি, শাক্যসিংহের দয়া তো ওদের উপর পড়েনি, তাই বেঁচে গেল, বেঁচে গেল ওরা। অমন স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছ কেন? ধৈর্যের ভান করতে শিখেছ?

ভিক্ষুণী। কেমন করে বলব? এখনো ভিতরে ভিতরে ধৈর্য ভঙ্গ হয়।

লোকেশ্বরী। ধৈর্য ভঙ্গ হয় তবু মনে মনে কেবল আমাদের ক্ষমাই করছ। তোমাদের এই নীরব স্পর্ধা অসহ্য। যাও। [ভিক্ষুণীর প্রস্থানোদ্যম

শোনো শোনো, ভিক্ষুণী। চিত্র কী একটা নতুন নাম নিয়েছে। জান তুমি?

ভিক্ষুণী। জানি, কুশলশীল।

লোকেশ্বরী। যে-নামে তার মা তাকে ডেকেছে সেটা আজ তার কাছে অশুচি! তাই ফেলে দিয়ে চলে গেল।

ভিক্ষুণী। মহারানী যদি ইচ্ছা কর তাঁকে একদিন তোমার কাছে আনতে পারি।

লোকেশ্বরী। আমি ইচ্ছা করতে যাব কোন্ লজ্জায়। আর আজ তুমি আনবে তাকে আমার কাছে, যে প্রথম এনেছে তাকে এই পৃথিবীতে!

ভিক্ষুণী। তবে আদেশ করো আমি যাই।

লোকেশ্বরী। একটু থামো। তোমার সঙ্গে তার দেখা হয়?

ভিক্ষুণী। হয়।

লোকেশ্বরী। আচ্ছা, একবার না হয় তাকে—যদি সে—না, থাক্।

ভিক্ষুণী। আমি তাঁকে বলব। হয়তো তাঁর সঙ্গে তোমার দেখা হবে। [প্রস্থান

লোকেশ্বরী। হয়তো, হয়তো, হয়তো! নাড়ীর রক্ত দিয়ে তাকে তো পালন করেছিলাম, তার মধ্যে 'হয়তো' ছিল না। এতদিনের সেই মাতৃঋণের দাবি আজ এই একটুখানি হয়তো-য় এসে ঠেকল। একেই বলে ধর্ম! মল্লিকা।

মল্লিকার প্রবেশ

মল্লিকা। দেবী।

লোকেশ্বরী। কুমার অজাতশত্রুর সংবাদ পেলে?

মল্লিকা। পেয়েছি। দেবদত্তকে আনতে গেছেন। এ-রাজ্যে ত্রিরত্ন-পূজার কিছুই বাকি থাকবে না।

লোকেশ্বরী। ভীরু! রাজার সাহস নেই রাজত্ব করতে। বুদ্ধ-ধর্মের কত যে শক্তি তার প্রমাণ তো আমার উপর দিয়ে হয়ে গেছে। তবু ওই অপদার্থ দেবদত্তের আড়ালে না দাঁড়িয়ে এই মিথ্যাকে উপেক্ষা করতে ভরসা হল না।

মল্লিকা। মহারানী যাদের অনেক আছে তাদেরই অনেক আশঙ্কা। উনি রাজ্যেশ্বর, তাই ভয়ে ভয়ে সকল শক্তির সঙ্গেই সন্ধির চেষ্টা। বুদ্ধশিষ্যের সমাদর যখন বেশি হয়ে যায় অমনি উনি দেবদত্ত শিষ্যদের ডেকে এনে তাদের আরও বেশি সমাদর করেন। ভাগ্যকে দুই দিক থেকেই নিরাপদ করতে চান।

লোকেশ্বরী। আমার ভাগ্য একেবারে নিরাপদ। আমার কিছুই নেই, তাই মিথ্যাকে সহায় করবার দুর্বলবুদ্ধি ঘুচে গেছে।

মল্লিকা। দেবী, ভিক্ষুণী উৎপলপর্ণার মতোই তোমার এ-কথা। তিনি বলেন, লোকেশ্বরী মহারানীর ভাগ্য ভালো, মিথ্যা যে সব খোঁটায় মানুষকে বাঁধে, ভগবান মহাবোধির কৃপায় সেই সব খোঁটাই তাঁর ভেঙে গেছে।

লোকেশ্বরী। দেখো ওই সব বানানো কথা শুনলে আমার রাগ ধরে। তোমাদের অতিনির্মল ফাঁকা সত্য নিয়ে তোমরা থাকো, আমার ওই মাটিতে মাথা খুঁটি কটা আমাকে ফিরিয়ে দাও। তাহলে আবার না হয় অশোকচৈত্যে দীপ জ্বালব, এক-শ শ্রমণকে অন্ন দেব, ওদের যত মন্ত্র আছে সব একধার থেকে আবৃত্তি করিয়ে যাব। আর তা যদি না হয় তো আসুন দেবদত্ত, তা তিনি সাঁচ্চাই হ'ন আর ঝুঁটোই হ'ন। যাই, একবার প্রাসাদ শিখরে গিয়ে দেখিগে এঁরা কতদূরে। [উভয়ের প্রস্থান

বীণা হস্তে শ্রীমতীর প্রবেশ

শ্রীমতী। (লতাবিতানতলে আসন বিছাইয়া, দূরে চাহিয়া) সময় হল, এস তোমরা।

আপন মনে গান

নিশীথে কী কয়ে গেল মনে,
কী জানি কী জানি।
সে কি ঘুমে সে কি জাগরণে,
কী জানি কী জানি।

মালতীর প্রবেশ

মালতী। তুমি শ্রীমতী?

শ্রীমতী। হাঁ গো, কেন বলো তো।

মালতী। প্রতিহারী পাঠিয়ে দিলে তোমার কাছে গান শিখতে।

শ্রীমতী। প্রাসাদে তোমাকে তো পূর্বে কখনো দেখিনি।

মালতী। নতুন এসেছি গ্রাম থেকে, আমার নাম মালতী।

শ্রীমতী। কেন এলে বাছা? সেখানে কি দিন কাটছিল না? ছিলে পূজার ফুল, দেবতা ছিলেন খুশি; হবে ভোগের মালা, উপদেবতা হাসবে। ব্যর্থ হবে তোমার বসন্ত। গান শিখতে এসেছ? এইটুকু তোমার আশা?

মালতী। সত্যি বলব? তার চেয়ে অনেক বড়ো আশা। বলতে সংকোচ হয়।

শ্রীমতী। ও, বুঝেছি। রাজরানী হবার দুরাশা। পূর্বজন্মে যদি অনেক দুষ্কৃতি করে থাক তো হতেও পার। বনের পাখি সোনার খাঁচা দেখে লোভ করে, যখন তার ডানায় চাপে দুষ্টবুদ্ধি। যাও, যাও, ফিরে যাও, এখনো সময় আছে।

মালতী। কী তুমি বলছ, দিদি, ভালো বুঝতে পারছিনে।

শ্রীমতী। আমি বলছি—

গান

বাঁধন কেন ভূষণবেশে তোরে ভোলায়,
হায় অভাগী।
মরণ কেন মোহন হেসে তোরে দোলায়,
হায় অভাগী।

মালতী। তুমি আমাকে কিছুই বোঝনি। তবে স্পষ্ট করে বলি। শুনেছি একদিন ভগবান বুদ্ধ বসেছিলেন এই আরাম-বনে অশোকতলায়। মহারাজ বিম্বিসার সেইখানেই নাকি বেদী গড়ে দিয়েছেন।

শ্রীমতী। হাঁ, সত্য।

মালতী। রাজবাড়ির মেয়েরা সন্ধ্যাবেলায় সেখানে পূজা দেন।—আমার যদি সে অধিকার না থাকে আমি সেখানে ধুলা ঝাঁট দেব এই আশা করে এখানে গায়িকার দলে ভরতি হয়েছি।

শ্রীমতী। এস এস বোন, ভালো হল। রাজকন্যাদের হাতে পূজার দীপে ধোঁওয়া দেয় বেশি, আলো দেয় কম। তোমার নির্মল হাতদুখানির জন্যে অপেক্ষা ছিল। কিন্তু এ কথা তোমাকে মনে করিয়ে দিলে কে?

মালতী। কেমন করে বলব, দিদি। আজ বাতাসে বাতাসে যে আগুনের মতো কী এক মন্ত্র লেগেছে। সেদিন আমার ভাই গেল চলে। তার বয়স আঠারো। হাত ধরে জিজ্ঞাসা করলেম, "কোথায় যাচ্ছিস ভাই", সে বললে, "খুঁজতে।"

শ্রীমতী। নদীর সব ঢেউকেই সমুদ্র আজ একডাকে ডেকেছে। পূর্ণচাঁদ উঠল।— এ কী। তোমার হাতে যে আংটি দেখি। কেমন লাগছে যে। স্বর্গের মন্দারকুঁড়ি তো ধুলোর দামে বিকিয়ে গেল না?

মালতী। তবে খুলে বলি—তুমি সব কথা বুঝবে।

শ্রীমতী। অনেক কেঁদে বোঝবার শক্তি হয়েছে।

মালতী। তিনি ধনী, আমরা দরিদ্র। দূর থেকে চুপ করে তাঁকে দেখেছি। একদিন নিজে এসে বললেন "মালতীকে আমার ভালো লাগে।" বাবা বললেন, "মালতীর সৌভাগ্য।" সব আয়োজন সারা হল যেদিন এলেন তিনি দ্বারে। বরের বেশে নয় ভিক্ষুর বেশে। কাষায়বস্ত্র, হাতে দণ্ড। বললেন, "যদি দেখা হয় তো মুক্তির পথে, এখানে নয়।"—দিদি, কিছু মনে ক'রো না—এখনো চোখে জল আসছে, মন যে ছোটো।

শ্রীমতী। চোখের জল বয়ে যাক না। মুক্তিপথের ধুলো ওই জলে মরবে।

মালতী। প্রণাম করে বললেম, "আমার তো বন্ধন ক্ষয় হয়নি। যে আংটি পরাবে কথা দিয়েছিলে সেটি দিয়ে যাও।" এই সেই আংটি। ভগবানের আরতিতে এটি যেদিন আমার হাত থেকে তাঁর পায়ে খসে পড়বে সেইদিন মুক্তির পথে দেখা হবে।

শ্রীমতী। কত মেয়ে ঘর বেঁধেছিল, আজ তারা ঘর ভাঙল। কত মেয়ে চীবর পরে পথে বেরিয়েছে, কে জানে সে কি পথের টানে, না পথিকের টানে? কতবার হাত জোড় করে মনে মনে প্রার্থনা করি—বলি, "মহাপুরুষ, উদাসীন থেকো না। আজ ঘরে ঘরে নারীর চোখের জলে তুমিই বন্যা বইয়ে দিলে, তুমিই তাদের শান্তি দাও।" রাজবাড়ির মেয়েরা ওই আসছেন।

বাসবী নন্দা রত্নাবলী অজিতা মল্লিকা ভদ্রার প্রবেশ

বাসবী। এ মেয়েটি কে, দেখি দেখি। চুল চূড়া করে বেঁধেছে, অলকে দিয়েছে জবা। নন্দা, দেখে যাও, আকন্দের মালা দিয়ে বেণী কী করম উঁচু করে জড়িয়েছে। গলায় বুঝি কুঁচফলের হার? শ্রীমতী, এ কোথা থেকে এল?

শ্রীমতী। গ্রাম থেকে। ওর নাম মালতী।

রত্নাবলী। পেয়েছ একটি শিকার! ওকে শিষ্যা করবে বুঝি? আমাদের উদ্ধার করতে পারলে না, এখন গ্রামের মেয়ে ধরে মুক্তির ব্যবসা চালাবে!

শ্রীমতী। গ্রামের মেয়ের মুক্তির ভাবনা কী। ওখানে স্বর্গের হাতের কাজ ঢাকা পড়েনি—না ধুলায়, না মণিমাণিক্যে—স্বর্গ তাই আপনি ওদের চিনে নেয়।

রত্নাবলী। স্বর্গে যদি না যাই সেও ভালো কিন্তু তোমার উপদেশের জোরে যেতে চাইনে। গণেশের ইঁদুরের কৃপায় সিদ্ধিলাভ করতে আমার উৎসাহ নেই, বরঞ্চ যমরাজের মহিষটাকে মানতে রাজি আছি।

নন্দা। রত্না তোমার বাহন তো তৈরিই আছে,—লক্ষ্মীর পেঁচা। দেখো তো অজিতা, শ্রীমতীকে নিয়ে কেন বিদ্রূপ। ও তো উপদেশ দিতে আসে না।

বাসবী। ওর চুপ করে থাকাই তো রাশীকৃত উপদেশ। ওই দেখো না, চুপি চুপি হাসছে। ওটা কি উপদেশ হল না?

রত্নাবলী। মহৎ উপদেশ। অর্থাৎ কিনা, মধুরের দ্বারা কটুকে জয় করবে, হাস্যের দ্বারা ভাষ্যকে।

বাসবী। একটু ঝগড়া কর না কেন. শ্রীমতী? এত মধুর কি সহ্য হয়? মানুষকে লজ্জা দেওয়ার চেয়ে মানুষকে রাগিয়ে দেওয়া যে ঢের ভালো।

শ্রীমতী। ভিতরে তেমন ভালো যদি হতেম বাইরে মন্দর ভান করলে সেটা গায়ে লাগত না। কলঙ্কের ভান করা চাঁদকেই শোভা পায়। কিন্তু অমাবস্যা! সে যদি মেঘের মুখোশ পরে?

অজিতা। ওই দেখো, গ্রামের মেয়েটি অবাক হয়ে ভাবছে, রাজবাড়ির মেয়েগুলোর রসনায় রস নেই কেবল ধারই আছে। কী তোমার নাম ভুলে গেছি।

মালতী। মালতী।

অজিতা। কী ভাবছিলে বলো না।

মালতী। দিদিকে ভালোবেসেছি, তাই ব্যথা লাগছিল।

অজিতা। আমরা যাকে ভালোবাসি তাকেই ব্যথা দেবার ছল করি। রাজবাড়ির অলংকারশাস্ত্রের এই নিয়ম। মনে রেখো।

ভদ্রা। মালতী, কী একটা কথা যেন বলতে যাচ্ছিলে। বলেই ফেলো না। আমাদের তুমি কী ভাব জানতে ভারি কৌতূহল হয়।

মালতী। আমি বলতে চাচ্ছিলেম, "হাঁ গা, তোমরা নিজের কথা শুনতেই এত ভালোবাস, গান শোনবার সময় বয়ে যায়।"

সকলের উচ্চহাস্য

বাসবী। হাঁ গা, হাঁ গা। রাজবাড়ির ব্যাকরণচঞ্চুকে ডাকো, তাঁর শিক্ষা সম্বোধনের শেষ পর্যন্ত পৌঁছয়নি।

রত্নাবলী। হাঁ গা বাসবী, হাঁ গা রাজকুলমুকুটমণিমালিকা।

বাসবী। হাঁ গা রত্নাবলী, হাঁ গা ভুবনমোহনলাবণ্যকৌমুদী—ব্যাকরণের এ কী নূতন সম্পদ। সম্বোধনে হাঁ গা।

মালতী। দিদি, এঁরা কি আমার উপরে রাগ করেছেন?

নন্দা। ভয় নেই তোমার মালতী। দিগ্‌বালিকারা শিউলিবনে যখন শিল বৃষ্টি করে তখন রাগ ক'রে করে না, তাদের আদর করবার প্রথাই ওই।

অজিতা। ওই দেখো, শ্রীমতী মনে মনেই গান গেয়ে যাচ্ছে। আমাদের কথা ওর কানেই পৌঁচ্ছে না। শ্রীমতী, গলা ছেড়ে গাও না, আমরাও যোগ দেব।

শ্রীমতীর গান

নিশীথে কী কয়ে গেল মনে,
কী জানি, কী জানি।
সে কি ঘুমে সে কি জাগরণে
কী জানি কী জানি।
নানাকাজে নানামতে
ফিরি ঘরে, ফিরি পথে
সে-কথা কি অগোচরে বাজে ক্ষণে ক্ষণে
কী জানি, কী জানি।
সে কথা কি অকারণে ব্যথিছে হৃদয়,
একি ভয়, একি জয়।
সে-কথা কি কানে কানে বারে বারে কয়
"আর নয়, আর নয়।"
সে-কথা কি নানাসুরে
বলে মোরে, "চলো দূরে,"
সে কি বাজে বুকে মম, বাজে কি গগনে,
কী জানি, কী জানি।

বাসবী। মালতী, তোমার চোখে যে জল ভরে এল। এ-গানের মধ্যে কী বুঝলে বলো তো।

মালতী। শ্রীমতী ডাক শুনেছে।

বাসবী। কার ডাক?

মালতী। যার ডাকে আমার ভাই গেল চলে। যার ডাকে আমার—

বাসবী। কে, কে তোমার?

শ্রীমতী। মালতী, বোন আমার, চুপ, আর বলিসনে। চোখ মুছে ফেল্, এ কাঁদবার জায়গা নয়।

বাসবী। শ্রীমতী, ওকে বাধা দিলে কেন? তুমি কি মনে ভাব আমরা কেবল হাসতেই জানি?

ভদ্রা। আমরা কি একেবারেই জানিনে হাসি কোন্ জায়গায় নাগাল পায় না?

মালতী। রাজকুমারী, আজ তো বাতাসে বাতাসে কথা চলছে তোমরা শোননি?

নন্দা। সকালের আলোতে পদ্মের পাপড়ি খুলে যায়, কিন্তু রাজপ্রাসাদের দেয়াল তো খোলে না।

লোকেশ্বরীর প্রবেশ। সকলের প্রণাম

লোকেশ্বরী। আমি সহ্য করতে পারছি নে। ওই শুনছ না রাস্তায় রাস্তায় স্তবের ধ্বনি—ওঁ নমো বুদ্ধায় গুরবে, নমঃ সংঘায় মহত্তমায়। শুনলে এখনো আমার বুকের ভিতর দুলে ওঠে।

(কানে হাত দিয়া) আজই থামিয়ে দেওয়া চাই। এখনই, এখনই।

মল্লিকা। দেবী শান্ত হ'ন।

লোকেশ্বরী। শান্ত হব কিসে? কোন্ মন্ত্রে শান্ত করবে? সেই, নমঃ পরমশান্তায় মহাকারুণিকায়—এ মন্ত্র আর নয়, আর নয়। আমার মন্ত্র, নমো বজ্রক্রোধডাকিন্যৈ, নমঃ শ্রীবজ্রমহাকালায়। অস্ত্র দিয়ে আগুন দিয়ে রক্ত দিয়ে জগতে শান্তি আসবে। নইলে মার কোল ছেড়ে ছেলে চলে যাবে, সিংহাসন থেকে রাজমহিমা জীর্ণপত্রের মতো খসে খসে পড়বে।—তোমরা কুমারীরা এখানে কী করছ?

রত্নাবলী। (হাসিয়া) অপেক্ষা করছি উদ্ধারের। মলিন মনকে নির্মল করে এই শ্রীমতীর শিষ্যা হবার পথে একটু একটু করে এগোচ্ছি।

বাসবী। অশ্রাব্য তোমার এই অত্যুক্তি।

লোকেশ্বরী। এই নটীর শিষ্যা। শেষকালে তাই ঘটাবে, সেই ধর্মই এসেছে। পতিতা আসবে পরিত্রাণের উপদেশ নিয়ে। শ্রীমতী বুঝি আজ হঠাৎ সাধ্বী হয়ে উঠেছে। যেদিন ভগবান বুদ্ধ অশোকবনে এসেছিলেন রাজপুরীর সকলেই তাঁকে দেখতে এল, একেও দয়া করে ডাকতে পাঠিয়েছিলেম। পাপিষ্ঠা এলই না। তবু আজ নাকি ভিক্ষু উপালি রাজবাড়িতে একমাত্র ওর হাতেই ভিক্ষা নিতে আসে, রাজকুমারীদের এড়িয়ে যায়। মূঢ়ে, রাজবংশের মেয়ে হয়ে তোরা এই ধর্মকে অভ্যর্থনা করতে বসেছিস, উচ্চ আসনকে ধুলায় টেনে ফেলবার এই ধর্ম। যেখানে রাজার

প্রভাব ছিল সেখানে ভিক্ষুর প্রভাব হবে—একে ধর্ম বলিস তোরা আত্মঘাতিনীরা ? উপালি তোকে কী মন্ত্র দিয়েছে উচ্চারণ কর্‌ দেখি নটী। দেখি কতবড়ো সাহস। পাপরসনায় পক্ষাঘাত হবে না ?

শ্রীমতী। (করজোড়ে, উঠিয়া দাঁড়াইয়া)

ওঁ নমো বুদ্ধায় গুরবে
নমো ধর্মায় তারিণে
নমঃ সংঘায় মহত্তমায় নমঃ।

লোকেশ্বরী। ওঁ নমো বুদ্ধায় গুরবে—থাক থাক থাম থাম।

শ্রীমতী। মদ্বিতায় অনাথায় অনুকম্পায় যে বিভো—

লোকেশ্বরী। (বক্ষে করাঘাত করিয়া) ওরে অনাথা, অনাথা। শ্রীমতী একবার বলো তো, মহাকারুণিকো নাথো—

উভয়ে আবৃত্তি

মহাকারুণিকো নাথো হিতায় সব্বপাণিনং
পূরেত্বা পারমী সব্বা পত্তো সম্বোধিমুত্তমম্‌।

লোকেশ্বরী। হয়েছে, হয়েছে, থাক্‌ আর নয়। নমো বজ্রক্রোধডাকিন্যৈ।

অনুচরীর প্রবেশ

অনুচরী। মহারানী, এইদিকে আসুন নিভৃতে।

(জনান্তিকে) রাজকুমার চিত্র এসেছেন জননীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে।

লোকেশ্বরী। কে বলে ধর্ম মিথ্যা। পুণ্যমন্ত্রের যেমনি উচ্চারণ অমনি গেল অমঙ্গল। ওরে বিশ্বাসহীনারা, তোরা আমার দুঃখ দেখে মনে মনে হেসেছিলি। মহাকারুণিকো নাথো, তাঁর করুণার কতবড়ো শক্তি। পাথর গলে যায় এই আমি তোদের সবাইকে বলে যাচ্ছি. পাব আবার পুত্রকে, পাব আবার সিংহাসন। যারা ভগবানকে অপমান করছে দেখব তাদের দর্প কতদিন থাকে।

বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি
ধম্মং সরণং গচ্ছামি
সংঘং সরণং গচ্ছামি। [বলিতে বলিতে অনুচরীসহ প্রস্থান

রত্নাবলী। মল্লিকা, হাওয়া আবার কোন্‌দিক থেকে বইল ?

মল্লিকা। আজকাল আকাশ জুড়ে এ যে পাগলামির হাওয়া, এর কি গতির

স্থিরতা আছে? হঠাৎ কাকে কোন্‌দিকে নিয়ে যায় কেউ বলতে পারে না। সেই যে কলন্দক আজ চল্লিশ বছর জুয়ো খেলে কাটালে, সে হঠাৎ শুনি নাকি ওদের অর্হৎ হয়ে উঠেছে। আবার নন্দিবর্ধন, যজ্ঞে যে সর্বস্ব দিতে পণ করলে আজ ব্রাহ্মণ দেখলে সে মারতে যায়।

রত্নাবলী। তাহলে রাজকুমার চিত্র ফিরে এলেন।

মল্লিকা। দেখো না শেষ পর্যন্ত কী হয়।

মালতী। ভগবান দয়াবতার যেদিন এখানে এসেছিলেন সেদিন শ্রীমতীদিদি তাঁকে দেখতে যাওনি, একি সত্য?

শ্রীমতী। সত্য। তাঁকে দেখা দেওয়াই যে পূজা দেওয়া। আমি মলিন, আমার মধ্যে তো নৈবেদ্য প্রস্তুত ছিল না!

মালতী। হায় হায়, তবে কী হল দিদি।

শ্রীমতী। অত সহজে তাঁর কাছে গেলে যে যাওয়া ব্যর্থ হয়। তাঁকে কি চেয়ে দেখলেই দেখি, তাঁর কথা কানে শুনলেই কি শোনা যায়?

রত্নাবলী। ইস, এটা আমাদের 'পরে কটাক্ষপাত হল। একটু প্রশ্রয়ের হাওয়াতেই নটীর সৌজন্যের আবরণ উড়ে যায়।

শ্রীমতী। কৃত্রিম সৌজন্যের দিন আমার গেছে। মিথ্যা স্তব করব না, স্পষ্টই বলব, তোমাদের চোখ যাঁকে দেখেছে তোমরা তাঁকে দেখনি।

রত্নাবলী। বাসবী, ভদ্রা, এই নটীর স্পর্ধা সহ্য করছ কেমন করে?

বাসবী। বাহির থেকে সত্যকে যদি সহ্য করতে না পারি তাহলে ভিতর থেকে মিথ্যাকে সহ্য করতে হবে। শ্রীমতী আর-একবার গাও তো তোমার মন্ত্রটি, আমার মনের কাঁটাগুলোর ধার খয়ে যাক।

শ্রীমতী।
ওঁ নমো বুদ্ধায় গুরবে
নমো ধর্মায় তারিণে
নমঃ সংঘায় মহত্তমায় নমঃ।

নন্দা। ভগবানকে দেখতে গিয়েছিলেম আমরা, ভগবান নিজে এসে দেখা দিয়েছেন শ্রীমতীকে, ওর অন্তরের মধ্যে।

রত্নাবলী। বিনয় ভুলেছ নটী! এ-কথার প্রতিবাদ করবে না?

শ্রীমতী। কেন করব রাজকুমারী? তিনি যদি আমারও অন্তরে পা রাখেন তাতে কি আমার গৌরব, না তাঁরই?

বাসবী। থাক থাক মুখের কথায় কথা বেড়ে যায়। তুমি গান গাও।

শ্রীমতীর গান

তুমি কি এসেছ মোর দ্বারে
খুঁজিতে আমার আপনারে ?
তোমারি যে ডাকে
কুসুম গোপন হতে বাহিরায় নগ্ন শাখে শাখে,
সেই ডাকে ডাকো আজি তারে।
তোমারি সে-ডাকে বাধা ভোলে,
শ্যামল গোপন প্রাণ ধূলি-অবগুণ্ঠন খোলে।
সে-ডাকে তোমারি
সহসা নবীন উষা আসে হাতে আলোকের ঝারি,
দেয় সাড়া ঘন অন্ধকারে।

নেপথ্যে। ওঁ নমো রত্নত্রয়ায় বোধিসত্ত্বায় মহাসত্ত্বায় মহাকারুণিকায়।

উৎপলপর্ণার প্রবেশ

সকলে। ভগবতী, নমস্কার।

ভিক্ষুণী। ভবতু সব্বমঙ্গলং রক্‌খন্তু সব্বদেবতা
সব্ববুদ্ধানুভাবেন সদা সোত্থী ভবন্তু তে।

শ্রীমতী।

শ্রীমতী। কী আদেশ ?

ভিক্ষুণী। আজ বসন্তপূর্ণিমায় ভগবান বোধিসত্ত্বের জন্মোৎসব। অশোকবনে তাঁর আসনে পূজা-নিবেদনের ভার শ্রীমতীর উপর।

রত্নাবলী। বোধ হয় ভুল শুনলেম। কোন্ শ্রীমতীর কথা বলছেন ?

ভিক্ষুণী। এই যে, এই শ্রীমতী।

রত্নাবলী। রাজবাড়ির এই নটী ?

ভিক্ষুণী। হাঁ, এই নটী।

রত্নাবলী। স্থবিরদের কাছে উপদেশ নিয়েছেন ?

ভিক্ষুণী। তাঁদেরই এই আদেশ।

রত্নাবলী। কে তাঁরা ? নাম শুনি।

ভিক্ষুণী। একজন তো উপালি।

রত্নাবলী। উপালি তো নাপিত।

ভিক্ষুণী। সুনন্দও ব'লছেন।

রত্নাবলী। তিনি গোয়ালার ছেলে।

ভিক্ষুণী। সুনীতেরও এই আদেশ।

রত্নাবলী। তিনি নাকি জাতিতে পুক্কুস।

ভিক্ষুণী। রাজকুমারী, এঁরা জাতিতে সকলেই এক। এঁদের আভিজাত্যের সংবাদ তুমি জান না।

রত্নাবলী। নিশ্চয় জানিনে। বোধ হয় এই নটী জানে। বোধ হয় এর সঙ্গে জাতিতে বিশেষ প্রভেদ নেই। নইলে এত মমতা কেন ?

ভিক্ষুণী। সে-কথা সত্য। রাজপিতা বিম্বিসার রাজগৃহ-নগরীর নির্জনবাস থেকে স্বয়ং আজ এসে ব্রতপালন করবেন। তাঁকে সংবর্ধনা করে আনিগে। [প্রস্থান

অজিতা। কোথায় চলেছ শ্রীমতী ?

শ্রীমতী। অশোকবনের আসনবেদী ধৌত করতে যাব।

মালতী। দিদি আমাকে সঙ্গে নিয়ো।

নন্দা। আমিও যাব।

অজিতা। ভাবছি গেলে হয়।

বাসবী। আমিও দেখিগে, তোমাদের অনুষ্ঠানটা কী রকম।

রত্নাবলী। কী শোভা ! শ্রীমতী করবে পূজার উদ্‌যোগ, তোমরা পরিচারিকার দল করবে চামরবীজন।

বাসবী। আর এখান থেকে তুমি অভিশাপের উষ্ণ নিশ্বাস ফেলবে। তাতে অশোকবনও দগ্ধ হবে না, শ্রীমতীর শান্তিও থাকবে অক্ষুণ্ণ।

রত্নাবলী ও মল্লিকা ব্যতীত আর সকলের প্রস্থান

রত্নাবলী। সইবে না ! সইবে না ! এ একেবারে সমস্তর বিরুদ্ধ। মল্লিকা, পুরুষ হয়ে জন্মালুম না কেন। এই কঙ্কণপরা হাতের 'পরে ধিক্কার হয়। যদি থাকত তলোয়ার ! তুমিও তো মল্লিকা সমস্তক্ষণ চুপ করে বসে ছিলে, একটি কথাও কওনি। তুমিও কি ওই নটীর পরিচারিকার পদ কামনা কর ?

মল্লিকা। করলেও পাব না। নটী আমাকে খুব চেনে।

রত্নাবলী। চুপ করে সহ্য কর কী করে বুঝতে পারিনে। ধৈর্য নিরুপায় ইতর লোকের অস্ত্র, রাজার মেয়েদের না।

মল্লিকা। আমি জানি প্রতিকার আসন্ন, তাই শক্তির অপব্যয় করিনে।

রত্নাবলী। নিশ্চিত জান ?

মল্লিকা। নিশ্চিত।

রত্নাবলী। গোপন কথা যদি হয় ব'লো না। কেবল এইটুকু জানতে চাই ওই নটী কি আজ সন্ধ্যাবেলায় পূজা করবে আর রাজকন্যারা জোড়হাতে দাঁড়িয়ে থাকবে ?

মল্লিকা। না কিছুতেই না। আমি কথা দিচ্ছি।

রত্নাবলী। রাজগৃহলক্ষ্মী তোমার বাণীকে সার্থক করুন।

দ্বিতীয় অঙ্ক

রাজোদ্যান

লোকেশ্বরী ও মল্লিকা

মল্লিকা। পুত্রের সঙ্গে তো দেখা হল মহারানী। তবে এখনো কেন—

লোকেশ্বরী। পুত্রের সঙ্গে ? পুত্র কোথায় ? এ যে মৃত্যুর চেয়ে বেশি। আগে বুঝতে পারিনি।

মল্লিকা। এমন কথা কেন বলছেন।

লোকেশ্বরী। পুত্র যখন অপুত্র হয়ে মার কাছে আসে তার মতো দুঃখ আর নেই। কী রকম করে সে চাইলে আমার দিকে। তার মা একেবারে লুপ্ত হয়ে গেছে— কোথাও কোনো তার চিহ্নও নেই। নিজের এতবড়ো নিঃশেষে সর্বনাশ কল্পনাও করতে পারতুম না।

মল্লিকা। রক্তমাংসের জন্মকে সম্পূর্ণ ঘুচিয়ে ফেলে এঁরা যে নির্মল নূতন জন্ম লাভ করেন।

লোকেশ্বরী। হায় রে রক্তমাংস। হায় রে অসহ্য ক্ষুধা, অসহ্য বেদনা। রক্তমাংসের তপস্যা এদের এই শূন্যের তপস্যার চেয়ে কি কিছুমাত্র কম !

মল্লিকা। কিন্তু যাই বল দেবী, তাঁকে দেখলেম, সে কী রূপ। আলো দিয়ে ধোওয়া যেন দেবমূর্তিখানি।

লোকেশ্বরী। ওই রূপ নিয়ে তার মাকে সে লজ্জা দিয়ে গেল। যে মায়ের প্রাণ আমার নাড়ীতে, যে মায়ের স্নেহ আমার হৃদয়ে, তাকে ওই রূপ ধিক্‌কার দিলে। যে-জন্ম তাকে দিয়েছি আমি, সে-জন্মের সঙ্গে তার এ জন্মের কেবল যে বিচ্ছেদ তা নয়, বিরোধ। দেখ্‌ মল্লিকা আজ খুব স্পষ্ট করে বুঝতে পারলেম এ ধর্ম পুরুষের তৈরি।

এ ধর্মে মা ছেলের পক্ষে অনাবশ্যক ; স্ত্রীকে স্বামীর প্রয়োজন নেই। যারা না পুত্র না স্বামী না ভাই সেই সব ঘরছাড়াদের একটুখানি ভিক্ষা দেবার জন্যে সমস্ত প্রাণকে শুকিয়ে ফেলে আমরা শূন্য ঘরে পড়ে থাকব! মল্লিকা, এই পুরুষের ধর্ম আমাদের মেরেছে, আমরাও একে মারব।

মল্লিকা। কিন্তু দেবী, দেখনি, মেয়েরাই যে দলে দলে চলেছে বুদ্ধকে পূজা দেবার জন্যে।

লোকেশ্বরী। মূঢ় ওরা, ভক্তি করবার ক্ষুধার ওদের অন্ত নেই। যা ওদের সব চেয়ে মারে তাকেই ওরা সব চেয়ে বেশি করে দেয়। এই মোহকে আমি প্রশ্রয় দিইনে।

মল্লিকা। মুখে বলছ, মহারানী। নিশ্চয় জানি, তোমার ওই পুত্র আজ তোমার সেবাকক্ষের দ্বার দিয়ে বেরিয়ে এসে তোমার পূজাকক্ষের দ্বার দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করেছে। তোমার মানব-পুত্র কোল থেকে নেমে আজ দেবতা-পুত্র হয়ে তোমার হৃদয়ের পূজাবেদীতে চড়ে বসেছে।

লোকেশ্বরী। চুপ চুপ। বলিসনে। আমি হাত জোড় করে তাকে অনুরোধ করলেম, বললেম, "একরাত্রির জন্যে তোমার মাতার ঘরে থেকে যাও।" সে বললে, "আমার মাতার ঘরের উপরে ছাদ নেই—আছে আকাশ।" মল্লিকা, যদি মা হতিস তো বুঝতিস কতবড়ো কঠিন কথা। বজ্র দেবতার হাতের কিন্তু সে তো বজ্র। বুক বিদীর্ণ হয়ে যায়নি! সেই বিদীর্ণ বুকের ছিদ্রের ভিতর দিয়ে ওই যে রাস্তার শ্রমণদের গর্জন আমার পাঁজরগুলোর ভিতরে প্রতিধ্বনিত হয়ে বেড়াচ্ছে—বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি, ধম্মং সরণং গচ্ছামি, সংঘং সরণং গচ্ছামি।

মল্লিকা। একি মহারানী, মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে আজো আপনি যে নমস্কার করেন!

লোকেশ্বরী। ওই তো বিপদ। মল্লিকা, দুর্বলের ধর্ম মানুষকে দুর্বল করে। দুর্বল করাই এই ধর্মের উদ্দেশ্য। যত উঁচু মাথাকে সব হেঁট করে দেবে। ব্রাহ্মণকে বলবে সেবা করো, ক্ষত্রিয়কে বলবে ভিক্ষা করো। এই ধর্মের বিষ অনেকদিন স্বেচ্ছায় নিজের রক্তের মধ্যে পালন করেছি। সেইজন্যে আজ আমিই একে সব চেয়ে ভয় করি। ওই কে আসছে?

মল্লিকা। রাজকুমারী বাসবী। পূজাস্থলে যাবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে এসেছেন।

বাসবীর প্রবেশ

লোকেশ্বরী। পূজায় চলেছ?

বাসবী। হাঁ।

লোকেশ্বরী। তোমাদের তো বয়স হয়েছে।

বাসবী। আমাদের ব্যবহারে তার কি কোনো বৈলক্ষণ্য দেখছেন?

লোকেশ্বরী। শিশু! তোমরা নাকি বলে বেড়াচ্ছ, অহিংসা পরমো ধর্মঃ!

বাসবী। আমাদের চেয়ে যাঁদের বয়স অনেক বেশি তাঁরাই বলে বেড়াচ্ছেন, আমরা তো কেবল মুখে আবৃত্তি করি মাত্র।

লোকেশ্বরী। নির্বোধকে কেমন করে বোঝাব অহিংসা ইতরের ধর্ম। হিংসা ক্ষত্রিয়ের বিশাল বাহুতে মাণিক্যের অঙ্গদ, নিষ্ঠুর তেজে দীপ্যমান।

বাসবী। শক্তির কি কোমল রূপ নেই?

লোকেশ্বরী। আছে, যখন সে ডোবায়। যখন সে দৃঢ় করে বাঁধে তখন না। পর্বতকে সৃষ্টিকর্তা নির্দয় পাথর দিয়ে গড়েছেন, পাঁক দিয়ে নয়। তোমাদের গুরুর কৃপায় উপর থেকে নিচে পর্যন্ত সবই কি হবে পাঁক? রাজবাড়িতে মানুষ হয়েও এই কথাটা মানতে ঘৃণা হয় না? চুপ করে রইলে যে?

বাসবী। ভেবে দেখছি, মহারানী।

লোকেশ্বরী। ভাববার কী আছে। চোখের সামনে দেখলে তো রাজপুত্র একমুহূর্তে রাজা হতে ভুলে গেল। বলে গেল চরাচরকে দয়া করবার সাধনা করব। শোননি, বাসবী?

বাসবী। শুনেছি।

লোকেশ্বরী। তাহলে নির্দয়তা করবার গুরুতর কাজ গ্রহণ করবে কে? কেউ যদি না করে তবে বীরভোগ্যা বসুন্ধরার কী হবে গতি? যত সব মাথা-হেঁট করা উপবাসজীর্ণ ক্ষীণকণ্ঠ মন্দাগ্নিম্লান নির্জীবের হাতে তার দুর্গতির কি সীমা থাকবে? তোরা ক্ষত্রিয়ের মেয়ে, কথাটা তোদের কাছে এত নতুন ঠেকছে কেন বাসবী?

বাসবী। এই পুরানো কথাটা হঠাৎ আজ যেন একদিনে ঢাকা পড়ে গেছে বসন্তে নিষ্পত্র কিংশুকের শাখা যেমন করে ফুলে ঢেকে যায়।

লোকেশ্বরী। কখনো কখনো বুদ্ধিভ্রংশ হয়ে পুরুষ আপন পৌরুষধর্ম ভুলে যায় কিন্তু নারীরা যদি তাকে সেটা ভুলতে দেয় তাহলে মরণ যে সেই নারীর। মহালতার জন্যে কি মহাবৃক্ষের দরকার নেই? সব গাছই গুল্ম হয়ে গেলে কি তার পক্ষে ভালো? বল না। মুখে যে উত্তর নেই।

বাসবী। মহাবৃক্ষ চাই বই কি।

লোকেশ্বরী। কিন্তু বনস্পতি নির্মূল করবার জন্যই এসেছেন তোমাদের গুরু। তাও যে পরশুরামের মতো কুঠার হাতে করবেন এমন শক্তি নেই। কোমল শাস্ত্রবাক্যের

পোকা তলায় তলায় লাগিয়ে দিয়ে মনুষ্যত্বের মজ্জাকে জীর্ণ করবেন, বিনা যুদ্ধে পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করে দেবেন। তাঁদেরও কাজ সারা হবে আর তোমরা রাজার মেয়েরা মাথা মুড়িয়ে ভিক্ষাপাত্র হাতে পথে পথে ফিরবে। তার আগেই যেন মর, আমার এই আশীর্বাদ। কী ভাবছ? কথাটা মনে লাগছে না?

বাসবী। ভালো করে ভেবে দেখি।

লোকেশ্বরী। ভেবে দেখবার দরকার নেই, প্রমাণ দেখো। আর্যপুত্র বিম্বিসার, ক্ষত্রিয় রাজা, রাজত্ব তো তাঁর ভোগের জিনিস নয়, তাতেই তাঁর ধর্মসাধনা। কিন্তু কোন্ মরুর ধর্ম কানে মন্ত্র দিল অমনি কত সহজেই রাজত্ব থেকে তিনি খসে পড়লেন—অস্ত্র হাতে না, রণক্ষেত্রে না, মৃত্যুর মুখে না। বাসবী, একদিন তুমিও রাজার মহিষী হবে এ আশা কি ত্যাগ করেছ?

বাসবী। কেন ত্যাগ করব?

লোকেশ্বরী। তাহলে জিজ্ঞাসা করি দয়া-মন্ত্রের হাওয়ায় যে-রাজা সিংহাসনের উপর কেবল টলমল করে, রাজদণ্ড যার হাতে শিথিল, জয়তিলক যার ললাটে ম্লান তাকে শ্রদ্ধা করে বরণ করতে পারবে?

বাসবী। না।

লোকেশ্বরী। আমার কথাটা বলি। মহারাজ বিম্বিসার সংবাদ পাঠিয়েছেন তিনি আজ আসবেন। তাঁর ইচ্ছা আমি প্রস্তুত থাকি। তোমরা ভাবছ ওঁর জন্যে সাজব! যে মানুষ রাজাও নয় ভিক্ষুও নয়, যে-মানুষ ভোগেও নেই ত্যাগেও নেই তাকে অভ্যর্থনা! কখনো না। বাসবী, তোমাকে বার বার বলছি, এই পৌরুষহীন আত্মাবমাননার ধর্মকে কিছুতে স্বীকার ক'রো না।

মল্লিকা। রাজকুমারী, কোথায় চলেছ?

বাসবী। ঘরে।

মল্লিকা। এদিকে নটী যে প্রস্তুত হয়ে এল।

বাসবী। থাক থাক। [প্রস্থান

মল্লিকা। মহারানী, শুনতে পাচ্ছ?

লোকেশ্বরী। শুনছি বই কি। বিষম কোলাহল।

মল্লিকা। নিশ্চয় এঁরা এসে পড়েছেন।

লোকেশ্বরী। কিন্তু ওই যে এখনো শুনছি, নমো—

মল্লিকা। সুর বদলেছে। 'নমো বুদ্ধায়' গর্জন আরও প্রবল হয়ে উঠেছে আঘাত পেয়েই। সঙ্গে সঙ্গে ওই শোনো—'নমঃ পিনাকহস্তায়'। আর ভয় নেই।

লোকেশ্বরী। ভাঙল রে ভাঙল। যখন সব ধুলো হয়ে যাবে তখন কে জানবে ওর মধ্যে আমার প্রাণ কতখানি দিয়েছিলেম। হায় রে, কত ভক্তি। মল্লিকা, ভাঙার কাজটা শীঘ্র হয়ে গেলে বাঁচি—ওর ভিতরটা যে আমার বুকের মধ্যে।

রত্নাবলীর প্রবেশ

রত্না, তুমিও চলেছ পূজায় ?

রত্নাবলী। ভ্রমক্রমে পূজ্যকে পূজা না করতে পারি কিন্তু অপূজ্যকে পূজা করার অপরাধ আমার দ্বারা ঘটে না।

লোকেশ্বরী। তবে কোথায় যাচ্ছ ?

রত্নাবলী। মহারানীর কাছেই এখানে এসেছি। আবেদন আছে।

লোকেশ্বরী। কী, বলো।

রত্নাবলী। ওই নটী যদি এখানে পূজার অধিকার পায় তাহলে এই অশুচি রাজবাড়িতে বাস করতে পারব না।

লোকেশ্বরী। আশ্বাস দিচ্ছি আজ এ পূজা ঘটবে না।

রত্নাবলী। আজ না হ'ক কাল ঘটবে।

লোকেশ্বরী। ভয় নেই, কন্যা, পূজাকে সমূলে উচ্ছেদ করব।

রত্নাবলী। যে অপমান সহ্য করেছি তাতেও তার প্রতিকার হবে না।

লোকেশ্বরী। তুমি রাজার কাছে অভিযোগ করলে নটীর নির্বাসন, এমন কি, প্রাণদণ্ডও হতে পারে।

রত্নাবলী। তাতে ওর গৌরব বাড়িয়ে দেওয়া হবে।

লোকেশ্বরী। তবে তোমার কী ইচ্ছা ?

রত্নাবলী। ও যেখানে পূজারিনী হয়ে পূজা করতে যাচ্ছিল সেখানেই ওকে নটী হয়ে নাচতে হবে। মল্লিকা, চুপ করে রইলে যে। তুমি কী বল ?

মল্লিকা। প্রস্তাবটা কৌতুকজনক।

লোকেশ্বরী। আমার মন সায় দিচ্ছে না রত্না।

রত্নাবলী। ওই নটীর 'পরে মহারানীর এখনো দয়া আছে দেখছি।

লোকেশ্বরী। দয়া! কুকুর দিয়ে ওর মাংস ছিঁড়ে খাওয়াতে পারি। আমার দয়া। অনেকদিন ওখানে নিজের হাতে পূজা দিয়েছি। পূজার বেদী ভেঙে পড়বে সেও সইতে পারি। কিন্তু রাজরানীর পূজার আসনে আজ নটীর চরণাঘাত!

রত্নাবলী। প্রগল্‌ভতা মাপ করবেন। ওইটুকু ব্যথাকে যদি প্রশ্রয় দেন তবে ওই ব্যথার উপরেই ভাঙা পূজার বেদী বারেবারে গড়ে উঠবে।

লোকেশ্বরী। সে-ভয় মনে একেবারে নেই তা নয়।

রত্নাবলী। মোহে পড়ে যে-মিথ্যাকে মান দিয়েছিলেন তাকে দূরে সরিয়ে দিলেই মোহ কাটে না। সেই মিথ্যাকে অপমান করুন তবে মুক্তি পাবেন।

লোকেশ্বরী। মল্লিকা, ওই শোনো। উদ্যানের উত্তর দিক থেকে শব্দ আসছে। ভেঙে ফেললে, সব ভেঙে ফেললে। ওঁ নমো—যাক যাক ভেঙে যাক।

রত্নাবলী। চলো না, মহারানী, দেখে আসি গে।

লোকেশ্বরী। যাব যাব, কিন্তু এখনো না।

রত্নাবলী। আমি দেখে আসি গে। [প্রস্থান

লোকেশ্বরী। মল্লিকা, বাঁধন ছিঁড়তে বড়ো বাজে।

মল্লিকা। তোমার চোখ দিয়ে যে জল পড়ছে।

লোকেশ্বরী। ওই শোনো না, 'জয় কালী করালী'—অন্য ধ্বনিটা ক্ষীণ হয়ে এল, এ আমি সইতে পারছি নে।

মল্লিকা। বুদ্ধের ধর্মকে নির্বাসিত করলে আবার ফিরে আসবে—অন্য ধর্ম দিয়ে চাপা না দিলে শান্তি নেই। দেবদত্তের কাছে যখন নূতন মন্ত্র নেবে তখনই সান্ত্বনা পাবে।

লোকেশ্বরী। ছি ছি, ব'লো না, ব'লো না, মুখে এনো না। দেবদত্ত ক্রূর সর্প, নরকের কীট। যখন অহিংসাব্রত নিয়েছিলেম তখনো মনে মনে তাকে প্রতিদিন দগ্ধ করেছি, বিদ্ধ করেছি। আর আজ! যে-আসনে আমার সেই পরমনির্মল জ্যোতির্ভাসিত মহাগুরুকে নিজে এনে বসিয়েছি তাঁর সেই আসনেই দেবদত্তকে ডেকে আনব! (জানু পাতিয়া) ক্ষমা করো প্রভু, ক্ষমা করো। দ্বারত্রয়েণ কৃতং সর্বং অপরাধং ক্ষমতু মে প্রভো।

উঠিয়া। ভয় নেই, মল্লিকা, ভিতরে উপাসিকা আছে সে ভিতরেই থাক্‌, বাইরে আছে নিষ্ঠুরা, আছে রাজকুলবধূ তাকে কেউ পরাস্ত করতে পারবে না। মল্লিকা, আমার নির্জন ঘরে গিয়ে বসি গে, যখন ধুলার সমুদ্রে আমার এতকালের আরাধনার তরণী একেবারে ডুবে যাবে তখন আমাকে ডেকো। [উভয়ের প্রস্থান

ধূপ দীপ গন্ধ মাল্য মঙ্গলঘট প্রভৃতি পূজোপকরণ লইয়া রাজবাটীর একদল্‌ নারীর প্রবেশ। পুষ্পপাত্রকে ঘিরিয়া সকলে

বণ্ণ-গন্ধ-গুণোপেতং এতং কুসুমসন্ততিং
পূজয়ামি মুনিন্দস্‌স সিরি-পাদ-সরোরুহে।

প্রণাম ও শঙ্খধ্বনি। ধূপপাত্রকে ঘিরিয়া

গন্ধ-সম্ভার-যুত্তেন ধূপেনাহং সুগন্ধিনা
পূজয়ে পূজনেয্যন্তং পূজাভাজনমুত্তমং ।

শঙ্খধ্বনি ও প্রণাম

শ্রীমতী প্রদীপের থালা ঘেরিয়া

ঘনসারপ্পদিত্তেন দীপেন তমধংসিনা
তিলোকদীপং সম্বুদ্ধং পূজয়ামি তমোহুদং ।

শঙ্খধ্বনি ও প্রণাম । আহার্য নৈবেদ্য ঘেরিয়া

অধিবাসেতু নো ভন্তে ভোজনং পরিকপ্পিতং
অনুকম্পং উপাদায় পতিগণ্হাতুমুত্তমং ।

শঙ্খধ্বনি ও প্রণাম । জানু পাতিয়া

যো সন্নিসিন্নো বরবোধিমূলে
মারং সসেনং মহতিং বিজেত্বা
সম্বোধিমাগচ্ছি অনন্তঞাণো
লোকুত্তমো তং পণমামি বুদ্ধং ।

বনের প্রবেশপথে পূজা সমাধা হল । এবার চলো স্তূপমূলে ।

মালতী। কিন্তু শ্রীমতীদিদি ওই দেখো, এদিকের পথ বেড়া দিয়ে বন্ধ

শ্রীমতী । বেড়া ডিঙিয়ে যেতে পারব, চলো ।

নন্দা । বোধ হচ্ছে রাজার নিষেধ ।

শ্রীমতী । কিন্তু প্রভুর আদেশ আছে ।

নন্দা । কী ভয়ংকর গর্জন । একি রাষ্ট্রবিপ্লব ?

শ্রীমতী । গান ধরো ।

গান

বাঁধন-ছেঁড়ার সাধন হবে ।
ছেড়ে যাব তীর মাভৈঃ রবে ।
যাঁহার হাতের বিজয়মালা
রুদ্রদাহের বহ্নিজ্বালা,
নমি নমি নমি সে ভৈরবে ।
কাল-সমুদ্রে আলোর যাত্রী :
শূন্যে যে ধায় দিবসরাত্রি ।

ডাক এল তার তরঙ্গেরি,
বাজুক বক্ষে বজ্রভেরী
অকূল প্রাণের সে উৎসবে।

একদল অন্তঃপুররক্ষিণীর প্রবেশ

রক্ষিণী। ফেরো তোমরা এখান থেকে।

শ্রীমতী। আমরা প্রভুর পূজায় চলেছি।

রক্ষিণী। পূজা বন্ধ।

মালতী। আজ প্রভুর জন্মোৎসব।

রক্ষিণী। পূজা বন্ধ।

শ্রীমতী। এও কি সম্ভব?

রক্ষিণী। পূজা বন্ধ। আমি আর কিছু জানিনে। দাও তোমাদের অর্ঘ্য।

[পূজার থালা প্রভৃতি ছিনাইয়া লইল

শ্রীমতী। এ কী পরীক্ষা আমার। অপরাধ কি ঘটেছে কিছু?

উত্তমঙ্গেন বন্দেহং পাদপংসু বরুত্তমং।
বুদ্ধে যো খলিতো দোসো বুদ্ধো খমতু তং মম।

রক্ষিণী। বন্ধ করো স্তব।

শ্রীমতী। দ্বারের কাছেই অবরোধ! প্রবেশ আমার ঘটল না ঘটল না।

মালতী। কাঁদ কেন শ্রীমতীদিদি। বিনা অর্ঘ্যে বিনা মন্ত্রে কি পূজা হয় না? ভগবান তো আমাদের মনের ভিতরেও জন্মলাভ করেছেন।

শ্রীমতী। শুধু তাই নয় মালতী, তাঁর জন্মে আমরা সবাই জন্মেছি। আজ সবারই জন্মোৎসব।

নন্দা। শ্রীমতী, হঠাৎ একমুহূর্তে আজ এমন দুর্দিন ঘনিয়ে এল কেন?

শ্রীমতী। দুর্দিনই যে সুদিন হয়ে ওঠবার দিন আজ। যা ভেঙেছে তা জোড়া লাগবে, যা পড়েছে তা উঠবে আবার।

অজিতা। দেখো শ্রীমতী, এখন আমার মনে হচ্ছে তোমাকে যে পূজার ভার দেওয়া হয়েছিল তার মধ্যে নিশ্চয় ভুল আছে। সব তাই নষ্ট হল। গোড়াতেই আমাদের বোঝা উচিত ছিল।

শ্রীমতী। আমি ভয় করিনে। জানি প্রথম থেকেই কেউ মন্দিরে দ্বার খোলা পায় না। ক্রমে যায় আগল খুলে। তবু আমার বলতে কোনো সংকোচ নেই যে, প্রভু আহ্বান করেছেন আমাকে। বাধা যাবে কেটে। আজই যাবে।

ভদ্রা। রাজার বাধাও সরাতে পারবে ?

শ্রীমতী। সেখানে রাজার রাজদণ্ড পৌঁছয় না।

রত্নাবলীর প্রবেশ

রত্নাবলী। কী বলছিলে, শুনেছি শুনেছি। তুমি রাজার বাধাও মান না এতবড়ো তোমার সাহস।

শ্রীমতী। পূজাতে রাজার বাধাই নেই।

রত্নাবলী। নেই রাজার বাধা ? সত্যি নাকি ? যেয়ো তুমি পূজা করতে, আমি দেখব দুই চোখের আশ মিটিয়ে।

শ্রীমতী। যিনি অন্তর্যামী তিনিই দেখবেন। বাহির থেকে সব সরিয়ে দিলেন, তাতে আড়াল পড়ে। এখন

বচসা মনসা চেব বন্দামেতে তথাগতে
সয়নে আসনে ঠানে গমনে চাপি সব্বদা।

রত্নাবলী। তোমার দিন এবার হয়ে এসেছে, অহংকার ঘুচবে।

শ্রীমতী। তা ঘুচবে। কিছুই বাকি থাকবে না, কিছুই না।

রত্নাবলী। এখন আমার পালা, আমি প্রস্তুত হয়ে আসছি। [প্রস্থান

ভদ্রা। কিছুই ভালো লাগছে না। বাসবী বুদ্ধিমতী, সে আগেই কোথায় সরে পড়েছে।

অজিতা। আমার কেমন ভয় করছে।

উৎপলপর্ণার প্রবেশ

নন্দা। ভগবতী, কোথায় চলেছেন ?

উৎপলপর্ণা। উপদ্রব এসেছে নগরে, ধর্ম পীড়িত, শ্রমণেরা শঙ্কিত, আমি পৌরপথে রক্ষামন্ত্র পড়তে চলেছি।

শ্রীমতী। ভগবতী, আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবে না ?

উৎপলপর্ণা। কেমন করে নিয়ে যাই ? তোমার উপরে যে পূজার আদেশ আছে।

শ্রীমতী। পূজার আদেশ এখনো আছে দেবী ?

উৎপলপর্ণা। সমাধান না হওয়া পর্যন্ত সে আদেশের তো অবসান নেই।

মালতী। মাত, কিন্তু রাজার বাধা আছে যে।

উৎপলপর্ণা। ভয় নেই, ধৈর্য ধরো। সে বাধা আপনিই পথ করে দেবে। [প্রস্থান

ভদ্রা। শুনছ অজিতা, রাস্তায় ও কি ক্রন্দন, না গর্জন।

নন্দা। আমার তো মনে হচ্ছে উদ্যানের ভিতরেই কারা প্রবেশ করে ভাঙচুর করছে। শ্রীমতী, শীঘ্র চলো রাজমহিষী মাতার ঘরের মধ্যে আশ্রয় নিইগে। [প্রস্থান

ভদ্রা। এস অজিতা, সমস্তই যেন একটা দুঃস্বপ্ন বলে বোধ হচ্ছে।

[রাজকুমারী প্রভৃতির প্রস্থান

মালতী। দিদি, বাইরে ওই যেন মরণের কান্না শুনতে পাচ্ছি। আকাশে দেখছ ওই শিখা! নগরে আগুন লাগল বুঝি। জন্মোৎসবে এই মৃত্যুর তাণ্ডব কেন।

শ্রীমতী। মৃত্যুর সিংহদ্বার দিয়েই জন্মের জয়যাত্রা।

মালতী। মনে ভয় আসছে বলে বড়ো লজ্জা পাচ্ছি দিদি। পূজা করতে যাব ভয় নিয়ে যাব এ আমার সহ্য হচ্ছে না।

শ্রীমতী। তোর ভয় কিসের বোন।

মালতী। বিপদের ভয় না। কিছুই যে বুঝতে পারছিনে, অন্ধকার ঠেকছে; তাই ভয়।

শ্রীমতী। আপনাকে এই বাইরে দেখিসনে। আজ যাঁর অক্ষয় জন্ম তাঁর মধ্যে আপনাকে দেখ্, তোর ভয় ঘুচে যাবে।

মালতী। তুমি গান করো দিদি, আমার ভয় যাবে।

শ্রীমতীর গান

আর রেখো না আঁধারে আমায়
দেখতে দাও।
তোমার মাঝে আমার আপনারে
আমায় দেখতে দাও।
কাঁদাও যদি কাঁদাও এবার,
সুখের গ্লানি সয় না যে আর,
যাক না ধুয়ে নয়ন আমার
অশ্রুধারে,
আমায় দেখতে দাও।
জানি না তো কোন্ কালো এই ছায়া,
আপন ব'লে ভুলায় যখন
ঘনায় বিষম মায়া।
স্বপ্নভারে জমল বোঝা,
চিরজীবন শূন্য খোঁজা,

যে মোর আলো লুকিয়ে আছে
রাতের পারে
আমায় দেখতে দাও।

একজন অন্তঃপুররক্ষিণীর প্রবেশ

রক্ষিণী। শোনো, শোনো, শ্রীমতী।

মালতী। কেন নিষ্ঠুর হচ্ছ তোমরা। আর আমাদের যেতে বলো না। আমরা দুটি মেয়ে এই উদ্যানের কাছে মাটির 'পরে বসে থাকি না—তাতে তোমাদের কী ক্ষতি হবে।

রক্ষিণী। তোমাদেরই বা কী তাতে প্রয়োজন।

মালতী। ভগবান বুদ্ধ যে-উদ্যানে একদিন প্রবেশ করেছিলেন তার শেষপ্রান্তেও তাঁর পদধুলা আছে। তোমরা যদি ভিতরে না যেতে দাও তাহলে আমরা এইখানে সেই ধুলায় বসে মনের মধ্যে তাঁর জন্মোৎসব গ্রহণ করি—মন্ত্রও বলব না, অর্ঘ্যও দেব না।

রক্ষিণী। কেন বলবে না মন্ত্র। বলো, বলো। শুনতেও পাব না এত কী পাপ করেছি। অন্য রক্ষিণীরা দূরে আছে, এইবেলা আজ পুণ্যদিনে শ্রীমতী তোমার মধুর কণ্ঠ থেকে প্রভুর স্তব শুনে নিই। তুমি জেনো আমি তাঁর দাসী। যেদিন তিনি এসেছিলেন অশোকছায়ায় সেদিন আমি যে তাঁকে এই পাপচোখে দেখেছি তার পর থেকে আমার অন্তরে তিনি আছেন।

শ্রীমতী।
নমো নমো বুদ্ধ দিবাকরায়
নমো নমো গোতম-চন্দিমায়,
নমো নমো নন্তগুণন্নবায়,
নমো নমো সাকিয়নন্দনায়॥

রক্ষিণী, তুমিও আমার সঙ্গে সঙ্গে বলো।

রক্ষিণী। আমার মুখে কি পুণ্যমন্ত্র বের হবে।

শ্রীমতী। ভক্তি আছে হৃদয়ে, যা বলবে তাই পুণ্য হবে। বলো

নমো নমো বুদ্ধ দিবাকরায়। [ক্রমে ক্রমে আবৃত্তি করাইয়া লইল।

রক্ষিণী। আমার বুকের বোঝা নেমে গেল শ্রীমতী, আজকের দিন আমার সার্থক

হল। যে-কথা বলতে এসেছিলেম এবার বলে নিই। তুমি এখান থেকে পালাও, আমি তোমাকে পথ করে দিচ্ছি।

শ্রীমতী। কেন।

রক্ষিণী। মহারাজ অজাতশত্রু দেবদত্তের কাছে দীক্ষা নিয়েছেন। তিনি অশোকতলে প্রভুর আসন ভেঙে দিয়েছেন।

মালতী। হায় হায় দিদি, হায় হায়, আমার দেখা হল না। আমার ভাগ্য মন্দ, ভেঙে গেল সব।

শ্রীমতী। কী বলিস মালতী। তাঁর আসন অক্ষয়। মহারাজ বিম্বিসার যা গড়েছিলেন তাই ভেঙেছে। প্রভুর আসনকে কি পাথর দিয়ে পাকা করতে হবে। ভগবানের নিজের মহিমাই তাকে রক্ষা করে।

রক্ষিণী। রাজা প্রচার করেছেন সেখানে যে-কেউ আরতি করবে, স্তবমন্ত্র পড়বে, তার প্রাণদণ্ড হবে। শ্রীমতী, তাহলে তুমি আর কী করবে এখানে।

শ্রীমতী। অপেক্ষা করে থাকব।

রক্ষিণী। কতদিন।

শ্রীমতী। যতদিন না পূজার ডাক আসে। যতদিন বেঁচে আছি ততদিনই।

রক্ষিণী। পূর্ব হতে আজ তোমার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি শ্রীমতী।

শ্রীমতী। কিসের ক্ষমা।

রক্ষিণী। হয়তো রাজার আদেশে তোমাকেও আঘাত করতে হবে।

শ্রীমতী। ক'রো আঘাত।

রক্ষিণী। সে আঘাত হয়তো রাজবাড়ির নটীর উপরে পড়বে, কিন্তু প্রভুর ভক্ত সেবিকাকে আজও আমার প্রণাম, সেদিনও আমার প্রণাম, আমাকে ক্ষমা করো।

শ্রীমতী। আমার প্রভু আমাকে সকল আঘাত ক্ষমা করবার বর দিন। বুদ্ধো খমতু, বুদ্ধো খমতু।

অন্য রক্ষিণীর প্রবেশ

দ্বিতীয় রক্ষিণী। রোদিনী।

প্রথম রক্ষিণী। কী পাটলী।

পাটলী। ভগবতী উৎপলপর্ণাকে এরা মেরে ফেলেছে।

রোদিনী। কী সর্বনাশ!

শ্রীমতী। কে মারলে।

পাটলী। দেবদত্তের শিষ্যেরা।

রোদিনী। রক্তপাত তবে শুরু হল। তাই যদি হলই তাহলে আমাদের হাতেও অস্ত্র আছে। এ পাপ সইব না। এ যে প্রভুর সংঘকে মারলে। শ্রীমতী ক্ষমা চলবে না, অস্ত্র ধরো।

শ্রীমতী। লোভ দেখিয়ো না রোদিনী। আমি নটী, তোমার ওই তলোয়ার দেখে আমার এই নাচের হাতও চঞ্চল হয়ে উঠল।

পাটলী। তাহলে এই নাও। [তরবারি দান

শ্রীমতী। (শিহরিয়া হাত হইতে তলোয়ার পড়িয়া গেল) না, না। প্রভুর কাছ থেকে অস্ত্র পেয়েছি। চলছে আমার যুদ্ধ, মার পরাস্ত হ'ক, প্রভুর জয় হ'ক।

পাটলী। চল্ রোদিনী, ভগবতীর দেহ বহন করে নিয়ে যেতে হবে শ্মশানে।

[উভয়ের প্রস্থান

কয়েকজন রক্ষিণী সহ রত্নাবলীর প্রবেশ

রত্নাবলী। এই যে এখানেই আছে। ওকে রাজাদেশ শুনিয়ে দাও।

রক্ষিণী। মহারাজের আদেশ এই যে, তুমি নটী তোমাকে অশোকবনে নাচতে যেতে হবে।

শ্রীমতী। নাচ! আজ!

মালতী। তোমরা এ কী কথা বলছ গো। মহারাজের ভয় হল না এমন আদেশ করতে?

রত্নাবলী। ভয় হবারই তো কথা। সেই দিনই তো এসেছে। তাঁর নটীদাসীকেও ভয় করবেন রাজেশ্বর! গ্রাম্য বর্বর।

শ্রীমতী। কখন নাচ হবে?

রত্নাবলী। আজ আরতির বেলায়।

শ্রীমতী। প্রভুর আসনবেদির সামনে?

রত্নাবলী। হাঁ।

শ্রীমতী। তবে তাই হ'ক। [সকলের প্রস্থান

ভিক্ষুদের প্রবেশ ও গান

হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী, নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্ব
ঘোর কুটিল পন্থ তার লোভজটিল বন্ধ।
নূতন তব জন্ম লাগি কাতর সব প্রাণী
কর ত্রাণ মহাপ্রাণ, আন অমৃতবাণী.
বিকশিত কর প্রেমপদ্ম চির-মধুনিষ্যন্দ।

শান্ত হে, মুক্ত হে, হে অনন্তপুণ্য,
করুণাঘন, ধরণীতল কর কলঙ্কশূন্য।
এস দানবীর দাও ত্যাগ কঠিন দীক্ষা,
মহাভিক্ষু লও সবার অহংকার ভিক্ষা।
লোক লোক ভুলুক শোক খণ্ডন কর মোহ,
উজ্জ্বল হ'ক জ্ঞান-সূর্য উদয়-সমারোহ,
প্রাণ লভুক সকল ভুবন নয়ন লভুক অন্ধ।
শান্ত হে, মুক্ত হে, হে অনন্তপুণ্য,
করুণাঘন, ধরণীতল কর কলঙ্কশূন্য।
ক্রন্দনময় নিখিল হৃদয় তাপদহনদীপ্ত,
বিষয়বিষ-বিকারজীর্ণ দীর্ণ অপরিতৃপ্ত।
দেশ দেশ পরিল তিলক রক্ত কলুষ গ্লানি,
তব মঙ্গলশঙ্খ আন তব দক্ষিণপাণি,
তব শুভসংগীতরাগ তব সুন্দর ছন্দ।
শান্ত হে, মুক্ত হে, হে অনন্তপুণ্য,
করুণাঘন, ধরণীতল কর কলঙ্কশূন্য।

রাজোদ্যান

মালতী ও শ্রীমতী

মালতী। দিদি, শান্তি পাচ্ছিনে।

শ্রীমতী। কী হয়েছে।

মালতী। তোমাকে যখন ওরা নাচের সাজ করাতে নিয়ে গেল আমি চুপি চুপি ওই প্রাচীরের কাছে গিয়ে রাস্তার দিকে চেয়ে দেখলেম। দেখি ভিক্ষুণী উৎপলপর্ণার মৃতদেহ নিয়ে চলেছে আর,—

শ্রীমতী। থামলে কেন। বলো।

মালতী। রাগ করবে না দিদি? আমি বড়ো দুর্বল।

শ্রীমতী। কিছুতেই না।

মালতী। দেখলেম অন্ত্যেষ্টিমন্ত্র পড়তে পড়তে শবদেহের সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছিলেন।

শ্রীমতী। কে যাচ্ছিলেন।

মালতী। দূর থেকে মনে হল যেন তিনি।

শ্রীমতী। অসম্ভব নেই।

মালতী। পণ করেছিলেম, মুক্তি যতদিন না পাই তাঁকে দূর থেকেও দেখব না।

শ্রীমতী। রক্ষা করিস সেই পণ। সমুদ্রের দিকে অনিমেষ তাকিয়ে থাকলেই তো পার দেখা যায় না। দুরাশায় মনকে প্রশ্রয় দিসনে।

মালতী। তাঁকে দেখবার আশায় মনকে আকুল করছি মনে ক'রো না। ভয় হচ্ছে ওঁকে তারা মারবে তাই কাছে থাকতে চাই। পণ রাখতে পারছিনে বলে আমাকে অবজ্ঞা ক'রো না দিদি।

শ্রীমতী। আমি কি তোর ব্যথা বুঝিনে।

মালতী। তাঁকে বাঁচাতে পারব না কিন্তু মরতে তো পারব। আর পারলুম না দিদি, এবারকার মতো সব ভেঙে গেল। এ-জীবনে হবে না মুক্তি।

শ্রীমতী। যাঁর কাছে যাচ্ছিস তিনিই তোকে মুক্তি দিতে পারেন। কেননা তিনি মুক্ত। তোর কথা শুনে আজ একটা কথা বুঝতে পারলুম।

মালতী। কী বুঝলে দিদি।

শ্রীমতী। এখনো আমার মনের মধ্যে পুরানো ক্ষত চাপা আছে সে আবার ব্যথিয়ে উঠল। বন্ধনকে বাইরে থেকে যতই তাড়া করেছি ততই সে ভিতরে গিয়ে লুকিয়েছে।

মালতী। রাজবাড়িতে তোমার মতো একলা মানুষ আর কেউ নেই তাই তোমাকে ছেড়ে যেতে বড়ো কষ্ট পাচ্ছি। কিন্তু যেতে হল। যখন সময় পাবে আমার জন্যে ক্ষমার মন্ত্র প'ড়ো।

শ্রীমতী। বুদ্ধে যো খলিতো দোসো, বুদ্ধো খমতু তং মম।

মালতী। (প্রণাম করিতে করিতে) 'বুদ্ধো খমতু তং মম।' যাবার মুখে একটা গান শুনিয়ে দাও। তোমার ওই মুক্তির গানে আজ একটুও মন দিতে পারব না। একটা পথের গান গাও।

শ্রীমতীর গান

পথে যেতে ডেকেছিলে মোরে।
পিছিয়ে পড়েছি আমি যাব যে কী করে।

এসেছে নিবিড় নিশি
পথরেখা গেছে মিশি',
সাড়া দাও, সাড়া দাও আঁধারের ঘোরে।
ভয় হয় পাছে ঘুরে ঘুরে
যত আমি যাই তত যাই চলে দূরে।
মনে করি আছ কাছে
তবু ভয় হয় পাছে
আমি আছি তুমি নাই কালি নিশিভোরে।

মালতী। শোনো দিদি, আবার গর্জন। দয়া নেই, কারো দয়া নেই। অনন্তকারুণিক বুদ্ধ তো এই পৃথিবীতেই পা দিয়েছেন তবু এখানে নরকের শিখা নিবল না। আর দেরি করতে পারিনে। প্রণাম, দিদি। মুক্তি যখন পাবে আমাকে একবার ডাক দিয়ো, একবার শেষ চেষ্টা করে দেখো।

শ্রীমতী। চল্, তোকে প্রাচীরদ্বার পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিয়ে আসিগে। [উভয়ের প্রস্থান

রত্নাবলী ও মল্লিকার প্রবেশ

রত্নাবলী। দেবদত্তের শিষ্যেরা ভিক্ষুণীকে মেরেছে। তা নিয়ে এত ভাবনা কিসের? ও তো ছিল সেই ক্ষেত্রপালের মেয়ে।

মল্লিকা। কিন্তু আজ যে ও ভিক্ষুণী।

রত্নাবলী। মন্ত্র পড়ে কি রক্ত বদল হয়?

মল্লিকা। আজকাল তো দেখছি মন্ত্রের বদল রক্তের বদলের চেয়ে ঢের বড়ো।

রত্নাবলী। রেখে দে ও-সব কথা। প্রজারা উত্তেজিত হয়েছে বলে রাজার ভাবনা! এ আমি সইতে পারিনে। তোমার ভিক্ষুধর্ম রাজধর্মকে নষ্ট করছে।

মল্লিকা। উত্তেজনার আরও একটু কারণ আছে। মহারাজ বিম্বিসার পূজার জন্য যাত্রা করে বেরিয়েছেন কিন্তু এখনো পৌঁছননি, প্রজারা সন্দেহ করছে।

রত্নাবলী। কানাকানি চলছে আমিও শুনেছি। ব্যাপারটা ভালো নয় তা মানি। কিন্তু কর্মফলের মূর্তি হাতে হাতে দেখা গেল।

মল্লিকা। কী কর্মফল দেখলে?

রত্নাবলী। মহারাজ বিম্বিসার পিতার বৈদিক ধর্মকে বিনাশ করেছেন। সে কি পিতৃহত্যার চেয়ে বেশি নয়? ব্রাহ্মণরা তো তখন থেকেই বলছে, যে যজ্ঞের আগুন উনি নিবিয়েছেন সেই ক্ষুধিত আগুন একদিন ওঁকে খাবে।

মল্লিকা। চুপ চুপ, আস্তে। জান তো, অভিশাপের ভয়ে উনি কী রকম অবসন্ন হয়ে পড়েছেন।

রত্নাবলী। কার অভিশাপ?

মল্লিকা। বুদ্ধের। মনে মনে মহারাজ ওঁকে ভারি ভয় করেন।

রত্নাবলী। বুদ্ধ তো কাউকে অভিশাপ দেন না। অভিশাপ দিতে জানে দেবদত্ত।

মল্লিকা। তাই তার এত মান। দয়ালু দেবতাকে মানুষ মুখের কথায় ফাঁকি দেয়, হিংসালু দেবতাকে দেয় দামি অর্ঘ্য।

রত্নাবলী। যে-দেবতা হিংসা করতে জানে না, তাকে উপবাসী থাকতে হয়, নখদন্তহীন বৃদ্ধ সিংহের মতো।

মল্লিকা। যাই হ'ক এই বলে যাচ্ছি, আজ সন্ধ্যেবেলায় ওই অশোকচৈত্যে পুজো হবেই।

রত্নাবলী। তা হয় হ'ক কিন্তু নাচ তার আগেই হবে এও আমি বলে দিচ্ছি।

[মল্লিকার প্রস্থান

বাসবীর প্রবেশ

বাসবী। প্রস্তুত হয়ে এলেম।

রত্নাবলী। কিসের জন্যে?

বাসবী। শোধ তুলব বলে। অনেক লজ্জা দিয়েছে ওই নটী।

রত্নাবলী। উপদেশ দিয়ে?

বাসবী। না, ভক্তি করিয়ে।

রত্নাবলী। তাই ছুরি হাতে এসেছ?

বাসবী। সেজন্যে না। রাষ্ট্রবিপ্লবের আশঙ্কা ঘটেছে। বিপদে পড়ি তো নিরস্ত্র মরব না।

রত্নাবলী। নটীর উপর শোধ তুলবে কী দিয়ে?

বাসবী। (হার দেখাইয়া) এই হার দিয়ে।

রত্নাবলী। তোমার হীরের হার!

বাসবী। বহুমূল্য অবমাননা, রাজকুলের উপযুক্ত। ও নাচবে ওর গায়ে পুরস্কার ছুঁড়ে ফেলে দেব।

রত্নাবলী। ও যদি তিরস্কার ক'রে ফিরে ফেলে দেয় তোমার গায়ে। যদি না নেয়।

বাসবী। (ছুরি দেখাইয়া) তখন এই আছে।

রত্নাবলী। শীঘ্র ডেকে আনো মহারানী লোকেশ্বরীকে, তিনি খুব আমোদ পাবেন।

বাসবী। আসবার সময় খুঁজেছিলেম তাঁকে। শুনলেম ঘরে দ্বার দিয়ে আছেন। একি রাষ্ট্রবিপ্লবের ভয়ে না স্বামীর ’পরে অভিমানে? বোঝা গেল না।

রত্নাবলী। কিন্তু আজ হবে নটীর নতিনাট্য, তাতে মহারানীর উপস্থিত থাকা চাই।

বাসবী। নটীর নতিনাট্য। নামটি বেশ বানিয়েছ।

মল্লিকার প্রবেশ

মল্লিকা। যা মনে করেছিলেম তাই ঘটেছে। রাজ্যে যেখানে যত বুদ্ধের শিষ্য আছে মহারাজ অজাতশত্রু সবাইকে ডাকতে দূত পাঠিয়েছেন। এমনি করে গ্রহপূজা চলছেই, কখনো বা শনিগ্রহ কখনো বা রবিগ্রহ।

রত্নাবলী। ভালোই হয়েছে। বুদ্ধের সব-কটি শিষ্যকেই দেবদত্তের শিষ্যদের হাতে একসঙ্গে সমর্পণ করে দিন। তাতে সময়-সংক্ষেপ হবে।

মল্লিকা। সেজন্যে নয়। ওরা রাজার হয়ে অহোরাত্র পাপমোচন মন্ত্র পড়তে আসছে। মহারাজ একেবারে অভিভূত হয়ে পড়েছেন।

বাসবী। তাতে কী হয়েছে?

মল্লিকা। কী আশ্চর্য। এখনো জনশ্রুতি তোমার কানে পৌঁছয়নি! সবাই অনুমান করছে, পথের মধ্যে ওরা বিম্বিসার মহারাজকে হত্যা করেছে।

বাসবী। সর্বনাশ। এ কখনো সত্য হতেই পারে না।

মল্লিকা। কিন্তু এটা সত্য যে, মহারাজকে যেন আগুনের জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছে। তিনি কোন্ একটা অনুশোচনায় ছটফট করে বেড়াচ্ছেন।

বাসবী। হায়, হায়, এ কী সংবাদ।

রত্নাবলী। লোকেশ্বরী মহারানী কি শুনেছেন?

মল্লিকা। অপ্রিয় সংবাদ তাঁকে যে শোনাবে তাকে তিনি দুখানা করে ফেলবেন। কেউ সাহস পাচ্ছে না।

বাসবী। সর্বনাশ হল। এতবড়ো পাপের আঘাত থেকে রাজবাড়ির কেউ বাঁচবে না। ধর্মকে নিয়ে যা খুশি করতে গেলে কি সহ্য হয়?

রত্নাবলী। ওই রে! বাসবী আবার দেখছি নটীর চেলা হবার দিকে ঝুঁকছে। ভয়ের তাড়া খেলেই ধর্মের মূঢ়তার পিছনে মানুষ লুকোতে চেষ্টা করে।

বাসবী। কখনো না। আমি কিছু ভয় করিনে। ভদ্রাকে এই খবরটা দিয়ে আসিগে।

রত্নাবলী। মিথ্যা ছুতো করে পালিয়ো না। ভয় তুমি পেয়েছ। তোমাদের এই অবসাদ দেখলে আমার বড়ো লজ্জা করে। এ কেবল নীচসংসর্গের ফল।

বাসবী। অন্যায় বলছ তুমি, আমি কিছুই ভয় করিনে।

রত্নাবলী। আচ্ছা তাহলে অশোকবনে নাচ দেখতে চলো।

বাসবী। কেন যাব না। তুমি ভাবছ আমাকে জোর করে নিয়ে যাচ্ছ?

রত্নাবলী। আর দেরি নয়, মল্লিকা, শ্রীমতীকে এখনই ডাকো, সাজ হ'ক বা না হ'ক। রাজকন্যারা যদি না আসতে চায় রাজকিংকরীদের সবাইকে চাই। নইলে কৌতুক অসম্পূর্ণ থাকবে।

বাসবী। ওই যে শ্রীমতী আসছে। দেখো, দেখো, যেন চলছে স্বপ্নে। যেন মধ্যাহ্নের দীপ্ত মরীচিকা, ওর মধ্যে ও যেন একটুও নেই।

ধীরে ধীরে শ্রীমতীর প্রবেশ ও গান

হে মহাজীবন, হে মহামরণ,
লইনু শরণ, লইনু শরণ।
আঁধার প্রদীপে জ্বালাও শিখা,
পরাও, পরাও জ্যোতির টিকা,
করো হে আমার লজ্জা হরণ।

রত্নাবলী। এইদিকে পথ। আমাদের কথা কি কানে পৌঁছচ্ছে না? এই যে এইদিকে।

শ্রীমতী। পরশরতন তোমারি চরণ,
লইনু শরণ লইনু শরণ,
যা-কিছু মলিন, যা কিছু কালো
যা-কিছু বিরূপ হোক তা ভালো,
ঘুচাও ঘুচাও সব আবরণ।

রত্নাবলী। বাসবী, দাঁড়িয়ে রইলে কেন? চলো।

বাসবী। না, আমি যাব না।

রত্নাবলী। কেন যাবে না?

বাসবী। তবে সত্য কথা বলি। আমি পারব না।

রত্নাবলী। ভয় করছে?

বাসবী। হাঁ ভয় করছে।

রত্নাবলী। ভয় করতে লজ্জা করছে না ?

বাসবী। একটুমাত্রও না। শ্রীমতী, সেই ক্ষমার মন্ত্রটা।

শ্রীমতী। উত্তমঙ্গেন বন্দেহং পাদপংসু-বরুত্তমং

বুদ্ধে যো খলিতো দোসো বুদ্ধো খমতু তং মম।

বাসবী। বুদ্ধো খমতু তং মম, বুদ্ধো খমতু তং মম,

বুদ্ধো খমতু তং মম।

শ্রীমতীর গান

হার মানালে, ভাঙিলে অভিমান।
ক্ষীণ হাতে জ্বালা
ম্লান দীপের থালা
হল খান খান।
এবার তবে জ্বালো
আপন তারার আলো,
রঙিন ছায়ার এই গোধূলি হ'ক অবসান।
এস পারের সাথি।
বইল পথের হাওয়া, নিবল ঘরের বাতি।
আজি বিজন বাটে,
অন্ধকারের ঘাটে
সব হারানো নাটে
এনেছি এই গান। [সকলের প্রস্থান

ভিক্ষুদের প্রবেশ ও গান

সকল কলুষ তামস হর,
জয় হ'ক তব জয়,
অমৃতবারি সিঞ্চন কর
নিখিল ভুবনময়।
মহাশান্তি মহাক্ষেম
মহাপুণ্য মহাপ্রেম।
জ্ঞানসূর্য-উদয়ভাতি
ধ্বংস করুক তিমির-রাতি।

দুঃসহ দুঃস্বপ্ন ঘাতি'
অপগত কর ভয়।
মহাশান্তি মহাক্ষেম
মহাপুণ্য মহাপ্রেম ॥
মোহমলিন অতিদুর্দিন
শঙ্কিত চিত পান্থ,
জটিল-গহন পথসংকট
সংশয় উদ্‌ভ্রান্ত।
করুণাময় মাগি শরণ
দুর্গতিভয় করহ হরণ,
দাও দুঃখবন্ধতরণ
মুক্তির পরিচয়।
মহাশান্তি মহাক্ষেম
মহাপুণ্য মহাপ্রেম।

চতুর্থ অঙ্ক

অশোকতল। ভাঙা স্তূপ। ভগ্নপ্রায় আসনবেদি

রত্নাবলী। রাজকিংকরীগণ। একদল রক্ষিণী

প্রথম কিংকরী। রাজকুমারী, আমাদের প্রাসাদের কাজে বিলম্ব হচ্ছে।

রত্নাবলী। আর একটু অপেক্ষা করো। মহারানী লোকেশ্বরী স্বয়ং এসে দেখতে চান। তিনি না এলে নাচ আরম্ভ হতে পারে না।

দ্বিতীয় কিংকরী। আপনার আদেশে এসেছি। কিন্তু অধর্মের ভয়ে মন ব্যাকুল।

তৃতীয় কিংকরী। এইখানেই প্রভুকে পূজা দিয়েছি, আজ এখানেই নটীর নাচ দেখা। ছি ছি, কেমন করে এ পাপের ক্ষালন হবে?

চতুর্থ কিংকরী। এতবড়ো বীভৎস ব্যাপার এখানে হবে জানতেম না। থাকতে পারব না আমরা, কিছুতে না।

রত্নাবলী। মন্দভাগিনী তোরা শুনিসনি, বুদ্ধের পূজা এ-রাজ্যে নিষিদ্ধ হয়েছে।

চতুর্থ কিংকরী। রাজাকে অমান্য করা আমাদের সাধ্য নেই। ভগবানের পূজা নাই করলেম কিন্তু তাই বলে তাঁর অপমান করতে পারিনে।

প্রথম কিংকরী। রাজবাড়ির নটীর নাচ রাজকন্যা রাজবধূদেরই জন্যে। এ সভায় আমাদের কেন? চলো তোমরা, আমাদের যেখানে স্থান সেখানে যাই।

রত্নাবলী। (রক্ষিণীদের প্রতি) যেতে দিয়ো না ওদের। এইবার শীঘ্র নটীকে ডেকে নিয়ে এস।

প্রথম কিংকরী। রাজকুমারী, এ পাপ নটীকে স্পর্শ করবে না। এ পাপ তোমারই।

রত্নাবলী। তোরা ভাবিস তোদের নতুন ধর্মের নতুন-গড়া পাপকে আমি গ্রাহ্য করি।

দ্বিতীয় কিংকরী। মানুষের ভক্তিকে অপমান করা এ তো চিরকালের পাপ।

রত্নাবলী। এই নটীসাধ্বীর হাওয়া তোমাদের সবাইকে লাগল দেখছি। আমাকে পাপের ভয় দেখিয়ো না, আমি শিশু নই।

রক্ষিণী। (প্রথম কিংকরীর প্রতি) বসুমতী, আমরা শ্রীমতীকে ভক্তি করেছি কিন্তু ভুল করেছি তো। সে তো নাচতে রাজি হল।

রত্নাবলী। রাজি হবে না? রাজার আদেশকে ভয় করবে না?

রক্ষিণী। ভয় তো আমরাই করি, কিন্তু—

রত্নাবলী। নটীর পদ কি তোমাদেরও উপরে?

প্রথম কিংকরী। আমরা তো ওকে নটী বলে আর ভাবতুম না। আমরা ওর মধ্যে স্বর্গের আলো দেখেছি।

রত্নাবলী। নটী স্বর্গে গিয়েও নাচে তা জানিসনে!

রক্ষিণী। শ্রীমতীকে পাছে রাজার আদেশে আঘাত করতে হয় এই ভয় ছিল কিন্তু আজ মনে হচ্ছে রাজার আদেশের অপেক্ষা করবার দরকার নেই।

প্রথম কিংকরী। ও পাপীয়সীদের কথা থাক্। কিন্তু এই পাপদৃশ্যে দুই চোখকে কলঙ্কিত করলে আমাদের গতি হবে কী?

রত্নাবলী। এখনো নটীর সাজ শেষ হল না। দেখছ তো তোমাদের নটীসাধ্বীর সাজের আনন্দ কত।

প্রথম কিংকরী। ওই যে এল! ইস, রেখেছিস ঝলমল করছে।

দ্বিতীয় কিংকরী। পাপদেহে এক-শ বাতির আলো জালিয়েছে।

শ্রীমতীর প্রবেশ

প্রথম কিংকরী। পাপিষ্ঠা, শ্রীমতী। ভগবানের আসনের সম্মুখে, নির্লজ্জ, তুই আজ নাচবি! তোর দুখানা পা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল না এখনো?

শ্রীমতী। উপায় নেই, আদেশ আছে।

দ্বিতীয় কিংকরী। নরকে গিয়ে শতলক্ষ বৎসর ধরে জ্বলন্ত অঙ্গারের উপরে তোকে দিনরাত নাচতে হবে এ আমি বলে দিলেম।

তৃতীয় কিংকরী। দেখো একবার। পাতকিনী আপাদমস্তক অলংকার পরেছে। প্রত্যেক অলংকারটি আগুনের বেড়ি হয়ে তোর হাড়ে মাংসে জড়িয়ে থাকবে, তোর নাড়ীতে নাড়ীতে জ্বালার স্রোত বইয়ে দেবে তা জানিস?

মল্লিকার প্রবেশ

মল্লিকা। (জনান্তিকে, রত্নাবলীকে) রাজ্যে বুদ্ধপূজার যে-নিষেধ প্রচার হয়েছিল সে আবার ফিরিয়ে নেওয়া হয়েছে। পথে পথে দুন্দুভি বাজিয়ে তাই ঘোষণা চলছে। হয়তো এখনই এখানেও আসবে তাই সংবাদ দিয়ে গেলেম। আরও একটি সংবাদ আছে। আজ মহারাজ অজাতশত্রু স্বয়ং এখানে এসে পূজা করবেন তার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছেন।

রত্নাবলী। একবার দৌড়ে যাও তাহলে মল্লিকা—শীঘ্র মহারানী লোকেশ্বরীকে ডেকে নিয়ে এস।

মল্লিকা। ওই যে তিনি আসছেন।

লোকেশ্বরীর প্রবেশ

রত্নাবলী। মহারানী, এই আপনার আসন।

লোকেশ্বরী। থামো। শ্রীমতীর সঙ্গে নিভৃতে আমার কথা আছে। (শ্রীমতীকে জনান্তিকে ডাকিয়া লইয়া) শ্রীমতী।

শ্রীমতী। কী মহারানী।

লোকেশ্বরী। এই লও, তোমার জন্যে এনেছি।

শ্রীমতী। কী এনেছেন?

লোকেশ্বরী। অমৃত।

শ্রীমতী। বুঝতে পারছিনে।

লোকেশ্বরী। বিষ। খেয়ে মরো, পরিত্রাণ পাবে।

শ্রীমতী। পরিত্রাণের আর উপায় নেই ভাবছেন?

লোকেশ্বরী। না। রত্নাবলী আগেই গিয়ে রাজার কাছ থেকে তোমার জন্তে নাচার আদেশ আনিয়েছে। সে আদেশ কিছুতেই ফিরবে না জানি।

রত্নাবলী। মহারানী, আর সময় নেই, নৃত্য আরম্ভ হ'ক।

লোকেশ্বরী। এই নে, শীঘ্র খেয়ে ফেল। এখানে মলে স্বর্গ পাবি, এখানে নাচলে যাবি অবীচি নরকে।

শ্রীমতী। সর্বাগ্রে আদেশ পালন করে নিই।

লোকেশ্বরী। নাচবি ?

শ্রীমতী। হাঁ নাচব।

লোকেশ্বরী। ভয় নেই তোর ?

শ্রীমতী। না, কিছু না।

লোকেশ্বরী। তবে তোমাকে কেউ উদ্ধার করতে পারবে না।

শ্রীমতী। যিনি উদ্ধারকর্তা তিনি ছাড়া।

রত্নাবলী। মহারানী, আর একমুহূর্ত দেরি চলবে না। বাইরে গোলমাল শুনছ না ? হয়তো বিদ্রোহীরা এখনই রাজোদ্যানে ঢুকে পড়বে। নটী, নাচ শুরু হ'ক।

শ্রীমতীর গান ও নাচ

আমায় ক্ষমো হে ক্ষমো, নমো হে নমঃ
তোমায় স্মরি, হে নিরুপম,
নৃত্যরসে চিত্ত মম
উছল হয়ে বাজে।
আমার সকল দেহের আকুল রবে
মন্ত্রহারা তোমার স্তবে
ডাহিনে বামে ছন্দ নামে
নব জনমের মাঝে।
তোমার বন্দনা মোর ভঙ্গিতে আজ
সংগীতে বিরাজে।

রত্নাবলী। এ কী রকম নাচ ? এ তো নাচের ভান। আর এই গানের অর্থ কী ?

লোকেশ্বরী। না না বাধা দিয়ো না।

শ্রীমতীর গান ও নাচ

এ কী পরম ব্যথায় পরান কাঁপায়
কাঁপন বক্ষে লাগে

শান্তিসাগরে ঢেউ খেলে যায়
সুন্দর তায় জাগে।
আমার সব চেতনা সব বেদনা
রচিল এ যে কী আরাধনা,
তোমার পায়ে মোর সাধনা
মরে না যেন লাজে।
তোমার বন্দনা মোর ভঙ্গিতে আজ
সংগীতে বিরাজে।

রত্নাবলী। এ কী হচ্ছে? গয়নাগুলো একে একে তালে তালে ওই স্তূপের আবর্জনার মধ্যে ফেলে দিচ্ছে। ওই গেল কঙ্কণ, ওই গেল কেয়ূর, ওই গেল হার। মহারানী, দেখছেন এ সমস্ত রাজবাড়ির অলংকার—এ কী অপমান! শ্রীমতী, এ আমার নিজের গায়ের অলংকার। কুড়িয়ে নিয়ে এসে মাথায় ঠেকাও, যাও এখনই।

লোকেশ্বরী। শান্ত হও, শান্ত হও। ওর দোষ নেই, এমনি করে আভরণ ফেলে দেওয়া, এই নাচের এই তো অঙ্গ। আনন্দে আমারও শরীর দুলে উঠছে। (গলা হইতে হার খুলিয়া ফেলিয়া) শ্রীমতী, থেমো না, থেমো না।

শ্রীমতীর গান ও নাচ

আমি কানন হতে তুলিনি ফুল,
মেলেনি মোরে ফল।
কলস মম শূন্যসম
ভরিনি তীর্থজল।
আমার তনু তনুতে বাঁধনহারা
হৃদয় ঢালে অধরা-ধারা,
তোমার চরণে হ'ক তা সারা
পূজার পুণ্য কাজে।
তোমার বন্দনা মোর ভঙ্গিতে আজ
সংগীতে বিরাজে।

রত্নাবলী। এ কী রকম নাচের বিড়ম্বনা। নটীর বেশ একে একে ফেলে দিলে। দেখছ তো মহারানী, ভিতরে ভিক্ষুণীর পীতবস্ত্র। একেই কি পূজা বলে না? রক্ষিণী, তোমরা দেখছ। মহারাজ কী দণ্ড বিধান করেছেন মনে নেই?

রক্ষিণী। শ্রীমতী তো পূজার মন্ত্র পড়েনি।

শ্রীমতী। (জানু পাতিয়া) বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি—

রক্ষিণী। (শ্রীমতীর মুখে হাত দিয়া) থাম্ থাম্ দুঃসাহসিকা, এখনো থাম্।

রত্নাবলী। রাজার আদেশ পালন করো।

শ্রীমতী।
বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি
ধম্মং সরণং গচ্ছামি—

কিংকরীগণ। সর্বনাশ করিসনে শ্রীমতী, থাম্ থাম্।

রক্ষিণী। যাসনে মরণের মুখে উন্মত্তা।

দ্বিতীয় রক্ষিণী। আমি করজোড়ে মিনতি করছি আমাদের উপর দয়া করে ক্ষান্ত হ।

কিংকরীগণ। চক্ষে দেখতে পারব না, দেখতে পারব না, পালাই আমরা। [পলায়ন

রত্নাবলী। রাজার আদেশ পালন করো।

শ্রীমতী।
বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি
ধম্মং সরণং গচ্ছামি
সংঘং সরণং গচ্ছামি।

লোকেশ্বরী। (জানু পাতিয়া সঙ্গে সঙ্গে)

বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি
ধম্মং সরণং গচ্ছামি
সংঘং সরণং গচ্ছামি।

রক্ষিণী শ্রীমতীকে অস্ত্রাঘাত করিতেই সে আসনের উপর পড়িয়া গেল। 'ক্ষমা করো ক্ষমা করো', বলিতে বলিতে রক্ষিণীরা একে একে শ্রীমতীর পায়ের ধুলা লইল।

লোকেশ্বরী। (শ্রীমতীর মাথা কোলে লইয়া) নটী, তোর এই ভিক্ষুণীর বস্ত্র আমাকে দিয়ে গেলি। (বসনের একপ্রান্ত মাথায় ঠেকাইয়া) এ আমার।

[রত্নাবলী ধূলিতে বসিয়া পড়িল

মল্লিকা। কী ভাবছ?

রত্নাবলী। (বস্ত্রাঞ্চলে মুখ আচ্ছন্ন করিয়া) এইবার আমার ভয় হচ্ছে।

প্রতিহারিণীর প্রবেশ

প্রতিহারিণী। মহারাজ অজাতশত্রু ভগবানের পূজা নিয়ে কাননদ্বারে অপেক্ষা করছেন দেবীদের সম্মতি চান।

মল্লিকা। চলো, আমি মহারাজকে দেবীদের সম্মতি জানিয়ে আসিগে। [প্রস্থান

লোকেশ্বরী। বলো তোমরা সবাই,

দ্ধং সরণং গচ্ছামি।

রত্নাবলী ব্যতীত সকলে। বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি।

লোকেশ্বরী। ধম্মং সরণং গচ্ছামি।

রত্নাবলী ব্যতীত সকলে। ধম্মং সরণং গচ্ছামি।

লোকেশ্বরী। সংঘং সরণং গচ্ছামি।

রত্নাবলী ব্যতীত সকলে। সংঘং সরণং গচ্ছামি।

নত্থি মে সরণং অঞ্‌ঞং বুদ্ধো মে সরণং বরং
এতেন সচ্চবজ্জেন হোতু মে জয়মঙ্গলং।

মল্লিকার প্রবেশ

মল্লিকা। মহারাজ এলেন না, ফিরে গেলেন।

লোকেশ্বরী। কেন?

মল্লিকা। সংবাদ শুনে তিনি ভয়ে কম্পিত হয়ে উঠলেন।

লোকেশ্বরী। কাকে তাঁর ভয়?

মল্লিকা। ওই হতপ্রাণ নটীকে।

লোকেশ্বরী। চলো পালঙ্ক নিয়ে আসি। এর দেহকে সকলে বহন করে নিয়ে যেতে হবে। [রত্নাবলী ছাড়া সকলের প্রস্থান

রত্নাবলী। (শ্রীমতীর পাদস্পর্শ করিয়া প্রণাম। জানু পাতিয়া বসিয়া)

বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি
ধম্মং সরণং গচ্ছামি
সংঘং সরণং গচ্ছামি

নটরাজ

ঋতুরঙ্গশালা

নৃত্য গীত ও আবৃত্তি যোগে "নটরাজ" দোলপূর্ণিমার রাত্রে শান্তিনিকেতনে অভিনীত হইয়াছিল।

নটরাজের তাণ্ডবে তাঁহার এক পদক্ষেপের আঘাতে বহিরাকাশে রূপলোক আবর্তিত হইয়া প্রকাশ পায়, তাঁহার অন্য পদক্ষেপের আঘাতে অন্তরাকাশে রসলোক উন্মথিত হইতে থাকে। অন্তরে বাহিরে মহাকালের এই বিরাট নৃত্যছন্দে যোগ দিতে পারিলে জগতে ও জীবনে অখণ্ড লীলারস উপলব্ধির আনন্দে মন বন্ধনমুক্ত হয়। "নটরাজ" পালাগানের এই মর্ম।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নটরাজ

মুক্তিতত্ত্ব

মুক্তিতত্ত্ব শুনতে ফিরিস
তত্ত্বশিরোমণির পিছে ?
হায় রে মিছে, হায় রে মিছে

মুক্ত যিনি দেখ্‌-না তাঁরে,
আয় চলে তাঁর আপন দ্বারে,
তাঁর বাণী কি শুকনো পাতায়
হলদে রঙে লেখেন তিনি।

মরা ডালের ঝরা ফুলের
সাধন কি তাঁর মুক্তি-কূলের।
মুক্তি কি পণ্ডিতের হাটে
উক্তিরাশির বিকিকিনি।

এই নেমেছে চাঁদের হাসি
এইখানে আয় মিলবি আসি,
বীণার তারে তারণ-মন্ত্র
শিখে নে তোর কবির কাছে।

আমি নটরাজের চেলা,
চিত্তাকাশে দেখছি খেলা,
বাঁধন খোলার শিখছি সাধন
মহাকালের বিপুল নাচে।

দেখছি, ও যার অসীম বিত্ত
সুন্দর তার ত্যাগের নৃত্য,
আপনাকে তার হারিয়ে প্রকাশ
আপনাতে যার আপনি আছে ।

যে-নটরাজ নাচের খেলায়
ভিতরকে তার বাইরে ফেলায়,
কবির বাণী অবাক মানি'
তারি নাচের প্রসাদ যাচে ।

শুনবি রে আয়, কবির কাছে
তরুর মুক্তি ফুলের নাচে,
নদীর মুক্তি আত্মহারা
নৃত্যধারার তালে তালে ।

রবির মুক্তি দেখ্ না চেয়ে
আলোক-জাগার নাচন গেয়ে,
তারার নৃত্যে শূন্য গগন
মুক্তি যে পায় কালে কালে ।

প্রাণের মুক্তি মৃত্যুরথে
নূতন প্রাণের যাত্রাপথে,
জ্ঞানের মুক্তি সত্য-সুতার
নিত্য-বোনা চিন্তাজালে ।

আয় তবে আয় কবির সাথে
মুক্তি-দোলের শুক্লরাতে,
জ্বলল আলো, বাজল মৃদঙ্
নটরাজের নাট্যশালে ।

উদ্বোধন

মন্দিরার মন্ত্র তব বক্ষে আজি বাজে, নটরাজ,
নৃত্যমদে মত্ত করে, ভাঙে চিন্তা, ভাঙে শঙ্কা লাজ,
তুচ্ছ করে সম্মানের অভিমান, চিত্ত টেনে আনে
বিশ্বের প্রাঙ্গণতলে তব নৃত্যচ্ছন্দের সন্ধানে।
মুক্তির প্রয়াসী আমি, শাস্ত্রের জটিল তর্কজালে
যৌবন হয়েছে বন্দী বাক্যের দুর্গের অন্তরালে ;
স্বচ্ছ আলোকের পথ রুদ্ধ করি ক্ষুব্ধ শুষ্ক ধূলি
আবর্তিয়া উঠে প্রাণে অন্ধতার জয়ধ্বজা তুলি
চতুর্দিকে। নটরাজ, তুমি আজ করো গো উদ্ধার
দুঃসাহসী যৌবনেরে, পদে পদে পড়ুক তোমার
চঞ্চল চরণভঙ্গি, রঙ্গেশ্বর, সকল বন্ধনে
উত্তাল নৃত্যের বেগে,—যে নৃত্যের অশান্ত স্পন্দনে
ধূলিবন্দিশালা হতে মুক্তি পায় নবশষ্পদল ;
পুলকে কম্পিত হয় প্রাণের দুরন্ত কৌতূহল,
আপনারে সন্ধানিতে ছুটে যায় দূর কালপানে,
দুর্গম দেশের পথে, জন্মমরণের তালে তানে,
সৃষ্টির রহস্যদ্বারে নৃত্যের আঘাত নিত্য হানে ,
যে-নৃত্যের আন্দোলনে মরুর পঞ্জরে কম্প আনে,
ক্ষুব্ধ হয় শুষ্কতার সজ্জাহীন লজ্জাহীন সাদা,
উচ্ছিন্ন করিতে চায় জড়ত্বের রুদ্ধবাক্ বাধা,
বন্ধ্যাতার অন্ধ দুঃশাসন ; শ্যামলের সাধনাতে
দীক্ষা ভিক্ষা করে মরু তব পায়ে ; যে নৃত্য আঘাতে
বহ্নিবাষ্প-সরোবরে ঊর্মি জাগে প্রচণ্ড চঞ্চল,
অতল আবর্তবক্ষে গ্রহনক্ষত্রের শতদল
প্রস্ফুটিয়া স্ফুরে নিত্যকাল ; ধূমকেতু অকস্মাৎ
উড়ায় উত্তরী হাস্যবেগে, করে ক্ষিপ্র পদপাত

তোমার ডম্বরুতালে, পূজা-নৃত্য করি দেয় সারা
সূর্যের মন্দির-সিংহদ্বারে, চলে যায় লক্ষ্যহারা
গৃহশূন্য পান্থ উদাসীন।
                              নটরাজ, আমি তব
কবি-শিষ্য, নাটের অঙ্গনে তব মুক্তিমন্ত্র লব।
তোমার তাণ্ডবতালে কর্মের বন্ধনগ্রন্থিগুলি
ছন্দবেগে স্পন্দমান পাকে পাকে সদ্য যাবে খুলি;
সর্ব অমঙ্গল-সর্প হীনদর্প অবনম্র ফণা
আন্দোলিবে শান্ত লয়ে।
                              প্রভু, এই আমার বন্দনা
নৃত্যগানে অর্পিব চরণতলে, তুমি মোর গুরু,
আজিকে আনন্দে ভয়ে বক্ষ মোর করে দুরু দুরু।
পূর্ণচন্দ্রে লিপি তব, হে পূর্ণ, পাঠালে নিমন্ত্রণে
বসন্তদোলের নৃত্যে, দক্ষিণবায়ুর আলিঙ্গন,
মল্লিকার গন্ধোল্লাসে, কিংশুকের দীপ্ত রক্তাংশুকে,
বকুলের মত্ততায়, অশোকের দোদুল কৌতুকে,
বেণুবনবীথিকার নিরন্তর মর্মরে কম্পনে
ইঙ্গিতে ভঙ্গিতে, আম্রমঞ্জরীর সর্বত্যাগপণে,
পলাশের গরিমায়।   অবসাদে যেন অন্যমনে
তাল ভঙ্গ নাহি করি, তব নামে আমার আহ্বান
জড়ের স্তব্ধতা ভেদি উৎসারিত করে দিক গান।
আমার আহ্বান যেন অভ্রভেদী তব জটা হতে
উত্তারি আনিতে পারে নির্ঝরিত রসসুধাস্রোতে
ধরিত্রীর তপ্ত বক্ষে নৃত্যচ্ছন্দ মন্দাকিনীধারা,
ভস্ম যেন অগ্নি হয়, প্রাণ যেন পায় প্রাণহারা।

নৃত্য

গান

নৃত্যের তালে তালে, নটরাজ,
ঘুচাও সকল বন্ধ হে।
সুপ্তি ভাঙাও, চিত্তে জাগাও
মুক্ত সুরের ছন্দ হে।
তোমার-চরণ-পবন-পরশে
সরস্বতীর মানস সরসে
যুগে যুগে কালে কালে,
সুরে সুরে তালে তালে,
ঢেউ তুলে দাও মাতিয়ে জাগাও
অমল কমল গন্ধ হে।
নমো নমো নমো—
তোমার নৃত্য অমিত বিত্ত
ভরুক চিত্ত মম।
নৃত্যে তোমার মুক্তির রূপ,
নৃত্যে তোমার মায়া।
বিশ্বতনুতে অণুতে অণুতে
কাঁপে নৃত্যের ছায়া।
তোমার বিশ্ব-নাচের দোলায়
বাঁধন পরায়, বাঁধন খোলায়,
যুগে যুগে কালে কালে,
সুরে সুরে তালে তালে ;
অন্ত কে তার সন্ধান পায়
ভাবিতে লাগায় ধন্দ হে।
নমো নমো নমো—
তোমার নৃত্য অমিত বিত্ত
ভরুক চিত্ত মম।

নৃত্যের বশে সুন্দর হল
বিদ্রোহী পরমাণু ;
পদযুগ ঘিরে জ্যোতি-মঞ্জীরে
বাজিল চন্দ্রভানু ।
তব নৃত্যের প্রাণবেদনায়
বিবশ বিশ্ব জাগে চেতনায়,
যুগে যুগে কালে কালে
সুরে সুরে তালে তালে,
সুখে দুখে হয় তরঙ্গময়
তোমার পরমানন্দ হে ।
নমো নমো নমো—
তোমার নৃত্য অমিত বিত্ত
ভরুক চিত্ত মম ।
মোর সংসারে তাণ্ডব তব,
কম্পিত জটাজালে ।
লোকে লোকে ঘুরে এসেছি তোমার
নাচের ঘূর্ণিতালে ।
ওগো সন্ন্যাসী, ওগো সুন্দর,
ওগো শংকর, হে ভয়ংকর,
যুগে যুগে কালে কালে
সুরে সুরে তালে তালে,
জীবন-মরণ নাচের ডমরু
বাজাও জলদমন্দ্র হে ।
নমো নমো নমো—
তোমার নৃত্য অমিত বিত্ত
ভরুক চিত্ত মম ।

ঋতুনৃত্য

বৈশাখ

ধ্যান-নিমগ্ন নীরব নগ্ন
নিশ্চল তব চিত্ত;
নিঃস্ব গগনে বিশ্ব ভুবনে
নিঃশেষ সব বিত্ত।
রসহীন তরু, নির্জীব মরু,
পবনে গর্জে রুদ্র ডমরু,
ঐ চারিধার করে হাহাকার
ধরাভাণ্ডার রিক্ত।
তব তপ-তাপে হেরো সবে কাঁপে,
দেবলোক হল ক্লান্ত।
ইন্দ্রের মেঘ, নাহি তার বেগ,
বরুণ করুণ শান্ত।
দুর্দিনে আনে নির্দয় বায়ু,
সংহার করে কাননের আয়ু,
ভয় হয় দেখি, নিখিল হবে কি
জড়দানবের ভৃত্য।
জাগো ফুলে ফলে নব তৃণদলে
তাপস, লোচন মেলো হে।
জাগো মানবের আশায় ভাষায়,
নাচের চরণ ফেলো হে।
জাগো ধনে ধানে, জাগো গানে গানে,
জাগো সংগ্রামে, জাগো সন্ধানে,
আশ্বাসহারা উদাস পরানে
জাগাও উদার নৃত্য।
ভুলেছে ছন্দ, ভালোয় মন্দ
একাকার তাই হায় রে।

কদর্য তাই করিছে বড়াই,
ধরণী লজ্জা পায় রে।
পিনাকে তোমার দাও টংকার,
ভীষণে মধুরে দিক ঝংকার,
ধুলায় মিশাক যা কিছু ধুলার,
জয়ী হ'ক যাহা নিত্য।

বৈশাখ-আবাহন

গান

এস, এস, এস, হে বৈশাখ।
তাপস নিশ্বাস বায়ে মুমূর্ষুরে দাও উড়ায়ে
বৎসরের আবর্জনা দূর হয়ে যাক।
যাক পুরাতন স্মৃতি যাক ভুলে যাওয়া গীতি,
অশ্রুবাষ্প সুদূরে মিলাক।
মুছে যাক সব গ্লানি, ঘুচে যাক জরা,
অগ্নিস্নানে দেহে প্রাণে শুচি হ'ক ধরা।
রসের আবেশরাশি শুষ্ক করি দাও আসি,
আনো, আনো, আনো তব প্রলয়ের শাঁখ,
মায়ার কুজ্ঝটি-জাল যাক দূরে যাক।

বৈশাখের প্রবেশ

গান

নমো, নমো, হে বৈরাগী।
তপোবহ্নির শিখা জ্বালো জ্বালো,
নির্বাণহীন নির্মল আলো
অন্তরে থাক্ জাগি।
নমো নমো হে বৈরাগী।

সম্বোধন

ধূসরবসন, হে বৈশাখ,
রক্তলোচন, হে নির্বাক,
শুষ্কপথের দানব দস্যু,
শুষে নিতে চাও হাসি ও অশ্রু,
ইঙ্গিতে দাও দারুণ ডাক।
স্তম্ভিত হল সে ডাকে পৃথ্বী,
ভাণ্ডারে তার কাঁপিল ভিত্তি,
শঙ্কায় তার শুকায় তালু,
অট্ট হাসিল মরুর বালু।
হুংকার সেই তপ্ত হাওয়ায়
প্রান্তর হতে প্রান্তরে ধায়,
দিগ্বধূদের নীরবে কাঁদায়,
শূন্যে শূন্যে উড়ায় ধূলি,
বিজয়পতাকা আকাশে তুলি।

দুহিয়া লয়েছ গগন-ধেনুরে,
ঝরায়ে দিয়েছ শিরীষরেণুরে
উদাস করেছ রাখাল-বেণুরে
তৃষ্ণাকরুণ সারঙ্‌-তানে।
শীর্ণ নদীর গেল সঞ্চয়,
ঝিরিঝিরি জল ধীরি ধীরি বয়,
আকুলিয়া উঠে কাননের ভয়
ভীরু কপোতের কাকলি গানে।
ধূসরবসন, হে বৈশাখ,
রক্তলোচন হে নির্বাক,
শুষ্ক পথের দানব দস্যু,
শুষে নিতে চাও হাসি ও অশ্রু,
ইঙ্গিতে দাও দারুণ ডাক।

গান

হৃদয় আমার, ঐ বুঝি তোর বৈশাখী ঝড় আসে,
বেড়া ভাঙার মাতন নামে উদ্দাম উল্লাসে।
মোহন এল ভীষণ বেশে
আকাশ ঢাকা জটিল কেশে,
এল তোমার সাধন-ধন চরম সর্বনাশে।
বাতাসে তোর সুর ছিল না, ছিল তাপে ভরা।
পিপাসাতে বুক-ফাটা তোর শুষ্ক কঠিন ধরা।
জাগ্ রে হতাশ, আয় রে ছুটে
অবসাদের বাঁধন টুটে,
এল তোমার পথের সাথি বিপুল অট্টহাসে।

কালবৈশাখী

ডাকো বৈশাখ, কালবৈশাখী,
করো তারে লীলাসঙ্গিনী,-
কেন সন্ন্যাসী রয়েছ একাকী
আসুক প্রলয়-রঙ্গিণী।
হৃত-নিঃশ্বাস অম্বর তলে
রুদ্ধ বাতাস তাপ-শৃঙ্খলে,
ঘন ঝঞ্ঝার দিক্ ঝংকার
অন্তর তব চঞ্চলি,
মন্থি আসুক মর্ত্যস্বর্গ
তোমার অর্ঘ্য-অঞ্জলি

বাজায় ডমরু তব তাণ্ডবে
গুরু গুরু মেঘ-মন্দ্রিয়া,—
দিগ্বধূ যত হাহাকার রবে
দুর্দাম উঠে ক্রন্দিয়া।

গৈরিক তব জয় পতাকায়
সন্ধ্যা-রবির রং সে মাখায়,
কুঞ্জে বাজায় শাখায় শাখায়
তাল-তমালের খঞ্জনি।
সপ্ততারার সুপ্তির 'পরে
নাচে সে সুপ্তি-ভঞ্জনী॥
তপোভঙ্গের দিবে মন্ত্রণা
তব শান্তিরে তর্জিয়া,
তন্ত্র পরাবে রুদ্রবীণায়
রেখেছিলে যারে বর্জিয়া।
দিগন্তরের সঞ্চয় টুটি
অঞ্চলে মেঘ আনিবে সে লুটি—
বাজিয়া উঠিবে কল-কল্লোল
বন-পল্লবে পল্লবে,—
শ্যাম উত্তরী নির্মল করি'
সাজাবে আপন বল্লভে।

মাধুরীর ধ্যান

গান

মধ্যদিনে যবে গান
বন্ধ করে পাখি,
হে রাখাল, বেণু তব
বাজাও একাকী।
শান্ত প্রান্তরের কোণে
রুদ্র বসি তাই শোনে,
মধুরের ধ্যানাবেশে
স্বপ্নমগ্ন আঁখি;
হে রাখাল, বেণু যবে
বাজাও একাকী

সহসা উচ্ছ্বসি উঠে
ভরিয়া আকাশ
তৃষাতপ্ত বিরহের
নিরুদ্ধ নিঃশ্বাস।
অম্বরপ্রান্তের দূরে
ডম্বরু গম্ভীর সুরে
জাগায় বিদ্যুৎ-ছন্দে
আসন্ন বৈশাখী।
হে রাখাল, বেণু তব
বাজাও একাকী।

পরানে কার ধেয়ান আছে জাগি,
জানি হে জানি, কঠোর বৈরাগী।
সুদূর পথে চরণ দুটি বাজে
পূরব কূলে বকুলবীথিমাঝে,
লুটায়ে-পড়া অমল-নীল সাজে
নবকেতকী-কেশর আছে লাগি।
তাহারি ধ্যান পরানে তব জাগি।

রাখাল বেণু বাজায় তরুতলে
রাগিণী তার তাহারি কথা বলে।
ভূতলে খসি পড়িছে পাতাগুলি
চলিতে পাছে চরণে লাগে ধূলি,—
কৃষ্ণচূড়া রয়েছে মেলা তুলি
পথে তাহারে ছায়া দিবারি লাগি।
তাহারি ধ্যান পরানে আছে জাগি।

কাঁকন-ধ্বনি তপোবনের পারে
চপল বায়ে আসিছে বারে বারে,
কপোত দুটি তাঁহারি সাড়া পেয়ে
চাঁপার ডালে উঠিছে গেয়ে গেয়ে,

মরমে তব মৌনী আছে চেয়ে
আপন মাঝে তাহারি বাণী মাগি।
তাহারি ধ্যান পরানে আছে জাগি।
কঠোর, তুমি মাধুরী-সাধনাতে
মগন হয়ে রয়েছ দিনে রাতে।
নীরস কাঠে আগুন তুমি জ্বালো,
আঁধার যাহা করিবে তারে আলো,
অশুচি যাহা, যা-কিছু আছে কালো
দহিবে তারে, সুদূরে যাবে ভাগি,—
মাধুরী-ধ্যান পরানে তব জাগি।

ব্যঞ্জনা

শুনিতে কি পাস
এই যে শ্বসিছে রুদ্র শূন্যে শূন্যে সন্তপ্ত নিশ্বাস
এরি মাঝে দূরে বাজে চঞ্চলের চকিত খঞ্জনি,
মাধুরীর মঞ্জীরের মৃদুমন্দ গুঞ্জরিত ধ্বনি?
রৌদ্রদগ্ধ তপস্যার মৌনস্তব্ধ অলক্ষ্য আড়ালে
স্বপ্নে-রচা অর্চনার থালে
অর্ঘ্যমাল্য সাজ হয় সংগোপনে সুন্দরের লাগি।
মগ্ন যেথা ধেয়ানের সর্বশূন্য গহনে বৈরাগী,
সেথা কে বুভুক্ষু আসে ভিক্ষা-অন্বেষণে;
জীর্ণ পর্ণশয্যা'পরে একা রহে জাগি
কঠিনের শুষ্ক প্রাণে কোমলের পদস্পর্শ মাগি
তাপিত আকাশে
হঠাৎ নীরবে চলে আসে
একটি করুণ ক্ষীণ স্নিগ্ধ বায়ুধারা,
কে অভিসারিণী যেন পথে এসে পায় না কিনারা।

অকস্মাৎ কোমলের কমলমালার স্পর্শ লেগে
শান্তের চিত্তের প্রান্ত অহেতু উদ্বেগে
ভ্রূকুটিয়া ওঠে কালো মেঘে ;
বিদ্যুৎ বিচ্ছুরি উঠে দিগন্তের ভালে,
রোমাঞ্চ-কম্পন লাগে অশ্বত্থের ত্রস্ত ডালে ডালে ;
মুহূর্তে অম্বরবক্ষে উলঙ্গিনী শ্যামা
বাজায় বৈশাখী-সন্ধ্যা ঝঞ্ঝার দামামা,
দিগ্বিদিকে নৃত্য করে দুর্বার ক্রন্দন,
ছিন্ন ছিন্ন হয়ে যায় ঔদাসীন্য কঠোর বন্ধন।

বর্ষার প্রবেশ

গান

নমো, নমো করুণাঘন নম হে।
নয়ন স্নিগ্ধ অমৃতাঞ্জন পরশে,
জীবন পূর্ণ সুধারস বরষে,
তব দর্শন-ধন-সার্থক মন হে,
অকৃপণবর্ষণ করুণাঘন হে।

প্রত্যাশা

গান

তপের তাপের বাঁধন কাটুক
রসের বর্ষণে,
হৃদয় আমার শ্যামল-বঁধুর
করুণ স্পর্শ নে ॥

ঐ কি এলে আকাশ-পারে
দিক্‌-ললনার প্রিয়,
চিত্তে আমার লাগল তোমার
ছায়ার উত্তরীয়

অঝোর-ঝরণ শ্রাবণজলে,
তিমির-মেদুর বনাঞ্চলে
ফুটুক সোনার কদম্বফুল
নিবিড় হর্ষণে।

মেঘের মাঝে মৃদঙ্গ্ তোমার
বাজিয়ে দিলে কি ও
ঐ তালেতেই মাতিয়ে আমায়
নাচিয়ে দিয়ো দিয়ো।

ভরুক গগন, ভরুক কানন
ভরুক নিখিল ধরা,
দেখুক ভুবন মিলন-স্বপন
মধুর বেদন ভরা।
পরান-ভরানো ঘন ছায়াজাল
বাহির আকাশ করুক আড়াল,
নয়ন ভুলুক বিজুলি ঝলুক
পরম দর্শনে।

আষাঢ়

কোন্ বারতার করিল প্রচার
দূর আকাশের ইঙ্গিতে
ঐরাবতের বৃংহিতে।
নিষ্ঠুর তপে আছে নিমগ্ন
ধরণী তপস্বিনী,
রুক্ষ অঙ্গ পাংশু-ধূসর,
ধ্যান-অঞ্জন শুষ্ক উষর,
নাহি সখী সঙ্গিনী :—
বুঝি আসন্ন হল তার বর,
শুনি গর্জন রথ-ঘর্ঘর,
বুঝি আসে কাঙ্ক্ষিত,

তাই চিত্ত যে হল চঞ্চল,
আঁখিপল্লব বাষ্পসজল,
তাই সে রোমাঞ্চিত।

ওগো বিরহিণী গেল দুর্দিন
দুঃখ ঘুচিবে নিঃশেষে,
মনোমাঝে যারে রুদ্ধ নয়নে
পূজিলে ধ্যানের পুষ্প চয়নে,
দেখা দিবে আজি বিশ্বে সে
ঐ বুঝি আসে আকাশে আকাশে
সমারোহ তার বিস্তারি,
বিজয়ী সে বীর, ওরে ভয়ভীতা
যাবে তোর ভয়, ওরে পিপাসিতা
তৃষা হতে দিবে নিস্তারি।
ললাটে নিপুণ পত্রলেখাটি
আঁকো কুঙ্কুম চন্দনে।
দুলাও চামেলি অলকে তোমার
কবরী রচিয়া এলো কেশভার
বেঁধে তোলো বেণীবন্ধনে।

উঠ ধূলি হতে ওগো দুঃখিনী
ছাড়ো গৈরিক উত্তরী।
নীলবসনের অঞ্চলখানি
কম্পিত বুকে লহ লহ টানি'
হাসিমুখে চাহো সুন্দরী।
বীর-মঙ্গল ঘোষুক মন্ত্র
মুখে তুলে তোর শঙ্খ নে।
কৌতুকসুখ চক্ষে ফুটুক,
বিদ্যুৎ-শিখা কম্পি উঠুক
তব চঞ্চল কঙ্কণে।

কুঞ্জকানন জাগ্রত হ'ক
আজি বন্দনা সংগীতে—
শিহর লাগুক শাখায় শাখায়,
মাতন লাগুক শিখীর পাখায়
তব নৃত্যের ভঙ্গিতে।
শ্যাম বন্ধুরে শ্যামল তৃণের
আসনে বসাবি অঙ্গনে।
রাখিবি দুয়ারে আল্‌পনা আঁকি',
চরণের তলে ধুলা দিবি ঢাকি,
টগর করবী রঙ্গনে।
গাও জয় জয়, গাও জয়গান
ঢেউ তোলো স্বরসপ্তকে,
বনপথে আসে মনোরঞ্জন,
নয়নে পরাবে প্রেম অঞ্জন,
সুধা দিবে চিরতপ্তকে।

লীলা

গান

গগনে গগনে আপনার মনে
কী খেলা তব।
তুমি কত বেশে নিমেষে নিমেষে
নিতুই নব।
জটার গভীরে লুকালে রবিরে
ছায়াপটে আঁক এ কোন্ ছবি রে।
মেঘমল্লারে কী বল আমারে
কেমনে কব।
বৈশাখী ঝড়ে সেদিনের সেই
অট্টহাসি

গুরু গুরু সুরে কোন্ দূরে দূরে
যায় যে ভাসি।
সে সোনার আলো শ্যামলে মিশাল,
শ্বেত উত্তরী আজ কেন কালো?
লুকালে ছায়ায় মেঘের মায়ায়
কী বৈভব।

বর্ষা-মঙ্গল

ওগো সন্ন্যাসী, কী গান ঘনাল মনে।
গুরু গুরু গুরু নাচের ডমরু
বাজিল ক্ষণে ক্ষণে।
তোমার ললাটে জটিল জটার ভার
নেমে নেমে আজি পড়িছে বারম্বার,
বাদল আঁধার মাতাল তোমার হিয়া,
বাঁকা বিদ্যুৎ চোখে উঠে চমকিয়া।
চিরজনমের শ্যামলী তোমার প্রিয়া
আজি এ বিরহ-দীপন-দীপিকা
পাঠাল তোমারে এ কোন্ লিপিকা,
লিখিল নিখিল-আঁখির কাজল দিয়া,
চিরজনমের শ্যামলী তোমার প্রিয়া।

মনে পড়িল কি ঘন কালো এলোচুলে
অগুরু ধূপের গন্ধ?
শিখি-পুচ্ছের পাখা সাথে দুলে দুলে
কাঁকন-দোলন ছন্দ?
মনে পড়িল কি নীল নদীজলে,
ঘন শ্রাবণের ছায়া ছল ছলে
মিলি মিলি সেই জল-কলকলে
কলালাপ মৃদুমন্দ;

স্খলিত-পায়ের চলা দ্বিধাহত,
ভীরু নয়নের পল্লব নত,
না-বলা কথার আভাসের মতো
নীলাম্বরের প্রান্ত ?
মনে পড়িছে কি কাঁখে তুলে ঝারি
তরু তলে তলে ঢেলে চলে বারি,
সেচন-শিথিল বাহু দুটি তারি
ব্যথায় আলসে ক্লান্ত ?

ওগো সন্ন্যাসী, পথ যায় ভাসি'
ঝর ঝর ধারাজলে --
তমালবনের শ্যামল তিমির তলে।
দ্যুলোক ভূলোকে দূরে দূরে বলাবলি
চিরবিরহের কথা,
বিরহিণী তার নত আঁখি ছলছলি'
নীপ-অঞ্জলি রচে বসি' গৃহকোণে,
ঢেলে ঢেলে দেয় তোমারে স্মরিয়া মনে,
ঢেলে দেয় ব্যাকুলতা।

কভু বাতায়নে অকারণে বেলা বাহি'
আতুর নয়নে দু-হাতে আঁচল ঝাঁপে।
তুমি চিত্তের অন্তরে অবগাহি'
খুঁজিয়া দেখিছ ধৈরজ নাহি নাহি,
মল্লার রাগে গর্জিয়া ওঠ গাহি',
বক্ষে তোমার অক্ষের মালা কাঁপে।
যাক যাক তব মন গলে গলে যাক,
গান ভেসে গিয়ে দূরে চলে চলে যাক,
বেদনার ধারা দুর্দাম দিশাহারা
দুখ-দুর্দিনে দুই কূল তার ছাপে।
কদম্ববন চঞ্চল ওঠে দুলি,
সেইমতো তব কম্পিত বাহু তুলি
টলমল নাচে নাচো সংসার ভুলি,
আজ সন্ন্যাসী [illegible] ।

শ্রাবণ-বিদায়

গান

শ্রাবণ তুমি বাতাসে কার
আভাস পেলে?
পথে তারি সকল বারি
দিলে ঢেলে।
কেয়া কাঁদে, যায় যায় যায়।
কদম ঝরে, হায় হায় হায়।
পুব হাওয়া কয়, ওর তো সময় নাই বাকি আর।
শরৎ বলে, যাক না সময় ভয় কিবা তার,—
কাটবে বেলা আকাশমাঝে বিনা কাজে
অসময়ের খেলা খেলে।

কালো মেঘের আর কি আছে দিন
ও যে হল সাথিহীন।
পুব হাওয়া কয়, কালোর এবার যাওয়াই ভালো,
শরৎ বলে, গেঁথে দেব কালোয় আলো।
সাজবে বাদল আকাশ মাঝে
সোনার সাজে
কালিমা ওর মুছে ফেলে।

যায় রে শ্রাবণ কবি রসবর্ষা ক্ষান্ত করি তার,
কদম্বের রেণুপুঞ্জে পদে পদে কুঞ্জবীথিকার
ছায়াঞ্চল ভরি দিল। জানি, রেখে গেল তার দান
বনের মর্মের মাঝে; দিয়ে গেল অভিষেকস্নান
সুপ্রসন্ন আলোকেরে; মহেন্দ্রের অদৃশ্য বেদীতে
ভরি গেল অর্ঘ্যপাত্র বেদনার উৎসর্গ অমৃতে;
সলিল গণ্ডূষ দিতে তটিনী সাগরতীর্থে চলে,
অঞ্জলি ভরিল তারি; ধরার নিগূঢ় বক্ষতলে

রেখে গেল তৃষ্ণার সম্বল ; অগ্নিতীক্ষ্ণ বজ্রবাণ
দিগন্তের তূণ ভরি একান্তে করিয়া গেল দান
কালবৈশাখীর তরে ; নিজ হস্তে সর্ব ম্লানতার
চিহ্ন মুছে দিয়ে গেল । আজ শুধু রহিল তাহার
রিক্তবৃষ্টি জ্যোতিঃশুভ্র মেঘে মেঘে মুক্তির লিখন,
আপন পূর্ণতাখানি নিখিলে করিল সমর্পণ ।

শেষ মিনতি

গান

কেন পান্থ এ চঞ্চলতা ?
কোন্ শূন্য হতে এল কার বারতা ।

যাত্রাবেলায় রুদ্ররবে
বন্ধন-ডোর ছিন্ন হবে,
ছিন্ন হবে, ছিন্ন হবে ।

নয়ন কিসের প্রতীক্ষা-রত
বিদায় বিষাদে উদাসমতো,
ঘন-কুন্তলভার ললাটে নত
ক্লান্ত তড়িৎবধূ তন্দ্রাগতা ।

মুক্ত আমি, রুদ্ধ দ্বারে
বন্দী করে কে আমারে ।
যাই চলে যাই অন্ধকারে
ঘণ্টা বাজায় সন্ধ্যা যবে ।

কেশরকীর্ণ কদম্ববনে
মর্মর মুখরিল মৃদু পবনে,
বর্ষণ-হর্ষভরা ধরণীর
বিরহ বিশঙ্কিত করুণ কথা ।

ধৈর্য মানো ওগো ধৈর্য মানো,
বরমাল্য গলে তব হয়নি ম্লান,
আজো হয়নি ম্লান,
ফুল-গন্ধ-নিবেদন-বেদন-সুন্দর
মালতী তব চরণে প্রণতা।

শ্রাবণ সে যায় চলে পান্থ,
কৃশতনু ক্লান্ত,
উড়ে পড়ে উত্তরী-প্রান্ত
উত্তর-পবনে।
যূথীগুলি সকরুণ গন্ধে
আজি তারে বন্দে,
নীপবন মর্মর ছন্দে
জাগে তার স্তবনে।
শ্যামঘন তমালের কুঞ্জে
পল্লবপুঞ্জে।
আজি শেষ মল্লারে গুঞ্জে
বিচ্ছেদগীতিকা,
আজি মেঘ বর্ষণরিক্ত
নিঃশেষবিত্ত,
দিল করি শেষ অভিষিক্ত
কিংশুকবীথিকা।

শরৎ

ধ্বনিল গগনে আকাশ-বাণীর বীন,
শিশির-বাতাসে দূরে দূরে ডাক দিল কে?
আয় সুলগনে, আজ পথিকের দিন,
এঁকে নে ললাট জয়যাত্রার তিলকে।

গেল খুলি গেল মেঘের ছায়ার দ্বার,
দিকে দিকে ঘোচে কালো আবরণভার,
তরুণ আলোক মুকুট পরেছে তার,
বিজয়শঙ্খ বেজে ওঠে তাই ত্রিলোকে।
শরৎ এনেছে অপরূপ রূপকথা
নিত্যকালের বালকবীরের মানসে।
নবীন রক্তে জাগায় চঞ্চলতা,
বলে,—চলো চলো, অশ্ব তোমার আনো'সে।
ধেয়ে যেতে হবে দুস্তর প্রান্তরে,
বন্দিনী কোন্ রাজকন্যার তরে,
মায়াজাল ভেদি চলো সে রুদ্ধ ঘরে,
লও কার্মুক, দানবের বুক হানো'সে।
ওরে শারদার জয়মন্ত্রের গুণে
বীর-গৌরবে পার হতে হবে সাগরে।
ইন্দ্রের শর ভরি নিতে হবে তূণে
রাক্ষসপুরী জিনে নিতে হবে, জাগো রে।
'দেবী শারদার যে প্রসাদ শিরে লয়ি'
দেব সেনাপতি কুমার দৈত্যজয়ী,
সে প্রসাদখানি দাও গো অমৃতময়ী',
এই মহা বর চরণে তাঁহার মাগো রে।
আজি আশ্বিনে স্বচ্ছ বিমল প্রাতে
শুভ্রের পায়ে অম্লান মনে নমো রে।
স্বর্গের রাখি বাঁধো দক্ষিণ হাতে
আঁধারের সাথে আলোকের মহাসমরে।
মেঘবিমুক্ত শরতের নীলাকাশ
ভুবনে ভুবনে ঘোষিল এ আশ্বাস —
হবে বিলুপ্ত মলিনের নাগপাশ,
জয়ী হবে রবি, মরিবে মরিবে তম রে।

শান্তি

গান

পাগল আজি আগল খোলে
বিদায়রজনীতে,
চরণে ওর বাঁধিবি ডোর,
কী আশা তোর চিতে।
গগনে তার মেঘ-দুয়ার ঝেঁপে,
বুকেরি ধন বুকেতে ছিল চেপে,
হিম হাওয়ায় গেল সে দ্বার কেঁপে,
এসেছে ডাক ভোরের রাগিণীতে।
শীতল হ'ক বিমল হ'ক প্রাণ,
হৃদয়ে শোক রাখুক তার দান।
যা ছিল ঘিরে শূন্যে সে মিলাল,
সে ফাঁক দিয়ে আসুক তবে আলো,
বিজনে বসি পূজাঞ্জলি ঢালো
শিশিরে ভরা শিউলি-ঝরা গীতে।

শরতের প্রবেশ

গান

নির্মল কান্ত, নমো হে নমঃ
স্নিগ্ধ সুশান্ত নমো হে নমঃ।
বন-অঙ্গনময় রবিকর-রেখা
লেপিল আলিম্পনলিপি লেখা,
আঁকিব তাহে প্রণতি মম।
নমো হে নমঃ।

শরৎ ডাকে ঘর ছাড়ানো ডাকা
কাজ ভোলানো সুরে,—
চপল করে হাঁসের দুটি পাখা
ওড়ায় তারে দূরে।
শিউলি কুঁড়ি যেমনি ফোটে শাখে
অমনি তারে হঠাৎ ফিরে ডাকে,
পথের বাণী পাগল করে তাকে,
ধুলায় পড়ে ঝুরে।
শরৎ ডাকে ঘর-ছাড়ানো ডাকা
কাজ-খোওয়ানো সুরে।

শরৎ আজি বাজায় এ কী ছলে
পথ-ভোলানো বাঁশি।
অলস মেঘ যায়-যে দলে দলে
গগনতলে ভাসি।
নদীর ধারা অধীর হয়ে চলে
কী নেশা আজি লাগল তার জলে,
ধানের বনে বাতাস কী যে বলে
বেড়ায় ঘুরে ঘুরে।
শরৎ ডাকে ঘর-ছাড়ানো ডাকা,
কাজ-খোওয়ানো সুরে

শরৎ আজি শুভ্র আলোকেতে
মন্ত্র দিল পড়ি,
ভুবন তাই শুনিল কান পেতে
বাজে ছুটির ঘড়ি।
কাশের বনে হাসির লহরীতে
বাজিল ছুটি মর্মরিত গীতে,—

ছুটির ধ্বনি আনিল মোর চিতে
পথিক বন্ধুরে।
শরৎ ডাকে ঘর-ছাড়ানো ডাকা
কাজ খোওয়ানো সুরে।

শরতের ধ্যান

গান

আলোর অমল কমলখানি
কে ফুটালে,
নীল আকাশের ঘুম ছুটালে।
সেই তো তোমার পথের বঁধু
সেই তো।
দূব কুসুমের গন্ধ এনে খোঁজায় মধু—
এই তো।

আমার মনের ভাবনাগুলি
বাহির হল পাখা তুলি,
ঐ কমলের পথে তাদের
সেই জুটালে।
সেই তো তোমার পথের বঁধু
সেই তো।
এই আলো তার এই তো আঁধার
এই আছে এই নেই তো।

শরৎ-বাণীর বীণা বাজে
কমলদলে।
ললিত রাগের সুর ঝরে তাই
শিউলিতলে।
তাই তো বাতাস বেড়ায় মেতে
কচি ধানের সবুজ খেতে,
বনের প্রাণে মরমরানির
ঢেউ উঠালে।

শরতের বিদায়

কেন গো যাবার বেলা
গোপনে চরণ ফেলা,
যাওয়ার ছায়াটি পড়ে যে হৃদয় মাঝে,
অজানা ব্যথার তপ্ত আভাস রক্ত আকাশে বাজে।
সুদূর বিরহতাপে
বাতাসে কী যেন কাঁপে,
পাখির কণ্ঠ করুণ ক্লান্তি ভরা,
হারাই হারাই মনে করে তাই সংশয়-ম্লান ধরা।
জানিনে গহন বনে
শিউলি কী ধ্বনি শোনে,
আনমনে তার ভূষণ খসায়ে ফেলে।
মালতী আপন সব ঢেলে দেয় শেষ খেলা তার খেলে।
না হতে প্রহর শেষ
হবে কি নিরুদ্দেশ,
তোমার নয়নে এখনো রয়েছে হাসি,
বাজায়ে সোহিনী এখনো মোহিনী বাঁশি ওঠে উচ্ছ্বাসি।
এই তব আসা-যাওয়া
একি খেয়ালের হাওয়া,
মিলন পুলক তাতেও কি অবহেলা,
আজি এ বিরহ-ব্যথার বিষাদ এও কেবলি খেলা ?

গান

শিউলি ফুল, শিউলি ফুল,
কেমন ভুল, এমন ভুল ?
রাতের বায় কোন্ মায়ায়
আনিল হায় বনছায়ায়,
ভোরবেলায় বারে বারেই
ফিরিবারেই হলি ব্যাকুল।
কেন রে তুই উন্মনা,
নয়নে তোর হিমকণা ?

কোন্ ভাষায় চাস বিদায়,
গন্ধ তোর কী জানায়,
সঙ্গে হায় পলে পলেই
দলে দলেই যায় বকুল।

বিলাপ

গান

চরণরেখা তব যে-পথে দিলে লেখি
চিহ্ন আজি তারি আপনি ঘুচালে কি ?
ছিল তো শেফালিকা
তোমারি লিপি-লিখা
তারে যে তৃণতলে আজিকে লীন দেখি
কাশের শিখা যত কাঁপিছে থরথরি,
মলিন মালতী যে পড়িছে ঝরি ঝরি।
তোমার যে-আলোকে
অমৃত দিত চোখে,
স্মরণ তারো কি গো মরণে যাবে ঠেকি ?

হেমন্তের প্রবেশ

গান

নম, নম, নম।
তুমি ক্ষুধার্তজন-শরণ্য,
অমৃত-অন্ন-ভোগ-ধন্য
করো অন্তর মম।
হেমন্তেরে বিভল করে কিসে,
চলিতে পথে হারাল কেন দিশে

যেন রে ওর আলোর স্মৃতিখানি
বিস্মৃতির বাষ্পে নিল টানি,—
কণ্ঠ তাই হারাল তার বাণী,
অশ্রু কাঁপে নয়ন অনিমিষে।
হেমন্তেরে বিভল করে কিসে।

ক্ষণেক তরে লও না ঘরে ডাকি,
যাত্রা ওর অনেক আছে বাকি।
শিশিরকণা লাগিবে পায়ে পায়ে,
রুক্ষ কেশ কাঁপিবে হিমবায়ে,
আঁধার-করা ঘনবনের ছায়ে
শুষ্ক পাতা রয়েছে পথ ঢাকি।
ক্ষণেক তরে লও না ঘরে ডাকি।

বাসা যে ওর সুদূর হিমাচলে,
শেওলা-ঝোলা তিমির গুহাতলে।
যে পথ বাহি বলাকা যায় ফিরে
সৈকতিনী নদীর তীরে তীরে,
সে পথ দিয়ে ধানের খেত ঘিরে
হিমের ভারে চলিবে পলে পলে।
যেতে যে হবে সুদূর হিমাচলে।

চলিতে পথে এল আঁধার রাতি,
নিবিয়া গেল ছিল যে ওর বাতি।
অসুর দলে গগনে রচে কারা,
তাই তো শশী হয়েছে জ্যোতিহারা,
আকাশ ঘেরি ধরিবে যত তারা
কে যেন জেলে কুহেলি-জাল পাতি।
নিবিয়া গেল ছিল যে ওর বাতি।

বধূরা যবে সাঁজের জ্যোতি জ্বাল
একটি দীপ উহারে দেওয়া ভালো।
দেবতা যারে বিঘ্ন দিয়ে হানে
তোমরা তারে বাঁচায়ো দয়া দানে
কল্যাণী গো তোদেরি কল্যাণে
ছুটিয়া যাক্ কুস্বপন কালো,—
একটি দীপ উহারে দেওয়া ভালো।

গান

শিউলি-ফোটা ফুরাল যেই শীতের বনে,
এলে যে সেই শূন্যখনে।
তাই গোপনে সাজিয়ে ডালা
দুখের সুরে বরণমালা
গাঁথি মনে মনে
শূন্য খনে।
দিনের কোলাহলে
ঢাকা সে যে রইবে হৃদয়তলে।
রাতের তারা উঠবে যবে
সুরের মালা বদল হবে
তখন তোমার সনে
মনে মনে।

হায় হেমন্তলক্ষ্মী, তোমার নয়ন কেন ঢাকা—
হিমের ঘন ঘোমটাখানি ধূমল রঙে আঁকা।
সন্ধ্যাপ্রদীপ তোমার হাতে
মলিন হেরি কুয়াশাতে,
কণ্ঠে তোমার বাণী যেন করুণ বাষ্পে মাখা।
ধরার আঁচল ভরে দিলে প্রচুর সোনার ধানে।
দিগঙ্গনার অঙ্গন আজ পূর্ণ তোমার দানে।
আপন দানের আড়ালেতে
রইলে কেন আসন পেতে,
আপনাকে এই কেমন তোমার গোপন করে রাখা।

হেমন্ত

হে হেমন্ত-লক্ষ্মী, তব চক্ষু কেন রুক্ষ চুলে ঢাকা,
ললাটের চন্দ্রলেখা অযত্নে এমন কেন ম্লান ?
হাতে তব সন্ধ্যাদীপ কেন গো আড়াল করে আন
কুয়াশায় ? কণ্ঠে বাণী কেন হেন অশ্রুবাষ্পে মাখা
গোধূলিতে আলোতে আঁধারে ?   দূর হিমশৃঙ্গ ছাড়ি
ওই হেরো রাজহংসশ্রেণী, আকাশে দিয়েছে পাড়ি
উজায়ে উত্তরবায়ুস্রোত, শীতে ক্লিষ্ট ক্লান্ত পাখা
মাগিছে আতিথ্য তব জাহ্নবীর জনশূন্য তটে
প্রচ্ছন্ন কাশের বনে।   প্রান্তরসীমায় ছায়াবটে
মৌনব্রত বউ-কথা-কও।   গ্রামপথ আঁকাবাঁকা
বেণুতলে পান্থহীন অবলীন অকারণ ত্রাসে,
ক্বচিৎ চকিত-ধূলি অকস্মাৎ পবন উচ্ছ্বাসে।

কেন বলো, হৈমন্তিকা, নিজেরে কুণ্ঠিত করে রাখা,
মুখের গুণ্ঠন কেন হিমের ধূমলবর্ণে আঁকা।

ভরেছ, হেমন্ত-লক্ষ্মী, ধরার অঞ্জলি পক্ব ধানে।
দিগঙ্গনে দিগঙ্গনা এসেছিল ভিক্ষার সন্ধানে
শীতরিক্ত অরণ্যের শূন্যপথে।   বলেছিল ডাকি,
"কোথায় গো, অন্নপূর্ণা, ক্ষুধার্তেরে অন্ন দিবে না কি ?
শান্ত করো প্রাণের ক্রন্দন, চাও প্রসন্ন নয়ানে
ধরার ভাণ্ডার পানে।"   শুনিয়া লুকায়ে হাস্যখানি,
লুকায়ে দক্ষিণ হস্ত দক্ষিণা দিয়েছ তুমি আনি,
ভূমিগর্ভে আপনার দাক্ষিণ্য ঢাকিলে সাবধানে।

স্বর্গলোক ম্লান করি প্রকাশিলে ধরার বৈভব
কোন্ মায়ামন্ত্রগুণে, দরিদ্রের বাড়ালে গৌরব।

অমরার স্বর্ণ নামে ধরণীর সোনার অঘ্রানে।
তোমার অমৃত-নৃত্য, তোমার অমৃতস্নিগ্ধ হাসি
কখন ধূলির ঘরে সঞ্চিত করিলে রাশি রাশি,
আপনার দৈন্যচ্ছলে পূর্ণ হলে আপনার দানে।

দীপালি

গান

হিমের রাতে ঐ গগনের
দীপগুলিরে
হেমন্তিকা করল গোপন
আঁচল ঘিরে।
ঘরে ঘরে ডাক পাঠাল—
"দীপালিকায় জ্বালাও আলো,
জ্বালাও আলো, আপন আলো,
সাজাও আলোয় ধরিত্রীরে।"
শূন্য এখন ফুলের বাগান,
দোয়েল কোকিল গাহে না গান,
কাশ ঝরে যায় নদীর তীরে।
যাক্ অবসাদ বিষাদ কালো,
দীপালিকায় জ্বালাও আলো,
জ্বালাও আলো, আপন আলো,
শুনাও আলোর জয়বাণীরে।
দেবতারা আজ আছে চেয়ে
জাগো ধরার ছেলে মেয়ে
আলোয় জাগাও যামিনীরে।
এল আঁধার, দিন ফুরাল,
দীপালিকায় জ্বালাও আলো,
জ্বালাও আলো, আপন আলো,
জয় করো এই তামসীরে।

শীতের উদ্বোধন

ডেকেছ আজি, এসেছি সাজি, হে মোর লীলাগুরু,
শীতের রাতে তোমার সাথে কী খেলা হবে শুরু
ভাবিয়াছিনু খেলার দিন
গোধূলি-ছায়ে হল বিলীন,
পরান মন হিমে মলিন
আড়াল তারে ঘেরি',—
এমন ক্ষণে কেন গগনে বাজিল তব ভেরী ?

উতর-বায় কারে জাগায়, কে বুঝে তার বাণী ?
অন্ধকারে কুঞ্জদ্বারে বেড়ায় কর হানি।
কাঁদিয়া কয় কানন-ভূমি --
"কী আছে মোর, কী চাহ তুমি ?
শুষ্ক শাখা যাও যে চুমি'
কাঁপাও থরথর,
জীর্ণপাতা বিদায়গাথা গাহিছে মরমর।"

বুঝেছি তব এ অভিনব ছলনাভরা খেলা,
তুলিছ ধ্বনি কী আগমনী আজি যাবার বেলা।
যৌবনেরে তুষার-ডোরে
রাখিয়াছিলে অসাড় ক'রে ;
বাহির হতে বাঁধিলে ওরে
কুয়াশা-ঘন জালে—
ভিতরে ওর ভাঙালে ঘোর নাচের তালে তালে।

নৃত্যলীলা জড়ের শিলা করুক খানখান,
মৃত্যু হতে অবাধ স্রোতে বহিয়া যাক প্রাণ
নৃত্য তব ছন্দে তারি
নিত্য ঢালে অমৃতবারি,

শঙ্খ কহে হুহুংকারি
বাঁধন সে তো মায়া,
যা-কিছু ভয়, যা-কিছু ক্ষয়, সে তো ছায়ার ছায়া।

এসেছে শীত গাহিতে গীত বসন্তেরি জয়,—
যুগের পরে যুগান্তরে মরণ করে লয়।
তাণ্ডবের ঘূর্ণিঝড়ে
শীর্ণ যাহা ঝরিয়া পড়ে,
প্রাণের জয়-তোরণ গড়ে
আনন্দের তানে,
বসন্তের যাত্রা চলে অনন্তের পানে।

বাঁধনে যারে বাঁধিতে নারে, বন্দী করি তারে
তোমার হাসি সমুচ্ছ্বাসি উঠিছে বারে বারে।
অমর আলো হারাবে না যে
ঢাকিয়া তারে আঁধার মাঝে,
নিশীথ-নাচে ডমরু বাজে
অরুণদ্বার খোলে—
জাগে মুরতি, পুরানো জ্যোতি নব উষার কোলে।

জাগুক মন, কাঁপুক বন, উড়ুক ঝরা পাতা,
উঠুক জয়, তোমারি জয়, তোমারি জয়গাথা।
ঋতুর দল নাচিয়া চলে
ভরিয়া ডালি ফুলে ও ফলে,
নৃত্য-লোল চরণতলে
মুক্তি পায় ধরা,—
ছন্দে মেতে যৌবনেতে রাঙিয়ে ওঠে জরা।

আসন্ন শীত

গান

শীতের বনে কোন্ সে কঠিন
আসবে বলে
শিউলিগুলি ভয়ে মলিন
বনের কোলে।
আমলকী ডাল সাজল কাঙাল,
খসিয়ে দিল পল্লবজাল,
কাশের হাসি হাওয়ায় ভাসি
যায় যে চলে।
সইবে না সে পাতায় ঘাসে
চঞ্চলতা,
তাই তো আপন রঙ ঘুচাল
ঝুমকো লতা।
উত্তরবায় জানায় শাসন,
পাতল তাপের শুষ্ক আসন,
সাজ খসাবার এই লীলা কার
অট্টরোলে।

শীত

ওগো শীত, ওগো শুভ্র, হে তীব্র নির্মম,
তোমার উত্তরবায়ু দুরন্ত দুর্দম
অরণ্যের বক্ষ হানে। বনস্পতি যত
থর থর কম্পমান, শীর্ষ করি নত
আদেশ-নির্ঘোষ তব মানে। 'জীর্ণতার
মোহবন্ধ ছিন্ন করো' এ বাক্য তোমার
ফিরিছে প্রচার করি জয়ডঙ্কা তব
দিকে দিকে। কুঞ্জে কুঞ্জে মৃত্যুর বিপ্লব

করিছে বিকীর্ণ শীর্ণ পর্ণ রাশি রাশি
শূন্য নগ্ন করি শাখা, নিঃশেষে বিনাশি
অকাল-পুষ্পের দুঃসাহস।
হে নির্মল,
সংশয়-উদ্বিগ্ন চিত্তে পূর্ণ করো বল।
মৃত্যু-অঞ্জলিতে ভরো অমৃতের ধারা,
ভীষণের স্পর্শঘাতে করো শঙ্কাহারা,
শূন্য করি' দাও মন ; সর্বস্বান্ত ক্ষতি
অন্তরে ধরুক শান্ত উদাত্ত মুরতি,
হে বৈরাগী। অতীতের আবর্জনাভার,
সঞ্চিত লাঞ্ছনা গ্লানি শ্রান্তি ভ্রান্তি তার
সম্মার্জন করি দাও। বসন্তের কবি
শূন্যতার শুভ্র পত্রে পূর্ণতার ছবি
লেখে আসি', সে-শূন্য তোমারি আয়োজন,
সেইমতো মোর চিত্তে পূর্ণের আসন
মুক্ত করো রুদ্র-হস্তে ; কুজ্ঝটিকারাশি
রাখুক পুঞ্জিত করি প্রসন্নের হাসি।
বাজুক তোমার শঙ্খ মোর বক্ষতলে
নিঃশঙ্ক দুর্জয়। কঠোর উদগ্রবলে
দুর্বলেরে করো তিরস্কার ; অট্টহাসে
নিষ্ঠুর ভাগ্যেরে পরিহাসো ; হিমশ্বাসে
আরাম করুক ধূলিসাৎ। হে নির্মম,
গর্বহরা, সর্বনাশা, নমো নমো নমঃ।

নৃত্য

গান

শীতের হাওয়ার লাগল নাচন
আমলকীর এই ডালে ডালে।
পাতাগুলি শিরশিরিয়ে
ঝরিয়ে দিল তালে তালে।

উড়িয়ে দেবার মাতন এসে
কাঙাল তারে করল শেষে,
তখন তাহার ফলের বাহার
রইল না আর অন্তরালে।

শূন্য করে ভরে-দেওয়া
যাহার খেলা
তারি লাগি রইনু বসে
সারা বেলা।
শীতের পরশ থেকে থেকে
যায় বুঝি ঐ ডেকে ডেকে,
সব খোওয়াবার সময় আমার
হবে কখন কোন্ সকালে।

শীতের প্রবেশ

গান

নম, নম, নম নম।
নির্দয় অতি করুণা তোমার
বন্ধু তুমি হে নির্মম,
যা কিছু জীর্ণ করিবে দীর্ণ
দণ্ড তোমার দুর্দম।

সর্বনাশার নিঃশ্বাস বায়
লাগল ভালে।
নাচল চরণ শীতের হাওয়ায়
মরণ তালে।
করব বরণ, আসুক কঠোর,
ঘুচুক অলস সুপ্তির ঘোর,
যাক ছিঁড়ে মোর বন্ধনডোর
যাবার কালে।

ভয় যেন মোর হয় খান খান
ভয়েরি ঘায়ে,
ভরে যেন প্রাণ ভেসে এসে দান
ক্ষতির বায়ে।
সংশয়ে মন না যেন ছুলাই,
মিছে শুচিতায় তারে না ভুলাই,
নির্মল হব পথের ধুলাই
লাগিলে পায়ে।

শীত যদি তুমি মোরে দাও ডাক
দাঁড়ায়ে দ্বারে—
সেই নিমেষেই যাব নির্বাক
অজানা পারে।
নাই দিল আলো নিবে-যাওয়া বাতি,
শুকনো গোলাপ ঝরা যুথী জাতী
নির্জন পথ হ'ক মোর সাথি
অন্ধকারে।

জানি জানি, শীত, আমার যে-গীত
বীণায় নাচে
তারে হরিবার কভু কি তোমার
সাধ্য আছে।
দক্ষিণ বায়ে করে যাব দান
রবিরশ্মিতে কাঁপিবে সে তান,
কুসুমে কুসুমে ফুটিবে সে গান
লতায় গাছে।

যাহা-কিছু মোর তুমি, ওগো চোর,
হরিয়া লবে,
জেনো বারেবারে ফিরে ফিরে তারে
ফিরাতে হবে।

যা কিছু ধুলায় চাহিবে চুকাতে
ধুলা সে কিছুতে নারিবে লুকাতে,
নবীন করিয়া নবীনের হাতে
সঁপিবে কবে।

স্তব

গান

হে সন্ন্যাসী,
হিমগিরি ফেলে নীচে নেমে এলে
কিসের জন্য ?
কুন্দমালতী করিছে মিনতি
হও প্রসন্ন।
যাহা কিছু ম্লান বিরস জীর্ণ
দিকে দিকে দিলে করি বিকীর্ণ,
বিচ্ছেদভারে বনচ্ছায়ারে
করে বিষণ্ণ ;
হও প্রসন্ন।

সাজাবে কি ডালা গাঁথিবে কি মালা
মরণসত্রে ?
তাই উত্তরী নিলে ভরি ভরি
শুকানো পত্রে ?
ধরণী যে তব তাণ্ডবে সাথি
প্রলয়বেদনা নিল বুকে পাতি,
রুদ্র এবারে বরবেশে তারে
করো গো ধন্য ;
হও প্রসন্ন।

শীতের বিদায়

তুঙ্গ তোমার ধবলশৃঙ্গশিরে
উদাসীন শীত, যেতে চাও বুঝি ফিরে ?
চিন্তা কি নাই সঁপিতে রাজ্যভার
নবীনের হাতে, চপল চিত্ত যার।
হেলায় যে-জন ফেলায় সকল তার
অমিত দানের বেগে ?

দণ্ড তোমার তার হাতে বেণু হবে,
প্রতাপের দাপ মিলাবে গানের রবে,
শাসন ভুলিয়া মিলনের উৎসবে
জাগাবে, রহিবে জেগে।

সে যে মুছে দিবে তোমার আঘাতচিহ্ন,
কঠোর বাঁধন করিবে ছিন্ন ছিন্ন।
এতদিন তুমি বনের মজ্জামাঝে
বন্দী রেখেছ যৌবনে কোন্ কাজে,
ছাড়া পেয়ে আজ কত অপরূপ সাজে
বাহিরিবে ফুলে দলে।

তব আসনের সম্মুখে যার বাণী
আবদ্ধ ছিল বহুকাল ভয় মানি'
কণ্ঠ তাহার বাতাসেরে দিবে হানি'
বিচিত্র কোলাহলে।

তোমার নিয়মে বিবর্ণ ছিল সজ্জা,
নগ্ন তরুর শাখা পেত তাই লজ্জা।
তাহার আদেশে আজি নিখিলের বেশে
নীল পীত রাঙা নানা রঙ ফিরে এসে,
আকাশের আঁখি ডুবাইবে রসাবেশে
জাগাইবে মত্ততা।

সম্পদ তুমি যার যত নিলে হরি'
তার বহুগুণ ও যে দিতে চায় ভরি,
পল্লবে যার ক্ষতি ঘটেছিল ঝরি,
ফুল পাবে সেই লতা।

ক্ষয়ের দুঃখে দীক্ষা যাহারে দিলে,
সব দিকে যার বাহুল্য ঘুচাইলে,
প্রাচুর্যে তারি হল আজি অধিকার।
দক্ষিণবায়ু এই বলে বার বার,
বাঁধন-সিদ্ধ যে-জন তাহারি দ্বার
খুলিবে সকলখানে।

কঠিন করিয়া রচিলে পাত্রখানি
রসভারে তাই হবে না তাহার হানি,
লুঠি লও ধন, মনে মনে এই জানি'
দৈন্য পুরিবে দানে।

বসন্তের প্রবেশ

গান

নম নম নম নম
তুমি সুন্দরতম।
দূর হইল দৈন্যদ্বন্দ্ব,
ছিন্ন হইল দুঃখবন্ধ
উৎসবপতি মহানন্দ
তুমি সুন্দরতম।

লুকানো রহে না বিপুল মহিমা
বিঘ্ন হয়েছে চূর্ণ,
আপনি রচিলে আপনার সীমা,
আপনি করিলে পূর্ণ।

ভরেছে পূজার সাজি,
গান উঠিয়াছে বাজি',
নাগকেশরের গন্ধরেণুতে
উড়ে চন্দনচূর্ণ।
এ কী লীলা, হে বসন্ত,
ম্লান আবরণ আড়ালে দেখালে
সব দৈন্যের অন্ত।

অমানিত মাটি, দিবে তারে মান
এসেছ তাহারি জন্য ;
পথে পথে দিলে পরশের দান
ধূলিরে করিলে ধন্য।
যেথা আস তুমি বীর
জাগে তব মন্দির,
বর্ণছটায় মাতে মহাকাশ
স্তব করে মহারণ্য।
এ কী লীলা, হে বসন্ত,
অনেক ভুলায়ে নিমেষে সহসা
দেখালে আপন পন্থ।

ছিনু পথ চেয়ে বহু দুখ সয়ে,
আজ দেখি এ কী দৃশ্য,
শক্তি তোমার সুন্দর হয়ে
জিনিল কঠিন বিশ্ব।
তব পুষ্পিত তরু
জয় করি নিল মরু,
মূক চিত্তের জাগাইলে গান,
কবি হল তব শিষ্য।

এ কী লীলা, হে বসন্ত,
যা ছিল শ্রীহীন দীপ্তি-বিহীন
করিলে প্রজ্বলন্ত।

আবাহন

গান

তোমার আসন পাতব কোথায়,
হে অতিথি।
ছেয়ে গেছে শুকনো পাতায়
কাননবীথি।
ছিল ফুটে মালতী ফুল, কুন্দকলি,
উত্তরবায় লুঠ করে তায় গেল চলি,
হিমে বিবশ বনস্থলী
বিরলগীতি,
হে অতিথি।

সুর-ভোলা ঐ ধরার বাঁশি
লুটায় ভুঁয়ে,
মর্মে তাহার তোমার হাসি
দাও না ছুঁয়ে।
মাতবে আকাশ নবীন রঙের তানে তানে,
পলাশ বকুল ব্যাকুল হবে আত্মদানে,
জাগবে বনের মুগ্ধ মনে
মধুর স্মৃতি,
হে অতিথি।

বসন্ত

হে বসন্ত, হে সুন্দর, ধরণীর ধ্যান-ভরা ধন,
বৎসরের শেষে
শুধু একবার মর্ত্যে মূর্তি ধর ভুবনমোহন
নব বরবেশে।

তারি লাগি তপস্বিনী কী তপস্যা করে অনুক্ষণ,
আপনারে তপ্ত করে, ধৌত করে, ছাড়ে আভরণ,
ত্যাগের সর্বস্ব দিয়ে ফল-অর্ঘ্য করে আহরণ
তোমার উদ্দেশে।

সূর্য প্রদক্ষিণ করি' ফিরে সে পূজার নৃত্যতালে
ভক্ত উপাসিকা।
নম্র ভালে আঁকে তার প্রতিদিন উদয়াস্তকালে
রক্তরশ্মিটিকা।
সমুদ্রতরঙ্গে সদা মন্দ্রস্বরে মন্ত্র পাঠ করে,
উচ্চারে নামের শ্লোক অরণ্যের উচ্ছ্বাসে মর্মরে,
বিচ্ছেদের মরুশূন্যে স্বপ্নচ্ছবি দিকে দিগন্তরে
রচে মরীচিকা।

আবর্তিয়া ঋতুমাল্য করে জপ, করে আরাধন
দিন গুনে গুনে।
সার্থক হল যে তার বিরহের বিচিত্র সাধন
মধুর ফাল্গুনে।
হেরিনু উত্তরী তব, হে তরুণ, অরুণ আকাশে,
শুনিনু চরণধ্বনি দক্ষিণের বাতাসে বাতাসে,
মিলনমাঙ্গল্য-হোম প্রজ্বলিত পলাশে পলাশে,
রক্তিম আগুনে।

তাই আজি ধরিত্রীর যত কর্ম, যত প্রয়োজন
হল অবসান।
বৃক্ষশাখা রিক্তভার, ফলে তার নিরাসক্ত মন,
খেতে নাই ধান।
বকুলে বকুলে শুধু মধুকর উঠিছে গুঞ্জরি
অকারণ আন্দোলনে চঞ্চলিছে অশোকমঞ্জরী,
কিশলয়ে কিশলয়ে নৃত্য উঠে দিবসশর্বরী
বনে জাগে গান।

হে বসন্ত, হে সুন্দর, হায় হায়, তোমার করুণা
ক্ষণকাল তরে।
মিলাইবে এ উৎসব, এই হাসি, এই দেখাশুনা
শূন্য নীলাম্বরে।
নিকুঞ্জের বর্ণচ্ছটা একদিন বিচ্ছেদবেলায়
ভেসে যাবে বৎসরান্তে রক্তসন্ধ্যাস্বপ্নের ভেলায়,
বনের মঞ্জীরধ্বনি অবসন্ন হবে নিরালায়
শ্রান্তিক্লান্তিভরে।

তোমারে করিবে বন্দী নিত্যকাল মৃত্তিকাশৃঙ্খলে
শক্তি আছে কার?
ইচ্ছায় বন্ধন লও, সে বন্ধন ইন্দ্রজাল বলে
কর অলংকার।
সে বন্ধন দোলরজ্জু, স্বর্গে মর্ত্যে দোলে ছন্দভরে,
সে বন্ধন শ্বেতপদ্ম, বাণীর মানসসরোবরে,
সে বন্ধন বীণাতন্ত্র, সুরে সুরে সংগীতনির্ঝরে
বর্ষিছে ঝংকার।

নন্দনে আনন্দ তুমি, এই মর্ত্যে, হে মর্ত্যের প্রিয়
নিত্য নাই হলে।
সুদূর মাধুর্যপানে তব স্পর্শ, অনির্বচনীয়,
দ্বার যদি খোলে,
ক্ষণে ক্ষণে সেথা আসি নিস্তব্ধ দাঁড়াবে বসুন্ধরা,
লাগিবে মন্দাররেণু শিরে তার ঊর্ধ্ব হতে ঝরা,
মাটির বিচ্ছেদপাত্র স্বর্গের উচ্ছ্বাসরসে ভরা
রবে তার কোলে।

রাগরঙ্গ

গান

রঙ লাগালে বনে বনে,
ঢেউ জাগালে সমীরণে।
আজ ভুবনের দুয়ার খোলা,
দোল দিয়েছে বনের দোলা,
কোন্ ভোলা সে ভাবে ভোলা
খেলায় প্রাঙ্গণে।

আন্ বাঁশি তোর আন্ রে,
লাগল সুরের বান রে,
বাতাসে আজ দে ছড়িয়ে
শেষ বেলাকার গান রে
সন্ধ্যাকাশের বুকফাটা সুর
বিদায় রাতি করবে মধুর,
মাতল আজি অস্তসাগর
সুরের প্লাবনে।

বসন্তের বিদায়

মুখখানি কর মলিন বিধুর
যাবার বেলা,
জানি আমি জানি সে তব মধুর
ছলের খেলা।
জানি গো বন্ধু, ফিরে আসিবার পথে
গোপন চিহ্ন এঁকে যাবে তব রথে,
জানি তুমি তারে ভুলিবে না কোনোমতে,
যার সাথে তব হল একদিন
মিলন-মেলা।

জানি আমি যবে আঁখিজল ভরে
রসের স্নানে
মিলনের বীজ অঙ্কুর ধরে
নবীন প্রাণে।
খনে খনে এই চিরবিরহের ভান,
খনে খনে এই ভয়রোমাঞ্চ দান,
তোমার প্রণয়ে সত্য সোহাগে
মিথ্যা হেলা।

প্রার্থনা

গান

জানি তুমি ফিরে আসিবে আবার, জানি,
তবু মনে মনে প্রবোধ নাহি যে মানি।
বিদায়লগনে ধরিয়া দুয়ার
তবু যে তোমায় বলি বারবার
"ফিরে এসো, এসো, বন্ধু আমার"
বাষ্পবিভল বাণী।

যাবার বেলায় কিছু মোরে দিয়ো দিয়ো
গানের সুরেতে তব আশ্বাস, প্রিয়।
বনপথে যবে যাবে সে-ক্ষণের
হয়তো বা কিছু রবে স্মরণের,
তুলি লব সেই তব চরণের
দলিত কুসুমখানি।

অহৈতুক

গান

মনে রবে কি না রবে আমারে
সে আমার মনে নাই গো।
ক্ষণে ক্ষণে আসি তব দুয়ারে,
অকারণে গান গাই গো।
চলে যায় দিন, যতখন আছি
পথে যেতে যদি আসি কাছাকাছি
তোমার মুখের চকিত সুখের
হাসি দেখিতে যে চাই গো,
তাই অকারণে গান গাই গো।

ফাগুনের ফুল যায় ঝরিয়া
ফাগুনের অবসানে।
ক্ষণিকের মুঠি দেয় ভরিয়া,
আর কিছু নাহি জানে।
ফুরাইবে দিন, আলো হবে ক্ষীণ,
গান সারা হবে, থেমে যাবে বীন,
যতখন থাকি ভরে দিবে না কি
এ খেলারি ভেলাটাই গো।
তাই অকারণে গান গাই গো।

মনের মানুষ[1]

কত-না দিনের দেখা
কত-না রূপের মাঝে,
সে কার বিহনে একা
মন লাগে নাই কাজে।

---

[1] এই ছন্দ চৌপদীজাতীয় নহে। ইহার যতিবিভাগ নিম্নলিখিত রূপে :
কত-না দিনের । দেখা ॥ কত-না রূপের । মাঝে ॥
সে কার বিহনে । একা ॥ মন লাগে নাই । কাজে ॥

কার নয়নের চাওয়া
পালে দিয়েছিল হাওয়া,
কার অধরের হাসি
আমার বীণায় বাজে।
কত ফাগুনের দিনে
চলেছিনু পথ চিনে,
কত শ্রাবণের রাতে
লাগে স্বপনের ছোঁওয়া।
চাওয়া-পাওয়া নিয়ে খেলা,
কেটেছিল কত বেলা,
কখনো বা পাই পাশে
কখনো বা যায় খোওয়া
শরতে এসেছে ভোরে
ফুলসাজি হাতে ক'রে,
শীতে গোধূলির বেলা
জ্বালায়েছে দীপশিখা।
কখনো করুণ সুরে
গান গেয়ে গেছে দূরে,
যেন কাননের পথে
রাগিণীর মরীচিকা।
সেই সব হাসি কাঁদা,
বাঁধন খোলা ও বাঁধা,
অনেক দিনের মধু,
অনেক দিনের মায়া—
আজ এক হয়ে তারা
মোরে করে মাতোয়ারা,
এক বীণারূপ ধরি
এক গানে ফেলে ছায়া।
নানা ঠাঁই ছিল নানা,
আজ তারে হল জানা,

বাহিরে সে দেখা দিত
মনের মানুষ মম—
আজ নাই আধাআধি,
ভিতর বাহির বাঁধি
এক দোলাতেই দোলে
মোর অন্তরতম।

চঞ্চল

ওরে প্রজাপতি, মায়া দিয়ে কে যে
পরশ করিল তোরে।
অস্তরবির তুলিখানি চুরি ক'রে।
বাতাসের বুকে যে-চঞ্চলের বাসা
বনে বনে তুই বহিস তাহারি ভাষা,
অপ্সরীদের দোল-খেলা ফুলরেণু
পাঠায় কে তোর দুখানি পাখায় ভ'রে

যে-গুণী তাহার কীর্তিনাশার নেশায়
চিকন রেখার লিখন শূন্যে মেশায়,
সুর বাঁধে আর সুর যে হারায় ভুলে,
গান গেয়ে চলে ভোলা রাগিণীর কূলে,
তার হারা সুর নাচের হাওয়ার বেগে
ডানাতে তোমার কখন পড়েছে ঝরে।

উৎসব

সন্ন্যাসী যে জাগিল ঐ, জাগিল ঐ, জাগিল।
হাস্যভরা দখিন বায়ে
অঙ্গ হতে দিল উড়ায়ে
শ্মশানচিতাভস্মরাশি, ভাগিল কোথা, ভাগিল।

মানসলোকে শুভ্র আলো
চূর্ণ হয়ে রঙ জাগাল,
মদির রাগ লাগিল তারে,
হৃদয়ে তার লাগিল।
আয় রে তোরা, আয় রে তোরা, আয় রে।
রঙের ধারা ঐ যে বহে যায় রে।

রঙের ঝড় উচ্ছ্বসিল গগনে,
রঙের ঢেউ রসের স্রোতে মাতিয়া ওঠে সঘনে ;—
ডাকিল বান আজি সে কোন্ কোটালে।
নাকাড়া বাজে, কানাড়া বাজে বাঁশিতে,
কান্নাধারা মিলিয়া গেছে হাসিতে,
প্রাণের মাঝে ফোয়ারা তার ছোটালে।
এসেছে হাওয়া বাণীতে দোল-দোলানো,
এসেছে পথ-ভোলানো,
এসেছে ডাক ঘরের দ্বার-খোলানো।
আয় রে তোরা, আয় রে তোরা, আয় রে।
রঙের ধারা ঐ যে বহে যায় রে।

উদয়রবি যে রাঙা রঙ রাঙায়ে
পূর্বাচলে দিয়েছে ঘুম ভাঙায়ে—
অস্তরবি সে রাঙা রসে রসিল,
চিরপ্রাণের বিজয়বাণী ঘোষিল ;
অরুণবীণা যে-সুর দিল রণিয়া
সন্ধ্যাকাশে সে সুর উঠে ঘনিয়া,
নীরব নিশীথিনীর বুকে নিখিল ধ্বনি ধ্বনিয়া।
আয় রে তোরা, আয় রে তোরা, আয় রে।
বাঁধনহারা রঙের ধারা ঐ যে বহে যায় রে।

শেষের রঙ

গান

রাঙিয়ে দিয়ে যাও গো এবার
যাবার আগে,—
আপন রাগে,
গোপন রাগে,
তরুণ হাসির অরুণ রাগে
অশ্রুজলের করুণ রাগে।
রঙ যেন মোর মর্মে লাগে,
আমার সকল কর্মে লাগে,
সন্ধ্যাদীপের আগায় লাগে,
গভীর রাতের জাগায় লাগে।

যাবার আগে যাও গো আমায়
জাগিয়ে দিয়ে
রক্তে তোমার চরণদোলা
লাগিয়ে দিয়ে।
আঁধার নিশার বক্ষে যেমন তারা জাগে,
পাষাণগুহার কক্ষে নির্ঝরধারা জাগে,
মেঘের বুকে যেমন মেঘের মন্দ্র জাগে,
বিশ্বনাচের কেন্দ্রে যেমন ছন্দ জাগে,
তেমনি আমায় দোল দিয়ে যাও
যাবার পথে আগিয়ে দিয়ে,
কাঁদন বাঁধন ভাগিয়ে দিয়ে।

দোল

আলোকরসে মাতাল রাতে
বাজিল কার বেণু।
দোলের হাওয়া সহসা মাতে,
ছড়ায় ফুলরেণু।

অমলরুচি মেঘের দলে
আনিল ডাকি গগনতলে,
উদাস হয়ে ওরা যে চলে
শূন্যে-চরা ধেনু।

দোলের নাচে সে বুঝি আছে
অমরাবতীপুরে ?
বাজায় বেণু বুকের কাছে,
বাজায় বেণু দূরে।
শরম ভয় সকলি ত্যেজে
মাধবী তাই আসিল সেজে,
শুধায় শুধু ‘বাজায় কে যে
মধুর মধু সুরে’।

গগনে শুনি এ কী এ কথা,
কাননে কী যে দেখি !
এ কি মিলনচঞ্চলতা।
বিরহব্যথা এ কি।
আঁচল কাঁপে ধরার বুকে,
কী জানি তাহা সুখে না দুখে।
ধরিতে যারে না পারে তারে
স্বপনে দেখিছে কি।

লাগিল দোল জলে স্থলে,
জাগিল দোল বনে,
সোহাগিনীর হৃদয়তলে,
বিরহিণীর মনে।
মধুর মোরে বিধুর করে
সুদূর তার বেণুর স্বরে,
নিখিলহিয়া কিসের তরে
দুলিছে অকারণে।

আনো গো আনো ভরিয়া ডালি
করবীমালা লয়ে,
আনো গো আনো সাজায়ে থালি
কোমল কিশলয়ে।
এস গো পীত বসনে সাজি,
কোলেতে বীণা উঠুক বাজি,
ধ্যানেতে আর গানেতে আজি
যামিনী যাক বয়ে।

এস গো এস দোলবিলাসী,
বাণীতে মোর দোলো।
ছন্দে মোর চকিতে আসি
মাতিয়ে তারে তোলো।
অনেক দিন বুকের কাছে
রসের স্রোত থমকি আছে,
নাচিবে আজি তোমার নাচে
সময় তারি হল।

কিশোর, আজি তোমার দ্বারে
পরান মম জাগে।
নবীন কবে করিবে তারে
রঙিন তব রাগে।
ভাবনাগুলি বাঁধনখোলা
রচিয়া দিবে তোমার দোলা,
দাঁড়িয়ো আসি হে ভাবে-ভোলা,
আমার আঁখি আগে।

উপন্যাস ও গল্প

গল্পগুচ্ছ

গল্পগুচ্ছ

সম্পাদক

আমার স্ত্রী-বর্তমানে প্রভা সম্বন্ধে আমার কোনো চিন্তা ছিল না। তখন প্রভা অপেক্ষা প্রভার মাতাকে লইয়া কিছু অধিক ব্যস্ত ছিলাম।

তখন কেবল প্রভার খেলাটুকু হাসিটুকু দেখিয়া, তাহার আধো আধো কথা শুনিয়া এবং আদরটুকু লইয়াই তৃপ্ত থাকিতাম; যতক্ষণ ভালো লাগিত নাড়াচাড়া করিতাম, কান্না আরম্ভ করিলেই তাহার মার কোলে সমর্পণ করিয়া সত্বর অব্যাহতি লইতাম। তাহাকে যে বহু চিন্তা ও চেষ্টায় মানুষ করিয়া তুলিতে হইবে, এ-কথা আমার মনে আসে নাই।

অবশেষে অকালে আমার স্ত্রীর মৃত্যু হইলে একদিন মায়ের কোল হইতে খসিয়া মেয়েটি আমার কোলের কাছে আসিয়া পড়িল, তাহাকে বুকে টানিয়া লইলাম।

কিন্তু মাতৃহীনা দুহিতাকে দ্বিগুণ স্নেহে পালন করা আমার কর্তব্য এটা আমি বেশি চিন্তা করিয়াছিলাম, না, পত্নীহীন পিতাকে পরম যত্নে রক্ষা করা তাহার কর্তব্য এইটে সে বেশি অনুভব করিয়াছিল, আমি ঠিক বুঝিতে পারি না। কিন্তু ছয় বৎসর বয়স হইতেই সে গিন্নীপনা আরম্ভ করিয়াছিল। বেশ দেখা গেল ওইটুকু মেয়ে তাহার বাবার একমাত্র অভিভাবক হইবার চেষ্টা করিতেছে।

আমি মনে মনে হাসিয়া তাহার হস্তে আত্মসমর্পণ করিলাম। দেখিলাম যতই আমি অকর্মণ্য অসহায় হই ততই তাহার লাগে ভালো; দেখিলাম, আমি নিজে কাপড়টা ছাতাটা পাড়িয়া লইলে সে এমন ভাব ধারণ করে, যেন তাহার অধিকারে হস্তক্ষেপ করা হইতেছে। বাবার মতো এতবড়ো পুতুল সে ইতিপূর্বে কখনো পায় নাই, এইজন্য বাবাকে খাওয়াইয়া পরাইয়া বিছানায় শুয়াইয়া সে সমস্ত দিন বড়ো আনন্দে আছে। কেবল ধারাপাত এবং পদ্যপাঠ প্রথমভাগ অধ্যাপনের সময় আমার পিতৃত্বকে কিঞ্চিৎ সচেতন করিয়া তুলিতে হইত।

কিন্তু মাঝে মাঝে ভাবনা হইত মেয়েটিকে সৎপাত্রে বিবাহ দিতে হইলে অনেক অর্থের আবশ্যক—আমার এত টাকা কোথায়। মেয়েকে তো সাধ্যমতো লেখাপড়া শিখাইতেছি কিন্তু একটা পরিপূর্ণ মূর্খের হাতে পড়িলে তাহার কী দশা হইবে।

উপার্জনে মন দেওয়া গেল। গবর্মেণ্ট আপিসে চাকরি করিবার বয়স গেছে, অন্য আপিসে প্রবেশ করিবারও ক্ষমতা নাই। অনেক ভাবিয়া বই লিখিতে লাগিলাম।

বাঁশের নল ফুটা করিলে তাহাতে তেল রাখা যায় না, জল রাখা যায় না, তাহার ধারণাশক্তি মূলেই থাকে না; তাহাতে সংসারের কোনো কাজই হয় না, কিন্তু ফুঁ দিলে বিনা খরচে বাঁশি বাজে ভালো। আমি স্থির জানিতাম, সংসারের কোনো কাজেই যে-হতভাগ্যের বুদ্ধি খেলে না, সে নিশ্চয়ই ভালো বই লিখিবে। সেই সাহসে একখানা প্রহসন লিখিলাম, লোকে ভালো বলিল এবং রঙ্গভূমিতে অভিনয় হইয়া গেল।

সহসা যশের আস্বাদ পাইয়া এমনি বিপদ হইল, প্রহসন আর কিছুতেই ছাড়িতে পারি না। সমস্তদিন ব্যাকুল চিন্তান্বিত মুখে প্রহসন লিখিতে লাগিলাম।

প্রভা আসিয়া আদর করিয়া স্নেহসহাস্যে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা, নাইতে যাবে না?"

আমি হুংকার দিয়া উঠিলাম, "এখন যা, এখন যা, এখন বিরক্ত করিসনে।"

বালিকার মুখখানি বোধ করি একটি ফুৎকারে নির্বাপিত প্রদীপের মতো অন্ধকার হইয়া গিয়াছিল; কখন সে অভিমানবিস্ফারিত-হৃদয়ে নীরবে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল আমি জানিতেও পারি নাই।

দাসীকে তাড়াইয়া দিই, চাকরকে মারিতে যাই, ভিক্ষুক সুর করিয়া ভিক্ষা করিতে আসিলে তাহাকে লাঠি লইয়া তাড়া করি। পথপার্শ্বেই আমার ঘর হওয়াতে যখন কোনো নিরীহ পান্থ জানলার বাহির হইতে আমাকে পথ জিজ্ঞাসা করে, আমি তাহাকে জাহান্নম নামক একটা অস্থানে যাইতে অনুরোধ করি। হায়, কেহই বুঝিত না, আমি খুব একটা মজার প্রহসন লিখিতেছি।

কিন্তু যতটা মজা এবং যতটা যশ হইতেছিল সে পরিমাণে টাকা কিছুই হয় নাই। তখন টাকার কথা মনেও ছিল না। এদিকে প্রভার যোগ্য পাত্রগুলি অন্য ভদ্রলোকদের কন্যাদায় মোচন করিবার জন্য গোকুলে বাড়িতে লাগিল, আমার তাহাতে খেয়াল ছিল না।

পেটের জ্বালা না ধরিলে চৈতন্য হইত না, কিন্তু এমন সময় একটা সুযোগ জুটিয়া গেল। জাহিরগ্রামের এক জমিদার একখানি কাগজ বাহির করিয়া আমাকে তাহার বেতনভোগী সম্পাদক হইবার জন্য অনুরোধ করিয়া পাঠাইয়াছেন। কাজটা স্বীকার করিলাম। দিনকতক এমনি প্রতাপের সহিত লিখিতে লাগিলাম যে, পথে বাহির হইলে লোকে আমাকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া দেখাইত এবং আপনাকে মধ্যাহ্নতপনের মতো দুর্নিরীক্ষ্য বলিয়া বোধ হইত।

জাহিরগ্রামের পার্শ্বে আহিরগ্রাম। দুই গ্রামের জমিদারে ভারি দলাদলি। পূর্বে কথায় কথায় লাঠালাঠি হইত। এখন উভয় পক্ষে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট মুচলেকা দিয়া লাঠি বন্ধ করিয়াছে এবং কৃষ্ণের জীব আমাকে পূর্ববর্তী খুনি লাঠিয়ালদের স্থানে নিযুক্ত করিয়াছে। সকলেই বলিতেছে আমি পদমর্যাদা রক্ষা করিয়াছি।

আমার লেখার জ্বালায় আহিরগ্রাম আর মাথা তুলিতে পারে না। তাহাদের জাতিকুল পূর্বপুরুষের ইতিহাস সমস্ত আদ্যোপান্ত মসীলিপ্ত করিয়া দিয়াছি।

এই সময়টা ছিলাম ভালো। বেশ মোটাসোটা হইয়া উঠিলাম। মুখ সর্বদা প্রসন্ন হাস্যময় ছিল। আহিরগ্রামের পিতৃপুরুষদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া এক একটা মর্মান্তিক বাক্যশেল ছাড়িতাম; আর সমস্ত জাহিরগ্রাম হাসিতে হাসিতে পাকা ফুটির মতো বিদীর্ণ হইয়া যাইত। বড়ো আনন্দে ছিলাম।

অবশেষে আহিরগ্রামও একখানা কাগজ বাহির করিল। সে কোনো কথা ঢাকিয়া বলিত না। এমনি উৎসাহের সহিত অবিমিশ্র প্রচলিত ভাষায় গাল পাড়িত যে, ছাপার অক্ষরগুলা পর্যন্ত যেন চক্ষের সমক্ষে চীৎকার করিতে থাকিত। এই জন্য দুই গ্রামের লোকেই তাহার কথা খুব স্পষ্ট বুঝিতে পারিত।

কিন্তু আমি চিরাভ্যাসবশত এমনি মজা করিয়া এত কূটকৌশল সহকারে বিপক্ষদিগকে আক্রমণ করিতাম যে, শত্রু মিত্র কেহই বুঝিতে পারিত না আমার কথার মর্মটা কী।

তাহার ফল হইল এই, জিত হইলেও সকলে মনে করিত আমার হার হইল। দায়ে পড়িয়া সুরুচি সম্বন্ধে একটি উপদেশ লিখিলাম। দেখিলাম ভারি ভুল করিয়াছি; কারণ, যথার্থ ভালো জিনিসকে যেমন বিদ্রূপ করিবার সুবিধা, এমন উপহাস্য বিষয়কে নহে। হনুবংশীয়েরা মনুবংশীয়দের যেমন সহজে বিদ্রূপ করিতে পারে, মনুবংশীয়েরা হনুবংশীয়দিগকে বিদ্রূপ করিয়া কখনো তেমন কৃতকার্য হইতে পারে না। সুতরাং সুরুচিকে তাহারা দন্তোন্মীলন করিয়া দেশছাড়া করিল।

আমার প্রভু আমার প্রতি আর তেমন সমাদর করেন না। সভাস্থলেও আমার কোনো সম্মান নাই। পথে বাহির হইলে লোকে গায়ে পড়িয়া আলাপ করিতে আসে না। এমন কি আমাকে দেখিয়া কেহ কেহ হাসিতে আরম্ভ করিয়াছে।

ইতিমধ্যে আমার প্রহসনগুলার কথাও লোকে সম্পূর্ণ ভুলিয়া গিয়াছে। হঠাৎ বোধ হইল, আমি যেন একটা দেশালায়ের কাঠি; মিনিটখানেক জ্বলিয়া একেবারে শেষ পর্যন্ত পুড়িয়া গিয়াছি।

মন এমনি নিরুৎসাহ হইয়া গেল মাথা খুঁড়িয়া মরিলে এক লাইন লেখা বাহির হয় না। মনে হইতে লাগিল বাঁচিয়া কোনো সুখ নাই।

প্রভা আমাকে এখন ভয় করে। বিনা আহ্বানে সহসা কাছে আসিতে সাহস করে না। সে বুঝিতে পারিয়াছে, মজার কথা লিখিতে পারে এমন বাবার চেয়ে মাটির পুতুল ঢের ভালো সঙ্গী।

একদিন দেখা গেল আমাদের আহিরগ্রামপ্রকাশ জমিদারকে ছাড়িয়া আমাকে লইয়া পড়িয়াছে। গোটাকতক অত্যন্ত কুৎসিত কথা লিখিয়াছে। আমার পরিচিত বন্ধুবান্ধবেরা একে একে সকলেই সেই কাগজখানা লইয়া হাসিতে হাসিতে আমাকে শুনাইয়া গেল। কেহ কেহ বলিল, ইহার বিষয়টা যেমনই হউক, ভাষার বাহাদুরি আছে। অর্থাৎ গালি যে দিয়াছে তাহা ভাষা দেখিলেই পরিষ্কার বুঝা যায়। সমস্ত দিন ধরিয়া বিশজনের কাছে ওই এক কথা শুনিলাম।

আমার বাসার সম্মুখে একটু বাগানের মতো ছিল। সন্ধ্যাবেলায় নিতান্ত পীড়িতচিত্তে সেইখানে একাকী বেড়াইতেছিলাম। পাখিরা নীড়ে ফিরিয়া আসিয়া যখন কলরব বন্ধ করিয়া স্বচ্ছন্দে সন্ধ্যার শান্তির মধ্যে আত্মসমর্পণ করিল, তখন বেশ বুঝিতে পারিলাম পাখিদের মধ্যে রসিক লেখকের দল নাই, এবং সুরুচি লইয়া তর্ক হয় না।

মনের মধ্যে কেবলই ভাবিতেছি কী উত্তর দেওয়া যায়। ভদ্রতার একটা বিশেষ অসুবিধা এই যে, সকল স্থানের লোকে তাহাকে বুঝিতে পারে না। অভদ্রতার ভাষা অপেক্ষাকৃত পরিচিত, তাই ভাবিতেছিলাম সেই রকম ভাবের একটা মুখের মতো জবাব লিখিতে হইবে। কিছুতেই হার মানিতে পারিব না। এমন সময়ে সেই সন্ধ্যার অন্ধকারে একটি পরিচিত ক্ষুদ্র কণ্ঠের স্বর শুনিতে পাইলাম এবং তাহার পরেই আমার করতলে একটি কোমল উষ্ণ স্পর্শ অনুভব করিলাম। এত উদ্বেজিত অন্যমনস্ক ছিলাম যে, সেই মুহূর্তে সেই স্বর ও সেই স্পর্শ জানিয়াও জানিতে পারিলাম না।

কিন্তু এক মুহূর্ত পরেই সেই স্বর ধীরে ধীরে আমার কর্ণে জাগ্রত, সেই সুধাস্পর্শ আমার করতলে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল। বালিকা একবার আস্তে আস্তে কাছে আসিয়া মৃদুস্বরে ডাকিয়াছিল, “বাবা”। কোনো উত্তর না পাইয়া আমার দক্ষিণ হস্ত তুলিয়া ধরিয়া একবার আপনার কোমল কপোলে বুলাইয়া আবার ধীরে ধীরে গৃহে ফিরিয়া যাইতেছে।

বহুদিন প্রভা আমাকে এমন করিয়া ডাকে নাই এবং স্বেচ্ছাক্রমে আসিয়া আমাকে এতটুকু আদর করে নাই। তাই আজ সেই স্নেহস্পর্শে আমার হৃদয় সহসা অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

কিছুক্ষণ পরে ঘরে ফিরিয়া গিয়া দেখিলাম প্রভা বিছানায় শুইয়া আছে। শরীর ক্লিষ্টচ্ছবি, নয়ন ঈষৎ নিমীলিত; দিনশেষের ঝরিয়া-পড়া ফুলের মতো পড়িয়া আছে।

মাথায় হাত দিয়া দেখি অত্যন্ত উষ্ণ; উত্তপ্ত নিশ্বাস পড়িতেছে; কপালের শির দপ দপ করিতেছে।

বুঝিতে পারিলাম, বালিকা আসন্ন রোগের তাপে কাতর হইয়া পিপাসিত হৃদয়ে একবার পিতার স্নেহ পিতার আদর লইতে গিয়াছিল, পিতা তখন জাহিরপ্রকাশের জন্য খুব একটা কড়া জবাব কল্পনা করিতেছিল।

পাশে আসিয়া বসিলাম। বালিকা কোনো কথা না বলিয়া তাহার দুই জ্বরতপ্ত করতলের মধ্যে আমার হস্ত টানিয়া লইয়া তাহার উপরে কপোল রাখিয়া চুপ করিয়া শুইয়া রহিল।

জাহিরগ্রাম এবং আহিরগ্রামের যত কাগজ ছিল সমস্ত পুড়াইয়া ফেলিলাম। কোনো জবাব লেখা হইল না। হার মানিয়া এতসুখ কখনো হয় নাই।

বালিকার যখন মাতা মরিয়াছিল তখন তাহাকে কোলে টানিয়া লইয়াছিলাম, আজ তাহার বিমাতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপন করিয়া আবার তাহাকে বুকে তুলিয়া লইয়া ঘরে চলিয়া গেলাম।

বৈশাখ, ১৩০০

মধ্যবর্তিনী

প্রথম পরিচ্ছেদ

নিবারণের সংসার নিতান্তই সচরাচর রকমের, তাহাতে কাব্যরসের কোনো নামগন্ধ ছিল না। জীবনে উক্ত রসের যে কোনো আবশ্যক আছে, এমন কথা তাহার মনে কখনো উদয় হয় নাই। যেমন পরিচিত পুরাতন চটি-জোড়াটার মধ্যে পা দুটো দিব্য নিশ্চিন্তভাবে প্রবেশ করে, এই পুরাতন পৃথিবীটার মধ্যে নিবারণ সেইরূপ আপনার চিরাভ্যস্ত স্থানটি অধিকার করিয়া থাকে, সে সম্বন্ধে ভ্রমেও কোনোরূপ চিন্তা তর্ক বা তত্ত্বালোচনা করে না।

নিবারণ প্রাতঃকালে উঠিয়া গলির ধারে গৃহদ্বারে খোলাগায়ে বসিয়া অত্যন্ত নিরুদ্বিগ্নভাবে হুঁকাটি লইয়া তামাক খাইতে থাকে। পথ দিয়া লোকজন যাতায়াত করে, গাড়ি ঘোড়া চলে, বৈষ্ণব-ভিখারি গান গাহে, পুরাতন বোতল সংগ্রহকারী হাঁকিয়া চলিয়া যায়; এই সমস্ত চঞ্চল দৃশ্য মনকে লঘুভাবে ব্যাপৃত রাখে এবং যেদিন

কাঁচা আম অথবা তপসি-মাছওয়ালা আসে, সেদিন অনেক দরদাম করিয়া কিঞ্চিৎ বিশেষরূপ রন্ধনের আয়োজন হয়। তাহার পর যথাসময়ে তেল মাখিয়া স্নান করিয়া আহারান্তে দড়িতে ঝুলানো চাপকানটি পরিয়া এক ছিলিম তামাক পানের সহিত নিঃশেষপূর্বক আর একটি পান মুখে পুরিয়া, আপিসে যাত্রা করে। আপিস হইতে ফিরিয়া আসিয়া সন্ধ্যাবেলাটা প্রতিবেশী রামলোচন ঘোষের বাড়িতে প্রশান্ত গম্ভীর ভাবে সন্ধ্যাযাপন করিয়া আহারান্তে রাত্রে শয়নগৃহে স্ত্রী হরসুন্দরীর সহিত সাক্ষাৎ হয়।

সেখানে মিত্রদের ছেলের বিবাহে আইবড় ভাত পাঠানো, নবনিযুক্ত ঝির অবাধ্যতা, ছেঁচকিবিশেষে ফোড়নবিশেষের উপযোগিতা সম্বন্ধে যে সমস্ত সংক্ষিপ্ত সমালোচনা চলে তাহা এ পর্যন্ত কোনো কবি ছন্দোবদ্ধ করেন নাই, এবং সেজন্য নিবারণের মনে কখনো ক্ষোভের উদয় হয় নাই।

ইতিমধ্যে ফাল্গুন মাসে হরসুন্দরীর সংকট পীড়া উপস্থিত হইল। জ্বর আর কিছুতেই ছাড়িতে চাহে না। ডাক্তার যতই কুইনাইন দেয়, বাধাপ্রাপ্ত প্রবল স্রোতের ন্যায় জ্বরও তত ঊর্ধ্বে চড়িতে থাকে। এমনি বিশ দিন, বাইশ দিন, চল্লিশ দিন পর্যন্ত ব্যাধি চলিল।

নিবারণের আপিস বন্ধ; রামলোচনের বৈকালিক সভায় বহুকাল আর সে যায় না; কী যে করে তাহার ঠিক নাই। একবার শয়নগৃহে গিয়া রোগীর অবস্থা জানিয়া আসে, একবার বাহিরের বারান্দায় বসিয়া চিন্তিত মুখে তামাক টানিতে থাকে। দুইবেলা ডাক্তার-বৈদ্য পরিবর্তন করে এবং যে যাহা বলে সেই সেই ঔষধ পরীক্ষা করিয়া দেখিতে চাহে।

ভালোবাসার এইরূপ অব্যবস্থিত শুশ্রূষা সত্ত্বেও চল্লিশ দিনে হরসুন্দরী ব্যাধিমুক্ত হইল। কিন্তু এমনি দুর্বল এবং শীর্ণ হইয়া গেল যে, শরীরটি যেন বহুদূর হইতে অতি ক্ষীণস্বরে ‘আছি’ বলিয়া সাড়া দিতেছে মাত্র।

তখন বসন্তকালে দক্ষিণের হাওয়া দিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং উষ্ণ নিশীথের চন্দ্রালোকও সীমন্তিনীদের উন্মুক্ত শয়নকক্ষে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে প্রবেশাধিকার লাভ করিয়াছে।

হরসুন্দরীর ঘরের নিচেই প্রতিবেশীদের খিড়কির বাগান। সেটা যে বিশেষ কিছু সুদৃশ্য রমণীয় স্থান তাহা বলিতে পারি না। এক সময় কে একজন শখ করিয়া গোটাকতক ক্রোটন রোপণ করিয়াছিল, তার পরে আর সেদিকে বড়ো একটা দৃক্‌পাত করে নাই। শুষ্ক ডালের মাচার উপর কুষ্মাণ্ডলতা উঠিয়াছে; বৃদ্ধ কুলগাছের তলায় বিষম জঙ্গল; রান্নাঘরের পাশে প্রাচীর ভাঙিয়া কতকগুলো ইট জড়ো হইয়া

আছে এবং তাহারই সহিত দগ্ধাবশিষ্ট পাথুরে কয়লা এবং ছাই দিন দিন রাশীকৃত হইয়া উঠিতেছে।

কিন্তু বাতায়নতলে শয়ন করিয়া এই বাগানের দিকে চাহিয়া হরসুন্দরী প্রতিমুহূর্তে যে একটি আনন্দরস পান করিতে লাগিল, তাহার অকিঞ্চিৎকর জীবনে এমন সে আর কখনো করে নাই। গ্রীষ্মকালে স্রোতোবেগ মন্দ হইয়া ক্ষুদ্র গ্রাম্যনদীটি যখন বালুশয্যার উপরে শীর্ণ হইয়া আসে তখন সে যেমন অত্যন্ত স্বচ্ছতা লাভ করে; তখন যেমন প্রভাতের সূর্যালোক তাহার তলদেশ পর্যন্ত কম্পিত হইতে থাকে, বায়ুস্পর্শ তাহার সর্বাঙ্গ পুলকিত করিয়া তোলে, এবং আকাশের তারা তাহার স্ফটিকদর্পণের উপর সুখস্মৃতির ন্যায় অতি সুস্পষ্টভাবে প্রতিবিম্বিত হয়, তেমনি হরসুন্দরীর ক্ষীণ জীবনতন্তুর উপর আনন্দময়ী প্রকৃতির প্রত্যেক অঙ্গুলি যেন স্পর্শ করিতে লাগিল এবং অন্তরের মধ্যে যে একটি সংগীত উঠিতে লাগিল তাহার ঠিক ভাবটি সে সম্পূর্ণ বুঝিতে পারিল না।

এমন সময় তাহার স্বামী যখন পাশে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিত 'কেমন আছ', তখন তাহার চোখে যেন জল উছলিয়া উঠিত। রোগশীর্ণ মুখে তাহার চোখ দুটি অত্যন্ত বড়ো দেখায়, সেই বড়ো বড়ো প্রেমার্দ্র সকৃতজ্ঞ চোখ স্বামীর মুখের দিকে তুলিয়া শীর্ণহস্তে স্বামীর হস্ত ধরিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া থাকিত, স্বামীর অন্তরেও যেন কোথা হইতে একটা নূতন অপরিচিত আনন্দরশ্মি প্রবেশ লাভ করিত।

এই ভাবে কিছুদিন যায়। একদিন রাত্রে ভাঙা প্রাচীরের উপরিবর্তী খর্ব অশথ-গাছের কম্পমান শাখান্তরাল হইতে একখানি বৃহৎ চাঁদ উঠিতেছে এবং সন্ধ্যাবেলাকার গুমট ভাঙিয়া হঠাৎ একটা নিশাচর বাতাস জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে, এমন সময় নিবারণের চুলের মধ্যে অঙ্গুলি বুলাইতে বুলাইতে হরসুন্দরী কহিল, "আমাদের তো ছেলেপুলে কিছুই হইল না, তুমি আর একটি বিবাহ করো।"

হরসুন্দরী কিছুদিন হইতে এই কথা ভাবিতেছিল। মনে যখন একটা প্রবল আনন্দ, একটা বৃহৎ প্রেমের সঞ্চার হয় তখন মানুষ মনে করে আমি সব করিতে পারি। তখন হঠাৎ একটা আত্মবিসর্জনের ইচ্ছা বলবতী হইয়া উঠে। স্রোতের উচ্ছ্বাস যেমন কঠিন তটের উপর আপনাকে সবেগে মূর্ছিত করে, তেমনি প্রেমের আবেগ, আনন্দের উচ্ছ্বাস একটা মহৎ ত্যাগ একটা বৃহৎ দুঃখের উপর আপনাকে যেন নিক্ষেপ করিতে চাহে।

সেইরূপ অবস্থায় অত্যন্ত পুলকিত চিত্তে একদিন হরসুন্দরী স্থির করিল, আমার স্বামীর জন্য আমি খুব বড়ো একটা কিছু করিব। কিন্তু হায়, যতখানি সাধ ততখানি

সাধ্য কাহার আছে। হাতের কাছে কী আছে, কী দেওয়া যায়। ঐশ্বর্য নাই, বুদ্ধি নাই, ক্ষমতা নাই, শুধু একটা প্রাণ আছে, সেটাও যদি কোথাও দিবার থাকে এখনই দিয়া ফেলি, কিন্তু তাহারই বা মূল্য কী।

আর স্বামীকে যদি দুগ্ধফেনের মতো শুভ্র, নবনীর মতো কোমল, শিশুকন্দর্পের মতো সুন্দর একটি স্নেহের পুত্তলি সন্তান দিতে পারিতাম। কিন্তু প্রাণপণে ইচ্ছা করিয়া মরিয়া গেলেও তো সে হইবে না। তখন মনে হইল, স্বামীর একটি বিবাহ দিতে হইবে। ভাবিল, স্ত্রীরা ইহাতে এত কাতর হয় কেন, এ কাজ তো কিছুই কঠিন নহে। স্বামীকে যে ভালোবাসে, সপত্নীকে ভালোবাসা তাহার পক্ষে কী এমন অসাধ্য। মনে করিয়া বক্ষ স্ফীত হইয়া উঠিল।

প্রস্তাবটা প্রথম যখন শুনিল, নিবারণ হাসিয়া উড়াইয়া দিল, দ্বিতীয় এবং তৃতীয়বারও কর্ণপাত করিল না। স্বামীর এই অসম্মতি এই অনিচ্ছা দেখিয়া হরসুন্দরীর বিশ্বাস এবং সুখ যতই বাড়িয়া উঠিল তাহার প্রতিজ্ঞাও ততই দৃঢ় হইতে লাগিল।

এদিকে নিবারণ যত বারংবার এই অনুরোধ শুনিল, ততই ইহার অসম্ভাব্যতা তাহার মন হইতে দূর হইল এবং গৃহদ্বারে বসিয়া তামাক খাইতে খাইতে সন্তানপরিবৃত গৃহের সুখময় চিত্র তাহার মনে উজ্জ্বল হইয়া উঠিতে লাগিল।

একদিন নিজেই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া কহিল, “বুড়াবয়সে একটি কচি খুকীকে বিবাহ করিয়া আমি মানুষ করিতে পারিব না।”

হরসুন্দরী কহিল, “সেজন্য তোমাকে ভাবিতে হইবে না। মানুষ করিবার ভার আমার উপর রহিল।” বলিতে বলিতে এই সন্তানহীনা রমণীর মনে একটি কিশোরবয়স্কা, সুকুমারী, লজ্জাশীলা, মাতৃক্রোড় হইতে সদ্যোবিচ্যুতা নববধূর মুখচ্ছবি উদয় হইল এবং হৃদয় স্নেহে বিগলিত হইয়া গেল।

নিবারণ কহিল, “আমার আপিস আছে, কাজ আছে, তুমি আছ, কচি মেয়ের আবদার শুনিবার অবসর আমি পাইব না।”

হরসুন্দরী বারবার করিয়া কহিল, তাহার জন্য কিছুমাত্র সময় নষ্ট করিতে হইবে না এবং অবশেষে পরিহাস করিয়া কহিল, “আচ্ছা গো, তখন দেখিব কোথায় বা তোমার কাজ থাকে, কোথায় বা আমি থাকি, আর কোথায় বা তুমি থাক।”

নিবারণ সে-কথার উত্তরমাত্র দেওয়া আবশ্যক মনে করিল না, শাস্তির স্বরূপ হরসুন্দরীর কপোলে হাসিয়া তর্জনী আঘাত করিল। এই তো গেল ভূমিকা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

একটি নোলকপরা অশ্রুভরা ছোটোখাটো মেয়ের সহিত নিবারণের বিবাহ হইল, তাহার নাম শৈলবালা।

নিবারণ ভাবিল, নামটি বড়ো মিষ্ট এবং মুখখানিও বেশ ঢলোঢলো। তাহার ভাবখানা, তাহার চেহারাখানি, তাহার চলাফেরা একটু বিশেষ মনোযোগ করিয়া চাহিয়া দেখিতে ইচ্ছা করে, কিন্তু সে আর কিছুতেই হইয়া উঠে না। উল্‌টিয়া এমন ভাব দেখাইতে হয় যে, ওই তো এক ফোঁটা মেয়ে, উহাকে লইয়া তো বিষম বিপদে পড়িলাম, কোনোমতে পাশ কাটাইয়া আমার বয়সোচিত কর্তব্যক্ষেত্রের মধ্যে গিয়া পড়িলে যেন পরিত্রাণ পাওয়া যায়।

হরসুন্দরী নিবারণের এই বিষম বিপদগ্রস্ত ভাব দেখিয়া মনে মনে বড়ো আমোদ বোধ করিত। এক একদিন হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিত, "আহা, পালাও কোথায়। ওইটুকু মেয়ে, ও তো আর তোমাকে খাইয়া ফেলিবে না।"

নিবারণ দ্বিগুণ শশব্যস্ত ভাব ধারণ করিয়া বলিত, "আরে রসো রসো, আমার একটু বিশেষ কাজ আছে।" বলিয়া যেন পালাইবার পথ পাইত না। হরসুন্দরী হাসিয়া দ্বার আটক করিয়া বলিত, আজ ফাঁকি দিতে পারিবে না। অবশেষে নিবারণ নিতান্তই নিরুপায় হইয়া কাতরভাবে বসিয়া পড়িত।

হরসুন্দরী তাহার কানের কাছে বলিত, "আহা পরের মেয়েকে ঘরে আনিয়া অমন হতশ্রদ্ধা করিতে নাই।"

এই বলিয়া শৈলবালাকে ধরিয়া নিবারণের বাম পাশে বসাইয়া দিত এবং জোর করিয়া ঘোমটা খুলিয়া ও চিবুক ধরিয়া তাহার আনত মুখ তুলিয়া নিবারণকে বলিত, "আহা কেমন চাঁদের মতো মুখখানি দেখো দেখি।"

কোনোদিন বা উভয়কে ঘরে বসাইয়া কাজ আছে বলিয়া উঠিয়া যাইত এবং বাহির হইতে ঝনাৎ করিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিত। নিবারণ নিশ্চয় জানিত দুটি কৌতূহলী চক্ষু কোনো-না-কোনো ছিদ্রে সংলগ্ন হইয়া আছে—অতিশয় উদাসীনভাবে পাশ ফিরিয়া নিদ্রার উপক্রম করিত, শৈলবালা ঘোমটা টানিয়া গুটিসুটি মারিয়া মুখ ফিরাইয়া একটা কোণের মধ্যে মিলাইয়া থাকিত।

অবশেষে হরসুন্দরী নিতান্ত না পারিয়া হাল ছাড়িয়া দিল, কিন্তু খুব বেশি দুঃখিত হইল না।

হরসুন্দরীর যখন হাল ছাড়িল, তখন স্বয়ং নিবারণ হাল ধরিল। এ বড়ো কৌতূহল,

এ বড়ো রহস্য। এক টুকরা হীরক পাইলে তাহাকে নানাভাবে নানাদিকে ফিরাইয়া দেখিতে ইচ্ছা করে, আর এ একটি ক্ষুদ্র সুন্দর মানুষের মন—বড়ো অপূর্ব। ইহাকে কতরকম করিয়া স্পর্শ করিয়া সোহাগ করিয়া অন্তরাল হইতে, সম্মুখ হইতে, পার্শ্ব হইতে দেখিতে হয়। কখনো একবার কানের দুলে দোল দিয়া, কখনো ঘোমটা একটুখানি টানিয়া তুলিয়া, কখনো বিদ্যুতের মতো সহসা সচকিতে, কখনো নক্ষত্রের মতো দীর্ঘকাল একদৃষ্টে নব নব সৌন্দর্যের সীমা আবিষ্কার করিতে হয়।

ম্যাক্‌মোরান্‌ কোম্পানির আপিসের হেডবাবু শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্রের অদৃষ্টে এমন অভিজ্ঞতা ইতিপূর্বে হয় নাই। সে যখন প্রথম বিবাহ করিয়াছিল তখন বালক ছিল, যখন যৌবন লাভ করিল তখন স্ত্রী তাহার নিকট চিরপরিচিত, বিবাহিত জীবন চিরাভ্যস্ত। হরসুন্দরীকে অবশ্যই সে ভালোবাসিত, কিন্তু কখনোই তাহার মনে ক্রমে ক্রমে প্রেমের সচেতন সঞ্চার হয় নাই।

একেবারে পাকা আম্রের মধ্যেই যে পতঙ্গ জন্মলাভ করিয়াছে, যাহাকে কোনো কালে রস অন্বেষণ করিতে হয় নাই, অল্পে অল্পে রসাস্বাদ করিতে হয় নাই, তাহাকে একবার বসন্তকালের বিকশিত পুষ্পবনের মধ্যে ছাড়িয়া দেওয়া হউক দেখি—বিকচোন্মুখ গোলাপের আধখোলা মুখটির কাছে ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাহার কী আগ্রহ। একটুকু যে সৌরভ পায়, একটুকু যে মধুর আস্বাদ লাভ করে তাহাতে তাহার কী নেশা।

নিবারণ প্রথমটা কখনো বা একটা গাউনপরা কাঁচের পুতুল কখনো বা এক শিশি এসেন্স, কখনো বা কিছু মিষ্টদ্রব্য কিনিয়া আনিয়া শৈলবালাকে গোপনে দিয়া যাইত। এমনি করিয়া একটুখানি ঘনিষ্ঠতার সূত্রপাত হয়। অবশেষে কখন একদিন হরসুন্দরী গৃহকার্যের অবকাশে আসিয়া দ্বারের ছিদ্র দিয়া দেখিল, নিবারণ এবং শৈলবালা বসিয়া কড়ি লইয়া দশ-পঁচিশ খেলিতেছে।

বুড়াবয়সের এই খেলা বটে। নিবারণ সকালে আহারাদি করিয়া যেন আপিসে বাহির হইল কিন্তু আপিসে না গিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছে। এ প্রবঞ্চনার কী আবশ্যক ছিল। হঠাৎ একটা জ্বলন্ত বজ্রশলাকা দিয়া কে যেন হরসুন্দরীর চোখ খুলিয়া দিল, সেই তীব্রতাপে চোখের জল বাষ্প হইয়া শুকাইয়া গেল।

হরসুন্দরী মনে মনে কহিল, আমিই তো উহাকে ঘরে আনিলাম, আমিই তো মিলন করাইয়া দিলাম, তবে আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার কেন—যেন আমি উহাদের সুখের কাঁটা।

হরসুন্দরী শৈলবালাকে গৃহকার্য শিখাইত। একদিন নিবারণ মুখ ফুটিয়া বলিল, "ছেলেমানুষ, উহাকে তুমি বড়ো বেশি পরিশ্রম করাইতেছ, উহার শরীর তেমন সবল নহে।"

বড়ো একটা তীব্র উত্তর হরসুন্দরীর মুখের কাছে আসিয়াছিল ; কিন্তু কিছু বলিল না, চুপ করিয়া গেল।

সেই অবধি বউকে কোনো গৃহকার্যে হাত দিতে দিত না ; রাঁধাবাড়া দেখাশুনা সমস্ত কাজ নিজে করিত। এমন হইল, শৈলবালা আর নড়িয়া বসিতে পারে না, হরসুন্দরী দাসীর মতো তাহার সেবা করে এবং স্বামী বিদূষকের মতো তাহার মনোরঞ্জন করে। সংসারের কাজ করা, পরের দিকে তাকানো যে জীবনের কর্তব্য এ শিক্ষাই তাহার হইল না।

হরসুন্দরী যে নীরবে দাসীর মতো কাজ করিতে লাগিল তাহার মধ্যে ভারি একটা গর্ব আছে। তাহার মধ্যে ন্যূনতা এবং দীনতা নাই। সে কহিল, তোমরা দুই শিশুতে মিলিয়া খেলা করো, সংসারের সমস্ত ভার আমি লইলাম।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

হায়, আজ কোথায় সে বল, যে বলে হরসুন্দরী মনে করিয়াছিল স্বামীর জন্য চিরজীবনকাল সে আপনার প্রেমের দাবির অর্ধেক অংশ অকাতরে ছাড়িয়া দিতে পারিবে। হঠাৎ একদিন পূর্ণিমার রাত্রে জীবনে যখন জোয়ার আসে, তখন দুই কূল প্লাবিত করিয়া মানুষ মনে করে, আমার কোথাও সীমা নাই। তখন যে একটা বৃহৎ প্রতিজ্ঞা করিয়া বসে, জীবনের সুদীর্ঘ ভাঁটার সময় সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে তাহার সমস্ত প্রাণে টান পড়ে। হঠাৎ ঐশ্বর্যের দিনে লেখনীর এক আঁচড়ে যে দানপত্র লিখিয়া দেয়, চির দারিদ্র্যের দিনে পলে পলে তিল তিল করিয়া তাহা শোধ করিতে হয়। তখন বুঝা যায় মানুষ বড়ো দীন, হৃদয় বড়ো দুর্বল, তাহার ক্ষমতা অতি যৎসামান্য।

দীর্ঘ রোগাবসানে ক্ষীণ, রক্তহীন, পাণ্ডু কলেবরে হরসুন্দরী সেদিন শুক্ল দ্বিতীয়ার চাঁদের মতো একটি শীর্ণ রেখামাত্র ছিল ; সংসারে নিতান্ত লঘু হইয়া ভাসিতেছিল। মনে হইয়াছিল আমার যেন কিছুই না হইলেও চলে। ক্রমে শরীর বলী হইয়া উঠিল, রক্তের তেজ বাড়িতে লাগিল, তখন হরসুন্দরীর মনে কোথা হইতে একদল শরিক আসিয়া উপস্থিত হইল, তাহারা উচ্চৈঃস্বরে কহিল, তুমি তো ত্যাগপত্র লিখিয়া বসিয়া আছ কিন্তু আমাদের দাবি আমরা ছাড়িব না।

হরসুন্দরী যেদিন প্রথম পরিষ্কাররূপে আপন অবস্থা বুঝিতে পারিল, সেদিন নিবারণ ও শৈলবালাকে আপন শয়নগৃহ ছাড়িয়া দিয়া ভিন্ন গৃহে একাকিনী গিয়া শয়ন করিল।

আট বৎসর বয়সে বাসররাত্রে যে-শয্যায় প্রথম শয়ন করিয়াছিল, আজ সাতাশ বৎসর পরে সেই শয্যা ত্যাগ করিল। প্রদীপ নিভাইয়া দিয়া এই সধবা রমণী যখন অসহ্য হৃদয়ভার লইয়া তাহার নূতন বৈধব্যশয্যার উপরে আসিয়া পড়িল, তখন গলির অপর প্রান্তে একজন শৌখিন যুবা বেহাগ রাগিণীতে মালিনীর গান গাহিতেছিল ; আর একজন বাঁয়া-তবলায় সংগত করিতেছিল এবং শ্রোতৃবন্ধুগণ সমের কাছে হাঃ-হাঃ করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিতেছিল।

তাহার সেই গান সেই নিস্তব্ধ জ্যোৎস্নারাত্রে পার্শ্বের ঘরে মন্দ শুনাইতেছিল না। তখন বালিকা শৈলবালার ঘুমে চোখ ঢুলিয়া পড়িতেছিল, আর নিবারণ তাহার কানের কাছে মুখ রাখিয়া ধীরে ধীরে ডাকিতেছিল, সই।

লোকটা ইতিমধ্যে বঙ্কিমবাবুর চন্দ্রশেখর পড়িয়া ফেলিয়াছে এবং দুই-একজন আধুনিক কবির কাব্যও শৈলবালাকে পড়িয়া শুনাইয়াছে।

নিবারণের জীবনের নিম্নস্তরে যে একটি যৌবন-উৎস বরাবর চাপা পড়িয়া ছিল, আঘাত পাইয়া হঠাৎ বড়ো অসময়ে তাহা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। কেহই সেজন্য প্রস্তুত ছিল না, এই হেতু অকস্মাৎ তাহার বুদ্ধিশুদ্ধি এবং সংসারের সমস্ত বন্দোবস্ত উলটাপালটা হইয়া গেল। সে বেচারা কোনোকালে জানিত না মানুষের ভিতরে এমন সকল উপদ্রবজনক পদার্থ থাকে, এমন সকল দুর্দাম দুরন্ত শক্তি, যাহা সমস্ত হিসাবকিতাব শৃঙ্খলা-সামঞ্জস্য একেবারে নয়ছয় করিয়া দেয়।

কেবল নিবারণ নহে, হরসুন্দরীও একটা নূতন বেদনার পরিচয় পাইল। এ কিসের আকাঙ্ক্ষা, এ কিসের দুঃসহ যন্ত্রণা। মন এখন যাহা চায়, কখনো তো তাহা চাহেও নাই, কখনো তো তাহা পায়ও নাই। যখন ভদ্রভাবে নিবারণ নিয়মিত আপিসে যাইত, যখন নিদ্রার পূর্বে কিয়ৎকালের জন্য গয়লার হিসাব, দ্রব্যের মহার্ঘতা এবং লৌকিকতার কর্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা চলিত, তখন তো এই অন্তর্বিপ্লবের কোনো সূত্রপাতমাত্র ছিল না। ভালোবাসিত বটে, কিন্তু তাহার তো কোনো উজ্জ্বলতা কোনো উত্তাপ ছিল না। সে ভালোবাসা অপ্রজ্বলিত ইন্ধনের মতো ছিল মাত্র।

আজ তাহার মনে হইল, জীবনের সফলতা হইতে যেন চিরকাল কে তাহাকে বঞ্চিত করিয়া আসিয়াছে। তাহার হৃদয় যেন চিরদিন উপবাসী হইয়া আছে। তাহার এই নারীজীবন বড়ো দারিদ্র্যেই কাটিয়াছে। সে কেবল হাটবাজার পানমসলা তরিতরকারির ঝঞ্ঝাট লইয়াই সাতাশটা অমূল্য বৎসর দাসীবৃত্তি করিয়া কাটাইল, আর আজ জীবনের মধ্যপথে আসিয়া দেখিল তাহারই শয়নকক্ষের পার্শ্বে এক গোপন মহামহৈশ্বর্যভাণ্ডারের কুলুপ খুলিয়া একটি ক্ষুদ্র বালিকা একেবারে রাজরাজেশ্বরী হইয়া বসিল। নারী দাসী

ঘটে, কিন্তু সেই সঙ্গে নারী রানীও বটে। কিন্তু ভাগাভাগি করিয়া একজন নারী হইল দাসী, আর একজন নারী হইল রানী ; তাহাতে দাসীর গৌরব গেল, রানীর সুখ রহিল না।

কারণ, শৈলবালাও নারী-জীবনের যথার্থ সুখের স্বাদ পাইল না। এত অবিশ্রাম আদর পাইল যে, ভালোবাসিবার আর মুহূর্ত অবসর রহিল না। সমুদ্রের দিকে প্রবাহিত হইয়া, সমুদ্রের মধ্যে আত্মবিসর্জন করিয়া বোধ করি নদীর একটি মহৎ চরিতার্থতা আছে, কিন্তু সমুদ্র যদি জোয়ারের টানে আকৃষ্ট হইয়া ক্রমাগতই নদীর উন্মুখীন হইয়া রহে, তবে নদী কেবল নিজের মধ্যেই নিজে স্ফীত হইতে থাকে। সংসার তাহার সমস্ত আদর সোহাগ লইয়া দিবারাত্রি শৈলবালার দিকে অগ্রসর হইয়া রহিল, তাহাতে শৈলবালার আত্মাদর অতিশয় উত্তুঙ্গ হইয়া উঠিতে লাগিল, সংসারের প্রতি তাহার ভালোবাসা পড়িতে পাইল না। সে জানিল, আমার জন্যই সমস্ত এবং আমি কাহার জন্যও নহি। এ অবস্থায় যথেষ্ট অহংকার আছে কিন্তু পরিতৃপ্তি কিছুই নাই।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

একদিন ঘনঘোর মেঘ করিয়া আসিয়াছে। এমনি অন্ধকার করিয়াছে যে, ঘরের মধ্যে কাজকর্ম করা অসাধ্য। বাহিরে ঝুপ ঝুপ করিয়া বৃষ্টি হইতেছে। কুলগাছের তলায় লতাগুল্মের জঙ্গল জলে প্রায় নিমগ্ন হইয়া গিয়াছে এবং প্রাচীরের পার্শ্ববর্তী নালা দিয়া ঘোলা জলস্রোত কলকল শব্দে বহিয়া চলিয়াছে। হরসুন্দরী আপনার নূতন শয়নগৃহের নির্জন অন্ধকারে জানলার কাছে চুপ করিয়া বসিয়া আছে।

এমন সময় নিবারণ চোরের মতো ধীরে ধীরে দ্বারের কাছে প্রবেশ করিল, ফিরিয়া যাইবে কি অগ্রসর হইবে ভাবিয়া পাইল না। হরসুন্দরী তাহা লক্ষ্য করিল কিন্তু একটি কথাও কহিল না।

তখন নিবারণ হঠাৎ একেবারে তীরের মতো হরসুন্দরীর পার্শ্বে গিয়া এক নিশ্বাসে বলিয়া ফেলিল, "গোটাকতক গহনার আবশ্যক হইয়াছে। জান তো অনেকগুলো দেনা হইয়া পড়িয়াছে, পাওনাদার বড়োই অপমান করিতেছে—কিছু বন্ধক রাখিতে হইবে—শীঘ্রই ছাড়াইয়া লইতে পারিব।"

হরসুন্দরী কোনো উত্তর দিল না, নিবারণ চোরের মতো দাঁড়াইয়া রহিল। অবশেষে পুনশ্চ কহিল, "তবে কি আজ হইবে না।"

হরসুন্দরী কহিল, "না।"

ঘরে প্রবেশ করাও যেমন শক্ত, ঘর হইতে অবিলম্বে বাহির হওয়াও তেমনি কঠিন। নিবারণ একটু এদিকে ওদিকে চাহিয়া ইতস্তত করিয়া বলিল, "তবে অন্যত্র চেষ্টা দেখিগে যাই", বলিয়া প্রস্থান করিল।

ঋণ কোথায় এবং কোথায় গহনা বন্ধক দিতে হইবে হরসুন্দরী তাহা সমস্তই বুঝিল। বুঝিল, নববধূ পূর্বরাত্রে তাহার এই হতবুদ্ধি পোষা পুরুষটিকে অত্যন্ত ঝংকার দিয়া বলিয়াছিল, "দিদির সিন্দুকভরা গহনা, আর আমি বুঝি একখানি পরিতে পারি না।"

নিবারণ চলিয়া গেলে ধীরে ধীরে উঠিয়া লোহার সিন্দুক খুলিয়া একে একে সমস্ত গহনা বাহির করিল। শৈলবালাকে ডাকিয়া প্রথমে আপনার বিবাহের বেনারসি শাড়িখানি পরাইল, তাহার পর তাহার আপাদমস্তক এক-একখানি করিয়া গহনায় ভরিয়া দিল। ভালো করিয়া চুল বাঁধিয়া দিয়া প্রদীপ জ্বালিয়া দেখিল, বালিকার মুখখানি বড়ো সুমিষ্ট, একটি সদ্যঃপক্ব সুগন্ধ ফলের মতো নিটোল রসপূর্ণ। শৈলবালা যখন ঝমঝম শব্দ করিয়া চলিয়া গেল, সেই শব্দ বহুক্ষণ ধরিয়া হরসুন্দরীর শিরার রক্তের মধ্যে ঝিমঝিম করিয়া বাজিতে লাগিল। মনে মনে কহিল, আজ আর কী লইয়া তোতে আমাতে তুলনা হইবে। কিন্তু এক সময়ে আমারও তো ওই বয়স ছিল, আমিও তো অমনি যৌবনের শেষরেখা পর্যন্ত ভরিয়া উঠিয়াছিলাম, তবে আমাকে সে কথা কেহ জানায় নাই কেন। কখন সেদিন আসিল এবং কখন সেদিন গেল তাহা একবার সংবাদও পাইলাম না। কিন্তু কী গর্বে, কী গৌরবে, কী তরঙ্গ তুলিয়া শৈলবালা চলিয়াছে।

হরসুন্দরী যখন কেবলমাত্র ঘরকন্নাই জানিত তখন এই গহনাগুলি তাহার কাছে কত দামি ছিল। তখন কি নির্বোধের মতো এ সমস্ত এমন করিয়া একমুহূর্তে হাতছাড়া করিতে পারিত। এখন ঘরকন্না ছাড়া আর একটা বড়ো কিসের পরিচয় পাইয়াছে, এখন গহনার দাম ভবিষ্যতের হিসাব সমস্ত তুচ্ছ হইয়া গিয়াছে।

আর শৈলবালা সোনামানিক ঝকমক করিয়া শয়নগৃহে চলিয়া গেল, একবার মুহূর্তের তরে ভাবিলও না হরসুন্দরী তাহাকে কতখানি দিল। সে জানিল চতুর্দিক হইতে সমস্ত সেবা, সমস্ত সম্পদ, সমস্ত সৌভাগ্য স্বাভাবিক নিয়মে তাহার মধ্যে আসিয়া পরিসমাপ্ত হইবে, কারণ, সে হইল শৈলবালা, সে হইল সই।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

এক-একজন লোক স্বপ্নাবস্থায় নির্ভীকভাবে অত্যন্ত সংকটের পথ দিয়া চলিয়া যায় মুহূর্তমাত্র চিন্তা করে না। অনেক জাগ্রত মানুষেরও তেমনি চিরস্বপ্নাবস্থা উপস্থিত হয়, কিছুমাত্র জ্ঞান থাকে না, বিপদের সংকীর্ণ পথ দিয়া নিশ্চিন্তমনে অগ্রসর হইতে থাকে, অবশেষে নিদারুণ সর্বনাশের মধ্যে গিয়া জাগ্রত হইয়া উঠে।

আমাদের ম্যাক্‌মোরান কোম্পানির হেডবাবুটিরও সেই দশা। শৈলবালা তাহার জীবনের মাঝখানে একটা প্রবল আবর্তের মতো ঘুরিতে লাগিল এবং বহুদূর হইতে বিবিধ মহার্ঘ্য পদার্থ আকৃষ্ট হইয়া তাহার মধ্যে বিলুপ্ত হইতে লাগিল। কেবল যে নিবারণের মনুষ্যত্ব এবং মাসিক বেতন, হরসুন্দরীর সুখসৌভাগ্য এবং বসনভূষণ, তাহা নহে, সঙ্গে সঙ্গে ম্যাক্‌মোরান কোম্পানির ক্যাশ তহবিলেও গোপনে টান পড়িল। তাহার মধ্য হইতেও দুটা-একটা করিয়া তোড়া অদৃশ্য হইতে লাগিল। নিবারণ স্থির করিত আগামী মাসের বেতন হইতে আস্তে আস্তে শোধ করিয়া রাখিব। কিন্তু আগামী মাসের বেতনটি হাতে আসিবামাত্র সেই আবর্ত হইতে টান পড়ে এবং শেষ দু-আনিটি পর্যন্ত চকিতের মতো চিকমিক করিয়া বিদ্যুৎবেগে অন্তর্হিত হয়।

শেষে একদিন ধরা পড়িল। পুরুষানুক্রমের চাকুরি। সাহেব বড়ো ভালোবাসে, তহবিল পূরণ করিয়া দিবার জন্য দুইদিনমাত্র সময় দিল।

কেমন করিয়া সে ক্রমে ক্রমে আড়াই হাজার টাকার তহবিল ভাঙিয়াছে তাহা নিবারণ নিজেই বুঝিতে পারিল না। একেবারে পাগলের মতো হইয়া হরসুন্দরীর কাছে গেল, বলিল, "সর্বনাশ হইয়াছে।"

হরসুন্দরী সমস্ত শুনিয়া একেবারে পাংশুবর্ণ হইয়া গেল।

নিবারণ কহিল, "শীঘ্র গহনাগুলো বাহির করো।" হরসুন্দরী কহিল, "সে তো আমি সমস্ত ছোটোবউকে দিয়াছি।"

নিবারণ নিতান্ত শিশুর মতো অধীর হইয়া বলিতে লাগিল, "কেন দিলে ছোটো-বউকে। কেন দিলে। কে তোমাকে দিতে বলিল।"

হরসুন্দরী তাহার প্রকৃত উত্তর না দিয়া কহিল, "তাহাতে ক্ষতি কী হইয়াছে। সে তো আর জলে পড়ে নাই।"

ভীরু নিবারণ কাতরস্বরে কহিল, "তবে যদি তুমি কোনো ছুতা করিয়া তাহার কাছ হইতে বাহির করিতে পার। কিন্তু আমার মাথা খাও বলিয়ো না যে, আমি চাহিতেছি কিংবা কী জন্য চাহিতেছি।"

তখন হরসুন্দরী মর্মান্তিক বিরক্তি ও ঘৃণাভরে বলিয়া উঠিল, "এই কি তোমার ছলছুতা করিবার, সোহাগ দেখাইবার সময়। চলো।" বলিয়া স্বামীকে লইয়া ছোটোবউয়ের ঘরে প্রবেশ করিল।

ছোটোবউ কিছু বুঝিল না। সে সকল কথাতেই বলিল, "সে আমি কী জানি।"

সংসারের কোনো চিন্তা যে তাহাকে কখনো ভাবিতে হইবে এমন কথা কি তাহার সহিত ছিল। সকলে আপনার ভাবনা ভাবিবে এবং সকলে মিলিয়া শৈলবালার আরাম চিন্তা করিবে, অকস্মাৎ ইহার ব্যতিক্রম হয়, এ কী ভয়ানক অন্যায়।

তখন নিবারণ শৈলবালার পায়ে ধরিয়া কাঁদিয়া পড়িল। শৈলবালা কেবলই বলিল, "সে আমি জানি না। আমার জিনিস আমি কেন দিব।"

নিবারণ দেখিল ওই দুর্বল ক্ষুদ্র সুন্দর সুকুমারী বালিকাটি লোহার সিন্দুকের অপেক্ষাও কঠিন। হরসুন্দরী সংকটের সময় স্বামীর এই দুর্বলতা দেখিয়া ঘৃণায় জর্জরিত হইয়া উঠিল। শৈলবালার চাবি বলপূর্বক কাড়িয়া লইতে গেল। শৈলবালা তৎক্ষণাৎ চাবির গোছা প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া পুষ্করিণীর মধ্যে ফেলিয়া দিল।

হরসুন্দরী হতবুদ্ধি স্বামীকে কহিল, "তালা ভাঙিয়া ফেলো না।"

শৈলবালা প্রশান্তমুখে বলিল, "তাহা হইলে আমি গলায় দড়ি দিয়া মরিব।"

নিবারণ কহিল, "আমি আর একটা চেষ্টা দেখিতেছি", বলিয়া এলোথেলো বেশে বাহির হইয়া গেল।

নিবারণ দুই ঘণ্টার মধ্যেই পৈতৃক বাড়ি আড়াই হাজার টাকায় বিক্রয় করিয়া আসিল।

বহুকষ্টে হাতে বেড়িটা বাঁচিল, কিন্তু চাকরি গেল। স্থাবর-জঙ্গমের মধ্যে রহিল কেবল দুটিমাত্র স্ত্রী। তাহার মধ্যে ক্লেশকাতর বালিকা স্ত্রীটি গর্ভবতী হইয়া নিতান্ত স্থাবর হইয়াই পড়িল। গলির মধ্যে একটি ছোটো স্যাঁতসেঁতে বাড়িতে এই ক্ষুদ্র পরিবার আশ্রয় গ্রহণ করিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ছোটো বউয়ের অসন্তোষ এবং অসুখের আর শেষ নাই। সে কিছুতেই বুঝিতে চায় না তাহার স্বামীর ক্ষমতা নাই। ক্ষমতা নাই যদি তো বিবাহ করিল কেন।

উপরের তলায় কেবল দুটিমাত্র ঘর। একটি ঘরে নিবারণ ও শৈলবালার শয়নগৃহ। আর একটি ঘরে হরসুন্দরী থাকে। শৈলবালা খুঁতখুঁত করিয়া বলে, "আমি দিনরাত্রি শোবার ঘরে কাটাইতে পারি না।"

নিবারণ মিথ্যা আশ্বাস দিয়া বলিত, "আমি আর একটা ভালো বাড়ির সন্ধানে আছি, শীঘ্র বাড়ি বদল করিব।"

শৈলবালা বলিত, "কেন, ওই তো পাশে আর একটা ঘর আছে।"

শৈলবালা তাহার পূর্ব-প্রতিবেশিনীদের দিকে কখনো মুখ তুলিয়া চাহে নাই। নিবারণের বর্তমান দুরবস্থায় ব্যথিত হইয়া তাহারা একদিন দেখা করিতে আসিল; শৈলবালা ঘরে খিল দিয়া বসিয়া রহিল, কিছুতেই দ্বার খুলিল না। তাহারা চলিয়া গেলে রাগিয়া, কাঁদিয়া, উপবাসী থাকিয়া, হিস্টিরিয়া করিয়া পাড়া মাথায় করিল। এমনতরো উৎপাত প্রায় ঘটিতে লাগিল।

অবশেষে শৈলবালার শারীরিক সংকটের অবস্থায় গুরুতর পীড়া হইল, এমন কি, গর্ভপাত হইবার উপক্রম হইল।

নিবারণ হরসুন্দরীর দুই হাত ধরিয়া বলিল, "তুমি শৈলকে বাঁচাও।"

হরসুন্দরী দিন নাই রাত্রি নাই শৈলবালার সেবা করিতে লাগিল। তিলমাত্র ত্রুটি হইলে শৈল তাহাকে দুর্বাক্য বলিত, সে একটি উত্তরমাত্র করিত না।

শৈল কিছুতেই সাগু খাইতে চাহিত না, বাটিসুদ্ধ ছুঁড়িয়া ফেলিত, জ্বরের সময় কাচা আমের অম্বল দিয়া ভাত খাইতে চাহিত। না পাইলে রাগিয়া কাঁদিয়া অনর্থপাত করিত। হরসুন্দরী তাহাকে "লক্ষ্মী আমার," "বোন আমার," "দিদি আমার" বলিয়া শিশুর মতো ভুলাইতে চেষ্টা করিত।

কিন্তু শৈলবালা বাঁচিল না। সংসারের সমস্ত সোহাগ আদর লইয়া পরম অসুখ ও অসন্তোষে বালিকার ক্ষুদ্র অসম্পূর্ণ ব্যর্থ জীবন নষ্ট হইয়া গেল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

নিবারণের প্রথমে খুব একটা আঘাত লাগিল, পরক্ষণেই দেখিল তাহার একটা মস্ত বাঁধন ছিঁড়িয়া গিয়াছে। শোকের মধ্যেও হঠাৎ তাহার একটা মুক্তির আনন্দ বোধ হইল। হঠাৎ মনে হইল এতদিন তাহার বুকের উপর একটা দুঃস্বপ্ন চাপিয়া ছিল। চৈতন্য হইয়া মুহূর্তের মধ্যে জীবন নিরতিশয় লঘু হইয়া গেল। মাধবীলতাটির মতো এই যে কোমল জীবনপাশ ছিঁড়িয়া গেল, এই কি তাহার আদরের শৈলবালা। হঠাৎ নিশ্বাস টানিয়া দেখিল, না, সে তাহার উদ্বন্ধনরজ্জু।

আর তাহার চিরজীবনের সঙ্গিনী হরসুন্দরী? দেখিল, সেই তো তাহার সমস্ত সংসার একাকিনী অধিকার করিয়া তাহার জীবনের সমস্ত সুখদুঃখের স্মৃতিমন্দিরের

মাঝখানে বসিয়া আছে—কিন্তু তবু মধ্যে একটা বিচ্ছেদ। ঠিক যেন একটি ক্ষুদ্র উজ্জ্বল সুন্দর নিষ্ঠুর ছুরি আসিয়া একটি হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ এবং বাম অংশের মাঝখানে বেদনাপূর্ণ বিদারণরেখা টানিয়া দিয়া গেছে।

একদিন গভীর রাত্রে সমস্ত শহর যখন নিদ্রিত, নিবারণ ধীরে ধীরে হরসুন্দরীর নিভৃত শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল। নীরবে সেই পুরাতন নিয়মমতো সেই পুরাতন শয্যার দক্ষিণ অংশ গ্রহণ করিয়া শয়ন করিল। কিন্তু এবার তাহার সেই চির অধিকারের মধ্যে চোরের মতো প্রবেশ করিল।

হরসুন্দরীও একটি কথা বলিল না, নিবারণও একটি কথা বলিল না। উহারা পূর্বে যেরূপ পাশাপাশি শয়ন করিত এখনও সেইরূপ পাশাপাশি শুইল, কিন্তু ঠিক মাঝখানে একটি মৃত বালিকা শুইয়া রহিল, তাহাকে কেহ লঙ্ঘন করিতে পারিল না।

জ্যৈষ্ঠ, ১৩০০

অসম্ভব কথা

এক যে ছিল রাজা।

তখন ইহার বেশি কিছু জানিবার আবশ্যক ছিল না। কোথাকার রাজা, রাজার নাম কী, এ সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া গল্পের প্রবাহ রোধ করিতাম না। রাজার নাম শিলাদিত্য কি শালিবাহন, কাশী কাঞ্চি কনোজ কোশল অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গের মধ্যে ঠিক কোন্‌খানটিতে তাঁহার রাজত্ব, এ সকল ইতিহাস-ভূগোলের তর্ক আমাদের কাছে নিতান্তই তুচ্ছ ছিল,—আসল যে-কথাটি শুনিলে অন্তর পুলকিত হইয়া উঠিত এবং সমস্ত হৃদয় একমুহূর্তের মধ্যে বিদ্যুদ্বেগে চুম্বকের মতো আকৃষ্ট হইত সেটি হইতেছে—এক যে ছিল রাজা।

এখনকার পাঠক যেন একেবারে কোমর বাঁধিয়া বসে। গোড়াতেই ধরিয়া লয় লেখক মিথ্যা কথা বলিতেছে। সেইজন্য অত্যন্ত সেয়ানার মতো মুখ করিয়া জিজ্ঞাসা করে, "লেখকমহাশয়, তুমি যে বলিতেছ এক যে ছিল রাজা, আচ্ছা বলো দেখি কে ছিল সে রাজা।"

লেখকেরাও সেয়ানা হইয়া উঠিয়াছে; তাহারা প্রকাণ্ড প্রত্নতত্ত্ব-পণ্ডিতের মতো মুখমণ্ডল চতুর্গুণ মণ্ডলাকার করিয়া বলে, "এক যে ছিল রাজা, তাহার নাম ছিল অজাতশত্রু।"

পাঠক চোখ টিপিয়া জিজ্ঞাসা করে, "অজাতশত্রু। ভালো, কোন্ অজাতশত্রু বলো দেখি।"

লেখক অবিচলিত মুখভাব ধারণ করিয়া বলিয়া যায়, "অজাতশত্রু ছিল তিনজন। একজন খ্রীস্টজন্মের তিন সহস্র বৎসর পূর্বে জন্মগ্রহণ করিয়া দুই বৎসর আট মাস বয়ঃক্রম কালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। দুঃখের বিষয়, তাঁহার জীবনের বিস্তারিত বিবরণ কোনো গ্রন্থেই পাওয়া যায় না।" অবশেষে দ্বিতীয় অজাতশত্রু সম্বন্ধে দশজন ঐতিহাসিকের দশ বিভিন্ন মত সমালোচনা শেষ করিয়া যখন গ্রন্থের নায়ক তৃতীয় অজাতশত্রু পর্যন্ত আসিয়া পৌঁছায় তখন পাঠক বলিয়া উঠে, "ওরে বাস রে, কী পাণ্ডিত্য। এক গল্প শুনিতে আসিয়া কত শিক্ষাই হইল। এই লোকটাকে আর অবিশ্বাস করা যাইতে পারে না। আচ্ছা লেখকমহাশয়, তার পরে কী হইল।"

হায় রে হায়, মানুষ ঠকিতেই চায়, ঠকিতেই ভালবাসে, অথচ পাছে কেহ নির্বোধ মনে করে এ ভয়টুকুও ষোলো আনা আছে; এইজন্য প্রাণপণে সেয়ানা হইবার চেষ্টা করে। তাহার ফল হয় এই যে, সেই শেষকালটা ঠকে, কিন্তু বিস্তর আড়ম্বর করিয়া ঠকে।

ইংরেজিতে একটি প্রবাদ আছে "প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিও না, তাহা হইলে মিথ্যা জবাব শুনিতে হইবে না।" বালক সেইটি বোঝে, সে কোনো প্রশ্ন করে না। এইজন্য রূপকথার সুন্দর মিথ্যাটুকু শিশুর মতো উলঙ্গ, সত্যের মতো সরল, সদ্য উৎসারিত উৎসের মতো স্বচ্ছ; আর এখনকার দিনের সুচতুর মিথ্যা মুখোশ-পরা মিথ্যা। কোথাও যদি তিলমাত্র ছিদ্র থাকে অমনি ভিতর হইতে সমস্ত ফাঁকি ধরা পড়ে, পাঠক বিমুখ হয়, লেখক পালাইবার পথ পায় না।

শিশুকালে আমরা যথার্থ রসজ্ঞ ছিলাম, এই জন্য যখন গল্প শুনিতে বসিয়াছি, তখন জ্ঞানলাভ করিবার জন্য আমাদের তিলমাত্র আগ্রহ উপস্থিত হইত না এবং অশিক্ষিত সরল হৃদয়টি ঠিক বুঝিত আসল কথাটা কোন্টুকু। আর এখনকার দিনে এত বাহুল্য কথাও বকিতে হয়, এত অনাবশ্যক কথারও আবশ্যক হইয়া পড়ে। কিন্তু সবশেষে সেই আসল কথাটিতে গিয়া দাঁড়ায়—এক যে ছিল রাজা।

বেশ মনে আছে সেদিন সন্ধ্যাবেলা ঝড়বৃষ্টি হইতেছিল। কলিকাতা শহর একেবারে ভাসিয়া গিয়াছিল। গলির মধ্যে একহাঁটু জল। মনে একান্ত আশা ছিল, আজ আর মাস্টার আসিবে না। কিন্তু তবু তাঁহার আসার নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ভীতচিত্তে পথের দিকে চাহিয়া বারান্দায় চৌকি লইয়া বসিয়া আছি। যদি বৃষ্টি একটু ধরিয়া

আসিবার উপক্রম হয় তবে একাগ্রচিত্তে প্রার্থনা করি, হে দেবতা আর একটুখানি। কোনোমতে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা পার করিয়া দাও। তখন মনে হইত পৃথিবীতে বৃষ্টির আর কোনো আবশ্যক নাই, কেবল একটিমাত্র সন্ধ্যায় নগরপ্রান্তের একটিমাত্র ব্যাকুল বালককে মাস্টারের করাল হস্ত হইতে রক্ষা করা ছাড়া। পুরাকালে কোনো একটি নির্বাসিত যক্ষও তো মনে করিয়াছিল, আষাঢ়ে মেঘের বড়ো একটা কোনো কাজ নাই, অতএব রামগিরিশিখরের একটিমাত্র বিরহীর দুঃখকথা বিশ্ব পার হইয়া অলকার সৌধবাতায়নের কোনো একটি বিরহিণীর কাছে লইয়া যাওয়া তাহার পক্ষে কিছুমাত্র গুরুতর নহে, বিশেষত পথটি যখন এমন সুরম্য এবং তাহার হৃদয়বেদনা এমন দুঃসহ।

বালকের প্রার্থনামতে না হউক, ধূম-জ্যোতিঃ-সলিল-মরুতের বিশেষ কোনো নিয়মানুসারে বৃষ্টি ছাড়িল না। কিন্তু হায় মাস্টারও ছাড়িল না। গলির মোড়ে ঠিক সময়ে একটি পরিচিত ছাতা দেখা দিল, সমস্ত আশাবাষ্প একমুহূর্তে ফাটিয়া বাহির হইয়া আমার বুকটি যেন পঞ্জরের মধ্যে মিলাইয়া গেল। পরপীড়ন পাপের যদি যথোপযুক্ত শাস্তি থাকে তবে নিশ্চয় পরজন্মে আমি মাস্টার হইয়া এবং আমার মাস্টারমহাশয় ছাত্র হইয়া জন্মিবেন। তাহার বিরুদ্ধে কেবল একটি আপত্তি এই যে, আমাকে মাস্টারমহাশয়ের মাস্টার হইতে গেলে অতিশয় অকালে ইহসংসার হইতে বিদায় লইতে হয়, অতএব আমি তাঁহাকে অন্তরের সহিত মার্জনা করিলাম।

ছাতাটি দেখিবামাত্র ছুটিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলাম। মা তখন দিদিমার সহিত মুখোমুখি বসিয়া প্রদীপালোকে বিন্তি খেলিতেছিলেন। ঝুপ করিয়া একপাশে শুইয়া পড়িলাম। মা জিজ্ঞাসা করিলেন, “কী হইয়াছে।” আমি মুখ হাঁড়ির মতো করিয়া কহিলাম, “আমার অসুখ করিয়াছে, আজ আর আমি মাস্টারের কাছে পড়িতে যাইব না।”

আশা করি, অপ্রাপ্তবয়স্ক কেহ আমার এ লেখা পড়িবে না, এবং স্কুলের কোনো সিলেকশন-বহিতে আমার এ লেখা উদ্ধৃত হইবে না। কারণ, আমি যে কাজ করিয়াছিলাম তাহা নীতিবিরুদ্ধ এবং সেজন্য কোনো শাস্তিও পাই নাই। বরঞ্চ আমার অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল।

মা চাকরকে বলিয়া দিলেন, “আজ তবে থাক্‌, মাস্টারকে যেতে বলে দে।”

কিন্তু তিনি যেরূপ নিরুদ্বিগ্নভাবে বিন্তি খেলিতে লাগিলেন, তাহাতে বেশ বোঝা গেল যে মা তাঁহার পুত্রের অসুখের উৎকট লক্ষণগুলি মিলাইয়া দেখিয়া মনে মনে হাসিলেন। আমিও মনের সুখে বালিশের মধ্যে মুখ গুঁজিয়া খুব হাসিলাম—আমাদের উভয়ের মন উভয়ের কাছে অগোচর রহিল না।

কিন্তু সকলেই জানেন, এ প্রকারের অসুখ অধিকক্ষণ স্থায়ী করিয়া রাখা রোগীর পক্ষে বড়োই দুষ্কর। মিনিটখানেক না যাইতে যাইতে দিদিমাকে ধরিয়া পড়িলাম, "দিদিমা, একটা গল্প বলো।" দুই-চারিবার কোনো উত্তর পাওয়া গেল না। মা বলিলেন, "র'স্ বাছা, খেলাটা আগে শেষ করি।"

আমি কহিলাম, "না, খেলা তুমি কাল শেষ ক'রো, আজ দিদিমাকে গল্প বলতে বলো না।"

মা কাগজ ফেলিয়া দিয়া কহিলেন, "যাও খুড়ি, উহার সঙ্গে এখন কে পারিবে।" মনে মনে হয়তো ভাবিলেন, আমার তো কাল মাস্টার আসিবে না, আমি কালও খেলিতে পারিব।

আমি দিদিমার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া একেবারে মশারির মধ্যে বিছানার মধ্যে গিয়া উঠিলাম। প্রথমে খানিকটা পাশবালিশ জড়াইয়া, পা ছুঁড়িয়া, নড়িয়াচড়িয়া মনের আনন্দ সংবরণ করিতে গেল—তার পরে বলিলাম, "গল্প বলো।"

তখনও ঝুপ ঝুপ করিয়া বাহিরে বৃষ্টি পড়িতেছিল—দিদিমা মৃদুস্বরে আরম্ভ করিলেন—এক যে ছিল রাজা।

তাহার এক রানী। আঃ, বাঁচা গেল। সুয়ো এবং দুয়ো রানী শুনিলেই বুকটা কাঁপিয়া উঠে—বুঝিতে পারি দুয়ো হতভাগিনীর বিপদের আর বিলম্ব নাই। পূর্ব হইতে মনে বিষম একটা উৎকণ্ঠা চাপিয়া থাকে।

যখন শোনা গেল আর কোনো চিন্তার বিষয় নাই, কেবল রাজার পুত্রসন্তান হয় নাই বলিয়া রাজা ব্যাকুল হইয়া আছেন এবং দেবতার নিকট প্রার্থনা করিয়া কঠিন তপস্যা করিবার জন্য বনগমনে উদ্যত হইয়াছেন, তখন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। পুত্রসন্তান না হইলে যে, দুঃখের কোনো কারণ আছে তাহা আমি বুঝিতাম না; আমি জানিতাম যদি কিছুর জন্য বনে যাইবার কখনো আবশ্যক হয় সে কেবল মাস্টারের কাছ হইতে পালাইবার অভিপ্রায়ে।

রানী এবং একটি বালিকা কন্যা ঘরে ফেলিয়া রাজা তপস্যা করিতে চলিয়া গেলেন। এক বৎসর দুই বৎসর করিয়া ক্রমে বারো বৎসর হইয়া যায় তবু রাজার আর দেখা নাই।

এদিকে রাজকন্যা ষোড়শী হইয়া উঠিয়াছে। বিবাহের বয়স উত্তীর্ণ হইয়া গেল কিন্তু রাজা ফিরিলেন না।

মেয়ের মুখের দিকে চায়, আর রানীর মুখে অন্নজল রুচে না। "আহা আমার এমন

সোনার মেয়ে কি চিরকাল আইবুড়ো হইয়া থাকিবে। ওগো, আমি কী কপাল করিয়াছিলাম।"

অবশেষে রানী রাজাকে অনেক অনুনয় করিয়া বলিয়া পাঠাইলেন, "আমি আর কিছু চাহি না, তুমি একদিন কেবল আমার ঘরে আসিয়া খাইয়া যাও।"

রাজা বলিলেন, "আচ্ছা।"

রানী তো সেদিন বহুযত্নে চৌষট্টি ব্যঞ্জন স্বহস্তে রাঁধিলেন এবং সমস্ত সোনার থালে ও রুপার বাটিতে সাজাইয়া চন্দনকাষ্ঠের পিঁড়ি পাতিয়া দিলেন। রাজকন্যা চামর হাতে করিয়া দাঁড়াইলেন।

রাজা আজ বারো বৎসর পরে অন্তঃপুরে ফিরিয়া আসিয়া খাইতে বসিলেন। রাজকন্যা রূপে আলো করিয়া দাঁড়াইয়া চামর করিতে লাগিলেন।

মেয়ের মুখের দিকে চান আর রাজার খাওয়া হয় না। শেষে রানীর দিকে চাহিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁ গো রানী, এমন সোনার প্রতিমা লক্ষ্মীঠাকরুনটির মতো এ মেয়েটি কে গা। এ কাহাদের মেয়ে।"

রানী কপালে করাঘাত করিয়া কহিলেন, "হা আমার পোড়া কপাল। উহাকে চিনিতে পারিলে না? ও যে তোমারই মেয়ে।"

রাজা বড়ো আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, "আমার সেই সেদিনকার এতটুকু মেয়ে আজ এত বড়োটি হইয়াছে?"

রানী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "তা আর হইবে না! বল কী, আজ বারো বৎসর হইয়া গেল।"

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "মেয়ের বিবাহ দাও নাই?"

রানী কহিলেন, "তুমি ঘরে নাই উহার বিবাহ কে দেয়। আমি কি নিজে পাত্র খুঁজিতে বাহির হইব।"

রাজা শুনিয়া হঠাৎ ভারি শশব্যস্ত হইয়া উঠিয়া বলিলেন, "রসো আমি কাল সকালে উঠিয়া রাজদ্বারে যাহার মুখ দেখিব তাহারই সহিত উহার বিবাহ দিয়া দিব।"

রাজকন্যা চামর করিতে লাগিলেন। তাঁহার হাতের বালাতে চুড়িতে ঠুং ঠাং শব্দ হইতে লাগিল। রাজার আহার হইয়া গেল।

পরদিন ঘুম হইতে উঠিয়া বাহিরে আসিয়া রাজা দেখিলেন, একটি ব্রাহ্মণের ছেলে রাজবাড়ির বাহিরে জঙ্গল হইতে শুকনা কাঠ সংগ্রহ করিতেছে। তাহার বয়স বছর সাত-আট হইবে।

রাজা বলিলেন, ইহারই সহিত আমার মেয়ের বিবাহ দিব। রাজার হুকুম কে

লঙ্ঘন করিতে পারে, তখনই ছেলেটিকে ধরিয়া তাহার সহিত রাজকন্যার মালা বদল করিয়া দেওয়া হইল।

আমি এই জায়গাটাতে দিদিমার খুব কাছ ঘেঁষিয়া খুব নিরতিশয় ঔৎসুক্যের সহিত জিজ্ঞাসা করিলাম—তার পরে? নিজেকে সেই সাত-আট বৎসরের সৌভাগ্যবান কাঠকুড়ানে ব্রাহ্মণের ছেলের স্থলাভিষিক্ত করিতে কি একটুখানি ইচ্ছা যায় নাই। যখন সেই রাত্রে ঝুপ ঝুপ বৃষ্টি পড়িতেছিল, মিট মিট করিয়া প্রদীপ জ্বলিতেছিল এবং গুন গুন স্বরে দিদিমা মশারির মধ্যে গল্প বলিতেছিলেন, তখন কি বালক-হৃদয়ের বিশ্বাসপরায়ণ রহস্যময় অনাবিষ্কৃত এক ক্ষুদ্র প্রান্তে এমন একটি অত্যন্ত সম্ভবপর ছবি জাগিয়া উঠে নাই যে, সেও একদিন সকালবেলায় কোথায় এক রাজার দেশে রাজার দরজায় কাঠ কুড়াইতেছে, হঠাৎ একটি সোনার প্রতিমা লক্ষ্মীঠাকরুনটির মতো রাজকন্যার সহিত তাহার মালা বদল হইয়া গেল; মাথায় তাহার সিঁথি, কানে তাহার দুল, গলায় তাহার কণ্ঠী, হাতে তাহার কাঁকন, কটিতে তাহার চন্দ্রহার, এবং আলতাপরা দুটি পায়ে নূপুর ঝম ঝম করিয়া বাজিতেছে।

কিন্তু আমার সেই দিদিমা যদি লেখকজন্ম ধারণ করিয়া আজকালকার সেয়ানা পাঠকদের কাছে এই গল্প বলিতেন তবে ইতিমধ্যে তাঁহাকে কত হিসাব দিতে হইত। প্রথমত রাজা যে বারো বৎসর বনে বসিয়া থাকেন এবং ততদিন রাজকন্যার বিবাহ হয় না, একবাক্যে সকলেই বলিত ইহা অসম্ভব। সেটুকুও যদি কোনো গতিকে গোলমালে পার পাইয়া যাইত, কিন্তু কন্যার বিবাহের জায়গায় বিষম একটা কলরব উঠিত। একে তো এমন কখনো হয় না, দ্বিতীয়ত, সকলেই আশঙ্কা করিত ব্রাহ্মণের ছেলের সহিত ক্ষত্রিয়কন্যার বিবাহ ঘটাইয়া লেখক নিশ্চয়ই ফাঁকি দিয়া সমাজবিরুদ্ধ মত প্রচার করিতেছেন। কিন্তু পাঠকেরা তেমন ছেলেই নয়, তাহারা তাঁহার নাতি নয় যে সকল কথা চুপ করিয়া শুনিয়া যাইবে? তাহারা কাগজে সমালোচনা করিবে। অতএব একান্তমনে প্রার্থনা করি, দিদিমা যেন পুনর্বার দিদিমা হইয়াই জন্মগ্রহণ করেন, হতভাগ্য নাতিটার মতো তাঁহাকে গ্রহদোষে যেন লেখক হইতে না হয়।

আমি একেবারে পুলকিত কম্পান্বিত হৃদয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম, তারপরে?

দিদিমা বলিতে লাগিলেন, তার পরে রাজকন্যা মনের দুঃখে তাহার সেই ছোটো স্বামীটিকে লইয়া চলিয়া গেল।

অনেক দূরদেশে গিয়া একটি বৃহৎ অট্টালিকা নির্মাণ করিয়া সেই ব্রাহ্মণের ছেলেটিকে, আপনার সেই অতি ক্ষুদ্র স্বামীটিকে বড়ো যত্নে মানুষ করিতে লাগিল।

আমি একটুখানি নড়িয়া-চড়িয়া পাশবালিশ আরও একটু সবলে জড়াইয়া ধরিয়া কহিলাম, তার পরে ?

দিদিমা কহিলেন, তার পরে ছেলেটি পুঁথি হাতে প্রতিদিন পাঠশালে যায়।

এমনি করিয়া গুরুমহাশয়ের কাছে নানা বিদ্যা শিখিয়া ছেলেটি ক্রমে যত বড়ো হইয়া উঠিতে লাগিল ততই তাহার সহপাঠীরা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, ওই যে সাতমহলা বাড়িতে তোমাকে লইয়া থাকে সেই মেয়েটি তোমার কে হয়।

ব্রাহ্মণের ছেলে তো ভাবিয়া অস্থির, কিছুতেই ঠিক করিয়া বলিতে পারে না, মেয়েটি তাহার কে হয়। একটু একটু মনে পড়ে একদিন সকালে রাজবাড়ির দ্বারের সম্মুখে শুকনা কাঠ কুড়াইতে গিয়াছিল—কিন্তু সেদিন কী একটা মস্ত গোলমালে কাঠ কুড়ানো হইল না। সে অনেক দিনের কথা, সে কি কিছু মনে আছে। এমন করিয়া চারি-পাঁচ বৎসর যায়। ছেলেটিকে রোজই তাহার সঙ্গীরা জিজ্ঞাসা করে, "আচ্ছা ওই যে সাতমহলা বাড়িতে পরমারূপসী মেয়েটি থাকে ও তোমার কে হয়।"

ব্রাহ্মণ একদিন পাঠশালা হইতে মুখ বড়ো বিমর্ষ করিয়া আসিয়া রাজকন্যাকে কহিল, "আমাকে আমার পাঠশালার প'ড়োরা প্রতিদিন জিজ্ঞাসা করে—ওই যে সাতমহলা বাড়িতে যে পরমাসুন্দরী মেয়েটি থাকে সে তোমার কে হয়। আমি তাহার কোনো উত্তর দিতে পারি না। তুমি আমার কে হও, বলো।"

রাজকন্যা বলিল, "আজিকার দিন থাক্‌, সে-কথা আর একদিন বলিব।"

ব্রাহ্মণের ছেলে প্রতিদিন পাঠশালা হইতে আসিয়া জিজ্ঞাসা করে, "তুমি আমার কী হও।"

রাজকন্যা প্রতিদিন উত্তর করে, "সে-কথা আজ থাক্‌, আর একদিন বলিব।"

এমনি করিয়া আরও চার-পাঁচ বৎসর কাটিয়া যায়। শেষে ব্রাহ্মণ একদিন আসিয়া বড়ো রাগ করিয়া বলিল, "আজ যদি তুমি না বল তুমি আমার কে হও, তবে আমি তোমার এই সাতমহলা বাড়ি ছাড়িয়া চলিয়া যাইব।"

তখন রাজকন্যা কহিলেন, "আচ্ছা কাল নিশ্চয়ই বলিব।"

পরদিন ব্রাহ্মণতনয় পাঠশালা হইতে ঘরে আসিয়াই রাজকন্যাকে বলিল, "আজ বলিবে বলিয়াছিলে, তবে বলো।"

রাজকন্যা বলিলেন, "আজ রাত্রে আহার করিয়া তুমি যখন শয়ন করিবে তখন বলিব।"

ব্রাহ্মণ বলিল, "আচ্ছা।" বলিয়া সূর্যাস্তের অপেক্ষায় প্রহর গনিতে লাগিল।

এদিকে রাজকন্যা সোনার পালঙ্কে একটি ধবধবে ফুলের বিছানা পাতিলেন, ঘরে সোনার প্রদীপে সুগন্ধ তেল দিয়া বাতি জ্বালাইলেন এবং চুলটি বাঁধিয়া নীলাম্বরী কাপড়টি পরিয়া সাজিয়া বসিয়া প্রহর গনিতে লাগিলেন, কখন রাত্রি আসে।

রাত্রে তাঁহার স্বামী কোনোমতে আহার শেষ করিয়া শয়নগৃহে সোনার পালঙ্কে ফুলের বিছানায় গিয়া শয়ন করিলেন। ভাবিতে লাগিলেন, আজ শুনিতে পাইব এই সাতমহলা বাড়িতে যে সুন্দরীটি থাকে সে আমার কে হয়।

রাজকন্যা তাহার স্বামীর পাত্রে প্রসাদ খাইয়া ধীরে ধীরে শয়নগৃহে প্রবেশ করিলেন। আজ বহুদিন পর প্রকাশ করিয়া বলিতে হইবে, সাতমহলা বাড়ির একমাত্র অধীশ্বরী আমি তোমার কে হই।

বলিতে গিয়া বিছানায় প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, ফুলের মধ্যে সাপ ছিল, তাঁহার স্বামীকে কখন দংশন করিয়াছে। স্বামীর মৃতদেহখানি মলিন হইয়া সোনার পালঙ্কে পুষ্পশয্যায় পড়িয়া আছে।

আমার যেন বক্ষঃস্পন্দন হঠাৎ বন্ধ হইয়া গেল। আমি রুদ্ধস্বরে বিবর্ণমুখে জিজ্ঞাসা করিলাম, তার পরে কী হইল।

দিদিমা বলিতে লাগিলেন, তার পরে—। কিন্তু সে-কথায় আর কাজ কী। সে যে আরও অসম্ভব। গল্পের প্রধান নায়ক সর্পাঘাতেই মারা গেল, তবুও তার পরে? বালক তখন জানিত না, মৃত্যুর পরেও একটা 'তারপরে' থাকিতে পারে বটে, কিন্তু সে 'তার-পরে'র উত্তর কোনো দিদিমার দিদিমাও দিতে পারে না। বিশ্বাসের বলে সাবিত্রী মৃত্যুরও অনুগমন করিয়াছিলেন। শিশুরও প্রবল বিশ্বাস। এইজন্য সে মৃত্যুর অঞ্চল ধরিয়া ফিরাইতে চায়, কিছুতেই মনে করিতে পারে না যে, তাহার মাস্টারবিহীন এক সন্ধ্যাবেলাকার এত সাধের গল্পটি হঠাৎ একটি সর্পাঘাতেই মারা গেল। কাজেই দিদিমাকে সেই মহাপরিণামের চিররুদ্ধ গৃহ হইতে গল্পটিকে আবার ফিরাইয়া আনিতে হয়। কিন্তু এত সহজে সেটি সাধন করেন, এমন অনায়াসে—কেবল হয়তো একটা কলার ভেলায় ভাসাইয়া দিয়া গুটি দুই মন্ত্র পড়িয়া মাত্র—যে সেই ঝুপ ঝুপ বৃষ্টির রাত্রে স্তিমিত প্রদীপে বালকের মনে মৃত্যুর মূর্তি অত্যন্ত অকঠোর হইয়া আসে, তাহাকে এক রাত্রের সুখনিদ্রার চেয়ে বেশি মনে হয় না। গল্প যখন ফুরাইয়া যায়, আরামে শ্রান্ত দুটি চক্ষু আপনি মুদিয়া আসে, তখনও তো শিশুর ক্ষুদ্র প্রাণটিকে একটি স্নিগ্ধ নিস্তব্ধ নিস্তরঙ্গ স্রোতের মধ্যে সুষুপ্তির ভেলায় করিয়া ভাসাইয়া দেওয়া হয়, তার পরে ভোরের বেলায় কে দুটি মায়ামন্ত্র পড়িয়া তাহাকে এই জগতের মধ্যে জাগ্রত করিয়া তোলে।

কিন্তু যাহার বিশ্বাস নাই, যে ভীরু এ সৌন্দর্যরসাস্বাদনের জন্যও এক ইঞ্চি পরিমাণ অসম্ভবকে লঙ্ঘন করিতে পরাঙ্মুখ হয়, তাহার কাছে কোনো কিছুর আর 'তার পরে' নাই, সমস্তই হঠাৎ অসময়ে এক অসমাপ্তিতে সমাপ্ত হইয়া গেছে। ছেলেবেলায় সাত সমুদ্র পার হইয়া মৃত্যুকেও লঙ্ঘন করিয়া গল্পের যেখানে যথার্থ বিরাম, সেখানে স্নেহময় সুমিষ্ট স্বরে শুনিতাম —

আমার কথাটি ফুরোল,
ন'টে গাছটি মুড়োল।

এখন বয়স হইয়াছে, এখন গল্পের ঠিক মাঝখানটাতে হঠাৎ থামিয়া গিয়া একটা নিষ্ঠুর কঠিন কণ্ঠে শুনিতে পাই—

আমার কথাটি ফুরোল না,
ন'টে গাছটি মুড়োল না।
কেন রে নটে মুড়োলিনে কেন।
তোর গরুতে—

দূর হউক গে, ওই নিরীহ প্রাণীটির নাম করিয়া কাজ নাই। আবার কে কোন্‌দিক হইতে গায়ে পাতিয়া লইবে।

আষাঢ়, ১৩০০

শাস্তি

প্রথম পরিচ্ছেদ

দুখিরাম রুই এবং ছিদাম রুই দুই ভাই সকালে যখন দা হাতে লইয়া জন খাটিতে বাহির হইল তখন তাহাদের দুই স্ত্রীর মধ্যে বকাবকি চেঁচামেচি চলিতেছে। কিন্তু প্রকৃতির অন্যান্য নানাবিধ নিত্য কলরবের ন্যায় এই কলহ-কোলাহলও পাড়াসুদ্ধ লোকের অভ্যাস হইয়া গেছে। তীব্র কণ্ঠস্বর শুনিবামাত্র লোকে পরস্পরকে বলে— “ওই রে বাধিয়া গিয়াছে,” অর্থাৎ যেমনটি আশা করা যায় ঠিক তেমনিটি ঘটিয়াছে, আজও স্বভাবের নিয়মের কোনোরূপ ব্যত্যয় হয় নাই। প্রভাতে পূর্বদিকে সূর্য উঠিলে যেমন কেহ তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করে না, তেমনি এই কুরিদের বাড়িতে দুই জায়ের মধ্যে যখন একটা হৈ-হৈ পড়িয়া যায় তখন তাহার কারণ নির্ণয়ের জন্য কাহারও কোনোরূপ কৌতূহলের উদ্রেক হয় না।

অবশ্য এই কোন্দল আন্দোলন প্রতিবেশীদের অপেক্ষা দুই স্বামীকে বেশি স্পর্শ করিত সন্দেহ নাই, কিন্তু সেটা তাহারা কোনোরূপ অসুবিধার মধ্যে গণ্য করিত না। তাহারা দুই ভাই যেন দীর্ঘ সংসারপথ একটা এক্কাগাড়িতে করিয়া চলিয়াছে, দুই দিকের দুই স্প্রিংবিহীন চাকার অবিশ্রাম ছড়ছড় খড়খড় শব্দটাকে জীবনরথযাত্রার একটা বিধিবিহিত নিয়মের মধ্যেই ধরিয়া লইয়াছে।

বরঞ্চ ঘরে যেদিন কোনো শব্দমাত্র নাই, সমস্ত থমথম ছমছম করিতেছে, সেদিন একটা আসন্ন অনৈসর্গিক উপদ্রবের আশঙ্কা জন্মিত, সেদিন যে কখন কী হইবে তাহা কেহ হিসাব করিয়া বলিতে পারিত না।

আমাদের গল্পের ঘটনা যেদিন আরম্ভ হইল, সেদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে দুই ভাই যখন জন খাটিয়া শ্রান্তদেহে ঘরে ফিরিয়া আসিল, তখন দেখিল, স্তব্ধ গৃহ গমগম করিতেছে।

বাহিরেও অত্যন্ত গুমট। দুই-প্রহরের সময় খুব একপসলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। এখনও চারিদিকে মেঘ জমিয়া আছে। বাতাসের লেশমাত্র নাই। বর্ষায় ঘরের চারিদিকে জঙ্গল এবং আগাছাগুলা অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছে, সেখান হইতে এবং জলমগ্ন পাটের খেত হইতে সিক্ত উদ্ভিজ্জের ঘন গন্ধবাষ্প চতুর্দিকে একটি নিশ্চল প্রাচীরের মতো জমাট হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। গোয়ালের পশ্চাদ্বর্তী ডোবার মধ্য হইতে ভেক ডাকিতেছে এবং ঝিল্লিরবে সন্ধ্যার নিস্তব্ধ আকাশ একেবারে পরিপূর্ণ।

অদূরে বর্ষার পদ্মা নবমেঘচ্ছায়ায় বড়ো স্থির ভয়ংকর ভাব ধারণ করিয়া চলিয়াছে। শস্যক্ষেত্রের অধিকাংশই ভাঙিয়া লোকালয়ের কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছে। এমন কি ভাঙনের ধারে দুই-চারিটা আম-কাঁঠালগাছের শিকড় বাহির হইয়া দেখা দিয়াছে, যেন তাহাদের নিরুপায় মুষ্টির প্রসারিত অঙ্গুলিগুলি শূন্যে একটা-কিছু অন্তিম অবলম্বন আঁকড়াইয়া ধরিবার চেষ্টা করিতেছে।

দুখিরাম এবং ছিদাম সেদিন জমিদারের কাছারি-ঘরে কাজ করিতে গিয়াছিল। ওপারের চরে জলিধান পাকিয়াছে। বর্ষায় চর ভাসিয়া যাইবার পূর্বেই ধান কাটিয়া লইবার জন্য দেশের দরিদ্র লোক মাত্রেই কেহ বা নিজের খেতে, কেহ বা পাট খাটিতে নিযুক্ত হইয়াছে; কেবল কাছারি হইতে পেয়াদা আসিয়া এই দুই ভাইকে জবরদস্তি করিয়া ধরিয়া লইয়া গেল। কাছারি-ঘরে চাল ভেদ করিয়া স্থানে স্থানে জল পড়িতেছিল তাহাই সারিয়া দিতে এবং গোটাকতক ঝাঁপ নির্মাণ করিতে তাহারা সমস্তদিন খাটিয়াছে। বাড়ি আসিতে পায় নাই, কাছারি হইতেই কিঞ্চিৎ জলপান খাইয়াছে। মধ্যে মধ্যে বৃষ্টিতেও ভিজিতে হইয়াছে,—উচিতমতো পাওনা মজুরি পায় নাই, এবং

তাহার পরিবর্তে যে-সকল অন্যায় কটু কথা শুনিতে হইয়াছে, সে তাহাদের পাওনার অনেক অতিরিক্ত।

পথের কাদা এবং জল ভাঙিয়া সন্ধ্যাবেলায় বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া দুই ভাই দেখিল, ছোটো জা চন্দরা ভূমিতে অঞ্চল পাতিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া আছে,—আজিকার এই মেঘলা দিনের মতো সে-ও মধ্যাহ্নে প্রচুর অশ্রুবর্ষণপূর্বক সায়াহ্নের কাছাকাছি ক্ষান্ত দিয়া অত্যন্ত গুমট করিয়া আছে, আর বড়ো জা রাধা মুখটা মস্ত করিয়া দাওয়ায় বসিয়া ছিল—তাহার দেড় বৎসরের ছোটো ছেলেটি কাঁদিতেছিল, দুই ভাই যখন প্রবেশ করিল, দেখিল উলঙ্গ শিশু প্রাঙ্গণের এক পার্শ্বে চিৎ হইয়া পড়িয়া ঘুমাইয়া আছে।

ক্ষুধিত দুখিরাম আর কালবিলম্ব না করিয়া বলিল, "ভাত দে।"

বড়ো বউ বারুদের বস্তায় স্ফুলিঙ্গপাতের মতো একমুহূর্তেই তীব্র কণ্ঠস্বর আকাশ-পরিমাণ করিয়া উঠিল, "ভাত কোথায় যে ভাত দিব। তুই কি চাল দিয়া গিয়াছিলি। আমি কি নিজে রোজগার করিয়া আনিব।"

সারাদিনের শ্রান্তি ও লাঞ্ছনার পর অন্নহীন নিরানন্দ অন্ধকার ঘরে প্রজ্বলিত ক্ষুধানলে গৃহিণীর রুক্ষবচন বিশেষত শেষ কথাটার গোপন কুৎসিত শ্লেষ দুখিরামের হঠাৎ কেমন একেবারেই অসহ্য হইয়া উঠিল। ক্রুদ্ধ ব্যাঘ্রের ন্যায় গম্ভীর গর্জনে বলিয়া উঠিল, "কী বললি।" বলিয়া মুহূর্তের মধ্যে দা লইয়া কিছু না ভাবিয়া একেবারে স্ত্রীর মাথায় বসাইয়া দিল। রাধা তাহার ছোটো জায়ের কোলের কাছে পড়িয়া গেল এবং মৃত্যু হইতে মুহূর্ত বিলম্ব হইল না।

চন্দরা রক্তসিক্ত বস্ত্রে "কী হল গো" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। ছিদাম তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল। দুখিরাম দা ফেলিয়া মুখে হাত দিয়া হতবুদ্ধির মতো ভূমিতে বসিয়া পড়িল। ছেলেটা জাগিয়া উঠিয়া ভয়ে চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

বাহিরে তখন পরিপূর্ণ শান্তি। রাখালবালক গোরু লইয়া গ্রামে ফিরিয়া আসিতেছে। পরপারের চরে যাহারা নূতনপক্ক ধান কাটিতে গিয়াছিল, তাহারা পাঁচ-সাতজনে এক-একটি ছোটো নৌকায় এপারে ফিরিয়া পরিশ্রমের পুরস্কার দুই-চারি আঁটি ধান মাথায় লইয়া প্রায় সকলেই নিজ নিজ ঘরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

চক্রবর্তীদের বাড়ির রামলোচন খুড়ো গ্রামের ডাকঘরে চিঠি দিয়া ঘরে ফিরিয়া নিশ্চিন্তমনে চুপচাপ তামাক খাইতেছিলেন। হঠাৎ মনে পড়িল, তাঁহার কোর্ফা প্রজা দুখির অনেক টাকা খাজনা বাকি; আজ কিয়দংশ শোধ করিবে প্রতিশ্রুত হইয়াছিল। এতক্ষণে তাহারা বাড়ি ফিরিয়াছে স্থির করিয়া চাদরটা কাঁধে ফেলিয়া ছাতা লইয়া বাহির হইলেন।

কুরিদের বাড়িতে ঢুকিয়া তাঁহার গা ছম ছম করিয়া উঠিল। দেখিলেন ঘরে প্রদীপ জ্বালা হয় নাই। অন্ধকার দাওয়ায় দুই-চারিটা অন্ধকার মূর্তি অস্পষ্ট দেখা যাইতেছে। রহিয়া রহিয়া দাওয়ার এক কোণ হইতে একটা অস্ফুট রোদন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে—এবং ছেলেটা যত মা মা বলিয়া কাঁদিয়া উঠিতে চেষ্টা করিতেছে ছিদাম তাহার মুখ চাপিয়া ধরিতেছে।

রামলোচন কিছু ভীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "দুখি, আছিস নাকি।"

দুখি এতক্ষণ প্রস্তরমূর্তির মতো নিশ্চল হইয়া বসিয়া ছিল, তাহার নাম ধরিয়া ডাকিবামাত্র একেবারে অবোধ বালকের মতো উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

ছিদাম তাড়াতাড়ি দাওয়া হইতে অঙ্গনে নামিয়া চক্রবর্তীর নিকটে আসিল। চক্রবর্তী জিজ্ঞাসা করিলেন, "মাগীরা বুঝি ঝগড়া করিয়া বসিয়া আছে? আজ তো সমস্তদিনই চীৎকার শুনিয়াছি।"

এতক্ষণ ছিদাম কিংকর্তব্য কিছুই ভাবিয়া উঠিতে পারে নাই। নানা অসম্ভব গল্প তাহার মাথায় উঠিতেছিল। আপাতত স্থির করিয়াছিল, রাত্রি কিঞ্চিৎ অধিক হইলে মৃতদেহ কোথাও সরাইয়া ফেলিবে। ইতিমধ্যে যে চক্রবর্তী আসিয়া উপস্থিত হইবে এ সে মনেও করে নাই। ফস করিয়া কোনো উত্তর জোগাইল না। বলিয়া ফেলিল, "হাঁ, আজ খুব ঝগড়া হইয়া গিয়াছে।"

চক্রবর্তী দাওয়ার দিকে অগ্রসর হইবার উপক্রম করিয়া বলিল, "কিন্তু সে জন্য দুখি কাঁদে কেন রে।"

ছিদাম দেখিল আর রক্ষা হয় না, হঠাৎ বলিয়া ফেলিল, "ঝগড়া করিয়া ছোটোবউ বড়ো বউয়ের মাথায় এক দায়ের কোপ বসাইয়া দিয়াছে।"

উপস্থিত বিপদ ছাড়া যে আর কোনো বিপদ থাকিতে পারে এ-কথা সহজে মনে হয় না। ছিদাম তখন ভাবিতেছিল, ভীষণ সত্যের হাত হইতে কী করিয়া রক্ষা পাইব। মিথ্যা যে তদপেক্ষা ভীষণ হইতে পারে তাহা তাহার জ্ঞান হইল না। রামলোচনের প্রশ্ন শুনিবামাত্র তাহার মাথায় তৎক্ষণাৎ একটা উত্তর জোগাইল এবং তৎক্ষণাৎ বলিয়া ফেলিল।

রামলোচন চমকিয়া উঠিয়া কহিল, "অ্যাঁ! বলিস কী! মরে নাই তো!"

ছিদাম কহিল, "মরিয়াছে।" বলিয়া চক্রবর্তীর পা জড়াইয়া ধরিল।

চক্রবর্তী পালাইবার পথ পায় না। ভাবিল, রাম রাম, সন্ধ্যাবেলায় এ কী বিপদেই পড়িলাম। আদালতে সাক্ষ্য দিতে দিতেই প্রাণ বাহির হইয়া পড়িবে। ছিদাম

কিছুতেই তাঁহার পা ছাড়িল না, কহিল, "দাদাঠাকুর, এখন আমার বউকে বাঁচাইবার কী উপায় করি।"

মামলামোকদ্দমার পরামর্শে রামলোচন সমস্ত গ্রামের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। তিনি একটু ভাবিয়া বলিলেন, "দেখ্, ইহার এক উপায় আছে। তুই এখনই থানায় ছুটিয়া যা—বল্‌গে, তোর বড়ো ভাই দুখি সন্ধ্যাবেলায় ঘরে আসিয়া ভাত চাহিয়াছিল, ভাত প্রস্তুত ছিল না বলিয়া স্ত্রীর মাথায় দা বসাইয়া দিয়াছে। আমি নিশ্চয় বলিতেছি এ-কথা বলিলে ছুঁড়িটা বাঁচিয়া যাইবে।"

ছিদামের কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া আসিল, উঠিয়া কহিল, "ঠাকুর, বউ গেলে বউ পাইব, কিন্তু আমার ভাই ফাঁসি গেলে আর তো ভাই পাইব না।" কিন্তু যখন নিজের স্ত্রীর নামে দোষারোপ করিয়াছিল তখন এ সকল কথা ভাবে নাই। তাড়াতাড়িতে একটা কাজ করিয়া ফেলিয়াছে, এখন অলক্ষিতভাবে মন আপনার পক্ষে যুক্তি এবং প্রবোধ সঞ্চয় করিতেছে।

চক্রবর্তীও কথাটা যুক্তিসংগত বোধ করিলেন, কহিলেন, "তবে যেমনটি ঘটিয়াছে তাই বলিস, সকল দিক রক্ষা করা অসম্ভব।"

বলিয়া রামলোচন অবিলম্বে প্রস্থান করিল এবং দেখিতে দেখিতে গ্রামে রাষ্ট্র হইল যে, কুরিদের বাড়ির চন্দরা রাগারাগি করিয়া তাহার বড়ো জায়ের মাথায় দা বসাইয়া দিয়াছে।

বাঁধ ভাঙিলে যেমন জল আসে গ্রামের মধ্যে তেমনি হুহু: শব্দে পুলিস আসিয়া পড়িল; অপরাধী এবং নিরপরাধী সকলেই বিষম উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ছিদাম ভাবিল, যে পথ কাটিয়া ফেলিয়াছে সেই পথেই চলিতে হইবে। সে চক্রবর্তীর কাছে নিজমুখে এক কথা বলিয়া ফেলিয়াছে সে-কথা গাঁসুদ্ধ রাষ্ট্র হইয়া পড়িয়াছে, এখন আবার আর-একটা কিছু প্রকাশ হইয়া পড়িলে কী জানি কী হইতে কী হইয়া পড়িবে সে নিজেই কিছু ভাবিয়া পাইল না। মনে করিল কোনোমতে সে-কথাটা রক্ষা করিয়া তাহার সহিত আর পাঁচটা গল্প জুড়িয়া স্ত্রীকে রক্ষা করা ছাড়া আর কোনো পথ নাই।

ছিদাম তাহার স্ত্রী চন্দরাকে অপরাধ নিজ স্কন্ধে লইবার জন্য অনুরোধ করিল। সে তো একেবারে বজ্রাহত হইয়া গেল। ছিদাম তাহাকে আশ্বাস দিয়া কহিল, "যাহা

বলিতেছি তাই কর্ তোর কোনো ভয় নাই, আমরা তোকে বাঁচাইয়া দিব"—আশ্বাস দিল বটে কিন্তু গলা শুকাইল, মুখ পাংশুবর্ণ হইয়া গেল।

চন্দরার বয়স সতেরো-আঠারোর অধিক হইবে না। মুখখানি হৃষ্টপুষ্ট গোলগাল শরীরটি অনতিদীর্ঘ আঁটসাঁট সুস্থসবল, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে এমন একটি সৌষ্ঠব আছে যে, চলিতে ফিরিতে নড়িতে চড়িতে দেহের কোথাও যেন কিছু বাধে না। একখানি নূতন-তৈরি নৌকার মতো; বেশ ছোটো এবং সুডোল, অত্যন্ত সহজে সরে এবং তাহার কোথাও কোনো গ্রন্থি শিথিল হইয়া যায় নাই। পৃথিবীর সকল বিষয়েই তাহার একটা কৌতুক এবং কৌতূহল আছে; পাড়ায় গল্প করিতে যাইতে ভালোবাসে; এবং কুম্ভকক্ষে ঘাটে যাইতে আসিতে দুই অঙ্গুলি দিয়া ঘোমটা ঈষৎ ফাঁক করিয়া উজ্জ্বল চঞ্চল ঘনকৃষ্ণ চোখ দুটি দিয়া পথের মধ্যে দর্শনযোগ্য যাহা কিছু সমস্ত দেখিয়া লয়।

বড়োবউ ছিল ঠিক ইহার উলটা; অত্যন্ত এলোমেলো ঢিলেঢালা অগোছালো। মাথার কাপড়, কোলের শিশু, ঘরকন্নার কাজ কিছুই সে সামলাইতে পারিত না। হাতে বিশেষ একটা কিছু কাজও নাই অথচ কোনো কালে যেন সে অবসর করিয়া উঠিতে পারে না। ছোটো জা তাহাকে অধিক কিছু কথা বলিত না, মৃদুস্বরে দুই-একটা তীক্ষ্ণ দংশন করিত, আর সে হাউ হাউ দাউ দাউ করিয়া রাগিয়া মাগিয়া বকিয়া ঝকিয়া সারা হইত এবং পাড়াসুদ্ধ অস্থির করিয়া তুলিত।

এই দুই জুড়ি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেও স্বভাবের একটা আশ্চর্য ঐক্য ছিল। দুখিরাম মানুষটা কিছু বৃহদায়তনের—হাড়গুলা খুব চওড়া, নাসিকা খর্ব, দুটি চক্ষু এই দৃশ্যমান সংসারকে যেন ভালো করিয়া বোঝে না, অথচ ইহাকে কোনোরূপ প্রশ্ন করিতেও যায় না। এমন নিরীহ অথচ ভীষণ, এমন সবল অথচ নিরুপায় মানুষ অতি দুর্লভ।

আর ছিদামকে একখানি চকচকে কালো পাথরে কে যেন বহুযত্নে কুঁদিয়া গড়িয়া তুলিয়াছে। লেশমাত্র বাহুল্যবর্জিত এবং কোথাও যেন কিছু টোল খায় নাই। প্রত্যেক অঙ্গটি বলের সহিত নৈপুণ্যের সহিত মিশিয়া অত্যন্ত সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। নদীর উচ্চপাড় হইতে লাফাইয়া পড়ুক, লগি দিয়া নৌকা ঠেলুক, বাঁশগাছে চড়িয়া বাছিয়া বাছিয়া কঞ্চি কাটিয়া আনুক, সকল কাজেই তাহার একটি পরিমিত পারিপাট্য, একটি অবলীলাকৃত শোভা প্রকাশ পায়। বড়ো বড়ো কালো চুল তেল দিয়া কপাল হইতে যত্নে আঁচড়াইয়া তুলিয়া কাঁধে আনিয়া ফেলিয়াছে - বেশভূষা-সাজসজ্জায় বিলক্ষণ একটু যত্ন আছে।

অপরাপর গ্রামবধূদিগের সৌন্দর্যের প্রতি যদিও তাহার উদাসীন দৃষ্টি ছিল না, এবং তাহাদের চক্ষে আপনাকে মনোরম করিয়া তুলিবার ইচ্ছাও তাহার যথেষ্ট ছিল—তবু

ছিদাম তাহার যুবতী স্ত্রীকে একটু বিশেষ ভালোবাসিত। উভয়ে ঝগড়াও হইত, ভাবও হইত, কেহ কাহাকেও পরাস্ত করিতে পারিত না। আর একটি কারণে উভয়ের মধ্যে বন্ধন কিছু সুদৃঢ় ছিল। ছিদাম মনে করিত চন্দরা যেরূপ চটুল চঞ্চল প্রকৃতির স্ত্রীলোক তাহাকে যথেষ্ট বিশ্বাস নাই, আর চন্দরা মনে করিত আমার স্বামীটির চতুর্দিকেই দৃষ্টি, তাহাকে কিছু কষাকষি করিয়া না বাঁধিলে কোন্‌দিন হাতছাড়া হইতে আটক নাই।

উপস্থিত ঘটনা ঘটিবার কিছুকাল পূর্বে হইতে স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে ভারি একটা গোলযোগ চলিতেছিল। চন্দরা দেখিয়াছিল তাহার স্বামী কাজের ওজর করিয়া মাঝে মাঝে দূরে চলিয়া যায়, এমন কি দুই-একদিন অতীত করিয়া আসে, অথচ কিছু উপার্জন করিয়া আনে না। লক্ষণ মন্দ দেখিয়া সে-ও কিছু বাড়াবাড়ি দেখাইতে লাগিল। যখন-তখন ঘাটে যাইতে আরম্ভ করিল এবং পাড়া পর্যটন করিয়া আসিয়া কাশী মজুমদারের মেজো ছেলেটির প্রচুর ব্যাখ্যা করিতে লাগিল।

ছিদামের দিন এবং রাত্রিগুলির মধ্যে কে যেন বিষ মিশাইয়া দিল। কাজেকর্মে কোথাও একদণ্ড গিয়া সুস্থির হইতে পারে না। একদিন ভাজকে আসিয়া ভারি ভর্ৎসনা করিল। সে হাত নাড়িয়া ঝংকার দিয়া অনুপস্থিত মৃত পিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "ও মেয়ে ঝড়ের আগে ছোটে উহাকে আমি সামলাইব! আমি জানি ও কোন্‌দিন কী সর্বনাশ করিয়া বসিবে।"

চন্দরা পাশের ঘর হইতে আসিয়া আস্তে আস্তে কহিল, "কেন দিদি তোমার এত ভয় কিসের।" এই দুই জায়ে বিষম দ্বন্দ্ব বাধিয়া গেল।

ছিদাম চোখ পাকাইয়া বলিল, "এবার যদি কখনো শুনি তুই একলা ঘাটে গিয়াছিস তোর হাড় গুঁড়াইয়া দিব।"

চন্দরা বলিল, "তাহা হইলে তো হাড় জুড়ায়।" বলিয়া তৎক্ষণাৎ বাহিরে যাইবার উপক্রম করিল।

ছিদাম এক লম্ফে তাহার চুল ধরিয়া টানিয়া ঘরে পুরিয়া বাহির হইতে দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল।

কর্মস্থান হইতে সন্ধ্যাবেলায় ফিরিয়া আসিয়া দেখে ঘর খোলা, ঘরে কেহ নাই। চন্দরা তিনটে গ্রাম ছাড়াইয়া একেবারে তাহার মামার বাড়ি গিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

ছিদাম সেখান হইতে বহুকষ্টে অনেক সাধ্যসাধনায় তাহাকে ঘরে ফিরাইয়া আনিল, কিন্তু এবার পরাস্ত মানিল। দেখিল এক অঞ্জলি পারদকে মুষ্টির মধ্যে শক্ত করিয়া ধরা যেমন দুঃসাধ্য এই মুষ্টিমেয় স্ত্রীটুকুকেও কঠিন করিয়া ধরিয়া রাখা তেমনি অসম্ভব— ও যেন দশ আঙুলের ফাঁক দিয়া বাহির হইয়া পড়ে।

আর কোনো জবরদস্তি করিল না,—কিন্তু বড়ো অশান্তিতে বাস করিতে লাগিল। তাহার এই চঞ্চলা যুবতী স্ত্রীর প্রতি সদাশঙ্কিত ভালোবাসা উগ্র একটা বেদনার মতো বিষম টনটনে হইয়া উঠিল। এমন কি, এক-একবার মনে হইত এ যদি মরিয়া যায় তবে আমি নিশ্চিন্ত হইয়া একটুখানি শান্তিলাভ করিতে পারি। মানুষের উপরে মানুষের যতটা ঈর্ষা হয় যমের উপরে এতটা নহে।

এমন সময় ঘরে সেই বিপদ ঘটিল।

চন্দরাকে যখন তাহার স্বামী খুন স্বীকার করিয়া লইতে কহিল, সে স্তম্ভিত হইয়া চাহিয়া রহিল; তাহার কালো দুটি চক্ষু কালো অগ্নির ন্যায় নীরবে তাহার স্বামীকে দগ্ধ করিতে লাগিল। তাহার সমস্ত শরীর মন যেন ক্রমেই সংকুচিত হইয়া স্বামীরাক্ষসের হাত হইতে বাহির হইয়া আসিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহার সমস্ত অন্তরাত্মা একান্ত বিমুখ হইয়া দাঁড়াইল।

ছিদাম আশ্বাস দিল, "তোমার কিছু ভয় নাই।" বলিয়া পুলিসের কাছে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে কী বলিতে হইবে বারবার শিখাইয়া দিল। চন্দরা সে সমস্ত দীর্ঘ কাহিনী কিছুই শুনিল না; কাঠের মূর্তি হইয়া বসিয়া রহিল।

সমস্ত কাজেই ছিদামের উপর দুখিরামের একমাত্র নির্ভর। ছিদাম যখন চন্দরার উপর দোষারোপ করিতে বলিল, দুখি বলিল, "তাহা হইলে বউমার কী হইবে।" ছিদাম কহিল, "উহাকে আমি বাঁচাইয়া দিব।" বৃহৎকায় দুখিরাম নিশ্চিন্ত হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ছিদাম তাহার স্ত্রীকে শিখাইয়া দিয়াছিল যে, তুই বলিস বড়ো জা আমাকে বঁটি লইয়া মারিতে আসিয়াছিল, আমি তাহাকে দা লইয়া ঠেকাইতে গিয়া হঠাৎ কেমন করিয়া লাগিয়া গিয়াছে। এ-সমস্তই রামলোচনের রচিত। ইহার অনুকূলে যে যে অলংকার এবং প্রমাণ প্রয়োগের আবশ্যক তাহাও সে বিস্তারিতভাবে ছিদামকে শিখাইয়াছিল।

পুলিস আসিয়া তদন্ত করিতে লাগিল। চন্দরাই যে তাহার বড়ো জাকে খুন করিয়াছে গ্রামের সকল লোকের মনে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। সকল সাক্ষীর দ্বারাই সেইরূপ প্রমাণ হইল। পুলিস যখন চন্দরাকে প্রশ্ন করিল, চন্দরা কহিল, "হাঁ আমি খুন করিয়াছি।"

কেন খুন করিয়াছ।

আমি তাহাকে দেখিতে পারিতাম না।

কোনো বচসা হইয়াছিল ?

না।

সে তোমাকে প্রথমে মারিতে আসিয়াছিল ?

না।

তোমার প্রতি কোনো অত্যাচার করিয়াছিল ?

না।

এইরূপ উত্তর শুনিয়া সকলে অবাক হইয়া গেল।

ছিদাম তো একেবারে অস্থির হইয়া উঠিল। কহিল, "উনি ঠিক কথা বলিতেছেন না। বড়োবউ প্রথমে—"

দারোগা খুব এক তাড়া দিয়া তাহাকে থামাইয়া দিল। অবশেষে তাহাকে বিধিমতে জেরা করিয়া বার বার সে-ই একই উত্তর পাইল—বড়োবউয়ের দিক হইতে কোনোরূপ আক্রমণ চন্দরা কিছুতেই স্বীকার করিল না।

এমন একগুঁয়ে মেয়েও তো দেখা যায় না। একেবারে প্রাণপণে ফাঁসিকাষ্ঠের দিকে ঝুঁকিয়াছে, কিছুতেই তাহাকে টানিয়া রাখা যায় না। এ কী নিদারুণ অভিমান। চন্দরা মনে মনে স্বামীকে বলিতেছে, আমি তোমাকে ছাড়িয়া আমার এই নবযৌবন লইয়া ফাঁসিকাঠকে বরণ করিলাম—আমার ইহজন্মের শেষবন্ধন তাহার সহিত।

বন্দিনী হইয়া চন্দরা, একটি নিরীহ ক্ষুদ্র চঞ্চল কৌতুকপ্রিয় গ্রামবধূ, চিরপরিচিত গ্রামের পথ দিয়া, রথতলা দিয়া, হাটের মধ্য দিয়া, ঘাটের প্রান্ত দিয়া, মজুমদারদের বাড়ির সম্মুখ দিয়া, পোস্টাপিস এবং ইস্কুলঘরের পার্শ্ব দিয়া, সমস্ত পরিচিত লোকের চক্ষের উপর দিয়া কলঙ্কের ছাপ লইয়া চিরকালের মতো গৃহ ছাড়িয়া চলিয়া গেল। একপাল ছেলে পিছন পিছন চলিল এবং গ্রামের মেয়েরা, তাহার সইসাঙাতরা কেহ কেহ ঘোমটার ফাঁক দিয়া, কেহ দ্বারের প্রান্ত হইতে, কেহ বা গাছের আড়ালে দাঁড়াইয়া পুলিস-চালিত চন্দরাকে দেখিয়া লজ্জায় ঘৃণায় ভয়ে কণ্টকিত হইয়া উঠিল।

ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছেও চন্দরা দোষ স্বীকার করিল। এবং খুনের সময় বড়োবউ যে তাহার প্রতি কোনোরূপ অত্যাচার করিয়াছিল তাহা প্রকাশ হইল না।

কিন্তু সেদিন ছিদাম সাক্ষ্যস্থলে আসিয়াই একেবারে কাঁদিয়া জোড়হস্তে কহিল, "দোহাই হুজুর, আমার স্ত্রীর কোনো দোষ নাই।" হাকিম ধমক দিয়া তাহার উচ্ছ্বাস নিবারণ করিয়া তাহাকে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, সে একে একে সত্য ঘটনা প্রকাশ করিল।

হাকিম তাহার কথা বিশ্বাস করিলেন না। কারণ, প্রধান বিশ্বস্ত ভদ্রসাক্ষী

রামলোচন কহিল, "খুনের অনতিবিলম্বেই আমি ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়াছিলাম। সাক্ষী ছিদাম আমার নিকট সমস্ত স্বীকার করিয়া আমার পা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, 'বউকে কী করিয়া উদ্ধার করিব আমাকে যুক্তি দিন।' আমি ভালো মন্দ কিছুই বলিলাম না। সাক্ষী আমাকে বলিল, আমি যদি বলি আমার বড়ো ভাই ভাত চাহিয়া ভাত পায় নাই বলিয়া রাগের মাথায় স্ত্রীকে মারিয়াছে, তাহা হইলে সে কি রক্ষা পাইবে।' আমি কহিলাম, 'খবরদার হারামজাদা, আদালতে একবর্ণও মিথ্যা বলিস না—এতবড়ো মহাপাপ আর নাই' ইত্যাদি।

রামলোচন প্রথমে চন্দরাকে রক্ষা করিবার উদ্দেশে অনেকগুলা গল্প বানাইয়া তুলিয়াছিল, কিন্তু যখন দেখিল, চন্দরা নিজে বাঁকিয়া দাঁড়াইয়াছে, তখন ভাবিল, ওরে বাপ রে শেষকালে কি মিথ্যা সাক্ষ্যের দায়ে পড়িব। যেটুকু জানি সেটুকু বলা ভালো, এই মনে করিয়া রামলোচন যাহা জানে তাহাই বলিল। বরঞ্চ তাহার চেয়েও কিছু বেশি বলিতে ছাড়িল না।

ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সেশনে চালান দিলেন।

ইতিমধ্যে চাষবাস হাটবাজার হাসিকান্না পৃথিবীর সমস্ত কাজ চলিতে লাগিল। এবং পূর্ব পূর্ব বৎসরের মতো নবীন ধান্যক্ষেত্রে শ্রাবণের অবিরল বৃষ্টিধারা বর্ষিত হইতে লাগিল।

পুলিস আসামী এবং সাক্ষী লইয়া আদালতে হাজির। সম্মুখবর্তী মুন্সেফের কোর্টে বিস্তর লোক নিজ নিজ মোকদ্দমার অপেক্ষায় বসিয়া আছে। রন্ধনশালার পশ্চাদ্বর্তী একটি ডোবার অংশ-বিভাগ লইয়া কলিকাতা হইতে এক উকিল আসিয়াছে এবং তদুপলক্ষে বাদীর পক্ষে উনচল্লিশজন সাক্ষী উপস্থিত আছে। কতশত লোক আপন আপন কড়াগণ্ডা হিসাবের চুলচেরা মীমাংসা করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া আসিয়াছে, জগতে আপাতত তদপেক্ষা গুরুতর আর কিছুই উপস্থিত নাই এইরূপ তাহাদের ধারণা। ছিদাম বাতায়ন হইতে এই অত্যন্ত ব্যস্তসমস্ত প্রতিদিনের পৃথিবীর দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছে, সমস্তই স্বপ্নের মতো বোধ হইতেছে। কম্পাউণ্ডের বৃহৎ বটগাছ হইতে একটি কোকিল ডাকিতেছে—তাহাদের কোনোরূপ আইন-আদালত নাই।

চন্দরা জজের কাছে কহিল, "ওগো সাহেব, এক কথা আর বারবার কতবার করিয়া বলিব।"

জজসাহেব তাহাকে বুঝাইয়া বলিলেন, "তুমি যে অপরাধ স্বীকার করিতেছ তাহার শাস্তি কী জানো ?"

চন্দরা কহিল, "না।"

জজসাহেব কহিলেন, "তাহার শাস্তি ফাঁসি।"

চন্দরা কহিল, "ওগো তোমার পায়ে পড়ি. তাই দাওনা সাহেব। তোমাদের যাহা খুশি করো, আমার তো আর সহ্য হয় না।"

যখন ছিদামকে আদালতে উপস্থিত করিল, চন্দরা মুখ ফিরাইল। জজ কহিলেন, "সাক্ষীর দিকে চাহিয়া বলো এ তোমার কে হয়।"

চন্দরা দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কহিল, "ও আমার স্বামী হয়।"

প্রশ্ন হইল—ও তোমাকে ভালোবাসে না?

উত্তর। উঃ ভারি ভালোবাসে।

প্রশ্ন। তুমি উহাকে ভালোবাস না?

উত্তর। খুব ভালোবাসি।

ছিদামকে যখন প্রশ্ন হইল, ছিদাম কহিল, "আমি খুন করিয়াছি।"

প্রশ্ন। কেন।

ছিদাম। ভাত চাহিয়াছিলাম বড়োবউ ভাত দেয় নাই।

দুখিরাম সাক্ষ্য দিতে আসিয়া, মূর্ছিত হইয়া পড়িল। মূর্ছাভঙ্গের পর উত্তর করিল, "সাহেব, খুন আমি করিয়াছি।"

কেন।

ভাত চাহিয়াছিলাম ভাত দেয় নাই।

বিস্তর জেরা করিয়া এবং অন্যান্য সাক্ষ্য শুনিয়া জজসাহেব স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন, ঘরের স্ত্রীলোককে ফাঁসির অপমান হইতে বাঁচাইবার জন্য ইহারা দুই ভাই অপরাধ স্বীকার করিতেছে। কিন্তু চন্দরা পুলিস হইতে সেশন আদালত পর্যন্ত বরাবর এককথা বলিয়া আসিতেছে, তাহার কথার তিলমাত্র নড়চড় হয় নাই। দুইজন উকিল স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া তাহাকে প্রাণদণ্ড হইতে রক্ষা করিবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু অবশেষে তাহার নিকট পরাস্ত মানিয়াছে।

যেদিন একরত্তি বয়সে একটি কালোকোলো ছোটোখাটো মেয়ে তাহার গোলগাল মুখটি লইয়া খেলার পুতুল ফেলিয়া বাপের ঘর হইতে শ্বশুরঘরে আসিল, সেদিন রাত্রে শুভলগ্নের সময় আজিকার দিনের কথা কে কল্পনা করিতে পারিত। তাহার বাপ মরিবার সময় এই বলিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিল যে, যাহা হউক আমার মেয়েটির একটি সদ্গতি করিয়া গেলাম।

জেলখানায় ফাঁসির পূর্বে দয়ালু সিভিল সার্জন চন্দরাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কাহাকেও দেখিতে ইচ্ছা কর?"

চন্দরা কহিল, “একবার আমার মাকে দেখিতে চাই।”

ডাক্তার কহিল “তোমার স্বামী তোমাকে দেখিতে চায়, তাহাকে কি ডাকিয়া আনিব।”

চন্দরা কহিল, “মরণ।—”

শ্রাবণ, ১৩০০

একটি ক্ষুদ্র পুরাতন গল্প

গল্প বলিতে হইবে? কিন্তু আর তো পারি না। এখন এই পরিশ্রান্ত অক্ষম ব্যক্তিটিকে ছুটি দিতে হইবে।

এ পদ আমাকে কে দিল বলা কঠিন। ক্রমে ক্রমে একে একে তোমরা পাঁচজন আসিয়া আমার চারিদিকে কখন জড়ো হইলে, এবং কেন যে তোমরা আমাকে এত অনুগ্রহ করিলে এবং আমার কাছে এত প্রত্যাশা করিলে, তাহা বলা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য। অবশ্যই সে তোমাদের নিজগুণে; শুভাদৃষ্টক্রমে আমার প্রতি সহসা তোমাদের অনুগ্রহ উদয় হইয়াছিল। এবং যাহাতে সে অনুগ্রহ রক্ষা হয় সাধ্যমতো সে চেষ্টার ত্রুটি হয় নাই।

কিন্তু পাঁচজনের অব্যক্ত অনির্দিষ্ট সম্মতিক্রমে যে কার্যভার আমার প্রতি অর্পিত হইয়া পড়িয়াছে আমি তাহার যোগ্য নহি। ক্ষমতা আছে কি না তাহা লইয়া বিনয় বা অহংকার করিতে চাহি না কিন্তু প্রধান কারণ এই যে, বিধাতা আমাকে নির্জনচর জীবরূপেই গঠিত করিয়াছিলেন। খ্যাতি যশ জনতার উপযোগী করিয়া আমার গাত্রে কঠিন চর্মাবরণ দিয়া দেন নাই; তাঁহার এই বিধান ছিল যে, যদি তুমি আত্মরক্ষা করিতে চাও তো একটু নিরালার মধ্যে বাস করিয়ো। চিত্তও সেই নিরালা বাসস্থানটুকুর জন্য সর্বদাই উৎকণ্ঠিত হইয়া আছে। কিন্তু পিতামহ অদৃষ্ট পরিহাস করিয়াই হউক অথবা ভুল বুঝিয়াই হউক, আমাকে একটি বিপুল জনসমাজের মধ্যে উত্তীর্ণ করিয়া এক্ষণে মুখে কাপড় দিয়া হাস্য করিতেছেন; আমি তাঁহার সেই হাস্যে যোগ দিবার চেষ্টা করিতেছি কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য হইতে পারিতেছি না।

পলায়ন করাও আমার কর্তব্য বলিয়া মনে হয় না। সৈন্যদলের মধ্যে এমন অনেক ব্যক্তি আছে যাহারা স্বভাবতই যুদ্ধের অপেক্ষা শান্তির মধ্যেই অধিকতর স্ফূর্তি পাইতে পারিত কিন্তু যখন সে নিজের এবং পরের ভ্রমক্রমে যুদ্ধক্ষেত্রের মাঝখানে আসিয়া

দাঁড়াইয়াছে তখন হঠাৎ দল ভাঙিয়া পলায়ন করা তাহাকে শোভা পায় না। অদৃষ্ট সুবিবেচনাপূর্বক প্রাণিগণকে যথাসাধ্য কর্মে নিয়োগ করেন না, কিন্তু তথাপি নিযুক্ত কার্য দৃঢ় নিষ্ঠার সহিত সম্পন্ন করা মানুষের কর্তব্য।

তোমরা আবশ্যক বোধ করিলে আমার নিকট আসিয়া থাক, এবং সম্মান দেখাইতেও ত্রুটি কর না। আবশ্যক অতীত হইয়া গেলে সেবকাধমের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া কিছু আত্মগৌরব অনুভব করিবারও চেষ্টা করিয়া থাক। পৃথিবীতে সাধারণত ইহাই স্বাভাবিক এবং এই কারণেই “সাধারণ” নামক একটি অকৃতজ্ঞ অব্যবস্থিতচিত্ত রাজাকে তাহার অনুচরবর্গ সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে না কিন্তু অনুগ্রহ-নিগ্রহের দিকে তাকাইলে সকল সময় কাজ করা হইয়া উঠে না। নিরপেক্ষ হইয়া কাজ না করিলে কাজের গৌরব আর থাকে না।

অতএব যদি কিছু শুনিতে ইচ্ছা করিয়া আসিয়া থাক তো কিছু শুনাইব। শ্রান্তি মানিব না এবং উৎসাহেরও প্রত্যাশা করিব না।

আজ কিন্তু অতি ক্ষুদ্র এবং পৃথিবীর অত্যন্ত পুরাতন একটি গল্প মনে পড়িতেছে। মনোহর না হইলেও সংক্ষেপবশত শুনিতে ধৈর্যচ্যুতি না হইবার সম্ভাবনা।

পৃথিবীর একটি মহানদীর তীরে একটি মহারণ্য ছিল। সেই অরণ্যে এবং সেই নদীতীরে এক কাঠঠোকরা এবং একটি কাদাখোঁচা পক্ষী বাস করিত।

ধরাতলে কীট যখন সুলভ ছিল তখন ক্ষুধানিবৃত্তিপূর্বক সন্তুষ্টচিত্তে উভয়ে ধরাধামের যশোকীর্তন করিয়া পুষ্টকলেবরে বিচরণ করিত।

কালক্রমে দৈবযোগে পৃথিবীতে কীট দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিল।

তখন নদীতীরস্থ কাদাখোঁচা শাখাসীন কাঠঠোকরাকে কহিল, “ভাই কাঠঠোকরা, বাহির হইতে অনেকের নিকট এই পৃথিবী নবীন শ্যামল সুন্দর বলিয়া মনে হয় কিন্তু আমি দেখিতেছি ইহা আদ্যোপান্ত জীর্ণ।”

শাখাসীন কাঠঠোকরা নদীতটস্থ কাদাখোঁচাকে বলিল, “ভাই কাদাখোঁচা, অনেকে এই অরণ্যকে সতেজ শোভন বলিয়া বিশ্বাস করে, কিন্তু আমি বলিতেছি ইহা একেবারে অন্তঃসারবিহীন।”

তখন উভয়ে মিলিয়া তাহাই প্রমাণ করিয়া দিতে কৃতসংকল্প হইল। কাদাখোঁচা নদীতীরে লম্ফ দিয়া, পৃথিবীর কোমল কর্দমে অনবরতই চঞ্চু বিদ্ধ করিয়া বসুন্ধরার জীর্ণতা নির্দেশ করিতে লাগিল এবং কাঠঠোকরা বনস্পতির কঠিন শাখায় বারংবার চঞ্চু আঘাত করিয়া অরণ্যের অন্তঃশূন্যতা প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইল।

বিধিবিড়ম্বনায় উক্ত দুই অধ্যবসায়ী পক্ষী সংগীতবিদ্যায় বঞ্চিত। অতএব কোকিল যখন ধরাতলে নব নব বসন্তসমাগম পঞ্চম স্বরে ঘোষণা করিতে লাগিল, এবং শ্যামা যখন অরণ্যে নব নব প্রভাতোদয় কীর্তন করিতে নিযুক্ত রহিল, তখন এই দুই ক্ষুধিত অসন্তুষ্ট মূক পক্ষী অশ্রান্ত উৎসাহে আপন প্রতিজ্ঞা পালন করিতে লাগিল।

এ গল্প তোমাদের ভালো লাগিল না? ভালো লাগিবার কথা নহে। কিন্তু ইহার সর্বাপেক্ষা মহৎ গুণ এই যে, পাঁচ-সাত প্যারাগ্রাফেই সম্পূর্ণ।

এই গল্পটা যে পুরাতন তাহাও তোমাদের মনে হইতেছে না? তাহার কারণ পৃথিবীর ভাগ্যদোষে এ গল্প অতিপুরাতন হইয়াও চিরকাল নূতন রহিয়া গেল। বহুদিন হইতেই অকৃতজ্ঞ কাঠঠোকরা পৃথিবীর দৃঢ় কঠিন অমর মহত্ত্বের উপর ঠক ঠক শব্দে চঞ্চুপাত করিতেছে, এবং কাদাখোঁচা পৃথিবীর সরস উর্বর কোমলত্বের মধ্যে খচ খচ শব্দে চঞ্চু বিদ্ধ করিতেছে—আজও তাহার শেষ হইল না, মনের আক্ষেপ এখনও রহিয়া গেল।

গল্পটার মধ্যে সুখদুঃখের কথা কী আছে জিজ্ঞাসা করিতেছ? ইহার মধ্যে দুঃখের কথাও আছে সুখের কথাও আছে। দুঃখের কথা এই যে, পৃথিবী যতই উদার এবং অরণ্য যতই মহৎ হউক, ক্ষুদ্র চঞ্চু আপনার উপযুক্ত খাদ্য না পাইবামাত্র তাহাদিগকে আঘাত করিয়া আসিতেছে। এবং সুখের বিষয় এই যে, তথাপি শত সহস্র বৎসর পৃথিবী নবীন এবং অরণ্য শ্যামল রহিয়াছে। যদি কেহ মরে তো সে ওই দুটি বিদ্বেষবিষজর্জর হতভাগ্য বিহঙ্গ, এবং জগতে কেহ সে সংবাদ জানিতেও পায় না।

তোমরা এ গল্পের মধ্যে মাথামুণ্ডু অর্থ কী আছে কিছু বুঝিতে পার নাই? তাৎপর্য বিশেষ কিছুই জটিল নহে, হয়তো কিঞ্চিৎ বয়সপ্রাপ্ত হইলেই বুঝিতে পারিবে।

যাহাই হউক সর্বসুদ্ধ জিনিসটা তোমাদের উপযুক্ত হয় নাই?

তাহার তো কোনো সন্দেহমাত্র নাই।

ভাদ্র, ১৩০০

সমাপ্তি

প্রথম পরিচ্ছেদ

অপূর্বকৃষ্ণ বি এ. পাস করিয়া কলিকাতা হইতে দেশে ফিরিয়া আসিতেছেন।

নদীটি ক্ষুদ্র। বর্ষা অন্তে প্রায় শুকাইয়া যায়। এখন শ্রাবণের শেষে জলে ভরিয় উঠিয়া একেবারে গ্রামের বেড়া ও বাঁশঝাড়ের তলদেশ চুম্বন করিয়া চলিয়াছে।

বহুদিন ঘন বর্ষার পরে আজ মেঘমুক্ত আকাশে রৌদ্র দেখা দিয়াছে।

নৌকায় আসীন অপূর্বকৃষ্ণের মনের ভিতরকার একখানি ছবি যদি দেখিতে পাইতা তবে দেখিতাম সেখানেও এই যুবকের মানস-নদী নববর্ষায় কূলে কূলে ভরিয়া আলোক ঝলঝল এবং বাতাসে ছলছল করিয়া উঠিতেছে।

নৌকা যথাস্থানে ঘাটে আসিয়া লাগিল। নদীতীর হইতে অপূর্বদের বাড়ির পাক ছাদ গাছের অন্তরাল দিয়া দেখা যাইতেছে। অপূর্বের আগমন-সংবাদ বাড়ির কে জানিত না সেইজন্য ঘাটে লোক আসে নাই। মাঝি ব্যাগ লইতে উদ্যত হইলে অপূ তাহাকে নিবারণ করিয়া নিজেই ব্যাগ হাতে লইয়া আনন্দভরে তাড়াতাড়ি নামিয় পড়িল।

নামিবামাত্র, তীরে ছিল পিছল, ব্যাগসমেত অপূর্ব কাদায় পড়িয়া গেল। যেম পড়া, অমনি,—কোথা হইতে এক সুমিষ্ট উচ্চকণ্ঠে তরল হাস্যলহরী উচ্ছ্বসিত হইয় নিকটবর্তী অশথগাছের পাখিগুলিকে সচকিত করিয়া দিল।

অপূর্ব অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া তাড়াতাড়ি আত্মসংবরণ করিয়া চাহিয়া দেখিল দেখিল, তীরে মহাজনের নৌকা হইতে নূতন ইঁট রাশীকৃত করিয়া নামাইয়া রাখা হইয়াছে তাহারই উপরে বসিয়া একটি মেয়ে হাস্যবেগে এখনই শতধা হইয়া যাইবে এমনি মন হইতেছে।

অপূর্ব চিনিতে পারিল তাহাদেরই নূতন প্রতিবেশিনীর মেয়ে মৃন্ময়ী। দূরে বড় নদীর ধারে ইহাদের বাড়ি ছিল, সেখানে নদীর ভাঙনে দেশ ত্যাগ করিয়া বছর দুই-তিন হইল এই গ্রামে আসিয়া বাস করিতেছে।

এই মেয়েটির অখ্যাতির কথা অনেক শুনিতে পাওয়া যায়। পুরুষ গ্রামবাসীরা স্নেহভরে ইহাকে পাগলী বলে, কিন্তু গ্রামের গৃহিণীরা ইহার উচ্ছৃঙ্খল স্বভাবে সর্বদা ভীত চিন্তিত শঙ্কান্বিত। গ্রামের যত ছেলেদের সহিতই ইহার খেলা; সমবয়সী মেয়েদের প্রতি অবজ্ঞার সীমা নাই। শিশুরাজ্যে এই মেয়েটি একটি ছোটোখাটো বর্গির উপদ্রব বলিলেই হয়।

বাপের আদরের মেয়ে ছিল, সেইজন্য ইহার এতটা দুর্দান্ত প্রতাপ। এই সম্বন্ধে বন্ধুদের নিকট মৃন্ময়ীর মা স্বামীর বিরুদ্ধে সর্বদা অভিযোগ করিতে ছাড়িত না, অথচ বাপ ইহাকে ভালোবাসে, বাপ কাছে থাকিলে মৃন্ময়ীর চোখের অশ্রুবিন্দু তাহার অন্তরে বড়োই বাজিত ইহাই মনে করিয়া প্রবাসী স্বামীকে স্মরণপূর্বক মৃন্ময়ীর মা মেয়েকে কিছুতেই কাঁদাইতে পারিত না।

মৃন্ময়ী দেখিতে শ্যামবর্ণ। ছোটো কোঁকড়া চুল পিঠ পর্যন্ত পড়িয়াছে। ঠিক যেন বালকের মতো মুখের ভাব। মস্ত মস্ত দুটি কালো চক্ষুতে না আছে লজ্জা, না আছে ভয়, না আছে হাবভাবলীলার লেশমাত্র। শরীর দীর্ঘ পরিপুষ্ট সুস্থ সবল, কিন্তু তাহার বয়স অধিক কি অল্প সে প্রশ্ন কাহারও মনে উদয় হয় না; যদি হইত, তবে এখনও অবিবাহিত আছে বলিয়া লোকে তাহার পিতামাতাকে নিন্দা করিত। গ্রামে বিদেশী জমিদারের নৌকা কালক্রমে যেদিন ঘাটে আসিয়া লাগে সেদিন গ্রামের লোকেরা সম্ভ্রমে শশব্যস্ত হইয়া উঠে, ঘাটের মেয়েদের মুখ-রঙ্গভূমিতে অকস্মাৎ নাসাগ্রভাগ পর্যন্ত যবনিকাপতন হয়, কিন্তু মৃন্ময়ী কোথা হইতে একটা উলঙ্গ শিশুকে কোলে লইয়া কোঁকড়া চুলগুলি পিঠে দোলাইয়া ছুটিয়া ঘাটে আসিয়া উপস্থিত। যে দেশে ব্যাধ নাই বিপদ নাই সেই দেশের হরিণশিশুর মতো নির্ভীক কৌতূহলে দাঁড়াইয়া চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে থাকে, অবশেষে আপন দলের বালকসঙ্গীদের নিকট ফিরিয়া গিয়া এই নবাগত প্রাণীর আচারব্যবহার সম্বন্ধে বিস্তর বাহুল্য বর্ণনা করে।

আমাদের অপূর্ব ইতিপূর্বে ছুটি উপলক্ষে বাড়ি আসিয়া এই বন্ধনবিহীন বালিকাটিকে দুই-চারিবার দেখিয়াছে এবং অবকাশের সময়, এমন কি, অনবকাশের সময়ও ইহার সম্বন্ধে চিন্তা করিয়াছে। পৃথিবীতে অনেক মুখ চোখে পড়ে কিন্তু এক একটি মুখ বলাকহা নাই একেবারে মনের মধ্যে গিয়া উত্তীর্ণ হয়। সে কেবল সৌন্দর্যের জন্য নহে, আর একটা কী গুণ আছে। সে গুণটি বোধ করি স্বচ্ছতা। অধিকাংশ মুখের মধ্যেই মনুষ্যপ্রকৃতিটি আপনাকে পরিস্ফুটরূপে প্রকাশ করিতে পারে না; যে-মুখে সেই অন্তরগুহাবাসী রহস্যময় লোকটি অবাধে বাহির হইয়া দেখা দেয়, সে মুখ সহস্রের মধ্যে চোখে পড়ে এবং এক পলকে মনে মুদ্রিত হইয়া যায়। এই বালিকার মুখে চোখে একটি দুরন্ত অবাধ্য নারীপ্রকৃতি উন্মুক্ত বেগবান অরণ্যমৃগের মতো সর্বদা দেখা দেয়, খেলা করে, সেইজন্য এই জীবনচঞ্চল মুখখানি একবার দেখিলে আর সহজে ভোলা যায় না।

পাঠকদিগকে বলা বাহুল্য, মৃন্ময়ীর কৌতুকহাস্যধ্বনি যতই সুমিষ্ট হউক দুর্ভাগা অপূর্বর পক্ষে কিঞ্চিৎ ক্লেশদায়ক হইয়াছিল। সে তাড়াতাড়ি মাঝির হাতে ব্যাগ সমর্পণ করিয়া রক্তিমমুখে দ্রুতবেগে গৃহ অভিমুখে চলিতে লাগিল।

আয়োজনটি অতি সুন্দর হইয়াছিল। নদীর তীর, গাছের ছায়া, পাখির গান, প্রভাতের রৌদ্র, কুড়ি বৎসর বয়স; অবশ্য ইটের স্তূপটা তেমন উল্লেখযোগ্য নহে, কিন্তু যে ব্যক্তি তাহার উপর বসিয়া ছিল সে এই শুষ্ক কঠিন আসনের প্রতিও একটি মনোরম শ্রী বিস্তার করিয়াছিল। হায়, এমন দৃশ্যের মধ্যে প্রথম পদক্ষেপমাত্রেই যে সমস্ত কবিত্ব প্রহসনে পরিণত হয় ইহা অপেক্ষা অদৃষ্টের নিষ্ঠুরতা আর কী হইতে পারে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সেই ইষ্টকশিখর হইতে প্রবহমান হাস্যধ্বনি শুনিতে শুনিতে চাদরে ও ব্যাগে কাদা মাখিয়া গাছের ছায়া দিয়া অপূর্ব বাড়িতে গিয়া উপস্থিত হইল।

অকস্মাৎ পুত্রের আগমনে তাহার বিধবা মাতা পুলকিত হইয়া উঠিলেন। তৎক্ষণাৎ ক্ষীর-দধি-রুইমাছের সন্ধানে দূরে নিকটে লোক দৌড়িল এবং পাড়াপ্রতিবেশীর মধ্যেও একটা আন্দোলন উপস্থিত হইল।

আহারান্তে মা অপূর্বর বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। অপূর্ব সেজন্য প্রস্তুত হইয়া ছিল। কারণ প্রস্তাব অনেক পূর্বেই ছিল, কিন্তু পুত্র নব্যতন্ত্রের নূতন ধুয়া ধরিয়া জেদ করিয়া বসিয়া ছিল যে, বি. এ. পাস না করিয়া বিবাহ করিব না। এতকাল জননী সেইজন্য অপেক্ষা করিয়া ছিলেন, অতএব এখন আর কোনো ওজর করা মিথ্যা। অপূর্ব কহিল, "আগে পাত্রী দেখা হউক, তাহার পর স্থির হইবে।" মা কহিলেন, "পাত্রী দেখা হইয়াছে, সেজন্য তোকে ভাবিতে হইবে না।" অপূর্ব ওই ভাবনাটা নিজে ভাবিতে প্রস্তুত হইল এবং কহিল, "মেয়ে না দেখিয়া বিবাহ করিতে পারিব না।" মা ভাবিলেন, এমন সৃষ্টিছাড়া কথাও কখনো শোনা যায় নাই, কিন্তু সম্মত হইলেন।

সে-রাত্রে অপূর্ব প্রদীপ নিবাইয়া বিছানায় শয়ন করিলে পর বর্ষানিশীথের সমস্ত শব্দ এবং সমস্ত নিস্তব্ধতার পরপ্রান্ত হইতে বিজন বিনিদ্র শয্যায় একটি উচ্ছ্বসিত উচ্চ মধুর কণ্ঠের হাস্যধ্বনি তাহার কানে আসিয়া ক্রমাগত বাজিতে লাগিল। মন নিজেকে কেবলই এই বলিয়া পীড়া দিতে লাগিল যে, সকালবেলাকার সেই পদস্খলনটা যেন কোনো একটা উপায়ে সংশোধন করিয়া লওয়া উচিত। বালিকা জানিল না যে, আমি অপূর্বকৃষ্ণ অনেক বিদ্যা উপার্জন করিয়াছি, কলিকাতায় বহুকাল যাপন করিয়া আসিয়াছি, দৈবাৎ পিছলে পা দিয়া কাদায় পড়িয়া গেলেও আমি উপহাস্য উপেক্ষণীয় একজন যে-সে গ্রাম্য যুবক নহি।

পরদিন অপূর্ব কনে দেখিতে যাইবে। অধিক দূরে নহে, পাড়াতেই তাহাদের বাড়ি। একটু বিশেষ যত্নপূর্বক সাজ করিল। ধুতি ও চাদর ছাড়িয়া সিল্কের চাপকান

জোব্বা, মাথায় একটা গোলাকার পাগড়ি, এবং বার্নিশকরা একজোড়া জুতা পায়ে দিয়া সিল্কের ছাতা হস্তে প্রাতঃকালে বাহির হইল।

সম্ভাবিত শ্বশুরবাড়িতে পদার্পণ করিবামাত্র মহা সমারোহ-সমাদরের ঘটা পড়িয়া গেল। অবশেষে যথাকালে কম্পিতহৃদয় মেয়েটিকে ঝাড়িয়া মুছিয়া রং করিয়া খোঁপায় রাংতা জড়াইয়া একখানি পাতলা রঙিন কাপড়ে মুড়িয়া বরের সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করা হইল। সে এক কোণে নীরবে মাথা প্রায় হাঁটুর কাছে ঠেকাইয়া বসিয়া রহিল এবং এক প্রৌঢ়া দাসী তাহাকে সাহস দিবার জন্য পশ্চাতে উপস্থিত রহিল। কনের এক বালক ভাই তাহাদের পরিবারের মধ্যে এই এক নূতন অনধিকার প্রবেশোদ্যত লোকটির পাগড়ি, ঘড়ির চেন এবং নবোদ্গত শ্মশ্রু একমনে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। অপূর্ব কিয়ৎকাল গোঁফে তা দিয়া অবশেষে গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কী পড়।" বসনভূষণাচ্ছন্ন লজ্জাস্তূপের নিকট হইতে তাহার কোনো উত্তর পাওয়া গেল না। দুই-তিনবার প্রশ্ন এবং প্রৌঢ়া দাসীর নিকট হইতে পৃষ্ঠদেশে বিস্তর উৎসাহজনক করতাড়নের পর বালিকা মৃদুস্বরে একনিঃশ্বাসে অত্যন্ত দ্রুত বলিয়া গেল, চারুপাঠ দ্বিতীয় ভাগ, ব্যাকরণসার প্রথম ভাগ, ভূগোলবিবরণ, পাটিগণিত, ভারতবর্ষের ইতিহাস। এমন সময় বহির্দেশে একটা অশান্ত গতির ধুপধাপ শব্দ শোনা গেল এবং মুহূর্তের মধ্যে দৌড়িয়া হাঁপাইয়া পিঠের চুল দোলাইয়া মৃন্ময়ী ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল। অপূর্বকৃষ্ণের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া একেবারে কনের ভাই রাখালের হাত ধরিয়া টানাটানি আরম্ভ করিয়া দিল। রাখাল তখন আপন পর্যবেক্ষণশক্তির চর্চায় একান্তমনে নিযুক্ত ছিল, সে কিছুতেই উঠিতে চাহিল না। দাসীটি তাহার সংযত কণ্ঠস্বরের মৃদুতা রক্ষার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া যথাসাধ্য তীব্রভাবে মৃন্ময়ীকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিল। অপূর্বকৃষ্ণ আপনার সমস্ত গাম্ভীর্য এবং গৌরব একত্র করিয়া পাগড়িপরা মস্তকে অভ্রভেদী হইয়া বসিয়া রহিল এবং পেটের কাছে ঘড়ির চেন নাড়িতে লাগিল। অবশেষে সঙ্গীটিকে কিছুতেই বিচলিত করিতে না পারিয়া তাহার পিঠে একটা সশব্দ চপেটাঘাত করিয়া এবং চট করিয়া কনের মাথার ঘোমটা টানিয়া খুলিয়া দিয়া ঝড়ের মতো মৃন্ময়ী ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। দাসীটি গুমরিয়া গর্জন করিতে লাগিল এবং ভগ্নীর অকস্মাৎ অবগুণ্ঠন মোচনে রাখাল খিল খিল শব্দে হাসিতে আরম্ভ করিল। নিজের পৃষ্ঠের প্রবল চপেটাঘাতটি সে অন্যায় প্রাপ্য মনে করিল না, কারণ, এরূপ দেনা পাওনা তাহাদের মধ্যে সর্বদাই চলিতেছে। এমন কি, পূর্বে মৃন্ময়ীর চুল কাঁধ ছাড়াইয়া পিঠের মাঝামাঝি আসিয়া পড়িত; রাখালই একদিন হঠাৎ পশ্চাৎ হইতে আসিয়া তাহার ঝুঁটির মধ্যে কাঁচি চালাইয়া দেয়। মৃন্ময়ী তখন অত্যন্ত রাগ করিয়া তাহার হাত হইতে

কাঁচিটি কাড়িয়া লইয়া নিজের অবশিষ্ট পশ্চাতের চুল ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দে নির্দয়ভাবে কাটিয়া ফেলিল, তাহার কোঁকড়া চুলের স্তবকগুলি শাখাচ্যুত কালো আঙুরের স্তূপের মতো গুচ্ছ গুচ্ছ মাটিতে পড়িয়া গেল। উভয়ের মধ্যে এরূপ শাসনপ্রণালী প্রচলিত ছিল।

অতঃপর এই নীরব পরীক্ষাসভা আর অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না। পিণ্ডাকার কন্যাটি কোনোমতে পুনশ্চ দীর্ঘাকার হইয়া দাসী সহকারে অন্তঃপুরে চলিয়া গেল। অপূর্ব পরম গম্ভীরভাবে বিরল গুম্ফরেখায় তা দিতে দিতে উঠিয়া ঘরের বাহিরে যাইতে উদ্যত হইল। দ্বারের নিকটে গিয়া দেখে, বার্নিশ-করা নূতন জুতাজোড়াটি যেখানে ছিল সেখানে নাই, এবং কোথায় আছে তাহাও বহুচেষ্টায় অবধারণ করা গেল না।

বাড়ির লোক সকলেই বিষম বিব্রত হইয়া উঠিল এবং অপরাধীর উদ্দেশে গালি ও ভর্ৎসনা অজস্র বর্ষিত হইতে লাগিল। অনেক খোঁজ করিয়া অবশেষে অনন্যোপায় হইয়া বাড়ির কর্তার পুরাতন ছিন্ন ঢিলা চটিজোড়াটা পরিয়া প্যান্টলুন চাপকান পাগড়ি সমেত সুসজ্জিত অপূর্ব কর্দমাক্ত গ্রামপথে অত্যন্ত সাবধানে চলিতে লাগিল।

পুষ্করিণীর ধারে নির্জন পথপ্রান্তে আবার হঠাৎ সেই উচ্চকণ্ঠের অজস্র হাস্যকলোচ্ছ্বাস। যেন তরুপল্লবের মধ্য হইতে কৌতুকপ্রিয়া বনদেবী অপূর্বর ওই অসংগত চটিজুতাজোড়ার দিকে চাহিয়া হঠাৎ আর হাসি ধারণ করিয়া রাখিতে পারিল না।

অপূর্ব অপ্রতিভভাবে থমকিয়া দাঁড়াইয়া ইতস্তত নিরীক্ষণ করিতেছে এমন সময় ঘন বন হইতে বাহির হইয়া একটি নির্লজ্জ অপরাধিনী তাহার সম্মুখে নূতন জুতাজোড়াটি রাখিয়াই পলায়নোদ্যত হইল। অপূর্ব দ্রুতবেগে দুই হাত ধরিয়া তাহাকে বন্দী করিয়া ফেলিল।

মৃন্ময়ী আঁকিয়া বাঁকিয়া হাত ছাড়াইয়া পলাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। কোঁকড়া চুলে বেষ্টিত তাহার পরিপুষ্ট সহাস্য দুষ্ট মুখখানির উপরে শাখান্তরালচ্যুত সূর্যকিরণ আসিয়া পড়িল। রৌদ্রোজ্জ্বল নির্মল চঞ্চল নির্ঝরিণীর দিকে অবনত হইয়া কৌতূহলী পথিক যেমন নিবিষ্টদৃষ্টিতে তাহার তলদেশ দেখিতে থাকে, অপূর্ব তেমনি করিয়া গভীর গম্ভীর নেত্রে মৃন্ময়ীর উর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত মুখের উপর, তড়িত্তরল দুটি চক্ষুর মধ্যে চাহিয়া দেখিল এবং অত্যন্ত ধীরে ধীরে মুষ্টি শিথিল করিয়া যেন যথাকর্তব্য অসম্পন্ন রাখিয়া বন্দিনীকে ছাড়িয়া দিল। অপূর্ব যদি রাগ করিয়া মৃন্ময়ীকে ধরিয়া মারিত তাহা হইলে সে কিছুই আশ্চর্য হইত না, কিন্তু নির্জন পথের মধ্যে এই অপরূপ নীরব শাস্তির সে কোনো অর্থ বুঝিতে পারিল না।

নৃত্যময়ী প্রকৃতির নূপুরনিক্কণের ন্যায় চঞ্চল হাস্যধ্বনিটি সমস্ত আকাশ ব্যাপিয়া বাজিতে লাগিল এবং চিন্তানিমগ্ন অপূর্বকৃষ্ণ অত্যন্ত ধীরপদক্ষেপে বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অপূর্ব সমস্তদিন নানা ছুতা করিয়া অন্তঃপুরে মার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেল না। বাহিরে নিমন্ত্রণ ছিল, খাইয়া আসিল। অপূর্বর মতো এমন একজন কৃতবিদ্য গম্ভীর ভাবুক লোক একটি সামান্য অশিক্ষিতা বালিকার কাছে আপনার লুপ্ত গৌরব উদ্ধার করিবার, আপনার আন্তরিক মাহাত্ম্যের পরিপূর্ণ পরিচয়-দিবার জন্য কেন যে এতটা বেশি উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিবে তাহা বুঝা কঠিন। একটি পাড়াগাঁয়ের চঞ্চল মেয়ে তাঁহাকে সামান্য লোক মনে করিলই বা। সে যদি মুহূর্তকালের জন্য তাঁহাকে হাস্যাস্পদ করিয়া তার পর তাঁহার অস্তিত্ব বিস্মৃত হইয়া রাখাল নামক একটি নির্বোধ নিরক্ষর বালকের সহিত খেলা করিবার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করে তাহাতেই বা তাঁহার ক্ষতি কী। তাহার কাছে প্রমাণ করিবার আবশ্যক কী যে, তিনি বিশ্বদীপ নামক মাসিক পত্রে গ্রন্থ সমালোচনা করিয়া থাকেন, এবং তাঁহার তোরঙ্গের মধ্যে এসেন্স, জুতা, রুবিনির ক্যাম্ফর, রঙিন চিঠির কাগজ এবং "হারমোনিয়ম শিক্ষা" বহির সঙ্গে একখানি পরিপূর্ণ খাতা নিশীথের গর্ভে ভাবী উষার ন্যায় প্রকাশের প্রতীক্ষায় রহিয়াছে। কিন্তু মনকে বুঝানো কঠিন এবং এই পল্লিবাসিনী চঞ্চলা মেয়েটির কাছে শ্রীযুক্ত অপূর্বকৃষ্ণ রায় বি. এ কিছুতেই পরাভব স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহে।

সন্ধ্যার সময়ে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলে মা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন রে অপু, মেয়ে কেমন দেখলি। পছন্দ হয় তো?"

অপূর্ব কিঞ্চিৎ অপ্রতিভভাবে কহিল, "মেয়ে দেখেছি মা, ওর মধ্যে একটিকে আমার পছন্দ হয়েছে।"

মা আশ্চর্য হইয়া কহিলেন, "তুই আবার কটি মেয়ে দেখলি!"

অবশেষে অনেক ইতস্ততর পর প্রকাশ পাইল প্রতিবেশিনী শরতের মেয়ে মৃন্ময়ীকে তাঁহার ছেলে পছন্দ করিয়াছে। এত লেখাপড়া শিখিয়া এমনি ছেলের পছন্দ!

প্রথমে অপূর্বর পক্ষে অনেকটা পরিমাণ লজ্জা ছিল, অবশেষে মা যখন প্রবল আপত্তি করিতে লাগিলেন তখন তাহার লজ্জা ভাঙিয়া গেল। সে রোখের মাথায় বলিয়া বসিল, মৃন্ময়ীকে ছাড়া আর কাহাকেও বিবাহ করিব না। অন্য জড়পুত্তলি মেয়েটিকে সে যতই কল্পনা করিতে লাগিল ততই বিবাহ-সম্বন্ধে তাহার বিষম বিতৃষ্ণার উদ্রেক হইল।

দুই-তিনদিন উভয়পক্ষে মান-অভিমান, অনাহার-অনিদ্রার পর অপূর্বই জয়ী হইল। মা মনকে বোঝাইলেন যে, মৃন্ময়ী ছেলেমানুষ এবং মৃন্ময়ীর মা উপযুক্ত শিক্ষাদানে

অসমর্থ, বিবাহের পর তাঁহার হাতে পড়িলেই তাহার স্বভাবের পরিবর্তন হইবে। এবং ক্রমশ ইহাও বিশ্বাস করিলেন যে, মৃন্ময়ীর মুখখানি সুন্দর। কিন্তু তখনই আবার তাহার খর্ব কেশরাশি তাঁহার কল্পনাপথে উদিত হইয়া হৃদয় নৈরাশ্যে পূর্ণ করিতে লাগিল. তথাপি আশা করিলেন, দৃঢ় করিয়া চুল বাঁধিয়া এবং জবজবে করিয়া তেল লেপিয়া কালে এ ত্রুটিও সংশোধন হইতে পারিবে।

পাড়ার লোকে সকলেই অপূর্বর এই পছন্দটিকে অপূর্ব-পছন্দ বলিয়া নামকরণ করিল। পাগলী মৃন্ময়ীকে অনেকেই ভালোবাসিত কিন্তু তাই বলিয়া নিজের পুত্রের বিবাহযোগ্যা বলিয়া কেহ মনে করিত না।

মৃন্ময়ীর বাপ ঈশান মজুমদারকে যথাকালে সংবাদ দেওয়া হইল। সে কোনো একটি স্টীমার কোম্পানির কেরানিরূপে দূরে নদীতীরবর্তী একটি ক্ষুদ্র স্টেশনে একটি ছোটো টিনের ছাদবিশিষ্ট কুটিরে মাল ওঠানো-নাবানো এবং টিকিট বিক্রয়কার্যে নিযুক্ত ছিল।

তাহার মৃন্ময়ীর বিবাহপ্রস্তাবে দুই চক্ষু বহিয়া জল পড়িতে লাগিল। তাহার মধ্যে কতখানি দুঃখ এবং কতখানি আনন্দ ছিল পরিমাণ করিয়া বলিবার কোনো উপায় নাই।

কন্যার বিবাহ উপলক্ষে ঈশান হেড আপিসের সাহেবের নিকট ছুটি প্রার্থনা করিয়া দরখাস্ত দিল। সাহেব উপলক্ষটা নিতান্তই তুচ্ছজ্ঞান করিয়া ছুটি নামঞ্জুর করিয়া দিলেন। তখন, পূজার সময় এক সপ্তাহ ছুটি পাইবার সম্ভাবনা জানাইয়া সে পর্যন্ত বিবাহ স্থগিত রাখিবার জন্য দেশে চিঠি লিখিয়া দিল, কিন্তু অপূর্বর মা কহিল, এই মাসে দিন ভালো আছে আর বিলম্ব করিতে পারিব না।

উভয়তই প্রার্থনা অগ্রাহ্য হইলে পর ব্যথিতহৃদয় ঈশান আর কোনো আপত্তি না করিয়া পূর্বমতো মাল ওজন এবং টিকিট বিক্রয় করিতে লাগিল।

অতঃপর মৃন্ময়ীর মা এবং পল্লীর যত বর্ষীয়সীগণ সকলে মিলিয়া ভাবী কর্তব্য সম্বন্ধে মৃন্ময়ীকে অহর্নিশি উপদেশ দিতে লাগিল। ক্রীড়াসক্তি, দ্রুতগমন, উচ্চহাস্য, বালকদিগের সহিত আলাপ এবং ক্ষুধা অনুসারে ভোজন সম্বন্ধে সকলেই নিষেধ-পরামর্শ দিয়া বিবাহটাকে বিভীষিকারূপে প্রতিপন্ন করিতে সম্পূর্ণ কৃতকার্য হইল। উৎকণ্ঠিত শঙ্কিতহৃদয় মৃন্ময়ী মনে করিল তাহার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং তদবসানে ফাঁসির হুকুম হইয়াছে।

সে দুষ্ট পোনি ঘোড়ার মতো ঘাড় বাঁকাইয়া পিছু হটিয়া বলিয়া বসিল, "আমি বিবাহ করিব না।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কিন্তু তথাপি বিবাহ করিতে হইল।

তার পরে শিক্ষা আরম্ভ হইল। একরাত্রির মধ্যে মৃন্ময়ীর সমস্ত পৃথিবী অপূর্বর মার অন্তঃপুরে আসিয়া আবদ্ধ হইয়া গেল।

শাশুড়ী সংশোধনকার্যে প্রবৃত্ত হইলেন। অত্যন্ত কঠিন মুখ করিয়া কহিলেন, "দেখো বাছা, তুমি কিছু আর কচি খুকী নও, আমাদের ঘরে অমন বেহায়াপনা করিলে চলিবে না।"

শাশুড়ী যে-ভাবে বলিলেন মৃন্ময়ী সেভাবে কথাটা গ্রহণ করিল না। সে ভাবিল এঘরে যদি না চলে তবে বুঝি অন্যত্র যাইতে হইবে। অপরাহ্ণে তাহাকে আর দেখা গেল না। কোথায় গেল কোথায় গেল খোঁজ পড়িল। অবশেষে বিশ্বাসঘাতক রাখাল তাহাকে তাহার গোপন স্থান হইতে ধরাইয়া দিল। সে বটতলায় রাধাকান্ত ঠাকুরের পরিত্যক্ত ভাঙা রথের মধ্যে গিয়া বসিয়া ছিল।

শাশুড়ী, মা এবং পাড়ার সমস্ত হিতৈষিণীগণ মৃন্ময়ীকে যেরূপ লাঞ্ছনা করিল তাহা পাঠকগণ এবং পাঠিকাগণ সহজেই কল্পনা করিতে পারিবেন।

রাত্রে ঘন মেঘ করিয়া ঝুপ ঝুপ শব্দে বৃষ্টি হইতে আরম্ভ হইল। অপূর্বকৃষ্ণ বিছানার মধ্যে অতি ধীরে ধীরে মৃন্ময়ীর কাছে ঈষৎ অগ্রসর হইয়া তাহার কানে কানে মৃদুস্বরে কহিল, "মৃন্ময়ী, তুমি আমাকে ভালোবাস না?"

মৃন্ময়ী সতেজে বলিয়া উঠিল, "না। আমি তোমাকে কক্‌খনোই ভালোবাসব না।" তাহার যত রাগ এবং যত শাস্তিবিধান সমস্তই পুঞ্জীভূত বজ্রের ন্যায় অপূর্বর মাথার উপর নিক্ষেপ করিল।

অপূর্ব ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিল, "কেন, আমি তোমার কাছে কী দোষ করেছি।" মৃন্ময়ী কহিল, "তুমি আমাকে বিয়ে করলে কেন।"

এ অপরাধের সন্তোষজনক কৈফিয়ত দেওয়া কঠিন। কিন্তু অপূর্ব মনে মনে কহিল, যেমন করিয়া হউক এই দুর্বাধ্য মনটিকে বশ করিতে হইবে।

পরদিন শাশুড়ী মৃন্ময়ীর বিদ্রোহী ভাবের সমস্ত লক্ষণ দেখিয়া তাহাকে ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া রাখিয়া দিল। সে নূতন পিঞ্জরাবদ্ধ পাখির মতো প্রথম অনেকক্ষণ ঘরের মধ্যে ধড়ফড় করিয়া বেড়াইতে লাগিল। অবশেষে কোথাও পালাইবার কোনো পথ না দেখিয়া নিষ্ফল ক্রোধে বিছানার চাদরখানা দাঁত দিয়া ছিঁড়িয়া কুটিকুটি করিয়া ফেলিল, এবং মাটির উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া মনে মনে বাবাকে ডাকিতে ডাকিতে কাঁদিতে লাগিল।

এমন সময়ে ধীরে ধীরে কে তাহার পাশে আসিয়া বসিল। সস্নেহে তাহার ধূলিলুণ্ঠিত চুলগুলি কপোলের উপর হইতে তুলিয়া দিবার চেষ্টা করিল। মৃন্ময়ী সবলে মাথা নাড়িয়া তাহার হাত সরাইয়া দিল। অপূর্ব কানের কাছে মুখ নত করিয়া মৃদুস্বরে কহিল, "আমি লুকিয়ে দরজা খুলে দিয়েছি। এস আমরা খিড়কির বাগানে পালিয়ে যাই।" মৃন্ময়ী প্রবলবেগে মাথা নাড়িয়া সতেজে সরোদনে কহিল, "না।" অপূর্ব তাহার চিবুক ধরিয়া মুখ তুলিয়া দিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, "একবার দেখো কে এসেছে।" রাখাল ভূপতিত মৃন্ময়ীর দিকে চাহিয়া হতবুদ্ধির ন্যায় দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া ছিল। মৃন্ময়ী মুখ না তুলিয়া অপূর্বর হাত ঠেলিয়া দিল। অপূর্ব কহিল, "রাখাল তোমার সঙ্গে খেলা করতে এসেছে, খেলতে যাবে?" সে বিরক্তি-উচ্ছ্বসিত স্বরে কহিল, "না।" রাখালও সুবিধা নয় বুঝিয়া কোনোমতে ঘর হইতে পালাইয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। অপূর্ব চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। মৃন্ময়ী কাঁদিতে কাঁদিতে শ্রান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িল, তখন অপূর্ব পা টিপিয়া বাহির হইয়া দ্বারে শিকল দিয়া চলিয়া গেল।

তাহার পরদিন মৃন্ময়ী বাপের কাছ হইতে এক পত্র পাইল। তিনি তাঁহার প্রাণপ্রতিমা মৃন্ময়ীর বিবাহের সময় উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই বলিয়া বিলাপ করিয়া নবদম্পতীকে অন্তরের আশীর্বাদ পাঠাইয়াছেন।

মৃন্ময়ী শাশুড়ীকে গিয়া কহিল, "আমি বাবার কাছে যাব।" শাশুড়ী অকস্মাৎ এই অসম্ভব প্রার্থনায় তাহাকে ভর্ৎসনা করিয়া উঠিলেন। "কোথায় ওর বাপ থাকে তার ঠিকানা নেই, বলে বাবার কাছে যাব। অনাসৃষ্টি আবদার।" সে উত্তর না করিয়া চলিয়া গেল। আপনার ঘরে গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া নিতান্ত হতাশ্বাস ব্যক্তি যেমন করিয়া দেবতার কাছে প্রার্থনা করে তেমনি করিয়া বলিতে লাগিল, "বাবা, আমাকে তুমি নিয়ে যাও। এখানে আমার কেউ নেই। এখানে থাকলে আমি বাঁচব না।"

গভীর রাত্রে তাহার স্বামী নিদ্রিত হইলে ধীরে ধীরে দ্বার খুলিয়া মৃন্ময়ী গৃহের বাহির হইল। যদিও এক-একবার মেঘ করিয়া আসিতেছিল তথাপি জ্যোৎস্নারাত্রে পথ দেখিবার মতো আলোক যথেষ্ট ছিল। বাপের কাছে যাইতে হইলে কোন্ পথ অবলম্বন করিতে হইবে মৃন্ময়ী তাহার কিছুই জানিত না। কেবল তাহার মনের বিশ্বাস ছিল, যে-পথ দিয়া ডাকের পত্রবাহক 'রানার'গণ চলে সেই পথ দিয়া পৃথিবীর সমস্ত ঠিকানায় যাওয়া যায়। মৃন্ময়ী সেই ডাকের পথ ধরিয়া চলিতে লাগিল। চলিতে চলিতে শরীর শ্রান্ত হইয়া আসিল, রাত্রিও প্রায় শেষ হইল। বনের মধ্যে যখন উসখুস করিয়া অনিশ্চিত সুরে দুটো-একটা পাখি ডাকিবার উপক্রম করিতেছে অথচ নিঃসংশয়ে সময় নির্ণয় করিতে না পারিয়া ইতস্তত করিতেছে তখন মৃন্ময়ী পথের শেষে নদীর ধারে একটা

বৃহৎ বাজারের মতো স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। অতঃপর কোন্‌দিকে যাইতে হইবে ভাবিতেছে এমন সময় পরিচিত ঝমঝম শব্দ শুনিতে পাইল। চিঠির থলে কাঁধে করিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে ডাকের রানার আসিয়া উপস্থিত হইল। মৃন্ময়ী তাড়াতাড়ি তাহার কাছে গিয়া কাতর শ্রান্তস্বরে কহিল, "কুশীগঞ্জে আমি বাবার কাছে যাব, আমাকে তুমি সঙ্গে নিয়ে চলো না।" সে কহিল, "কুশীগঞ্জ কোথায় আমি জানিনে।" এই বলিয়া ঘাটে বাঁধা ডাকনৌকার মাঝিকে জাগাইয়া দিয়া নৌকা ছাড়িয়া দিল। তাহার দয়া করিবার বা প্রশ্ন করিবার সময় নাই।

দেখিতে দেখিতে হাট এবং বাজার সজাগ হইয়া উঠিল। মৃন্ময়ী ঘাটে নামিয়া একজন মাঝিকে ডাকিয়া কহিল, "মাঝি, আমাকে কুশীগঞ্জে নিয়ে যাবে ?" মাঝি তাহার উত্তর দিবার পূর্বেই পাশের নৌকা হইতে একজন বলিয়া উঠিল, "আরে কে ও ? মিনু মা, তুমি এখানে কোথা থেকে।" মৃন্ময়ী উচ্ছ্বসিত ব্যগ্রতার সহিত বলিয়া উঠিল, "বনমালী, আমি কুশীগঞ্জে বাবার কাছে যাব, আমাকে তোর নৌকায় নিয়ে চল্‌।" বনমালী তাহাদের গ্রামের মাঝি ; সে এই উচ্ছৃঙ্খলপ্রকৃতি বালিকাটিকে বিলক্ষণ চিনিত, সে কহিল, "বাবার কাছে যাবে ? সে তো বেশ কথা। চলো, আমি তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি।" মৃন্ময়ী নৌকায় উঠিল।

মাঝি নৌকা ছাড়িয়া দিল। মেঘ করিয়া মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। ভাদ্রমাসের পূর্ণ নদী ফুলিয়া ফুলিয়া নৌকা দোলাইতে লাগিল, মৃন্ময়ীর সমস্ত শরীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া আসিল ; অঞ্চল পাতিয়া সে নৌকার মধ্যে শয়ন করিল এবং এই দুরন্ত বালিকা নদী-দোলায় প্রকৃতির স্নেহপালিত শান্ত শিশুটির মতো অকাতরে ঘুমাইতে লাগিল।

জাগিয়া উঠিয়া দেখিল, সে তাহার শ্বশুরবাড়িতে খাটে শুইয়া আছে। তাহাকে জাগ্রত দেখিয়া ঝি বকিতে আরম্ভ করিল। ঝির কণ্ঠস্বরে শাশুড়ী আসিয়া অত্যন্ত কঠিন কঠিন করিয়া বলিতে লাগিলেন। মৃন্ময়ী বিস্ফারিতনেত্রে নীরবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল অবশেষে তিনি যখন তাহার বাপের শিক্ষাদোষের উপর কটাক্ষ করিয়া বলিলেন, তখন মৃন্ময়ী দ্রুতপদে পাশের ঘরে প্রবেশ করিয়া ভিতর হইতে শিকল বন্ধ করিয়া দিল।

অপূর্ব লজ্জার মাথা খাইয়া মাকে আসিয়া বলিল, "মা, বউকে দুই-একদিনের জন্যে একবার বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিতে দোষ কী।"

মা অপূর্বকে 'ন ভূতো ন ভবিষ্যতি' ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন, এবং দেশে এত মেয়ে থাকিতে বাছিয়া বাছিয়া এই অস্থিদাহকারী দস্যু-মেয়েকে ঘরে আনার জন্য তাহাকে যথেষ্ট গঞ্জনা করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সেদিন সমস্তদিন বাহিরে ঝড়বৃষ্টি এবং ঘরের মধ্যেও অনুরূপ দুর্যোগ চলিতে লাগিল।

তাহার পরদিন গভীর রাত্রে অপূর্ব মৃন্ময়ীকে ধীরে ধীরে জাগ্রত করিয়া কহিল, "মৃন্ময়ী, তোমার বাবার কাছে যাবে?"

মৃন্ময়ী সবেগে অপূর্বর হাত চাপিয়া ধরিয়া সচকিত হইয়া কহিল, "যাব।"

অপূর্ব চুপিচুপি কহিল. "তবে এস আমরা দুজনে আস্তে আস্তে পালিয়ে যাই। আমি ঘাটে নৌকা ঠিক করে রেখেছি।"

মৃন্ময়ী অত্যন্ত সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে একবার স্বামীর মুখের দিকে চাহিল। তাহার পর তাড়াতাড়ি উঠিয়া কাপড় ছাড়িয়া বাহির হইবার জন্য প্রস্তুত হইল। অপূর্ব তাহার মাতার চিন্তা দূর করিবার জন্য একখানি পত্র রাখিয়া দুইজনে বাহির হইল।

মৃন্ময়ী সেই অন্ধকার রাত্রে জনশূন্য নিস্তব্ধ নির্জন গ্রামপথে এই প্রথম স্বেচ্ছায় আন্তরিক নির্ভরের সহিত স্বামীর হাত ধরিল; তাহার হৃদয়ের আনন্দ উদ্বেগ সেই সুকোমল স্পর্শযোগে তাহার স্বামীর শিরার মধ্যে সঞ্চারিত হইতে লাগিল।

নৌকা সেই রাত্রেই ছাড়িয়া দিল। অশান্ত হর্ষোচ্ছ্বাস সত্ত্বেও অনতিবিলম্বেই মৃন্ময়ী ঘুমাইয়া পড়িল। পরদিন কী মুক্তি, কী আনন্দ। দুইধারে কত গ্রাম বাজার শস্যক্ষেত্র বন, দুইধারে কত নৌকা যাতায়াত করিতেছে। মৃন্ময়ী প্রত্যেক তুচ্ছ বিষয়ে স্বামীকে সহস্রবার করিয়া প্রশ্ন করিতে লাগিল। ওই নৌকায় কী আছে, উহারা কোথা হইতে আসিয়াছে, এই জায়গার নাম কী, এমন সকল প্রশ্ন যাহার উত্তর অপূর্ব কোনো কলেজের বহিতে পায় নাই এবং যাহা তাহার কলিকাতার অভিজ্ঞতায় কুলাইয়া উঠে না। বন্ধুগণ শুনিয়া লজ্জিত হইবেন, অপূর্ব এই সকল প্রশ্নের প্রত্যেকটারই উত্তর করিয়াছিল এবং অধিকাংশ উত্তরের সহিত সত্যের ঐক্য হয় নাই। যথা, সে তিলের নৌকাকে তিসির নৌকা, পাঁচবেড়েকে রায়নগর এবং মুনসেফের আদালতকে জমিদারি কাছারি বলিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত বোধ করে নাই! এবং এই সমস্ত ভ্রান্ত উত্তরে বিশ্বস্তহৃদয় প্রশ্নকারিণীর সন্তোষের তিলমাত্র ব্যাঘাত জন্মায় নাই।

পরদিন সন্ধ্যাবেলায় নৌকা কুশীগঞ্জে গিয়া পৌঁছিল। টিনের ঘরে একখানি ময়লা চৌকা-কাঁচের লণ্ঠনে তেলের বাতি জ্বালাইয়া ছোটো ডেস্কের উপর একখানি চামড়ায় বাঁধা মস্ত খাতা রাখিয়া গা-খোলা ঈশানচন্দ্র টুলের উপর বসিয়া হিসাব লিখিতেছিলেন। এমন সময় নবদম্পতী ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। মৃন্ময়ী ডাকিল, "বাবা"। সে ঘরে এমন কণ্ঠধ্বনি এমন করিয়া কখনো ধ্বনিত হয় নাই।

ঈশানের চোখ দিয়া দরদর করিয়া অশ্রু পড়িতে লাগিল। সে কী বলিবে, কী করিবে কিছুই ভাবিয়া পাইল না। তাহার মেয়ে এবং জামাই যেন সাম্রাজ্যের যুবরাজ এবং যুবরাজমহিষী; এই সমস্ত পাটের বস্তার মধ্যে তাহাদের উপযুক্ত সিংহাসন কেমন করিয়া নির্মিত হইতে পারে ইহাই যেন তাহার দিশাহারা বুদ্ধি ঠিক করিয়া উঠিতে পারিল না।

তাহার পর আহারের ব্যাপার—সেও এক চিন্তা। দরিদ্র কেরানি নিজ হস্তে ডাল ভাতে ভাত পাক করিয়া খায়—আজ এই এমন আনন্দের দিনে সে কী করিবে, কী খাওয়াইবে। মৃন্ময়ী কহিল, "বাবা, আজ আমরা সকলে মিলিয়া রাঁধিব।" অপূর্ব এই প্রস্তাবে সাতিশয় উৎসাহ প্রকাশ করিল।

ঘরের মধ্যে স্থানাভাব, লোকাভাব, অন্নাভাব, কিন্তু ক্ষুদ্র ছিদ্র হইতে ফোয়ারা যেমন চতুর্গুণ বেগে উত্থিত হয় তেমনি দরিদ্র্যের সংকীর্ণ মুখ হইতে আনন্দ পরিপূর্ণ ধারায় উচ্ছ্বসিত হইতে লাগিল।

এমনি করিয়া তিন দিন কাটিল। দুইবেলা নিয়মিত স্টীমার আসিয়া লাগে, কত লোক, কত কোলাহল; সন্ধ্যাবেলায় নদীতীর একেবারে নির্জন হইয়া যায়, তখন কী অবাধ স্বাধীনতা। এবং তিন জনে মিলিয়া নানাপ্রকার জোগাড় করিয়া, ভুল করিয়া, এক করিতে আর-এক করিয়া তুলিয়া রাঁধাবাড়া। তাহার পরে মৃন্ময়ীর বলয়ঝংকৃত স্নেহহস্তের পরিবেশনে শ্বশুর জামাতার একত্রে আহার এবং গৃহিণীপনার সহস্র ত্রুটি প্রদর্শনপূর্বক মৃন্ময়ীকে পরিহাস ও তাহা লইয়া বালিকার আনন্দকলহ এবং মৌখিক অভিমান। অবশেষে অপূর্ব জানাইল আর অধিক দিন থাকা উচিত হয় না। মৃন্ময়ী করুণস্বরে আরও কিছু দিন সময় প্রার্থনা করিল। ঈশান কহিল, "কাজ নাই।"

বিদায়ের দিন কন্যাকে বুকের কাছে টানিয়া তাহার মাথায় হাত রাখিয়া অশ্রুগদ্গদ-কণ্ঠে ঈশান কহিল, "মা, তুমি শ্বশুরঘর উজ্জ্বল করিয়া লক্ষ্মী হইয়া থাকিয়ো। কেহ যেন আমার মিনুর কোনো দোষ না ধরিতে পারে।"

মৃন্ময়ী কাঁদিতে কাঁদিতে স্বামীর সহিত বিদায় হইল। এবং ঈশান সেই দ্বিগুণ নিরানন্দ সংকীর্ণ ঘরের মধ্যে ফিরিয়া গিয়া দিনের পর দিন, মাসের পর মাস নিয়মিত মাল ওজন করিতে লাগিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

এই অপরাধিযুগল গৃহে ফিরিয়া আসিলে মা অত্যন্ত গম্ভীরভাবে রহিলেন, কোনো কথাই কহিলেন না। কাহারও ব্যবহারের প্রতি এমন কোনো দোষারোপ করিলেন

না যাহা সে ক্ষালন করিতে চেষ্টা করিতে পারে। এই নীরব অভিযোগ নিস্তব্ধ অভিমান লৌহভারের মতো সমস্ত ঘরকন্নার উপর অটলভাবে চাপিয়া রহিল।

অবশেষে অসহ্য হইয়া উঠিলে অপূর্ব আসিয়া কহিল, “মা, কালেজ খুলেছে, এখন আমাকে আইন পড়তে যেতে হবে।”

মা উদাসীন ভাবে কহিলেন, “বউয়ের কী করবে।”

অপূর্ব কহিল, “বউ এখানেই থাক্‌।”

মা কহিলেন, “না বাপু, কাজ নাই। তুমি তাকে তোমার সঙ্গেই নিয়ে যাও।” সচরাচর মা অপূর্বকে তুই সম্ভাষণ করিয়া থাকেন।

অপূর্ব অভিমানক্ষুণ্নস্বরে কহিল, “আচ্ছা।”

কলিকাতা যাইবার আয়োজন পড়িয়া গেল। যাইবার আগের রাত্রে অপূর্ব বিছানায় আসিয়া দেখিল, মৃন্ময়ী কাঁদিতেছে।

হঠাৎ তাহার মনে আঘাত লাগিল। বিষণ্নকণ্ঠে কহিল, “মৃন্ময়ী. আমার সঙ্গে কলকাতায় যেতে তোমার ইচ্ছে করছে না?”

মৃন্ময়ী কহিল, “না।”

অপূর্ব জিজ্ঞাসা করিল, “তুমি আমাকে ভালোবাস না?” এ-প্রশ্নের কোনো উত্তর পাইল না। অনেক সময় এই প্রশ্নটির উত্তর অতিশয় সহজ কিন্তু আবার এক-একসময় ইহার মধ্যে মনস্তত্ত্বঘটিত এত জটিলতার সংস্রব থাকে যে, বালিকার নিকট হইতে তাহার উত্তর প্রত্যাশা করা যায় না।

অপূর্ব প্রশ্ন করিল, “রাখালকে ছেড়ে যেতে তোমার মন কেমন করছে?”

মৃন্ময়ী অনায়াসে উত্তর করিল, “হাঁ।”

বালক রাখালের প্রতি এই বি. এ পরীক্ষোত্তীর্ণ কৃতবিদ্য যুবকের সূচির মতো অতি-সূক্ষ্ম অথচ অতি সুতীক্ষ্ণ ঈর্ষার উদয় হইল। কহিল, “আমি অনেককাল আর বাড়ি আসতে পাব না।” এই সংবাদ সম্বন্ধে মৃন্ময়ীর কোনো বক্তব্য ছিল না। “বোধ হয় দু-বৎসর কিংবা তারও বেশি হতে পারে।” মৃন্ময়ী আদেশ করিল “তুমি ফিরে আসবার সময় রাখালের জন্যে একটা তিনমুখো রজার্সের ছুরি কিনে নিয়ে এসো।”

অপূর্ব শয়ান অবস্থা হইতে ঈষৎ উত্থিত হইয়া কহিল, “তুমি তাহলে এইখানেই থাকবে?”

মৃন্ময়ী কহিল, “হাঁ, আমি মায়ের কাছে গিয়ে থাকব।”

অপূর্ব নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, “আচ্ছা, তাই থেকো। যতদিন না তুমি আমাকে আসবার জন্যে চিঠি লিখবে, আমি আসব না। খুব খুশি হলে?”

মৃন্ময়ী এ-প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বাহুল্য বোধ করিয়া ঘুমাইতে লাগিল। কিন্তু অপূর্বর ঘুম হইল না, বালিশ উঁচু করিয়া ঠেসান দিয়া বসিয়া রহিল।

অনেক রাত্রে হঠাৎ চাঁদ উঠিয়া চাঁদের আলো বিছানার উপর আসিয়া পড়িল। অপূর্ব সেই আলোকে মৃন্ময়ীর দিকে চাহিয়া দেখিল। চাহিয়া চাহিয়া মনে হইল যেন রাজকন্যাকে কে রুপার কাঠি ছোঁয়াইয়া অচেতন করিয়া রাখিয়া গিয়াছে। একবার কেবল সোনার কাঠি পাইলেই এই নিদ্রিত আত্মাটিকে জাগাইয়া তুলিয়া মালা বদল করিয়া লওয়া যায়। রুপার কাঠি হাস্য, আর সোনার কাঠি অশ্রুজল।

ভোরের বেলায় অপূর্ব মৃন্ময়ীকে জাগাইয়া দিল—কহিল, "মৃন্ময়ী, আমার যাইবার সময় হইয়াছে। চলো তোমাকে তোমার মার বাড়ি রাখিয়া আসি।"

মৃন্ময়ী শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলে অপূর্ব তাহার দুই হাত ধরিয়া কহিল, "এখন আমার একটি প্রার্থনা আছে। আমি অনেক সময় তোমার অনেক সাহায্য করিয়াছি আজ যাইবার সময় তাহার একটি পুরস্কার দিবে?"

মৃন্ময়ী বিস্মিত হইয়া কহিল, "কী।"

অপূর্ব কহিল, "তুমি ইচ্ছা করিয়া ভালোবাসিয়া আমাকে একটি চুম্বন দাও।"

অপূর্বর এই অদ্ভুত প্রার্থনা এবং গম্ভীর মুখভাব দেখিয়া মৃন্ময়ী হাসিয়া উঠিল। হাস্য সংবরণ করিয়া মুখ বাড়াইয়া চুম্বন করিতে উদ্যত হইল – কাছাকাছি গিয়া আর পারিল না, খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল এমন দুইবার চেষ্টা করিয়া অবশেষে নিরস্ত হইয়া মুখে কাপড় দিয়া হাসিতে লাগিল। শাসনচ্ছলে অপূর্ব তাহার কর্ণমূল ধরিয়া নাড়িয়া দিল।

অপূর্বর বড়ো কঠিন পণ। দস্যুবৃত্তি করিয়া কাড়িয়া লুটিয়া লওয়া সে আত্মাবমাননা মনে করে। সে দেবতার ন্যায় সগৌরবে থাকিয়া স্বেচ্ছানীত উপহার চায়, নিজের হাতে কিছুই তুলিয়া লইবে না।

মৃন্ময়ী আর হাসিল না। তাহাকে প্রত্যুষের আলোকে নির্জন পথ দিয়া তাহার মার বাড়ি রাখিয়া অপূর্ব গৃহে আসিয়া মাতাকে কহিল, "ভাবিয়া দেখিলাম, বউকে আমার সঙ্গে কলিকাতায় লইয়া গেলে আমার পড়াশুনার ব্যাঘাত হইবে, সেখানে উহারও কেহ সঙ্গিনী নাই। তুমি তো তাহাকে এ বাড়িতে রাখিতে চাও না, আমি তাই তাহার মার বাড়িতেই রাখিয়া আসিলাম।"

সুগভীর অভিমানের মধ্যে মাতাপুত্রের বিচ্ছেদ হইল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

মার বাড়িতে আসিয়া মৃন্ময়ী দেখিল কিছুতেই আর মন লাগিতেছে না। সে বাড়ির আগাগোড়া যেন বদল হইয়া গেছে। সময় আর কাটে না। কী করিবে কোথায় যাইবে কাহার সহিত দেখা করিবে ভাবিয়া পাইল না।

মৃন্ময়ীর হঠাৎ মনে হইল যেন সমস্ত গৃহে এবং সমস্ত গ্রামে কেহ লোক নাই। যেন মধ্যাহ্নে সূর্যগ্রহণ হইল। কিছুতেই বুঝিতে পারিল না, আজ কলিকাতায় চলিয়া যাইবার জন্য এত প্রাণপণ ইচ্ছা করিতেছে, কাল রাত্রে এই ইচ্ছা কোথায় ছিল; কাল সে জানিত না যে, জীবনের যে-অংশ পরিহার করিয়া যাইবার জন্য এত মন-কেমন করিতেছিল তৎপূর্বেই তাহার সম্পূর্ণ স্বাদ-পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। গাছের পক্কপত্রের ন্যায় আজ সেই বৃন্তচ্যুত অতীত জীবনটাকে ইচ্ছাপূর্বক অনায়াসে দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিল।

গল্পে শুনা যায়, নিপুণ অস্ত্রকার এমন সূক্ষ্ম তরবারি নির্মাণ করিতে পারে যে, তদ্দ্বারা মানুষকে দ্বিখণ্ড করিলেও সে জানিতে পারে না, অবশেষে নাড়া দিলে দুই অর্ধখণ্ড ভিন্ন হইয়া যায়। বিধাতার তরবারি সেইরূপ সূক্ষ্ম, কখন তিনি মৃন্ময়ীর বাল্য ও যৌবনের মাঝখানে আঘাত করিয়াছিলেন সে জানিতে পারে নাই; আজ কেমন করিয়া নাড়া পাইয়া বাল্য-অংশ যৌবন হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িল এবং মৃন্ময়ী বিস্মিত হইয়া ব্যথিত হইয়া চাহিয়া রহিল।

মাতৃগৃহে তাহার সেই পুরাতন শয়নগৃহকে আর আপনার বলিয়া মনে হইল না, সেখানে যে থাকিত সে হঠাৎ আর নাই। এখন হৃদয়ের সমস্ত স্মৃতি সেই আর একটা বাড়ি, আর একটা ঘর, আর একটা শয্যার কাছে গুনগুন করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

মৃন্ময়ীকে আর কেহ বাহিরে দেখিতে পাইল না। তাহার হাস্যধ্বনি আর শুনা যায় না। রাখাল তাহাকে দেখিলে ভয় করে। খেলার কথা মনেও আসে না।

মৃন্ময়ী মাকে বলিল, "মা, আমাকে শ্বশুরবাড়ি রেখে আয়।"

এদিকে, বিদায়কালীন পুত্রের বিষণ্ণ মুখ স্মরণ করিয়া অপূর্বর মার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। সে যে রাগ করিয়া বউকে বেহানের বাড়ি রাখিয়া আসিয়াছে ইহা তাঁহার মনে বড়োই বিঁধিতে লাগিল।

হেনকালে একদিন মাথায় কাপড় দিয়া মৃন্ময়ী ম্লানমুখে শাশুড়ীর পায়ের কাছে পড়িয়া প্রণাম করিল। শাশুড়ী তৎক্ষণাৎ ছলছলনেত্রে তাহাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন। মুহূর্তের মধ্যে উভয়ের মিলন হইয়া গেল। শাশুড়ী বধূর মুখের দিকে চাহিয়া আশ্চর্য

হইয়া গেলেন। সে মৃন্ময়ী আর নাই। এমন পরিবর্তন সাধারণত সকলের সম্ভব নহে। বৃহৎ পরিবর্তনের জন্য বৃহৎ বলের আবশ্যক।

শাশুড়ী স্থির করিয়াছিলেন, মৃন্ময়ীর দোষগুলি একটি একটি করিয়া সংশোধন করিবেন, কিন্তু আর একজন অদৃশ্য সংশোধনকর্তা একটি অজ্ঞাত সংক্ষেপ উপায় অবলম্বন করিয়া মৃন্ময়ীকে যেন নূতন জন্ম পরিগ্রহ করাইয়া দিলেন।

এখন শাশুড়ীকেও মৃন্ময়ী বুঝিতে পারিল, শাশুড়ীও মৃন্ময়ীকে চিনিতে পারিলেন; তরুর সহিত শাখাপ্রশাখার যেরূপ মিল, সমস্ত ঘরকন্না তেমনি পরস্পর অখণ্ডসম্মিলিত হইয়া গেল।

এই যে একটি গম্ভীর স্নিগ্ধ বিশাল রমণীপ্রকৃতি মৃন্ময়ীর সমস্ত শরীরে ও সমস্ত অন্তরে রেখায় রেখায় ভরিয়া ভরিয়া উঠিল ইহাতে তাহাকে যেন বেদনা দিতে লাগিল। প্রথম-আষাঢ়ের শ্যামসজল নবমেঘের মতো তাহার হৃদয়ে একটি অশ্রুপূর্ণ বিস্তীর্ণ অভিমানের সঞ্চার হইল। সেই অভিমান তাহার চোখের ছায়াময় সুদীর্ঘ পল্লবের উপর আর একটি গভীরতর ছায়া নিক্ষেপ করিল। সে মনে মনে বলিতে লাগিল, আমি আমাকে বুঝিতে পারি নাই বলিয়া তুমি আমাকে বুঝিলে না কেন। তুমি আমাকে শাস্তি দিলে না কেন। তোমার ইচ্ছানুসারে আমাকে চালনা করাইলে না কেন। আমি রাক্ষসী যখন তোমার সঙ্গে কলিকাতায় যাইতে চাহিলাম না, তুমি আমাকে জোর করিয়া ধরিয়া লইয়া গেলে না কেন। তুমি আমার কথা শুনিলে কেন, আমার অনুরোধ মানিলে কেন, আমার অবাধ্যতা সহিলে কেন।

তাহার পর, অপূর্ব যেদিন প্রভাতে পুষ্করিণীতীরের নির্জন পথে তাহাকে বন্দী করিয়া কিছু না বলিয়া একবার কেবল তাহার মুখের দিকে চাহিয়াছিল সেই পুষ্করিণী সেই পথ সেই তরুতল সেই প্রভাতের রৌদ্র এবং সেই হৃদয়ভারাবনত গভীর দৃষ্টি তাহার মনে পড়িল এবং হঠাৎ সে তাহার সমস্ত অর্থ বুঝিতে পারিল। তাহার পর সেই বিদায়ের দিনের যে চুম্বন অপূর্বর মুখের দিকে অগ্রসর হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিল, সেই অসম্পূর্ণ চুম্বন এখন মরুমরীচিকাভিমুখী তৃষার্ত পাখির ন্যায় ক্রমাগত সেই অতীত অবসরের দিকে ধাবিত হইতে লাগিল, কিছুতেই তাহার আর পিপাসা মিটিল না। এখন থাকিয়া থাকিয়া মনে কেবল উদয় হয়, আহা অমুক সময়টিতে যদি এমন করিতাম, অমুক প্রশ্নের যদি এই উত্তর দিতাম, তখন যদি এমন হইত।

অপূর্বর মনে এই বলিয়া ক্ষোভ জন্মিয়াছিল যে, মৃন্ময়ী আমার সম্পূর্ণ পরিচয় পায় নাই; মৃন্ময়ীও আজ বসিয়া বসিয়া ভাবে, তিনি আমাকে কী মনে করিলেন, কী বুঝিয়া গেলেন। অপূর্ব তাহাকে যে দুরন্ত চপল অবিবেচক নির্বোধ বালিকা বলিয়া

জানিল, পরিপূর্ণ হৃদয়ামৃতধারায় প্রেমপিপাসা মিটাইতে সক্ষম রমণী বলিয়া পরিচয় পাইল না ইহাতেই সে পরিতাপে লজ্জায় ধিক্কারে পীড়িত হইতে লাগিল। চুম্বনের এবং সোহাগের সে ঋণগুলি অপূর্বর মাথার বালিশের উপর পরিশোধ করিতে লাগিল। এমনিভাবে কতদিন কাটিল।

অপূর্ব বলিয়া গিয়াছিল, তুমি চিঠি না লিখিলে আমি বাড়ি ফিরিব না। মৃন্ময়ী তাহাই স্মরণ করিয়া একদিন ঘরে দ্বার রুদ্ধ করিয়া চিঠি লিখিতে বসিল। অপূর্ব তাহাকে যে সোনালি পাড় দেওয়া রঙিন কাগজ দিয়াছিল তাহাই বাহির করিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল। খুব যত্ন করিয়া ধরিয়া লাইন বাঁকা করিয়া অঙ্গুলিতে কালি মাখিয়া অক্ষর ছোটো বড়ো করিয়া উপরে কোনো সম্বোধন না করিয়া একেবারে লিখিল তুমি আমাকে চিঠি লেখ না কেন। তুমি কেমন আছ, আর তুমি বাড়ি এসো। আর কী বলিবার আছে কিছুই ভাবিয়া পাইল না। আসল বক্তব্য কথা সবগুলিই বলা হইয়া গেল বটে, কিন্তু মনুষ্যসমাজে মনের ভাব আর একটু বাহুল্য করিয়া প্রকাশ করা আবশ্যক। মৃন্ময়ীও তাহা বুঝিল; এইজন্য আরও অনেকক্ষণ ভাবিয়া ভাবিয়া আর কয়েকটি নূতন কথা যোগ করিয়া দিল—এইবার তুমি আমাকে চিঠি লিখো, আর কেমন আছ লিখো, আর বাড়ি এসো, মা ভালো আছেন, বিশু পুঁটি ভালো আছে, কাল আমাদের কালো গোরুর বাছুর হয়েছে। এই বলিয়া চিঠি শেষ করিল। চিঠি লেফাফায় মুড়িয়া প্রত্যেক অক্ষরটির উপর একটি ফোঁটা করিয়া মনের ভালোবাসা দিয়া লিখিল, শ্রীযুক্ত বাবু অপূর্বকৃষ্ণ রায়। ভালোবাসা যতই দিক, তবু লাইন সোজা, অক্ষর সুছাঁদ এবং বানান শুদ্ধ হইল না।

লেফাফায় নামটুকু ব্যতীত আরও যে কিছু লেখা আবশ্যক মৃন্ময়ীর তাহা জানা ছিল না। পাছে শাশুড়ী অথবা আর কাহারও দৃষ্টিপথে পড়ে সেই লজ্জায় চিঠিখানি একটি বিশ্বস্ত দাসীর হাত দিয়া ডাকে পাঠাইয়া দিল।

বলা বাহুল্য এ পত্রের কোনো ফল হইল না, অপূর্ব বাড়ি আসিল না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

মা দেখিলেন ছুটি হইল তবু অপূর্ব বাড়ি আসিল না। মনে করিলেন এখনও সে তাঁহার উপর রাগ করিয়া আছে।

মৃন্ময়ীও স্থির করিল অপূর্ব তাহার উপর বিরক্ত হইয়া আছে, তখন আপনার চিঠিখানি মনে করিয়া সে লজ্জায় মরিয়া যাইতে লাগিল। সে চিঠিখানা যে কত তুচ্ছ, তাহাতে যে কোনো কথাই লেখা হয় নাই, তাহার মনের ভাব যে কিছুই প্রকাশ করা

হয় নাই, সেটা পাঠ করিয়া অপূর্ব যে মৃন্ময়ীকে আরও ছেলেমানুষ মনে করিতেছে; মনে মনে আরও অবজ্ঞা করিতেছে, ইহা ভাবিয়া সে শরবিদ্ধের ন্যায় অন্তরে অন্তরে ছটফট করিতে লাগিল। দাসীকে বার বার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "সে চিঠিখানা তুই কি তাকে দিয়ে এসেছিস।" দাসী তাহাকে সহস্রবার আশ্বাস দিয়া কহিল, "হাঁ গো, আমি নিজের হাতে বাক্সের মধ্যে ফেলে দিয়েছি, বাবু তা এতদিনে কোন্‌কালে পেয়েছে।"

অবশেষে অপূর্বর মা একদিন মৃন্ময়ীকে ডাকিয়া কহিলেন, "বউমা, অপু অনেকদিন তো বাড়ি এল না, তাই মনে করছি কলকাতায় গিয়ে তাকে দেখে আসিগে। তুমি সঙ্গে যাবে?" মৃন্ময়ী সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িল এবং ঘরের মধ্যে আসিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া বিছানার উপর পড়িয়া বালিশখানা বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া হাসিয়া নড়িয়া চড়িয়া মনের আবেগ উন্মুক্ত করিয়া দিল; তাহার পর ক্রমে গম্ভীর হইয়া বিষণ্ণ হইয়া আশঙ্কায় পরিপূর্ণ হইয়া বসিয়া কাঁদিতে লাগিল।

অপূর্বকে কোনো খবর না দিয়া এই দুটি অনুতপ্তা রমণী তাহার প্রসন্নতা ভিক্ষা করিবার জন্য কলিকাতায় যাত্রা করিল। অপূর্বর মা সেখানে তাঁহার জামাইবাড়িতে গিয়া উঠিলেন।

সেদিন মৃন্ময়ীর পত্রের প্রত্যাশায় নিরাশ হইয়া সন্ধ্যাবেলায় অপূর্ব প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া নিজেই তাহাকে পত্র লিখিতে বসিয়াছে। কোনো কথাই পছন্দমতো হইতেছে না। এমন একটা সম্বোধন খুঁজিতেছে যাহাতে ভালোবাসাও প্রকাশ হয় অথচ অভিমানও ব্যক্ত করে; কথা না পাইয়া মাতৃভাষার উপর অশ্রদ্ধা দৃঢ়তর হইতেছে। এমন সময় ভগ্নীপতির নিকট হইতে পত্র পাইল মা আসিয়াছেন, শীঘ্র আসিবে এবং রাত্রে এইখানেই আহারাদি করিবে। সংবাদ সমস্ত ভালো।—শেষ আশ্বাস সত্ত্বেও অপূর্ব অমঙ্গলশঙ্কায় বিমর্ষ হইয়া উঠিল। অবিলম্বে ভগ্নীর বাড়ি গিয়া উপস্থিত হইল।

সাক্ষাৎমাত্রই মাকে জিজ্ঞাসা করিল, "মা, সব ভালো তো।" মা কহিলেন, "সব ভালো। তুই ছুটিতে বাড়ি গেলি না, তাই আমি তোকে নিতে এসেছি।"

অপূর্ব কহিল, "সেজন্য এত কষ্ট করিয়া আসিবার কী আবশ্যক ছিল; আইন পরীক্ষার পড়াশুনা" ইত্যাদি।

আহারের সময় ভগ্নী জিজ্ঞাসা করিল, "দাদা, এবার বউকে তোমার সঙ্গে আনলে না কেন।"

দাদা গম্ভীরভাবে কহিতে লাগিল, "আইনের পড়াশুনা" ইত্যাদি।

ভগ্নীপতি হাসিয়া কহিল, "ও-সমস্ত মিথ্যা ওজর। আমাদের ভয়ে আনতে সাহস হয় না।"

ভগ্নী কহিল, "ভয়ংকর লোকটাই বটে। ছেলেমানুষ হঠাৎ দেখলে আচমকা আঁতকে উঠতে পারে।"

এই ভাবে হাস্যপরিহাস চলিতে লাগিল, কিন্তু অপূর্ব অত্যন্ত বিমর্ষ হইয়া রহিল। কোনো কথা তাহার ভালো লাগিতেছিল না। তাহার মনে হইতেছিল, সেই যখন মা কলিকাতায় আসিলেন তখন মৃন্ময়ী ইচ্ছা করিলে অনায়াসে তাঁহার সহিত আসিতে পারিত। বোধ হয়, মা তাহাকে সঙ্গে আনিবার চেষ্টাও করিয়াছিলেন, কিন্তু সে সম্মত হয় নাই। এ-সম্বন্ধে সংকোচবশত মাকে কোনো প্রশ্ন করিতে পারিল না—সমস্ত মানবজীবন এবং বিশ্বরচনাটা আগাগোড়া ভ্রান্তিসংকুল বলিয়া বোধ হইল।

আহারান্তে প্রবলবেগে বাতাস উঠিয়া বিষম বৃষ্টি আরম্ভ হইল।

ভগ্নী কহিল, "দাদা, আজ আমাদের এইখানেই থেকে যাও।"

দাদা কহিল, "না বাড়ি যেতে হবে; কাজ আছে।"

ভগ্নীপতি কহিল, "রাত্রে তোমার আবার এত কাজ কিসের। এখানে একরাত্রি থেকে গেলে তোমার তো কারও কাছে জবাবদিহি করতে হবে না, তোমার ভাবনা কী।"

অনেক পীড়াপীড়ির পর বিস্তর অনিচ্ছাসত্ত্বে অপূর্ব সে-রাত্রি থাকিয়া যাইতে সম্মত হইল।

ভগ্নী কহিল, "দাদা তোমাকে শ্রান্ত দেখাচ্ছে, তুমি আর দেরি ক'রো না, চলো শুতে চলো।"

অপূর্বরও সেই ইচ্ছা। শয্যাতলে অন্ধকারের মধ্যে একলা হইতে পারিলে বাঁচে, কথার উত্তরপ্রত্যুত্তর করিতে ভালো লাগিতেছে না।

শয়নগৃহের দ্বারে আসিয়া দেখিল ঘর অন্ধকার। ভগ্নী কহিল, "বাতাসে আলো নিবে গেছে দেখছি, তা আলো এনে দেব কি দাদা।"

অপূর্ব কহিল, "না দরকার নেই, আমি রাত্রে আলো রাখিনে।"

ভগ্নী চলিয়া গেলে অপূর্ব অন্ধকারে সাবধানে খাটের অভিমুখে গেল।

খাটে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইতেছে এমন সময়ে হঠাৎ বলয়নিক্কণশব্দে একটি সুকোমল বাহুপাশ তাহাকে সুকঠিন বন্ধনে বাঁধিয়া ফেলিল এবং একটি পুষ্পপুটতুল্য ওষ্ঠাধর দস্যুর মতো আসিয়া পড়িয়া অবিরল অশ্রুজলসিক্ত আবেগপূর্ণ চুম্বনে তাহাকে বিস্ময় প্রকাশের অবসর দিল না। অপূর্ব প্রথমে চমকিয়া উঠিল তাহার পর বুঝিতে পারিল অনেকদিনের একটি হাস্যবাধায় অসম্পন্ন চেষ্টা আজ অশ্রুজলধারায় সমাপ্ত হইল।

আশ্বিন, ১৩০০

সমস্যাপূরণ

প্রথম পরিচ্ছেদ

ঝিঁকড়াকোটার কৃষ্ণগোপাল সরকার জ্যেষ্ঠপুত্রের প্রতি জমিদারি এবং সংসারের ভার দিয়া কাশী চলিয়া গেলেন। দেশের যত অনাথ দরিদ্র লোক তাঁহার জন্য হাহাকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল এমন বদান্যতা, এমন ধর্মনিষ্ঠতা কলিযুগে দেখা যায় না, এই কথা সকলেই বলিতে লাগিল।

তাঁহার পুত্র বিপিনবিহারী আজকালকার একজন সুশিক্ষিত বি-এ। দাড়ি রাখেন, চশমা পরেন, কাহারও সহিত বড়ো একটা মিশেন না। অতিশয় সচ্চরিত্র—এমন কি, তামাকটি পর্যন্ত খান না, তাস পর্যন্ত খেলেন না। অত্যন্ত ভালোমানুষের মতো চেহারা, কিন্তু লোকটা ভারি কড়াক্কড়।

তাঁহার প্রজারা শীঘ্রই তাহা অনুভব করিতে পারিল। বুড়াকর্তার কাছে রক্ষা ছিল কিন্তু ইঁহার কাছে কোনো ছুতায় দেনা খাজনার এক পয়সা রেয়াত পাইবার প্রত্যাশা নাই। নির্দিষ্ট সময়েরও একদিন এদিক-ওদিক হইতে পায় না।

বিপিনবিহারী হাতে কাজ লইয়াই দেখিলেন তাঁহার বাপ বিস্তর ব্রাহ্মণকে জমি বিনা খাজনায় ছাড়িয়া দিয়াছেন এবং খাজনা যে কত লোককে কমি দিয়াছেন তাহার আর সংখ্যা নাই। তাঁহার কাছে কেহ একটা কিছু প্রার্থনা করিলে তিনি তাহা পূর্ণ না করিয়া থাকিতে পারিতেন না—সেটা তাঁহার একটা দুর্বলতা ছিল।

বিপিনবিহারী কহিলেন, এ কখনোই হইতে পারে না; অর্ধেক জমিদারি আমি লাখেরাজ ছাড়িয়া দিতে পারি না। তাঁহার মনে নিম্নলিখিত দুই যুক্তির উদয় হইল।

প্রথমত, যে-সকল অকর্মণ্য লোক ঘরে বসিয়া এইসব জমির উপস্বত্ব ভোগ করিয়া স্ফীত হইতেছে তাহারা অধিকাংশই অপদার্থ এবং দয়ার অযোগ্য। এরূপ দানে দেশে কেবল আলস্যের প্রশ্রয় দেওয়া হয়।

দ্বিতীয়ত, তাঁহার পিতৃ-পিতামহের সময়ের অপেক্ষা এখন জীবিকা অত্যন্ত দুর্লভ এবং দুর্মূল্য হইয়া পড়িয়াছে। অভাব অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। এখন একজন ভদ্রলোকের আত্মসম্ভ্রম রক্ষা করিয়া চলিতে পূর্বাপেক্ষা চারগুণ খরচ পড়ে। অতএব তাঁহার পিতা যেরূপ নিশ্চিন্তমনে দুই হস্তে সমস্ত বিলাইয়া ছড়াইয়া গিয়াছেন এখন আর তাহা করিলে চলিবে না, বরঞ্চ সেগুলি কুড়াইয়া বাড়াইয়া আবার ঘরে আনিবার চেষ্টা করা কর্তব্য।

কর্তব্যবুদ্ধি তাঁহাকে যাহা বলিল তিনি তাহাই করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি একটা প্রিন্সিপ্‌ল্‌ ধরিয়া চলিতে লাগিলেন।

ঘর হইতে যাহা বাহির হইয়াছিল, আবার তাহা অল্পে অল্পে ঘরে ফিরিতে লাগিল। পিতার অতি অল্প দানই তিনি বাহাল রাখিলেন, এবং যাহা রাখিলেন তাহাও যাহাতে চিরস্থায়ী দানের স্বরূপে গণ্য না হয় এমন উপায় করিলেন।

কৃষ্ণগোপাল কাশীতে থাকিয়া পত্রযোগে প্রজাদিগের ক্রন্দন শুনিতে পাইলেন—এমন কি, কেহ কেহ তাঁহার নিকটে গিয়াও কাঁদিয়া পড়িল। কৃষ্ণগোপাল বিপিনবিহারীকে পত্র লিখিলেন যে, কাজটা গর্হিত হইতেছে।

বিপিনবিহারী উত্তরে লিখিলেন যে, পূর্বে যেমন দান করা যাইত তেমনি পাওনা নানাপ্রকারের ছিল। তখন জমিদার এবং প্রজা উভয় পক্ষের মধ্যেই দানপ্রতিদান ছিল। সম্প্রতি নূতন নূতন আইন হইয়া ন্যায্য খাজনা ছাড়া অন্য পাঁচরকম পাওনা একেবারে বন্ধ হইয়াছে এবং কেবলমাত্র খাজনা আদায় করা ছাড়া জমিদারের অন্যান্য গৌরবজনক অধিকারও উঠিয়া গিয়াছে—অতএব এখনকার দিনে যদি আমি আমার ন্যায্য পাওনার দিকে কঠিন দৃষ্টি না রাখি তবে আর থাকে কী। এখন প্রজাও আমাকে অতিরিক্ত কিছু দিবে না আমিও তাহাকে অতিরিক্ত কিছু দিব না—এখন আমাদের মধ্যে কেবলমাত্র দেনাপাওনার সম্পর্ক। দানখয়রাত করিতে গেলে ফতুর হইতে হইবে, বিষয় রক্ষা এবং কুলসম্ভ্রম রক্ষা করা দুরূহ হইয়া পড়িবে।

কৃষ্ণগোপাল সময়ের এতাধিক পরিবর্তনে অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া উঠিতেন এবং ভাবিতেন এখনকার ছেলেরা এখনকার কালের উপযোগী কাজ করিতেছে আমাদের সেকালের নিয়ম এখন খাটিবে না। আমি দূরে বসিয়া ইহাতে হস্তক্ষেপ করিতে গেলে তাহারা বলিবে, তবে তোমার বিষয় তুমি ফিরিয়া লও, আমরা ইহা রাখিতে পারিব না। কাজ কী বাপু, এ কয়েকটা দিন কোনোমতে হরিনাম করিয়া কাটাইয়া দিতে পারিলে বাঁচি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

এই ভাবে কাজ চলিতে লাগিল। অনেক মকদ্দমা মামলা হাঙ্গামা ফেসাদ করিয়া বিপিনবিহারী সমস্তই প্রায় একপ্রকার মনের মতো গুছাইয়া লইলেন।

অনেক প্রজাই ভয়ক্রমে বশ্যতা স্বীকার করিল, কেবল মির্জা বিবির পুত্র অছিমদ্দি বিশ্বাস কিছুতেই বাগ মানিল না।

বিপিনবিহারীর আক্রোশও তাহার উপরে সব চেয়ে বেশি। ব্রাহ্মণের ব্রহ্মত্র

একটা অর্থ বোঝা যায় কিন্তু এই মুসলমান-সন্তান যে কী হিসাবে এতটা জমি নিষ্কর ও স্বল্পকরে উপভোগ করে বুঝা যায় না। একটা সামান্য যবন বিধবার ছেলে গ্রামের ছাত্রবৃত্তি স্কুলে দুই ছত্র লিখিতে পড়িতে শিখিয়াছে কিন্তু আপনার সৌভাগ্যগর্বে সে যেন কাহাকেও গ্রাহ্য করে না।

বিপিন পুরাতন কর্মচারীদের কাছে জানিতে পারিলেন কর্তার আমল হইতে বাস্তবিক ইহারা বহুকাল অনুগ্রহ পাইয়া আসিতেছে। কিন্তু এ অনুগ্রহের কোনো বিশেষ কারণ তাহারা নির্ণয় করিতে পারে না। বোধ করি অনাথা বিধবা নিজ দুঃখ জানাইয়া কর্তার দয়া উদ্রেক করিয়াছিল।

কিন্তু বিপিনের নিকট এই অনুগ্রহ সর্বাপেক্ষা অযোগ্য বলিয়া প্রতিভাত হইল। বিশেষত ইহাদের পূর্বেকার দরিদ্র অবস্থা বিপিন দেখেন নাই, এখন ইহাদের সচ্ছলতার বাড়াবাড়ি এবং অপর্যাপ্ত দম্ভ দেখিয়া বিপিনের মনে হইত ইহারা যেন তাঁহার দয়াদুর্বল সরল পিতাকে ঠকাইয়া তাঁহাদের বিষয়ের এক অংশ চুরি করিয়া লইয়াছে।

অছিমদ্দিও উদ্ধত প্রকৃতির যুবক। সে বলিল, প্রাণ যাইবে তবু আমার অধিকারের এক তিল ছাড়িয়া দিব না। উভয় পক্ষে ভারি যুদ্ধ বাধিয়া উঠিল।

অছিমদ্দির বিধবা মাতা ছেলেকে বার বার করিয়া বুঝাইল, জমিদারের সহিত কাজিয়া করিয়া কাজ নাই, এতদিন যাঁহার অনুগ্রহে জীবন কাটিল তাঁহার অনুগ্রহের 'পরে নির্ভর করাই কর্তব্য, জমিদারের প্রার্থনামতো কিছু ছাড়িয়া দেওয়া যাক।

অছিমদ্দি কহিল, "মা, তুমি এ-সকল বিষয় কিছুই বোঝ না।"

মকদ্দমায় অছিমদ্দি একে একে হারিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু যতই হার হইতে লাগিল, ততই তাহার জিদ বাড়িয়া উঠিল। তাহার সর্বস্বের জন্য সে সর্বস্বই পণ করিয়া বসিল।

মির্জা বিবি একদিন বৈকালে বাগানের তরিতরকারি কিঞ্চিৎ উপহার লইয়া গোপনে বিপিনবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিল। বৃদ্ধা যেন তাহার সকরুণ মাতৃদৃষ্টির দ্বারা সস্নেহে বিপিনের সর্বাঙ্গে হাত বুলাইয়া কহিল, "তুমি আমার বাপ, আল্লা তোমার ভাল করুন। বাবা, অছিমকে তুমি নষ্ট করিয়ো না, ইহাতে তোমার ধর্ম হইবে না। তাহাকে আমি তোমার হস্তেই সমর্পণ করিলাম—তাহাকে নিতান্তই অবজ্ঞাপ্রতিপাল্য একটি অকর্মণ্য ছোটো ভাইয়ের মতো গ্রহণ করো—সে তোমার অসীম ঐশ্বর্যের ক্ষুদ্র এককণা পাইয়াছে বলিয়া ক্ষুণ্ণ হইয়ো না বাপ।"

অধিক বয়সের স্বাভাবিক প্রগল্‌ভতাবশত বুড়ী তাঁহার সহিত ঘরকন্না পাতাইতে আসিয়াছে দেখিয়া বিপিন ভারি বিরক্ত হইয়া উঠিল। কহিল, "তুমি মেয়েমানুষ,

এ সমস্ত কথা বোঝ না। যদি কিছু জানাইবার থাকে তোমার ছেলেকে পাঠাইয়া দিয়ো।”

মির্জা বিবি নিজের ছেলে এবং পরের ছেলে উভয়ের কাছেই শুনিল, সে এ বিষয় কিছুই বোঝে না। আল্লার নাম স্মরণ করিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে বিধবা ঘরে ফিরিয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মকদ্দমা ফৌজদারি হইতে দেওয়ানি, দেওয়ানি হইতে জেলা-আদালত, জেলা-আদালত হইতে হাইকোর্ট পর্যন্ত চলিল। বৎসর দেড়েক এমনি করিয়া কাটিয়া গেল। অছিমদ্দি যখন দেনার মধ্যে আকণ্ঠ নিমগ্ন হইয়াছে তখন আপিল-আদালতে তাহার আংশিক জয় সাব্যস্ত হইল।

কিন্তু ডাঙার বাঘের মুখ হইতে যেটুকু বাঁচিল জলের কুমির তাহার প্রতি আক্রমণ করিল। মহাজন সময় বুঝিয়া ডিক্রীজারি করিল। অছিমদ্দির যথাসর্বস্ব নিলাম হইবার দিন স্থির হইল।

সেদিন সোমবার, হাটের দিন। ছোটো একটা নদীর ধারে হাট। বর্ষাকালে নদী পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। কতক নৌকায় এবং কতক ডাঙায় কেনাবেচা চলিতেছে, কলরবের অন্ত নাই। পণ্যদ্রব্যের মধ্যে এই আষাঢ় মাসে কাঁঠালের আমদানিই সব চেয়ে বেশি, ইলিশ মাছও যথেষ্ট। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে; অনেক বিক্রেতা বৃষ্টির আশঙ্কায় বাঁশ পুতিয়া তাহার উপর একটা কাপড় খাটাইয়া দিয়াছে।

অছিমদ্দিও হাট করিতে আসিয়াছে—কিন্তু তাহার হাতে একটি পয়সাও নাই, এবং তাহাকে আজকাল কেহ ধারেও বিক্রয় করে না। সে একটি কাটারি এবং একটি পিতলের থালা হাতে করিয়া আসিয়াছে, বন্ধক রাখিয়া ধার করিবে।

বিপিনবাবু বিকালের দিকে হাওয়া খাইতে বাহির হইয়াছেন, সঙ্গে দুই-তিনজন লাঠিহস্তে পাইক চলিয়াছে। কলরবে আকৃষ্ট হইয়া তিনি একবার হাট দেখিতে ইচ্ছুক হইলেন।

হাটের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দ্বারী কলুকে কৌতূহলবশত তাহার আয়ব্যয় সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতেছিলেন, এমন সময় অছিমদ্দি কাটারি তুলিয়া বাঘের মতো গর্জন করিয়া বিপিনবাবুর প্রতি ছুটিয়া আসিল। হাটের লোক তাহাকে অর্ধপথে ধরিয়া তৎক্ষণাৎ নিরস্ত্র করিয়া ফেলিল—অবিলম্বে তাহাকে পুলিসের হস্তে অর্পণ করা হইল এবং আবার হাটে যেমন কেনাবেচা চলিতেছিল চলিতে লাগিল।

বিপিনবাবু এই ঘটনায় মনে মনে যে খুশি হন নাই তাহা বলা যায় না। আমরা যাহাকে শিকার করিতে চাহি সে যে আমাদিগকে থাবা মারিতে আসিবে এরূপ বজ্জাতি এবং বে-আদবি অসহ্য। যাহা হউক, বেটা যেরূপ বদ্‌মায়েস সেইরূপ তাহার উচিত শাস্তি হইবে।

বিপিনের অন্তঃপুরের মেয়েরা আজিকার ঘটনা শুনিয়া কণ্টকিত হইয়া উঠিলেন। সকলেই বলিলেন, মাগো, কোথাকার বজ্জাত হারামজাদা বেটা। তাহার উচিত শাস্তির সম্ভাবনায় তাঁহারা অনেকটা সান্ত্বনা লাভ করিলেন।

এদিকে সেই সন্ধ্যাবেলায় বিধবার অন্নহীন পুত্রহীন গৃহ মৃত্যুর অপেক্ষাও অন্ধকার হইয়া গেল। এই ব্যাপারটা সকলেই ভুলিয়া গেল, আহারাদি করিল, শয়ন করিল, নিদ্রা দিল,—কেবল একটি বৃদ্ধার কাছে পৃথিবীর সমস্ত ঘটনার মধ্যে এইটেই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ হইয়া উঠিল, অথচ ইহার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য সমস্ত পৃথিবীতে আর কেহই নাই, কেবল দীপহীন কুটিরপ্রান্তে কয়েকখানি জীর্ণ অস্থি এবং একটি হতাশ্বাস ভীত হৃদয়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ইতিমধ্যে দিন তিনেক অতিবাহিত হইয়া গেছে। কাল ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট বিচারের দিন নির্দিষ্ট হইয়াছে। বিপিনকেও সাক্ষ্য দিতে যাইতে হইবে। ইতিপূর্বে জমিদারকে কখনো সাক্ষ্যমঞ্চে দাঁড়াইতে হয় নাই - কিন্তু বিপিনের ইহাতে কোনো আপত্তি নাই।

পরদিন যথাসময়ে পাগড়ি পরিয়া ঘড়ির চেন ঝুলাইয়া পালকি চড়িয়া মহাসমারোহে বিপিনবাবু কাছারিতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। এজলাসে আজ আর লোক ধরে না। এতবড়ো হুজুক আদালতে অনেকদিন ঘটে নাই।

যখন মকদ্দমা উঠিতে আর বড়ো বিলম্ব নাই, এমন সময় একজন বরকন্দাজ আসিয়া বিপিনবাবুর কানে কানে কী একটা কথা বলিয়া দিল—তিনি তটস্থ হইয়া আবশ্যক আছে বলিয়া বাহিরে চলিয়া আসিলেন।

বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, কিছু দূরে এক বটতলায় তাঁহার বৃদ্ধ পিতা দাঁড়াইয়া আছেন। খালি পা, গায়ে একখানি নামাবলি, হাতে হরিনামের মালা, কৃশ শরীরটি যেন স্নিগ্ধ জ্যোতির্ময়। ললাট হইতে একটি শান্ত করুণা বিশ্বে বিকীর্ণ হইতেছে।

বিপিন চাপকান জোব্বা এবং আঁট প্যান্টলুন লইয়া কষ্টে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। মাথার পাগড়িটি নাসাপ্রান্তে নামিয়া আসিল, ঘড়িটি জেব হইতে বাহির হইয়া পড়িল।

সেগুলি শশব্যস্তে সারিয়া লইয়া পিতাকে নিকটবর্তী উকিলের বাসায় প্রবেশ করিতে অনুরোধ করিলেন।

কৃষ্ণগোপাল কহিলেন, "না, আমার যাহা বক্তব্য আমি এইখানেই বলিয়া লই।"

বিপিনের অনুচরগণ কৌতূহলী লোকদিগকে দূরে ঠেলিয়া রাখিল।

কৃষ্ণগোপাল কহিলেন, "অছিম যাহাতে খালাস পায় সেই চেষ্টা করিতে হইবে এবং উহার যে সম্পত্তি কাড়িয়া লইয়াছ তাহা ফিরাইয়া দিবে।"

বিপিন বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এইজন্যই আপনি কাশী হইতে এতদূরে আসিয়াছেন? উহাদের 'পরে আপনার এত অধিক অনুগ্রহ কেন।"

কৃষ্ণগোপাল কহিলেন, "সে-কথা শুনিয়া তোমার লাভ কী হইবে বাপু।"

বিপিন ছাড়িলেন না—কহিলেন, "অযোগ্যতা বিচার করিয়া কত লোকের কত দান ফিরাইয়া লইয়াছি, তাহার মধ্যে কত ব্রাহ্মণও ছিল, আপনি তাহার কিছুতে হস্তক্ষেপ করেন নাই, আর এই মুসলমান-সন্তানের জন্য আপনার এতদূর পর্যন্ত অধ্যবসায়! আজ এত কাণ্ড করিয়া অবশেষে যদি অছিমকে খালাস দিতে এবং সমস্ত ফিরাইয়া দিতে হয় তো লোকের কাছে কী বলিব।"

কৃষ্ণগোপাল কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। অবশেষে দ্রুতকম্পিত অঙ্গুলিতে মালা ফিরাইতে ফিরাইতে কিঞ্চিৎ কম্পিতস্বরে কহিলেন, "লোকের কাছে যদি সমস্ত খুলিয়া বলা আবশ্যক মনে কর তো বলিয়ো, অছিমদ্দিন তোমার ভাই হয়, আমার পুত্র।"

বিপিন চমকিয়া উঠিয়া কহিলেন, "যবনীর গর্ভে?"

কৃষ্ণগোপাল কহিলেন, "হাঁ বাপু।"

বিপিন অনেকক্ষণ স্তব্ধভাবে থাকিয়া কহিলেন, "সে সব কথা পরে হইবে এখন আপনি ঘরে চলুন।"

কৃষ্ণগোপাল কহিলেন, "না, আমি তো আর গৃহে প্রবেশ করিব না। আমি এখনই এখান হইতে ফিরিয়া চলিলাম। এখন তোমার ধর্মে যাহা উচিত বোধ হয় করিয়ো" বলিয়া আশীর্বাদ করিয়া অশ্রুনিরোধপূর্বক কম্পিতকলেবরে ফিরিয়া চলিলেন।

বিপিন কী বলিবে কী করিবে ভাবিয়া পাইল না। চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কিন্তু এটুকু তাহার মনে উদয় হইল, সে-কালের ধর্মনিষ্ঠা এইরূপই বটে। শিক্ষা এবং চরিত্রে আপনাকে আপনার পিতার চেয়ে ঢের শ্রেষ্ঠ বোধ হইল। স্থির করিলেন, একটা প্রিন্সিপল্ না থাকার এই ফল।

আদালতে যখন ফিরিলেন, দেখিলেন শীর্ণ ক্লিষ্ট শুষ্ক শ্বেতওষ্ঠাধর দীপ্তনেত্র অছিম দুই

পাহারাওয়ালার হস্তে বন্দী হইয়া একখানি মলিন চীর পরিয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। সে বিপিনের ভ্রাতা।

ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের সহিত বিপিনের বন্ধুত্ব ছিল। মকদ্দমা একপ্রকার গোলমাল করিয়া ফাঁসিয়া গেল। এবং অছিমও অল্পদিনের মধ্যে পূর্বাবস্থা ফিরিয়া পাইল। কিন্তু তাহার কারণ সে-ও বুঝিতে পারিল না, অন্য লোকেও আশ্চর্য হইয়া গেল।

মকদ্দমার সময় কৃষ্ণগোপাল আসিয়াছিলেন সে-কথা রাষ্ট্র হইতে বিলম্ব হইল না। সকলেই নানা কথা কানাকানি করিতে লাগিল।

সূক্ষ্মবুদ্ধি উকিলেরা ব্যাপারটা সমস্তই অনুমান করিয়া লইল। রামতারণ উকিলকে কৃষ্ণগোপাল নিজের খরচে লেখাপড়া শিখাইয়া মানুষ করিয়াছিলেন। সে বরাবরই সন্দেহ করিত, কিন্তু এতদিনে সম্পূর্ণ বুঝিতে পারিল যে, ভালো করিয়া অনুসন্ধান করিলে সকল সাধুই ধরা পড়ে। যিনি যত মালা জপুন পৃথিবীতে আমার মতোই সব বেটা। সংসারে সাধু অসাধুর মধ্যে প্রভেদ এই যে, সাধুরা কপট আর অসাধুরা অকপট। যাহা হউক কৃষ্ণগোপালের জগদ্বিখ্যাত দয়াধর্মমহত্ত্ব সমস্তই যে কাপট্য ইহাই স্থির করিয়া রামতারণের যেন এতদিনকার একটা দুর্বোধ সমস্যার পূরণ হইল এবং কী যুক্তি অনুসারে জানি না, তাহাতে কৃতজ্ঞতার বোঝাও যেন স্কন্ধ হইতে লঘু হইয়া গেল। ভারি আরাম পাইল।

অগ্রহায়ণ, ১৩০০

খাতা

লিখিতে শিখিয়া অবধি উমা বিষম উপদ্রব আরম্ভ করিয়াছে। বাড়ির প্রত্যেক ঘরের দেয়ালে কয়লা দিয়া বাঁকা লাইন কাটিয়া বড়ো বড়ো কাঁচা অক্ষরে কেবলই লিখিতেছে—জল পড়ে, পাতা নড়ে।

তাহার বউঠাকুরানীর বালিশের নিচে 'হরিদাসের গুপ্তকথা' ছিল, সেটা সন্ধান করিয়া বাহির করিয়া তাহার পাতায় পাতায় পেনসিল দিয়া লিখিয়াছে—কালো জল, লাল ফুল।

বাড়ির সর্বদাব্যবহার্য নূতন পঞ্জিকা হইতে অধিকাংশ তিথিনক্ষত্র খুব বড়ো বড়ো অক্ষরে একপ্রকার লুপ্ত করিয়া দিয়াছে।

বাবার দৈনিক হিসাবের খাতায় জমাখরচের মাঝখানে লিখিয়া রাখিয়াছে—লেখাপড়া করে যেই গাড়িঘোড়া চড়ে সেই।

এ প্রকার সাহিত্যচর্চায় এ পর্যন্ত সে কোনোপ্রকার বাধা পায় নাই, অবশেষে একদিন একটা গুরুতর দুর্ঘটনা ঘটিল।

উমার দাদা গোবিন্দলাল দেখিতে অত্যন্ত নিরীহ, কিন্তু সে খবরের কাগজে সর্বদাই লিখিয়া থাকে। তাহার কথাবার্তা শুনিলে তাহার আত্মীয়স্বজন কিংবা তাহার পরিচিত প্রতিবেশীরা কেহ তাহাকে চিন্তাশীল বলিয়া কখনো সন্দেহ করে না। এবং বাস্তবিকও সে যে কোনো বিষয়ে কখনো চিন্তা করে এমন অপবাদ তাহাকে দেওয়া যায় না, কিন্তু সে লেখে; এবং বাংলার অধিকাংশ পাঠকের সঙ্গে তার মতের সম্পূর্ণ ঐক্য হয়।

শরীরতত্ত্ব সম্বন্ধে য়ুরোপীয় বৈজ্ঞানিকমণ্ডলীর মধ্যে কতকগুলি গুরুতর ভ্রম প্রচলিত আছে, সেগুলি গোবিন্দলাল যুক্তির কোনো সাহায্য অবলম্বন না করিয়াও কেবলমাত্র রোমাঞ্চজনক ভাষার প্রভাবে সতেজে খণ্ডনপূর্বক একটি উপাদেয় প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিল।

উমা একদিন নির্জন দ্বিপ্রহরে দাদার কালিকলম লইয়া সেই প্রবন্ধটির উপরে বড়ো বড়ো করিয়া লিখিল—গোপাল বড়ো ভালো ছেলে, তাহাকে যাহা দেওয়া যায় সে তাহাই খায়।

গোপাল বলিতে সে যে গোবিন্দলালের প্রবন্ধ-পাঠকদের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য করিয়াছিল তাহা আমার বিশ্বাস হয় না, কিন্তু দাদার ক্রোধের সীমা ছিল না। প্রথমে তাহাকে মারিল, অবশেষে তাহার একটি স্বল্পাবশিষ্ট পেনসিল, আদ্যোপান্ত মসীলিপ্ত একটি ভোঁতা কলম, তাহার বহুযত্নসঞ্চিত যৎসামান্য লেখোপকরণের পুঁজি কাড়িয়া লইল। অপমানিতা বালিকা তাহার এতাদৃশ গুরুতর লাঞ্ছনার কারণ সম্পূর্ণ বুঝিতে না পারিয়া ঘরের কোণে বসিয়া ব্যথিতহৃদয়ে কাঁদিতে লাগিল।

শাসনের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইলে পর গোবিন্দলাল কিঞ্চিৎ অনুতপ্তচিত্তে উমাকে তাহার লুণ্ঠিত সামগ্রীগুলি ফিরাইয়া দিল এবং উপরন্তু একখানি লাইন-টানা ভালো বাঁধানো খাতা দিয়া বালিকার হৃদয়বেদনা দূর করিবার চেষ্টা করিল।

উমার বয়স তখন সাত বৎসর। এখন হইতে এই খাতাটি রাত্রিকালে উমার বালিশের নিচে ও দিনের বেলা সর্বদা তাহার কক্ষে ক্রোড়ে বিরাজ করিতে লাগিল।

ছোটো বেণীটি বাঁধিয়া ঝি সঙ্গে করিয়া যখন সে গ্রামের বালিকাবিদ্যালয়ে পড়িতে যাইত খাতাটি সঙ্গে সঙ্গে যাইত। দেখিয়া মেয়েদের কাহারও বিস্ময়, কাহারও লোভ, কাহারও বা দ্বেষ হইত।

প্রথম বৎসরে অতি যত্ন করিয়া খাতায় লিখিল—পাখি সব করে রব, রাতি

পোহাইল। শয়নগৃহের মেঝের উপরে বসিয়া খাতাটি আঁকড়িয়া ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে সুর করিয়া পড়িত এবং লিখিত। এমনি করিয়া অনেক গদ্য পদ্য সংগ্রহ হইল।

দ্বিতীয় বৎসরে মধ্যে মধ্যে দুটি-একটি স্বাধীন রচনা দেখা দিতে লাগিল; অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত কিন্তু অত্যন্ত সারবান—ভূমিকা নাই, উপসংহার নাই। দুটা-একটা উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া যাইতে পারে।

খাতায় কথামালার ব্যাঘ্র ও বকের গল্পটা যেখানে কাপি করা আছে, তাহার নিচে এক জায়গায় একটা লাইন পাওয়া গেল, সেটা কথামালা কিংবা বর্তমান বঙ্গসাহিত্যের আর কোথাও ইতিপূর্বে দেখা যায় নাই। সে লাইনটি এই—যশিকে আমি খুব ভালোবাসি।

কেহ না মনে করেন আমি এইবার একটা প্রেমের গল্প বানাইতে বসিয়াছি। যশি পাড়ার কোনো একাদশ কিংবা দ্বাদশবর্ষীয় বালক নহে। বাড়ির একটি পুরাতন দাসী, তাহার প্রকৃত নাম যশোদা।

কিন্তু যশির প্রতি বালিকার প্রকৃত মনোভাব কী এই এক কথা হইতে তাহার কোনো দৃঢ় প্রমাণ পাওয়া যায় না। এ বিষয়ে যিনি বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস লিখিতে ইচ্ছা করিবেন, তিনি এই খাতাতেই দু-পাতা অন্তরে পূর্বোক্ত কথাটির সুস্পষ্ট প্রতিবাদ দেখিতে পাইবেন।

এমন একটা-আধটা নয়, উমার রচনায় পদে পদে পরস্পরবিরোধিতা দোষ লক্ষিত হয়। একস্থলে দেখা গেল—হরির সঙ্গে জন্মের মতো আড়ি। (হরিচরণ নয়, হরিদাসী, বিদ্যালয়ের সহপাঠিকা।) তার অনতিদূরেই এমন কথা আছে যাহা হইতে সহজেই বিশ্বাস জন্মে যে, হরির মতো প্রাণের বন্ধু তাহার আর ত্রিভুবনে নাই।

তাহার পরবৎসরে বালিকার বয়স যখন নয় বৎসর, তখন একদিন সকালবেলা হইতে তাহাদের বাড়িতে সানাই বাজিতে লাগিল। উমার বিবাহ। বরটির নাম প্যারীমোহন, গোবিন্দলালের সহযোগী লেখক। বয়স যদিও অধিক নয় এবং লেখাপড়া কিঞ্চিৎ শেখা আছে, তথাপি নব্যভাব তার মনে কিছুমাত্র প্রবেশ করিতে পারে নাই। এইজন্য পাড়ার লোকেরা তাকে ধন্য ধন্য করিত এবং গোবিন্দলাল তাহার অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিত, কিন্তু সম্পূর্ণ কৃতকার্য হইতে পারে নাই।

উমা বেনারসি শাড়ি পরিয়া ঘোমটায় ক্ষুদ্র মুখখানি আবৃত করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে শ্বশুরবাড়ি গেল। মা বলিয়া দিলেন, “বাছা, শাশুড়ীর কথা মানিয়া চলিস, ঘরকন্নার কাজ করিস, লেখাপড়া লইয়া থাকিসনে।”

গোবিন্দলাল বলিয়া দিলেন, “দেখিস, সেখানে দেয়ালে আঁচড় কাটিয়া বেড়াসনে; সে

তেমন বাড়ি নয়। আর প্যারীমোহনের কোনো লেখার উপরে খবরদার কলম চালাসনে।"

বালিকার হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। তখন বুঝিতে পারিল, সে যেখানে যাইতেছে, সেখানে কেহ তাহাকে মার্জনা করিবে না। এবং তাহারা কাহাকে দোষ বলে, অপরাধ বলে, ত্রুটি বলে, তাহা অনেক ভর্ৎসনার পর অনেকদিনে শিখিয়া লইতে হইবে।

সেদিন সকালেও সানাই বাজিতেছিল। কিন্তু সেই ঘোমটা এবং বেনারসি শাড়ি এবং অলংকারে মণ্ডিত ক্ষুদ্র বালিকার কম্পিত হৃদয়টুকুর মধ্যে কী হইতেছিল তাহা ভালো করিয়া বোঝে এমন একজনও সেই লোকারণ্যের মধ্যে ছিল কি না সন্দেহ।

যশিও উমার সঙ্গে গেল। কিছুদিন থাকিয়া উমাকে শ্বশুরবাড়িতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সে চলিয়া আসিবে এমনি কথা ছিল।

স্নেহশীলা যশি অনেক বিবেচনা করিয়া উমার খাতাটি সঙ্গে লইয়া গিয়াছিল। এই খাতাটি তাহার পিতৃভবনের একটি অংশ; তাহার অতিক্ষণিক জন্মগৃহবাসের স্নেহময় স্মৃতিচিহ্ন; পিতামাতার অঙ্কস্থলীর একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, অত্যন্ত বাঁকাচোরা কাঁচা অক্ষরে লেখা। তাহার এই অকাল গৃহিণীপনার মধ্যে বালিকাস্বভাবরোচক একটুখানি স্নেহমধুর স্বাধীনতার আস্বাদ।

শ্বশুরবাড়ি গিয়া প্রথম কিছুদিন সে কিছুই লেখে নাই, সময়ও পায় নাই। অবশেষে কিছুদিন পরে যশি তাহার পূর্বস্থানে চলিয়া গেল।

সেদিন উমা দুপুরবেলা শয়নগৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া টিনের বাক্স হইতে খাতাটি বাহির করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে লিখিল—যশি বাড়ি চলে গেছে আমিও মার কাছে যাব।

আজকাল চারুপাঠ এবং বোধোদয় হইতে কিছু কাপি করিবার অবসর নাই, বোধ করি তেমন ইচ্ছাও নাই। সুতরাং আজকাল বলিকার সংক্ষিপ্ত রচনার মধ্যে মধ্যে দীর্ঘ বিচ্ছেদ নাই। পূর্বোক্ত পদটির পরেই দেখা যায় লেখা আছে—দাদা যদি একবার বাড়ি নিয়ে যায় তাহলে দাদার লেখা আর কখনো খারাপ করে দেব না।

শুনা যায়, উমার পিতা উমাকে প্রায় মাঝে মাঝে বাড়ি আনিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু গোবিন্দলাল প্যারীমোহনের সঙ্গে যোগ দিয়া তাঁহার প্রতিবন্ধক হয়।

গোবিন্দলাল বলে, এখন উমার পতিভক্তি শিক্ষার সময়, এখন তাহাকে মাঝে মাঝে পতিগৃহ হইতে পুরাতন পিতৃস্নেহের মধ্যে আনয়ন করিলে তাহার মনকে অনর্থক বিক্ষিপ্ত করিয়া দেওয়া হয়। এই বিষয়ে সে উপদেশে বিদ্রূপে জড়িত এমন

সুন্দর প্রবন্ধ লিখিয়াছিল যে, তাহার একমতবর্তী সকল পাঠকেই উক্ত রচনার অকাট্য সত্য সম্পূর্ণ স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারে নাই।

লোকমুখে সেই কথা শুনিয়াই উমা তাহার খাতায় লিখিয়াছিল—দাদা, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমাকে একবার তোমাদের ঘরে নিয়ে যাও, আমি তোমাকে আর কখনো রাগাব না।

একদিন উমা দ্বার রুদ্ধ করিয়া এমনি কী একটা অর্থহীন তুচ্ছ কথা খাতায় লিখিতেছিল। তাহার ননদ তিলকমঞ্জরীর অত্যন্ত কৌতূহল হইল—সে ভাবিল বউদিদি মাঝে মাঝে দরজা বন্ধ করিয়া কী করে দেখিতে হইবে। দ্বারের ছিদ্র দিয়া দেখিল লিখিতেছে। দেখিয়া অবাক। তাহাদের অন্তঃপুরে কখনোই সরস্বতীর এরূপ গোপন সমাগম হয় নাই।

তাহার ছোটো কনকমঞ্জরী, সে-ও আসিয়া একবার উঁকি মারিয়া দেখিল।

তাহার ছোটো অনঙ্গমঞ্জরী, সে-ও পদাঙ্গুলির উপর ভর দিয়া বহুকষ্টে ছিদ্রপথ দিয়া রুদ্ধগৃহের রহস্য ভেদ করিয়া লইল।

উমা লিখিতে লিখিতে সহসা গৃহের বাহিরে তিনটি পরিচিত কণ্ঠের খিলখিল হাসি শুনিতে পাইল। ব্যাপারটা বুঝিতে পারিল, খাতাটি তাড়াতাড়ি বাক্সে বন্ধ করিয়া লজ্জায় ভয়ে বিছানায় মুখ লুকাইয়া পড়িয়া রহিল।

প্যারীমোহন এই সংবাদ অবগত হইয়া বিশেষ চিন্তিত হইল। পড়াশুনা আরম্ভ হইলেই নভেল-নাটকের আমদানি হইবে এবং গৃহধর্ম রক্ষা করা দায় হইয়া

তা ছাড়া বিশেষ চিন্তা দ্বারা এ বিষয়ে সে একটি অতি সূক্ষ্মতত্ত্ব নির্ণয় করিয়াছিল। সে বলিত, স্ত্রীশক্তি এবং পুংশক্তি উভয় শক্তির সম্মিলনে পবিত্র দাম্পত্যশক্তির উদ্ভব হয়; কিন্তু লেখাপড়া শিক্ষার দ্বারা যদি স্ত্রীশক্তি পরাভূত হইয়া একান্ত পুংশক্তির প্রাদুর্ভাব হয়, তবে পুংশক্তির সহিত পুংশক্তির প্রতিঘাতে এমন একটি প্রলয়শক্তির উৎপত্তি হয় যদ্দ্বারা দাম্পত্যশক্তি বিনাশশক্তির মধ্যে বিলীনসত্তা লাভ করে, সুতরাং রমণী বিধবা হয়। এ পর্যন্ত এ তত্ত্বের কেহ প্রতিবাদ করিতে পারে নাই।

প্যারীমোহন সন্ধ্যাকালে ঘরে আসিয়া উমাকে যথেষ্ট ভর্ৎসনা করিল এবং কিঞ্চিৎ উপহাসও করিল—বলিল, "শামলা ফরমাশ দিতে হইবে, গিন্নী কানে কলম গুঁজিয়া আপিসে যাইবেন।"

উমা ভালো বুঝিতে পারিল না। প্যারীমোহনের প্রবন্ধ সে কখনো পড়ে নাই এই জন্য তাহার এখনও ততদূর রসবোধ জন্মে নাই। কিন্তু সে মনে মনে একান্ত

সংকুচিত হইয়া গেল—মনে হইল পৃথিবী দ্বিধা হইলে তবে সে লজ্জা রক্ষা করিতে পারে।

বহুদিন আর সে লেখে নাই। কিন্তু একদিন শরৎকালের প্রভাতে একটি গায়িকা ভিখারিনী আগমনীর গান গাহিতেছিল। উমা জানালার গরাদের উপর মুখ রাখিয়া চুপ করিয়া শুনিতেছিল। একে শরৎকালের রৌদ্রে ছেলেবেলাকার সকল কথা মনে পড়ে, তাহার উপরে আগমনীর গান শুনিয়া সে আর থাকিতে পারিল না।

উমা গান গাহিতে পারিত না; কিন্তু লিখিতে শিখিয়া অবধি এমনি তাহার অভ্যাস হইয়াছে যে, একটা গান শুনিলেই সেটা লিখিয়া লইয়া গান গাহিতে না পারার খেদ মিটাইত। আজ কাঙালি গাহিতেছিল—

“পুরবাসী বলে উমার মা,
তোর হারা তারা এল ওই।
শুনে পাগলিনীপ্রায়, অমনি রানী ধায়,
কই উমা বলি কই।
কেঁদে রানী বলে, আমার উমা এলে,
একবার আয় মা, একবার আয় মা,
একবার আয় মা করি কোলে।
অমনি দুবাহু পসারি, মায়ের গলা ধরি
অভিমানে কাঁদি রানীরে বলে—
কই মেয়ে বলে আনতে গিয়েছিলে।”

অভিমানে উমার হৃদয় পূর্ণ হইয়া চোখে জল ভরিয়া গেল। গোপনে গায়িকাকে ডাকিয়া গৃহদ্বার রুদ্ধ করিয়া বিচিত্র বানানে এই গানটি খাতায় লিখিতে আরম্ভ করিল।

তিলকমঞ্জরী, কনকমঞ্জরী এবং অনঙ্গমঞ্জরী সেই ছিদ্রযোগে সমস্ত দেখিল এবং সহসা করতালি দিয়া বলিয়া উঠিল, “বউদিদি, কী করছ আমরা সমস্ত দেখেছি।”

তখন উমা তাড়াতাড়ি দ্বার খুলিয়া বাহির হইয়া কাতরস্বরে বলিতে লাগিল, “লক্ষ্মী ভাই, কাউকে বলিসনে ভাই, তোদের দুটি পায়ে পড়ি ভাই—আমি আর করব না, আমি আর লিখব না।”

অবশেষে উমা দেখিল, তিলকমঞ্জরী তাহার খাতাটির প্রতি লক্ষ্য করিতেছে। তখন সে ছুটিয়া গিয়া খাতাটি বক্ষে চাপিয়া ধরিল। ননদীরা অনেক বল প্রয়োগ করিয়া সেটা কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিল, কৃতকার্য না হইয়া অনঙ্গ দাদাকে ডাকিয়া আনিল।

প্যারীমোহন আসিয়া গম্ভীরভাবে খাটে বসিল। মেঘমন্দ্রস্বরে বলিল, "খাতা দাও।" আদেশ পালন হইল না দেখিয়া আরও দুই-এক সুর গলা নামাইয়া কহিল, "দাও।"

বালিকা খাতাটি বক্ষে ধরিয়া একান্ত অনুনয়দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে চাহিল। যখন দেখিল প্যারীমোহন খাতা কাড়িয়া লইবার জন্য উঠিয়াছে, তখন সেটা মাটিতে ফেলিয়া দিয়া দুই বাহুতে মুখ ঢাকিয়া ভূমিতে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িল।

প্যারীমোহন খাতাটি লইয়া বালিকার লেখাগুলি উচ্চৈঃস্বরে পড়িতে লাগিল; শুনিয়া উমা পৃথিবীকে উত্তরোত্তর গাঢ়তর আলিঙ্গনে বদ্ধ করিতে লাগিল; এবং অপর তিনটি বালিকা-শ্রোতা খিল খিল করিয়া হাসিয়া অস্থির হইল।

সেই হইতে উমা আর সে খাতা পায় নাই। প্যারীমোহনেরও সূক্ষ্মতত্ত্বকণ্টকিত বিবিধ প্রবন্ধপূর্ণ একখানি খাতা ছিল কিন্তু সেটি কাড়িয়া লইয়া ধ্বংস করে এমন মানবহিতৈষী কেহ ছিল না।

প্রবন্ধ

সঞ্চয়

শ্রীযুক্ত ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল
মহাশয়ের নামে এই গ্রন্থ উৎসর্গ করিয়া
তাঁহার প্রতি আমার হৃদয়ের
গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন
করিলাম।

সঞ্চয়

রোগীর নববর্ষ

আমার রোগশয্যার উপর নববৎসর আসিল। নববৎসরের এমন নবীন মূর্তি অনেক দিন দেখি নাই।

একটু দূরে আসিয়া না দাঁড়াইতে পারিলে কোনো বড়ো জিনিসকে ঠিক বড়ো করিয়া দেখা যায় না। যখন বিষয়ের সঙ্গে জড়িত হইয়া থাকি তখন নিজের পরিমাণেই সকল জিনিসকে খাটো করিয়া লই। তাহা না করিলে প্রতিদিনের কাজ চলে না। মানুষের ইতিহাসে যত বড়ো মহৎ ঘটনাই ঘটুক না নিজের পেটের ক্ষুধাকে উপস্থিতমতো যদি একান্ত করিয়া না দেখা যায় তবে বাঁচাই শক্ত হয়। যে মজুর কোদাল হাতে মাটি খুঁড়িতেছে সে লোক মনেও ভাবে না যে সেই মুহূর্তেই রাজা-মহারাজার মন্ত্রণাসভায় রাজ্যসাম্রাজ্যের ব্যবস্থা লইয়া তুমুল আন্দোলন চলিতেছে। অনাদি অতীত ও অনন্ত ভবিষ্যৎ যত বড়োই হ'ক, তবু মানুষের কাছে এক মুহূর্তের বর্তমান তাহার চেয়ে ছোটো নয়। এই জন্য এই সমস্ত ছোটো ছোটো নিমেষগুলির বোঝা মানুষের কাছে যত ভারি এমন যুগ-যুগান্তরের ভার নহে ;—এই জন্য তাহার চোখের সামনে এই নিমেষের পর্দাটাই সকলের চেয়ে মোটা ;—যুগ-যুগান্তরের প্রসারের মধ্যে এই পর্দার স্থূলতা ক্ষয় হইয়া যাইতে থাকে। বিজ্ঞানে পড়া যায় পৃথিবীর গায়ের কাছের বাতাসের আচ্ছাদনটা যত ঘন, এমন তাহার দূরের আচ্ছাদন নহে,—পৃথিবীর নিচের টানে ও উপরের চাপে তাহার আবরণ এমন নিবিড় হইয়া উঠে। আমাদেরও তাই। যত আমাদের কাছের দিকে, ততই আমাদের নিজের টানে ও পরের চাপে আমাদের মনের উপরকার পর্দা অত্যন্ত বেশি নিরেট হইয়া দাঁড়ায়।

শাস্ত্রে তাই বলে আমাদের সমস্ত আবরণ আসক্তিরই অর্থাৎ আকর্ষণেরই রচনা। নিজের দিকে যতই টান দিব নিজের উপরকার ঢাকাটাকে ততই ঘন করিয়া তুলিব। এই টান হালকা হইলে তবেই পর্দা ফাঁক হইয়া যায়।

দেখিতেছি রুগ্‌ণ শরীরের দুর্বলতায় এই টানের গ্রন্থিটাকে খানিকটা আলগা করিয়া দিয়াছে। নিজের চারিদিকে যেন অনেকখানি ফাঁকা ঠেকিতেছে। কিছু একটা করিতেই হইবে, ফল একটা পাইতেই হইবে, আমার হাতে কাজ আছে আমি না হইলে তাহা সম্পন্নই হইবে না এই চিন্তায় নিজেকে একটুও অবসর দেওয়া ঘটে না, অবসরটাকে যেন

অপরাধ বলিয়া মনে হয়। কর্তব্যের যে অন্ত নাই, জগৎসংসারের দাবির যে বিরাম নাই; এই জন্য যতক্ষণ শক্তি থাকে ততক্ষণ সমস্ত মন কাজের দিকে ছটফট করিতে থাকে। এই টানাটানি যতই প্রবল হইয়া উঠে ততই নিজের অন্তরের ও বাহিরের মাঝখানে সেই স্বচ্ছ অবকাশটি ঘুচিয়া যায়—যাহা না থাকিলে সকল জিনিসকে যথাপরিমাণে সত্য আকারে দেখা যায় না। বিশ্বজগৎ অনন্ত আকাশের উপরে আছে বলিয়াই, অর্থাৎ তাহা খানিকটা করিয়া আছে ও অনেকটা করিয়া নাই বলিয়াই তাহার ছোটো বড়ো নানা আকৃতি আয়তন লইয়া তাহাকে এমন বিচিত্র করিয়া দেখিতেছি। কিন্তু জগৎ যদি আকাশে না থাকিয়া একেবারে আমাদের চোখের উপরে চাপিয়া থাকিত—তাহা হইলে ছোটোও যা বড়োও তা, বাঁকাও যেমন সোজাও তেমন।

তেমনি যখন শরীর সবল ছিল তখন অবকাশটাকে একেবারে নিঃশেষে বাদ দিবার আয়োজন করিয়াছিলাম। কেবল কাজ এবং কাজের চিন্তা; কেবল অন্তবিহীন দায়িত্বের নিবিড় ঠেসাঠেসির মাঝখানে চাপা পড়িয়া নিজেকে এবং জগৎকে স্পষ্ট করিয়া ও সত্য করিয়া দেখিবার সুযোগ যেন একেবারে হারাইয়াছিলাম। কর্তব্যপরতা যত মহৎ জিনিস হ'ক, সে যখন অত্যাচারী হইয়া উঠে তখন সে আপনি বড়ো হইয়া উঠিয়া মানুষকে খাটো করিয়া দেয়। সেটা একটা বিপরীত ব্যাপার। মানুষের আত্মা মানুষের কাজের চেয়ে বড়ো।

এমন সময় শরীর যখন বাঁকিয়া বসিল, বলিল, আমি কোনোমতেই কাজ করিব না তখন দায়িত্বের বাঁধন কাটিয়া গেল। তখন টানাটানিতে ঢিল পড়িতেই কাজের নিবিড়তা আলগা হইয়া আসিল—মনের চারিদিকের আকাশে আলো এবং হাওয়া বহিতে লাগিল। তখন দেখা গেল আমি কাজের মানুষ একথাটা যত সত্য, তাহার চেয়ে ঢের বড়ো সত্য আমি মানুষ। সেই বড়ো সত্যটির কাছেই জগৎ সম্পূর্ণ হইয়া দেখা দেয়— বিশ্ববীণা সুন্দর হইয়া বাজে—সমস্ত রূপরসগন্ধ আমার কাছে স্বীকার করে যে "তোমারই মন পাইবার জন্য আমরা বিশ্বের প্রাঙ্গণে মুখ তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছি।"

আমার কর্মক্ষেত্রকে আমি ক্ষুদ্র বলিয়া নিন্দা করিতে চাই না কিন্তু আমার রোগশয্যা আজ দিগন্তপ্রসারিত আকাশের নীলিমাকে অধিকার করিয়া বিস্তীর্ণ হইয়াছে। আজ আমি আপিসের চৌকিতে আসীন নই, আমি বিরাটের ক্রোড়ে শয়ান। সেইখানে সেই অপরিসীম অবকাশের মাঝখানে আজ আমার নববর্ষের অভ্যুদয় হইল—মৃত্যুর পরিপূর্ণতা যে কী সুগভীর আমি যেন আজ তাহার আস্বাদন পাইলাম। আজ নববর্ষ অতলস্পর্শ মৃত্যুর সুনীল শীতল সুবিপুল অবকাশপূর্ণ স্তব্ধতার মাঝখানে জীবনের পদ্মটিকে যেন বিকশিত করিয়া ধরিয়া দেখাইল।

তাই তো আজ বসন্তশেষের সমস্ত ফুলগন্ধ একেবারে আমার মনের উপরে আসিয়া এমন করিয়া ছড়াইয়া পড়িতেছে। তাই তো আমার খোলা জানালা পার হইয়া বিশ্ব-আকাশের অতিথিরা এমন অসংকোচে আমার ঘরের মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিতেছে। আলো যে ওই অন্তরীক্ষে কী সুন্দর করিয়া দাঁড়াইয়াছে, আর পৃথিবী ওই তার পায়ের নীচে আঁচল বিছাইয়া কী নিবিড় হর্ষে পুলকিত হইয়া পড়িয়া আছে তাহা যেন এত কাল দেখি নাই। এই আজ আমি যাহা দেখিতেছি এ যে মৃত্যুর পটে আঁকা জীবনের ছবি : যেখানে বৃহৎ, যেখানে বিরাম, যেখানে নিস্তব্ধ পূর্ণতা, তাহারই উপরে দেখিতেছি এই সুন্দরী চঞ্চলতার অবিরাম নূপুরনিক্বণ, তাহার নানা রঙের আঁচলখানির এই উচ্ছ্বসিত ঘূর্ণ্যগতি।

আমি দেখিতেছি বাহিরের দরজায় লক্ষ লক্ষ চন্দ্রসূর্য গ্রহতারা আলো হাতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, আমি দেখিতেছি মানুষের ইতিহাসে জন্ম-মৃত্যু উত্থান-পতন ঘাত-প্রতিঘাত উচ্চকলরবে উতলা হইয়া ফিরিতেছে—কিন্তু সেও তো ওই বাহিরের প্রাঙ্গণে। আমি দেখিতেছি ওই যে রাজার বাড়ি তাহাতে মহলের পর মহল উঠিয়াছে, তাহার চূড়ার উপরে নিশান মেঘ ভেদ করিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে সে আর চোখে দেখা যায় না। কিন্তু চাবি যখন লাগিল, দ্বার যখন খুলিল—ভিতর বাড়িতে একি দেখা যায়! সেখানে আলোয় তো চোখ ঠিকরিয়া পড়ে না, সেখানে সৈন্যসামন্তে ঘর জুড়িয়া তো দাঁড়ায় নাই! সেখানে মণি নাই মানিক নাই, সেখানে চন্দ্রাতপে তো মুক্তার ঝালর ঝুলিতেছে না। সেখানে ছেলেরা ধুলাবালি ছড়াইয়া নির্ভয়ে খেলা করিতেছে, তাহাতে দাগ পড়িবে এমন রাজআস্তরণ তো কোথাও বিছানো নাই। সেখানে যুবকযুবতীরা মালা বদল করিবে বলিয়া আঁচল ভরিয়া ফুল তুলিয়াছে কিন্তু রাজোদ্যানের মালী আসিয়া তো কিছুমাত্র হাঁকডাক করিতেছে না। বৃদ্ধ সেখানে কর্মশালার বহু কালিমাচিহ্নিত অনেক দিনের জীর্ণ কাপড়খানা ছাড়িয়া ফেলিয়া পট্টবসন পরিতেছে, কোথাও তো কোনো নিষেধ দেখি না। ইহাই আশ্চর্য যে এত ঐশ্বর্য এত প্রতাপের মাঝখানটিতে সমস্ত এমন সহজ, এমন আপন! ইহাই আশ্চর্য, পা তুলিতে ভয় হয় না, হাত তুলিতে হাত কাঁপে না। ইহাই আশ্চর্য যে এমন অভেদ্য রহস্যময় জ্যোতির্ময় লোকলোকান্তরের মাঝখানে এই অতি ক্ষুদ্র মানুষের জন্মমৃত্যু সুখদুঃখ খেলাধুলা কিছুমাত্র ছোটো নয়, সামান্য নয়, অসংগত নয়—সে জন্য কেহ তাহাকে একটুও লজ্জা দিতেছে না। সবাই বলিতেছে তোমার ওইটুকু খেলা, ওইটুকু হাসিকান্নার জন্যই এত আয়োজন—ইহার যতটুকুই তুমি গ্রহণ করিতে পার ততটুকুই সে তোমারই ;—যতদূর পর্যন্ত তুমি দেখিতেছ সে তোমারই দুই চক্ষুর ধন,—যতদূর পর্যন্ত তোমার মন দিয়া বেড়িয়া লইতে পার সে

তোমারই মনের সম্পত্তি। তাই এত বড়ো জগৎ ব্রহ্মাণ্ডের মাঝখানে আমার গৌরব ঘুচিল না—ইহার অন্তবিহীন ভারে আমার মাথা এতটুকুও নত হইল না।

কিন্তু ইহাও বাহিরে। আরও ভিতরে যাও—সেখানেই সকলের চেয়ে আশ্চর্য। সেইখানেই ধরা পড়ে, কৌটার মধ্যে কৌটা, তাহার মাঝখানে যে রত্নটি সেই তো প্রেম। কৌটার বোঝা বহিতে পারি না কিন্তু সেই প্রেমটুকু এমনি যে, তাহাকে গলার হার গাঁথিয়া বুকের কাছে অনায়াসে ঝুলাইয়া রাখিতে পারি। প্রকাণ্ড এই জগৎব্রহ্মাণ্ডের মাঝখানে বড়ো নিভৃতে ওই একটি প্রেম আছে—চারিদিকে সূর্যতারা ছুটাছুটি করিতেছে, তাহার মাঝখানকার স্তব্ধতার মধ্যে ওই প্রেম; চারিদিকে সপ্তলোকের ভাঙাগড়া চলিতেছে, তাহারই মাঝখানকার পূর্ণতার মধ্যে ওই প্রেম। ওই প্রেমের মূল্যে ছোটোও যে সে বড়ো, ওই প্রেমের টানে বড়োও যে সে ছোটো। ওই প্রেমই তো ছোটোর সমস্ত লজ্জাকে আপনার মধ্যে টানিয়া লইয়াছে, বড়োর সমস্ত প্রতাপকে আপনার মধ্যে আচ্ছন্ন করিয়াছে, ওই প্রেমের নিকেতনের মধ্যে প্রবেশ করিলে দেখিতে পাই বিশ্বজগতের সমস্ত সুর আমারই ভাষাতে গান করিতেছে—সেখানে একি কাণ্ড! সেখানে নির্জন রাত্রির অন্ধকারে রজনীগন্ধার উন্মুখ গুচ্ছ হইতে যে গন্ধ আসিতেছে সে কি সত্যই আমারই কাছে নিঃশব্দচরণে দূত আসিল! এও কি বিশ্বাস করিতে পারি! হাঁ সত্যই। একেবারেই বিশ্বাস করিতে পারিতাম না মাঝখানে যদি প্রেম না থাকিত। সেই তো অসম্ভবকে সম্ভব করিল। সেই তো এতবড়ো জগতের মাঝখানেও এত ছোটোকে বড়ো করিয়া তুলিল। বাহিরের কোনো উপকরণ তাহার যে আবশ্যক হয় না, সে যে আপনারই আনন্দে ছোটোকে গৌরব দান করিতে পারে।

এই জন্যই তো ছোটোকে তাহার এতই দরকার। নইলে সে আপনার আনন্দের পরিমাণ পাইবে কী করিয়া? ছোটোর কাছে সে আপনার অসীম বৃহত্ত্বকে বিকাইয়া দিয়াছে; ইহাতেই তাহার আপনার পরিচয়, ইহাতেই তাহার আনন্দের পরিমাণ। সেই জন্যই এমন স্পর্ধা করিয়া বলিতেছি, এই তারাখচিত আকাশের নীচে, এই পুষ্পবিকশিত বসন্তের বনে, এই তরঙ্গমুখরিত সমুদ্র-বেলায় ছোটোর কাছে বড়ো আসিতেছেন। জগতে সমস্ত শক্তির আন্দোলন, সমস্ত নিয়মের বন্ধন, সমস্ত অসংখ্য কাজের মাঝখানে এই আনন্দের লীলাটিই সকলের চেয়ে গভীর, সকলের চেয়ে সত্য। ইহা অতি ছোটো হইয়াও ছোটো নহে, ইহাকে কিছুতেই আচ্ছন্ন করিতে পারিল না। দেশকালের মধ্যে তাহার বিহার; প্রত্যেক তিলপরিমাণ দেশকে ও পলপরিমাণ কালকে অসীমত্বে উদ্ভাসিত করা তাহার স্বভাব;—আর, আমার এই ক্ষুদ্র আমি টুকুকে নানা আড়ালের ভিতর দিয়া নিবিড় সুখেদুঃখে আপন করিয়া লওয়া তাহার পরিপূর্ণতা।

জগতের গভীর মাঝখানটিতে এই যেখানে সমস্ত একেবারেই সহজ, যেখানে বিশ্বের বিপুল বোঝা আপনার সমস্ত ভার নামাইয়া দিয়াছে, সত্য যেখানে সুন্দর, শক্তি যেখানে প্রেম, সেইখানে একেবারে সহজ হইয়া বসিবার জন্য আজ নববর্ষের দিনে ডাক আসিল। যেদিকে প্রয়াস, যেদিকে যুদ্ধ সেই সংসার তো আছেই—কিন্তু সেইখানেই কি দিন খাটিয়া দিন-মজুরি লইতে হইবে? সেই খানেই কি চরম দেনাপাওনা? এই বিপুল হাটের বাহিরে নিখিল ভুবনের নিভৃত ঘরটির মধ্যে একটি জায়গা আছে যেখানে হিসাবকিতাব নাই, যেখানে আপনাকে অনায়াসে সম্পূর্ণ সমর্পণ করিতে পারাই মহত্তম লাভ, যেখানে ফলাফলের তর্ক নাই, বেতন নাই কেবল আনন্দ আছে; কর্মই যেখানে সকলের চেয়ে প্রবল নহে, প্রভু যেখানে প্রিয়—সেখানে একবার যাইতে হইবে, একেবারে ঘরের বেশ পরিয়া, হাসিমুখ করিয়া। নহিলে প্রাণপণ চেষ্টায় কেবলই আপনাকে আপনি জীর্ণ করিয়া আর কতদিন এমন করিয়া চলিবে? নিজের মধ্যে অন্ন নাই গো অন্ন নাই—অমৃতহস্ত হইতে অন্ন গ্রহণ করিতে হইবে। সে অন্ন উপার্জনের অন্ন নয়, সে প্রেমের অন্ন—হাত খালি করিয়া দিয়া অঞ্জলি পাতিয়া চাহিতে পারিলেই হয়। সহজ হইয়া সেইখানে চল্—আজ নববর্ষের পাখি সেই ডাক ডাকিতেছে, বেলফুলের গন্ধ সেই সহজ কথাটিকে বাতাসে অযাচিত ছড়াইয়া দিতেছে। নববর্ষ যে সহজ কথাটি জানাইবার জন্য প্রতিবৎসর দেখা দিয়া যায়, রোগের শয্যায় কাজ ছিল না বলিয়া সেই কথাটি আজ স্তব্ধ হইয়া শুনিবার সময় পাইলাম—আজ প্রভাতের আলোকের এই নিমন্ত্রণ-পত্রটিকে প্রণাম করিয়া মাথায় করিয়া গ্রহণ করি।

১৩১৯

রূপ ও অরূপ

জগৎ বলিয়া আমরা যাহা জানিতেছি সেই জানাটাকে আমাদের দেশে মায়া বলে। বস্তুত তাহার মধ্যে যে একটা মায়ার ভাব আছে তাহা কেবল তত্ত্বজ্ঞান বলে না আধুনিক বিজ্ঞানও বলিয়া থাকে। কোনো জিনিস বস্তুত স্থির নাই, তাহার সমস্ত অণু পরমাণু নিয়ত কম্পমান অথচ জানিবার বেলায় এবং ব্যবহারকালে আমরা তাহাকে স্থির বলিয়াই জানিতেছি। নিবিড়তম বস্তুও জালের মতো ছিদ্রবিশিষ্ট অথচ জানিবার বেলায় তাহাকে আমরা অচ্ছিদ্র বলিয়াই জানি। স্ফটিক জিনিসটা যে কঠিন জিনিস তাহা দুর্যোধন একদিন ঠেকিয়া শিখিয়াছিলেন অথচ আলোকের কাছে যেন সে জিনিসটা একেবারে নাই বলিলেই হয়। এদিকে যে মহাপ্রবল আকর্ষণ সূর্য হইতে পৃথিবী ও পৃথিবী হইতে সূর্যে

প্রসারিত, যাহা লক্ষ কোটি হাতির বলকে পরাস্ত করে আমরা তাহার ভিতর দিয়া চলিতেছি কিন্তু মাকড়সার জালটুকুর মতোও তাহা আমাদের গায়ে ঠেকিতেছে না। আমাদের সম্বন্ধে যেটা আছে এবং যেটা নাই অস্তিত্বরাজ্যে যমজ ভাইয়ের মতো তাহারা হয়তো উভয়েই পরমাত্মীয়; তাহাদের মাঝখানে হয়তো একেবারেই ভেদ নাই। বস্তুমাত্রই একদিক থেকে দেখিতে গেলে বাষ্প—সেই বাষ্প ঘন হইয়া আছে বলিয়াই তাহাকে দৃঢ় আকারে বদ্ধ করিয়া প্রত্যক্ষ দেখি কিন্তু উত্তাপের তাড়ায় তাহা আলগা হইয়া গেলেই মরীচিকার মতো তাহা ক্রমশই দৃষ্টির অগোচর হইবার উপক্রম করিতে থাকে। বস্তুত হিমালয় পর্বতের উপরকার মেঘের সহিত হিমালয়ের প্রভেদকে আমরা গুরুতর বলি বটে কিন্তু সেই গুরুতরত্ব ভাবিয়া দেখিলেই লঘু হইয়া পড়ে। মেঘ যেমন অদৃশ্য বাষ্পের চেয়ে নিবিড়তর, হিমালয়ও সেইরূপ মেঘের চেয়ে নিবিড়তর।

তার পর কালের ভিতর দিয়া দেখো সমস্ত জিনিসই প্রবহমান। তাই আমাদের দেশে বিশ্বকে জগৎ বলে—সংসার বলে; তাহা মুহূর্তকাল স্থির নাই, তাহা কেবলই চলিতেছে, সরিতেছে।

যাহা কেবলই চলে, সরে, তাহার রূপ দেখি কী করিয়া? রূপের মধ্যে তো একটা স্থিরত্ব আছে। যাহা চলিতেছে, তাহাকে, যেন চলিতেছে না, এমন ভাবে না দেখিলে আমরা দেখিতেই পাই না। লাটিম যখন দ্রুতবেগে ঘুরিতেছে তখন আমরা তাহাকে স্থির দেখি। মাটি ভেদ করিয়া যে অঙ্কুরটি বাহির হইয়াছে প্রতি নিমেষেই তাহার পরিবর্তন হইতেছে বলিয়াই তাহার পরিণতি ঘটে। কিন্তু যখন তাহার দিকে তাকাই সে কিছু মাত্র ব্যস্ততা দেখায় না; যেন অনন্তকাল সে এই রকম অঙ্কুর হইয়াই খুশি থাকিবে, যেন তাহার বাড়িয়া উঠিবার কোনো মতলবই নাই। আমরা তাহাকে পরিবর্তনের ভাবে দেখি না, স্থিতির ভাবেই দেখি।

এই পৃথিবীকে আমরা ক্ষুদ্রকালের মধ্যে বদ্ধ করিয়া দেখিতেছি বলিয়াই ইহাকে ধ্রুব বলিয়া বর্ণনা করিতেছি—ধরণী আমাদের কাছে ধৈর্যের প্রতিমা। কিন্তু বৃহৎকালের মধ্যে ইহাকে দেখিতে গেলে ইহার ধ্রুবরূপ আর দেখি না তখন ইহার বহুরূপী মূর্তি ক্রমেই ব্যাপ্ত হইতে হইতে এমন হইয়া আসে যে, আমাদের ধারণার অগোচর হইয়া যায়। আমরা বীজকে ক্ষুদ্রকালের মধ্যে বীজরূপে দেখিতেছি কিন্তু বৃহৎকালে তাহাকে দেখিতে গেলে তাহা গাছ হইয়া অরণ্য-পরম্পরার মধ্য দিয়া নানা বিচিত্ররূপে ধাবিত হইয়া পাথুরে কয়লার খনি হইয়া আগুনে পুড়িয়া ধোঁয়া হইয়া ছাই হইয়া ক্রমে যে কী হইয়া যায় তাহার আর উদ্দেশ পাওয়াই শক্ত।

আমরা ক্ষণকালের মধ্যে বদ্ধ করিয়া ধরিয়া যাহাকে জমাট করিয়া দেখি বস্তুত

তাহার সে রূপ নাই কেননা সত্যই তাহা বদ্ধ হইয়া নাই এবং ক্ষণকালেই তাহার শেষ নহে। আমরা দেখিবার জন্য জানিবার জন্য তাহাকে স্থির করিয়া স্বতন্ত্র করিয়া তাহাকে যে নাম দিতেছি সে নাম তাহার চিরকালের সত্য নাম নহে। এই জন্যই আমরা যাহা কিছু দেখিতেছি জানিতেছি বলিয়া স্থির করিয়াছি তাহাকে মায়া বলা হইয়াছে। নাম ও রূপ যে শাশ্বত নহে একথা আমাদের দেশের চাষারাও বলিয়া থাকে।

কিন্তু গতিকে এই যে স্থিতির মধ্য দিয়া আমরা জানি এই স্থিতির তত্ত্বটা তো আমাদের নিজের গড়া নহে। আমাদের গড়িবার ক্ষমতা কিসের? অতএব, গতিই সত্য, স্থিতি সত্য নহে, একথা বলিলে চলিবে কেন? বস্তুত সত্যকেই আমরা ধ্রুব বলিয়া থাকি, নিত্য বলিয়া থাকি। সমস্ত চঞ্চলতার মাঝখানে একটি স্থিতি আছে বলিয়া সেই বিধৃতিসূত্রে আমরা যাহা কিছু জানিতেছি নহিলে সেই জানার বালাইমাত্র থাকিত না—যাহাকে মায়া বলিতেছি তাহাকে মায়াই বলিতে পারিতাম না যদি কোনোখানে সত্যের উপলব্ধি না থাকিত।

সেই সত্যকে লক্ষ্য করিয়াই উপনিষৎ বলিতেছেন—

"এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি নিমেষা মুহূর্তা অহোরাত্রাণ্যর্ধমাসা মাসা ঋতবঃ সংবৎসরা ইতি বিধৃতাস্তিষ্ঠন্তি।"

সেই নিত্য পুরুষের প্রশাসনে, হে গার্গি নিমেষ মুহূর্ত অহোরাত্র অর্ধমাস মাস ঋতু সংবৎসর সকল বিধৃত হইয়া স্থিতি করিতেছে।

অর্থাৎ এই সমস্ত নিমেষ মুহূর্তগুলিকে আমরা একদিকে দেখিতেছি চলিতেছে কিন্তু আর একদিকে দেখিতেছি তাহা একটি নিরবচ্ছিন্নতাসূত্রে বিধৃত হইয়া আছে। এই জন্যই কাল বিশ্বচরাচরকে ছিন্ন ছিন্ন করিয়া যাইতেছে না, তাহাকে সর্বত্র জুড়িয়া গাঁথিয়া চলিতেছে। তাহা জগৎকে চকমকি ঠোকা স্ফুলিঙ্গপরম্পরার মতো নিক্ষেপ করিতেছে না, আদ্যন্ত যোগযুক্ত শিখার মতো প্রকাশ করিতেছে। তাহা যদি না হইত তবে আমরা মুহূর্তকালকেও জানিতাম না। কারণ আমরা এক মুহূর্তকে অন্য মুহূর্তের সঙ্গে যোগেই জানিতে পারি বিচ্ছিন্নতাকে জানাই যায় না। এই যোগের তত্ত্বই স্থিতির তত্ত্ব। এইখানেই সত্য, এইখানেই নিত্য।

যাহা অনন্ত সত্য, অর্থাৎ অনন্ত স্থিতি, তাহা অনন্ত গতির মধ্যেই আপনাকে প্রকাশ করিতেছে। এই জন্য সকল প্রকাশের মধ্যেই দুই দিক আছে। তাহা একদিকে বদ্ধ, নতুবা প্রকাশই হয় না, আর একদিকে মুক্ত, নতুবা অনন্তের প্রকাশ হইতে পারে না। একদিকে তাহা হইয়াছে আর একদিকে তাহার হওয়া শেষ হয় নাই, তাই সে কেবলই চলিতেছে। এই জন্যই জগৎ জগৎ, সংসার সংসার। এই জন্য

কোনো বিশেষরূপ আপনাকে চরমভাবে বদ্ধ করে না—যদি করিত তবে সে অনন্তের প্রকাশকে বাধা দিত।

তাই যাঁহারা অনন্তের সাধনা করেন, যাঁহারা সত্যকে উপলব্ধি করিতে চান, তাঁহাদিগকে বারবার একথা চিন্তা করিতে হয়, চারিদিকে যাহা কিছু দেখিতেছি জানিতেছি ইহাই চরম নহে, স্বতন্ত্র নহে, কোনো মুহূর্তেই ইহা আপনাকে আপনি পূর্ণ করিয়া প্রকাশ করিতেছে না। যদি তাহা করিত তবে ইহারা প্রত্যেকে স্বয়ম্ভূ স্বপ্রকাশ হইয়া স্থির হইয়া থাকিত। ইহারা অন্তহীন গতি দ্বারা যে অন্তহীন স্থিতিকে নির্দেশ করিতেছে সেইখানেই আমাদের চিত্তের চরম আশ্রয় চরম আনন্দ।

অতএব আধ্যাত্মিক সাধনা কখনোই রূপের সাধনা হইতে পারে না। তাহা সমস্ত রূপের ভিতর দিয়া চঞ্চল রূপের বন্ধন অতিক্রম করিয়া ধ্রুব সত্যের দিকে চলিতে চেষ্টা করে। ইন্দ্রিয়গোচর যে কোনো বস্তু আপনাকেই চরম বলিয়া স্বতন্ত্র বলিয়া ভান করিতেছে, সাধক তাহার সেই ভানের আবরণ ভেদ করিয়া পরম পদার্থকে দেখিতে চায়। ভেদ করিতেই পারিত না যদি এই সমস্ত নাম রূপের আবরণ চিরন্তন হইত। যদি ইহারা অবিশ্রাম প্রবহমান ভাবে নিয়তই আপনার বেড়া আপনিই ভাঙিয়া না চলিত তবে ইহারা ছাড়া আর কিছুর জন্য কোনো চিন্তাও মানুষের মনে মুহূর্তকালের জন্য স্থান পাইত না তবে ইহাদিগকেই সত্য জানিয়া আমরা নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকিতাম—তবে বিজ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞান এই সমস্ত অচল প্রত্যক্ষ সত্যের ভীষণ শৃঙ্খলে বাঁধা পড়িয়া একেবারে মূক হইয়া মূর্ছিত হইয়া থাকিত। ইহার পিছনে কিছুই দেখিতে পাইত না। কিন্তু সমস্ত খণ্ড বস্তু কেবলই চলিতেছে বলিয়াই, সারি সারি দাঁড়াইয়া পথ রোধ করিয়া নাই বলিয়াই আমরা অখণ্ড সত্যের, অক্ষয় পুরুষের সন্ধান পাইতেছি। সেই সত্যকে জানিয়া সেই পুরুষের কাছেই আপনার সমস্তকে নিবেদন করিয়া দেওয়াই আধ্যাত্মিক সাধনা। সুতরাং তাহা সত্যের দিক হইতে রূপের দিকে কোনো মতে উজান পথে চলিতে পারে না।

এই তো আধ্যাত্মিক সাধনা। শিল্প-সাহিত্যের সাধনাটা কী? এই সাধনায় মানুষের চিত্ত আপনাকে বাহিরে রূপ দিয়া সেই রূপের ভিতর হইতে পুনশ্চ আপনাকেই ফিরিয়া দেখিতেছে।

সৌন্দর্যের মধ্যে আনন্দ আপনাকেই বাহিরে দেখিতে পায় - সেইজন্যই সৌন্দর্যের গৌরব। মানুষ আপনার সৌন্দর্য-সৃষ্টির মধ্যে আপনারই আনন্দময় স্বরূপকে দেখিতে পায়—শিল্পীর শিল্পে কবির কাব্যে মানুষের সেইজন্যই এত অনুরাগ। শিল্পে সাহিত্যে মানুষ কেবলই যদি বাহিরের রূপকেই দেখিত আপনাকে না দেখিত তবে সে শিল্প-সাহিত্য তাহার পক্ষে একেবারে ব্যর্থ হইত।

এই জন্যই শিল্প-সাহিত্যে ভাবব্যঞ্জনার (suggestiveness) এত আদর। এই ভাবব্যঞ্জনার দ্বারা রূপ আপনার একান্ত ব্যক্ততা যথাসম্ভব পরিহার করে বলিয়াই অব্যক্তের অভিমুখে আপনাকে বিলীন করে বলিয়াই মানুষের হৃদয় তাহার দ্বারা প্রতিহত হয় না। রাজোদ্যানের সিংহদ্বারটা কেমন? তাহা যতই অভ্রভেদী হ'ক, তাহার কারুনৈপুণ্য যতই থাক, তবু সে বলে না আমাতে আসিয়াই সমস্ত পথ শেষ হইল। আসল গন্তব্য স্থানটি যে তাহাকে অতিক্রম করিয়াই আছে এই কথাই তাহার জানাইবার কথা। এই জন্য সেই তোরণ কঠিন পাথর দিয়া যত দৃঢ় করিয়াই তৈরি হউক না কেন, সে আপনার মধ্যে অনেকখানি ফাঁক রাখিয়া দেয়। বস্তুত সেই ফাঁকটাকেই প্রকাশ করিবার জন্য সে খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। সে যতটা আছে তাহার চেয়ে নাই অনেক বেশি। তাহার সেই "নাই" অংশটাকে যদি সে একেবারে ভরাট করিয়া দেয় তবে সিংহোদ্যানের পথ একেবারেই বন্ধ। তবে তাহার মতো নিষ্ঠুর বাধা আর নাই। তবে সে দেয়াল হইয়া উঠে এবং যাহারা মূঢ় তাহারা মনে করে এইটেই দেখিবার জিনিস, ইহার পশ্চাতে আর কিছুই নাই; এবং যাহারা সন্ধান জানে তাহারা ইহাকে অতি স্থূল একটা মূর্তিমান বাহুল্য জানিয়া অন্যত্র পথ খুঁজিতে বাহির হয়। রূপমাত্রই এইরূপ সিংহদ্বার। সে আপনার ফাঁকটা লইয়াই গৌরব করিতে পারে। সে আপনাকেই নির্দেশ করিলে বঞ্চন করে, পথ নির্দেশ করিলেই সত্য কথা বলে। সে ভূমাকে দেখাইবে, আনন্দকে প্রকাশ করিবে, কী শিল্প সাহিত্যে কী জগৎ-সৃষ্টিতে এই তাহার একমাত্র কাজ। কিন্তু সে প্রায় মাঝে মাঝে দুরাকাঙ্ক্ষাগ্রস্ত দাসের মতো আপনার প্রভুর সিংহাসনে চড়িয়া বসিবার আয়োজন করে। তখন তাহার সেই স্পর্ধায় আমরা যদি যোগ দিই তবে বিপদ ঘটে—তখন তাহাকে নষ্ট করিয়া ফেলাই তাহার সম্বন্ধে আমাদের কর্তব্য—তা সে যতই প্রিয় হ'ক, এমন কি, সে যদি আমার নিজেরই অহংরূপটা হয় তবুও। বস্তুত রূপ যাহা তাহাকে তাহার চেয়ে বড়ো করিয়া জানিলেই সেই বড়োকে হারানো হয়।

মানুষের সাহিত্য শিল্পকলায় হৃদয়ের ভাব রূপে ধরা দেয় বটে কিন্তু রূপে বদ্ধ হয় না। এই জন্য সে কেবলই নব নব রূপের প্রবাহ সৃষ্টি করিতে থাকে। তাই প্রতিভাকে বলে "নবনবোন্মেষশালিনী বুদ্ধি।" প্রতিভা রূপের মধ্যে চিত্তকে ব্যক্ত করে কিন্তু বন্দী করে না—এই জন্য নব নব উন্মেষের শক্তি তাহার থাকা চাই।

মনে করা যাক পূর্ণিমা রাত্রির শুভ্র সৌন্দর্য দেখিয়া কোনো কবি বর্ণনা করিতেছেন যে, সুরলোকে নীলকান্তমণিময় প্রাঙ্গণে সুরাঙ্গনারা নন্দনের নবমল্লিকার ফুলশয্যা রচনা করিতেছেন। এই বর্ণনা যখন আমরা পড়ি তখন আমরা জানি পূর্ণিমা রাত্রিসম্বন্ধে

এই কথাটা একেবারে শেষ কথা নহে—অসংখ্য ব্যক্ত ও অব্যক্ত কথার মধ্যে এ একটা কথা ;—এই উপমাটিকে গ্রহণ করার দ্বারা অন্য অগণ্য উপমার পথ বন্ধ করা হয় না, বরঞ্চ পথকে প্রশস্তই করা হয়।

কিন্তু যদি আলংকারিক বলপূর্বক নিয়ম করিয়া দেন যে, পূর্ণিমা রাত্রি সম্বন্ধে সমস্ত মানবসাহিত্যে এই একটিমাত্র উপমা ছাড়া আর কোনো উপমাই হইতে পারে না—যদি কেহ বলে, কোনো দেবতা রাত্রে স্বপ্ন দিয়াছেন যে এই রূপই পূর্ণিমার সত্য রূপ—এই রূপকেই কেবল ধ্যান করিতে হইবে, প্রকাশ করিতে হইবে, কাব্যে পুরাণে এই রূপেরই আলোচনা করিতে হইবে, তবে পূর্ণিমা সম্বন্ধে সাহিত্যের দ্বার রুদ্ধ হইয়া যাইবে। তবে আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে এরূপ চরম উপমার দৌরাত্ম্য একেবারে অসহ্য—কারণ ইহা মিথ্যা। যতক্ষণ ইহা চরম ছিল না ততক্ষণই ইহা সত্য ছিল। বস্তুত এই কথাটাই সত্য যে পূর্ণিমা সম্বন্ধে নিত্য নব নব রূপে মানুষের আনন্দ আপনাকেই প্রকাশ করে। কোনো বিশেষ একটিমাত্র রূপই যদি সত্য হয় তবে সেই আনন্দই মিথ্যা হইয়া যায়। জগৎ-সৃষ্টিতেও যেমন সৃষ্টিকর্তার আনন্দ কোনো একটিমাত্র রূপে আপনাকে চিরকাল বদ্ধ করিয়া শেষ করিয়া ফেলে নাই,—অনাদিকাল হইতে তাহার নব নব বিকাশ চলিয়া আসিতেছে, তেমনি সাহিত্যশিল্প সৃষ্টিতেও মানুষের আনন্দ কোনো একটিমাত্র উপমায় বর্ণনায় আপনাকে চিরকালের মতো বন্দী করিয়া থামিয়া যায় নাই, সে কেবলই নব নব প্রকাশের মধ্যে লীলা করিতেছে। কারণ, রূপ জিনিসটা কোনো কালে বলিতে পারিবে না যে, আমি এইখানেই থামিয়া দাঁড়াইলাম, আমিই শেষ—সে যদি চলিতে না পারে তবে তাহাকে বিকৃত হইয়া মরিতে হইবে। বাতি যেমন ছাই হইতে হইতে শিখাকে প্রকাশ করে, রূপ তেমনি কেবলই আপনাকে লোপ করিতে করিতে একটি শক্তিকে আনন্দকে প্রকাশ করিতে থাকে। বাতি যদি নিজে অক্ষয় হইতে চায় তবে শিখাকেই গোপন করে—রূপ যদি আপনাকেই ধ্রুব করিতে চায় তবে সত্যকে অস্বীকার করা ছাড়া তাহার উপায় নাই। এইজন্য রূপের অনিত্যতাই রূপের সার্থকতা, তাহাই তাহার গৌরব। রূপ নিত্য হইবার চেষ্টা করিলেই ভয়ংকর উৎপাত হইয়া ওঠে। সুরের অমৃত অসুর পান করিলে স্বর্গলোকের বিপদ তখন বিধাতার হাতে তাহার অপঘাত মৃত্যু ঘটে। পৃথিবীতে ধর্মে কর্মে সমাজে সাহিত্যে শিল্পে সকল বিষয়েই আমরা ইহার প্রমাণ পাই। মানুষের ইতিহাসে যত কিছু ভীষণ বিপ্লব ঘটিয়াছে তাহার মূলেই রূপের এই অসাধু চেষ্টা আছে। রূপ যখনই একান্ত হইয়া উঠিতে চায় তখনই তাহাকে রূপান্তরিত করিয়া মানুষ তাহার অত্যাচার হইতে মনুষ্যত্বকে বাঁচাইবার জন্য প্রাণপণ লড়াই করিতে প্রবৃত্ত হয়।

বর্তমানকালে আমাদের শিক্ষিত লোকেরা যখন প্রতিমাপূজার সমর্থন করেন তখন তাঁহারা বলেন প্রতিমা জিনিসটা আর কিছুই নহে, উহা ভাবকে রূপ দেওয়া। অর্থাৎ মানুষের মধ্যে যে বৃত্তি শিল্পসাহিত্যের সৃষ্টি করে ইহাও সেই বৃত্তির কাজ। কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে কথাটা সত্য নহে। দেবমূর্তিকে উপাসক কখনোই সাহিত্য হিসাবে দেখেন না। কারণ, সাহিত্যে আমরা কল্পনাকে মুক্তি দিবার জন্যই রূপের সৃষ্টি করি দেবমূর্তিতে আমরা কল্পনাকে বদ্ধ করিবার জন্যই চেষ্টা করিয়া থাকি। আমরা কল্পনাকে তখনই কল্পনা বলিয়া জানি যখন তাহার প্রবাহ থাকে, যখন তাহা এক হইতে আর-একের দিকে চলে, যখন তাহার সীমা কঠিন থাকে না; তখনই কল্পনা আপনার সত্য কাজ করে। সে কাজটি কী, না, সত্যের অনন্ত রূপকে নির্দেশ করা। কল্পনা যখন থামিয়া গিয়া কেবলমাত্র একটি রূপের মধ্যে একান্তভাবে দেহধারণ করে তখন সে আপনার সেই রূপকেই দেখায়, রূপের অতীতকে অনন্ত সত্যকে আর দেখায় না। সেইজন্য বিশ্বজগতের বিচিত্র ও নিত্যপ্রবাহিত রূপের চির-পরিবর্তনশীল অন্তহীন প্রকাশের মধ্যেই আমরা অনন্তের আনন্দকে মূর্তিমান দেখিতে পাই। জগতের রূপ কারাপ্রাচীরের মতো অটল অচল হইয়া আমাদিগকে ঘিরিয়া থাকিলে কখনোই তাহার মধ্যে আমরা অনন্তের আনন্দকে জানিবার অবকাশমাত্র পাইতাম না। কিন্তু যখনই আমরা বিশেষ দেবমূর্তিকে পূজা করি তখনই সেই রূপের প্রতি আমরা চরমসত্যতা আরোপ করি। রূপের স্বাভাবিক পরিবর্তনশীল ধর্মকে লোপ করিয়া দিই রূপকে তেমন করিয়া দেখিবামাত্রই তাহাকে মিথ্যা করিয়া দেওয়া হয়, সেই মিথ্যার দ্বারা কখনোই সত্যের পূজা হইতে পারে না।

তবে কেন কোনো কোনো বিদেশী ভাবুকের মুখে আমরা প্রতিমা-পূজার সম্বন্ধে ভাবের কথা শুনিতে পাই? তাহার কারণ তাঁহারা ভাবুক, তাঁহারা পূজক নহেন। তাঁহারা যতক্ষণ ভাবুকের দৃষ্টিতে কোনো মূর্তিকে দেখিতেছেন ততক্ষণ তাঁহারা চরম করিয়া দেখিতেছেন না। একজন খ্রীস্টানও তাঁহার কাব্যে সরস্বতীর বন্দনা করিতে পারেন; কারণ সরস্বতী তাঁহার কাছে ভাবের প্রকাশমাত্র - গ্রীসের এথেনীও তাঁহার কাছে যেমন, সরস্বতীও তেমনি। কিন্তু সরস্বতীর যাঁহারা পূজক তাঁহারা এই বিশেষ মূর্তিকেই বিশেষভাবে অবলম্বন করিয়াছেন, জ্ঞানস্বরূপ অনন্তের এই একটিমাত্র রূপকেই তাঁহারা চরম করিয়া দেখিতেছেন—তাঁহাদের ধারণাকে তাঁহাদের ভক্তিকে এই বিশেষ রূপের বন্ধন হইতে তাঁহারা মুক্ত করিতেই পারেন না।

এই বন্ধন মানুষকে এতদূর পর্যন্ত বন্দী করে যে, শুনা যায় শক্তি-উপাসক কোনো একজন বিখ্যাত ভক্ত মহাত্মা আলিপুর পশুশালায় সিংহকে বিশেষ করিয়া দেখিবার জন্য

অতিশয় ব্যাকুলতা প্রকাশ করিয়াছিলেন—কেননা "সিংহ মায়ের বাহন"। শক্তিকে সিংহরূপে কল্পনা করিতে দোষ নাই—কিন্তু সিংহকেই শক্তিরূপে যদি দেখি তবে কল্পনার মহত্ত্বই চলিয়া যায়। কারণ, যে কল্পনা সিংহকে শক্তির প্রতিরূপ করিয়া দেখায় সেই কল্পনা সিংহে আসিয়া শেষ হয় না বলিয়াই আমরা তাহার রূপ-উদ্ভাবনকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করি—যদি তাহা কোনো এক জায়গায় আসিয়া বদ্ধ হয় তবে তাহা মিথ্যা, তবে তাহা মানুষের শত্রু।

যাহা স্বভাবতই প্রবহমান তাহাকে কোনো একটা জায়গায় রুদ্ধ করিবামাত্র তাহা যে মিথ্যা হইয়া উঠিতে থাকে সমাজে তাহার অনেক দৃষ্টান্ত আছে। আচার জিনিসটা অনেক স্থলেই সেই বন্ধন-আকার ধারণ করে। তাহার সময় উত্তীর্ণ হইলেও অভ্যাসের আসক্তিবশত আমরা তাহাকে ছাড়িয়া দিতে চাই না। যাহার মুখ্য উদ্দেশ্য চলা এবং চালানো, এক সময়ে তাহাকেই আমরা খোঁটার মতো ব্যবহার করি, অথচ মনে করি যেন তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইতেছে।

একটা উদাহরণ দিই। জগতে বৈষম্য আছে। বস্তুত বৈষম্য সৃষ্টির মূলতত্ত্ব। কিন্তু সেই বৈষম্য ধ্রুব নহে। পৃথিবীতে ধনমান বিদ্যাক্ষমতা একজায়গায় স্থির নাই, তাহা আবর্তিত হইতেছে। আজ যে ছোটো কাল সে বড়ো, আজ যে ধনী কাল সে দরিদ্র। বৈষম্যের এই চলাচল আছে বলিয়াই মানবসমাজে স্বাস্থ্য আছে। কেননা বৈষম্য না থাকিলে গতিই থাকে না—উঁচু-নিচু না থাকিলে নদী চলে না, বাতাসে তাপের পার্থক্য না থাকিলে বাতাস বহে না। যাহা চলে না এবং যাহা সচল পদার্থের সঙ্গে যোগ রাখে না তাহা দূষিত হইতে থাকে। অতএব, মানবসমাজে উচ্চ নীচ আছেই, থাকিবেই এবং থাকিলেই ভালো, একথা মানিতে হইবে।

কিন্তু এই বৈষম্যের চলাচলকে যদি বাঁধ দিয়া বাঁধিয়া ফেলি, যদি একশ্রেণীর লোককে পুরুষানুক্রমে মাথায় করিয়া রাখিব এবং আর এক শ্রেণীকে পায়ের তলায় ফেলিব এই বাঁধা নিয়ম একেবারে পাকা করিয়া দিই তবে বৈষম্যের প্রকৃতিগত উদ্দেশ্যই একেবারে মাটি করিয়া ফেলি। যে বৈষম্য চাকার মতো আবর্তিত হয় না, সে বৈষম্য নিদারুণ ভারে মানুষকে চাপিয়া রাখে, তাহা মানুষকে অগ্রসর করে না। জগতে বৈষম্য ততক্ষণ সত্য যতক্ষণ তাহা চলে, যতক্ষণ তাহা মুক্ত—জগতে লক্ষ্মী যতক্ষণ চঞ্চলা ততক্ষণ তিনি কল্যাণদায়িনী। লক্ষ্মীকে এক জায়গায় চিরকাল বাঁধিতে গেলেই তিনি অলক্ষ্মী হইয়া উঠেন। কারণ, চঞ্চলতার দ্বারাই লক্ষ্মী বৈষম্যের মধ্যে সাম্যকে আনেন। দুঃখী চিরদিন দুঃখী নয়, সুখী চিরদিন সুখী নয়—এইখানেই সুখীতে দুঃখীতে সাম্য আছে। সুখ দুঃখের এই চলাচল আছে বলিয়াই সুখ দুঃখের দ্বন্দ্বে মানুষের মঙ্গল ঘটে।

তাই বলিতেছি, সত্যকে, সুন্দরকে, মঙ্গলকে, যে রূপ যে সৃষ্টি ব্যক্ত করিতে থাকে তাহা বদ্ধরূপ নহে, তাহা একরূপ নহে, তাহা প্রবহমান এবং তাহা বহু। এই সত্যসুন্দর মঙ্গলের প্রকাশকে যখনই আমরা বিশেষ দেশে কালে পাত্রে বিশেষ আকারে বা আচারে বদ্ধ করিতে চাই তখনই তাহা সত্যসুন্দর মঙ্গলকে বাধাগ্রস্ত করিয়া মানবসমাজে দুর্গতি আনয়ন করে। রূপমাত্রের মধ্যেই যে একটি মায়া আছে, অর্থাৎ যে চঞ্চলতা অনিত্যতা আছে, যে অনিত্যতাই সেই রূপকে সত্য ও সৌন্দর্য দান করে, যে অনিত্যতাই তাহার প্রাণ, সেই কল্যাণময়ী অনিত্যতাকে কী সংসারে, কী ধর্মসমাজে, কী শিল্পসাহিত্যে, প্রথার পিঞ্জরে অচল করিয়া বাঁধিতে গেলে আমরা কেবল বন্ধনকেই লাভ করি, গতিকে একেবারেই হারাইয়া ফেলি। এই গতিকে যদি হারাই তবে শিকলে বাঁধা পাখি যেমন আকাশকে হারায় তেমনি আমরা অনন্তের উপলব্ধি হইতে বঞ্চিত হই সুতরাং সত্যের চিরমুক্ত পথ রুদ্ধ হইয়া যায় এবং চারিদিক হইতে নানা অদ্ভুত আকার ধারণ করিয়া অসংখ্য প্রমাদ আমাদিগকে মায়াবী নিশাচরের মতো আক্রমণ করিতে থাকে। স্তব্ধ হইয়া জড়বৎ পড়িয়া থাকিয়া আমাদিগকে তাহা সহ্য করিতে হয়।

১৩১৮

নামকরণ

এই আনন্দরূপিণী কন্যাটি একদিন কোথা হইতে তাহার মায়ের কোলে আসিয়া চক্ষু মেলিল। তখন তাহার গায়ে কাপড় ছিল না, দেহে বল ছিল না, মুখে কথা ছিল না, কিন্তু সে পৃথিবীতে পা দিয়াই এক মুহূর্তে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উপর আপনার প্রবল দাবি জানাইয়া দিল। সে বলিল আমার এই জল, আমার এই মাটি, আমার এই চন্দ্র সূর্য গ্রহতারকা। এত বড়ো জগৎচরাচরের মধ্যে এই অতি ক্ষুদ্র মানবিকাটি নূতন আসিয়াছে বলিয়া কোনো দ্বিধা সংকোচ সে দেখাইল না। এখানে যেন তাহার চিরকালের অধিকার আছে, যেন চিরকালের পরিচয়।

বড়লোকের কাছ হইতে ভালোরকমের পরিচয়পত্র সংগ্রহ করিয়া আনিতে পারিলে নূতন জায়গার রাজপ্রাসাদে আদর অভ্যর্থনা পাইবার পথ পরিষ্কার হইয়া যায়। এই মেয়েটিও যেদিন প্রথম এই পৃথিবীতে আসিল উহার ছোটো মুঠির মধ্যে একখানি অদৃশ্য

১৮৩৩ শক ৩রা ফাল্গুন বৃহস্পতিবার শান্তিনিকেতন আশ্রমে শ্রীযুক্ত অজিতকুমার চক্রবর্তীর কন্যার নামকরণ উপলক্ষ্যে কথিত বক্তৃতার সারমর্ম।

পরিচয়পত্র ছিল। সকলের চেয়ে যিনি বড়ো তিনিই নিজের নামসইকরা একখানি চিঠি ইহার হাতে দিয়াছিলেন তাহাতে লেখা ছিল, এই লোকটি আমার নিতান্ত পরিচিত, তোমরা যদি ইহাকে যত্ন কর তবে আমি খুশি হইব।

তাহার পরে কাহার সাধ্য ইহার দ্বার রোধ করে। সমস্ত পৃথিবী তখনই বলিয়া উঠিল, এস, এস, আমি তোমাকে বুকে করিয়া রাখিব—দূর আকাশের তারাগুলি পর্যন্ত ইহাকে হাসিয়া অভ্যর্থনা করিল—বলিল, তুমি আমাদেরই একজন। বসন্তের ফুল বলিল, আমি তোমার জন্য ফলের আয়োজন করিতেছি ; বর্ষার মেঘ বলিল, তোমার জন্য অভিষেকের জল নির্মল করিয়া রাখিলাম।

এমনি করিয়া জন্মের আরম্ভেই প্রকৃতির বিশ্বদরবারের দরজা খুলিয়া গেল। মা বাপের যে স্নেহ সেও প্রকৃতি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে। শিশুর কান্না যেমনি আপনাকে ঘোষণা করিল অমনি সেই মুহূর্তেই জলস্থল আকাশ সেই মুহূর্তেই মা বাপের প্রাণ সাড়া দিল, তাহাকে অপেক্ষা করিতে হইল না।

কিন্তু আরও একটি জন্ম ইহার বাকি আছে, এবার ইহাকে মানবসমাজের মধ্যে জন্ম লইতে হইবে। নামকরণের দিনই সেই জন্মের দিন। একদিন রূপের দেহ ধরিয়া এই কন্যা প্রকৃতির ক্ষেত্রে আসিয়াছিল, আজ নামের দেহ ধরিয়া এই কন্যা সমাজের ক্ষেত্রে প্রথম পদার্পণ করিল। জন্মমাত্রে পিতামাতা এই শিশুকে স্বীকার করিয়া লইয়াছে, কিন্তু এ যদি কেবলই ইহার পিতামাতারই হইত তবে ইহার আর নামের দরকার হইত না, তবে ইহাকে নিত্য নূতন নূতন নামে ডাকিলেও কাহারও ক্ষতিবৃদ্ধি ছিল না। কিন্তু এ মেয়েটি নাকি শুধু পিতামাতার নহে, এ নাকি সমস্ত মানবসমাজের, সমস্ত মানুষের জ্ঞান প্রেম কর্মের বিপুল ভাণ্ডার নাকি ইহার জন্য প্রস্তুত আছে, সেইজন্য মানবসমাজ ইহাকে একটি নামদেহ দিয়া আপনার করিয়া লইতে চায়।

মানুষের যে শ্রেষ্ঠরূপ যে মঙ্গলরূপ তাহা এই নামদেহটির দ্বারাই আপনাকে চিহ্নিত করে। এই নামকরণের মধ্যে সমস্ত মানবসমাজের একটি আশা আছে, একটি আশীর্বাদ আছে—এই নামটি যেন নষ্ট না হয় ম্লান না হয়, এই নামটি যেন ধন্য হয়, এই নামটি যেন মাধুর্যে ও পবিত্রতায় মানুষের হৃদয়ের মধ্যে অমরতা লাভ করে। যখন ইহার রূপের দেহটি একদিন বিদায় লইবে তখনও ইহার নামের দেহটি মানবসমাজের মর্মস্থানটিতে যেন উজ্জ্বল হইয়া বিরাজ করে।

আমরা সকলে মিলিয়া এই কন্যাটির নাম দিয়াছি, অমিতা। অমিতা বলিতে বুঝায় এই যে, যাহার সীমা নাই। এই নামটি তো ব্যর্থ নহে। আমরা যেখানে মানুষের সীমা দেখিতেছি সেইখানেই তো তাহার সীমা নাই। এই যে কলভাষিণী কন্যাটি

জানে না যে আজ আমরা ইহাকে লইয়াই আনন্দ করিতেছি, জানে না বাহিরে কী ঘটিতেছে, জানে না ইহার নিজের মধ্যে কী আছে—এই অপরিস্ফুটতার মধ্যেই তো ইহার সীমা নহে। এই কন্যাটি যখন একদিন রমণীরূপে বিকসিত হইয়া উঠিবে তখনই কি এ আপনার চরমকে লাভ করিবে? তখনও এই মেয়েটি নিজেকে যাহা বলিয়া জানিবে এ কি তাহার চেয়েও অনেক বড়ো নহে! মানুষের মধ্যে এই যে একটি অপরিমেয়তা আছে যাহা তাহার সীমাকে কেবলই অতিক্রম করিয়া চলিয়াছে তাহাই কি তাহার সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ পরিচয় নহে? মানুষ যেদিন নিজের মধ্যে আপনার এই সত্য পরিচয়টি জানিতে পারে সেই দিনই সে ক্ষুদ্রতার জাল ছেদন করিবার শক্তি পায়, সেই দিনই সে উপস্থিত স্বার্থকে লক্ষ্য বলিয়া স্বীকার করে না, সেই দিনই সে চিরন্তন মঙ্গলকেই আপনার বলিয়া বরণ করিয়া লয়। যে মহাপুরুষেরা মানুষকে সত্য করিয়া চিনিয়াছেন তাঁহারা তো আমাদের মর্ত্য বলিয়া জানেন না, তাঁহারা আমাদের ডাক দিয়া বলেন, তোমরা "অমৃতস্য পুত্রাঃ।"

আমরা অমিতা নামে সেই অমৃতের পুত্রীকেই আমাদের সমাজে আহ্বান করিলাম। এই নামটি ইহাকে আপন মানবজন্মের মহত্ত্ব চিরদিন স্মরণ করাইয়া দিক আমরা ইহাকে এই আশীর্বাদ করি।

আমাদের দেশে নামকরণের সঙ্গে আর একটি কাজ আছে সেটি অন্নপ্রাশন। দুটির মধ্যে গভীর একটি যোগ রহিয়াছে। শিশু যে দিন একমাত্র মায়ের কোল অধিকার করিয়া ছিল সেদিন তাহার অন্ন ছিল মাতৃস্তন্য। সে অন্ন কাহাকেও প্রস্তুত করিতে হয় নাই—সে একেবারে তাহার একলার জিনিস, তাহাতে আর কাহারও অংশ ছিল না। আজ সে নাম দেহ ধরিয়া মানুষের সমাজে আসিল তাই আজ তাহার মুখে মানবসাধারণের অন্নকণাটি উঠিল। সমস্ত পৃথিবীতে সমস্ত মানুষের পাতে পাতে যে অন্নের পরিবেষণ চলিতেছে তাহারই প্রথম অংশ এই কন্যাটি আজ লাভ করিল। এই অন্ন সমস্ত সমাজে মিলিয়া প্রস্তুত করিয়াছে—কোন্ দেশে কোন্ চাষা রৌদ্রবৃষ্টি মাথায় করিয়া চাষ করিয়াছে, কোন্ বাহক ইহা বহন করিয়াছে, কোন্ মহাজন ইহাকে হাটে আনিয়াছে, কোন্ ক্রেতা ইহা ক্রয় করিয়াছে, কোন্ পাচক ইহা রন্ধন করিয়াছে, তবে এই কন্যার মুখে ইহা উঠিল। এই মেয়েটি আজ মানবসমাজে প্রথম আতিথ্য লইতে আসিয়াছে, এই জন্য সমাজ আপনার অন্ন ইহার মুখে তুলিয়া দিয়া অতিথিসৎকার করিল। এই অন্নটি ইহার মুখে তুলিয়া দেওয়ার মধ্যে মস্ত একটি কথা আছে। মানুষ ইহার দ্বারাই জানাইল আমার যাহা কিছু আছে তাহাতে তোমার অংশ আমি স্বীকার করিলাম। আমার জ্ঞানীরা যাহা জানিয়াছেন তুমি তাহা জানিবে,

আমার মহাপুরুষেরা যে তপস্যা করিয়াছেন তুমি তাহার ফল পাইবে, আমার বীরেরা যে জীবন দিয়াছেন তাহাতে তোমার জীবন পূর্ণ হইয়া উঠিবে, আমার কর্মীরা যে পথ নির্মাণ করিয়াছেন তাহাতে তোমার জীবনযাত্রা অব্যাহত হইবে। এই শিশু কিছুই না জানিয়া আজ একটি মহৎ অধিকার লাভ করিল—অদ্যকার এই শুভদিনটি তাহার সমস্ত জীবনে চিরদিন সার্থক হইয়া উঠিতে থাক্।

অদ্য আমরা ইহাই অনুভব করিতেছি মানুষের জন্মক্ষেত্র কেবল একটিমাত্র নহে, তাহা কেবল প্রকৃতির ক্ষেত্র নহে, তাহা মঙ্গলের ক্ষেত্র। তাহা কেবল জীবলোক নহে তাহা স্নেহলোক, তাহা আনন্দলোক। প্রকৃতির ক্ষেত্রটিকে চোখে দেখিতে পাই, তাহা জলেস্থলে ফলেফুলে সর্বত্রই প্রত্যক্ষ—অথচ তাহাই মানুষের সর্বাপেক্ষা সত্য আশ্রয় নহে। যে জ্ঞান, যে প্রেম, যে কল্যাণ অদৃশ্য হইয়া আপনার বিপুল সৃষ্টিকে বিস্তার করিয়া চলিয়াছে—সেই জ্ঞানপ্রেম-কল্যাণের চিন্ময় আনন্দময় জগৎই মানুষের যথার্থ জগৎ। এই জগতের মধ্যেই মানুষ যথার্থ জন্মলাভ করে বলিয়াই সে একটি আশ্চর্য সত্তাকে আপনার পিতা বলিয়া অনুভব করিয়াছে, যে সত্তা অনির্বচনীয়। এমন একটি সত্যকেই পরম সত্য বলিয়াছে যাহাকে চিন্তা করিতে গিয়া মন ফিরিয়া আসে। এইজন্যই এই শিশুর জন্মদিনে মানুষ জলস্থলঅগ্নিবায়ুর কাছে কৃতজ্ঞতা নিবেদন করে নাই, জলস্থলঅগ্নিবায়ুর অন্তরে শক্তিরূপে যিনি অদৃশ্য বিরাজমান, তাঁহাকেই প্রণাম করিয়াছে। সেইজন্যই আজ এই শিশুর নামকরণের দিনে মানুষ মানবসমাজকে অর্ঘ্য সাজাইয়া পূজা করে নাই কিন্তু যিনি মানবসমাজের অন্তরে প্রীতিরূপে কল্যাণরূপে অধিষ্ঠিত তাঁহারই আশীর্বাদ সে প্রার্থনা করিতেছে। বড়ো আশ্চর্য মানুষের এই উপলব্ধি এই পূজা, বড়ো আশ্চর্য মানুষের এই অধ্যাত্মলোকে জন্ম, বড়ো আশ্চর্য মানুষের এই দৃশ্য জগতের অন্তর্বর্তী অদৃশ্য নিকেতন। মানুষের ক্ষুধাতৃষ্ণা আশ্চর্য নহে, মানুষের ধনমান লইয়া কাড়াকাড়ি আশ্চর্য নহে, কিন্তু বড়ো আশ্চর্য—জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের পর্বে পর্বে মানুষের সেই অদৃশ্যকে পূজ্য বলিয়া প্রণাম, সেই অনন্তকে আপন বলিয়া আহ্বান। অদ্য এই শিশুটিকে নাম দিবার বেলায় মানুষ সকল নামরূপের আধার ও সকল নাম-রূপের অতীতকে আপনার এই নিতান্ত ঘরের কাজে এমন করিয়া আমন্ত্রণ করিতে ভরসা পাইল ইহাতেই মানুষ সমস্ত জীবসমাজের মধ্যে কৃতকৃতার্থ হইল,—ধন্য হইল এই কন্যাটি, এবং ধন্য হইলাম আমরা।

১৩১৮

ধর্মের নবযুগ

সংসারের ব্যবহারে প্রতিদিন আমরা ছোটো ছোটো সীমার মধ্যে আপনাকে রুদ্ধ করিয়া থাকি। এমন অবস্থায় মানুষ স্বার্থপরভাবে কাজ করে, গ্রাম্যভাবে চিন্তা করে, ও সংকীর্ণ সংস্কারের অনুসরণ করিয়া অত্যন্ত অনুদারভাবে নিজের রাগদ্বেষকে প্রচার করে। এইজন্যই দিনের মধ্যে অন্তত একবার করিয়াও নিজেকে অসীমের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেখিবার উপদেশ আছে। অন্তত একবার করিয়াও এ কথা বুঝিতে হইবে যে কোনো ভৌগোলিক ভূমিখণ্ডেই আমার চিরকালের দেশ নহে, সমস্ত ভূর্ভুবঃ স্বঃ আমার বিরাট আশ্রয়; অন্তত একবার করিয়াও অন্তরের মধ্যে এই কথাটিকে ধ্যান করিয়া লইতে হইবে যে, আমার ধীশক্তি আমার চৈতন্য কোনো একটা কলের জিনিসের মতো আমার মধ্যেই উৎপন্ন ও আমার মধ্যেই বদ্ধ নহে, জগদ্ব্যাপী ও জগতের অতীত অনন্ত চৈতন্য হইতেই তাহা প্রতিমুহূর্তে আমার মধ্যে বিকীর্ণ হইতেছে।

এইরূপে নিজেকে যেমন সমস্ত আবরণ হইতে মুক্তি দিয়া সত্য করিয়া দেখিতে হইবে নিজের ধর্মকেও তেমনি করিয়া তাহার সত্য আধারের মধ্যে দেখিবার সাধনা করা চাই। আমাদের ধর্মকেও যখন সংসারে আমরা প্রতিদিন ব্যবহার করিতে থাকি তখন কেবলই তাহাকে নিজের নানাপ্রকার ক্ষুদ্রতার দ্বারা বিজড়িত করিয়া ফেলি। মুখে যাহাই বলি না কেন, ভিতরে ভিতরে তাহাকে আমাদের সমাজের ধর্ম আমাদের সম্প্রদায়ের ধর্ম করিয়া ফেলি। সেই ধর্মসম্বন্ধে আমাদের সমস্ত চিন্তা সাম্প্রদায়িক সংস্কারের দ্বারা অনুরঞ্জিত হইয়া উঠে। অন্যান্য বৈষয়িক ব্যাপারের ন্যায় আমাদের ধর্ম, আমাদের আত্মাভিমান বা দলীয় অভিমানের উপলক্ষ্য হইয়া পড়ে; ভেদবুদ্ধি নানাপ্রকার ছদ্মবেশ ধরিয়া জাগিতে থাকে; এবং আমরা নিজের ধর্মকে লইয়া অন্যান্য দলের সহিত প্রতিযোগিতার উত্তেজনায় হারজিতের ঘোড়দৌড় খেলিয়া থাকি। এই সমস্ত ক্ষুদ্রতা যে আমাদেরই স্বভাব, তাহা যে আমাদের ধর্মের স্বভাব নহে সে কথা আমরা ক্রমে ক্রমে ভুলিয়া যাই এবং একদিন আমাদের ধর্মের উপরেই আমাদের নিজের সংকীর্ণতা আরোপ করিয়া তাহাই লইয়া গৌরব করিতে লজ্জা বোধ করি না।

এইজন্যই আমাদের ধর্মকে অন্তত বৎসরের মধ্যে একদিনও আমাদের স্বরচিত সমাজের বেষ্টন হইতে মুক্তি দিয়া সমস্ত মানুষের মধ্যে তাহার নিত্য প্রতিষ্ঠায় তাহার সত্য আশ্রয়ে প্রত্যক্ষ করিয়া দেখিতে হইবে; দেখিতে হইবে, সকল মানুষের মধ্যেই তাহার সামঞ্জস্য আছে কিনা, কোথাও তাহার বাধা আছে কিনা—বুঝিতে হইবে তাহা সেই পরিমাণেই সত্য যে পরিমাণে তাহা সকল মানুষেরই।

কিছুকাল হইতে মানুষের সভ্যতার মধ্যে একটা খুব বড়ো রকমের পরিবর্তন দেখা দিতেছে—তাহার মধ্যে সমুদ্র হইতে যেন একটা জোয়ার আসিয়াছে। একদিন ছিল যখন প্রত্যেক জাতিই ন্যূনাধিক পরিমাণে আপনার গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ হইয়া বসিয়া ছিল। নিজের সঙ্গে সমস্ত মানবেরই যে একটা গূঢ়গভীর যোগ আছে ইহা সে বুঝিতই না। সমস্ত মানুষকে জানার ভিতর দিয়াই যে নিজেকে সত্য করিয়া জানা যায় একথা সে স্বীকার করিতেই পারিত না। সে এই কথা মনে করিয়া নিজের চৌকিতে খাড়া হইয়া মাথা তুলিয়া বসিয়াছিল যে, তাহার জাতি, তাহার সমাজ, তাহার ধর্ম যেন ঈশ্বরের বিশেষ সৃষ্টি এবং চরম সৃষ্টি—অন্য জাতি, ধর্ম, সমাজের সঙ্গে তাহার মিল নাই এবং মিল থাকিতেই পারে না। স্বধর্মে এবং পরধর্মে যেন একটা অটল অলঙ্ঘ্য ব্যবধান।

এদিকে তখন বিজ্ঞান বাহিরের বিষয়ে আমাদের জ্ঞানের বেড়া ভাঙিয়া দিতে আরম্ভ করিয়াছে। এই একটা মস্ত ভুল সে আমাদের একে একে ঘুচাইতে লাগিল যে, জগতে কোনো বস্তুই নিজের বিশেষত্বের ঘেরের মধ্যে একেবারে স্বতন্ত্র হইয়া নাই। বাহিরে তাহার বিশেষত্ব আমরা যেমনই দেখি না কেন, কতকগুলি গূঢ় নিয়মের ঐক্য-জালে সে ব্রহ্মাণ্ডের দূরতম অণু-পরমাণুর সহিত নাড়ির বাঁধনে বাঁধা। এই বৃহৎ বিশ্বগোষ্ঠীর গোপন কুলজিখানি সন্ধান করিয়া দেখিতে গেলে তখনই ধরা পড়িয়া যায় যে যিনি আপনাকে যত বড়ো কুলীন বলিয়াই মনে করুন না কেন গোত্র সকলেরই এক। এইজন্য বিশ্বের কোনো একটি কিছুর তত্ত্ব সত্য করিয়া জানিতে গেলে সবকটির সঙ্গে তাহাকে বাজাইয়া দেখিতে হয়। বিজ্ঞান সেই উপায় ধরিয়া সত্যের পরখ করিতে লাগিয়া গেছে।

কিন্তু ভেদবুদ্ধি সহজে মরিতে চায় না। কেননা জন্মকাল হইতে আমরা ভেদটাকেই চোখে দেখিতেছি, সেইটেই আমাদের বুদ্ধির সকলের চেয়ে পুরাতন অভ্যাস। তাই মানুষ বলিতে লাগিল জড়পর্যায়ে যেমনই হ’ক না কেন, জীবপর্যায়ে বিজ্ঞানের ঐক্যতত্ত্ব খাটে না; পৃথিবীতে ভিন্ন ভিন্ন জীবের ভিন্ন ভিন্ন বংশ; এবং মানুষ, আরম্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত, সকল জীব হইতে একেবারেই পৃথক। কিন্তু বিজ্ঞান এই অভিমানের সীমানাটুকুকেও বজায় রাখিতে দিল না; জীবের সঙ্গে জীবের কোথাও বা নিকট কোথাও বা দূর কুটুম্বিতার সম্পর্ক আছে এ সংবাদটিও প্রকাশ হইয়া পড়িল।

এদিকে মানবসমাজে যাহারা পরস্পরকে একেবারে নিঃসম্পর্ক বলিয়া সমুদ্রের ভিন্ন ভিন্ন পারে স্বতন্ত্র হইয়া বসিয়া ছিল, ভাষাতত্ত্বের স্তরে স্তরে তাহাদের পুরাতন সম্বন্ধ উদ্‌ঘাটিত হইতে আরম্ভ হইল। তাহাদের ধর্ম ও সামাজিক ইতিহাসের নানা শাখা

প্রশাখায় উজান বাহিয়া মানুষের সন্ধান অবশেষে এক দূর গঙ্গোত্রীতে এক মূল প্রস্রবণের কাছে উপনীত হইতে লাগিল।

এইরূপে জড়ে জীবে সর্বত্রই একের সঙ্গে আরের যোগ এমনি সুদূরবিস্তৃত এমনি বিচিত্র করিয়া প্রত্যহ প্রকাশ হইতেছে; যেখানেই সেই যোগের সীমা আমরা স্থাপন করিতেছি সেইখানেই সেই সীমা এমন করিয়া লুপ্ত হইয়া যাইতেছে যে, মানুষের সকল জ্ঞানকেই আজ পরস্পর তুলনার দ্বারা তৌল-করিয়া দেখিবার উদ্‌যোগ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। দেহগঠনের তুলনা, ভাষার তুলনা, সমাজের তুলনা, ধর্মের তুলনা,—সমস্তই তুলনা। সত্যের বিচারসভায় আজ জগৎ জুড়িয়া সাক্ষীর তলব পড়িয়াছে; আজ একের সংবাদ আরের মুখে না পাইলে প্রমাণ সংশয়াপন্ন হইতেছে; নিজের পক্ষের কথা একমাত্র যে নিজের জবানিতেই বলে, যে বলে আমার শাস্ত্র আমার মধ্যেই, আমার তত্ত্ব আমাতেই পরিসমাপ্ত, আমি আর কারও ধার ধারি না— তৎক্ষণাৎ তাহাকে অবিশ্বাস করিতে কেহ মুহূর্তকাল দ্বিধা করে না।

তবেই দেখা যাইতেছে মানুষ যেদিকটাতে অতি দীর্ঘকাল বাঁধা ছিল আজ যেন একেবারে তাহার বিপরীত দিকে আসিয়া পড়িয়াছে। এতদিন সে নিশ্চয় জানিত যে, সে খাঁচার পাখি, আজ জানিতে পারিয়াছে সে আকাশের পাখি। এতকাল তাহার চিন্তা, ভাব ও জীবনযাত্রার সমস্ত ব্যবস্থাই ওই খাঁচার লৌহশলাকাগুলার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই রচিত হইয়াছিল। আজ তাহা লইয়া আর কাজ চলে না। সেই আগেকার মতো ভাবিতে গেলে সেই রকম করিয়া কাজ করিতে বসিলে সে আর সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পায় না। অথচ অনেক দিনের অভ্যাস অস্থিমজ্জায় গাঁথা হইয়া রহিয়াছে। সেইজন্যই মানুষের মনকে ও ব্যবহারকে আজ বহুতর অসংগতি অত্যন্ত পীড়া দিতেছে। পুরাতনের আসবাবগুলা আজ তাহার পক্ষে বিষম বোঝা হইয়া উঠিয়াছে, অথচ এত দিন তাহাকে এত মূল্য দিয়া আসিয়াছে যে তাহাকে ফেলিতে মন সরিতেছে না; সেগুলা যে অনাবশ্যক নহে, তাহারা যে চিরকালই সমান মূল্যবান এই কথাই প্রাণপণে নানাপ্রকার সুযুক্তি ও কুযুক্তির দ্বারা সে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিতেছে।

যতদিন খাঁচায় ছিল ততদিন সে দৃঢ়রূপেই জানিত তাহার বাসা চিরকালের জন্যই কোনো এক বুদ্ধিমান পুরুষ বহুকাল হইল বাঁধিয়া দিয়াছে; আর কোনো প্রকার বাসা একেবারে হইতে পারে না, নিজের শক্তিতে তো নহেই;—সে জানিত তাহার প্রতিদিনের খাদ্য-পানীয় কোনো একজন বুদ্ধিমান পুরুষ চিরকালের জন্য বরাদ্দ করিয়া দিয়াছে, অন্য আর কোনো প্রকার খাদ্য সম্ভবপরই নহে, বিশেষত নিজের চেষ্টায় স্বাধীনভাবে অন্নপানের সন্ধানের মতো নিষিদ্ধ তাহার পক্ষে আর কিছুই নাই। এই নির্দিষ্ট

খাঁচার মধ্য দিয়া যেটুকু আকাশ দেখা যাইতেছে তাহার বাহিরেও যে বিধাতার সৃষ্টি আছে একথা একেবারেই অশ্রদ্ধেয় এবং সীমাকে লঙ্ঘন করার চেষ্টামাত্রই গুরুতর অপরাধ।

আধুনিক পৃথিবীতে সেই পুরাতন ধর্মের সহিত নূতন বোধের বিরোধ খুবই প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। সে এমন একটি ধর্মকে চাহিতেছে যাহা কোনো একটি বিশেষ জাতির বিশেষ কালের বিশেষ ধর্ম নহে; যাহাকে কতকগুলি বাহ্য পূজাপদ্ধতির দ্বারা বিশেষ রূপের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া ফেলা হয় নাই; মানুষের চিত্ত যতদূরই প্রসারিত হউক যে ধর্ম কোনো দিকেই তাহাকে বাধা দিবে না, বরঞ্চ সকল দিকেই তাহাকে মহানের দিকে অগ্রসর হইতে আহ্বান করিবে। মানুষের জ্ঞান আজ যে মুক্তির ক্ষেত্রে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে সেইখানকার উপযোগী হৃদয়বোধকে এবং ধর্মকে না পাইলে তাহার জীবন সংগীতের সুর মিলিবে না, এবং কেবলই তাল কাটিতে থাকিবে।

আজ মানুষের জ্ঞানের সম্মুখে সমস্ত কাল জুড়িয়া, সমস্ত আকাশ জুড়িয়া একটি চিরধাবমান মহাযাত্রার লীলা প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে—সমস্তই চলিতেছে সমস্তই কেবল উন্মেষিত হইয়া উঠিতেছে। প্রকাশ কোনো জায়গাতেই স্থির হইয়া ঘুমাইয়া পড়ে নাই, এক মুহূর্ত তাহার বিরাম নাই; অপরিস্ফুটতা হইতে পরিস্ফুটতার অভিমুখে কেবলই সে আপনার অগণ্য পাপড়িকে একটি একটি করিয়া খুলিয়া দিকে দিকে প্রসারিত করিয়া দিতেছে। এই পরমাশ্চর্য নিত্যবহমান প্রকাশব্যাপারে মানুষ যে কবে বাহির হইল তাহা কে জানে—সে যে কোন্ বাষ্পসমুদ্র পার হইয়া কোন্ প্রাণরহস্যের উপকূলে আসিয়া উত্তীর্ণ হইল তাহার ঠিকানা নাই। যুগে যুগে বন্দরে বন্দরে তাহার তরী লাগিয়াছিল, সে কেবলই আপনার পণ্যের মূল্য বাড়াইয়া অগ্রসর হইয়াছে; কেবলই "শঙ্খের বদলে মুকুতা," স্থূলের বদলে সূক্ষ্মটিকে সংগ্রহ করিয়া ধনপতি হইয়া উঠিয়াছে এ সংবাদ আজ আর তাহার অগোচর নাই। এইজন্য যাত্রার গানই আজ তাহার গান, এইজন্য সমুদ্রের আনন্দই আজ তাহার মনকে উৎসুক করিয়া তুলিয়াছে। একথা আজ সে কোনোমতেই মনে করিতে পারিতেছে না যে, নোঙরের শিকলে মরিচা পড়াইয়া হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া চুপ করিয়া কূলে পড়িয়া থাকাই তাহার সনাতন সত্যধর্ম! বাতাস আজ তাহাকে উতলা করিতেছে, বলিতেছে, ওরে মহাকালের যাত্রী, সবকটা পাল তুলিয়া দে,—ধ্রুব নক্ষত্র আজ তাহার চোখের সম্মুখে জ্যোতির্ময় তর্জনী তুলিয়াছে, বলিতেছে, ওরে দ্বিধাকাতর, ভয় নাই অগ্রসর হইতে থাক্। আজ পৃথিবীর মানুষ সেই কর্ণধারকেই ডাকিতেছে—যিনি তাঁহার পুরাতন গুরুভার নোঙরটাকে গভীর পঙ্কতল হইতে তুলিয়া আনন্দচঞ্চল তরঙ্গের পথে হাল ধরিয়া বসিবেন।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে ভারতবর্ষের পূর্বপ্রান্তে এই বাংলাদেশে আজ প্রায় শতবৎসর পূর্বে রামমোহন রায় পৃথিবীর সেই বাধামুক্ত ধর্মের পালটাকেই ঈশ্বরের প্রসাদবায়ুর সম্মুখে উন্মুক্ত করিয়া ধরিয়াছেন। ইহাও আশ্চর্যের বিষয় যে মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগ, ধর্মের সঙ্গে ধর্মের ঐক্য, তখন পৃথিবীর অন্য কোথাও মানবের মনে পরিস্ফুট হইয়া প্রকাশ পায় নাই। সেদিন রামমোহন রায় যেন সমস্ত পৃথিবীর বেদনাকে হৃদয়ে লইয়া পৃথিবীর ধর্মকে খুঁজিতে বাহির হইয়াছিলেন।

তিনি যে সময়ে ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তখন এদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম আচ্ছন্ন হইয়াছিল। তিনি মূর্তিপূজার মধ্যেই জন্মিয়াছিলেন এবং তাহারই মধ্যে বাড়িয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু এই বহুকালব্যাপী সংস্কার ও দেশব্যাপী অভ্যাসের নিবিড়তার মধ্যে থাকিয়াও এই বিপুল এবং প্রবল এবং প্রাচীন সমাজের মধ্যে কেবল একলা রামমোহন মূর্তিপূজাকে কোনোমতেই স্বীকার করিতে পারিলেন না। তাহার কারণ এই, তিনি আপনার হৃদয়ের মধ্যে বিশ্বমানবের হৃদয় লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। মূর্তিপূজা সেই অবস্থারই পূজা যে অবস্থায় মানুষ বিশেষ দেশকে বিশেষ জাতিকে বিশেষ বিধিনিষেধসকলকে বিশ্বের সহিত অত্যন্ত পৃথক করিয়া দেখে;—যখন সে বলে যাহাতে আমারই বিশেষ দীক্ষা তাহাতে আমারই বিশেষ মঙ্গল; যখন সে বলে আমার এই সমস্ত বিশেষ শিক্ষাদীক্ষার মধ্যে বাহিরের আর কাহারও প্রবেশ করিয়া ফল নাই এবং প্রবেশ করিতে দিবই না। "তবে বাহিরের লোকের কী গতি হইবে" এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে মানুষ উত্তর দেয় পুরাকাল ধরিয়া সেই বাহিরের লোকের যে বিশেষ শিক্ষাদীক্ষা চলিয়া আসিতেছে তাহাতেই অচলভাবে আবদ্ধ থাকিলেই তাহার পক্ষে শ্রেয়; অর্থাৎ যে সময়ে মানুষের মনের এইরূপ বিশ্বাস যে, বিদ্যায় মানুষের সর্বত্র অধিকার, বাণিজ্যে মানুষের সর্বত্র অধিকার, কেবলমাত্র ধর্মেই মানুষ এমনি চিরন্তনরূপে বিভক্ত যে সেখানে পরস্পরের মধ্যে যাতায়াতের কোনো পথ নাই; সেখানে মানুষের ভক্তির আশ্রয় পৃথক, মানুষের মুক্তির পথ পৃথক, পূজার মন্ত্র পৃথক; আর সর্বত্রই স্বভাবের আকর্ষণেই হউক আর প্রবলের শাসনের দ্বারাই হউক মানুষের এক হইয়া মিলিবার আশা আছে, উপায় আছে; এমন কি নানাজাতির লোক পাশাপাশি দাঁড়াইয়া যুদ্ধের নাম করিয়া নিদারুণ নরহত্যার ব্যাপারেও গৌরবের সহিত সম্মিলিত হইতে পারে, কেবলমাত্র ধর্মের ক্ষেত্রেই মানুষ দেশবিদেশ স্বজাতি বিজাতি ভুলিয়া আপন পূজাসনের পার্শ্বে পরস্পরকে আহ্বান করিতে পারিবে না। বস্তুত মূর্তিপূজা সেইরূপ কালেরই পূজা—যখন মানুষ বিশ্বের পরমদেবতাকে একটি কোনো বিশেষ রূপে একটি কোনো বিশেষ স্থানে আবদ্ধ করিয়া তাহাকেই বিশেষ মহাপুণ্যফলের আকর বলিয়া নির্দেশ

করিয়াছে অথচ সেই মহাপুণ্যের দ্বারকে সমস্ত মানুষের কাছে উন্মুক্ত করে নাই, সেখানে বিশেষ সমাজে জন্মগ্রহণ ছাড়া প্রবেশের অন্য কোনো উপায় রাখা হয় নাই ; মূর্তিপূজা সেই সময়েরই—যখন পাঁচসাত ক্রোশ দূরের লোক বিদেশী, পরদেশের লোক ম্লেচ্ছ, পরসমাজের লোক অশুচি, এবং নিজের দলের লোক ছাড়া আর সকলেই অনধিকারী—এক কথায় যখন ধর্ম আপন ঈশ্বরকে সংকুচিত করিয়া সমস্ত মানুষকে সংকুচিত করিয়াছে এবং জগতে যাহা সকলের চেয়ে বিশ্বজনীন তাহাকে সকলের চেয়ে গ্রাম্য করিয়া ফেলিয়াছে। সংস্কার যতই সংকীর্ণ হয় তাহা মানুষকে ততই আঁট করিয়া ধরে, তাহাকে ত্যাগ করিয়া বাহির হওয়া ততই অত্যন্ত কঠিন হয় ;—যাহারা অলংকারকে নিরতিশয় পিনদ্ধ করিয়া পরে তাহাদের এই অলংকার ইহজন্মে তাহারা আর বর্জন করিতে পারে না, সে তাহাদের দেহচর্মের মধ্যে একেবারে কাটিয়া বসিয়া যায়। সেইরূপ ধর্মের সংস্কারকে সংকীর্ণ করিলে তাহা চিরশৃঙ্খলের মতো মানুষকে চাপিয়া ধরে,—মানুষের সমস্ত আয়তন যখন বাড়িতেছে তখন সেই ধর্ম আর বাড়ে না, রক্তচলাচলকে বন্ধ করিয়া অঙ্গকে সে কৃশ করিয়াই রাখিয়া দেয়, মৃত্যু পর্যন্ত তাহার হাত হইতে নিস্তার পাওয়াই কঠিন হয়। সেই অতি কঠিন সংকীর্ণ ধর্মের প্রাচীন বন্ধনকে রামমোহন রায় যে কোনোমতেই আপনার আশ্রয় বলিয়া কল্পনা করিতে পারেন নাই তাহার কারণ এই যে, তিনি সহজেই বুঝিয়াছিলেন, যে সত্যের ক্ষুধায় মানুষ ধর্মকে প্রার্থনা করে সে সত্য ব্যক্তিগত নহে, জাতিগত নহে, তাহা সর্বগত। তিনি বাল্যকাল হইতেই অনুভব করিয়াছিলেন যে, যে দেবতা সর্বদেশে সর্বকালে সকল মানুষের দেবতা না হইতে পারেন, অর্থাৎ যিনি আমার কল্পনাকে তৃপ্ত করেন অন্যের কল্পনাকে বাধা দেন, যিনি আমার অভ্যাসকে আকর্ষণ করেন অন্যের অভ্যাসকে পীড়িত করেন তিনি আমারও দেবতা হইতে পারেন না, কারণ সকল মানুষের সঙ্গে যোগ কোনোখানে বিচ্ছিন্ন করিয়া মানুষের পক্ষে পূর্ণ সত্য হওয়া একেবারেই সম্ভব হয় না এবং এই পূর্ণ সত্যই ধর্মের সত্য।

আমাদের একটি পরম সৌভাগ্য এই ছিল যে, মানুষের শ্রেষ্ঠ ধর্মের মহোচ্চ আদর্শ একদিকে আমাদের দেশে যেমন বাধাগ্রস্ত হইয়াছিল তেমনি আর একদিকে তাহাকে উপলব্ধি করিবার সুযোগ আমাদের দেশে যেমন সহজ হইয়াছিল জগতের আর কোথাও তেমন ছিল না। একদিন আমাদের দেশে সাধকেরা ব্রহ্মকে যেমন আশ্চর্য উদার করিয়া দেখিয়াছিলেন এমন আর কোনো দেশেই দেখে নাই। তাঁহাদের সেই ব্রহ্মোপলব্ধি একেবারে মধ্যাহ্নগগনের সূর্যের মতো অত্যুজ্জ্বল হইয়া প্রকাশ পাইয়াছিল, দেশকালপাত্রগত সংস্কারের লেশমাত্র বাষ্প তাহাকে কোথাও স্পর্শ করে নাই। সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম যিনি, তাঁহারই মধ্যে মানবচিত্তের এরূপ পরিপূর্ণ আনন্দময় মুক্তির

বার্তা এমন সুগভীর রহস্যময় বাণীতে অথচ এমন শিশুর মতো অকৃত্রিম সরল ভাষায় উপনিষদ্ ছাড়া আর কোথায় ব্যক্ত হইয়াছে? আজ মানুষের বিজ্ঞান তত্ত্বজ্ঞান যতদূরই অগ্রসর হইতেছে, সেই সনাতন ব্রহ্মোপলব্ধির মধ্যে তাহার অন্তরে বাহিরে কোনো বাধাই পাইতেছে না। তাহা মানুষের সমস্ত জ্ঞানভক্তিকর্মকে পূর্ণ সামঞ্জস্যের মধ্যে গ্রহণ করিতে পারে, কোথাও তাহাকে পীড়িত করে না, সমস্তকেই সে উত্তরোত্তর ভূমার দিকেই আকর্ষণ করিতে থাকে, কোথাও তাহাকে কোনো সাময়িক সংকোচের দোহাই দিয়া মাথা হেঁট করিতে বলে না।

কিন্তু এই ব্রহ্ম তো কেবল জ্ঞানের ব্রহ্ম নহেন—রসো বৈ সঃ—তিনি আনন্দরূপং অমৃতরূপং। ব্রহ্মই যে রসস্বরূপ, এবং—এষোস্য পরম আনন্দঃ—ইনিই আত্মার পরম আনন্দ, আমাদের দেশের সেই চিরলব্ধ সত্যটিকে যদি এই নূতন যুগে নূতন করিয়া সপ্রমাণ করিতে না পারি তবে ব্রহ্মজ্ঞানকে তো আমরা ধর্ম বলিয়া মানুষের হাতে দিতে পারিব না—ব্রহ্মজ্ঞানী তো ব্রহ্মের ভক্ত নহেন। রস ছাড়া তো আর কিছুই মিলাইতে পারে না ভক্তি ছাড়া তো আর কিছুই বাঁধিতে পারে না। জীবনে যখন আত্মবিরোধ ঘটে, যখন হৃদয়ের এক তারের সঙ্গে আর এক তারের অসামঞ্জস্যের বেসুর কর্কশ হইয়া উঠে তখন কেবলমাত্র বুঝাইয়া কোনো ফল পাওয়া যায় না—মজাইয়া দিতে না পারিলে দ্বন্দ্ব মিটে না।

ব্রহ্ম যে সত্যস্বরূপ তাহা যেমন বিশ্বসত্যের মধ্যে জানি, তিনি যে জ্ঞানস্বরূপ তাহা যেমন আত্মজ্ঞানের মধ্যে বুঝিতে পারি, তেমনি তিনি যে রসস্বরূপ তাহা কেবলমাত্র ভক্তের আনন্দের মধ্যেই দেখিতে পাই। ব্রাহ্মধর্মের ইতিহাসে সে দেখা আমরা দেখিয়াছি এবং সে দেখা আমাদিগকে দেখাইয়া চলিতে হইবে।

ব্রাহ্মসমাজে আমরা একদিন দেখিয়াছি ঐশ্বর্যের আড়ম্বরের মধ্যে, পূজার্চনা ক্রিয়াকর্মের মহাসমারোহের মাঝখানে বিলাসলালিত তরুণ যুবকের মন ব্রহ্মের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল।

তাহার পরে দেখিয়াছি সেই ব্রহ্মের আনন্দেই সাংসারিক ক্ষতি-বিপদকে তিনি ভ্রূক্ষেপ করেন নাই, আত্মীয়স্বজনের বিচ্ছেদ ও সমাজের বিরোধকে ভয় করেন নাই; দেখিয়াছি চিরদিনই তিনি তাঁহার জীবনের চিরবরণীয় দেবতার এই অপরূপ বিশ্বমন্দিরের প্রাঙ্গণতলে তাঁহার মস্তককে নত করিয়া রাখিয়াছিলেন, এবং তাঁহার আয়ুর অবসানকাল-পর্যন্ত তাঁহার প্রিয়তমের বিকশিত আনন্দকুঞ্জচ্ছায়ায় বুলবুলের মতো প্রহরে প্রহরে গান করিয়া কাটাইয়াছেন।

এমনি করিয়াই তো আমাদের নবযুগের ধর্মের রসস্বরূপকে আমরা নিশ্চিত সত্য

করিয়া দেখিতেছি। কোনো বাহ্যমূর্তিতে নহে, কোনো ক্ষণকালীন কল্পনায় নহে—একেবারে মানুষের অন্তরতম আত্মার মধ্যেই সেই আনন্দরূপকে অমৃতরূপকে অখণ্ড করিয়া অসন্দিগ্ধ করিয়া দেখিতেছি।

বস্তুত পরমাত্মাকে এই আত্মার মধ্যে দেখার জন্যই মানুষের চিত্ত অপেক্ষা করিতেছে। কেননা আত্মার সঙ্গেই আত্মার স্বাভাবিক যোগ সকলের চেয়ে সত্য; সেইখানেই মানুষের গভীরতম মিল। আর সর্বত্র নানাপ্রকার বাধা। বাহিরের অচারবিচারঅনুষ্ঠান কল্পনাকাহিনীতে পরস্পরের মধ্যে পার্থক্যের অন্ত নাই; কিন্তু মানুষের আত্মায় আত্মায় এক হইয়া আছে—সেইখানেই যখন পরমাত্মাকে দেখি তখন সমস্ত মানবাত্মার মধ্যে তাঁহাকে দেখি, কোনো বিশেষ জাতিকুল-সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখি না।

সেইজন্যই আজ উৎসবের দিনে সেই রসস্বরূপের নিকট আমাদের যে প্রার্থনা তাহা ব্যক্তিগত প্রার্থনা নহে, তাহা আমাদের আত্মার প্রার্থনা, অর্থাৎ তাহা একই কালে সমস্ত মানবাত্মার প্রার্থনা। হে বিশ্বমানবের দেবতা, হে বিশ্বসমাজের বিধাতা, একথা যেন আমরা একদিনের জন্যও না ভুলি যে, আমার পূজা সমস্ত মানুষের পূজারই অঙ্গ, আমার হৃদয়ের নৈবেদ্য সমস্ত মানবহৃদয়ের নৈবেদ্যেরই একটি অর্ঘ্য। হে অন্তর্যামী, আমার অন্তরের বাহিরের, আমার গোচর অগোচর যত কিছু পাপ যত কিছু অপরাধ এই কারণেই অসহ্য যে আমি তাহার দ্বারা সমস্ত মানুষকেই বঞ্চনা করিতেছি, আমার সে সকল বন্ধন সমস্ত মানুষেরই মুক্তির অন্তরায়, আমার নিজের নিজত্বের চেয়ে যে বড়ো মহত্ত্ব আমার উপর তুমি অর্পণ করিয়াছ আমার সমস্ত পাপ তাহাকেই স্পর্শ করিতেছে; এইজন্যই পাপ এত নিদারুণ, এত ঘৃণ্য; তাহাকে আমরা যত গোপনই করি তাহা গোপনের নহে, কোন্ একটি সুগভীর যোগের ভিতর দিয়া তাহা সমস্ত মানুষকে গিয়া আঘাত করিতেছে, সমস্ত মানুষের তপস্যাকেই ম্লান করিয়া দিতেছে। হে ধর্মরাজ, নিজের যতটুকু সাধ্য তাহার দ্বারা সর্বমানবের ধর্মকে উজ্জ্বল করিতে হইবে, বন্ধনকে মোচন করিতে হইবে, সংশয়কে দূর করিতে হইবে। মানবের অন্তরাত্মার অন্তর্গূঢ় এই চির-সংকল্পটিকে তুমি বীর্যের দ্বারা প্রবল করো, পুণ্যের দ্বারা নির্মল করো, তাহার চারিদিক হইতে সমস্ত ভয়সংকোচের জাল ছিন্ন করিয়া দাও, তাহার সম্মুখ হইতে সমস্ত স্বার্থের বিঘ্ন ভগ্ন করিয়া দাও। এ যুগ, সমস্ত মানুষে মানুষে কাঁধে কাঁধে মিলাইয়া হাতে হাতে ধরিয়া, যাত্রা করিবার যুগ। তোমার হুকুম আসিয়াছে চলিতে হইবে। আর একটুও বিলম্ব না। অনেক দিন মানুষের ধর্মবোধ নানা বন্ধনে বদ্ধ হইয়া নিশ্চল হইয়া পড়িয়া ছিল। সেই ঘোর নিশ্চলতার রাত্রি আজ প্রভাত হইয়াছে। তাই আজ দশদিকে তোমার

আহ্বানভেরী বাজিয়া উঠিল। অনেক দিন বাতাস এমনি স্তব্ধ হইয়া ছিল যে মনে হইয়াছিল সমস্ত আকাশ যেন মূর্ছিত ; গাছের পাতাটি পর্যন্ত নড়ে নাই, ঘাসের আগাটি পর্যন্ত কাঁপে নাই ;—আজ ঝড় আসিয়া পড়িল ; আজ শুষ্ক পাতা উড়িবে, আজ সঞ্চিত ধূলি দূর হইয়া যাইবে। আজ অনেকদিনের অনেক প্রিয়বন্ধনপাশ ছিন্ন হইবে সেজন্য মন কুণ্ঠিত না হউক। ঘরের, সমাজের, দেশের যে সমস্ত বেড়া-আড়ালগুলাকেই মুক্তির চেয়ে বেশি আপন বলিয়া তাহাদিগকে লইয়া অহংকার করিয়া আসিয়াছি সে সমস্তকে ঝড়ের মুখের খড়কুটার মতো শূন্যে বিসর্জন দিতে হইবে সেজন্য মন প্রস্তুত হউক ! সত্যের ছদ্মবেশপরা প্রবল অসত্যের সঙ্গে, ধর্মের উপাধিধারী প্রাচীন অমঙ্গলের সঙ্গে আজ লড়াই করিতে হইবে সেজন্য মনের সমস্ত শক্তি পূর্ণবেগে জাগ্রত হউক ! আজ বেদনার দিন আসিল, কেননা আজ চেতনার দিন,—সেজন্য আজ কাপুরুষের মতো নিরানন্দ হইলে চলিবে না ; আজ ত্যাগের দিন আসিল, কেননা আজ চলিবার দিন, আজ কেবলই পিছনের দিকে তাকাইয়া বসিয়া থাকিলে দিন বহিয়া যাইবে আজ কৃপণের মতো রুদ্ধ সঞ্চয়ের উপর বুক দিয়া পড়িয়া থাকিলে ঐশ্বর্যের অধিকার হারাইতে থাকিব। ভীরু, আজ লোকভয়কেই ধর্মভয়ের স্থানে যদি বরণ কর তবে এমন মহাদিন ব্যর্থ হইবে ;— আজ নিন্দাকেই ভূষণ, আজ অপ্রিয়কেই প্রিয় করিয়া তুলিতে হইবে। আজ অনেক খসিবে, ঝরিবে, ভাঙিবে, ক্ষয় হইয়া যাইবে ;—নিশ্চয় মনে করিয়াছিলাম যেদিকে পর্দা সেদিকে হঠাৎ আলোক প্রকাশ হইবে ; নিশ্চয় মনে করিয়াছিলাম যেদিকে প্রাচীর সেদিকে হঠাৎ পথ বাহির হইয়া পড়িবে। হে যুগান্তবিধাতা, আজ তোমার প্রলয়-লীলায় ক্ষণে ক্ষণে দিগন্তপট বিদীর্ণ করিয়া কতই অভাবনীয় প্রকাশ হইতে থাকিবে, বীর্যবান আনন্দের সহিত আমরা তাহার প্রতীক্ষা করিব ;—মানুষের চিত্তসাগরের অতলস্পর্শ রহস্য আজ উন্মথিত হইয়া জ্ঞানে কর্মে ত্যাগে ধর্মে কত কত অত্যাশ্চর্য অজেয় শক্তি প্রকাশমান হইয়া উঠিবে, তাহাকে জয়শঙ্খধ্বনির সঙ্গে অভ্যর্থনা করিয়া লইবার জন্য আমাদের সমস্ত দ্বারবাতায়ন অসংকোচে উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিব। হে অনন্তশক্তি, আমাদের হিসাব তোমার হিসাব নহে,—তুমি অক্ষমকে সক্ষম কর, অচলকে সচল কর, অসম্ভবকে সম্ভব কর এবং মোহমুগ্ধকে যখন তুমি উদ্‌বোধিত কর তখন তাহার দৃষ্টির সম্মুখে তুমি যে কোন্ অমৃতলোকের তোরণ-দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়া দাও তাহা আমরা কল্পনাও করিতে পারি না—এই কথা নিশ্চয় জানিয়া আমরা যেন আনন্দে অমর হইয়া উঠি, এবং আমাদের যাহা কিছু আছে সমস্তই পণ করিয়া, ভূমার পথে নিখিল মানবের বিজয়যাত্রায় যেন সম্পূর্ণ নির্ভয়ে যোগদান করিতে পারি।

জয় জয় জয় হে, জয় বিশ্বেশ্বর,
মানবভাগ্যবিধাতা !

১৩১৮

ধর্মের অর্থ

মানুষের উপর একটা মস্ত সমস্যার মীমাংসাভার পড়িয়াছে। তাহার একটা বড়োর দিক আছে, একটা ছোটোর দিক আছে। দুইয়ের মধ্যে একটা ছেদ আছে, অথচ যোগও আছে। এই ছেদটাকেও রাখিতে হইবে অথচ যোগটাকেও বাড়াইতে হইবে। ছোটো থাকিয়াও তাহাকে বড়ো হইয়া উঠিতে হইবে। এই মীমাংসা করিতে গিয়া মানুষ নানা রকম চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইতেছে কখনো সে ছোটোটাকে মায়া বলিয়া উড়াইয়া দিতে চায়, কখনো বড়োটাকে স্বপ্ন বলিয়া আমল দিতে চায় না। এই দুইয়ের সামঞ্জস্য করিবার চেষ্টাই তাহার সকল চেষ্টার মূল। এই সামঞ্জস্য যদি না করিতে পারা যায় তবে ছোটোরও কোনো অর্থ থাকে না, বড়োটিও নিরর্থক হইয়া পড়ে।

প্রথমে ধরা যাক আমাদের এই শরীরটাকে। এটি একটি ছোটো পদার্থ। ইহার বাহিরে একটি প্রকাণ্ড বড়ো পদার্থ আছে, সেটি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। আমরা অন্যমনস্ক হইয়া এই শরীরটাকে একটা স্বতন্ত্র পদার্থ বলিয়া মনে করি। যেন এ শরীর আপনার মধ্যে আপনি সম্পূর্ণ। কিন্তু তেমন করিয়া বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিলে এ শরীরের কোনো অর্থই খুঁজিয়া পাই না। আপনাকে লইয়া এ শরীর করিবে কী? থাকিবে কোথায়? আপনার মধ্যে এই শরীরের প্রয়োজন নাই সমাপ্তি নাই।

বস্তুত আমাদের এই শরীরে যে স্বাতন্ত্র্যটুকু আছে, সে আপনাকে লইয়া আপনি থাকিতে পারে না। বৃহৎ বিশ্বশরীরের সঙ্গে যে পরিমাণে তাহার মিল হয় সেই পরিমাণে তাহার অর্থ পাওয়া যায়। গর্ভের ভ্রূণ যে নাক কান হাত পা লইয়া আছে গর্ভের বাহিরেই তাহার সার্থকতা। এইজন্য জন্মগ্রহণের পর হইতেই চোখের সঙ্গে আকাশব্যাপী আলোর, কানের সঙ্গে বাতাসব্যাপী শব্দের, হাত পায়ের সঙ্গে চারিদিকের নানাবিধ বিষয়ের, সকলের চেয়ে যেটি ভালো যোগ সেইটি সাধন করিবার জন্য মানুষের কেবলই চেষ্টা চলিতেছে। এই বড়ো শরীরটির সঙ্গে পূর্ণভাবে মিলিবে ইহাই ছোটো শরীরের একান্ত সাধনা—অথচ আপনার ভেদটুকু যদি না রাখে তাহা হইলে সে মিলনের কোনো অর্থই থাকে না। আমার চোখ আলো হইবে না, চোখরূপে থাকিয়া আলো পাইবে, দেহ পৃথিবী হইবে না, দেহরূপে থাকিয়া পৃথিবীকে উপলব্ধি করিবে, ইহাই তাহার সমস্যা।

বিরাট বিশ্বদেহের সঙ্গে আমাদের ছোটো শরীরটি সকল দিক দিয়া এই যে আপনার যোগ অনুভব করিবার চেষ্টা করিতেছে এ কি তাহার প্রয়োজনের চেষ্টা? পাছে

অন্ধকারে কোথাও খোঁচা লাগে এইজন্যই কি চোখ দেখিতে চেষ্টা করে? পাছে বিপদের পদধ্বনি না জানিতে পারিয়া দুঃখ ঘটে এইজন্যই কি কান উৎসুক হইয়া থাকে?

অবশ্য প্রয়োজন আছে বটে কিন্তু প্রয়োজনের চেয়ে বেশি জিনিস একটা আছে—প্রয়োজন তাহার অন্তর্ভূত। সেটা আর কিছু নহে, পূর্ণতার আনন্দ। চোখ আলোর মধ্যেই পূর্ণ হয়, কান শব্দের অনুভূতিতেই সার্থক হয়। যখন আমাদের শরীরে চোখ কান ফোটেও নাই তখনও সেই পূর্ণতার নিগূঢ় ইচ্ছাই এই চোখ কানকে বিকশিত করিবার জন্য অশ্রান্ত চেষ্টা করিয়াছে। মায়ের কোলে শুইয়া শুইয়া যে শিশু কথা কহিবার চেষ্টায় কলস্বরে আকাশকে পুলকিত করিয়া তুলিতেছে কথা কহিবার প্রয়োজন যে কী তাহা সে কিছুই জানে না। কিন্তু কথা কহার মধ্যে যে পূর্ণতা, সেই পূর্ণতা দূর হইতেই তাহাকে আনন্দআহ্বান পাঠাইতেছে, সেই আনন্দে সে বারবার নানা শব্দ উচ্চারণ করিয়া কিছুতেই ক্লান্ত হইতেছে না।

তেমনি করিয়াই আমাদের এই ছোটো শরীরটির দিকে বিরাট বিশ্ব-শরীরের একটি আনন্দের টান কাজ করিতেছে। ইহা পূর্ণতার আকর্ষণ, সেইজন্য যেখানে আমাদের কোনো প্রয়োজন নাই সেখানেও আমাদের শক্তি ছুটিয়া যাইতে চায়। গ্রহে চন্দ্রে তারায় কী আছে তাহা দেখিবার জন্য মানুষ রাত্রির পর রাত্রি জাগিতে শ্রান্ত হয় না। যেখানে তাহার প্রয়োজনক্ষেত্র সেখান হইতে অনেক দূরে মানুষ আপনার ইন্দ্রিয়বোধকে দূত পাঠাইতেছে। যাহাকে সহজে দেখা যায় না তাহাকে দেখিবার জন্য দূরবীন অণুবীক্ষণের শক্তি কেবলই সে বাড়াইয়া চলিয়াছে—এমনি করিয়া মানুষ নিজের চক্ষুকে বিশ্বব্যাপী করিয়া তুলিতেছে; যেখানে সহজে যাওয়া যায় না সেখানে যাইবার জন্য নব নব যানবাহনের কেবলই সে সৃষ্টি করিতেছে; এমনি করিয়া মানুষ আপনার হাত পাকে বিশ্বে প্রসারিত করিবার চেষ্টা করিতেছে। জলস্থল আকাশের সঙ্গে আপনার যোগ অবারিত করিবার উদ্‌যোগ কত কাল হইতে চলিয়াছে। জলস্থল আকাশের পথ দিয়া সমস্ত জগৎ মানুষের চোখ কান হাত পাকে কেবলই যে ডাক দিতেছে। বিরাটের এই নিমন্ত্রণ রক্ষার জন্য মানুষ পৃথিবীতে পদার্পণের পরমুহূর্ত হইতেই আজ পর্যন্ত কেবলই দীর্ঘ হইতে দীর্ঘতর, প্রশস্ত হইতে প্রশস্ততর করিয়া পথ তৈরি করিতে লাগিয়াছে। বিরাটের সেই নিমন্ত্রণ প্রয়োজনের নিমন্ত্রণ নহে, তাহা মিলনের নিমন্ত্রণ, আনন্দের নিমন্ত্রণ; তাহা ক্ষুদ্র শরীরের সহিত বৃহৎ শরীরের পরিণয়ের নিমন্ত্রণ; এই পরিণয়ে প্রেমও আছে সংসারযাত্রাও আছে, আনন্দও আছে প্রয়োজনও আছে; কিন্তু এই মিলনের মূলমন্ত্র আনন্দেরই মন্ত্র।

শুধু চোখ কান হাত পা লইয়া মানুষ নয়। তাহার একটা মানসিক কলেবর আছে। নানা প্রকারের বৃত্তি প্রবৃত্তি সেই কলেবরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। এই সব মনের বৃত্তি লইয়া আপনার মনটিকে যে নিতান্তই কেবল আপনার করিয়া সকল হইতে তফাত করিয়া রাখিব তাহার জো নাই। ওই বৃত্তিগুলাই আপনার বাহিরে ছুটিবার জন্য মনকে লইয়া কেবলই টানাটানি করিতেছে। মন একটি বৃহৎ মনোলোকের সঙ্গে যতদূর পারে পূর্ণরূপে মিলিতে চাহিতেছে। নহিলে তাহার স্নেহপ্রেম দয়ামায়া, এমন কি ক্রোধ দ্বেষ লোভ হিংসারও কোনো অর্থই থাকে না। সকল মানুষের মন বলিয়া একটি খুব বড়ো মনের সঙ্গে সে আপনার ভালো রকম মিল করিতে চায়। সেইজন্য কত কাল হইতে সে যে কত রকমের পরিবারতন্ত্র সমাজতন্ত্র রাষ্ট্রতন্ত্র গড়িয়া তুলিতেছে তাহার ঠিকানা নাই। যেখানে বাধিয়া যায় সেখানে তাহাকে আবার ভাঙিয়া ফেলিতে হয়, গড়িয়া তুলিতে হয়, এইজন্যই কত বিপ্লব কত রক্তপাতের মধ্য দিয়া তাহাকে পথ চলিতে হইয়াছে। বৃহৎ মনঃশরীরের সঙ্গে আপনার মনটিকে বেশ ভালোরকম করিয়া মিলাইয়া লইতে না পারিলে মানুষ বাঁচে না। যে পরিমাণে তাহার ভালো রকম করিয়া মিল ঘটে সেই পরিমাণেই তাহার পূর্ণতা। যে ব্যবস্থায় তাহার মিল অসম্পূর্ণ হয় ও কেবলই ভেদ ঘটিতে থাকে সেই ব্যবস্থায় তাহার দুর্গতি। এখানেও প্রয়োজনের প্রেরণা মূল প্রেরণা এবং সর্বোচ্চ প্রেরণা নহে। মানুষ পরিবারের বাহিরে প্রতিবেশী, প্রতিবেশীর বাহিরে দেশ, দেশের বাহিরে বিশ্বমানবসমাজের দিকে আপন চিত্তবিস্তারের যে চেষ্টা করিতেছে এ তাহার প্রয়োজনের আপিসযাত্রা নহে, এ তাহার অভিসারযাত্রা। ছোটো হৃদয়টির প্রতি বড়ো হৃদয়ের একটি ডাক আছে। সে ডাক এক মুহূর্ত থামিয়া নাই। সেই ডাক শুনিয়া আমাদের হৃদয় বাহির হইয়াছে সে খবরও আমরা সকল সময়ে জানিতে পারি না। রাত্রি অন্ধকার হইয়া আসে, ঝড়ের মেঘ ঘনাইয়া উঠে, বারবার পথ হারাইয়া যায়, পা কাটিয়া গিয়া মাটির উপর রক্তচিহ্ন পড়িতে থাকে তবু সে চলে; পথের মাঝে মাঝে সে বসিয়া পড়ে বটে কিন্তু সেখানেই চিরকাল বসিয়া থাকিতে পারে না, আবার উঠিয়া আবার তাহাকে অগ্রসর হইতে হয়।

এই যে মানুষের নানা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, নানা ইন্দ্রিয়বোধ, তাহার নানা বৃত্তিপ্রবৃত্তি, এ সমস্তই মানুষকে কেবলই বিচিত্রের মধ্যে বিস্তারের দিকে লইয়া চলিয়াছে। এই বিচিত্রের শেষ কোথায় ? এই বিস্তারের অন্ত কল্পনা করিব কোন্‌খানে ? শুনিয়াছি সেকেন্দর শা একদিন জয়োৎসাহে উন্মত্ত হইয়া চিন্তা করিয়াছিলেন জিতিয়া লইবার জন্য দ্বিতীয় আর একটা পৃথিবী তিনি পাইবেন কোথায় ? কিন্তু মানুষের চিত্তকে কোনোদিন এমন বিষম দুশ্চিন্তায় আসিয়া ঠেকিতে হইবে না যে, তাহার অধিকার বিস্তারের স্থান

আর নাই। কোনো দিন সে বিমর্ষ হইয়া বলিবে না যে, সে তাহার ব্যাপ্তির শেষ সীমায় আসিয়া বেকার হইয়া পড়িয়াছে।

কিন্তু মানুষের পক্ষে কেবলই কি এই গণনাহীন বৈচিত্র্যের মধ্যে বিরামহীন ব্যাপ্তিই আছে? কোনোখানেই তাহার পৌঁছানো নাই? অন্তহীন বহু কেবলই কি তাহাকে এক হইতে দুই, দুই হইতে তিনের সিঁড়ি বাহিয়া লইয়া চলিবে—সে সিঁড়ি কোথাও যাইবার নাম করিবে না?

এ কখনো হইতেই পারে না। আমরা জগতে এই একটি কাণ্ড দেখি - গম্যস্থানকে আমরা পদে পদেই পাইতেছি। বস্তুত আমরা গম্যস্থানেই আসিয়া রহিয়াছি—আমরা গম্যস্থানের মধ্যেই চলিতেছি। অর্থাৎ যা আমরা পাইবার তা আমরা পাইয়া বসিয়াছি, এখন সেই প্যাওয়ারই পরিচয় চলিতেছে। যেন আমরা রাজবাড়িতে আসিয়াছি—কিন্তু কেবল আসিলেই তো হইল না—তাহার কত মহল কত ঐশ্বর্য কে তাহার গণনা করিতে পারে? এখন তাই দেখিয়া দেখিয়া বেড়াইতেছি। এই জন্য একটু করিয়া যাহা দেখিতেছি তাহাতেই সমস্ত রাজপ্রাসাদের পরিচয় পাইতেছি। ইহাকে তো পথে চলা বলে না। পথে কেবল আশা থাকে, আস্বাদন থাকে না। আবার যে পথ অনন্ত সেখানে আশাই বা থাকিবে কেমন করিয়া?

তাই আমি বলিতেছি আমাদের কেহ পথে বাহির করে নাই—আমরা ঘরেই আছি। সে ঘর এমন ঘর যে, তাহার বারাণ্ডায় ছাতে দালানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাহাকে আর শেষ করিতে পারি না অথচ সর্বত্রই তাহার শেষ; সর্বত্রই তাহা ঘর, কোথাও তাহা পথ নহে।

এ রাজবাড়ির এই তো কাণ্ড, ইহার কোথাও শেষ নাই অথচ ইহার সর্বত্রই শেষ। ইহার মধ্যে সমাপ্তি এবং ব্যাপ্তি একেবারে গায়ে গায়ে লাগিয়া আছে। এই জন্য এখানে কোনোখানে আমরা বসিয়া থাকি না অথচ প্রত্যেক পদেই আমরা আশ্রয় পাই। মাটি ফুঁড়িয়া যখন অঙ্কুর বাহির হইল তখন সেইখানেই আমাদের চোখ বিশ্রাম করিতে পারে। অঙ্কুর যখন বড়ো গাছ হইল তখন সেখানেও আমাদের মন দাঁড়াইয়া দেখে। গাছে যখন ফুল ধরে তখন ফুলেও আমাদের তৃপ্তি। ফুল হইতে যখন ফল জন্মে তখন তাহাতেও আমাদের লাভ। কোনো জিনিস সম্পূর্ণ শেষ হইলে তবেই তাহার সম্বন্ধে আমরা পূর্ণতাকে পাইব আমাদের এমন দুরদৃষ্ট নহে—পূর্ণতাকে আমরা পর্বে পর্বে পাইয়াই চলিয়াছি। তাই বলিতেছিলাম ব্যাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই আমরা পরিসমাপ্তির স্বাদ পাইতে থাকি সেইজন্যই ব্যাপ্তি আনন্দময়—নহিলে তাহার মতো দুঃখকর আর কিছুই হইতে পারে না।

ব্যাপ্তি এবং সমাপ্তি এই যে দুটি তত্ত্ব সর্বত্র একসঙ্গেই বিরাজ করিতেছে আমাদের

মধ্যেও নিশ্চয় ইহার পরিচয় আছে। আমরাও নিশ্চয় আপনাকে উপলব্ধি করিবার জন্য অনন্ত জীবনের প্রান্তে পৌঁছিবার দুরাশায় অপেক্ষা করিতেছি না। এ কথা বলিতেছি না যে, এখনও যখন আমার সমস্ত নিঃশেষে চুকিয়া বুকিয়া যায় নাই তখন আমি আপনাকে জানিতেছি না। বস্তুত আমার মধ্যে একদিকে চলা, এবং আর একদিকে পৌঁছানো, একদিকে বহু, আর একদিকে এক, একসঙ্গেই রহিয়াছে, নহিলে অস্তিত্বের মতো বিভীষিকা আর কিছুই থাকিত না। একদিকে আমার বিচিত্র শক্তি বাহিরের বিচিত্রের দিকে চলিয়াছে, আর একদিকে আমার আনন্দ ভিতরের একের দিকে পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে।

এই যেখানে মানুষের আপনার আনন্দ—এইখানেই মানুষের পর্যাপ্তি, এইখানেই মানুষ বড়ো। এইখান হইতেই গতি লইয়া মানুষের সমস্ত শক্তি বাহিরে চলিয়াছে এবং বাহির হইতে পুনরায় তাহারা এইখানেই অর্ঘ্য আহরণ করিয়া ফিরিয়া আসিতেছে।

বাহির হইতে যখন দেখি তখন বলি মানুষ নিঃশ্বাস লইয়া বাঁচিতেছে, মানুষ আহার করিয়া বাঁচিতেছে, রক্ত চলাচলে মানুষ বাঁচিয়া আছে। এমন করিয়া কত আর বলিব? বলিতে গিয়া তালিকা শেষ হয় না। তখন দেখি শরীরের অণুতে অণুতে রসে রক্তে অস্থিমজ্জাস্নায়ুপেশীতে ফর্দ কেবল বাড়িয়া চলিতেই থাকে। তাহার পরে যখন প্রাণের হিসাব শেষ পর্যন্ত মিলাইতে গিয়া আলোকে উত্তাপে বাতাসে জলে মাটিতে আসিয়া পৌঁছাই, যখন প্রাকৃত বৈজ্ঞানিক ও রাসায়নিক শক্তিরহস্যের মধ্যে গিয়া উপস্থিত হই, তখন একেবারে হাল ছাড়িয়া দেওয়া ছাড়া উপায় নাই।

এমন করিয়া অন্তহীনতার খাতায় কেবলই পাতা উলটাইয়া শ্রান্ত হইয়া মরিতে হয়। কিন্তু বাহির হইতে প্রাণের ভিতর বাড়িতে গিয়া যখন প্রবেশ করি তখন কেবল একটি কথা বলি, প্রাণের আনন্দে মানুষ বাঁচিয়া আছে আর কিছু বলিবার দরকার হয় না। এই প্রাণের আনন্দেই আমরা নিশ্বাস লইতেছি, খাইতেছি, দেহ রচনা করিতেছি, বাড়িতেছি। বাঁচিয়া থাকিব এই প্রবল আনন্দময় ইচ্ছাতেই আমাদের সমস্ত শক্তি সচেষ্ট হইয়া বিশ্বময় ছুটিয়া চলিতেছে। প্রাণের আনন্দেই জীবপ্রবাহ প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে; প্রাণের নিগূঢ় আনন্দে প্রাণীরা জগতের নানা স্পর্শের তানে আপনার স্নায়ুর তারগুলিকে কেবলই বিচিত্রতর করিয়া বাঁধিয়া তুলিতেছে। বাঁচিয়া থাকিতে চাই এই ইচ্ছা সন্তানসন্ততিকে জন্ম দিতেছে, রক্ষা করিতেছে, চারিদিকের পরিবেষ্টনের সঙ্গে উত্তরোত্তর আপনার সর্বাঙ্গীণ সামঞ্জস্য সাধন করিতেছে।

এমন কি, বাঁচিয়া থাকিব এই আনন্দেই জীব মৃত্যুকেও স্বীকার করিতেছে। সে লড়াই করিয়া প্রাণের আনন্দেই প্রাণ দিতেছে। কর্মী মউমাছিরা আপনাকে অঙ্গহীন

করিতেছে কেন ? সমস্ত মউচাকের প্রজাদের প্রাণের সমগ্রতার আনন্দ তাহাদিগকে ত্যাগ-স্বীকারে প্রবৃত্ত করিতেছে। দেশের জন্ত মানুষ যে অকাতরে যুদ্ধ করিয়া মরিতেছে তাহার মূলে এই প্রাণেরই আনন্দ। সমস্ত দেশের প্রাণকে সে বড়ো করিয়া জানিতে চায়— সেই ইচ্ছার জোরেই সেই আনন্দের শক্তিতেই সে আপনাকেও বিসর্জন করিতে পারে।

তাই আমি বলিতেছিলাম মূলে দৃষ্টিপাত করিতে গেলে দেখা যায় প্রাণের আনন্দই বাঁচিয়া থাকিবার নানা শক্তিকে নানা দিকে প্রেরণ করে। শুধু তাই নয়, সেই নানা শক্তি নানা দিক হইতে নানা উপকরণ সংগ্রহ করিয়া এই আনন্দেই ফিরিয়া আসিতেছে এবং তাহারই ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া তুলিতেছে। প্রাণের এই শক্তি যেমন প্রাণের ব্যাপ্তির দিক, প্রাণের এই আনন্দ তেমনি প্রাণের সমাপ্তির দিক।

যেমন গানের তান। এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে, তান জিনিসটা একটা নিয়মহীন উচ্ছৃঙ্খলতা নহে; তাহার মধ্যে তালমানলয় রহিয়াছে; তাহার মধ্যে স্বর-বিন্যাসের অতি কঠিন নিয়ম আছে; সেই নিয়মের মূলে স্বরতত্ত্বের গণিতশাস্ত্রসম্মত একটা দুরূহ বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আছে; শুধু তাই নয়, যে কণ্ঠ বা বাদ্যযন্ত্রকে আশ্রয় করিয়া এই তান চলিতেছে তাহারও নিয়মের শেষ নাই; সেই নিয়মগুলি কার্যকারণের বিশ্বব্যাপী শৃঙ্খলকে আশ্রয় করিয়া কোন্ অসীমের মধ্যে যে চলিয়া গিয়াছে তাহার কেহ কিনারা পায় না। অতএব বাহিরের দিক হইতে যদি কেহ বলে এই তানগুলি অন্তহীন নিয়ম-শৃঙ্খলকে আশ্রয় করিয়াই বিস্তীর্ণ হইতেছে তবে সে একরকম করিয়া বলা যায় সন্দেহ নাই কিন্তু তাহাতে আসল কথাটি বাদ পড়িয়া যায়। মূলের কথাটি এই যে, গায়কের চিত্ত হইতে গানের আনন্দই বিচিত্র তানের মধ্যে প্রসারিত হইতেছে। যেখানে সেই আনন্দ দুর্বল, শক্তিও সেখানে ক্ষীণ।

গানের এই তানগুলি গানের আনন্দ হইতে যেমন নানা ধারায় উৎসারিত হইতে থাকে, তেমনি তাহারা সেই আনন্দের মধ্যেই ফিরিয়া আসে। বস্তুত এই তানগুলি বাহিরে ছোটে কিন্তু গানের ভিতরকারই আনন্দকে তাহারা ভরিয়া তোলে। তাহারা মূল হইতে বাহির হইতে থাকে কিন্তু তাহাতে মূলের ক্ষয় হয় না, মূলের মূল্য বাড়িয়াই উঠে।

কিন্তু যদি এই আনন্দের সঙ্গে তানের যোগ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় তাহা হইলে উলটাই হয়। তাহা হইলে তানের দ্বারা গান কেবল দুর্বল হইতেই থাকে। সে তানে নিয়ম যতই জটিল ও বিশুদ্ধ থাক না কেন গানকে সে কিছুই রস দেয় না, তাহা হইতে সে কেবল হরণ করিয়াই চলে।

যে গায়ক আপনার মধ্যে এই গানের মূল আনন্দে গিয়া পৌঁছিয়াছে গান সম্বন্ধে সে মুক্তিলাভ করিয়াছে। সে সমাপ্তিতে পৌঁছিয়াছে। তখন তাহার গলায় যে তান খেলে তাহার মধ্যে আর চিন্তা নাই, চেষ্টা নাই, ভয় নাই। যাহা দুঃসাধ্য তাহা আপনি ঘটিতে থাকে। তাহাকে আর নিয়মের অনুসরণ করিতে হয় না, নিয়ম আপনি তাহার অনুগত হইয়া চলে। তানসেন আপনার মধ্যে সেই গানের আনন্দলোকটিকে পাইয়াছিলেন। ইহাই ঐশ্বর্যলোক; এখানে অভাব পূরণ হইতেছে, ভিক্ষা করিয়া নয়, হরণ করিয়া নয়, আপনারই ভিতর হইতে। তানসেন এই জায়গায় আসিয়া গান সম্বন্ধে মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন। মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন বলিতে এ কথা বুঝায় না যে, তাঁহার গানে তাহার পর হইতে নিয়মের বন্ধন আর ছিল না;—তাহা সম্পূর্ণই ছিল, তাহার লেশমাত্র ত্রুটি ছিল না—কিন্তু তিনি সমস্ত নিয়মের মূলে আপনার অধিকার স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া নিয়মের প্রভু হইয়া বসিয়াছিলেন—তিনি এককে পাইয়াছিলেন বলিয়াই অসংখ্য বহু আপনি তাঁহার কাছে ধরা দিয়াছিল। এই আনন্দলোকটিকে আবিষ্কার করিতে পারিলেই কাব্য সম্বন্ধে কবি, কর্ম সম্বন্ধে কর্মী মুক্তিলাভ করে। কবির কাব্য কর্মীর কর্ম তখন স্বাভাবিক হইয়া যায়।

যাহা আপনার ভাব হইতে উঠে তাহাই স্বাভাবিক—তাহার মধ্যে অন্যের তাড়না নাই, তাহাতে নিজেরই প্রেরণা। যে কর্ম আমার স্বাভাবিক সেই কর্মেই আমি আপনার সত্য পরিচয় দিই।

কিন্তু এখানে আমরা যথেষ্ট ভুল করিয়া থাকি। এই ঠিক আপনটিকে পাওয়া যে কাহাকে বলে তাহা বুঝা শক্ত। যখন মনে করিতেছি অমুক কাজটা আমি আপনি করিতেছি অন্তর্যামী দেখিতেছেন তাহা অন্যের নকল করিয়া করিতেছি—কিংবা কোনো বাহিরের বিষয়ের প্রবল আকর্ষণে একঝোঁকা প্রবৃত্তির জোরে করিতেছি।

এই যে বাহিরের টানে প্রবৃত্তির জোরে কাজ করা ইহাও মানুষের সত্যতম স্বভাব নহে। বস্তুত ইহা জড়ের ধর্ম। যেমন নীচের টানে পাথর আপনাকে ধরিয়া রাখিতে পারে না, সে প্রবল বেগে গড়াইয়া পড়ে ইহাও সেইরূপ। এই জড়ধর্মকে খাটাইয়া প্রকৃতি আপনার কাজ চালাইয়া লইতেছে। এই জড়ধর্মের জোরে অগ্নি জ্বলিতেছে, সূর্য তাপ দিতেছে, বায়ু বহিতেছে, কোথাও তাহার আর নিষ্কৃতি নাই। ইহা শাসনের কাজ। এই জন্যেই উপনিষদ বলিয়াছেন—

ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্যঃ,
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ।

অগ্নিকে জ্বলিতেই হইবে, মেঘকে বর্ষণ করিতেই হইবে, বায়ুকে বহিতেই হইবে এবং

মৃত্যুকে পৃথিবীসুদ্ধ লোকে মিলিয়া গালি দিলেও তাহার কাজ তাহাকে শেষ করিতেই হইবে।

মানুষের প্রবৃত্তির মধ্যে এইরূপ জড়ধর্ম আছে। মানুষকে সে কানে ধরিয়া কাজ করাইয়া লয়। মানুষকে প্রকৃতি এইখানে তাহার অন্যান্য জড়বস্তুর শামিল করিয়া লইয়া জোর করিয়া আপন প্রয়োজন আদায় করিয়া থাকে।

কিন্তু মানুষ যদি সম্পূর্ণই জড় হইত তাহা হইলে কোথাও তাহার বাধিত না সে পাথরের মত অগত্যা গড়াইত, জলের মত অগত্যা বহিয়া যাইত এ সম্বন্ধে কোনো নালিশটিও করিত না।

মানুষ কিন্তু নালিশ করে। প্রবৃত্তি যে তাহাকে কানে ধরিয়া সংসারক্ষেত্রে খাটাইয়া লয় ইহার বিরুদ্ধে তাহার আপত্তি আজও থামিল না। সে আজও কাঁদিতেছে —

তারা, কোন্ অপরাধে দীর্ঘ মেয়াদে
সংসার-গারদে থাকি বল্।

সে ভিতরে ভিতরে এই কথাটা অনুভব করিতেছে যে, আমি যে কাজ করিতেছি সে গারদের মধ্যে কয়েদির কাজ — প্রবৃত্তিপেয়াদার তাড়নায় খাটিয়া মরিতেছি।

কিন্তু সে ভিতরে জানে এমন করিয়া অভাবের তাড়নায় প্রবৃত্তির প্রেরণায় কাজ করাই তাহার চরম ধর্ম নহে। তাহার মধ্যে এমন কিছু একটি আছে যাহা মুক্ত, যাহা আপনার আনন্দেই আপনাতে পর্যাপ্ত, দেশকালের দ্বারা যাহার পরিমাপ হয় না, জরামৃত্যুর দ্বারা যাহা অভিভূত হয় না। আপনার সেই সত্য পরিচয় সেই নিত্য পরিচয়টি লাভ করিবার জন্যই তাহার চরম বেদনা।

পূর্বেই আমি বলিয়াছি, কবি আপন কবিত্বশক্তির মধ্যে, কর্মী আপন কর্মশক্তির মধ্যে সমস্তের মূলগত আপনাকে লাভ করিতে চেষ্টা করিতেছে। সেই ভিতরকার আপনাকে যতই সে লাভ করে ততই কবির কাব্য অমর হইয়া উঠে ; সে তখন বাহিরের অক্ষরগনা কাব্য হয় না ; ততই কর্মীর কর্ম অমর হইয়া উঠে, সে তখন যন্ত্রচালিতবৎ কর্ম হয় না। কারণ প্রত্যেকের এই আপন পদার্থটি আনন্দময়,—এইখানেই স্বত-উৎসারিত আনন্দের প্রস্রবণ।

এইজন্যই শাস্ত্রে বলে—

সর্বং পরবশং দুঃখং সর্বমাত্মবশং সুখম্।

যাহা কিছু পরবশ তাহাই দুঃখ, যাহা কিছু আত্মবশ তাহাই সুখ।

অর্থাৎ মানুষের সুখ তাহার আপনের মধ্যে—আর দুঃখ তাহার আপন হইতে ভ্রষ্টতায়।

এত বড়ো কথাটাকে ভুল বুঝিলে চলিবে না। যখন বলিতেছি সুখ মানুষের আপনের মধ্যে, তখন ইহা বলিতেছি না যে, সুখ তাহার স্বার্থসাধনের মধ্যে। স্বার্থপরতার দ্বারা মানুষ ইহাই প্রমাণ করে যে, সে যথার্থ আপনার স্বাদটি পায় নাই, তাই সে অর্থকেই এমন চরম করিয়া এমন একান্ত করিয়া দেখে। অর্থকেই যখন সে আপনার চেয়ে বড়ো বলিয়া জানে তখন অর্থই তাহাকে ঘুরাইয়া মারে, তাহাকে দুঃখ হইতে দুঃখে লইয়া যায়—তখনই সে পরবশতার জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত হইয়া উঠে।

প্রতিদিনই আমরা ইহার প্রমাণ পাইয়া থাকি। যে ব্যক্তি স্বার্থপর তাহাকে আপনার অর্থ ত্যাগ করিতে হয়—কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই দায়ে পড়িয়া অর্থেরই জন্য সে অর্থ ত্যাগ করে—সেই তাহার প্রয়োজনের ত্যাগ দুঃখের ত্যাগ। কেননা, সেই ত্যাগের মূলে একটা তাড়না আছে, অর্থাৎ পরবশতা আছে। অভাবের উৎপীড়ন হইতে বাঁচিবার জন্যই তাহাকে ব্যয় করিতে হয়। কিন্তু এক একটা সময় উপস্থিত হয় যখন সে খুশি হইয়া খরচ করিয়া ফেলে। তাহার পুত্র জন্মিয়াছে খবর পাইয়া সে তাহার গায়ের দামি শালখানা তখনই দিয়া ফেলে। ইহা একপ্রকার অকারণ দেওয়া, কেননা কোনো প্রয়োজনই তাহাকে দিতে বাধ্য করিতেছে না। এই যে দান ইহা কেবল আপনার আনন্দের প্রাচুর্যকে প্রকাশ করিবার দান। আমার আপন আনন্দই আমার আপনার পক্ষে যথেষ্ট এই কথাটাকে স্পষ্ট করিয়া বলিবার জন্য ওই শালখানা দিয়া ফেলিতে হয়। এই আনন্দের জোরে মানুষ একেবারে গভীরতম এমন একটি আপনাকে গিয়া স্পর্শ করে যাহাকে পাওয়া তাহার অত্যন্ত বড়ো পাওয়া। সেই তাহার আপনটি কাহারও তাঁবেদার নহে, সে জগতের সমস্ত শাল দোশালার চেয়ে অনেক বড়ো এইজন্য চকিতের মতো মানুষ তাহার দেখা যেই পায় অমনি বাহিরের ওই শালটার দাম একেবারে কমিয়া যায়। যখন মানুষের আনন্দ না থাকে, যখন মানুষ আপনাকে না দেখে, তখন ওই শালটা একেবারে হাজার টাকা ওজনের বোঝা হইয়া তাহাকে দ্বিতীয় চর্মের মতো সর্বাঙ্গে চাপিয়া ধরে—তাহাকে সরাইয়া দেওয়া শক্ত হইয়া উঠে। তখন ওই শালটার কাছে পরবশতা স্বীকার করিতে হয়।

এমনি করিয়া মানুষ ক্ষণে ক্ষণে কিছু কিছু করিয়া আপনাকে দেখিতে পায়। মাঝে মাঝে এমন এক একটা আনন্দের হাওয়া দেয় যখন তাহার বাহিরের ভারি ভারি পর্দাগুলাকে অন্তত কিছুক্ষণের জন্য উড়াইয়া ফেলে। তখন বিপরীত কাণ্ড ঘটে,—কৃপণ যে সেও ব্যয় করে, বিলাসী যে সেও দুঃখ স্বীকার করে, ভীরু যে সেও প্রাণ বিসর্জন করিতে কুণ্ঠিত হয় না। তখন যে নিয়মে সংসার চলিতেছে সেই নিয়মকে মানুষ এক মুহূর্তে লঙ্ঘন করে। সেইরূপ অবস্থায় মানুষের ইতিহাসে হঠাৎ এমন একটা যুগান্তর

উপস্থিত হয়—পূর্বেকার সমস্ত খাতা মিলাইয়া যাহার কোনো প্রকার হিসাব পাওয়া যায় না। কেমন করিয়া পাইবে? স্বার্থের প্রয়োজনের হিসাবের সঙ্গে আত্মার আনন্দের হিসাব কোনোমতেই মেলানো যায় না—কেননা সেই যথার্থ আপনার মধ্যে গিয়া পৌঁছিলে মানুষ হঠাৎ দেখিতে পায়, খরচই সেখানে জমা, দুঃখই সেখানে সুখ।

এমনি করিয়া মাঝে মাঝে মানুষ এমন একটি আপনাকে দেখিতে পায়, বাহিরের সমস্তেরই চেয়ে যে বড়ো। কেন বড়ো? কেননা সে আপনার মধ্যেই আপনি সমাপ্ত। তাহাতে গুনিতে হয় না, মাপিতে হয় না—সমস্ত গনা এবং মাপা তাহা হইতেই আরম্ভ এবং তাহাতে আসিয়াই শেষ হয়। ক্ষতি তাহার কাছে ক্ষতি নহে, মৃত্যু তাহার কাছে মৃত্যু নহে, ভয় তাহার বাহিরে এবং দুঃখের আঘাত তাহার তারে আনন্দের সুর বাজাইয়া তোলে।

এই যাহাকে মানুষ ক্ষণে ক্ষণে কিছু কিছু করিয়া পায়—যাহাকে কখনো কখনো কোনো একটা দিক দিয়া সে পায়—যাহাকে পাইবামাত্র তাহার শক্তি স্বাভাবিক হয়, দুঃসাধ্য সুসাধ্য হয়, তাহার কর্ম আনন্দের কর্ম হইয়া উঠে; যাহাকে পাইলে তাহার উপর হইতে বাহিরের সমস্ত চাপ যেন সরিয়া যায়, সে আপনার মধ্যেই আপনার একটি পর্যাপ্তি দেখিতে পায় তাহার মধ্যেই মানুষ আপনার সত্য পরিচয় উপলব্ধি করে। সেই উপলব্ধি মানুষের মধ্যে অন্তরতমভাবে আছে বলিয়াই প্রবৃত্তির দ্বারা চালিত হইয়া প্রকৃতির প্রেরণায় সে যে সকল কাজ করে সে কাজকে সে গারদের কাজ বলে। অথচ প্রকৃতি যে নিতান্তই জবরদস্তি করিয়া বেগার খাটাইয়া লয় তাহা নহে—সে আপনার কাজ উদ্ধারের সঙ্গে সঙ্গে বেতনটিও শোধ করে, প্রত্যেক চরিতার্থতার সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু সুখও বাঁটিয়া দেয়। সেই সুখের বেতনটির প্রলোভনে আমরা অনেক সময় ছুটির পরেও খাটিয়া থাকি, পেট ভরিলেও খাইতে ছাড়ি না। কিন্তু হাজার হইলে তবু মাহিনা খাইয়া খাটুনিকেও আমরা দাসত্ব বলি—আমরা এ চাকরি ছাড়িতেও পারি না তবু বলি হাড় মাটি হইল, ছাড়িতে পারিলে বাঁচি। সংসারে এই যে আমরা খাটি—সকল দুঃখ সত্ত্বেও ইহার মাহিনা পাই—ইহাতে সুখ আছে, লোভ আছে। তবু মানুষের প্রাণ রহিয়া রহিয়া কাঁদিয়া উঠে এবং বলে—

তারা, কোন্ অপরাধে দীর্ঘ মেয়াদে
সংসারগারদে থাকি বল্।

এমন কথা সে যে বলে, বেতন খাইয়াও তাহার যে পুরা সুখ নাই তাহার কারণ এই যে, সে জানে তাহার মধ্যে প্রভুত্বের একটি স্বাধীন সম্পদ আছে—সে জন্মদাস নহে—সমস্ত প্রলোভনসত্ত্বেও দাসত্ব তাহার পক্ষে স্বাভাবিক নয়—প্রকৃতির দাসত্বে তাহার

অভাবটাই প্রকাশ পায় স্বভাবটা নহে। স্বভাবতই সে প্রভু; সে বলে আমি নিজের আনন্দে চলিব, আমার নিজের কাজের বেতন আমার নিজেরই মধ্যে—বাহিরের স্তুতি বা লাভ, বা প্রবৃত্তি-চরিতার্থতার মধ্যে নহে। যেখানে সে প্রভু, যেখানে সে আপনার আনন্দে আপনি বিরাজমান, সেইখানেই সে আপনাকে দেখিতে চায়; সেজন্য সে দুঃখ কষ্ট ত্যাগ মৃত্যুকেও স্বীকার করিতে পারে। সেজন্য রাজপুত্র রাজ্য ছাড়িয়া বনে যায়—পণ্ডিত আপনার ন্যায়শাস্ত্রের বোঝা ফেলিয়া দিয়া শিশুর মত সরল হইয়া পথে পথে নৃত্য করিয়া বেড়ায়।

এই জন্যই মানুষ এই একটি আশ্চর্য কথা বলে, আমি মুক্তি চাই। কী হইতে সে মুক্তি চায়? না, যাহা কিছু সে চাহিতেছে তাহা হইতেই সে মুক্তি চায়। সে বলে আমাকে বাসনা হইতে মুক্ত করো—আমি দাসপুত্র নই অতএব আমাকে ওই বেতন-চাওয়া হইতে নিষ্কৃতি দাও। যদি সে নিশ্চয় না জানিত যে বেতন না চাহিলেও তাহার চলে, নিজের মধ্যেই তাহার নিজের সম্পদ আছে এ বিশ্বাস যদি তাহার অন্তরতম বিশ্বাস না হইত তবে সে চাকরির গারদকে গারদ বলিয়াই জানিত না—তবে এ প্রার্থনা তাহার মুখে নিতান্তই পাগলামির মতো শুনাইত যে আমি মুক্তি চাই। বস্তুত আমাদের বেতন যখন বাহিরে তখনই আমরা চাকরি করি কিন্তু আমাদের বেতন যখন আমাদের নিজেরই মধ্যে, অর্থাৎ যখন আমরা ধনী তখন আমরা চাকরিতে ইস্তফা দিয়া আসি।

চাকরি করি না বটে কিন্তু কর্ম করি না, এমন কথা বলিতে পারি না। কর্ম বরঞ্চ বাড়িয়া যায়। যে চিত্রকর চিত্ররচনাশক্তির মধ্যে আপনাকে পাইয়াছে—যাহাকে আর নকল করিয়া ছবি আঁকিতে হয় না, পুঁথির নিয়ম মিলাইয়া যাহাকে তুলি টানিতে হয় না, নিয়ম যাহার স্বাধীন আনন্দের অনুগত—ছবি আঁকার দুঃখ তাহার নাই, তাই বলিয়া ছবি আঁকাই তাহার বন্ধ এমন কথা কেহ বলিতে পারে না। বরঞ্চ উলটা। ছবি আঁকার কাজে আপনাকে সে আর বিশ্রাম দিতে চায় না। বেতন দিয়া এত খাটুনি কাহাকেও খাটানো যায় না।

ইহার কারণ এই যে, এখানে চিত্রকর কর্মের একেবারে মূলে তাহার পর্যাপ্তির দিকে গিয়া পৌঁছিয়াছে। বেতন কর্মের মূল নহে, আনন্দই কর্মের মূল—বেতনের দ্বারা কৃত্রিম উপায়ে আমরা সেই আনন্দকেই আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করি। গঙ্গা হইতে যেমন আমরা পাইপে করিয়া কলের জল আনি, বেতন তেমনি করিয়াই আনন্দকেই ঠেলা দিয়া তাহার একাংশ হইতে শক্তির সবল সঞ্চয় করিয়া আনে। কিন্তু কলের জলে আমরা ঝাঁপ দিতে পারি না, তাঁহার হাওয়া খাইতে পারি না, তাহার তরঙ্গলীলা দেখিতে পাই না—তা ছাড়া কেবল কাজের সময়টিতেই সে খোলা থাকে—অপব্যয়ের

ভয়ে কৃপণের মতো প্রয়োজনের পরেই তাহাকে বন্ধ করিয়া দিতে হয়, তাহার পরে কল বিগড়াইতেও আটক নাই।

কিন্তু আনন্দের মূল গঙ্গায় গিয়া পৌঁছিলে দেখিতে পাই সেখানে কর্মের অবিরাম স্রোত বিপুল তরঙ্গে আপনি বহিয়া যাইতেছে, লোহার কল অগ্নিচক্ষু রাঙা করিয়া তাহাকে তাড়না করিতেছে না। সেই জলের ধারা পাইপের ধারার চেয়ে অনেক প্রবল, অনেক প্রশস্ত, অনেক গভীর। শুধু তাই নয়—কলের পাইপ-নিঃসৃত কাজে কাজই আছে কিন্তু সৌন্দর্য নাই, আরাম নাই—আনন্দের গঙ্গায় কাজের অফুরান প্রবাহের সঙ্গে নিরন্তর সৌন্দর্য ও আরাম অনায়াসে বিকীর্ণ হইতেছে।

তাই বলিতেছিলাম চিত্রকর যখন সত্য আপনার মধ্যে সকল কর্মের মূলে গিয়া উত্তীর্ণ হয়, আনন্দে গিয়া পৌঁছে, তখন তাহার চিত্র আঁকার কর্মের আর অবধি থাকে না। বস্তুত তখন তাহার কর্মের দ্বারাই আনন্দের পরিমাপ হইতে থাকে, দুঃখের দ্বারাই তাহার সুখের গভীরতা বুঝিতে পারি। এই জন্যই কার্লাইল বলিয়াছেন—অসীম দুঃখ স্বীকার করিবার শক্তিকে বলে প্রতিভা। প্রতিভা সেই শক্তিকেই বলে, যে শক্তির মূল আপনারই আনন্দের মধ্যে ; বাহিরের নিয়ম বা তাড়না বা প্রলোভনের মধ্যে নহে। প্রতিভার দ্বারা মানুষ সেই আপনাকেই পায় বলিয়া কর্মের মূল আনন্দ-প্রস্রবণটিকে পায় ; সেই আনন্দকেই পায় বলিয়া কোনো দুঃখ তাহাকে আর দুঃখ দিতে পারে না। কারণ প্রাণ যেমন আপনিই খাদ্যকে প্রাণ করিয়া লয়, আনন্দ তেমনি আপনিই দুঃখকে আনন্দ করিয়া তোলে।

এতক্ষণ যাহা বলিতে চেষ্টা করিতেছি তাহা কথাটা এই যে, যেখানে আপনার সমাপ্তি সেই আপনাকে মানুষ পাইতে চাহিতেছে, আপনার মধ্যে দাঁড়াইতে চাহিতেছে, কারণ সেইখানেই তাহার স্থিতি, সেইখানেই তাহার আনন্দ। সেই তাহার স্বাধীন আপনার সঙ্গেই তাহার সংসারকে তাহার সমস্ত কর্মকে যোজনা করিতে চাহিতেছে। সেখান হইতে যে পরিমাণে সে বিচ্ছিন্ন হয় সেই পরিমাণেই কর্ম তাহার বন্ধন, সংসার তাহার কারাগার। সেখানকার সঙ্গে পূর্ণযোগে কর্মই মানুষের মুক্তি, সংসারই মানুষের অমৃতধাম।

এইবার আর একবার গোড়ার কথায় যাইতে হইবে। আমরা বলিয়াছিলাম, মানুষের সমস্যা এই যে, ছোটোকে বড়োর সঙ্গে মিলাইবার ভার তাহার উপর। আমরা দেখিয়াছি তাহার ছোটো শরীরের সার্থকতা বিশ্বশরীরের মধ্যে, তাহার ছোটো মনের সার্থকতা বিশ্বমানবমনের মধ্যে। 'এই শরীর মনের দিক্ মানুষের ব্যাপ্তির দিক্। আমরা ইহাও দেখিয়াছি শুদ্ধমাত্র এই আমাদের ব্যাপ্তির দিকে আমরা

প্রকৃতির অধীন, আমরা বিশ্বব্যাপী অনন্ত নিয়মপরম্পরার দ্বারা চালিত,—এখানে আমাদের পূর্ণ সুখ নাই, এখানে বাহিরের তাড়নাই আমাদিগকে কাজ করায়। আমাদের মধ্যে যেখানে একটি সমাপ্তির দিক আছে, যে পরিমাণে সেইখানকার সঙ্গে আমাদের এই ব্যাপ্তির যোগসাধন হইতে থাকিবে সেই পরিমাণেই আমাদের আনন্দ সম্পূর্ণ হইয়া উঠিতে থাকিবে। তখন আমার শরীর আমারই বশীভূত শরীর, আমার মন আমারই বশীভূত মন হইয়া উঠিবে। তখন সর্বমাত্মবশং সুখম্‌। তখন আমার শরীর মনের বহু বিচিত্র নিয়ম আমার এক আনন্দের অনুগত হইয়া সুন্দর হইয়া উঠিবে। তাহার বহুত্বের দুঃসহ ভার একের মধ্যে বিন্যস্ত হইয়া সহজ হইয়া যাইবে।

কিন্তু যেখানে তাহার সমাপ্তির দিক্‌, যেখানে তাহার সমগ্র একের দিক্‌ সেখানেও কি তাহার সমস্যাটি নাই ?

আছে বই কী। সেখানেও মানুষের আপন, আপনার চেয়ে বড়ো আপনার সঙ্গে মিলিতে চাহিতেছে। মানুষ যখনই আত্মবশ হইয়া আপনার আনন্দকে পায় তখনই বড়ো আনন্দকে সর্বত্র দেখিতে পায়। সেই বড়ো আত্মাকে দেখাই আত্মার স্বভাব, সেই বড়ো আনন্দকে জানাই আত্মানন্দের সহজ প্রকৃতি। মানুষের শরীর বড়ো শরীরকে সহজে দেখিয়াছে, মানুষের মন বড়ো মনকে সহজে দেখিয়াছে, মানুষের আত্মা বড়ো আত্মাকে সহজে দেখে।

এইখানে পৌঁছানো, এইখানে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার যে চেষ্টা তাহাকেই আমরা ধর্ম বলি। বস্তুত ইহাই মানবের ধর্ম; মানুষের ইহাই স্বভাব, ইহাই তাহার সত্যতম চেষ্টা। বীরের ধর্ম বীরত্ব, রাজার ধর্ম রাজত্ব—মানুষের ধর্ম ধর্মই—তাহাকে আর কোনো নাম দিবার দরকার করে না। মানুষের সকল কর্মের মধ্যে সকল সৃষ্টির মধ্যে এই ধর্ম কাজ করিতেছে। অন্য সকল কাজের উদ্দেশ্য হাতে হাতে বোঝা যায়—ক্ষুধা নিবারণের জন্য খাই, শীত নিবারণের জন্য পরি কিন্তু ধর্মের উদ্দেশ্যকে তেমন করিয়া চোখে আঙুল দিয়া বুঝাইয়া দিবার জো নাই। কেননা, তাহা কোনো সাময়িক অভাবের জন্য নহে, তাহা মানুষের যাহা কিছু সমস্তের গভীরতম মূলগত। এইজন্য কোনো বিশেষ মানুষ তাহাকে ক্ষণকালের জন্য ভুলিতে পারে, কোনো বিশেষ বুদ্ধিমান তর্কের দিক্‌ হইতে তাহাকে অস্বীকার করিতে পারে—কিন্তু সমস্ত মানুষ তাহাকে ত্যাগ করিতে পারে না। মানুষের ইতিহাসে মানুষের সকল প্রয়োজনের মধ্যে, তাহার সমস্ত কাড়াকাড়ি মারামারি তাহার সমস্ত ব্যস্ততার মাঝখানে এই ধর্ম রহিয়াই গিয়াছে;—তাহা অন্নপান নহে, বসনভূষণ নহে, খ্যাতিপ্রতিপত্তি নহে, তাহা এমন কিছুই নহে যাহাকে বাদ দিলে মানুষের আবশ্যকের হিসাবে একটু কিছু গরমিল হয়; তাহাকে বাদ

দিলেও শস্য ফলে, বৃষ্টি পড়ে, আগুন জ্বলে, নদী বহে ; তাহাকে বাদ দিয়া পশুপক্ষীর কোনো অসুবিধাই ঘটে না ; কিন্তু মানুষ তাহাকে বাদ দিতে পারিল না। কেননা, ধর্মকে কেমন করিয়া ছাড়িবে ? প্রয়োজন থাক্ আর নাই থাক্ অগ্নি তাহার তাপধর্মকে ছাড়িতে পারে না, কারণ তাহাই তাহার স্বভাব। বাহির হইতে দেখিলে বলা যায় অগ্নি কাঠকে চাহিতেছে কিন্তু ভিতরের সত্য কথা এই যে, অগ্নি আপন স্বভাবকে সার্থক করিতে চাহিতেছে—সে জ্বলিতে চায় ইহাই তার স্বভাব—এইজন্য কখনো কাঠ, কখনো খড়, কখনো আর কিছুকে সে আত্মসাৎ করিতেছে ; সে দিক দিয়া তাহার উপকরণের তালিকার অন্ত পাওয়া যায় না কিন্তু মূল কথাটি এই যে, সে আপনার স্বভাবকেই পূর্ণ করিতে চাহিতেছে। যখন তাহার উজ্জ্বল শিখাটি দেখা যায় না কেবল কৃষ্ণবর্ণ ধূমই উঠিতে থাকে, তখন সেই চাওয়া তাহার মধ্যে আছে ; যখন সে ভস্মাচ্ছন্ন হইয়া বিলুপ্তপ্রায় হইয়া থাকে তখনও সেই চাওয়া তাহার মধ্যে নির্বাপিত হয় না। কারণ তাহাই তাহার ধর্ম। মানুষেরও সকলের চেয়ে বড়ো চাওয়াটি তাহার ধর্ম। ইহাই তাহার আপনাকে পরম আপনের মধ্যে চাওয়া। অন্য সকল চাওয়ার হিসাব দেওয়া যায়, কারণ, তাহার হিসাব বাহিরে, কিন্তু এই চাওয়াটির হিসাব দেওয়া যায় না, কারণ ইহার হিসাব তাহার আপনারই মধ্যে। এই জন্য তর্কে ইহাকে অস্বীকার করা অত্যন্ত সহজ কিন্তু মূলে ইহাকে অস্বীকার করা একেবারে অসম্ভব। এই জন্যই শাস্ত্রে বলে, ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্। এ তত্ত্ব বাহিরে নাই, এ তত্ত্ব অন্তরের মধ্যে সকলের মূলে নিহিত। সেইজন্য আমাদের তর্কবিতর্কের উপর, স্বীকার-অস্বীকারের উপর ইহার নির্ভর নহে। ইহা আছেই। মানুষের একটা প্রয়োজন আজ মিটিতেছে আর একটা প্রয়োজন কাল মিটিতেছে, যেটা মিটিতেছে সেটা চুকিয়া যাইতেছে—কিন্তু তাহার স্বভাবের চরম চেষ্টা রহিয়াছেই। অবশ্য এ প্রশ্ন মনে উদয় হওয়া অসম্ভব নয় যে, ইহাই যদি মানুষের স্বভাব হয় তবে ইহার বিপরীত আমরা মনুষ্যসমাজে দেখি কেন ? চলিবার চেষ্টাই শিশুর পক্ষে স্বাভাবিক, তবু তো দেখি শিশু চলিতে পারে না। সে বারংবার পড়িয়া যায়। কিন্তু এই অক্ষমতা হইতে এই পড়িয়া যাওয়া হইতেই আমরা তাহার স্বভাব বিচার করি না। বরঞ্চ এই কথাই আমরা বলি যে শিশু যে বারবার করিয়া পড়িতেছে আঘাত পাইতেছে তবু চলিবার চেষ্টা ত্যাগ করিতেছে না ইহার কারণ চলাই তাহার স্বভাব— সেই স্বভাবের প্রেরণাতেই সমস্ত প্রতিকূলতার মধ্যে, সমস্ত আত্মবিরোধের মধ্যে, তাহার চলার চেষ্টা রহিয়া গিয়াছে। শিশু যখন মাটিতে গড়াইতেছে, যখন পৃথিবীর আকর্ষণ কেবলই তাহাকে নিচে টানিয়া টানিয়া ফেলিতেছে তখনও তাহার স্বভাব এই প্রকৃতির আকর্ষণকে কাটাইয়া উঠিতে

চাহিতেছে—সে আপনার শরীরের সম্পূর্ণ প্রভুত্ব চায়—টলিয়া টলিয়া পড়িতে চায় না ;—ইহা তাহার পক্ষে প্রাকৃতিক নহে, ইহা তাহার পক্ষে স্বাভাবিক। এইজন্য প্রকৃতি যখন তাহাকে ধুলায় টানিয়া ফেলিতে চায় তখন তাহার স্বভাব তাহাকে উপরে টানিয়া রাখিতে চাহে। সমস্ত টলিয়া পড়ার মধ্যে এই স্বভাব তাহাকে কিছুতেই ছাড়ে না।

আমাদের ধর্ম আমাদের সেইরূপ স্বভাব। প্রকৃতির উপরে সকল দিক হইতে আমাদিগকে খাড়া করিয়া তুলিবার জন্য সে কেবলই চেষ্টা করিতেছে—যখন ধুলায় লুটাইয়া তাহাকে অস্বীকার করিতেছি তখনও অন্তরের মধ্যে সে আছে। সে বলিতেছে আপনার স্থিতিকে পাইতেই হইবে, তাহা হইলেই গতিকে পাইবে—দাঁড়াইতে পারিলেই চলিতে পারিবে। আপনাকে পাইলেই সমস্তকে মূলে গিয়া পাইবে। তখন তোমার সমস্ত জীবন প্রাকৃতিক হইবে না, স্বাভাবিক হইবে। স্বভাবে যখন তুমি প্রতিষ্ঠিত হইবে প্রকৃতি তখন তোমার অনুগত হইবে। তখনই তোমার ধর্ম সার্থক হইবে—তখনই তুমি তোমার চরিতার্থতাকে পাইবে।

এই চরিতার্থতার সঙ্গে বিচ্ছিন্ন করিয়া মানুষ বাহির হইতে যাহা কিছু পাইতেছে তাহাতেই তাহার অন্তরতম ইচ্ছা মাথা নাড়িয়া বলিতেছে—যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্। এই চরিতার্থতা হইতে, এই পরিসমাপ্তি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া সে যাহা কিছু দেখিতেছে তাহার মধ্যে সে মৃত্যুকেই দেখিতেছে—কেবল বিচ্ছেদ, কেবল অবসান ; প্রয়োজন আছে তাহার আয়োজন পাই না, আয়োজন আছে তাহার প্রয়োজন চলিয়া যায়। এ যে মৃত্যুকে দেখা, ইহার অর্থ, নিরর্থকতাকে দেখা। মানুষ ইচ্ছা করিল, কাজ করিল, সুখ দুঃখ ভোগ করিল, তাহার পর মরিয়া গেল। সেইখানে মৃত্যুকে যখন দেখি তখন মানুষের জীবনের সমস্ত ইচ্ছা সমস্ত কাজের অর্থকে আর দেখিতে পাই না। তাহার দীর্ঘকালের জীবন মুহূর্তকালে মৃত্যুর মধ্যে হঠাৎ মিথ্যা হইয়া গেল।

পদে পদে এই মৃত্যুকে দেখা, এই অর্থহীনতাকে দেখা তো কখনোই সত্য দেখা নহে। অর্থাৎ ইহা কেবল বাহিরের দেখা ; ভিতরের দেখা নহে ; ইহাই যদি সত্য হইত তবে মিথ্যাই সত্য হইত—তাহা কখনোই সম্ভব হইতে পারে না। জীবনের কার্য ও বিশ্বের ব্যাপ্তির মধ্যে একটি পরমার্থকে দেখিতেই হইবে। মুখে যতই বলি না কেন, কোনো অর্থ নাই ; যতই বলি না কাজ কেবল কাজকে জন্ম দিয়াই চলিয়াছে তাহার কোনো পরিণাম নাই, ব্যাপ্তি কেবলই দেশে কালে ছড়াইয়া পড়িতেছে, তাহার সঙ্গে দেশকালাতীত সুগভীর পরিসমাপ্তির কোনোই যোগ নাই মন কোনোমতেই তাহাতে সায় দিতে পারে না।

দ্বারী দরজার কাছে বসিয়া তুলসীদাসের রামায়ণ সুর করিয়া পড়িতেছে। আমি তাহার ভাষা বুঝি না। আমার কেবলই মনে হয়, একটার পর আর একটা শব্দ চলিয়া চলিয়া যাইতেছে; তাহাদের কোনো সম্বন্ধ জানি না। ইহাই মৃত্যুর রূপ; ইহাই অর্থহীনতা। ইহাতে কেবল পীড়া দেয়। যখন ভাষা বুঝি, যখন অর্থ পাই, তখন বিচ্ছিন্ন শব্দগুলিকে আর শুনি না—তখন অর্থের অনবচ্ছিন্ন ঐক্যধারাকে দেখি, তখন অখণ্ড অমৃতকে পাই, তখন দুঃখ চলিয়া যায়। তুলসীদাসের রামায়ণে অর্থের অমৃত শব্দের খণ্ডতাকে পূর্ণ করিয়া দেখাইতেছে। সেই পূর্ণটিকে দেখাই তুলসীদাসের রামায়ণ পড়িবার চরম উদ্দেশ্য—যতক্ষণ সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হইবে ততক্ষণ প্রত্যেক শব্দই কেবল আমাদিগকে দুঃখ দিবে। ততক্ষণ পাঠকের মন কেবলই বলিতে থাকিবে, অবিশ্রাম শব্দের পর শব্দ লইয়া আমি কী করিব—অমৃত যদি না পাই তবে ইহাতে আমার কিসের প্রয়োজন।

আমাদেরও সেই কান্না। আমরা যখন কেবলই অন্তহীন ব্যাপ্তির গম্যহীন পথে চলি তখন প্রত্যেক পদক্ষেপ নিরর্থক হইয়া আমাদিগকে কষ্ট দেয়—একটি পরিপূর্ণ পরিসমাপ্তির সঙ্গে যোগ করিয়া যখন তাহাকে দেখি তখনই তাহার সমস্ত ব্যর্থতা দূর হইয়া যায়। তখন প্রতিপদেই আমাদিগকে আনন্দ দিতে থাকে। তখন মৃত্যুই আমাদের কাছে মিথ্যা হইয়া যায়। তখন এক অখণ্ড অমৃতে জগৎকে এবং জীবনকে আদ্যন্ত পরিপূর্ণ দেখিয়া আমাদের সমস্ত দারিদ্র্যের অবসান হয়। তখন সা রি গা মা-র অরণ্যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ক্লান্ত হইয়া মরি না—রাগিণীর পরিপূর্ণ রসের সমগ্রতায় নিমগ্ন হইয়া আশ্রয় লাভ করি।

পৃথিবী জুড়িয়া নানা দেশে নানা কালে নানা জাতির নানা ইতিহাসে মানুষ এই রাগিণী শিখিতেছে। যে এক অখণ্ড পরিপূর্ণ আনন্দ হইতে বিশ্বজগৎ নব নব তানের মতো কেবলই আকাশ হইতে আকাশে বিস্তীর্ণ হইতেছে—সেই আনন্দ-রাগিণী মানুষ সাধিতেছে। ওস্তাদের ঘরে তাহার জন্ম, পিতার কাছে তাহার শিক্ষা। পিতার অনাদি বীণাযন্ত্রের সঙ্গে সে সুর মিলাইতেছে। সেই একের সুরে যতই তাহার সুর মিলিতে থাকে, সেই একের আনন্দে যতই তাহার আনন্দ নিরবচ্ছিন্ন হইয়া উঠিতে থাকে, বহুর তানমানের মধ্যে ততই তাহার বিঘ্ন কাটিয়া যায়, দুঃখ দূর হয়—বহুকে ততই সে আনন্দের লীলা বলিয়া দেখে; বহুর মধ্যে তাহার ক্লান্তি আর থাকে না, সমস্তের সামঞ্জস্যকে সে একের মধ্যে লাভ করিয়া বিক্ষেপের হাত হইতে রক্ষা পায়। ধর্ম সেই সংগীতশালা যেখানে পিতা তাঁহার পুত্রকে গান শিখাইতেছেন, পরমাত্মা হইতে আত্মার সুর সঞ্চারিত হইতেছে। এই সংগীতশালার যে সর্বত্রই সংগীত পরিপূর্ণ হইয়া

উঠিতেছে তাহা নহে। সুর মিলিতেছে না, তাল কাটিয়া যাইতেছে; এই বেসুর বেতালকে সুরে তালে সংশোধন করিয়া লইবার দুঃখ অত্যন্ত কঠোর; সেই কঠোর দুঃখে কতবার তার ছিঁড়িয়া যায়, আবার তার সারিয়া লইতে হয়। সকলের এক রকমের ভুল নহে, সকলের একজাতীয় বাধা নহে, কাহারও বা সুরে দোষ আছে, কাহারও বা তালে, কেহ বা সুর তাল উভয়েই কাঁচা; এইজন্য সাধনা স্বতন্ত্র। কিন্তু লক্ষ্য একই। সকলকেই সেই এক বিশুদ্ধ সুরে যন্ত্র বাঁধিয়া, এক বিশুদ্ধ রাগিণী আলাপ করিয়া, এক বিশুদ্ধ আনন্দের মধ্যে মুক্তিলাভ করিতে হইবে, যেখানে পিতার সঙ্গে পুত্রের, গুরুর সঙ্গে শিষ্যের যন্ত্রে যন্ত্রে কণ্ঠে কণ্ঠে হৃদয়ে হৃদয়ে মিলিয়া গিয়া যোগের সার্থকতা পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে।

১৩১৮

ধর্মশিক্ষা

বালকবালিকাদিগকে গোড়া হইতেই ধর্মশিক্ষা কেমন করিয়া দেওয়া যাইতে পারে এ তর্ক আজকাল খ্রীস্টান মহাদেশে খুবই প্রবল হইয়া উঠিয়াছে এবং বোধ করি কতকটা একই কারণে এ চিন্তা আমাদের দেশেও জাগ্রত হইবার উপক্রম করিতেছে। ব্রাহ্মসমাজে এই ধর্মশিক্ষার কিরূপ আয়োজন হইতে পারে সেই বিষয়ে আলোচনা করিবার জন্য বন্ধুগণ আমাকে অনুরোধ করিয়াছেন।

ধর্মসম্বন্ধে আমাদের অধিকাংশ লোকের একটা সংকট এই দেখিতে পাই যে, আমাদের একটা মোটামুটি সংস্কার আছে যে, ধর্ম জিনিসটা প্রার্থনীয় অথচ তাহার প্রার্থনাটা আমাদের জীবনে সত্য হইয়া উঠে নাই। এইজন্য তাহা আমরা চাহিও বটে কিন্তু যতদূর সম্ভব সস্তায় পাইতে চাই—সকল প্রয়োজনের শেষে উদ্‌বৃত্তটুকু দিয়া কাজ সারিয়া লইবার চেষ্টা করি।

সস্তা জিনিস পৃথিবীতে অনেক আছে তাহাদিগকে অল্প চেষ্টাতেই পাওয়া যায় কিন্তু মূল্যবান জিনিস কী করিয়া বিনামূল্যে পাওয়া যাইতে পারে এ কথা যদি কেহ জিজ্ঞাসা করিতে আসে তবে বুঝিতে হইবে সে ব্যক্তি সিঁধ কাটিবার বা জাল করিবার পরামর্শ চাহে; সে জানে উপার্জনের বড়ো রাস্তাটা প্রশস্ত এবং সেই বড়ো রাস্তাটা ধরিয়াই জগতের মহাজনেরা চিরকাল মহাজনি করিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু সেই রাস্তায় চলিবার মতো সময় দিতে বা পাথেয় খরচ করিতে সে রাজি নহে।

তাই ধর্মশিক্ষাসম্বন্ধে আমরা সত্যই কিরূপ পরামর্শ চাহিতেছি সেটা একটু ভালো করিয়া ভাবিয়া দেখা দরকার। কারণ, গীতায় বলিয়াছেন, আমাদের ভাবনাটা যেরূপ তাহার সিদ্ধিও সেইরূপ হইয়া থাকে। আমাদের ভাবনাটা কী? যদি এমন কথা আমাদের মনে থাকে যে, যেমন যাহা আছে এমনিই সমস্ত থাকিবে, তাহাকে বেশি কিছু নাড়াচাড়া করিব না অথচ তাহাকেই পূর্ণভাবে সফল করিয়া তুলিব, তবে পিতলকে সোনা করিয়া তুলিবার আশা দেওয়া যে সকল চতুর লোকের ব্যবসায় তাহাদেরই শরণাপন্ন হইতে হয়।

কিন্তু এমন অবস্থা আছে যখন ধর্মশিক্ষা নিতান্তই সহজ। একেবারে নিশ্বাসগ্রহণের মতোই সহজ। তবে কিনা যদি কোথাও বাধা ঘটে তবে নিশ্বাসগ্রহণ এমনি কঠিন হইতে পারে যে বড়ো বড়ো ডাক্তারেরা হাল ছাড়িয়া দেয়। যখনই মানুষ বলে আমার নিশ্বাস লওয়ার প্রয়োজন ঘটিয়াছে তখনই বুঝিতে হইবে ব্যাপারটা শক্ত বটে।

ধর্মসম্বন্ধেও সেইরূপ। সমাজে যখন ধর্মের বোধ যে কারণেই হউক উজ্জ্বল হয়, তখন স্বভাবতই সমাজের লোক ধর্মের জন্য সকলের চেয়ে বড়ো ত্যাগ করিতে থাকে— তখন ধর্মের জন্য মানুষের চেষ্টা চারিদিকেই নানা আকারে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিতে থাকে— তখন দেশের ধর্মমন্দির ধনীর ধনের অধিকাংশকে এবং শিল্পীর শিল্পের শ্রেষ্ঠ প্রয়াসকে অনায়াসে আকর্ষণ করিয়া আনে—তখন ধর্ম যে কত বড়ো জিনিস তাহা সমাজের ছেলেমেয়েদের বুঝাইবার জন্য কোনো প্রকার তাড়না করিবার দরকার হয় না। সেই সমাজে অনেকেই আপনিই ধর্মসাধনার কঠোরতাকে আনন্দের সহিত বরণ করিয়া লইতে পারে। আমাদের দেশের ইতিহাস অনুসরণ করিলে এরূপ সমাজের আদর্শকে নিতান্ত কাল্পনিক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না।

ধর্ম যেখানে পরিব্যাপ্ত ধর্মশিক্ষা সেইখানেই স্বাভাবিক। কিন্তু যেখানে তাহা জীবনযাত্রার কেবল একটা অংশমাত্র সেখানে মন্ত্রীরা বসিয়া যতই মন্ত্রণা করুক না কেন ধর্মশিক্ষা যে কেমন করিয়া যথার্থরূপে দেওয়া যাইতে পারে ভাবিয়া তাহার কিনারা পাওয়া যায় না।

পৃথিবীর প্রায় সকল সমাজেই আধুনিকদের যে দশা ব্রাহ্মসমাজেও তাহাই লক্ষিত হইতেছে। আমাদের বুদ্ধির এবং ইচ্ছার টান বাহিরের দিকেই এত অত্যন্ত যে অন্তরের দিকে রিক্ততা আসিয়াছে। এই অসামঞ্জস্য যে কী নিদারুণ তাহা উপলব্ধি করিবার অবকাশই পাই না -বাহিরের দিকে ছুটিয়া চলিবার মত্ততা দিনরাত্রি আমাদিগকে দৌড় করাইতেছে। এমন কি, আমাদের ধর্মসমাজসম্বন্ধীয় চেষ্টাগুলিও নিরন্তর ব্যস্ততাময় উত্তেজনা-পরম্পরায় আকার ধারণ করিতেছে। অন্তরের দিকে একটুও তাকাইবার

যদি অবসর পাইতাম তবে দেখিতাম তাহা গ্রীষ্মকালের বালুকাবিস্তীর্ণ নদীর মতো— সেখানে অগভীর ধর্মবোধ আমাদের জীবনযাত্রার নিতান্ত একপাশে আসিয়া ঠেকিয়াছে; তাহাকে আমরা অধিক জায়গা ছাড়িয়া দিতে চাই না। আমরা নবযুগের মানুষ, আমাদের জীবনযাত্রায় সরলতা নাই; আমাদের ভোগের আয়োজন প্রচুর এবং তাহার অভিমানও অত্যন্ত প্রবল; ধর্ম আমাদের অনেকের পক্ষেই সামাজিকতার একটা অঙ্গমাত্র। এমন কি, সমাজে এমন লোক দেখিয়াছি যাঁহারা যথার্থ ধর্মনিষ্ঠাকে চিত্তের দুর্বলতা বলিয়া অন্তরের সহিত অবজ্ঞা করিয়া থাকেন।

এইরূপে ধর্মকে যদি আমাদের জীবনের এককোণে সরাইয়া রাখি, অথচ এই অবস্থায় ছেলেমেয়েদের জন্য ধর্মশিক্ষা কী করিয়া অল্পমাত্রায় ভদ্রতারক্ষার পরিমাণে বরাদ্দ করা যাইতে পারে সে কথা চিন্তা করিয়া উদ্বিগ্ন হইয়া উঠি তবে সেই উদ্বেগ অত্যন্ত সহজে কী উপায়ে নিবারণ করা যাইতে পারে তাহা বলা অত্যন্ত কঠিন। তবু, বর্তমান অবস্থাকে স্বীকার করিয়া লইয়াই ব্যবস্থা চিন্তা করিতে হইবে। অতএব এ সম্বন্ধে আমাদের আলোচনা করিয়া দেখা কর্তব্য তাহাতে সন্দেহ নাই।

এক সময়ে পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই শিক্ষাব্যাপারটা ধর্মাচার্যগণের হাতে ছিল। তখন রাষ্ট্রব্যবস্থার মধ্যে এমন একটা অনিশ্চয়তা ছিল যে, দেশের সর্বসাধারণে দীর্ঘকাল শান্তি ভোগ করিবার অবসর পাইত না। এইজন্য জাতিগত সমস্ত বিদ্যা ও ধর্মকে অবিচ্ছিন্নভাবে রক্ষা করিবার জন্য স্বভাবতই এমন একটি বিশেষ শ্রেণীর সৃষ্টি হইয়াছিল যাহার প্রতি ধর্মালোচনা ও শাস্ত্রালোচনা ছাড়া আর কোনোপ্রকার সামাজিক দাবি ছিল না; তাহার জীবিকার ভারও সমাজ গ্রহণ করিয়াছিল। সুতরাং এই শ্রেণীর লোকেরাই সমাজের শিক্ষক ছিলেন। তখন শিক্ষার বিষয় ছিল সংকীর্ণ, শিক্ষার্থীও ছিল অল্প, এবং শিক্ষকের দলও ছিল একটি সংকীর্ণ সীমায় বদ্ধ। এই কারণে শিক্ষাসমস্যা তখন বিশেষ জটিল ছিল না, তাই তখনকার ধর্মশিক্ষা ও অন্যান্য শিক্ষা অনায়াসে একত্র মিলিত হইয়াছিল।

এখন অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়াছে। রাষ্ট্রব্যবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের শিক্ষালাভের ইচ্ছা চেষ্টা ও সুযোগ প্রশস্ত হইয়া উঠিতেছে, সেই সঙ্গে বিদ্যার শাখা-প্রশাখাও চারিদিকে অবাধে বাড়িয়া চলিয়াছে। এখন কেবল ধর্মযাজকগণের রেখাঙ্কিত গণ্ডির ভিতর সমস্ত শিক্ষাব্যাপার বদ্ধ হইয়া থাকিতে চাহিতেছে না।

তবু সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেলেও পুরাতন প্রথা সহজে মরিতে চায় না। তাই বিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষা কোনোমতে এ পর্যন্ত ধর্মশিক্ষার সঙ্গে ন্যূনাধিক পরিমাণে জড়িত হইয়া চলিয়া আসিয়াছে। কিন্তু সমস্ত য়ুরোপখণ্ডেই আজ তাহাদের বিচ্ছেদ-

সাধনের জন্য তুমুল চেষ্টা চলিতেছে। এই বিচ্ছেদকে কোনোমতেই স্বাভাবিক বলিতে পারি না কিন্তু তবু বিশেষ কারণে ইহা অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছে।

কেননা, সেখানকার ইতিহাসে ইহা দেখা গিয়াছে যে, একদিন যে ধর্মসম্প্রদায় দেশের বিদ্যাকে পালন করিয়া আসিয়াছে, পরে তাহারাই সে বিদ্যাকে বাধা দিবার সর্বপ্রধান হেতু হইয়া উঠিল। কারণ বিদ্যা যতই বাড়িয়া উঠিতে থাকে ততই সে প্রচলিত ধর্মশাস্ত্রের সনাতন সীমাকে চারিদিকেই অতিক্রম করিতে উদ্যত হয়। শুধু যে বিশ্বতত্ত্ব ও ইতিহাসসম্বন্ধেই সে ধর্মশাস্ত্রের বেড়া ভাঙিতে বসে তাহা নহে, মানুষের চারিত্রনীতিগত নূতন উপলব্ধির সঙ্গেও প্রাচীন শাস্ত্রানুশাসনের আগাগোড়া মিল থাকে না।

এমন অবস্থায় হয় ধর্মশাস্ত্রকে নিজের ভ্রান্তি কবুল করিতে হয়, নয় বিদ্রোহী বিদ্যা স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করে ;—উভয়ের এক অন্নে থাকা আর সম্ভবপর হয় না।

কিন্তু ধর্মশাস্ত্র যদি স্বীকার করে যে, কোনো অংশে তাহার জ্ঞান অসম্পূর্ণ ও ভ্রান্ত তবে তাহার প্রতিষ্ঠাই চলিয়া যায়। কারণ, সে বিশুদ্ধ দৈববাণী এবং তাহার সমস্ত দলিল ও পরোয়ানার উপর স্বয়ং সর্বজ্ঞ দেবতার সীলমোহরের স্বাক্ষর আছে এই বলিয়াই সে আপন শাসন পাকা করিয়া আসিয়াছে। বিদ্যা তখন বিশ্বেশ্বরের বিশ্বশাস্ত্রকে সাক্ষী মানে আর ধর্মসম্প্রদায় তাহাদের সনাতন ধর্মশাস্ত্রকে সাক্ষী খাড়া করিয়া তোলে—উভয়ের সাক্ষ্যে এমনি বিপরীত অমিল ঘটিতে থাকে যে, ধর্মশাস্ত্র ও বিশ্বশাস্ত্র যে একই দেবতার বাণী এ কথা আর টেকে না এবং এ অবস্থায় ধর্মশিক্ষা ও বিদ্যাশিক্ষাকে জোর করিয়া মিলাইয়া রাখিতে গেলে হয় মূঢ়তাকে নয় কপটতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়।

প্রথম কিছুদিন মারিয়া কাটিয়া বাঁধিয়া পুড়াইয়া একঘরে করিয়া বিদ্যার দলকে চিরকেলে দাঁড়ে বসাইয়া চিরদিন আপনার পুরাতন বুলি বলাইবার জন্য ধর্মের দল উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিল কিন্তু বিদ্যার পক্ষ যতই প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল ধর্মের পক্ষ ততই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যাখ্যার দ্বারা আপনার বুলিকে বৈজ্ঞানিক বুলির সঙ্গে অভিন্ন প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা শুরু করিয়া দিল। এখন এমন একটা অসামঞ্জস্য আসিয়া দাঁড়াইয়াছে যে বর্তমান কালে য়ুরোপে রাজা বা সমাজ ধর্মবিশ্বাসকে কঠোর শাসনে আটে-ঘাটে বাঁধিয়া রাখিবার আশা একেবারেই ছাড়িয়া দিয়াছে। এইজন্যই পাশ্চাত্যদেশে প্রায় সর্বত্রই বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে ধর্মশিক্ষার যোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইবার আয়োজন চলিতেছে। এইজন্য সেখানে সন্তানদিগকে বিনা ধর্মশিক্ষায় মানুষ করিয়া তোলা ভালো কি মন্দ সে তর্ক কিছুতেই মিটিতে চাহিতেছে না।

আমাদের দেশেও আধুনিক কালে সে সমস্যা ক্রমশই দুরূহ হইয়া উঠিতেছে।

কেননা বিদ্যাশিক্ষার দ্বারাতেই আমাদের ধর্মবিশ্বাস শিথিল হইয়া পড়িতেছে। উভয়ের মধ্যে এক জায়গায় বিরোধ ঘটিয়াছে। কারণ আমাদের দেশেও সৃষ্টিতত্ত্ব ইতিহাস ভূগোল প্রভৃতি অধিকাংশ বিদ্যাই পৌরাণিক ধর্মশাস্ত্রের অন্তর্গত। দেবদেবীদের কাহিনীর সঙ্গে তাহারা এমন করিয়া জড়িত যে, কোনোপ্রকার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার সাহায্যেও তাহাদিগকে পৃথক্ করা অসম্ভব বলিলেই হয়। যখনই আমাদের দেশের আধুনিক ধর্মাচার্য বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাদ্বারা পৌরাণিক কাহিনীর সত্যতা প্রমাণ করিতে বসেন তখনই তাঁহারা বিপদকে উপস্থিতমতো ঠেকাইতে গিয়া তাহাকে বদ্ধমূল করিয়া দেন। কারণ বিজ্ঞানকে যদি একবার বিচারক বলিয়া মানেন তবে কেবলমাত্র ওকালতির জোরে চিরদিন মকদ্দমায় জিত হইবার আশা নাই। বরাহ অবতার যে সত্যসত্যই বরাহবিশেষ নহে তাহা ভূকম্পশক্তির রূপকমাত্র এ কথা বলাও যা আর ধর্মবিশ্বাসের শাস্ত্রীয় ভিত্তিকে কোনোপ্রকারে ভদ্রতা রক্ষা করিয়া বিদায় করাও তা। কেবলমাত্র শাস্ত্রলিখিত মত ও কাহিনীগুলি নহে শাস্ত্রীয় সামাজিক অনুশাসনগুলিকেও আধুনিক কালের বুদ্ধি অভিজ্ঞতা ও অবস্থান্তরের সহিত সংগতরূপে মিলাইয়া তোলাও একেবারে অসাধ্য। অতএব বিজ্ঞান, ইতিহাস ও সামাজিক আচারকে আমরা কোনো মতেই শাস্ত্রসীমার মধ্যে খাপ খাওয়াইয়া রাখিতে পারিব না। এমন অবস্থায় আমাদের দেশেও প্রচলিত ধর্মশিক্ষার সহিত অন্য শিক্ষার প্রাণান্তিক বিরোধ ঘটিতে বাধ্য এবং আমাদের জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে সেরূপ বিরোধ ঘটিতেছেই। এই জন্য এ দেশে হিন্দু-বিদ্যালয়সম্বন্ধীয় নূতন যে সকল উদ্‌যোগ চলিতেছে তাহার প্রধান চিন্তা এই যে, বিদ্যাশিক্ষার মাঝখানে ধর্মশিক্ষাকে স্থান দেওয়া যায় কী করিয়া।

আধুনিক কালের জ্ঞান বিজ্ঞান ও মনুষ্যত্বের সর্বাঙ্গীণ আদর্শের সহিত প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রের যে বিরোধ ঘটিয়াছে তাহার উল্লেখ করিলাম। কিন্তু সেই বিরোধের কথাটা যদি ছাড়িয়া দিই; যদি শিথিলভাবে চিন্তা ও অন্ধভাবে বিশ্বাস করাটাকে দোষ বলিয়া গণ্য না করি, যদি সত্যকে যথাযথরূপে গ্রহণ করিবার ইচ্ছা ও অভ্যাসকে আমাদের প্রকৃতিতে সুদৃঢ় করিয়া তোলা মনুষ্যত্ব লাভের পক্ষে নিতান্তই আবশ্যক বলিয়া মনে না হয় তবে এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে এইরূপ বাঁধা ধর্মশাস্ত্রের একটা সুবিধা আছে। ধর্মসম্বন্ধে বালকদিগকে কী শিখাইব, কেমন করিয়া শিখাইব তাহা লইয়া বেশি কিছু ভাবিতে হয় না, তাহাদের বুদ্ধিবিচারকে উদ্বোধিত করিবার প্রয়োজন হয় না, এমন কি, না করারই প্রয়োজন হয়; কতকগুলি নির্দিষ্ট মত কাহিনী ও আচারকে ধ্রুব সত্য বলিয়া তাহাদের মনে সংস্কার বদ্ধ করিয়া দিলেই যথোচিত ধর্মশিক্ষা দেওয়া হইল বলিয়া নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।

বস্তুত ব্রাহ্মসমাজে ধর্মশিক্ষাসম্বন্ধে যে সমস্যা দাঁড়াইয়াছে তাহা এইখানেই। আমরা মানুষের মনকে বাঁধিব কী দিয়া? তাহাকে ব্যাপৃত করিব কিরূপে, তাহাকে আকর্ষণ করিব কী উপায়ে? যেমন কেবলমাত্র বৃষ্টি বর্ষণ হইলেই তাহাকে সম্পূর্ণ কাজে লাগানো যায় না, তাহাকে ধরিয়া রাখিবার জন্য নানাপ্রকার পাকা ব্যবস্থা থাকা চাই তেমনি কেবলমাত্র ধর্মবক্তৃতায় যদি বা ক্ষণকালের জন্য মনকে একটু ভিজায় কিন্তু তাহা গড়াইয়া চলিয়া যায়, মধ্যাহ্নের পিপাসায়, গৃহদাহের দুর্বিপাকে তাহাকে খুঁজিয়া পাই না। তা ছাড়া মন জিনিসটা কতকটা জলের মতো, তাহাকে কেবল একদিকে চাপিয়া ধরিলেই ধরা যায় না, তাহাকে সকল দিক দিয়া ঘিরিয়া ধরিতে হয়।

কিন্তু ব্রাহ্মসমাজে মানুষের মনকে নানা দিক দিয়া আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধিয়া ধরিবার বাঁধা পদ্ধতি নাই। তাই আমরা কেবলই আক্ষেপ করিয়া থাকি ছেলেদের মন যে আলগা হইয়া খসিয়া খসিয়া যাইতেছে। তথাপি এই প্রকার অনির্দিষ্টতার যে অসুবিধা আছে তাহা আমাদিগকে স্বীকার করিয়া লইতেই হইবে কিন্তু সাম্প্রদায়িক অতি-নির্দিষ্টতার যে সাংঘাতিক অকল্যাণ তাহা স্বীকার করা ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে প্রকৃতিবিরুদ্ধ।

ব্রাহ্মধর্মের ভিতরকার এই অনির্দিষ্টতাকে যথাসম্ভব দূর করিয়া তাহাকে এক জায়গায় চিরন্তনরূপে স্থির রাখিবার জন্য আজকাল ব্রাহ্মসমাজের কেহ কেহ ব্রাহ্মধর্মকে একটি ধর্মতত্ত্ব একটি বিশেষ ফিলজফি বলিতে ইচ্ছা করেন। ইহার মধ্যে কতটুকু দ্বৈত, কতটুকু অদ্বৈত,কতটুকু দ্বৈতাদ্বৈত ; ইহার মধ্যে শংকরের প্রভাব কতটা, কতটা কাণ্টের, কতটা হেগেল বা গ্রীনের তাহা একেবারে পাকা করিয়া একটা কোনো বিশেষ তত্ত্বকেই চিরকালের মতো ব্রাহ্মধর্ম নাম দিয়া সমাপ্ত করিয়া দিবার জন্য তাঁহারা উদ্যত হইয়াছেন। বস্তুত ব্রাহ্মসমাজের প্রতি যাঁহাদের শ্রদ্ধা নাই তাঁহারা অনেকেই এই কথা বলিয়াই ব্রাহ্মধর্মকে নিন্দা করিয়াছেন যে, উহা ধর্মই নহে উহা একটা ফিলজফি মাত্র ; ইঁহারা সেই কলঙ্ককেই গৌরব বলিয়া বরণ করিয়া লইতে চাহেন।

অথচ ইহা আমরা স্পষ্টই প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে, ব্রাহ্মধর্ম অন্যান্য বিশ্বজনীন ধর্মেরই ন্যায় ভক্তের জীবনকে আশ্রয় করিয়াই ইতিহাসে অবতীর্ণ হইয়াছে। ইহা কোনো ধর্মবিদ্যালয়ের টেক্‌স্টবুককমিটির সংকলিত সামগ্রী নহে এবং ইহা গ্রন্থের পরিচ্ছেদে পরিচ্ছেদে পরিচ্ছিন্ন হইয়া কোনো দপ্তরির হাতে মজবুত করিয়া বাঁধাই হইয়া যায় নাই।

যাহা জীবনের সামগ্রী তাহা বাড়িবে, তাহা চলিবে। একটা পাথরকে দেখাইয়া বলিতে পার ইহাকে যেমনটি দেখিতেছ ইহা তেমনই কিন্তু একটা বীজ সম্বন্ধে সে কথা খাটে না। তাহার মধ্যে এই একটি আশ্চর্য রহস্য আছে যে, সে যেমনটি সে তাহার চেয়ে অনেক বড়ো। এই রহস্যকে যদি অনির্দিষ্টতা বলিয়া নিন্দা কর, তবে ইহাকে

জাঁতায় ফেলিয়া পেষ—ইহার জীবধর্মকে নষ্ট করিয়া ফেল। কিন্তু যিনি যাহাই বলুন ব্রাহ্মধর্ম কোনো একটি বিশেষ নির্দিষ্ট সুপ্রণালীবদ্ধ তত্ত্ববিদ্যা নহে। কারণ, আমরা ইহাকে ভক্তের জীবনউৎস হইতে উৎসারিত হইতে দেখিয়াছি। তাহা ডোবা নহে, বাঁধানো সরোবর নহে, তাহা কালের ক্ষেত্রে ধাবিত নদী - তাহার রূপ প্রবহমান রূপ তাহা বাধাহীন বেগে নব নব যুগকে আপন অমৃতধারা পান করাইয়া চলিবে,—নব নব হেগেল ও গ্রীন তাহার মধ্যে নব নব পাথরের ঘাট বাঁধাইয়া দিতে থাকিবে, - কিন্তু সে সকল ঘাটকেও তাহা বহুদূরে ছাড়াইয়া চলিবে—কোনো স্পর্ধিত তত্ত্বজ্ঞানীকে সে এমন কথা কদাচ বলিতে দিবে না যে ইহাই তাহার শেষ তত্ত্ব। কোনো দর্শনতত্ত্ব এই ধর্মকে একেবারে বাঁধিয়া ফেলিবার জন্য যদি ইহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ফাঁস লইয়া ছোটে তবে এ কথা তাহাকে মনে রাখিতে হইবে যে, যদি ইহাকে বন্দী করিতে হয় তবে তাহার আগে ইহাকে বধ করিতে হইবে।

তাই যদি হইল তবে ব্রাহ্মধর্মের ভাবাত্মক লক্ষণটি কী ? তাহা একটা মোটা কথা, তাহা অনন্তের ক্ষুধাবোধ, অনন্তের রসবোধ। এই অনন্তের জ্ঞানকে বিশ্লেষণ করিয়া যিনি যেরূপ তত্ত্ব ব্যাখ্যা করুন তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই, কারণ এরূপ ব্যাখ্যা চিরকালই চলিবে, এ রহস্যের অন্ত পাওয়া যাইবে না ; কিন্তু আসল কথা এই যে রামমোহন রায় হইতে কেশবচন্দ্র সেন পর্যন্ত সকলেরই জীবনে আমরা এই অনন্তের ক্ষুধাবোধের আনন্দ প্রত্যক্ষ করিয়াছি। দেশের প্রচলিত আচার ও ধর্মবিশ্বাস যে তাঁহাদের জ্ঞানকে আঘাত দিয়াছে তাহা নহে, তাঁহাদের প্রাণকে আঘাত দিয়াছে।

কিন্তু ব্রাহ্মধর্মকে কয়েকজন মানুষের জীবনের মধ্য দিয়া দেখিতে গেলেও তাহাকে ছোটো করিয়া দেখা হইবে। বস্তুত ইহা মানব-ইতিহাসের সামগ্রী। মানুষ আপনার গভীরতম অভাব মোচনের জন্য নিয়ত যে গূঢ় চেষ্টা করিতেছে ব্রাহ্মসমাজের সৃষ্টির মধ্যে আমরা তাহারই পরিচয় পাই। মানুষ যতবারই কৃত্রিম আচারপদ্ধতির দ্বারা অনন্তকে ছোটো করিয়া আপনার সুবিধার মতো করিয়া লইতে চেষ্টা করিয়াছে ততবারই সে সোনা ফেলিয়া আঁচলে গ্রন্থি বাঁধিয়াছে। আমি একবার অত্যন্ত অদ্ভুত এই একটা স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম যে, মা তাহার কোলের ছেলেটিকে সর্বত্র অতি সহজে বহন করিবার সুবিধা করিতে গিয়া তাহার মুণ্ডটা কাটিয়া লইয়াছিল। ইহা স্বপ্ন বটে কিন্তু মানুষ এমন কাজ করিয়া থাকে। আইডিয়াকে সহজসাধ্য করিবার জন্য সে তাহার মাথা কাটিয়া তাহাকে দিব্য সংক্ষিপ্ত করিয়া লয় ইহাতে মুণ্ডটাকে করতলন্যস্ত আমলকবৎ আয়ত্ত করা যায় বটে কিন্তু প্রাণটাকেই বাদ দিতে হয়। এমনি করিয়া মানুষ যেটাকে সব চেয়ে বেশি চায় সেইটে হইতেই আপনাকে সব চেয়ে বেশি ফাঁকি দিতে থাকে।

এইরূপ অবস্থায় মানুষের মধ্যে দুই দল হইয়া পড়ে। এক দল আপনার সাধনার সামগ্রীকে খেলার সামগ্রী করিয়া সেই খেলাটাকেই সিদ্ধি মনে করে—আর এক দল ইহাদের খেলার বিঘ্ন না করিয়া অতিদূরে নিভৃতে গিয়া আপনার সাধনার বিশুদ্ধতা রক্ষা করিবার চেষ্টা করে।

কিন্তু এমন করিয়া কখনোই চিরদিন চলে না। যখন চারিদিক অচেতন, সমস্ত দ্বার রুদ্ধ, সমস্ত দীপ নির্বাপিত, অভাব যখন এতই অধিক যে অভাববোধ চলিয়া গিয়াছে, বাধা যখন এত নিবিড় যে মানুষ তাহাকে আপনার আশ্রয় বলিয়া অবলম্বন করিয়া ধরে, সেই সময়েই অভাবনীয়রূপে প্রতিকারের দূত কোথা হইতে দ্বারে আসিয়া দাঁড়ায় তাহা বুঝিতেই পারি না। তাহাকে কেহ প্রত্যাশা করে না, কেহ চিনে না, সকলেই তাহাকে শত্রু বলিয়া উদ্বিগ্ন হইয়া উঠে। এদেশে একদিন যখন রাশীকৃত প্রাণহীন সংস্কারের বাধা অনন্তের বোধকে আচ্ছন্ন করিয়া ধরিয়াছিল; মানুষের জীবনযাত্রাকে তুচ্ছ ও সমাজকে শতখণ্ড করিয়া তুলিয়াছিল; মনুষ্যত্বকে যখন আমরা সংকীর্ণ গ্রাম্যতার মধ্যেই আবদ্ধ করিয়া দেখিতেছিলাম; বিশ্বব্যাপারের কোথাও যখন আমরা একের অমোঘ নিয়ম দেখি নাই, কেবল দশের উৎপাতই কল্পনা করিতেছিলাম; উন্মত্তের দুঃস্বপ্নের মতো যখন সমস্ত জগৎকে বিচিত্র বিভীষিকায় পরিপূর্ণ দেখিতেছিলাম এবং কেবলই মন্ত্রতন্ত্র তাগাতাবিজ শান্তিস্বস্ত্যয়ন মানত ও বলিদানের দ্বারা ভীষণ শত্রুকল্পিত সংসারে কোনোমতে আত্মরক্ষা করিয়া চলিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলাম; এইরূপে যখন চিন্তায় ভীরুতা, কর্মে দৌর্বল্য, ব্যবহারে সংকোচ এবং আচারে মূঢ়তা সমস্ত দেশের পৌরুষকে শতদীর্ণ করিয়া অপমানের রসাতলে আমাদিগকে আকর্ষণ করিতেছিল—সেই সময়ে বাহিরের বিশ্ব হইতে আমাদের জীর্ণ প্রাচীরের উপরে একটা প্রচণ্ড আঘাত লাগিল, সেই আঘাতে যাঁহারা জাগিয়া উঠিলেন তাঁহারা একমুহূর্তেই নিদারুণ বেদনার সহিত বুঝিতে পারিলেন কিসের অভাব এখানে, কিসের এই অন্ধকার এই জড়তা এই অপমান, কিসের এই জীবিত-মৃত্যুর আনন্দহীন সর্বব্যাপী অবসাদ! এখানে আকাশ খণ্ডিত, আলোক নিষিদ্ধ, অনন্তের প্রাণসমীরণ প্রতিহত; এখানে নিখিলের সহিত অবাধ যোগ সহস্র কৃত্রিমতার প্রাচীরে প্রতিরুদ্ধ। তাঁহাদের সমস্ত প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল, ভূমাকে চাই, ভূমাকে চাই।

এই কান্নাই সমস্ত মানুষের কান্না। পৃথিবীর সর্বত্রই মানুষ কোথাও বা আপনার বহু প্রাচীন অভ্যাসের আবরণের দ্বারা আপনার মঙ্গলকে আড়াল করিয়া রাখিয়াছে, কোথাও বা সে আপনার নানা রচনার দ্বারা সঞ্চয়ের দ্বারা কেবলই আপনাকে বড়ো করিতে গিয়া আপনার চেয়ে বড়োকে হারাইয়া ফেলিতেছে। কোথাও বা সে

নিষ্ক্রিয়ভাবে জড়তার দ্বারা কোথাও বা সে সক্রিয়ভাবে প্রয়াসের দ্বারাই মানব-জীবনের শ্রেষ্ঠ সার্থকতাকে বিস্মৃত হইয়া বসিয়াছে।

এই বিস্মৃতির গভীর তলদেশ হইতে আপনাকে উদ্ধার করিবার চেষ্টা, ইহাই আমরা ব্রাহ্মধর্মের ইতিহাসের আরম্ভেই দেখিতে পাই। মানুষের সমস্ত বোধকেই অনন্তের বোধের মধ্যে উদ্বোধিত করিয়া তুলিবার প্রয়াসই ব্রাহ্মধর্মের সাধনারূপে প্রকাশ পাইয়াছে। সেই জন্যই আমরা দেখিতে পাইলাম, রামমোহন রায়ের জীবনের কর্মক্ষেত্র সমস্ত মনুষ্যত্ব। রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, ধর্মনীতি, সকল দিকেই তাঁহার চিত্ত পূর্ণবেগে ধাবিত হইয়াছে। কেবলমাত্র কর্মশক্তির স্বাভাবিক প্রাচুর্যই তাহার মূল প্রেরণা নহে—ব্রহ্মের বোধ তাঁহার সমস্ত শক্তিকে অধিকার করিয়াছিল। সেই বোধের মধ্য দিয়া তিনি মানুষকে দেখিয়াছিলেন বলিয়াই মানুষকে সকল দিকেই এমন বড়ো করিয়া এমন সত্য করিয়া দেখিয়াছিলেন; সেই জন্যই তাঁহার দৃষ্টি সমস্ত সংস্কারের বেষ্টন ছাড়াইয়া গিয়াছিল; সেই জন্য কেবল যে তিনি স্বদেশের চিত্তশক্তির বন্ধনমোচন কামনা করিয়াছিলেন তাহা নহে, মানুষ যেখানেই কোনো মহৎ অধিকার লাভ করিয়া আপনার মুক্তির ক্ষেত্রকে বড়ো করিতে পারিয়াছে সেইখানেই তিনি তৃপ্তিবোধ করিয়াছেন।

ব্রাহ্মসমাজে, আরম্ভে এবং আজ পর্যন্ত এই সত্যকেই আমরা সকলের চেয়ে বড়ো করিয়া দেখিতেছি। কোনো বিশেষ শাস্ত্র, বিশেষ মন্দির, বিশেষ দর্শনতন্ত্র বা পূজাপদ্ধতি যদি এই মুক্ত সত্যের স্থান নিজে অধিকার করিয়া লইতে চেষ্টা করে তবে তাহা ব্রাহ্মধর্মের স্বভাববিরুদ্ধ হইবে। আমরা মানুষের জীবনের মধ্যেই এই সত্যকে নিশ্চিতরূপে প্রত্যক্ষ করিব যে, অনন্তবোধের আলোকে সমস্তকে দেখা এবং অনন্তবোধের প্রেরণায় সমস্ত কাজ করা ইহাই মনুষ্যত্বের সর্বোচ্চ সিদ্ধি—ইহাই মানুষের সত্যধর্ম।

ধর্মশিক্ষা কেমন করিয়া দেওয়া যাইবে তাহা আলোচনার পূর্বে আমরা কাহাকে ধর্ম বলি তাহা পরিষ্কার করিয়া বুঝিয়া দেখা আবশ্যক বলিয়া এত কথা বলিতে হইল। এ কথা স্থির জানিতে হইবে যে, বাঁধা বচন মুখস্থ করা বা বাঁধা আচার অভ্যাস করা আমাদের ধর্মশিক্ষা নহে। অতএব ইহার যে অসুবিধা আছে তাহা আমাদিগকে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। অন্যান্য সাম্প্রদায়িক ধর্মে শিক্ষা প্রণালীতে কতকগুলি সহজ সুযোগ আছে এ কথা চিন্তা করিয়া আমাদিগকে বিচলিত হইলে চলিবে না। কারণ সত্যের জায়গায় সহজকে বসাইয়া লাভ কী? সোনার চেয়ে যে ধুলা সহজ!

যাহা হউক এ কথা নিশ্চিত সত্য যে, স্বাস্থ্য যেমন সমস্ত শরীরকে জুড়িয়া আছে, ধর্ম তেমনি মানুষের সমগ্র-প্রকৃতিগত।

স্বাস্থ্যকে টাকা পয়সার মতো হাতে তুলিয়া দেওয়া যায় না কিন্তু আনুকূল্যের দ্বারা ভিতরের দিক হইতে তাহাকে জাগাইয়া তোলা যায়। তেমনি মানুষের প্রকৃতিনিহিত এই অনন্তের বোধকে তাহার এই ধর্ম-প্রবৃত্তিকে ইতিহাস ভূগোল অঙ্কের মতো ইস্কুল-কমিটির শাসনাধীনে সমর্পণ করা যায় না; ইন্‌স্পেক্টরের তদন্তজালে তাহার উন্নতির পরিমাণ ধরা পড়ে না, এবং পরীক্ষকের নীল পেন্সিলের মার্কা দ্বারা তাহার ফলাফল চিহ্নিত হওয়া অসম্ভব; কেবল সর্বপ্রকার অনুকূল অবস্থার মধ্যে রাখিয়া তাহার সর্বাঙ্গীণ পরিণতি সাধন করা যাইতে পারে, তাহাকে বাঁধা নিয়মে বিদ্যালয়ে দেওয়া-নেওয়ার ব্যবসায়ের জিনিস করা যাইতে পারে না।

সাধকেরা আপনারাই বলিয়াছেন তাঁহাকে পাইবার পথ, "ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।" অর্থাৎ এটা কোনোমতেই পঠন পাঠনের ব্যাপার নহে। কিন্তু কেমন করিয়া সাধকেরা এই পূর্ণতার উপলব্ধিতে গিয়া উপনীত হইয়াছেন তাহা আজ পর্যন্ত কোনো মহাপুরুষ আমাদিগকে বলিয়া দিতে পারেন নাই। তাঁহারা কেবল বলেন, বেদাহমেতম্, আমি জানিয়াছি, আমি পাইয়াছি। তাঁহারা বলেন, য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি যাঁহারা ইঁহাকে জানেন, তাঁহারাই অমৃত হন। কেমন করিয়া যে তাঁহারা ইঁহাকে জানেন সে অভিজ্ঞতা এতই অন্তরতম যে, তাহা তাঁহাদের নিজেদেরই গোচর নহে। সে রহস্য যদি তাঁহারা প্রকাশ করিয়া দিতে পারিতেন তবে ধর্মশিক্ষা লইয়া আজ কোনোরূপ তর্কই থাকিত না।

অথচ ঈশ্বরের বোধ কেমন করিয়া পূর্ণভাবে উদ্বোধিত করা যাইতে পারে এরূপ প্রশ্ন করিলে কোনো কোনো মহাত্মা অত্যন্ত বাঁধা প্রণালীর উপদেশ দিয়াছেন তাহাও দেখা গিয়াছে। একদিকে যেমন একদল মহাপুরুষ বলিয়াছেন, চিত্তকে শুদ্ধ করো, পাপকে দমন করো, ঈশ্বরের বোধ অন্তরের সামগ্রী, অতএব অন্তরকেই আপন আন্তরিক চেষ্টায় উদ্বোধিত করিয়া তোলো, অপরদিকে তেমনি আর এক দল বিশেষ বিশেষ বাহ্যপ্রক্রিয়ার কথাও বলিয়াছেন। কেহবা বলেন, যজ্ঞ করো, কেহবা বলেন বিশেষ শব্দ উচ্চারণ করিয়া বিশেষ মূর্তিকে ধ্যান করো, এমন কি, কেহ বা বলেন মাদক পদার্থের দ্বার অথবা অন্য নানা উপায়ে শারীরিক উত্তেজনার সাহায্যে মনকে তাড়না করিয়া দ্রুতবেগে সিদ্ধিলাভের দিকে অগ্রসর হইতে থাকো।

এমনি করিয়া যখনই চেষ্টাকে বাহিরের দিকে বিক্ষিপ্ত করিবার উপদেশ দেওয়া হয় তখনই প্রমাদের পথ খুলিয়া দেওয়া হয়। তখনই মিথ্যাকে ঠেকাইয়া রাখা যায় না, কল্পনাকে সংযত করা অসাধ্য হয়, তখনই মানুষের বিশ্বাসমুগ্ধতা লুব্ধ হইয়া উঠিয়া কোথাও আপনার সীমা দেখিতে পায় না; মানুষ আপনাকে ভোলায়, অন্যকে ভোলায়;

সম্ভব-অসম্ভবের ভেদ বিলুপ্ত হইয়া ধর্মসাধনার ব্যাপার বিচিত্র মূঢ়তায় একেবারে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠে।

অথচ যাহারা এইরূপ উপদেশ দেন তাঁহারা অনেকেই সাধু ও সাধক। তাঁহারা যে ইচ্ছা করিয়া লোকের মনকে মোহের পথে লইয়া যান তাহা নহে কিন্তু এ সম্বন্ধে তাঁহাদের ভুল করিবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। কারণ, পাওয়া এক জিনিস, আর সেই পাওয়া ব্যাপারটাকে বিশ্লেষণ করিয়া জানা আর এক জিনিস।

মনে করো আহার পরিপাক করিবার শক্তি আমার অসামান্য ; আমাকে যদি কোনো বেচারা অজীর্ণপীড়িত রোগী আসিয়া প্রশ্ন করে তুমি কেমন করিয়া এতটা পরিমাণ খাদ্য ও অখাদ্য বিনাদুঃখে হজম করিতে পার তবে আমি হয়তো সরল বিশ্বাসে তাহাকে বলিয়া দিতে পারি যে আহারের পর আমি দুই খণ্ড কাঁচা সুপারি মুখে দিয়া বর্মাদেশজাত একটা করিয়া আস্ত চুরুট নিঃশেষে ছাই করিয়া থাকি ইহাতেই আমার সমস্ত হজম হইয়া যায়। আসলে আমি যে এতৎসত্ত্বেও হজম করিয়া থাকি তাহা আমি নিজেই জানি না ; এমন কি, যে অভ্যাসকে আমি আমার পরিপাকের সহায় বলিয়া কল্পনা করিয়া লইয়াছি কোনো দিন যদি তাহার অভাব ঘটে তবে আমার নিজেরই মনে হইতে থাকে যে, আজ বুঝি পাকযন্ত্রটা তেমন বেশ উৎসাহের সহিত কাজ করিতেছে না।

শুনা যায় কবিতা লিখিবার সময় বিখ্যাত জর্মান কবি শিলার পচা আপেল তাঁহার ডেস্কের মধ্যে রাখিতেন। তাঁহার পক্ষে ইহার উগ্র গন্ধ হয়তো একটা উত্তেজনার কাজ করিত। তাঁহার শিষ্য যদি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিত আপনি কী করিয়া এমন ভালো কবিতা লেখেন তবে তিনি আর কোনো প্রকাশযোগ্য কারণ ঠাহর করিতে না পারিয়া ওই পচা আপেলটাকেই হয়তো উপায় বলিয়া নির্দেশ করিতেও পারিতেন। এ স্থলে, তিনি যত বড়ো কবি হউন না কেন, তাঁহার বাক্যকেই যে কবিত্বচর্চার উপায় সম্বন্ধে বেদবাক্য বলিয়া গণ্য করিতে হইবে এমন কথা নাই। এরূপস্থলে তাঁহাকে যদি মুখের সামনে বলি তুমি কবিতাই লিখিতে পার তাই বলিয়া তাহার উপায় সম্বন্ধে কী জান, তবে তাঁহাকে কবি হিসাবে অশ্রদ্ধা করা হয় না। বস্তুত স্বাভাবিক প্রতিভাবশতই যাহারা কোনো একটা জিনিস পায় পাওয়ার প্রণালীটা তাহাদেরই কাছে সব চেয়ে বেশি বিলুপ্ত হইয়া থাকে।

যেমন ব্যক্তিগত অভ্যাসের কথা বলিলাম তেমনি এমন অনেক অভ্যাস আছে যাহা কৌলিক বা স্বাদেশিক। সেই সকল অভ্যাসমাত্রেই যে শক্তির সঞ্চার করে তাহা নহে ; এমন কি, তাহারা শক্তিকে বহিরাশ্রিত করিয়া চিরদুর্বল করিয়া রাখে। অনেক মহাপুরুষ এইরূপ দেশপ্রচলিত অভ্যাসকে অমঙ্গলের হেতু বলিয়া আঘাত করিয়া থাকেন,

আবার কেহ কেহ সংস্কারের প্রভাবে তাহার অবলম্বন ত্যাগ করেন নাই তাহাও দেখা যায়। শেষোক্ত সাধকেরা যে নিজের প্রতিভাগুণে এই সকল অভ্যাসের বাধা অতিক্রম করিয়াও আসল জায়গায় গিয়া পৌঁছিয়াছেন তাহা সকল সময়ে নিজেরাও বুঝেন না, এবং কখনো বা মনে করেন এখন আমার পক্ষে এই সকল বাহ্য প্রক্রিয়া বাহুল্য হইলেও গোড়ায় ইহার প্রয়োজন ছিল। ইহার ফল হয় এই, যাহাদের স্বাভাবিক শক্তি নাই তাহারা কেবলমাত্র এই অভ্যাসগুলিকেই অবলম্বন করিয়া কল্পনা করে যে আমরা সার্থকতালাভ করিয়াছি; তাহারা অহংকৃত ও অসহিষ্ণু হইয়া উঠে এবং যেখানে তাহাদের অভ্যাসের সামগ্রী না দেখিতে পায় সেখানে যে সত্য আছে এ কথা মনে করিতেই পারে না, কারণ, তাহাদের কাছে এই সকল বাহ্য অভ্যাস এবং সত্য এক হইয়া গেছে।

যে সকল জিনিসের মূল কারণ বাহিরের অভ্যাস নহে, অন্তরের বিকাশ, তাহাদের সম্বন্ধে কোনো কৃত্রিম প্রণালী থাকিতে পারে না, কিন্তু স্বাভাবিক আনুকূল্য আছে। ধর্মবোধ জিনিসটাকে যদি আমরা কোনো একটা সাম্প্রদায়িক ফ্যাশান বা ভদ্রতার আসবাব বলিয়া গণ্য না করি, যদি তাহাকে মানুষের সর্বাঙ্গীণ চরম সার্থকতা বলিয়াই জানি, তবে প্রথম হইতেই বালকবালিকাদের মনকে ধর্মবোধে উদ্বোধিত করিয়া তুলিবার উপযুক্ত স্থান এবং অবকাশ থাকা আবশ্যক এ কথা আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে; অর্থাৎ চারিদিকে সেই রকমের হাওয়া আলো আকাশটা থাকা চাই যাহাতে নিশ্বাস লইতেই প্রাণসঞ্চার হয় এবং আপনা হইতেই চিত্ত বড়ো হইয়া উঠিতে থাকে।

নিজের বাড়িতে যদি সেই অনুকূল অবস্থা পাওয়া যায় তবে তো কথাই নাই। অর্থাৎ সেখানে যদি বৈষয়িকতাই নিজের মূর্তিকে সকলের চেয়ে প্রবল করিয়া না বসিয়া থাকে, যদি অর্থই সেখানে পরমার্থ না হয়, যদি গৃহস্বামী নিজেকেই নিজের সংসারের স্বামী বলিয়া প্রতিষ্ঠিত না করিয়া থাকেন, যদি তিনি বিশ্বের মঙ্গলময় স্বামীকেই বাক্যে ও ব্যবহারে মানিয়া চলেন, যদি সকল প্রকার সাময়িক ঘটনাকে নিজের রাগদ্বেষের নিক্তিতে তৌল না করিয়া, ভূমার মধ্যে স্থাপিত করিয়া যথাসাধ্য তাহাদিগকে বিচার ও যথোচিতভাবে তাহাদিগকে গ্রহণ করিতে চেষ্টা করেন, তবে সেইখানেই ছেলেমেয়েদের শিক্ষার স্থান বটে।

এরূপ সুযোগ সকল ঘরে নাই সে কথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু ঘরে নাই আর বাহিরে আছে এ কথা বলিলেই বা চলিবে কেন? এ সব দুর্লভ জিনিস তো আবশ্যক বুঝিয়া ফরমাশ দিয়া তৈরি করা যায় না। সে কথা সত্য। কিন্তু আবশ্যকতা যদি

থাকে এবং তাহার বোধ যদি জাগে তবে আপনিই যে সে আপনার পথ করিতে থাকিবে। সেই পথ করার কাজ আরম্ভ হইয়াছে; আমরা ইচ্ছা করিতেছি, আমরা সন্ধান করিতেছি, আমরা চেষ্টা করিতেছি। আমরা যাহা চাই আমাদের মনের মধ্যে তাহার একটা আদর্শ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আমরা যখনই বলিতেছি ব্রাহ্মসমাজের ছেলেরা ধর্মশিক্ষার একটা কেন্দ্র একটা যথার্থ আশ্রয় যথার্থভাবে পাইতেছে না তখনই সে জিনিসটা যে কেমনতরো হইতে পারে তাহার একটা আভাস আমাদের মনে জাগিতেছে।

বস্তুত ব্রাহ্মসমাজে আমরা দেবমন্দির চাই না, বাহ্য আচার অনুষ্ঠান চাই না আমরা আশ্রম চাই। অর্থাৎ যেখানে বিশ্বপ্রকৃতির নির্মল সৌন্দর্য এবং মানুষের চিত্তের পবিত্র সাধনা একত্র মিলিত হইয়া একটি যোগাসন রচনা করিতেছে এমন আশ্রম। বিশ্বপ্রকৃতি এবং মানবের আত্মা যুক্ত হইয়াই আমাদের দেবমন্দির স্থাপন করে এবং স্বার্থবন্ধনহীন মঙ্গলকর্মই আমাদের পূজানুষ্ঠান। এমন কি কোনো একটি স্থান আমরা পাইব না যেখানে শান্তং শিবমদ্বৈতম্ বিশ্বপ্রকৃতিকে এবং মানুষকে, সুন্দরকে এবং মঙ্গলকে এক করিয়া দিয়া প্রাত্যহিক জীবনের কাজে ও পরিবেষ্টনে মানুষের হৃদয়ে সহজে অবাধে প্রত্যক্ষ হইতেছেন? সেই জায়গাটি যদি পাওয়া যায় তবে সেইখানেই ধর্মশিক্ষা হইবে। কেননা পূর্বেই বলিয়াছি ধর্মসাধনার হাওয়ার মধ্যে স্বভাবের গূঢ় নিয়মেই ধর্মশিক্ষা হইতে পারে, সকল প্রকার কৃত্রিম উপায় তাহাকে বিকৃত করে ও বাধা দেয়।

আমি জানি যাঁহারা সকল বিষয়কেই শ্রেণীবিভক্ত ও নামাঙ্কিত করিয়া সংক্ষেপে সরাসরি বিচার করিতে ভালোবাসেন তাঁহারা বলিবেন, এটা তো এ কালের কথা হইল না। এ যে দেখি মধ্যযুগের Monasticism অর্থাৎ মঠাশ্রয়ী ব্যবস্থা। ইহাতে সংসারের সঙ্গে সাধকজীবনকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলা হয়, ইহাতে মনুষ্যত্বকে পঙ্গু করা হয়, ইহা কোনোমতেই চলিবে না।

অন্য কোনো এককালে যে জিনিসটা ছিল এবং যাহা তাহার চরমে আসিয়া মরিয়াছে তাহার নকল করিতে বলা যে পাগলামি সে কথা আমি খুবই স্বীকার করি। বর্বরদের ধনুর্বাণ যতই মনোহর হউক তাহাতে এখনকার কালের যোদ্ধার কাজ চলে না।

কিন্তু অসভ্যযুগের যুদ্ধপ্রবৃত্তির উপকরণ সভ্যযুগে যদি বা অনাদৃত হয় কিন্তু সেই যুদ্ধের প্রবৃত্তিটা তো আছে। তাহা যতক্ষণ লুপ্ত না হয় ততক্ষণ ভিন্ন ভিন্ন যুগের যুদ্ধব্যাপারের মধ্যে একটা প্রণালীগত সাদৃশ্য থাকিবেই। অতএব যুদ্ধ করিতে হইলেই ব্যাপারটা তখনকার কাল হইতে একেবারে উলটা রকমের কিছু হইতে পারিবে না। এখনও সেকালেরই মতো সৈন্য লইয়া দল বাঁধিতে এবং দুইপক্ষে হানাহানি করিতে হইবে।

মানুষের মনের যে ইচ্ছা পূর্বে একদিন ধর্মসাধন উপলক্ষ্যে একটি বিশেষ আকার ধারণ করিয়াছিল, সেই ইচ্ছা যদি আজও প্রবল হইয়া উঠে তবে তাহারও সাধনোপায়, নকল না করিয়াও অনেকটা সেই পূর্ব আকার লইবে। এখনকার কালের উপযোগী বলিয়া ইহার একটা স্বাতন্ত্র্যও থাকিবে এবং চিরকালীন সত্যের প্রকাশ বলিয়া ভিন্ন ভিন্ন কালের সহিত ইহার মিলও থাকিবে। অতএব মৃত পিতার সঙ্গে সাদৃশ্য আছে বলিয়াই ছেলেকে যেমন শ্মশানে দাহ করাটা কর্তব্য নহে তেমনি সত্যের নূতন প্রকাশচেষ্টা তাহার পুরাতন চেষ্টার সঙ্গে কোনো অংশে মেলে বলিয়াই তাহাকে তাড়াতাড়ি বিদায় করিতে ব্যস্ত হওয়াটাকে সংগত বলিতে পারি না।

অথচ আমরা অনুকরণচ্ছলে অনেক জিনিস গ্রহণ করি যাহার সংগতি বিচার করি না। যদি বলা গেল এটা বর্তমানকালীন তবেই যেন তাহার পক্ষে সব কথা বলা হইল। কিন্তু যাহা তোমার বর্তমান তাহা যে আমার বর্তমান নহে সে কথা চিন্তা করিতে চাই না। এই জন্যই যদি বলা যায় আমরা যথাসম্ভব গির্জার মতো একটা পদার্থ গড়িয়া তুলিব তবে আমাদের মনে মস্ত এই একটা সান্ত্বনা আসে যে আমরা বর্তমানের সঙ্গে ঠিক তাল রাখিয়া চলিতেছি—অথচ গির্জার হাজার বছরের ইতিহাসের সঙ্গে আমাদের কোনো যোগই নাই। কিন্তু যে সকল ব্যবস্থা আমাদের স্বদেশীয়, যাহা আমাদের জাতির প্রকৃতিগত তাহাকে আমরা অন্য দেশের ইতিহাসের মধ্যে স্থাপন করিবার চেষ্টা করিয়া মাথা নাড়িয়া বলি—“না, ইহা চলিবে না। ইহা মডার্ন্ নহে।” মনের এমন অবস্থা মানুষের যখন জন্মায় তখন সে আধুনিকতা নামক অপরূপ পদার্থকে গুরু করিয়া তাহার নিকট হইতে কতকগুলা বাঁধা মন্ত্রকে কানে লয় এবং সত্যকে পরিত্যাগ করে।

আমি এখানে কেবল একটা কাল্পনিক প্রসঙ্গ লইয়া তর্ক করিতেছি না। আপনারা সকলেই জানেন আমার পূজনীয় পিতৃদেব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বোলপুরের উন্মুক্ত প্রান্তরের মধ্যে যুগল সপ্তপর্ণচ্ছায়াতলে যেখানে একদিন তাঁহার নিভৃত সাধনার বেদী নির্মাণ করিয়াছিলেন সেইখানে তিনি একটি আশ্রম স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। এই আশ্রমের প্রতি কেবল যে তাঁহার একটি গভীর প্রীতি ছিল তাহা নহে, ইহার প্রতি তাঁহার একটি সুদৃঢ় শ্রদ্ধা ছিল। যদিও সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত এই স্থান প্রায় শূন্যই পড়িয়া ছিল তথাপি তাঁহার মনে লেশমাত্র সংশয় ছিল না যে ইহার মধ্যে একটি গভীর সার্থকতা আছে। সেই সার্থকতা তিনি চক্ষে না দেখিলেও তাহার প্রতি তাঁহার পূর্ণ নির্ভর ছিল। তিনি জানিতেন, ঈশ্বরের ইচ্ছার মধ্যে ব্যস্ততা নাই কিন্তু অমোঘতা আছে।

একদিন এই আশ্রমে বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব যখন তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল

তখন পরমোৎসাহে তিনি সম্মতি দিলেন। এতদিন আশ্রম এই বিদ্যালয়ের জন্যই যে অপেক্ষা করিতেছিল তাহা তিনি অনুভব করিলেন। ছেলেদের মনকে মানুষ করিয়া তুলিবার ভারই এই আশ্রমের উপর। কারণ, মা যখন সন্তানকে অন্ন দেন তখন একদিকে তাহা অন্ন, আর এক দিকে তাহা তাঁহার হৃদয়। এই অন্নের সঙ্গে তাঁহার হৃদয় সম্মিলিত হইয়াই তাহা অমৃত হইয়া উঠে। আশ্রমও বালকদিগকে যে বিদ্যা-অন্ন দিবে তাহা হোটেলের অন্ন ইস্কুলের বিদ্যা নহে—তাহার সঙ্গে সঙ্গে আশ্রমের একটি প্রাণরস একটি অমৃতরস অলক্ষ্যে মিলিত হইয়া তাহাদের চিত্তকে আপনি পরিপুষ্ট করিয়া তুলিতে থাকিবে।

ইহা কেবল আশামাত্র নহে, বস্তুত ইহাই আমরা ঘটিতে দেখিয়াছি। শিক্ষকদের উপদেশ অনুশাসন নিতান্ত স্থূলভাবে কাজ করে এবং তাহার অধিকাংশই উগ্র ঔষধের মতো কেবল যে ব্যর্থ হয় তাহা নহে অনিষ্টই করিতে থাকে। কিন্তু এই আশ্রমের অলক্ষ্য ক্রিয়া অত্যন্ত গভীর এবং স্বাভাবিক। কেহ মনে করিবেন না আমি এখানে কোনো অলৌকিক শক্তির উল্লেখ করিতেছি। এখানে যে একজন সাধক সাধনা করিয়াছেন এবং সেই সাধনার আনন্দই যে এই আশ্রমকে মানুষের চিরদিনের সামগ্রী করিয়া তুলিবার জন্য এখনও নিযুক্ত আছে তাহা এখানকার সর্বত্রই নানা আকারে প্রকাশমান। বর্তমান আশ্রমবাসী আমরা সেই প্রকাশকে অহরহ নানাবিধ প্রকারে বাধা দিয়াও তাহাকে আচ্ছন্ন করিতে পারি নাই। সেই প্রকাশটি কেবল বালকদের নহে, শিক্ষকদের মনেও প্রতিনিয়ত অগোচরে কাজ করিয়া চলিয়াছে। এই স্থানটি যে নিতান্ত একটি বিদ্যালয়মাত্র নহে, ইহা যে আশ্রম, কেবলমাত্র এই ভাবটিরই প্রবলতা বড়ো সামান্য নহে।

ইহা দেখা গিয়াছে যতদিন পর্যন্ত মনে করিয়াছিলাম, আমরাই বালকদিগকে শিক্ষা দিব আমরাই তাহাদের উপকার করিব, ততদিন আমরা নিতান্তই সামান্য কাজ করিয়াছি। ততদিন যত যন্ত্রই গড়িয়া তুলিয়াছি তত যন্ত্রই ভাঙিয়া ফেলিতে হইয়াছে। এখনও যন্ত্র গড়িবার উৎসাহ আমাদের একেবারে যায় নাই, কেননা এখনও ভিতরের জিনিসটি বেশ করিয়া ভরিয়া উঠে নাই। কিন্তু তবুও যখন হইতে এই ভাবনাটা আমাদের মনে ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিল যে আপনারই শূন্যতাকে পূর্ণ করিতে হইবে; আমরাই এখানে পাইতে আসিয়াছি; এখানে বালকদের সাধনার এবং আমাদের সাধনার একই সমতল আসন; এখানে গুরুশিষ্য সকলেই একই ইস্কুলে সেই মহাগুরুর ক্লাসে ভরতি হইয়াছি; তখন হইতে ফল যেন আপনি ফলিয়া উঠিল, কাজের শৃঙ্খলা আপনি ঘটিতে লাগিল। এখনও আমাদের যাহা কিছু নিষ্ফলতা সে এখানেই—যেখানেই আমরা মনে করি আমরা দিব অন্যে নিবে, সাধনা কেবল ছাত্রদের

এবং আমরা তাহার চালক ও নিয়ন্তা, সেইখানেই আমরা কোনো সত্য পদার্থ দিতে পারি না, সেইখানেই আমরা নিজের অপরাধ অন্যের স্কন্ধে চাপাই এবং প্রাণের অভাব কলের দ্বারা পূরণ করিতে চেষ্টা করি।

নিজেদের এই অভিজ্ঞতার প্রতি লক্ষ্য করিয়া একথা আমাকে বিশেষভাবে বলিতে হইবে যে, আমরা অন্যকে ধর্মশিক্ষা দিব এই বাক্যই যেখানে প্রবল সেখানে ধর্মশিক্ষা কখনোই সহজ হইবে না। যেমন, অন্যকে দৃষ্টিশক্তি দিব বলিয়া দীপশিখা ব্যস্ত হইয়া বেড়ায় না, নিজে সে যে পরিমাণে উজ্জ্বল হইয়া উঠে সেই পরিমাণে স্বভাবতই অন্যের দৃষ্টিকে সাহায্য করে। ধর্মও সেই প্রকারের জিনিস, তাহা আলোর মতো; তাহার পাওয়া এবং দেওয়া একই কথা, তাহা একেবারে একসঙ্গেই ঘটে। এইজন্যই ধর্মশিক্ষার ইস্কুল নাই, তাহার আশ্রম আছে,—যেখানে মানুষের ধর্মসাধনা অহোরাত্র প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিতেছে, যেখানে সকল কর্মই ধর্মকর্মের অঙ্গরূপে অনুষ্ঠিত হইতেছে সেইখানেই স্বভাবের নিয়মে ধর্মবোধের উদ্বোধন হয়। এইজন্য সকল শাস্ত্রেই সঙ্গকেই ধর্মলাভের সর্বপ্রধান উপায় বলা হইয়াছে। এই সঙ্গ জিনিসটিকে, এই সাধকদের জীবনের সাধনাকে, যদি আমরা কোনো একটি বিশেষ অনুকূল স্থানে আকর্ষণ করিয়া আনিতে পারি, তাহা যদি স্থানে স্থানে বিক্ষিপ্ত হইয়া ছড়াইয়া না থাকে তবে এই পুঞ্জীভূত শক্তিকে আমরা মানবসমাজের উচ্চতম ব্যবহারে লাগাইতে পারি।

এ দেশে একদিন তপোবনের এইরূপ ব্যবহারই ছিল, সেখানে সাধনা ও শিক্ষা একত্র মিলিত হইয়াছিল বলিয়া, সেখানে পাওয়া এবং দেওয়ার কাজ অতি সহজে নিয়ত অনুষ্ঠিত হইতেছিল বলিয়াই তপোবন হৃৎপিণ্ডের মতো সমস্ত সমাজের মর্মস্থান অধিকার করিয়া তাহার প্রাণকে শোধন পরিচালন এবং রক্ষা করিয়াছে। বৌদ্ধ বিহারেরও সেই কাজ ছিল। সেখানে পাওয়া এবং দেওয়া অবিচ্ছিন্ন হইয়া বিরাজ করিতেছিল।

এইখানে স্বভাবতই শ্রোতাদের মনে এই প্রশ্ন উঠিবে যে তবে পূর্বে যে আশ্রমটির কথা বলা হইয়াছে সেখানে কি সাধকদের সমাগমে একটি পরিপূর্ণ ধর্মজীবনের শতদল পদ্ম বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে?

না, তাহা হয় নাই। আমরা যাহারা সেখানে সমবেত হইয়াছি আমাদের লক্ষ্য এক নহে এবং তাহা যে নির্বিশেষে উচ্চ এমন কথাও বলিতে পারি না। আমাদের সকলেরই শ্রদ্ধা যে গভীর এবং ধ্রুব তাহা নহে এবং তাহা আশাও করি না। আমরা যাহাকে উচ্চাকাঙ্ক্ষা নাম দিয়া থাকি অর্থাৎ সাংসারিক উন্নতি ও খ্যাতিপ্রতিপত্তির ইচ্ছা, তাহা আমাদের মনে খুবই উচ্চ হইয়া আছে, সকলের চেয়ে উচ্চ আকাঙ্ক্ষাকে উচ্চে স্থাপন করিতে পারি নাই। কিন্তু তৎসত্ত্বেও একথা আমি দৃঢ় করিয়া বলিব সেই আশ্রমের যে

আহ্বান তাহা সেই শান্তম্ শিবমদ্বৈতম্ যিনি তাঁহারই আহ্বান। আমরা যে যাহা মনে করিয়া আসি না কেন, তিনিই ডাকিতেছেন এবং সে ডাক এক মুহূর্তের জন্য থামিয়া নাই। আমরা কোনো কলরবে সেই অনবচ্ছিন্ন মঙ্গল-শঙ্খধ্বনিকে ঢাকিয়া ফেলিতে পারিতেছি না—তাহা সকলের উচ্চে বাজিতেছে, তাহার সুগম্ভীর স্বরতরঙ্গ সেখানকার তরুশ্রেণীর পল্লবে পল্লবে স্পন্দিত হইতেছে, এবং সেখানকার নির্মল আকাশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করিয়া তাহার আলোককে পুলকিত ও অন্ধকারকে নিস্তব্ধ পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতেছে।

সাধকদের জন্য অপেক্ষা করিতে হয়; তাঁহারা যখন আসিবেন তখন আসিবেন; তাঁহারা সকলেই কিছু গেরুয়া পরিয়া মাথায় তিলক কাটিয়া আসিবেন না—তাঁহারা এমন দীনবেশে নিঃশব্দে আসিবেন যে তাঁহাদের আগমন-বার্তা জানিতেও পারিব না।—কিন্তু ইতিমধ্যে ওই যে সাধনার আহ্বানটি ইহাই আমাদের সকলের চেয়ে বড়ো সম্পদ। এই ভূমার আহ্বানের একেবারেই মাঝখানে আশ্রমবাসীদিগকে বাস করিতে হইতেছে। সেই একাগ্র ধ্বনি তাহাদের বিমুখ কর্ণের বধিরতাকে দিনে দিনে ভেদ করিতেছে। সে তাহাদের শুষ্ক হৃদয়ের কঠিনতম স্তরের মধ্যেও অগোচরে প্রবেশ করিয়া ধীরে ধীরে রসসঞ্চার করিতেছে।

এমন কথা আমি একদিন কোনো বন্ধুর কাছে শুনিয়াছিলাম যে, জনতা হইতে দূরে একটা নিভৃত বেষ্টনের মধ্যে যে জীবনযাত্রা, তাহার মধ্যে একটা শৌখিনতা আছে, তাহার মধ্যে পুরাপুরি সত্য নাই, সুতরাং এখানকার যে শিক্ষা তাহা সম্পূর্ণ কাজের শিক্ষা নহে। কোনো কাল্পনিক আশ্রম সম্বন্ধে একথা খাটিতে পারে কিন্তু আমাদের এই আধুনিক আশ্রমটি সম্বন্ধে একথা আমরা স্বীকার করিতে পারি না।

সত্য বটে শহরে জনতার অভাব নাই কিন্তু সেই জনতার সঙ্গে সত্যকার যোগ আছে কয়জন মানুষের? সে জনতা একহিসাবে ছায়াবাজির ছায়ার মতো। নগরে গৃহস্থ তরঙ্গিত জনতাসমুদ্রের মধ্যে বেষ্টিত হইয়া এক একটি রবিনসন ক্রুসোর মতো আপনার ফ্রাইভেটিকে লইয়া নিরালায় দিন কাটাইতে থাকেন। এতবড়ো জনময় নির্জনতা কোথায় পাওয়া যাইবে?

কিন্তু এক-শ দু-শ মানুষকে এক আশ্রয়ে লইয়া দিনযাপন করাকে কোনোমতেই নির্জন বাস বলা চলে না। এই যে এক-শ দু-শ মানুষ ইহারা দূরের মানুষ নহে; ইহারা পথের পথিক নহে; ইচ্ছা করিলাম ইহাদের সঙ্গ লইলাম আর ইচ্ছা না হইল তো আপনার ঘরের কোণে আসিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলাম এমনটি হইবার জো নাই; এই এক-শ দু-শ মানুষের দিনরাত্রির সমস্ত প্রয়োজনের প্রত্যেক তুচ্ছ অংশটির সম্বন্ধেও

চিন্তা করিতে হইবে ; ইহাদের সমস্ত সুখদুঃখ সুবিধা-অসুবিধাকে আপনার করিয়া লইতে হইবে—ইহাকেই কি বলে মানুষের সঙ্গ এড়াইয়া দায়িত্ব কাটাইয়া শৌখিন শান্তির মধ্যে একটা বেড়া-দেওয়া পারমার্থিকতার দুর্বল সাধনা ?

আমার সেই বন্ধু হয়তো বলিবেন, নির্জনতার কথা ছাড়িয়া দাও—কিন্তু সংসারে যেখানে চারিদিকেই ভালো-মন্দর তরঙ্গ কেবলই উঠা-পড়া করিতেছে সেইখানেই ঠিক সত্যভাবে ভালোকে চিনাইয়া দিবার সুযোগ পাওয়া যায়। কাঁটার পরিচয় যেখানে নাই সেখানে কাঁটা বাঁচাইয়া চলিবার শিক্ষা হইবে কেমন করিয়া ? কাঁটাবনের গোলাপটাই সত্যকার গোলাপ—আর বারবার অতি যত্নে চোলাই করিয়া লওয়া সাধুতার গোলাপি আতর একটা নবাবি জিনিস।

হায়, সাধুতার এই নিষ্কণ্টক আতরটি কোন্ দোকানে মেলে তাহা নিশ্চয় জানি না কিন্তু আমাদের আশ্রমে যে তাহার কারবার নাই তাহা নিজের দিকে তাকাইলেই বুঝিতে পারি। কাব্যে পুরাণে সর্বত্রই তপোবনের আদর্শটি অত্যুজ্জ্বল বর্ণনায় বিরাজ করে কিন্তু তবু সেই বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে বহুতর মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ ঘন ঘন উঁকি মারিতেছে। মানুষের আদর্শও যেমন সত্য, সেই আদর্শের ব্যাঘাতও তেমনি সত্য—যাহারা সেই ব্যাঘাতের ভিতর দিয়াই চোখ মেলিয়া আদর্শকে দেখিতে না পারে, চোখ বুজিয়া স্বপ্ন দেখা ছাড়া তাহাদের আর গতি নাই।

আমরা যে আশ্রমের কথা বলিতেছি, সেখানে লোকালয়ের অন্য বিভাগেরই মতো মন্দের জন্য সিংহদ্বার খোলাই আছে। শয়তানকে সেখানে সকল সময়ে সাপের মতো ছদ্মবেশে প্রবেশ করিতে হয় না—সে দিব্য ভদ্রলোকেরই মতো মাথা তুলিয়া যাতায়াত করে। সেখানে সংসারের নানা দাবি, বৈষয়িকতার নানা আড়ম্বর, প্রবৃত্তির নানা চাঞ্চল্য এবং অহং-পুরুষের নানা উদ্ধত মূর্তি সর্বদাই দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণ লোকালয়ে বরঞ্চ তাহারা তেমন করিয়া চোখেই পড়ে না—কারণ ভালোমন্দ সেখানে একপ্রকার আপস করিয়া মিলিয়া-মিশিয়াই থাকে—এখানে তাহাদের মাঝখানে একটা বিচ্ছেদ আছে বলিয়াই মন্দটা এখানে খুব করিয়া দেখা দেয়।

তাই যদি হইল তবে আর হইল কী ? বন্ধুরা বলিবেন, যদি সেখানে জনতার চাপ লোকালয়ের চেয়ে কম না হইয়া বরঞ্চ বেশিই হয় এবং মন্দকেই যদি সেখান হইতে নিঃশেষে ছাঁকিয়া ফেলিবার আশা না করিতে পার এবং যদি সেখানকার আশ্রমবাসীরা সংসারের সাধারণ লোকেরই মতো মাঝারি রকমেরই মানুষ হন তবে সেই প্রকার স্থানই যে বালক-বালিকাদের ধর্মশিক্ষার অনুকূল স্থান তাহা কেমন করিয়া বলিবে ?

এ সম্বন্ধে আমার যাহা বক্তব্য তাহা এই,—কবিকল্পনার দ্বারা আগাগোড়া মনোরম

করিয়া যে একটা আকাশকুসুমখচিত আশ্রম গড়া যায় না এ কথাটা আমাকে খুব স্পষ্ট করিয়াই বলিতে হইতেছে—কারণ আমার মতো লোকের মুখে কোনো প্রস্তাব শুনিলেই সেটাকে নিরতিশয় ভাবুকতা বলিয়া শ্রোতারা সন্দেহ করিতে পারেন। আশ্রম বলিতে আমি যে কোনো একটা অদ্ভুত অসম্ভব স্বপ্নসুলভ পদার্থের কল্পনা করিতেছি তাহা নহে। সকল স্থূলদেহধারীর সঙ্গেই তাঁহার স্থূল দেহের ঐক্য আছে একথা আমি বারংবার স্বীকার করিব। কেবল যেখানে তাহার সূক্ষ্ম জায়গাটি সেইখানেই তাহার স্বাতন্ত্র্য। সে স্বাতন্ত্র্য সেইখানেই, যেখানে তাহার মাঝখানে একটি আদর্শ বিরাজ করিতেছে। সে আদর্শটি সাধারণ সংসারের আদর্শ নহে, সে আদর্শ আশ্রমের আদর্শ—তাহা বাসনার দিকে নয় সাধনার দিকেই নিয়ত লক্ষ্য নির্দেশ করিতেছে। এই আশ্রম যদি বা পাঁকের মধ্যেও ফুটিয়া থাকে তবু ভূমার দিকে তাহার মুখ তুলিয়াছে, সে আপনাকে যদি বা ছাড়িতে না পারিয়া থাকে তবু আপনাকে কেবলই ছাড়াইতে চাহিতেছে; সে যেখানে দাঁড়াইয়া আছে সেইখানেই তাহার পরিচয় নয়, সে যেখানে দৃষ্টি রাখিয়াছে সেইখানেই তাহার প্রকাশ। তাহার সকলের উর্ধ্বে যে সাধনার শিখাটি জ্বলিতেছে তাহাই তাহার সর্বোচ্চ সত্য।

কিন্তু কেনই বা বড়ো কথাটাকে গোপন করিব? কেনই বা কেবল কেজো লোকদের মন জোগাইবার জন্য ভিতরকার আসল রসটিকে আড়াল করিয়া রাখিব? এই প্রবন্ধ শেষ করিবার পূর্বে আমি অসংকোচে বলিব, আশ্রম বলিতেই আমাদের মনের সামনে যে ছবিটি জাগে যে ভাবটি ভরিয়া উঠে তাহা আমাদের সমস্ত হৃদয়কে হরণ করে। তাহার কারণ, শুদ্ধমাত্র এ নহে যে, তাহা আমাদের জাতির অনেক যুগের ধ্যানের ধন, সাধনার সৃষ্টি—তাহার গভীর কারণ এই, আমাদের সমস্তের সঙ্গে তাহার ভারি একটি সংগতি দেখিতে পাই, এইজন্যই তাহাকে এমন সত্য এমন সুন্দর বলিয়া ঠেকে। বিধাতার কাছে আমরা যে দান পাইয়াছি তাহাকে অস্বীকার করিব কেমন করিয়া? আমরা তো ঘন মেঘের কালিমালিপ্ত আকাশের নিচে জন্মগ্রহণ করি নাই, শীতের নিষ্ঠুর পীড়ন আমাদিগকে তো রুদ্ধ ঘরের মধ্যে তাড়না করিয়া বদ্ধ করে নাই; আকাশ যে আমাদের কাছে তাহার বিরাট বক্ষপট উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে; আলোক যে কোনোখানে কিছুমাত্র কার্পণ্য রাখিল না; সূর্যোদয় যে ভক্তির পূজাঞ্জলির মতো আকাশে উঠে এবং সূর্যাস্ত যে ভক্তের প্রণামের মতো দিগন্তে নীরবে অবনমিত হয়; কী উদার নদীর ধারা, কী নির্জন গম্ভীর তাহার প্রসারিত তট; অবারিত মাঠ রুদ্রের যোগাসনের মতো স্থির হইয়া পড়িয়া আছে। কিন্তু তবু সে যেন বিষ্ণুর বাহন মহাবিহঙ্গমের মতো তাহার দিগন্তজোড়া পাখা মেলিয়া দিয়া কোন্ অনন্তের অভিমুখে উড়িয়া চলিয়াছে সেখানে তাহার গতিকে আর

লক্ষ্য করা যাইতেছে না ; এখানে তরুতল আমাদিগকে আতিথ্য করে, ভূমিশয্যা আমাদিগকে আহ্বান করে, আতপ্তবায়ু আমাদিগকে বসন পরাইয়া রাখিয়াছে ; আমাদের দেশে এ সমস্তই যে সত্য, চিরকালের সত্য ;—পৃথিবীতে নানা জাতির মধ্যে যখন সৌভাগ্য ভাগ করা হইতেছিল তখন এই সমস্ত যে আমাদের ভাগে পড়িয়াছিল—তবু আমাদের জীবনের সাধনায় ইহাদের কোনো ব্যবহারই করিব না ? এত বড়ো সম্পদ আমাদের চেতনার বহির্দ্বারে অনাদৃত হইয়া পড়িয়া থাকিবে ? আমরাই তো জগৎ-প্রকৃতির সঙ্গে মানবপ্রকৃতির মিলন ঘটাইয়া চিত্তের বোধকে সর্বানুভূ, ধর্মের সাধনাকে বিশ্বব্যাপী করিয়া তুলিব, সেইজন্যই এই ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। সেইজন্যই আমাদের দুই চক্ষুর মধ্যে এমন একটি সুগভীর দৃষ্টি যাহা রূপের মধ্যে অরূপকে প্রত্যক্ষ করিবার জন্য স্নিগ্ধ শান্ত অচঞ্চল হইয়া রহিয়াছে—সেইজন্যই অনন্তের বাঁশির সুর এমনি করিয়া আমাদের প্রাণের মধ্যে পৌঁছে যে সেই অনন্তকে আমাদের সমস্ত হৃদয় দিয়া ছুঁইবার জন্য, তাহাকে ঘরে বাহিরে চিন্তায় কল্পনায় সেবায় রসভোগে স্নানে আহারে কর্মে ও বিশ্রামে বিচিত্র প্রকারে ব্যবহার করিবার জন্য আমরা কত কাল ধরিয়া কত দিক দিয়া কত কত পথে কত কত চেষ্টা করিতেছি তাহার অন্ত নাই। সেইজন্য ভারতবর্ষের আশ্রম ভারতবর্ষের জীবনকে এমন করিয়া অধিকার করিয়াছে—আমাদের কাব্যপুরাণকে এমন করিয়া আবিষ্ট করিয়া ধরিয়াছে—সেইজন্যই ভারতবর্ষের যে দান আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে অক্ষয় হইয়া আছে এই আশ্রমেই তাহার উদ্ভব। না হয় আজ যেকালে আমরা জন্মিয়াছি তাহাকে আধুনিক কাল বলা হয় এবং যে শতাব্দী ছুটিয়া চলিতেছে তাহা বিংশ শতাব্দী বলিয়া আদর পাইতেছে কিন্তু তাই বলিয়া বিধাতার অতি পুরাতন দান আজ নূতন কালের ভারতবর্ষে কি একেবারে নিঃশেষ হইয়া গেল, তিনি কি আমাদের নির্মল আকাশের উন্মুক্ততায় একেবারে কুলুপ লাগাইয়া দিলেন ? না হয়, আমরা কয়জন এই শহরের পোষ্যপুত্র হইয়া তাহার পথের প্রাঙ্গণটাকে খুব বড়ো মনে করিতেছি কিন্তু যে মাতার আমরা সন্তান সেই প্রকৃতি কি ভারতবর্ষ হইতে তাহার দিগন্তবিস্তীর্ণ শ্যামাঞ্চলটি তুলিয়া লইয়া বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন ? তাহা যদি সত্য না হয় তবে আমাদের দেশের বাহিরের ও অন্তরের প্রকৃতিকে নির্বাসিত করিয়া সকল বিষয়ে সর্বতোভাবে অন্য দেশের ইতিহাসকে অনুসরণ করিয়া চলাকেই মঙ্গলের পথ বলিয়া মানিয়া লইতে পারিব না।

শান্তিনিকেতন আশ্রমের বিদ্যালয়টির সহিত আমার জীবনের একাদশবর্ষ জড়িত হইয়াছে অতএব তাহার সফলতার কথা প্রকাশ করাতে সেটাকে আপনারা আমার নিরবচ্ছিন্ন অহমিকা বলিয়া মনে করিতে পারেন। সেই আশঙ্কা সত্ত্বেও আমি

আপনাদের কাছে শিক্ষা সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা বিবৃত করিলাম ; কারণ আনুমানিক কথার কোনো মূল্য নাই এবং সকল অপবাদ স্বীকার করিয়াও সত্যের পক্ষে সাক্ষ্য দিতে হইবে। অতএব আমি সবিনয়ে অথচ অসংশয় বিশ্বাসের দৃঢ়তার সঙ্গেই বলিতেছি যে, যে ধর্ম কোনো প্রকার রূপকল্পনা বা বাহ্য প্রক্রিয়াকে সাধনার বাধা ও মানুষের বুদ্ধি ও চরিত্রের পক্ষে বিপজ্জনক বলিয়াই মনে করে, সাময়িক বক্তৃতা বা উপদেশের দ্বারা সে ধর্ম মানুষের চিত্তকে সম্পূর্ণ অধিকার করিতে পারিবে না। সে ধর্মের পক্ষে এমন সকল আশ্রমের প্রয়োজন, যেখানে বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মানবজীবনের যোগ ব্যবধানবিহীন ও যেখানে তরুলতা পশুপক্ষীর সঙ্গে মানুষের আত্মীয় সম্বন্ধ স্বাভাবিক ; যেখানে ভোগের আকর্ষণ ও উপকরণবাহুল্য নিত্যই মানুষের মনকে ক্ষুব্ধ করিতেছে না ; সাধনা যেখানে কেবলমাত্র ধ্যানের মধ্যেই বিলীন না হইয়া ত্যাগে ও মঙ্গলকর্মে নিয়তই প্রকাশ পাইতেছে ; কোনো সংকীর্ণ দেশকালপাত্রের দ্বারা কর্তব্য-বুদ্ধিকে খণ্ডিত না করিয়া যেখানে, বিশ্বজনীন মঙ্গলের শ্রেষ্ঠতম আদর্শকেই মনের মধ্যে গ্রহণ করিবার অনুশাসন গভীরভাবে বিরাজ করিতেছে ; যেখানে পরস্পরের প্রতি ব্যবহারে শ্রদ্ধার চর্চা হইতেছে, জ্ঞানের আলোচনায় উদারতার ব্যাপ্তি হইতেছে এবং সকল দেশের মহাপুরুষদের চরিত স্মরণ করিয়া ভক্তির সাধনায় মন রসাভিষিক্ত হইয়া উঠিতেছে ; যখানে সংকীর্ণ বৈরাগ্যের কঠোরতার দ্বারা মানুষের সরল আনন্দকে বাধাগ্রস্ত করা হইতেছে না ও সংযমকে আশ্রয় করিয়া স্বাধীনতার উল্লাসই সর্বদা প্রকাশমান হইয়া উঠিতেছে ; যেখানে সূর্যোদয় সূর্যাস্ত ও নৈশ আকাশে জ্যোতিষ্কসভার নীরব মহিমা প্রতিদিন ব্যর্থ হইতেছে না, এবং প্রকৃতির ঋতু-উৎসবের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের আনন্দসংগীত একসুরে বাজিয়া উঠিতেছে ; যেখানে বালকগণের অধিকার কেবলমাত্র খেলা ও শিক্ষার মধ্যে বদ্ধ নহে,—তাহারা নানা প্রকারে কল্যাণভার লইয়া কর্তৃত্বগৌরবের সহিত প্রতিদিনের জীবনচেষ্টার দ্বারা আশ্রমকে সৃষ্টি করিয়া তুলিতেছে এবং যেখানে ছোটো-বড়ো বালকবৃদ্ধ সকলেই একাসনে বসিয়া নতশিরে বিশ্বজননীর প্রসন্ন হস্ত হইতে জীবনের প্রতিদিনের এবং চিরদিনের অন্ন গ্রহণ করিতেছে।

১৩১৮

ধর্মের অধিকার

যে-সকল মহাপুরুষের বাণী জগতে আজও অমর হইয়া আছে তাঁহারা কেহই মানুষের মন জোগাইয়া কথা কহিতে চেষ্টা করেন নাই। তাঁহারা জানিতেন মানুষ আপনার মনের চেয়েও অনেক বড়ো—অর্থাৎ মানুষ আপনাকে যাহা মনে করে সেইখানেই তাহার সমাপ্তি নহে। এই জন্য তাঁহারা একেবারে মানুষের রাজদরবারে আপনার দূত প্রেরণ করিয়াছেন, বাহিরের দেউড়িতে দ্বারীকে মিষ্টবাক্যে ভুলাইয়া কাজ উদ্ধারের সহজ উপায় সন্ধান করিয়া কাজ নষ্ট করেন নাই।

তাঁহারা এমন সব কথা বলিয়াছেন যাহা বলিতে কেহ সাহস করে না, এবং সংসারের কাজকর্মের মধ্যে যাহা শুনিবামাত্র মানুষ বিরক্ত হইয়া উঠে, বলিয়া বসে এসব কথা কোনো কাজের কথাই নহে। কিন্তু কত বড়ো বড়ো কাজের কথা কালের স্রোতে বুদ্‌বুদের মতো ফেনাইয়া উঠিল এবং ভাসিতে ভাসিতে ফাটিয়া বিলীন হইয়া গেল, আর যত অসম্ভবই সম্ভব হইল, অভাবনীয়ই সত্য হইল, বুদ্ধিমানের মন্ত্রণা নহে কিন্তু পাগলের পাগলামিই যুগে যুগে মানুষের অন্তরে বাহিরে, তাহার চিন্তায় কর্মে, তাহার দর্শনে সাহিত্যে কত নব নব সৃষ্টিবিকাশ করিয়া চলিল তাহার আর অন্ত নাই। তাঁহাদের সেইসকল অদ্ভুত কথা ঠেকাইতে গিয়াও কোনোমতেই ঠেকানো যায় না, তাহাকে মারিতে চেষ্টা করিলেই আরও অমর হইয়া উঠে, তাহাকে পোড়াইলে সে উজ্জ্বল হয়, তাহাকে পুঁতিয়া ফেলিলে সে অঙ্কুরিত হইয়া দেখা দেয়, তাহাকে সবলে বাধা দিতে গিয়াই আরও নিবিড় করিয়া গ্রহণ করিতে হয়—এবং যেন মন্ত্রের বলে কেমন করিয়া দেখিতে দেখিতে নিজের অগোচরে, এমন কি, নিজের অনিচ্ছায়, সেই সকল বাণীর বেদনায় ভাবুক লোকের ভাবের রং বদল হইতে থাকে, কাজের লোকের কাজের সুর ফিরিয়া যায়।

মহাপুরুষেরা মানুষকে অকুণ্ঠিত কণ্ঠে অসাধ্য সাধনেরই উপদেশ দিয়াছেন। মানুষ যেখানেই একটা কোনো বাধায় আসিয়া ঠেকিয়াছে এবং মনে করিয়াছে ইহাই তাহার চরম আশ্রয়, এবং সেইখানেই আপনার শাস্ত্রকে প্রথাকে একেবারে নিশ্ছিদ্ররূপে পাকা করিয়া সনাতন বাসা বাঁধিবার চেষ্টা করিয়াছে—সেইখানেই মহাপুরুষেরা আসিয়া গণ্ডি মুছিয়াছেন, বেড়া ভাঙিয়াছেন—বলিয়াছেন, পথ এখনও বাকি, পাথেয় এখনও শেষ হয় নাই, যে অমৃতভবন তোমার আপন ঘর তোমার চরমলোক সে তোমাদের এই মিস্ত্রির হাতের গড়া পাথরের দেওয়াল দিয়া প্রস্তুত নহে, তাহা পরিবর্তিত হয় কিন্তু ভাঙে না, তাহা আশ্রয় দেয় কিন্তু আবদ্ধ করে না, তাহা নির্মিত হয় না বিকশিত হয়, সঞ্চিত

হয় না সঞ্চারিত হয়, তাহা কৌশলের কারুকার্য নহে তাহা অক্ষয় জীবনের অক্লান্ত সৃষ্টি। মানুষ বলে সেই পথযাত্রা আমার অসাধ্য, কেননা আমি দুর্বল আমি শ্রান্ত ; তাঁহারা বলেন এইখানে স্থির হইয়া থাকাই তোমার অসাধ্য, কেননা তুমি মানুষ, তুমি মহৎ, তুমি অমৃতের পুত্র, ভূমাকে ছাড়া কোথাও তোমার সন্তোষ নাই।

যে ব্যক্তি ছোটো সে বিশ্বসংসারকে অসংখ্য বাধার রাজ্য বলিয়াই জানে, বাধামাত্রই তাহার দৃষ্টিকে বিলুপ্ত করে ও তাহার আশাকে প্রতিহত করিয়া দেয় এই জন্য সে সত্যকে জানে না, বাধাকেই সত্য বলিয়া জানে। যে ব্যক্তি বড়ো তিনি সমস্ত বাধাকে ছাড়াইয়া একেবারেই সত্যকে দেখিতে পান। এইজন্য ছোটোর সঙ্গে বড়োর কথার একেবারে এতই বৈপরীত্য। এইজন্য সকলেই যখন একবাক্যে বলিতেছে আমরা কেবল অন্ধকার দেখিতেছি তখনও তিনি জোরের সঙ্গে বলিতে পারেন—

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।

সমস্ত অন্ধকারকে ছাড়াইয়া আমি তাঁহাকেই জানিতেছি যিনি মহান্ পুরুষ, যিনি জ্যোতির্ময়।

এইজন্য যখন স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি, অধর্মই আমাকে বাঁচাইতে পারে এই মনে করিয়া হাজার হাজার লোক জালজালিয়াতি মারামারি কাড়াকাড়ির দিকে দলে দলে ছুটিয়া চলিয়াছে তখনও তাঁহারা অসংকোচে এমন কথা বলেন যে, স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ—অতি অল্পমাত্র ধর্মও মহাভয় হইতে ত্রাণ করিতে পারে; যখন দেখা যাইতেছে সৎকর্ম পদে পদে বাধাগ্রস্ত, তাহা মূঢ়তার জড়ত্বপুঞ্জে প্রতিহত, প্রবলের অত্যাচারে প্রপীড়িত, বাহিরে তাহার দারিদ্র্য সর্বপ্রকারেই প্রত্যক্ষ তখনও তাঁহারা অসংশয়ে বলেন, সর্ষপপরিমাণ বিশ্বাস পর্বতপরিমাণ বাধাকে জয় করিতে পারে। তাঁহারা কিছুমাত্র হাতে রাখিয়া কথা বলেন না, মানুষকে খাটো মনে করিয়া সত্যকে তাহার কাছে খাটো করিয়া ধরেন না ; তাঁহারা অসত্যের আস্ফালনকে একেবারেই অবজ্ঞা করিয়া বলেন, সত্যমেব জয়তে—এবং সংসারকেই যে-সকল লোক অহোরাত্র সত্য বলিয়া পাক খাইয়া ফিরিতেছে, তাহাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ঘোষণা করেন—সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম—অনন্তস্বরূপ ব্রহ্মই সত্য। যাহাকে চোখে দেখিতেছি, স্পর্শ করিতেছি, যাহাকে জ্ঞানের শেষ বিষয় বলিয়া মনে করিতেছি সত্যকে তাহার চেয়েও তাঁহারাই বড়ো করিয়া দেখাইয়াছেন মানুষের মধ্যে যাঁহারা বড়ো হইয়া জন্মিয়াছেন।

তাঁহাদের যাহা অনুশাসন তাহাও শুনিতে অত্যন্ত অসম্ভব। সংসারে যে লোকটি যেমন তাহাকে ঠিক তেমনি করিয়া দেখো এ পরামর্শটি নিতান্ত সহজ নহে কিন্তু এখানেই তাঁহারা দাঁড়ি টানেন নাই, তাঁহারা বলিয়াছেন আপনার মতো করিয়াই সকলকে দেখো। তাহার কারণ এই আত্মপরের ভেদ যেখানে সেইখানেই তাঁহাদের দৃষ্টি ঠেকিয়া যায় নাই

আত্মপরের মিল যেখানে সেইখানেই তাঁহারা বিহার করিতেছেন। শত্রুকে ক্ষমা করিবে একথা বলিলে যথেষ্ট বলা হইল কিন্তু তাঁহারা সে কথাও ছাড়াইয়া বলিয়াছেন শত্রুকেও প্রীতিদান করিবে যেমন করিয়া চন্দনতরু আঘাতকারীকেও সুগন্ধ দান করে। তাহার কারণ এই প্রেমের মধ্যেই তাঁহারা সত্যকে পূর্ণ করিয়া দেখিয়াছেন, এইজন্য স্বভাবতই সে-পর্যন্ত না গিয়া তাঁহারা থামিতে পারেন না। তুমি বড়ো হও, ভালো হও এই কথাই মানুষের পক্ষে কম কথা নয় কিন্তু তাঁহারা একেবারে বলিয়া বসেন—

শরবৎ তন্ময়ো ভবেৎ।

শর যেমন লক্ষ্যের মধ্যে একেবারে নিবিষ্ট হইয়া যায় তেমনি করিয়া তন্ময় হইয়া ব্রহ্মের মধ্যে প্রবেশ করো।

ব্রহ্মই পরিপূর্ণ সত্য এবং তাঁহাকেই পূর্ণভাবে পাইতে হইবে এই কথাটিকে খাটো করিয়া বলা তাঁহাদের কর্ম নহে—তাই তাঁহারা স্পষ্ট করিয়াই বলেন যে, তাঁহাকে না জানিয়া যে মানুষ কেবল জপ তপ করিয়াই কাটায় অন্তবদেবাস্ত তদ্‌ভবতি, তাহার সে সমস্তই বিনষ্ট হইয়া যায়—তাঁহাকে না জানিয়াই যে ব্যক্তি ইহলোক হইতে অপসৃত হয়, স কৃপণঃ—সে কৃপাপাত্র।

অতএব ইহা দেখা যাইতেছে, মানুষের মধ্যে যাঁহারা সকলের বড়ো তাঁহারা সেইখানকার কথাই বলিতেছেন যাহা সকলের চরম। কোনো প্রয়োজনের দিকে তাকাইয়া সে সত্যকে তাঁহারা ছোটো করেন না। সেই চরম লক্ষ্যকেই অসংশয়ে সুস্পষ্টরূপে সকল সত্যের পরম সত্য বলিয়া স্বীকার না করিলে মানুষকে আত্ম-অবিশ্বাসী ও ভীরু করিয়া রাখা হয়; বাধার ওপারে যে সত্য আছে তাহার কথাই তাহাকে বড়ো করিয়া না শুনাইয়া বাধাটার উপরেই যদি ঝোঁক দেওয়া হয় তবে সে অবস্থায় মানুষ সেই বাধার সঙ্গেই আপস করিয়াই বাসা বাঁধে এবং সত্যকেই আয়ত্তের অতীত বলিয়া ব্যবহারের বাহিরে নির্বাসিত করিয়া দেয়।

কিন্তু মানবগুরুগণ যে পরম লাভ, যে অসাধ্যসাধনের কথা বলেন তাহাকেই তাঁহারা মানুষের ধর্ম বলিয়া থাকেন। অর্থাৎ তাহাই মানুষের পরিপূর্ণ স্বভাব, তাহাই মানুষের সত্য। যেমনি লোভ হইবে অমনি কাড়িয়া খাইবে মানুষের মধ্যে এমন একটা প্রবৃত্তি আছে সে কথা অস্বীকার করি না কিন্তু তবু ইহাকে আমরা মানুষের ধর্ম অর্থাৎ মানুষের সত্যকার স্বভাব বলি না। লোভ হইলেও লোভ দমন করিবে, পরের অন্ন কাড়িয়া খাইবে না, একথা বলিলেও কম বলা হয় না—কিন্তু তবু এখানেও মানুষ থামিতে পারে না। সে বলিয়াছে, ক্ষুধিতকে নিজের অন্ন দান করিবে, ইহাই মানুষের ধর্ম, ইহাই মানুষের পুণ্য, অর্থাৎ তাহার পূর্ণতা। অথচ লোকসংখ্যা গণনা করিয়া যদি ওজনদরে মানুষের ধর্ম বিচার করিতে হয় তবে নিশ্চয়ই বলিতে হইবে নিজের অন্ন পরকে দান

করা মানুষের ধর্ম নহে; কেননা অনেক-লোকই পরের অন্ন কাড়িবার বাধাহীন সুযোগ পাইলে নিজেকে সার্থক মনে করে। তবু আজ পর্যন্ত মানুষ একথা বলিতে কুণ্ঠিত হয় নাই যে দয়াই ধর্ম, দানই পুণ্য।

কিন্তু মানুষের পক্ষে যাহা সত্য মানুষের পক্ষে তাহাই যে সহজ তাহা নহে। তবেই দেখা যাইতেছে সহজকেই আপনার ধর্ম বলিয়া মানিয়া লইয়া মানুষ আরাম পাইতে চায় না, এবং যে-কোনো দুর্বলচিত্ত সহজকেই আপনার ধর্ম বলিয়াছে এবং ধর্মকে আপনার সুবিধামত সহজ করিয়া লইয়াছে তাহার আর দুর্গতির অন্ত থাকে না। আপন ধর্মের পথকে মানুষ বলিয়াছে—ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি। দুঃখকে মানুষ মনুষ্যত্বের বাহন বলিয়া গণ্য করিয়া লইয়াছে এবং সুখকেই সে সুখ বলে নাই, বলিয়াছে—ভূমৈব সুখম্।

এই জন্যই এই বড়ো একটি আশ্চর্য ব্যাপার দেখা যায় যে, যাঁহারা মানুষকে অসাধ্যসাধনের উপদেশ দিয়াছেন, যাঁহাদের কথা শুনিলেই হঠাৎ মনে হয় ইহা কোনোমতেই বিশ্বাস করিবার মতো নহে, মানুষ তাঁহাদিগকেই শ্রদ্ধা করে অর্থাৎ বিশ্বাস করে। তাহার কারণ মহত্ত্বই মানুষের আত্মার ধর্ম; সে মুখে যাহাই বলুক শেষকালে দেখা যায় সে বড়োকেই যথার্থ বিশ্বাস করে। সহজের উপরেই তাহার বস্তুত শ্রদ্ধা নাই; অসাধ্যসাধনকেই সে সত্য সাধনা বলিয়া জানে; সেই পথের পথিককেই সে সর্বোচ্চ সম্মান না দিয়া কোনোমতেই থাকিতে পারে না।

যাঁহারা মানুষকে দুর্গম পথে ডাকেন, মানুষ তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধা করে, কেননা মানুষকে তাঁহারা শ্রদ্ধা করেন। তাঁহারা মানুষকে দীনাত্মা বলিয়া অবজ্ঞা করেন না। বাহিরে তাঁহারা মানুষের যত দুর্বলতা যত মূঢ়তাই দেখুন না কেন তবুও তাঁহারা নিশ্চয় জানেন যথার্থত মানুষ হীনশক্তি নহে—তাহার শক্তিহীনতা নিতান্তই একটা বাহিরের জিনিস; সেটাকে মায়া বলিলেই হয়। এই জন্য তাঁহারা যখন শ্রদ্ধা করিয়া মানুষকে বড়ো পথে ডাকেন তখন মানুষ আপনার মায়াকে ত্যাগ করিয়া সত্যকে চিনিতে পারে, মানুষ নিজের মাহাত্ম্য দেখিতে পায় এবং নিজের সেই সত্যস্বরূপে বিশ্বাস করিবামাত্র সে অসাধ্যসাধন করিতে পারে। তখন সে বিস্মিত হইয়া দেখে ভয় তাহাকে ভয় দেখাইতেছে না, দুঃখ তাহাকে দুঃখ দিতেছে না, বাধা তাহাকে পরাভূত করিতেছে না, এমন কি, নিষ্ফলতাও তাহাকে নিরস্ত করিতে পারিতেছে না। তখন সে হঠাৎ দেখিতে পায় ত্যাগ তাহার পক্ষে সহজ, ক্লেশ তাহার পক্ষে আনন্দময়, এবং মৃত্যু তাহার পক্ষে অমৃতের সোপান।

বুদ্ধদেব তাঁহার শিষ্যদিগকে উপদেশ দিবার কালে এক সময়ে বলিয়াছিলেন যে, মানুষের মনে কামনা অত্যন্ত বেশি প্রবল, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তাহার চেয়েও প্রবল

পদার্থ আমাদের আছে; সত্যের পিপাসা যদি আমাদের রিপুর চেয়ে প্রবলতর না হইত তবে আমাদের মধ্যে কেই বা ধর্মের পথে চলিতে পারিত।

মানুষের প্রতি এত বড়ো শ্রদ্ধার কথা এত বড়ো আশার কথা সকলে বলিতে পারে না। কামনার আঘাতে মানুষ বারবার স্খলিত হইয়া পড়িতেছে, কেবল ইহাই বড়ো করিয়া তাহার চোখে পড়ে যে ছোটো; কিন্তু তৎসত্ত্বেও সত্যের আকর্ষণে মানুষ যে পাশবতার দিক হইতে মনুষ্যত্বের দিকে অগ্রসর হইতেছে এইটেই বড়ো করিয়া দেখিতে পান তিনিই যিনি বড়ো। এই জন্য তিনিই মানুষকে বারংবার নির্ভয়ে ক্ষমা করিতে পারেন, তিনিই মানুষের জন্য আশা করিতে পারেন, তিনিই মানুষকে সকলের চেয়ে বড়ো কথাটি শুনাইতে আসেন, তিনিই মানুষকে সকলের চেয়ে বড়ো অধিকার দিতে কুণ্ঠিত হন না। তিনি কৃপণের ন্যায় মানুষকে ওজন করিয়া অনুগ্রহ দান করেন না, এবং বলেন না তাহাই তাহার বুদ্ধি ও শক্তির পক্ষে যথেষ্ট,—প্রিয়তম বন্ধুর ন্যায় তিনি আপন চিরজীবনের সর্বোচ্চ সাধনের ধন তাহার নিকট সম্পূর্ণ শ্রদ্ধার সহিত উৎসর্গ করেন, জানেন সে তাহার যোগ্য। সে যে কত বড়ো যোগ্য তাহা সে নিজে তেমন করিয়া জানে না, তিনি যেমন করিয়া জানেন।

মানুষ বলে, জানি, আমরা পারি না —মহাপুরুষ বলেন, জানি, তোমরা পার। মানুষ বলে, যাহা সাধ্য এমন একটা ধর্ম খাড়া করো; মহাপুরুষ বলেন, যাহা ধর্ম তাহা নিশ্চয়ই তোমাদের সাধ্য। মানুষের সমস্ত শক্তির উপরে তাঁহারা দাবি করেন—কেননা সমস্ত অশক্তির পরিচয়কে অতিক্রম করিয়াও তাঁহারা নিশ্চয়ই জানেন তাহার শক্তি আছে।

অতএব ধর্মেই মানুষের শ্রেষ্ঠ পরিচয়। ধর্ম মানুষের উপরে যে পরিমাণে দাবি করে সেই অনুসারে মানুষ আপনাকে চেনে। কোনো লোক রাজার ছেলে হইয়াও হয়তো আপনাকে ভুলিয়া থাকিতে পারে তবুও দেশের লোকের দিক হইতে একটা তাগিদ থাকা চাই। তাহার পৈতৃক গৌরব তাহাকে স্মরণ করাইতেই হইবে, তাহাকে লজ্জা দিতে হইবে, এমন কি, তাহাকে দণ্ড দেওয়া আবশ্যক হইতে পারে। কিন্তু তাহাকে চাষা বলিয়া মিথ্যা ভুলাইয়া সমস্যাকে দিব্য সহজ করিয়া দিলে চলিবে না; সে চাষার মতো প্রত্যহ ব্যবহার করিলেও সত্য তাহার সম্মুখে স্থির রাখিতে হইবে। তেমনি ধর্ম কেবলই মানুষকে বলিতেছে, তুমি অমৃতের পুত্র, ইহাই সত্য; ব্যবহারত মানুষের স্খলন পদে পদে হইতেছে তবু ধর্ম তাহার সত্য পরিচয়কে উচ্চে ধরিয়া রাখিতেছে; মানুষ বলিতে যে কতখানি বুঝায় ধর্ম তাহা কোনোমতেই মানুষকে ভুলিতে দিবে না; ইহাই তাহার সর্বপ্রধান কাজ।

ব্যাধি মানুষের শরীরের স্বভাব নহে তবু ব্যাধি মানুষকে ধরে। কিন্তু তখন

মানুষের শরীরের প্রকৃতি ভিতরের দিক হইতে ব্যাধিকে তাড়াইবার নানাপ্রকার উপায় করিতে থাকে। যতক্ষণ মস্তিষ্ক ঠিক থাকে ততক্ষণ এই সংগ্রামে ভয় বেশি নাই কিন্তু যখন মস্তিষ্ককেই ব্যাধিশত্রু পরাভূত করে তখনই ব্যাধি সকলের চেয়ে নিদারুণ হইয়া উঠে কারণ তখন বাহিরের দিক হইতে চিকিৎসকের চেষ্টা যতই প্রবল হউক ভিতরের দিকের শ্রেষ্ঠ সহায়টি দুর্বল হইয়া পড়ে। মস্তিষ্ক যেমন শরীরে, ধর্ম তেমনি মানবসমাজে। এই ধর্মের আদর্শই নিয়ত ভিতরে ভিতরে মানবপ্রকৃতিকে তাহার সমস্ত বিকৃতির সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিয়া রাখে কিন্তু যে পরম দুর্দিনে এই ধর্মের আদর্শকেই বিকৃতি আক্রমণ করে সেদিন বাহিরের নিয়ম সংযম আচার অনুষ্ঠান পুলিস ও রাষ্ট্রবিধি যতই প্রবল হউক না কেন সমাজপ্রকৃতিকে দুর্গতি হইতে বাঁচাইয়া রাখিবে কে? এই জন্য দুর্বলতার দোহাই দিয়া ইচ্ছাপূর্বক ধর্মকে দুর্বল করার মতো আত্মঘাতকতা আর কিছুই হইতে পারে না, কারণ, দুর্বলতার দিনেই বাঁচিবার একমাত্র উপায় ধর্মের বল।

আমাদের দেশে সকলের চেয়ে নিদারুণ দুর্ভাগ্য এই যে, মানুষের দুর্বলতার মাপে ধর্মকে সুবিধামতো খাটো করিয়া ফেলা যাইতে পারে এই অদ্ভুত বিশ্বাস আমাদিগকে পাইয়া বসিয়াছে। আমরা এ কথা অসংকোচে বলিয়া থাকি, যাহার শক্তি কম তাহার জন্য ধর্মকে ছাঁটিয়া ছোটো করিতে দোষ নাই, এমন কি, তাহাই কর্তব্য।

ধর্মের প্রতি যদি শ্রদ্ধা থাকে তবে এমন কথা কি বলা যায়? প্রয়োজন অনুসারে আমরা তাহাকে ছোটো বড়ো করিব! ধর্ম তো জীবনহীন জড় পদার্থ নহে; তাহার উপরে ফরমাশমতো অনায়াসে দরজির কাঁচি বা ছুতারের করাত তো চলে না। এ কথা তো কেহ বলে না যে, শিশুটি ক্ষুদ্র বলিয়া মাকেও চারিদিক হইতে কাটিয়া কম করিয়া ফেলো। মা তো শিশুর গায়ের জামার সঙ্গে তুলনীয় নহেন। প্রথমত মাকে কাটিতে গেলেই মারিয়া ফেলা হইবে, দ্বিতীয়ত অখণ্ড সমগ্র মাতাই বড়ো সন্তানের পক্ষে যেমন আবশ্যক ছোটো সন্তানটির পক্ষেও তেমনি আবশ্যক—তাঁহাকে কম করিলে বড়োও যেমন বঞ্চিত হইবে, ছোটোও তেমনি বঞ্চিত হইবে। ধর্ম কি মানুষের মাতার মতোই নহে?

আমি জানি আমাকে এই প্রশ্ন করা হইবে সকল মানুষেরই কি বুদ্ধি ও প্রকৃতি একই রকমের? সকলেই কি ধর্মকে একই ভাবে বোঝে? না, সকলের এক নহে; ছোটো বড়ো উঁচু নিচু জগতে আছে। অতএব সত্যকে আমরা সকলেই সমান দূর পর্যন্ত পাইয়াছি একথা বলিতে পারি না। আমাদের শক্তি পরিমিত; কিন্তু যতদূর বড়ো করিয়া সত্যকে পাইয়াছি তাহার চেয়েও সে ছোটো এ মিথ্যা কথা তো ক্ষণকালের জন্যও আমরা কাহারও খাতিরে বলিতে পারি না। গ্যালিলিও যে জ্যোতিষ্কতত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছিলেন তাহা তখনকার কালের প্রচলিত খ্রীস্টানধর্মের সঙ্গে খাপ খায় নাই— তাই

বলিয়া একথা বলা কি শোভা পাইত যে, খ্রীস্টান বেচারার পক্ষে মিথ্যা জ্যোতির্বিদ্যাই সত্য ? তাহাকে কি এই উপদেশ দেওয়া চলিত যে, তুমি খ্রীস্টান অতএব তোমার উচিত তোমার উপযোগী একটা বিশেষ জ্যোতিষকেই একান্ত শ্রদ্ধার সহিত বরণ করা ?

কিন্তু তাই বলিয়া গ্যালিলিওই কি জ্যোতিষের চরমে গিয়াছেন ? তাহা নহে। তবুও তাহা সত্যের দিকে যাওয়া। সেখান হইতেও অগ্রসর হও কিন্তু কোনো কারণেই পিছু হটা আর চলিবে না ; যদি হটিতে থাকি তবে সত্যের উলটা দিকে চলা হইবে সুতরাং তাহার শাস্তি অবশ্যম্ভাবী। তেমনি ধর্ম সম্বন্ধে একটিমাত্র লোকের বোধও যদি দেশের সকল লোকের বোধকে ছাড়াইয়া গিয়া থাকে তবে তাহাই সমস্ত দেশের লোকের ধর্ম, কারণ তাহাই দেশের সর্বোচ্চ সত্য। অন্য লোকে তাহা গ্রহণ করিতে রাজি হইবে না, তাহা বুঝিতে বিলম্ব করিবে ; কিন্তু তুমি যদি বুঝিয়া থাক তবে তোমাকে সকল লোকের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিতে হইবে, ইহাই সত্য এবং ইহা সকল লোকেরই সত্য, কেবল একলা আমার সত্য নহে। কেহ যদি জড়ভাবে বলিতে থাকে ইহা আমি বুঝিতে পারিব না তবে তোমাকে জোর করিয়াই বলিতে হইবে, তুমি বুঝিতে পারিবে, কারণ ইহা সত্য এবং সত্যকে গ্রহণ করাই মানুষের ধর্ম।

ইতিহাসে আমরা কী দেখিলাম ? আমরা দেখিয়াছি, বুদ্ধদেব যখন সত্যকে পাইয়াছি বলিয়া উপলব্ধি করিলেন, তখন তিনি বুঝিলেন আমার ভিতর দিয়া সমস্ত মানুষ এই সত্য পাইবার অধিকারী হইয়াছে। তখন তিনি ভিন্ন ভিন্ন লোকের শক্তির পরিমাপ করিয়া সত্যের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে মিথ্যার খাদ মিশাইতে লাগিলেন না। তাঁহার মতো অদ্ভুত শক্তিমান পুরুষ বহুকাল একাগ্রচিন্তার পর যে সত্য উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন তাহা যে সকল মানুষেরই নয় এ কথা তিনি এক মুহূর্তের জন্যও কল্পনা করেন নাই। অথচ সকল মানুষ তাহাকে শ্রদ্ধা করে নাই, অনেকে তাহা বুদ্ধির দোষে বিকৃতও করিয়াছে। তৎসত্ত্বেও একথা নিশ্চিত সত্য যে, ধর্মকে হিসাব করিয়া ক্ষুদ্র করা কোনোমতেই চলে না—যে তাহাকে যে পরিমাণে মানুক আর না মানুক, সেই যে একমাত্র মাননীয় এই কথা বলিয়া তাহাকে সকলের সামনে পূর্ণভাবে ধরিয়া রাখিতে হইবে। বাপকে সকল ছেলে সমান শ্রদ্ধা করে না এবং অনেক ছেলে তাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াও থাকে তাই বলিয়া ছেলেদিগকে শ্রেণীবিভক্ত করিয়া এমন কথা বলা চলে না যে, তোমার বাপ বারো আনা, তোমার বাপ সিকি, এবং তোমার বাপ বাপই নহে, তুমি একটা গাছের ডালকে বাপ বলিয়া গ্রহণ করো– এবং এইরূপে অধিকার ভেদে তোমরা বাপের সঙ্গে ভিন্নরূপে ব্যবহার করিতে থাকো ; তাহা হইলেই তোমাদের সন্তানধর্ম পালন করা হইবে। বস্তুত পিতার তারতম্য নাই ; তাঁহার সম্বন্ধে

সন্তানদের হৃদয়ের ও ব্যবহারের যদি তারতম্য থাকে তবে সেই অনুসারে তাহাদিগকে ভালো বলিব বা মন্দ বলিব, একথা কখনোই বলিব না তুমি যখন এইটুকু মাত্র পার তখন এইটুকুই তোমার পক্ষে ভালো।

সকলেই জানেন যিশু যখন বাহ্যঅনুষ্ঠানপ্রধান ধর্মকে নিন্দা করিয়া আধ্যাত্মিক ধর্মের বার্তা ঘোষণা করিলেন তখন য়িহুদিরা তাহা গ্রহণ করে নাই। তবু তিনি নিজের গুটিকয়েক অনুবর্তীমাত্রকেই লইয়া সত্যধর্মকে নিখিল মানবের ধর্ম বলিয়াই প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি একথা বলেন নাই, এ ধর্ম যাহারা বুঝিতে পারিতেছে তাহাদেরই, যাহারা পারিতেছে না তাহাদের নহে। মহম্মদের আবির্ভাবকালে পৌত্তলিক আরবীয়েরা যে তাঁহার একেশ্বরবাদ সহজে গ্রহণ করিয়াছিল তাহা নহে, তাই বলিয়া তিনি তাহাদিগকে ডাকিয়া বলেন নাই, তোমাদের পক্ষে যাহা সহজ তাহাই তোমাদের ধর্ম, তোমরা বাপ দাদা ধরিয়া যাহা মানিয়া আসিয়াছ তাহাই তোমাদের সত্য। তিনি এমন অদ্ভুত অসত্য বলেন নাই যে, যাহাকে দশজনে মিলিয়া বিশ্বাস করা যায় তাহাই সত্য, যাহাকে দশজনে মিলিয়া পালন করা যায় তাহাই ধর্ম। একথা বলিলে উপস্থিত আপদ মিটিত কিন্তু চিরকালের বিপদ বাড়িয়া চলিত।

একথা বলাই বাহুল্য, উপস্থিতমতো মানুষ যাহা পারে সেইখানেই তাহার সীমা নহে। তাহা যদি হইত তবে যুগযুগান্তর ধরিয়া মানুষ মউমাছির মতো একই রকম মউচাক তৈরি করিয়া চলিত। বস্তুত অবিচলিত সনাতন প্রথার বড়াই যদি কেহ করিতে পারে তবে সে পশুপক্ষী কীটপতঙ্গ, মানুষ নহে। আরও বেশি বড়াই যদি কেহ করিতে পারে তবে সে ধুলামাটিপাথর। মানুষ কোনো একটা জায়গায় আসিয়া হাল ছাড়িয়া চোখ বুজিয়া সীমাকে মানিতে চায় না বলিয়াই সে মানুষ। মানুষের এই যে কেবলই আরও-র দিকে গতি, ভূমার দিকে টান এইখানেই তাহার শ্রেয়। এই শ্রেয়কে রক্ষা করিবার ইহাকে কেবলই স্মরণ করাইবার ভার তাহার ধর্মের প্রতি। এইজন্যই মানুষের চিত্ত তাহার কল্যাণকে যত সুদূর পর্যন্ত চিন্তা করিতে পারে তত সুদূরেই আপনার ধর্মকে প্রহরীর মতো বসাইয়া রাখিয়াছে—সেই মানবচেতনার একেবারে দিগন্তে দাঁড়াইয়া ধর্ম মানুষকে অনন্তের দিকে নিয়ত আহ্বান করিতেছে।

মানুষের শক্তির মধ্যে দুটা দিক আছে, একটা দিকের নাম "পারে" এবং আর একটা দিকের নাম "পারিবে"। "পারে"র দিকটাই মানুষের সহজ, আর "পারিবে"র দিকটাতেই তাহার তপস্যা। ধর্ম মানুষের এই "পারিবে"র সর্বোচ্চ শিখরে দাঁড়াইয়া তাহার সমস্ত "পারে"কে নিয়ত টান দিতেছে তাহাকে বিশ্রাম করিতে দিতেছে না, তাহাকে কোনো একটা উপস্থিত সামান্য লাভের মধ্যে সন্তুষ্ট থাকিতে দিতেছে না।

এইরূপে মানুষের সমস্ত "পারে" যখন সেই "পারিবে"র দ্বারা অধিকৃত হইয়া সম্মুখের দিকে চলিতে থাকে তখনই মানুষ বীর—তখনই সে সত্যভাবে আত্মাকে লাভ করে। কিন্তু "পারিবে"র দিকে এই আকর্ষণ যাহারা সহিতে পারে না, যাহারা নিজেকে মূঢ় ও অক্ষম বলিয়া কল্পনা করে, তাহারা ধর্মকে বলে আমি যেখানে আছি সেইখানে তুমিও নামিয়া এস। তাহার পরে ধর্মকে একবার সেই সহজসাধ্যের সমতলক্ষেত্রে টানিয়া আনিতে পারিলে তখন তাহাকে বড়ো বড়ো পাথর চাপা দিয়া অত্যন্ত সনাতনভাবে জীবিত সমাধি দিয়া রাখিতে চায় এবং মনে করে ফাঁকি দিয়া ধর্মকে পাইলাম এবং তাহাকে একেবারে ঘরের দরজার কাছে চিরকালের মতো বাঁধিয়া রাখিয়া পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ভোগ দখল করিতে থাকিলাম। তাহারা ধর্মকে বন্দী করিয়া নিজেরাই অচল হইয়া বসে, ধর্মকে দুর্বল করিয়া নিজেরা হীনবীর্য হইয়া পড়ে, এবং ধর্মকে প্রাণহীন করিয়া নিজেরা পলে পলে মরিতে থাকে; তাহাদের সমাজ কেবলই বাহ্য আচারে অনুষ্ঠানে অন্ধসংস্কারে এবং কাল্পনিক বিভীষিকায় কুজ্‌ঝটিকায় দশদিকে সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে।

বস্তুত ধর্ম যখন মানুষকে অসাধ্যসাধন করিতে বলে তখনই তাহা মানুষের শিরোধার্য হইয়া উঠে, আর যখনই সে মানুষের প্রবৃত্তির সঙ্গে কোনোমতে বন্ধুত্ব রাখিবার জন্য কানে কানে পরামর্শ দেয় যে তুমি যাহা পার তাহাই তোমার শ্রেয়, অথবা দশজনে যাহা করিয়া আসিতেছে তাহাতেই নির্বিচারে যোগ দেওয়াই তোমার পুণ্য, ধর্ম তখন আমাদের প্রবৃত্তির চেয়েও নিচে নামিয়া যায়। প্রবৃত্তির সঙ্গে বোঝাপড়া করিতে এবং লোকাচারের সঙ্গে আপস করিয়া গলাগলি করিতে আসিলেই ধর্ম আপনার উপরের জায়গাটি আর রাখিতে পারে না; একেবারেই তাহার জাতি নষ্ট হয়।

আমাদের দেশের বর্তমান সমাজে ইহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। আমাদের সমাজে পুণ্যকে সস্তা করিবার জন্য বলিয়াছে, কোনো বিশেষ তিথিনক্ষত্রে কোনো বিশেষ জলের ধারায় স্নান করিলে কেবল নিজের নহে, বহুসহস্র পূর্বপুরুষের সমস্ত পাপ ক্ষালিত হইয়া যায়। পাপ দূর করিবার এতবড়ো সহজ উপায়ের কথাটা বিশ্বাস করিতে অত্যন্ত লোভ হয় সন্দেহ নাই, সুতরাং মানুষ তাহার ধর্মশাস্ত্রের এই কথায় আপনাকে কিছু-পরিমাণে ভুলায় কিন্তু সম্পূর্ণ ভুলানো তাহার পক্ষেও অসাধ্য। একজন বিধবা রমণী একবার মধ্যরাত্রে চন্দ্রগ্রহণের পরে পীড়িত শরীর লইয়া যখন গঙ্গাস্নানে যাইতে উদ্যত হইয়াছিলেন আমি তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়াছিলাম, "আপনি কি একথা সত্যই বিশ্বাস করিতে পারেন যে পাপ জিনিসটাকে ধুলামাটির মতো জল দিয়া ধুইয়া ফেলা সম্ভব? অথচ অকারণে আপনার শরীর-ধর্মের বিরুদ্ধে এই যে পাপ করিতে যাইতেছেন ইহার ফল কি

আপনাকে পাইতে হইবে না? তিনি বলিলেন, "বাবা, এ তো সহজ কথা, তুমি যাহা বলিতেছ তাহা বেশ বুঝি কিন্তু তবু ধর্মে যাহা বলে তাহা পালন না করিতে যে ভরসা পাই না।" একথার অর্থ এই যে, সেই রমণীর স্বাভাবিক বুদ্ধি তাঁহার ধর্মবিশ্বাসের উপরে উঠিয়া আছে।

আর একটা দৃষ্টান্ত দেখো। একাদশীর দিনে বিধবাকে নির্জল উপবাস করিতে হইবে ইহা আমাদের দেশে লোকাচারসম্মত অথবা শাস্ত্রানুগত ধর্মানুশাসন। ইহার মধ্যে যে নিদারুণ নিষ্ঠুরতা আছে স্বভাবত আমাদের প্রকৃতিতে তাহা বর্তমান নাই। একথা কখনোই সত্য নহে স্ত্রীলোককে ক্ষুধাপিপাসায় পীড়িত করিতে আমরা সহজে দুঃখ পাই না। তবে কেন হতভাগিনীদিগকে আমরা ইচ্ছা করিয়া দুঃখ দিই এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে আর কোনো যুক্তিসংগত উত্তর খুঁজিয়া পাই না, কেবল এই কথাই বলিতে হয় আমাদের ধর্মে বলে বিধবাদিগকে একাদশীর দিনে ক্ষুধার অন্ন ও পিপাসার জল দিতে পারিবে না, এমন কি, মরিবার মুখে রোগের ঔষধ পর্যন্ত সেবন করানো নিষেধ। এখানে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে আমাদের ধর্ম আমাদের সহজবুদ্ধির চেয়ে অনেক নিচে নামিয়া গেছে।

ইহা আমি অনেকবার দেখিয়াছি, ছেলেরা স্বভাবতই তাহাদের সহপাঠী বন্ধুদিগকে জাতিবর্ণ লইয়া ঘৃণা করে না—কখনোই তাহারা আপনাকে হীনবর্ণ বন্ধু অপেক্ষা কোনো অংশে শ্রেষ্ঠ মনে করিতে পারে না, কারণ অনেক স্থলেই শ্রেষ্ঠতা জাতিবর্ণের অপেক্ষা রাখে না তাহা তাহারা প্রত্যহই প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতেছে, তথাপি আহার কালে তাহারা হীনবর্ণ বন্ধুর লেশমাত্র সংস্পর্শ পরিহার্য মনে করে। এমন ঘটনা ঘটিতে দেখা গিয়াছে যে রান্নাঘরের বাহিরের দাওয়ার উপরে একটা ঘুড়ি পড়িয়াছিল—সেই ঘুড়িটা তুলিয়া লইবার জন্য একজন পতিত জাতির ছেলে ক্ষণকালের জন্য দাওয়ায় পদক্ষেপ করিয়াছিল বলিয়া রান্নাঘরের সমস্ত ভাত ফেলা গিয়াছিল, অথচ সেই দাওয়ায় সর্বদাই কুকুর যাতায়াত করে তাহাতে অন্ন অপবিত্র হয় না। এই আচরণের মধ্যে যে পরিমাণ অতিঅসহ্য মানবঘৃণা আছে, তত পরিমাণ ঘৃণা কি যথার্থই আমাদের অন্তরতর প্রকৃতির মধ্যে বর্তমান? এতটা মানবঘৃণা আমাদের জাতির মনে স্বভাবতই আছে একথা আমি তো স্বীকার করিতে পারি না। বস্তুত এখানে স্পষ্টই আমাদের ধর্ম আমাদের হৃদয়ের চেয়ে অনেক নিচে পড়িয়া গিয়াছে।

এইরূপে মানুষ ধর্মকে যখন আপনার চেয়েও নিচে নামাইয়া দেয় তখন সে নিজের সহজ মনুষ্যত্বও যে কতদূর পর্যন্ত বিস্মৃত হয় তাহার একটি নিষ্ঠুর দৃষ্টান্ত আমার মনে যেন আগুন দিয়া চিরকালের মতো দাগিয়া রহিয়া গিয়াছে। আমি জানি একজন বিদেশী

রোগী পথিক পল্লীগ্রামের পথের ধারে তিনদিন ধরিয়া অনাশ্রয়ে পড়িয়া তিল তিল করিয়া মরিয়াছে, ঠিক সেই সময়েই মস্ত একটা পুণ্যস্নানের তিথি পড়িয়াছিল—হাজার হাজার নরনারী কয়দিন ধরিয়া পুণ্যকামনায় সেই পথ দিয়া চলিয়া গিয়াছে, তাহাদের মধ্যে একজনও বলে নাই এই মুমূর্ষুকে ঘরে লইয়া গিয়া বাঁচাইয়া তুলিবার চেষ্টা করি এবং তাহাতেই আমার পুণ্য। সকলেই মনে মনে বলিয়াছে, জানি না ও কোথাকার লোক, ওর কী জাত—শেষকালে কি ঘরে লইয়া গিয়া প্রায়শ্চিত্তের দায়ে পড়িব? মানুষের স্বাভাবিক দয়া যদি আপনার কাজ করিতে যায় তবে ধর্মের রক্ষকস্বরূপে সমাজ তাহাকে দণ্ড দিবে। এখানে ধর্ম যে মানুষের হৃদয়প্রকৃতির চেয়েও অনেক নিচে নামিয়া বসিয়াছে।

আমি পল্লীগ্রামে গিয়া দেখিয়া আসিলাম সেখানে নমশূদ্রদের ক্ষেত্র অন্য জাতিতে চাষ করে না, তাহাদের ধান কাটে না, তাহাদের ঘর তৈরি করিয়া দেয় না—অর্থাৎ পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে মানুষের কাছে মানুষ যে সহযোগিতা দাবি করিতে পারে আমাদের সমাজ ইহাদিগকে তাহারও অযোগ্য বলিয়াছে;—বিনা অপরাধে আমরা ইহাদের জীবনযাত্রাকে দুরূহ ও দুঃসহ করিয়া তুলিয়া জন্মকাল হইতে মৃত্যুকাল পর্যন্ত ইহাদিগকে প্রতিদিনই দণ্ড দিতেছি। অথচ মানুষকে এরূপ নিতান্তই অকারণে নির্যাতন করা কি আমাদের স্বভাবসিদ্ধ? আমরা নিজে যাহাদের নিকট হইতে যথেষ্ট পরিমাণে সেবা ও সাহায্য লইতে দ্বিধা করি না তাহাদিগকে সকল প্রকার সহায়তা হইতে বঞ্চিত করাকেই আমাদের ন্যায়বুদ্ধি কি সত্যই সংগত বলিতে পারে? কখনোই না। কিন্তু মানুষকে এইরূপ অন্যায় অবজ্ঞা করিতে আমাদের ধর্মই উপদেশ দিতেছে, আমাদের প্রকৃতি নয়। আমাদের হৃদয় দুর্বল বলিয়াই যে আমরা এইরূপ অবিচার করি তাহা নহে, ইহাই আমাদের কর্তব্য এবং ইহাই না করা আমাদের স্খলন বলিয়া করিয়া থাকি। আমাদের ধর্মই আমাদের প্রকৃতির নিচে নামিয়া অন্যায়ে আমাদিগকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে—শুভবুদ্ধির নাম লইয়া দেশের নর-নারীকে শত শত বৎসর ধরিয়া এমন নির্দয়ভাবে এমন অন্ধ মূঢ়ের মতো পীড়ন করিয়া চলিয়াছে!

আমাদের দেশের বর্তমান শিক্ষিত সম্প্রদায়ের এক শ্রেণীর লোক তর্ক করিয়া থাকেন যে, জাতিভেদ তো য়ুরোপেও আছে; সেখানেও তো অভিজাতবংশের লোক সহজে নীচবংশের সঙ্গে একত্রে পানাহার করিতে চান না। ইহাদের একথা অস্বীকার করা যায় না। মানুষের মনে অভিমান বলিয়া একটা প্রবৃত্তি আছে, সেইটেকে অবলম্বন করিয়া মানুষের ভেদবুদ্ধি উদ্ধত হইয়া ওঠে ইহা সত্য,—কিন্তু ধর্ম স্বয়ং কি সেই অভিমানটার সঙ্গেই আপস করিয়া তাহার সঙ্গে একাসনে আসিয়া বসিবে? ধর্ম কি

আপনার সিংহাসনে বসিয়া এই অভিমানের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করিবে না ? চোর তো সকল দেশেই চুরি করিয়া থাকে কিন্তু আমাদের সমাজে যে ম্যাজিস্ট্রেটসুদ্ধ তাহার সঙ্গে যোগ দিয়া চোরকেই আপনার পেয়াদা বলিয়া স্বহস্তে তাহাকে নিজের সোনার চাপরাস পরাইয়া দিতেছে ! কোনোকালে বিচার পাইব কোথায়, কোনোমতে রক্ষা পাইব কাহার কাছে ?

এরূপ অদ্ভুত তর্ক আমাদের মুখেই শোনা যায় যে, যাহারা তামসিক প্রকৃতির লোক, মদমাংস যাহারা খাইবেই এবং পাশবতা যাহাদের স্বভাবসিদ্ধ, ধর্মের সম্মতিদ্বারা যদি তাহাদের পাশবতাকে নির্দিষ্টপরিমাণে স্বীকার করা যায়—যদি বলা যায় এইরূপ বিশেষভাবে মদমাংস খাওয়া ও চরিত্রকে কলুষিত করা তোমাদের পক্ষে ধর্ম, তবে তাহাতে দোষ নাই, বরং ভালোই। এরূপ তর্কের সীমা যে কোন্‌খানে তাহা ভাবিয়াই পাওয়া যায় না। মানুষের মধ্যে এমনতরো স্বভাবপাপিষ্ঠ অমানুষ দেখা যায় নরহত্যায় যাহারা আনন্দ বোধ করে। এই শ্রেণীর লোকের জন্য ঠগিধর্মকেই ধর্ম বলিয়া বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া উচিত একথাও বোধ হয় আমাদের মুখে বাধিবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত ঠিক নিজের গলাটা তাহাদের ফাঁসের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত না হয়।

ধর্ম সম্বন্ধে সত্য সম্বন্ধে মানুষের উচ্চাধিকার নিম্নাধিকার একবার কোথাও স্বীকার করিতে আরম্ভ করিলেই মানুষ যে-মহাতরী লইয়া জীবনসমুদ্রে পাড়ি দিতেছে তাহাকে টুকরা টুকরা করিয়া ভাঙিয়া ছোটো ছোটো ভেলা তৈরি করা হয় তাহাতে মহাসমুদ্রের যাত্রা আর চলে না, তীরের কাছে থাকিয়া হাঁটুজলে খেলা করা চলে মাত্র। কিন্তু যাহারা কেবল খেলিবেই, কোনোদিন যাত্রা করিবেই না, তাহারা খড়কুটা যাহা খুশি লইয়া আপনার খেলনা তৈরি করুক না—তাহাদের জড়তার খাতিরে অমূল্য ধর্মতরীকে টুকরা করিয়াই কি চিরদিনের মতো সর্বনাশ ঘটাইতে হইবে ?

একথা আবার বলিতেছি, ধর্ম মানুষের পূর্ণ শক্তির অকুণ্ঠিত বাণী, তাহার মধ্যে কোনো দ্বিধা নাই। সে মানুষকে মূঢ় বলিয়া স্বীকার করে না দুর্বল বলিয়া অবজ্ঞা করে না। সেই তো মানুষকে ডাক দিয়া বলিতেছে, তুমি অজর, তুমি অশোক, তুমি অভয়, তুমি অমৃত। সেই ধর্মের বলেই মানুষ যাহা পারে নাই তাহা পারিতেছে, যাহা হইয়া উঠিবে বলিয়া কোনোদিন স্বপ্নেও মনে করে নাই একদিন তাহাই হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু এই ধর্মের মুখ দিয়াই মানুষ যদি মানুষকে এমন কথা কেবলই বলাইতে থাকে যে, "তুমি মূঢ়, তুমি বুঝিবে না," তবে তাহার মূঢ়তা ঘুচাইবে কে, যদি বলায় "তুমি অক্ষম, তুমি পারিবে না," তবে তাহাকে শক্তি দান করে জগতে এমন সাধ্য আর কাহার আছে ?

আমাদের দেশে বহুকাল হইতে তাহাই ঘটিয়াছে। আমাদের দেশের অধিকাংশ লোককেই আমাদের ধর্মশাসন স্বয়ং বলিয়া আসিয়াছে পূর্ণ সত্যে তোমার অধিকার নাই; অসম্পূর্ণেই তুমি সন্তুষ্ট হইয়া থাকো। কতশত লোক পিতা পিতামহ ধরিয়া এই কথা শুনিয়া আসিয়াছে মন্ত্রে তোমাদের দরকার নাই, পূজায় তোমাদের প্রয়োজন নাই, দেবমন্দিরে তোমাদের প্রবেশ নাই; তোমাদের কাছে ধর্মের দাবি, তোমাদের ক্ষুদ্র সাধ্যের পরিমাণে, যৎকিঞ্চিৎ মাত্র। তোমরা স্থূলকে লইয়াই থাকো চিত্তকে অধিক উচ্চে তুলিতে হইবে না, যেখানে আছ ওইখানেই নিচে পড়িয়া থাকিয়া সহজে তোমরা ধর্মের ফললাভ করিতে পারিবে।

অথচ হীনতম মানুষেরও একটিমাত্র সম্মানের স্থান আছে ধর্মের দিকে—তাহার জানা উচিত সেইখানেই তাহার অধিকারের কোনো সংকোচ নাই। রাজা বল, পণ্ডিত বল, অভিজাত বল, সংসারের ক্ষেত্রেই তাহাদের যত কিছু প্রতাপ প্রভুত্ব—ধর্মের ক্ষেত্রে দীনহীন মূর্খেরও অধিকার কোনো কৃত্রিম শাসনের দ্বারা সংকীর্ণ করিবার ভার কোনো মানুষের উপর নাই। ধর্মই মানুষের সকলের চেয়ে বড়ো আশা—সেইখানেই তাহার মুক্তি, কেননা সেই খানেই তাহার সমস্ত ভবিষ্যৎ, সেইখানেই তাহার অন্তহীন সম্ভাব্যতা, ক্ষুদ্র বর্তমানের সমস্ত সংকোচ সেইখানেই ঘুচিতে পারে। অতএব সংসারের দিকে, জন্ম বা যোগ্যতার প্রতি চাহিয়া মানুষের স্বত্বকে যতই খণ্ডিত কর না, ধর্মের দিকে কোনো মানুষের জন্ত কোনো বাধা সৃষ্টি করিতে পারে এতবড়ো স্পর্ধিত অধিকার কোনো পরমজ্ঞানী পুরুষের কোনো চক্রবর্তী সম্রাটের নাই।

ধর্মের অধিকার বিচার করিয়া তাহার সীমা নির্দেশ করিয়া দিতে পার - তুমি কে, যে, তোমার সেই অলৌকিক শক্তি আছে! তুমি কি অন্তর্যামী? মানুষের মুক্তির ভার তুমি গ্রহণ করিবার অহংকার রাখ? তুমি লোকসমাজ তুমি লৌকিক ব্যবহারেও আপনাকে সামলাইতে পার না, কত তোমার পরাভব, কত তোমার বিকৃতি, কত তোমার প্রলোভন তুমিই তোমার অত্যাচারের লাঠিটাকে ধর্মের নামে গিল্টি করিয়া ধর্মরাজের স্থান জুড়িয়া বসিতে চাও! তাই করিয়া আজ শত শত বৎসর ধরিয়া এতবড়ো একটি সমগ্র জাতিকে তুমি মর্মে মর্মে শৃঙ্খলিত করিয়া তাহাকে পরাধীনতার অন্ধকূপের মধ্যে পঙ্গু করিয়া ফেলিয়া দিয়াছ তাহার আর উদ্ধারের পথ রাখ নাই। যাহা ক্ষুদ্র, যাহা স্থূল, যাহা অসত্য, যাহা অবিশ্বাস্ত তাহাকেও দেশকালপাত্র অনুসারে ধর্ম বলিয়া স্বীকার করিয়া কী প্রকাণ্ড, কী অসংগত, কী অসংলগ্ন জঞ্জালের ভয়ংকর বোঝা মানুষের মাথার উপরে আজ শত শত বৎসর ধরিয়া চাপাইয়া রাখিয়াছ! সেই ভগ্নমেরুদণ্ড নিষ্পেষিতপৌরুষ নতমস্তক মানুষ প্রশ্ন করিতেও জানে না, প্রশ্ন করিলেও

তাহার উত্তর কোথাও নাই—কেবল বিভীষিকার তাড়নায় এবং কাল্পনিক প্রলোভনের ব্যর্থ আশ্বাসে তাহাকে চালনা করিয়া যাইতেছে; চারিদিক হইতেই আকাশে তর্জনী উঠিতেছে এবং এই আদেশ নানা পরুষকণ্ঠে ধ্বনিত হইতেছে, যাহা বলিতেছি তাহাই মানিয়া যাও, কেননা তুমি মূঢ় তুমি বুঝিবে না; যাহা পাঁচজনে করিতেছে তাহাই করিয়া যাও, কেননা তুমি অক্ষম; সহস্র বৎসরের পূর্ববর্তীকালের সহিত তোমাকে আপাদমস্তক শতসহস্র সূত্রে একেবারে বাঁধিয়া রাখিয়াছি, কেননা নূতন করিয়া নিজের কল্যাণচিন্তা করিবার শক্তিমাত্র তোমার নাই। নিষেধজর্জরিত চিরকাপুরুষ নির্মাণ করিবার এত বড়ো সর্বদেশব্যাপী ভয়ংকর লৌহযন্ত্র ইতিহাসে আর কোথাও কি কেহ সৃষ্টি করিয়াছে—এবং সেই মনুষ্যত্ব চূর্ণ করিবার যন্ত্রকে আর কোনো দেশে কি ধর্মের পবিত্র উপাধিতে আখ্যাত করা হইয়াছে?

দুর্গতি তো প্রত্যক্ষ, আর তো কোনো যুক্তির প্রয়োজন দেখি না, কিন্তু সেই প্রত্যক্ষকে চোখ মেলিয়া দেখিব না, চোখ বুজিয়া কি কেবল তর্কই করিব। আমাদের দেশে ব্রহ্মের ধ্যানে পূজার্চনায় যে বহুবিচিত্র স্থূলতার প্রচার হইয়াছে তর্ককালে তাহাকে আমরা চরম বলিয়া মানি না। আমরা বলিয়া থাকি, যে মানুষ আধ্যাত্মিকতার যে অবস্থায় আছে এ দেশে তাহার জন্য সেই প্রকার আশ্রয় গড়িয়া দেওয়া হইয়াছে; এইরূপে প্রত্যেকে নিজ নিজ আশ্রয়ে থাকিয়া ক্রমশ স্বতই উচ্চতর অবস্থার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। কিন্তু জানিতে চাই অনন্ত কালের অসংখ্য মানুষের প্রত্যেক ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার জন্য সেরূপ উপযুক্ত আশ্রয় গড়িতে পারে এমন সাধ্য কাহার! সমস্ত বিচিত্রতাকেই স্থান দিবে, বাধা দিবে না, এতবড়ো বিশ্বকর্মা মানবসমাজে কে আছে?

বস্তুত মানুষের অসীম বৈচিত্র্যকে যাহারা সত্যই মানে তাহারা মানুষের জন্য অসীম স্থানকেই ছাড়িয়া রাখে। ক্ষেত্র যেখানে মুক্ত, বৈচিত্র্য সেখানে আপনি অবাধে আপনাকে প্রকাশ করিতে পারে। এই জন্যই যে-সমাজে জাগ্রত ও নিদ্রিতকালের সমস্ত ব্যাপারই একেবারে পাকা করিয়া বাঁধা সেখানে মানুষের চরিত্র আপন স্বাতন্ত্র্যে দৃঢ় হইয়া উঠিতে পারে না, সকলেই একছাঁচে গড়া নির্জীব ভালোমানুষটি হইয়া থাকে। আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রেও সে কথা খাটে। মানুষের সমস্ত চিন্তাকে কল্পনাকে পর্যন্ত যদি অবিচলিত স্থূল আকারে একেবারে বাঁধিয়া ফেলা যায়, যদি তাহাকে বলা যায় অসীমকে তুমি কেবল এই একটিমাত্র বা কয়টিমাত্র বিশেষ রূপেই চিন্তা করিতে থাকো তবে সেই উপায়ে সত্যই কি মানুষের স্বাভাবিক বৈচিত্র্যকে আশ্রয় দেওয়া হয়, তাহার চিরধাবমান পরিণতিপ্রবাহকে সাহায্য করা হয়? ইহাতে তাহার আধ্যাত্মিক বিকাশকে কি বদ্ধ

করাই হয় না, আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে তাহাকে কৃত্রিম উপায়ে মূঢ় ও পঙ্গু করিয়াই রাখা হয় না ?

এই যে এক সুবিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে নানাজাতির নানালোক শিশুকাল হইতে বার্ধক্য পর্যন্ত নানা অবস্থার মধ্য দিয়া চিন্তা করিতেছে, কল্পনা করিতেছে, কর্ম করিতেছে ইহারা যদি একই জগতের মধ্যে সকলে ছাড়া না পাইত, যদি একদল প্রবলপ্রতাপশালী বুদ্ধিমান ব্যক্তি মন্ত্রণা করিয়া বলিত ইহাদের প্রত্যেকের জন্য এবং প্রত্যেকের প্রত্যেক ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার জন্য স্বতন্ত্র করিয়া ছোটো ছোটো জগৎ একেবারে পাকা করিয়া বাঁধিয়া দেওয়া যাইবে তবে কি সেই হতভাগ্যদের উপকার করা হইত? মানবচিত্তের চিরবিচিত্র অভিব্যক্তিকে কোনো কৃত্রিম সৃষ্টির মধ্যে চিরদিনের মতো আটক করা যাইতে পারে একথা যিনি কল্পনাও করিতে পারেন তিনি বিশ্বের অমিত্র। ছোটো হইতে বড়ো, অবোধ হইতে সুবোধ পর্যন্ত সকলেই এই একই অসীম জগতে বাস করিতেছে বলিয়াই প্রত্যেকেই আপন বুদ্ধি ও প্রকৃতি অনুসারে ইহার মধ্য হইতে আপন শক্তির পরিমাণ পুরা প্রাপ্য আদায় করিয়া লইবার চেষ্টা করিতেছে। সেই জন্যই শিশু যখন কিশোর বয়সে পৌঁছিতেছে তখন তাহাকে তাহার শৈশবজগৎটা বলপূর্বক ভাঙিয়া ফেলিয়া একটা বিপ্লব ঘটাইতে হইতেছে না। তাহার বুদ্ধি বাড়িল, শক্তি বাড়িল, জ্ঞান বাড়িল তবু তাহাকে নূতন জগতের সন্ধানে ছুটাছুটি করিয়া মরিতে হইল না। নিতান্ত অর্বাচীন মূঢ় এবং বুদ্ধিতে বৃহস্পতি সকলেরই পক্ষে এই একই সুবৃহৎ জগৎ। কিন্তু নিজের উপস্থিত প্রয়োজন বা মূঢ়তাবশতঃ মানুষ যেখানেই মানুষের বৈচিত্র্যকে শ্রেণীবিভক্ত করিয়া প্রত্যেকের অধিকারকে সনাতন করিয়া তুলিতে চাহিয়াছে সেইখানেই হয় মনুষ্যত্বকে বিনাশ করিয়াছে, নয়, ভয়ংকর বিদ্রোহ ও বিপ্লবকে আসন্ন করিয়া তুলিয়াছে। কোনো মতেই কোনো বুদ্ধিমানই মানুষের প্রকৃতিকে সজীব রাখিয়া তাহাকে চিরদিনের মতো সনাতন বন্ধনে বাঁধিতে পারেই না। মানুষকে না মারিয়া তাহাকে গোর দেওয়া কিছুতেই সম্ভবপর নহে। মানুষের বুদ্ধিকে যদি থামাইয়া রাখিতে চাও তবে তাহার বুদ্ধিকে বিনষ্ট করো, তাহার জীবনের চাঞ্চল্যকে যদি কোনো একটা সুদূর অতীতের সুগভীর কূপের তলদেশে নিমগ্ন করিয়া রাখিতে চাও তবে তাহাকে নির্জীব করিয়া ফেলো। নিজের উপস্থিত প্রয়োজনে অবিবেকী হইয়া উঠিলে মানুষ তো মানুষকে এইরূপ নির্মমভাবে পঙ্গু করিতেই চায়; সেই জন্যই তো মানুষ নির্লজ্জ ভাষায় এমন কথা বলে যে, আপামর সকলকেই যদি শিক্ষা দেওয়া হয় তবে আমরা আর চাকর পাইব না; স্ত্রীলোককে যদি বিদ্যাদান করা যায় তবে তাহাকে দিয়া আর বাটনা বাটানো চলিবে না; প্রজাদিগকে যদি অবাধে উচ্চ শিক্ষা দেওয়া যায় তবে তাহারা নিজের সংকীর্ণ অবস্থায়

সন্তুষ্ট থাকিতে পারিবে না। বস্তুত এ কথা নিশ্চিত সত্য, মানুষকে কৃত্রিমশাসনে বাঁধিয়া খর্ব করিতে না পারিলে কোনো মতেই তাহাকে একই স্থানে চিরকালের মতো স্থির রাখিতে পারিবে না। অতএব যদি কেহ মনে করেন ধর্মকেও মানুষের অন্যান্য শত শত নাগপাশবন্ধনের মতো অন্যতম বন্ধন করিয়া তাহার দ্বারা মানুষের বুদ্ধিকে, বিশ্বাসকে, আচরণকে চিরদিনের মতো একই জায়গায় বাঁধিয়া ফেলিয়া সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিন্ত হইয়া থাকাই শ্রেয়, তবে তাঁহার কর্তব্য হইবে আহারে বিহারে নিদ্রায় জাগরণে শতসহস্র নিষেধের দ্বারা বিভীষিকা দ্বারা প্রলোভনের দ্বারা এবং অসংযত কাল্পনিকতার দ্বারা মানুষকে মোহাচ্ছন্ন করিয়া রাখা। সে মানুষকে জ্ঞানে কর্মে কোথাও যেন মুক্তির স্বাদ না দেওয়া হয়; ক্ষুদ্র বিষয়েও তাহার রুচি যেন বন্দী থাকে সামান্য ব্যাপারেও তাহার ইচ্ছা যেন ছাড়া না পায়, কোনো মঙ্গলচিন্তায় সে যেন নিজের বুদ্ধিবিচারকে খাটাইতে না পারে এবং বাহ্যিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক কোনো দিকেই সে যেন সমুদ্রপার হইবার কোনো সুযোগ না পায়, প্রাচীনতম শাস্ত্রের নোঙরে সে যেন কঠিনতম আচারের শৃঙ্খলে অবিচলিত হইয়া একই পাথরে বাঁধানো ঘাটে বাঁধা পড়িয়া থাকে।[১]

কিন্তু তার্কিকের সহিত তর্ক করিতে গিয়া আমি হয়তো নিজের দেশের প্রতি অবিচার করিতেছি। এই যে দেখা যাইতেছে আমাদের ধর্মচিন্তায় স্থূলতা এবং আমাদের ধর্মকর্মে মূঢ়তা নানা রূপ ধরিয়া আজ সমস্ত দেশকে পর্দার উপর পর্দা ফেলিয়া বহুস্তরের অন্ধতায় আচ্ছন্ন করিয়াছে ইহা কোনো একদল বিশেষ বুদ্ধিমানে মিলিয়া পরামর্শ করিয়া ঘটায় নাই। যদিও আমরা অহংকার করিয়া বলি ইহা আমাদের বহুদূরদর্শী পূর্বপুরুষদের জ্ঞানকৃত কিন্তু তাহা সত্য হইতেই পারে না— বস্তুত ইহা আমাদের অজ্ঞানকৃত। আমাদের দেশের ইতিহাসের বিশেষ অবস্থায় বিশেষ কারণে

---

১. এ কথার উত্তরে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন অধিকারভেদ চিরন্তন নহে, তাহা সাধনার অবস্থাভেদ মাত্র। কিন্তু আমাদের যে সমাজে বর্ণবিশেষের পক্ষে ধর্মের উচ্চতম অধিকার মুক্ত ও অন্যান্য বর্ণের পক্ষে তাহা রুদ্ধ সেখানে কি এমন কথা বলা চলে? একে তো প্রত্যেক মানুষের অধিকার কোনো কৃত্রিম নিয়মে কেহই স্থির করিয়া দিতেই পারে না তৎসত্বে যদিবা দেখিতাম সমাজে সেই চেষ্টা সজীব হইয়া আছে, যদি দেখিতাম কখনো বা ব্রাহ্মণ শূদ্র হইয়া যাইতেছে ও শূদ্র ব্রাহ্মণ হইয়া উঠিতেছে তাহা হইলেও অন্তত ইহা বুঝিতে পারিতাম এখানে মানুষের অধিকারলাভ তাহার ব্যক্তিগত ক্ষমতার উপরেই নির্ভর করিতেছে। আমাদের দেশে সমাজের এবং ধর্মের অধিকারভেদ হয়তো এককালে সচল ও সজীবভাবে ছিল—কিন্তু যখনই তাহা সচলতা হারাইয়াছে তখনই তাহা আমাদের পথের বাধা হইয়াছে, যখনই তাহা আমাদের জীবনের সঙ্গে বাড়িয়া উঠিতেছে না তখনই তাহা আমাদের জীবনের গতিকে অবরুদ্ধ করিতেছে। এ কথা এখানে স্পষ্ট করিয়া বলা আবশ্যক পুরাকালে আর্যসমাজ কী নিয়মে চলিত তাহা এ প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নহে।

বিপাকে পড়িয়া এইরূপ ঘটিয়া উঠিয়াছে। এ কথা কখনোই সত্য নহে যে, আমরা অধিকারভেদ চিন্তা করিয়া মানুষের বুদ্ধির ওজনমতো ভিন্ন অবস্থার উপযোগী পূজার্চনা ও আচারপদ্ধতি সৃষ্টি করিয়াছি। আমাদের ঘাড়ে আসিয়া যাহা চাপিয়া পড়িয়াছে তাহাই আমরা বহন করিয়া লইয়াছি। ভারতবর্ষে আর্যেরা সংখ্যায় অল্প ছিলেন। তাঁহারা আপনার ধর্মকে সভ্যতাকে চিরদিন অবিমিশ্রভাবে নিজেদের প্রকৃতির পথে অভিব্যক্ত করিয়া তুলিতে পারেন নাই। পদে পদেই নানা অনুন্নত জাতির সহিত তাঁহাদের সংঘাত বাধিয়াছিল, তাহাদিগকে প্রতিরোধ করিতে করিতেও তাহাদের সঙ্গে তাঁহাদের মিশ্রণ ঘটিতেছিল, পুরাণে ইতিহাসে তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। এমনি করিয়া একদিন ভারতবর্ষীয় আর্যজাতির ঐক্যধারা বিভক্ত ও বিমিশ্রিত হইয়া পড়িয়াছিল। নানা নিকৃষ্ট জাতির নানা পূজাপদ্ধতি আচারসংস্কার কথাকাহিনী তাঁহাদের সমাজের ক্ষেত্রে জোর করিয়াই স্থান গ্রহণ করিয়াছিল। অত্যন্ত বীভৎস নিষ্ঠুর অনার্য ও কুৎসিত সামগ্রীকেও ঠেকাইয়া রাখা সম্ভবপর হয় নাই। এই সমস্ত বহুবিচিত্র অসংলগ্ন স্তূপকে লইয়া আর্যশিল্পী কোনো একটা কিছু খাড়া করিয়া তুলিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। কিন্তু তাহা অসাধ্য। যাহাদের মধ্যে সত্যকার মিল নাই, কৌশলে তাহাদের মিল করা যায় না। সমাজের মধ্যে যাহা কিছু স্রোতের বেগে আসিয়া পড়িয়াছে সমাজ যদি তাহাকেই সম্মতি দিতে বাধ্য হয় তবে সমাজের যাহা শ্রেষ্ঠ তাহার আর স্থান থাকে না। কাঁটাগাছকে পালন করিবার ভার যদি কৃষকের উপর চাপাইয়া দেওয়া হয় তবে শস্যকে রক্ষা করা অসাধ্য হয়। কাঁটাগাছের সঙ্গে শস্যের যে স্বাভাবিক বিরোধ আছে তাহার সমন্বয় সাধন করিতে পারে এমন কৃষক কোথায়! তাই আজ আমরা যেখানকার যত আগাছাকেই স্বীকার করিয়াছি; জঙ্গলে সমস্ত খেত একেবারে নিবিড় হইয়া উঠিয়াছে;—সেই সমস্ত আগাছার মধ্যে বহু শতাব্দী ধরিয়া ঠেলাঠেলি চাপাচাপি চলিতেছে, আজ যাহা প্রবল, কাল তাহা দুর্বল হইতেছে, আজ যাহা স্থান পাইতেছে কাল তাহা স্থান পাইতেছে না, আবার এই ভিড়ের মধ্যে কোথা হইতে বাতাসে বাহিরের বীজ উড়িয়া আসিয়া ক্ষেত্রের কোন্ এক কোণে রাতারাতি আর একটা অদ্ভুত উদ্ভিদকে ভুঁই ফুড়িয়া তুলিতেছে। এখানে আর সমস্ত জঞ্জালই অবাধে প্রবেশ করিতে পারে, একমাত্র নিষেধ কেবল কৃষকের নিড়ানির বেলাতেই; যাহা কিছু হইতেছে সমস্তই প্রাকৃতিক নির্বাচনের নিয়মে হইতেছে;—পিতামহেরা এককালে সত্যের যে বীজ ছড়াইয়াছিলেন তাহার শস্য কোথায় চাপা পড়িয়াছে সে আর দেখা যায় না।—কেহ যদি সেই শস্যের দিকে তাকাইয়া জঙ্গলে হাত দিতে যায় তবে ক্ষেত্রপাল একেবারে লাঠি হাতে হাঁ হাঁ করিয়া

ছুটিয়া আসে, বলে, এই অর্বাচীনটা আমার সনাতন খেত নষ্ট করিতে আসিয়াছে। এই সমস্ত নানা জাতির বোঝা ও নানা কালের আবর্জনাকে লইয়া নির্বিচারে আমরা কেবলই একটা প্রকাণ্ড মোট বাঁধিতে বাঁধিতেই চলিয়াছি এবং সেই উত্তরোত্তর সঞ্চীয়মান উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট নূতন পুরাতন আর্য ও অনার্য অসম্বদ্ধতাকে হিন্দুধর্ম নামক এক নামে অভিহিত করিয়া এই সমস্তটাকেই আমাদের চিরকালীন জিনিস বলিয়া গৌরব করিতেছি ;—ইহার ভয়ংকর ভারে আমাদের জাতি কত যুগযুগান্তর ধরিয়া ধূলি-লুণ্ঠিত, কোনোমতেই সে অগ্রসর হইতে পারিতেছে না ; এই বিমিশ্রিত বিপুল বোঝাটাই তাহার জীবনের সর্বোচ্চ সম্পদ বলিয়া তাহাকে গ্রহণ করিতে হইয়াছে ; এই বোঝাকে কোনো দিকে কিছুমাত্র হ্রাস করিতে গেলেই সেটাকে সে অধর্ম বলিয়া প্রাণপণে বাধা দিতে থাকে ; এবং দুর্গতির মধ্যে ডুবিতে ডুবিতেও আজ সেই জাতির শিক্ষাভিমানী ব্যক্তিরা গর্ব করিতে থাকেন যে, ধর্মের এমন অদ্ভুত বৈচিত্র্য জগতের আর কোথাও নাই, অন্ধসংস্কারের এরূপ বাধাহীন একাধিপত্য আর কোনো সমাজে দেখা যায় না, সকল প্রকার মুগ্ধ বিশ্বাসের এরূপ প্রশস্ত ক্ষেত্র মানবের ইতিহাসে আর কোথাও প্রস্তুত হয় নাই, এবং পরস্পরের মধ্যে এত ভেদ এত পার্থক্যকে আর কোথাও এমন করিয়া চিরদিন বিভক্ত করিয়া রাখা সম্ভবপর নহে—অতএব বিশ্বসংসারে একমাত্র হিন্দুসমাজেই উচ্চ নীচ সমান নির্বিচারে স্থান পাইয়াছে।

কিন্তু বিচারই মানুষের ধর্ম। উচ্চ ও নীচ, শ্রেয় ও প্রেয়, ধর্ম ও স্বভাবের মধ্যে তাহাকে বাছাই করিয়া লইতেই হইবে। সবই সে রাখিতে পারিবে না—সেরূপ চেষ্টা করিতে গেলে তাহার আত্মরক্ষাই হইবে না। স্থূলতম তামসিকতাই বলে যাহা যেমন আছে তাহা তেমনিই থাক, যাহা বিনাশের যোগ্য তাহাকেও এই তামসিকতাই সনাতন বলিয়া আঁকড়িয়া থাকিতে চায় এবং যাহা তাহাকে একই স্থানে পড়িয়া থাকিতে বলে তাহাকেই সে আপনার ধর্ম বলিয়া সম্মান করে।

মানুষ নিয়ত আপনার সর্বশ্রেষ্ঠকেই প্রকাশ করিবে ইহাই তাহার সাধনার লক্ষ্য। যাহা আপনি আসিয়া জমিয়াছে তাহাকে নহে, যাহা হাজার বৎসর পূর্বে ঘটিয়াছে তাহাকেও নহে। নিজের এই সর্বশ্রেষ্ঠকেই নিয়ত প্রকাশ করিবার যে শক্তি, সেই শক্তি তাহার ধর্মই তাহাকে দান করে। এই কারণে মানুষ আপন ধর্মের আদর্শকে আপন তপস্যার সর্বশেষে, আপন শ্রেষ্ঠতার চরমেই স্থাপন করিয়া থাকে। কিন্তু মানুষ যদি বিপদে পড়িয়া বা মোহে ডুবিয়া ধর্মকেই নামাইয়া বসে তবে নিজের সবচেয়ে সাংঘাতিক বিপদ ঘটায়, তবে ধর্মের মতো সর্বনেশে ভার তাহার পক্ষে আর কিছুই হইতে পারে না। যাহাকে উপরে রাখিলে উপরে টানে, তাহাকে নিচে রাখিলে সে

নিচেই টানিয়া লয়। অতএব ধর্মকে কোনো জাতি যদি নীতির দিকে না বসাইয়া রীতির দিকে বসায়, বুদ্ধির দিকে না বসাইয়া সংস্কারের দিকেই বসায়, অন্তরের দিকে আসন না দিয়া যদি বাহ্য অনুষ্ঠানে তাহাকে বদ্ধ করে এবং ধর্মের উপরেই দেশকাল-পাত্রের ভার না দিয়া দেশকালপাত্রের হাতেই ধর্মকে হাত পা বাঁধিয়া নির্মমভাবে সমর্পণ করিয়া বসে; ধর্মেরই দোহাই দিয়া কোনো জাতি যদি মানুষকে পৃথক করিতে থাকে, এক শ্রেণীর অভিমানকে আর এক শ্রেণীর মাথার উপরে চাপাইয়া দেয় এবং মানুষের চরমতম আশা ও পরমতম অধিকারকে সংকুচিত ও শতখণ্ড করিয়া ফেলে; তবে সে-জাতিকে হীনতার অপমান হইতে রক্ষা করিতে পারে এমন কোনো সভা-সমিতি কন্‌গ্রেস কন্‌ফারেন্স্‌, এমন কোনো বাণিজ্য-ব্যবসায়ের উন্নতি, এমন কোনো রাষ্ট্রনৈতিক ইন্দ্রজাল বিশ্বজগতে নাই। সে জাতি এক সংকট হইতে উদ্ধার পাইলে আর এক সংকটে আসিয়া পড়িবে এবং এক প্রবলপক্ষ তাহাকে অনুগ্রহপূর্বক সম্মান-দান করিলে আর এক প্রবলপক্ষ অগ্রসর হইয়া তাহাকে লাঞ্ছনা করিতে কুণ্ঠিত হইবে না; যে আপনার সর্বোচ্চকেই সর্বোচ্চ সম্মান না দেয় সে কখনোই উচ্চাসন পাইবে না। ইহাতে কোনো সন্দেহমাত্র নাই যে, ধর্মের বিকারেই গ্রীস মরিয়াছে, ধর্মের বিকারেই রোম বিলুপ্ত হইয়াছে এবং আমাদের দুর্গতির কারণ আমাদের ধর্মের মধ্যে ছাড়া আর কোথাও নাই। এবং ইহাতেও কোনো সন্দেহমাত্র নাই যে, যদি উদ্ধার ইচ্ছা করি তবে কোনো বাহিরের দিকে তাকাইয়া কোনো ফল নাই, কোনো উপস্থিত বাহ্য সুবিধার সুযোগ করিয়া কোনো লাভ নাই;—রক্ষার উপায়কে কেবলই বাহিরে খুঁজিতে যাওয়া দুর্বল আত্মার মূঢ়তা;—ইহাই ধ্রুব সত্য যে, ধর্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ।

১৩১৮

আমার জগৎ

পৃথিবীর রাত্রিটি যেন তার এলোচুল, পিঠ-ছাপিয়ে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত নেমে পড়েছে। কিন্তু সৌরজগৎলক্ষ্মীর শুভ্রললাটে একটি কৃষ্ণতিলও সে নয়। ওই তারাগুলির মধ্যে যে-খুশি সেই আপন শাড়ির একটি খুঁট দিয়ে এই কালিমার কণাটুকু মুছে নিলেও তার আঁচলে যেটুকু দাগ লাগবে তা অতি বড়ো নিন্দুকের চোখেও পড়বে না।

এ যেন আলোক মায়ের কোলের কালো শিশু, সবে জন্ম নিয়েছে। লক্ষ লক্ষ তারা অনিমেষে তার এই ধরণী-দোলার শিয়রের কাছে দাঁড়িয়ে। তারা একটু নড়ে না পাছে এর ঘুম ভেঙে যায়।

আমার বৈজ্ঞানিক বন্ধুর আর সইল না। তিনি বললেন, তুমি কোন্ সাবেককালের ওয়েটিং রুমের আরাম-কেদারায় পড়ে নিদ্রা দিচ্ছ ওদিকে বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের রেলগাড়িটা যে বাঁশি বাজিয়ে ছুট দিয়েছে। তারাগুলো নড়ে না এটা তোমার কেমন কথা? একেবারে নিছক কবিত্ব!

আমার বলবার ইচ্ছা ছিল, তারাগুলো যে নড়ে এটা তোমার নিছক বৈজ্ঞানিকত্ব। কিন্তু সময় এমনি খারাপ ওটা জয়ধ্বনির মতোই শোনাবে।

আমার কবিত্বকলঙ্কটুকু স্বীকার করেই নেওয়া গেল। এই কবিত্বের কালিমা পৃথিবীর রাত্রিটুকুরই মতো। এর শিয়রের কাছে বিজ্ঞানের জগজ্জয়ী আলো দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু সে এর গায়ে হাত তোলে না। স্নেহ ক'রে বলে, আহা স্বপ্ন দেখুক।

আমার কথাটা হচ্ছে এই যে, স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি তারাগুলো চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। এর উপরে তো তর্ক চলে না।

বিজ্ঞান বলে, তুমি অত্যন্ত বেশি দূরে আছ বলেই দেখছ তারাগুলো স্থির। কিন্তু সেটা সত্য নয়।

আমি বলি, তুমি অত্যন্ত বেশি কাছে উঁকি মারছ বলেই বলছ ওরা চলছে। কিন্তু সেটা সত্য নয়।

বিজ্ঞান চোখ পাকিয়ে বলে, সে কেমন কথা?

আমিও চোখ পাকিয়ে জবাব দিই, কাছের পক্ষ নিয়ে তুমি যদি দূরকে গাল দিতে পার তবে দূরের পক্ষ নিয়ে আমিই বা কাছকে গাল দেব না কেন?

বিজ্ঞান বলে, যখন দুই পক্ষ একেবারে উলটো কথা বলে তখন ওদের মধ্যে এক পক্ষকেই মানতে হয়।

আমি বলি, তুমি তা তো মান না। পৃথিবীকে গোলাকার বলবার বেলায় তুমি অনায়াসে দূরের দোহাই পাড়। তখন বল, কাছে আছি বলেই পৃথিবীটাকে সমতল বলে ভ্রম হয়। তখন তোমার তর্ক এই যে কাছে থেকে কেবল অংশকে দেখা যায়, দূরে না দাঁড়ালে সমগ্রকে দেখা যায় না। তোমার এ কথাটায় সায় দিতে রাজি আছি। এই জন্যই তো আপনার সম্বন্ধে মানুষের মিথ্যা অহংকার। কেননা আপনি অত্যন্ত কাছে। শাস্ত্রে তাই বলে, আপনাকে যে লোক অন্যের মধ্যে দেখে সেই সত্য দেখে— অর্থাৎ আপনার থেকে দূরে না গেলে আপনার গোলাকার বিশ্বরূপ দেখা যায় না।

দূরকে যদি এতটা খাতিরই কর তবে কোন্ মুখে বলবে, তারাগুলো ছুটোছুটি ক'রে মরছে? মধ্যাহ্নসূর্যকে চোখে দেখতে গেলে কালো কাচের মধ্য দিয়ে দেখতে হয়। বিশ্বলোকের জ্যোতির্ময় দুর্দর্শরূপকে আমরা সমগ্রভাবে দেখব বলেই পৃথিবী এই কালো

রাত্রিটাকে আমাদের চোখের উপর ধরেছেন। তার মধ্যে দিয়ে কী দেখি? সমস্ত শান্ত, নীরব। এত শান্ত, এত নীরব যে আমাদের হাউই, তুবড়ি, তারাবাজিগুলো তাদের মুখের সামনে উপহাস করে আসতে ভয় করে না।

আমরা যখন সমস্ত তারাকে পরস্পরের সঙ্গে সম্বন্ধযোগে মিলিয়ে দেখছি তখন দেখছি তারা অবিচলিত স্থির। তখন তারা যেন গজমুক্তার সাতনলী হার। জ্যোতির্বিদ্যা যখন এই সম্বন্ধসূত্রকে বিচ্ছিন্ন ক'রে কোনো তারাকে দেখে তখন দেখতে পায় সে চলছে—তখন হার-ছেঁড়া মুক্তা টলটল করে গড়িয়ে বেড়ায়।

এখন মুশকিল এই, বিশ্বাস করি কাকে? বিশ্বতারা অন্ধকার সাক্ষ্যমঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে যে সাক্ষ্য দিচ্ছে তার ভাষা নিতান্ত সরল—একবার কেবল চোখ মেলে তার দিকে তাকালেই হয়, আর কিছুই করতে হয় না। আবার যখন দু-একটা তারা তাদের বিশ্বাসন থেকে নিচে নেমে এসে গণিতশাস্ত্রের গুহার মধ্যে ঢুকে কানে কানে কী সব বলে যায় তখন দেখি সে আবার আর এক কথা। যারা স্বদলের সম্বন্ধ ছেড়ে এসে পুলিস ম্যাজিস্ট্রেটের প্রাইভেট কামরায় ঢুকে সমস্ত দলের একজোট সাক্ষ্যের বিরুদ্ধে গোপন সংবাদ ফাঁস করে দেবার ভান করে সেই সমস্ত অ্যাপ্রুভারদেরই যে পরম সত্যবাদী বলে গণ্য করতেই হবে এমন কথা নেই।

কিন্তু এই সমস্ত অ্যাপ্রুভাররা বিস্তারিত খবর দিয়ে থাকে। বিস্তারিত খবরের জোর বড়ো বেশি। সমস্ত পৃথিবী বলছে আমি গোলাকার, কিন্তু আমার পায়ের তলার মাটি বলছে আমি সমতল। পায়ের তলার মাটির জোর বেশি, কেননা সে যেটুকু বলে সে একেবারে তন্ন তন্ন করে বলে। পায়ের তলার মাটির কাছ থেকে পাই তথ্য, অর্থাৎ কেবল তথাকার খবর, বিশ্বপৃথিবীর কাছ থেকে পাই সত্য, অর্থাৎ সমস্তটার খবর।

আমার কথাটা এই যে কোনোটাকে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। আমাদের যে দুইই চাই। তথ্য না হলেও আমাদের কাজকর্ম বন্ধ, সত্য না হলেও আমাদের পরিত্রাণ নেই। নিকট এবং দূর, এই দুই নিয়েই আমাদের যত কিছু কারবার। এমন অবস্থায় এদের কারও প্রতি যদি মিথ্যার কলঙ্ক আরোপ করি তবে সেটা আমাদের নিজের গায়েই লাগে।

অতএব যদি বলা যায়, আমার দূরের ক্ষেত্রে তারা স্থির আছে, আর আমার নিকটের ক্ষেত্রে তারা দৌড়োচ্ছে তাতে দোষ কী? নিকটকে বাদ দিয়ে দূর, এবং দূরকে বাদ দিয়ে নিকট যে একটা ভয়ংকর কবন্ধ। দূর এবং নিকট এরা দুইজনে দুই বিভিন্ন তথ্যের মালিক কিন্তু এরা দুজনেই কি এক সত্যের অধীন নয়?

সেই জন্যেই উপনিষৎ বলেছেন—

তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে।

তিনি চলেন এবং তিনি চলেন না, তিনি দূরে এবং তিনি নিকটে এ দুইই এক সঙ্গে সত্য। অংশকেও মানি, সমস্তকেও মানি; কিন্তু সমগ্রবিহীন অংশ ঘোর অন্ধকার এবং অংশবিহীন সমগ্র আরও ঘোর অন্ধকার।

এখনকার কালের পণ্ডিতেরা বলতে চান, চলা ছাড়া আর কিছুই নেই, ধ্রুবত্বটা আমাদের বিদ্যার সৃষ্টি মায়া। অর্থাৎ জগৎটা চলছে কিন্তু আমাদের জ্ঞানেতে আমরা তাকে একটা স্থিরত্বের কাঠামোর মধ্যে দাঁড় করিয়ে দেখছি নইলে দেখা ব'লে জানা ব'লে পদার্থটা থাকতই না—অতএব চলাটাই সত্য এবং স্থিরত্বটা বিদ্যার মায়া। আবার আর-এককালের পণ্ডিত বলেছিলেন, ধ্রুব ছাড়া আর কিছুই নেই, চঞ্চলতাটা অবিদ্যার সৃষ্টি। পণ্ডিতেরা যতক্ষণ এক পক্ষের ওকালতি করবেন ততক্ষণ তাঁদের মধ্যে লড়াইয়ের অন্ত থাকবে না। কিন্তু সরলবুদ্ধি জানে, চলাও সত্য, থামাও সত্য। অংশ, যেটা নিকটবর্তী, সেটা চলছে; সমগ্র, যেটা দূরবর্তী, সেটা স্থির রয়েছে।

এ সম্বন্ধে একটা উপমা আমি পূর্বেই ব্যবহার করেছি, এখনও ব্যবহার করব। গাইয়ে যখন গান করে তখন তার গাওয়াটা প্রতি মুহূর্তে চলতে থাকে। কিন্তু সমগ্র গানটা সকল মুহূর্তকে ছাড়িয়ে স্থির হয়ে আছে। যেটা কোনো গাওয়ার মধ্যেই চলে না সেটা গানই নয়, যেটা কোনো গানের মধ্যে স্থিরপ্রতিষ্ঠ হতে না পারে তাকে গাওয়াই বলা যেতে পারে না। গানে ও গাওয়ায় মিলে যে সত্য সেই তো—

তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে।

সে চলেও বটে চলে নাও বটে, সে দূরেও বটে নিকটেও বটে।

যদি এই পাতাটিকে অণুবীক্ষণ দিয়ে দেখি তবে একে ব্যাপ্ত আকাশে দেখা হয়। সেই আকাশকে যতই ব্যাপ্ত করতে থাকব ততই ওই পাতার আকার আয়তন বাড়তে বাড়তে ক্রমেই সে সূক্ষ্ম হয়ে ঝাপসা হয়ে মিলিয়ে যাবে। ঘন আকাশে যা আমার কাছে পাতা, ব্যাপ্ত আকাশে তা আমার কাছে নেই বললেই হয়।

এই তো গেল দেশ। তার পরে কাল। যদি এমন হতে পারত যে আমি যে কালটাতে আছি সেটা যেমন আছে তেমনিই থাকত অথচ গাছের ওই পাতাটার সম্বন্ধে এক মাসকে এক মিনিটে ঠেসে দিতে পারতুম তবে পাতা হওয়ার পূর্ববর্তী অবস্থা থেকে পাতা হওয়ার পরবর্তী অবস্থা পর্যন্ত এমনি হুস করে দৌড় দিত যে আমি ওকে প্রায় দেখতে পেতুম না। জগতের যে সব পদার্থ আমাদের কাল থেকে অত্যন্ত ভিন্ন কালে চলছে তারা আমাদের চারদিকে থাকলেও তাদের দেখতেই পাচ্ছিনে এমন হওয়া অসম্ভব নয়।

একটা দৃষ্টান্ত দিলে কথাটা আর একটু স্পষ্ট হবে। গণিত সম্বন্ধে এমন অসামান্য শক্তিশালী লোকের কথা শোনা গেছে যাঁরা বহুসময়সাধ্য দুরূহ অঙ্ক এক মুহূর্তে গণনা করে দিতে পারেন। গণনা সম্বন্ধে তাঁদের চিত্ত যে কালকে আশ্রয় ক'রে আছে আমাদের চেয়ে সেটা বহু দ্রুত কাল—সেই জন্যে যে পদ্ধতির ভিতর দিয়ে তাঁরা অঙ্কফলের মধ্যে গিয়ে উত্তীর্ণ হন সেটা আমরা দেখতেই পাইনে এমন কি তাঁরা নিজেরাই দেখতে পান না।

আমার মনে আছে, একদিন দিনের বেলা আমি অল্পক্ষণের জন্য ঘুমিয়ে পড়েছিলেম। আমি সেই সময়ের মধ্যে একটা দীর্ঘকালের স্বপ্ন দেখেছিলেম। আমার ভ্রম হল আমি অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছি। আমার পাশের লোককে জিজ্ঞাসা ক'রে জানা গেল আমি পাঁচ মিনিটের বেশি ঘুমোইনি। আমার স্বপ্নের ভিতরকার সময়ের সঙ্গে আমার স্বপ্নের বাহিরের সময়ের পার্থক্য ছিল। আমি যদি একই সময়ে এই দুই কাল সম্বন্ধে সচেতন থাকতুম তাহলে হয় স্বপ্ন এত দ্রুতবেগে মনের মধ্যে চলে যেত যে, তাকে চেনা শক্ত হত, নয় তো সেই স্বপ্নবর্তীকালের রেলগাড়িতে ক'রে চলে যাওয়ার দরুন স্বপ্নের বাইরের জগৎটা রেলগাড়ির বাইরের দৃশ্যের মতো বেগে পিছিয়ে যেতে থাকত; তার কোনো একটা জিনিসের উপর চোখ রাখা যেত না। অর্থাৎ স্বভাবত যার গতি নেই সেও গতি প্রাপ্ত হত।

যে ঘোড়া দৌড়োচ্ছে তার সম্বন্ধে এক মিনিটকে যদি দশঘণ্টা করতে পারি তাহলে দেখব তার পা উঠছেই না। ঘাস প্রতিমুহূর্তে বাড়ছে অথচ আমরা তা দেখতেই পাচ্ছিনে। ব্যাপক কালের মধ্যে ঘাসের হিসাব নিয়ে তবে আমরা জানতে পারি ঘাস বাড়ছে। সেই ব্যাপক কাল যদি আমাদের আয়ত্তের চেয়ে বেশি হত তাহলে ঘাস আমাদের পক্ষে পাহাড় পর্বতের মতোই অচল হত।

অতএব আমাদের মন যে কালের তালে চলছে তারই বেগ অনুসারে আমরা দেখছি বটগাছটা দাঁড়িয়ে আছে এবং নদীটা চলছে। কালের পরিবর্তন হলে হয়তো দেখতুম বটগাছটা চলছে কিংবা নদীটা নিস্তব্ধ।

তাহলেই দেখা যাচ্ছে, আমরা যাকে জগৎ বলছি সেটা আমাদের জ্ঞানের যোগে ছাড়া হতেই পারে না। যখন আমরা পাহাড় পর্বত সূর্য চন্দ্র দেখি তখন আমাদের সহজেই মনে হয় বাইরে যা আছে আমরা তাই দেখছি। যেন আমার মন আয়নামাত্র। কিন্তু আমার মন আয়না নয়, তা সৃষ্টির প্রধান উপকরণ। আমি যে মুহূর্তে দেখছি সেই মুহূর্তে সেই দেখার যোগে সৃষ্টি হচ্ছে। যতগুলি মন ততগুলি সৃষ্টি। অন্য কোনো অবস্থায় মনের প্রকৃতি যদি অন্য রকম হয় তবে সৃষ্টিও অন্য রকম হবে।

আমার মন ইন্দ্রিয়যোগে ঘন দেশের জিনিসকে একরকম দেখে, ব্যাপক দেশের জিনিসকে অন্য রকম দেখে, দ্রুতকালের গতিতে এক রকম দেখে, মন্দকালের গতিতে অন্য রকম দেখে—এই প্রভেদ অনুসারে সৃষ্টির বিচিত্রতা। আকাশে লক্ষকোটি ক্রোশ পরিমাণ দেশকে যখন সে এক হাত আধ হাতের মধ্যে দেখে তখন দেখে তারাগুলি কাছাকাছি এবং স্থির। আমার মন কেবল যে আকাশের তারাগুলিকে দেখছে তা নয়, লোহার পরমাণুকেও নিবিড় এবং স্থির দেখছে—যদি লোহাকে সে ব্যাপ্ত আকাশে দেখত তাহলে দেখত তার পরমাণুগুলি স্বতন্ত্র হয়ে দৌড়াদৌড়ি করছে। এই বিচিত্র দেশকালের ভিতর দিয়ে দেখাই হচ্ছে সৃষ্টির লীলা দেখা। সেই জন্যেই লোহা হচ্ছে লোহা, জল হচ্ছে জল, মেঘ হচ্ছে মেঘ।

কিন্তু বিজ্ঞান ঘড়ির কাঁটার কাল এবং গজকাঠির মাপ দিয়ে সমস্তকে দেখতে চায়। দেশকালের এক আদর্শ দিয়ে সমস্ত সৃষ্টিকে সে বিচার করে। কিন্তু এই এক আদর্শ সৃষ্টির আদর্শই নয়। সুতরাং বিজ্ঞান সৃষ্টিকে বিশ্লিষ্ট ক'রে ফেলে। অবশেষে অণু পরমাণুর ভিতর দিয়ে এমন একটা জায়গায় গিয়ে পৌঁছোয় যেখানে সৃষ্টিই নেই। কারণ সৃষ্টি তো অণু পরমাণু নয়—দেশকালের বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে আমাদের মন যা দেখছে তাই সৃষ্টি। ঈথর-পদার্থের কম্পনমাত্র সৃষ্টি নয় আলোকের অনুভূতিই সৃষ্টি। আমার বোধকে বাদ দিয়ে যুক্তি দ্বারা যা দেখছি তাই প্রলয়, আর বোধের দ্বারা যা দেখছি তাই সৃষ্টি।

বৈজ্ঞানিক বন্ধু তাড়া করে এলেন ব'লে। তিনি বলবেন, বিজ্ঞান থেকে আমরা বহুকষ্টে বোধকে খেদিয়ে রাখি—কারণ আমার বোধ এক কথা বলে, তোমার বোধ আর-এক কথা বলে। আমার বোধ এখন এক কথা বলে, তখন আর এক কথা বলে।

আমি বলি ওই তো হল সৃষ্টিতত্ত্ব। সৃষ্টি তো কলের সৃষ্টি নয় সে যে মনের সৃষ্টি। মনকে বাদ দিয়ে সৃষ্টিতত্ত্ব আলোচনা, আর রামকে বাদ দিয়ে রামায়ণ গান একই কথা।

বৈজ্ঞানিক বলবেন—এক এক মন এক এক রকমের সৃষ্টি যদি ক'রে বসে তাহলে সেটা যে অনাসৃষ্টি হয়ে দাঁড়ায়।

আমি বলি,—তা তো হয়নি। হাজার লক্ষ মনের যোগে হাজার লক্ষ সৃষ্টি কিন্তু তবুও তো দেখি সেই বৈচিত্র্যসত্ত্বেও তাদের পরস্পরের যোগ বিচ্ছিন্ন হয়নি। তাই তো তোমার কথা আমি বুঝি, আমার কথা তুমি বোঝ।

তার কারণ হচ্ছে, আমার এক-টুকরো মন যদি বস্তুত কেবল আমারই হত তাহলে

মনের সঙ্গে মনের কোনো যোগই থাকত না। মন পদার্থটা জগদ্ব্যাপী। আমার মধ্যে সেটা বদ্ধ হয়েছে বলেই যে সেটা খণ্ডিত তা নয়। সেই জন্যেই সকল মনের ভিতর দিয়েই একটা ঐক্যতত্ত্ব আছে। তা না হলে মানুষের সমাজ গড়ত না মানুষের ইতিহাসের কোনো অর্থ থাকত না।

বৈজ্ঞানিক জিজ্ঞাসা করছেন, এই মন পদার্থটা কী শুনি।

আমি উত্তর করি যে, তোমার ঈথর-পদার্থের চেয়ে কম আশ্চর্য এবং অনির্বচনীয় নয়। অসীম যেখানে সীমাকে গ্রহণ করেছেন সেইটে হল মনের দিক। সেই দিকেই দেশকাল; সেই দিকেই রূপরসগন্ধ; সেই দিকেই বহু। সেই দিকেই তাঁর প্রকাশ।

বৈজ্ঞানিক বলেন, অসীমের সীমা এসব কথা কবি যখন আলোচনা করেন তখন কি কবিরাজ ডাকা আবশ্যক হয় না?

আমার উত্তর এই যে, এ আলোচনা নতুন নয়। পুরাতন নজির আছে। খ্যাপার বংশ সনাতনকাল থেকে চলে আসছে। তাই পুরাতন ঋষি বলছেন—

অন্ধং তমঃপ্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ।

যে লোক অনন্তকে বাদ দিয়ে অন্তের উপাসনা করে সে অন্ধকারে ডোবে। আর যে অন্তকে বাদ দিয়ে অনন্তের উপাসনা করে সে আরও বেশি অন্ধকারে ডোবে।

বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে।

অন্তকে অনন্তকে যে একত্র ক'রে জানে সেই অন্তের মধ্য দিয়ে মৃত্যুকে উত্তীর্ণ হয় আর অনন্তের মধ্যে অমৃতকে পায়।

তাই বলে সীমা ও অসীমের ভেদ একেবারেই ঘুচিয়ে দেখাই যে দেখা তাও নয় সে কথাও আছে। তাঁরা বলছেন অন্ত এবং অনন্তের পার্থক্যও আছে। পার্থক্য যদি না থাকে তবে সৃষ্টি হয় কী করে? আবার যদি বিরোধ থাকে তাহলেই বা সৃষ্টি হয় কী করে? সেই জন্যে অসীম যেখানে সীমায় আপনাকে সংকুচিত করেছেন সেইখানেই তাঁর সৃষ্টি সেইখানেই তাঁর বহুত্ব—কিন্তু তাতে তাঁর অসীমতাকে তিনি ত্যাগ করেননি।

নিজের অস্তিত্বটার কথা চিন্তা করলে একথা বোঝা সহজ হবে। আমি আমার চলাফেরা কথাবার্তায় প্রতি মুহূর্তে নিজেকে প্রকাশ করছি—সেই প্রকাশ আমার আপনাকে আপনার সৃষ্টি। কিন্তু সেই প্রকাশের মধ্যে আমি যেমন আছি তেমনি সেই প্রকাশকে বহুগুণে আমি অতিক্রম ক'রে আছি। আমার এক কোটিতে অন্ত

আর এক কোটিতে অনন্ত। আমার অব্যক্ত-আমি আমার ব্যক্ত-আমির যোগে সত্য। আমার ব্যক্ত-আমি আমার অব্যক্ত-আমির যোগে সত্য।

তার পরে কথা এই যে, তবে এই আমিটা কোথা থেকে আসে। সেটাও আমার সম্পূর্ণ নিজস্ব নয়। অসীম যেখানে আপনাকে সীমায় সংহত করেছেন সেখানেই অহংকার। সোঽহমস্মি। সেখানেই তিনি হচ্ছেন আমি আছি। অসীমের বাণী, অর্থাৎ সীমার মধ্যে অসীমের প্রকাশই হচ্ছে, অহমস্মি। আমি আছি। যেখানেই হওয়ার পালা আরম্ভ হল সেখানেই আমির পালা। সমস্ত সীমার মধ্যেই অসীম বলছেন, অহমস্মি। আমি আছি, এইটেই হচ্ছে সৃষ্টির ভাষা।

এই এক আমি-আছিই লক্ষ লক্ষ আমি-আছিতে ছড়িয়ে পড়েছেন—তবু তার সীমা নেই। যদিচ আমার আমি-আছি সেই মহা আমি-আছির প্রকাশ কিন্তু তাই বলে একথা বলাও চলে না যে এই প্রকাশেই তাঁর প্রকাশ সমাপ্ত। তিনি আমার আমি আছির মধ্যেও যেমন আছেন তেমনি আমার আমি-আছিকে অতিক্রম করেও আছেন। সেই জন্যেই অগণ্য আমি-আছির মধ্যে যোগের পথ রয়েছে। সেই জন্যেই উপনিষৎ বলেছেন,—সর্বভূতের মধ্যে যে লোক আত্মাকে এবং আত্মার মধ্যে যে লোক সর্বভূতকে জানে সে আর গোপন থাকতে পারে না। আপনাকে সেই জানে না যে লোক আপনাকে কেবল আপনি বলেই জানে, অন্যকেও যে আপন বলে জানে না।

তত্ত্বজ্ঞানে আমার কোনো অধিকার নেই—আমি সেদিক থেকে কিছু বলছিও নে। আমি সেই মূঢ় যে মানুষ বিচিত্রকে বিশ্বাস করে, বিশ্বকে সন্দেহ করে না। আমি নিজের প্রকৃতির ভিতর থেকেই জানি দূরও সত্য নিকটও সত্য, স্থিতিও সত্য গতিও সত্য। অণু পরমাণু যুক্তির দ্বারা বিশ্লিষ্ট এবং ইন্দ্রিয় মনের আশ্রয় থেকে একেবারে ভ্রষ্ট হতে হতে ক্রমে আকার আয়তনের অতীত হয়ে প্রলয় সাগরের তীরে এসে দাঁড়ায় সেটা আমার কাছে বিস্ময়কর বা মনোহর বোধ হয় না। রূপই আমার কাছে আশ্চর্য, রসই আমার কাছে মনোহর। সকলের চেয়ে আশ্চর্য এই যে আকারের ফোয়ারা নিরাকারের হৃদয় থেকে নিত্যকাল উৎসারিত হয়ে কিছুতেই ফুরোতে চাচ্ছে না। আমি এই দেখেছি যেদিন আমার হৃদয় প্রেমে পূর্ণ হয়ে ওঠে সেদিন সূর্যালোকের উজ্জ্বলতা বেড়ে ওঠে, সেদিন চন্দ্রালোকের মাধুর্য ঘনীভূত হয় সেদিন সমস্ত জগতের সুর এবং তাল নতুন তানে নতুন লয়ে বাজতে থাকে—তার থেকেই বুঝতে পারি, জগৎ আমার মন দিয়ে আমার হৃদয় দিয়ে ওতপ্রোত। যে দুইয়ের যোগে সৃষ্টি হয় তার মধ্যে এক হচ্ছে আমার হৃদয় মন। আমি যখন বর্ষার গান গেয়েছি তখন সেই মেঘমল্লারে জগতের সমস্ত বর্ষার অশ্রুপাতধ্বনি নবতর ভাষা এবং অপূর্ব বেদনায় পূর্ণ হয়ে উঠেছে,

চিত্রকরের চিত্র, এবং কবির কাব্যে বিশ্বরহস্য নূতন রূপ এবং নূতন বেশ ধরে দেখা দিয়েছে—তার থেকেই জেনেছি এই জগতের জল স্থল আকাশ আমার হৃদয়ের তন্তু দিয়ে বোনা, নইলে আমার ভাষার সঙ্গে এর ভাষার কোনো যোগই থাকত না ; গান মিথ্যা হত, কবিত্ব মিথ্যা হত, বিশ্বও যেমন বোবা হয়ে থাকত আমার হৃদয়কেও তেমনি বোবা করে রাখত। কবি এবং গুণীদের কাজই এই যে, যারা ভুলে আছে তাদের মনে করিয়ে দেওয়া যে, জগৎটা আমি, জগৎটা আমার, ওটা রেডিয়ো-চাঞ্চল্য-মাত্র নয়। তত্ত্বজ্ঞান যা বলছে সে এক কথা, বিজ্ঞান যা বলছে সে এক কথা, কিন্তু কবি বলছে আমার হৃদয়মনের তারে ওস্তাদ বীণা বাজাচ্ছেন সেই তো এই বিশ্বসংগীত নইলে কিছুই বাজত না। বীণার তার একটি নয়—লক্ষ তারে লক্ষ সুর কিন্তু সুরে সুরে বিরোধ নেই। এই হৃদয়মনের বীণাযন্ত্রটি জড়যন্ত্র নয়, এ যে প্রাণবান—এই জন্য এ যে কেবল বাঁধা সুর বাজিয়ে যাচ্ছে তা নয় ; এর সুর এগিয়ে চলছে, এর সপ্তক বদল হচ্ছে, এর তার বেড়ে যাচ্ছে, একে নিয়ে যে জগৎ সৃষ্টি হচ্ছে সে কোথাও স্থির হয়ে নেই ; কোথাও গিয়ে সে থামবে না ; মহারসিক আপন রস দিয়ে চিরকাল এর কাছ থেকে নব রস আদায় করে নেবেন, এর সমস্ত সুখ সমস্ত দুঃখ সার্থক করে তুলবেন। আমি ধন্য যে, আমি পান্থশালায় বাস করছিনে, রাজপ্রাসাদের এক কামরাতেও আমার বাস নির্দিষ্ট হয়নি। এমন জগতে আমার স্থান, আমার আপনাকে দিয়ে যার সৃষ্টি ; সেই জন্যই এ কেবল পঞ্চভূত বা চৌষট্টিভূতের আড্ডা নয়, এ আমার হৃদয়ের কুলায়, এ আমার প্রাণের লীলাভবন, আমার প্রেমের মিলনতীর্থ।

১৩২১

পরিচয়

পরিচয়

ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা

সমস্ত বিশ্বব্যাপারের মধ্যেই একটা নিশ্বাস ও প্রশ্বাস, নিমেষ ও উন্মেষ, নিদ্রা ও জাগরণের পালা আছে; একবার ভিতরের দিকে একবার বাহিরের দিকে নামা উঠার ছন্দ নিয়তই চলিতেছে। থামা এবং চলার অবিরত যোগেই বিশ্বের গতিক্রিয়া সম্পাদিত। বিজ্ঞান বলে, বস্তুমাত্রই সছিদ্র, অর্থাৎ "আছে" এবং "নাই" এই দুইয়ের সমষ্টিতেই তাহার অস্তিত্ব। এই আলোক ও অন্ধকার, প্রকাশ ও অপ্রকাশ এমনি ছন্দে ছন্দে যতি রাখিয়া চলিতেছে যে, তাহাতে সৃষ্টিকে বিচ্ছিন্ন করিতেছে না, তাহাকে তালে তালে অগ্রসর করিতেছে।

ঘড়ির ফলকটার উপরে মিনিটের কাঁটা ও ঘণ্টার কাঁটার দিকে তাকাইলে মনে হয় তাহা অবাধে একটানা চলিয়াছে কিংবা চলিতেছেই না। কিন্তু সেকেণ্ডের কাঁটা লক্ষ্য করিলেই দেখা যায় তাহা টিকটিক করিয়া লাফ দিয়া দিয়া চলিতেছে। দোলনদণ্ডটা যে একবার বামে থামিয়া দক্ষিণে যায়, আবার দক্ষিণে থামিয়া বামে আসে তাহা ওই সেকেণ্ডের তালে লয়েই ধরা পড়ে। বিশ্বব্যাপারে আমরা ওই মিনিটের কাঁটা ঘড়ির কাঁটাটাকেই দেখি কিন্তু যদি তাহার অণুপরিমাণ কালের সেকেণ্ডের কাঁটাটাকে দেখিতে পাইতাম তবে দেখিতাম বিশ্ব নিমেষে নিমেষে থামিতেছে ও চলিতেছে—তাহার একটানা তানের মধ্যে পলকে পলকে লয় পড়িতেছে। সৃষ্টির দ্বন্দ্বদোলকটির এক প্রান্তে হাঁ অন্য প্রান্তে না, একপ্রান্তে এক অন্য প্রান্তে দুই, একপ্রান্তে আকর্ষণ অন্য প্রান্তে বিকর্ষণ, একপ্রান্তে কেন্দ্রের অভিমুখী ও অন্য প্রান্তে কেন্দ্রের প্রতিমুখী শক্তি। তর্কশাস্ত্রে এই বিরোধকে মিলাইবার জন্য আমরা কত মতবাদের অসাধ্য ব্যায়ামে প্রবৃত্ত, কিন্তু সৃষ্টিশাস্ত্রে ইহারা সহজেই মিলিত হইয়া বিশ্বরহস্যকে অনির্বচনীয় করিয়া তুলিতেছে।

শক্তি জিনিসটা যদি একলা থাকে তবে সে নিজের একঝোঁকা জোরে কেবল একটা দীর্ঘ লাইন ধরিয়া ভীষণ উদ্ধতবেগে সোজা চলিতে থাকে, ডাইনে বাঁয়ে ভ্রূক্ষেপমাত্র করে না; কিন্তু শক্তিকে জগতে একাধিপত্য দেওয়া হয় নাই বলিয়াই, বরাবর তাহাকে জুড়িতে জোড়া হইয়াছে বলিয়াই, দুইয়ের উলটাটানে বিশ্বের সকল জিনিসই নম্র হইয়া

গোল হইয়া সুসম্পূর্ণ হইতে পারিয়াছে। সোজা লাইনের সমাপ্তিহীনতা, সোজা লাইনের অতি তীব্র তীক্ষ্ণ কৃশতা বিশ্বপ্রকৃতির নহে; গোল আকারের সুন্দর পরিপুষ্ট পরিসমাপ্তিই বিশ্বের স্বভাবগত। এই এক শক্তির একাগ্র সোজা রেখায় সৃষ্টি হয় না— তাহা কেবল ভেদ করিতে পারে, কিন্তু কোনো কিছুকেই ধরিতে পারে না, বেড়িতে পারে না, তাহা একেবারে রিক্ত, তাহা প্রলয়েরই রেখা; রুদ্রের প্রলয়পিনাকের মতো তাহাতে কেবল একই সুর, তাহাতে সংগীত নাই; এই অন্য শক্তি একক হইয়া উঠিলেই তাহা বিনাশের কারণ হইয়া উঠে। দুই শক্তির যোগেই বিশ্বের যত কিছু ছন্দ। আমাদের এই জগৎকাব্য মিত্রাক্ষর—পদে পদে তাহার জুড়িজুড়ি মিল।

বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে এই ছন্দটি যত স্পষ্ট এবং বাধাহীন, মানবপ্রকৃতির মধ্যে তেমন নহে। সেখানেও এই সংকোচন ও প্রসারণের তত্ত্বটি আছে—কিন্তু তাহার সামঞ্জস্যটিকে আমরা সহজে রাখিতে পারি না। বিশ্বের গানে তালটি সহজ, মানুষের গানে তালটি বহু সাধনার সামগ্রী। আমরা অনেক সময়ে দ্বন্দ্বের এক প্রান্তে আসিয়া এমনি ঝুঁকিয়া পড়ি যে অন্য প্রান্তে ফিরিতে বিলম্ব হয় তখন তাল কাটিয়া যায়, প্রাণপণে ত্রুটি সারিয়া লইতে গলদ্‌ঘর্ম হইয়া উঠিতে হয়। একদিকে আত্ম একদিকে পর, একদিকে অর্জন একদিকে বর্জন, একদিকে সংযম একদিকে স্বাধীনতা, একদিকে আচার একদিকে বিচার মানুষকে টানিতেছে; এই দুই টানার তাল বাঁচাইয়া সমে আসিয়া পৌঁছিতে শেখাই মনুষ্যত্বের শিক্ষা; এই তাল-অভ্যাসের ইতিহাসই মানুষের ইতিহাস। ভারতবর্ষে সেই তালের সাধনার ছবিটিকে স্পষ্ট করিয়া দেখিবার সুযোগ আছে।

গ্রীস রোম ব্যাবিলন প্রভৃতি সমস্ত পুরাতন মহাসভ্যতার গোড়াতেই একটা জাতি-সংঘাত আছে। এই জাতিসংঘাতের বেগেই মানুষ পরের ভিতর দিয়া আপনার ভিতরে পুরামাত্রায় জাগিয়া উঠে। এইরূপ সংঘাতেই মানুষ রূঢ়িক হইতে যৌগিক বিকাশ লাভ করে এবং তাহাকেই বলে সভ্যতা।

পর্দা উঠিবামাত্র ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রথমাঙ্কেই আমরা আর্য-অনার্যের প্রচণ্ড জাতিসংঘাত দেখিতে পাই। এই সংঘাতের প্রথম প্রবলবেগে অনার্যের প্রতি আর্যের যে বিদ্বেষ জাগিয়াছিল তাহারই ধাক্কায় আর্যেরা নিজের মধ্যে নিজে সংহত হইতে পারিল।

এইরূপ সংহত হইবার অপেক্ষা ছিল। কারণ, ভারতবর্ষে আর্যেরা কালে কালে ও দলে দলে প্রবেশ করিতেছিলেন। তাঁহাদের সকলেরই গোত্র, দেবতা ও মন্ত্র যে একই ছিল তাহা নহে। বাহির হইতে যদি একটা প্রবল আঘাত তাঁহাদিগকে বাধা না দিত তবে এই আর্য উপনিবেশ দেখিতে দেখিতে নানা শাখা প্রতিশাখায় সম্পূর্ণ বিভক্ত হইয়া

বিক্ষিপ্ত হইয়া যাইত। তাহারা আপনাদিগকে এক বলিয়া জানিতে পারিত না। আপনাদের সামান্য বাহ্য ভেদগুলিকেই বড়ো করিয়া দেখিত। পরের সঙ্গে লড়াই করিতে গিয়াই আর্যেরা আপনাকে আপন বলিয়া উপলব্ধি করিলেন।

বিশ্বের সকল পদার্থের মতো সংঘাত পদার্থেরও দুই প্রান্ত আছে—তাহার একপ্রান্তে বিচ্ছেদ, আর এক প্রান্তে মিলন। তাই এই সংঘাতের প্রথম অবস্থায় স্ববর্ণের ভেদরক্ষার দিকে আর্যদের যে আত্মসংকোচন জন্মিয়াছিল সেইখানেই ইতিহাস চিরকাল থামিয়া থাকিতে পারে না। বিশ্বছন্দ-তত্ত্বের নিয়মে আত্মপ্রসারণের পথে মিলনের দিকে ইতিহাসকে একদিন ফিরিতে হইয়াছিল।

অনার্যদের সহিত বিরোধের দিনে আর্যসমাজে যাঁহারা বীর ছিলেন, জানি না তাঁহারা কে। তাঁহাদের চরিতকাহিনী ভারতবর্ষের মহাকাব্যে কই তেমন করিয়া তো বর্ণিত হয় নাই। হয়তো জনমেজয়ের সর্পসত্রের কথার মধ্যে একটা প্রচণ্ড প্রাচীন যুদ্ধ-ইতিহাস প্রচ্ছন্ন আছে। পুরুষানুক্রমিক শত্রুতার প্রতিহিংসা সাধনের জন্য সর্প-উপাসক অনার্য নাগজাতিকে একেবারে ধ্বংস করিবার জন্য জনমেজয় নিদারুণ উদ্‌যোগ করিয়াছিলেন এই পুরাণকথায় তাহা ব্যক্ত হইয়াছে বটে তবু এই রাজা ইতিহাসে তো কোনো বিশেষ গৌরব লাভ করেন নাই।

কিন্তু অনার্যদের সহিত আর্যদের মিলন ঘটাইবার অধ্যবসায়ে যিনি সফলতা লাভ করিয়াছিলেন তিনি আজ পর্যন্ত আমাদের দেশে অবতার বলিয়া পূজা পাইয়া আসিতেছেন।

আর্য অনার্যের যোগবন্ধন তখনকার কালের যে একটি মহা উদ্‌যোগের অঙ্গ, রামায়ণ-কাহিনীতে সেই উদ্‌যোগের নেতারূপে আমরা তিনজন ক্ষত্রিয়ের নাম দেখিতে পাই। জনক, বিশ্বামিত্র ও রামচন্দ্র। এই তিন জনের মধ্যে কেবল মাত্র একটা ব্যক্তিগত যোগ নহে একটা এক অভিপ্রায়ের যোগ দেখা যায়। বুঝিতে পারি রামচন্দ্রের জীবনের কাজে বিশ্বামিত্র দীক্ষাদাতা—এবং বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রের সম্মুখে যে লক্ষ্যস্থাপন করিয়াছিলেন তাহা তিনি জনক রাজার নিকট হইতে লাভ করিয়াছিলেন।

এই জনক, বিশ্বামিত্র ও রামচন্দ্র যে পরস্পরের সমসাময়িক ছিলেন সে কথা হয়তো বা কালগত ইতিহাসের দিক দিয়া সত্য নহে, কিন্তু ভাবগত ইতিহাসের দিক দিয়া এই তিন ব্যক্তি পরস্পরের নিকটবর্তী। আকাশের যুগ্মনক্ষত্রগুলিকে কাছে হইতে দেখিতে গেলে মাঝখানকার ব্যবধানে তাহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখায়—তাহারা যে জোড়া তাহা দূর হইতে সহজেই দেখা যায়। জাতীয় ইতিহাসের আকাশেও এইরূপ অনেক জোড়া নক্ষত্র আছে, কালের ব্যবধানের দিক দিয়া দেখিতে গেলে তাহাদের ঐক্য

হারাইয়া যায়—কিন্তু আভ্যন্তরিক যোগের আকর্ষণে তাহারা এক হইয়া মিলিয়াছে। জনক বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রের যোগও যদি সেইরূপ কালের যোগ না হইয়া ভাবের যোগ হয় তবে তাহা আশ্চর্য নহে।

এইরূপ ভাবগত ইতিহাসে ব্যক্তি ক্রমে ভাবের স্থান অধিকার করে। ব্রিটিশ পুরাণ-কথায় যেমন রাজা আর্থার। তিনি জাতির মনে ব্যক্তিরূপ ত্যাগ করিয়া ভাবরূপ ধারণ করিয়াছেন। জনক ও বিশ্বামিত্র সেইরূপ আর্য ইতিহাসগত একটি বিশেষ ভাবের রূপক হইয়া উঠিয়াছেন, রাজা আর্থার মধ্যযুগের য়ুরোপীয় ক্ষত্রিয়দের একটি বিশেষ খ্রীস্টীয় আদর্শদ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া তাহাকেই জয়যুক্ত করিবার জন্য বিরুদ্ধ পক্ষের সহিত লড়াই করিতেছেন এই যেমন দেখি, তেমনি ভারতে একদিন ক্ষত্রিয়দল ধর্মে এবং আচরণে একটি বিশেষ উচ্চ আদর্শকে উদ্ভাবিত করিয়া তুলিয়া বিরোধিদলের সহিত দীর্ঘকাল ঘোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন ভারতীয় ইতিহাসে তাহার আভাস পাওয়া যায়। এই সংগ্রামে ব্রাহ্মণেরাই যে তাঁহাদের প্রধান প্রতিপক্ষ ছিলেন তাহারও প্রমাণ আছে।

তখনকার কালের নবক্ষত্রিয়দলের এই ভাবটা কী, তাহার পুরা-পুরি সমস্তটা জানা এখন অসম্ভব, কেননা বিপ্লবের জয় পরাজয়ের পরে আবার যখন সকল পক্ষের মধ্যে একটা রফা হইয়া গেল তখন সমাজের মধ্যে বিরোধের বিষয়গুলি আর পৃথক হইয়া রহিল না এবং ক্ষতচিহ্নগুলি যত শীঘ্র জোড়া লাগিতে পারে তাহারই চেষ্টা চলিতে লাগিল। তখন নূতন দলের আদর্শকে ব্রাহ্মণেরা স্বীকার করিয়া লইয়া পুনরায় আপন স্থান গ্রহণ করিলেন।

তথাপি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের মধ্যে আদর্শের প্রভেদ কোন্ পথ দিয়া কী আকারে ঘটিয়াছিল তাহার একটা আভাস পাওয়া যায়। যজ্ঞবিধিগুলি কৌলিকবিদ্যা। এক এক কুলের আর্যদলের মধ্যে এক একটি কুলপতিকে আশ্রয় করিয়া বিশেষ বিশেষ স্তবমন্ত্র ও দেবতাদিগকে সন্তুষ্ট করিবার বিধিবিধান রক্ষিত ছিল। যাঁহারা এই সমস্ত ভালো করিয়া জানিতেন পৌরোহিত্যে তাঁহাদেরই বিশেষ যশ ও ধনলাভের সম্ভাবনা ছিল। সুতরাং এই ধর্মকার্য একটা বৃত্তি হইয়া উঠিয়াছিল এবং কৃপণের ধনের মতো ইহা সকলের পক্ষে সুগম ছিল না। এই সমস্ত মন্ত্র ও যজ্ঞানুষ্ঠানের বিচিত্র বিধি বিশেষরূপে আয়ত্ত ও তাহা প্রয়োগ করিবার ভার স্বভাবতই একটি বিশেষ শ্রেণীর উপর ছিল। আত্মরক্ষা যুদ্ধবিগ্রহ ও দেশ-অধিকারে যাঁহাদিগকে নিয়ত নিযুক্ত থাকিতে হইবে তাঁহারা এই কাজের ভার লইতে পারেন না, কারণ ইহা দীর্ঘকাল অধ্যয়ন ও অভ্যাস সাপেক্ষ। কোনো এক শ্রেণী এই সমস্তকে রক্ষা করিবার ভার

যদি না লন তবে কৌলিকসূত্র ছিন্ন হইয়া যায় এবং পিতৃপিতামহদের সহিত যোগধারা নষ্ট হইয়া সমাজ শৃঙ্খলাভ্রষ্ট হইয়া পড়ে। এই কারণে যখন সমাজের একশ্রেণী যুদ্ধ প্রভৃতি উপলক্ষ্যে নব নব অধ্যবসায়ে নিযুক্ত তখন আর-এক শ্রেণী বংশের প্রাচীন ধর্ম এবং সমস্ত স্মরণীয় ব্যাপারকে বিশুদ্ধ ও অবিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিবার জন্যই বিশেষভাবে প্রবৃত্ত হইলেন।

কিন্তু যখনই বিশেষ শ্রেণীর উপর এইরূপ কাজের ভার পড়ে তখনই সমস্ত জাতির চিত্তবিকাশের সঙ্গে তাহার ধর্মবিকাশের সমতানতায় একটা বাধা পড়িয়া যায়। কারণ সেই বিশেষ শ্রেণী ধর্মবিধিগুলিকে বাঁধের মতো এক জায়গায় দৃঢ় করিয়া বাঁধিয়া রাখেন সুতরাং সমস্ত জাতির মনের অগ্রসরগতির সঙ্গে তাহার সামঞ্জস্য থাকে না। ক্রমে ক্রমে অলক্ষ্যভাবে এই সামঞ্জস্য এতদূর পর্যন্ত নষ্ট হইয়া যায় যে, অবশেষে একটা বিপ্লব ব্যতীত সমন্বয়সাধনের উপায় পাওয়া যায় না। এইরূপে একদা ব্রাহ্মণেরা যখন আর্যদের চিরাগত প্রথা ও পূজাপদ্ধতিকে আগলাইয়া বসিয়াছিলেন, যখন সেই সমস্ত ক্রিয়াকাণ্ডকে ক্রমশই তাঁহারা কেবল জটিল ও বিস্তারিত করিয়া তুলিতেছিলেন তখন ক্ষত্রিয়েরা সর্বপ্রকার প্রাকৃতিক ও মানুষিক বাধার সঙ্গে সংগ্রাম করিতে করিতে জয়োল্লাসে অগ্রসর হইয়া চলিতেছিলেন। এইজন্যই তখন আর্যদের মধ্যে প্রধান মিলনের ক্ষেত্র ছিল ক্ষত্রিয়সমাজ। শত্রুর সহিত যুদ্ধে যাহারা এক হইয়া প্রাণ দেয় তাহাদের মতো এমন মিলন আর কাহারও হইতে পারে না। মৃত্যুর সম্মুখে যাহারা একত্র হয় তাহারা পরস্পরের অনৈক্যকে বড়ো করিয়া দেখিতে পারে না। অপর পক্ষে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে মন্ত্র দেবতা ও যজ্ঞকার্যের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার ব্যবসায় ক্ষত্রিয়ের নহে, তাঁহারা মানবের বন্ধুরদুর্গম জীবনক্ষেত্রে নব নব ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্যে মানুষ, এই কারণে প্রথামূলক বাহ্যানুষ্ঠানগত ভেদের বোধটা ক্ষত্রিয়ের মনে তেমন সুদৃঢ় হইয়া উঠিতে পারে না। অতএব আত্মরক্ষা ও উপনিবেশ বিস্তারের উপলক্ষ্যে সমস্ত আর্যদলের মধ্যকার ঐক্যসূত্রটি ছিল ক্ষত্রিয়দের হাতে। এইরূপে একদিন ক্ষত্রিয়েরাই সমস্ত অনৈক্যের অভ্যন্তরে একই যে সত্যপদার্থ ইহা অনুভব করিয়াছিলেন। এইজন্য ব্রহ্মবিদ্যা বিশেষভাবে ক্ষত্রিয়ের বিদ্যা হইয়া উঠিয়া ঋক্ যজুঃ সাম প্রভৃতিকে অপরাবিদ্যা বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে এবং ব্রাহ্মণ কর্তৃক সযত্নে রক্ষিত হোম যাগ যজ্ঞ প্রভৃতি কর্মকাণ্ডকে নিষ্ফল বলিয়া পরিত্যাগ করিতে চাহিয়াছে। ইহা হইতে স্পষ্টই দেখা যায় একদিন পুরাতনের সহিত নূতনের বিরোধ বাধিয়াছিল।

সমাজে যখন একটা বড়ো ভাব সংক্রামকরূপে দেখা দেয় তখন তাহা একান্তভাবে কোনো গণ্ডিকে মানে না। আর্যজাতির নিজেদের মধ্যে একটা ঐক্যবোধ যতই

পরিস্ফুট হইয়া উঠিল ততই সমাজের সর্বত্রই এই অনুভূতি সঞ্চারিত হইতে লাগিল যে, দেবতারা নামে নানা কিন্তু সত্যে এক ;—অতএব বিশেষ দেবতাকে বিশেষ স্তব ও বিশেষ বিধিতে সন্তুষ্ট করিয়া বিশেষ ফল পাওয়া যায় এই ধারণা সমাজের সর্বত্রই ক্ষয় হইয়া দলভেদে উপাসনাভেদ স্বভাবতই ঘুচিবার চেষ্টা করিল। তথাপি ইহা সত্য যে বিশেষভাবে ক্ষত্রিয়ের মধ্যেই ব্রহ্মবিদ্যা অনুকূল আশ্রয় লাভ করিয়াছিল এবং সেইজন্যই ব্রহ্মবিদ্যা রাজবিদ্যা নাম গ্রহণ করিয়াছে।

ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের মধ্যে এই প্রভেদটি সামান্য নহে। ইহা একেবারে বাহিরের দিক ও অন্তরের দিকের ভেদ। বাহিরের দিকে যখন আমরা দৃষ্টি রাখি তখনই আমরা কেবলই বহুকে ও বিচিত্রকে দেখিতে পাই, অন্তরে যখন দেখি তখনই একের দেখা পাওয়া যায়। যখন আমরা বাহ্যশক্তিকেই দেবতা বলিয়া জানিয়াছি তখন মন্ত্রতন্ত্র ও নানা বাহ্য প্রক্রিয়ার দ্বারা তাহাদিগকে বাহির হইতে বিশেষভাবে আপনাদের পক্ষভুক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছি। এইজন্য বাহিরের বহু শক্তিই যখন দেবতা তখন বাহিরের নানা অনুষ্ঠানই আমাদের ধর্মকার্য এবং এই অনুষ্ঠানের প্রভেদ ও তাহারই গূঢ়শক্তি-অনুসারেই ফলের তারতম্য কল্পনা।

এইরূপে সমাজে যে আদর্শের ভেদ হইয়া গেল, সেই আদর্শভেদের মূর্তিপরিগ্রহ-স্বরূপে আমরা দুই দেবতাকে দেখিতে পাই। প্রাচীন বৈদিক মন্ত্রতন্ত্র ক্রিয়াকাণ্ডের দেবতা ব্রহ্মা এবং নব্যদলের দেবতা বিষ্ণু। ব্রহ্মার চারি মুখ চারি বেদ—তাহা চিরকালের মতো ধ্যানরত স্থির ;—আর বিষ্ণুর চারি ক্রিয়াশীল হস্ত কেবলই নব নব ক্ষেত্রে মঙ্গলকে ঘোষিত করিতেছে, ঐক্যচক্রকে প্রতিষ্ঠিত করিতেছে, শাসনকে প্রচারিত করিতেছে এবং সৌন্দর্যকে বিকাশিত করিয়া তুলিতেছে।

দেবতারা যখন বাহিরে থাকেন, যখন মানুষের আত্মার সঙ্গে তাঁহাদের আত্মীয়তার সম্বন্ধ অনুভূত না হয় তখন তাঁহাদের সঙ্গে আমাদের কেবল কামনার সম্বন্ধ ও ভয়ের সম্বন্ধ। তখন তাঁহাদিগকে স্তবে বশ করিয়া আমরা হিরণ্য চাই গো চাই, আয়ু চাই, শত্রুপরাভব চাই; যাগযজ্ঞ-অনুষ্ঠানের ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতায় তাঁহারা অপ্রসন্ন হইলে আমাদের অনিষ্ট করিবেন এই আশঙ্কা তখন আমাদিগকে অভিভূত করিয়া রাখে। এই কামনা এবং ভয়ের পূজা বাহ্য পূজা, ইহা পরের পূজা। দেবতা যখন অন্তরের ধন হইয়া উঠেন তখনই অন্তরের পূজা আরম্ভ হয়—সেই পূজাই ভক্তির পূজা।

ভারতবর্ষের ব্রহ্মবিদ্যার মধ্যে আমরা দুইটি ধারা দেখিতে পাই, নির্গুণ ব্রহ্ম ও সগুণ ব্রহ্ম, অভেদ ও ভেদাভেদ। এই ব্রহ্মবিদ্যা কখনো একের দিকে সম্পূর্ণ ঝুঁকিয়াছে, কখনো দুইকে মানিয়া সেই দুইয়ের মধ্যেই একককে দেখিয়াছে। দুইকে না মানিলে

পূজা হয় না, আবার দুইয়ের মধ্যে এককে না মানিলে ভক্তি হয় না। দ্বৈতবাদী য়িহুদিদের দূরবর্তী দেবতা ভয়ের দেবতা, শাসনের দেবতা, নিয়মের দেবতা। সেই দেবতা নূতন টেস্টামেন্টে যখন মানবের সঙ্গে এক হইয়া মিশিয়া আত্মীয়তা স্বীকার করিলেন তখনই তিনি প্রেমের দেবতা ভক্তির দেবতা হইলেন। বৈদিক দেবতা যখন মানুষ হইতে পৃথক তখন তাঁহার পূজা চলিতে পারে কিন্তু পরমাত্মা ও জীবাত্মা যখন আনন্দের অচিন্ত্যরহস্যলীলায় এক হইয়াও দুই, দুই হইয়াও এক, তখনই সেই অন্তরতম দেবতাকে ভক্তি করা চলে। এই জন্য ব্রহ্মবিদ্যার আনুষঙ্গিকরূপেই ভারতবর্ষে প্রেম-ভক্তির ধর্ম আরম্ভ হয়। এই ভক্তিধর্মের দেবতাই বিষ্ণু।

বিপ্লবের অবসানে বৈষ্ণবধর্মকে ব্রাহ্মণেরা আপন করিয়া লইয়াছেন কিন্তু গোড়ায় যে তাহা করেন নাই তাহার কিছু কিছু প্রমাণ এখনও অবশিষ্ট আছে। বিষ্ণুর বক্ষে ব্রাহ্মণ ভৃগু পদাঘাত করিয়াছিলেন এই কাহিনীর মধ্যে একটি বিরোধের ইতিহাস সংহত হইয়া আছে। এই ভৃগু যজ্ঞকর্তা ও যজ্ঞফলভাগীদের আদর্শরূপে বেদে কথিত আছেন। ভারতবর্ষে পূজার আসনে ব্রহ্মার স্থানকে সংকীর্ণ করিয়া বিষ্ণুই যখন তাহা অধিকার করিলেন—বহুপল্লবিত যাগযজ্ঞ-ক্রিয়াকাণ্ডের যুগকে পশ্চাতে ফেলিয়া ভক্তি-ধর্মের যুগ যখন ভারতবর্ষে আবির্ভূত হইল তখন সেই সন্ধিক্ষণে একটা বড়ো ঝড় আসিয়াছিল। আসিবারই কথা। এই বিচিত্র ক্রিয়াকাণ্ডের অধিকার যাঁহাদের হাতে, এবং সেই অধিকার লইয়া যাঁহারা সমাজে একটি বিশেষ আদর পাইয়াছিলেন, তাঁহারা সহজে তাহার বেড়া ভাঙিতে দেন নাই।

এই ভক্তির বৈষ্ণবধর্ম যে বিশেষভাবে ক্ষত্রিয়ের প্রবর্তিত ধর্ম, তাহার একটি প্রমাণ একদা ক্ষত্রিয় শ্রীকৃষ্ণকে এই ধর্মের গুরুরূপে দেখিতে পাই—এবং তাঁহার উপদেশের মধ্যে বৈদিক মন্ত্র ও আচারের বিরুদ্ধে আঘাতেরও পরিচয় পাওয়া যায়। তাহার দ্বিতীয় প্রমাণ এই—প্রাচীন ভারতের পুরাণে যে দুইজন মানবকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া স্বীকার করিয়াছে তাঁহারা দুইজনেই ক্ষত্রিয়—একজন শ্রীকৃষ্ণ, আর একজন শ্রীরামচন্দ্র। ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় ক্ষত্রিয়দলের এই ভক্তিধর্ম, যেমন শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ তেমনি রামচন্দ্রের জীবনের দ্বারাও বিশেষভাবে প্রচারলাভ করিয়াছিল।

বৃত্তিগত ভেদ হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের মধ্যে এই চিত্তগত ভেদ এমন একটা সীমায় আসিয়া দাঁড়াইল যখন বিচ্ছেদের বিদারণ-রেখা দিয়া সামাজিক বিপ্লবের অগ্নি-উচ্ছ্বাস উদ্‌গিরিত হইতে আরম্ভ করিল। বশিষ্ঠবিশ্বামিত্রের কাহিনীর মধ্যে এই বিপ্লবের ইতিহাস নিবদ্ধ হইয়া আছে।

এই বিপ্লবের ইতিহাসে ব্রাহ্মণপক্ষ বশিষ্ঠ নামটিকে ও ক্ষত্রিয়পক্ষ বিশ্বামিত্র নামটিকে

আশ্রয় করিয়াছে। পূর্বেই বলিয়াছি ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় মাত্রই যে পরস্পরের বিরুদ্ধ দলে যোগ দিয়াছে তাহা নহে। এমন অনেক রাজা ছিলেন যাঁহারা ব্রাহ্মণদের সপক্ষে ছিলেন। কথিত আছে ব্রাহ্মণের বিদ্যা বিশ্বামিত্রের দ্বারা পীড়িত হইয়া রোদন করিতেছিল, হরিশ্চন্দ্র তাহাদিগকে রক্ষা করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন; অবশেষে রাজ্য সম্পদ সমস্ত হারাইয়া বিশ্বামিত্রের কাছে তাঁহাকে সম্পূর্ণ হার মানিতে হইয়াছিল।

এরূপ দৃষ্টান্ত আরও আছে। প্রাচীনকালের এই মহাবিপ্লবের আর যে একজন প্রধান নেতা শ্রীকৃষ্ণ কর্মকাণ্ডের নিরর্থকতা হইতে সমাজকে মুক্তি দিতে দাঁড়াইয়াছিলেন তিনি একদিন পাণ্ডবদের সাহায্যে জরাসন্ধকে বধ করেন। সেই জরাসন্ধ রাজা তখনকার ক্ষত্রিয়দলের শত্রু-পক্ষ ছিলেন। তিনি বিস্তর ক্ষত্রিয় রাজাকে বন্দী ও পীড়িত করিয়াছিলেন। ভীমার্জুনকে লইয়া শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁহার পুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন তখন তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশ ধরিতে হইয়াছিল। এই ব্রাহ্মণ-পক্ষপাতী ক্ষত্রবিদ্বেষী রাজাকে শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদের দ্বারা যে বধ করাইয়াছিলেন এটা একটা খাপছাড়া ঘটনামাত্র নহে। শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া তখন দুই দল হইয়াছিল। সেই দুই দলকে সমাজের মধ্যে এক করিবার চেষ্টায় যুধিষ্ঠির যখন রাজসূয় যজ্ঞ করিয়াছিলেন তখন শিশুপাল বিরুদ্ধদলের মুখপাত্র হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে অপমান করেন। এই যজ্ঞে সমস্ত ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়, সমস্ত আচার্য ও রাজার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণকেই সর্বপ্রধান বলিয়া অর্ঘ্য দেওয়া হইয়াছিল। এই যজ্ঞে তিনি ব্রাহ্মণের পদক্ষালনের জন্য নিযুক্ত ছিলেন পরবর্তীকালের সেই অত্যুক্তির প্রয়াসেই পুরাকালীন ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় বিরোধের ইতিহাস স্পষ্ট দেখা যায়। কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের গোড়ায় এই সামাজিক বিবাদ। তাহার একদিকে শ্রীকৃষ্ণের পক্ষ, অন্যদিকে শ্রীকৃষ্ণের বিপক্ষ। বিরুদ্ধপক্ষে সেনাপতিদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন ব্রাহ্মণ দ্রোণ—কৃপ ও অশ্বত্থামাও বড়ো সামান্য ছিলেন না।

অতএব দেখা যাইতেছে, গোড়ায় ভারতবর্ষের দুই মহাকাব্যেরই মূল বিষয় ছিল সেই প্রাচীন সমাজবিপ্লব। অর্থাৎ সমাজের ভিতরকার পুরাতন ও নূতনের বিরোধ। রামায়ণের কালে রামচন্দ্র নূতন দলের পক্ষ লইয়াছিলেন তাহা স্পষ্ট দেখা যায়। বশিষ্ঠের সনাতন ধর্মই ছিল রামের কুলধর্ম, বশিষ্ঠবংশই ছিল তাঁহাদের চিরপুরাতন পুরোহিতবংশ, তথাপি অল্পবয়সেই রামচন্দ্র সেই বশিষ্ঠের বিরুদ্ধপক্ষ বিশ্বামিত্রের অনুসরণ করিয়াছিলেন। বস্তুত বিশ্বামিত্র রামকে তাঁহার পৈতৃক অধিকার হইতে ছিনাইয়া লইয়াছিলেন। রাম যে পন্থা লইয়াছিলেন তাহাতে দশরথের সম্মতি ছিল না, কিন্তু বিশ্বামিত্রের প্রবল প্রভাবের কাছে তাঁহার আপত্তি টিকিতে পারে নাই। পরবর্তীকালে এই কাব্য যখন জাতীয়সমাজে বৃহৎ ইতিহাসের স্মৃতিকে কোনো এক রাজবংশের

পারিবারিক ঘরের কথা করিয়া আনিয়াছিল তখনই দুর্বলচিত্ত বৃদ্ধ রাজার অদ্ভুত স্ত্রৈণতাকেই রামের বনবাসের কারণ বলিয়া রটাইয়াছে।

রামচন্দ্র যে নব্যপন্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন ইতিহাসে তাহার আর এক প্রমাণ আছে। একদা যে ব্রাহ্মণ ভৃগু বিষ্ণুর বক্ষে পদাঘাত করিয়াছিলেন তাঁহারই বংশোদ্ভব পরশুরামের ব্রত ছিল ক্ষত্রিয়বিনাশ। রামচন্দ্র ক্ষত্রিয়ের এই দুর্ধর্ষ শত্রুকে নিরস্ত্র করিয়াছিলেন। এই নিষ্ঠুর ব্রাহ্মণবীরকে বধ না করিয়া তিনি তাঁহাকে যে বশ করিয়াছিলেন তাহাতে অনুমান করা যায়, ঐক্যসাধনব্রত গ্রহণ করিয়া রামচন্দ্র তাহার প্রথম পর্বেই কতক বীর্যবলে কতক ক্ষমাগুণে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের বিরোধভঞ্জন করিয়াছিলেন। রামের জীবনের সকল কার্যেই এই উদার বীর্যবান সহিষ্ণুতার পরিচয় পাওয়া যায়।

বিশ্বামিত্রই রামচন্দ্রকে জনকের গৃহে লইয়া গিয়াছিলেন এবং এই বিশ্বামিত্রের নেতৃত্বেই রামচন্দ্র জনকের ভূকর্ষণজাত কন্যাকে ধর্মপত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সমস্ত ইতিহাসকে ঘটনামূলক বলিয়া গণ্য করিবার কোনো প্রয়োজন নাই, আমি ইহাকে ভাবমূলক বলিয়া মনে করি। ইহার মধ্যে হয়তো তথ্য খুঁজিলে ঠকিব কিন্তু সত্য খুঁজিলে পাওয়া যাইবে।

মূল কথা এই, জনক ক্ষত্রিয় রাজার আদর্শ ছিলেন। ব্রহ্মবিদ্যা তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া বিকাশলাভ করিয়াছিল। এ বিদ্যা কেবল মাত্র তাঁহার জ্ঞানের বিষয় ছিল না; এ বিদ্যা তাঁহার সমস্ত জীবনে রূপ গ্রহণ করিয়াছিল; তিনি তাঁহার রাজ্যসংসারের বিচিত্র কর্মের কেন্দ্রস্থলে এই ব্রহ্মজ্ঞানকে অবিচলিত করিয়া রক্ষা করিয়াছিলেন ইতিহাসে তাহা কীর্তিত হইয়াছে। চরমতম জ্ঞানের সঙ্গে ভক্তির সঙ্গে প্রাত্যহিক জীবনের ছোটো বড়ো সমস্ত কর্মের আশ্চর্য যোগসাধন ইহাই ভারতবর্ষের ক্ষত্রিয়দের সর্বোচ্চ কীর্তি। আমাদের দেশে যাঁহারা ক্ষত্রিয়ের অগ্রণী ছিলেন তাঁহারা ত্যাগকেই ভোগের পরিণাম করিয়া কর্মকে মুক্তিলাভের শ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন।

এই জনক একদিকে ব্রহ্মজ্ঞানের অনুশীলন, আর এক দিকে স্বহস্তে হলচালন করিয়াছিলেন। ইহা হইতেই জানিতে পারি কৃষিবিস্তারের দ্বারা আর্যসভ্যতা বিস্তার করা ক্ষত্রিয়দের একটি ব্রতের মধ্যে ছিল। একদিন পশুপালন আর্যদের বিশেষ উপজীবিকা ছিল। এই ধেনুই অরণ্যাশ্রমবাসী ব্রাহ্মণদের প্রধান সম্পদ বলিয়া গণ্য হইত। বনভূমিতে গোচারণ সহজ; তপোবনে যাহারা শিষ্যরূপে উপনীত হইত গুরুর গোপালনে নিযুক্ত থাকা তাহাদের প্রধান কাজ ছিল।

অবশেষে একদিন রণজয়ী ক্ষত্রিয়েরা আর্যাবর্ত হইতে অরণ্যবাধা অপসারিত করিয়া পশুসম্পদের স্থলে কৃষিসম্পদকে প্রবল করিয়া তুলিলেন। আমেরিকায় য়ুরোপীয়

ঔপনিবেশিকগণ যখন অরণ্যের উচ্ছেদ করিয়া কৃষিবিস্তারের ক্ষেত্র প্রশস্ত করিতেছিলেন তখন যেমন মৃগয়াজীবী আরণ্যকগণ পদে পদে তাঁহাদিগকে বাধা দিতেছিল—ভারতবর্ষেও সেরূপ আরণ্যকদের সহিত কৃষকদের বিরোধে কৃষিব্যাপার কেবলই বিঘ্নসংকুল হইয়া উঠিয়াছিল। যাঁহারা অরণ্যের মধ্যে কৃষিক্ষেত্র উন্মুক্ত করিতে যাইবেন তাঁহাদের কাজ সহজ ছিল না। জনক মিথিলার রাজা ছিলেন—ইহা হইতেই জানা যায় আর্যাবর্তের পূর্বপ্রান্ত পর্যন্ত আর্য উপনিবেশ আপনার সীমায় আসিয়া ঠেকিয়াছিল। তখন দুর্গম বিন্ধ্যাচলের দক্ষিণভাগে অরণ্য অক্ষত ছিল এবং দ্রাবিড়সভ্যতা সেই দিকেই প্রবল হইয়া আর্যদের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিয়াছিল। রাবণ বীরপরাক্রমে ইন্দ্র প্রভৃতি বেদের দেবতাকে পরাস্ত করিয়া আর্যদের যজ্ঞের বিঘ্ন ঘটাইয়া নিজের দেবতা শিবকে জয়ী করিয়াছিলেন। যুদ্ধজয়ে স্বকীয় দলের দেবতার প্রভাব প্রকাশ পায় পৃথিবীতে সকল সমাজেরই বিশেষ অবস্থায় এই বিশ্বাস দৃঢ় থাকে—কোনো পক্ষের পরাভবে সে পক্ষের দেবতারই পরাভব গণ্য হয়। রাবণ আর্যদেবতাদিগকে পরাস্ত করিয়াছিলেন এই যে লোকশ্রুতি আমাদের দেশে প্রচলিত আছে ইহার অর্থই এই যে, তাঁহার রাজত্বকালে তিনি বৈদিক দেবতার উপাসকদিগকে বারংবার পরাভূত করিয়াছিলেন।

এমন অবস্থায় সেই শিবের হরধনু ভাঙিবে কে একদিন এই এক প্রশ্ন আর্যসমাজে উঠিয়াছিল। শিবোপাসকদের প্রভাবকে নিরস্ত করিয়া যিনি দক্ষিণখণ্ডে আর্যদের কৃষিবিদ্যা ও ব্রহ্মবিদ্যাকে বহন করিয়া লইয়া যাইতে পারিবেন তিনিই যথার্থ ভাবে ক্ষত্রিয়ের আদর্শ জনকরাজার অমানুষিক মানসকন্যার সহিত পরিণীত হইবেন। বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রকে সেই হরধনু ভঙ্গ করিবার দুঃসাধ্য পরীক্ষায় লইয়া গিয়াছিলেন। রাম যখন বনের মধ্যে গিয়া কোনো কোনো প্রবল দুর্ধর্ষ শৈববীরকে নিহত করিলেন তখনই তিনি হরধনু ভঙ্গের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন এবং তখনই তিনি সীতাকে অর্থাৎ হলচালন-রেখাকে বহন করিয়া লইবার অধিকারী হইতে পারিলেন। তখনকার অনেক বীর রাজাই এই সীতাকে গ্রহণ করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছিলেন কিন্তু তাঁহারা হরধনু ভাঙিতে পারেন নাই, এইজন্য রাজর্ষি জনকের কন্যাকে লাভ করিবার গৌরব হইতে তাঁহারা বঞ্চিত হইয়া ফিরিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এই দুঃসাধ্য ব্রতের অধিকারী কে হইবেন, ক্ষত্রিয় তপস্বিগণ সেই সন্ধান হইতে বিরত হন নাই। একদা বিশ্বামিত্রের সেই সন্ধান রামচন্দ্রের মধ্যে আসিয়া সার্থক হইল।

বিশ্বামিত্রের সঙ্গে রামচন্দ্র যখন বাহির হইলেন তখন তরুণ বয়সেই তিনি তাঁহার জীবনের তিনটি বড়ো বড়ো পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। প্রথম, তিনি শৈব রাক্ষসদিগকে পরাস্ত করিয়া হরধনু ভঙ্গ করিয়াছিলেন; দ্বিতীয়, যে ভূমি হলচালনের

অযোগ্যরূপে অহল্যা হইয়া পাষাণ হইয়া পড়িয়া ছিল, ও সেই কারণে দক্ষিণাপথের প্রথম অগ্রগামীদের মধ্যে অন্যতম ঋষি গৌতম যে ভূমিকে একদা গ্রহণ করিয়াও অবশেষে অভিশপ্ত বলিয়া পরিত্যাগ করিয়া যাওয়াতে যাহা দীর্ঘকাল ব্যর্থ পড়িয়াছিল, রামচন্দ্র সেই কঠিন পাথরকেও সজীব করিয়া তুলিয়া আপন কৃষিনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছিলেন ;[১] তৃতীয়, ক্ষত্রিয়দলের বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণদের যে বিদ্বেষ প্রবল হইয়া উঠিতেছিল তাহাকেও এই ক্ষত্রঋষি বিশ্বামিত্রের শিষ্য আপন ভুজবলে পরাস্ত করিয়াছিলেন।

অকস্মাৎ যৌবরাজ্য-অভিষেকে বাধা পড়িয়া রামচন্দ্রের যে নির্বাসন ঘটিল তাহার মধ্যে সম্ভবত তখনকার দুই প্রবল পক্ষের বিরোধ সূচিত হইয়াছে। রামের বিরুদ্ধে যে একটি দল ছিল তাহা নিঃসন্দেহ অত্যন্ত প্রবল—এবং স্বভাবতই অন্তঃপুরের মহিষীদের প্রতি তাহার বিশেষ প্রভাব ছিল। বৃদ্ধ দশরথ ইহাকে উপেক্ষা করিতে পারেন নাই এই জন্য একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁহার প্রিয়তম বীর পুত্রকেও তিনি নির্বাসনে পাঠাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সেই নির্বাসনে রামের বীরত্বের সহায় হইলেন লক্ষ্মণ ও তাঁহার জীবনের সঙ্গিনী হইলেন সীতা অর্থাৎ তাঁহার সেই ব্রত। এই সীতাকেই তিনি নানা বাধা ও নানা শত্রুর আক্রমণ হইতে বাঁচাইয়া বন হইতে বনান্তরে ঋষিদের আশ্রম ও রাক্ষসদের আবাসের মধ্য দিয়া অগ্রসর করিয়া লইয়া যাইতে লাগিলেন।

আর্য অনার্যের বিরোধকে বিদ্বেষের দ্বারা জাগ্রত রাখিয়া যুদ্ধের দ্বারা নিধনের দ্বারা তাহার সমাধানের প্রয়াস অন্তহীন দুশ্চেষ্টা। প্রেমের দ্বারা মিলনের দ্বারা ভিতরের দিক হইতে ইহার মীমাংসা হইলেই এত বড়ো বৃহৎ ব্যাপারও সহজ হইয়া যায়। কিন্তু ভিতরের মিলন জিনিসটা তো ইচ্ছা করিলেই হয় না। ধর্ম যখন বাহিরের জিনিস হয়, নিজের দেবতা যখন নিজের বিষয়সম্পত্তির মতো অত্যন্ত স্বকীয় হইয়া থাকে তখন মানুষের মনের মধ্যকার ভেদ কিছুতেই ঘুচিতে চায় না। জু-দের সঙ্গে জেন্টাইলদের মিলনের কোনো সেতু ছিল না। কেননা জু-রা জিহোভাকে বিশেষভাবে আপনাদের জাতীয় সম্পত্তি বলিয়াই জানিত এবং এই জিহোভার সমস্ত অনুশাসন, তাঁহার আদিষ্ট সমস্ত বিধিনিষেধ বিশেষভাবে জু-জাতিরই পালনীয় এইরূপ তাহাদের ধারণা ছিল। তেমনি আর্য দেবতা ও আর্য-বিধিবিধান যখন বিশেষ জাতিগতভাবে সংকীর্ণ ছিল তখন আর্য অনার্যের পরস্পর সংঘাত, এক পক্ষের সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ছাড়া, কিছুতেই মিটিতে পারিত না। কিন্তু ক্ষত্রিয়দের মধ্যে দেবতার ধারণা যখন বিশ্বজনীন হইয়া উঠিল—

---

[১] অল্পদিন হইল “রাক্ষস-রহস্য” নামক একটি স্বাধীনচিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধ আমি পাণ্ডুলিপি আকারে দেখিতে পাই, তাহার মধ্যেই “অহল্যা” শব্দটির এই তাৎপর্যব্যাখ্যা আমি দেখিলাম। লেখক আপনার নাম প্রকাশ করেন নাই—তাঁহার নিকট আমি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি।

বাহিরের ভেদ বিভেদ একান্ত সত্য নহে এই জ্ঞানের দ্বারা মানুষের কল্পনা হইতে দৈব বিভীষিকাসকল যখন চলিয়া গেল তখনই আর্য অনার্যের মধ্যে সত্যকার মিলনের সেতু স্থাপিত হওয়া সম্ভবপর হইল। তখনই বাহ্যিক ক্রিয়াকর্মের দেবতা অন্তরের ভক্তির দেবতা হইয়া উঠিলেন এবং কোনো বিশেষ শাস্ত্র ও শিক্ষা ও জাতির মধ্যে তিনি আবদ্ধ হইয়া রহিলেন না।

ক্ষত্রিয় রামচন্দ্র একদিন গুহক চণ্ডালকে আপন মিত্র বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন এই জনশ্রুতি আজ পর্যন্ত তাঁহার আশ্চর্য উদারতার পরিচয় বলিয়া চলিয়া আসিয়াছে। পরবর্তী যুগের সমাজ উত্তরকাণ্ডে তাঁহার এই চরিতের মাহাত্ম্য বিলুপ্ত করিতে চাহিয়াছে; শূদ্র তপস্বীকে তিনি বধদণ্ড দিয়াছিলেন এই অপবাদ রামচন্দ্রের উপরে আরোপ করিয়া পরবর্তী সমাজরক্ষকের দল রামচরিতের দৃষ্টান্তকে স্বপক্ষে আনিবার চেষ্টা করিয়াছে। যে সীতাকে রামচন্দ্র সুখে দুঃখে রক্ষা করিয়াছেন ও প্রাণপণে শত্রুহস্ত হইতে উদ্ধার করিয়াছেন সমাজের প্রতি কর্তব্যের অনুরোধে তাহাকেও তিনি বিনা অপরাধে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন উত্তরকাণ্ডের এই কাহিনীসৃষ্টির দ্বারা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় আর্যজাতির বীরশ্রেষ্ঠ আদর্শচরিত্ররূপে পূজ্য রামচন্দ্রের জীবনীকে একদা সামাজিক আচাররক্ষার অনুকূল করিয়া বর্ণনা করিবার বিশেষ চেষ্টা জন্মিয়াছিল। রামচরিতের মধ্যে যে একটি সমাজ-বিপ্লবের ইতিহাস ছিল পরবর্তীকালে যথাসম্ভব তাহার চিহ্ন মুছিয়া ফেলিয়া তাহাকে নব্যকালের সামাজিক আদর্শের অনুগত করা হইয়াছিল। সেই সময়েই রামের চরিত্রকে গৃহধর্মের ও সমাজধর্মের আশ্রয়রূপে প্রচার করিবার চেষ্টা জাগিয়াছিল এবং রামচন্দ্র যে একদা তাঁহার স্বজাতিকে বিদ্বেষের সংকোচ হইতে প্রেমের প্রসারণের দিকে লইয়া গিয়াছিলেন ও সেই নীতির দ্বারা একটি বিষম সমস্যার সমাধান করিয়া সমস্ত জাতির নিকট চিরকালের মতো বরণীয় হইয়াছিলেন সে কথাটা সরিয়া গিয়াছে এবং ক্রমে ইহাই দাঁড়াইয়াছে যে তিনি শাস্ত্রানুমোদিত গার্হস্থ্যের আশ্রয় ও লোকানুমোদিত আচারের রক্ষক। ইহার মধ্যে অদ্ভুত ব্যাপার এই, এককালে যে রামচন্দ্র ধর্মনীতি ও কৃষিবিদ্যাকে নূতন পথে চালনা করিয়াছিলেন, পরবর্তীকালে তাঁহারই চরিতকে সমাজ পুরাতন বিধিবন্ধনের অনুকূল করিয়া ব্যবহার করিয়াছে। একদিন সমাজে যিনি গতির পক্ষে বীর্য প্রকাশ করিয়াছিলেন আর একদিন সমাজ তাঁহাকেই স্থিতির পক্ষে বীর বলিয়া প্রচার করিয়াছে। বস্তুত রামচন্দ্রের জীবনের কার্যে এই গতিস্থিতির সামঞ্জস্য ঘটিয়াছিল বলিয়াই এইরূপ হওয়া সম্ভবপর হইয়াছে।

তৎসত্ত্বেও এ কথা ভারতবর্ষ ভুলিতে পারে নাই যে তিনি চণ্ডালের মিতা, বানরের দেবতা, বিভীষণের বন্ধু ছিলেন। তিনি শত্রুকে ক্ষয় করিয়াছিলেন এ তাঁহার গৌরব

নহে তিনি শত্রুকে আপন করিয়াছিলেন। তিনি আচারের নিষেধকে, সামাজিক বিদ্বেষের বাধাকে অতিক্রম করিয়াছিলেন; তিনি আর্য অনার্যের মধ্যে প্রীতির সেতু বন্ধন করিয়া দিয়াছিলেন।

নৃতত্ত্ব আলোচনা করিলে দেখা যায় বর্বর জাতির অনেকেরই মধ্যে এক একটি বিশেষ জন্তু পবিত্র বলিয়া পূজিত হয়। অনেক সময়ে তাহারা আপনাদিগকে সেই জন্তুর বংশধর বলিয়া গণ্য করে। সেই জন্তুর নামেই তাহারা আখ্যাত হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে এইরূপে নাগবংশের পরিচয় পাওয়া যায়। কিষ্কিন্ধ্যায় রামচন্দ্র যে অনার্যদলকে বশ করিয়াছিলেন তাহারাও যে এইরূপ কারণেই বানর বলিয়া পরিচিত তাহাতে সন্দেহ নাই। কেবল তো বানর নহে রামচন্দ্রের দলে ভল্লুকও ছিল। বানর যদি অবজ্ঞাসূচক আখ্যা হইত তবে ভল্লুকের কোনো অর্থ পাওয়া যায় না।

রামচন্দ্র এই যে বানরদিগকে বশ করিয়াছিলেন তাহা রাজনীতির দ্বারা নহে, ভক্তিধর্মের দ্বারা। এইরূপে তিনি হনুমানের ভক্তি পাইয়া দেবতা হইয়া উঠিয়াছিলেন। পৃথিবীর সর্বত্রই দেখা যায়, যে-কোনো মহাত্মাই বাহ্যধর্মের স্থলে ভক্তিধর্মকে জাগাইয়াছেন তিনি স্বয়ং পূজা লাভ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ, খ্রীস্ট, মহম্মদ, চৈতন্য প্রভৃতি তাহার অনেক দৃষ্টান্ত আছে। শিখ, সুফি, কবিরপন্থী প্রভৃতি সর্বত্রই দেখিতে পাই, ভক্তি যাঁহাদিগকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশ পায় অনুবর্তীদের কাছে তাঁহারা দেবত্ব প্রাপ্ত হন। ভগবানের সহিত ভক্তের অন্তরতম যোগ উদ্‌ঘাটন করিতে গিয়া তাঁহারাও যেন দেবত্বের সহিত মনুষ্যত্বের ভেদসীমা অতিক্রম করিয়া থাকেন। এইরূপে হনুমান ও বিভীষণ রামচন্দ্রের উপাসক ও ভক্ত বৈষ্ণবরূপে খ্যাত হইয়াছেন।

রামচন্দ্র ধর্মের দ্বারাই অনার্যদিগকে জয় করিয়া তাহাদের ভক্তি অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি বাহুবলে তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়া রাজ্যবিস্তার করেন নাই। দক্ষিণে তিনি কৃষিস্থিতিমূলক সভ্যতা ও ভক্তিমূলক একেশ্বরবাদ প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি সেই যে বীজ রোপণ করিয়া আসিয়াছিলেন বহু শতাব্দী পরেও ভারতবর্ষ তাহার ফল লাভ করিয়াছিল। এই দাক্ষিণাত্যে ক্রমে দারুণ শৈবধর্মও ভক্তিধর্মের রূপ গ্রহণ করিল এবং একদা এই দাক্ষিণাত্য হইতেই ব্রহ্মবিদ্যার এক ধারায় ভক্তিস্রোত ও আর-এক ধারায় অদ্বৈতজ্ঞান উচ্ছ্বসিত হইয়া সমস্ত ভারতবর্ষকে প্লাবিত করিয়া দিল।

আমরা আর্যদের ইতিহাসে সংকোচ ও প্রসারণের এই একটি রূপ দেখিলাম। মানুষের একদিকে তাহার বিশেষত্ব আর একদিকে তাহার বিশ্বত্ব এই দুই দিকের টানই ভারতবর্ষে যেমন করিয়া কাজ করিয়াছে তাহা যদি আমরা আলোচনা করিয়া না দেখি তবে ভারতবর্ষকে আমরা চিনিতেই পারিব না। একদিন তাহার এই আত্মরক্ষণ শক্তির দিকে

ছিল ব্রাহ্মণ, আত্মপ্রসারণ শক্তির দিকে ছিল ক্ষত্রিয়। ক্ষত্রিয় যখন অগ্রসর হইয়াছে তখন ব্রাহ্মণ তাহাকে বাধা দিয়াছে কিন্তু বাধা অতিক্রম করিয়াও ক্ষত্রিয় যখন সমাজকে বিস্তারের দিকে লইয়া গিয়াছে তখন ব্রাহ্মণ পুনরায় নূতনকে আপন পুরাতনের সঙ্গে বাঁধিয়া সমস্তটাকে আপন করিয়া লইয়া আবার একটা সীমা বাঁধিয়া লইয়াছে। য়ুরোপীয়েরা যখন ভারতবর্ষে চিরদিন ব্রাহ্মণদের এই কাজটির আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারা এমনি ভাবে করিয়াছেন যেন এই ব্যাপারটা ব্রাহ্মণ নামক একটি বিশেষ ব্যবসায়ী কুলের চাতুরী। তাঁহারা ইহা ভুলিয়া যান যে, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের যথার্থ জাতিগত ভেদ নাই, তাহারা একই জাতির দুই স্বাভাবিক শক্তি। ইংলণ্ডে সমস্ত ইংরেজ জাতি লিবারাল ও কন্সারভেটিভ এই দুই শাখায় বিভক্ত হইয়া রাষ্ট্রনীতিকে চালনা করিতেছে— ক্ষমতা লাভের জন্য এই দুই শাখার প্রতিযোগিতার মধ্যে বিবাদও আছে, কৌশলও আছে, এমন কি, ঘুষ এবং অন্যায়ও আছে, তথাপি এই দুই সম্প্রদায়কে যেমন দুই স্বতন্ত্র বিরুদ্ধ পক্ষের মতো করিয়া দেখিলে ভুল দেখা হয়—বস্তুত তাহারা প্রকৃতির আকর্ষণ ও বিকর্ষণ-শক্তির মতো বাহিরে দেখিতে বিরুদ্ধ কিন্তু অন্তরে একই সৃজনশক্তির এ-পিঠ ও-পিঠ, তেমনি ভারতবর্ষে সমাজের স্বাভাবিক স্থিতি ও গতি-শক্তি দুই শ্রেণীকে অবলম্বন করিয়া ইতিহাসকে সৃষ্টি করিয়াছে—কোনো পক্ষেই তাহা কৃত্রিম নহে।

তবে দেখা গিয়াছে বটে ভারতবর্ষে এই স্থিতি ও গতি-শক্তির সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় নাই সমস্ত বিরোধের পর ব্রাহ্মণই এখানকার সমাজে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। ব্রাহ্মণের বিশেষ চাতুর্যই তাহার কারণ এমন অদ্ভুত কথা ইতিহাসবিরুদ্ধ কথা। তাহার প্রকৃত কারণ ভারতবর্ষের বিশেষ অবস্থার মধ্যেই রহিয়াছে। ভারতবর্ষে যে জাতি-সংঘাত ঘটিয়াছে তাহা অত্যন্ত বিরুদ্ধ জাতির সংঘাত। তাহাদের মধ্যে বর্ণের ও আদর্শের ভেদ এতই গুরুতর যে এই প্রবল বিরুদ্ধতার আঘাতে ভারতবর্ষের আত্মরক্ষণীশক্তিই বলবান হইয়া উঠিয়াছে। এখানে আত্মপ্রসারণের দিকে চলিতে গেলে আপনাকে হারাইবার সম্ভাবনা ছিল বলিয়া সমাজের সতর্কতাবৃত্তি পদে পদে আপনাকে জাগ্রত রাখিয়াছে।

তুষারাবৃত আল্‌প্‌স্ গিরিমালার শিখরে যে দুঃসাহসিকেরা আরোহণ করিতে চেষ্টা করে, তাহারা আপনাকে দড়ি দিয়া বাঁধিয়া বাঁধিয়া অগ্রসর হয়—তাহারা চলিতে চলিতে আপনাকে বাঁধে, বাঁধিতে বাঁধিতে চলে—সেখানে চলিবার উপায় স্বভাবতই এই প্রণালী অবলম্বন করে, তাহা চালকদের কৌশল নহে। বন্দিশালায় যে বন্ধনে স্থির করিয়া রাখে দুর্গম পথে সেই বন্ধনই গতির সহায়। ভারতবর্ষেও সমাজ কেবলই দড়িদড়া লইয়া আপনাকে বাঁধিতে বাঁধিতে চলিয়াছে কেননা নিজের পথে অগ্রসর

হওয়া অপেক্ষা পিছলিয়া অন্তের পথে নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা তাহার সম্পূর্ণ ছিল। এই জন্যই ভারতবর্ষে স্বভাবের নিয়মে আত্মরক্ষণীশক্তি আত্মপ্রসারণী শক্তির অপেক্ষা বড়ো হইয়া উঠিয়াছে।

রামচন্দ্রের জীবন আলোচনায় আমরা ইহাই দেখিলাম যে ক্ষত্রিয়েরা একদিন ধর্মকে এমন একটা ঐক্যের দিকে পাইয়াছিলেন যাহাতে অনার্যদের সহিত বিরুদ্ধতাকে তাঁহারা মিলননীতির দ্বারাই সহজে অতিক্রম করিতে পারিয়াছিলেন। দুই পক্ষের চিরন্তন প্রাণান্তিক সংগ্রাম কখনো কোনো সমাজের পক্ষে হিতকর হইতে পারে না—হয় এক পক্ষকে মারিতে, নয় দুই পক্ষকে মিলিতে হইবে। ভারতবর্ষে একদা ধর্মকে আশ্রয় করিয়া সেই মিলনের কাজ আরম্ভ হইয়াছিল। প্রথমে এই ধর্ম ও এই মিলননীতি বাধা পাইয়াছিল কিন্তু অবশেষে ব্রাহ্মণেরা ইহাকে স্বীকার করিয়া আত্মসাৎ করিয়া লইলেন।

আর্যে অনার্যে যখন অল্প অল্প করিয়া যোগ স্থাপন হইতেছে তখন অনার্যদের ধর্মের সঙ্গেও বোঝাপড়া করার প্রয়োজন ঘটিয়াছিল। এই সময়ে অনার্যদের দেবতা শিবের সঙ্গে আর্যউপাসকদের একটা বিরোধ চলিতেছিল, এবং সেই বিরোধে কখনো আর্যেরা কখনো অনার্যেরা জয়ী হইতেছিল। কৃষ্ণের অনুবর্তী অর্জুন কিরাতদের দেবতা শিবের কাছে একদিন হার মানিয়াছিলেন। শিবভক্ত বাণ-অসুরের কন্যা উষাকে কৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধ হরণ করিয়াছিলেন—এই সংগ্রামে কৃষ্ণ জয়ী হইয়াছিলেন। বৈদিক যজ্ঞে অনার্য শিবকে দেবতা বলিয়া স্বীকার করা হয় নাই, সেই উপলক্ষ্যে শিবের অনার্য অনুচরগণ যজ্ঞ নষ্ট করিয়াছিল। অবশেষে শিবকে বৈদিক রুদ্রের সহিত মিলাইয়া একদিন তাঁহাকে আপন করিয়া লইয়া আর্য অনার্যের এই ধর্মবিরোধ মিটাইতে হইয়াছিল। তথাপি দেবতা যখন অনেক হইয়া পড়েন তখন তাঁহাদের মধ্যে কে বড়ো কে ছোটো সে বিবাদ সহজে মিটিতে চায় না। তাই মহাভারতে রুদ্রের সহিত বিষ্ণুর সংগ্রামের উল্লেখ আছে—সেই সংগ্রামে রুদ্র বিষ্ণুকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন।

মহাভারত আলোচনা করিলে স্পষ্টই দেখা যায় বিরোধের মধ্য দিয়াও আর্যদের সহিত অনার্যদের রক্তের মিলন ও ধর্মের মিলন ঘটিতেছিল। এইরূপে যতই বর্ণসংকর ও ধর্মসংকর উৎপন্ন হইতে লাগিল ততই সমাজের আত্মরক্ষণীশক্তি বারংবার সীমানির্ণয় করিয়া আপনাকে বাঁচাইতে চেষ্টা করিয়াছে। যাহাকে ত্যাগ করিতে পারে নাই তাহাকে গ্রহণ করিয়া বাঁধ বাঁধিয়া দিয়াছে। মনুতে বর্ণসংকরের বিরুদ্ধে যে চেষ্টা আছে এবং তাহাতে মূর্তি-পূজা-ব্যবসায়ী দেবল ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে যে ঘৃণা প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতে বুঝা যায় রক্তে ও ধর্মে অনার্যদের মিশ্রণকে গ্রহণ করিয়াও তাহাকে বাধা দিবার

প্রয়াস কোনো দিন নিরস্ত হয় নাই। এইরূপে প্রসারণের পরমুহূর্তেই সংকোচন আপনাকে বারংবার অত্যন্ত কঠিন করিয়া তুলিয়াছে।

একদিন ইহারই একটা প্রবল প্রতিক্রিয়া ভারতবর্ষের দুই ক্ষত্রিয় রাজসন্ন্যাসীকে আশ্রয় করিয়া প্রচণ্ডশক্তিতে প্রকাশ পাইয়াছে। ধর্মনীতি যে একটা সত্য পদার্থ, তাহা যে সামাজিক নিয়মমাত্র নহে—সেই ধর্মনীতিকে আশ্রয় করিয়াই যে মানুষ মুক্তি পায়, সামাজিক বাহ্য প্রথাপালনের দ্বারা নহে, এই ধর্মনীতি যে মানুষের সহিত মানুষের কোনো ভেদকে চিরন্তন সত্য বলিয়া গণ্য করিতে পারে না ক্ষত্রিয় তাপস বুদ্ধ ও মহাবীর সেই মুক্তির বার্তাই ভারতবর্ষে প্রচার করিয়াছিলেন। আশ্চর্য এই যে তাহা দেখিতে দেখিতে জাতির চিরন্তন সংস্কার ও বাধা অতিক্রম করিয়া সমস্ত দেশকে অধিকার করিয়া লইল। এইবার অতি দীর্ঘকাল পর্যন্ত ভারতবর্ষে ক্ষত্রিয়গুরুর প্রভাব ব্রাহ্মণের শক্তিকে একেবারে অভিভূত করিয়া রাখিয়াছিল।

সেটা সম্পূর্ণ ভালো হইয়াছিল এমন কথা কোনোমতেই বলিতে পারি না। এইরূপ একপক্ষের ঐকান্তিকতায় জাতি প্রকৃতিস্থ থাকিতে পারে না, তাহার স্বাস্থ্য নষ্ট হইতে বাধ্য। এই কারণেই বৌদ্ধযুগ ভারতবর্ষকে তাহার সমস্ত সংস্কারজাল হইতে মুক্ত করিতে গিয়া যেরূপ সংস্কারজালে বদ্ধ করিয়া দিয়াছে এমন আর কোনোকালেই করে নাই। এতদিন ভারতবর্ষে আর্য অনার্যের যে মিলন ঘটিতেছিল তাহার মধ্যে পদে পদে একটা সংযম ছিল- মাঝে মাঝে বাঁধ বাঁধিয়া প্রলয়স্রোতকে ঠেকাইয়া রাখা হইতেছিল। আর্যজাতি অনার্যের কাছ হইতে যাহা কিছু গ্রহণ করিতেছিল তাহাকে আর্য করিয়া লইয়া আপন প্রকৃতির অনুগত করিয়া লইতেছিল—এমনি করিয়া ধীরে ধীরে একটি প্রাণবান জাতীয় কলেবর গড়িয়া আর্যে অনার্যে একটি আন্তরিক সংস্রব ঘটিবার সম্ভাবনা হইয়া উঠিতেছিল। নিশ্চয়ই সেই মিলন-ব্যাপারের মাঝখানে কোনো এক সময়ে বাঁধাবাঁধি ও বাহ্যিকতার মাত্রা অত্যন্ত বেশি হইয়া পড়িয়াছিল, নহিলে এত বড়ো বিপ্লব উৎপন্ন হইতেই পারিত না এবং সে বিপ্লব কোনো সৈন্যবল আশ্রয় না করিয়া কেবলমাত্র ধর্মবলে সমস্ত দেশকে এমন করিয়া আচ্ছন্ন করিতে পারিত না। নিশ্চয়ই তৎপূর্বে সমাজের শ্রেণীতে শ্রেণীতে ও মানুষের অন্তরে বাহিরে বৃহৎ একটা বিচ্ছেদ ঘটিয়া স্বাস্থ্যকর সামঞ্জস্য নষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু ইহার প্রতিক্রিয়াও তেমনি প্রবল হইয়া একেবারে সমাজের ভিত্তিতে গিয়া আঘাত করিল। রোগের আক্রমণও যেমন নিদারুণ, চিকিৎসার আক্রমণও তেমনি সংঘাতিক হইয়া প্রকাশ পাইল।

অবশেষে একদিন এই বৌদ্ধপ্রভাবের বন্যা যখন সরিয়া গেল তখন দেখা গেল সমাজের সমস্ত বেড়াগুলা ভাঙিয়া গিয়াছে। যে একটি ব্যবস্থার ভিতর দিয়া ভারতবর্ষের

জাতিবৈচিত্র্য ঐক্যলাভের চেষ্টা করিতেছিল সেই ব্যবস্থাটা ভূমিসাৎ হইয়াছে। বৌদ্ধধর্ম ঐক্যের চেষ্টাতেই ঐক্য নষ্ট করিয়াছে। ভারতবর্ষে সমস্ত অনৈক্যগুলি অবাধে মাথা তুলিয়া উঠিতে লাগিল—যাহা বাগান ছিল তাহা জঙ্গল হইয়া উঠিল।

তাহার প্রধান কারণ এই, একদিন ভারতসমাজে কখনো ব্রাহ্মণ কখনো ক্ষত্রিয় যখন প্রাধান্য লাভ করিতেছিলেন তখনও উভয়ের ভিতরকার একটা জাতিগত ঐক্য ছিল। এইজন্য তখনকার জাতি-রচনাকার্য আর্যদের হাতেই ছিল। কিন্তু বৌদ্ধপ্রভাবের সময় কেবল ভারতবর্ষের ভিতরকার অনার্যেরা নহে ভারতবর্ষের বাহির হইতেও অনার্যদের সমাগম হইয়া তাহারা এমন একটি প্রবলতা লাভ করিল যে আর্যদের সহিত তাহাদের সুবিহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করা কঠিন হইয়া উঠিল। যতদিন বৌদ্ধধর্মের বল ছিল ততদিন এই অসামঞ্জস্য অস্বাস্থ্য আকারে প্রকাশ পায় নাই কিন্তু বৌদ্ধধর্ম যখন দুর্বল হইয়া পড়িল তখন তাহা নানা অদ্ভুত অসংগতিরূপে অবাধে সমস্ত দেশকে একেবারে ছাইয়া ফেলিল।

অনার্যেরা এখন সমস্ত বাধা ভেদ করিয়া একেবারে সমাজের মাঝখানে আসিয়া বসিয়াছে সুতরাং এখন তাহাদের সহিত ভেদ ও মিলন বাহিরের নহে তাহা একেবারে সমাজের ভিতরের কথা হইয়া পড়িল।

এই বৌদ্ধপ্লাবনে আর্যসমাজে কেবলমাত্র ব্রাহ্মণসম্প্রদায় আপনাকে স্বতন্ত্র রাখিতে পারিয়াছিল কারণ আর্যজাতির স্বাতন্ত্র্য রক্ষার ভার চিরকাল ব্রাহ্মণের হাতে ছিল। যখন ভারতবর্ষে বৌদ্ধযুগের মধ্যাহ্ন তখনও ধর্মসমাজে ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ এ ভেদ বিলুপ্ত হয় নাই। কিন্তু তখন সমাজে আর সমস্ত ভেদই লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। তখন ক্ষত্রিয়েরা জনসাধারণের সঙ্গে অনেক পরিমাণে মিলাইয়া গিয়াছিল।

অনার্যের সহিত বিবাহ সম্বন্ধে ক্ষত্রিয়ের প্রায় কোনো বাধা ছিল না তাহা পুরাণে স্পষ্টই দেখা যায়। এই জন্য দেখা যায় বৌদ্ধযুগের পরবর্তী অধিকাংশ রাজবংশ ক্ষত্রিয়বংশ নহে।

এদিকে শক হুন প্রভৃতি বিদেশীয় অনার্যগণ দলে দলে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া সমাজের মধ্যে অবাধে মিশিয়া যাইতে লাগিল—বৌদ্ধধর্মের কাটা খাল দিয়া এই সমস্ত বন্যার জল নানা শাখায় একেবারে সমাজের মর্মস্থলে প্রবেশ করিল। কারণ, বাধা দিবার ব্যবস্থাটা তখন সমাজ-প্রকৃতির মধ্যে দুর্বল। এইরূপে ধর্মেকর্মে অনার্যসংমিশ্রণ অত্যন্ত প্রবল হওয়াতে সর্বপ্রকার অদ্ভুত উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে যখন কোনো সংগতির সূত্র রহিল না তখনই সমাজের অন্তরস্থিত আর্যপ্রকৃতি অত্যন্ত পীড়িত হইয়া আপনাকে প্রকাশ করিবার জন্য নিজের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিল। আর্যপ্রকৃতি নিজেকে

হারাইয়া ফেলিয়াছিল বলিয়াই নিজেকে সুস্পষ্টরূপে আবিষ্কার করিবার জন্য তাহার একটা চেষ্টা উদ্যত হইয়া উঠিল।

আমরা কী এবং কোন্ জিনিসটা আমাদের—চারিদিকের বিপুল বিশ্লিষ্টতার ভিতর হইতে এইটেকে উদ্ধার করিবার একটা মহাযুগ আসিল। সেই যুগেই ভারতবর্ষ আপনাকে ভারতবর্ষ বলিয়া সীমাচিহ্নিত করিল। তৎপূর্বে বৌদ্ধসমাজের যোগে ভারতবর্ষ পৃথিবীতে এত দূরদূরান্তরে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল যে সে আপনার কলেবরটাকে সুস্পষ্ট করিয়া দেখিতেই পাইতেছিল না। এইজন্য আর্য জনশ্রুতিতে প্রচলিত কোনো পুরাতন চক্রবর্তী সম্রাটের রাজ্যসীমার মধ্যে ভারতবর্ষ আপনার ভৌগোলিক সত্তাকে নির্দিষ্ট করিয়া লইল। তাহার পরে, সামাজিক প্রলয়ঝড়ে আপনার ছিন্নবিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত সূত্রগুলিকে খুঁজিয়া লইয়া জোড়া দিবার চেষ্টা চলিতে লাগিল। এই সময়েই সংগ্রহকর্তাদের কাজ দেশের প্রধান কাজ হইল। তখনকার যিনি ব্যাস, নূতন রচনা তাঁহার কাজ নহে পুরাতন সংগ্রহেই তিনি নিযুক্ত। এই ব্যাস একব্যক্তি না হইতে পারেন কিন্তু ইনি সমাজের একই শক্তি। কোথায় আর্যসমাজের স্থিরপ্রতিষ্ঠা ইনি তাহাই খুঁজিয়া একত্র করিতে লাগিলেন।

সেই চেষ্টার বশে ব্যাস বেদ সংগ্রহ করিলেন। যথার্থ বৈদিককালে মন্ত্র ও যজ্ঞানুষ্ঠানের প্রণালীগুলিকে সমাজ যত্ন করিয়া শিখিয়াছে ও রাখিয়াছে, তবু তখন তাহা শিক্ষণীয় বিদ্যামাত্র ছিল এবং সে বিদ্যাকেও সকলে পরাবিদ্যা বলিয়া মানিত না।

কিন্তু একদিন বিশ্লিষ্ট সমাজকে বাঁধিয়া তুলিবার জন্য এমন একটি পুরাতন শাস্ত্রকে মাঝখানে দাঁড় করাইবার দরকার হইয়াছিল যাহার সম্বন্ধে নানা লোক নানা প্রকার তর্ক করিতে পারিবে না—যাহা আর্যসমাজের সর্বপুরাতন বাণী; যাহাকে দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করিয়া বিচিত্র বিরুদ্ধসম্প্রদায়ও এক হইয়া দাঁড়াইতে পারিবে। এই জন্য বেদ যদিচ প্রাত্যহিক ব্যবহার হইতে তখন অনেক দূরবর্তী হইয়া পড়িয়াছিল তথাপি দূরের জিনিস বলিয়াই তাহাকে দূর হইতে মান্য করা সকলের পক্ষে সহজ হইয়াছিল। আসল কথা, যে জাতি বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল কোনো একটি দৃঢ়নিশ্চল কেন্দ্রকে স্বীকার না করিলে তাহার পরিধি নির্ণয় কঠিন হয়। তাহার পরে আর্যসমাজে যত কিছু জনশ্রুতি খণ্ড খণ্ড আকারে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল তাহাদিগকেও একত্র করিয়া মহাভারত নামে সংকলিত করা হইল।

যেমন একটি কেন্দ্রের প্রয়োজন, তেমনি একটি ধারাবাহিক পরিধিসূত্রও তো চাই—সেই পরিধিসূত্রই ইতিহাস। তাই ব্যাসের আর এক কাজ হইল ইতিহাস সংগ্রহ করা। আর্যসমাজের যত কিছু জনশ্রুতি ছড়াইয়া পড়িয়াছিল তাহাদিগকে তিনি এক

করিলেন। শুধু জনশ্রুতি নহে, আর্যসমাজে প্রচলিত সমস্ত বিশ্বাস, তর্কবিতর্ক ও চারিত্রনীতিকেও তিনি এই সঙ্গে এক করিয়া একটি জাতির সমগ্রতার এক বিরাট মূর্তি এক জায়গায় খাড়া করিলেন। ইহার নাম দিলেন মহাভারত। এই নামের মধ্যেই তখনকার আর্যজাতির একটি ঐক্য উপলব্ধির চেষ্টা বিশেষভাবে প্রকাশ পাইতেছে। আধুনিক পাশ্চাত্য সংজ্ঞা অনুসারে মহাভারত ইতিহাস না হইতে পারে কিন্তু ইহা যথার্থই আর্যদের ইতিহাস। ইহা কোনো ব্যক্তিবিশেষের রচিত ইতিহাস নহে, ইহা একটি জাতির স্বরচিত স্বাভাবিক ইতিবৃত্তান্ত। কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি যদি এইসমস্ত জনশ্রুতিকে গলাইয়া পোড়াইয়া বিশ্লিষ্ট করিয়া ইহা হইতে তথ্যমূলক ইতিহাস রচনা করিবার চেষ্টা করিত তবে আর্যসমাজের ইতিহাসের সত্য স্বরূপটি আমরা দেখিতে পাইতাম না। মহাভারত সংগ্রহের দিনে আর্যজাতির ইতিহাস আর্যজাতির স্মৃতিপটে যেরূপ রেখায় আঁকা ছিল, তাহার মধ্যে কিছু বা স্পষ্ট কিছু বা লুপ্ত, কিছু বা সুসংগত কিছু বা পরস্পরবিরুদ্ধ, মহাভারতে সেই সমস্তেরই প্রতিলিপি একত্র করিয়া রক্ষিত হইয়াছে।

এই মহাভারতে কেবল যে নির্বিচারে জনশ্রুতি সংকলন করা হইয়াছে তাহাও নহে। আতস-কাচের একপিঠে যেমন ব্যাপ্ত সূর্যালোক এবং আর একপিঠে যেমন তাহারই সংহত দীপ্তিরশ্মি, মহাভারতেও তেমনি একদিকে ব্যাপক জনশ্রুতিরাশি আর একদিকে তাহারই সমস্তটির একটি সংহত জ্যোতি—সেই জ্যোতিটিই ভগবদ্‌গীতা। জ্ঞান কর্ম ও ভক্তির যে সমন্বয়যোগ তাহাই সমস্ত ভারতইতিহাসের চরমতত্ত্ব। নিঃসন্দেহই পৃথিবীর সকল জাতিই আপন ইতিহাসের ভিতর দিয়া কোনো সমস্যার মীমাংসা কোনো তত্ত্বনির্ণয় করিতেছে, ইতিহাসের ভিতর দিয়া মানুষের চিত্ত কোনো একটি চরম সত্যকে সন্ধান ও লাভ করিতেছে—নিজের এই সন্ধানকে ও সত্যকে সকল জাতি স্পষ্ট করিয়া জানে না, অনেকে মনে করে পথের ইতিহাসই ইতিহাস, মূল অভিপ্রায় ও চরম গম্যস্থান বলিয়া কিছুই নাই। কিন্তু ভারতবর্ষ একদিন আপনার সমস্ত ইতিহাসের একটি চরমতত্ত্বকে দেখিয়াছিল। মানুষের ইতিহাসের জ্ঞান ভক্তি ও কর্ম অনেক সময়ে স্বতন্ত্রভাবে, এমন কি পরস্পর বিরুদ্ধভাবে আপনার পথে চলে; সেই বিরোধের বিপ্লব ভারতবর্ষে খুব করিয়াই ঘটিয়াছে বলিয়াই এক জায়গায় তাহার সমন্বয়টিকে স্পষ্ট করিয়া সে দেখিতে পাইয়াছে। মানুষের সকল চেষ্টাই কোনখানে আসিয়া অবিরোধে মিলিতে পারে মহাভারত সকল পথের চৌমাথায় সেই চরম লক্ষ্যের আলোকটি জ্বালাইয়া ধরিয়াছে। তাহাই গীতা। এই গীতার মধ্যে য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা লজিকগত অসংগতি দেখিতে পান। ইহাতে সাংখ্য, বেদান্ত এবং যোগকে যে একত্রে স্থান দেওয়া হইয়াছে

তাঁহারা মনে করেন সেটা একটা জোড়াতাড়া ব্যাপার—অর্থাৎ তাঁহাদের মতে ইহার মূলটি সাংখ্য ও যোগ, বেদান্তটি তাহার পরবর্তী কোনো সম্প্রদায়ের দ্বারা যোজনা করা। হইতেও পারে মূল ভগবদ্‌গীতা ভারতবর্ষের সাংখ্য ও যোগতত্ত্বকে আশ্রয় করিয়া উপদিষ্ট, কিন্তু মহাভারতসংকলনের যুগে সেই মূলের বিশুদ্ধতা-রক্ষাই প্রধান উদ্দেশ্য ছিল না—সমস্ত জাতির চিত্তকে সমগ্র করিয়া এক করিয়া দেখাই তখনকার সাধনা ছিল। অতএব যে গ্রন্থে তত্ত্বের সহিত জীবনকে মিলাইয়া মানুষের কর্তব্যপথ নির্দেশ করা হইয়াছে সে গ্রন্থে বেদান্ততত্ত্বকে তাঁহারা বাদ দিতে পারেন নাই। সাংখ্যই হউক যোগই হউক বেদান্তই হউক সকল তত্ত্বেরই কেন্দ্রস্থলে একই বস্তু আছেন, তিনি কেবলমাত্র জ্ঞান বা ভক্তি বা কর্মের আশ্রয় নহেন, তিনি পরিপূর্ণ মানবজীবনের পরমাগতি, তাঁহাতে আসিয়া না মিলিলে কোনো কথাই সত্যে আসিয়া পৌঁছিতে পারে না; অতএব ভারতচিত্তের সমস্ত প্রয়াসকেই সেই এক মূল সত্যের মধ্যে এক করিয়া দেখাই মহাভারতের দেখা। তাই মহাভারতের এই গীতার মধ্যে লজিকের ঐক্যতত্ত্ব সম্পূর্ণ না থাকিতেও পারে কিন্তু তাহার মধ্যে বৃহৎ একটি জাতীয় জীবনের অনির্বচনীয় ঐক্যতত্ত্ব আছে। তাহার স্পষ্টতা ও অস্পষ্টতা, সংগতি ও অসংগতির মধ্যে গভীরতম এই একটি উপলব্ধি দেখা যায় যে, সমস্তকে লইয়াই সত্য, অতএব এক জায়গায় মিল আছেই। এমন কি, গীতায় যজ্ঞকেও সাধনাক্ষেত্রে স্থান দিয়াছে। কিন্তু গীতায় যজ্ঞ-ব্যাপার এমন একটি বড় ভাব পাইয়াছে যাহাতে তাহার সংকীর্ণতা ঘুচিয়া সে একটি বিশ্বের সামগ্রী হইয়া উঠিয়াছে। যে সকল ক্রিয়াকলাপে মানুষ আত্মশক্তির দ্বারা বিশ্বশক্তিকে উদ্‌বোধিত করিয়া তোলে তাহাই মানুষের যজ্ঞ। গীতাকার যদি এখনকার কালের লোক হইতেন তবে সমস্ত আধুনিক বৈজ্ঞানিক অধ্যবসায়ের মধ্যে তিনি মানুষের সেই যজ্ঞকে দেখিতে পাইতেন। যেমন জ্ঞানের দ্বারা অনন্ত জ্ঞানের সঙ্গে যোগ, কর্মের দ্বারা অনন্ত মঙ্গলের সঙ্গে যোগ, ভক্তির দ্বারা অনন্ত ইচ্ছার সঙ্গে যোগ, তেমনি যজ্ঞের দ্বারা অনন্ত শক্তির সঙ্গে আমাদের যোগ—এইরূপে গীতায় ভূমার সঙ্গে মানুষের সকল প্রকারের যোগকেই সম্পূর্ণ করিয়া দেখাইয়াছেন—একদা যজ্ঞকাণ্ডের দ্বারা মানুষের যে চেষ্টা বিশ্বশক্তির সিংহদ্বারে আঘাত করিতেছিল গীতা তাহাকেও সত্য বলিয়া দেখিয়াছেন।

এইরূপে ইতিহাসের নানা বিক্ষিপ্ততার মধ্য হইতে তখনকার কালের প্রতিভা যেমন একটি মূলসূত্র খুঁজিয়া বাহির করিয়াছিল তেমনি বেদের মধ্য হইতেও তাহা একটি সূত্র উদ্ধার করিয়াছিল তাহাই ব্রহ্মসূত্র। তখনকার ব্যাসের এও একটি কীর্তি। তিনি যেমন একদিকে ব্যষ্টিকে রাখিয়াছেন আর-একদিকে তেমনি সমষ্টিকেও

প্রত্যক্ষগোচর করিয়াছেন ; তাঁহার সংকলন কেবল আয়োজনমাত্র নহে তাহা সংযোজন, শুধু সঞ্চয় নহে তাহা পরিচয়। সমস্ত বেদের নানা পথের ভিতর দিয়া মানুষের চিত্তের একটি সন্ধান ও একটি লক্ষ্য দেখিতে পাওয়া যায়—তাহাই বেদান্ত। তাহার মধ্যে একটি দ্বৈতেরও দিক আছে একটি অদ্বৈতেরও দিক আছে কারণ এই দুইটি দিক ব্যতীত কোনো একটি দিকও সত্য হইতে পারে না। লজিক ইহার কোনো সমন্বয় পায় না, এইজন্য যেখানে ইহার সমন্বয় সেখানে ইহাকে অনির্বচনীয় বলা হয়। ব্যাসের ব্রহ্মসূত্রে এই দ্বৈত অদ্বৈত দুই দিককেই রক্ষা করা হইয়াছে। এই জন্য পরবর্তীকালে এই একই ব্রহ্মসূত্রকে লজিক নানা বাদ বিবাদে বিভক্ত করিতে পারিয়াছে। ফলত ব্রহ্মসূত্রে আর্যধর্মের মূলতত্ত্বটি দ্বারা সমস্ত আর্যধর্মশাস্ত্রকে এক আলোকে আলোকিত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। কেবল আর্যধর্ম কেন সমস্ত মানবের ধর্মের ইহাই এক আলোক।

এইরূপে নানা বিরুদ্ধতার দ্বারা পীড়িত আর্যপ্রকৃতি একদিন আপনার সীমা নির্ণয় করিয়া আপনার মূল ঐক্যটি লাভ করিবার জন্য একান্ত যত্নে প্রবৃত্ত হইয়াছিল তাহার লক্ষণ স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়। তাই, আর্য জাতির বিধিনিষেধগুলি যাহা কেবল স্মৃতিরূপে নানাস্থানে ছড়াইয়া ছিল এই সময়ে তাহাও সংগৃহীত হইয়া লিপিবদ্ধ হইতে লাগিল।

আমরা এই যে মহাভারতের কথা এখানে আলোচনা করিলাম ইহাকে কেহ যেন কালগত যুগ না মনে করেন—ইহা ভাবগত যুগ—অর্থাৎ আমরা কোনো একটি সংকীর্ণ কালে ইহাকে বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করিতে পারি না। বৌদ্ধযুগের যথার্থ আরম্ভ কবে তাহা সুস্পষ্টরূপে বলা অসম্ভব—শাক্যসিংহের বহু পূর্বেই যে তাহার আয়োজন চলিতেছিল এবং তাঁহার পূর্বেও যে অন্য বুদ্ধ ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহা একটি ভাবের ধারাপরম্পরা যাহা গৌতমবুদ্ধে পূর্ণ পরিণতি লাভ করিয়াছিল। মহাভারতের যুগও তেমনি কবে আরম্ভ তাহা স্থির করিয়া বলিলে ভুল বলা হইবে। পূর্বেই বলিয়াছি সমাজের মধ্যে ছড়ানো ও কুড়ানো এক সঙ্গেই চলিতেছে। যেমন পূর্ব-মীমাংসা ও উত্তর মীমাংসা। ইহা যে পুরাতন পক্ষ ও নূতন পক্ষের বোঝাপড়া তাহাতে সন্দেহ নাই। একপক্ষ বলিতেছেন যেসকল মন্ত্র ও কর্মকাণ্ড চলিয়া আসিয়াছে তাহা অনাদি, তাহার বিশেষ গুণবশতই তাহার দ্বারাই চরমসিদ্ধি লাভ করা যায়। অপর পক্ষ বলিতেছেন জ্ঞান ব্যতীত আর কোনো উপায়ে মুক্তি নাই। যে দুই গ্রন্থ আশ্রয় করিয়া এই দুই মত বর্তমানে প্রচলিত আছে তাহার রচনাকাল যখনই হউক এই মতদ্বৈধ যে অতি পুরাতন তাহা নিঃসন্দেহ। এইরূপ আর্যসমাজের যে উদ্যম আপনার সামগ্রীগুলিকে বিশেষভাবে

সংগৃহীত ও শ্রেণীবদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে এবং যাহা সুদীর্ঘকাল ধরিয়া ভিন্ন ভিন্ন পুরাণ সংকলন করিয়া স্বজাতির প্রাচীন পথটিকে চিহ্নিত করিয়া আসিয়াছে তাহা বিশেষ কোনো সময়ে সীমাবদ্ধ নহে। আর্য অনার্যের চিরন্তন সংমিশ্রণের সঙ্গে সঙ্গেই ভারতবর্ষের এই দুই বিরুদ্ধ শক্তি চিরকালই কাজ করিয়া আসিয়াছে; ইহাই আমাদের বক্তব্য।

একথা কেহ যেন না মনে করেন যে অনার্যেরা আমাদিগকে দিবার মত কোনো জিনিস দেয় নাই। বস্তুত প্রাচীন দ্রাবিড়গণ সভ্যতায় হীন ছিল না। তাহাদের সহযোগে হিন্দুসভ্যতা, রূপে বিচিত্র, ও রসে গভীর হইয়াছে। দ্রাবিড় তত্ত্বজ্ঞানী ছিল না কিন্তু কল্পনা করিতে, গান করিতে এবং গড়িতে পারিত। কলাবিদ্যায় তাহারা নিপুণ ছিল এবং তাহাদের গণেশ দেবতার বধূ ছিল কলাবধূ। আর্যদের বিশুদ্ধ তত্ত্বজ্ঞানের সঙ্গে দ্রাবিড়ের রসপ্রবণতা ও রূপোদ্ভাবনী শক্তির সংমিশ্রণ-চেষ্টায় একটি বিচিত্র সামগ্রী গড়িয়া উঠিয়াছে। তাহা সম্পূর্ণ আর্যও নহে সম্পূর্ণ অনার্যও নহে, তাহাই হিন্দু। এই দুই বিরুদ্ধের নিরন্তর সমন্বয়প্রয়াসে ভারতবর্ষ একটি আশ্চর্য সামগ্রী পাইয়াছে। তাহা অনন্তকে অন্তের মধ্যে উপলব্ধি করিতে শিখিয়াছে এবং ভূমাকে প্রাত্যহিক জীবনের সমস্ত তুচ্ছতার মধ্যেও প্রত্যক্ষ করিবার অধিকার লাভ করিয়াছে। এই কারণেই ভারতবর্ষে এই দুই বিরুদ্ধ যেখানে না মেলে সেখানে মূঢ়তা ও অন্ধ সংস্কারের আর অন্ত থাকে না; যেখানে মেলে সেখানে অনন্তের অন্তহীন রসরূপ আপনাকে অবাধে সর্বত্র উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেয়। এই কারণেই ভারতবর্ষ এমন একটি জিনিস পাইয়াছে যাহাকে ঠিকমত ব্যবহার করা সকলের সাধ্যায়ত্ত নহে, এবং ঠিকমত ব্যবহার করিতে না পারিলে যাহা জাতির জীবনকে মূঢ়তার ভারে ধূলিলুণ্ঠিত করিয়া দেয়। আর্য ও দ্রাবিড়ের এই চিত্তবৃত্তির বিরুদ্ধতার সম্মিলন যেখানে সিদ্ধ হইয়াছে সেখানে সৌন্দর্য জাগিয়াছে, যেখানে হওয়া সম্ভবপর হয় নাই সেখানে কদর্যতার সীমা দেখি না। একথাও মনে রাখিতে হইবে শুধু দ্রাবিড় নহে, বর্বর অনার্যদের সামগ্রীও একদিন দ্বার খোলা পাইয়া অসংকোচে আর্যসমাজে প্রবেশলাভ করিয়াছে। এই অনধিকার প্রবেশের বেদনাবোধ বহুকাল ধরিয়া আমাদের সমাজে সুতীব্র হইয়া ছিল।

যুদ্ধ এখন বাহিরে নহে যুদ্ধ এখন দেহের মধ্যে—কেননা অস্ত্র এখন শরীরের মধ্যেই প্রবেশ করিয়াছে, শত্রু এখন ঘরের ভিতরে। আর্য সভ্যতার পক্ষে ব্রাহ্মণ এখন একমাত্র। এই জন্য এই সময়ে বেদ যেমন অভ্রান্ত ধর্মশাস্ত্ররূপে সমাজস্থিতির সেতু হইয়া দাঁড়াইল, ব্রাহ্মণও সেইরূপ সমাজে সর্বোচ্চ পূজ্যপদ গ্রহণের চেষ্টা করিতে লাগিল। তখনকার পুরাণে ইতিহাসে কাব্যে সর্বত্রই এই চেষ্টা এমনি প্রবল আকারে পুনঃপুন

প্রকাশ পাইতেছে যে, স্পষ্টই বুঝা যায় যে তাহা একটা প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে প্রয়াস, তাহা উজানস্রোতে গুণটানা, এইজন্য গুণবন্ধন অনেকগুলি এবং কঠিন টানের বিরামমাত্র নাই। ব্রাহ্মণের এই চেষ্টাকে কোনো একটি সম্প্রদায়বিশেষের স্বার্থসাধন ও ক্ষমতালাভের চেষ্টা মনে করিলে ইতিহাসকে সংকীর্ণ ও মিথ্যা করিয়া দেখা হয়। এ চেষ্টা তখনকার সংকটগ্রস্ত আর্যজাতির অন্তরের চেষ্টা। ইহা আত্মরক্ষার প্রাণপণ প্রযত্ন। তখন সমস্ত সমাজের লোকের মনে ব্রাহ্মণের প্রভাবকে সর্বতোভাবে অক্ষুণ্ণ করিয়া তুলিতে না পারিলে যাহা চারিদিকে ভাঙিয়া পড়িতেছিল তাহাকে জুড়িয়া তুলিবার কোনো উপায় ছিল না।

এই অবস্থায় ব্রাহ্মণদের দুইটি কাজ হইল। এক, পূর্বধারাকে রক্ষা করা, আর এক, নূতনকে তাহার সহিত মিলাইয়া লওয়া। জীবনীপ্রক্রিয়ার এই দুইটি কাজই তখন অত্যন্ত বাধাগ্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিল বলিয়াই ব্রাহ্মণের ক্ষমতা ও অধিকারকে এমন অপরিমিত করিয়া তুলিতে হইয়াছিল। অনার্যদেবতাকে বেদের প্রাচীন মঞ্চে তুলিয়া লওয়া হইল, বৈদিক রুদ্র উপাধি গ্রহণ করিয়া শিব আর্য-দেবতার দলে স্থান পাইলেন। এইরূপে ভারতবর্ষে সামাজিক মিলন ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরে রূপ গ্রহণ করিল। ব্রহ্মায় আর্যসমাজের আরম্ভকাল, বিষ্ণুতে মধ্যাহ্নকাল, এবং শিবে তাহার শেষ পরিণতির রূপ রহিল।

শিব যদিচ রুদ্রনামে আর্যসমাজে প্রবেশ করিলেন তথাপি তাঁহার মধ্যে আর্য ও অনার্য এই দুই মূর্তিই স্বতন্ত্র হইয়া রহিল। আর্যের দিকে তিনি যোগীশ্বর, কামকে ভস্ম করিয়া নির্বাণের আনন্দে নিমগ্ন, তাঁহার দিগ্‌বাস সন্ন্যাসীর ত্যাগের লক্ষণ ; অনার্যের দিকে তিনি বীভৎস, রক্তাক্ত গজাজিনধারী গঞ্জিকা ও ভাং ধুতুরায় উন্মত্ত। আর্যের দিকে তিনি বুদ্ধেরই প্রতিরূপ এবং সেই রূপেই তিনি সর্বত্র সহজেই বুদ্ধমন্দিরসকল অধিকার করিতেছেন ; অন্যদিকে তিনি ভূত প্রেত প্রভৃতি শ্মশানচর সমস্ত বিভীষিকা এবং সর্পপূজা, বৃষপূজা, বৃক্ষপূজা, লিঙ্গপূজা প্রভৃতি আত্মসাৎ করিয়া সমাজের অন্তর্গত অনার্যদের সমস্ত তামসিক উপাসনাকে আশ্রয় দান করিতেছেন। একদিকে প্রবৃত্তিকে শান্ত করিয়া নির্জনে ধ্যানে জপে তাঁহার সাধনা ; অন্যদিকে চড়কপূজা প্রভৃতি ব্যাপারে নিজেকে প্রমত্ত করিয়া তুলিয়া ও শরীরকে নানা প্রকারে ক্লেশে উত্তেজিত করিয়া নিদারুণভাবে তাঁহার আরাধনা।

এইরূপে আর্য অনার্যের ধারা গঙ্গাযমুনার মতো একত্র হইল তবু তাহার দুই রং পাশাপাশি রহিয়া গেল। এইরূপে বৈষ্ণব ধর্মের মধ্যেও কৃষ্ণের নামকে আশ্রয় করিয়া যেসমস্ত কাহিনী প্রবেশ করিল তাহা পাণ্ডবসখা ভাগবতধর্মপ্রবর্তক বীরশ্রেষ্ঠ দ্বারকাপুরীর শ্রীকৃষ্ণের কথা নহে। বৈষ্ণব ধর্মের একদিকে ভগবদ্‌গীতার বিশুদ্ধ অবিমিশ্র

উচ্চ ধর্মতত্ত্ব রহিল, আর-একদিকে অনার্য আভীর গোপজাতির লোকপ্রচলিত দেবলীলার বিচিত্র কথা তাহার সহিত যুক্ত হইল। শৈবধর্মকে আশ্রয় করিয়া যে জিনিসগুলি মিলিত হইল তাহা নিরাভরণ এবং নিদারুণ; তাহার শান্তি এবং তাহার মত্ততা তাহার স্থাণুবৎ অচল স্থিতি এবং তাহার উদ্দাম তাণ্ডবনৃত্য উভয়ই বিনাশের ভাবসূত্রটিকে আশ্রয় করিয়া গাঁথা পড়িল। বাহিরের দিকে তাহা আসক্তিবন্ধন ছেদন ও মৃত্যু, অন্তরের দিকে তাহা একের মধ্যে বিলয়—ইহাই আর্য-সভ্যতার অদ্বৈতসূত্র। ইহাই নেতি নেতির দিক—ত্যাগ ইহার আভরণ, শ্মশানেই ইহার বাস। বৈষ্ণব ধর্মকে আশ্রয় করিয়া লোকপ্রচলিত যে পুরাণকাহিনী আর্যসমাজে প্রতিষ্ঠিত হইল, তাহার মধ্যে প্রেমের, সৌন্দর্যের এবং যৌবনের লীলা; প্রলয়পিনাকের স্থলে সেখানে বাঁশির ধ্বনি; ভূতপ্রেতের স্থলে সেখানে গোপিনীদের বিলাস; সেখানে বৃন্দাবনের চিরবসন্ত এবং গোলোকধামের চির-ঐশ্বর্য; এইখানে আর্যসভ্যতার দ্বৈতসূত্র।

একটি কথা মনে রাখা আবশ্যক। এই যে আভীরসম্প্রদায়-প্রচলিত কৃষ্ণকথা বৈষ্ণবধর্মের সহিত মিশিয়া গিয়াছে তাহার কারণ এই যে, এখানে পরস্পর মিশিবার একটি সত্যপথ ছিল। নায়ক নায়িকার সম্বন্ধকে জীব ও ভগবানের সম্বন্ধের রূপক ভাবে পৃথিবীর নানাস্থানেই মানুষ স্বীকার করিয়াছে। আর্যবৈষ্ণব ভক্তির এই তত্ত্বটিকে অনার্যদের কাহিনীর সঙ্গে মিলিত করিয়া সেইসমস্ত কাহিনীকে একটি উচ্চতম সত্যের মধ্যে উত্তীর্ণ করিয়া লইল। অনার্যের চিত্তে যাহা কেবল রসমাদকতারূপে ছিল আর্য তাহাকে সত্যের মধ্যে নিত্যপ্রতিষ্ঠ করিয়া দেখিল—তাহা কেবল বিশেষ জাতির বিশেষ একটি পুরাণকথারূপে রহিল না, তাহা সমস্ত মানবের একটি চিরন্তন আধ্যাত্মিক সত্যের রূপকরূপে প্রকাশ পাইল। আর্য এবং দ্রাবিড়ের সম্মিলনে এইরূপে হিন্দুসভ্যতায় সত্যের সহিত রূপের বিচিত্র সম্মিলন ঘটিয়া আসিয়াছে—এইখানে জ্ঞানের সহিত রসের, একের সহিত বিচিত্রের অন্তরতর সংযোগ ঘটিয়াছে।

আর্যসমাজের মূলে পিতৃশাসনতন্ত্র, অনার্যসমাজের মূলে মাতৃশাসনতন্ত্র। এইজন্য বেদে স্ত্রীদেবতার প্রাধান্য নাই। আর্যসমাজে অনার্যপ্রভাবের সঙ্গে এই স্ত্রীদেবতাদের প্রাদুর্ভাব ঘটিতে লাগিল। তাহা লইয়াও যে সমাজে বিস্তর বিরোধ ঘটিয়াছে প্রাকৃত সাহিত্যে তাহার নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। এই দেবীতন্ত্রের মধ্যেও একদিকে হৈমবতী উমার সুশোভনা আর্যমূর্তি অন্যদিকে করালী কালিকার কপালমালিনী বিবসনা অনার্যমূর্তি।

কিন্তু সমস্ত অনার্য অনৈক্যকে তাহার সমস্ত কল্পনাকাহিনী আচার ও পূজাপদ্ধতি লইয়া আর্যভাবের ঐক্যসূত্রে আদ্যোপান্ত মিলিত করিয়া তোলা কোনোমতেই সম্ভবপর

হয় না—তাহার সমস্তটাকেই রক্ষা করিতে গেলে তাহার মধ্যে শত সহস্র অসংগতি থাকিয়া যায়। এইসমস্ত অসংগতির কোনোপ্রকার সমন্বয় হয় না—কেবল কালক্রমে তাহা অভ্যস্ত হইয়া যায় মাত্র। এই অভ্যাসের মধ্যে অসংগতিগুলি একত্র থাকে, তাহাদের মিলিত করিবার প্রয়োজনবোধও চলিয়া যায়। তখন ধীরে ধীরে এই নীতিই সমাজে প্রবল হইয়া উঠে যে, যাহার যেরূপ শক্তি ও প্রবৃত্তি সে সেইরূপ পূজা আচার লইয়াই থাক্। ইহা একপ্রকার হাল ছাড়িয়া দেওয়া নীতি। যখন বিরুদ্ধগুলিকে পাশে রাখিতেই হইবে অথচ কোনো মতেই মিলাইতে পারা যাইবে না, তখন এই কথা ছাড়া অন্য কথা হইতেই পারে না।

এইরূপে বৌদ্ধযুগের প্রলয়াবসানে বিপর্যস্ত সমাজের নূতন পুরাতন সমস্ত বিচ্ছিন্ন পদার্থ লইয়া ব্রাহ্মণ যেমন করিয়া পারে সেগুলিকে সাজাইয়া শৃঙ্খলাবদ্ধ করিতে বসিল। এমন অবস্থায় স্বভাবতই শৃঙ্খল অত্যন্ত কঠিন হইয়া উঠে। যাহারা স্বতই স্বতন্ত্র, যাহারা নানা জাতির নানা কালের সামগ্রী, তাহাদিগকে এক করিয়া বাঁধিতে গেলে বাঁধন অত্যন্ত আঁট করিয়া রাখিতে হয়—তাহারা জীবনধর্মের নিয়ম অনুসারে আপনার যোগ আপনিই সাধন করে না।

ভারতবর্ষে ইতিহাসের আরম্ভযুগে যখন আর্য অনার্যে যুদ্ধ চলিতেছিল তখন দুই পক্ষের মধ্যে একটা প্রবল বিরোধ ছিল। এই প্রকার বিরোধের মধ্যেও এক প্রকারের সমকক্ষতা থাকে। মানুষ যাহার সঙ্গে লড়াই করে তাহাকে তীব্রভাবে দ্বেষ করিতে পারে কিন্তু তাহাকে মনের সঙ্গে অবজ্ঞা করিতে পারে না। এই জন্য ক্ষত্রিয়েরা অনার্যের সহিত যেমন লড়াই করিয়াছে তেমনি তাহাদের সহিত মিলিতও হইয়াছে। মহাভারতে ক্ষত্রিয়দের বিবাহের ফর্দ ধরিলেই তাহা বুঝা যাইবে।

কিন্তু ইতিহাসের পরবর্তী যুগে যখন আর-একদিন অনার্য বিরোধ তীব্র হইয়া উঠিয়াছিল অনার্যেরা তখন আর বাহিরে নাই তাহারা একেবারে ঘরে ঢুকিয়া পড়িয়াছে। সুতরাং তখন যুদ্ধ করিবার দিন আর নাই। এই জন্য সেই অবস্থায় বিদ্বেষ একান্ত একটা ঘৃণার আকার ধরিয়াছিল। এই ঘৃণাই তখন অস্ত্র। ঘৃণার দ্বারা মানুষকে কেবল যে দূরে ঠেকাইয়া রাখা যায় তাহা নহে, যাহাকে সকল প্রকারে ঘৃণা করা যায় তাহারও মন আপনি খাটো হইয়া আসে; সেও আপনার হীনতার সংকোচে সমাজের মধ্যে কুণ্ঠিত হইয়া থাকে; যেখানে সে থাকে সেখানে সে কোনোরূপ অধিকার দাবি করে না। এইরূপ যখন সমাজের একভাগ আপনাকে নিকৃষ্ট বলিয়াই স্বীকার করিয়া লয় এবং আর-একভাগ আপনার আধিপত্যে কোনো বাধাই পায় না—তখন নিচে সে যতই অবনত হয় উপরে যে থাকে সেও ততই নামিয়া পড়িতে থাকে। ভারতবর্ষে

আত্মপ্রসারণের দিনে যে অনার্যবিদ্বেষ ছিল এবং আত্মসংকোচনের দিনে যে অনার্যবিদ্বেষ জাগিল উহার মধ্যে অত্যন্ত প্রভেদ। প্রথম বিদ্বেষের সমতলটানে মনুষ্যত্ব খাড়া থাকে দ্বিতীয় বিদ্বেষের নিচের টানে মনুষ্যত্ব নামিয়া যায়। যাহাকে মারি সে যখন ফিরিয়া মারে তখন মানুষের মঙ্গল, যাহাকে মারি সে যখন নীরবে সে মার মাথা পাতিয়া লয় তখন বড়ো দুর্গতি। বেদে অনার্যদের প্রতি যে বিদ্বেষ প্রকাশ আছে তাহার মধ্যে পৌরুষ দেখিতে পাই, মনুসংহিতায় শূদ্রের প্রতি যে একান্ত অন্যায় ও নিষ্ঠুর অবজ্ঞা দেখা যায় তাহার মধ্যে কাপুরুষতারই লক্ষণ ফুটিয়াছে। মানুষের ইতিহাসে সর্বত্রই এইরূপ ঘটে। যেখানেই কোনো একপক্ষ সম্পূর্ণ একেশ্বর হয়, যেখানেই তাহার সমকক্ষ ও প্রতিপক্ষ কেহই থাকে না, সেখানেই কেবল বন্ধনের পর বন্ধনের দিন আসে, সেখানেই একেশ্বর প্রভু নিজের প্রতাপকে সকল দিক হইতেই সম্পূর্ণ বাধাহীনরূপে নিরাপদ করিতে গিয়া নিজের প্রতাপই নত করিয়া ফেলে। বস্তুত মানুষ যেখানেই মানুষকে ঘৃণা করিবার অপ্রতিহত অধিকার পায় সেখানে যে মাদক বিষ তাহার প্রকৃতির মধ্যে প্রবেশ করে তেমন নিদারুণ বিষ মানুষের পক্ষে আর কিছুই হইতে পারে না। আর্য ও অনার্য, ব্রাহ্মণ ও শূদ্র, য়ুরোপীয় ও এসিয়াটিক, আমেরিকান ও নিগ্রো, যেখানেই এই দুর্ঘটনা ঘটে সেখানেই দুই পক্ষের কাপুরুষতা পুঞ্জীভূত হইয়া মানুষের সর্বনাশকে ঘনাইয়া আনে। বরং শত্রুতা শ্রেয়, কিন্তু ঘৃণা ভয়ংকর।

ব্রাহ্মণ একদিন সমস্ত ভারতবর্ষীয় সমাজের একেশ্বর হইয়া উঠিল এবং সমাজবিধি সকলকে অত্যন্ত কঠিন করিয়া বাঁধিল। ইতিহাসে অত্যন্ত প্রসারণের যুগের পর অত্যন্ত সংকোচনের যুগ স্বভাবতই ঘটিল।

বিপদ হইল এই যে, পূর্বে সমাজে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় এই দুই শক্তি ছিল। এই দুই শক্তির বিরুদ্ধতার যোগে সমাজের গতি মধ্যপথে নিয়ন্ত্রিত হইতেছিল; এখন সমাজে সেই ক্ষত্রিয়শক্তি আর কাজ করিল না। সমাজের অনার্যশক্তি ব্রাহ্মণশক্তির প্রতিযোগীরূপে দাঁড়াইতে পারিল না—ব্রাহ্মণ তাহাকে অবজ্ঞার সহিত স্বীকার করিয়া লইয়া আপন পরাভবের উপরেও জয়স্তম্ভ স্থাপিত করিল।

এদিকে বাহির হইতে যে বীর জাতি এক সময়ে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া রাজপুত নামে ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত সিংহাসনগুলিই অধিকার করিয়া লইয়াছে, ব্রাহ্মণগণ অন্যান্য অনার্যদের ন্যায় তাহাদিগকেও স্বীকার করিয়া লইয়া একটি কৃত্রিম ক্ষত্রিয় জাতির সৃষ্টি করিল। এই ক্ষত্রিয়গণ বুদ্ধিপ্রকৃতিতে ব্রাহ্মণদের সমকক্ষ নহে। ইহারা প্রাচীন আর্য ক্ষত্রিয়দের ন্যায় সমাজের সৃষ্টিকার্যে আপন প্রতিভা প্রয়োগ করিতে পারে নাই, ইহারা সাহস ও বাহুবল লইয়া ব্রাহ্মণশক্তির সহায় ও অনুবর্তী হইয়া বন্ধনকে দৃঢ় করিবার দিকেই সম্পূর্ণ যোগ দিল।

এরূপ অবস্থায় কখনোই সমাজের ওজন ঠিক থাকিতে পারে না। আত্মপ্রসারের পথ একেবারে অবরুদ্ধ হইয়া একমাত্র আত্মরক্ষণীশক্তি সংকোচের দিকেই যখন পাকের পর পাক জড়াইয়া চলে তখন জাতির প্রতিভা স্ফূর্তি পাইতে পারে না। কারণ সমাজের এই বন্ধন একটা কৃত্রিম পদার্থ; এইরূপ শিকল দিয়া বাঁধার দ্বারা কখনো কলেবর গঠিত হয় না। ইহাতে কেবলই বংশানুক্রমে জাতির মধ্যে কালের ধর্মই জাগে ও জীবনের ধর্মই হ্রাস পায়; এরূপ জাতি চিন্তায় ও কর্মে কর্তৃত্বভাবের অযোগ্য হইয়া পরাধীনতার জন্যই সর্বতোভাবে প্রস্তুত হইতে থাকে। আর্যইতিহাসের প্রথম যুগে যখন সমাজের অভ্যাস-প্রবণতা বিস্তর বাহিরের জিনিস জমাইয়া তুলিয়া চলিবার পথ বন্ধ করিয়া দিতেছিল তখন সমাজের চিত্তবৃত্তি তাহার মধ্যে দিয়া ঐক্যের পথ সন্ধান করিয়া এই বহুর বাধা হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়াছিল। আজও সমাজে তেমনি আর একদিন আসিয়াছে। আজ বাহিরের জিনিস আরও অনেক বেশি এবং আরও অনেক অসংগত। তাহা আমাদের জাতির চিত্তকে ভারগ্রস্ত করিয়া দিতেছে। অথচ সমাজে সুদীর্ঘকাল ধরিয়া যে একমাত্র শক্তি আধিপত্য করিতেছে তাহা রক্ষণীশক্তি। তাহা যা-কিছু আছে তাহাকেই রাখিয়াছে, যাহা ভাঙিয়া পড়িতেছে তাহাকেও জমাইতেছে, যাহা উড়িয়া আসিয়া পড়িতেছে তাহাকেও কুড়াইতেছে। জাতির জীবনের গতিকে এইসকল অভ্যাসের জড়সঞ্চয় পদে পদে বাধা না দিয়া থাকিতে পারে না; ইহা মানুষের চিন্তাকে সংকীর্ণ ও কর্মকে সংরুদ্ধ করিবেই;—সেই দুর্গতি হইতে বাঁচাইবার জন্য এইকালেই সকলের চেয়ে সেই চিত্তশক্তিরই প্রয়োজন হইয়াছে যাহা জটিলতার মধ্য হইতে সরলকে, বাহ্যিকতার মধ্য হইতে অন্তরকে এবং বিচ্ছিন্নতার মধ্য হইতে এককে বাধামুক্ত করিয়া বাহির করিবে। অথচ আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে এই চিত্তশক্তিকেই অপরাধী করিয়া তাহাকে সমাজ হাজার শিকলে কারাগারে বন্দী করিয়া রাখিয়াছে।

কিন্তু তবু এই বন্ধনজর্জর চিত্ত একেবারে চুপ করিয়া থাকিতে পারে না। সমাজের একান্ত আত্ম-সংকোচনের অচৈতন্যের মধ্যেও তাহার আত্মপ্রসারণের উদ্বোধনচেষ্টা ক্ষণে ক্ষণে যুঝিয়াছে, ভারতবর্ষের মধ্য যুগে তাহার দৃষ্টান্ত দেখিয়াছি। নানক কবির প্রভৃতি গুরুগণ সেই চেষ্টাকেই আকার দিয়াছেন। কবিরের রচনা ও জীবন আলোচনা করিলে স্পষ্টই দেখা যায় তিনি ভারতবর্ষের সমস্ত বাহ্য আবর্জনাকে ভেদ করিয়া তাহার অন্তরের শ্রেষ্ঠ সামগ্রীকেই ভারতবর্ষের সত্যসাধনা বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছিলেন, এই জন্য তাঁহার পন্থীকে বিশেষরূপে ভারতপন্থী বলা হইয়াছে। বিপুল বিক্ষিপ্ততা ও অসংলগ্নতার মধ্যে ভারত যে কোন্ নিভৃতে সত্যে প্রতিষ্ঠিত আছে তাহা যেন ধ্যানযোগে তিনি সুস্পষ্ট দেখিতে পাইয়াছিলেন। সেই মধ্যযুগে পরে পরে বারবার সেইরূপ গুরুরই অভ্যুদয়

হইয়াছে—তাঁহাদের একমাত্র চেষ্টা এই ছিল যাহা বোঝা হইয়া উঠিয়াছে তাহাকেই সোজা করিয়া তোলা। ইহারাই লোকাচার, শাস্ত্রবিধি, ও সমস্ত চিরাভ্যাসের রুদ্ধ দ্বারে করাঘাত করিয়া সত্য ভারতকে তাহার বাহ্য বেষ্টনের অন্তঃপুরে জাগাইয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন।

সেই যুগের এখনও অবসান হয় নাই, সেই চেষ্টা এখনও চলিতেছে। এই চেষ্টাকে কেহ রোধ করিতে পারিবে না; কারণ ভারতবর্ষের ইতিহাসে আমরা প্রাচীনকাল হইতেই দেখিয়াছি, জড়ত্বের বিরুদ্ধে তাহার চিত্ত বরাবরই যুদ্ধ করিয়া আসিয়াছে;—ভারতের সমস্ত শ্রেষ্ঠ সম্পদ, তাহার উপনিষদ, তাহার গীতা, তাহার বিশ্বপ্রেমমূলক বৌদ্ধধর্ম সমস্তই এই মহাযুদ্ধে জয়লব্ধ সামগ্রী; তাহার শ্রীকৃষ্ণ তাহার শ্রীরামচন্দ্র এই মহাযুদ্ধেরই অধিনায়ক; আমাদের চিরদিনের সেই মুক্তিপ্রিয় ভারতবর্ষ বহুকালের জড়ত্বের নানা বোঝাকে মাথায় লইয়া একই জায়গায় শতাব্দীর পর শতাব্দী নিশ্চল পড়িয়া থাকিবে ইহা কখনোই তাহার প্রকৃতিগত নহে। ইহা তাহার দেহ নহে, ইহা তাহার জীবনের আনন্দ নহে, ইহা তাহার বাহিরের দায়।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, বহুর মধ্যে আপনাকে বিক্ষিপ্ত করিয়া ফেলা ভারতবর্ষের স্বভাব নহে, সে এককে পাইতে চায় বলিয়া বাহুল্যকে একের মধ্যে সংযত করাই ভারতের সাধনা। ভারতের অন্তরতম সত্যপ্রকৃতিই ভারতকে এই সমস্ত নিরর্থক বাহুল্যের ভীষণ বোঝা হইতে বাঁচাইবেই। তাহার ইতিহাস তাহার পথকে যতই অসাধ্যরূপে বাধাসংকুল করিয়া তুলুক না, তাহার প্রতিভা নিজের শক্তিতে এই পর্বত-প্রমাণ বিঘ্নব্যূহ ভেদ করিয়াই বাহির হইয়া যাইবে—যত বড়ো সমস্যা তত বড়োই তাহার তপস্যা হইবে। যাহা কালে কালে জমিয়া উঠিয়াছে তাহারই মধ্যে হাল ছাড়িয়া ডুবিয়া পড়িয়া ভারতবর্ষের চিরদিনের সাধনা এমন করিয়া চিরকালের মতো হার মানিবে না। এরূপ হার মানা যে মৃত্যুর পথ। যাহা যেখানে আসিয়া পড়িয়াছে তাহা যদি শুদ্ধমাত্র সেখানে পড়িয়াই থাকিত তবে সে অসুবিধা কোনো মতে সহ্য করা যাইত—কিন্তু তাহাকে যে খোরাক দিতে হয়। জাতিমাত্রেরই শক্তি পরিমিত—সে এমন কথা যদি বলে যে, যাহা আছে এবং যাহা আসে সমস্তকেই আমি নির্বিচারে পুষিব তবে এত রক্তশোষণে তাহার শক্তি ক্ষয় না হইয়া থাকিতে পারে না। যে সমাজ নিকৃষ্টকে বহন ও পোষণ করিতেছে উৎকৃষ্টকে সে উপবাসী রাখিতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই। মূঢ়ের জন্য মূঢ়তা, দুর্বলের জন্য দুর্বলতা, অনার্যের জন্য বীভৎসতা সমাজে রক্ষা করা কর্তব্য এ কথা কানে শুনিতে মন্দ লাগে না কিন্তু জাতির প্রাণভাণ্ডার হইতে যখন তাহার খাদ্য জোগাইতে হয় তখন জাতির যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ প্রত্যহই তাহার ভাগ

নষ্ট হয় এবং প্রত্যহই জাতির বুদ্ধি দুর্বল ও বীর্য মৃতপ্রায় হইয়া আসে। নীচের প্রতি যাহা প্রশ্রয় উচ্চের প্রতি তাহাই বঞ্চনা;—কখনোই তাহাকে ঔদার্য বলা যাইতে পারে না; ইহাই তামসিকতা—এবং এই তামসিকতা কখনোই ভারতবর্ষের সত্য সামগ্রী নহে।

ঘোরতর দুর্যোগের নিশীথ অন্ধকারেও এই তামসিকতার মধ্যে ভারতবর্ষ সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিয়া পড়িয়া থাকে নাই। যে সমস্ত অদ্ভুত দুঃস্বপ্নভার তাহার বুক চাপিয়া নিশ্বাস রোধ করিবার উপক্রম করিয়াছে তাহাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া সরল সত্যের মধ্যে জাগিয়া উঠিবার জন্য তাহার অভিভূত চৈতন্যও ক্ষণে ক্ষণে একান্ত চেষ্টা করিয়াছে। আজ আমরা যে-কালের মধ্যে বাস করিতেছি সে কালকে বাহির হইতে সুস্পষ্ট করিয়া দেখিতে পাই না; তবু অনুভব করিতেছি ভারতবর্ষ আপনার সত্যকে, এককে, সামঞ্জস্যকে ফিরিয়া পাইবার জন্য উদ্যত হইয়া উঠিয়াছে। নদীতে বাঁধের উপর বাঁধ পড়িয়াছিল, কতকাল হইতে তাহাতে আর স্রোত খেলিতেছিল না, আজ কোথায় তাহার প্রাচীর ভাঙিয়াছে—তাই আজ এই স্থির জলে আবার যেন মহাসমুদ্রের সংস্রব পাইয়াছি, আবার যেন বিশ্বের জোয়ার ভাটার আনাগোনা আরম্ভ হইয়াছে। এখনই দেখা যাইতেছে আমাদের সমস্ত নব্য উদ্‌যোগ সজীবহৃৎপিণ্ডচালিত রক্তস্রোতের মতো একবার বিশ্বের দিকে ছুটিতেছে একবার আপনার দিকে ফিরিতেছে, একবার সার্বজাতিকতা তাহাকে ঘরছাড়া করিতেছে একবার স্বাজাতিকতা তাহাকে ঘরে ফিরাইয়া আনিতেছে। একবার সে সর্বস্বের প্রতি লোভ করিয়া নিজস্বকে ছাড়িতে চাহিতেছে, আবার সে দেখিতেছে নিজস্বকে ছাড়িয়া রিক্ত হইলে কেবল নিজস্বই হারানো হয় সর্বস্বকে পাওয়া যায় না। জীবনের কাজ আরম্ভ হইবার এই তো লক্ষণ। এমনি করিয়া দুই ধাক্কার মধ্যে পড়িয়া মাঝখানের সত্য পথটি আমাদের জাতীয় জীবনে চিহ্নিত হইয়া যাইবে এবং এই কথা উপলব্ধি করিব যে স্বজাতির মধ্য দিয়াই সর্বজাতিকে ও সর্বজাতির মধ্য দিয়াই স্বজাতিকে সত্যরূপে পাওয়া যায়,—এই কথা নিশ্চিতরূপেই বুঝিব যে আপনাকে ত্যাগ করিয়া পরকে চাহিতে যাওয়া যেমন নিষ্ফল ভিক্ষুকতা, পরকে ত্যাগ করিয়া আপনাকে কুঞ্চিত করিয়া রাখা তেমনি দারিদ্র্যের চরম দুর্গতি।

১৩১৮

আত্মপরিচয়

আমাদের পরিচয়ের একটা ভাগ আছে, যাহা একেবারে পাকা— আমার ইচ্ছা অনুসারে যাহার কোনো নড়চড় হইবার জো নাই। তাহার আর একটা ভাগ আছে যাহা আমার স্বোপার্জিত— আমার বিদ্যা ব্যবহার ব্যবসায় বিশ্বাস অনুসারে যাহা আমি বিশেষ করিয়া লাভ করি এবং যাহার পরিবর্তন ঘটা অসম্ভব নহে। যেমন মানুষের প্রকৃতি; তাহার একটা দিক আছে যাহা মানুষের চিরন্তন, সেইটেই তাহার ভিত্তি,— সেইখানে সে উদ্ভিদ ও পশুর সঙ্গে স্বতন্ত্র, কিন্তু তাহার প্রকৃতির আর একটা দিক আছে যেখানে সে আপনাকে আপনি বিশেষভাবে গড়িয়া তুলিতে পারে—সেইখানেই একজন মানুষের সঙ্গে আর একজন মানুষের স্বাতন্ত্র্য।

মানুষের প্রকৃতির মধ্যে সবই যদি চিরন্তন হয়, কিছুই যদি তাহার নিজে গড়িয়া লইবার না থাকে, আপনার মধ্যে কোথাও যদি সে আপনার ইচ্ছা খাটাইবার জায়গা না পায় তবে তো সে মাটির ঢেলা। আবার যদি তাহার অতীতকালের কোনো একটা চিরন্তন ধারা না থাকে তাহার সমস্তই যদি আকস্মিক হয় কিংবা নিজের ইচ্ছা অনুসারেই আগাগোড়া আপনাকে যদি তাহার রচনা করিতে হয় তবে সে একটা পাগলামি, একটা আকাশকুসুম।

মানুষের এই প্রকৃতি অনুসারেই মানুষের পরিচয়। তাহার খানিকটা পাকা খানিকটা কাঁচা, তাহার এক জায়গায় ইচ্ছা খাটে না আর এক জায়গায় ইচ্ছারই সৃজনশালা। মানুষের সমস্ত পরিচয়ই যদি পাকা হয় অথবা তাহার সমস্তই যদি কাঁচা হয় তবে দুইই তাহার পক্ষে বিপদ।

আমি যে আমারই পরিবারের মানুষ সে আমার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না। আমার পরিবারের কেহ বা মাতাল, কেহ বা বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণীতে আসিয়া ঠেকিয়া গেল এবং লোকসমাজেও উচ্চশ্রেণীতে গণ্য হইল না। এই কারণেই আমি আমার পারিবারিক পরিচয়টাকে একেবারে চাপিয়া যাইতে পারি কিন্তু তাহা হইলে সত্যকে চাপা দেওয়া হইবে।

কিংবা হয়তো আমাদের পরিবারে পুরুষানুক্রমে কেহ কখনো হাবড়ার পুল পার হয় নাই কিংবা দুইদিন অন্তর গরম জলে স্নান করিয়া আসিয়াছে, তাই বলিয়া আমিও যে পুল পার হইব না কিংবা স্নানসম্বন্ধে আমাকে কার্পণ্য করিতেই হইবে একথা মানা যায় না।

অবশ্য, আমার সাত পুরুষে যাহা ঘটে নাই অষ্টমপুরুষে আমি যদি তাহাই করিয়া বসি, যদি হাবড়ার পুল পার হইয়া যাই তবে আমার বংশের সমস্ত মাসীপিসী ও খুড়োজ্যেঠার দল নিশ্চয়ই বিস্ফারিত চক্ষুতারকা ললাটের দিকে তুলিয়া বলিবে, "তুই অমুক গোষ্ঠীতে জন্মিয়াও পুল পারাপারি করিতে শুরু করিয়াছিস! ইহাও আমাদিগকে চক্ষে দেখিতে হইল!" চাই কি লজ্জায় ক্ষোভে তাঁহাদের এমন ইচ্ছাও হইতে পারে আমি পুলের অপর পারেই বরাবর থাকিয়া যাই কিন্তু তবু আমি যে সেই গোষ্ঠীরই ছেলে সে পরিচয়টা পাকা। মা মাসীরা রাগ করিয়া তাহা স্বীকার না করিলেও পাকা, আমি নিজে অভিমান করিয়া তাহা অস্বীকার করিলেও পাকা। বস্তুত পূর্ব-পুরুষগত যোগটা নিত্য, কিন্তু চলাফেরাসম্বন্ধে অভ্যাসটা নিত্য নহে।

আমাদের দেশে বর্তমানকালে, কী বলিয়া আপনার পরিচয় দিব তাহা লইয়া অন্তত ব্রাহ্মসমাজে একটা তর্ক উঠিয়াছে। অথচ এ তর্কটা রামমোহন রায়ের মনের মধ্যে একেবারেই ছিল না দেখিতে পাই। এদিকে তিনি সমাজপ্রচলিত বিশ্বাস ও পূজার্চনা ছাড়িয়াছেন, কোরান পড়িতেছেন, বাইবেল হইতে সত্যধর্মের সারসংগ্রহ করিতেছেন, অ্যাডাম সাহেবকে দলে টানিয়া ব্রহ্মসভা স্থাপন করিয়াছেন; সমাজে নিন্দায় কান পাতিবার জো নাই, তাঁহাকে সকলেই বিধর্মী বলিয়া গালি দিতেছে, এমন কি যদি কোনো নিরাপদ সুযোগ মিলিত তবে তাঁহাকে মারিয়া ফেলিতে পারে এমন লোকের অভাব ছিল না,—কিন্তু কী বলিয়া আপনার পরিচয় দিব সে বিষয়ে তাঁহার মনে কোনো দিন লেশমাত্র সংশয় ওঠে নাই। কারণ হাজার হাজার লোকে তাঁহাকে অহিন্দু বলিলেও তিনি হিন্দু এ সত্য যখন লোপ পাইবার নয় তখন এ সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া সময় নষ্ট করিবার কোনো দরকার ছিল না।

বর্তমানকালে আমরা কেহ কেহ এই লইয়া চিন্তা করিতে আরম্ভ করিয়াছি। আমরা যে কী, সে লইয়া আমাদের মনে একটা সন্দেহ জন্মিয়াছে। আমরা বলিতেছি আমরা আর কিছু নই আমরা ব্রাহ্ম। কিন্তু সেটা তো একটা নূতন পরিচয় হইল। সে পরিচয়ের শিকড় তো বেশি দূর যায় না আমি হয়তো কেবলমাত্র গতকল্য ব্রাহ্মসমাজে দীক্ষা লইয়া প্রবেশ করিয়াছি। ইহার চেয়ে পুরাতন ও পাকা পরিচয়ের ভিত্তি আমার কিছুই নাই? অতীতকাল হইতে প্রবাহিত কোনো একটা নিত্য লক্ষণ কি আমার মধ্যে একেবারেই বর্তায় নাই?

এরূপ কখনো সম্ভবই হইতে পারে না। অতীতকে লোপ করিয়া দিই এমন সাধ্যই আমার নাই; সুতরাং সেই অতীতের পরিচয় আমার ইচ্ছার উপর লেশমাত্র নির্ভর করিতেছে না।

কথা এই, সেই আমার অতীতের পরিচয়ে আমি হয়তো গৌরব বোধ করিতে না পারি। সেটা দুঃখের বিষয়। কিন্তু এইরূপ যে-সকল গৌরব পৈতৃক তাহার ভাগ-বাঁটোয়ারা সম্বন্ধে বিধাতা আমাদের সম্মতি লন না, এই সকল সৃষ্টিকার্যে কোনোরূপ ভোটের প্রথাও নাই। আমরা কেহ বা জর্মনির সম্রাটবংশে জন্মিয়াছি আবার কাহারও বা এমন বংশে জন্ম—ইতিহাসের পাতায় সোনালি অক্ষরে বা কালো অক্ষরে যাহার কোনো উল্লেখমাত্র নাই। ইহাকে জন্মান্তরের কর্মফল বলিয়াও কথঞ্চিৎ সান্ত্বনালাভ করিতে পারি অথবা এ সম্বন্ধে কোনো গভীর তত্ত্বালোচনার চেষ্টা না করিয়া ইহাকে সহজে স্বীকার করিয়া গেলেও বিশেষ কোনো ক্ষতি নাই।

অতএব, আমি হিন্দু এ কথা বলিলে যদি নিতান্তই কোনো লজ্জার কারণ থাকে তবে সে লজ্জা আমাকে নিঃশব্দে হজম করিতেই হইবে। কারণ, বিধাতার বিরুদ্ধে নালিশ করিতে হইলে সেই আপিলআদালতের জজ পাইব কোথায়?

ব্রাহ্মসমাজের কেহ কেহ এ সম্বন্ধে এইরূপ তর্ক করেন যে, হিন্দু বলিয়া নিজের পরিচয় দিলে মুসলমানের সঙ্গে আমার যোগ অস্বীকার করা হয়, তাহাতে ঔদার্যের ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে।

বস্তুত পরিচয়মাত্রেরই এই অসুবিধা আছে। এমন কি, যদি আমি বলি আমি কিছুই না, তবে যে বলে আমি কিছুই, তাহার সঙ্গে পার্থক্য ঘটে; হয়তো সেই সূত্রেই তাহার সঙ্গে আমার মারামারি লাঠালাঠি বাধিয়া যাইতে পারে। আমি যাহা এবং আমি যাহা নই এই দুইয়ের মধ্যে একটা বিচ্ছেদ আছে—পরিচয়মাত্রই সেই বিচ্ছেদেরই পরিচয়।

এই বিচ্ছেদের মধ্যে হয়তো কোনো একপক্ষের অপ্রিয়তার কারণ আছে। আমি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলিয়াই হয়তো কোনো একজন বা একদল লোক আমার প্রতি খড়্গহস্ত হইতে পারে। এটা যদি আমি বাঞ্ছনীয় না মনে করি তবে আমার সাধ্যমতো আমার তরফ হইতে অপ্রিয়তার কারণ দূর করিতে চেষ্টা করাই আমার কর্তব্য—যদি এটা কোনো সংগত ও উচিত কারণের উপর নির্ভর না করে, যদি অন্ধসংস্কারমাত্র হয়, তবে আমার নামের সঙ্গে সঙ্গে এই অহেতুক বিদ্বেষটুকুকেও আমার বহন করিতে হইবে। আমি রবীন্দ্রনাথ নই বলিয়া শান্তিস্থাপনের প্রয়াসকে কেহই প্রশংসা করিতে পারিবে না।

ইহার উত্তরে তর্ক উঠিবে, ওটা তুমি ব্যক্তিবিশেষের কথা বলিলে। নিজের ব্যক্তিগত দায়িত্ব ও অসুবিধা স্বতন্ত্র কথা—কিন্তু একটা বড়ো জাতির বা সম্প্রদায়ের সমস্ত দায় আমারি স্বকৃত নহে সুতরাং যদি তাহা অপ্রিয় হয় তবে তাহা আমি নিঃসংকোচে বর্জন করিতে পারি।

আচ্ছা বেশ, মনে করা যাক, ইংরেজ এবং আইরিশ ; ইংরেজের বিরুদ্ধে আইরিশের হয়তো একটা বিদ্বেষের ভাব আছে এবং তাহার কারণটার জন্য কোনো একজন বিশেষ ইংরেজ ব্যক্তিগতভাবে বিশেষরূপে দায়ী নহে ; তাহার পূর্বপিতামহেরা আইরিশের প্রতি অন্যায় করিয়াছে এবং সম্ভবত এখনও অধিকাংশ ইংরেজ সেই অন্যায়ের সম্পূর্ণ প্রতিকার-করিতে অনিচ্ছুক। এমন স্থলে যে ইংরেজ আইরিশের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করেন তিনি আইরিশকে ঠাণ্ডা করিয়া দিবার জন্য বলেন না আমি ইংরেজ নই ; তিনি বাক্যে ও ব্যবহারে জানাইতে থাকেন তোমার প্রতি আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে। বস্তুত এরূপ স্থলে স্বজাতির অধিকাংশের বিরুদ্ধে আইরিশের পক্ষ লওয়াতে স্বজাতির নিকট হইতে দণ্ডভোগ করিতে হইবে, তাঁহাকে সকলে গালি দিবে, তাঁহাকে Little Englander-এর দলভুক্ত ও স্বজাতির গৌরবনাশক বলিয়া সকলে নিন্দা করিবে, কিন্তু তবু এ কথা তাঁহাকে বলা সাজিবে না, আমি ইংরেজ নহি।

তেমনি হিন্দুর সঙ্গে মুসলমানের যদি বিরোধ থাকে, তবে আমি হিন্দু নই বলিয়া সে বিরোধ মিটাইবার ইচ্ছা করাটা অত্যন্ত সহজ পরামর্শ বলিয়া শোনায় কিন্তু তাহা সত্য পরামর্শ নহে। এই জন্যই সে পরামর্শে সত্য ফল পাওয়া যায় না। কারণ, আমি হিন্দু নই বলিলে হিন্দু মুসলমানের বিরোধটা যেমন তেমনই থাকিয়া যায়, কেবল আমিই একলা তাহা হইতে পাশ কাটাইয়া আসি।

এস্থলে অপর পক্ষে বলিবেন, আমাদের আসল বাধা ধর্ম লইয়া। হিন্দুসমাজ যাহাকে আপনার ধর্ম বলে আমরা তাহাকে আপনার ধর্ম বলিতে পারি না। অতএব আমরা ব্রাহ্ম বলিয়া নিজের পরিচয় দিলেই সমস্ত গোল চুকিয়া যায় ; তাহার দ্বারা দুই কাজই হয়। এক, হিন্দুর যে ধর্ম আমার বিশ্বাসবিরুদ্ধ তাহাকে অস্বীকার করা হয় এবং যে ধর্মকে আমি জগতে শ্রেষ্ঠধর্ম বলিয়া জানি তাহাকেও স্বীকার করিতে পারি।

এ সম্বন্ধে ভাবিবার কথা এই যে, হিন্দু বলিলে আমি আমার যে পরিচয় দিই, ব্রাহ্ম বলিলে সম্পূর্ণ তাহার অনুরূপ পরিচয় দেওয়া হয় না, সুতরাং একটি আর একটির স্থান গ্রহণ করিতে পারে না। যদি কাহাকে জিজ্ঞাসা করা যায়, "তুমি কি চৌধুরিবংশীয়" আর সে, যদি তাহার উত্তর দেয়, "না আমি দপ্তরির কাজ করি," তবে প্রশ্নোত্তরের সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য হয় না। হইতে পারে চৌধুরিবংশের কেহ আজ পর্যন্ত দপ্তরির কাজ করে নাই, তাই বলিয়া তুমি দপ্তরি হইলেই যে চৌধুরি হইতে পারিবেই না এমন কথা হইতে পারে না।

তেমনি, অন্তকার দিনে হিন্দুসমাজ যাহাকে আপনার ধর্ম বলিয়া স্থির করিয়াছে

তাহাই যে তাহার নিত্য লক্ষণ তাহা কখনোই সত্য নহে। এ সম্বন্ধে বৈদিককাল হইতে অদ্য পর্যন্তের ইতিহাস হইতে নজির সংগ্রহ করিয়া পাণ্ডিত্যের অবতারণা করিতে ইচ্ছাই করি না। আমি একটা সাধারণতত্ত্বরূপেই বলিতে চাই, কোনো বিশেষ ধর্মমত ও কোনো বিশেষ আচার কোনো জাতির নিত্য লক্ষণ হইতেই পারে না। হাঁসের পক্ষে জলে সাঁতার যেমন, মানুষের পক্ষে বিশেষ ধর্মমত কখনোই সেরূপ নহে। ধর্মমত জড় পদার্থ নহে—মানুষের বিদ্যাবুদ্ধি অবস্থার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার বিকাশ আছে—এই জন্য ধর্ম কোনো জাতির অবিচলিত নিত্য পরিচয় হইতেই পারে না। এই জন্য যদিচ সাধারণত সমস্ত ইংরেজের ধর্ম খ্রীস্টানধর্ম, এবং সেই ধর্মমতের উপরেই তাহার সমাজ-বিধি প্রধানত প্রতিষ্ঠিত তথাপি একজন ইংরেজ বৌদ্ধ হইয়া গেলে তাহার যত অসুবিধাই হউক তবু সে ইংরেজই থাকে।

তেমনি ব্রাহ্মধর্ম আপাতত আমার ধর্ম হইতে পারে, কিন্তু কাল আমি প্রটেস্টান্ট পরশু রোম্যানক্যাথলিক এবং তাহার পর দিনে আমি বৈষ্ণব হইতে পারি, তাহাতে কোনো বাধা নাই, অতএব সে পরিচয় আমার সাময়িক পরিচয়,—কিন্তু জাতির দিক দিয়া আমি অতীতের ইতিহাসে এক জায়গায় বাঁধা পড়িয়াছি, সেই সুবৃহৎকালব্যাপী সত্যকে নড়াইতে পারি এমন সাধ্য আমার নাই।

হিন্দুরা একথা বলে বটে আমার ধর্মটা অটল; এবং অন্য ধর্ম গ্রহণ করিলে তাহারা আমাকে অহিন্দু বলিয়া ত্যাগ করে। কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি তাহাদের এই আচরণ আমার হিন্দু পরিচয়কে স্পর্শমাত্র করিতে পারে না। অনেক দিন পর্যন্ত হিন্দুমাত্রই বৈদ্যমতে ও মুসলমান হাকিমিমতে আপনাদের চিকিৎসা করিয়া আসিয়াছে। এমন কি, এমন নিষ্ঠাবতী হিন্দু বিধবা থাকিতে পারেন যিনি ডাক্তারি ঔষধ স্পর্শ করেন না। তথাপি অভিজ্ঞতার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুজাতির চিকিৎসা-প্রণালী বিস্তার লাভ করিয়াছে। আজও ইহা লইয়া অনেকে আক্ষেপ প্রকাশ করিতেছেন যে বিদেশী চিকিৎসা আমাদের পক্ষে অস্বাভাবিক এবং ইহাতে আমাদের শরীর জীর্ণ হইয়া গেল, দেশ উজাড় হইবার জো হইল কিন্তু তবু কুইনীনমিকশ্চার যে অহিন্দু এমন কথা কোনো তত্ত্বব্যাখ্যার দ্বারা আজও প্রমাণের চেষ্টা হয় নাই। ডাক্তারের ভিজিটে এবং ঔষধের উগ্র উপদ্রবে যদি আমি ধনেপ্রাণে মরি তবু আমি হিন্দু এ কথা অস্বীকার করা চলিবে না। অথচ হিন্দু আয়ুর্বেদের প্রথম অধ্যায় হইতে শেষ পর্যন্ত খুঁজিলে ঔষধতালিকার মধ্যে কুইনীনের নাম পাওয়া যাইবে না।

এই যেমন শরীরের কথা বলিলাম, তেমনি, শরীরের চেয়ে বড়ো জিনিসেরও কথা বলা যায়। কারণ, শরীর রক্ষাই তো মানুষের একমাত্র নহে, তাহার যে প্রকৃতি ধর্মকে

আশ্রয় করিয়া সুস্থ ও বলিষ্ঠ থাকে তাহাকেও বাঁচাইয়া চলিতেই হইবে। সমাজের অধিকাংশ লোকের এমন মত হইতে পারে যে, তাহাকে বাঁচাইয়া চলিবার উপযোগী ধর্ম আয়ুর্বেদ আমাদের দেশে এমনই সম্পূর্ণ হইয়া গিয়াছে যে, সে সম্বন্ধে কাহারও কোনো কথা চলিতে পারে না। এটা তো একটা বিশ্বাসমাত্র, এরূপ বিশ্বাস সত্যও হইতে পারে মিথ্যাও হইতে পারে, অতএব যে লোকের প্রাণ লইয়া কথা সে যদি নিজের বিশ্বাস লইয়া অন্য কোনো একটা পন্থা অবলম্বন করে তবে গায়ের জোরে তাহাকে নিরস্ত করিতে পারি কিন্তু সত্যের জোরে পারি না। গায়ের জোরের তো যুক্তি নাই। পুলিস দারোগা যদি ঘুষ লইয়া বলপূর্বক অন্যায় করে তবে দুর্বল বলিয়া আমি সেটাকে হয়তো মানিতে বাধ্য হইতে পারি কিন্তু সেইটেকেই রাজ্যশাসনতন্ত্রের চরম সত্য বলিয়া কেন স্বীকার করিব? তেমনি হিন্দুসমাজ যদি ধোবানাপিত বন্ধ করিবার ভয় দেখাইয়া আমাকে বলে অমুক বিশেষ ধর্মটাকেই তোমার মানিতে হইবে কারণ এইটেই হিন্দুধর্ম—তবে যদি ভয় পাই তবে ব্যবহারে মানিয়া যাইব কিন্তু সেইটেই যে হিন্দুসমাজের চরম সত্য ইহা কোনোক্রমেই বলা চলিবে না। যাহা কোনো সভ্য সমাজেরই চরম সত্য নহে তাহা হিন্দুসমাজেরও নহে, ইহা কোটি কোটি বিরুদ্ধবাদীর মুখের উপরেই বলা যায়—কারণ, ইহাই সত্য।

হিন্দুসমাজের ইতিহাসেও ধর্মবিশ্বাসের অচলতা আমরা দেখি নাই। এখানে পরে পরে যত ধর্মবিপ্লব ঘটিয়াছে এমন আর কোথাও ঘটে নাই। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যে-সকল দেবতা ও পূজা আর্যসমাজের নহে তাহাও হিন্দুসমাজে চলিয়া গিয়াছে—সংখ্যাহিসাবে তাহারাই সব চেয়ে প্রবল। ভারতবর্ষে উপাসকসম্প্রদায়সম্বন্ধে যে কোনো বই পড়িলেই আমরা দেখিতে পাইব হিন্দুসমাজে ধর্মাচরণের কেবল যে বৈচিত্র্য আছে তাহা নহে, তাহারা পাশাপাশি আছে, ইহা ছাড়া তাহাদের পরস্পরের আর কোনো ঐক্যসূত্র খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। যদি কাহাকেও জিজ্ঞাসা করি, কোন্ ধর্ম হিন্দুর ধর্ম, যেটা না মানিলে তুমি আমাকে হিন্দু বলিয়া স্বীকার করিবে না? তখন এই উত্তর পাওয়া যায়, যে-কোনো ধর্মই কিছুকাল ধরিয়া যে-কোনো সম্প্রদায়ে হিন্দুধর্ম বলিয়া গণ্য হইয়াছে। ধর্মের এমনতরো জড়সংজ্ঞা আর হইতেই পারে না। যাহা শ্রেয়, বা যাহার আন্তরিক কোনো সৌন্দর্য বা পবিত্রতা আছে তাহাই ধর্ম এমন কোনো কথা নাই;—স্তূপের মধ্যে কিছুকাল যাহা পড়িয়া আছে তাহাই ধর্ম—তাহা যদি বীভৎস হয়, যদি তাহাতে সাধারণ ধর্মনীতির সংযম নষ্ট হইতে থাকে তথাপি তাহাও ধর্ম। এমন উত্তর যতগুলি লোকে মিলিয়াই দিক্ না কেন তথাপি তাহাকে আমি আমার সমাজের পক্ষের সত্য উত্তর বলিয়া কোনোমতেই গ্রহণ করিব না। কেননা, লোক গণনা করিয়া ওজন দরে বা গজের মাপে সত্যের মূল্যনির্ণয় হয় না।

নানাপ্রকার অনার্য ও বীভৎস ধর্ম কেবলমাত্র কালক্রমে আমাদের সমাজে যদি স্থান পাইয়া থাকে তবে যে-ধর্মকে আমার জ্ঞান বুদ্ধি ও ভক্তির সাধনায় আমি শ্রেষ্ঠ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি, সেই ধর্মদীক্ষার দ্বারা আমি হিন্দুসমাজের মধ্যে আমার সত্য অধিকার হইতে বঞ্চিত হইব এতবড়ো অন্যায় আমরা কখনোই মানিতে পারিব না। ইহা অন্যায়, সুতরাং ইহা হিন্দুসমাজের অথবা কোনো সমাজেরই নহে।

প্রশ্ন এই, হিন্দুসমাজ যদি জড়ভাবে ভালোমন্দ সকলপ্রকার ধর্মকেই পিণ্ডাকার করিয়া রাখে এবং যদি কোনো নূতন উচ্চ আদর্শকে প্রবেশে বাধা দেয় তবে এই সমাজকে তোমার সমাজ বলিয়া স্বীকার করিবার দরকার কী? ইহার একটা উত্তর পূর্বেই দিয়াছি—তাহা এই যে, ঐতিহাসিক দিক দিয়া আমি যে হিন্দু এ সম্বন্ধে আমার ইচ্ছা অনিচ্ছার কোনো তর্কই নাই।

এ সম্বন্ধে আরও একটা বলিবার আছে। তোমার পিতা যেখানে অন্যায় করেন সেখানে তাহার প্রতিকার ও প্রায়শ্চিত্তের ভার তোমারই উপরে। তোমাকে পিতৃঋণ শোধ করিতেই হইবে—পিতাকে আমার পিতা নয় বলিয়া তোমার ভাইদের উপর সমস্ত বোঝা চাপাইয়া পর হইয়া দাঁড়াইয়া সমস্যাকে সোজা করিয়া তোলা সত্যাচরণ নহে। তুমি বলিবে, প্রতিকারের চেষ্টা বাহির হইতে পররূপেই করিব—পুত্ররূপে নয়। কেন? কেন বলিবে না, যে পাপ আমাদেরই সে পাপ আমরা প্রত্যেকে ক্ষালন করিব?

জিজ্ঞাসা করি, হিন্দুসমাজকে অস্বীকার করিয়া আমরা যে-কোনো সম্প্রদায়কেই তাহার স্থলে বরণ করি না কেন সে সম্প্রদায়ের সমষ্টিগত দায় কি সম্প্রদায়ের প্রত্যেককেই গ্রহণ করিতে হয় না? যদি কখনো দেখিতে পাই ব্রাহ্মসমাজে বিলাসিতার প্রচার ও ধনের পূজা অত্যন্ত বেশি চলিতেছে, যদি দেখি সেখানে ধর্মনিষ্ঠা হ্রাস হইয়া আসিতেছে তবে এ কথা কখনোই বলি না যে যাহারা ধনের উপাসক ও ধর্মে উদাসীন তাহারাই প্রকৃত ব্রাহ্ম, কারণ সংখ্যায় তাহারাই অধিক, অতএব আমাকে অন্য নাম লইয়া অন্য আর-একটা সমাজ স্থাপন করিতে হইবে। তখন এই কথাই আমরা বলি এবং ইহা বলাই সাজে যে, যাঁহারা সত্যধর্ম বাক্যে ও ব্যবহারে পালন করিয়া থাকেন তাঁহারাই যথার্থ আমাদের সমাজের লোক;—তাঁহাদের যদি কর্তৃত্ব না-ও থাকে ভোটসংখ্যা গণনায় তাঁহারা যদি নগণ্য হন তথাপি তাঁহাদেরই উপদেশে ও দৃষ্টান্তে এই সমাজের উদ্ধার হইবে।

পূর্বেই বলিয়াছি সত্য ওজনদরে বা গজের মাপে বিক্রয় হয় না—তাহা ছোটো হইলেও তাহা বড়ো। পর্বতপরিমাণ খড়বিচালি স্ফুলিঙ্গপরিমাণ আগুনের চেয়ে

দেখিতেই বড়ো কিন্তু আসলে বড়ো নহে। সমস্ত শেজের মধ্যে যেখানে সলিতার সূচ্যগ্র পরিমাণ মুখটিতে আলো জ্বলিতেছে সেইখানেই সমস্ত শেজটার সার্থকতা। তেলের নিম্নভাগে অনেকখানি জল আছে তাহার পরিমাণ যতই হউক সেইটেকে আসল জিনিস্ বলিবার কোনো হেতু নাই। সকল সমাজেই সমস্ত সমাজপ্রদীপের আলোটুকু যাঁহারা জ্বালাইয়া আছেন তাঁহারা সংখ্যাহিসাবে নহে সত্যহিসাবে সে সমাজে অগ্রগণ্য। তাঁহারা দগ্ধ হইতেছেন, আপনাকে তাঁহারা নিমেষে নিমেষে ত্যাগই করিতেছেন তবু তাঁহাদের শিখা সমাজে সকলের চেয়ে উচ্চে—সমাজে তাঁহারাই সজীব, তাঁহারাই দীপ্যমান।

অতএব, যদি এমন কথা সত্যই আমার মনে হয় যে, আমি যে ধর্মকে আশ্রয় করিয়াছি তাহাই সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, তবে এই কথা আমাকে নিশ্চয় বলিতে হইবে এই ধর্মই আমার সমাজের ধর্ম। সমাজের মধ্যে যে-কোনো ব্যক্তি যে-কোনো বিষয়েই সত্যকে পায় তাঁহাকে অবলম্বন করিয়াই সেই সমাজ সিদ্ধিলাভ করে। ইস্কুলের নব্বই জনের মধ্যে নয়জন যদি পাস করে তবে সেই নয়জনের মধ্যেই ইস্কুল সার্থক। একদিন বঙ্গসাহিত্যে একমাত্র মাইকেল মধুসূদনের মধ্যে সমস্ত বাংলা কাব্যসাহিত্যের সাধনা সিদ্ধ হইয়াছিল। তখনকার অধিকাংশ বাঙালিপাঠকে উপহাস পরিহাস করুক আর যাহাই করুক তথাপি মেঘনাদবধকাব্য বাংলা সাহিত্যেরই শ্রেষ্ঠকাব্য। এইরূপ সকল বিষয়েই। রামমোহন রায় তাঁহার চারিদিকের বর্তমান অবস্থা হইতে যত উচ্চেই উঠিয়াছেন সমস্ত হিন্দুসমাজকে তিনি তত উচ্চেই তুলিয়াছেন। একথা কোনো মতেই বলিতে পারিব না যে তিনি হিন্দু নহেন, কেননা অন্যান্য অনেক হিন্দু তাঁহার চেয়ে অনেক নিচে ছিল, এবং নিচে থাকিয়া তাঁহাকে গালি পাড়িয়াছে। কেন বলিতে পারিব না? কেননা একথা সত্য নহে। কেননা তিনি যে নিশ্চিতই হিন্দু ছিলেন—অতএব তাঁহার মহত্ত্ব হইতে কখনোই হিন্দুসমাজ বঞ্চিত হইতে পারিবে না—হিন্দুসমাজের বহুশত লক্ষ লোক যদি এক হইয়া স্বয়ং এজন্য বিধাতার কাছে দরখাস্ত করে তথাপি পারিবে না। শেক্স্‌পীয়র নিউটনের প্রতিভা অসাধারণ হইলেও তাহা যেমন সাধারণ ইংরেজের সামগ্রী তেমনি রামমোহনের মত যদি সত্য হয় তবে তাহা সাধারণ হিন্দু-সমাজেরই সত্য মত।

অতএব, যদি সমস্ত বিপুল হিন্দুসমাজের মধ্যে কেবল মাত্র আমার সম্প্রদায়ই সত্যধর্মকে পালন করিতেছে ইহাই সত্য হয় তবে এই সম্প্রদায়কেই আশ্রয় করিয়া সমস্ত হিন্দুসমাজ সত্যকে রক্ষা করিতেছে—তবে অপরিসীম অন্ধকারের মধ্যে একমাত্র এই পূর্বপ্রান্তে সমস্ত সমাজেরই অরুণোদয় হইয়াছে। আমি সেই রাত্রির অন্ধকার

হইতে অরুণোদয়কে ভিন্ন কোঠায় স্বতন্ত্র করিয়া রাখিব না। বস্তুত ব্রাহ্মসমাজের আবির্ভাব সমস্ত হিন্দুসমাজেরই ইতিহাসের একটি অঙ্গ। হিন্দুসমাজেরই নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে তাহারই বিশেষ একটি মর্মান্তিক প্রয়োজনবোধের ভিতর দিয়া তাহারই আন্তরিক শক্তির উদ্যমে এই সমাজ উদ্বোধিত হইয়াছে। ব্রাহ্মসমাজ আকস্মিক অদ্ভুত একটা খাপছাড়া কাণ্ড নহে। যেখানে তাহার উদ্ভব সেখানকার সমগ্রের সহিত তাহার গভীরতম জীবনের যোগ আছে। বীজকে বিদীর্ণ করিয়া গাছ বাহির হয় বলিয়াই সে গাছ বীজের পক্ষে একটা বিরুদ্ধ উৎপাত নহে। হিন্দুসমাজের বহুস্তরবদ্ধ কঠিন আবরণ একদা ভেদ করিয়া সতেজে ব্রাহ্মসমাজ মাথা তুলিয়াছিল বলিয়া তাহা হিন্দুসমাজের বিরুদ্ধ নহে, ভিতর হইতে যে অন্তর্যামী কাজ করিতেছেন তিনি জানেন তাহা হিন্দুসমাজেরই পরিণাম।

আমি জানি এ কথায় ব্রাহ্মসমাজের কেহ কেহ বিরক্ত হইয়া বলিবেন,—না, আমরা ব্রাহ্মসমাজকে হিন্দুসমাজের সামগ্রী বলিতে পারিব না, তাহা বিশ্বের সামগ্রী। বিশ্বের সামগ্রী নয় তো কী? কিন্তু বিশ্বের সামগ্রী তো কাল্পনিক আকাশ-কুসুমের মতো শূন্যে ফুটিয়া থাকে না—তাহা তো দেশ কালকে আশ্রয় করে, তাহার তো বিশেষ নামরূপ আছে। গোলাপ ফুল তো বিশ্বেরই ধন, তাহার সুগন্ধ তাহার সৌন্দর্য তো সমস্ত বিশ্বের আনন্দেরই অঙ্গ, কিন্তু তবু গোলাপফুল তো বিশেষভাবে গোলাপগাছেরই ইতিহাসের সামগ্রী, তাহা তো অশ্বত্থগাছের নহে। পৃথিবীতে সকল জাতিরই ইতিহাস আপনার বিশেষত্বের ভিতর দিয়া বিশ্বের ইতিহাসকেই প্রকাশ করিতেছে। নহিলে তাহা নিছক পাগলামি হইয়া উঠিত,—নহিলে একজাতির সিদ্ধি আর একজাতির কোনোপ্রকার ব্যবহারেই লাগিতে পারিত না। ইংরেজের ইতিহাসে লড়াই কাটাকাটি মারামারি কী হইয়াছে, তাহার কোন্ রাজা কত বৎসর রাজত্ব করিয়াছে এবং সে রাজাকে কে কবে সিংহাসনচ্যুত করিল এ সমস্ত তাহারই ইতিহাসের বিশেষ কাঠখড়—কিন্তু এই সমস্ত কাঠখড় দিয়া সে যদি এমন কিছুই গড়িয়া না থাকে যাহা মানবচিত্তের মধ্যে দেবসিংহাসন গ্রহণ করিতে পারে তবে ইংরেজের ইতিহাস একেবারেই ব্যর্থ হইয়াছে। বস্তুত বিশ্বের চিত্তশক্তির কোনো একটা দিব্যরূপ ইংরেজের ইতিহাসের মধ্য দিয়া আপনাকেই অপূর্ব করিয়া ব্যক্ত করিতেছে।

হিন্দুর ইতিহাসেও সে চেষ্টার বিরাম নাই। বিশ্বসত্যের প্রকাশশক্তি হিন্দুর ইতিহাসেও ব্যর্থ হয় নাই; সমস্ত বাধা-বিরোধও এই শক্তিরই লীলা। সেই হিন্দু-ইতিহাসের অন্তরে যে বিশ্বচিত্ত আপন সৃজনকার্যে নিযুক্ত আছেন ব্রাহ্মসমাজ কি বর্তমানযুগে তাহারই সৃষ্টিবিকাশ নহে? ইহা কি রামমোহন রায় বা আর দুই একজন

মানুষ আপন খেয়ালমতো আপন ঘরে বসিয়া গড়িয়াছেন? ব্রাহ্মসমাজ এই যে ভারতবর্ষের পূর্বপ্রান্তে হিন্দুসমাজের মাঝখানে মাথা তুলিয়া বিশ্বের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করিল ইহার কি একেবারে কোনো মানেই নাই—ইহা কি বিশ্ববিধাতার দ্যূতক্রীড়াঘরে পাশাখেলার দান পড়া? মানুষের ইতিহাসকে আমি তো এমন খামখেয়ালির সৃষ্টিরূপে সৃষ্টিছাড়া করিয়া দেখিতে পারি না। ব্রাহ্মসমাজকে তাই আমি হিন্দুসমাজের ইতিহাসেরই একটি স্বাভাবিক বিকাশ বলিয়া দেখি। এই বিকাশ হিন্দুসমাজের একটি বিশ্বজনীন বিকাশ। হিন্দুসমাজের এই বিকাশটিকে আমরা কয়জনে দল বাঁধিয়া ঘিরিয়া লইয়া ইহাকে আমাদের বিশেষ একটি সম্প্রদায়ের বিশেষ একটা গৌরবের জিনিস বলিয়া চারিদিক হইতে তাহাকে অত্যন্ত স্বতন্ত্র করিয়া তুলিব এবং মুখে বলিব এইরূপেই আমরা তাহার প্রতি পরম ঔদার্য আরোপ করিতেছি—একথা আমি কোনোমতেই স্বীকার করিতে পারিব না।

অন্যপক্ষে আমাকে বলিবেন ভাবের দিক্‌ হইতে এ সমস্ত কথা শুনিতে বেশ লাগে কিন্তু কাজের বেলা কী করা যায়? ব্রাহ্মসমাজ তো কেবলমাত্র একটা ভাবের ক্ষেত্র নহে—তাহাকে জীবনের প্রতিদিনের ব্যবহারে লাগাইতে হইবে, তখন হিন্দুসমাজের সহিত তাহার মিল করিব কেমন করিয়া?

ইহার উত্তরে আমার বক্তব্য এই যে, হিন্দুসমাজ বলিতে যদি এমন একটা পাষাণখণ্ড কল্পনা কর যাহা আজ যে অবস্থায় আছে তাহাতেই সম্পূর্ণ পরিসমাপ্ত তবে তাহার সঙ্গে কোনো সজীব মানুষের কোনোপ্রকার কারবারই চলিতে পারে না—তবে সেই পাথর দিয়া কেবলমাত্র মৃত মানবচিত্তের গোর দেওয়াই চলিতে পারে। আমাদের বর্তমান সমাজ যে কারণে যত নিশ্চল হইয়াই পড়ুক না, তথাপি তাহা সেরূপ পাথরের স্তূপ নহে। আজ, যে বিষয়ে তাহার যাহা কিছু মত ও আচরণ নির্দিষ্ট হইয়া আছে তাহাই তাহার চরম সম্পূর্ণতা নহে—অর্থাৎ সে মরে নাই। অতএব বর্তমান হিন্দুসমাজের সমস্ত বাঁধা মত ও আচারের সঙ্গে নিজের সমস্ত মত ও আচারকে নিঃশেষে মিলাইতে পারিলে তবেই নিজেকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে পারির একথা সত্য নহে। আমাদেরই মত ও আচারের পরিণতি ও পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই সমাজের পরিণতি ও পরিবর্তন ঘটিতে থাকে। আমাদের মধ্যে কোনো বদল হইলেই আমরা যদি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তখনই নিজেকে সমাজের বহির্ভূক্ত বলিয়া বর্ণনা করি তবে সমাজের বদল হইবে কী করিয়া?

একথা স্বীকার করি, সমাজ একটা বিরাট কলেবর। ব্যক্তিবিশেষের পরিণতির সমান তালে সে তখনই-তখনই অগ্রসর হইয়া চলে না। তাহার নড়িতে বিলম্ব হয়

এবং সেরূপ বিলম্ব হওয়াই কল্যাণকর। অতএব সেই সমাজের সঙ্গে যখন ব্যক্তিবিশেষের অমিল শুরু হয় তখন ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে তাহা সুখকর নহে। সেই কারণে তখন তাড়াতাড়ি সমাজকে অস্বীকার করার একটা ঝোঁক আসিতেও পারে। কিন্তু যেখানে মানুষ অনেকের সঙ্গে সত্যসম্বন্ধে যুক্ত সেখানে সেই অনেকের মুক্তিতেই তাহার মুক্তি। একলা হইয়া প্রথমটা একটু আরাম বোধ হয় কিন্তু তাহার পরেই দেখা যায় যে, যে-অনেককে ছাড়িয়া দূরে আসিয়াছি দূরে আসিয়াছি বলিয়াই তাহার টান ক্রমশ প্রবল হইয়া উঠিতে থাকে। যে আমারই, তাহাকে, সঙ্গে থাকিয়া উদ্ধার করিলেই, যথার্থ নিজে উদ্ধার পাওয়া যায়—তাহাকে যদি স্বতন্ত্র নিচে ফেলিয়া রাখি তবে একদিন সেও আমাকে সেই নিচেই মিলাইয়া লইবে; কারণ, আমি যতই অস্বীকার করি না কেন তাহার সঙ্গে আমার নানাদিকে নানা মিলনের যোগসূত্র আছে—সেগুলি বহুকালের সত্য পদার্থ। অতএব সমস্ত বাধা সমস্ত অসুবিধা স্বীকার করিয়াই আমার সমস্ত পরিবেষ্টনের মধ্যে আমার সাধনাকে প্রবর্তিত ও সিদ্ধিকে স্থাপিত করিতেই হইবে। না করিলে কখনোই তাহার সর্বাঙ্গীণতা হইবে না—সে দিনেদিনে নিঃসন্দেহই কৃশ ও প্রাণহীন হইয়া পড়িবে, তাহার পরিপোষণের উপযোগী বিচিত্র রস সে কখনোই লাভ করিতে পারিবে না।

অতএব আমি যাহা উচিত মনে করিতেছি তাহাই করিব, কিন্তু একথা কখনোই বলিব না যে, সমাজের মধ্যে থাকিয়া কর্তব্যপালন চলিবে না। একথা জোর করিয়াই বলিব যাহা কর্তব্য তাহা সমস্ত সমাজেরই কর্তব্য। এই কথাই বলিব, হিন্দুসমাজের কর্তব্য আমিই পালন করিতেছি।

হিন্দুসমাজের কর্তব্য কী? যাহা ধর্ম তাহাই পালন করা। অর্থাৎ যাহাতে সকলের মঙ্গল তাহারই অনুষ্ঠান করা। কেমন করিয়া জানিব কিসে সকলের মঙ্গল? বিচার ও পরীক্ষা ছাড়া তাহা জানিবার অন্য কোনো উপায়ই নাই। বিচারবুদ্ধিটা মানুষের আছে এইজন্যই। সমাজের মঙ্গলসাধনে, মানুষের কর্তব্যনিরূপণে সেই বুদ্ধি একেবারেই খাটাইতে দিব না এমন পণ যদি করি তবে সমাজের সর্বনাশের পথ করা হয়। কেননা সর্বদা হিতসাধনের চিন্তা ও চেষ্টাকে জাগ্রত রাখিলেই তবে সেই বিচারবুদ্ধি নিজের শক্তিপ্রয়োগ করিয়া সবল হইয়া উঠিতে পারে এবং তবেই, কালে কালে সমাজে স্বভাবতই যে সমস্ত আবর্জনা জমে, যে সমস্ত অভ্যাস ক্রমশই জড়ধর্ম প্রাপ্ত হইয়া উন্নতির পথরোধ করিয়া দেয়, তাহাদিগকে কাটাইয়া তুলিবার শক্তি সমাজের মধ্যে সর্বদা প্রস্তুত হইয়া থাকে। অতএব ভ্রম ও বিপদের আশঙ্কা করিয়া সমাজকে চিরকাল চিন্তাহীন চেষ্টাহীন শিশু করিয়া রাখিলে কিছুতেই তাহার কল্যাণ হইতে পারে না।

একথা যখন নিশ্চিত তখন নিজের দৃষ্টান্ত ও শক্তিদ্বারাই সমাজের মধ্যে এই মঙ্গল-চেষ্টাকে সজীব রাখা নিতান্তই আমাদের প্রত্যেকের কর্তব্য। যাহা ভালো মনে করি তাহা করিবার জন্য কখনোই সমাজ ত্যাগ করিব না।

আমি দৃষ্টান্তস্বরূপে বলিতেছি, জাতিভেদ। যদি জাতিভেদকে অন্যায় মনে করি তবে তাহা নিশ্চয়ই সমস্ত হিন্দুসমাজের পক্ষে অন্যায়—অতএব তাহাই যথার্থ অহিন্দু। কোনো অন্যায় কোনো সমাজেরই পক্ষে নিত্য লক্ষণ হইতেই পারে না। যাহা অন্যায় তাহা ভ্রম, তাহা স্খলন, সুতরাং তাহাকে কোনো সমাজেরই চিরপরিণাম বলিয়া গণ্য করা একপ্রকার নাস্তিকতা। আগুনের ধর্মই যেমন দাহ, অন্যায় কোনো সমাজেরই সেরূপ ধর্ম হইতেই পারে না। অতএব হিন্দু থাকিতে গেলে আমাকে অন্যায় করিতে হইবে অধর্ম করিতে হইবে একথা আমি মুখে উচ্চারণ করিতে চাই না। সকল সমাজেই বিশেষ কালে কতকগুলি মনুষ্যত্বের বিশেষ বাধা প্রকাশ পায়। যে সকল ইংরেজ মহাত্মারা জাতিনির্বিচারে সকল মানুষের প্রতিই ন্যায়াচরণের পক্ষপাতী, যাঁহারা সকল জাতিরই নিজের বিশেষ শক্তিকে নিজ নিজ পন্থায় স্বাধীনতার মধ্যে পূর্ণ বিকশিত দেখিতে ইচ্ছা করেন—তাঁহারা অনেকে আক্ষেপ করিতেছেন বর্তমানে ইংরেজজাতির মধ্যে সেই উদার ন্যায়পরতার, সেই স্বাধীনতাপ্রিয়তার, সেই মানবপ্রেমের খর্বতা ঘটিয়াছে—কিন্তু তাই বলিয়াই এই দুর্গতিকে তাঁহারা নিত্য বলিয়া কিছুতেই স্বীকার করিয়া লইতে পারেন না। তাই তাঁহারা ইহারই মাঝখানে থাকিয়া নিজের উদার আদর্শকে সমস্ত বিদ্রূপ ও বিরোধের মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন—তাঁহারা স্বজাতির বাহিরে নূতন একটা জাতির সৃষ্টি করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসেন নাই।

তেমনি, জাতিভেদকে যদি হিন্দুসমাজের অনিষ্টকর বলিয়া জানি তবে তাহাকেই আমি অহিন্দু বলিয়া জানিব এবং হিন্দুসমাজের মাঝখানে থাকিয়াই তাহার সঙ্গে লড়াই করিব। ছেলেমেয়ের অসবর্ণ বিবাহ দিতে আমি কুণ্ঠিত হইব না এবং তাহাকেই আমি নিজে হইতে অহিন্দুবিবাহ বলিব না—কারণ বস্তুত আমার মতানুসারে তাহাই হিন্দুবিবাহনীতির শ্রেষ্ঠ আদর্শ। যদি এমন হয় যে, হিন্দুসমাজের পক্ষে জাতিভেদ ভালোই, কেবলমাত্র আমাদের কয়েকজনের পক্ষেই তাহার অসুবিধা বা অনিষ্ট আছে তবেই এই ক্ষেত্রে আমার পক্ষে স্বতন্ত্র হওয়া শোভা পায় নতুবা কদাচ নহে।

হিন্দুসমাজে কোনো কালেই অসবর্ণ বিবাহ ছিল না এ কথা সত্য নহে, কোনো কালেই অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত হইতে পারে না ইহাও সত্য নহে—হিন্দুসমাজের সমস্ত অতীত ভবিষ্যৎকে বাদ দিয়া যে সমাজ, সেই বর্তমান সমাজকেই একমাত্র সত্য বলিয়া তাহার আশ্রয় ত্যাগ করিয়া তাহার সঙ্গে আত্মীয়তা অস্বীকার করিয়া দূরে চলিয়া যাওয়াকে আমি ধর্মসংগত বলিয়া কখনোই মনে করি না।

অপর পক্ষ বলিবেন আচ্ছা বেশ, বর্তমানের কথাই ধরা যাক, আমি যদি জাতিভেদ না মানিতেই চাই তবে এ সমাজে কাজকর্ম করিব কাহার সঙ্গে? উত্তর, এখনও যাহাদের সঙ্গে করিতেছ। অর্থাৎ যাহারা জাতিভেদ মানে না।

তবেই তো সেই সূত্রে একটা স্বতন্ত্র সমাজ গড়িয়া উঠিল। না, ইহা স্বতন্ত্র সমাজ নহে ইহা সম্প্রদায় মাত্র। পূর্বেই বলিয়াছি সমাজের স্থান সম্প্রদায় জুড়িতে পারে না। আমি হিন্দুসমাজে জন্মিয়াছি এবং ব্রাহ্ম সম্প্রদায়কে গ্রহণ করিয়াছি—ইচ্ছা করিলে আমি অন্য সম্প্রদায়ে যাইতে পারি কিন্তু অন্য সমাজে যাইব কী করিয়া? সে সমাজের ইতিহাস তো আমার নহে। গাছের ফল এক ঝাঁকা হইতে অন্য ঝাঁকায় যাইতে পারে কিন্তু এক শাখা হইতে অন্য শাখায় ফলিবে কী করিয়া?

তবে কি মুসলমান অথবা খ্রীস্টান সম্প্রদায়ে যোগ দিলেও তুমি হিন্দু থাকিতে পার? নিশ্চয়ই পারি। ইহার মধ্যে পারাপারির তর্কমাত্রই নাই। হিন্দুসমাজের লোকেরা কী বলে সে কথায় কান দিতে আমরা বাধ্য নই কিন্তু ইহা সত্য যে কালীচরণ বাঁড়ুজ্যে মশায় হিন্দু খ্রীস্টান ছিলেন, তাঁহার পূর্বে জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর হিন্দু খ্রীস্টান ছিলেন, তাঁহারও পূর্বে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় হিন্দু খ্রীস্টান ছিলেন। অর্থাৎ তাঁহারা জাতিতে হিন্দু, ধর্মে খ্রীস্টান। খ্রীস্টান তাঁহাদের রং, হিন্দুই তাঁহাদের বস্তু। বাংলাদেশে হাজার হাজার মুসলমান আছে, হিন্দুরা অহর্নিশি তাহাদিগকে হিন্দু নও হিন্দু নও বলিয়াছে এবং তাহারাও নিজেদিগকে হিন্দু নই হিন্দু নই শুনাইয়া আসিয়াছে কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাহারা প্রকৃতই হিন্দুমুসলমান। কোনো হিন্দু পরিবারে এক ভাই খ্রীস্টান এক ভাই মুসলমান ও এক ভাই বৈষ্ণব এক পিতামাতার স্নেহে একত্র বাস করিতেছে এই কথা কল্পনা করা কখনোই দুঃসাধ্য নহে বরঞ্চ ইহাই কল্পনা করা সহজ—কারণ ইহাই যথার্থ সত্য. সুতরাং মঙ্গল এবং সুন্দর। এখন যে অবস্থাটা আছে তাহা সত্য নহে তাহা সত্যের বাধা—তাহাকেই আমি সমাজের দুঃস্বপ্ন বলিয়া মনে করি এই কারণে তাহাই জটিল, তাহাই অদ্ভুত অসংগত, তাহাই মানবধর্মের বিরুদ্ধ।

হিন্দু শব্দে এবং মুসলমান শব্দে একই পর্যায়ের পরিচয়কে বুঝায় না। মুসলমান একটি বিশেষ ধর্ম কিন্তু হিন্দু কোনো বিশেষ ধর্ম নহে। হিন্দু ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটি জাতিগত পরিণাম। ইহা মানুষের শরীর মন হৃদয়ের নানা বিচিত্র ব্যাপারকে বহু সুদূর শতাব্দী হইতে এক আকাশ, এক আলোক, এক ভৌগোলিক নদনদী অরণ্যপর্বতের মধ্য দিয়া, অন্তর ও বাহিরের বহুবিধ ঘাতপ্রতিঘাতপরম্পরার একই ইতিহাসের ধারা দিয়া আজ আমাদের মধ্যে আসিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছে। কালীচরণ বাঁড়ুজ্যে, জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় খ্রীস্টান হইয়াছিলেন—বলিয়াই এই

সুগভীর ধারা হইতে বিচ্ছিন্ন হইবেন কী করিয়া? জাতি জিনিসটা মতের চেয়ে অনেক বড়ো এবং অনেক অন্তরতর; মত পরিবর্তন হইলে জাতির পরিবর্তন হয় না। ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তিসম্বন্ধে কোনো একটা পৌরাণিক মতকে যখন আমি বিশ্বাস করিতাম তখনও আমি যে জাতি ছিলাম, তৎসম্বন্ধে আধুনিক বৈজ্ঞানিক মত যখন বিশ্বাস করি তখনও আমি সেই জাতি। যদিচ আজ ব্রহ্মাণ্ডকে আমি কোনো অণ্ডবিশেষ বলিয়া মনে করি না ইহা জানিতে পারিলে এবং সুযোগ পাইলে আমার প্রপিতামহ এই প্রকার অদ্ভুত নব্যতায় নিঃসন্দেহ আমার কান মলিয়া দিতেন।

কিন্তু চীনের মুসলমানও মুসলমান, পারস্যেরও তাই, আফ্রিকারও তদ্রূপ। যদিচ চীনের মুসলমানসম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না তথাপি এ কথা জোর করিয়াই বলিতে পারি যে, বাঙালি মুসলমানের সঙ্গে তাহাদের ধর্মমতের অনেকটা হয়তো মেলে কিন্তু অন্য অসংখ্য বিষয়েই মেলে না। এমন কি, ধর্মমতেরও মোটামুটি বিষয়ে মেলে কিন্তু সূক্ষ্ম বিষয়ে মেলে না। অথচ হাজার হাজার বিষয়ে তাহার স্বজাতি কন্‌ফ্যুসীয় অথবা বৌদ্ধের সঙ্গে তাহার মিল আছে। পারস্যে চীনের মতো কোনো প্রাচীনতর ধর্মমত নাই বলিলেই হয়। মুসলমান বিজেতার প্রভাবে সমস্ত দেশে এক মুসলমান ধর্মই স্থাপিত হইয়াছে তথাপি পারস্যে মুসলমান ধর্ম সেখানকার পুরাতন জাতিগত প্রকৃতির মধ্যে পড়িয়া নানা বৈচিত্র্য লাভ করিতেছে—আজ পর্যন্ত কেহ তাহাকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারিতেছে না।

ভারতবর্ষেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইতে পারে না। এখানেও আমার জাতি-প্রকৃতি আমার মতবিশেষের চেয়ে অনেক ব্যাপক। হিন্দুসমাজের মধ্যেই তাহার হাজার দৃষ্টান্ত আছে। যে সকল আচার আমাদের শাস্ত্রে এবং প্রথায় অহিন্দু বলিয়া গণ্য ছিল আজ কত হিন্দু তাহা প্রকাশ্যেই লঙ্ঘন করিয়া চলিয়াছে; কত লোককে আমরা জানি যাঁহারা সভায় বক্তৃতা দিবার ও কাগজে প্রবন্ধ লিখিবার বেলায় আচারের স্খলন লেশমাত্র সহ্য করিতে পারেন না অথচ যাঁহাদের পানাহারের তালিকা দেখিলে মনু ও পরাশর নিশ্চয়ই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিবেন এবং রঘুনন্দন আনন্দিত হইবেন না। তাঁহাদের প্রবন্ধের মত অথবা তাঁহাদের ব্যাবহারিক মত, কোনো মতের ভিত্তিতেই তাঁহাদের হিন্দুত্ব প্রতিষ্ঠিত নহে, তাহার ভিত্তি আরও গভীর। সেই জন্যই হিন্দুসমাজে আজ যাঁহারা আচার মানেন না, নিমন্ত্রণ রক্ষায় যাঁহারা ভাটপাড়ার বিধান রক্ষা করেন না, এবং গুরু বাড়ি আসিলে গুরুতর কাজের ভিড়ে যাঁহাদের অনবসর ঘটে, তাঁহারাও স্বচ্ছন্দে হিন্দু বলিয়া গণ্য হইতেছেন। তাহার একমাত্র কারণ এ নয় যে হিন্দুসমাজ দুর্বল—তাহার প্রধান কারণ এই যে, সমস্ত বাঁধাবাঁধির মধ্যেও হিন্দুসমাজ একপ্রকার অর্ধচেতন

ভাবে অনুভব করিতে পারে যে, বাহিরের এই সমস্ত পরিবর্তন হাজার হইলেও তবু বাহিরের—যথার্থ হিন্দুত্বের সীমা এইটুকুর মধ্যে কখনোই বদ্ধ নহে।

যে কথাটা সংকীর্ণ বর্তমানের উপস্থিত অবস্থাকে অতিক্রম করিয়া বৃহৎভাবে সত্য, অনেক পাকা লোকেরা তাহার উপরে কোনো আস্থাই রাখেন না। তাঁহারা মনে করেন এ সমস্ত নিছক আইডিয়া। মনে করেন করুন কিন্তু আমাদের সমাজে আজ এই আইডিয়ার প্রয়োজনই সকলের চেয়ে বড়ো প্রয়োজন। এখানে জড়ত্বের আয়োজন যথেষ্ট আছে যাহা পড়িয়া থাকে, বিচার করে না, যাহা অভ্যাসমাত্র, যাহা নড়িতে চায় না তাহা এখানে যথেষ্ট আছে,- এখানে কেবল সেই তত্ত্বেরই অভাব দেখিতেছি, যাহা সৃষ্টি করে, পরিবর্তন করে, অগ্রসর করে, যাহা বিচিত্রকে অন্তরের দিক হইতে মিলাইয়া এক করিয়া দেয়। হিন্দুসমাজ ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে সেই আইডিয়াকেই জন্ম দিয়াছে, যাহা তাহাকে উদ্বোধিত করিবে; যাহা তাহাকে চিন্তা করাইবে, চেষ্টা করাইবে, সন্ধান করাইবে; যাহা তাহার নিজের ভিতরকার সমস্ত অনৈক্যকে সত্যের বন্ধনে এক করিয়া বাঁধিয়া তুলিবার সাধনা করিবে, যাহা জগতের সমস্ত প্রাণশক্তির সঙ্গে তাহার প্রাণক্রিয়ার যোগসাধন করিয়া দিবে। এই যে আইডিয়া, এই যে সৃজনশক্তি, চিত্তশক্তি, সত্যগ্রহণের সাধনা, এই যে প্রাণচেষ্টার প্রবল বিকাশ, যাহা ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে আকার গ্রহণ করিয়া উঠিয়াছে তাহাকে আমরা হিন্দুসমাজের বলিয়া অস্বীকার করিব? যেন আমরাই তাহার মালেক, আমরাই তাহার জন্মদাতা। হিন্দুসমাজের এই নিজেরই ইতিহাসগত প্রাণগত সৃষ্টি হইতে আমরা হিন্দুসমাজকেই বঞ্চিত করিতে চাহিব? আমরা হঠাৎ এত বড়ো অন্যায় কথা বলিয়া বসিব যে, যাহা নিশ্চল, যাহা বাধা, যাহা প্রাণহীন তাহাই হিন্দুসমাজের, আর যাহা তাহার আইডিয়া, তাহার মানসরূপ, তাহার মুক্তির সাধনা, তাহাই হিন্দু-সমাজের নহে, তাহাই বিশ্বের সরকারি জিনিস। এমন করিয়া হিন্দুসমাজের সত্যকে বিচ্ছিন্ন করিবার চেষ্টাই কি ব্রাহ্মসমাজের চেষ্টা?

এতদূর পর্যন্ত আসিয়াও আমার শ্রোতা বা পাঠক যদি একজনও বাকি থাকেন, তবে তিনি নিশ্চয় আমাকে শেষ এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবেন যদি জাতিভেদ না মানিয়াও হিন্দুত্ব থাকে, যদি মুসলমান খ্রীস্টান হইয়াও হিন্দুত্ব না যায় তবে হিন্দুত্বটা কী? কী দেখিলে হিন্দুকে চিনিতে পারি?

এই প্রশ্নের উত্তর দিতে যদি আমি বাধ্য হই তবে নিশ্চয়ই তিনিও বাধ্য। হিন্দুত্ব কী—ইহার যে-কোনো উত্তরই তিনি দিন না, বিশাল হিন্দুসমাজের মধ্যে কোথাও না কোথাও তাহার প্রতিবাদ আছে। শেষকালে তাঁহাকে এই কথাই বলিতে হইবে, যে সম্প্রদায় কিছুদিন ধরিয়া যে ধর্ম এবং যে আচারকেই হিন্দু বলিয়া মানিয়া আসিয়াছে

তাহাই তাহার পক্ষে হিন্দুত্ব এবং তাহার ব্যতিক্রম তাহার পক্ষেই হিন্দুত্বের ব্যতিক্রম। এই কারণে যাহাতে বাংলার হিন্দুত্ব দূষিত হয় তাহাতে পাঞ্জাবের হিন্দুত্ব দূষিত হয় না, যাহা দ্রাবিড়ের হিন্দুর পক্ষে অগৌরবের বিষয় নহে তাহা কান্যকুব্জের হিন্দুর পক্ষে লজ্জাজনক।

বাহিরের দিক হইতে হিন্দুকে বিচার করিতে গেলেই এত বড়ো একটা অদ্ভুত কথা বলিয়া বসিতে হয়। কিন্তু বাহিরের দিক হইতেই এইরূপ বিচার করাটাই অবিচার;—সেই অবিচারটা হিন্দুসমাজ স্বয়ং নিজের প্রতি নিজে প্রয়োগ করিয়া থাকে বলিয়াই যে সেটা তাহার যথার্থ প্রাপ্য একথা আমি স্বীকার করি না। আমি নিজেকে নিজে যাহা বলিয়া জানি তাহা যে প্রায়ই সত্য হয় না একথা কাহারও অগোচর নাই।

মানুষের গভীরতম ঐক্যটি যেখানে, সেখানে কোনো সংজ্ঞা পৌঁছিতে পারে না—কারণ সেই ঐক্যটি জড়বস্তু নহে তাহা জীবনধর্মী। সুতরাং তাহার মধ্যে যেমন একটা স্থিতি আছে তেমনি একটা গতিও আছে। কেবল মাত্র স্থিতির দিকে যখন সংজ্ঞাকে খাড়া করিতে যাই তখন তাহার গতির ইতিহাস তাহার প্রতিবাদ করে - কেবলমাত্র গতির উপরে সংজ্ঞাকে স্থাপন করাই যায় না, সেখানে সে পা রাখিবার জায়গাই পায় না।

এই জন্যই জীবনের দ্বারা আমরা জীবনকে জানিতে পারি কিন্তু সংজ্ঞার দ্বারা তাহাকে বাঁধিতে পারি না। ইংরেজের লক্ষণ কী, যদি সংজ্ঞা নির্দেশের দ্বারা বলিতে হয় তবে বলিতেই পারিব না—এক ইংরেজের সঙ্গে আর এক ইংরেজের বাধিবে—এক যুগের ইংরেজের সঙ্গে আর এক যুগের ইংরেজের মিল পাইব না। তখন কেবলমাত্র এই একটা মোটা কথা বলিতে পারিব যে, এক বিশেষ ভূখণ্ড ও বিশেষ ইতিহাসের মধ্যে এই যে জাতি সুদীর্ঘকাল ধরিয়া মানুষ হইয়াছে এই জাতি আপন ব্যক্তিগত কালগত সমস্ত বৈচিত্র্য লইয়াও এক ইংরেজজাতি। ইহাদের মধ্যে যে খ্রীস্টান সেও ইংরেজ, যে কালীকে মানিতে চায় সেও ইংরেজ; যে পরজাতির উপরে নিজের আধিপত্যকে প্রবল করিয়া তোলাকেই দেশহিতৈষিতা বলে সেও ইংরেজ এবং যে এইরূপে অন্য জাতির প্রতি প্রভুত্বচেষ্টা দ্বারা স্বজাতির চরিত্রনাশ হয় বলিয়া উৎকণ্ঠিত হয় সেও ইংরেজ,—যে ইংরেজ নিজেদের মধ্যে কাহাকেও বিধর্মী বলিয়া পুড়াইয়া মারিয়াছে সেও ইংরেজ এবং যে লোক সেই বিধর্মকেই সত্যধর্ম বলিয়া পুড়িয়া মরিয়াছে সেও ইংরেজ। তুমি বলিবে ইহারা সকলেই আপনাকে ইংরেজ বলিয়া মনে করে সেইখানেই ইহাদের যোগ; কিন্তু শুধু তাই নয়, মনে করিবার একটা ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে; ইহারা যে যোগসম্বন্ধে প্রত্যেকে সচেতন তাহারই একটি যোগের জাল আছে।

সেই জালটিতে সকল বৈচিত্র্য বাঁধা পড়িয়াছে। এই ঐক্যজালের সূত্রগুলি এত সূক্ষ্ম যে তাহাদিগকে স্পষ্ট করিয়া নির্দেশ করাই যায় না অথচ তাহা স্থূলবন্ধনের চেয়ে দৃঢ়।

আমাদের মধ্যেও তেমনি একটি ঐক্যজাল আছে। জানিয়া এবং না জানিয়াও তাহা আমাদের সকলকে বাঁধিয়াছে। আমার জানা ও স্বীকার করার উপরেই তাহার সত্যতা নির্ভর করে না। কিন্তু তথাপি আমি যদি তাহাকে জানি ও স্বীকার করি তবে তাহাতে আমারও জোর বাড়ে তাহারও জোর বাড়ে। এই বৃহৎ ঐক্যজালের মহত্ত্ব নষ্ট করিয়া তাহাকে যদি মূঢ়তার ফাঁদ করিয়া তুলি তবে সত্যকে খর্ব করার যে শাস্তি তাহাই আমাকে ভোগ করিতে হইবে। যদি বলি, যে লোক দক্ষিণ শিয়রে মাথা করিয়া শোয় সেই হিন্দু, যে অমুকটা খায় না এবং অমুককে ছোঁয় না সেই হিন্দু, যে লোক আট বছরের মেয়েকে বিবাহ দেয় এবং সবর্ণে বিবাহ করে সেই হিন্দু তবে বড়ো সত্যকে ছোটো করিয়া আমরা দুর্বল হইব, ব্যর্থ হইব, নষ্ট হইব।

এই জন্যই, যে আমি হিন্দুসমাজে জন্মিয়াছি সেই আমার এ কথা নিশ্চয়রূপে জানা কর্তব্য, জ্ঞানে ভাবে কর্মে যাহা কিছু আমার শ্রেষ্ঠ তাহা একলা আমার নহে, তাহা একলা আমার সম্প্রদায়েরও নহে তাহা আমার সমস্ত সমাজের। আমার মধ্য দিয়া আমার সমস্ত সমাজ তপস্যা করিতেছে—সেই তপস্যার ফলকে আমি সেই সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে পারি না। মানুষকে বাদ দিয়া কোনো সমাজ নাই, এবং যাহারা মানুষের শ্রেষ্ঠ তাহারাই মানুষের প্রতিনিধি, তাহাদের দ্বারাই সমস্ত মানুষের বিচার হয়। আজ আমাদের সম্প্রদায়ই যদি জ্ঞানে ও আচরণে শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়া থাকে তবে আমাদের সম্প্রদায়ের দ্বারাই ইতিহাসে সমস্ত হিন্দুসমাজের বিচার হইবে এবং সে বিচার সত্য বিচারই হইবে। অতএব হিন্দুসমাজের দশজন যদি আমাকে হিন্দু না বলে এবং সেই সঙ্গে আমিও যদি আমাকে হিন্দু না বলি তবে সে বলামাত্রের দ্বারা তাহা কখনোই সত্য হইবে না। সুতরাং ইহাতে আমাদের কোনো পক্ষেরই কোনো ইষ্ট নাই। আমরা যে-ধর্মকে গ্রহণ করিয়াছি তাহা বিশ্বজনীন তথাপি তাহা হিন্দুরই ধর্ম। এই বিশ্বধর্মকে আমরা হিন্দুর চিত্ত দিয়াই চিন্তা করিয়াছি, হিন্দুর চিত্ত দিয়াই গ্রহণ করিয়াছি। শুধু ব্রহ্মের নামের মধ্যে নহে, ব্রহ্মের ধারণার মধ্যে নহে, আমাদের ব্রহ্মের উপাসনার মধ্যেও একটি গভীর বিশেষত্ব আছেই—এই বিশেষত্বের মধ্যে বহুশতবৎসরের হিন্দুর দর্শন, হিন্দুর ভক্তিতত্ত্ব, হিন্দুর যোগসাধনা, হিন্দুর অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান, হিন্দুর ধ্যানদৃষ্টির বিশেষত্ব ওতপ্রোতভাবে মিলিত হইয়া আছে। আছে বলিয়াই তাহা বিশেষ ভাবে উপাদেয়, আছে বলিয়াই পৃথিবীতে তাহার বিশেষ মূল্য আছে। আছে বলিয়াই সত্যের এই রূপটিকে—এই রসটিকে মানুষ কেবল এখান হইতে পাইতে পারে। ব্রাহ্ম

সমাজের সাধনাকে আমরা অন্ধ অহংকারে নূতন বলিতেছি কিন্তু তাহার চেয়েও অনেক বেশি সত্য অহংকারে বলিব ইহা আমাদেরই ভিতরকার চিরন্তন—নবযুগে নববসন্তে সেই আমাদের চিরপুরাতনেরই নূতন বিকাশ হইয়াছে। য়ুরোপে খ্রীস্টান ধর্ম সেখানকার মানুষের কর্মশক্তি হইতে একটি বিশ্বসত্যের বিশেষ রূপ লাভ করিয়াছে। সেইজন্য খ্রীস্টানধর্ম নিউটেস্টামেন্টের শাস্ত্রলিখিত ধর্ম নহে ইহা য়ুরোপীয় জাতির সমস্ত ইতিহাসের মধ্য দিয়া পরিপুষ্ট জীবনের ধর্ম; একদিকে তাহা য়ুরোপের অন্তরতম চিরন্তন, অন্য দিকে তাহা সকলের। হিন্দুসমাজের মধ্যেও আজ যদি কোনো সত্যের জন্ম ও প্রচার হয় তবে তাহা কোনোক্রমেই হিন্দুসমাজের বাহিরের জিনিস হইতেই পারে না,—যদি তাহা আমাদের চিরদিনের জীবন হইতে জীবন না পাইয়া থাকে, যদি সেইখান হইতেই তাহার স্তন্যরস না জুটিয়া থাকে, আমাদের বৃহৎ সমাজের চিত্তবৃত্তি যদি ধাত্রীর মতো তাহার সেবা না করিয়া থাকে তবে কেবল আমাদের হিন্দুসমাজে নহে পৃথিবীর কোনো সমাজেই এই পথের ধারের কুড়াইয়া পাওয়া জিনিস শ্রদ্ধার যোগ্য হয় নাই—তবে ইহা কৃত্রিম, ইহা অস্বাভাবিক, তবে সত্যের চির অধিকারসম্বন্ধে এই দরিদ্রের কোনো নিজের বিশেষ দলিল দেখাইবার নাই, তবে ইহা কেবল ক্ষণকালের সম্প্রদায়ের, ইহা চিরকালের মানবসমাজের নহে।

আমি জানি কোনো কোনো ব্রাহ্ম এমন বলিয়া থাকেন, আমি হিন্দুর কাছে যাহা পাইয়াছি, খ্রীস্টানের কাছে তাহার চেয়ে কম পাই নাই—এমন কি, হয়তো তাঁহারা মনে করেন তাহার চেয়ে বেশি পাইয়াছেন। ইহার একমাত্র কারণ, বাহির হইতে যাহা পাই তাহাকেই আমরা পাওয়া বলিয়া জানিতে পারি—কেননা, তাহাকে চেষ্টা করিয়া পাইতে হয় এবং তাহার প্রত্যেক অংশকে অনুভব করিয়া করিয়া পাই। এই জন্য বেতনের চেয়ে মানুষ সামান্য উপরি পাওনায় বেশি খুশি হইয়া উঠে। আমরা হিন্দু বলিয়া যাহা পাইয়াছি তাহা আমাদের রক্তে মাংসে অস্থিমজ্জায়, তাহা আমাদের মানসপ্রকৃতির তন্তুতে তন্তুতে জড়িত হইয়া আছে বলিয়াই তাহাকে স্বতন্ত্র করিয়া দেখিতে পাই না তাহাকে লাভ বলিয়া মনেই করি না—এই জন্য ইংরেজি পাঠশালায় পড়া মুখস্থ করিয়া যাহা অগভীরভাবে অল্পপরিমাণে ও ক্ষণস্থায়ীরূপেও পাই তাহাকেও আমরা বেশি না মনে করিয়া থাকিতে পারি না। মাথার ভারকে আমরা ভারী বলিয়া জানি না, কিন্তু মাথার উপরকার পাগড়িটাকে একটা কিছু বলিয়া স্পষ্ট বোঝা যায়, তাই বলিয়া এ কথা বলা সাজে না যে, মাথা বলিয়া জিনিসটা নাই পাগড়িটা আছে; সে পাগড়ি বহুমূল্য রত্নমাণিক্যজড়িত হইলেও এমন কথা বলা সাজে না। সেই জন্য আমরা বিদেশ হইতে যাহা পাইয়াছি দিনরাত্রি তাহাকে লইয়া ধ্যান করিলে এবং প্রচার

করিলেও, তাহাকে আমরা সকলের উচ্চে চড়াইয়া রাখিয়া দিলেও, আমার অগোচরে আমার প্রকৃতির গভীরতার মধ্যে নিঃশব্দে আমার চিরন্তন সামগ্রীগুলি আপন নিত্যস্থান অধিকার করিয়া থাকে। উর্দু ভাষায় যতই পারসি এবং আরবি শব্দ থাক্ না তবু ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণ জানেন তাহা ভারতবর্ষীয় গৌড়ীয় ভাষারই এক শ্রেণী;—ভাষার প্রকৃতিগত যে কাঠামোটাই তাহার নিত্যসামগ্রী, যে কাঠামোকে অবলম্বন করিয়া সৃষ্টির কার্য চলে সেটা বিদেশী সামগ্রীতে আদ্যোপান্ত সমাচ্ছন্ন হইয়া তবুও গৌড়ীয়। আমাদের দেশের ঘোরতর বিদেশীভাবাপন্নও যদি উপযুক্ত তত্ত্ববিদের হাতে পড়েন তবে তাঁহার চিরকালের স্বজাতীয় কাঠামোটা নিশ্চয়ই তাঁহার প্রচুর আবরণ আচ্ছাদনের ভিতর হইতে ধরা পড়িয়া যায়।

যে আপনাকে পর করে সে পরকে আপনার করে না, যে আপন ঘরকে অস্বীকার করে কখনোই বিশ্ব তাহার ঘরে আতিথ্য গ্রহণ করিতে আসে না; নিজের পদরক্ষার স্থানটুকুকে পরিত্যাগ করার দ্বারাই যে চরাচরের বিরাট ক্ষেত্রকে অধিকার করা যায় এ কথা কখনোই শ্রদ্ধেয় হইতে পারে না।

১৩১৯

হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়

আজকালকার দিনে পৃথিবী জুড়িয়া আনাগোনা মেলামেশা চলিতেছে। মানুষের নানা জাতি নানা উপলক্ষ্যে পরস্পরের পরিচয় লাভ করিতেছে। অতএব ভিন্ন ভিন্ন জাতির স্বাতন্ত্র্য ঘুচিয়া গিয়া পরস্পর মিলিয়া যাইবার সময় এখন উপস্থিত হইয়াছে একথা মনে করা যাইতে পারিত।

কিন্তু আশ্চর্য এই, বাহিরের দিকে দরজা যতই খুলিতেছে, প্রাচীর যতই ভাঙিতেছে, মানুষের জাতিগুলির স্বাতন্ত্র্যবোধ ততই যেন আরও প্রবল হইয়া উঠিতেছে। এক সময় মনে হইত মিলিবার উপায় ছিল না বলিয়াই মানুষেরা পৃথক হইয়া আছে কিন্তু এখন মিলিবার বাধা সকল যথাসম্ভব দূর হইয়াও দেখা যাইতেছে পার্থক্য দূর হইতেছে না।

যুরোপের যে সকল রাজ্যে খণ্ড খণ্ড জাতিরা একপ্রকার মিলিয়া ছিল এখন তাহারা প্রত্যেকেই আপন স্বতন্ত্র আসন গ্রহণ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে। নরোয়ে সুইডেনে ভাগ হইয়া গিয়াছে। আয়র্লণ্ড আপনার স্বতন্ত্র অধিকার লাভের জন্য বহু দিন হইতে অশ্রান্ত চেষ্টা করিতেছে। এমন কি, আপনার বিশেষ ভাষা, বিশেষ সাহিত্যকে

আইরিশরা জাগাইয়া তুলিবার প্রস্তাব করিতেছে। ওয়েল্‌স্‌বাসীদের মধ্যেও সে চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায়। বেল্‌জিয়মে এতদিন একমাত্র ফরাসি ভাষার প্রাধান্য প্রবল ছিল; আজ ফ্লেমিশরা নিজের ভাষার স্বাতন্ত্র্যকে জয়ী করিবার জন্য উৎসাহিত হইয়াছে; অস্ট্রিয়া রাজ্যে বহুবিধ ছোটো ছোটো জাতি একসঙ্গে বাস করিয়া আসিতেছে—তাহাদিগকে এক করিয়া মিলাইয়া ফেলিবার সম্ভাবনা আজ স্পষ্টই দুরপরাহত হইয়াছে। রুশিয়া আজ ফিনদিগকে আত্মসাৎ করিবার জন্য বিপুল বল প্রয়োগ করিতেছে বটে কিন্তু দেখিতেছে গেলা যত সহজ পরিপাক করা তত সহজ নহে। তুরস্ক সাম্রাজ্যে যে নানা জাতি বাস করিতেছে বহু রক্তপাতেও তাহাদের ভেদচিহ্ন বিলুপ্ত হইতে চাহিতেছে না।

ইংলণ্ডে হঠাৎ একটা ইম্পীরিয়ালিজ্‌মের ঢেউ উঠিয়াছিল। সমুদ্রপারের সমুদয় উপনিবেশগুলিকে এক সাম্রাজ্যতন্ত্রে বাঁধিয়া ফেলিয়া একটা বিরাট কলেবর ধারণ করিবার প্রলোভন ইংলণ্ডের চিত্তে প্রবল হইয়া উঠিতেছিল। এবারে উপনিবেশগুলির কর্তৃপক্ষেরা মিলিয়া ইংলণ্ডে যে এক মহাসমিতি বসিয়াছিল তাহাতে যতগুলি বন্ধনের প্রস্তাব হইয়াছে তাহার কোনোটাই টিঁকিতে পারে নাই। সাম্রাজ্যকে এককেন্দ্রগত করিবার খাতিরে যেখানেই উপনিবেশগুলির স্বাতন্ত্র্য হানি হইবার লেশমাত্র আশঙ্কা দেখা দিয়াছে সেইখানেই প্রবল আপত্তি উঠিয়াছে।

একান্ত মিলনেই যে সবলতা এবং বৃহৎ হইলেই যে মহৎ হওয়া যায় একথা এখনকার কথা নহে। আসল কথা, পার্থক্য যেখানে সত্য, সেখানে সুবিধার খাতিরে, বড়ো দল বাঁধিবার প্রলোভনে তাহাকে চোখ বুজিয়া লোপ করিবার চেষ্টা করিলে সত্য তাহাতে সম্মতি দিতে চায় না। চাপা-দেওয়া পার্থক্য ভয়ানক একটা উৎপাতক পদার্থ, তাহা কোনো-না-কোনো সময়ে ধাক্কা পাইলে হঠাৎ ফাটিয়া এবং ফাটাইয়া একটা বিপ্লব বাধাইয়া তোলে। যাহারা বস্তুতই পৃথক, তাহাদের পার্থক্যকে সম্মান করাই মিলনরক্ষার সদুপায়।

আপনার পার্থক্য যখন মানুষ যথার্থভাবে উপলব্ধি করে তখনই সে বড়ো হইয়া উঠিতে চেষ্টা করে। আপনার পার্থক্যের প্রতি যাহার কোনো মমতা নাই সেই হাল ছাড়িয়া দিয়া দশের সঙ্গে মিশিয়া একাকার হইয়া যায়। নিদ্রিত মানুষের মধ্যে প্রভেদ থাকে না—জাগিয়া উঠিলেই প্রত্যেকের ভিন্নতা নানা প্রকারে আপনাকে ঘোষণা করে। বিকাশের অর্থই ঐক্যের মধ্যে পার্থক্যের বিকাশ। বীজের মধ্যে বৈচিত্র্য নাই। কুঁড়ির মধ্যের সমস্ত পাপড়ি ঘনিষ্ঠ ভাবে মিলিয়া এক হইয়া থাকে—যখন তাহাদের ভেদ ঘটে তখনই ফুল বিকশিত হইয়া উঠে। প্রত্যেক পাপড়ি ভিন্ন ভিন্ন মুখে আপন পথে আপনাকে যখন পূর্ণ করিয়া তোলে তখনই ফুল সার্থক হয়। আজ

পরস্পরের সংঘাতে সমস্ত পৃথিবীতেই একটা জাগরণ সঞ্চারিত হইয়াছে বলিয়া বিকাশের অনিবার্য নিয়মে মনুষ্য-সমাজের স্বাভাবিক পার্থক্যগুলি আত্মরক্ষার জন্য চতুর্দিকে সচেষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। আপনাকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করিয়া অন্যের সঙ্গে একেবারে মিলিয়া গিয়া যে বড়ো হওয়া তাহাকে কোনো জাগ্রৎসত্তা বড়ো হওয়া মনে করিতেই পারে না। যে ছোটো সেও যখনই আপনার সত্যকার স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠে তখনই সেটিকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য প্রাণপণ করে—ইহাই প্রাণের ধর্ম। বস্তুত সে ছোটো হইয়াও বাঁচিতে চায়, বড়ো হইয়া মরিতে চায় না।

ফিনরা যদি কোনো ক্রমে রুশ হইয়া যাইতে পারে তবে অনেক উৎপাত হইতে তাহারা পরিত্রাণ পায়—তবে একটি বড়ো জাতির শামিল হইয়া গিয়া ছোটোত্বর সমস্ত দুঃখ একেবারে দূর হইয়া যায়। কোনো একটা নেশনের মধ্যে কোনো প্রকার দ্বিধা থাকিলেই তাহাতে বলক্ষয় করে এই আশঙ্কায় ফিনল্যাণ্ডকে রাশিয়ার সঙ্গে বলপূর্বক অভিন্ন করিয়া দেওয়াই রুশের অভিপ্রায়। কিন্তু ফিনল্যাণ্ডের ভিন্নতা যে একটা সত্য-পদার্থ; রাশিয়ার সুবিধার কাছে সে আপনাকে বলি দিতে চায় না। এই ভিন্নতাকে যথোচিত উপায়ে বশ করিতে চেষ্টা করা চলে, এক করিতে চেষ্টা করা হত্যা করার মতো অন্যায়। আয়র্লণ্ডকে লইয়াও ইংলণ্ডের সেই সংকট। সেখানে সুবিধার সঙ্গে সত্যের লড়াই চলিতেছে। আজ পৃথিবীর নানা স্থানেই যে এই সমস্যা দেখা যাইতেছে তাহার একমাত্র কারণ সমস্ত পৃথিবীতেই একটা প্রাণের বেগ সঞ্চারিত হইয়াছে।

আমাদের বাংলা দেশের সমাজের মধ্যে সম্প্রতি যে ছোটোখাটো একটি বিপ্লব দেখা দিয়াছে তাহারও মূল কথাটি সেই একই। ইতিপূর্বে এ দেশে ব্রাহ্মণ ও শূদ্র এই দুই মোটা ভাগ ছিল। ব্রাহ্মণ ছিল উপরে, আর সকলেই ছিল তলায় পড়িয়া।

কিন্তু যখনই নানা কারণে আমাদের দেশের মধ্যে একটা উদ্বোধন উপস্থিত হইল তখনই অব্রাহ্মণ জাতিরা শূদ্র শ্রেণীর এক-সমতল হীনতার মধ্যে একাকার হইয়া থাকিতে রাজি হইল না। কায়স্থ আপনার যে একটি বিশেষত্ব অনুভব করিতেছে তাহাতে সে আপনাকে শূদ্রত্বের মধ্যে বিলুপ্ত করিয়া রাখিতে পারে না। তাহার হীনতা সত্য নহে। সুতরাং সামাজিক শ্রেণীবন্ধনের অতি প্রাচীন সুবিধাকে সে চিরকাল মানিবে কেমন করিয়া? ইহাতে দেশাচার যদি বিরুদ্ধ হয় তবে দেশাচারকে পরাভূত হইতেই হইবে। আমাদের দেশের সকল জাতির মধ্যেই এই বিপ্লব ব্যাপ্ত হইবে। কেননা, মূর্ছাবস্থা ঘুচিলেই মানুষ সত্যকে অনুভব করে; সত্যকে অনুভব করিবামাত্র সে কোনো কৃত্রিম সুবিধার দাসত্ববন্ধন স্বীকার করিতে পারে না, বরঞ্চ সে অসুবিধা ও অশান্তিকেও বরণ করিয়া লইতে রাজি হয়।

ইহার ফল কী? ইহার ফল এই যে, স্বাতন্ত্র্যের গৌরববোধ জন্মিলেই মানুষ দুঃখ স্বীকার করিয়াও আপনাকে বড়ো করিয়া তুলিতে চাহিবে। বড়ো হইয়া উঠিলে তখনই পরস্পরের মিলন সত্যকার সামগ্রী হইবে। দীনতার মিলন, অধীনতার মিলন, এবং দায়ে পড়িয়া মিলন গোঁজামিলন মাত্র।

মনে আছে আমারই কোনো ব্যাকরণঘটিত প্রবন্ধ লইয়া একবার সাহিত্যপরিষৎ সভায় এমন একটি আলোচনা উঠিয়াছিল যে, বাংলা ভাষাকে যতদূর সম্ভব সংস্কৃতের মতো করিয়া তোলা উচিত—কারণ, তাহা হইলে গুজরাটি মারাঠা সকলেরই পক্ষে বাংলা ভাষা সুগম হইবে।

অবশ্য একথা স্বীকার করিতেই হইবে বাংলা ভাষার যে একটি নিজত্ব আছে অন্য দেশবাসীর পক্ষে বাংলা ভাষা বুঝিবার সেইটেই প্রধান বাধা। অথচ বাংলা ভাষার যাহা কিছু শক্তি যাহা কিছু সৌন্দর্য সমস্তই তাহার সেই নিজত্ব লইয়া। আজ ভারতের পশ্চিমতমপ্রান্তবাসী গুজরাটি বাংলা পড়িয়া বাংলা সাহিত্য নিজের ভাষায় অনুবাদ করিতেছে। ইহার কারণ এ নয় যে বাংলা ভাষাটা সংস্কৃতের কৃত্রিম ছাঁচেঢালা সর্বপ্রকার বিশেষত্ব-বর্জিত সহজ ভাষা। সাঁওতাল যদি বাঙালি পাঠকের কাছে তাহার লেখা চলিত হইবে আশা করিয়া নিজের ভাষা হইতে সমস্ত সাঁওতালিত্ব বর্জন করে তবেই কি তাহার সাহিত্য আমাদের কাছে আদর পাইবে? কেবল ওই বাধাটুকু দূর করার পথ চাহিয়াই কি আমাদের মিলন প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া আছে?

অতএব, বাঙালি বাংলা ভাষার বিশেষত্ব অবলম্বন করিয়াই সাহিত্যের যদি উন্নতি করে তবেই হিন্দিভাষীদের সঙ্গে তাহার বড়ো রকমের মিল হইবে। সে যদি হিন্দুস্থানীদের সঙ্গে সস্তায় ভাব করিয়া লইবার জন্য হিন্দির ছাঁদে বাংলা লিখিতে থাকে তবে বাংলা সাহিত্য অধঃপাতে যাইবে এবং কোনো হিন্দুস্থানী তাহার দিকে দৃক্‌পাতও করিবে না। আমার বেশ মনে আছে অনেকদিন পূর্বে একজন বিশেষ বুদ্ধিমান শিক্ষিত ব্যক্তি আমাকে বলিয়াছিলেন, "বাংলা সাহিত্য যতই উন্নতিলাভ করিতেছে ততই তাহা আমাদের জাতীয় মিলনের পক্ষে অন্তরায় হইয়া উঠিতেছে। কারণ এ সাহিত্য যদি শ্রেষ্ঠতা লাভ করে তবে ইহা মরিতে চাহিবে না—এবং ইহাকে অবলম্বন করিয়া শেষ পর্যন্ত বাংলা ভাষা মাটি কামড়াইয়া পড়িয়া থাকিবে। এমন অবস্থায় ভারতবর্ষে ভাষার ঐক্যসাধনের পক্ষে সর্বাপেক্ষা বাধা দিবে বাংলা ভাষা। অতএব বাংলা সাহিত্যের উন্নতি ভারতবর্ষের পক্ষে মঙ্গলকর নহে।" সকল প্রকার ভেদকে ঢেঁকিতে কুটিয়া একটা পিণ্ডাকার পদার্থ গড়িয়া তোলাই জাতীয় উন্নতির চরম পরিণাম, তখনকার দিনে ইহাই সকল লোকের মনে জাগিতেছিল। কিন্তু আসল কথা বিশেষত্ব বিসর্জন করিয়া

যে সুবিধা তাহা দু-দিনের ফাঁকি—বিশেষত্বকেই মহত্ত্বে লইয়া গিয়া যে সুবিধা তাহাই সত্য।

আমাদের দেশে ভারতবর্ষীয়দের মধ্যে রাষ্ট্রীয় ঐক্যলাভের চেষ্টা যখনই প্রবল হইল, অর্থাৎ যখনই নিজের সত্তা সম্বন্ধে আমাদের বিশেষভাবে চেতনার উদ্রেক হইল তখনই আমরা ইচ্ছা করিলাম বটে মুসলমানদিগকেও আমাদের সঙ্গে এক করিয়া লই, কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য হইতে পারিলাম না। এক করিয়া লইতে পারিলে আমাদের সুবিধা হইতে পারিত বটে, কিন্তু সুবিধা হইলেই যে এক করা যায় তাহা নহে। হিন্দু মুসলমানের মধ্যে যে একটি সত্য পার্থক্য আছে তাহা ফাঁকি দিয়া উড়াইয়া দিবার জো নাই। প্রয়োজনসাধনের আগ্রহবশত সেই পার্থক্যকে যদি আমরা না মানি তবে সেও আমাদের প্রয়োজনকে মানিবে না।

হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সকল দিক দিয়া একটা সত্যকার ঐক্য জন্মে নাই বলিয়াই রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে তাহাদিগকে এক করিয়া তুলিবার চেষ্টায় সন্দেহ ও অবিশ্বাসের সূত্রপাত হইল। এই সন্দেহকে অমূলক বলিয়া উড়াইয়া দিলে চলিবে না। আমরা মুসলমানকে যখন আহ্বান করিয়াছি তখন তাহাকে কাজ উদ্ধারের সহায় বলিয়া ডাকিয়াছি, আপন বলিয়া ডাকি নাই। যদি কখনো দেখি তাহাকে কাজের জন্য আর দরকার নাই তবে তাহাকে অনাবশ্যক বলিয়া পিছনে ঠেলিতে আমাদের বাধিবে না। তাহাকে যথার্থ আমাদের সঙ্গী বলিয়া অনুভব করি নাই, আনুষঙ্গিক বলিয়া মানিয়া লইয়াছি। যেখানে দুইপক্ষের মধ্যে অসামঞ্জস্য আছে সেখানে যদি তাহারা শরিক হয়, তবে কেবল ততদিন পর্যন্ত তাহাদের বন্ধন থাকে যতদিন বাহিরের কোনো বাধা অতিক্রমের জন্য তাহাদের একত্র থাকা আবশ্যক হয়,—সে আবশ্যকটা অতীত হইলেই ভাগবাঁটোয়ারার বেলায় উভয় পক্ষেই ফাঁকি চলিতে থাকে।

মুসলমান এই সন্দেহটি মনে লইয়া আমাদের ডাকে সাড়া দেয় নাই। আমরা দুই পক্ষ একত্র থাকিলে মোটের উপর লাভের অঙ্ক বেশি হইবে বটে, কিন্তু লাভের অংশ তাহার পক্ষে বেশি হইবে কি না, মুসলমানের সেইটেই বিবেচ্য। অতএব মুসলমানের এ কথা বলা অসংগত নহে যে আমি যদি পৃথক থাকিয়াই বড়ো হইতে পারি তবেই তাহাতে আমার লাভ।

কিছুকাল পূর্বে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে এই স্বাতন্ত্র্য-অনুভূতি তীব্র ছিল না। আমরা এমন এক রকম করিয়া মিলিয়া ছিলাম যে আমাদের মধ্যেকার ভিন্নতাটা চোখে পড়িত না। কিন্তু স্বাতন্ত্র্য-অনুভূতির অভাবটা একটা অ-ভাবমাত্র, ইহা ভাবাত্মক নহে। অর্থাৎ আমাদের মধ্যে সত্যকার অভেদ ছিল বলিয়াই যে, ভেদ সম্বন্ধে আমরা অচেতন

ছিলাম তাহা নহে—আমাদের মধ্যে প্রাণশক্তির অভাব ঘটিয়াছিল বলিয়াই একটা নিশ্চেতনতায় আমাদিগকে অভিভূত করিয়াছিল। একটা দিন আসিল যখন হিন্দু আপন হিন্দুত্ব লইয়া গৌরব করিতে উদ্যত হইল। তখন মুসলমান যদি হিন্দুর গৌরব মানিয়া লইয়া নিজেরা চুপচাপ পড়িয়া থাকিত তবে হিন্দু খুব খুশি হইত সন্দেহ নাই, কিন্তু যে কারণে হিন্দুর হিন্দুত্ব উগ্র হইয়া উঠিল সেই কারণেই মুসলমানের মুসলমানি মাথা তুলিয়া উঠিল। এখন সে মুসলমানরূপেই প্রবল হইতে চায়, হিন্দুর সঙ্গে মিশিয়া গিয়া প্রবল হইতে চায় না।

এখন জগৎ জুড়িয়া সমস্যা এ নহে যে, কী করিয়া ভেদ ঘুচাইয়া এক হইব—কিন্তু কী করিয়া ভেদ রক্ষা করিয়াই মিলন হইবে। সে কাজটা কঠিন—কারণ, সেখানে কোনো প্রকার ফাঁকি চলে না, সেখানে পরস্পরকে পরস্পরের জায়গা ছাড়িয়া দিতে হয়। সেটা সহজ নহে, কিন্তু যেটা সহজ সেটা সাধ্য নহে; পরিণামের দিকে চাহিলে দেখা যায় যেটা কঠিন সেটাই সহজ।

আজ আমাদের দেশে মুসলমান স্বতন্ত্র থাকিয়া নিজের উন্নতিসাধনের চেষ্টা করিতেছে। তাহা আমাদের পক্ষে যতই অপ্রিয় এবং তাহাতে আপাতত আমাদের যতই অসুবিধা হউক, একদিন পরস্পরের যথার্থ মিলনসাধনের ইহাই প্রকৃত উপায়। ধনী না হইলে দান করা কষ্টকর; মানুষ যখন আপনাকে বড়ো করে তখনই আপনাকে ত্যাগ করিতে পারে। যত দিন তাহার অভাব ও ক্ষুদ্রতা ততদিনই তাহার ঈর্ষা ও বিরোধ। ততদিন যদি সে আর কাহারও সঙ্গে মেলে তবে দায়ে পড়িয়া মেলে—সে মিলন কৃত্রিম মিলন। ছোটো বলিয়া আত্মলোপ করাটা অকল্যাণ, বড়ো হইয়া আত্মবিসর্জন করাটাই শ্রেয়।

আধুনিক কালের শিক্ষার প্রতি সময় থাকিতে মনোযোগ না করায় ভারতবর্ষের মুসলমান হিন্দুর চেয়ে অনেক বিষয়ে পিছাইয়া পড়িয়াছে। সেখানে তাহাকে সমান হইয়া লইতে হইবে। এই বৈষম্যটি দূর করিবার জন্য মুসলমান সকল বিষয়েই হিন্দুর চেয়ে বেশি দাবি করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহাদের এই দাবিতে আমাদের আন্তরিক সম্মতি থাকাই উচিত। পদ-মান-শিক্ষায় তাহারা হিন্দুর সমান হইয়া উঠে ইহা হিন্দুরই পক্ষে মঙ্গলকর।

বস্তুত বাহির হইতে যেটুকু পাওয়া যাইতে পারে, যাহা অন্যের নিকট প্রার্থনা করিয়া পাওয়া যায় তাহার একটা সীমা আছেই। সে সীমা হিন্দু ও মুসলমানের কাছে প্রায় সমান। সেই সীমায় যতদিন পর্যন্ত না পৌঁছানো যায় ততদিন মনে একটা আশা থাকে বুঝি সীমা নাই, বুঝি এই পথেই পরমার্থ লাভ করা যায়। তখনই সেই পথের পাথের

কার একটু বেশি জুটিয়াছে কার একটু কম, তাই লইয়া পরস্পর ঘোরতর ঈর্ষা বিরোধ ঘটিতে থাকে।

কিন্তু খানিকটা দূরে গিয়া স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, নিজের গুণে ও শক্তিতেই আমরা নিজের স্থায়ী মঙ্গল সাধন করিতে পারি। যোগ্যতা লাভ ছাড়া অধিকার লাভের অন্য কোনো পথ নাই। এই কথাটা বুঝিবার সময় যত অবিলম্বে ঘটে ততই শ্রেয়। অতএব অন্যের আনুকূল্যলাভের যদি কোনো স্বতন্ত্র সিধা রাস্তা মুসলমান আবিষ্কার করিয়া থাকে তবে সে পথে তাহাদের গতি অব্যাহত হউক। সেখানে তাহাদের প্রাপ্যের ভাগ আমাদের চেয়ে পরিমাণে বেশি হইতেছে বলিয়া অহরহ কলহ করিবার ক্ষুদ্রতা যেন আমাদের না থাকে। পদ-মানের রাস্তা মুসলমানের পক্ষে যথেষ্ট পরিমাণে সুগম হওয়াই উচিত—সে রাস্তার শেষ গম্যস্থানে পৌঁছিতে তাহাদের কোনো বিলম্ব না হয় ইহাই যেন আমরা প্রসন্নমনে কামনা করি।

কিন্তু এই যে বাহ্য অবস্থার বৈষম্য ইহার পরে আমি বেশি ঝোঁক দিতে চাই না—ইহা ঘুচিয়া যাওয়া কিছুই শক্ত নহে। যে কথা লইয়া এই প্রবন্ধে আলোচনা করিতেছি তাহা সত্যকার স্বাতন্ত্র্য। সে স্বাতন্ত্র্যকে বিলুপ্ত করা আত্মহত্যা করারই সমান।

আমার নিশ্চয় বিশ্বাস, নিজেদের স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন প্রভৃতি উদ্‌যোগ লইয়া মুসলমানেরা যে উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছে তাহার মধ্যে প্রতিযোগিতার ভাব যদি কিছু থাকে তবে সেটা স্থায়ী ও সত্য পদার্থ নহে। ইহার মধ্যে সত্য পদার্থ নিজেদের স্বাতন্ত্র্য উপলব্ধি। মুসলমান নিজের প্রকৃতিতেই মহৎ হইয়া উঠিবে এই ইচ্ছাই মুসলমানের সত্য ইচ্ছা।

এইরূপ বিচিত্র স্বাতন্ত্র্যকে প্রবল হইয়া উঠিতে দেখিলে আমাদের মনে প্রথমে একটা ভয় হয়। মনে হয় স্বাতন্ত্র্যের যে যে অংশে আজ বিরুদ্ধতা দেখিতেছি সেইগুলাই প্রশ্রয় পাইয়া অত্যন্ত বাড়িয়া যাইবে, এবং তাহা হইলে মানুষের মধ্যে পরস্পরের প্রতিকূলতা ভয়ংকর উগ্র হইয়া উঠিবে।

একদা সেই আশঙ্কার কাল ছিল। তখন এক এক জাতি আপনার মধ্যেই আবদ্ধ থাকিয়া আপনার বিশেষত্বকে অপরিমিতরূপে বাড়াইয়া চলিত। সমস্ত মানুষের পক্ষে সে একটা ব্যাধি ও অকল্যাণের রূপ ধারণ করিত।

এখন সেরূপ ঘটা সম্পূর্ণ সম্ভবপর নহে। এখন আমরা প্রত্যেক মানুষেই সকল মানুষের মাঝখানে আসিয়া পড়িয়াছি। এখন এত বড়ো কোণ কেহই খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিবে না, যেখানে অসংগতরূপে অবাধে একঝোঁকা রকম বাড় বাড়িয়া একটা অদ্ভুত সৃষ্টি ঘটিতে পারে।

এখনকার কালের যে দীক্ষা তাহাতে প্রাচ্য পাশ্চাত্য সকল জাতিরই যোগ আছে কেবল নিজের শাস্ত্র পড়িয়া পণ্ডিত হইবার আশা কেহ করিতে পারে না। অন্তত এই দিকেই মানুষের চেষ্টার গতি দেখা যাইতেছে; বিদ্যা এখন জ্ঞানের একটি বিশ্বযজ্ঞ হইয়া উঠিতেছে—সে সমস্ত মানুষের চিত্ত-সম্মিলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতেছে।

মানুষের এই বৃহৎ চেষ্টাই আজ মুসলমানের দ্বারে এবং হিন্দুর দ্বারে আঘাত করিতেছে। আমরা এতদিন পুরাপুরি পাশ্চাত্য শিক্ষা পাইতেছিলাম। এ শিক্ষা যখন এদেশে প্রথম আরম্ভ হইয়াছিল তখন সকল প্রকার প্রাচ্যবিদ্যার প্রতি তাহার অবজ্ঞা ছিল। আজ পর্যন্ত সেই অবজ্ঞার মধ্যে আমরাও বাড়িয়া উঠিয়াছি। তাহাতে মাতা সরস্বতীর ঘরে গৃহবিচ্ছেদ ঘটিয়াছে! তাঁহার পূর্বমহলের সন্তানেরা পশ্চিম মহলের দিকে জানালা বন্ধ করিয়াছে এবং পশ্চিম মহলের সন্তানেরা পুবে হাওয়াকে জঙ্গলের অস্বাস্থ্যকর হাওয়া জ্ঞান করিয়া তাহার একটু আভাসেই কান পর্যন্ত মুড়ি দিয়া বসিয়াছেন।

ইতিমধ্যে ক্রমশই সময়ের পরিবর্তন ঘটিয়াছে। সর্বত্রই প্রাচ্য বিদ্যার অনাদর দূর হইতেছে। মানবের জ্ঞানের বিকাশে তাহারও প্রয়োজন সামান্য নহে সে পরিচয় প্রতিদিন পাওয়া যাইতেছে।

অথচ, আমাদের বিদ্যাশিক্ষার বরাদ্দ সেই পূর্বের মতোই রহিয়া গিয়াছে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে কেবল আমাদেরই বিদ্যার উপযুক্ত স্থান নাই। হিন্দুমুসলমানশাস্ত্র অধ্যয়নে একজন জর্মান ছাত্রের যে সুবিধা আছে আমাদের সে সুবিধা নাই। এরূপ অসম্পূর্ণ শিক্ষালাভে আমাদের ক্ষতি করিতেছে সে বোধ যে আমাদের মনে জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা এখনকারই কালের ধর্মবশত; আমরা যদি কেবল পশ্চিমের পড়া পাখি হইয়া শেখা বুলি আওড়াই তবে তাহাতে রাস্তার লোকের ক্ষণকালীন বিস্ময় ও কৌতুক উৎপাদন করিবে মাত্র, পৃথিবীর তাহাতে কোনো লাভ নাই। আমরা নিজের বাণীকে লাভ করিব, সমস্ত মানব আমাদের কাছে এই প্রত্যাশা করিতেছে।

সেই প্রত্যাশা যদি পূর্ণ করিতে না পারি তবে মানুষের কাছে আমাদের কোনো সম্মান নাই। এই সম্মানলাভের জন্য প্রস্তুত হইবার আহ্বান আসিতেছে। তাহারই আয়োজন করিবার উদ্‌যোগ আমাদিগকে করিতে হইবে।

অল্পদিন হইতে আমাদের দেশে বিদ্যাশিক্ষার উপায় ও প্রণালী পরিবর্তনের যে চেষ্টা চলিতেছে সেই চেষ্টার মূলে আমাদের এই আকাঙ্ক্ষা রহিয়াছে। চেষ্টা যে ভালো করিয়া সফলতা লাভ করিতে পারিতেছে না তাহারও মূল কারণ আমাদের এতকালের অসম্পূর্ণ শিক্ষা। আমরা যাহা ঠিক মতো পাই নাই তাহা দিতে চেষ্টা করিয়াও দিতে পারিতেছি না।

আমাদের স্বজাতির এমন কোনো একটি বিশিষ্টতা আছে যাহা মূল্যবান, একথা সম্পূর্ণ অশ্রদ্ধা করেন এমন লোকও আছেন, তাঁহাদের কথা আমি একেবারেই ছাড়িয়া দিতেছি।

এই বিশিষ্টতাকে স্বীকার করেন অথচ ব্যবহারের বেলায় তাহাকে ন্যূনাধিক অগ্রাহ্য করিয়া থাকেন এমন লোকের সংখ্যা অল্প নহে। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে হয়তো আহ্নিকতর্পণও করেন এবং শাস্ত্রালাপেও পটু কিন্তু জাতীয় আদর্শকে তাঁহারা অত্যন্ত আংশিকভাবে গ্রহণ করেন এবং মুখে যতটা করেন কাজে ততটা করেন না। ইঁহারা নিজেরা যে বিদ্যালয়ে পড়া মুখস্থ করিয়া আসিয়াছেন তাহাকে বেশিদূর ছাড়াইয়া যাইতে ভরসা করেন না।

আর একদল আছেন তাঁহারা স্বজাতির বিশিষ্টতা লইয়া গৌরব করেন কিন্তু এই বিশিষ্টতাকে তাঁহারা অত্যন্ত সংকীর্ণ করিয়া দেখিয়া থাকেন। যাহা প্রচলিত তাহাকেই তাঁহারা বড়ো আসন দেন, যাহা চিরন্তন তাহাকে নহে। আমাদের দুর্গতির দিনে যে বিকৃতিগুলি অসংগত হইয়া উঠিয়া সমস্ত মানুষের সঙ্গে আমাদের বিরোধ ঘটাইয়াছে, খণ্ড খণ্ড করিয়া আমাদিগকে দুর্বল করিয়াছে, এবং ইতিহাসে বারবার করিয়া কেবলই আমাদের মাথা হেঁট করিয়া দিতেছে, তাঁহারা তাহাদিগকেই আমাদের বিশেষত্ব বলিয়া তাহাদের প্রতি নানাপ্রকার কাল্পনিক গুণের আরোপ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। ইঁহারা কালের আবর্জনাকেই স্বজাতির প্রকৃত পরিচয় মনে করিয়া তাহাকেই চিরস্থায়ী করিবার চেষ্টা করিবেন এবং দূষিত বাষ্পের আলেয়া-আলোককেই চন্দ্রসূর্যের চেয়ে সনাতন বলিয়া সম্মান করিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

অতএব যাঁহারা স্বতন্ত্রভাবে হিন্দু বা মুসলমান বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকে ভয় করেন তাঁহাদের ভয়ের কোনো কারণ নাই এমন কথা বলিতে পারি না। কিন্তু তৎসত্ত্বেও একথা জোর করিয়া বলিতে হইবে যে, যে শিক্ষার মধ্যে প্রাচ্য পাশ্চাত্ত্য সকল বিদ্যারই সমাবেশ হইতেছে সে শিক্ষা কখনোই চিরদিন কোনো একান্ত আতিশয্যের দিকে প্রশ্রয় লাভ করিতে পারিবে না। যাহারা স্বতন্ত্র তাহারা পরস্পর পাশাপাশি আসিয়া দাঁড়াইলে তবেই তাহাদের বাড়াবাড়ি কাটিয়া যায় ও তাহাদের সত্যটি যথার্থভাবে প্রকাশ পায়। নিজের ঘরে বসিয়া ইচ্ছামতো যিনি যতবড়ো খুশি নিজের আসন প্রস্তুত করিতে পারেন, কিন্তু পাঁচজনের সভার মধ্যে আসিয়া পড়িলে স্বতই নিজের উপযুক্ত আসনটি স্থির হইয়া যায়। হিন্দু বা মুসলমান বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি বিশ্বকে স্থান দেওয়া হয় তবে সেই সঙ্গে নিজের স্বাতন্ত্র্যকে স্থান দিলে কোনো বিপদের সম্ভাবনা থাকিবে না। ইহাতেই বস্তুত স্বাতন্ত্র্যের যথার্থ মূল্য নির্ধারিত হইয়া যাইবে।

এ পর্যন্ত আমরা পাশ্চাত্য শাস্ত্রসকলকে যে প্রকার বৈজ্ঞানিক, ঐতিহাসিক ও যুক্তিমূলক প্রণালীর দ্বারা বিচার করিয়া আসিতেছি নিজেদের শাস্ত্রগুলিকে সেরূপ করিতেছি না। যেন জগতে আর সর্বত্রই অভিব্যক্তির নিয়ম কাজ করিয়া আসিয়াছে, কেবল ভারতবর্ষেই সে প্রবেশ করিতে পারে নাই—এখানে সমস্তই অনাদি এবং ইতিহাসের অতীত। এখানে কোনো দেবতা ব্যাকরণ, কোনো দেবতা রসায়ন, কোনো দেবতা আয়ুর্বেদ আস্ত সৃষ্টি করিয়াছেন কোনো দেবতার মুখ-হস্ত-পদ হইতে একেবারেই চারি বর্ণ বাহির হইয়া আসিয়াছে সমস্তই ঋষি ও দেবতায় মিলিয়া এক মুহূর্তেই খাড়া করিয়া দিয়াছেন। ইহার উপরে আর কাহারও কোনো কথা চলিতেই পারে না। সেই জন্যই ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনায় অদ্ভুত অনৈসর্গিক ঘটনা বর্ণনায় আমাদের লেখনীর লজ্জা বোধ হয় না—শিক্ষিত লোকদের মধ্যেও ইহার পরিচয় প্রতিদিনই পাওয়া যায়। আমাদের সামাজিক আচার ব্যবহারেও বুদ্ধিবিচারের কোনো অধিকার নাই কেন আমরা একটা কিছু করি বা করি না তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করাই অসংগত। কেননা কার্যকারণের নিয়ম বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কেবলমাত্র ভারতবর্ষেই খাটিবে না—সকল কারণ শাস্ত্রবচনের মধ্যে নিহিত। এই জন্য সমুদ্রযাত্রা ভালো কি মন্দ, শাস্ত্র খুলিয়া তাহার নির্ণয় হইবে, এবং কোন্ ব্যক্তি ঘরে ঢুকিলে হুঁকার জল ফেলিতে হইবে পণ্ডিতমহাশয় তাহার বিধান দিবেন। কেন যে একজনের ছোঁয়া দুধ বা খেজুর রস বা গুড় খাইলে অপরাধ নাই, জল খাইলেই অপরাধ—কেন যে যবনের প্রস্তুত মদ খাইলে জাত যায় না, অন্ন খাইলেই জাত যায় এসব প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে ধোবা নাপিত বন্ধ করিয়াই মুখ বন্ধ করিয়া দিতে হয়।

শিক্ষিত সমাজেও যে এমন অদ্ভুত অসংগত ব্যবহার চলিতেছে তাহার একটা কারণ আমার এই মনে হয়, পাশ্চাত্যশাস্ত্র আমরা বিদ্যালয়ে শিখিয়া থাকি এবং প্রাচ্য-শাস্ত্র আমরা ইস্কুলের কাপড় ছাড়িয়া অন্যত্র অন্য অবস্থার মধ্যে শিক্ষা করি। এই জন্য উভয়ের সম্বন্ধে আমাদের মনের ভাবের একটা ভেদ ঘটিয়া যায়—অনায়াসেই মনে করিতে পারি বুদ্ধির নিয়ম কেবল এক জায়গায় খাটে - অন্য জায়গায় বড়ো জোর কেবল ব্যাকরণের নিয়মই খাটিতে পারে। উভয়কেই এক বিদ্যামন্দিরে এক শিক্ষার অঙ্গ করিয়া দেখিলে আমাদের এই মোহ কাটিয়া যাইবার উপায় হইবে।

কিন্তু আধুনিক শিক্ষিত সমাজেই এই ভাবটা বাড়িয়া উঠিতেছে কেন, এ প্রশ্ন স্বতই মনে উদিত হয়। শিক্ষা পাইলে বুদ্ধিবৃত্তির প্রতি লোকের অনাস্থা জন্মে বলিয়াই যে এমনটা ঘটে তাহা আমি মনে করি না। আমি পূর্বেই ইহার কারণ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি।

শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে আমাদের স্বাতন্ত্র্য-অভিমানটা প্রবল হইয়া উঠিতেছে। এই অভিমানের প্রথম জোয়ারে বড়ো একটা বিচার থাকে না, কেবল জোরই থাকে। বিশেষত এতদিন আমরা আমাদের যাহা কিছু সমস্তকেই নির্বিচারে অবজ্ঞা করিয়া আসিয়াছি—আজ তাহার প্রবল প্রতিক্রিয়ার অবস্থায় আমরা মাঝে মাঝে বৈজ্ঞানিক বিচারের ভান করি, কিন্তু তাহা নির্বিচারেরও বাড়া।

এই তীব্র অভিমানের আবিলতা কখনোই চিরদিন টিঁকিতে পারে না—এই প্রতিক্রিয়ার ঘাত প্রতিঘাত শান্ত হইয়া আসিবেই তখন ঘর হইতে এবং বাহির হইতে সত্যকে গ্রহণ করা আমাদের পক্ষে সহজ হইবে।

হিন্দুসমাজের পূর্ণ বিকাশের মূর্তি আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ ব্যাপার নহে। সুতরাং হিন্দু কী করিয়াছে ও কী করিতে পারে সে সম্বন্ধে আমাদের ধারণা দুর্বল ও অস্পষ্ট। এখন আমরা যেটাকে চোখে দেখিতেছি সেইটেই আমাদের কাছে প্রবল। তাহা যে নানারূপে হিন্দুর যথার্থ প্রকৃতি ও শক্তিকে আচ্ছন্ন করিয়া তাহাকে বিনাশ করিতেছে একথা মনে করা আমাদের পক্ষে কঠিন। পাঁজিতে যে সংক্রান্তির ছবি দেখা যায় আমাদের কাছে হিন্দু সভ্যতার মূর্তিটা সেই রকম। সে কেবলই যেন স্নান করিতেছে, জপ করিতেছে, এবং ব্রত উপবাসে কৃশ হইয়া জগতে সমস্ত কিছুর সংস্পর্শ পরিহার করিয়া অত্যন্ত সংকোচের সঙ্গে এক পাশে দাঁড়াইয়া আছে। কিন্তু একদিন এই হিন্দু সভ্যতা সজীব ছিল, তখন সে সমুদ্র পার হইয়াছে, উপনিবেশ বাঁধিয়াছে, দিগ্‌বিজয় করিয়াছে, দিয়াছে এবং নিয়াছে; তখন তাহার শিল্প ছিল, বাণিজ্য ছিল, তাহার কর্মপ্রবাহ ব্যাপক ও বেগবান ছিল; তখন তাহার ইতিহাসে নব নব মতের অভ্যুত্থান, সমাজবিপ্লব ও ধর্মবিপ্লবের স্থান ছিল; তখন তাহার স্ত্রীসমাজেও বীরত্ব, বিদ্যা ও তপস্যা ছিল; তখন তাহার আচার ব্যবহার যে চিরকালের মতো লোহার ছাঁচে ঢালাই করা ছিল না মহাভারত পড়িলে পাতায় পাতায় তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। সেই বৃহৎ বিচিত্র, জীবনের-বেগে-চঞ্চল, জাগ্রত চিত্তবৃত্তির তাড়নায় নব নব অধ্যবসায়ে প্রবৃত্ত হিন্দু সমাজ—যে সমাজ ভুলের ভিতর দিয়া সত্যে চলিয়াছিল; পরীক্ষার ভিতর দিয়া সিদ্ধান্তে ও সাধনার ভিতর দিয়া সিদ্ধিতে উত্তীর্ণ হইতেছিল; যাহা শ্লোকসংহিতার জটিল রজ্জুতে বাঁধা কলের পুত্তলীর মতো একই নির্জীব নাট্য প্রতিদিন পুনরাবৃত্তি করিয়া চলিতেছিল না;—বৌদ্ধ যে সমাজের অঙ্গ, জৈন যে সমাজের অংশ; মুসলমান ও খ্রীস্টানেরা যে সমাজের অন্তর্গত হইতে পারিত; যে সমাজের এক মহাপুরুষ একদা অনার্যদিগকে মিত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, আর এক মহাপুরুষ কর্মের আদর্শকে বৈদিক যাগযজ্ঞের সংকীর্ণতা হইতে উদ্ধার করিয়া উদার মনুষ্যত্বের ক্ষেত্রে মুক্তিদান করিয়া

ছিলেন এবং ধর্মকে বাহ্য অনুষ্ঠানের বিধিনিষেধের মধ্যে আবদ্ধ না করিয়া তাহাকে ভক্তি ও জ্ঞানের প্রশস্ত পথে সর্বলোকের সুগম করিয়া দিয়াছিলেন; সেই সমাজকে আজ আমরা হিন্দুসমাজ বলিয়া স্বীকার করিতেই চাই না;—যাহা চলিতেছে না তাহাকে আমরা হিন্দুসমাজ বলি;—প্রাণের ধর্মকে আমরা হিন্দুসমাজের ধর্ম বলিয়া মানিই না, কারণ, প্রাণের ধর্ম বিকাশের ধর্ম, পরিবর্তনের ধর্ম, তাহা নিয়ত গ্রহণ বর্জনের ধর্ম।

এই জন্যই মনে আশঙ্কা হয় যাঁহারা হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিতে উদ্‌যোগী, তাঁহারা কিরূপ হিন্দুত্বের ধারণা লইয়া এই কার্যে প্রবৃত্ত? কিন্তু সেই আশঙ্কামাত্রেই নিরস্ত হওয়াকে আমি শ্রেয়স্কর মনে করি না। কারণ, হিন্দুত্বের ধারণাকে তো আমরা নষ্ট করিতে চাই না, হিন্দুত্বের ধারণাকে আমরা বড়ো করিয়া তুলিতে চাই। তাহাকে চালনা করিতে দিলে আপনি সে বড়ো হইবার দিকে যাইবেই—তাহাকে গর্তের মধ্যে বাঁধিয়া রাখিলেই তাহার ক্ষুদ্রতা ও বিকৃতি অনিবার্য। বিশ্ববিদ্যালয় সেই চালনার ক্ষেত্র—কারণ সেখানে বুদ্ধিরই ক্রিয়া, সেখানে চিত্তকে সচেতন করারই আয়োজন। সেই চেতনার স্রোত প্রবাহিত হইতে থাকিলে আপনিই তাহা ধীরে ধীরে জড় সংস্কারের সংকীর্ণতাকে ক্ষয় করিয়া আপনাকে প্রশস্ত করিয়া তুলিবেই। মানুষের মনের উপর আমি পুরা বিশ্বাস রাখি; ভুল লইয়াও যদি আরম্ভ করিতে হয় সেও ভালো, কিন্তু আরম্ভ করিতেই হইবে, নতুবা ভুল কাটিবে না। ছাড়া পাইলে সে চলিবেই। এই জন্য যে-সমাজে অচলতাকেই পরমার্থ বলিয়া জ্ঞান করে সে-সমাজ অচেতনতাকেই আপনার সহায় জানে এবং সর্বাগ্রে মানুষের মন জিনিসকেই অহিফেন খাওয়াইয়া বিহ্বল করিয়া রাখে। সে এমন সকল ব্যবস্থা করে যাহাতে মন কোথাও বাহির হইতে পায় না, বাধা-নিয়মে একেবারে বদ্ধ হইয়া থাকে, সন্দেহ করিতে ভয় করে, চিন্তা করিতেই ভুলিয়া যায়। কিন্তু কোনো বিশেষ বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য যেমনই হ'ক মনকে তো সে বাঁধিয়া ফেলিতে পারিবে না, কারণ, মনকে চলিতে দেওয়াই তাহার কাজ। অতএব যদি হিন্দু সত্যই মনে করে শাস্ত্রশ্লোকের দ্বারা চিরকালের মতো দৃঢ়বদ্ধ জড়নিশ্চলতাই হিন্দুর প্রকৃত বিশেষত্ব—তবে সেই বিশেষত্ব রক্ষা করিতে হইলে বিশ্ববিদ্যালয়কে সর্বতোভাবে দূরে পরিহার করাই তাহার পক্ষে কর্তব্য হইবে। বিচারহীন আচারকে মানুষ করিবার ভার যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর দেওয়া হয় তবে ডাইনের হাতে পুত্র সমর্পণ করা হইবে।

কিন্তু যাঁহারা সত্যই বিশ্বাস করেন, হিন্দুত্বের মধ্যে কোনো গতিবিধি নাই—তাহা স্থাবর পদার্থ—বর্তমানকালের প্রবল আঘাতে পাছে সে লেশমাত্র বিচলিত হয়, পাছে তাহার স্থাবরধর্মের তিলমাত্র বৈলক্ষণ্য হয় এই জন্য তাহাকে নিবিড় করিয়া বাঁধিয়া

রাখাই হিন্দুস্তানের সর্বশ্রেষ্ঠ কর্তব্য—তাঁহারা মানুষের চিত্তকে প্রাচীর ঘেরিয়া বন্দিশালায় পরিণত করিবার প্রস্তাব না করিয়া বিশ্ববিদ্যার হাওয়া বহিবার জন্য তাহার চারিদিকে বড়ো বড়ো দরজা ফুটাইবার উদ্‌যোগ যে করিতেছেন ইহা ভ্রমক্রমে অবিবেচনাবশতই করিতেছেন, তাহা সত্য নহে। আসল কথা, মানুষ মুখে যাহা বলে তাহাই যে তাহার সত্য বিশ্বাস তাহা সকল সময়ে ঠিক নহে। তাহার অন্তরতম সহজবোধের মধ্যে অনেক সময় এই বাহ্যবিশ্বাসের একটা প্রতিবাদ বাস করে। বিশেষত যে সময়ে দেশে প্রাচীন সংস্কারের সঙ্গে নূতন উপলব্ধির দ্বন্দ্ব চলিতেছে সেই ঋতুপরিবর্তনের সন্ধিকালে আমরা মুখে যাহা বলি সেটাকেই আমাদের অন্তরের প্রকৃত পরিচয় বলিয়া গ্রহণ করা চলে না। ফাল্গুন মাসে মাঝে মাঝে বসন্তের চেহারা বদল হইয়া গিয়া হঠাৎ উত্তরে হাওয়া বহিতে থাকে, তখন পৌষ মাস ফিরিয়া আসিল বলিয়া ভ্রম হয়, তবু একথা জোর করিয়াই বলা যাইতে পারে উত্তরে হাওয়া ফাল্গুনের অন্তরের হাওয়া নহে। আমের যে বোল ধরিয়াছে, নব কিশলয়ে যে চিক্কণ তরুণতা দেখিতেছি, তাহাতেই ভিতরকার সত্য সংবাদটা প্রকাশ হইয়া পড়ে। আমাদেরও দেশের মধ্যে প্রাণের হাওয়াই বহিয়াছে—এই হাওয়া বহিয়াছে বলিয়াই আমাদের জড়তা ভাঙিয়াছে এবং গলা ছাড়িয়া বলিতেছি যাহা আছে তাহাকে রাখিয়া দিব। একথা ভুলিতেছি যাহা যেখানে যেমন আছে তাহাকে সেখানে তেমনি করিয়া ফেলিয়া রাখিতে যদি চাই তবে কোনো চেষ্টা না করাই তাহার পন্থা। খেতের মধ্যে আগাছাকে প্রবল করিয়া তুলিবার জন্য কেহ চাষ করিয়া মই চালাইবার কথা বলে না। চেষ্টা করিতে গেলেই সেই নাড়াচাড়াতেই ক্ষয়ের কার্য পরিবর্তনের কার্য দ্রুতবেগে অগ্রসর হইবেই। নিজের মধ্যে যে সঞ্জীবনীশক্তি অনুভব করিতেছি, মনে করিতেছি সেই সঞ্জীবনীশক্তি প্রয়োগ করিয়াই মৃতকে রক্ষা করিব। কিন্তু জীবনীশক্তির ধর্মই এই, তাহা মৃতকে প্রবলবেগে মারিতে থাকে এবং যেখানে জীবনের কোনো আভাস আছে সেইখানেই আপনাকে প্রয়োগ করে। কোনো জিনিসকে স্থির করিয়া রাখা তাহার কাজ নহে—যে জিনিস বাড়িতে পারে তাহাকে সে বাড়াইয়া তুলিবে, আর যাহার বাড় ফুরাইয়াছে তাহাকে সে ধ্বংস করিয়া অপসারিত করিয়া দিবে। কিছুতেই সে স্থির রাখিবে না। তাই বলিতেছিলাম আমাদের মধ্যে জীবনীশক্তির আবির্ভাব হইয়া আমাদিগকে নানা চেষ্টায় প্রবৃত্ত করিতেছে—এই কথাই এখনকার দিনের সকলের চেয়ে বড়ো সত্য—তাহা মৃত্যুকে চিরস্থায়ী করিবার পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়াছে ইহাই বড়ো কথা নহে—ইহা তাহার একটা ক্ষণিক লীলা মাত্র।

শ্রীযুক্ত গোখেলের প্রাথমিক শিক্ষার অবশ্যপ্রবর্তনের বিল সম্বন্ধে কোনো কোনো

শিক্ষিত লোক এমন কথা বলিতেছেন যে, আধুনিক শিক্ষায় আমাদের তো মাথা ঘুরাইয়া দিয়াছে আবার দেশের জনসাধারণেরও কি বিপদ ঘটাইব? যাঁহারা এই কথা বলিতেছেন তাঁহারা নিজের ছেলেকে আধুনিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা দিতে ক্ষান্ত হইতেছেন না। এরূপ অদ্ভুত আত্মবিরোধ কেন দেখিতেছি? ইহা যে কপটাচার তাহা নহে। ইহা আর কিছু নয়,—অন্তরে নব বিশ্বাসের বসন্ত আসিয়াছে, মুখে পুরাতন সংস্কারের হাওয়া মরে নাই। সেই জন্য আমরা যাহা করিবার তাহা করিতে বসিয়াছি অথচ বলিতেছি আর এক কালের কথা। আধুনিক শিক্ষায় যে চঞ্চলতা আনিয়াছে সেই চঞ্চলতা সত্ত্বেও তাহার মঙ্গলকে আমরা মনের মধ্যে উপলব্ধি করিয়াছি। তাহাতে যে বিপদ আছে সেই বিপদকেও আমরা স্বীকার করিয়া লইয়াছি। নিরাপদ মৃত্যুকে আর আমরা বরণ করিতে রাজি নই: সেই জন্য জীবনের সমস্ত দায় সমস্ত পীড়াকেও মাথায় করিয়া লইবার জন্য আজ আমরা বীরের মতো প্রস্তুত হইতেছি। জানি উলটপালট হইবে, জানি বিস্তর ভুল করিব, জানি কোনো পুরাতন ব্যবস্থাকে নাড়া দিতে গেলেই প্রথমে দীর্ঘকাল বিশৃঙ্খলতার নানা দুঃখ ভোগ করিতে হইবে—চিরসঞ্চিত ধুলার হাত হইতে ঘরকে মুক্ত করিবার জন্য ঝাঁট দিতে গেলে প্রথমটা সেই ধুলাই খুব প্রচুর পরিমাণে ভোগ করিতে হইবে– এই সমস্ত অসুবিধা ও দুঃখ বিপদের আশঙ্কা নিশ্চয় জানি তথাপি আমাদের অন্তরের ভিতরকার নূতন প্রাণের আবেগ আমাদিগকে তো স্থির থাকিতে দিতেছে না। আমরা বাঁচিব, আমরা অচল হইয়া পড়িয়া থাকিব না,—এই ভিতরের কথাটাই আমাদের মুখের সমস্ত কথাকে বারংবার সবেগে ছাপাইয়া উঠিতেছে।

জাগরণের প্রথম মুহূর্তে আমরা আপনাকে অনুভব করি, পরক্ষণেই চারিদিকের সমস্তকে অনুভব করিতে থাকি। আমাদের জাতীয় উদ্বোধনের প্রথম আরম্ভেই আমরা যদি নিজেদের পার্থক্যকেই প্রবলভাবে উপলব্ধি করিতে পারি তবে ভয়ের কারণ নাই—সেই জাগরণই চারিদিকের বৃহৎ উপলব্ধিকেও উন্মেষিত করিয়া তুলিবে। আমরা নিজেকে পাইবার সঙ্গে সঙ্গেই সমস্তকে পাইবার আকাঙ্ক্ষা করিব।

আজ সমস্ত পৃথিবীতেই একদিকে যেমন দেখিতেছি প্রত্যেক জাতিই নিজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য প্রাণপণ করিতেছে, কোনো মতেই অন্য জাতির সঙ্গে বিলীন হইতে চাহিতেছে না, তেমনি দেখিতেছি প্রত্যেক জাতিই বৃহৎ মানবসমাজের সঙ্গে আপনার যোগ অনুভব করিতেছে। সেই অনুভূতির বলে সকল জাতিই আজ নিজেদের সেই সকল বিকট বিশেষত্ব বিসর্জন দিতেছে—যাহা অসংগত অদ্ভুতরূপে তাহার একান্ত নিজের—যাহা সমস্ত মানুষের বুদ্ধিকে রুচিকে ধর্মকে আঘাত করে—যাহা কারাগারের প্রাচীরের মতো, বিশ্বের দিকে যাহার বাহির হইবার বা প্রবেশ করিবার কোনো প্রকার পথই

নাই। আজ প্রত্যেক জাতিই তাহার নিজের সমস্ত সম্পদকে বিশ্বের বাজারে যাচাই করিবার জন্য আনিতেছে। তাহার নিজত্বকে কেবল তাহার নিজের কাছে চোখ বুজিয়া বড়ো করিয়া তুলিয়া তাহার কোনো তৃপ্তি নাই, তাহার নিজত্বকে কেবল নিজের ঘরে ঢাক পিটাইয়া ঘোষণা করিয়া তাহার কোনো গৌরব নাই—তাহার নিজত্বকে সমস্ত জগতের অলংকার করিয়া তুলিবে তাহার অন্তরের মধ্যে এই প্রেরণা আসিয়াছে। আজ যে দিন আসিয়াছে আজ আমরা কেহই গ্রাম্যতাকেই জাতীয়তা বলিয়া অহংকার করিতে পারিব না। আমাদের যে-সকল আচার ব্যবহার সংস্কার আমাদিগকে ক্ষুদ্র করিয়া পৃথক করিয়াছে, যে সকল থাকাতে কেবলই আমাদের সকলদিকে বাধাই বাড়িয়া উঠিয়াছে, ভ্রমণে বাধা, গ্রহণে বাধা, দানে বাধা, চিন্তায় বাধা, কর্মে বাধা—সেই সমস্ত কৃত্রিম বিঘ্ন ব্যাঘাতকে দূর করিতেই হইবে—নহিলে মানবের রাজধানীতে আমাদের লাঞ্ছনার সীমা থাকিবে না। একথা আমরা মুখে স্বীকার করি আর না করি, অন্তরের মধ্যে ইহা আমরা বুঝিয়াছি। আমাদের সেই জিনিসকেই আমরা নানা উপায়ে খুঁজিতেছি যাহা বিশ্বের আদরের ধন যাহা কেবলমাত্র ঘরগড়া আচার অনুষ্ঠান নহে। সেইটেকে লাভ করিলেই আমরা যথার্থভাবে রক্ষা পাইব—কারণ, তখন সমস্ত জগৎ নিজের গরজে আমাদিগকে রক্ষা করিবে। এই ইচ্ছা আমাদের অন্তরের মধ্যে জাগিয়া উঠিয়াছে বলিয়াই আমরা আর কোণে বসিয়া থাকিতে পারিতেছি না। আজ আমরা যে-সকল প্রতিষ্ঠানের পত্তন করিতেছি তাহার মধ্যে একই কালে আমাদের স্বাতন্ত্র্যবোধ এবং বিশ্ববোধ দুই প্রকাশ পাইতেছে। নতুবা আর পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়ের কল্পনাও আমাদের কাছে নিতান্ত অদ্ভুত বোধ হইত। এখনও একদল লোক আছেন যাঁহাদের কাছে ইহার অসংগতি পীড়াজনক বলিয়া ঠেকে। তাঁহারা এই মনে করিয়া গৌরব বোধ করেন যে হিন্দু এবং বিশ্বের মধ্যে বিরোধ আছে—তাই হিন্দু নানাপ্রকারে আটঘাট বাঁধিয়া অহোরাত্র বিশ্বের সংস্রব ঠেকাইয়া রাখিতেই চায়; অতএব হিন্দু টোল হইতে পারে, হিন্দু চতুষ্পাঠী হইতে পারে, কিন্তু হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় হইতেই পারে না—তাহা সোনার পাথরবাটি। কিন্তু এই দল যে কেবল কমিয়া আসিতেছে তাহা নহে, ইঁহাদেরও নিজেদের ঘরের আচরণ দেখিলে বোঝা যায় ইঁহারা যে কথাকে বিশ্বাস করিতেছেন বলিয়া বিশ্বাস করেন, গভীরভাবে, এমন কি, নিজের অগোচরে তাহাকে বিশ্বাস করেন না।

যেমন করিয়াই হউক আমাদের দেশের মর্মাধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে আমরা চিরকাল মন্দিরের অন্ধকার কোণে বসাইয়া রাখিতে পারিব না। আজ রথযাত্রার দিন আসিয়াছে—বিশ্বের রাজপথে, মানুষের সুখদুঃখ ও আদান-প্রদানের পণ্যবীথিকায় তিনি বাহির

হইয়াছেন। আজ আমরা তাঁহার রথ নিজেদের সাধ্য অনুসারে যে যেমন করিয়াই তৈরি করি না—কেহ বা বেশি মূল্যের উপাদান দিয়া, কেহ বা অল্প মূল্যের—চলিতে চলিতে কাহারও বা রথ পথের মধ্যেই ভাঙিয়া পড়ে, কাহারও বা বৎসরের পর বৎসর টিঁকিয়া থাকে—কিন্তু আসল কথাটা এই যে শুভলগ্নে রথের সময় আসিয়াছে। কোন্ রথ কোন্ পর্যন্ত গিয়া পৌঁছিবে তাহা আগে থাকিতে হিসাব করিয়া বলিতে পারি না—কিন্তু আমাদের বড়োদিন আসিয়াছে—আমাদের সকলের চেয়ে যাহা মূল্যবান পদার্থ তাহা আজ আর কেবলমাত্র পুরোহিতের বিধি-নিষেধের আড়ালে ধূপ-দীপের ঘনঘোর বাষ্পের মধ্যে গোপন থাকিবে না আজ বিশ্বের আলোকে আমাদের যিনি বরেণ্য তিনি বিশ্বের বরেণ্যরূপে সকলের কাছে গোচর হইবেন। তাহারই একটি রথ নির্মাণের কথা আজ আলোচনা করিয়াছি; ইহার পরিণাম কী তাহা নিশ্চয় জানি না, কিন্তু ইহার মধ্যে সকলের চেয়ে আনন্দের কথা এই যে, এই রথ বিশ্বের পথে চলিয়াছে, প্রকাশের পথে বাহির হইয়াছে,—সেই আনন্দের আবেগেই আমরা সকলে মিলিয়া জয়ধ্বনি করিয়া ইহার দড়ি ধরিতে ছুটিয়াছি।

কিন্তু আমি বেশ দেখিতে পাইতেছি যাঁহারা কাজের লোক তাঁহারা এই সমস্ত ভাবের কথায় বিরক্ত হইয়া উঠিতেছেন। তাঁহারা বলিতেছেন হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয় নাম ধরিয়া যে জিনিসটা তৈরি হইয়া উঠিতেছে কাজের দিক দিয়া তাহাকে বিচার করিয়া দেখো। হিন্দু নাম দিলেই হিন্দুত্বের গৌরব হয় না, এবং বিশ্ববিদ্যালয় নামেই চারিদিকে বিশ্ববিদ্যার ফোয়ারা খুলিয়া যায় না। বিদ্যার দৌড় এখনও আমাদের যতটা আছে তখনও তাহার চেয়ে যে বেশি দূর হইবে এ পর্যন্ত তাহার তো কোনো প্রমাণ দেখি না; তাহার পরে কমিটি ও নিয়মাবলীর শান-বাঁধানো মেজের কোন্ ছিদ্র দিয়া যে হিন্দুর হিন্দুত্ব শতদল বিকশিত হইয়া উঠিবে তাহাও অনুমান করা কঠিন।

এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, কুম্ভকার মূর্তি গড়িবার আরম্ভে কাদা লইয়া যে তালটা পাকায় সেটাকে দেখিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিলে চলিবে না। একেবারেই এক মুহূর্তেই আমাদের মনের মতো কিছুই হইবে না। এ কথা বিশেষরূপে মনে রাখা দরকার যে, মনের মতো কিছু যে হয় না, তাহার প্রধান দোষ মনেরই, উপকরণের নহে। যে অক্ষম সে মনে করে সুযোগ পায় না বলিয়াই সে অক্ষম। কিন্তু বাহিরের সুযোগ যখন জোটে তখন সে দেখিতে পায় পূর্ণ শক্তিতে ইচ্ছা করিতে পারে না বলিয়াই সে অক্ষম। যাহার ইচ্ছায় জোর আছে সে অল্প একটু সূত্র পাইলেই নিজের ইচ্ছাকে সার্থক করিয়া তোলে। আমাদের হতভাগ্য দেশেই আমরা প্রতিদিন এই কথা শুনিতে পাই, এই জায়গাটাতে আমার মতের সঙ্গে মিলিল না অতএব আমি

ইহাকে ত্যাগ করিব—এইখানটাতে আমার মনের মতো হয় নাই অতএব আমি ইহার সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ রাখিব না। বিধাতার আদুরে ছেলে হইয়া আমরা একেবারেই ষোলো আনা সুবিধা এবং রেখায় রেখায় মনের মিল দাবি করিয়া থাকি—তাহার কিছু ব্যত্যয় হইলেই অভিমানের অন্ত থাকে না। ইচ্ছাশক্তি যাহার দুর্বল ও সংকল্প যাহার অপরিস্ফুট তাহারই দুর্দশা। যখন যেটুকু সুযোগ পাই তাহাকেই ইচ্ছার জোরে সম্পূর্ণ করিব, নিজের মন দিয়া মনের মতো করিয়া তুলিব—একদিনে না হয় বহুদিনে, একলা না হয় দল বাঁধিয়া, জীবনে না হয় জীবনের অন্তে—এই কথা বলিবার জোর নাই বলিয়াই আমরা সকল উদ্‌যোগের আরম্ভেই কেবল খুঁতখুঁত করিতে বসিয়া যাই, নিজের অন্তরের দুর্বলতার পাপকে বাহিরের ঘাড়ে চাপাইয়া দূরে দাঁড়াইয়া ভারি একটা শ্রেষ্ঠতার বড়াই করিয়া থাকি। যেটুকু পাইয়াছি তাহাই যথেষ্ট, বাকি সমস্তই আমার নিজের হাতে, ইহাই পুরুষের কথা। যদি ইহাই নিশ্চয় জানি যে আমার মতই সত্য মত—তবে সেই মত গোড়াতেই গ্রাহ্য হয় নাই বলিয়া তখনই গোসাঘরে গিয়া দ্বার রোধ করিয়া বসিব না—সেই মতকে জয়ী করিয়া তুলিবই বলিয়া কোমর বাঁধিয়া লাগিতে হইবে। এ কথা নিশ্চয় সত্য, কোনো বিশেষ প্রতিষ্ঠানের দ্বারাই আমরা পরমার্থ লাভ করিব না—কেননা কলে মানুষ তৈরি হয় না। আমাদের মধ্যে যদি মনুষ্যত্ব থাকে তবেই প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে আমাদের মনোরথ সিদ্ধি হইবে। হিন্দুর হিন্দুত্বকে যদি আমরা স্পষ্ট করিয়া না বুঝি তবে হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয় হইলেই বুঝিব তাহা নহে—যদি তাহা স্পষ্ট করিয়া বুঝি তবে বাহিরে তাহার প্রতিকূলতা যত প্রবলই থাক সমস্ত ভেদ করিয়া আমাদের সেই উপলব্ধি আমাদের কাজের মধ্যে আকার ধারণ করিবেই। এই জন্যই হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয় কী ভাবে আরম্ভ হইতেছে, কিরূপে দেহ ধারণ করিতেছে, সে সম্বন্ধে মনে কোনো প্রকার সংশয় রাখিতে চাহি না। সংশয় যদি থাকে তবে সে যেন নিজের সম্বন্ধেই থাকে; সাবধান যদি হইতে হয় তবে নিজের অন্তরের দিকেই হইতে হইবে। কিন্তু আমার মনে কোনো দ্বিধা নাই। কেননা আলাদিনের প্রদীপ পাইয়াছি বলিয়া আমি উল্লাস করিতেছি না, রাতারাতি একটা মস্ত ফল লাভ করিব বলিয়াও আশা করি না। আমি দেখিতেছি আমাদের চিত্ত জাগ্রত হইয়াছে। মানুষের সেই চিত্তকে আমি বিশ্বাস করি—সে ভুল করিলেও নির্ভুল যন্ত্রের চেয়ে আমি তাহাকে শ্রদ্ধা করি। আমাদের সেই জাগ্রৎ চিত্ত যে-কোনো কাজে প্রবৃত্ত হইতেছে সেই আমাদের যথার্থ কাজ—চিত্তের বিকাশ যতই পূর্ণ হইতে থাকিবে কাজের বিকাশও ততই সত্য হইয়া উঠিবে। সেই সমস্ত কাজই আমাদের জীবনের সঙ্গী—আমাদের জীবনের সঙ্গে সঙ্গে তাহারা বাড়িয়া চলিবে—তাহাদের সংশোধন হইবে, তাহাদের বিস্তার হইবে;

বাধার ভিতর দিয়াই তাহারা প্রবল হইবে, সংকোচের ভিতর দিয়াই তাহারা পরিস্ফূর্ত হইবে এবং ভ্রমের ভিতর দিয়াই সত্যের মধ্যে সার্থক হইয়া উঠিবে।

১৩১৮

ভগিনী নিবেদিতা

ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে যখন আমার প্রথম দেখা হয় তখন তিনি অল্পদিনমাত্র ভারতবর্ষে আসিয়াছেন। আমি ভাবিয়াছিলাম সাধারণত ইংরেজ মিশনরি মহিলারা যেমন হইয়া থাকেন ইনিও সেই শ্রেণীর লোক, কেবল ইঁহার ধর্মসম্প্রদায় স্বতন্ত্র।

সেই ধারণা আমার মনে ছিল বলিয়া আমার কন্যাকে শিক্ষা দিবার ভার লইবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছিলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কী শিক্ষা দিতে চাও? আমি বলিলাম, ইংরেজি এবং সাধারণত ইংরেজি ভাষা অবলম্বন করিয়া যে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। তিনি বলিলেন, বাহির হইতে কোনো একটা শিক্ষা গিলাইয়া দিয়া লাভ কী? জাতিগত নৈপুণ্য ও ব্যক্তিগত বিশেষ ক্ষমতারূপে মানুষের ভিতরে যে জিনিসটা আছে তাহাকে জাগাইয়া তোলাই আমি যথার্থ শিক্ষা মনে করি। বাঁধা নিয়মের বিদেশী শিক্ষার দ্বারা সেটাকে চাপা দেওয়া আমার কাছে ভালো বোধ হয় না।

মোটের উপর তাঁহার সেই মতের সঙ্গে আমার মতের অনৈক্য ছিল না। কিন্তু কেমন করিয়া মানুষের ঠিক স্বকীয় শক্তি ও কৌলিক প্রেরণাকে শিশুর চিত্তে একেবারে অঙ্কুরেই আবিষ্কার করা যায় এবং তাহাকে এমন করিয়া জাগ্রত করা যায় যাহাতে তাহার নিজের গভীর বিশেষত্ব সার্বভৌমিক শিক্ষার সঙ্গে ব্যাপকভাবে সুসংগত হইয়া উঠিতে পারে তাহার উপায় তো জানি না। কোনো অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন গুরু এ কাজ নিজের সহজবোধ হইতে করিতেও পারেন, কিন্তু ইহা তো সাধারণ শিক্ষকের কর্ম নহে। কাজেই আমরা প্রচলিত শিক্ষাপ্রণালী অবলম্বন করিয়া মোটা রকমে কাজ চালাই। তাহাতে অন্ধকারে ঢেলা মারা হয়—তাহাতে অনেক ঢেলা অপব্যয় হয়, এবং অনেক ঢেলা ভুল জায়গায় লাগিয়া ছাত্র বেচারাকে আহত করে। মানুষের মতো চিত্তবিশিষ্ট পদার্থকে লইয়া এমনতরো পাইকারি ভাবে ব্যবহার করিতে গেলে প্রভূত লোকসান হইবেই সন্দেহ নাই, কিন্তু সমাজে সর্বত্র তাহা প্রতিদিনই হইতেছে।

যদিচ আমার মনে সংশয় ছিল, এরূপ শিক্ষা দিবার শক্তি তাঁহার আছে কি না, তবু আমি তাঁহাকে বলিলাম, আচ্ছা বেশ আপনার নিজের প্রণালীমতোই কাজ করিবেন, আমি কোনো প্রকার ফরমাশ করিতে চাই না। বোধ করি ক্ষণকালের জন্য তাঁহার মন অনুকূল হইয়াছিল, কিন্তু পরক্ষণেই বলিলেন, না, আমার এ কাজ নহে। বাগবাজারের একটি বিশেষ গলির কাছে তিনি আত্মনিবেদন করিয়াছিলেন—সেখানে তিনি পাড়ার মেয়েদের মাঝখানে থাকিয়া শিক্ষা দিবেন তাহা নহে, শিক্ষা জাগাইয়া তুলিবেন। মিশনরির মতো মাথা গণনা করিয়া দলবৃদ্ধি করিবার সুযোগকে, কোনো একটি পরিবারের মধ্যে নিজের প্রভাব বিস্তারের উপলক্ষ্যকে, তিনি অবজ্ঞা করিয়া পরিহার করিলেন।

তাহার পরে মাঝে মাঝে নানাদিক্‌ দিয়া তাঁহার পরিচয়-লাভের অবসর আমার ঘটিয়াছিল। তাঁহার প্রবল শক্তি আমি অনুভব করিয়াছিলাম কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও বুঝিয়াছিলাম তাঁহার পথ আমার চলিবার পথ নহে। তাঁহার সর্বতোমুখী প্রতিভা ছিল, সেই সঙ্গে তাঁহার আর একটি জিনিস ছিল, সেটি তাঁহার যোদ্ধৃত্ব। তাঁহার বল ছিল এবং সেই বল তিনি অন্যের জীবনের উপর একান্ত বেগে প্রয়োগ করিতেন—মনকে পরাভূত করিয়া অধিকার করিয়া লইবার একটা বিপুল উৎসাহ তাঁহার মধ্যে কাজ করিত। যেখানে তাঁহাকে মানিয়া চলা অসম্ভব সেখানে তাঁহার সঙ্গে মিলিয়া চলা কঠিন ছিল। অন্তত আমি নিজের দিক দিয়া বলিতে পারি তাঁহার সঙ্গে আমার মিলনের নানা অবকাশ ঘটিলেও এক জায়গায় অন্তরের মধ্যে আমি গভীর বাধা অনুভব করিতাম। সে যে ঠিক মতের অনৈক্যের বাধা তাহা নহে, সে যেন একটা বলবান আক্রমণের বাধা।

আজ এই কথা আমি অসংকোচে প্রকাশ করিতেছি তাহার কারণ এই যে, একদিকে তিনি আমার চিত্তকে প্রতিহত করা সত্ত্বেও আর একদিকে তাঁহার কাছ হইতে যেমন উপকার পাইয়াছি এমন আর কাহারও কাছ হইতে পাইয়াছি বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার সহিত পরিচয়ের পর হইতে এমন বারংবার ঘটিয়াছে যখন তাঁহার চরিত স্মরণ করিয়া ও তাঁহার প্রতি গভীর ভক্তি অনুভব করিয়া আমি প্রচুর বল পাইয়াছি।

নিজেকে এমন করিয়া সম্পূর্ণ নিবেদন করিয়া দিবার আশ্চর্য শক্তি আর কোনো মানুষে প্রত্যক্ষ করি নাই। সে সম্বন্ধে তাঁহার নিজের মধ্যে যেন কোনো প্রকার বাধাই ছিল না। তাঁহার শরীর, তাঁহার আশৈশব য়ুরোপীয় অভ্যাস, তাঁহার আত্মীয় স্বজনের স্নেহমমতা, তাঁহার স্বদেশীয় সমাজের উপেক্ষা এবং যাহাদের জন্য তিনি প্রাণ সমর্পণ

করিয়াছেন তাহাদের ঔদাসীন্য, দুর্বলতা ও ত্যাগস্বীকারের অভাব কিছুতেই তাঁহাকে ফিরাইয়া দিতে পারে নাই। মানুষের সত্যস্বরূপ, চিৎস্বরূপ যে কী, তাহা যে তাঁহাকে জানিয়াছে সে দেখিয়াছে। মানুষের আন্তরিক সত্তা সর্বপ্রকার স্থূল আবরণকে একেবারে মিথ্যা করিয়া দিয়া কিরূপ অপ্রতিহত তেজে প্রকাশ পাইতে পারে তাহা দেখিতে পাওয়া পরম সৌভাগ্যের কথা। ভগিনী নিবেদিতার মধ্যে মানুষের সেই অপরাহত মাহাত্ম্যকে সম্মুখে প্রত্যক্ষ করিয়া আমরা ধন্য হইয়াছি।

পৃথিবীতে সকলের চেয়ে বড়ো জিনিস আমরা যাহা কিছু পাই তাহা বিনামূল্যেই পাইয়া থাকি, তাহার জন্য দরদস্তুর করিতে হয় না। মূল্য চুকাইতে হয় না বলিয়াই জিনিসটা যে কত বড়ো তাহা আমরা সম্পূর্ণ বুঝিতেই পারি না। ভগিনী নিবেদিতা আমাদিগকে যে জীবন দিয়া গিয়াছেন তাহা অতি মহৎজীবন;—তাঁহার দিক হইতে তিনি কিছুমাত্র ফাঁকি দেন নাই;—প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তেই আপনার যাহা সকলের শ্রেষ্ঠ, আপনার যাহা মহত্তম, তাহাই তিনি দান করিয়াছেন, সে জন্য মানুষ যত প্রকার কৃচ্ছ্রসাধন করিতে পারে সমস্তই তিনি স্বীকার করিয়াছেন। এই কেবল তাঁহার পণ ছিল যাহা একেবারে খাঁটি তাহাই তিনি দিবেন - নিজেকে তাহার সঙ্গে একটুও মিশাইবেন না—নিজের ক্ষুধাতৃষ্ণা, লাভলোকসান, খ্যাতিপ্রতিপত্তি কিছু না—ভয় না, সংকোচ না, আরাম না, বিশ্রাম না।

এই যে এতবড়ো আত্মবিসর্জন আমরা ঘরে বসিয়া পাইয়াছি ইহাকে আমরা যে অংশে লঘু করিয়া দেখিব সেই অংশেই বঞ্চিত হইব, পাইয়াও আমাদের পাওয়া ঘটিবে না। এই আত্মবিসর্জনকে অত্যন্ত অসংকোচে নিতান্তই আমাদের প্রাপ্য বলিয়া অচেতনভাবে গ্রহণ করিলে চলিবে না। ইহার পশ্চাতে কত বড়ো একটা শক্তি, ইহার সঙ্গে কী বুদ্ধি, কী হৃদয়, কী ত্যাগ, প্রতিভার কী জ্যোতির্ময় অন্তর্দৃষ্টি আছে তাহা আমাদিগকে উপলব্ধি করিতে হইবে।

যদি তাহা উপলব্ধি করি তবে আমাদের গর্ব দূর হইয়া যাইবে। কিন্তু এখনও আমরা গর্ব করিতেছি। তিনি যে আপনার জীবনকে এমন করিয়া দান করিয়াছেন সেদিক দিয়া তাঁহার মাহাত্ম্যকে আমরা যে পরিমাণে মনের মধ্যে গ্রহণ করিতেছি না, সে পরিমাণে এই ত্যাগস্বীকারকে আমাদের গর্ব করিবার উপকরণ করিয়া লইয়াছি। আমরা বলিতেছি তিনি অন্তরে হিন্দু ছিলেন, অতএব আমরা হিন্দুরা বড়ো কম লোক নই। তাঁহার যে আত্মনিবেদন তাহাতে আমাদেরই ধর্ম ও সমাজের মহত্ত্ব। এমনি করিয়া আমরা নিজের দিকের দাবিকেই যত বড়ো করিয়া লইতেছি তাঁহার দিকের দানকে ততই খর্ব করিতেছি।

বস্তুত তিনি কী পরিমাণে হিন্দু ছিলেন তাহা আলোচনা করিয়া দেখিতে গেলে নানা জায়গায় বাধা পাইতে হইবে—অর্থাৎ—আমরা হিন্দুয়ানির যে ক্ষেত্রে আছি তিনিও ঠিক সেই ক্ষেত্রেই ছিলেন একথা আমি সত্য বলিয়া মনে করি না। তিনি হিন্দুধর্ম ও হিন্দুসমাজকে যে ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে দেখিতেন—তাহার শাস্ত্রীয় অপৌরুষেয় অটল বেড়া ভেদ করিয়া যেরূপ সংস্কারমুক্ত চিত্তে তাহাকে নানা পরিবর্তন ও অভিব্যক্তির মধ্য দিয়া চিন্তা ও কল্পনার দ্বারা অনুসরণ করিতেন, আমরা যদি সে পন্থা অবলম্বন করি তবে বর্তমানকালে যাহাকে সর্বসাধারণে হিন্দুয়ানি বলিয়া থাকে তাহার ভিত্তিই ভাঙিয়া যায়। ঐতিহাসিক যুক্তিকে যদি পৌরাণিক উক্তির চেয়ে বড়ো করিয়া তুলি তবে তাহাতে সত্য নির্ণয় হইতে পারে কিন্তু নির্বিচার বিশ্বাসের পক্ষে তাহা অনুকূল নহে।

যেমনই হউক, তিনি হিন্দু ছিলেন বলিয়া নহে, তিনি মহৎ ছিলেন বলিয়াই আমাদের প্রণম্য। তিনি আমাদেরই মতন ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে ভক্তি করিব তাহা নহে, তিনি আমাদের চেয়ে বড়ো ছিলেন বলিয়াই তিনি আমাদের ভক্তির যোগ্য। সেই দিক দিয়া যদি তাঁহার চরিত আলোচনা করি তবে, হিন্দুত্বের নহে, মনুষ্যত্বের গৌরবে আমরা গৌরবান্বিত হইব।

তাঁহার জীবনে সকলের চেয়ে যেটা চক্ষে পড়ে সেটা এই যে, তিনি যেমন গভীরভাবে ভাবুক তেমনি প্রবলভাবে কর্মী ছিলেন। কর্মের মধ্যে একটা অসম্পূর্ণতা আছেই—কেননা তাহাকে বাধার মধ্য দিয়া ক্রমে ক্রমে উদ্ভিন্ন হইয়া উঠিতে হয়—সেই বাধার নানা ক্ষতচিহ্ন তাহার সৃষ্টির মধ্যে থাকিয়া যায়। কিন্তু ভাব জিনিসটা অক্ষুণ্ণ অক্ষত। এই জন্য যাহারা ভাববিলাসী তাহারা কর্মকে অবজ্ঞা করে অথবা ভয় করিয়া থাকে। তেমনি আবার বিশুদ্ধ কেজো লোক আছে তাহারা ভাবের ধার ধারে না, তাহারা কর্মের কাছ হইতে খুব বড়ো জিনিস দাবি করে না বলিয়া কর্মের কোনো অসম্পূর্ণতা তাহাদের হৃদয়কে আঘাত করিতে পারে না।

কিন্তু ভাবুকতা যেখানে বিলাসমাত্র নহে, সেখানে তাহা সত্য, এবং কর্ম যেখানে প্রচুর উদ্যমের প্রকাশ বা সাংসারিক প্রয়োজনের সাধনামাত্র নহে, যেখানে তাহা ভাবেরই সৃষ্টি, সেখানে তুচ্ছও কেমন বড়ো হইয়া উঠে এবং অসম্পূর্ণতাও মেঘপ্রতিহত সূর্যের বর্ণচ্ছটার মতো কিরূপ সৌন্দর্যে প্রকাশমান হয় তাহা ভগিনী নিবেদিতার কর্ম যাঁহারা আলোচনা করিয়া দেখিয়াছেন তাঁহারা বুঝিয়াছেন।

ভগিনী নিবেদিতা যে-সকল কাজে নিযুক্ত ছিলেন তাহার কোনোটারই আয়তন বড়ো ছিল না, তাহার সকলগুলিরই আরম্ভ ক্ষুদ্র। নিজের মধ্যে যেখানে বিশ্বাস কম,

সেখানেই দেখিয়াছি বাহিরের বড়ো আয়তনে সান্ত্বনা লাভ করিবার একটা ক্ষুধা থাকে। ভগিনী নিবেদিতার পক্ষে তাহা একেবারে সম্ভবপর ছিল না। তাহার প্রধান কারণ এই যে তিনি অত্যন্ত খাঁটি ছিলেন। যেটুকু সত্য তাহাই তাঁহার পক্ষে একেবারে যথেষ্ট ছিল, তাহাকে আকারে বড়ো করিয়া দেখাইবার জন্য তিনি লেশমাত্র প্রয়োজন বোধ করিতেন না, এবং তেমন করিয়া বড়ো করিয়া দেখাইতে হইলে যে-সকল মিথ্যা মিশাল দিতে হয় তাহা তিনি অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন।

এই জন্যই এই একটি আশ্চর্য দৃশ্য দেখা গেল, যাঁহার অসামান্য শিক্ষা ও প্রতিভা তিনি এক গলির কোণে এমন কর্মক্ষেত্র বাছিয়া লইলেন যাহা পৃথিবীর লোকের চোখে পড়িবার মতো একেবারেই নহে। বিশাল বিশ্বপ্রকৃতি যেমন তাহার সমস্ত বিপুল শক্তি লইয়া মাটির নিচেকার অতি ক্ষুদ্র একটি বীজকে পালন করিতে অবজ্ঞা করে না এও সেইরূপ। তাঁহার এই কাজটিকে তিনি বাহিরে কোনোদিন ঘোষণা করেন নাই এবং আমাদের কাহারও নিকট হইতে কোনোদিন ইহার জন্য তিনি অর্থসাহায্য প্রত্যাশাও করেন নাই। তিনি যে ইহার ব্যয় বহন করিয়াছেন তাহা চাঁদার টাকা হইতে নহে, উদ্‌বৃত্ত অর্থ হইতে নহে, একেবারেই উদরান্নের অংশ হইতে।

তাঁহার শক্তি অল্প বলিয়াই যে তাঁহার অনুষ্ঠান ক্ষুদ্র ইহা সত্য নহে।

একথা মনে রাখিতে হইবে ভগিনী নিবেদিতার যে ক্ষমতা ছিল তাহাতে তিনি নিজের দেশে অনায়াসেই প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারিতেন। তাঁহার যে-কোনো স্বদেশীয়ের নিকটসংস্রবে তিনি আসিয়াছিলেন সকলেই তাঁহার প্রবল চিত্তশক্তিকে স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। দেশের লোকের নিকট যে খ্যাতি তিনি জয় করিয়া লইতে পারিতেন সেদিকে তিনি দৃক্‌পাতও করেন নাই।

তাহার পর এদেশের লোকের মনে আপনার ক্ষমতা বিস্তার করিয়া এখানেও তিনি যে একটা প্রধান স্থান অধিকার করিয়া লইবেন সে ইচ্ছাও তাঁহার মনকে লুব্ধ করে নাই। অন্য য়ুরোপীয়কেও দেখা গিয়াছে ভারতবর্ষের কাজকে তাঁহারা নিজের জীবনের কাজ বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছেন কিন্তু তাঁহারা নিজেকে সকলের উপরে রাখিতে চেষ্টা করিয়াছেন—তাঁহারা শ্রদ্ধাপূর্বক আপনাকে দান করিতে পারেন নাই তাঁহাদের দানের মধ্যে এক জায়গায় আমাদের প্রতি অনুগ্রহ আছে। কিন্তু শ্রদ্ধয়া দেয়ম্, অশ্রদ্ধয়া অদেয়ম্। কারণ, দক্ষিণ হস্তের দানের উপকারকে বাম হস্তের অবজ্ঞা অপহরণ করিয়া লয়।

কিন্তু ভগিনী নিবেদিতা একান্ত ভালোবাসিয়া সম্পূর্ণ শ্রদ্ধার সঙ্গে আপনাকে ভারতবর্ষে দান করিয়াছিলেন, তিনি নিজেকে কিছুমাত্র হাতে রাখেন নাই। অথচ

নিতান্ত মৃদুস্বভাবের লোক ছিলেন বলিয়াই যে নিতান্ত দুর্বলভাবে তিনি আপনাকে বিলুপ্ত করিয়াছিলেন তাহা নহে। পূর্বেই এ কথার আভাস দিয়াছি, তাঁহার মধ্যে একটা দুর্দান্ত জোর ছিল, এবং সে জোর যে কাহারও প্রতি প্রয়োগ করিতেন না তাহাও নহে। তিনি যাহা চাহিতেন তাহা সমস্ত মন প্রাণ দিয়াই চাহিতেন এবং ভিন্ন মতে বা প্রকৃতিতে যখন তাহা বাধা পাইত তখন তাঁহার অসহিষ্ণুতাও যথেষ্ট উগ্র হইয়া উঠিত। তাঁহার এই পাশ্চাত্ত্য-স্বভাবসুলভ প্রতাপের প্রবলতা কোনো অনিষ্ট করিত না তাহা আমি মনে করি না—কারণ, যাহা মানুষকে অভিভূত করিতে চেষ্টা করে তাহাই মানুষের শত্রু—তৎসত্ত্বেও বলিতেছি, তাঁহার উদার মহত্ত্ব তাঁহার উদগ্র প্রবলতাকে অনেক দূরে ছাড়াইয়া গিয়াছিল। তিনি যাহা ভালো মনে করিতেন তাহাকেই জয়ী করিবার জন্য তাঁহার সমস্ত জোর দিয়া লড়াই করিতেন, সেই জয়গৌরব নিজে লইবার লোভ তাঁহার লেশমাত্র ছিল না। দল বাঁধিয়া দলপতি হইয়া উঠা তাঁহার পক্ষে কিছুই কঠিন ছিল না, কিন্তু বিধাতা তাঁহাকে দলপতির চেয়ে অনেক উচ্চ আসন দিয়াছিলেন, আপনার ভিতরকার সেই সত্যের আসন হইতে নামিয়া তিনি হাটের মধ্যে মাচা বাঁধেন নাই। এদেশে তিনি তাঁহার জীবন রাখিয়া গিয়াছেন কিন্তু দল রাখিয়া যান নাই।

অথচ তাহার কারণ এ নয় যে, তাঁহার মধ্যে রুচিগত বা বুদ্ধিগত আভিজাত্যের অভিমান ছিল ;—তিনি জনসাধারণকে অবজ্ঞা করিতেন বলিয়াই যে তাহাদের নেতার পদের জন্য উমেদারি করেন নাই তাহা নহে। জনসাধারণকে হৃদয় দান করা যে কত বড়ো সত্য জিনিস তাহা তাঁহাকে দেখিয়াই আমরা শিখিয়াছি। জনসাধারণের প্রতি কর্তব্য সম্বন্ধে আমাদের যে বোধ তাহা পুঁথিগত—এসম্বন্ধে আমাদের বোধ কর্তব্যবুদ্ধির চেয়ে গভীরতায় প্রবেশ করে নাই। কিন্তু মা যেমন ছেলেকে সুস্পষ্ট করিয়া জানেন, ভগিনী নিবেদিতা জনসাধারণকে তেমনি প্রত্যক্ষ সত্তারূপে উপলব্ধি করিতেন। তিনি এই বৃহৎ ভাবকে একটি বিশেষ ব্যক্তির মতোই ভালোবাসিতেন। তাঁহার হৃদয়ের সমস্ত বেদনার দ্বারা তিনি এই “পীপ্‌ল”কে এই জনসাধারণকে আবৃত করিয়া ধরিয়াছিলেন। এ যদি একটিমাত্র শিশু হইত তবে ইহাকে তিনি আপনার কোলের উপর রাখিয়া আপনার জীবন দিয়া মানুষ করিতে পারিতেন।

বস্তুত তিনি ছিলেন লোকমাতা। যে মাতৃভাব পরিবারের বাহিরের একটি সমগ্র দেশের উপরে আপনাকে ব্যাপ্ত করিতে পারে তাহার মূর্তি তো ইতিপূর্বে আমরা দেখি নাই। এসম্বন্ধে পুরুষের যে কর্তব্যবোধ তাহার কিছু কিছু আভাস পাইয়াছি, কিন্তু রমণীর যে পরিপূর্ণ মমত্ববোধ তাহা প্রত্যক্ষ করি নাই। তিনি যখন বলিতেন Our people তখন তাহার মধ্যে যে একান্ত আত্মীয়তার সুরটি লাগিত আমাদের কাহারও

কণ্ঠে তেমনটি তো লাগে না। ভগিনী নিবেদিতা দেশের মানুষকে যেমন সত্য করিয়া ভালোবাসিতেন তাহা যে দেখিয়াছে সে নিশ্চয়ই ইহা বুঝিয়াছে যে, দেশের লোককে আমরা হয়তো সময় দিই, অর্থ দিই, এমন কি, জীবনও দিই কিন্তু তাহাকে হৃদয় দিতে পারি নাই—তাহাকে তেমন অত্যন্ত সত্য করিয়া নিকটে করিয়া জানিবার শক্তি আমরা লাভ করি নাই।

আমরা যখন দেশ বা বিশ্বমানব বা ওইরূপ কোনো একটা সমষ্টিগত সত্তাকে মনের মধ্যে দেখিতে চেষ্টা করি তখন তাহাকে যে অত্যন্ত অস্পষ্ট করিয়া দেখি তাহার কারণ আছে। আমরা এইরূপ বৃহৎ ব্যাপক সত্তাকে কেবলমাত্র মন দিয়াই দেখিতে চাই, চোখ দিয়া দেখি না। যে লোক দেশের প্রত্যেক লোকের মধ্যে সমগ্র দেশকে দেখিতে পায় না, সে মুখে যাহাই বলুক দেশকে যথার্থভাবে দেখে না। ভগিনী নিবেদিতাকে দেখিয়াছি তিনি লোকসাধারণকে দেখিতেন, স্পর্শ করিতেন, শুদ্ধমাত্র তাহাকে মনে মনে ভাবিতেন না। তিনি গণ্ডগ্রামের কুটীরবাসিনী একজন সামান্য মুসলমানরমণীকে যেরূপ অকৃত্রিম শ্রদ্ধার সহিত সম্ভাষণ করিয়াছেন দেখিয়াছি, সামান্য লোকের পক্ষে তাহা সম্ভবপর নহে—কারণ ক্ষুদ্র মানুষের মধ্যে বৃহৎ মানুষকে প্রত্যক্ষ করিবার সেই দৃষ্টি, সে অতি অসাধারণ। সেই দৃষ্টি তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত সহজ ছিল বলিয়াই এতদিন ভারতবর্ষের এত নিকটে বাস করিয়া তাঁহার শ্রদ্ধা ক্ষয় হয় নাই।

লোকসাধারণ ভগিনী নিবেদিতার হৃদয়ের ধন ছিল বলিয়াই তিনি কেবল দূর হইতে তাহাদের উপকার করিয়া অনুগ্রহ করিতেন না। তিনি তাহাদের সংস্রব চাহিতেন, তাহাদিগকে সর্বতোভাবে জানিবার জন্য তিনি তাঁহার সমস্ত মনকে তাহাদের দিকে প্রসারিত করিয়া দিতেন। তিনি তাহাদের ধর্মকর্ম কথাকাহিনী পূজাপদ্ধতি শিল্পসাহিত্য তাহাদের জীবনযাত্রার সমস্ত বৃত্তান্ত কেবল বুদ্ধি দিয়া নয় আন্তরিক মমতা দিয়া গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাহার মধ্যে যাহা কিছু ভালো যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু নিত্য পদার্থ আছে তাহাকেই তিনি একান্ত আগ্রহের সঙ্গে খুঁজিয়াছেন। মানুষের প্রতি স্বাভাবিক শ্রদ্ধা এবং একটি গভীর মাতৃস্নেহবশতই তিনি এই ভালোটিকে বিশ্বাস করিতেন এবং ইহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিতেন। এই আগ্রহের বেগে কখনো তিনি ভুল করেন নাই তাহা নয়, কিন্তু শ্রদ্ধার গুণে তিনি যে সত্য উদ্ধার করিয়াছেন সমস্ত ভুল তার কাছে তুচ্ছ। যাঁহারা ভালো শিক্ষক তাঁহারা সকলেই জানেন শিশুর স্বভাবের মধ্যেই প্রকৃতি একটি শিক্ষা করিবার সহজ প্রবৃত্তি নিহিত করিয়া রাখিয়া দিয়াছেন; শিশুদের চঞ্চলতা, অস্থির কৌতূহল, তাহাদের খেলাধুলা সমস্তই প্রাকৃতিক শিক্ষাপ্রণালী; জনসাধারণের মধ্যে সেই প্রকারের একটি

শিশুত্ব আছে। এই জন্য জনসাধারণ নিজেকে শিক্ষা দিবার ও সান্ত্বনা দিবার নানা প্রকার সহজ উপায় উদ্ভাবন করিয়াছে। ছেলেদের ছেলেমানুষি যেমন নিরর্থক নহে—তেমনি জনসাধারণের নানাপ্রকার সংস্কার ও প্রথা নিরবচ্ছিন্ন মূঢ়তা নহে—তাহা আপনাকে নানা প্রকারে শিক্ষা দিবার জন্য জনসাধারণের অন্তর্নিহিত চেষ্টা—তাহাই তাহাদের স্বাভাবিক শিক্ষার পথ। মাতৃহৃদয়া নিবেদিতা জনসাধারণের এই সমস্ত আচার-ব্যবহারকে সেই দিক হইতে দেখিতেন। এই জন্য সেই সকলের প্রতি তাঁহার ভারি একটা স্নেহ ছিল। তাহার সমস্ত বাহ্যরূঢ়তা ভেদ করিয়া তাহার মধ্যে মানব-প্রকৃতির চিরন্তন গূঢ় অভিপ্রায় তিনি দেখিতে পাইতেন।

লোকসাধারণের প্রতি তাঁহার এই যে মাতৃস্নেহ তাহা একদিকে যেমন সকরুণ ও সুকোমল আর একদিকে তেমনি শাবকবেষ্টিত বাঘিনীর মতো প্রচণ্ড। বাহির হইতে নির্মমভাবে কেহ ইহাদিগকে কিছু নিন্দা করিবে সে তিনি সহিতে পারিতেন না, অথবা যেখানে রাজার কোনো অন্যায় অবিচার ইহাদিগকে আঘাত করিতে উদ্যত হইত সেখানে তাঁহার তেজ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিত। কত লোকের কাছে হইতে তিনি কত নীচতা বিশ্বাসঘাতকতা সহ্য করিয়াছেন, কত লোক তাঁহাকে বঞ্চনা করিয়াছে, তাঁহার অতি সামান্য সম্বল হইতে কত নিতান্ত অযোগ্যলোকের অসংগত আবদার তিনি রক্ষা করিয়াছেন, সমস্তই তিনি অকাতরে সহ্য করিয়াছেন; কেবল তাঁহার একমাত্র ভয় এই ছিল পাছে তাঁহার নিকটতম বন্ধুরাও এই সকল হীনতার দৃষ্টান্তে তাঁহার "পীপ্‌ল"দের প্রতি অবিচার করে। ইহাদের যাহা কিছু ভালো তাহা যেমন তিনি দেখিতে চেষ্টা করিতেন তেমনি অনাত্মীয়ের অশ্রদ্ধাদৃষ্টিপাত হইতে ইহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য তিনি যেন তাঁহার সমস্ত ব্যথিত মাতৃহৃদয় দিয়া ইহাদিগকে আবৃত করিতে চাহিতেন। তাহার কারণ এ নয় যে সত্য গোপন করাই তাঁহার অভিপ্রায় ছিল, কিন্তু তাহার কারণ এই যে, তিনি জানিতেন অশ্রদ্ধার দ্বারা ইহাদিগকে অপমান করা অত্যন্ত সহজ এবং স্থূলদৃষ্টি লোকের পক্ষে তাহাই সম্ভব কিন্তু ইহাদের অন্তঃপুরের মধ্যে যেখানে লক্ষ্মী বাস করিতেছেন সেখানে তো এই সকল শ্রদ্ধাহীন লোকের প্রবেশের অধিকার নাই এই জন্যই তিনি এই সকল বিদেশীয় দিঙ্‌নাগদের "স্থূলহস্তাবলেপ" হইতে তাঁহার এই আপন লোকদিগকে রক্ষা করিবার জন্য এমন ব্যাকুল হইয়া উঠিতেন, এবং আমাদের দেশের যেসকল লোক বিদেশীর কাছে এই দীনতা জানাইতে যায় যে, আমাদের কিছুই নাই এবং তোমরাই আমাদের একমাত্র আশাভরসা, তাহাদিগকে তিনি তাঁহার তীব্ররোষের বজ্রশিখার দ্বারা বিদ্ধ করিতে চাহিতেন।

এমন য়ুরোপীয়ের কথা শোনা যায় যাঁহারা আমাদের শাস্ত্র পড়িয়া, বেদান্ত

আলোচনা করিয়া, আমাদের কোনো সাধুসজ্জনের চরিত্রে বা আলাপে আকৃষ্ট হইয়া ভারতবর্ষের প্রতি ভক্তি লইয়া আমাদের নিকটে আসিয়াছেন; অবশেষে দিনে দিনে সেই ভক্তি বিসর্জন দিয়া রিক্তহস্তে দেশে ফিরিয়াছেন। তাঁহারা শাস্ত্রে যাহা পড়িয়াছেন সাধুচরিতে যাহা দেখিয়াছেন সমস্ত দেশের দৈন্য ও অসম্পূর্ণতার আবরণ ভেদ করিয়া তাহা দেখিতে পান নাই। তাঁহাদের যে ভক্তি সে মোহমাত্র, সেই মোহ অন্ধকারেই টিঁকিয়া থাকে, আলোকে আসিলে মরিতে বিলম্ব করে না।

কিন্তু ভগিনী নিবেদিতার যে শ্রদ্ধা তাহা সত্যপদার্থ, তাহা মোহ নহে তাহা মানুষের মধ্যে দর্শনশাস্ত্রের শ্লোক খুঁজিত না, তাহা বাহিরের সমস্ত আবরণ ভেদ করিয়া মর্মস্থানে পৌঁছিয়া একেবারে মনুষ্যত্বকে স্পর্শ করিত। এই জন্য অত্যন্ত দীন অবস্থার মধ্যেও আমাদের দেশকে দেখিতে তিনি কুণ্ঠিত হন নাই। সমস্ত দৈন্যই তাঁহার স্নেহকে উদ্বোধিত করিয়াছে, অবজ্ঞাকে নহে। আমাদের আচার-ব্যবহার, কথাবার্তা, বেশভূষা, আমাদের প্রাত্যহিক ক্রিয়াকলাপ একজন য়ুরোপীয়কে যে কিরূপ অসহ্যভাবে আঘাত করে তাহা আমরা ঠিকমতো বুঝিতেই পারি না, এই জন্য আমাদের প্রতি তাহাদের রূঢ়তাকে আমরা সম্পূর্ণ অহেতুক বলিয়া মনে করি। কিন্তু ছোটো ছোটো রুচি, অভ্যাস ও সংস্কারের বাধা যে কত বড়ো বাধা তাহা একটু বিচার করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারি, কারণ, নিজেদের দেশের ভিন্ন শ্রেণী ও ভিন্ন জাতির সম্বন্ধে আমাদের মনেও সেটা অত্যন্ত প্রচুর পরিমাণেই আছে। বেড়ার বাধার চেয়ে ছোটো ছোটো কাঁটার বাধা বড়ো কম নহে। অতএব এ কথা আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে ভগিনী নিবেদিতা কলিকাতার বাঙালিপাড়ার এক গলিতে একেবারে আমাদের ঘরের মধ্যে আসিয়া যে বাস করিতেছিলেন তাহার দিনে রাত্রে প্রতি মুহূর্তে বিচিত্র বেদনার ইতিহাস প্রচ্ছন্ন ছিল। একপ্রকার স্থূলরুচির মানুষ আছে তাহাদিগকে অল্প কিছুতেই স্পর্শ করে না—তাহাদের অচেতনতাই তাহাদিগকে অনেক আঘাত হইতে রক্ষা করে। ভগিনী নিবেদিতা একেবারেই তেমন মানুষ ছিলেন না। সকল দিকেই তাঁহার বোধশক্তি সূক্ষ্ম এবং প্রবল ছিল; রুচির বেদনা তাঁহার পক্ষে অল্প বেদনা নহে; ঘরে বাহিরে আমাদের অসাড়তা, শৈথিল্য, অপরিচ্ছন্নতা, আমাদের অব্যবস্থা ও সকল প্রকার চেষ্টার অভাব, যাহা পদে পদে আমাদের তামসিকতার পরিচয় দেয় তাহা প্রত্যহই তাঁহাকে তীব্র পীড়া দিয়াছে সন্দেহ নাই কিন্তু সেইখানেই তাঁহাকে পরাভূত করিতে পারে নাই। সকলের চেয়ে কঠিন পরীক্ষা এই যে প্রতিমুহূর্তের পরীক্ষা, ইহাতে তিনি জয়ী হইয়াছিলেন।

শিবের প্রতি সতীর সত্যকার প্রেম ছিল বলিয়াই তিনি অর্ধাশনে অনশনে অগ্নিতাপ

সহ্য করিয়া আপনার অত্যন্ত সুকুমার দেহ ও চিত্তকে কঠিন তপস্যায় সমর্পণ করিয়াছিলেন। এই সতী নিবেদিতাও দিনের পর দিন যে তপস্যা করিয়াছিলেন তাহার কঠোরতা অসহ্য ছিল—তিনিও অনেকদিন অর্ধাশন অনশন স্বীকার করিয়াছেন, তিনি গলির মধ্যে যে বাড়ির মধ্যে বাস করিতেন সেখানে বাতাসের অভাবে গ্রীষ্মের তাপে বীতনিদ্র হইয়া রাত কাটাইয়াছেন, তবু ডাক্তার ও বান্ধবদের সনির্বন্ধ অনুরোধেও সে বাড়ি পরিত্যাগ করেন নাই; এবং আশৈশব তাঁহার সমস্ত সংস্কার ও অভ্যাসকে মুহূর্তে মুহূর্তে পীড়িত করিয়া তিনি প্রফুল্লচিত্তে দিন যাপন করিয়াছেন—ইহা যে সম্ভব হইয়াছে এবং এই সমস্ত স্বীকার করিয়াও শেষ পর্যন্ত তাঁহার তপস্যা ভঙ্গ হয় নাই তাহার একমাত্র কারণ, ভারতবর্ষের মঙ্গলের প্রতি তাঁহার প্রীতি একান্ত সত্য ছিল, তাহা মোহ ছিল না; মানুষের মধ্যে যে শিব আছেন সেই শিবকেই এই সতী সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। এই মানুষের অন্তর-কৈলাসের শিবকেই যিনি আপন স্বামীরূপে লাভ করিতে চান তাঁহার সাধনার মতো এমন কঠিন সাধনা আর কার আছে?

একদিন স্বয়ং মহেশ্বর ছদ্মবেশে তপঃপরায়ণা সতীর কাছে আসিয়া বলিয়াছিলেন, হে সাধ্বী, তুমি যাঁহার জন্য তপস্যা করিতেছ তিনি কি তোমার মতো রূপসীর এত কৃচ্ছ্রসাধনের যোগ্য? তিনি যে দরিদ্র, বৃদ্ধ, বিরূপ, তাঁহার যে আচার অদ্ভুত। তপস্বিনী ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন, তুমি যাহা বলিতেছ সমস্তই সত্য হইতে পারে, তথাপি তাঁহারই মধ্যে আমার সমস্ত মন "ভাবৈকরস" হইয়া স্থির রহিয়াছে।

শিবের মধ্যেই যে সতীর মন ভাবের রস পাইয়াছে তিনি কি বাহিরের ধনযৌবন রূপ ও আচারের মধ্যে তৃপ্তি খুঁজিতে পারেন? ভগিনী নিবেদিতার মন সেই অনন্যদুর্লভ সুগভীর ভাবের রসে চিরদিন পূর্ণ ছিল। এই জন্যই তিনি দরিদ্রের মধ্যে ঈশ্বরকে দেখিতে পাইয়াছিলেন এবং বাহির হইতে যাঁহার রূপের অভাব দেখিয়া রুচিবিলাসীরা ঘৃণা করিয়া দূরে চলিয়া যায় তিনি তাঁহারই রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহারই কণ্ঠে নিজের অমর জীবনের শুভ্র বরমাল্য সমর্পণ করিয়াছিলেন।

আমরা আমাদের চোখের সামনে সতীর এই যে তপস্যা দেখিলাম তাহাতে আমাদের বিশ্বাসের জড়তা যেন দূর করিয়া দেয়—যেন এই কথাটিকে নিঃসংশয় সত্যরূপে জানিতে পারি যে মানুষের মধ্যে শিব আছেন, দরিদ্রের জীর্ণকুটীরে এবং হীনবর্ণের উপেক্ষিত পল্লীর মধ্যেও তাঁহার দেবলোক প্রসারিত এবং যে ব্যক্তি সমস্ত দারিদ্র্য বিরূপতা ও কদাচারের বাহ্য আবরণ ভেদ করিয়া এই পরমৈশ্বর্যময় পরমসুন্দরকে ভাবের দিব্য দৃষ্টিতে একবার দেখিতে পাইয়াছেন তিনি মানুষের এই অন্তরতম আত্মাকে পুত্র হইতে

প্রিয় বিত্ত হইতে প্রিয় এবং যাহা কিছু আছে সকল হইতেই প্রিয় বলিয়া বরণ করিয়া লন।[1] তিনি ভয়কে অতিক্রম করেন, স্বার্থকে জয় করেন, আরামকে তুচ্ছ করেন, সংস্কারবন্ধনকে ছিন্ন করিয়া ফেলেন এবং আপনার দিকে মুহূর্তকালের জন্য দৃক্‌পাতমাত্র করেন না।

১৩১৮

শিক্ষার বাহন

প্রয়োজনের দিক হইতে দেখিলে বিদ্যায় মানুষের কত প্রয়োজন সে কথা বলা বাহুল্য। অথচ সেদিক দিয়া আলোচনা করিতে গেলে তর্ক ওঠে। চাষিকে বিদ্যা শিখাইলে তার চাষ করিবার শক্তি কমে কি না, স্ত্রীলোককে বিদ্যা শিখাইলে তার হরিভক্তি ও পতিভক্তির ব্যাঘাত হয় কি না এ-সব সন্দেহের কথা প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায়।

কিন্তু দিনের আলোকে আমরা কাজের প্রয়োজনের চেয়ে আরও বড়ো করিয়া দেখিতে পারি, সে হইতেছে জাগার প্রয়োজন। এবং তার চেয়ে আরও বড়ো কথা, এই আলোতে মানুষ মেলে, অন্ধকারে মানুষ বিচ্ছিন্ন হয়।

জ্ঞান মানুষের মধ্যে সকলের চেয়ে বড়ো ঐক্য। বাংলা দেশের এক কোণে যে ছেলে পড়াশুনা করিয়াছে তার সঙ্গে য়ুরোপের প্রান্তের শিক্ষিত মানুষের মিল অনেক বেশি সত্য, তার দুয়ারের পাশের মূর্খ প্রতিবেশীর চেয়ে।

জ্ঞানে মানুষের সঙ্গে মানুষের এই যে জগৎজোড়া মিল বাহির হইয়া পড়ে, যে মিল দেশভেদ ও কালভেদকে ছাড়াইয়া যায়—সেই মিলের পরম প্রয়োজনের কথা ছাড়িয়া দেওয়া যাক কিন্তু সেই মিলের যে পরম আনন্দ তাহা হইতে কোনো মানুষকেই কোনো কারণেই বঞ্চিত করিবার কথা মনেই করা যায় না।

সেই জ্ঞানের প্রদীপ এই ভারতবর্ষে কত বহু দূরে দূরে এবং কত মিটমিট করিয়া জ্বলিতেছে সে কথা ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারি ভারতবাসীর পক্ষে সেই পরম যোগের পথ কত সংকীর্ণ, যে যোগ জ্ঞানের যোগ, যে যোগে সমস্ত পৃথিবীর লোক আজ মিলিত হইবার সাধনা করিতেছে।

যাহা হউক, বিদ্যাশিক্ষার উপায় ভারতবর্ষে কিছু কিছু হইয়াছে। কিন্তু বিদ্যা-

---

[1] তদেতৎ প্রেয়ঃপুত্রাৎ প্রেয়োবিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্বস্মাৎ অন্তরতরং যদয়মাত্মা।

বিস্তারের বাধা এখানে মস্ত বেশি। নদী দেশের একধার দিয়া চলে, বৃষ্টি আকাশ জুড়িয়া হয়। তাই ফসলের সব চেয়ে বড়ো বন্ধু বৃষ্টি, নদী তার অনেক নীচে; শুধু তাই নয়, এই বৃষ্টিধারার উপরেই নদীজলের গভীরতা, বেগ এবং স্থায়িত্ব নির্ভর করে।

আমাদের দেশে যাঁরা বজ্রহাতে ইন্দ্রপদে বসিয়া আছেন, তাঁদের সহস্রচক্ষু, কিন্তু বিদ্যার এই বর্ষণের বেলায় অন্ততঃ তার ৯৯০টা চক্ষু নিদ্রা দেয়। গর্জনের বেলায় অট্টহাস্যের বিদ্যুৎ বিকাশ করিয়া বলেন, বাবুগুলার বিদ্যা একটা অদ্ভুত জিনিস,—তার খোসার কাছে তলতল করে তার আঁঠির কাছে পাক ধরে না। যেন এটা বাবুসম্প্রদায়ের প্রকৃতিগত। কিন্তু বাবুদের বিদ্যাটাকে যে প্রণালীতে জাগ দেওয়া হয় সেই প্রণালীতেই আমাদের উপরওয়ালাদের বিদ্যাটাকেও যদি পাকানোর চেষ্টা করা যাইত তবে বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রমাণ হইত যে, যে-বিদ্যার উপরে ব্যাপক শিক্ষার সূর্যালোকের তা লাগে না তার এমনি দশাই হয়।

জবাবে কেহ কেহ বলেন, পশ্চিম যখন পশ্চিমেই ছিল পূর্বদেশের ঘাড়ে আসিয়া পড়ে নাই তখন তোমাদের টোলে চতুষ্পাঠীতে যে তর্কশাস্ত্রের প্যাঁচ কষা এবং ব্যাকরণ-সূত্রের জাল বোনা চলিত সেও তো অত্যন্ত কুনোরকমের বিদ্যা। একথা মানি, কিন্তু বিদ্যার যে অংশটা নির্জলা পাণ্ডিত্য সে অংশ সকল দেশেই পণ্ড এবং কুণো; পশ্চিমেও পেডান্ট্রি মরিতে চায় না। তবে কিনা যে দেশ দুর্গতিগ্রস্ত সেখানে বিদ্যার বল কমিয়া গিয়া বিদ্যার কায়দাটাই বড়ো হইয়া ওঠে। তবু একথা মানিতে হইবে তখনকার দিনের পাণ্ডিত্যটাই তর্কচঞ্চু ও ন্যায়পঞ্চাননদের মগজের কোণে কোণে বদ্ধ ছিল বটে কিন্তু তখনকার কালের বিদ্যাটা সমাজের নাড়িতে নাড়িতে সজীব ও সবল হইয়া বহিত। কি গ্রামের নিরক্ষর চাষি, কি অন্তঃপুরের স্ত্রীলোক সকলেরই মন নানা উপায়ে এই বিদ্যার সেচ পাইত। সুতরাং এ জিনিসের মধ্যে অন্য অভাব অসম্পূর্ণতা যাই থাক্ ইহা নিজের মধ্যে সুসংগত ছিল।

কিন্তু আমাদের বিলাতি বিদ্যাটা কেমন ইস্কুলের জিনিস হইয়া সাইনবোর্ডে টাঙানো থাকে, আমাদের জীবনের ভিতরের সামগ্রী হইয়া যায় না। তাই পশ্চিমের শিক্ষায় যে ভালো জিনিস আছে তার অনেকখানি আমাদের নোটবুকেই আছে; সে কি চিন্তায়, কি কাজে ফলিয়া উঠিতে চায় না।

আমাদের দেশে আধুনিক পণ্ডিত বলেন, ইহার একমাত্র কারণ জিনিসটা বিদেশী। একথা মানি না। যা সত্য তার জিয়োগ্রাফি নাই। ভারতবর্ষও একদিন যে সত্যের দীপ জ্বালিয়াছে তা পশ্চিম মহাদেশকেও উজ্জ্বল করিবে, এ যদি না হয় তবে ওটা আলোই নয়। বস্তুত যদি এমন কোনো ভালো থাকে যা একমাত্র ভারতবর্ষেরই ভালো

তবে তা ভালোই নয় একথা জোর করিয়া বলিব। যদি ভারতের দেবতা ভারতেরই হন তবে তিনি আমাদের স্বর্গের পথ বন্ধ করিবেন কারণ স্বর্গ বিশ্বদেবতার।

আসল কথা, আধুনিক শিক্ষা তার বাহন পায় নাই—তার চলাফেরার পথ খোলসা হইতেছে না। এখনকার দিনে সার্বজনীন শিক্ষা সকল সভ্য দেশেই মানিয়া লওয়া হইয়াছে যে, কারণেই হউক আমাদের দেশে এটা চলিল না। মহাত্মা গোখলে এই লইয়া লড়িয়াছিলেন। শুনিয়াছি দেশের মধ্যে বাংলা দেশের কাছ হইতেই তিনি সব চেয়ে বাধা পাইয়াছেন। বাংলা দেশে শুভবুদ্ধির ক্ষেত্রে আজকাল হঠাৎ সকল দিক হইতেই একটা অদ্ভুত মহামারীর হাওয়া বহিয়াছে। ভূতের পা পিছন দিকে, বাংলা দেশে সামাজিক সকল চেষ্টারই পা পিছনে ফিরিয়াছে। আমরা ঠিক করিয়াছি সংসারে চলিবার পথে আমরা পিছন মুখে চলিব কেবল রাষ্ট্রীয় সাধনার আকাশে উড়িবার পথে আমরা সামনের দিকে উড়িব, আমাদের পা যেদিকে আমাদের ডানা ঠিক তার উলটো দিকে গজাইবে।

যে সার্বজনীন শিক্ষা দেশের উচ্চশিক্ষার শিকড়ে রস জোগাইবে কোথাও তার সাড়া পাওয়া গেল না, তার উপরে আবার আর এক উপসর্গ জুটিয়াছে। একদিকে আসবাব বাড়াইয়া অন্যদিকে স্থান কমাইয়া আমাদের সংকীর্ণ উচ্চশিক্ষার আয়তনকে আরও সংকীর্ণ করা হইতেছে। ছাত্রের অভাব ঘটুক কিন্তু সরঞ্জামের অভাব না ঘটে সেদিকে কড়া দৃষ্টি।

কাগজে দেখিলাম সেদিন বেহার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত গাড়িতে গিয়া ছোটোলাট বলিয়াছেন যে, যারা বলে ইমারতের বাহুল্যে আমরা শিক্ষার সম্বল খর্ব করি তারা অবুঝ, কেননা শিক্ষা তো কেবল জ্ঞান লাভ নয়, ভালো ঘরে বসিয়া পড়াশুনা করাও একটা শিক্ষা,—ক্লাসে বড়ো অধ্যাপকের চেয়ে বড়ো দেয়ালটা বেশি বই কম দরকারি নয়।

মানুষের পক্ষে অন্নেরও দরকার থালারও দরকার একথা মানি কিন্তু গরিবের ভাগ্যে অন্ন যেখানে যথেষ্ট মিলিতেছে না সেখানে থালা সম্বন্ধে একটু কষাকষি করাই দরকার। যখন দেখিব ভারত জুড়িয়া বিদ্যার অন্নসত্র খোলা হইয়াছে তখন অন্নপূর্ণার কাছে সোনার থালা দাবি করিবার দিন আসিবে। আমাদের জীবনযাত্রা গরিবের অথচ আমাদের শিক্ষার বাহ্যাড়ম্বরটা যদি ধনীর চালে হয় তবে টাকা ফুঁকিয়া দিয়া টাকার থলি তৈরি করার মতো হইবে।

আঙিনায় মাদুর বিছাইয়া আমরা আসর জমাইতে পারি; কলা পাতায় আমাদের ধনীর যজ্ঞের ভোজও চলে। আমাদের দেশের নমস্য যাঁরা তাঁদের অধিকাংশই খ'ড়ো

ঘরে মানুষ,—এদেশে লক্ষ্মীর কাছ হইতে ধার না লইলে সরস্বতীর আসনের দাম কমিবে একথা আমাদের কাছে চলিবে না।

পূর্বদেশে জীবনসমস্যার সমাধান আমাদের নিজের প্রণালীতেই করিতে হইয়াছে। আমরা অশনে বসনে যতদূর পারি বস্তুভার কমাইয়াছি। এ বিষয়ে এখানকার জল হাওয়া হাতে ধরিয়া আমাদের হাতে খড়ি দিয়াছে। ঘরের দেয়াল আমাদের পক্ষে তত আবশ্যক নয় যতটা আবশ্যক দেয়ালের ফাঁক; আমাদের গায়ের কাপড়ের অনেকটা অংশই তাঁতির তাঁতের চেয়ে আকাশের সূর্যকিরণেই বোনা হইতেছে; আহারের যে অংশটা দেহের উত্তাপ সঞ্চারের জন্য তার অনেকটার বরাত পাকশালার ও পাকযন্ত্রের 'পরে নয়, দেবতার 'পরে। দেশের প্রাকৃতিক এই সুযোগ জীবনযাত্রায় খাটাইয়া আমাদের স্বভাবটা এক রকম দাঁড়াইয়া গেছে—শিক্ষাব্যবস্থায় সেই স্বভাবকে অমান্য করিলে বিশেষ লাভ আছে এমন তো আমার মনে হয় না।

গাছতলায় মাঠের মধ্যে আমার এক বিদ্যালয় আছে। সে বিদ্যালয়টি তপোবনের শকুন্তলারই মতো—অনাঘ্রাতং পুষ্পং কিসলয়মলূনং কররুহৈঃ—অবশ্য ইনস্পেক্টরের কররুহ। মৈত্রেয়ী যেমন যাজ্ঞবল্ক্যকে বলিয়াছিলেন তিনি উপকরণ চান না, অমৃতকে চান,—এই বিদ্যালয়ের হইয়া আমার সেই কামনা ছিল। এইখানে ছোটোলাটের সঙ্গে একটা খুব গোড়ার কথায় আমাদের হয়তো অমিল আছে—এবং এইখানটায় আমরাও তাঁকে উপদেশ দিবার অধিকার রাখি। সত্যকে গভীর করিয়া দেখিলে দেখা যায়—উপকরণের একটা সীমা আছে যেখানে অমৃতের সঙ্গে তার বিরোধ বাধে। মেদ যেখানে প্রচুর, মজ্জা সেখানে দুর্বল।

দৈন্য জিনিসটাকে আমি বড়ো বলি না। সেটা তামসিক। কিন্তু অনাড়ম্বর, বিলাসীর ভোগসামগ্রীর চেয়ে দামে বেশি, তাহা সাত্ত্বিক। আমি সেই অনাড়ম্বরের কথা বলিতেছি যাহা পূর্ণতারই একটি ভাব, যাহা আড়ম্বরের অভাবমাত্র নহে। সেই ভাবের যেদিন আবির্ভাব হইবে সেদিন সভ্যতার আকাশ হইতে বস্তুকুয়াশার বিস্তর কলুষ দেখিতে দেখিতে কাটিয়া যাইবে! সেই ভাবের অভাব আছে বলিয়া যে-সব জিনিস প্রত্যেক মানুষের পক্ষে একান্ত আবশ্যক তাহা দুর্মূল্য ও দুর্ভর হইতেছে; গান বাজনা, আহার বিহার, আমোদ আহ্লাদ, শিক্ষা দীক্ষা, রাজ্যশাসন, আইন আদালত সভ্য দেশে সমস্তই অতি জটিল, সমস্তই মানুষের বাহিরের ও ভিতরের প্রভূত জায়গা জুড়িয়া বসে; এই বোঝার অধিকাংশই অনাবশ্যক—এই বিপুল ভার বহনে মানুষের জোর প্রকাশ পায় বটে ক্ষমতা প্রকাশ পায় না। এইজন্য বর্তমান সভ্যতাকে যে-দেবতা বাহির হইতে দেখিতেছেন তিনি দেখিতেছেন ইহা অপটু দৈত্যের সাঁতার দেওয়ার মতো, তার

হাত-পা ছোঁড়ায় জল ঘুলাইয়া ফেনাইয়া উঠিতেছে ;—সে জানেও না এত বেশি হাঁসফাঁস করার যথার্থ প্রয়োজন নাই। মুশকিল এই যে দৈত্যটার দৃঢ় বিশ্বাস যে প্রচণ্ড জোরে হাত পা ছোঁড়াটারই একটা বিশেষ মূল্য আছে। যেদিন পূর্ণতার সরল সত্য সভ্যতার অন্তরের মধ্যে আবির্ভূত হইবে সেদিন পাশ্চাত্ত্য বৈঠকখানার দেয়াল হইতে জাপানি পাখা, চীনবাসন, হরিণের শিং, বাঘের চামড়া,—তার এ কোণ ও কোণ হইতে বিচিত্র নিরর্থকতা দুঃস্বপ্নের মতো ছুটিয়া যাইবে ; মেয়েদের মাথার টুপিগুলা হইতে মরা পাখি, পাখির পালক, নকল ফুল পাতা এবং রাশিরাশি অদ্ভুত জঞ্জাল খসিয়া পড়িবে ; তাদের সাজসজ্জার অমিতাচার বর্বরতার পুরাতত্ত্বে স্থান পাইবে, যে-সব পাঁচতলা দশতলা বাড়ি আকাশের আলোর দিকে ঘুষি তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে তারা লজ্জায় মাথা হেঁট করিবে ; শিক্ষা বল, কর্ম বল, ভোগ বল, সহজ হইয়া ওঠাকেই আপনার শক্তির সত্য পরিচয় বলিয়া গণ্য করিবে ; এবং মানুষের অন্তরপ্রকৃতি বাহিরের দাসরাজাদের রাজত্ব কাড়িয়া লইয়া তাহাদিগকে পায়ের তলায় বসাইয়া রাখিবে। একদিন পশ্চিমের মৈত্রেয়ীকেও বলিতে হইবে, যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্।

সে কবে হইবে ঠিক জানি না। ততদিন ঘাড় হেঁট করিয়া আমাদিগকে উপদেশ শুনিতে হইবে যে, প্রভূত আসবাবের মধ্যে বড়ো বাড়ির উচ্চতলায় বসিয়া শিক্ষাই উচ্চশিক্ষা। কারণ মাটির তলাটাই মানুষের প্রাইমারি, ওইটেই প্রাথমিক ; ইঁটের কোটা যত বড়ো হাঁ করিয়া হাই তুলিবে বিদ্যা ততই উপরে উঠিতে থাকিবে।

একদা বন্ধুরা আমার সেই মেঠো বিদ্যালয়ের সঙ্গে একটা কালেজ জুড়িবার পরামর্শ দিয়াছিলেন। কিন্তু একদিন আমাদের দেশের যে উচ্চশিক্ষা তরুতলকে অশ্রদ্ধা করে নাই আজ তাকে তৃণাসন দেখাইলে সে কি সহিতে পারিবে? সে যে ধনী পশ্চিমের পোষ্যপুত্র, বিলিতি বাপের কায়দায় সে বাপকেও ছাড়াইয়া চলিতে চায়। যতই বলি না কেন, শিক্ষাটাকে যতদূর পারি উচ্চেই রাখিব, কায়দাটাকে আমাদের মতো করিতে দাও—সে কথায় কেহ কান দেয় না। বলে কি না, ওই কায়দাটাই তো শিক্ষা, তাই তোমাদের ভালোর জন্যেই ওই কায়দাটাকে যথাসাধ্য দুঃসাধ্য করিয়া তুলিব। কাজেই আমাকে বলিতে হইল, অন্তঃকরণকেই আমি বড়ো বলিয়া মানি, উপকরণকে তার চেয়েও বড়ো বলিয়া মানিব না।

উপকরণ যে অংশে অন্তঃকরণের অনুচর সে অংশে তাকে অমান্য করা হীনতা একথা জানি। কিন্তু সেই সামঞ্জস্যটাকে য়ুরোপ এখনও বাহির করিতে পারে নাই ; বাহির করিবার চেষ্টা করিতেছে। আমাদের নিজের মতে আমাদিগকেও সেই চেষ্টা করিতে কেন পাকা নিয়ম করিয়া বাধা দেওয়া হইবে? প্রয়োজনকে খর্ব না করিয়াও

সমস্তটাকেও সাদাসিধা করিয়া তুলিব সে আমাদের নিজের স্বভাব ও নিজের গরজ অনুসারে। শিক্ষার বিষয়কে আমরা অন্য জায়গা হইতে লইতে পারি কিন্তু মেজাজটাকে সুদ্ধ লইতে সে যে বিষম জুলুম।

পূর্বেই বলিয়াছি, পশ্চিমের পোষ্যপুত্র তার বিলিতি বাপকেও ছাড়াইয়া চলে। আমেরিকায় দেখিলাম, স্টেটের সাহায্যে কত বড়ো বড়ো বিদ্যালয় চলিতেছে যেখানে ছাত্রদের বেতন নাই বলিলেই হয়। য়ুরোপেও দরিদ্র ছাত্রদের জন্য সুলভ শিক্ষার অনেক উপায় আছে। কেবল গরিব বলিয়াই আমাদের দেশের শিক্ষা আমাদের সামর্থ্যের তুলনায় পশ্চিমের চেয়ে এত বেশি দুর্মূল্য হইল? অথচ এই ভারতবর্ষেই একদিন বিদ্যা টাকা লইয়া বেচা কেনা হইত না।

দেশকে শিক্ষা দেওয়া স্টেটের গরজ ইহা তো অন্যত্র দেখিয়াছি। এই জন্য য়ুরোপে জাপানে আমেরিকায় শিক্ষায় কৃপণতা নাই। কেবলমাত্র আমাদের গরিব দেশেই শিক্ষাকে দুর্মূল্য ও দুর্লভ করিয়া তোলাতেই দেশের বিশেষ মঙ্গল—এ কথা উচ্চাসনে বসিয়া যত উচ্চস্বরে বলা হইবে বেসুর ততই উচ্চ সপ্তকে উঠিবে। মাতার স্তন্যকে দুর্মূল্য করিয়া তোলাই উচিত, এমন কথা যদি স্বয়ং লর্ড কার্জনও শপথ করিয়া বলিতেন তবু আমরা বিশ্বাস করিতাম না যে শিশুর প্রতি করুণায় রাত্রে তাঁর ঘুম হয় না।

বয়স বাড়িতে বাড়িতে শিশুর ওজন বাড়িবে এই তো স্বাস্থ্যের লক্ষণ। সমান থাকিলেও ভালো নয়, কমিতে থাকিলে ভাবনার কথা। তেমনি, আমাদের দেশে যেখানে শিক্ষার অধিকাংশ জমিই পতিত আছে সেখানে বছরে বছরে ছাত্রসংখ্যা বাড়িবে হিতৈষীরা এই প্রত্যাশা করে। সমান থাকিলে সেটা দোষের, আর সংখ্যা যদি কমে তো বুঝিব, পাল্লাটা মরণের দিকে ঝুঁকিয়াছে। বাংলা দেশে ছাত্রসংখ্যা কমিল। সে জন্যে শিক্ষাবিভাগে উদ্বেগ নাই। এই উপলক্ষ্যে একটি ইংরেজি কাগজে লিখিয়াছে,—এই তো দেখি লেখাপড়ায় বাঙালির শখ আপনিই কমিয়াছে—যদি গোখলের অবশ্যশিক্ষা এখানে চলিত তবে তো অনিচ্ছুকের 'পরে জুলুম করাই হইত।

এ সব কথা নির্মমের কথা। নিজের জাতের সম্বন্ধে এমন কথা কেহ এমন অনায়াসে বলিতে পারে না। আজ ইংলণ্ডে যদি দেখা যাইত লোকের মনে শিক্ষার শখ আপনিই কমিয়া আসিতেছে তবে নিশ্চয়ই এই সব লোকই উৎকণ্ঠিত হইয়া লিখিত যে কৃত্রিম উপায়েও শিক্ষার উত্তেজনা বাড়াইয়া তোলা উচিত।

নিজের জাতির 'পরে যে দরদ বাঙালির 'পরেও ইংরেজের সেই দরদ হইবে এমন আশা করিতেও লজ্জা বোধ করি। কিন্তু জাতিপ্রেমের সমস্ত দাবি মিটাইয়াও মনুষ্যপ্রেমের হিসাবে কিছু প্রাপ্য বাকি থাকে। ধর্মবুদ্ধির বর্তমান অবস্থায় স্বজাতির জন্য

প্রতাপ, ঐশ্বর্য প্রভৃতি অনেক দুর্লভ জিনিস অন্যকে বঞ্চিত করিয়াও লোকে কামনা করে কিন্তু এখনও এমন কিছু আছে যা খুব কম করিয়াও সকল মানুষেরই জন্য কামনা করা যায়। আমরা কোনো দেশের সম্বন্ধেই এমন কথা বলিতে পারি না যে, সেখানকার স্বাস্থ্য যখন আপনিই কমিয়া আসিতেছে তখন সে দেশের জন্য ডাক্তার খরচটা বাদ দিয়া অন্ত্যেষ্টিসংকারেরই আয়োজনটা পাকা করা উচিত।

তবে কি না, এ কথাও কবুল করিতে হইবে, স্বজাতি সম্বন্ধে আমাদের নিজের মনে শুভবুদ্ধি যথেষ্ট সজাগ নয় বলিয়াই বাহিরের লোক আমাদের অন্নবস্ত্র বিদ্যাবুদ্ধির মূল্য খুব কম করিয়া দেখে। দেশের অন্ন, দেশের বিদ্যা, দেশের স্বাস্থ্য আমরা তেমন করিয়া চাই নাই। পরের কাছে চাহিয়াছি, নিজের কাছে নহে। ওজর করিয়া বলি আমাদের সাধ্য কম, কিন্তু আমাদের সাধনা তার চেয়েও অনেক কম।

দেশের দাম আমাদের নিজের কাছে যত, অন্যের কাছে তার চেয়ে বেশি দাবি করিলে সে এক রকম ঠকানো হয়। ইহাতে বড়ো কেহ ঠকেও না। কেবল চিনা-বাজারের দোকানদারের মতো করিয়া পরের কাছে দর চড়াইয়া সময় নষ্ট করিয়া থাকি। তাতে যে পরিমাণে সময় যায় সে পরিমাণে লাভ হয় না। এতকাল রাষ্ট্রীয় হাটে সেই দোকানদারি করিয়া আসিয়াছি; যে জিনিসের জন্য নিজে যত দাম দিয়াছি বা দিতে রাজি তার চেয়ে অনেক বড়ো দাম হাঁকিয়া খুব একটা হট্টগোল করিয়া কাটাইলাম।

শিক্ষার জন্য আমরা আবদার করিয়াছি, গরজ করি নাই। শিক্ষাবিস্তারে আমাদের গা নাই। তার মানে শিক্ষার ভোজে নিজেরা বসিয়া যাইব, পাতের প্রসাদটুকু পর্যন্ত আর কোনো ক্ষুধিত পায় বা না পায় সেদিকে খেয়ালই নাই। এমন কথা যারা বলে, নিম্নসাধারণের জন্য যথেষ্ট শিক্ষার দরকার নাই, তাতে তাদের ক্ষতিই করিবে, তারা কর্তৃপক্ষদের কাছ হইতে একথা শুনিবার অধিকারী যে, বাঙালির পক্ষে বেশি শিক্ষা অনাবশ্যক, এমন কি, অনিষ্টকর।—জনসাধারণকে লেখাপড়া শিখাইলে আমাদের চাকর জুটিবে না একথা যদি সত্য হয় তবে আমরা লেখাপড়া শিখিলে আমাদেরও দাস্যভাবের ব্যাঘাত হইবে এ আশঙ্কাও মিথ্যা নহে।

এ সম্বন্ধে নিজের মনের ভাবটা ঠিকমত যাচাই করিতে হইলে দুটো একটা দৃষ্টান্ত দেখা দরকার। আমরা বেঙ্গল প্রোভিন্‌শ্যাল কনফারেন্স নামে একটা রাষ্ট্রসভার সৃষ্টি করিয়াছি। সেটা প্রাদেশিক, তার প্রধান উদ্দেশ্য বাংলার অভাব ও অভিযোগ সম্বন্ধে সকলে মিলিয়া আলোচনা করিয়া বাঙালির চোখ ফুটাইয়া দেওয়া। বহুকাল পর্যন্ত এই নিতান্ত সাদা কথাটা কিছুতেই আমাদের মনে আসে নাই যে, তা করিতে হইলে বাংলা ভাষায় আলোচনা করা চাই। তার কারণ, দেশের লোককে দেশের লোক

বলিয়া সমস্ত চৈতন্য দিয়া আমরা বুঝি না। এই জন্যই দেশের পুরা দাম দেওয়া আমাদের পক্ষে অসম্ভব। যা চাহিতেছি তা পেট ভরিয়া পাই না তার কারণ এ নয় যে, দাতা প্রসন্নমনে দিতেছে না—তার কারণ এই যে, আমরা সত্যমনে চাহিতেছি না।

বিদ্যাবিস্তারের কথাটা যখন ঠিকমতো মন দিয়া দেখি তখন তার সর্বপ্রধান বাধাটা এই দেখিতে পাই যে, তার বাহনটা ইংরেজি। বিদেশী মাল জাহাজে করিয়া শহরের ঘাট পর্যন্ত আসিয়া পৌঁছিতে পারে কিন্তু সেই জাহাজটাতে করিয়াই দেশের হাটে হাটে আমদানি রপ্তানি করাইবার দুরাশা মিথ্যা। যদি বিলিতি জাহাজটাকেই কায়মনে আঁকড়াইয়া ধরিতে চাই তবে ব্যবসা শহরেই আটকা পড়িয়া থাকিবে।

এ পর্যন্ত এ অসুবিধাটাকে আমাদের অসুখ বোধ হয় নাই। কেননা মুখে যাই বলি মনের মধ্যে এই শহরটাকেই দেশ বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলাম। দাক্ষিণ্য যখন খুব বেশি হয় তখন এই পর্যন্ত বলি, আচ্ছা বেশ, খুব গোড়ার দিকের মোটা শিক্ষাটা বাংলা ভাষায় দেওয়া চলিবে কিন্তু সে যদি উচ্চশিক্ষার দিকে হাত বাড়ায় তবে গমিষ্যত্যুপহাস্যতাম্।

আমাদের এই ভীরুতা কি চিরদিনই থাকিয়া যাইবে? ভরসা করিয়া এটুকু কোনোদিন বলিতে পারিব না যে, উচ্চশিক্ষাকে আমাদের দেশের ভাষায় দেশের জিনিস করিয়া লইতে হইবে? পশ্চিম হইতে যা কিছু শিখিবার আছে জাপান তা দেখিতে দেখিতে সমস্ত দেশে ছড়াইয়া দিল, তার প্রধান কারণ, এই শিক্ষাকে তারা দেশী ভাষার আধারে বাঁধাই করিতে পারিয়াছে।

অথচ জাপানি ভাষার ধারণাশক্তি আমাদের ভাষার চেয়ে বেশি নয়। নূতন কথা সৃষ্টি করিবার শক্তি আমাদের ভাষায় অপরিসীম। তা ছাড়া য়ুরোপের বুদ্ধিবৃত্তির আকার প্রকার যতটা আমাদের সঙ্গে মেলে এমন জাপানির সঙ্গে নয়। কিন্তু উদ্‌যোগী পুরুষসিংহ কেবলমাত্র লক্ষ্মীকে পায় না সরস্বতীকেও পায়। জাপান জোর করিয়া বলিল য়ুরোপের বিদ্যাকে নিজের বাণীমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিব। যেমন বলা তেমনি করা, তেমনি তার ফললাভ। আমরা ভরসা করিয়া এ পর্যন্ত বলিতেই পারিলাম না যে, বাংলাভাষাতেই আমরা উচ্চশিক্ষা দিব এবং দেওয়া যায়, এবং দিলে তবেই বিদ্যার ফসল দেশ জুড়িয়া ফলিবে।

আমাদের ভরসা এতই কম যে ইস্কুল কালেজের বাহিরে আমরা যে-সব লোকশিক্ষার আয়োজন করিয়াছি সেখানেও বাংলা ভাষার প্রবেশ নিষেধ। বিজ্ঞানশিক্ষাবিস্তারের জন্য দেশের লোকের চাঁদায় বহুকাল হইতে শহরে এক বিজ্ঞান সভা খাড়া

দাঁড়াইয়া আছে। প্রাচ্যদেশের কোনো কোনো রাজার মতো গৌরবনাশের ভয়ে জনসাধারণের কাছে সে বাহির হইতেই চায় না। বরং অচল হইয়া থাকিবে তবু কিছুতে সে বাংলা বলিবে না। ও যেন বাঙালির চাঁদা দিয়া বাঁধানো পাকা ভিতের উপর বাঙালির অক্ষমতা ও ঔদাসীন্যের স্মরণস্তম্ভের মতো স্থাণু হইয়া আছে। কথাও বলে না, নড়েও না। উহাকে ভুলিতেও পারি না, উহাকে মনে রাখাও শক্ত। ওজর এই যে, বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানশিক্ষা অসম্ভব। ওটা অক্ষমের ভীরুর ওজর। কঠিন বই কি, সেই জন্যেই কঠোর সংকল্প চাই। একবার ভাবিয়া দেখুন, একে ইংরেজি তাতে সায়ান্স্‌, তার উপরে, দেশে যে-সকল বিজ্ঞানবিশারদ আছেন তাঁরা জগদ্বিখ্যাত হইতে পারেন কিন্তু দেশের কোণে এই যে একটুখানি বিজ্ঞানের নীড় দেশের লোক বাঁধিয়া দিয়াছে এখানে তাঁদের কণাও জায়গা নাই এমন অবস্থায় এই পদার্থটা বঙ্গসাগরের তলায় যদি ডুব মারিয়া বসে তবে ইহার সাহায্যে সেখানকার মৎস্যশাবকের বৈজ্ঞানিক উন্নতি আমাদের বাঙালির ছেলের চেয়ে যে কিছুমাত্র কম হইতে পারে এমন অপবাদ দিতে পারিব না।

মাতৃভাষা বাংলা বলিয়াই কি বাঙালিকে দণ্ড দিতেই হইবে? এই অজ্ঞানকৃত অপরাধের জন্য সে চিরকাল অজ্ঞান হইয়াই থাক্‌—সমস্ত বাঙালির প্রতি কয়জন শিক্ষিত বাঙালির এই রায়ই কি বহাল রহিল? যে বেচারা বাংলা বলে সেই কি আধুনিক মনুসংহিতার শূদ্র? তার কানে উচ্চশিক্ষার মন্ত্র চলিবে না? মাতৃভাষা হইতে ইংরেজি ভাষার মধ্যে জন্ম লইয়া তবেই আমরা দ্বিজ হই?

বলা বাহুল্য ইংরেজি আমাদের শেখা চাইই—শুধু পেটের জন্য নয়। কেবল ইংরেজি কেন? ফরাসি জার্মান শিখিলে আরও ভালো। সেই সঙ্গে এ কথা বলাও বাহুল্য অধিকাংশ বাঙালি ইংরেজি শিখিবে না। সেই লক্ষ লক্ষ বাংলাভাষীদের জন্য বিদ্যার অনশন কিংবা অর্ধাশনই ব্যবস্থা, এ কথা কোন্‌মুখে বলা যায়।

দেশে বিদ্যাশিক্ষার যে বড়ো কারখানা আছে তার কলের চাকার অল্পমাত্র বদল করিতে গেলেই বিস্তর হাতুড়ি-পেটাপেটি করিতে হয়—সে খুব শক্ত হাতের কর্ম। আশু মুখুজ্যে মশায় ওরই মধ্যে এক-জায়গায় একটুখানি বাংলা হাতল জুড়িয়া দিয়াছেন।

তিনি যেটুকু করিয়াছেন তার ভিতরকার কথা এই,—বাঙালির ছেলে ইংরেজি বিদ্যায় যতই পাকা হ'ক বাংলা না শিখিলে তার শিক্ষা পুরা হইবে না। কিন্তু এ তো গেল যারা ইংরেজি জানে তাদেরই বিদ্যাকে চৌকশ করিবার ব্যবস্থা। আর, যারা বাংলা জানে ইংরেজি জানে না, বাংলার বিশ্ববিদ্যালয় কি তাদের মুখে তাকাইবে না? এত বড়ো অস্বাভাবিক নির্মমতা ভারতবর্ষের বাহিরে আর কোথাও আছে?

আমাকে লোকে বলিবে শুধু কবিত্ব করিলে চলিবে না—একটা প্র্যাক্টিক্যাল পরামর্শ দাও, অত্যন্ত বেশি আশা করাটা কিছু নয়। অত্যন্ত বেশি আশা চুলোয় যাক, লেশমাত্র আশা না করিয়াই অধিকাংশ পরামর্শ দিতে হয়। কিছু করিবার এবং হইবার আগে ক্ষেত্রটাতে দৃষ্টি তো পড়ুক। কোনোমতে মনটা যদি একটু উসখুস করিয়া ওঠে তাহলেই আপাতত যথেষ্ট। এমন কি, লোকে যদি গালি দেয় এবং মারিতে আসে তাহলেও বুঝি, যে, একটা বেশ উত্তম-মধ্যম ফল পাওয়া গেল।

অতএব পরামর্শে নামা যাক।

আজকাল আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা প্রশস্ত পরিমণ্ডল তৈরি হইয়া উঠিতেছে। একদিন মোটের উপর ইহা একজামিন পাশের কুস্তির আখড়া ছিল। এখন আখড়ার বাহিরেও ল্যাঙটটার উপর ভদ্রবেশ ঢাকা দিয়া একটু হাঁফ ছাড়িবার জায়গা করা হইয়াছে। কিছুদিন হইতে দেখিতেছি বিদেশ হইতে বড়ো বড়ো অধ্যাপকেরা আসিয়া উপদেশ দিতেছেন,—এবং আমাদের দেশের মনীষীদেরও এখানে আসন পড়িতেছে। শুনিয়াছি বিশ্ববিদ্যালয়ের এইটুকু ভদ্রতাও আশু মুখুজ্যে মশায়ের কল্যাণে ঘটিয়াছে।

আমি এই বলি বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতন বাড়িটায় ভিতরের আঙিনায় যেমন চলিতেছে চলুক,—কেবল তার এই বাহিরের প্রাঙ্গণটাতে যেখানে আম্‌দরবারের নূতন বৈঠক বসিল সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাটাকে যদি সমস্ত বাঙালির জিনিস করিয়া তোলা যায় তাতে বাধাটা কী? আহূত যারা তারা ভিতর বাড়িতেই বসুক—আর রবাহূত যারা তারা বাহিরে পাত পাড়িয়া বসিয়া যাক না। তাদের জন্য বিলিতি টেবিল না হয় না রইল, দিশি কলাপাত মন্দ কী? তাদের একেবারে দরোয়ান দিয়া ধাক্কা মারিয়া বিদায় করিয়া দিলে কি এ যজ্ঞে কল্যাণ হইবে? অভিশাপ লাগিবে না কি?

এমনি করিয়া বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি এবং বাংলা ভাষার ধারা যদি গঙ্গাযমুনার মতো মিলিয়া যায় তবে বাঙালি শিক্ষার্থীর পক্ষে এটা একটা তীর্থস্থান হইবে। দুই স্রোতের সাদা এবং কালো রেখার বিভাগ থাকিবে বটে কিন্তু তারা এক সঙ্গে বহিয়া চলিবে। ইহাতেই দেশের শিক্ষা যথার্থ বিস্তীর্ণ হইবে, গভীর হইবে, সত্য হইয়া উঠিবে।

শহরে যদি একটিমাত্র বড়ো রাস্তা থাকে তবে সে পথে বিষম ঠেলাঠেলি পড়ে। শহর-সংস্কারের প্রস্তাবের সময় রাস্তা বাড়াইয়া ভিড়কে ভাগ করিয়া দিবার চেষ্টা হয়। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঝখানে আর একটি সদর রাস্তা খুলিয়া দিলে ঠেলাঠেলি নিশ্চয় কমিবে।

বিদ্যালয়ের কাজে আমার যেটুকু অভিজ্ঞতা তাতে দেখিয়াছি একদল ছেলে স্বভাবতই ভাষাশিক্ষায় অপটু। ইংরেজি ভাষা কায়দা করিতে না পারিয়া যদি বা তারা কোনোমতে এন্ট্রেন্সের দেউড়িটা তরিয়া যায় – উপরের সিঁড়ি ভাঙিবার বেলাতেই চিত হইয়া পড়ে।

এমনতরো দুর্গতির অনেকগুলা কারণ আছে। এক তো যে-ছেলের মাতৃভাষা বাংলা তার পক্ষে ইংরেজি ভাষার মতো বালাই আর নাই। ও যেন বিলিতি তলোয়ারের খাপের মধ্যে দিশি খাঁড়া ভরিবার ব্যায়াম। তার পরে গোড়ার দিকে ভালো শিক্ষকের কাছে ভালো নিয়মে ইংরেজি শিখিবার সুযোগ অল্প ছেলেরই হয়,—গরিবের ছেলের তো হয়ই না। তাই অনেক স্থলেই বিশল্যকরণীর পরিচয় ঘটে না বলিয়া আস্ত গন্ধমাদন বহিতে হয় ;—ভাষা আয়ত্ত হয় না বলিয়া গোটা ইংরেজি বই মুখস্থ করা ছাড়া উপায় থাকে না। অসামান্য স্মৃতিশক্তির জোরে যে ভাগ্যবানরা এমনতরো কিষ্কিন্ধ্যা-কাণ্ড করিতে পারে তারা শেষ পর্যন্ত উদ্ধার পাইয়া যায় – কিন্তু যাদের মেধা সাধারণ মানুষের মাপে প্রমাণসই তাদের কাছে এতটা আশা করাই যায় না। তারা এই রুদ্ধ ভাষার ফাঁকের মধ্য দিয়া গলিয়া পার হইতেও পারে না, ডিঙাইয়া পার হওয়াও তাহাদের পক্ষে অসাধ্য।

এখন কথাটা এই, এই যে-সব বাঙালির ছেলে স্বাভাবিক বা আকস্মিক কারণে ইংরেজি ভাষা দখল করিতে পারিল না তারা কি এমন কিছু মারাত্মক অপরাধ করিয়াছে যেজন্য তারা বিদ্যামন্দির হইতে যাবজ্জীবন আণ্ডামানে চালান হইবার যোগ্য ? ইংলণ্ডে একদিন ছিল যখন সামান্য কলাটা মুলাটা চুরি করিলেও মানুষের ফাঁসি হইতে পারিত—কিন্তু এ যে তার চেয়েও কড়া আইন। এ যে চুরি করিতে পারে না বলিয়াই ফাঁসি কেননা মুখস্থ করিয়া পাস করাই তো চৌর্যবৃত্তি। যে ছেলে পরীক্ষাশালায় গোপনে বই লইয়া যায় তাকে খেদাইয়া দেওয়া হয় ; আর যে ছেলে তার চেয়েও লুকাইয়া লয়, অর্থাৎ চাদরের মধ্যে না লইয়া মগজের মধ্যে লইয়া যায় সেই বা কম কী করিল ? সভ্যতার নিয়ম অনুসারে মানুষের স্মরণশক্তির মহলটা ছাপাখানায় অধিকার করিয়াছে। অতএব যারা বই মুখস্থ করিয়া পাস করে তারা অসভ্যরকমে চুরি করে অথচ সভ্যতার যুগে পুরস্কার পাইবে তারাই ?

যাই হ'ক ভাগ্যক্রমে যারা পার হইল তাদের বিরুদ্ধে নালিশ করিতে চাই না। কিন্তু যারা পার হইল না তাদের পক্ষে হাবড়ার পুলটাই না হয় দু-ফাঁক হইল, কিন্তু কোনোরকমের সরকারি খেয়াও কি তাদের কপালে জুটিবে না ? স্টীমার না হয় তো পানসি ?

ভালোমতো ইংরেজি শিখিতে পারিল না এমন ঢের ঢের ভালো ছেলে বাংলাদেশে আছে। তাদের শিখিবার আকাঙ্ক্ষা ও উদ্যমকে একেবারে গোড়ার দিকেই আটক করিয়া দিয়া দেশের শক্তির কি প্রভূত অপব্যয় করা হইতেছে না?

আমার প্রশ্ন এই, প্রেপারেটরি ক্লাস পর্যন্ত একরকম পড়াইয়া তার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের মোড়টার কাছে যদি ইংরেজি বাংলা দুটো বড়ো রাস্তা খুলিয়া দেওয়া যায় তা হইলে কি নানাপ্রকারে সুবিধা হয় না? এক তো ভিড়ের চাপ কিছু কমেই, দ্বিতীয়ত শিক্ষার বিস্তার অনেক বাড়ে।

ইংরেজি রাস্তাটার দিকেই বেশি লোক ঝুঁকিবে তা জানি; এবং দুটো রাস্তায় চলাচল ঠিক সহজ অবস্থায় পৌঁছিতে কিছু সময়ও লাগিবে। রাজভাষার দর বেশি সুতরাং আদরও বেশি। কেবল চাকরির বাজারে নয়, বিবাহের বাজারেও বরের মূল্যবৃদ্ধি ওই রাস্তাটাতেই। তাই হ'ক—বাংলা ভাষা অনাদর সহিতে রাজি, কিন্তু অকৃতার্থতা সহ্য করা কঠিন। ভাগ্যমন্তের ছেলে ধাত্রীস্তন্যে মোটাসোটা হইয়া উঠুক না কিন্তু গরিবের ছেলেকে তার মাতৃস্তন্য হইতে বঞ্চিত করা কেন?

অনেকদিন হইতে অনেক মার খাইয়াছি বলিয়া সাবধানে কথা বলিবার চেষ্টা করিয়া থাকি। তবু অভ্যাসদোষে বেফাঁস কথা আপনি বাহির হইয়া পড়ে। আমার তো মনে হয়, গোড়ায় কথাটা আমি বেশ কৌশলেই পাড়িয়াছিলাম। নিজেকে বুঝাইয়াছিলাম গোপাল অতি সুবোধ ছেলে, তাকে কম খাইতে দিলেও সে চেঁচামেচি করে না। তাই মৃদুস্বরে শুরু করিয়াছিলাম আজকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের বহিরঙ্গনে যে একটা বক্তৃতার বৈঠক বসিয়াছে তারই এককোণে বাংলার একটা আসন পাতিলে জায়গায় কুলাইয়া যাইবে। এ কথাটা গোপালের মতোই কথা হইয়াছিল; ইহাতে অভিভাবকেরা যদি বা নারাজ হন তবু বিরক্ত হইবেন না।

কিন্তু গোপালের সুবুদ্ধির চেয়ে যখন তার ক্ষুধা বাড়িয়া ওঠে তখন তার সুর আপনি চড়িতে থাকে; আমার প্রস্তাবটা অনেকখানি বড়ো হইয়া উঠিয়াছে। তার ফল প্রস্তাবের পক্ষেও সাংঘাতিক হইতে পারে, প্রস্তাবকের পক্ষেও সেটা নূতন নয়। শুনিয়াছি আমাদের দেশে শিশুমৃত্যুসংখ্যা খুব বেশি। এ দেশে শতকরা একশ পঁচিশটা প্রস্তাব আঁতুড় ঘরেই মরে। আর সাংঘাতিক মার এ বয়সে এত খাইয়াছি যে, ও জিনিসটাকে সাংঘাতিক বলিয়া একেবারেই বিশ্বাস করি না।

আমি জানি তর্ক এই উঠিবে তুমি বাংলা ভাষার যোগে উচ্চশিক্ষা দিতে চাও কিন্তু বাংলাভাষায় উঁচুদরের শিক্ষাগ্রন্থ কই? নাই সে কথা মানি কিন্তু শিক্ষা না চলিলে শিক্ষাগ্রন্থ হয় কী উপায়ে? শিক্ষাগ্রন্থ বাগানের গাছ নয় যে, শৌখিন লোকে শখ

করিয়া তার কেয়ারি করিবে,—কিংবা সে আগাছাও নয় যে, মাঠে বাটে নিজের পুলকে নিজেই কণ্টকিত হইয়া উঠিবে! শিক্ষাকে যদি শিক্ষাগ্রন্থের জন্য বসিয়া থাকিতে হয় তবে পাতার জোগাড় আগে হওয়া চাই তার পরে গাছের পালা এবং কুলের পথ চাহিয়া নদীকে মাথায় হাত দিয়া পড়িতে হইবে।

বাংলায় উচ্চঅঙ্গের শিক্ষাগ্রন্থ বাহির হইতেছে না এটা যদি আক্ষেপের বিষয় হয় তবে তার প্রতিকারের একমাত্র উপায় বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলায় উচ্চঅঙ্গের শিক্ষা প্রচলন করা। বঙ্গসাহিত্যপরিষৎ কিছুকাল হইতে এই কাজের গোড়াপত্তনের চেষ্টা করিতেছেন। পরিভাষা রচনা ও সংকলনের ভার পরিষৎ লইয়াছেন, কিছু কিছু করিয়াওছেন। তাঁদের কাজ ঢিমা চালে চলিতেছে বা অচল হইয়া আছে বলিয়া নালিশ করি। কিন্তু দুপাও যে চলিয়াছে এইটেই আশ্চর্য। দেশে এই পরিভাষা তৈরির তাগিদ কোথায়? ইহার ব্যবহারের প্রয়োজন বা সুযোগ কই? দেশে টাকা চলিবে না অথচ টাঁকশাল চলিতেই থাকিবে এমন আবদার করি কোন্ লজ্জায়?

যদি বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনোদিন বাংলাশিক্ষার রাস্তা খুলিয়া যায় তবে তখন এই বঙ্গসাহিত্যপরিষদের দিন আসিবে। এখন রাস্তা নাই তাই সে হঁচট খাইতে খাইতে চলে, তখন চার-ঘোড়ার গাড়ি বাহির করিবে। আজ আক্ষেপের কথা এই যে, আমাদের উপায় আছে, উপকরণ আছে,—ক্ষেত্র নাই। বাংলার যজ্ঞে আমরা অন্নসত্র খুলিতে পারি। এই তো সব আছেন আমাদের জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র, ব্রজেন্দ্রনাথ, মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী এবং আরও অনেক এই শ্রেণীর নামজাদা ও প্রচ্ছন্ননামা বাঙালি। অথচ যে-সব বাঙালি কেবল বাংলা জানে তাদের উপবাস কোনোদিন ঘুচিবে না? তারা এঁদের লইয়া গৌরব করিবে কিন্তু লইয়া ব্যবহার করিতে পারিবে না? বাংলা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসাদে বরঞ্চ সাতসমুদ্র পার হইয়া বিদেশী ছেলে এঁদের কাছে শিক্ষা লইয়া যাইতে পারে কেবল বাংলা দেশের যে ছাত্র বাংলা জানে এঁদের কাছে বসিয়া শিক্ষা লইবার অধিকার তাদের নাই!

জার্মানিতে ফ্রান্সে আমেরিকায় জাপানে যে সকল আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয় জাগিয়া উঠিয়াছে তাদের মূল উদ্দেশ্য সমস্ত দেশের চিত্তকে মানুষ করা। দেশকে তারা সৃষ্টি করিয়া চলিতেছে। বীজ হইতে অঙ্কুরকে, অঙ্কুর হইতে বৃক্ষকে তারা মুক্তিদান করিতেছে। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিকে চিত্তশক্তিকে উদ্‌ঘাটিত করিতেছে।

দেশের এই মনকে মানুষ করা কোনোমতেই পরের ভাষায় সম্ভবপর নহে। আমরা লাভ করিব কিন্তু সে লাভ আমাদের ভাষাকে পূর্ণ করিবে না, আমরা চিন্তা করিব কিন্তু সে চিন্তার বাহিরে আমাদের ভাষা পড়িয়া থাকিবে, আমাদের মন বাড়িয়া চলিবে

সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ভাষা বাড়িতে থাকিবে না, সমস্ত শিক্ষাকে অকৃতার্থ করিবার এমন উপায় আর কী হইতে পারে।

তার ফল হইয়াছে, উচ্চঅঙ্গের শিক্ষা যদি বা আমরা পাই, উচ্চ অঙ্গের চিন্তা আমরা করি না। কারণ চিন্তার স্বাভাবিক বাহন আমাদের ভাষা। বিদ্যালয়ের বাহিরে আসিয়া পোশাকি ভাষাটা আমরা ছাড়িয়া ফেলি, সেই সঙ্গে তার পকেটে যা কিছু সঞ্চয় থাকে তা আলনায় ঝোলানো থাকে,—তার পরে আমাদের চিরদিনের আটপৌরে ভাষায় আমরা গল্প করি, গুজব করি, রাজাউজির মারি, তর্জমা করি, চুরি করি এবং খবরের কাগজে অশ্রাব্য কাপুরুষতার বিস্তার করিয়া থাকি। এ সত্ত্বেও আমাদের দেশে বাংলায় সাহিত্যের উন্নতি হইতেছে না এমন কথা বলি না কিন্তু এ সাহিত্যে উপবাসের লক্ষণ যথেষ্ট দেখিতে পাই। যেমন, এমন রোগী দেখা যায়, যে খায় প্রচুর অথচ তার হাড় বাহির হইয়া পড়িয়াছে, তেমনি দেখি আমরা যতটা শিক্ষা করিতেছি তার সমস্তটা আমাদের সাহিত্যের সর্বাঙ্গে পোষণ সঞ্চার করিতেছে না। খাদ্যের সঙ্গে আমাদের প্রাণের সঙ্গে সম্পূর্ণ যোগ হইতেছে না। তার প্রধান কারণ আমরা নিজের ভাষার রসনা দিয়া খাই না, আমাদের কলে করিয়া খাওয়ানো হয়, তাতে আমাদের পেট ভরতি করে, দেহপূর্তি করে না।

সকলেই জানেন আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাঁচে তৈরি। ওই বিদ্যালয়টি পরীক্ষায় পাস করা ডিগ্রীধারীদের নামের উপর মার্কা মারিবার একটা বড়ো-গোছের সীলমোহর। মানুষকে তৈরি করা নয়, মানুষ চিহ্নিত করা তার কাজ। মানুষকে হাটের মাল করিয়া তার বাজার-দর দাগিয়া দিয়া ব্যবসাদারির সহায়তা সে করিয়াছে।

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় হইতেও আমরা সেই ডিগ্রীর টাঁকশালার ছাপ লওয়াকেই বিদ্যালাভ বলিয়া গণ্য করিয়াছি। ইহা আমাদের অভ্যাস হইয়া গেছে। আমরা বিদ্যা পাই বা না পাই বিদ্যালয়ের একটা ছাঁচ পাইয়াছি। আমাদের মুশকিল এই যে, আমরা চিরদিন ছাঁচের উপাসক। ছাঁচে ঢালাই-করা রীতিনীতি চালচলনকেই নানা আকারে পূজার অর্ঘ্য দিয়া এই ছাঁচ-দেবীর প্রতি অচলা ভক্তি আমাদের মজ্জাগত। সেইজন্য ছাঁচে-ঢালা বিদ্যাটাকে আমরা দেবীর বরদান বলিয়া মাথায় করিয়া লই—ইহার চেয়ে বড়ো কিছু আছে এ কথা মনে করাও আমাদের পক্ষে শক্ত।

তাই বলিতেছি, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের যদি একটা বাংলা অঙ্গের সৃষ্টি হয় তার প্রতি বাঙালি অভিভাবকদের প্রসন্ন দৃষ্টি পড়িবে কি না সন্দেহ। তবে কি না, ইংরেজি চালুনির ফাঁক দিয়া যারা গড়িয়া পড়িতেছে এমন ছেলে এখানে পাওয়া যাইবে। কিন্তু আমার মনে হয় তার চেয়ে একটা বড়ো সুবিধার কথা আছে।

সে সুবিধাটি এই যে, এই অংশেই বিশ্ববিদ্যালয় স্বাধীনভাবে ও স্বাভাবিকরূপে নিজেকে সৃষ্টি করিয়া তুলিতে পারিবে। তার একটা কারণ, এই অংশের শিক্ষা অনেকটা পরিমাণে বাজার-দরের দাসত্ব হইতে মুক্ত হইবে। আমাদের অনেককেই ব্যবসার খাতিরে জীবিকার দায়ে ডিগ্রী লইতেই হয়—কিন্তু সে পথ যাদের অগত্যা বন্ধ কিংবা যারা শিক্ষার জন্যই শিখিতে চাহিবে তারাই এই বাংলা বিভাগে আকৃষ্ট হইবে। শুধু তাই নয় যারা দায়ে পড়িয়া ডিগ্রী লইতেছে তারাও অবকাশমতো বাংলা ভাষার টানে এই বিভাগে আনাগোনা করিতে ছাড়িবে না। কারণ, দুদিন না যাইতেই দেখা যাইবে এই বিভাগেই আমাদের দেশের অধ্যাপকদের প্রতিভার বিকাশ হইবে। এখন যাঁরা কেবল ইংরেজি শব্দের প্রতিশব্দ ও নোটের ধুলা উড়াইয়া আঁধি লাগাইয়া দেন তাঁরাই সেদিন ধারাবর্ষণে বাংলার তৃষিত চিত্ত জুড়াইয়া দিবেন।

এমনি করিয়া যাহা সজীব তাহা ক্রমে কলকে আচ্ছন্ন করিয়া নিজের স্বাভাবিক সফলতাকে প্রমাণ করিয়া তুলিবে। একদিন ইংরেজিশিক্ষিত বাঙালি নিজের ইংরেজি লেখার অভিমানে বাংলা ভাষাকে অবজ্ঞা করিয়াছিল, কিন্তু কোথা হইতে নব বাংলা-সাহিত্যের ছোটো একটি অঙ্কুর বাংলার হৃদয়ের ভিতর হইতে গজাইয়া উঠিল;—তখন তার ক্ষুদ্রতাকে তার দুর্বলতাকে পরিহাস করা সহজ ছিল; কিন্তু সে যে সজীব, ছোটো হইলেও উপেক্ষার সামগ্রী নয়; আজ সে মাথা তুলিয়া বাঙালির ইংরেজি রচনাকে অবজ্ঞা করিবার সামর্থ্য লাভ করিয়াছে। অথচ বাংলা সাহিত্যের কোনো পরিচয় কোনো আদর রাজদ্বারে ছিল না—আমাদের মতো অধীন জাতির পক্ষে সেই প্রলোভনের অভাব কম অভাব নয়—বাহিরের সেই সমস্ত অনাদরকে গণ্য না করিয়া বিলাতি বাজারের যাচনদারের দৃষ্টির বাহিরে কেবলমাত্র নিজের প্রাণের আনন্দেই সে আজ পৃথিবীতে চিরপ্রতিষ্ঠা লাভের যোগ্য হইতেছে। এতদিন ধরিয়া আমাদের সাহিত্যিকেরা যদি ইংরেজি কপিবুক নকল করিয়া আসিতেন তাহা হইলে জগতে যে প্রভূত আবর্জনার সৃষ্টি হইত তাহা কল্পনা করিলেও গায়ে কাঁটা দিয়া উঠে।

এতদিন ধরিয়া ইংরেজি বিদ্যার যে কলটা চলিতেছে সেটাকে মিস্ত্রিখানার যোগে বদল করা আমাদের সাধ্যায়ত্ত নহে। তার দুটো কারণ আছে, এক, কলটা একটা বিশেষ ছাঁচে গড়া, একেবারে গোড়া হইতে সে ছাঁচ বদল করা সোজা কথা নয়। দ্বিতীয়ত, এই ছাঁচের প্রতি ছাঁচ উপাসকদের ভক্তি এত সুদৃঢ় যে, আমরা ন্যাশনাল কলেজই করি আর হিন্দু য়ুনিভার্সিটিই করি আমাদের মন কিছুতেই ওই ছাঁচের মুঠা হইতে মুক্তি পায় না। ইহার সংস্কারের একটিমাত্র উপায় আছে এই ছাঁচের পাশে একটা সজীব জিনিসকে অল্প একটু স্থান দেওয়া। তাহা হইলে সে তর্ক না করিয়া

বিরোধ না করিয়া কলকে আচ্ছন্ন করিয়া একদিন মাথা তুলিয়া উঠিবে এবং কল যখন আকাশে ধোঁয়া উড়াইয়া ঘর্ঘর শব্দে হাটের জন্য মালের বস্তা উদ্‌গার করিতে থাকিবে তখন এই বনস্পতি নিঃশব্দে দেশকে ফল দিবে, ছায়া দিবে এবং দেশের সমস্ত কলভাষী বিহঙ্গদলকে নিজের শাখায় শাখায় আশ্রয়দান করিবে।

কিন্তু ওই কলটার সঙ্গে রফা করিবার কথাই বা কেন বলা? ওটা দেশের আপিস আদালত, পুলিসের থানা, জেলখানা, পাগলাগারদ, জাহাজের জেটি, পাটের কল প্রভৃতি আধুনিক সভ্যতার আসবাবের সামিল হইয়া থাক না। আমাদের দেশ যেখানে ফল চাহিতেছে ছায়া চাহিতেছে সেখানে কোঠাবাড়িগুলা ছাড়িয়া একবার মাটির দিকেই নামিয়া আসি না কেন? গুরুর চারিদিকে শিষ্য আসিয়া যেমন স্বভাবের নিয়মে বিশ্ববিদ্যালয় সৃষ্টি করিয়া তোলে, বৈদিককালে যেমন ছিল তপোবন, বৌদ্ধকালে যেমন ছিল নালন্দা, তক্ষশিলা—ভারতের দুর্গতির দিনেও যেমন করিয়া টোল চতুষ্পাঠী দেশের প্রাণ হইতে প্রাণ লইয়া দেশকে প্রাণ দিয়া রাখিয়াছিল তেমনি করিয়াই বিশ্ববিদ্যালয়কে জীবনের দ্বারা জীবলোকে সৃষ্টি করিয়া তুলিবার কথাই সাহস করিয়া বলা যাক্ না কেন?

সৃষ্টির প্রথম মন্ত্র—"আমরা চাই!" এই মন্ত্র কি দেশের চিত্তকুহর হইতে একেবারেই শুনা যাইতেছে না? দেশের যাঁরা আচার্য, যাঁরা সন্ধান করিতেছেন, সাধনা করিতেছেন, ধ্যান করিতেছেন, তাঁরা কি এই মন্ত্রে শিষ্যদের কাছে আসিয়া মিলিবেন না? বাষ্প যেমন মেঘে মেলে, মেঘ যেমন ধারাবর্ষণে ধরণীকে অভিষিক্ত করে তেমনি করিয়া কবে তাঁরা একত্র মিলিবেন, কবে তাঁদের সাধনা মাতৃভাষায় গলিয়া পড়িয়া মাতৃভূমিকে তৃষ্ণার জলে ও ক্ষুধার অন্নে পূর্ণ করিয়া তুলিবে?

আমার এই শেষ কথাটি কেজো কথা নহে, ইহা কল্পনা। কিন্তু আজ পর্যন্ত কেজো কথায় কেবল জোড়াতাড়া চলিয়াছে, সৃষ্টি হইয়াছে কল্পনায়।

১৩২২

ছবির অঙ্গ

এক বলিলেন বহু হইব, এমনি করিয়া সৃষ্টি হইল—আমাদের সৃষ্টিতত্ত্বে এই কথা বলে।

একের মধ্যে ভেদ ঘটিয়া তবে রূপ আসিয়া পড়িল। তাহা হইলে রূপের মধ্যে দুইটি পরিচয় থাকা চাই, বহুর পরিচয়, যেখানে ভেদ; এবং একের পরিচয়, যেখানে মিল।

জগতে রূপের মধ্যে আমরা কেবল সীমা নয় সংযম দেখি। সীমাটা অন্য সকলের সঙ্গে নিজেকে তফাত করিয়া, আর সংযমটা অন্য সমস্তের সঙ্গে রফা করিয়া। রূপ একদিকে আপনাকে মানিতেছে, আর একদিকে অন্য সমস্তকে মানিতেছে তবেই সে টিঁকিতেছে।

তাই উপনিষৎ বলিয়াছেন, সূর্য ও চন্দ্র, দ্যুলোক ও ভূলোক, একের শাসনে বিধৃত। সূর্য ও চন্দ্র দ্যুলোক ভূলোক আপন-আপন সীমায় খণ্ডিত ও বহু—কিন্তু তবু তার মধ্যে কোথায় এককে দেখিতেছি? যেখানে প্রত্যেকে আপন-আপন ওজন রাখিয়া চলিতেছে; যেখানে প্রত্যেকে সংযমের শাসনে নিয়ন্ত্রিত।

ভেদের দ্বারা বহুর জন্ম কিন্তু মিলের দ্বারা বহুর রক্ষা। যেখানে অনেককে টিকিতে হইবে সেখানে প্রত্যেককে আপন পরিমাণটি রাখিয়া আপন ওজন বাঁচাইয়া চলিতে হয়। জগৎ সৃষ্টিতে সমস্ত রূপের মধ্যে অর্থাৎ সীমার মধ্যে পরিমাণের যে সংযম সেই সংযমই মঙ্গল সেই সংযমই সুন্দর। শিব যে যতী।

আমরা যখন সৈন্যদলকে চলিতে দেখি তখন একদিকে দেখি প্রত্যেকে আপন সীমার দ্বারা স্বতন্ত্র আর একদিকে দেখি প্রত্যেকে একটি নির্দিষ্ট মাপ রাখিয়া ওজন রাখিয়া চলিতেছে। সেইখানেই সেই পরিমাণের সুষমার ভিতর দিয়া জানি ইহাদের ভেদের মধ্যেও একটি এক প্রকাশ পাইতেছে। সেই এক যতই পরিস্ফুট এই সৈন্যদল ততই সত্য। বহু যখন এলোমেলো হইয়া ভিড় করিয়া পরস্পরকে ঠেলাঠেলি ও অবশেষে পরস্পরকে পায়ের তলায় দলাদলি করিয়া চলে তখন বহুকেই দেখি, এককে দেখিতে পাই না, অর্থাৎ তখন সীমাকেই দেখি ভূমাকে দেখি না—অথচ এই ভূমার রূপই কল্যাণরূপ, আনন্দরূপ।

নিছক বহু কি জ্ঞানে কি প্রেমে কি কর্মে মানুষকে ক্লেশ দেয়, ক্লান্ত করে,—এই জন্য মানুষ আপনার সমস্ত জানায় চাওয়ায় পাওয়ায় করায় বহুর ভিতরকার এককে খুঁজিতেছে নহিলে তার মন মানে না, তার সুখ থাকে না, তার প্রাণ বাঁচে না। মানুষ তার বিজ্ঞানে বহুর মধ্যে যখন এককে পায় তখন নিয়মকে পায়, দর্শনে বহুর মধ্যে যখন এককে পায় তখন তত্ত্বকে পায়, সাহিত্যে শিল্পে বহুর মধ্যে যখন এককে পায় তখন সৌন্দর্যকে পায়. সমাজে বহুর মধ্যে যখন এককে পায় তখন কল্যাণকে পায়। এমনি করিয়া মানুষ বহুকে লইয়া তপস্যা করিতেছে এককে পাইবার জন্য।

এই গেল আমার ভূমিকা। তার পরে, আমাদের শিল্প-শাস্ত্র চিত্রকলা সম্বন্ধে কী বলিতেছে বুঝিয়া দেখা যাক।

সেই শাস্ত্রে বলে, ছবির ছয় অঙ্গ। রূপভেদ, প্রমাণ, ভাব, লাবণ্য, সাদৃশ্য ও বর্ণিকাভঙ্গ।

"রূপভেদাঃ"—ভেদ লইয়া শুরু। গোড়ায় বলিয়াছি ভেদেই রূপের সৃষ্টি। প্রথমেই রূপ আপনার বহু বৈচিত্র্য লইয়াই আমাদের চোখে পড়ে। তাই ছবির আরম্ভ হইল রূপের ভেদে—একের সীমা হইতে আরের সীমার পার্থক্যে।

কিন্তু শুধু ভেদে কেবল বৈষম্যই দেখা যায়। তার সঙ্গে যদি সুষমাকে না দেখানো যায় তবে চিত্রকলা তো ভূতের কীর্তন হইয়া উঠে। জগতের সৃষ্টিকার্যে বৈষম্য এবং সৌষম্য রূপে রূপে একেবারে গায়ে গায়ে লাগিয়া আছে; আমাদের সৃষ্টিকার্যে যদি তার সেটা অন্যথা ঘটে তবে সেটা সৃষ্টিই হয় না, অনাসৃষ্টি হয়।

বাতাস যখন স্তব্ধ তখন তাহা আগাগোড়া এক হইয়া আছে। সেই এককে বীণার তার দিয়া আঘাত করো তাহা ভাঙিয়া বহু হইয়া যাইবে। এই বহুর মধ্যে ধ্বনিগুলি যখন পরস্পর পরস্পরের ওজন মানিয়া চলে তখন তাহা সংগীত, তখনই একের সহিত অন্যের সুনিয়ত যোগ—তখনই সমস্ত বহু তাহার বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়া একই সংগীত প্রকাশ করে। ধ্বনি এখানে রূপ, এবং ধ্বনির সুষমা যাহা সুর তাহাই প্রমাণ। ধ্বনির মধ্যে ভেদ, সুরের মধ্যে এক।

এইজন্য শাস্ত্রে ছবির ছয় অঙ্গের গোড়াতে যেখানে "রূপভেদ" আছে সেইখানেই তার সঙ্গে সঙ্গে "প্রমাণানি" অর্থাৎ পরিমাণ জিনিসটাকে একেবারে যমক করিয়া সাজাইয়াছে। ইহাতে বুঝিতেছি ভেদ নইলে মিল হয় না এই জন্যই ভেদ, ভেদের জন্য ভেদ নহে; সীমা নহিলে সুন্দর হয় না এই জন্যই সীমা, নহিলে আপনাতেই সীমার সার্থকতা নাই, ছবিতে এই কথাটাই জানাইতে হইবে। রূপটাকে তার পরিমাণে দাঁড় করানো চাই। কেননা আপনার সত্য মাপে যে চলিল অর্থাৎ চারিদিকের মাপের সঙ্গে যার খাপ খাইল সেই হইল সুন্দর। প্রমাণ মানে না যে রূপ সেই কুরূপ, তাহা সমগ্রের বিরোধী।

রূপের রাজ্যে যেমন জ্ঞানের রাজ্যেও তেমনি। প্রমাণ মানে না যে যুক্তি সেই তো কুযুক্তি। অর্থাৎ সমস্তের মাপকাঠিতে যার মাপে কমিবেশি হইল, সমস্তের তুলাদণ্ডে যার ওজনের গরমিল হইল সেই তো মিথ্যা বলিয়া ধরা পড়িল। শুধু আপনার মধ্যেই আপনি তো কেহ সত্য হইতে পারে না, তাই যুক্তিশাস্ত্রে প্রমাণ করার মানে অন্যকে দিয়া এককে মাপা। তাই দেখি সত্য এবং সুন্দরের একই ধর্ম। একদিকে তাহা রূপের বিশিষ্টতায় চারিদিক হইতে পৃথক ও আপনার মধ্যে বিচিত্র, আর-একদিকে তাহা প্রমাণের সুষমায় চারিদিকের সঙ্গে ও আপনার মধ্যে সামঞ্জস্যে মিলিত। তাই যারা গভীর করিয়া বুঝিয়াছে তারা বলিয়াছে সত্যই সুন্দর, সুন্দরই সত্য।

ছবির ছয় অঙ্গের গোড়ার কথা হইল রূপভেদাঃ প্রমাণানি। কিন্তু এটা তো হইল বহিরঙ্গ—একটা অন্তরঙ্গও তো আছে।

কেননা, মানুষ তো শুধু চোখ দিয়া দেখে না, চোখের পিছনে তার মনটা আছে। চোখ ঠিক যেটি দেখিতেছে মন যে তারই প্রতিবিম্বটুকু দেখিতেছে তাহা নহে। চোখের উচ্ছিষ্টেই মন মানুষ এ কথা মানা চলিবে না—চোখের ছবিতে মন আপনার ছবি জুড়িয়া দেয় তবেই সে ছবি মানুষের কাছে সম্পূর্ণ হইয়া ওঠে।

তাই শাস্ত্র "রূপভেদাঃ প্রমাণানি"তে ষড়ঙ্গের বহিরঙ্গ সারিয়া অন্তরঙ্গের কথায় বলিতেছেন—"ভাবলাবণ্য যোজনং"—চেহারার সঙ্গে ভাব ও লাবণ্য যোগ করিতে হইবে—চোখের কাজের উপরে মনের কাজ ফলাইতে হইবে; কেননা শুধু কারু কাজটা সামান্ত, চিত্র করা চাই—চিত্রের প্রধান কাজই চিৎকে দিয়া।

ভাব বলিতে কী বুঝায় তাহা আমাদের এক রকম সহজে জানা আছে। এই জন্তই তাহাকে বুঝাইবার চেষ্টায় যাহা বলা হইবে তাহাই বুঝা শক্ত হইবে। স্ফটিক যেমন অনেকগুলা কোণ লইয়া দানা বাঁধিয়া দাঁড়ায় তেমনি "ভাব" কথাটা অনেকগুলা অর্থকে মিলাইয়া দানা বাঁধিয়াছে। এ সকল কথায় মুশকিল এই যে, ইহাদের সব অর্থ আমরা সকল সময়ে পুরাভাবে ব্যবহার করি না, দরকার মতো ইহাদের অর্থচ্ছটাকে ভিন্ন পর্যায়ে সাজাইয়া এবং কিছু কিছু বাদসাদ দিয়া নানা কাজে লাগাই। ভাব বলিতে feelings, ভাব বলিতে idea, ভাব বলিতে characteristics, ভাব বলিতে suggestion, এমন আরও কত কী আছে।

এখানে ভাব বলিতে বুঝাইতেছে অন্তরের রূপ। আমার একটা ভাব তোমার একটা ভাব; সেইভাবে আমি আমার মতো, তুমি তোমার মতো। রূপের ভেদ যেমন বাহিরের ভেদ, ভাবের ভেদ তেমনি অন্তরের ভেদ।

রূপের ভেদ সম্বন্ধে যে কথা বলা হইয়াছে ভাবের ভেদ সম্বন্ধেও সেই কথাই খাটে। অর্থাৎ কেবল যদি তাহা এক-রোখা হইয়া ভেদকেই প্রকাশ করিতে থাকে তবে তাহা বীভৎস হইয়া উঠে। তাহা লইয়া সৃষ্টি হয় না, প্রলয়ই হয়। ভাব যখন আপন সত্য ওজন মানে অর্থাৎ আপনার চারিদিককে মানে, বিশ্বকে মানে, তখনই তাহা মধুর। রূপের ওজন যেমন তাহার প্রমাণ, ভাবের ওজন তেমনি তাহার লাবণ্য।

কেহ যেন না মনে করেন ভাব কথাটা কেবল মানুষের সম্বন্ধেই খাটে। মানুষের মন অচেতন পদার্থের মধ্যেও একটা অন্তরের পদার্থ দেখে। সেই পদার্থটা সেই অচেতনের মধ্যে বস্তুতই আছে কিংবা আমাদের মন সেটাকে সেইখানে আরোপ করে সে হইল তত্ত্বশাস্ত্রের তর্ক, আমার তাহাতে প্রয়োজন নাই। এইটুকু মানিলেই হইল স্বভাবতই মানুষের মন সকল জিনিসকেই মনের জিনিস করিয়া লইতে চায়।

তাই আমরা যখন একটা ছবি দেখি তখন এই প্রশ্ন করি এই ছবির ভাবটা কী?

অর্থাৎ ইহাতে তো হাতের কাজের নৈপুণ্য দেখিলাম, চোখে দেখার বৈচিত্র্য দেখিলাম, কিন্তু ইহার মধ্যে চিত্তের কোন্ রূপ দেখা যাইতেছে—ইহার ভিতর হইতে মন মনের কাছে কোন্ লিপি পাঠাইতেছে? দেখিলাম একটা গাছ—কিন্তু গাছ তো ঢের দেখিয়াছি, এ গাছের অন্তরের কথাটা কী, অথবা যে আঁকিল গাছের মধ্য দিয়া তার অন্তরের কথাটা কী সেটা যদি না পাইলাম তবে গাছ আঁকিয়া লাভ কিসের? অবশ্য উদ্ভিদ্‌তত্ত্বের বইয়ে যদি গাছের নমুনা দিতে হয় তবে সে আলাদা কথা। কেননা সেখানে সেটা চিত্র নয় সেটা দৃষ্টান্ত।

শুধু-রূপ শুধু-ভাব কেবল আমাদের গোচর হয় মাত্র। "আমাকে দেখো" "আমাকে জানো" তাহাদের দাবি এই পর্যন্ত। কিন্তু "আমাকে রাখো" এ দাবি করিতে হইলে আরও কিছু চাই। মনের আম-দরবারে আপন-আপন রূপ লইয়া ভাব লইয়া নানা জিনিস হাজির হয়, মন তাহাদের কাহাকেও বলে, "বসো," কাহাকেও বলে "আচ্ছা যাও"।

যাহারা আর্টিস্ট তাহাদের লক্ষ্য এই যে, তাহাদের সৃষ্ট পদার্থ মনের দরবারে নিত্য আসন পাইবে। যে সব গুণীর সৃষ্টিতে রূপ আপনার প্রমাণে, ভাব আপনার লাবণ্যে, প্রতিষ্ঠিত হইয়া আসিয়াছে তাহারাই ক্লাসিক হইয়াছে, তাহারাই নিত্য হইয়াছে।

অতএব চিত্রকলায় ওস্তাদের ওস্তাদি, রূপে ও ভাবে তেমন নয়, যেমন প্রমাণে ও লাবণ্যে। এই সত্য-ওজনের আন্দাজটি পুঁথিগত বিদ্যায় পাইবার জো নাই। ইহাতে স্বাভাবিক প্রতিভার দরকার। দৈহিক ওজনবোধটি স্বাভাবিক হইয়া উঠিলে তবেই চলা সহজ হয়। তবেই নূতন নূতন বাধায়, পথের নূতন নূতন আঁকেবাঁকে আমরা দেহের গতিটাকে অনায়াসে বাহিরের অবস্থার সঙ্গে তানে লয়ে মিলাইয়া চলিতে পারি। এই ওজনবোধ একেবারে ভিতরের জিনিস যদি না হয় তবে রেলগাড়ির মতো একই বাঁধা রাস্তায় কলের টানে চলিতে হয়, এক ইঞ্চি ডাইনে বাঁয়ে হেলিলেই সর্বনাশ। তেমনি রূপ ও ভাবের সম্বন্ধে যার ওজনবোধ অন্তরের জিনিস সে "নব-নবোন্মেষশালিনী বুদ্ধি"র পথে কলাসৃষ্টিকে চালাইতে পারে। যার সে বোধ নাই সে ভয়ে ভয়ে একই বাঁধা রাস্তায় ঠিক এক লাইনে চলিয়া প'টো হইয়া কারিগর হইয়া ওঠে, সে সীমার সঙ্গে সীমার নূতন সম্বন্ধ জমাইতে পারে না। এই জন্য নূতন সম্বন্ধমাত্রকে সে বাঘের মতো দেখে।

যাহা হউক এতক্ষণ ছবির ষড়ঙ্গের আমরা চুটি অঙ্গ দেখিলাম, বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ। এইবার পঞ্চম অঙ্গে বাহির ও ভিতর যে-কোঠায় এক হইয়া মিলিয়াছে তাহার কথা আলোচনা করা যাক। সেটার নাম "সাদৃশ্যং"। নকল করিয়া যে সাদৃশ্য মেলে এতক্ষণে সেই কথাটা আসিয়া পড়িল এমন যদি কেহ মনে করেন তবে শাস্ত্রবাক্য তাঁহার

পক্ষে বৃথা হইল। ঘোড়াগোরুকে ঘোড়াগোরু করিয়া আঁকিবার জন্ত রেখা প্রমাণ ভাব লাবণ্যের এত বড়ো উদ্‌যোগপর্ব কেন? তাহা হইলে এমন কথাও কেহ মনে করিতে পারেন উত্তর-গোগৃহে গোরু-চুরি কাণ্ডের জন্তই উদ্‌যোগ পর্ব, কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের জন্ত নহে।

সাদৃশ্যের দুইটা দিক আছে। একটা, রূপের সঙ্গে রূপের সাদৃশ্য; আর-একটা ভাবের সঙ্গে রূপের সাদৃশ্য। একটা বাহিরের, একটা ভিতরের। দুটাই দরকার। কিন্তু সাদৃশ্যকে মুখ্যভাবে বাহিরের বলিয়া ধরিয়া লইলে চলিবে না।

যখনই রেখা ও প্রমাণের কথা ছাড়াইয়া ভাব লাবণ্যের কথা পাড়া হইয়াছে তখনই বোঝা গিয়াছে গুণীর মনে যে ছবিটি আছে সে প্রধানত রেখার ছবি নহে তাহা রসের ছবি। তাহার মধ্যে এমন একটি অনির্বচনীয়তা আছে যাহা প্রকৃতিতে নাই। অন্তরের সেই অমৃতরসের ভাবচ্ছবিকে বাহিরে দৃশ্যমান করিতে পারিলে তবেই রসের সহিত রূপের সাদৃশ্য পাওয়া যায়, তবেই অন্তরের সহিত বাহিরের মিল হয়। অদৃশ্য তবেই দৃশ্যে আপনার প্রতিরূপ দেখে। নানারকম চিত্রবিচিত্র করা গেল, নৈপুণ্যের অন্ত রহিল না, কিন্তু ভিতরের রসের ছবির সঙ্গে বাহিরের রূপের ছবির সাদৃশ্য রহিল না; রেখাভেদ ও প্রমাণের সঙ্গে ভাব ও লাবণ্যের জোড় মিলিল না;—হয়তো রেখার দিকে ত্রুটি রহিল নয়তো ভাবের দিকে—পরস্পর পরস্পরের সদৃশ হইল না। বরও আসিল কনেও আসিল, কিন্তু অশুভ লগ্নে মিলনের মন্ত্র ব্যর্থ হইয়া গেল। মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ, বাহিরের লোক হয়তো পেট ভরিয়া সন্দেশ খাইয়া খুব জয়ধ্বনি করিল কিন্তু অন্তরের খবর যে জানে সে বুঝিল সব মাটি হইয়াছে! চোখ-ভোলানো চাতুরীতেই বেশি লোক মজে, কিন্তু, রূপের সঙ্গে রসের সাদৃশ্যবোধ যার আছে, চোখের আড়ে তাকাইলেই যে-লোক বুঝিতে পারে রসটি রূপের মধ্যে ঠিক আপনার চেহারা পাইয়াছে কিনা, সেই তো রসিক। বাতাস যেমন সূর্যের কিরণকে চারিদিকে ছড়াইয়া দিবার কাজ করে তেমনি গুণীর সৃষ্ট কলাসৌন্দর্যকে লোকালয়ের সর্বত্র ছড়াইয়া দিবার ভার এই রসিকের উপর। কেননা যে ভরপুর করিয়া পাইয়াছে সে স্বভাবতই না দিয়া থাকিতে পারে না,—সে জানে তস্মৈ যম্ন দীয়তে। সর্বত্র এবং সকল কালেই মানুষ এই মধ্যস্থকে মানে! ইহারা ভাবলোকের ব্যাঙ্কের কর্তা—এরা নানাদিক হইতে নানা ডিপজিটের টাকা পায় - সে টাকা বন্ধ করিয়া রাখিবার জন্ত নহে;—সংসারে নানা কারবারে নানা লোক টাকা খাটাইতে চায়, তাহাদের নিজের মূলধন যথেষ্ট নাই—এই ব্যাঙ্কার নহিলে তাহাদের কাজ বন্ধ।

এমনি করিয়া রূপের ভেদ প্রমাণে বাঁধা পড়িল, ভাবের বেগ লাবণ্যে সংযত হইল, ভাবের সঙ্গে রূপের সাদৃশ্য পটের উপর সুসম্পূর্ণ হইয়া ভিতরে বাহিরে পুরাপুরি মিল হইয়া গেল—এই তো সব চুকিল। ইহার পর আর বাকি রহিল কী?

কিন্তু আমাদের শিল্পশাস্ত্রের বচন এখনও যে ফুরাইল না। স্বয়ং দ্রৌপদীকে সে ছাড়াইয়া গেল। পাঁচ পার হইয়া যে ছয়ে আসিয়া ঠেকিল সেটা বর্ণিকাভঙ্গং— রঙের ভঙ্গিমা।

এইখানে বিষম খটকা লাগিল। আমার পাশে এক গুণী বসিয়া আছেন তাঁরই কাছ হইতে এই শ্লোকটি পাইয়াছি। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, রূপ, অর্থাৎ রেখার কারবার যেটা ষড়ঙ্গের গোড়াতেই আছে আর এই রঙের ভঙ্গি যেটা তার সকলের শেষে স্থান পাইল চিত্রকলায় এ দুটোর প্রাধান্য তুলনায় কার কত?

তিনি বলিলেন, বলা শক্ত।

তাঁর পক্ষে শক্ত বই কি? দুটির পরেই যে তাঁর অন্তরের টান, এমন স্থলে নিরাসক্ত মনে বিচার করিতে বসা তাঁর দ্বারা চলিবে না। আমি অব্যবসায়ী, অতএব বাহির হইতে ঠাহর করিয়া দেখা আমার পক্ষে সহজ।

রং আর রেখা এই দুই লইয়াই পৃথিবীর সকল রূপ আমাদের চোখে পড়ে। ইহার মধ্যে রেখাটাতেই রূপের সীমা টানিয়া দেয়। এই সীমার নির্দেশই ছবির প্রধান জিনিস। অনির্দিষ্টতা গানে আছে, গন্ধে আছে কিন্তু ছবিতে থাকিতে পারে না।

এই জন্যই কেবল রেখাপাতের দ্বারা ছবি হইতে পারে কিন্তু কেবল বর্ণপাতের দ্বারা ছবি হইতে পারে না। বর্ণটা রেখার আনুষঙ্গিক।

সাদার উপরে কালোর দাগ এই হইল ছবির গোড়া। আমরা সৃষ্টিতে যাহা চোখে দেখিতেছি তাহা অসীম আলোকের সাদার উপরকার সসীম-দাগ। এই দাগটা আলোর বিরুদ্ধ তাই আলোর উপরে ফুটিয়া উঠে। আলোর উলটা কালো, আলোর বুকের উপরে ইহার বিহার।

কালো আপনাকে আপনি দেখাইতে পারে না। স্বয়ং সে শুধু অন্ধকার, দোয়াতের কালির মতো। সাদার উপর যেই সে দাগ কাটে অমনি সেই মিলনে সে দেখা দেয়। সাদা আলোকের পটটি বৈচিত্র্যহীন ও স্থির, তার উপরে কালো রেখাটি বিচিত্রনৃত্যে ছন্দে ছন্দে ছবি হইয়া উঠিতেছে। শুভ্র ও নিস্তব্ধ অসীম রজতগিরিনিভ, তারই বুকের উপর কালীর পদক্ষেপ চঞ্চল হইয়া সীমায় সীমায় রেখায় রেখায় ছবির পরে ছবির ছাপ মারিতেছে। কালীরেখার সেই নৃত্যের ছন্দটি লইয়া চিত্রকলার রূপভেদাঃ প্রমাণানি। নৃত্যের বিচিত্র বিক্ষেপগুলি রূপের ভেদ, আর তার ছন্দের তালটিই প্রমাণ।

আলো আর কালো অর্থাৎ আলো আর না-আলোর দ্বন্দ্ব খুবই একান্ত। রংগুলি তারই মাঝখানে মধ্যস্থতা করে। ইহারা যেন বীণায় আলাপের মীড়—এই মীড়ের দ্বারা সুর যেন সুরের অতীতকে পর্যায়ে পর্যায়ে ইশারায় দেখাইয়া দেয়—ভঙ্গিতে ভঙ্গিতে

সুর আপনাকে অতিক্রম করিয়া চলে। তেমনি রঙের ভঙ্গি দিয়া রেখা আপনাকে অতিক্রম করে; রেখা যেন অরেখার দিকে আপন ইশারা চালাইতে থাকে। রেখা জিনিসটা সুনির্দিষ্ট,—আর রং জিনিসটা নির্দিষ্ট অনির্দিষ্টের সেতু, তাহা সাদা কালোর মাঝখানকার নানা টানের মীড়। সীমার বাঁধনে বাঁধা কালো রেখার তারটাকে সাদা যেন খুব তীব্র করিয়া আপনার দিকে টানিতেছে, কালো তাই কড়ি হইতে অতিকোমলের ভিতর দিয়া রঙে রঙে অসীমকে স্পর্শ করিয়া চলিয়াছে। তাই বলিতেছি রং জিনিসটা রেখা এবং অরেখার মাঝখানের সমস্ত ভঙ্গি। রেখা ও অরেখার মিলনে যে ছবির সৃষ্টি সেই ছবিতে এই মধ্যস্থের প্রয়োজন। অরেখ সাদার বুকের উপর যেখানে রেখা-কালীর নৃত্য সেখানে এই রংগুলি যোগিনী। শাস্ত্রে ইহাদের নাম সকলের শেষে থাকিলেও ইহাদের কাজ নেহাত কম নয়।

পূর্বেই বলিয়াছি সাদার উপর শুধু-রেখার ছবি হয়, কিন্তু সাদার উপর শুধু-রঙে ছবি হয় না। তার কারণ রং জিনিসটা মধ্যস্থ—দুই পক্ষের মাঝখানে ছাড়া কোনো স্বতন্ত্র জায়গায় তার অর্থই থাকে না।

এই গেল বর্ণিকাভঙ্গ।

এই ছবির ছয় অঙ্গের সঙ্গে কবিতার কিরূপ মিল আছে তাহা দেখাইলেই কথাটা বোঝা হয়তো সহজ হইবে।

ছবির স্থুল উপাদান যেমন রেখা তেমনি কবিতার স্থুল উপাদান হইল বাণী। সৈন্যদলের চালের মতো সেই বাণীর চালে একটা ওজন একটা প্রমাণ আছে—তাহাই ছন্দ। এই বাণী ও বাণীর প্রমাণ বাহিরের অঙ্গ, ভিতরের অঙ্গ ভাব ও মাধুর্য।

এই বাহিরের সঙ্গে ভিতরকে মিলাইতে হইবে। বাহিরের কথাগুলি ভিতরের ভাবের সদৃশ হওয়া চাই; তাহা হইলেই সমস্তটায় মিলিয়া কবির কাব্য কবির কল্পনার সাদৃশ্য লাভ করিবে।

বহিঃসাদৃশ্য, অর্থাৎ রূপের সঙ্গে রূপের সাদৃশ্য, অর্থাৎ যেটাকে দেখা যায় সেইটাকে ঠিকঠাক করিয়া বর্ণনা করা কবিতার প্রধান জিনিস নহে। তাহা কবিতায় লক্ষ্য নহে উপলক্ষ্য মাত্র। এইজন্য বর্ণনামাত্রই যে-কবিতার পরিণাম, রসিকেরা তাঁহাকে উঁচুদরের কবিতা বলিয়া গণ্য করেন না। বাহিরকে ভিতরের করিয়া দেখা ও ভিতরকে বাহিরের রূপে ব্যক্ত করা ইহাই কবিতা এবং সমস্ত আর্টেরই লক্ষ্য।

সৃষ্টিকর্তা একেবারেই আপন পরিপূর্ণতা হইতে সৃষ্টি করিতেছেন তাঁর আর-কোনো উপসর্গ নাই। কিন্তু বাহিরের সৃষ্টি মানুষের ভিতরের তারে ঘা দিয়া যখন একটা মানস পদার্থকে জন্ম দেয়, যখন একটা রসের সুর বাজায় তখনই সে আর থাকিতে পারে না,

বাহিরে সৃষ্ট হইবার কামনা করে। ইহাই মানুষের সকল সৃষ্টির গোড়ার কথা। এই জন্যই মানুষের সৃষ্টিতে ভিতর বাহিরের ঘাত প্রতিঘাত। এই জন্য মানুষের সৃষ্টিতে বাহিরের জগতের আধিপত্য আছে। কিন্তু একাধিপত্য যদি থাকে, যদি প্রকৃতির ধামা-ধরা হওয়াই কোনো আর্টিস্টের কাজ হয় তবে তার দ্বারা সৃষ্টিই হয় না। শরীর বাহিরের খাবার খায় বটে কিন্তু তাহাকে অবিকৃত বমন করিবে বলিয়া নয়। নিজের মধ্যে তাহার বিকার জন্মাইয়া তাহাকে নিজের করিয়া লইবে বলিয়া। তখন সেই খাদ্য একদিকে রসরক্তরূপে বাহ্য আকার, আর-এক দিকে শক্তি স্বাস্থ্য সৌন্দর্যরূপে আন্তর আকার ধারণ করে। ইহাই শরীরের সৃষ্টিকার্য। মনের সৃষ্টিকার্যও এমনিতরো। তাহা বাহিরের বিশ্বকে বিকারের দ্বারা যখন আপনার করিয়া লয় তখন সেই মানস পদার্থটা একদিকে বাক্য রেখা সুর প্রভৃতি বাহ্য আকার, অন্যদিকে সৌন্দর্য শক্তি প্রভৃতি আন্তর আকার ধারণ করে। ইহাই মনের সৃষ্টি—যাহা দেখিলাম অবিকল তাহাই দেখানো সৃষ্টি নহে।

তারপরে, ছবিতে যেমন বর্ণিকাভঙ্গং কবিতায় তেমনি ব্যঞ্জনা (suggestiveness)। এই ব্যঞ্জনার দ্বারা কথা আপনার অর্থকে পার হইয়া যায়। যাহা বলে তার চেয়ে বেশি বলে। এই ব্যঞ্জনা ব্যক্ত ও অব্যক্তর মাঝখানকার মীড়। কবির কাব্যে এই ব্যঞ্জনা বাণীর নির্দিষ্ট অর্থের দ্বারা নহে, বাণীর অনির্দিষ্ট ভঙ্গির দ্বারা, অর্থাৎ বাণীর রেখার দ্বারা নহে, তাহার রঙের দ্বারা সৃষ্ট হয়।

আসল কথা, সকল প্রকৃত আর্টেই একটা বাহিরের উপকরণ, আর একটা চিত্তের উপকরণ থাকা চাই—অর্থাৎ একটা রূপ, আর একটা ভাব। সেই উপকরণকে সংযমের দ্বারা বাঁধিয়া গড়িতে হয়; বাহিরের বাঁধন প্রমাণ, ভিতরের বাঁধন লাবণ্য। তার পরে সেই ভিতর বাহিরের উপকরণকে মিলাইতে হইবে কিসের জন্য? সাদৃশ্যের জন্য। কিসের সঙ্গে সাদৃশ্য? না, ধ্যানরূপের সঙ্গে কল্পরূপের সঙ্গে সাদৃশ্য। বাহিরের রূপের সঙ্গে সাদৃশ্যই যদি মুখ্য লক্ষ্য হয় তবে ভাব ও লাবণ্য কেবল যে অনাবশ্যক হয় তাহা নহে, তাহা বিরুদ্ধ হইয়া দাঁড়ায়। এই সাদৃশ্যটিকে ব্যঞ্জনার রঙে রঙাইতে পারিলে সোনায় সোহাগা—কারণ তখন তাহা সাদৃশ্যের চেয়ে বড়ো হইয়া ওঠে,—তখন তাহা কতটা যে বলিতেছে তাহা স্বয়ং রচয়িতাও জানে না—তখন সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি তাহার সংকল্পকেও ছাড়াইয়া যায়।

অতএব, দেখা যাইতেছে ছবির যে ছয় অঙ্গ, সমস্ত আর্টের অর্থাৎ আনন্দরূপেরই তাই।

১৩২২

সোনার কাঠি

রূপকথায় আছে, রাক্ষসের জাদুতে রাজকন্যা ঘুমিয়ে আছেন। যে পুরীতে আছেন সে সোনার পুরী, যে পালঙ্কে শুয়েছেন সে সোনার পালঙ্ক; সোনা মানিকের অলংকারে তাঁর গা ভরা। কিন্তু কড়াকড় পাহারা, পাছে কোনো সুযোগে বাহিরের থেকে কেউ এসে তাঁর ঘুম ভাঙিয়ে দেয়। তাতে দোষ কী? দোষ এই যে, চেতনার অধিকার যে বড়ো। সচেতনকে যদি বলা যায় তুমি কেবল এইটুকুর মধ্যেই চিরকাল থাকবে, তার এক পা বাইরে যাবে না,তাহলে তার চৈতন্যকে অপমান করা হয়। ঘুম পাড়িয়ে রাখার সুবিধা এই যে তাতে দেহের প্রাণটা টিঁকে থাকে কিন্তু মনের বেগটা হয় একেবারে বন্ধ হয়ে যায়, নয় সে অদ্ভুত স্বপ্নের পথহীন ও লক্ষ্যহীন অন্ধলোকে বিচরণ করে।

আমাদের দেশের গীতিকলার দশাটা এই রকম। সে মোহ-রাক্ষসের হাতে পড়ে বহুকাল থেকে ঘুমিয়ে আছে। যে ঘরটুকু যে পালঙ্কটুকুর মধ্যে এই সুন্দরীর স্থিতি তার ঐশ্বর্যের সীমা নেই; চারিদিকে কারুকার্য, সে কত সূক্ষ্ম কত বিচিত্র! সেই চেড়ির দল, যাদের নাম ওস্তাদি, তাদের চোখে ঘুম নেই; তারা শত শত বছর ধরে সমস্ত আসা যাওয়ার পথ আগলে বসে আছে, পাছে বাহির থেকে কোনো আগন্তুক এসে ঘুম ভাঙিয়ে দেয়।

তাতে ফল হয়েছে এই যে, যে কালটা চলছে রাজকন্যা তার গলায় মালা দিতে পারেনি, প্রতিদিনের নূতন নূতন ব্যবহারে তার কোনো যোগ নেই। সে আপনার সৌন্দর্যের মধ্যে বন্দী, ঐশ্বর্যের মধ্যে অচল।

কিন্তু তার যত ঐশ্বর্য যত সৌন্দর্যই থাক তার গতিশক্তি যদি না থাকে তাহলে চলতি কাল তার ভার বহন করতে রাজি হয় না। একদিন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে পালঙ্কের উপর অচলাকে শুইয়ে রেখে সে আপন পথে চলে যায়—তখন কালের সঙ্গে কলার বিচ্ছেদ ঘটে। তাতে কালেরও দারিদ্র্য, কলারও বৈকল্য।

আমরা স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি আমাদের দেশে গান জিনিসটা চলছে না। ওস্তাদরা বলছেন, গান জিনিসটা তো চলবার জন্যে হয় নি, সে বৈঠকে বসে থাকবে তোমরা এসে সমের কাছে খুব জোরে মাথা নেড়ে যাবে; কিন্তু মুশকিল এই যে, আমাদের বৈঠকখানার যুগ চলে গেছে, এখন আমরা যেখানে একটু বিশ্রাম করতে পাই সে মুসাফিরখানায়। যা কিছু স্থির হয়ে আছে তার খাতিরে আমরা স্থির হয়ে থাকতে পারব না। আমরা যে নদী বেয়ে চলছি সে নদী চলছে, যদি নৌকোটা না চলে তবে খুব দামি নৌকো হলেও তাকে ত্যাগ করে যেতে হবে।

সংসারে স্থাবর অস্থাবর দুই জাতের মানুষ আছে অতএব বর্তমান অবস্থাটা ভালো কি মন্দ তা নিয়ে মতভেদ থাকবেই। কিন্তু মত নিয়ে করব কী? যেখানে একদিন ডাঙা ছিল সেখানে আজ যদি জল হয়েই থাকে তবে সেখানকার পক্ষে দামি চৌঘুড়ির চেয়ে কলার ভেলাটাও যে ভালো।

পঞ্চাশ বছর আগে একদিন ছিল যখন বড়ো বড়ো গাইয়ে বাজিয়ে দূরদেশ থেকে কলকাতা শহরে আসত। ধনীদের ঘরে মজলিস বসত, ঠিক সমে মাথা নড়তে পারে এমন মাথা গুনতিতে নেহাত কম ছিল না। এখন আমাদের শহরে বক্তৃতাসভার অভাব নেই, কিন্তু গানের মজলিস বন্ধ হয়ে গেছে। সমস্ত তানমানলয় সমেত বৈঠকি গান পুরোপুরি বরদাস্ত করতে পারে এত বড়ো মজবুত লোক এখনকার যুবকদের মধ্যে প্রায় দেখাই যায় না।

চর্চা নেই বলে জবাব দিলে আমি শুনব না। মন নেই বলেই চর্চা নেই। আকবরের রাজত্ব গেছে এ কথা আমাদের মানতেই হবে। খুব ভালো রাজত্ব, কিন্তু কী করা যাবে—সে নেই। অথচ গানেতেই যে সে রাজত্ব বহাল থাকবে একথা বললে অন্যায় হবে। আমি বলছিনে আকবরের আমলের গান লুপ্ত হয়ে যাবে—কিন্তু এখনকার কালের সঙ্গে যোগ রেখে তাকে টিঁকতে হবে—সে যে বর্তমান কালের মুখ বন্ধ করে দিয়ে নিজেরই পুনরাবৃত্তিকে অন্তহীন করে তুলবে তা হতেই পারবে না।

সাহিত্যের দিক থেকে উদাহরণ দিলে আমার কথাটা স্পষ্ট হবে। আজ পর্যন্ত আমাদের সাহিত্যে যদি কবিকঙ্কণ চণ্ডী, ধর্মমঙ্গল, অন্নদামঙ্গল, মনসার ভাসানের পুনরাবৃত্তি নিয়ত চলতে থাকত তাহলে কী হত? পনেরো আনা লোক সাহিত্য পড়া ছেড়েই দিত। বাংলার সকল গল্পই যদি বাসবদত্তা কাদম্বরীর ছাঁচে ঢালা হত তাহলে জাতে ঠেলার ভয় দেখিয়ে সে গল্প পড়াতে হত।

কবিকঙ্কণ চণ্ডী কাদম্বরীর আমি নিন্দা করছিনে। সাহিত্যের শোভাযাত্রার মধ্যে চিরকালই তাদের একটা স্থান আছে কিন্তু যাত্রাপথের সমস্তটা জুড়ে তারাই যদি আড্ডা করে বসে, তাহলে সে পথটাই মাটি, আর তাদের আসরে কেবল তাকিয়া পড়ে থাকবে, মানুষ থাকবে না।

বঙ্কিম আনলেন সাতসমুদ্রপারের রাজপুত্রকে আমাদের সাহিত্য রাজকন্যার পালঙ্কের শিয়রে। তিনি যেমনি ঠেকালেন সোনার কাঠি, অমনি সেই বিজয়-বসন্ত লয়লামজনুর হাতির দাঁতে বাঁধানো পালঙ্কের উপর রাজকন্যা নড়ে উঠলেন। চলতিকালের সঙ্গে তাঁর মালা বদল হয়ে গেল, তার পর থেকে তাঁকে আজ ঠেকিয়ে রাখে কে?

যারা মনুষ্যত্বের চেয়ে কৌলীন্যকে বড়ো করে মানে তারা বলবে ওই রাজপুত্রটা

যে বিদেশী। তারা এখন বলে, এ সমস্তই ভুয়ো; বস্তুতন্ত্র যদি কিছু থাকে তো সে ওই কবিকঙ্কণ চণ্ডী, কেননা এ আমাদের খাঁটি মাল। তাদের কথাই যদি সত্য হয় তাহলে এ কথা বলতেই হবে নিছক খাঁটি বস্তুতন্ত্রকে মানুষ পছন্দ করে না; মানুষ তাকেই চায় যা বস্তু হয়ে বাস্তু গেড়ে বসে না, যা তার প্রাণের সঙ্গে সঙ্গে চলে, যা তাকে মুক্তির স্বাদ দেয়।

বিদেশের সোনার কাঠি যে জিনিসকে মুক্তি দিয়েছে সে তো বিদেশী নয়—সে যে আমাদের আপন প্রাণ। তার ফল হয়েছে এই যে, যে বাংলাভাষাকে ও সাহিত্যকে একদিন আধুনিকের দল ছুঁতে চাইত না এখন তাকে নিয়ে সকলেই ব্যবহার করছে ও গৌরব করছে। অথচ যদি ঠাহর করে দেখি তবে দেখতে পাব গদ্যে পদ্যে সকল জায়গাতেই সাহিত্যের চালচলন সাবেক কালের সঙ্গে সম্পূর্ণ বদলে গেছে। যাঁরা তাকে জাতিচ্যুত বলে নিন্দা করেন ব্যবহার করবার বেলা তাকে তাঁরা বর্জন করতে পারেন না।

সমুদ্রপারের রাজপুত্র এসে মানুষের মনকে সোনার কাঠি ছুঁইয়ে জাগিয়ে দেয় এটা তার ইতিহাসে চিরদিন ঘটে আসছে। আপনার পূর্ণ শক্তি পাবার জন্যে বৈষম্যের আঘাতের অপেক্ষা তাকে করতেই হয়। কোনো সভ্যতাই একা আপনাকে আপনি সৃষ্টি করেনি। গ্রীসের সভ্যতার গোড়ায় অন্য সভ্যতা ছিল এবং গ্রীস বরাবর ইজিপ্ট ও এশিয়া থেকে ধাক্কা খেয়ে এসেছে। ভারতবর্ষে দ্রাবিড় মনের সঙ্গে আর্য সংঘাত ও ও সম্মিলন ভারতসভ্যতা সৃষ্টির মূল উপকরণ, তার উপরে গ্রীস রোম পারস্য তাকে কেবলই নাড়া দিয়েছে। য়ুরোপীয় সভ্যতায় যে সব যুগকে পুনর্জন্মের যুগ বলে সে সমস্তই অন্য দেশ ও অন্য কালের সংঘাতের যুগ। মানুষের মন বাহির হতে নাড়া পেলে তবে আপনার অন্তরকে সত্যভাবে লাভ করে এবং তার পরিচয় পাওয়া যায় যখন দেখি সে আপনার বাহিরের জীর্ণ বেড়াগুলোকে ভেঙে আপনার অধিকার বিস্তার করছে। এই অধিকার বিস্তারকে একদল লোক দোষ দেয়, বলে ওতে আমরা নিজেকে হারালুম—তারা জানে না নিজেকে ছাড়িয়ে যাওয়া নিজেকে হারিয়ে যাওয়া নয় - কারণ বৃদ্ধি মাত্রই নিজেকে ছাড়িয়ে যাওয়া।

সম্প্রতি আমাদের দেশে চিত্রকলার যে নবজীবন লাভের লক্ষণ দেখছি তার মূলেও সেই সাগরপারের রাজপুত্রের সোনার কাঠি আছে। কাঠি ছোঁওয়ার প্রথম অবস্থায় ঘুমের ঘোরটা যখন সম্পূর্ণ কাটে না, তখন আমরা নিজের শক্তি পুরোপুরি অনুভব করিনে, তখন অনুকরণটাই বড়ো হয়ে ওঠে, কিন্তু ঘোর কেটে গেলেই আমরা নিজের জোরে চলতে পারি। সেই নিজের জোরে চলার একটা লক্ষণ এই যে তখন আমরা পরের পথেও নিজের শক্তিতে চলতে পারি। পথ নানা; অভিপ্রায়টি আমার, শক্তিটি আমার।

যদি পথের বৈচিত্র্য রুদ্ধ করি, যদি একই বাঁধা পথ থাকে, তাহলে অভিপ্রায়ের স্বাধীনতা থাকে না—তাহলে কলের চাকার মতো চলতে হয়। সেই কলের চাকার পথটাকে চাকার স্বকীয় পথ বলে গৌরব করার মতো অদ্ভুত প্রহসন আর জগতে নেই।

আমাদের সাহিত্যে চিত্রে সমুদ্রপারের রাজপুত্র এসে পৌঁছেছে। কিন্তু সংগীতে পৌঁছোয়নি। সেই জন্যেই আজও সংগীত জাগতে দেরি করছে। অথচ আমাদের জীবন জেগে উঠেছে। সেই জন্যে সংগীতের বেড়া টলমল করছে। এ কথা বলতে পারব না, আধুনিকের দল গান একেবারে বর্জন করেছে। কিন্তু তারা যে গান ব্যবহার করছে, যে গানে আনন্দ পাচ্ছে সে গান জাত-খোয়ানো গান। তার শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার নেই। কীর্তনে বাউলে বৈঠকে মিলিয়ে যে জিনিস আজ তৈরি হয়ে উঠছে সে আচার-ভ্রষ্ট। তাকে ওস্তাদের দল নিন্দা করছে। তার মধ্যে নিন্দনীয়তা নিশ্চয়ই অনেক আছে। কিন্তু অনিন্দনীয়তাই যে সব চেয়ে বড়ো গুণ তা নয়। প্রাণশক্তি শিবের মতো অনেক বিষ হজম করে ফেলে। লোকের ভালো লাগছে, সবাই শুনতে চাচ্ছে, শুনতে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ছে না,—এটা কম কথা নয়। অর্থাৎ গানের পঙ্গুতা ঘুচল, চলতে শুরু করল। প্রথম চালটা সর্বাঙ্গসুন্দর নয়, তার অনেক ভঙ্গি হাস্যকর এবং কুশ্রী—কিন্তু সব চেয়ে আশার কথা যে, চলতে শুরু করেছে— সে বাঁধন মানছে না। প্রাণের সঙ্গে সম্বন্ধই যে তার সব চেয়ে বড়ো সম্বন্ধ, প্রথার সঙ্গে সম্বন্ধটা নয়, এই কথাটা এখনকার এই গানের গোলমেলে হাওয়ার মধ্যে বেজে উঠেছে। ওস্তাদের কারদানিতে আর তাকে বেঁধে রাখতে পারবে না।

দ্বিজেন্দ্রলালের গানের সুরের মধ্যে ইংরেজি সুরের স্পর্শ লেগেছে বলে কেউ কেউ তাকে হিন্দুসংগীত থেকে বহিষ্কৃত করতে চান। যদি দ্বিজেন্দ্রলাল হিন্দুসংগীতে বিদেশী সোনার কাঠি ছুঁইয়ে থাকেন তবে সরস্বতী নিশ্চয়ই তাঁকে আশীর্বাদ করবেন। হিঁদুসংগীত বলে যদি কোনো পদার্থ থাকে তবে সে আপনার জাত বাঁচিয়ে চলুক; কারণ তার প্রাণ নেই, তার জাতই আছে। হিন্দুসংগীতের কোনো ভয় নেই—বিদেশের সংস্রবে সে আপনাকে বড়ো করেই পাবে। চিত্তের সঙ্গে চিত্তের সংঘাত আজ লেগেছে—সেই সংঘাতে সত্য উজ্জ্বল হবে না, নষ্টই হবে, এমন আশঙ্কা যে ভীরু করে, যে মনে করে সত্যকে সে নিজের মাতামহীর জীর্ণ কাঁথা আড়াল করে ঘিরে রাখলে তবেই সত্য টিকে থাকবে, আজকের দিনে সে যত আস্ফালনই করুক তাকে পথ ছেড়ে দিয়ে চলে যেতে হবে। কারণ, সত্য হিঁদুর সত্য নয়, পণ্ডিতের করে ফোঁটা ফোঁটা পুঁথির বিধান খাইয়ে তাকে বাঁচিয়ে রাখতে হয় না! চারদিক থেকে মানুষের নাড়া খেলেই সে আপনার শক্তিকে প্রকাশ করতে পারে।

১৩২২

কৃপণতা

দেশের কাজে যাঁরা টাকা সংগ্রহ করিয়া ফিরিতেছেন তাঁদের কেহ কেহ আক্ষেপ করিতেছিলেন যে, টাকা কেহ সহজে দিতে চাহেন না. এমন কি, যাঁদের আছে এবং যাঁরা দেশানুরাগের আড়ম্বর করিতে ছাড়েন না, তাঁরাও।

ঘটনা তো এই কিন্তু কারণটা কী খুঁজিয়া বাহির করা চাই। রেলগাড়ির পয়লা দোসরা শ্রেণীর কামরার দরজা বাহিরের দিকে টানিয়া খুলিতে গিয়া যে ব্যক্তি হয়রান হইয়াছে তাকে এটা দেখাইয়া দেওয়া যাইতে পারে যে, দরজা হয় বাহিরের দিকে খোলে, নয় ভিতরের দিকে। দুই দিকেই সমান খোলে এমন দরজা বিরল।

আমাদের দেশে ধনের দরজাটা বহুকাল হইতে এমন করিয়া বানানো যে, সে ভিতরের দিকের ধাক্কাতেই খোলে। আজ তাকে বাহিরের দিকে টান দিবার দরকার হইয়াছে কিন্তু দরকারের খাতিরে কলকব্জা তো একেবারে একদিনেই বদল করা যায় না। সামাজিক মিস্ত্রিটা বুড়ো, কানে কম শোনে, তাকে তাগিদ দিতে গেলেই গরম হইয়া ওঠে।

মানুষের শক্তির মধ্যে একটা বাড়তির ভাগ আছে। সেই শক্তি মানুষের নিজের প্রয়োজনের চেয়ে বেশি। জন্তুর শক্তি পরিমিত বলিয়াই তারা কিছু সৃষ্টি করে না, মানুষের শক্তি পরিমিতের বেশি বলিয়াই তারা সেই বাড়তির ভাগ লইয়া আপনার সভ্যতা সৃষ্টি করিতে থাকে।

কোনো একটি দেশের সম্বন্ধে বিচার করিতে হইলে এই কথাটি ভাবিয়া দেখিতে হইবে যে, সেখানে মানুষ আপন বাড়তি অংশ দিয়া কী সৃষ্টি করিয়াছে, অর্থাৎ জাতির ঐশ্বর্য আপন বসতির জন্য কোন্ ইমারত বানাইয়া তুলিতেছে?

ইংলণ্ডে দেখিতে পাই সেখানকার মানুষ নিজের প্রয়োজনটুকু সারিয়া বহু যুগ হইতে ব্যয় করিয়া আসিতেছে রাষ্ট্রনৈতিক স্বাতন্ত্র্য গড়িয়া তুলিতে এবং তাকে জাগাইয়া রাখিতে।

আমাদের দেশের শক্তির অতিরিক্ত অংশ আমরা খরচ করিয়া আসিতেছি রাষ্ট্রতন্ত্রের জন্য নয়, পরিবারতন্ত্রের জন্য। আমাদের শিক্ষাদীক্ষা ধর্মকর্ম এই পরিবারতন্ত্রকে আশ্রয় করিয়া নিজেকে প্রকাশ করিতেছে।

আমাদের দেশে এমন অতি অল্পলোকই আছে যার অধিকাংশ সামর্থ্য প্রতিদিন আপন পরিবারের জন্য ব্যয় করিতে না হয়। উমেদারির দুঃখে ও অপমানে আমাদের

তরুণ যুবকদের চোখের গোড়ায় কালি পড়িল, মুখ ফ্যাকাশে হইয়া গেল, কিসের জন্য? নিজের প্রয়োজনটুকুর জন্য তো নয়। বাপ মা বৃদ্ধ, ভাইকটিকে পড়াইতে হইবে, দুটি বোনের বিবাহ বাকি, বিধবা বোন তার মেয়ে লইয়া তাদের বাড়িতেই থাকে, আর আর যত অনাথ অপোগণ্ডের দল আছে অন্য কোথাও তাদের আত্মীয় বলিয়া স্বীকার করেই না।

এদিকে জীবনযাত্রার চাল বাড়িয়া গেছে, জিনিসপত্রের দাম বেশি, চাকরির ক্ষেত্র সংকীর্ণ, ব্যবসাবুদ্ধির কোনো চর্চাই হয় নাই। কাঁধের জোর কমিল, বোঝার ভার বাড়িল, এই বোঝা দেশের একপ্রান্ত হইতে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত। চাপ এত বেশি যে, নিজের ঘাড়ের কথাটা ছাড়া আর কোনো কথায় পুরা মন দিতে পারা যায় না। উঞ্ছবৃত্তি করি, লাথিঝাঁটা খাই, কন্যার পিতার গলায় ছুরি দিই, নিজেকে সকল রকমে হীন করিয়া সংসারের দাবি মেটাই।

রেলে ইস্টিমারে যখন দেশের সামগ্রীকে দূরে ছড়াইয়া দিত না, বাহিরের পৃথিবীর সঙ্গে আমদানি রপ্তানি একপ্রকার বন্ধ ছিল আমাদের সমাজের ব্যবস্থা তখনকার দিনের। তখন ছিল বাঁধের ভিতরকার বিধি। এখন বাঁধ ভাঙিয়াছে, বিধি ভাঙে নাই।

সমাজের দাবি তখন ফলাও ছিল। সে দাবি যে কেবল পরিবারের বৃহৎ পরিধির দ্বারা প্রকাশ পাইত তাহা নহে—পরিবারের ক্রিয়াকর্মেও তার দাবি কম ছিল না। সেই সমস্ত ক্রিয়াকর্ম পালপার্বণ আত্মীয় প্রতিবেশী অনাহূত রবাহূত সকলকে লইয়া। তখন জিনিসপত্র সস্তা, চালচলন সাদা, এই জন্য ওজন যেখানে কম আয়তন সেখানে বেশি হইলে অসহ্য হইত না।

এদিকে সময় বদলাইয়াছে কিন্তু সমাজের দাবি আজও খাটো হয় নাই। তাই জন্মমৃত্যুবিবাহ প্রভৃতি সকল রকম পারিবারিক ঘটনাই সমাজের লোকের পক্ষে বিষম দুর্ভাবনার কারণ হইল। এর উপর নিত্যনৈমিত্তিকের নানাপ্রকার বোঝা চাপানোই রহিয়াছে।

এমন উপদেশ দিয়া থাকি পূর্বের মতো সাদাচালে চলিতেই বা দোষ কী? কিন্তু মানবচরিত্র শুধু উপদেশে চলে না,—এ তো ব্যোমযান নয় যে উপদেশের গ্যাসে তার পেট ভরিয়া দিলেই সে উধাও হইয়া চলিবে। দেশকালের টান বিষম টান। যখন দেশে কালে অসন্তোষের উপাদান অল্প ছিল, তখন সন্তোষ মানুষের সহজ ছিল। আজকাল আমাদের আর্থিক অবস্থার চেয়ে ঐশ্বর্যের দৃষ্টান্ত অনেক বেশি বড়ো হইয়াছে। ঠিক যেন এমন একটা জমিতে আসিয়া পড়িয়াছি যেখানে আমাদের পায়ের জোরের

চেয়ে জমির ঢাল অনেক বেশি,—সেখানে স্থির দাঁড়াইয়া থাকা শক্ত, অথচ চলিতে গেলে সুস্থভাবে চলার চেয়ে পড়িয়া মরার সম্ভাবনাই বেশি।

বিশ্বপৃথিবীর ঐশ্বর্য ছাতা জুতা থেকে আরম্ভ করিয়া গাড়ি বাড়ি পর্যন্ত নানা জিনিষে নানা মূর্তিতে আমাদের চোখের উপরে আসিয়া পড়িয়াছে,- দেশের ছেলেবুড়ো সকলের মনে আকাঙ্ক্ষাকে প্রতিমুহূর্তে বাড়াইয়া তুলিতেছে। সকলেই আপন সাধ্যমতো সেই আকাঙ্ক্ষার অনুযায়ী আয়োজন করিতেছে। ক্রিয়াকর্ম যা কিছু করি না কেন সেই সর্বজনীন আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে তাল রাখিয়া করিতে হইবে। লোক ডাকিয়া খাওয়াইব কিন্তু পঞ্চাশ বছর আগেকার রসনাটা এখন নাই একথা ভুলিবার জো কী!

বিলাতে প্রত্যেক মানুষের উপর এই চাপ নাই। যতক্ষণ বিবাহ না করে ততক্ষণ সে স্বাধীন, বিবাহ করিলেও তার ভার আমাদের চেয়ে অনেক কম। কাজেই তার শক্তির উদ্‌বৃত্ত অংশ অনেকখানি নিজের হাতে থাকে। সেটা অনেকে নিজের ভোগে লাগায় সন্দেহ নাই। কিন্তু মানুষ যে-হেতুক মানুষ এই জন্য সে নিজেকে নিজের মধ্যেই নিঃশেষ করিতে পারে না। পরের জন্য খরচ করা তার ধর্ম। নিজের বাড়তি শক্তি যে অন্যকে না দেয়, সেই শক্তি দিয়া সে নিজেকে নষ্ট করে, সে পেটুকের মতো আহারের দ্বারাই আপনাকে সংহার করে. এমনতরো আত্মঘাতকগুলো পয়মাল হইয়া বাকি যারা থাকে তাদের লইয়াই সমাজ। বিলাতে সেই সমাজে সাধারণের দায় বহন করে, আমাদের দেশে পরিবারের দায়।

এদিকে নূতন শিক্ষায় আমাদের মনের মধ্যে এমন একটা কর্তব্যবুদ্ধি জাগিয়া উঠিতেছে যেটা একালের জিনিস। লোকহিতের ক্ষেত্র আমাদের মনের কাছে আজ দূরব্যাপী—দেশবোধ বলিয়া একটা বড়ো রকমের বোধ আমাদের মনে জাগিয়াছে। কাজেই বন্যা কিংবা দুর্ভিক্ষে লোকসাধারণ যখন আমাদের দ্বারে আসিয়া দাঁড়ায় তখন খালিহাতে তাকে বিদায় করা আমাদের পক্ষে কঠিন। কিন্তু কুল রাখাই আমাদের বরাবরের অভ্যাস, শ্যাম রাখিতে গেলে বাধে। নিজের সংসারের জন্য টাকা আনা, টাকা জমানো, টাকা খরচ করা আমাদের মজ্জাগত; সেটাকে বজায় রাখিয়া বাহিরের বড়ো দাবিকে মানা দুঃসাধ্য। মোমবাতির দুই মুখেই শিখা জ্বালানো চলে না। বাছুর যে গাভীর দুধ পেট ভরিয়া খাইয়া বসে সে গাভী গোয়ালার ভাঁড় ভরতি করিতে পারে না;—বিশেষত তার চরিয়া খাবার মাঠ যদি প্রায় লোপ পাইয়া থাকে।

পূর্বেই বলিয়াছি, আমাদের আর্থিক অবস্থার চেয়ে আমাদের ঐশ্বর্যের দৃষ্টান্ত বড়ো হইয়াছে। তার ফল হইয়াছে জীবনযাত্রাটা আমাদের পক্ষে প্রায় মরণযাত্রা হইয়া উঠিয়াছে। নিজের সম্বন্ধে ভদ্রতারক্ষা করিবার শক্তি অল্পলোকের আছে, অনেকে

ভিক্ষা করে, অনেকে ধার করে, হাতে কিছু জমাইতে পারে এমন হাত তো প্রায় দেখি না। এই জন্য এখনকার কালের ভোগের আদর্শ আমাদের পক্ষে দুঃখভোগের আদর্শ।

ঠিক এই কারণেই নূতনকালের ত্যাগের আদর্শটা আমাদের শক্তিকে বহুদূরে ছাড়াইয়া গেছে। কেননা, আমাদের ব্যবস্থাটা পারিবারিক, আমাদের আদর্শটা সার্বজনীন। ক্রমাগতই ধার করিয়া ভিক্ষা করিয়া এই আদর্শটাকে ঠেলাঠেলি করিয়া চালাইবার চেষ্টা চলিতেছে। যেটাকে আদর্শ বলিয়া গণ্য করিয়াছি সেটাকে ভালো করিয়া পালন করিতে অক্ষম হওয়াই চারিত্রনৈতিক হিসাবে দেউলে হওয়া। তাই, ভোগের দিক দিয়া যেমন আমাদের দেউলে অবস্থা ত্যাগের দিক দিয়াও তাই। এই জন্যই চাঁদা তুলিতে, বড়োলোকের স্মৃতি রক্ষা করিতে, বড়ো ব্যবসা খুলিতে, লোকহিতকর প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিতে গিয়া নিজেকে ধিক্‌কার দিতেছি ও বাহিরের লোকের কাছে নিন্দা সহিতেছি।

আমাদের জন্মভূমি সুজলা সুফলা, চাষ করিয়া ফসল পাইতে কষ্ট নাই। এই জন্যই এমন এক সময় ছিল, যখন কৃষিমূলক সমাজে পরিবারবৃদ্ধিকে লোকবলবৃদ্ধি বলিয়া গণ্য করিত। কিন্তু এমনতরো বৃহৎ পরিবারকে একত্র করিতে হইলে তাহার বিধিবিধানের বাঁধন পাকা হওয়া চাই, এবং কর্তাকে নির্বিচারে না মানিয়া চলিলে চলে না। এই কারণে এমন সমাজে জন্মিবামাত্র বাঁধা নিয়মে জড়িত হইতে হয়। দানধ্যান পুণ্যকর্ম প্রভৃতি সমস্তই নিয়মে বদ্ধ; যারা ঘনিষ্ঠভাবে একত্র থাকিবে তাদের মধ্যে যাতে কর্তব্যের আদর্শের বিরোধ না ঘটে, অর্থাৎ নিজে চিন্তা না করিয়া যাতে একজন ঠিক অন্যজনের মতোই চোখ বুজিয়া চলিতে পারে সেই ভাবের যত বিধিবিধান।

প্রকৃতির প্রশ্রয় যেখানে কম, যেখানে মানুষের প্রয়োজন বেশি অথচ ধরণীর দাক্ষিণ্য বেশি নয় সেখানে বৃহৎ পরিবার মানুষের বলবৃদ্ধি করে না, ভারবৃদ্ধিই করে। চাষের উপলক্ষ্যে মানুষকে যেখানে এক জায়গায় স্থির হইয়া বসিতে হয় সেইখানেই মানুষের ঘনিষ্ঠতার সম্বন্ধ চারিদিকে অনেক ডালপালা ছড়াইবার জায়গা এবং সময় পায়। যারা লুঠপাট করে, পশু চরাইয়া বেড়ায়, দূর-দেশ হইতে অন্ন সংগ্রহ করে তারা যতটা পারে ভারমুক্ত হইয়া থাকে। তারা বাঁধা-নিয়মের মধ্যে আটকা পড়ে না; তারা নূতন নূতন দুঃসাহসিকতার মধ্যে ছুটিয়া গিয়া নূতন নূতন কাজের নিয়ম আপন বুদ্ধিতে উদ্ভাবিত করে। এই চিরকালের অভ্যাস ইঁহাদের রক্তমজ্জার মধ্যে আছে বলিয়াই সমাজ-বন্ধনের মধ্যেও ব্যক্তির স্বাধীনতা যত কম খর্ব হয় ইঁহারা কেবলই তার চেষ্টা করিতে থাকে। রাজা থাক কিন্তু কিসে রাজার ভার না থাকে এই ইঁহাদের সাধনা, ধন আছে

কিন্তু কিসে তাহা দরিদ্রের বুকের উপর চাপিয়া না বসে এই তপস্যায় তারা আজও নিবৃত্ত হয় নাই।

এমনি করিয়া ব্যক্তি যেখানে মুক্ত সেখানে তার আয়ও মুক্ত, তার ব্যয়ও মুক্ত। সেখানে যদি কোনো জাতি দেশহিত বা লোকহিত ব্রত গ্রহণ করে তবে তার বাধা নাই। সেখানে সমস্ত মানুষ আপনাদের ইতিহাসকে আপনাদের শক্তিতেই গড়িয়া তুলিতেছে, বাহিরের ঠেলা বা বিধাতার মারকে তারা শিরোধার্য করিয়া লইতেছে না। পুঁথি তাহাদের বুদ্ধিকে চাপা দিবার যত চেষ্টা করে তারা ততই তাহা কাটিয়া বাহির হইতে চায়। জ্ঞান ধর্ম ও শক্তিকে কেবলই স্বাধীন অর্থাৎ বিশ্বব্যাপী করিবার প্রয়াসই তাদের ইতিহাস।

আর পরিবারতন্ত্র জাতির ইতিহাস বাঁধনের পর বাঁধনকে স্বীকার করিয়া লওয়া। যতবারই মুক্তির লক্ষণ দেখা দেয় ততবারই নূতন শৃঙ্খলকে সৃষ্টি করা বা পুরাতন শৃঙ্খলকে আঁটিয়া দেওয়াই তার জাতীয় সাধনা। আজ পর্যন্ত ইতিহাসের সেই প্রক্রিয়া চলিতেছে। নীতিধর্মকর্ম সম্বন্ধে আমরা আমাদের কৃত্রিম ও সংকীর্ণ বাঁধন কাটিবার জন্য যেই একবার করিয়া সচেতন হইয়া উঠি অমনি আমাদের অভিভাবক আমাদের বাপ-দাদার আফিমের কৌটা হইতে আফিমের বড়ি বাহির করিয়া আমাদের খাওয়াইয়া দেয়, তার পরে আবার সনাতন স্বপ্নের পালা।

যাই হ'ক, ঘরের মধ্যে বাঁধনকে আমরা মানি। সেই পবিত্র বাঁধন-দেবতার পূজা যথাসর্বস্ব দিয়া জোগাইয়া থাকি এবং তার কাছে কেবলই নরবলি দিয়া আসিতেছি। এমন অবস্থায় দেশহিত সম্বন্ধে আমাদের কৃপণতাকে পশ্চিম দেশের আদর্শ অনুসারে বিচার করিবার সময় আসে নাই। সর্বদেশের সঙ্গে অবাধ যোগবশত দেশে একটা আর্থিক পরিবর্তন ঘটিতেছে এবং সেই যোগবশতই আমাদের আইডিয়ালেরও পরিবর্তন ঘটিতেছে। যতদিন পর্যন্ত এই পরিবর্তন পরিণতি লাভ করিয়া সমস্ত সমাজকে আপন মাপে গড়িয়া না লয় ততদিন দোটানায় পড়িয়া পদে পদে আমাদিগকে নানা ব্যর্থতা ভোগ করিতে হইবে। ততদিন এমন কথা প্রায়ই শুনিতে হইবে, আমরা মুখে বলি এক, কাজে করি আর, আমাদের যতকিছু ত্যাগ সে কেবল বক্তৃতায় বচনত্যাগ। কিন্তু আমরা যে স্বভাবতই ত্যাগে কৃপণ এত বড়ো কলঙ্ক আমাদের প্রতি আরোপ করিবার বেলায় এই কথাটা ভাবিয়া দেখা উচিত যে, পরিবারের প্রতি দায়িত্ব রক্ষা করিতে গিয়া এই বৃহৎ দেশের প্রায় প্রত্যেক লোক প্রায় প্রত্যহ যে দুঃসহ ত্যাগ স্বীকার করিতেছে জগতে কোথাও তার তুলনা নাই।

নূতন আদর্শ লইয়া আমরা যে কী পর্যন্ত টানাটানিতে পড়িয়াছি তার একটা প্রমাণ

এই যে, আমাদের দেশের একদল শিক্ষক আমাদের সন্ন্যাসী হইতে বলিতেছেন। গৃহের বন্ধন আমাদের সমস্ত বুদ্ধিকে ও শক্তিকে এমন করিয়া পরাহত করিয়া রাখে যে, হিতব্রত সত্যভাবে গ্রহণ করিতে হইলে সে বন্ধন একেবারে ছেদন করিতে হইবে এ কথা না বলিয়া উপায় নাই। বর্তমান কালের আদর্শ আমাদের যে-সব যুবকদের মনে আগুন জ্বালাইয়া দিয়াছে তারা দেখিতে পাই সেই আগুনে স্বভাবতই আপন পারিবারিক দায়িত্ববন্ধন জ্বালাইয়া দিয়াছে।

এমন করিয়া যারা মুক্ত হইল তারা দেশের দুঃখ দারিদ্র্য মোচন করিতে চলিয়াছে কোন্ পথে? তারা দুঃখের সমুদ্রকে ব্লটিং কাগজ দিয়া শুষিয়া লইবার কাজে লাগিয়াছে বলিয়া মনে হয়। আজকাল "সেবা" কথাটাকে খুব বড়ো অক্ষরে লিখিতেছি ও সেবকের তকমাটাকে খুব উজ্জ্বল করিয়া গিলটি করিলাম।

কিন্তু ফুটা কলস ক্রমাগতই কত ভরতি করিব? কেবলমাত্র সেবা করিয়া চাঁদা দিয়া দেশের দুঃখ দূর হইবে কেমন করিয়া? দেশে বর্তমান দারিদ্র্যের মূল কোথায়, কোথায় এমন ছিদ্র যেখান দিয়া সমস্ত সঞ্চয় গলিয়া পড়িতেছে, আমাদের রক্তের মধ্যে কোথায় সেই নিরুদ্যমের বিষ যাতে আমরা কোনোমতেই আপনাকে বাঁচাইয়া তুলিতে উৎসাহ পাই না সেটা ভাবিয়া দেখা এবং সেইখানে প্রতিকার-চেষ্টা আমাদের প্রধান কাজ।

অনেকে মনে করেন দারিদ্র্য জিনিসটা কোনো একটা ব্যবস্থার দোষে বা অভাবে ঘটে। কেহ বলেন যৌথ কারবার চলিলে দেশে টাকা আপনিই গড়াইয়া আসিবে, কেহ বলেন ব্যবসায়ে সমবায়-প্রণালীই দেশে দুঃখ-নিবারণের একমাত্র উপায়। যেন এই রকমের কোনো-না-কোনো একটা প্যাঁচা আছে যা লক্ষ্মীকে আপনিই উড়াইয়া আনে।

য়ুরোপে আমাদের নজির আছে। সেখানে ধনী কেমন করিয়া ধনী হইল, নির্ধন কেমন করিয়া নির্ধনতার সঙ্গে দল বাঁধিয়া লড়াই করিতেছে সে আমরা জানি। সেই উপায়গুলিই যে আমাদেরও উপায় এই কথাটা সহজেই মনে আসে।

কিন্তু আসল কথাটাই আমরা ভুলি। ঐশ্বর্য বা দারিদ্র্যের মূলটা উপায়ের মধ্যে নয়, আমাদের মানসপ্রকৃতির মধ্যে। হাতটা যদি তৈরি হয় তবে হাতিয়ারটা জোগানো শক্ত হয় না। যারা একটা বিশেষ উদ্দেশ্যকে মনের মধ্যে চিন্তা করিয়া মিলিতে পারে তারা স্বভাবতই বাণিজ্যেও মেলে অন্য সমস্ত প্রয়োজনের কাজেও মেলে। যারা কেবলমাত্র প্রথার বন্ধনে তাল পাকাইয়া মিলিয়া থাকে, যাহাদিগকে মিলনের প্রণালী নিজেকে উদ্ভাবন করিতে হয় না, কতকগুলো নিয়মকে চোখ বুজিয়া মানিয়া যাইতে হয় তারা কোনোদিন কোনো অভিপ্রায় মনে লইয়া নিজের সাধনায় মিলিতে পারে না। যেখানে

তাদের বাপদাদার শাসন নাই সেখানে তারা কেবলই ভুল করে, অন্যায় করে, বিবাদ করে,—সেখানে তাদের ঈর্ষা, তাদের লোভ, তাদের অবিবেচনা। তাদের নিষ্ঠা পিতামহের প্রতি; উদ্দেশ্যের প্রতি নয়। কেননা চিরদিন যারা মুক্ত তারা উদ্দেশ্যকে মানে, যারা মুক্ত নয় তারা অভ্যাসকে মানে।

এই কারণেই পরিবারের বাহিরে কোনো বড়ো রকমের যোগ আমাদের প্রকৃতির ভিতর দিয়া আজও সম্পূর্ণ সত্য হইয়া ওঠে নাই। অথচ এই পারিবারিক যোগটুকুর উপর ভর দিয়া আজিকার দিনের পৃথিবীতে আমাদের প্রাণরক্ষা বা মানরক্ষা প্রায় অসম্ভব। আমরা নদীতে গ্রামের ঘাটে ঘাটে যে নৌকা বাহিয়া এতদিন আরামে কাটাইয়া দিলাম, এখন সেই নৌকা সমুদ্রে আসিয়া পড়িল। আজ এই নৌকাটাই আমাদের পরম বিপদ।

নৌকাটা যেখানে ঢেউয়ের ঘায়ে সর্বদাই টলমল করিতেছে সেখানে আমাদের স্বভাবের ভীরুতা ঘুচিবে কেমন করিয়া? প্রতি কথায় প্রতি হাওয়ায় যে আমাদের বুক দুরদুর করিয়া ওঠে। আমরা নূতন নূতন্ পথে নূতন নূতন পরীক্ষায় চলিব কোন্ ভরসায়?

সকলের চেয়ে সর্বনাশ এই যে, এই বহুযুগসঞ্চিত ভীরুতা আমাদিগকে মুক্তভাবে চিন্তা করিতে দিতেছে না। এই কথাই বলিতেছে তোমাদের বাপদাদা চিন্তা করেন নাই, মানিয়া চলিয়াছেন, দোহাই তোমাদের, তোমরাও চিন্তা করিয়ো না, মানিয়া চলো।

তারপরে সেই মানিয়া চলিতে চলিতে দুঃখে দারিদ্র্যে অজ্ঞানে অস্বাস্থ্যে যখন ঘর বোঝাই হইয়া উঠিল তখন সেবাধর্মই প্রচার কর আর চাঁদার খাতাই বাহির কর মরণ হইতে কেহ বাঁচাইতে পারিবে না।

১৩২২

আষাঢ়

ঋতুতে ঋতুতে যে ভেদ সে কেবল বর্ণের ভেদ নহে, বৃত্তিরও ভেদ বটে। মাঝে মাঝে বর্ণসংকর দেখা দেয়—জ্যৈষ্ঠের পিঙ্গল জটা শ্রাবণের মেঘস্তূপে নীল হইয়া উঠে, ফাল্গুনের শ্যামলতায় বৃদ্ধ পৌষ আপনার পীত রেখা পুনরায় চালাইবার চেষ্টা করে। কিন্তু প্রকৃতির ধর্মরাজ্যে এ সমস্ত বিপর্যয় টেঁকে না।

গ্রীষ্মকে ব্রাহ্মণ বলা যাইতে পারে। সমস্ত রসবাহুল্য দমন করিয়া, জঞ্জাল মারিয়া তপস্যার আগুন জ্বালিয়া সে নিবৃত্তিমার্গের মন্ত্রসাধন করে। সাবিত্রী-মন্ত্র জপ করিতে

করিতে কখনো বা সে নিশ্বাস ধারণ করিয়া রাখে, তখন গুমটে গাছের পাতা নড়ে না; আবার যখন সে রুদ্ধ নিশ্বাস ছাড়িয়া দেয় তখন পৃথিবী কাঁপিয়া উঠে। ইহার আহারের আয়োজনটা প্রধানত ফলাহার।

বর্ষাকে ক্ষত্রিয় বলিলে দোষ হয় না। তাহার নকিব আগে আগে গুরুগুরু শব্দে দামামা বাজাইতে বাজাইতে আসে,—মেঘের পাগড়ি পরিয়া পশ্চাতে সে নিজে আসিয়া দেখা দেয়। অল্পে তাহার সন্তোষ নাই। দিগ্বিজয় করাই তাহার কাজ। লড়াই করিয়া সমস্ত আকাশটা দখল করিয়া সে দিক্‌চক্রবর্তী হইয়া বসে। তমালতালী-বনরাজির নীলতম প্রান্ত হইতে তাহার রথের ঘর্ঘরধ্বনি শোনা যায়, তাহার বাঁকা তলোয়ারখানা ক্ষণে ক্ষণে কোষ হইতে বাহির হইয়া দিগ্‌বক্ষ বিদীর্ণ করিতে থাকে, আর তাহার তূণ হইতে বরুণ-বাণ আর নিঃশেষ হইতে চায় না। এদিকে তাহার পাদপীঠের উপর সবুজ কিংখাবের আস্তরণ বিছানো, মাথার উপরে ঘনপল্লবশ্যামল চন্দ্রাতপে সোনার কদম্বের ঝালর ঝুলিতেছে, আর বন্দিনী পূর্বদিগ্বধূ পাশে দাঁড়াইয়া অশ্রুনয়নে তাহাকে কেতকীগন্ধবারিসিক্ত পাখা বীজন করিবার সময় আপন বিদ্যুন্মণিজড়িত কঙ্কণখানি ঝলকিয়া তুলিতেছে।

আর শীতটা বৈশ্য। তাহার পাকা ধান কাটাই-মাড়াইয়ের আয়োজনে চারিটি প্রহর ব্যস্ত, কলাই যব ছোলার প্রচুর আশ্বাসে ধরণীর ডালা পরিপূর্ণ। প্রাঙ্গণে গোলা ভরিয়া উঠিয়াছে, গোষ্ঠে গোরুর পাল রোমন্থ করিতেছে, ঘাটে ঘাটে নৌকা বোঝাই হইল, পথে পথে ভারে মন্থর হইয়া গাড়ি চলিয়াছে; আর ঘরে ঘরে নবান্ন এবং পিঠাপার্বণের উদ্‌যোগে ঢেঁকিশালা মুখরিত।

এই তিনটেই প্রধান বর্ণ। আর শূদ্র যদি বল সে শরৎ ও বসন্ত। একজন শীতের, আর একজন গ্রীষ্মের তলপি বহিয়া আনে। মানুষের সঙ্গে এইখানে প্রকৃতির তফাত। প্রকৃতির ব্যবস্থায় যেখানে সেবা সেখানেই সৌন্দর্য, যেখানে নম্রতা সেইখানেই গৌরব। তাহার সভায় শূদ্র যে, সে ক্ষুদ্র নহে, ভার যে বহন করে সমস্ত আভরণ তাহারই। তাই তো শরতের নীল পাগড়ির উপরে সোনার কলকা বসন্তের সুগন্ধ পীত উত্তরীয়খানি ফুলকাটা। ইহারা যে-পাদুকা পরিয়া ধরণী-পথে বিচরণ করে তাহা রং-বেরঙের সূত্রশিল্পে বুটিদার; ইহাদের অঙ্গদে কুণ্ডলে অঙ্গুরীয়ে জহরতের সীমা নাই।

এই তো পাঁচটার হিসাব পাওয়া গেল। লোকে কিন্তু ছয়টা ঋতুর কথাই বলিয়া থাকে। ওটা নেহাত জোড় মিলাইবার জন্য। তাহারা জানে না বেজোড় লইয়াই প্রকৃতির যত বাহার। ৩৬৫ দিনকে দুই দিয়া ভাগ করো—৩৬ পর্যন্ত বেশ মেলে কিন্তু

সব-শেষের ওই ছোট্টো পাঁচ-টি কিছুতেই বাগ মানিতে চায় না। দুইয়ে দুইয়ে মিল হইয়া গেলে সে মিল থামিয়া যায়, অলস হইয়া পড়ে। এই জন্য কোথা হইতে একটা তিন আসিয়া সেটাকে নাড়া দিয়া তাহার যত রকম সংগীত সমস্তটা বাজাইয়া তোলে। বিশ্বসভায় অমিল-শয়তানটা এই কাজ করিবার জন্যই আছে,—সে মিলের স্বর্গপুরীকে কোনোমতেই ঘুমাইয়া পড়িতে দিবে না ;—সেই তো নৃত্যপরা উর্বশীর নূপুরে ক্ষণে ক্ষণে তাল কাটাইয়া দেয় সেই বেতালটি সামলাইবার সময়েই সুরসভায় তালের রস উৎস উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে।

ছয় ঋতু গণনার একটা কারণ আছে। বৈশ্যকে তিন বর্ণের মধ্যে সব নীচে ফেলিলেও উহারই পরিমাণ বেশি। সমাজের নীচের বড়ো ভিত্তি ওই বৈশ্য। একদিক দিয়া দেখিতে গেলে সংবৎসরের প্রধান বিভাগ শরৎ হইতে শীত। বৎসরের পূর্ণ পরিণতি ওইখানে। ফসলের গোপন আয়োজন সকল-ঋতুতেই কিন্তু ফসলের প্রকাশ হয় ওই সময়েই। এই জন্য বৎসরের এই ভাগটাকে মানুষ বিস্তারিত করিয়া দেখে। এই অংশেই বাল্য যৌবন বার্ধক্যের তিন মূর্তিতে বৎসরের সফলতা মানুষের কাছে প্রত্যক্ষ হয়। শরতে তাহা চোখ জুড়াইয়া নবীন বেশে দেখা দেয়, হেমন্তে তাহা মাঠ ভরিয়া প্রবীণ শোভায় পাকে, আর শীতে তাহা ঘর ভরিয়া পরিণত রূপে সঞ্চিত হয়।

শরৎ হেমন্ত-শীতকে মানুষ এক বলিয়া ধরিতে পারিত কিন্তু আপনার লাভটাকে সে থাকে-থাকে ভাগ করিয়া দেখিতে ভালোবাসে। তাহার স্পৃহনীয় জিনিস একটি হইলেও সেটাকে অনেকখানি করিয়া নাড়াচাড়া করাতেই সুখ। একখানা নোটে কেবলমাত্র সুবিধা, কিন্তু সারিবন্দি তোড়ায় যথার্থ মনের তৃপ্তি। এই জন্য ঋতুর যে অংশে তাহার লাভ সেই অংশে মানুষ ভাগ বাড়াইয়াছে। শরৎ-হেমন্ত-শীতে মানুষের ফসলের ভাণ্ডার, সেইজন্য সেখানে তাহার তিন মহল ; ওইখানে তাহার গৃহলক্ষ্মী। আর যেখানে আছেন বনলক্ষ্মী সেখানে দুই মহল,—বসন্ত ও গ্রীষ্ম। ওইখানে তাহার ফলের ভাণ্ডার, বনভোজনের ব্যবস্থা। ফাল্গুনে বোল ধরিল, জ্যৈষ্ঠে তাহা পাকিয়া উঠিল। বসন্তে ঘ্রাণ গ্রহণ, আর গ্রীষ্মে স্বাদ গ্রহণ।

ঋতুর মধ্যে বর্ষাই কেবল একা একমাত্র। তাহার জুড়ি নাই। গ্রীষ্মের সঙ্গে তাহার মিল হয় না ;—গ্রীষ্ম দরিদ্র, সে ধনী। শরতের সঙ্গেও তাহার মিল হইবার কোনো সম্ভাবনা নাই। কেননা শরৎ তাহারই সমস্ত সম্পত্তি নিলাম করাইয়া নিজের নদীনালা মাঠঘাটে বেনামি করিয়া রাখিয়াছে। যে ঋণী সে কৃতজ্ঞ নহে।

মানুষ বর্ষাকে খণ্ড করিয়া দেখে নাই ; কেননা বর্ষা-ঋতুটা মানুষের সংসারব্যবস্থার

সঙ্গে কোনোদিক দিয়া জড়াইয়া পড়ে নাই। তাহার দাক্ষিণ্যের উপর সমস্ত বছরের ফল-ফসল নির্ভর করে কিন্তু সে ধনী তেমন নয় যে নিজের দানের কথাটা রটনা করিয়া দিবে। শরতের মতো মাঠে ঘাটে পত্রে পত্রে সে আপনার বদান্যতা ঘোষণা করে না। প্রত্যক্ষভাবে দেনা-পাওনার সম্পর্ক নাই বলিয়া মানুষ ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া বর্ষার সঙ্গে ব্যবহার করিয়া থাকে। বস্তুত বর্ষার যা-কিছু প্রধান ফল তাহা গ্রীষ্মেরই ফলাহার ভাণ্ডারের উদ্‌বৃত্ত।

এই জন্য বর্ষা-ঋতুটা বিশেষভাবে কবির ঋতু। কেননা কবি গীতার উপদেশকে ছাড়াইয়া গেছে। তাহার কর্মেও অধিকার নাই; ফলেও অধিকার নাই। তাহার কেবলমাত্র অধিকার ছুটিতে;—কর্ম হইতে ছুটি, ফল হইতে ছুটি।

বর্ষা ঋতুটাতে ফলের চেষ্টা অল্প এবং বর্ষার সমস্ত ব্যবস্থা কর্মের প্রতিকূল। এই জন্য বর্ষায় হৃদয়টা ছাড়া পায়। ব্যাকরণে হৃদয় যে লিঙ্গই হউক, আমাদের প্রকৃতির মধ্যে সে যে স্ত্রীজাতীয় তাহাতে সন্দেহ নাই। এই জন্য কাজ-কর্মের আপিসে বা লাভ লোকসানের বাজারে সে আপনার পালকির বাহির হইতে পারে না। সেখানে সে পর্দা-নশিন।

বাবুরা যখন পূজার ছুটিতে আপনাদের কাজের সংসার হইতে দূরে পশ্চিমে হাওয়া খাইতে যান, তখন ঘরের বধূর পর্দা উঠিয়া যায়। বর্ষায় আমাদের হৃদয়-বধূর পর্দা থাকে না। বাদলার কর্মহীন বেলায় সে যে কোথায় বাহির হইয়া পড়ে তাহাকে ধরিয়া রাখা দায় হয়। একদিন পয়লা আষাঢ়ে উজ্জয়িনীর কবি তাহাকে রামগিরি হইতে অলকায়, মর্ত্য হইতে কৈলাস পর্যন্ত অনুসরণ করিয়াছেন।

বর্ষায় হৃদয়ের বাধা-ব্যবধান চলিয়া যায় বলিয়াই সে সময়টা বিরহী বিরহিণীর পক্ষে বড়ো সহজ সময় নয়। তখন হৃদয় আপনার সমস্ত বেদনার দাবি লইয়া সম্মুখে আসে। এদিক ওদিকে আপিসের পেয়াদা থাকিলে সে অনেকটা চুপ করিয়া থাকে কিন্তু এখন তাহাকে থামাইয়া রাখে কে?

বিশ্বব্যাপারে মস্ত একটা ডিপার্টমেন্ট আছে, সেটা বিনা কাজের। সেটা পাব্লিক ওআর্কস ডিপার্টমেন্টের বিপরীত। সেখানে যে-সমস্ত কাণ্ড ঘটে সে একেবারে বেহিসাবি। সরকারি হিসাবপরিদর্শক হতাশ হইয়া সেখানকার খাতাপত্র পরীক্ষা একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছে। মনে করো, খামখা এত বড়ো আকাশটার আগাগোড়া নীল তুলি বুলাইবার কোনো দরকার ছিল না—এই শব্দহীন শূন্যটাকে বর্ণহীন করিয়া রাখিলে সে তো কোনো নালিশ চালাইত না। তাহার পরে, অরণ্যে প্রান্তরে লক্ষ লক্ষ ফুল একবেলা ফুটিয়া আর-একবেলা ঝরিয়া যাইতেছে, তাহাদের বোঁটা হইতে পাতার ডগা

পর্যন্ত এত যে কারিগরি সেই অজস্র অপব্যয়ের জন্য কাহারও কাছে কি কোনো জবাবদিহি নাই? আমাদের শক্তির পক্ষে এ সমস্তই ছেলেখেলা, কোনো ব্যবহারে লাগে না; আমাদের বুদ্ধির পক্ষে এ সমস্তই মায়া, ইহার মধ্যে কোনো বাস্তবতা নাই।

আশ্চর্য এই যে, এই নিষ্প্রয়োজনের জায়গাটাই হৃদয়ের জায়গা। এই জন্য ফলের চেয়ে ফুলেই তাহার তৃপ্তি। ফল কিছু কম সুন্দর নয়, কিন্তু ফলের প্রয়োজনীয়তাটা এমন একটা জিনিস যাহা লোভীর ভিড় জমায়; বুদ্ধি-বিবেচনা আসিয়া সেটা দাবি করে; সেই জন্য ঘোমটা টানিয়া হৃদয়কে সেখান হইতে একটু সরিয়া দাঁড়াইতে হয়। তাই দেখা যায় তাম্রবর্ণ পাকা আমের ভারে গাছের ডালগুলি নত হইয়া পড়িলে বিরহিণীর রসনায় যে রসের উত্তেজনা উপস্থিত হয় সেটা গীতিকাব্যের বিষয় নহে। সেটা অত্যন্ত বাস্তব, সেটার মধ্যে যে প্রয়োজন আছে তাহা টাকা-আনা-পাইয়ের মধ্যে বাঁধা যাইতে পারে।

বর্ষা-ঋতু নিষ্প্রয়োজনের ঋতু। অর্থাৎ তাহার সংগীতে তাহার সমারোহে, তাহার অন্ধকারে তাহার দীপ্তিতে, তাহার চাঞ্চল্যে তাহার গাম্ভীর্যে তাহার সমস্ত প্রয়োজন কোথায় ঢাকা পড়িয়া গেছে। এই ঋতু ছুটির ঋতু। তাই ভারতবর্ষে বর্ষায় ছিল ছুটি—কেননা ভারতবর্ষে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের একটা বোঝাপড়া ছিল। ঋতুগুলি তাহার দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া দর্শন না পাইয়া ফিরিত না। তাহার হৃদয়ের মধ্যে ঋতুর অভ্যর্থনা চলিত।

ভারতবর্ষের প্রত্যেক ঋতুরই একটা না একটা উৎসব আছে। কিন্তু কোন্ ঋতু যে নিতান্ত বিনা-কারণে তাহার হৃদয় অধিকার করিয়াছে তাহা যদি দেখিতে চাও তবে সংগীতের মধ্যে সন্ধান করো। কেননা সংগীতেই হৃদয়ের ভিতরকার কথাটা ফাঁস হইয়া পড়ে।

বলিতে গেলে ঋতুর রাগরাগিণী কেবল বর্ষার আছে আর বসন্তের। সংগীত-শাস্ত্রের মধ্যে সকল ঋতুরই জন্য কিছু কিছু সুরের বরাদ্দ থাকা সম্ভব—কিন্তু সেটা কেবল শাস্ত্রগত। ব্যবহারে দেখিতে পাই বসন্তের জন্য আছে বসন্ত আর বাহার—আর বর্ষার জন্য মেঘ, মল্লার, দেশ, এবং আরও বিস্তর। সংগীতের পাড়ায় ভোট লইলে বর্ষারই হয় জিত।

শরতে হেমন্তে ভরা-মাঠ ভরা-নদীতে মন নাচিয়া ওঠে; তখন উৎসবেরও অন্ত নাই, কিন্তু রাগিণীতে তাহার প্রকাশ রহিল না কেন? তাহার প্রধান কারণ, ওই ঋতুতে বাস্তব ব্যস্ত হইয়া আসিয়া মাঠঘাট জুড়িয়া বসে। বাস্তবের সভায় সংগীত মুজরা দিতে আসে না—যেখানে অখণ্ড অবকাশ সেখানেই সে সেলাম করিয়া বসিয়া যায়।

যাহারা বস্তুর কারবার করিয়া থাকে তাহারা যেটাকে অবস্তু ও শূন্য বলিয়া মনে করে সেটা কম জিনিস নয়। লোকালয়ের হাটে ভূমি বিক্রি হয়, আকাশ বিক্রি হয় না। কিন্তু পৃথিবীর বস্তু-পিণ্ডকে ঘেরিয়া যে বায়ুমণ্ডল আছে, জ্যোতির্লোক হইতে আলোকের দূত সেই পথ দিয়াই আনাগোনা করে। পৃথিবীর সমস্ত লাবণ্য ওই বায়ু-মণ্ডলে। ওইখানেই তাহার জীবন। ভূমি ধ্রুব, তাহা ভারি, তাহার একটা হিসাব পাওয়া যায়। কিন্তু বায়ুমণ্ডলে যে কত পাগলামি তাহা বিজ্ঞ লোকের অগোচর নাই। তাহার মেজাজ কে বোঝে? পৃথিবীর সমস্ত প্রয়োজন ধূলির উপরে, কিন্তু পৃথিবীর সমস্ত সংগীত ওই শূন্যে,—যেখানে তাহার অপরিচ্ছিন্ন অবকাশ।

মানুষের চিত্তের চারিদিকেও একটি বিশাল আকাশের বায়ু-মণ্ডল আছে। সেইখানেই তাহার নানারঙের খেয়াল ভাসিতেছে; সেইখানেই অনন্ত তাহার হাতে আলোকের রাখি বাঁধিতে আসে; সেইখানেই ঝড়বৃষ্টি, সেইখানেই উনপঞ্চাশ বায়ুর উন্মত্ততা, সেখানকার কোনো হিসাব পাওয়া যায় না। মানুষের যে অতিচৈতন্যলোকে অভাবনীয়ের লীলা চলিতেছে সেখানে যে-সব অকেজো লোক আনাগোনা রাখিতে চায়—তাহারা মাটিকে মান্য করে বটে কিন্তু বিপুল অবকাশের মধ্যেই তাহাদের বিহার। সেখানকার ভাষাই সংগীত। এই সংগীতে বাস্তবলোকে বিশেষ কী কাজ হয় জানি না—কিন্তু ইহারই কম্পমান পক্ষের আঘাত-বেগে অতিচৈতন্যলোকের সিংহদ্বার খুলিয়া যায়।

মানুষের ভাষার দিকে একবার তাকাও। ওই ভাষাতে মানুষের প্রকাশ; সেই জন্যে উহার মধ্যে এত রহস্য। শব্দের বস্তুটা হইতেছে তাহার অর্থ। মানুষ যদি কেবলমাত্র হইত বাস্তব, তবে তাহার ভাষার শব্দে নিছক অর্থ ছাড়া আর কিছুই থাকিত না। তবে তাহার শব্দ কেবলমাত্র খবর দিত,—সুর দিত না। কিন্তু বিস্তর শব্দ আছে যাহার অর্থপিণ্ডের চারিদিকে আকাশের অবকাশ আছে, একটা বায়ু-মণ্ডল আছে। তাহারা যেটুকু জানায় তাহারা তাহার চেয়ে অনেক বেশি—তাহাদের ইশারা তাহাদের বাণীর চেয়ে বড়ো। ইহাদের পরিচয় তদ্ধিত প্রত্যয়ে নহে, চিত্তপ্রত্যয়ে। এই সমস্ত অবকাশওয়ালা কথা লইয়া অবকাশ-বিহারী কবিদের কারবার। এই অবকাশের বায়ু-মণ্ডলেই নানা রঙিন আলোর রং ফলাইবার সুযোগ—এই ফাঁকটাতেই ছন্দগুলি নানা ভঙ্গিতে হিল্লোলিত হয়।

এই সমস্ত অবকাশবহুল রঙিন শব্দ যদি না থাকিত তবে বুদ্ধির কোনো ক্ষতি হইত না কিন্তু হৃদয় যে বিনা প্রকাশে বুক ফাটিয়া মরিত। অনির্বচনীয়কে লইয়া তাহার প্রধান কারবার; এই জন্য অর্থে তাহার অতি সামান্য প্রয়োজন। বুদ্ধির দরকার

গতিতে, কিন্তু হৃদয়ের দরকার নৃত্যে। গতির লক্ষ্য—একাগ্র হইয়া লাভ করা, নৃত্যের লক্ষ্য—বিচিত্র হইয়া প্রকাশ করা। ভিড়ের মধ্যে ভিড়িয়াও চলা যায় কিন্তু ভিড়ের মধ্যে নৃত্য করা যায় না। নৃত্যের চারিদিকে অবকাশ চাই। এই জন্য হৃদয় অবকাশ দাবি করে। বুদ্ধিমান তাহার সেই দাবিটাকে অবাস্তব এবং তুচ্ছ বলিয়া উড়াইয়া দেয়।

আমি বৈজ্ঞানিক নহি কিন্তু অনেকদিন ছন্দ লইয়া ব্যবহার করিয়াছি বলিয়া ছন্দের তত্ত্বটা কিছু বুঝি বলিয়া মনে হয়। আমি জানি ছন্দের যে অংশটাকে যতি বলে অর্থাৎ যেটা ফাঁকা, অর্থাৎ ছন্দের বস্তুঅংশ যেখানে নাই সেইখানেই ছন্দের প্রাণ—পৃথিবীর প্রাণটা যেমন মাটিতে নহে, তাহার বাতাসেই। ইংরেজিতে যতিকে বলে pause—কিন্তু pause শব্দে অভাব সূচনা করে, যতি সেই অভাব নহে। সমস্ত ছন্দের ভাবটাই ওই যতির মধ্যে—কারণ যতি ছন্দকে নিরস্ত করে না নিয়মিত করে। ছন্দ যেখানে যেখানে থামে সেইখানেই তাহার ইশারা ফুটিয়া উঠে, সেইখানেই সে নিশ্বাস ছাড়িয়া আপনার পরিচয় দিয়া বাঁচে।

এই প্রমাণটি হইতে আমি বিশ্বাস করি বিশ্বরচনায় কেবলই যে-সমস্ত যতি দেখা যায় সেইখানে শূন্যতা নাই, সেইখানেই বিশ্বের প্রাণ কাজ করিতেছে। শুনিয়াছি অণু পরমাণুর মধ্যে কেবলই ছিদ্র,—আমি নিশ্চয় জানি সেই ছিদ্রগুলির মধ্যেই বিরাটের অবস্থান। ছিদ্রগুলিই মুখ্য, বস্তুগুলিই গৌণ। যাহাকে শূন্য বলি বস্তুগুলি তাহারই অশ্রান্ত লীলা। সেই শূন্যই তাহাদিগকে আকার দিতেছে, গতি দিতেছে, প্রাণ দিতেছে। আকর্ষণ-বিকর্ষণ তো সেই শূন্যেরই কুস্তির প্যাঁচ। জগতের বস্তুব্যাপার সেই শূন্যের, সেই মহাযতির, পরিচয়। এই বিপুল বিচ্ছেদের ভিতর দিয়াই জগতের সমস্ত যোগ-সাধন হইতেছে—অণুর সঙ্গে অণুর, পৃথিবীর সঙ্গে সূর্যের, নক্ষত্রের সঙ্গে নক্ষত্রের। সেই বিচ্ছেদমহাসমুদ্রের মধ্যে মানুষ ভাসিতেছে বলিয়াই মানুষের শক্তি, মানুষের জ্ঞান, মানুষের প্রেম, মানুষের যত কিছু লীলাখেলা। এই মহাবিচ্ছেদ যদি বস্তুতে নিরেট হইয়া ভরিয়া যায় তবে একেবারে নিবিড় একটানা মৃত্যু।

মৃত্যু আর কিছু নহে বস্তু যখন আপনার অবকাশকে হারায় তখন তাহাই মৃত্যু। বস্তু তখন যেটুকু কেবলমাত্র সেটুকুই, তার বেশি নয়। প্রাণ সেই মহা-অবকাশ—যাহাকে অবলম্বন করিয়া বস্তু আপনাকে কেবলই আপনি ছাড়াইয়া চলিতে পারে।

বস্তু-বাদীরা মনে করে অবকাশটা নিশ্চল কিন্তু যাহারা অবকাশরসের রসিক তাহারা জানে বস্তুটাই নিশ্চল, অবকাশই তাহাকে গতি দেয়। রণক্ষেত্রে সৈন্যের অবকাশ

নাই ; তাহারা কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া ব্যূহরচনা করিয়া চলিয়াছে, তাহারা মনে ভাবে আমরাই যুদ্ধ করিতেছি। কিন্তু যে-সেনাপতি অবকাশে নিমগ্ন হইয়া দূর হইতে স্তব্ধভাবে দেখিতেছে, সৈন্যদের সমস্ত চলা তাহারই মধ্যে। নিশ্চলের যে ভয়ংকর চলা তাহার রুদ্রবেগ যদি দেখিতে চাও তবে দেখো ওই নক্ষত্রমণ্ডলীর আবর্তনে, দেখো যুগ-যুগান্তরের তাণ্ডব নৃত্যে। যে নাচিতেছে না তাহারই নাচ এই সকল চঞ্চলতায়।

এত কথা যে বলিতে হইল তাহার কারণ, কবিশেখর কালিদাস যে আষাঢ়কে আপনার মন্দাক্রান্তাচ্ছন্দের অম্লান মালাটি পরাইয়া বরণ করিয়া লইয়াছেন তাহাকে ব্যস্ত-লোকেরা "আষাঢ়ে" বলিয়া অবজ্ঞা করে। তাহারা মনে করে যে মেঘাবগুণ্ঠিত বর্ষণ-মঞ্জীর-মুখর মাসটি সকল কাজের বাহির, ইহার ছায়াবৃত প্রহরগুলির পসরায় কেবল বাজে কথার পণ্য। অন্যায় মনে করে না। সকল কাজের-বাহিরের যে দলটি যে অহৈতুকী স্বর্গসভায় আসন লইয়া বাজে-কথার অমৃত পান করিতেছে, কিশোর আষাঢ় যদি আপন আলোল কুন্তলে নবমালতীর মালা জড়াইয়া সেই সভার নীলকান্তমণির পেয়ালা ভরিবার ভার লইয়া থাকে, তবে স্বাগত, হে নবঘনশ্যাম, আমরা তোমাকে অভিবাদন করি। এস এস জগতের যত অকর্মণ্য, এস এস ভাবের ভাবুক, রসের রসিক,—আষাঢ়ের মৃদঙ্গ ওই বাজিল, এস সমস্ত খ্যাপার দল, তোমাদের নাচের ডাক পড়িয়াছে। বিশ্বের চির-বিরহবেদনার অশ্রু-উৎস আজ খুলিয়া গেল, আজ তাহা আর মানা মানিল না। এস গো অভিসারিকা, কাজের সংসারে কপাট পড়িয়াছে, হাটের পথে লোক নাই, চকিত বিদ্যুতের আলোকে আজ যাত্রায় বাহির হইবে—জাতীপুষ্প-সুগন্ধি বনান্ত হইতে সজল বাতাসে আহ্বান আসিল—কোন্ ছায়াবিতানে বসিয়া আছে বহুযুগের চিরজাগ্রত প্রতীক্ষা!

১৩২১

শরৎ

ইংরেজের সাহিত্যে শরৎ প্রৌঢ়। তার যৌবনের টান সবটা আলগা হয় নাই, ওদিকে তাকে মরণের টান ধরিয়াছে ; এখনও সব চুকিয়া যায় নাই কেবল সব ঝরিয়া যাইতেছে।

একজন আধুনিক ইংরেজ কবি শরৎকে সম্ভাষণ করিয়া বলিতেছেন, "তোমার ওই শীতের আশঙ্কাকুল গাছগুলাকে কেমন যেন আজ ভূতের মতো দেখাইতেছে ; হায় রে, তোমার ওই কুঞ্জবনের ভাঙা হাট, তোমার ওই ভিজা পাতার বিবাগি হইয়া বাহির

হওয়া! যা অতীত এবং যা আগামী তাদের বিষণ্ণ বাসরশয্যা তুমি রচিয়াছ। যা-কিছু ম্রিয়মাণ তুমি তাদেরই বাণী, যত-কিছু গতস্য শোচনা তুমি তারই অধিদেবতা।"

কিন্তু এ শরৎ আমাদের শরৎ একেবারেই নয়, আমাদের শরতের নীল চোখের পাতা দেউলে-হওয়া যৌবনের চোখের জলে ভিজিয়া ওঠে নাই। আমার কাছে আমাদের শরৎ শিশুর মূর্তি ধরিয়া আসে। সে একেবারে নবীন। বর্ষার গর্ভ হইতে এইমাত্র জন্ম লইয়া ধরণী-ধাত্রীর কোলে শুইয়া সে হাসিতেছে।

তার কাঁচা দেহখানি; সকালে শিউলিফুলের গন্ধটি সেই কচিগায়ের গন্ধের মতো। আকাশে আলোকে গাছেপালায় যা-কিছু রং দেখিতেছি সে তো প্রাণেরই রং, একেবারে তাজা।

প্রাণের একটি রং আছে। তা ইন্দ্রধনুর গাঁঠ হইতে চুরি করা লাল নীল সবুজ হল্‌দে প্রভৃতি কোনো বিশেষ রং নয়; তা কোমলতার রং। সেই রং দেখিতে পাই ঘাসে পাতায়, আর দেখি মানুষের গায়ে। জন্তুর কঠিন চর্মের উপরে সেই প্রাণের রং ভালো করিয়া ফুটিয়া ওঠে নাই সেই লজ্জায় প্রকৃতি তাকে রং-বেরঙের লোমের ঢাকা দিয়া ঢাকিয়া রাখিয়াছে। মানুষের গা-টিকে প্রকৃতি অনাবৃত করিয়া চুম্বন করিতেছে।

যাকে বাড়িতে হইবে তাকে কড়া হইলে চলিবে না, প্রাণ সেইজন্য কোমল। প্রাণ জিনিসটা অপূর্ণতার মধ্যে পূর্ণতার ব্যঞ্জনা। সেই ব্যঞ্জনা যেই শেষ হইয়া যায় অর্থাৎ যখন যা আছে কেবলমাত্র তাই আছে, তার চেয়ে আরও-কিছুর আভাস নাই তখন মৃত্যুতে সমস্তটা কড়া হইয়া ওঠে, তখন লাল নীল সকল রকম রংই থাকিতে পারে কেবল প্রাণের রং থাকে না।

শরতের রংটি প্রাণের রং। অর্থাৎ তাহা কাঁচা, বড়ো নরম। রৌদ্রটি কাঁচা সোনা, সবুজটি কচি, নীলটি তাজা। এইজন্য শরতে নাড়া দেয় আমাদের প্রাণকে, যেমন বর্ষায় নাড়া দেয় আমাদের ভিতরমহলের হৃদয়কে, যেমন বসন্তে নাড়া দেয় আমাদের বাহির-মহলের যৌবনকে।

বলিতেছিলাম শরতের মধ্যে শিশুর ভাব। তার, এই-হাসি, এই-কান্না। সেই হাসিকান্নার মধ্যে কার্যকারণের গভীরতা নাই, তাহা এমনি হালকাভাবে আসে এবং যায় যে, কোথাও তার পায়ের দাগটুকু পড়ে না, জলের ঢেউয়ের উপরটাতে আলোছায়া ভাইবোনের মতো যেমন কেবলই দুরন্তপনা করে অথচ কোনো চিহ্ন রাখে না।

ছেলেদের হাসিকান্না প্রাণের জিনিস, হৃদয়ের জিনিস নহে। প্রাণ জিনিসটা ছিপের নৌকার মতো ছুটিয়া চলে তাতে মাল বোঝাই নাই; সেই ছুটিয়া-চলা প্রাণের হাসিকান্নার ভার কম। হৃদয় জিনিসটা বোঝাই নৌকা, সে ধরিয়া রাখে, ভরিয়া রাখে,—

তার হাসিকান্না চলিতে চলিতে ঝরাইয়া ফেলিবার মতো নয়। যেমন ঝরনা, সে ছুটিয়া চলিতেছে বলিয়াই ঝলমল করিয়া উঠিতেছে। তার মধ্যে ছায়া আলোর কোনো বাসা নাই, বিশ্রাম নাই। কিন্তু এই ঝরনাই উপত্যকায় যে সরোবরে গিয়া পড়িয়াছে, সেখানে আলো যেন তলায় ডুব দিতে চায়, সেখানে ছায়া জলের গভীর অন্তরঙ্গ হইয়া উঠে। সেখানে স্তব্ধতার ধ্যানের আসন।

কিন্তু প্রাণের কোথাও আসন নাই, তাকে চলিতেই হইবে, তাই শরতের হাসিকান্না কেবল আমাদের প্রাণপ্রবাহের উপরে ঝিকিমিকি করিতে থাকে, যেখানে আমাদের দীর্ঘনিশ্বাসের বাসা সেই গভীরে গিয়া সে আটকা পড়ে না। তাই দেখি শরতের রৌদ্রের দিকে তাকাইয়া মনটা কেবল চলি চলি করে, বর্ষার মতো সে অভিসারের চলা নয়, সে অভিমানের চলা।

বর্ষায় যেমন আকাশের দিকে চোখ যায় শরতে তেমনি মাটির দিকে। আকাশপ্রাঙ্গণ হইতে তখন সভায় আস্তরণখানা গুটাইয়া লওয়া হইতেছে, এখন সভার জায়গা হইয়াছে মাটির উপরে। একেবারে মাঠের এক পার হইতে আর এক পার পর্যন্ত সবুজে ছাইয়া গেল, সেদিক হইতে আর চোখ ফেরানো যায় না।

শিশুটি কোল জুড়িয়া বসিয়াছে সেইজন্যই মায়ের কোলের দিকে এমন করিয়া চোখ পড়ে। নবীন প্রাণের শোভায় ধরণীর কোল আজ এমন ভরা। শরৎ বড়ো বড়ো গাছের ঋতু নয়, শরৎ ফসলখেতের ঋতু। এই ফসলের খেত একেবারে মাটির কোলের জিনিস। আজ মাটির যত আদর সেইখানেই হিল্লোলিত, বনস্পতি দাদারা একধারে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া তাই দেখিতেছে।

এই ধান, এই ইক্ষু, এরা যে ছোটো, এরা যে অল্পকালের জন্য আসে, ইহাদের যত শোভা যত আনন্দ সেই দুদিনের মধ্যে ঘনাইয়া তুলিতে হয়। সূর্যের আলো ইহাদের জন্য যেন পথের ধারের পানসত্রের মতো—ইহারা তাড়াতাড়ি গণ্ডূষ ভরিয়া সূর্যকিরণ পান করিয়া লইয়াই চলিয়া যায়—বনস্পতির মতো জল বাতাস মাটিতে ইহাদের অন্নপানের বাঁধা বরাদ্দ নাই; ইহারা পৃথিবীতে কেবল আতিথ্যই পাইল, আবাস পাইল না। শরৎ পৃথিবীর এই সব ছোটোদের এই সব ক্ষণজীবীদের ক্ষণিক উৎসবের ঋতু। ইহারা যখন আসে তখন কোল ভরিয়া আসে, যখন চলিয়া যায় তখন শূন্য প্রান্তরটা শূন্য আকাশের নিচে হা হা করিতে থাকে। ইহারা পৃথিবীর সবুজ মেঘ, হঠাৎ দেখিতে দেখিতে ঘনাইয়া ওঠে, তার পরে প্রচুর ধারায় আপন বর্ষণ সারিয়া দিয়া চলিয়া যায়, কোথাও নিজের কোনো দাবি দাওয়ার দলিল রাখে না।

আমরা তাই বলিতে পারি, হে শরৎ তুমি শিশিরাশ্রু ফেলিতে ফেলিতে গত এবং

আগতের ক্ষণিক মিলনশয্যা পাতিয়াছ। যে বর্তমানটুকুর জন্য অতীতের চতুর্দোলা দ্বারের কাছে অপেক্ষা করিয়া আছে, তুমি তারই মুখচুম্বন করিতেছ, তোমার হাসিতে চোখের জল গড়াইয়া পড়িতেছে।

মাটির কন্যার আগমনীর গান এই তো সেদিন বাজিল। মেঘের নন্দীভৃঙ্গী শিঙা বাজাইতে বাজাইতে গৌরী শারদাকে এই কিছু দিন হইল ধরা-জননীর কোলে রাখিয়া গেছে। কিন্তু বিজয়ার গান বাজিতে আর তো দেরি নাই; শ্মশানবাসী পাগলটা এল বলিয়া,—তাকে তো ফিরাইয়া দিবার জো নাই;—হাসির চন্দ্রকলা তার ললাটে লাগিয়া আছে, কিন্তু তার জটায় জটায় কান্নার মন্দাকিনী।

শেষকালে দেখি ওই পশ্চিমের শরৎ আর এই পূর্বদেশের শরৎ একই জায়গায় আসিয়া অবসান হয়—সেই দশমী রাত্রির বিজয়ার গানে। পশ্চিমের কবি শরতের দিকে তাকাইয়া গাহিতেছেন, "বসন্ত তার উৎসবের সাজ বৃথা সাজাইল, তোমার নিঃশব্দ ইঙ্গিতে পাতার পর পাতা খসিতে খসিতে সোনার বৎসর আজ মাটিতে মিশিয়া মাটি হইল যে!"—তিনি বলিতেছেন, "ফাল্গুনের মধ্যে মিলন-পিপাসিনীর যে রস-ব্যাকুলতা তাহা শান্ত হইয়াছে, জ্যৈষ্ঠের মধ্যে তপ্ত-নিশ্বাস-বিক্ষুব্ধ যে হৃৎস্পন্দন তাহা স্তব্ধ হইয়াছে। ঝড়ের মাতনে লণ্ডভণ্ড অরণ্যের গায়ন সভায় তোমার ঝ'ড়ো বাতাসের দল তাহাদের প্রেতলোকের রুদ্রবীণায় তার চড়াইতেছে তোমারই মৃত্যুশোকের বিলাপগান গাহিবে বলিয়া। তোমার বিনাশের শ্রী তোমার সৌন্দর্যের বেদনা ক্রমে সুতীব্র হইয়া উঠিল, হে বিলীয়মান মহিমার প্রতিরূপ!"

কিন্তু তবুও পশ্চিমে যে শরৎ, বাষ্পের ঘোমটায় মুখ ঢাকিয়া আসে, আর আমাদের ঘরে যে শরৎ মেঘের ঘোমটা সরাইয়া পৃথিবীর দিকে হাসি মুখখানি নামাইয়া দেখা দেয়, তাদের দুইয়ের মধ্যে রূপের এবং ভাবের তফাত আছে। আমাদের শরতে আগমনীটাই ধুয়া। সেই ধুয়াতেই বিজয়ার গানের মধ্যেও উৎসবের তান লাগিল। আমাদের শরতে বিচ্ছেদ-বেদনার ভিতরেও একটা কথা লাগিয়া আছে যে, বারে বারে নূতন করিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া আসিবে বলিয়াই চলিয়া যায়—তাই ধরার আঙিনায় আগমনী-গানের আর অন্ত নাই। যে লইয়া যায় সেই আবার ফিরাইয়া আনে। তাই সকল উৎসবের মধ্যে বড়ো উৎসব এই হারাইয়া ফিরিয়া পাওয়ার উৎসব।

কিন্তু পশ্চিমে শরতের গানে দেখি পাইয়া হারানোর কথা। তাই কবি গাহিতেছেন, "তোমার আবির্ভাবই তোমার তিরোভাব। যাত্রা এবং বিদায় এই তোমার ধুয়া, তোমার জীবনটাই মরণের আড়ম্বর; আর তোমার সমারোহের পরম পূর্ণতার মধ্যেও তুমি মায়া, তুমি স্বপ্ন।"

১৩২২

কর্তার ইচ্ছায় কর্ম

কর্তার ইচ্ছায় কর্ম

একটু বাদলার হাওয়া দিয়াছে কি, অমনি আমাদের গলি ছাপাইয়া সদর রাস্তা পর্যন্ত বন্যা বহিয়া যায়, পথিকের জুতাজোড়াটা ছাতার মতোই শিরোধার্য হইয়া ওঠে, এবং অন্তত এই গলি-চর জীবেরা উভচর জীবের চেয়ে জীবনযাত্রায় যোগ্যতর নয় শিশুকাল হইতে আমাদের বারান্দা হইতে এইটে বছর বছর লক্ষ্য করিতে করিতে আমার চুল পাকিয়া গেল।

ইহার মধ্যে প্রায় ষাট বছর পার হইল। তখন বাষ্প ছিল কলীয় যুগের প্রধান বাহন, এখন বিদ্যুৎ তাহাকে কটাক্ষ করিয়া হাসিতে শুরু করিয়াছে; তখন পরমাণুতত্ত্ব পৌঁছিয়াছিল অদৃশ্যে, এখন তাহা অভাব্য হইয়া উঠিল; ওদিকে মরিবার কালের পিঁপড়ার মতো মানুষ আকাশে পাখা মেলিয়াছে, একদিন এই আকাশেরও ভাগবখরা লইয়া শরিকদের মধ্যে মামলা চলিবে অ্যাটর্নি তার দিন গনিতেছেন; চীনের মানুষ একরাত্রে তাদের সনাতন টিকি কাটিয়া সাফ করিল, এবং জাপান কালসাগরে এমন এক বিপর্যয় লাফ মারিল যে, পঞ্চাশ বছরে পাঁচশ বছর পার হইয়া গেল। কিন্তু বর্ষার জলধারা সম্বন্ধে আমাদের রাস্তার আতিথেয়তা যেমন ছিল তেমনিই আছে। যখন কন্‌গ্রেসের ক অক্ষরেরও পত্তন হয় নাই তখনও এই পথের পথিকবধূদের বর্ষার গান ছিল—

কতকাল পরে পদচারি করে
দুখসাগর সাঁতরি পার হবে?

আর আজ যখন হোমরুলের পাকা ফলটা প্রায় আমাদের গোঁফের কাছে ঝুলিয়া পড়িল আজও সেই একই গান—মেঘমল্লার-রাগেণ, যতিতালাভ্যাং।

ছেলেবেলা হইতেই কাণ্ডটা দেখিয়া আসিতেছি সুতরাং ব্যাপারটা আমাদের কাছে অভাবনীয় নয়। যা অভাবনীয় নয় তা লইয়া কেহ ভাবনাই করে না। আমরাও ভাবনা করি নাই, সহ্যই করিয়াছি। কিন্তু চিঠিতে যে-কথাটা অমনিতে চোখ এড়াইয়া যায় সেটার নিচে লাইন কাটা দেখিলে যেমন বিশেষ করিয়া মনে লাগে, আমাদের রাস্তার জলাশয়তার নিচে তেমনি জোড়া লাইন কাটা দেখিয়া, শুধু মনটার মধ্যে নয় আমাদের গাড়ির চাকাতেও, ক্ষণে ক্ষণে চমক লাগিল; বর্ষাও নামিয়াছে ট্র্যামলাইনের মেরামতও শুরু। যার আরম্ভ আছে তার শেষও আছে ন্যায়শাস্ত্রে এই কথা বলে, কিন্তু ট্র্যামওয়ালাদের অন্যায় শাস্ত্রে মেরামতের আর শেষ দেখি না। তাই এবার লাইন কাটার

সহযোগে যখন চিৎপুর রোডে জলস্রোতের সঙ্গে জনস্রোতের দ্বন্দ্ব দেখিয়া দেহমন আর্দ্র হইতে লাগিল তখন অনেকদিন পরে গভীরভাবে ভাবিতে লাগিলাম, সহ্য করি কেন ?

সহ্য না করিলে যে চলে এবং না করিলেই যে ভালো চলে চৌরঙ্গি অঞ্চলে একবার পা বাড়াইলেই তা বোঝা যায়। একই শহর, একই ম্যুনিসিপালিটি, কেবল তফাতটা এই, আমাদের সয় ওদের সয় না। যদি চৌরঙ্গি রাস্তার পনেরো আনার হিস্‌সা ট্র্যামেরই থাকিত, এবং রাস্তা উৎখাত করিয়া লাইন মেরামত এমন সুমধুর গজগমনে চলিত আজ তবে ট্র্যাম কোম্পানির দিনে আহার রাত্রে নিদ্রা থাকিত না।

আমাদের নিরীহ ভালোমানুষটি বলেন, "সে কী কথা ! আমাদের একটু অসুবিধা হইবে বলিয়াই কি ট্র্যামের রাস্তা মেরামত হইবে না ?"

"হইবে বই কি ! কিন্তু এমন আশ্চর্য সুস্থ মেজাজে এবং দীর্ঘ মেয়াদে নয়।"

নিরীহ ভালোমানুষটি বলেন, "সে কি সম্ভব ?"

যা হইতেছে তার চেয়ে আরও ভালো হইতে পারে এই ভরসা ভালোমানুষদের নাই বলিয়াই অহরহ চক্ষের জলে তাদের বক্ষ ভাসে এবং তাদের পথঘাটেরও প্রায় সেই দশা। এমনি করিয়া দুঃখকে আমরা সর্বাঙ্গে মাখি এবং ভাঙা পিপের আলকাতরার মতো সেটাকে দেশের চারদিকে গড়াইয়া ছড়াইয়া পড়িতে দিই।

কথাটা শুনিতে ছোটো, কিন্তু আসলে ছোটো নয়। কোথাও আমাদেরই কোনো কর্তৃত্ব আছে এটা আমরা কিছুতেই পুরামাত্রায় বুঝিলাম না। বইয়ে পড়িয়াছি, মাছ ছিল কাঁচের টবের মধ্যে ; সে অনেক মাথা খুঁড়িয়া অবশেষে বুঝিল যে কাঁচটা জল নয়। তার পরে সে বড়ো জলাশয়ে ছাড়া পাইল, তবু তার এটা বুঝিতে সাহস হইল না যে, জলটা কাচ নয় ; তাই সে একটুখানি জায়গাতেই ঘুরিতে লাগিল। ওই মাথা ঠুকিবার ভয়টা আমাদেরও হাড়েমাসে জড়ানো, তাই যেখানে সাঁতার চলিতে পারে সেখানেও মন চলে না। অভিমন্যু মায়ের গর্ভেই ব্যূহে প্রবেশ করিবার বিদ্যা শিখিল, বাহির হইবার বিদ্যা শিখিল না, তাই সে সর্বাঙ্গে সপ্তরথীর মারটা খাইয়াছে। আমরাও জন্মিবার পূর্ব হইতেই বাঁধা-পড়িবার বিদ্যাটাই শিখিলাম, গাঁঠ-খুলিবার বিদ্যাটা নয় ; তার পর জন্মমাত্রই বুদ্ধিটা হইতে শুরু করিয়া চলাফেরাটা পর্যন্ত পাকে পাকে জড়াইলাম, আর সেই হইতেই জগতে যেখানে যত রথী আছে, এমন কি পদাতিক পর্যন্ত সকলের মার খাইয়া মরিতেছি। মানুষকে, পুঁথিকে, ইশারাকে, গণ্ডিকে বিনাবাক্যে পুরুষে পুরুষে মানিয়া চলাই এমনি আমাদের অভ্যস্ত যে, জগতে কোথাও যে আমাদের কর্তৃত্ব আছে তাহা চোখের সামনে সশরীরে উপস্থিত হইলেও কোনো মতেই ঠাহর হয় না, এমন কি, বিলাতি চশমা পরিলেও না।

মানুষের পক্ষে সকলের চেয়ে বড়ো কথাটাই এই যে, কর্তৃত্বের অধিকারই মনুষ্যত্বের অধিকার। নানা মন্ত্রে, নানা শ্লোকে, নানা বিধিবিধানে এই কথাটা যে-দেশে চাপা পড়িল, বিচারে পাছে এতটুকু ভুল হয় এই জন্য যে-দেশে মানুষ আচারে আপনাকে আষ্টেপিষ্টে বাঁধে, চলিতে গেলে পাছে দূরে গিয়া পড়ে এইজন্য নিজের পথ নিজেই ভাঙিয়া দেয়, সেই দেশে ধর্মের দোহাই দিয়া মানুষকে নিজের 'পরে অপরিসীম অশ্রদ্ধা করিতে শেখানো হয় এবং সেই দেশে দাস তৈরি করিবার জন্য সকলের চেয়ে বড়ো কারখানা খোলা হইয়াছে।

আমাদের রাজপুরুষেরাও শাস্ত্রীয় গাম্ভীর্যের সঙ্গে এই কথাই বলিয়া থাকেন, "তোমরা ভুল করিবে, তোমরা পারিবে না, অতএব তোমাদের হাতে কর্তৃত্ব দেওয়া চলিবে না।"

আর যাই হ'ক, মনু-পরাশরের এই আওয়াজটা ইংরেজি গলায় ভারি বেসুর বাজে, তাই আমরা তাঁদের যে-উত্তরটা দিই সেটা তাঁদেরই সহজ সুরের কথা। আমরা বলি, ভুল করাটা তেমন সর্বনাশ নয় স্বাধীনকর্তৃত্ব না পাওয়াটা যেমন। ভুল করিবার স্বাধীনতা থাকিলে তবেই সত্যকে পাইবার স্বাধীনতা থাকে। নিখুঁত নির্ভুল হইবার আশায় যদি নিরঙ্কুশ নির্জীব হইতে হয় তবে তার চেয়ে না হয় ভুলই করিলাম।

আমাদের বলিবার আরও কথা আছে। কর্তৃপক্ষদের এ-কথাও স্মরণ করাইতে পারি যে, আজ তোমরা আত্মকর্তৃত্বের মোটর গাড়ি চালাইতেছ কিন্তু একদিন রাত-থাকিতে যখন গোরুর গাড়িতে যাত্রা শুরু হইয়াছিল তখন খালখন্দর মধ্য দিয়া চাকা দুটোর আর্তনাদ ঠিক জয়ধ্বনির মতো শোনাইত না। পার্লামেন্ট বরাবরই ডাইনে বাঁয়ে প্রবল ঝাঁকানি খাইয়া এক নজির হইতে আর এক নজিরের লাইন কাটিতে কাটিতে আসিয়াছে, গোড়াগুড়িই স্টীমরোলার-টানা পাকা রাস্তা পায় নাই। কত ঘুষঘাষ, ঘুষাঘুষি, দলাদলি, অবিচার এবং অব্যবস্থার মধ্য দিয়া সে হেলিয়া হেলিয়া চলিয়াছে। কখনো রাজা, কখনো গির্জা, কখনো জমিদার, কখনো বা মদওয়ালারও স্বার্থ বহিয়াছে। এমন এক সময় ছিল সদস্যেরা যখন জরিমানা ও শাসনের ভয়েই পার্লামেন্টে হাজির হইত। আর গলদের কথা যদি বল, কবেকার কালে সেই আয়ার্লণ্ড আমেরিকার সম্বন্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া আজকের দিনে বোয়ার যুদ্ধ এবং ডার্ডানেলিস মেসোপোটেমিয়া পর্যন্ত গলদের লম্বা ফর্দ দেওয়া যায়; ভারতবিভাগের ফর্দটাও নেহাত ছোটো নয়—কিন্তু সেটার কথায় কাজ নাই। আমেরিকার রাষ্ট্রতন্ত্রে কুবের দেবতার চরগুলি যে-সকল কুকীর্তি করে সেগুলো সামান্য নয়। ড্রেফুসের নির্যাতন উপলক্ষ্যে ফ্রান্সের রাষ্ট্রতন্ত্রে সৈনিক-প্রাধান্যের যে অন্যায় প্রকাশ পাইয়াছিল তাহাতে রিপুর অন্ধশক্তিরই তো হাত দেখা যায়।

এ-সকল সত্ত্বেও আজকের দিনে এ-কথায় কারও মনে সন্দেহ লেশমাত্র নাই যে, আত্মকর্তৃত্বের চির-সচলতার বেগেই মানুষ ভুলের মধ্য দিয়াই ভুলকে কাটায়, অন্যায়ের গর্তে ঘাড়মোড় ভাঙিয়া পড়িয়াও ঠেলাঠেলি করিয়া উপরে ওঠে। এইজন্য মানুষকে পিছমোড়া বাঁধিয়া তার মুখে পায়সান্ন তুলিয়া দেওয়ার চেয়ে তাকে স্বাধীনভাবে অন্ন উপার্জনের চেষ্টায় উপবাসী হইতে দেওয়াও ভালো।

এর চেয়েও একটা বড়ো কথা আমাদের বলিবার আছে,—সে এই যে, রাষ্ট্রীয় আত্মকর্তৃত্বে কেবল যে সুব্যবস্থা বা দায়িত্ববোধ জন্মে তা নয়, মানুষের মনের আয়তন বড়ো হয়। কেবল পল্লীসমাজে বা ছোটোছোটো সামাজিক শ্রেণীবিভাগে যাদের মন বদ্ধ, রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের অধিকার পাইলে তবেই মানুষকে বড়ো পরিধির মধ্যে দেখিবার তারা সুযোগ পায়। এই সুযোগের অভাবে প্রত্যেক মানুষ মানুষ-হিসাবে ছোটো হইয়া থাকে। এই অবস্থায় সে যখন মনুষ্যত্বের বৃহৎ ভূমিকার উপরে আপন জীবনকে না ছড়াইয়া দেখে তখন তার চিন্তা তার শক্তি তার আশাভরসা সমস্তই ছোটো হইয়া যায়। মানুষের এই আত্মার খর্বতা তার প্রাণনাশের চেয়ে ঢের বেশি বড়ো অমঙ্গল। "ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি।" অতএব ভুলচুকের সমস্ত আশঙ্কা মানিয়া লইয়াও আমরা আত্মকর্তৃত্ব চাই। আমরা পড়িতে পড়িতে চলিব—দোহাই তোমার, আমাদের এই পড়ার দিকেই তাকাইয়া আমাদের চলার দিকে বাধা দিয়ো না।

এই জবাবই সত্য জবাব। যদি নাছোড়বান্দা হইয়া কেনো একগুঁয়ে মানুষ এই জবাব দিয়া কর্তৃপক্ষকে বেজার করিয়া তোলে তবে সেদিক হইতে সে ইন্‌টার্নড্‌ হইতে পারে কিন্তু এদিক হইতে বাহবা পায়। অথচ ঠিক এই জবাবটাই যদি আমাদের সমাজকর্তাদের কাছে দাখিল করি, যদি বলি "তোমরা বল, যুগটা কলি, আমাদের বুদ্ধিটা কম, স্বাধীন বিচারে আমাদের ভুল হয়, স্বাধীন ব্যবহারে আমরা অপরাধ করি, অতএব মগজটাকে অগ্রাহ্য করিয়া পুঁথিটাকে শিরোধার্য করিবার জন্যই আমাদের নতশিরটা তৈরি, কিন্তু এতবড়ো অপমানের কথা আমরা মানিব না," তবে চণ্ডীমণ্ডপের চক্ষু রাঙা হইয়া ওঠে এবং সমাজকর্তা তখনই সামাজিক ইন্‌টার্নমেন্ট এর হুকুম জারি করেন। যাঁরা পোলিটিকাল আকাশে উড়িবার জন্য পাখা ঝটপট করেন তাঁরাই সামাজিক দাঁড়ের উপর পা-দুটোকে শক্ত শিকলে জড়াইয়া রাখেন।

আসল কথা নৌকাটাকে ডাইনে চালাইবার জন্যও যে হাল, বাঁয়ে চালাইবার জন্যও সেই হাল। একটা মূলকথা আছে সেইটেকে আয়ত্ত করিতে পারিলেই সমাজেও মানুষ সত্য হয়, রাষ্ট্রব্যাপারেও মানুষ সত্য হয়। সেই মূলকথাটার ধারণা লইয়াই চিতপুরের সঙ্গে চৌরঙ্গির তফাত। চিতপুর একেবারেই ঠিক করিয়া আছে যে, সমস্তই

উপরওয়ালার হাতে। তাই সে নিজের হাত খালি করিয়া চিত হইয়া রহিল। চৌরঙ্গি বলে, কিছুতে আমাদের হাত নাই এ-যদি সত্যই হইত তবে আমাদের হাত দুটোই থাকিত না। উপরওয়ালার হাতের সঙ্গে আমাদের হাতের একটা অবিচ্ছিন্ন যোগ আছে চৌরঙ্গি এই কথা মানে বলিয়াই জগৎটাকে হাত করিয়াছে, আর চিতপুর তাহা মানে না বলিয়াই জগৎটাকে হাতছাড়া করিয়া দুই চক্ষুর তারা উলটাইয়া শিবনেত্র হইয়া রহিল।

আমাদের ঘরগড়া কুনো নিয়মকেই সব চেয়ে বড়ো মনে করিতে হইলে চোখ বুজিতে হয়। চোখ চাহিলে দেখি, বিশ্বের আগাগোড়া একটা বৃহৎ নিয়ম আছে। নিজের চেষ্টায় সেই নিয়মকে দখল করাই শক্তিলাভ সমৃদ্ধিলাভ দুঃখ হইতে পরিত্রাণ লাভ—এই নিশ্চিত বোধটাই বর্তমান য়ুরোপীয় সভ্যতার পাকা ভিত। ব্যক্তিবিশেষের সফলতা কোনো বিশেষ বিধানে নয়, বিশ্ববিধানে—এইটে শক্ত করিয়া জানাতেই শক্তির ক্ষেত্রে য়ুরোপের এতবড়ো মুক্তি।

আমরা কিন্তু দুই হাত উলটাইয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিতেছি—কর্তার ইচ্ছা কর্ম। সেই কর্তাটিকে—ঘরের বাপদাদা, বা পুলিসের দারোগা, বা পাণ্ডা পুরোহিত, বা স্মৃতিরত্ন, বা শীতলা মনসা ওলাবিবি দক্ষিণরায়, শনি মঙ্গল রাহু কেতু—প্রভৃতি হাজার রকম নাম দিয়া নিজের শক্তিকে হাজার টুকরা করিয়া আকাশে উড়াইয়া দিই।

কালেজি পাঠক বলিবেন—আমরা তো এ-সব মানি না। আমরা তো বসন্তর টিকা লই; ওলাউঠা হইলে নুনের জলের পিচকিরি লইবার আয়োজন করি; এমন কি, মশাবাহিনী ম্যালেরিয়াকে আজও আমরা দেবী বলিয়া খাড়া করি নাই, তাকে আমরা কীটস্য কীট বলিয়াই গণ্য করি ;- এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রভরা তাবিজটাকে পেটভরা পিলের উপর ঝুলাইয়া রাখি।

মুখে কোন্‌টাকে মানি বা নাই মানি তাতে কিছু আসে যায় না কিন্তু ওই মানার বিষে আমাদের মনের ভিতরটা জর্জরিত। এই মানসিক কাপুরুষতার ভিত্তি একটা চরাচরব্যাপী অনিশ্চিত ভয়ের উপর। অখণ্ড বিশ্বনিয়মের মধ্যে প্রকাশিত অখণ্ড বিশ্বশক্তিকে মানি না বলিয়াই হাজার রকম ভয়ের কল্পনায় বুদ্ধিটাকে আগেভাগে বরখাস্ত করিয়া বসি। ভয় কেবলই বলে, কী জানি, কাজ কী। ভয় জিনিসটাই এই রকম। আমাদের রাজপুরুষদের মধ্যেও দেখি, রাজ্যশাসনের কোনো একটা ছিদ্র দিয়া ভয় ঢুকিলেই তারা পাশ্চাত্য স্বধর্মকেই ভুলিয়া যায়—যে ধ্রুব আইন তাদের শক্তির ধ্রুব নির্ভর তারই উপর চোখ বুজিয়া কুড়াল চালাইতে থাকে। তখন ন্যায় রক্ষার উপর ভরসা চলিয়া যায়, প্রেস্টিজ রক্ষাকে তার চেয়ে বড়ো মনে করে—এবং বিধাতার উপর

টেক্কা দিয়া ভাবে প্রজার চোখের জলটাকে গায়ের জোরে আসমানে পাঠাইতে পারিলেই তাদের পক্ষে লঙ্কার ধোঁয়াটাকে মনোরম করা যায়। এইটেই তো বিশ্ব-বিধানের প্রতি অবিশ্বাস, নিজের বিশেষ বিধানের প্রতি ভরসা। এর মূলে ছোটো ভয়, কিংবা ছোটো লোভ, কিংবা কাজকে সোজা করিবার অতি ছোটো চাতুরী। আমরাও অন্ধভয়ের তাড়ায় মনুষ্যধর্মটাকে বিসর্জন দিতে রাজি। ব্যতিব্যস্ত হইয়া, যেখানে যা-কিছু আছে এবং নাই, সমস্তকেই জোড়হাত করিয়া মানিতে লাগিয়াছি। তাই আমরা জীববিজ্ঞান বা বস্তুবিজ্ঞানই পড়ি আর রাষ্ট্রতন্ত্রের ইতিহাসে পরীক্ষাই পাস করি, "কর্তার ইচ্ছা কর্ম" এই বীজমন্ত্রটাকে মন হইতে ঝাড়িয়া ফেলিতে পারি না। তাই, যদিচ আমাদের একালের ভাগ্যে দেশে অনেকগুলি দশের কাজের পত্তন হইয়াছে তবু আমাদের সেকালের ভাগ্যে সেই দশের কাজ একের কাজ হইয়া উঠিবার জন্য কেবলই ঠেলা মারিতে থাকে। কোথা হইতে খামকা একটা-না-একটা কর্তা ফুঁড়িয়া ওঠে। তার একমাত্র কারণ, যে দশের কথা হইতেছে তারা ওঠে বসে, খায় দায়, বিবাহ ও চিতারোহণ করে এবং পরকালে পিণ্ড লইতে হাত বাড়ায় কর্তার ইচ্ছায়; কিসে পাপ কিসে পুণ্য, কে ঘরে ঢুকিলে হুঁকার জল ফেলিতে হইবে, ক-হাত ঘেরের কুয়ার জলে স্নান করা যায়, ভোক্তার ধর্মরক্ষার পক্ষে ময়রার হাতের লুচিরই বা কী গুণ রুটিরই বা কী, ম্লেচ্ছের তৈরি মদেরই বা কী আর ম্লেচ্ছের ছোঁয়া জলেরই বা কী, কর্তার ইচ্ছার উপর বরাত দিয়া সে-বিচার তারা চিরকালের মতো সারিয়া রাখিয়াছে। যদি বলি পানি-পাঁড়ে নোংরা ঘটি ডুবাইয়া যে-জল বালতিতে লইয়া ফিরিতেছে সেটা পানের অযোগ্য, আর পানি মিঞা ফিলটার হইতে যে-জল আনিল সেটাই শুচি ও স্বাস্থ্যকর, তবে উত্তর শুনিব, ওটা তো তুচ্ছ যুক্তির কথা, কিন্তু ওটা তো কর্তার ইচ্ছা নয়। যদি বলি, নাই হইল কর্তার ইচ্ছা, তবে নিমন্ত্রণ বন্ধ। শুধু অতিথিসংকার নয়, অন্ত্যেষ্টিসংকার পর্যন্ত অচল। এত নিষ্ঠুর জবরদস্তি দ্বারা যাদের অতি সামান্য খাওয়াছোঁওয়ার অধিকার পর্যন্ত পদে পদে ঠেকানো হয়, এবং সেটাকে যারা কল্যাণ বলিয়াই মানে তারা রাষ্ট্রব্যাপারে অবাধ অধিকার দাবি করিবার বেলায় সংকোচ বোধ করে না কেন?

যখন আপন শক্তির মূলধন লইয়া জনসাধারণের কারবার না চলে তখন সকল ব্যাপারেই মানুষ দৈবের কাছে, গ্রহের কাছে, পরের কাছে হাত পাতিয়া ভয়ে ভয়ে কাটায়। এই ভাবটার বর্ণনা যদি কোথাও খুব স্পষ্ট করিয়া ফুটিয়া থাকে তাহা বাংলার প্রাচীন মঙ্গলকাব্যে। চাঁদ সদাগরের মনের আদর্শ মহৎ তাই যে-দেবতাকে নিকৃষ্ট বলিয়া কিছুতে সে মানিতে চায় নাই বহুদুঃখে তারই শক্তির কাছে তাকে হার মানিতে হইল। এই যে শক্তি, এর সঙ্গে জ্ঞান বা ন্যায়ধর্মের যোগ নাই। মানিবার পাত্র যতই

যথেচ্ছাচারী ততই সে ভয়ংকর, ততই তার কাছে নতিস্তুতি। বিশ্বকর্তৃত্বের এই ধারণার সঙ্গে তখনকার রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের যোগ ছিল। কবিকঙ্কণের ভূমিকাতেই তার খবর মেলে। আইন নাই, বিচার নাই, জোর যার মুলুক তার; প্রবলের অত্যাচারে বাধা দিবার কোনো বৈধ পথ নাই; দুর্বলের একমাত্র উপায় স্তবস্তুতি, ঘুষঘাষ এবং অবশেষে পলায়ন। দেবচরিত্র-কল্পনাতেও যেমন, সমাজেও তেমন, রাষ্ট্রতন্ত্রেও সেইরূপ।

অথচ একদিন উপনিষদে বিধাতার কথা বলা হইয়াছিল, যাথাতথ্যতোঽর্থান ব্যদধাৎ শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ। অর্থাৎ তাঁর বিধান যথাতথ, তাহা এলোমেলো নয় এবং সে-বিধান শাশ্বত কালের। তাহা নিত্যকাল হইতে এবং নিত্যকালের জন্য বিহিত, তাহা মুহূর্তে মুহূর্তে নূতন নূতন খেয়াল নয়। সুতরাং সেই নিত্যবিধানকে আমরা প্রত্যেকেই জ্ঞানের দ্বারা বুঝিয়া কর্মের দ্বারা আপন করিয়া লইতে পারি। তাকে যতই পাইব ততই নূতন নূতন বাধা কাটাইয়া চলিব। কেননা, যে-বিধানে নিত্যতা আছে কোথাও সে একেবারে ঠেকিয়া যাইতে পারে না, বাধা সে অতিক্রম করিবেই। এই নিত্য এবং যথাতথ বিধানকে যথাতথরূপে জানাই বিজ্ঞান। সেই বিজ্ঞানের জোরে য়ুরোপের মনে এতবড়ো একটা ভরসা জন্মিয়াছে যে, সে বলিতেছে, ম্যালেরিয়াকে বিদায় করিবই, কোনো রোগকেই টিঁকিতে দিব না, জ্ঞানের অভাব অন্নের অভাব লোকালয় হইতে দূর হইবেই, মানুষের ঘরে যে-কেহ জন্মিবে সকলেই দেহে মনে সুস্থ সবল হইবে এবং রাষ্ট্রতন্ত্রে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সহিত বিশ্বকল্যাণের সামঞ্জস্য সম্পূর্ণ হইয়া উঠিবে।

আধ্যাত্মিক অর্থে ভারতবর্ষ একদিন বলিয়াছিল, অবিদ্যাই বন্ধন, মুক্তি জ্ঞানে; সত্যকে পাওয়াতেই আমাদের পরিত্রাণ। অসত্য কাকে বলে? নিজেকে একান্ত বিচ্ছিন্ন করিয়া জানাই অসত্য। সর্বভূতের সঙ্গে আত্মার মিল জানিয়া পরমাত্মার সঙ্গে আধ্যাত্মিক যোগটিকে জানাই সত্য জানা। এতবড়ো সত্যকে মনে আনিতে পারা যে কী পরমাশ্চর্য ব্যাপার তা আজ আমরা বুঝিতেই পারিব না।

এদিকে আধিভৌতিক ক্ষেত্রে য়ুরোপ যে-মুক্তির সাধনা করিতেছে তারও মূল কথাটা এই একই। এখানেও দেখা যায় অবিদ্যাই বন্ধন, সত্যকে পাওয়াতেই মুক্তি। সেই বৈজ্ঞানিক সত্য মানুষের মনকে বিচ্ছিন্নতা হইতে বিশ্বব্যাপিকতায় লইয়া যাইতেছে এবং সেই পথে মানুষের বিশেষ শক্তিকে বিশ্বশক্তির সহিত যোগযুক্ত করিতেছে।

ভারতে ক্রমে ঋষিদের যুগ, অর্থাৎ গৃহস্থ তাপসদের যুগ গেল; ক্রমে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর যুগ আসিল। ভারতবর্ষ যে মহাসত্য পাইয়াছিল তাহাকে জীবনের ব্যবহারের পথ হইতে তফাত করিয়া দিল। বলিল, সন্ন্যাসী হইলে তবেই মুক্তির সাধনা সম্ভবপর হয়।

তার ফলে এদেশে বিদ্যার সঙ্গে অবিদ্যার একটা আপস হইয়া গেছে; বিষয়বিভাগের মতো উভয়ের মহল-বিভাগ হইয়া মাঝখানে একটা দেয়াল উঠিল। সংসারে তাই ধর্মে কর্মে আচারে বিচারে যত সংকীর্ণতা যত স্থূলতা যত মূঢ়তাই থাক উচ্চতম সত্যের দিক হইতে তার প্রতিবাদ নাই, এমন কি, সমর্থন আছে। গাছতলায় বসিয়া জ্ঞানী বলিতেছে, "যে-মানুষ আপনাকে সর্বভূতের মধ্যে ও সর্বভূতকে আপনার মধ্যে এক করিয়া দেখিয়াছে সেই সত্যকে দেখিয়াছে," অমনি সংসারী ভক্তিতে গলিয়া তার ভিক্ষার ঝুলি ভরিয়া দিল। ওদিকে সংসারী তার দরদালানে বসিয়া বলিতেছে, "যে-বেটা সর্বভূতকে যতদূর সম্ভব তফাতে রাখিয়া না চলিয়াছে তার ধোবানাপিত বন্ধ," আর জ্ঞানী আসিয়া তার মাথায় পায়ের ধুলা দিয়া আশীর্বাদ করিয়া গেল, "বাবা বাঁচিয়া থাকো।" এইজন্যই এদেশে কর্মসংসারে বিচ্ছিন্নতা জড়তা পদে পদে বাড়িয়া চলিল, কোথাও তাকে বাধা দিবার কিছু নাই। এইজন্যই শত শত বছর ধরিয়া কর্মসংসারে আমাদের এত অপমান, এত হার।

য়ুরোপে ঠিক ইহার উলটা। য়ুরোপের সত্যসাধনার ক্ষেত্র কেবল জ্ঞানে নহে ব্যবহারে। সেখানে রাজ্যে সমাজে যে কোনো খুঁত দেখা যায় এই সত্যের আলোতে সকলে মিলিয়া তার বিচার, এই সত্যের সাহায্যে সকলে মিলিয়া তার সংশোধন। এইজন্য সেই সত্য যে-শক্তি যে-মুক্তি দিতেছে সমস্ত মানুষের তাহাতে অধিকার, তাহা সকল মানুষকে আশা দেয়, সাহস দেয়—তাহার বিকাশ তন্ত্রমন্ত্রের কুয়াশায় ঢাকা নয়, মুক্ত আলোকে সকলের সামনে তাহা বাড়িয়া উঠিতেছে, এবং সকলকেই বাড়াইয়া তুলিতেছে।

এই যে কর্মসংসারে শত শত বছর ধরিয়া অপমানটা সহিলাম সেটা আমাদের কাছে দেখা দিয়াছে রাষ্ট্রীয় পরাধীনতার আকারে। যেখানে ব্যথা সেইখানেই হাত পড়ে। এইজন্যই যে-য়ুরোপীয় জাতি প্রভুত্ব পাইল তাদের রাষ্ট্রব্যবস্থার দিকেই আমাদের সমস্ত মন গেল। আমরা আর সব কথা ভুলিয়া কেবলমাত্র এই কথাই বলিতেছি যে, ভারতের শাসনতন্ত্রের সঙ্গে আমাদের ইচ্ছার যোগসাধন হ'ক - উপর হইতে যেমন-খুশি নিয়ম হানিবে আর আমরা বিনা খুশিতে সে-নিয়ম মানিব এমনটা না হয়। কর্তৃত্বকে কাঁধে চাপাইলেই বোঝা হইয়া ওঠে, ওটাকে এমন একটা চাকাওয়ালা ঠেলাগাড়ির উপর নামানো হ'ক যেটাকে আমরাও নিজের হাতে ঠেলিতে পারি।

আজকের দিনে এই প্রার্থনা পৃথিবীর সব দেশেই জাগিয়া উঠিয়াছে যে, বাহিরের কর্তার সম্পূর্ণ একতরফা শাসন হইতে মানুষ ছুটি লইবে। এই প্রার্থনায় আমরা যে

যোগ দিয়াছি তাহা কালের ধর্মে—না যদি দিতাম, যদি বলিতাম রাষ্ট্রব্যাপারে আমরা চিরকালই কর্তাভজা, সেটা আমাদের পক্ষে নিতান্ত লজ্জার কথা হইত। অন্তত একটা ফাটল দিয়াও সত্য আমাদের কাছে দেখা দিতেছে, এটাও শুভলক্ষণ।

সত্য দেখা দিল বলিয়াই আজ এতটা জোর করিয়া বলিতেছি যে, দেশের যে-আত্মাভিমানে আমাদের শক্তিকে সম্মুখের দিকে ঠেলা দিতেছে তাকে বলি সাধু, কিন্তু যে-আত্মাভিমান পিছনের দিকের অচল-খোঁটায় আমাদের বলির পাঁঠার মতো বাঁধিতে চায় তাকে বলি ধিক্! এই আত্মাভিমানে বাহিরের দিকে মুখ করিয়া বলিতেছি, রাষ্ট্রতন্ত্রের কর্তৃত্বসভায় আমাদের আসন পাতা চাই, আবার সেই অভিমানেই ঘরের দিকে মুখ ফিরাইয়া হাঁকিয়া বলিতেছি, "খবরদার, ধর্মতন্ত্রে, সমাজতন্ত্রে এমন কি ব্যক্তিগত ব্যবহারে কর্তার হুকুম ছাড়া এক পা চলিবে না"—ইহাকেই বলি হিন্দুয়ানির পুনরুজ্জীবন। দেশাভিমানের তরফ হইতে আমাদের উপর হুকুম আসিল, আমাদের এক চোখ জাগিবে আর এক চোখ ঘুমাইবে। এমন হুকুম তামিল করাই দায়।

বিধাতার শাস্তিতে আমাদের পিঠের উপর যখন বেত পড়িল তখন দেশাভিমান ধড়ফড় করিয়া বলিয়া উঠিল, "ওপড়াও ওই বেতবনটাকে।" ভুলিয়া গেছে বেতবনটা গেলেও বাঁশবনটা আছে। অপরাধ বেতেও নাই বাঁশেও নাই, আছে আপনার মধ্যেই। অপরাধটা এই যে সত্যের জায়গায় আমরা কর্তাকে মানি, চোখের চেয়ে চোখের ঠুলিকে শ্রদ্ধা করাই আমাদের চিরাভ্যাস। যতদিন এমনি চলিবে ততদিন কোনো-না-কোনো ঝোপে-ঝাড়ে বেতবন আমাদের জন্য অমর হইয়া থাকিবে।

সমাজের সকল বিভাগেই ধর্মতন্ত্রের শাসন এক সময়ে য়ুরোপেও প্রবল ছিল। তারই বেড়-জালটাকে কাটিয়া যখন বাহির হইল তখন হইতেই সেখানকার জনসাধারণ আত্মকর্তৃত্বের পথে যথেষ্ট লম্বা করিয়া পা ফেলিতে পারিল। ইংরেজের দ্বৈপায়নতা ইংরেজের পক্ষে একটা বড়ো সুযোগ ছিল। কেননা য়ুরোপীয় ধর্মতন্ত্রের প্রধান আসন রোমে। সেই রোমের পূর্ণপ্রভাব অস্বীকার করা বিচ্ছিন্ন ইংলণ্ডের পক্ষে কঠিন হয় নাই। ধর্মতন্ত্র বলিতে যা বোঝায় ইংলণ্ডে আজও তার কোনো চিহ্ন নাই, এমন কথা বলি না। কিন্তু বড়োঘরের গৃহিণী বিধবা হইলে যেমন হয় তার অবস্থা তেমনি। একসময়ে যাদের কাছে সে নথ-নাড়া দিয়াছে, ন্যায়ে অন্যায়ে আজ তাদেরই মন জোগাইয়া চলে; পাশের ঘরে তার বাসের জায়গা, খোরপোশের জন্য সামান্য কিছু মাসহারা বরাদ্দ। হালের ছেলেরা পূর্বদস্তুরমতো বুড়িকে হপ্তায় হপ্তায় প্রণাম করে বটে কিন্তু মান্য করে না। এই গৃহিণীর দাবরাব যদি পূর্বের মতো থাকিত তবে ছেলেমেয়েদের কারও আজ টুঁ শব্দ করিবার জো থাকিত না।

ইংলণ্ড এই বুড়ির শাসন অনেকদিন হইল কাটাইয়াছে কিন্তু স্পেন এখনও সম্পূর্ণ কাটায় নাই। একদিন স্পেনের পালে খুব জোর হাওয়া লাগিয়াছিল; সেদিন পৃথিবীর ঘাটে আঘাটায় সে আপনার জয়ধ্বজা উড়াইল। কিন্তু তার হালটার দিকে সেই বুড়ি বসিয়া ছিল, তাই আজ সে একেবারে পিছাইয়া পড়িয়াছে। প্রথম দমেই সে এতটা দৌড় দিল তবু একটু পরেই সে যে আর দম রাখিতে পারিল না, তার কারণ কী। তার কারণ, বুড়িটা বরাবর ছিল তার কাঁধে চড়িয়া। অনেকদিন আগেই সেদিন স্পেনের হাঁপের লক্ষণ দেখা যায় যেদিন ইংরেজের সঙ্গে স্পেনের রাজা ফিলিপের নৌযুদ্ধ বাধিল। সে-দিন হঠাৎ ধরা পড়িল স্পেনের ধর্মবিশ্বাসও যেমন সনাতন প্রথায় বাঁধা তার নৌযুদ্ধ-বিদ্যাও তেমনি। ইংরেজের যুদ্ধজাহাজ চঞ্চল জলহাওয়ার নিয়মকে ভালো করিয়া বুঝিয়া লইয়াছিল কিন্তু স্পেনীয়দের যুদ্ধজাহাজ নিজের অচল বাঁধি নিয়মকে ছাড়িতে পারে নাই। যার নৈপুণ্য বেশি, তার কৌলীন্য যেমনি থাক, সে ইংরেজ-যুদ্ধজাহাজের সর্দার হইতে পারিত কিন্তু কুলীন ছাড়া স্পেনীয় রণতরীর পতিপদে কারও অধিকার ছিল না।

আজ য়ুরোপের ছোটোবড়ো যে-কোনো দেশেই জনসাধারণ মাথা তুলিতে পারিয়াছে, সর্বত্রই ধর্মতন্ত্রের অন্ধ কর্তৃত্ব আলগা হইয়া মানুষ নিজেকে শ্রদ্ধা করিতে শিখিয়াছে। গণসমাজে যেখানে এই শ্রদ্ধা নাই—যেমন রাশিয়ায়—সেখানকার সমাজ বেওয়ারিস ক্ষেত্রের মতো নানা কর্তার কাঁটাগাছে জঙ্গল হইয়া ওঠে। সেখানে একালের পেয়াদা হইতে সেকালের পুঁথি পর্যন্ত সকলেই মনুষ্যত্বের কান মলিয়া অন্যায় খাজনা আদায় করে।

মনে রাখা দরকার, ধর্ম আর ধর্মতন্ত্র এক জিনিস নয়। ও যেন আগুন আর ছাই। ধর্মতন্ত্রের কাছে ধর্ম যখন খাটো হয় তখন নদীর বালি নদীর জলের উপর মোড়লি করিতে থাকে। তখন স্রোত চলে না, মরুভূমি ধুধু করে। তার উপরে, সেই অচলতাটাকে লইয়াই মানুষ যখন বুক ফোলায় তখন গণ্ডস্যোপরি বিস্ফোটকং।

ধর্ম বলে, মানুষকে যদি শ্রদ্ধা না কর তবে অপমানিত ও অপমানকারী কারও কল্যাণ হয় না। কিন্তু ধর্মতন্ত্র বলে, মানুষকে নির্দয়ভাবে অশ্রদ্ধা করিবার বিস্তারিত নিয়মাবলী যদি নিখুঁত করিয়া না মান তবে ধর্মভ্রষ্ট হইবে। ধর্ম বলে, জীবকে নিরর্থক কষ্ট যে দেয় সে আত্মাকেই হনন করে। কিন্তু ধর্মতন্ত্র বলে, যত অসহ্য কষ্টই হ'ক্, বিধবা মেয়ের মুখে যে বাপ মা বিশেষ তিথিতে অন্নজল তুলিয়া দেয় সে পাপকে লালন করে। ধর্ম বলে, অনুশোচনা ও কল্যাণকর্মের দ্বারা অন্তরে বাহিরে পাপের শোধন। কিন্তু ধর্মতন্ত্র বলে, গ্রহণের দিনে বিশেষ জলে ডুব দিলে, কেবল নিজের নয়, চোদ্দপুরুষের

পাপ উদ্ধার। ধর্ম বলে, সাগরগিরি পার হইয়া পৃথিবীটাকে দেখিয়া লও, তাতেই মনের বিকাশ। ধর্মতন্ত্র বলে, সমুদ্র যদি পারাপার কর তবে খুব লম্বা করিয়া নাকে খত দিতে হইবে। ধর্ম বলে, যে মানুষ যথার্থ মানুষ সে যে-ঘরেই জন্মাক পূজনীয়। ধর্মতন্ত্র বলে, যে মানুষ ব্রাহ্মণ সে যতবড়ো অভাজনই হ'ক মাথায় পা তুলিবার যোগ্য। অর্থাৎ মুক্তির মন্ত্র পড়ে ধর্ম আর দাসত্বের মন্ত্র পড়ে ধর্মতন্ত্র।

আমি জানি একদিন একজন রাজা কলিকাতায় আর-এক রাজার সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলেন। বাড়ি যাঁর তিনি কালেজে পাস-করা সুশিক্ষিত। অতিথি যখন দেখা সারিয়া গাড়িতে উঠিবেন এমন সময় বাড়ি যাঁর তিনি রাজার কাপড় ধরিয়া টানিলেন, বলিলেন, "আপনার মুখে পান!" গাড়ি যাঁর তিনি দায়ে পড়িয়া মুখের পান ফেলিলেন, কেননা সারথি মুসলমান। এ-কথা জিজ্ঞাসা করিবার অধিকারই নাই "সারথি যেই হ'ক মুখের পান ফেলা যায় কেন?" ধর্মবুদ্ধিতে বা কর্মবুদ্ধিতে কোথাও কিছুমাত্র আটক না খাইলেও গাড়িতে বসিয়া স্বচ্ছন্দে পান খাইবার স্বাধীনতাটুকু যে দেশের মানুষ অনায়াসে বর্জন করিতে প্রস্তুত সে-দেশের লোক স্বাধীনতার অন্ত্যেষ্টি সংকার করিয়াছে। অথচ দেখি যারা গোড়ায় কোপ দেয় তারাই আগায় জল ঢালিবার জন্য ব্যস্ত।

নিষ্ঠা পদার্থের একটা শোভা আছে। কোনো কোনো বিদেশী এদেশে আসিয়া সেই শোভার ব্যাখ্যা করেন। এটাকে বাহির হইতে তাঁরা সেইভাবেই দেখেন একজন আর্টিস্ট পুরানো ভাঙা বাড়ির চিত্রযোগ্যতা যেমন করিয়া দেখে, তার বাসযোগ্যতার খবর লয় না। স্নানযাত্রার পরবে বরিশাল হইতে কলিকাতায় আসিতে গঙ্গাস্নানের যাত্রী দেখিয়াছি, তার বেশির ভাগ স্ত্রীলোক। স্টীমারের ঘাটে ঘাটে, রেলওয়ের স্টেশনে স্টেশনে তাদের কষ্টের অপমানের সীমা ছিল না। বাহিরের দিক হইতে এই ব্যাকুল সহিষ্ণুতার সৌন্দর্য আছে। কিন্তু আমাদের দেশের অন্তর্যামী এই অন্ধ নিষ্ঠার সৌন্দর্যকে গ্রহণ করেন নাই। তিনি পুরস্কার দিলেন না, শাস্তিই দিলেন। দুঃখ বাড়িতেই চলিল। এই মেয়েরা মানত-স্বস্ত্যয়নের বেড়ার মধ্যে যে সব ছেলে মানুষ করিয়াছে ইহকালের সমস্ত বস্তুর কাছেই তারা মাথা হেঁট করিল এবং পরকালের সমস্ত ছায়ার কাছেই তারা মাথা খুঁড়িতে লাগিল। নিজের কাজের বাধাকে রাস্তার বাঁকে বাঁকে গাড়িয়া দেওয়াই এদের কাজ, এবং নিজের উন্নতির অন্তরায়কে আকাশপরিমাণ উঁচু করিয়া তোলাকেই এরা বলে উন্নতি। সত্যের জন্য মানুষ কষ্ট সহিবে এইটেই সুন্দর। কানা-বুদ্ধি কিম্বা খোঁড়া-শক্তির হাত হইতে মানুষ লেশমাত্র কষ্ট যদি সয় তবে সেটা কুদৃশ্য। কারণ, বিধাতা আমাদের সব চেয়ে বড়ো যে-সম্পদ দিয়াছেন—

ত্যাগ-স্বীকারের বীরত্ব—এই কষ্ট তারই বেহিসাবি বাজে খরচ। আজ তারই নিকাশ আমাদের চলিতেছে—ইহার ঋণের ফর্দটাই মোটা। চোখের সামনে দেখিয়াছি হাজার হাজার মেয়েপুরুষ পুণ্যের সন্ধানে যে-পথ দিয়া স্নানে চলিয়াছে ঠিক তারই ধারে মাটিতে পড়িয়া একটি বিদেশী রোগী মরিল, সে কোন্ জাতের মানুষ জানা ছিল না বলিয়া কেহ তাহাকে ছুঁইল না। এই তো ঋণদায়ে দেউলিয়ার লক্ষণ। এই কষ্টসহিষ্ণু পুণ্যকামীদের নিষ্ঠা দেখিতে সুন্দর কিন্তু ইহার লোকসান সর্বনেশে। যে-অন্ধতা মানুষকে পুণ্যের জন্য জলে স্নান করিতে ছোটায় সেই অন্ধতাই তাকে অজানা মুমূর্ষুর সেবায় নিরস্ত করে। একলব্য পরম নিষ্ঠুর দ্রোণাচার্যকে তার বুড়া আঙুল কাটিয়া দিল, কিন্তু এই অন্ধ নিষ্ঠার দ্বারা সে নিজের চিরজীবনের তপস্যাফল হইতে তার সমস্ত আপন জনকে বঞ্চিত করিয়াছে। এই যে মূঢ় নিষ্ঠার নিরতিশয় নিষ্ফলতা, বিধাতা ইহাকে সমাদর করেন না—কেননা ইহা তাঁর দানের অবমাননা। গয়াতীর্থে দেখা গেছে, যে-পাণ্ডার না আছে বিদ্যা, না আছে চরিত্র, ধনী স্ত্রীলোক রাশি রাশি টাকা ঢালিয়া দিয়া তার পা পূজা করিয়াছে। সেই সময়ে তার ভক্তিবিহ্বলতা ভাবুকের চোখে সুন্দর কিন্তু এই অবিচলিত নিষ্ঠা, এই অপরিমিত বদান্যতা কি সত্য দয়ার পথে এই স্ত্রীলোককে এক-পা অগ্রসর করিয়াছে। ইহার উত্তর এই যে, তবু তো সে টাকাটা খরচ করিতেছে; সে যদি পাণ্ডাকে পবিত্র বলিয়া না মানিত তবে টাকা খরচ করিতই না, কিম্বা নিজের জন্য করিত। সে-কথা ঠিক,—কিন্তু তার একটা মস্ত লাভ হইত এই যে, সেই খরচ-না-করাটাকে কিম্বা নিজের জন্য খরচ-করাটাকে সে ধর্ম বলিয়া নিজেকে ভোলাইত না,—এই মোহের দাসত্ব হইতে তার মন মুক্ত থাকিত। মনের এই মুক্তির অভাবেই দেশের শক্তি বাহিরে আসিতে পারিতেছে না। কেননা যাকে চোখ বুজিয়া চালানো অভ্যাস করানো হইয়াছে, চোখ খুলিয়া চলিতে তার পা কাঁপে, অনুগত দাসের মতো যে কেবল মনিবের জন্যই প্রাণ দিতে শিখিয়াছে, আপনি প্রভু হইয়া স্বেচ্ছায় ন্যায়ধর্মের জন্য প্রাণ দেওয়া তার পক্ষে অসাধ্য।

এই জন্যই আমাদের পাড়াগাঁয়ে অন্ন জল স্বাস্থ্য শিক্ষা আনন্দ সমস্ত আজ ভাঁটার মুখে। আত্মশক্তি না জাগাইতে পারিলে পল্লীবাসীর উদ্ধার নাই—এই কথা মনে করিয়া, নিজের কল্যাণ নিজে করিবার শক্তিকে একটা বিশেষ পাড়ায় জাগাইবার চেষ্টা করিলাম। একদিন পাড়ায় আগুন লাগিল; কাছে কোথাও এক ফোঁটা জল নাই; পাড়ার লোক দাঁড়াইয়া 'হায় হায়' করিতেছে। আমি তাদের বলিলাম, "নিজের মজুরি দিয়া যদি তোমরা পাড়ায় একটা কুয়ো খুঁড়িয়া দাও আমি তার বাঁধাইবার খরচা দিব।" তারা ভাবিল, পুণ্য হইবে ওই সেয়ানা লোকটার, আর তার মজুরি জোগাইব

আমরা, এটা ফাঁকি। সে কুয়ো খোঁড়া হইল না, জলের কষ্ট রহিয়া গেল, আর আগুনের সেখানে বাঁধা নিমন্ত্রণ।

এই যে অটল দুর্দশা, এর কারণ,—গ্রামের যা-কিছু পূর্তকার্য তা এ-পর্যন্ত পুণ্যের প্রলোভনে ঘটিয়াছে। তাই মানুষের সকল অভাবই পূরণ করিবার বরাত হয় বিধাতার 'পরে, নয় কোনো আগন্তুকের উপর। পুণ্যের উমেদার যদি উপস্থিত না থাকে তবে এরা জল না-খাইয়া মরিয়া গেলেও নিজের হাতে এক কোদাল মাটিও কাটিবে না। কেননা এরা এখনও সেই বুড়ির কোল থেকে নামে নাই যে-বুড়ি এদের জাতিকুল ধর্মকর্ম ভালোমন্দ শোওয়াবসা সমস্তই বাহির হইতে বাঁধিয়া দিয়াছে। ইহাদের দোষ দিতে পারি না, কেননা বুড়ি এদের মনটাকেই আফিম খাওয়াইয়া ঘুম পাড়াইয়াছে। কিন্তু অবাক হইতে হয় যখন দেখি, এখনকার কালের শিক্ষিত যুবকেরা, এমন কি, কালেজের তরুণ ছাত্রেরাও এই বুড়িতন্ত্রের গুণ গাহিতেছেন। ভারতবর্ষকে সনাতন ধাত্রীর কাঁখে চড়িতে দেখিয়া ইহাদের ভারি গর্ব; বলেন, ওটা বড়ো উচ্চ জায়গা, ওখান হইতে পা মাটিতেই পড়ে না; বলেন, ওই কাঁখে থাকিয়াই আত্মকর্তৃত্বের রাজদণ্ড হাতে ধরিলে বড়ো শোভা হইবে।

অথচ স্পষ্ট দেখি, দুঃখের পর দুঃখ, দুর্ভিক্ষের পর দুর্ভিক্ষ; যমলোকের যতগুলি চর আছে সবগুলিই আমাদের ঘরে ঘরে বাসা লইল। বাঘে ডাকাতে তাড়া করিলেও যেমন আমাদের অস্ত্র তুলিবার হুকুম নাই তেমনি এই অমঙ্গলগুলো লাফ দিয়া যখন ঘাড়ের উপর দাঁত বসাইতে আসে তখন দেখি সামাজিক বন্দুকের পাস নাই। ইহাদিগকে খেদাইবার অস্ত্র জ্ঞানের অস্ত্র, বিচারবুদ্ধির অস্ত্র। বুড়ির শাসনের প্রতি যাঁদের ভক্তি অটল তাঁরা বলেন, "ওই অস্ত্রটা কি আমাদের একেবারে নাই? আমরাও সায়ান্স শিখিব এবং যতটা পারি খাটাইব।" অস্ত্র একেবারে নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় কিন্তু অস্ত্র-পাসের আইনটা বিষম কড়া। অস্ত্র ব্যবহার করিতে দিয়াও যতটা না-দিতে পারা যায় তারই উপর ষোলো আনা ঝোঁক। ব্যবহারের গণ্ডি এতই, তার একটু এদিক-ওদিক হইলেই এত দুর্জয় কানমলা, সমস্ত গুরুপুরোহিত তাগাতাবিজ সংস্কৃত শ্লোক ও মেয়েলি মন্ত্র এত ভয়ে ভয়ে সাবধানে বাঁচাইয়া চলিতে হয় যে, ডাকাত পড়িলে ডাকাতের চেয়ে অনভ্যাসের বন্দুকটা লইয়াই ফাঁপরে পড়িতে হয়।

যাই হ'ক, পায়ের বেড়িটা অক্ষয় হ'ক বলিয়াই যখন আশীর্বাদ করা হইল তখন দয়ালু লোক এ-কথাও বলিতে বাধ্য যে, মানুষদের কাঁধে করিয়া বেড়াইতে প্রস্তুত হও। যত রাজ্যের জাতের বেড়া, আচারের বেড়া মেরামত করিয়া পাকা করাই যদি পুনরুজ্জীবন হয়, যদি এমনি করিয়া জীবনের ক্ষেত্রকে বাধাগ্রস্ত ও বুদ্ধির ক্ষেত্রকে সংকীর্ণ

করাই আমাদের গৌরবের কথা হয় তবে সেই সঙ্গে এ-কথাও বলিতে হয়, এই অক্ষমদের দুই বেলা লালন করিবার জন্য দল বাঁধো। কিন্তু দুই বিপরীত কূলকে এক সঙ্গে বাঁচাইবার সাধ্য কোনো শক্তিমানেরই নাই। তৃষার্তের ঘড়াঘটি সমস্ত চুরমার করিবে, তার পরে চালুনি দিয়া জল আনিতে ঘন ঘন ঘাটে-ঘরে আনাগোনা, এ আবদার বিধাতার সহ্য হয় না।

অনেকে বলেন, এদেশে পদে পদে এত দুঃখদারিদ্র্য, তার মূল কারণ এখানকার সম্পূর্ণ শাসনভার পরজাতির উপর। কথাটাকে বিচার করিয়া দেখা দরকার।

ইংরেজ-রাষ্ট্রনীতির মূলতত্ত্বই রাষ্ট্রতন্ত্রের সঙ্গে প্রজাদের শক্তির যোগ। এই রাষ্ট্রতন্ত্র চিরদিনই একতরফা আধিপত্যের বুকে শেল হানিয়াছে, এ-কথা আমাদের কাছেও কিছুমাত্র ঢাকা নাই। এই কথাই সরকারি বিদ্যালয়ে আমরা সদরে বসিয়া পড়ি, শিখি, এবং পড়িয়া এগজামিন পাস করি। এ-কথাটাকে এখন আমাদের কাছ হইতে ফিরাইয়া লইবার আর উপায় নাই।

কন্‌গ্রেস বল, লীগ বল, এ-সমস্তর মূলই এইখানে। যেমন য়ুরোপীয় সায়ান্সে আমাদের সকলেরই অধিকারটা সেই সায়ান্সেরই প্রকৃতিগত, তেমনি ইংরেজ-রাষ্ট্রতন্ত্রে ভারতের প্রজার আপন অধিকার সেই রাষ্ট্রনীতিরই জীবনধর্মের মধ্যেই। কোনো একজন বা দশজন বা পাঁচশজন ইংরেজ বলিতে পারে, ভারতীয় ছাত্রকে সায়ান্স শিখিবার সুযোগটা না দেওয়াই ভালো, কিন্তু সায়ান্স সেই পাঁচশ ইংরেজের কণ্ঠকে লজ্জা দিয়া বজ্রস্বরে বলিবে, "এস তোমরা, তোমাদের বর্ণ যেমনি হ'ক, তোমাদের দেশ যেখানেই থাক, আমাকে গ্রহণ করিয়া শক্তি লাভ করো।" তেমনি কোনো দশজন বা দশহাজারজন ইংরেজ রাজসভার মঞ্চে বা খবরের কাগজের স্তম্ভে চড়িয়া বলিতেও পারে যে, ভারতশাসনতন্ত্রে ভারতীয় প্রজার কর্তৃত্বকে নানাপ্রকারে প্রবেশে বাধা দেওয়াই ভালো, কিন্তু সেই দশহাজার ইংরেজের মন্ত্রণাকে তিরস্কার করিয়া ইংরেজের রাষ্ট্রনীতি বজ্রস্বরে বলিতেছে, "এস তোমরা, তোমাদের বর্ণ যেমনি হ'ক, তোমাদের দেশ যেখানেই থাক, ভারতশাসনতন্ত্রে ভারতীয় প্রজার আপন অধিকার আছে, তাহা গ্রহণ করো।"

কিন্তু ইংরেজের রাষ্ট্রনীতি আমাদের বেলায় খাটে না, এমন একটা কড়া জবাব শুনিবার আশঙ্কা আছে। ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ যেমন বলিয়াছিল উচ্চতর জ্ঞানে ধর্মে কর্মে শূদ্রের অধিকার নাই, এও সেই রকমের কথা। কিন্তু ব্রাহ্মণ এই অধিকারভেদের ব্যবস্থাটাকে আগাগোড়া পাকা করিয়া গাঁথিয়াছিল—যাহাকে বাহিরে পঙ্গু করিবে তার মনকেও পঙ্গু করিয়াছিল। জ্ঞানের দিকে গোড়া কাটা পড়িলেই কর্মের দিকে ডালপালা

আপনি শুকাইয়া যায়। শূদ্রের সেই জ্ঞানের শিকড়টা কাটিতেই আর বেশি কিছু করিতে হয় নাই; তার পর হইতে তার মাথাটা আপনিই নুইয়া পড়িয়া ব্রাহ্মণের পদরজে আসিয়া ঠেকিয়া রহিল। ইংরেজ আমাদের জ্ঞানের দ্বার বন্ধ করে নাই, অথচ সেইটেই মুক্তির সিংহদ্বার। রাজপুরুষেরা সেজন্য বোধ করি মনে মনে আপসোস করেন এবং আস্তে আস্তে বিদ্যালয়ের দুটো-একটা জানলাদরজাও বন্ধ করিবার গতিক দেখি,—কিন্তু তবু একথা তাঁরা কোনোদিন একেবারে ভুলিতে পারিবেন না যে, সুবিধার খাতিরে নিজের মনুষ্যত্বকে আঘাত করিলে ফলে সেটা আত্মহত্যার মতোই হয়।

ভারতশাসনে আমাদের ন্যায্য অধিকারটা ইংরেজের মনস্তত্ত্বের মধ্যেই নিহিত—এই আশার কথাটাকে যদি আমাদের শক্তি দিয়া ধরিতে পারি তবে ইহার জন্য বিস্তর দুঃখ সহা, ত্যাগ করা. আমাদের পক্ষে সহজ হয়। যদি আমাদের দুর্বল অভ্যাসে বলিয়া বসি, কর্তার ইচ্ছা কর্ম, ওর আর নড়চড় নাই, তবে যে সুগভীর নৈরাশ্য আসে, তার দুই রকমের প্রকাশ দেখিতে পাই—হয় গোপনে চক্রান্ত করিয়া. আকস্মিক উপদ্রবের বিস্তার করিতে থাকি, নয় ঘরের কোণে বসিয়া পরস্পরের কানে-কানে বলি, অমুক লাটসাহেব ভালো কিম্বা মন্দ, অমুক ব্যক্তি মন্ত্রিসভায় সচিব থাকিতে আমাদের কল্যাণ নাই, মর্লি সাহেব ভারতসচিব হইলে হয়তো আমাদের সুদিন হইবে, নয়তো আমাদের ভাগ্যে এই বিড়াল বনে গিয়া বনবিড়াল হইয়া উঠিবে। অর্থাৎ নৈরাশ্যে, হয় আমাদের মাটির তলার সুরঙ্গের মধ্যে ঠেলিয়া শক্তির বিকার ঘটায়, নয় গৃহকোণের বৈঠকে বসাইয়া শক্তির ব্যর্থতা সৃষ্টি করে; হয় উন্মাদ করিয়া তোলে, নয় হাবা করিয়া রাখে।

কিন্তু মনুষ্যত্বকে অবিশ্বাস করিব না; এমন জোরের সঙ্গে চলিব, যেন ইংরেজ-রাষ্ট্রনীতির মধ্যে কেবল শক্তিই সত্য নহে, নীতি তার চেয়ে বড়ো সত্য। প্রতিদিন তার বিরুদ্ধতা দেখিব; দেখিব স্বার্থপরতা, ক্ষমতাপ্রিয়তা, লোভ, ক্রোধ, ভয় ও অহংকার সমস্তরই লীলা চলিতেছে; কিন্তু মানুষের এই রিপুগুলো সেইখানেই আমাদের মারে যেখানে আমাদের অন্তরেও রিপু আছে, যেখানে আমরাও ক্ষুদ্র ভয়ে ভীত, ক্ষুদ্র লোভে লুব্ধ, যেখানে আমাদের পরস্পরের প্রতি ঈর্ষা বিদ্বেষ অবিশ্বাস। যেখানে আমরা বড়ো, আমরা বীর, আমরা ত্যাগী তপস্বী শ্রদ্ধাবান, সেখানে অন্যপক্ষে যাহা মহৎ তার সঙ্গে আমাদের সত্য যোগ হয়; সেখানে অন্য পক্ষের রিপুর মার খাইয়াও তবু আমরা জয়ী হই, বাহিরে না হইলেও অন্তরে। আমরা যদি ভিতু হই, ছোটো হই, তবে ইংরেজ-গবর্মেন্টের নীতিকে খাটো করিয়া তার রিপুটাকেই প্রবল করিব। যেখানে দুই পক্ষ লইয়া কারবার সেখানে দুই পক্ষের শক্তির যোগেই শক্তির উৎকর্ষ, দুই পক্ষের দুর্বলতার যোগে চরম দুর্বলতা। অব্রাহ্মণ যখনই জোড়হাতে অধিকারহীনতা মানিয়া লইল,

ব্রাহ্মণের অধঃপতনের গর্তটা তখনই গভীর করিয়া খোঁড়া হইল। সবল দুর্বলের পক্ষে যতবড়ো শত্রু, দুর্বল সবলের পক্ষে তার চেয়ে কম বড়ো শত্রু নয়।

একজন উচ্চপদস্থ ইংরেজ-রাজপুরুষ আমাকে বলিয়াছিলেন, "তোমরা প্রায়ই বল, পুলিস তোমাদের 'পরে অত্যাচার করে, আমিও তা অবিশ্বাস করি না, কিন্তু তোমরা তো তার প্রমাণ দাও না।" বলা বাহুল্য, পুলিসের সঙ্গে লাঠালাঠি মারামারি করো, একথা তিনি বলেন না। কিন্তু অন্যায়ের সঙ্গে লড়াই তো গায়ের জোরে নয়, সে তো তেজের লড়াই, সে তেজ কর্তব্যবুদ্ধির। দেশকে নিরন্তর পীড়ন হইতে বাঁচাইবার জন্য একদল লোকের তো বুকের পাটা থাকা চাই, অন্যায়কে তারা প্রাণপণে প্রমাণ করিবে, পুনঃপুনঃ ঘোষণা করিবে। জানি, পুলিসের একজন চৌকিদারও একজন মানুষমাত্র নয়, সে একটা প্রকাণ্ড শক্তি। একটি পুলিসের পেয়াদাকে বাঁচাইবার জন্য মকদ্দমায় গবর্মেণ্টের হাজার হাজার টাকা খরচ হয়। অর্থাৎ আদালত-মহাসমুদ্র পার হইবার বেলায় পেয়াদার জন্য সরকারি স্টীমার, আর গরিব ফরিয়াদিকে তুফানে সাঁতার দিয়া পার হইতে হইবে, একখানা কলার ভেলাও নাই। এ যেন একরকম স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দেওয়া, "বাপু, মার যদি খাও তবে নিঃশব্দে মরাটাই অতীব স্বাস্থ্যকর।" এর পরে আর হাত পা চলে না। প্রেস্টিজ! ওটা যে আমাদের অনেকদিনের চেনা লোক। ওই তো কর্তা, ওই তো আমাদের কবিকঙ্কণের চণ্ডী, ওই তো বেহুলাকাব্যের মনসা, ন্যায় ধর্ম সকলের উপরে ওকেই তো পূজা দিতে হইবে, নহিলে হাড় গুঁড়া হইয়া যাইবে! অতএব—

যা দেবী রাজ্যশাসনে
প্রেস্টিজ-রূপেণ সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ
নমস্তস্যৈ নমোনমঃ।

কিন্তু ইহাই তো অবিদ্যা, ইহাই তো মায়া। যেটা স্থূলচোখে প্রতীয়মান হইতেছে তাই কি সত্য? আসল সত্য, আমাকে লইয়াই গবর্মেণ্ট। এই সত্য সমস্ত রাজপুরুষের চেয়ে বড়ো। এই সত্যের উপরই ইংরেজ বলী—সেই বল আমারও বল। ইংরেজ-গবর্মেণ্টও এই সত্যকে হারায়, যদি এই সত্যের বল আমার মধ্যেও না থাকে। আমি যদি ভীরু হই, ইংরেজ রাষ্ট্রতন্ত্রের নীতিতত্ত্বে আমার যদি শ্রদ্ধা না থাকে, তবে পুলিস অত্যাচার করিবেই, ম্যাজিস্ট্রেটের পক্ষে সুবিচার কঠিন হইবেই, প্রেস্টিজ দেবতা নরবলি দাবি করিতেই থাকিবে এবং ইংরেজের শাসন ইংরেজের চিরকালীন ঐতিহাসিক ধর্মের প্রতিবাদ করিবে।

এ-কথার উত্তরে শুনিব "রাষ্ট্রতন্ত্রে নীতিই শক্তির চেয়ে সত্য এই কথাটাকে পারমার্থিকভাবে মানা চলে কিন্তু ব্যবহারিকভাবে মানিতে গেলে বিপদ আছে, অতএব হয় গোপনে পরম-নিঃশব্দ গরম-পন্থা—নয়তো প্রেস অ্যাক্টের মুখ-থাবার নিচে পরম-নিঃশব্দ নরম-পন্থা।"

"হাঁ, বিপদ আছে বই কি, তবু জ্ঞানে যা সত্য ব্যবহারেও তাকে সত্য করিব।"

"কিন্তু আমাদের দেশের লোকেই ভয়ে কিংবা লোভে ন্যায়ের পক্ষে সাক্ষ্য দিবে না বিরুদ্ধেই দিবে।"

"এ-কথাও ঠিক। তবু সত্যকে মানিয়া চলিতে হইবে।"

"কিন্তু আমাদের দেশের লোকেই প্রশংসা কিংবা পুরস্কারের লোভে ঝোপের মধ্য হইতে আমার মাথায় বাড়ি মারিবে।"

"একথাও ঠিক। তবুও সত্যকে মানিতে হইবে।"

"এতটা কি আশা করা যায়?"

হাঁ, এতটাই আশা করিতে হইবে, ইহার একটুকুও কম নয়। গবর্মেন্টের কাছ হইতেও আমরা বড়ো দাবিই করিব কিন্তু নিজেদের কাছ হইতে তার চেয়ে আরও বড়ো দাবি করিতে হইবে, নহিলে অন্য দাবি টিঁকিবে না। এ-কথা মানি, সকল মানুষই বলিষ্ঠ হয় না এবং অনেক মানুষই দুর্বল; কিন্তু সকল বড়ো দেশেই প্রত্যেকদিনই অনেকগুলি করিয়া মানুষ জন্মেন যাঁরা সকল মানুষের প্রতিনিধি—যাঁরা সকলের দুঃখকে আপনি বহেন, সকলের পথকে আপনি কাটেন, যাঁরা সমস্ত বিরুদ্ধতার মধ্যেও মনুষ্যত্বকে বিশ্বাস করেন এবং ব্যর্থতার গভীরতম অন্ধকারের পূর্ব প্রান্তে অরুণোদয়ের প্রতীক্ষায় জাগিয়া থাকেন। তাঁরা অবিশ্বাসীর সমস্ত পরিহাসকে উপেক্ষা করিয়া জোরের সঙ্গে বলেন—

"স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ"

অর্থাৎ কেন্দ্রস্থলে যদি স্বল্পমাত্রও ধর্ম থাকে তবে পরিধির দিকে রাশি রাশি ভয়কেও ভয় করিবার দরকার নাই। রাষ্ট্রতন্ত্রে নীতি যদি কোনোখানেও থাকে তবে তাহাকেই নমস্কার—ভীতিকে নয়। ধর্ম আছে, অতএব মরা পর্যন্ত মানিয়াও তাহাকে মানিতে হইবে।

মনে করো ছেলের শক্ত ব্যামো। সেজন্য দূর হইতে স্বয়ং ইংরেজ সিভিল সার্জনকে আনিয়াছি। খরচ বড়ো কম করি নাই। যদি হঠাৎ দেখি তিনি মন্ত্র পড়িয়া মারিয়া-ধরিয়া ভূতের ওঝার মতো বিষম ঝাড়াঝুড়ি শুরু করিলেন, রোগীর আত্মাপুরুষ ত্রাহি ত্রাহি করিতে লাগিল তবে ডাক্তারকে জোর করিয়াই বলিব; "দোহাই সাহেব, ভূত ঝাড়াইবেন না, চিকিৎসা করুন।" তিনি চোখ রাঙাইয়া বলিতে পারেন, "তুমি কে হে। আমি

ডাক্তার যাই করি না তাই ডাক্তারি।" ভয়ে যদি বুদ্ধি দমিয়া না যায় তবে তাঁকে আমার একথা বলিবার অধিকার আছে "যে ডাক্তারি-তত্ত্ব লইয়া তুমি ডাক্তার আমি তাকে তোমার চেয়ে বড়ো বলিয়াই জানি, তার মূল্যেই তোমার মূল্য।"

এই যে অধিকার এর সকলের চেয়ে বড়ো জোর ওই ডাক্তার সম্প্রদায়েরই ডাক্তারি-শাস্ত্রে এবং ধর্মনীতির মধ্যে। ডাক্তার যতই আস্ফালন করুক এই বিজ্ঞান এবং নীতির দোহাই মানিলে লজ্জা না পাইয়া সে থাকিতেই পারে না। এমন কি, রাগের মুখে সে আমাকে ঘুষিও মারিতে পারে—কিন্তু তবু আস্তে আস্তে আমার সেলাম এবং সেলামিটি পকেটে করিয়া গাড়িতে বসার চেয়ে এই ঘুষির মূল্য বড়ো। এই ঘুষিতে সে আমাকে যত মারে নিজেকে তার চেয়ে বেশি মারে। তাই বলিতেছি, যে-কথাটা ইংরেজের কথা নয় কেবলমাত্র ইংরেজ আমলাদের কথা, সে-কথায় যদি আমরা সায় না দিই তবে আজ দুঃখ ঘটিতে পারে কিন্তু কাল দুঃখ কাটিবে।

দেড়-শ বছর ভারতে ইংরেজ-শাসনের পর আজ এমন কথা শোনা গেল, মাদ্রাজ গবর্মেণ্ট ভালোমন্দ যাই করুক বাংলা দেশে তা লইয়া দীর্ঘনিশ্বাসটি ফেলিবার অধিকার বাঙালির নাই। এত দিন এই জানিতাম, ইংরেজের অখণ্ড শাসনে মাদ্রাজ বাংলা পাঞ্জাব মারাঠা ভিতরে বাহিরে এক হইয়া উঠিতেছে এই গৌরবই ইংরেজ সাম্রাজ্যের মুকুটের কোহিনুর মণি। বেলজিয়ম ও ফ্রান্সের দুর্গতিকে আপন দুর্গতি মনে করিয়া ইংরেজ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিতে ছুটিয়াছে, সমুদ্রের পশ্চিম পারে যখন এই বার্তা তখন সমুদ্রের পূর্ব-পারে এমন নীতি কি একদিনও খাটিবে যে, মাদ্রাজের ভালোমন্দ সুখ-দুঃখে বাঙালির কোনো মাথাব্যথা নাই? এমন হুকুম কি আমরা মাথা হেঁট করিয়া মানিব? এ-কথা কি নিশ্চয় জানি না যে, মুখে এই হুকুম যত জোরেই হাঁকা হউক অন্তরে ইহার পিছনে মস্ত একটা লজ্জা আছে? ইংরেজের সেই অন্যায়ের গোপন লজ্জা আর আমাদের মনুষ্যত্বের প্রকাশ্য সাহস—এই দুয়ের মধ্যে মিল করিতে হইবে। ইংরেজ ভারতের কাছে সত্যে বদ্ধ; ইংরেজ য়ুরোপীয় সভ্যতার দায়িত্ব বহিয়া এই পূর্ব দেশে আসিয়াছে; সেই সভ্যতার বাণীই তাহার প্রতিশ্রুতি-বাণী। সেই দলিলকেই আমরা সব চেয়ে বড়ো দলিল করিয়া চলিব,—এ-কথা তাকে কখনোই বলিতে দিব না যে, ভারতবর্ষকে আমরা টুকরা টুকরা করিয়া মাছকাটা করিবার জন্যই সমুদ্র পার হইয়া আসিয়াছি।

যে-জাতি কোনো বড় সম্পদ পাইয়াছে সে তাহা দেশে দেশে দিকে দিকে দান করিবার জন্যই পাইয়াছে। যদি সে কৃপণতা করে তবে সে নিজেকেই বঞ্চিত করিবে। য়ুরোপের প্রধান সম্পদ বিজ্ঞান এবং জনসাধারণের ঐক্যবোধ ও আত্মকর্তৃত্ব লাভ। এই সম্পদ এই শক্তি ভারতকে দিবার মহৎ দায়িত্বই ভারতে ইংরেজ-শাসনের বিধিদত্ত

রাজ-পরোয়ানা। এই কথা শাসনকর্তাদের স্মরণ করাইবার ভার আমাদের উপরেও আছে। কারণ, দুই পক্ষের যোগ না হইলে বিস্মৃতি ও বিকার ঘটে।

ইংরেজ নিজের ইতিহাসের দোহাই দিয়া এমন কথা বলিতে পারে—"জনসাধারণের আত্মকর্তৃত্বটি যে একটি মস্ত জিনিস তা আমরা নানা বিপ্লবের মধ্য দিয়া তবে বুঝিয়াছি এবং নানা সাধনার মধ্য দিয়া তবে সেটাকে গড়িয়া তুলিয়াছি।" এ-কথা মানি। জগতে এক-এক অগ্রগামী দল এক-এক বিশেষ সত্যকে আবিষ্কার করে। সেই আবিষ্কারের গোড়ায় অনেক ভুল, অনেক দুঃখ, অনেক ত্যাগ আছে। কিন্তু তার ফল যারা পায় তাহাদিগকে সেই ভুল সেই দুঃখের সমস্ত লম্বা রাস্তাটা মাড়াইতে হয় না। দেখিলাম, বাঙালির ছেলে আমেরিকায় গিয়া হাতে-কলমে এঞ্জিন গড়িল এবং তার তত্ত্বও শিখিয়া লইল কিন্তু আগুনে কাৎলি চড়ানো হইতে শুরু করিয়া স্টীম এঞ্জিনের সমস্ত ঐতিহাসিক পালা যদি তাকে সারিতে হইত তবে সত্যযুগের পরমায়ু নহিলে তার কুলাইত না। য়ুরোপে যাহা গজাইয়া উঠিতে বহুযুগের রৌদ্র বৃষ্টি ঝড় বাতাস লাগিল জাপানে তাহা শিকড় সুদ্ধ পুঁতিবার বেলায় বেশি সময় লাগে নাই। আমাদের চরিত্রে ও অভ্যাসে যদি কর্তৃশক্তির বিশেষ অভাব ঘটিয়া থাকে তবে আমাদেরই বিশেষ দরকার কর্তৃত্বের চর্চা। ব্যক্তিবিশেষের মধ্যে কিছু নাই এটা যদি গোড়া হইতেই ধরিয়া লও তবে তার মধ্যে কিছু যে আছে সেই আবিষ্কার কোনো কালেই হইবে না। আত্মকর্তৃত্বের সুযোগ দিয়া আমাদের ভিতরকার নূতন নূতন শক্তি আবিষ্কারের পথ খুলিয়া দাও—সেটাকে রোধ করিয়া রাখিয়া যদি আমাদের অবজ্ঞা কর এবং বিশ্বের কাছে চিরদিন অবজ্ঞাভাজন করিয়া রাখ তবে তার চেয়ে পরম শত্রুতা আর কিছু হইতেই পারে না। ডাইনে বাঁয়ে দু-পা বাড়াইলেই যার মাথা ঠক করিয়া দেয়ালে গিয়া ঠেকে তার মনে কখনো কি সেই বড়ো আশা টিঁকিতেই পারে যার জোরে মানুষ সকল বিভাগে আপন মহত্ত্বকে প্রাণ দিয়াও সপ্রমাণ করে?

দেখিয়াছি, ইতিহাসে যখন প্রভাত হয় সূর্য তখন পূর্বদিকে ওঠে বটে কিন্তু সেই সঙ্গেই উত্তরে দক্ষিণে পশ্চিমেও আলো ছড়াইয়া পড়ে। এক-এক ইঞ্চি করিয়া ধাপে ধাপে যদি জাতির উন্নতি হইত তবে মহাকালকেও হার মানিতে হইত। মানুষ আগে সম্পূর্ণ যোগ্য হইবে তার পরে সুযোগ পাইবে এই কথাটাই যদি সত্য হয় তবে পৃথিবীতে কোনো জাতিই আজ স্বাধীনতার যোগ্য হয় নাই। ডিমক্রেসির দেমাক করিতেছ! কিন্তু য়ুরোপের জনসাধারণের মধ্যে আজও প্রচুর বীভৎসতা আছে—সে-সব কুৎসার কথা ঘাঁটিতে ইচ্ছা করে না। যদি কোনো কর্ণধার বলিত এই সমস্ত যতক্ষণ আছে ততক্ষণ ডিমক্রেসি তার কোনো অধিকার পাইবে না তবে বীভৎসতা তো থাকিতই, আবার সেই পাপে স্বাভাবিক প্রতিকারের উপায়ও চলিয়া যাইত।

তেমনি আমাদের সমাজে, আমাদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ধারণায়; দুর্বলতা যথেষ্ট আছে সে-কথা ঢাকিতে চাহিলেও ঢাকা পড়িবে না। তবু আমরা আত্মকর্তৃত্ব চাই। অন্ধকার ঘরে এককোণের বাতিটা মিটমিট করিয়া জলিতেছে বলিয়া যে আর-এককোণের বাতি জালাইবার দাবি নাই এ কাজের কথা নয়। যে-দিকের যে সলতে দিয়াই হ'ক আলো জালাই চাই। আজ মনুষ্যত্বের দেয়ালি মহোৎসবে কোনো দেশই তার সব বাতি পুরা জালাইয়া উঠিতে পারে নাই—তবু উৎসব চলিতেছে। আমাদের ঘরের বাতিটা কিছুকাল হইতে নিবিয়া গেছে—তোমাদের শিখা হইতে যদি ওটাকে জালাইয়া লইতে যাই তবে তা লইয়া রাগারাগি করা কল্যাণের নহে। কেননা, ইহাতে তোমাদের আলো কমিবে না, এবং উৎসবের আলো বাড়িয়া উঠিবে।

উৎসবের দেবতা আজ আমাদিগকে ভিতর হইতে ডাকিতেছেন। পাণ্ডা কি আমাদের নিষেধ করিয়া ঠেকাইয়া রাখিতে পারিবে? সে যে কেবল ধনী যজমানকেই দেখিলে গদগদ হইয়া ওঠে, ক্যানাডা অস্ট্রেলিয়ার নামে যে স্টেশন পর্যন্ত ছুটিয়া যায়—আর গরিবের বেলায় তার ব্যবহার উলটা—এটা তো সহিবে না, দেবতা যে দেখিতেছেন। ইহাতে স্বয়ং অন্তর্যামী যদি লজ্জারূপে অন্তরে দেখা না দেন, তবে ক্রোধ রূপে বাহির হইতে দেখা দিবেন।

কিন্তু আশার কারণটা উহাদের মধ্যে আছে, আমাদের মধ্যেও আছে। বাঙালিকে আমি শ্রদ্ধা করি। আমি জানি আমাদের যুবকদের যৌবনধর্ম কখনোই চিরদিন ধারকরা বার্ধক্যের মুখোশ পরিয়া বিজ্ঞ সাজিবে না। আবার আমরা ইংরেজের মধ্যেও এমন মহাত্মা বিস্তর দেখিলাম যাঁরা স্বজাতির কাছে লাঞ্ছনা সহিয়াও ইংরেজ ইতিহাসবৃক্ষের অমৃত ফলটি ভারতবাসীর অধিকারে আনিবার জন্য উৎসুক। আমাদের তরফেও আমরা তেমনি মানুষের মতো মানুষ চাই যাঁরা বাহির হইতে দুঃখ এবং স্বজনদের নিকট হইতে ধিক্কার সহিতে প্রস্তুত। যাঁরা বিফলতার আশঙ্কাকে অতিক্রম করিয়াও মনুষ্যত্ব প্রকাশ করিবার জন্য ব্যগ্র।

ভারতের জরাবিহীন জাগ্রত ভগবান আজ আমাদের আত্মাকে আহ্বান করিতেছেন, যে আত্মা অপরিমেয়, যে আত্মা অপরাজিত, অমৃতলোকে যাহার অনন্ত অধিকার, অথচ যে আত্মা আজ অন্ধ প্রথা ও প্রভুত্বের অপমানে ধুলায় মুখ লুকাইয়া। আঘাতের পর আঘাত বেদনার পর বেদনা দিয়া তিনি ডাকিতেছেন, আত্মানং বিদ্ধি। আপনাকে জানো।

আজ আমরা সম্মুখে দেখিলাম বৃহৎ এই মানুষের পৃথিবী, মহৎ এই মানুষের ইতিহাস। মানুষের মধ্যে ভূমাকে আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি; শক্তির রথে চড়িয়া

তিনি মহাকালের রাজপথে চলিয়াছেন, রোগ তাপ বিপদ মৃত্যু কিছুতেই তাঁহাকে বাধা দিতে পারিল না, বিশ্বপ্রকৃতি বরমাল্যে তাঁহাকে বরণ করিয়া লইল, জ্ঞানের জ্যোতির্ময় তিলকে তাঁর উচ্চললাট মহোজ্জ্বল, অতিদূর ভবিষ্যতের শিখরচূড়া হইতে তাঁর জন্য আগমনীর প্রভাত রাগিণী বাজিতেছে। সেই ভূমা আজ আমার মধ্যেও আপনার আসন খুঁজিতেছেন। ওরে অকাল-জরা-জর্জরিত, আত্ম অবিশ্বাসী ভীরু, অসত্যভারাবনত মূঢ়, আজ ঘরের লোকদের লইয়া ক্ষুদ্র ঈর্ষায় ক্ষুদ্র বিদ্বেষে কলহ করিবার দিন নয়, আজ তুচ্ছ আশা তুচ্ছ পদমানের জন্য কাঙালের মতো কাড়াকাড়ি করিবার সময় গেছে, আজ সেই মিথ্যা অহংকার দিয়া নিজেকে ভুলাইয়া রাখিব না, যে অহংকার কেবল আপন গৃহ-কোণের অন্ধকারেই লালিত হইয়া স্পর্ধা করে, বিরাট বিশ্বসভার সম্মুখে যাহা উপহসিত লজ্জিত। অন্যকে অপবাদ দিয়া আত্মপ্রসাদলাভের চেষ্টা অক্ষমের চিত্তবিনোদন, আমাদের তাহাতে কাজ নাই। যুগে যুগে আমাদের পুঞ্জ পুঞ্জ অপরাধ জমিয়া উঠিল, তাহার ভারে আমাদের পৌরুষ দলিত, আমাদের বিচারবুদ্ধি মুমূর্ষু,—সেই বহু শতাব্দীর আবর্জনা আজ সবলে সতেজে তিরস্কৃত করিবার দিন। সম্মুখে চলিবার প্রবলতম বাধা আমাদের পশ্চাতে; আমাদের অতীত তাহার সম্মোহনবাণ দিয়া আমাদের ভবিষ্যৎকে আক্রমণ করিয়াছে; তাহার ধূলিপুঞ্জে শুষ্কপত্রে সে আজিকার নূতন যুগের প্রভাতসূর্যকে ম্লান করিল, নবনব অধ্যবসায়শীল আমাদের যৌবনধর্মকে অভিভূত করিয়া দিল, আজ নির্মম বলে আমাদের সেই পিঠের দিকটাকে মুক্তি দিতে হইবে তবেই নিত্যসম্মুখগামী মহৎ মনুষ্যত্বের সহিত যোগ দিয়া আমরা অসীম ব্যর্থতার লজ্জা হইতে বাঁচিব, সেই মনুষ্যত্ব যে মৃত্যুঞ্জয়ী, যে চিরজাগরূক চিরসন্ধানরত, যে বিশ্বকর্মার দক্ষিণ হস্ত, জ্ঞানজ্যোতিরালোকিত সত্যের পথে যে চিরযাত্রী, যুগযুগের নবনব তোরণদ্বারে যাহার জয়ধ্বনি উচ্ছ্বসিত হইয়া দেশদেশান্তরে প্রতিধ্বনিত।

বাহিরের দুঃখ শ্রাবণের ধারার মতো আমাদের মাথার উপর নিরন্তর বর্ষিত হইয়াছে, অহরহ এই দুঃখভোগের যে তামসিক অশুচিতা, আজ তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। তাহার প্রায়শ্চিত্ত কোথায়? নিজের মধ্যে নিজের ইচ্ছায় দুঃখকে বরণ করিয়া। সেই দুঃখই পবিত্র হোমাগ্নি,—সেই আগুনে পাপ পুড়িবে, মূঢ়তা বাষ্প হইয়া উড়িয়া যাইবে, জড়তা ছাই হইয়া মাটিতে মিশাইবে। এস প্রভু, তুমি দীনের প্রভু নও। আমাদের মধ্যে যে অদীন, যে অমর, যে প্রভু, যে ঈশ্বর আছে, হে মহেশ্বর তুমি তাহারই প্রভু—ডাকো আজ তাহাকে তোমার রাজসিংহাসনের দক্ষিণপার্শ্বে। দীন লজ্জিত হউক, দাস লাঞ্ছিত হউক, মূঢ় তিরস্কৃত হইয়া চির-নির্বাসন গ্রহণ করুক।

১৩২৪

গ্রন্থপরিচয়

[রচনাবলীর বর্তমান খণ্ডে মুদ্রিত গ্রন্থগুলির প্রথম প্রকাশের তারিখ ও গ্রন্থসংক্রান্ত অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য গ্রন্থপরিচয়ে সংকলিত হইল। এই খণ্ডে মুদ্রিত কোনো কোনো রচনা সম্বন্ধে কবির নিজের মন্তব্যও মুদ্রিত হইল। পূর্ণতর তথ্যসংগ্রহ সর্বশেষ খণ্ডে একটি পঞ্জীতে সংকলিত হইবে।]

শেষ সপ্তক

শেষ সপ্তক ১৩৪২ সালের ২৫ বৈশাখ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

শেষ সপ্তকের ১৫ সংখ্যক কবিতাবলীর সহিত পথে ও পথের প্রান্তে গ্রন্থে প্রকাশিত শ্রীমতী রানী মহলানবিশকে লিখিত ২৬ ও ২৭ সংখ্যক পত্র তুলনীয়; এই কবিতাগুলিকে ঐ চিঠি দুটিরই কাব্যরূপ বলা যাইতে পারে।

পথে ও পথের প্রান্তে, ২৬। তুলনীয় শেষ সপ্তক ১৫।১

আমি আবার ঘর বদল করেছি। এই উদয়নের বাড়িতেই। বাড়িটার নাম উদয়ন, সেকথা জানিয়ে দেওয়া ভালো। উত্তরের দিকে দুটি ছোটো ঘর। এই রকম ছোটো ঘর আমি ভালোবাসি, তার কারণ তোমাকে বলি। ঘরটাই যদি বড়ো হয় তবে বাহিরটা থেকে দূরে পড়া যায়। বস্তুত বড়ো ঘরেই মানুষকে বেশি আবদ্ধ করে। তার মধ্যেই তার মনটা আসন ছড়িয়ে বসে, বাহিরটা বড্ড বেশি বাইরে সরে দাঁড়ায়। এই ছোটো ঘরে ঠিক আমার বাসের পক্ষে যতটুকু দরকার তার বেশি কিছুই নেই। সেখানে খাট আছে টেবিল আছে চৌকি আছে; সেই আসবাবের সঙ্গে একখণ্ড আকাশকে জড়িত ক'রে রেখে আকাশের শখ ঘরেই মেটাতে চাইনে। আকাশকে পেতে চাই তার স্বস্থানে বাইরে; পূর্ণভাবে বিশুদ্ধভাবে। দেয়ালের ভিতরে যে আকাশকে বেঁধে রাখা হয় তাকে আমি ছেড়ে দেবামাত্রই সে আমার যথার্থ কাছে এসে দাঁড়ায়। একেবারেই আমার বসবার চৌকির অনতিদূরে, আমার জানলার গা ঘেঁষে। তার কাজ হচ্ছে মনকে ছুটি দেওয়া; সে যদি নিজে যথেষ্ট ছুটি না পায়, মনকে ছুটি দিতে পারে না। এইবার আমার ঘরে-আকাশে যথার্থ মিল হয়েছে—বেশ লাগছে। চেয়ে দেখি যতদূর দেখা যায়, আবার পরক্ষণেই আমার ডেস্কের মধ্যে চোখ ফিরিয়ে আনতে দেরি হয় না। জানলার কাছে বসে বসে প্রায়ই ভাবি, দূর ব'লে একটা পদার্থ আছে, সে বড়ো সুন্দর। বস্তুত সুন্দরের মধ্যে একটি দূরত্ব আছে, নিকট তার স্থূল হস্ত

নিয়ে তাকে যেন নাগাল পায় না। সুন্দর আমাদের সমস্ত দিগন্ত ছাড়িয়ে যায়, তাই সে আমাদের প্রয়োজনের সঙ্গে সংলগ্ন থাকলেও আমাদের প্রয়োজনের অতীত। আমাদের নিজের ব্যক্তিগত জীবনেও এই দূর পদার্থকে যদি না রাখতে পারি তাহলে আমাদের ছুটি নেই, তাহলে সমস্ত অসুন্দর হয়ে পড়ে। যারা বিষয়কর্মে অত্যন্ত নিবিষ্ট, তাদের জীবনে নিকট আছে দূর নেই। কেননা স্বার্থ জিনিসটা মানুষের অত্যন্ত বেশি কাছের জিনিস, তার আসক্তি দেয়ালের মতো। আপন দেয়ালকে মানুষ ভালোবাসে, কেননা, দেয়াল আমারই, আর কারো নয়। সেই ভালোবাসা যখন একান্ত হয়ে ওঠে তখন মানুষ ভুলে যায় যে, যা আমার অতীত তা কত আনন্দময় হতে পারে, তার প্রতি ভালোবাসার আর তুলনা হয় না।

কর্ম যখন বিষয়কর্ম না হয়, তখন সেই কর্ম মানুষকে দূরের স্বাদ দেয়, দূরের বাঁশি বাজায়। কবিতা লিখি, ছবি আঁকি, তার মধ্যে প্রয়োজনের অতীত দূরের আকাশ আছে বলেই এত ভালোবাসি, তাতে এমন মগ্ন হতে পারি। সেই সঙ্গে আজকাল আমার বিদ্যালয়ের কাজ যোগ দিয়েছে— এরকম কাজে মনের মুক্তি। এ কাজের ক্ষেত্র নিকটের ক্ষেত্র নয়। দেশকালে বহুদূর বিস্তীর্ণ; অব্যবহিত নিজের কাছে থেকে কতদূরে চলে গেছে তার ঠিকানা নেই; তাই এর জন্য ত্যাগ করা সহজ, এর জন্যে কাজ করতে ক্লান্তি নেই। সেইজন্য আজকাল আমি আমার মধ্যে যেন বহুদূরকে দেখি, আমি এখন আমার কাছে থাকিনে। আমার চোখের সামনে যেমন এই আকাশ, আমার চিন্তার মধ্যে সেই আকাশ, আমার চেষ্টা উড়ে চলেছে সেই আকাশে। এই রকমের কাজে অনেকে জড়িত হয়ে থাকে ব্যক্তিগত ক্ষমতা পাবার জন্যে; এমন উদার কাজও তাদের পক্ষে বন্ধন, মুক্তির ক্ষেত্রেও তারা ইন্‌টার্নড। আমার কাজে আমি ক্ষমতা চাইনে, আমার নিজের দিকের কিছুই চাইনে, কাজের মধ্যে আমি বিরাট বাহিরকে চাই, দূরকে চাই— "আমি সুদূরের পিয়াসী।" বস্তুত বাহির থেকে দেখলে আজকাল আমার লেশমাত্র সময় নেই, কিন্তু ভিতর থেকে দেখলে প্রত্যেক মুহূর্তই আমার অবকাশ। নিজের দিকে কোনো ফল পাব একথা যখনি ভুলি তখনি দেখতে পাই কর্মের মতো ছুটি আর নেই। কর্মহীন শুধু ছুটিতে মুক্তি পাইনে, কেননা সে ছুটিও নিজেকে নিয়েই। ইতি ৬ অগ্রহায়ণ, ১৩৩৫

পথে ও পথের প্রান্তে ২৭ ॥ তুলনীয় শেষ সপ্তক ১৫।২।৩

অন্য কথা পরে হবে, গোড়াতেই বলে রাখি তুমি যে চা পাঠিয়েছিলে সেটা খুব ভালো। এতদিন যে লিখিনি সেটা আমার স্বভাবের বিশেষত্ববশত। যেমন আমার

ছবি আঁকা তেমনি আমার চিঠি লেখা। একটা যা হয় কিছু মাথায় আসে সেটা লিখে ফেলি, প্রতিদিনের জীবনযাত্রায় ছোটো বড়ো যে-সব খবর জেগে ওঠে তার সঙ্গে কোনো যোগ নেই। আমার ছবিও ঐ রকম। যা হয় কোনো একটা রূপ মনের মধ্যে হঠাৎ দেখতে পাই, চারদিকের কোনো কিছুর সঙ্গে তার সাদৃশ্য বা সংলগ্নতা থাক্ বা না থাক্। আমাদের ভিতরের দিকে সর্বদা একটা ভাঙাগড়া চলাফেরা জোড়াতাড়া চলছেই; কিছু বা ভাব, কিছু বা ছবি নানারকম চেহারা ধরছে— তারই সঙ্গে আমার কলমের কারবার। এর আগে আমার মন আকাশে কান পেতে ছিল, বাতাস থেকে সুর আসত, কথা শুনতে পেত, আজকাল সে আছে চোখ মেলে রূপের রাজ্যে, রেখার ভিড়ের মধ্যে। গাছপালার দিকে তাকাই, তাদের অত্যন্ত দেখতে পাই— স্পষ্ট বুঝতে পারি জগৎটা আকারের মহাযাত্রা। আমার কলমেও আসতে চায় সেই আকারের লীলা। আবেগ নয়, ভাব নয়, চিন্তা নয়, রূপের সমাবেশ। আশ্চর্য এই যে তাতে গভীর আনন্দ। ভারি নেশা। আজকাল রেখায় আমাকে পেয়ে বসেছে। তার হাত ছাড়াতে পারছিনে। কেবলি তার পরিচয় পাচ্ছি নতুন নতুন ভঙ্গীর মধ্যে দিয়ে। তার রহস্যের অন্ত নেই। যে বিধাতা ছবি আঁকেন এতদিন পরে তাঁর মনের কথা জানতে পারছি। অসীম অব্যক্ত, রেখায় রেখায় আপন নতুন নতুন সীমা রচনা করছেন— আয়তনে সেই সীমা কিন্তু বৈচিত্র্যে সে অন্তহীন। আর কিছু নয়, সুনির্দিষ্টতাতেই যথার্থ সম্পূর্ণতা। অমিতা যখন সুমিতাকে পায় তখন সে চরিতার্থ হয়। ছবিতে যে আনন্দ, সে হচ্ছে সুপরিমিতির আনন্দ, রেখার সংযমে সুনির্দিষ্টকে সুস্পষ্ট করে দেখি— মন বলে ওঠে, নিশ্চিত দেখতে পেলুম— তা সে যাকেই দেখি না কেন, একটুকরো পাথর, একটা গাধা, একটা কাঁটাগাছ, একজন বুড়ি, যাই হোক। নিশ্চিত দেখতে পাই যেখানেই, সেখানেই অসীমকে স্পর্শ করি, আনন্দিত হয়ে উঠি। তাই ব'লে এ কথা ভুললে চলবে না যে তোমার চা খুব ভালো লেগেছে। ইতি
১৩ অগ্রহায়ণ, ১৩৩৫

শেষ সপ্তকের অনেকগুলি কবিতার ছন্দোবদ্ধ রূপ, বা রূপান্তর বিভিন্ন সাময়িক পত্রে বা পাণ্ডুলিপিতে পাওয়া যায়। শ্রীকানাই সামন্ত এই রূপান্তরগুলি সংকলন করিয়া দিয়াছেন। সংযোজন অংশে সেগুলি মুদ্রিত হইল।

এই প্রসঙ্গে শেষ সপ্তকের তেইশ ও চৌত্রিশ সংখ্যক কবিতার সঙ্গে প্রান্তিক (১৩৪৪) গ্রন্থের পনেরো ও ষোলো সংখ্যক কবিতা তুলনীয়। কবিতা দুইটি নিচে মুদ্রিত হইল।

প্রান্তিক ১৫ ॥ তুলনীয় শেষ সপ্তক ২৩

অবরুদ্ধ ছিল বায়ু; দৈত্যসম পুঞ্জ মেঘভার
ছায়ার প্রহরীব্যূহে ঘিরে ছিল সূর্যের দুয়ার;

অভিভূত আলোকের মূর্ছাতুর ম্লান অসম্মানে
দিগন্ত আছিল বাষ্পাকুল। যেন চেয়ে ভূমিপানে
অবসাদে অবনত ক্ষীণশ্বাস চির প্রাচীনতা
স্তব্ধ হয়ে আছে বসে দীর্ঘকাল, ভুলে গেছে কথা,
ক্লান্তিভারে আঁখিপাতা বন্ধপ্রায়।
শূন্যে হেনকালে
জয়শঙ্খ উঠিল বাজিয়া। চন্দনতিলক ভালে
শরৎ উঠিল হেসে চমকিত গগন-প্রাঙ্গণে ;
পল্লবে পল্লবে কাঁপি বনলক্ষ্মী কিঙ্কিণী কঙ্কণে
বিচ্ছুরিল দিকে দিকে জ্যোতিষ্কণা। আজি হেরি চোখে
কোন্ অনির্বচনীয় নবীনেরে তরুণ আলোকে।
যেন আমি তীর্থযাত্রী অতিদূর ভাবীকাল হতে
মন্ত্রবলে এসেছি ভাসিয়া। উজান স্বপ্নের স্রোতে
অকস্মাৎ উত্তরিনু বর্তমান শতাব্দীর ঘাটে
যেন এই মুহূর্তেই। চেয়ে চেয়ে বেলা মোর কাটে।
আপনারে দেখি আমি আপন বাহিরে, যেন আমি
অপর যুগের কোনো অজানিত, সদ্য গেছে নামি
সত্তা হতে প্রত্যহের আচ্ছাদন ; অক্লান্ত বিস্ময়
যার পানে চক্ষু মেলি তারে যেন আঁকড়িয়া রয়
পুষ্পলগ্ন ভ্রমরের মতো। এই তো ছুটির কাল,
সর্ব দেহমন হতে ছিন্ন হল অভ্যাসের জাল,
নগ্ন চিত্ত মগ্ন হল সমস্তের মাঝে। মনে ভাবি,
পুরানোর দুর্গদ্বারে মৃত্যু যেন খুলে দিল চাবি,
নূতন বাহিরি' এল ; তুচ্ছতার জীর্ণ উত্তরীয়
ঘুচাল সে ; অস্তিত্বের পূর্ণ মূল্যে কী অভাবনীয়
প্রকাশিল তার স্পর্শে, রজনীর মৌন সুবিপুল
প্রভাতের গানে সে মিশায়ে দিল ; কালো তার চুল
পশ্চিমদিগন্তপারে নামহীন বন-নীলিমায়
বিস্তারিল রহস্য নিবিড়।
আজি মুক্তিমন্ত্র গায়

আমার বক্ষের মাঝে দূরের পথিকচিত্ত মম,
সংসারযাত্রার প্রান্তে সহমরণের বধূসম ॥

প্রান্তিক ১৬ ॥ তুলনীয় শেষ সপ্তক ৩।

পথিক দেখেছি আমি পুরাণে কীর্তিত কত দেশ
কীর্তি-নিঃস্ব আজি ; দেখেছি অবমানিত ভগ্নশেষ
দর্পোদ্ধত প্রতাপের ; অন্তর্হিত বিজয়-নিশান
বজ্রাঘাতে স্তব্ধ যেন অট্টহাসি ; বিরাট সম্মান
সাষ্টাঙ্গে সে ধুলায় প্রণত, যে ধুলার পরে মেলে
সন্ধ্যাবেলা ভিক্ষু জীর্ণ কাঁথা, যে ধুলায় চিহ্ন ফেলে
শ্রান্ত পদ পথিকের, পুনঃ সেই চিহ্ন লোপ করে
অসংখ্যের নিত্য পদপাতে। দেখিলাম বালুস্তরে
প্রচ্ছন্ন সুদূর যুগান্তর, ধূসর সমুদ্রতলে
যেন মগ্ন মহাতরী অকস্মাৎ ঝঞ্ঝাবর্তবলে
লয়ে তার সব ভাষা, সর্ব দিনরজনীর আশা,
মুখরিত ক্ষুধাতৃষ্ণা, বাসনা-প্রদীপ্ত ভালোবাসা।
তবু করি অনুভব বসি' এই অনিত্যের বুকে
অসীমের হৃৎস্পন্দন তরঙ্গিছে মোর দুঃখে সুখে ॥

শেষ সপ্তকের সাতাশ-সংখ্যক কবিতার অন্য একটি রূপ সংযোজন অংশে (ঘট ভরা, পৃ ১১৫) মুদ্রিত হইয়াছে। পাণ্ডুলিপি হইতে অন্য একটি পাঠ নিচে মুদ্রিত হইল :

আমার এই ছোটো কলস পেতে রাখি
ঝরনাধারার নিচে।
সকালবেলায় বসে থাকি
শেওলা-ঢাকা পিছল কালো পাথরটাতে
পা ঝুলিয়ে।
ঘট ভরে যায় এক নিমেষে,
ফেনিয়ে ওঠে ছল্‌ছলিয়ে,
ছাপিয়ে পড়ে বারে বারে,
সেই খেলা ওর আমার মনের খেলা।

সবুজ দিয়ে মিনে-করা
পাহাড়গুলির নীল আকাশে
ঝর্‌ঝরানি উছলে ওঠে দিনেরাতে।
ভোরের ঘুমে ডাক শোনে তার
গাঁয়ের মেয়েরা।

জলের ধ্বনি যায় পেরিয়ে
বেগ্‌নি রঙের বনের সীমানা
যেখানে ঐ বুনো পাড়ার হাটের মানুষ
তরাই গ্রামের রাস্তা ছেড়ে
ধীরে ধীরে উঠছে চড়াই পথে,
বলদের পিঠে বোঝাই
শুক্‌নো কাঠের আঁটি;
ঝুমুঝুমু ঘণ্টা গলায় বাঁধা।

প্রথম প্রহর গেল কেটে।
রাঙা ছিল সকালবেলার
নতুন রোদের রঙ,
উঠল সাদা হয়ে।
বক উড়ে যায় পেরিয়ে পাহাড়
জলার দিকে।

বেলা হল, ডাক পড়েছে ঘরে।
ওরা আমায় রাগ করে কয়,
"দেরি করলি কেন।"
চুপ ক'রে সব শুনি।
ঘট ভরতে হয় না দেরি,
সবাই জানে,—
উপচে-পড়া জলের কথা
বুঝবে না তো ওরা।

শেষ বর্ষণ

শেষ বর্ষণ ১৩৩২ সালে রচিত হয়। ঐ সালের ভাদ্র মাসে ইহা মঞ্চস্থ হওয়া উপলক্ষ্যে ঐ নামে যে পুস্তিকা প্রকাশিত হয় তাহাতে শুধু নাট্যে ব্যবহৃত গানগুলিই মুদ্রিত হইয়াছিল, কথাবস্তু প্রকাশিত হয় নাই; পরে ঋতু-উৎসব (১৩৩৩) গ্রন্থে কথা ও গানসহ শেষ বর্ষণের সম্পূর্ণ নাট্যরূপটি প্রকাশিত হয়।

নটীর পূজা

নটীর পূজা ১৩৩৩ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়।

একই আখ্যানবস্তু অবলম্বনে কথা ও কাহিনীর পূজারিনী কবিতাও লিখিত হইয়াছিল।

১৩৩৩ সালে ২৫ বৈশাখ সায়ংকালে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে নটীর পূজার প্রথম অভিনয়ের সময় এই নাটকে উপালি-চরিত্র ছিল না, উপালি-চরিত্র সংবলিত সূচনা অংশও গ্রন্থের প্রথম মুদ্রণে ছিল না। ১৩৩৩ সালের ১৪ মাঘ কলিকাতায় জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে দ্বিতীয় অভিনয়ের সময় ঐ অংশ যোজিত হয়; উপালির ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ অভিনয় করিয়াছিলেন। এই সময়ে মুদ্রিত অভিনয়পত্রীতে সূচনা ও নিম্নোদ্ধৃত ভূমিকা প্রকাশিত হয়, ঐ পত্রীতে নাট্যবিষয়সারও মুদ্রিত আছে। সূচনা অংশ দ্বিতীয় সংস্করণ হইতে গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়া আসিতেছে।

ভূমিকা

অজাতশত্রু পিতৃসিংহাসনে লোভ প্রকাশ করিতেছেন জানিয়া মহারাজ বিম্বিসার স্বেচ্ছায় রাজ্যভার তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিয়া নগরী হইতে দূরে বাস করিতেছেন।

একদা রাজোদ্যানে ভগবান বুদ্ধ অশোকতরুচ্ছায়ায় আসন গ্রহণ করিয়া উপদেশ দিয়াছিলেন সেইখানে বুদ্ধভক্ত বিম্বিসার চৈত্য স্থাপন করিয়া রাজকন্যাদিগকে বেদীমূলে প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে অর্ঘ্য আহরণ করিতে প্রবৃত্ত করিয়াছিলেন।

রাজমহিষী লোকেশ্বরী তাঁহার স্বামীর রাজ্যত্যাগে ও তাঁহার পুত্র চিত্রের সন্ন্যাসগ্রহণে ক্ষুব্ধ হইয়া বুদ্ধ-অনুশাসিত ধর্মের প্রতি বিমুখ হইয়াছেন।

নটরাজ

নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা ১৩৩৩ সালে রচিত ও শান্তিনিকেতনে প্রথম অভিনীত হয় এবং ১৩৩৪ সালের আষাঢ় সংখ্যা বিচিত্রায় প্রকাশিত হয়। ১৩৩৪ সালের অগ্রহায়ণ মাসে

কলিকাতায় ঋতুরঙ্গ নামে ইহা অভিনীত হয়; অভিনয়পত্রী হইতে দেখা যায়, ইহার কবিতাংশ সম্পূর্ণ নূতন। ১৩৩৪ সালের পৌষ সংখ্যা মাসিক বসুমতীতে ঋতুরঙ্গ মুদ্রিত হয়।

১৩৩৮ সালে প্রকাশিত বনবাণী গ্রন্থে, বিচিত্রায় মুদ্রিত নটরাজ ও মাসিক বসুমতীতে মুদ্রিত ঋতুরঙ্গ একত্রীভূত ও পুনঃসজ্জিত হইয়া নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা নামে সংকলিত হয়। বনবাণীর এই অংশটিই বর্তমান খণ্ডে মুদ্রিত হইয়াছে। বিচিত্রায় প্রকাশিত নটরাজের শেষ কবিতা "শেষ মধু" এই নূতন পাঠের অন্তর্গত হয় নাই; উক্ত কবিতাটি তৎপূর্বেই মহুয়ার অন্তর্গত হয়।

"কেন পান্থ এ চঞ্চলতা" (পৃ. ২১৫) গানটির নিম্নমুদ্রিত পাঠান্তর বিচিত্রায় পাওয়া যায়; গান হিসাবে এই পাঠান্তর সুপ্রচলিত নহে (গীতবিতান ২য় সং, ২য় খণ্ড পৃ. ১৯৩)।

কেন পান্থ এ চঞ্চলতা।
শূন্য গগনে পাও কার বারতা?
নয়ন অতন্দ্র প্রতীক্ষারত
কেন উদ্‌ভ্রান্ত অশান্ত-মতো,
কুন্তলপুঞ্জ অযত্নে নত
ক্লান্ত তড়িৎ-বধূ তন্দ্রাগতা।
ধৈর্য ধরো, সখা, ধৈর্য ধরো,
দুঃখে মাধুরী হোক মধুরতর;
হেরো গন্ধ নিবেদন বেদন সুন্দর
মল্লিকা চরণতলে প্রণতা।

"চরণরেখা তব" (পৃ. ২২২) গানটির বিচিত্রায় মুদ্রিত পূর্বপাঠ প্রকাশিত নিম্নে মুদ্রিত হইল:

চরণরেখা তব যে পথে দিলে লেখি
চিহ্ন আজি তারি আপনি ঘুচালে কি?
অশোকরেণুগুলি
রাঙাল যার ধূলি
তারে যে তৃণতলে আজিকে লীন দেখি?
ফুরায় ফুল ফোটা পাখিও গান ভোলে
দখিন বায়ু সেও উদাসী যায় চলে।

তবুও কি ভরি তারে
অমৃত ছিল না রে ?
স্মরণ তারো কি গো মরণে যাবে ঠেকি ?

মূলতঃ গানটি বসন্ত-বিদায়ের "বিলাপ"রূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল— অভিনয়োপলক্ষ্যে একবার গানটি শরৎ-বিদায়ের "বিলাপ" রূপে পরিবর্তিত হয়। উপরে উদ্ধৃত পাঠটিই গান হিসাবে সুপ্রচলিত (গীতবিতান ২য় সং, ২য় খণ্ড পৃ. ২৪৭)।

শেষ বর্ষণের অন্তর্গত "শ্যামল শোভন শ্রাবণ-ছায়া" (পৃ ১৩৬) গানটিকে, নটরাজের "শ্রাবণ-বিদায়" (পৃ ২১৪) গানটির পাঠান্তর বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে।

"দোল" (পৃ ২৪৬) কবিতাটির গীত-রূপ "ওগো কিশোর আজি" গীতবিতানে (২য় সং, ২য় খণ্ড, পৃ ৮৭) দ্রষ্টব্য।

গল্পগুচ্ছ

বর্তমান খণ্ডে প্রকাশিত আটটি গল্পের প্রথম সাতটি ১৩০০ সালের সাধনায় প্রকাশিত হইয়াছিল ; নিম্নে বিস্তারিত সূচী মুদ্রিত হইল।

সম্পাদক	বৈশাখ ১৩০০
মধ্যবর্তিনী	জ্যৈষ্ঠ ১৩০০
অসম্ভব কথা	আষাঢ় ১৩০০
শাস্তি	শ্রাবণ ১৩০০
একটি ক্ষুদ্র পুরাতন গল্প	ভাদ্র ১৩০০
সমাপ্তি	আশ্বিন কার্তিক ১৩০০
সমস্যাপূরণ	অগ্রহায়ণ ১৩০০

খাতা গল্পটি কোনো সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল কি না এখনো জানা যায় নাই। শনিবারের চিঠিতে (চৈত্র ১৩৪৬) প্রকাশিত "রবীন্দ্র রচনাপঞ্জী"তে লিখিত হইয়াছে, এ গল্পটি সম্ভবত হিতবাদীতে (১২৯৮) মুদ্রিত হইয়াছিল। হিতবাদী বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য। এই গল্পটি সাময়িকে প্রকাশ অনুসারে সাজানো যায় নাই, গ্রন্থাকারে প্রকাশের তারিখ অবলম্বনে ('ছোট গল্প', ফাল্গুন ১৩০০) বর্তমান খণ্ডে উহা মুদ্রিত হইল।

সম্পাদক ও সমস্যাপূরণ 'ছোট গল্প' (ফাল্গুন ১৩০০) পুস্তকে ; অসম্ভব কথা 'বিচিত্র গল্প' প্রথম ভাগে (১৩০১); একটি ক্ষুদ্র পুরাতন গল্প 'বিচিত্র গল্প' দ্বিতীয়

ভাগে (১৩০১) ; এবং মধ্যবর্তিনী, শাস্তি ও সমাপ্তি 'কথা-চতুষ্টয়' (১৩০১) পুস্তকে প্রথম গ্রন্থান্তর্ভুক্ত হয়।

সঞ্চয়

সঞ্চয় ১৩২৩ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

এই গ্রন্থে-মুদ্রিত প্রবন্ধাবলীর সাময়িক পত্রে প্রকাশের সূচী নিম্নে মুদ্রিত হইল :

রোগীর নববর্ষ	তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯
রূপ ও অরূপ	প্রবাসী পৌষ ১৩১৮
নামকরণ	তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা চৈত্র ১৩১৮
ধর্মের নবযুগ	তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ; ভারতী ফাল্গুন ১৩১৮
ধর্মের অর্থ	তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা আশ্বিন কার্তিক ১৩১৮
ধর্মশিক্ষা	তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা মাঘ ১৩১৮
ধর্মের অধিকার	প্রবাসী ফাল্গুন ১৩১৮
আমার জগৎ	সবুজ পত্র আশ্বিন ১৩২১

ধর্মের নবযুগ মাঘোৎসব উপলক্ষে ১১ মাঘ ১৩১৮ মহর্ষি-ভবনে পঠিত হয়।

ধর্মের অর্থ ভাদ্রোৎসব উপলক্ষ্যে ৪ ভাদ্র ১৩১৮ সায়ংকালে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে পঠিত হয়।

ধর্মশিক্ষা কলিকাতা সিটি কলেজে অনুষ্ঠিত একেশ্বরবাদীগণের সম্মিলনে ২৭ ডিসেম্বর ১৯১১ সায়ংকালে পঠিত হয়।

ধর্মের অধিকার মাঘোৎসব উপলক্ষ্যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে ১২ মাঘ ১৩১৮ সায়ংকালে পঠিত হয়।

নামকরণ রচনার উপলক্ষ্যাদি প্রবন্ধের পাদটীকায় উল্লিখিত হইয়াছে।

পরিচয়

পরিচয় ১৩২৩ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

এই গ্রন্থে মুদ্রিত প্রবন্ধাবলীর সাময়িক পত্রে প্রকাশের সূচী নিম্নে মুদ্রিত হইল :

ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা	প্রবাসী বৈশাখ ১৩১৯
আত্মপরিচয়	তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা বৈশাখ ১৩১৯
হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়	প্রবাসী অগ্রহায়ণ ১৩১৮

ভগিনী নিবেদিতা	প্রবাসী অগ্রহায়ণ ১৩১৮
শিক্ষার বাহন	সবুজ পত্র পৌষ ১৩২২
ছবির অঙ্গ	সবুজ পত্র আষাঢ় ১৩২২
সোনার কাঠি	সবুজ পত্র জ্যৈষ্ঠ ১৩২২
কৃপণতা	সবুজ পত্র ভাদ্র-আশ্বিন ১৩২২
আষাঢ়	সবুজ পত্র আষাঢ় ১৩২১
শরৎ	সবুজ পত্র ভাদ্র-আশ্বিন ১৩২২

ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা ৪ চৈত্র ১৩১৮ তারিখে ওভারটুন হলে পঠিত হয়। এই প্রবন্ধ পঠিত ও প্রবাসীতে প্রকাশিত হইলে সাময়িক পত্রে নানারূপ আলোচনা হয়; রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় যে মন্তব্য প্রকাশ করেন তাহা নিম্নে মুদ্রিত হইল :

“ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা”

বিগত বৈশাখের প্রবাসীতে শ্রীমান রবীন্দ্রনাথের পর্যালোচিত “ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা” পাঠ করিয়া আমার মনে হইল যে, প্রাচীন ভারতের রহস্যপূর্ণ ইতিহাসের নানারঙের বহিরাবরণের মধ্য হইতে মস্তক উত্তোলন করিয়া তাহার ভিতরের কথাটি যাহা এতদিন সহস্র চেষ্টা করিয়াও আলোকাভাবে আপনাকে প্রকাশ করিতে পারিয়া উঠিতেছিল না, এইবার তাহার সে চেষ্টা বাঞ্ছানুরূপ সাফল্য লাভ করিবে তাহার অরুণোদয় দেখা দিয়াছে; তবে যে, চতুর্দিকে কর্কশ কা কা ধ্বনি হইতেছে—রজনী-প্রভাতের সমসময়কালে তাহা হইবারই কথা। এতদিনের ধস্তাধস্তির পরে ভারতে প্রকৃত ইতিহাসের এই যে একটা সম্ভবমতো পাকা রকমের গোড়াপত্তন হইল, ইহা বঙ্গ-সরস্বতীর ভক্ত সন্তানদিগের কত না আনন্দের বিষয়। গোড়াপত্তন হইয়াছে যেরূপ সুন্দর, তাহার উপরে তদনুরূপ ভিত গাঁথিয়া তুলিতে হইলে আরো নানাপ্রকার ইষ্টক প্রস্তর এবং মালমশলার জোগাড় করা আবশ্যক, তা ছাড়া পুরাতন ইতিহাস-ভারতীর নূতন দেবালয়ের নির্মাণকার্যে বাছা-বাছা কারিকরদিগের সমবেত চেষ্টা কেন্দ্রীভূত হওয়া আবশ্যক। রবীন্দ্রনাথের নূতন প্রবন্ধটির সম্বন্ধে একটি প্রশ্ন আপাতত যাহা আমার মনে উত্থিত হইতেছে তাহা সংক্ষেপে এই :

মহাদেবের আদিম পীঠস্থান দক্ষিণ অঞ্চলে কি উত্তর অঞ্চলে ?

রবীন্দ্রনাথের লেখার আভাসে আমার এইরূপ মনে হয় যে, তাঁহার মতে মহাদেবের আদিম পীঠস্থান দক্ষিণ অঞ্চলে। তিনি যাহা আঁচিয়াছেন তাহা একেবারেই অমূলক

বলিয়া উড়াইয়া দিবার কথা নহে, যেহেতু বাস্তবিকই রাক্ষসাদি ক্রূর জাতিদিগের মধ্যে বিষ্ণুর স্নিগ্ধমূর্তি উপাস্য দেবতার আদর্শ পদবীতে স্থান পাইবার অনুপযুক্ত। দুর্দান্ত রাক্ষস জাতিদিগের মনোরাজ্যের সিংহাসন শিবের রুদ্রমূর্তিরই উপযুক্ত অধিষ্ঠান-মঞ্চ। কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও আমরা দেখিতে পাই যে, একদিক যেমন রক্ষঃ আর একদিকে তেমনি যক্ষ। প্রাচীন ভারতের দক্ষিণ অঞ্চল যেমন রক্ষদিগের দলবলের প্রধান সংগমস্থান (headquarters) ছিল— উত্তর অঞ্চল তেমনি যক্ষদিগের দলবলের প্রধান সংগমস্থান ছিল। ভারতবর্ষীয় আর্যদিগের চক্ষে দক্ষিণের দ্রাবিড়াদি জাতিরা যেমন রাক্ষস-বানরাদি মূর্তি ধারণ করিয়াছিল, উত্তরের মোগলাদি জাতিরা তেমনি যক্ষকিন্নরাদি মূর্তি ধারণ করিয়াছিল—ইহা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। বিকটাকার বিষয়ে দক্ষিণের রক্ষ এবং উত্তরের যক্ষের মধ্যে যেমন মিল আছে, কিম্ভূতকিমাকার বিষয়ে তেমনি দক্ষিণের বানর এবং উত্তরের কিন্নরের সঙ্গে মিল আছে।

এখন কথা হইতেছে এই যে, যক্ষদিগের রাজধানীতে কুবেরপুরীতে মহাদেবের অধিষ্ঠানের কথা কাব্যপুরাণাদি শাস্ত্রে ভূয়োভূয় উল্লিখিত হইয়াছে। তাছাড়া কৈলাস-শিখর মহাদেবের প্রধান পীঠস্থান।

রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ পাঠে একটি বিষয়ে আমার চক্ষু ফুটিয়াছে; সে-বিষয়টি এই যে, জনক রাজা যে কেবল ব্রহ্মজ্ঞানী ছিলেন তাহা নহে, সেই সঙ্গে তিনি ভারতে কৃষিকার্য প্রবর্তনের প্রধান নেতা ছিলেন; আর তাঁহার গুরু ছিলেন বিশ্বামিত্র। পক্ষান্তরে দেখিতে পাই যে, হিমালয় প্রদেশের কিরাত জাতিরা ব্যাধবৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকা-নির্বাহ করিত—তাহারা কৃষিকার্যের ধারই ধারিত না। কিরাত জাতি মোগল এবং তাতারদিগের সহোদর জাতি ইহা বলা বাহুল্য। এটাও দেখিতেছি যে, হিমালয়ের উপত্যকায় মহাদেব অর্জুনকে কিরাতবেশে দেখা দিয়াছিলেন। মহাদেব কিরাতদিগের দলে মিশিয়া কিরাত হইয়াছিলেন। মহাদেব পশুহন্তাও বটেন, পশুপতিও বটেন। মহাদেব যে অংশে কিরাতদিগের ইষ্টদেবতা ছিলেন, সেই অংশে তিনি পশুহন্তা; আর, যে অংশে তিনি খাস মোগলদিগের ইষ্টদেবতা ছিলেন, সেই অংশে তিনি পশুপতি। পুরাকালের মোগল এবং তাতার জাতিরা জীবিকালাভের একমাত্র উপায় জানিত পশুপালন, তা বই, কৃষিকার্যের ক অক্ষরও তাহারা জানিত না—ইহা সকলেরই জানা কথা। তবেই হইতেছে যে, মোগল এবং তাতার জাতিরা— সংক্ষেপে যক্ষেরা—একপ্রকার পশুপতির দল ছিল; সুতরাং পশুপতি মহাদেব বিশিষ্টরূপে তাহাদেরই দেবতা হওয়া উচিত; আর, পুরাণাদিকে যদি শাস্ত্র বলিয়া মানিতে হয়, তবে ছিলেনও তিনি তাই। যক্ষরাজ কুবেরের রূপ ছিল অনার্যোচিত; আর, তিনি

ধনপতি নামে বিখ্যাত। প্রাচীন ভারতে ধন-শব্দে বিশিষ্টরূপে গোমেষাদি পশুধনই বুঝাইত। ইহাতেই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, পশুজীবী মোগল তাতার প্রভৃতি জাতিরাই প্রাচীন ভারতের আর্যদিগের ইতিহাসে যক্ষনাম প্রাপ্ত হইয়াছিল। কি পশুহন্তা কিরাত জাতি, কি পশুপালক মোগল জাতি, উভয়েই কৃষিকার্য বিষয়ে সমান অনভিজ্ঞ ছিল। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, ধনুর্ভঙ্গের ব্যাপারটিকে কোন্ প্রকার বিঘ্নভঙ্গ বলিব? কিরাতদিগের পশুঘাতী ধনুর্ভঙ্গ বলিব? না রাক্ষসদিগের বিষদাঁত ভঙ্গ বলিব? আমার বোধ হয়, প্রাচীনকালে ভারতের উত্তর-দক্ষিণের মধ্যে একটা ঐতিহাসিক যোগ-সেতু বর্তমান ছিল; কেননা লঙ্কাপুরী প্রথমে কুবেরের ছিল, পরে তাহা রাবণ বলপূর্বক হস্তগত করিয়াছিল। রাবণ এবং কুবের যে একই পিতার পুত্রদ্বয় ইহা কাহারো অবিদিত নাই।

এ সম্বন্ধে আর একটি কথা আমার বলিবার আছে—সেটাও বিবেচ্য। কথাটি এই :

নেপাল প্রদেশে বুদ্ধমন্দির এবং শিবমন্দির পাশাপাশি অবস্থিতি করে। গুর্খারাও শৈবধর্মাবলম্বী। খুব সম্ভব যে, বৌদ্ধধর্মের প্রাদুর্ভাবকালে বৌদ্ধসাধকেরা হিমালয় প্রদেশে নির্জনে যোগসাধন এবং তপস্যা করিতেন। উমা যেমন উপনিষদের সুনির্মলা ব্রহ্মবিদ্যা, পার্বতী তেমনি তন্ত্রশাস্ত্রের বিভীষিকাময়ী দশমহাবিদ্যা। ভক্তের দেবতা যেমন বিষ্ণু, যোগীতপস্বীদিগের দেবতা তেমনি মহাদেব। বৌদ্ধধর্মের প্রাদুর্ভাবকালে বৌদ্ধ সাধকেরা বিশিষ্টরূপে যোগীতপস্বী ছিলেন। মহাদেব সেই সকল পর্বতবাসী বৌদ্ধ যোগীতপস্বীদিগের আদর্শ-প্রতিমা—এরূপ মনে হওয়া কিছুই বিচিত্র নহে। কয়েক বৎসর পূর্বে 'বৌদ্ধধর্ম এবং আর্যধর্মের ঘাতপ্রতিঘাত' নামক পুস্তিকায় এই বিষয়টির সম্বন্ধে আমি যাহা সবিস্তরে লিখিয়াছি তাহা সংক্ষেপে এই :

পৌরাণিক শাস্ত্রকারেরা আশ্চর্য নূতন প্রণালীতে বৌদ্ধ বিপ্লবের প্রতিবিধানচেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারা বৌদ্ধ যোগীতপস্বীদিগকে আর্য যোগীতপস্বীদিগের দলে টানিয়া লইলেন, আর, মহাদেবকে সেই সকল অবৈদিক যোগীতপস্বীদিগের ইষ্টদেবতার পদবীতে আসন গ্রহণ করাইলেন। পাছে লোকে মনে করে, যোগীশ্বর মহাদেব বুদ্ধেরই আর এক অবতার—এই আশঙ্কায় পৌরাণিক শাস্ত্রকারেরা তাঁহার গলায় পৈতা দিয়া তাঁহাকে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ করিয়া গড়িয়া লইলেন।

রবীন্দ্রনাথের মোট কথাটির সহিত আমার মতের একটুও অনৈক্য নাই। যে দু-একটি কথা আমি উপরে ইঙ্গিত করিলাম তাহার সহিত ভারতের ইতিহাস-ধারার কথাগুলির সমন্বয় মতে প্রবন্ধটির অঙ্গপূরণ করা হইলে ভালো হয়—ইহাই আমার

মনোগত অভিপ্রায়। আমার বিশ্বাস এই যে, এই সমন্বয়কার্যটি রবীন্দ্রনাথ মনে করিলেই ঈশ্বরপ্রসাদে সর্বাঙ্গসুন্দররূপে সুনিষ্পন্ন করিতে পারেন।[1]

আত্মপরিচয় প্রবন্ধ ছাত্রসমাজের অধিবেশনে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে পঠিত হয়। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পত্রিকা তত্ত্বকৌমুদী এই প্রবন্ধে বিবৃত মতের প্রতিবাদ করেন, রবীন্দ্রনাথ হিন্দু ব্রাহ্ম প্রবন্ধে তাহার প্রত্যুত্তর দেন।

হিন্দু ব্রাহ্ম

"আত্মপরিচয়" নামক প্রবন্ধে আমরা এই কথাটি বলিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম যে, হিন্দু ব্রাহ্মরা হিন্দুই, অর্থাৎ যে ব্যক্তি হিন্দু সে ব্রাহ্ম হইলেও হিন্দু, ব্রাহ্ম না হইলেও হিন্দু। ইহাতে তত্ত্বকৌমুদী পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় লিখিতেছেন যে, যেহেতু আদি ব্রাহ্মসমাজ সামাজিক বিষয়ে "উন্নতিশীল" ব্রাহ্মসমাজের অপেক্ষা অনেক পশ্চাতে পড়িয়াছেন "তখন সমগ্র ব্রাহ্মসমাজ হিন্দু কি না, এ কথা বিচার করিবার অধিকার আদি ব্রাহ্মসমাজের কাহারও নাই। উন্নতিশীল ব্রাহ্মগণ হিন্দুত্বের সংকীর্ণ গণ্ডী অনেককাল অতিক্রম করিয়াছেন।"[2]

পরস্পরের উন্নতির তারতম্যসম্বন্ধে আমরা কোনো কথাই কহিব না, কারণ ইহা আমাদের আলোচ্য বিষয় নহে। কিন্তু সমগ্র হিন্দুসমাজের পক্ষে যাহা অন্যায় তাহা যে ব্রাহ্মসমাজের পক্ষেও অন্যায় অন্তত এ কথাটা আমাদিগকে কর্তব্যের অনুরোধে বলিতে হইবে।

নিশ্চয়ই আমাদের অনেক কুসংস্কার আছে। যেমন যেমন তাহা বুঝিতে পারিব তেমনি তাহার বন্ধন কাটাইয়া উঠিব এইরূপ আশা করি— কিন্তু আমাদের এরূপ সংস্কার আদৌ নাই যে, বিচার করিয়া সত্য নির্ণয় করিবার অধিকার কেবল কোনো বিশেষ উপাধি দ্বারা চিহ্নিত সমাজের লোকেরই আছে অন্য সমাজের লোকের নাই। যদিচ আমি আদি ব্রাহ্মসমাজের সভ্য তথাপি ঈশ্বর আমার চিন্তা করিবার শক্তি সম্পূর্ণ অপহরণ করেন নাই; এবং কে হিন্দু ও কে হিন্দু নয় ইহা আমার পক্ষে বিচার করিবার অধিকার যদিচ "উন্নতিশীল" সম্পাদক মহাশয় কাড়িয়া লইতে চান তথাপি মনুষ্যত্বের সকল মহৎ অধিকারই আমরা যাঁহার কাছ হইতে পাইয়াছি তিনি এ সম্বন্ধে আমাদের কাহাকেও কোনো বাধা দিয়াছেন বলিয়া আমরা আদি ব্রাহ্মসমাজের লোকেরা বিশ্বাস করি না।

---

[1] প্রবাসী, আষাঢ় ১৩১৯

[2] "আদি সমাজ ও উন্নতিশীল ব্রাহ্মসমাজ", তত্ত্ব-কৌমুদী, ১ বৈশাখ ১৩১৯

উপবীতচিহ্নের দ্বারা সমাজে অধিকারভেদ নির্দিষ্ট হয় বলিয়া যাহারা উপবীতধারণকে নিন্দা করেন তাঁহারা কি এ কথা চিন্তা করিবেন না যে, অদৃশ্য উপবীত দৃশ্য উপবীতের চেয়ে অনেকগুণে দৃঢ়? "উন্নতিশীল ব্রাহ্ম" নামের পৈতাটা উচ্চ করিয়া তুলিয়া ধরিয়া তত্ত্বকৌমুদীর সম্পাদক মহাশয় যে জাত্যভিমান, যে কৌলীন্যগর্ব প্রকাশ করিয়াছেন, জিজ্ঞাসা করি, তাহা কি সর্বপ্রকার কুসংস্কারবর্জিত?

উন্নতিশীল ব্রাহ্মগণ কেবলমাত্র উন্নতিশীলতার বেগে হিন্দুত্বের সংকীর্ণ গণ্ডী অনেক কাল হইল কাটাইয়াছেন বলিয়া সম্পাদক মহাশয় গৌরব প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু যে গণ্ডী আমাদের স্বরচিত ও কৃত্রিম নহে তাহা আমরা কাটাইতে পারি না। যেমন আমার একটা দেহের গণ্ডী আছে। এই গণ্ডীকে আশ্রয় করিয়া আমি একটি বিশেষ স্বাতন্ত্র্য লাভ করিয়াছি; এই স্বাতন্ত্র্য যদি আমার উন্নতির প্রতিকূল ও আমার অপরাধ বলিয়া গণ্য হয় তবে বিশ্বের সহিত একাকার হইবার চেষ্টায় পঞ্চত্বলাভ ছাড়া আমার অন্য কোনো গতি থাকে না।

গণ্ডীর পরে গণ্ডী, চক্রের পরে চক্র কাটিয়া বিধাতা এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। পৃথিবীর গণ্ডী পৃথিবীর, সূর্যের গণ্ডী সূর্যের, তৃণের গণ্ডী তৃণের, মানুষের গণ্ডী মানুষের। স্বাভাবিক গণ্ডীর বিরুদ্ধে লড়াই করাই যে উন্নতিশীলতার লক্ষণ এ কথা মনে করি না।

আবার আমাদের স্বরচিত গণ্ডীও আছে। কেননা, বিধাতার সৃষ্টিকার্যেও যেমন মানুষের সৃষ্টিকার্যেও তেমনি – গণ্ডী দিয়া দিয়াই গড়িয়া তুলিতে হয়। মানুষের ঘরবাড়ি একটা গণ্ডী, তাহার পরিবার একটা গণ্ডী, তাহার ব্যবসায় একটা গণ্ডী। প্রত্যেক গণ্ডীর মধ্যে বিশিষ্টতা আছে, সেই বিশিষ্টতার দ্বারা মানুষ আপন ঘরে আপন পরিবারে আপন ব্যবসায়ে স্বতন্ত্র। এমন কি সামান্য ছাতাজুতা ঘটিবাটিও সরকারী নহে, এবং কেহ তাহাকে সরকারী করিবার চেষ্টা করিলেই থানায় খবর দিতে হয়।

তাই যদি হইল তবে সর্বজনীনতা বলিয়া একটা পদার্থ কি একেবারেই আকাশকুসুম? যদি সকলপ্রকার গণ্ডীকে, সকলপ্রকার বিশিষ্টতাকে একেবারে অস্বীকার করাকেই সর্বজনীনতা বলে তবে সর্বজনীনতা বস্তুতই আকাশকুসুম সন্দেহ নাই। ভাইকে মানি না কিন্তু ভ্রাতৃভাবকে মানি, এ কথাটাও যেমন তেমনি সর্বজনকে বিশেষ বলিয়া মানি না একটা নির্বিশেষ সর্বজনীনতাকে মানি ইহাও সেইরূপ মাথা-নেই-তার-মাথা-ব্যথা। প্রত্যেকের বিশিষ্টতা আছে বলিয়াই সেই অগণ্য বিশিষ্টতার মধ্যে ঐক্য উপলব্ধি করার সাধনা সর্বজনীনতা—নতুবা তাহার কোনো প্রয়োজন নাই। বিশিষ্টতাকে স্বীকার করা যে কুসংস্কার এইরূপ সৃষ্টিছাড়া কথাই অন্ধ সংস্কার। অতএব হিন্দুত্বের

সংকীর্ণ গণ্ডী কাটাইয়া যাওয়াকে উন্নতিশীলতা বা কোনো শীলতাই বলে না, তাহা একটা ব্যর্থবাক্য উচ্চারণ মাত্র।

ভূতের বিশ্বাস পৃথিবীতে সকল জাতির মধ্যেই ন্যূনাধিক পরিমাণে আছে;—যখন বলা যায় আমি এই ভূতের বিশ্বাসের কুসংস্কার কাটাইয়াছি তখন এমন কথা বলা হয় না যে আমি মনুষ্যত্বের সংকীর্ণ গণ্ডী অতিক্রম করিয়াছি।

তেমনি হিন্দুসমাজে যে কুসংস্কার প্রচলিত আছে যদি কোনো হিন্দু সে সংস্কার কাটাইয়া থাকেন তবে তাঁহাকে কুসংস্কারহীন হিন্দু বলিব, অহিন্দু বলিব না। কুসংস্কারই হিন্দুর স্থায়ী পরিচয় এমন অদ্ভুত কথা কোনোমতেই বলা চলে না। এ কথা আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে, অন্ধসংস্কার মানুষের সকল জাতির মধ্যেই আছে কিন্তু বিধাতার রাজ্যে অন্ধসংস্কারের স্বভাবই এই যে তাহা নিত্য নহে; বস্তুত এই জন্যই উন্নতিশীল হওয়া সম্ভব, এবং এই জন্যই আদি ব্রাহ্মসমাজের অথবা অন্য যে কোনো সম্প্রদায়ের মানুষ যতই মূঢ় ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন হই না তৎসত্ত্বেও আমরা উন্নতিশীল, কারণ, আমরাও মানুষ। তাই যদি না হইবে তবে পৃথিবীতে ধর্মসংস্কারকের মতো উন্মত্ত পাগল আর তো কেহই নাই। সত্যমেব জয়তে. এই বাণী বিশ্বচরাচরে কেবল হিন্দুসমাজেই অসত্য, বিশ্ববিধাতা কেবল এই হিন্দুসমাজেই পরাস্ত হইয়া হাল ছাড়িয়াছেন—অসাধারণ উন্নতিলাভ করিলেও এমন কথা বলিতে পারিব না। অতএব হিন্দুসমাজের প্রচলিত ভ্রম ও অন্ধসংস্কার বর্জন করার দ্বারাই যদি আমরা অহিন্দু হই তবে শিশু রাম কথা কহিতে শিখিলেই শ্যাম হইয়া যায় এ কথাটা বলা চলে। তাহাকে বালক রাম বা যুবক রাম বা সুবুদ্ধি রাম বল তাহাতে কোনো বাধা নাই কিন্তু তাহাকে রামই বলিব না এমন পণ করিলে মানুষের নিত্যই নূতন নামকরণ করিয়া চলিতে হয়।

যাঁহারা আমার প্রবন্ধ ভালো করিয়া না পড়িয়াই বিচলিত হইয়া উঠিয়াছেন তাঁহাদের ভাবখানা এই যে, “তুমি আমাকে হিন্দু বলিতেছ তবেই তো বলা হইতেছে আমি পৌত্তলিক, আমি জাতিভেদ মানি আমি ইত্যাদি ইত্যাদি; তুমি নিজের সম্বন্ধে এমন কথা বলিতে পার, কেননা, তুমি কুসংস্কারাপন্ন, তুমি সাধারণ বা নববিধান ব্রাহ্মসমাজের নও, তোমার পিতা এমন কাজ করিয়াছেন, তিনি এমন কথা বলিয়াছেন ইত্যাদি ইত্যাদি।”

বস্তুত আমার পিতা যদি অত্যন্ত সংকীর্ণ সংস্কারের অনুদার প্রকৃতির লোক ছিলেন ইহাই প্রকৃত সত্য হয় তবে আমার পিতাকে আমি তো পিতারূপে ত্যাগ করিতে পারিব না। যদিও বা আমার কোনো একটা অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় তাহা আমার ইচ্ছার মধ্যেও

উদয় হয় তথাপি তাহা আমার সাধ্যের মধ্যে নাই। আমারই পিতার সন্তান যে আমি, এ গণ্ডী বিধাতার গণ্ডী। সুখের বিষয় এই যে, এই গণ্ডী স্বীকার করিয়াও আমি সর্বজনীন হইতে পারি, এমন কি, কোনো একদিন হঠাৎ কায়ক্লেশে উন্নতিশীল হইয়া উঠাও আমার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব নহে। হিন্দুত্বের গণ্ডীর মধ্যেও বিধাতার সেই বিধান আছে বলিয়াই তাহা নানা পরিণতির মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়াছে এবং এখনও হইবে,—হিন্দুসমাজের মধ্যেও সেই সত্যস্বরূপ বিধাতার বিধান কাজ করে বলিয়াই এই সমাজেই আজ আমরা রামমোহন রায়ের অভ্যুদয় দেখিলাম। ইহাতেও কি বিধাতার উপরে বিশ্বাস জন্মে না, সত্য বিধানের প্রতি নির্ভর বাড়ে না? হিন্দুসমাজে ভ্রম আছে, অন্ধসংস্কার আছে, সবই আছে মানি কিন্তু তাহার চেয়ে বেশি করিয়া মানি হিন্দুসমাজেও সত্য আছেন, মঙ্গল আছেন, ব্রহ্ম আছেন। হিন্দুসমাজের মধ্যে আমি সেই সত্যের দিকে মঙ্গলের দিকে ব্রহ্মের দিকে দাঁড়াইব ইহাই যেন আমার সংকল্প হয়। সাধক যাঁহারা তাঁহারা সকল সমাজেই সত্যের দিকেই নিজের জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহারই অভিমুখে সকলের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করেন। যেখানে অসত্যের অজ্ঞানের প্রভাব বেশি সেইখানেই সত্যকে তাঁহারা দেখেন ও সত্যকে তাঁহারা দেখান, ইহাই তাঁহাদের ব্রত। দুর্গতির মধ্যে যে সমাজ উপনীত হইয়াছে তাহাকে তাঁহারা ত্যাগ করেন না, কারণ তাঁহাদের এই বিশ্বাস অটল যে দুর্গতি কখনোই নিত্য হইতে পারে না এবং যিনি পরমাগতি তিনি দুর্গতির মধ্যেই আপনাকে একদা পূর্ণতমরূপে প্রকাশ করেন। বস্তুত যথার্থ প্রেমের সাধনা, শক্তির সাধনা, সেইখানেই সেই দুর্যোগে সেই দুর্দিনে। আমাদের আত্মাভিমান সেখান হইতে দূরে যাইতে চায়, আমাদের সাম্প্রদায়িক অসহিষ্ণুতা তাহার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিয়া বিমুখ হইয়া থাকে, কিন্তু সেই ঘৃণাই বিশ্বজনীনতার লক্ষণ নহে—কিন্তু যে দুর্গতিগ্রস্ত তাহাকেই আপন বলিয়া স্বীকার করার মধ্যেই যথার্থ সর্বজনীনতা আছে। কারণ, সর্বজনীনতা কেবল একটা বস্তুবিহীন বাক্য মাত্র নহে, তাহা অহংকৃত আত্মপরিচয়ের একটা স্বরচিত উপাধি মাত্র নহে; তাহা প্রেমের জিনিস, এই জন্যই তাহা সত্য। সেই প্রেম সকলের চেয়ে নীচের মধ্যে আপনাকে বদ্ধ করিয়াও সকলের চেয়ে উচ্চে আপনার স্থান লাভ করিয়া থাকে; সীমার মধ্যে বাস করিয়াও প্রতিমুহূর্তে সেই সীমাকে অতিক্রম করিয়া বিরাজ করে।

ব্রাহ্মধর্ম হিন্দু-ইতিহাসের একটি বিকাশ, এই কথা আমরা বলিয়াছি। অর্থাৎ ব্রাহ্মধর্ম যতবড়োই সর্বজনীন ধর্ম হউক না, বিধাতার সৃষ্টির নিয়ম তাহাকেও মানিতে হয়, নতুবা তাহা সত্যই হইতে পারে না। অতএব বিশেষ দেশে ও বিশেষ কালে তাহার উদয় হইয়াছে ব্রাহ্মধর্মের এই ঐতিহাসিক বন্ধনটুকু স্বীকার করিতে

লজ্জা বা ক্ষোভের কোনো কারণ থাকিতে পারে না। যদি ইতিহাসকে মানি, যদি হিন্দু-ইতিহাসের মধ্যে ব্রাহ্মধর্মের প্রকাশরূপ ঘটনাকেই একেবারে অস্বীকার করিয়া না বসি তবে সেই ঐতিহাসিক ঘটনাটার সুস্পষ্ট অর্থই এই যে, হিন্দুর প্রকৃতির মধ্যে ও অবস্থার মধ্যে এমন কতকগুলি সমাবেশ আছে যাহাতে এই ধর্ম এইপ্রকার রূপ লইয়া এইখানেই ব্যক্ত হইতে পারিয়াছে।

হিন্দু-ইতিহাসের মধ্যে এই যে ব্রাহ্মধর্মের প্রকাশ, ইহার কারণরূপে নানা শক্তির খেলা থাকিতে পারে। হয়ত বিদেশের আঘাত তাহার মধ্যে একটা কারণ। অর্ধরাত্রে ভূমিকম্পে আমাকে জাগাইয়াছিল, তাই বলিয়া জাগরণটা ভূমিকম্পের নহে সেটা আমারই জাগরণ। যদি ইহাই প্রকৃত সত্য হয় যে, কোরাণ পুরাণ বাইবেল বৌদ্ধশাস্ত্র এবং দেশদেশান্তরের যত কিছু ধর্মগ্রন্থ ও ধর্মসমাজ আছে সকলে একত্রে মিলিয়া তিলোত্তমার সৃষ্টির ন্যায় এই ব্রাহ্মধর্মকে সৃষ্টি করিয়া থাকে তথাপি এইরূপ অদ্ভুত সৃষ্টি যদি হিন্দুর ইতিহাসেই সম্ভবপর হইয়া থাকে তবে তাহা হিন্দুরই। সূর্যের আলোক সূর্যেই সম্ভবপর হইয়াছে,— কেহ কেহ বলেন সূর্য অসংখ্য উল্কাপিণ্ডকে নিরন্তর আত্মসাৎ করিয়া সেই আলোকের সঞ্চয় রক্ষা করিতেছে; তাহা সত্যও হইতে পারে, নাও হইতে পারে, তথাপি এই আলোক সূর্যেরই। আমি শাক খাইয়া ফল খাইয়া দুধ মাছ ভাত খাইয়া প্রাণধারণ করিতেছি বটে তাই বলিয়া আমার প্রাণকে আমারই প্রাণ বলিয়া স্বীকার না করিয়া ঐ শাকভাতকেই স্বীকার করিলে কি অত্যন্ত ঔদার্য প্রকাশ করা হয়? প্রত্যেক ধর্মেরই উৎপত্তি সম্বন্ধে তর্ক আছে। কেহ বলেন, খ্রীস্টানধর্ম বৌদ্ধধর্ম হইতে চুরি, কেহ বলেন বৈষ্ণবধর্ম খ্রীস্টানধর্ম হইতে চুরি, এমনতর আরো অনেক বাদবিবাদ আছে—তেমনি হয়তো কালক্রমে কোনো ঐতিহাসিক প্রমাণ করিয়া দেখাইবেন ব্রাহ্মধর্ম জগতের সকল ধর্মের চোরাইমালের ভাণ্ডার। কিন্তু উৎপত্তিঘটিত সমস্ত বাদবিবাদ সত্ত্বেও খ্রীস্টানধর্ম খ্রীস্টানধর্মই, বৈষ্ণবধর্ম বৈষ্ণবধর্মই। খ্রীস্টানধর্ম যদি বৌদ্ধধর্মকে আত্মসাৎ করিয়া থাকে, বৈষ্ণবধর্ম যদি খ্রীস্টানধর্মকে আত্মসাৎ করিয়া থাকে, তবে তাহাতে তাহার অস্তিত্ব লোপ হয় নাই, তাহার গৌরব খর্ব হয় নাই। অনাত্মকে গ্রহণ করিয়া আত্মীয়ে পরিণত করিবার শক্তিই জীবনের শক্তি—অনাত্মের মধ্যে আত্মবিশেষত্ব বিলুপ্ত করিয়া দেওয়াই মৃত্যুর লক্ষণ। অতএব যেমন করিয়াই বিচার করি, হিন্দুর ইতিহাসে ব্রাহ্মধর্মের বিকাশ স্বদেশীয় বিদেশীয় যত কিছু কারণপরম্পরা অবলম্বন করিয়াই দেখা দিক্ না তথাপি তাহা হিন্দুরই সামগ্রী। এই ইতিহাস আমার ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর নির্ভর করিতেছে না—ইহা আমার প্রিয় হইলেও, সত্য অপ্রিয় হইলেও সত্য। কিন্তু সকলের চেয়ে

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তত্ত্বকৌমুদী-সম্পাদক মহাশয় আমার উক্তি স্বীকার করিয়াও আমার প্রবন্ধের প্রতি বিরুদ্ধভাব ধারণ করিয়াছেন। তিনি একজায়গায় স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, "ব্রাহ্মধর্ম কেবল যে হিন্দুদের মধ্যেই আবদ্ধ থাকিবে তাহা নহে, ব্রাহ্মগণ কেবল যে হিন্দুবংশোদ্ভব ব্যক্তিগণের মধ্যেই অবস্থিত থাকিবেন তাহা নহে, সর্বদেশের লোক এই উদার ধর্ম গ্রহণ করিতে পারিবেন।"[১] আমি তো সর্বদেশের লোককে ঠেকাইয়া রাখিবার জন্য ব্রাহ্মধর্মের দরজায় কুলুপ লাগাইতে চেষ্টা করি নাই। হিন্দুও যে ব্রাহ্ম হইতে পারেন এই কথাই আমি বলিয়াছিলাম, কিন্তু "ব্রাহ্মধর্ম কেবল হিন্দুদের মধ্যে আবদ্ধ থাকিবে" এমন অদ্ভুত কথা আমি কোনোদিন বলি নাই।

তত্ত্বকৌমুদী-সম্পাদক মহাশয় প্রশ্ন করিয়াছেন, ব্রাহ্মসমাজে যে সকল য়িহুদী মুসলমান য়ুরোপীয় আশ্রয় লইতেছেন তাঁহারা কি নিজেদের হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিবেন?[২] পরিচয় নানা প্রকারের আছে—কোনোটা সংকীর্ণ কোনোটা ব্যাপক। আমি ব্রাহ্ম বলিয়া আপনার পরিচয় দিলেই যে আমাকে হিন্দু পরিচয়ও গ্রহণ করিতে হইবে এমন কোনো কথা নাই। একজন ইংরেজ যে-অংশে ব্রাহ্ম কেবল সেই অংশেই হিন্দুর সহিত তাঁহার দেনাপাওনার একটা যোগ থাকিয়া গেল; তাহাতে তাঁহার লজ্জার কারণ কিছুই নাই। আমরা হিন্দু হইয়াও ইংরেজি সাহিত্যে আনন্দ পাই, য়ুরোপীয় চিকিৎসায় প্রাণ বাঁচাই, রেলগাড়িতে অসংকোচে চড়ি, টেলিগ্রাফে খবর পাঠাইয়া দিই—চিন্তামাত্র করি না তাহা আমাদের পিতৃপুরুষের উদ্ভাবিত সামগ্রী কি না। এইরূপে প্রতিদিনই দেখিতেছি বিশেষ মানবজাতির কীর্তিই সর্বসাধারণ মানবজাতির সম্পদ।

বেদান্তদর্শনকে ভারতবর্ষীয় দর্শন বলিয়া সম্পূর্ণ স্বীকার করিয়াও তাহাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করাতে জর্মন পণ্ডিত ডয়সনের যদি জর্মনত্বে কোনো বাধা না ঘটাইয়া থাকে তবে ব্রাহ্মধর্মকে হিন্দু ইতিহাসের সামগ্রী বলিয়া স্বীকার করিয়াও তাহাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে মুসলমানের বা ইংরেজের বা য়িহুদির লেশমাত্র বাধা কেন থাকিবে? সত্যকে কি মানুষ এমনি করিয়াই গ্রহণ করিতেছে না? প্লেটোর রচনা কি গ্রীসের সীমার বাহিরে অস্পৃশ্য? আরিস্টটলের দর্শন কি মুসলমান জ্ঞানী কোনোদিন সত্য বলিয়া গ্রহণ করেন নাই এবং সেই গ্রহণ করিবার শক্তি দ্বারাই কি তাঁহার গৌরবহানি হইয়াছিল? বস্তুত ব্রাহ্মধর্ম বিশেষভাবে হিন্দুর চিত্তের সমস্ত রস লইয়া বিকশিত হইয়াছে বলিয়াই অহিন্দুর পক্ষে তাহার উপাদেয়তা বাড়িয়াছে নতুবা

---

[১] "ব্রাহ্মধর্মের মূল মত ও অবান্তর বিষয়", তত্ত্ব-কৌমুদী ১ বৈশাখ ১৩১৯

[২] "হিন্দু কি?" তত্ত্ব-কৌমুদী ১৬ চৈত্র ১৩১৮

জগৎসংসারে তাহা নিতান্তই বাহুল্য হইয়া থাকিত, তাহা একটা পুনরাবৃত্তিমাত্র হইত, তাহার মধ্যে বিধাতার কোনো বিশেষ বিধান প্রকাশ হইতে পারিত না।

তত্ত্বকৌমুদীর সম্পাদক মহাশয় অনাবশ্যক উত্তেজনার সহিত বারংবার বলিয়াছেন, খ্রীস্ট, মহম্মদ, থিওডোর পার্কার, মার্টিন লুথর, ম্যার্টিনো সকলেই আমাদের গুরু।[1] তিনি তালিকা আরো অনেক বাড়াইয়া দিতে পারেন। তিনি যাহা বলিতেছেন তাহার সংক্ষেপ তাৎপর্য এই যে, মানবসমাজের মধ্যে যে-দেশে যে-জাতির মধ্যে যে কেহ যে-কোনো সত্য আবিষ্কার ও প্রচার করিয়াছেন তিনি সেই বিষয়েই নিখিলমানবের গুরু। ইহাই সম্ভবপর বলিয়া আমরা সত্যকে অপরের নিকট হইতে গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হই না। কিন্তু এই কথা কেবল পরের বেলাই খাটিবে নিজের বেলা খাটিবে না? খ্রীস্টানের সত্য মুসলমানের সত্য আমি গ্রহণ করিতে পারি কিন্তু আমার সত্য আমার বলিয়াই পাছে খ্রীস্টান ও মুসলমান গ্রহণ না করে এই কারণেই তাহা আমার সত্য নয় এমন কথা বলিতে হইবে? বাম হাতের দিকে সত্যকে মানিব আর ডান হাতের দিকে তাহাকে মানিব না? লইবার বেলা এক কথা আর দিবার বেলা তাহার বিপরীত?

সম্পাদক মহাশয় বলিয়াছেন, সব ধর্মই যদি হিন্দুধর্ম হইতে পারে, যদি হিন্দুর বিশেষ ধর্ম কী তাহা আমরা না জানি তবে তো নিজেকে হিন্দু বলাও যা আর সাদা চেকে স্বাক্ষর করাও তা।[2] সকল জাতির মধ্যেই তো সাদা চেকের ফাঁকা জায়গা আছে। কোনো ইংরেজ যদি এরূপ মত প্রকাশ করে যে জাতিভেদ ভালো অথবা জেনেনা প্রথা স্ত্রীপ্রকৃতির পক্ষে যথার্থ অনুকূল তথাপি যে ইংরেজ ইংরেজ তাহার সকল বিষয়ে সকল মতই একেবারে অবিচলিতরূপে পাকা করিয়া স্থির হইয়া বসিয়াছে বলিয়াই প্রত্যেক ইংরেজ আপনাকে ইংরেজ বলিবার অধিকার পাইয়াছে ইহাই কি সত্য? প্রত্যেক ইংরেজের হাতেই সাদা চেকের খাতা আছে তাহাতে তাহার আপনাকে ইংরেজ বলিবার কোনো বাধা ঘটে নাই। সেইরূপ আমরা দেখাইয়াছি হিন্দু কোনো বিশেষ নির্দিষ্ট ধর্মের বা মতের পরিচায়ক নহে কিন্তু সেইজন্যই যদি হিন্দু বলিয়া কিছুই না থাকে তবে মানুষ বলিয়াও কিছু থাকে না, তবে কেহ বলিয়াও কেহ নাই। আমি যে একজন বিশেষনামধারী ব্যক্তি, আমার ব্যক্তিত্ব আশ্রয় করিয়া অসংখ্য পরিবর্তন প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে,—ছেলেবেলা হইতে আজ পর্যন্ত আমি কত ভুল বুঝিয়াছি ও সে ভুল ছাড়িয়াছি, কত মত লইয়াছি ও বিসর্জন দিয়াছি, শিক্ষক মহাশয়ের দ্বারা কাটাকুটি-করা আমার রাশি রাশি এক্সেরসাইজ বহির সঙ্গে আর আমার অদ্যকার

---

[1] "ভারতবর্ষে ব্রাহ্মধর্ম", তত্ত্ব-কৌমুদী : বৈশাখ ১৩১৯

[2] "সাদা কাগজে স্বাক্ষর", তত্ত্ব-কৌমুদী ১ বৈশাখ ১৩১৯

শিক্ষায় একেবারে আকাশ-পাতাল প্রভেদ, আশৈশবকাল হইতে আজ পর্যন্ত নিজের সমস্ত খুঁটিনাটি যদি বিচার করিয়া দেখি তো দেখিব, মতে ভাবে কর্মে আত্মবিরোধের আর অন্ত নাই কিন্তু তৎসত্ত্বেও সেই সমস্ত বিরোধ ও অনৈক্যগুলিও একটি গভীরতম ঐক্যসূত্রে গ্রথিত হইয়াছে ; সেই সূত্রটি আচ্ছন্ন, তাহাকে প্রত্যক্ষ করিয়া নির্দেশ করা কঠিন ;—অনৈক্যের পরম্পরাটাই বাহিরে প্রকাশমান—তবু যে লোক দেখিতেছে সে এই অনৈক্যের মালাকেও মালা বলিয়া দেখিতেছে – সে প্রতিদিনের ভূরি ভূরি বিচ্ছেদের মধ্যেও আমাকে বিচ্ছিন্ন পদার্থ বলিয়া ভ্রম করিতেছে না। অতএব, যেমন সকল জাতিরই, যেমন সকল মানুষেরই, তেমনি হিন্দুরও ইতিহাসে মতের ধর্মের আচারের পরিবর্তনহীন অবিচলিত ঐক্য নাই, সেরূপ ঐক্য থাকিতে পারে না, এবং না থাকাই মঙ্গল। সেইরূপ নিশ্চল ঐক্য আছে বলিয়া যাঁহারা গৌরব বোধ করেন তাঁহাদের সেই গৌরববোধ কাল্পনিক—সেরূপ ঐক্য নাই বলিয়া যদি কেহ অবজ্ঞা প্রকাশ করেন তবে তাঁহাদের সেই অবজ্ঞাও একেবারে অযৌক্তিক।

ভারতবর্ষে হিন্দুজাতির সহস্র বিচ্ছিন্নতার মাঝখানে যে এক প্রবল শক্তি গভীর ভাবে কাজ করিতেছে সেই শক্তি আর্যের সঙ্গে অনার্যকে রক্তে রক্তে মিলাইয়া দিয়াছে, সেই শক্তি শক হূন এবং গ্রীক উপনিবেশগুলিকে আত্মসাৎ করিয়া ফেলিয়াছে, সেই শক্তি শত শত ধর্মমত ও আচারকে আপনার মধ্যে স্থান দিয়াছে এবং সেই শক্তিই সকল ধর্মের অনৈক্যের ভিতর দিয়া অনন্ত সত্যের একটি সুমহৎ ঐক্যকে উপলব্ধি করিবার সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছে। তাহার কার্যক্ষেত্র অতি বৃহৎ তাহার উপকরণ অতি বিপুল বলিয়াই তাহার বাধাও পর্বতপ্রমাণ – কিন্তু এই বাধাই তাহার নিত্য নহে ; সে মহত্তম সত্যকে চায় বলিয়াই গুরুতর ভ্রান্তির সহিত পদে পদে তাহাকে লড়াই করিতে হইতেছে ; সে যে সামঞ্জস্যকে ঘটাইয়া তুলিবার দায়িত্ব নিজের স্কন্ধে লইয়াছে তাহা সংকীর্ণ নহে বলিয়াই তাহার অনৈক্যভারে সুদীর্ঘ পথ সে এমন পীড়িত হইয়া চলিয়াছে কিন্তু তৎসত্ত্বেও এই অনৈক্যরাশিই তাহার চরম সঞ্চয় নহে। আজ যদি এই হিন্দুর ইতিহাসের সমস্ত শিক্ষার ভিতর দিয়া আমরা কোনো একটি ঐক্যের উপলব্ধিকে পাইয়া থাকি তবে অকৃতজ্ঞের মতো কি আমরা এমন কথা বলিতে পারি যে, সাধনা যাহার সিদ্ধি তাহার নহে ; এতদিনের দায়-বহনটা রহিল হিন্দুর, আর সেই দায়-শোধের অঙ্কটা কেবলমাত্র আমাদের সাম্প্রদায়িক ক্ষুদ্র খাতায় জমা করিয়া লইব এবং তাহাকেই নাম দিব অসাম্প্রদায়িকতা ? যেখানেই হিন্দু-ইতিহাসের সফলতা সেইখানেই আমি তাড়াতাড়ি সকলকে ঠেলিয়া ঠুলিয়া সকল হিন্দুর সঙ্গে পৃথক হইয়া নিজের আসনটা চৌকা করিয়া পাতিয়া লইয়া চারিদিকে সাম্প্রদায়িকতার বেড়া তুলিয়া দিব এবং উচ্চৈঃস্বরে বলিতে থাকিব, এস

খ্রীস্টান, এস মুসলমান, এস য়িহুদী, আমরা ব্রহ্মনামের সদাব্রত খুলিয়াছি, কিন্তু এই সদাব্রতের আয়োজনটি হিন্দুর নহে, ইহা কেবল আমাদেরই এই কয়জনের; ইহার মধ্যে অতীতের কোনো সাধনা নাই, চিরন্তনকালের ঐতিহাসিক পরীক্ষাশালার কোনো ছাপ নাই, মানবসমাজে সত্যমাত্রই বিধাতার স্বহস্তস্বাক্ষরিত যে একটি বিশেষ দেশ-কালের পরিচয় লইয়া আসে ইহার মধ্যে সেই স্বাক্ষর নাই, সেই পরিচয় নাই—এই যে আমাদের ভাবাবেগ, এই যে আমাদের আইডিয়াল, কবন্ধের মতো ইহার মুণ্ড নাই কেবল দেহ আছে, ইহার বিশেষত্ব নাই কেবল বিশ্বত্ব আছে; ইহা নিজের পায়ের তলার আশ্রয়কে মাটি বলিয়া অবজ্ঞা করে এবং শূন্যের উপর দাঁড়াইয়া জগৎকে আলিঙ্গন করিতে চায়, তাহাও নিজের হাত দিয়া নহে পাছে সেই নিজত্বের দ্বারা বিশ্বজনীনতার খর্বতা ঘটে।[১] —তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯

হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয় প্রবন্ধটি চৈতন্য লাইব্রেরির অধিবেশন উপলক্ষ্যে রিপন কলেজে ২৯ অক্টোবর ১৯১১ তারিখে পঠিত হয়।

শিক্ষার বাহন ২৪ অগ্রহায়ণ ১৩২২ তারিখে রামমোহন লাইব্রেরিতে পঠিত হয়।

মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন করিবার প্রস্তাব রবীন্দ্রনাথের এই নূতন নহে, ১২৯৯ সালে "শিক্ষার হেরফের"[২] রচনার সময় হইতে তিনি এ-বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন; এবং ১৩৪০ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠিত "বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ"[৩] ও "শিক্ষার বিকিরণ"[৩] প্রবন্ধে ও ১৩৪৩ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক পদবী-সম্মান বিতরণ-সভায় পঠিত "ছাত্র-সম্ভাষণ"[৩] প্রবন্ধেও, প্রসঙ্গক্রমে এ-বিষয়ে মনোবেদনা জ্ঞাপন করেন; ১৩৪৩ সালে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত শিক্ষা-সপ্তাহে পঠিত "শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ"[৩] প্রবন্ধেও দেশের শিক্ষাব্যবস্থার কর্তৃপক্ষের নিকট একই আবেদন জানাইয়া গিয়াছেন। শিক্ষার বাহন প্রবন্ধে তিনি যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন "বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতন বাড়িটার ভিতরের আঙিনায় যেমন চলিতেছে চলুক,— কেবল তার এই বাহিরের প্রাঙ্গণটাতে···

---

[১] আলোচ্য বিষয়টি লইয়া ১৩১৮ ও ১৩১৯ সালের তত্ত্ব-কৌমুদীতে আরও কয়েকটি সম্পাদকীয় মন্তব্য ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ১৩১৯ জ্যৈষ্ঠের প্রবাসীতে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর "ব্রাহ্ম হিন্দু কি অহিন্দু" প্রবন্ধে, ব্রাহ্মগণ হিন্দু, এই মত সমর্থন করেন। ১৩২১ সালের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে অজিতকুমার চক্রবর্তী প্রসঙ্গক্রমে বিষয়টি পুনরুত্থাপিত করেন, তাঁহার আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের মত সমর্থিত হয়; তাহার অনুবৃত্তিরূপ ঐ সালের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ও তত্ত্ব-কৌমুদীতে এ-বিষয়ে অনেক বাদপ্রতিবাদ প্রকাশিত হয়; গুরুচরণ মহলানবিশ, সুকুমার রায়চৌধুরী প্রভৃতি অজিতকুমারের প্রতিবাদ করেন।

[২] রবীন্দ্র-রচনাবলী দ্বাদশ খণ্ড; ঐ খণ্ডে 'শিক্ষা'র গ্রন্থপরিচয়ও দ্রষ্টব্য।

[৩] 'শিক্ষা,' ১৩৫১ সংস্করণ দ্রষ্টব্য।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাটাকে যদি সমস্ত বাঙালির জিনিস করিয়া তোলা যায় তাতে বাধাটা কী?···প্রেপারেটরি ক্লাস পর্যন্ত একরকম পড়াইয়া তার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের মোড়টার কাছে যদি ইংরেজি বাংলা দুটো বড়ো রাস্তা খুলিয়া দেওয়া যায় তা হইলে কি নানা প্রকারে সুবিধা হয় না?" শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ প্রবন্ধেও তদনুরূপ প্রস্তাব করিয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি বঙ্গের তদানীন্তন শিক্ষাসচিব আজিজুল হক মহাশয়কে যে চিঠি লিখিয়াছিলেন নিচে তাহা অংশত মুদ্রিত হইল।

> আমার আর একটি প্রস্তাব আমাদের শিক্ষা-বিভাগের সম্মুখে আমি উপস্থিত করতে চাই। দেশের যে-সকল পুরুষ ও স্ত্রীলোকেরা নানাকারণে বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত, তাদের জন্যে ছোটোবড়ো প্রাদেশিক শহরগুলিতে যদি পরীক্ষা-কেন্দ্র স্থাপন করা যায় তবে অনেকেই অবসরমতো ঘরে বসে নিজেকে শিক্ষিত করতে উৎসাহিত হবে। নিম্নতন থেকে উচ্চতন পর্ব পর্যন্ত তাদের পাঠ্যবিষয় নির্দিষ্ট ক'রে তাদের পাঠ্যপুস্তক বেঁধে দিলে সুবিহিতভাবে তাদের শিক্ষা নিয়ন্ত্রিত হতে পারবে। এই পরীক্ষার যোগে যে-সকল উপাধির অধিকার পাওয়া যাবে, সমাজের দিক থেকে তার সম্মান ও জীবিকার দিক থেকে তার প্রয়োজনীয়তার মূল্য আছে। তাই আশা করা যায়, দেশব্যাপী পরীক্ষার্থীর দেয় অর্থ থেকে অনায়াসে এর ব্যয় নির্বাহ হবে। এই উপলক্ষ্যে পাঠ্যপুস্তক রচনার ক্ষেত্র প্রসারিত হয়ে জনসাধারণের মধ্যে বিদ্যাবিস্তারের উপাদান বেড়ে যাবে এবং এতে করে বিস্তর লেখকের জীবিকার উপায় নির্ধারিত হবে। একদা বিশ্বভারতী থেকে এই কর্তব্য গ্রহণ করবার সংকল্প মনে উদয় হয়েছিল কিন্তু দরিদ্রের মনোরথ মনের বাইরে অচল। তা ছাড়া রাজসরকারের উপাধিই জীবনযাত্রায় কর্ণধার।

"বাংলা দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারেও" ইতিপূর্বে শিক্ষার বিকিরণ প্রবন্ধে তিনি অনুরূপ "আবেদন উপস্থিত" করিয়াছিলেন:

> মস্তিষ্কের সঙ্গে স্নায়ুজালের অবিচ্ছিন্ন যোগ সমস্ত দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে। বিশ্ববিদ্যালয়কে সেই মস্তিষ্কের স্থান নিয়ে স্নায়ুতন্ত্র প্রেরণ করতে হবে দেশের সর্বদেহে। প্রশ্ন এই কেমন করে করা যেতে পারে। তার উত্তরে আমার প্রস্তাব এই যে একটা পরীক্ষার বেড়াজাল দেশ জুড়ে পাতা হোক। এমন সহজ ও ব্যাপকভাবে তার ব্যবস্থা করতে হবে যাতে ইস্কুল-কলেজের বাইরে থেকেও দেশে পরীক্ষাপাঠ্য বইগুলি স্বেচ্ছায় আয়ত্ত করবার উৎসাহ জন্মে। অন্তঃপুরের মেয়েরা কিংবা পুরুষদের যারা নানা বাধায় বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারে না, তারা অবকাশকালে নিজের চেষ্টায় অশিক্ষার লজ্জা নিবারণ করছে এইটি দেখবার উদ্দেশে বিশ্ববিদ্যালয় জেলায় জেলায় পরীক্ষার কেন্দ্র

স্থাপন করতে পারে। বহু বিষয় একত্র জড়িত ক'রে বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিগ্রি দেওয়া হয়, এ ক্ষেত্রে উপাধি দেবার উপলক্ষ্যে সে-রকম বহুলতার প্রয়োজন নেই।

বিশ্ববিদ্যালয় বা গবর্নমেণ্ট হইতে এইরূপ পরীক্ষাকেন্দ্র স্থাপনের ব্যবস্থা হয় নাই বলিয়া, রবীন্দ্রনাথের প্রবর্তনায় বিশ্বভারতী লোকশিক্ষাসংসদ যথাশক্তি দেশের বিভিন্ন স্থানে এইরূপ পরীক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করিতে থাকেন, এই কাজ এখনো চলিতেছে।

পরিচয় গ্রন্থের বর্তমানে প্রচলিত দ্বিতীয় সংস্করণে অনেক পূর্বতন প্রবন্ধ বর্জিত ও নূতন প্রবন্ধ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে; রচনাবলীতে প্রথম সংস্করণের প্রবন্ধসূচী অনুসৃত হইল।

কর্তার ইচ্ছায় কর্ম

কর্তার ইচ্ছায় ১৩২৪ সালের ভাদ্র মাসের প্রবাসীতে প্রকাশিত হয় এবং ঐ বৎসরেই (২২ আগস্ট ১৯১৭) পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। তৎপূর্বে উহা কলিকাতা রামমোহন লাইব্রেরিতে (৪ আগস্ট ১৯১৭) ও ভূপেন্দ্রনাথ বসুর সভাপতিত্বে আলফ্রেড থিয়েটার গৃহে পঠিত হয়।

এই বৎসর আষাঢ় মাসে, ভারতবর্ষে আত্মশাসন-প্রবর্তনচেষ্টার ফলে, "নির্বাসিত, অবরুদ্ধ বা নজরবন্দী শত শত বাঙালীর ন্যায় শ্রীমতী অ্যানী বেসাণ্ট ও তাঁহার দুই জন সহকারীর স্বাধীনতা লুপ্ত"[১] হয়। "কথা হয় যে, টাউন হলে এক সভায় প্রতিবাদ করা হইবে, এবং তথায় বঙ্গের সব জেলার প্রতিনিধি উপস্থিত থাকিবেন। গবর্নমেণ্ট পক্ষ হইতে মিঃ কামিং ও কলিকাতার পুলিশ কমিশনার এই সভার কয়েকজন উদ্যোক্তাকে ডাকিয়া এই জানাইয়াছিলেন যে, বাংলা গবর্নমেণ্ট টাউন-হলে এই সভা হইতে দিবেন না; কেবল মান্দ্রাজ গবর্নমেণ্টের একটি কাজের প্রতিবাদ করিবার জন্য গবর্নমেণ্ট সভা হইতে দিতে পারেন না; অন্য প্রদেশে যাহা হইতেছে, তাহার প্রতিবাদ বা আলোচনা বাংলা গবর্নমেণ্ট বঙ্গে হইতে দিতে পারেন না[২]. কেহ সভা করিয়া প্রতিবাদাদি করিলে

---

[১] প্রবাসী, ভাদ্র ১৩২৪, বিবিধ প্রসঙ্গ, "প্রতিবাদের অধিকার"।

[২] দ্রষ্টব্য পৃ. ৫৬২ :

"দেড়শ বছর ভারতে ইংরেজ-শাসনের পর আজ এমন কথা শোনা গেল মান্দ্রাজ গবর্মেণ্ট ভালোমন্দ যাই করুক বাংলাদেশে তা লইয়া দীর্ঘনিশ্বাসটি ফেলিবার অধিকার বাঙালির নাই। এতদিন এই জানিতাম ইংরেজের অখণ্ড শাসনে মান্দ্রাজ বাংলা পাঞ্জাব মারাঠা ভিতরে বাহিরে এক হইয়া উঠিতেছে এই গৌরবই ইংরেজ সাম্রাজ্যের মুকুটের কোহিনুর মণি। বেলজিয়ম ও ফ্রান্সের দুর্গতিকে আপন দুর্গতি মনে করিয়া ইংরেজ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিতে ছুটিয়াছে, সমুদ্রের পশ্চিমপারে যখন এই বার্তা তখন সমুদ্রের পূর্বপারে এমন নীতি কি একদিনও খাটিবে যে, মান্দ্রাজের ভালোমন্দ সুখদুঃখে বাঙালির কোনো মাথাব্যথা নাই? এমন হুকুম কি আমরা মাথা হেঁট করিয়া মানিব?"

গবর্নমেণ্ট তাহাদের বিরুদ্ধে আইন প্রয়োগ করিবেন।”[1] এইরূপ অবস্থায় রবীন্দ্রনাথ ‘কর্তার ইচ্ছায় কর্ম’ প্রবন্ধ পাঠ করিয়া রাষ্ট্রিক ও সামাজিক আত্মকর্তৃত্ব ও মুক্তির প্রসঙ্গ আলোচনা করেন; জনশ্রুতি, এইজন্য তাঁহার গ্রেপ্তার হইবার সম্ভাবনাও ঘটিয়াছিল।

“যখন বঙ্গের গবর্নর টাউনহলে শ্রীমতী বেসাণ্টের স্বাধীনতালোপের প্রতিবাদ করিতে দিবেন না বলিয়া হুকুম জারি করেন, তখন বাক্যস্ফূর্তি “রাজনীতি-ক্ষেত্রে শিক্ষানবিশ” (“novice in politics”) রবীন্দ্রনাথেরই হইয়াছিল, তখন তিনিই রামমোহন লাইব্রেরিতে কর্তার ইচ্ছায় কর্ম পড়িয়া বঙ্গের ভীতিবিহ্বল নীরবতা ভঙ্গ করিয়াছিলেন, বঙ্গের রাজনৈতিক মহারথীরা করেন নাই।”[2]

“দেশ দেশ নন্দিত করি মন্দ্রিত তব ভেরী” গানটি এই সময় রচিত ও রামমোহন লাইব্রেরির সভায় সর্বপ্রথম সাধারণ্যে গীত হয়; গানটি প্রবাসীতে “কর্তার ইচ্ছায় কর্ম” প্রবন্ধের অনুবৃত্তিরূপে প্রথম প্রকাশিত হয়।

জ্ঞানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, সম্ভবত এই প্রবন্ধে বিবৃত সমাজ-সংক্রান্ত মতামত-প্রসঙ্গে, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পত্রব্যবহার করেন; তদুত্তরে রবীন্দ্রনাথ যে চিঠি লেখেন নিম্নে তাহা মুদ্রিত হইল:

আপনার পত্রখানি পড়িয়া আনন্দিত হইলাম। কিছুদিন হইতে বাংলাদেশের যুবকদের ভাবগতিক দেখিয়া বড়োই হতাশ হইতেছিলাম। স্বদেশভক্তির নাম লইয়া বিচারবুদ্ধির অন্ধতা সমস্ত দেশে ব্যাপ্ত হইয়াছে। এমন কি আমার এই বিদ্যালয়ে অল্পবয়সের যে-সব ছাত্র আসে তারাও এমন একটা বিরুদ্ধ বুদ্ধি লইয়া আসে যে হার মানিতে হয়। যে মূঢ়তা স্বাভাবিক তার প্রতিকার আছে। কিন্তু যে মূঢ়তা কৃত্রিম— যাহা জোর করিয়া কোমর বাঁধিয়া সর্বত্র তাল ঠুকিয়া বেড়ায়, তার সঙ্গে পারিয়া ওঠা দায়। আমি একরকম হাল ছাড়িবার চেষ্টাতেই ছিলাম, এমন সময় এই বক্তৃতার তাগিদ আসিল। আর যাই হোক একটা দেখিলাম, রাক্ষসটাকে যত প্রকাণ্ড প্রবল বলিয়া মনে হইত উহার জোর তত্টা নয়। উহার আয়তন বড়ো, কিন্তু ভিতরটা ভুয়ো। একটু ধাক্কা মারিলেই দেখি টলমল করিয়া উঠে। সুতরাং যে পর্যন্ত না কাত হইয়া পড়ে মাঝে মাঝে ধাক্কা মারিবার সংকল্প রহিল। দূর হইতে আপনাদের উৎসাহবাণী কাজে লাগিবে। ইতি ৬ ভাদ্র ১৩২৪

---

[1] প্রবাসী, ভাদ্র ১৩২৪, বিবিধ প্রসঙ্গ, “প্রতিবাদের অধিকার”।

[2] প্রবাসী, কার্তিক, ১৩২৪, বিবিধ প্রসঙ্গ, “রবীন্দ্রনাথের মহত্ত্ব”।

সংশোধন : অষ্টাদশ খণ্ড

পৃষ্ঠা	ছত্র	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৮৯	২৫	মৃতুদিনের	মৃত্যুদিনের
১৩৫	১০	করো নবগীত	নবগীত করো
৫০৬	২০	রইল	রহিল
৩১	১০ ও ১১	ছত্রের মধ্যে '২' সংখ্যা বসিবে।	
১১৭	১২ ও ১৩	মুদ্রণকালে অক্ষর ভাঙিয়াছে। ছত্র দুইটি যথাক্রমে হইবে : রাতের আঁধার দিনের জ্যোতিতে। প্রতি তুচ্ছ মুহূর্তেরই আবর্জনা করি আমি জুড়ো,	

বর্ণানুক্রমিক সূচী

অঙ্গের বাঁধনে বাঁধাপড়া ... ৭৩
অনেককালের একটিমাত্র দিন ... ৫৮
অনেক হাজার বছরের ... ১৩
অন্য কথা পরে হবে ... ৩০
অশ্রুভরা বেদনা দিকে দিকে ... ১৩২
অসম্ভব কথা ... ২৭০
অসীম আকাশে কালের তরী ... ৩১
অহৈতুক ... ২৭২
আকাশে চেয়ে দেখি .. ৫২
আজ শরতের আলোয় ... ৪৬
আজ শ্রাবণের পূর্ণিমাতে ... ১৩০
আত্মপরিচয় ... ৪৫২
আবাহন ... ২৩৭
আমরা কি সত্যই চাই ... ৩৬
আমায় ক্ষমো হে ক্ষমো ... ১৮৭
আমার এই ছোটো কলসখানি ... ১১৫
আমার এই ছোটো কলসিটা ... ৫৪
আমার কাছে শুনতে চেয়েছ ... ৩৪
আমার জগৎ ... ৪১১
আমার ফুলবাগানের ... ৪৮
আমার রাত পোহাল ... ১৪২
আমার শেষবেলাকার ঘরখানি .. ৯৭
আমি ... ১১৭
আমি কানন হতে ... ১৮৮
আমি বদল করেছি ... ২৮
আর রেখো না আঁধারে ... ১৭৩
আলোকরসে মাতাল রাতে ... ২৪৬

আলোর অমল কমলখানি ... ২২০
আষাঢ় ... ১২০, ২০৯, ৫৩১
আসন্ন শীত ... ২২৯
উৎসব ... ২৪৪
উদ্বোধন ... ১৯৭
ঋষি কবি বলেছেন ... ৭৯
এই যে সবার সামান্য পথ ... ১১৭
একটি ক্ষুদ্র পুরাতন গল্প ... ২৮৯
একদিন কোন্‌ তুচ্ছ আলাপের ... ১০৭
একদিন তুচ্ছ আলাপের ... ৪
একদিন শান্ত হলে ... ১০৮
একলা বসে বাদলশেষে ... ১৩৬
এ কী পরম ব্যথায় ... ১৮৭
এবার অবগুণ্ঠন খোলো ... ১৪০
এস, এস, এস, হে বৈশাখ ... ২০২
এস নীপবনে ... ১২৯
এস শরতের অমল মহিমা ... ১৩৯
ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব ... ১৩৪
ওগো শীত, ওগো শুভ্র ... ২২৯
ওগো শেফালিবনের মনের কামনা ... ১৩৯
ওগো সন্ন্যাসী, কী গান ... ২১২
ওরা এসে আমাকে বলে ... ৭৮
ওরে প্রজাপতি, মায়া দিয়ে ... ২৪৪
ওলো শেফালি ... ১৩৮
কত-না দিনের দেখা ... ২৪২
কর্তার ইচ্ছায় কর্ম ... ৫৪৩
কার বাঁশি নিশিভোরে ... ১৪১
কালবৈশাখী ... ২০৪
কালো অন্ধকারের তলায় ... ২৬
কৃপণতা ... ৫২৫

কেউ চেনা নয় ... ২৪
কেন গো যাবার বেলা ... ২২১
কেন পান্থ এ চঞ্চলতা ... ২১৫
কোথা যে উধাও হল ... ১৩০
কোন্ বারতার করিল প্রচার ... ২০৯
খাতা ... ৩১৭
গগনে গগনে আপনার মনে ... ২১১
গান আমার যায় ... ১৪৩
ঘট ভরা ... ১১৫
চঞ্চল ... ২৪৪
চরণরেখা তব ... ২২২
ছবির অঙ্গ ... ৫১২
জানি তুমি ফিরে আসিবে ... ২৪১
ঝরে ঝর ঝর .. ১৩০
ডাকো বৈশাখ কালবৈশাখী ... ২০৪
ডেকেছ আজি, এসেছি সাজি ... ২২৭
তখন আমার আয়ুর তরণী ... ৯৯
তখন আমার বয়স ছিল ... ১০১
তখন বয়স ছিল কাঁচা ... ৩৮
তপের তাপের বাঁধন ... ২০৮
তুঙ্গ তোমার ধবল-শৃঙ্গশিরে ... ২৩৪
তুমি কি এসেছ মোর ... ১৬২
তুমি গল্প জমাতে পার ... ৮৫
তুমি প্রভাতের শুকতারা ... ৫৬
তোমার আসন পাতব কোথায় ... ২৩৭
তোমার নাম জানিনে ... ১৪১
দিনের প্রান্তে এসেছি ... ১০
দীপালি ... ২২৬
দুঃখ যেন জাল পেতেছে চারদিকে ... ১২৩
দেখো শুকতারা ... ১৩৭

দেহের মধ্যে বন্দী প্রাণের ... ১১৬
দোল ... ২৪৬
ধরণীর গগনের মিলনের ছন্দে ... ১৩৩
ধর্মশিক্ষা ... ৩৭২
ধর্মের অধিকার ... ৩৯৩
ধর্মের অর্থ ... ৩৫৬
ধর্মের নবযুগ ... ৫৪৭
ধূসরবসন, হে বৈশাখ ... ২০৩
ধ্যান-নিমগ্ন নীরব নগ্ন ... ২০১
ধ্বনিল গগনে আকাশ-বাণীর ... ২১৬
নব বরষার দিন ... ১২০
নম, নম, নম। তুমি ক্ষুধার্ত ... ২২২
নম নম নম নম তুমি সুন্দরতম ... ২৩৫
নম, নম, নম, নম। নির্দয় অতি ... ২৩১
নমো, নমো করুণাঘন ... ২০৮
নমো, নমো, হে বৈরাগী ... ২০২
নামকরণ ... ৩৪৩
নির্মল কান্ত নমো হে নমঃ ... ২১৮
নিশীথে কী কয়ে গেল ... ১৫৮
নূতন কল্পে সৃষ্টির আরম্ভে ... ৪১
নৃত্য ... ১৯৯, ২৩০
নৃত্যের তালে তালে ... ১৯৯
পঁচিশে বৈশাখ চলেছে ... ৮৯
পড়েছি আজ রেখার মায়ায় ... ৩২
পথিক আমি ... ৭২
পথিক মেঘের দল জোটে ... ১৩৩
পথে যেতে ডেকেছিল ... ১৭৮
পরানে কার ধেয়ান আছে ... ২০৬
পাগল আজি আগল খোলে ... ২১৮
পাঁচিলের এধারে ... ৫৭

পাড়ায় আছে ক্লাব … ৬২
পিলসুজের উপর পিতলের প্রদীপ … ৬৬
পুব হাওয়াতে দেয় দোলা … ১৩২
পুরবাসী বলে উমার মা … ৩২২
পূর্বগগনভাগে … ১৪৯
প্রত্যাশা … ২০৮
প্রশ্ন … ১১৬
প্রার্থনা … ২৪১
ফুরিয়ে গেল পৌষের দিন … ৫
বজ্রমানিক দিয়ে গাঁথা … ১৩১
বন্ধু, রহো রহো সাথে … ১৩৪
বর্ষা নেমেছে প্রান্তরে … ৮
বর্ষা-মঙ্গল … ২১২
বসন্ত … ২৩৭
বসন্তের বিদায় … ২৪০
বাতাবির চারা … ১০৮
বাদশাহের হুকুম … ৬৯
বাঁধন কেন ভূষণবেশে … ১৫৫
বাঁধন-ছেঁড়ার সাধন হবে … ১৭০
বিলাপ … ২২২
বিশ্বলক্ষ্মী, তুমি একদিন … ৭৫
বৈশাখ … ২০১
বৈশাখ-আবাহন … ২০২
ব্যঞ্জনা … ২০৭
ভগিনী নিবেদিতা … ৪৮৭
ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা … ৪২৩
ভালোবেসে মন বললে … ১৭
ভোরের আলো-আঁধারে … ২১
মধ্যদিনে যবে গান … ২০৫
মধ্যবর্তিনী … ২৫৭

মনে মনে দেখলুম ... ১৪

মনে রবে কি না রবে ... ২৪২

মনের মানুষ ... ২৪২

মনে হয়েছিল আজ ... ২০

মন্দিরায় মন্ত্র তব ... ১৯৭

মর্মবাণী ... ১১২

মুক্তিতত্ত্ব ... ১৭৫

মুক্তিতত্ত্ব শুনতে ফিরিস ... ১৭৫

মাধুরীর ধ্যান ... ২০৫

মুখখানি কর মলিন বিধুর ... ২৪০

যক্ষ ... ১২১

যখন দেখা হল ... ৬০

যায় রে শ্রাবণ কবি ... ২১৪

যে ছায়ারে ধরব বলে ... ১৩৮

যেথা দূর যৌবনের ... ১০৯

যৌবনের প্রান্তসীমায় ... ৬

রঙ লাগালে বনে বনে ... ২৪০

রাগরঙ্গ ... ২৪০

রাঙিয়ে দিয়ে যাও গো ... ২৪৬

রাস্তায় চলতে চলতে ... ২৫

রূপ ও অরূপ ... ৩৩৫

রোগীর নববর্ষ ... ৩৩১

লীলা ... ২১১

লুকানো রহে না বিপুল মহিমা ... ২৩৫

শরৎ ... ২১৬, ৫৩৮

শরৎ ডাকে ঘর-ছাড়ানো ডাকা ... ২১৯

শরতের ধ্যান ... ২২০

শরতের বিদায় ... ২২১

শান্তি ... ২১৮

শান্তি ... ২৭৮

শিউলি-ফোটা ফুরাল যেই	...	২২৪
শিক্ষার বাহন	...	৪৯৭
শীত	...	২২৯
শীতের উদ্বোধন	...	২২৭
শীতের বনে কোন্ সে কঠিন	...	২২৯
শীতের বিদায়	...	২৩৪
শীতের রোদ্দুর	...	৭৪
শীতের হাওয়ার লাগল নাচন	...	২৩০
শিল্পীর ছবিতে যাহা	...	১১২
শুনিতে কি পাস	...	২০৭
শুরু হতেই ও আমার সঙ্গ ধরেছে	...	৪৪
শেষ পর্ব	...	১০৯
শেষ মিনতি	...	২১৫
শেষের রঙ	...	২৪৬
শ্যামল শোভন শ্রাবণ-ছায়া	...	১৩৬
শ্রাবণ, তুমি বাতাসে কার	...	২১৪
শ্রাবণ-বিদায়	...	২১৪
শ্রাবণ সে যায় চলে পান্থ	...	২১৬
সকল কলুষ তামস হর	...	১৮৩
সন্ন্যাসী যে জাগিল ঐ	...	২৪৪
সমস্যাপূরণ	...	৩১১
সমাপ্তি	...	২৯২
সম্পাদক	...	২৫১
সম্বোধন	...	২০৩
সেদিন আমাদের ছিল খোলা সভা	...	৩৯
সোনার কাঠি	...	৫২১
স্তব	...	২৩৩
স্থির জেনেছিলেম	...	৩
স্মৃতি-পাথেয়	...	১০৭

হায় হেমন্তলক্ষ্মী, তোমার … ২২৪
হার মানালে … ১৮৩
হালকা আমার স্বভাব … ৮২
হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয় … ৪৭০
হিন্দু ব্রাহ্ম … ৫৮০
হিমের রাতে ঐ গগনের … ২২৬
হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী … ১৭৬
হৃদয় আমার, ঐ বুঝি … ২০৪
হে ক্ষণিকের অতিথি … ১৪২
হে বসন্ত, হে সুন্দর … ২৩৭
হেমন্ত … ২২৫
হে মহাজীবন … ১৮২
হে যক্ষ তোমার প্রেম … ১২১
হে যক্ষ, সেদিন … ৭৬
হে সন্ন্যাসী, হিমগিরি ফেলে … ২৩৩
হে হেমন্ত-লক্ষ্মী, তব … ২২৫